সূচীপত্র

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা : ৩

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
২২৯	এক সেট সোনার চুড়ি (গল্প)	—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
২৩৪	প্রদর্শনী	—শ্রীকলারসিক
২৩৫	ইন্দ্রপুরী বিষ্ণুপুর (ভ্রমণ কাহিনী)	—শ্রীঅপূর্ববরণ ভাদুড়ী
২৩৭	শব্দকল্পদ্রুম	—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
২৩৮	দেশে-বিদেশে	—
২৩৯	ঘটনা-প্রবাহ	—
২৪০	সমকালীন সাহিত্য	—শ্রীঅভয়ঙ্কর
২৪৬	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
২৫৩	খেলাধুলা	—শ্রীদর্শক

দুটী ঐতিহাসিক উপন্যাস

অমরেন্দ্র দাস-এর

বেগম রিজিয়া

চার টাকা

বিনয় চৌধুরীর

অনুক্ত অধ্যায়

তিন টাকা

মহামতি সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার নন্দন রসিক প্রধানদের নিয়ে এ উপন্যাসের প্রস্তাবনা।

শ্রীপারাবতের

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস

যে জীবন দীন

তিন টাকা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

মাটি ও মানুষ

চার টাকা

"নাট্যকার দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।"

—যুগান্তর

শ্রীমন্ত সওদাগরের

তিলোত্তমা ৩·০০

এর পূরবী ওর বিভাস ৩·০০

যাঁরা সমরেশ বসুর "গঙ্গা" পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পড়বেন।

শক্তিপদ রাজগুরুর

নোনা গাঙ ৩·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস

মধুচক্র ২·৫০

মণ্ডল বুক হাউস

৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সর্বাধুনিক গ্রন্থ

সোনা নয় রূপো নয় ২॥০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি

পোড়ামাটি ডাকঘর ৮৲

মদন ভস্ম ৩৲

আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

২৩, নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

আয় চাঁদ

প্রখ্যাত কথাশিল্পী **সুবোধকুমার চক্রবর্তী** বাংলা-সাহিত্যে এক স্মরণীয় নাম। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। ৩·০০॥

গোধূলির রঙ

প্রথিতযশা কথা-সাহিত্যিক **স্বরেশচন্দ্র শর্মাচার্যের** উপন্যাস। ঘটনার বিন্যাসে ও বুননে হৃদয়স্পর্শী। ৩·৫০॥

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥

স্বনামধন্য সাহিত্যিক **বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের** নবতম উপন্যাস

রূপ হোল অভিশাপ

॥ সাত টাকা ॥

রস-সাহিত্যে **বিভূতিভূষণের** জুড়ি নেই। কিন্তু বিয়োগান্ত রচনাতেও যে তিনি অনন্য, তারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই উপন্যাস।

রূপান্তর (২য় মুঃ) ২·০০॥ **হাসি ও অশ্রু** (সচিত্র) ৩·০০॥

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

বাংলা ছোটগল্পের আশ্চর্য সংকলন

শতবর্ষের শত গল্প

১ম খণ্ড : ১৫·০০॥

২য় খণ্ড : ১২·৫০॥

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

সুবোধ ঘোষের

একটি নমস্কারে (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিষের ধোঁয়া (৭ম মুঃ) ৪·০০ ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

চলাচল (২য় মুঃ) ৬·৫০ ॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মৃগতৃষ্ণা ৩·০০ ॥

সাহিত্যের খবর

(সাহিত্যভাবনা-প্রোজ্জ্বল অভিনব মাসিকপত্র)

শ্রাবণ সংখ্যা : ১৩৬৮

প্রতি সংখ্যা : ৫০ ন প

বার্ষিক : ৬·০০॥

সম্পাদক : **মনোজ বসু**

লেখকসূচী : **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অবধূত, আব্দুল ওদুদ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও অমলেন্দু ঘোষ।** আসামের নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে, ভাষা ও সাহিত্যের অবমাননার বিরুদ্ধে বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ এই সংখ্যায় বাণীরূপ লাভ করেছে।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

অমৃত

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা মূল্য ৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 18th August, 1961
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ যে বাণী প্রকাশ করেছেন, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় তার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি নূতন মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ কেবলমাত্র "আহ্বান" ও "আবেদনের" দ্বারা তাঁর আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সমাধান করেননি। বর্তমান দিনের বাস্তব অবস্থা এবং দেশব্যাপী নৈরাশ্যের ও বিভ্রান্তির চিত্র তাঁর বক্তৃতায় সুস্পষ্ট। তিনি একথা বলেন নি যে, স্বাধীনতার প্রথম চৌদ্দ বৎসরে এবং দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় যা আশা করা গিয়েছিল, তাই লাভ করা গেছে। তিনি বলেননি যে, দেশের মানসিক চিত্র আশাপ্রদ; কিংবা যে সামাজিক প্রগতি এই কয় বৎসরে কাম্য ছিল, তাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যে রূপান্তরিত করা গেছে। তিনি বলেছেন যে, সামাজিক বিপ্লবের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে কতকগুলি ধ্বংসাত্মক শক্তিও দেশে আবির্ভূত হয়েছে। পুরাতন বিভেদ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ, জাতি ও বর্ণভেদের মধ্যে সঞ্চিত অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা এখনও দূরীভূত হয়নি। এখনও মনুষ্যত্বের সমান মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। কাজেই এখনও গণতন্ত্রের মূল উপাদান ও ভিত্তি রচিত হয়নি এবং দেশব্যাপী মানসিক ঐক্যের পটভূমি দৃঢ় হয়নি। তিনি বলেছেন যে, একটি জাতির মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সমগ্র জাতি তার অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ আশার স্বপ্নে একসূত্রে আবদ্ধ হয়। অতীত স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের এই আশাকে জনসাধারণের অন্তরে উজ্জ্বলভাবে রূপায়িত করতে হবে।

বলাবাহুল্য যে, এই বিবৃতির মধ্যে বাস্তবের স্বীকৃতি যেমন আছে, তেমনি গভীর চিন্তাশীলতাও এতে প্রকাশিত হয়েছে। গত সপ্তাহের অমৃত সম্পাদকীয়ের পুনরাবৃত্তি করেই আমরা বলছি যে, বিগত ১৪ বৎসরের ইতিহাসে বহু বেদনা এবং নৈরাশ্য সঞ্চিত হয়েছে, যা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি চিত্র লক্ষ্য করবার আছে। কোনো দেশেরই প্রকৃত উন্নয়ন এবং প্রগতি শুধু মেশিন, বয়লার কিংবা ইস্পাত কারখানার দ্বারা সম্ভব নয়। কিংবা শুধু কাঁচামাল, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং বৈদেশিক সাহায্য কোনো জাতির ভাগ্যকে ফেরাতে পারে না। ভাগ্যের লিখনকে খণ্ডাতে হলে যে জিনিসটি সবচেয়ে মূল্যবান তা হচ্ছে মানবিক উপাদান। আমরা মানবিক উপাদান বলতে শুধু ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার কিংবা বিজ্ঞানীর কথা বলছি না। আমাদের আইনসভায়, আমাদের রাজনীতিতে, সমাজে, শিক্ষায় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে—প্রতি কাজে এবং প্রতি স্তরে খাঁটি মানুষের অভাব ঘটেছে, একথা আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার। পণ্যদ্রব্যের, মেশিনের কিংবা মূলধনের অভাবটাই কোনো জাতির পক্ষে মারাত্মক নয়। যে মানুষ নিষ্ঠায় ও নির্ভীকতায়, পরিশ্রমে এবং গভীর আত্মত্যাগে কোনো উদীয়মান জাতির মেরুদণ্ড নির্মাণ করে, সেই মানুষের অভাব জাতির পক্ষে আরও মারাত্মক। এই মানবিক উপাদান ছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে কোনো স্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য উন্নয়নের বনিয়াদ তৈরী করা সম্ভব নয়।

বিগত মহাযুদ্ধে পশ্চিম জার্মানীর সমস্ত শিল্প এবং কারখানা ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও সেই শ্মশানভূমির উপরে গত ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে জার্মান জাতির অপরিসীম শ্রম এবং নিষ্ঠার ফলে একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক বনিয়াদ এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, পশ্চিম এবং পূর্ব ইউরোপ উভয়েই আজ তার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সন্ত্রস্ত। অদ্যকার দিনে রাশিয়ার বিপুল বৈজ্ঞানিক সাফল্য এবং মহাকাশ যাত্রার অভিযানও বিস্ময়জনক। অথবা অতীতের দৃষ্টান্তরূপে দেখানো যায় যে, দেড়শত বৎসর পূর্বে মার্কিন মুল্লুকে কিছু জমি, ভূগর্ভে প্রোথিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কিছু উদ্বাস্তু ও ভাগ্যহীন মানুষ ছাড়া সেখানে আর কী ছিল? আর কোন্ সভ্যতার ইঙ্গিত ছিল? কিন্তু মাত্র দেড়শত বৎসরের অভিযানে পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী রাষ্ট্ররূপে মার্কিন দেশ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অভিযানগুলি বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূত্র অবলম্বন ক'রে এবং রাজনীতির ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্ত বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও মানব অভিযানের এই সাফল্যের পশ্চাতে একটি জায়গায় সাদৃশ্য ছিল প্রকাণ্ড। বর্তমান জার্মানী, রাশিয়া এবং মার্কিন মুল্লুকে মানবিক উপাদানের অভাব

ঘটেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রচণ্ড শ্রম এবং সাহসের অভিযানে একযোগে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং নিজেদের জাতিগত উচ্চাশা তাঁদেরকে বিপুল বেগে সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করেছিল। এই জাতিগত গর্ববোধ, আত্মবিশ্বাস এবং কর্মিষ্ঠতা না থাকলে কোনো রাজনৈতিক পদ্ধতির টনিক দিয়ে কোনো জাতিকে চাঙ্গা করা যায় না। উচ্চাশার প্রবল তাড়না যদি প্রত্যেকটি ব্যক্তিজীবনকে ঝড়ের মতো এসে নাড়া না দেয়, চারদিক থেকে দুরন্ত অগ্রগতির প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা যদি সমস্ত তরুণ-জীবনকে ক্রমাগত চঞ্চল ও অস্থির করতে না থাকে, যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরম্ভ না হয় এবং যদি ব্যক্তি-জীবনের সেই সংগ্রামের সংগে দেশগত উচ্চাশার একটি সার্থক বন্ধন না স্থাপিত হয় তাহলে কোনো দেশের পক্ষে অগ্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত এবং দেশগতভাবে সেই প্রবল, চঞ্চল, অস্থির উচ্চাশার ঝড় কবে আরম্ভ হবে? কবে, কোন্ ১৫ই আগষ্ট আমরা সেই ঝড়ের মুখে আন্দোলিত ত্রিবর্ণ পতাকার নীচে এসে দাঁড়াব?

স্বাধীনতা : একটি অনুভব

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পেয়েছি তোমাকে, মানি। তবু কেন ভাঙা মতো ঘর?
রাজপথে ভিক্ষাজীর্ণ, উঞ্ছজীবী মনের জগতে!
একটি একটি ক'রে যৌবনের আশা দীপাবলী
নেভে কোনো অন্ধ ফুৎকারে! আজ কুণ্ঠিত অধর

কেন রুদ্ধ, স্তব্ধবাক; কেন আজো সুযোগসন্ধানী
কয়েকটি প্রাণী ছাড়া সকলেই বাঁচে কোনোমতে
ফুটপাথে, বারান্দায়! নিপীড়িত অদৃশ্য শোষণে
যাতনায় ভাঙে ঘাড়, প্রস্তরিত নগরীর পঞ্জি

ভরে আবর্জনা স্তূপে। বিচক্ষণ দেশপ্রেমিকেরা
অতল ক্লান্তিতে হাই তোলে। তিক্ত বন্ধনে শাসনে
গোপন রোষের গ্রন্থি দৃঢ়তর। সমাজের সেরা
গুণিজ্ঞানী নায়কেরা সর্বনাশ প্রত্যাসন্ন জেনে

নিশ্চল, বধির আর বিরত থেকেছে প্রতিবাদে?
পেয়েছি তোমাকে, মানি। তবু কেন হৃদয়সম্পদে
দিন দিন রিক্ততর অরবিন্দ, সুভাষের দেশ?
বিস্মৃত বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রের অমোঘ নির্দেশ।

তোমাকে পেয়েছি, মানি। কিন্তু কর্মে তোমার প্রকাশ
যদি না প্রদীপ্ত হয় তাহলে যে আমাদ সর্বনাশ॥

মেঘনা-কন্যা

কৃষ্ণধন দে

চাঁদ ডুবে গেছে অস্তাচল দ্বীপের কাছে,
সাদা ফেনা বুকে চারপাশে ঢেউ নাচে,
ছুটে-ছুটি করে নীল জল কৌতুকে
কালপুরুষের মাণিক উষার বুকে;
ধ্রুবতারা যেন এখনো নেবেনি আলো,
কণ্ঠে দুলিছে সাতটি ফুলের মালা;
তুমি একা ধীরে ছোট ডিঙিখানি বাহি,
মেঘনা-কন্যা, কোন সুরে গান গাহি?

ম্লান নক্ষত্রেরা শুধায় তোমারে ধীরে—
খোঁজ কোন পথ হারানো তীরে তীরে?
ভোরের কুহেলি কাঁপিছে বাতাস লেগে,
শঙ্খধবল পাখীরা উঠেছে জেগে,
নভোদিগন্তে আলোকের ফুল ফোটে,
রূপালি চুমকি-বুকে ঢেউ নেচে ওঠে;
চলে ডিঙিখানি বালুচরে, বালুচরে,
মেঘনা-কন্যা, কোথা যাও কার তরে?

মন্দ-মন্দেই মাছগুলি অবিরত
ছোটে আশে-পাশে রূপার পাতের মত,
কোথাও শুশুক ডিগবাজি খায় জলে,
কোথাও ঘূর্ণি থাপরা ঘুরায়ে চলে,
কোথাও বা মাটি কূল হতে ভেঙে পড়ে,
একটানা সুরে ভোরের বাতাস ভরে;
এ-পারে ও-পারে আকাশ ছুঁয়েছে ধরা,
মেঘনা-কন্যা, কার লাগি এত ত্বরা?

আঁচল জড়ায়ে হলুদবরণ শাড়ী
কোন সুদূরের সন্ধানে দাও পাড়ি?
ঝড়ো-হাওয়া এসে ওড়ায় যে এলোচুল,
চোখে নেমে আসে কোন দিশাহারা ভুল;
কাঁপে ঠোঁট-দুটি উষার লালিমা লেগে
শেষ কথাটি তার ঢেকে যায় রাঙা মেঘে;
কত দূরে যাও বুকে নিয়ে কোন ব্যথা,—
মেঘনা-কন্যা, বল, বল সেই কথা।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫।১।৬০

"সহজ সুরে সহজ কথা শুনিয়ে
দিতে তোমায়
সাহস নাহি পাই।"

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই বক্রোক্তি করে গেলেন। কিন্তু বিদেশী আলংকারিক বলেছেন, poetry, direct and oblique। সপ্তদশ ও প্রথম অংশের অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু ইংরেজ direct poetryই লিখেছেন। Pope-এর লেখা কবিতা হবে না কেন? তাঁর রচনা প্রায় সবই ত' direct statement। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে রোমাণ্টিক কবিতার প্রতি যে ভয়ংকর ঝোঁক এসেছিল তার জের এখনও কাটেনি, প্রমাণ Dylan Thomas, T. S. Eliot-এর Quartets একটু যেন পাষাণ ভাঙছে। গদ্য যখন অত্যন্ত ঘন হয় তখন সেটা কবিতার কোঠায় ওঠে; শেকসপীয়ারের গদ্যের মতন। বাংলা কবিতায় statement-এর কবিতা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু ঘন নয়, যথা জীবনানন্দের রচনায়। এই ঘনত্বটা কি? চিনি থেকে মিছরি। এটা অবশ্য উপমা; তার বেশী কিছু কি বলা যায়? Classic, romantic, তারও বেশী wise—নয় কি?

৬।১।৬০

রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর সংগীত সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ লিখলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না ভালো হয়েছে কিনা। দু-চারটে বক্তব্য মনে এলো—গুছিয়ে লিখতে পারছি না।

তাঁর সংগীতের বিশেষত্বটুকু কি? ভাষায় অবশ্য সঠিক বলা অসম্ভব। ব্রাহ্ম-সংগীত প্রভৃতি বাদ দিচ্ছি। এ-ছাড়াও প্রায় হাজার দুয়েক গান আছে যেখানে কথা ও সুর মিশে রয়েছে। মিশে থাকার পরও গোটা কয়েক গান থাকে যেখানে কথা ও সুর একদম এক হয়ে যায়। এদের সংখ্যা কম নিশ্চয়, কিন্তু সঠিক বিশেষত্বটি এদেরই নিয়ে। এক এক সময় মনে হয় সেগুলি বাউল, নিতান্ত ভদ্র বাউল। আবার মনে হয়—'নীল অম্বর পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর'; 'ঝর ঝর বরিষে' প্রভৃতিতে কথা ও সুরের ঐক্য রয়েছে—যেন কথার পাশে পাশে সুরের রস। আবার মনে আসে, অত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োজন কিসের? 'হ্যাদে গো নন্দরাণী' ত রয়েছে! আবার বাউলে ফিরে এল না কি?

আমার বক্তব্যটা হোলো এই: কথা ও সুর যদি একই হয়, তবু তাদের অতিরিক্ত সুর, অর্থাৎ সংগীত ও গান, ত' রয়েইছে। সেই অতিরেক হোলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুচারু সমাবেশ; তাইতে ওতঃপ্রোত হোলো অর্থ। অর্থ মানে হোলো ভাবের খেয়াল, mood। এই mood নিয়েই রবীন্দ্রনাথের বাহাদুরি। mood মানে রাগের type নয়, প্রত্যেক গানের বিশেষ বিশেষ mood।

৭।১।৬০

গ্যেটের সাহিত্যে রসিকতা নেই, অন্ততঃ আমি জানি না; অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর। রবীন্দ্র-সাহিত্যে খুবই আছে।

গ্যেটে রঙ, আলো, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তা করেননি, তবে শখ ছিল খুব। বিশ্ব-পরিচয় লিখলেন, কিন্তু কবিতা করে।

গ্যেটের জীবনই সর্বস্ব, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথের ছিল আত্মপ্রকাশ এবং তাইতে আত্মার আনন্দ; গ্যেটের

ছিল—আজকাল। এ ছাড়া দুজনের তফাত কোথায়?

১০।১।৬০

ডায়েরীর পাতা নয়, ভাব আসছে যাচ্ছে, কোনোটা লেখার অক্ষরে আটকা পড়ে, অনেকে পড়ে না। যেটা আটকায় সেটা হালকা। তৎসত্ত্বেও এই হালকা বাঁধনেই একটা গাঢ়তা থাকে। সহজ ভাষা, কিন্তু লেখাটা ঘন যেন। কিন্তু ঘন, গাঢ় মানে dense নয়, compact। দু' চারটে কথার সমাবেশ মাত্র। বক্তব্য ছোট হওয়াই চাই।

ফরাসীরা যাকে maxim, apothegm বলে তাও ঠিক নয়। Wit থাকলে ভালো হয়, না হলেও চলে। Aphorism কি ঠিক তাই? Rest is silence-wisdom-এর মতন, মন্ত্রের মতন ছোট্ট। আমার লেখা ছোট হয়ে আসছে নিশ্চয়—তবু wise হতে পারিনি। Witgenstein-এর মতন লিখতে ইচ্ছে হয়।

১৫।১।৬০।

কামু মারা গেল মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে। নোবেল প্রাইজের কথা মনেই আসছে না, এলো না-এলো বয়ে গেল। প্রায় তাঁর সব লেখাই পড়েছি। Plague-এর মতন ইস্পাতের কলম দিয়ে লেখা. etching যেন। কামু কম্যুনিজম ছেড়ে দিলেন, হয়ত ছিলেনই না কোনো দিন; এলজিয়ারেসের Colon দল পছন্দ কোরতেন না মোটেই; ফ্রান্সের existentialist, Sartre, এদের সঙ্গে তর্ক কোরেছেন। একটা অসম্ভব রকমের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। সাধারণ লোকের মতন ভাবধারা, কিন্তু সত্যকারের intellectual। অ-সাধারণত্ব আর intellectualism এক বস্তু নয়।

ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার এই সাধারণ ভাবধারা সত্ত্বেও কামু নিতান্ত একাকী। Intellectualism-এর পরিণতি এই ভীষণ একাকিত্ব। Plague-এর পর ঠিক এই ধরণের নভেল বেরিয়েছে কি? দুর্ঘটনায় মারা গেল, অবশ্য তার কোনো কারণ নেই, কিন্তু হয়ত কারণ ছিল, তাঁর দুর্নীবার একাকিত্ব। নভেলিস্ট হতে গেলেও অতটা সম্পূর্ণ একাকী হওয়া চলে কি?

১৬।১।৬০

জার্মানীর মধ্যে দুটি পৃথক সত্তা আছে। প্রথমটি হোলো বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমান, সংগীত ও সাহিত্য; দ্বিতীয়টি হোলো একটা কালো, অন্ধকার, অ-সভ্য, টিউটনিক, ল্যাটিন স্বচ্ছতার বিপরীত, মধ্যযুগীয়, এমন কি Primitive। গোটে শীলার বেটোফেন মোটামুটি অ-জার্মান; অন্যদিকে হার্ডারের জার্মানী, ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মলটকে, বার্ণহার্ডি, তারই সঙ্গে ট্রীসকে, রোমেনবার্গ, শেষে হিটলার। পঞ্চাশ লক্ষ য়িহুদী হত্যা। (এ-জাতকে ক্ষমা করা যায় না।) দুটোর সমন্বয় করা অসম্ভব।

ইতিহাস অন্য কথা বলে হয়ত, কিন্তু যেন ইচ্ছা হয় না। এক এক সময় মনে হয় সেই টিউটনিক জাতির Seigfried, সেই তার Wagner, সেই তারই Clauseuritz, তারই Bismarck, তারই Hitler! প্রেমের মধ্যে তলোয়ার! আবার নাৎসী উঠল—আমেরিকানরা কি করেন দেখা যাক! Democratic process সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে জার্মানীতে। রাশিয়ানরা বুঝেছিল, কিন্তু তারা বুঝতে পারলে না এবং বুঝতে দিলে না।

১৭।১।৬০

মনের দিক থেকে খৃষ্টপূর্ব সভ্যতা অপেক্ষা বর্তমান সভ্যতার কোনো উন্নতি হয়েছে কি? একটা axial period হয়েছিল নিশ্চয়; ৬০০।৫০০ খৃঃ পূঃ-এর সময় মানসিক সভ্যতা একেবারে উল্টেপাল্টে যায় নিশ্চয়; আর হয়েছে সপ্তদশ-শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত; আমাদের আবহাওয়াও উল্টে যাবে। ভাবের দিক থেকে অবশ্য নয় মনে হয়। যদি না বদলায় তবে আমাদের উপায় কি? বিংশ শতাব্দীর প্রেম এভাবে চলা উচিত নয়। অন্ততঃ প্রেম নিয়ে নভেল লেখা আজকাল সম্পূর্ণ অচল। সৌহার্দ্য নিয়ে কাজ চালাতে হবে, যথা হেমিংওয়ে।

২০।১।৬০

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে উচ্ছন্ন গেল। কাশী, এলাহাবাদেও তাই বল্লেই হয়। আলিগড়ে তহবিল নিয়ে গোলমাল চলছে, সে সম্বন্ধে একটা সরকারী কমিটি বসেছে। যদি ধরা যায় যে, এটা ছাত্রবিক্ষোভ, তাহলে টাকা খরচ করলেই চলবে; অর্থাৎ ছেলেদের হোস্টেল, খেলাধুলো, টিউটরিয়াল ও মাস্টারদের সংখ্যা বাড়ালেই কিছু উপশম হবে। কিছু—কারণ চীনের ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু খরচ করতেই হবে; আমাদের defence budget নেহাৎ ছোট নয়। তাই মনে হয় এই ছাত্রবিক্ষোভটা অপেক্ষাকৃত ছোট—ছাত্রেরা আসবে—যাবে।

ব্যাপারটা কিন্তু বস্তুত এই—দেশে mass-culture আরম্ভ হয়েছে। এই অর্ধ-শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে দেশ কি উন্নত হবে? আমাদের সিনেমা, আমাদের সাজসজ্জা, আমাদের চলন-বলন, আমাদের image হোলো mass-culture-এর image। গ্যাসেট য়ুরোপে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে যা লিখেছিলেন, এই অর্ধসভ্য অনুন্নত দেশে তাই এল। এথেকে ঠেকানো যাবে না, যদি না দেশে একটা ঘোরতর বিপ্লব বাধে। সেটা হবে না, আমরা সেটা চাইও না। অতএব এই চলবে। ছাত্ররা উন্মাদের মতন একটা না একটা শিক্ষককে দোষী করবেই করবে, সত্য-মিথ্যা তারা যাচাই করবে না। তাদের অবস্থা রুগ্নের মতন, পাগলের মতন, দুঃস্বপ্নের মতন, অর্থাৎ অর্ধ-শিক্ষিতের মতন। এ কয়দিন লক্ষ্ণৌএ যা হয়েছে তাকে দুঃস্থ মনের লক্ষণই বলা যায়; তাদের culture হোলো Borstal Culture।

শুনলাম বিজ্ঞানের ছেলেরা না-কি অন্য রকমের। যদি তা হয় তবে ল' কলেজ আর আর্টসের ছেলেদের কিছু খাটিয়ে নিতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু তারা কি খাটবে? এদের জন্য টিউটরিয়াল করা বিড়ম্বনা। আমার কাছে ৩০ জনের প্রতিদিন 'টিউটরিয়াল' থাকত! আমি পারতাম না, তারাও পারত না।

কি করা যায় ভেবে উঠতে পারছি না। এ-ধরণের ডিমক্রাসীতে বিশ্বাস হারাচ্ছি।

(ক্রমশ)

উইলিয়ম কেরি ও বাংলা গদ্যের আদিপর্ব

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদিপর্বের নায়ক উইলিয়ম কেরি। উইলিয়ম কেরির অবদান বাঙালী তথা ভারতবাসীমাত্রই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। কেরিকে তাই বাংলা গদ্যের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই বাংলা গদ্যের সূতিকাগার। কেননা, ধারাবাহিক বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় এইখানে—কেরির নেতৃত্বে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইতিহাস, আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক, লাতিন ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজ শাসকদের জন্যে বাংলা ভাষার ক্লাশ খোলারও প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। কেননা, ইংরেজ একথা বুঝেছিল যে, রাজ্যশাসন শুধু অসির সাহায্যেই করা যায় না। এ দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্যে ভাষা-শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা সুশাসনের পক্ষে অপরিহার্য। তাই ১৮০১ সালে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে উইলিয়ম কেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ইংরেজ ছাত্রদের বাংলাভাষার পাঠ দেওয়া প্রাথমিক লক্ষ্য হলেও কেরির কল্পনা ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। তিনি বাংলা শেখাতে গিয়ে বাংলায় লিখিত বইয়ের অভাবে যথেষ্ট বিড়ম্বনা অনুভব করতে লাগলেন। সেজন্যে রামরাম বসু ও আরো কয়েকজন পণ্ডিতকে বাংলা বই লেখার কাজে নিযুক্ত করলেন। বাংলার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। কেরির নেতৃত্ব ও উৎসাহে এই পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যে পাঠ্য-পুস্তক রচনা শুরু করেন।

১৮০১ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত কেরির নেতৃত্বে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কেরি, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি আটজন লেখক দ্বারা মোট ১৩ খানি বাংলা বই লিখিত হয়েছিল। তাই এই পর্যায়কে 'কেরির যুগ' এই গৌরবময় আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কথা ছেড়ে দিলে কেরির স্বনামে মাত্র দু'খানা পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাদের নাম যথাক্রমে 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'।

উপরোক্ত রচনা ব্যতীত কেরি ইংরেজী ভাষায় 'বাংলা ব্যাকরণ' ও 'বাংলা-ইংরেজী অভিধান' গ্রন্থ দুটি প্রণয়ন করেন—যা তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। সংস্কৃত, মারাঠী, পাঞ্জাবী, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষারও

উইলিয়ম কেরি

ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি তাঁর নেতৃত্বে পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত হয়। কেরির তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'কাশীদাসী মহাভারত', বিষ্ণুশর্মার 'হিতোপদেশ' ও 'বাল্মীকি রামায়ণ' প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার চর্চা কেরির ধ্যান-জ্ঞান হলেও অন্যান্য ইংরেজী রচনা এবং কৃষি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়েও কেরির অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা ছিল। স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিই কেরি চরিত্রের মহার্ঘ সম্পদ।

উইলিয়ম কেরীর জন্ম ১৭৬১ সালে। পিতার জাত ব্যবসা ছিল বস্ত্র-বয়ন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে তাঁত চালাতে হলেও তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা প্রবল ছিল।

তন্তুবায় পিতার সংস্পর্শেই উইলিয়ম কেরির জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হয়। পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় কেরিকেও ১২ বছর বয়েসে জীবিকার্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হয়। প্রথমে তিনি কৃষি-কর্মে যোগ দেন। এই সময় থেকেই কেরির মনে কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আকর্ষণ জন্মায়। পরে তিনি জুতো তৈরীর কাজ শেখেন। জুতো তৈরী করার কাজের ফাঁকে যেটুকু অবসর পেতেন সেই সময় পিতার আদর্শের অনুকরণে লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষাচর্চা ও পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। এই-ভাবে উত্তরকালে তিনি ফরাসী, ইতালিয়ান ডাচ ভাষাও অবলীলাক্রমে শিখে ফেলেন। ভাষা-শিক্ষার সহজাত ক্ষমতা কেরির আয়ত্ত ছিল। ধর্ম বিষয়ক ঔৎসুক্যও এই সময় কেরির মনে জাগ্রত হয়। প্রথম জীবনে সঙ্গদোষে কেরির চরিত্রের কথঞ্চিৎ স্খলিত হলেও ধর্মযাজকদের সংসর্গে কেরি তা কাটিয়ে ওঠেন। ১৭৮৯ সালে ধর্মযাজকদের অনুপ্রেরণায় কেরি পাদ্রী হলেন। খৃষ্টান পাদ্রী বন্ধু জন টমাস ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কেরি তাঁর অনুরোধে ৩১ বছর বয়েসে সপরিবারে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন ১৭৯৩ সালে। তারপরে কেরি যতদিন জীবিত ছিলেন সেই দীর্ঘ ৪১ বছর এদেশেই তাঁর কর্মময় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮৩৪ সালে শ্রীরামপুরে কেরির দেহাবসান ঘটে।

নিজের স্বার্থের পরিপন্থী হবে—এই আশঙ্কায় কোম্পানী মিশনারিদের দ্বারা এদেশের লোকদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের চেষ্টাকে খুব সুনজরে দেখতো না। বাংলাদেশে কেরির শিক্ষা-প্রসারের পথ তাই প্রথম দিকে সুগম হয়নি। ব্যাণ্ডেল, নদীয়া, সুন্দরবন চতুর্দিকে আস্তানা গাড়ার চেষ্টায় তাই তাঁকে সপরিবারে ঘুরে

SERAMPORE, PRINTED AT THE MISSION PRESS.
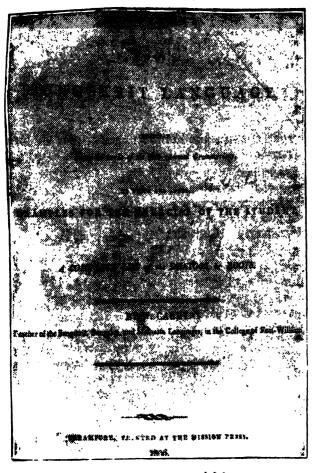
কেরি রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতিলিপি

দৌড়োতে হয়েছে। অবশেষে মালদহের মদনবাটির নীলকুঠীর তত্ত্বাবধায়কের পদ প্রাপ্ত হয়ে তিনি কিঞ্চিৎ স্থিতিলাভ করেন। পারিবারিক জীবনে কেরিকে বহু দুর্দৈবের সম্মুখীন হতে হয়। স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান এবং একমাত্র পুত্রও অকালে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু কোনো কিছুই কেরিকে ভগ্নোদ্যম করতে পারেনি। কেরি দেশীয় ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করার জন্যে ভাষা শিক্ষা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ, শব্দকোষ আয়ত্ত করে চলতি ভাষাকে সংহত করার প্রয়াসও সমানে চললো।

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে ১৮০০ সালে বাংলাভাষায় বাইবেল প্রকাশিত হলো। কেননা, ইতিমধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশন সেখানে কেন্দ্র স্থাপন করে বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র বসিয়েছে। ইংরেজ কোম্পানী নয়, ডেনমার্কের অধীন বলে এই শ্রীরামপুরই হয়ে উঠলো কেরি ও তাঁর সহকর্মীদের খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। কেরি উত্তরকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে বাংলা ভাষার অধ্যক্ষের পদ পেলে তাঁর অবস্থা সচ্ছল হয়। কিন্তু তার আগে দারিদ্র্যে ও নৈরাশ্যে কেরির স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, ফেলিক্স কেরির মত বুদ্ধিমান একমাত্র পুত্র মারা গেছে। ভারতীয় ১৩টি প্রধান ভাষার যে সর্বশব্দকোষ বহু পরিশ্রম করে তিনি 'ইউনিভার্সাল ডিকশনারি' নামে সংকলন করেছিলেন তাও অগ্নিতে ভস্মসাৎ হয় দুর্ঘটনাক্রমে। এই শব্দকোষ সংকলন করার মত শক্তি কেরি আর পাননি। আঘাতে আঘাতে কখনো তবু অটল মানুষটিকে বিপর্যস্ত হতে দেখা যায়নি।

খৃষ্টধর্ম প্রচার বাংলা গদ্যের পথ নির্মাণ, 'দিগদর্শন' বাংলা প্রথম সংবাদ-পত্র 'সমাচার দর্পণ' এবং 'ফ্রেন্ডস অব ইণ্ডিয়া' মত পত্রিকা প্রকাশে মার্সম্যানের সহযোগিতা করা ও বহু ভারতীয় ভাষার ভিত্তি স্থাপন—এ সব ছাড়াও কেরি স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রায় ৮৫ হাজার শব্দ-সম্বলিত বাংলা-ইংরেজী অভিধান তাঁরই পরিশ্রমে প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল তিনি On the Agriculture in India' নামক বক্তৃতামালায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৮২৫ সালে 'এগ্রি-হর্টি-কালচারাল সোসাইটি'র স্থাপন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ সব থেকে সহজেই অনুমেয় যে কি পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন।

কেরিকে প্রকৃতভাবে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বাংলা গদ্যের পথিকৃৎরূপে অভিহিত করা যেতে পারে। কেননা, বাংলা গদ্যের যে আদিমতম নমুনা দেখা গেছে, তার থেকে এ ধারণা স্বভাবতঃই করা যেতে পারে যে কেরির পূর্বে একটি আদর্শ শৃঙ্খলাবদ্ধ লিখিত ভাষার অভাব ছিল। স্ব-স্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই নানাজনে নানা কারণে বাংলা গদ্যের কাঠামোকে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু সেই মূল কাঠামোকে রক্ত-মাংসে সম্পূর্ণ করে তোলার প্রচেষ্টা কারো ছিল না। কোন রকমে বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। পর্তুগীজদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত ব্যাকরণেও স্ব-জাতীয়দের কাছে বাংলা-ভাষাকে বোধগম্য করার কৌশলটুকুই তুলে ধরার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

এই ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ভঙ্গীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বাংলা গদ্যকে এক রীতিসম্মত চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা যে কেরি করেছিলেন, তাঁর রচিত 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' বই দুটি দেখলে সে ধারণা স্পষ্ট হয়।

'কথোপকথনে' বাংলার কোনো কোনো আঞ্চলিক উপভাষার বহু মনোরম নিদর্শন আছে। মেয়েলি কলহ থেকে শুরু করে বাবুর্চি-সাহেবের কথাবার্তা পর্যন্ত অনেক কিছুই বইটির দ্বিভাষিক বাংলা-ইংরিজি কথোপকথনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীরাম-পুর অঞ্চলের সকল শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত এই বইটি মূলতঃ কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষার অনুসরণে রচিত। এজন্যে বলা যায় 'কথোপকথনে'র ভাষা বাংলা চলিত ভাষার পথনির্দেশক।

কথ্য-ভাষার প্রকৃত অমিশ্র রূপ কেরি আয়ত্ত করেছিলেন। ভাষাভাষী জন-

সাধারণের বাক-ভঙ্গিমা ও রীতি অনুযায়ী বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতি ও গঠনসৌকর্য কেরির হাতে ধরা পড়েছিল। 'কথোপকথনে'র মাধ্যমে কেরি বাংলা গদ্যের মূলে স্বভাবটিকে সকলের চোখে তুলে ধরেছিলেন।

এ ছাড়াও কেরির উচ্চাশা ছিল, বাংলা গদ্য-ভাষাকে তিনি উচ্চ পর্যায়ের ধ্রুপদী সাহিত্য রচনার উপযোগী করে তুলবেন। তাই নতুন ভাষার কাঠামোকে অবলম্বন করে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ ব্যবস্থা করেছিলেন। এই চেষ্টাতেই পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি থেকে অনুবাদ গল্প-কাহিনীর সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, যার নাম 'ইতিহাসমালা'। কেরির নিজস্ব রচনা কতটুকু তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। অনুমান করা যায় রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার দুজনের রচনাই কেরির রচনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। অন্ততঃ এ দুজনের প্রভাবাধীনে কেরি সাহিত্য রচনা করতেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রামরাম বসুর প্রভাবাধীনে কেরির লেখা সহজ সরল ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের প্রভাবেই তিনি সাধু ও প্রাঞ্জল গদ্য রচনায় ব্রতী হন। এই প্রভাবে তাঁর ভাষা কিঞ্চিৎ সংস্কৃতানুগ হলেও পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়বদ্ধ ও সাবলীল হয়ে ওঠে।

ডক্টর সুশীল দে যথার্থই বলেছেন—'সপ্তদশ বর্ষব্যাপী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্যের গঠনভঙ্গি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল, তারই পরিণত সুফল নিয়ে দেখা দিয়েছিল এই গ্রন্থের ভাষা। যথার্থ শিল্পের স্বাক্ষরবহনকারী। কিঞ্চিৎ নমুনা দিই—"একজন ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়ে আসিতেছিল। সে স্থানে এক ব্যাঘ্র ঘটককে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।" এইখানে বিষয় বা মাধ্যম অনুযায়ী ভাষার গঠনরীতি সম্বন্ধে কেরির সচেতনতার তারিফ না করে পারা যায় না। পাঠ্যপুস্তক-তালিকাভুক্তি ছাড়াও এ গ্রন্থের কপালে জনপ্রিয়তা জুটলে বাংলা উপন্যাস-সৃষ্টির তারিখ হয়তো অনেক এগিয়ে যেত।'

কেরি হয়তো ধর্মের গোঁড়ামিমুক্ত ছিলেন না। সেকালের পাদ্রী সম্প্রদায়ের পক্ষে তা হওয়াও প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনা, বাস্তববোধ ও মানুষ ও পৃথিবীকে জানবার আগ্রহ এবং সর্বোপরি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠাই আমাদের চোখের সামনে মানুষটির আসল স্বরূপ তুলে ধরে।

কেরি বলেছেন—"My heart is wedded to India, and though I am of little use, I feel a pleasure in doing a little I can."

এই উক্তি কেরির মত মহৎ চরিত্রের মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়াই সম্ভব। বাংলা গদ্যের এই পথিকৃৎ-এর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

জীবনী-পঞ্জী

সংকলয়িতা—সনৎকুমার গুপ্ত

১৭৬১ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট ঃ ইংলণ্ডের নরদাম্পটনশায়ারে পলার্সপিউরি গ্রামে নিতান্ত অখ্যাত পরিবারে উইলিয়ম কেরির জন্ম। পিতা এডমণ্ড তন্তুবায় বৃত্তিধারী ছিলেন—পরে শিক্ষকতাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

১৭৮১ খৃঃ ১০ই জুন ঃ ডরোথি প্লাকেটকে বিবাহ।

১৭৮২ খৃঃ আর্লস বার্টন গ্রামে প্রথম ধর্মকথা প্রচার।

১৭৮৩ খৃঃ ৫ই অক্টোবর ঃ জন রাইল্যাণ্ডের পৌরোহিত্যে দীক্ষিত।

১৭৮৫ খৃঃ মুলটনে গমন।

১৭৯২ খৃঃ মে মাসে ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের সভায় ধর্মের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে আহ্বান জানান।

১৭৯৩ খৃঃ ১৩ই জুন ঃ প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজযোগে ভারতবর্ষ-যাত্রা—১১ই নভেম্বর কলিকাতায় উপস্থিতি।

১৭৯৪ খৃঃ ২৩শে মে—চাঁদুরিয়ায় প্রথম বাঙলায় ধর্মপ্রচার।

১৭৯৭ খৃঃ "নিউ টেস্টামেণ্টের" অনুবাদ শেষ।

১৭৯৮ খৃঃ মদনাবাটির কাছাকাছি জায়গায় মিশন যে প্রেস ক্রয় করে কেরি সেখানে যান প্রেস চালাবার জন্যে।

১৭৯৯ খৃঃ মিসেস কেরি উন্মাদ হয়ে যান—২৫শে ডিসেম্বর কেরি মিশনারীদের কাজে যোগ দেবার জন্য বেরিয়ে পড়েন।

১৮০০ খৃঃ ১০ই জানুয়ারী ঃ কেরি শ্রীরামপুরে আসেন ও এখানে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা। ১৮ই মার্চ ঃ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে কেরি প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ম্যাথু লিখিত সমাচারের মুদ্রণ আরম্ভ, ২৩শে মে চুঁচুড়া-নিবাসী রামরাম বসুর এই মিশনে যোগদান। আগষ্ট ঃ ম্যাথু লিখিত "মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত" প্রকাশিত।

২৮শে ডিসেম্বর ঃ কেরি কর্তৃক ফেলিক্স ও কৃষ্ণ পালকে দীক্ষাদান।

১৮০১ খৃঃ ৫ই মার্চ ঃ "নিউ টেস্টামেণ্টে"র মুদ্রিত আকারে প্রকাশ। "কথোপকথন" প্রকাশ।

৮ই এপ্রিল ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষের আহ্বানে উক্ত কলেজে বাঙলার অধ্যাপকপদ গ্রহণে স্বীকৃতি। ১লা মে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত—রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে সহকারী হিসাবে নিয়োগ। কেরির বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত—রামরাম বসু রচিত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রকাশিত, এই গ্রন্থ কেরির হাতে সংস্কৃত হয়।

১৮০১-৩২ খৃঃ ঃ কেরির উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা, আরবী, ফার্সী, দেবনাগরী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, চীনা প্রভৃতি ভাষায় প্রায় ২ লক্ষ ১২ হাজার বই ছাপা হয়।

১৮০২ খৃঃ কেরি কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত মুদ্রণ ও প্রকাশ।

১৮০৬ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

১৮০৭ খৃঃ মিসেস ডরোথি কেরির মৃত্যু।

১৮০৯ খৃঃ বিখ্যাত লালবাজার চ্যাপেলের প্রতিষ্ঠা।

১২ই মার্চ অগ্নিসংযোগে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ধ্বংসপ্রাপ্তি।

১৮১২ খৃঃ "ইতিহাসমালা" গ্রন্থের প্রকাশ।

১৮১৫-২৫ খৃঃ বাংলা অভিধানের খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ।

১৮২১ খৃঃ দ্বিতীয় পত্নী শার্লটের মৃত্যু।

১৮৩১ খৃঃ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৩৪ খৃঃ ৯ই জুন ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

আরেক লেকে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এখন ছয়টা মোটে সন্ধ্যা ন'টায়।
উড়ে যায় শাদা বক পাখা দুটি মেলে,
ডারওয়েন্ট ওয়াটারে যদিও বা ছায়া পড়ে
সেই দুডানার, ভেসে যায় দূরে দূরে
সেই ছায়া—শেষটায় মিলে মিশে সব
একাকার খণ্ড খণ্ড নীল ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

তারপর যাহা কিছু শুধুই মনের পটে স্মৃতি-রেখা
হয়ে আঁকা থাকে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ;
কোথাও কোথাও সেথা বড়ো ছোট ঘর,
বনচ্ছায়া আচ্ছাদিত মর্মর-মুখর,
অদূরের পাহাড়ের প্রেমে মাতোয়ারা—
যেথা প্রতিক্ষণ এ ধরণী ধরা দেয় নব নব রূপে।

বিকেলের রোদে হাসে ডাফোডিল ক্যামেলিয়া
রোডোডেনড্রন। এধারে ওধারে জলে রাজহংস
মিথুন-মাতাল। বোটে বোটে মুখোমুখি
তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া আর শিশু,
বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও। জীবনের বিচিত্র সম্ভোগ
বিভিন্ন বয়সে। এ লেকেরই চারিদিকে মণিমুক্তো
কবিতা ছড়ানো। কবিতায় যা কিছু সম্ভব,
ক্যামেরায় কতটুক তারে ধরা যায়? তবুও
অসংখ্য লোক প্রতিদিন ছবি নিতে আসে।

কিন্তু কেন নাহি জানি, কেবলই আমার যেন
মনে হয় একালেও সেদিনেরই মতো
নিশ্চয়ই কেউ না কেউ এখানে কোথাও
নিভৃতে একাকী বসে প্রকৃতি পজোয়
পরম নিষ্ঠায় ছন্দে গেঁথে চলে মালা।

ডারওয়েন্ট ওয়াটার লেক,
ইংল্যান্ড,
২৭।৫।৬১

গ্রেট বৃটেনের সৌন্দর্য-নিকেতন লেকল্যান্ড (কাম্বারল্যান্ড)। ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী, সুগভীর হ্রদ-মালা এবং নিভৃততম বহু উপত্যকা-শোভিত লেকল্যান্ডের হৃদপিন্ড কেসউইক। পর্বত-পরিবেষ্টিত এই অঞ্চল বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের লীলাভূমি হিসেবে ধন্য এবং বিখ্যাত ডারওয়েন্ট ওয়াটার লেকও এই শহরেরই প্রায় উপান্তে অবস্থিত।

প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ উত্তর-পশ্চিমে দূরবর্তী আর এক শহর ককার-মাউথে জন্মগ্রহণ করলেও কেসউইকেরই অদূরে এক শান্ত পল্লীতে শান্তি-কুটীর 'ডাভ কটেজ' নির্মাণ করে তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে গেছেন।

ডারওয়েন্ট ওয়াটার ছাড়া লেক-ল্যান্ডের অন্তর্বর্তী বেসেনথোয়েইট, বাটারমিয়ার, গ্রাসমিয়ার এবং থার্লমিয়ার প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেকগুলো কেস-উইক শহরের বার মাইলের মধ্যে অব-স্থিত এবং এখান থেকে দিনের মধ্যেই লেক ডিস্ট্রিক্টের যে কোনো দর্শনীয় স্থান দেখে আসা চলে।

অরণ্য-পর্বত ও হ্রদ-হ্রদয় কেসউইক অঞ্চলটিকে সে জন্যেই বোধহয় কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। 'ডাভ কটেজ' থেকে অল্প দূরেই রাস্তার পাশে কবির সমাধিস্থল পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শুধুমাত্র ওয়ার্ডসওয়ার্থই যে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কাব্য-রচনায় অনুপ্রাণিত হতেন তা নয়, কোল-রিজ, সাদে, শেলী, রাস্কিন এবং আরো পরবর্তী কালের স্যার হিউ ওয়ালপোল প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের অবিস্মরণীয় নাম কেসউইক শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। স্যার হিউ ওয়ালপোল ডারওয়েন্ট ওয়াটার লেকেরই তীরবর্তী ব্র্যাকেনবার্ণ নামক স্থানে বাস করতেন। বাস্তবিক পক্ষে লেকল্যান্ডের যে কোনো লেকই যে-কোনো কবি-প্রাণ মানুষের পক্ষে প্রেরণার উৎস।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'

কুলীন কলকাতার বর্ষায় সে কুল-টুকুও নেই যে বসবো, একটু ভাববো কি করা যায়। কোন ভরসা তো নেই-ই, বরং এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে 'আঁখি সরসা' হবার উপক্রম!

তবে যাঁদের বাড়ি উঁচু পাড়ায়, বাড়িটাও উঁচু- তাঁরা উঁচু জাতের নাও হন যদি তাতে ক্ষতি নেই—সেদিন তাঁরা উঁচু মানের। তাঁদের কেউ কেউ যদি সেদিন পেটের তাগিদে বা কাজের তাগিদে বাইরে বেরিয়ে না থাকেন—তবে তাঁরা রীতিমত সৌভাগ্যবানও বটেন। ঘন বরষায় বিকেলে দিব্যি মুড়ি মাখিয়ে তেলেভাজা খাওয়া, এবং রাত্রে গরমাগরম খিচুড়ি-আলুভাজা (মাছ আনতে কে যাবে?) আর সারাদিনটা জানলার ধারে বসে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলকাতার ভেনিস-নগরী দর্শন করা—যাকে বলে পূর্বজন্মের পুণ্য ফল!

তা, কলকাতার বর্ষা সত্যিই দর্শনীয়। এবং সেই বরষায় রাস্তায় যাঁদের 'আঁখি সরসা' তাঁরাও কম দ্রষ্টব্য নন। আর যেসব ভাগ্যবান বা বতীরা দোতলার জানলা বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে সে দৃশ্য দেখতে পান, তাঁরা তো সেদিন যেন থিয়েটারের পাঁচ টাকার সামনের সীটে বসে একটা অতি বিয়োগান্ত নাটক দেখার 'পুলক' অনুভব করলেন! পৌষ মাস আর সর্বনাশের বহু বাস্তব উদাহরণ সেদিন এই কলকাতার জলীয় রাস্তায় ঘোলা আর নোংরা জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রবাহিত!

বৃষ্টিতে পায়ের-পাতা-ডোবা-জল রাস্তায় জমবার সঙ্গে-সঙ্গেই ট্রামগুলি তাঁদের করুণাময় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাড়াতাড়ি ডিপোতে ঢুকে পড়লেন। যাঁরা পারলেন না, তাঁরা রাস্তার মাঝ-খানে লম্বা হ'য়ে পড়ে পড়ে ভিজলেন। এক বেঘত জল জমবার সঙ্গে-সঙ্গে ঢাউস সরকারী বাসগুলো কোথায় যে উধাও হ'য়ে গেলেন, কে জানে! হিন্দুস্থানী পুলিশগুলো মোষের চামড়ার বুট ভেজবার ভয়ে কোন বাড়ির উঁচু রকে গিয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে চাড়া দিতে লাগলো। বাঙ্গালী মাত্রেই একটু বে-পরোয়া—বাঙ্গালী পুলিশরা আরো বেশী। তাদের অনেকেই ঠিক করলো, চাকরি মাথায় থাক, খুলে ফ্যাল্ পটি-জুতো। চাকরি গেলে চাকরি পাবো, প্রাণটা গেলে কেউ দেবে না। ডাক্তার বিধান রায়ও না। অতএব দেখা গেল হাতে পটি ও বুট ঝুলিয়ে তারা অলি-গলিতে ঢুকলো!

ততক্ষণে রাস্তায় জলের লেভেল কড়াইয়ে দুধ উথলোবার মতই ঊর্ধ্ব-গামী। ফুটপাথ ডুবলো, বাড়ির একটা-দুটো ক'রে সিঁড়ি ডুবলো, সামনের বাড়ির রক ডুবলো এবং শেষ পর্যন্ত রাস্তার জলের কল আর জলের টিউব-ওয়েলগুলোও অমন জল দেখে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসে রইলো।

এবং তারপর যা হলো, তা বৈষ্ণব কবির ভাষায় 'ঘর করিনু বাহির, বাহির করিনু ঘর।' সদর-অন্দর একাকার। নীচের ড্রেনের জল উঠে এলো সদর রাস্তায়; সদর রাস্তার জল ঢুকলো এসে শোবার ঘরে, রান্নাঘরে। পায়খানার 'ময়লা' জল আর রান্নাঘরের কয়লা-ঘুঁটে, হাঁড়ি-কড়াই হাতা-খুন্তিতে দেখা গেল কেমন দিব্যি একটা মাখামাখি ভাব! সর্বত্রই একটা ফ্রী অ্যাডমিশন গোছের আবহাওয়া। নো-অ্যাডমিশন বা 'ফ্রী-পাশ বন্ধ' কথাগুলোও এদিন অচল। এমত অবস্থায় যে-সব গৃহস্থরা উদার মতাবলম্বী তাঁরা শোবার ঘরের চৌকির উপরে বাক্স-বিছানা উঠিয়ে তার ওপর বসে নির্বিকার চিত্তে শ্রীক্ষেত্র দর্শন করতে লাগলেন। ছাত্ররা নতুন ঘরোয়া ভূগোল পাঠে মন দিলো: চৌকি-টুকুই স্থল আর সবই জল। রহস্যবাদীরা নতুন দর্শন আবিষ্কার করলেন: ব্রহ্মাণ্ড জলাকার। ওদিকে মৌলালীর খৃষ্টানরা ডাইনিং টেবিলের উপর চেয়ার পেতে তাতে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন: এইকি বিংশ শতাব্দীর নোয়ার আর্ক? আর হিন্দুধর্মে ছুঁৎ-মার্গে বিশ্বাসী ঠাকুমা-দিদিমারা দাঁড়

হাতে হয়তো-ঘরের কড়ি-কাঠের আংটা খ‌ুঁজতে লাগলেন, যদি ঝুলে থাকা যায় ততক্ষণ, অন্তত এই 'নির্ঘিন্নে' জলের ছোঁয়া থেকে গা-পা সব বাঁচানো যাবে তব‌ু!

বাইরে রাস্তার অবস্থা ততোধিক জলীয়। স্কুল-ফেরৎ ছেলেরা প্রায় সাঁতার

কাটছে। বই খাতাও। ছোট মেয়েরা প্রায়ই স্কুলে বন্দিনী। তবে কোন কোন বাড়ির ভাংগা চাকর তাদের বাচ্চা দিদিমণির স্যুটকেশ একহাতে আর অন্যহাতে দিদিমণিকে বাঁধা-দুই-বিনুনি ঐ স্যুটকেশের হাতলের মতই উঁচু করে ধ'রে (যাতে মাথাটুকু জলের বাইরে থাকে!) কোন রকমে ভাসিয়ে নিয়ে আসচে বাড়ির দিকে! মেজদিদিমণিরাও বই-খাতা ও জুতো বরণ ডালার মত উঁচিয়ে ধরে জল ঠেলে-ঠেলে চলেছেন আর ফোকড় ছোঁড়াগুলো কোন থাকের ('পথে'র আর বাঁশ কি ক'রে?) মোড়ে দাঁড়িয়ে গাইছে : 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভেজাবো না।' বড়দিদিমণিরা এক হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, অন্য হাতে স্যাণ্ডেল সহ ভারাক্রান্ত দেহ ও মন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন জলপথে, যেন, 'আদিম যমক্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে, ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—'! এ'দের মধ্যে যাঁরা 'পতিরতা', তাঁরা হয়তো কর্তার চা-এর জন্যে ব্যাকুল আর খোকনা বা খুকুনির মা'দের চোখগুলো ততক্ষণ ছলছল : ছেলেমেয়েগুলো এতক্ষণ কি করছে, কে জানে!

অথচ তাড়াতাড়ি এগুবারও উপায় নেই। ট্রাম নেই, বাস নেই—সব উধাও। ট্যাক্সি নেই, বেশির ভাগই জলে দেহের কালিমাটুকু ডুবিয়ে রেখে সাদা পাকা মাথাটুকু বার করে আছে 'খালে'র এখানে-ওখানে। আর বাকী সব শোয়ারী ভর্তি। তেমনি ছোট-ছোট প্রাইভেট কারগুলো জলে নাক ডোবানো। গাড়ির চালকরা গাড়ির ছাদে বা বনেটে অবস্থিত। একটু বড় মোটরকারগুলোর পেছনের ধোঁয়া-নলের ধোঁয়া জলের মধ্যে বগ্‌বগ্ করচে, যেন মোটর দণ্ড! লরিগুলো স্টীমার! জলে ঢেউয়ের দোলা দিয়ে দিয়ে এগুচ্ছে। খালি ও খোলা লরিতে বিনা টিকেটের ভিজে প্যাসেঞ্জার ভর্তি। রিক্সার ভাড়া এদিন প্রতি একশ গজ দু' টাকা এবং ঠেলাগাড়ির প্যাসেঞ্জারদের ভাড়া এক টাকা ক'রে প্রতি মাথা! ডালহৌসী টু চাকুরে, সখের-বাজার কিংবা বাগেরবাজার, এড়েদা যাওয়া শ্রীচরণ-দ্বয়ের সাধ্যাতীত ব্যাপার। তার উপর পায়ে-পায়ে জলরাশির জাজ্জ্বল্যমান তামাশা : দেহি পদপল্লবমুদারম্! কাজেই বেলা পাঁচটায় যাঁর ঘরে ঢোকবার কথা, রাত বারোটাতেও তিনি ঘরছাড়া! আর ঘরনীদের ঘরের মধ্যেই ঘোরাঘুরির সার! কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

অনেক মওকা যাঁরা খোঁজেন, তাঁরা বেশ্যের গলে হাতে কলসে-গঙ্গো। যদি সস্তায় ইলিশমাছটা বা তরি-তরকারি হাতানো যায়! মোটরগাড়ি ঠেলে দু' পয়সা কামাবার জন্যে বিড়ি-কানে ছোকরাদের হুড়োহুড়ি! মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের জায়গায় পাড়ার বেকারদের মোটরকার তদারকী,—সবাই যে-যার তালে ব্যস্ত। ওদিকে দোকানদাররা উদ্বাস্তু চালের বস্তা, ময়দার বস্তা সরাতে, কাপড়ের দোকানে কাপড়ের গাঁট সরাতে ব্যস্ত দোকানী, প্রেস-মালিকরা খদ্দেরের রিম-রিম কাগজ নিয়ে নাজেহাল, দপ্তরী ফর্মা বাঁচাতে অস্থির।

কলকাতার সার্কুলার রোডের একটা স্থান আছে, যেখানে সহজে জল জমে না। কিন্তু রাত দশটাতেও এদিন সেখানে হাঁটুজল! মোটরগাড়ির আর মানুষের ঠেলাঠেলি—একটু কম জলে আসবার বাসনা। তাই অত রাত্রেও রাস্তাটা লোকারণ্য। যেন মেলা।

কিন্তু কলেজ স্ট্রীট? অমন জমজমাট রাস্তাটা যেন স্রেফ প্রেতপুরী : গাঁয়ের এক ফালি খাল! ঘুটঘুটে অন্ধকার। নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ। লোক নেই, জন নেই, গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই। দুধারে বাড়ি-বাঁধানো লম্বাটে একটা একটানা খাল! আর ঐ যে ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বইয়ের দোকানগুলো। অন্ধকারে জলে প্রায় গলা ডুবিয়ে বসে আছেন বিদ্যাসাগর, দাঁড়িয়ে প্রফুল্লচন্দ্র!

হাতের ডুবন্ত সাইকেলখানা বুক-জলে ঠেলতে ঠেলতে এগুচ্ছি। দুপাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে হাঁড়ি, কলসী, তোষক, বালিশ, ঝুড়ি, জুতো, বই, কাগজ ইত্যাদি!

হঠাৎ পায়ে যেন ঠেকলো কী! কলেজ স্কোয়ারের কুমীর কিংবা কাছিম ভেসে এলো নাকি? একেই বলে ভাগ্য! কিন্তু পায়ে জড়িয়ে গেল জিনিসটা! তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে দেখি একটা মরা কুকুরের ঠ্যাং চারটে আমার ঠ্যাংকে আঁকড়ে ধরেছে। বাঁচাতে? ইস্! যেন বলছে, পারলে না আমাকে বাঁচাতে? আমিও তো তোমাদের মহানগরীর একজন নাগরিক!

মরা কুকুরটার ঠ্যাং চতুষ্টয় থেকে নিজের ঠ্যাংকে মুক্ত করে নিয়ে ভাবলাম, সত্যিই তো, আমাদের এই প্রতিবেশীদের কথা তো এতক্ষণ মনেই পড়েনি!

আবার এগোতে লাগলাম। পায়ে খোয়া বিঁধতে লাগলো। তবে গর্তে পা পড়বার ভয় নেই, এই যা! কারণ পথের ড্রেনের মুখগুলো তখনো খোলা হয়নি।

ভ্রমেরা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এ-ঘরে নীল আলো জ্বলছিল। সামনের ঘরটায় জোরালো শাদা আলো। মাঝের দরজায় পুরু নীল পরদা। দু'ঘরে পুরো দমে পাখা ঘুরছে। পরদাটা একটু একটু নড়ছে, দুলছে। এ ঘরটা ঠাণ্ডা নীল। ও-ঘরটা খরখরে শাদা। পরদার ফাঁকে নীলের ওপর শাদার ঘা পড়ছে।

এ-ঘরে দত্তসাহেবের মুখে অতিকায় একটা চুরুট পুড়ছে। ও-ঘরে রাগে অপমানে এক মেয়ের বুকের ভিতরটা পুড়ছে। খানিক আগে অসহিষ্ণু পায়ের শব্দ কানে আসতে দত্তসাহেব বুঝেছেন কে এলো। মা নয়, মেয়ে। মায়ের ফিরতে এখনো ঢের দেরি। ক্লাবে তাস খেলা বা পার্টি-টার্টি সেরে তাঁর ফিরতে রাত হয়।

দত্তসাহেব একবার উঠে এসে পরদা সরিয়ে দেখে গেছেন। মেয়ে নিজের ঘরেও যায়নি। মায়ের বিছানাতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। দত্তসাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন খানিকক্ষণ। কি হয়েছে বুঝেছেন। আজ তাহলে স্পষ্ট করেই কিছু জেনে এসেছে, স্পষ্ট করেই কিছু শুনে এসেছে।

দত্তসাহেবের একবার ইচ্ছে হ'ল কাছে গিয়ে দাঁড়ান, গায়ে পিঠে হাত রাখেন, বলেন, কি আর হয়েছে, ওঠ—। মেয়েকে তিনি ভালবাসেন বইকি, একটি মাত্র মেয়ে—কোন্ বাপ ভালো না বেসে পারে। কিন্তু ফল বিপরীত হবে। রাগে আর ক্ষোভে ঝলসে উঠবে। মেয়ের মেজাজ জানেন। মায়ের মেয়ে। মায়ের মনের মত মেয়ে। এই মেয়ের মধ্যে মা নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করছেন, নতুন করে সার্থক করছেন। নতুন করে আর জোরালো করে। বাবা একজন আছেন এই পর্যন্ত—মা-ই সব। এই রাগ আর এই জ্বলুনীর খানিকটা ঘুরে ফিরে তাঁর ওপরেও এসে পড়বে বইকি।

তাছাড়া সান্ত্বনা দেবারই বা আছে কি। সান্ত্বনা কেউ চায় না। হৃদয়ের ব্যাপারে ঘাটতি পড়লে ওটা চলে। সেখানকার কোনো বাঁধন ছিঁড়লে সান্ত্বনার প্রশ্ন ওঠে। এ-ক্ষেত্রে হৃদয় বস্তুটা মান-অপমানের পালিশে ঢাকা। ও-তে আঁচড় পড়লে হৃদয় নড়ে না, স্নায়ু চড়ে। সান্ত্বনার বদলে দত্তসাহেব এখন যদি গিয়ে বলেন, যা হয়েছে তার বিহিত তিনি করবেন, ভালো হাতে শিক্ষা দেবেন—তাহলে বরং কাজ হতে পারে। মেয়ের জ্বালা জুড়বে হয়ত, প্রতিশোধের আনন্দে মুখখানা ঝকমকিয়ে উঠবে।

কিন্তু দত্তসাহেব তাও করলেন না। চুপচাপ ভিতরে এসে বসলেন আবার। চুরুট টানতে লাগলেন।

খানিক বাদে আবারও পায়ের শব্দ কানে এলো। পায়ে-পায়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার এ-শব্দটাও চেনা। মা-ও তাহলে আজ তাড়াতাড়িই ফিরলেন দেখা যাচ্ছে।

কান খাড়া করার দরকার নেই। সুমিতার প্রতিটা কথা আপনিই এ-ঘরে পৌঁছুবে। স্ত্রীটির রাগ যেমন, কথাও তেমনি। দুই-ই জোরালো। প্রায় কর্কশ।

—তুই এভাবে মুখ গুঁজে পড়ে আছিস কেন? ওকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস নাকি! সুড়সুড় করে ওকে ঘাড় গুঁজে আসতে হবে দেখে নিস—চাকরির মায়া নেই? চাকরি করতে হবে না? অপমানের শোধ নিয়ে তবে ছাড়ব—

অপমান। অপমানটাই আসল। দত্তসাহেবের কানের ভিতরটা জ্বালা করছিল। এখন হাসি পাচ্ছে। মা-মেয়ে দুজনেই অপমানে জ্বলছে। অনীতা ঠিক যে-কথা এখন শুনতে চায় সেই কথাই সুমিতা বলছে। এই অপমানের ভয়টা দূর করার জন্যে আর একটা মেয়ের কলজে ছিঁড়ে আনতেও দ্বিধা নেই কারো। সে-দিকটা এরা ভাবছেও না। ভাবার শক্তি নেই।

তুই কাঁদছিস কেন! অসহিষ্ণু বিরক্তিতে মায়ের কণ্ঠ চড়ল আরো।—কালই সোজা ওর কাছে যা—গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় সত্যি কি না। রাগ করার দরকার নেই, কান্নাকাটিরও দরকার নেই—শুধু সত্যি কি না জিজ্ঞাসা করে আসবি, তারপর দেখা যাবে।

এ-ঘরে বসে শশধর দত্ত বিষম অবাক। অনীতা কাঁদছে! অনীতা কাঁদতেও পারে! ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার পর থেকে এই এতগুলো বছরের মধ্যে

কখনো কাঁদতে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না তো।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত কি একটা স্মৃতি ঝলসে উঠল দত্তসাহেবের মনের তলায়। এই এক পরিস্থিতিতে সব মেয়েই কাঁদতে পারে। একদিনের জন্যে, একবারের জন্যে অন্তত পারে। শশধর দত্ত নিজের চোখে দেখেছেন, পারে।

উঠে এলেন। অনীতা সত্যিই কাঁদছে কিনা দেখার জন্যে পরদা সরিয়ে এ-ঘরে এলেন। কাছে এলেন। সুমিতা ফিরে তাকালেন। অনীতাও। তার চোখের পাতা জলে ভেজা। চেয়ে আছে। তাঁর দিকেই চেয়ে আছে।

আবারও হঠাৎই বিষম একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন দত্তসাহেব। শাদা আলো, নীল আলো, ঘরের আসবাবপত্র ঘর বাড়ি সব কিছু চোখের সামনে মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এক নিমেষে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছেন তিনি ঠিক নেই। ...পাথুরে রাস্তা, দুধারে ঝোপ-ঝাড় আগাছা জঙ্গল, পাহাড়, পাথর—ড্রসেরা! বাতাসে হেলছে দুলছে, পড়ন্ত সূর্য-ছটায় নির্যাস-সিক্ত কেশরগুলো দল মেলে নতুন বর্ণালীতে চক-চকিয়ে উঠেছে। ড্রসেরা পাতায় পোকা-মাকড়-কীট-পতঙ্গ... সামনে পাথরের ওপর নারীর কান্না-ভেজা চোখের তারায় বিস্মিত মন্ত্র-মুগ্ধ পুরুষের ছায়া। ড্রসেরার রসসিক্ত চকচকে কেশরগুলোর মত রমণীর নেত্র-পদ্ম সপ-সপে ভেজা।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

দত্তসাহেব আত্মস্থ হলেন, এক নজর দেখেই বুঝেছেন, মায়ের কথা-মত অনীতা যায় যদি সেখানে, অনীতা কাঁদবে। একটা দিনের জন্য একান্ত সান্নিধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁদবে।

না—!

মা মেয়ে দুজনেই ঈষৎ বিস্মিত। সুমিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কি না?

অনীতা যাবে না।

প্রায় আদেশের মত শোনালো। আদেশ শুনতে সুমিতা অভ্যস্ত নন। বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি খবর রাখো কিছু? মিসেস ভঞ্জ ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিয়েটা কবে হচ্ছে, তপন তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এখানে বিয়ে করবে না—শুনেছ?

শুনিনি, বুঝেছি।

বুঝেও কি করছ? মজা দেখছ বসে বসে? এতবড় স্পর্ধা তার হয় কি করে?

দত্তসাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এ-রকম যে হতে পারে সে আভাস তোমাকে আমি আগেই দিয়েছিলাম।

মিসেস দত্তর সব রাগ স্বামীর ওপরে গিয়ে পড়ল বুঝি। কটু-কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, তবে আর কি, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এখন তাহলে তোমার ওই আদরের ছেলের সঙ্গে সেই কেরানী মেয়ের বিয়ে দাও গে যাও। যেমন নজর তেমনি রুচি—শুনলেও গা জ্বলে।

অনীতা অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসেছিল। এবারে বাবার ওপরেই অসহিষ্ণু ক্ষোভে উঠে দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল। দত্তসাহেব সে-দিকে চেয়ে

...উঠে দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল।

দেখলেন একটু। এক ছেলে জায়গা ছাড়লে আর পাঁচজন ছুটে আসবে তাতে তাঁর একটুও সন্দেহ নেই। বললেন, অমন নজর আর ওই রুচি যে-ছেলের তার জন্য তোমাদের এত আক্ষেপ কেন? অন্য ছেলে ঠিক করো—

আর কত সহ্য হয় মিসেস দত্তর। এত অবুঝও হয় মানুষ! তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, তোমার মাথা খারাপ হল? এতদিন বাদে এখন অন্য ছেলে ঠিক করব আমি! এমনিতেই ক্লাবের সবাই তলায় তলায় হাসা-হাসি কানাকানি করছে নিশ্চয়—মিসেস ভঞ্জ কি আর কথা পেটে চেপে বসে আছেন ভাবো? অনির বন্ধুরাই বা বলবে কি, তাদের কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন করে?

এ-সমস্যার সমাধান দত্তসাহেবের জানা নেই। জবাব দিতে পারেন কিছু, কিন্তু তাতে অশান্তি। তিনি নীরব।

—বোসো। যা বলি মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। মিসেস দত্ত যা করণীয় ঠিক করে ফেলেছেন।—অনি না যায় না-ই যাবে, তার না যাওয়াই ভালো, কালই তুমি তপনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো এ-সব কথা কেন আমাদের কানে আসে—! তোমার ভালোমানুষিতেই এত আশকারা পেয়েছে, নইলে এত সাহস তার হয় কি করে? ওকে ডেকে বেশ করে সমঝে দাও, বিহিত যা করার তুমি করো।

দত্তসাহেব স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। চেয়ে থাকতে ভয় নেই।...... কারণ, সুমিতার চোখে জল নেই। জ্বালা আছে। চেয়ে থাকা সহজ। নিজের অগোচরেই দত্তসাহেব মাথা নাড়লেন বোধহয়। বিহিত করবেন।

সুমিতার কথা নরম হল একটু। অবুঝ স্বামীকে আরো একটু বোঝানো দরকার মনে করলেন তিনি। বললেন, তাছাড়া একটা মাত্র মেয়ে, ছেলের অভাব নেই জানি—কিন্তু যে-কোনো এক জায়গায় বিয়ে দিয়ে মেয়ে বিদেয় করলেই তো হল না—বুঝছ না কেন!

বুঝেছেন। নীল পরদা ঠেলে নীল আলোর আশ্রয়ে এসে বসলেন দত্তসাহেব।...... একটা মাত্র মেয়ে কেন, সে-তর্ক তোলার দিন গেছে। দেশের ফ্যামিলি প্ল্যানিংএর সোরগোলের অনেক আগেই সুমিতা তার মর্ম বুঝেছে। তার প্ল্যানিংএ কোনো প্রশ্রয় নেই, প্রতিবাদ অচল।...... একটা মাত্র মেয়ে, সুমিতা কন্যা দান করবে না—মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছেলে আনবে। দত্তসাহেব ভাবছেন, সুমিতার রাগ হবারই কথা, পশু-পাখি পোষার মত মেয়ের জন্য সে মনে মনে পুরুষ পুষেছে একটি। মনে মনে কেন, প্রকাশ্যেই পুষেছে। সেই পোষা-পুরুষ হঠাৎ এমন বেঁকে বসলে সহ্য হবে কেন—স্পর্ধা মনে হবে না?

ভাবতে গেলে স্পর্ধাই বটে। বাঙালীদের মধ্যে বিলিতি তেল কোম্পানীর সব থেকে উচ্চপদস্থ অফিসার দত্তসাহেব। অনেকগুলো বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বাঙালী ছেড়ে কত সাহেব তাঁর অধীনে কাজ করছে ঠিক নেই। তাঁর একটা কলমের খোঁচায় বহুজনের ভবিষ্যৎ জ্বলে যেতে পারে, ঝলসেও উঠতে পারে। সেদিক থেকে ভাবলে ওই সেদিনের এঞ্জিনিয়ার ছোকরার প্রচণ্ড দুঃসাহস বইকি।

এতটা দুঃসাহস তিনিও আশা করেননি। করেননি বলেই কিছু খবর তাঁর কানে আসা সত্ত্বেও একটুও ভাবেননি তিনি। পরে অবশ্য ভেবেছেন। ভেবে স্ত্রীকে বলেছেন। স্ত্রী আমলই দেননি। কোথায় তাঁর মেয়ে আর কোথায় এক কেরানী মেয়ে। শুনে বরং মুখচোরা লাজুক ছেলেটার প্রতি একটু শ্রদ্ধা বেড়েছে তাঁর। একেবারে গো-বেচারা নয় তাহলে। তা' বলে চাঁদ ধরতে পেলে আর চন্দ্রাবলী ধরতে যায় না কেউ। তিনি নিশ্চিত।

ছেলেটার ওপর গোড়া থেকেই চোখ পড়েছিল দত্তসাহেবের। পার্সোন্যাল ফাইল দেখেছেন, প্রথম শ্রেণীর এঞ্জিনিয়ার, আগাগোড়া ভালো রেকর্ড। নম্র, বিনয়ী, মুখে বুদ্ধির ছাপ—কাজেও চটপটে। যোগনাথ হাজরাকে খোঁজ-খবর নিতে বলেছিলেন ছেলেটার সম্বন্ধে। যোগনাথবাবু দত্তসাহেবের পার্সোন্যাল অ্যাসিসট্যান্ট—তাঁরই সমবয়সী। অফিসের সকল খবর আর সকলের খবর রাখেন। অন্তত রাখতে পারেন। তিনিও একবাক্যে প্রশংসা করেছেন ছেলেটার, এত প্রশংসা সচরাচর করেন না।

নতুন ইনস্টলেশান অথবা সাইট দেখার ব্যাপারে ছেলেটাকে মাঝে মধ্যে দত্তসাহেবের বাড়িতে আসতে হত। বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরুতেন দুজনে। দত্তসাহেব স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সুমিতারও পছন্দ হল। পছন্দ হবারই কথা। ছেলেটা মেয়ের বশেই থাকবে মনে হল তাঁর। বড় চাকরির সঙ্গে এই গুণটা খুব সুলভ নয়।

এরপর দত্তসাহেব দায়মুক্ত। যা করার সুমিতাই করবেন। করলেনও। ছেলেটাকে ঘষে-মেজে আর একটু অন্তত চৌকস করে তোলা দরকার—বড় বেশি কাঁচমাচু ভাব সব সময়। আর সেই সঙ্গে বড় সমাজে সচল করা দরকার। সুমিতা প্রায়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে লাগলেন ওকে। নিজে চাঁদা দিয়ে ক্লাবে ভর্তি করে দিলেন। দুদিনের বেশি তিন দিন ক্লাব কামাই হলে মিষ্টি করে চোখ রাঙাতে লাগলেন। ক্লাবের সকলেই সুমিতার ভাবী জামাই চিনল। অনীতার বন্ধুরাও জানল। বাড়িতে অনেকদিন দত্তসাহেব অনীতাকে কড়া মেজাজে কর্তৃত্ব করতে দেখেছেন ছেলেটার ওপর।

কিন্তু এরপর থেকে তাঁর সামনে এলেই ছেলেটা যেন মিইয়ে যেত কেমন। ভয়ানক বিব্রত বোধ করত। সঙ্কোচটা ভাবী সম্পর্কের কারণে ভাবতেন দত্তসাহেব। এত মাথা নিচু করে থাকাটা পছন্দ হত না তা' বলে। যোগনাথবাবু শিগগীরই একদিন এসে মাথা চুলকে জানালেন, ছেলেটি তো খুবই ভালো সার, তবে একটু গোলমেলে ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে।

ব্যাপারটা শুনলেন দত্তসাহেব, কিন্তু তেমন গোলমেলে কিছু মনে হল না তাঁর। এই অফিসের একটি কেরানী মেয়ের সঙ্গে ভাবী জামাই তপনকে নাকি একটু ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা করতে দেখেছেন তিনি। খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, অনেকদিনের হৃদ্যতা দুজনের।

এই অফিসের মেয়ে? কেমন মেয়ে, খুব সুন্দরী? তেমন কিছু না? তাহলে আর কি। তাছাড়া কোথায় তাঁর মেয়ে আর কোথায় কেরানী মেয়ে। সুমিতার মত চাঁদ আর চন্দ্রাবলীর উপমা মনে আসেনি তাঁর, তফাতটা মনে হয়েছে।

কিন্তু নিজের চোখেই একদিন একটা দৃশ্য দেখলেন তিনি। রাস্তা ছেড়ে ময়দান ঘেঁষে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে চলেছে। ছেলেটি তাঁর অফিসের তপন মজুমদার। মেয়েটি কে জানেন না। দত্তসাহেবের কৌতূহল হয়েছিল। তাঁর নির্দেশে ড্রাইভার খানিকটা এগিয়ে গাড়ি থামিয়েছিল। দত্তসাহেব ঘুরে বসে দেখছিলেন। ওরা এগিয়ে আসছে। এগিয়ে গেল। দুনিয়ার আর কোনদিকে চোখ নেই দুজনার কারো। এই মুখের হাসি আলাদা। এই চলার ছাঁদ আলাদা। ভাগ করে চলা, পরস্পরের নির্ভরশীল হয়ে চলা।

যোগনাথবাবু আর একদিন জানিয়েছেন, রেস্তরাঁয় দুজনকে চা খেতে দেখেছেন একসঙ্গে। অদূরে তিনি ছিলেন কেউ লক্ষ্যও করেনি। আর কারো প্রতিই লক্ষ্য ছিল না তাদের। অতএব তাঁর মনে হয় একটু ভাবনার কারণ আছে।

ভাবনার কারণ যে আছে সেটা দত্তসাহেব সেইদিন গাড়িতে বসেই বুঝেছিলেন। ভেবেও ছিলেন। ছেলেটার কেন এমন দ্বিধাগ্রস্ত ভাব সব সময় সেটা এখন অনুমান করতে পারেন।......

মেয়েটাকে সেদিন খুব ভালো করে দেখলেন তিনি। অবকাশ সময়ে মাঝে-সাজে সমস্ত বিভাগে টহল দেওয়ার অভ্যাস আছে। কোনো অ্যাসিসট্যান্টএর ধারে কাছে যান না অবশ্য। মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলে যান শুধু, তাইতেই সমস্ত বিভাগ তটস্থ।

সেদিন একজনের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েটা মুখ গুঁজে কাজ করছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দত্তসাহেব দেখলেন। মেয়েটা ভয়ে কাঠ একেবারে, মুখ ফ্যাকাশে। সুন্দরী নয়। তাঁর মেয়ের কাছে অন্তত কিছুই নয়। তবু সুশ্রী। আর সমস্ত মুখখানায় কমনীয়তা মাখানো। মেয়েটা ভয় পেয়েছে বুঝতে পারছেন। কেন ভয় পেয়েছে তাও বুঝতে পারছেন। দত্তসাহেব অভয় দেবার মত করে হেসেছিলেন হয়ত একটু—কিন্তু মেয়েটির তা চোখে পড়েনি। সে চোখ তুলে তাকায়নি।

সেই দিনই দত্তসাহেব সুমিতাকে আভাস দিয়েছিলেন কিছু। সুমিতা আমল দেননি। তাঁর মেয়ের সঙ্গে কেরানী মেয়ে পাল্লা দেবে এটা বিশ্বাস্য নয়। বিশেষ করে ছেলেটা যখন এই অফিসে চাকরি করে। কিন্তু সেই থেকে দত্তসাহেব ভিতরে ভিতরে ভারী একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ তার ফয়সালা হয়ে গেল।

ঘরের নীল আলো নিভিয়ে দিয়েছেন অনেকক্ষণ। রাত অনেক বোধ হয়। কেউ আর জেগে নেই, শুধু তিনি ছাড়া। মাথাটা বিষম ভার হয়ে আছে। দেরাজের ওপর অনেক রকমের ওষুধ মজুত আছে। প্রেসারের ওষুধ, মাথার যন্ত্রণার ওষুধ, ঘুমের ওষুধ। হাত বাড়িয়ে শিয়রের কাছের বোতাম টিপলে ও-ধারের এক ঘরে কড়কড়িয়ে বেল বাজবে। প্রৌঢ়া পরিচারিকা আর তার পিছনে জনা দুই চাকর দৌড়ে আসবে। দত্তসাহেবের শরীরের ওপর কড়া নজর সুমিতার। পয়সার বিনিময়ে যতটা সেবা-যত্ন কেনা যেতে পারে সে-রকম সব ব্যবস্থা পাকা। রাত্রিতে দত্তসাহেব পারতপক্ষে বিরক্ত করতে চান না তাদের। শুধু ওদের চাকরি রাখা আর কর্ত্রীর সুনজরে রাখার জন্যেই কখনো-সখনো বেল টেপেন।

রাতের এই নির্জনতার একটা চাপ বোধ করছেন আজ তিনি। কাউকে

ডেকে কিছু ওষুধ খাবেন কিনা ভাবলেন। শেষে নিজেই উঠে শুধু জল খেলেন এক গেলাস।

...অনীতাকে তপনের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন তিনি। তিনি করেননি, কেউ যেন তাঁকে দিয়ে করিয়েছে। সুমিতার একটা বিহিত করার হুকুম হয়েছে। ছেলেটাকে ডেকে বেশ করে সমঝে দিতে হবে। কৈফিয়ত নিতে হবে। স্পর্ধা ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু কি করবেন তিনি? কি করার আছে? নরম-সরম ছেলেটার মধ্যে এত জোর আশা করেননি। সেই জোরের ওপর জোর খাটাবেন? কি করবেন?

কিছুই করলেন না। পরদিন শুধু অফিসে নিজের ঘরে ডেকে দু'দিনের জন্য মফঃস্বলের একটা প্ল্যাণ্ট ইনস্-

পেকশনে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। এই করলেন। তাও করতেন না হয়ত। অনীতাকে কাঁদতে না দেখলে কিছুই করতেন না।......ছেলেটার জোর আছে আছে বটে, কিন্তু অনীতার চোখেও জল আছে।

... একবার একটা বোল্‌তা বসতে দেখেছিলেন ড্রসেরার পাতায়। বোলতার হুল আছে। কিন্তু আছে যে সে-কি আর ওটারই মনে ছিল তখন?

দুটো দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। দু-দিনের ভাববার অবকাশ। সেই দিনটা শনিবার। পরের দিন রবিবার। ছেলে-টাকে বাইরে না পাঠালে এই শিথিল দিনে বা কাল ছুটির দিনে সুমিতার তলব পড়তই। স্ত্রীটি মুখে বললেও আদৌ নির্ভরশীল নন তাঁর ওপর। নিষেধ না শুনে অনীতাও হয়ত ছুটে যেত। তার মান-অপমানের প্রশ্ন, বন্ধু-দের কাছে মুখ দেখানোর প্রশ্ন।

আর দত্তসাহেব নিঃসংশয়, অনীতা গেলে অনীতা কাঁদবে।

বাড়ি ফিরতেই সুমিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

সে নেই এখানে, বাইরে গেছে।

কবে ফিরবে?

সোমবার নাগাদ।

তাঁর দিকে চেয়ে মা-মেয়ে দুজনেরই হয়ত মনে হল তিনি কিছু করবেন। কি-যে করবেন তাই ভাবছেন দত্তসাহেব। মেয়েটা তো কম আদরের নয়। সবই তো করা যায় তার জন্যে।

তবু দত্তসাহেব খুব বেশি ভাবতে পারছেন না কি করবেন। ভাবনায় বার বার ছেদ পড়ছে। মনটা মুহুর্মুহু উধাও হচ্ছে কোথায়। অনেক দিনের একটা পরিচিত জায়গা অবিশ্রান্ত টানছে তাঁকে। টানছেই।

... পরিচিত পাথুরে রাস্তা, দুধারে ঝোপঝাড় আগাছা, জঙ্গল, পাহাড়, পাথর—

ড্রসেরা!

নীল আলো নিভিয়ে দত্তসাহেব শাদা আলো জ্বাললেন ঘরে। ড্রাইভারকে ডেকে আদেশ দিলেন, গাড়িতে তেল মজুত রাখতে—পরদিন খুব ভোরে বেরুবেন, সেদিন না-ও ফিরতে পারেন।

অবাক হবার মত নয় কিছু। নতুন কোথাও ইন্‌স্টলেশনের কাজ শুরু হলে মাসের মধ্যে এমন তিন-চার দিন বাইরে কাটাতে হয়। সঙ্গে যোগানন্দবাবু থাকেন।

সকালের আবছা আলোয় বেরিয়ে-ছেন। ফাঁকা রাস্তায় বেগে গাড়ি ছুটেছে। সামনে ড্রাইভার। পিছনে দত্ত-সাহেব একা।

বেলা বাড়ছে।...... ন'টা, দশটা, এগারোটা। বাংলাদেশের পশ্চিমের সীমা ছাড়িয়েছেন। বেলা বারটা নাগাত উৎ-সুক নেত্রে পথের দুদিকে তাকাতে লাগলেন দত্তসাহেব। সেই পরিচিত রাস্তা। পাথুরে রাস্তা, দুধারে ঝোপ-ঝাড় আগাছা জঙ্গল পাহাড় পাথর। কতদিনের, কতকালের নাড়ির যোগ...... কেমন করে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে-ছিলেন তিনি।

ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি থামাতে। নামলেন।

পায়ে চলা পথ ধরে এক জায়গায় এসে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়লেন দত্ত-সাহেব। এই জায়গাটাই বটে। মাথার ওপর পাহাড়। নিচের প্রশস্ত জমিতে কতগুলো পাথর ছড়ানো। ও-ধারে সংকীর্ণ জল-ধারা। উৎসুক নেত্রে এদিক-ওদিক তাকালেন। ...ওই পাথর-টাই। পাটাতনের মত বিরাট পাথর—নিরেট, নিরন্ধ্র, তাম্রাভ-কৃষ্ণবর্ণ। তার সামনে ড্রসেরা। বাতাসে নড়ছে কাঁপছে হেলছে দুলছে। তাঁকে যেন ডাকছে, অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

পাথরটার ওপর এসে দাঁড়ালেন দত্ত-সাহেব। রোমে রোমে রোমাঞ্চ। দাঁড়িয়ে আছেন। বিস্ফারিত নেত্রে সেই ছেলে-বেলার মতই চেয়ে চেয়ে দেখছেন। আরো কাঁটা গাছ আছে, কিন্তু এই পাথরে দাঁড়িয়ে এই গাছটাই দেখতেন তিনি। পাতাগুলো দেখছেন। পাতার চার ধারে লম্বা লম্বা চকচকে কেশর-গুলো দেখছেন—রসসিক্ত, পিচ্ছিল।

গিরিডিতে মামাদের ছোট বাড়ি ছিল একটা। মামাদের কাছেই মানুষ শশধর দত্ত। মামাদের সঙ্গে বছরে চার পাঁচ-বারও আসতেন। এই জায়গাটায় মেজ-মামা তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন প্রথম। তখন ইস্কুলের ছাত্র তিনি। মামা এই ড্রসেরা গাছ চিনিয়েছিলেন। কাঁটা ঝোপের মত ছোট গাছ, পাতাগুলো লম্বা লম্বা, পাতার চার ধারে কেশর।

কেশরগুলো থেকে শাদা আঠার মত বেরোয়, তাতে রোদ পড়লে অদ্ভুত চকচক করে। কি বিচিত্র মাদক শক্তি এই পাতাগুলোর! কিসের লোভে পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গ এই পাতাগুলোর ওপরে এসে বসে। কেশরগুলো তখন সজাগ হয়ে উঁচিয়ে উঠতে থাকে। তারপর জড়িয়ে ধরে, পাতা বুজে যায়—সব শেষ। অমোঘ, আশ্চর্য।

দিনের পর দিন দেখেছেন। এই দেখাটা যেন নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গিরিডিতে এলেই এখানে ছুটে আসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ড্রসেরার গ্রাসে পতঙ্গ মিলিয়ে যেতে দেখতেন। ছেলেবেলায় একবার আঙুল বাড়িয়েছিলেন তিনি—পাতা সজাগ হয়েছিল, কেশরগুলো সজাগ হয়েছিল —মানুষের আঙুল-পতঙ্গ দেখে অন্য পাতাগুলো সাহায্যে এগিয়ে আসছিল—মামা হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে এনেছিলেন তাঁকে। বকেছিলেন।

কিন্তু তিনি ইচ্ছে করে আঙুল বাড়ান নি। ড্রসেরার যেন ডেকে নেবার শক্তি আছে, টেনে নেবার শক্তি আছে। পতঙ্গেরা সেই ডাক শোনে। এসে আত্মসমর্পণ করে। সেই অভ্যর্থনা তিনি দেখেন, বোঝেন। তাইতেই বিভ্রম।

স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে পা দিয়েছেন, কলেজ ছাড়িয়ে য়ুনিভার্সিটিতে। কিন্তু তখনো জায়গাটার সঙ্গে যেন নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে গেছেন তিনি। না এসে পারতেন না। মামারা হাসতেন, মামীরা ঠাট্টা করতেন।

গিরিডিতে ওঁদের ছোট বাড়ির লাগোয়া একটা বড় বাড়ি ছিল। ছোট বাড়িটার অস্তিত্ব ঢেকে দেবার মত বড়। বনের পশুরাজকে এড়িয়ে চলার মত ছেলেবেলায় এই সিংগীবাড়ি এড়িয়ে চলতেন তিনি। এ-বাড়ির হালচাল জাঁকজমক দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন।

সিংগীবাড়ির মেয়ে সুমিতা সিংহ।

শশধর দত্ত এম-এ পড়েন যখন, কলকাতায় এই বাড়িরই একটা ছোট ছেলেকে মোটা টাকার বিনিময়ে পড়াতেন। সুমিতাকে দূর থেকেই দেখতেন কখনো সখনো—এ-বাড়ির গৃহ-শিক্ষক তো প্রায় করুণার পাত্র। কোণের একটা ঘরে নিজের পড়াশুনো নিয়ে থাকতেন, সময় হলে ভিতরে পড়াতে যেতেন।

কি ছিল তাঁর? চেহারা? তা ছিল অবশ্য। সকলে সুন্দর বলত, মিষ্টি ছেলে বলত। কিন্তু টাকায় কত কন্দর্প-কান্তি কেনা যায়, তিনি কোন্ ছার। তবু এম-এ পরীক্ষার ফল বেরুতে তাঁর দিকেই চোখ গেল গৃহ-কর্তার আর গৃহ-কর্ত্রীর। পরীক্ষায় তো অমন ফি বছরেই একজন করে প্রথম হয়, কিন্তু এমন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ক'জন? কলকাতার বাড়িতে উমেদার মোসাহেবের ছড়াছড়ি, কথাটা তাদেরই মারফত কানে এলো তাঁর। সিংগীমশাই নিজের মতই মস্ত অবস্থা দেখে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয়নি। এবারে তিনি জামাই আনবেন না, জামাই কিনবেন। আর সেই সৌভাগ্যলাভের সম্ভাবনা তাঁরই।

আদর যত্ন বেড়ে গেল। সুমিতা ছলে কৌশলে কাছে আসতে লাগলেন। ফাঁক পেলে জোর জুলুমও করতেন। শশধর দত্ত ফাঁপরে পড়ে গেলেন। এই বাড়ি, এই বাড়ির হালচাল, এই বাড়ির পুরুষ মেয়ে—সবই প্রায় রহস্যের মত তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে, তাঁর মামাবাড়ির সঙ্গে যোজন তফাত। মামাদের কাছে প্রস্তাব যেতেই তাঁরা আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন যেন। সিংগীবাড়ির সঙ্গে কুটুম্বিতা! ভাগ্য ছাড়া আর কি! বিয়ের পরেই আবার সিংগীমশাই জামাইকে বিলেত পাঠাবেন শুনলেন। তারপর ভবিষ্যতের কি কূল-কিনারা আছে কিছু?

এক সকালে শশধর দত্ত পালালেন সেই বাড়ি থেকে। সোজা গিরিডিতে। আসার আগে সুমিতার এক কাকাকে জানিয়ে এলেন এ-বিয়েতে অপারক তিনি। নিতান্ত গরীব ঘরের ছেলে তিনি, তাঁকে যেন ক্ষমা করেন, তাঁরা।

মামারা অনেক করে বোঝালেন তাঁকে। কিন্তু তিনি অনড়। কলেজে মাস্টারী করবেন। সিংগীমশাইয়ের জামাই হবার বাসনা নেই, বিলেত যাবারও না। অগত্যা মামারাও ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখে দিলেন।

কিন্তু ক্ষমা তাঁরা করলেন না। যা তাঁরা চান সেটা তাঁরা পেয়েই অভ্যস্ত।

সেদিনও শশধর দত্ত এসেছিলেন এই পাহাড়ের নিচে। এই চওড়া পাথরটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে চেয়ে ড্রসেরা পাতায় একটা ফড়িংয়ের জীবনান্ত দেখছিলেন। কেশরগুলো সজাগ হয়েছে, এবারে আস্তে আস্তে বুজে যাবে।

চমকে ফিরে তাকালেন। পাথরের ওপর তাঁর পিছনেই সুমিতা দাঁড়িয়ে। বড় বাড়িতে আজ লোকজন এসেছে টের পেয়েছিলেন। সুমিতা এসেছেন জানতেন না। কখন এখানে এসেছেন তাও টের পাননি।

শশধর দত্ত হতভম্ব, বিমূঢ় খানিকক্ষণ। কিন্তু তারপরই হকচকিয়ে গেলেন একেবারে। সিংগীবাড়ির মেয়ে সুমিতার চোখে জল! সুমিতার দু-চোখে টলটল করছে জল। নিজের অগোচরে কাছে এলেন তিনি—সুমিতার কাঁধে হাত রাখলেন। চোখে চোখ রাখলেন। তারপরেই আর্ত বোবা আকুতিতে শিউরে উঠলেন হঠাৎ। সুমিতার জল-ভরা চোখের কালো তারায় তাঁরই ছায়া। সুমিতার দুচোখ বুজে আসছে আস্তে আস্তে, চোখের

ত্‌রায় তাঁর ছায়া আটকে আছে। ড্রসেরার কেশরের মত সুমিতার আর্দ্র নেত্র-পদ্ম নিমীলিত হচ্ছে. তিনি হারিয়ে যাচ্ছেন। প্রাণপণ শক্তিতে শেষবারের মত নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার একটা তাড়না অনুভব করলেন তিনি। কিন্তু পারা গেল না। ছায়াটা আটকেই থাকল। সুমিতার দুচোখ বুজে গেল। তিনি হারিয়ে গেলেন।

হঠাৎই এক সময় হুঁস ফিরল দত্তসাহেবের। চমকে উঠলেন তিনি। সামনেই ড্রসেরা পাতায় একটা প্রজাপতি এসে বসেছে। চটচটে চকচকে কেশরগুলো সজাগ হয়েছে। আর ওটার অব্যাহতি নেই। হন্তদন্ত হয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন তিনি। যেতে যেতে ঘড়ি দেখলেন। দু ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজকের দিনটা গিরিডির মামাবাড়িতে থেকে যাবেন ভেবেছিলেন। মামারা নেই, মামাতো ভাইয়েরা আছে। তারা অবাক হবে, খুশী হবে। কিন্তু সেখানে আর যাওয়া হবে না দত্তসাহেবের। তাঁর বিষম ফেরার তাড়া। একটু দেরি হলে একেবারে দেরি হয়ে যেতে পারে যেন। কাল নয়, আজই ফিরতে হবে তাঁকে।

অনীতা দেখা করতে পারে তপনের সঙ্গে। দেখা করলে অনীতা কাঁদবেও। তপন হাঁ করে সেই জল দেখবে। কাছে এসে দেখবে।......এই বয়সের সুমিতার থেকে এই বয়সের অনীতা দেখতে অনেক সুন্দর।

ফিরতি পথে দ্বিগুণ বেগে ছুটেছে গাড়িটা।

পরদিন।

অফিসে নিজের কামরায় তপনকে ডেকে পাঠালেন দত্তসাহেব। ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে হাসি পাচ্ছে তাঁর। হাসছেন না অবশ্য। অবাধ্য গোঁয়ার ছেলের মত মুখ গোঁজ করে টেবিলের ওধারে বসেছে। হাসি পাবারই কথা দত্তসাহেবের। ড্রসেরা দেখেনি, দেখলে মুরোদ কত বোঝা যেত।

বিনা ভনিতায় ট্রান্সফার অর্ডারটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। পড়ে ছেলেটা অবাক একেবারে। কানপুরে ডিভিশন্যাল এঞ্জিনিয়ার করে পাঠানো হচ্ছে তাকে। সৌভাগ্য বইকি।

এবারে ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

দত্তসাহেব বললেন, দুই একদিনের মধ্যে স্টার্ট করো, সেখানকার ডিভিশনাল এঞ্জিনিয়ার রিলিভড্ হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। থামলেন একটু, গম্ভীর মুখে হাসির আভাস। বললেন, এখান থেকে নিজের ইচ্ছেমত একজন অ্যাসিসট্যান্টও নিয়ে যেতে পারো........ তবে আমার মতে নিয়ে গেলেও তাকে অফিসের কাজে পাঠানো দরকার নেই, ইউ ডোণ্ট রিকোয়ার দ্যাট্। আচ্ছা, উইশ ইউ গুড্ লাক—

নিজেই আগে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ব্যস্ত মানুষ। কাজে চললেন কোথাও।

গিরিডির সেই পাহাড়ের নিচে বেড়াতে এলে এদিক-ওদিকের কুঁড়ে ঘরগুলোর অধিবাসীরা নিজে থেকেই আলাপ করতে এগিয়ে আসবে আপনাদের সঙ্গে। দু'চার কথার পরেই তারা জানাবে, গোটাকতক অদ্ভুত পতঙ্গ-ভুক গাছ ছিল ওখানে। আর বলবে, কি খেয়াল হল, হঠাৎ একদিন কলকাতার এক সাহেব-বাবু জনাকতক লোক নিয়ে এসে সেই গাছগুলো কেটে সাবাড় করে দিয়ে চলে গেলেন।

মতামত

সবিনয় নিবেদন,

৬ষ্ঠ সংখ্যা 'অমৃতে' প্রকাশিত আমার 'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রীশৈলেন ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্যটি দেখলুম। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে, এমন কি 'মুক্তধারা' নাটক আলোচনায় আমার বক্তব্যের সঙ্গেও পত্রলেখক দ্বিমত নন, তা তিনি নিজের মন্তব্যের মাধ্যমেই প্রমাণ করেছেন। তিনি শুধু আপত্তি তুলেছেন 'নমো যন্ত্র' গানটি সম্বন্ধে। গানটি কবিগুরুর 'মুক্তধারা' নাটকের অন্তর্গত। আমার প্রবন্ধে 'মুক্তধারা' নাটকের বিষয়-বস্তু নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি 'নমো যন্ত্র' গানটিকে যন্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বলে অভিহিত করিনি, কারণ সেখানে এটাকে কিছুটা ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি শুধু 'নমো যন্ত্র' গানটিকে বিচ্ছিন্নভাবে কবির যন্ত্র বন্দনা বলে উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত পুরো গানটিই উদ্ধৃত করছি :

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র!
নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র
তুমি চক্রমুখর মন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত—
তব বস্তুবিশ্ব বক্ষোদংশ
ধ্বংসবিকট দন্ত।
তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-
শতঘ্নী-বিঘ্ন বিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচলচলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ়,
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-
লঙ্ঘন লঘু মায়া—
তব খনিখনিত্র নখ বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র।
তব পঞ্চভূত বন্ধন কর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

এই গানের মধ্যে শুধুমাত্র একটি যন্ত্রের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হয়নি, পরন্তু বিভিন্ন যান্ত্রিক প্রয়োগ যথা লৌহগলন, শৈলদলন, খনিখনিত্র নখ-বিদীর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। বিরাটকায় যন্ত্রের বর্ণনা নিঃসন্দেহেই 'দখিনা মলয় বাতাসের' বর্ণনার ভাষায় করা যায় না। তাই কোন কোন জায়গায় কিছু ভয়ঙ্করও হয়ে পড়ে। কিন্তু কবি 'বিঘ্নবিজয় পন্থ', 'অচলচলন মন্ত্র' প্রভৃতি গুণাবলীও যন্ত্রের প্রতি আরোপ করেছেন। একে কি যন্ত্র বন্দনা বলা মোটেই অযৌক্তিক? গানটিকে শুধুমাত্র 'মুক্তধারার' পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে, আর কোন দৃষ্টিতে দেখা চলবে নাকি? প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে 'জনগন মন অধিনায়ক জয় হে' (১৩১৮) গানটি কোন পরিবেষ্টনে লেখা তা নিয়েও যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে, তা বলে সেটাকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মেনে নিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত কি!

নমস্কারান্তে,
ইতি—
সলিল বসু
কলিকাতা-৪

আমতত্ত্ব

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

আমের কথা বলছি। আম এখন বাজারে প্রায় অমিল হয়ে এসেছে বলে আলোচনাটা হয়তো মন্দ লাগবে না।

শহরে অনেক লোকের ধারণা আছে যে, কাঁচা অবস্থায় আমের স্বাদ টক এবং পাকলেই মিষ্টি। এমন মিষ্টি যে, তার তুলনা হতে পারে শুধু অমৃতের স্বাদের সঙ্গে। যে-অমৃতের স্বাদ-গন্ধ কিছুই আমরা জানিনে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, অমৃত বেশ মিষ্টি এবং অতি সুগন্ধ। তা হলে বলতে হবে যে, ওই ফলের অমৃত-ফল নাম দিয়েছে শহুরে লোক। কাঁচামিঠে আম কাঁচা অবস্থায় খেতে মিষ্টি (খুব মিষ্টি হয়), আর পাকা অবস্থায় পানশো, তবে টক নয়।

এমন আমও আছে যা কাঁচা আর পাকা দুই অবস্থাতেই **টক**। আমার ধারণা, সে-আম যত পাকে ততই বেশি টক হয়। পূর্ববঙ্গে আমাদের বাড়িতে অনেক রকম আমের গাছ ছিল। এখনও কি নেই? তিনটে গাছ ছিল টক আমের। তিন আমের চেহারা আর আয়তন তিন রকম, টকও তিন রকমের। একটার টক ছিল ঝাঁঝালো। আর একটার টকে ছিল জোয়ানের গন্ধ। তৃতীয় প্রকারের আমটা চেহারায় আর আকারে ছিল ঠিক মালদা'র সবচেয়ে বিরাট ফজলি আমের মত, টকটা ছিল অপর দুটোর তুলনায় কিছু ভদ্র। সেই আমের নাম ছিল 'বদনবাঁকা'। অপর দুটো টক আমের নাম ছিল 'কাগ-দেশান্তরী' আর 'বাঘ-পলানী' (পলানী—পলায়নী। ও আম খেলে বাঘ পালিয়ে যায়—ইত্যর্থ)। নাম-গুলো ঘরোয়া। দেশপ্রচলিত প্রখ্যাত নাম ওগুলো নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস।

সে-সব টক আম কি অনাদৃত ছিল? একেবারেই না। সেই তিনটি আম-গাছ ডালে-শাখে-পল্লবে মহামহীরুহ-আকারেই বিরাজমান দেখেছি। ও-সব আম সবচেয়ে প্রিয় ছিল বাড়ির মেয়েদের। তাঁরা ওই আম আস্বাদন-কালে মুখের যে চেহারা করতেন আজও আমার মানসলোকে সুস্পষ্ট জেগে আছে। আজ আমাদের [illegible]নগরতলীর গৃহে, আমার গৃহিণী অম্লরস উপভোগ করতে গিয়ে আননে যে চরম আরামের পরম শ্রী ফুটিয়ে তোলেন তা দেখলেই আমার মনে প'ড়ে যায় সেই তিনটে আমের কথা। আমার মনে হয়, মেয়েদের যদি অমৃতের স্বাদ জিজ্ঞেস করা হয় তবে তাঁরা বলবেন, টক। আমি অবশ্য কখনও জিজ্ঞেস করিনি। করবও না।

আমার ধারণা, আমের স্বাদ একেবারে নির্ভেজাল মিষ্টি নয়। নির্ভেজাল মিষ্টি স্বাদের আম যখন খাই তখন যেন মনে একটা খুঁতখুঁত থেকে যায়—ওরই মধ্যে ঈষৎ অম্লরসের জন্য আনচান করে মন। এ-বিষয়ে আমার চিত্তে একটু সংকোচবোধ ছিল (কোন পুরুষই নাকি শতকরা একশ' ভাগ পুরুষ নয়)। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহনের মুখে আমের স্বাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রমানসের কাহিনী শোনার পর থেকে আমার সেই সংকোচ ঘুচেছে। একবার গ্রীষ্মকালে কবি নাকি কোন্ বিদেশে যখন ছিলেন, প্রায়ই দুঃখ করছিলেন যে, সে-বছর তাঁর আম খাওয়া হল না। অবশেষে অনেক চেষ্টায় কোথাকার যেন চালানী ভাল আম এনে তাঁকে খেতে দেওয়া হল। খেলেন। কেউ শুধোলেন, 'কেমন, আম খাওয়া হল তো?' কবি কিঞ্চিৎ অতৃপ্ত স্বরে বললেন, 'হল। কিন্তু বড় মিষ্টি। একটু টক না হলে কি আম হয়?'

একরত্তিও টক নেই এমন মিষ্টি থেকে এক কণাও মিষ্টি নেই এমন টক পর্যন্ত নানা স্বাদের আম নিজেদের বাড়িতে খেয়েছি। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে খেয়েছি। অন্তত কয়েকটা আমগাছ নেই এমন বাড়ি দেখিনি।

আমাদের বাড়িতে কত রকমের আমের গাছ যে ছিল, তা মনে হলে আজ চোখে আর জিভে একসঙ্গে জল আসে। বিরাট থেকে ক্ষুদ্র পর্যন্ত তাদের ছিল নানা আয়তন। আর গোলমত, লম্বা, গোলশা লম্বা, লম্বাটে গোল, মাথামোটা, মুখসরু—নানা রকম ছিল তাদের আকার। স্বাদের কথা তো বলেছি. সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তিনটে আমের কথা। তার একটা হল সবচেয়ে বড়। ওটা ছিল ফজলি আমের জাত। কল-কাতায় এবার টাকায় দেড়টা দরে যে ফজলি আম বিক্রি হচ্ছে, তার চেয়ে ছোট আম ও-গাছে ফলতে কখনও দেখিনি। নাম ছিল 'বাটাজোড়া' আম। স্বাদ খুবই মিষ্টি, তবে ওই সঙ্গে একটু সুখকর টকের ছিল গোপন অস্তিত্ব।

তারপরেই মনে পড়ে সবচেয়ে ছোট আমের কথা। নাম 'বেতইন্যা'। বেতইন বলা হয় বেতফলকে। বেতফল হয় থোকা থোকা, **এক এক থোকায় ফলে**

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ **বারো** ॥

মাস কয়েক হয়ে গেল; এর মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে। প্রশান্তর আসা শুধু যে বেড়েই গেছে এমন নয়, এক-রকম নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকেও যেমন রজতের দিক থেকে আবার বারকয়েক দেরী হয়ে গেল, তেমনি স্বাতিও বিশাখাকে আটকে রাখতে লাগল মাঝে মাঝে। প্রথম দিন মোটর এসে দাঁড়িয়েই রইল, তারপর থেকে অনাথ এসে বলেই যেতে লাগল বিলম্ব হবে। প্রশান্তই গিয়ে নিয়ে আসতে লাগল স্বাতিকে। ক্রমে এই ব্যবস্থাটাই যেন নিঃসাড়েই কায়েমী হয়ে গেল। একটির জায়গায় দুটি ছাত্রী নিয়ে পড়েছেন লাহিড়ীমশাই, সময়ের জ্ঞান থাকে না। এ ছাড়া স্বাতিও ছাড়তে চায় না বিশাখাকে সহজে। অনেক দিক থেকে জড়িয়েও ফেলেছে। তার মধ্যে একটা হোলো বাগান। বাড়ির পেছনে বেশ খানিকটা জমি জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল। পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে একটা বাগান করেছে; ফুলপাতায় আরম্ভ হয়েছিল, তারপর তরিতরকারি এনে ফেলে তার বৈষয়িক গুরুত্বটাও বাড়িয়েছে অনাথ।

বাগানটি এখন সকলেরই একটা আকর্ষণ। পড়া শেষ হয়ে গেলে, ওরা দুজনে বাগানেই চলে যায়। অনাথ তো যতটা সময় পায় দেয়ই, যদি হাট বার না হোল তো এ সময়টাও ওদের সঙ্গেই থাকে। না থাকলেও ক্ষতি নেই, বাড়িটার অন্তরাল রয়েছে, জল সিঞ্চন থেকে নিড়ানি দেওয়া, আবর্জনা পরিষ্কার করা—সব ওরা দুজনেই করে। পাশে একটা ছোট-খাট ডোবাও আছে।

একটা বাঁধা রুটিনের মতো হয়ে গেছে। ওদের পড়িয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে যান লাহিড়ীমশাই। উনি যত-ক্ষণে ফেরেন, ততক্ষণে প্রশান্তও এসে পড়ে অফিস থেকে পোশাক ছেড়ে সোজা এখানে। কোনদিন যদি ওদের দিক বেড়াতে গেলেন লাহিড়ী-মশাই তো পথেই তুলে নেয়; দুজনে একসঙ্গেই এসে পড়ে। এর পরেই বাগান।

বেশ বাগানটি করেছে স্বাতি। রুচি আছে, এছাড়া গাঁয়ে ভালো বাগানই ছিল। যতটা পেরেছে তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ করবার চেষ্টা করেছে। মাঝ-খানে বেশ খানিকটা লন্ বা ঘাসজমি, তার চারিদিকে ফুলের গাছ; একটা গেট করে তার ওপর একটি মাধবীলতা। নূতন নূতন সংগ্রহে মেতে গেছে সবাই, এদিক দিয়েও একটা কাজ বেড়ে গেছে অনাথের। সামনেও যে একটু বাগান তা সম্পূর্ণ তারই চার্জে। বাড়িটাও আর সেরকম নেই যে বাগানটুকু নেহাত বেমানান হবে তার সঙ্গে। অবশ্য কাঠা-মোটা সেই আছে—তিনখানি ঘর, একটি মেটে রান্নাঘর, মাঝখানে একটু উঠান, ওপরে সেই গোলপাতার ছাউনি; তবে জানলা বসেছে, ঘরের দেয়ালগুলোও সংস্কার করিয়ে কলি ফিরিয়ে নিয়েছে অনাথ। বাড়তির মধ্যে কঞ্চির বেড়ার জায়গায় ইঁটের দেয়াল টেনে উঠানটুকু ঘিরিয়ে নিয়েছে। চৌকি দুটোও নিয়েছে ঠিক করে, একটি বাড়িয়েছেও। খরচ হল একটু। তার ব্যবস্থা অনাথই করল।

খরচ করবার একটা মস্ত সুবিধা, লাহিড়ীমশাই ওদিকটা একেবারেই বোঝেন না; কোন কালেই যেমন বোঝেন নি। তবু একটা হিসাব দেখাতে হয়—টাকাটা যোগাড় হবে কোন্ সূত্রে, তারপরে তো খরচ।

একদিন পাড়ল কথাটা কর্তার কাছে।

কর্তা প্রশ্ন করলেন—"আগে দরকারটা কিসের তাই বল্, আমায়। তারপর খরচের কথা আসছে।"—একটু কড়াভাবেই প্রশ্ন।

এমনতর অবস্থায় উদ্ধত না হয়েও, শক্ত হয়েই জবাব দেয় অনাথ। ধাত বোঝেতো। তোয়ের হয়েই নামে, বলল—"আছে বৈকি দরকার, এখন আপনার নজরে যদি না পড়ে। মানলুম মুনি-ঋষির কুঁড়ে, মাথার ওপর একটা পাতার ছাউনি থাকলেই হোল যাতে তালপাতার পুঁথিগুলো না বরবাদ হয়। কিন্তু আর চলে?" পুঁথির ওপর একটা আক্রোশ আছে। লাহিড়ীমশাই ব্যথা পাবেন বলে

তোলে না ও প্রসঙ্গ, তবে অবসর বুঝে আবার তুলতেও হয়।

"বুঝলুম পুঁথি মস্ত বড় অপরাধ করেছে, তা দরকারটা কি না হয় খুলেই বললে।"

"একটা ভদ্রলোক আসছে বাড়িতে, একরকম নিত্যিই। কেউ-কেটা নয়, ধরতে গেলে রেলের একজন কেন্ট-বিষ্টুই; আর ঐ একটি মেয়ে, পড়তে আসছে। কী ইস্টাইলে থাকে বাড়িতে, কী আসবাব-পত্র......"

"কিছু বলে ওরা? নাক সিঁটকোয়?—বাধা দিয়েই প্রশ্ন করলেন লাহিড়ী-মশাই, ভ্রূ দুটিও কুঁচকে উঠেছে। অনাথ বলল—"ওনারা সেই ধরনের মানুষ? দেখছ তাই আপনি?"

"তবে?"

"নিজেদের একটু আক্কেল করতে হবে তো—কি করছি, কোথায় বসাচ্ছি।"

"সব আক্কেলের গোড়াতেই তো টাকা। তোর বুঝি ঐ পঞ্চাশটার ওপর নজর পড়েছে? পড়বেই, আমি জানি। তারপর? চারিদিকে ভেবে দেখতে হয় গেরস্তকে, আর জমিদারি আছে?"—বেশ একটু অন্যমনস্কই হয়ে গেছেন, যুক্তিটুকু তো লেগেছেই মনে। হিসাবের দিকে সারা জীবনে খেয়াল রইল না বলে, হিসাবের কথা উঠলে যেমন বেশি জোর দিয়েই বলেন সেইভাবে বলে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অনাথ বলল—

"নেই-ই-তো। থাকলে এই তুচ্ছ কথাটা তুলতে আসত কে কানে। নেই বলেই তো একটা সল্লা-পরামর্শ নেওয়া।"

মুখের ভাবটা অনুকূল, আর দেরি করল না, বলল—"মোটা বুদ্ধিতে একটা ঠিক করেছি ভেবে, মা-মণিকেও বলেছি এখন আপনি দ্যাখো একটা ভেবে। ইনজিয়ারবাবুর কাছ থেকে একটা আগাম চেয়ে নি—শত খানেক ট্যাকা—যেটা লাগবে আন্দাজ করছি—তারপর মাঝে মাঝে চুকিয়ে দিলেই হবে—ধরো এই গোটা পাঁচ—না রাজি হয় দশটা করেই—দশ মাসে কর্জ-হর্জা-কর্জ তো নয়ও, আগাম নেওয়া কটা টাকা, সুদ চান দেওয়া যাবে......" —গোঁফের ওপর হাত ফিরিয়ে নিল একবার।

"সুদ নেবে, ঐ মানুষে? তুই গুনতে যাবি মুখ্যুর মতন? খবরদার! টাকার হিসেবটাই বুঝতে শিখেছিস, মানুষের হিসেব বুঝবি সে বুদ্ধি তো দেননি ভগবান।"

মনে হঠাৎ কোথা থেকে একটা আবেগ এসে গিয়ে এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো বলে যেন এলিয়ে গেল কণ্ঠস্বরটা, বললেন—"তা যা ইচ্ছে করগে, আমায় জিজ্ঞেস করা কেন—যেটা ধরিস্ সেটা না করে তো ছাড়িস্ না..... কিন্তু ল্যাজে-গোবরে হয়ে পড়বি অনাথ, পারবি না সামলাতে। কথাটা আমার কোথাও বরং লিখে রাখ।"

একটির জায়গায় দুটি ছাত্রী; মেতেই আছেন। হয়ে যাচ্ছে এইটুকুই জানেন, তার বেশী আর খোঁজ রাখেন না।

স্বাতিকেও ঐ ভাবেই বুঝিয়েছে।

অনাথের ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু আগাম নেওয়ার কোন স্থানই নেই। গয়না ছাড়াবার জন্যে প্রশান্তর কাছ থেকে টাকাটা পেয়েছে—কিন্তু ছাড়ায়নি গয়না। ঠিক করেছে দশ, পনের, বা ততোধিক, যেমন পারে মাসে মাসে শোধ দিয়ে যাবে। এদিকে রইল মবলিক এই দু'শ টাকা—বাড়ি ঘর ঠিক করে নিয়ে যেটা বাঁচবে, হাতে থাকবে। গৃহস্থের একেবারে নিঃস্ব হয়ে থাকা ঠিক নয় তো। এই করে চলে আসছে।

হাট থেকে একদিন একটা লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। তার কাঁধে দুটি বেতের চেয়ার আর একটা বেতের টেবিল বাঁশে লটকানো। স্বাতি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল—"একটু সবুজ রং জোগাড় করো অনাথ কাকা—কোথায় বিক্রি হয় দ্যাখো।...... আরও দুটো চেয়ার যদি হতো—বাগানে চারজনে বসবার।"

লাহিড়ীমশাই বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন, একটু আড়চোখে চেয়ে বললেন,—"আর উৎসাহ দিও না, ওর বে-হিসেবীপনার জন্যে এবার হেঁসেল বন্ধ হতে যা বাকি।"

গোড়ার দিকের কথা এসব। এখন চারদিক দিয়ে একটা শ্রী ফুটেছে বাড়িতে। বাগানে লনের মাঝখানে বসে অনেকক্ষণ গল্প-সল্প হয় সবার। এক একদিন রজতকেও ধরে আনে প্রশান্ত। গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়, বিশেষ করে যদি জ্যোৎস্না রইল। লাহিড়ীমশাই আর স্বাতিরও কবার আসা হয় কলোনিতে। একদিন মোটরে করে দুজনকে পুলের দিকটাও দেখিয়ে নিয়ে এলো প্রশান্ত। দুদিন ডাক্তারের বাড়ি একটু প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হোল। একদিন নিজের বাসায়ও ব্যবস্থা করল প্রশান্ত। ঠাকুরকে ছুটি দিয়ে স্বাতি আর বিশাখাই হেঁসেল নিয়ে রইল। কাজের চেয়ে বেশি সরঞ্জামের মধ্যে, মুক্ত আনন্দে এমনভাবে দিনটা কেটে গেল, বিশেষ করে অনাথের যে, সে সংযম হারিয়ে স্বাতির একটা গোপন কথা প্রকাশ না করে পারল না প্রশান্তর কাছে। সন্ধ্যা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটু ছমছমে হয়ে পড়েছে, যেন একটা কিসের সুযোগ খুঁজছে, তারপর একবার একান্তে পেয়ে হটাৎ মাঝখান থেকেই গলা নামিয়ে বলে উঠল—"সব তো হচ্ছে, সব ভালোই হবে দেখবে আপনি—পাকা একটা গিন্নিই তো মা-মণি কিন্তু আসল জিনিসটেই তো বের করছে না।"

"কী?"— কৌতূহলী হয়েই প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"কী তা বলি কি করে?" একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল অনাথ, বলল—"শক্ত দিব্যি দিয়ে রেখেছে যে উদিকে। টের পেলে রক্ষে আছে?......খুব ভালো ব্যাঞ্জো বাজাতে পারে।...ঐ নিন, গেলই কথাটা বেরিয়ে মুখ ফসকে।"

"সত্যি নাকি? কৈ টের পাইনি তো কোনদিন।"—

"এই দেখুন! টের পেতে দেবার মেয়ে কিনা। কি রকম আটঘাট বেঁধে বসা। কত্তা বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন, সিন্দুক থেকে বের করে সাগরেদ নিয়ে গুছিয়ে বসল। আমার ওপর হুকুম...।"

"সাগরেদ! ইস্কুল খুলেছেন নাকি?"

"এই দেখুন। কোন কথা তো পেটে থাকতে দিলেন না আপনি। সাগরেদ বিশাখা-ঠাকরুন—স্কুলই বলুন, কালেজই বলুন।"

"সেও তো কৈ বলেনি কখনও।"

"কার সাগরেদ সেটা দেখতে হবে তো। ইনজিয়ারবাবু বল্লেন—কৈ বলেনি তো কখনও! কত্তা বেরিয়ে গেলেন, গোজগাছ করে বসল দুজনে। আমার ওপর হুকুম 'অনাথকাকা,— তুমি বাইরে গিয়ে বসে থাকো। মোটরের আওয়াজ শুনলে—'হ্যাট-হ্যাট —বেরো বেরো' করে একটা আওয়াজ করবে—যেন ঘোষেদের গোরু, কি ধোপাদের গাধা ঢুকেছে..."

—হঠাৎ প্রশান্তর ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠতে বলল—"এই দ্যাখো!

পেত্যয়ই যাচ্ছেন না ইন্‌জিয়ারবাবু! আমি ইদিকে বারান্দায় বসে কার গোরু, কার গাধা তাই তাড়িয়ে হয়রান। সদর রাস্তা—সামনেই কলোনিতে কাজ হচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-আধখানা মটরগাড়ি করছেই তো আসা-যাওয়া—কেটে কেটে তো যাচ্ছে বাজনা উদিকে—'অনাথকাকা, তোমার আর বস্তু নেই,'—তা অনাথ কাকা কি করে বলুন?—বিরাম তো নেই মোটরের—তার মধ্যে কোনটে মাখন ঘোষের গোরু, কোনটেই বা তারিণী ধোপার গাধা।......"

—বেশ সাজিয়ে একটু সরস করে বলতে যাচ্ছিল হটাৎ সম্বিত হওয়ায় থেমে গিয়ে অপ্রতিভভাবে মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

অতটা হয়ত কানেও যায়নি প্রশান্তর। অন্যমনস্ক হয়ে একটা কথা ভাবছিল, বলল—"তার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে অনাথ। এমন কিছু শক্ত নয়। সত্যিই তো, পদে পদে যদি বাধাই পড়ে তো বাজাবেই বা কখন, শেখাবেই বা কখন্? আমার মোটরের হর্ণটা তো জানা আছে—আজ যাওয়ার সময় না হয় ভাল করে শুনে নিও—একটু আলাদা রকম কির্-র্-র্ করে শব্দ হয়—ওইটে বাজালেই বুঝবে আমি এলাম—'হ্যাট হ্যাট' করে শব্দ করবে। নইলে বাজিয়ে যেতেই দিও। কেমন তো?"

॥ তেরো ॥

প্রশান্তও সরস করেই নিল সাধ্যমত। আজকের রাতটি বড় উপযোগী। শেষ দিকে যদি একটু সংগীতের রণন্ থাকত—তাও স্বাতির হাতেরই—ষোল কলায় পূর্ণ হোত আনন্দসমাবেশটুকু। ব্যবস্থা হয়েই যেত; তবু তাড়াহুড়া করে এনে ফেলবে—কেমন যেন মন সরল না প্রশান্তর। রাগ নয়—এ ধরণের গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে রাগ করে না কেউ; তবু একটু বিব্রত হয়ে পড়বেই স্বাতি। ও সেটুকুও চায় না। চায়না যে কর্ম-চঞ্চলতার মধ্যে ওর যে মুক্ত রূপটি ফুটেছে, আরও উঠছে ফুটে, কোথাও থেকে কিছু এসে সেটাতে এতটুকুও ব্যতিক্রম ঘটায়।

অনাথকেও বাঁচাতে পারা যায় তো দেখতে হবে ভেবে। ও বেচারা আজ নিজের মধ্যে এঁটে উঠতে না পেরেই তো ভুলটা করে বসল। এ-ভুলের ফসলটুকু প্রশান্তর কাছেই মিষ্টি, ওর কাছে তো না হওয়ারই কথা। অন্তত মিষ্টি ফসলের জন্যে একটা কৃতজ্ঞতাও তো থাকা দরকার। কটা দিন ব্যবস্থা-মতোই কাজ হোল। তারপর একদিন মোটরটা খানিকটা আগেই দাঁড় করিয়ে বেড়ার আড়ালে আড়ালে হেঁটে এসে একেবারেই সামনাসামনি হয়ে হয়ে দাঁড়াল। একেবারে হকচকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনাথ, সতর্ক করে দেওয়ার সেই 'হ্যাট-হ্যাট' শব্দ ভুলে গেছে; "ইন্‌জিয়ারবাবু!" বলে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্যাঞ্জোর ঝনঝন ভেসে আসছে, খানিকটা যেন দূরে থেকেই। ক'দিন নিশ্চিন্তভাবে বাজাতে পেরে ওরা বাগানেই গিয়ে বসেছে।

প্রশান্ত বলল—"আজ আর গোরু-গাধা তাড়িয়ে কাজ নেই অনাথ। মোটরটা একটু আগেই ছেড়ে আসতে হোল আমায়,—হর্ণটা বাজাতে গিয়েই দেখি বিগড়ে বসে আছে—তুমি গিয়ে ঐখানেই..."

"মা-মণি বন্ধ করতে পেলে না তো।" —ব্যাপারটুকুর আকস্মিকতার জন্যেই বেশ একটু ঘাবড়ে গেছে অনাথ। প্রশান্ত বলল—"ভালোই তো হোল অনাথ, হোল না? ভেবে দ্যাখো না। তুমি আমায় বলেছিলে—উনি মানা করলেও মুখ ফসকে অবশ্য বেরিয়েই গিয়েছিল তোমার—তা সে দোষটা তো কেটেই গেল—যাও। বসেই থেকো মোটরটার মধ্যে।"

ভেতরে চলে গিয়ে অনেকক্ষণ শুনল উঠানে বেশ একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে। স্বাতিই বাজাচ্ছিল, তবে শিক্ষকতা হিসাবেই। একটা গতের খানিকটা বার চারেক বাজিয়ে হাত থামিয়ে বলল—"লক্ষ্য করে দেখলে তো? নামবার মুখে তোমার ভুলটা হয়ে যাচ্ছে নিখাদ থেকে পঞ্চমে নামতে মাত্রার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে একটু, আরও একমাত্রা টেনে রাখতে হবে।...নাও, ধরো।"

জীবনে এক একদিন যোগাযোগ-গুলো ঘটে অদ্ভুতভাবে। দৈবের দানের হাতটা যেন খুলে যায়; শুধু প্রচুরই দেয় না, যা দেয় যেন সোনার পাতে মুড়ে যতটা পারে মধুর করেই দেয়।

বিশাখা বলল—"আজ কেমন যেন আসছে না ঠিক স্বাতিদি। তা ওটুকু হয়ে যাবেখন ভেবো না। আজ বরং তুমি বাজাও।...হ্যাঁ, ঠিক কথা, বাজাওই স্বাতিদি', এর পরে যে গৎটা দেবে—কেদারা বলছ না?—সেইটে বাজাও শুনি।"

"একটা না শিখে একটা লাফিয়ে ধরতে যাওয়া—ঐ তোমার এক রোগ বিশাখা। পড়ার দিকেও তাই দেখেছি। ও হয় না।"

"বেশ হয় স্বাতিদি। মনের দিক দিয়েও দ্যাখো না। সামনে কিছু একটা আকর্ষণ থাকলে—লোভের একটা কিছু—উৎসাহের চোটেই মনটা এগিয়ে যায়।"

"আগেরটা অসম্পূর্ণ রেখে? না, সেটা এমন কিছু বুদ্ধির..." এর পরেই একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল স্বাতি। বলল—"তোমার কথা শুনে আমার সেই গাধাটার কথা মনে পড়ে গেল বিশাখা—পা বাড়াতে চায় না দেখে তার মনিব ধোবা লাঠিতে একমুঠো ঘাস ঝুলিয়ে মুখের কাছে টাঙিয়ে...উফ! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর—উফ!..." বলতে বলতে হাসিতে ভেঙে পড়ল একেবারে। বিশাখাও যোগ দিল। নিশ্চিন্ত রহস্যালাপটা হাসির দিকেই পড়ল ঝুঁকে, যেমন হয় এসব ক্ষেত্রে। একচোট হেসে নিয়ে বিশাখা হটাৎ সুর বদলে রাগের ভান করে বলল—"যাও বললাম বাজাতে—ফল হলো—গাধা হয়ে গেলাম, কুকুর হয়ে গেলাম..."

"ওরে বিশাখা!—জানিস? গাধারা আবার গানের ভক্ত হয়!" হাসির স্রোতে হটাৎ যেন কোথা থেকে এনে যুগিয়ে দিচ্ছে। দমকের মধ্যেই কেটে কেটে বলে যেতে লাগল—"সেই যেরে সেই গল্পটা 'এ্যান্‌ডারসন্‌স ফেয়ারী টেলস'এ আছে না?—মনিব বাড়িতে গান শুনে গাধার হটাৎ খেয়াল হোল—এতো কম খাতিরের জিনিস নয়—জানলার ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে—একেবারে গলা ছেড়ে—উফ!...তারপর খাতিরের ঘটা!—মনিব লাঠি ঘাড়ে করে এসে—উফ! উফ!...বাবা গো!..."

মুক্ত হাসির চোটে সমস্ত জায়গাটা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে—দুজনেরই হাসি—বিশাখাও কি বলতে যাচ্ছিল—হয়ত অনুরূপ কোন গল্প বা ঘটনা মনে পড়ে গিয়ে, স্বাতি হটাৎ যেন ভীত হয়ে থেমে গিয়ে বলল—"ওরে থাম, আজ যে কী

অদৃষ্টে আছে, যত হাসি তত কান্না না হয়..."

"কেন?" একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করল বিশাখা—। তারপর আবার চাপা হাসিটাই বেরিয়ে আসবে, স্বাতিও একটা বেগ চেপেই বলল—"কেন! অনাথ কাকা ওদিকে—'হ্যাট-হ্যাট' করে..."

তার পরেই হটাৎ এবারে আরও ফুকরে হেসে উঠল একেবারে—ভেঙে ভেঙে বলে চলল—"আর ঐ এক উজবুক—অনাথ কাকা—জিজ্ঞেস করলাম—তা উনি এসে পড়লে কি করে জানাবে—বললে—উফ! মুখে একটুও আটকাল না—অম্লান বদনে বললে—'হ্যাট-হ্যাট' শব্দ করব—যেন ঘোষেদের গোরু কি তারিণী ধোপার গাধা...উফ! বাবাগো আর পারছি না—পেটে খিল ধরে গেল..."

অনেক চেষ্টা করে দম চেপে চেপে বন্ধ করল হাসির স্রোতটা দুজনে। একটু চুপচাপ গেল। বিশাখা কি বলতে যাচ্ছিল—বোধ হয় তার গল্পটাই শুরু করবে—স্বাতি যেন হাসির ক্লান্তির একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল—"না ভাই, আর হাসিও না। বেটাছেলেদের..."

চুপ করে গিয়ে একটু যেন দ্বিধা কাটিয়ে বলল—"বেটাছেলেদের যেন একটা ক্ষমতাই আছে—কোথা থেকে যে ঝুপ করে এসে পড়ে..."

"আকাশ থেকে তো পড়বেন না।... তুমি বাজাও গৎটা স্বাতিদি—যে কথা হচ্ছিল আমাদের......"

"না পড়ে না যেন!...তুমি যদি পড়তে 'শকুন্তলা'খানা..."

"বলি তো পড়িয়ে দাও, না, সংস্কৃতটা আগে রপ্ত হোক! রপ্তও হয়েছে, আমিও পড়েছি!"

কোনও উত্তর হোল না; বেশ বোঝা যায় যেন হাসির আসরের বাতি নিভিয়ে হঠাৎ অন্য এক আসরে উঠে গেছে স্বাতি। একটা শান্ত নিঝুম ভাব রইল ছেয়ে খানিকক্ষণ। তারপর ব্যাঞ্জোয়—টুং টুং করে গোটা তিনচার শব্দ উঠল—খুব ধীরে, থেমে থেমে। ব্যাঞ্জো যেন তন্দ্রার ঘোরে কি স্বপ্ন দেখছে। এক সময়—ঝনঝন করে তারের ওপর আঙুলগুলি বুলিয়ে নিয়ে স্বাতি বলল—"তাহলে—ছাড়বেই না তো না হয় বাজাই-ই, শোন তবে। তোমার কেদারাটা নয়। একটা পুরবী ধরি—সময়টা তো তারই।"

আর একবার পর্দাগুলো ঝনঝনিয়ে আরম্ভ করে দিল, টানা বিলম্বিত লয়ে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি শোনা হোল না প্রশান্তর। একটা ভয় লেগে রয়েছে। লাহিড়ীমশাই যে কোন সময়ে বেড়িয়ে ফিরতে পারেন। তা'ভিন্ন অনাথও রয়েছে। এদের সাবধান করে দিতে পারেনি বলে একটা ধুকপুকানি আছেই লেগে, খেয়ালী মানুষ, কতক্ষণ যে মোটর আগলে বসে থাকতে পারবে ধৈর্য ধরে, কিছুই বলা যায় না। এ তো আছেই, একটু কৌতুকের লোভও উঁকি মারছে মনে, যেন দুষ্টু হাসি ঠোঁটে করে। এ রস তো খানিকটা উপভোগ করা গেল, একটা পথও তো খুলে যাচ্ছে, "শকুন্তলাও" না হয় এসে পড়ুক না একটু; দুর্লভই তো জীবনে।... লোভটা শুধু আজকের জন্যেই নয়; যদি তেমন সৌভাগ্য হয়, কোন দূর ভবিষ্যতেও যদি রহস্যটা প্রকাশ করবার সুযোগ আসে জীবনে; সঞ্চয়টা তো রইল। ওরা দুজনে বেতের চেয়ারে সামনাসামনি হয়ে বসেছিল, খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুতেই বিশাখার দৃষ্টিটা প্রথমে এসে পড়ল ওর ওপর। যেন ভূত দেখেছে! "কিরে?" বলেই হাত থামিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে স্বাতিও স্থানুর মতো নিশ্চল হয়ে গেল সেই ভঙ্গিতে।

প্রশ্ন হবে, তার আগেই একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়বার ভাব নিয়ে প্রশান্ত বলতে বলতে এগুলো—"মাফ করবেন; আমি মনে করলাম নতুন কেউ বুঝি এসেছেন কোথাও থেকে।"

একখানা চেয়ারে, বসে পড়ে বলল—"চমৎকার হাত-তো আপনার? কৈ, আমি তো এতদিন জানতে পারিনি!"

ঘেমে উঠেছে স্বাতি, মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। বাঁ-হাতে আঁচলের কোণ তুলে কপালটা মুছে নিয়ে বলল—"ইয়ে......অনাথ কাকা ছিল না বাইরে?"

নিজের কানেই নিশ্চয়ই বেখাপ্পা শুনিয়ে থাকবে অবান্তর প্রশ্নটা; বিশাখার দিকে চেয়ে বলল—"দ্যাখ তো ভাই, থাকে তো উনুন ধরিয়ে চায়ের জলটা বসিয়ে দিক এসে।"

প্রশান্ত বলল—"সে রাস্তায় আমার মোটর আগলাচ্ছে। অনেকখানি ওদিকেই ছেড়ে আসতে হোল তো।"

"আজকেও আবার বিগড়েছে?"

এবার রাঙা হয়ে ওঠবার পালা প্রশান্তর। স্বাতির দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যাতে মনে হয়—মোটরের কথাই যখন, তখন একটা রহস্য থাকা আশ্চর্য নয়। সেই প্রথম দিনের মিথ্যা রচনা যেন মনে পড়ে গেছে তার। সেদিনও চোখের চাউনির ধরণটা এই রকমই ছিল; শুধু আজ যেন আরও একটু স্পষ্ট। দুজনের মধ্যেকার সে দূরত্বটাও অনেকখানি কমেছে তো।

একটু থতমত খেয়ে যাওয়ার জন্য উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারল না প্রশান্ত। একটু সামলে নিয়ে সোজা উত্তর না দিয়ে বলল—"সেরে নিয়ে এলেই হোত। এসে আমি এক বিষম দোটানায় পড়ে গেলাম। বাজনা শুনি, কি, মোটরটাই আগে ঠিক করে আনি।"

"আমরা ওঁকে একদিকের টান থেকে মুক্তি দিতে পারি, কি বল ভাই?"—বিশাখাকেই কথাটা বলল স্বাতি। সে যেন হতভম্ব হয়ে বসে আছে, সব ছেড়ে 'শকুন্তলা' কথাটাই যেন ওর সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে। এমন আশ্চর্য মিল হয় কি করে জীবনে?

একটা কাজ হোল। দুদিকেই ধরা পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে এক ধরণের যেন শোধবোধ হয়ে দুপক্ষেরই সঙ্কোচটা কেটে গেল খানিকটা; আড়কাল বেশিক্ষণ থাকেও না আর। ওর প্রশ্নে বিশাখা জড়তা কাটিয়ে বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্বাতি উঠে পড়ে প্রশান্তকে বলল—"না, মোটরটা ঠিক করেই আনুন, আমরাই চায়ের দিকটায় যাচ্ছি।...অনাথ কাকা থাকুকগে, ঠেলাঠেলির জন্যে দরকার হতে পারে।"

"উঠে পড়লেন একেবারে?...বেশ তাই থাক্ তাহলে। ভাঙা মোটরের চিন্তা নিয়ে ব্যাঞ্জো শোনা চলে না।"

"আমার ব্যাঞ্জো শোনায় অবশ্য ক্ষতি হোত না।"—হেসে বলল স্বাতি। ওরা এগিয়েছে বাড়ির দিকে। প্রশান্ত

উত্তর করল—"সেটাই না হয় ঠিকমত প্রমাণ করে দিন। লোভ থাকে না আর।"

"আমার প্রমাণ বিশাখা। সাহসের করার দুঃসাহস অন্য কারুর ওপর দিয়ে খাটত না তো।"

"উল্টো বললেন; বিশাখা আমার দিকেরই প্রমাণ। শক্তি না থাকলে কেউ শক্ত কাজ ধরে না। থাক্, আমি কিন্তু আপাত্ত শুনছি না, এসেই বসে যাব।"

মোটরটা নিয়ে খানিকটা খুটখাট খোরাতেই হোল। ভাল সাক্ষী দিয়ে স্বাতির সংশয়ের ধারটুকু ভোঁতা করে দেওয়ার জন্য অনাথকে ঠেলতেও বলে ও উঠে স্টীয়ারিং ধরেছে; আরও ভাল সাক্ষী গেল জুটে। লাহিড়ীমশাই বেড়িয়ে ফিরছেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—"ব্রেক-ডাউন করেছে আবার সেদিনকার মতন? একলা পারবিনি তুই অনাথ, দাঁড়া।"

প্রশান্ত কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দেখে কিছু বোঝবার আগেই কোঁচাটা গুঁজে নিয়ে হাত লাগিয়েছেন।

একরকম লাফিয়ে পড়েই ছুটে এলো সে, বলল—"ওকি করছেন আপনি।"

"দেখ কি একলা পারবে না ও।"

"তা বলে আপনি?"

—কী যে করবে বুঝতে পারছে না। তারপরই দু'হাতে ওঁর ডান হাতটা ধরে বলল—"আপনি বরং স্টীয়ারিংটা ধরুন। আমি ঠেলছি ওর সঙ্গে।"

"ক্ষতিটা কি ছিল? আমিও যে না পারতাম......"

ওঁর কথার মধ্যেই ওঁকে বসিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে অনাথের পাশে দাঁড়াল, বলল—"নাও জোর দাও অনাথ।"

মোটর উঠেছে, সে কিন্তু তত্টা মেহনতে নয়, যতটা লজ্জায় আর কুণ্ঠায়। হাসিও কোথায় যেন গুড়গুড়িয়ে উঠছে ভেতরে। মিথ্যা বলার সদ্যসদ্যই প্রায়শ্চিত্ত তো! খানিকটা নিয়েই যেতে হোল ঠেলে। জমিদার মানুষ, একেবারে গাড়িতে বসিয়ে ঝাঁকুনি দিতে সাহস হচ্ছে না [illegible] অতটা আর না ভেবেই খানিকটা মিথ্যে কলকব্জা টেনে উঠে এসে স্টার্ট দিয়ে বলল—"এবার ঠিক হয়ে গেছে।"

লাহিড়ীমশাই বললেন—"ভাল হোল বাপু। ছাড়, কিন্তু আমি আবার বুঝি না কিছু। কোন রকম সাহায্য করতে পারতাম না এক ঐ ঠেলা ছাড়া।"

।। চৌদ্দ ।।

সেদিন ব্যাঞ্জো আর হোল না। স্বাতি ভুলেই রেখেছিল, সময় পেয়ে ঠিকও করে রেখেছিল কিভাবে কাটান দেবে। লাহিড়ীমশাই এসেই মোটর বিড়ম্বনার কথা তুলতে এমনভাবে সেকথা নিয়ে পড়ল যে গানের প্রসঙ্গ আর উঠতেই পেল না। তোলবার অবশ্য চেষ্টাও করল না প্রশান্ত। ও তো বইলই হাতের পাঁচ। আজ বেশি যেন লজ্জায় পড়ে গেছে স্বাতি। হঠাতই তো।

শুধু শেষের দিকে একটু ছুঁয়ে গেল। উঠে পা বাড়িয়ে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এইভাবে ঘুরে বলল—"আজ একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম—স্বাতি দেবী চমৎকার ব্যাঞ্জো বাজাতে পারেন।"

"কেন, জানতে না তুমি আগে?"—একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন লাহিড়ীমশাই।

"লুকোলে কি করে জানব বলুন। আজ এসে পড়ে......"

"লুকোবার কি আছে? একটা ভালো জিনিস..."

স্বাতি বলল—"কে বলছে ভাল জিনিস বাবা? তবে ভালো হাতের ছোঁয়া চাই তো।"

"আমিও অনেকদিন শুনিনি।" প্রশান্তর দিকেই চেয়ে বললেন লাহিড়ীমশাই। হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে স্বাতির কথাটা যেন কানেই যায়নি। পরে স্বাতির দিকেই চেয়ে বললেন—"তোমার ব্যাঞ্জো শেখবার শুরু সেই তুমি আই-এ পাশ করতে যে একটু প্রীতি-ভোজের আয়োজন হয়...অনেক দিনের কথা...তারপর আর..."

অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকেই চেয়ে কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ দৃষ্টিটা আকাশের এক কোণে স্থির হয়ে গেল। ভুরু দুটো কুঁচকে যেন লক্ষ্য করে বললেন—"দেখোতো, মেঘ উঠেছে কি? ঝড় হবে?"

স্বাতিও কি রকম হয়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে বলল—"মেঘ কোথায় বাবা? এখুনি তো জোছনা উঠবে। তুমি যাও আগে জামা উড়ুনি ছেড়ে ফলগে এসো। হাত-পা ধোও। ব্যাঞ্জো না হয় বাজানই যাবে, একাম আর কি? যাই বাজাই, তুমি মেয়ের নিন্দে করবেই না, তারপর উনি......"

প্রশান্তর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল—"দাঁড়ান, আমি আসছি এখুনি।"

একটু পরে ফিরে এসে হাসিটাকে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ করে নিয়ে বলল—"চলুন।......বিশাখা এসো।"

নিবদ্ধ হয়েই গেছে স্বাতি। মাথা নীচু করেই দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে পাশে-পাশে যাচ্ছিল। বিশাখাকে বলে উঠল—"যাও তো বিশাখা—ভুলে গেলাম ব্যাঞ্জোটা রেখে এসো—যেমন থাকে—ঢাকনাটা পরিয়ে দিও ভালো করে। এই নাও চাবি।—নইলে হয়তো আবার এখুনি বাজাবার জন্যে জিদ করে বসবেন। যাও।"

বাড়ি থেকে নেমে খানিকটা এগিয়েছে। বিশাখা চলে যেতে একবার ঘুরে দেখে নিয়ে বলল—"একটা কথা প্রশান্তবাবু, —একটা অনুরোধ।"

দাঁড়িয়েও পড়েছে। বিশাখা ফিরে এসে যাতে দেখতে পায়। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"কি কথা স্বাতি দেবী?"

"মানে—কি বলি—পুরোনো কথা হঠাৎ উঠে এলে একেবারে [illegible] জিনিস আজ—বাবা মনের ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেন..."

"কৈ তাড়া দেখেছি বলে কিছু..."

"দেখেননি—আজকাল হয়ও না বড়ো। —তবে আপনাকে বলে রাখা এই জন্যে যে—এই জন্যে যে—কি সব মনে পড়ে গিয়ে—হঠাৎ কখনও কখনও রেগেও যেতে পড়েন—তাই যদি এমন কখনও হয়......"

"আমি জানি স্বাতি দেবী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অনাথ আমায় বলেছিল।"

"কী বলেছিল?"—একেবারে চমকে উঠল স্বাতি। প্রশান্ত শান্ত কণ্ঠেই বলল—"আপনিই বলে দিয়েছিলেন বলতে, মনে নেই আপনার। সেই প্রথম দিন আমার প্রতি ওঁর ব্যবহারটা আপনার রূঢ় মনে হয়েছিল, তাই......"

"মনে রাখবেন দয়া করে একটু—মাফ করবেন আমাদের।"—বিশাখা বেরিয়ে এসেছে। নিরতিশয় মিনতির স্বরে

......দয়া করে একটু মাফ করবেন আমাদের।"

কথাগুলো বলে বিশাখাকে বলল—"এসো তাড়াতাড়ি, তুমি যে বুড়িয়ে গেলে!"

ক'মাস ধরে একটানা বেশ হাসি-খুশি চলে আসছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটু বিষণ্ণতার ছায়া এসে পড়ল।

তা পড়ুক; সুখই দুটি মনকে বেশি কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে, কি দুঃখ, তাওতো ঠিক বলা যায় না। মিনতি করে বলবার সময় স্বাতির চোখ দুটি যে একটু সজল হয়ে উঠেছিল সেটা আর মন থেকে যেতে চাইনি প্রশান্তর। ওর বেদনা এই জন্য যে, সমস্তটুকুর গোড়ায় ওই রয়েছে; ও না ব্যাঞ্জোর কথা তুললে, না এটুকু হোত। অনাথের কাছে শুনে ও সমস্তটুকু জানে বলে ওর কাছে ঘটনা-টুকু যেন আরও মর্মন্তুদ হয়ে উঠল। ঠিক করল ব্যাঞ্জোর কথা আর আনবেই না মুখে, কাল গিয়ে বিশাখাকে একটু ছুতো করে সরিয়ে দিয়ে—যেমন স্বাতি দিয়েছিল—ক্ষমা চেয়ে নেবে স্বাতির কাছে। কি বলে সরাবে, যাতে একটু বেশি সময় পায়, তারপর কি করে, কি বলে ক্ষমা চাইবে তার একটি পরিপূর্ণ রূপ যতক্ষণ না দাঁড় করাতে পারল মনে মনে ততক্ষণ বিছানাতেও শুয়ে অস্থির হয়ে কাটাল।

তার পরদিন বেলা একটায় সময় আফিস থেকে খেতে এসেছে, দ্যাখে অনাথ বারান্দায় বসে চাটুজ্যের সঙ্গে গল্প করছে; এদিকে যাওয়া আসা বাড়ায় বেশ প্রীতিপাত্র জমিয়ে নিয়েছে ওর কাছে।

প্রশ্ন করতে ও যেমন সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আসল কথার দিকে এগোয় সেই ভাবে নীচে থেকেই আরম্ভ করল—আজ বিশাখাকে একটু সকাল সকাল পাঠিয়ে দিতে হবে সেই কথা বলবার জন্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক হোল এসে বসে আছে—না গেলে ফিরতে যে আবার দেরি হয়ে যাবে—হবে না দেরি?—মা-মণি অবশ্য একলাই কোমর বেঁধে লেগেছে, কিন্তু একলা পেরে উঠবে?—না পেরে উঠবার কারণ, আজ তো শুধু ডাক্তার-বাবু, প্রশান্ত আর বিশাখাঠাকরুণ নয় যে খুদকুঁড়া যা জুটল খাইয়ে বিদেয় করে দিলে—মা-মণি তো আবার সেই অন্ন-পূর্ণোর রূপ ধরেছে—গাঁসুদ্ধ সবাইকে ভোজ দিতে হবে—ছোট গাঁ, তবু এ্যাণ্ডা-বাচ্ছা, বুড়ো-হাবড়া মিলিয়ে গুটি পঞ্চাশেকের পাতা তো পড়বে উঠোনে—সবাই অনুগত, বাদ দেওয়া তো চলবে না......

অন্যমনস্ক হয়েই শুনে যাচ্ছিল প্রশান্ত—একটা ট্রাজেডীই একদিক দিয়ে, তার গোড়াতে প্রশান্তই তার ব্যাঞ্জো শোনবার শখ নিয়ে—স্বাতির রাত কেটেছে তার চেয়েও বেশি অস্থিরতার মধ্যে—কি করে সামলাবে তার যেন হদিস পেয়ে উঠছে না বেচারি।

অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল, হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে উঠল—"আমি নিজেও যাব অনাথ। চট্ করে একমুঠো খেয়ে নিই।"

—এ অপচয়, এই অবস্থার মধ্যে। বন্ধ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে প্রশান্ত।

"আপনি তো গিয়ে রাঁধবে না মশাই। সাত-তাড়াতাড়ি নাকে মুখে ভাত গুঁজে গিয়ে হবেটা কি?"—বেশ বিস্মিতই হয়ে পড়েছে অনাথ।

"সবাইকে বলা হয়ে গেছে?"

"তা বলে এলুম বৈকি। কখন ফিরব, তারপর বলব—ওরা তো সকাল সকাল রেঁধে-বেড়ে খেয়ে নেয়, যার যা জোটে সবার ঘরে তো পিদিমের বালাই নেই যে......" অন্যমনস্ক হয়েই শুনছিল প্রশান্ত, প্রশ্ন করল—"এর খরচ? পঞ্চাশ জন বলছ, অনেকগুলি টাকা লাগবে তো।"

"খর—চ, তা—".

একটু টান দিয়ে কথাটা ছেড়ে ছিল অনাথ। তারপর একবার চারিদিক থেকে দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে এনে ওর মুখের ওপর আবার দাঁড় করাল। এর মধ্যে একবার চাটুজ্যের ওপরও গিয়ে পড়ল দৃষ্টিটা। প্রশান্ত তাকে ভেতরে চলে যেতে বলল। একটু নড়েচড়ে বসল অনাথ।

বলল— "খরচ— সেকথাটা যে বুঝিনে ইন্জিয়ারবাবু এমন নয়—হাজার দুহাজার নিয়েও হাতে মেখেছি, আজ দুটো টাকার জন্যে—কি যে বলে... খরচ বুঝি বৈকি, কিন্তু প্রাণটার কাছে তো খরচ কিছু নয়। কাল ঐ যে ব্যাপারটুকু হোল—ছিলুমই তো দাঁড়িয়ে একটু তফাতে—ঐ করতে করতেই সব মনে পড়ে গিয়ে কাণ্ডটা তো ঘটে শেষ পর্যন্ত। তা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বাপকে তো

সামলাল ত্যাখন-ত্যাখন। অমন হলে শরীরটা তো আবার কাহিল হয়ে পড়ে— আপনাদের বিদেয় দিয়ে গিয়ে গিন্নি মাটির মতন করে সামলালো তো কচি ছেলেকে। তারপর, ওমা! সকাল থেকে নিজের মুখ শুকনো! এদিককার পাট সেরে হেঁসেলে ঢুকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখি, আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে।......'হ্যাগা মা-মণি। বলি সকাল থেকে মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছ—একটু সময় পাচ্ছি না যে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করি—তারপর এখন আবার এ কি!...'

আর বলতে দেয়?—এসে ঝাঁপিয়ে তো বুকে পড়ল......'কি হবে অনাথ কাকা?'...'আগে কি হয়েছে তাই বল্?' —না, 'বাবার আবার সেই রকম হতে আরম্ভ হয়েছে দেখলে তো।' '...' দেখলুম বৈকি, ভাবচিও; তোর মতন এই রকম হেদিয়ে পড়লে হবে, না, এর ওষুধ বের করতে হবে?'

এই ওষুধ বের করেছি ইন্‌জিয়ার-বাবু—ব্যাঙ্গোর কথায় মনে পড়ে গিয়ে আর সে রকম পিতি-ভোজ হচ্ছে না বলে দুঃখ, তা গাঁসুদ্দু ডেকে খাইয়ে দিলেই তো হোল। তা বৌরাণীমার আশীর্বাদ আছে তো ওপর থেকে—ধরেছে ওষুধ —বাপবেটি দুজনেরই ওপর। আপনি গিয়ে দেখবেনই......"

"পঞ্চাশটি টাকা আয়ের ওপর পঞ্চাশ জনকে পাতপেতে খাওয়ান অনাথ—বেশি দিতে গেলে নেবেনও না......"

"নেবার মালিক তো এই বান্দা ইন্‌জিয়ারবাবু। নিচ্ছি না? না, না দরকার পড়লে নোব না বলেছি কখনও? —অবিশ্যি আপনকার কাছেই।...তা, এখন তো দরকারটা হচ্ছে না।"

"তার মানে?"

"তার মানে—ঐ ওপর থেকে তানার আশীর্বাদ এই দাসানুদাসের ওপর। একটা মস্ত সুবিধে, কত ধানে কত চাল—কোন্ কাজটায় কত খরচ পড়বে কত্তা তো তা একেবারেই বোঝেন না। যেমন বোঝেন না, তেমনি মাথাও ঘামাতে যান না। মেয়ে ঘা খেয়ে খেয়ে কিছু বোঝে, তবু তাকে ট্যাকাকড়ির হিসেবের মধ্যে পুরোপুরি টানি না—ভাঁওতা চলে —তা ভিন্ন একটা বিশ্বেস দাঁড়িয়ে গেছে, অনাথ কাকা অঘটন ঘটাতে পারে—আর যখন বলে তার হাত খালি, তখনও কিছু থাকেই হাতে—দেখলেও তো।"

"আমায় তো সেই ভাঁওতায় ভোলাতে পারবে না অনাথ।" —একটু হেসেই কথাটা বলে ঘরের দিকে পা বাড়াল প্রশান্ত; বলতে বলতেই—"না, এর খরচটা তোমায় নিতেই হবে অনাথ, দাঁড়াও।"

অনাথ খপ ক'রে উঠে পড়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরল, —বলল, "গঙ্গাজলের মতন শুদ্ধ মন দুজনের, তবু করেছি পাপ নুকিয়ে নুকিয়ে, করতেও হবে— হাতের আঁজলা পেতে নোব, আপনাকে কথা দিচ্ছি—তবে যাদ্দিন আছে হাতে..."

"কোথা থেকে থাকবে অনাথ?— বললুম তো, আমায় তো লাহিড়ীমশাই পাওনি, তোমার মা-মণিও নয়।"

"আছে ইন্‌জিয়ারবাবু, না পেত্যয় যান, চলুন, আজই গুণে দেখিয়ে দোব। পুরো টাকা দিয়ে গয়নাগুলো ছাড়াইনি তো। দশ পনেরো করে যেমন পারছি দিয়ে যাচ্ছি মাসে মাসে—একেবারে হাত খালি করলে তো চলবেও না। বলবেন, তবুও পঞ্চাশজনের ভোজ। তা ভোজও তো তেমনি, বাপ-বেটিকে একটু ভুলিয়ে রাখা—খিচুড়ি, একটা চচ্চড়ি, একটা ভাজা, একটা টক। কত্তা বললেন, 'শেষ দিকে একটু করে দই আর একমুঠো করে বোঁদে রেখে দে অনাথ, তুই খরচের দিকটা যেন বড্ড ভাবিস!'...একদিনের নুটিসে ঢালোয়া দইয়ের ব্যবস্থা হয় না, তবু পাঁচু ঘোষকে বলেছি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে যতটা পারে, দেখতে। টোকো দই, ওদের তো আর মগরা থেকে সে মাল এনে দিতে হচ্ছে না। বোঁদেটাকেও চিনিতে এনে দাঁড় করিয়েছিলুম ইন্জিয়ারবাবু, ঐ বলেই—শহর জায়গা নয়, একদিনের নুটিসে মিলবে না, তা মা-মণি ধরে বসল—বাবার ইচ্ছে, ওটা তোমায় করে দিতেই হবে অনাথ কাকা; পাঁচ-ছটার কমে তো মিষ্টি হয়নি কোন ভোজে, ওটা তোমায় ক'রে দিতেই হবে।'

এই হোল ইতিহাস ভোজের, কোন-রকমে বাপ-বেটিকে একটু ভুলিয়ে রাখা। আমার ইষ্টিমিট্ হোল......"

চুপ করে মাথাটা হেঁট করে নিল অনাথ, পা দুটো ধরেই আছে। প্রশান্ত বলল—"তা শুনি এষ্টিমেট্‌টা কি তোমার।"

অনাথ আবার কুণ্ঠিতভাবে মুখটা তুলল, বলল—"তা একরকম বললে তো চলবে না। বাপকে বলেছি—দশ টাকাতেই হয়ে যাচ্ছে আমার। ভগবানের দয়া, হিসেব জিনিসটে তো একেবারেই মাথায় ঢুকতে দেননি। দিব্যি বুঝে নিয়েছেন। মেয়ে, অত-কি যে বলে—ইয়ে নয়, তবু খানিকটা ভাঁওতা চলে, তাকে বুঝিয়েছি—অত কমে কখনও হয়? পনেরোটা টাকা লম্বা হয়ে যাবে, তবে ওনাকেই বললুম, কত্তা যেন না টের পান। তারপর......"

"হ্যাঁ, তারপর আমার জন্যে কি রেখেছ?" কি ভেবে এত দুঃখের 'ইতিহাসে'ও কোথা থেকে এসে একটু হাসি জুটে গেছে প্রশান্তর ঠোঁটে। পায় একটু টান দিয়ে বলল—"পা দুটোও ছাড়বে তো?"

একটু চেপেই ধরল অনাথ। মাথাটাও হেঁটে বলল—"তিরিশটে টাকার মায়া কাটাতে হবে। ইন্‌জিয়ারবাবু দুচারটে বেশিই হয়তো। তা ওটা আর আপনি জোর করে নেওয়াবেন না। দুজনাকে ঠকিয়ে, নুকিয়ে নেওয়া তো ও মহা-পাতকটা আর করাবেন না আমায় দিয়ে। তারপর—মানুষ তো নয়, সাক্ষাৎ দ্যাবতা —নোব বৈকি প্রেয়োজন হলে, কার কাছে আর দাঁড়াব গিয়ে?"

ফোনে ড্রাইভারকে ডাকিয়ে এনে জীপটা বের করিয়ে দিল প্রশান্ত। কো-অপারেটিভ থেকে এদিককার জন্যে সওদাপাতি করে, রজতকেও নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিশাখাকে নিয়ে চলে গেল অনাথ। (ক্রমশ)

জন-স্ফীতি

উমাপদ মজুমদার

আধুনিক যুগের নামকরা অর্থনীতিবিদ কীনস্ সেকেলে ম্যালথাসকে খানিকটা সম্মান দেখিয়েছেন; কিন্তু বেশীর ভাগ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বর্তমান যুগের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে, দুনিয়ার উন্নত ও অনুন্নত দেশের প্রভেদ ভুলে গিয়েছিলেন। তাই যখন ভেষজ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুনের উৎকর্ষতা লাভের ফলে মৃত্যুর হার জন্ম-হারের থেকে অনেক নীচে নেমে গেল, তখন অনুন্নত দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল—এই বাড়তি জনসংখ্যাকে কি খেতে দেবে।

বেশীর ভাগ দেশই যুদ্ধের পর স্বাধীন হয়েছে। সকলেরই একান্ত ইচ্ছা যে শিল্পে-অগ্রসর পশ্চিম দেশের ন্যায় তারা শিল্প-বিস্তার করে। আন্তর্জাতিক অবস্থা এই রকম পুনর্গঠনের অনুকূলে আবহাওয়ারও সৃষ্টি করল। কয়েকটি রক্ষণশীল পশ্চিমী দেশ ছাড়া সকলেই ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে অগ্রসর দেশের অর্থনীতির কাঠামো শক্ত রাখতে অনগ্রসর দেশের শিল্প-বিস্তারের গোড়াপত্তন করতে সাহায্য করতে হ'ল। আন্তর্জাতিক পুনর্মিলনে অসংখ্য অনগ্রসর দেশ থাকায় ও আন্তর্জাতিক বিদ্বেষের অন্তরালে মতবাদের সংঘর্ষ থাকায় সংগ্রামশীল জাতির মধ্যে অনগ্রসর দেশগুলিকে সাহায্য করবার একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল। যাহোক এতে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির পক্ষে ভালই হয়েছে। অনেক অনুন্নত দেশ আশা করছিল যে, শীঘ্রই তথাকথিত 'take off' point-এ হাজির হবে। একজন মন্ত্রী আমেরিকা সফর থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন যে, আমেরিকায় শস্য তৈরী হয় পশুপক্ষী প্রভৃতিকে খাওয়াতে আর সেখানের মানুষ খায় সেই জন্তুগুলিকে। কিন্তু আমরা শুধু ডাল-ভাতের যোগাড়ে হিমসিম খাচ্ছি।

আজ জন-স্ফীতির ফলে এই ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করাও মুস্কিল হয়ে পড়েছে। এশিয়ার জনবহুল দেশগুলিতে দারিদ্র্যত্রাণের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার অনেকখানি এই জনবৃদ্ধির জন্য বিফল হবে। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সভাপতি এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যেখানে ১৯৫০ সালে ৪ জন লোক ছিল, আজ আরেকজন যোগ হয়েছে। সারা দুনিয়ায় লোকগণনায় ১০ বৎসরে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সারা দুনিয়ায় প্রতি ৩০ সেকেণ্ডে ৯০টি শিশু জন্মগ্রহণ করছে আর এই সময়ে খুব জোর ৬০ জন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে। এই বৃদ্ধি বেশীর ভাগই দরিদ্র দেশগুলিতে হচ্ছে, ফলে সমস্যা জটিল রূপ গ্রহণ করেছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ ব্ল্যাক মনে করেন, যদি দরিদ্র দেশগুলিতে জনসংখ্যা এরকমভাবে বেড়ে চলে, তাহলে ঐ দেশগুলির জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত করা সম্ভব হবে না, এমন কি দারিদ্র্য আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে না করতে পারলে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের কোন সম্ভাবনা নেই।

গত লোকগণনায় ভারতীয় জনবৃদ্ধির যে খতিয়ান দেওয়া হয়েছে তা কম ভয়াবহ নয়। পরিকল্পনার দফা শেষ না করলেও এই অপ্রত্যাশিত জন-স্ফীতি পরিকল্পনার লক্ষ্যমূলে যে কুঠারাঘাত করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কর্ম-সংস্থান, মাথাপিছু আয়ের হার, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি মূলগত ব্যাপারে ভারতীয় আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হয়েছে। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সন পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছিল শতকরা ১৩·৩৪ ভাগ; কিন্তু ১৯৫১ সন থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত বাড়তি অংশ শতকরা ২১·৪৯। আসামে এই বছরে ৩৪·৩০ ভাগ লোকবসতি বেড়েছে আর পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প-আয়তনে ৩২·৯৪ ভাগ। এখন ভারতীয় জনসংখ্যা ৪৩ কোটির উপরে।

প্রথম পরিকল্পনায় প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, জনগণকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা হবে। ২১ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭১ সনে ভারতীয় জাতীয় আয় দ্বিগুণ করা হবে আর ২৭ বৎসরে ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ১৯৪৮ সনের মূল্য অনুসারে ১৯৫১ সনে ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ২৬৪্ টাকা। এ প্রায় অনেক অনুন্নত জাতির তুলনায় কম। বলা হয়েছিল যে, এই আয় ঐ সনের মূল্য অনুসারে ১৯৭৭ সনে ৪৯২্ টাকা হবে।

প্রথম পরিকল্পনায় অপ্রত্যাশিত ফললাভ হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন এই সময়কে আরও ছোট করলেন। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের পিছনে ছিল ভাল আবহাওয়া আর আগেকার অলস শিল্প-ক্ষমতা। যা হোক পরিকল্পনা কমিশন যদিও আন্দাজ করলেন যে, পরবর্তীকালে জনবৃদ্ধির হার কিছুটা বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু এতটা স্ফীতি হবে আশা করেননি। এঁদের নির্ধারিত হার ছিল শতকরা ১২·৫ ভাগ এবং তাঁরা আশা করছিলেন যে, ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত বৃদ্ধির হার হবে ১৩·৩ ও ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত শতকরা ১৪ ভাগ হতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি শতকরা ১১ ভাগের স্থানে ১৯ ভাগ হয়েছিল। সুতরাং জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে হিসাবে বেসামাল হয়নি। আর এঁদের লোকগণনায় ত্রুটি থাকায় বর্তমান উচ্চ বৃদ্ধি-হারের আভাস পান নি। তাই সগর্বে ঘোষণা করলেন যে, জাতীয় আয় ২১ বছরের জায়গায় ১৭ বছরে আর মাথাপিছু আয় ২৭ বছরের জায়গায় ২৩ বছরে দ্বিগুণ হবে। কিন্তু বর্তমান লোকগণনার ফলাফল দেখে তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। বর্তমানের হিসাবে গত দশ বছরে জাতীয় আয় বছরে শতকরা তিন ভাগের একটু বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে আর মাথাপিছু আয় শতকরা এক ভাগের একটু বেশী। এই বাড়তির যোগফলে আবার বিয়োগ আছে। অর্থাৎ ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ সনে মাথাপিছু আয় কমে গিয়েছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে আমাদের অগ্রগতি ধারাবাহিক নয়।

গত দুটি পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বেড়েছে মাত্র শতকরা ৩৬ ভাগ আর জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২১ ভাগ। বৃদ্ধির হার যদি একভাবেই চলে তাহলে আমাদের মাথাপিছু আয়—অর্থাৎ বছরে ৫০০্ টাকার কম আয়—১০০ বছরে আশা করছি। আর যদি জনবৃদ্ধির হার

আরও দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন কে না জানে, এই দেশ তলিয়ে যাবে।

এখন গত ৬০ বছরের জনবৃদ্ধির হিসাব নেওয়া যাক্। ১৯০১ সনে ভারতীয় জনসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি। বর্তমানে ৪৩ কোটি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ১৯৭৬ সনে ৬০ কোটির উপরে উঠবে। এই ৬০ বছরে জনবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৮৫·৭ ভাগ। মনে হয়, পরবর্তী ১৫ বছরে আর ৪৩ ভাগ বাড়তে পারে। বর্তমান আদমসুমারীর হিসাবে গত ৬০ বছরে আসামের জনবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ও উত্তরপ্রদেশের সর্বনিম্ন। যেখানে সর্বভারতীয় হার শতকরা ৮৫ ভাগ, আসামের জনবৃদ্ধির হার ২১৯ আর উত্তরপ্রদেশের ৫১·৭। কাশ্মীর রাজ্য বাদ দিলে ১৪টি প্রদেশের মধ্যে ৮টি প্রদেশের জনবৃদ্ধির হার সর্বভারতীয় হারের বেশী ও ৬টি প্রদেশের কম।

প্রদেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ১৯০১—৬১		শতকরা বৃদ্ধির হার ১৯০১—১৯৬১	ঘনতা— এক স্কোয়ার মাইল ১৯৬১
অন্ধ্র	১৯·৭	৩৬·০	৮৮·৭	৩৩৯
আসাম	৩·৭	১১·৯	২১৯·৪	২৫২
বিহার	২৭·৩	৪৬·৫	৭০·১	৬৯১
গুজরাট	৯·১	২০·৬	১২৬·৮	২৮৬
কেরালা	৬·৪	১৬·৯	১৬৩·৮	১,১২৫
মধ্যপ্রদেশ	১৬·৯	৩২·৪	৯২·১	১৮৯
মাদ্রাজ	১৯·৩	৩৩·৭	৭৪·৮	৬৭১
মহারাষ্ট্র	১৯·৪	৩৯·৫	১০৩·৭	৩৩২
মহীশুর	১৩·১	২৩·৫	৮০·৪	৩১৮
উড়িষ্যা	১০·৩	১৭·৬	৭০·৫	২৯২
পাঞ্জাব	১৩·৩	২০·৩	৫৩·০	৪৩১
রাজস্থান	১০·৩	২০·১	৯৫·৭	১৫২
উত্তরপ্রদেশ	৪৮·৬	৭৩·৮	১৫১·৭	৬৫০
পশ্চিমবঙ্গ	১৬·৯	৩৫·০	১০৬·৪	১,০৩১
সর্বভারত	২৩৫·০	৪৩৬·৪	৮৫·৭	৩৮৪

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, ৫টি প্রদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার ঘনবসতির হার সবচেয়ে বেশী। বহিরাগতের সংখ্যা বাদ দিলেও জন্মবৃদ্ধির হার কম নয়। ঘনবসতির হার যেভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা খুবই অশুভ। ১৯০১ সনে যখন ভারতীয় হার ছিল প্রতি স্কোয়ার মাইলে ২০৮, বাঙলার হার ছিল ৪৯১। বর্তমানে ভারতীয় হার ৩৮৪, পশ্চিমবঙ্গের হার ১,০৩১।

কেরালার অবস্থা আরও ভয়াবহ। পূর্বে কেরালার ঘনবসতি ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৪২৬ জন, বর্তমানে হয়েছে ১১২৫ জন। এখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি স্বভাবতই জন্মবৃদ্ধির জন্য। এখানে গত ৬০ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ১৬৪ ভাগ বেড়েছে। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা তীব্র, সুতরাং এই দুই প্রদেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের জনবৃদ্ধির হার উচ্চ হলেও কেরালা কিংবা পশ্চিমবঙ্গের মত সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেনি। এই দুই প্রদেশে ঘনবসতির হার কম, তাছাড়া গুজরাটে কৃষি-ব্যবস্থা উন্নত ধরনের। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র শিল্প-সম্প্রসারণে আশানুরূপ ফল লাভ করেছে। উত্তরপ্রদেশে ভারতীয় হারের তুলনায় জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ১৯০১ সনে সর্বভারতীয় জনসংখ্যার ২০·৭ ভাগ উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী ছিল; ১৯৬১ সনে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬·৯। এই হ্রাসের প্রধান কারণ, উত্তরপ্রদেশের অধিবাসীরা কর্ম-সংস্থানের জন্যে ক্রমাগত বর্ধিত হারে নিজেদের প্রদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও দিল্লী যাচ্ছে। এখানে যদিও জনবৃদ্ধির হার কম, কিন্তু ঘনবসতির হার কম নয়।

বিহারের অবস্থাও প্রায় উত্তরপ্রদেশের মত। ১৯০১ সনে বিহারের ঘনবসতি ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৪০৬ জন আর ১৯৬১ সনে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯১ জন। জনবৃদ্ধির হার ৭০·১ ভাগ। নূতন শিল্পবৃদ্ধির ফলে বিহারের কয়েকটি জেলা সমৃদ্ধিলাভ করেছে; কিন্তু অনেক স্থানেই দারিদ্র্যের করাল মূর্তি বর্তমান। এখানেও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিশেষ প্রয়োজন।

মাদ্রাজের ঘনবসতি প্রতি বর্গমাইলে ৬৭১ জন। ৬০ বছরের জন্মবৃদ্ধির হার ৭৪·৮ জন। মাদ্রাজে কয়েক বৎসরে কৃষি ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, জনসংখ্যা যদি এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তা'হলে আমরা কখনই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করতে পারি না; আমরা কখনই জাতীয় অর্থনীতিকে প্রগতিশীল ধারায় বাঁধতে পারব না। ১৯৬০ সনের বিবিধ পরিসংখ্যান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমরা দিনের পর দিন ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি থেকে কিভাবে পিছিয়ে পড়ছি। ভারতবর্ষ গত দশ বছরের পরিকল্পিত অর্থনীতি সত্ত্বেও স্পেন পর্তুগালের নীচে, কেবল আর্জেণ্টিনার ওপরে স্থান পেয়েছে। জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতির কথা বাদ দিলাম। ইস্রায়েল, ইরাক, গ্রীস, বর্মা, মেক্সিকো, তুর্কী, সাইপ্রাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অনগ্রসর দেশের চেয়েও ভারত কম হারে অর্থনৈতিক উন্নতি করছে।

দ্রুত শিল্প গঠনের জন্য যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী লোক আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় তার বেশীর ভাগই আসে দান কিংবা ঋণ হিসাবে। দেশে লোকসংখ্যা বেশীর জন্য রপ্তানিযোগ্য মাল পর্যাপ্ত উৎপন্ন হয় না। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিদেশী মুদ্রা-ব্যয় করে আমদানি করতে হয়। জাতীয় আয়ের যে অংশ আমরা মূলধন হিসাবে ব্যবহার করছি তাও পর্যাপ্ত নয়; সুতরাং লগ্নী-উপযুক্ত মূলধনও আমাদের আমদানি করতে হয়। এতখানি পরমুখাপেক্ষিতা জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়।

মা ষষ্ঠির কৃপায় আমাদের দেশে সামাজিক সঙ্কট বিকট আকারে দেখা দিয়েছে। এখন কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। অবশ্য আমাদের নেতারা এই ম্যালথাস-মার্কা ভূতকে ভয় করেন না। তাই এই ভূত জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কাজকর্ম যেভাবে চলছে তাতে কোন আশার সঞ্চার করে না। কারণ এর সাফল্য ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের উপর নির্ভর করছে। ব্যাপক অর্থনৈতিক জ্ঞানও প্রয়োজন। ক্লিনিক-এর ব্যবস্থা যেমন পর্যাপ্ত নয়, প্রচারের ব্যবস্থাও সেইরকম। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে সুলভে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অস্ত্রোপচার ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। সুব্যবস্থা ও প্রচারের অভাবে আজ আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ শ্রেণীর মধ্যেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন!
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
4 oz.
phial
Rs. 2/8/-
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা
SA-2/60

প্রতিবেশী সাহিত্য

॥ উর্দু গল্প ॥

॥ ভূমিকা ॥

(উর্দু ভাষায় বাংলা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের বহু গল্প-কবিতা-উপন্যাসের অনুবাদ তো হয়েছেই—আধুনিক যুগের তারাশঙ্কর-মাণিক-প্রেমেন্দ্র এমনকি তরুণতম লেখক পর্যন্ত উর্দু পাঠকসমাজে সুপরিচিত। বাঙালী লেখকদের সম্পর্কে উর্দু লেখকেরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন।

আধুনিক উর্দু সাহিত্যে এগিয়ে চলার সুরই মুখ্য। নতুন ধরনের সাহিত্যরচনায় উর্দু সাহিত্যিকেরা ব্রতী হয়েছেন। প্রেমচাঁদের আগে পর্যন্ত উর্দু কথাসাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে কেউ গল্প-উপন্যাস লেখেননি। প্রেমচাঁদের রচনায় কৃষক-জীবনের বাস্তবরূপ স্থান পেয়েছে। প্রেমচাঁদের সমসাময়িক লেখক হিসাবে কাজী আব্দুল গফফর ও রশেদুল খইরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

উর্দু কথাসাহিত্য বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক ও গভীর রসসৃষ্টির দিক থেকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ছোটগল্পের তুলনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বর্তমান উর্দু ছোটগল্প যতখানি সমৃদ্ধ উপন্যাস ততখানি নয়।

উর্দু শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পলেখক হিসেবে কৃষণ চন্দনের নাম উল্লেখ্য। গভীর মানবতাবোধ ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর গুণে তাঁর লেখা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সমাদর লাভ ক'রেছে। প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। ভারতের ও বিশ্বের বহু ভাষায় গ্রন্থগুলি অনূদিত হয়েছে।

তারপরেই উল্লেখযোগ্য খাজা আহমদ আব্বাসের নাম। উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর পনরটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শ্লেষাত্মক গল্পরচয়িতা হিসেবে কানহাইয়ালাল কাপুরের নাম খ্যাতিলাভ করেছে। ইসমৎ চুগতাই লেখিকা হিসেবে সত্যিই শক্তিমান। মনোবিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর কয়েকটি গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তারপরেই লেখিকাদের মধ্যে হাজরা মসরুরের নাম উল্লেখ্য।

উপেন্দ্রনাথ অশক কথা-সাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। অন্যান্য শক্তিমান কথাশিল্পীদের মধ্যে মুমতাজ মুফতী, সাকীর উরজমান, বলবন্ত সিং গার্গী, বলবীন্দর সিং, শাদৎ হাসান মিন্টু, আজিজ আহমদ, আখতার হোসেন রাইপুরী, আখতার উরাই নবি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ('অনুবাদক')

চাঁদের সঙ্গে আলাপ

রচনা : কিষণ চন্দর

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

নির্জন সমুদ্রতীর। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ। চাঁদকে বললাম, তোমাকে দুটো কথা বলতে চাই।

—বল। চাঁদ চাপা হাসি হেসে বলল। জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তে।

নীরবে লক্ষ্য করছিলাম বালিয়াড়ি। মনে মনে ভাবছি কথাগুলো কোত্থেকে শুরু করব। বালির কণাগুলো সমুদ্র-তীরে ঘুমিয়ে আছে। জ্যোৎস্নালোকে বালির কণাগুলো শুয়ে আছে। মনে-মনে ভাবছি, কিন্তু কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছে। বালি-চিক-চিক-ঘুমন্ত তীর-ভূমির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। সমুদ্রের ঢেউগুলো মনের মত করে সাজিয়ে গেছে বালিয়াড়ি। দু-একটি জায়গায় ঘাস গজিয়ে উঠেছে। বালির বুকে সবুজের আলিম্পন। আমার পায়ের কাছে কয়েকটি ঝিনুক। চিক্ চিক্ করছে। আমি ভাবছি।

—চুপ করলে কেন? চাঁদ আবার প্রশ্ন করল।

—একটি ডাগর মেয়ের কথা......

—ডাগর মেয়ে? চাঁদ মুখটিপে হাসল।

—আমি তাকে ভালবাসি।

—ভালবাস?— তারপর চাঁদ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সঙ্গে কেউ অন্য কথা বলে না। যখন শুনি সেই ভালবাসার কথা। হাজার বছর ধরে ঐ এককথা শুনে আসছি। যার সঙ্গেই দেখা হয় সেই জানায় ভালবাসার কথা। আশ্চর্য! আমার কাছে কি অন্য কথা বলার নেই।

আড়ি পেতে শুনে বললাম, তোমার কাছেই তো বলবে। তুমি যে চাঁদ........ তুমিই বলনা আজ পর্যন্ত সূর্যের কাছে কি কেউ ওসব কথা বলতে গেছে? একটি মেয়েকে ভালবাসার কথা। সত্যি কথা বলতে কি, সূর্যের তেজ এত প্রখর যে তাকে দেখে মনে পড়ে শুধু ছাতার কথা...... কোন তন্বীর কথা নয়।

আবার চাঁদ মুখ টিপে টিপে হাসল। আর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিল নিজের আলো। তারপর নক্ষত্রগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে বলল, তুমি দেখছি একজন প্রেমিকের মতই প্রগল্ভ। আমাকে তোমার ভালবাসার কথা না জানিয়ে দেখছি ছাড়বে না। বল শুনি...। একটি ডাগর মেয়ের কথা......

—শুনেছি তো। কিন্তু সে মেয়েটা এখন কোথায়? তোমার সঙ্গে নেই কেন?

—এই তীরভূমি থেকে অনেক দূরে আছে একটি শহর। সেই শহরের এক প্রান্তে আছে একটি গলি। সেই গলির শেষপ্রান্তে আছে একটি বাড়ি। সেই বাড়ির এক কোণে আছে একটি ঘর.....

—হ্যাঁ তা আমার আলোতে দেখতে পাচ্ছি। এখন তোমার সেই ডাগর মেয়ে পালঙ্কে বসে বসে তোমার কথাই ভাবছে। তার চোখের কোণ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। যাক, তারপর বল শুনি তোমার কথা।

—আমরা পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ পাচ্ছি না। শুনেছো চাঁদ, আমরা একে অন্যকে কাছে পাই না; কারণ, ওর বাবা-মার ধর্মসম্প্রদায় আর আমার ধর্মসম্প্রদায়, আচার-বিচারে মিল নেই। ভিন্ন। তাইতো আমরা পরস্পরকে কাছে পাই না আজকাল।

—কোনদিন কি তোমাদের একজনের চোখ অপরের চোখে নিবদ্ধ হয়েছিল?

—হয়েছিল।

—কোনদিন কি তোমার হাতের আঙ্গুলগুলো ওর হাতের আঙ্গুলগুলোকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে তুমি ঠাহর করতে পারনি কোনটা কার আঙ্গুল?

—হ্যাঁ।

—আর কোনদিন কি তোমার ঠোঁট ওর ঠোঁটের উপর এমনভাবে রেখেছিলে যে টের পাওনি কতক্ষণ ঠোঁটগুলো পরস্পরকে আলিঙ্গন করে রেখেছে?

—হ্যাঁ।

—কোনদিন এই ধরনের ঘটনা কি ঘটেছে যে তার ঠোঁট তোমার ঠোঁট, তার আঙ্গুল তোমার আঙ্গুল পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেছে অথচ সে-কথার অর্থ তোমার কাছে ছিল এক আর তার কাছে ছিল অন্য? অর্থাৎ তুমি যা বুঝেছো সে তা বুঝতে পারেনি।

—না, আমরা দুজনে একই কথা চিন্তা করি। আমরা দুজনে একই ধরনের কথা বলি।

—এই ধরনের ঘটনা কখনও ঘটেনি তো যে তুমি ওর খোঁপায় গুঁজে দিয়েছো একটি গোলাপ আর সে গন্ধ পেয়েছে অন্য ফুলের।

—না আমরা দুজনে একই সৌরভ পাই।

—তাহলে আর কি। —চাঁদ গণক-ঠাকুরের মত বলল, তাহলে মনে রেখো সেই সুগন্ধই সত্য আর সব মিথ্যা।

—বলতে পার চাঁদ, মিথ্যা সত্যকে হারিয়ে দেয় কেন? তা যদি না হত তা হলে তো সে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারত। আমরা দুজনে মনের দিক থেকে এত কাছে হয়েও কেন এতদূরে? বলত চাঁদ এর কারণ কি?

—ভালবাসা অত সস্তা জিনিস নয়। ভালবাসা হল একটি প্রতিজ্ঞা—একটা খেয়াল নয়। ভালবাসা চায় একটা সংগ্রাম। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের, মন্দের সঙ্গে ভালর, অসুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে মাঝে-মাঝে মিথ্যা সত্যকে হারিয়ে দিয়েছে আর কখনও সত্যেরই হয়েছে জয়।

এই সংগ্রামে কত ফুল অকালে ঝরে পড়েছে। মরে প্রেমিক-প্রেমিকারাই, অন্যেরা তামাসা দেখে। এমন একদিন ছিল যখন একটি নারী পাঁচজন পুরুষকে বিয়ে করত আর একজন পুরুষ বিয়ে করত পাঁচশো নারীকে। কিন্তু চেয়ে দেখ আজকের দিকে। অন্ধকার কমে গেছে, সেদিন আর নেই। হাজার মানুষের ভালবাসার সংগ্রামের আলোতে সেই কুৎসিৎ অন্ধকার ঘুচে গেছে।

—আমি তা জানি।

—কিন্তু সে কি তা জানে?

—সেও জানে।

—তা সত্ত্বেও তোমরা পরস্পরকে কাছে পাও না?

আমি নীরবে কয়েক মুহূর্ত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বললাম, সে বলেছিল.........

চাঁদ আমার কথার মাঝেই বলল, তার কথা তার মুখেই শুনতে চাই। দেখতে চাই তোমার সেই প্রেমিকাকে। তার মুখেই শুনতে চাই। সেই আমাকে বলুক। যাও নিয়ে এস তাকে আমার সামনে।

তারপর চাঁদ মেঘের আড়ালে গা-ঢাকা দিল। হারিয়ে গেল আকাশের বুকে। আমার কথা যে বলা হয়নি। হতাশ হয়ে তীরভূমি থেকে ফিরলাম।

তারপরে অনেকগুলো চাঁদনী রাত কেটে গেল। বাতাস বয়ে আনল কত ফুলের সুগন্ধ। সমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গ বালিয়াড়িতে আছড়ে পড়ল। নৌকায় করে কতদিন মাছ-মারা মাঝিরা সমুদ্রে পাড়ি দিল। ফিরল। নারকেল গাছের পাতাগুলো কত ঝরে পড়ল। আকাশে প্রত্যেকদিন কত নক্ষত্রকে দেখেছি কিন্তু সে এল না। আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম। চাঁদ অপেক্ষায় ছিল আর সমুদ্র নীরবে কাঁদছিল। তবুও সে এল না।

আর যেদিন সে এল সেদিন চাঁদ ছিল না। যেখানে তার দেখা পেলুম সেটা তীরভূমি নয়। সমুদ্র সেখানে নেই। একটি ছমছমে অন্ধকার ঘর। একটি সাধারণ বিছানা। ফুলদানিতে গোলাপ ফুল আছে। রেডিওতে শুনছি গান। আমার একেবারে কাছে বসে সে বলছিল, মা বলছে, আমি তোমাকে বিয়ে করলে নাকি সে বিষ খেয়ে মরবে।

আমি বললাম, আমার বাবা শাসিয়ে আমাকে বলেছে, আমি বেঁচে থাকতে ও মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না। তুমি ত জান স্বর্ণা, আমার বাবা কত বড়লোক। পত্রিকা খুললেই তাঁর নাম বড় বড় হরপে দেখা যায়।

স্বর্ণা বলল, আমার ভাই আবার বলছে তোমাকে নাকি সে গুলী করে মেরে ফেলবে।

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, কি হবে তাহলে?

—কি আর হবে। ওরা আগামী মাসেই ধরেবেঁধে আমার বিয়ে দেবে।—বলেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তারপর আমারও কান্না পেল। আর আমরা দুজনে একসঙ্গে কাঁদলাম। অনেকক্ষণ কেঁদে ক্লান্ত হয়ে আমরা দুজনে সিদ্ধান্ত করলাম, জীবন যায় যাক কিন্তু আমাদের ভালবাসা নষ্ট হতে দেব না। একে সার্থক করে তুলবো।

স্বর্ণা আমার গলা জড়িয়ে বলল, আমি তোমাকে ছাড়া নিজেকে কল্পনাই করতে পারি না......আমি বাঁচতে পারব না তোমাকে ছাড়া।

আমার ঠোঁট তার ঠোঁটের কাছে বিড় বিড় করে বলল, তোমাকে ছাড়া আমিও বাঁচতে পারব না স্বর্ণা।

স্বর্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পৃথিবীটা কি নিষ্ঠুর, আমাদের বাঁচতে দিচ্ছে না, আমাদের ভালবাসার পথ করে দিচ্ছে রুদ্ধ। আমরা তো কারও বাড়া ভাতে ছাই দিতে যাচ্ছি-না। শুধু চাই পরস্পরকে ভালবাসতে ......নিবিড়ভাবে পেতে। চল আমরা কোথাও......

—তার চেয়েও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি এসো।

—বিদ্রোহের কথা বল না— ও-কথা শুনলে আমার ভয় করে।

আমি চুপ করে গেলাম। কিছু-ক্ষণের জন্য কঠিন নীরবতা। স্বর্ণার কান্না কমে এল। চোখ মুছে ঠোঁটের লিপস্টিক ঠিক করে বলল, আমার মতে আমাদের দুজনেরই মরে যাওয়া উচিত।

—যে-অবস্থায় পড়েছি তাতে তোমার প্রস্তাবই ভাল মনে হচ্ছে।

তারপর তাকে কাছে টেনে নিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, আমরা যদি একসঙ্গে বাঁচতে না পারি নিশ্চয়ই এক-সঙ্গে মরব। কিন্তু কি করে মরব বলত?

—বা, সেটা আবার এমন কি শক্ত কাজ। দুটো দাঁড় কিনে এনে ঝুলে পড়লেই ত হয়ে গেল।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, পরি-কল্পনাটা ভাল। কিন্তু কল্পনা করে দেখ দেখি ঝোলার সময় হঠাৎ যদি দড়িটা ছিঁড়ে যায় অথবা ফাঁসটা যদি গলায় ঠিক আষ্টেপৃষ্ঠে না আটকে যায় অথবা একজনের হয়ে গেল অন্যের হল না—একজন মারা গেল অন্যে মরল না, তখন কি হবে?

অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে আমরা দাঁড় দিয়ে মরার প্রস্তাব পরিকল্পনা বাতিল করে দিলাম।

তাহলে কি হবে? স্বর্ণা আশঙ্কা-মিশ্রিত দৃষ্টি মেলে বলল, অন্য কোন উপায় বল তাহলে।

—বিষ কিনে এনে খাব।

—না, তা হয় না। বিষ খেলে চেহারা খারাপ হয়ে যায়। আমার এক বান্ধবী খেয়েছিল। ইস, মরার সময় তার কি কুৎসিত চেহারা হয়েছিল।

বাচনে-ভঙ্গিতে স্বর্ণা তার অনিচ্ছা প্রকাশ করল। আমিও কোন তর্ক না করে বাতিল করে দিলাম সে-পরি-কল্পনা। তারপর একে একে অনেক-গুলো উপায় ঠাওরালাম, কিন্তু তার প্রত্যেকটাই বাতিল করেছি—হয় আমি, না হয় স্বর্ণা।

স্বর্ণা চটে গিয়ে বলল, আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল। ভেবেছিলাম বাঁচা কঠিন, এখন দেখছি মরা আরও কঠিন।

তারপর অনেকক্ষণ পরে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। লাফিয়ে উঠে বললাম, স্বর্ণা শোন, এইটেই সবচেয়ে ভাল উপায়। পেয়েছি এতক্ষণে। তোমার বিয়ের একদিন আগে আমরা দুজনে সমুদ্রে যাব—পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ডুবে মরব।

—ডুবতে অসুবিধা হবে না তো?

—মোটেই না। আমি এমনভাবে বললাম যেন এ-বিষয়ে আমার আগে থেকেই একটা অভিজ্ঞতা আছে। শোন, কোন অসুবিধা হবে না। প্রথমে জল হাঁটু পর্যন্ত আসবে......তারপর কোমর —তখন আমরা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরবো......পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবো......তারপর...তারপর সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলো এসে আমাদের ডুবিয়ে দেবে। টেনে নিয়ে যাবে সমুদ্রের গভীরে......তারপর আমাদের নিষ্প্রাণ শরীর মাছের মত ভাসতে ভাসতে ঘোষণা করবে আমাদের অমর প্রেমের বাণী।

—সত্যিই সুন্দর মৃত্যু হবে।—স্বর্ণা আমার হাত টিপে বলল, আমার তো এখনই ও-ভাবে মরতে ইচ্ছে করছে।

—এখন নয়, এখন নয়—তোমার বিয়ের ঠিক একদিন আগে। সেদিন চাঁদের দেখাও নিশ্চয়ই পাব।

চাঁদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? অবাক হয়ে স্বর্ণা প্রশ্ন করল।

—এমন কিছু নয়। চাঁদ তোমাকে একবার ডেকেছিল।

কথাটা বুঝতে পারল না স্বর্ণা। সে শুধু মৃত্যুর ডাক শুনেছে—চাঁদের নয়।

শেষ পর্যন্ত সেইদিন এল। আমাদের মরার দিন। স্বর্ণা তার পছন্দসই শাড়ি পরে কপালে টিপ পরল। বধূ সেজে সে এসেছে আমার কাছে এক সঙ্গে মরতে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। নীল আকাশের নীচে সমুদ্রের তীরে আমরা দুজনে যখন পৌঁছলাম চাঁদ আমাদের বাধা দিয়ে বলল, দেখ ত স্বর্ণা, এই চাঁদনী রাত কত সুন্দর। এই রাত কারোর মৃত্যুর জন্য সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে ভালবাসার জন্য।

স্বর্ণা বলল, আমি যে নিরুপায়, আমি যে পরাধীন। চাঁদ, তুমি বুঝবে না আমি কত পরাধীন। একে আমি বিয়ে করলে মা বিষ খেয়ে মরবে। আর সারাজীবন সেই ব্যথা কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবে আমার বুকে, নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।

—কে বিষ খাবে? বিষ কি কেউ কোনদিন খেয়েছে? লয়লার বাবা, মজনুর মা, জুলিয়েটের বাবা, রোমিয়োর ভাই? কেউ বিষ খায়নি। কারো ভালবাসা বানচাল করতে কেউ বিষ খায় না। শুধু মরে যারা ভালবাসে। কেউ মরে বিষ খেয়ে আর কেউ রেলগাড়ির নিচে মাথা দিয়ে। অকালে এ-ভাবে সুন্দর ফুলগুলো ঝরে পড়ে। অত্যাচারীরা মরে না, মরে যারা ভালবাসে।

—তুমি কি জান চাঁদ, আমাদের জন্যে কত লোক দুঃখ পাবে?

—দুঃখহীন ভালবাসা নেই। কারণ প্রেম হল একটি সৃষ্টি। সদ্য পাতার কোল থেকে ফুল যেমন বিচ্ছিন্ন হয়, প্রেমিকাকে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে। কমলকে ফুটতে হলে পাঁকের ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। তাছাড়া কোন উপায় নেই। স্বর্ণা তুমিই বল, এমন কোন সৃষ্টি আছে যে দুঃখ নেই।

স্বর্ণা তৎক্ষণাৎ আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, এই পাগলা চাঁদের কথা শুনে না। চলে এস।

তবুও চাঁদ কি যেন সব বলতে লাগল। বালিয়াড়ি থেকে সমুদ্রের জলে নেবেছি, পায়ের পাতা ডুবে গেছে জলে। তারপর হাঁটু ডুবে গেল। আরও এগিয়ে গেলাম। কোমর পর্যন্ত জল উঠল। তার পরেই সমুদ্রের জল আমাদের টেনে টেনে আরও এগিয়ে নিল। সমুদ্রের জল যেন কমীরের মত পা আঁকড়ে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে চাইল। আমরা পরস্পরকে তখন জড়িয়ে ধরে আছি। গলা পর্যন্ত জল উঠেছে। ঢেউগুলো মাথার উপর দিয়ে আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুনতে হল একজন মানুষের আর্তনাদ। আমাদের চেয়েও দূরে, বেশ খানিকটা দূরে একজন ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠছে আর চীৎকার করছে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

আমি তৎক্ষণাৎ স্বর্ণার হাত ছেড়ে দিয়ে সাঁতার কেটে সেই লোকটার কাছে গিয়ে তাকে টেনে-টুনে তুললাম তীরে। লোকটা অচেতন হয়ে পড়ে আছে বালির ওপরে। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্বর্ণা। টপ টপ করে জল গড়াল স্বর্ণার গাল বেয়ে। আমার হাত চেপে ধরে বলল, এ বেচারা হয়ত আমাদেরই মত অবস্থায় পড়েছে।

আমি বললাম, বেচারা......দেখছ স্বর্ণা। একেই বলে ভালবাসা। সত্যিকারের ভালবাসা।

তারপর লোকটা আস্তে আস্তে চোখ খুলল। ফ্যাল ফ্যাল করে এদিকে-ওদিকে তাকাল। আমরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে, রুটি দাও, এক টুকরো রুটি এনে দাও......আজ দুদিন কিছু পেটে পড়েনি।

আমরা দুজনে থ বনে গেলাম। আমি আর স্বর্ণা। আমরা দুজনে একে অন্যকে ভালবাসি। ভালবাসছি বলে মরতে যাচ্ছি। জানতুম না যে রুটির জন্যেও মানুষ মরে। আমরা পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা বুঝলাম যে, এ-ভাবে মরা নিরর্থক, অনাবশ্যক, পাপ এবং ভুলপথ। অন্য কিছু করা উচিত। মৃত্যু সে যতই বড় হোক, জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে বড় নয়।

আজ পূর্ণিমা। আমি চাঁদের সঙ্গে কথা বলছি। অনেকদিন চাঁদের সঙ্গে কথা বলিনি। বহুকাল। ইতিমধ্যে স্বর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে অন্যত্র। আমারও হয়েছে। এখন স্বর্ণার একটি সংসার আছে। ছেলেমেয়ে আছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং একটি আস্ত জীবন আছে তার। আমারও একটি পরিবার আছে। ছেলেমেয়ে যে নেই তা নয়। বিষয়-সম্পত্তি বন্ধু-বান্ধব এবং একটি আস্ত জীবন আছে। আমরা দুজনেই থাকি দূরে দূরে। কেউ কারোর সঙ্গে তেমন-ভাবে দেখাসাক্ষাৎ করি না। কালেভদ্রে কার্যোপলক্ষে হয়তো দেখা হয়ে যায়। দেখা হলে ওর কিছু কথা মনে পড়ে। আমারও পড়ে। তবে একটা কথা সত্য যে, এই বছরগুলির মধ্যে কোথাও ভালবাসা জয়ী হয়েছে আর কারো ভালবাসা হয়েছে পরাজিত। দুনিয়ার হালচাল বদলেছে। আগের তুলনায় ভাল হয়েছে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমার অবদান আছে, আছে স্বর্ণার এবং আরও হাজার নারী-পুরুষের। বিশ্ব যে ভালর দিকে যাচ্ছে এতো কম কথা নয়।

—তা হলে তুমি সুখী?—চাঁদ মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ।

—আর স্বর্ণা?

—সেও সুখে আছে।

তারপর চাঁদ বিচিত্রভাবে হাসল। আমি তার সে হাসির অর্থ বুঝিনি। চাঁদ আবার বলল, স্বর্ণার কথা কি তোমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে?

—পড়ে বৈকি। মাঝে মাঝে তাকে মনে পড়লে সমস্ত মন কেমন যেন হয়ে যায়। জীবনের সব স্বাদ যেন অপূর্ণ রয়ে গেল। যা চেয়েছি তা যেন কিছুই পাইনি। আর যা পেয়েছি তা তো স্বপ্নেও কোনদিন চাইনি।

চাঁদ চাপাহাসি হাসল। আমি বললাম, তুমি কত নির্বিকারভাবে হাসছ! অথচ ধরতে গেলে এ-সমস্ত কিছুর জন্যে তুমিই তো দায়ী। সব দোষ যে তোমার তা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

বিস্মিত হয়ে চাঁদ বলল, আমার! সে কি রকম?

—কারণ তুমি স্বর্ণাকে ভালভাবে বোঝাওনি। ভালবাসার ব্যাপারে তোমার তো হাজার বছরের অভিজ্ঞতা আছে, তুমি দান্তের দুঃখ বুঝেছ, তুমি জুলিয়েটের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছ। তুমি শকুন্তলার চোখের জল মুছেছো। তুমি সোহনীকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছো। সাবিত্রীকে এগিয়ে দিয়েছো নরকের দ্বার পর্যন্ত—স্বামীকে উদ্ধার করাতে। তুমি পারতে স্বর্ণাকে ভালভাবে বোঝাতে, তাকে বুঝিয়ে-শুজিয়ে সব রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত মনের জোর তার মধ্যে সঞ্চয় করতে পারতে। কিন্তু তা তো তুমি করার পাত্র নও। তোমার মন যে কালিমালিপ্ত, তাই তো তোমার স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম আলো যতই প্রাণমাতানো হোক না কেন তোমার গায়ে, তোমার বুকে অতগুলো কালো ছোপ।

চাঁদ পাঁজর ফাটিয়ে হেসে বলল, আমি তো চাঁদ নই। আমি হলাম ভালবাসার প্রতীক। এই যে আমার বুকে এতগুলো কালো ছোপ দেখতে পাচ্ছ এ-গুলো ভালবাসারই দাগ। যখনই হোক যেখানেই হোক একটি ভালবাসা ব্যর্থ হয়, হয় পরাজিত, তখনি আমার বুকে একটি করে কালো দাগ হয়ে যায় আঁকা। নিজেদের ভীরুতার জন্যে আমাকে দোষ দাও কেন বুঝি না। ওরে ভীরু, ওরে কাপুরুষ, আমার গায়ের যে কালো ছোপ সে ত তোমাদেরই দেওয়া।

—কিন্তু......

চাঁদ আমাকে বাধা দিয়ে বলল, এখন চলে যাও, আর না। আমি সবাইকে বলে দিয়েছি। ঐ দেখ, আর একজন যুবক আমার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসছে।

"মহারাসে"—নয়না, রঞ্জনা, দর্শনা এবং সুবর্ণা জাভেরি

রাধার ভূমিকায় : নয়না জাভেরি

ভারতের নৃত্যকলা

।। মণিপুরী নৃত্য ।।

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে মণিপুরী নৃত্য বিশেষ স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন। কেবলমাত্র স্বাতন্ত্র্যই নয়, এর ঐতিহ্যও গৌরবমণ্ডিত। মূলতঃ অসংখ্য কিংবদন্তী আর রূপকথাকে আশ্রয় করেই মণি-পুরী নৃত্যের উদ্ভব ঘটলেও পর-বর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ ও রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা এই নৃত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। উৎপত্তিকাল থেকে সমন্বিত গন্ধর্ব নৃত্যের প্রতি আস্থা এই নৃত্যের মধ্যে এনে দিয়েছে এক নির্মলতার আব-হাওয়া। তাই পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী থেকে এই নৃত্যকলার উদ্ভব

ঘটলেও এর ব্যঞ্জনাময় রসসৃষ্টিতে প্রকরণগত ঐশ্বর্যের অভাব ঘটেনি। উৎসবানুষ্ঠানের বিভিন্নতায় একই নৃত্যকলার মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়, এবং প্রয়োজনভেদে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ও তাৎপর্য ফুটে ওঠে। এই বিভিন্নতা নৃত্যের রূপায়ণ ছাড়াও, অঙ্গসজ্জায় ও অলংকরণে বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

মণিপুরী নৃত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় লীলায়িত অঙ্গ-সঞ্চালনে ও হিল্লোলিত দেহ-ভঙ্গিমায়। জলতরঙ্গের ছন্দময় রূপমাধুর্য যেন ফুটে ওঠে এই নৃত্যের প্রতিটি ছন্দে। আবহ সৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হয় মৃদঙ্গ, করতাল, এসরাজ, বাঁশি, বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র।

বাংলাদেশে মণিপুরী নৃত্যের প্রভাব এখন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই এই নৃত্যকলার মধুর গীতিকবিতার মতো ছন্দোসুষমায় মুগ্ধ হয়ে একে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন ঋতু-উৎসবে ও নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে প্রয়োগ করেন। তারপর থেকে এই নৃত্যকলার জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে তো বটেই, সমগ্র ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছে। মণিপুরী নৃত্য এখন ভারতনাট্যম, কথাকলি ও কথকের মতোই ভারতের এক প্রধান নৃত্যকলা হিসাবে গৃহীত।

"কলিঙ্গমর্দন"—সুবর্ণা ও দর্শনা জাভেরি

একটি নয়নাভিরাম দৃশ্য

অয়স্কান্ত

নভোচারণা ও মানুষের ভবিষ্যৎ

মেজর তিতোভের বিস্ময়কর কীর্তি খবর হিসেবে হয়তো এতদিনে পুরনো হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আমরা ধরেই নিয়েছি, বিস্ময়কর ঘটনা আজ যদি কিছু ঘটে দু-দিন পরে আরো অনেক বেশী বিস্ময়কর অন্য কিছু ঘটবেই। কাজেই কোনো ঘটনা নিয়েই আমাদের বিস্ময় এখন আর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে প্রথম স্পুৎনিক আকাশে উঠেছিল। তারপরে চার বছরও পার হয়নি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্পুৎনিক আমাদের কাছে তার বিস্ময় খুইয়ে বসেছে। আমরা এই বিজ্ঞানের কথা শুরু করেছিলাম গাগারিনের কথা দিয়ে। তারপরে চার মাসও পার হয়নি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিতোভের কীর্তি গাগারিনকেও ছাপিয়ে যেতে পেরেছে। এবং আশ্চর্যের কথা এই যে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তিতোভকেও আমরা প্রায় স্বাভাবিক একটা ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়েছি এবং অপেক্ষা করছি আরো অনেক বেশি বিস্ময়কর ঘটনা কবে ঘটবে সেই দিনটির জন্য। অর্থাৎ বিস্ময় আর বিস্ময় থাকছে না। অতি বড়ো বিস্ময়কেও স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।

এখন আমি যদি বলি যে মানুষ আর কিছুদিনের মধ্যেই চাঁদে পদার্পণ করবে তারপরে ক্রমে ক্রমে মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে এবং সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহেও—তাহলে খুব সম্ভবত কাউকে আর বিস্মিত করে তোলা যাবে না। মাত্র চার বছরের মধ্যেই আমরা মনে মনে এজন্য তৈরি হয়ে আছি। তবে আমি যদি বলি যে আগামী একশো বছরের মধ্যে মানুষ নক্ষত্রলোকে যাত্রার তোড়জোড় সম্পূর্ণ করতে পারবে তাহলে অনেকেই হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন। কারণ আমরা জানি যে আমাদের এই পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটির দূরত্ব হচ্ছে সাড়ে চার আলো-বছর। আলোর বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই বেগে ছুটে দিতে পারলে এক বছরে যতোখানি দূরত্ব অতিক্রম করা চলে তাই হচ্ছে এক আলো-বছর। এমনি সাড়ে চার আলো-বছর! সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা চাঁদের উদ্দেশে যে লুনিক পাঠিয়েছিলেন সেই লুনিক যদি এই সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রের উদ্দেশে যাত্রা করত তবে একবার যাতায়াতে লুনিকের সময় লাগত ৭০,০০০ বছর। গড়ে একশো বছর পরমায়ু ধরলেও একজন মানুষকে এই যাত্রাটি সাঙ্গ করতে হলে অন্তত সাতশো বার নতুন করে জন্মাতে হয়। কাজেই এক্ষেত্রে অবিশ্বাসের হাসি হাসাটা খুব অকারণ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের গত একশো বছরের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে গত একশো বছরে অবিশ্বাসীদের অনেকবারই ঢোক গিলতে হয়েছে। বিজ্ঞান যে কত অল্প সময়ের মধ্যে কী অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তার দৃষ্টান্ত এখন আর একটি-দুটি নয়—অজস্র। আর এটুকু আমরাও নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে আগামী একশো বছরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আরো দ্রুত হবে, হবে, আরো বিস্ময়কর। এমনও হতে পারে, আগামী একশো বছরের মধ্যে নক্ষত্রলোকের উদ্দেশ্যে মানুষের সত্যিকারের যাত্রাও শুরু হয়ে যাবে!

আমরা কেউ-ই হয়তো একশো বছর পরেকার পৃথিবীকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে বেঁচে থাকব না। 'হয়তো' বললাম এই কারণে যে বিজ্ঞানের এই কল্পনাতীত অগ্রগতির দিনে কোনো কিছুই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হবে যে আমাদের সকলের আয়ু অনেক বেড়ে যাবে। এমনও হতে পারে—

কিন্তু এসব কল্পনাকে বাদ দিলেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়াই এমনি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তিতোভের বিস্ময়কর কীর্তি এই তাৎপর্যময় ভবিষ্যৎকেই উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। এই সংখ্যায় মানুষের এই ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই আমি কিছু বলতে চাই।

প্রথম সংখ্যায় গাগারিনের কথা বলতে গিয়ে আমরা মন্তব্য করেছিলাম, "মেজর গাগারিনের দেড় ঘণ্টার পৃথিবী-প্রদক্ষিণও এমনি এক মহাকাশ-জোড়া আলোড়নের সূত্রপাত মাত্র। সেই আলোড়ন পৃথিবীর মানুষকে করে তুলবে মহাবিশ্বের মানুষ। খণ্ডকালের মানুষকে মহাকালের।" গাগারিন নভোচারী হয়েছিলেন গত ১২ই এপ্রিল তারিখে। তিতোভের নভোচারণা ৬ই ও ৭ই আগস্ট তারিখে। সময়ের হিসেবে ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। যে-কক্ষে তিনি আবর্তিত হয়েছিলেন, পৃথিবী থেকে তার সবচেয়ে কাছের দূরত্ব ছিল ১১০·৬ মাইল ও সবচেয়ে দূরের দূরত্ব ১৫৯·৭ মাইল। কাজেই তিতোভও যে খুব একটা মহাকাশ-জোড়া আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তা নয়। পৃথিবীর প্রায় গা ঘেঁষেই তাঁর পরিক্রমা। কিন্তু গাগারিনের চেয়ে এটি যে অনেকখানি অগ্রগতি তা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। কাজেই গাগারিনের কীর্তি যে-ভবিষ্যতের সূত্রপাত করেছিল, তিতোভের কীর্তি তাকে কিছুটা বাস্তব ভিত্তি দিয়েছে একথাও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই ঘটনার তাৎপর্য কী?

নভোচারণবিদ্যার দৌলতে মানুষের পরমায়ু অনেকখানি বেড়ে যেতে পারে—এমনি একটা কথা একটু আগে বলেছি। কথাটার মানে কী? বলা হয়েছে যে পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠবে মহাবিশ্বের, খণ্ডকালের মানুষ মহাকালের। তারই বা মানে কী?

দেশজয়ী ও কালজয়ী মানুষ

দেশ-জয়ের ব্যাপারটাকে কল্পনা করা খুব একটা অসাধ্য ব্যাপার নয়। বলা হচ্ছে, মানুষ এই পৃথিবীর বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মহাবিশ্বের যত্রতত্র বিচরণ করে বেড়াবে। যত্রতত্র না হোক, অন্তত এই পৃথিবী ছাড়িয়ে যে ছুটে দিতে পারবে তার প্রমাণ গত চার বছরে যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে গাগারিন ও তিতোভের দৃষ্টান্ত এখনো পর্যন্ত এর সপক্ষে চরম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কেন, তা বলা দরকার।

এতকাল আমাদের ধারণা ছিল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কয়েক-শো মাইল

মহাকাশবিজয়ী মেজর জার্মান স্টিপানোভিচ্ তিতভ মহাকাশ যাত্রার পূর্বে তার পত্নী তামারা ভেসিলেভ্নাকে বই পড়ে শোনাচ্ছেন।

উ'চু, তার বাইরে ফাঁকা মহাশূন্য। এই ধারণা ভুল। বায়ুমণ্ডলের রেশ অনেক দূরে পর্যন্ত থেকে গিয়েছে—কয়েক হাজার মাইল পর্যন্ত। তারও ওপরে রয়েছে আরও কয়েক হাজার মাইলের তড়িতাবিষ্ট কণিকার একটি বলয়। গাগারিন ও তিতোভ দুজনেই এই বলয়ের অনেক নিচু দিয়ে পৃথিবীকে পাক খেয়েছেন। মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে তড়িতাবিষ্ট কণিকার এই বলয়-টিকে ফুঁড়ে বেরোতে হবে। রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে তা বড়ো সহজসাধ্য নয়।

সমস্যা শুধু এইটুকুই নয়। ধরে নেওয়া গেল যে মহাশূন্যের যাত্রী এই তড়িতাবিষ্ট কণিকার বলয়টিকে পেরিয়ে বাইরের মহাশূন্যের এলাকায় গিয়ে হাজির হয়েছে। এই এলাকাটিও নামেই মহাশূন্য, আসলে ইনফ্রা-রে, রেডিও রে, এক্স-রে ইত্যাদি নানা ধরনের রশ্মিতে ঠাসা। এইসব এলাকা পার হবার জন্যে মানুষের রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে কতখানি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তা এখনো হাতেনাতে পরখ হয়নি।

তারপরে আছে ডেরা বাঁধার সমস্যা। চাঁদে বা শুক্রগ্রহে বা মঙ্গলগ্রহে বা অন্য যেখানেই মানুষ পদার্পণ করুক না কেন সেই স্থানটিকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করে নিতে হবে। তাও বড়ো সহজসাধ্য নয়। প্রথমত যদি উপগ্রহের কথা ওঠে তাহলে কোনো উপগ্রহেই জল বা হাওয়া নেই। আর যদি গ্রহের কথা ওঠে তাহলেও বিপত্তিটা কম নয়। বুধ-গ্রহের কথা বাদই দেওয়া যাক। সেখানে হাওয়াও নেই, জলও নেই। অন্যান্য গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে বটে কিন্তু তা পৃথিবীর মতো নয়। কোনো কোনো গ্রহের বায়ুমণ্ডল তো রীতিমতো বিষাক্ত। একমাত্র মঙ্গলগ্রহের বায়ু-

মণ্ডলেই কিছুটা অক্সিজেন আছে, যদিও পরিমাণে খুবই সামান্য। জল সম্পর্কেও একই কথা। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল একমাত্র মঙ্গলগ্রহেই জল আছে, মেঘ আছে, বৃষ্টি আছে, মেরু-অঞ্চলের বরফ আছে। হালে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মঙ্গলগ্রহের জল সম্পর্কেও একেবারে উলটো কথা বলে-ছেন। অন্যান্য গ্রহেও জলীয় বা বাষ্পীয় চেহারায় জল যে পাওয়া যাবে না সে-বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

তবুও ধরে নেওয়া গেল যে এতসব অসুবিধে কাটিয়ে উঠেও মানুষ গ্রহে-উপগ্রহে পদার্পণ করেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ এই সৌরমণ্ডলের দেশকে জয় করেছে। কিন্তু তারপরেও এমন একটি অসুবিধে থেকে যায় যা প্রায় অজেয়। মহাশূন্যের বিপুল বিস্তৃতিতে পাড়ি জমাতে হলে যতো-খানি সময়ের প্রয়োজন ততোখানি সময় মানুষের পরিমিত আয়ু কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। বিশ্বের বা মহা-বিশ্বের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল,—এমন কি এই সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ প্লুটোতেও একবার ঘুরে আসতে হলে শতখানেক বৎসর সময় হাতে নিয়ে বেরোনো দরকার। অতএব নক্ষত্রলোকে যাত্রার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এখানেই কাল-জয়ের প্রশ্ন ওঠে। বলা হয়েছে, মানুষ যেমন দেশকে জয় করছে, তেমনি জয় করবে কাল-কে। কি ভাবে?

এই পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে সময়ের একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে। সূর্যের চারদিকে পৃথি-বীর পুরো একটি পাক খাওয়ার সময়কে, অর্থাৎ পৃথিবীর একটি কক্ষ-আবর্তনকে, আমরা বলি বছর। তেমনি পৃথিবীর একটি অক্ষ-আবর্তনকে আমরা বলি দিন। এই দিনকে আবার আমরা ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ডে ভাগ করে নিয়েছি। যতোক্ষণ আমরা এই পৃথি-

যাঁরই মানুষ ততোক্ষণ আমাদের কারও কাছে এই সময়ের কোনো হেরফের নেই।

কিন্তু পৃথিবীর বাইরে গেলেও সময়ের এই মাপটা বজায় থাকবে তেমন কোনো কথা নেই। আসলে সময়ের মাপটা নির্ভর করে বস্তুর বেগের ওপরে। এই মুহূর্তে যখন আমরা ভাবছি যে আমরা এই পৃথিবীর মাটির ওপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তখনো কিন্তু আমরা মহাশূন্য দিয়ে ছুটে চলেছি আর এই চলাটা অনেকগুলো বেগের মোট ফল। প্রথমত এই পৃথিবী তার অক্ষদণ্ডে আবর্তিত হচ্ছে ঘণ্টায় প্রায় হাজার মাইল বেগে। আর এই আবর্তমান পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে সেকেণ্ডে প্রায় কুড়ি মাইল বেগে। তারপরে পৃথিবী সমেত গোটা সৌরমণ্ডলটি স্থানীয় তারামণ্ডলে সেকেণ্ডে ১৩ মাইল বেগে ছুটছে। আবার সৌরমণ্ডল সমেত এই স্থানীয় তারামণ্ডলটি আকাশগঙ্গা ছায়াপথে সেকেণ্ডে ২০০ মাইল বেগে পাক খাচ্ছে। তারও ওপরে আছে গোটা ছায়াপথটির একটি বেগ, যার মাপ দূরের কোনো ছায়াপথের সঙ্গে বিচার করলে সেকেণ্ডে প্রায় ১০০ মাইলের মতো। এতগুলো বিভিন্ন ধরনের বেগ মহাশূন্য দিয়ে আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। মহাশূন্যে গতিহীন অবস্থা বা স্থিরতা বলে কিছু নেই।

কল্পনা করা যাক, কোনো একটি বস্তু প্রচণ্ড বেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দিয়েছে। এই অবস্থায় এই বস্তুটির বেগ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর বেগের চেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে এই বস্তুটির সময় আর পৃথিবীর কোনো বস্তুর সময় এক হবে না। যে-বস্তুর বেগ বেশি তার কাছে যা একঘন্টা, যে-বস্তুর বেগ কম তার কাছে তাই একঘণ্টার চেয়ে বেশি। কতটা বেশি তা নির্ভর করে বেগের তারতম্যের ওপরে। যদি এমন হয় যে পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুটন্ত বস্তুটির বেগ আলোর বেগের প্রায় কাছাকাছি তাহলে এমনও হতে পারে যে এই বস্তুটির কাছে যা এক বছর, পৃথিবীর কোনো বস্তুর কাছে তা এক-কোটি বছর।

গাগারিন বা তোতোভ যে-ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে মহাশূন্যে পরিক্রমা করেছেন তার বেগ ছিল সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ মাইল। পৃথিবীর বেগ আর এই বেগের মধ্যে তারতম্য সামান্যই। এক্ষেত্রে নিতান্তই সূক্ষ্মতম হিসেব না ধরলে সময়ের হিসেবটা পৃথিবীর মানুষের কাছে যা, গাগারিন ও তোতোভের কাছেও তাই। কিন্তু এমন যদি হত যে তোতোভের ব্যোমযান আলোর প্রায় কাছাকাছি বেগে ছুট দিয়েছে তাহলে এমনও হতে পারত যে পঁচিশ ঘণ্টার মহাশূন্য-পরিক্রমা শেষ করে তোতোভ এসে দেখতেন পৃথিবীতে ইতিমধ্যে পঁচিশ বছর বা তারও বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে। এমন কি পঁচিশ কোটি বা তারও বেশি সময় পার হতে পারে।

ব্যাপারটা ভাবতেই অদ্ভুত লাগে। ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক প্রায় সেই একই বয়সে ফিরে এসে (মাত্র পঁচিশ ঘণ্টায় তার বয়েস আর কতটুকু বাড়ছে?) দেখছে তার চেনা-জানা পৃথিবীটা ইতিমধ্যে পঁচিশ কোটি বছরের পুরনো হয়ে গেছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা ফোটোন রকেট নিয়ে গবেষণা করছেন, যে-রকেট আলোর প্রায় কাছাকাছি বেগে ছুট দিতে পারবে। তাঁদের অনেকেরই ধারণা, আগামী একশো বছরের মধ্যেই এই ফোটোন রকেটের কল্পনা বাস্তব হয়ে উঠবে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন যে তাঁরা মুখে যা বলেন কাজেও তাই করেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের লেখা কোনো বইয়ে ইতিমধ্যেই ফোটোন রকেটের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে আগামী একশো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবার তোড়জোড় সম্পূর্ণ করতে পারবেন এ-বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবার কোনো অবকাশ নেই।

গাগারিন ও তিতোভ এই সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই উদ্গাতা। পৃথিবীর ইতিহাসে এই দুজন যুবকের কীর্তি বিপুল মর্যাদায় চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের

॥ পনেরো ॥

গড়মুক্তেশ্বরের মেলায় একটি অস্থায়ী তেরপলের তাঁবুর মধ্যে কোনও এক রুটির দোকানের সঙ্গে আমার ভাগ্য এভাবে জড়িত হবে, মাত্র এক বছর আগেও আমার পক্ষে এই আজগুবী সংবাদ বিশ্বাস্য ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, প্রায় তিন সপ্তাহকাল আমি একটি নাবালকের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে সেই তাঁবুর মধ্যে পড়ে রইলুম, এবং একখানি পাৎলা তুলোর কম্বল মুড়ি দিয়ে চাটাইয়ের উপর রাত কাটাতে কাটাতে ভাবলুম, মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের উপকরণ কত সামান্য।

সাধারণ লোক যেটাকে একান্ত দুরবস্থা বলে, কিষণ সেটাকে আমলই দেয় না। দুবেলা রুটি-তরকারি এবং দুবেলা দু'গেলাস চা-এর বাইরে সংসারে তার কাম্য কিছু নেই। এতেই সে তুষ্ট, এতেই নিশ্চিন্ত। ওই তাঁবুটির উপর দিয়ে প্রবল বৃষ্টি, এবং ভিতরে মাঝে মাঝে তুহিন বায়ুর ঝাপটা, তেরপালের ফুটো দিয়ে জল নামা, উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাব, দিবারাত্র কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করা, স্নানাদি এবং পরিচ্ছন্নতার একান্ত অসুবিধা, প্রতিনিয়ত ক্ষুধার্ত কুকুরের উৎপাত, ঠাণ্ডা জলে হাত-পা কালিয়ে যাওয়া, ভোজ্যসামগ্রীর বৈচিত্র্যহীনতা,— এগুলিকে কোনও সময়েই সে দুরবস্থার চিহ্ন মনে করে না। আমি এই বালকের অনন্যসাধারণ সহনশীলতা দেখে অভিভূত হয়েছিলুম। আমি যে সর্বপ্রকারে ওর সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিলুম, এটিতে কিষণের কুণ্ঠা ছিল। কিন্তু আমি নিজে কেমন একটা অভিনব কৌতুকের খেলায় মশগুল ছিলুম!

জানি আমার এই কৌতুকের উৎপত্তি চিত্তবিকারের থেকে। এই ধরণের জীবনযাপন আমার জন্য নয়, জানি বৈ কি। কিন্তু এই বিকার আমাকে পেয়ে বসেছিল ভূতের মতো। আমি চেয়েছিলুম পালিয়ে যেতে, সরে যেতে, দূরে যেতে। নিজকে দেখেছি এবং নিজকে নিয়ে থেকেছি অনেককাল ধরে, এবার বাইরের জীবনকে দেখতে চাই। এবার যেন মনে হচ্ছে মানুষের দুঃখের সঙ্গে নিজকে মিলিয়ে নিই। চেয়ে দেখি তাদের অদম্য সংগ্রাম, রক্তক্ষয়ী অধ্যবসায়, তাদের অসমসাহসিক প্রচেষ্টা। নিঃশব্দে এবং নিভৃতলোকে যেসব মানুষ দুঃখ-দুর্গতির ভিতর দিয়ে খ্যাতিহীন কীর্তিপ্রতিষ্ঠার মহৎ কর্মে লিপ্ত,—এবার যেন তাদের দিকে মুখ ফেরাতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার মধ্যে যুগান্তর ঘটেছে।

কিষণের সঙ্গে হিসাবপত্র মিলিয়ে সত্য সত্যই খতিয়ে দেখা গেল, গত তিন সপ্তাহে খরচ-খরচা বাদে প্রায় শ' দুই টাকা লাভ হয়েছে। মৌনী অমাবস্যার বিরাট মেলাও ততদিনে অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সম্পূর্ণ একটা মাস থাকলে আরও কিছু লাভ হত সন্দেহ নেই। কিন্তু সেদিন আমিই বলে বসলুম, কিষণ, এবার দোকান তোল্, ভাই,—তোর বাকি লাভের অংশটা আমিই পুরিয়ে দেবো, ভাবিসনে। এবার চল্, তোর ঘরে তোকে বসিয়ে আমি ছুটি নেব।

কিষণের অসম্মতি ছিল না। কিন্তু সে একটু কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বলল, আপনি মালিক, আমি 'নোকর'। তবে যদি আমায় কিছু মজুরি দেন তাহলে অন্য কোথাও গিয়ে আমি ছোট একটা রুটির দোকান দিতে পারি।

কত মজুরি চাস?

সে আমাকে বুঝিয়ে দিল, গোটা তিরিশ চল্লিশ টাকা পেলে একটা ছোটখাটো দোকান কোথাও সে বসাতে পারে। সে নিজেই খাটবে।

আমি হেসে বললুম, আমার বন্ধু হরনাম সিংয়ের দেনা শোধ করেও পোনে দুশো টাকা লাভের অংশ থাকবে। এ-টাকা তুই নিস, কিষণ।

কিষণ একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। বোধ করি সে ভাবছিল, আমি তামাশা করছি। হাসিমুখে আমি তাকে অভয় দিয়ে বললুম তোর কাছে যা শিখলুম তার দাম অনেক টাকা— সেইটিই হল আমার পুঁজি। টাকা কটা সবই নিয়ে যা,—ওটাকা তোরই। সে যাই হোক, এবার দোকান তুলে দিয়ে চল্ বেরিয়ে পড়ি—

আমার কতকটা অস্বস্তিও ছিল। এই ধরণের দুর্দশায় ঠিক আমি অভ্যস্ত নই। আমার শীত ভাঙতে চায় না, একবার ঘুমোলে উঠতে ইচ্ছা করে না, এবং দোকানের কাজে কিষণের সঙ্গে যেন আর তাল রাখতেও পারিনে। প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে আমার যেন একটু গা গরম হচ্ছিল। আমি সুস্থ ছিলুম না, বরং একটু জবুথবু হয়ে পড়েছিলুম।

আমার পরিচয়টা যে কারণেই হোক কিষণের কাছে প্রকাশ করিনি। আমি বেকার, বাউন্ডুলে, উড়নচুড়ে এবং অব্যবসায়ী—এটি নিশ্চিন্ত বুঝতে পেরে মাঝে মাঝে সে দুঃখবোধ করেছে এবং আমি মাঝে মাঝে এখানকার সাধুফকির এবং এক-আধজন ভিখারীকে ডেকে যে দু-চারখানা রুটি বিতরণ করেছি—এজন্য মৃদুকণ্ঠে কিষণ প্রতিবাদও জানিয়েছে। বলেছে, ভিক্ষাটা ওদের পেশা, হুজুর। ওরা খেটে খেতে চায় না, পরের মেহনতের ওপর ওরা দিন চালায়। ওরা 'দুষমন।'—কিষণের ধারণা হয়েছে, কাজকারবারে আমি একেবারেই অযোগ্য এবং আমি যে রকম নরম প্রকৃতির লোক তাতে আমার পক্ষে বৈষয়িক উন্নতি করা একপ্রকার অসম্ভব। আমার ভবিষ্যৎ নাকি আলোকোজ্জ্বল

নয়। 'দিল' বড় হলে কারবার সব সময় বড় হয় না,—কিষণ এটি বিশ্বাস করে।

দু'ঘণ্টার মধ্যে আমাদের এতদিনের দোকান উঠে গেল। বাসনপত্র, তেরপল, চাটাই, মেজ, খুরসি প্রভৃতি যারা সরবরাহ করেছিল তারা নিজেদের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে বিদায় হল। কিষণ পাছে আমাকে সন্দেহ করে, এজন্য দোকানের সমস্ত টাকা তার কাছেই রেখেছিলুম। আমার কাছে কেবল ছিল বন্ধুবর হরনাম সিংয়ের ঋণ পরিশোধের দরুণ একশ' টাকা। কথা রইল এই, কার্নালে নেমে হরনামের দেনা আমি শোধ করে যাব।

নিজের শারীরিক অবস্থা লক্ষ্য ক'রে একসময় আমি বললুম, কিষণ, তুই একলা গিয়ে তোর ঘরে দাঁড়ালে কি সবাই মিলে তোকে মারধর করবে? আমি যেতে পারতুম, কিন্তু বড় অসুস্থ রে।

কিষণ আশা করেনি শেষ মুহূর্তে আমি তাকে তার অনির্দিষ্ট ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ব। আমার কথায় তার সুন্দর মুখখানা মলিন হয়ে এল। সে তার কালো চোখ দুটো তুলে বলল, ওরা মারবে ঠিকই, তবে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমার 'জান' বাঁচতে পারত, হুজুর।

এরপরে আর অন্য কোনও কথা চলে না। আমি অসুস্থ বলে সে নিজেই আমাকে সব রকমে প্রস্তুত করে নিল। কিন্তু সকালের দিকে এক সময় সে যখন আমাকে কার্নালগামী ট্রেনে তুলল, তখন সেই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে অত্যন্ত ভিড় থাকা সত্ত্বেও আমি বেঞ্চি ছেড়ে মেঝের এক কোণে কম্বল মুড়ি দিয়ে কাৎ হয়ে পড়লুম। কিষণ আসবার সময় সোৎসাহে আমার জন্য দুখানা রুটি তার ঝোলাটার মধ্যে এনেছিল, যদি আমি চিবোতে পারি,—কিন্তু আহারে আমার একেবারেই রুচি ছিল না। আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলুম।

চিত্তবিকার আমার ছিল বৈকি। নিজকে কিছু কষ্ট দিতে আমার ভাল লাগছে বটে, কিন্তু অভিমান আমার নেই কারও ওপর। আমি দেখতে চেয়েছিলুম জনজীবনের তলাটা, তাদের দুঃখ-সুখের সত্য চেহারাটা,— কেননা আমার চাকরিটা ছেড়ে এবং নিজের পরিচয়টা ঘুচিয়ে আমি যেতে চাই কতকটা নিচের দিকে—যেখানে গিয়ে জানব এরা আমার পর নয়। আমি সেই গণ্ডী অতিক্রম করতে চাই যেখানে আমার চিন্তার ধারা ও সংস্কার বিশেষ সংস্কৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমি অজানা জনেদের মাঝখানে গিয়ে আপনজনকে আবিষ্কার করতে চাই। কিষণের পরিচয় জানিনে, তার ভাষা বুঝিনে, তার নিজের দেশের কোনও রেওয়াজ বা রীতির সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই। কিন্তু সমস্ত অচেনার মাঝখানে কিষণকে পেয়ে আমি জানলুম, তার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা যুগযুগান্তের এবং জন্মজন্মান্তের। তাকে আমার দুঃখের মধ্যে জানা, বেদনার মধ্যে চেনা!

কার্নাল কখন্ এসেছে আমি জানিনে। কম্বল মুড়ি দিয়ে আমি পুঁটলীর মতো পড়েছিলুম। এক সময় আমার গায়ের উপর অতি মোলায়েমভাবে একখানা হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে কিষণ ডাকল, হুজুর—?

মুখের উপর থেকে কম্বলখানা সরিয়ে দেখি, বেঞ্চির কোণে বসে কিষণ আমার উপর ঝুঁকে পড়েছে। বললুম, কি রে?

কিষণ বলল, কার্নাল আ গয়া, হুজুর। উৎরানা নহি?

বললুম, থাকগে কিষণ, আর নামতে পারিনে। সোজা দিল্লীই যাওয়া যাক্—। ও কি রে, মার খাবার ভয়ে এখন থেকেই কাঁদছিস্? ছোট ছেলে এক আধবার এমন চুরি করেই থাকে। ভয় কি?

কিষণের ময়লা মুখখানা বেয়ে আমার ময়লা কম্বলের উপর দু'এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল। কিন্তু আমার নিজের অনুমান সত্য নয়। কিষণ নির্বোধের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এক সময় আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, আমি নাকি বড়মানুষের ঘরের ছেলে, এবং আমি যে তাকে পিতার মতো রক্ষা করে চলেছি—এর বদলে সে আমার এই অসুস্থ অবস্থার কিছুই করতে পারছে না, এই দুঃখ তার পক্ষে সহ্য করা নাকি কঠিন। আমি যদি একখানাও রুটি চিবোতে পারি তাহলে সে একটু সাহস পায়!

কিষণের সমস্যাটা দুর্বোধ্য নয়। মার খাবার ভয়ে সে আমাকে ছাড়তেও পারছে না, অথচ আমার এই শারীরিক অবস্থায় আমাকে সে নিয়ে যেতেও ভয় পাচ্ছে। আমি তাকে হাসিমুখে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, কাঁদিসনে কিষণ, মানুষের অসুখ-বিসুখ করেই থাকে। আর যদি দেখিস মরেই গেলুম—তাহলে তোদের চানামণ্ডির সামনে যমুনায় আমায় টেনে ফেলে দিস। নে, চুপ কর।

চলন্ত গাড়ির ভিতরে নানা লোক নিজেদের মধ্যে কি যেন সব বলাবলি করছিল। কিষণের কপালে একবার হাত বুলিয়ে আবার আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলুম। আমার বেশ জ্বর এসেছিল।

এরপরে আর আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। পুরনো দিল্লী থেকে কতদূরে কোন্ একটা ছোট স্টেশনে কখন্ কিষণ আমাকে নামাল, এবং সেখান থেকে একখানা যাত্রীবাহী বয়েল্ গাড়িতে তুলে সে রাত্রের দিকে কোন্ পথে আমাকে নিয়ে চলল, সেটি তলিয়ে আমি দেখিনি। সেটা কাঁচাপাকা গ্রামের পথ, শুধু এটুকু গাড়ির দোলায় বুঝতে পারা যাচ্ছিল। আমি চোখ বুজে কম্বলখানা জড়িয়ে তাল পাকিয়ে পড়েছিলুম এবং কিষণ একসময় তার নিজের পাৎলা কম্বলটি আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। গাড়ি চলতে লাগল সমস্ত রাত।

অন্ধকারে বিদেশ-বিভুঁয়ে কোন্‌টা কি পার হয়ে যাচ্ছিল আমি জানিনে। সমস্ত অজানাটাই অন্ধকারে অবলুপ্ত—শুধু জানার মধ্যে ছিল একটি ব্যাগ্র-ব্যাকুল নাবালকের অশ্রুসিক্ত ভয়ার্ত একখানা কচি মুখ। সে আমাকে দুহাতে ধরে প্রহর গুনছিল। শেষরাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া দেহাতের পথের গাছপালায় সড়-সড়ে শব্দ করে বয়ে যাচ্ছিল এবং অনুমানে বুঝতে পারছিলুম, নদীর উপর দিয়ে মাঝে মাঝে বাতাসের ঝলক আসছে। সম্ভবত আমার জ্বর বেড়েছিল খুব।

অতি প্রত্যুষে বয়েল গাড়িখানা এসে থামল গাছপালা ছাওয়া একখানা ঝুপসি গাঁওয়ের প্রাঙ্গণে। কিষণ চাপা-গলায় শুধু বলল, চানামণ্ডি।

চানামণ্ডির গাঁও তখনও নিদ্রাভিভূত, তখনও বিশেষ কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিষণ আমাকে বলল, হুজুর, এবার আপনাকে নামতে হবে। আগে আমি দেখে আসি।—এই বলে গাড়ি থেকে সে নামল।

কিষণ চলে গেল, এবং মিনিট দশেকের মতো তার সাড়াশব্দও কিছু পাওয়া গেল না। এখানে তার নিজের প্রতিষ্ঠা কোথাও নেই, বরং চোর বলেই

তার এখানে খ্যাতি। এই প্রকার অবস্থায় পরদেশী আমি কোন্ সুবাদে এখানে নামব, কিষণের জন্য কার কাছে আবেদন জানাব, আমি নিজে কোথায় মাথা গ‍ুঁজব,—ইত্যাদি নানা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজে উৎসাহ করে কিছু পেরে উঠব মনে হচ্ছে না। কিষণের উপর হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে রইলুম।

কিষণ কোথায় গিয়ে কি করল জানিনে, তবে এক সময় দ্রুতপদে এসে সে আমাকে সাবধানে ধরে নামাল এবং উ‍ঁচুনীচু ডেলা-ডুমরি পার হয়ে একটি ঝোপড়া চালার মধ্যে নিয়ে গিয়ে তুলল। ঘরের মেঝেটা ঠাহর করতে পারলুম না, শুধু দেখলুম শুকনো উলু ঘাসে ঘরখানা ভর্তি। তারই উপর ইতিমধ্যে কিষণ খানদুই চট এনে পেতেছে। আমি তার উপর বসলুম এবং ওই রাশি পরিমাণ শুকনো ঘাসের সঙ্গে যে স্বাভাবিক উত্তাপ ছিল সেটি আমার পক্ষে বিশেষ আরামদায়ক মনে হল। আমি যেন মোটা গরম গদির উপর জায়গা পেয়েছি।

এরপর কিষণ কি করল, কখন বয়েল গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিল, আমার সম্বন্ধে কোথায় কি বন্দোবস্ত করতে ছুটল, এসব খ‍ুঁটিয়ে দেখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। প্রায় তিন মাস পরে প্রথম শয্যার উষ্ণতা পেয়ে আমি অত্যন্ত আরাম ও তৃপ্তির সঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা অচেতন নিদ্রার মধ্যে তলিয়ে গেলুম। রেলস্টেশনে, মুসাফিরখানায়, দোকান ঘরে, মজুরদের চালায়, গড়মুক্তেশ্বরের তাঁবুতে,—কোথাও এমন উষ্ণ আরাম এ বছর শীতে পাইনি—যেমন পেলাম এখানে কিষণের কল্যাণে। আমি বেঁহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বোধহয় কোনও একটা সময়ে কারও ডাক শুনে থাকব। সেই ডাকে যখন কম্বল সরিয়ে চোখ খুললুম, দেখি রৌদ্রোজ্জ্বল হলুদ-মাখানো দিন। আমার নিজের লোলদৃষ্টি সম্ভবত রক্তিম। সেই রক্তিম চক্ষু চারদিকে হলুদবর্ণ ছাড়া আর কিছু দেখছে না। কিন্তু একটু সজাগ হতেই প্রথম চোখে পড়ল, পাশের বেড়ার ভিতর দিয়ে একটা জীবন্ত ঘোড়ার মুণ্ড আমার উপর ঝ‍ুঁকে পড়বার চেষ্টা পাচ্ছে। এটা আস্তাবলের একটা অংশ এবং এঘরে ঘোড়ার রসদ থাকে। সামনের উঠোনে দু'একটা মোরগ ও ছাগল ঘুরছে, অদূরে একটা দেহাতি কুকুর বসে রয়েছে।

যে-ব্যক্তির গলার আওয়াজ পেয়েছিলুম, সেই পাগড়িপরা লোকটি এবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করল, কিন্তু আলাপ করল না। অতঃপর তার পাশ কাটিয়ে এক সময় কিষণ একটি কলাইয়ের গেলাসে অল্প চায়ের সঙ্গে অনেকখানি ফুটন্ত দুধ মিশিয়ে এনে হাজির করল। এটি দেখে আমি খুশী হলুম, এবং এই পানীয়টিই মনে মনে কামনা করেছিলুম। কিষণ কাছে এসে হেঁট হতেই প্রথম প্রশ্ন করলুম, কি রে, তোকে মারেনি কেউ? বেঁচে গেছিস?

কিষণ ঈষৎ হেসে বলল, জি হুজুর, এযাত্রা আপনার টাকার জন্যেই বেঁচে গেলুম। তবে আমি আপনার কাছে 'কসম খেয়ে' বলছি, কখনও চুরি আর করব না!

তা হলে এবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি যাই?

নহি সাব, আপ ইলাজি আদমি হ্যঁ, কেইসে ছোড়ু?—একটু ভাল হলে যাবেন। ওই যে, আমার 'বহিন' আসছে—কিষণ সোৎসাহে বাইরের দিকে ফিরে তাকাল।

বছর পঁচিশ বয়সের একটি মেয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ মিষ্টি হাস্যে 'নমস্তে' জানাল। পরণে তার পায়জামা এবং দীর্ঘলম্বিত একটি গাউন,—যেটিকে সেমিজও বলা চলে। পিছনদিকে

মস্ত বেশী ঝুলেছে। কিন্তু মেয়েটির সুর্মামাখানো চোখ ও ভ্রূভঙ্গী একটু ভিন্ন প্রকার। আপন দেহসৌষ্ঠবকে প্রকাশ করার জন্য এমন একটি ইচ্ছাকৃত ভঙ্গী সে করল যেটি ঠিক নীতি-স্বীকৃত নয়। অতঃপর অর্থপূর্ণ কণ্ঠে বলল, শোচনা নাহি, আপ ঠহর যাইয়ে, আরাম মিল্ যায়গা। এখানে অসুবিধে কিছু নেই। কাছেই এখানে 'বৈদ্' আছে, আপনাকে 'দাওয়াই' দিয়ে যাবে।

আমি শুধু হাসলুম এবং গেলাসের দুধ-চা প্রায় সবটাই গিলে আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়লুম।

বেশ মনে পড়ে দিনদুই ওই উলু-খড়ের গাদার মধ্যে একপ্রকার আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থেকে নিজের সম্বন্ধে কতকটা উৎকন্ঠিত হয়ে উঠেছিলুম। আমার মনে ছিল এই চাষী পরিবারে আমি এসে পড়েছি মূর্তিমান একটা অশান্তির মতো এবং দ্বিতীয়ত, হরনাম সিংয়ের টাকা আমি শোধ করে আসিনি! আমার ব্যাধির মধ্যে এ দুটো ছিল ধারাল কন্টকের মতো। সেই কারণে আমি দুর্বল হস্তে প্রথমে পকেট থেকে কিছু টাকা এখানকার খরচের জন্য যখন বার করলুম, তখন আমার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে ওই টাকা নিয়ে তিন-চারজনের মধ্যে যেন একটা ঝটাপটি লেগে গেল শুনতে পেলুম। ওই কাড়াকাড়ির ভিতরে ওই মেয়েটাও ছিল—যার নাম শুনলুম চুনারিয়াবিবি। এবার বোধ হয় কিষণও চড়-চাপড় দুটো খেল। পরে আমি যখন কিষণকে ডাকলুম, কিষণের সঙ্গে চুনারিয়া ছুটে এসে খড়ের গাদায় ঝাঁপিয়ে বসল। মেয়েটা টাকার গন্ধে চঞ্চল হয়েছিল।

আমার খানসামার ঠিকানাটা এবং তার সঙ্গে দু'লাইন চিঠি কোনমতে লিখে কিষণের হাতে দিলুম। তখন অপরাহ্ন গড়িয়ে চলেছে সন্ধ্যার দিকে। দিল্লী এখান থেকে অনেক দূর। ওরা বলল, তিরিশ কি বত্রিশ মাইলের কম নয়। রেলস্টেশন এদিকে নেই। যানবাহনের মধ্যে বয়েল গাড়ি, আর নয়ত ঘোড়া। দুদিনের কম পৌঁছনো যাবে না শুনে আমি যেন একটু ভয়ই পেলুম। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, কিষণ এখান থেকে ক্রোশ চারেক হেঁটে গিয়ে যমুনার ধারে কোনও এক ঘাটে নৌকা পাবে, সেই নৌকা যাবে লালকেল্লার অদূরে শ্মশান-ঘাটা পর্যন্ত। উজানপথে যেতে কিছু সময় লাগবে। অনেক ভেবেচিন্তে আমার বাক্সের চাবিটাও খানসামার হস্তে দেবার জন্য দিয়ে দিলুম। তারপর ঈষৎ ক্ষীণ-কণ্ঠেই বললুম, মনে রাখিস কিষণ, খানসামা যেন হরনাম সিংয়ের টাকাটা অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয়। অন্য সব কথা চিঠিতেই আছে। তুই এখনই চলে যা, কিষণ। অসুখটা বোধ হয় বাঁকা পথ ধরেছে।

কয়েকখানা রুটি সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই কিষণ রওনা হয়ে গেল।

'বৈদ্য' আমাকে কখন্ দেখে পরীক্ষা করে গেছে আমার মনে নেই। কিন্তু কিষণ যাবার আগে পর্যন্ত বারদুই আমাকে অতি কুস্বাদ কি একটা তরল পদার্থ খাইয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কে যেন একটা লোক বেড়ার পিছন দিকে গিয়ে ঘোড়ার মুণ্ডটা আমার মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বেঁধে রেখেছে। এর মধ্যে আরেকবার যবের ছাতুর সঙ্গে খানিকটা গরম দুধ মিলিয়ে আমাকে দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম।

মাঝখানে একবার অনুভব করে-ছিলুম, কেউ এসে চেপে বসেছে আমার পাশে খড়ের গাদায়। একবার বোধহয় আমাকে মৃদু গলায় সে ডেকেছিল, কিন্তু সাড়া পায়নি। একবারটি বোধ করি আমি অনুমান করেছিলুম, চুনারিয়াই হবে। আমি পরদেশী অসুস্থ অতিথি, আমার প্রতি যদি তার কর্তব্যের তাগিদ থাকে, সেটি অন্যায় নয়।

এখানে আলো জ্বালা চলে না, এটি ঘাস ও খড় রাখার ঘর। খড়ের গাদার তলায় বড় বড় ইঁদুরের উৎপাত চলছে, এবং নিচের দিক থেকে আমার কম্বল কাটছে—এটি জেনেও আমার করবার কিছু ছিল না। এটার প্রতি চুনারিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ভেবে একবার কম্বলের ভিতর থেকে মুখখানা বার করলুম, কিন্তু ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা গেল্ না। কখন্ যেন নিঃশব্দে উঠে চুনারিয়া চলে গেছে। আমি যেন স্বস্তিবোধ করলুম।

চাষী পরিবার ঠিক কেমন এটা আমার জানা ছিল না। কিন্তু এই পরি-বারটির সঙ্গে ঘর-গৃহস্থালীর কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলুম না। বরং যেন একটা চাপা চাপা ভাব, ফিসফাস কথা-বার্তা, বাকবিতণ্ডার আভাস, এইগুলি অনুভব করছিলুম। বালক-বালিকার সাড়াশব্দ, রান্নাবান্নার তোড়জোড়, গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনযাপনের একটা পরিচয়—এসব কোথাও কোনদিকে নেই। ফলে, এমন একটা জীবনচেতনাহীন নিশুতি অন্ধকার চারিদিক থেকে আমাকে অবরোধ করল যে, আমি একটা কৃষ্ণকায় অতিদানবের করাল মুখ-ব্যাদানের সঙ্গে বীভৎস মৃত্যুর গ্রাস লক্ষ্য করে আমার রুগ্নচক্ষু বুজে রইলুম এবং সেই ঘোড়াটা পুনরায় অন্ধকারে তার বিরাট মুণ্ডটা এদিকে গলিয়ে তার সুদীর্ঘ শ্বাস আমার কম্বলের উপর ফেলতে লাগল ও কয়েকটা ইঁদুর আমার পিঠের তলার দিকে কোথাও কম্বলের একটা অংশ কেটে চলল। আমি বোধ হয় ঘুমের মধ্যেই তলিয়ে যাচ্ছিলুম।

রাত্রির খোঁজ আমার কাছে নেই। রাত কত জানিনে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে কোনও এক সময়ে বোধ হয় কারও চিৎকার এবং কান্না শুনে থাকব। আমি চমকে উঠে মুখের ঢাকা খুললুম। যে-অন্ধকারকে প্রাণীশূন্য মনে হয়েছিল, সেটা যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে উঠল। এখন মনে হচ্ছে আমার চারি-দিকে গোপনচারী প্রেতচ্ছায়াদলের নিঃশব্দ আসা-যাওয়া আছে, আছে যেন একটা নির্বাক ষড়যন্ত্র এবং চাপা কানা-কানি—যেটা আমার শ্রুতিগোচর নয়। চোখ চেয়ে এবার দেখলুম আমার চালাটার বাইরে যেন ক্ষীণ আলোর আভাস পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলুম, আমার খড়ের রাশির উপর কোনও একটা প্রাণীর পদসঞ্চার ঘটছে। দিনের বেলায় যে কুকুরটাকে দেখেছিলুম, রাত্রির ঠাণ্ডায় সে বোধ করি উষ্ণতার মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু সেটা যে ধীরে ধীরে আমার মুখের কাছাকাছি আসবে এটি ভাবিনি। হঠাৎ বিশ্বাস করলুম, না, কুকুর নয়—এ হল চুনারিয়া! সে হাত রেখেছে আমার গায়ে, এবং ঝুঁকে পড়েছে আমার মুখের ওপর। অতঃপর আমাকে ডাকছে, মেহমানজি?

স্পষ্ট জবাব দিতে হল, ক্যা?

কুচ ফরমাইয়ে?

বললুম, একটু খাবার জল দিতে পার?

মেয়েটা তৎক্ষণাৎ উঠে চলে গেল, এবং তিন মিনিটের মধ্যে একটি কলাইয়ের গেলাসে জল ও বাঁহাতে

হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এল। জল খেয়ে বললুম, এখানে তুমি একলা থাক কেন?

চুনারিয়া জবাব দিল, কপালের ফল, আর কি বলব?

কিষণ তোমার কে?

কোই নহি লগ্‌তা! ওকে ছোটবেলা লাহোরে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।

আমি থামলুম না। বললুম, তোমার মরদ কোথায়? তুমি কি কর এখানে?

চুনারিয়া জানাল, মরদ তার নেই। কেইবা তাকে পছন্দ করবে। তবে হ্যাঁ, সে এখানে 'ক্ষেতীবারি'র কাজ করে। কষ্টে দিন যায়।

আমি বোধ হয় একটু বিকারের ঝোঁকে ছিলুম। তার অনম্র ও সুসজ্জিত চেহারাটা আমার মনে সংশয় এনেছিল। তখনই প্রশ্ন করলুম, খানিকটা আগে তুমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিলে কেন? কেউ মেরেছিল?

একটু যেন কান্নার ভণিতা করে চুনারিয়া বলল, দো মরদ আয়কে মেরা রূপ্যা ছিন্‌ লিয়া!

তোমার টাকা কেড়ে নিল, আর তুমি কেঁদেই চুপ করে গেলে! কে তারা তোমার?

নতমুখে চুনারিয়া চুপ করে রইল। তার ভাবখানা দেখে মনে হতে পারে আমি যেন তার কতকালের কুটুম্ব। আমার কথার স্পষ্ট জবাব দিতে তার বাধল। দুইজন মরদের সঙ্গে তার দৈনিক সম্পর্ক কি প্রকার, তারা এসে কাঁদায় কেন, কেনই বা টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেয় —এসব প্রশ্ন উঠতে পারে বটে, তবে চুনারিয়া সে সেগুলির যথাযথ উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে,—ওর মুখের চেহারা দেখলে সেটি মনে হয় না।

আমি বললুম, এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু কই, তোমাকে দেখে কিছু মনে হচ্ছে না ত? তুমি কি আমাকে কিছু বলতে এসেছিলে?

চুনারিয়ার বসবার ভঙ্গী এবং বিস্রস্ত পরিচ্ছদের মধ্যে সম্ভবত একটি বিশেষ আবেদন ছিল। নিজের দিকে এক-একবার তাকিয়ে সে পরীক্ষা করে নিচ্ছে, আবেদনটি তার নিখুঁৎ হচ্ছে কিনা। এবার সে আমার কথার জবাব দিয়ে বলল, আপনি কিষণকে ভালবাসেন, কিন্তু সে চোর এবং ডাকু —

রুগ্ন শরীরে হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ উত্তেজনা এসেছিল প্রচণ্ড প্রতিবাদের চেহারা নিয়ে। কিন্তু চুপ করে রইলুম,— আমি পরদেশী! চুনারিয়া পুনরায় বলল, আমিও ত আপনার সেবা করতে পারি!

আমি বললুম, আজ সারাদিন ধরে তোমরা সবাই মিলে আমার যেটুকু সেবা করেছ, আমি তাতেই কৃতজ্ঞ। তবে এখন আমি চুপ করে পড়ে থাকতে চাই। তুমি কি কিছু বকশিষ চাও, চুনারিয়া?

চুনারিয়া জবাব দিল, সে আপনার অনুগ্রহ! আমি ত' নিজের হাতে আপনার পকেট থেকে তুলে নিতে পারিনে!

অসুখ আরেকটু বাড়লে হয়ত তাও পারবে! আমি ত' আর তোমাদের পর নই!—এই ব'লে ঈষৎ হাস্যে আমি পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে পুনরায় বললুম, আরেকটু সেবা তুমি করতে পার চুনারিয়া—। ঘোড়াটা বারবার অন্ধকারে মাথা গলিয়ে আমার মুখের ওপর ঝুঁকছে, ওর নিঃশ্বাস পড়ছে আমার এই পোড়া কপালে। কিন্তু ওর দাঁতের পাটির দিকে চেয়ে আমার মনে হচ্ছে, ওর উদ্দেশ্যটা খুব সাধু নয়। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি বৈকি।

বেশ আপাতত তাহলে এই দশটি টাকা নমস্কারী নিয়ে ও-কাজটি ক'রে যাও!

টাকা নিয়ে তৎক্ষণাৎ চুনারিয়া উঠে দাঁড়াল এবং আমার সঙ্গে আর কিছুমাত্র

ক্রুটান্বিত্তা না করে লন্ঠনটা তুলে নিয়ে কোন্‌দিকে যেন সটান চলে গেল। ঘোড়াটার কোনও ব্যবস্থা অতঃপর করল কিনা তার খোঁজ নেবার মতো শারীরিক সঙ্গতি আর আমার ছিল না। কম্বলখানা উত্তমরূপে জড়িয়ে মুখ গঁুজে কিছু খড় নিজের উপর চাপা দিলুম।

জ্বর এবং মাথার যন্ত্রণা ছাড়া ব্যাধির যে উপসর্গটা বুকের মধ্যে জমা হয়েছিল, চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে সেটা খুব উৎসাহজনক নয়। পরদিন কেউ আমার খোঁজখবর করেছিল কিনা, ঠিক মনে পড়ে না। তবে চানামণ্ডির এই অখ্যাত গ্রাম থেকে বেরিয়ে আমার বিবাগী মন বোধ হয় কলকাতার পথ এবং তার দূরত্ব খঁুজে ফিরছিল,—যেখানে রয়েছে আমাদের চিরকালের নিঃস্বার্থ এবং মমতাময়ী বুড়িপিসি, যার অসুখের সংবাদ শুনেও আমি কিছু করতে পারিনি। সে আমার নিত্য-কল্যাণের পথের দিকে চেয়ে রইল অথবা আমিই তার নিত্যস্নেহের আশ্রয়ে ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছি, এই জটিল চিন্তা সারাদিন আমাকে আনমনা করে রাখল।

সকালের প্রথম আলো, নিঃঝুম মধ্যদিনের রৌদ্র, অপরাহ্ণের ক্লান্ত দিনমান,—এগুলি আমার চোখে পড়েনি। শুধু একবার চোখ মেলেছিলুম যখন আস্তাবলেরই একটি লোক একটি পাত্রে ঠাণ্ডাজলে যবের ছাতু গুলে আমাকে খাওয়াতে এসেছিল।

আমি কিষণের জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিলুম। সে যদি আমাকে কোনওমতে তুলে নিয়ে যমুনার দিকে যায়, এবং নৌকাযোগে নিয়ে যায় যমুনা থেকে গঙ্গায়, এবং গঙ্গা থেকে ভাগীরথীর প্রবাহপথে, তবে হয়ত এক-দিন গিয়ে পৌঁছতে পারি বুড়িপিসির দরজায়—!

কম্বল সরিয়ে মুখ খুললুম। বাইরে যেন নানা ব্যক্তির সাড়াশব্দ পাওয়া গেল। এবার হয়ত চুনারিয়া এক আধজন কারোকে ডেকে এনেছে আমার পকেট থেকে বাকি কটা টাকা কেড়েকুড়ে নেবার জন্য! কিন্তু আমার আন্দাজ সত্য নয়। এখনও সন্ধ্যা হয়নি। চুনারিয়া আসবে রাত্রে যখন তার চক্ষু-লজ্জা থাকবে না! আবার আমি তলিয়ে গেলুম কম্বলের তলায়।

বাইরের সাড়াশব্দ আমার কাছে এল। তারপর সব চুপ। সেই নীরবতার ভিতর দিয়ে দু'একজন অতি সন্তর্পণে এল আমার উলুখড়ের গাদায়। সাড়া দিয়ে বললুম কে?

হুজুর—কিষণ সাড়া দিল।

কম্বল সরিয়ে ঠাহর করে দেখি তিন চারজন লোক। খানসামাকে চিনলুম, আর চিনলুম আমার ঊর্ধ্বতন অফিসারকে। তাঁর পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে আছেন স্টেথিসকোপ এবং ব্যাগ ঝুলিয়ে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। আগাগোড়া ব্যাপারটা যেন যন্ত্রচালিত।

আমার পক্ষে উচিত উঠে বসে মাননীয় অতিথিগণকে অভ্যর্থনা জানানো। আর কিছু না হোক, 'শুভ সন্ধ্যা' বলে সহাস্যে দুটো মিষ্ট-ভাষণও করা উচিত। কিন্তু সেই উৎসাহ খুঁজে পাবার আগেই আমার লোলদৃষ্টি আবার বন্ধ হয়ে এল। হঠাৎ শুনতে পেলুম কিষণের কণ্ঠের চূর্ণ আর্তস্বর, এবং কে যেন পাশ থেকে তাকে চাপা-কণ্ঠে ধমক দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে অনুভব করলুম কম্বলের ভিতর দিয়ে আমার বুকে ও পিঠে যন্ত্র বসিয়ে পরীক্ষা চলছে। মিঃ শেগেল, আমার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, নানাবিধ নির্দেশ দিচ্ছিলেন। অতঃপর শরীরের এখানে ওখানে একটির পর একটি ইনজেকশন দেওয়া হল। হঠাৎ শুনতে পেলুম ঘোড়াটার মুখের আওয়াজ। বোধ করি তার মুণ্ডটা এবার অনেকখানি আমার-দিকে বাড়িয়ে থাকবে,—তাই কেউ ওকে ঠেলা দিয়েছে!

প্রায় আধঘণ্টা আবার চুপ। তারপর মিঃ শেগেল কথা বললেন, চৌধুরী, তুমি এখানে বেশ কৌতুকজনক জীবন-যাপন করছিলে। কিন্তু এবার তোমাকে তুলে নিয়ে যাব আমরা। তোমার জন্য সেই স্টেশন-ওয়াগন এবং আরেকখানা জিপ এনেছি আমরা। দেখতে পাচ্ছ সবাই তোমাকে ভালবাসে! পুলিশ-স্টেশন থেকে সশস্ত্র সেপাই এসেছে দুজন,—কি জানি রাতের দিকে ফিরব কিনা—। ডাক্তারসাব বলছেন এখন তুমি একটু ভাল আছ, চৌধুরী—। এবার চামচ দিয়ে একটু গরম দুধ খেতে হবে ভাই।

কপালে হাত বুলিয়ে চামচ দিয়ে ডাক্তারই আমার মুখে একটু-একটু গরম দুধ দেওয়া হল। সম্ভবত চুনারিয়াই আমাকে খাওয়াতে বসেছিল। চোখ বুজেই আমি ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললুম, এবার তোমার সেবা ঠিক হয়েছে চুনারিয়া। যাবার সময় বাকি কটা টাকা তুমি নিয়ে নিয়ো!

কাছাকাছি বোধ করি আর কেউ ছিল না। কিষণ আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে এবার ধরা গলায় বলল, হুজুর, চুনারিয়া নহি, দেখিয়ে মেমসাব আ গায়া দিল্লীসে—।

আমি চোখ খুলে হঠাৎ সেই চিরকালের পাষাণ প্রতিমাকে দেখলুম—যার জন্মের পর আমারই পরলোকগতা জননী নাম রেখেছিল হেনা! উলুখড়ের গাদার উপর বসে আমাকে এতক্ষণ সে দুধ খাওয়াচ্ছিল। হেমার চোখ বেয়ে জল নেমেছিল। কিন্তু পাছে আমার ভাবাবেগ উপস্থিত হয়, এজন্য সে আমার চোখে হাত চাপা দিল। (ক্রমশ)

"..............ঠাহর করে দেখি তিন-চারজন লোক। খানসামাকে চিনলুম,"

সাধারন গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

বিমল রায়চৌধুরী

একদা প্রমথ চৌধুরী মশাই লাইব্রেরীকে 'মনের হাসপাতাল' বলেছিলেন। কিন্তু আধুনিক অভিধায় জনসাধারণের গ্রন্থাগার হল "Arsenal of democracy" অর্থাৎ গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার। রোগের অভিজ্ঞান-পত্রটি না নিয়ে কেউ হাসপাতালে ঢোকে না, কিন্তু গ্রন্থাগারের আহ্বান প্রতিটি সুশিক্ষিত মনে। অবশ্য গণতন্ত্রের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সাদৃশ্যও প্রমথ চৌধুরীর চোখ এড়ায়নি, তবু মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন গ্রীসীয় অ্যারিস্টোক্রাসীর সমর্থক। গণতন্ত্রের সাফল্য মনের আভিজাত্যের ওপর নির্ভর করে কিনা জানি না, তবে ব্যবহারের কষ্টিপাথরে না ঘষলে গণতন্ত্রের সোনাটিকে সঠিক চেনা অসম্ভব। জনতার অরণ্যে যাবতীয় নির্বাচনের পায়ে-হাঁটা পথ-ই গণতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছায় না। একমাত্র 'স্বশিক্ষিত' ব্যক্তিই গণতন্ত্রের পক্ষে উপযোগী। এবং প্রকৃতি ছাড়া মানুষের স্বশিক্ষার যতগুলি উপায় আছে তাদের মধ্যে অভিজ্ঞতার পরেই গ্রন্থাগারের স্থান।

গ্রন্থাগারের শিক্ষা স্কুল-কলেজের সঙ্গে কখনই তুলনীয় নয়। হাতে চাবুক নিয়ে গ্রন্থাগার কি ভাবতে হবে তা শেখায় না, কোনটুকু 'ইম্পর্টেন্ট' সেটা লাল পেন্সিলে চিহ্নিত করে না, ইতিহাসকে সাল তারিখ দিয়ে, বিজ্ঞানকে আবিষ্কারের সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে এবং সাহিত্যকে কাব্য-জিজ্ঞাসার খুঁটিতে বাঁধে না। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব শুধু সবিনয়ে কি করে ভাবতে হয় তাই শেখানো। নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে শেখাই গণতন্ত্রের প্রথম শিক্ষা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ ইংলণ্ডে তাই গ্রন্থাগারের বিকাশ ও সমৃদ্ধি যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে অনুকরণীয়। গ্রন্থাগার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। স্কুল লাইব্রেরী, কলেজ লাইব্রেরী, ইউনির্ভাসিটি লাইব্রেরী, স্পেশ্যাল লাইব্রেরী, প্রিজন লাইব্রেরী এবং পাব্লিক লাইব্রেরী ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে গ্রন্থাগারকে বিভক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এদের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগারই গণতন্ত্রের বাহন হতে পারে।

পরিসংখ্যানের অপরিসীম কৌতুকে—সংখ্যায় সাধারণ গ্রন্থাগার ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে 'প্রথম'। ইউনেস্কো প্রকাশিত পরিসংখ্যান (১৯৫৬) অনুযায়ী ভারতবর্ষে সাধারণ গ্রন্থাগার আছে **২৪০৮৬টি,** অথচ ইংলণ্ডে মাত্র ৬১৮টি, আমেরিকায় ৭৫০০টি, ডেনমার্কে ১৩২৯টি এবং সুইডেনে আছে মাত্র ৩৫০৭টি। কিন্তু এই ধরনের গ্রন্থাগারের বিশ্বজনীন সংজ্ঞানুযায়ী বিচার করলে ভারতে এদের সংখ্যা ১০টার বেশী হয় কিনা সন্দেহ। ঐ সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার হবে (ক) অবৈতনিক, (খ) গ্রন্থাগারের ভরণ-পোষণ হবে সাধারণের অর্থে—ট্যাক্স মারফত, (গ) প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলির পরিপূরক হিসেবে গণ-চেতনার জাতিধর্মনির্বিশেষে জনসাধারণের ব্যবহার্য হবে। আমাদের দেশের 'পাঠাগার'গুলি চলে সভ্যদের চাঁদার দাক্ষিণ্যে এবং আংশিক সরকারী সাহায্যে। সাহায্য নামেই, কারণ সরকার-প্রদত্ত অর্থের পরিমাণে গ্রন্থাগারের বাড়ী-ভাড়ার টাকাও সব সময়ে ওঠে না। বাংলাদেশের সরকারী সাহায্যের কথাই ধরা যাক। সরকার গ্রন্থাগারগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং সাহায্যের পরিমাণও শ্রেণী অনুযায়ী দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন :

(ক) ১০০০০ গ্রন্থ-সম্বলিত গ্রন্থাগারের বাৎসরিক বাজেট ৩০০০৲ হলে সরকার দেবেন ৬০০ টাকা।

(খ) ৩০০০ গ্রন্থ-সম্বলিত গ্রন্থাগারের বাৎসরিক বাজেট ৩০০০৲ হলে সরকার দেবেন ৪০০ টাকা।

(গ) ৫০০ গ্রন্থ-সম্বলিত গ্রন্থাগারের বাৎসরিক বাজেট ৩০০৲ হলে সরকার দেবেন ২০০ টাকা।

সভ্যদের চাঁদার কথা না তোলাই ভাল। কারণ চাঁদা অনেক ক্ষেত্রেই আদায় করা কতো কঠিন তা সকলেই জানেন। আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার কখনই জনসাধারণ কিংবা রাজানুগ্রহে চলবে না। নিজের অধিকারেই একমাত্র তার চলা সম্ভব। অর্থাৎ গ্রন্থাগার আইন পাশ করিয়ে ট্যাক্স মারফতই একমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্থসংগ্রহ সম্ভব। ভারতবর্ষে মাত্র মাদ্রাজে এবং অন্ধ্রেই 'লাইব্রেরী এ্যাক্ট' পাশ হয়েছে। এবং তার ফলে মাদ্রাজে যখন গ্রন্থাগার খাতে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে তখন বম্বে অনেক বড় প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও ৫ লক্ষের বেশী টাকা খরচ করতে পারেনি গ্রন্থাগার সম্প্রসারণে। আমাদের দেশের প্রথম লাইব্রেরী এ্যাক্ট যদিও ১৯৪৮ সালের ফসল, ইংলণ্ডে প্রথম আইন পাশ হয় ১৮৫০ (১৪ই আগষ্ট) সালে। সাধারণ গ্রন্থাগারের সবচেয়ে প্রধান লক্ষণ হল ব্যবহারের অবারিত অধিকারটি। এই অধিকার কোনো ব্যক্তি-বিশেষের, সংস্থার বা সরকারের অনুগ্রহে প্রদত্ত নয়। ইউ-এন-ওর সনদে মানবাধিকার ঘোষণার ২৭ ধারা অনুযায়ী মানুষের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। সুতরাং কোনো বড়লোকের অথবা কমিটি মেম্বরের সুপারিশ-পত্র ছাড়া যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করা যায় না, তাকে সাধারণ গ্রন্থাগার বলা যাবে না কখনই।

সমগ্র ভারতবর্ষে ঠিক কটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রয়োজন তার নির্ভুল হিসেব দেওয়াটা আজকে অদূরদর্শিতাই হবে। তবে নিতান্ত 'না-হলে-নয়'-এর ভিত্তিতে ধরলে লাইব্রেরী এ্যাডভাইজারী কমিটির মতামতটিই বর্তমানে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রয়োজন মোট ২৬৮,৩৬৯টি গ্রন্থ-কেন্দ্র। তার মধ্যে আছে :

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ১৩১০৭টি
গ্রামীণ শাখা গ্রন্থাগার ৪১০০টি
গ্রামের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ৩৭৩টি
শহরের শাখা গ্রন্থাগার ৭১২টি
শহরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ১৫৪টি

এবং প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ২২টি। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-সমস্যার একটি অদ্ভুত দিক আছে যার ফলে গ্রন্থাগার সংখ্যা বাড়লেও স্বদেশী ভাষার গ্রন্থের সংখ্যা আমাদের দেশে বাড়ে না। কারণ ভারতবর্ষ থেকে সবরকম ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা বছরে প্রায় ত্রিশ হাজারের মতন। এই ত্রিশ হাজারের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৫১ ভাগ গ্রন্থাগার সংগ্রহে স্থান পাওয়ার অনুপযুক্ত। অতএব বিদেশী বইয়ের কথা ছেড়ে দিলে মাত্র ১৫ হাজার বই বছরে সংগৃহীত হতে পারে সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিতে। ১৯৫৪ সালের

।২ সবে পাওয়া যায় যে দেশের ৩২০০০) হাজার পাঠাগারের পুস্তক-সংখ্যা মাত্র ৭১ লক্ষের কিছু বেশী।

পাঠকদের অবস্থাও তথৈবচ। পাঠক-সংখ্যাও ভারতবর্ষে রাতারাতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজও ভারত-বর্ষের শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর। এবং ১৯৮০ সালের আগে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হবে না। ১৯৬১-এর কথা বলা যাবে না এখনই, কিন্তু ১৯৫১-র লোকসংখ্যা ধরলে বলা যায় দেশের মাত্র ছ'কোটি লোক গ্রন্থাগার ব্যবহারে সক্ষম। পরিসংখ্যানের ভাষায় ভারতবর্ষের একজন প্রাপ্তবয়স্ক বছরে একটিমাত্র বই পড়ে এবং প্রতি ৫০ জনের জন্যে আছে ওই একটি-ই মাত্র বই। আমেরিকার গ্রন্থাগারে প্রতি এক-জনের জন্যে আছে ১·২৪ খণ্ড গ্রন্থ। গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার সংখ্যায় সোভিয়েট রাশিয়া সকলের প্রথমে।

গ্রন্থাগার সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার বয়স খুব বেশী নয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজ-নার আগে ১৯৪৯ সালে ন্যাশানাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটির পরিকল্পনায় দিল্লীতে কেন্দ্রীয় 'ন্যাশনাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী'র অধীনে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে "ষ্টেট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। অনেক প্রদেশেই 'ষ্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'ষ্টেট সেন্ট্রাল লাই-ব্রেরী'র অধীনে আছে 'ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী' বা জেলা গ্রন্থাগার। এই জেলা গ্রন্থাগারগুলির অধীনে আছে অনেক-গুলি করে "এরিয়া হেড কোয়ার্টার লাইব্রেরী"। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় গ্রন্থাগার-খাতে অর্থ মঞ্জুর হয়েছিল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় ব্যয় করেছে ৮০ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিস্তারের কাঠামো হয়েছে এইভাবে :

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার [১টি]
|
জেলা গ্রন্থাগার
[১৯টি]
|
মহকুমা গ্রন্থাগার — আঞ্চলিক গ্রন্থাগার
[২৪টি]
|
বিভিন্ন থানা ও ব্লকে
গ্রাম্য গ্রন্থাগার
(৪৬৪টি)
|
পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার

পুস্তক-বিতরণ কেন্দ্র

এছাড়াও আছে সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত ১০০০ হাজার গ্রন্থাগার। সর-কারী এবং বেসরকারী গ্রন্থাগারের মোট সংখ্যা হল ১৫০৮টি। গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসংখ্যা প্রায় সাড়ে উনত্রিশ লক্ষ। এবং এইসব গ্রন্থাগার দ্বারা উপকৃত হবে মাত্র ১২ লক্ষ লোক। আমাদের দেশে পরিকল্পনার খাতায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ালেই সে অনুপাতে পাঠকসংখ্যা না বাড়ার কারণটা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে জন্মের হার শতকরা ৩২টি বাড়লেও নিরক্ষরতার হার শতকরা ৮ জনের বেশী কমছে না। সুতরাং আমাদের দেশের গ্রন্থাগার-গুলিকে শুধু মাত্র 'পাঠাগার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেই চলবে না, তার একটি লোকরঞ্জক ভূমিকাও থাকতে হবে। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার "কমিউ-নিটী ডেভেলপমেণ্ট"এর কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন এবং তদনুযায়ী গ্রামে গ্রামে "ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার" এবং তাঁর অধীনে বুনিয়াদি শিক্ষা সমাজ শিক্ষা ইত্যাদি নানা শিক্ষা-উন্নয়ন পরি-কল্পনার অঙ্গ হিসেবে ছোট ছোট গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের মৌলিক উদ্দেশ্য শিক্ষার দিকে নয়—স্বশিক্ষার দিকে। মনে হয়, সরকার যদি গ্রামোন্নতিমূলক কর্মসূচীর সঙ্গে গ্রন্থাগারকে জুড়ে না দিয়ে গ্রন্থা-গার—কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিতেন, গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণও বাড়তই—উন্নয়নের কাজটিও নিষ্প্রাণ কর্তব্যের একটা সূচীপত্র হত না। সমস্ত ব্যাপারটি সরকারী তাঁবে না এনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর মতন কোনো সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠানের সহ-যোগিতায় পরিকল্পিত হলে সমা-লোচনার অবকাশ কম থাকত এবং একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাহায্য পেলে ত্রুটি-বিচ্যুতিও কম হত।

সাধারণ গ্রন্থাগারকে গণতন্ত্রের উপ-করণ হতে হলে তাকে গণসঙ্গীও হতে হবে। গ্রামে ভাগবত-পাঠের আসর, চণ্ডী-মণ্ডপে অপরাহ্নে পাশা-দাবার আয়োজন, কবিরাজের বৈঠকখানার গল্প-গন্ধ কম লোককে আকর্ষণ করে না। সাধারণ গ্রন্থাগার যদি বই-ঘরের মধ্যেই আটকে না থাকে তাহলে এই সমস্ত জনতাকে সে অনায়াসে আপন করে নিতে পারে। বাস্তবিক গ্রন্থাগার কেনই বা শুধু 'পাঠাগার' হবে? রেডিও মারফত কিছু খবর এবং আনন্দ বিতরণে তার আপত্তি কি? না হয় গ্রন্থাগারের অঙ্গনে যাত্রাই হলো কিংবা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। গ্রন্থাগারিক কেনই বা শুধু 'কাউণ্টারের বাবু' অথবা "বই-ঘরের খাজাঞ্চী" হয়ে থাকবেন, পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একদিন বন-ভোজনেও ত বেরিয়ে পড়তে পারেন ভদ্রলোক। পাঠক এবং গ্রন্থাগারিকের সম্বন্ধে একটি রবীন্দ্রোক্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

প্রত্যেক লাইব্রেরীর অন্তরঙ্গ সভ্য-রূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরীকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরীয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরী করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব।

গ্রন্থাগারিকের এই কৃতিত্বের ফল বিশেষ কোনো গ্রন্থাগার, অঞ্চল বা দেশ ভোগ করে না। গণতন্ত্রের কালজয়ী আয়ুধ তার ফলে ধারালো হয় এবং সেই কৃতিত্ব সভ্যতার একটি বিশেষ অলঙ্কার।

নেশার মাত্রাটা আজ একটু বেশী হ'য়ে গেছে চন্দ্রকান্ত পোদ্দারের। ইচ্ছে করেই তিনি আজ মাত্রাধিক পান করেছেন। নানা কারণে নিজেকে বড় দুর্বল মনে হ'চ্ছে তাঁর। এই দুর্বলতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রবার জন্যই তাঁর এই প্রয়াস। ভুলতে চান, সেই সঙ্গে ভোলাতে চান মনের চাঞ্চল্যকে।

একলা ঘরে চুপ ক'রে বসে আছেন চন্দ্রকান্ত পোদ্দার। ধ্যানগম্ভীর মুখ-ভাব। গভীর চিন্তার অতলে তলিয়ে গেছেন তিনি। সম্মুখে খোলা পড়ে আছে লোহার সিন্দুকটা। হাতে রয়েছে দশ গাছা ক্ষয়ে যাওয়া সাবেক আমলের সোনার চুড়ি। সাবধানে ওজন করে দর কষে বন্ধক রেখেছিলেন বছর খানেক পূর্বে। সর্তাধীনে বন্ধক রেখেছিলেন। পুরো বার ভরির চুড়ি কগাছি হাতের একটু হেরফের ক'রে এগার ভরিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। একটুও হাত কাঁপেনি—হৃদয় গলেনি সেদিন। ব্যবসা ...ব্যবসাই। এখানে শুধু যোগ আর গুণ। সুনন্দার প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে চন্দ্রকান্ত পোদ্দার সামান্য একটু ব্যবসায়ী বুদ্ধি খাটিয়েছিলেন মাত্র। ফলও তাই পেয়েছেন। চুড়ি কগাছি আজ তাঁর নিজ সম্পত্তি। সুদ এবং আসলে চক্রবৃদ্ধি হারে হিসেব দেখিয়ে হাতে আরও সামান্য কিছু গুঁজে দিয়ে দখল করে নিয়েছেন তিনি। সুনন্দার অনুরোধ, করুণ মিনতি আর চোখের জলও শেষ পর্যন্ত তাঁকে টলাতে পারেনি।

কদিন ধরেই স্ত্রী তাগিদ দিচ্ছেন। পুটুরানীর গহনাগুলির ব্যবস্থা করবার জন্য। তাগিদ দেবার কথাও। তাই সিন্দুক থেকে চুড়ি কগাছি বার করেছেন মরা বাদ দিয়ে গলিয়ে ফেলবার জন্য। আর সামান্য কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটবে।

চন্দ্রকান্ত পোদ্দারের একমাত্র সন্তান পুটুরানীর আগামী মাসে বিবাহ স্থির হ'য়েছে। গহনা দিতে হবে ওজন ক'রে পঞ্চাশ ভরির। এখানে হাতের হেরফের অচল। পাকা সোনা আর কাঁটার ওজনে এতটুকু ফাঁকি চলবে না। ওরা তার চেয়ে ঢের বেশী হুঁশিয়ার। নইলে যুদ্ধকালীন ফাঁপা বাজারের আর বর্তমানের বিবিধ আইনকানুনের বেড়াপাশ অতিক্রম ক'রে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় ধনী হ'য়ে উঠা সম্ভবপর হ'ত না। লোহালক্কর, চাল, চিনি আর সিমেণ্ট...ওদের মতে সব ভুল। এরই মধ্যে নাকি তাল তাল সোনা লুকিয়ে আছে। জহুরীর চোখ ওদের। ওখানে ফাঁকি চলবে না।

চুড়িগুলি আর একবার নাড়াচাড়া করে চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন চন্দ্রকান্ত। জেল্লাহীন চুড়িগুলির খাঁজে খাঁজে প্রচুর ময়লা আর খাদ। মরা আর ময়লা বাদ দিয়ে পাকা করে নিতে হবে। নইলে চলবে না। কিন্তু অ্যাসিডের মধ্যে চুড়িগুলি ডুবিয়ে দিতে গিয়ে তাঁর হাত কেঁপে উঠল একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায়। বুকটা দুলে দুলে উঠতে লাগল কেমন একপ্রকারের ভয়ে। অথচ এই ধরনের দুর্বলতাকে কোনদিনই ইতিপূর্বে আমোল দেননি চন্দ্রকান্ত।

এত চেষ্টা করেও এই ভাবান্তরের হাত থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন না। তাঁর আচ্ছন্ন অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে কে যেন সাবধান বাণী উচ্চারণ করল। তাঁর হাতে-ধরা জেল্লাহীন চুড়িগুলির ভিতর থেকে একঝলক আলো বিচ্ছুরিত হ'লো যেন। আর সেই আলোর মাঝে চন্দ্রকান্ত পোদ্দার একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার সন্ধান পেলেন। দু'হাতে বার কয়েক চোখ দুটোকে ঘষে নিয়ে পুনরায় ভাল ক'রে চোখ চাইলেন, কিন্তু ক্ষণপূর্বে দেখা সে আলো আর তাঁর চোখে পড়ল না। পরিবর্তে তিনি দেখলেন চুড়িগুলির সাবেক মালিকের স্বপ্নভঙ্গের একটি করুণ হাহাকার—অশ্রুকলঙ্কিত একখানি মুখ।

চন্দ্রকান্তর চিন্তার ধারা কন্যা পুটুরানীই আজ অলক্ষ্যে থেকে এই পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কন্যার

বিবাহিত জীবনের একটি আনন্দময় নিটোল ছবি তিনি মনে মনে এ'কে চলেছেন। সেদিনের মেয়ে পুটুরানী—চন্দ্রকান্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন বিগত আঠার বছরের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস। পর্দায় ছায়াছবির মতই একের পর এক তাঁর চোখের সম্মুখে দেখা দিয়ে পুনরায় সরে যাচ্ছে। পুটুরানীর আবির্ভাবের দিনটি থেকে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত।

একমাথা কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে টুকটুকে ছোট মেয়েটি দশবার চলতে গিয়ে বিশবার হ'চোট খেয়ে পড়েছে। আধ আধ কণ্ঠে কত কথাই না ব'লেছে। সেই মেয়েই তারপর পায়ে পেল শক্তি—মুখে ফুটল ভাষা। দাপাদাপি করে...অনর্গল অর্থহীন কথা ব'লে...কখনও বা বাপের কাছে মায়ের নামে—মায়ের কাছে বাপের নামে নালিশ জানিয়ে প্রচুর আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে তাঁদের। ধমকালে কেঁদে... আদর ক'রলে গলা জড়িয়ে ধরে চুমা খেয়ে, গালের উপর গাল রেখে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে পুটুরানী। চন্দ্রকান্তর অবসন্ন সময় ওকে নিয়েই কেটেছে—বুকে তুলে নিয়ে সোহাগে আর আদরে। তার কচি মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ভবিষ্যতের কত রঙিন ছবি এ'কেছেন মনে মনে। আর তারই ভবিষ্যতের কথা ভেবে অধিকতর মনোযোগী হ'য়ে উঠেছেন অর্থ উপার্জনের জন্য।

সেই পুটুরানী আজ তার জীবনের আর এক অধ্যায়ের প্রবেশদ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। নতুন ক'রে আবার শুরু হবে তার জীবন। কত সম্ভাবনা.. কত মধুর কল্পনা এই ভবিষ্যতকে ঘিরে। তারই আয়োজনে চন্দ্রকান্ত আজ উদ্যোগী হ'য়েছেন। কিন্তু......

ছোট্ট একটি প্রশ্ন......যে প্রশ্ন আজ কদিন ধ'রেই চন্দ্রকান্তর মনে এক পাষাণ বোঝার মত চেপে বসেছে। পুটুরানীর ভবিষ্যৎ যেন আর একজনের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে অভিশপ্ত হ'য়ে না ওঠে। হয়তো সেই জন্যই তার মনে এত দ্বিধা। সুনন্দার......

চন্দ্রকান্তকে থামতে হ'ল। তাঁর চিন্তার পথে সহসা তাঁর স্ত্রীর আবির্ভাব ঘটল।

তিনি ঘরে ঢুকেই বিস্মিত কণ্ঠে ব'ললেন, কিগো সেই থেকেই চুড়িগুলো নিয়ে চুপ ক'রে বসে আছো?

চন্দ্রকান্ত চিন্তার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন। তাঁর নেশার ঘোর অনেকটা ফিকে হ'য়ে গেছে। একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, বসে থাকবো কেন পুটুর মা। ভাবছিলাম...

চন্দ্রকান্তর স্ত্রী রাগ ক'রে জবাব দিলেন, আর কতদিন তোমার ভাবতে লাগবে! মাত্র একমাস সময় আছে যে।

চন্দ্রকান্ত তাঁর ঘোলাটে চোখ দুটি মেলে বললেন, মনে হ'চ্ছে পুটুরানী শুধু তোমার একলারই মেয়ে, আমার কেউ না।

কেমন একপ্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে তিনি হাসতে থাকেন।

এ কথার কোন জবাব খুঁজে পান না চন্দ্রকান্তর স্ত্রী। তবুও বলেন, কি জানি বাপু অতশত আমি বুঝিনে। দেখতে পাচ্ছি আর সময় নেই তাই ব'লেছি—

তিনি চলে যান। কিন্তু চন্দ্রকান্তর কানে তাঁর শেষ কথাটি বড় বেসুরোভাবে ধ্বনিত হ'তে থাকে—আর সময় নেই... আর সময় নেই।

চন্দ্রকান্ত পুনরায় কয়েক ঢোক পান করলেন। তাঁর ক্ষণপূর্বের চিত্ত-চাঞ্চল্য পুনরায় স্থির হ'ল। তাছাড়া কথাটা পুটুর মা ঠিকই বলেছেন। প্রত্যেকটি দিন শেষ হবার সঙ্গে এর কি সুন্দর নিগূঢ় সম্বন্ধ। মন সব সময় মেনে নিতে চায় না। সত্য জেনেও না বোঝার অবুঝ আনন্দে মগ্ন হ'য়ে থাকতেই ভাল লাগে। নইলে সব যে থেমে যাবে। থেমে যাবে পুটুরানী... তার মা...থেমে যাবে চন্দ্রকান্ত নিজে... থেমে যাবে প্রত্যেকটি মানুষ। ঐ অবুঝ আনন্দের মধ্যেই আত্মগোপন ক'রে আছে জীবনের গতি।

চন্দ্রকান্ত আধবোজা চোখে হেসে ওঠেন। নিজের কাজের এমন সবেস যুক্তিতে তিনি ভিতরে ভিতরে সাহস ফিরে পান। আরও জোরালভাবে কথাটা বারে বারে উচ্চারণ করতে থাকেন—জীবন মানেই গতি। তাকে থামিয়ে দেবার অধিকার কোন মানুষের নেই। তাছাড়া যে কাজের মধ্যে প্রাপ্তির আনন্দ নেই সে কাজকে চন্দ্রকান্ত কাজই মনে করে না।

কিন্তু এই মনগড়া দুর্বল যুক্তি শেষ পর্যন্ত চন্দ্রকান্তর ভিন্নমুখী চিন্তাধারাকে বশে আনতে পারল না।

একদিন যে যুক্তির কাছে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি অর্থহীন দুর্বলতা বলে স্বীকৃত হ'য়েছিল, আজ কিন্তু তা এককথায় উড়িয়ে দিতে চন্দ্রকান্ত পারলেন না বরং মনে মনে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তিনি এগোতেও ভয় পাচ্ছেন, পিছিয়ে যেতেও দ্বিধায় পড়েছেন। সামান্য কগাছি চুড়িই শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। পুটুরানীর বিবাহিত জীবনের উজ্জ্বল কল্পনাকে ম্লান ক'রে দিয়েছে।

চন্দ্রকান্তর হাত থেকে চুড়ি কগাছি খসে পড়ে খানিকটা শব্দের তরঙ্গ সৃষ্টি হ'ল। আতঙ্কিত বিস্ময়ে তিনি চমকে উঠলেন। শব্দতরঙ্গের মধ্যে চন্দ্রকান্ত স্পষ্ট শুনতে পেলেন একটা চাপা কান্নার মর্মন্তুদ হাহাকার। আশাভঙ্গের নীরব ক্রন্দন। এ কান্না সুনন্দার। শুনতে তিনি ভুল করেননি। এই কান্নার সামান্য একটু ভগ্নাংশের সঙ্গে সেদিন তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। শুনেও শোনেন নি। শুনতে চাননি। আজ কিন্তু উৎকর্ণ হ'য়ে উঠেছেন। শুধু উৎকর্ণ নয়। চন্দ্রকান্তর সমগ্র চেতনা উদ্‌গ্রীব আগ্রহে কান পেতে আর চোখ মেলে রয়েছে সেদিনের উপেক্ষিত দৃশ্যটির পুনরভিনয় দেখতে......

এই ঘরে এসেই সুনন্দা দাঁড়িয়ে-ছিল। সম্মুখের সিন্দুকটাও ঠিক আমনিভাবেই খোলা ছিল। ভিতরে সাজান ছিল বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা—আর এখান ওখান থেকে উঁকি দিচ্ছিল প্রচুর বন্ধকি স্বর্ণালঙ্কার। চন্দ্রকান্ত ভাল করেই লক্ষ্য করেছিলেন সুনন্দার দৃষ্টির দ্রুত পরিবর্তন। বার কয়েক জ্বলে জ্বলে এক সময় কিন্তু বেদনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ দৃশ্য চন্দ্র-কান্তর কাছে নতুন নয়। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই তাঁর মুখের অম্লান হাসির এতটুকু অভাব দেখা গেল না। তিনি সহজ কণ্ঠেই অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন মা জননী। আপনার জন্য কি করতে পারি আমি? চন্দ্রকান্ত লক্ষ্য করেছিলেন, মেয়েটি কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। বার কয়েক চেষ্টা করে দুবার ঢোক গিলে সুনন্দা নিবেদন করেছিল, মানে আমার কিছু টাকার দরকার পড়েছে—

কথাটা শেষ করতে গিয়েও পারে না। কুণ্ঠা আর সংকোচে তার গলা বুজে গেল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, কিন্তু মা জননী জানেন, শুধু হাতে টাকা ধার দিই না।

বার কয়েক ইতস্ততঃ করে সুনন্দা তার বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে বার করল দশ-গাছা বহুকালের পুরানো সোনার চুড়ি। বলল, খালি হাতে চাই না।

চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, বন্ধক না বিক্রি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া গেল, বন্ধক।

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে বললেন, দুটো কথা বলছি কিছু মনে করবেন না জননী। ছাড়িয়ে নেবার আশা থাকলে বন্ধকই রাখুন নইলে বিক্রি করায় আপনার লাভ বেশী।

সুনন্দা ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছিল। সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, লাভ লোকসানের কথা থাক পোদ্দার মশাই। আশা না থাকলেও বিক্রি করা সম্ভব হবে না।

একটু যেন বিরক্ত হয়েছেন এমনি ভাব দেখিয়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, এইতো আপনাদের দোষ মা। বুঝেও বুঝতে চান না। আপনাদের সব কথা জানি বলেই বলছি নইলে আমার আর কি, বিক্রির চেয়ে বন্ধকে লাভ বেশী। কিন্তু আপনারই স্বামীর ভিটায় বসে আর অন্ততঃ আপনাদের কাছ থেকে লাভ করতে চাইছিলাম না।

কিন্তু মুখে তিনি যত ভাল ভাল কথাই বলুন না কেন লাভ লোকসানকে চন্দ্রকান্ত জীবনে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকেন। তাই সুনন্দার স্বামীর সততার সুযোগ নিয়ে তার সর্বস্ব মায় বসত বাড়ীখানি দখল করে নিতেও তার বিন্দুমাত্র আটকায়নি।

সততা......ঐ শব্দটা যেন কেন বর্তমান যুগেও অভিধানে রাখা হয়েছে......অর্থহীন......একেবারেই অর্থহীন একটা শব্দ। নইলে সুনন্দাদের এ দুরবস্থা কেন! কি পেয়েছে ওর স্বামী? প্রাসাদ থেকে বস্তিবাসী হয়েছে—আর দুদিন পরে হয়তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার সূচনাও ইতিমধ্যে হয়েছে।

মানুষ তার ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। নইলে এমন দুর্বুদ্ধি হবে কেন। চন্দ্রকান্ত কে, কতটুকু তার ক্ষমতা। শুধুই নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু তাঁর মনের কথা মনেই থাকে। প্রকাশ্যে পুনরায় বললেন, আমার কথাটা আর একবার ভেবে দেখলে ভাল করতেন মা জননী।

শান্ত সংযত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল সুনন্দা, কেন একই কথা বার বার বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন পোদ্দার মশাই। ও চুড়ি বিক্রি করবার আমার কোন অধিকার নেই। বংশ পরম্পরায় ও চুড়ি শাশুড়ির কাছ থেকে তার বড় ছেলের বৌ পেয়ে এসেছে। আমিও পেয়েছিলাম। অত্যন্ত বিপদের মধ্যে পড়েই বন্ধকের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছি......সুনন্দার কণ্ঠস্বর সজল হয়ে উঠল।

চন্দ্রকান্ত নির্বিকারভাবে বললেন, ওগুলো তাহলে আপনার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিত হবে মা জননী।

সুনন্দার কণ্ঠস্বর পুনরায় কঠিন হয়ে উঠল, বলল, ফিরিয়েই যদি নিতে পারবো তাহলে এলাম কেন পোদ্দার মশাই।

এর পরে আর কথা বলা উচিত হবে না বুঝেও চন্দ্রকান্ত চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, এত কথার পরে চুড়িগুলো রাখতে আমার হাত উঠছে না। আপনি বরং অন্য কোথাও দেখুন জননী।

সুনন্দা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, আমাদের বলতে যা কিছু ছিল সবই তো আপনার, তাই এখানেই এসেছি। তাছাড়া আমাদের সুখ-দুঃখ সবই আপনি জানেন তাই আপনার কাছে আসতে তেমন লজ্জা পাইনি কিন্তু—

কথাটা সুনন্দা শেষ করতে পারেনি।

চন্দ্রকান্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, জানি বইকি মা জননী। কিন্তু আপনার স্বামীর যদি আর একটু বিষয়-বুদ্ধি থাকতো—

সুনন্দা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বলল কিন্তু সকলের যে এক রকম বিষয়-বুদ্ধি হয় না পোদ্দার মশাই।

চন্দ্রকান্ত বলেন, চতুর্দিকে এত দেখেও যাদের বুদ্ধি হয় না তারা এমনি করেই দুঃখ পায়। সততা—শেষ পর্যন্ত এই সততা আপনাদের কিছু দিতে পারল মা জননী?

সুনন্দা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল, দেয় পোদ্দার মশাই তবে তা গ্রহণ করবার শক্তি সকলের থাকে না। কিন্তু আমার যে বড্ড দেরী হয়ে গেল। আমাকে এবারে বিদায় দিন।

গরজ বুঝে চন্দ্রকান্ত তার ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী ঠিক করে নিলেন। কষ্টি-পাথরে প্রত্যেক গাছি চুড়ি ঘষে দেখে সোনাটা পরখ করে নিলেন, তারপর হাতের হেরফের করে......সুনন্দা কিন্তু একবার ফিরেও দেখল না কি করছেন চন্দ্রকান্ত পোদ্দার। হাতের মধ্যে এক গোছা নোট নিয়ে এক প্রকার ছুটে চলে গেল ঘর ছেড়ে। অকারণে অনেক দেরী হয়ে গেছে তার।

সুনন্দার চলে যাওয়ার পথের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে এই সর্বপ্রথম তাঁর মনে হল এতটা না করলেই হয়তো ভাল করতেন। মনের কোথায় যেন একটি সূক্ষ্ম কাঁটা খচ খচ করে বিঁধছিল। কিন্তু এই সূক্ষ্ম আঘাতের বেদনা সহজে প্রাপ্তির আনন্দে চাপা পড়ে গেল। অন্ততঃ চন্দ্রকান্ত তাই বিশ্বাস করে-ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর পরে সুনন্দা যখন আবার এই ঘরে এসে দাঁড়াল তার পানে চোখ তুলে তাকাতেও চন্দ্রকান্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। আপন অজ্ঞাতে ডান হাতখানা এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের খোলা দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল। ওর অভ্যন্তরে থাকে থাকে সাজান নোটের গোছা তাকে হয়তো-বা আজ লজ্জাই দিল। কিন্তু মুহূর্তের এই স্বাভাবিক দুর্বলতাকে তিনি জোর করে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন থতিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। থেমে থেমে জিজ্ঞেস করলেন, কি করতে পারি আপনার জন্য মা জননী......

কথার ধ্বনি চন্দ্রকান্তকে শক্তি যোগাল। দুর্বলতাকে অনেকটাই জয় করে ফেললেন তিনি।

সুনন্দা কিন্তু সহজে মুখ খুলতে পারল না। তার ঠোঁট দুখানি থর থর করে কাঁপতে থাকে। চন্দ্রকান্তের হয়তো তা চোখে পড়ল না। পড়লে এত সহজে তিনিও সম্ভবতঃ জিজ্ঞেস করতে পারতেন না, মা জননী কি চুড়ি কগাছি ফেরত নেবার জন্যে এসেছেন?

সুনন্দার কণ্ঠস্বর হতাশায় লুটিয়ে পড়ল, আপনি যদি দয়া করেন পোদ্দার মশাই।

নির্লিপ্ত গলায় চন্দ্রকান্ত বল্লেন, আপনার জিনিস আপনি ফিরিয়ে নেবেন

এর মধ্যে দয়া করবার কথা আসে না। তাহলে হিসেবটা কষে ফেলি আমি?

সুনন্দা কুণ্ঠিত আবেদনের সুরে বলল, টাকা দেবার যে আমার ক্ষমতা নেই—

চন্দ্রকান্ত একটুখানি হাসলেন, বললেন, কথাটা যেন কেমন গোলমেলে ঠেকছে মা জননী। টাকা দেবেন না...... জিনিষ ফিরে পেতে চান......এ কেমন করে সম্ভব?

সুনন্দা হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। চন্দ্রকান্তর কথার অন্তর্নিহিত শ্লেষ তাকে যেন অনেকখানি ছোট করে ফেলেছে। আশ্চর্য, কিসের প্রত্যাশায় সুনন্দা এই লোকের কাছে ছুটে এসেছে! সহসা তার চেহারা বদলে গেল। আঘাত প্রাপ্ত সাপের মত গর্জন করে উঠল সুনন্দা। বলল, কি আশ্চর্য, যে লোক নিজেই দয়ার পাত্র আমি এসেছি তারই কাছে দয়া ভিক্ষা করতে। একটু থেমে সে পুনশ্চ বলতে থাকে, আমার স্বামী আত্মহত্যা করে জুড়িয়েছেন। আমি পারিনি আমার পেটের সন্তানের জন্য। আপনার কাছে এসেছিলাম তারই কথা ভেবে। কিন্তু এখন দেখছি ভুল ক'রেছি। ও জিনিষ যে আপনার ছোঁয়া লেগে অপবিত্র হ'য়ে গেছে কথাটা আমার বোঝা উচিত ছিল। চুড়ি আমি চাই না। দেনা পাওনা মিটিয়ে নিন।

চন্দ্রকান্ত চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালেন। সুনন্দার জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন তাঁকে ঝলসে দিচ্ছে। তিনি আমতা আমতা ক'রে বললেন, মিথ্যে আপনি রাগ ক'রছেন। আমি ত' কোন অন্যায় কথা বলিনি।

থামুন, সুনন্দা পুনরায় জ্বলে উঠল। ন্যায় অন্যায়ের আপনি কতটুকু জানেন? যা জানেন তাই করুন।

হিসেব মত তার পাওনা বুঝে নিয়ে সুনন্দা চলে গেল।

মাত্র একটি সপ্তাহ পূর্বে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই থেকেই চন্দ্রকান্ত তাঁর নেশার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সুনন্দার সেদিনের সেই মূর্তিটি আর আগুনে কথাগুলির জ্বালা। চন্দ্রকান্তর সর্বাঙ্গ জ্বলছে। পুড়ে যাচ্ছে তাঁর সমস্ত সত্ত্বা অথচ সুনন্দার উপর রাগ করতে পারছেন না চন্দ্রকান্ত। বরং নিজের কাজের হিসেব ক'রতে ব'সে বড় বেশী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন তিনি।

দেওয়াল ঘড়িটা রাত বারটার সংকেত জানাল। চন্দ্রকান্ত যেন এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন। একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন। এইমাত্র জেগে উঠেছেন। ঘরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত চুড়িগুলি পুনরায় হাতে তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা এসে তাঁর চিন্তার পথে মাথা তুলে দাঁড়াল। মুখে উপেক্ষার হাসি—চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। এই চুড়িগুলি শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাগল না ক'রে ছাড়বে না। চন্দ্রকান্ত ভাবছিলেন।

পুটুরানীর মা পুনরায় দেখা দিয়েছেন। ঘরের দরজায় সজাগ প্রহরী অ্যালসেশিয়ানটা বারেকের জন্য ঘড়ঘড় শব্দ ক'রে থেমে গেল।

চন্দ্রকান্তের আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে...কে ওখানে?

আমি—সাড়া দিয়ে পুটুর মা এসে ঘরে প্রবেশ ক'রলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চন্দ্রকান্তের মুখোমুখি বসে রাগত সুরে ব'ললেন, চুড়িগুলোর কি প্রাণও আছে। কথা কয়, হাসে, কাঁদে আবার চোখ রাঙিয়ে ধমক দেয়......

পুটুর মা ধমক দিলেন, বুড়ো মিনসের রকম দেখনা। আজ আবার অন্য নেশাও হ'য়েছে বুঝি—

চন্দ্রকান্ত বিষণ্ণ হেসে জবাব দিলেন, নেশার কথা থাক পুটির মা। মেয়েটা কিন্তু সত্যিই যাদু জানে। আমার আজন্মের বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়েছে।

পুটুর মা বিস্মিত হ'য়ে বলেন, আজ অশ্বার কখন এসেছিল মেয়েটা? আমার ত চোখে পড়েনি!

আসবে কি পুটুর মা...সে কি গেছে যে আসবে...এখানেই সে আছে... স্তিমিত গলায় চন্দ্রকান্ত বলেন।

ভয় পেয়ে পুটুর মা চন্দ্রকান্তর একখানা হাত চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, এসব তুমি কি ব'লছো গো? কোথায় তোমার সুনন্দা?

চন্দ্রকান্ত যেন বহুদূর থেকে কথা বলছেন এমনিভাবে জবাব দিলেন, এই কথাটাই ত' আজ সাতদিন ধরে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি পুটুর মা, কিন্তু এই অলক্ষণে চুড়ি ক'গাছা আমাকে শান্তি দিচ্ছে না। গলাতে গিয়েও হাত কেঁপে উঠেছে। মেয়েটা এগুলো ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। আমি দিইনি।

"ন্যায় অন্যায়ের আপনি কতটুকু জানেন? যা জানেন তাই করুন।"

রূপ বেড়েছে—সেই সন্ধ্যে থেকে কি দেখছো তুমি?

চন্দ্রকান্ত ক্লান্ত গলায় জবাব দিলেন, শুধুই কি রূপ পুটুর মা—বোধহয়

পুটুর মা প্রশ্ন করেন, দিলে না কেন তাহ'লে?

চন্দ্রকান্ত বললেন, আমার পুটুরানীর কথা ভেবে পারিনি। তাছাড়া

মেয়েটার টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। আমার এত কষ্টের টাকা ত' আর বিলিয়ে দিতে পারি না পঁটুর মা।

পঁটুর মা বাধা দিয়ে বললেন, দিলেও তোমার ক্ষতি হ'তো না। আমাদের অনেক আছে। আর ওদের যথাসর্বস্ব—

চন্দ্রকান্তর অকস্মাৎ রূপান্তর ঘটল। তিনি গর্জন ক'রে উঠলেন, খবর্দার পঁটুর মা। সুযোগ পেয়ে তুমিও যদি আমাকে উপদেশ দিতে আস তা আমি সহ্য করব না। তুমি এখন যাও। আমার অনেক কাজ আছে।

পঁটুর মা স্বামীকে বিলক্ষণ জানেন। তথাপি একেবারে নিঃশব্দে চলে যাওয়া আজ সম্ভব হ'ল না। চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তোমার আর যা খুশি ক'রতে পার, কিন্তু ঐ অলক্ষ্মণে চুড়ির সোনায় পঁটুরানীর গয়না হ'লে আমি অনর্থ ক'রবো এ কথাটাও তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি। তিনি দুপ দাপ ক'রে ঘর থেকে চলে গেলেন।

চন্দ্রকান্ত বিরক্তিভরে একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। প্রহরারত আলসেশিয়ানটাও হয়তো অকারণে আর একবার ঘড়ঘড় ক'রে উঠল।

পঁটুর মা ততক্ষণে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছেন। চন্দ্রকান্ত স্ত্রীর ব্যবহারে কিছু নতুনত্বের সন্ধান পেলেন। লোকে বলে টাকা পয়সার ব্যাপারে তিনি নাকি আর একগুণে বাড়া। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখা গেল।

সকলে মিলে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রকান্তকে পাগল করে ছাড়বে। আরে বাপু, যাদের ভগবান মেরেছেন মানুষে তাদের কতটুকু ভাল ক'রতে পারে। এই বাড়ি ঘরদোর নইলে আজ তাঁর হবে কেন। না বুঝে অনেক দুর্বলতাকে এই ক'দিন ধরে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু আর না।

চন্দ্রকান্ত দৃঢ়হাতে নাইট্রিক অ্যাসিডের বোতলটা তুলে নিয়ে এলেন। পার্শ্বে অবস্থিত পাত্রে তার থেকে অনেকখানি ঢেলে দিলেন। তুঁতে রঙের খানিকটা না নীল না সবুজ আভা তার দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। বোতলটা সযত্নে এক পাশে সরিয়ে রেখে চন্দ্রকান্ত পুনরায় চুড়ি ক'গাছি হাতে তুলে নিলেন। অ্যাসিডের মধ্যে ভিজিয়ে দিতে গিয়ে কি ভাবলেন। তারপর সকল দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ওগুলি পাত্রের মধ্যে ফেলে দিলেন। অনেকগুলি বুদবুদ দেখা গেল। সামান্য একটু শব্দও হ'য়ে থাকবে। চন্দ্রকান্ত চমকে উঠে অ্যাসিডের পাত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রলেন। মনে হ'ল কে যেন তাঁর কানের কাছে মুখ এনে মৃদু কণ্ঠে ধিক্কার দিল, ভাল করলে না চন্দ্রকান্ত......

আবার নতুন ক'রে নেশা ক'রলেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে একটা ধোঁয়ার পর্দা নেমে এল। আর সেই ধোঁয়ার পথ বেয়ে তাঁর দৃষ্টি-পথে দেখা দিল সালংকরা হাস্যমুখী জীবনরসে টলটলে একটি মেয়ে। অপূর্ব সুন্দরী। চোখ ফেরাতে পারেন না তিনি। পরনে লাল রঙের চেলী—সর্বাঙ্গে আনন্দের হিল্লোল, চোখে মদির স্বপন। আশা আনন্দের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। চন্দ্রকান্ত মূক বিস্ময়ে চেয়ে আছেন আর মেয়েটি তাঁর মুখের পানে চেয়ে মিষ্টি ক'রে হাসছে—লজ্জা জড়ান বড় মধুর এই হাসিটুকু। ভবিষ্যৎ জীবনপথের সিংহদ্বার খোলা পেয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ উল্লাসে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে মেয়েটি। নিজেকেও ঐ মেয়ে নতুন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

চন্দ্রকান্ত কিছুটা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে লাল চেলীর পরিবর্তে সাধারণ শাড়ী পরে মেয়েটি এসে আবার দেখা দিল। এখন সে স্বামীর স্ত্রী—আকুল আগ্রহে পথের পানে চেয়ে আছে কখন স্বামী ফিরে আসবেন তারই আশায়। চন্দ্রকান্ত আবার বিমনা হ'য়ে পড়লেন। আপন জীবনের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ধীরে ধীরে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর কাছে। অপূর্ব এক সুখানুভূতিতে তিনি আনমনা হ'য়ে পড়লেন।...কানে একটি লোভনীয় শব্দ...অত্যন্ত পরিচিত। চোখ চেয়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারলেন না চন্দ্রকান্ত। মেয়েটা ধরা দিয়েও ছেড়ে দেবার অনুরোধ করে খল খল করে হেসে উঠে বুকের মধ্যে মুখ লুকাল। আঃ বেহায়া ছেলে মেয়ে দুটো করছে কি...লজ্জা শরম বলেও কি কিছু নেই! কিন্তু চোখ ফেরাতেও পারছেন না তিনি। জীবন-কাব্যের এই পৃষ্ঠাগুলি বড় শিগ্‌গির শেষ হ'য়ে যায় ব'লেই কি এত আকর্ষণীয়?......

এরপরেই দেখা দিল স্থূলে বাস্তব। অঙ্ক কষায় গরমিল। এত হাসি, এত গান, এত চুপি চুপি কথা কওয়া, স্বপ্ন দেখা সব একদিন থেমে গেল। এই প্রাসাদ থেকে ওদের চলে যেতে হ'ল বস্তিবাড়ীতে আর চন্দ্রকান্ত এলেন এখানে। আশ্চর্য মেয়ে সুনন্দা—তার চেয়েও আশ্চর্য মানুষ তার স্বামী সুধীরেন্দ্র। ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল তবু আদর্শচ্যুত হ'লো না। কিন্তু যে যুগে ঐ শব্দটা শুধুই একটা কেতাবি শব্দরূপে বেঁচে আছে সে-যুগে, এই শ্রেণীর মানুষ বাঁচতে পারে না। সুধীরেন্দ্রকেও শেষ পর্যন্ত মরে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হলো। আর তার স্ত্রী সুনন্দা......

চন্দ্রকান্তর বুকের ভিতরটা এত দ্রুত স্পন্দিত হ'তে লাগল যে, তিনি ভয় পেয়ে দু'হাতে বুক চেপে ধরলেন। মাথার ভিতরটা তাঁর একেবারে খালি হ'য়ে গেছে যেন। চোখের দৃষ্টিতে দেখা গেল কেমন একপ্রকারের উন্মাদ ঔজ্জ্বল্য। চন্দ্রকান্তর চোখের সম্মুখেই সেদিনের সেই লাল চেলীর সবটুকু রঙ ধুয়ে মুছে সাদা হ'য়ে গেল। আর সর্বাঙ্গে সেই সাদা কাপড়খানা জড়িয়ে সুনন্দা তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে বলছে—ঐ সামান্য ক'গাছি চুড়ি ফিরিয়ে দিতে। তার ভবিষ্যৎ বংশধরের অকল্যাণের ভয়ে সব ভুলে সে ছুটে এসে হাত পেতেছে। দয়া ভিক্ষা করেছে। চন্দ্রকান্ত এ আবেদনে সাড়া দিতে পারেননি। চিরদিন তিনি শুধু যোগ করেই এসেছেন। যোগফলেই তার আনন্দ। বিয়োগ করার মধ্যেও যে আনন্দ থাকতে পারে এ খবর তাঁর অজানা। জানবার চেষ্টাও কোনদিন করেননি।

চন্দ্রকান্ত চীৎকার ক'রে উঠলেন, না...না...শুধু হাতে ফিরে পাওয়া যায় না। ফিরে পেতে হ'লে...কথা কটি তাঁর শেষ হ'ল না। হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। কোথা দিয়ে কি যে হ'য়ে গেল চন্দ্রকান্ত কিছুই বুঝতে পারেন না। সুনন্দা কেমন ক'রে পঁটুরানী হ'তে পারে!

তিনি দুহাতে চোখ রগড়ে আবার তাকালেন। স্বপ্নও নয়, দৃষ্টিভ্রমও নয়। সুনন্দা কোথাও নেই—সেখানে পঁটু-রানী দেখা দিয়েছে। তাঁর পঁটুরানীর এ কেমন বেশ। এই বেশে হতভাগী তার বাপের কাছে এসে দাঁড়াতে পারল! হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে সুনন্দার চুড়ি ক'গাছি।

একটা তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে হতাশায় আর বেদনায় ভেঙে পড়ল। সহসা অ্যাসিডের পাত্রের উপর ঝুঁকে পড়লেন চন্দ্রকান্ত, তারপর পাগলের মত তার মধ্যে হাত দিয়ে চুড়ি কগাছি শক্ত ক'রে মুঠির মধ্যে চেপে ধরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। তিনি জ্ঞান হারালেন। আলসেশিয়ানটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর্ত সুরে কেঁদে উঠল।

শিল্পীর তুলিতে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী নিয়ে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ কিছুকাল আগে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন। শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গরূপে এবার তাঁরা দ্বিতীয় উৎসবের আয়োজন করেছেন ক্যাথেড্রাল রোডের নিজস্ব ভবনে। এই উৎসবে বাঙলা দেশের নবীন ও প্রাচীন শিল্পীদের প্রায় ৬০ জন অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের শিল্পকলায় এবার রবীন্দ্রনাথের নানা রূপ, নানা ভঙ্গী, যেমন বিচিত্র শিল্প-সুষমায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি রবীন্দ্র-চিন্তা-মানসের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পী যে-সব শৈল্পিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন তাকে ভিত্তি করেও রচনা করেছেন অনেকগুলি সুন্দর চিত্র-সম্পদ। এই দিক দিয়ে প্রদর্শনীটি দর্শকদের কৌতূহলী মনের দরবারে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে বোধহয়।

বাঙলার প্রবীণ ও খ্যাতনামা শিল্পীরা এককালে রবীন্দ্রনাথের যে-সব চমৎকার প্রতিকৃতি চিত্র অংকন করেছিলেন কিংবা রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ অবলম্বনে যে ভাব-ব্যঞ্জনাময় চিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, তার অনেকগুলিই দীর্ঘকাল পরে এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। বাঙলা দেশের শিল্পরসিক ব্যক্তিরা পুনর্বার বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু, যামিনী রায়, রমেন্দ্র চক্রবর্তী, মুকুল দে, শুভো ঠাকুর, শৈলজ মুখার্জী, কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-নাথের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করে অংকিত চিত্রগুলি দেখে আসতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই দেশ-বিদেশের শিল্পী ও ভাস্করের শিল্প-দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ঐ সুন্দর দেহ-লাবণ্য ও মনোহরণ কান্তিকে শিল্পী আর ভাস্করেরা বারংবার বিধৃত করতে চেয়েছেন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে। বাঙলার

জল পড়ে পাতা নড়ে—কিরণময় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রদর্শনী

॥ কলারসিক ॥

খ্যাতনামা শিল্পীরাও এর ব্যতিক্রম নন। কেউ তেল-রঙে, কেউ জল-রঙে, কেউ প্যাস্টেলে, কেউ কাঠ খোদাইয়ের মাধ্যমে সেই দুর্লভ-দর্শন রবীন্দ্রনাথকে আমাদের দৃষ্টি-গোচর করেছেন। ১৯২৭ সালে অংকিত শিল্পী মুকুল দে-র পেন্সিল-স্কেচ কিংবা অবনীন্দ্রনাথের প্যাস্টেলে অংকিত রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি নিঃসন্দেহে এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ রচনা।

এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী যামিনী রায়ের আঁকা 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' চিত্রখানিও এই প্রদর্শনীর সম্মান বৃদ্ধি করেছে। শ্রীযুক্ত রায় এককালে যে প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন এই চিত্রখানি দেখে তা অনায়াসে অনুভব করা যায়। শিল্পী রমেন্দ্র চক্রবর্তীর তৈলরঙে অংকিত প্রতিকৃতি চিত্র ও চিত্রাঙ্গদা সিরিজের সেই বিখ্যাত কাঠ খোদাইয়ের কাজগুলিও ভাল লাগবে সবার। অধুনালুপ্ত ক্যালকাটা গ্রুপের প্রখ্যাত শিল্পী শুভো ঠাকুরের জ্যামিতিক প্যাটার্ণে (cubism) অংকিত বিরাটাকার রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিখানিও বহুকাল পরে আবার দেখার সুযোগ ঘটবে অনেক দর্শকের।

এ-ছাড়া শিল্পী ইন্দ্র দুগার, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, সুনীল পাল, নীরোদ মজুমদার, দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ অনেকের চিত্রকলাই স্থান পেয়েছে এখানে। প্রথমোক্ত তিনজন শিল্পী তাঁদের পুরানো কাজই উপস্থিত করেছেন এই প্রদর্শনীতে। শেষোক্ত তিনজনের কাজ সাম্প্রতিক কালের বলে মনে হলো। শিল্পী সুনীল পাল 'কঠিন প্রস্তর কেটে মূর্তিগর গড়িছে প্রতিমা, অসীমের রূপ দিক জীবনের বাধাময় সীমা,' এই কাব্য-ভাবনারই চিত্ররূপ দিয়েছেন জল-রঙের মাধ্যমে। কঠিন প্রস্তরের বুকে ভাস্করেরা রবীন্দ্র-মূর্তিকে কঠিন শ্রমে তার সাধনায় ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলছেন, এই কল্পনাকে সুনীল বাবু চমৎকারভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্পী নীরোদ মজুমদার তাঁর সেই পরিচিত বৃত্তজালের অজস্র আবেষ্টনীতে যা সৃষ্টি করেছেন তার নাম দিয়েছেন 'ইম্প্রেশান অফ ডাকঘর।' চোখ টানে, বুদ্ধিকে উস্কে দেয়, কিন্তু নীরোদ বাবুর এই চিত্রকলা আমার হৃদয়কে দোলায়িত করে না। অন্য দর্শকেরাও এই শক্তিশালী শিল্পীকে রবীন্দ্র-চিন্তা-মানসের আলোকে একবার বিচার করে দেখতে পারবেন এই প্রদর্শনী দর্শনে এসে। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে আমার শিল্পী দেবকুমার রায়চৌধুরীর চিত্র-খানি। জানিনা, ইতালী-পরিভ্রমণ করে এসে এই শিল্পী আমাদের আধুনিকতার কোন্ সম্পদ উপহার দিতে চাইছেন। একটি বড় ক্যানভাসে দুপাশে দুটো চৌকো রঙের আস্তরণ লাগিয়ে প্রথম-টিকে অনেকগুলি বিবর্ণ রঙে আবছা রাঙিয়ে করে দ্বিতীয়টির উজ্জ্বল হলুদ আস্তরণের উপর একটি বড় কালো রেখার ছন্দিত আভাসে রবীন্দ্র-মুখমণ্ডলের ব্যঞ্জনা। এনে কি তিনি বুঝাতে চেয়েছেন বাঙলা দেশের দর্শকদের? আমি এই স্ট্যাণ্টের মর্ম গ্রহণে সত্যি অক্ষমতা প্রকাশ করছি। আশা করি দেবকুমার বাবু আমাদের চিত্রকলার ঐতিহ্যকে এখনো সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন নি। তাঁর মত শক্তিশালী শিল্পীর কাছে বাঙলা দেশ এবং আধুনিক মন অন্যতর কিছু প্রত্যাশা করে।

মহিলা-শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তীর কাজ সত্যি উপ-ভোগ্য। ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতিতে অংকিত তাঁর 'আশ্রম' চিত্রখানি সাধারণ দর্শকদের তৃপ্তি দেবে। এছাড়া শ্রীমতী সি. বসু, শ্রীমতী টুটু লাহিড়ী, শ্রীমতী অনুরাধা রায়, শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়-চৌধুরী এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা ঘোষালের চিত্রও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রথম যুগের ছাত্র অর্ধেন্দু বন্দোপাধ্যায়ের কথা বাঙলা দেশ ভুলে গেছে। কিন্তু শিল্পী হিসাবে তিনি যে সত্যি কত ভাল ছিলেন এই প্রদর্শনীর চারখানি চিত্র তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ অর্ধেন্দু বাবুর চিত্র সংগ্রহ করায় আমরা খুশি কিন্তু শিল্পাচার্য নন্দলালের কোনো ছবি এই প্রদর্শনীতে কেন যে দেখতে পেলাম না, তা বুঝতে পারছিনে ঠিক। এ-ত্রুটি বড় বিসদৃশ।

তবু আমরা এই প্রদর্শনী দেখে আসার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করছি।
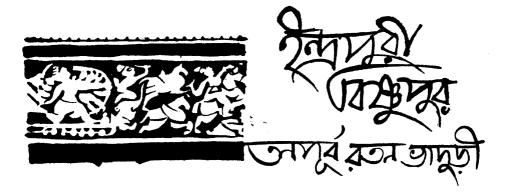
মর্তভূমির ইন্দ্রপুরী বিষ্ণুপুর, সুরতীর্থ, মল্লভূমির রাজধানী। সাত মাইল পরিধি নিয়ে বিস্তৃত। আজও কত মন্দির, কত সরোবর বা বাঁধ আর দুর্গ নিয়ে সে গৌরবান্বিত হয়ে আছে আপন সংস্কৃতির দ্যুতিতে, মহিমান্বিত হয়ে আছে অভিনব স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের ঐতিহ্যে। অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় বিষ্ণুপুর, অমরত্ব লাভ করেছেন তার নৃপতিরাও। বাংলার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান তাঁরা অধিকার করে আছেন। তাঁদের ইতিহাসের আরম্ভ হিন্দু যুগে, তাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মতও বিভিন্ন। কেউ বলেন তাঁরা জাতিতে রাজপুত, পরে রাঢ়ে বসতি স্থাপন করেন। আবার কেউ বলেন, তাঁরা বাঙালী, মল্লভূমের আদিম অধিবাসী। মল্লভূমে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁদের পূর্বপুরুষও আদি মল্ল। মল্লবীর তাঁরা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামন্ত রাজা পশ্চিমবঙ্গের। জয়মল্ল, কালুমল্ল আর বীরহাম্বীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। তাঁদের শৌর্যে, রাজ্যের সীমানাও বিস্তৃত হয় উত্তরে সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই-কোতে, দক্ষিণে মেদিনীপুরের একাংশে, পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম, ও ছোটনাগপুরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ও পূর্বে বর্ধমানের একাংশে। তাঁরা "মল্লাবনীনাথ" নামে খ্যাতিলাভ করেন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের স্বাধীনতার কাহিনী, শৌর্যের ও বীর্যের কাহিনী। তাঁদের সংস্কৃতির আর কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতার কাহিনীও খ্যাতিলাভ করে। এই নৃপতিরা শাক্ত, শক্তির উপাসক, শিবের পূজক ও বীর্যে দুর্দম, দুর্ধর্ষ। গৌড়ে শকটারোহণে প্রেরিত হয় বৃন্দাবন থেকে মহামূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থ—তাদের মধ্যে আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থের সদ্য-সমাপ্ত অমূল্য পাণ্ডুলিপি। তার পুরোধা বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ। তাঁরা ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরের রাজার এলাকায়, মল্লভূমের গোপালপুর গ্রামে উপনীত হন। দস্যুরা অপহরণ করে সেই গ্রন্থগুলি। খবর পেয়ে মূর্ছিত হন কবিরাজ এবং মৃত্যুবরণ করেন। দস্যুদের হাতে নিগৃহীত হ'য়ে বৈষ্ণবাচার্যেরা বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হন। অতিবাহিত হয় কিছু দিন। শেষে একদিন শ্রীনিবাস রাজসভায় উপনীত হন। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হন রাজা বীরহাম্বীর। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা মল্লভূমের ইতিহাসে ঘটে। তাঁরা ফিরে পান অপহৃত গ্রন্থগুলি।

বীরহাম্বীর সিংহাসনে আরোহণ করেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। স্রষ্টা তিনি, নির্মাণ শুরু করেন মল্লেশ্বরের শিবের মন্দির কিন্তু অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে যান বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করায়। প্রবল পরাক্রান্ত তাঁর পুত্র রঘুনাথও মুর্শিদাবাদের নবাব কর্তৃক সিংহ উপাধিতে ভূষিত হন। প্রথম সিংহ হিসেবে বিষ্ণুপুরের রাজাদের মধ্যে ভূষিত। তিনি সমাপ্ত করেন মল্লেশ্বরের এই অসম্পূর্ণ মন্দিরটি। তিনিই বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেবালয়ের ও বাঁধের নির্মাতা। তারপরে এখানে রাজত্ব করেন একে একে রঘুনাথ-নন্দন বীরসিংহ ও তাঁর পুত্র দুর্জন সিংহ। তিনিই নির্মাণ করেন মদনমোহনের মহিমাময় মন্দিরটি, এটি সুন্দরতম মন্দির বিষ্ণুপুরের।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে গোপাল সিংহ অধিরোহণ করেন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে। তিনি প্রতিরোধ করেন মারাঠা বর্গী রঘুজী ভোঁস্‌লার সেনা-

রাসমঞ্চ ঃ ফটো ঃ শিবাণী চট্টোপাধ্যায়
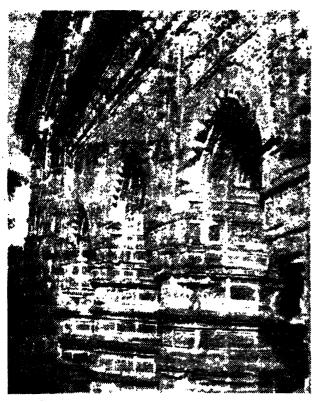
বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে পোড়া মাটির কাজ। ফটোঃ শিবাণী চট্টোপাধ্যায়

নায়ক দুর্ধর্ষ ভাস্কর পন্ডিতের আক্রমণ। তাঁর কাছে পরাজিত হয় মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁয়ের সৈন্যবাহিনী। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে গোপাল সিংহের মৃত্যু হয়, চৈতন্য সিংহ অধিরোহণ করেন বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে। মল্লভূমের শেষ স্বাধীন রাজা, তাঁর কাছে দামোদরের তীরে পরাজয় বরণ করে নবাব সিরাজের সৈন্য-বাহিনী। সিংহাসনের অধিকার নিয়ে চৈতন্য সিংহের গোপাল সিংহের অপর পৌত্র দামোদর সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনি সাহায্যপ্রার্থী হন মুর্শিদা-বাদের। নবাব মীর্জাফর আক্রমণ করেন বিষ্ণুপুর, গভীর রাত্রিতে অতর্কিতে। রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করেন চৈতন্য সিংহ সঙ্গে পরিবারবর্গ ও কুলদেবতা মদনমোহনকে নিয়ে। রক্ষাকর্তা তিনি বিষ্ণুপুরের, স্বহস্তে ধারণ করেন কামান "দলমাদল" ভাস্করের বিরুদ্ধে। প্রকম্পিত হয় সারা মল্লভূম তার গভীর গর্জনে। ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পলায়ন করেন ভাস্কর পন্ডিত। ভবিষ্যতেও একাধিকবার গর্জে ওঠে বিষ্ণুপুরের কামান, ওঠে ইংরাজের বিরুদ্ধেও।

চৈতন্য সিংহ মুর্শিদাবাদে উপনীত হন। ক্লাইভের অনুগ্রহে ফিরে পান বিষ্ণুপুরের রাজ্য ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু পান না মদনমোহন। তিনি সপ্ত-সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রীত হন গোকুল মিত্রের কাছে, প্রতিষ্ঠিত হন বাগবাজারে। দামোদর সিংহও স্থাপন করেন এক পৃথক রাজ্য জামকুঁড়িতে। এই উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিষ্ণুপুরাধিপতি বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে অশক্ত হলে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর ইংরেজের অধিকারে আসে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে আর অন্তর্দ্বন্দ্বে বিষ্ণুপুর রাজ্যের অবনতি উপনীত হয় চরমে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য সিংহের মৃত্যু হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রাজা মাধব সিংহ বাৎসরিক কর দিতে অসমর্থ হলে নীলামে বিক্রীত হয় বিষ্ণুপুর রাজ্য, বর্ধমানের রাজা ক্রয় করেন। এভাবে পরিসমাপ্তি হয় পশ্চিম-বঙ্গের এক স্বাধীন রাজ্যের মহা-গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের, এক পরাক্রম-শালী দুর্ধর্ষ নৃপতিদের, অবসিত হয় এক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকদের ইতিহাস।

পরের দিন ভোরে উঠে চা ও প্রচুর জলযোগ করে, গৃহস্বামীর পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে মন্দির দর্শনে বার হই। দুর্গের সামনে উপনীত হই। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখি এক অপরূপ কীর্তি বিষ্ণুপুরের রাজাদের। দেখি এক পিরামিডাকৃতি মঞ্চ, পাদদেশে সারি সারি বাংলার দোচালা আর চারচালা গৃহের অলংকরণ। পরিচিত রাসমঞ্চ নামে দুর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এই মঞ্চটি। দুর্গের ভিতরের মন্দিরগুলির প্রহরী হয়ে আছে।

রাসমঞ্চ দেখে আমরা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করি। মন্দির-নগরে পরিণত হ'য়ে আছে দুর্গটি, বুকে নিয়ে চারিটি দেউল ও আরও কত মন্দিরের সমষ্টি। সুন্দরতম এই মন্দিরগুলি, বিভিন্ন তাদের গঠনপদ্ধতিও, সুন্দর-তম অলংকরণযুক্ত তার মূর্তির সম্ভার। বাংলার মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির আর ভাস্করের মহিমাময় সৃষ্টি এবং অবিনশ্বর কীর্তি। বাংলার মন্দিরের গঠনপদ্ধতির ক্রমবিকাশের স্বাক্ষরও বটে। হাম্বীর-নন্দন রঘুনাথ সিংহই নির্মাণ করেন অধিকাংশ সুন্দরতম মন্দিরগুলি, বেশীর ভাগই বিষ্ণুমন্দির, তাদের গর্ভগৃহে বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্তি পূজিত হতো।

প্রথমে দেউলগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তারা বর্ধমান জেলার বরাকরের বেগুনিয়া দেউলের সমপর্যায়ে পড়ে না, বাঁকুড়ার বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরের দেউল সম্বন্ধেও একথা খাটে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বাংলার প্রসিদ্ধ পালনৃপতিদের দ্বারা নির্মিত এই মন্দিরের গঠনের মহিমময়ত্বে, অঙ্গের পর্যাপ্ত সুন্দরতম অলংকরণে, শিল্পসম্পদে আর মূর্তিসম্ভার স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলার এক লুপ্ত পদ্ধতির প্রতীক, সংযোজনে উড়িষ্যার বহুবিস্তৃত মহামহিমময় স্থাপত্যের সঙ্গে বাংলার, প্রতিফলন ভুবনেশ্বরের বহু শতাব্দীব্যাপী মন্দির-স্থাপত্যের, এক গোষ্ঠীভুক্তির সাক্ষী। এই সংযোজন ময়ূরভঞ্জে, কিচিং-এ সংযোজিত হয়। মহাশক্তিশালী ভঞ্জ রাজারা তা সাধন করেন। এর পরে শ্যাম-রায়ের মন্দিরে উপনীত হই। পঞ্চরত্ন এই মন্দিরটি, ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। বিষ্ণুমন্দিরের চারিটি চালা,

নির্মিত বাংলার চারচালা গৃহের অনুকরণে, তার শীর্ষের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহদাকৃতি শিখর ও চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্রতর আকৃতির অঙ্গশিখর। এই মন্দিরটির সর্বাঙ্গে পোড়ামাটির অপরূপ পর্যাপ্ত অলংকরণ আর মূর্তিসম্ভার। মূর্তি দিয়ে রচিত এই মন্দিরগাত্রে ভাগবত গীতার কত কাহিনী, মহাভারতের আর পুরাণের কত দৃশ্য, কত উৎসবের, কত সুখ-দুঃখের চিত্র আছে! তার অঙ্গের অলংকরণ দেখে স্তব্ধ হই, প্রণতি জানাই তার সৃষ্টিকর্তাকে। আবার মদনগোপালের মন্দিরে উপনীত হই। বিষ্ণুমন্দির এই মন্দিরটিও, পঞ্চরত্ন, নির্মিত হয় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে, পোড়ামাটির অলংকরণ এর অঙ্গে, কিন্তু শ্যামরায়ের মন্দিরের গঠনের সৌকুমার্যে আর অঙ্গের অলংকরণের ঐতিহ্যে সমপর্যায়ের নয়।

জোড়-বাংলাতে উপনীত হই। যুক্ত হয় পাশাপাশি দু'খানা বাংলার দোচালা ঘর, তার শীর্ষে একটিমাত্র শিখর বা চূড়া। দেখি এক বিশিষ্ট অভিনব সৃষ্টি বাংলার স্থপতির, তার নিজস্ব পরিকল্পনার অনবদ্য, সুষ্ঠু রূপদান। অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। ইষ্টক দিয়ে ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় এই মন্দিরটি, সর্বাঙ্গে পোড়ামাটির অলংকরণ, শিল্পসম্পদ আর মূর্তিসম্ভার--কত দৃশ্যকথা, কত কাহিনীর ইঙ্গিত রয়েছে। শ্রদ্ধা নিবেদন করি বাংলার মহা-অভিজ্ঞ স্থপতিকে।

জোড়-বাংলা দেখে আমরা লালজীর মন্দিরে উপস্থিত হই। বিষ্ণুমন্দির, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত, শীর্ষে একটি মাত্র শিখর, অঙ্গে প্রকৃষ্টতম অলংকরণ। তারপর একে একে রাধাশ্যাম, কালাচাঁদ ও মদনমোহনের মন্দির দেখি। এক বত্ন বা এক চূড়াবিশিষ্ট এই মন্দিরগুলিও বাংলার চারচালা গৃহের অনুকরণে গঠিত; তাদের ছাদের অঙ্গের বঙ্কিম রেখা সুস্পষ্ট। মহামহিমময় তাদের মধ্যে মদনমোহনের মন্দিরটি, সুন্দরতম মন্দির বিষ্ণুপুরের, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা দুর্জন সিংহ এটি নির্মাণ করেন। অপরূপ এই মন্দিরের অঙ্গের শিল্পসম্পদ আর অলংকরণ, অতুলনীয় এর গাত্রের পোড়ামাটির মূর্তিসম্ভার আর দৃশ্যের সমাবেশ। এর সমপর্যায়ে পড়ে শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরের আর জোড়-বাংলার মন্দিরের কারুকার্য, অঙ্গের শিল্পসম্পদের পর্যাপ্তে ও ঐতিহ্যে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি আর প্রণাম জানাই স্থপতি আর ভাস্করকে।

পরের দিন মল্লেশ্বরের মন্দির দেখতে যাই। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে বীর-হাম্বীর নির্মাণ শুরু করেন এই মন্দিরটির। তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেওয়ায় সম্পূর্ণ হয় না মন্দিরটির নির্মাণ, তাঁর পুত্র রঘুনাথ সিংহ, বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এই মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত করেন। এই মন্দিরটি প্রাচীনতম, চতুষ্কোণ তার একটি মাত্র চূড়া, বিষ্ণুপুরের অপর মন্দিরের থেকে স্থাপত্যে পৃথকতর এবং গঠনের গরিমায় আর অঙ্গের অলংকরণেও ভিন্ন ও অভিনব। দেবতার বাহন বৃষভের মূর্তিটি অপরূপ, একেবারে জীবন্ত, তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের নন্দীর ও মহীশূরের নন্দীর সঙ্গে এর প্রতিতুলনা করা যায়। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কৃষ্ণরায়ের অপরূপ মন্দিরটিও দেখে আসি। আরও কয়েক দিন বিষ্ণুপুরে অতিবাহিত করে কলিকাতায় ফিরে আসি। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও অম্লান হ'য়ে আছে মনের মন্দিরে।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় আসর

॥ বানান ॥

[উত্তর অন্যত্র আছে। উত্তর দেখার আগে নিজে উত্তর করুন। পরে মিলিয়ে দেখুন আপনার কটি উত্তর ঠিক হয়েছে। যদি আটটা ঠিক হয়, তাহলে বুঝতে হবে বাংলা বানানের উপর আপনার বেশ দখল আছে। পাঁচ থেকে সাত পর্যন্ত শুদ্ধ হলেও মন্দ নয়।]

১। 'ইতঃমধ্যে', 'ইতিমধ্যে', 'ইতোমধ্যে'—তিনটির মধ্যে কোন্‌টি শুদ্ধ?

২। **পৌরোপিতারা প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে কোনো-না-কোনো সভায় পৌরহিত্য করে থাকেন।**—যে কটি বানানে ভুল আছে সংশোধন করুন।

৩। 'রেনেসাঁস' না 'রেনেসাঁ'?

৪। 'শিবাজি' নামে কি কোনো ভুল আছে?

৫। **বহিস্কার, আবিস্কার, পুরস্কার, নমস্কার, অয়স্কান্ত, তিরস্কৃত, পরিস্কৃত, নিস্কলংক, শুস্ক, তস্কর।**—কোন্‌ কোন্‌ শব্দে, 'স্ক' স্থানে 'ষ্ক' হবে?

৬। 'পক্ব' না 'পক্ক'?

৭। মাছের 'আঁশ' না 'আঁষ'?

৮। 'অংগন' না 'অংগণ'?

৯। 'তেজেশ্চন্দ্র'—ভুল কোথায়?

১০। 'কালীদাস' না 'কালিদাস'? 'চণ্ডীদাস' না 'চণ্ডিদাস'?

দেশে বিদেশে

।। জল ।।

জল ও বায়ু এমন একটি জিনিস যে না হলেও মুস্কিল, অত্যধিক হলেও মুস্কিল। পানীয় জল চাই, নদীজলধারা চাই, জমিতে জল চাই। কিন্তু এই জল যদি প্রবল বর্ষার রূপে, বন্যার তোড়ে, প্লাবনের আকারে আসে তবে সর্বনাশ। এই সর্বনাশ এবার ঘটেছে কেরালায়, মাদ্রাজে, পুণায়। লোক মারা গেছে। ঘরবাড়ী ভেসে গেছে, সম্পত্তিনাশ হয়েছে। এসব ক্ষতির কবে পূরণ হবে কেউ আশ্বাস দিতে পারে না। তারপর সেই জলের জন্য পশ্চিমবাংলায় হাহাকার। কৃষিমন্ত্রী বলেন, আর এক সপ্তাহের মধ্যে বৃষ্টি না হলে আমন শস্যের অবস্থা কাহিল হবে, কেননা, ডি ভি সি'র কাছে যে জলের প্রত্যাশা ছিল তাও জুলাই মাসে পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে কিছু বিতর্ক চলছে। এমন সময় হ'ল জল এবং কলকাতা সহরে এক গলা জল। আগে সার্কুলার রোডে জল দাঁড়াত না এবার সেখানেও এক হাঁটু তো বটেই, তারও ওপর। জল দিল কলকাতা ভাসিয়ে। যারা বাইরে শোয়, বস্তিতে থাকে, একতলায় বাস করে তাদের দুর্দশার অবধি ছিল না। কলকাতা যানবাহন ছাড়া মোটে মহানগরীই নয়, সে যানবাহনেরও গতিপথ রুদ্ধ, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতের লোক আটক। কারণ? কারণ, পৌর প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি, এইকথাই সবাই বলছে। একটা হিসেব বেরিয়েছে যে, কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের যত শ্রমিক বা কর্মী ইউনিয়ন তার সব কর্মকর্তা হচ্ছেন কাউন্সিলারগণ। কাউন্সিলারগণই পৌর সভায় বলেন, কর্মীরা কোন কাজ করে না, ফাঁকি দেয় এবং দুর্নীতিপরায়ণ; আবার তাঁরাই শ্রমিক কর্মীদের "বিপদে-আপদে" তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে পৌর-কর্তৃপক্ষের সংগত রোষ থেকে তাদের রক্ষা করে চলেছেন। ফলে, কেউ আর কাজে বড় একটা গা করে না। কাজ হয় না, অকাজ হয় এবং ফলং—মায়ের নৌকায় আগমন। কলকাতায় এই নিবার্য দুঃখ ক্রমশ এমন স্তরে আনা হয়েছে যে কলকাতার প্লাবন রোধ করা যাবে না যদি কলকাতাকে একেবারে ঢেলে না সাজা যায়। নানা রকম কথা হচ্ছে, মেট্রোপলিটন সংস্থা, মাস্টার প্ল্যান, লবণ হ্রদ ইত্যাদি ইত্যাদি; আমেরিকা কিছু টাকাও এগিয়ে ধরেছে—কিন্তু দুর্ভোগ অবসানের সীমাটা ঝাপ্‌সা ঝাপসাও চোখে পড়ছে না।

।। মুখ্য ।।

দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে একটি মুখ্য কথা উঠেছে। বলা হয়েছে, যদি কেউ দেশের কোনো অংশাংশেরও ছেদের কথা বলেন তবে তা দণ্ডনীয় হবে। কথাটা এতদিনে উঠল এইটেই আশ্চর্য লাগে। ১৯৪৭ সাল থেকে হিসেব করলে অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু যাদের দণ্ড পাওয়া উচিত ছিল তারা কেউ দণ্ড পায়নি। উঁচু মহলেও এই সার্বভৌম জ্ঞানটি ছিল না, একথাও আজ স্পষ্ট করে বলা দরকার। পররাষ্ট্র বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যখনই আমাদের কোন কথাবার্তা, আপোষ-আলোচনা হয়েছে আমরা আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্বকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছি। না, বড় রকমের দেশ বিভাগের কথা বলা এখন অবান্তর। কিন্তু দেশ বিভাগের পরও আমরা শুধু দিয়ে এসেছি। সীমানা-বিরোধ হয়েছে, হুমকি শুনেছি, আমরা কিছু ভূদান করেছি। তালিকা দিতে চাই না; কাকে কাকে দিয়েছি তাদেরও নাম করতে চাই না। দেশের অঙ্গচ্ছেদের কথা বলা দণ্ডনীয় হচ্ছে এর চাইতে সুখের সংবাদ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বলাটাই কি বড়, না, করাটা বড়? বললে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে, অন্যায়কারী দণ্ড পাবে; কিন্তু কেউ যদি আপন পদ-মর্যাদার সুযোগ নিয়ে ভূদান করে বসে আইনে তাকে ধরা যাবে কেমন করে—বিশেষ আইন রচয়িতা ও আইনের রক্ষকই সে। এমন তো হয়েছে সার্বভৌম ক্ষুণ্ণ করে ভূদানের পর সংবিধানকে সংবিধান শুদ্ধ পাল্টাতে হয়েছে। তবু যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশদ্রোহীরা এই আইনের ভয়ে সংযত হয় খুবই আনন্দের কথা হবে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

॥ বার্লিন ॥

মহাকাশ পরিক্রমা হচ্ছে, পৃথিবী ১৭ বার প্রদক্ষিণ হ'ল কিন্তু জার্মানীর ওরফে বার্লিন সমস্যা অমীমাংসিত থেকে গেল। ওটা যেন কি একরকমের ক্ষত। কিছুতেই শুকোয় না, সারে না। ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ মস্কোয় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জার্মাণ-চুক্তি সম্পাদন এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, আর বিলম্ব সহ্য হয় না। তাঁদের মতে এই প্রশ্নটি জীইয়ে রাখার অর্থই যুদ্ধের আশংকাকে সতেজ রাখা। ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া। পূর্ব জার্মানীর নেতারাও বৈঠকে ছিলেন।

বৈঠকের নেতারা একথাও বলেছেন, বৎসর শেষ হওয়ার আগেই শান্তিচুক্তি হওয়া উচিত। অর্থাৎ এটা হওয়াই চাই, এই তাঁদের জোরালো মত। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গের বক্তব্যও সমান জোরালো এবং তাঁরাও শান্তি চান। উভয় পক্ষই যেখানে শান্তি চায় সেখানে লক্ষ্যটি বড় কথা নয়, বড় কথা পদ্ধতি। উভয়েই চায়, আপন আপন পদ্ধতিতে এই শান্তি হোক। উভয়েই শান্তির কথা বলছেন আবার হুমকিও দিচ্ছেন নরমে গরমে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ স্থির করেছেন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বার্লিন ও জার্মান সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপের প্রস্তাব করবেন। এ পর্যন্ত ভাল। কিন্তু খবরে আছে, শান্তি-পর্ব উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে বন-পর্বেরও উদ্যোগ করা হবে। এতো শান্তির কথা নয়। এ যেন সেই আমাদের অতি-পরিচিত কণ্ঠ লাঠি তুলে বলছে, অশান্তি হ'তে দেব না।

॥ আশ্চর্য ॥

নিউজিল্যাণ্ডের পর্বতারোহী পিটার ম্যালগ্রু হিমালয় পর্বত আরোহণকালে তুষারদষ্ট হন। তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনার পর পায়ের আঙুল ছেঁটে ফেলতে হয়। আরও কিছুদিন পর গ্যাংগ্রিন হচ্ছিল আশংকায় তাঁর দুটি পা-ই কেটে ফেলতে হয়। কিন্তু দুখানি পা হারিয়েও তাঁর মন নিবৃত্ত হয়নি। তাঁকে তো এবার কৃত্রিম পা নিতে হবে। আশ্চর্য কথা তা নয়। আশ্চর্য কথা, তিনি নাকি দেহের স্বাভাবিক পা হারানো সত্ত্বেও কৃত্রিম পায়েই পর্বত অভিযানে বেরোবেন স্যার এডমণ্ড হিলারীর সঙ্গেই। হিলারী ও ম্যালগ্রু দু'জনেরই দৃঢ় বিশ্বাস কৃত্রিম পায়েই তাঁর পক্ষে পর্বতারোহণ সম্ভব হবে।

এ যে সেই—পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। তাঁর কৃপায় নয়, গভীর আত্মবিশ্বাসে।

॥ ঘরে ॥

৪ঠা আগষ্ট—১৯শে শ্রাবণ ঃ বৎসরের ১৩৬৮ বাং) প্রবলতম বর্ষণে কলিকাতা মহানগরীর স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত—রাজপথে বুক-জল ও সমস্তরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ।

চতুর্থ শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি—পেন্সন ও গ্র্যাচুয়িটির হার অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীদের সমপর্যায়ে উন্নীত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত পে-কমিটির প্রতীক্ষিত রিপোর্ট সরকারী অর্থ-দপ্তরে পেশ।

৫ই আগষ্ট—২০শে শ্রাবণ ঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যাপারে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব—প্রশ্ন সম্পর্কে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ প্রতিনিধিদের আলোচনা।

১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ভোট গ্রহণের প্রশ্ন—২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ মধ্যে সময় নির্ধারণের জন্য রাজ্য সরকারের সুপারিশ।

স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের জন্য ২৪শে অক্টোবর (১৯৬১) 'দাবী দিবস' পালন—সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলনের সংসদ পরিষদের শিলং বৈঠকের সিদ্ধান্ত।

৬ই আগষ্ট—২১শে শ্রাবণ ঃ বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিপজ্জনক বলিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় বক্তৃতা।

'ভারত আক্রান্ত হইলে আমেরিকা সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিবে'—দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ চেস্টার বোলজের ঘোষণা।

৭ই আগষ্ট—২২শে শ্রাবণ ঃ পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশনের সূচনায় ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ—পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে ১১,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

'আপন সীমান্ত পরিবর্তনের জন্য ভারত চীনের সহিত কোন আলোচনা চালাইবে না,—চীনা দাবীর সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান—লোকসভায় সরকারের পক্ষ হইতে ভারত-চীন পত্রাবলী পেশ।

৮ই আগষ্ট—২৩শে শ্রাবণ ঃ দিল্লীতে নেহরু-চেস্টার বোলজ (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিণ সরকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) বৈঠক—বার্লিন সমেত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্ন আলোচনা।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে এযাবত এক লক্ষ ৬৬ হাজার একর জমি বন্টন—রাজ্য ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে বিবৃতি।

৯ই আগষ্ট—২৪শে শ্রাবণ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বেতন কমিটির (সরকার নিযুক্ত) রিপোর্টে মাগ্‌গী ভাতা মূলে বেতনের অন্তর্ভুক্ত—বিভিন্ন কর্মচারীর বেতন-বৈষম্য হ্রাসের সুপারিশ।

'প্রয়োজনবোধে দেশের সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা অসম্ভব নহে'—লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিবৃতি।

১০ই আগষ্ট—২৫শে শ্রাবণ ঃ রাষ্ট্রের (ভারত) কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করার দাবী দণ্ডনীয় অপরাধ—দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব।

শিখরাজ্য গঠনের জন্য বৃটিশ ও মুস্‌লিম লীগের সহিত ষড়যন্ত্র—লোকসভায় সরকার পক্ষ হইতে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্‌ঘাটন।

বেসরকারী কর্মচারীদের গ্র্যাচুয়িটির টাকার উপর আয়কর রেহাই— আয়কর সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় পেশ—গ্রন্থকার, নাট্যকার ও শিল্পীদেরও বিশেষ সুবিধাদানের সুপারিশ।

॥ বাইরে ॥

৪ঠা আগষ্ট—১৯শে শ্রাবণ ঃ পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন নোট—জার্মানীর সহিত সর্বসম্মত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের তাগিদ প্রকাশ।

৫ই আগষ্ট—২০ শে শ্রাবণ ঃ খান আব্দুল গফুর খানের (লাল কোর্তা নেতা) ১৩০ জন অনুগামী দণ্ডিত—পাক্ সামরিক আদালতের রায়—দণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করার আদেশ।

জার্মান সমস্যা সম্পর্কে প্যারিসে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মাণীর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের জরুরী বৈঠক।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের টিউনিসিয়া সফরের সিদ্ধান্ত—টিউনিসীয় প্রেসিডেন্ট হাবিব বোরগুইবার আমন্ত্রণ গ্রহণ।

রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি কাঠামোর আমূলে পরিবর্তন—বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের প্রথা চালু—ব্যক্তি-পূজা বিধির অবসান।

৬ই আগষ্ট—২১শে শ্রাবণ ঃ পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে রুশিয়ার দ্বিতীয়বার মনুষ্য প্রেরণ—ভোস্টক—২ যানযোগে ১৫৯·৭ মাইল ঊর্ধ্বে থাকিয়া মহাশূন্যচারী মেজর টিটফের মর্ত্যভূমি প্রদক্ষিণ (প্রতি ৮৮·৬ মিনিটে একবার)।

মস্কোয় ওয়ারশ চুক্তির সদস্য রাষ্ট্র-সমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠান—সত্বর জার্মান শান্তি চুক্তি সম্পাদনের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে মতৈক্য হওয়ার ঘোষণা।

৭ই আগষ্ট—২২শে শ্রাবণ ঃ সতেরবার ভূ-প্রদক্ষিণের পর সোভিয়েট দ্বিতীয় মহাকাশচারী মেজর টিটফের নিরাপদে অবতরণ—ভোস্টক-২ মহাশূন্যযানে ২৫ ঘন্টারও অধিক সময় মহাকাশে অবস্থান।

৮ই আগষ্ট—২৩শে শ্রাবণ ঃ হোয়াইট হাউসে (ওয়াশিংটন) মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) বৈঠক—বিভিন্ন বিষয়ে উভয় নেতার মধ্যে ৪৫ মিনিট আলোচনা।

'মহাশূন্য-যান (ভোস্টক-২) খুশিমত চালাইতে ও যেখানে ইচ্ছা নামাইতে পারিতাম'—সোভিয়েট সাংবাদিকদের নিকট মহাশূন্যে বিজয়ী মেজর টিটফের মহাকাশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা।

৯ই আগষ্ট—২৪শে শ্রাবণ ঃ বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের আগ্রহ—নিউইয়র্কে ফোর্ড ফাউন্ডেসানের (আলোচ্য ব্যাপারে সাহায্যকারী) প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহিত বৈঠক।

সোভিয়েট রাজধানীতে (মস্কো) মহাকাশ-বিজয়ী টিটফের বীরোচিত সম্বর্ধনা—অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে যুদ্ধবাজদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী।

১০ই আগষ্ট—২৫শে শ্রাবণ ঃ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সদস্যদের জন্য বৃটেনের আবেদন সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা।

'বার্লিন প্রশ্নের সমাধানে ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) নূতন কোন প্রস্তাব নাই'—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির মন্তব্য।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ অবসর-রঞ্জনী সাহিত্য ॥

আমাদের দেশে এককালে 'আষাঢ়ে গল্প' নামে এক রকমের খোস-গল্প প্রচলিত ছিল। সেই সব গল্প সাধারণতঃ বর্ষণ-মুখরিত সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে বসে, কিংবা আরো পরে বৈঠকখানায় গুড়গুড়ি টানতে টানতে বাবুরা শুনতেন, মন্তব্য করতেন। ঠনঠনের রাস্তায় এক কোমর জল, পথে ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত 'চাই বেল-ফুল', কিংবা 'টাটকা তপসে মাছ'।

সেদিন আর নেই, নেই সেই সন্ধ্যা-ক্লান্ত তালে চলা দিন, এখন শুধু সারা কলকাতাই ঠনঠনে হয়ে যায় একটু বৃষ্টিতেই কলকাতায় আছি না ভেনিসে আছি বোঝা যায় না। বেল ফুল কোনো কোনো পাড়ায় হয়ত পাওয়া যায়, তবে এখন রজনীগন্ধার ষ্টিকের যুগ, আর 'তপসে মাছ' হিমালয় পারে হয়ত অগস্ত্য যাত্রা করেছে। বৈঠকখানা অন্তর্হিত, সেইখানে হয়ত শাল রিপেয়ারিং সপ বা মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় পুত্র-কলত্র নিয়ে ছ' সাতজনের একমাত্র 'বেড-ড্রয়িং-কিচেন' কম্বাইনড্। সুতরাং অবসর বিনোদনের সময় কোথায়? স্থান কোথায়? চারদিকে এই জনারন্য, তার মাঝে আর অবসর কই! কোথায় অবকাশ?

কিন্তু অবসরেরও ত' প্রয়োজন আছে, এবং সেই অবসর যাপনের তৃষা কি শুধু তাস-পাশা, রাজনৈতিক কচ্‌কচি, কিংবা পরচর্চায় মেটে? যেটুকু অবসর পাওয়া যায় শহরের মানুষ তা সিনেমা, ফুটবল, ক্লাব, রেস্তোরাঁয় কাটান, ছুটির দিনে কলকাতা ময়দান, দক্ষিণেশ্বর, লেক ইত্যাদির ভিড়ও দেখবার মতো।

যাঁরা এই ভিড় এবং উন্মাদনা পছন্দ করেন না, যাঁদের আয়ু-সূর্য পশ্চিমে হেলেছে, যাঁরা গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয়, কিংবা গীতায় ব্রহ্মবাদ বা পরমাণুবাদ পড়ে ক্লান্ত হয়েছেন তাঁদেরই সবচেয়ে প্রয়োজন অবসর-রজনী সাহিত্য। সেই সাহিত্য : অ-লৌকিক (ভূতের) গল্প, অ-প্রাকৃত গল্প (Sur-realistic), আজগুবি গল্প (phantasy) কিংবা শিকার কাহিনী, জঙ্গলের দুঃসাহসিক অভিযান, নতুন দেশ বা গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কারের কাহিনী বা রহস্যঘন খুন-জখমের কাহিনী।

ভূতের গল্প য়ুরোপে এখন পরিপূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। সেখানে ভূত সম্প্রদায় বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীতে বিভক্ত! Banshee—আয়ার্লাণ্ডের ভূত, এ চাঁদের আলোয় মায়াকান্না কাঁদে, খানিকটা আমাদের দেশের আলেয়া-ভূতের সমগোত্রীয়। আলেয়া এবং নিশি-ডাকার সমন্বয় বলা যেতে পারে। Vampire রক্তপায়ী বাদুড়ের মত এই ভূত যাকে ধরে তার রক্ত চুষে খায় আমাদের রাক্ষস ভূতের মত।

Poltergeist ভূত অন্তরীক্ষ থেকে নানাবিধ দ্রব্য এমন কি ভারী ইঁট-পাথর পর্যন্ত ছোঁড়ে, Were wolf অর্ধ-নারীশ্বরের মত অর্ধ নর-বৃকেশ্বর বলা যায়—এই ভূতও অতিশয় শক্তিশালী। আমাদের দেশের মামুলী ভূত—ব্রহ্মদৈত্য, যখ, মামদো, পেত্নী, শাঁখচুন্নী, কন্ধকাটা প্রভৃতি।

এলগারনন ব্ল্যাকউডের—'রানিং উলফ্' বা ক্যাপটেন ম্যারিয়াটের 'ওয়ার উলফ্', জোসেফ কনরাদের—'বিকস অব দি ডলারস', লর্ড লিটনের 'দি হানটেড এণ্ড দি হন্টারস', ডব্লু. ডব্লু. জেকবসের 'মনকিংস প', রবার্ট লুই ষ্টীফেনসনের 'মার্কহিম', উইলিয়াম ম্যাকপিস্ থ্যাকারের—'দি ষ্টোরি অব মেরী এঞ্জেল', উইলকি কলিনসের 'এ টেরিবলি ষ্ট্রেঞ্জ বেড্', স্যার ওয়াল্টার স্কটের—'দি মিরর সাকীর 'লরা', এইচ. জি. ওয়েলসের 'দি ইনএকস্‌পিরিন্সেড গোষ্ট', এডগার এ্যালেন পোর—'বেরেনিস্', ওয়াল্টার 'ড লা মেয়ারের—'দি গার্ডেন' প্রভৃতি বিখ্যাত ভৌতিক গল্পগুলির সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত পাঠকের পরিচয় আছে।

এর মধ্যে আধুনিক এবং প্রাচীন ভূত আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ভূত কি যুগের সঙ্গে তাল ফেলে আকৃতি ও প্রকৃতি বদলায়—কাহিনী হিসাবে ওরা কালজয়ী, এক হিসাবে ধরতে গেলে অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়। সর্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, ঠিক ইচ্ছা হয়ে নয়, তবে কল্পনায় মানুষের মনের মাঝারে ভূত আছে এবং যতই কেন পৃথিবীর রঙ পালটিয়ে যাক, ভূতহীন সমাজ কোনোদিনই কেউ গড়তে পারবে না। তবে একথা সত্যি, ভূত আমাদের চাইতেও আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন, তাই তারা কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। তাদের বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত হচ্ছে, আমাদের নার্ভের ওপর তাদের অলক্ষ্য প্রভাব বড় কম নয়, তারা ক্ষেত্র, চরিত্র, আঙ্গিক বদলালেও আসলে তারা সেই ভূত, হেস্টিংসের আমলেও যেমন সত্য আজো তেমনই সত্য হয়ে বিরাজিত। তাই ওদেশে আজো ক্রীসমাসের শীতের রাতের একটি প্রধান অঙ্গ Ghost Story, এই সময় ভূতের গল্পের চাহিদা বাড়ে, পুরাতন গ্রন্থের নতুন সংস্করণ হয়, নয়া জমানার ভূত সম্পর্কিত নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ছেলে, বুড়ো, জ্ঞানী, অর্ধজ্ঞানী সবাই আনন্দ করে পড়ে। ভূতের গল্প নিয়ে কোনোরকম শুচিবাই নেই ওদের সমাজে।

আমাদের সমাজে ভূত সম্প্রদায়ের এমন দুর্দিন ঘটল কেন? বৈদিক যুগ থেকে এদেশের সাহিত্যে 'ভূত' আমাদের নানাবিধ নীতিকথা শুনিয়ে এসেছে, আসলে আমাদের অধিকাংশ নীতিশাস্ত্র ভূত প্রমুখাৎ প্রাপ্ত। ভোজরাজার উদ্যানবাটিকায় পাণিনি-রসিক ব্রহ্মদৈত্য শেষ পর্যন্ত কালিদাসকে প্রশ্ন করেন 'স্ত্রী-পুংবচ্চ' এবং কালিদাস তা পূরণ করেন—'প্রভবতি যদা তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্'। (অর্থাৎ যে-সংসারে স্ত্রীলোক পুরুষ-সদৃশ মাতব্বরি করে সেই সংসার বিনষ্ট হয়) এই উত্তর শুনে সেই যে পাণিনি-রসিক পালালেন তাঁর আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। মানুষের মত ভূতরাও কেউ কেউ অতি-রসিক, কেউ অতি বে-রসিক এবং স্থানে অস্থানে নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রচারে দ্বিধা বোধ করেন না—যথা এই পাণিনি ভূত।

আমাদের নানা গল্প, রূপকথা, উপকথায় যে সব ভূতের দেখা মেলে তারা অতিশয় ভদ্র, মার্জিত এবং সৎস্বভাব-সম্পন্ন। সাধারণতঃ এদের আজ ডাকা হয়েছে শিশুদের মনোরঞ্জনে, তাই এরা অতিশয় শান্ত-শিষ্ট, এতটুকু ভয়ংকরত্ব এদের মধ্যে নেই। শিশুমহলে আজো ভূত অপাঙক্তেয় নয়, নতুন পোশাকে সেই সমাজে পুরাতন ভূতদের আজো আসা-যাওয়া আছে। 'পানতো ভূতের জানতো ছানা'দের দেখার জন্য ছোটদের যদি আগ্রহ না থাকে তাহলে সে ছোটই নয়।

রবীন্দ্রনাথ ভূতের গল্প ভালো বলতে পারতেন এবং লিখতে যে পারতেন তার প্রমাণ 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'কঙ্কাল', 'মাস্টার মশায়'।

'উড্ল্যান্ডসে' (আজ বেলভেডিয়ারের অপর পার্শ্বে সে উড্ল্যান্ডস আর নেই) মহারাণী কুচবিহারকে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে বানিয়ে যে ভূতের গল্প বলেছেন তা শুনে কুচবিহারের মহারাণী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছেন—"হ্যাঁ রবিবাবু, সত্য নাকি!'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেছেন—'না মোটেই সত্যি নয়, গল্প করেছি মাত্র।'

রবীন্দ্রনাথ রচিত ভৌতিক গল্প বা তাঁর ভৌতিক গল্পের বর্ণনাভঙ্গী লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ভূতের গল্পের প্রচলন এবং সমাদর ছিল।

রবীন্দ্রনাথের পর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অতি-প্রাকৃত রচনার যাদুকর হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গী, অন্তর্নিহিত শ্লেষ, এবং উদ্ভট কল্পনা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। ভূত, প্রেত, দৈত্য দানা তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রী হলেও নিছক ভূতের গল্প তিনি লেখেননি। তাঁর 'কঙ্কাবতী' কাহিনী বাংলাদেশের এক প্রচলিত জনপ্রবাদ অবলম্বনে রচিত। এই অতি-প্রাকৃত কাহিনীর আঙ্গিক এবং বর্ণনাভঙ্গী ত্রৈলোক্যনাথের নিজস্ব। তাঁর 'পূজোর ভূত' গল্পটি অবিস্মরণীয়।

অবনীন্দ্রনাথের **'পথে** বিপথে'র 'মোহিনী' গল্পটি একটি চমৎকার ভূতের গল্প, অবনীন্দ্রনাথেরও অতি-প্রাকৃত জগৎসৃষ্টির এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থের ১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠায় অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"**বুড়ি বললে—কোথায় যাচ্ছ? বললুম—চক্রতীর্থে। ভাবলুম চক্রতীর্থে পেণছতে পারলেই এখন যথেষ্ট। বুড়ি বললে—তা যেদিকে যাচ্ছ সেদিকে সমুদ্র। আমার সঙ্গে এস, আমি যাচ্ছি চক্রতীর্থে। বুড়ির সঙ্গে চক্রতীর্থে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নয়তো সারারাত সেদিন ঘুরে বেড়ালেও কিছু খ'জে পেতুম না।' ভূত-পত্রী'তে আছে এই বর্ণনা।** ×× **একদিন রওনা হলুম কোনারকে, চার-খানা পাল্কিতে লাঠি লণ্ঠন লোকজন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সব সঙ্গে নিয়ে। 'পথে বিপথে' বইয়ে আছে এই বর্ণনা।** ×× **এমন সময় দেখি, একটা লোক, এক হাতে লাঠি, এক হাতে লণ্ঠন, চলেছে আমার পাল্কির খোলা দরজার পাশে পাশে।**

বলি 'ও বেহারা, এ কে রে?'

'অঃ বাবু, ওদিকে দেখো না, ওসব দেউতা আছে।' বলে ওদিকের দরজা বন্ধ করে দিলে।

দেউতা বলে ওরা ভূতকে। বলি 'ওকি লণ্ঠন হাতে দেউতা কিরে।'

খানিক বাদে দেখি ঘোড়ায় চড়ে একটা সাহেব টুপি মাথায় পাশ কাটিয়ে গেল।

বাবু তুমি শুয়ে পড় বলে শুধু বেহারারা।

শুনেছিলুম কোন্ এক মিলিটারিকে ওখানে মেরে ফেলেছিল, ভূত হয়ে সে ঘোরে, অনেকেই দেখে।

রাত্তির বেলা লণ্ঠন হাতে লোকটাকে দেখে আমার বরং ভালোই লেগেছিল।"

অবনীন্দ্রনাথ অন্যত্র এমন অনেক কথা বলেছেন। ভূত এবং অদ্ভুত ধরনের এই রকম অনেক কিছু দেখেছেন অবনীন্দ্রনাথ, যার পরিচয় **'ভূতপত্রী'** এবং **'পথে** বিপথে'। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কারাহীনের কাহিনী'ও চমৎকার ভূতের গল্পের বই, আজকাল বোধহয় পাওয়া যায় না। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'আহুতি' গল্পটি আর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এই গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত। শরৎচন্দ্র ঠিক ভূতের গল্প না লিখলেও ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয় এবং মজলিসে চমৎকার ভূতের গল্প বলতেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি ভূতের গল্প লিখেছেন, আর মণীন্দ্রলাল বসুর 'রেবতী' উল্লেখ-

যোগ্য ভূতের গল্প। হেমেন্দ্রকুমার রায় যে ভূতের গল্প লিখেছেন তা বড় এবং ছোট উভয় দলের উপযোগী। তাঁর বিখ্যাত কাহিনী 'যখের ধনে'র মূল বিদেশী হলেও, অনুসরণে তিনি তাকে নতুন করে গড়েছেন। প্রভাতকুমারের 'রসময়ীর রসিকতা'তে ভৌতিক আমেজ আছে।

'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় ভূতের গল্প মজলিসে সুন্দর বলতে পারেন এবং তাঁর কয়েকটি ভূতের গল্পের নমুনা আছে তাঁর 'বিচিত্র কাহিনী' গ্রন্থ দুটিতে।

শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির কয়েকটি গল্পে ভৌতিক পরিবেশ এবং কাহিনী সুন্দর ফুটেছে।

তবু এই দিকটি ইদানীং অবহেলিত। মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিতে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চমৎকার ভূতের গল্প এবং অতি-প্রাকৃত গল্প রচনা করা যায় তার নমুনা অন্য দেশের অতি-আধুনিক রচনায় প্রচুর পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অবসর-রঞ্জনের জন্য এই সাহিত্য আজ উপেক্ষিত। কল্পিত এই প্রেত-লোকে আছে অজানার আতঙ্ক, অপরিচিত জাগতিক পরিবেশে পরিচিত মানুষের কাহিনী, সেই বাসনা-কামনাজর্জর ব্যথা ও বেদনা। তবে কেন তা উপেক্ষিত হবে। শুধু রোমান্স-ধর্মী বলে?

বিখ্যাত ভৌতিক কাহিনী লেখিকা এলিজাবেথ বাওয়েন লিখেছেন :—

Fiction is the ideal placing-ground for the ghost—"apparitions," when they occur in real life, are apt to seem to lack meaning, or lack wholeness. About a ghost one longs to be told more—and of that, research often falls short: that, the imagination must supply.—"

বাংলা ভাষায় 'Trader Horn' কিংবা 'King Solomones Mines' বা 'She' জাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়নি। 'রূপকুন্ডের কাহিনী', 'হিমালয়ের আজব মানুষ' নিয়ে কি কাহিনী লেখা সম্ভব নয়? জঙ্গল এবং এ্যাডভেঞ্চারের গল্প যা কিছু রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই বিদেশী কাহিনীর অনুসরণে। সে যুগের পাঁচকড়ি দে, দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির পরে বর্তমানে বাংলা রহস্য কাহিনী অর্থাৎ থ্রিলার বা মিসট্রি রচনায় সিদ্ধহস্ত নীহাররঞ্জন গুপ্ত ছেলে বুড়ো দুই দলের জনাই 'কালো-ভ্রমর' বা 'কিরীটি রায়ের কাহিনী' লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। রহস্যঘন খুন, জখম, রাহাজানির কাহিনী অবসর-রঞ্জনের এক অপূর্ব খোরাক। নিদ্রাহারা রাতে, ট্রেন ভ্রমণের সময়, কিংবা অতিশয় মানসিক উদ্বেগের সময় "থ্রিলার' এক আশ্চর্য মলমের কাজ করে। আমাদের দেশের থ্রিলার জগতে কোনান ডয়েল কি এলেরী কুইনের আজো দেখা পাওয়া যায়নি।

গুরুভার সাহিত্যের মত, লঘু সাহিত্যও যে প্রয়োজনীয় এবং জনপ্রিয় একথা চিন্তা করা প্রয়োজন। ভূতকে নির্বাসিত করে সাহিত্য ক্ষেত্রের কাঁধ থেকে অপদেবতা নেমে যাবেন একথা মনে করা ভুল, তেমনই ভুল হবে বিস্ময়কর সাহিত্য হিসাবে রহস্যঘন খুন-জখম-রাহাজানির বুদ্ধিপ্রধান জটিল কাহিনীকে অবজ্ঞা করা।

নতুন বই

দূর কিনারে— শ্রীবাদল। দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম, ২২।১, কর্ণ-ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫-০০।

বর্ধমান জেলার সোনা পলাশী গ্রামের একটি কাহিনী অবলম্বন করে বর্তমান উপন্যাসখানি রচিত। লেখকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি গ্রামীণ পরিবেশকে অনেকখানি স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করেছে কাহিনীর মধ্যে। কাহিনীর নায়ক ফটিক চাষী—সুশ্রী, সুঠাম, স্বল্পবয়স্ক যুবক; নায়িকা কেষ্টকলি যুবতী ও জাত-বোষ্টমী। এই দুটি মুখ্য চরিত্র ব্যতীত আরও কতকগুলি গৌণ চরিত্র আছে, যেমন চন্ডী বোষ্টমী, তঙ্ক চাষী, পানুদা, সেজদা ও আরও অনেক।

লেখকের প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি চাষীদের চলতি ভাষা অনেকটা আয়ত্ত করেছেন; তাদের জীবন-যাত্রা ও সমস্যার সঙ্গেও তিনি পরিচিত। গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আক-র্ষণ তাঁর লেখনীতে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে তিনি পলাশীর বিশেষ উৎসব গাজনের কথা বলেছেন, সন্ন্যাসীদের মড়ার মাথা নিয়ে উন্মত্ত নৃত্য, গ্রামের নিজস্ব শিল্প সন্ন্যাসীর মালা রচনা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি পাল-পার্বন উৎসবের কথা এমনই রসো-ত্তীর্ণ করে তুলেছেন যে, মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে। আমাদের মন চলে যায় সেই পুরাতন গ্রাম্য জীবনের হাসি-কান্নার মধ্যে, হৃদয়ে একটা অপূর্ব সাড়া জাগে—আমরা অল্পবিস্তর রোমান্টিক হয়ে উঠি। কেষ্টকলির আত্মসমর্পণ, চন্ডীর নিকষ প্রেম, ফটিকের বিহ্বলতা, ঘন-দুর্যোগের রুদ্ধশ্বাস, পাঠককে কিছু-ক্ষণের জন্য অভিভূত করে তোলে। মুদ্রণ, বাঁধাই ও কাগজ আভিজাত্যের পরি-চায়ক এবং বহিরাবরণ তৃপ্তিদায়ক।

মোনালিসা—মূল লেখক : আলেক-জান্ডার লারনেট-হলনিয়া, অনু-বাদ : বাণী রায়। প্রকাশক : রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

জার্মাণ লেখক আলেকজান্ডার লার-নেট হরনিয়া বিংশ শতাব্দীর জার্মাণ সাহিত্যে একটি সুপরিচিত নাম। নাটক, কবিতা এবং উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর রচনায় শ্লেষ ও তির্যক উক্তির ঝোঁক দেখা যায়। 'মোনালিসা' নামক যে উপন্যাসটি বিখ্যাত বাঙালী মহিলা লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায় অনুবাদ

করেছেন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা পাইকা অক্ষরে মাত্র একষট্টি, সুতরাং বড় গল্পও বলা চলে। বাণী রায় কবি, প্রবন্ধকার এবং গল্পলেখিকা হিসাবে খ্যাতি ও পুরস্কার অর্জন করেছেন। এই তাঁর প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ এবং সম্ভবতঃ মূল জার্মাণ থেকে নয়, ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ এই 'মোনালিসা'। স্বচ্ছন্দ এবং সহজ ভঙ্গীতেই লেখিকা অনুবাদ করেছেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২—১৫১৯) অঙ্কিত মোনালিসা চিত্রটি ল্যুভর চিত্রশালায় সংরক্ষিত। এই ছবিটি পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধতম চিত্র, নারী-মূর্তির বিস্ময়কর হাসির মধ্যে চিরন্তনী নারীর দুর্জ্ঞেয় মনোভঙ্গীর প্রকাশ আছে। হেনরিয়েটা মারিয়ার রক্ষী হিসাবে প্রথম চার্লস যখন ডিউক অব বাকিংহামকে ফ্রান্সে পাঠান তখন সেই মহামতি ডিউক এই ছবিটির প্রেমে পড়েছিলেন। ফ্লোরেন্সের পদস্থ কর্মচারী ফ্রানসেসকো ডেল জকন্দের তৃতীয়া স্ত্রী মোনালিসা (La Joconde) বা লা জকন্দের এই ছবি আঁকার সময় দা ভিঞ্চি নাকি মডেলের মুখের হাসি বজায় রাখার জন্য বাজনাদার ভাড়া করে রেখেছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই ছবিটা চুরি যায় ও দু বছর পরে পাওয়া যায়। এই বিচিত্র চিত্র-কাহিনীই লারনেট-হরনিয়ার ক্ষুদ্র উপন্যাসের উপজীব্য। ভূমিকাটি সুলিখিত। ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর এবং সুরুচিসঙ্গত।

দেখা (প্রবন্ধ)—**অন্নদাশঙ্কর রায়। এম, সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।**

বর্তমান বাংলার চিন্তানায়কদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর অন্যতম। তাঁর গল্প, উপন্যাস যেমন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মর্যাদা ও স্বীকৃতিলাভ করেছে, তাঁর প্রবন্ধাবলীও তেমনই মূল্যবান। তার কারণ তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট তীক্ষ্ম এবং আধুনিক। গোঁড়ামি বা সংস্কারে আচ্ছন্ন নয় বলেই তাঁর প্রবন্ধ সমাজে সমাদৃত। 'দেখা' অন্নদাশঙ্করের সাম্প্রতিক প্রবন্ধ সংকলন, কুড়িটি প্রবন্ধ এই সংকলন গ্রন্থে আছে। প্রবন্ধগুলি দুই জাতের কিছু রাজনীতিক কিছু সাহিত্যিক। 'সাহিত্যিকের দায়িত্ব', 'স্বাধীনতার এক যুগ পরে', 'সূর্য-গ্রহণ', 'গণতন্ত্র প্রসঙ্গে', 'বাঙালীর ক্ষুধা', 'অপক্ষপাত', 'ড্রাগনের দাঁত' 'ঐক্যের সাধনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন সমস্যাবলী নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। সাহিত্যিকের দায়িত্ব প্রবন্ধে লেখক বলেছেন—"সাহিত্যিকদের ওপর রাজা-রাজড়াদের দৃষ্টিপাত হয় কখন? যখন প্রচারকার্যের প্রয়োজন হয়। আর প্রজা সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় কখন? যখন মনোরঞ্জন করা হয়। প্রোপাগান্ডা আর এনটারটেনমেন্ট-এর কোনোটাই সর্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক নয়। এতে সাহিত্যিকের উচ্চতা বাড়ে না। মানুষেরও ইজ্জত বাড়ে না। সব দেশেই সাহিত্যিকের স্থান পিছনের সারিতে। কী রাজসভায়, কী প্রজা-পরিষদে।" এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে কত সংক্ষেপ, কত জটিল সমস্যা সম্পর্কে লেখক তার নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। 'ড্রাগনের দাঁত' সম্পর্কে অনেক মতভেদ, কিন্তু লেখক যেখানে নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে যা সত্য বলে মনে করেন তাকে আঁকড়ে থাকেন সেখানে তাঁকে সাধুবাদ জানানোই রীতি।

'উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,' 'রাজশেখর বসু,' 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী,' 'আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন,' 'ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী,' 'রামানন্দ স্মরণে' প্রভৃতি চরিত্র-চিত্রণগুলি চমৎকার হয়েছে, বিশেষ করে এই মানুষগুলি যাঁদের পরিচিত তাঁদের কাছে এই সংক্ষিপ্ত অথচ বলিষ্ঠ আঁচড়ে আঁকা রেখাচিত্র ভালো লাগবে।

প্রচ্ছদচিত্র এবং ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

বিদেশী ভারত-সাধক—সৌমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·৫০।

উইলিয়াম জোন্স, চার্লস উইলকিন্স, উইলিয়ম কেরী, কোলব্রুক, আলেকজান্ডার সোমা, ফেলিক্স কেরী, জেমস প্রিন্সেপ, জোশুয়া মার্সম্যান ও মণিয়ার উইলিয়াম নামগুলি বিদেশী। স্বদেশীয় সাধারণ জন এই বিদেশীয় সকলজনকে চেনেন না। কিছু বিদগ্ধজনের হয়ত এঁদের সঙ্গে পরিচয় আছে। সে পরিচয় ঐতিহাসিক পরিচয়। বিস্তৃতকালের ভারতবর্ষে এঁদের অনেকেই এসেছিলেন হয় তৎকালীন রাজ-সরকারের কর্মোপলক্ষ্যে অথবা ধর্মপ্রচারক হিসাবে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের দেশ থেকেই প্রাচ্যদেশ তথা বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু তথ্য-সংগ্রহ ও গবেষণা করেছিলেন। অযত্নরক্ষিত, অবহেলিত, বিস্তৃত ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল্যবান ঐশ্বর্যসকল এঁদের মধ্যে অনেকেই পুনরুদ্ধারে প্রভূত সাহায্য করেন। সে কারণ, 'ভারত-সাধক' নামে এঁরা ভূষিত হয়েছেন। শব্দগত অর্থ হিসাবে নামটি স্বল্প পরিমাণ অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট হলেও, তাঁরা যে 'ভারত-বন্ধু' ছিলেন এবং নিজেদের জাতীয় প্রয়োজনেই হোক অথবা স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও কৌতূহল নিরসনের জন্যই হোক, ভারতের কল্যাণসাধন করেছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই জন্যই তাঁর 'Letters on Hinduism'এর মধ্যে লিখেছিলেন 'The researches of European Scholars have converted what was once unintelligible nonsense to a subject of accurate scientific study.'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের নবজাগরণের পশ্চাতে এই বিদেশীয়দের কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এসিয়া-

টিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠায়, বিলাতে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার ব্যাপারে, সংস্কৃত ভাষার প্রচারে, শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপনে, মুদ্রা প্রস্তুতের ব্যাপারে, ধর্মস্থাপন প্রভৃতি কর্মে এ'রা প্রত্যেকেই যে উদারতা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না।

বসু মহাশয়ের লেখার হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গীতে চরিত্রগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহু প্রাসঙ্গিক ঘটনার সংমিশ্রণে বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জীবন-কথা অত্যন্ত সুখপাঠ্য হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তিরাও এথেকে আনন্দলাভ করবেন। পরিশিষ্টের চিঠিপত্রগুলিও এই গ্রন্থের অন্যতম বিশিষ্ট অংশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

একাঙ্ক সঞ্চয়ন—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা—৯। দাম আট টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রমেন লাহিড়ী পর্যন্ত কুড়িজন প্রবীণ এবং নবীন লেখকের একাঙ্ক নাটিকার সঞ্চয়ন করেছেন দু'জন নাট্যরসিক এবং বিদগ্ধ সমালোচক। সম্পাদকদ্বয় নাট্য-সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক এবং নাটক-বিচারে এবং নাট্য-আন্দোলনের সহায়তায় এ'দের উৎসাহ এবং নিষ্ঠা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই আলোচ্য একাঙ্ক নাট্য সঞ্চয়নটি একটি সার্থক সংকলন হয়েছে। প্রথমেই ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য 'একাঙ্ক নাটিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আর ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বাংলা একাঙ্ক নাটকের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সেই সঙ্গে সংকলনবদ্ধ নাটিকাগুলির পরিচয়ও দিয়েছেন। শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়, অচিন্ত্যকুমার দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, কিরণ মৈত্র এবং রমেন লাহিড়ীর একাঙ্ক নাটিকাবলী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় সৃষ্টি এবং সংকলনযোগ্য।

দেশ দেশান্তে— নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। সত্যব্রত লাইব্রেরী। ১৯৭, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ছ'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নব্য তুর্কী ও সভ্য গ্রীস—কুমারেশ ঘোষ। গ্রন্থগৃহ। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দুই টাকা।

'দেশ দেশান্তে' গ্রন্থের লেখক নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য একজন কুশলী শিল্পী। তিনি জাতীয় ললিত কলা আকাদেমীর সাধারণ সভার নির্বাচিত সদস্য এবং শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের লেখক; ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আর চারজন শিল্পীর সঙ্গে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী পরিচালনার জন্য চিত্র ও ভাস্কর্যের সংগ্রহ নিয়ে কাবুল ও তাসকেন্ট হয়ে মস্কো যান। মস্কো, কিয়েভ এবং লেনিনগ্রাদে চিত্র প্রদর্শনীর পর পোলিস সরকারের নিমন্ত্রণে তাঁরা ওয়ারশ ও কাকাও শহরে চিত্র-প্রদর্শন করেন তারপর পশ্চিম জার্মানীর কলোনে। তারপর প্রদর্শনী শেষ হলে তাঁরা হল্যাণ্ড, প্যারী এবং লণ্ডন হয়ে সমুদ্রপথে স্বদেশে ফিরেছেন। 'দেশ দেশান্তে' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য সেই পর্যটনের ইতিহাস লিখেছেন। রাশিয়ায় আড়াই মাস এবং পোলাণ্ডে এক মাস অবস্থানকালে যেসব ঘটনা লেখকের চোখে পড়েছে 'দেশ দেশান্তে' তারই খুঁটিনাটি বিবরণ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক বলেছেন, 'আমি সাহিত্য-সাধক নই' 'এ আমার অনধিকার চর্চা'—কিন্তু 'দেশ দেশান্তে'র আঙ্গিক, বর্ণনাভঙ্গী, অনাড়ম্বর সহজবোধ্য সরল ভাষা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। চোখ এবং কান উন্মুক্ত রেখে ভ্রমণের সকল চিহ্নই তাঁর রচনায় পরিস্ফুট।

শ্রীযুক্ত কুমারেশ ঘোষ সরস সাহিত্য লেখক হিসাবে সুপরিচিত। 'নব্য তুর্কী ও সভ্য গ্রীস' তাঁর সাম্প্রতিক বিদেশ-ভ্রমণের বিবরণ। এই দুটি দেশকে অতিক্রম করে তিনি বিদেশ ভ্রমণে যান, নব্য তুর্কী ও সভ্য গ্রীসের রাজনৈতিক দিকটি বাদ দিয়ে লেখক তাদের ঘরোয়া কাহিনী এবং এই দুই দেশে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা অতি সরসভাবে বর্ণনা করেছেন। কুমারেশবাবুর 'দৃষ্টিভঙ্গী' মানবিক তাই এই দুটি দেশের সাধারণ মানুষের কথা তাঁর বর্ণনার গুণে অতিশয় সুখপাঠ্য হয়েছে। ডায়েরীধর্মী এই রচনা ভ্রমণ-সাহিত্য পাঠে আগ্রহান্বিত পাঠকের কৌতূহল তৃপ্ত করবে সন্দেহ নেই।

উভয় গ্রন্থের ছাপা এবং প্রচ্ছদ সুন্দর।

শততম রজনীর অভিনয়—রমেন লাহিড়ী। আড়াই টাকা।

অণুবীক্ষণ—রমেন লাহিড়ী। তিন টাকা। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। কলিকাতা-৯।

দুর্বল বঙ্গ-নাট্য-সাহিত্যে ইদানীং কয়েক বছর হোলো যেন একটা প্রাণ-স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে। নাট্য-আন্দোলনের ধারা আজ নানা খাতে প্রবাহিত। পেশাদারী মঞ্চকেও সে প্লাবিত করেছে। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তার প্রেরণা কিছুটা কাজ করছে, এবং কিছু নূতন নাটকের আবির্ভাব ঘটছে। অবশ্য একথা [illegible] পরিমাণের অনুপাতে উৎকর্ষ [illegible] ঘটেনি। আবার একথাও সত্য যে, সাধারণভাবে বাংলা নাট্য-রচনার মান আগের থেকে উন্নত।

রমেন লাহিড়ী একজন তরুণ নাট্যকার। ইতিপূর্বে তাঁর আরো দু'একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য নাটক

দুটির মধ্যে 'শততম রজনীর অভিনয়' পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং 'অণুবীক্ষণ' চারটি একাঙ্কের সংকলন। 'শততম রজনীর অভিনয়'-এর বিষয়বস্তু মামুলী—ত্রিকোণ প্রেম। গভীরতাও স্বল্প। তবে উপস্থাপন-রীতিতে মুন্সীয়ানা আছে। নাটকের পাত্রপাত্রীরা থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী। তাদের নেপথ্য-জীবনের একটি প্রেম-সমস্যাকে একটি নাটক-অভিনয়ের মধ্যে মিশিয়ে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। তিনটি সাজঘরের দৃশ্য ও তিনটি মঞ্চাভিনয়ের দৃশ্য একান্তরভাবে উপস্থাপিত। দুই জগৎ—সাজঘরের বাস্তব জগৎ ও মঞ্চের অভিনয়ের মায়া-জগৎ—এর সংযোগও আছে। কিন্তু চরিত্রের ভিড়ে আসল [illegible] প্রেম-সমস্যা তীক্ষ্ণ হয়ে [illegible] পারেনি। আর পরিণতিও অত্যন্ত [illegible]টিক।

শব্দকল্পদ্রুম

॥ বানানের উত্তর ॥

১। সংস্কৃত দুটি শব্দ ইতঃ এবং মধ্যে সন্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে 'ইতোমধ্যে' হয়েছে। বাংলায় এককালে 'ইতোমধ্যে' খুব চলত। এখনও সংস্কৃতবহুল সাধু-ভাষায় 'ইতোমধ্যে' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'ইতিমধ্যে' অশুদ্ধ হলেও অতি প্রচলিত।

২। শুদ্ধ বানান : পৌরপিতা, অপরাহ্ণ, পৌরোহিত্য।

৩। ফরাসী শব্দ : Renaissance—উচ্চারণ 'রেনেসাঁস্'। মনে রাখতে হবে ফরাসী ভাষার সকল শব্দের শেষ ব্যঞ্জনই অনুচ্চারিত থাকে না।

৪। 'শিবা-জি' নয় 'শিব-জি'। ইংরেজী Shivaji-কে আমরা ভুল করে শিবাজি পড়ি, তারপর ভুল করে শিবাজি লিখি। এখন ভুল এতদূর চলে গেছে যে একে সংশোধন করা বোধ হয় সম্ভব হবে না।

৫। বহিষ্কার, আবিষ্কার, পরিষ্কৃত, নিষ্কলঙ্ক, শুষ্ক। অন্য শব্দগুলির বানান শুদ্ধই আছে।

ক খ প ফ পরে থাকলে ইকার বা উকারের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়। যেমন, বহিঃ+কার=বহিষ্কার। নিঃ+কলঙ্ক=নিষ্কলঙ্ক।

৬। পঙ্ক।

৭। আঁশ। অংশু থেকে। আমিষ থেকে আঁষ। যেমন, আঁষ-হাঁড়ি।

৮। অঙ্গন। কিন্তু প্রাঙ্গণ।

৯। তেজশ্চন্দ্র হওয়া উচিত। তেজস্+চন্দ্র=তেজশ্চন্দ্র।

১০। কালিদাস। চণ্ডীদাস।

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের অধিকাংশ নাটক কি বিষয়বস্তুতে, কি ঘটনা-বিন্যাসে, কি চরিত্রচিত্রণে কি গঠন-পারিপাট্যে আজও মধ্যযুগীয় রোমান্টিকধর্মী হ'লেও বাঙলাভাষাতে বাস্তবধর্মী নাটকও লেখা হয়েছে এবং অনেক আগে থেকে। বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের গোড়াপত্তন যে-নাটক নিয়ে হয়, সেই "নীলদর্পণ" হচ্ছে একখানি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী নাটক। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে লেখা এই নাটকে দৃশ্যাবলীর ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে বা নাট্যপরিস্থিতি রচনায় বহু দৈন্য দেখতে পাওয়া গেলেও এর বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের কথোপকথন অত্যন্ত বাস্তব। তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, নবীন মাধব, গোলকবিহারী প্রভৃতি চরিত্র তখনকার দিনে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে চ'লেফিরে বেড়াত। গিরীশচন্দ্রের "প্রফুল্ল", "বলিদান", "শাস্তি কি শান্তি" প্রভৃতি নাটককেও অনেকখানি বাস্তব ব'লে আখ্যা দেওয়া যায়। এবং এ-যুগের "নবান্ন", "অঙ্গার" প্রভৃতিও নিজেদের বাস্তব পর্যায়ভুক্ত ব'লে দাবী করতে পারে।

তারাশঙ্কর রচিত "বিপাশা"র একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও লিলি চক্রবর্তী।

ইয়োরোপে নাটকের মধ্যে বাস্তবধর্মিতার সূচনা করেন ফ্রান্সের গোনকুর ও জোলা এবং নরওয়ের ইবসেন ও স্ট্রীণ্ডবার্গ। কিন্তু আজ তাঁরা তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে সুধীসমাজের নমস্য হ'লেও জীবিতকালে তাঁরা প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই কুড়িয়েছিলেন বেশী। তাঁরা অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন ব'লেই অপরের ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না ক'রে তাঁদের নাটক অভিনীত হবে, এ-আশা না ক'রেও তাঁরা স্রেফ নিজেদের আনন্দ চরিতার্থ করবার জন্যে উপন্যাস, নাটক লিখে গেছেন বাস্তবতাকে আশ্রয় ক'রে। নাটক নিশ্চয়ই অভিনীত হবার জন্যে লেখা হয়ে থাকে। বাস্তবধর্মী নাটক খালি লিখলেই হ'ল না। বাস্তবধর্মিতা বজায় রেখে অভিনয় করাবার জন্যে একজন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন নাট্য-প্রযোজক বা প্রয়োগশিল্পীও প্রয়োজন। আবার সেই নাটকের অভিনয় দেখে তারিফ করবে, এমন সহানুভূতি-সম্পন্ন দর্শকও নিশ্চয়ই থাকা চাই। আবেগধর্মী বা রোমান্টিক নাটকের অভিনয় দেখে হৃদয় আলোড়িত হ'লেই খুসী হয়না, বাস্তবধর্মী মননশীল নাটকের অভিনয় দেখে ভাববার খোরাক পেতে চায়, এমন দর্শকের সামনেই বাস্তবধর্মী নাট্যাভিনয়ের সার্থকতা। এ-হেন দর্শকের সংখ্যা স্বভাবতঃই খুব বেশী কোনদিনই নয়; তবু যে-কটি দর্শক অভিনয় দেখতে আসবেন, তারা সবাই যেন সহানুভূতির সঙ্গে অভিনয়টি দেখেন, এমন কামনা প্রত্যেক নাট্যকারই ক'রে থাকেন।

ইয়োরোপে সহানুভূতির সুন্দর পরিবেশে বাস্তবধর্মী নাটকের নিয়মিত

এম কে জি প্রোডাকসন্স নিবেদিত, চিত্ত বসু পরিচালিত অনুরূপা দেবীর "মা" চিত্রে সন্ধ্যারাণী, অনুভা গুপ্তা ও অন্যান্য কয়েকজন শিল্পী।

অভিনয় প্রথম যিনি করান, তাঁর নাম হচ্ছে আঁদ্রে আন্টোয়ানে। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল থিয়েটর লাইবার অর্থাৎ liberal theatre। তিনি একক এই প্রচেষ্টা শুরু করলেও কয়েকখানি সার্থকতা লাভ করেন যে, তাঁর এই ধারা জার্মাণী, রুশিয়া, ইংলণ্ড এমন কি আমেরিকাতেও অনেকের দ্বারা অনুসৃত হয়। জোলা এবং গোনকুর অবশ্য আন্টোয়ানের জন্যে প্রচুর প্রচার চালাতে কসুর করেননি; কিন্তু এরই ফলে তিনি নতুন নাটকের নতুন ধারায় অভিনীত হবার পথ উন্মুক্ত করে দেন।

আন্টোয়ান প্রথমে ছিলেন একজন সৌখীন অভিনেতা। প্যারিস গ্যাস কোম্পানীতে একটি সামান্য কেরাণীর চাকরী করে তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের বসন্ত ঋতুতে তিনি তাঁরই মত কয়েকজন সৌখীন অভিনেতাকে জড়ো করেন এবং উত্তর প্যারিসের মোঁমার্তের অঞ্চলে একটি বড় হলে কয়েকখানি একাঙ্কিকার অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই হলে ৩৪২ জন দর্শকের আসন ছিল। এর পর থিয়েটর লাইবার স্থানান্তরিত হয় প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারের একটি ৮০০ সীট বিশিষ্ট হলে এবং পরে প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে থিয়েটর-মেনাস-প্লেজার্সে। ১৮৯৪ সালে বন্ধ হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত এই থিয়েটর লাইবার চলত কয়েকটি নিয়মে চিন্তাশীল এবং সমঝদারকে অনুসরণ করে।

থিয়েটর লাইবার এর অভিনয় জনসাধারণে দেখতে পেতো না—এর অভিনয়ে প্রবেশাধিকার ছিল এর সদস্যদের, যারা মাসিক একটি নির্দিষ্ট মূল্য চাঁদা দিত। প্রথম বছর দেড়েক এতে একরাত্রে মাত্র একটি নাটকেরই অভিনয় হ'ত। মেনাস-প্লেজার্সে যাবার পরে অবশ্য এক রাতে প্রায়ই দু'খানি বইয়ের অভিনয় দেখানো হ'ত। জনসাধারণকে থিয়েটর লাইবার এর অভিনয় দেখতে দেওয়া হয়েছে, এ ঘটনা কচিৎ ঘটেছে। এই থিয়েটারে মাত্র সেইসব নাট্যকারেরই বই অভিনীত হ'ত, যাঁরা অন্য কোথাও পাত্তা পেতেন না। সে-সব নাট্যকারের পাণ্ডুলিপি নাটক এখানে সাফল্যলাভ করত, তারা যে-কোনো জায়গায় তাঁদের নতুন বই দেওয়ার অধিকার ছিল। আন্টোয়ান মনে করতেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, পাম্পকে প্রথম চালু করা এবং সকলেই স্বীকার করবেন যে, তিনি এ-কাজটা বেশ ভালোভাবেই করতে পেরেছেন। থিয়েটর লাইবার অন্ততঃ একান্নজন নাট্যকারের নাটক অভিনয় করেছেন এবং এই একান্ন-জনের মধ্যে কম-সে-কম বিয়াল্লিশ জন হচ্ছে চল্লিশেরও কম বয়সের। এবং এই নাট্যকারদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা বিংশশতাব্দী পড়তে না পড়তেই খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর প্রযোজিত ১১১ খানি নাটকের মধ্যে কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশই একাঙ্কিকা; কারণ একাঙ্কিকা নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সহজ এবং কম ব্যয়সাধ্য।

আন্টোয়ান আশা করেছিলেন যে, তাঁর থিয়েটর লাইবার হবে একটি খুব বড় উচ্চাঙ্গের নাট্য-কোষাগার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর সে আশা ফলবতী হয়নি। কিন্তু পদ্যে রচিত বারোটিরও বেশী একাঙ্কিকার প্রযোজনা করে-

"সিস্টার নিবেদিতা" চিত্রে অমরেশ দাশ ও অরুন্ধতী মুখার্জি।

ছিলেন; তিনি হাউপ্টম্যান রচিত বাস্তবতা ও কাব্যমিশ্রিত "হানেলে"-ও অভিনয় করিয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, থিয়েতর লাইবার হচ্ছে বাস্তবধর্মী নাট্যাভিনয়ের লীলা-ভূমি। এর কারণও অবশ্য ছিল। থিয়েতর লাইবার-এর প্রথম নিবেদন ছিল জোলার একটি বাস্তবধর্মী গল্পের নাট্যরূপ এবং পরেও যে-সব নতুন নাট্যকারের বই ওখানে অভিনীত হ'ত, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বাস্তবতার অনুগামী। এ ছাড়া ইবসেনের ঘোস্ট এবং ওয়াইল্ড ডাক, স্ট্রীণ্ডবার্গের মিস্ জুলিয়া এবং হাউপ্টম্যানের দি উইভার্স আন্টোয়ানের অভিনয় এবং প্রযোজনা-ধারার অত্যন্ত উপযোগী ছিল।
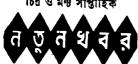
আন্টোয়ানে-এর কণ্ঠস্বর ছিল ক্ষীণ; কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি অভিনয় করতেন চমৎকার। তাঁর প্রথম বছরের শেষ হ'তে না হতেই "ওডিয়ন" তাঁকে দলভুক্ত করতে চেয়েছিল। তিনি তাঁর দলকে এমনভাবে নাট্যমঞ্চের ওপর জমায়েত করতেন যে, তাদের একসংগে বিভিন্নভাবে নড়াচড়া বা চলাফেরা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে বোধ হ'ত। তিনি তাঁর অভিনেতাদের এমনভাবে কথা কইতে বা চলতে-ফিরতে শেখাতেন যে, মনে হ'ত তাদের গৃহীত চরিত্রগুলি একেবারে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি অনেক সময় অত্যন্ত দুঃসাহসিকভাবে তাদের দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে কথা বলতে শেখাতেন। এ ছাড়া তিনি বাস্তবধর্মী দৃশ্যপটও ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। ঝোলানো পশ্চাদপট তিনি কখনও ব্যবহার করেননি। উল্টে মেনাস-প্লেজার্সে তিনি সত্যিকার প্যানেলওলা দরজা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিলেন। একটি নাটকে তিনি একটি ভেড়ার পা ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রপার্টি হিসেবে। ১৮৮৯-৯০ সালের অভিনয় শেষ ক'রে তিনি আধুনিক রংগ-মঞ্চ সম্বন্ধে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরি-কল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়নি। কেউই টাকা নিয়ে তাঁর এই পরি-কল্পনাকে রূপ দিতে এগিয়ে আসেনি। তাই বেলজিয়াম, জার্মানী, ইংলণ্ড এবং ইটালীতে স্বল্পমেয়াদী অভিনয় দেখাবার পর আন্টোয়ানে-এর থিয়েতর লাইবার অকালমৃত্যুকে বরণ করে। কিন্তু আর্থিক অসাফল্যলাভ করলেও থিয়েতর লাইবার চারটি দরকারী কাজ করে গেছে; এক, বাস্তবধর্মী নাটকের বাস্তবধর্মী প্রয়োগরীতি দেখিয়েছে; দুই, কাব্যধর্মী বা রোমাণ্টিক নাটকের অভিনয়কেও মানবীয় আবেদনপূর্ণ করতে শিখিয়েছে; তিন, নতুন নাট্য-কারকে উৎসাহ জুগিয়েছে; আর চার, থিয়েতর লাইবার কেবল প্যারিসেই নয়, বার্লিন, লণ্ডন, এমনকি আমেরিকা এবং আমাদের ভারতেও তার আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছে।

।।অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি।।

হাওড়া বা শিয়ালদা'র লোক্যাল ট্রেণে হরেক রকম জিনিষের ফেরিওলা বা ক্যান্‌ভাসারদের সমস্বরে চীৎকারের দ্বারা বিব্রত হননি, এমন ভাগ্যবান লোক হাজারে দশজনও আছেন কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি ঠিক ঐ ধরণেরই উপদ্রবের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সিনেমা হাউসগুলির মধ্যে। দর্শক পয়সা খরচ করে ছবি দেখতে গিয়ে আসল ছবি দেখার আগে খালি যে সরকারের তৈরী দলিলচিত্র এবং সংবাদচিত্র দু'খানি বাধ্যতামূলক-ভাবে দেখে থাকেন, তা নয়, উপরন্তু আরও কিছু দেখতে বাধ্য হন অত্যন্ত অনিচ্ছা এবং বিরক্তির সংগে। অজস্র সিনেমা স্লাইড বা পর্দার ওপর প্রক্ষি-ফলিত স্থির রঙীন বিজ্ঞাপন তো আছেই, তার ওপর সিন্দবাদের ভূতের মতো দর্শকের ঘাড়ে এসে চেপেছে অ্যাড্‌ভার্টাইজিং শর্ট্‌স্ বা চলচ্চিত্রের মারফত বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপন। এই সেদিন একটি ভারতীয় চিত্রগৃহে

কনক মুখোপাধ্যায়ের "আশায় বাঁধিনু ঘর" চিত্রের একটি দৃশ্যে কুনাল, তপতী ও বিশ্বজিৎ।
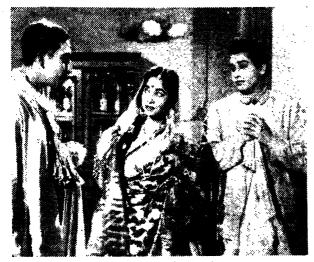
একখানি প্রসিদ্ধ বিদেশী ছবি দেখতে গিয়ে কম করে সাতটি বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র দেখবার দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। আগে প্রথা ছিল ইণ্টারভাল বা বিরতির সময় সিনেমা-স্লাইডগুলি দেখানো হ'ত; যারা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে থাকতেন, তাঁরা ইচ্ছে হলে পর্দার দিকে চোখ রাখতেন, না ইচ্ছে হলে রাখতেন না। কিন্তু এখন দর্শকের আর নিস্তার নেই; সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার রেখে সরকারী দলিলচিত্র দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই খান কয়েক বিজ্ঞাপন-চিত্র দেখানো হয়ে গেল; দর্শকের পর্দার ওপর থেকে চোখ ফেরাবার বা চোখ বুজে থাকবার উপায় নেই—কখন আবার সংবাদ-চিত্র কিংবা আসল ছবি আরম্ভ হয়ে যায়, তার ঠিকানা নেই। বিদেশী চিত্রগৃহে মূল ছবি আরম্ভের আগে হয় ঘণ্টা কিংবা আলোর সঙ্কেত দেওয়া হয়, দেশী হাউসগুলিতে সে-বালাই নেই। কাজেই দর্শক যতই বিরক্ত হোন না কেন, তাঁকে কুইনাইনের বড়ি গেলার মতো করে বিজ্ঞাপন-চিত্রগুলি দেখতেই হবে; ওদের হাত থেকে তাঁর পরিত্রাণ নেই। তার ওপর আবার আসল ছবিটি যদি দর্শকের দুর্ভাগ্যক্রমে দৈর্ঘে ছোট হয়,—যেমন সেদিনের বিদেশী ছবিটি ছিল হাজার নয়েক ফুট,—তাহ'লে তাঁর অবস্থা চিত্রগৃহের মালিকের অনুকম্পায় হয়ে পড়ে আরও শোচনীয়; কেননা বিজ্ঞাপন-চিত্রের সংখ্যা, যেটা সাধারণতঃ থাকে তিন থেকে চার, সেটি বেড়ে গিয়ে হয় সাত থেকে আট।

দর্শক পয়সা খরচ করে ছবি দেখতে যান কিছুক্ষণের জন্যে কর্মবহুল বাস্তব জীবনকে ভুলে থাকবার জন্যে—কিছু আনন্দ-রস সিঞ্চনের দ্বারা মনকে চঙ্গা করে তোলবার জন্যে। তাই প্রথম প্রথম দলিল-চিত্র এবং সংবাদ চিত্রগুলি সম্বন্ধেও দর্শকের বিমুখতার অন্ত ছিল না। কিন্তু ক্রমে পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আগ্রহ জাগাবার সঙ্গে সঙ্গে এবং কিছু শিক্ষণীয় জিনিষ জেনে নিলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই, এই ধরণের মনোবৃত্তি গঠিত হওয়ার ফলে আজকের দর্শক সরকারী দলিল-চিত্র এবং সংবাদ-চিত্রকে অধিকাংশ সময়েই বেশ সমাদরের চোখেই দেখে। ভারত সরকারের উন্নত ধরণের দলিল-চিত্রগুলি দর্শক চিত্তে শ্রদ্ধা জাগাতে পেরেছে বলেই এ ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু চিত্ত বিনোদনের জন্যে যেখানে যাওয়া, সেখানে যদি প্রথমেই পর পর বিজ্ঞাপন-চিত্র দেখিয়ে চিত্ত-নিপীড়ন করা সুরু হয়ে যায়, তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় সে-কথা চিত্রগৃহের পরিচালকরা একবার ভেবে দেখেছেন কি? অতি-র কিছুই ভালো নয়। বিজ্ঞাপন-চিত্র দেখানোরও একটা সীমা থাকা উচিত। এবং আমাদের মনে হয়, সে-সীমা দুই বা

...এর 'তারা' চিত্রের একটি দৃশ্যে সুনীল দত্ত ও আশা পারেখ।

তিনকে অতিক্রম করা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। চিত্রগৃহ চলে দর্শক সমাগমের ফলে—দর্শকই চিত্রগৃহের লক্ষ্মী। কাজেই এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে দর্শক বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এবং প্রথমেই দর্শক যদি বিরক্ত হয়ে ওঠে, তাহলে মূল ছবির রসাস্বাদনে স্বভাবতঃই বিঘ্ন ঘটতে পারে। ফলে ছবির প্রযোজক এবং পরিবেশক প্রত্যক্ষে না হোক, অন্ততঃ পরোক্ষেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কারণ, ছবিটি দর্শকের যতখানি ভালো লাগবার কথা, বিরক্ত মন নিয়ে দেখার দরুণ যদি ঠিক ততখানি ভালো না লাগে, তাহলে দর্শক আর একবার ছবিটি দেখবার কথা মনেও আনবেন না অর্থাৎ ছবির repeat value কমে যাবে এবং তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় পরিচিতের কাছেও ছবিটি সম্পর্কে যতখানি প্রশংসা করা উচিত ছিল, ততখানি করবেন না। অতএব দর্শক মারফত ছবির যতখানি প্রচার হয়ে থাকে, তা হবে না। অতএব চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সামগ্রিক লাভক্ষতির দিকে লক্ষ্য করে চিত্রগৃহের পরিচালকেরা বিজ্ঞাপন চিত্র দেখানো সম্বন্ধে কিছু সতর্ক হবেন।

বিবিধ সংবাদ

১৫ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে, রঙমহল নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দকে নতুন নাটক উপহার দিলেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত "চক্র"। সলিল সেনের পরিচালনায় এবং ভি. বালসারার সুরারোপে সমৃদ্ধ নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মিত্র, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সরযূবালা, শিপ্রা মিত্র, দীপিকা দাস, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিতা রায়। আমরা বারান্তরে "চক্র" সম্পর্কে আমাদের মতামত পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করব।

*

মোহন বিশ্বাসের পরিচালনায় মহামায়া চিত্রম্‌-এর "তাণ্ডব" ইন্দ্রপুরীতে দ্রুত সমাপ্তির পথে। ছবিখানির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন অসিতবরণ, বিকাশ রায়, তুলসী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষ, নমিতা সিংহ প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র।

*

শচীন অধিকারী লিখিত ও পরিচালিত "কালচক্র"-এর চিত্রগ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, তরুণকুমার, আশিসকুমার, ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মন, তপতী ঘোষ, অপর্ণা প্রভৃতি শিল্পী এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন।

*

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এবং সন্ধ্যারাণী, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, কবিতা রায়, পদ্মাদেবী প্রভৃতি অভিনীত শ্রীমান পিকচার্সের 'মধুবেণ' চিত্র অতি শীঘ্র মুক্তিলাভ করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

বেলেঘাটার বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা পারসারথী সম্প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা', 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি' এবং 'ফাঁকি'—এই চারটি রচনার কাহিনীকে একত্র করে রচিত 'ফাঁকি' নামে একটি নাটককে মঞ্চস্থ করেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। নাট্যকার কালীপদ চক্রবর্তী স্বয়ং এর পরিচালনা করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় সুকোমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর চক্রবর্তী, সলিল ঘোষ, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, করুণা

মিত্র, গীতা দত্ত ও বাবলু কুন্ডিতের সঙ্গে অভিনয় করেন। সঙ্গীতাংশে ও আলোক-সম্পাতে যথাক্রমে সুধাংশু গুপ্ত ও আশুতোষ বড়ুয়া।

*

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে গেল ১৫ই আগষ্ট, বেলা সাড়ে ১০টায় লোটাস সিনেমাতে আর্ণ সাক্সডর্ফ পরিচালিত "গ্রেট অ্যাড্‌ভেঞ্চার" দেখানো হয়। এই ছবিখানি ১৯৫৪ সালে কেন্‌স্ ফেস্টিভ্যালে গ্র্যান্ড প্রিক্স লাভ করে। ছবিখানিতে পরিচালক গভীর অরণ্যের ভিতর সুন্দর এবং অসুন্দরের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করেছেন।

॥ ডাইনী ॥

এই সপ্তাহের একটি মাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি দেবী প্রোডাকসন্সের 'ডাইনী' কলিকাতার রূপবাণী, ভারতী, অরুণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মনোজ ভট্টাচার্য। সঙ্গীত : কালোবরণ দাস এবং চিত্রগ্রহণ করেছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। নাম-ভূমিকায় গীতা দে এবং অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, প্রশান্ত-কুমার, গঙ্গাপদ বসু, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন, কেতকী দত্ত, সীতা মুখার্জী ও আরতি দাস প্রভৃতি। "ডাইনী"র কাহিনীকার হচ্ছেন শৈলেশ দে।

ফিল্ম এণ্টার প্রাইজার্স প্রযোজিত সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দুই ভাই' চিত্রের একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার।

॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী ॥

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত বুধবার ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যায় মহান কর্মবীর ও বঙ্গমাতার সুসন্তান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীকমলকুমার বসু আচার্য রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুরূপা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কয়েকখানি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

॥ অভ্যুদয়ের নাটক সমারোহ ॥

নব নাট্য প্রচেষ্টায় যে সব সম্প্রদায় মঞ্চে, 'অভ্যুদয়'-এর আসন তার প্রথম সারিতে। এই সম্প্রদায় মিনার্ভা থিয়েটারে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এক 'নাটক সমারোহ'-এর আয়োজন করেছেন। কিরণ মৈত্রের 'অন্ধ কারায়' ও "বিশ-পঞ্চাশ" এবং বনফুলের "শিক-কাবাব" এই তিনটি নাটিকা সমারোহের অন্তর্গত।

॥ যাত্রার আসর ॥

কলিকাতার জনপ্রিয় নাট্য প্রতিষ্ঠান 'অম্বিকা নাট্য কোম্পানী' আগামী ২১শে আগষ্ট ও ২২শে আগষ্ট বিশ্বরূপা মঞ্চে যাত্রাভিনয় করবেন। প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথের 'মস্তক বিক্রয়' কবিতার মূল আখ্যানের উপর ভিত্তি করে রচিত ব্রজেন দে'র 'প্রতিশোধ' নাটকটি এবং

দ্বিতীয় দিন ব্রজেন দে'র 'শয়তানের চর' অভিনীত হবে। উক্ত নাটকই পরিচালনা করবেন অমিয় বসু। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন অমিয় বসু, বিমল লাহিড়ী, মধু ব্যানার্জি, কালীয়দমন গুহঠাকুরতা, শ্রীমতী ছবি রায়, শ্রীমতী ছবি রাহা ও বেলা ঘোষ প্রভৃতি।

* * *

কলিকাতার আর একটি স্বনামধন্য যাত্রা প্রতিষ্ঠান "নিউ গণেশ অপেরা" শীঘ্রই কলিকাতায় বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন। এ'রা যে দুখানি নাটক এবার উপহার দেবেন সে দুটি হলো আনন্দময়ের "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" ও বড় ফণীবাবুর "নাগপঞ্চমী"। জনপ্রিয় গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ছবিরাণী, ফণী গাঙ্গুলী, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্না চক্রবর্তী, শিব ভট্টাচার্য, বিজয় মজুমদার, সন্তোষরাণী, ইন্দ্রানী বিশ্বাস প্রভৃতি শিল্পীরা এতে অংশ গ্রহণ করবেন।

টুকিটাকি

গ্যারী কুপার-অভিনীত শেষ ছবি 'নেকেড এজ'। এক আমেরিকান ব্যবসায়ীর ভূমিকায়, যাঁর বিপরীতে ডেবোরাকের। ছবিটির একটা বিশেষ দিক হল, এক যন্ত্রের সাহায্যে রোমাঞ্চকর পরিবেশটুকু সৃষ্টি করে দর্শকদের আকর্ষণ করা হচ্ছে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয় ছবি শেষ হবার তেরো মিনিট আগে থেকে প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শকদের সামনে একটা লাল আলো জেলে রেখে শিহরণের চরম মুহূর্তকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার ফলে ছবিঘর থেকে বেরিয়ে এসেও দর্শকদের মনে যাতে এই ছবির সাসপেন্সটুকু রয়ে যায় তার চেষ্টা করেছেন ছবির পরিচালক মিচেল এন্ডারসন। জানি না সাসপেন্সের একমাত্র রাজা আলফ্রেড হিচকক হলে এ-ব্যাপারে কি ভাবতেন?

* * *

বব হোফ ও বিং ক্রসবি—এই দুই জুড়ি ছবির জগতে এক বিস্ময়কর যোগাযোগ। আজ থেকে ন' বছর আগে এ'দুয়ের সমন্বয় ঘটেছিল 'রোড' ছবিতে। আবার সেই মুহূর্তটি বুঝি ফিরে এল। এবার এ'রা একসঙ্গে 'দি রোড টু হংকং' ছবিতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। ছবির কাজ শুরু হয়েছে ইংলন্ডে। ছবির আরম্ভে প্রথমেই একটা 'ট্যাপ্ ড্যান্স'— নাচের দৃশ্য আছে। এই বয়েসেও নাচটির জন্য তাঁরা যুবকের মত নাচতে শুরু করেছেন। যদিও এখন বব হোফের বয়স ৫৮ এবং বিং ক্রসবির ৫৭ বছর।

* * *

ইটালীর এখন যে কোন ছবি নিয়েই হৈ-চৈ বেশী। গত বছর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মিলিত বাইশটা পুরস্কার নিয়ে শ্রেষ্ঠ ছবি বিবেচিত হল ইটালীর পরিচালক লুচিনো ভিসকণ্টির 'রকো এন্ড হিজ ব্রাদার্স' ছবিটি। কৃষক জীবনের জীবন-জিজ্ঞাসার প্রশ্ন এ-ছবির মূল বক্তব্য। পরীক্ষামূলক ছবি তুলতে সবচেয়ে বেশী ভাবেন ভিসকণ্টি। পঞ্চান্ন বছর বয়সেও তিনি সমানভাবে ভেবে চলেছেন ছবিতে আর কি নতুন দৃষ্টির প্রয়োজন।

রসেলিনী ও ডি সিকা-র সমকক্ষ হলেন ভিসকণ্টি। 'রকো' ইটালীর নিও-রিয়ালিসমের আর একটি ছবি।

* * *

মস ফিল্ম প্রযোজিত 'ফেট অফ এ ম্যান' সোভিয়েট রাশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন সেরজি বন্দারচাক। গত তিন বছরের মধ্যে এই ছবিটি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

খেলাধূলা

দর্শক

॥ ভারত সফরে এম সি সি ॥

আগামী শীতকালে এম., সি, সি, ভারত সফরে আসছে। কিন্তু এখনও চূড়ান্তভাবে এম, সি, সি'র দল গঠন করা সম্ভব হয়নি। এম, সি, সি কর্তৃপক্ষ যে ২৯ জন খেলোয়াড়কে ভারত সফরের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের সম্মতি জানতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নামকরা টেস্ট খেলোয়াড় পিটার মে, কলিন কাউড্রে, ব্রায়ান স্ট্যাথাম, ফ্রেডী ট্রুম্যান, সুব্বারাও, এডরিচ, ডি বি ক্লোজ এবং জে ফ্লাভেল ভারত সফরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় জানিয়ে দিয়েছেন। এই সব প্রখ্যাত খেলোয়াড়গণ ব্যক্তিগত কারণ এবং ব্যবসায়ের স্বার্থে ভারত সফরে যোগদানের অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। টেড ডেক্সটার এখনও মনস্থির করতে পারেননি। যে ২০ জন খেলোয়াড় তাঁদের সম্মতি জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র চারজন—কেন ব্যারিংটন, জন মারে ডেভিড এ্যালেন এবং জিওফ পুলার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এ মরসুমে টেস্ট খেলেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইংল্যাণ্ডের নামকরা খেলোয়াড়দের ভারতবর্ষের মাটিতে পেতে হলে সফরের সময়ের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন ভারতীয় ক্রিকেট খেলার উন্নত-মান। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলার যোগ্যতা লাভ করে ১৯৩২ সালে, ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। সেই থেকে এ পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে ৭টা টেস্ট সিরিজ (মোট ২৪টা খেলা) খেলা হয়েছে। ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ড সফরে গেছে ৫ বার, কিন্তু এম সি সি সরকারীভাবে ভারত সফরে এসেছে মাত্র ২ বার—১৯৩৩ এবং ১৯৫১ সালে। এই দু'বারই তারা ইংল্যাণ্ডের পুরো শক্তি নিয়ে ভারত সফরে আসেনি। এসেছিল ইংল্যাণ্ডের ছায়ামাত্র। ১৯৩৩-৩৪ সালের সফরে ডি আর জার্ডিনের নেতৃত্বে এম সি সি দল মোট ৩টে টেস্ট খেলার মধ্যে ২—০ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' পায়। একটা টেস্ট ড্র যায়। ১৯৫১-৫২ সালের সফরে এম সি সি দল ৫টা খেলার মধ্যে মাত্র একটায় জয়ী হয় এবং হার স্বীকার করে একটায়। ৩টে খেলা ড্র যায়। মোট ৭টা সিরিজে এম সি সি 'রাবার' পেয়েছে ৬টায়, ১৯৫১-৫২ সালের টেস্ট সিরিজটা ড্র যায়। মোট ২৪টা টেস্ট খেলার মধ্যে এম সি সি'র জয় ১৫, হার ১। খেলা ড্র গেছে ৮টা। এই হিসাব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এম সি সি'র সঙ্গে সমানে পাল্লা দেবার মত শক্তি ভারতবর্ষ এখনও অর্জন করতে পারেনি। সেই কারণে ভারত সফরে শক্তিশালী দল গঠনে এম সি সি'র খুব বেশী গরজ নেই। ভারতবর্ষের অগণিত ক্রিকেট অনুরাগী তীর্থের কাকের মত ক'রে থেকে বসে আছে—ইংল্যাণ্ডের শক্তিশালী খেলোয়াড়দের খেলা দেখার অপেক্ষায়। কিন্তু আমাদের আবেদন-নিবেদন 'অরণ্যে রোদন' হয়েছে।

এম সি সি'র হালচাল দেখে ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তৃপক্ষ মহল খুবই মুষড়ে পড়েছেন। তাঁরা আশংকা করছেন, এম সি সি'র ভারত সফরের সাধারণ খেলাগুলিতে দর্শক সংখ্যা বেশী হবে না; আর্থিক দিক থেকে ক্ষতি হবে। তবে টেস্ট খেলা সম্বন্ধে তাঁদের কোন মাথা ব্যথা নেই। ভারতীয় জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁদের নাড়ী-জ্ঞান খুব বেশী। গত কয়েক বছরে লোকে এমন টেস্ট-পাগলা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এ রোগ নাকি নিরাময় করা স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য। স্টেডিয়াম কোন ছার।

এম সি সি-র আসন্ন ভারত সফরে জাঁদরেল ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কেউ আসবেন না। জোর দু'-একজন যদি আসেন। ইংল্যাণ্ডের পুরো শক্তির কাছে তা কিছুই নয়। ইংল্যাণ্ডের নামজাদা ক্রিকেট সমালোচক এলেক্স ব্যানিস্টার খেলোয়াড়দের হাঁড়ির খবর রাখেন। তাঁর লেখায় খেলোয়াড়দের মনের কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ পেয়েছে—আসলে নামজাদা খেলোয়াড়দের ভারত সফরে যোগদানের অনিচ্ছার কারণ অন্য কিছু নয়—সকলেরই লক্ষ্য আগামী বছরের অস্ট্রেলিয়া-সফর। অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ এই দুইয়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নিঃসন্দেহে অস্ট্রেলিয়া।

সুতরাং আগামী মরসুমের অস্ট্রেলিয়া সফরের 'বাঘের খেলায়' ইংল্যাণ্ডের বাঘা-বাঘা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা এখন পূর্ণ বিশ্রাম পেতে চান—শক্তি সঞ্চয় এবং চিত্তবিনোদন করতে চান। ১৯৬১ সালের টেস্ট সিরিজ ইংল্যাণ্ডের বিফলে গেল। ইংল্যাণ্ডের চিন্তারাজ্যে এখন পরবর্তী অস্ট্রেলিয়া সফর। ভারতবর্ষ সফর তাদের কাছে 'নেট-প্র্যাক্টিশ'।

গত ভারত বনাম পাকিস্তান টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের খেলার দুর্বলতা ইংল্যাণ্ডের অজানা নেই। তারা আরও জানে, এখনও ভারতবর্ষ 'গুরুমারা বিদ্যা' করায়ত্ত করতে পারে নি। ফলে ইংল্যাণ্ডের পূর্ণ শক্তির কাছে আমরা করুণার পাত্র—যোগ্য পাত্র নই। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ যে-দিন 'রাবার' লাভ করবে, সেই দিনই ইংল্যাণ্ডের টনক নড়বে। তখন আর ছেঁজি-পেঁজি দিয়ে কাজ হাসিল করার কথা ইংল্যাণ্ড চিন্তাই করবে না। সুতরাং হা-হুতাশ, জাঁদরেল খেলোয়াড়দের খেলা দেখার জন্যে হত্যে দিয়ে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। অতঃপর আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের কর্তব্য, ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষতা লাভের জন্যে কঠোর শপথ গ্রহণ ক'রে নিষ্ঠার সঙ্গে ক্রিকেট খেলার অনুশীলন করা।

ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

অস্ট্রেলিয়া বনাম সারে

ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল সফরের ২৪শ খেলায় সারে কাউণ্টি ক্রিকেট দলকে ২৫৫ রাণে পরাজিত করে।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ২০৯ (বেনো ৪৭, নার্ভ ৪৫। টনি লক ৫টা উইকেট)।

ও ২২৫ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সিম্পসন ৬৪। বেডসার ৪২ রাণে ৩, সিডেনহ্যাম ৫১ রাণে ৩ উইকেট)।

সারে ঃ ৭৯ (মিশন ৩২ রাণে ৩, সিম্পসন ১৭ রাণে ৩ এবং গাণ্ট ২৬ রাণে ৪।

ও ১০০ (কেন ব্যারিংটন ৬৮ নট আউট; ক্লাইন ২৩ রাণে ৪)।

অস্ট্রেলিয়া বনাম গ্লামর্গান

অস্ট্রেলিয়া ঃ ১৯২ (লরী ৬৬ ও'নীল ৬৩। শেফার্ড ৫০ রানে ৫ এবং ওয়াকার ৫৫ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৬২ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সিম্পসন নট-আউট ১১৬, বেনো নট-আউট ৮০। ওয়ার্ড ৮৬ রানে ৩ উইকেট)

গ্লামর্গান ঃ ১৪৯ (বেনো ৭১ রানে ৫, ক্লাইন ৬০ রানে ৪ উইকেট)

ও ১২৪ (২ উইকেটে। জোন্স নট-আউট ৭০)

ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল গ্লামর্গান কাউণ্টি দলের বিপক্ষে সফরের পঞ্চবিংশতি খেলাটি ড্র করে।

অস্ট্রেলিয়া—ওয়ারউইকশায়ার

ওয়ারউইকসায়ার ঃ ২৫১ (কার্টরাইট ৯৩, ব্যানিস্টার ৬৬, জে কে স্মিথ ৫৩। ডেভিডসন ২৮ রাণে ৩ এবং গাউট ৪৯ রাণে ৩ উইকেট)

ও ১৮৩ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হর্ণার ৭৭)

অস্ট্রেলিয়া : ২২৬ (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড, সিম্পসন নট আউট ১৩২, হার্ভে নট আউট ১১৫ এবং ম্যাকডোনাল্ড ৪৫।

ও ১০৩ (৩ উইকেটে। বার্জ নট আউট ৫১)

খেলাটা ড্র গেছে। অস্ট্রেলিয়ার দলের কপাল ভাল—বৃষ্টিই তাদের পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

॥ খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ॥

(১১ই আগস্ট পর্যন্ত)

মোট খেলা ২৬, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৯, হার ২, খেলা ড্র ১৫।

টেস্ট সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (৩) : বিল লরী (২)—১৩০ (২য় টেস্ট) ও ১০২ (৪র্থ টেস্ট); নীল হার্ভে ১১৪ (১ম টেস্ট)।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে (২) : টেড ডেক্সটার ১৮০ (১ম টেস্ট) ও রমন সুব্বা রাও ১১২ (১ম টেস্ট)।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী (৩০) : উইলিয়াম লরী ৮; নর্মান ও'নীল ৬; নীল হার্ভে ৫; রোণাল্ড সিম্পসন ৪; কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৩, কেনেথ ম্যাকয় ২ এবং ব্রেন চার্লস বুথ ২।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে : ৯

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৮টি—বিল লরী।

টেস্ট ক্রিকেটে গড়পড়তা

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের বিগত ৪টি টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা ওপনিং ব্যাটসম্যান বিল লরি ব্যাটিং-এর গড়পড়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। বোলিং-এর গড়পড়তায় শীর্ষ-স্থান অধিকার করেছেন ইংল্যান্ডের চৌখশ খেলোয়াড় টেড ডেক্সটার। ব্যাটিং-এর গড়পড়তায় লরি উভয় দলের খেলোয়াড়দের অনেক উর্ধ্বে আছেন।

এ কে ডেভিডসন

বিল লরী

ব্যাটিং

১। বিল লরি (অস্ট্রেলিয়া) : মোট ৪২০ রাণ; গড়পড়তা ৬০·০০ রাণ।

২। টেড্ ডেক্সটার (ইংল্যান্ড) : মোট ৩৫৪ রাণ; গড়পড়তা ৫০·৫৭ রাণ।

৩। নীল হার্ভে (অস্ট্রেলিয়া) : মোট ৩২৫ রাণ; গড়পড়তা ৪৬·৪২ রাণ।

৪। রমন সুব্বারাও (ইংল্যান্ড) : মোট ৩১৯ রাণ; গড়পড়তা ৩৯.৮৭ রাণ।

৫। কেন ব্যারিংটন (ইংল্যান্ড) : মোট রাণ ২২৮। গড়পড়তা ৩৮.০০ রাণ।

৬। এ কে ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া) : মোট রাণ ১৩৪; গড়পড়তা ৩৩.৫০ রাণ।

বোলিং

১। টেড ডেক্সটার (ইংল্যান্ড) : মোট ৯ উইঃ; গড়পড়তা ১৭·২২ রাণ।

২। এ কে ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া) : মোট ১৯ উইঃ; গড়পড়তা ২২·২১ রাণ।

৩। ডি এ এলেন (ইংল্যান্ড) : মোট ৯ উইঃ; গড়পড়তা ২৪.৫৫ রাণ।

৪। ফ্রেডি ট্রুম্যান (ইংল্যান্ড) : মোট ২০ উইঃ; গড়পড়তা ২৬·৪৫ রাণ।

৫। জি ম্যাকেঞ্জি (অস্ট্রেলিয়া) : মোট ১১ উইঃ; গড়পড়তা ২৯·৩৬ রাণ।

৬। আর সিম্পসন (অস্ট্রেলিয়া) : মোট ৭ উইঃ; গড়পড়তা ৩০·০০ রাণ।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া
পঞ্চম টেস্ট
তারিখ : ১৭, ১৮, ১৯, ২১ ও ২২শে আগস্ট
ওভাল

সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের খেলার মাঠ ওভাল। সারে ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৪৫ সালে। ঐ বছরই ওভালে

রমণ সুব্বারাও

টেড ডেক্সটার

ফ্রেডি ট্রুম্যান

তারা ক্রিকেট খেলার শুভ উদ্বোধন করে।

ইংল্যান্ডের দুই সেরা মাঠ—লর্ডস এবং ওভাল। এই দুটি মাঠই ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে'র প্রধান ঘাঁটি লর্ডস মাঠে এবং ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলা পরিচালনা করা হয় লর্ডস মাঠ থেকেই। তাই লর্ডস বড় কুলীন। কিন্তু ওভাল মাঠকে বাদ দিয়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলার ইতিহাস চিন্তা করা যায় না। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক 'এ্যাসেজ' কথার প্রথম ব্যবহার হয় ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠের টেস্ট খেলা উপলক্ষ্য ক'রে। ১৮৮০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ওভাল মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে টেস্ট খেলা হয়, সেই খেলাটিই ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা। ইংল্যান্ড স্বদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত এই প্রথম টেস্ট খেলায় ৫ উইকেটে জয়লাভের গৌরব লাভ করে। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ছিলেন লর্ড হ্যারিস এবং অস্ট্রেলিয়ার ডব্লিউ এ মার্ডক।

এক বছর পর ১৮৮২ সালে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড সফরে এসে এই ওভাল মাঠেই ইংল্যান্ডকে ৭ রাণে পরাজিত ক'রে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। ইংল্যান্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার এই প্রথম টেস্ট জয়। এই খেলায় ইংল্যান্ডেরই জয়লাভের ষোল আনা কথা ছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া নাটকীয়ভাবে ইংল্যান্ডকে ২য় ইনিংসের খেলায় অল্প রানের মধ্যে আউট ক'রে মাত্র ৭ রাণে জয়ী হয়। ইংল্যান্ডের পরাজয়ের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। খেলাটি প্রবল উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। সে দিন অনেকেরই বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে নি—অনেকেরই নিরম্বু উপবাসে কাটে। সমস্ত দেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে—এ যেন ইংল্যান্ডের জাতীয় শোক—অতি প্রিয়জনকে হারানোর শূন্যতা।

খেলার পরের দিন ৩০শে আগস্ট তারিখে ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত 'Sporting Times' পত্রিকা চারিপাশে শোকব্যঞ্জক কালো বর্ডার দিয়ে নীচের সংবাদটি প্রকাশ করে:

"In affectionate remembrance
of
English cricket
Which died at The Oval,
29th August, 1882.
Deeply lamented by a large
Circle of sorrowing friends and
acquaintances.
R. I. P.
N.B. The body will be cremated and the Ashes taken to Australia."

[উপরের সংবাদটি রচনা ক'রেছিলেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত 'Punch' ব্যঙ্গচিত্র পত্রিকার জনৈক সম্পাদকের পুত্র—শার্লি ব্রুকস]

এই ওভাল মাঠের প্রতিটি ধূলিকণা আবার ইংল্যান্ডের সাফল্যে ধন্য হয়ে আছে। এই মাঠেই ইংল্যান্ড ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এক ইনিংসে ৯০৩ (৭ উইকেটে) রাণ ক'রে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করে—সে রেকর্ড আজও অক্ষুন্ন আছে। ইংল্যান্ড দলের ৯০৩ রানের মধ্যে লেন হাটন একাই করেন ৩৬৪ রান—টেস্ট খেলায় এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড। সুদীর্ঘ ২০ বছর পর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গারফিল্ড সোবার্স নট-আউট ৩৬৫ রান ক'রে লেন হাটনের বিশ্ব-রেকর্ড ভংগ করেন।

ওভাল মাঠের বিবিধ রেকর্ডের মধ্যে ১৮৮০ সালের টেস্ট খেলা উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, 'গ্রেস' পরিবারের তিন ভাই—ডবলিউ জি গ্রেস (যিনি ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলায় জনক আখ্যায় নমস্য) ই এম গ্রেস এবং জি এফ গ্রেস খেলেছিলেন।

ওভাল মাঠের বিবিধ রেকর্ড

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

মোট খেলা ২১। ইংল্যান্ডের জয় ১১, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, খেলা ড্র ৬।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রাণ

ইংল্যান্ড : ৯০৩ রাণ (৭ উইঃ), ১৯৩৮ (বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ৭০১ রাণ, ১৯৩৪

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রাণ

ইংল্যান্ড : ৫২ রাণ ১৯৪৮

অস্ট্রেলিয়া : ৪৪ রাণ ১৮৯৬

এক ইনিংসে পাঁচ শতাধিক রাণ

ইংল্যান্ড : ৯০৩ রাণ (৭ উইঃ), ১৯৩৮; ৫৭৬ রাণ ১৮৯৯

অস্ট্রেলিয়া : ৭০১ রাণ, ১৯৩৪; ৬৯৫ রাণ ১৯৩০; ৫৫১ রাণ ১৮৮৪

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

ইংল্যান্ড : ৩৬৪* —লেন হাটন, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া : ২৬৬ ডবলিউ পোন্সফোর্ড, ১৯৩৪

* যে কোন দেশের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ।

সেঞ্চুরী সংখ্যা

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১৯টা

অস্ট্রেলিয়া পক্ষে : ১৩টা

উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১০৬ ও ১০০ রাণ—ডবলিউ বার্ডসলি, ১৯০৯

এক ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ড : লেন হাটন (৩৬৪ রাণ), লেল্যান্ড (১৮৭ রাণ) এবং হার্ডস্টাফ (১৬৯ রাণ), ১৯৩৮ সালে।

অস্ট্রেলিয়া : মার্ডক (২১১ রাণ), পি এস ম্যাকডোনাল (১০৩ রাণ) এবং এইচ স্কট (১০২ রাণ) —১৮৮৪ সালে।

১০নং খেলোয়াড়ের সেঞ্চুরী

১৮৮৪ সালে ইংল্যান্ডের ডবলিউ রীড ১১৭ রাণ করে এই বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

অল্পের ব্যবধানে জয়

ইংল্যান্ড : ১৯০২ সালে ১ রাণে জয়ী হয়।

অস্ট্রেলিয়া : ১৮৮২ সালে ৭ রাণে জয়ী হয়।

সর্বাধিক রাণে জয়লাভ

অস্ট্রেলিয়া : ১৯৪৮ সালে এক ইনিংস ও ১৪৯ রাণে জয়লাভ করে।

ইংল্যান্ড : (১) ১৯৩৮ সালে এক ইনিংস ও ৫৭৯ রাণে জয়লাভ করে।

(২) ১৮৮৬ সালে এক ইনিংস ও ২১৭ রাণে জয়লাভ করে।

একটা খেলায় সর্বাধিক উইকেট

১৪টা (৯০ রাণে) —এফ আর স্পোফোর্থ (অস্ট্রেলিয়া), ১৮৮২।
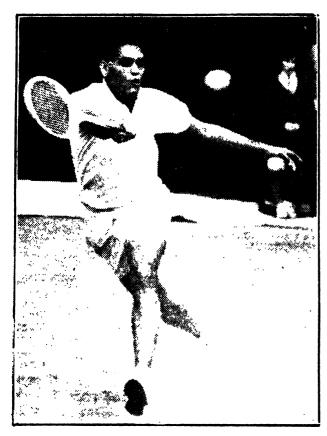
রমানাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ) অস্টেণ্ডের আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে জয়ী হন।

দুই শতাধিক রাণ

ইংলণ্ড : ৩৬৪—লেন হাটন, ১৯৩৮
অস্ট্রেলিয়া : ২৬৬ পোন্সফোর্ড, ১৯৩৪
২৪৪ ব্র্যাডম্যান, ১৯৩৪
২৩২ ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০
২১১ মার্ডক, ১৮৮৪

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

মালয়ের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বছর কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ বছর চতুর্থ বার্ষিক স্বাধীনতা দিবসের প্রতিযোগিতায় নয়টি দেশ যোগদান করে।

১৯৬১ সালের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ইন্দোনেশিয়া ২—১ গোলে মালয়কে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রেছে। প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫৮ সাল থেকে মালয় উপর্যুপরি ৩ বার চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছিল। তবে, ১৯৬০ সালে মালয় এবং কোরিয়া যুগ্মভাবে খেতাব লাভ করে।

'এ' গ্রুপের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ভিয়েৎনাম ২—১ গোলে 'বি' গ্রুপের ২য় স্থান অধিকারী সিঙ্গাপুরকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ ১—২ গোলে ভিয়েৎনামের কাছে পরাজিত হয়। প্রথমার্ধের খেলার ৩৬ মিনিটে ভারতবর্ষের পক্ষে ইয়ুসুফ গোল করেন। বিরতির সময় ভারতবর্ষ ১—০ গোলে অগ্রগামী থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভিয়েৎনাম ২ গোল দিয়ে জয়লাভ করে। বিপক্ষের গোলের সামনে অজস্র বল পেয়েও ভারতবর্ষের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা গোল দিতে পারেন নি। খেলায় এই মারাত্মক ত্রুটির জন্যে ভারতবর্ষকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সূচনা থেকেই ভারতবর্ষ বিপক্ষ দল ভিয়েৎনামকে কোণঠাসা ক'রে রাখে। ভিয়েৎনাম ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

গ্রুপ 'এ'

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিঃ	পঃ
মালয়	৩	২	০	১	৭	৫	৪
ভিয়েৎনাম	৩	২	০	১	৬	৬	৪
জাপান	৩	১	০	২	৭	৭	২
ভারতবর্ষ	৩	১	০	২	৪	৬	২

গ্রুপ 'বি'

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিঃ	পঃ
ইন্দোনেশিয়া	৪	২	২	০	৬	৪	৬
সিঙ্গাপুর	৪	৩	০	১	১০	৭	৬
হংকং	৪	১	২	১	৮	৮	৪
কোরিয়া	৪	১	২	১	৫	৪	৪
থাইল্যাণ্ড	৪	০	০	৪	৬	১২	০

জাপান ৩—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। এই খেলাতেও ভারতবর্ষ প্রথমে গোল দেয়। বল আদান-প্রদান এবং কৌশলের দিক থেকে ভারতবর্ষ দর্শকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু খেলায় যা চরম কাম্য সেই জয়লাভ থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়। ভারতবর্ষ লম্বা পাশে খেলে। অপর দিকে জাপানের খেলার ধরন ছিল, সরাসরি সরল পন্থায় বল খেলা। প্রথমার্ধের খেলায় এক গোলে পশ্চাদগামী থেকেও জাপান তার মনোবল হারায় নি। দ্বিতীয়ার্ধে জাপান খেলায় প্রাধান্য বিস্তার ক'রে তিনটি গোল দেয়। খেলায় পারদর্শিতা ছাড়াও জয়লাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন দলগত সংহতি এবং অটুট মনোবল। জাপান এই তিনটি বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

ভারতবর্ষ তার শেষ খেলায় 'এ' গ্রুপের শীর্ষস্থান অধিকারী মালয়কে ২—১ গোলে পরাজিত করলেও তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান লাভ ক'রেছে। ভারতবর্ষের পক্ষে গোল করেন প্রদীপ ব্যানার্জি এবং সমাজপতি। মোট ৩টে খেলার মধ্যে ভারতবর্ষের হার ২টো এবং জয় মাত্র ১টা। ভারতবর্ষ নিজ গ্রুপে সর্বনিম্ন স্থান লাভ করায় মূল প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে। 'এ' গ্রুপে মালয় এবং 'বি' গ্রুপে ইন্দোনেশিয়া শীর্ষস্থান লাভ করে। 'এ' গ্রুপে ছিল চারটি দেশ। 'বি' গ্রুপে খেলেছে পাঁচটি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
ফোন : ৫৫-৫২৩১
কলিকাতা—৩

সূচীপত্র

সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও
অফিস সংক্রান্ত ষ্টেশনারী
কাগজ বিক্রেতা ও প্রিন্টার্স
বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
৬৩ ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট · কলিকাতা-১
ফোন
২২-৪২২৩

সূচীপত্র

একটি উৎকৃষ্ট
হারিকেন
KISAN BRAND

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
২৯৯	পুরাতন লেখা (গল্প)	—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
৩০৩	রবার্ট ফ্লাহার্টি কাহিনী	—শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত
৩০৫	শরৎচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী	—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
৩০৯	হরতালের আগে-পরে (রসরচনা)	—শ্রীপ্রবুদ্ধ
৩১০	শব্দকল্পদ্রুম	—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
৩১১	পরিশোধ (উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৩১৬	গৃহকোণ	—শ্রীবীণা ভট্টাচার্য
৩১৭	দেশে-বিদেশে	
৩১৯	ঘটনা-প্রবাহ	
৩২০	সমকালীন সাহিত্য	—শ্রীঅভয়ংকর
৩২৬	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
৩৩২	খেলাধুলো	—শ্রীদর্শক

অমৃত

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড; ১৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 25th August, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের সরকারী নীতির একটা ভয়ঙ্কর দৈন্য রয়েছে, যে দৈন্য আজ পশ্চিমবঙ্গের বাজারে হাহাকাররূপে প্রকাশিত হচ্ছে। সাধারণ গৃহস্থঘরে মাছের মূল্যবৃদ্ধির ফলে অব্যবহিতভাবে যে দুর্দশা দেখা দেবে, সেটা সাংসারিক অনটন—বাজার-সংকুলান করায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর ব্যর্থতা। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এই সাংসারিক অনটন বা দৈনন্দিন বাজার-দারিদ্র্য মূল বা প্রধান সমস্যা নয়। সরকারী নীতির দৈন্য এইখানে যে, তাঁরা পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি কোনো ক্ষেত্রে, কোনো দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেননি। পণ্যের মূল্য, অর্থাৎ সাংসারিক ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য প্রতিটি পাঁচসালা পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগামিতা লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে গত দশ বৎসরের পরিকল্পনায় যে পরিমাণে পণ্যসম্ভারের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে, প্রায় সেই অনুপাতেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। তার অর্থনৈতিক কারণ দুটি —(১) ফাঁপাই মুদ্রার আক্রমণ; (২) ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মিশ্র অর্থনীতিতে পরিকল্পনাবদ্ধ উন্নয়নের জন্য এই দুটি উপসর্গ দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু পরিকল্পনার প্রসাদ কিংবা কল্যাণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য থেকে এই দুটি উপসর্গ যাতে জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করতে না পারে তারজন্য পরিকল্পনার মধ্যেই সাধারণতঃ কতকগুলি প্রতিষেধক ব্যবস্থা রাখা হয়। ভারতবর্ষে সরকারী নীতির প্রাথমিক দৈন্য এইখানে যে, সেই প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলিকে কার্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা বা সৎসাহস কোনোটাই গভর্ণমেন্ট যথোপযুক্তভাবে দেখাতে পারেন নি।

দ্বিতীয় দৈন্য এইখানে যে, খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের পরিকল্পনাগুলি শুধু চাল, ডাল ইত্যাদি তন্ডুলজাতীয় পদার্থ উৎপাদনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বৃদ্ধি এবং নাগরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের খাদ্যের যে স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়, সেদিকে সরকার বিশেষ রকম মনোযোগ দেননি। সাধারণ মানুষের যদি টাকার অঙ্কে কোনো আয়বৃদ্ধি ঘটে, কিংবা সে যদি গ্রামচ্যুত হয়ে নগরের অধিবাসী হয়, তাহলে তার দৈনন্দিন আহার্যতালিকার পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। এই পরিবর্তন সমাজের পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে যেমন অনিবার্য, তেমনি প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ যেখানে গ্রামের মানুষের এবং বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষের আহার্য প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকে তন্ডুলজাতীয় দ্রব্যে এবং শাকসব্জীতে, সেখানে সহরের অধিবাসীরা, মধ্যবিত্তরা এবং শিক্ষিত লোকেরা স্বভাবতই আহার্যতালিকায় তন্ডুলের পরিমাণ অপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য বা প্রোটীনজাতীয় খাদ্যের পক্ষপাতী। এই পক্ষপাত সুষম আহার্যের জন্য যেমন একান্ত প্রয়োজন তেমনি দেশের স্বাস্থ্যশ্রী বর্ধনের জন্যও প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে আহার্য নির্বাচনে যে কোনো সভ্য দেশে জনসাধারণকে এই দিকে, অর্থাৎ সুষম পথ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্যের দিকে উৎসাহিত করা হয় এবং সেই উৎসাহিত করার কাজ প্রধানত সরকারের। কিন্তু এ দেশে অন্নের অনটন মেটাতে গিয়ে সরকার এত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত যে, জনসাধারণকে প্রোটীনজাতীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যের দিকে উৎসাহিত করা তো দূরে থাকুক, স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ বা চাহিদা দেখা দিচ্ছে, সেই অনুযায়ী সরবরাহে কিংবা সরবরাহের পরিকল্পনায়ও সরকার বহুলাংশে ব্যর্থকাম।

মাছের অস্বাভাবিক দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। বাঙালী মাছের কাঙাল এবং মাছের যোগান বাজারে কম পড়েছে বলে তার আব্দারের চীৎকার উঠছে— একথা ভেবে সমস্যাটিকে উপেক্ষা করা যায় না। বাঙালীর মাছের জন্য কাঙালপনার প্রশ্ন বাদ দিয়েও মনে রাখতে হবে যে, পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে যেখানে দুধ দুষ্প্রাপ্য, ডিম দুর্মূল্য এবং মাংস দুর্লভ সেখানে মাছের উপরে জোর দেওয়া বাঙালীর পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় মাছ, ডিম, দুধ ও মাংসের সরবরাহে কোনো লক্ষণীয় উন্নতি ঘটেনি। অথচ ইতিমধ্যে সহরবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্যাভাসে অধিকতর যুক্তিবোধ দেখা দিচ্ছে। শুধু তন্ডুলজাতীয় কতকগুলি দ্রব্য মানুষকে গিলিয়ে এবং হাসপাতালে মাথাপিছু রোগীর জন্য ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়ে কোনো জাতই বাঁচতে পারে না, কিংবা বড় হতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, এখনো

আমাদের দেশে চালের দুর্ভিক্ষকে যত বড় সংকট এবং সমস্যা বলে জ্ঞান করা হয়, এই দ্রব্যগুলির অভাব বা দুর্মূল্যতাকে তত বড় বিপদরূপে জ্ঞান করা হয় না। শুধু সরকারের কথাই নয়, জনসাধারণের তরফ থেকেও এই দুষ্প্রাপ্যতা কিংবা দুর্মূল্যতার প্রতিবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য দাবি রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় রকম গুরুত্ব আজ পর্যন্তও পায়নি। কিন্তু যদি খাদ্যের গুণগত অভাব এবং মূল্যবৃদ্ধির এই সমস্যাকে জনসাধারণ, রাজনৈতিক দলগুলি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট গুরুত্ব না দেন তাহলে অর্ধমৃত, যক্ষ্মাকীর্ণ এবং পুষ্টিহীন কয়েক কোটি লোকের জন্য ইস্পাতের কারখানা, গ্যাসের পাইপ, ১৩ তলা সেক্রেটারিয়েট ভবন কিংবা দুর্গাপুরের জৌলুষ তৈরী করে কিছু লাভ হবে না। স্বাস্থ্যহীন লোকের পক্ষে এই জৌলুষগুলি মর্মান্তিক পরিহাসরূপে দেখা দিতে পারে।

কাব্যচিন্তা

দীনেশ দাস

॥ জীবন ও সাহিত্য ॥

জানতাম, জীবনের প্রতিবিম্ব
উপন্যাস কবিতাসম্ভার।
সাহিত্যের প্রতিবিম্ব এ জীবন কিনা—
মনে মনে ভাবি বারবার ॥

॥ জীবনের অর্থ ॥

নীতি খোঁজে অধ্যাপক-শিক্ষকেরা ঠিক,
তত্ত্ব খুঁজে বের করে প্রৌঢ় দার্শনিক।
জীবনের মানে কিছু আছে কিনা আছে—
কবি, শিল্পী খোঁজ করে—দিশা পায় না যে ॥

॥ বুদ্ধি ॥

বুদ্ধির ধারাল ক্ষুর
কেটে কেটে কুচি কুচি করে।
বোধির আলোয় কবি দেখে শোনে,
অনুভূতি দিয়ে শুধু গড়ে ॥

॥ কল্পনা ॥

বস্তু হ'তে কবির কল্পনা
কবি-কল্পনায় দেখি সৃষ্টি হয় নতুন বাস্তব ;
তার কাছে বস্তুময় পৃথিবীর সব
ফাঁকা হয়, শূন্য, অবাস্তব ॥

অন্তরীণ

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

অন্ধকারে বসে আছি স্মৃতিভ্রষ্ট উন্মাদের মতো।
সম্মুখে প্রদীপ্ত রশ্মি। বন্ধ এই জানালা-দরোজা
প্রাচীন হারেমে আমি অবরুদ্ধ। শস্ত্রবাহী খোজা
সতর্ক প্রহরা দিচ্ছে। অস্ত্রাঘাতে শরীর বিক্ষত।

নিয়ত শ্রবণে বাজছে তীক্ষ্ণধার অসির ঝঞ্ঝনা
উৎক্ষিপ্ত কামনা যেন ঊর্ধ্বমুখ ইস্পাতের ফলা
নিরন্তর চক্ষে আঁকে লোভ ক্ষরক্ষতির বঞ্চনা
অন্তরে সুপ্তিতে মগ্ন আবাল্যের সুকুমার কলা।

যুথভ্রষ্ট একাকীত্ব। অন্য কোনো কারার নিভৃতে
হয়তো আমারই কোনো বিড়ম্বিত সঙ্গী পড়ে আছে
লাঞ্ছিত যৌবনে প্রেম বক্ষে চেপে; অন্তর্দাহনে
পুড়ে যাচ্ছে সর্ব অঙ্গ; ক্রমাগত টেনে নিচ্ছে
নিয়তিকে কাছে।

আমাদের উপচ্ছায়া জাফরিকাটা জানালা খিলানে
আলিন্দ চত্বরব্যাপী অস্থিচূর্ণে যোজনবিস্তারী।

মানসিক

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

যে উত্তাপ তুমি দিলে
সে উত্তাপ শারীরিক নয়।
যখন আমার মন
নিরাশার শীতল সংশয়ে
জমে গিয়ে পড়েছিল
এক খণ্ড বরফের মতো,
তোমার মনের স্পর্শ,
সান্ত্বনার বাক্যের প্রলেপ,
হৃদয়ের আবেগ-উষ্ণতা
সে-তুষারে করেছিল
প্রাণের সঞ্চার;
গলে জল হ'ল মন—
ময়ূরাক্ষী নদী,
সেখানে শ্রাবণ এল
বৈশাখেই যেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২১।১।৬০

রেমব্রান্ট, হল্স্, হবেমা, স্টীন, ভার্মিয়ার—এঁরা হল্যান্ডের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বসেও খেতে পেলেন না। হবেমাকে ত ছবি আঁকা ছাড়তে হয়েছিল। হুক্ এবং রুইসডেল—এঁদের ছবি তাঁদের সমসাময়িকরা পছন্দ করতেন না। ফণ্ডেল, ওলন্দাজদের শ্রেষ্ঠ কবি, রেমব্রান্টের ছবি মোটেই কদর করতেন না। অথচ শুনেছি যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজদের জনসাধারণ ছবি কিনতেন, বিক্রী করতেন, ব্যবসা করতেন; সে যুগের সাধারণ লোক ছবি collect করতেন। তবু সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টদের অন্ন জুটত না। অতি অল্প বড় আর্টিষ্টরা ছবি থেকে লাভবান হয়েছেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর আন্তরিক বিবাদ আছে।

রাশিয়ার কিন্তু অন্য কথা; অবশ্য সেখানে ভালো ছবি মোটেই হচ্ছে না। তা না হোক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছবিরও চাহিদা খুব বেশী, এবং সেখানে দর কষাকষি নেই, competition নেই। তবু, তবু, ওখানে প্রথম শ্রেণীর ছবি হচ্ছে না কেন? regimentation? জারের সময় তাই ছিল, আর যদি জারের সময় cultural freedomই ছিল তবু সেখানে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে, ঐ ধরণেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী জন্মাত কেন? রাশিয়ায় সাহিত্য শিখরে উঠল, চিত্র উঠল না কেন? দুটো কিংবা তিনটে আর্ট একত্রে ওপরে উঠতে পারে না?

২৩।১।৬০

সত্য কথা লেখা অসম্ভব দেখছি। ভদ্রতায় অত্যন্ত বাধে। তাই ভাসা-ভাসা লিখতে হয়; বরঞ্চ কিছু বলা যায়, কিন্তু তার বেশী আমার দ্বারা লেখা চলে না। বোধ হয়, কারুরই চলে না। এড়িয়ে চলতেই হয়। অথচ কোনো একদিন সত্য কথা লিখতেই হবে। আজ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুরবস্থা হোলো কেন? কিছু না কিছু সত্য কথা

না লিখে উপায় নেই। প্রথম দিন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত আছি, আমাদেরই হাতে এটা গড়েছি, আলিগড়ে যাবার সময় থেকে এর পতন শুরু হয়েছে। ত্রিশ বৎসর লাগল গড়তে, চার বৎসরে হোলো অবনতি, এবং বাকি পাঁচ-ছয় বৎসরে ধূলিসাৎ।

প্রথম প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তার Vice-Chancellor-এর জন্য। প্রথমে এলেন শ্রীজ্ঞান চক্রবর্তী। তাঁর একটা অভিজাত মর্যাদাজ্ঞান ছিল। তাঁর সংগে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা Executive Council-এর সভ্য থাকতেন। শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ছিল, কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়নি। দোষত্রুটি ছিল না বলছি না, কিন্তু মোটের ওপর আমরা প্রথম থেকেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছি। এবং সেই ধাক্কায় প্রায় পনের বছর আমরা কাটালাম। তার পরে আমাদের ঠিক অবনতিও হয়নি, উন্নতিও হয়নি। কিন্তু সেই সময় থেকে তারও পরে আমাদের অবনতি শুরু হয়। একজন Vice-Chancellor এলেন তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগে কোনো সম্পর্ক রাখতেন না; সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতেন না; ছাত্ররা কি করছে না করছে, শিক্ষকেরা ছাত্রদের সংগে কোনো প্রকার সম্বন্ধ রাখছে কি না, জানতেন না। ভদ্রলোক ছিলেন সামন্তপন্থী। বেলা এগারটা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন, এবং ঘুম থেকে উঠে পুতুল খেলতেন। অবশ্য সে সময়টা ছিল বিপ্লবের যুগ। কিন্তু কিছুদিন পরে এলেন আচার্য নরেন্দ্রনাথ। তিনি আমাদের সুবর্ণযুগ। ছাত্র ও শিক্ষকদের, তাদের মধ্যে ভাল শিক্ষকদের, সংগে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হোলো। অত ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে কত না অনুষ্ঠানের সুযোগ হোল। প্রতিদিন সভা-সমিতিতে আমরা যেতাম, আমরা কেউ দিনের বেলা ঘুমোতুম না, সারাদিন পড়তাম, পড়াতাম, আলাপ-আলোচনা করতাম। সন্ধ্যার সময়ও তাই। মধ্যে মধ্যে অসুখে পড়তেন, কিন্তু কি অসম্ভব পরিশ্রমই না করতে পারতেন। সপ্তাহে ২।৩ দিন আবার ছাত্রদের পড়াতেন। অনেক politics করেছেন জীবনে, কিন্তু একটি দিনের জন্য তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাতে হস্তক্ষেপ করেননি। আমি Arts Faculty-র পাঁচ বৎসরের ওপর লেকচারারের নির্বাচন-সমিতির সভ্য ছিলাম, প্রায় চল্লিশ জনের ওপর আমরা, তাঁদের নির্বাচন করতে হোতো, কিন্তু বোধ হয় দুজন ছাড়া তাঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর; এবং সে দুজনই একটু কিন্তু কিন্তু করেছিলেন। এই ধরণের অধ্যক্ষ আমাদের ছেড়ে কাশী বিদ্যালয়ে চলে গেলেন! মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল এবং শ্রীপ্রকাশ তাঁকে বল্লেন যে, লক্ষ্ণৌ বেশ চলছে, কাশী উচ্ছন্ন যাচ্ছে, আপনি সেইখানে যান। কাশী বিদ্যাপীঠের ওপর তাঁর ভীষণ ঝোঁক ছিলো। তিনি কাশী বিদ্যা-পীঠেরই ছিলেন অধ্যক্ষ, সেই প্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁর প্রিয়। কিন্তু সেখানে থাকতে পারলেন না, তিনি অত্যন্ত sensitive লোক, তাই তাঁকে চলে আসতে হোলো। তাঁর শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ল।

তাঁর পরেই এলেন আচার্য যুগল-কিশোর, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (দু বৎসরের জন্য) এবং সুব্রহ্মণ্য আয়ার। এঁদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না। তবে আলগোছে দুকথা না বলে থাকতে পারছি না। এঁদের প্রত্যেকের সময় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠল পলিটিকস, যাকে খেউড় বলে। মাত্র দুজন ছাড়া বাইশ জন Executive Councillor একজন মন্ত্রীর হাতের পুতুল। Academic Council-ও প্রায়ই তাই হয়ে উঠল। লেখাপড়া গেল উঠে, এল কেবল তরফদারী। সেই সংগে অনেক পুরানো লোক চলে এলেন। আমি যখন আলিগড় যাই তখন তেরজন বয়স্থ অধ্যাপক অবসর গ্রহণ করলেন। ছেলেছোকরাদের দল ওপরে উঠল। আমি নিজে কুড়ি বৎসরের ওপর লেকচারার ছিলাম; এখন পাঁচ বছরেই রীডার আর প্রোফেসার! এটা হোলো কেন? তাদের ঠেকিয়ে রাখা যেত যদি অধ্যক্ষ এবং তাঁর বন্ধুরা তাঁদের অত সহজে ঠেলে না তুলতেন। আমরা দু-দলই দায়ী, কিন্তু যদি বেশী দায়ী হয় ত' এঁরা। দু'একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ছাড়া প'নের বছরের পূর্বে রীডার-প্রোফেসার হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। না খেতে পেয়ে লেকচারার থাকা মঙ্গল।

অনেক কথা আমার বলা উচিত ছিল কিন্তু বন্ধুবাৎসল্যের জন্য পারলাম না। ছাত্রদের কেন দোষ দিই? গোড়ায় গলদ আমাদেরই। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর লোক, এবং তৃতীয় শ্রেণীতেই থাকব। সেই তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকদের ছাত্ররাও চতুর্থ শ্রেণীর হবে। তাঁদের হচ্ছে Mass Culture! কোনো উপায় নেই। এই থাকবে। উপায় বাৎলে দিতে লোকে বলে। কিন্তু না দেওয়াটাই উচিত। অনেক বাগবিতণ্ডার পর এক চীনে পণ্ডিত বল্লেন, 'কাদাটা থিতোতে দেওয়াই ভালো।'

লিখতে লিখতে মনে হোলো বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার মনে দুঃখ না হওয়াই উচিত। ছাত্র ও শিক্ষক মিলে-মিশে যাবে, সরকার একটা সমিতি বসাবে, কিছুই হবে না, ছাত্ররা আবার অসভ্যতা করবে—এই চলল। উগ্রতা একটু বেশী বাড়বে—এই যা।

২৯।১।৬০

আকাশে-বাতাসে একটা মধুর চাঞ্চল্য দেখলাম। ইডেন উদ্যানে খেলার ভিড়; আমিও শুনেছি। কাণপুরে জিতেছি, কিন্তু তার বেশী আর পারব না। ক্রিকেট খেলা এখন feudal নয়; এটা space-এর খেলা। প্রকাণ্ড জমি, একদিন থেকে পাঁচদিন, সময়ও বড়; outfield প্রকাণ্ড। আর বাইশজন খেলোয়াড়, তারা খেলে, তারা জেতে, তারা হারে, কখনও কখনও draw হয়। সব চেয়ে মজা হোলো it is criket, অর্থাৎ কি হবে বলা যায় না। একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে দুই দলের। সেই জন্যে চঞ্চলতা। বাংলায় রেডিও সমাচার বেশ ভালো লাগল।

৩১।১।৬০

এক অদ্ভুত মজা লাগল। একটি ছেলে এল, তার 'মনে এলো' ভালো লাগে, তাকে আমার ডায়েরী পড়তে দিলাম। উল্টে-পাল্টে পড়লে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নাম দেবো?' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, 'লেখাটা গুরু-গম্ভীর, কিন্তু নাম দেওয়া উচিত হালকা।' 'কি হওয়া উচিত?' আবার চুপ করে থেকে বল্লে, 'নিভৃত চিন্তা।' আমি বল্লাম, 'কালিপ্রসন্ন ঘোষের বইখানার নাম তাই।' 'তা হোলে, হালকা নামই রাখুন......নাম হবে 'ঝিলিমিলি।' আশ্চর্য এই, আমিও ঠিক ঝিলিমিলি নামই রেখেছি। ছেলেটি আমার এই নাম জানত না। দুজনের এই অভূতপূর্ব নামকরণ দেখে অবাক লাগল। ঝিলিমিলি নামটা বেশ লাগছে। আলো সূর্য, পরকলা—আলো হোলো মনের, সূর্য হোলো আলোর আর পরকলা হোলো আলো ও সূর্যের প্রতিবিম্ব। মনে

এলো' বইএর রচনা। ঝিলিমিলি হোলো মাত্র মনের আভাস।

২।২।৬০

আমাকে একজন বল্লেন, 'আপনার পুরানো কথাগুলি সাজিয়ে লিখুন না? অনেক লোকের ভালো লাগবে নিশ্চয়। তারা অনেক কথা জানতে চান।'

আমি উত্তর দিলাম, গুছিয়ে লেখা আমার সাধ্যাতীত। খান পাঁচ-ছয় গুছিয়ে লিখেছি, বাকী সব প্রবন্ধ। আর এখন লিখছি টুকরো টুকরো। দ্বিতীয় কথা এই—'ভালো লাগবে নিশ্চয়' কথাটির অর্থ নেই। আমি জানি যে, পাঠকবৃন্দের ভালো লাগবে না। জোর চার-পাঁচশ জন পড়বে, তার বেশী মোটেই নয়। এই পাঁচশ জনের নিশ্চয়তার মূল্য কি? যদি পাঁচ হাজার হোতো তবে সখ্যা গুণে পরিণত হোতো। তৃতীয় কথা—লেখা ঘনতর হয়ে আসছে। মন্ত্রের মতন লেখাই আমার আদর্শ। অতএব গল্প বলে কি হবে? রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জহরলাল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রফি আহমাদ কিদ্‌ওয়াই, আচার্য নরেন্দ্র দেব, ডাঃ কাটজু, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, অতুল গুপ্ত—এঁদের সম্বন্ধে অনেক লিখতে পারি। এ-ছাড়া সত্যেন বোস, মেঘনাদ, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখুজ্যে, বীরবল সাহানী, রাধাকুমুদ, রাধাকমল, নির্মল সিদ্ধান্ত, আওবেশ নারায়ণ, করম নারায়ণ, ডাঃ রাও, কোশাম্বী প্রভৃতিরও নাম যে করতে পারি না তা নয়। তাঁরা আমার মনেও আসেন। কিন্তু অত কথা কেনই বা লিখতে চাই। তাঁদের জেনেছি, চিনেছি, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি এই যথেষ্ট। তা ছাড়া ব্যাপারটা এই, ঠিক সত্য কথা কি তাঁদের সম্বন্ধে বোলতে পারি? কলমের চাপে, তার খোঁচায় একটু ত বদলে যাবেই। আমি চাই হুবহু সত্য কথা বলতে—তা পারি না।

তাই কেবলই মনে হচ্ছে, বুঝি বা ভদ্রতায় আটকাল! সে-যুগের লেখা ছিল ভদ্র। বাংলা সাহিত্যের লেখা মোটামুটি এখনও তাই। আমি সেটার ব্যতিরেক করতে পারি না।

৭।২।৬০

সুধীন (দত্ত) আমাকে বলে এলিয়টে Cristian Grace অপেক্ষা উপনিষদের অংশই বেশী। চমকে উঠলাম। তবে সে যা বলছে, তার মধ্যে বিস্তর কথা রয়েছে। তার মতে, এলিয়টের মূল বক্তব্য Love, প্রেম, Gr. নয়। কিন্তু প্রেমের অন্তরালে Grace রয়েছে। অবশ্য প্রেম বড় আরো বড়। তাও না হয় হোলো কি উপনিষদে প্রেম, Love, জিনিসটা মনে হয়। সে বলে আছে। বই পড়ে দেখতে হবে। আছে ওজস, জিজ্ঞাসা জ্ঞান ও সর্বশেষে শান্তি। এলিয়টের মধ্যে আছে জিজ্ঞাসা, কিন্তু জিজ্ঞাসার অবসানে রয়েছে বিরোধের অস্তিত্ব জ্ঞান এবং জ্ঞানের শেষে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নয়। উপনিষদের শান্তি আনন্দময়। আনন্দ ফিরে এসে শান্তিতে পরিণত হল। আদৎ কথা, এলিয়টের জ্ঞান দর্শন নয়। কি সেটা বুঝতে পারছি না। ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। সুধীন ভাবিয়ে তুলেছে।

১৮।২।৬০

অঙ্গার দেখে এলাম। এ-ধরণের নাটক বাংলাদেশে আছে বলে মনে হয় না। মারাহাট্টা ভাষায় আছে না কি? নাট্য মঞ্চের সাজ সরঞ্জাম, যাকে production ও stage-craft বলে চমৎকার। শেষ দৃশ্যটি অপূর্ব। নাটকত্ব রয়েছে—কিন্তু আমার বলবার কথা আছে। দফা-পিছু সাজাচ্ছি।

(১) প্রথম দৃশ্যে বিনুর এক দৃশ্যেই মারা পড়ল। আরম্ভটা খাসা, কিন্তু প্রথম দৃশ্যের শেষেই মারা গেল কেন? তার চরিত্রটা এক হিসেবে সম্পূর্ণ। তা যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে তার দরকারই কি ছিল?

(২) রূপা নিতান্ত অপরিণত, এবং তাই রয়ে গেল। মানুষে, যদিও মেয়ে-মানুষ, সর্বদাই অপরিণত থাকবে এমন কথা জীবনে চলে, নাটকে চলে না। নাটকে পরিণতি চাই।

(৩) হাবিলদার (উৎপল দত্ত) অসম্পূর্ণ। পরিণতি নিশ্চয়ই আ
কিন্তু বিরোধ, যেটা পরিণতি
ভাল করে ফোটেনি। পরিণ
হঠাৎ হোলো। মারধোর
সঙ্গে এই ধরণের আ
আবার বলি, জী
নাটকে নয়।

(৪) বিন
নেই—না
সঙ্গে স
(
সা
ক

ছেলেরা ভালো অভিনয় করে (এক রূপা ছাড়া, মোটেই তাঁকে মানায়নি, লেখকেরও দোষ আছে)। বিনুর মা সনাতন, বিনু এবং দুচারটি ছোট পাত্র সত্যই খুব ভালো। নাটক হিসেবে এ-গুলি সম্পূর্ণ ও পরিণত। বাহাদুরী আছে সনাতনের এবং তারই পরে বিনুর মা'র। দলের (Group) গোছান বেশ। কয়লার খন্দরে যখন ডুবে মরছে, তখন মানুষ এক হয়ে গেল। সনাতন সকলকে এক করে ফেল্লে। পাগল হয়েও গোটা মানুষ। সনাতনই নাটকের নায়ক।

অত্যন্ত ভালো লাগল অনেক ছোট্ট-খাট্ট কথা। চাঁছাছোলা কথাবার্তা, নিতান্ত স্বাভাবিক, সেই জন্যে সত্যকারের আর্ট। গোটাভাবে অবশ্য তা নয়।

তাই বলছি অঙ্গার ভালো লেখা এবং ভালো অভিনয়। এই ধরণের জিনিষ বাংলায় নেই। এবার কি সত্যই বাংলা নাটকের মোড় ফিরবে? উৎপল দত্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রায় এক মাস চলছে আশ্চর্য হয়েছি।

২০।২।৬০

কেন জানি না, বহুদিন প
তিন বৎসরের ওপর, Zuric
মনে হচ্ছে। একজন
আসে। ক
এলেন,
বেশ

বাঘে মানুষে

হীরালাল দাশগুপ্ত

সকলেই জানেন, বাঘ হরিণ বরাহ ইত্যাদি বনের জানোয়ার ধরে খায়। বনে জানোয়ারের অভাব হলে মানুষ খায়। গহন বন থেকে বাঘেরা তখন নেমে আসে বস্তি-সংলগ্ন জঙ্গলে। এই মানুষ-খেকো বাঘেরা এক জায়গায় বা এক অঞ্চলে বেশী দিন থাকে না। বিশ তিরিশ মাইল দীর্ঘ এলাকার মধ্যে এরা বিচরণ করে। কখন কোন্ বস্তিতে যে এদের আবির্ভাব হবে কেউ জানে না। সুতরাং এই বিশ তিরিশ মাইল দীর্ঘ এলাকার সমস্ত বস্তিতে একটা সর্বক্ষণের ত্রাস ও আতঙ্ক জেগে থাকে।

দাক্ষিণাত্যের পর্বতছায়ায় এমনি একটি পল্লী। সম্মুখে প্রান্তর। মাঝে মাঝে গাছপালা। গাছের পাতায় সকালের রোদ ঝিকমিক করে। ছেলে-মেয়েরা খেলা করে অস্ত-রবির সোনালী আলোয়। জ্যোৎস্না-ধারা গায়ে মেখে আঙিনায় বসে। দুপুরে রাখালছেলেরা গোরু চরায়। কেউ বা বাঁশী বাজায় প্রান্তরের গাছের ছায়ায়। বিষাদের লেশটুকুও নেই কোথাও।

কদিন থেকে একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছে ঘরে ঘরে। বাঘে মানুষ খেয়েছে অদূরে পাহাড়ের নীচে। বাপ-মায়েরা ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত ছেলেদের ডেকে আনে ঘরের ভিতরে। বাতাসের শব্দে শঙ্কা জাগে।

সন্ধ্যা নেমেছে। রমা ঘরে নেই।

রমা, রমা, রমা—বাপ মা ভাই সকলে ডাকছে-

রমা, রমা, রমা! সাড়া নেই। আঙিনার প্রাচীরের দরজা খোলা। রমা কি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছে।

হয়ত খানিক আগে রমাই কিন্তু কণ্ঠে ডেকেছিল তার বাবাকে! রমা কিশোরী তরুণী।

রমার সন্ধান চলল পল্লীর চতুঃসীমানায়, খামারে, কুয়োর ধারে, বাগানে সর্বত্র। প্রতিবেশীরা জুটেছে। সকলেই ত্রস্ত ভীত।

সন্ধান নিষ্ফল। রমার পিতা আর্তনাদ করে উঠল। রমাকে বাঘে নিয়েছে!

পঞ্চাশজন লোক দুটো গাদা বন্দুক, বিভিন্ন হাতিয়ার আর লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শেষ রাত্রি পর্যন্ত সন্ধানে কোনো ফল হল না! সে-রাত্রে বস্তির চোখে ঘুম ছিল না।

পরদিন।

অর্ধ মাইল দূরে। একটা কাঁটা গাছে ভোরের হাওয়ায় উড়ছে একখানা ছেঁড়া শাড়ী। রমার দেহের চিহ্ন নেই কোথাও। পাথুরে জমি। বাঘের পায়ের ছাপ পড়েনি কোথাও।

রমা হারিয়ে গেল। বস্তির চাঞ্চল্যও প্রায় থেমে গেছে।

এমন সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটল। পল্লী থেকে ক্রোশ দুই দূরে অরণ্যের ভিতরে।

ধোপারা দুই ভাই। রোজ পাহাড়-ঘেরা একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যেত কাপড় কাচতে। তিনটি গাধা বয়ে নিয়ে যেত কাপড়। আবার দিনশেষে কাপড়ের গাঁটি পিঠে নিয়ে ফিরে আসত বস্তিতে। মাঝখানে তিনটি গাধা—সামনে ও পেছনে দুই ভাই।

অপরাহ্ণ কাল। সূর্যাস্তের বেশী বিলম্ব নেই। বনের ভিতর ধূসর ছায়া নেমেছে। জ্যেষ্ঠ সামনে, আর কনিষ্ঠ ভাই পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করে এগোচ্ছে।

অকস্মাৎ সেখানে উল্কাপাত হল!

পাহাড়ের আড়াল থেকে এক ঝলক আগুন যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যেষ্ঠের উপরে! একটা ক্ষীণ আর্তনাদ ডুবে গেল একটা গম্ভীর গর্জনের আওয়াজের ভিতরে। গাধা তিনটি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো। ঘটনাটা ঘটে গেল কনিষ্ঠের বিস্ময় আতঙ্কিত দৃষ্টির সম্মুখে, এক লহমায়।

ছোট ভাই প্রায় পাগল হয়ে গেল! সে ছুটলো পেছনে জলাশয়ের দিকে!

কোনদিকে বস্তির নেই। জন-মানবের চিহ্নমাত্র নেই!

রাত এক প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ওরা ফিরে এল না। দুই ভাইর স্ত্রী ছুটলো বাড়ী বাড়ী। জনা পঁচিশেক হাতিয়ারধারী লোক লণ্ঠন জ্বালিয়ে এগোল পাহাড়ী জলাশয়ের দিকে।

প্রথমে দেখা গেল একটি গাধা। কাপড়ের গাঁটি পিঠে নিয়ে শুয়ে আছে বনপথ থেকে খানিকটা দূরে। খান্নুকে পাওয়া গেল জলাশয়ের ধারে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে! মুখে ফেনা! চেতনা নেই বললেই চলে।

দুটি অভাগিনী নারীর কান্নাকাটি ও সেবাযত্নের অর্ধঘণ্টা পরে রাম ভাঙা গলায় জানালো অঘটনের কাহিনী।

সে রাত্রে আর কোনো সন্ধান মিললো না।

পরদিন সকালে। আর দুটো গাধাকে পাওয়া গেল। তাদের পিঠেও কাপড়ের বোঝা তেমনি ছিল।

আরো খোঁজার পরে পাওয়া গেল শ্যামুর একখানা হাত, একটা পা আর রক্তাক্ত মাথাটা। বাকী দেহটা বাঘে খেয়ে ফেলেছে। হয়ত কোনো কোনো অংশ পরে অন্য জানোয়ারে খেয়েছে!

পাহাড় পল্লীগুলিতে ত্রাস আর আতঙ্কের সীমা নেই।

কিছুদিন সব চুপচাপ। বাঘের কোনো খবর নেই! রোজ সকালে সূর্য ওঠে। পাখী ডাকে। ফুল ফোটে। জ্যোৎস্না নামে প্রান্তরে। প্রকৃতির কোথাও এতটুকু গ্লানি নেই।

তারপর বাঘের দৌরাত্ম্যের আর একটা খবর এল তিন-চার মাইল দূর থেকে। এবারে আর মানুষ নয়। একটা চলন্ত গোরুর গাড়ী থেকে একটা বলদকে টেনে নিয়ে গেছে বাঘ। গাড়োয়ান পালিয়েছে।

পরদিন গাড়ীটা পাওয়া গেল ঘটনা-স্থলেই। একটা বলদ তখনও বাঁধা রয়েছে গাড়ীতে। রক্তের দাগ আর বিকৃত বলদ-টার দেহাবশেষ পাওয়া গেল মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। জীবিত বলদটার বিমূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে বসেই বাঘ প্রথম বলদ-টাকে খেয়েছে!

মানুষ-খেকো বাঘের খবর পেয়ে শিকারে এসেছেন এণ্ডারসন সাহেব। নির্দিষ্ট বাংলোতে একাকী তাঁর কামরা।

সেখানে পেণছে এণ্ডারসন পার্টি দেখলেন পাঁচদিন আগে সেখানে এসেছেন দ্'জন শিকারী। দ্'জনেই তরুণ। সংগে আছে মোটরগাড়ী। এই পূর্বতন শিকারীরা জানালেন যেখানে ধোপাকে বাঘে খেয়েছে সেখানে দু'দিন ধরে মোষ বেঁধে রাখা হচ্ছে।

বেলা তখন দশটা। জঙ্গল থেকে মোষের খবর নিয়ে ফিরে আসেনি কুলীরা।

প্রাচীন শিকারী এণ্ডারসন দ্বিধাগ্রস্ত। এই দুইজন অসমসাহসিক যুবক শিকারীর আয়োজন ও উদ্যমের পুরস্কার তাঁদেরি প্রাপ্য। এখানে এণ্ডারসন পার্টির নাকগলানো সংগত নয়।

যুবকদ্বয় কিন্তু এণ্ডারসনকে সাগ্রহে আহ্বান জানালেন। বললেন, পরদিন তাঁদের ফিরে যেতেই হবে। একটা দিন একটু কণ্ট করে সকলে একসংগেই থাকবেন।

অগত্যা এণ্ডারসন সম্মত হলেন। স্বাচ্ছন্দ্য শিকারীদের জন্য নয়।

বাংলোতে চা'র সংগে গল্প-গুজব চলছে। তখন জংগল থেকে ফিরে এসেছে কুলীরা। তারা সকলেই উত্তেজিত। 'বাঘে মোষ খেয়েছে!' এই তাদের খবর। বাঘকে প্রলুব্ধ করতে যে মোষ বেঁধে রাখা হত জঙ্গলে, এ সেই মোষ।

সকল শিকারীই জানেন এই খবরের তাৎপর্য। তিনটি শব্দের একটি খবরে শিকারীদের চেহারা মুহূর্তে বদলে গেছে। তাঁদের চোখে বদলে গেছে প্রান্তরের রূপ।

একটি তরুণ শিকারী এণ্ডারসনকে বললেন, 'এ শিকার আপনি গ্রহণ করুন।'

এণ্ডারসন মাথা নেড়ে বললেন, 'না তা হয় না, এ শিকারের সৌভাগ্য এবং গৌরব তোমাদেরই। আমি তোমাদের সংগে বেরোব শুধু আয়োজন ও ব্যবস্থাটা দেখে আসার জন্যই। এ বাঘ মারার অধিকার তোমাদের। আমার নয়।'

আধ ঘণ্টা পরে শিকারীরা ঘটনাস্থলে পেণছলেন। এণ্ডারসন দেখলেন স্থান নির্বাচনে ভুল করেছেন অনভিজ্ঞ শিকারীরা। বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে আকীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে অনুচ্চ টিলা। মোষটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল না। বাঘ মোষটার ঘাড় কামড়ে ধরে টানাটানি করে দড়িটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে। তারপর টেনে নিয়ে মোষটাকে রেখেছে নীচু একটা টিলার কাছে। যে গাছে মাচা তৈরী করে শিকারীদের বসার কথা ছিল সে গাছ থেকে এই টিলার আড়ালের জায়গা নজরে আসে না।

অর্ধভুক্ত মোষের 'মরি'টা যেখানে রয়েছে, বাঘের সেখানে আসবার দুটি সম্ভাবিত রাস্তা ছিল। যেখানে ধোপাকে বাঘে মেরেছিল সেই এক পথ, আরএকটা পথ সিকি মাইল দূরের একটা পাহাড় থেকে নেমে আসার রাস্তা। প্রান্তরের অসংখ্য টিলার মধ্যে দুটি টিলা থেকে এই দুটি রাস্তাতেই নজর রাখা চলে। এণ্ডারসন বললেন, এই টিলা দুটিতে দু'জন শিকারীর স্বতন্ত্রভাবে বসতে হ'লে কাঁটা গাছের আড়াল তৈরী করা প্রয়োজন। নরখাদক বাঘ হলে এই সতর্কতা অলংঘ্য। নূতন

শিকারীদ্বয় এই কাঁটা গাছের বেড়া অনাবশ্যক বিবেচনা করে টিলার উপরে পাথরে ঠেস দিয়ে বসতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তথাপি এণ্ডারসন কিছু কিছু ডাল-পালা কাটিয়ে এনে খানিকটা আড়ালের ব্যবস্থা করে বাংলোতে ফিরে এলেন অপরাহ্ন ৪টায়।

বাংলোতে এণ্ডারসন পার্টিতে ছিলেন আর একজন শিকারী এবং তাঁর স্ত্রী। চা'র সংগে গল্প-গুজব চলল। অমনি চলে শিকার-ক্যাম্পে।

কিন্তু গল্প-গুজবে আজ এণ্ডারসনের তেমন মন নেই। নৈশভোজন শেষে একাকী এণ্ডারসন বসেছেন বারান্দায়—ডেক-চেয়ারে। মাথার ভিতরে এলোমেলো চিন্তা। বাইরে জোর হাওয়া বইছে। হাওয়ার উল্টোদিক থেকে রাইফেলের আওয়াজ সেখানে পেণছোবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু তাঁর চোখে ঘুম নেই। শয্যার আকর্ষণও ছিল না।

প্রবল হাওয়ায় জঙ্গলের শব্দ ভেসে আসছে। অরণ্যপ্রান্তের অন্ধকারে চুপ করে বসে থেকে জঙ্গলের শব্দ শোনার কি যে নেশা—কি অপূর্ব অনুভূতি!

এর পরের ঘটনা এণ্ডারসনের মুখেই শুনুন: রাত তখন ১১টা। প্রায় একঘণ্টা আগে পেছনের পল্লীঅঞ্চলের অস্ফুট কলরব থেমে গেছে। ভাবছি এবারে শুতে যাব।

হঠাৎ কানে এল একটা অদ্ভুত শব্দ! অদূরে কি যেন ছুটছে! একটানা

দৌড়ের শব্দ নয়। মাঝে মাঝে যেন ধাবমান মানুষটার বা জানোয়ারের পদস্খলন হচ্ছে। আজ সন্ধ্যার দিকে মনের ভিতরে একটা অজানা আশঙ্কা আমাকে আনমনা করে তুলেছিল। সে ভয়টা আমার তখনো কাটেনি। তরুণ শিকারীদ্বয়ের কারোর কোনো বিপদ ঘটেনি ত? হঠাৎ বাংলোর ভিতর থেকে দ্রুত রাইফেল ও টর্চ বার করে ছুটলাম শব্দ লক্ষ্য করে বাইরে।

সামনেই তরুণ শিকারী ইংকে! দুই যুবকের মধ্যে যেটি বড় সেইটি। এলোমেলো চুল। ছিন্ন পোশাক। ঘর্মাক্ত। মাতালের মত টলছে। ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকাচ্ছে পেছনের দিকে।

ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

"তোমার সঙ্গী কোথায়? অমন করছ কেন?"

মুখ থেকে তার কথা ফোটে না। শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

"সে—সে নেই! তাকে নিয়েছে। বাঘে নিয়েছে! উঃ—"

সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে আমার কাঁধে মাথা রেখে।

বাংলোয় নিয়ে তাকে শুইয়ে কম্বল চাপা দিলাম, কড়া ব্রাণ্ডি দিলাম মুখে।

সে তখনো কাঁপছে থর থর করে।

কি ঘটেছে জানবার জন্য আমার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। কিন্তু যাঁর মুখে শুনব তাকে আগে চাঙ্গা করা চাই ত'।

ইংকের কাহিনী রোমাঞ্চকর।

শিকারের জন্য ইংকে বসেছিল যে রাস্তায় ধোপাকে বাঘে মেরেছিল সেখানে।

টড বসেছিল অদূরের পাহাড়টাকে নজরে রেখে। আগেই বলা হয়েছে এই দুটি রাস্তাই ছিল বাঘের সম্ভাবিত আগমনের রাস্তা।

তখনো সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে ওঠেনি। সহসা ইংকে দেখলেন একটা জানোয়ার পাহাড় থেকে নেমে ঢুকলো ঝোপ-জঙ্গলের ভিতরে। এই ঘটনা টডকে জানিয়ে দেওয়ার সুযোগ ইংকের ছিল না। টড ছিল ইংকের দৃষ্টির আড়ালে। তা ছাড়া বাঘের নেমে আসাটা টডের চোখ এড়াতে পারে না। যদিও দুই শিকারী পরস্পরকে দেখতে পায় না।

সন্ধ্যার পাণ্ডুর আলো নিবে এল। অরণ্য পুরীতে নেমে এল রাত্রের অন্ধকার। নিঃশব্দ অন্ধকার। ঝোপ-ঝাড়ের ব্যবধান আর নজরে আসে না।

হঠাৎ একটু ক্ষীণ শব্দ কানে এল ইংকের। কোনো বস্তুর পতনের শব্দ। তার পরেই শোনা গেল কিছু একটা টেনে নেওয়ার শব্দ।

ইংকে উৎকর্ণ। আবার শুনছে কড়মড় চিবিয়ে খাওয়ার শব্দ। স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছে বাঘটা মোষের হাড়-গোড় চিবিয়ে খাচ্ছে।

কিন্তু টডের কি হ'ল? সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? সে রহস্য কেউ জানবে না কোনোদিন!

ইংকের আর নিষ্ক্রিয় থাকা চলল না।

"রাইফেলটা ওদিকে তাক্ করে, রাইফেল-সংলগ্ন টর্চের সুইচ্ টিপে দিলাম।

"উজ্জ্বল আলোকে দেখলাম বাঘ! বিরাট মাথাটা হেলিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে খাচ্ছে।

"ঠিক সেই মু... দিকে আসবে কেউ ... স্থারা ছা-পোষা মানুষ। গেল। একটা হিংস্র ...ই হবে। তাই একটা ছটফটানির আওয়... উপরিভাগ ক্ষীণ আর্তি! তারপর আর ...ভগ্ন। নৈশ প্রান্তর স্তব্ধ। শ্বাপ-

"টর্চটাকে ঘুরিয়ে টডের টিলাতে ফেলেছি। 'মরি'র উপর থেকে বাঘটা লাফ দিয়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল। টডের চিহ্নমাত্রও দেখিনি।

"চীৎকার করে টডকে ডাকছি। প্রতিধ্বনি ছাড়া কোনো জবাব পাইনি।

"পাগলের মত ছুটে গেলাম টডের দিকে। রাইফেল, জলের ক্যারিয়ার আর কিছু স্যাণ্ডউইচ্ ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না! টড সেখানে নেই!"

ইংকে গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বার বার বলছে, বাঘ তাকে ছিঁড়ে খেয়েছে!

একটু সামলে নিয়ে ইংকে আবার বললে: "তারপর জঙ্গলে ছুটেছি টডকে খুঁজতে। হোঁচট খেয়েছি। কাঁটাবনে ছুটোছুটি করেছি—পথ ভুল করে। খেয়াল ছিল না। হিসাবও ছিল না। ছুটেছি লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তের মত। দৈবাৎ কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম বাংলোর।"

ইংকে আর কিছু বলতে পারেনি।

আমার কাছে কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট হ'ল।

বাঘ একটা নয়। দুটো। একটা জঙ্গলের জানোয়ার ধরে খায়। দ্বিতীয়টা তার চেয়েও ভয়ংকর। দুরন্ত বেপরোয়া নর-খাদক।

যাই হোক, এবার এণ্ডারসনের জবানী বাদ দিয়ে সোজা কাহিনীর বর্ণনায় চলে আসি।

এণ্ডারসন ভাবছে তাকে বোঝাপড়া করতে হবে এই দুটো বাঘের সঙ্গেই।

বাংলোর ভিতরে সবাই স্তব্ধ। বাইরের স্তব্ধতা ভয়াবহ।

অভিজ্ঞ শিকারী ভাবছে দুটো বাঘ। একটা বাঘ আর একটা বাঘিনী। একটা বনের জানোয়ার ধরে খায় আর একটা 'আদম-খোর'। এমন সচরাচর দেখা যায় না। হয়ত বিশেষ ঋতুতে প্রকৃতির প্রয়োজনে মিলেছিল দুটিতে। এখনো ছাড়াছাড়ির সময় হয়নি। নভেম্বর থেকে জানুয়ারী ওদের মিলন ঋতু। বাঘিনীটা নর-খাদক। শৈশবে নর-

ভোজী মার কাছে শিখেছে মানুষ খেতে। এটা অভিজ্ঞ শিকারীর ধারণা। হয়ত এ সত্য নাও হতে পারে।

অল্প সময়ের মধ্যেই লোকজন যোগাড় হল। দুটো গাদা বন্দুক, লাঠি-সোটা-বল্লমসহ বিশ জন অনিচ্ছুক অনুচর নিয়ে এণ্ডারসন সে রাত্রেই পৌঁছলেন টডের শেষ আশ্রয়-টিলার কাছে। ইংকে জিদ ধরেছিলেন সঙ্গে যেতে। কিন্তু তাঁর না ছিল দেহের সে শক্তি, না ছিল ধৈর্য। শিকারী বন্ধু ম্যাক হলেন তাঁর সঙ্গী। তিনিও বিচক্ষণ শিকারী।

টিলা থেকে পাহাড়ের পথ-রেখাটি পরীক্ষা করা হোল। রাস্তায় পাওয়া গেল এক পাটী রবারসোল জুতো। বাঘ টডকে মুখে ঝুলিয়ে যে এই রাস্তায় চলেছে তার স্পষ্ট নিদর্শন। পাহাড় তার লক্ষ্য। আরো খানিক পরে ল্যাণ্টার্নের আলোতে দেখা গেল এক জায়গায় রক্ত জমাট হয়ে আছে। বাঘ এইখানটায় মুখের বোঝা নামিয়েছিল খাওয়ার জন্য কিন্তু এখানে বসে মাংস খায়নি। সম্ভবতঃ টডের চীৎকার আর ছুটোছুটির শব্দে বোঝা মুখে নিয়ে আবার পাহাড়ের দিকে এগিয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরেছে পথের উপরে।

দুই শিকারীর নেতৃত্বে লোকজন এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ কখন কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ আসবে তাই সকলে এগোচ্ছে পরস্পরের গা ঘেঁসে।

রাত সাড়ে তিনটার সময়ে নজরে এল এক বীভৎস দৃশ্য। পাহাড়ের ঠিক নিচের জমি। ওখানে রয়েছে টডের দেহের আধখানা! দেহের অর্ধেকটা বাঘ খেয়েছে। এই পরিত্যক্ত আধখানা দেহ তুলে নিয়ে পার্টি ফিরে এলো বাংলোতে। ইংকে মূর্চ্ছিত হল এই করুণ দৃশ্য দেখে।

পরদিন এণ্ডারসনের সর্বপ্রথম কর্তব্য ইংকেকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া। বাইরে ছিল টডের মোটরখানা। এই মোটরে করে ইংকেকে হাসপাতালে নেওয়া হোল। টডের ছিন্ন দেহেরও একটা ব্যবস্থা হল।

বাংলোতে আলোচনা চলেছে ম্যাকের সাথে। এই বাংলোকে কেন্দ্র করে তাদের ঘাঁটী হবে বাঘের সন্ধানে।

প্রথম দিন। ম্যাককে সাথে নিয়ে এণ্ডারসন পৌঁছেছেন টডের জীবনের শেষ আশ্রয়ে। মোষটার অস্থি-চামড়ার কিছু বাকী নেই। বাঘের খাওয়ার পরে হয়ত শকুনেরা বাকী অংশ সাফ করেছে।

ওঁরা পৌঁছলেন অদূরের পাহাড়ের নীচে। এখানে টডের দেহ টেনিয়ে খেয়েছে নরখাদক বাঘ। কঠিন পাথুরে জমি। বাঘের পায়ের ছাপ পড়ে না এই জমিতে। আক্রমণকারী বাঘ না বাঘিনী, কতটা তার দেহের দৈর্ঘ্য কিছুই বোঝা গেল না।

এণ্ডারসন সিদ্ধান্ত করলেন আর একটা মোষ বেঁধে রাখতে হবে, ধোপাকে যেখানে বাঘে মেরেছে সেখানেই। এখানে বসবে ম্যাক। এণ্ডারসন বসবেন সেই টিলার উপরে যেখানে বসে দুর্ভাগা টড প্রাণ হারিয়েছে গত রাতে। যদি দুটো বাঘ একসঙ্গে আসে, যদি জানোয়ার-খেকো বাঘ মোষের ঘাড় ভাঙে, হয়ত নর-খাদক বাঘ তৈরী ভোজ ছেড়ে অন্যত্র যাবে না মানুষের সন্ধানে। ম্যাক তাহলে মানুষ-খেকো বাঘকে একটা গুলি দিতে পারবে। আর সে যদি মোষের মাংসে আকৃষ্ট না হয় তা হলে এণ্ডারসনের গুলি তার গতিরোধ করবে।

মাচা তৈরীর জন্য উপযুক্ত গাছ নেই। একটা গর্ত কাটানো হ'ল মাটিতে। গর্তে বসবেন ম্যাক। গর্তটা ঢেকে দেওয়া হল তারের রস জাল দেওয়ার একটা বড় কড়াই উল্‌টো করে দিয়ে। দুজন লোক ওটাকে বস্তি থেকে নিয়ে এসেছিল ধরাধরি করে। কড়াইটার নীচে কিছু দিয়ে উঁচু করে ফাঁক রাখা হল বাঘের গতায়াত দেখার জন্যে।

মিসেস ম্যাক নাছোড়বান্দা। তিনিও বসবেন গর্তে ম্যাকের সঙ্গে। তাঁর জিদ মেনে নিতে হল।

এণ্ডারসন বসলেন টডের ব্যবহৃত টিলার উপরে। টিলার তিন দিক বারো ফুট উঁচু খাড়া পাহাড়। একদিক ঢালু। এই শেষোক্ত ঢালু জমিতে কাঁটা গাছের বেড়া তৈরী হয়েছিল। তিন দিকের খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে বাঘ এণ্ডারসনকে পেড়ে ফেলবে এমন আশঙ্কার কারণ ছিল না।

অপরাহ্ন কাল। পাঁচটা বাজতেই এণ্ডারসন টিলার উপরে উঠে শুয়ে পড়লেন। পাহাড় রৌদ্রতপ্ত। তবু বাঘের নজর এড়াবার জন্যে পাহাড়ের সঙ্গে বেমালুম লেগে থাকাই প্রশস্ত।

পরামর্শ ছিল যে-পক্ষই প্রয়োজন বোধ করবে সে তিনবার বাঁশীতে হুইসেল দেবে। এ জিনিসটা শিকারীর সঙ্গেই থাকে।

শান্তিভরা দীর্ঘ প্রতীক্ষা। অরণ্যের মুখোমুখী হয়ে জেগে-থাকা অনিদ্র-রাত। উৎকর্ণ হয়ে থাকা, যাতে জঙ্গলের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাওয়া যায়। এমনি এক ঠায়ে অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় একটি জিনিস অনুভব করা যায়। সে হচ্ছে অরণ্যের স্তব্ধতা। অদ্ভুত সে অনুভূতি। সে অনুভূতি বোঝানো যায় না তাঁকে, যিনি এমন নিঃসঙ্গ রজনী শংকাকুল প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করেন নি।

একটি পাখীও উড়ছে না। সেই অকারণে ডাকা রাতজাগা পাখীটাও সেদিন নীরব। গভীর এবং একান্ত নিঃশব্দতা ছেয়ে আছে অরণ্যভূমি। টডের প্রেতাত্মা বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছে তার দেহের বাকী অর্ধাংশ। আকাশের নক্ষত্রগুলি যেন চোখ পাকিয়ে লুকোনো শিকারকেই নিরীক্ষণ করছে। হয়ত কোন্‌ ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে গত রজনীর টডের হত্যাকারী বাঘ!

মধ্যরজনী অতীত হয়েছে। এণ্ডারসন অপলক নেত্রে পরীক্ষা করছেন ঘনান্ধকারের রহস্য!

হঠাৎ হুইসলের আওয়াজ এল কানে। তিনটি হুইসেল। তীব্র-তীক্ষ্ণ! অলংঘ্য সংকেত।

দ্রুত নেমে এলেন এণ্ডারসন্‌। টর্চের আলোতে পথ দেখে পৌঁছুলেন ম্যাকের গহ্বরের পাশে। হাতে তাঁর রাইফেল। আশ্চর্য! ম্যাক দম্পতি দাঁড়িয়ে আছেন গহ্বরের বাইরে। বিরাট কড়াইটা উল্টে পড়ে আছে এক পাশে!

ম্যাক জানালেন তাঁদের গহ্বরের বাইরে আসার কারণ। পিঠে-পিঠি বসেছিলাম। একটুকু ফাঁক ছিল না নড়া-চড়ার। আমার নজর ছিল 'মরি'র দিকে।

মিসেস ম্যাকের উল্টোদিকে। মধ্যরাত অবধি কোনো শব্দ ছিল না। তারপর মিসেস ম্যাক শুনলেন একটা ভারী নিশ্বাসের শব্দ! শশব্যস্তে নজর ক'রে দেখলেন স্নানের টবের মত একটা জিনিস। পাথর না বাঘ! কড়াইর ফাঁক দিয়ে তিনি নিরীক্ষণ করে বুঝলেন সামনের দুই পায়ের উপরে মাথা রেখে বসেছে বাঘ! সে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করছে মিসেস ম্যাকের দুটি চোখ!

মিসেস ম্যাক পেছনে হাত দিয়ে টানছেন স্বামীকে। কোনো সাড়া নেই। জোরে টানতেই হঠাৎ ম্যাক ঘাড় ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। রাইফেলে লেগে গেল কড়াইটা। একটা শব্দ হ'ল। ধাতব শব্দ।

'উফ্' একটা আওয়াজ দিয়ে বাঘটা কড়াই ডিঙিয়ে লাফিয়ে পালাল জঙ্গলে।

বাঘ আততায়ীর সন্ধান জেনেছে। আর সে আসবে না। প্রতীক্ষা অনাবশ্যক। তাই হুইস্‌লে সংকেত জানিয়েছে বন্ধুকে।

শিকারীরা ফিরে এলেন বাংলোতে। মোষটা রয়ে গেল যেমন ছিল তেমনি।

পরদিন ভোর। কুলীদের পাঠানো হল মোষটাকে নিয়ে আসতে। তারা ফিরে এল আশ্চর্য খবর নিয়ে। শিকারীদের বিস্ময়ের সীমা নেই।

বাঘ মোষটাকে খেয়েছে। নিঃশেষে খেয়েছে। মাংসের চিহ্নমাত্র নেই।

শিকারীরা জঙ্গলে পৌঁছে দেখলেন মোষের মাথাটা আর পায়ের ক্ষুর ছাড়া মোষের কিছু অবশিষ্ট নেই! কড়াইটা এক পাশে পড়ে আছে। ত্রিপল রয়েছে স্তূপাকারে। বাঘের ভয় পাওয়া দূরে থাক এই অস্বাভাবিক দৃশ্যে সে ভ্রূক্ষেপও করেনি! অথচ বাঘের মত সন্দিগ্ধ জানোয়ার দুটি নেই। এ বাঘ সম্পূর্ণ বে-পরোয়া।

একটা নির্ভুল খবর পাওয়া গেল যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঘ একটা নয়। দুটো। একটা গোটা মোষের মাংস নিঃশেষে সাবাড় হয়েছে এক রাত্রে। একটা বাঘ অল্প সময়ে এতটা মাংস খেতে পারে না।

শিকারীরা ভাবছেন এই দুটি বাঘের একটি নরখাদক। কিন্তু সেই নরখাদকের মোষের মাংসেও অরুচি নেই। অথবা টডকে যে বাঘে খেয়েছে সে তৃতীয় বাঘ। সমস্যা ক্রমেই জটিলতর মনে হচ্ছে।

অনেক আলোচনার পরে সেদিন মোষের নতুন 'মরি' দেওয়া হল নতুন জায়গায়। আবার বড় করে সিকি মাইল দূরে নতুন গর্ত তৈরী হল। কড়াইর উপরে ত্রিপল, মাটি আর ঘাসের চাপরা দেওয়া হ'ল। কড়াইর নিসেংলগ্ন টর্চ আর-একটু বড় করা হ'ল। মিসেস নয়। দুই বন্ধুতে বসেছেন জাজ গহ্বরে।

তিনটি বিনিদ্র শীতার্ত রাত কাটলো ব্যর্থ প্রতীক্ষায়।

চতুর্থ দিন সকাল দশটা। খবর এল এক মাইল দূরে খেজুর বনে বাঘে মানুষ ধরেছে। কিছুদিন আগে এই বনে খেজুর গাছের উপরে একটি ভালুক মারা হয়েছিল। ভালুকটি চুরি করে খেজুরের রস খাচ্ছিল গাছে চড়ে।

শিকারীরা অবিলম্বে ছুটলেন ঐ নতুন বধ্যভূমির উদ্দেশে। নিষ্ফল পর্যটন। বাঘে-খাওয়া মানুষটার দেহাংশ তার আত্মীয়েরা তুলে নিয়ে দাহ করেছে। ওগুলো থাকলে বাঘ ওখানেই ফিরে আসত বাকী অংশটা খেতে। নিকটে কোনো গাছের উপরে মাচায় বসে বাঘ মারার সম্ভাবনা ছিল। অগত্যা আর একটা মোষ বাঁধা হল এখানে। তৈরী মাচাতে এন্ডারসন বসলেন একাকী।

আবার একটা ব্যর্থ রাত কাটলো অনিদ্রায়। এর ত্রিসীমানাতেও বাঘের অস্তিত্ব ছিল না শিকারীর নজরে।

আবার সেই শোকাকুল নৈরাশ্যভরা বাংলো। ক্ষুদ্র অরণ্য-নিবাস। দেহে শ্রান্তির অবধি নেই। তবু কুলীদের পাঠানো হল সেই ধোপার রক্ত-চিহ্নিত অরণ্যে। ওখানে তখনো মোষ বাঁধা আছে।

তা নিক্। বেচারা ছা-পোষা মানুষ। বিপদ যে কোন্ দিকে আসবে কেউ জানে না। আমাকে যেতেই হবে। তাই এগিয়ে চলেছি। প্রাচীরের উপরিভাগ আমার রাস্তা। প্রাচীর কোথাও ভগ্ন। কোথাও পতনোন্মুখ। নিচের ঝোপ-মোড়অনেক স্থলেই নজর চলে না। একাকী শাল। পাঁচটা বেজেছে। কাঁটা কুলীরা যে স্নায়ু ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি। দেখেছে। এই অবস্থা বিপরীত দিকে সে মোষের ঘাড় মট্‌কে দিগন্তে সূর্যটা আবার বিস্ময়। মোষ র মত টলমল বসে আছে। বাঘের সাড়াশব্দ দিগ্বলয়ের নিঝুম দুপুর। মোষের পায়ে আমার দড়িটা খুলে দিয়ে শিকারী পায়ে হেঁটে কাঁটা ক্লান্ত দেহে ফিরে এলেন বাংলোতে।

আবার সেদিন 'মরি' বাঁধা হল। মাচায় না বসে এন্ডারসন ঢুকলেন সেই কড়াই-ঢাকা গর্তে। রাত্রির অবসান হ'ল। বাঘ এলো না! ভোরে ম্যাক মোটরে করে এন্ডারসনকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন বাংলোতে।

আজকে ঘুমুতেই হবে। বিশ্রাম প্রয়োজন দেহের ও মনের। বিস্মৃতি-ভরা দীর্ঘ গভীর নিদ্রা। সকালে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে ঘুমিয়েছেন।

অসমাপ্ত ঘুম ভেঙে গেল অপরাহ্ন ৪টায় বাইরের কোলাহলে।

আবার বাঘে মানুষ ধরেছে।

ডজনখানেক লোক এক পাল গোরু নিয়ে হাটে চলেছিল বিক্রি করার জন্যে।
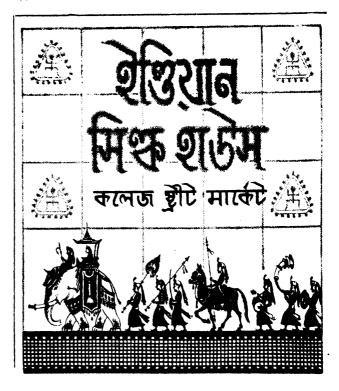
একটা গোরু পিছিয়ে পড়াতে একজন লোক গোরুকে মাত্র কয়েক গজ দূরে থেকে রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে গেল। হঠাৎ জঙ্গলে দেখা গেল বাঘের মুণ্ড। লোকটা ছুটে গিয়ে নিকটেই একটা টিলার উপরে উঠে গেল। বাঘ পেছনে পেছনে তাড়া করল। তারপর এক পাল গোরু আর ঐ ডজনখানেক লোকের আতঙ্কিত দৃষ্টির সম্মুখে হল বাঘে-মানুষে টানাটানি।

বাঘ লাফিয়ে টিলায় উঠে তার ধারালো নখর বসিয়ে দিল মানুষটার হাঁটুর নীচে। আক্রান্ত লোকটি একটি গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে সাহায্যের জন্য চ্যাঁচাচ্ছে।

বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও!

বাঘের নখরে জর্জরিত হতভাগ্যের আর্তনাদ চলছে অবিরাম। তার অদূরে অসহায়ভাবে ভয়ে কাঁপছে তার সাথীরা। বাঘটা একবার গড়িয়ে পড়ল চামড়া-মাংস ছিঁড়ে নিয়ে। আবার লাফিয়ে চড়ল টিলার উপরে। প্রথম ব্যর্থতায় সে আরো রুষ্ট, আরো ক্ষিপ্ত। দুই পা দিয়ে মানুষটাকে আঁকড়ে ধরে পেড়ে ফেলল নিচে। তারপর তার ঘাড় কামড়ে ধরে অদৃশ্য হল জঙ্গলে।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মোটর নিয়ে ছুটে গেলেন দুই শিকারী। ঘটনা-স্থলে আক্রান্ত লোকটির আঙ্গুলের নখের টুকরো, চামড়া, মাংস লেগে আছে গাছে। রক্ত জমেছে নীচে। রক্তচিহ্ন রয়েছে পলায়নের পথে।

রক্তের দাগ অনুসরণ করে শিকারীরা এগোলেন জঙ্গলের ভিতরে। দুঃসাহসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুই শিকারী। বহু বিপদ-সংকুল দুর্যোগে এমনি দুইজনে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন বহু অভিযানে।

পাঁচটা বেজেছে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে ছিন্নদেহ আবিষ্কার করা চাই।

সামনেই ছেঁড়া কাপড়। জমাট রক্ত। এখানেই দেহটা একবার নামিয়েছিল। তারপর কি ভেবে বাঘ আবার তাকে মুখে নিয়ে এগিয়েছে পাহাড়ের ঢালু পথে।

অদূরে ছোট পাহাড় ঝোপ-ঝাড়ে আচ্ছন্ন।

হঠাৎ শোনা গেল গোংরানো আওয়াজ। এক টুকরো পাথর গড়িয়ে পড়ল নিচে। হয়ত বাঘের পায়ে লেগে।

সামনের বাঁকটা ঘুরে যেতেই দেখা গেল নরদেহ। খানিকটা খেয়েছে। বেশী খাওয়ার অবকাশ হয়নি। দেহটা রক্তে মাখামাখি হয়েছে। একটা শব্দ হল। অনুভব করা গেল বাঘটা লাফ দিয়ে একটা নালা পার হয়ে ওপারে গেল।

কাছোপিঠে কোনো গাছ নেই। আছে একটা ছোট টিলা। বারো তেরো ফুট উঁচু হবে। এ টিলারও তিন দিক খাড়াই একদিক ঢালু। কিন্তু ঐ ঢালু দিক থেকে বাঘে-খাওয়া নরদেহ নজরে আসে না। সুতরাং ঢালুর দিকে নজর রাখতে হবে বাঘের ভয়ে। অন্যদিকে নজর চাই নর-দেহে বাঘের আবির্ভাব লক্ষ্য করার জন্যে। যদি ঢালুর দিকে বাঘ লাফিয়ে ওঠে, সে পিছলে পড়ে যাবে নীচে। ততক্ষণে শিকারীর রাইফেল নীরব থাকবে না। আর কোনো ভাল জায়গা নেই। ম্যাককে গাড়ীতে ফেরত পাঠিয়ে এণ্ডারসন নিজেকে টেনে তুললেন টিলার উপরে। পাথর জঙ্গল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল ঢালু দিকটা।

এণ্ডারসন লিখেছেন: "এক খণ্ড পাথরের উপরে বসেছি। আমার বাঁদিকে একটা মানুষের কবন্ধ। তাকিয়ে আছি ডানদিকে। ওদিক থেকে বাঘ আসার সম্ভাবনা।

বিশাল প্রান্তর। অরণ্য আর পাহাড়ে ঠাসাঠাসি। অন্ধকার গ্রাস করেছে এই প্রান্তর। পাহাড় জঙ্গল প্রায় একাকার। একটি হাতীর মত বিরাট জানোয়ার বেরিয়ে না এলে বুঝি আগন্তুকের আবির্ভাব মালুম হবে না।

রাত তখন দশটা। হঠাৎ শোনা গেল শম্বরের ডাক। মাইলখানেক দূরে। পর মুহূর্তেই ডাকলো বাঘ। বাঘের ডাকের জবাব এল আর একটা বাঘের মুখ থেকে। যে রাস্তা ধরে টিলায় এসেছি সে দিক থেকেই এল দ্বিতীয় বাঘের আওয়াজ।"

দু' দিক থেকে দুটি বাঘের আওয়াজ শোনা গেল। হয়ত আরও একটি আছে। নিঃশব্দ হিংসায় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছে আড়ালে। দুটিতে বন্য জানোয়ার মেরে খায়। সুযোগ পেলে গৃহপালিত পশুও টেনে আনে। আর একটি খুঁজছে মানুষ। কিন্তু কোনো মাংসে কারোর অরুচি নেই। এই অন্ধকার রাতে কত দিকে নজর রাখবেন এণ্ডারসন!

বাঘের ডাক আর শোনা যায় না। অরণ্য নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে অন্ধকার চিরে ভেসে আসছে পাহাড়ী পেচকের গম্ভীর ডাক। আর শোনা যাচ্ছে গাছের ডালপালায় ঝোড়ো হাওয়ার আছাড়ী-পিছাড়ী।

"তারপর একটা ঘটনা ঘটল বিনা ভূমিকায়। সচেতন হলাম আমার পেছনে একটা ভারী জিনিসের পতনের শব্দে। সঙ্গে সঙ্গেই শুনছি পাথরের উপরে আঁচড় ও টানা-খেঁচার শব্দ। একটু বিরক্তিপূর্ণ গোংরানো আওয়াজ। আবার এল পতনের আওয়াজ। ঘুরে বসবার আগেই বাঘটা এক লম্ফে অদৃশ্য হল।

নরঘাতক আমাকে লক্ষ্য করে পেছন দিক থেকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে-ছিল। আমার ভাগ্য মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সমস্ত রাত দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে পাহারা দিয়েছি। আর সে ফিরে আসেনি।

ভোর হয়েছে। ক্রমে সূর্য উঠল দিগ্বলয় ছাড়িয়ে। যদি বাঘটা আশ-পাশে কোথাও ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকে এই ভয়ে খুব বেলা না হতে পাহাড় থেকে নেমে আসিনি।

ম্যাক সমস্ত রাত পরিক্রমা করেছে মোটরে। যদি অরণ্য পথে বাঘের সাক্ষাৎ মেলে এই আশায়।

যখন বাংলোতে ফিরে এলাম দুই বন্ধুই রাত জাগরণে শ্রান্ত। বাংলোয় পৌঁছেই কুলীদের পাঠাচ্ছিলাম আজ দিনে পাহারা রেখে শকুনের হাত থেকে শবটি বাঁচিয়ে রাখতে। ইচ্ছা ছিল আবার সন্ধ্যায় বসব ওখানেই। কিন্তু নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন জিদ ধরেছে ঐ দেহাংশ তারা অগ্নি-সংকার করবে। তাই মানতে হল।"

দু ঘণ্টা পরে খবর এল জঙ্গলে কয়দিন ধরে যে মোষ বাঁধা ছিল তাকে বাঘে মেরেছে।

রাত্রে দুই শিকারী বসলেন গহ্বরে কড়াইর নীচে। বাঘ ডাকছে। বৃত্তাকারে ঘুরছে শিকারীদের ঘিরে। ডাক শুনে বাঘের চলাচল বোঝা যায়, কিন্তু বাঘ দেখা দিচ্ছে না দৃষ্টিসীমার ভিতরে এসে। স্পষ্ট বোঝা গেল বাঘ কোনো শিকারীর সন্ধান জেনেছে।

ম্যাক একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। তিনি রাইফেল হাতে নিয়ে চলে যাবেন বাংলোর দিকে। বাঘ যখন বুঝতে পারবে শিকারী চলে গেল, তখন সে বেরিয়ে আসবে তার 'মরি'র কাছে। সেই সুযোগে এণ্ডারসন গুলি চালাবেন। ম্যাকের যুক্তি হল গতবারের অভিজ্ঞতা। ম্যাক চলে যাওয়ার পরে বাঘ এসে মোষ মেরেছিল।

এণ্ডারসন ম্যাককে নিরস্ত করলেন। যেখানে নরখাদক বিচরণ করছে সেখানে এই কাজ হবে নিজের মৃত্যুর পরওয়ানা নিজের হাতে লেখা।

আরো একটা বিফল রাত কাটলো গহ্বরের ভিতরে। তার পরে দু'দিন চেষ্টা হ'ল স্পট লাইট দিয়ে রাস্তার কিনারে বাঘ সন্ধানে। তাও ব্যর্থ হল।

লুকোচুরি খেলছে বাঘ। শিকারীরাও অদম্য। একটা হেস্তনেস্ত অথবা বাঘের পেটে না গেলে তাঁদের সংকল্প বুঝি শিথিল হবে না।

তৃতীয় দিনে একদল কাঠুরে এসে খবর দিলে, চার মাইল দূরে বাঘে মুখে করে নিয়ে গেছে তাদের গাড়ীর একটা বলদ। তারা রাত কাটাচ্ছিল বনপথে। অস্থায়ী ক্যাম্পে। আগুন জেলে গোরুর

গাড়ীর বেষ্টনী তৈরী করে কাঠুরেরা ছিল ভিতরে।

কাঠুরেদের দলে একজন ছিল ওস্তাদ ব্যবসায়ী। তার কথাবার্তা এবং ধরন-ধারনে বোঝা যায় সে এই সরল কাঠুরেদের সমগোত্রীয় নয়। সে জানালে তাকে অনুসরণ করলে এই বাঘের আশ্রয় স্থান সে দেখিয়ে দিতে পারে। পরে জানা গিয়েছিল এই লোকটি বে-আইনী মদের চোলাই করে অরণ্যের নিভৃতে।

এই ওস্তাদ লোকটির নেতৃত্বে শিকারীরা পেঁছুলেন ৬ মাইল দূরে এক পাহাড়-বেষ্টিত ঝরনার কিনারায়। ঝরনার জলে একটি গহ্বরে জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। ছায়াশীতল নিভৃত পরিবেশ। বাঘের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান বটে। বাঘ দিনে নিদ্রায় আত্মসমর্পণ করে। অপরাহ্নে জল পান করে শিকার অন্বেষণে বেরিয়ে যায়। ভোরে ফিরে এসে জল পান করে দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকে। এখানে মাচা হলে রাত জেগে বাঘের প্রতীক্ষায় থাকা চলে।

বনের সমস্ত পথ-ঘাট এই ব্যবসায়ীর নখদর্পণে। পঁচিশ বছর মদ চোলাইর ব্যবসা চালিয়েছে এই নির্জনে যেখানে বাঘের ভয়ে পুলিশের লোক পদার্পণ করে না।

প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল।

শিকারীরা অপরাহ্ন তিনটায় পেঁছুলেন জলাধারের কাছে। উপর থেকে ঝরনার জল ঝরে পড়ছে অনর্গল। পাহাড়দেহ উপর থেকে নিচে সবটা পিচ্ছিল। চতুর্দিকে এমনি পাহাড়। নীচে মাঝখানে জলাশয়। জলের কিনারে বাঘের পায়ের ছাপ। একটা বাঘের। একটা বাঘিনীর। বাঘিনীটা নর-খাদক। এই অনুমান যথার্থ না হলে তৃতীয় বাঘ আছে কোথাও। সেটাই হবে মানুষ-খেকো।

জলাশয়ের কাছে একটা বুনো আমগাছের ডালে মাচা তৈরী হ'ল। তিনজন এখানে বসবেন। দু'জন শিকারী আর একজন সেই ব্যবসায়ী। গাছে উঠলেন ও'রা ৪টার পরে।

দূরে দু'-একটা বার্কিং ডিয়ার বা শম্বরের ডাক শোনা গেল। তা'ছাড়া অরণ্য নিস্তব্ধ। হয়ত বাঘের ভয়ে ছোট জানোয়ার এদিকে আসছে না। বড় বড় গাছের শাখা প্রশাখা স্থানটিকে ছায়াময় করেছে।

ভোর ৪টার সময়ে ভারী নিশ্বাসের শব্দ শোন গেল। শুকনো বাঁশের পাতার উপরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে গোমরানো আওয়াজ।

শিকারীদের ডাক দিয়ে জিভ দিয়ে জল চেটে খাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই নজরে আসছে না। পূর্ব পরামর্শ অনুসারে ম্যাককে টিপে দিলেন এণ্ডারসন। রাইফেল সংলগ্ন টর্চ দেখিয়ে দিল বাঘ।

দুম্ করে রাইফেলের আওয়াজ হ'ল। দুম্ দুম্ আরো দুটো। বাঘ প্রথম গুলিতে লাফিয়ে উঠেছিল। এবারে পড়ে গেছে। অর্ধেক দেহটা কিনারে অর্ধেক জলে।

ভোর হতেই শিকারীরা গাছ থেকে নেমে এলেন। এটা বাঘিনী নয়। বাঘ! প্রথম গুলিতে নাক-জিভসহ চোয়াল ভেঙেগেছে। দ্বিতীয় গুলি ডান স্কন্ধ ভেদ করে পেটে ঢুকেছে।

পল্লীবাসীদের আনন্দের সীমা নেই। আদম-খোর দুষমন মরেছে। আর ভয় নেই। ওরা বলছে এই সেই বাঘ। একে ওরা চেনে। শিকারীদ্বয়ের ধারণা স্বতন্ত্র। এ নর-খাদক বাঘ নয়। যদি এই ঘটনার পরে বাঘিনী অন্যত্র পালিয়ে না যায় তা হলে খুব শিগ্গীরই আবার মানুষ মারার খবর আসবে।

শিকারীর অনুমান সত্য হ'ল। পঞ্চম দিনে খবর এল। পাহাড়ের উপরে জীর্ণ দুর্গে অবস্থিত যোগী মঠে একটি কুটীর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স্ক এক কিশোর বালককে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে! এই আশঙ্কাই করেছিলেন এণ্ডারসন।

বালকটি সন্ধ্যাবেলায় ছিল কুটীরের দাওয়ায়। কাছাকাছি কোনো জঙ্গল নেই। অদূরে আছে ভগ্ন দুর্গ প্রাচীর। বাঘ এই বালককে ধরে যে ঐ প্রাকারের ঝোপ-জঙ্গলে লুকিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শিকারে সহিষ্ণুতা অচল। বিলম্বেরও অবকাশ নেই।

সন্ধান আরম্ভ হল। প্রত্যেক বোল্ডার বা পাথরখণ্ডের উপরে উঠে চলছে নিরীক্ষণ। একজন সন্ধানকারী জানালে ভগ্ন প্রাকারের ভিতরের একটা গাছের ডালে একটা শকুন দেখা যাচ্ছে।

দুর্গটি ছিল একটা পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে পেঁছে পাথরের পর পাথরে চড়াই উৎরাই করে এক জায়গায় বালকের ভুক্তাবশিষ্ট হাড়-গোড় পাওয়া গেল। মাংসের চিহ্নমাত্র নেই। শকুন বাঘের ভুক্তাবশেষ মাংস খেয়ে থাকবে।

এখানে মাচা তৈরী করে বাঘের প্রতীক্ষা করে লাভ নেই। দু' টুকরো হাড়ের জন্য বাঘ এখানে ফিরে আসবে না। তথাপি ম্যাক দুজন সাথী নিয়ে শকুন যে গাছে বসেছিল সেই গাছের ডালে বসলেন।

এণ্ডারসন লিখেছেন : "আমি এগিয়ে গেলাম। ভগ্ন প্রাচীরের উপর দিয়ে দুর্গের দিকে। পুরোনো ই'টের পাঁজায় কাঁটাগাছের ঝোপ-ঝাড়ে দুর্গের পথ দুর্ভেদ্য। আমার সঙ্গের লোকটি একটি বিরাট ডুমুর গাছের ডালে আশ্রয় নিলে।

তা নিক্। বেচারা ছা-পোষা মানুষ। বিপদ যে কোন্ দিকে আসবে কেউ জানে না। আমাকে যেতেই হবে। তাই এগিয়ে চলেছি। প্রাচীরের উপরিভাগ আমার রাস্তা। প্রাচীর কোথাও ভগ্ন। কোথাও পতনোন্মুখ। নিচের ঝোপ-ঝাড়ের অনেক স্থলেই নজর চলে না। অপরাহ্ন কাল। পাঁচটা বেজেছে। কাঁটা গাছের ডাল-পালায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি।

যখন প্রাচীরের বিপরীত দিকে পেঁছেছি, তখন পশ্চিম দিগন্তে সূর্যটা একটা আগুনের গোলকের মত টলমল করছে। কখন অকস্মাৎ সে দিগ্বলয়ের নীচে খসে পড়ে ঠিক নেই। আমার সমস্ত দেহ ঘামে ভিজে গেছে। কসরতটা কম হয়নি।

কয়েক বছর আগে একবার এখানে এসেছিলাম। আমি জানতাম আমার সামনেই প্রাচীরের উপর দিয়ে চলার আর রাস্তা নেই। একটা ছাতহীন জীর্ণ গারদ আছে ওখানে। এবারে হয় নীচে নেমে যেতে হবে জঙ্গলের ভিতরে না হয় ফিরে যেতে হবে অন্যূন দেড়শত ফুট যে পর্যন্ত অভগ্ন প্রাচীর না পাওয়া যায়। দু দিকেই সঙ্কট। সন্ধ্যারও বিলম্ব নেই। অগত্যা নেমে পড়লাম কাঁটা জঙ্গলে। সে কি দুর্গম পথ। কাঁটা গাছের ডালপালা ছিঁড়ে দিচ্ছে আমার ঘর্মাক্ত পোশাক। দেহের চামড়া।

গারদের ভগ্ন প্রাচীর আমার সম্মুখে। আমার বিশ্বাস বাঘ যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে সে এই ভাঙ্গা গারদের কামরার ভিতরে।

আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও বিপদের সংকেত জানালে। মনে হচ্ছিল বাঘ আমার পিছু নিয়েছে। সুযোগ পেলেই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। তাই অতিদ্রুত কাঁটা বন ছেড়ে উপরে ওঠার রাস্তা খুঁজছি। চতুর্দিকে যথাসম্ভব সতর্ক দৃষ্টি।

আর ত্রিশ গজ—বিশ গজ—পনর গজ।

ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে একটা মাথা! বড় বড় চোখ দুটোতে জ্বলন্ত আগুন। কান দুটো পেছনের দিকে। নিমেষে আক্রমণের জন্য উদ্যত!

মুহূর্তে আমার রাইফেলে আওয়াজ হ'ল। আগুনের গোলকের মত একটা গুলি ঢুকেছে ঐ হাঁ-করা মুখের ভিতরে। তারপর আর একটা, আরো একটা।

বাঘের উদ্যত মাথাটা একপাশে হেলে পড়েছে। আমিও পড়েছি। দেহে বুঝি এতটুকু শক্তি নেই।

নর-খাদক বাঘিনী মরেছে। বহু রজনীর অভিযান, পর্যটন, বহু শঙ্কার অবসান হ'ল ঐ দ্রুত নেমে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে।"

কম্বুজ দেশে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা

অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আদি ও মধ্য যুগ (খৃঃ পূঃ ২ শতক —৭০০ খৃঃ অঃ)

ভারতের সভ্যতার অবনতির যুগে এবং অর্বাচীন পুরাণাদিতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই নিষেধ পূর্বে স্বীকৃত হয় নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃঃ পূঃ ৩ শতক) রাজ-ধর্মের একটি অবশ্যপালনীয় নীতি ছিল দেশান্তরে ভারতবাসীদের উপ-নিবেশ স্থাপন করা। কেবল যে রাজা দেশান্তর হইতে মানুষ আনাইয়া স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহা নহে —দেশের মানুষকে বিদেশে পাঠাইয়া দূরদেশে ভারতীয় কৃষ্টির শাখা প্রতি-ষ্ঠিতকরণ ছিল অবশ্য কর্তব্য রাজধর্ম ("পর-দেশ অবমাহনেন, নিজ দেশ—বমনেন বা নিবেশয়েৎ")। এই নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত সমুদ্রের পর-পারে যবদ্বীপে, কম্বুজে এবং মহা-চম্পায় বৃহত্তর ভারত গঠিত হইয়াছিল। আদিমকালে এই সকল দেশ অনার্য আদিম নিবাসীদের বাসস্থান ছিল এবং অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ সভ্যতার ভূমিতে আর্য্য সভ্যতার বীজবপন করা বাঞ্ছনীয় ছিল না। কিন্তু বায়ুপুরাণের এক নির্দেশে দেখা যায় যে এইসব অনার্য দেশ আর্য্য সভ্যতার ক্ষেত্র হইতে পারে। আর্য্যগণ যদি এইসব অনার্য্য দেশে গমন করিয়া "যজ্ঞ করেন, যুদ্ধ করেন, বাণিজ্য করেন,"—তবে এইসব দেশ পবিত্রীকৃত হইয়া, আর্য্যগণের বসবাসের যোগ্য ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। ("ইজ্যা-যুদ্ধ-বাণিজ্যাদৈঃ কর্মভিঃ কৃত-পাবণা")। সুতরাং, দেখিতে পাই যে তিন শতকে ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা সুদূর বর্হিন দ্বীপে (বোর্নিও) গমন করিয়া বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন ও যূপদণ্ড প্রোথিত করিয়া—তাহার উপর সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক উৎকীর্ণ করিয়া বৈদিক যজ্ঞের স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছেন। সুদূর কম্বুজ দেশেও ভারতের উপনিবেশ স্থাপনে ব্রাহ্মণ ঋষির বংশধরগণ ছিলেন অগ্রণী। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে আর্য্য দেশ হইতে ঋষি কম্বু স্বয়ম্ভুব শিবের আদেশে ঐ দেশে গমন করিয়া সেখানকার নাগ-রাজার কন্যা মীরার পাণিগ্রহণ করিয়া রাজার অর্ধেক সাম্রাজ্য যৌতুকরূপে লাভ করেন এবং ঐদেশে ভারতীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঋষি কম্বুর নাম হইতেই 'কম্বুজ' (কাম্বোডিয়া) দেশের উৎপত্তি। কম্বুর সহিত ভারত-বাসীর যে শাখা কম্বুজে দেশে গিয়া-ছিলেন—সেই শাখার প্রাচীন নাম ছিল—'খেমের, ক্ষ্মের, খমির। এই খেমের শাখা ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে গিয়াছিল তাহা নির্ধারিত হয় নাই। কিন্তু ফরাসী পণ্ডিতগণ একমতে বলিয়াছেন যে, 'ক্ষ্মের' উপজাতি অবশ্যই ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিল। পরবর্তী শিলা-লেখে তাহাদের 'কম্বুজ' বলা হইয়াছে এবং কম্বুজের রাজার নাম 'কম্বুজেশ্বর' রূপে উক্ত হইয়াছে।

কম্বুজের উত্তরাংশে সর্বাগ্রে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অংশের চৈনিক নাম ছিল 'ফুনান্'। দক্ষিণাংশের চৈনিক নাম ছিল 'চেন্-লা' (চন্দ্রপুর)। চীনের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ঋষি কৌণ্ডিণ্য বংশের এক ব্রাহ্মণ ভারতীয় সভ্যতার দ্বিতীয় তরঙ্গ বহন করিয়া কম্বুজে আগমন করেন এবং ঐ দেশের এক রাজার কন্যা গোপাকে বিবাহ করিয়া— 'গোপা-কৌণ্ডিণ্য' বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বংশের এক রাজা যাঁর নাম সম্ভবতঃ সুচন্দন, ৩৫৭ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের রাজার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। কৌণ্ডিণ্য বংশের একাধিক ব্রাহ্মণ পরে পরে কম্বুজ দেশে বসবাস করিতে আসেন। এই ব্রাহ্মণগণের বাসকেন্দ্রের নাম হইল—"আঢ্যপুর", কম্বুজের নব-দ্বীপ বা ভাটপাড়া। এই কেন্দ্রের অনেক ব্রাহ্মণ কম্বুজের রাজগণের গুরু, পুরোহিত ও মন্ত্রীপদে ও দূতের কর্মে নিযুক্ত হয়ে কম্বুজের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও কৃষ্টির বহুল প্রচার ও সুপরিণতির ব্যবস্থা করেন।

ইতিপূর্বেই কৌণ্ডিণ্য এবং তাঁহার বংশধরগণ কম্বুজে সংস্কৃত ভাষা এবং সম্ভবতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। আঢ্যপুরে দুই ভ্রাতা ধর্মদেব ও সিংহ-দেব পরপর একাধিক রাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। সিংহদেব ৬০৫ খৃষ্টাব্দে কম্বুজ রাজার দূতের ভূমিকায় চম্পা-দেশের রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। আঢ্যপুরের বেদবিদ পণ্ডিত-গণের অনেকের পরিচয় ও কীর্তির কথা শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন খুব যশস্বী হইয়াছিলেন। এঁরা হলেন দ্বিতীয় ভাস্করবর্মণের (৬৩১ খৃঃ অঃ) পুরো-হিত বিদ্যাপুষ্প ও ভিষগাচার্য সিংহ-দত্ত। শেষোক্ত কীর্তিমান ব্যক্তি পরে আঢ্যপুরের রাজ্যপালের পদ অলংকৃত করেছিলেন। আর একজন মেধাবী শৈবাচার্য্য ব্রাহ্মণ শিব-কৈবল্য কূট-নীতিতে চাণক্যের ন্যায় যশস্বী হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইনি কম্বুজ সিংহাসন হইতে এক রাজাকে অপসারিত করিয়া দ্বিতীয় জয়বর্মণকে সেখানে অধিষ্ঠিত করেন। রাজার মলয় দেশে যুদ্ধাভিযানে শিবকৈবল্য সেনা-নায়কত্ব করেন এবং মলয় দেশে কম্বুজের আধিপত্য স্থাপন করেন। ইনি ছিলেন একজন গুহ্যবাদী শৈব-সাধক এবং "দেবরাজ-বাদ" নামক এক নূতন পদ্ধতির সাধনার শ্রেষ্ঠ গুরু। রাজা তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে "দেবরাজ-পূজার" হোতারূপে বরণ করেন।

কম্বুজে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আর এক প্রমাণে। কম্বুজ দেশের নানা প্রদেশ ও অঞ্চল সংস্কৃত নামে চিহ্নিত ও পরিচিত। যথা —চক্রাঙ্কপুর, অমোঘপুর, ভীমপুর, শম্ভুপুর, ব্যাধপুর ইত্যাদি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় নানা দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠানে ও তাঁহাদের পূজা-অর্চনার ব্যবস্থায়। শিব-পূজার প্রথম প্রবর্তন হয় কম্বু ঋষির আগমনের পরেই। বিষ্ণু পূজার পরি-চয় পাই কৌণ্ডিণ্য বংশের রাজকুমার গুণবর্মণের একটি শিলালেখে। ইনি একখানি বিষ্ণু পাদপদ্ম উৎকীর্ণ করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজা জয়বর্মণের (৪৭৮-৫১৪ খৃঃ অঃ) রাজত্ব-কালে তাঁহার রাণী কুল প্রভাবতী দেবী
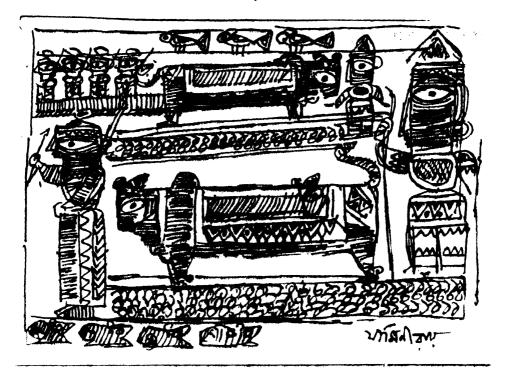
একটি আশ্রম ও একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা চীন দেশে তাঁহার দূত নাগসেনকে পাঠাইয়াছিলেন এবং চীনের রাজাকে জানাইয়াছিলেন যে, কম্বুজে মহেশ্বরের পূজা উপাসনা বহুলরূপে প্রচলিত। বিষ্ণু দেবতা ও লক্ষ্মীদেবীর পূজার পরিচয়ও পাওয়া যায়। ৫১৯ খৃঃ অব্দে রাজা রুদ্রবর্মণ চীনরাজাকে উপহার পাঠান চন্দন কাষ্ঠ নির্মিত লক্ষ্মীদেবীর একখানি ক্ষুদ্র প্রতিমা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কম্বুজ দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার বহু পূর্বে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন হয়। রাজা-মহারাজাদের যুদ্ধযাত্রার ধ্বজ-পতাকায় হনুমান ও গরুড়ের রেখাচিত্র লিখিত হইত। কম্বুজের রাজারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজত্বকালে একাধিক শিবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা ভববর্মণ (৬০০ খৃষ্টাব্দ) "গম্ভীরেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্রবর্মণ (৬০৯ খৃষ্টাব্দ) 'শম্ভু' নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শিবালয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি লাওস্ রাজ্য জয় করিয়া জয়কীর্তির স্মারকরূপে ঐ প্রদেশে গিরীশ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজা ঈশানবর্মণ (৬১১-৬৩৫) তাঁহার রাজধানী ঈশানপুরে অনেক শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিত্তশালী প্রজারাও অনেক শিবালয় স্থাপনা করেন। এইরূপে কম্বুজ দেশ অসংখ্য শিবালয়ে অলংকৃত হইয়া শৈবধর্মের বিরাট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বিষ্ণু দেবতার পূজারও তিনটি চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। পুষ্করাক্ষ, পুষ্পবট-স্বামী এবং ত্রৈলোক্যসার নামে তিনটি বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চতুর্ভুজা ভগবতী, সরস্বতী, গণপতি, যম এবং নবগ্রহের মন্দিরেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

হয়গ্রীব বিষ্ণুর মন্দিরেরও উল্লেখ রহিয়াছে। এই দুই দেবতার পূজার সমন্বয় করিয়া হরিহর, হরিশঙ্কর এবং শঙ্করনারায়ণের মূর্তি কল্পনার পরিচয় আছে। এক শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে যে এইসব মন্দির রচিত হইয়াছিল পুণ্যলাভের কামনায় নহে। পরন্তু "সাত্ত্বিকী ভক্তির" প্রকাশনার জন্য। শিবের মন্দির ব্যতীত শৈবাচার্যগণের সাধনা ও বিদ্যানুশীলনের উদ্দেশ্যে একাধিক "শৈবাশ্রম" ও বিদ্যালয় "বিপ্রশালা সরস্বতী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি "আশ্রম মহর্ষি" নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এই মন্দিরে একটি চমৎকার "হরিহরে"র মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিমাখানি কম্বুজের আদি যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শতাধিক অনুশাসন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কম্বুজে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন ও আলোচনা হইয়াছিল। অতি বিশুদ্ধ কাব্যরীতিতে লেখা এই সকল শিলালিপি বিশিষ্ট সংস্কৃতবিদ পণ্ডিতগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠেরও প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিত পুরাণ পাঠের নিমিত্ত একাধিক অর্থদান রীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে এমন কয়েকটি অনুশাসনও পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা, কৃষ্টি ও পূজাপদ্ধতি সর্বতোভাবে নীত হইয়া কম্বুজে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা সুদৃঢ়রূপে শিকড় গাড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। শিল্প ও স্থাপত্যকীর্তি ভারত হইতে আমদানী হইয়া কম্বুজে নূতনরূপে পরিগ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের আদর্শ অনুসরণ করিলেও তাহা ভারতের শিল্প-রীতির অনুকরণমাত্র নহে। এই বিরাট উপনিবেশ স্থাপনায় অগ্রণী ও উদ্যোক্তা ছিলেন বহু সংখ্যক বেদবিদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিত, সাধক ও ঋষিমণ্ডলী—যাঁহাদের নাম ও কীর্তির কথা সংস্কৃত

ভাষায় রচিত শিলালেখে পুনঃপুনঃ কীর্তিত ও উল্লিখিত হইয়াছে।

মধ্যযুগ ও শেষযুগ—
(খৃঃ অব্দ ৭০০—১৪৩০)

মধ্যযুগের পূর্বভাগে,— মহেন্দ্রবর্মণ (৬১১ খৃঃ অঃ), ঈশানবর্মণ (৬৩৫) ও ভববর্মণের (৬৩৯) রাজ্যকালে, মন্ত্রী ও কুল-পুরোহিতগণের নায়কতায় এমন বৃহৎ-কল্পনার হিন্দু-সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল,—যাহার উপরে মধ্যযুগের শেষভাগে (৮০২-৯১০) এমন একটি বৃহদাকার উচ্চ-চূড় সাম্রাজ্যের সৌধ নির্মিত হইয়াছিল—যাহার তুলনা, কেবল ভারতবর্ষে নহে, সারা পৃথিবীর কোনও স্থানে পাওয়া যায় না। কম্বুজের নয়-দশ শতকের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিরাট হিন্দু-সাম্রাজ্য— ভারতের গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দক্ষিণের বিজয়নগরের সাম্রাজ্যের, এবং য়ুরোপের ক্যারলাইন-বংশের কেথলিক-খৃষ্টান সাম্রাজ্যের গৌরবকে ম্লান করিয়াছে। চৌদ্দশত বৎসরব্যাপী কম্বুজের হিন্দু-সাম্রাজ্য কেবল যে কালের ব্যাপ্তিতে সুদীর্ঘ ছিল তাহা নহে—আধ্যাত্মিক শক্তিতে, সামাজিক শক্তিতে, বহুজনের হিতেরত বীর্যবান নীতি-পরায়ণ রাজশক্তিতে কম্বুজ এমন একটি গৌরবময় শক্তিশালী পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল— যাহা সারা বিশ্বের বিস্ময় রচনা করিয়াছে। এই উক্তি যে অত্যুক্তি নহে— তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, যাঁহারা শিলালেখের শতাধিক অনুশাসনের সহিত মিলাইয়া কম্বুজের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন।

কম্বুজের ইতিহাসের উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন হইল কীর্তিমান যশোবর্মণের কীর্তি-বহুল রাজ্যকাল (৮৮৯-৯১০ খৃঃ অঃ)। কিন্তু এই অতি উজ্জ্বল যুগের কীর্তিমালার প্রস্তুতি হইয়াছিল —অগ্রগামী তিনজন শক্তিমান রাজার বহুমুখী প্রতিভার প্রভাবে ও প্রেরণায়, —তাঁহাদের নাম দ্বিতীয় জয়বর্মণ (৮০২-৮৫০), তৃতীয় জয়বর্মণ (৮৫০-৮৭৭), এবং ইন্দ্রবর্মণ (৮৭৭-৮৮৯)। দ্বিতীয় জয়বর্মণ কম্বুজে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। তাঁহার রাজ্যকালে ৮১৭ খৃষ্টাব্দে মহাচম্পার রাজা কম্বুজের পূর্বভাগ আক্রমণ করিয়া, সামন্ত রাজাকে হত্যা করিয়া কম্বুজের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করেন। কম্বুজ-রাজ এই আক্রমণ নিরস্ত করিয়া মহাচম্পার সেনাদের পরাজিত করিয়া, কম্বুজের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ব্যাপার সম্ভব হইয়াছিল, কেবল রাজ-শক্তির বীর্যবলে নহে, আধ্যাত্মিক ও ঐশী শক্তির প্রয়োগে। জয়বর্মণের চেষ্টায় কম্বুজে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার নূতন শক্তির অনুপ্রবেশে, ঐ সময়ে ভারত হইতে আনীত হন একজন তন্ত্র-সাধনার প্রচণ্ড সিদ্ধপুরুষ—তাঁহার নাম হিরণ্য-দাম। ইনি চতুর্বিধ তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রয়োগে কম্বুজে তন্ত্রাচার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন—(১) শিরশ্ছেদ, (২) বিনাশিখ, (৩) সম্মোহ, (৪) এবং নয়োওর। এই চার তান্ত্রিক পন্থা তুম্বুরুর চারিটি মুখ হইতে প্রকাশিত হয়,—এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। মহাচম্পার আক্রমণ, এই তন্ত্রোক্ত পথের—মন্ত্রের ও অভিচারের বলে— পরাস্ত হয়। হিরণ্যদামের তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদিতে চমৎকৃত হইয়া রাজা এই তান্ত্রিক সাধককে, রাজ্যের প্রধান হোতা শিব-কৈবল্যকে তান্ত্রিক পদ্ধতি শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। এই তান্ত্রিক উপচারাদির প্রভাবে রাজ্যের আরক্ষদেবতা— "দেবরাজ-লিঙ্গ"—নূতন ঐশী শক্তির আরোপনায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং উত্তরকালের কম্বুজের অলৌকিক ঐশ্বর্য, উন্নতি ও গৌরব তন্ত্রাচারের ফল ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এই ঐশী আরক্ষণ-শক্তির আর একটি প্রতীক হইল—রাজার "পবিত্র তরবারি" (প্রিয়াখান)—যাহা "দেবরাজ"-মন্দিরে শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইয়া আসিতেছে। এই জাতীয় অস্ত্র অদ্যাপি ব্রাহ্মণ বংশের এক শাখা—"বাকো" ব্রাহ্মণদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

শিব-কৈবল্য "দেবরাজ" মন্দিরে নিযুক্ত থাকায়, রাজা অন্য দুইজন ব্রাহ্মণকে রাজকীয় পুরোহিতের পদে বরণ করেন,— তাঁহাদের নাম প্রণবাত্মন এবং কেশবভট্ট। রাজার তিন মহিষীর নাম হইল—অমৃতা, পবিত্রা ও ভাসভামিনী,—ইনিই ছিলেন অগ্রমহিষী—"কম্বুজ-লক্ষ্মী"। রাজা আত্মপ্রচার ও প্রশস্তি রচনার বিরোধী ছিলেন—সেইজন্য তাঁহার রাজ্যকালে— শিলালেখ অত্যন্ত বিরল। পরবর্তী শিলালেখ এবং আরব বণিকের বর্ণনা হইতে জানা যায়—যে জয়বর্মণের দীর্ঘ রাজ্যকাল—শান্তিময় এবং রাজ্যের নানা বিভাগ বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল। একজন আরব পরিব্রাজকের মতে, "ক্ষেমের সম্রাট সুরাপান এবং ব্যভিচার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।"।

সাধারণ প্রজাদের জন্য প্রভূত ধান-চাল ও মৎস্যের ব্যবস্থা ছিল এবং দেশের নানা স্থানে বিনামূল্যে অন্ন-সত্রের ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং, আমরা এইসব প্রমাণে—একটু সুস্থ, সবল, সুপুষ্ট, শান্তিময়, নীতিপরায়ণ প্রজার হিতকামী সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের চিত্র পাইতেছি। কথিত আছে যে দ্বিতীয় জয়বর্মণ শতায়ু হইয়াছিলেন এবং এই শিবভক্ত রাজা মৃত্যুর পর শিবত্বলাভ করিয়া "পরমেশ্বর"— এই উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

তাহার পরে সিংহাসনে বসিলেন তৃতীয় জয়বর্মণ (৮৫০-৮৭৭)। ইনি রাজ্যলাভ করিয়া সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এক চীন পরিব্রাজকের মতে (৮৬২ খৃঃ অঃ) কম্বুজে রাজ্য সমগ্র লাওস্ দেশ শাসন করিত এবং রাজ্যের পরিধি চীন দেশের য়ুন্নান্ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পিতার ন্যায় এই রাজাও প্রশস্তি রচনার বিরোধী ছিলেন—সুতরাং তাঁহার রাজ্যকালে শিলালেখ অত্যন্ত বিরল। তাঁহার গুরু ছিলেন—শ্রেষ্ঠপুরের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাস কবি। গুরু এবং মন্ত্রী বাসুদেবের প্রভাবে রাজা কয়েকটি বিষ্ণু এবং হরিহরের মন্দির নির্মাণ করেন। মৃত্যুর পর তিনি উপাধিলাভ করেন—"বিষ্ণুলোক"।

কেবল যে পৌরাণিক দেবদেবীদের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা নহে, বৈদিক পদ্ধতিতে হোমাদির যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। ইন্দ্রবর্মণ ও যশোবর্মণের শিলালেখে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত হোম-যাগের জন্য ১২০টি "বহ্নি-শালার" উল্লেখ আছে। সুতরাং বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম সমানভাবেই সম্মানিত হইয়াছিল।

কম্বুজের কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিণতির সূত্রপাত হয় রাজা ইন্দ্রবর্মণের রাজত্বকালে (৮৭৭-৮৮৯)। তাঁহার সময় আবার প্রশস্তি রচনার প্রথা পুনঃ প্রচলিত হয়। সুতরাং তাঁহার শিলালেখ হইতে রাজার অনেক কীর্তির কথা আমরা জানিতে পারি। রাজার আচার্য এবং গুরু ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ শিখ-সোম। ইনি একাধারে ছিলেন সংযমী যতি, এবং একজন বাগ্মী সুপণ্ডিত, পুতাত্মা সাধুপুরুষ। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল— যে তিনি ভারতবর্ষে ভগবান শংকরাচার্যের নিকট দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষালাভ করিয়া-

ছিলেন। ইন্দ্রবর্মণ গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হিসাবে যশস্বী হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজার একাধিক ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা ছিলেন— তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—শিখা-শান্তি, তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব, এবং পুরোহিত অমৃত-গর্ভ। রাজা রাজকুমার যশোবর্ধনের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-বাম-শিব, শিবকৈবল্যের পৌত্র।

সিংহাসনে আরোহন করিয়াই, ইন্দ্রবর্মণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি পাঁচদিনের মধ্যে— বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন আরম্ভ করিবেন, যাহার দ্বারা নগরের মন্দিরগুলির জলাভাব এবং নগরের বাহিরে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়। বলা বাহুল্য, এই প্রতিজ্ঞা তিনি পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার খোদিত দীর্ঘিকা — "ইন্দ্র-তড়াক" নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, এইরূপ জনহিতকর অন্য অনুষ্ঠান তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে গড়িতে পারেন নাই, কারণ একজন সামন্ত রাজা বিদ্রোহ করিয়া রাজার দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল। অনেক যুদ্ধ করিয়া তবে বিদ্রোহ দমন করিতে পারিয়াছিলেন। এইসব যুদ্ধবিগ্রহে রাজার প্রভূত শৌর্য্য-বীর্য্যের দাবী শিলালেখে প্রশিদ্ধ লাভ করিয়াছে। ইহার পর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং দেশ-বিদেশের সামন্ত রাজারা ইন্দ্রবর্মণের আজ্ঞা, যুথিকা পুষ্পের মালার মত, তাঁহাদের শিরোদেশে আনন্দে বহন করিতে থাকেন। ইহার পর, চীনদেশ, মহাচম্পা, এবং যবদ্বীপ হইতে অসংখ্য বাণিজ্য-পোত নানা পণ্য দ্রব্য বহন করিয়া আনিয়া কম্বুজ দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া তুলে। একটি শিলালেখে এই আভাস আছে—যে ইন্দ্রবর্মণ য়ুনান্ অঞ্চলে চীন রাজ শক্তির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, যুদ্ধে বীর্যশক্তি অপেক্ষা শিল্পকলা ও স্থাপত্যে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় অনেক বেশী। কম্বুজের স্থাপত্যকীর্তি তিনিই প্রথমে আরম্ভ করেন:— দুইটি উৎকৃষ্ট মন্দির—প্রিয়া কো এবং বাকং—৮৭৯ এবং ৮৮১ সালে নির্মিত হয়। একাধিক ফরাসী পণ্ডিত ইন্দ্রবর্মণের যুগের শিল্পকলা সম্বন্ধে (Art of Indravarman) সুষ্ঠু আলোচনা করিয়াছেন। এক শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা নিজে একজন সুদক্ষ কলাশিল্পী ছিলেন, এবং তিনি নিজের হাতে সিংহাসন, রথাদি এবং রাজপ্রাসাদের পরিকল্পনা করিয়া কলা-সৃষ্টির প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজ্যকালে নানা কীর্তির পরিচয়ে, এবং রাজার পাণ্ডিত্য, শৌর্য্য-বীর্য্য, কলা-কুশলতা এবং ধর্ম-সাধনার উৎসাহ ইত্যাদি নানা গুণে ভূষিত ইন্দ্রবর্মণ—কম্বুজের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নানা "আশ্রম" ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দির-স্থাপত্যে নূতন যুগ এনেছিলেন এই বহুমুখী প্রতিভাশালী কম্বুজ সম্রাট। ৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজধানী হরিহরালয়ে স্বর্গারোহন করেন এই যশস্বী নরপতি। শিবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, মৃত্যুর পর "ঈশ্বরলোক" এই উপাধি তিনি অর্জন করেন। যশোধরপুর এবং বায়নের মন্দিরের পত্তন হয় তাঁহার রাজ্যকালে। এইবার কম্বুজ সিংহাসনে বসিলেন বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট যশোবর্মণ (৮৮৯-৯১০)— যাঁহার গগনচুম্বী শিব-মন্দির 'ওংকার বট' সারা পৃথিবীর মন্দির-স্থাপত্যকে পরাজিত করিয়া হিন্দু কৃষ্টির অক্ষয় কীর্তিরূপে আজিও বিদ্যমান। এই বিশালকায় মন্দির কম্বুজে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক ও জয়স্তম্ভ। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া কম্বুজে যে সুষ্ঠু সুপরিকল্পিত ধর্মমুখী সমাজ ও সভ্যতা উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার তুলনা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কেন্দ্রমূল ভারত ভূমিতেও দেখা যায় না। যশোবর্মণ যে আদর্শ হিন্দু সম্রাটের বিশিষ্ট গুণাবলীর প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহার কীর্তিকলাপে— তাহার বীজ নিহিত ছিল গুরু রাম-শিবের সর্বতোমুখী শিক্ষার মধ্যে। শাস্ত্রের সকল শাখায় তিনি (যশোবর্মণ) ছিলেন সুপণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি পতঞ্জলীর মহাভাষ্যের নূতন টীকা রচনা করিয়া সকলকে চমকৃত করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজনীতি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করিয়া কম্বুজে আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্র ও সমাজ

পাড়িয়া তুলিয়াছিলেন। একটি শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁর আদর্শ হিন্দু সমাজের ভিত্তি ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিকল্পনানুসারে গঠিত হইয়াছিল। রাজধর্ম বা রাজনীতি পালন করিতেন রাজা, ধর্মসাধনার অধিনায়কত্ব করিতেন অসংখ্য বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ও সাধকমণ্ডলী, ক্ষত্রিয় জাতি করিতেন যুদ্ধ ব্যবসায়, শত্রুনাশ এবং শান্তি সংস্থাপন, বৈশ্যজাতি করিতেন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দেশের অর্থ-সংগতি সংরক্ষণ এবং চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শূদ্রগণ ছিলেন মৎস্যজীবি ও কৃষিজীবি। যশোবর্মণের শিলালেখে চতুর্বর্ণের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও বর্ণনা আছে। কম্বুজের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং জাতিভেদ কোনও বিরোধের সৃষ্টি করে নাই। বর্ণাশ্রমের চারি জাতি সুচারুরূপে সহযোগিতা করিয়া যে ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছিল— কম্বুজের সমাজ-জীবনের নানাক্ষেত্রে তার সুমিষ্ট সুর সুসংগতির সংগীত রচনা করিয়াছিল এবং যশোবর্মণের বিভিন্ন শিলালেখে উহা উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের আধুনিক রাজনীতিতে কম্বুজের ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সভ্যতা হইতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় আছে। নৃত্যকলায় কম্বুজের অলৌকিক দিব্য রীতি অদ্যাপি জীবিত রহিয়া সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ডাঃ কুমারস্বামী বৃহত্তর ভারতের নৃত্যকলার দিব্য সৌন্দর্য সুষ্ঠুরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্থাপত্যকলার নানা বিভাগে কম্বুজের ধর্মপ্রাণ শিল্পীকুল যে অলৌকিক স্বর্গ রচনা করিয়া দিয়াছে তাহার মহিমা ও সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত স্তুতির অর্ঘ্য রচনা করিয়া কম্বুজের মন্দির-শিল্পকে পৃথিবীর কলাশিল্পের আসরে সর্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন।

যশোবর্মণের রাজত্বকালে (৮৮৯-৯১০) কম্বুজ দেশ জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের সূর্য চরম শিখরে উঠিবার পর ক্রমশঃ আবার অবনতির পথে অস্তাচলের অন্ধকারে ঢলিয়া পড়ে। কিন্তু কম্বুজ দেশের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সূর্য বহু শতাব্দী উচ্চশিখরে দীপ্যমান ছিল। উহা অবনতির সোপান অবলম্বন করে নাই। কারণ, যশোবর্মণের পর একাধিক শক্তিশালী রাজা কম্বুজের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাকে অতি উচ্চ আদর্শে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্মাদর্শ নিম্নগামী হয় নাই। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় ঈশানবর্মণ (৯১০-৯২৮), চতুর্থ জয়বর্মণ (৯২৮-৯৪১), হর্ষবর্মণ (৯৪১-৯৪৪), রাজেন্দ্রবর্মণ (৯৪৪-৯৬৮), পঞ্চম জয়বর্মণ (৯৬৮-১০০১) কম্বুজের সর্বতোমুখী সভ্যতার প্রসিদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শেষোক্ত রাজার আমলে ভারতবর্ষের যমুনাতীর হইতে একজন নূতন পণ্ডিত (দিবাকর পণ্ডিত) কম্বুজের রাজসভা অলংকৃত করিতে যান। এই সময় একাধিক উচ্চশিক্ষিত মহিলারও নাম পাওয়া যায়। একজন রাণী, নাম তাঁর প্রাণা, তিনি রাজকার্যের সম্পাদিকার পদ লাভ করেন এবং অপর একজন মেধাবিণী নারী বিচারপতির আসন লাভ করেন। বর্ণাশ্রমের সম্মান রক্ষার্থে মহারাণীকে "মহাক্ষত্রিয়াণী" আখ্যায় অভিহিত করা হইত। সেনাপতিগণ যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে তাঁহার আরক্ষ দেবতার মন্দিরে পূজা ও প্রার্থনা করিয়া দেবতার আশীর্বাদ লইয়া যুদ্ধাভিযান করিত। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বহু নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের স্থাপত্য রীতি যশোবর্মণের কীর্তি হইতে কোনক্রমে ন্যূন নহে। এদের মধ্যে খাণ্ডাই শ্রীর মন্দির, প্রাসাদনীক, প্রাসাদলোম, প্রাসাদ বিহার এবং চতুর্দ্বার প্রাসাদ (বিমানকাং) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের সকল রাজারা সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া পূর্বপুরুষগণের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সূর্যবর্মণ ব্যাকরণ শাস্ত্রে, কাব্যে ও ষড়দর্শনে ছিলেন সুপণ্ডিত। সপ্তম জয়বর্মণ (১১৮১-১২১৮) শতাধিক আরোগ্যশালা স্থাপনা করিয়া জনহিতকর নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইসব আরোগ্যশালায় প্রজাগণ বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইত। রাজা বহু সংখ্যক রাজপথ নির্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রীদের ও বণিক সম্প্রদায়ের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কম্বুজে বিষ্ণু পূজা ও ব্রহ্মদেবতার পূজার কিছু কিছু পরিচয় থাকিলেও শিবপূজা ও শিবভক্তিই ছিল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড। যদি কোনও ব্রতচারী শিবভক্ত ভ্রমবশতঃ কোনও অপরাধ করিতেন —রাজা সেই শিবভক্তকে অপরাধের দণ্ড হইতে মুক্তি দিতেন ঃ "ব্রতস্থাম্ শিবভক্তম্ যো দোষবন্তম্ প্রমাদতঃ।

শিবভক্তি পরঃ প্রায়ঃ দণ্ড্যান্ দণ্ডাৎ অমোচয়ৎ"।।

এইরূপে মধ্যযুগের শেষ পাদেও কম্বুজের শিবভক্তি ও সমৃদ্ধি বহু শতাব্দীব্যাপী অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহার পর চম্পাদেশ ও শ্যামদেশের রাজাদের সহিত নানা সংঘর্ষে ও যুদ্ধবিগ্রহে কম্বুজের উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হইতে সুরু করে। তথাপি এই দুঃসময়ের মধ্যেও বিদ্যাচর্চায় উৎসাহদান ও পাণ্ডিত্য সমাজকে পৃষ্ঠপোষকতার ছেদ পড়ে নাই। এই সময়েও আর্যদেশ হইতে আসিয়াছিলেন বহু বিখ্যাত পণ্ডিত— যথা নিদেশবিদ্, মধুসেন পণ্ডিত ইত্যাদি। তাঁহারা সকলেই রাজাদের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত কম্বুজে নূতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা শ্রীইন্দ্রবর্মণ (১৩০৭-১৩২৭) "শ্রীভদ্রেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের শিলালেখ কম্বুজের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রাজানুশাসন। এই শিলালেখ ১০৩টি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লেখা উৎকৃষ্ট কালাকৃতি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্যাম রাজ্যের সহিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কম্বুজরাজ পরাজিত হইলেন এবং বহু সংগ্রামের পর শ্যামদেশের রাজা ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে কম্বুজদেশ অধিকার করেন।

আমরা দেখিয়াছি খৃঃ পূঃ এক শত শতকে কম্বু ঋষি কম্বুজ রাজ্যের পত্তন করেন। ক্রমশঃ এই রাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া প্রায় চতুর্দশশতক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক হইয়া, দূর দেশে ভারতের এই নব উপনিবেশকে নানা কীর্তিতে অলংকৃত করিয়া, ভারতের সভ্যতার গৌরবকে উজ্জ্বল করিয়া, দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এবং এই সুকীর্তি সুসম্পন্ন হয় বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়। কম্বুজ দেশের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতায় যে অলৌকিক, বিস্ময়কর কীর্তির পরিচয় আমরা পাইতেছি, —ধর্ম-নিরপেক্ষ, বর্ণাশ্রম-বিরোধী, জাতিভেদ-বিদ্বেষী কংগ্রেস শাসনে— তাহার ক্ষীণ ছায়াও পরিলক্ষিত হয় নাই।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ষোল ॥

একটি মিথ্যা খবর কাগজে ছাপা হয়েছিল—।

"কোনও একজন বিশিষ্ট এবং তরুণ সরকারী কর্মচারী রাজধানী থেকে সহসা নিরুদ্দেশ হন। প্রকাশ, তিনি ছদ্মবেশে দেশের বৃহত্তর জনজীবনের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করার জন্য সকলের অগোচরে সর্বসাধারণের মধ্যে আত্মগোপন করেন। প্রায় তিন মাস পরে তাঁকে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় একটি অখ্যাত গ্রামে খুঁজে পাওয়া যায়। সম্প্রতি তিনি দিল্লীর হাসপাতালে আরোগ্যলাভের পথে চলেছেন।"—

একটি ক্যাবিনে আমি ছিলুম, তার খরচের অংকটা ছোট নয়। ক্যাবিনের সর্ত ছিল এই, রোগীর জীবন-মৃত্যুর যিনি মালিক, তাঁর আনাগোনা এখানে থাকবে অবারিত। শুধু সকাল-সন্ধ্যা নয়, টাইম-বেটাইম নেই, মধ্যরাত্রি বা শেষরাত্রি নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না,—তাঁর আসা-যাওয়ার পথে পায়ে যেন কাঁটা না ফোটে!

কিন্তু কাঁটা একদিন ফুটেছিল।

ক্যাবিনের পর্দার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা নার্স একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, বাঙালী মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর পরেন, কিন্তু আপনার মাথায় সিঁদুর দেখছিনে ত?

হেনা থমকিয়ে দাঁড়াল তারপরে জবাব দিল, স্বামী বলে স্বীকার করলে হয়ত দেখতেন!

মহিলা দাঁড়িয়েই রইলেন। হেনা মাথা উঁচু করে চলে গেল। বোধ হয় আরেক দিনও এই ধরনের প্রশ্ন কেউ করে থাকবে,—উনি আপনার কে হন?

শান্ত এবং মিষ্ট কণ্ঠে হেনা সেদিন জবাব দিল, কে হন তা জানিনে। তবে আমি ছাড়া ওঁর কেউ নেই এটি জানি।

প্রশ্নকর্তা বোধ করি হেনাকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়ে থাকবেন। আমি চুপ করে আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করতুম। অনেকদিন অপরাহ্নের দিকে দেখেছি, হেনা মেঝের উপর তার দরিদ্র বিছানাটায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। শেষরাত্রের দিকে কতবার আচমকা ঘুম ভেঙে দেখেছি, ক্যাবিনে আলো জ্বলছে, এবং দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে হেনা তখনও বসে ঢুলছে। কিন্তু আমার পক্ষে কোনও অনুরোধ এবং সহানুভূতি জানানো বে-আইনী। অতএব আমি নিজেই একসময়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়েছি।

বোধ হয় এখানে বলা দরকার, প্রায় একমাস হতে চলল আমাদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। একদিনের জন্যও হেনার মুখে হাসি দেখিনি, এবং তার মুখ দেখলে আমার মনে পড়ে যেত, ঠাকুরদাদার আমলের পুরনো পিতলের হাঁড়ির তলাটা। হাসপাতালের একটা ঝি আশে-পাশে শিখণ্ডীর মতো খাড়া থাকত, এবং হেনা সব করত তার নিজের হাতে। শয্যাগত রোগীর পক্ষে প্রতিবাদ জানানো মিথ্যে, সুতরাং আমাকে চুপ করেই থাকতে হত। আমাকে ঔষধ গেলানো, পথ্য খাওয়ান, বিছানা বদলানো ইত্যাদি কাজে সে ছিল যন্ত্রবৎ, এবং এসব ব্যাপারে আমার সঙ্গে একটি কথা বলাও তার প্রয়োজন ছিল না। তার সেই কঠিন, নির্লিপ্ত, নির্মোহ এবং উদাসীন পাথরের টুকরোর মতো মুখখানা দেখে একদিন আমি বললুম, আমার ভাগ্যের হাতে আমি প্রতারিত হয়েছি! তোমাকে সুন্দরী বলে এতকাল ভুল করেছিলুম!

হেনা তাকাল আমার দিকে নির্নিকার মুখে। আমি পুনরায় বললুম, তোমার হাসিমুখ বরং সহ্য হয়,—কিন্তু তোমার মুখখানা গম্ভীর থাকলে নিশাচর পেচক-পত্নীকে মনে পড়ে। সত্রী একখানি মুখ আমার বরাতে নেই!

হেনা আমার মুখখানা হাঁ করিয়ে ঔষধ ঢেলে দিল, তারপর হাতের তলায় থার্মমিটার লাগিয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে রইল। আমার মুখের ওপরেই তার চোখ দুটো স্থির হয়ে ছিল, তবু আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে ব্যর্থই হলুম। এক সময় থার্মমিটারটি বার করে নিয়ে সে নিরীক্ষণ করে দেখল, বিন্দুমাত্র ভ্রূকুঞ্চন তার নেই,—তারপর সেটি তুলে রেখে দিল। একখণ্ড পাথর সামনে যেন ঘোরাফেরা করছে!

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ডাক্তার এলেন। রোগীকে পরীক্ষা করলেন, চার্ট মিলিয়ে দেখলেন। পরে সহাস্যে ইংরেজিতে বললেন, রোগী অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত আরোগ্যলাভ করেছেন। আপনার আদর্শ সেবা এবং পরিচর্যাই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে।

হেনার মুখে রেখামাত্র পরিবর্তন নেই। সে এবার ধীর কণ্ঠে বলল, এক মাস আগে আপনারা এঁর মস্তিষ্কবিকারের লক্ষণ দেখেছিলেন। সে-লক্ষণ কি এখনও আছে মনে করেন?

না, না, ওসব ভাববেন না, ওসব একদম কিছু নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তবে কেন মাঝে মাঝে উনি আবোল-তাবোল বকেন?

ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। পরে বললেন, না না, ওঁর মাথা বেশ পরিষ্কার। আপনি কিছু ভাববেন না। এমন অনেক রোগী আছেন যাঁরা ভাল হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিহাসবোধ খুঁজে পান। উনি একটু তামাশা ভালবাসেন।

হেনা প্রশ্ন করল, ভবিষ্যতেও কি ওঁর মাথাটা এমনি পরিষ্কার থাকবে আপনি আশা করেন?

মারাঠি ডাক্তার ভদ্রলোক এবার একটু অবাক হয়ে হেনার প্রতি তাকালেন। পরে

সহাস্যে বললেন, সেটি ও'র পারিবারিক জীবনের শান্তির ওপর নির্ভর করে।

উনি কবে ছাড়া পাবেন এখান থেকে?

ডাক্তার আবার চার্টখানা পরীক্ষা করে বললেন, এই সামনের পনেরোই তারিখে। আচ্ছা, নমস্কার—

পর্দা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ডাক্তার আবার ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, ও'র পক্ষে আরও মাসখানেক ছুটি নিলে ভাল হয়।

হেনা বলল, উনি এক বছরের জন্য আগেই ছুটির দরখাস্ত করেছেন!

এক বছর!—ও, আচ্ছা,—নমস্কার। ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট দুই পরেই কিষণ এসে ঘরে ঢুকল। সে এনেছে আপেল, আনার এবং কিছু আঙুর। কিষণকে আমি কাছে ডাকলুম। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, না, আমি দেশে আর ফিরব না, হুজুর। আপনাদের কাছেই আমি থাকব।

হেনা একবার আমাদের দিকে তাকাল। আমি একটু আড়ষ্ট বোধ করে কিষণের সঙ্গে আমার বিশ্রম্ভালাপটুকু থামিয়ে দিলুম। চেয়ে দেখলুম গত এক মাসে ছেলেটার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছে। পরনে তার নতুন জামা ও পাজামা, মাথায় কালো রংয়ের একটা টুপি, পায়ে নতুন জুতো। কিষণ এখন পালিত পুত্রের জায়গা পেয়ে গেছে।—

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেদিন বাড়ি পৌঁছলুম, সেদিন আয়নার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দেখলুম, আমার চেয়ে সুখী ও সুস্থকায় ব্যক্তি অন্তত দিল্লীতে আর কেউ নেই।

সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হলুম যখন আমার কোয়ার্টারের তৃতীয় ঘরখানা থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল একটি সুশ্রী যুবক এবং একটি মধুর-হাসিনী তরুণী। যুবকটিকে দেখে চিনলুম, এ সেই মণিপ্রসাদ।

মণিপ্রসাদকে মনে আছে তোমার?—এক বছর পরে এই প্রথম হাসিমুখে হেনা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল।—ওরই সঙ্গে কানপুর থেকে মধ্যভারতে পালিয়েছিলুম। এ মেয়েটির নাম শিবন্তী,—মণিপ্রসাদের পায়ের বেড়ি।

আমরা সবাই কলহাস্যে ঘর মুখরিত করলুম। শিবন্তী কাছে এসে আমার কুশল প্রশ্ন করল। মণিপ্রসাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে বলল, আমরা দুজনে স্থির করেছি আপনাদের সকল কাজে আপনাদের পাশে থাকব। দিদির কাছে আমরা দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।

আমি একটু হকচকিয়ে হেনার দিকে তাকালুম। হেনা বলল, পরে আমরা সবাই মিলে এসব আলোচনা নিয়ে বসব। ওরা আমার এখানে প্রায় দশ বারো দিন রইল, আজ চলে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে?

মণিপ্রসাদ এবার হাসল। কিন্তু জবাব দিল শিবন্তী। সে তার কচি হাসিমুখখানা তুলে বলল, আপনারা দুজনে আমাদের জন্য যে জায়গা নির্দেশ করেছেন, সেখানেই যাচ্ছি?

আবার আমার নির্বোধ দৃষ্টি হেনার দিকে ফিরল। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছেন আমার মস্তিষ্কবিকারের কোনও লক্ষণ নেই। তাঁর কথাটা নির্ভুল কিনা, হেনার দিকে তাকিয়ে সেটি ভাবলুম। হেনা আবার হেসে বলল, আজকাল তুমি সব কথাই একটু দেরিতে বোঝ! সরকারি লোকদের দস্তুরই এই। আমরা যে মস্ত ঘর-সংসার ফেঁদে বসছি, ওরা সেখানেই যাচ্ছে!

আগাগোড়া হেঁয়ালী রেখে দেওয়া হচ্ছে ব'লেই কথাটা আর বাড়ালুম না। শুধু বললুম, এক বছরে তোমরা যে এতখানি অগ্রসর হয়ে গেছ, এটি সকলের পক্ষেই আনন্দের কথা।—শিবন্তীবাই, তোমার বিয়ে হয়েছে কতদিন?

শিবন্তী সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে হেনার দিকে তাকাল। বলল, দিদিই বলুন—

হেনা সহাস্যে জবাব দিল, মাস চারেক হল ওদের বিয়ে হয়েছে!

মণিপ্রসাদ কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, দিদির কথাটা আমি একটু শুধরে দিই। আমাদের বিয়েতে দিদিই দাঁড়িয়েছিলেন, উনি না দাঁড়ালে হয়ত এ বিয়ে হত না!

হাসিমুখে প্রশ্ন করলুম, ঘটক বিদায় কি দিয়েছ?

শিবন্তী খুব হেসে উঠল। মণিপ্রসাদ সগৌরবে শুধু বলল, চিরজীবনের দাসখত!

এমন সহজ সুস্পষ্ট এবং আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর শুনে আমি যেন একটু বিস্মিতই হলুম। কিন্তু এর পরে আমার বক্তব্যও কিছু ছিল না। আজ আমি হাসপাতাল থেকে ফিরেছি মাত্র। গত তিন মাসকাল যে বিচিত্র একটা জীবন যাপন ক'রে এসেছি, সেটার ছায়া এখনও আমাকে ঘিরে রয়েছে। সামনে একটা মস্ত অগোছালো সংসারযাত্রার চেহারা দেখতে পাচ্ছি। সরকারি কাজে আমার যে আর মন নেই, একথা বুঝতে পেরেই হেনা আমাকে দিয়ে এক বছরের ছুটির দরখাস্তে সই করিয়ে নিয়েছে। এ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট। তাছাড়া বিগত এক বছর ধ'রে হেনার গতিবিধি এবং কর্মধারার সঙ্গে আমার কোনও সংযোগ ছিল না। কানপুর ছেড়ে সে কোথায় গিয়েছে, কি করেছে, কেমন ক'রে দিন কাটিয়েছে,—এসব কোন তথ্যই আমার জানা নেই। আমি কেবল দেখছি হেনার গায়ের বর্ণ কিছু মলিন, কিছু মেদ ঝরে গিয়েছে তার শরীর থেকে, মুখখানা কিছুটা রোদে ঝলসানো, এবং মাথার সেই চুলের রাশি আরও কিছু রুক্ষ। আমি শুধু জানতুম, কিছুকাল আগে কলকাতায় কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সে কয়েকদিন আমার ওখানে থেকে আবার কোথায় যেন চলে গিয়েছিল।

আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবার জন্যই শিবন্তী ও মণিপ্রসাদ অপেক্ষা করেছিল। তারা দুপুরের ট্রেন ধরে চ'লে যাচ্ছে, এবং আমার সঙ্গে এই মাসের শেষদিকেই তাদের আবার দেখা হবে এই প্রস্তাবটি জানিয়ে আহারাদির পর তারা হাসিমুখে বিদায় নিল। হেনা এবং কিষণ ওদেরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে গেল।

আমার পাচক কাজ ছেড়ে দিয়ে অনেকদিন আগেই চলে গেছে। খানসামা আমার কাছে বসে গত তিন মাসের হিসেব দিতে লাগল। হরনাম সিংয়ের একশ' টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হেনা এখানে এসেছে প্রায় দু' মাস। কিন্তু এই দুমাসের মধ্যে তাকে বার বার দিল্লী ছেড়ে মধ্যভারতের দিকে ছুটতে হয়েছে। গত এক মাস কাল আমি ছিলুম হাসপাতালে, এবং লক্ষ্য করেছি হেনা মাঝে মাঝে কোথায় যেন অদৃশ্য হচ্ছে। কখনও কখনও কানে এসেছে, তার শরীর খারাপ, তাই অনুপস্থিত। আজ শুনলুম এই এক মাসের মধ্যে সে বার তিনেক গিয়েছিল দিল্লী ছেড়ে।

খানসামা বলল, রান্নাবান্না সমস্তই মেম-সাব করেন। খরচপত্র এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি সবই তাঁর হাতে। কিন্তু খান-সামার কাছে আনুপূর্বিক শুনতে শুনতে আমি নিজকে কেমন যেন অপ-রাধী মনে করছিলুম। গত তিনমাস কাল ধ'রে যে বিপ্লব আমার উপর দিয়ে ঘটে গেল, আজ যেন তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পেলুম না। কতক্ষণ অবধি বিছানায় পাশ ফিরে চুপ করে পড়ে রইলুম। কিন্তু ভাল করে বুঝতে পারলুম না কেন আমি একটা বেপরোয়া, দুঃশীল, এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য জীবন-যাত্রার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলুম!

হেনা কখন্ ফিরে এসেছে জানিনে। কিন্তু সে আমার ঘুমটুকু ভাঙ্গায়নি। আমি যখন উঠে বসলুম তখন বিকাল। হেনা নিজের মনে এঘর ওঘর ঘুরে নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। আমি এখনও ডাক্তারি পথ্যে রয়েছি, সেই কারণে আমার ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে যে ধরনের ভোজ্য বস্তু কিষণ নিয়ে এসে হাজির করল, তাতে আমার বিক্ষোভ বেড়ে উঠল। বললুম, আর কতদিন তোরা আমাকে রুগী বানিয়ে রাখবি বল্ ত?

হেনা তখনই সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আমাদের সবাইকে তুমি যতদিন বিনা অপরাধে দুঃখ দিয়েছ, ঠিক ততদিন তোমাকে রুগী বানিয়ে রাখা হবে। যা কিষণ, আমার জন্যেও নিয়ে আয়।

কিষণ দুমিনিটের মধ্যে আরেকটি জলযোগের ট্রে নিয়ে এল। কিষণের এ প্রকার ফিটফাট কাজ দেখে আমি হেসে বললুম, তুই এত শিখলি কোত্থেকে রে?

মাতাজি শিখলায়া, সাব।

কিন্তু তুই যে বলেছিলি হোটেল খুলবি, তার কি হল?

কিষণ আমাকে বোঝালো, ওসব ঝঞ্ঝাটে সে আর যেতে চায় না। তার চেয়ে এখানে সে অনেক ভাল আছে, এবং তার 'আখেরের' সব দায়িত্ব মাতাজি তুলে নিয়েছেন। চুনারিয়া এবং তার লোকেরা তার কাছ থেকে অর্ধেক টাকা কেড়ে নিয়েছে। ওই বেইমানদের কাছে সে আর কখনও ফিরবে না। সামান্য সে যা বাঁচাতে পেরেছিল, মাতাজির কাছে সে গচ্ছিত রেখেছে। ছেলেটাকে বেশ হাসিখুশী দেখা যাচ্ছিল।

কিষণ চলে যাবার পর এবার সরাসরি হেনাকে প্রশ্ন করলুম, তোমার চেহারা এমন কাহিল হল কেমন ক'রে?

হেনা হঠাৎ অভব্য পরিহাস করে বসল,—অনেকদিন তোমার চোখ পড়েনি সেই জন্যে!

আমি তার দিকে তাকালুম। সে বলল, বুঝতে পারলে না? বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েছেলের বিয়ে না হলে তাদের চেহারা শুকোতে থাকে!

এবার আমি হাসলুম। বললুম, শিবন্তী আর মণিপ্রসাদের বিয়ে দিয়ে বুঝি নিজের জন্যেও ইচ্ছে হয়েছে? বল না, এবার না হয় আমিই ঘটকালি করি!

ট্রে-র উপর থেকে দু'একখানা বিস্কুট এবং দু'এক ফালা আপেলের টুকরো চিবিয়ে চা খেয়ে হেনা উঠে পড়ল। তার সময় কম। আলমারি খুলে একটা শিশি থেকে গোটা দুই শাদা ট্যাবলেট বার করে আমার হাতে দিয়ে সে বলল, চায়ের সঙ্গে গিলে ফেলো। সাবধান থাকা ভাল। যাই, রান্নার যোগাড় করিগে।

রাগ ক'রে বললুম, কেন, দাও না কিষণকে, ও রাঁধুক?

হেনা বলল, রাঁধতে ও ভালই পারে অবিশ্যি। কিন্তু—মাইনে দিচ্ছ বলেই কি খাটিয়ে নিতে চাও? তুমি ত আগে এমন ছিলে না?

আমি চুপ করে গেলুম। হেনা গেল রান্নার দিকে। কি যেন সব সামগ্রী কেনাকাটা ক'রে খানসামা ফিরে এল একটু আগে। অনেকদিন পরে আমার কাছে আজ যেন সব নতুন লাগছিল। একটা কথা সকাল থেকে আমাকে পেয়ে বসেছে। এক বছরের ছুটিতে যদি আমাকে থাকতেই হয় তা হলে এ বাড়ি বোধহয় আমার পক্ষে আর রাখা চলে না। রাখাটা শোভন নয়, সঙ্গতও নয়। তা ছাড়া আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে আমার মনে। হেনা থাকছে না আমার চতুঃ-সীমার মধ্যে,—সে চলে যাবে তার নিজের জগতে, যেটি তার নিজের সৃষ্টি। কোনও লোভে কোনও মোহে সে তার স্বকীয় জগতের বাইরে দীর্ঘদিন থাকতে প্রস্তুত নয়। তার ডাক আছে ভিন্ন দিক থেকে—যেখানকার আহ্বান এবং আকর্ষণ ভালোবাসার চেয়েও বোধ করি বড়। আমি তাকে কোনমতেই ধরে রাখতে পারব না।

জুতো পায়ে দিয়ে বাগানে পায়চারি করতে করতে এই কথাগুলোই যখন তোলাপাড়া করছি, সেই সময় বাগানের ঘাসের উপর দিয়ে এসে হেনা আমার কাছে দাঁড়াল। বলল, শোন'—আজ থেকে আর জিজ্ঞেস করব না তোমার শরীর কেমন আছে! দেখতেই পাচ্ছি তুমি ভাল হয়ে গেছ। এবার একটু একটু ঠাণ্ডা পড়ছে, এসো ভেতরে যাই।

রান্না শেষ করেছ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার রান্নাটুকু ওদের হাতে দিইনি! এবার শুনলে ত? এসো—

ঘরে এসে দুজনে বসলুম কাছা-কাছি। হেনা বলল, এমন ঝড় তুমি তুলেছিলে যে, ভয়ে মরি! কেন বল দিকি তোমাকে অমন করে ভূতে ধরে-ছিল? কিষণ যেদিন খুঁজতে খুঁজতে এসে খবর দিল,—আমি আর নেই! আগে খবর দিলুম পুলিশে, তারপর তোমার দপ্তরে! তারপর ডাক্তারকে ডাকলুম। হাতের কাছে যা পেলুম সঙ্গে নিলুম। কিষণকে নিয়ে আগেভাগে গাড়িতে উঠলুম। তোমার হয়েছিল কি, শুনি? সাধ ক'রে আস্তাবলে ঢুকেছিলে কি ঘোড়ার কামড় খেতে? ভাগ্যি কিষণকে নিয়ে রুটির দোকান ফেঁদে বসেছিলে,—ছেলেটার জন্যেই এ যাত্রা বেঁচে গেলে! বলো, জবাব দাও?

আমি হাসলুম, তার আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও!

কি বলো।

বললুম, তোমার চেহারা, চাহনি, ভঙ্গী, এমন কি মুখের ভাষাটি পর্যন্ত বদলে গেছে এই এক বছরে। বয়স যেন তোমার বেড়ে গেছে দশ বছর। তুমি যেন জাঁদরেল গিন্নি হয়ে ফিরে এসেছো। বলো দেখি তোমার এমন দশা হল কেন?

হেনা মুখ নিচু করল। তারপর বলল, তোমার জন্যে, পার্থ!

আমার জন্যে? মানে?

তুমি চেয়েছিলে আমার লঘুলাবণ্য খসে পড়ুক, আমার দেহ থেকে সমস্ত পাপড়ি ঝরে যাক্। তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করেছি, পার্থ।—একটু চুপ ক'রে থেকে হেনা পুনরায় বলল, তুমি আগুন জেলেছিলে আমাকে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে খাঁটি করার জন্য; সাংঘাতিক সংযম শিখিয়েছিলে আমার স্বভাবে গাম্ভীর্য আনার জন্য। তোমার আশা মিথ্যে হয়নি। যে-অগ্নিবাসনাটা ফণা তুলতো মাঝে মাঝে ভিতর থেকে, সেটা বোধ হয় আর বেঁচে নেই! এবার খুশী ত?

ঈষৎ অস্থিরতার সঙ্গে আমি বল-লুম, না, হেনা, এ আমি চাইনি। ও

সাপটা বেঁচে থাক্, ফণা নাই তুললো! ওটা আছে বলেই ত সকল কাজে উৎসাহ, সকল চিন্তায় উদ্দীপনা। ওটা না থাকলে ভালবাসায় মাধুর্য কোথায়, সুখস্বপ্নের ইন্দ্রজাল কোথায়, বাঁচবার আনন্দ কোথায়? এ তুমি ভুল করেছ, হেনা। ওই সাপ চিরদিন বেঁচে থাক্।

নিজকে ঠকিয়ো না, পার্থ!—হেনার মৃদু কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। সে বলল, তোমার মনে অনিশ্চয়তার ভয় আছে তাই তুমি আনন্দ পাওনি, উদ্বিগ্ন সংশয় নিয়ে তুমি বসে থাকতে চাওনি। আমাকে কাছে পেয়েও তোমার স্বস্তি ছিল না। কেন জান? তুমি ভেবেছিলে মালা-বদলের মালাটা কোনদিন ছেঁড়ে না! ভেবেছিলে শুভদৃষ্টির চোখ দুটো তোমার দিকে একবার স্থির হয়ে তাকালে অন্য কোনও বিষয়ের দিকে সে চোখ আর ফিরবে না।

বললুম, আমি কি কোনদিন বিয়ের কথা তুলেছি?

তুলতে না পেরে দুঃখবোধ করেছ, সে আমি দেখেছি! মনে করেছিলে বিয়ে না হলে পায়রা-মটরের মতন চিরকাল শুধু গড়িয়ে বেড়াতে হবে, গায়ে গায়ে মিলবে না! তোমার ভয়, আমি পাছে হারাই!

আমার মনের কথা তুমি কেমন ক'রে জানলে?

হেনা বলল, কেমন ক'রে জানলুম? তোমার মন কি আমার মনের বাইরে? আজন্ম যাকে গুলে খেয়েছি, গিলে খেয়েছি, দূরে গেলে যে আমার প্রতি নিঃশ্বাসে জড়ানো, তার মনের কথা জানতে কতটুকু সময় লাগে? তুমি বাউণ্ডুলে হয়ে যখন পথে পথে ঘুরেছো, তখন যে এই ঘর দখল করে আমি ব'সে আছি! দিল্লী, কানপুর, কলকাতা—কোথায় খুঁজিনি তোমাকে? তুমি গিয়েছিলে কানপুরে, সেখানে শুনে এসেছ মণিপ্রসাদকে নিয়ে আমি নিরুদ্দেশে চলে গেছি,—ব্যস, অমনি পুরুষের আসল চেহারা ধরা প'ড়ে গেল!

তার কী প্রমাণ পেয়েছ তুমি?—প্রশ্ন করলুম।

হেনা হাসিমুখে বলল, প্রমাণ তোমারই আচরণ! পাঁচখানা ছ'খানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছি পর পর, একখানা চিঠিরও তুমি জবাব দাওনি! পাছে সব কাজ ফেলে ছুটে আসি, তাই ঠিকানা না রেখে খবর না দিয়ে, চিহ্নটি পর্যন্ত মুছে ফেলে তুমি গৃহত্যাগী হয়েছিলে! আগেকার কালে মেয়েরা সিঁদুরের জোর মেনে চলত, এখন মনের জোরে তারা বেশি বিশ্বাসী। মনের জোর আছে বলেই একমাস হাসপাতালে তোমার সঙ্গে কথা বলিনি; আট দিন তোমার বিকারের ঘোর ছিল, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিনি! একথা ভুলে যেয়ো না পার্থ, মণিপ্রসাদ আর শিবন্তীকে তোমারই জন্যে সামনে এনে রেখেছিলুম!

বললুম, সে আমি অনুমান করেছি।

করবেই ত,—হেনা বলল, ওখানে যে তোমার ক্ষত আছে। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারনি বলেই দুঃখ বরণ করেছ। এতকাল পরে আজ জানলুম তোমার শ্রদ্ধার মধ্যে অবিশ্বাসের কিছু ভেজাল মেশান ছিল। তবু বলি, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস স্থির আছে বলেই তোমাকে না জানিয়ে আমি এখানে ওখানে যাই! কিন্তু তুমি এবার থেকে দেখে নিয়ো, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আর কোনও দিন তোমাকে আমি দূরে রাখব না!

বোধ হয় হেনার গলাটা ধরে এসেছিল। সে উঠে চলে গেল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই শিবন্তীর চিঠি এল। চিঠিখানা ইংরেজিতে লেখা হেনার নামে। শিবন্তী আমাকে প্রণাম জানিয়ে কুশল চেয়ে পাঠিয়েছে। ওদের সকল কাজের মাঝখানে আমি গিয়ে না দাঁড়ালে ওদের সাফল্যের আশা কম ইত্যাদি।

চিঠিখানা বড়, কিন্তু তার বয়ানে আর কি কি বক্তব্য আছে সেগুলি হেনার মুখ থেকে শুনলুম না। বোধ হয় ওটার সঙ্গে এক বছরের ইতিহাস নিহিত রয়েছে,—যেটার আনুপূর্বিক বিবরণ আমার জানা নেই। শিবন্তীর মোট বক্তব্য, আমরা দুজনে অবিলম্বে ওখানে যেন যাই। আমাদের চিঠির জন্য তারা অপেক্ষায় রইল।

হাসিমুখে বললুম, তোমার সঙ্গে আমার কি প্রকার সম্পর্ক ওরা জেনে রেখেছে?

ওই দ্যাখো—হেনা হেসে উঠল, তুমি কেমন সচেতন! অমনি ভয় ঢুকেছে, সম্পর্কটা জানলে লোকে কি ভাববে! ভেতরে সেই রক্ষণশীল খোকা-পুতুল, রক্তের মধ্যে সেই ঐতিহ্যের ভূত! তুমি আমি যে মিলিয়ে আছি প্রতি অঙ্গে, প্রতি কল্পনায়, প্রতি ভাবনায়,—আমরা যে একই শক্তির দুই প্রকাশ, একই ভালোবাসার দুই প্রতীক—এটির ওপর তোমার আস্থা কম। তুমি চাইছ সেই পুরনো ব্যবস্থার নতুন ছিমছাম চেহারাটা। দেখতেই পাচ্ছি, তুমি সেই পুরনো গাছটা কেটে ফেলেছ, কিন্তু তার শিকড় উপড়ে ফেলতে পারনি!

বললুম, তুমি তাহলে মণিপ্রসাদের বিয়ে দিতে গেলে কেন?

তোমার জন্যে!—হেনা বলল, ওই মেয়েটাকে না পেয়ে মণিপ্রসাদ রাগ করে দেশ ছেড়ে আসে। এ খবরটা আমি শুনতে পাই। তুমি যাতে ওদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করো, তাই আমি চেষ্টা ক'রে ওদের বিয়ে ঘটাই!

রাত্রের দিকে আবার হেনাকে ডাকলুম। সরাসরি তাকে আমি প্রশ্ন করলুম, তোমার কি ইচ্ছে নয় সরকারি চাকরি আমি করি?

হেনা বলল, বাঃ তুমিই ত' বলতে, সরকারি-বেসরকারি কোনও চাকরিই তোমার পছন্দ নয়!

তুমি জান কি, আমি বেশ মোটা মাইনে পাই? এমন চাকরি পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভেবেচিন্তে উত্তর দাও, হেনা।

উত্তর আছে তোমার নিজেরই মধ্যে। হেনা বলল, এমন মোটা মাইনের চাকরি তুমি যে কোনও সময়ে যে কোনও জায়গায় পেতে পার!

আমি চুপ করে রইলুম। পরে বললুম, এ বাড়ি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এক বছরের ছুটির পর এ চাকরিও আমি ছেড়ে দেব!

হেনা থমকিয়ে দাঁড়াল। বলল, ছেড়ে দিলে ভবিষ্যতে যদি তোমার অনুতাপ আসে?

তুমি সঙ্গে থাকলে অনুতাপ আসবে কেন?

ভাগ্য যদি আমাকে সরিয়ে রাখে তোমার কাছ থেকে?

আমি হাসলুম। বললুম, ভয় দেখিয়ো না হেনা, আমাকে দিয়ে চুক্তি-সর্তও লিখিয়ে নিয়ো না। ভাগ্য যদি সেই রকম ব্যবস্থাই করে আমি আমার পথ বেছে নিতে পারব। তোমার সঙ্গে আমার চাকরি করা বা না করার যোগ থাকতে

থাকবে কেন? একথা কেন ভাবছ, তুমি কাছে না থাকলে শুধু চাকরির টাকা নিয়ে আমি ভুলে থাকব? তোমার চেয়ে টাকা নিশ্চয়ই বড় নয়!

হেনা হেসে উঠল। বলল, টিকার মতন টাকা পেলে পুরুষমানুষ বউকেও ছেড়ে দেয়!

বটে! আর তোমরা?—প্রশ্ন করলুম।

আমরা? পুরুষের মতন পুরুষ পেলে আমরা স্বামীকেও ছেড়ে দিই!

একটা প্রবল হাসির ঝড়ে আমাদের ঘর মুখরিত হয়ে উঠল।

এক বছরের ছুটির দরখাস্ত চলে গেছে বটে, কিন্তু সেটি এখনও মঞ্জুর হয়ে আসেনি। যদি ছুটি পাই তবে সর্ত থাকবে এই, প্রথম তিন মাসের মাইনে সম্পূর্ণ পাব, দ্বিতীয় তিন মাস অর্ধেক মাইনে, এবং বাকি ছয় মাস বিনা মাইনে। এ বাড়ি আমি ছেড়ে দিচ্ছি নিজের বাংলোতে। এক বছর পরে যদি আসতেই হয় তখন সরকারি বাড়ি নাও পেতে পারি। হেনা কলকাতায় গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছে, বুড়ীপিসির খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বাড়িভাড়ার টাকা খুড়িমা আমার ঠিকানায় নিয়মিত পাঠাবেন—আমি যেখানেই থাকি। বুড়ী-পিসি ঠিকে-ঝি ছাড়িয়ে তার নাতি সুরেনকে নিজের কাছে রাখবে আমার ওখানে এবং খুড়িমার মহলে দুজনেই কাজকর্ম এবং রান্নাবান্না করবে। মাইনে-পত্র আমিই দেবো।

হেনা এবার আমার কাগজপত্র নিয়ে এসে সামনে বসল। কলকাতায় আমার ওখানে সে গিয়েছিল সদলবলে। স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে মোটামুটি একটা বন্দোবস্ত করেছে। দিব্যেন্দু এবং খুড়িমার সাহায্যে স্বর্ণকারকে ডাকিয়ে প্রচুর লাভে সে তার তিন পুরুষের অলঙ্কারপত্রাদি বেচে এসেছে। এ টাকা নাকি তার পক্ষে পথে কুড়িয়ে পাওয়ার সামিল। এ ছাড়া এটর্নী আপিসে গিয়ে হেনা কাগজপত্রের সমস্ত কাজ শেষ করেছে, এবং নরেন্দ্রর দরুন সেই ক্ষতি-পূরণের সমস্ত টাকা দিয়ে এসেছে রামকৃষ্ণ মিশনকে। বাগানবাড়ি বিক্রির টাকা আগেই রাখা ছিল ব্যাঙ্কে এবং আমার পক্ষে যেটি সর্বাপেক্ষা আপত্তি-জনক, সেই ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ির দরুণ যে বিস্তর অর্থ সে পেয়েছিল, সেটি রেখে এসেছে আমার একাউণ্টে। ভেবে-চিন্তে দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতি আমরা প্রচুর অর্থের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছি!

আমাকে লেখা চিঠিগুলি হেনা এবার একে একে খুলে বসল। এগুলি সে লিখেছে বিগত আটমাস কালের মধ্যে। প্রায় পঁচিশখানা চিঠি,—কিন্তু একখানার জবাবও আমি লিখিনি।

হেনা বলল, যা কিছু করেছি এই এক বছরে, তার আগাগোড়া সমস্ত ইতিহাস এই সব চিঠিতে লিখেছি। প্রতিদিনের কথা, প্রতি কাজের, আমার প্রতিটি গতিবিধির,—তোমাকে না জানিয়ে কিছু করিনি। সব কথা চিরদিন তোমাকে বলতেই ভাল লাগে। আমার মনের জানলা শুধু তোমার দিকেই খুলেতুম। কিন্তু একটি চিঠিরও তুমি জবাব দাওনি। রাগ করো না পার্থ, তোমার মনে ছিল কেমন একটা রহস্যজনক বিদ্বেষ, তার সংগে জড়িয়ে গিয়েছিল আত্মাভিমান। এ কথাটা আমি কোনমতেই ভুলতে পারছিনে। এর জন্যে চিরদিন হয়ত আমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে! এমন শাস্তি তুমি কেন দিলে আমাকে? আমার সকলের বড় আশ্রয় ছিল তোমার বিশ্বাসের ওপর, তার তলায় তুমি ভূমিকম্প এনে দিলে কেন, বলতে পার?

"হেনাকে কাছে টেনে নিলুম"

উদ্বেলিত আবেগ নিয়ে আবার হেনা উঠে যাচ্ছিল, আমি তার হাত ধরে ফেললুম, এবং কখনও যা করিনি আজ তাই করে বসলুম। হেনাকে আমি কাছে টেনে নিলুম। আস্তে আস্তে বললুম, আমিও শাস্তি কম পাইনি, তুমি বিশ্বাস কর। দুঃখ আমিও বরণ করেছি, হেনা।

হেনা আমার গলার কাছে মাথাটা রেখে বলল, এই দুর্বলতা তোমার আজকের নয়, পার্থ। তোমার বয়স যখন আঠারো, তখন থেকে। বরাবর দেখেছি, নবেন্দু আমার কাছাকাছি এলেই তুমি দূরে সরে যেতে। তুমি তাকে জায়গা ছেড়ে দেবার চেষ্টা পেতে। তোমার দিকে যে আমার মন পড়ে থাকত সে-খোঁজ একবারও তুমি নাওনি। অবশেষে যখন নবেন্দু একটা মিথ্যে কাহিনী রটিয়ে স্ত্রী বলে আমাকে দাবি করল, তুমি তারই পক্ষ নিলে! আজ যখন মাতাল নবেন্দুর মুখ থেকে খুড়িমা আর তুমি সত্য ঘটনাটা শুনলে তখনই শুধু তুমি বিশ্বাস করলে, নবেন্দুর বিছানা থেকে তার হাতখানা ছাড়িয়ে একদিন আমি উঠে এসেছিলুম।

আমি চুপ করে রইলুম। এক সময় হেনা মাথা তুলল। বলল, খুড়িমা সব বলেছেন আমাকে। লজ্জাটা কোথায় জান? নবেন্দুর মিথ্যে কাহিনী তুমি বিশ্বাস করেছিলে, আমার সত্যভাষণ তুমি গ্রহণ করনি!

বললুম, নবেন্দুর প্রতারণা আমি বুঝতে পারিনি। ওখানেই আমি মস্ত ভুল করেছিলুম!

হেনা এবার এক ঝলক হাসল। পরে বলল, শোন, মাঝরাত্তিরে ভালবাসার কথা নিয়ে গল্পগাছা করার দরকার নেই।

শুধু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি। আমাকে বার বার নরেন্দ্রর স্ত্রী বলে ভাবতে তোমার একটুও লজ্জা করেনি, কেন বল ত?

আমিও হাসলুম। বললুম, বোধ হয় আধুনিক কালের বান্ধবী আর স্ত্রীর মাঝামাঝি পার্থক্যটা ভুলে গিয়েছিলুম।

ছি ছি, ধিক তোমাকে! আর কোনোদিন যেন এসব কথা উচ্চারণ করো না পার্থ।

হেনা চুপ করে গেল। অতঃপর আমি বললুম, এসব কথা থাক্। তুমি কবে এখান থেকে চলে যেতে চাও, আমাকে ঠিক করে বল।

হেনা এবার বিছানায় মুখ ঘষল। পরে ললিত জড়িত হাস্যে বলল, হুজুরের খোস মেজাজের জন্যেই ত' অপেক্ষা। আমি তৈরিই আছি, এবার তিনি মেহেরবানি করলেই হয়। পা আমি বাড়িয়েই আছি।

আমি সোজা হয়ে উঠে বসলুম, এবার আমাদের মনোক্ষোভের শেষ হোক হেনা। আমিও প্রতিজ্ঞা নিলুম মনে মনে।

হেনা স্পষ্ট করে আমার দিকে তাকাল। বলল, প্রতিজ্ঞা তোমার বিচার-বুদ্ধির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে কিনা?

নিশ্চয়ই থাকবে।—আমি বললুম, তোমার আমার মধ্যে আর কোনদিন ছাড়াছাড়ি না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখব। শোনো, কাল সকালেই আমি বোর্ডের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি গুছিয়ে নাও কাল সকাল থেকেই। তোমার সঙ্গেই আমি যাব।

হেনা একটু হাসল। পরে বলল, শত্রুপক্ষ এই কথা যদি রটায়, একটি মেয়ের চোখের ইশারায় তুমি এতবড় চাকরি ছেড়ে দিলে, এবং সেই দজ্জাল মেয়েটা তোমাকে কড়ি দিয়ে কিনে নিয়ে চোখের আড়ালে সরে গেল বিদেশ-বিভূঁয়ে ঘর পাতবে বলে। তুমি এর কী জবাব দেবে?

আমি বললুম, জবাব অতি সহজ! আমাদের আচরণের দ্বারাই একথা প্রকাশ করতে পারব, দুই দেহপিন্ডের জান্তব আকর্ষণে আমরা ঘরছাড়া হচ্ছিনে! আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ভালমন্দ, ভবিষ্যৎ—সমস্ত ভাসিয়ে বড় কাজের মাঝখানে নেমে যাচ্ছি; দেশের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চাইছি!

কথাটা বোধ হয় হেনার ভাল লেগেছিল। আবেশমদির কণ্ঠে সে শুধু বলল, ছোট সংসার আমাদের জন্যে নয়, একথা চেঁচিয়ে বলতে পারবে ত?

বললুম, ভয় পেয়ো না হেনা, আমার জীবন ঢেলেই একথা প্রমাণ করব।

নতুন জীবনের একটা ডাক ছিল, অস্বীকার করব না। সেই নতুন কেমন, তার কেমন চেহারা,—এ প্রশ্ন আজকে আর তুলব না। নিজের বুকের মধ্যেই বার বার কান পেতে শুনেছি অনিশ্চয়ের দরন্ত ডাক। আজ এই মহানুভনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আর বলা চলবে না, তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছি, তুমি সংশয় আনছ, তুমি আনছ বিপ্লব, আনছ অশান্তি। যাকে দূরের থেকে একদা মনে হয়েছিল মধুর, মনোহর এবং স্বপ্নময়, যাকে পাবার জন্য হৃৎপিণ্ডে দোলা লেগেছে কতবার,—তার সামনে এসে দেখি সে যেন ভয়ভীষণ, দাবি তার বিরাট, দৃষ্টি তার মোহমুক্ত, বাস্তব তার অভিব্যক্তি। সেই ক্ষুধার্ত, বলিষ্ঠ, কঠোরশ্রমী নূতন যেন ডাক দিয়ে এনেছে তার মুখোমুখি। আমার বক্ষোস্পন্দন দ্রুত তালে চলছিল।

মধ্যভারতের ভিতর দিয়ে পশ্চিম বুন্দেলখন্দের একটি ছোট্ট ষ্টেশনে যখন আমরা নামলুম, পূর্বাকাশে তখনও রং ধরেনি। আমরা তিনজন,—কিষণ সিং আমাদের সঙ্গে ছিল। ছেলেটাকে দিল্লীতে ছেড়ে আসার চেষ্টা পেয়েছিলুম, কিন্তু আমাদের সংগ সে কোনমতেই ছাড়তে চাইল না। যে-নৌকা অকূলে ভাসল, তারই দড়িদড়া শক্ত করে কিষণ ধরে রইল। আমি ছেলেটার হিসাব-বুদ্ধির তারিফ করতে পারলুম না।

একটা সুবিধা, আমাদের গাড়িবদল ছিল না। আমাদের প্রয়োজনের মালপত্র সমস্তই এসেছে লগেজ-ভ্যানে। কেবল সঙ্গে এসেছে আমাদের ব্যবহারের সামগ্রী। কিষণের হাতে তাদের সমস্ত হেপাজত ছিল।

হেনার চলাফেরা দেখে বুঝলুম, এই ষ্টেশনের সঙ্গে তার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। গাড়িখানা ছেড়ে যাবার পর এক সময় দেখলুম ষ্টেশন-মাষ্টারমশায় হেনাকে দীর্ঘ নমস্কার জানিয়ে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। ষ্টেশনের কুলিরা হেনাকে জানে, এবং হেনা যখন আমাকে ওয়েটিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসাল তখন একটি লোক দ্রুতগতিতে আমাদের জন্য জলের বন্দোবস্ত করতে লেগে গেল।। নতুন জায়গায় এসে কিষণ মহা খুশী, এবং এক সময়ে সে অত ভোরে ভেন্ডারকে দিয়ে চা বানিয়ে আমাদের জন্য নিয়ে এল।

হেনা ভুল করেনি, জলযোগের আয়োজন তার সঙ্গেই ছিল। তার ধারণা ঠিক সময় মতো রুচিকর সামগ্রী আমার মুখে যোগাতে পারলে আমি নাকি তুষ্ট থাকি। আমার ধারণা, ওটা ঘুষ! হেনা সেকথা মানে না।

আমরা সবেমাত্র চায়ের আয়োজন করে বসেছি, এমন সময় কিষণের সঙ্গে এসে হাসিমুখে ঢুকল মণিপ্রসাদ এবং শিবন্তী। আমরাও হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা করলুম।

মণিপ্রসাদ বলল, আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না। কাল রাত্রেই আমরা বাসে সীট রিসার্ভ করে রেখেছি।

তোমরা রাত কাটালে কোথায়?

কেন, রেষ্টরুমে—? এই ত' পাশেই। আমাদের এখানে স্থায়ী ব্যবস্থা আছে, আমাদের কোনও লোক এখানে এলেই মাষ্টারসাব ঘর খুলে দেন।

চা এবং জলযোগ সারতে আন্দাজ আধঘন্টা লাগল। ওরই মধ্যে কিষণকে এক জায়গায় বসিয়ে হেনা তাকে সযত্নে খাওয়াল এবং বলল, কিষণ, তোর মতন আমাদের দুজনেরও মা-বাপ নেই, মনে রাখিস। আমরা তিনজন একই দলে। মা-বাপ অনেকেরই থাকে না।

কিষণ বুদ্ধিমান ছেলে। সে বলল, আপনাদের নেই, লেকিন্ আমার মা-বাপকে আমি পেয়ে গেছি!

শিবন্তী ব'লে উঠল, দেখলেন ত, কেমন সুন্দর বললে? ছেলেটি খুব হুঁসিয়ার! আমরা সবাই কিষণের মনোভাবটিকে তারিফ করলুম।

মালপত্র আমাদের প্রচুর। যেগুলি লগেজ-ভ্যান থেকে নামানো হয়েছে, সেগুলি বয়েল্-গাড়িতে যাবে। তার জন্য মণিপ্রসাদ এখানে মোতায়েন রইল। সে যাবে বেলা দশটার বাসে। কিন্তু মালপত্র তিন দিনের আগে আমাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছবে না। অনেক দূর পথ। আমাদের সঙ্গে খুচরো মালগুলি দিয়ে ভোর ছটায় মণিপ্রসাদ আমাদের চারজনকে মোটরবাসে তুলে দিল। শিবন্তী আমাদের সঙ্গে চলল। আমরা যেখানে যাচ্ছি এই প্রথম সেই অঞ্চলের নাম জানলুম সুকেতগড়। মোটরবাসে ঘাট

মাইল অতিক্রম করতে হবে। গাড়ি ছেড়ে দিল এক সময়।

বাসের সীটে গুছিয়ে বসে এবার প্রশ্ন করলুম, তোমাদের মুলুক কোথায়, শিবন্তীবাঈ?

শিবন্তী সলজ্জ কুণ্ঠার সংগে জবাব দিল, সুকেতগড়ের পাশের গ্রামেই আমার মা বাবা থাকেন। আপনাকে তাঁদের কাছে একদিন আমি নিয়ে যাব।

বেশ ত'। তোমাদের দেশে এলুম, এবার মনকে ছেড়ে দেবো। ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় দেখে বেড়াব।

শিবন্তী বলল, আপনি আনন্দ পাবেন সে আমাদের সৌভাগ্য! সুকেত-গড়ে সকলেই আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রে রয়েছে!

আমার জন্যে? এ কি বলছ, শিবন্তী?

শিবন্তীর মিষ্টমধুর মুখখানিতে আমার সকল প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলুম।

জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে হেনা হাসিমুখে বসেছিল। সকালের হাওয়া স্নিগ্ধ, এবং যেহেতু প্রায় সমগ্র বুন্দেল-খন্দ বিন্ধ্যাগিরিশ্রেণীর অন্তর্গত, সেই হেতু শীতের আমেজ রয়েছে। চারিদিকে হরিৎ-ক্ষেত্র, দূরে দূরে ছোট ছোট বনময় পাহাড়, পথগুলি অতি মসৃণ এবং চিক্কণ। আমাদের যাত্রাটা বড় আনন্দের ছিল।

কোথাও কোথাও মোগল আমলের রণক্ষেত্র এবং স্থাপত্য পেরিয়ে যাচ্ছি-লুম। কোথাও দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট এক-একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি পুরাতন দুর্গ। কোথাও বা বড় বড় 'তালাও' এবং শিবের মন্দির। প্রতি পথের বাঁকে এখানে-ওখানে-সেখানে—যেন ছোট ছোট কবিতার টুকরো ছড়ানো। হেনার মুখখানা উদ্ভাসিত হচ্ছিল মাঝে মাঝে।

বাস এক এক জায়গায় থামছিল। যাত্রী নামাওঠা করছে। কোন কোনও যাত্রীর চোখে ও মুখে বাঙ্ময় আভা দেখে মনে হচ্ছে হেনাকে ওরা যেন অনেকেই চেনে! গাড়িতে ওঠবার সময় ড্রাইভার হেনাকে 'নমস্তে' জানিয়ে ষ্টিয়ারিং ধরেছে। আমি হেনাকে যেন নতুন চোখে দেখছিলুম।

আমরা যখন সুকেতগড়ের ছায়া-নিরিবিলি একটি বাগানের ধারে পোঁছে গাড়ি থেকে নামলুম, বেলা তখন প্রায় দশটা বাজে। কিষণ একে একে গাড়ির চালের উপর থেকে বিছানা, বাক্স, সুট-কেস, টুকরি, বস্তা, ব্যাগ—প্রভৃতি নামিয়ে নিল। চারিদিকে নিঃঝুম পল্লী-প্রান্তরের বনময় শোভা দেখে আমার চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে গেল। পাশ কাটিয়ে এক সময় হনহনিয়ে এগিয়ে যাবার পথে হেনা হাসিমুখে বলল, দেখে-শুনে বুঝি ভয় পাচ্ছ? অগাধ জল মনে হচ্ছে, কেমন?

আমার বলা উচিত ছিল, পৃথিবী এত সুন্দর আগে জানতুম না।— কিন্তু কোন-ও জবাব না দিয়ে আমি চুপ ক'রে হাসলুম।

শিবন্তী বলল, কিষণ, তুই একটু দাঁড়া ভাই এখানে জিনিসপত্র নিয়ে, গাড়ি এলে তার সংগে যাস। দাদা, 'আপ আইয়ে।'

সামনে এক বিস্তৃত কলাবাগান,—এটি পশ্চিমের পক্ষে বিচিত্র। মাঠের এক প্রান্তে কয়েক সারি শেগুন গাছ। আমরা একটি সরু রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে চললুম। হেনা আগে ভাগে এগিয়ে গেল অনেকটা। শিবন্তী বলল, আপনি দেখবেন এখানে আপনার শরীর সারবে, 'হাওয়া-পানি ইধর বহুৎ আচ্ছা হ্যায়, দাদা।'

বাগান পেরিয়ে বাঁ হাতি অদূরে দেখা গেল, সারি সারি কয়েকটি কাঁচা পাকা ঘর। তারই সামনে মস্ত খামার—সেখানে রাশি রাশি গম ঢালা। ওপাশে কয়েকখানা ঘেরবাঁধা বয়েল-গাড়ি,—বয়েলগুলি খোঁটায় বাঁধা। এ ধারের চালা-ঘরের সামনে চার-পাঁচটি ছোট ছোট ঘোড়া শুকনো খড় চিবোচ্ছে। এতক্ষণ পরে আমরা লোকজনের দেখা পেলুম।

আমাকে এখানে পোঁছিয়ে শিবন্তী যেন কোন্‌দিকে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেনা আমাকে ডাকল। বলল, তুমি বোধ হয় ভাবছ মালপত্রগুলো কোথায় পড়ে রইল! কিছু ভেব না, এদের সবাইকে বিশ্বাস ক'রে চল, কখনও ঠকবে না। এসো—

সমস্তটাই আমার অপরিচিত। ঘর-দোর, গ্রাম, খামার, প্রান্তর, পৃথিবীর এই একান্ত, হেনার কর্মধারা, সুকেত-গড়ের পরিচয়—আগাগোড়া এখন পর্যন্ত সবই দুর্বোধ্য। এতক্ষণ পরে হেনাকে কাছে পেয়ে বললুম, সত্যি বলব, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, হেনা। তোমার মুখ থেকে এবার আমি সব শুনতে চাই, —বলো।

হেনা বলল, না, কোনটা শুনতে চেয়ো না! তোমার চোখ আছে, তুমি নিজে আবিষ্কার ক'রে নাও। এ তোমারই.—এই যা কিছু দেখছ। আরও দেখবে যতই দিন যাবে। প্রতিদিন তুমি একটি একটি ক'রে খুঁজে বার করো!

তুমি এখানে কে?

আমি?—হেনা হাসল,—আমি কেউ না। ওরাই সব।

ওরা কা'রা?

ওই যাদের তুমি দেখবে একে একে? ওরা সবাই আসবে, কিন্তু তোমার পক্ষে ডাকতে জানা চাই! কায়মনোবাক্যে ওদের ডাকতে হবে, পার্থ।

আমি চুপ ক'রে একখানা তক্তার উপর এসে অনেকটা যেন ক্লান্ত হয়ে বসলুম। হেনা কাছে এল। পিছন থেকে আমার মাথার উপর হাত রেখে বলল, যে-ভাষায় এতকাল খানসামাকে ডেকে এসেছ, যে-ভাষায় ডেকেছ কুলিমজুর-মেথর-জমাদারকে,—সে-ভাষা নয়। এ হবে তোমার প্রাণের ডাক, তোমার শ্রদ্ধা নিয়ে এই ডাক যেন ছুটে যায় অনেক দূরে। সেই ডাক শুনে ওরা ছুটে আসবে তোমার চারদিকে, তুমি গিয়ে ওদের মাঝ-খানে আপনজনের মতন দাঁড়াবে। তুমি ওদের লোক, নিঃস্বার্থভাবেই ওদের—এই কথা সত্য হয়ে উঠুক, পার্থ।

বললুম, আমার ডাক ওরা শুনবে কেন? ওদের ডাকব, সে-অধিকারই বা আমার কোথায় হেনা?

হেনা আমার মাথার এলোমেলো চুল গুছিয়ে দিতে দিতে বলল, অধিকার! তুমি ডাকলে আমি কেন ছুটে আসি তোমার কাছে? কোন্ অধিকারে তুমি ডাকো আমাকে?

আমি চুপ ক'রে গেলুম। হেনা বাইরে চ'লে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে কয়েকটি লোক আমাদের ব্যাগ বিছানা ও সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদের সংগে রয়েছে শিবন্তী ও কিষণ। শিবন্তী বলল, দাদাজি, এবারে আসুন আপনার ঘরে। আমি সব গুছিয়ে দিয়ে এসেছি।

বললুম, তা হলে এসব ঘরগুলি কাদের, শিবন্তী?

এখানে বাইরের লোক থাকে। আসুন—

আমি তার অনুসরণ করে যখন কিষণকে নিয়ে এগোচ্ছিলুম তখন শিবন্তী বলল, এক বছর আগে এখানে মাঠ ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু ওই যে ওদিকে পুরনো ইমারতটা দেখছেন, ওইটি শুধু ছিল। দূরে দূরে চালাঘর ছিল কয়েকখানা। তবে হ্যাঁ, মহারাজাও সাহায্য করেছেন দিদিকে, নৈলে এত তাড়াতাড়ি বোধ হয় এত কাজ হত না!

একটু অবাক হয়ে বললুম, মহা-রাজা? তিনি আবার কে?

শিবন্তী বলল, আপনি শুনবেন সব দিদির কাছে। আসুন—

একটি সরু নূতন বাঁধানো পাকা রাস্তা চ'লে এসেছে গাছপালার ভিতর দিয়ে। সেটির প্রান্তে এসে দেখা গেল বড় একখানা চালাঘর, এবং অদূরে কয়েকজন কর্মী ঘর-দোর তৈরির কাজে লিপ্ত। (ক্রমশঃ)

ডক্টর জন কেনেথ গলব্রেথ

কৌটিল্য সান্যাল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত কেনেডীর নিকটে স্নায়ু ও ঠাণ্ডাযুদ্ধে ক্লান্ত পৃথিবীর শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের আশা অনেক। গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ও-দেশে, এ-দেশে ডেমোক্র্যাটিক দলের জয়কামনা বহু ব্যক্তিই করেছিলেন। ডেমোক্রাটিক দলের নির্বাচন-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তত্ত্ব-মূলক ফ্রন্টে যিনি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত জন কেনেথ গলব্রেথ। বেতার, টেলিভিসন আলো ও আরও নানা ধরনের শ্রবণ-সুখকর ও নয়নভুলানো বক্তব্য বা দ্রষ্টব্যের মার্কিন নির্বাচনের রণক্ষেত্রে তত্ত্বের দিকটির প্রতি সুস্থ নাগরিকের প্রবণতাই গণতন্ত্র রক্ষার একমাত্র শক্তিশালী বর্ম। জন কেনেথ গলব্রেথের মূল্য তাই গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছিল অসামান্য। তিনিই ডেমোক্রাটিক পার্টি এ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের মূল উদ্যোক্তা। ১৯৫২ এবং ১৯৫৬ সালেও এ্যাডলাই স্টিভেনসনের নির্বাচনী প্রচারে তিনি ছিলেন মূল বিষয়গুলির প্রধান উপদেষ্টা ও লেখক।

এই পটভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অব্যবহিত পরে শ্রী গলব্রেথের ভারতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়ে আসা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই জানেন, ভারতের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের উপরেই এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করছে। ভারতই সেই সুবৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে শান্তি-পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রথায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাধীন ও সচ্ছল ভবিষ্যৎ রচনার কাজ চলেছে। তাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-জগতের মধ্যমণি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জন কেনেথ গলব্রেথের ভারতে রাষ্ট্রদূত হিসাবে আগমনে আমরা অত্যন্তই আনন্দিত। কারণ একাধারে তিনি বিদ্বান এবং ভারতের হিতৈষী বন্ধু।

রাষ্ট্রদূত গলব্রেথের সঙ্গে ভারতের পরিচয় আজকের নয়। ১৯৫৬ সালে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটের আমন্ত্রণে তিনি দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রায় সূচনার সময়ে ভারতে এসেছিলেন। ডক্টর গলব্রেথ এদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার দিক, বিশেষভাবে এদেশের শিল্পসংগঠন, সম্পদ ও মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপরে, পরিকল্পনার সুচারু উদ্বর্তনের প্রয়োজনে আলোকপাত করেন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটের ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভের বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার দিকগুলিও সবিশেষ আলোচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয়বার তিনি আসেন ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে। ভারত সরকারের অনুরোধে তিনি তাঁর মতামতগুলি একত্রিত করেন, পরে সেগুলি লোক-সভায় উপস্থাপিত হয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা পায়। ডঃ গলব্রেথ আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক শঙ্কাকুল ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা ও অর্থনীতিবিদদের স্পষ্টই বলেছিলেন, 'আমরা নিশ্চিত

জন কেনেথ গলব্রেথ

হতে পারি এই ভেবে যে, যে পরিকল্পনা সংকটের সম্মুখীন হয় না, সে পরিকল্পনা (আলোচনার অযোগ্য) ছোট পরিকল্পনা। সংকটই প্রয়োজনীয় কর্ম-প্রয়াসকে আগবাড়িয়ে নিয়ে আসে।'

ডঃ গলব্রেথের জীবন বহু কর্ম-ব্যস্ততায় কেটেছে। তাঁর জন্ম হয় ১৯০৮ সালে কানাডার অন্টারিওতে। ১৯৩১ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন। অন্টারিওর কৃষিবিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি অর্জনের পর তিনি ১৯৩৩ কালে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এম-এস (M. S.) লাভ করেন এবং পরের বছরই পি-এইচ-ডি ডিগ্রীতে সম্মানিত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি কেম্ব্রীজে (ইংলণ্ড) সমাজ-বিজ্ঞানের রিসার্চ ফেলো হন। তারপর ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি প্রথম সরকারী কাজ গ্রহণ করেন। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা উপদেশাত্মক সমিতির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, মূল্যনিয়ন্ত্রণ সংস্থার ডিরেক্টার-ইনচার্জ, ডেপুটি এ্যাডমিনিস্ট্রেটর, United States Strategic Bombing Survey-র ডিরেক্টার হিসাবে কাজ করেছেন। সে সময়ে জার্মানী ও জাপানের যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে বিমান আক্রমণের প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করার গুরুত্বপূর্ণ কাজেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরাজিত ঐ দুটি দেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হন। আজ পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের যে অর্থনৈতিক কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তার পেছনে এই নিরলস অর্থনৈতিক-কর্মী ডক্টর জন কেনেথ গলব্রেথের প্রয়াস রয়েছে একথা সকলেই জানেন। এ ছাড়াও তিনি আরও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী বিভাগে বহু উচ্চপদের কাজ করেছেন। তারপর ১৯৪৯ সালে আবার তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। উল্লেখ করা দরকার, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত তিনি ফরচুন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যও ছিলেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ক্যাসারিন গলব্রেথ একজন বহুভাষাবিদ বিদুষী মহিলা। তিনটি পুত্র নিয়ে গলব্রেথ-দম্পতি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সুখী পরিবার রচনা করেছেন।

কর্মজীবনের দিকে লক্ষ্য দিলে বলা যায়, শ্রীযুক্ত জন কেনেথ গলব্রেথ তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অর্থনীতি-বিজ্ঞানে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকটে সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। মার্কিনী চিন্তা-জগতের সঙ্গে ডক্টর গলব্রেথের সংশ্রব দীর্ঘ দিনের। তিনি American Academy of Arts and Sciences-এর এবং ওয়াশিংটনের Cosmos ক্লাবের সদস্য। তাছাড়া নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসাবে অতি নিকট বাস্তবতার পরিচয় ছিল তাঁর। ফলে, তিনি বাস্তবের দিক থেকে মুখফেরানো এ্যাকাডেমিক অর্থনীতিবিদ হননি। তিনি জানেন, যে কোনো দেশের অর্থনীতি নিয়ত পরিবর্তনমান, সুতরাং নিতানতুন বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তত্ত্বের দিকেই তিনি বেশী আগ্রহী। মার্কিন মূলধনতন্ত্র American Capitalism সম্পর্কে তাঁর আলোচনা তাই বহু ক্ষেত্রেই ক্লাসিক্যাল ও কীনসীয় তত্ত্বে

দীক্ষিত অর্থনীতি-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মেলে না। কীনসের ভাষায় 'the ideas of economic and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood ...... Practical men, who believed themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slave of some defunct economist.' ডক্টর গলব্রেথ তাঁর বহু-আলোচিত, সাধারণ পাঠকদের জন্যে লেখা American Capitalism — The Concept of Countervailing Power বইটিতে কীনসের ঐ উক্তিটি উধ্‌ৃত করে, নতুন করে মূলধনতন্ত্রের বিচার করতে বলেন। বইখানিতে তিনি বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং ব্যবসার ক্ষমতা বিশদভাবে আলোচনা করেন। 'As the conservative has worried about government power, so the liberal has been alarmed over business power'. রক্ষণশীলেরা অর্থনীতিতে সরকারী উদ্যোগের প্রতি সন্দিগ্ধ এবং লিবারেলগণ মনোপলি বা অলিগোপলির (অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসা বা ছোট ছোট ব্যবসায়ীর গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বড় ব্যবসা-র) অক্টোপাশে বাঁধা অর্থনীতির ভয়ে নিদ্রাহীন। গলব্রেথ উভয় দলেরই ভুল দেখিয়েছেন, বলেছেন যে, রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে উদ্যোগ গ্রহণ বা বড় বড় গোষ্ঠীর ব্যবসা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিশালীই করে। আসলে রাষ্ট্রের উদ্যোগ এবং বৃহৎ ব্যবসার সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ মনোভাবই ভুল বোঝার মূল কারণ। যে তত্ত্বগুলি জেনে রক্ষণশীল বা লিবারেলগণ বিচলিত হ'য়ে ওঠে, তা হল, 'Neither the structure of the economy nor the role of the Government conforms to the pattern specified, even demanded by the ideas they hold'. প্রচলিত তাত্ত্বিক অর্থনীতিতে শেখানো হয় যে, বৃহৎ ব্যবসা ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব অপহরণ করে, ইচ্ছামত দাম আদায় করে এবং ফলে অর্থনীতিতে উৎপাদনের কার্যক্ষমতা (efficiency) হ্রাস পায়। আবার সরকার যদি অর্থনীতিতে নানা বিভাগে উদ্যোগ নেয়, তবে রাজনৈতিক গণতন্ত্র নষ্ট হয়ে সর্বগ্রাসী একনায়কত্ব (Totalitarianism) দেখা দেয়। অথচ ডক্টর গলব্রেথের মতে, অনুরূপ কোন ঘটনাই মার্কিন মূলধনতন্ত্রে লক্ষ্য করা যায় না। যদি বৃহদায়তন উৎপাদন ও ব্যবসা উৎপাদনের কার্যকারিতা কমিয়ে দিত, অথবা সরকারী উদ্যোগ যদি স্বাধীনতা হরণ করত, তবে—যে উদারনীতিকেরা আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ পণ্য-ব্যবসায়ীদের দ্রব্য ভোগ করছেন ক্রমবর্ধমান হারে, যে রক্ষণশীলেরা প্রায় দুই দশক New Deal এবং Fair Deal-এর সরকারী ব্যবস্থাপনায় দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের জীবন ঐ দ্বিমুখী আক্রমণ অতিষ্ঠ করে তুলতো। গলব্রেথের মতে, স্বাধীনতাবিধ্বংসী তথাকথিত 'ক্লাসিক্যাল একচেটিয়া ব্যবসা' মার্কিন দেশে ঘটবে না। কেননা এক বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উত্থান, অপর গোষ্ঠীর উত্থানকে ত্বরান্বিত করে। ফলে, বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পরস্পরের প্রতি উদ্যত তাদের প্রতিযোগী মুষ্টি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে। এই হল Countervailing Power —এবং "the group that seeks. Countervailing Power is, initially, a numerous and disadvantaged group which seeks organization because it faces, in its markets", এবং যে দল দানা বেঁধে উঠল, তারা জনসাধারণের সহানুভূতিও লাভ করে। ফলে, প্রতিযোগিতার তাড়নায় গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়াও সম্ভবসাধ্য হয়। তাই ডক্টর গলব্রেথের মতে বৃহৎ ব্যবসা আদৌ ক্ষতিকর নয়, বরং ক্ষমতা এবং প্রতিরোধী ক্ষমতা মার্কিন অর্থনীতিকে স্থায়ী ও ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে।

ডক্টর গলব্রেথের দ্বিতীয় পুস্তক The Affluent Society দেশে বিদেশে বহুল আলোচিত, সামাজিক সমস্যা বিষয়ক গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে তিনি মার্কিন অর্থনীতির কয়েকটি গলদের প্রতিও অংগুলি-নির্দেশ করেছেন। শ্রীযুক্ত কলিন উইলসন তাঁর Age of Defeat গ্রন্থে আমাদের শতকের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে গলব্রেথের ও রীশম্যানের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। ডেভিড রীশম্যান তাঁর 'Lonely Crowd' গ্রন্থে বর্তমান সমাজের মনীষাবিরোধী সমস্যাগুলি আলোচনা করেছেন। মানুষ মূলতঃ তিনধর্মী, ঐতিহ্য নিয়ন্ত্রিত (tradition directed). আত্মনির্দেশিত (Inner Directed) এবং অপর দ্বারা নির্দেশিত (Other Directed)। মধ্যযুগের মানুষ সংস্কার নির্দেশিত, উনিশ শতকের বিভিন্ন উদারনৈতিক আন্দোলনে যোগদানকারী মানুষ স্বয়ং নির্দেশিত ছিল, কিন্তু বিংশ শতকের মানুষ অপর দ্বারা নির্দেশিত। এখন বৃহৎ উৎপাদন বা ব্যবসাসংস্থায় নিযুক্ত মানুষ মূলতঃ অপর নির্দেশিত। আজ 'সংগঠনের মানুষ' (Organization man) বলে যে, সে সংগঠনের যান্ত্রিকতার বুদ্ধিহীনতায় একজন প্রায় স্বয়ংচালিত যন্ত্রমাত্র। পূর্বে স্বয়ং নির্দেশিত যুবকের সম্মুখে যেমন শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব ছিল, তার যৌবন যেমন অভিযান-উন্মুখ ছিল, বর্তমানে ভালো মাইনের চাকুরী, চাকুরীতে ক্রমোন্নতি, সুস্থ পরিবারের নিশ্চিতি—এই হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল লক্ষ্য। গলব্রেথ অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে সম্পদ-উপছে-পড়া সমাজের (Affluent Society) অবস্থায় এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি কি সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হ'য়েছে পর্যালোচনা করেছেন। প্রচলিত রক্ষণশীল অর্থনীতির সঙ্গে তাঁর বক্তব্য খাপ খায় না। কিন্তু এই বইটির জন্যই তিনি Tamiment Book Award পান। তাঁর মতে মার্কিন অর্থনীতি এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে 'উৎপাদনের অতিআবশ্যকীয়তা' (Urgency of Production) আর মূল লক্ষ্য নয়। তাঁর মতে অধিকাংশ দ্রব্যই অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যভোগের প্রয়োজনে উৎপাদিত হচ্ছে। বিজ্ঞাপন, প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ক্রমশঃ বশীভূত করে ব্যবসায়ীরা রুচি তৈরী করছে, ফলে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও চাহিদা তৈরী হচ্ছে। আর তারই ফলে অশিক্ষিত, বিজ্ঞাপন বা প্রচার নির্দেশিত অপগণ্ড নাগরিক তৈরী হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। সেজন্য গলব্রেথ অনেক বেশি সেবামূলক কাজে সরকারী ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। কেনেডী এ্যাডমিনিস্ট্রেশন গলব্রেথের এই নীতিটি গ্রহণ করেছেন এবং যাতে সুখী, উন্নত-স্বাস্থ্য এবং যথার্থ শিক্ষিত স্বাধীন নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দেয়, তারই জন্যে সচেষ্ট রয়েছেন। মূলধনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে যে দেশ আজ পশ্চিমী জগতের নেতা, সেই দেশের অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতি তথা সমাজনীতিবিদের এই বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য। বিশেষ করে, আমাদের দেশে সম্প্রতি ভালো ও স্বল্পিতপূর্ণ মোটা চাকুরীর মোহ ক্রমশঃ বিস্তার পাচ্ছে। ফলে নিম্নসংস্কৃতি ও পোষাক বা বাহিরের নানা দর্শনীয় বিষয়ের প্রতিযোগিতা বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে পোশাক, গৃহসজ্জা প্রভৃতির ধরনধারনও বদলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় গলব্রেথের ভাষা অধিক প্রণিধান-যোগ্য।

আর সেই সঙ্গেই বিবেচনা করা দরকার, নির্বিচারে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের বিষয়ে তাঁর সাবধানবাণী। এ ব্যাপারে পূর্ণতর আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অয়স্কান্ত

॥ মার্কিন উপগ্রহে পারমাণবিক তেজের ব্যাটারি ॥

মার্কিন বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত গাগারিন বা তিতোভের মতো কোনো মানুষকে কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পাক খাওয়াতে পারেননি—একথা ঠিক। রকেট-বিজ্ঞান ততোখানি উন্নত হলে সাড়ে চার টন ওজনের ব্যোমযানকে আকাশের কক্ষপথে তোলা যেতে পারে—মার্কিন বিজ্ঞানীরা এখনো ততোদূরে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। কিন্তু রকেট-বিজ্ঞানে উন্নত না হলেও কৃত্রিম উপগ্রহের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে মার্কিন বিজ্ঞানীদের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। সম্প্রতি মার্কিন দেশ থেকে যে শেষতম উপগ্রহটিকে আকাশে তোলা হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ট্রান্সিট চার-এ, তার একটি বিশেষত্ব এই যে, উপগ্রহটিতে পারমাণবিক তেজের সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো কৃত্রিম উপগ্রহে তেজের যোগান পারমাণবিক পদ্ধতিতে হয়নি।

বিদ্যুৎ-তৈরির এই পারমাণবিক ব্যবস্থাটির নাম দেওয়া হয়েছে SNAP (System for Nuclear Auxiliary Power)। আকারে এটি একটি আঙুরের চেয়ে বড়ো নয়। কোনো সচল অংশও এতে নেই। এই পারমাণবিক জেনারেটরে তেজের যোগানদার হিসেবে আছে অল্প পরিমাণ প্লুটোনিয়াম-২৩৮। এই তেজের যোগান বহু বছর ধরে অব্যাহত থাকবে।

প্লুটোনিয়াম-২৩৮ পদার্থটির এমনিতেই একটা ভাঙনের ক্রিয়া চলতে থাকে, যার ফলে উত্তাপ পাওয়া যায়। এই উত্তাপ একটি তাপ-বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তোলে। প্লুটোনিয়ামের ভাঙন যতোদিন ধরে চলে ততোদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থাও অচল হয় না। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, প্লুটোনিয়াম-২৩৮ পদার্থটির তেজ-স্ক্রিয়তা প্রায় ১৮০ বছর পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ-তৈরির এই পারমাণবিক জেনারেটরটিও বহু বছর ধরে সক্রিয় থাকবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, এই তাপ-বিদ্যুৎ জেনারেটর থেকে যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে তা খুবই সামান্য। তবে ট্রান্সিট চার-এ উপগ্রহে এই সামান্য পরিমাণ বিদ্যুতের সাহায্যেই চারটি বেতার-প্রেরক যন্ত্রের মধ্যে দুটিকে চালানো হচ্ছে এবং এই দুটি বেতার-প্রেরক যন্ত্রের সংকেতও পৃথিবী থেকে ঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ-তৈরির এই পারমাণবিক ব্যবস্থাটির সুবিধে এই যে, এটি ওজনে খুবই হাল্কা, আকারে খুবই ছোট এবং যে-কথা আগেই বলেছি, এর সক্রিয়তা বহু বছর ধরে বজায় থাকে।

॥ একটি আজব শহরের কথা ॥

গত শীতকালে উত্তরমেরু-অঞ্চলের বরফের নিচে একটি আজব শহর তৈরি হয়েছিল। শহরটির নাম দেওয়া হয়েছিল ক্যাম্প সেঞ্চুরি। মানচিত্রে যে-অঞ্চলটির নাম গ্রীনল্যান্ড, উত্তরমেরু থেকে যার দূরত্ব ৮০০ মাইল, সেখানেই তৈরি হয়েছিল এই শহরটি। উদ্দেশ্য ছিল আবহাওয়া সম্পর্কিত গবেষণা। গ্রীনল্যান্ডকে বলা হয় উত্তর গোলার্ধের আবহাওয়ার জন্মস্থান। এই কারণেই এই বিশেষ স্থানটির নির্বাচন।

বরফের নিচে শহর গড়ে তোলবার সময়ে গভীর গর্ত খুঁড়তে হয়েছিল। কাজেই এমন বরফের নমুনাও পাওয়া গিয়েছিল যা কয়েক শো বা কয়েক হাজার বছর আগেকার। এই সমস্ত নমুনার গুরুত্বও খুব বেশি, কারণ এই সমস্ত নমুনা বিশ্লেষণ করে কয়েক শতাব্দীর বরফপাত ও আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর পাওয়া যেতে পারে।

শহরটি তৈরি করার সময়ে বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে একুশটি সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল। সুড়ঙ্গগুলোর বিন্যাস ছিল কোনো বড়ো শহরের রাস্তার মতো। সুড়ঙ্গগুলো কাটার পরে তার ওপরের দিকে ইস্পাতের আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছিল। তারপরে যখন আবার এই ইস্পাতের আচ্ছাদনের ওপরে পুরু হয়ে বরফ জমেছিল তখন তলা থেকে ইস্পাতের আচ্ছাদনগুলোকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তারপরে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে ত্রিশটি কাঠের বাড়ি সমেত গড়ে তোলা হয়েছিল পুরো একটি শহর। এবং রীতিমতো আধুনিক শহর। বিদ্যুৎ-সরবরাহ-ব্যবস্থা, জল-সরবরাহ-ব্যবস্থা ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই কোনো রকম ঘাটতি ছিল না। বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল পারমাণবিক চুল্লীর সাহায্যে, যার পরিমাণ ছিল ২০০০ কিলোওয়াট।

একদল মার্কিন বিজ্ঞানী গত বছরের পুরো শীতকালটা কাটিয়েছিলেন এই বরফের নিচের শহরে। বরফের বিন্যাস সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তাঁরা গবেষণা করেছিলেন। তাঁদের একজন মুখপাত্র বলেছেন—গবেষণার কথা বাদ দিলেও বরফের নিচে বসবাস করার এই সুসম্পূর্ণ আয়োজনটি গড়ে তোলাই

তো একটি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

॥ ফুসফুসে অস্ত্রোপচার ॥

এ-বছরে এক দল সোভিয়েত সার্জনকে লেনিন পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কৃতিত্ব এই যে, ফুসফুসে অস্ত্রোপচার করে তাঁরা কয়েক ধরনের গুরুতর ফুসফুসের পীড়াকে আরোগ্য করে তুলছেন।

ফুসফুসে যক্ষ্মা, ক্যানসার বা এ-ধরনের কোনো রোগের আক্রমণ কখনো এমন গুরুতর হতে পারে যে, ফুসফুসে অস্ত্রোপচার না করলে তা থেকে আরোগ্যলাভ সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দেশের সার্জনরা অনেক দিন থেকেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন এবং ১৯১৭ সাল থেকেই এ-ধরনের অস্ত্রোপচার শুরু হয়েছিল। তবে সহজেই অনুমান করা চলে যে, ১৯১৭ সাল এ-ধরনের অস্ত্রোপচারের পক্ষে খুব প্রশস্ত ছিল না। তখন না ছিল নির্ভরযোগ্য অ্যানীস্থেসিয়া, না প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, না অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। তারপরে অবশ্য বছরে বছরে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ফুসফুসে অস্ত্রোপচারের একটি মৌলিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। যেমন, গুরুতর রকমের যক্ষ্মায় আক্রান্ত ফুসফুসের চিকিৎসা করার সময়ে তাঁরা প্রথমে রোগীর বুকে অস্ত্রোপচার করে একটি প্রবেশদ্বার—বা যাকে তাঁরা বলছেন "বাতায়ন"—তৈরি করে নেন। তারপরে সেই খোলা মুখ দিয়ে আক্রান্ত ফুসফুসের ওপরে সরাসরি জীবাণুনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

এক ধরনের প্লুরিসি আছে যা ওষুধের সাহায্যে সারানো যায় না। সোভিয়েত সার্জনরা এতকালের এই দুরারোগ্য প্লুরিসি রোগকেও অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নিরাময় করে তুলছেন। এজন্যে ফুসফুসের কোনো অংশকে কেটে বাদ দিতে হয়। কিন্তু তারপরেও দেখা গিয়েছে যে রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পুরোপুরি কার্যক্ষম থাকে।

কয়েক ধরনের পুরনো যক্ষ্মারোগ আছে যা সারাতে হলে গোটা ফুসফুসকেই কেটে বাদ দেওয়া দরকার। এই অস্ত্রোপচার খুবই জটিল। সোভিয়েত সার্জনরা এ-ধরনের অস্ত্রোপচারেও সাফল্য অর্জন করেছেন।

আর ফুসফুসের ক্যানসার রোগে তো আক্রান্ত অংশকে কেটে বাদ দেওয়াটাই একমাত্র চিকিৎসা। কয়েকশো রোগীর ওপরে এই অস্ত্রোপচারও হয়েছে এবং এখন তাঁরা আবার কর্মক্ষম হয়ে উঠেছেন।

॥ পর্যাপ্ত মানুষের পৃথিবী ॥

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে আগামী দিনের পৃথিবীতে শুধু যে মানুষের আয়ু বাড়বে তা নয়—অকালমৃত্যুও থাকবে না। আগামী দিনের পৃথিবী হবে পর্যাপ্ত মানুষের পৃথিবী। সহজেই অনুমান করা চলে পৃথিবীর যে-জনসংখ্যা এমনিতেই বাড়ছে তা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতির ফলে আরো অনেক বেশি বেড়ে যাবে। কথাটি ঠিক। একটি ব্রিটিশ পত্রিকায় সম্প্রতি এ-বিষয়ে একটি হিসেব দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের সকলেরই আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক। তাই আমি কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা আজকের চেয়ে দ্বিগুণ হবে। পৃথিবীর এখনকার জনসংখ্যা মোটামুটি ২৯০ কোটি। এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই তা হবে ৬২৮ কোটি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশ সমেত ইউরোপের এখনকার জনসংখ্যা ৬৩·৯ কোটি। তা হবে ৯৪·৭ কোটি। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে এখন আছে ২০·৫ কোটি। হবে ৫৯·২ কোটি। উত্তর আমেরিকায় ১৯·৭৬ কোটি থেকে ৩১·৩৫ কোটি। ওসিনিয়াতে ১·৫৭ কোটি থেকে ২·৭৮ কোটি। নিকট প্রাচ্যে ১৩·১৪ কোটি থেকে ৩৩·২৪ কোটি। আফ্রিকায় ৯·৩৭ কোটি থেকে ৪২·০৬ কোটি। দূর প্রাচ্যে ১৫২·৬৩ কোটি থেকে ৩৬৩·৪০ কোটি।

এই হিসেব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাড়ছে প্রাচ্য দেশগুলিতে ও আফ্রিকায়। এসব দেশে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খাদ্যাভাব আছে। কাজেই, এসব দেশে খাদ্য-উৎপাদনের বর্তমান ব্যবস্থায় যদি কোনো বৈপ্লবিক রূপান্তর না ঘটে তাহলে এই বর্ধিত জনসংখ্যার ফলে স্থায়ী একটি দুর্ভিক্ষের অবস্থা তৈরি হবে।

মোট হিসেবে পৃথিবীর এই বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাবার জন্যে আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর খাদ্য-উৎপাদনকে শতকরা ২০০ ভাগ বাড়ানো দরকার। ব্যাপারটা খুব সহজসাধ্য নয়। এজন্যে দরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও একাগ্র প্রচেষ্টা। আশা করা চলে, আগামী দিনের পৃথিবীতে এই অনুকূল পরিবেশটি তৈরি হবে, কারণ খাদ্য-উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলতে না পারলে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যে-সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তা সারা পৃথিবীর মানুষকে উৎসাহিত করে তুলবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আগামী দশ বছরে কৃষিজাত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে শতকরা ১৫০ ভাগ এবং আগামী কুড়ি বছরে শতকরা ২৫০ ভাগ। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের এই পৃথিবী এখনো এমন বুড়িয়ে যায়নি যে, তার গর্ভে শস্যের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়েছে।

তাছাড়া আরো একটি প্রায় অফুরন্ত খাদ্যের ভান্ডার পৃথিবীর মানুষের নাগালের মধ্যে রয়ে গিয়েছে—আন্তর্জাতিক সহযোগিতা থাকলে যে-ভান্ডারটির দিকে এখনই হাত বাড়ানো যেতে পারে। তা হচ্ছে সমুদ্র। এ-বিষয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতো পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার সবগুলিই কম-বেশি পরিমাণে সমুদ্রের জলে মজুত আছে। সমুদ্রে অজস্র ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায় আর একটু চেষ্টা করলেই সমুদ্রে আরো অজস্র ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মানো যেতে পারে। সব মিলিয়ে সমুদ্র প্রায় এক অফুরন্ত ভান্ডার।

॥ ভোস্তোক—২ ও ২৮টি মার্কিন উপগ্রহ ॥

ভোস্তোক-২ পৃথিবীর নিরক্ষরেখাতলের ৬৪ ডিগ্রি ৫৬ মিনিট কোণাকৃণি কক্ষে পৃথিবীর চারদিকে ১৭ বার পাক খেয়েছিল। এক-একটি পাক দিতে সময় লেগেছিল ৮৮·৬ মিনিট। আর ভোস্তোক-২-এর যাত্রী মেজর তিতোভ মহাশূন্যে ছিলেন মোট ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। তিনি মোট প্রায় সাত লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি যদি পৃথিবীকে পাক না দিয়ে সরাসরি যাত্রা করতেন তাহলে চাঁদে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে পারতেন। ভোস্তোকের অনুভূ বা পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের দূরত্ব ছিল ১৭৮ কিলোমিটার। আর অপভূ বা পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরের দূরত্ব ছিল ২৫৭ কিলোমিটার।

এ-সমস্ত খবর কাগজেই বেরিয়েছে। কিন্তু কাগজে প্রায় একই সময়ে আরো

একটি খবর বেরিয়েছে যেদিকে হয়তো অনেকেরই নজর পড়েনি। খবরটি এই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৪৭টি উপগ্রহ আকাশে উঠেছে। এদের মধ্যে ১৭টির কোনো অস্তিত্ব এখন আর নেই। বাকি ৩০টি উপগ্রহ এখনো থেকে গিয়েছে। আবার ত্রিশটির মধ্যে দুটিকে এখন আর উপগ্রহ বলা চলে না, বলতে হবে কৃত্রিম গ্রহ যা সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে। বাকি ২৮টির মধ্যে ১৩টি থেকে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক তথ্য পৃথিবীতে প্রেরিত হচ্ছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহের জন্যে যথেষ্ট জায়গা আছে। ইতিমধ্যে ব্রিটেন ফ্রান্স ও অন্যান্য কয়েকটি দেশেও উপগ্রহ তৈরি করার তোড়জোড় চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরো অনেকগুলো উপগ্রহ পৃথিবীর আকাশে উঠবে। তখন এই পৃথিবীর আকাশটিই হয়ে উঠবে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির নিদর্শন। আর সবচেয়ে মজার কথা এই যে আমাদের এই পৃথিবীতে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যতোই ঠোকাঠুকি থাকুক না কেন, এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলো কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

॥ তৃতীয় টাইরস ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ॥

গত ১২ই জুলাই তারিখে মার্কিন বিজ্ঞানীরা তৃতীয় টাইরস নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে আকাশে তুলেছেন। উদ্দেশ্য, ঝড় কি-ভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে সে-সম্পর্কে খবর সংগ্রহ। এই উপগ্রহ থেকে যে-সমস্ত আলোকচিত্র পাওয়া যাবে তা থেকে ঝড়ের সামগ্রিক চেহারাটি পরিস্ফুট হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। বিশেষ করে অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার ঝড় সম্পর্কে অনেক নতুন খবর এই উপগ্রহ থেকে পাওয়া যাবে।

বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় আঠারোটি দেশ সহযোগিতা করছে। এই আঠারোটি দেশ হচ্ছে—ভারত, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, দুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রিটেন।

ওদিকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও ঘোষণা করেছেন যে, মহাকাশ-সংক্রান্ত গবেষণার কোনো খবরই তাঁরা গোপন করবেন না। ইতিপূর্বে স্পুৎনিক ও লুনিক থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য সমস্তই তাঁরা প্রকাশ করেছেন। প্রথম নভোচারী মেজর গাগারিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং পৃথিবীর দেশে দেশে আমন্ত্রিত হচ্ছেন। দ্বিতীয় নভোচারী মেজর তিতোভও পূর্বসূরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছেন। সব মিলিয়ে অন্তত নভোচারণবিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পক্ষে আবহাওয়া খুবই অনুকূল। এই সহযোগিতা যতো সুদৃঢ় হবে মানুষের বিশ্ব-জয়ের দিনটিও ততোই ত্বরান্বিত হবে। কারণ, মহাকাশ-যাত্রার ব্যাপারটি এতই ব্যয়বহুল যে, কোনো একটি দেশের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে তা বহন করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীর সবক'টি দেশের সংস্থান একত্রিত হলে এই ব্যয়বহুল ব্যাপারটিও অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠবে।

ভারতের নৃত্যকলা

॥ সাঁওতাল নৃত্য ॥

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে বোধ করি সাঁওতালদের স্থান-ই সবার ওপরে। কারণ, এই রাজ্যের আদিবাসী জনসংখ্যার দিক থেকে এদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি এবং লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরা বিশিষ্ট এক ধারার অনুসারী। সাঁওতালী নাচের সঙ্গে পরিচিত নন এমন লোক এদেশে খুব কমই আছেন।

বিহারের ছোটনাগপুর এবং তারই সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রধান বাস। সাঁওতালী স্ত্রী-পুরুষ সাধারণত কর্মঠ, সাহসী, অতিথি-বৎসল এবং নৃত্যগীতে অনুরাগী। প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়ে এরা যেন স্বভাবতই প্রাণোচ্ছল। আর, প্রাণের সেই উচ্ছলতাই তারা যেন প্রকাশ করে নাচগানের মধ্য দিয়ে।

সাঁওতালী মেয়েরা রঙ ভালোবাসে, বিশেষ করে লাল রঙ। তাই লাল রঙের ফুলই যেন তাদের প্রসাধনের প্রধান অংগ। খোঁপায় লাল রঙের ফুল গুঁজে মেয়েরা যখন পরিপাটী অথচ সাধারণ বেশভূষায় দল বেঁধে নাচে তখন যেন সুন্দর একটি ছবি ফুটে ওঠে প্রকৃতির আঙিনায়। পুরুষেরা মাদল বাজায়, আর তারই তালে তালে লঘু ছন্দে মেয়েরা নাচে। সে-নাচে অনেক সময় হয়তো বৈচিত্র্য থাকে না, কিন্তু স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল সাঁওতালী মেয়েদের নাচের মধ্যে যে সাবলীল একটা সুষমা ফুটে ওঠে তা আনন্দদায়ক।

সাঁওতালী নাচে আড়ম্বর নেই, কিন্তু সৌন্দর্য আছে; বহুবিধ বাদ্য-যন্ত্রের সমাবেশ নেই, কিন্তু মাদলের বোল্ ও বাঁশের বাঁশির মিঠে সুর আছে। আর আছে নাচের প্রতিটি পদ-ক্ষেপের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা।

নাচের সঙ্গে গানও হয় অনেক সময়। সাঁওতালী গানের মধ্য দিয়ে যে সহজ সুরটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে লৌকিক-সংগীতের ক্ষেত্রে তারও একটা বিশেষ স্থান আছে। অতিথির অভ্যর্থনায়, পূজা-পার্বণে এবং বৈবাহিক ক্রিয়াকর্মে প্রচলিত সাঁওতালী গানগুলির মধ্যে সহজ-প্রাণের সুন্দর একটা পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"আইস্ কুটুম বাইস কুটুম
হামারিও অঙ্গানাকো।
আগুতো বাইসালম্
রাইঙহো ফাল্না রায়া
তাহি পিছু বাইসালম্ দশ কুটুম।
আন্সেগো বাহিনী এক
লোটা পানি জো,
আন্সেগো বাহিনী এক
ছিলিম্ তামাকুর;
হুকা তামাকুর লড়রে বেতহার।"

অর্থাৎ,—এসো কুটুম, আমার আঙিনায় বসো কুটুম। প্রথমে বসালাম অমুক রায়াকে (মাঝিকে), তারপর বসালাম দশ কুটুমকে (অন্যান্য কুটুম্বকে)। আনো গো বোন এক ঘটি জল, আনো গো বোন এক ছিলিম তামাক; হুকা-তামাক আতিথেয়তায় ব্যবহার-যোগ্য।

বাতিক

নির্মল সরকার

এক কবিরাজ মশায়কে বলতে শুনেছি বাত নাকি চৌষট্টি প্রকারের—গেঁটে বাত, ঝিন-ঝিনে বাত, সুড়সুড়ি বাত—এক নিশ্বাসে নামগুলি গড়গড় করে বলে গিয়েছিলেন তিনি; মাঝে মাঝে অবশ্য সংস্কৃত শব্দের ছিঁটে-ফোঁটা ছিল সেই সঙ্গে, কিন্তু বাতিক যে কত রকমের আছে তা এখনও পর্যন্ত শোনা যায়নি।

বোধহয় যত 'বাত্' তত বাতিক. এখানে বাত্ অর্থে মাতৃ ভাষা অনুযায়ী কথা বলে ধরে নিলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যত রকমের মানুষ তত রকমের বাতিক এবং এক কথায় বাতিকের অন্ত নেই।

এক বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক বলেছেন, কোন লোকই নাকি বাতিক বিহীন নয় অর্থাৎ একটা না একটা বাতিক তার থাকবেই। এ কথাটা কতদূর সত্যি তা বলতে পারি না তবে বাতিকগ্রস্ত লোকের যে অভাব নেই একথা জোর করেই বলা চলে। কত উপন্যাস, গল্প আর নাটকের খোরাক যে এই বাতিক জুগিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সব দেশের সাহিত্যেই কিছু না কিছু এর নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাতিকগ্রস্ত লোকই বোধহয় বেশী। মাথা টিপটিপ করা, পেট ভুটভাট কিংবা বুক ধড়ফড় করার কথা অনেককেই হয়ত বলতে শুনে থাকবেন, লক্ষ্য করবেন তাঁদের অসুস্থতা সম্বন্ধে বিশদভাবে বলতেই তাঁরা ভালবাসেন অর্থাৎ বলাটা যে শুধু তাঁদের প্রয়োজনীয় তা নয়, তাঁদের পক্ষে আরামপ্রদও বটে।

এমনিতে হয়ত এগুলো তেমন মারাত্মক কিছু নয় কিন্তু অভ্যাসটা বাড়তে বাড়তে এমন বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পড়ে যাতে শেষ পর্যন্ত বাড়ীর এবং আশে-পাশের সকলেই অতিষ্ট হয়ে পড়ে।

যেমন ধরুন হরিদাসবাবুর কথা। রেলে কাজ করেন, বয়সও অল্প। কিন্তু প্রত্যহ অফিস যাবার আগে ডাক্তারবাবুকে বুকটা দেখিয়ে এবং তাঁর আশ্বাস নিয়ে তবে অফিসে যান।

সঙ্গের ব্যাগে থাকে বোতল ভরা বাড়ীর জল (অন্য জল তিনি খান না), কোরামিন, কারমিনেটিভ মিক্সচার, টিঞ্চার আয়োডিন, সালফাড্রাগ ইত্যাদি, প্রায় ছোটখাট একটি ডিস্পেনসারী। হরিদাস-বাবুর রিপোর্ট মত, ঠিক বেলা চারটের সময় নাকি তাঁর মুখের অর্ধেকটা লাল এবং বাকী অর্ধেকটা কালো হয়ে যায়। এ তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ করা ঘটনা, রোজই তিনি আরশিতে এটি লক্ষ্য করে থাকেন। এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে বা অবিশ্বাস করলে তিনি যে শুধু বিচলিত হয়ে পড়েন তা নয় বিরক্তও হন দস্তুরমত।

সে যাই হোক, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যেদিন তিনি বিয়ে করতে চললেন। হঠাৎ তাঁর ধারণা হল যে বিয়ে করতে বসে তিনি নির্ঘাৎ হার্টফেল করে দেহত্যাগ করবেন—শুভ কাজটি আর শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে না। বোঝানর চেষ্টা বৃথা, হাসি থেকে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব—অগত্যা তাঁর কথামত ডাক্তার-বাবুকে নিতবরের জায়গায় বসিয়ে বিয়ে করতে চললেন হরিদাসবাবু। বিয়ের সময় থেকে বাসর ঘর পর্যন্ত ডাক্তারবাবু ঠায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন আর ফিরে আসার সময় হরিদাসবাবুকে যথারীতি পরীক্ষা করে এবং তাঁর হৃদযন্ত্রের সবলতা সম্বন্ধে বিস্তর ভরসা দিয়ে তবে ছুটি পেলেন। অবশ্য ফুলশয্যার রাত্রে যে কারণেই হোক ডাক্তারবাবুকে আর কল দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। হরিদাসবাবুর এখন তিনটি সন্তান—অফিস যাওয়া সংসারকে চালু রাখা সবই করছেন তিনি কিন্তু বাতিকটি লেগে আছে ঠিক—ডাক্তারবাবুর কাছে রোজই ধরণা দেন এখনও।

এবার একজন অধ্যাপকের কথা বলি। একেবারে স্বাভাবিক মানুষ, যেমন বিদ্বান তেমনি অমায়িক ভদ্রলোক, কোন দোষ নেই বদঅভ্যাসও নেই। কিন্তু পাখার নীচে শুতে বা বসতে দিন, তা হলেই বিপর্যয়!

এক লাফে তিনি চার হাত দূরে সরে যাবেন—তাঁর ধারণা তিনি যদি পাখার নীচে থাকেন তাহলে পাখাটি খুলে টুপ করে তাঁর মাথায় পড়তে দেরী হবে না। তিন মণ ওজনের পাখাটা কারুর মাথায় পড়লে সে বাঁচে নাকি! বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে অনেক, তাতে কুফলই হয়েছে—বন্ধু হয়েছে পরম শত্রু, আর আপনজন পর।

আর একটা শুনুন। বিখ্যাত ডাক্তার আসছেন এক বাড়ীতে মুমূর্ষু রুগী দেখতে। তাঁর অপেক্ষায় সবাই সদরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অবশেষে ডাক্তারবাবু এলেন। গাড়ীর দরজা খুলতে এগিয়ে গেলেন একজন। হাঁ-হাঁ করেন কি—ছোঁবেন না গাড়ীর দরজা। খাতির করতে গিয়ে ভদ্রলোকও অপ্রস্তুত! ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে ডাক্তারবাবু আড়ষ্ট হয়ে সব স্পর্শ বাঁচিয়ে নামলেন। এমন কি রুগীর ঘরে গিয়েও ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর নির্দেশে বাড়ীর ডাক্তারই রুগীকে পরীক্ষা করে জ্ঞাতব্য জিনিষ-গুলি জানালেন—তিনি নিজে কিন্তু রুগীকে ছুঁলেন না। ওষুধ এবং পথ্য সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন। এবার হাত ধোবার পালা। নূতন সাবান চাই এবং সেটি আলগোছে তাঁর হাতে ফেলে দিয়ে সরু ধারায় জল ঢালতে হবে। জল পাছে ছিটকে পড়ে, সেই আশঙ্কায় কয়েকবার ধমকও দিলেন তিনি। পরিষ্কার তোয়ালে এগিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু হাত মুছলেন না তিনি, হাতের জল হাতেই শুকুতে দেওয়া হল। তারপর ভিজিটের টাকা। বলা বাহুল্য সে টাকা ছোঁয়াও তাঁর পক্ষে হল না, ড্রাইভার সেটা তাঁর হয়ে রেখে দিল।

বিখ্যাত ডাক্তার, সুচিকিৎসক, অমায়িক ভদ্রলোক, কিন্তু এ এক বাতিক— ছোঁবেন না কিছুই। নিজে তিনি ডাক্তার, সবই জানেন এবং বোঝেন। কিন্তু বাতিক যে! মুক্ত হতে পারেন না।

মনের সঙ্গে বাতিক এমন দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে থাকে যে শেষ পর্যন্ত তাকে দূর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাতিক যে মানুষের মনে কিভাবে এবং কি কারণে শিকড় গেড়ে বসে সে বিষয় নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। কারোর মতে অবদমিত যৌন ক্ষুধা বা হীনমন্যতাই এর কারণ, কেউ বা বলেন, শিশু মনের ভয় বা ঘৃণা থেকেই হয়ত এর উৎপত্তি আবার কারোর মতে এটা এক ধরণের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কিংবা প্রতিবাদ জানাবার একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গী। কারণ যাই হোক আর যেভাবেই তাকে ব্যাখ্যা করা হক না কেন বাতিক থেকে অব্যাহতি পাওয়া শক্ত। তবে একথা সত্যি যে বিদকুটে ক্লেশদায়ক বাতিকের চাইতে ছোটখাট বাতিক বরঞ্চ সহ্য করা যায়।

যেমন ধরুন একজন পরলোকগত বিখ্যাত সাহিত্যিকের কথা। তিনি পারত পক্ষে স্নান করতেন না—ঠাণ্ডা লাগার বাতিক ছিল তাঁর। স্নান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, পাতকুয়া থেকে জল তোলার জন্যে যে দড়ি ব্যবহার করা হয় সেটা লক্ষ্য করেছ, কিভাবে দিন দিন নষ্ট হয়ে যায়। যুক্তিটা লক্ষ্য করুন। বাতিকের ধাক্কায় বিদ্যাবুদ্ধি এমন কি বিচার করার শক্তিও ভোঁতা হয়ে যায়।

এই ধরণের ছোটখাট বাতিকের সন্ধান আপনারা প্রায়ই পাবেন, এমন কি হয়ত আপনার নিজের মধ্যেও পেয়ে যাবেন। তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ বাতিক যখন থাকবেই তখন বড়র চেয়ে ছোটই ভাল।

পুরাতন লেখা

রামপদ মুখোপাধ্যায়

সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসার কালে প্রকাণ্ড লোহার গেটটা নজরে পড়বেই। পাঁচীল দিয়ে ঘেরা খানিকটা জমির মাঝ বরাবর মাঝারিগোছের একতলা ইমারত। ইমারতে একখানি মাত্র লম্বা ঘর—তার কোলে চওড়া বারান্দা। বারান্দার মাথায় সাইনবোর্ড ঝুলছে—শকুন্তলা শিশু-পাঠাগার। প্রথমে পাঠাগারের চারপাশে ছিল খোলা জমি—সম্প্রতি ওটার চারপাশে উঠেছে ইঁটের পাঁচীল—সামনে ওই লোহার গেট। প্রাচীরঘেরা হয়েও জমিটা এতদিন ফাঁকাই পড়েছিল—মাস দুই তিন থেকে কয়েকটি অকুলীন ফুলগাছ লাগিয়ে ওটিতে সৌন্দর্যের প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

শিশু-পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা তারিখটি উৎকীর্ণ রয়েছে—১৩২০ সাল। আর লোহার গেটটির আয়ুষ্কালের হিসাব মিলছে গেটের গায়ে সাঁটা একটি পাথরের চাকতিতে—১৩৪০ সাল। বিশ বছরের চেষ্টায় এই পাঠাগার সীমাচৌহদ্দিতে সম্পূর্ণাঙ্গ হয়েছে!

কিন্তু তা হয়নি। কুড়ি বছরের ফাঁকে একটি কাহিনী তৈরী হয়েছে। সেই কাহিনীর সূত্রে গাঁথা রয়েছে—জমিটা, বাড়ী আর পাঠাগার। আজ নতুন মানুষেরা এই পথ দিয়ে যাবার সময় বাড়ীটা দেখবে ঠিকই, লোহার গেটটাও দেখবে, অথচ শকুন্তলা শিশু-পাঠাগারের চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাবে না। অর্থাৎ ও নামের ঘোষণা কোথাও নাই। না সাইনবোর্ড, না গেটের মাথায়, না বা দেওয়ালের গায়ে। পাঠাগারটি কিন্তু আছে। পূর্বের চেয়ে সমৃদ্ধতর পাঠাগার। এখন ছেলেরাই শুধু বই নিতে আসে না—বয়োবৃদ্ধরাও বই আর সংবাদপত্র পড়তে—আলোচনার আসর বসাতে আসেন। বরং ওঁরাই এমনভাবে জেঁকে বসেছেন—যাতে ছেলেরা বই পাল্টে তাড়াতাড়ি চলে যায়। খানিকটা বসে দাঁড়িয়ে হুটোপুটি হৈহৈ হট্টগোল করার ইচ্ছা থাকলেও ভারাক্কি অভিভাবকদের ভয়ে পারে না।

একবার আমাদের মধ্যে কে যেন বলেছিল, জ্যেঠামশায়, আপনারা থাকেন বলে ছেলেরা চোরের মত আসে—চোরের মত চলে যায়। ওদের ধর্ম পালন করতে পারে না।

হরিশ মিত্র বলেছিলেন, ওদের ধর্মটা কি? চুরি?

না—না। আমরা হেসে ফেলেছিলাম। খানিকটা হৈহৈ হট্টগোল—

উনি হো হো করে হেসে উঠেছিলেন—এই! জান—আমরা থাকি বলে ওরা বেয়াড়াপনা করতে পারে না—লাইব্রেরির ডিসিপ্লিন নষ্ট হয় না। এটা কি ভাল নয় বাবা?

আমরা বলেছিলাম, এখানে তো সবই ছেলেদের বই রাখা হয়। ওসব পড়তে ভাল লাগে আপনাদের?

উনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, বল কি বাবা, ওগুলো ছেলেদের বই! ওই সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর খুন জখম চুরি রাহাজানি ভূতপ্রেতের গল্প—এ হলো ছেলেদের খোরাক! পড়তে পড়তে আমাদের মাথায় চুল খাড়া হয়ে ওঠে—তা বাচ্চারা! এক একদিন বই শেষ করতে রাত ঝাঁ ঝাঁ করে। বই বন্ধ করেও ঘুমুতে পারি না। মনে হয়, মানে চোখ বুজলেই দেখি, আমার চারধারে ভূত-প্রেত খুনী গুন্ডার দল ঘোরাফেরা করছে। উঃ—কি জিনিসই তোমরা তুলে দিচ্ছ কচি কচি বাচ্ছাদের হাতে!

একথা আমরাও ভাবি। আবার সেই সঙ্গে ফিরে যাই আমাদের শৈশবে। এই জিনিস শুধু কি আমরাই দিচ্ছি? ছেলেবেলায় পাইনি কি মা ঠাকুমা দিদিমা দাদামশাইদের কাছ থেকে? সত্য কথা বলতে কি—দুধের চেয়ে কাঁচা টক আম যেমন রুচিতর, রসগোল্লার চেয়ে যেমন মুখরোচক চানাচুর ঝালফুলুরি, তেমনি হৃদ্য এই শ্রেণীর গল্পগুলি। শিশু এবং রোগীরা সর্বকালেই পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে নির্বিকার। ডাক্তারের সতর্কবাণী কানে তোলে ক'জনই বা।

সত্য বলতে কি—আমাদের দেশে হৃদয়বান ডাক্তার আছেন অল্প। অর্থাৎ শিশু-সাহিত্যের দাওয়াইখানায় এঁরা দুর্লভই। কালেভদ্রে একটু-আধটু ব্যবস্থাপত্র দিয়ে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করেন; সে কিন্তু সিন্ধুতে বিন্দুবৎ।

যাই হোক—লোহার গেটটা দেখে এত কথা চিন্তা করবেন না কোন পথিক—ওঁর দৃষ্টি সর্বাগ্রে পড়বে সাইনবোর্ডটার উপরেই। সেখানে শকুন্তলা শিশু-পাঠাগারের ঘোষণা নাই। কুড়ি বছরের রোদ-জলের ঝাপটায় কাঁচা রঙের লেখা কি মুছে গেছে! কিংবা পথিক হয়েছেন বয়োভারে ক্ষীণদৃষ্টি! না, এর কোনটাই সত্য নয়। পুরাতন বোর্ডটা আকৃতি বদল করেছে। ছোট থেকে হয়েছে বড়। এবং হরফগুলিও সাহসী সৈনিকের মত সঙ্গীন উঁচিয়ে কালের যাত্রাপথে পা মিলিয়ে চলেছে। একালের পথিক জানেন না—আমরা জানি—১৯৪০ সালে বোর্ড, হরফ, ঘোষণা—সমস্তই কায়া বদল করেছে। ফাঁকা জমির চারিদিকে পাঁচীল উঠে—গেট তৈরী হয়ে ইমারতের রূপটাও বদলে গেছে। ব্যক্তিনামের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে জন-দেবতার সুবিস্তৃত অঙ্গনে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে এসেছে পাঠাগার।

কেমন করে সম্ভব হলো— সেই কাহিনীই বিশ বছর আগেকার। কিংবা তারও কিছু আগে থেকে শুরু।

●

আমরা তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। থাকি শহরে, প্রতি শনিবারে দেশে আসি। দেশে এলেই নজরে পড়ে সদা-চলমান একটি মূর্তি। স্বাস্থ্যবান, খর্ব এবং পৃথুল দেহ। গায়ের রং কালো, মাথার চুলগুলি সাদা। পরনে কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে সংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে সাইডস্প্রীং-এর কালো বার্ণিস করা জুতো, হাতে রুপো বাঁধানো লাঠি। আর মুখে একমুখ পান। মূর্তি লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে সর্বদাই চলাফেরা করছে। গ্রামের এ-পথ থেকে সে-পথ—এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী। বেশ মনে পড়ছে—ওই চলমান মূর্তির সামনে এসে প্রমাদ গনেছি। কতবার ওঁকে দূর থেকে দেখে হয়তো ছাতা আড়াল দিয়ে অন্য পথ ধরবার চেষ্টা করেছি—উনি মুহূর্তের তীক্ষ্ন দৃষ্টি-পাতে বুঝে নিয়েছেন ব্যাপারটা। অমনি হেঁকেছেন, রমেন না? শোন—শোন।

শুনবো আর কি—যা বলবেন জানি। যতবার দেখা হয়েছে—শুনিয়েছেন একই

কথাঃ তোমরা হলে গিয়ে দেশের উপার্জনশীল ছেলে—তোমাদের জানাব না তো কাকে জানাব! বিদেশে রয়েছ—দেশটার পানে এক একবার নজর দিও। এই দেখ—এবার লাইব্রেরির চারধারে পাঁচীল দিয়ে জমিটাকে কায়দা করে নিচ্ছি। একটা লোহার গেটও বসবে পূবধারে। ভাল হবে না? এই যে—সকলকার দানেই...তোমার নামে পাঁচ টাকা চাঁদা ধরেছি।

চটি একসারসাইজ খাতাখানা সামনে মেলে ধরেছেন। দেশের উন্নতি হোক এই কামনা কে না করে কিন্তু যখন-তখন চাঁদার খাতাটা সামনে মেলে ধরলে অতিবড় দেশ-হিতকামীরও হৃদকম্প কিছুটা হয়ই—বিশেষ করে সময়টা যদি মাসের শেষ, শারদীয়ার প্রাক্কাল অথবা আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী ক্রিয়াকর্মের যোগাযোগে লৌকিকতা-সম্ভাব্য হয়। এছাড়াও চাঁদা জিনিসটাকে সুস্থ ও সানন্দচিত্তে অভ্যর্থনা জানানো কঠিন। যাই হোক্, ও'র কাছে এ-মাসে টানাটানি যাচ্ছে বলে রেহাই পাবার উপায় ছিল না। পাঁচটি টাকার অঙ্ক ফেলে একটি টাকা অন্তত আদায় করবেনই। বাকিটা কিস্তিবন্দী হারে দেয়। কিস্তি কিন্তু খেলাপ হবার উপায় ছিল না। এপথ-সেপথ—এগলি-সেগলি ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে চাঁদা-দাতার মুখোমুখি হতেন। হাতের খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলতেন, এই যে—সেই থেকে তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ মাসের পাওনাটা জমা করে নিচ্ছি। খুচরো নেই? দশ টাকার নোট? আচ্ছা—এসো—যুগলের দোকান থেকে ভাঙিয়ে দিই।

সঙ্গে টাকা নাই বললেও নিষ্কৃতি থাকতো না। বলতেন, তাতে কি হয়েছে—উত্তরপাড়া আর ক'মিনিটের পথ, চল তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই। টাকাটা না পেলে কাজটা পড়ে থাকবে।

যদি কেউ বলতো, এত খরচপত্তর করে লোহার গেট আর পাঁচীল এখন নাইবা তুললেন! ওই টাকায় বই কিনলে লাইব্রেরিটা আরও বড় হবে।

হেসে বলতেন, বড় হবে, আব্রু থাকবে না। দেখ, আমাদের পাড়াগাঁয়ে একটা রীতি আছে—আব্রুটা রেখে চলতে হয়। তাতেই মানমর্যাদা—সম্মানও। বাড়ীর বউঝিদের ঘোমটা যেমন আব্রু তেমনি বাড়ীর আব্রু পাঁচীল। শহরের কথা আলাদা। ওখানে বাড়ীর পাঁচীল নেই, মেয়েদের ঘোমটা নেই। সবটাই ন্যাড়া-ন্যাড়া, খাপছাড়া। ওরা বড় কিনা! বলে হাসতেন।

চাঁদার খাতায় গ্রামের হেন পুরুষ নাই—যার নাম না দেখেছি। চার আনা থেকে দশ বিশ পঁচিশ পর্যন্ত চাঁদার হার। যার যেমন অবস্থা শুধু নয়, যার যেমন মতি—সেই অনুপাতে চাঁদা।

কিন্তু আদায়কারী এই একজন—পঞ্চাশোর্ধের বৃদ্ধ বলরাম সেন। প্রত্যুষ থেকে প্রদোষকাল পর্যন্ত সদা সচল মূর্তি। এক হাতে লাঠি—অন্য হাতে নস্যের কৌটা—বগলদাবাতে চাঁদার খাতা: গ্রামের পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ভাবতাম—লোকটার কি সংসার নাই! পুত্র-কন্যা আত্মীয়-পরিজন নাই অথবা তাঁদের সঙ্গে নাই সদ্ভাব? আহার-নিদ্রা ছাড়া কোন কর্ম নাই? সংসার প্রতিপালনের চিন্তা নাই?

অথচ জানি—সবই ছিল ও'র। ধন-জন-দায়িত্ব। উত্তরাধিকারসূত্রে কলকাতার একখানি কাপড়ের দোকানের মালিক হয়েছিলেন। চালু দোকান। শুধু ক্যাশ-বাক্সটা কোলের কাছে নিয়ে বসলেই নিশ্চিন্ত। করণীয় কার্যগুলি কর্ম-চারীরাই সুসম্পন্ন করত। ভালভাবেই চলত দোকান। সেই আয়েই অন্নবস্ত্র—লোকলৌকিকতা—দোল-দুর্গোৎসব। হাঁ—দুর্গোৎসব হত দেশের বাড়ীতে। তিন ফোকরের পুজোর দালানটি শরৎকালের প্রসন্ন হাসিতে ঝলমল করে উঠতো। পিতৃপক্ষ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুমোর এসে পুজোর পাটায় খড়-মাটি দিয়ে প্রতিমার আদল গড়তো। তারপর দিনে দিনে তিলে তিলে গড়ে উঠতো সপ্তমূর্তির সাতটি বিভিন্ন রূপ। পটুয়া অঙ্কিত চাল-চিত্রের ছবি, মালি নিজের হাতে তৈরী ডাকের সাজ দিয়ে প্রতিমা সাজাতো। আর আমরা ছেলের দল দিনে অসংখ্যবার এসে দাঁড়াতাম প্রতিমার সামনে। ওই ক'টা দিন বলরাম সেনের বাড়ীটা ছিল আমাদের নিদ্রা জাগরণের বিচরণ ভূমি। বড় হয়েও দেখেছি পুজার সমারোহ। তারপর একবার হঠাৎ পুজো বন্ধ হয়ে গেল। শুনলাম—ওঁর কলকাতার দোকানের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু বিপর্যয় শুধু একটিই নয়—পর পর কয়েকটাই ঘটলো। স্ত্রী-বিয়োগ, পুত্র-কন্যা-বিয়োগ, বিষয়সম্পত্তি হস্তান্তর মামলা-মোকদ্দমা—বলরাম সেনের উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় বয়ে গেল। ঝড় বয়ে গেল, উনি কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না। অন্তঃপুরের মধ্যে কিছুদিন আত্মগোপন করে ধাক্কাটা সামলে নিলেন। অতঃপর গ্রামের রাস্তায় ওঁকে দেখলাম।

দেখা হলেই বলতেন, রমেন, আসচেবার ম্যাট্রিকটা দিচ্ছ তো? বেশ বাবা, বেশ, মন দিয়ে লেখাপড়া কর—দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

শুধু আমাকে নয়—প্রতিটি ছেলেকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। আশা করতেন সকলেই দেশের সুসন্তান হবে।

আমার সহপাঠীরা বলত, ছেলে দুটো তো এ-লাইনে এলো না, তাই আমাদের ভরসা করেন।

কেন, ওরা ম্যাট্রিক পাশ করেনি?

কোথায়! বড়টা দোকানে ঢুকেছে; ছোটটা শুনি রানাঘাটে কি একটা সিনেমায় গেটকীপারি করছে। দেশের লোককে ডেকে ডেকে মিনিপয়সায় ছবি দেখায়।

এখন অবস্থা বুঝি ভাল নয়?

একেবারে পড়তি অবস্থা। কলকাতার দোকানখানা ফেল মেরেছে—জমিজমা বিক্রী করে সংসার চলছে।

●

আশ্চর্য, এই সময়েই শকুন্তলা শিশু-পাঠাগার সুসম্পূর্ণ হল। অবশ্য ভিত-পত্তন হয়েছিল কিছুদিন আগে—তখন কলকাতার দোকান ভালভাবেই চলছিল। কাঁড় সমান অবধি গাঁথনি উঠছে—এমন সময় শুরু হ'ল বিপর্যয়। ইমারত এযাবৎ অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল। ইতিমধ্যে আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে—অথচ এই সময়েই ঘরখানা সম্পূর্ণ হল, পাঠাগারের বই কেনা হল, টেবিল চেয়ার আলমারি আর আসবাবপত্র এলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। শকুন্তলা শিশু-পাঠাগার জন্ম-গ্রহণ করলো।

কেমন করে সম্ভব হল? নানাজনের নানা কথা। কেউ বললে, একটা বড় সম্পত্তি বিক্রী করে এসব হয়েছে। কেউ বললে, না, স্ত্রী-ধন থেকে। অনেক গহনা ছিল পরিবারের—তাই থেকে। কেউ বললে, তা নয়, কর্তাদের আমলের এক ঘড়া মোহর পোঁতা ছিল ভাঙ্গা সিঁড়ির নীচেয়—সেইটে পেয়ে গেছেন ভিত খুঁড়তে খুঁড়তে।

সে যাই হোক—অনেক খরচপত্র হয়ে গেল। পাঠাগারের চারিদিকে প্রাচীর

আর উঠলো না। এর পর অনেকদিন গেল—পড়ো জমিটা বন-জঙ্গলে ভর্তি হতে লাগল। বেড়া দিয়ে ঘিরে একবার কয়েকটি ফুলের চারা লাগানো হয়েছিল। সে থাকল না। বর্ষার জলে বেড়ার বাঁশ বাকারি পচে গেল—উই ধরে সেগুলি ভূমিসাৎ হলো। ফুল গাছকে ঢেকে আবার আগাছার জঙ্গল বাড়তে লাগল।

এক হাতে লাঠি—এক হাতে নস্যের কৌটা, আর বগলদাবায় চাঁদার খাতা—বলরাম সেন সচল হয়ে উঠলেন গ্রামের পথে।

কিন্তু ওই পাঁচীল তোলার সময়েই যে ঘটনাটা ঘটেছিল—সেইটিই অকরুণ ভাবে মুছে দিয়েছিল—পূর্বোক্ত নামের ঘোষণাটিকে। আমরা যারা সেদিনের কথা জানি তারা অবশ্য চোখ বুজলেই প্রতিষ্ঠা কালের লেখাটিকে পড়তে পারব : শকুন্তলা শিশু-পাঠাগার। অথচ সেই আমরাই আজ চোখ মেলে দেখছি আর এক লেখা : সুত্রাপুর সাধারণ শিশু-পাঠাগার। আগের চেয়ে বড় সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা। উজ্জ্বল চকচকে সবুজ রং-এর ফুলকাটা বর্ডারের বেষ্টনীবিদ্ধ লেখা। দিব্য মানানসই লেখা—কিন্তু...

সেদিনের ঘটনাটা ছিল অন্য রকম।

পাঠাগারের পাঁচীল আর গেট তৈরীর জন্য যখন চাঁদার খাতা বগলে করে বার হচ্ছিলেন বলরাম সেন, প্রস্তাবটি তখনই তুলেছিলেন করুণাসিন্ধু ইন্দ্র। করুণাসিন্ধু বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। অর্থে কুলীন এবং বয়সে প্রবীণ। বলেছিলেন, চাঁদার খাতা হাতে করে তো পাড়া টহল দিয়ে বেড়াচ্ছ বলরাম, একবারও ভেবেছ কি তোমার এই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের উপর সাধারণের দরদ আসবে কেমন করে?

বলরাম নাকি বলেছিলেন, সে কথাও ভেবেছি বইকি ইন্দ্রমশায়। বাড়ীটা নিজের ক্ষুদকুঁড়ো দিয়ে খাড়া করে দিলাম, পাঁচীল তোলবার ক্ষমতা আর হলো না; ফলটা অপুষ্টই রয়ে গেল। এটা নিজেরই দায় বলে চাঁদার খাতা নিয়ে বা'র হয়েছি। ফলটা না পাকলে কি দেবতার ভোগে দেওয়া যায়? তাই মনে করেছি—পাঁচীলটা উঠিয়ে সামনে একটি গেট বসিয়ে ওটা পাঁচজনের হাতে তুলে দেব। ওই যে ছেলেরা বলে—গণদেবতা—তারই হাতে।

সাধু-সাধু! করুণাসিন্ধু হাসিমুখে বলেছিলেন, শুনে আনন্দ হ'লো। কিন্তু তার আগে নিয়মমাফিক একটা কমিটি তৈরী করে নিতে হবে। তাদের উপর লাইব্রেরির ভারটা ছেড়ে দিলে ওটা ভালভাবেই গড়ে উঠবে।

বলরাম বলেছিলেন বেশ তো, তার একটা ব্যবস্থা করুন। একটা মিটিং ডেকে সব মাথা এক হয়ে শলা-পরামর্শ করে যা ভাল হয় ঠিক করুন।

সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রামের সাত জন মাতব্বরকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি তৈরী হয়েছিল। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। বয়স বা অর্থ-কৌলীন্যের দাবীতে এই পদ পাইনি। যেহেতু আমি গ্র্যাজুয়েট আর খাস সরকারী আপিসের কর্মচারী আর থাকি শহর কলকাতায়, সেই কারণে আমার যোগ্যতা সর্বাধিক।

যাই হোক, চাঁদার টাকায় পাঁচীল উঠল, গেট তৈরী হ'ল। বাকি টাকাটা জমা-খরচের হিসাব মিলিয়ে বলরাম সেন আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত।

বললাম, আপনার স্বর্গতা পত্নীর ঋণ শোধ হলো?

চমকে উঠলেন বলরাম সেন। মুখখানি ও'র শুকিয়ে গেল। মাথা নেড়ে হাসবার চেষ্টা করে কি যে বললেন বোধগম্য হ'ল না। চেয়ে দেখি করুণাসিন্ধু মুচকি মুচকি হাসছেন। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি।

যাই হোক—প্রস্তাবটি করুণাসিন্ধু উত্থাপন করলেন। বলরাম, তোমার মহৎ দানের কথা সবাই মনে রাখবেন। কিন্তু ভাই, একটি কথা—পাঁচজনের মর্জিগত এই পাঠাগারের নিয়ম-কানুন যদি কিছু পরিবর্তন করতে হয়—তোমার কোন অমত হবে না তো?

বলরাম বললেন, প্রতিষ্ঠান যখন পাঁচজনের, তখন পাঁচজনে যা বলবেন—তাই শিরোধার্য হবে।

সাধু সাধু! তাহলে আগামী সপ্তাহে আর একটু সভা ডেকে আমরা সব ঠিক করে নেব। তবে হ্যাঁ—একটা কথা জানিয়ে রাখি। কথাটা ইতিমধ্যে পাঁচ বৈঠকে আলোচনা হয়ে আমাদের কানে এসেছে বলেই জানিয়ে রাখছি। পাবলিক বলছে—জিনিসটা যখন সাধারণেরই হ'ল, তখন নামটাও সেইমত হোক।

বলরাম সেন আবার চমকে উঠলেন—ও'র মুখে চোখে চিন্তার ছায়া পড়লো ঘন হয়ে। শুকনো গলায় বললেন, "সে আর আমি কি বলব ইন্দ্রমশায়। পাঁচজনের জিনিস—তাঁদের যা অভিরুচি তাই হবে।

ইন্দ্র হেসে বললেন, অবশ্য আমি তাতে সায় দেব না। যে প্রাণপাত করে জিনিসটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলো তার দেওয়া নামটা মুছে যাবে—এমন প্রস্তাব উঠলে বিরোধিতাই করব। নাম ওরা যাই দিক না কেন—তোমার দানের স্বীকৃতিটুকু থাকবেই। না থাকলে...

বলরাম সেন শূন্য দৃষ্টিতে উপর পানে চেয়ে বললেন, আপনাদের দয়া।

●

রবিবারের বৈকালে সভা বসবে। শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ী এসে শুনলাম বলরাম সেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে ওঁর বাড়ী থেকে লোক এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছে—আমি বাড়ী এসেছি কিনা। আমি বাড়ী এলে যেন ও'র সঙ্গে একবার দেখা করি। বিশেষ জরুরী কথা আছে।

সেদিন যেতে পারিনি, রবিবার সকালে গেলাম ও'র সঙ্গে দেখা করতে।

সেই তিন মহল বাড়ীটাতে ছেলেবেলায় বহুবার গিয়েছি। প্রথম মহলে বৈঠকখানা আর পুজোর দালান। দ্বিতীয়টাতে অন্দর মহল। আর শেষের

মহলটি রন্ধনশালা—গোশালা ইত্যাদি নিয়ে।

প্রথম মহলে ঢুকে দেখি—কি দুরবস্থা! পায়রা চামচিকে আর তাদের পুরীষে দালান ভর্তি, চুন-বালির পলস্তরা খসে গেছে দেওয়াল আর থামের গা থেকে, কাঠের খড়খড়ি-দরজা জানালা নড়বড় করছে, উঠোনটায় কে যেন লাঙ্গল চষে আগাছার বীজ বুনে দিয়েছিল—সেই ফসলে ভরে গেছে উঠোন আর ঠাকুর দালান। ওদিকে না চেয়েই অন্দরের পথ ধরলাম।

এ মহলটায় মানুষ বাস করে—খানিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কালের ক্ষত ঘরগুলোর সর্বাঙ্গে দগ্‌-দগ করছে। সেই ক্ষতচিহ্নের পথ ধরে ওঁর ঘরে পৌঁছলাম।

একখানা মোটা আধ-ময়লা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে খাটে শুয়ে রয়েছেন বলরাম সেন। সেকালের লতা-পাতা ফুল পরীর কাজকরা ভারী সেগুণ কাঠের খাট। পালিসটা এখনও মুছে যায়নি।

শিয়রের কাছে একখানি টুল পাতা ছিল। আমায় বসতে বললেন। বসলাম।

বললাম, কেমন আছেন?

হেসে বললেন, ভাল। খুব ভাল। ডাক এসেছে— ঘরে ফিরে যাবার। যাচ্ছি। একটা কথা তোমাকে বলবার জন্যে ডেকেছি বাবা। আজ বিকেলেই তো মিটিং বসবে লাইব্রেরি ঘরে। যা প্রস্তাব হবে—জানি। নামটা পালটে যাবেই—

বললাম—আপনি চিন্তা করবেন না —নাম যাতে না পাল্‌টায়—

বললেন, তোমার একার চেষ্টায় কি হবে বাবা, রুখতে পারবে না। নাম পালটাবেই। আমি ভাল লোকের মুখে খবর পেয়েছি—নাম বদলাবেই। তা বদলাক—তাতে আমার দুঃখ নাই। সাধারণের জিনিস—সাধারণের রুচি অনুযায়ী গড়ে উঠুক। কিছুই কি চিরদিন একভাবে থাকে। আমরাও থাকব না তবে মিছে কেন, নামের বিজ্ঞাপন সেঁটে নতুন মানুষদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। ...এ ভালই হবে। ভবিষ্যতে কেউ জানতে চাইবে না—কে ছিলেন শকুন্তলা —কেন তাঁর নামে গড়ে উঠেছিল পাঠাগার। কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—কোন্ আশা নিয়ে...... এক রাশ অন্ধকারের বুক থেকে একটুখানি সত্য উদ্ধার করার দায়িত্ব কারও থাকবে না। ভালই হবে।

অনেকগুলি কথা বলে উনি পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে লাগলেন। ওঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, কেন ভাবছেন এত? কেউ না জানুক, আমরা তো জানি—কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে। আপনার স্ত্রীর নাম যাতে না পালটায়—

ডান হাতখানি উঁচিয়ে ম্লান একটু হাসলেন বলরাম সেন। বললেন, তুমি ছেলেমানুষ বাবা, কোন্‌টা সত্য ঠিক জান না। আমরা তাকেই সত্য বলে স্বীকার করি—যে জিনিসের সমাজ-স্বীকৃতি আছে। পাঁচজনে যা মানে—তাই সত্য।

একটু থেমে বললেন, শকুন্তলা আমার স্ত্রী ছিলেন না—সমাজের স্বীকৃতিও পাইনি। কিন্তু—কিন্তু, উনি তার চেয়েও বেশী ছিলেন। ওঁর আত্মীয়-স্বজন ছিল না, বন্ধু-বান্ধব ছিল না, পুত্র-কন্যা কিছুই না। তাই একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন,—আমার ভারি সাধ হয় একটি ছেলে কি একটি মেয়েকে কোলে করে খানিকক্ষণ বসে থাকি, একটু আদর করি। কথাটা আমারও মনে লেগেছিল। ভাবতাম, আহা—তা যদি হতো! ভাবতে ভাবতে একদিন হঠাৎ আলো দেখতে পেলাম। একদিন একটি শিশু-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক সভায় গিয়ে বক্তৃতা শুনলাম সভাপতির। সভাপতি বলছিলেন—ছোট ছোট ছেলেদের যেমন মা-ছাড়া চলে না—মা-ই ওদের জীবনকে সবদিক দিয়ে ঘিরে থাকেন—গড়ে তোলেন, তেমনি হচ্ছে পাঠাগার। পাঠাগারের সঙ্গে মায়ের তুলনা করে বক্তা সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের শাস্ত্রে বলে—মানুষের সাতটি মা। জননী, ধাত্রী, রানী, পৃথিবী, গো, ব্রাহ্মণী এবং গুরুপত্নী। কিন্তু বর্তমানকালে ওঁদের সব কটিকে পাওয়া যায় না, মানাও সম্ভব নয়। ওঁদেরই সঙ্গে আর একটি মায়ের নাম যোগ করা সহজ—আর তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও বাড়ছে দিন দিন। তিনি হলেন জ্ঞানদায়িনী বিদ্যা দেবী। তাঁর বাসভূমি হচ্ছে বিদ্যালয়—পাঠাগার—যার কোলে বসে শিশু-মনের পুষ্টিসাধন হয়। এমনি অনেক কথা বাবা। ওঁর কথাগুলি সেদিন মনে গেঁথে গিয়েছিল। ঠিক করলাম শকুন্তলার নামে এমনই একটি জিনিস তৈরী করে দেব—যেখানে এসে অনেকক্ষণ ধরে বসতে পারবে ছেলেরা। মায়ের কোলে বসে ছেলেরা যেমন তুষ্টি পুষ্টি লাভ করে—

উনি হাঁপাতে লাগলেন।

ওঁকে আশ্বাস দিলাম—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—নাম যাতে না বদলায় সে চেষ্টা করব। ইন্দ্রমশায়ও সেদিন বলেছেন—

উনি ম্লান হেসে বললেন, তুমি ছেলেমানুষ—মন তোমাদের নরম। জাননা এই পৃথিবী কি কঠিন, এর মাটি কত পিছল।

●

সত্যিই জানতাম না। সভায় আমার প্রতিবাদকে উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন করুণাসিন্ধু ইন্দ্র, রমেন—তুমি ছেলেমানুষ—জান না ও-নামের আসল হিস্ট্রি। ও-নাম সাধারণ প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারে না। থাকা উচিত নয়। একটা কঙ্কুবাইনের নাম...আপনারা কি বলেন?

●

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বার দুই চোখ রগড়ে চাইলাম সাইনবোর্ডের পানে। না, সে নাম কোথাও নাই। ১৯৪০ সালে বোর্ডসমেত পাল্টে গেছে নাম। ওখানে বড় বড় হরপের সঙ্গীন উঁচিয়ে সত্যাপুর সাধারণ শিশু-পাঠাগার কালের তালে পা ফেলে কুচকাওয়াজ করছে।

রবার্ট ফ্লাহার্টি কাহিনী

প্রভাতকুমার দত্ত

কোন কোন ফিল্ম পরিচালক আছেন যাঁরা একটু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। আগে থাকতে তৈরী গল্প বা নির্ধারিত ছবির দৃশ্য তাঁদের দু'চক্ষের বিষ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পরিচালকের মনে সব সময়ে বড় 'আইডিয়া' কাজ করে। এই আইডিয়ার প্রাবল্যেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী খানিকটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পরিচালকেরা ছবিকে অনেকটা অখণ্ড-ভাবেই দেখে থাকেন। তাই তাঁরা একাধারে চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজ করে থাকেন। আমেরিকার সুবিখ্যাত চিত্র-পরিচালক রবার্ট ফ্লাহার্টির সারা জীবনের প্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা উপরোক্ত কথাগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

ফিল্ম-জগতে ফ্লাহার্টির আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক ঘটনা। আমেরিকার একটি বিখ্যাত 'ফার' কোম্পানী ফ্লাহার্টিকে উত্তর কানাডায় এস্কিমোদের দেশে জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার জন্য পাঠান। এস্কিমোদের কাছ থেকেই ফারের বেশী চালান আসে। কোম্পানীর উদ্দেশ্য ফ্লাহার্টি যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন সেগুলি তাঁরা তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণের কাজে লাগাবেন। ফ্লাহার্টি উত্তর কানাডায় যাবার সময় টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে একটা ভাঙা ক্যামেরা সংগে নিয়েছিলেন। জাতিতত্ত্বের ব্যাপার, তাই প্রামাণিক ছবি তোলা দরকার এই ভেবেই তিনি ক্যামেরাটি সংগে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই ক্যামেরাই শেষ-পর্যন্ত ফ্লাহার্টির ভাগ্যকে পরিবর্তিত করল। এস্কিমোদের দেশে গিয়ে তাদের জগৎ ও জীবনকে দেখে তিনি চমকিত ও বিস্মিত হলেন। কঠিন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে এস্কিমোদের অপূর্ব জীবন-সংগ্রাম ফ্লাহার্টির মনে উপলব্ধির একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করল। ফ্লাহার্টি উত্তর কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরলেন। জাতিতত্ত্বের গবেষণা বোধ হয়

রবার্ট ফ্লাহার্টি

কিছু হোল না। কিন্তু তাঁর সংগে ফিরল ৫০০০ ফুটের একটা ছবি। এইটিই হচ্ছে সেই পৃথিবী-বিখ্যাত ছবি Nanook of the North। আইজেনস্টাইনের ব্যাটলশিপ পোটেমকিনের যে খ্যাতি ফ্লাহার্টির Nanook of the North-এর সেই খ্যাতি। একটি মাত্র এস্কিমো পরিবারকে কেন্দ্র করে আলোচ্য ছবিতে এস্কিমো জীবনের অন্তর-সত্যকে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। ছবি তোলার সময় ফ্লাহার্টির এ্যাসিস্টেন্ট ছিলেন মাত্র একজন। তিনি সেই এস্কিমো পরিবারেরই কর্তা। ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রকৃতির কতকগুলি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এস্কিমোদের বাঁচতে হয়। প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উদ্দাম প্রকাশের পটভূমিকায় এস্কিমোদের অসীম প্রাণশক্তি ফ্লাহার্টির শিল্প-চেতনাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। শিল্পীর মনে যখন সত্যিকারের অনুপ্রেরণা জাগে তখন তিনি অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারেন। Nanook of the North চিত্রে ফ্লাহার্টি এই রকম এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ছোট্ট বই অথচ আজ পর্যন্ত চিত্রজগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। এমন একটি সূক্ষ্ম রসানুভূতি বইটির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত যে মনে হয় ছবিটি চিন্ময় কাব্য। Nanook of the North ফ্লাহার্টির কবি-খ্যাতি এনে দিয়েছে। সত্যই বইটি এস্কিমো জীবনের কাব্য।

Nanook-এর বিশ্বজোড়া খ্যাতির ফলে হলিউডের দৃষ্টি পড়ে ফ্লাহার্টির উপর। প্যারামাউণ্ট চিত্র-প্রতিষ্ঠান Nanook-এর মত একটি ছবি তোলার জন্য তাঁকে South Sea-তে পাঠিয়ে দেন। ফ্লাহার্টির কাছে সমস্ত 'ছবি তোলা' জিনিসটাই হোল একটা অনু-

সন্ধান কাজ। পূর্বনির্ধারিত পথে কখনও তিনি চলতে রাজি হননি। কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হবার পর ক্যামেরা তাঁকে যে পথে পরিচালিত করেছে তিনি সেই পথে গেছেন। ক্যামেরাকে ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি ক্রমশ বিষয়বস্তু, চরিত্র, দৃশ্য ইত্যাদি তৈরী করে নিয়েছেন। প্যারামাউন্ট প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে ফ্লাহার্টি সামোয়া (Samoa) দ্বীপে দু বছর অতিবাহিত করেন। এই দু বছরে তিনি সামোয়াবাসীদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, লোকশ্রুতি ইত্যাদি রপ্ত করেন। সামোয়া দ্বীপের জীবনধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হবার পর তিনি ছবি তোলায় হাত দেন। সাভাইয়ের প্রাচীন দ্বীপে বসে তিনি একাই ছবি তুলেছেন, ফিল্ম ডেভালাপ করেছেন এবং সমগ্র ছবির সম্পাদনা করেছেন। আশ্চর্য কর্মশক্তি মানুষটির। দুঃসাহসিক আইডিয়া সব সময়েই তাঁর মাথায়। Nanook ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯২২ সালে আর ১৯২৬ সালে ফ্লাহার্টি সামোয়া থেকে ফিরে প্যারামাউন্টের হাতে তুলে দিলেন যে চিত্র তার নাম Moana। কিন্তু প্যারামাউন্ট যা চেয়েছিলেন তা না পাওয়ায় গভীরভাবে নিরাশ হলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন সমুদ্রের টাইফুন, হাঙর আর অসভ্য নরনারীদের প্রেম নিয়ে একটা চমৎকার রসাল বই হবে হলিউডি ধরনে। শেষ পর্যন্ত যেটা হোল তা নির্বাক চিত্রের একটি অপরূপ কাব্য। এ বিশেষণ ছাড়া Moana ছবিকে আর কোন নামে চিহ্নিত করা যায় না।

ফ্লাহার্টি তাঁর ধীর ও ধৈর্যশীল পন্থায় আবিষ্কার করলেন যে, সামোয়াবাসীর জীবনে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কোন ক্লাসিক বিরোধ নেই। এই দ্বীপে ভগবান সদয়। খাদ্য অপরিমিত এবং কাপড় আর আশ্রয়ের উপাদান গাছেই জন্মায়। ফ্লাহার্টি Moana ছবিতে হয়ত ক্রম-অপসৃয়মান একটি সংস্কৃতির উপর ব্যবসাদার আর মিশনারিদের প্রভাবের কথা নাটকীয় ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু শ্বেতকায়দের অনিষ্টকারী প্রভাবে সামোয়াবাসীদের অবনতির দিকটা বড় করে দেখানো কখনও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। 'মোয়ানা' ছবিতে যতটা সম্ভব তিনি সামোয়া জীবনের অতীত ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ধরার চেষ্টা করেছেন। ছবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামোয়াবাসীদের Tattoo অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সামোয়া যুবকেরা পূর্ণ পুরুষত্বের অধিকার অর্জন করে। সামোয়া জীবনধারার বিভিন্ন দিক অর্থাৎ নারিকেল সংগ্রহ, মাছধরা, বন্য-শূকর শিকার, মেয়েদের রান্না ও কাপড়-বোনার কাজ, আনুষ্ঠানিক ভোজ ও নৃত্য—এ সমস্তই ফ্লাহার্টি আন্তরিকতার সঙ্গে বার বার পর্যবেক্ষণ করেছেন, বিশেলষণ করেছেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় পরিপূর্ণ বোঝার পর তবে সেগুলিকে ক্যামেরার সামনে ধরেছেন। ফলে ছবিতে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটা সময় আনুপাতিক পরিচ্ছন্ন ঔজ্জ্বল্য আমাদের চোখে পড়ে। 'মোয়ানা'র প্রতিটি দৃশ্যপটেরই সৌন্দর্য ক্লাসিক। সূক্ষ্ম অথচ মোলায়েম ফোটোগ্রাফি এবং নরম অথচ সরস আলোর ব্যবহার ছবিটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। অবশ্য 'মোয়ানা' কেবল কতকগুলি সুন্দর দৃশ্যপটের সমষ্টি নয়। ফ্লাহার্টি ছবি তোলার ব্যাপারে ক্যামেরা সঠিক স্থানে সংস্থাপন এবং সম্পাদনার গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক অনেক চিত্র-পরিচালকই ছবির এই দুটি দিকের প্রতি বিশেষ নজর দেননি। গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণনার অদ্ভুত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল ফ্লাহার্টির। তিনি প্রতিটি দৃশ্যই যে কোণ থেকে তুলতেন তা ছিল একান্ত ব্যঞ্জনাময়।

এ সব সত্ত্বেও প্যারামাউন্ট প্রতিষ্ঠান Moana ছবিকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা এটিকে অদল-বদল করে দক্ষিণ সমুদ্রের মুগ্ধকারিণী নারীর প্রেম-কাহিনী রূপে প্রচার করার ব্যবস্থা করলেন। ছবিটি দেখাবার প্রস্তাবনা হিসাবে মঞ্চে একদল নাচিয়ে হুলা-হুলা তরুণীকে উপস্থিত করার ব্যবস্থা হোল। ফ্লাহার্টি অবশ্য প্যারামাউন্ট প্রতিষ্ঠানের এই একান্ত ব্যবসায়ী-সুলভ মনোবৃত্তিতে মোটেই দমে যাননি। তিনি তিনি বললেন যে, সমাজের একটি বড় অংশ রয়েছে যাঁরা নিয়মিত সিনেমাতে না গেলেও 'মোয়ানা'র মত বিশেষ ধরনের একটি ছবি দেখার জন্য তাঁদের সহজেই চিত্রগৃহে আনা যায়। ফ্লাহার্টি নিজে ছটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বইটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে একথার সত্যতা প্রমাণ করেন। ফ্লাহার্টির চেষ্টায় শিক্ষালয়, ব্যবসা সংগঠন, সাহিত্য সংঘ প্রভৃতির মারফত 'মোয়ানা' প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্যারামাউন্ট জিনিসটাকে অন্যভাবে চিন্তা করলেন। তাঁরা বললেন যে, দর্শকদের বছরে বাহান্ন সপ্তাহে চিত্রগৃহে টেনে আনতে হলে তথাকথিত সাধারণ ছবিই করতে হবে।

ফ্লাহার্টি অবশ্য একথা বলতে ছাড়েননি যে, ভাল ছবি তৈরী করা যায় এবং তার ব্যবসাগত সাফল্যও সম্ভব। প্যারামাউন্ট প্রতিষ্ঠানের পর এম, জি, এম, আবার ফ্লাহার্টিকে South Sea-তে পাঠান। তিনি যান তাহিতি দ্বীপে ডবলিউ, এম, ভ্যান ডাইকের সঙ্গে সহ-পরিচালক হিসাবে ফ্রেডারিক ও'ব্রিয়ান রচিত 'হোয়াইট স্যাডোস্ ইন দি সাউথ সীস্' বইটি তোলার জন্য। এম, জি, এম, নির্বাচিত এই বইটি অবশ্য ফ্লাহার্টির খুব প্রিয় ছিল। তবে ফ্লাহার্টি যখন জানতে পারলেন যে, এম, জি, এম, এই আশ্চর্য সুন্দর বইটি থেকে শুধুমাত্র নিছক 'মেলোড্রামা' ধরনের একটি ছবি চান তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন। ফরমায়েস মত কাজ করার শিল্পী-মন ফ্লাহার্টির কোন দিনই ছিল না। সত্যিকার সৃষ্টিধর্মী মন নিলে নিজের উপলব্ধিগত ধারণার দ্বারাই তিনি প্রধানত পরিচালিত হতেন। আধুনিক ফিল্ম-জগতে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার প্রধান অসুবিধাই এই যে, তাঁদের মাথায় ভালো ছবি তোলার 'আইডিয়া' রয়েছে অথচ হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। এম, জি, এম-এর পর আর একটি প্রতিষ্ঠান টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ফ্লাহার্টিকে 'পুয়েবলো ইণ্ডিয়ান'দের উপর একটি ছবি তোলার পরিকল্পনা রচনা করতে বলেন। কিন্তু ফক্স প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত এই ছবি তোলার 'আইডিয়া'টাই সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন।

ফক্সের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাওয়ার পর ১৯২৯ সালে ফ্লাহার্টি জার্মান পরিচালক এফ, ডবলিউ, মুরনাউ-এর সঙ্গে একত্র হন। মুরনাউ হচ্ছেন 'দি লাস্ট লাফ' ও 'সানরাইজ' এই দুটি বিখ্যাত নির্বাক ছবির পরিচালক। ফ্লাহার্টির যেন দক্ষিণ সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক আর শেষ হতে চায় না। বার বার তিনি ঘুরে আসেন ঐ একই অঞ্চলে। মুরনাউ ও ফ্লাহার্টি আবার যান দক্ষিণ সমুদ্রে, তোলেন 'টাবু' নামে একটি ছবি। মুরনাউ ও ফ্লাহার্টি দুজনেই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন শিল্পী। কিন্তু 'টাবু' বইটিতে মুরনাউকেই আমরা পেলাম বেশী করে। বইটিতে মুরনাউ-এর টেকনিকই বড় হয়ে উঠেছে। 'টাবু' তোলার পরই মুরনাউ এক শোকাবহ মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। আর ফ্লাহার্টি হলিউড ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে জন গ্রিয়ারসনের ডকুমেন্টারি ছবি তোলার নতুন প্রচেষ্টায় যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ফ্লাহার্টি এই ডকুমেণ্টারি প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডকুমেণ্টারি পর্যায়ের কথা এখানে আর বর্ণনা করলাম না যদিও এই পর্যায়ে ফ্লাহার্টি Louisiana Story নামে একটি বিখ্যাত ছবি তুলেছিলেন। Nanook আর Moana-র জন্যই রবার্ট ফ্লাহার্টি চিরস্মরণীয় হয়েছেন এবং অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবেন। যেমন Potemkin ছবি আইজেনষ্টাইনের তেমনি Nanook ছবিকে মানুষ ভুলতে পারে না।

শরৎচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী

❀ গোপালচন্দ্র রায় ❀

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের অনেকেই এই উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্তকে স্বয়ং শরৎচন্দ্র ভেবে থাকেন। আর সেই সূত্রে তাঁরা শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়-কাহিনীটিকে রাজলক্ষ্মীর সহিত শরৎচন্দ্রের নিজেরই প্রণয়-কাহিনী বলে মনে করেন।

এঁদের অনেকে শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিণী হিরন্ময়ী দেবীকেই সেই রাজলক্ষ্মী বলেই মনে করতেন। এমন কি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ একথা বিশ্বাস করেন। সেই জন্যই শরৎচন্দ্রের কোন কোন বন্ধু তাঁকে প্রশ্নও করতেন --তাহলে হিরন্ময়ী দেবীই কি রাজলক্ষ্মী?

শরৎচন্দ্র অনেক সময়ই বন্ধুদের এই প্রশ্নের কোনরূপ জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকতেন। আবার কখন বা বিরক্ত হয়ে তাঁদের কথা সমর্থন করে বলতেন -- হ্যাঁ, ইনিই সেই রাজলক্ষ্মী, ছাড়লেন না, তাই শেষ পর্যন্ত শৈবমতে বিয়ে করতে হল।

তাঁরাই শরৎচন্দ্রের এই কথাকে বিশ্বাস করে বাইরে এসে প্রচার করতেন, -- ঐ হিরন্ময়ী দেবীই রাজলক্ষ্মী।

শরৎচন্দ্রের এক স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীশৈলেশ বিশী তাঁর "বিপ্লবী শরৎ-চন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন" গ্রন্থে হিরন্ময়ী দেবীকেই তাই রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস করে লিখেছেন--"এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজলক্ষ্মী কে? তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী--লক্ষ্মী বলেই যাঁকে তিনি আদর করে ডাকতেন।......তিনি তাঁকে বিয়ে করে-ছিলেন শৈবমতে। যেদিন সেই কথা তাঁর মুখে শুনলুম, আমার সব অমাতের সন্ধান বিষিয়ে গেল, নিজের অলক্ষ্যে চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে ক'ফোটা জল ঝরে পড়লো। আমি স্পষ্টই বললুম-- এত বড় ভালবাসাকে আপনি বিয়ে করে অমর্যাদা করলেন। যেটা ছিল স্রোতের জল, স্বচ্ছ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, আজ সেটাকে বাঁধ দিয়ে করলেন একটা পুকুর, খানা, ডোবা! তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন--এ ছাড়া উপায় ছিল না, তাছাড়া ও ছাড়ল না।" (পৃঃ ৯১--৯২)

রাজলক্ষ্মী যে কে, শরৎচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি কাউকে কাউকে আবার একথাও বলতেন যে, ও সব স্রেফ কল্পনা। যেমন লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় নাম্নী জনৈকা মহিলা লেখিকার এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁকে লিখেছিলেন-- "রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ও সব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত উপন্যাস বইত নয়। এ সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই।" (শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র)।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিরন্ময়ী দেবী ২৩ বছর বেঁচেছিলেন। ঐ সময়টা তিনি সাধারণতঃ শরৎচন্দ্রের হাওড়া জেলায় সামতাবেড়ের বাড়ীতেই থাকতেন। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর বন্ধুরা যেমন তাঁকে, হিরন্ময়ী দেবীই রাজলক্ষ্মী কিনা জিজ্ঞাসা করতেন, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও লোকে তেমনি সামতাবেড়ে বেড়াতে গিয়ে হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও প্রশ্ন করতেন--আপনিই কি রাজলক্ষ্মী?

লোকের অনবরত এই একই প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে, হিরন্ময়ী দেবী শেষ দিকে আর কোন আগন্তুকের সঙ্গে সহজে দেখাই করতেন না। কলকাতা কি অন্য কোনখান থেকে লোক এসেছে শুনলেই তিনি দোতলায় উঠে জানালা কপাট বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতেন। শত ডাকা-ডাকিতেও নামতেন না।

হিরন্ময়ী দেবীকে যাঁরা দেখেছেন, বা তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, এই হিরন্ময়ী দেবী কখনই রাজলক্ষ্মী হতে পারেন না। আমি নিজে অন্ততঃ বার দশেক সামতাবেড়ে হিরন্ময়ী দেবীর নিকটে গেছি এবং তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তাও বলেছি। আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে, হিরন্ময়ী দেবী একজন অত্যন্ত সাধারণ, গ্রাম্য সরলা মহিলা ছিলেন। গুছিয়ে ভাল করে কথা বলতেও তিনি পারতেন না। অথচ রাজলক্ষ্মী নাচগানে যেমন ওস্তাদ, কথাবার্তায়ও তেমনি কি চৌকস! রূপে, গুণে এবং বুদ্ধিতে হিরন্ময়ী দেবী রাজলক্ষ্মীর সমকক্ষ তা মনে হয়নি।

অতএব হিরন্ময়ী দেবী যে রাজলক্ষ্মী নন, একথা জোর করেই বলা যেতে পারে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে লেখক শ্রীকান্তের কাহিনী নিজের জবানীতে বিবৃত করেছেন। প্রধানতঃ সেই কারণেই অনেকে শরৎচন্দ্রকে শ্রীকান্ত ভেবে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ শরৎচন্দ্রের ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে শ্রীকান্তের জীবনের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। শ্রীকান্তকে শরৎচন্দ্র ভাবা এও একটা কারণ। যাই হোক, রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে প্রথমে শ্রীকান্তই শরৎচন্দ্র কিনা এবং শ্রীকান্তের কাহিনীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনের কতটা মিল আছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাকঃ--

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি ১৩২২ সালের মাঘ মাস থেকে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। তখন লেখাটি "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" নামে ছাপা হত এবং লেখকের নাম হিসাবে থাকত "শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা"।

ঐ সময় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ভারতবর্ষ পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন--

"শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী যে সত্যই 'ভারতবর্ষে' ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই--এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপান এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

যদি বলেন তো আরো লিখি, আরো অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই। তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা কোন মতেই প্রকাশ না পায়। এমন কি আপনি ছাড়া, উপেন-বাবু ছাড়া (তাঁর মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না--তা ভালই হোক, মন্দই হোক)

আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এ সব নেই। বাস্তবিক 'তিন মাস' যে ত্রিশ বচ্ছরের ধাক্কা লইবার উপক্রম করিল। অথচ কি নীরস! কি কটু! আপনি দুঃখিত হবেন না—এইটা শুধু আমার নয়, অনেকেরই মত। মহারাজের ওটায় ত এর শতভাগের একভাগও আত্মম্ভরিতা নেই। তাতে 'আমি'ও যেমন আছে, 'তুমি'ও তেমনি আছে—ওরা, তারাও বাদ যায় নাই। রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই দেখানো শোনানো দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়, না তা নয়। অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না-বলা, না-আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।" (শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র)

এখানে উধৃত পত্রাংশটির মধ্যে যে, তিন মাস ত্রিশ বচ্ছরের ধাক্কার কথা আছে সেটি হচ্ছে, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'য়ুরোপে তিন মাস' প্রবন্ধের কথা। ঐ প্রবন্ধটি তখন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হচ্ছিল। তিন মাসের ভ্রমণ কাহিনী বহুমাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছিল বলেই শরৎচন্দ্র ঐরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

আর পত্রাংশটির মধ্যে "মহারাজের ওটা"র যে কথা আছে, তা হচ্ছে—বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাবের 'আমার য়ুরোপ ভ্রমণের' কথা। মহারাজের এই ভ্রমণ কাহিনীটিও তখন ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হচ্ছিল।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' ১৩২২ সালের মাঘ থেকে ১৩২৩ সালের মাঘ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হলে, ঐ ১৩২৩ সালের মাঘ মাসেই শ্রীকান্ত ১ম পর্ব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' শ্রীকান্ত নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময়, গ্রন্থে, 'ভারতবর্ষে' প্রথম বারের প্রকাশিত অংশটার কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। ঐ অংশেই কিছু ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ছিল।

শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই, তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে আরও লিখেছিলেন—অবশ্য শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর সঙ্গে কিছুটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই।

আর একটা কথা, শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে লেখা পত্রে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বর্ধমানের মহারাজা ও রবীন্দ্রনাথের আত্মকাহিনী নিয়ে যেভাবে আলোচনা করেছেন এবং ঐ পত্রেই আত্মকাহিনী বলতে গেলে, অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করার, যে কথা বলেছেন, তাতে শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীতেও যে, তিনি তাঁর আত্মকাহিনীই বলেননি, তারও একটা পরিষ্কার আভাষ পাওয়া যায়।

আমাদের কিন্তু সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকান্ত আসলে একটি উপন্যাস এবং উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখক সত্য ঘটনার উপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে তাকে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করে তুলেছেন, এ কথা মনে রেখেই এখন শ্রীকান্তে বাস্তব চরিত্র বা ঘটনা কিছু আছে কিনা দেখা যাক্—

প্রথমেই দেখা যায় যে, শ্রীকান্ত উপন্যাস গোড়াতেই যাকে নিয়ে আরম্ভ, সেই ইন্দ্রনাথ একটি বাস্তব চরিত্র। ইন্দ্রনাথের আসল নাম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বাল্যবন্ধু ও মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন আমায় বলেছিলেন—শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে রাজেন্দ্র বা রাজুকে ইন্দ্রনাথরূপে চিত্রিত করতে গিয়ে, আদৌ অতিরঞ্জিত করেননি। আমি দেখেছি, বাস্তবিক রাজু ঐ প্রকৃতিরই মানুষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর গ্রামের দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী বি-এল মহাশয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর বৎসর (১৩৪৫ সাল) কোন এক পত্রিকায় "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ঐ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে দ্বিজেনবাবু কিন্তু লেখেন—দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের 'বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলের' শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেখে শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ চরিত্র কল্পনা করেছেন। সতীশচন্দ্র শরৎচন্দ্র অপেক্ষা ২।৩ বৎসরের বড় হলেও বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সতীশচন্দ্র শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের ন্যায় ঐ ধরনেরই মানুষ ছিলেন।

দ্বিজেনবাবু শেষে অবশ্য বলেছেন—রাজু এবং সতীশ দুজনের চরিত্র একসঙ্গে মিশিয়ে ইন্দ্রনাথ আঁকাও শরৎচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব নয়।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের নিজের কাহিনী কতটা আছে, সে সম্বন্ধে কবি কালিদাস রায় একবার শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন।

উত্তরে শরৎচন্দ্র সেদিন কালিদাসবাবুকে বলেছিলেন—তা কিছু আছে বৈকি। তবে উপন্যাসে বর্ণিত কোন একটা সময়ের ঘটনাই যে, আমারও জীবনের সেই একটা সময়েরই ঘটনা তা নয়। জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা খণ্ড খণ্ড অনেক ঘটনাকেই, লিখবার সময় এক সময়ের একটি সম্পূর্ণ ঘটনা করে লিখেছি। কোন কাহিনী বা ঘটনাকে সাহিত্যের পর্যায়ে আনতে হলে, তাকে হয় কল্পনা দিয়ে, নয়ত অন্যান্য খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা কাহিনী দিয়ে পূরণ করে, সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। তোমাকে দিয়েই একটা উদাহরণ দিচ্ছি :—তুমি শিক্ষকতা করছ। ধর তুমি একটি ছেলেকে তার নিজের গ্রাম সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে দিলে। মনে কর, ছেলেটির গ্রামে লিখবার মত উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। গ্রামে নদী নাই, এমন কি একটি দেবমন্দির পর্যন্ত নেই। ছেলেটিকে এখন রচনার নম্বর পেতে হলে,

তার আশপাশের গ্রামে দেখা নদী, দেবমন্দির প্রভৃতির কথাও তার নিজের গ্রামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে লিখতে হবে। তবেই ত তুমি তাকে নম্বর দেবে, নাকি? সাহিত্যের বেলায়ও তাই। একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বা চরিত্র সৃষ্টি করতে হলে, ঐরূপই করতে হয়।

কালিদাসবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলি থেকে এখন বলা যেতে পারে যে, ইন্দ্রনাথ চরিত্র পরিপূর্ণভাবে চিত্রিত করতে গিয়ে রাজুর চরিত্রের সঙ্গে আর এক বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্রের জীবনের কাহিনী কিছু জুড়ে দেওয়া এমন কিছুই বিচিত্র নয়।

শ্রীকান্তের অন্নদা দিদিও একটি বাস্তবচরিত্র। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলেছিলেন, তিনি শরৎচন্দ্রের মুখে গল্প শুনেছিলেন, অন্নদাদিদি নাকি সত্যই ছিলেন।

অন্নদাদিদি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী লিখেছেন—"শ্রীকান্ত উপন্যাসে প্রথম পর্বের যে অন্নদাদিদি ও শাহজী নামক তাঁহার সাপুড়ে স্বামীর কাহিনী আছে, তাহাও দেবানন্দপুর গ্রামের প্রান্তবর্তী সরস্বতী নদীর অপর পারের 'মালিস্‌পুর' গ্রামের তখনকার দিনের একটি সত্য ঘটনা। শরৎচন্দ্র এবং সতীশচন্দ্র প্রায়ই এই অন্নদাদিদির কুটীরে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাকে ফল, তরকারী, মাছ, মাঝে মাঝে দিয়া আসিতেন ও সময়ে সময়ে সামান্য অর্থ সাহায্যও করিতেন—একথা শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শ্রীকান্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে উল্লিখিত দেবানন্দপুর নিবাসী 'প্রসন্ন ঠাকুরদার' পুত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, কারণ তিনিও শরৎচন্দ্রের সহিত উক্ত অন্নদাদিদির কুটীরে কয়েকবার গিয়াছেন এবং শাহজীর মৃত্যুর পর যে, অন্নদাদিদি শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভবনের নিকটবর্তী চৌমাথা রাস্তার মোড়ের গোবিন্দ মুদির দোকানে মাকড়ী দুইটি বিক্রয় করিয়া যান ও প্রাপ্ত টাকা হইতে শরৎচন্দ্রকে দেওয়ার জন্য ঐ মুদীর দোকানে পাঁচটি টাকা রাখিয়া যান, তাহা তাঁহার স্পষ্টই মনে আছে।"

দ্বিজেনবাবুর কথা অনুযায়ী অন্নদাদিদির কাহিনী মালিসপুরের বাস্তবঘটনা হওয়াও বিচিত্র নয়। ইন্দ্রনাথের সহিত মাছচুরি ইত্যাদি কাহিনীগুলি বিহারের, কিন্তু অন্নদাদিদির কাহিনীটি বাঙলা দেশের। অথচ গ্রন্থে দেখা যায়, শরৎচন্দ্র একই জায়গার ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্বে যে কথা আলোচনা করেছি—শরৎচন্দ্র কালিদাসবাবুর কাছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন জায়গায় দেখা ঘটনাসমূহকে একত্র সন্নিবেশিত করার যে কথা বলেছিলেন, এখানে সেরূপ করাও অসম্ভব নয়।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে দেখা যায় যে, শ্রীকান্ত নিজের বাড়ীতে না থেকে অপরের বাড়ীতে (পিসির বাড়ীতে) থাকতেন, শরৎচন্দ্রের নিজের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনিও অপরের বাড়ীতে (মামার বাড়ীতে) থাকতেন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শ্রীকান্তর সন্ন্যাসীদের দলে মেশার কাহিনী আছে। শরৎচন্দ্র নিজেও বহুদিন সন্ন্যাসীদের দলে ছিলেন।

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্তের দেশের বাড়ীতে তাঁর পিতার মাতুল বংশের অবস্থানের কথা আছে। শরৎচন্দ্রের নিজের বেলাতেও তাই ছিল। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মাতুলালয়ে থাকতেন এবং মাতুলদের বাড়ীর সংলগ্ন তাঁদেরই দেওয়া ৪ কাঠা জমিতে বাড়ী করেছিলেন। পরে মতিলাল আবার দেনার দায়ে ঐ বাড়ী তাঁর মধ্যম মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২২৫, টাকায় বিক্রী করেছিলেন।

শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বের উল্লিখিত প্রসন্ন ঠাকুরদাও একটি বাস্তবচরিত্র। ইনি পূর্বোক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ভ্রাতা।

শ্রীকান্তে বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া ও বক্রেশ্বরের কথা আছে। শরৎচন্দ্র নিজে একবার উক্ত সাঁইথিয়া ও বক্রেশ্বর গিয়েছিলেন। একথা তিনি বীরভূমনিবাসী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নকে বলেছিলেন। হরেকৃষ্ণ সেকথা এক প্রবন্ধে লিখেছেন। (ভারতবর্ষ, ১৩৪৪ চৈত্র)

শ্রীকান্ত উপন্যাসে ৪র্থ পর্বে 'খাঁয়েদের গলায় দড়ের' বাগানের উল্লেখ আছে, এটিও দেবানন্দপুরের মুন্সীদের 'গলায় দড়ের বাগান' বলেই মনে হয়। আর শ্রীকান্ত উপন্যাসে বর্ণিত মুরারীপুরের আখড়াটি যে দেবানন্দপুর থেকে তিন চার মাইল দূরবর্তী সরস্বতী নদীর তীরের কৃষ্ণপুর গ্রামের শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া, তাতে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় প্রায়ই ঐ আখড়ায় যেতেন। ঐ আখড়া আজও বর্তমান। ঐ আখড়াটি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী লিখেছেন—

"এই সময়ে দুই বন্ধুতে (শরৎচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র) মিলিয়া সন্ধ্যার পর জেলের ডিঙি চড়িয়া গ্রাম হইতে তিন চার মাইল দূরবর্তী কৃষ্ণপুর গ্রামের শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আখড়া বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। এই আখড়া বাড়ীর নিকটেই তাঁহাদের সমবয়স্ক 'গফুর' নামে এক মুসলমান বন্ধু ছিল। এবং সে আখড়া বাড়ীতে কীর্তনেও যোগদান করিত। এই গফুরের পিতামাতাও অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। কৃষ্ণপুরের এই আখড়া বাড়ী—শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে 'মুরারিপুরের' আখড়া' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আখড়া বাড়ী আজিও রহিয়াছে।"

এইরূপ আরও অনেক বাস্তব ঘটনা বা কাহিনীর সহিত শ্রীকান্ত উপন্যাসের ঘটনা বা কাহিনীর মিল পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্র ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রেঙ্গুনে ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের এই অধ্যায়ের অনেক কথাই আমাদের কাছে অজ্ঞাত। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধুরা এ সম্বন্ধে কিছু কিছু যা লিখেছেন মাত্র।

শুধু রেঙ্গুনের কথাই বা কেন, পড়াশুনা ছেড়ে দেবার পর থেকে রেঙ্গুনে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, শরৎচন্দ্রের জীবনের ঐ সময়ের অনেক কথাও জানা যায় না। ঐ সময় বাড়ী ছেড়ে কোথায় কোথায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, আর কোথায় বা থেকেছিলেন, তারও অনেক কথা জানা যায় না।

তবুও শরৎচন্দ্রের জীবনকথা যা জানা গেছে, এবং তা থেকে এখানে যা আলোচনা করা গেল, তাতে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে যে লিখেছিলেন—"শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হবে" এবং শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর সঙ্গে কিছুটা সম্বন্ধ ত থাকবেই—তা একেবারে মিথ্যা নয়।

এই কারণেই এখন বলা যেতে পারে যে, শ্রীকান্ত উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর কাহিনীটির মধ্যেও কিছুটা সত্য থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী দেবানন্দপুরের প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা এই ঃ—

"তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদের বাটীর নিকটবর্তী প্যারী

(বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায়।...... এই পাঠশালায় পড়ার সময় শরৎচন্দ্রের দুটি বিশেষ বন্ধু ছিলেন পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র কাশীনাথ ও গ্রামের এক যাজক ব্রাহ্মণের ভাগিনেয়ী "রাজলক্ষ্মী"। এই রাজলক্ষ্মী মেয়েটি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের ছোট হইলেও সকল সময়েই তাঁহার সহিত সঙ্গিনীর ন্যায় বেড়াইত। দুজনের ভাবও ছিল যেমন, ঝগড়াও সেইরূপ হইত। শরৎচন্দ্র যখন প্রথমবার দেবানন্দপুর হইতে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে লেখাপড়ার জন্য তাঁহার পিতামাতার সহিত যান, তখন এই রাজলক্ষ্মী মেয়েটিও তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য খুব কান্নাকাটি করিয়াছিল।

"...ভাগলপুর হইতে আসিয়া যখন হুগলী শহরের স্কুলে ভর্তি হন, তখন আবার শরৎচন্দ্রের পাঠশালার সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী মেয়েটির সহিত গ্রামে মেলামেশার সুযোগ বেশী হয়। দুইজনে নদীর ধারে বা পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ালে বসিয়া মাছ ধরিতেন, কখন বা ডোঙায় কিম্বা জেলেদের নৌকায় চড়িয়া নদীবক্ষে বেড়াইতেন, কখনও বা উভয়ে বনে-জংগলে ঘুরিয়া নানা রংয়ের ফুল, ছিপের বাঁশ বা ফড়িং সংগ্রহ করিতেন, কখনও বা দুজনে মিলিয়া ঘুড়ি তৈয়ার করিতেন, কি ঘুড়ির সুতোয় 'মানজা' দিতেন। মেয়েটির একটি খেয়াল ছিল, যখন বৈঁচি ফল পাকিত, তখন বৈঁচি ফলের মালা গাঁথিয়া রোজই শরৎচন্দ্রকে উপহার দিত। একবার দুজনে এক জমিদারবাবুর সুরক্ষিত ভাল আমের বাগান হইতে সন্ধ্যার সময় কোনও ভাল আম সংগ্রহ করিতে গিয়া ধরা পড়ার উপক্রম হয়, শরৎচন্দ্র বাগানের পার্শ্ববর্তী এক ঝোপের আড়ালে লুকোন, কিন্তু মেয়েটি ধরা পড়ে। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর কে তাহার সংগে আম চুরি করিতে আসিয়াছে, তখন শরৎচন্দ্র যাহাতে ধরা না পড়েন তারজন্য মেয়েটি উত্তরে বলে যে, সে তার মার জন্য কোনও ঔষধের গাছ সংগ্রহ করিতে বাগানে একাই আসিয়াছে। আম পাড়িতে আসে নাই, বা সংগেও কেহ আসে নাই। শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার অনেকরকম খামখেয়ালীর কাজে এই রাজলক্ষ্মী মেয়েটি ছিল, তাঁহার প্রধান উৎসাহদাত্রী ও সহচারিণী। দুজনে মাঝে মাঝে এমন ঝগড়াও হইত যে, দু'জনের কথাবার্তা বন্ধ হইত ও মেয়েটি দেখা দিয়াও কথা কহিত না। শরৎচন্দ্র তখন নিজেই যাইয়া মেয়েটিকে আদর করিয়া ডাকিয়া আলাপ করিতেন। এই বাল্য-সঙ্গিনী প্রকৃতই যে শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের পার্বতী ও শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী চরিত্রে অনেকাংশে চিত্রিত রহিয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই মেয়েটির দুই বছরের আর একটি বড় ভগিনী ছিল 'সুরলক্ষ্মী'। মেয়ে দুইটির মাতা বিধবা হইয়া তাহাদের লইয়া দেবানন্দপুরে তাঁহার ভ্রাতার সংসারে আসিয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা সামান্য যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার লইতে পারেন নাই। এজন্য মেয়ে দুইটিকে লইয়া তাহাদের মাতা স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে দেব-সেবাদি কার্যে ব্রতী হইয়া তথায় আশ্রয় লাভ করেন। মেয়ে দুইটি বিবাহযোগ্য হওয়ায়, উপায়ান্তর না থাকায়, কোনও এক দূরবর্তী গ্রামের এক কুলীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাহাত্তর টাকা পণ দিয়া দুইটি মেয়েরই বিবাহ দেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া পত্নী দুইটির কাহাকেও নিজ বাটীতে লইয়া যান নাই। বা বহুদিন যাবৎ কোনও সংবাদ লন নাই। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠা সুরলক্ষ্মীর মৃত্যু হয় ও তাহার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়া যখন পত্নীদের কাহাকেও লইয়া যাইতে লোক পাঠান, তখন রাজলক্ষ্মীকে স্বামীর ভিটায় যাইতে হয়; কিন্তু অল্পকাল পরেই স্বামীর মৃত্যু ঘটায় আবার দেবানন্দপুরেই মাতার নিকট ফিরিয়া আসেন। ইহার বছর খানেকের মধ্যেই রাজলক্ষ্মীকে লইয়া তাহার মাতা কাশীধামে গমন করেন ও পরে যখন তথা হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন শুনা যায় যে, রাজলক্ষ্মীর কাশীধামে মৃত্যু হইয়াছে। রাজলক্ষ্মীই যে 'পিয়ারী বাঈজী' হয় নাই, তাহা বলা যায় না।" (দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিজেনবাবু রাজলক্ষ্মীর বাল্যজীবনের যে ইতিহাস দিয়েছেন, শ্রীকান্তে বর্ণিত রাজলক্ষ্মীর বাল্যজীবনের ইতিহাসের সংগে তা অনেকটা মিলে যায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে দ্বিজেনবাবুর বর্ণিত রাজলক্ষ্মীর বাল্যজীবনের কাহিনীটি ঠিক কিনা? দ্বিজেনবাবুর বর্ণিত কাহিনীটি যে সত্য নয়, তা জোর করে বলা যায় না। কেন না অনেক বাস্তব নাম, ধাম, এমনকি ছোট ছোট ঘটনাও ত শরৎচন্দ্র তাঁর অনেক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

রাজলক্ষ্মীর বাল্যজীবনের ইতিহাস না হয় গেল, কিন্তু যেটি আসল কাহিনী অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীর সহিত শরৎচন্দ্রের প্রণয়-কাহিনী তার মধ্যে কি কোনও সত্য নেই?

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, শরৎচন্দ্র বাঙলা, বিহার এবং ব্রহ্মদেশ ভালভাবেই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। জীবনে বহু লোকের সংগে মিশে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। আর তিনি যে প্রকৃতির ছন্নছাড়া ও ভবঘুরে মানুষ ছিলেন, তাতে করে এই ধরনের কোন বাঈজীর পাল্লায় পড়া বা অন্ততঃ বাস্তবেও ঐরূপ বাঈজী দেখা তাঁর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।

শরৎচন্দ্র হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মশায়ের কাছে একবার বলেছিলেন—রেঙ্গুনে যাওয়ার পূর্বে তিনি কিছুদিন বনেলী এস্টেটে চাকুরি করেছিলেন। তখন সাঁওতাল পরগণায় সেটেলমেণ্টের কাজ চলছিল। এস্টেটের তরফ থেকে ঐ সময় তাঁকে কিছুদিন সেখানে থাকতে হয়েছিল। এস্টেটের আরও কয়েকজন অফিসারও সেখানে ছিলেন। ডাঙ্গার উপরে ক্যাম্প পড়েছিল, সকলে সেই ক্যাম্পে থাকতেন। মাঝে মাঝে বনেলী এস্টেটের কুমার বাহাদুরও জমিদারীর মধ্যে সেটেলমেণ্টের কাজ দেখবার জন্য সেখানে যেতেন। তাঁর পৃথক ক্যাম্প হ'ত। তিনি তাঁর ক্যাম্পে মাঝে মাঝে নাচ-গানের ব্যবস্থা করতেন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসেও দেখছি, এক কুমার বাহাদুরের ক্যাম্পে নাচ-গানের আসরেই রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের জীবনীতে আরও দেখা যায় যে, তিনি বনেলী এস্টেটে চাকরি করতে করতেই কাকেও কিছু না বলেই উধাও হয়েছিলেন এবং কিছুদিন কোথায় ঘুরে শেষে সন্ন্যাসী সেজে মজঃফরপুরে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র যে কুমার বাহাদুরের নাচগানের ক্যাম্পে কোন বাঈজীর দেখা পান নি, বা তার সংগে কোনরূপ মেলা-মেশা করেননি, তা জোর করে বলা যায় না, বরং দেখা পাওয়া ও তার সংগে পরিচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই শরৎচন্দ্রের জীবনে রাজলক্ষ্মী বাস্তবে না ঘটলেও তিনি একজন বাঈজী দেখে বা তার সংগে কিছুদিন মেলামেশা করে তার উপর রং চড়িয়ে যে রাজলক্ষ্মী চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তাতে আদৌ সন্দেহ নেই।

বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিতই রাজলক্ষ্মীকে একটি দেখা চরিত্র বলেছেন। মোহিতবাবুর সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করেই এখানে রাজলক্ষ্মী প্রসংগ শেষ করছি ঃ

"আর ঐ রাজলক্ষ্মীর কথা! যাঁহারা এই কাহিনী—শুধুই রসতত্ত্ব নয়, সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্দেহ থাকিবে না যে, শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীতে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র কত সত্য, কত বাস্তব। ঐ চরিত্র যদি বাস্তব না হয়, তবে সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বই মিথ্যা। কোন কবি, এমন কি সেক্সপিয়ারও কোন হয়, এতখানি কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন না যে, চোখে না দেখিয়া এইরূপ একটা চরিত্র সৃষ্টি করেন।"

—বারংবারই এই রকম ঘটে আসছে। কিন্তু প্রশ্ন, আর কতোকাল এভাবে চলবে?

আমরা বঙ্গসন্তান, অন্যায়ের প্রতিবাদে হরতাল করি, দোকান-পাট বন্ধ করে সরকারকে জানাই, দেখো, তোমাদের অন্যায়ের জন্য আমরা শোকসন্তপ্ত, দোকান-পাট বন্ধ রেখেছি, অফিস কামাই করেছি, গাড়ী-ঘোড়া-ট্রাম-ট্রেন চলতে দিইনি;—আমরা ভীষণ, ভী-ষ-ণ দুঃখিত, শোকসন্তপ্ত। এই অন্যায়ের প্রতিবাদের পেছনে আছে কুলি থেকে আরম্ভ করে চাকুরে শ্রেণীর লোক, গরীব থেকে ধনী। আমাদের এই হরতাল লক্ষ্য করে সাবধান হও, আমরা সমবেত শক্তিতে তোমাদের শাসনতন্ত্র অচল করে দিতে পারি কিনা তা এই একদিনের হরতালে মালুম হোল নিশ্চয়ই। অতএব সাবধান হও, অন্যায়টি কোর না ভবিষ্যতে।

কিন্তু হরতালের পর? আবার আমরা যেই কে সেই। নিজেদের মধ্যে করি মারামারি, কাটাকাটি—ক্ষমতালোভের দ্বন্দ্ব। ভুলে যাই—এরই সুযোগ নিয়ে ওরা আমাদের এক দিনের হরতালের হুমকি, প্রতিবাদ, সবই নস্যাৎ করে দেয়। হাল্কা হয়ে যায় সমস্ত কিছু আড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তুতি-পর্ব। ওরা হাসে।

ওরা ভালো করেই জানে আমাদের,—তাই আমাদের এই ধরণের হরতাল দেখে গম্ভীর হবার ভান করে; যেন কত ভয় পেয়েছে। তাদের এই কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখে আমরা আনন্দে আত্মহারা হই,—উল্লাসে নিজেই নিজেদের পিঠ চাপড়াই: দেখেছ, কেমন "ঘেবড়ে" গেছে? ক্ষণিকের জয়োল্লাসে গুলিবিদ্ধ ঐ সমস্ত শহীদের লাসের ভবিষ্যৎ যায় হারিয়ে; বড়জোর হপ্তাখানেক ওদের নাম মনে রাখি, তারপর স্মৃতিপট থেকে মুছে যায় ওরা, ওদের প্রাণোৎসর্গের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। মুখে যতই বলি না কেন ওরা অমর হয়ে রইলো, আসলে তো জানি ওদের নাম আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন নেই। তর্ক তুলে বলি, আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ানের নাম মুখস্ত রাখেননি।

আমরা বাঙালীরা নাকি বড় সেণ্টিমেণ্টাল,—ওরা বলে বারংবার। বলুক। সেণ্টিমেণ্টাল না হলে ধর্মবোধ জাগে না। পরের দুঃখে কাঁদা, দরিদ্রের প্রতি দয়া, অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা এবং তারজন্য জীবন পণ করা—এগুলো ভাবপ্রবণতারই লক্ষণ। এই সেণ্টিমেণ্টে খুদিরাম ফাঁসিতে ঝুলেছেন, রবীন্দ্রনাথ খেতাব ত্যাগ করেছেন, নেতাজী স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে মারা গেলেন। সেণ্টিমেণ্ট ধর্মবোধ জাগায়, মানুষকে 'মানুষ' করে তোলে। বিদ্যাসাগর সেণ্টিমেণ্টাল ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, শ্যামাপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্রও বাদ যাননি।

কিন্তু আমরা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি?

ধর্মঘটের আগের দিন অফিসে...কালকে তোফা ঘুমানো যাবে।

হরতাল?—সে যেন একটা হিড়িক্। হরতাল হোক, বাধা দেব না। ব্যস, আর কিছু চাই? আমি তো স্যার দোকান না খুলে অফিস না গিয়ে আমাদের বাঙালীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করলুম! —ভাবটা এই, যেন এইখানেই আমাদের ডিউটি শেষ।—দোকান বন্ধ রেখে, অফিস না গিয়ে আমাদের ধর্মঘট-আহ্বানকারী দলগুলিকে 'কেতাথ' করে দিয়েছি!! কিন্তু দেখা যাবে—ঐ এ'রাই ধর্মঘটের আগের দিন অফিসে বলাবলি করছেন: আঃ! কালকে তোফা ঘুমানো যাবে। ওহে ব্যানার্জি, এ-মাসে তাহলে সাকুল্যে পাঁচ-'খানা' ছুটি পাওয়া গেল, কি বলো? কাল সন্ধ্যার শো-তে তাহলে সিনেমা যাচ্ছো? —...ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কেউ-কেউ আবার ধর্মঘটের আগের দিন রাতের ট্রেনে ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আশ-পাশের আত্মীয়ের বাড়ী।—দিব্যি মাছ ধরা যাবে। যেন, এও একটা ফাল্‌তু রোববার!

ধর্মঘটের আগের দিন সন্ধ্যায় বাজারে বাজারে সে কী ভিড়!—তাক্ বুঝে দেবার দাম বাড়ায় দোকানীরা—যেন 'এর জন্যেই বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুণে'। আলু-বেগুন-পোস্ত-ডাল

সুদে-আসলে পুষিয়ে নিতে ব্যস্ত

মাত্র একদিনের জন্য কৌলিন্য পায়। এই ধর্মঘটে দোকানীরা একদিন দোকান বন্ধ রেখে যে 'লস্' খাবে, তা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিতে ব্যস্ত থাকে। তা বলে আপনি এই ধর্মঘটে এদের 'অসহযোগী' আখ্যা দিতে পারেন না, ধর্মঘটের দিন দেখুন গিয়ে—এরা সত্যই দোকান বন্ধ রেখেছে; ফুটপাথে চৌকি পেতে দিব্যি তাস পিট্‌ছে, কেউ-কেউ আরামে ঘুমে দিচ্ছে।

এবং আমরাও ঘুম দিই কসে। জাগি সেই চারটায়—যখন কর্মচঞ্চলতায় প্রাণস্পন্দন ফিরে পাচ্ছে শহর একটু-একটু

ফুটপাথে দিব্যি তাস পিটছে

করে। এক কাপ চা গলাধঃকরণ করে আশপাশে বেরিয়ে খোঁজ নিই—হ্যাঁ মশাই, কোথাও গোলমাল হোল কি? গোলমাল হলে উদ্‌গ্রীব হই,—না হলে কেমন যেন একটা হতাশা জাগে মনে। গোলমালই যদি না হোল, তাহলে এতবড় একটা হরতালের কি দাম রইলো শুনি? এই দুপুরে মাঝে-মাঝে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছে; গেঞ্জি গায়ে কারণ অনুসন্ধানে বেরিয়ে দেখেছি—স্টেট্‌বাসের গুমটি টেনে টেনে গোলপোস্ট করে দু'দলে খেলা চলছে; 'গোল' এর শব্দই এই

দু'দলে খেলা চলছে

গোলমালের হেতু। কিংবা গোটা দুই ষাঁড় ধরে এনে তাদের গায়ে লাল কালিতে 'চালিহা' বা অন্য কারুর নাম দেগে অপার উল্লাসে গগন বিদীর্ণ করে আশ-পাশের জনতাকে দেখানো ঃ দেখো, কি-ভাবে আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলাম, কত সহজে ওদের অপমান করে বাঙালী জাতির সম্মান রক্ষা করলাম; এই রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলা হরফ দিয়েই কেমন প্রতিশোধ তুলে ছাড়লাম!!

হায়, আমাদের এত সহজে বিস্মৃতি ঘটে কেন? শোকবিহ্বল পিতা-মাতা, যাদের কোল খালি করে তাদের অমূল্য-নিধি চলে গেছে,—হে ভগবান, তুমি তাদের মনে বিস্মৃতি দাও, তারা যেন শোকের ব্যথা ভুলে যায়; কিন্তু আমরা যেন বিস্মৃত না হই ঐ সমস্ত শহীদদের। আমাদের এই হতভাগ্য বাঙালী জাত—বড্ড বেশী ভুল করে; বড্ড বেশী তাড়া-তাড়ি সব কিছু ভুলে যায়। তা না হলে কাগজে-কাগজে খবর আর সম্পাদকীয় পড়ে মাথায় রক্ত চাড়া দিয়ে ওঠে, মনে করি এই সব নারীঘাতী শিশুঘাতীদের আর প্রশ্রয় দেবো না, দমদম রোড বা চিত্ত-রঞ্জন এ্যাভিন্যুর দুই ফুটপাথে ভিড় করে আর ওদের জয়ধ্বনি কোরবনা; কিন্তু আমাদের এমনই ভোলা মন, সব ভুলে যাই,—করজোড়ে আবার দাঁড়াই, ওদেরই স্তুতিগানে মুখর হয়ে উঠি। এই যে বিস্মৃতি, এ আর কতদিন ঘটবে? তাই বলি, হে ভগবান, বাঙালীকে বিস্মৃতি দিও না, তারা যেন সব অপমান, সব অভিযোগ মনে রাখে, সকল

খবর...পড়ে মাথায় রক্ত চাড়া দিয়ে ওঠে

অত্যাচার, সমূহ রক্তপাত যেন তাদের চোখের সামনে সুদীর্ঘকাল জ্বলজ্বল করে, মৃদু পিঠ-চাপড়ানিতে মোহান্ধ না হয়, বৃহৎ দাবী যেন ক্ষুদ্র ভিক্ষালাভের আনন্দে ধূলিসাৎ না হয়!!

শব্দকল্পদ্রুম

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

তৃতীয় আসর

।। কথার মানে ।।

[প্রত্যেক শব্দের চারটি করে অর্থ দেওয়া হয়েছে। যে অর্থটি নির্ভুল বলে মনে হচ্ছে সেটি দাগ দিয়ে রাখুন। উত্তর অন্যত্র আছে। সবগুলি শেষ না করে উত্তর দেখবেন না। যদি দশ বা তার বেশী প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে বাংলা শব্দের উপর আপনার বেশ দখল আছে। সাত থেকে নয় পর্যন্ত শুদ্ধ হলেও মন্দ নয়।]

১। **অব্যবহিত**
(ক) নিশ্চিত। (খ) অবস্থাপিত (গ) সংলগ্ন। (ঘ) প্রবাহিত।

২। **বিকচ**
(ক) কুঞ্চিত। (খ) বিক্রীত। (গ) বিকশিত। (ঘ) সচকিত।

৩। **সতীর্থ**
(ক) তীর্থস্নান। (খ) সহপাঠী। (গ) মহাদেব। (ঘ) সতীধর্ম।

৪। **স্থপতি**
(ক) পাথর কেটে যে মূর্তি নির্মাণ করে। (খ) ছুতার। (গ) গৃহনির্মাতা। (ঘ) প্রতিষ্ঠা।

৫। **স্তনিত**
(সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী)
(ক) স্তম্ভিত। (খ) স্তন সমন্বিত। (গ) তরঙ্গিত। (ঘ) গর্জিত।

৬। **কর্ণিকার**
(ক) পদ্ম। (খ) সোঁদাল। (গ) ঘেঁটু। (ঘ) বকুল।

৭। **যুগপৎ**
(ক) এক সময়। (খ) দ্বিপদ। (গ) এক জোড়া। (ঘ) নবযুগের আরম্ভ।

৮। **মুমুক্ষু**
(ক) মোক্ষাভিলাষী। (খ) মৃতপ্রায়। (গ) মূর্ছিত। (ঘ) মুখোমুখি।

৯। **মুষ্টিমেয়**
(ক) টোটকা ঔষধ। (খ) মুষ্টিপরিমিত। (গ) স্থূলকায়। (ঘ) মুষ্টিযুদ্ধ।

১০। **ভোঁদড়**
(ক) নেউল। (খ) উদ্‌বিড়াল। (গ) শেয়াল। (ঘ) নেকড়ে বাঘ।

১১। **ব্যপদেশ**
(ক) ছল। (খ) কোমর। (গ) বিস্তার। (ঘ) দেশান্তর।

১২। **বোম্বেটে**
(ক) বোম্বাইয়ের অধিবাসী। (খ) গাঁটকাটা। (গ) জলদস্যু। (ঘ) দীর্ঘাকার লোক।

১৩। **জিগীষা**
(ক) জয়ের ইচ্ছা। (খ) হত্যা করবার ইচ্ছা। (গ) জীবিত থাকবার ইচ্ছা। (ঘ) জানবার ইচ্ছা।

১৪। **নিরস্ত**
(ক) আশাহীন। (খ) উপহাস। (গ) অস্ত্রহীন। (ঘ) বিরত।

১৫। **দন্তস্ফুট**
(ক) দাঁত বসানো। (খ) দাঁত ওঠা। (গ) শক্ত। (ঘ) দাঁতের ব্যথা।

পরিশেষ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। পনেরো ।।

একদিনেই সব ব্যবস্থা, গাঁয়ের নিমন্ত্রিতদের বিদায় করে এদিককার খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত দশটা হয়ে গেল।

তাড়াহুড়োটা দেখে রজতই জানাল সকালের কথাটা। স্বাতি পান দিচ্ছিল সবাইকে, বলল—"তাবলে এক্ষুণি যেতে পারেন না। রুগী নেই তো হাতে?"

"রুগী আমি নিজেই এখন একটি।"—হেসে উত্তর করল রজত। বলল—"চলচ্ছক্তিহীন, যা খাইয়েছেন। তবে, একেবারে গিয়ে বিছানায় পড়লেই ভালো হোত।"

রাগ করল স্বাতি। বলল—"তুমিই বাঁচা বাবা। আমার কোন অনুরোধই রাখেননি খাওয়ার সময়, অথচ নিন্দে বদনাম দিয়ে যাচ্ছেন। আমি আর বলবই না।"

লাহিড়ীমশাই প্রশ্রয়ের কণ্ঠে রজতের দিকে চেয়ে বললেন—"চলো না হয় একটু বসবে।"

ওরা সবাই গিয়ে বাগানে বসল।

বৈশাখের শেষ, বেশ গরম পড়েছিল, তবে দু'দিন আগে একটা বড় রকম কাল-বৈশাখী উঠে তাপটাকে অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, একটি ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে; একবার যখন বসল, আর সব কিছু ভুলেই বসে রইল সবাই।

রজত দেখল একটা ভুলও হয়ে যাচ্ছিল। বাগানের দিকে একটু আয়োজনও করে রেখেছে—নিশ্চয় স্বাতিই, ওরা তিনজন বেটাছেলে যে সময় আহার করছিল, সেই ফাঁকে কোন সময়। বিশেষ কিছু নয় অবশ্য, চৌকির ওপর একটা মাদুর বা সতরঞ্চি পেতে তার ওপর একটা ধোপদুরুস্ত চাদর বিছানো। মাঝখানে একটা রেকাবিতে সদ্য তোলা বেলফুল। তবে এটা যে আগে ছিল না তাই থেকেই মনে হয় উৎসবটুকুর মেয়াদ আরও একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে কর্মব্যস্ততার মাঝেই এই পরিকল্পনা।... চলে গেলে ভুলই হোত।

রজত এইটুকুই ভাবল, স্বাতিদের সঙ্গে তার সম্পর্কও তত ঘনিষ্ঠ নয়। প্রশান্ত কিন্তু ভাবছিল, এ-আয়োজনের এইখানেই শেষ হয়ে যাওয়া অনুচিত; শেষ হয়ে যেতে দেওয়া যেন একটা অপরাধ। পূর্ণতার একটা চিহ্নও তার মনে রয়ে গেছে, স্বাতির ব্যাপারে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে কথা শেষপর্যন্ত না হয়ে গেল, একরকম সংকল্পই করেছে আর তার কথা তুলবে না—অন্ততঃ লাহিড়ীমশাই যতক্ষণ কাছে-পিঠে আছেন ততক্ষণ তো নয়ই। আজকে তাই সব কিছুর মধ্যেই সে একটু বেশি নীরব। লোভ ক্রমাগতই ওর সংকল্পের ওপর আঘাত হানছে—গোড়া থেকেই; তারপর এখানে এসে আরও বেশি করেই, ও কিন্তু নিজের জিহ্বাকে যেন সজোরে লাগাম দিয়ে টেনে রেখেছে।

লাহিড়ীমশাই অবশ্য বেশিক্ষণ বসলেন না, তাহলে পেলেনই না বসতে। কিছুক্ষণ থেকেই ওদিকে একটু গোছগাছ করে নিয়ে অনাথ এসে বলল—ওঁর শুতে যাওয়া দরকার। বললেন—"দরকার তেমন দেখিনে তবে সেকথা তুইও মানবিনি, ডাক্তারবাবুও তোর দিকেই হবেন। যাই তাহলে।"

উনি উঠে গেলেও প্রশান্ত তুলতে পারল না কথাটা। তবে অন্যভাবে উঠল।

স্বাতিও কি মনে মনে পূর্ণতার এই একটি চিত্র নিয়ে আয়োজন করেছে? সেকথা অবশ্য এখনও প্রকাশ পাওয়ার নয়। তবে যদি করেই থাকে তো আজ নিশ্চয় তার অনুকূলে। নিজের কথা চলে না, প্রশান্ত তো বলতে পারছে না, তবে কথাটা অন্যদিক দিয়ে উঠলই শেষ-পর্যন্ত।

কর্তা চলে যেতে প্রশান্ত বলল—"খাওয়ার কথা বলছিলে, রজত, ডাক্তার মানুষ, ভয় নেই এই ভরসায় যদি খেয়েই থাক বেশি তো না হয় গড়িয়েই নাও না একটু চৌকিটার ওপর। আর তো উনি নেই।"

রজত বলল—"আমিও অরসিক ডাক্তারই, বলা মানায় না আমার; তবে তুমি দেখছি নিতান্তই হাতুড়ি-পেটা

ইন্‌জিনিয়ার—অমন চমৎকার ধবধবে চাদর বিছানো, মাঝখানে বেলফুলের রাশ, একপেট খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা মানায় ওখানে? তার চেয়ে যদি... "

ব্যাঞ্জোর কথা জানে না রজত। প্রশান্তের প্রায় ঠোঁটের আগায় এসে গেছে, কোনরকমে সামলে রেখেছে নিজেকে। বিশাখাই বলে উঠল—"চমৎকার ব্যাঞ্জো তো বাজাতে পারেন স্বাতি-দিদি।"

"তোমার সাগরেদি গেল বিশাখা আজ থেকে।" —মুখটা খুব ভারি করে নিয়ে বলল স্বাতি। বলল—"তোমার না বারণ করে দেওয়া হয়েছিল?"

বিশাখা বলল—"কাল প্রশান্তদা তো জেনে গেলেন স্বাতিদি'।"

"অথচ দেখো সাগরেদ না হয়েও কেমন চুপ করে আছি আমি...। নয় কি স্বাতি দেবী?"

এমনভাবে ওকে সাক্ষী মেনে মাঝখান থেকে বলে উঠল প্রশান্ত যে একটু হাসি পড়ে গেল। কপট গাম্ভীর্য'ই স্বাতির। সেটুকু কেটে গিয়ে সে সাধারণভাবেই আপত্তি তুলল খানিকটা—গাইতে বাজাতে বললে সবাই যেমন তোলে—শোনাবার মত নয় বলেই প্রকাশ করতে মানা করেছি বিশাখাকে—অনেকদিন অভ্যাস নেই—রাত হয়ে গেছে অনেকটা। শেষ পর্যন্ত বিশাখার ওপর চাপাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে (সফলতা চায়নিও তো) বলল—"তাহলে নিয়ে এসো তো বিশাখা; একবার দিই-ই শুনিয়ে, তাহলে আর তো বলবেন না।"

বিশাখা উঠতে বলল—"থাক্, আমিই যাচ্ছি।"

ভেতরে গিয়ে ডাকল—"বাবা।"

একটু তন্দ্রাই এসে গিয়েছিল লাহিড়ীমশাইয়ের। ভেঙে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—"স্বাতি-মা? কেন গা?"

"না, ঘুমুচ্ছিলে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম। ও'রা ছাড়লেন না, ব্যাঞ্জোটা বাজাতে হবে। তোমার আবার ব্যাঘাত হবে।"

"কিছু না, তুমি বাজাওগে, বলছেন যখন সবাই।"

গাইয়ে-বাজিয়ের মনের সঙ্কোচ তার গান-বাজনাতেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আরও একটা কথা আছে, সেটা আসে কাকে বা কাদের শোনাচ্ছি তাই নিয়ে। প্রশান্ত আর রজত উপলক্ষ্য হলেও স্বাতির আজকের সংগীত ঠিক তাদের জন্য ছিল না; অন্ততঃ প্রারম্ভে তো নয়ই। আজকের সমস্ত আয়োজনটুকুই তার পিতার জন্য। কালকে তাঁর মনে পুরানো স্মৃতির ঢেউ উঠে যে আঘাতটা দিয়েছিল তার প্রতিষেধ হিসাবে। অনাথের মাথা থেকে বেরিয়েছিল ভোজের কথাটা। ও ঠিক করেছিল বাজনা। আশা করেছিল প্রশান্তই তুলবে কথাটা, প্রায় নিরাশ হয়েই এসেছে, এমন সময় বিধি অনুকূল হোল, একটু ঘুরে এসেই পড়ল অভীপ্সিত ফরমাসটুকু।

বাপের জন্য আয়োজন বলেই, নিজেই গিয়ে তাঁর ঘুমটুকু ভাঙিয়ে এল।

তারপর অবশ্য আর সবকিছুই পড়ল এসে। মনের একটি স্পষ্ট বাসনার দীপ্তির নীচে অস্পষ্ট অনেকগুলি ঘোরাঘুরি করে, শুধু আলোর নীচের অন্ধকারের জন্যই তাদের স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় না। লাহিড়ীমশাই ছিলেন, কিন্তু সলজ্জ নিভৃতে কি আর কেউ ছিল না? স্বাতি আশা করেছিল ফরমাসটা আসবে প্রশান্তর কাছ থেকে।

ও আশাভঙ্গের বেদনা কিন্তু স্থায়ী হতে পেল না। এই স্নিগ্ধ গভীর জ্যোৎস্না রাত্রি, এই প্রিয়-সমাগম, কোন্ অজানা দূরের অতিথি যারা এত কাছাকাছি এসে পড়েছে জীবনে—এত কাছে যে নিজের জীবনের চেয়েও কাছে বলে মনে হয়,—বাপকে শোনাবার বিপুল আনন্দের মধ্যে দিয়ে, সবাই, সব কিছুই একে একে এসে পড়ল মনে। বাবার প্রসন্নতাই যেন আশীর্বাদ হয়ে সবকিছুই নবতর রূপে এনে দাঁড় করিয়েছে স্বাতির সামনে।

ইচ্ছা করছে যতটা পারি বাড়িয়ে যাই, এই রাত্রিটিকে—যতটা পারি সুরে সুরে ভরে দিই এ-রাত্রি। কৈ, আসেনি তো আর এমন একটি রাত্রি এ-জীবনে।

আজ বিধি ওর অনুকূল।......মনে পড়ে একদিন এক সিদ্ধপুরুষ এসেছিলেন ওদের বাড়িতে—"তুমি কি চাও সোনামণি?"

আর সবাই চেয়েছিল মিষ্টি, কেউ অন্য কিছু। স্বাতি চেয়েছিল গোলাপ ফুল; তখন বাগানে নূতন গাছ বসানো হয়েছে, ফুল ফোটেনি, ঐটেই মাথায় ঘুরছিল।

"এই নাও তোমার গোলাপ ফুল"

—হাত দুটো অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে একটু নেড়ে মেলে ধরলেন সিদ্ধপুরুষ।

সেইরকম একটা কিছু যেন কোথা থেকে হয়ে যাচ্ছে আজ; যে বাসনা মনে উঠছে কোথা দিয়ে কি হয়ে পেয়ে যাচ্ছে স্বাতি।

গোটা তিন গৎ বাজানো হয়ে গেলে, কতকটা অভ্যাস মতোই রজত হাত-ঘড়িটা উলটে দেখেছে, স্বাতিই প্রশ্ন করল—"কটা বেজেছে?"

"পৌণে বারোটা"—রজত উত্তর করল।

"ওরে বাবা!" ব'লে স্বাতি ব্যাঞ্জোটা কোলে নামিয়ে রেখেছে, বিশাখা বলে উঠল—"রেখে দিলেন যে স্বাতিদি!"

"শুনলে তো—রাত বারোটা।"

"পৌণে বারোটা। বারোটা এখনও হয়নি। হ'লেও বারোটা কি এমন রাত গরমকালে? আমরা সেদিন রাত দুটো পর্যন্ত নদীর ধারে কাটিয়ে দিলাম। নতুন পুল থেকে পুরনো পুল, তারপর পুরনো পুল পেরিয়ে নদীর ওপারে—সে যে কী চমৎকার!—দাদা, আমি, প্রশান্তদা, ওভারসিয়ারবাবুর ভাই—কলকাতা থেকে এসেছিলেন......"

"নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাতে বেড়ানো আর বসে বসে একঘেয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া......"

তিনজনেই একটু বিস্মিত হয়ে বিশাখার দিকে চেয়ে ছিল, স্বাতিই তার কথার ওপর কথাটা বলল।

বিশাখা ছেলেমানুষের মতোই বলে উঠল—"বেশ তো, চলো নদীর ধারেই বেড়াতে তাহলে।"

"একি জ্বালা!"—খিল-খিল করে হেসেই উঠল স্বাতি। বলল—"না বাজনা বাজাও তো নদীর ধারে বেড়াতে চলো। নদীর ধারে যদি না যাও তো......না যাও তো......আর একটা ভোজের বাটনা বেটে রাখি এসো...উঃ কী বাটনাই বাটতে পারে!"

—হেসেই চলল স্বাতি। বিশাখার হঠাৎ প্রস্তাবে একটা অসঙ্গতি ছিলই, তার ওপর স্বাতির টীকা-মন্তব্যে ওরা দুজনেও না একটু একটু যোগ দিয়ে

পারল না। বিশাখা কিন্তু একটুও যেন দমল না। উঠে পড়ে বলল—"যতই বলো আমি শুনছিনে কিন্তু। চলো নদীর ধারেই. সেদিন তুমি ছিলে না, আমার এত আপসোস হচ্ছিল। আমি জ্যাঠামশাইয়ের হুকুম নিয়ে আসছি..."

এগিয়েছে, স্বাতিও সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"ওরে শোন্, কী পাগল দ্যাখো তো? অথচ এদিকে সাত চড়ে কথা কইতে জানে না মেয়েটা! ক্ষেপে গেলো নাকি?...ওরে, বাবা ঘুমুচ্ছেন!"

থামাবার জন্যে ওকে অনুসরণ করে ভেতরে এসে দেখল লাহিড়ীমশাই এই দিকেই মুখ ক'রে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু থমকেই দাঁড়াল স্বাতি, বিশাখাও দাঁড়িয়ে পড়েছে চুপ ক'রে, নিশ্চয় ওঁকে একেবারে এমন সামনাসামনি পেয়ে যাওয়ার জন্যই।

স্বাতি যে থমকে দাঁড়াল তা বহুদিনই বাপকে এ-রূপে দেখেনি ব'লে। মনে হোল উঠানে পায়চারি করতে করতে বাজনাই শুনছিলেন, তারপর ওদের সব কথাবার্তাও শুনে তোয়ের হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মুখে একটি শান্ত হাসি, স্বাতির মনে হোল কতদিনের গ্লানি নেমে গিয়ে একটি প্রসন্নতার আবরণ সর্বাঙ্গে রয়েছে ছেয়ে। দাঁড়িয়ে পড়েছেন পশ্চিমে হেলা চাঁদের একেবারে মুখোমুখি হয়ে।

উনিই কথা বললেন প্রথমে, বললেন—"তা বিশাখা মার সাধ হয়েছে তো যাও না মা। আমার অবশ্য আরও দু'-একটা বাজনা হোলেই ভালো হোত। ......সে তো পরেও হবে। না, যাওই, বেশ রাত্তিরটি; হয়ে এসো।"

।। ষোল ।।

বিশাখা আজ স্বাতির এঞ্জেল হয়ে উঠেছে; দেবদূতী।

এমনি মেয়েটি বড় লাজুক প্রকৃতির। যেখানেই দুজনের বেশি, কিংবা দ্বিতীয়ের মধ্যেও অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত এমন কেউ যে মেয়ে নয় ও সাধ্যমতো একটি মানসিক নিভৃত রচনা ক'রে সাধ্যমতো চুপ করেই ব'সে থাকে। যখন নিতান্ত উপায় না থাকে, একটি অবগুন্ঠিত হাসি দিয়ে নিজের অস্তিত্বটা প্রকট ক'রে। এর জন্যই স্বাতি বলল—সাত চড়ে কথা কয় না। এর জন্যেই একসঙ্গে অতগুলো কথা ফরফরিয়ে বলে যাওয়ায় প্রশান্ত ওর মুখের দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে ছিল; ওর দাদাও। আর এইজন্যেই বাটনা বাটা বা ঐ ধরণের দৈহিক পরিশ্রমের কাজ পেলে যেন ও বর্তে যায়, কারণ আর সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আত্মগত করে ফেলতে দৈহিক শ্রমের মতো আর কিছু নেই।

প্রথমটা রাত-দুপুরে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়াটা অদ্ভুতই লেগেছিল সবার, বিশেষ ক'রে, পূর্ব-কল্পিত নয় বলেই, তারপর বিশাখার উৎসাহটাই সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ওই যেন অগ্রণী হয়ে নৈশ অভিযানটা চালিয়ে নিয়ে গেল। শুনিয়ে যাচ্ছে—কোথায় নদীর একটি সুন্দর চড়া জেগে উঠেছে, কচি-কচি ঘাস উঠেছে গজিয়ে, ঝিরঝিরে খানিকটা জলের স্রোত ভেঙে যাওয়া, এক হাঁটুও জল নয়; কোথায় নদীর পাড় সোজা নেমে গিয়ে বেশ একটু ভয়-ভয় করে; কোথায় কি এক সাদা সাদা ফুলের রাশ বিছিয়ে আছে: মনে হয় যেন......

"হ্যাঁরে বিশা, তোর পেটে এত!" —ওর দাদাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, বলে—"আমরাও তো ছিলাম সেদিন, তুই যে পেছনে চুপচাপ করে থেকে এমন খুঁটিয়ে দেখে গেছিস সব, পারিস এমন করে দেখতে, কৈ জানতাম না তো!"

ওই টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ব'কেও যাচ্ছিল একরকম ওই, আর তিনজনে চুপ করেই ছিল বিশেষ করে প্রশান্ত আর স্বাতি,. রজতের কথার উত্তরটা স্বাতিই দিল, বলল—"নাঃ, বড় বিশ্রী জায়গায় আপনি বাধা দিলেন রজতবাবু, কী যে মনে হয় সেটা শুনতে দিলেন না। নৈলে দেখতেন বোন আপনার একটি নীরব কবিই।"

"তা নয় হোল, চাপা মানুষকে চেনা যায় না, কিন্তু নীরব কবি হঠাৎ এত সরব হয়ে উঠল কোথা থেকে তার তো হদিস পাচ্ছি না।......হ্যাঁরে বিশা?"

"হঠাৎ হয়নি; এসব একদিনে হয় না।"—স্বাতিই উত্তর দিল। বিশাখা একটু গুটিয়ে গেছে এর মধ্যে।

প্রশ্ন হোল—"তবে?"

স্বাতি বলল—"তবে......সব কথা না-ই বা শুনলেন।—মানে, গল্পের দিকে মন দিলে দেখবেন কখন? আমাকেও দেখতে দিচ্ছেন না।"

মিনিট কয়েক বিরতি দিয়ে আবার বলে উঠল—"হ্যাঁ, ওভারসিয়ারবাবুর যে ভাইটি এসেছিলেন রজতবাবু—আপনাদের সঙ্গে এখানে বেড়াতেও এসেছিলেন সে রাত্তিরে—তিনি আবার আসবেন কবে? এলে আমাদের ওখানে নিশ্চয় নিয়ে আসবেন—শুনেছি নাকি বেশ মিশুকে।"

একবার আড়চোখে বিশাখার পানে চাইল। চোখাচোখি হয়ে গেল। প্রশান্ত প্রশ্ন করল—"কার কাছে শুনলেন আপনি?"

"আপনি থামুন তো, অমন ইয়ের মতন প্রশ্ন করবেন না। জানবার জন্যে শুনতেই হবে কারুর কাছে এমন কথা যেন ধ'রে লেখা আছে কোথাও!" —একটু ধমক দিয়েই বলল স্বাতি।

প্রশান্ত উত্তর করল—"না, আপনি বললেন কিনা খুব মিশুকে, তাই বলছি। আমি তো একরকম টেরই পেলাম না কবে এল সে, কবে চলে গেল—এক সেই রাত্তিরে একটু যা দেখেছিলাম।"

"আপনি হলেন এ-বনের সিংহ, মিশতে নিশ্চয় সাহস পায়নি, তাব'লে হরিণের সঙ্গেও যে মেশেনি, একথা বললেন কি ক'রে?"

এবার বেশ একটু ঘাড় ফিরিয়েই চাইতে হোল বিশাখার দিকে, সে আরও পেছন দিকে স'রে গেছে।

আসল কথা, শোধ তুলে নিচ্ছে স্বাতি। ...তাহ'লে আরও আগের দিকে চলে যেতে হয়—আজ বিশাখা যে হঠাৎ মুখরই হয়ে উঠেছে এমন নয়, ওর মধ্যেকার কৌতুকপ্রিয় নারীটি হঠাৎ চারিদিক দিয়েই সজাগ হ'য়ে উঠেছে। গোড়া থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছে ও।

স্বাতির কাপড় আর ব্লাউজটা ছাড়ালো ওই। ইচ্ছেটা ছিল স্বাতির, কিন্তু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিল না, বিশাখাই একটু পাশে টেনে নিয়ে

গিয়ে বলল—"কাপড়-জামাটা পাল্টে নাও স্বাতিদি।"

"কেন, বেশ তো আছে। মিছিমিছি দেরি হয়ে যাবে।"

"কাপড়-জামাটা পাল্টে নাও স্বাতিদি।"

"তা হোক। বেটাছেলেরা বড় পিটপিটে, তাদেরই হো। বিশেষ করে প্রশান্তদা।"

"দুষ্টুমি হচ্ছে? তবে রইলাম!" —একটু চোখ পাকিয়েই বলল স্বাতি।

বদলেই নিল অবশ্য। বিশাখা ছাড়ল না। মোটামুটি একটা ভালো শাড়ি আর ব্লাউজ পরেই ছিল আজ, বিশাখা খুঁতি তুলল, ওগুলোর ওপর দিয়ে খাটাখাটুনি গেছে সমস্ত দিনের।...আজ স্বাতির এঞ্জেল হয়েই তো দেখা দিয়েছে। ও যা চাইছে অথচ করতে পারছে না, ও তা করবার সুযোগ রচনা করিয়ে দিচ্ছে, যতটা পারছে, না করিয়ে ছাড়ছে না।

খাওয়ার সময় রেকাবির বেলফুলগুলো তুলে নিয়ে আঁচলে আলগা ভাবে বেঁধে নিয়েছিল। জীপের পেছনের সীটে বসেছিল ওরা, রজত আর প্রশান্ত সামনে, ফিসফিস করে বলল— "ফুলগুলো খোঁপায় গুঁজে দিই স্বাতীদিদি।"

"কেন? শুনি। এবার মরবি তুই মার খেয়ে।"

"কেন আবার। দিব্যি বেলফুল!"

"তুইও গুঁজবি তো নিজের খোঁপায়?"

"আমার তো দাদা রয়েছেন। দাদার বন্ধু, তিনিও দাদাই!"

"এবার তুই সত্যিই মার খাবি বিশাখা। বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস আজ!"

ওটা সদাসদা হোল না। তবে তর্কে তর্কেই রইল বিশাখা। এবং যখন সফল হোল তখন ভালোভাবেই হোল, কেন না এবার প্রশান্তকেও নিল টেনে।

গাড়ি থেকে নেমে আসতে আসতে বার দুই যেন স্বাতির মনে হোল প্রশান্তর দৃষ্টিটা ওর মাথার ওপর গিয়ে গিয়ে পড়ছে। সন্দেহটা ছিলই, একবার খোঁপায় হাত দিতে টের পেল কখন, হয়তো নামবার সময় গোলমালে গোটা তিনেক ফুল আটকে দিয়েছে বিশাখা। আলগাভাবে আটকানো, হাতে উঠেই এল। বিশাখার দিকে একবার চোখ পাকিয়ে দেখে নিয়ে মাটিতে ফেলেই দিল স্বাতি। হয়ত না দিয়ে, উপায়ও ছিল না, যেমনভাবে প্রশান্তর নজরটা আবার পড়ে গেল।

বিশাখা ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে দল ছেড়ে পেছিয়ে পড়ছিল। "বাঃ! মাটিতে ফেলে দিলে স্বাতিদি?" বলে কুড়িয়ে নিল ফুল তিনটে। তারপর নূতন পরিস্থিতিতে নূতনতর মতলব আঁটতে লাগল।

একটু এগিয়ে গিয়ে ওরা তীরঘেঁসে এক টুকরো ঘাস-জমির ওপর বসল—স্বাতি, তারপরে ও, তারপরে প্রশান্ত, সবশেষে রজত। দূরে সেই সাদা ... মাঠটা জোৎস্নায় একটা ধপধপে ... মতো পড়ে রয়েছে। এটা নিয়েই কথা উঠতে, বিশাখা সুযোগ খুঁজছিলই একটা কোনও, বলে উঠল— "তা বলে, বেল ফুলের মতন নয়—আমি বাপু, তোমার ফুলো চুরি করে নিয়ে এসেছি স্বাতিদি—রাগ করো আর যা করো। এই আঁচলে রয়েছে আমার!"

স্বাতি বলল—"দোষ স্বীকার করছিস ক্ষমা করলাম!" প্রশান্ত শুধু একটু হাসল মাত্র। বড় মৌন আজ। রজত বলল—"তাই বুঝি একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি তখন থেকে!"

"হাঁ, তোমরাও একমুঠো করে রাখো না রুমাল বেঁধে দাদা। এই নাও!"

আঁচলের আলগা গেরো খুলে দিল ওকে। তারপর আর একমুঠো নিয়ে নিতান্তই যেন অন্যমনস্কভাবে বাঁ-হাতের স্বাতির খোঁপার সেই তিনটে ফুল মিশিয়ে দিয়ে বলল—"আপনিও নিন, প্রশান্তদা। তিনটেতে একটু ধুলো...না, লাগতে পায়নি। ঘাসের ওপর পড়েছিল।"

যেন যা করল তার অর্থ কিছুই বোঝে না এইভাবে স্বাতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে নিতান্তই শিশুসুলভ নিরীহ দৃষ্টি মিলিয়ে বলল—"তা বলে তোমায় দিচ্ছি না, তিনটে ফুল তো ফেলেই দিলে মাটিতে।"

গোড়া থেকেই এই করে এসেছে যখন যেমন সুবিধা পেয়েছে। সুবিধা

পেয়ে স্বাতি যখন পাল্টা জবাব আরম্ভ করল, খানিকটা চুপ করে গেল, কিন্তু শেষবারের জন্যে একেবারে মোক্ষম অস্ত্রটা ওই রইল হাতে করে।

মুখের তাগাদা বার কয়েক দিতে হোল স্বাতিকে; সমস্ত দিন খাটুনি গেছে—অনেকখানি যেতেও হবে ওকে—বাবা রয়েছেন; কাটান দিয়ে দিয়ে আটকে রাখল বিশাখাই। ঘুরে বেড়িয়ে সাদা ফুলের মাঠ আর নদীর মধ্যেকার চড়ায় বসে, গল্প করে ওরা যখন বাড়িমুখো হোল তখন একটা-সাতান্নর গাড়িটা পুলের ওপর উঠেছে।

মতলব ভেতরে ভেতরে এইটেই চলেছে বিশাখা, আজ ওকে ভূতে পেয়েছে। ও যেন শুধু এই সংকল্প-টুকুই ধরে আছে যে আজকের রাত্রের পূর্ণ সুযোগটুকু নেবেই; তাতে কোথায় সীমা লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে সেদিকে যেন হুঁস নেই। ওর স্বপক্ষে ওর এত-দিনের স্বল্পবাক নির্লিপ্তভাব, আর আজকের শিশুসুলভ নিরীহ দুটি চোখ।......রজতের এদিকে তেমন মন নেই; প্রশান্ত দেখেশুনে একটু ধোঁকায়ই পড়ে গেছে, বিশাখার পক্ষে জ্ঞানতঃ কিছু করা সম্ভব কিনা বুঝে উঠতে পারছে না।

বুঝেছে স্বাতি। মেয়েদের রহস্য মেয়েদের বুঝতে খুব দেরি হয় না। বুঝেছে বলে ওভারসিয়ারের ভাইকে টেনে পাল্টা উত্তর দিয়ে গেল। মিথ্যা হলে অবশ্য এমন করতে যেত না। ও বুঝেছিল বিশাখার মনের এই উন্মেষ হঠাৎ নয়। নারীর মন নিয়েই বুঝেছিল এর সূত্রপাত—ওদের সেদিনকার নদী-তীরের ভ্রমণ। সেদিন ওর মনে যা উঠেছিল, আজ নদীতীরের স্মৃতিতে তারপর নৈশ-অভিযানের পুনরাবৃত্তিতে স্বাতি-প্রশান্তর মধ্যে দিয়ে যেন ফলিয়ে নিচ্ছে।

মিষ্টিই লাগছিল অবশ্য স্বাতির, আর শোধ তোলা—সেও তো মিষ্টি করেই।

ওর পাল্টা জবাব পাওয়ার পর থেকে বিশাখা খানিকটা গুটিয়েই গেল, ওর সেই নিভৃত বিলাসের মধ্যে। হঠাৎ কথা বন্ধ, নিতান্ত নিরুপায়ে সেই একটু হাসি। ......আবার সেই বহু-পরিচিত বিশাখা।

জীপে এসে উঠল ওরা।

ওদের বাড়ির রাস্তা দিয়ে যাবে জীপ। কাছাকাছি এসে মোনের ওপর বেশ একটু অবসাদের ভাব টেনে এনে বলল—"আমার মাথাটা ধরেছে দাদা—গাটাও কেমন করছে যেন।"

"তাই বুঝি হঠাৎ এমন লক্ষ্মীটি হয়ে পড়েছে?—"প্রশান্তই আগে প্রশ্নটা করে নিল। রজত বলল—"তা চল্, নামিয়ে দিই তোকে। দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়্‌গে যা।"

"তুমিও নামো। প্রশান্তদা রেখে আসছেন স্বাতিদিকে। একটু যেন বেশি মনে হচ্ছে আমার।"

স্তম্ভিত হয়ে গেছে স্বাতি ওর দুষ্টুমির বহর দেখে, সামলাবার বুদ্ধি জোগাচ্ছে না হঠাৎ। প্রশান্ত ওর ক্লান্ত শিশুসুলভ দৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে। একটা যে সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছে বোকা, অনভিজ্ঞ বোন এটা সহজভাবেই বুঝে রজত নিজের ব্যবসাগত অভিজ্ঞতায় সহজ সমাধান করেই বললে—"নামিয়ে দিয়েই তো চলে আসছি—মিনিট দশেক তুই ঐ করগে।"

বিশাখা বলল—"তবে না হয় আমিও ঘুরে আসব? হাওয়া লেগে যদি ঠিক হয়ে যায় মাথাটা।"

"অন্তত এই দশ মিনিটে মরবিনি, এটুকু বলতে পারি আমি"—স্বাতি যেন এ ঝালটুকু না ঝেড়ে পারলই না।—সাহসও পাচ্ছে না আর এ মেয়েকে সঙ্গে রাখতে।

(ক্রমশঃ)

শব্দকল্পদ্রুম

।। কথার মানের উত্তর ।।

১। (গ) সংলগ্ন। ব্যবধানহীন।

২। (গ) বিকশিত। প্রস্ফুটিত।
বিকচ কমলে যেন কুতূহল
ভ্রমর পাঁতির দেখা।

৩। (খ) সহপাঠী। এক গুরুর শিষ্য।

৪। (গ) ঘর বাড়ি সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করে যে। Architect।

৫। (ঘ) গর্জিত। ধ্বনিত।

৬। (খ) সোঁদাল। Cassia fistula।

৭। (ক) এক সময়ে।

৮। (ক) মোক্ষাভিলাষী। মুক্তি-কামী।

৯। (খ) মুষ্টিপরিমিত। অল্প-মাত্র।

১০। (খ) উদ্‌বিড়াল।

১১। (ক) ছল। pretext।

১২। (গ) জলদস্যু। ইং bombardier. নিম্নতম গোলন্দাজ সৈন্য। বাংলা দেশে পোর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের উপদ্রবের সময় থেকে বাংলা ভাষায় এই শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে।

১৩। (ক) জয় করবার ইচ্ছা। সংস্কৃত জি ধাতুর অর্থ জয় করা। এই জি ধাতু থেকে উৎপন্ন।

১৪। (ঘ) ক্ষান্ত। বিরত।

১৫। (ক) দাঁত বসানো। আলংকারিক অর্থ, কঠিন বিষয়ে প্রবেশলাভ। দৃষ্টান্ত—বিষয়টি এমনি দুরূহ যে সহজে দন্তস্ফুট করা যায় না।

॥ বীণা ভট্টাচার্য ॥

ফুলকপির রোস্ট

(জার্মান প্রকরণ)

একটি বড় সাইজের ফুলকপি। বড় ডিম ৪টি, বড়দানার মটরশুঁটি আধ সের, মাখন এক পোয়া, পার্সলি পাতা এক আঁটি, আন্দাজ মত লবণ ও মাস্টার্ড গোলা ও পেঁয়াজ কুচি।

ডাঁটা পাতা ছাড়িয়ে আস্ত ফুলকপিটি খুব নরম আঁচে ভাপে সিদ্ধ ক'রে রাখুন। এবার বড় ফ্রাইং প্যান বা ডেকচিতে মাখন গরম করে আধপো কুচোনো পেঁয়াজ ফেলে দিন ও তাতে ভাপানো আস্ত কপিটি দিয়ে লাল করে এপিট ওপিট ভাজুন। ফ্রাইং প্যান নামিয়ে রাখুন। এবার ডিম ৪টি ভালো করে ফেটিয়ে তাতে দুই বড় চামচ দুধ ও সামান্য ময়দা ও গোল মরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে একটি ছোট পাত্রে গরম করুন। সর্বদা নাড়বেন, না হ'লে তলায় ধরে যাবে ও গোলাটি ছাড়া ছাড়া হবে। গরম হলে জমাট বাঁধার আগেই পাত্র নামিয়ে ফেলুন ও সামান্য একটু মাখন মিশিয়ে ফেটিয়ে রাখুন।

এবার ফুলকপির পাত্রটি উনুনে চড়ান ও ছাড়ানো সিদ্ধ মটরশুঁটি দানাগুলি ও পার্শলি পাতা কুচোনো কপির সঙ্গে দিন। উনুনে বসানো কপির ওপর এবার ডিমের আধ-জমানো গোলাটি সমান ক'রে কপি ও শুঁটিদানাগুলির ওপর ঢেলে দিন। উনুন থেকে পাত্র নামিয়ে তন্দুর বা "আভনে" বাদামী রংয়ে "বেক্" করে গরম পরিবেশনের আগে মাস্টার্ড গোলা ঢেলে দিন। এই রান্নাটি সর্বদাই নরম আঁচে করতে হবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন।

(চেকোশ্লোভাকিয় প্রকরণ)

একটি মাঝারী সাইজের ফুলকপি। সুপক্ক টোমাটো এক পোয়া, আন্দাজ মত পেঁয়াজ রসুন বাটা, মাখন বা ভেজিটেবল তেল এক পোয়া, আন্দাজ মত নুন, চিনি ও গোলমরিচ গুঁড়ো।

কপিটির ডাঁটা পাতা ছাড়িয়ে নিন। ফুলটির ডাঁটার অংশে ভিতরের দিকে যে শক্ত শাঁস থাকে সেটা ছোট ছুরি দিয়ে কুরে বার করে নিন। ফুলটি আস্ত থাকবে।

এবার প্যানে মাখন বা ভেজিটেবল তেলটুকু তাতিয়ে নিয়ে আস্ত কপিটি বাদামী রংয়ে এপিট ওপিট ভাজুন ও অন্য পাত্রে সাবধানে তুলে রাখুন, ফুলটি যেন না ভাঙে। বাকী গরম তেলে বা মাখনে, পেঁয়াজ রসুন বাটা, নুন ও চিনি ছেড়ে দিন। ছোট ছোট টুকরো ক'রে কাটা টোমাটোগুলি হাতে চটকে ঐ তেলে ফেলে লাল করে কসুন। থকথকে কাথ মত হলে তাতে আস্ত ভাজা কপিটি ছেড়ে মুখ ঢাকা দিয়ে দমে বসিয়ে রাখুন। কপি সুসিদ্ধ হলে নামিয়ে গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে গরম পরিবেশন করুন।

(ইন্দোনেশীয় প্রকরণ)

একটি বড় ফুলকপি। মাংসের কিমা এক পোয়া, বড় পেঁয়াজ ২টি, বড় টোমাটো ২টি, তিন কোয়া রসুন, সামান্য লঙ্কাগুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, মাখন বা বাদাম তেল এক পোয়া।

কপির ডাঁটা পাতা ছাড়িয়ে আস্ত কপিটি নরম আঁচে ভাপে সিদ্ধ করুন। কোনক্রমেই ফুলটি যেন গাঁঠ থেকে খুলে না যায়।

বড় প্যানে এবার মাখন বা তেল ফুটিয়ে ঐ ভাপানো কপিটি এপিট-ওপিঠ ভেজে অন্য পাত্রে তুলে রাখুন। এবার পেঁয়াজ কুচি ও রসুন কুচি ঐ তেলে লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। এবার মাংসের কিমায় লঙ্কা গুঁড়ো ও সয়াবীনের সস (এক বড় চামচ) মিশিয়ে ঐ তেলে ফেলে ভাল করে কসুন (চপের পুরের মত) ও অন্য পাত্রে তুলে নিয়ে ভাজা পেঁয়াজ কুচির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। এবার ঐ প্যানে টোমাটোগুলি টুকরো করে ছেড়ে দিন ও সামান্য চিনি ও এক ছোট চামচ সয়াবীন সস দিন, টোমাটোগুলির ওপর এবার ভাপানো কপিটি বসিয়ে দিন ও ভাজা কিমাগুলি সমান করে কপিটির গায়ে ও চারপাশে ছড়িয়ে দিন। ভাজা গন্ধ বার হলে নামিয়ে মরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে ভাত ও রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

এতে নুন মেশাবার প্রয়োজন নেই। কারণ সয়াবীন সসই নুন ও মশলার কাজ করবে।

(ভারতীয় প্রকরণ)

একটি মাঝারী সাইজের ফুলকপি। মাখন বা তেল এক পোয়া, টক দই এক পোয়া, কিসমিস এক ছটাক, আন্দাজ মত নুন, চিনি, গোটা গরম মশলা, তেজপাতা, আদা, পেঁয়াজ বাটা আধ পোয়া, সামান্য হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো।

কপির ডাঁটা পাতা বাদ দিয়ে গাঁটের শক্ত অংশের ভিতরকার শাঁসটি ছোট ছুরি দিয়ে কুরে বার করে নিন। ফুলটি গোটা থাকবে।

এবার ডেকচিতে মাখন বা তেল তাতিয়ে নিয়ে কপিটি লাল ক'রে এপিট-ওপিট ভাজুন ও অন্য পাত্রে তুলে রাখুন। এবার বাকী তেলে গোটা গরম মশলা তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে, ধোয়া বাছা কিসমিসগুলি ও দইটুকু ছেড়ে দিন, দই ফুটে উঠলে হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, চিনি ও সামান্য ময়দা দিয়ে সবগুলি লাল করে কসুন। ভাজার গন্ধ বার হলে আন্দাজ মত গরম জল ঢেলে দিন। এবার ঐ কাথে কপিটি ছেড়ে দিয়ে মুখ ঢাকা দিয়ে দমে বসিয়ে রাখুন। কপিটি সিদ্ধ হলে, ঝোলটি গা-মাখা হলে নামিয়ে নিন। গরম পরিবেশন করুন। ভাত রুটি পাউরুটি ইত্যাদির সঙ্গে অভিরুচি অনুযায়ী খাওয়া চলবে।

দেশে বিদেশে

॥ সংহতি ॥

বহু-প্রতীক্ষিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের মূল কথা একটি শব্দে প্রকাশ করা যায়। সে শব্দটি হচ্ছে হিন্দী। জাতীয় সংহতির জন্য চাই হিন্দী, ভাষা-সংহতির জন্য চাই হিন্দী লিপি-সংহতির জন্য চাই দেবনাগরী এবং শিক্ষা-সংহতির জন্য চাই হিন্দী। কবিরাজী মকরধ্বজের মত এই হিন্দী অনুপানভেদে সর্বত্র প্রযোজ্য। এর কথার সারাংশ দাঁড়ায় এই যে, ঐ দেবনাগরীসহ হিন্দী ভাষাটি সর্বত্র গৃহীত হয়নি বলেই যতরকমের ভাষা-বিরোধ দেখা দিচ্ছে এবং ভারতের সংহতি নষ্ট করছে। নেতৃবৃন্দের মাথায় এই হিন্দী জিনিসটা এমন জেঁকে বসেছে যে ছোটখাট নাড়াচাড়ায় তা স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা নেই। বোঝা যাচ্ছে, এত বড় আসাম ঘটনাও তাঁদের বিচলিত করেনি; যাঁরা বাংলা-অসমীয়া বিবাদের অজুহাতে তখনও হিন্দী দাওয়াই বাৎলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনেও তাই বাৎলালেন। কেবল মহকুমান্তর ডিঙিয়ে জেলান্তরে এসে বললেন, এখানকার শতকরা ৬০ ভাগ যদি রাজ্যভাষাভাষী না হয় অপর কোন ভাষাভাষী হয় তবে ঐ জেলার সীমানা মধ্যে রাজ্যভাষার পাশাপাশি এ ভাষাও সরকারী ভাষা বলে গণ্য হবে। এর বাইরে যারা সংখ্যালঘু তাদের জ্ঞাতার্থে তাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রচারিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীদের ভরসা এই কালক্রমে দেবনাগরী অক্ষরে সারা ভারত যখন হিন্দী ভাষায় একাকার হয়ে যাবে তখন আর জেলা-রাজ্যভাষার ব্যবধানটুকুও থাকবে না। তবে হিন্দী ভাষা নাকি এখনও তেমন উন্নত নয়, এই কারণে বিজ্ঞান-কারিগরী প্রভৃতি আমাদের অজ্ঞাত বিষয়গুলি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য, আর পররাষ্ট্রের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের জন্যও বটে, ইংরেজীটা থাকবে কিছুকাল। মোটকথা, এক অখন্ড ভারতের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের শ্লোগান হবে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দী।

অথচ আমরা মনে করছি, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এই শ্লোগানের ওপর মাত্রাধিক জোর দেওয়ার জন্যই যত গোলমাল বাড়ছে; যেটুকু-বা সংহতি ছিল তাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। যে হিন্দী সমগ্র ভারতের ভাষা নয়, দক্ষিণের নয়, উত্তরেরও নয়, যে হিন্দী ভাষা হিসাবে ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠও নয়, যেভাবে পরিকল্পনা করে আয়োজন করে দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী হবে সে ভাষার ওপর বড্ড বেশী যে জোর দেওয়া হয়েছিল, হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তা নেতৃবৃন্দই মাঝে মাঝে ভৎসনার সুরে প্রকাশ করেছেন। এতে ফল এই হয়েছে যে, সর্বত্রই কোন বিশেষ ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটা সংশয় জেগেছে। এই কারণেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য বানচাল হতে চলেছে। যখনই কোথাও রাজ্যভাষা স্থির হয়েছে বা হতে যাচ্ছে তখনই প্রস্তাবিত রাজ্যভাষা যাদের ভাষা নয় তারা স্বভাবতই এই আশঙ্কা করেছে যে, তাদের মাতৃভাষা অবলুপ্ত হতে চলল। আমরা এ কথাটা বুঝি না, ইংরেজী ভাষা যখন এই জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের খাতিরেই থাকছে তখন ঐ পরিপুষ্ট ভাষাটিই থাক না ততকাল যতকাল দেশী ভাষাগুলো ফল-ফুলে পরিপুষ্ট না হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক বিকাশে যদি কোন ভাষা ভারতে আপনা আপনি প্রাধান্য পায় পাক না, তা যদি না পায়—সকল ভাষার অতিরিক্ত থাক না ইংরেজী ভাষা—যে ভাষার সাহায্যে আমরা জাতীয়তা, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিখেছি, যে ভাষার সাহায্যে শিক্ষিত মহলে আমরা স্বদেশীভাব ছড়িয়েছি এবং যে ভাষায় শিক্ষিত হয়ে ভারতের নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব মাতৃভাষায় মাতৃভাষাভাষীদের ভারতীয় ভাবধারা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সহজ জিনিসটা কেমন যেন জটিল করা হয়েছে শুধু এই অন্ধ আবেগে যে, ইংরেজী আমাদের শাসকের ভাষা। তাতে কি?

॥ বিশ্বজন ॥

সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার একটি হিসেব বেরিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ৩০০ কোটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রত্যেক বছর পাঁচ কোটি করে জনসংখ্যা বাড়ছে। ভারতবর্ষে প্রতি বছর শতকরা দুইজন করে বাড়ে; পাকিস্তানে ২·১৭ জন করে বাড়ে।

দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে ভাল কথা, পৃথিবীতে লোকসংখ্যার চাপ কমাবার জন্যও দেখছি চাঁদ হোক, মঙ্গল হোক, শুক্র হোক কোনো একটা নতুন বাসভূমি আবিষ্কার করতেই হবে। আগে পৃথিবীতে এই কাজটি হয়েছিল। এক ভৌগোলিক অবস্থান থেকে আর এক অবস্থানে মানুষ উপনিবেশ গড়েছে। এজন্য কত প্রচেষ্টা, কত মরণপণ। তার পর সেই উপনিবেশ হল বাদ-বিবাদের কারণ। এশিয়া-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে কত বিচিত্র রাষ্ট্র পতাকার দ্বন্দ্ব। তারপর দেখা গেল, জনসংখ্যার চাপ যত নয় (হিটলারও রাষ্ট্রকর্তারা জনসংখ্যার চাপটা সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বনের কারণ বলে ঘোষণা করতেন), তার চাইতেও বেশী চাপ বাণিজ্যের। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। এই বাণিজ্য অর্থ যার যার তাঁবে —এবং একান্তভাবে—এক একটি বাজার। কে কত জায়গায় তার বাজার বসাতে পারবে এবং সেখানে স্বদেশের পণ্য বেচতে ও বাজার থেকে প্রয়োজনীয় মূল দ্রব্য ও উপাদান কিনতে পারে। এর নামই হল জাতীয়তাবাদের জঙ্গী নাম—সাম্রাজ্যবাদ। ম্যালথাস প্রভৃতি অর্থনীতিবিদরাও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপর্যয় এবং (প্রাকৃতিক না হলেও) যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার কথা প্রচার করলেন। প্রিন্স ক্রপটকিন তাঁর 'কংকোয়েণ্ট অব ব্রেডে' জলের মতো সহজ করে বোঝালেন যে, ওসব তত্ত্ব একান্তই ভুয়ো—রুটি রোজগারীর পথ এখনও অনন্ত, অবাধ ও সীমাহীন। কিন্তু নিত্য দুর্ভিক্ষ ও অভাবের মধ্যে থেকে পৃথিবীর মানুষের কাছে ক্রপটকিনতত্ত্ব বিস্মৃতপ্রায়—পশ্চিমবঙ্গ রাজমহল থেকে মার্কিণ রাজমহল পর্যন্ত সর্বত্র জনসংখ্যায় বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত। সুতরাং, হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ-মঙ্গল-শুক্র চাই, নয়তো ম্যালথাসের বিপর্যয়।

॥ বৃহত্তম ॥

কোন সহর পৃথিবীর বৃহত্তম? আজকের উত্তর, টোকিও। টোকিও জাপানে, জাপান এশিয়া ভূখন্ডে। এশিয়ার মধ্যে জাপানই সর্বতোভাবে সর্বাধিক অগ্রসর। এই টোকিও সহরের জনসংখ্যা ৮১ লক্ষ ৬১ হাজার। কলকাতার জনসংখ্যার আড়াই গুণেরও অনেক বেশী। নিউইয়র্কের স্থান দ্বিতীয়। এর জনসংখ্যা ৭৭ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৮৪। বৃহত্তর পরিধিতে টোকিওর জনসংখ্যা এক কোটি ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৯, অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার এক তৃতীয়াংশ। বৃহত্তর লন্ডনের জনসংখ্যা টোকিও সহরের (বৃহত্তর নয়) কিছু বেশী অর্থাৎ ৮২, ২২, ৩৪০। অর্থাৎ লন্ডন 'বৃহত্তর' পরিধিতে (আপন মহিমায় নয়) টোকিও সহরের কিছু বেশী জনসংখ্যার দাবীদার। বৃহত্তরের পরিধিতে অবশ্য লন্ডন তৃতীয়, নতুবা দশম।

প্রথম হল টোকিও, তারপর ক্রমান্বয়ে নিউইয়র্ক, সাংহাই, মস্কো, বোম্বাই, পিকিং, বুয়োনেস এয়ারস, সাউপাওলো (ব্রেজিল), চিকাগো, লন্ডন, তিনসিম, রিওডি জেনেরিও, কলকাতা। লক্ষ্য করবার বিষয় কলকাতা লন্ডনের নীচে তো ছিল, এখন বোম্বাইয়েরও নীচে। বোম্বাই যেন লাফিয়ে লাফিয়ে কলকাতাকে জন-

সংখ্যায় পেছনে ফেলে গেছে। বৃহত্তর পরিধিতে ফেললে অবশ্য টোকিও প্রথম, তারপর ক্রমান্বয়ে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, লস এঞ্জেলস, চিকাগো, কলকাতা, প্যারিস, ফিলাডেলফিয়া, ডেট্রয়ট ও কায়রো। এখানে বোম্বাইয়ের স্থান নেই বা কলকাতার নীচে। সহর হিসাবে কলকাতা ত্রয়োদশ (বোম্বাই পঞ্চম) এবং বৃহত্তর পরিধিতে কলকাতা ষষ্ঠ।

কিন্তু আমরা ভাবছি অন্য কথা। ভাবছি ঐ সব বড় বড় সহরে পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধি-রক্ষা, আবর্জনা অপসারণ, ময়লা জল নিষ্কাষণ, আলো, বাতাস, যানবাহন ইত্যাদি কি কলকাতার মতোই বিপর্যস্ত ও দুঃসহ? পর্যটকরা কিন্তু অন্যান্য সহরের পরিচ্ছন্নতার কথাই বলেন। জনসংখ্যায় বড় না হয়ে আমরা যদি পরিচ্ছন্নতায় বড় হতাম! সে বোধ হয় স্বপ্ন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফরান্তে সর্বপ্রথম কলকাতার কথাই বলেছেন। অনেকেই সাহায্যের ভরসা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন মাষ্টার প্ল্যানের জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু ডাঃ রায় বিশ্ব-স্বাস্থ্যের নাম নিয়ে বলেছেন, জোড়াতালিতে হবে না; ৩৩টি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ৫০ কোটি টাকার পরিকল্পনা আছে। তাতে কলকাতাও বাঁচবে।

॥ পথ-কণ্টক ॥

বার্লিনের পথে কাঁটা পড়েছে। পূর্ব জর্মানীর সীমান্ত বন্ধ করার প্রতিক্রিয়া যথাযথ প্রকাশ পেতে না পেতেই ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ গেটটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী যাতায়াতের এই ছিল প্রধান পথ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করার পর দেড় হাজারের মতো জর্মাণ পূর্ব বার্লিন থেকে পালিয়ে পশ্চিম বার্লিনে এসেছে। কেউ নদী বা খাল সাঁতরে পার হয়েছে, কেউ মাঠ-বাগান পেরিয়ে এসেছে। পূর্ব জার্মাণ কর্তৃপক্ষ নাকি অভিযোগ করেছেন যে, পশ্চিম জার্মাণ কর্তৃপক্ষের প্ররোচনামূলক কাজের জন্যই এটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হল। পশ্চিম বার্লিনের মেয়র পূর্ব জার্মাণ পুলিশের কাছে এই আবেদন জানিয়েছেন যে, তাঁরা যেন স্বজাতি জার্মাণদের ওপর গুলী না চালান। প্রতিবাদ মিছিলকে সম্বোধন করে তিনি বলেন আমরা স্থির করেছি, আমরা শান্ত থাকব। পূর্ব-পশ্চিম জার্মাণীর টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পশ্চিম জার্মাণ কর্তৃপক্ষ সবাইকে শান্ত থাকতে আবেদন জানিয়েছেন। সোভিয়েট সৈন্যদের নাকি বার্লিনের উত্তর ও পশ্চিমে টহল দিতে দেখা গেছে। পশ্চিম মিত্রশক্তি সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাবেন আশা করা যাচ্ছে। পশ্চিম জার্মাণীর যানবাহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক। পূর্ব জার্মাণীর শ্রমিকেরা পশ্চিম বার্লিনে কাজে যেতে পারছে না; তাদের সংখ্যা ৫৩,০০০; এরা যদি আদৌ আসতে না পারে তবে পশ্চিম জার্মাণীর যে কারখানায় এরা কাজ করে তাদের একটু অসুবিধে হবে। এ ছাড়া, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাচ্ছে যে, পূর্ব বার্লিনের এমন লোক কমই আছে যাদের সঙ্গে পশ্চিম বার্লিনে কোন সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক যোগসূত্র নেই। পশ্চিম জার্মান কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ পূর্ব জার্মানীর এই আচরণকে ভূমি দখলের সামিল বলছেন; অথচ এই ভূখণ্ড চতুঃশক্তির প্রশাসন ব্যবস্থাধীন। সুতরাং কেবল প্রতিবাদ নয়, যাতে এ-ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয় সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ? — অর্থাৎ কি, তা খুব শিগ্‌গিরই জানা যাবে। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স জবাব তৈরী করছে; আমেরিকায় ১১৩টি রিজার্ভ দলকে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। পূর্ব জার্মানী ওরফে সোভিয়েট রুশিয়ারও চুপচাপ বসে নেই। এক ভরসা মধ্যস্থতা। সে মধ্যস্থতার ভার কি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ওপর পড়বে? এমন কথা শোনা যাচ্ছে।

॥ কঙ্গো ॥

কঙ্গোয় এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন সরকার যে, অনেকেই আশা করছেন, এর আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হবে না। এর নেতৃত্ব করছেন মিঃ সিরিল এডুলা। মন্ত্রিসভায় ২৬ জন মন্ত্রী ও ১৫ জন রাষ্ট্রসচিব আছেন (শুনে আমাদের অনেক রাজ্যমন্ত্রিমণ্ডলী উৎসাহিত বোধ করতে পারেন)। তবু প্রশ্ন উঠেছে, কি ধরণের রাজনীতি হবে এডুলার? সরকারের ওপর তাঁর প্রাধান্য থাকবে এবং তিনি সেনা বাহিনীর ওপর ভরসা করতে পারেন? জেনারেল মোবুতুর সঙ্গে তো তাঁর সদ্ভাব নেই। এডুলার বয়স ৪০, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান, মদ্য পান বা তামাকু সেবন প্রভৃতি নেশা নেই। কিন্তু কেমন যেন একটু হীনমন্য ভাব থেকে উগ্র ব্যবহার তাঁর। তিনি লুমুম্বার পুরানো সহচর, সমাজবাদী। কিন্তু তাঁর ওপর মধ্যপন্থীদের বেশ আস্থা আছে। প্রতিরক্ষা দপ্তর তাঁর হাতে; সেদিক থেকে মোবুতুকে হয়তো সংযত রাখতেও পারবেন। অবশ্য যদি নির্বাসন থেকে তিনি জেনারেল ভিক্টর লুণ্ডুলাকে ফিরিয়ে এনে সেনা-শিক্ষার কাজে বহাল করেন। মন্ত্রিসভায় মধ্যপন্থীদের হাতে আছে পররাষ্ট্র, প্রচার ও অর্থদপ্তর। কিন্তু গিজেঙ্গাপন্থীদের হাতে আছে স্বরাষ্ট্র ও বিচার দপ্তর। এখনও সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের খবরদারি নজর আছে, এ বছরের শেষ পর্যন্ত থাকবে। তারপর কঙ্গো সব রকমে মুক্ত হবে। সেই মুক্তাবস্থায় কি হবে স্থির করে বলা কঠিন। এডুলা সরকার যদি ইতিমধ্যে দানা বাঁধে তাহলে হয়তো আর অরণ্য-নিয়ম নাও প্রাধান্য পেতে পারে। অনেকে বলেন, গিজেঙ্গার মতিগতির ওপর ভবিষ্যৎ কিছু নির্ভর করছে। তারপর আছে কাটাঙ্গা। শোম্বে অবাঞ্ছিত বেলজিয়ানদের ক্রমশ সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সবাই তো তা নয়, কঙ্গোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহও নেই। সুতরাং, এদিক থেকেও কঙ্গো রাজনীতির নিশ্চিত নোঙর পাওয়া যাচ্ছে না।

॥ তাক ॥

দিল্লী থেকে একটি কৌতুকপ্রদ খবর পাওয়া গেছে। সরকারী দলিলপত্র বা রেকর্ড তাক (বা র‍্যাক)-এ রাখার ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের যে রেকর্ড-পত্র তা যে তাকে রক্ষিত হয়েছে তার দৈর্ঘ্য হবে ৪০ মাইল। প্রত্যেক বছর যা রেকর্ড জমা হয় তা রক্ষার জন্য আট মাইলব্যাপী তাকের দরকার। জনপথে এখন যে জাতীয় দলিলাগার আছে তার অর্ধেকটা ক'রে এক এক বছর ভ'রে যাবে। এই দলিলাগারে মাত্র ১৬ মাইল তাক আছে। এরপর যিনি যত অঙ্ক কষবেন তিনি তত মজা পাবেন। যদি ধরা যায় ২০ বছরে কত মাইল হবে তাহলে ১৬০ মাইলের জন্য, অর্থাৎ এইমাত্র যে দলিলাগারের কথা বলা হল তার মতো দশটা ভবন দরকার হবে। এই ক'রে একটি "দলিলের শহর" কালক্রমে গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এ তো একমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের খবর। রাজ্যসরকারদেরও কাগজপত্র, রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ আছে। তাঁরাও এই ম্যারাথন মাইল রেসে খুব কম যাবেন মনে হয় না। কেননা, পৃথিবীর লোকে জানে, আমরা যত কাজ করি তার কয়েকগুণ বেশী কথা বলি বা লিখি। তাও রেকর্ড মানে সব কাগজপত্রই নয়, বিশেষ বিশেষ কাগজপত্র। পশ্চিম বাংলায় রেকর্ড অফিসে যে ২২,১১৩ ফুট তাক (৪ মাইলের কিছু বেশী) আছে তা এখন একেবারে ঠাসা; আর রাখবার জায়গা নেই। বোর্ড অব রেভিনিউ, ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস ও বোটানিকাল গার্ডেনের রেকর্ড এ হিসেবে নেই। যে তিনটি দপ্তরের হিসেব নেই তাদের রেকর্ড জমে আছে ১৭৯৩ সাল থেকে। প্রতি বছর কত মাইল জমেছে জানতে পারলে এ হিসেবটা ক'রেও গণিত-রসিকেরা আনন্দ পেতেন।

এই স্থান-সমস্যার একটা বোধ হয় সমাধান হ'তে পারে। এগুলো যদি অতি ক্ষুদ্রকায় ফটোস্টাটে পরিণত করা যায়, যা দরকার হ'লে এনলার্জ করা যায়, নয়তো ভাল আতস কাচ তো আছেই।

ঘটনাপ্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১১ই আগষ্ট—২৬শে শ্রাবণ ঃ দাদরা ও নগর-হাভেলীর (পর্তুগীজ কবলমুক্ত ছিটমহল) ভারতীয় ইউনিয়নভুক্তির আয়োজন—সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনকল্পে লোকসভায় বিল উপস্থাপিত।

পূর্ব পাকিস্থানে আটক ভারতীয় অফিসার কর্ণেল জি এস ভট্টাচার্যকে অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবী—পাক্ সরকারের নিকট ভারতের পত্র প্রেরণ।

১২ই আগষ্ট—২৭শে শ্রাবণ ঃ ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় লিপিরূপে দেবনাগরী গ্রহণের ব্যবস্থা—দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সভাপতিত্বে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত—সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব।

৪২ দিন বিদেশে সফরের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কলিকাতা প্রত্যাবর্তন—দমদম বিমান বন্দরে সম্বর্ধিত।

১৩ই আগষ্ট—২৮শে শ্রাবণ ঃ মাষ্টার তারা সিং (পাঞ্জাবের আকালী নেতা) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান—অনশনের সংকল্পে দৃঢ়-মনোভাব—বিশেষ দূত মারফত দিল্লীতে লিপি প্রেরণ।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য হিন্দু সম্মেলনে কংগ্রেস কর্মীদের যোগদান নিষিদ্ধ—মাদ্রাজে সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডীর বিবৃতি।

'জাতীয় সংহতির সমস্যা সমাধানে সর্বদলের সহযোগিতা সম্ভবপর'—শ্রী নেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) উপস্থিতিতে কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী নেতৃ-সম্মেলনের (নয়াদিল্লী) অভিমত।

১৪ই আগষ্ট—২৯শে শ্রাবণ; বার্লিন প্রশ্ন সম্পর্কে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) নিকট ক্রুশ্চেভের (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) ব্যক্তিগত পত্র—১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী লিপিতে জার্মাণ সমস্যা বিষয়ে সোভিয়েট নীতি বিশ্লেষণ।

'ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা রাখিয়া নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলুন'—স্বাধীনতার চতুর্দশ বার্ষিকী উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস রাধাকৃষ্ণণের আহ্বান—জাতীয় শৃঙ্খলা ছাড়া জাতীয় সংহতি অসম্ভব বলিয়া মন্তব্য।

দাদরা ও নগরহাভেলীর ভারত-ভুক্তি ব্যবস্থা অনুমোদিত—লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত।

১৫ই আগষ্ট—৩০শে শ্রাবণ ঃ ধর্মমত নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর দুর্ভেদ্য সংহতি দাবী—চতুর্দশ স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে লালকেল্লায় (দিল্লী) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ সমেত) স্বাধীনতা দিবসের বিচিত্র অনুষ্ঠান।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে অমৃতসরে আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং-এর 'আমৃত্যু অনশন' শুরু।

১৬ই আগষ্ট—৩১শে শ্রাবণ ঃ কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জল-সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা—সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের ঘোষণা।

'প্রয়োজন হইলে গোয়ায় (পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত) সৈন্য প্রেরণ করা হইবে'—গোয়ার মুক্তির প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

১৭ই আগষ্ট—৩২শে শ্রাবণ ঃ অনশনরত মাষ্টার তারা সিং-এর নিকট দিল্লী হইতে শ্রীনেহরুর পত্র প্রেরণ—সঙ্গে সঙ্গে অমৃতসরে আকালী হাই-কমাণ্ডের জরুরী বৈঠকের ব্যবস্থা।

'আমেরিকার পক্ষ হইতে ভারতকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিদানের প্রশ্ন উঠে না—ভারত কাহারও রক্ষণাধীন রাষ্ট্র নহে'—চেষ্টার বোলজের (সহকারী মার্কিণ পররাষ্ট্রসচিব) বিবৃতির উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

১১ই আগষ্ট—২৬শে শ্রাবণ ঃ 'ন্যাটো' জোটের দেশগুলির প্রতি ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) সতর্কবাণী—'সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ বাধাইলে চরম আঘাত হানিব'—পূর্ব জার্মাণীর সহিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের সংকল্প পুনরায় ঘোষণা।

আলজিরিয়ায় ফ্রান্সের যুদ্ধ-বিরতি অবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা—কার্যব্যবস্থা অবলম্বনে আলজিরিয়াস্থ ফরাসী সর্বাধিনায়কের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্নে রুশিয়ার পূর্ণ সমর্থন—মস্কোর সভায় ক্রুশ্চেভের পূর্ব ঘোষণার পুনরুক্তি।

১২ই আগষ্ট—২৭শে শ্রাবণ ঃ পাকিস্থান সামরিক আদালতে (ঢাকা) ভারতীয় অফিসার কর্ণেল ভট্টাচার্যের বিচার শুরু—পাবলিক প্রসিকিউটর কর্তৃক গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ পেশ।

১৩ই আগষ্ট—২৮শে শ্রাবণ ঃ পশ্চিম বার্লিনের চতুর্দিকে পূর্ব জার্মাণ পুলিশ ও সৈন্যের বেষ্টনী রচনা—স্মরণার্থী নির্গমনরোধে ব্যবস্থা অবলম্বন—রুশিয়া সহ ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত শক্তিপুঞ্জ কর্তৃক পূর্ব জার্মাণ সরকারের ক্রিয়াপূর্ণ সমর্থনের সংবাদ।

পশ্চিম বার্লিন সীমান্তে অবরোধ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব ডীন রাস্কের তীব্র প্রতিবাদ—আদেনায়ের (পশ্চিম জার্মাণ চ্যান্সেলার) কর্তৃক পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকী।

১৪ই আগষ্ট—২৯শে শ্রাবণ ঃ পূর্ব আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতা জোমো কেনিয়াট্টার মুক্তিলাভ—নয় বৎসরব্যাপী কারাজীবন যাপনের পর বীরোচিত সম্বর্ধনা।

'ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তিন কোটিতে উঠিতেছে'—রাষ্ট্রসংঘের সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণীতে তথ্য প্রকাশ।

১৫ই আগষ্ট—৩০শে শ্রাবণ ঃ বার্লিনে অবলম্বিত ব্যবস্থায় চীনের পূর্ণ সমর্থন—পিকিং-এ চীনা পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী মার্শাল চেন ইর ঘোষণা।

উভয় বার্লিনের সীমান্ত বন্ধের দ্বারা চতুঃশক্তি চুক্তি লঙ্ঘিত হইয়াছে—সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট পশ্চিমীদের অভিযোগপূর্ণ পত্র।

১৬ই আগষ্ট—৩১শে শ্রাবণ ঃ ভারতকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় ৩০ কোটি টাকা ঋণদান—তিনটি জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা।

পূর্ব জার্মাণী ও পশ্চিম জার্মাণীর মধ্যেও সীমান্ত বন্ধ—পূর্ব জার্মাণদের পশ্চিম জার্মাণীতে যাইতে বাধাদান—পূর্ব জার্মাণ সরকারের (সোভিয়েট সমর্থিত) কার্যক্রম।

১৭ই আগষ্ট—৩২শে শ্রাবণ ঃ পূর্ব বার্লিনের সীমান্ত বন্ধের জন্য রুশ সরকারের উপর দোষারোপ—সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের (আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স) আর একদফা প্রতিবাদ-লিপি—পুনরায় চতুঃশক্তি মর্যাদা সংক্রান্ত চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ।

বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত মার্কিণ সৈন্যদের অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি—১ শত ১৩টি রিজার্ভ ইউনিটকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা।

অভয়ংকর

॥ সংস্কৃত ও সংস্কৃতি ॥

বিগত ১৮ই আষাঢ় মহাজাতি সদনে যে নিখিল ভারত সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান শেষ হল তার সমাপ্তি ভাষণে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে, হিন্দি ভাষার চাপে সংস্কৃত ভাষা ক্রমশঃ এদেশ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। তিনি যখন বলেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উচ্চতর স্তরে সংস্কৃতকে 'ঐচ্ছিক' বিষয় করার চেষ্টা অভিসন্ধিমূলক, সংস্কৃতকে 'আবশ্যিক' করতে হবে, তখন সেই সভার উপস্থিত জনমণ্ডলী উল্লাস প্রকাশ করে তাঁকে সমর্থন করেন। এই সূত্রে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন :

"সংস্কৃত ভারত-আত্মার মূল উৎস। সংস্কৃত পাঠ বন্ধ করার ফলে, আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। নেপাল থেকে কেরালা পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড সংস্কৃতের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এই ঐক্য যদি বিনষ্ট হয়, তাহ'লে ভারত কি নিয়ে বাঁচবে?"

বলা বাহুল্য সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে যাঁরা ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের কথাগুলি চিন্তা করবেন, তাঁরা এই উক্তির মধ্যে যে সতর্ক-বাণী আছে তার সত্যতা উপলব্ধি করবেন। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে বক্তৃতা অনেক হয়, অনেকে অনেক ভালো এবং যুক্তিসঙ্গত কথা বলেন, কিন্তু ডেমোক্রেসীর এমনই মজা যে যাঁরা শাসনচক্রের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত তাঁদের আশীর্বাদ লাভ না করলে কিছুই কার্যকরী হয় না।

সাম্প্রতিক ভাষাবিরোধজনিত বাদ-প্রতিবাদে সংস্কৃত ভাষার কাছে সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলি যে কি ভাবে ঋণী তা আমরা ভুলে গেছি। যে সব ভাষা প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত থেকে জন্মগ্রহণ করেছে সেই সব ভাষা ছাড়াও দ্রাবিড় ভাষাও সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করতে বিরত থাকেনি। দক্ষিণ ভারতে আজো সংস্কৃতের সমাদর আছে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা স্বীকার করেন আর কোনো ভাষার ভারতের ভাষাগুলির আদি জননীর গৌরবলাভের অধিকার নেই। অনেকে, সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলেন, সংস্কৃত প্রাত্যহিক কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষা নয়, সেই হিসাবে হয়ত 'মৃত' বলা যায়, কিন্তু হিন্দু এবং বৌদ্ধশাস্ত্র পুরাণ প্রভৃতিতে সংস্কৃত অতিশয় শক্তি-শালী ভাষা হিসাবে আজো সজীব, আজো সংস্কৃত ভারতীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে।

পণ্ডিত নেহরু ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে তেমন শ্রদ্ধাশীল নন, কিন্তু এই সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে তিনি বলেছেন : "সংস্কৃত ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উৎস এবং সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ। এর অতুলনীয় অতীত ঐশ্বর্যকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উপযোগী করে তুলতে হবে।"

মৃত ভাষাসমূহের মত সংস্কৃত কোনো দিন শিলীভূত বা fossilised হয়নি। শুধু যে সংস্কৃত ভারতের বহু ভাষাকে প্রাণরসে উচ্ছল করেছে তা নয়। প্রাচীন পালিভাষা ও বর্তমান হিন্দিভাষা সংস্কৃতের শিকড় থেকেই রস আহরণ করেছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিত এবং পণ্ডিতগণ মিশনারীর মত আগ্রহ নিয়ে এই সংস্কৃত ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং শুধু তাই নয় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।

সংস্কৃত কঠিন এবং জটিল ভাষা এই ধারণা অতি ভ্রান্ত, বরং সংস্কৃতের ভিত্তি সম্পর্কে সামান্য অধ্যয়ন করলেই যাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত তাঁদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে না। সংস্কৃতকে রাষ্ট্র-ভাষা করার কথা উঠেছে, এই দাবী অযৌক্তিক, অবাস্তব এবং অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া হবে সন্দেহ নেই, তবে স্থিরমস্তিষ্কে ভেবে দেখলে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য হবার জন্য সংস্কৃত ভাষার দাবী সর্বাধিক।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেছেন :

"প্রগতির নামে আমাদের যৌথ অস্তিত্ব ও গোষ্ঠীগত কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত বস্তুকে আমরা ধ্বংস করছি। ভারতীয় ঐক্যের দুটি মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে সংস্কৃত ও ইংরেজি। সংস্কৃত ভাষা সমগ্র ভারতকে দিয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য, আর ইংরেজি ভাষা ঐ সাংস্কৃতিক ঐক্যের পটভূমিতে রাজনৈতিক ঐক্যচেতনা আমাদের দিয়েছে। আজ ভারতের সর্বত্র প্রগতির নামে ও বহু পাশ্চাত্য দেশের অনুসরণে, ভারতের জীবনে বহুশক্তি-মান সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা বা সাম্প্রদায়িক ভাষা বলে নিন্দা করা হচ্ছে।

......সংস্কৃত ভাষার জগৎ ও পরি-বেশ থেকে যে-ভারতীয় বিচ্যুত, সে-ব্যক্তি ভারতীয়রূপে জীবনের যে-সব গুরুত্ব-পূর্ণ শিক্ষা পাওয়া দরকার, তা থেকে ভ্রষ্ট হয়।"

উইলিয়াম কেরীর দ্বি-শতবার্ষিকী উৎসব বাঙালী পালন করছে। পিতৃ-ঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতির মত এও এক প্রকার ঋণশোধ। কেরী সাহেব বাংলা গদ্যকে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করেছিলেন আজ তা সার্থক হয়েছে। তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বলেছিলেন :

"The Bengali may be considered as more nearly allied to the Sanskrita than any of the other languages of India. Words may be compounded with such facility and to as great an extent in Bengali as to convey ideas with the utmost precision—a circumstances which adds much to copiousness."

কেরী সাহেবের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ছিলেন মেদিনীপুর জেলার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কার। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। কেরী সাহেবের ভাষায় "His knowledge of Sanscrita classics was unrivalled and his Bengali composition has never

been surpassed for ease, simplicity and vigour".

বাংলা গদ্য ও বাংলা সাহিত্য এইভাবে সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী এবং পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে যে মার্জিত ভাষা আজ ব্যবহৃত হয় তা মূলতঃ সংস্কৃতভিত্তিক বলেই উত্তম বাংলা ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা কিঞ্চিৎ সংস্কৃতাভিজ্ঞ অ-বাঙালীর পক্ষে বোঝা কঠিন হয় না তা দেখা গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী, বাংলা সাহিত্য রচনাকর্মে বর্তমানে যাঁরা ব্রতী আছেন, তাঁদের অনেকেরই উত্তম সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান আছে। ভারতের ভাষাসমূহের পুনরুজ্জীবনে সংস্কৃত সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডার থেকে বিপুল শব্দসম্ভার আহরণ করা হয়েছে।

জার্মানীতে যাঁরা অধ্যয়ন করেছেন বা কিছুদিন কাটিয়েছেন তাঁরাই জানেন জার্মান ভাষাভাষীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি কি পরিমাণ অনুরাগ। তাঁরা এখনও বেশ যত্নসহকারে সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং ভারতীয় দর্শন এবং শাস্ত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তাঁরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থই পাঠ করে থাকেন। ভাষা-তত্ত্ববিদ প্রিলুস্কি তাই বলেছেন, সংস্কৃত ভাষা ভারতের মানচিত্রের সীমানা পার হয়ে বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত। সংস্কৃত ভাষা কি ভাবে এই সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয় করেছে তার ইতিহাস অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। পাণিনির ব্যাকরণ এবং কালিদাসের কাব্য কোনোদিন কোনো দেশের ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী অবহেলা করতে সমর্থ হবেন না।

বাংলা সাহিত্যকর্মের অনুশীলনে যাঁরা নবীন-ব্রতী তাঁদের কাছে অনুরোধ যে, প্রচার ও ভ্রান্ত সংস্কারের প্রভাবে তাঁরা যদি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা থেকে বিরত থাকেন তাহলে তার ফল হবে আত্মহত্যামূলক।

ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বোক্ত প্রবন্ধের শেষাংশে লিখেছেন :

"সংস্কৃত ভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতি যে রূপে প্রকাশিত, তারই অভিব্যক্তি। এই সংস্কৃত ভাষাকে আমরা অনায়াসেই ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি ব্যবহার করতে পারি। সংস্কৃত ও ইংরেজী এই দুই ভাষা পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে। বর্তমানের নানা অশান্তিপূর্ণ সময়ে ভারতের মানসিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যরক্ষার ক্ষেত্রে এই দুই ভাষা পরস্পরের সহায়ক হতে পারে।"

সংস্কৃত আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সংহতি রক্ষায় অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাষা এবং সেই ভাষা অনায়াসে না হলেও অল্পায়াসে বাঙালীর পক্ষে শিক্ষা করা সহজ। এই সহজ তথ্যটুকু আজ বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নায়কত্ব করছেন তাঁদের অনুধাবন করা কর্তব্য।

আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক নব-জন্মের ক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক সংস্কৃত কমিশন নিয়োগই এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন। যদিচ এই কমিশনের সকল প্রস্তাব কার্যকরী করা হবে না, তবু সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ড স্থাপন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণাকর্মের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ও প্রয়োজনীয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই বোর্ডের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানের জন্যও চেষ্টিত হওয়া উচিত। স্কুল ও কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে ছাত্রদের তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে এবং অত্যধিক চাপ পড়বে এই যুক্তিতে সংস্কৃত শিক্ষাকে উপেক্ষা করার ফল অতিশয় বিষময় হবে।

সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানহীন যে কোনও ভারতীয়কে সম্পূর্ণ শিক্ষিত বলা যাবে না। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ এবং খর্ব করবে।

নতুন বই

পটভূমিকা (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বসু সাহিত্য সংসদ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—২·৫০ নয়া পয়সা।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় খ্যাতিমান লেখক। তাঁর কাহিনীগুলি মানবিক আবেদন এবং সাবলীলতার জন্যে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। বর্তমান ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

'পটভূমিকা' একখানি ছোট উপন্যাস। এর নায়ক ফকির একজন স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক। নির্বিরোধী, সৎ জীবন যাপনের দিকে তার আগ্রহ প্রকৃতিগত। অশেষ দারিদ্র্য এবং দুষ্ট ব্যক্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে সৎ পথ থেকে বিচ্যুতি হ'তে চায় না, বরং এর মধ্যেই সে যেন আরো-ভালো হওয়ার জন্যে প্রেরণা অনুভব করে। এই কাহিনীতে অবশ্য ছোট বৌ, যতীন ডাক্তার, দেবযানী ইত্যাদি বিরোধী চরিত্রের পাশাপাশি ললিতা পিসি এবং গীতার মতো কল্যাণী নারীর চরিত্রও স্থান পেয়েছে, কিন্তু এরা সকলেই রচনা করেছে এমন একটি পটভূমিকা,

যাতে ফকিরের চরিত্র উজ্জ্বলতর হ'য়ে ওঠে। বিশেষ করে মনে দাগ কাটে সুখী। কিন্তু তার জীবনের যন্ত্রণাময় দিনগুলি পাঠকের কাছে পরোক্ষ হ'য়ে থাকায় একটু অতৃপ্তি থেকে যায়। বইটির প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ সুন্দর।

রাজদ্রোহী (উপন্যাস)—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী। ১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩, টাকা।

লেখক জানিয়েছেন, চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে রচিত সিনারিও থেকেই তিনি বর্তমান কাহিনীকে রূপায়িত করেছেন। মনে হয়, ভারতীয় পটভূমিতে বনীন হুডের মতো এক দরিদ্রবন্ধু 'রাজদ্রোহীর' চরিত্র আঁকাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবেই সার্থক হ'য়েছে। 'দারবটিয়া' (দস্যু), প্রতাপ এবং তার প্রণয়িনী 'পরপের' (অর্থাৎ জলসত্রের) পরিচারিকা চিন্তার চরিত্র উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে। অন্য দুটি পার্শ্বচরিত্র ভীমভাট এবং ত্রিলোচনা ওরফে তিলুও বেশ জীবন্ত মনে হয়। বইটির অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

হায় ছায়াবৃতা— (সংকলন গ্রন্থ)—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা।

প্যাট্রিস লুমুম্বার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূর্ব-পশ্চিম বাংলার কবিদের শ্রদ্ধা নিবেদন এই কবিতা সংকলনের বৈশিষ্ট্য। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ মণীন্দ্র রায়, শওকত ওসমান, চিত্ত ঘোষ, শেখ আবদুল জাব্বার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় দাশ, কনক মুখোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শান্তিব্রত ঘোষ, গোপাল ভট্টাচার্য, আবদুল গাফফার চৌধুরী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ আবদুল হুদা, অরুণাচল বসু, সুনীল মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্যামসুন্দর দে, আশিস সান্যাল, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন কবিদের আফ্রিকার নিপীড়িত ইতিহাসের স্মরণে রচিত কবিতাগুলি বর্তমানকালে বিশেষ সময়োপযোগী। আধুনিক কবিদের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই কবিতাগুলিতে পরিস্ফুট।

প্যাট্রিস লুমুম্বার শেষ চিঠি অনুবাদ করেছেন মঙ্গলায় মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর কবিতা অনুবাদ করেছেন সরোজকুমার দত্ত।

এই সুন্দর সংকলন গ্রন্থটির জন্য সম্পাদককে অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানাই।

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—ভবতোষ দত্ত। জিজ্ঞাসা। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম ছ টাকা।

বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিস্ময়কর নাম। বঙ্কিম-প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আবেগমুক্ত যুক্তিপূর্ণ বিচারের প্রচেষ্টা তেমন উৎসাহজনক নয়। বঙ্কিম-মনীষার ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীল, ইত্যাদি অভিযোগও শোনা যায়। তাঁর চরিত্রে শিল্পী অপেক্ষা সংস্কারকের মনোভাব ছিল বেশী। তাঁর দেশাত্মবোধ সংস্কারের জাতীয় জীবনে মহৎ দান হলেও তা ত্রুটিহীন নয়, এমনই নানা অভিযোগ মাঝে মাঝে উঠেছে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বঙ্কিম-মনীষার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করেছেন বঙ্কিম-চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে। তিনি ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন: "একালের নিকষে সেকালের মনীষাকে যাচাই করতে গিয়ে নিজেরাই চিন্তার দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছি।" লেখক তাই অভিজ্ঞ দক্ষতার সঙ্গে বিশেষ দৃঢ়তাসহকারে তাঁর বক্তব্য যুক্তি ও তথ্যের সমন্বয়ে উপস্থাপিত করেছেন। বাঙ্ক্‌ম-মনীষার উন্মেষ, বঙ্কিম-যুগের মনন সাধনা, বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্ত্য মনীষা, বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারত-সংস্কৃতি, বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই কয়েকটি অধ্যায়ে লেখক বঙ্কিম-মনীষা ও সমকালীন সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতির মূল্যায়ন করেছেন এবং বঙ্কিম-মনীষার অনুবর্তন পরিচ্ছেদে যে দুজন বিশিষ্ট বঙ্গ সন্তান বঙ্কিম-মনীষার যথাযথ অনুবর্তন করেছিলেন সেই বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পর্কে দুটি বিভিন্ন নিবন্ধ সংযোজিত করেছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটির সম্যক পরিচয় স্বল্প-পরিসর সমালোচনায় দেওয়া সম্ভবপর নয়, তবে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, ইদানীং বাংলা এই জাতীয় মৌলিক গবেষণা কদাচিৎ দেখা যায়। বঙ্কিম-মনীষার এই নবমূল্যায়নের জন্য লেখক ভবতোষ দত্ত বাংলা-সাহিত্য-পাঠকের অভিনন্দন লাভ করবেন।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ শোভন এবং রুচিসম্মত।

প্রাচীন ইরাক (প্রবন্ধ)—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ছ' টাকা।

গ্রন্থকার ইতিপূর্বে 'প্রাচীন মিশর' ও 'মহাচীনের ইতিকথা' দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। 'প্রাচীন মিশর' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন যে, প্রাচ্যভূমির জ্ঞানের সূত্র না আরম্ভ হয়েছে মিশরে তার শেষ হবে প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে। প্রাচ্য দেশসমূহের সমৃদ্ধতম ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ পাঠক অজ্ঞ, এই সম্পর্কে যে সব গ্রন্থ পাওয়া যায় তা সাধারণের আয়ত্তের বাইরে, সুপণ্ডিত লেখক তাই অশেষ শ্রমসহকারে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। মানব সভ্যতার বিকাশ, ধর্ম ও পৌরোহিত্যতন্ত্র, রাজা ও রাজ্য শাসন, রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে—সুমের ও আক্কাড, দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাবিলন তৃতীয় খণ্ডে আসিরিয়া ও ক্যালেডিয়ান বা নব্য-ব্যাবিলনীয়

সাম্রাজ্য এই বিষয়গুলির ধারাবাহিক বিবরণ ও সেই সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রায় কুড়িখানি রেখাচিত্র এবং চোদ্দখানি মূল্যবান প্লেট এই গ্রন্থে সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বর্তমানে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গবেষণা গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছে এ অতি সুলক্ষণ। 'প্রাচীন ইরাকে'র মত এমন একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সুলিখিত গ্রন্থ-প্রণয়ন লেখকের কৃতিত্ব ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও লোকশ্রুতির সমন্বয়ে সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশ গ্রন্থকারের অনন্য-সাধারণ পরিবেশন পদ্ধতিতে অতিশয় সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই ধারাবাহিক বিবরণ বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য অভিনব, চিত্রগুলিও সুমুদ্রিত।

রবীন্দ্র সমীক্ষা (প্রবন্ধ)—অরুণ-কুমার মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে সব গবেষণা ও সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে লেখক তার মধ্যে একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং প্রশংসালাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন এবং রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম, ঊনিশ শতকের গীতিকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ শতকের গীতি-কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের মঞ্চচিন্তা, রবীন্দ্র নাটকে সমাজচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের ছবি ও ছিন্নপত্রাবলীর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে রবীন্দ্র-রসিক লেখক এই আলোচনা গ্রন্থে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং সমকালীন মতামত উদ্ধৃত করে লেখক তাঁর বক্তব্য ও যুক্তি সপ্রমাণ করার প্রচেষ্টা করেছেন এবং সেদিক দিয়ে আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছেন। প্রস্তাবগুলি আকারে ছোট হওয়ায় পাঠকের বিচার এবং বিচিন্তার পক্ষে গ্রন্থটি সহায়ক হয়েছে। প্রতিটি আলোচনার মধ্যে রবীন্দ্র-মনীষার বিচিত্র দিক সম্পর্কে যে মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। সমগ্র গ্রন্থটি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি পরিপূর্ণ পরিচয়।

ছাপা ও বাঁধাই নয়নানন্দকর।

সুর ও বাণী (প্রথম খণ্ড)—বিমল পাল। ২৭।১ এফ, জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড। কলিকাতা-৩৭। দাম—আড়াই টাকা।

গ্রন্থখানি বাংলা সংগীত সমাজে গ্রন্থকারের একটি নতুন অবদান। তুলসীদাস, সুরদাস, কবিরদাস প্রভৃতি সন্তদের রচিত ভজন, বাংলার সাধক কমলাকান্ত, নরচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদের লিখিত শ্যামাসংগীত এবং গ্রন্থকার রচিত বাংলা রাগপ্রধান গানগুলির সংগ্রহ এই পুস্তকের একটি বিশেষত্ব।

গানগুলিতে সুরারোপ করা হয়েছে ভজন, শ্যামাসংগীত ও রাগপ্রধানের পূর্ণ ঐতিহ্য বজায় রেখে। শুধু তাই নয়, সুরও হয়েছে প্রাণস্পর্শী। কতকগুলি অপ্রচলিত রাগেরও স্বর-পরিচয় ও স্বরলিপি দেওয়া আছে এই পুস্তকে। মোট কথা এই ধরণের স্বরলিপি গ্রন্থ এই প্রথম প্রকাশিত হ'ল বলে মনে হয়। তাল এবং আকার মাত্রিক স্বরলিপির

ব্যাখ্যা করে দেওয়ায় শিক্ষাথীদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। বাঁধাই অনুযায়ী বইটির দাম সুলভ বলতে হবে।

বাণীবিতান—(রবীন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংকলন। সাধারণ সম্পাদক— রণজিৎকুমার সেন, সম্পাদিকা : ভারতী সেন। প্রকাশক : বাণীবিতান— কলিকাতা-১৯, মূল্য দু'টাকা।

এই সংকলন গ্রন্থে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক প্রভৃতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও কবিতা আছে, এছাড়া বাংলার বিখ্যাত কবিদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কবিতার অংশ-বিশেষ দিয়ে গ্রথিত 'কবি-প্রণাম' নামক একটি অংশ আছে। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং সুন্দরভাবে বাঁধানো, তবে চিত্রসম্পদে ভীষণ দুর্বল। প্রচেষ্টা হিসাবে এই সংকলন গ্রন্থ প্রশংসাযোগ্য।

অনেক বসন্ত দু'টি মন (গল্প)—চিত্তরঞ্জন মাইতি। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

চিত্তরঞ্জন মাইতি তরুণ গীতি-কবি হিসাবে সুপরিচিত। তাঁর রচিত দু'টি ভ্রমণ-কাহিনী ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'অনেক বসন্ত দু'টি মন' কয়েকটি প্রণয়-মুগ্ধ মনের লীলা-কাহিনী। পাঁচটি গল্পে তিনি প্রাচীন ভারতের দেবদাসী, রাজকন্যা, বৌদ্ধ যুগের নায়িকা এবং মরুপ্রান্তরের বেদুইন তরুণীর বিচিত্র প্রেমকাহিনী তাঁর কাব্যধর্মী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সোনার অতীতের এই মনোহর প্রেমকথা এ যুগের মানুষেরও ভালো লাগবে। বিভূতি সেনগুপ্ত অঙ্কিত চিত্রগুলি চলনসই। প্রচ্ছদ, ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর।

রবীন্দ্র রচনা কোষ (প্রথম খণ্ড : প্রথম পর্ব—চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১১বি, রামমোহন বেরা লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৬-৫০।

অধুনা শিক্ষার ধারা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে এবং বিশেষ শিক্ষার মূল্যও আজ অনস্বীকার্য; কারণ বর্তমান যুগ বিশেষজ্ঞদের যুগ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ আলোচনার পক্ষে আলোচ্য পুস্তকখানি প্রভূত সাহায্য করবে বলে আমরা আশা করি। পুস্তকখানির মুখবন্ধে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "পুস্তকখানি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখার অতি প্রয়োজনীয় গবেষণামূলক পঞ্জীপুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার শিরোনাম ও প্রথম ছত্র, গল্প প্রবন্ধের শিরোনাম, গল্প-উপন্যাস-নাটকে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর নাম, সকল প্রকার রচনায় উল্লিখিত ব্যক্তি, স্থান, দেব-দানব, বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ঘটনা, বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রভৃতি বর্তমান প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্বে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধারাবাহিক আলোচনার পক্ষে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি অপরিহার্য। বহুকাল ধরে এমন একখানি গ্রন্থের অভাব ছিল, সংকলকদ্বয় সে অভাব পূর্ণ করলেন।

'নিবেদনে' সংকলকদ্বয় বলেছেন, "যোগ্যতর হস্তে এই কাজ সম্পাদিত হইলে শোভন হইত সন্দেহ নাই; আশা করি ভবিষ্যতে তাহা সম্পন্ন হইবেও। সেই ভাবী মহাযজ্ঞের সমিধ আহরণে আমাদের এই যথাসাধ্য প্রয়াস।" এই প্রশংসনীয় প্রয়াসকে আমরা আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। ভবিষ্যতে হয়ত অনুরূপ তথ্যবহুল আরও গ্রন্থ প্রকাশিত হবে এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের তত্ত্বালোচনার পথও সুগম হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু পথিকৃৎ হিসাবে গ্রন্থকারদ্বয়ের প্রচেষ্টা অবশ্যই স্বীকৃত হবে সর্বক্ষেত্রে। গ্রন্থখানির দীর্ঘ শুদ্ধিপত্র পরবর্তী সংস্করণে আশা করি বর্জিত হবে।

মন্দির নগরী ভুবনেশ্বর—(মন্দির পরিচয়)— অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক— অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, আকড়া-কৃষ্ণনগর। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'Konaraka at a Glance' এবং 'কোণার্ক' নামক গ্রন্থ দু'টি রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। মন্দির-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে ওড়িশী রীতিও একটা বিশিষ্ট স্থানাধিকার করে আছে। লেখক ভুবনেশ্বরকে উড়িষ্যার স্থাপত্যের মধ্যাহ্ন সূর্য বলেছেন। এই ভুবনেশ্বরের কয়েকটি বিশেষ ধরণের মন্দির সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন। পরশুরামেশ্বর, বৈতাল, মুক্তেশ্বর, রাজরাণী, ব্রহ্মেশ্বর, লিংগরাজ, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি এবং জগন্নাথ মন্দির সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনেকগুলি চিত্র-সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। আগাগোড়া আর্ট পেপারে ছাপা এই চমৎকার গ্রন্থটি যাঁরা ভারতের মন্দির সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত এবং ভ্রমণ-বিলাসী তাঁদের কাছে সমাদৃত হবে।

লাল-সন্ধ্যা (উপন্যাস)—বিভূতিভূষণ গুপ্ত। গ্রন্থম্ : ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় টাকা।

সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে বিভূতিবাবু নিতান্ত নবাগত নন। দাম্পত্য সংঘাতের

যুগোচিত সমাধান প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে রিয়াল ও আইডিয়ালের বহু-আলোচিত দ্বন্দ্বকে উপজীব্য করে রচিত তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসটি পড়ে সুখী হলাম। দরিদ্র অথচ আদর্শবাদী শিক্ষকের মেয়ে শ্রীমতির সঙ্গে বিত্তবান ও আত্মম্ভরী শিল্পপতি অতনুর আকস্মিক ও অসম মিলনে যে কাহিনীর পূর্বরঙ্গ, নর্মসঙ্গিনীকে মর্মসহচরীর সম্মাননা দেবার ইঙ্গিতবহতায় তারই ফলশ্রুতি। অবশ্য এর মধ্যে শ্রমজীবী ও কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ আদর্শভ্রষ্ট দেশসেবকের চরিত্রায়ণ, হৃত-নারীত্ব উপনায়িকার মনোবিবর্তন ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে। বিভূতিবাবুর কাছে আমাদের আরও প্রত্যাশা রইল। প্রকাশনার ব্যাপারে গ্রন্থম্ তাঁদের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

প্র-পূর্বরাগ (গল্প)—**বিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার। নিউ বেংগল প্রেস (পি) লিঃ। কলিকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।**

আটটি লঘু রসের গল্পের সংকলন 'প্র-পূর্বরাগ'। রচনায় লেখকের অপরিণত মানসের ছাপ সুস্পষ্ট। লঘু রসের গল্প মানে তার রচনাশৈলীও যে লঘু হবে এমন কোনো বিধি নেই। লেখকের শক্তি আছে কিন্তু সেই শক্তির সুসংযত প্রকাশক্ষমতা নেই। গল্পগুলির মধ্যে 'গঙ্গা থেকে জর্ডন' এবং 'সৌন্দর্য-বিচার' প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট এ যুগে অচল।

দূরান্তের ডাক (রূপক গল্প)—**সূর্য মিত্র। শ্রীপ্রকাশ ভবন। এ-৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম দু টাকা।**

'দূরান্তের ডাক' একটি নতুন ধরণের রূপকথা। বর্তমান কালের মেজাজ এমনই ভারাক্রান্ত যে রূপকথা স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই কালে 'দূরান্তের ডাক' রচয়িতার মধ্যে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গেল তার জন্য অকুণ্ঠিত প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। সাত সাগর আর তেরো নদী ছাড়িয়ে, তারও উত্তরের পাহাড় ছাড়িয়ে যে দেশ যেখানে রঙ-বেরঙের পাখিরা উড়ে বেড়ায় সেই দেশের রাজার ছেলে কুণালকে নিয়ে এই কাহিনী। সেই কুণালকে হাতছানি দেয় দূরান্ত। রাজার ছেলে কুণালের স্বপ্নময় কাহিনী এই দূরান্তের ডাক। লেখক যে এক্সপেরিমেন্ট করার প্রচেষ্টা করেছেন তা সার্থক হয়েছে। গতানুগতিকতাবর্জিত এই 'দূরান্তের ডাক' একটি অভিনন্দনযোগ্য গ্রন্থ।

দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ—**প্রথম সংকলন। সম্পাদক : কমলাপতি দে ও বাসব সরকার। বসু প্রকাশনী, ১১৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬ কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৩.৫০ নয়া পয়সা।**

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই বইটির একটি চমৎকার স্বাতন্ত্র্য প্রথমেই মনকে আকর্ষণ করে নেয়। এতে সুযোগসন্ধানী সাহিত্য যশঃপ্রার্থীদের 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' নামক যথেচ্ছাচারের তালিকা বৃদ্ধি করা হয়নি, দেশে ও বিদেশের প্রতিষ্ঠিত মনীষীদের রবীন্দ্র-চর্চা, রবীন্দ্রঅনুসন্ধান এবং শ্রদ্ধাঞ্জলির বিচিত্র নিদর্শনগুলি গ্রন্থিত করা হয়েছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্লভ বিভিন্ন সূত্র থেকে সম্পাদকদ্বয় প্রয়োজন বিশেষে সরল বাংলায় অনুবাদ করে এই সব প্রবন্ধগুলির যে সুন্দর সমাবেশ করেছেন, তার জন্যে তাঁরা বাঙালী পাঠকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন। ভারতীয় লেখকবৃন্দের চিত্তাকর্ষক তালিকায় আছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জওহরলাল নেহরু, কে এস রামস্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি; বিদেশী লেখকদের মধ্যে ইংলণ্ডের গিলবার্ট ম্যারে, জেমস এইচ কোজিনস, টি ডবলু ক্লার্ক, সি এফ এণ্ডরুজ আছেন; চেকোশ্লোভেকিয়ার আছেন ড দুসান জবাভিটেল ও কারেল কিনুসিল; সোবিয়েত রাশিয়ার পি এস কোগান, ফিয়োদোর পেত্রোভ প্রভৃতি, পোলাণ্ডের আদ্রিয়ান জারমিনস্কি, আমেরিকার এজরা পাউণ্ড, নরম্যান ব্রাউন, ড এডওয়ার্ড সি, ডিমক, ফ্রান্সের আঁরি বিদো, রেনে, টেভার্ণিয়ার, পূর্ব-জার্মাণীর ড হাইনজ মোদে, ল্যাতিন আমেরিকার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো চীনের তান-য়ুন-শান প্রভৃতি এই বুধ-সম্মিলনীতে সমবেত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও তাঁর প্রতিভার অলৌকিক বহুমুখিত্বের আলোচনার মহৎ উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে পাকিস্তানের আজিজুল হাকিমের প্রবন্ধটি মানববুদ্ধির চূড়ান্ত মূঢ়তা ও সংকীর্ণতার নিদর্শনরূপে উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ ভালো, সম্পাদকের 'রবীন্দ্রনাথ : নোবেল প্রাইজ : প্রতিক্রিয়া' নামক আলোচনাটি সংগ্রহ এবং বিচারদক্ষতার জন্য প্রশংসার যোগ্য।

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥
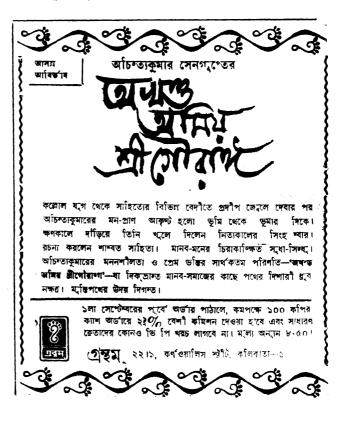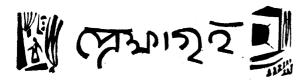
"বাঙলা ছবির ভবিষ্যতের" জের

৩০-এ জুন তারিখে "অমৃত"-এর ৮ম সংখ্যায় লিখেছিলুম, "হিন্দী ছবিতে আমরা সাধারণতঃ যে-গ্ল্যামারের বা চিত্তবিভ্রমকারী বস্তুর ছড়াছড়ি দেখতে পাই, বাঙলা ছবিতে তার কড়াক্রান্তিও পাই না। লাবণ্যময়ী বিলাসিনী হিন্দী ছবির পাশে বাঙলা ছবিকে দুঃখিনী বিধবা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।" এবং এই কারণে বাঙলা ছবি অত্যন্ত দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে—তার বাজার সে হারাচ্ছে। বালুরঘাট থেকে জনৈক পত্রপ্রেরক আমার বক্তব্যকে আংশিকভাবে মেনে নিয়েও বলছেন—"বাজারের সমস্যাই বাংলা ছবির একমাত্র সমস্যা একথা আমি মেনে নিতে পারছি না। বাংলা ছবির পরিচালক ও প্রযোজকদের দায়িত্ব অস্বীকার করাটা উচিত হবে না...... সত্যজিৎ রায় এবং আর দু'তিন জন পরিচালকের দু'চারটি ছবি বাদ দিলে... বাংলা ছবি সাধারণতঃ যা দেয়, তা হ'ল সেণ্টিমেণ্টাল ছিঁচ-কাঁদুনি, সস্তা বাস্তবতা, নাটুকে বক্তৃতা এবং কথায় কথায় মেয়েলী ঢঙের ঝুড়ি ঝুড়ি গান।"

পত্রলেখককে তাঁর লেখার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, বাজারের সমস্যা বাঙলা ছবির একমাত্র সমস্যা না হলেও যে প্রধানতম সমস্যা, এ-কথা না মেনে উপায় নেই। কেননা, সিনেমা-শিল্প যত বড়ই আর্ট হোক না কেন, আজকের জগতে তা প্রতিটি দেশেই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। এবং যে-কোনোও সিনেমাকে, তা সে বাঙলাই হোক আর আর যে কোন ভাষায় হোক—ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বেঁচে থাকতে গেলে তার প্রধান লক্ষ্য হতে হবে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব দর্শকমনোরঞ্জন। কোনো উচ্চাঙ্গের আর্টই জনসাধারণের জন্যে নয়—ক্ল্যাসিকাল মিউজিক কন্‌ফারেন্সের দশ বা পনেরোটি অধিবেশনের জন্যে যাঁরা টিকিট কিনতে ভীড় করেন, তাঁদের অধিকাংশই তাঁদের টাকা আছে, এইটি জাহির করবার জন্যেই টিকিট কেনেন, গান শুনে তারিফ করবার জন্যে নয়; কারণ সে-যোগ্যতা তাঁদের অনেকেরই নেই। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যাঁরা উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি দেখবার জন্যে লালায়িত, তাঁদের সংখ্যা সাধারণ সিনেমা-দর্শকদের অনুপাতে হাজারে এক। এই 'এক'-এর ওপর নির্ভর ক'রে সিনেমা-শিল্পকে যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়, তা'হলে সে হবে মর্মান্তিক বাতুলতা এবং এ-কথাটা আর কেউ না বুঝলেও আমাদের সকল কৃতিমান পরিচালকই বোঝেন। কোনও চলচ্চিত্রকে উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্ম রূপে উপস্থাপিত করা তখনই সম্ভব, যখন তার ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা চলে, যখন তার নির্মাণকার্যে যিনি বা যে-প্রতিষ্ঠান—সে সরকারী বা বে-সরকারী, যাই হোক না কেন—অর্থব্যয় করবেন, তিনি বা সেই প্রতিষ্ঠান চিত্রটির নিখুঁত শিল্পবস্তু হয়ে ওঠবার জন্যে অকৃপণ হস্তে অর্থব্যয় ক'রে যাবেন এবং চিত্রটির মুক্তির পরে সেই অপরিমিত অর্থরাশির একটি নয়া পয়সাও ফেরত পাবার আশা করবেন না।

শংকর পিকচার্সের 'জীবন ও স্বপ্ন' চিত্রে নীলিমা দাস ও কালী ব্যানার্জী।

অবশ্য আমার এ-কথায় পত্রলেখকের মনে করবার সংগত কারণ নেই যে, আমি রাশি রাশি বস্তাপচা বাঙলা ছবির সমর্থক। আমিও পত্রলেখকেরই মতো বহু বাঙলা ছবি দেখবার পরে মনে মনে চিন্তা করি এই ছবিগুলি নির্মিত না হ'লে এদের নির্মাণ কার্যের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থোপার্জনে বাধা পড়ত বটে, কিন্তু বাঙলার চিত্র-জগত নিঃসন্দেহে আবর্জনার হাত থেকে রেহাই পেত। কিন্তু বাঙলা ও হিন্দী ছবির দর্শক আলাদা—পত্রলেখকের এই মতের সংগে আমি কিছুতেই একমত হ'তে পারছি না। নিছক বাঙলা ছবি দেখেন এবং অন্য ছবি দেখেন না—এমন দর্শকের ওপর নির্ভর ক'রে বাঙলা ছবি নির্মাণ করা চলে না আদপেই; কারণ, বাঙলা ছবি দেখে যাঁরা আমাদের আজও ধন্য করেন, তাঁদের শতকরা পঁচাত্তর জনই হিন্দী ছবি দেখে থাকেন নিয়মিতভাবেই এবং তাঁরাই

বিমল ঘোষ প্রযোজিত বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের "বধু"র একটি দৃশ্যে অনুভা গুপ্তা, কমল মিত্র ও বসন্ত চৌধুরী।

শান্তি চৌধুরী পরিচালিত "ডাকাতের হাতে" চিত্রে শেখর চ্যাটার্জি

আমাদের কাছে অভিযোগ করেন যে, বাঙলা ছবি মাঝে মাঝে তাঁদের এমনই আপ্লুনি লাবণ্যহীন। লাগে না, তাঁদের ক্রমেই অরুচি ধরবার উপক্রম ঘটছে। ফ্যাশান হিসেবে কিছু কিছু অবাঙালী দর্শক—অ-ভারতীয় নয়—আজকাল সত্যজিৎ রায়-প্রমুখের ছবি দেখে আমাদের পিঠ চাপড়াচ্ছেন বটে, কিন্তু তা ধোপে কতদিন টিঁকবে বা আদৌ টিঁকবে কিনা, তা এখুনি বোঝা যাচ্ছে না। বরং উল্টোটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না, যখন দেখি আমাদের ঘরের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আনমনে গান গেয়ে উঠছে :

"উতনা না মুঝসে তু প্যার বঢ়া
কি ম্যয় এক বাদল আওয়ারা।
ক্যায়সে কিসী কা সহারা বনু
কি ম্যয় খুদ্ বেঘর বেচারা।"

এবং এই হিন্দী ছবির আক্রমণ থেকে বাঙলা ছবির পরিত্রাণের পথ খুঁজতে গিয়ে চোখ আজ ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে।

॥ একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় ॥

গেল ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা-দিবসে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে চতুর্মুখ নাট্য-সম্প্রদায় ডস্টোয়েভ্‌স্কির সুবৃহৎ উপ-ন্যাস 'দি ইডিয়ট' দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং অজিত গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'নির্বোধ' নাটকের অভিনয় করলেন। বর্তমানের সমস্যাসংকুল জীবনের পথে কেই বা নির্বোধ, আর কেই বা বুদ্ধিমান, এ-কথা সঠিক ক'রে বলা যেমন অত্যন্ত দুরূহ, তার চেয়েও দুরূহ মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে শেষ কথা বলা। তাই দেখি, দৈনন্দিন জীবনের শালীনতার মাপ-কাঠিতে চিত্রার মত মেয়ে সমাজ-সংরক্ষকদের কাছ থেকে কম নম্বর পেলেও মনের গভীরে সে শুচিতার প্রতিমূর্তি, সেখানে সে নিঃসঙ্গ-তাপসী। কে বলে যে, রঞ্জন বসু একজন নির্বোধ, ইডিয়ট, যখন দেখি, জীবনের সঠিক মূল্যায়নে তার কোনো ভ্রান্তি নেই, মানুষের সকল ব্যথাকে সে আপনার ক'রে নিয়ে অত্যন্ত ঔদার্যের সঙ্গে বলতে পারে, 'ওরে ভাই কার নিন্দা করো তুমি?...... এ আমার, এ তোমার পাপ'? এই স্বার্থান্ধ পৃথিবীতে অত্যন্ত সরলপ্রাণ এবং মহানুভব ব'লেই আমরা তাকে নির্বোধ, ইডিয়ট ব'লে তৃপ্তি পাই। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'নির্বোধ' নাটকে ডস্টোয়েভ্‌স্কির রচনার মূল সুরটি ধ্বনিত হ'লেও নাটকটি যত্র যে স্থানে-অস্থানে কাব্যধর্মী হয়ে পড়েছে, তাই নয়, হরিশের মতো পার্শ্ব-চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে এবং ঘটনাবলী উপস্থাপনার দোষে মূল নাট্যবস্তুটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারেনি।

চতুর্মুখের অভিনয়ে এমন একটি নিষ্ঠা লক্ষ্য করলুম, যা সচরাচর সুলভ নয়। দৃশ্যসজ্জা বা মঞ্চোপস্থাপনার মধ্যে বিশেষ বাহাদুরী দেখাবার প্রয়াস না থাকলেও নাটকের প্রয়োজনকে তা অনায়াসেই মিটোতে পেরেছে। অভিনয়ে

টাস্ ফিল্মসের মুক্তি প্রতীক্ষিত হাস্য-মধুর 'কানামাছি' চিত্রের একটি দৃশ্যে : সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও অনুপকুমার।

প্রায় প্রত্যেকেই সু-অভিনয় করলেও বিশেষ প্রশংসার দাবি করতে পারেন চিত্রার ভূমিকাভিনেত্রী অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রার চরিত্রের মর্ম তিনি উপলব্ধি করেছেন অনায়াসেই এবং সেই কারণেই ভূমিকা উপযোগী দেহ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী না হয়েও মাত্র অভিনয়গুণে তিনি দর্শকমানসে একটি গভীর রেখাপাত করতে পেরেছেন অবলীলাক্রমে। প্রথম দিকে না হলেও নাটকের শেষের দিকে তাঁর সংগে প্রায় পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দাস সুমিত্রা রায়ের ভূমিকায়। বিশেষ ক'রে যেখানে তাঁর ঈর্ষান্বিত মন আসল কথাকে চেপে রেখে ইডিয়ট রঞ্জন বসুর সংগে ছলনা ও অপমানের চূড়ান্ত অভিনয় করে, সে-দৃশ্য অবিস্মরণীয়। 'নির্বোধে'র নাম-ভূমিকায় পরিচালক শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য এবং আনন্দের ভূমিকায় গোষ্ঠী-সম্পাদক অসীম চক্রবর্তী তাঁদের গৃহীত চরিত্র দুটি'কে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন অনায়াসেই। বস্তুসর্বস্ব জগতের matercalistic world-এর সাধারণ মানব আনন্দের জীবনের ট্রাজেডি যেমন বেশে, চলনে, দেহভংগীতে ও কথাবার্তায় মূর্ত হয়ে উঠেছে অসীম চক্রবর্তীর অভিনয়ের মাধ্যমে, তেমনই এ-জগতের চোখে 'নির্বোধ', ইডিয়ট অথচ হৃদয়বান দার্শনিকের স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন রঞ্জন বসুও দর্শকদের কাছে সহজেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্যের অনায়াস অভিনয়গুণে। সবশেষে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে, বাউল-বেশে নির্মল চৌধুরীর দার্শনিক গানটি শুনে সকলেই অতিমাত্রায় পরিতৃপ্ত হয়েছেন।

'চতুর্মুখ'-সম্প্রদায়ের সাফল্য সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে আমরা উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে রইলুম।

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

ডাইনী : দেবী প্রোডাক্সন্সের চিত্র; ১২৫৬৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : শৈলেশ দে; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : মনোজ

এস কে জি প্রোডাকসন্সের "মা" চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যারাণী এবং বাবলু ব্যানার্জি।

বর্তমান সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত "ডাইনী" চিত্রের একটি দৃশ্যে গীতা দে ও শ্রীমান বাবুয়া।

ভট্টাচার্য; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ কালোবরণ; চিত্রগ্রহণ ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত; শব্দধারণ ঃ বাণী দত্ত; শিল্পনির্দেশ ঃ বিজয় বসু; সম্পাদনা ঃ গোবর্ধন অধিকারী; গীত-রচনা ঃ শান্তি দাশগুপ্তা; ভূমিকায় ঃ ছবি বিশ্বাস, দিলীপ রায়, গঙ্গাপদ বসু, বীরেশ্বর সেন, খগেন চক্রবর্তী, হরিধন, নৃপতি, প্রশান্তকুমার, মাঃ বাবু, গীতা দে, কেতকী দত্ত, সীতা মুখোপাধ্যায়, নিভাননী, আশা, ঊষা প্রভৃতি। দেবী প্রোডাক্‌সন্স-এর পরিবেশনায় গেল ১৮ই আগষ্ট থেকে রূপবাণী, ভারতী, অরুণা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

অধিকাংশ লোকই যা দেখে এবং শোনে, তা নিজের নিজের চোখ দিয়ে দেখে না বা কান দিয়ে শোনে না, তারা তাদের ধারণা দিয়ে দেখে বা শোনে— এই মতবাদকে তুলে ধরবার জন্যেই ডাইনী গল্পের অবতারণা। কোনো লোকের কার্যকলাপ, কথাবার্তা এবং জীবনের ঘটনাবলীকে সমগ্রভাবে না দেখে যদি খণ্ডিতভাবে দেখা এবং বিচার করা যায়, তা হ'লে সে বিচার ভ্রান্ত হবারই সম্ভাবনা বেশী এবং তার ফলে সেই লোকের চরিত্র সম্বন্ধে একদেশ-দর্শিতা জন্মানোও অসম্ভব নয়। তাই ডাইনী গল্পের নায়িকা নয়নতারার ভাগ্য-বিপর্যয়ে তার প্রতি কারো সহানুভূতি না জেগে তাকে সকলেই অশুভের প্রতীকজ্ঞানে দূর দূর করল, তার স্নেহাতুর মাতৃ-হৃদয় যখন প্রকাশের ভাষা না পেয়ে অন্তরে গুমরে উঠেছে এবং চাপা কান্নায় ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে তার ঠোঁট উঠেছে মুহুর্মুহু কেঁপে, তখন লোকের চোখে সে ডাইনী হয়ে সর্বনাশের মন্ত্র পড়ছে তার অশুভ দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে। বালক-হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত, অভিশপ্ত নারীর সমগ্র জীবন যখন আদালতে প্রকাশিত হয়ে তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করল, তখন সে চির-শান্তির কোলে নিদ্রিত। তার বিড়ম্বিত জীবনের আকস্মিক সমাপ্তিতেই গল্পের শেষ।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে, যার কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না; দৃশ্যতঃ অত্যন্ত সুস্থ সবল লোক বিনা নোটীশে অকারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাই ব'লে আর্টের ক্ষেত্রে, শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে কার্যকারণসম্পর্ক বিবর্জিত ঘটনার অবতারণা করলে তা সম্ভাব্যতাকে (probability-কে) অতিক্রম করে এবং সেই কারণে তা পাঠক বা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। কালী মন্দিরের তান্ত্রিক পূজারী ভৈরব এমন-কি অন্যায় কাজ করেছিল, যার জন্যে সমস্ত গ্রামবাসী তার প্রতি বিরূপ? নয়নতারা যে চরকায় সুতো কেটে

তারাশঙ্কর রচিত ও অগ্রদূত পরিচালিত 'বিপাশা' চিত্রে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার।

ভৈরবের সহকারীর সাহায্যে তা বিক্রয় করে জীবিকানির্বাহ করত, তা কি গ্রামের আর কারুর জানবার সুযোগ হয়নি ? ভৈরবের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে নয়নতারা যখন স্বামী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর-ঘর করতে এল, তখন গ্রামে কলেরার মড়কের ফলে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু ঘটা হয়ত' সম্ভব ছিল, কিন্তু তার স্বামী?—মাকে দাহ করে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল কেন? তারপর তার শিশু পুত্র? তার নিজের হাত থেকে সে হঠাৎ ফসকে জলেই বা পড়ল কেন এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রাণই বা বেরিয়ে গেল কেন ?—একদিকে তার দুর্ভাগ্যকে চরম করে দেখাবার জন্যে এবং অন্যদিকে তাকে মূর্তিমতী সর্বনাশরূপে প্রতিপন্ন করবার জন্যে দ্রুতগতিতে পর পর চার চারটি মৃত্যু ঘটানো সহজ শিল্পবোধকে অতিমাত্রায় আহত করেছে। বালক-হত্যার অপরাধে যখন সে অভিযুক্ত, তখন ভৈরব ছাড়াও যে-লোকটির সাহায্যে সে সুতো-বিক্রী করত, সেই লোকটিকেও কি তার সপক্ষে সাক্ষী দেবার জন্যে পাওয়া যায় নি?—একেই ত' ডাইনী গল্পের বিষয়-বস্তু এবং কাঠামো অত্যন্ত সেকেলে, তার ওপর তার মধ্যে এখানে-সেখানে এত বেশী অসম্ভাব্যতার ছড়াছড়ি যে, নয়নতারার জীবনের ট্রাজিডি কচিৎ দর্শককে অভিভূত করে। নয়নতারার জীবন-জিজ্ঞাসা বুদ্ধিমান দর্শকের মনকেও ভাবিত করে তোলে না।

ডাইনীর অভিনয়াংশে নাম-ভূমিকায় গীতা দে যে বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন, তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বলা-বাহুল্য, ভূমিকাটি অত্যন্ত কঠিন। কখনও হৃদয়হীনা, রক্ষতার প্রতিমূর্তি রূপে প্রতিভাত হওয়া, আবার কখনও মমতাময়ী, স্নেহাতুর, প্রেমবিমুগ্ধা রমণী রূপে নিজেকে উপস্থাপিত করা রীতিমত উচ্চাঙ্গের অভিনয়-প্রতিভা সাপেক্ষ। গীতা দে কিন্তু অনায়াসেই এই দুরূহ কার্যে জয়ী হয়েছেন। ছবি বিশ্বাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে স্বল্পিক ভৈরবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর রূপ-সজ্জাটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। জীবনের

কৃষ্ণচোপরার "চার দিওয়ারীতে" নন্দা।
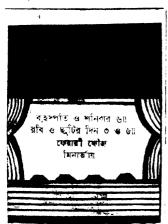
শ্রীমান পিকচার্সের "মধুরেণ চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও কানু চ্যাটার্জি।

চরিত্রে দিলীপ রায়ের অভিনয় যথাযথ। সরকারী কৌশলীর চরিত্রে বীরেশ্বর সেন ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছেন অনায়াসেই; তাঁর বাচনভংগী চমৎকার। অন্যান্য ভূমিকায় গংগাপদ বসু, হরিধন, সীতা মুখোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, খগেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির সু-অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের রোজার ভূমিকা দর্শকদের পুলকিত করেছে প্রচুর

চিত্রগ্রহণে রামানন্দ সেনগুপ্ত মোটের উপর প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন; ছবির মুড অনুযায়ী চিত্রগ্রহণ দর্শক-দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। শব্দধারণে বাণী দত্তর কাজ প্রায় নিখুঁত। ছবির দৃশ্যসজ্জা যথাযথ। ডাইনীতে দুটি গান আছে। গান দুখানি সুগীত হলেও ছবিতে এদের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। আবহ-সংগীত ঘটনাকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছে।

সম্ভাব্যতার সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠা সত্ত্বেও ছবিখানি তার স্বাতন্ত্র্য গুণে সাধারণ দর্শককে খুশী করবে বলেই বিশ্বাস।

।। মধুরেণ ।।

শ্রীমান পিকচার্সের "মধুরেণ" চিত্রটি চণ্ডিকা পিকচার্সের পরিবেশনায় শিগ্গীরই রাধা, পূর্ণ এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। কাহিনী—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য ও সংলাপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য, পরিচালনা—শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত—কালীপদ সেন। শ্রেষ্ঠাংশে ঃ সন্ধ্যারাণী, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোঃ, কানু বন্দ্যোঃ, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, নবদ্বীপ, পদ্মা দেবী, নিভাননী ও কবিতা রায়। নেপথ্য কণ্ঠ—মানবেন্দ্র, নির্মলা মিত্র, দিপালী ঘোষদস্তিদার, সনৎ সিংহ এবং তুলসী চক্রবর্তী।

।। হিন্দী ছবি ।।

এ সপ্তায় দুটি হিন্দী চিত্র মুক্তিলাভ করেছে। প্রথমটি রোভার ফিল্মসের 'হাম মাতওয়ালে নওজোয়ান' সোসাইটি, গ্রেস, খাজনমহল, পিকাডিলি, নবভারত, লীলা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। পরিচালনা করেছেন এল আর প্রকাশ, সংগীত পরিচালনা চিত্রগুপ্ত। রূপদান করেছেন সইদা, শেখর, জীবন মির্জা মুশারফ, আগা, লিলিয়ান প্রভৃতি। চিত্রটির পরিবেশন করছেন নাটরাজ ফিল্মস। দ্বিতীয়টি হলো আদর্শলোকের 'রামু-দাদা'। পরিচালনা আদর্শ ও সংগীত পরিচালনা চিত্রগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন শেখ মুখতার, জয়মালা, হানি ইরাণী, সপ্রু ও চাঁদ ওসমানী। কলিকাতার অপেরা, ম্যাজেষ্টিক, প্রভাত, চিত্রা, রূপালী প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে।

*

।। "শান্তি"র নাট্যরূপ ।।

গত ২১শে আগষ্ট সোমবার রঙমহলে "সাজঘর" কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প "শাস্তি"র নাট্যরূপ অভিনীত হয়। দুখীরামের ভূমিকায় সন্তু বসু এবং চন্দরার ভূমিকায় আলো দাশগুপ্তের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। ছিদাম, জনার্দন, নরহরি ও নায়েব প্রভৃতির অভিনয়ও ভালো হয়েছে। আদালতের দৃশ্যের আলোকসম্পাত আরেকটু নিখুঁত হলে ভাল হত। গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন সলিল সেন। মূল গল্পটি অক্ষুন্ন রাখার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

বিবিধ সংবাদ

।। আশায় বাঁধিনু ঘর ।।

কনক মুখার্জি প্রযোজিত, রচিত ও পরিচালিত কনক প্রোডাকসন্সের 'আশায় বাঁধিনু ঘর' কলিকাতায় মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও আরো অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে ২৫শে আগষ্ট। পরিচিত জীবনকে কেন্দ্র করে "আশায় বাঁধিনু ঘরে"র কাহিনী গড়ে উঠেছে। রূপদান করেছেন ঃ সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, বিশ্বজিত, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সংগীতা, হরিধন, নৃপতি, কুণাল প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন ভি বালসারা। চণ্ডিমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ চিত্রটির পরিবেশক।

।। স্বাধীনতা উৎসব ।।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে স্বাধীনতার চতুর্দশ বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৫—২১শে আগষ্ট পর্যন্ত চৌরঙ্গী রোড ও থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে নির্মিত কংগ্রেস মণ্ডপে।

১৫ই আগষ্টে কংগ্রেস ভবনে পতাকা উত্তোলিত হয়। ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক জনসভায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। কংগ্রেস মণ্ডপে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষা অভিনীত হয়। ১৬ই আগষ্ট শিল্পী-মৈত্রী সংঘ কর্তৃক অভিনীত হয় শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস'। ১৮ই আগষ্ট অভিনীত হয় বিশ্বরূপা কর্তৃক 'ডাউন ট্রেন'। ২১শে আগষ্ট আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক অভিনীত হয় শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে গুণীজন সম্বর্ধনা জানান হয়। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীবলাইদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীজওহরলাল গংগোপাধ্যায়, শ্রী[illegible]কুমার দস্তিদার এবং অসিতকুমার হালদারকে। বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল উৎসবটির দৈনন্দিন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া—৫ম টেস্ট

ইংল্যান্ড : ২৫৬ (পিটার মে ৭১, কেন ব্যারিংটন ৫৩। ডেভিডসন ৮৩ রাণে ৪, গণ্ট ৫৩ রাণে ৩ এবং ম্যাকেকে ৭৫ রাণে ২ উইকেট)

ও ৩২ (কোন উইকেট না পড়ে, ৩য় দিন পর্যন্ত)

অস্ট্রেলিয়া : ৪৯৪ (পিটার বার্জ ১৮১, নর্মান ও'নীল ১১৭, ব্রেন বুথ ৭১, সিম্পসন ৪০। স্ট্যাথাম ৭৫ রাণে ৩, এলেন ১৩৩ রাণে ৪, ফ্ল্যাভেল ১০৫ রাণে ২ উইকেট)

[তৃতীয় দিনের (১৯শে আগষ্ট) খেলা পর্যন্ত]

ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে জয়লাভের পুরস্কার কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' লাভ। তবে এ পুরস্কার বিতরণ করার কোন রীতি নেই। ১৯৬১ সালের টেস্ট সিরিজে 'এ্যাসেজ' পুরস্কার লাভের মীমাংসা ৪র্থ টেস্ট খেলাতেই হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়া ৪র্থ টেস্টে ৫৪ রাণে জয়ী হলে 'এ্যাসেজ' পুরস্কার তাদের হাতেই থেকে যায়। ইংল্যান্ড এই সম্মান পুনরুদ্ধার করতে না পারায় দেশের লোকের কাছে যথেষ্ট মুখনাড়া খেয়েছে। ৫ম টেস্টে ইংল্যান্ড জয়লাভ করলেও দুই দেশের অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী 'এ্যাসেজ' খেতাব অস্ট্রেলিয়ার, সেক্ষেত্রে টেস্ট সিরিজটা ড্র যাবে মাত্র। 'এ্যাসেজ' বেহাত হয়েছে, শেষ আশা 'রাবার' ড্র—তাই সই। এই অবস্থায় ইংল্যান্ড ৫ম টেস্টে টসে জয়ী হয়ে খেলতে নামে। পাঁচদিনের টেস্ট খেলার তিন দিন গত হয়েছে। বাকি মাত্র দুদিন। গত তিনদিনের খেলায় ইংল্যান্ড ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ৫ম টেস্টে ইংল্যান্ডের জয়লাভের আশার বাতি নিবে গেছে। এখন একমাত্র ভরসা যদি কিছু অঘটন ঘটে যায়—যার জন্যে ক্রিকেট খেলা চির প্রসিদ্ধ। তার আগে ইংল্যান্ডকে ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ২য়

ও' নীল

পিটার বার্জ

ইনিংসে ২৩৮ রাণ তুলতেই হবে; কোন উইকেট না হারিয়ে ৩য় দিনের শেষ ৫০ মিনিটের খেলায় ৩২ রাণ তুলেছে। খেলাটা ড্র যেতে পারে যদি ইংল্যান্ড ১ম টেস্ট খেলার মত প্রচুর রাণ তুলতে পারে—অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে চরম ব্যর্থতা দেখা দেয় —অথবা অস্ট্রেলিয়া গা এলিয়ে দেয়, এখনও পর্যন্ত খেলায় যার কোন আভাস পাওয়া যায়নি। আর শেষ ভরসা বরুণ দেবের কৃপা লাভ। তাঁর উপর কারও হাত নেই। বৃষ্টির দরুণ খেলা ভণ্ডুল হওয়া ছাড়া খেলায় যদি অন্য কোন রকম অঘটন ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে এই শেষ টেস্ট খেলাও ভাঙ্গা হাটে যথেষ্ট আসর গরম করবে।

৫ম টেস্টে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক পিটার মে টসে জয়ী হ'ন। কিন্তু রান করার উপযুক্ত পীচ পেয়েও ইংল্যান্ড প্রথম দিনের ৫½ ঘন্টার খেলায় ২১০ রানের বেশী তুলতে পারে নি। খেলার সূচনাতেই ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটে। ইংল্যান্ডের মাত্র ২০ রানের মধ্যে ৩ জন—পুলার (৮), সুব্বা রাও (১২) এবং কলিন কাউড্রে (০) আউট হন। ১ম উইকেট পড়ে দলের ১৮ রানে, ২য় উইকেট ২০ রানে এবং আর কোন রান যোগ না হয়েই ৩য় উইকেট পড়ে যায়। প্রথম ৪৫ মিনিটের খেলায় তিনজন নামজাদা খেলোয়াড় আউট—১৮ থেকে ২০ রানের মধ্যে। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে খেলেছিলেন মে এবং ডেক্সটার। এই জুটি ভেঙ্গে যায় দলের ৬৭ রানে; লাঞ্চের শেষ ওভারে ডেক্সটার লোভ সামলাতে না পেরে উইকেট থেকে গল্টের একটা দূরে পাল্লার বল মারলেন; সেই মারই তাঁর কাল হ'ল—গ্রাউট ধরে ফেললেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের ৪টে উইকেট পড়ে রাণ হ'ল মাত্র ৬৭। খোস মেজাজ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া লাঞ্চ খেতে গেল।

লাঞ্চের পর সারে কাউন্টি দলের দুই খেলোয়াড়—মে এবং ব্যারিংটনের ৫ম উইকেটের জুটি মাঠে খেলতে নামে। এই জুটিই ইংল্যান্ডের পতন রোধ ক'রে ১১০ মিনিট টিকে থাকে। চা-পানের ১৫ মিনিট আগে দলের ১৪৭ রানে ৫ম উইকেটের জুটি ভেঙ্গে গেল—মে নিজস্ব ৭১ রান ক'রে বেনোর বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে ক্যাচ তুলে লরীর হাতে ধরা দিলেন। ৪র্থ টেস্টের ২য় ইনিংসে মে

ডেভিডসন

'গোল্লা' ক'রেছিলেন। এবার তাঁর ৭১ রানের মধ্যে 'বাউণ্ডারী' ছিল ১১টা। এই রান তুলতে সময় লেগেছিল ৩ ঘণ্টা ৩ মিনিট। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি ব্যারিংটন এবং মারে খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলতে থাকেন। চা-পানের বিরতির সময় ৫ উইকেট পড়ে ইংল্যাণ্ডের ১৫২ রান দাঁড়ায়। দলের ১৯৩ রানে ব্যারিংটন অফ্‌-ষ্টাম্প থেকে গন্টের একটা দূরের বলে খোঁচা মারলেন—গ্রাউট এ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না—বলটা লুফে নিলেন। ডেক্সটার, মে এবং ব্যারিংটন এই তিনজনই অযথা বল মেরে একইভাবে আউট হয়েছেন, লোভ সামলাতে পারেন নি। অতি লোভ করার ফল হাতে-নাতে পেয়েছেন।

খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ইংল্যাণ্ডের ৮টা উইকেট পড়ে ২১০ রান ওঠে।

খেলার ২য় দিনে ইংল্যাণ্ডের শেষের দিকের তিনজন খেলোয়াড় ষ্ট্যাথাম, ফ্ল্যাভেল এবং এলেন বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ সঞ্চার করেন। প্রখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক এলেক্স ব্যানিষ্টার ইংল্যাণ্ডের বোলার ফ্ল্যাভেলের খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'তাঁর (ফ্ল্যাভেলের) মারগুলির বিশেষত্ব ছিল; এই মারগুলির আঞ্চলিক নাম 'Worcestershire wallop'। এম, সি, সির ক্রিকেট খেলা শিক্ষার বইতে এ মারের নাম-গন্ধ নেই।' অস্ট্রেলিয়া এই দিন কয়েকটা সহজ ক্যাচ নষ্ট করে। ২য় দিনে ৪৮ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ডের পূর্ব দিনের ২১০ রানের সঙ্গে ৪৬ রান যোগ হ'লে ১ম ইনিংস ২৫৬ রানে শেষ হয়। ডেভিডসন ৮৩ রানে ৪টে এবং গন্ট ৫৩ রানে ৩টে উইকেট পান। উইকেট রক্ষক গ্রাউট ৪টে ক্যাচ লুফেন। পীচ খেলোয়াড়দের পক্ষে কবরস্থান ছিল না—রান করার উপযুক্ত পীচ ছিল। তবুও ইংল্যাণ্ড ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ৯ম উইকেটের জুটিতে এলেন এবং ষ্ট্যাথাম আধঘণ্টার খেলায় দলের ২৮ রান তুলে দেন। এলেন শেষ পর্যন্ত ২২ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

ইংল্যাণ্ডের মতই অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের সূচনায় বিপর্যয় দেখা দেয়। দলের কোন রান উঠেনি, অতি নির্ভর-শীল ব্যাটসম্যান উইলিয়াম লরী কট-আউট হলেন ষ্ট্যাথামের বলে। সিম্পসনের সঙ্গে হার্ভে যোগ দিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ খেলতে পারলেন না; দলের মাত্র ১৫ রানের মাথায় নিজস্ব ১৩ রান ক'রে ফ্ল্যাভেলের বল প্যা দিয়ে আটকানোর অপরাধে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। ১৫ রানে অস্ট্রেলিয়ার দু'জন খ্যাতনামা ব্যাটসম্যানের বিদায়—ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খুবই আশার কথা। ইংল্যাণ্ডের সমর্থকেরা আরও আনন্দ ও আশায় গড়িয়ে পড়লো যখন অস্ট্রেলিয়ার ৮৮ রানের মাথায় সিম্পসন বিদায় নিলেন। ৪র্থ উইকেটে জুটি হ'লেন নর্মান ও'নীল এবং পিটার বার্জ। এ'রা দুজনে অস্ট্রেলিয়ার পতন রোধ করলেন।

লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার ২ উইকেট পড়ে ৪৯ রান ছিল। ৩য় উইকেটের জুটিতে ও'নীল এবং সিম্পসন দলের ৭৩ রান যোগ করেন। চা-পানের সময় ৩ উইকেট পড়ে ১৬৬ রান দাঁড়ায়। উই-কেটে ছিলেন ও'নীল এবং বার্জ। লাঞ্চের পরবর্তী ২ ঘণ্টার খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১১৭ রান ওঠে। দলের ২১১ রানের মাথায় ও'নীল নিজস্ব ১১৭ রান ক'রে এলেনের বলে 'কট-আউট' হ'ন। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে, প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরে এসে নর্মান ও'নীলের এই প্রথম সেঞ্চুরী; শুধু তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় তাঁর এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী: এ পর্যন্ত ও'নীল ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১০টা টেস্ট খেলেছেন। সর্বসমেত তাঁর ২৩টা টেস্ট খেলায় ৫টা সেঞ্চুরী হ'ল। টেস্ট খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ১৮১ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ঐতি-হাসিক প্রসিদ্ধ ১ম টেস্ট, ব্রিসবেন, ১৯৬০-৬১)।

ও'নীলের ১১৭ রানের মধ্যে বাউ-ণ্ডারী ছিল ১৪টা। ১৬৮ মিনিটে শত-রান পূর্ণ ক'রে টেস্ট সিরিজে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শতরাণ করার কৃতিত্ব হিসাবে ও'নীল ৪00 ষ্টার্লিং পুরস্কার পেয়ে-ছেন। যদিও তিনি দু'বার নিজস্ব ১৯ রান এবং ৭১ রানের মাথায় আউট হওয়ার হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছিলেন, তবু তাঁর খেলাকে এ দু'টি ঘটনা কোন-মতেই নিষ্প্রভ করতে পারে না। তিনি একজন কুশলী ব্যাটসম্যানের পর্যায়ে খেলেছিলেন—তাঁর ২00 মিনিটের খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট অনুরাগী দর্শকসাধারণ ও'নীলের খেলা দেখার জন্যে এতদিন ধৈর্য ধরে-ছিল। ও'নীল তাদের নিরাশ করেন নি। ও'নীল এবং বার্জের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে অস্ট্রেলিয়ার ১২৩ রান ওঠে। ২য় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্ধারিত সময়ে অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ২৯০, ৪টে উইকেট পড়ে। ৫ম উইকেটের জুটিতে বার্জ ৮৬ এবং বুথ ৩৩ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার হিসাবে অস্ট্রেলিয়া ৩৪ রানে এগিয়ে যায়, হাতে জমা থাকে ৫টা উইকেট।

ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব অধিনায়ক কলিন কাউড্রে অসুস্থতার দরুন দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামেন নি। তাঁর স্থানে খেলেছিলেন সারে দলের মাইক স্টিওয়ার্ট, যিনি এ্যালেনের বলে ও'নীলকে লুফেছিলেন।

খেলার ৩য় দিনে পূর্ব দিনের খেলোয়াড় বার্জ (নট আউট ৮৬) এবং বুথ (নট আউট ৩৩) সুরু থেকেই ইংল্যাণ্ডের বোলারদের পিটিয়ে খেলতে লাগলেন, কোন রকম দয়া-মায়া করলেন না—না কোন ভ্রূক্ষেপ।

লাঞ্চের সময়ে অস্ট্রেলিয়াব বাণ দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৩৮৬। এই দিনের দেড় ঘণ্টার খেলায় বার্জ এবং বুথ ৯৬ রাণ তুলে দেন—উভয়ের জুটিতে মোট ১৭৫ রাণ দাঁড়ায়। অস্ট্রেলিয়া ১৩০ রাণে অগ্রগামী হয়।

লাঞ্চের পর আর কোন রাণ না করে বুথ নিজস্ব ৭১ রাণে আউট হন লকের বলে সুব্বা রাওয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে। এই সময় দলের রাণ ছিল ৩৯৬। বার্জের নট আউট ১৫০ রাণ। বুথ এবং বার্জের ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ১৮৫ রাণ ওঠে। বুথ ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট খেলে ১২টা 'বাউণ্ডারী' মার দিয়ে-ছিলেন।

৬ষ্ঠ উইকেটে বার্জের সঙ্গে ম্যাক্‌কে জুটি বাঁধেন। কিন্তু মাত্র ৫ রাণ ক'রে দলের ৪০১ রাণের মাথায় উইকেট-কীপার মারের হাতে একটা অতি সহজ ক্যাচ তুলে দিয়ে আউট হন।

অস্ট্রেলিয়ার যখন ৪১৪ রাণ, তখন চারিদিক অন্ধকার করে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমে খেলাটা বন্ধ করে দেয়। খেলছিলেন ৭ম উইকেটের জুটি বার্জ (১৬০ রাণ) এবং ডেভিডসন (৩ রাণ); মাঠের খেলোয়াড়রা মাথা বাঁচাতে ছুট দিলেন প্যাভিলিয়নের দিকে।

চা-পানের সময় অস্ট্রেলিয়ার রাণ ছিল ৭ উইকেটে ৪৪৭। বার্জ ১৭৪ এবং বেনো ১। দলের ৪৪৯ রাণে ডেভিডসন ১৭ রাণ করে এবং দলের

স্ট্যাথাম

৪৫৫ রাণে বেনো ৬ রাণ ক'রে আউট হন।

দলের ৪৭২ রাণের মাথায় ৯ম উইকেট পড়লো। শুধু ৯ম উইকেটের পতন তো নয়—মহাগুরু পতন—পিটার বার্জ নিজস্ব ১৮১ রাণ করে আউট হলেন। তাঁর এই ১৮১ রাণ উভয় দলের মধ্যে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ; তাছাড়া এ মরসুমের ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষেও সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ। এজবাস্টনের ১ম টেস্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের টেড ডেক্সটারের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণের (১৮০) গর্ব ভেঙ্গে যায়। পিটার বার্জ খেলেছিলেন ৬ ঘন্টা ৫০ মিনিট। বাউণ্ডারীর ওপারে বল মেরেছিলেন ২২ বার। বার্জ এ

কেন ব্যারিংটন

পিটার মে

পর্যন্ত ২১টা টেস্ট খেলেছেন এবং টেস্ট খেলায় এই তাঁর ১ম সেঞ্চুরী (১৮১ রাণ)।

৫০ মিনিট খেলার সময় বাকি থাকতে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৪৯৪ রাণে শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া ২৩৮ রাণে অগ্রগামী থাকে। ইংল্যাণ্ড ২য় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ৩২ রাণ করে। এখনও তারা ২০৬ রাণের ব্যবধানে পিছিয়ে আছে। ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডকে আরও ২০৬ রাণ তুলতে হবে। ইংল্যাণ্ডের হাতে জিয়ানো আছে ১০টা উইকেট—খেলার সময় পুরো দু'দিন। ২০শে আগস্ট, রবিবার, বিশ্রামের দিন।

	খেলা	মোট রাণ	মোট সর্বোচ্চ রাণ	সেঞ্চুরী সংখ্যা
নর্মান ও'নীল	২৩	১৭২২	১৮১	৫
পিটার বার্জ	২১	১০০১	১৮১	১

ব্রিটেনে বয়েজ ক্লাবের ভূমিকা

ক্রিস্টোফার চ্যাটাওয়ে
প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ ও বৃটিশ
পার্লামেন্টের সদস্য

যে কোন জাতির ভবিষ্যতের কল্যাণ নির্ভর করছে তার যুবশক্তির ওপর; কিন্তু তা সত্ত্বেও হাজার হাজার যুবক আজ প্রচুর সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও নিজেদের চরিত্র বিকাশের পথ খ'ুজে পাচ্ছে না। — ব্রিটেনের বয়েজ ক্লাবগুলি তাদের এই চরিত্র বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছে। জাতীয় জীবনে এই সব ক্লাবের যে গুরুত্ব রয়েছে তা কোন দিক দিয়ে অস্বীকার করার উপায় নেই। ছেলেদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রেখে খেলাধুলো ও স্ফূর্তির সুযোগ করে দেওয়াই যে ক্লাবগুলির একমাত্র কাজ, তা মনে করলে ভুল হবে; তাদের সত্যকারের কাজ, মেলামেশা ও খেলাধুলোর সুযোগ দিয়ে ছেলেদের শারীরিক শক্তির সঙ্গে মানসিক শক্তি বিকাশে সাহায্য করা এবং তাদের পৌরুষ জাগ্রত করা।

ব্রিটেনে এই ধরণের বয়েজ ক্লাব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬০-এর দশকে; এই সময় শহরের বস্তিগুলির অবস্থা এমন ছিল যে, ছেলেদের সারা দিনই প্রায় রাস্তায় রাস্তায় কাটাতে হত। তারা কখনও দল বেঁধে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়াত, আর কত রকমের বে-

> খেলাধুলো এবং আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে বৃটেনের যুব সম্প্রদায়কে কিভাবে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় এবং চরিত্র গঠনে সহযোগিতা করা হয় তারই সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ক্রিস্টোফার চ্যাটাওয়ে।

আইনী কাজ করে আসত। তাদের দেখাশুনোর কেউ ছিল না বললেই চলে। একদল হিতৈষী সমাজসেবী এই সব ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই ক্লাব গঠনে অগ্রসর হয়ে আসেন; তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল খেলাধুলো এবং আনন্দ-মেলার মাধ্যমে তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করা।

১৯০০ সালের মধ্যে কয়েকটি শহরে ক্লাবগুলিকে নিয়ে কতকগুলি ফেডারেশন গঠন করা হয়। এই সব ফেডারেশনের কাজ সামার ক্যাম্প পরিচালনা করা এবং খেলাধুলো ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং সেই-সঙ্গে প্রয়োজন মত ঔষধপত্র দেবার ব্যবস্থা করা। এ সম্পর্কে ব্রিটেনের যেটি জাতীয় সংস্থা—ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব বয়েজ ক্লাবস্—গঠিত হয় ১৯২৮ সালে। সংস্থাটি অতি সহজে সরকারী সমর্থন লাভ করে এবং সেই সঙ্গে লাভ

করে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং অর্থ সাহায্য।

এসোসিয়েশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সংখ্যা এখন ২,০০০ এবং এছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত আছে প্রায় ৫০টি কাউন্টি এসোসিয়েশন অথবা ফেডারেশন। যাঁরা সংস্থাটির নীতি নির্ধারণ করে থাকেন তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁদের নিয়েই গঠিত হয়েছে সংস্থাটির পরিচালন সংস্থা। ক্লাবের কাজকর্মের বিশেষ দিক যথা ধর্ম, খেলাধুলা এবং কলাশিল্প সম্পর্কে আছে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কমিটি এবং সেই সঙ্গে আছে একটি কার্যনির্বাহক কমিটি যাঁরা এসোসিয়েশনের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সম্পর্কে দায়ী। ক্লাবগুলির বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে দেখার জন্য এবং করণীয় বিষয় স্থির করার জন্য আছে বাৎসরিক সম্মেলনের ব্যবস্থা।

ন্যাশনাল এসোসিয়েশন মনে করেন যে তাঁদের সদস্যগণ যদিও বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে ইচ্ছুক তথাপি তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা মনে করেন ক্লাবের সভাপদ লাভ করে তারা যেন নাগরিকত্ব, নেতৃত্ব এবং নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ক্লাবে নিয়মকানুন বিশেষ কিছু নেই, বেশি নিয়মকানুন থাকাও ভাল নয়। মাত্র দুটি নিয়ম সকলকে মেনে চলতে হয়; প্রথম নিয়ম সকলকে চাঁদা দিতে হবে এবং দ্বিতীয়, ক্লাবকে একটি আদর্শ মিলন স্থল করে গড়ে তোলার জন্য সকলকে চেষ্টা করতে হবে। অন্য যে সমস্ত নিয়ম আছে তা সবই অলিখিত। বেশি নিয়মকানুন ছেলেদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে না, তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে সুযোগ ও প্রভাব।

"ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব বয়েজ ক্লাবস" বিশেষভাবে নেতৃবৃন্দের ট্রেনিং সম্পর্কে উৎসাহী। প্রপশায়ারের (ইংল্যাণ্ড) অন্তর্গত লাডলোর ন্যাশ কোর্টে সংস্থাটি একটি ট্রেনিং কেন্দ্র পরিচালনা করছে; এখানে বয়েজ ক্লাবের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কোর্স এবং সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পুরো সময়ের নেতাদের জন্য এক বৎসরের একটি কোর্স এবং ঐচ্ছিক নেতাদের জন্য কয়েকটি এক সপ্তাহের আবাসিক কোর্স দেশের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়ে থাকে।

সংস্থাটির ট্রেনিং বিভাগে আছে একটি চলমান ট্রেনিং ইউনিট, এই ট্রেনিং ইউনিটের কর্মীরা সকলেই অভিজ্ঞ। ইউনিটটি ব্রিটেনের সর্বত্র বয়েজ ক্লাব লীডারশিপের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় এবং বয়েজ ক্লাবের উদ্দেশ্য প্রচার করে।

বলরাম
ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাবের বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত ১৯৬১ সালের ফুটবল মরশুমের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়।

উইম্বলেডন টেনিসের ইতিহাস

(২)

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য বিস্তার করে ফ্রান্স। এই সময়ে ফ্রান্সকে আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলার শীর্ষদেশে নিয়ে যায় ফ্রান্সের বিশ্বখ্যাত 'Four Musketeers'—বোরোত্রা, লাকোস্ত, কোশে এবং ব্রুঁয়ো। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন দুবার করে সিঙ্গলস খেতাব পান। ব্রুঁয়ো ছিলেন ডাবলসের খেলায় ওস্তাদ খেলোয়াড়। তিনি মোট ৪ বার খেতাব পান—বোরোত্রা এবং কোশের সঙ্গে জুটি বেঁধে। বোরোত্রা পান ৩ বার—একবার লাকোস্ত এবং দুবার ব্রুঁয়োর সঙ্গী হয়ে।

উইম্বলেডন লন্‌ টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে চার ভাইয়ের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [illegible] এফ্‌ ডোহার্টি এবং এইচ এল ডোহার্টি এবং দুই যমজ ভাই ডবলউ রেনশ এবং ই রেনশ।

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৬ সাল, এই ৯ বছরের মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলায় আর এফ ডোহার্টি খেতাব পান ৪ বার (১৮৯৭-১৯০০) এবং এইচ এল ডোহার্টি ৫ বার (১৯০২-১৯০৬)। ডাবলসের খেলায় ডোহার্টি ভাইদের জুটি মোট ৮ বার (পর্যায়ক্রমে ৫ বার—১৮৯৭—১৯০১ এবং ১৯০৩ থেকে ১৯০৫) ডাবলসে জয়ী হয়ে প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক বার জয়লাভের রেকর্ড করেছেন। রেনশ যমজ ভাইদের মধ্যে ডবলউ রেনশ সিঙ্গলস খেতাব পান মোট ৭ বার, তার মধ্যে ৬ বার পর্যায়ক্রমে (১৮৮১ থেকে ১৮৮৬)। ই রেনশ মাত্র একবার সিঙ্গলসে জয়ী হন (১৮৮৮)। ডোহার্টি ভাইদের মত রেনশ যমজ ভাই দু'জনও ডাবলসে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন,—তাঁরা মোট ৭ বার জয়ী হয়েছেন (১৮৮০-৮১; ১৮৮৪-১৮৮৬; ১৮৮৮-১৮৮৯)।

মহিলাদের ডাবলসের খেলায় ফ্রান্সের রাইন ১২ বার খেতাব পেয়ে সর্বাধিক জয়লাভের রেকর্ড করেছেন। লেংলেনের জুটিতে পান ৬ বার (১৯১৯-১৯২৩; ১৯২৫) এবং আরও ৬ বার পান বিভিন্ন খেলোয়াড়দের জুটিতে।

রাইনের ডাবলসের জুটি লেংলেন উপর্যুপরি ৫ বার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন, কিন্তু রাইন একবারও না। রাইন মিক্সড ডাবলসে ৭ বার এবং লেংলেন ৩ বার জয়লাভের গৌরব লাভ করেন। উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় রাইন ১৯টি খেতাব পেয়ে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক খেতাব লাভের রেকর্ড করেছেন—এ পর্যন্ত কোন মহিলা বা পুরুষ খেলোয়াড় এত খেতাব পাননি। উইম্বলেডনের ইতিহাসে ১৯১৯ সাল বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছরই অস্ট্রেলিয়ার প্যাটারসন টেনিস খেলায় 'Cannon ball' সার্ভিস প্রথা প্রথম চালু করেন।
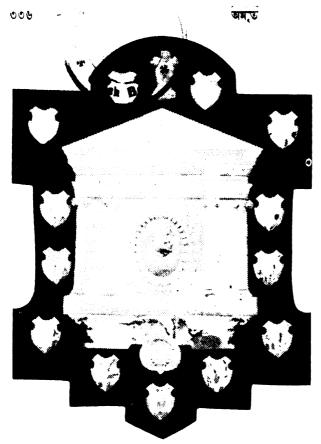
উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভে

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের ফুটবল খেলায় মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দল যুগ্মভাবে ডঃ হরেন্দ্রকুমার স্মৃতি ট্রফি জয়ী হয়েছে।

বৃটেনের রাজপরিবারের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা এবং আন্তরিক আগ্রহ লাভ করে। ১৯২৬ সালের প্রতিযোগিতায় ডিউক অব ইয়র্ক (পরবর্তীকালে রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ) ডাবলসের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরলোকগত রাণী মেরী উইম্বলেডন প্রতিযোগিতার প্রায় প্রতিটি খেলায় উপস্থিত থাকতেন।

উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য অপেশাদার খেলোয়াড়দের সাফল্য নিয়ে, সেখানে পেশাদার খেলোয়াড়রা একঘরে। টেনিসে পেশাদার খেলোয়াড় সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে উইম্বলেডনের ধুরন্ধর চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়দের নিয়ে। উইম্বলেডনে চ্যাম্পিয়ানসীপ খেতাব পেলেই পেশাদার সম্প্রদায় থেকে ডাক আসে—মোটা টাকার চুক্তিপত্র নিয়ে। ফলে উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় বেশীর ভাগ চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়কে একবারের বেশী দেখা যায় না। খেলার মান নিম্নগামী হওয়ার প্রধান কারণ তাই। উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় দর্শকদের আসনে ভাটা না পড়লেও, কর্মকর্তাদের ধারণায় নিকট ভবিষ্যতে পেশাদার সম্প্রদায়ের খেলায় দর্শকদের ভীড় বেশী হবে আর উইম্বলেডন হবে ভাঙ্গা হাট। তাই তাঁরা মহা-চিন্তায় পড়েছেন। এতদিন যাঁরা পেশাদার খেলোয়াড়দের ছায়া মাড়াতে চাননি তাঁরা কোমর বেঁধে এগিয়ে এসেছেন পেশাদার এবং অপেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যিকার দেওয়াল ভেঙে ফেলার জন্যে। কথাটা 'ভূতের মুখে রাম নাম' উচ্চারণের মতই শোনায়। চেষ্টা অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। ইংল্যান্ড এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্যোক্তা। অস্ট্রেলিয়া প্রথম দিকে ইংল্যান্ডের প্রস্তাবে মত দিলেও পরে কিন্তু বেঁকে বসে—অপেশাদার এবং পেশাদার খেলোয়াড়রা একসঙ্গে খেলবে তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। গত জুলাই মাসে ষ্টকহলমে অনুষ্ঠিত 'ইন্টার ন্যাশন্যাল লন টেনিস ফেডারেশনে'র অধিবেশনে অধিকসংখ্যক ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি টুর্ণামেন্টে অপেশাদার খেলোয়াড়দের সঙ্গে পেশাদারদের যোগদান করতে দেওয়া হবে। ফেডারেশনের ১৯৬২ সালের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রতিযোগিতায় পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে একটি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অল্-ইংল্যান্ড ক্লাব এবং লন্ডনের লন্ টেনিস এসোসিয়েশন যৌথভাবে উইম্বলেডন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে। ১৯৬২ সালের উইম্বলেডন প্রতিযোগিতা কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। আগামী বছর থেকেই হয়ত উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পুরাতন ঐতিহ্যের শেষ অধ্যায়; পেশাদার খেলোয়াড়রা যোগদান করলে প্রতিযোগিতা এক নতুন জীবনের দিকে পদক্ষেপ করবে।

।। তরুণ খেলোয়াড়ের জীবনাবসান ।।

খেলার মাঠে দুর্ঘটনার অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের কাছে এমন একটি দুর্ঘটনার খবর এসেছে যা সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায় না। ষোল বৎসরের তরুণ পরিমল বসাক খেলার মাঠে বিনা আঘাতেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন; তারপর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজপুর সাধারণ সম্মিলনীর এই তরুণ খেলোয়াড় হরিনাভি মাঠে কুমুদিনী ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় যোগদানকালে এই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ১৯।৮।৬১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্প্রতি প্রকাশিত

'বনফুল'-এর উপন্যাস **হাটে বাজারে** ৩·৫০ : **স্থাবর** ৮·০০ ॥ নবেন্দু ঘোষের গল্পগ্রন্থ **পঞ্চম রাগ** ৩·২৫ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ **কোকিল ডেকেছিলো** ৩·৩৫ ॥ দিলীপকুমার রায়ের **স্মৃতিচারণ** (আত্ম-কাহিনী) ১২·০০ ॥ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের **ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা** ২·৫০ ॥ ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের **নিজের ডাক্তার নিজে** ২·৭৫ ॥ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের **ক্যাকটাস** (সরস প্রবন্ধ গ্রন্থ) ৩·০০ ॥ কাজী আবদুল ওদুদের **শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর** (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতামালা) ৪·০০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর **ফানুস ফাটাই** (সরস প্রবন্ধ গ্রন্থ) ২·৫০ ॥ বিমল মিত্রের (ছোটদের উপন্যাস) **মৃত্যুহীন প্রাণ** (সচিত্র) ২·৭৫ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সদাশিবের হৈ হৈ কান্ড** (সচিত্র—সদাশিবের কাহিনী) ১·৫০ ॥ শৈলেন বিশ্বাসের (ছোটদের জন্য) **মহাভারত** (সচিত্র) ৩·০০ ॥ বাণী রায়ের (ছোটদের উপন্যাস) **সেই চেনা ছেলেটি** (সচিত্র) ১·৭৫ ॥

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের (কাব্যগ্রন্থ) **সাগর থেকে ফেরা** (নবম মুদ্রণ) ৩·০০ ॥ দিলীপকুমার রায়ের **অঘটন আজো ঘটে** (পঞ্চম সংস্করণ) ৫·৫০ ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **স্বনির্বাচিত গল্প** (তৃতীয় মুদ্রণ) ৪·০০ ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উপন্যাস) **দেবকন্যা** (তৃতীয় সংস্করণ) ৪·৫০ ॥

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

২২শে শ্রাবণের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কাব্যগ্রন্থ
কখনো মেঘ ৪·০০

কানাই সামন্তের
প্রবন্ধ গ্রন্থ
রবীন্দ্র প্রতিভা ১০·০০

সদ্য প্রকাশিত

নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস
প্রথম বসন্ত ২·৫০

অজিতকৃষ্ণ বসুর উপন্যাস
সানাই ২·৫০

মাহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা ৪·০০

ছো ট দে র ব ই

উপন্যাস :: লীলা মজুমদারের **হলদে পাখীর পালক** ২·০০ : **গুপির গুপ্ত খাতা** ২·০০ : **বক-ধার্মিক** ১·৭৫ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **পোনুর চিঠি** ২·০০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর **বর্মার মামা** ২·২৫ ॥ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের **কাদম্বরীর কথা** ২·২৫ ॥ জয়ন্ত চৌধুরীর **হাওয়া বদল** ৩·০০ ॥ গিরীন্দ্রশেখর বসুর **লাল কালো** ৩·০০ ॥ অনাথনাথ বসুর **ছোটদের কঙ্কাবতী** ১·০০ ॥ প্রশান্ত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরীর **ছুট্** ('জন্মতিথি' কথাচিত্রে রূপায়িত) ২·২৫ ॥ বিমল মিত্রের **মৃত্যুহীন প্রাণ** ২·৭৫ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সদাশিবের হৈ হৈ কান্ড** ১·৫০ ॥ বাণী রায়ের **সেই চেনা ছেলেটি** ১·৭৫ ॥

গল্পগ্রন্থ :: প্রেমেন্দ্র মিত্রের **ঘনাদার গল্প** ৩·০০ : **অদ্বিতীয় ঘনাদা** ২·৭৫ ॥ 'বনফুল'-এর **রঙ্গনা** ২·৫০ : **করবী** ১·৭৫ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর **নিখরচায় জলযোগ** ২·০০ : **ভুতুড়ে-অদ্ভুতুড়ে** ১·৭৫ : **চুলচেরা শোধবোধ** ২·০০ : **হাস্নুহানা** ২·৫০ ॥ রবীন্দ্র মৈত্রের **মায়াবাঁশী** ১·৫০ ॥ সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর **হিন্দুস্থানী উপকথা** ৩·২৫ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **হেসে যাও** ২·০০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **তালনবমী** ২·৫০ ॥ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের **রূপকথার ঝাঁপি** ২·২৫ ॥ পশুপতি ভট্টাচার্যের **সুদূর দেশের রূপকথা** ২·০০ ॥ প্রতিভা বসুর **সবচেয়ে যা বড়** ১·৫০ ॥ বুদ্ধদেব বসুর **রান্না থেকে কান্না** ১·৭৫ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষ** ২·০০ ॥ **চলা গল্প-নিকেতনে** ২·৫০ ॥ বিশ্বনাথ দে সংকলিত **শুধু হাসির গল্প** ৫·০০ ॥ সুধীর সরকারের **বোমা** ২·৫০ ॥ সুখলতা রাওয়ের **নানান গল্প** ২·০০ ॥ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **বাঘের লুকোচুরি** ২·০০ ॥ স্বামী প্রেমঘনানন্দের **উপনিষদের গল্প** ১·০০ : **রামকৃষ্ণের গল্প** ১·০০ ॥

বিবিধ :: শৈল চক্রবর্তীর **ছোটদের ক্র্যাফ্‌ট্** ২·৫০ ॥ অচিনকুমার চক্রবর্তীর **পৃথিবীর রূপান্তর** ১·৫০ : **সমাজ-সেবীর দিনলিপি** ১·৫০ ॥ প্রভাত বসুর **গান্ধীজীর গল্প** ০·৫০ ॥ অনাথনাথ বসুর **গান্ধীজী** ১·৫০ ॥ বিধুভূষণ শাস্ত্রীর **ছোটদের চন্ডী** ০·৬২ : **ছোটদের গীতা** ০·৬২ ॥ 'অ-কৃ-ব'র **খামখেয়ালী ছড়া** ১·৫০ ॥ শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের **বাল্মীকি রামায়ণ** ২·৫০ : **মহাভারত** ৩·০০ ॥

খেলাধুলার বই :: শ্রীখেলোয়াড়ের **জগৎজোড়া খেলার মেলা** (১ম ভাগ) ২·৫০ : (২য় ভাগ) ২·০০ : (৩য় ভাগ) ২·০০ ॥ **খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা** ৩·২৫ ॥ **খেলাধুলায় সাধারণ জ্ঞান** ১·২৫ (বোর্ড বাঁধাই) ১·৫০ ॥ **বিশ্বক্রীড়াঙ্গণে স্মরণীয় যাঁরা** (১ম) ৩·৫০ : (২য়) ৩·৫০ ॥ **ক্রিকেটের রাজকুমার** ২·৫০ ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৫

সূচীপত্র

যেকোন হাঁপানি ও কাসি
চিরদিনের মত দূর করিতে পারে একমাত্র
মন্ত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৮১	বিবাগী ভ্রমর (উপন্যাস)	—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
৩৮৮	ফ্রিডম রাইডারস্	—শ্রীমনকুমার সেন
৩৯১	দু' পাশে দর্পণ (গল্প)	—শ্রীকবিতা সিংহ
৩৯৬	প্রতিবেশী সাহিত্য	
	দর্শনের ছবি (গুজরাতী গল্প)	—শ্রীশিউকুমার জোশী
৩৯৮	দেশে-বিদেশে	
৪০১	ঘটনা-প্রবাহ	
৪০২	সমকালীন সাহিত্য	—শ্রীঅভয়ংকর
৪০৮	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
৪১৪	খেলাধুলো	—শ্রীদর্শক

অমৃত

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নঃ পঃ
শুক্রবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 1st September, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

একথা নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিখ সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ দান আছে এবং সেই দান অতুলনীয় ত্যাগস্বীকারের, মহৎ বীর্যবত্তার এবং গভীর দেশপ্রেম ও ধর্মপ্রাণতার। সুতরাং শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতবর্ষের জনগণের মনোভাব শ্রদ্ধার ও প্রীতির। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইবার ফলে এবং ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাঙলার মত পাঞ্জাবও ভাসিয়া গেল। আজ খণ্ডিত এবং পূর্ব-পাঞ্জাবই ভারত রাষ্ট্রে পাঞ্জাব রাজ্য নামে অভিহিত। মাষ্টার তারা সিং এই ক্ষুদ্রায়তন পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী নেতা, তিনি বর্ষীয়ান, ৭৫ বছরের উপরে তাঁর বয়স। অর্থাৎ বয়স, প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের জন্য তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে আমৃত্যু অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে, স্বভাবতঃই তাঁর জীবন সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে এই বিপজ্জনক অনশন পরিত্যাগ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। মাষ্টারজীর উচিত এই আবেদনে সাড়া দেওয়া এবং অনশন পরিত্যাগ করা। অন্যথা এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের আগেই তাঁর জীবন সম্পর্কে কঠিন সংকট দেখা দিতে পারে।

ভারতের শিখ সম্প্রদায় এবং তার বর্ষীয়ান নেতা মাষ্টার তারা সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমরা একথা বলিতে বাধ্য যে, তাঁর পৃথক পাঞ্জাবী বা শিখ সুবার দাবী ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। অনশনে রামালুর মৃত্যুর পর পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ তেলেগু ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু সেখানে ভাষার দাবীটা যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবী সুবার দাবীর পিছনে ভাষাগত ন্যায়-বিচারের প্রশ্ন বড় নহে—পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের মধ্যে ভাষা ও সমাজগত বৈষম্যও মৌলিক নহে। সুতরাং এই ধরণের দাবীর নিকট নতিস্বীকার করিয়া যদি খণ্ডিত পাঞ্জাবকে আবার দুই টুকরা করিতে হয়, তবে, উহা এক বিপজ্জনক নজীর হইবে। কারণ, ভারতবর্ষের অন্যান্য যে কোন সম্প্রদায় এই নজীরের দাবীতে অন্য যে কোন রাজ্যকে আবার খণ্ডন করার আব্দার তুলিতে পারে। এভাবে টুকরা টুকরা বিভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (যাহা একটা জেলার মত) রাজ্যের সৃষ্টি গোটা ভারতবর্ষের পক্ষে নানা দিক দিয়া অনিষ্টকর। প্রশাসনিক এবং আর্থিক দিক দিয়াও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে উহা প্রকাণ্ড অন্তরায়স্বরূপ হইবে। এজন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে লোকসভায় দাঁড়াইয়া পৃথক পাঞ্জাবী সুবার দাবী দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, খণ্ডিত পাঞ্জাবকে আবার খণ্ডন করা সম্ভব নয় এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যে মূলনীতি স্বীকার করা হইয়াছিল, উহারও একটা সীমা আছে এবং ভাষা ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রশ্ন বিচার করার আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে কোন রাজ্যই একভাষী নহে এবং প্রত্যেক রাজ্যেই বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমষ্টির বাস। সুতরাং একমাত্র ভাষাগত রাজ্য-গঠনের দাবী লইয়া বাড়াবাড়ি করা সম্ভব নহে। কারণ, এরূপ দাবীর কোন সীমা নাই এবং এমন অসংখ্য দাবী মানিয়া লইতে গেলে ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতি গড়িয়া তোলা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিশ্চয়ই যুক্তি-হীন নহে। যদি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পরাধীন ভারতে পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায় পাশাপাশি সদ্ভাবে বসবাস করিয়া থাকিতে পারেন, তবে, স্বাধীন ভারতবর্ষেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন? বিশেষতঃ বর্তমান পাঞ্জাব ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী। সেখানে মাথাপিছু জনগণের আয় ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেক বেশী। এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংহতির উপর নূতন করিয়া পার্টিশানের আঘাত হানিলে পাঞ্জাবের মূল ভিত্তি নাড়িয়া যাইবে এবং অনেক দিক দিয়া নূতন বিপর্যয় দেখা দিবে। এই প্রসঙ্গে অনশনের ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য নিয়া এক্ষণে আর আলোচনায় লাভ নাই। কারণ, মাষ্টারজী সেই বিপদের পথে পা বাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁর প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ, যুক্তিহীন দাবীতে আমৃত্যু অনশনের সঙ্কল্প নূতন গৌরব ডাকিয়া আনিবে না। বর্তমান ভারতবর্ষে ভাষাগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, মাষ্টার তারা সিংয়ের মত প্রতিষ্ঠাবান নেতাদের উচিত এই বিভেদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ানো। বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখেরা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের চেয়ে সম্ভবতঃ অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। নূতন জাতি হিসাবে তাঁরা বৈষয়িক এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগামী। সুতরাং শিখদের উপর কোন অবিচার হইতেছে, এমন কথা কল্পনা করাও কঠিন। সুতরাং মাষ্টার তারা সিং এবং শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের আবেদন এই যে, তাঁরা সুস্থ ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে আগাইয়া আসুন। অনশন ও বিভেদের পথ ত্যাগ করিয়া তাঁরা নতুন ভারতকে অন্ততঃ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দিন।

জাগতে হবে

বনফুল

এবার তোকে জাগতে হবে
এবার কাজে লাগতে হবে।

আর কত কাল ব্যাঙের লাথি
খাবি রে তুই ওরে হাতি
শত্রু-শিরে ধরে' ছাতি
আর কত কাল থাকবি নফর
আর কত কাল এমন করে'
খুঁড়বি রে তুই নিজের কবর।

মিথ্যা-পুজোয় আর কত কাল
বাজাবি তুই ঘণ্টা-ঝাঁঝর
আর কত কাল জ্বালবি মশাল
পুড়িয়ে নিজের বুকের পাঁজর।

আত্মভোলা ওরে ঈশান
কোথা রে তোর রুদ্র বিষাণ
সতীকে তোর খাচ্ছে ছিঁড়ে
খোলা মাঠে শকুন শেয়াল
ঝুটা জটা বাঘাম্বরে
থিয়েটারী আড়ম্বরে
অনেক কাল যে কাটিয়ে দিলি
এখনও কি নেইকো খেয়াল।

স্বরূপ কবে দেখাবি তুই
কবে রে তোর হবে রে হুঁস
বলবি কবে, নইকো পশু
পাথরও নই, আমি মানুষ।
আমার দাবী প্রাণের দাবী
মনের দাবী মানের দাবী
প্রাণের দাবী মানের দাবী
আমার দাবী মানের দাবী
রাখিয়ে তবে ছাড়ব আমি
আমায় মনে রাখতে হবে।

ইতিহাসের পাতায় সেটা
রক্ত-রঙে দাগতে হবে
এবার তোকে জাগতে হবে।

নতুন চিহ্ন

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

পিছু টানে বিশ্বাসী নই মোটেই
বিন্দুমাত্র নেইকো অভিলাষ
স্মৃতির কবর খুঁড়তে কোনো মতেই;
বর্তমানেই একান্ত বিশ্বাস।

ভবিষ্যৎ কী হাতের মুঠোয় থাকে,
আহা, যদি থাকতো একটি বার
জানতে যদি পারতেম সেই বাঁকে
কি আছে কি নেই তা বারংবার।

বর্তমানেই ফুল পাখি গাছপালা;
অন্ধকার, ও গন্ধরাজের মালা;
এবং আলো, কিংবা যদি জ্বালা
যা হোক তবু একান্ত নির্ভয়......

ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের আয়ু
হয়তো ঘূর্ণী, নয় অনুকূল বায়ু
ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের জয়
বর্তমানেই একান্ত বিশ্বাস......

দুঃখ তবু দুঃখী তো নয় হৃদয়
ফুল ফোটাবে, মনের অভিলাষ;
বর্তমানেই ফুলপাখি গাছপালা,
ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের জয়;
বর্তমানেই একান্ত বিশ্বাস।।

*

* *

সহজাত বালক

শিবশম্ভু পাল

নিশ্চয় জানি শরীরে রক্ত দুলিয়ে কোথাও
লুকিয়ে রয়েছে বালক;
সব দ্বিধা যায় বয়সের বিজ্ঞতাও;
খসে খসে গেল বুক থেকে যত অভিজ্ঞতার পালক

নইলে কি করে দুরধিগম্য পাহাড়
হয়ে গেল নীলাকাশ!
নইলে কি করে দুরধিগম্য পাহাড়
অপলক দেখি, তুমি সে কি নীলাকাশ!

ভ্রূকুটি হেনো না। উক্তিতে হয়তো বা
প্রথাগত কিছু ললিতমধুর বিন্যাস আছে; তা হোক।
এই যে তোমার দ্বিতীয়রহিত শোভা
দেখেছ কি তুমি? দেখেছ আমারই চাওয়ায় অথবা,
যখন সেখানে ছায়া ফেলে এক বালক'

ছাপাখানার আবিষ্কারে মানুষের অনেক উপকার হ'য়েছে। কিন্তু একটা অসুবিধার কথা বোধকরি কেউই ভেবে দেখেন নি। পুলিশের কাছে জবানবন্দীর মতো আমাদের মুদ্রিত বক্তব্যও একটা স্থায়িত্ব পায়। আর বিপদ ঘটে সেখানেই।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা গত কয়েক মাস ধরে যে-সব সুভাষিতাবলী বিতরণ করছেন এবং শতাধিক কমিটির কল্যাণে তা মুদ্রিত হ'চ্ছে, সেগুলিও একরকম ঐতিহাসিক দলিল হ'য়ে থাকছে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হায়, সে ইতিহাস কি আমাদের সম্মানবৃদ্ধি ঘটাবে? হাতে-গোনা যায় এমন কয়েকটি প্রবন্ধ বাদ দিলে এই মাথার-চুলের মতো অসংখ্য লেখাগুলি যে কেন প্রকাশিত হল তাই ভেবেই আজ অবাক হ'তে হয়। এই বক্তব্যহীন চর্বিতচর্বণ এবং গেঁজে-ওঠা আবেগের মাত্রাহীনতা আমাদের কোথায় টেনে নিচ্ছে তা কি লেখকগণ ভেবে দেখেছেন? জানি, তাঁরা অমরতা-প্রত্যাশী। তাই আর কিছু না হোক, বিরাট রবীন্দ্র-সৌধের এক কোণে ভ্রমণ-বিলাসী কিশোরের মতো পেন্সিল দিয়ে নিজের নামটুকু লিখেই তাঁরা তৃপ্তি বোধ করছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি?

একদিন এ উত্তেজনা থেমে যাবে। কালের অমোঘ নিয়মে একদিন তাঁরা এবং আমরা কেউই থাকব না এই পৃথিবীতে। কিন্তু তখনও দেশ থাকবে এবং থাকবে দেশের ভাবীকালের মানুষ। তখন?

তখনও থাকবে এই লেখাগুলি। লাইব্রেরীর অখ্যাত কোণের তাক থেকে, পুরনো বইয়ের দোকান থেকে নতুন যুগের গবেষকগণ টেনে বার করবে এই-সব ঐতিহাসিক দলিল। মহাকালের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করবে আমাদের এই গোটা যুগটাকে।

না, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আমাদের মতামত দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনুধাবন করতে যাবে না তারা। তারা নতুন ক'রে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করবে, নতুনভাবে আবিষ্কার করবে মহাকবিকে। কালিদাস,

দান্তে বা শেক্সপীয়ারের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে একেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের এই বর্তমান কালের রবীন্দ্র-চর্চা বুমেরাঙের মতো ফিরে আসবে আমাদেরই দিকে। এই অস্ত্রেই ঘায়েল হ'য়ে যাব আমরা। অমরতা আজকের মতো সেদিনও থেকে যাবে সোনার স্বপ্নের দিগন্তরেখা।

স্পষ্ট করে বলতে পারব না, কারণ আমি পুনর্জন্ম লাভ করিনি, তবে সেদিনের চোখে আমাদের কালের যে ছবিটা ফুটে উঠবে তার একটা আভাস দিতে পারি সংক্ষেপে।

প্রথমেই তারা বলবে, আমরা এ যুগের লোকেরা ছিলাম চিন্তাহীন বাচাল এবং হ্যাংলা। নিজের নাম নিয়েই আমরা অস্থির, রবীন্দ্রনাথকে বোঝার মতো সময়ই ছিল না আমাদের হাতে। কাজে-অকাজে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ব্যবহার করেছি, কিন্তু রবীন্দ্র-চিন্তার মধ্যে নিজেদের আমরা কখনো সংহত করতে পারি নি।

তারপর তারা বলবে, আমরা ছিলাম অন্ধ। স্বচক্ষে আমরা নিজেদেরই দেখে উঠতে পারি নি তো রবীন্দ্রনাথকে দেখব কি! আমাদের রবীন্দ্র-পরিচয় তাই অন্ধের হস্তি-দর্শনের মতোই একটা মর্মান্তিক পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়!

এবং সবশেষে তারা হয়তো বলবে, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা দেশের চিন্তা-রাজ্যে নেমে এসেছিল একটা মধ্য-যুগীয় আবহাওয়া। তখন অজ্ঞতার সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে দু-একজন সত্য-সন্ধানীই কেবল খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মতো জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে-ছিলেন, দেশের গরিষ্ঠাংশে দেখা দিয়ে-ছিল ভাগ্যান্বেষী চিন্তা-যাযাবরের দল—যারা ছিল পরশ্রীকাতর, অক্ষম এবং বর্বর।

আমরা অস্বীকার করতে পারব কি?

* * *

খেলার মরশুমে দ্বিতীয়বার শুরু হবে আর কয়েকদিনের ভিতরই। ইতি-মধ্যে সময়টা বড়ই একঘেয়ে লাগছিল। এক বন্ধু সেদিন আমাকে একটি অপূর্ব রহস্য-খনির সন্ধান দেওয়াতে এখন বেশ চাংগা বোধ করছি।

বাস্তবিক বিনে পয়সায় এমন উত্তেজনাকর সংবাদের যোগান পাব বলে কল্পনাই করিনি আমি। পরিবারবর্গের তাগিদে সামান্য কিছু কেনাকাটা বা নিছক অধুনাতম ফ্যাশনের হালচাল দেখার জন্যে মাঝে-মাঝে নিউ মার্কেটের দিকে গেছি। ওরই কাছাকাছি মস্ত বড় একটি লাল-বাড়ীর দিকে তাকিয়ে কত-দিন মনে মনে বলেছি—এই হল সেই দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় এবং নেতাজির পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত পৌরসভা-ভবন—ভারতীয় নাগরিকদের আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকারের প্রথম অভিব্যক্তি ঘটেছিল এই-খানে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তখন টের পাইনি, এতবড় একটা মজার ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে ওর মধ্যেই।

ভেবে দেখুন, কতকগুলি বয়স্ক ব্যক্তি—এমনিতে যাঁরা সদালাপী, শিক্ষিত ভদ্রলোক—এই বাড়ীটির মধ্যে ঢুকে মিটিং করতে বসলেই হঠাৎ তাঁরা নাবা-লকের মতো হৈ চৈ, টেবিল-বাজানো এবং হাতাহাতির জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন, এতে কার না কৌতুক বোধ হয়!

অনেকে অবশ্য সভ্যতা শালীনতা ইত্যাদি বস্তাপচা বুলি আউড়ে আমাদের পৌরপিতাদের সংযত হ'তে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার তাতে একবিন্দুও সমর্থন নেই। বরং আমি বলি, প্রত্যেকটি শো-র জন্যে চাঁদা ধার্য করে দর্শক হিসাবে আমাদেরও প্রবেশাধিকার দেওয়া হোক সেখানে। সময়টা ভালোই কাটবে তাহলে। আর চাইকি, এই বাড়তি রোজগারের টাকায় পৌরসভাও হয়তো কিছু জনহিতকর কাজ করতে পারবে!

* * *

ভারতে সুপারসোনিক বিমান তৈরী শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু 'সুপার-সোনিক' কথাটার অর্থ কী? নিশ্চয়ই 'শব্দের চেয়ে দ্রুততর গতিসম্পন্ন'? তাহলেই তো মুস্কিল!

এমনিতে যাঁরা শব্দ নিয়ে কাজ-কারবার করেন, যেমন টিন-পেটাই কারখানার শ্রমিক বা খেলার মাঠের দর্শক, তাঁদের কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু গলাবাজী করে বক্তৃতা দেওয়াই যাঁদের একমাত্র আনন্দ তাঁদের অবস্থা ভেবে দেখেছেন কি?

বিশেষ করে এই ইলেকশন-মুখী আবহাওয়ায় শব্দই তো তাঁদের একমাত্র সান্ত্বনা। শব্দ যদি তাঁদের এমন করে জব্দ করে, কোন ঘাটে নৌকো বাঁধবেন তাঁরা?

নাকি সুপারসোনিক যুগে, বক্তৃতাও হবে সুপারসোনিক? অর্থাৎ শ্রবণ-মাত্রেই কৈবল্যপ্রাপ্তি!

বৈজ্ঞানিকদের কাছে নিবেদন, তাঁরা এই শব্দ-ত্রয় যুগের আক্রমণ থেকে অচিরে আমাদের রক্ষা করুন। মোটর-গাড়ীর 'সাইলেন্সার পাইপে'র মতো এমন একটা যন্ত্র তাঁরা আবিষ্কার করুন যাতে বেগবান শব্দও কমজোরী হয়ে কানে ঢোকে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে ইলেকশনের আগে বক্তাদের কিছু অসুবিধে ঘটলেও ইলেকশন পার হয়ে গেলে তাঁদের সুবিধেই হবে। তখন আজকের শ্রোতারা প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্যে দামামা পিটবে ঠিকই। কিন্তু তার অণুমাত্র আওয়াজ তরে-যাওয়া বক্তাদের শান্তিভঙ্গ করবে না।

প্রস্তাবটির কার্যকারিতায় আমি নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছি।

* হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ *
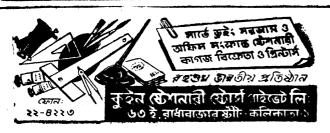
লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে যখন বাঙ্গলায় "স্বদেশী" নামে স্বাধীনতার আন্দোলন হয়, তখন একই আন্দোলনের দুইটি অংশ—

(১) বিদেশী বর্জন (অর্থাৎ "বয়কট")

(২) রাখি-বন্ধন।

"রাখি-বন্ধন" —ঐক্যের চিহ্ন—বিদেশী শাসক প্রদেশ বিভক্ত করিলেও বাঙ্গালী জাতি বিভক্ত হইবে না, এই সংকল্পের প্রতীক।

রাখি-বন্ধন বাঙ্গলায় প্রচলিত প্রথা ছিল না। পুরাণের কথা—"রক্ষা" হইতে উৎপন্ন "রাখি"। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণের জন্য অর্থাৎ বিপদ হইতে রক্ষার জন্য তাঁহার মণিবন্ধে রাখি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। উত্তরভারতে ইহা হিন্দুর ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং ঝুলন পূর্ণিমার দিন হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে রাখি-বন্ধন প্রথা প্রচলিত। কোন কোন স্থানে ঝুলন-পূর্ণিমা —রাখি-পূর্ণিমা নামে অভিহিত। রাজপুতানায় কোন হিন্দু রাজ্যের বিধবা রাণী শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তৎকালীন মোগল সম্রাটকে ভ্রাতা সম্বোধন করিয়া রাখি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—প্রবাদ আছে।

বাঙ্গলায় এ-প্রথা ছিল না। ঝুলন-পূর্ণিমায় হিন্দুস্থানী দ্বারবান প্রভৃতি পরস্পরের মণিবন্ধে এমনকি প্রভুর মণিবন্ধেও রাখি-বন্ধন করিত।

মিলনের প্রতীকরূপে বাঙ্গলাদেশে রাখি-বন্ধন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার ২ বৎসর পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বন্ধুদিগের সহযোগে ভারত-সভার দ্বারা কলিকাতায় এরূপ সম্মেলন আহবান করাইয়াছিলেন। একাধিক প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাহাতে সমবেত হইয়াছিলেন। ব্লাণ্ট নামক ইংরেজ রাজনীতিক ঐ সম্মেলনের এক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশন উপলক্ষে হেমচন্দ্র একটি অনতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। ইহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি ঐ কবিতার নামকরণ করিয়াছিলেন—"রাখি-বন্ধন"।

কবিতার আরম্ভ—

"কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে
ভারত-জননী জাগিল।
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি!
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি—
ঊষার কপোলে জ্বলিল!

* * *

পূরব বাঙ্গলা মগধ বিহার
দেরাইস্মাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি, মাদ্রাজ, সহর বোম্বাই
সুরাটী, গুজরাটী মহারাঠী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি বন্ধ,
খুলে দেছে হৃদি হৃদি পরস্পর;
একপ্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে,
গাহিল—'বন্দে মাতরম্'।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্—"

একাধিক কারণে এই কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম কারণ—ইহাতে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উল্লেখ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গ-দর্শনে' "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইতে থাকে—ঐ মন্ত্র ঐ উপন্যাসের মেরুদণ্ড।

"আনন্দমঠ" যে বিদেশী শাসকরা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্যই উহার দ্বিতীয় সংস্করণে 'লিবারেল' পত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত হয়—স্বাধীনতার উল্লেখ নাই, আর্য (হিন্দু) ধর্মের বিস্তারের কথাই বলা হইয়াছিল। প্রকাশের পরেই যে "আনন্দমঠ" শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সমাজে আলোচনার বিষয় হইয়াছিল, তাহা ঐ সমালোচনায় বুঝিতে পারা যায়। "স্বদেশী" আন্দোলনের সময় অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের কথায় লিখিয়াছিলেন—বহু বর্ষ পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঐ গান রচনা করিয়াছিলেন, তখন অল্প লোকই তাহা শুনিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে যখন বাঙ্গালীরা মায়ামুক্ত হইয়া সত্যের সন্ধানরত, তখনই—সেই মাহেন্দ্রক্ষণে একজন কেহ ঐ গান গাহিলেন। মন্ত্র প্রদত্ত হইল—একদিনে সমগ্র জাতি দেশপ্রেম-ধর্মে দীক্ষিত হইল। দেশমাতৃকা তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। একবার সে দর্শন পাইলে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মন্দির নির্মিত করিয়া তাহাতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ও পূজার অর্ঘ্য আনিতে না পারে ততক্ষণ আর স্থির থাকিতে পারে না—আর নিদ্রাতুর হয় না। সে দর্শনলাভের পরে কোন জাতি আর বিজেতার শাসন সহ্য করিতে পারে না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের কবিতায় ঐ মন্ত্রের উল্লেখে বুঝা যায়—প্রথম প্রকাশাবধিই বঙ্কিমচন্দ্র গুণগ্রাহী পাঠক পাইয়াছিলেন—তবে মনে হয় Fit audience though few, এমনকি কবি নবীনচন্দ্র সেনও গানটির রচনা-পদ্ধতিতে আপত্তি করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ—যদিও ভারতে ইংরেজ শাসন বিপন্মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজের চেষ্টায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা যে একদিন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করিয়া সে উদ্দেশ্য অতিক্রম বা ব্যর্থ করিবে—এ-বিশ্বাস তখনই হেমচন্দ্রের মনে স্থান পাইয়াছিল। সে বিশ্বাস কত সত্য তাহা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২০ বৎসর পরে তাহার উদ্দেশ্য-পরিবর্তনে প্রতিপন্ন হয়। সে উদ্দেশ্য—স্বরাজ লাভ।

সেই বিশ্বাসহেতু হেমচন্দ্র কবিতার শেষাংশে লিখিয়াছিলেন:—

"জীবন সার্থক আজিরে আমার
এ রাখি-বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনুরে আজ
অভেদ ভারত চিরমনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।"

স্বাধীনতার কবি হেমচন্দ্রের "চির-মনোরথ" কি তাহা তিনি বহু কবিতায় পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্নতন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে,
স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে
প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষ হ'তে;
স্বাধীনতা রূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।"

তাঁহার শৃঙ্গনিনাদ—

"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে র'বে?"

তৃতীয় কারণ—ইলবার্ট বিলের সময় লর্ড রিপণ শেষপর্যন্ত ইংরেজদিগের অসংগত দাবীই স্বীকার করায় তিনি যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি মানুষের হৃদয় লইয়া যে খেলা করিলেন, তাহার ফল বিষময়। ভারতবাসীরা বুঝিল, শ্বেতাঙ্গের নিকটে তাহাদিগের সংগত স্বার্থ "তৃণের সমান"—এ-অবস্থার প্রতীকারোপায়—বীরব্রত, সাহস ও উৎসাহ—ভারতবাসীরা তাহা বুঝিয়া সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

চতুর্থ কারণ—ঐ ইলবার্ট বিলে ভারতবাসী যে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হয় নাই—

"যে নীরদ উঠি রিপণ মিলনে
শুষ্ক তরুডালে সলিল-সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি যে ফুটিল।"

এই প্রসংগে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের যে অধিবেশনের জন্য হেমচন্দ্র "রাখি-বন্ধন" রচনা করিয়াছিলেন, সেই অধিবেশনেই প্রথম রাজেন্দ্রলাল মিত্র—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ভারতের হিন্দুদিগের ঐক্যবিধানকল্পে জাতি গঠনের স্বপ্ন বিবৃত করিয়াছিলেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ পরে প্রতিভাত হয়—পাকিস্তানে।

বাঙ্গলায় "রাখি-বন্ধন" হেমচন্দ্রের কথা—রাজনীতিক ঐক্যে খণ্ড খণ্ড ভারতকে মহাভারতে পরিণত দেখিবার আশায় ও আকাঙ্ক্ষায়।

তখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর মধ্যে যাঁহারা রাজনীতি-চর্চা করিতেন, তাঁহাদিগের মনে কত আশার ও কত আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাও এই কবিতায় বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু তখনই বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। জাতীয় ঐক্য যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ফল তাহা হেমচন্দ্র অকুণ্ঠকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন; আর ২০ বৎসর পরে বারাণসীতে কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে লালা লজপত রায় ঘোষণা করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী যে ভারতে নবযুগ প্রবর্তিত করিবে তাহাই বিধাতার বিধান; আর সেইজন্যই বাঙ্গালী ভারতে সর্বাগ্রে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার ফল সম্ভোগ করিয়াছিল।

হেমচন্দ্র বাঙ্গলায় রাজনীতিক রাখি-বন্ধনের কথা বলিবার ২০ বৎসর পরে আবার বাঙ্গলায় ঐ কারণে রাখি-বন্ধন হয়। সে পরিকল্পনা কাহার, তাহা জানিবার উপায় নাই।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দেই জানা গেল লর্ড কার্জন বাঙ্গালাকে—পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালীর

ঐক্যও শক্তি ক্ষুন্ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পরবৎসর জুলাই মাসে ভারত-সচিব সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন—বিলাতী পণ্য বর্জন করিয়া প্রতিশোধ লইবার প্রস্তাব হইল। ৭ই আগস্ট কলিকাতায় বিরাট সভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হইল। নূতন অস্ত্র লইয়া বাঙ্গালী রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। কামিনীকুমার ভট্টাচার্য গাহিলেন—

"অবনত ভারত চাহে তোমারে—
এস সুদর্শনধারী—মুরারি।
নবীনতন্ত্রে নবীন মন্ত্রে
কর দীক্ষিত ভারত-নর-নারী।
মঙ্গল-ভৈরব-শঙ্খ-নিনাদে
বিচূর্ণ কর সব ভেদ-বিবাদে;
সম্মান-শৌর্যে পৌরুষ-বীর্যে
কর পূরিত নিপীড়িত
ভারত তোমারি।"

রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশীবর্জন ঘৃণা-দ্যোতক মনে করেন নাই। তিনি লিখিলেন—

"আজ বাঙ্গলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে
বাহির হ'লে, জননি।"

মা'র "সোনার মন্দিরে" দ্বার মুক্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মা'র নূতন রূপ দেখিয়া দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিতেছে না—

ডানহাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁহাত করে শঙ্কা হরণ;
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট নেত্র আগুন বরণ।"

"বন্দে মাতরম্" বাঙ্গালীর রণহুঙ্কারে পরিণত হইল।

১৬ই অক্টোবর সরকারের আদেশে বাঙ্গলা খণ্ডিত হইল। সেদিন সমগ্র বাঙ্গলায় অরন্ধন—হরতাল হইল। কলিকাতার বাজারেও সেদিন কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রীত হইল না—গৃহস্থের রন্ধনশালায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল না। লোক স্নানান্তে মাতৃনাম কীর্তন করিতে করিতে সমবেত হইয়া এ উহার মণিবন্ধে রাখি বাঁধিয়া দিল। রবীন্দ্রনাথ রাখিস্নানের মন্ত্র রচনা করিলেন—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক—হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূণ্য হউক, হে ভগবান।

বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক—হে ভগবান।

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক—হে ভগবান।"

সেদিন রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিল—বাঙ্গালীর পণ সত্য হইবে, বাঙ্গালীর আশা পূর্ণ হইবে, বাঙ্গালীর কাজ ধন্য হইবে, বাঙ্গালীর ভাষা সমাদৃত হইবে। সেদিন বাঙ্গালীর পণ—বঙ্গবিভাগ ব্যর্থ করিতে হইবে—সেই আশায় সে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং পণ সত্য করিয়াছিল। বাঙ্গালীর কার্যফলে রাজনীতিক পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। আর বাংলা ভাষা কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসাম হইতে বাংলা ভাষার উচ্ছেদ-সাধনে অসমীয়াদিগকে সমর্থন করিলেও—আজ সমগ্র সভ্য জগৎ বাঙ্গালী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে উৎসবে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে।

রাখি-বন্ধন বাংলায় প্রচলিত ছিল না, এখনও নাই। উত্তর ভারতে উহা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান হইতে জনগণের মধ্যে প্রথা হিসাবে প্রচলিত হয়—এখনও প্রচলিত আছে।

বাংলার একজন বাঙ্গালী কবি রাজনীতিক কার্যের জন্য উহাকে সাহিত্যে আসন দিয়াছিল, আর তাহার বহুদিন পরে আর একজন বাঙ্গালী কবি রাজনীতিক কাজেই তাহাকে সাহিত্যে আদর দেন। সেই জন্য হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই দুইজনের স্মৃতির সহিত বাংলা সাহিত্যে রাখির স্থানলাভ জড়িত।

ইস্রেলে কয়েকটি দিন

শ্রীলেখা ঘোষ

অবশেষে সত্যিই ইস্রেলে এসে পৌঁছলুম। তেল-আভিবের মাটিতে পা রেখেই সুদূরে এলাহাবাদে ডিসেম্বরের নরম রোদে ভরা প্রসন্ন একটি সকালের কথা মনে ভেসে উঠলো। যেদিন বাবা আমাকে ডেকে জানালেন যে, তিনি ১৯৬১ সালের মে মাসে তেল-আভিভে অনুষ্ঠিত International Press Institute-এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করবেন এবং প্রশ্ন করলেন আমি ইস্রেল ভ্রমণে তাঁর সংগী হতে রাজি আছি কিনা? *

রাজি আছি কিনা? বাল্য এবং কৈশোরের অনেকগুলো দিন কনভেন্টের আবহাওয়ায় কাটিয়েছি। শুভ্রবেশধারিণী সিস্টারদের ভক্তিনম্র মুখে শত সহস্রবার শোনা একটি পুণ্য জীবনচরিতের অলৌকিক কাহিনীগুলি মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোমাখা পরিবেশে অর্গ্যানের সংগে মিলিত সমবেত কণ্ঠের মধুর-গম্ভীর প্রার্থনা-সংগীতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বেথলেহেম, নাজারেথ...... সুপরিচিত নামগুলি মানসপটে আবার রঙে রেখায় সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো। সাগ্রহে বাবার লোভনীয় প্রস্তাবে সম্মতি জানালুম এবং কোনো-ক্রমেই যাতে তাঁর মতের পরিবর্তন না হয় সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে বাবার সেবাযত্নের প্রতি সহসা অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে পড়লুম।...... অবশেষে আকাংখিত দিনটি এগিয়ে এলো। ভারতীয় প্রথার অন্যথা না-করে দমদম এয়ারপোর্টে প্রচুর সজল আবহাওয়া সৃষ্টি করে ১৯৬১ সালের ২৯শে মে সত্যিই এসে পৌঁছলুম তেল-আভিভে।

[শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের একমাত্র কন্যা কুমারী শ্রীলেখা সম্প্রতি ইস্রেল ঘুরে এসেছেন। এই প্রবন্ধটিতে "অমৃত"র পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তিনি তাঁর সদ্য-লব্ধ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। শ্রীলেখা এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির বি-এ ক্লাসের ছাত্রী।]

তেল-আভিভে লেখিকা ও তাঁর পিতা

তেল-আভিব সদ্যোজাত ইস্রেল রাজ্যের অন্যতম প্রধান নগরী। চতুর্দিকেই তার রুক্ষ মরুভূমির ধূসর আভাস। কিন্তু সুনীল মেডিটেরেনীয়ানের তরল হাসিতে তার সোনালী উপকূল প্লাবিত। ইস্রেলী ভাষায় 'তেল' মানে পাহাড় এবং 'আভিভ' মানে বসন্ত। নীলে-সোনায় মোড়া নগরীটিকে দেখে মনে হলো এতোদিনে বুঝি সত্যিই বসন্ত ঋতু তার বর্ণগন্ধের সমারোহ নিয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত ইহুদী জাতির জীবনে আবির্ভূত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ধর্ম এবং সংস্কারের বাহক যে জাতি, এতো বড়ো বিশাল ধরণীর ক্ষুদ্রতম একটি অংশকেও তার মাতৃভূমি বলে অভিহিত করবার ক্ষমতা ছিলো না। বহু দেশে বহু যুগে লাঞ্ছিত ইহুদী জাতির মধ্যে আজ নবজাগরণের ঢেউ এসেছে, গঠিত হয়েছে নূতন ইহুদী-রাজ্য ইস্রেল। রাজনীতির কূট পন্থা অনুযায়ী আরব বা ইহুদী -কোন্ জাতির দাবী ন্যায়সঙ্গত সে বিচার করতে বসিনি। তবে স্বল্পসময়ের মধ্যে ইস্রেল যে অসাধারণ উন্নতি করেছে তা দেখে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়েছি। সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, আজ ইহুদীদের কাছে ইস্রেল রাজ্য কতো গৌরবের ধন, নিজেদের রক্তে অভিষিক্ত করে যে সম্পদ তারা লাভ করেছে স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে, সাহিত্যে-বিজ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলবার জন্যে তারা কৃতসংকল্প। মাত্র কিছুদিন আগে রকেট উৎক্ষিপ্ত করে পৃথিবীর ছয়টি প্রধান রকেট উৎক্ষেপকারী দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সদ্যোগঠিত রাজ্য ইস্রেল। চৌদ্দ বছরের কিশোর-রাষ্ট্রের পক্ষে এ-কি কম গৌরবের কথা! সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়োৎফুল্ল চোখে ইস্রেলের অগ্রগতি লক্ষ্য করছে, উৎকর্ণ হয়ে শুনছে যে বিচার-সভা বসেছে ইস্রেলের প্রধান নগরী জেরুসালেমে, যেখানে নবজাগ্রত ইস্রেলীরা লক্ষ লক্ষ ইহুদী হত্যার কৈফিয়ৎ তলব

---

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাবা ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস ইন্‌ষ্টিট্যুটের এক্‌জিকিউটিভ বোর্ডের ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সদস্য।

করেছে অন্যতম নাৎসী নেতা অ্যাডল্‌ফ্‌ আইখ্‌ম্যানের কাছে।

আইখ্‌ম্যান! ইতিহাসের রক্তরাঙা একটি পরিচ্ছেদের কুখ্যাত নায়ক। নাৎসী উত্থানের সেই বিভীষিকা-ময় অধ্যায়, যখন সমস্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া বিস্তৃত হয়েছে। S. S. সৈন্যদের মদ-গর্বিত পদভারে বিশ্বে আলোড়ন জেগেছে, Concentration Camps, gas chamberগুলি থেকে আর্তনাদ উঠেছে মরণোন্মুখ দুর্ভাগাদের......... আইখ্‌ম্যান সেই গ্লানিময় ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। সে অধ্যায়ের কথা মনে হ'লে জার্মানী আজ লজ্জারক্তিম মুখ নত করে। সেই সময় যাঁরা তার নেতৃত্বভার নিজেদের মুঠোয় গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা তো শুধু লক্ষ কোটী বিদেশীদের জীবনই বিনষ্ট করেননি, সেই সংগে সংগে জার্মানীর মত প্রচণ্ড শক্তিশালী জাতির অগ্রগতিকেও বহু বছরের জন্য ব্যাহত করে দিয়ে গেছেন। তাই আজ দ্বিখণ্ডিত জার্মানী নিজের সমস্যা সমা-ধানের জন্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখের দিকে ব্যাকুল প্রত্যাশায় চেয়ে আছে। তাই সেদিন যখন West Berlin-এ এক জার্মান দম্পতি আমার কাছে অনুযোগ করছিলেন যে, কঙ্গোলীদেরও self determination-এর right আছে অথচ জার্মান জাতির সে অধিকার নেই, আমি তখন কোনো জবাব দিই নাই। কিন্তু তাঁরাই আবার বললেন যে, অবশ্য এর কারণ যথেষ্ট আছে এবং তাঁরাও সেটা বুঝতে পারেন।

একটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে তেল-আভিভ থেকে বাবার সংগে জেরুসালেমে পৌঁছলুম। সেই উষ্ণ আবহাওয়াতেও আমার হাত ঠাণ্ডা কিন্তু কপালে ঘামের ফোঁটা। আমার বয়সী বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সম্ভবতঃ আমিই প্রথম যে জেরু-সালেমের বিচারশালায় আইখ্‌ম্যানের বিচার দেখার সুযোগ পাবে। ভাগ্যের এই অভাবনীয় দাক্ষিণ্যে আমি স্বভাবতঃই রীতিমত বিচলিত বোধ করছিলুম। লাঞ্চের সময় সুখাদ্যগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারলুম না এবং বিশ্রাম নেবার মত ধৈর্য বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিলো না। বাবার কিন্তু দেখলুম দিব্যি নিশ্চিন্ত ভাব। খাবার সময় চিরকালের অভ্যাস অনুযায়ী একটা অশ্রুতপূর্ব ডিশের অর্ডার দিলেন এবং সেটির এক চামচ মুখে তুলেই মুখ বিকৃত করে বসে রইলেন। অতঃপর সাদামাটা খাবার এলো, সেগুলি নিঃশেষ করে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে তবে আমাদের প্রদর্শক ভদ্র-লোকটিকে অনুসরণ করলেন।

প্রথমে অনুমতিপত্র পাবার জন্য গভর্ণমেণ্টের একটি বিশেষ কার্যালয়ে যেতে হ'লো। সেখানে ইস্রেলী প্রেস সমস্ত ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন, তাই বিশেষ কোনো বেগ পেতে হলো না, শুধু গাইড ভদ্রলোকটি আমাদের পাস-পোর্টের নম্বরগুলি চাইলেন।

আইখ্‌ম্যান

পাসপোর্ট নম্বর! শুনেই তো বাবার মুখখানি শুকিয়ে গেল। সচরাচর তিনি সদাসর্বদাই পাসপোর্ট সংগে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করেন, কিন্তু ইস্রেলী গভর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থায় আমাদের পাসপোর্টের এ পর্যন্ত কোনো প্রয়োজনই হয়নি। তাই আজও সেগুলি সংগে আনা হয়নি। অতঃপর কিংকর্তব্যম্‌? প্রায় ৫০।৬০ মাইল দূরে তেল-আভিবে পাসপোর্ট দুটি তালাবন্ধ স্যুটকেসের নিরাপদ অভ্যন্তরে নিশ্চিন্ত বিশ্রামসুখ উপভোগ করছে, আর জেরুসালেমের প্রখর রৌদ্রে শংকিত বিপর্যস্ত আমরা দুটি ভারতীয়। শেষে কি আইখ্‌ম্যানের বিচার দেখার অনন্য সুযোগটি বন্ধ-মুঠির আঙুলের ফাঁক দিয়েই গলে যাবে?

সহসা চকিত হয়ে উঠলুম। আমার হাতে একটি শান্তিনিকেতনী বটুয়া ছিলো, সেটির আকৃতি দেখে বাবা সেটিকে 'ঘটি' নামে অভিহিত করতেন। সেই 'ঘটি'র গর্ভে সেফটিপিন থেকে কলম অবধি যাবতীয় জিনিসপত্র সর্বদাই নানাবিধ শব্দ-ঝংকারে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতো। গুদামঘরের সেই ক্ষুদ্র সংস্করণটি কোলের উপরে উপুড় করে তার মধ্যে থেকে টেনে বার করলুম একটি কাগজের টুকরো, যাতে আমাদের দুজনের জন্ম-তারিখ পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি 'এমার্জেন্সি রিকোয়ারমেণ্ট' হিসাবে বাবাই টুকে রেখেছিলেন। সগর্বে সেটি গাইড ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিয়ে বাবার দিকে চেয়ে একটি প্রশান্ত হাস্য বিস্তার করলুম। বাবা তৎক্ষণাৎ জানা-লেন আমি যে একটি ক্ষণজন্মা কন্যা এবং আমার বুদ্ধিমত্তার যে কোনো ইয়ত্তা নেই তা তিনি আমার জন্মক্ষণ থেকেই জানতেন, আজ সে সম্বন্ধে একে-বারে নিঃসন্দেহ হলেন।

এরপরে আইখ্‌ম্যানের বিচারশালার তোরণদ্বারে এসে পৌঁছলুম। জেরু-সালেমের Municipal Cultural Centre-এর সুবৃহৎ অট্টালিকাটি নয় ফিট উঁচু তারের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী প্রহরায় রত, ছাতের উপরে মেশিনগানের উপ-স্থিতিও লক্ষ্য করলুম, এইখানেই চলেছে ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ বিচার। কম্পিত পদে ভিতরে প্রবেশ করতেই ইস্রেলী পুলিসের হাতে পড়ে গেলুম! না, ব্যাপার অবশ্য তেমন গুরুতর নয়; শুধু নিয়ম অনুসারে প্রতিটি লোককে রীতিমত 'সার্চ' করে নিয়ে তবে বিচার-শালায় ঢোকবার অনুমতি দেওয়া হবে। অগত্যা মহিলা বিভাগের দিকে এগিয়ে গেলুম, সেখানে দু'টি মহিলা-পুলিস আমার শাড়ী দেখে ইস্রেলী ভাষায় কি-যে বল্‌লেন তার একবর্ণও বুঝলুম না, শুধু চোখের সপ্রশংস চাহনি দেখে উপ-লব্ধি করলুম পৃথিবীর সব দেশের মত ইস্রেলেও শাড়ীর আদর কম নয়। আমার বেচারা 'ঘটি'টিও অনুসন্ধানকারিণীদের

হাত থেকে রেহাই পেল না, সেটিকে উদ্ধার করে বাইরে এনে খাখা ও গাইডের সংগে বিচারশালার মধ্যে প্রবেশ করলুম।

নীচের তলায় দেখলুম সুবিশাল একটি হল্ঘর, তাতে সারি সারি অগণ্য বেঞ্চ এবং টেবিল পড়েছে আর সেগুলিকে অধিকার করে বসে রয়েছেন অসংখ্য দেশের রিপোর্টারের দল। এতো বড়ো 'রিপোর্টার-সম্মেলন' আগে কখনও দেখিনি, ঐ রকম বিরাট সম্মেলনটিই যে কেন একটি সুন্দর 'রিপোর্টিং আইটেম' হবে না তাও ভাববার বিষয়। চারপাশের চারটি দেওয়ালে চারটি টেলিভিশন-সেট লাগানো রয়েছে, তাতে বিচার কক্ষের ছবি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। রিপোর্টারদের কানে Transister head phone লাগানো, আইখ্ম্যানের বিচার হিব্রু, ইংরিজি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান—এই চারটি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হচ্ছে এবং রিপোর্টারেরা বোতাম ঘুরিয়ে ইচ্ছামত ভাষায় কথোপকথন শুনছেন। সামনে টাইপরাইটারের উপরে তাঁদের আঙুলগুলি ছন্দোবদ্ধ তালে নৃত্য করে চলেছে—প্রায় প্রলয় নৃত্যের বিচিত্র সংস্করণ।

কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে উপরে চললুম। সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে সশস্ত্র পুলিশ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে প্রতি ব্যক্তিকে লক্ষ্য করছে। অবশেষে চারতলার সেই সুবিস্তৃত হলটিতে এসে ঢুকলুম—আইখ্ম্যানের বিচারসভা।

হলটির অপর প্রান্তে প্রশস্ত উচ্চাসনে আসীন তিনজন সুবিখ্যাত ইস্রেলী বিচারক (Moshe Landau, Benjamin Halvey এবং Yitzhak Ravey) তাঁদের সামনে অজস্র বই এবং কাগজপত্রের মাঝখানে আসামী ও বাদী-পক্ষের অ্যাটর্নিদ্বয়—যথাক্রমে Dr. Robert Servatius ও অ্যাটর্নি-জেনারেল Gideon Hausner তাঁদের সহকারীদের নিয়ে বসে আছেন। সাক্ষীর আসনে দণ্ডায়মান রোসেনবার্গ। বিচারকত্রয়ের ডানপাশে অপেক্ষাকৃত নীচু আসনে বসে স্বয়ং অ্যাডল্ফ আইখ্ম্যান তাঁর পিছনেই দু'টি সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরীদ্বয় শুধু আইখ্ম্যান একটি বুলেট-প্রুফ কাঁচ ও প্ল্যাস্টিকের চার দেওয়ালের স্বচ্ছ আবেষ্টনীর মধ্যে বন্ধ। পিছনের একটি-মাত্র দরজার পাশেও সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা আছে। হলটি কানায় কানায় জনপূর্ণ কিন্তু বিস্ময়করভাবে নিস্তব্ধ। প্রতিটি আসনের সংগে লাগানো Transister head phone-গুলির গুঞ্জরণ ছাড়া সবকিছু নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। যেন কোনো প্রলয় ঝঞ্ঝার আশংকায় স্তব্ধ ধরণী প্রতীক্ষমানা।

যথাসম্ভব নিঃশব্দে আসনে বসে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখছিলুম ইতিহাসের এক কুখ্যাত নায়ককে। মধ্যবয়সী বিরলকেশ পুরুষ সামনের টেবিলে হাত-দুটি রাখা। মাঝে মাঝে গাঢ় ফ্রেমের চশমাটি নাড়াচাড়া করা এবং দু'টি একটি কথা কাগজে নোট করা ছাড়া নিশ্চলভাবে অখণ্ড মনোযোগে বিচারকের দিকে চেয়ে বসে রয়েছেন। এই সেই আইখ্ম্যান! কল্পনায় প্রায় বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করছিলো মর্মন্তুদ কতকগুলি ছবি...... Warsaw ghetto-র ঠাণ্ডা মাটিতে চটের উপরে সারি সারি পড়ে আছে কংকালপ্রায় কয়েকটি মূর্তি, সর্বাংগে তাদের বিষাক্ত ক্ষত, পথের দু'ধারে প্রতিদিন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত শত শত মানুষের শব, Auschwitz Extermination Camp-এর গ্যাস-চেম্বারগুলির প্রবেশদ্বারে জুতো, চশমা ও শিশুদের খেলনার পর্বতপ্রমাণ অবিশ্বাস্য স্তূপ।...... ওই তো বসে আছে সেই মানুষ, পরিচ্ছন্ন পোষাকে, প্রশান্ত মুখচ্ছবি নিয়ে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এই মানুষই ঠাণ্ডা মাথায় আগাগোড়া ভেবে, আয়োজন করে, সুচারুরূপে নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধী নারী, পুরুষ ও নিষ্পাপ পুষ্পতুল্য শিশুদের। ছয় লক্ষ মৃত ইহুদী আজ অদৃশ্য অংগুলি সংকেতে অসংখ্য নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করছে অ্যাডল্ফ আইখ্ম্যানকে।

অস্পষ্টভাবে কানে এলো প্রধান বিচারক Moshe Landau প্রশ্ন করছেন সাক্ষী রোসেনবার্গকে, "তখন আপনার কাজ কি ছিলো?"

"আমরা তখন পলায়মান ইহুদীদের যথাসাধ্য খাদ্য সরবরাহ করে তাদের পলায়নে সাহায্য করতুম।"

মানসপটে প্রশ্নোত্তরমালায় আবার যন্ত্রণাময় ছবিগুলি জীবন্ত হয়ে উঠলো। কোথায় পালাবে অসহায় মানুষগুলি, বেড়া ধীরে ধীরে তাদের বেষ্টন করে সংকুচিত হয়ে আসছে। Herr Fuhrer ধ্বনিতে মত্ত জার্মানী সেদিন নিজশক্তির কি নিদারুণ অপচয়ই না করেছে! আজ তাই আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হৃদয়ে সে বলছে,

"No one can deny that what Eichmann did took place in Germany......we must swallow the great bitterness". ('Die Zeit'. Hamburg).

যেদিন আইখ্ম্যান এবং তার অমানুষিক কার্যকলাপের সংগীরা শক্তিহীন নিরুপায় মানুষগুলিকে মৃত্যুগহ্বরে পাঠিয়ে দিয়েছিলো, সেদিন কি তারা কল্পনাও করেছিলো যে একদিন সেই মানুষগুলিরই প্রতিনিধিরা ডাকবে বিচারসভা আর সুদূর আর্জেণ্টিনা থেকে আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হবে মদগর্বিত আইখ্ম্যানকে!

বিচারক প্রশ্ন করছেন, "আপনি কি তখন জানতেন যে, নিরুদ্দিষ্ট ইহুদীদের কি পরিণাম হচ্ছে?"

রোসেনবার্গ জবাব দিলেন, "সঠিকভাবে জানতুম না, তবে অস্পষ্ট একটা ধারণা হয়ে গেছলো, কারণ শুধু যে যারা শহর ছেড়ে চলে যেত তাদের আর কোনো উদ্দেশই পাওয়া যেত না তাই নয়, সেই সংগে চাপা জনশ্রুতি যা বাতাসে ভেসে আসতো তা যেমন ভয়াবহ তেমনই হৃদয়বিদারক।"

শান্তভাবে বসে আছেন হিট্লারের দক্ষিণ-হস্ত অ্যাডল্ফ আইখ্ম্যান, ভাবলেশহীন মুখে, ক্রোধ বা গ্লানি কিছুরই পরিচয় নেই। বিচারকত্রয়ের গম্ভীর মুখচ্ছবি, রোসেনবার্গের কণ্ঠস্বরে ও ভঙ্গিমায় মর্মবিদারক স্মৃতির দংশন সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। সারা

হলটিতে সমবেত প্রতিটি ব্যক্তির চোখে-মুখে ভাবাবেগের নিঃশব্দ প্রকাশ।

আইখম্যানের জার্মান অ্যাটর্নি Robert Servatius এইবার সাক্ষীকে জেরা করবার অভিলাষে উঠে দাঁড়ালেন।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছিলুম ও শুনছিলুম কিন্তু বাবা সংকেত করে জানালেন যে সময় হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম, কোথায় গেছে সেই প্রবেশকালীন চাঞ্চল্য আর ঔৎসুক্য, মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাবা ধীরে ধীরে বললেন, "ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি ভগবানের দেওয়া আশীর্বাদ কিন্তু মানুষ তাকে অভিশাপে পরিণত করে তোলে।"

মনে হলো সত্যিই তাই, মদগর্বে একদিন যে নাৎসী নেতারা হত্যাযজ্ঞে মেতেছিলেন আজ অন্য শক্তিমানদের কাছে তাঁদের বিচার চলেছে। Herman Goering বিষপান করে আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করেছিলেন, আইখম্যানের উপরে হয়তো মৃত্যুদণ্ড নেমে আসবে। কিন্তু এর শেষ কোথায়, শান্তি কোথায়?

তখন সন্ধ্যা নামছে সুপ্রাচীন শহর জেরুসালেমের উপরে। রক্তরাগে প্লাবিত আকাশের বর্ণচ্ছটার দিকে চেয়ে মনে হলো একদিন এই দেশেই মানব-প্রেমের প্লাবন এনেছিলেন অহিংসার পূজারী যীশুখৃষ্ট। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবাণী স্মরণ করলুম:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্॥
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

দেশে দেশে যুগে যুগে শান্তির অবতারেরা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁদেরই আদর্শ তুলে ধরে বিশ্বস্রষ্টা বার বার অনিবার্য ধ্বংসের মুখ থেকে তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি মানুষকে ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁদেরই অনুপ্রেরণাতে হয়তো একদিন মানুষ 'আনন্দ রূপম্ অমৃতম্' খুঁজে পাবে যা তাদের উত্তীর্ণ করে দেবে স্বর্গলোকের দ্বারপ্রান্তে।

স্নিগ্ধ প্রশান্তির আবরণ বিস্তার করে সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হয়ে নেমে এলো, নূতন আশায় সঞ্জীবিত মন নিয়ে ধীরে পথে বেরিয়ে এলুম। (ক্রমশঃ)

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

চতুর্থ আসর

॥ সংখ্যা-রহস্য ॥

[প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করুন। অন্যত্র উত্তর দেওয়া আছে। আপনার উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন কটা ঠিক হয়েছে।]

১। **দ্বৈতবাদী—**
কাদের বলা হয়?

২। **ত্রিপিটক—**
ত্রিপিটক বলতে কি বোঝায়?

৩। **চতুরঙ্গ—**
চতুরঙ্গ=চতুঃ+অঙ্গ। চার অঙ্গ কিসের? অঙ্গগুলি কি কি?

৪। **পঞ্চভূত—**
ভূতের অর্থ কি? পাঁচটি ভূতের কি কি নাম?

৫। **ষড়্দর্শন—**
ছটি দর্শনের নাম কি?

৬। **সপ্তসমুদ্র—**
সপ্তসমুদ্র বলতে কোন্ কোন্ সমুদ্রকে বোঝানো হয়?

৭। **অষ্ট ঐশ্বর্য—**
ঐশ্বর্য বলতে কি বোঝায়? আটটি ঐশ্বর্য কি কি?

৮। **নবগ্রহ—**
নটি গ্রহের নাম কি?

৯। **দশ দশা—**
কি কি দশ দশা?

১০। **দ্বাদশ রাশি—**
দ্বাদশ রাশির নাম বলতে পারেন?

জেরুজালেমে আইখম্যানের বিচার দৃশ্য

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮

চৈতন্য চাকলাদারের গলিটা চওড়াতে মাত্র ষোল ফুট হলেও মর্যাদাতে কোন আশি ফুট রাস্তার চেয়ে কম নয়। এ গলিতে অনেক ভাল ভাল লোক থাকেন : একজন ম্যাজিস্ট্রেট, দুজন উকীল, জনতিনেক বড় সরকারী চাকুরে, আর তার চেয়েও যা গর্ব করার মতো—একজন নামকরা কমিক-অভিনেতা এবং কোন ফার্স্ট ডিভিশন টিমের এক বিখ্যাত গোলকীপার! সুতরাং অনেক বড় বড় রোড বা স্ট্রীটও যে এই ক্ষুদ্র লেনটিকে ঈর্ষার চোখে দেখবে, এ আর আশ্চর্য কি!

গলি অবশ্য লম্বাতেও খুব বেশী নয়—হয়ত একশ' গজ হবে বড় জোর—তবু এ রাস্তার মর্যাদামাফিক গলির দুই মুড়োয় দুটি বড় ক্লাবও ছিল। একটি হল 'জয়শ্রী স্পোর্টিং' আর একটি 'পাড়াশ্রী ইউনাইটেড'।

এক গলিতে যখন দুটি ক্লাব তখন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা প্রতি-যোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এটাও স্বাভাবিক। বাজে লোকেরা বলে, 'আড়াআড়ি' বা 'রেষারেষি' কিন্তু ওরা—মানে উক্ত দুই ক্লাবের মেম্বাররা এ দুটি শব্দ শুনলেই চটে যায়। ওরা বলে, 'স্বাস্থ্যকর প্রতি-যোগিতা বা "হেলদি কম্পিটিশান' না থাকলে আর জীবন কি? কম্পিটিশানের অভাবই তো মৃত্যু। আমরা দুদলের কেউই মার খাওয়ার দল নই—বেঁচে থাকার এগিয়ে যাওয়ার দল।'

ফলে, 'জয়শ্রী'র সরস্বতী পুজোয় থিয়েটার হলে 'পাড়াশ্রী'র পুজোয় জলসা কিম্বা বায়স্কোপের আয়োজন করা হয়ে থাকে। জয়শ্রী যেবার শীতলা-পুজোর ব্যবস্থা করে সেবার পাড়াশ্রী সর্বজনীন ঘেঁটুপুজোর আয়োজন করে এবং শীতলাপুজোতে যদি যাত্রা দেওয়া হয় তাহলে ঘেঁটুপুজোতে তরজা কবির লড়াই কিংবা পাঁচালী গান—আসবেই আসবে। ওরা ওদের ফাংস্যানে ইলেকট্রিক আলোর ওপর জোর দিলে এরা কোথা থেকে একগাদা ম্যাসিটিলিন ভাড়া করে এনে দিনের মত আলো করে দেয়।

এইভাবেই চলছিল বেশ কিন্তু এবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর হুল্লোড় শুরু হতে ওরা বড় ফাঁপরে পড়ল। কারণ এই ব্যাপারটাতে বৈচিত্র্য আনার উপায় বড় কম; আবৃত্তি, গান, নৃত্যনাট্য অভিনয়—মোটামুটি এর বাইরে যাবার উপায় নেই। সর্বত্রই এই হচ্ছে, নিয়ে দিয়ে কে কত দামী 'আর্টিস্ট' আনতে পারে আর কে কত বড় সাহিত্যিককে সভাপতি করতে পারে—এর ওপরই প্রতিযোগিতা। কিন্তু সেদিক দিয়ে আবার এদের বেশ একটু অসুবিধা আছে, কেননা, ছোট-গলির মধ্যে দুটি ক্লাব, চাঁদা তোলার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। একই সংগে দুদল চাঁদা চাইলে সাধারণ দাতারা যা দেবার দু-ভাগ করে দেন। টাকার অভাব, স্থানের অভাব, কর্মীর অভাব। অন্য ব্যাপারে প্রতিযোগিতা হলেও আগুপিছু করে করা হয়—এটা প্রায় একসময়ই করতে হবে, বড়জোর এক সপ্তাহের কি দশ দিনের তফাত করা যেতে পারে। বৈশাখ থেকে না হয় জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত টানা যায়—আষাঢ়, শ্রাবণ টানলে দুর্নাম হবে। সভাপতি নিয়েও হাংগামা। ভাল ভাল সাহিত্যিকদের টানটা বিদেশের ওপর, পরের পয়সায় দেশ ভ্রমণ, ভাল খাওয়া-দাওয়া চলে তাতে। পাড়াঘরের গলিঘুঁজির সভাতে আসতে চান না তাঁরা।

কী করা যেতে পারে—অর্থাৎ বাজে লোকদের ভাষায় সাধারণ রেষারেষিতে না নেমে কিভাবে হেলদি কম্পিটিশনে চৈতন্য চাকলাদার লেনের গৌরব বৃদ্ধি করা যায়—এই আলোচনা করতে ঘন ঘন দুই ক্লাবের যুক্তবৈঠক আহ্বান করা চলতে লাগল; কিন্তু সে বৈঠকেও বিশেষ কিছু মীমাংসা হল না। ইতিমধ্যে গলির পাঁচকে ছেলের দল 'পিছিয়ে যাওয়ার যাত্রী সংঘ' নাম দিয়ে কোন এক ধড় কাগজের একজন ছোট সাব-এডিটরকে সভাপতি করে গলির মধ্যেই তেরপল পেতে সভা সেরে ফেলল। সে খবর আবার ফলাও করে উক্ত কাগজে ছাপাও হয়ে গেল। কী বিপদ! এখন এরা তাহলে করে কি?

অনেক চিন্তার পর—অর্থাৎ পঁচিশে বৈশাখ পেরিয়ে গেলে এক সময় ঠিক হল যে এইসব অসুবিধার মধ্যেই ওদের করতে হবে এটা। নইলে পাড়ার ও ক্লাবের প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। সবাই সেরে ফেলল প্রায়, আর এটা যখন জাতীয় কর্তব্যের মধ্যেই পড়ছে—তখন বেশী চিন্তা করে লাভ নেই। এই মাসেই করা হবে, তবে সাতদিনের তফাতে। কে কী করবে তা অপর দলকে বলবে না, সম্পূর্ণ 'সারপ্রাইজ' দেওয়া হবে বা চমক লাগানো হবে। চাঁদাটা খালি যুক্তভাবে তুলে সমান ভাগ করে নেবে দুদল। তাতে যা হবার যতদূর যা হবার তাই হবে। এতে করে সুবিধা—কে বেশী তুলল, কে কম তুলল তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা ও মনঃপীড়ার কারণ থাকবে না, পাড়ার লোকরাও বিব্রত হবে না।

এ মীমাংসায় সবাই খুশী হল। একজন শুধু ক্ষীণকণ্ঠে প্রস্তাব করতে গিছলেন যে 'দুদলে মিলেই তাহলে বড় করে ফাংশান করা হোক' কিন্তু তাতে সকলেরই দেখা গেল প্রবল আপত্তি। তাতে নাকি হেলদি কম্পিটিশানের ব্যাঘাত হয়।

এখন শুধু একটা প্রশ্ন রইল, কে আগে আর কে পরে করবে। কেউই নিজের অগ্রাধিকার ছাড়তে রাজী নয়। অনেক টানাহেঁচড়ার পর একজন প্রস্তাব করলেন যে, দুই ক্লাব মিলিয়ে যে সদ-

চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ মেম্বার তার মত জিজ্ঞাসা করা হোক।

এ প্রস্তাব অনেকেরই মনোমত হল। খোঁজ করতে করতে তেমন মেম্বারও একজন বেরিয়ে গেল—বোঁচা। বোঁচার বয়স সাত—তার চেয়ে ক্ষুদে মেম্বার দুই ক্লাবে একজনও নেই। সে অবশ্য জয়শ্রীর মেম্বার—পাড়াশ্রীর কর্তাব্যক্তিরা সেজন্যে একটু ক্ষুণ্ণই হলেন এবং ওর মধ্যেই ফিস্‌ফিস্ করে সংকল্প করলেন পরস্পরকে সাক্ষী রেখে যে অতঃপর ও'রা একটি এক বছরের ছেলে ও খোঁজ করে একটি একশ বছরের বুড়োকে মেম্বার করে নেবেন, দুদিকই বাঁধা থাকবে, কে জানে কাকে কখন দরকার হয়।

সে যাই হোক, আপাতত বোঁচার অধিকার চ্যালেঞ্জ করা চলে না। তাছাড়া বোঁচা যে এ মীমাংসার উপযুক্ত অধিকারী সে বিষয়েও সকলে নিঃসন্দেহ। কারণ সে বয়সে ছোট হলেও জ্ঞানে কারো্র চেয়ে খাটো নয়। ফুটবল ও ক্রীকেটের জগৎ তার নখদর্পণে। আশ্চর্য স্মৃতি-শক্তিও। এ সম্বন্ধে কারোর কিছু জানবার প্রয়োজন হলে নিঃসংকোচে তাকে প্রশ্ন করতেন সবাই। এম-সি-সির কোন্ খেলোয়াড় কি রঙের পর্দা ভালবাসেন তা থেকে শুরু করে কলকাতার বিখ্যাত ব্যাক ভাদু গোঁসাইয়ের কটা বেড়াল বাচ্ছা—এসব তার কন্ঠস্থ।

এ-হেন বোঁচা'র সামনে সমস্যাটা উপস্থাপিত করা মাত্র সে এক কথায় মীমাংসা করে দিলে; বললে, 'আরে—এ তো খুব সোজা, টস করুন না।'

তখন সবাইকে মানতেই হল যে এটা খুবই সোজা এবং তাদের সকলেরই মনে পড়া উচিত ছিল।

অতঃপর একটা আধুলি যোগাড় করে কেলোদাকে দিয়ে টস্ করানো হল। কেলোদা নাকি সাতখানা পাড়ার মধ্যে টস্-এর মাষ্টার। জয়শ্রী হেড্ নেবে না পাড়াশ্রী হেড্ নেবে, এ নিয়েও একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল অবশ্য কিন্তু সেটা বেশীদূর গড়াতে পারল না। বোঁচা দুটো আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'আপনাদের দুই সেক্রেটারী ধরুন একটা করে—আমি ঠিক করে দিচ্ছি কে হেড্ আর কে টেল!'

আঙুল ধরাতে জয়শ্রীই হেড্ পেলে। তাতে করে একটা চাপা গুঞ্জন যে না উঠেছিল তা নয়, যে, যেহেতু বোঁচা জয়শ্রীর লোক সে ইচ্ছে করে ওদের হেডটা পাইয়ে দিলে,—তবে সে গুঞ্জনে কর্তারা কেউই কর্ণপাত করলেন না। কেলোদা সাড়ম্বরে সকলের সামনে টস্ করলেন এবং তার ফলে পাড়াশ্রীই পেল অগ্রাধিকার। বোঁচা 'আনফেয়ার মীনস্' বা অন্যায় উপায় অবলম্বন করেছিল কিনা—এ ক্ষোভ আর পাড়াশ্রীর কোন মেম্বারের মনে রইল না।

এরপর দুই পক্ষই চুপচাপ। আলোচনা হয় কমিটি বসে—সব ক্লাব-ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে। 'ইন-ক্যামেরা' মিটিং না কি বলে ওকে। মেম্বারদের সব শপথ করানো হয়েছে যে এই মিটিং-এ কি আলোচনা হয়েছে তা কোন মেম্বার ঘরের বাইরে আলোচনা করবে না—এমন কি অপর মেম্বারদের সঙ্গেও না।

যথারীতি এমনি গুটিকতক 'ইন-ক্যামেরা' মিটিং-এর পর এবং একত্রে তোলা চাঁদা ভাগ করে নেওয়ার পর—বেশ কয়েকদিন কাটলে জয়শ্রীর 'অনি' প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও জয়েন্ট সেক্রেটারীগণ, ভাইস প্রেসিডেন্টগণ ও মেম্বাররা পাড়াশ্রীর চিঠি পেলেন:—আগামী শনিবার বেলা চারটার সময় পাড়াশ্রীর সভা; সভাপতি কবি মহেশ্বর দাশরথি রায়: স্থান—সাদার্ণ এভিনিউ, 'রবীন্দ্র সরোবরের প্রবেশপথের সম্মুখস্থ বাস-ষ্টপ!'

চিঠি পেয়ে এ'রা বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। ওদের সভায় খুব লোক হবে না এটা সত্যি কথা, এ তো আর জয়শ্রীর ব্যাপার নয়—তবু একটা বাস-ষ্টপে, রাস্তার ওপরে সভা আহ্বান করা—এ যেন বড্ডই বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? প্রবীণ কবি দাশরথি রায় মশাই আসছেন, এ তো তাঁরও অপমান।

নাঃ, ওদের আর মানুষ করা গেল না!

তবু, যাই হোক না কেন, পাড়াশ্রীকে জব্দ করার একটা সহজাত ইচ্ছা জয়শ্রীর সব সভ্যদের মনেই সুপ্ত থাকবে—এটা স্বাভাবিক। সুতরাং আবারও রুদ্ধদ্বার মন্ত্রণা-অধিবেশনে স্থির হল যে, এ ক্লাবের সকলে সেদিন তো পাড়াশ্রীর সভাতে যাবেই—পাড়ার সকলেই (মেম্বার নির্বিশেষে) যাতে যান সেজন্য এরা খুব সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকবে। কোথায় ওরা জায়গা দেয়—তা দেখে নেবে এরা।...

তারপর যথাসময়ে ও যথানির্দিষ্ট দিনে জয়শ্রীর সভাপতি— সহসভাপতি— সম্পাদক— যুগ্ম-সম্পাদক— কোষাধ্যক্ষের দল একেবারে দল বেঁধেই গিয়ে হাজির হলেন। পাড়ার আর কাঁরা যাবেন না যাবেন এখনও জানা যায়নি। কিন্তু একটা বাস-ষ্টপের পক্ষে এই কজনই তো যথেষ্ট। পেভ্‌মেন্টের সবটা জুড়ে সামিয়ানা খাটালেও বড় জোর দুশ' আড়াইশ' লোক বসতে পারবে তার নিচে। এরাই তো যাচ্ছে ত্রিশ-চল্লিশ জন।

কিন্তু সেই বিশেষ বাস-ষ্টপটিতে পৌঁছে বিষম ঘাবড়ে গেলেন তাঁরা। এই প্রথম ঘাবড়ে গেলেন এ যাত্রায়। কোথায় সভা আর কোথায় সামিয়ানা? গোটা পেভ্‌মেণ্ট আর তার সামনের রাস্তা যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে আছে। বাস-ষ্টপ-এ সাধারণত যা দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তা-ই ছিল, বাস আসতেই উঠে চলে গেল তারা।

সভা কোথায়?

বোকা বানাল নাকি তাঁদের পাড়াশ্রীর দল?

কিন্তু আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়! মে মাস তা-ও তো শেষ হতে চলেছে। তবে?

তাঁরা বোকা সেজেই দাঁড়িয়ে রইলেন, বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন পরস্পরের মুখের দিকে। কী করবেন, এক্ষেত্রে কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফিরে যাবেন না আর একটু দাঁড়িয়ে থাকবেন তাও স্থির করতে পারলেন না।

এইভাবে মিনিট চার-পাঁচ কাটবার পর তাঁদের মনে হল যে কাছ থেকে কেমন একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে। খুবই কাছে কোথাও থেকে। যেন বেশ কিছু লোক চাপাগলায় কথা বলছে—

আর সেই সঙ্গেই হঠাৎ এক সময় মনে হল তাঁদের মাথার ওপরের শিরীষ গাছটা থেকে যে পরিমাণ আধ-শুকনো ফুল আর পাতা খসে পড়ছে সেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়—একটু অস্বাভাবিক রকমের বেশী।

কথাটা মনে হতে হতেই কে একজন চাইলেন যেন ওপর দিকে—

সঙ্গে সঙ্গেই 'আঁক্' করে একটা বিস্ময়সূচক চিৎকার করে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন!

আর তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপর দিকে চেয়ে বাকী কজনও তেমনি

আঁতকে চেঁচিয়ে উঠে তেমনি হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। বিস্ময়েই তাঁদের সকলকার কথা হরে গেল যেন!

দেখলেন তাঁরা—শিরীষ গাছে শুধু ফুলই নয়, ফলও ধরেছে। অসংখ্য ফল। সে ফল আর কিছু নয়, জুতো-পরা জোড়া জোড়া পা।

অর্থাৎ পাড়াশ্রীর রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সভার আয়োজনটা হয়েছে এই বাস-স্টপের এই প্রসারিত বিপুল শিরীষ গাছটিতে।

এ'দের আঁতকে ওঠা চিৎকারেই সম্ভবত, ওপরওয়ালাদের চোখ পড়ল নিচের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কলরব করে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন, আসুন, দাদারা আসুন। চলে আসুন ওপরে, আপনাদের জন্যে বেস্ট্ সীট সব রেখে দিয়েছি। সভাপতির পাশের মোটা ডালটিই রাখা হয়েছে আপনাদের জন্যে। কোন ভয় নেই, চলে আসুন।'

আর প্রায় তখনই সড়াক করে ওপর থেকে লম্বা একটি বাঁশের মই নেমে এল। সম্ভবত ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বড় মই—এই সভার জন্য না-বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

তবু এ'রা নীরব। মই বেয়ে গাছে উঠে সভার শোভাবর্ধন করার মত উৎসাহ এ'দের মধ্যে বিশেষ দেখা গেল না।

'কী দাদারা—চেপে গেলেন যে! ফুটবল সিজন্-এ এ কাজ তো করতেই হয়। গাছে চড়া তো আর নতুন নয়। ফুটবলের জন্য যা পারেন কবিগুরুর জন্যে তা পারেন না?'

এ'রা কী জবাব দেবেন ভেবে ঠিক করার আগেই হুস করে এক ট্যাক্সী এসে গেল। পাড়াশ্রীর ড্রামাটিক সেক্রেটারী অতনু নন্দীর সঙ্গে তা থেকে নামলেন কবি মহেশ্বর দাশরথি রায়।

'আসুন স্যার, এই যে, এই মই বেয়ে উঠে পড়ুন—'

হাত ধরে মৃদু একটু টান দিলেন অতনু নন্দী।

প্রস্তাবটা শুনে বলা বাহুল্য কবি মহেশ্বরেরও চক্ষু স্থির। তিনি থপ্থপে অথর্ব মানুষ, জীবনে কখনও খেলাধুলো করেননি—গাছে-টাছে চড়তে তিনি পারবেন না, ও মই বেয়ে তো নয়ই! তাতে সভাপতি তাঁকে না করা হয় সেও ভাল।

তিনি সাফ জবাব দিয়ে গেলেন।

কিন্তু তাঁর সে জবাব শুনছে কে? অতনু নন্দী তো ছিলেনই, ততক্ষণে সড়সড় করে নেমে এসেছেন আরও দু-চারজন পাড়াশ্রীর কর্তাব্যক্তি, তাঁরা 'না না কোন ভয় নেই, আমরা আছি কী করতে, গায়ে আঁচ লাগতে দেব না স্যার আপনার' ইত্যাদি বলতে বলতে আগু-পিছু করে একরকম টেনেই তুলে নিলেন মই দিয়ে—এবং তিনি ওপরে ওঠামাত্র মইটি আবার সরিয়ে নিলেন। তার মানে—কবি মহেশ্বরের ইচ্ছা থাকলেও নেমে পালাবার আর পথ রইল না।

এই হ্যাংগামে এ'দের—কিনা জয়শ্রী-দের ওঠা হল না ওপরে। তখন আর মই নামানো যায় না, যদি সভাপতি পালান সেই ফাঁকে? এ'দের অবশ্য ওঠবার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু তাই বলে চলেও গেলেন না; সেই গাছের গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইলেন সকলে। লাউড স্পীকার তো রয়েছেই—সভাতে যোগ দেবার কোন অসুবিধা নেই। কতদূর কী হয় দেখাই যাক্ না। যথাদস্তুর সভা শুরু হল। সভাপতিবরণ, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সভাপতিকে মাল্যদান প্রভৃতির পর ন্যাড়া মিত্তিরের উদ্বোধন সঙ্গীত, ঝুনু মল্লিকের আবৃত্তি ও চীনেবাদাম মজুমদারের কৌতুকাভিনয়ের পরই সভাপতি মশায়ের অভিভাষণ আরম্ভ হল। কারণ সভার উদ্যোক্তারা বুঝেছিলেন যে, জোর করে সভাপতিকে যদি বা ধরে রাখা যায়, কিন্তু পরে আর কাজ করানো যাবে না, যে রকম নার্ভাস হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ—হয়তো এবার অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবেন।

কবি মহেশ্বর বারকতক কেশে গলা সাফ করে অভিভাষণ শুরু করলেন, 'সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, —পড়ে যাব না তো? আজ আমরা যে পবিত্র কর্তব্যের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি—পড়ে যাব না তো?—সে কর্তব্য শুধু পবিত্রই নয়, আনন্দদায়কও বটে। এ আমাদের—পড়ে যাব না তো?—বলতে গেলে জাতীয় কর্তব্য। কারণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—পড়ে যাব না তো?—তাঁর কীর্তির দ্বারা আমাদের জাতিকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে—পড়ে যাব না তো?—প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর কাছে—পড়ে যাব না তো?—আমাদের ঋণের অবধি নেই! তিনি—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলল সভাপতির অভিভাষণ। এর মধ্যে অন্ততঃ বার-আশি তিনি ঐ অর্ধস্বগত প্রশ্নটি করলেন নিজেকে, কিংবা ভাগ্যকে, কিংবা আশ-পাশের সভ্যদের। বলা বাহুল্য এই স্বগতোক্তিটি খুব নিম্নস্বরেই কর-ছিলেন দাশরথিবাবু, কিন্তু মুখটা মাইকের কাছে থাকায় শ্রোতাদের শোনবার কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না। এমন কি, পাড়াশ্রীর কর্মসচিব বকুল মাইতি যে খবরের কাগজের রিপোর্টার-দের কাছে অনুনয় করলেন, যাতে তাঁরা অভিভাষণের রিপোর্ট থেকে ঐ অর্ধ-স্বগত প্রশ্নটি বাদ দেন দয়া করে—সেটা পর্যন্ত জয়শ্রীর এ'রা শুনতে পেলেন।

ঠোঁটের কোণে এ'দের সকলকারই একটি মধুর হাসি ফুটে উঠল। কতকটা যেন সস্নেহ প্রশ্রয়েরই হাসি।

ছেলেমানুষ ওরা, যা করেছে তা করেছে—তার জন্য তাঁরা অন্ততঃ কোন

দোষ ধরবেন না, বা আলোচনা করবেন না—তাঁদের হাসির ভাবটা হল এই।

এইবার জয়শ্রীর পালা।

তাঁরা কী করবেন তা তাঁরাও সাবধানে গোপন করে রাখলেন। সরকারী টপ্ সিক্রেটের মত চাউর হওয়ার উপায় ছিল না, এমনি কড়া মিলিটারী ডিসিপ্লিন ও'দের।

তবে টেক্কা যে দেবেন পাড়াশ্রীর ওপর তা কে না জানে!

সেই টেক্কাটাই কেমন হবে—কতখানি 'ডাউন' দেবেন তাঁরা পাড়াশ্রীকে সেটা জানবার জন্য পাড়াশ্রীরা ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন—তবু জানা গেল না।

অবশেষে সেই দিনটি এল। অনেক বিনিদ্র রজনীর অবসানে— অনেক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর।

নিমন্ত্রণপত্র এসে পে'ছিল জয়শ্রীর।

কিন্তু এ কী? তাঁরাও যে বাস-স্টপেই নিমন্ত্রণ করেছেন! তবে সাধারণ কোন স্টপ নয়—ঘাঁটি। ন'নম্বর বাস যেখান থেকে ছাড়ে সেইখানের বিশেষ স্টপটিতে যেতে বলা হয়েছে রবীন্দ্রানুরাগী সুধীদের!

এই! তাহলে ওরা আর নতুন কিছু ভাবতে পারলে না!

সকলে হেসেই খুন হলেন প্রথমটা। হাসি থামলে সভাপতি পাকদমন পাকড়াশী একজনকে ডেকে বললেন, 'এই বংকা, দেখে আয় তো ওখানের গাছটা কত বড়, আর কেমন! ওখানে খুব বড় গাছ তো দেখেছি বলে মনে হয় না!'

কিন্তু বংকাকে যেতে হল না শেষ পর্যন্ত, ওকে বাঁচিয়ে দিল খোদন, সে বলে উঠল, 'পাকু কাকা—কিন্তু গাছ হলে শেষের এই লাইনটা লিখবে কেন? সভায় যোগদানেচ্ছু সুধীবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া অপরাহ্ন পাঁচটা সাত মিনিটের মধ্যে আসিবেন—নহিলে সভায় যোগদান সম্ভব হইবে না। এর মানে কি? গাছ তো আর পালায় না? ওরা বাস রিজার্ভ করে নি তো?

খোদনের মানব-জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে এই সুগভীর জ্ঞান ও গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। ......সত্যিই তো, গাছ হলে, এমন কথা লিখবে কেন?

পাকদমন বললেন, 'খোদন, আসছেবারে তোকেও একটা ভাইস প্রেসিডেন্ট করে নেব—দেখিস!'

একটা প্রশ্ন অবশ্য উঠেছিল যে ওরা এত টাকা পেলে কোথায়—কিন্তু সেটাকে কেউ তত আমল দিলে না। সরকারী চাঁদার ভাগ ছাড়াও নিজেরা চাঁদা তুলতে পারে, সেটায় তো কোন আইনের বাধা নেই! তাছাড়া ওদের দলের পাঁচু শীল একাই একশ—একুশ বছর বয়সে বাপের বড় কাগজের দোকানের মালিক হয়ে বসে দুহাতে টাকা ওড়াচ্ছে।

কিন্তু দেখা গেল ওরা অর্থাৎ জয়শ্রীরা এ ব্যাপারেও আর একচোট টেক্কা দিয়েছে। রিজার্ভ করার ঝামেলায় আদৌ যায় নি।

'বাস রিজার্ভ করব কোন্ দুঃখে। এতগুলো লোক উঠে বসলেই তো রিজার্ভ! তারপর আর উঠবে কে? কোথায়ই বা উঠবে? এক ট্রিপ যাওয়া আর এক ট্রিপ আসা—এর মধ্যেই আমরা সভা সেরে ফেলব। বাস্ ফিনিশ!'

'কিন্তু তাতেও তো কম যাবে না!' একটু দমে গিয়েই যেন প্রশ্ন করলেন পাকদমন পাকড়াশী।

'দেখা যাক্' সংক্ষেপে বললেন ওদের সভাপতি। হাসলেনও একটু মুচকে। বেশ রহস্যময় হাসি।

সে হাসির অর্থ বোঝা গেল আর একটু পরেই। সভাপতি বরণের সময়।

সভাপতি ও প্রধান অতিথি হয়েছেন এই ট্রিপের দুই কনডাক্টর; উদ্বোধক হলেন ড্রাইভার স্বয়ং। তাঁর সামনে এমনভাবে মাইক দেওয়া হয়েছে যাতে গাড়ি চালাতে চালাতেই তিনি ভাষণ দিতে পারেন!

খোদন উত্তেজিত হয়ে পাকদমনের কানে কানে বললেন, 'উঃ, কী বুদ্ধি দেখেছেন। কনডাকটররা এখনই মনে মনে লেকচার ভাঁজছে, টিকিট বিক্রীর কথা মনে আছে ওদের! অর্ধেক টিকিট নেওয়াই হবে না। সব গুলিয়ে যাবে। আর ও ড্রাইভার ভেবেছেন কোন স্টপে থামবে আর! এ তো অর্ধেক খরচেই রিজার্ভ হয়ে গেল ওদের!'

তার মধ্যেই অতনু নন্দী গলাটা বাড়িয়ে বললে, 'শুধু কি তাই? শুনেছি যে যদি কোন ইনস্পেকটর ওঠেন, তখুনি তাঁকে বিশেষ অতিথি করে নেওয়া হবে। তারপর আর তিনি টিকিট দেখতে চাইবেন কোন্ লজ্জায়!'

সভা চলতে লাগল। ভালই চলল সভা। রাস্তার দুপাশে লোক জড়ো হয়ে গেল গান আর আবৃত্তি শুনতে! এবং এখন ওরা আপসোস করতে লাগল একটা নৃত্যনাট্য ব্যবস্থা করেনি বলে। না হয় আর একটা ট্রিপই লাগত।

'উঃ বেড়ে জমালে তো!' জয়শ্রীর একজন ফিসফিস করে বললেন!

'হিট্। সুপার হিট্!' জবাব দিলেন তিনি গম্ভীর বিনয়ী মুখে।

সভা ভাঙতে নামবার সময় অতনু আর থাকতে পারলেন না—জিজ্ঞাসা করলেন এ দলের পাঁচু শীলকে, 'আচ্ছা এ প্ল্যানটা এসেছিল কার মাথায় বলুন তো!'

'বোঁচার।' সংক্ষেপে উত্তর দিলে পাঁচু।

সেইদিনই পাড়াশ্রীর বিশেষ অধিবেশনে স্থির হল যে, অতঃপর যেমন করেই হোক বোঁচাকে এ দলে ভাঙিয়ে আনতে হবে। তারজন্যে যদি ভাইস প্রেসিডেন্টের সংখ্যা পনেরো থেকে ষোল করতে হয়—সেও ভাল।

পাকদমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'উহু, আমার একটা য়্যামেন্ডমেন্ট রইল। যদি প্রেসিডেন্ট হয়েও এ দলে আসতে চায়—সে ও আচ্ছা! আমি সানন্দে আমার পোস্ট ছেড়ে দেব! মোদ্দা আনা চাই-ই ওকে!'

সবাই 'চিয়ার' 'চিয়ার' বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

রবীন্দ্রচিত্রের অন্তর্লোক

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি ভালো করে পরীক্ষা করলে, একথা অনায়াসেই বোঝা যায় যে, সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথে একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে প্রকাশ, তা কখনো শুচিতার ও সৌন্দর্যের গণ্ডীর বাইরে আসে না। জীবনের ও জগতের বিচিত্ররূপ ফুটেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যা কুৎসিত, কদর্য স্থূল বা নগ্ন, তাকে তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। বাস্তবকে ভিত্তি করেই জন্মেছে অবশ্য তাঁর সাহিত্যবোধ, কিন্তু বাস্তবকে অতিক্রম করে তা উন্নীত হয়েছে ভাবের রাজ্যে। কিন্তু চিত্রে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের রূপ ঠিক এর বিপরীত। যা কদর্য, যা বীভৎস, যা উলঙ্গ উৎকট, তাকেও তিনি গোপন করেন নি। আবার যা সুন্দর মধুর ও মনোজ্ঞ, তাকেও তিনি অধিক মূল্যে অভিষিক্ত করেন নি। সুন্দরে কুৎসিতে, শুচিতে অশুচিতে, ভালোয় মন্দে অবিচ্ছেদ্য মেশামিশি হয়েছে তাঁর ছবিতে। বরং বলতে পারি, অসুন্দর অশুচি ও বীভৎসেরই প্রাধান্য ঘটেছে তাতে।

কেন এমন হল? একই রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিধা-বিভক্ত রূপ কেন দেখি আমরা? এই প্রশ্নের উত্তরে পৌঁছতে হলে, আমাদের যেতে হবে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন পর্বের গোড়ার ইতিহাসে। অনেকেই জানেন আশা করি যে, রবীন্দ্রনাথ বিধিবদ্ধ বিদ্যা হিসাবে ছবি আঁকা কোনদিন শিক্ষা করেন নি এবং সত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত ছবি পদবী লাভ করতে পারে এমন কোন জিনিসও তাঁর হাত থেকে জন্মায় নি। হঠাৎ সত্তরের সীমানায় এসে শিল্প-সাধনার এই দিকটি উন্মুক্ত হয়ে গেল তাঁর সামনে এবং হল অনেকটা আকস্মিকভাবেই। কবিতা রচনার সময় পাণ্ডুলিপিতে তাঁর কখনো কখনো খুব কাটাকুটি হত। এই কাটাকুটিগুলোর উপর আনমনেই কলম ঘষতেন তিনি। বলা যেতে পারে হিজিবিজি আঁকতেন। আসলে বাইরে কলম যখন এইভাবে খেলা করত, ভেতরে মন তখন তাঁর রচনার চরণটিতে মনের মতো সুর ও শব্দের গ্রন্থনা করত। তারপর যেই আসত লেখার বেগ, অমনি সেই কালি-কলঙ্কিত হিজিবিজির পদচিহ্ন একান্তে ফেলে রেখে, এগিয়ে যেতেন তিনি লেখার পথে। এ থেকেই একদিন আবিষ্কার করলেন তিনি যে ঐ হিজিবিজিগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের অজান্তেই তাঁর হাত সৃষ্টি করেছে রকমারী রূপ, যা কোথাও বাস্তবের কোথাও বা অতি-বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হয়ে রচনার মর্যাদা দাবী করতে পারে। এখানেই তাঁর সামনে খুলে গেল বৃহৎ একটা অজ্ঞাতলোকের দরজা। সজাগভাবে শুরু করলেন তিনি চিত্রাঙ্কন এবং এক এক করে দেড় হাজারেরও বেশী ছবি রচনা করলেন তিনি জীবনের শেষ দশ বৎসরে। প্রথমে করেন কালি-কলমের রেখাঙ্কন, ক্রমে অঙ্কনে আসতে শুরু করল বিচিত্র আঙ্গিক ও রীতির পরীক্ষা, সেই সঙ্গেই উপকরণ হিসাবে এল তুলি এবং আরো যা-যা লাগে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, হাতও যেমন উত্তরোত্তর খুলতে লাগল তাঁর, দৃষ্টিও তেমনি ছড়িয়ে পড়তে লাগল অঙ্কনের নূতন নূতন দিগন্তে।

এ ইতিহাসে এইটুকু বোঝা গেল যে চিত্রাঙ্কন বিদ্যাটা রবীন্দ্রনাথ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করেন নি, ওটা এসেছিল তাঁর কাছে হঠাৎ পাওয়া একটা শক্তির মতো। এর ফলে বিধিবদ্ধ শিক্ষার যে গ্রামার, তা তাঁর কল্পনার সহজ গতির মুখে রীতি-পদ্ধতির লাগাম পরাতে পারে নি। অকপটে আপন অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও কল্পনাকে প্রকাশ করবার সহজতাটুকু তাঁর অবিকৃতই থেকে ছিল এজন্যে। পক্ষান্তরে অঙ্কনের গ্রামারে দক্ষতা ছিল না বলেই, ছবি তাঁর বিশুদ্ধ চিত্র-বিজ্ঞানের নিরিখে সব সময় সর্বাঙ্গীণ ছবিত্ব লাভ করেনি। অঙ্গ-সংস্থানে, পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবস্থাপনায়, আলোক সন্নিপাতে পদে পদে হয়েছে তাঁর ত্রুটি। কতক ছবি তাঁর বাস্তবের কাছাকাছি, কতক অতি-বাস্তবের অভিমুখী, কোনটা স্পষ্ট, কোনটা জটিল, ধোঁয়াটে দুর্বোধ্য। যেন দেখার মধ্যেই অদেখা, বোঝার মধ্যেই অবোঝা কি-একটা রয়েছে, এই হল তাঁর বেশীর ভাগ ছবি। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী না হওয়া একই সঙ্গে তাঁর পক্ষে যেমন লাভের হয়েছে, তেমনি লোকসানেরও হয়েছে। লোকসানের কথা এই মাত্র বলা হল। বিজ্ঞান-সিদ্ধ অঙ্কন হিসাবে তাঁর বহু ছবি অনুত্তীর্ণের মার্কা পায়। আর লাভের দিক হল এই যে, আপন আবেগ অনুভূতি ও কামনা-কল্পনাকে তিনি কোথাও রেখে ঢেকে প্রকাশ করেন নি, যা করে থাকেন প্রত্যেক 'শিক্ষিত' শিল্পীই। তাঁদের ছবি ঝকঝকে তকতকে নিখুঁত নির্ভুল ও জীবন্ত হয় ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবির মতো বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি, রূঢ়তা অস্পষ্টতার মধ্যেও প্রকাশের এমন প্রাচুর্য তাতে থাকে না।

একথা অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, ছবির রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ধারা অনুসরণ করেছেন, তা পিকাসো ও মাতিস অনুসৃত সুররিয়ালিষ্টিক বা অতি-বাস্তবিক অঙ্কন ধারারই অনুবর্তী। পার্থক্য এই যে, পিকাসো ও মাতিস 'শিক্ষিত' শিল্পী ছিলেন বলেই, তাঁদের অবলম্বিত ধারাকে ও'রা একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ এমেচিয়ার বা অপেশাদার শিল্পী ছিলেন বলে, সেই একই দার্শনিক তত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করেছেন কতকটা কৈফিয়তের আকারে। আসলে কথাটা প্রণিধানযোগ্য। পিকাসো বলেন, মানুষ যা সৃষ্টি করে, তার

মধ্যে শ্রী, সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা থাকে। মানুষের হাতের বাইরে যা সৃষ্টি হয়, তা হল বিশৃঙ্খল, অগ্রথিত এবং নানা ভগ্নাংশের সমবায়ে গড়ে ওঠা একটা কিছু। বহিঃপ্রকৃতি বা অন্তঃপ্রকৃতির যেখানে তাকান, সেখানেই এই বিশৃঙ্খলা। কাব্যে ও চিত্রে স্রষ্টা যদি মনের কল্পনা কামনা বা আবেগকে অবিকৃতরূপে ফোটাতে চান, তাহলে তা অনিবার্যভাবেই হবে অসংলগ্ন। কিছু বোঝা, কিছু অবোঝা, কিছু বাস্তব, কিছু অবাস্তব যেখানে মিলে-মিশে এক হয়েছে, সেখানে সংকেত ছাড়া তাই আত্মপ্রকাশ কিভাবে সম্ভব?

লক্ষ্য করার বিষয় যে, কাব্যে এই সংকেত-ধর্মিতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁরা এই ধারা অনুসরণ করেছেন, দু-একখানি চিঠিতে এবং শেষ জীবনের একটি প্রবন্ধে তিনি তাদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সাহিত্য সৃষ্টি হয় স্রষ্টার আনন্দ থেকে, একথা ঠিক। কিন্তু তা সার্থক হয় ভোক্তার আনন্দের সংগে যুক্ত হয়ে। অর্থাৎ লেখক-পাঠকে অন্তরঙ্গতার সেতুবন্ধন চাই। লেখকের বক্তব্যের সিংহদরজা পার হয়ে পাঠক যেখানে অন্দরে পৌঁছতেই পারলেন না, সেখানে লেখার সার্থকতা কি রইল? কার জন্যে লেখা হল? কিন্তু মজা এই যে, ছবির ক্ষেত্রে দর্শকের সংগে শিল্পীর অনুভূতির সেতুবন্ধন ঘটানোর জন্যে মোটেই সচেষ্ট হন নি রবীন্দ্রনাথ। বরং বলেছিলেন, সব জিনিষই বোঝার জন্যে নয়। বোঝার পথ ধরে চলতে চলতে না-বোঝার অন্ধকারে পথ হারানোর আনন্দটাই শিল্পের সব চেয়ে বড় দান। জ্যামিতির কাঁটা কম্পাস নিয়ে যাঁরা বসে যান ছবির মূল্য কষতে, তাঁদের জন্যেই নিষেধ বাক্য আছে, মা লিখ, মা লিখ! অর্থাৎ সেই পিকাসোপন্থীদেরই কথা।

এখন প্রশ্ন উঠবে, পঁয়ষট্টি বৎসরের সাহিত্যিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করেছেন, দশ বৎসরের শিল্পী জীবনে তাহলে কি তিনি তাঁর সেই জীবন-ব্যাপী আদর্শের বিরোধিতা করেছেন? কি এই স্ববিরোধিতার মূল কারণ? বলা বাহুল্য বিরোধিতাটা এত স্পষ্ট যে তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাকে কার্য-কারণ সূত্রে বাঁধতে গেলে, অর্থাৎ একই মানুষের এই দ্বি-মানসিকতার স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে, বেশ একটু ফাঁপরে পড়তে হবে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য-সৃষ্টি বৃহৎ ও বহু ব্যাপক হলেও, তা সীমার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। তিনি যে আবেষ্টনীতে জন্মে-ছিলেন, যে শিক্ষা-দীক্ষা ও পারি-পার্শ্বিক তাঁর মননশীলতা গঠন করেছিল, তাতে সমাজ ও মানুষের সমগ্র রূপ স্বাভাবিক কারণেই তাঁর চোখে ধরা পড়েনি। আবার যে ধারায় নিজেকে তিনি ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, তাতেও অনিবার্যভাবেই এসেছিল একটা বিধি-নিষেধাশ্রিত ঘষা-মাজা অলঙ্কারিক উজ্জ্বলতার রূপ। তাই জৈবতা ও তার নিষ্কুন্ঠ নিরাবরণ অভিব্যক্তি রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। মানুষের উন্মত্ত হিংস্র ক্ষুধিত বিকৃত ও বুদ্ধিহত রূপকে তিনি সযত্নে পরিহার করে গেছেন। এগুলি অসত্য একথা তিনি বলেন নি। এই সত্য শিল্পের অংগনে অনাচরণীয় নয়, এই কথাই তিনি বলেছেন। তাঁর বিখ্যাত একটি কথা হল: পংকটা সত্য বটে, কিন্তু পংকজও ত সত্য। পংকজকে একান্তে সরিয়ে রেখে পাঁক ঘাঁটাঘাটি হল সাহিত্যিক অঘোরপন্থীর কাজ।

কিন্তু জ্ঞাতসারে সাহিত্যে যে অঘোর পন্থাকে তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন, শুধু তা-ই নয়, বিরূপতার দ্বারা সম্ব-র্ধিত করেছেন, অজ্ঞাতসারে তাই এসে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে তাঁর ছবিতে। চলতি দৃষ্টিতে যাকে আমরা শ্লীল, শুচি বা সুন্দর বলি, তার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ মূর্ত হয়েছে তাঁর বহু ছবিতে এবং লক্ষণীয় যে, আঙ্গিক আবেষ্টনী ও বর্ণবিন্যাসে সেগুলিই তাঁর সর্বোত্তম শিল্পকর্ম। তাহলে এই কথাই কি দাঁড়াল না যে, যে-বাস্তবতা ও জৈবতাকে তিনি সাহিত্যের অংগনে প্রবেশাধিকার দেন নি, তাঁর অবচেতনায় তাদেরও ছিল বৃহৎ একটা স্বীকৃতির দাবী? সেই দাবীই অনুশীলিত তুলির মুখে তাঁর সজাগ মনকে ফাঁকি দিয়ে প্রকাশমান হয়েছে!

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে মিথুন মূর্তির সংখ্যাধিক্য নিশ্চয় মনন-শীল দর্শকের চোখ এড়ায়নি। গুহা-গহ্বরের জটিল অন্ধকারে প্রাগ-ঐতি-হাসিক শ্বাপদ-সরীসৃপের সংগে মানুষের জড়াজড়ির ভয়ংকর সুন্দর মূর্তি তাঁর সংখ্যায় অল্প নয়। ভগ্নাংশে পর্যবসিত বিকট বিকলাংগ মানব-মানবীর অট্টহাস্যানিরত চমকপ্রদ চিত্রও
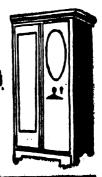
চোখে পড়ে অজস্র। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত-ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় মানবতৃষ্ণার সেই সব দিক, অর্থবান ভাষায় যাকে তিনি কদাচ রূপ দেন নি। এক হিসাবে রবীন্দ্র-চিত্রের বারো আনাই এই। অবশ্য যাকে আমরা সহজ ও স্বাভাবিক বলি, সেই জীবনেরও রূপায়ণ আছে তাঁর ছবিতে। জ্যোৎস্নালোকিত বিশাল দিগন্তে ধ্যানস্তিমিতনেত্র নারীর রূপ মূর্তি পরিগ্রহ করেছে তাঁর তুলিতে। নৃত্য-মুখর হরিণ-যুগল সতৃষ্ণ কামনায় তরুণ-তরুণীর মূর্তির কাছে এগিয়ে এসেছে। প্রস্ফুটিত ফুলের দলগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে অশ্রুবিধুর দুটি কালো চোখ উঁকি দিচ্ছে, ঘুমন্ত অরণ্যের মাঝ-খান দিয়ে অস্পষ্ট সর্পিল পায়ে চলার পথ দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে........ এমনি সব আশ্চর্য সৌন্দর্যময় ছবিও ফুটেছে তাঁর হাতে। কিন্তু সতর্ক পরীক্ষায় দেখা যাবে, তারা সংখ্যাল্প এবং প্রাণশক্তিতেও পূর্বোক্ত দলের সম-কক্ষ নয়। বলতে বাধা নেই যে, এই বিভাগের চিত্রকর্ম তাঁর যত্নকৃত সহজাত নয়। তাই চিত্রী রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরি-চয় তারা বহন করে না, যা করে আগের বিভাগটি।

প্রসংগত বলা যেতে পারে যে, প্রাচ্য চিত্র-রীতির পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ একদা এদেশে বৃহৎ একটি ভূমিকা নিয়ে-ছিলেন। কাউণ্ট ওকাকুরা, ভগিনী নিবেদিতা, তিনি ও অবনীন্দ্রনাথই তথা-কথিত প্রাচ্য কলাকে জীবন্ত একটি শিল্পরীতি রূপে এদেশে নূতন করে প্রবর্তন করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে দেখা দেন স্রষ্টা রূপে এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণাদাতা, কারণ চিত্রাঙ্কনের চিন্তা তখন মনেও উদয় হয়নি তাঁর। এই প্রাচ্য চিত্ররীতি নিয়ে অনুকূল প্রতিকূল যাই আলোচনা হয়ে থাক দেশে, একটা কথা এই শিল্প-গোষ্ঠী মননশীল মানুষদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে চিত্রকলা ফটোগ্রাফ নয়, বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি তুলির মুখে ফোটাতে পারাই শিল্প রচনার পরমার্থ নয়। শিল্পী চোখে যা দেখেন, তার সংগে যুক্ত হয় তাঁর মনের দেখাও। সেই মানস বীক্ষণের দ্যুতি এসে পড়ে

যখন বাইরের দৃষ্ট বস্তুতে, তখন স্বাভাবিক কারণেই তার বস্তুরূপ যায় বদলে। কাজেই বাস্তবে যেটা যে রকম দেখতে, ছবিতে সেটা সে রকম নয় বলা রসিকের উক্তি নয়। বলা বাহুল্য প্রাচ্য কলারীতির প্রাণধর্ম সম্বন্ধে এই উক্তি একাধিক স্থানে করেছেন রবীন্দ্রনাথই।

কিন্তু কালক্রমে যখন স্বয়ং দেখা দিলেন তিনি চিত্রশিল্পী রূপে, তখন তিনি প্রাচ্য রীতির এই দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন না। তিনি অবলম্বন করলেন প্রতীচ্য রীতির একেবারে অতি-আধুনিক ধারাটি, যেখানে অবয়ব, আবেগ ও আবেষ্টনী, সবই প্রধানত সংকেত-নির্ভর। রূপ যেখানে অরূপ ও নিরূপের মধ্যে দোদুল্যমান। পিকাসো, মাতিস, গগাঁ, সেজান প্রমুখের ছবি যে তিনি ভালো করে অনুশীলন করেছিলেন, বা এই সংকেতধর্মী অতিবাস্তবিক অংকনের পক্ষে তাঁদের দার্শনিক ব্যাখ্যানগুলি যে তিনি ভালো করে আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করেছিলেন, এমন কথা তাঁর সংগে ছবি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেও কখনই আমার মনে হয়নি। বলতে পারি, প্রায় একই সময়ে প্রায় একই ধারা প্রকট হয়েছিল তাঁর হাতে, অনেকটা অজ্ঞাতসারেই। হতে পারে ফ্রয়েডীয় অবচেতনাবাদের ব্যাপক প্রচার এবং শিল্পসাহিত্যের প্রাণলোকে অবচেতনার সুবৃহৎ ভূমিকা সম্পর্কীয় ব্যাখ্যান রবীন্দ্রনাথকেও একইভাবে নাড়া দিয়েছিল, যেমন দিয়েছিল পিকাসোগোষ্ঠীকে। তার ফলেই জন্ম নিয়েছিল সম্পূর্ণ আত্ম-স্বতন্ত্র পথে তাঁর অংকন ধারা, ঘটনাচক্রে যার প্রাণগত মিল হয়েছে সমসাময়িক আর একটি প্রসিদ্ধ শিল্পরীতির সংগে।

অনেকে জানেন আশা করি যে, রবীন্দ্রনাথের ছবি পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য শহরেই প্রদর্শনীর মাধ্যমে গুণীজনের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। ফরাসী ইতালীয়ান স্ক্যানডিনেভিয়ান ও জার্মাণ মুল্লুকে এমন কথাও বহুজন বলেছেন যে, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ছাড়া ছোট নন। হয়ত সোভিয়েট মুল্লুক ছাড়া আর সব দেশেই তখন ত্রিভুজিক বা কিউবিক, অতিবাস্তবিক বা সুররিয়ালিস্টিক অংকনের একাধিকার চলছে বলেই, রবীন্দ্র-চিত্র তাঁদের কাছে অদ্ভুত বা উদ্ভট ঠেকেনি। অথবা অতিন্দ্রীয়তা প্রধান রবীন্দ্র-কবিতার মধ্যে তাঁরা যে জিনিষটি পান নি, ছবিতে তার সাক্ষাৎ পেয়েই তাঁরা এতটা অভিভূত হয়েছিলেন। মোটের উপর দেশের চেয়ে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ছবি বেশী আদৃত হয়েছে, এটা লক্ষণীয়। একজন নরওয়েবাসী শিল্পী 'সে' নামক কিশোর পাঠ্য বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি দেখে বর্তমান লেখককে বলেছিলেন, কেবলমাত্র এই কখানি ছবি আঁকতে পারলেই আমি জীবন সার্থক মনে করতাম। এক সংগে এত বড় কবি ও শিল্পী মানুষের ইতিহাসেই আর জন্মাননি!

কথাটি প্রণিধান করবার মতো। প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে গ্যেটে, ভিক্তর হ্যুগো, উইলিয়াম ব্লেক ও গ্যাব্রিয়েল রোসেটি চিত্রাংকনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ'দের মধ্যে ব্লেক একটা মানসিক আঁধির আক্রমণে ভুগেছিলেন, তাই তাঁর পরিণত জীবনের কবিতা ও ছবির মধ্যে কেমন একটা ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া ছায়া ভাব দেখা যায়, যা নজর করার মতো। কিন্তু কি তাঁর, আর কি অন্যান্য কবির ছবি যতটা কৌতূহলের বস্তু, ততটা মাথায় করে রাখবার মতো জিনিষ নয়। কারণ প্রাণবস্তু বা আংগিকের অনস্বীকার্য স্বাতন্ত্র্য তাঁদের কারো ছবিতে নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে, ছবির রাজ্যে তিনি যদিও এসেছিলেন আগন্তুকরূপে, তবু নিজেকে প্রকাশের ভাষা তিনি নিজেই গড়ে নিয়েছিলেন। কারো কাছে ধার করেন নি কিছু, অবনীন্দ্র নন্দলালের সংগে সারাজীবন যুক্ত থেকেও। আসলে তাঁর মধ্যে ছিল এমন এক সার্বভৌম শিল্পীসত্তা, যা সংগীত চিত্র কাব্য ও অভিনয়, কলা কৃষ্টির এই চতুর্বর্গ শাখাতেই সমভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিধি নিরূপণের সময় তাঁর এই সামগ্রিক রূপটি যদি আমরা প্রণিধান না করি, তা'হলে রবীন্দ্র-পরিচিতি আমাদের কোনদিন সম্পূর্ণতা লাভ করবে না।

শব্দকল্পদ্রুম

॥ সংখ্যা-রহস্যের উত্তর ॥

১। দ্বৈতবাদী—
জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক নয়—এই মতকে দ্বৈতবাদ বলা হয়। যাঁরা এই মত মানেন তাঁরা দ্বৈতবাদী।

২। ত্রিপিটক—
তিন ভাগে বিভক্ত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। তিনটি ভাগ : সূত্র, ধর্ম ও বিনয়।

৩। চতুরংগ—
চার অংগবিশিষ্ট সেনাবাহিনী। চার অংগ : হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি।

৪। পঞ্চভূত—
ভূত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর শাস্ত্রোক্ত উপাদান। পাঁচটি উপাদান এই : ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজ (আলো), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ)।

৫। ষড়দর্শন—
সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত (বা উত্তরমীমাংসা) বৈশেষিক ও ন্যায়।

৬। সপ্তসমুদ্র—
পুরাণে যে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে সেগুলি এই : লবণ সাগর, ইক্ষু সাগর, সুরা সাগর, ঘৃত সাগর, দধি সাগর, ক্ষীর সাগর, স্বাদুদক সাগর।

৭। অষ্ট ঐশ্বর্য—
ঐশ্বর্য বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যোগলব্ধ শক্তি। আটটি শক্তি এই : অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িতা।

৮। নবগ্রহ—
সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

৯। দশ দশা—
দেহজ দশ দশা এই : গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগন্ড, যৌবন, স্থাবির্য, জরা প্রাণরোধ ও বিনাশ।

কামজ দশ দশা এই : অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু।

১০। দ্বাদশ রাশি—
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। সতেরো ।।

সফল হোল না বিশাখা, তবে সফলতার কি একটি রূপেই আছে?

যা ছিল দুজনের মনে মনেই এতদিন, বিশাখার ষড়যন্ত্রে দুজনের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়ে দুজনকে পরস্পরের আরও কাছে টেনে নিয়ে এল। স্বাতি তার এই ধরা-পড়ে-যাওয়া ভালোবাসাকে স্বীকার করে নিল বিশাখাকে গালাগালের অভিনন্দন জানিয়ে; যা গোপনীয় তার অভিনন্দনও তো প্রচ্ছন্নরূপেই আসবে।

প্রশান্ত ও-দিকেই গেল না একেবারে। প্রথমত প্রচ্ছন্নতার ব্যাপারে পুরুষ অত দক্ষ নয়। দ্বিতীয়ত রজতের সম্পর্কে বিশাখার সঙ্গে ওর সম্পর্কটাও এমন যে, যা হোল সেটা নিয়ে কোন রকম অভিনন্দন দিয়ে ওর কাছে মনের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইবে। এই সম্বন্ধ ধরে ও নিশ্চিন্তও তো হতে পারেনি যে বিশাখা যা বলল বা করল তা জ্ঞানতঃ বলেছে বা করেছে।

তবু একটা ব্যাপার করল সে। তাতে বিশাখা যদি ভেবে থাকে এ তার সেই নদীতীরের রাত্রির পুরস্কার তো ভাবুক, প্রশান্তর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু সে-রাত্রে যা-কিছু হোল সেসব স্বাতির কাছে স্বীকার করে নেওয়া—খোঁপার তিনটি বেলফুল পর্যন্ত। কাজ উপলক্ষ্যে কলকাতায় প্রায় যেতে হয়, এবার গিয়ে বিশাখার জন্য একটি ভালো ব্যাঞ্জো কিনে নিয়ে এল।

আরও একটি জিনিস ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেলেছে, সেটি কিন্তু আপাতত বেদনার কারণই হয়ে রইল।

একটি হাতে-চালানো সুদৃশ্য সেলাইয়ের কল। যখন কিনল, তখন কিছুই অসম্ভব বা অসংগত মনে হয়নি। তখন নদীর তীরের স্মৃতিটাই মনের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় কথা। কেন দেওয়া যাবে না স্বাতিকেই, যেমন বিশাখাকে দিতে পারছে? এইতেই কি বেমানান হবে না যে, দুটি সখী, তার মধ্যে একজনকে দেওয়া হচ্ছে আর একজন হচ্ছে বঞ্চিত? এরচেয়ে যদি স্পষ্ট হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যটা তো তাইতেই বা ক্ষতি কি? স্বাতি আর ওর মাঝে কি আর রইল কিছু অস্পষ্ট? তারপর, লাহিড়ী-মশাইয়ের কথা। অত রাত্রে স্বাতিকে যেতে দিলেন ওদের সঙ্গে। অবশ্য, প্রশান্তকে ভালো করে দেখেছেন এর মধ্যে, গেছেও একটি পুরো দল—একটা কিছু দেখতে না পেলে ভবিষ্যতের একটা স্পষ্ট চিত্র সামনে না থাকলে পারে না তো কেউ। বিশেষ করে ও'র মতো মানুষ।

কেনার উল্লাসে, কিনেই ফেলল, দেবে স্বাতিকেও।

তারপর গাড়ি ছাড়ার পর থেকেই যুক্তির উলটা স্রোত বইতে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে মনটাকে লজ্জায়-সংকোচে অভিভূত করে ফেলতে লাগল...এমন অপরিণামদর্শীর মতো কাজ করতে পারল কি করে সে! তখন যেটাকে একটি দেওয়ার মতো উপহার বলে মনে হয়েছিল, দেখল, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা অপমানই। স্বাতিরা যে অবস্থায় তাতে সেলাইয়ের কল তাদের উপজীবিকার সহায় মাত্র, শৌখীন জিনিস তোয়ের করে অবসর বিনোদনের সামগ্রী নয়।...উপহার হিসাবে দেওয়াও যে কত শক্ত, সে কথাটাও ওর কাছে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল, তবে স্বাতিদের দারিদ্রের কথাটা আর সব কিছুকেই দিল চাপা। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, প্রথম শ্রেণীর কামরায় একাই বসেছিল প্রশান্ত, ক্রমে এটা নিয়ে নামাও ওর পক্ষে এমন সংকোচের ব্যাপার মনে হোল যে একবার সত্যই ভাবল ওপরের বাঙ্কের ওপর জিনিসটা ভুলে নেমে যাবে। এ মতিভ্রমের যা পরিতাপ তার কাছে শ'তিনেক টাকার ক্ষতিও যেন তুচ্ছ মনে হোল।

এ কথাও তো রয়েছে এর সংগে যে স্বাতি এখন ওর মানসআকাশে কত উর্ধ্বের এক দীপ্ত তারকা।

তা অবশ্য করল না। নিয়ে এসে ভগ্নীর জন্য কেনা, দেশে গেলে নিয়ে যাবে বলে, ঘরের এক জায়গায় রেখে দিল। কয়েকদিন অবহেলারই রইল পড়ে, তারপর একদিন করুণা-বন্দেই একটা লাল ভেলভেটের আস্তরণ করে

দিল।......একটা সেলাইয়ের কল, কিন্তু তারও যেন একটা নীরব আবেদন রয়েছে।

আরও কিছুদিন গেল। আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে ওরা দুজনে। ভেতরের দেওয়া-নেওয়া বাইরেও প্রকাশ খোঁজে। একদিন বিশাখা স্বাতিদের বাড়ি আসবার জন্যে মোটরে ওঠবার আগে প্রশান্তর হাতে একটা রুমাল দিল। একটি কোণে প্রশান্তর নামের আদ্য অক্ষর, নীচে একটি ছোট্ট সবুজ পাতার সঙ্গে রাঙাফুল। প্রশান্ত দেখে বলল—"বাঃ, এমব্রয়ডারিতে তোমার বেশ হাত তো।"

বিশাখার এখন আবার সেই অল্প হাসি অল্প কথার যুগ চলেছে, তবে কথাগুলোয় একটু করে ধার থাকে মাঝে মাঝে। বলল—"এই তো দুঃখু, আপনি হাত চেনেন না।"

"তোমার নয়?"—প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

দুজনে বারান্দা থেকে নেমে মোটরের কাছে চলে গেছে, উঠতে উঠতে বিশাখা বলল—"আমার কেন হতে যাবে?"

ঐটুকুই। মোটরও ছেড়ে দিল।

সন্ধ্যের পর ওকে আনতে গিয়ে প্রশান্ত বলল— "আপনার দেওয়া মেয়ে বাবা? আমি এদিকে সারা বাড়ি এক করছি, গেল কোথায় রুমালটা।"

"ঠিক জায়গায় যায়নি?" ঐটুকুই প্রশ্ন করে কথাটা ঘুরিয়ে নিল বিশাখা। ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিল, শিক্ষানবিশী, বলল— "এবার তুমি বাজাও স্বাতিদি।"

"কি হোল?" প্রশ্ন করল স্বাতি।

"চটেছ, ভুল হলে আরও চটবেই তো।"

পথটা খুলল এইভাবে; এরপর দেওয়া-নেওয়া স্রোত বয়েই চলল। অবশ্য একতরফা স্রোত, একজনই দিচ্ছে আর একজনই নিচ্ছে। দেওয়ার সুবিধাও তো স্বাতির, তারা উপকৃত, তার হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। এই কৃতজ্ঞতার পর্দার আড়ালে টেবিল ক্লথ, বেড-কভার, বালিসের ঢাকনা, আরও সব নানা রকম নানা জিনিস উপস্থিত হতে লাগল, জামা মোজা পর্যন্ত। শুধু ফুল তোলার জন্যই নয়, রিফু-সেলাইয়ের জন্যও। বিশাখা নিয়ে যায়, চেহারা ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

বাবা দেখেন বৈকি। তিনটি ঘর আর একটা বাগান নিয়ে বাড়ি, নুকুনো থাকবে কোথায়?

দরকারই বা কি নুকুবার?

চলো গিয়ে ডেকে আনি—কী যে ছিরি করে রেখেছে বাড়ির তিনটেতে মিলে! ......বুঝি তোরা ফ্যাশান দুরস্ত করে রাখতে পারবি না—কেউ আশাও করে না সেটা—তবু একটু ছিমছাম করে তো রাখতে হয়। ঘরের পর্দাটা এতখানি ছিঁড়ে ঝলঝল করে ঝুলছে। কী, না কুকুর আর বেড়ালটায় ঝগড়া করতে করতে ঐ করেছে। তা একটু সেলাই করে দিবি তো ছুঁচের দুটো ফোঁড় দিয়ে?—না পারিস দর্জির বাড়ি থেকেও তো সারিয়ে আনতে পারিস... "

দেওয়ার একটিই সুক্ষ্মসূত্র, সেটাকে চাপা দিতে একরাশ কথা এনে ফেলে স্বাতি।

একটু করে হাসেন বাবা, বলেন— "যতটুকু পার, দেখো, দুজনে রয়েছ তো।"

ওঁর হাসিতে আজকাল একটা যেন নূতন কি দ্যাখে স্বাতি, প্রসন্নতাটা ওঁর অভ্যাস, তার সঙ্গে একটা যেন করুণা মেশানো থাকে।

শ্রী-হীন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নূতন শ্রী নিয়ে ফিরে আসে প্রশান্তর জিনিসগুলা।

ওর দৃষ্টিটা গিয়ে গিয়ে পড়ে ভেলভেট-ঢাকা সেলাইয়ের কলটার ওপর। এক এক সময় লোভটা এত বেড়ে যায় যে, প্রায় সংযম হারিয়ে তুলে দিতে বলে মোটরে। কিন্তু পারে না।

ওর তো ঢাকবার কিছু নেই। কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তো সারতে পারে না। তারপর একদিন বিনা আয়াসেই পৌঁছে গেল সেলাইয়ের কল।

এসব ব্যাপারের গন্ধ বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। একটা যে কিছু চলছে, বিবাহেরই প্রস্তুতি, এ খবরটা চাকরদের মহলে ছড়িয়ে পড়েছে; এদিকে অনাথ, ওদিকে প্রশান্তর পাচক-ঠাকুর চাটুজ্যে-মশাই, বেয়ারা গোপেশ্বর, রজতের ঠাকুর, চাকর। তাদের থেকে আরও পাঁচ কান। আলোচনা হয়। ছোট জায়গা, নেইও তো আলোচনার বেশি কিছু।

এইটুকু.................

রুমালটা পেলাম স্বাতী দেবী, ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

স্বাতি একেবারে শিউরে উঠে বিশাখার দিকে চাইল, বলল—"নিশ্চয় তোমার কাজ বিশাখা। কী নবনেশে

"আহা একলা মানুষ, চাকর-বাকর সম্বল—কী যে বাড়ির অবস্থা করে রেখেছে বাবা, দেখলে কষ্ট হয়। গেছলাম তো সেদিন, বিশাখাদের বাড়ি সেদিন নেমতন্ন ছিল—বিশাখা বলল—

বেশি আলোচনা হয় অবশ্য যাদের বেশি সম্বন্ধ ব্যাপারটুকুর সঙ্গে, অনাথ আর পাচক ঠাকুরের মধ্যে। গোপেশ্বর রইল তো সেও যোগ দেয়। অনাথের আসা-যাওয়া বেড়েছে আজকাল। প্রয়োজন থাকে। না থাকে তো সৃষ্টি করে নেয়। বেড্-কভারে ফুলতোলা শেষ

হয়ে গেছে, বিশাখার জন্য না রেখে নিজেই হাতে করে নিয়ে এল। বাগানের শাক-সব্জি আছে, তেমন কিছু যদি বা করল স্বাতি বাড়িতে; নেহাত কিছু না রইল চাটুজ্যেকে হাটের সঙ্গী করেই নিয়ে গেল একটু ঘুর পথে এসে।

সেদিন সকাল বেলায় এসেছে, প্রায় এগারোটার সময়। একটা টিফিন-কেরিয়ার হাতে। স্বাতি কয়েকরকম তরকারি করে পাঠিয়ে দিয়েছে। ডোবাটায় মাছ করেছে অনাথ। আরও একটু কথা আছে লাহিড়ীমশাইয়ের, প্রশান্তকে বলতে হবে।

এটুকু অবশ্য মিথ্যা; লাহিড়ী-মশাইয়ের কোন কথাই থাকে না। ভেতরকার কথা, মা-মণি রান্নায় অন্নপূর্ণা, চাটুজ্যেকে বিশ্বাস করে না অনাথ, লোভে পড়ে যেতে কতক্ষণ? তার ওপর গোপেশ্বর আছে, এখানেই খায়। অন্নপূর্ণার হাতের রান্না দুজনের লোভ কাটিয়ে কতটা পেণছবে প্রশান্তর কাছে, কোনটা হয়তো আদৌ পেণছাবে কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত নয় অনাথ।

বারান্দায় বসে বসে দুজনে গল্প করছিল। যে কথা নিয়েই উঠুক, আজকাল বিবাহের কথাতেই এসে পড়ে শেষ অবধি।

অনাথ বলল,—"সে তো বুঝলুম চাটুজ্যেমশাই, এ বিয়ে কে না চাইবে বলো। তুমিও চাও, আমিও চাই, চরাচরে সবাই চাইবে। একধারে শিব আর একধারে অন্নপূর্ণোই তো গো; কিন্তু হবে কি করে তাও তো চর্ম-চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছিনে।"

"বাধছেটা কিসে?"—চাটুজ্যে প্রশ্ন করল, বলল "—শিবও চান, অন্নপূর্ণোও চান, চুকে তো গেল ল্যাঠা।"

"আসলটিকেই যে বাদ দিয়ে বসলে আপনি। দক্ষ মহারাজ কেউ নয়? এ তো আর সায়েব-মেমের ব্যাপার নয়।"

"তা বেশ তো, রইলেন তিনি। অপছন্দের কিছু আছে কি? শিবকে তো আজ থেকে দেখছিনে। বিলেত গেলেন পাশ করতে—সঙ্গে চাটুজ্যে না গেলে যাব না—নাগাড়ে এই পাঁচ বচ্ছর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছি, অপছন্দের তো কিছু 'নজরে' পড়ল না আজ পজ্জন্ত।"

"নেইও তো, পড়বে কোথা থেকে? পাঁচ বছরে যেটা লোকের চোখে ধরা পড়বে না, পাঁচদিনেই এই দুটো চোখে দেখে নের। অনেক দেখলে তো। তবে আপনিও তো কিছু অলেহ্য কথা বলছ না, বলি, নেই-ই কোন দোষ তো দেখবে কোথা থেকে। তবে আর শিবতুল্যি বললুম কেন? কিন্তু......"

সামনাসামনি হয়ে বসেছিল দুজনে। চাটুজ্যে একটা মোড়ায়—অনাথ এসে একটা মোড়াই টেনে নিয়ে নিজের আভিজাত্যটা রক্ষা করে—অনাথ নীচে একটু দূরে, "কিন্তু..." বলে এগিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল—"কিন্তু একজায়গায় যে একটা মস্তবড়—কি যে বলে ভালো—গরমিল থেকে যাচ্ছে..."

"শুনব তবে তো বুঝব। তবে তো তার উপায় হবে।"—ভারিক্কে হয়েই জবাব দেয় চাটুজ্যে।

"ভয়ানক নিষ্টি যে। বংশটা তো যে সে নয়। বর্ণচোরা আমটি হয়ে বসে আছে তাই, নইলে বংশটা তো যে-সে নয়। কে, কেন কোথা থেকে আবির্ভাব হোল—সে পরে টের পাবে আপনি, আগে দু'হাত এক হোক—আর করতেই হবে এক, শিব আর অন্নপূর্ণোকে তো আলাদা করে রাখা যায় না। তবে, ঐ যেমন বললুম—ভয়ানক নিষ্টিবান যে বুড়ো,—মেয়েও বাপকা বেটি......ঐখানে যে আটকাচ্ছে।"

ব্যাপারটা কিছুই নয়, সেই চিরন্তন শুক-শারীর দ্বন্দ্ব। শুক বলে আমার কৃষ্ণ এই রকম, শারী আর এক ধাপ বাড়িয়েই বলে আমার রাধা এই। আসল যা বোঝাপড়া তা রাধা-কৃষ্ণের মধ্যেই, মাঝখান থেকে যার কৃষ্ণ আর যার রাধা তাদের মধ্যে একটা আলাদা বোঝাপড়া; একটা বড়াই, সব বড়াই তো শেষ পর্যন্ত আবার নিজের বড়াই-ই।

......খানিকটা রেশারেশি আবার খানিকটা মেলামেশা, মাঝখানে স্বার্থ তো একই। চাটুজ্যে বলল—"বুঝলুম, তা আমার শিবঠাকুরের নিষ্টির অভাবটা দেখলে কোথায়? মদ নেই, গাঁজা নেই, ভাঙ নেই—ওর নাম কি, কোন রকম..."

"পুজো-আচ্চা কোথায়?"—বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে অনাথ।

"পুজো-আচ্চা?......" একটু থতমত খেয়ে গিয়ে চারিদিকে চায় চাটুজ্যে, কিছু না দেখতে পেয়ে, সময় নেয়, বলে—"পুজো-আচ্চার কথা বলছ? তা ......তোমার গিয়ে......"...

বিজয়ীর হাসি ফোটে অনাথের মুখে, মাথাটা আস্তে আস্তে দোলায়। বলে—"আর সেখানে গিয়ে দ্যাখো—তা তোমার যাখন খুশি যাও না, সকাল হোক, দুপুর হোক—দেখবে বাপ-বেটিতে পুঁথি খুলে অং-বং সংস্কৃত মন্তর পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে; সামনে দ্যাবতা— ঐ শিবঠাকুর— এই দাড়ি, এই কপাল, এই জটার রাশ লুটিয়ে পড়ছে, এই ঢুলুঢুলু দুটি নয়ান—গলায় মালা, ধূপ-ধুনোর গন্ধয় সারা ঘর ম-ম করছে।—এখন ধুলো-বালির সময়, বেশির ভাগ ঢাকাই থাকেন ঠাকুর। তবে এসো না একদিন, ফলকটা

ঘেরাটোপ করে দিয়েছে মা-মণি. তুলে দেখিয়ে দোবখ'ণ তোমায়। তাক নেগে যাবে!"

—ঠাকুর অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সেই আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি। ......শুকে-শারীর লড়াই-ই তো। সময় পেয়ে চাটুজ্যে সামলে নিয়েছে। একদিন কবে কি একটা কাজে গিয়েছিল নজরেও পড়েছিল। দেবত্বটা অস্বীকার করতে পারল না. তবে একটু অবহেলার সংগেই বলল —"তাই কও. সেই পুজো। আমি বলি ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, ফুল-বিল্বিপত্তর, ভোগ-আরতি দিয়ে নিত্যি-সেবা বুঝি......"

"তা ও টুকুনও তো চাই ইদিকে—সমানে সমানে না হলে......"

হর্ণ বাজিয়ে কলোনির মধ্যে প্রবেশ করল প্রশান্তর জীপ। চাটুজ্যে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেই তার দৃষ্টিটা সামনের ঘরের মধ্যে দিয়ে ও দিকের ছোট ঘরটায় গিয়ে পড়ল। প্রশান্তর মা যতদিন ছিলেন ঐটে পুজোর ঘর করে নিয়েছিলেন। এখন অবশ্য পুজোর ব্যবস্থা নেই সে ধরনের, তবে ঠাকুর একজন আছেন। তিনি অন্তত সদ্য পরাজয় থেকে চাটুজ্যেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রাখেন।

ঘরের ভেতরে ছোট একটা টেবিলের ওপর ভেলভেটের ঘেরা-টোপ দেওয়া প্রশান্তর ঠাকুর দেখিয়ে দিল চাটুজ্যে. বলল—"তা যখন তখন মন্তর পড়তে থাকবে, তুমি শুনবে. সে-ফুরসত কোথায় ইদিকে? একদিন রাত দুপুরের পর এসো. দেখবে নিষ্টির ঘটা—শিব-ঠাকুর দ্যাবতা সামনে করে যোগাসনে বসে আছেন চোখ দুটো বুজে।"

অনাথের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে বিজয়ের হাসিটুকু আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাটুজ্যের। প্রশান্তর জীপ মোড় ঘুরে বাসার রাস্তায় ঢুকল।

॥ আঠারো ॥

যে নিজের হয়ে আসছে সে একাই আসে না, তার যারা আপনজন তাদের সংগে করে নিয়ে আসে। স্বাতি নিয়ে এসেছে তার পিতা লাহিড়ী-মশাইকে।

লাহিড়ীমশাইকে সেই বর্ষার রাতে প্রথম দেখলেও প্রশান্ত তাঁর আসল পরিচয়টি পায় সেদিন যেদিন তাঁর অসুখের কথা শুনে রজতকে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেল। সহানুভূতির সংগে একটি শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে ফিরে আসে প্রশান্ত। এর পর অনাথের কাছে ও'র জীবনকাহিনী শুনে এবং সাক্ষাৎ পরিচয়ে এই ভাবটি দিন দিন পুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। জীবনের পাশা খেলায় বরাবর হেরেই এসেছেন, আজও ঠিকমতো বুঝলেন না জীবনকে, তবু একজন যে জ্ঞানতপস্বী, যতি পুরুষ তাতে তো আর সন্দেহ নেই।

স্বাতি প্রশান্তর জীবনে প্রবেশ করতে আর একটা নূতন জিনিস দেখা দিল এই সম্বন্ধের মধ্যে। যা মাত্র শ্রদ্ধাই তা একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলে, স্বাতি মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দূরত্বটুকু আনল কমিয়ে। শ্রদ্ধা রইলই. তার সংগে একটা নিবিড় আত্মীয়তার ভাব; স্বাতির পিতা, সুতরাং কত আপন, কত কাছের, কত অন্তরঙ্গ!......

কত আনন্দের! কিন্তু সত্যই যা নিছক আনন্দের ব্যাপারই হয়ে থাকতে পারত, অবস্থাগতিকে তাতে একটু খাদ মিশে রইল। লাহিড়ীমশাই তো তাঁর জীবনের ট্রাজেডীটাকে পেছনে ফেলে আসতে পারলেন না।

তবে ট্রাজেডীর অন্য অংশগুলো অতটা নয়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন এ-সব জীবনের অংগ, সমবেদনা জাগায় নিশ্চয়, কিন্তু ঠিক ততটা গভীর ভাবে নয়। আসল বেদনার বিষয় হয়ে রইল যা লাহিড়ীমশাইয়ের মনে দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আলাদা করে একটা গভীরতর রেখাপাত করে রয়েছে। তাঁর এই টুইশনি। আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, পড়াচ্ছেন বলে এই পঞ্চাশটি ক'রে টাকা নেওয়া; সেইটাই তাঁর উপজীবিকা হয়ে থাকা। ও'র পূর্ব-ইতিহাসের সংগে, বিশেষ করে, ও'র চরিত্রের সংগে এই ব্যাপারটুকুর যে কত অসামঞ্জস্য, এটাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁকে অবস্থার সংগে যে কতটা আপোস রক্ষা ক'রে নিতে হয়েছে সেটা তো বোঝে প্রশান্ত। ও'র লজ্জাটা তার নিজের লজ্জা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাবে মাঝে মাঝে, কি ক'রে এটুকু ও'র জীবন থেকে অপনোদন করা যায়। সম্ভব কি? এইটুকুই তো রুজি, অনাথের হাতের সেই ক'টা টাকা ফুরিয়েই তো আসছে।

এরপর, যেটা ছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসরের চিন্তা, সেটা কাজের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। একদিন স্বাতির নিজের মুখেও ঠিক এই কথাটাই শুনে প্রশান্ত দেখল যেটা এতদিন পর্যন্ত তার মনের একটা আন্দাজ রূপেই ছিল, সেটা অতি সত্য এবং সেটা স্বাতি. লাহিড়ীমশাই—দুজনের মনেরই গভীর বেদনা এবং লজ্জার কারণ হয়ে রয়েছে।

হেড-আফিস থেকে বড়সাহেব তদারকে আসায় সেদিনও অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটল। সেই যে সকালে প্রাতরাশ করে এসেছে প্রশান্ত আর বাড়ি যেতে পারেনি। গোপেশ্বরের ফুরসত ছিল না, প্রশান্তর নিজেরও মনে পড়েনি বিশাখাকে স্বাতিদের বাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা! ওটা একেবারেই বাদ পড়ে গেছে দিনের প্রোগ্রাম থেকে।

খুব অন্যমনস্ক রয়েছে। দেখা-শোনা শেষ করে সন্ধ্যার সময় বড়সাহেব চলে গেল। মনটাকে ছুটি দেওয়ার জন্যে, এবং কতকটা অভ্যাসবশেই মোটর নিয়ে স্বাতিদের বাড়ির পথে আধা-আধি এগিয়েছে, মনে পড়ে গেল বিশাখা আসেইনি আজ! একবার ভাবল ফিরবে, তারপর এগিয়েই গেল।

আজকে একটু অন্যরকম পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ল। বিশাখা এলে লাহিড়ীমশাই ওর পড়া নিয়েই থাকেন। প্রশান্ত যখন আসে, প্রায়ই দ্যাখে ও'র কাজ শেষ ক'রে উনি বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন, বিশাখা ব্যাঙ্গো নিয়ে স্বাতির সাগরেদি করছে। ওরা তিনজনে রাস্তায় বা গ্রামের ভেতর একটু বেড়িয়ে এসে বাগানে বসে, ততক্ষণে অনাথের চা-জলখাবার তোয়ের হয়ে যায়, সামনে ক'রে তিনজনের গল্প চলে। স্বাতির ব্যাঞ্জো এসে পড়ে কোন কোন দিন। লাহিড়ীমশাইও ফেরেন।

আজ বিশাখার অনুপস্থিতিতে স্বাতিকেই নিয়ে বসেছিলেন লাহিড়ীমশাই। ও'র,—শুধু ও'রই বা কেন—বাপ-মেয়ের উভয়েরই যা প্রাণের বস্তু সেই সংস্কৃত কাব্য নিয়ে। পড়াচ্ছিলেন 'উত্তর-রামচরিত'।

ভেতরের বারান্দায় বসে পড়াচ্ছিলেন। আলো কমে এসেছে, সেদিকে খেয়াল নেই। একটা শ্লোক নিয়ে টোলের পণ্ডিতের মতো বসে লাহিড়ীমশাই কি ব্যাখ্যা-আলোচনা করে যাচ্ছেন, একটু দুলে দুলে, নিজের পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে, স্বাতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে শুনে যাচ্ছে, এমন সময় প্রশান্ত এসে প্রবেশ করল।

প্রশান্তকে দেখে আবিষ্টভাবেই লাহিড়ীমশাই চেয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে। তারপর যা প্রথম কথা তা থেকেও বোঝা গেল তাঁর মনটা তখনও অন্য কোথাও মগ্ন। প্রশ্ন করলেন—"তুমি উত্তর-রামচরিত পড়েছ প্রশান্ত?"

প্রশ্নটা এতই অপ্রত্যাশিত, অধিকন্তু অদ্ভুত যে টপ ক'রে একটা উত্তর জোগাল না প্রশান্তর মুখে। একটু মূঢ় হাসি নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল, স্বাতি বলল—"সংস্কৃত কি ছিল ও'র?...... মনে তো হয় না।"

প্রশান্তর মুখের দিকেই চেয়ে কথাটা শেষ করতে সে বলল—"না, ওটা বাদই প'ড়ে গেছে; এখন আফসোস হয়!"

"আজ যে বিশাখা এল না প্রশান্তবাবু?"—ও প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিল

স্বাতি। প্রশান্তও ঐ কথাটা নিয়ে পড়ল —বড়সাহেব সায়েব হঠাৎ এসে পড়ায় সব গোলমাল হয়ে গেছে—আগে থাকতে জানলে ওকে পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করতই। এসে পড়ার পর থেকে সতক্ষণ ছিল অন্যকথা ভাববার ফুরসতই হয়নি তার। ক্ষতি হোল বেচারির পড়াতে...... উত্তর-রামচরিত না পড়ার লজ্জাটা সাধ্যমতো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো অযথাই বিশাখার কথাটা বড় করে দিয়ে।

বইটার দিকেই আবার চেয়ে বসেছিলেন লাহিড়ীমশাই, মুড়ে রেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"প্রশান্ত এসেছে, আমি তাহলে একটু বেড়িয়েই আসি মা-স্বাতি।"

একটা শ্লোকই গুনগুনে ক'রে আওড়াতে আওড়াতে কামিজ প'রে চাদরটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, স্বাতি এগিয়ে গিয়ে টর্চ আর লাঠিটা হাতে তুলে দিল।

একটা অস্বস্তির ভাব যে এসে পড়েছিল দুজনেরই মধ্যে ওঁর অসংগত প্রশ্নটার জন্যে সেটা আরও বেড়েই গেল। একটা অসংগত কাজও করে বসলেন তো লাহিড়ীমশাই। অনাথ হাটে গেছে, এখনও ফেরেনি, খালি বাড়িতে মাত্র ওরা দুজনেই রইল।

যেন সমস্তটুকুই ধ'রে নিয়ে কিছু একটা বলে অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যই প্রশান্ত বলল—"আজ বড্ড যে অন্যমনস্ক রয়েছেন।"

"ঠিক তাই।" —মুখ খুলতে পেরে স্বাতি যেন বাঁচল, বলল—"আসল কথা, আজ অনেকদিন পরে উনি যেন পড়িয়ে বেঁচেছেন প্রশান্তবাবু। বিশাখা না আসায় আমায়ই তো পড়াচ্ছিলেন।"

"বিশাখাকে পড়ানোটা পছন্দ করেন না নাকি!" —একটু চকিত হয়েই প্রশ্নটা করল প্রশান্ত।

"আমার বলতে ভুল হয়ে গেছে।" লজ্জিতভাবে স্বীকার করল স্বাতি, বলল—"চলুন বাগানে গিয়ে বসা যাক—তেমনি গরম পড়েছে আজ। টুইশন নিয়ে একটা কথা অনেকদিন থেকে বলব মনে করছি আপনাকে, বিশাখা থাকলে সুবিধে হয় না।...... একটু দাঁড়ান, চেয়ার দুখানা রেখে আসি আগে।"

একখানা তুলেছে, প্রশান্ত অন্যটাও তুলে নিল, বলল—"ওটাও আমায়ই দিন বরং।...... আমাদেরই কাজ ওটা।"

স্বাতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটাকে স্পষ্ট হওয়ার অবসর না দিয়ে বলল,—"আসুন —তাহলে নিজের নিজের।"

একটু হেসেই বলল। যখন চেয়ার পাতল তখন আবার গম্ভীর হয়ে গেছে, একটু বিষণ্ণও। প্রশান্ত বসলে নিজেও বসে বলল—"মাফ করবেন, আমার বলতেই একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। বাবা বিশাখাকে পড়ানোটা যে অপছন্দ করেন এমন নয়—মোটেই এমন নয়—পড়া আর পড়ানোই তো ওঁর জীবনের আনন্দ—এমন দুঃখের মধ্যেও ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে—বিশাখাকে পড়িয়েও আনন্দ পান—তবু কোথায় যেন......"

যেন ভাষার অভাবেই কথাটা অসমাপ্ত রেখে তখনই আবার বলল—"আসল কথা, টুইশানি বলতে যা বোঝায় সেটা মনে ধরছে না বাবার।"

একটু চুপচাপ গেল। স্বাতি এর বেশি যেন স্পষ্ট করতে পারছে না।

প্রশান্ত সামনের আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে এনে বলল—"টাকা নেওয়াটা কষ্টকর হচ্ছে ওঁর পক্ষে।"

"ঠিক তাই। অথচ ভয় না নিতে চাইলে বিশাখাকে আপনারা পাঠাবেন না। আমার ভয় তো আরও বেশি। একবার ব'লে এই উত্তরই তো পেয়েছিলাম।"

একটু ম্লান হেসে আবার তখনই আরম্ভ করল যাতে যে-সুযোগটা পেল সেটা নষ্ট না হয়ে যায়; বলল—"দেখেছি, যেদিন খুব মন লেগে যায় সেদিনও যেন কোথায় একটা ব্যথা লেগে থাকে বাবার—সেদিন যেন আরও বেশি করেই—আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না আপনাকে—যেন এই রকম আনন্দটায় এতবড় একটা লজ্জা লেগে রইল......"

"লজ্জা, স্বাতি দেবী?" —নিজের মনের কথার সঙ্গে এতটা মিলে যাওয়ায় একটু চকিত-বিস্মিত হয়েই প্রশ্নটা করল প্রশান্ত।

স্বাতি বলল—"লজ্জাই। আপনি যদি ওঁর সমস্ত জীবনের কথা......" চোখ দুটি ছল ছল করে উঠেছে, হঠাৎ হুঁস হ'তে থেমে গেল।

ওর সামনে চোখের জল এসে পড়তে এই প্রথম দেখল প্রশান্ত। মনটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর, তবে এ-বেদনায় একটা অভিনব আনন্দও আছে; খুব কাছে না এসে পড়লে তো মন এমন তরল হয়ে অশ্রুরূপে দেখা দেয় না।

অশ্রুবিন্দু দুটি কিন্তু মাঝপথেই গেল থেমে; একটা আশঙ্কা এসে পড়েছে মনে, বেদনার সঙ্গে সমবেদনায় অসতর্ক হয়ে প'ড়ে যেটুকু বলে ফেলল তাতে ও'র জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠে প্রশ্ন না করে বসে প্রশান্ত। একটু চুপ করেই রইল, তারপর কিন্তু মনের গোলমালে আরও অসতর্কভাবেই বলে ফেলল—"আপনার বোন হলে অন্য কথা ছিল, বন্ধই করে দেওয়াতাম টাকাটা, কিন্তু রজতবাবুর কাছে জোর খাটাতে গেলে..."

"মা-মণি বাগানে নাকি গো?"

বারান্দা থেকে অনাথের প্রশ্নটা ভেসে আসতে বাধা পড়ে গেল। শুধু তাই নয়, এবার অসতর্কতায় মনের আর এক কোন্ গোপনতর কক্ষের চাবি খুলে বসেছে, সে-কথাটা ভেবে দেখবার আর অবসরও পেল না স্বাতি।

এর পরেও না। সেটার দিকে মন গেলে খুবই লজ্জায় পড়ে যেতে হোত, সেটাকে আর এক লজ্জা দিয়ে একেবারেই চাপা দিয়ে দিল অনাথ। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বলল—"এই যে ইন্‌জিয়ারবাবুও এসে গেছেন, বেশ হোল। এনছান মিঁয়া এ্যাদ্দিন পরে আজ ফটোকের ফেরেম দুটো বাঁধিয়ে দিলে। এই যে।"

র‍্যাশন ব্যাগের ভেতর থেকে কাঠের ফ্রেমে আঁটা দুটো ফটো বের করল। একটাতে স্বাতি, তার পাশে বিশাখা, তার পাশে রজত, একটাতে রজতের জায়গায় প্রশান্ত। ওরা যেদিন নদীর ধারে বেড়াতে যায় সেদিন রজতের ক্যামেরায় ফ্লাশ-লাইটে তোলা হয়। একটা তোলে রজত, একটা তোলে প্রশান্ত।

লজ্জায় যেন মাথা তুলতে পারছে না স্বাতি। একটা ফটো ওর হাতে দিয়েছে অনাথ একটা প্রশান্তর হাতে, যেটাতে প্রশান্ত রয়েছে। অনাথ বলে যাচ্ছে—"মা-মণি কি হাটেই তাগাদা দিচ্ছে, উদিকে এনছান মিঁয়ার আর চাড় হয় না—এক হাটে তো এলই না—তারপর গতহাটে যদি বা এল......তা, হাত আছে কিন্তু, বেঁধেছে ভালোই......কি ক'ন ইন্‌জিয়ারবাবু?...... মা-মণি কি বলো গো?—দিব্যি মানানসইটি হয়নি?"

'মানানসই'—সে নিশ্চয় ফটো আর ফ্রেমে, স্বাতি কিন্তু রাঙা হয়ে গিয়ে উত্তর খুঁজে পেল না হঠাৎ। প্রশান্তও মৌন থাকায় যে সময়টা গেল তাইতে টীকাও করে দিল অনাথ, বলল—"ফটোক তোমার ছোট হোক, ফেরেম দিয়েছে কেমন জোড়দার!"

ঐতেই বাঁচাল।

"চমৎকার!" —বলে একটু হেসেই উঠল স্বাতি। বলল—"বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি!......যাও, তুমি একটু তাড়াতাড়ি চায়ের জলটা বসিয়ে দাও গে। দেরি করে ফেলেছ আজ।"

হেসে বাঁচল, প্রশান্তও; ছোট সাইজের ফটো, তাতে প্রায় ইঞ্চিখানেক মোটা আর বিঘৎখানেক লম্বা কালো ফ্রেম এ'টে হাতের পরিচয় দিয়েছে এনছান মিঁয়া। বলল—"আমায় দিন বরং, কাল কলকাতায় লোক যাচ্ছে, ভালো ব্রোঞ্জ বা নিকেলের ফ্রেমে বাঁধিয়ে আনাচ্ছি—কি পছন্দ আপনার?"

"যেটা ভালো বুঝবেন। এনছানের হাত না থাকলেই হোল।"

একসঙ্গে হেসে উঠে দুজনে বাকি জড়তাটুকু কাটিয়ে বাঁচল।

(ক্রমশ)

ইলিশ : কলকাতা, ১৯৮৪ ***** মতি নন্দী

বাগবাজার স্ট্রীট ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছেন গণেশবাবু। রাস্তার লোক অবাক, কি ব্যাপার?

আলোচনা শুরু হয়ে গেল, তাহলে কি ঘটতে পারে? কেউ বলল গণেশবাবুর রাঁধুনি তাকে সার্টিফিকেট না দিয়েই কাজ ছেড়ে চলে গেছে, ফলে লোক পাচ্ছেন না, তাইতে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেউ বলল, ছেলেকে কলেজে ভর্তি করাতে ট্রেন ধরতে ছুটেছেন, খবর পেয়েছেন সাঁওতাল পরগণা ইউনিভার্সিটিতে নাকি দু'-একটা সীট এখনো পাওয়া যেতে পারে। একজন বলল, ইন্ডিয়ান হকি টিম এবারের ওলিম্পিকে ফার্স্ট রাউন্ডে আট গোলে হেরে যাবার পর থেকেই নাকি ওনার চালচলন বদলে গেছে, হবেই তো, সেকেলে মানুষ কিনা, শুনে আমাদেরই দুঃখ হয়। আর একজন বলল, ওসব কিছু নয়, ওর যে ছেলে সেকেন্ডারী স্কুলে পড়ে, সে নতুন কায়দায় গল্প লিখেছে, তাই পড়ে ভদ্রলোক...... আহা বেচারা, অমন শান্ত নিরীহ মানুষটা আজ...... ইত্যাদি।

অল্পবয়সী কয়েকজন এ সব আলোচনায় কান না দিয়ে গণেশবাবুর পিছু নিল। উনি ছুটেছেন গঙ্গার দিকে। দেখা গেল গণেশবাবু একা নন আরো বহু লোক পিলপিল করে ছুটছে বাগবাজার খাল আর গঙ্গার মোড় লক্ষ্য করে। রীতিমত এক জনতা সেখানে তৈরী হয়ে গেছে। ঠেলেঠুলে গণেশবাবু ঢুকলেন। এক মস্ত গোঁফওয়ালা জেলে হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে, তার সামনে, মাটিতে অদ্ভুত এক মৃত জীব।

নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে 'পরিমল' কাগজের চীফ রিপোর্টার তারক মুখুজ্যে একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলেছে আর জেলে বেচারার মুখ আরো করুণ হয়ে উঠছে।

"আরে ভয় কি, বলোই না। তোমার জালেই তো ধরা পড়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।"

"কটার সময়"

"বিকেল চারটে লাগাৎ।"

"তুমি তখন কি করছিলে?"

উত্তরগুলো খস-খস করে লেখা হতে লাগল। আর ঝক-ঝক করে ফটো তোলা হয়ে গেল। ভিড় ক্রমশঃই বাড়ছে। জনতার দাবীতে সেই অদ্ভুত জীবটিকে মাথার উপর তুলে কে একজন সকলকে দর্শন করাল। জনতা হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠল। গণেশবাবু অনেকখানি এগিয়ে এসে নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকলেন। একবার, দুবার, তিনবার, চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, এইবার বুঝেছি, বহুদিন আগে সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গোড়ার দিকে শেষবারের মত এই জিনিস দেখেছি।"

তারক মুখুজ্যে শোনা মাত্রই খস-খস করে লিখে চলল। "হ্যাঁ নামটাও মনে পড়েছে" গণেশবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "এর নাম ইলিশ। এক ধরনের মাছ।"

পরদিন কাগজে আট কলম ডবল ডেক হেড লাইনে খবর বেরোল: "কোলকাতার গঙ্গায় দুষ্প্রাপ্য মৎস্যের আবির্ভাব। ধীবরের জালে লুপ্ত বঙ্গ-সংস্কৃতির নিদর্শন।"

এরপর: "কল্য বিকাল চার ঘটিকা নাগাদ হরিরাম দাস নামক এক ধীবরের জালে ইলিশ নামের একজাতীয় মৎস, যাহা একদা গঙ্গায় ঝাঁকে-ঝাঁকে ধীবরের জালে ধরা পড়িত, তাহারই এক নিদর্শন দৈবাৎ আটকাইয়া যায়।"

এর কিছু পরে: "ওয়াকিবহাল মহলের এক অসমর্থিত সংবাদ মারফত

জানা গেল, দৈবক্রমে ধৃত লুপ্ত মৎস্যের শেষ উদাহরণ হিসাবে 'কোয়েলাকানথ্' নামক এক জাতীয় জীবের নাম জানা যায়, যাহা দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে জেলেদের জালে হঠাৎ ধৃত হয়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, 'কোয়েলাকানথ্' ছয় কোটি বৎসর পূর্বেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার কথা, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তাহা হয় নাই। বর্তমান ঘটনাটি তাহা অপেক্ষাও আশ্চর্যজনক। 'কোয়েলাকানথে'র রেকর্ড অবশেষে 'ইলিশ' ভাঙিয়া দিল। এ বড় গৌরবের কথা। বাঙালী হিসাবে তাই আজ আমরা গর্বিত। ধন্য বাঙালী! ধন্য হরিরাম!"

সেদিনের সম্পাদকীয়ের শিরোনামা ঃ "বঙ্গ-ঐতিহ্যের উৎস সন্ধানে"। হরিরাম দাসের তিন কলম ছবি এবং অটোগ্রাফ (টিপ ছাপ) ছাপা হল প্রথম পাতায়। ঘোষণা করা হল আগামী শনিবার এক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে।

চীফ রিপোর্টার তারক মুখুজ্যেকে সেই দিনই তিনটি ইনক্রিমেণ্ট মঞ্জুর করা হল।

সারা কোলকাতায় তোলপাড়। সকলের মুখে এক কথা, 'ইলিশ, ইলিশ, ইলিশ।'

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সেদিনই সভা বসল। সভার জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ডাকতে হল। সভাপতি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নামী অধ্যাপক করুণশেখর চোধুরী। প্রধান অতিথি হরিরাম দাস। সভাপতি তাঁর ভাষণে বললেন ঃ যদি বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের তালিকা কোনদিন রচনা করা হয়, তাহলে ইলিশ নিঃসন্দেহে প্রথম স্থান

পাবে। মধ্যযুগে কর্মলোচনম ইলিশ সম্পর্কে চমৎকার কাব্য রচনা করে বলে গেছেন,

সর্বেষামেব মৎস্যানাং ইল্লিশঃ
শ্রেষ্ঠঃ উচ্চতে।
ভাগীরথী জলে ভাতি নিত্যং
রজত খণ্ডবৎ॥

আপনারা জানেন উত্তর ভারতের আর্য ব্রাহ্মণরা মাছ খেতেন না। তাঁদেরই পাঁচজন এলেন বাংলাদেশে। ইতিহাসে লেখা নেই তাঁরা মাছ খাওয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বংশধররা যে ইলিশ খাওয়া ধরেছিলেন তার প্রমাণ এই প্রবচন ঃ

ইলিশা খলিশশ্চৈব বাচা ভাংনা
তথৈবচ।
রোহিতো মৎস্য রাজেন্দ্রঃ পঞ্চমৎস্যাঃ
নিরামিষঃ।

এ ছাড়াও মনসামঙ্গলের কবি বংশীবদন বলছেন ঃ

ইলিশ তালিত করে বাচা ও ভাংনা।
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল পোনা॥

এ ছাড়াও এক অজ্ঞাতনামা কবির রচনায় আমরা পাচ্ছি ঃ

খোড় ডুমুর ইচলা মাছে
খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে॥

এরপর 'ইলশে গুঁড়ি ইলশে গুঁড়ি ইলিশ মাছের ডিম' এর উল্লেখ নাই বা করলাম।

তাহলেই দেখুন, বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে একদা রীতিমত তেল যুগিয়ে গেছে এই ইলিশ মাছ। 'হিন্দু দায়ভাগ'-এর প্রণেতা জীমূতবাহনের 'কাল বিবেক' বইয়ে তৈল-নিরূপণম অধ্যায়েও ইলিশের তেলের উল্লেখ আছে। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদরোর শীলমোহর এবং তৈজসে মাছের ছাপ পাওয়া যায়। এ মাছ কোন মাছ? আপনারা জানেন, সিন্ধু নদীতে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যেত এবং এখনো যায়। সেখানের লোকেরা বর্শা গেঁথে ইলিশ মারে, তারপর আঁশ ছাড়িয়ে নুন-মশলা মাখিয়ে একটা পাতায় জড়িয়ে তার উপর আবার কাপড় জড়িয়ে মরুভূমির বালিতে পুঁতে রাখে। রোদের তাপে সে ইলিশ সেদ্ধ হয়। আপনারা হয়তো জানেন না, 'ইলিশ ভাতে' বলে একরকমের রান্না আমাদের দেশেও ছিল। আজ আর নেই। আপনারা জানেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে আমাদের দেশে এক কবি ছিলেন। মাত্র তিন বছর আগে ১৯৬১ সালে

তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। খুব হৈ-চৈ হয়েছিল। আমি ৩১৮টি বক্তৃতা দিয়েছিলাম সে বছর। এই রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে।" এর গূঢ়ার্থ কি? ইলিশ! যে নীরে এই মাছ জন্মায় তা আছে এসিয়া মাইনর, ইরাণ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বর্মা, মালয়, শ্যাম এবং চীনে। এই ইলিশই সকলের সঙ্গে আমাদের মিলিয়েছে। প্রোটো অষ্ট্রালয়েড এবং ভূমধ্যসাগরীয় মানব-গোষ্ঠীর ইলিশপ্রীতি আমাদের মধ্যেও ছিল কিন্তু ইলিশের অভাবে এখন আর তা নেই। যদি থাকত তাহলে......... যাক আজকের দিনে আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব না, শুধু এটুকু জেনে রাখুন বাংলায় যা ইলিশ সংস্কৃতে তাই ইল্লিশ। ইল্ শব্দে গতি বোঝায়, এর অন্য নাম গাঙ্গেয়, বারিকপুর, শফরাধিপ, জলতাল, জলতাপী, রাজসফরী। তেলেগু ভাষায় পলাশা, তামিলে উলাম, সিন্ধুদেশে পল্লা।

বন্ধুগণ, ইলিশ যে কতভাবে আমাদের সাহিত্য-রুচিকে প্রভাবিত করেছে তার হিসাব কে রাখে? বাঙালীর সে মস্তিষ্ক আজ আর নেই। থাকবে কি করে, ইলিশই যে নেই। দেশে আজ রীতিমত গবেষণার অভাব দেখা দিয়েছে। ছাত্ররা খেটেখুটে পড়তে চায় না। তা যদি পড়ত তাহলে.... কয়েকদিন ধরেই আমার মনে হয়েছে, চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত পদটি

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর,
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

আপনারা সকলেই এতদিন জেনেছেন এই পদ, শ্যাম-বিরহে শ্রীরাধিকার বিলাপ। কিন্তু আমার মনে হয় ইলিশের অভাবেই বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের এই খেদ শ্রীরাধিকার মুখে ব্যক্ত হয়েছে। ইলিশ শ্রাবণে ভাদ্রেই পাওয়া যায়। শূন্য মন্দির অর্থে এখানে শূন্য রান্নাঘর বুঝতে হবে। অবিরাম করতালিধ্বনির মধ্যে করুণশেখর তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন।

সুধীন চক্রবর্তী ক'মাস হল সরকারী চাকরিতে ঢুকেছে। ছেলেটি বেজায় চটপটে। কাজ দেখিয়ে চাকরিতে উন্নতির ইচ্ছা। একটি পত্রিকা থেকে মৎস্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু তথ্য যোগাড় করে উপরওয়ালার কাছে পাঠাল। ব্যাপারটা মোটামুটি এই রকম :

১৯০৬-৭ সালে গঙ্গা এবং পদ্মায় খুব অল্প ইলিশ পাওয়া যায়। রাজস্ব দপ্তরের কর্তা কে, জি, গুপ্ত আই, সি, এস, এর কারণ জানতে ইংলণ্ড আমেরিকা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। আমেরিকায় ইলিশ জাতের স্যাড মাছ এবং ইংলণ্ডে হেরিং মাছের ঠিকুজি সংগ্রহ করেও ইলিশের না আসার কোন হদিশ করতে পারেননি। তিনি রিপোর্টে লেখেন। "It is certain that if no remedial measures are adopted in course of time the hilsa would at this rate be exterminated, or the fishery at least would greatly diminish, as was the case in the U.S. in 1879".

১৯০৯ সালে কিন্তু বাংলার নদীতে ইলিশের দেখা মিলল প্রচুর। ১৯১১ থেকে আবার কমে যায়, ১৯১২-১৩ সালে আবার প্রচুর মাছ দেখা দেয়। তখন জুলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কর্তা সাউথওয়েল সাহেব লিখলেন : "There seems little support for the statement that hilsa are becoming scarce". কিন্তু '১৭-১৮ সালে ইলিশ আবার বেপাত্তা হয়ে যায়।

এইভাবে ইলিশের লুকোচুরি খেলা চলতে শুরু করে। ১৯৩৯ সালে সুন্দরবনের লোনা মাছের একচেটে ব্যবসাদার ক্রেগহর্ন সাহেব জানান যে, তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন, বিলিতী হেরিং-এর মত
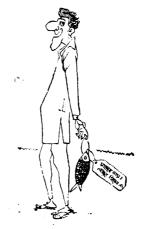
ইলিশও ঠিক পাঁচ বছর অন্তর ঝাঁকে ঝাঁকে নদীতে উঠে আসে। তাই মাঝে মাঝে এরা নদীতে কমে যায়।

ক্রেগহর্নের কথামত হিসাব করে দেখা যায় যে কথাটা ঠিক। ১৯৩৪-এ বিহার ভূমিকম্পের বছরেও এত ইলিশ পাওয়া গেছল যে পুঁতে ফেলতে হয়েছিল মহামারীর ভয়ে। ১৯৩৯-এ ১১২টি মাছের গা থেকে আঁশ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ঝাঁকের ইলিশের বেশির ভাগেরই বয়স পাঁচ বছর। ১৯৪৪, '৪৯ এবং '৫৪ সালেও প্রচুর ইলিশ দেখা যায় কিন্তু ১৯৫৯-এ আগের মত পরিমাণে আর দেখা যায়নি। এ সম্পর্কে সরকারী মৎস্য দপ্তর কোন সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে ১৯৩৮-এ ডক্টর হোরা এবং ডক্টর নায়ার সত্যিকারের কিছু চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়। চার বছর তিনি ইলিশের পিছনে ঘোরাঘুরি করেন।

বর্ষায় ইলিশ ডিম ছাড়ার জন্য নদী বেয়ে উঠে আসে। কে, জি, গুপ্ত তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন, এরা ডিম পাড়ে ভাগলপুর-মুঙ্গেরের কাছাকাছি। কিন্তু হোরা-নায়ার দেখেন, ওরা ডিম ছাড়ে কলকাতার বাগবাজার খালের কাছেই।

তাঁরা আরো লক্ষ্য করলেন, ইলিশ সারাবছর থাকে নদীর মোহনার খাড়ি অঞ্চলে আর সমুদ্রের ধার ঘেঁষা অল্পজলে যেখানে মিঠা এবং নোনাজলের মেশামেশি হয়। ইলিশরা খুব বেশি নোনায় থাকতে পারে না। শ্রাবণের বৃষ্টি শুরু হলেই ইলিশরা ঝাঁকে-ঝাঁকে উঠে আসে গঙ্গায়-পদ্মায়। উদ্দেশ্য ডিম ছাড়া, নোনাজলে তারা ছাড়ে না। গঙ্গার ইলিশ পাড়ি দেয় কলকাতা হয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত। তারপরই গঙ্গায় চড়া পড়ে গেছে, ওরা আর এগোতে পারে না। সেখানে বাধা পেয়ে তাদের ফিরতে হয়। এদের গতি দিনে নব্বুই মাইল।

পদ্মার ইলিশ পাড়ি দেয় ধুলিয়ানা হয়ে রাজমহল, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পাটনা, বেনারস, কানপুর। এদেরই একটা দল আস্তানা গেড়েছে বেনারস-কানপুরে। তারা আর নামেনি। এই

ইলিশও কোলকাতার বাজারে প্রচুর আমদানি হত।

এই সব মাছ উপরে উঠার সময়ই জালে ধরা পড়ে। যারা পালাতে পারে ডিম ছাড়া শেষ করে কার্তিক-অঘ্রাণে ফিরতে শুরু করে। তখন ওরা বিস্বাদ হয়ে যায়।

ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিকে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোতে থাকে। গুঁড়ি-সেওলা আর খুদে চিংড়ি খেয়ে বাচ্চারা বড় হয়। এক ফুট হতে এদের সময় লাগে দশ মাস। তারপর ফিরে যায় খাড়ি অঞ্চলে। এই সময় এদের কেউ কেউ ধরা পড়ে। এদের বলা হয় 'খোকা ইলিশ'। খাড়ি অঞ্চলে বছর দুয়েক কাটিয়ে খোকারা জোয়ান হয়ে সমুদ্রের অল্পজলে নেমে যায়। সেখানে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়িয়ে বর্ষায় আবার নদী বেয়ে উঠে আসে।

ইলিশ বছরে দুবার নদীতে আসে। জুন থেকে নভেম্বরে এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে। শীতকালে সদ্য জোয়ানরা আসে, বর্ষাকালে ধাড়ীরা।

ইলিশের নাম শুনেই কোলকাতার যাবতীয় মধ্য-বয়সী বৌ-ঝিরা হঠাৎ বায়না ধরে বসল, ইলিশ চাই। ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছ থেকে তারা নাকি শুনেছিল বিজয়া দশমীতে জোড়াইলিশ সিঁদুর দিয়ে বরণ করে তুললে ধান বেশি হয়। পুজো এসে পড়ল প্রায়। সুতরাং কর্তারা হন্যে হয়ে খোঁজ শুরু করল দশমীর দিন যাতে ইলিশ পাওয়া যায়।

পটল দত্ত চালাক মানুষ। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে ছুটল 'পরিমল' কাগজের স্টাফ ফটোগ্রাফারের কাছে। ইলিশের যে ফটো তুলেছে তার একটা কপি চাই।

কপি পাওয়া গেল। পটল দত্ত ছুটল কুমারটুলিতে। সেই ছবি দেখে মাটির ইলিশ করতে হবে। প্রথমেই ১৫ লক্ষের অর্ডার দিয়ে বসল। ছাঁচ তৈরী হল, সাত দিনেই ইলিশ গড়ার কারখানা থেকে দশ লক্ষ মাছ বেরিয়ে এল। কোলকাতায় ৭৫টি দোকান খুলে ফেলল পটল দত্ত। প্রতিটি মাছের দাম আড়াই টাকা। দোকানে দোকানে লাইন পড়ে গেল। হাতে ইলিশ ঝুলিয়ে কর্তারা বাড়ি ফিরলেন. বিজয়া দশমীর এখনো দেরী আছে তবু বলা যায় না। হয়তো মাটির ইলিশই ব্ল্যাক মার্কেটে চলে যাবে, তার চেয়ে স্টক করে রাখা ভাল। এই ক'দিন ভাত খাওয়ার সময় ইলিশ হাতে গিন্নীরা দাঁড়িয়ে থাকলেন কর্তাদের সামনে। তাঁরা এক এক গ্রাস ভাত মুখে পোরেন আর তাকান মাটির ইলিশের দিকে। গিন্নীরা ভাবেন, এবার গোলা-ভরা ধান উঠবে।

পটল দত্ত বড়বাজারে জমি কিনছে বলে খবর পাওয়া গেল।

হরি সান্যালের এক পূর্বপুরুষ দশ টাকার ইলিশ মাছ কিনে, মাছের গায়ে টিকিট মেরে হাতে ঝুলিয়ে বাজার থেকে ফিরেছিলেন। সেই থেকে তাদের 'বনেদী বাড়ির' ছেলে বলা হয়। হরি সান্যালের পক্ষে মাটির মাছ কেনা তাই অসম্ভব ব্যাপার। 'বাঙালী রক্ষা সমিতির' সম্পাদক পঞ্চু মুস্তাফী, হরির বাল্য-বন্ধু। সে বলল, "আর তিন বছর পরেই ইলেকশন, হরি তুই দাঁড়াবি? শিওর জিতবি। একটা চমৎকার ইস্যু পেয়ে গেছি। এখন থেকেই ক্যাম্পেন চালাতে হবে।"

পঞ্চুর কথায় হরি রাজী হয়ে গেল। পরদিনই ময়দানে সভা ডাকা হল। কাতারে কাতারে লোক জুটল হরি সান্যালের বক্তৃতা শুনতে। দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার সবটুকু লেখা সম্ভব নয়, তার শেষ কথা হল, "আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি গঙ্গা কত প্রকাণ্ড নদী ছিল। আর আজ দেখুন, তা প্রায় হেঁটে পার হওয়া যায়। এর কারণ আগেই বলেছি, চড়া পড়েছে। আপনারা জানেন, চড়ায় ইলিশ মাছ আসতে পারে না। গঙ্গায় মিষ্টি জলের পরিমাণও কমে গেছে। ইলিশরা কেন ডিম ছাড়তে আসবে? অতএব বন্ধুগণ, ফরাক্কা বাঁধের যে প্রস্তাব ১৯৬১ সালে নেওয়া হয়েছিল অথচ এখন পর্যন্ত এক ইঞ্চি মাটিও খোঁড়া হয়নি, আসুন আন্দোলনের দ্বারা আমরা সেই বাঁধ নির্মাণ ত্বরান্বিত করি। আগামী কাল থেকে আমরা সত্যাগ্রহ শুরু করব। প্রতিদিন কুড়িজন করে কারাবরণ করব। তিন বছর ধরে এই সত্যাগ্রহ চালান হবে। ইলিশকে যদি আপনারা ভালবাসেন, মাতৃভূমিকে যদি ভালবাসেন তাহলে আজ থেকেই আপনারা স্বেচ্ছাসেবক হোন।"

সেই দিনই ৩৫ লক্ষ কোলকাতা-বাসী সত্যাগ্রহী হবার জন্য লাইন দিয়ে গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

মীনাক্ষী মহামন্দির—মাদুরাই

চিত্রগ্রহণ ও রচনা : **শিশিরকুমার চৌধুরী**

মাদ্রাজ নগরীর এগমোর ষ্টেশন। রাত আটটা। 'ত্রিবান্দম এক্সপ্রেস' ছাড়বার আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। হন্তদন্ত হয়ে এ সময়ে যিনি আমাদের কামরার সামনে এসে দাঁড়ালেন এমুহূর্তে এখানে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। চাটুজ্জে কি তবে আমাদের বিদায়-অভিনন্দন জানাতে এসেছেন? না, বন্ধুবর শেষ-মুহূর্তে মনস্থির করেছেন মাদুরা ভ্রমণে তিনিও আমাদের সঙ্গী হবেন।

আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ছ'টি শয্যাসন সংরক্ষিত হয়ে আছে পুরো এক সপ্তাহ আগে থেকে। এখানে এখন নবাগতের প্রবেশ নিষেধ। ট্রেণের বাকী কামরাগুলিতেও 'ন স্থানং তিলধারণং'। অথচ আসন সংরক্ষণের আগে আমরা চাটুজ্জেকে শুধু পায়ে ধরে সাধতেই বাকী রেখেছি, তাঁর সঙ্গদানে আমাদের কৃতার্থ করতে। কিন্তু অনড় অটল ছিল তাঁর সংকল্প। মন্দির দর্শন?—ছোঃ!

অগত্যা রক্ষী চেকারপুঙ্গবের শরণাপন্ন হলাম। প্রার্থনা, ধন নয়, মান নয়, আমাদের কামরায় বন্ধুবরের জন্য এতটুকু স্থান। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা, নো মিষ্টার, আমায় মাপ কর। বাধ্য হয়ে মালপত্র আমাদের জিম্মা করে দিয়ে, চাটুজ্জে অদৃশ্য হলেন কামরান্তরে স্থান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লো। আগামী দিনের ব্যস্ততার কথা স্মরণ করে অনতিবিলম্বে নির্দিষ্ট শয্যাসনে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। দ্রুতগতি এক্সপ্রেস, ঈষৎ দোলায়মান সুখশয্যা—নিদ্রাকর্ষণ হ'তে দেরী হ'ল না।

॥ ২ ॥

'ত্রিবান্দম এক্সপ্রেস' মাদুরায় পৌঁছল পরদিন সকাল আটটায়। এক কামরা থেকে আমরা ছ'জন বেরুলাম নির্বাধ নিদ্রাসমাপ্তির পরিতৃপ্তি নিয়ে অন্য এক কামরা থেকে অবতরণ করলেন চাটুজ্জে, দুঃসহ বিনিদ্ররজনী যাপনের চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করে। শর্মা সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করল মাত্র।

ষ্টেশনের আধ মাইলের মধ্যে অনেকগুলি হোটেল। কিন্তু তার সবই প্রায় নিরামিষ। আমিষ যে দু' একটি আছে আমাদের ভাগ্যক্রমে তার সবকটিতেই স্থানাভাব। কেন জানি না, আমিষ হোটেলগুলোকে এদিকে মিলিটারী হোটেল বলে। সম্ভবতঃ দক্ষিণীদের ধারণা আমিষজাতীয় অখাদ্য মিলিটারী ছাড়া আর কেউ খেতে পারে না। ষ্টেশন থেকেই আমরা এক গাইডের শিকার হ'য়েছিলাম। অগত্যা তাঁরই সাহায্যে একটি নিরামিষ হোটেলে সুটকেস বিছানাগুলো জমা করে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নগর সন্দর্শনে।

গাইড উপদেশ দিলেন নগর ভ্রমণের পক্ষে ঝট্‌কার ব্যবহারই প্রশস্ত। হাড়-সর্বস্ব, যুগল অশ্বচালিত যে দ্বিচক্রযানগুলি এদেশে ঝট্‌কা বলে পরিচিত, তাদের যাত্রীবহনের ক্ষমতা নিতান্তই গবেষণার বিষয়। কিন্তু 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ'। এই বিচিত্র রথবাহিত হয়েই আমরা উপস্থিত হ'লাম মাদুরার প্রথম এবং প্রধান দ্রষ্টব্য মীনাক্ষী মহামন্দিরের দ্বারদেশে।

বিশাল বা অতিবিশাল, ইংরেজী colossal শব্দের সঠিক বঙ্গানুবাদ নয়, আংশিক ভাবমাত্র প্রকাশ করে। অথচ colossal ভিন্ন আর কোন বিশেষণে মীনাক্ষী মহামন্দিরের ব্যাপকতা প্রকাশ সম্ভব নয়।

এই মন্দির-গঠনের প্রারম্ভকাল, আজ থেকে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে রাজা প্রথম পাণ্ড্যায়ার রাজত্বকালে। তারপর ক্রমাগত সাতশত বৎসর ধরে এই কাজ চলতে থাকে। সম্পূর্ণ হয় মাত্র তিন শত বৎসর পূর্বে নায়েক বংশীয় রাজা থিরুমলের তত্ত্বাবধানে।

মন্দির ও তৎসংলগ্ন বিস্তৃত অঙ্গনকে চারিদিকে ঘিরে আছে পনের ষোল ফুট উচ্চ একটি প্রাচীর। চারিটি অতি বিশাল গোপুরম্-পথে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। প্রতি গোপুরমের উচ্চতা প্রায় দুইশত ফুট এবং সর্বাঙ্গে অসংখ্য পৌরাণিক চরিত্রের মেলা। গোপুরম্-গুলি অতি সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রথম দর্শনে দর্শকসাধারণ অভিভূত হয় তাদের সৌন্দর্যে নয়, বিশালতায়। এই বিপুল সৃষ্টির পাশে নিজেকে মনে হয় অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। বিগ্রহ দর্শনের পূর্বে এক অবনমিত মনোভাব সৃষ্টিই হয়ত বিরাট গোপুরম্‌গুলির উদ্দেশ্য।

মন্দির-প্রাচীরের চারিপাশে ছোটবড় অসংখ্য দোকানপাট, ক্রেতা-বিক্রেতার উচ্চগ্রাম বাদানুবাদে সকল সময়েই কোলাহলমুখর। তীর্থযাত্রীরাই প্রধান ক্রেতা এবং তাদের প্রলোভিত করবার জন্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে বহু দালাল। তাঁত বস্ত্র পেতলের কাজ ইত্যাদি থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় বহু পণ্য-সম্ভারই এই দোকানগুলিতে সহজলভ্য। বস্তুতঃ মহামন্দিরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সমগ্র মাদুরা শহর। ব্যবসা-কেন্দ্রকে পেছনে রেখে পূর্ব গোপুরম্-পথে আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম।

একটি মাত্র প্রাচীরের ব্যবধান, কিন্তু পরিবেশের কি আশ্চর্য পরিবর্তন। মনে হলো, স্বার্থ-সর্বস্ব তামসিক বর্তমানকে পেছনে ফেলে শান্ত-সমাহিত চিরন্তন ভারত-সত্তার মুখোমুখি হয়েছি। এখানে দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, আছে ভক্তি, প্রীতি আর ইষ্টদর্শনের আকুল আগ্রহ।

পশ্চিম গোপুরম-সংলগ্ন প্রসিদ্ধ 'সংগীত স্তম্ভশ্রেণীর' (Musical pillars) দর্শন পাওয়া গেল, মন্দির অর্ধ-পরিক্রমা করে। নির্মাণ ও স্থাপত্যের আশ্চর্য কৌশলে শূন্যগর্ভ এই স্তম্ভশ্রেণীর প্রতিটি স্তম্ভ সামান্য আঘাতেই একটি বিশুদ্ধ স্বরের জন্ম দিতে সক্ষম। মন্দিরচত্বরের পূর্বদিকে বসন্ত মণ্ডপমে নায়েক রাজন্যদের প্রতিমূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য।

॥ ৩ ॥

গাইড জানালেন মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হবে ঠিক বেলা বারোটায়। মন্দির অভ্যন্তরে দর্শনীয় রয়েছে প্রচুর। অতএব বাইরে আর কালক্ষেপণ না করাই বিধেয়। সৎ পরামর্শ সন্দেহ নেই। অতএব উত্তর দ্বারপথে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

যদিও মাদুরা মহামন্দির মীনাক্ষী মন্দির বলেই প্রখ্যাত, তবু এখানে

রয়েছে পাশাপাশি দুটো দেবালয়। একটিতে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ সুন্দরেশ্বরর বা শিব অন্যটিতে শিবানী মীনাক্ষী।

মন্দির বললে আমাদের মনে সাধারণতঃ যে ছবি ফুটে ওঠে, মীনাক্ষী মন্দিরের সংগে তার কোন মিল নেই। একটি ছোটখাট দুর্গ বললেই বোধ হয় এর যথার্থ বর্ণনা দেওয়া হয়। কত অসংখ্য প্রকোষ্ঠ, গুপ্তস্থান ও অলিন্দ যে এই মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে তা শুধু কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন। গাইড ভিন্ন অনেক কিছুর হদিস পাওয়াই দুষ্কর। মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের বিগ্রহ ছাড়াও প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে এবং অলিন্দের ধারে ধারে স্থাপিত রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর অসংখ্য বিগ্রহ। তন্মধ্যে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও লিংগমের সংখ্যাই সর্বাধিক।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের মধ্যেই রয়েছে বহুস্তম্ভবিশিষ্ট 'কম্বট্টাত্তি মণ্ডপম'। এই মণ্ডপের প্রতিটি স্তম্ভের ভাস্কর্য অতি সুন্দর। বিষয়বস্তু, শিবশক্তির বিভিন্ন লীলা। মহাবিষ্ণুকে মহাদেবের ভিক্ষাদান, বৃষারূঢ় ভোলানাথ ইত্যাদি স্তম্ভ বিশেষ মনোযোগ দাবী করে। 'সহস্র স্তম্ভ দরবার' মন্দিরপ্রাঙ্গণের আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। এটির স্তম্ভ সংখ্যা নয়শত পঁচাশী, নির্মাণকাল ১৫৬০ সাল। বিভিন্ন কোণ থেকে দেখলে প্রতিবারই স্তম্ভসমষ্টির একটি আলাদা ছন্দ দেখতে পাওয়া যায়। এ যেন আমাদের শিশুবয়সের কাঁচের টুকরো দেওয়া সেই খেলনা, যাতে চোখ রেখে আলোর বিপরীতে ধরে ঘোরালে প্রতিবারেই হাজির হতো অজস্র নতুন নতুন শ্রেণীবদ্ধ নমুনা। অনেকগুলি স্তম্ভের কারুকার্য অতি সুন্দর। 'পুরুষের কাঁধে নারী' স্তম্ভটি একটি অসাধারণ রচনা। অনেকের মতে বর্তমান যুগে পুরুষের ওপর নারীর আধিপত্যই এই রচনার বিষয়বস্তু।

মীনাক্ষী মন্দিরের ধারে স্বর্ণপদ্ম জলাশয়। কথিত আছে, পুরাকালে এই জলাশয় সাহিত্যিক রচনার গুণাগুণ পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হতো। পাণ্ডুলিপি জলে ফেলে দিলে নিকৃষ্ট রচনার হতো সলিল সমাধি। প্রকৃত সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন রচনাই শুধু ভেসে উঠতো জলাশয়োত্থিত এক কাষ্ঠ-পাটাতনের সাহায্যে।

স্বর্ণপদ্ম জলাশয়ের চারিদিক ঘিরে দরদালান। দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে অসংখ্য চিত্রাবলী প্রাচীন তামিল-কৃষ্টির পরিচয় বহন করছে। পূর্বধারে যাত্রীদের বিশ্রামস্থান, উত্তরে বিচিত্র স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি চাতাল। মীনাক্ষী দেবীর মন্দির-দর্শনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিকোণ পশ্চিম দরদালানের স্তম্ভশ্রেণীর ভেতর দিয়ে। দেবীকে প্রণাম জানিয়ে এবার আমরা এলাম সুন্দরেশ্বররের মন্দিরের সামনে। বাইরের আলোর প্রবেশাধিকার এখানে সামান্যই। দু' একটা ঘুলঘুলি পথে যা আসছে তা অন্ধকারকে যেন বাড়িয়েই তুলেছে। পূজারীগণ প্রদীপের আলো ধরে দেবদর্শন করালেন। সুন্দরেশ্বররের মন্দিরের ঠিক সামনেই লৌহ-গরাদ ও প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনীতে আবদ্ধ এক চতুষ্কোণ বেদীতে রয়েছে বৃহৎ একটি স্বর্ণস্তম্ভ। মহামন্দিরের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-গুলি বেষ্টনীর এই নিকষকালো প্রস্তর-স্তম্ভশ্রেণী। এমনি একটি স্তম্ভে সুন্দরেশ্বরর-মীনাক্ষী বিবাহদৃশ্যের কোন তুলনা আমি আর খুঁজে পাইনি। সম্মুখস্থ বিশাল হলঘরের এক কোণে রয়েছে একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য অশ্ব। দুটি রচনাতেই গতিশীলতার ব্যঞ্জনা বিস্ময়জনক। এ-মন্দিরে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বররের বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং জন-সাধারণ বিশেষ আগ্রহের সংগে এজন্যে অপেক্ষা করে থাকে। অনুষ্ঠান-শেষে বিগ্রহদ্বয়কে পুরোভাগে রেখে বার করা হয় এক বিরাট মিছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য অশ্বদ্বয়ের প্রয়োজন হয় সেই মিছিলের শোভাবর্ধন করতে।

॥ ৪ ॥

মন্দিরদর্শনপর্ব শেষ হ'ল প্রায় বারোটায়। আমরা স্বর্ণপদ্ম জলাশয়ের পাশের চাতাল দিয়ে পূর্ব গোপুরমের ধারে মন্দির-অফিসে এসে পৌঁছলাম। এবার আমার তরফ থেকে যে প্রস্তাব এলো, সংগীদের কাছে তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। জানালাম, মন্দির ও সমগ্র মাদুরা শহরের পরিপূর্ণ দৃশ্য দেখবার জন্যে আমি পূর্ব গোপুরমের শীর্ষ-দেশে আরোহণ করবো। গোপুরমগুলির ওপরে যাবার ব্যবস্থা আছে এ খবর সংগ্রহ করেছি পূর্বাহ্নেই গাইডের কাছ থেকে। তিনজন বন্ধু আনন্দের সংগে আমার সংগী হতে রাজী হলেন, দু'জন রইলেন নিরপেক্ষ এবং চাটুজ্জে জানালেন ঘোর আপত্তি। কিন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠের দাবী অগ্রগণ্য। অতএব মন্দির-অফিসে আমরা আমাদের আর্জি পেশ করলাম। কর্তৃপক্ষ একটু বিস্মিত হলেন বলেই মনে হলো, কারণ অনুরোধ তাঁদের কাছে অতি কদাচিতই আসে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তাঁরা জানালেন, ওপরে ওঠার ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। তবে যদি আমরা নিজেদের দায়িত্বে যেতে রাজী থাকি তবে তাঁদের আপত্তি নেই, অবশ্যি মাথাপিছু এজন্য দর্শনী দিতে হবে চার আনা।

দর্শনী দেবার আগেই নিরপেক্ষরা গরিষ্ঠ পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। একলা পড়ে যাওয়ার ভয়ে চাটুজ্জেকেও অগত্যা চার আনা পয়সা খরচা করতে হলো। কর্তৃপক্ষের উপদেশানুযায়ী কয়েকটি মোমবাতিও কিনে নিলাম। গাইড নীচেই রইলেন।

প্রথম ১০০।১২৫ ফুট উঠে যেতে কোন অসুবিধেই নেই। শুধু অসংখ্য চামচিকার অবস্থানহেতু বিষাক্ত দুর্গন্ধই যা কিছু আপত্তিকর। চামচিকাদের ভীতত্রস্ত সঞ্চরণ ও সশব্দ প্রতিবাদে মনে হলো, বহুদিনের মধ্যে তাদের শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। এরপর কিন্তু উঠবার সিঁড়িগুলো ক্রমেই সংকুচিত হ'য়ে এলো। পাশাপাশি দু'জন চলবারও আর উপায় নেই। অতি অল্প স্থানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে উঠতে হচ্ছে বলে সিঁড়ির ধাপগুলিও খুব উঁচু। আরো খানিকটা ওঠার পর পাথরের সিঁড়ি বদলে গিয়ে শুরু হলো কাঠের সিঁড়ি। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় যতটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে মন্দির-কর্তৃপক্ষের ইতস্ততের কারণ বোঝা গেল। অতি জীর্ণ কাঠের সিঁড়ি প্রকৃতই ভয়ের কারণ। একবার মনে হলো বোধ হয় এ গোয়ার্তুমি না করলেই ভাল হতো। কিন্তু এখন ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

আরো পনের কুড়ি ফিট উঠলাম। পথ আরও সংকুচিত। দুদিকের দেওয়াল পর্যন্ত গায়ে ঠেকছে। পায়ের নীচে সিঁড়ি আরও নড়বড়। ভেংগে পড়লে কোথায় যেয়ে ঠেকবো জানি না। গুমোট আবদ্ধ গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছে। গলগল করে ঘামছি আর নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাঁসফাঁস করছি। অবস্থা আরো অসহনীয় করে তুলেছে চামচিকার দুর্গন্ধ। ঠিক এমনি সময়ে চাটুজ্জে ঘোষণা করলেন তিনি আর 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। কারণ আর একটি সিঁড়ি ভাংগবার মত শক্তিও তাঁর অবশিষ্ট নেই। কিছুক্ষণ সকলেই স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম। সারিতে চাটুজ্জের স্থান চতুর্থ। তিনি থামলেন বলে পেছনের তিনজনকেও থামতে হলো, কারণ একজনকে পাশ কাটিয়ে আর একজনের এগিয়ে যাওয়া এখানে অসম্ভব। ৪০।৫০ ফুট নীচে দু'জনের পাশাপাশি চলার মত জায়গা আছে। পেছনের তিনজনের এগুবার একমাত্র উপায় চাটুজ্জেকে নিয়ে এই ৪০।৫০ ফুট নেবে যাওয়া এবং তাঁকে সেখানে রেখে আবার উঠে আসা। বর্তমান পরি-

পূর্ব গোপুরমের ওপর থেকে মন্দির, দক্ষিণ গোপুরম ও মাদুরাই শহরের দৃশ্য।
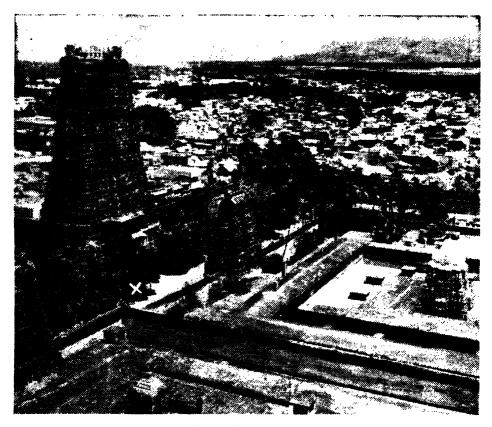
রাজা তিরুমলা নায়কের রাজপ্রাসাদ।

প্রেক্ষিতে এরূপ আয়াসসাধ্য প্রয়াস আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা সেটাই বিবেচ্য। কিন্তু শর্মা প্রস্তাবটা তোলা মাত্র তার-স্বরে চাটুজ্জে জানালেন, তাঁকে অর্ধ-পথে ফেলে রেখে এলে তিনি সেখানেই 'মুর্চ্ছো' যাবেন।

এরপর সর্ব জল্পনার সেখানেই অবসান। স্ফীতোদর চাটুজ্জে অতি কষ্টে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং একটু জিরিয়ে নিয়েই নাবতে শুরু করলেন। বাধ্য হয়ে পশ্চাতের বন্ধুত্রয়ও তাঁর পূর্বগামী হ'লেন। স্বল্পালোকে সকলের মুখচ্ছবিই অস্পষ্ট। কিন্তু অনুমান করি, ইচ্ছাশক্তির যদি বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হতো তাহলে এই মুহূর্তে চাটুজ্জে ভস্মে পরিণত হতেন।

এবার দলে শুধু আমি, দত্ত ও শর্মা। অতিকষ্টে পা টিপে টিপে একটি একটি করে সিঁড়ি ভাঙছি আর মনে হচ্ছে এই শেষ, আর ওঠা সম্ভব নয়। হৃদস্পন্দন-ধ্বনি যেন প্রতি পদক্ষেপেই উচ্চতর হচ্ছে। ক্যামেরা ও আনুসঙ্গিকের সামান্য বোঝা বইতেও কাঁধ বিদ্রোহ জানাচ্ছে। তবে কি আমাকেও চাটুজ্জের মত পরাজয় বরণ করে ফিরে যেতে হবে?

হঠাৎ মনে হলো, একটু ঠাণ্ডা মুক্ত হাওয়ার ছোঁয়া পেলাম। তবে তো লক্ষ্যে পৌঁছতে আর বেশী দেরী নেই। জয় মা মীনাক্ষী, জয় বাবা সুন্দরেশ্বরর। মনের সব বল যেন নিমেষে আবার ফিরে পেলাম। আরো কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙতেই দেখা গেল মাথার ওপরে খোলা আকাশ, আমাদের লক্ষ্য, গোপুরমের শীর্ষদেশ।

সুন্দরেশ্বরর মন্দির প্রাঙ্গণে স্বর্ণময় অশ্ব।

গোপুরমের শীর্ষে একটি ক্ষুদ্র কাঠের পাটাতনে তিনজন এসে দাঁড়ালাম। সোনালী রোদ্রে অবগাহন করছে মহামন্দির। স্বর্ণময় চূড়াগুলিতে চোখ-ঝলসানো দ্যুতি। মন্দির-প্রাচীরের বাইরে দিগন্ত-ছোঁয়া মাদুরাই শহর।

হু হু করে একটানা বয়ে চলেছে পুবে হাওয়া। চলার পথে বহু-শতাব্দীর ইতিহাসের মৌন সাক্ষী এই গোপুরমের সঙ্গে তার কত কানাকানি, ফিসফিসানি। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরাও কান পেতে আছি। গোপুরম কি তার স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত সহস্র বৎসরের গৌরবময় ইতিহাসের একটুও আমাদের শোনাবে না?

সুন্দরেশ্বরর-মীনাক্ষী বিবাহদৃশ্য। সম্পাদনকর্তা মহাবিষ্ণু
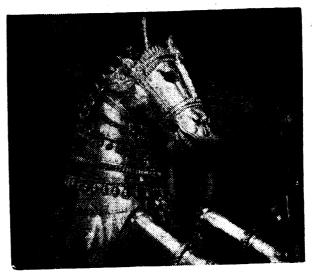
অয়স্কান্ত

।। খনিজ তৈল ।।

আমাদের এই পৃথিবীকে বলা হয় রত্নগর্ভা। তবে পৃথিবীর গর্ভ থেকে যতো রকমের রত্ন আমরা আহরণ করেছি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন হচ্ছে খনিজ তেল। এই পদার্থটি আমাদের কাছে এত সহজ-লভ্য যে সব সময়ে এর দাম আমরা বুঝি না। কিন্তু এই পদার্থটির অভাব ঘটলে আমাদের যে কী হাল হবে তা যদি একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করি তাহলে হয়তো খনিজ তেলের যথোচিত মূল্যে সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারব।

মনে করা যাক, বেশ কিছুকালের জন্যে আমাদের দেশে এক ফোঁটাও খনিজ তেল পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

প্রথমেই যে-ব্যাপারটি চোখে পড়বে তা হচ্ছে এই যে রাস্তায় ট্রাম বাস বা মোটরগাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। রেলগাড়ির চাকা বন্ধ—রেলের লাইনের ওপরে মরচে পড়ে গিয়েছে। আকাশে এরোপ্লেনের গর্জন নেই। এমন কি সমুদ্রে জাহাজ নেই, নদীতে স্টীমার নেই। এক কথায় যাকে বলা হয় পরিবহণ-ব্যবস্থা তা একেবারে অচল হয়ে গিয়েছে।

তার পরেই টের পাওয়া যাবে যে রাত্রিবেলা ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলছে না। গ্রামে গ্রামে কেরোসিনের বাতিও নয়। টিম টিম করে বড়ো জোর দু-একটা সরষের তেলের প্রদীপ জ্বলতে পারে মাত্র।

কারখানা বন্ধ। কারণ কারখানাকে চালু রাখতে হলে যন্ত্রপাতিকে তৈলাক্ত রাখা দরকার। এমন কি যে-সব যন্ত্র বাষ্পচালিত, তারও চলমান অংশ-গুলোকে চালু রাখতে হলে তেলের মসৃণতা চাই। ইংরেজিতে যাকে বলে লুব্রিক্যান্ট—তা খনিজ তেল থেকেই পাওয়া যায়।

দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলছে এমন অবস্থায় কোনো প্রকারে একবার যদি কোনো একটি দেশের খনিজ তেলের যোগান বন্ধ করে দেওয়া যায়—তাহলে সেই দেশের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ খনিজ তেলের অভাবে যান্ত্রিক বাহিনী-গুলো অচল হয়ে যাবে, লুব্রিক্যান্টের অভাবে আগ্নেয়াস্ত্র অনড় হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে ইটের টুকরো, লাঠি আর তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই। আর সকলেই জানেন, আধুনিক যুদ্ধে এই সমস্ত মান্ধাতার আমলের অস্ত্র নিয়ে একেবারেই সুবিধে করতে পারা যাবে না।

অর্থাৎ, আজকের জগতটাই এমন একটা চেহারা নিয়েছে যে আমাদের খাওয়া-পরা চলা-ফেরা সব কিছুর জন্যেই খনিজ তেল অপরিহার্য। ভারতে আমাদের খনিজ তেলের চাহিদা মেটাবার জন্যে বিদেশের বাজারে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। দেশের শিল্পায়ন যতো অগ্রসর হবে ততোই খনিজ তেলের চাহিদা বাড়বে। এ-অবস্থায় আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যদি খাড়া রাখতে হয়, দেশের শিল্পায়নকে যদি দ্রুত অগ্রসর করতে হয়—তবে এই খনিজ তেলের প্রবাহকেও অব্যাহত রাখতে হবে। নিজেদের দেশে যদি না পাওয়া যায় তো বিদেশ থেকে কিনে। এমন কি আমাদের দেশের নিরাপত্তার জন্যেও সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া দরকার এই খনিজ তেলের দিকেই।

পৃথিবীর মানচিত্রে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব এত বেশি তার কারণ এই অঞ্চলটি খনিজ তেলে অতি মাত্রায় সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যে সমুদ্রপথে ও আকাশপথে তাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরে-ছিল তার একটি কারণ এই যে, এই দুটি দেশে কখনো খনিজ তেলের অভাব ঘটেনি। জার্মানিতে ও জাপানে সবচেয়ে বড়ো অভাব ঘটেছিল এই খনিজ তেলেরই।

খনিজ তেল যে আরো কতভাবে আমাদের জীবনযাপনের পক্ষে অপরি-হার্য হয়ে উঠেছে তার পুরো ফিরিস্তি হয়তো অনেকেরই জানা নেই। আমরা আমাদের বাড়ির দরজা জানলায় যে-রঙ লাগাই, আমরা যে প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করি, মেয়েরা ঠোঁটে ও নখে যে-পালিশ মাখে—এই সবকিছুর মধ্যেই খনিজ তেলের কিছু না কিছু অবদান আছে। এমন কি গ্রামোফোনের রেকর্ডও খনিজ তেল ছাড়া হত না। আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে বলা হয় যে, আধুনিক সভ্যতা চাকায় চলে। এই চাকাকে চালু রাখার জন্যেও ফোঁটা ফোঁটা খনিজ তেল চাই। এই তেল চাই মোমবাতি তৈরি করার জন্যে, রাস্তার অ্যাসফল্টের জন্যে, তরল সাবান, বিস্ফোরক পদার্থ, ছাপার কালি, ভেলভেট, তন্তু, সার, কীটনাশক পদার্থ, রং, ওষুধ, ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম, সেলোফেন, গ্রীজ, কৃত্রিম রবার ও আরো অনেক কিছুর জন্যে। এক কথায়, আধুনিক বিজ্ঞান যতো কিছু আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ আমাদের কাছে হাজির করেছে তার বেশির ভাগই পাওয়া গিয়েছে খনিজ তেল থেকে। এবং প্রতি-দিনই নতুনতর উপকরণ তৈরি হয়ে চলেছে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কল্পনা করা যায়নি যে খনিজ তেলকে মানুষের প্রয়োজনে এমন বিচিত্ররূপে হাজির করা যেতে পারে। যে-কটি উপকরণের নাম করা হল সেগুলোকে বাদ দিলে আধুনিক জীবন অনেকখানি রঙ ও মাধুর্য খুইয়ে বসবে।

খনিজ তেল থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যেতে পারে তা কয়লার চেয়ে দেড়গুণ বেশি, কাঠের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। আর উত্তাপ মানেই তেজ। তেজ মানেই শক্তি। তাছাড়া কয়লা বা কাঠের তুলনায় খনিজ তেলকে মজুদ রাখা সহজ, চালান দেওয়া আরো সহজ। এই কারণেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কয়লার চেয়ে তেলের লেনদেনই বেশি। পৃথিবীতে মোট যে-পরিমাণ তেল উৎপন্ন হয় তার শতকরা চল্লিশ ভাগই ব্যবসার লেনদেনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চালান হয়ে যায়।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মানুষ খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান করেছে নিজের শরীরের শক্তি বা জন্তু-জানোয়ারের শক্তি ব্যবহার করে। তারপরে যন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে আর যন্ত্রকে শক্তি জুগিয়েছে এই খনিজ তেল। গত একশো বছরের মধ্যে মানুষ যে শিল্পে বিজ্ঞানে ও যন্ত্রবিদ্যায় এত উন্নতি করতে পেরেছে তার একটি কারণ এই যে খনিজ তেলের ব্যবহার তার জন্যে অনেকখানি অবকাশ সৃষ্টি করেছে।

তেলের অভাব ঘটলে যে-কোনো দেশেরই শিল্পগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি ব্যাহত হতে বাধ্য। এই কারণেই উন্নতিকামী প্রত্যেকটি দেশের অনেকখানি মনোযোগ থাকে এই খনিজ তেলের দিকে।

পৃথিবীর কোন্ দেশে মাথাপিছু কি-পরিমাণ খনিজ তেল খরচ হয়ে থাকে তার একটা মোটামুটি হিসেব এখানে দেওয়া যেতে পারে।

	মাথাপিছু খরচ (গ্যালনে)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬০০
কানাডা	৫০০
ব্রিটেন	১৫০
ফ্রান্স	১১০
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১০৫
ভারত	৩
পৃথিবীর গড়	৭০

দেখা যাচ্ছে, এই হিসেব থেকেও ভারতের অনুন্নত অবস্থা ও জীবনযাত্রার দরিদ্র মান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে পারে।

।। ভারতে খনিজ তেলের চাহিদা ।।

ভারতে খনিজ তেলের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে সাড়ে-পাঁচ লক্ষ গ্রাম আছে। গ্রামের মানুষরা এখনো পর্যন্ত বাতি জ্বালাবার জন্যে কেরোসিন তেলই ব্যবহার করে থাকে। এই কেরোসিন তেলের চাহিদাও বাড়তির দিকে। তাছাড়া, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেশের শিল্পোদ্যোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এ জন্যেও আরো বেশি পরিমাণে খনিজ তেল চাই।

১৯৫৮ সালের আগের দশ বছরে ভারতে খনিজ তেলের চাহিদা বেড়েছে প্রতি বছরে শতকরা ১০·৫ ভাগ। ফলে এই দশ বছরের মধ্যেই খনিজ তেলের চাহিদা তিনগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৫৯ সালের হিসেবে দেখা যায়, এই একটি বছরে ভারতে মোট ৬ কোটি টন খনিজ তেল খরচ হয়েছে। আগামী কয়েক বছরে এই খরচের পরিমাণ আরো বাড়বে। এবং খুব সম্ভবত ১৯৬৬ সালে এই খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪ কোটি টন।

এ-প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা মনে রাখা দরকার। ভারতে তেজ ও শক্তির উৎস হিসেবে খনিজ তেলের ব্যবহার খুবই কম। তেজ ও শক্তির যোগান শতকরা আশি ভাগ আসে গোবর ও খড়-পাতা পুড়িয়ে বা মানুষের ও জন্তু-জানোয়ারের গায়ের জোর থেকে। তেজ ও শক্তির যোগান শতকরা মাত্র কুড়ি ভাগ আসে কয়লা, খনিজ তেল ও জলবিদ্যুৎ থেকে।

পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত যতো তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে ১৫,০০০ কোটি গ্যালন তেল পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে যে-হারে তেল খরচ হচ্ছে সেই হারটি যদি বজায় থাকে এবং নতুন কোনো তেলের খনি যদি আবিষ্কৃত না হয়—তাহলে এই তেলের পুঁজি নিঃশেষ হতে সময় লাগবে আরো ১৬০ বছর। তবে এতক্ষণের আলোচনা থেকে এই কথাটি নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে আগামী কয়েক বছরে অনুন্নত দেশগুলি শিল্পোন্নত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খনিজ তেলের খরচও অসম্ভব বেড়ে যাবে। কাজেই বর্তমান তেলের পুঁজিও ১৬০ বছরের অনেক আগেই নিঃশেষ
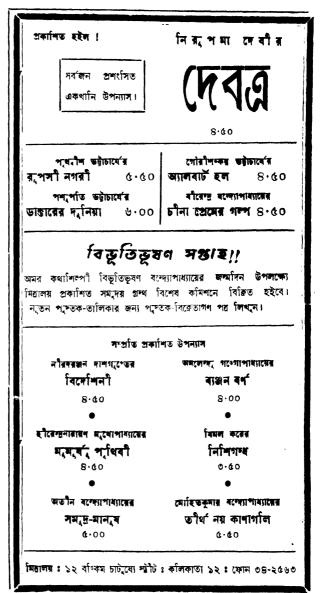
হবে। অবশ্য সেজন্য আমাদের শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। আগামী দিনে উন্নততর যন্ত্রের সাহায্যে আরো নতুন নতুন তেলের খনি নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হবে। তাছাড়া পারমাণবিক তেজকেও আমরা আরো অনেক বেশি পরিমাণে কাজে লাগাতে পারব। তবে আমাদের দেশকে আপাতত বেশ কিছুকাল নির্ভর করতে হবে কয়লা, খনিজ তেল ও জল-বিদ্যুতের ওপরেই।

ভারতে বর্তমানে খনিজ তেলের দিকে অনেকখানি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সামর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। দ্বিতীয় পরি-কল্পনায় এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি টাকা। আর তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। বিশেষ একটি কমিশনও গঠন করা হয়েছে আর এই কমিশনের পরিচালনায় এক দল ভারতীয়কে বিদেশে পাঠিয়ে বিশেষজ্ঞ করে তোলা হয়েছে। আর সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে খনিজ তেলের সন্ধান। বলাই বাহুল্য, ভারত রাষ্ট্র হিসেবে কতখানি আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে তা অনেকখানি নির্ভর করছে এই খনিজ তেলের ফ্রন্টে সাফল্যের ওপরে। এ-বিষয়ে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় বিস্তৃততর আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

।। জীববিজ্ঞানীদের চোখে মহাকাশ-অভিযান ।।

বিখ্যাত সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী এ. আই. ওপারিনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে জুলাই মাসের 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকায়। ওপারিনের নাম বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে নিশ্চয়ই অপরিচিত নয়। জীবের উৎপত্তি সম্পর্কিত তাঁর তত্ত্ব নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

এই প্রবন্ধে ওপারিন মহাকাশ-অভিযানের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, এর ফলে জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক সন্দেহের নিরসন হবে এবং অনেক সমস্যার ওপরে নতুন আলোকপাত হবে।

আমাদের এই পৃথিবীর জীব-জগতের আদি রূপটি ক্রমবিকাশের ধারায় অনেক আগেই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়েছে। যেমন, ধরা যাক, ২০০ কোটি বছর আগে আদি প্রাণের যে-রূপটি আমাদের এই পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যেত তা এখন আর নেই। এমন কি সে-সময়ে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরি-বেশটিও যা ছিল তাও একেবারেই পাল্টে গিয়েছে।

সে-সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল খুবই কম। এমন কি হয়তো একেবারেই ছিল না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ত্রিশ কিলোমিটার উঁচুতে এখন যে ওজোন গ্যাসের পর্দাটি রয়েছে, সে পর্দাটি থাকার দরুণ সূর্য-কিরণের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারছে না— তখন সেটি ছিল না এবং তার ফলে সূর্যকিরণের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সরাসরি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছত। তাহলে আমরা বলতে পারি, যে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি এমনিতে প্রাণকে সংহার করে সেই আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিই সেই আদিম সমুদ্রে জৈব পদার্থের বিশেষ একটি বিন্যাস তৈরি হবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। প্রাণের উদ্ভবের সেই প্রাথমিক অবস্থাটি এখন আর নতুন করে আমাদের এই পৃথিবীতে তৈরি করা সম্ভব নয়।

ওপারিন বলছেন যে প্রাণের উদ্ভবের এই প্রাথমিক অবস্থাটিই আমরা হয়তো অন্য কোনো গ্রহে আবিষ্কার করতে পারি। মহাকাশ-অভিযানের সাফল্যের পথ ধরে অগ্রসর হতে হতে আমাদের সঙ্গে হয়তো আমাদের অতীতের সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে। এমন কি আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীতেও জীবজগতের যে-রূপটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই রূপটিও যদি অন্য কোনো গ্রহে আবিষ্কৃত হয়, তাহলেও জীবের ক্রমবিকাশে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক-খানি পরিণতি লাভ করবে। আর যদি সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহে জীব-জগতের সাক্ষাৎ নাও পাওয়া যায় তাহলেও জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণা যাচাই হয়ে যাবে। অর্থাৎ, যে-ভাবেই হোক, মহাকাশ-বিজয় জীব-বিজ্ঞানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতকাল পর্যন্ত আমরা জীবজগৎ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আহরণ করেছি একমাত্র এই পৃথিবী থেকেই। এবারে সময় হয়েছে এই সমস্ত তথ্যকে বিশ্ব-লোকের পটভূমিতে স্থাপন করে তার যাথার্থ সঠিকভাবে নির্ণয় করা।

* * *

আইনস্টাইনের একটি উক্তি :

"এই জীবন একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আমার খুবই ভালো লাগে। আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আমি শুনি যে, আর তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে তাহলেও আমি কিছুমাত্র বিচলিত হব না। আমি তখন ভাবতে বসব যে এই শেষ তিন ঘণ্টা আমি কি-করে সব চেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি। তার-পরে কিছুমাত্র শোরগোল না তুলে আমি আমার কাগজপত্র গুছিয়ে বসব এবং শান্তভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে যাব।"

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সতের

একটি ছোট টিলা পাহাড়ের চূড়োয় দূর থেকে যে ক্ষুদ্র ও প্রাচীন দুর্গটি চোখে পড়ে, ওইটির নামই সুকেতগড়। ওর থেকেই এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে। এটি মহারাজা মাধবেন্দ্র সিং-এর এলাকা। জমিদারি আজকাল নেই, সামন্তরাজ্যও লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু এই দুই গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ভেঙে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে অগণিত ছোট ছোট ভূভাগ সৃষ্টি হয়েছে।

সুকেতগড়ের এই পাহাড়ি অঞ্চলটি অনাদৃতভাবে অনেককাল ধ'রে পড়ে ছিল। বর্তমান মহারাজার পিতা স্বর্গত রঘুবীর সিং একবার এখানে একটি লোহসারের কারখানা নির্মাণের চেষ্টা পান। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে নেরবতীর একটি শাখানদী থেকে তিনি মোটা পাইপের সাহায্যে জল আনেন, এবং গভর্ণমেন্টের সহায়তায় ইলেকট্রিক উৎপাদন করতে সমর্থ হন। সেটি ইংরেজ আমল। অতঃপর রঘুবীর সিং হঠাৎ অকালে মারা যান তাঁর নাবালক কুমারকে রেখে। মণিপ্রসাদ হল রঘুবীর সিংয়ের শ্যালকপুত্র,—মহারাজার পঞ্চম স্ত্রীর বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু কুমার মাধবেন্দ্র এবং মণিপ্রসাদ উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শ্রীমতী শিবন্তীর পিতাও রাজবাড়ির সঙ্গে কি যেন আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। মণিপ্রসাদের সহায়তায় এবং দৌত্যগিরির ফলে এখানে কম বেশি প্রায় তিনশত একর জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তার বিনিময়ে হেনা জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। সুবিধা ছিল এই, পুরনো কাঠামোটি বেশ মজবুত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছে। এদিকে মণিপ্রসাদের চেষ্টায় এবং তার দিল্লী আনাগোনার ফলে কিছুদিন আগে কুমার মাধবেন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে মহারাজা উপাধিটি পেয়ে যান। সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ তিনি সুকেতগড়ের গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থদানের দ্বারা পরিশোধ করেন।

মূল কাহিনীটি সবিস্তারে শুনে আমি হাসলুম। বললুম, আধুনিক মহারাজা কি এখনও কুমার আছেন?

হেনা হেসে বলল, না, তোমার মতন তিনি সুদূরদর্শী নন! তাঁর স্ত্রী আছেন।

স্ত্রীটি কি যথেষ্ট পরিমাণে সুরূপা?

হেনা বলল, তুমি গিয়ে দেখে আসতে পার।

কৌতুক বুদ্ধি আমাকে পেয়ে বসল। বললুম, একজন উটকো বিদেশিনী মেয়ে এসে এমনভাবে রাজানুগ্রহ লাভ করল, এটি বিচিত্র বটে। তুমি কি তোমার সেই লোল বেণী দুলিয়ে এবং দীর্ঘলম্বিত পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে রাজবাড়িতে যাতায়াত করতে?

বাঁকা চোখে হেনা আমার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, দেখছি সেই পোষাকটা তোমার মাথা থেকে এখনও যায়নি। আমার মরণদশা, তাই অমন পোষাকে রুচি এসেছিল! তবে তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, কানপুর যেদিন ছাড়লুম, পোষাকও সেদিন ত্যাগ করলুম।

মণিপ্রসাদ যখন এসে পৌঁছল বেলা তখন প্রায় দুটো। ষ্টেশন থেকে সে বয়েল-গাড়ির সাহায্যে আমাদের সমস্ত মালপত্র ছেড়ে দিয়ে তবে এসেছে। সম্ভবত আগামী পরশু দিন সন্ধ্যার আগেই গাড়িখানা এসে পৌঁছতে পারে। মণিপ্রসাদ কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে নিজের কোয়ার্টারের দিকে অগ্রসর হল। কিষণ ওপাশের ঘরটি গোছাচ্ছিল।

এ মহলের ঘরগুলি হেনার এলাকার পড়ে। এটি বসবার ঘর। উপরে টালি-খোলার ছাদ, দুই দিকে ঢালু,—সমস্তটা কাঠের ফ্রেমে দাঁড়িয়ে। ঘরের মধ্যে কাঁচা কাঠের বনা মিষ্ট গন্ধ। দেওয়ালগুলি পাকা। মেঝের উপর সিমেন্টের নতুন কাজ। বৈভবের চিহ্ন কোথাও নেই, কিন্তু ব্যবস্থাগুলি সুশৃঙ্খল। বাইরে রৌদ্র প্রখর, কিন্তু গাছপালার জন্য হাওয়া মধুর। চারিদিকে অনাহত নীরবতা,—মাঝে মাঝে পাখীর চূর্ণকণ্ঠের ডাক শুনতে পাচ্ছিলুম।

এই ফাঁকে কিষণ এসে বলল, সাব, অব নাহা লিজিয়ে।

তোর কেমন লাগছে রে, কিষণ?

কিষণ তার নিজের ভাষায় জানাল, এ জায়গা যে এত ভাল আমি জানতুম না। এখানে চারিদিকে কাজ। আমি আর কোথাও যাব না। সব কাজ আমি করব।

আমরা স্নানাদি সেরে মণিপ্রসাদের কোয়ার্টারে এসে উঠলুম। শিবন্তী আহারের আয়োজন করেছে প্রচুর। তার ঘরে রান্নাবান্না করেছে একটি বর্ষীয়সী মেয়েছেলে। রান্না নিরামিষ। ভাত রুটি দুই আছে।—অড়হর ডালে জবজবে ঘি। ভিণ্ডিকা সব্জি। আলু আর গোবি। ভাণ্টা কি ভাজি। পিঁয়াজ টোমাটো। ইমলিকা চাটনি। শেষ পাতে মালাই। দহি ভি হ্যায়। আপকো তকলিফ হোগি। বংগালি মছলি খানেবালে!

শিবন্তী হেসে কুটিপাটি। মণিপ্রসাদ বলল, আমি লোক ঠিক করে রেখেছি দাদা। বেতোয়ার মাছ আপনাকে রোজ খাওয়াব। অণ্ডা ভি লায়েগা। ভেড়িকা মীট ভি বাজারমে মিলতা। দেহাতিলোক এৎনা বড়া বড়া মুর্গী উঁহা লাতা, সাব। পরোয়া ক্যা?

হেনা খেতে খেতে বলল, দেখছ ত', তোমাকে অনুব্রার আগে এরা কত বন্দো-

বন্ধ ক'রে রেখেছে? মণি, তুমি এ'কে মাধবেন্দ্রর কাছে নিয়ে যাচ্ছ কখন্?

মণিপ্রসাদ বলল, আপনি কিছু ভাববেন না দিদি, ও আমি সব ভেবে রেখেছি। আমাদের এখন সকলের বড় কাজ, ও'কে এখানকার সকল কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত করানো। তবে আমার কি মনে হয় জানেন? ও'কে আমরা ছেড়ে দিই। উনি নিজের মনে ঘুরে বেড়ান। যা দেখবার তা উনি নিজেই দেখুন।

কিন্তু মনে রেখ মণিপ্রসাদ, পার্থ বড় নিন্দুক!

মণিপ্রসাদ হাসল। বলল, উনি কি হাততালি দেবার জন্য এখানে এসেছেন, দিদি? উনি সংশোধন করুন, সেই আমাদের লাভ। উনি ও'র নিজের জগৎ সৃষ্টি করুন, সেইটি সকলের আনন্দ।

বললুম, কিন্তু আমি এখানে সমালোচক হয়ে আসিনি মণিপ্রসাদ, তোমাদের সঙ্গে কাজ করব ব'লে এসেছি! আমরা কেউ কারও অভিভাবক হতে চাইনে, সবাই আমরা সহকর্মী। আমাদের পরিচয় যেন কোনদিন উঁচুনিচু না হয়!

শিবন্তী বলল, আপনি যা কিছু খেলেন সবই এখানকার! কোনও জিনিস কিন্তু আমরা কিনিনি। আজ আপনি বিশ্রাম নিন, কাল থেকে সব দেখবেন।

হেনা বলল, এক বছরে শুধু এইটুকু হয়েছে—আমরা নিজেদের ওপর দাঁড়াতে পারছি। এর মধ্যে অবশ্য মহারাজার প্রচুর অনুগ্রহ আছে। আচ্ছা, এবার আমরা উঠি—

কিষণ আমাদের সঙ্গেই বসেছিল। সেও এবার উঠে দাঁড়াল।

হেনার কাজ জমে রয়েছে প্রচুর, সে দেখতেই পাচ্ছি। যেমন-তেমন তার বসবাস জায়গা এবং এলোমেলো তার ধরণ। অঙ্ক ও বিজ্ঞানের ভাল ছাত্রী ছিল সে, সুতরাং অনেক কাজ তার পক্ষে সহজসাধ্য। দেখতে পাচ্ছি এখানে সে নিজের টাকা খরচ করেছে অনেক। বিগত এক বছরে সে যা কিছু করেছে, যা কিছু গড়েছে, এবং যাদের সঙ্গে মিলে একটা পরিকল্পনাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা পেয়েছে, সেটি আমার পক্ষে একদিনে জানা সম্ভব নয়। সেটি পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ।

কিন্তু যে-হেনাকে দেখে এসেছি এবং জেনে এসেছি এতকাল, সেই হেনার সঙ্গে সুকেতগড়ের হেনার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকার দাঁড়াবে, আগে থেকে সেটি জানা সহজ নয়। একদা যে-মেয়েটি কানপুর জেলার কোনও এক গ্রামের প্রান্তে গঙ্গার তীরে বসে আমাকে গান শুনিয়ে অভিভূত করেছিল, সেই মেয়েকেই ভিন্ন ভাষাভাষী জনতার জটলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফসলবিক্রির চুলচেরা হিসাব নিতে দেখলে আমারই একটু খট্‌কা লাগে। একশতটি গরু কত দুধ দেয়, এবং সাতষট্টিটি মহিষ কি পরিমাণ খায়,—এই দুই মিলিয়ে লাভ ও লোকসানের খতিয়ান কি প্রকার,—এ হিসাব আমার কাছেও চিরদিন জটিল। ইলেকট্রিক থাকার জন্য ছোট ছোট কারখানা নাকি গ'ড়ে উঠছে। এই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে নাকি বরফ-উৎপাদনের কাজটি প্রয়োজনীয়। তাঁত-বোনার কাজ চলছে বিদ্যুৎশক্তিতে। এসব উন্নতির পথ, শ্রীবৃদ্ধির পথ—বলাই বাহুল্য। জমি তোমার, তুমি যদি চাষ করো। ফসলের মালিক তুমি নিজে,—কিন্তু অতিরিক্ত অংশটা ন্যায্যমূল্যে তুমি বেচতে বাধ্য। মূল্য নিরূপিত হচ্ছে সম্মিলিত বিচারবিবেচনার দ্বারা। সমবায় পদ্ধতিতে মূল ব্যবস্থাটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই সব কথা মণিপ্রসাদ একদিন আমাকে বোঝাতে বসেছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে হিসাব দেখাল, এখানে বিদ্যালয় আছে তিনটি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দুটি, একটি চিকিৎসাকেন্দ্র। পঠন ও পাঠনের মধ্যে কৃষি-বিদ্যাই প্রধান। সংস্কৃতির মধ্যে আঞ্চলিক নৃত্যগীত এবং নাট্যপ্রচেষ্টা। আমাদের প্রতিষ্ঠান স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে জানাল।

মণিপ্রসাদের সঙ্গে প্রায় দিন পনেরো আমি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছিলুম। মোটামুটি হিসাব পাওয়া গেল, প্রায় তিনশ' নরনারী এই সুকেতগড় প্রতিষ্ঠানের কর্মী। পরলোকগত মহারাজা রঘুবীর সিংয়ের আমলে প্রায় চল্লিশখানা ছোট বড় এবং কাঁচা-পাকা বাড়ি এখানে অযত্নরক্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল, সেগুলি সংস্কার ক'রে কাজে লাগানো হয়েছে। মণিপ্রসাদ বলল, আমাদের হাতে রয়েছে প্রায় হাজার বিঘা জমি। আমরা আসবার পরে প্রায় পঞ্চাশখানা পাকা চালাঘর তৈরি হয়েছে।

একদিন হঠাৎ মহারাজা মাধবেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা কয়েকজন চায়ের আমন্ত্রণ পেলুম। বিকাল চারটের সময় তিনি গাড়ি পাঠাবেন। আমাদের অসুবিধা থাকলে পত্রবাহকের কাছে যেন জানিয়ে দিই।

বলা বাহুল্য, রাজারাজড়াকে আমরা যতই লোক-দেখানো গাল-মন্দ করি না কেন, তাঁদের আমন্ত্রণ পাবামাত্রই গৌরববোধের সঙ্গে গ্রহণ করি। মণিপ্রসাদ সবিনয়ে আমার সম্মতির অপেক্ষা করছিল, কিন্তু হেনা চাপা ও চোরা হাসি হাসছিল আমার দিকে চেয়ে। আমি তাকে রাগাবার জন্য বললুম, তোমার পোষাকপত্র বেশ মানানসই আছে ত?

হেনা হাসল। বলল, যদি না থাকে শালোয়ার পরেই যাব?

আমি শুধু হাসলুম, এবং মণিপ্রসাদকে বলে দিলুম, বেশত, আমরা চারটের সময় তৈরি থাকব। ওকে বলে দাও।

এ আমন্ত্রণটি আমাদের পক্ষে কিছু বৈচিত্র্য। আমরা মোট পাঁচজন। কেননা, কিষণকে রেখে হেনা যাবে না। কিষণ আমাদের সমপর্যায়ভুক্ত। আমি প্রতিবাদ জানিয়েছিলুম, কিন্তু হেনা কানে তোলেনি। হেনা বলে, এ জন্মের মতো কিষণ তার পূর্বজন্মেরও সন্তান। কিষণ তার সকল আনন্দের সঙ্গী।

মাইল তিনেক দূরে রাজবাড়ি। বাইরের চেহারাটা যথেষ্ট সম্ভ্রম এবং চমক উদ্রেক করে না। কিন্তু তার বিস্তার অনেক। সামনে মস্ত প্রাঙ্গণ। প্রথম দিকে সেরেস্তাবাড়ি। একটা মন্দির দেখছি কাছেই। আগে যেটাকে ঘোড়াশালা বলা চলত, এখন সেটি মোটর-গ্যারেজ। প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি একটি মস্ত লোহস্তম্ভ। চারদিকে লোকজনের সমারোহ। সামন্ত যুগের একটা ছাপ সর্বত্র সুস্পষ্ট।

জন দুই কর্মচারী এসে আমাদের নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ভিতরটা একটু যেন বুকচাপা। বাড়িটি অনেককালের, তবে ভিতরে কিছু আধুনিক সংস্কার আছে। আমাদের রেখে মণিপ্রসাদ ভিতরে চলে গেল, এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই যাঁকে নিয়ে সে বেরিয়ে এল, তিনিই মাধবেন্দ্র। আমরা নমস্কার বিনিময় করলুম, এবং তিনি প্রথমেই বললেন, আমার সৌভাগ্য যে, আপনারা এখানে 'পাঁওকা ধূলো' দিয়েছেন।

মহারাজা বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড়, গায়ের বর্ণ কালো, একটু স্থূলকায়,

—অনেকটা কুস্তিগীরের মতো। কলকাতার পথে এ'কে দেখলে ধনী মাড়োয়ারির দারোয়ান মনে করতুম। কিন্তু তাঁর মিষ্ট কথাবার্তা এবং আন্তরিক সৌজন্য এক মিনিটের মধ্যেই তাঁকে আমাদের নিকট-আত্মীয় ক'রে তুলল। আমি তাঁর কাছে নতুন, এবং আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যই প্রধানত তিনি আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, এটি তিনি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে প্রথমেই জানালেন। বললেন, আজ আমি তাঁর প্রধান অতিথি।

চায়ের মস্ত লম্বা টেবিলে এসে আমরা যখন বসলুম, সেই সময় অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন মহারাণী রম্ভা দেবী। বয়স তাঁর আন্দাজ বছর ত্রিশেক। পরিচ্ছন্ন সাধারণ সুশ্রী চেহারা এবং পরনে শাদামাটা একখানি সুতী শাড়ি। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালুম, এবং তিনি প্রথম কথাতেই বললেন, এদেশে আপনারা এসে তবু কথা বলার লোক পেয়েছি! আমাদের ইচ্ছে, আপনাদের সঙ্গে রোজ রোজ দেখা হয়।

মহারাণী এগিয়ে এসে হেনা ও শিবন্তীর পাশে বসলেন। হেনা আমার দিকে ফিরে বলল, আমাদের নানা কাজে রম্ভাদিকে অনেক খাটিয়েছি। আমার সঙ্গে উনি চাষীমহলে ঘুরেছেন অনেক। টাকাও খরচ করেছেন যথেষ্ট।

মহারাণী বললেন, বাঃ আমরা না হয় সামান্য টাকাই খরচ করেছি, কিন্তু তুমি যে তোমার জীবন ও টাকা দুই খরচ করেছ?

মহারাজা আমার দিকে ফিরে বললেন, একথা একটুও মিথ্যে নয়, মিষ্টার চৌধুরী। সুকতগড়ের সৌভাগ্য, উনি এখানে এসেছেন! কি বল, মণিপ্রসাদ?

হেনা এবার রাগ করল। বলল, মহারাজা, এবার থামবেন কি? পারস্পরিক সুখ্যাতি আর কতক্ষণ চলবে?

আমরা সবাই হাসছিলুম। মণিপ্রসাদ বলল, মুখের সামনে বসে সুখ্যাতি শোনা দিদির দুচোখের বিষ।

শিবন্তী হাসিমুখে বলল, আমরা অনেকবার ধমক খেয়ে চুপ ক'রে গেছি। আর কিছু বলিনে।

চা মানে শুধু চা নয়। শেউ ছিল, প্যাঁড়া এবং পনীরের সামগ্রী ছিল, ছিল প্রচুর আপেল আঙুর এবং অন্যান্য মেওয়া। এক দুনুর গরম গরম 'সামোসা' এবং বালুসাই ও কচৌড়ি এল। রম্ভা দেবী উঠে পরিবেশন করলেন।

মহারাজা ও রম্ভা দেবী কিষণের সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান চেহারাটির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিষণের পোষাকপত্র আজ বেশ পরিপাটি। ধোপদস্ত প্যাণ্ট এবং রেশমি হাওয়াই শার্টে তাকে বেশ মানিয়েছে। সম্ভবত তার মাতাজি এখানে আসবার আগে তাকে তালিম দিয়ে এনেছে। কিষণ একটু কুণ্ঠাজড়িত হয়ে বসেছিল। আমি ভাবছিলুম সেই গড়মুক্তেশ্বরের মেলায় ক্যাম্পের দোকানে রুটিওয়ালা কিষণের কথা! আজ কিষণকে আর চিনতে পারা যাচ্ছে না।

রম্ভা দেবী বললেন, অচ্ছা বেশ, সুখ্যাতি শুনলে হেনাদিদি রাগ করেন, এবার তবে একটু নিন্দার কথা বলি। আমাদের বাড়িতে 'হেনাবেন' বিপ্লব এনেছেন। আমি পুরনো কালের গয়না পরতুম, আর আমার স্বামী জরিবাঁধা পাগড়ি আর মখমলের পোষাক পরতেন। হাতীর হাওদায় আমাদের যেতে হত—। আমাদের এখানে দরবার বসত, প্রজারা নজরানা আনত,—হেনাবেন শুধু ঠাট্টা-তামাশা ক'রে এগুলির চলন তুলে দিলেন।

হেনা বলল, এতে আপনাদের খরচ কত বাঁচল?

মিথ্যে নয়, খরচ অনেক বাঁচল। 'লেকিন আদৎ' তাড়ানো কি সোজা কথা? 'পুরাণে মেওয়াজের' কাছে মানুষ ক্রীতদাস!

মাধবেন্দ্র বললেন, রাজত্ব গিয়ে আমরা বেঁচেছি! ঝঞ্ঝাট গিয়েছে, বদনাম গিয়েছে। আমরা মুক্তি পেয়েছি। আগের চেয়ে এখন আমরা অনেক শান্তিতে আছি!

জলযোগের শেষ পর্বে পুরি, ভাজি এবং মালাই রাবড়ি। হেনা এবার হাসল। বলল, মহারাজা, এবার যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?

কেন, কেন? আপনি কিছু মন্তব্য করলেই আমি ভয় পাই!

হেনা বলল, নয়ত কি? আপনাদের অভ্যাস হাতীকে খাওয়ান—সেই ওজনে আমাদের খাওয়াচ্ছেন! এসব কি হবে বলুন ত?

রম্ভা দেবী বললেন, না না, জবরদস্তি নেই। 'চওদ্রি সাবকো' যেষনা মর্জি'!

আমি হাসলুম, বললুম, আমার মর্জিরও শেষ আছে!

ঠোঁট উলটিয়ে মহারাজা বললেন, কি জানেন মিষ্টার চৌধুরী,—আগাগোড়া
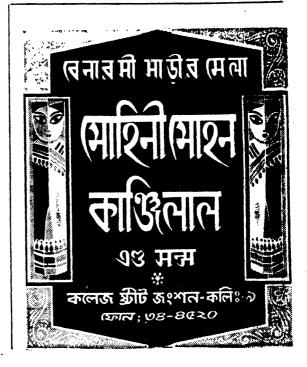
সব পুরনো অভ্যেস! সম্পদের দম্ভকে প্রকাশ করা, নিজের অহংকারকে জানানো, আত্মাভিমানের প্রতিষ্ঠা,—এক-দিনে এক যুগে এসব ভূত ছাড়ানো যায় না। আমরা জানি এত আপনারা খাবেন না,—কিন্তু না দিলেই যে চলবে না! অতীতের তাড়না যে আছে এই দেওয়ার মধ্যে। এ যে দিতেই হবে! এইটিই যে চ'লে এসেছে।

হেনা বলল, সেই অসংযত কুস্বভাব অতীতের হাতেই যদি মার খেতে হয় তাহলে এ যুগে জন্মালেন কেন? ভয় পান কেন মাথা তুলতে?

মহারাজা হাসলেন। শুধু বললেন, সময়সাপেক্ষ, হেনাবেন। নিজে কিছু করব, উপায় নেই। বিশেষ ছাঁচে আমরা তৈরি। আপনাদের মতন স্বাধীন আমরা আজও হইনি, হেনাদিদি।

মহারাজার কথাগুলি আমার ভাল লাগছিল। তিনি পুনরায় বললেন, আমি একালের লোক বটে, কিন্তু আমার পিঠে বোঝা অনেক। মণিপ্রসাদ জানে, মহারাজা উপাধির দায়িত্ব কেন ঘাড়ে তুলেছি। কিন্তু আপনাদের কোনও বোঝা নেই, আপনারা নতুন যুগের মানুষ। ভরসা আছে, একদিন আপনারাই আমাদের টেনে তুলবেন! সেই দিন গুনছি!

চায়ের শেষ দিকে মাধবেন্দ্র বললেন, বলতে সাহস পাইনে, মিস্টার চৌধুরী। কিন্তু আমাদের এখানে নিঃস্বার্থ মনের মানুষ পাইনে। যদি আপনার সম্মতি থাকে, তাহলে আমি নিজেও আপনাদের ওখানে যেতে পারি গল্প-গুজব করার জন্য। আর যদি বলেন, আমি গাড়িও পাঠাতে পারি।

আমি হাসলুম। পরে হেনার দিকে একবার ফিরে বললুম, বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা হলে আপনার পরিষদ্ মহলে আমার সম্বন্ধে নানা কথা উঠতে পারে, রাজাসাহেব।

বুদ্ধিমান মাধবেন্দ্র পলকের মধ্যেই আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছিলেন। এবার বললেন, বেশ, আমার প্রাণের তাড়া থাকলে নিজেই আপনাকে খুঁজে নেব।

মাধবেন্দ্র এবং রত্না দেবী দুজনেই বাইরে এসে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন। শিবন্তী এবং মণিপ্রসাদ দুজনে রয়ে গেল রাজবাড়িতে। ওরা রাত্রে ফিরে যাবে। ড্রাইভারের পাশে উঠে হাসিখুশী মুখে কিষণ বসল।

পথের কিছুদূর পর্যন্ত আলো, তার-পর অন্ধকার। এই পথটি পশ্চিমে ঝাঁসীর দিকে চলে গেছে, এবং এরই একটি কোন্ শাখা গিয়েছে সোজা দক্ষিণে বিদিশার দিকে। আমরা পূব-দিকে যাচ্ছিলুম। গাড়ির মধ্যে হেনার একখানা হাত আমার হাতের উপর স্থির হয়ে ছিল। পথ মাত্র তিন মাইল। অন্ধ-কারে আসতে আসতেই এক সময় সুকেতগড়ের আলো দেখা গেল। আমাদের ওয়াটার টাওয়ারের ওপর আলো জ্বলছে, আরেকটি জ্বলছে ডাই-নামোর ঘরে। চামড়ার কারখানায় কাজ চলছে। মেয়েদের কারিগরি বিদ্যার কেন্দ্রে সন্ধ্যার পরে আলো জ্বলেছে; মাখন তৈরির কারখানায় লোকেরা কাজ করছে তখনও। আমাদের গাড়ি সেই কলা-বাগানটার পাশ কাটিয়ে খামার ছাড়িয়ে এসে আমাদের বাংলার সামনে থামল। আমরা নেমে যাবার পর ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল।

বারান্দায় আলো জেলে হেনার মারাঠি পরিচারিকা অপেক্ষা করছিল। এবার সে ভিতরে ঢুকে আলো জেলে জিজ্ঞেস করল, রান্না হবে ত মা?

হেনা বলল, রান্না আমিই ক'রে নেব। কিষণ আছে, জোগাড় দেবে।

আচ্ছা, আমি জল তুলে রেখে গেলুম।—এবার কি আমি বাসায় যাব না?

হেনা বলল, হ্যাঁ, যেতে পার।

কিষণের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখলুম, ছেলেটা অভ্যাসমতো বই খাতা নিয়ে বসেছে। হেনা ওর মাথার মধ্যে কিছুকাল থেকে এ কথা ঢুকিয়েছে, লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হয় না! ফলে, ছেলেটা এখানে এসেই ইস্কুল যেতে আরম্ভ করেছে। ওর মনোযোগ একেবারে অখণ্ড। আড়াল থেকে সকৌতুকে যখন কিষণের বিদ্যাভ্যাসের চেহারাটা লক্ষ্য করছিলুম, তখন পিছন থেকে হেনা আমার হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে এল। ঘর অন্ধকার, আলোটা সেই নিবিয়ে দিয়েছে!

দুহাতে আমাকে ধরে হেনা বলল, সমস্ত আকাশ ঘুরে পাখি এসে বাসা খুঁজে নেয়, এ কি তুমি ভুলে গেছ পার্থ?

একটুখানি চুপ ক'রে রইলুম। পরে বললুম, আমার মনের কথাই তুমি বলছ মনে হচ্ছে।

সে-বাসা আমার কই?—হেনা মুখ তুলল।

তুমি ত' এখনো ক্লান্ত হওনি! তোমার পাখার শক্তি অনেক।

হেনা মৃদুকণ্ঠে বলল, অনেক, কিন্তু অফুরন্ত নয়। এক মাস ধরে তোমার দুই চোখ বাইরের দিকেই ছড়িয়ে রয়েছে। কই, সেই চোখ ত' ঘরে ঢোকেনি!

আমার গলা বোধ হয় একটু কাঁপল। বললুম, ঘরে তুমি নেই, হেনা। বাইরেই তুমি ছড়ানো। বাইরে গিয়ে ঘুরলেই তোমাকে পাই। ঘরের মধ্যে তুমি প্রাণহীন মাংসপিণ্ড!

কান পেতে কি শুনেছ, আমার প্রাণ নেই?

আমি চুপ ক'রে রইলুম। হেনা পুনরায় বলল, তুমি যতদিন ছিলে না, ততদিন সাংঘাতিক প্রাণশক্তির খেলা খেলেছি। কিন্তু তোমাকে দেখলে অপরি-সীম ক্লান্তি কেন আসে, বলতে পার? মনে হয় তোমার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে প'ড়ে থাকি।

বললুম, ক্লান্তি এলে চলবে না, তোমার অনেক কাজ। সারাজীবনের অফুরন্ত দায়িত্ব। পালাবার কোনও পথ নেই। আমার কথা বলছ? আমি যদি তোমাকে শক্তি জোগাতে না পারি—!

চুপ করো পার্থ,—হেনা বলল, আজ একথা নয়। কাঁদিয়েছ তুমি অনেক, দুঃখ দিয়েছ তার চেয়েও বেশি। আজ আমাকে আবার নতুন করে বল, তোমার মন কি কোনও মতেই পাওয়া যায় না? তুমি কি চিরদিন ভালবাসার নামে আঘাত ক'রেই কাঁদাবে? বলতে পার কেমন করে তোমার মনের নাগাল পাই? তোমাকে কি কোন-মতেই খুশী করা যায় না? আমি কি শুধু জলের ওপর দাগ টানবার চেষ্টা করলুম এতকাল?

হেনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। অন্ধকারে অনুভব করলুম, তার চোখে জল এসেছে। কিন্তু আমি তার এই ভাবাবেগের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। একটু আড়ষ্টভাবে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালুম। তারপর তার হাত ধরে টেনে নিয়ে বললুম, সব ছেড়ে দিয়ে যার কাছে এসে চিরদিনের জন্য বাসা বাঁধলুম, তার মুখে আজ এসব বিতর্কের কথা

কেন? এসো,—আজ সমস্ত রাত জেগে তুমি গান শোনাবে। তুমি আর আমি।

মণিপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে মাঝখানে দিল্লী গিয়েছিল্ম, এবং আমাদের যাবার পিছনে একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল।

সমস্ত আকাশ ঘুরে পাখি এসে বাসা খ্ঁজে নেয়, একি তুমি ভুলে গেছ পার্থ?

আমার অনুরোধে মাধবেন্দ্র সিং দিল্লীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দুন দুই জরুরী পত্র লেখেন। প্রথম পত্রে সুকেতগড়ের সুদীর্ঘ বর্ণনা ছিল। তার পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি, পুনর্গঠন, পরিনির্মাণ, এবং ক্রমোন্নয়নের বিস্তৃত বিবরণ এতে দেওয়া হয়। এই পত্রে হেনার উল্লেখ ছিল। একটি বাঙালী মেয়ে কেবলমাত্র তার ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায় এবং স্বার্থত্যাগের গুণে কেমন করে একটি বৃহৎ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে সমর্থ হয়, এর ইতিহাসও মহারাজা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই লেখেন, সমবায় নীতির এমন সাফল্য সমগ্র বিন্ধ্যপ্রদেশে আর দ্বিতীয় নেই!—প্রথম পত্রের যে জবাবটি আসে সেটি উৎসাহজনক। অতঃপর দ্বিতীয় পত্রে মহারাজা দিল্লীর বিশেষ দপ্তরকে আমন্ত্রণ জানান। তার ফলে মাস দুই আগে দিল্লীর একজন উপমন্ত্রীসহ চারজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তদন্তের জন্য আসেন এবং প্রায় এক সপ্তাহের জন্য মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ'দের মধ্যে দুজনের সঙ্গে আমি আমার কর্ম-সূত্রে বিশেষভাবে পরিচিত, এবং তাঁরা যখন দেখলেন আমি এক বছরের ছুটি নিয়ে এখানকার কাজে আত্মনিয়োগ করেছি,—তাঁরা সেটি তারিফ করলেন। অতিথিবৎসল মহারাজা অভ্যাগত সকলের জন্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং একটি শিকার পার্টির আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করেছিলেন। সরকারী কমিশন সুকেতগড়ের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে নানাবিধ কর্মসূচীর সাফল্য লক্ষ্য ক'রে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। মহারাজাকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন তাঁরা আমাদের বাংলায় এসে উপস্থিত হলেন, সেদিন হেনার মতো একটি সাধারণ ও সামান্য মেয়েকে দেখে তাঁদের পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কঠিন হল যে, এই মেয়ে এখানকার মধ্যমণি! হেনা তখন তার উনুনে আলু-চচ্চড়ি রাঁধতে বসেছিল, এবং সেই অবস্থায় আঁচলে হাত মুছে এসে দাঁড়িয়ে ও'দের মুখ থেকে সুখ্যাতি শুনল।

দিল্লী ফিরে গিয়ে তাঁরা উত্তম রিপোর্ট দিয়েছিলেন, এবং সেই সূত্রেই মণিপ্রসাদ ও আমি সেখানে গিয়ে তিন সপ্তাহকাল কাটিয়ে সম্প্রতি ফিরে এসেছি।

আমি এবং মণিপ্রসাদ যখন আমাদের দপ্তরে কাজকর্ম এবং আলাপ-আলোচনা নিয়ে একদিন দুপুরে ব্যস্ত, সেই সময় বাইরে মহারাজার গাড়িখানা এসে থামল এবং মহারাজার আগে আগে অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে হেনা উঠে এসে ঘরে ঢুকল। মাধবেন্দ্র হাসছিলেন।

আমরা খাতির ক'রে তাঁকে বসাবার আগেই হেনা বলে উঠল, এসব তোমরা কি করেছ, পার্থ? এই যে দিল্লীর চিঠি—!

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল্ম। মহারাজা বললেন, চিঠি পেয়েই আপনাদের ওখানে গিয়েছি, কিন্তু হেনাদিদি চিঠি দেখেই—ব্যস, উনকো দেমাক খারাপ হো গৈ!

হেনা চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বলল, গভর্ণমেণ্ট এত টাকা মঞ্জুর করেছেন, কিন্তু টাকা কি আমরা চেয়েছিল্ম? তোমরা বোধ হয় এইজন্যেই দিল্লী গিয়েছিলে? তোমাদের সঙ্গে যে ভিক্ষের

ঝুলি ছিল এটি জানতাম না। এ টাকায় কোনও সম্মান নেই, পার্থ।

বললুম, তোমার **রাগের কারণটা একটু দুর্বোধ্য ঠেকছে,** হেনা **দেবী: আমাদের অন্যায়টা ঠিক** বুঝতে **পারছিনে।**

আমরা কি টাকার লোভে এতদিন **কাজ করছি? —হেনা প্রশ্ন করল।**

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম, গভর্ণমেণ্ট কি তোমার লোভকে খুশী করার জন্য টাকা দিচ্ছেন?

মণিপ্রসাদ আমার দিকে চেয়ে বোধ হয় একটু আড়ষ্ট হয়েছিল। সে বলল, দাদাজি, আপনি বসুন—

হেনা একটু থমকিয়ে গিয়েছিল। এবার একটু নরম কণ্ঠে সে বলল, তুমি কি বলতে চাও, ফেরৎ পাবার জন্য **আমরা এখানে টাকা খরচ করেছিলুম?**

আমি বললুম, তুমি যথাসর্বস্ব **বিলিয়ে দাও, কেউ তোমাকে মানা করছে না।** কিন্তু **গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করছেন প্রতিষ্ঠানকে।** তোমাকেও নয়, মহা-**রাজাকেও নয়!**

হেনা বলল, আমার কানপুরের অভিজ্ঞতা কি তোমাদের মনে নেই? সেখানে স্বাধীন কর্মপন্থার কতটুকু জায়গা ছিল?

সেটা **সরকারি** প্রতিষ্ঠান, এটা **বেসরকারি!**

কিন্তু টাকা দিলেই গভর্ণমেণ্টের **একটা দখল জন্মায়, তা জান?**

আমি **হাসলুম। বললুম,** গভর্ণমেণ্ট **তোমার হাত থেকে কেড়ে** নিতে **আসছেন না, বন্ধুর মতন সাহায্য করতে আসছেন! একটা কথা মনে রাখা দরকার** হেনা, এ **প্রতিষ্ঠান** তোমার আমার **বা** মহারাজার—**কারও নয়।** যেটা গড়ে উঠেছে, **সেটা সাধারণের।** আমরা অছি মাত্র। এখানকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

অসীম নৈরাশ্য নিয়ে হেনা একখানা চেয়ারে বসল। **তারপর শুষ্ক ও** নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল, **ক্ষমা কর পার্থ,** মিলছে না আমার সঙ্গে। **এ আমি** ভাবিনি, এর জন্যে **প্রস্তুত ছিলুম না!**

মহারাজা **এতক্ষণ পরে** এবার বললেন, আপনার **আদর্শের** সঙ্গে আমাদের **বিরোধ** নেই, বহিনজি। সরকারেরও **কাম্য,** এ প্রতিষ্ঠান আরও বড় হোক।

কপালের **উপর** থেকে চুলের ঝলক সরিয়ে হেনা বলল, প্রতিষ্ঠান হয়ত বড় হল রাজাসাহেব, কিন্তু মানুষের এককের কীর্তি বোধ হয় আজ থেকে ছোট হয়ে গেল! **শক্তির** প্রকৃত পরিচয় মহৎ সৃষ্টিতে,—সে হাত পেতে ভিক্ষে করে না।

হেনার মুখে চোখে একটা যন্ত্রণা লক্ষ্য **করছিলুম।** এবার বললুম, রাজা-সাহেব **তোমার** কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারেননি, হেনা।

হেনা **বলল,** দুঃখ রইল আমিই বোঝাতে **পারলুম** না! আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, ব্যক্তির অধ্যবসায়, আদর্শ, স্বার্থত্যাগ, মহত্ত্ব, প্রতিভা এরা বড় হোক,—তা হল না। আজ গভর্ণমেণ্টের টাকা এল—মানে, আমাদের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তার আশঙ্কা, প্রতি-দিনের সংগ্রাম, প্রতিক্ষণের উদ্দীপনা—এরা জুড়িয়ে গেল! আমাদের উদ্দীপনা আজ থেকে পঙ্গু হল।

বললুম, জনতার সম্মিলিত কীর্তির ওপর কি তোমার শ্রদ্ধা নেই? বহু মানুষের জয়যাত্রায় কি তুমি বিশ্বাস কর না?

হেনা **উঠে দাঁড়াল। বলল,** করি, **একশ'বার করি।** কিন্তু **এই ক্ষেত্রটা** ছিল অন্য **রকম। এই কামনা করি** রাজাসাহেব, **আপনার প্রভাব প্রতিপত্তির** জোরে আরও **পাঁচটা প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে উঠুক, দেশের** উন্নতি হোক। **কিন্তু আমি ভেবেছিলুম,** নিরাসক্ত **মানুষের তপস্যার জায়গা** এখানে **আছে, এখানে হবে তার আত্মিক শক্তির প্রকাশ।** প্রতি **মানুষের অন্ত-**র্নিহিত সত্তার **স্বচ্ছন্দ** অভিব্যক্তি এখানে বড় হবে। **এমন একটি প্রতিষ্ঠান** চেয়ে-ছিলুম, যেখানে **মানুষের সত্য মূল্য** জেনে নিতে পারব!

আমি বললুম, তুমি কি এটা চাও না যে, এদিককার দরিদ্র **জনসাধারণ** সুখে, সাচ্ছল্যে, প্রাচুর্যে এবং **সম্পদ-সমৃদ্ধিতে** থাকুক?

হেনা আমার দিকে ফিরল। বলল, তুমি আমাকে **উত্তেজিত** করার চেষ্টা পাচ্ছ, পার্থ। **যন্ত্র বড় হোক,** কাজ বড় হোক, তোমাদের বিরাট **নির্মাণকলা** বড় **হোক—আপত্তি** নেই। **সকল** দেশকর্মে **গভর্ণমেণ্ট** এগিয়ে **আসুক,**—সেটিও **কাম্য! কিন্তু** আমরা **যে** অসাড়ের মধ্যে সাড়া **জাগাতে** এসে**ছিলুম!** মানুষ খুঁজতে **বেরিয়েছিলুম!** দেখতে এসে-ছিলুম, **মহৎ সৃষ্টির** নতুন **মন্ত্র** কোথায় উচ্চারিত **হচ্ছে,** মৌল কল্পনার জন্ম হচ্ছে কোথায়, কোথায় বসেছে মানুষ নতুন তপস্যা নিয়ে! **শেষ** পর্যন্ত মেসিনের চাকার তলায় চাপা প'ড়ে গেলুম?

আমার কিছু **বলবার** আগেই হেনা আপনা হতেই **উত্তেজিত হয়ে উঠল,—** ভাত কাপড়ের **প্রতিষ্ঠানই যদি** গড়ে তুলবে তাহলে তুমি **দিল্লী গিয়ে** মাথা ঠুকলেই ত' **পারতে? কী দরকার** ছিল **বুন্দেলখণ্ডের পাহাড়তলীতে** এসে নিরিবিলি জায়গা **খুঁজে বার** করা? আমরা এখানে **নিশ্চয় মানুষকে** মোটা-সোটা ভেড়া-**ছাগল বানাবার** জন্য আসিনি!

মণিপ্রসাদ নীরব, **মহারাজা হতবাক।** আমি বললুম, মূলে **প্রশ্ন নিয়ে যেখানে** বিরোধ, সেখানে কাজ করা অসুবিধা! কর্মনীতির পরিবর্তন অসম্ভব, কেননা এ প্রতিষ্ঠান এখন উন্নতির পথে চলেছে। একে আর থামানো চলবে না। যতই দিন যাবে ততই এর উন্নতির গতি দ্রুততর হবে। যদি এর সঙ্গে কারও বনিবনা না হয়, তাকেই স'রে যেতে হবে!

মাধবেন্দ্র মুখ তুলে একবার আমার দিকে **তাকালেন। তারপর বললেন, এ** রকম অপ্রিয় পরিস্থিতি **দাঁড়াতে পারে** আগে **ভাবিনি। আমাদের সৌভাগ্য,**

একদিন আপনারা এসে আমাদের এখানে এত বড় একটা কাজ গ'ড়ে তুলেছেন। আমাকে আপনারা যা কিছু করতে বলেছেন আমি করেছি। আমার বিশেষ অনুরোধ, এ প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিই আপনারা ভাববেন। আপনারা যদি স্থির করেন, আপাতত দিল্লীর হাত থেকে টাকা না নিলেও চলবে, তাহলে সে কথা আমি অবশ্য তাঁদেরকে জানাতে পারি।

সে হয় না রাজাসাহেব,—আমি বললুম,—সেখানে আমাদের সম্মানের প্রশ্ন আছে। মণিপ্রসাদ আর আমি তিন সপ্তাহ দিল্লীতে সরকারি মহলে ঘুরে যে-ব্যবস্থা করেছি, তাকে নাকচ করা আর এখন সম্ভব নয়। সেখানে আপনিও খেলো হয়ে যাবেন! টাকা আমাদের নিতেই হবে। আমরা খেলা করতে বসিনি!

হেনা এবার বলল, আমাকে এখানে প্রধান পরামর্শদাতার পদে বসানো হয়েছে, অথচ টাকা চাইবার আগে একবারও কি আমাকে আপনারা জিজ্ঞেস করেছিলেন? একটু আশ্চর্য হচ্ছি বৈকি—

মণিপ্রসাদ এবার দুর্বল কণ্ঠে বলল, টাকা আমরা ঠিক হাত পেতে চাইনি, দিদি!

আমি বললুম, একজনের সম্মতি-অসম্মতির ওপর সংকেতগড়ের ভাল মন্দ নির্ভর করে না। তোমাকে জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করিনি, কেননা এটা আমরাই স্থির করেছি। তাছাড়া আমাকে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা করা হয়েছে! বিনা বেতনে শুধু আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে এখানে কাজ করি। স্বার্থ আমার কিছু নেই। এই সব কারণে একথা আমার মনে হয়নি যে, পরামর্শ-দাতা আমাকে কুপরামর্শ দেবেন! তিনি যে সরকারি টাকার ওপর ক্ষিপ্ত, এ আমি জানতুম না!

তুমি কি জানতে না যে, কানপুরে আমিও বিনা বেতনে চাকরি করতুম?—হেনা প্রশ্ন করল।

আমি হাসলুম। বললুম, সেখানে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তোমার ওপর ছিল না। এখানে ভিন্ন কথা। আদর্শের কথা রাখ, বাস্তব হিসাব-বুদ্ধিতে এস। থিয়োরি শুনেছি অনেক, এবার প্র্যাকটিসে নামো। দুঃখী মানুষকে ডাক দিয়ে আনা হয়েছে, আগে তাদের সংস্থান করো। আগে জীবনকে গ'ড়ে তোলা হোক, পরে ভাবা যাবে আদর্শের চুলচেরা বিচার! এখানে তুমি নিজের তহবিল থেকে অনেক টাকা ঢেলেছ হেনা, কিন্তু সে হল মুষ্টিভিক্ষা মাত্র!

হেনা বলল, ভিক্ষে আমি দিইনি, আমি দান করেছি!

দান মানেই দয়া,—আমি বললুম, এ প্রতিষ্ঠান থেকে তোমার দয়া যদি এবার ফিরিয়ে নিতে চাও, কেউ আপত্তি করবে না, হেনা। দেখতে পাচ্ছ গভর্ণমেণ্টের সুবিবেচনার সঙ্গে তোমার আত্মাভিমানের সংঘর্ষ লেগেছে। তুমি চেয়েছিলে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মানুষ বড় হোক, আমরা চাই এর বিপরীত। তুমি চেয়েছিলে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা আর প্রাধান্য। কিন্তু আমরা ওটায় ভয় পাই। ব্যক্তি বড় হলেই প্রভুত্বের লোভ তাকে পেয়ে বসে। তখনই সর্বনাশ। তখনই দেখা যায় ওর থেকেই একনায়কত্বের জন্ম! আমার মনে হয়, এবার তুমি বিশ্রাম নাও, হেনা—স্পষ্টতই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম।

হেনা জানলার ধারে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার পরিচ্ছন্ন ইংরেজি ভাষায় পুনরায় বলল, সেই ভাল রাজাসাহেব, আমি ছুটিই নেবো। একদিন বিশেষ আদর্শের তাড়নায় সব ছেড়ে চলে এসেছিলুম, সেটাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বস্বান্ত হতে চাইনে! আপনাদের কাছে আজ আমি বিদায় নিচ্ছি! প্রতিদিন পায়ের তলায় কাঁটা ফুটবে, সংশয় আর অশ্রদ্ধা নিয়ে প্রতিদিন কাজ করব, প্রতিদিন আমাকে ভাবতে হবে আমার সঙ্গে এর কোথাও মিল ঘটছে না,—তার চেয়ে এর থেকে আমি মুক্তি চাই! আমাকে ছুটি দিন আপনারা—।

মাধবেন্দ্র বললেন, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠান আপনারই সৃষ্টি, হেনাদিদি। আপনাদের কর্তাদিনের পরিশ্রম, উপবাস, হায়রানি, ছুটোছুটি, রাতজাগা, উদ্বেগ-অশান্তি—এর পেছনে আছে, আমরা কেউ ভুলিনি। আজ আপনি সরে গেলে সকলের পক্ষেই বেদনাদায়ক হবে। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা সবাই মিলে বসে আরেকবার আগাগোড়া সমস্তটা বিচার ক'রে দেখুন।—রাজাসাহেব এবার উঠলেন।

হেনা এক ঝলক শুধু হাসল। বলল, মন যেখানে মেলাতে পারব না, সেখানে বন্ধন কোন মতেই সইবে না, রাজাসাহেব! আচ্ছা নমস্কার—

রাজাসাহেবের আগেই হেনা বেরিয়ে চলে গেল।

(ক্রমশ)

ফ্রিডম রাইডারস্

মনকুমার সেন

সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রো জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মানবেতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোজনা করেছে। কৃষ্ণবর্ণের 'অপরাধে' লাঞ্ছিত ও অপমানিত নিগ্রো নরনারী গান্ধীজী-প্রদর্শিত অহিংস সত্যাগ্রহের পথে তাঁদের মৌলিক অধিকার, আমেরিকার সংবিধানে এবং জাতি সংঘের সনদে স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার অর্জনের জন্য বছরের পর বছর যে সংগ্রাম করে চলেছে আর এক বর্ণ-বিদ্বেষী শ্বেতবর্ণাভিমানী রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত কৃষ্ণকায়দের সংগ্রামের সঙ্গেই শুধু তার তুলনা চলে। এক হিসাবে নিগ্রো জাতির সংগ্রাম দুরূহতর; কেননা, স্বাধীন দুনিয়ার মধ্যমণিরূপে আমেরিকার পেছনে পৃথিবীর কোন কোন মানুষের যে নৈতিক সমর্থন রয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তা' থেকে বঞ্চিত। আর এই সমর্থন প্রকারান্তরে বর্ণবৈষম্য-বিরোধী সংগ্রামকে প্রত্যাশিত ব্যাপকতার স্তরে উঠতে বাধাও দিচ্ছে। এই কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী বিভেদমূলক ব্যবস্থা সচেতন মানব সভ্যতার প্রায় সর্বত্র তীব্রভাবে ধিক্কৃত,—আর দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যসরকারগুলোর চূড়ান্ত বর্ণবৈষম্য ও নিগ্রো-নিপীড়ন আজও বিশ্বসভায় তদ্রূপ ধিক্কার থেকে অব্যাহতি পেয়ে এসেছে। সত্য বটে, পূর্বের তুলনায় আজকের আমেরিকায় কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদের সমানাধিকার কিছু পরিমাণে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু আমেরিকারই দক্ষিণাঞ্চলে রাজ্য-শাসকদের দাম্ভিক ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের ঔদ্ধত্য থেকে একথা মেনে নেবার উপায় নেই যে এইরূপে কালজীর্ণ ও মানবতা-বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে স্বাধীন আমেরিকার জনগণ আশানুরূপ সচেতন। আমেরিকার ফেডারেল গভর্ণমেন্ট বা কেন্দ্রীয় সরকারের আইনে যে অধিকার স্বীকৃত, তাকে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের গভর্ণর যেভাবে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে চলেছেন প্রচ্ছন্ন জনসমর্থন ছাড়া তা একদিনও টিঁকতে পারত কিনা সন্দেহ।

নিগ্রো জাতির সংগ্রামের অধুনাতম পর্যায় 'ফ্রিডম রাইডিং': যে-সব সরকারী বাসে কৃষ্ণবর্ণদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ, তাতে চড়ে দলে দলে নিগ্রো নরনারী দক্ষিণ আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। গত মে মাসের শুরুতে অভিযাত্রীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এই নবরূপ দেশে দেশে প্রবল আগ্রহ ও নবজাগরণের সৃষ্টি করেছে। সকলেই জানেন রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) এই জাগ্রত নিগ্রো জাতির অবিসম্বাদিত নেতা, যাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার নিগ্রো নরনারী মাসের পর মাস বাস-বয়কট করে দীর্ঘপথ হেঁটে কর্মস্থলে যাতায়াত করেছিল এবং এই অশেষ ক্লেশের শেষে তাঁদের দাবীও বহুলাংশে মেনে নিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী অধ্যায়ও কম রোমাঞ্চকর নয়: এই অধ্যায়ে 'অবস্থান-সত্যাগ্রহ' পরিচালিত হয় সেইসব রেস্তোঁরা ও ভোজনালয়ে যেগুলোর দ্বার কৃষ্ণবর্ণদের নিকট ছিল রুদ্ধ। সংগ্রামের এই অধ্যায়ও প্রভূত সাফল্যের স্বাক্ষরে ঐতিহাসিক হয়ে রয়েছে। বর্তমানে চলেছে সরকারী বাসে নিগ্রো যাত্রীদের স্বাধীনযাত্রা। লক্ষ্য করবার বিষয়, সংগ্রামের এক একটি অধ্যায় শুরু হচ্ছে, আর অধিক হতে অধিকতর সংখ্যায় শ্বেতাঙ্গ মানবতাবাদী মানুষও সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে এই আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, ফেডারেল সরকার তো বটেই, দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্য-শাসকগণও 'দেয়ালের লিখন' কিছু কিছু পড়তে পারছেন, তাই তাঁদের ক্রুদ্ধ ও হিংসাত্মক প্রতিরোধের কঠোরতাও একটু একটু করে শিথিল হচ্ছে।

৪ঠা মে 'ফ্রিডম রাইডার্স'-দের বাসে-অভিযান শুরু হয় ওয়াশিংটন থেকে। এর উদ্যোক্তা জাতিসাম্য কংগ্রেস—'কংগ্রেস ফর রেসিয়্যাল ইকুয়্যালিটি',—সংক্ষেপে 'কোর্'। কোরের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীও রয়েছেন এই স্বাধীন-যাত্রায়। আমেরিকার অন্য যে-কোন নাগরিকের তুল্য অধিকার ও মর্যাদা অর্জনে বদ্ধপরিকর হয়ে অভিযাত্রীগণ সরকারী

বাসে চড়লেন বর্ণবৈষম্যমূলক নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে। দক্ষিণের প্রত্যন্ত প্রদেশ নিউ অরলিন্‌স্‌ তাঁদের গন্তব্যস্থল। বাসযাত্রার আশেপাশের প্রায় সব বসতিই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণবর্ণবিদ্বেষী, তাই যাত্রীদের ভাগ্যে বিড়ম্বনার অন্ত ছিল না। তবু তাঁরা অগ্রসর হলেন এবং ৭ই মে দের্নাভিল-এর এক শ্বেতাঙ্গ ভোজন-শালায় দলবেঁধে ভোজনপর্ব সমাধা করতেও তাঁরা সক্ষম হলেন। পরের দিন যাত্রীদের একজনকে গ্রেপ্তার করা হল চার্লোট-এ ; তাঁর অপরাধ, শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় গিয়ে তিনি তাঁর জুতো পালিশ করাতে চেষ্টা করেন এবং ঐ স্থান ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। ৯ই মে রকহিলের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ ও অবস্থানের 'অপরাধে' শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা নির্মম অত্যাচার করল দুজন অভিযাত্রীর ওপর। একই 'অপরাধে' ১০ই মে উইন্‌স্‌বরোতে গ্রেপ্তার করা হল আরো দুজন অভিযাত্রীকে। কিন্তু অভি-যানের কঠিনতম মুহূর্ত দেখা দিল আলাবামা রাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। এ অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গের বর্ণ-অহংকার এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গের সংহত সত্যাগ্রহীশক্তি সমান দৃঢ়তার সঙ্গে মুখোমুখি দণ্ডায়মান। ১৪ই মে এ্যানিসটনে ক্ষিপ্ত শ্বেতাঙ্গ জনতা শান্তিকামী যাত্রীদলের একটি বাস পুড়িয়ে দিল, আর বার্মিংহামে উন্মত্ত জনতার আক্রমণে গুরুতররূপে আহত হলেন আরো কয়েকজন অভিযাত্রী।

২০শে মে ফ্রিডম রাইডার্সগণ পৌঁছুলেন আলাবামার রাজধানী মন্ট-গোমারীতে, আর বাসস্ট্যান্ডে নামবার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত শ্বেত-নরনারী ঝাঁপিয়ে পড়ল যাত্রীদের ওপর; দুইজন কৃষ্ণাঙ্গ এবং একজন শ্বেতাঙ্গ ছাত্র-অভিযাত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার করা হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, যদিও যাত্রীদল তাঁদের অভিযান ও গন্তব্যস্থলের ঘোষণা পূর্বেই করেছিলেন নিখুঁত অহিংস সংগ্রামের নীতি অনুযায়ী, আর হাজার হাজার ক্ষিপ্ত শ্বেতাঙ্গ নরনারীর জমায়েত হয়েছিল বাসস্ট্যান্ডে, রাজ্যসরকার নিয়মশৃংখলা রক্ষার বা বাসযাত্রীদের নিরাপত্তার কোন বন্দোবস্তই করেননি। বর্ণবিদ্বেষ কতদূর গড়িয়েছে যে, অকুস্থলে একটা এ্যাম্বুলেন্স এসেও মুমূর্ষুদের কৃষ্ণচর্ম লক্ষ্য করে সরে পড়ে! কিন্তু এই চরম দুঃসময় ও হতাশার মধ্যেও শ্বেতাঙ্গ সত্যাগ্রহী

> **'অমৃতে'র ২য় সংখ্যায় যে আলোকচিত্র প্র তি যো গি তা ঘোষণা করা হ'য়েছিল, তাতে বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন :**
>
> **শ্রীসন্তোষ ঘোষ,**
> **যশোর রোড, কলিকাতা-২৮।**
>
> **দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন :**
> **শ্রীঅমিয় সাধু,**
> **লম্বোদরপুর, সিউড়ী।**
>
> **তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন :**
> **শ্রীঅমিয় দে,**
> **চুচুড়া, হুগলী।**
>
> **আলোকচিত্রগুলি 'অ মৃ তে' প্রকাশিত হবে। এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের টাকা তাঁদের ঠিকানায় পাঠান হবে।**
>
> **সম্পাদক 'অমৃত'**

ছাড়া অন্তত আর একজন বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী অসামান্য নৈতিক সততা ও সাহসের পরিচয় দিয়ে মার্কিন মুল্লুকের ইজ্জত রক্ষা করেছেন : ইনি প্রেসিডেন্ট কেনেডীর প্রতিনিধি জন সিগেনথলার। ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে এক নিগ্রো বালিকাকে বাঁচাতে গিয়ে ইনি মস্তকে ভীষণ আঘাত পান। অশান্তির এখানেই শেষ হল না,—পরদিন নিগ্রো-দের ওপর স্থানে স্থানে ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালালো শ্বেতাঙ্গরা। কৃষ্ণাঙ্গ-দমনে আলাবামা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই একক নন : পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিসিসিপির গভর্ণর তো খোলাখুলিই ঘোষণা করলেন যে 'ফেডারেল সরকারের আক্রমণের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করবার জন্য আমরা প্রতিবেশী রাজ্যগুলোকে সাহায্য করতে প্রস্তুত!'

প্রেসিডেন্ট কেনেডীর উদারতা বা উদারনীতি সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই, যেমন সংশয়াতীত তাঁর ভ্রাতা আমেরিকার এ্যাটর্নি-জেনারেল রবার্ট কেনেডীর মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী। আমে-রিকার বাইরে বিভিন্ন দেশের সেবায় মার্কিণ শান্তিসৈনিক নিয়োগের একটি পরিকল্পনা নিয়েই প্রেসিডেন্ট কেনেডী গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী মানব-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন। 'উই স্ট্যান্ড ফর হিউম্যান লিবার্টি'—"আমরা মানুষের স্বাধীনতা চাই"—রবার্ট কেনেডীর এই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণাও নিঃসন্দেহে নিগ্রো সত্যা-গ্রহীদের অনেকখানি প্রেরণা দিয়েছে।

তথাপি যে আলাবামার উগ্র বর্ণবাদীদের রোষাগ্নি ঝরতে পেরেছে তার কারণ দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যসরকারগুলোর মনুষ্যত্বের অবশেষ সম্পর্কে কেনেডী-প্রশাসনের তখনও সম্ভবত খানিকটা আস্থা বা দুর্বলতা ছিল। তাই, প্রেসিডেন্টের উদ্বিগ্ন অনুসন্ধান এবং অশান্ত দক্ষিণ আমেরিকার মণ্টগোমারীতে ছয় শতাধিক সৈন্য পাঠানোর আদেশ যখন কার্যকরী হল, তার আগেই প্রচুর পরিমাণে কালো রক্ত আলাবামার মাটিকে অভিশপ্ত করে দিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ জনতার উগ্রতা কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল তার প্রমাণ ২১শে মের ঘটনা। প্রেসিডেন্টের আদেশে ফেডারেল সরকারের ৬৩০ জন মার্শাল তখন মণ্টগোমারীতে শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করেছে, সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। কিন্তু জনতার আক্রোশ তাতেও দমল না। ব্যাপটিস্ট গির্জায় তখন প্রায় দেড় হাজার সত্যাগ্রহী তাঁদের নেতা মার্টিন লুথারের উদ্দীপনাময়ী ভাষণ শুনছে রুদ্ধনিঃশ্বাসে। উন্মত্ত জনতা সৈন্য-বেষ্টনী ভেদ করে গির্জার সীমায় ঢুকে পড়ল এবং অকথ্য গালিগালাজের সংগে সংগে বেপরোয়া ইষ্টকবর্ষণে মেতে উঠল। শান্ত সত্যাগ্রহীদের সংযম তাতেও এতটুকু বিচলিত হয়নি। এরপরেও বহু সত্যাগ্রহীর ভাগ্যে নানারকম লাঞ্ছনা জুটেছে,—কারুর হয়েছে জরিমানা, কেউবা নিক্ষিপ্ত হয়েছে কারাগারে। কিন্তু এই নিপীড়ন সত্যাগ্রহের শক্তিকে আরো প্রবল করেছে, আরো হাজারে হাজারে মানুষ ভয়শূন্য হয়ে এই অহিংস সংগ্রামের পথে নেমে পড়েছে। মণ্টগোমারীর পর জ্যাকসনের ঘটনা এই সংগ্রামে আকৃষ্ট করেছে আরো অনেক শ্বেতাঙ্গ মানবতাবাদীকে। বর্ণকৌলিন্য নির্বিচারে বহু সংগঠন এগিয়ে এসেছে আজ এই কঠিন সমস্যার সুমীমাংসায়, স্বচ্ছ মানবতার বিচারে যা কঠিন তো নয়ই, সবচেয়ে সহজ। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নেও মানুষকে শুধুমাত্র মানুষ হিসাবে গণ্য করা, গ্রহণ করা সত্যই কি কঠিন? প্রশাসনিক মহলেও দায়িত্ববোধের লক্ষণ ইতিমধ্যেই আরো বেশী করে প্রকাশ পাচ্ছে : আলাবামার কয়েকটি অঞ্চলের স্ট্যান্ড থেকে শ্বেতাঙ্গ-অঞ্চল সংরক্ষণমূলক সাইনবোর্ড অপসারিত হয়েছে। রবার্ট কেনেডীর দপ্তর থেকে কড়া নির্দেশ গিয়েছে—রাজ্যগুলো থেকে জাতি-বৈষম্যের অভিশাপকে নির্বাসন দিতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার জ্ঞানী ও গুণীসমাজের মানসিক স্তরে জাতিভেদ বা বর্ণবৈষম্য অনুপস্থিত, একথা বিশ্বাসযোগ্য। তা যদি সত্য না হত, তাহলে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট রায় দিতে পারতেন না যে, 'আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিনাবৈষম্যে যাতায়াত করার অধিকার যাত্রীদের রয়েছে'; আর, তারও আগে, ১৯৫৯ সালে খোদ আলাবামার আইনেই বলা হত না যে, 'কোন ব্যক্তি তার হিংসাত্মক অশোভন আচরণ বা ভাষার দ্বারা অন্যের শান্তির ব্যাঘাত ঘটালে এবং শান্তিভঙ্গের অবস্থা সৃষ্টি করলে দণ্ডনীয় হবে।'

বর্তমান মুহূর্তে সম্ভবত আন্তর্জাতিক মর্যাদারক্ষার (কেনেডী-ক্রুশ্চেভ সাক্ষাৎকারের প্রাক্কালে) তাগিদেই ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলন আরো বেশী অপছন্দ করেছেন। কিন্তু আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় ছেড়ে দিলে, পরবর্তী কালে প্রশাসনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এবং সে-তৎপরতা সহানুভূতি-বর্জিত নিছক যান্ত্রিক কুশলতা নয়। যেমন, কেনেডী মার্শালদের পাঠাবার পর আলবামার গভর্ণর প্যাটার্সনকে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সম্বন্ধে কড়া ভাষায় হুঁসিয়ারি করে দিয়েছেন, বার্মিংহাম ও মণ্টগোমারীর পুলিশের কৈফিয়ত তলব করেছেন—কেন তারা ফ্রিডম রাইডার্সদের নির্বিঘ্নে তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারেনি। সংবাদে আরো জানা যাচ্ছে, ফেডারেল সরকারের বিচার বিভাগ প্রমাণ পেয়েছেন যে 'পুলিশ ইচ্ছা করেই দেরীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং কেবল মেরে ফেলতে বাকী রেখে আর সবরকম নির্যাতন সত্যাগ্রহীদের ওপর চালাবার অনুমতি দিয়েছে শ্বেতাঙ্গ জনতাকে।'

'ভয়েস অব আমেরিকা' থেকে প্রচারিত এক ভাষণে রবার্ট কেনেডী দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন—'দক্ষিণ আমেরিকার মতবাদ আমেরিকার মতবাদ নয়।' তাঁর পরবর্তী বক্তব্যটির আরো গভীর তাৎপর্য রয়েছে এবং এই বক্তব্যে কেনেডীর স্বচ্ছ মানবতাবোধও সুস্পষ্ট-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কেনেডী বলেছেন— "আমার পিতামহ ছিলেন আইরিশ; অনেক বছর আগে তিনি যখন বোস্টনে বসতি স্থাপন করতে আসেন তখন আমেরিকায় আইরিশগণ ছিলেন অবাঞ্ছিত। এখন একজন আইরিশ ক্যাথলিকই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে একজন নিগ্রোও এই পদমর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।"

দুপাশে দর্পণ

কবিতা সিংহ

সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো অপর্ণাকে তার সন্ধ্যাতারা মনে হল। সিঁড়ির বাঁক ঘুরে সে যখন অপর্ণার মুখোমুখি হল তখন অপর্ণার দিক থেকে প্রসন্নতার কতকগুলো ঢেউ ছল্‌কে নীচে না নামলে বিনায়কের উঠে যেতে খুব কষ্ট হত। অপর্ণার সঙ্গে পর্দা সরিয়ে সে যখন ঘরে এল, তখন সমস্ত ঘর যেন তাকে প্রসন্নতার স্পর্শ দিয়ে গেল।

ঘরের এই সহৃদয়তায় বিনায়ক যখন কৃতজ্ঞ, অপর্ণা তখন তার হাত থেকে খাতা নিল, বই নিল, পাঞ্জাবি আর গেঞ্জি নিল। হাত মুখ ধুয়ে বিনায়ক এসে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চোখ বুজতেই বেড-কভারের সবুজ সুতোগুলো তার চারপাশে যেন ঘাস হয়ে গেল। আর তারই মধ্যে সে এমন একজন লোক যে মাঠের রাজা, অকুতোভয় ভবঘুরে, অন্নসংস্থানের চিন্তা করে না। সকলে যখন কাজ করছে, আপিস যাচ্ছে তখন নিশ্চিন্ত শুয়ে আছে এমনিভাবে মনে মনে দাঁত দিয়ে ঘাসের ডাঁটি কাটতে লাগল। এর মধ্যে কখন ঘরে ঢুকে চা ইত্যাদির পেয়ালা নামিয়ে রেখে অপর্ণা ওকে ডাকল। বিনায়ক তার সেই মনের জগতেই রয়ে গেল, সংকুচিত হয়ে বরং সরে গেল একটু। যেন অপর্ণা বিষম দূরের, অছোঁয়া, অধরা, ছিমছাম অন্য কোনো ভদ্র-যুবতী, যেন অপর্ণা দেখতে পাচ্ছে সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি, না চান করা খালি ঘুমোনো, ময়লা জামা, ফোলা চোখো, কানে বিড়ি গোঁজা এক ভবঘুরেকে। তাই অপর্ণা যখন একটু দুষ্টুমি করে মুখ নামিয়ে আনল, বিনায়কের খুব আড়ষ্ট লাগল। সংকোচ এড়িয়ে লজ্জা লজ্জা গলায় সে বলল—খোকন কোথায়?

—মনির মায়েদের সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়েছি, আজ আমরা একটু একা থাকব না বুঝি?

বিনায়ক পেয়ালায় চুমুক দিল,

—দেখেছ আজ কেমন সব তোমার মনের মতন?

বিনায়ক অন্যমনস্ক হয়, সে সব দেখেছে। সে ভালোবাসে না বলে ঘরে একটা ক্যালেণ্ডারও রাখে না অপর্ণা, সবুজ করেছে সারা ঘর, কাচের প্লেটে কয়েকটা বকুল ফুল; তাছাড়া পৃথিবীও আজ ঐশ্বর্যে অঢেল বিনায়কের কাছে। আর আকাশ। স্বচ্ছ আকাশে কয়েকটা তারা, বিজ্ঞাপনের নিয়নের আলোর যেটুকু রেশ আলো-নেভা ঘরে এসে পড়লে তার ভালো লাগে ঠিক সেটুকু। নির্জনতা আর সারা বাড়িতে শুধু অপর্ণা, সন্ধ্যার এই আয়োজনকে যেন পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুধু একটা দাঁড়ানো ল্যাম্প জেলে বারান্দায় এসে বসল ওরা। চেয়ারে বিনায়ক, ওর কাছে বেতের মোড়ায় অপর্ণা।

—সাত বছর হয়ে গেল, না অপর্ণা, খুব পুরোনো লাগে আমাকে? ওর কোলের ওপর গালটা নামিয়ে দিয়ে অপর্ণা বলল—রোজ ঐ এক উত্তর শোনা চাই, না?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অপর্ণা আবার বলল মনির মায়ের প্রায় পনের বছর বিয়ে হয়ে গেল জানো,—তবু—হাসল অপর্ণা। বিনায়ক দেখল ওর ধুতিতে সিঁদুর লেগে যাচ্ছে,—অপর্ণার চুলের উপর আস্তে আঙুল চালাল বিনায়ক, অপর্ণা বলল—সত্যি স্বামীকে

কি চাঁদের মত দেখতে ইচ্ছে করে? শুধু তার এক পিঠ?

হাসল বিনায়ক,—তুমি বড় খুঁত-খুঁতে অপর্ণা—

—সত্যি আমি যদি মনির মা হতাম,...।'

—মরে যেতে।

—না, সে হয়ত মুখে বলছি, মরা অত সহজ না। তাবলে জানব না আমার স্বামী সারা দিন কি করেন, কি করে তাঁর সময় কাটে, কি সব ছোট্ট ছোট্ট কথা ভাবেন?

—তোমার মনির মার স্বামীর হয়ত সে রকম ছোট্ট ছোট্ট কথা কিছু নেই!

—মদ খেয়ে বাড়ি ফেরা, অফিসের ঘুষের পয়সায় মোটর কেনা এ সব বলছ? করুক না, পৃথিবীতে কটা মানুষ আছে যারা সৎ? তা নয়, সে কথা বলছি না, কিন্তু মনির মা জানতে চাইবে না কেন স্বামী কোথা থেকে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল?...ও বলে ছেলেরা নাকি অমন হয়।

—কেমন?

তা জানি না। হয়তো স্বামীকে ও মনে করে একটা ঘর—এমন একটা ঘর যার এক কোণে শুধু মিট মিট করে একটা পিদিম জ্বলছে।

বাতাসে উড়ে সরে যাওয়া টেবিলের ঢাকনাটা ঠিক করতে করতে অপর্ণা বল্ল,—আমার জীবনেও ত এ ঘটনা ঘটেছে! যেদিন প্রথম তোমার মুখে মদের গন্ধ পেলাম! গন্ধ পেয়েও বুঝতে দিইনি পেয়েছি। সেদিন তুমি যদি নিজে থেকে না বলতে—।

ফ্যাকাশে একটা হাসি হাসল বিনায়ক,—আমি জানি সত্যিই তুমি সেদিন মরে যেতে!

—তুমি তারপর থেকে কত ভালো হয়ে গেছ, কত ভালো!

বিনায়ক হাসল, তোমার ধারণা তুমিই আমায় ভালো করেছ না? অপর্ণার চুল এলোমেলো করে দিল বিনায়ক—ওঃ খুব গর্ব! কথা বলা হচ্ছে না একদম!

নিঃশব্দে অন্ধকারে বসে রইল দুজন। যেমন ওরা চেয়েছিল তেমনি লাবণ্যে নিটোল হয়ে গেল সময়টা।

কলিং বেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজে স্নায়ুতে ধাক্কা লাগল হঠাৎ। অপর্ণা উঠে বড় আলোটা জেলে দিতে চোখে হাত চাপা দিতে হল বিনায়ককে।

অপর্ণা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকল শ্যামল।

—এলি ত' ডিসটার্ব করতে? অপর্ণা এ দিনটায় কাউকে পছন্দ করে না।

অপর্ণা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল—না না, শ্যামলবাবু, সত্যি বলছি, মন থেকে স্বীকার করছি আপনি না হয়ে অন্য কেউ হলে সত্যিই ডিসটার্বড্ হতাম। কিন্তু আপনি? সে আলাদা কথা—দাঁড়ান আর এক প্রস্থ চা-টা নিয়ে এসে জমিয়ে বসা যাক।

অপর্ণা রান্না ঘরে গেলে শ্যামল বিনায়কের সামনের চেয়ারে এসে বসল।

—সত্যি বলতে কি জ্বালাতেই এসেছি তোদের। তোর চিঠিতে পড়েছি এ দিনটায় তোরা কাউকে ডাকিস না। কিন্তু না এসে পারলাম না তবু, কারণ তোর চিঠিতেই পড়েছি অপর্ণা কত করুণাময়ী। একলা হোটেলে আর সময় কাটতে চাইছে না,—দেখ্ যে কদিন কলকাতায় থাকব সে কদিন কিন্তু রোজ তোদের জ্বালাব!

—থাম্ শ্যামল, আমার সঙ্গে আর তোকে ভদ্রতা না করলেও চলবে। অপর্ণার তোকে খুব ভালো লেগেছে জানিস্, ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই ত ও তোর গল্প শুনছে।—তাছাড়া আমি বলেছি মুভমেন্ট করে তুই জেলে গিয়েছিলি, ও ত তা শুনে আরো মুগ্ধ!

—অপর্ণাকে জেলে যাবার আসল কারণটা বলিসনি ত? শ্যামলের সারা মুখ রক্তশূন্য হয়ে এল,—আজ আমি আবার জুয়ায় হেরে গেছি।...সমস্ত দানে। বড্ড মন খারাপ, জানিস বিনু,—

অপর্ণার শাড়ির খস খস শব্দ শোনা গেলে বিনায়ক শ্যামলকে থামিয়ে দিল। কিন্তু মনে মনে শ্যামলের কথাই ভাবতে লাগল বিনায়ক। শ্যামল আর ও ছোট-বেলা থেকেই এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে, ওর কথা আলাদা করে মনে করা দরকার হয়নি। আপাততঃ আলাদা হলেও জড়িয়ে থাকার প্রতিটি বাঁকে ওর মন যেন আগের মতই বেঁকে বেঁকে রয়েছে। তাই শ্যামল তবুও যদি ভুলে যায়, বিনায়ক কখনো ভোলে না। প্রতি শনিবার কলেজ থেকে ফেরবার মুখে নিজের সব কথা জানিয়ে একখানা করে চিঠি ডাকে দিয়ে যায় আজো।

চায়ের ট্রে নিয়ে অপর্ণা ভিতরে ঢুকলে দুজনেই নড়ে চড়ে বসল।

—হ্যাঁ, তারপর বলুন কি সব গল্পসল্প হচ্ছিল আপনাদের। অবশ্য যদি না......

অপর্ণা হাসল, চা ঢালতে ঢালতে বলল,—কিছু না, একটু পরনিন্দা পরচর্চা,

—কেমন?

—আমি বলছি,—বিনায়ক হাল্কা গলায় বলল—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী বলতে চাইছেন গোয়ালা ফাঁকি দেবে, চাকর ফাঁকি দেবে, মুদি ফাঁকি দেবে, অধ্যাপক, মাষ্টার, মায় গল্পলেখকও ফাঁকি দেবে তা সওয়া যায়, কিন্তু স্বামী ফাঁকি দেবে এটা সইতে উনি বিষম নারাজ....এবং ওঁর মতে আমি হলাম আদর্শ স্বামী। আশা করি তুই আমায় আদর্শ স্বামী হিসেবে মানবি, আর চালিয়ে যেতে দিবি?

শ্যামল মুখ নীচু করে একটা সিঙাড়া তুলে নিল। তার মুখের ওপর উজ্জ্বল আলো পড়ছিল। ফ্যান ঘুরছিল বলেই আলোটা অস্থির, না, তার চামড়ার তলাকার ছোট ছোট পেশীগুলো বিভিন্ন বেগে কাঁপছিল বলেই মুখটাকে অমন দেখাচ্ছিল তা বুঝল না বিনায়ক বা অপর্ণা। খেতে খেতে জড়িত গলায় শ্যামল বলল—

—জুয়া খেলাটা একটা ভারি মজার জিনিস,

বিনায়ক একটু চমকে উঠলে তাকে বরাভয় মুদ্রা দেখিয়ে হেসে শুরু করল শ্যামল—হ্যাঁ জুয়া; জুয়া মানে বলছি মানসিক জুয়া। মনে মনে জুয়া খেলে না লোকে? আমি ত খেলি, একটায় হারলে আবার আর এক দান খেলতে ইচ্ছে করে! আচমকা বিনায়কের দিকে তাকিয়ে যেন প্রসঙ্গ বদলাল শ্যামল। নিজের টাইটা সমান করতে করতে নরম গলায় বলল,—তোর সুখ দেখে হিংসে হয় বিনু, এত সুখী হবি কখনো তুই ভেবেছিলি? বিনায়ক মাথা তুলে তাকাল। শ্যামলের মুখের প্রতিটি রেখা স্থির। পরিচ্ছন্ন হাসছে শ্যামল। স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবার্ষিকীতে এক সুখী

শুভার্থী বন্ধু। আস্তে আস্তে বিনায়ক বলল—

—মানুষ যা চায় প্রায়ই তা পায় না। আমি পেয়েছি। ঠিক এই সংসারটিই আমি চেয়েছিলাম। এই ছবি, এই ঘর, এই অপর্ণা, এই খোকন নয়, তবে এমনি ছবি, এমনি ঘর, এমনি অপর্ণা, এমনি খোকন।

অপর্ণার মনে হল বিনায়ক তার প্রতিটি কথা দিয়ে শুধু শ্যামলকে নয়, শ্যামলকে অতিক্রম করে অপর্ণাকেও ছুঁতে চাইছে। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু শুধুই তার দুচোখ সজল হয়ে উঠল।

—এত সুখ তোর ভালো লাগছে না?

—ভালো লাগছে। শুধু ভালো-লাগা! এখনো মনে হয় আমি এই সমস্ত সংসারের চার পাশে আল্গা একটা ভালোলাগা হয়ে ঘুরছি। কিছুতেই আরো ভিতরে ঢুকতে পারছি না। এখনো এসব আমার পাওনা বলে মনে হয় না। মনে হয় লটারিতে পাওয়া এত এত টাকার মত।

—কেন একথা বলছ! শ্যামলের সামনে বিষম বিব্রত বোধ করল অপর্ণা।

—সবাইকে কি সব জায়গায় ধরে? তুমি অপর্ণা নিজেকে কি ধরাতে পারো আজ থেকে সাত বছর আগের সেই দিনটায়, যেদিন তোমার বাড়িতে বসে বলেছিলে আমাকে ছাড়া কিছুতেই চলবে না তোমার? অপর্ণা, পারো?

—পারি!—অপর্ণা বলল।

—যত সহজে বলছ তত সহজে?

মাথা নীচু করে টি-পটের গায়ের গোলাপ ফুলের নক্সাটা আঙুল দিয়ে খুঁটতে লাগল অপর্ণা। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল শ্যামল—

—কেন পারবেন না অপর্ণা? ঐ সুতোয় ত এ সাত বছর লেশ বুনে এসেছেন উনি।...আচ্ছা ম্যানসনের ছাদে গেলে হয় না!

শ্যামলের ত্বরিৎ প্রসঙ্গান্তরে চমকে উঠল দুজন। কিন্তু ঘরে যেন একটা গুমোট নেমেছে। খোলা হাওয়ার প্রয়োজন ওরা তিনজনেই বোধ করতে লাগল হঠাৎ।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে উঠে যাচ্ছিল শ্যামল। বিনায়ক চুপি চুপি তাকে জিজ্ঞেস করল—কিরে তোর জুয়ার নেশা কেটেছে? শ্যামল সে কথার উত্তর না দিয়ে বিনায়ককে ডিঙিয়ে অপর্ণার দিকে কথা ছুঁড়ল। অন্ধকার চোঙার মত সরু জায়গাটায় সমস্ত কথা যেন গম্ গম্ করে বেজে উঠল।—

—আপনাদের দেখে আমার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে যায় জানেন? রাণুর আর আমার জীবনে কিছুতেই শান্তি এল না। আসলে আমরা দুজনেই বড় দুর্বল-আত্মা, কেবল কাটাকাটি করেই মরি। দুজনেই দুজনের ক্ষতি করি...কেন যে এমন হল...অথচ আমার বাবা মা...

বিনায়ক থেমে দাঁড়াল। সে বুঝতে পারল জুয়োর প্রথম হাড়ের পাশা ছুঁড়ে মেরেছে শ্যামল। বিনায়ককে পেরিয়ে শ্যামলের দিকে উঠে গেল অপর্ণা। বলল,—সত্যি যাদের বাবা মা খুব সুখী জীবন কাটিয়ে গেছেন তাদের বড় যন্ত্রণা। আমি ত সব সময় একথা ভাবি। ও'র বাবা আর মায়ের সুখী জীবনের কথা যখনি মনে পড়ে তখনি ভয় করে আমার। ভাবি, আমি কি ও'কে অমন সুখী করতে পারব!

বিনায়ক আর যাচ্ছে না। একবার তার মনে হল, সে ছুটে পালায়, অন্য-বার মনে হল শ্যামলকে সে হিঁচড়ে নামিয়ে আনে। কিন্তু আশ্চর্য, লক্ষা-ভ্রষ্ট হয়ে ওরা যেন ছাদের দরজার দিকেই ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিনায়ক কিছুই করতে পারল না। বায়বীয় সত্তার মত আস্তে আস্তে ওপরের সিঁড়ির ধাপগুলোকে সে পায়ের তলায় পেতে থাকল। ক্রমশঃ তব মধ্যে সেই অদ্ভুত খেলোয়াড়ের অস্তিত্বটা নাড়া দিয়ে উঠছে। অপর্ণাকে সে এত ভালোবাসে বলেই তার শেষ পর্যন্ত বোঝবার এই ইচ্ছেটা তরবারির মত নিষ্কোষিত হতে থাকল তার ভিতর থেকে।

বিরাট ছাদ। শেষ প্রান্তে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল আর অপর্ণা। বিনায়ক নিঃশব্দে অপর্ণার পিছনে এসে দাঁড়াল। অপর্ণা তখন বলছে—

—থাক না, আপনার জীবনের অশান্তির কথা যত ভাববেন ততই মন খারাপ লাগবে শ্যামলবাবু। তার চেয়ে আপনার বাবা মার গল্প বলুন না, আজকের দিনটা সুখী মানুষদেরই গল্প শোনা যাক।

—আমার বাবা মা,

স্বপ্নময় হয়ে এল শ্যামলের কণ্ঠ। যেন অদ্ভুত স্মৃতিজলে সাঁতার কাটছে তার সমস্ত মন।

আমার বাবা মা....খুব ছোট্ট আর খুব গরীব ছিল আমাদের সংসার। আমার বাবা ছিলেন সামান্য এক গরীব দোকানদার। দোকান বন্ধ করতে করতে তার কত রাত হয়ে যেত! মা বার বার পাঠাতেন বাবার খোঁজ নিতে। বাবা বাড়ি ফিরে এলে সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া। তারপর হ্যারিকেন নিভিয়ে দিয়ে দাওয়ায় বসে থাকা আর গল্প করা। বার বার বাবার তামাক সেজে দিতে হত। মার হাতে ছাড়া তামাক-সাজাটি কিন্তু কিছুতেই পছন্দ হত না বাবার....মা কত বিরক্ত হতেন,...আসলে কিন্তু একটুও বিরক্ত হতেন না আর কি....তারপর আমরা শুয়ে পড়তাম। অনেক রাতে হয়ত ঘুম ভেঙে যেত, দেখতাম বাবা বসে বসে বই পড়ছেন। মা, পাশে বসে কাঁথা সেলাই করছেন। ...খুব ছোট্ট ব্যাপার; কিন্তু ওঁদের দুজনের মুখ দেখে মনে হত একটি সুর যেন সব সময় দুজনের মনে বাজছে,...ভীষণ মনে হত...আর সত্যি আমার মা....

অপর্ণা শ্যামলের বিপরীত দিকে ফিরে তাকাল, কেন তা বিনায়ক বুঝতে পারল। তার দুগালে দুটো রুপোর পাতের মত ধারা। বিকৃত গলায় অপর্ণা বলল,—আর আপনার মা যখন মারা যান আপনার বাবা তাঁকে নিজে হাতে চান করিয়ে চুলে বিলিকেটে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলেন, নিজেই আগুন দিয়েছিলেন শরীরে, তারপর যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন আর কখনো হাসেননি, না শ্যামলবাবু?

—এত কথা বিনায়ক আপনাকে বলেছে? মনেও আছে ত ওর?...আমার মা-বাবার কথা বিনায়ক এত করে মনে রেখেছে...হবে হয়ত...বেচারির যা অশান্তির জীবন ছিল, একটা বীভৎস স্মৃতিতে ভরা ছোটবেলা......

অপর্ণা কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। বিনায়ক আর থাকতে পারল না। সে তার হাতের একটা আড়াল রেখে অপর্ণার সামনে এসে দাঁড়াল। বিনায়কের দিকে চকিতে তাকিয়ে কী বুঝল শ্যামল কে জানে, ছাদের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে গেল ধীরে ধীরে। কিংবা সে কাছেই হয়তো থাকল, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সে থাকলেও থাকত না ওদের মধ্যে।

ছোট্ট ছোট্ট ইঁট দিয়ে তৈরী এই বিরাট ছ' তলা ম্যানসন বাড়ি। ভিতরে লোহা, তারপর ইঁট, তারপর কংক্রীট, তারপর পলেস্তারা। মানুষের ভিতরও হয়ত এই রকমই আছে, অথচ মিথ্যে মনে হয়। তাছাড়া এই ম্যানসনের নোস্তারও দেয়ালের মধ্যে তেমন কোনো লোহার জঞ্জাল আছে তাও কি ভাবা যায় চট করে? যায় না। কত পরিশ্রম করে গাঁথা একটু একটু করে। কোথায় স্নানঘর, কোথায় রান্নাঘর, কতটা বা শোয়ার ঘর, কটা কটা ঘর দিলে ঠিক ছোট ছোট ফ্ল্যাট করা যায় সবই নিখুঁত-ভাবে প্ল্যান করা। কি ছাদ, কি বিরাট ছাদ, জলের বড় বড় ট্যাঙ্ক, হাত দিয়ে ধাক্কা দিলে গুম্‌গুম্‌গুম্ আওয়াজ বাজে। নীচে কত দূরে ছড়ানো ঐ খেলনার মত কলকাতা। অন্ধকার, আলো। দূরে জোরালো নিয়নের বিজ্ঞাপনে এখানে অপর্ণার মুখ সবুজ হচ্ছে, লাল হচ্ছে। প্যানারোমা স্ক্রীনের মত, ডিমের মত, একটু চালু আকাশ কয়েকটা হাল্কা তারার আলোয় রাত্রির দৃশ্য দেখাচ্ছে! হাওয়া এত উদ্দাম কেন? কানের পাশ দিয়ে তার গর্জন সমানে শোনা যায়। পেছনে ছাদের দরজার পাট ক্রমাগত বন্ধ হচ্ছে, খুলছে, তার একটা ঝকঝক অবিরত শব্দ। অপর্ণার ভিতর অপমান কান্না বাসনার একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প। বিনায়ক বুঝতে পারল। নিরুপায় বিনায়ক প্রায় স্বপ্নের মতো উচ্চারণ করল—

—অপর্ণা সাত বছর আগে আমি তোমায় শুধু ভালোবাসতাম,

আর তারপর থেকে?

—তারপর থেকে ভালোবাসা পণ্ডিত করে রাখার কথা ভাবতাম। একটা সুখী ভদ্র সুন্দর সংসারের কথা ভাবতাম। খুব ভালো স্বামী হবার কথা ভাবতাম, খুব মিষ্টি বাবা হবার কথা ভাবতাম, তোমার কাছে কিছু লুকোব না ভাবতাম।

—মিথ্যে কথা,

—মা, এই সংসার এই সুখ আমি একলা তৈরি করেছি অপর্ণা।

—আমি নয়?

এত ত্যাগ এত কষ্ট সহ্যের পর বিয়ের সাত বছর বাদে বিনায়ক এ কি বলছে?

স্পষ্ট শোনা গেল তার গলা।

—আমি এর ভিত গেঁথেছিলাম।

—আমি নয়?

—আমি একলা একে তিলে তিলে গড়েছি।

—আমি নয়?

—আমি একজন প্রেমিকের চেয়ে বা একজন স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি করেছি।

—আমি নয়?

—না এবং না। শোন অপর্ণা। আমার বাবা কোনো দোকানদার ছিলেন না। ওই গ্রামেরই জমিদার ছিলেন। চরিত্রহীন ছিলেন, মাতাল ছিলেন। আমার মাকে তিনি মারতেন।

অপর্ণা চোখ তুলে তাকাল। তার চোখ দুটো একবার লাল হচ্ছে, একবার সবুজ হচ্ছে। হাওয়া বইছে কানের পাশ দিয়ে। দরজার পাটগুলো ঝকঝক করে তখনো খুলছে, বন্ধ হচ্ছে।

—এতদিন যে বাবার গল্প আমি তোমাকে বলেছি তিনি শ্যামলের বাবা। আর আমি কেমন বাবা হব সেই কল্পনার। সাত বছর ধরে এই বাবার গল্প আমি তোমায় বলেছি, সাত বছর ধরে এই বাবার গল্প তুমি শুনেছ! আর সাত বছর ধরে আমার প্রতিটি কাজে এই মিথ্যেকে আমি তিলে তিলে সত্যি করেছি।......অপর্ণা তোমার মনে আছে বিয়ের প্রথম বছরে একদিন আমি মদ খেয়ে বাড়ি এসেছিলাম, আমি তোমায় চড় মেরেছিলাম। তুমি অবাক হয়ে এই ভদ্র শিক্ষিত অধ্যাপকের দিকে তাকিয়েছিলে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমি যে বুদ্ধির অঙ্কটা কষতে দিয়েছিলাম তোমায়, সেটা প্রায় কষেই এনেছিলে। কিন্তু মেলাতে পারোনি। কারণ অঙ্কটা একটু বাদ রেখে বলেছিলাম তোমায়। চড়টা তুমি জানতে, চোখের বুনো আগুনটাও ধরে ফেলেছিলে তুমি কিন্তু তার পেছনের কথাটা জানতে না, ধর—ছেলের বয়স তোমায় বের করবার কথা, কিন্তু বাবার ঠিক বয়স আমি তোমায় বলিনি, তাই কুড়ি বছর বাদে ছেলের

বয়স কত হবে এ অংক তুমি বলেও বলতে পারোনি।

অপর্ণা বিনায়কের মুখের দিকে স্থির চোখ রাখল। বিনায়ক বলতে লাগল,

দিয়েছে। বিয়ের পর থেকে বিনায়ক নিজে কি আশ্চর্য বদলাতে আরম্ভ করেছিল। একটু উগ্র, একটু অভদ্র বিনায়ক, মাঝে মাঝে মদ খেয়ে রাত করে ফেরা বিনায়ক।—অপর্ণা কি বোকা, সে

অপর্ণা বিনায়কের মুখের দিকে স্থির চোখ রাখল।

—সেদিন যদি তুমি আমার বাবার পরিচয় জানতে, কত সহজে অংক মেলাতে পারতে! চড় খেয়ে তুমি অবাক হতে না। মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে—হবে না? যেমন বাবা তেমনি ছেলে হবে ত?—আমি তখন অপর্ণা আমার দুর্বল ঘায়ে খোঁচা দেয়ার অপরাধে তোমাকে আর একটা চড় মারতাম। লাথি মারতাম, জুতো মারতাম। মদ খেয়ে এসে প্রথম দিন স্বীকার করতাম না মদ খেয়েছি, দ্বিতীয় দিন থেকেই বগলে বোতল নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। আমরা দুজন খেয়োখেয়ি করতাম। তোমাকে আমার মায়ের জায়গায় বসাতাম, আর আমি নিজে হতাম আমার বাবা। যে পচা গলা কদর্য সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, সেই সংসার আবার তৈরি করতাম আমরা। তুমি অমন করে তাকিয়ে থেক না অপর্ণা। আজ বলো আমি কোন বাবার ছেলে। আমাকে কেমন বাবার ছেলে মনে হয়, কে আমার সত্যিকার বাবা?

অতীতের উনুন খোঁচাতে যেন একটা লোহার শিকের মত অপর্ণাকে বিনায়ক বড় বড় গনগনে কয়লার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেই আগুনের মধ্যে পুড়তে পুড়তে অপর্ণা দর্পণে দ্বিতীয় বিনায়ককে দেখতে পেল পরিষ্কার-ভাবে। সুন্দর ভদ্র পরিচ্ছন্ন বিনায়ককে। বিনায়কের বাবা মাকে। বিনায়ক তার দুই বছরের অভ্যাসকে কত সহজ করে ভেবেছিল সেই বদলেছে বিনায়ককে। কিন্তু তা নয়? বিনায়ক বদলেছে নিজে, নিজে নিজে বদলেছে!

অপর্ণার সমস্ত শরীর একটা চোখ হয়ে তাকাল বিনায়কের দিকে। একটি সুন্দর সুস্থ চরিত্রবান পুরুষ, পায়ের তলার ফ্ল্যাটে তার সুখী সংসার রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজেই নিজের পিতা, ভাইবোন মা। তারও চেয়ে বেশি, সে অপর্ণার প্রেমিক, সে খোকনের বাবা। খোকনের সুন্দর শৈশবের জন্য, নিজের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য, অতীতের উনুনে পুড়ে লাল, ভীষণ লাল একটা লোহার শিকের মত বেরিয়ে এসে সে বিনায়ককে জড়িয়ে ধরল। যেন সে তার ছাপ বিনায়কের মধ্যে রেখে যাবে। যেন বিনায়কের সঙ্গে মিশে সে এক নতুন ধাতু তৈরি করবে। বিনায়কের বুকের মধ্যে মুখ রেখে হঠাৎ শ্যামলের কথা মনে পড়ল তার। এই একটি মাত্র সত্যি কথা নিজের অতীত সম্বন্ধে বলেছিল বিনায়ক। মিথ্যে বাবা মা ঝি চাকর ভাই-বোনের সঙ্গে এক সত্যিকার বন্ধুর কথা। কিন্তু আজ এই ম্যানসনের ছাদে দাঁড়িয়ে যখন সব মিথ্যে সত্যি হয়ে গেল, তখন একমাত্র সত্যির এই মিথ্যে হয়ে যাওয়ায় এক চোখে হেসে অন্য চোখে কাঁদল অপর্ণা।

প্রতিবেশী সাহিত্য

॥ গুজরাতি গল্প ॥

॥ ভূমিকা ॥

।। রবীন্দ্রনাথের জন্মসাল থেকেই আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের যাত্রা শুরু।

গুজরাতী সাহিত্যে আজ বাঙলাদেশের মতই ছোটগল্পের আংগিক, রূপ ও স্বরূপ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

গ্রামীণ পরিবেশে কিষাণ-জীবনের জীবন্ত চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনাগ্রন্থনে পান্নালাল প্যাটেলের দক্ষতা অসামান্য। তাঁকে গুজরাতের শরৎচন্দ্র বলা চলে।

মধ্যবিত্ত জীবনের ফাঁকা দম্ভকে ভিত্তি করে আংগিকদুরন্ত ও মনস্তত্ত্বমূলক গল্প লেখেন রামনারায়ণ পাঠক। গল্প লিখে 'ধূমকেতু' (গৌরীশঙ্কর জোশী) পাঠকচিত্তে আসন করে নিয়েছেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ভিত্তিতে গল্প-উপন্যাস রচনা করে প্রথম সারিতে স্থানলাভ করেছেন কানাইলাল মুন্সী। ঝাওয়ের চন্দ মেঘানী যেন বাঙলার 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ। তাঁর রচনায় প্রকৃতির সংগে মানুষের সম্পর্ক গভীর ও নিবিড়।

লেখিকাদের মধ্যে লীলাবতী মুন্সী, বিনোদিনী নীলকণ্ঠ, কুন্দানিকা কাপাডিয়া ও লাভুবেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান গল্পের লেখক শিউকুমার জোশীর সাহিত্যক্ষেত্রে নাট্যকার হিসেবে পদার্পণ ঘটলেও তিনি একজন সার্থক ছোটগল্প-লেখক হিসাবেও খ্যাত। তিনি শরৎচন্দ্রের দেবদাসের নাট্যকার এবং বিরাজ বউ নাটকের গুজরাতী অনুবাদক। শিয়ালদহ স্টেশনের ছিন্নমূল বাস্তুহারাদের নিয়ে তিনি আশ্চর্য এক সার্থক নাটক রচনা করেছেন। —অনুবাদক

দর্শনের ছবি

রচনা : শিউকুমার জোশী
অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

জানি না কোনদিন একটা ক্যামেরা ঝুলিয়ে কোন হিল-স্টেশনে নেমেছেন কিনা। নেমে দেখবেন আপনার হাবভাব চালচলন একটু বদলে গেছে। মনে হবে, আমার চেয়ে বড় আর পৃথিবীতে কে আছে!

কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে সিমলার নামকরা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। নানাদেশের অনেক বড়লোক সেখানে জড়ো হয়। অনেকের কাঁধেই ক্যামেরা ঝোলে। দামী দামী ক্যামেরা। নানা ঢঙের। সেগুলো কাঁধে নিয়ে বাজারে এসেছে নানা বয়সের নারীপুরুষ। অনেকের দিকেই তাকাতে ইচ্ছে করে।

একদিনের কথা। বাজারের কাছের গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তোলার কথা ভাবছি। ক্যামেরা ঠিক করে তুলতে যাব এমন সময় বছর আট-ন' বয়সের একটি পাহাড়ী মেয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। ক্যামেরার একদিকে আমি চোখ এঁটে রেখেছি, অন্যদিকে সেই মেয়েটি। ক্যামেরা সরিয়ে নিতেই মেয়েটি হেসে উঠল। সহজ-সরল চমৎকার হাসি। তার হাসির সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বড় গোলাপের পাপড়িগুলো যেন ঝরে পড়ছে। মেয়েটির পরনে সাধারণ পোশাক। আড়ম্বর তো দূরের কথা, দারিদ্র্যের ছাপই স্পষ্ট। কিন্তু তার চোখমুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে গরীব ঘরের মেয়ে।

—ছবি তুলবেন?

কী সহজ প্রশ্ন! এর কী জবাব দেব ঠিক করতে পারিনি। কিছুক্ষণ পরে ক্যামেরা ঠিক করতে করতে বললাম, তুলব। দাঁড়াও ও-দিকে। আচ্ছা, একটু হাস দিকি।

—হাসছিলাম তো! তখন তুললেন না কেন, এখন যে আমার হাসি পাচ্ছে না।

তারপর সে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি হঠাৎ এক সময় কল টিপে দিলাম।

—তুলেছেন?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর হবে তোমার ছবি।

—কই দিন তাহলে আমাকে।

—এক্ষুণি?...এখন দেব কি করে!

—কেন? তাহলে আর কবে পাব?

—দু'তিন দিন পরে। অনেক কান্ড করে এটাকে কাগজে তুলতে হয়।

—তাই নাকি?—বড় বড় চোখে এই প্রশ্ন করে তারপর হেসে হরিণের মত লাফাতে লাফাতে চড়াই-উৎরাইগুলো পেরিয়ে হারিয়ে গেল সে দিগন্তের দিকে।

এ এক নতুন অনুভূতি। শহরের ছেলেমেয়েরা এত সহজ-সরল তো হয় না! এদের মনে যেকথা জাগে মুখফুটে তাই বলে—কত সহজ-সরল এরা! কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই।

ছবিটা সত্যিই সুন্দর উঠেছিল। তিনদিনের দিন ফটোটাকে কোটের পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়লাম সেই মেয়ের খোঁজে। কিন্তু পেলাম না তাকে। তারপর থেকে একদিন দুদিন তিনদিন... দশদিন......বারদিন......কিন্তু তার খোঁজ পেলাম না। নিজের বোকামির জন্য মেজাজ বিগড়ে গেল। কেন যে নাম-ঠিকানা রাখলাম না। এই ধরনের এক নতুন জায়গায় কোথায় খুঁজব সেই মেয়েটাকে।

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে এল। ফিরে যাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। মেয়েটার খোঁজ পাওয়ার আর কোন আশা রইল না মনে। কি যে বিশ্রী লাগে! যার সুন্দর ছবি উঠেছে তাকে সেটা দেখাতে না পারার যন্ত্রণা, কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। সবসময় মনে পড়ত ছবির কথা... ঐ কচি মেয়েটির কথা।

বেশ কিছুদিন পরে বাজারে বেড়াচ্ছি এমন সময় কে যেন পেছন থেকে কোট ধরে টানল। ফিরে দেখি সেই মেয়েটি। সেই ডাগর ডাগর চোখ। তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মুখে কতখানি আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে জানি না কিন্তু মন আমার কানায় কানায় ভরে গেছে আনন্দে।

—আপনি মিথ্যা কথা কেন বলেন বাবু? কথা দিয়েছিলেন ছবি দেবেন, কই দিলেন না তো?

প্রত্যেক দিন ফটোটাকে যে-কোটের পকেটে পুরে বেরুতাম সেটা আজ পরিনি। বড় ভাবনায় পড়লাম।

—কতদিন তো খুঁজেছি তোমাকে; কোথায় ছিলে এতদিন? কী সুন্দর ছবি উঠেছে তোমার। কত খুঁজেছি তোমাকে...

—বারে আমি বুঝি রোজ রোজ বাজারে আসি!

—আমি তো তা জানি না।

—মাসে দু'বার আসি রেশন তুলতে। আমি না হয় না-ই এলাম, ছবিটা আপনি বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেননি কেন? আমি যে সেইদিনই মাকে বলে-দিয়েছিলাম......কতদিন হয়ে গেল তবু ফটোটা দেখতে পেলাম না। মা ঠিক কথাই বলেছিল......

—কী বলেছিল?

—বলেছিল, ফটো-তোলাবাবুরা কি আর তোর কুঁড়েঘরে এসে ছবি দিয়ে যাবে?

—কিন্তু কই তুমি তো তোমার বাড়ির ঠিকানা আমাকে দাওনি?—তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—কি বলছেন। দর্শনের মাকে তো এগাঁয়ের সবাই একডাকে চেনে। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

—দর্শন! দর্শন আবার কে?

—আপনি তো আচ্ছা লোক! আমি তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।

—তাই নাকি? বাঃ বেশ মিষ্টি নাম তো!

পরিচয় দেওয়ার এই নতুন পদ্ধতিতে আমি আরও মুগ্ধ হলাম। আমার হোটেলটা খুব দূরে নয়। সেখান থেকে ফটোটা এনে তাকে দিলাম।

কিছুক্ষণ সেটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, অত ভাল হয়নি তো বাবু? মা বোধ হয় এটা পছন্দ করবে না।

—কেন?—আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে তখন নিজের ছেঁড়া তালি-দেওয়া পোশাক দেখিয়ে বলল, মা সেদিন বলেছিল এই পোশাকে ফটো না তুলিয়ে রেশমের ঘাগরা, জামা আর ওড়না পরে ছবি তোলালে ভাল করতিস, দিব্যি দেখাত।

—বেশ তো তাই হবে। কবে যাব বল তোমার বাড়ি?

কথাটা শুনেই তার মুখ এতটুকু হয়ে গেল। মুখে একফোঁটা রক্তও যেন নেই। দমকা হাওয়ায় গোলাপের সবগুলো পাপড়ি যেন ঝরে পড়েছে হঠাৎ।

তারপর আমার খেয়াল হল, সত্যিই তো যে পোশাকের কথা সে বলেছে সেটা তো যৌবনকাল আসার আগে পরার মতো সৌভাগ্য কারো হয় না।

মেয়েটি তার বাড়ির ঠিকানা ঠিকমত বুঝিয়ে চলে গেল। তার পরের দিনই ওদের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ভাবছি, এমন সুন্দর চালাকচতুর মেয়েটির মা কেমন হবে! যে-গাছে এ-গোলাপ ফুটেছে তা কেমন হবে।

দর্শন থাকে তার চৌত্রিশ বছরের মায়ের সঙ্গে। ওদের কুঁড়েঘরটা প্রকৃতির দয়ার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভিতরে আলোবাতাস ঢুকতে চায় না। জিনিসপত্রের আড়ম্বর নেই। আশ্চর্য! শহরের বাড়িগুলোর সঙ্গে এই ঘরটার পার্থক্য আশমান-জমিন।

সেদিন ছবিতোলার সময় দর্শনের কাঁধে যে একটা রেশন ব্যাগ ঝুলছিল তা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। রেশনের কথা সেদিন সে বলেছিল বটে, আমার মনে নেই।

দর্শনের মা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছে। সর্বনেশে রোগ তার স্বামীকে গিলে খেয়েছে। ওরা এখন সরকারী ভাতা পায়। যা-হোক করে দিন কাটে। যে মেয়েকে অ-আ-ক-খ শেখাতে পারছে না সে আবার চায় রেশমী পোশাক। দর্শনের মাও রোগে ভুগছে। খাটে শুয়ে শুয়ে মেয়েকে তার বাবার বীরত্বের গল্প শোনায়। চিরকাল ওরা গরীব। দুমুঠো-ভাত জোটাতে সবসময় ওদের কষ্ট পোয়াতে হয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য তাদের দমাতে পারেনি। দর্শনের মা গল্প বলে বলে মেয়েকে এমনভাবে গড়ে তুলছে যাতে সে যেকোন অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলতে পারে।

অবস্থা বুঝে মেয়েটাকে রেশমী পোশাক কিনে দেওয়ার জন্য কিছু টাকা দিচ্ছিলাম। অত দারিদ্র্যেও দর্শনের মা বলল, না না টাকা দেবেন না। কত কষ্টের ভেতর দিয়ে আমার মেয়েকে দিন কাটাতে হবে। অনেক কিছুকেই বাদ দিয়ে তাকে চলতে হবে। বাবু, রেশমী ঘাগরা জামা আর ওড়না তার দুঃখকে কমাবে না। হয়ত আরও বাড়বে তাতে। কাল আমি না থাকলে ওর কি দশা হবে জানি না। তাই চেষ্টা করছি তাকে এমনভাবে মানুষ করতে যাতে আমি না থাকলেও সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যুঝতে পারে। যদ্দিন যেন ঠাকুর আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

এখন বুঝলাম দর্শনের সেই আত্ম-প্রত্যয়, সহজ-সরল কথা ও হাসির উৎস কোথায়। একটি প্রশ্ন জাগল—কে সত্যিকারের শিল্পী। আমার মত ক্যামেরা কাঁধে করে যারা ঘোরে, ছবি তোলে, তারা, না দর্শনের মায়ের মত যারা নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের নিখুঁত ছবি নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন আঁকে, তারা! রোগে দর্শনের মাকে দাঁতদিয়ে, নখদিয়ে, অস্ত্রদিয়ে দিনের পর দিন কুরে কুরে খেয়েও তার ইচ্ছাশক্তিকে দমাতে পারেনি।

ফেরার পথে সারাক্ষণ কে বড় শিল্পী—এই একই প্রশ্ন মগজে তোলপাড় করছিল। রাস্তার কোন দৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। আমার ক্যামেরাটাও বেকার হয়ে অসহায়ভাবে যেন আমার কাঁধে ঝুলছিল।

দেশে বিদেশে

॥ পরলোকে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের পরলোক-গমনে আমরা মর্মাহত। সদালাপী ও সুরসিক এই আচার্যস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আগত সর্বশ্রেণীর মানুষকে আপন করে নিয়েছিলেন নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। বিজ্ঞানী হিসাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ছাত্রজীবনে তিনি যেমন কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর কর্মজীবনও ছিল তেমনি গৌরবোজ্জ্বল। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট। তারপর চারুচন্দ্র পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেখানে ৩৪ বৎসরব্যাপী অধ্যাপনা-জীবনে তিনি চারজন বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানীর আচার্য হিসাবে শিক্ষাদানের গৌরব লাভ করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞান ও কর্ম-দক্ষতার প্রতি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তাঁরই আগ্রহে চারুচন্দ্র বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের দায়িত্ব নিয়ে শান্তি-নিকেতনের সান্নিধ্যে আসেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ সম্পর্ক অটুট ছিল। কর্মচক্রের আবর্তনে বাধা হয়তো তিনি অনেকই পেয়েছেন, কিন্তু শেষজীবন পর্যন্তও ছিল তাঁর দেশের প্রতি অপরিসীম মমতা। এই সেদিন তিনি আমাদের যে কথা শুনিয়েছেন এখনও তা উজ্জ্বল হয়ে আছে আমাদের মনে।

"দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে অনেক প্রিমিয়ম দিতে হয়,—কথাটা ঠিক। আমিও দিয়েছি। কিন্তু ডিভিডেন্ডও পাওয়া যেতে পারে বড় রকমের। আমি তা পাব। তাই প্রতীক্ষা করছি। আমি আমার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করব সেই ভারতবর্ষে, যে ভারতবর্ষ স্বাধীন।"

স্বাধীন দেশ এই মনেপ্রাণে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানতপস্বীর জন্যে গৌরব বোধ করবে।

॥ পরমাণবিক ॥

ভারতবর্ষে পরমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সমস্ত সুলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ব্যয় যাই হোক ভারতবর্ষকে পরমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। কেননা, একমাত্র এই ভাবেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা এর কারিগরি দিকটা আয়ত্ত করতে পারবেন। এই সম্পর্কে সরকার একটি বিশদ লিপি প্রকাশ করবেন: তাতে ব্যয় সম্পর্কে সকল সম্ভাব্য তথ্য দেওয়া থাকবে। বোম্বাইয়ের কাছে যে পরমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তা সক্রিয় হতে পাঁচ বছর লাগবে। দ্বিতীয় পর-মাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রটি ইউ. পি.-রাজস্থান-পাঞ্জাব-দিল্লী অঞ্চলের কোথাও হবে। দক্ষিণে বা অন্যত্র এমন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা ভারত সরকার এখন ভাবতে পারছেন না। উপাদান সম্পর্কে তিনি এই খবর জানান যে, কেরালা উপকূলের চাইতেও অনেক বেশী মোনা-জাইটের সন্ধান বিহারে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে ভারতীয় পরমাণবিক বিজ্ঞানীরা যে রকম একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন এবং যেভাবে ট্রম্বের পরমাণবিক শক্তি কমিশন সফলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, এই বিজ্ঞানীদের নতুন বেতন-হার শিগগিরই নির্ধারিত হবে এবং ১৯৫৯ সালের ১লা জুলাই থেকে বলবৎ হবে।

তিনি আরও জানান, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যও একটি ছোট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে; সম্ভবত এক্ষেত্রে কানাডার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তারাপুরে কেন্দ্রে অনগ্রসর দেশের বিদেশী বিজ্ঞানীদের শিক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। ভেষজের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ ব্যবস্থা এগোচ্ছে। এই সংবাদ শুনে লোকসভার সদস্যগণ স্বভাবতই খুব খুশী হয়েছেন এবং আণবিক অগ্রগতির মানচিত্রে ভারতবর্ষেরও স্থান হচ্ছে জেনে গর্বানুভব করেছেন। সমগ্র দেশের লোকও নিশ্চয়ই আনন্দ ও গর্বানুভব করবে। আজকের যুগই পরমাণবিক যুগ —কি শান্তিতে, কি যুদ্ধে পরমাণবিক শক্তি আজ অপরিহার্য। একমাত্র যুদ্ধের আশংকায়ই মনুষ্যকল্যাণে এর সদ্ব্যবহার হচ্ছে না।

॥ চেক-মানি ॥

সংবাদপত্রের একটি খবরে প্রকাশ যে, ডাক কর্তৃপক্ষ কলকাতা ও হাওড়ায় মানি অর্ডারের টাকা নগদ না দিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামে চেক দেবার কথা ভাবছেন। যুক্তি যতটা বুঝতে পারা গেল তা হচ্ছে এই যে, কলকাতা ও হাওড়ায় মানি অর্ডার বাবদ কর্তৃপক্ষকে দৈনিক আট লক্ষ ও মাসিক দুই কোটি টাকা বিলি করতে হয়। এতে ঝুঁকি নাকি ক্রমশই বাড়ছে। অর্থাৎ, যে টাকাটা বাড়ীতে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার ঝুঁকি তাঁদের (এবং এজন্যই মানি অর্ডার ফি দেওয়া হয়, ২ কোটি টাকায় সে ফি কত তাও কষে দেখা যায়), সে ঝুঁকি এখন থেকে নিতে হবে যাঁর নামে টাকা আসবে তাঁর। একে তো মানি অর্ডার সময় মতো পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত এই নতুন ব্যবস্থামতো প্রাপক টাকা পাবেন না, চেক পাবেন। যেদিন পাবেন সেদিন চেক ভাঙাবার সময় যে থাকবে না তা আমরা এখন থেকেই নিশ্চয় করে বলতে পারি। যদি পাওয়াও যায় তবে চেক ভাঙাতে যাবে কে? মানি অর্ডারের মুখ চেয়ে বসে আছেন যে অশক্ত বৃদ্ধ বা ঘরের আবদ্ধ স্ত্রীলোক—অথবা বোর্ডিং মেসের বালক বালিকা তরুণ তরুণী? তারা ছুটবে ব্যাঙ্কে—এই মারাত্মক যানবাহন এবং ছিনতাই-সংকুল পথে? প্রতিদিন ৮ লক্ষ টাকা খুচরো খুচরো বিলি বন্দোবস্তে ব্যাংকগুলোরই কি যথেষ্ট সময় হবে? তাদের কথা তারা ভাবুক, কিন্তু ব্যাঙ্কে এমনিতেই যে প্রচুর হয়রাণি তা কি আরও বেড়ে যাবে না,

ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে লাইন দীর্ঘতর হবে না? ডাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিই এই যে, মানি অর্ডার প্রাপকের ঠিকানামতো পৌঁছে দিতে হবে। তা যদি না দেন তো সে চুক্তির খেলাপ হবে। ডাক কর্তৃপক্ষের ঝুঁকি পরিহার ও সুবিধের জন্য লক্ষ কোটি লোকের মাথায় ঝুঁকি চাপিয়ে বিস্তর অসুবিধে সৃষ্টির ব্যবস্থা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ডাক কর্তৃপক্ষ এমনিতেই যথেষ্ট অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, এটি তাদের একচেটিয়া বলে লোকে সহ্যও করে, নয়া পয়সার সুযোগে টিকিট ইত্যাদির দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন, এখন মানি অর্ডার বিলির দায়িত্ব এড়াবার ফিকির খুঁজছেন—প্রকাশিত সংবাদপাঠে এই উপসংহার অনিবার্য। জনসাধারণের কাছে এমন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; যদি হয় তো ডাক কর্তৃপক্ষ এমন প্রস্তাবও করতে পারেন যে, ঝুঁকি এড়াবার জন্য এই চেক (যদি না ক্রশ চেক ক'রে আরও বিপদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়) ডাকঘরে এসে প্রাপককে নিতে হবে। ক্রমে চিঠিপত্র রেজিষ্ট্রি চিঠি ইত্যাদি সম্পর্কেও সেই ব্যবস্থা হবে। ও'রা একই জায়গায় ব'সে মাশুলটা শুধু গুণবেন। এমন একদিন ছিল যখন পিয়নদের কাছে পোষ্টকার্ড, মানি অর্ডার ফরম ইত্যাদি পাওয়া যেত। অর্থাৎ তখন ডাকঘর আসত ঘরে ঘরে; এখন বুঝি উল্টো শুরু হল।

॥ তারার মৃত্যু ॥

ব্যোমলোকে এক মহাদুর্যোগের খবর সম্প্রতি পৃথিবীতে পৌঁছেছে। ৮০ কোটি বছর আগে যে তারার মৃত্যু হয়েছে সে খবর এল আজ। আলোর গতিতে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল ছুটেও সে খবর এতদিনে পৃথিবীতে পৌঁছোলো। সে তারাও যেমন-তেমন তারা নয়, আমাদের সূর্যের মতো আয়তন তার। দূরে, বহু দূরে (কত দূরে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না) এই সূর্য ছিল নিঃসঙ্গ। নিরুপদ্রব সাধারণ 'জীবন' ছিল এই সূর্যের। সে একদিন আপন রুদ্ধ শক্তির বেগে ফেটে পড়ে এবং ঘটোৎকচের মতো আশে-পাশের উপগ্রহরাজি এবং তাতে যদি কোনো 'মরজীবন' থেকে থাকে তারাও পলকে ভস্মে পরিণত হয়েছে। একটি সূর্যের বিস্ফোরণ (এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!)। ৮০ কোটি বছর আগের বিপর্যয় এক ঝলক অত্যুজ্জ্বল আলোর মতো পৃথিবীর দৃষ্টিগোচরে এল ৮০ কোটি বছর পর। আমাদের মতো অজ্ঞ লোকদের কাছে বৈজ্ঞানিকরা শত হলফ করে বললেও বিশ্বাস্য মনে হয় না। কেননা, এইটুকু বিশ্বাস করতেও যে মগজের প্রস্তুতি দরকার তা আমাদের নেই। আমাদের পূর্ববর্তী যাঁরা তাঁরাও আজকের মহাকাশ ভ্রমণের সম্ভাব্যতা পাগলের প্রলাপ ব'লে অগ্রাহ্য করতেন। কিন্তু এই ৮০ কোটি বছর আগে এই সূর্য বিস্ফোরণের তথ্য পেশ করেছেন ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউণ্ট পালোমার অবজারভেটরীর ডাঃ ফ্রিৎস জুইকি ইণ্টার ন্যাশনাল এস্ট্রনমিকাল ইউনিয়নের কাছে ২৯শে আগষ্ট তারিখে। আমরা সাধারণ লোক খবরটা শুনে রাখি, বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণা করবেন এবং তার ফল একদিন আমরা পাব।

॥ মাছ ॥

মৎস্যভোজীদের শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে নামতে হল। আমরা বরাবর বলেছি, আমাদের সকল পরিকল্পনাই যেন হাওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা রাতারাতি আমেরিকা হব এই অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমাদের পরিকল্পনা রচয়িতাগণ আমেরিকা বৃটেন, জার্মানী, কানাডা প্রভৃতি দেশের দিকে তাকিয়ে কেবলমাত্র গুটি কয়েক শিল্পোন্নয়নের কথা ভাবেন। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পণ্য হয় বেসরকারী প্রচেষ্টার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, নতুবা কোনো বিপর্যয় না ঘটলে সেদিকে কর্তৃপক্ষ নজর দেওবাও প্রয়োজন মনে করেন না। আপাতদৃষ্টিতে এ কিছুই নয়, অথচ এই সব নিয়েই আমাদের বাস্তব জীবন। আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত; সে ভাতের জন্য আমাদের প্রকৃতির মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। কিছু আন্দোলন হলে আমরা সেদিকে মাঝে মাঝে নজর দিয়ে থাকি; কিন্তু এই অতি ন্যূনতম বাঁচার উপাদানটি সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ না করা পর্যন্ত কোনো কথা ভাবা হবে না এমন সুদৃঢ় সঙ্কল্প নেই। তেমনি গৃহ-নির্মাণ সম্পর্কে আমাদের মাঝে মাঝে সম্বিত আসে, আবার পরক্ষণেই তা ঝিমিয়ে পড়ে। চিকিৎসার অধিকাংশ ব্যবস্থা বেসরকারী প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষা শাসকবৃন্দ সর্বতোভাবে কুক্ষিগত করেছেন বটে; কিন্তু বক্তৃতাই বেশী। এই সেদিন ছাত্র ভর্তি নিয়ে কি গোলমাল গেল; তখন কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এলেন। এখন দৈনিক বাজারের ফর্দ নিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। সব জিনিসে আগুন। বিশেষ ক'রে বাঙালীদের মাছ নইলে চলে না। কিন্তু মাছের দাম যখন ২৷৷ টাকা, ৩ টাকা, ৪ টাকা, ৫ টাকা—কোথাও কোথাও ৮ টাকা পর্যন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে কর্তৃপক্ষের কিছু মাথা ব্যথা দেখা যায়নি। যেই জনসাধারণ মারমূর্তি হ'য়ে আন্দোলনে নেমেছে অমনি কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, উদ্বেগটা আন্দোলনের জন্য, সমস্যা সমাধানের জন্য ততটা নয়। লোকে বলে বাংলা নদীমাতৃক দেশ; কিন্তু সে বাংলা নেই। এ পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গেই যা নদী জলাশয় আছে তার কতটা সদ্ব্যবহার করা হয়েছে? মাছের চাষ বলে যে একটা কথা আছে তা কি আমাদের অজানা? জানি আমরা সবই; শুধু আমাদের ঔদাসীন্য অথবা পরিকল্পনাহীনতা তখন ধরা পড়ে যখন একটা হট্টগোল হয়। ঠিক এই কারণে অকারণে লোকে আন্দোলনের পথ নেয়। এ কিন্তু পরম লজ্জার বিষয়।

॥ ভোট ॥

কলকাতার ভোটার-তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কোথায় কোথায় সে তালিকা দেখা যাবে তারও ঠিকানা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কলকাতার ভোটার সংখ্যা আপাততঃ দাঁড়িয়েছে ১৪,৫২,০০০; মোটামুটি হিসেবে কলকাতার জনসংখ্যার অর্ধেক। ১৯৬০ সালে ছিল ১৩,৮৬,০০০। ২১ বছর বয়স হচ্ছে ভোটার হবার যোগ্যতার বয়স। সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে কলকাতার জনসংখ্যার অর্ধেক ২১ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক; বাকীটা শিশু এবং যাদের বয়স ২১-এর শেষসীমা স্পর্শ করেনি। এ তালিকাটি খসড়া; সামান্য কিছু অদল বদল হলেও হতে পারে; কিন্তু মূলে সংখ্যাটি এই রকমই দাঁড়াবে।

এবার তালিকা দেওয়া হচ্ছে পরিবারের কর্তা ধ'রে এবং তাঁদের পদবীর বর্ণানুক্রমে। পরিবারের কর্তার নীচে পরিবারভুক্ত অন্য সবার নাম থাকছে। পরিচয়ের সুবিধার্থে ঠিকানার মধ্যে ভোটার কোন্ তলায় কত নম্বর ফ্ল্যাটে কোন্ পল্লীর কোন্ বাড়ীতে থাকেন তার উল্লেখ থাকছে। সকল আপত্তি ৩০ দিনের মধ্যে ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের কাছে পেশ করতে

হবে। যিনি আপত্তি করবেন তিনি যথাসম্ভব দলিলপত্র দেখাবেন; নয়তো বিবৃতি দেবেন; তার ওপর ভিত্তি ক'রে যথা সম্ভব তদন্ত হবে। গণতন্ত্রে একটি ভোটের মূল্য অসাধারণ। এর প্রয়োগশক্তি যাই হোক এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয় এবং সচেতনভাবে এর ব্যবহারও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে শক্তিশালী ক'রে তোলে। এ বিষয়ে কোন রকম ঔদাসীন্য বা আলস্য বাঞ্ছনীয় নয়।

॥ কেনিয়াট্টা ॥

এ সপ্তাহের বড় সংবাদের মধ্যে কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টার কারামুক্তি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি আট বছর কারারুদ্ধ থাকার পর প্রথমে সর্তাধীনে, বর্তমানে বিনাসর্তে, মুক্তি পেলেন। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যাচ্ছে, তিনি গবর্ণর স্যার প্যাট্রিক রেনিসনের সঙ্গে কেনিয়া উপনিবেশ সম্পর্কে ৯০ মিনিট আলোচনা করেছেন। একটি যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কেনিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনিক প্রগতি, নিরাপত্তা, বন্দীমুক্তি ইত্যাদি আলোচনার বিষয়ভুক্ত ছিল। মিঃ কেনিয়াট্টা আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কিন্তু জানিয়েছেন তাঁর আইন পরিষদে যোগদানের প্রশ্নটি চূড়ান্ত হয়নি। কেনিয়াট্টার দুইজন সহকর্মী নানাবিধ বাধা-নিষেধের জন্য দেশান্তরে ছিলেন। তাঁদের ওপর থেকে বাধানিষেধ তুলে নেয়া হয়েছে এবং তাঁরা এখন দেশে ফিরতে পারেন।

কেনিয়া আফ্রিকার একটি বৃটিশ উপনিবেশ। জোমো কেনিয়াট্টাকে আমাদের দেশের গান্ধীজী বা নেতাজীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত অজ্ঞাত। বাল্যকালে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা স্বজাতীয় ধারায়ই হয়েছিল। স্বজাতীয় সংস্কার তিনি সবকিছুই পরিহার করেছেন। ইংলণ্ডে ইংরাজী শিক্ষালাভ করেন; রুশিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় কয়েকটি দেশ সফর করেন। দেশে ফিরে তিনি ক্রমশ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। শ্বেতকায়দের উপনিবেশে যা হয় এখানেও সেই বর্ণবিদ্বেষের পাপ ছিল। শ্বেতকায়রা ক্রমশ হাত পা ছড়াতে ছড়াতে যখন স্বদেশী অঞ্চলেও হাত বাড়ালো তখন লাগল সংঘাত। জোমো কেনিয়াট্টা স্বভাবতই স্বদেশীদের অনুকূলে এই সংঘাতের পুরোভাগে এলেন। তাঁর চাইতেও উগ্রতর যাঁরা, তাঁরা মাউ মাউ-য়ের হিংস্রপথ নিলেন। শ্বেতকায় শাসক কর্তৃপক্ষ জোমো কেনিয়াট্টাকেই সকল ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র বা সূত্র মনে ক'রে কারান্তরালে পাঠালেন। শাসক সম্প্রদায় আজ এতদিন পরে সম্ভবত অহেতুক নিপীড়নের দিনগুলির ভুল দেখতে পারছেন। আফ্রিকা তো আর সে আফ্রিকা নেই। লোকে বলে, এর অরণ্য আজ জাগ্রত।

॥ জন্ম-মৃত্যু ॥

পৃথিবীর মধ্যে আফ্রিকার জন্মের হারও বেশী, মৃত্যুর হারও বেশী। রাষ্ট্রপুঞ্জ জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞগণ এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। আফ্রিকার জন্মহার হচ্ছে প্রতি হাজারে ৪৭ এবং মৃত্যু ২৮। সবচাইতে কম জন্ম হার হচ্ছে—ইউরোপে ঃ হাজারে ১৯। সারা পৃথিবীর গড়পড়তা জন্মহার হচ্ছে হাজারে ৩৬, মৃত্যুহার ১৯। মৃত্যুহার সবচাইতে কম সোভিয়েট রুশিয়ায়—হাজারে আট। ওসেনিয়ায় ৯, উত্তর আমেরিকায় ৯, ইউরোপে দশ।

নরওয়ের আয়ু দীর্ঘতম, পুরুষের গড়পড়তা প্রত্যাশিত আয়ু ৭১ এবং মেয়ের ৭৫। নেদারল্যাণ্ডস ও সুইডেনে পুরুষের গড়পড়তা আয়ু ৭১; ইংলণ্ড ওয়েলসে মেয়েদের গড়পড়তা আয়ু ৭৪। সবচাইতে কম আয়ু হচ্ছে গিনিবাসীদের —৩০ বছর, হাইতিবাসীদের ৩২, **ভারতীয়দের—৩১।**

শিক্ষার দিক থেকে শতকরা ৯০ জন আফ্রিকাবাসী নিরক্ষর। তার মধ্যে সোয়াজিল্যাণ্ডে শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর। সবচাইতে দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে সোভিয়েট ইউনিয়ানে; ১৯২৬ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে নিরক্ষরের হার শতকরা ৫৩ থেকে ২-এ নেমেছে। সিংহলে ৬৬ থেকে ৩২-এ, গ্রীসে ৫০ থেকে ২৬-এ, ফিলিপাইনসে ৫১ থেকে ২৫-এ নিরক্ষরের হার হ্রাস পেয়েছে। ইউরোপের ভেতর জিব্রাল্টারের নিরক্ষরের হার সর্বাধিক; তা হচ্ছে শতকরা ৩৫।

শিশু-মৃত্যুর হার সবচাইতে বেশী—নর্দার্ন রোডেশিয়া, উগাণ্ডা, গিনি ও সিকিম। হাজারে ২০০।

পুরুষের চাইতে মেয়ের সংখ্যা কোথায় বেশী?—ইউরোপে, অধিকাংশ দক্ষিণ আমেরিকায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ানে। অন্যত্র পুরুষের সংখ্যা বেশী।

॥ চিনি ॥

বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারতীয় চিনি আমেরিকায় চালান হ'ল। প্রথম কিস্তিতে ৮০০০ টন যাচ্ছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২,২৫,০০০ টন নিতে রাজী হ'য়েছে। এ বছরের শেষে এই চিনির বিনিময়ে ১২ কোটি টাকার আনুপাতিক ডলার উপার্জন করা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী সম্প্রতি আমেরিকা সফরকালে আমেরিকাকে ভারতীয় চিনি কিনতে রাজী করান। আমেরিকা ভারতবর্ষকে পরিকল্পনার জন্য টাকা ধার দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীপাতিলের যুক্তি ছিল এই যে, ভারতবর্ষ থেকে এই ভাবে কিছু কিছু জিনিস আমদানীতে রাজী হ'লে ভারতের পক্ষে মার্কিণ ঋণ পরিশোধ করা সহজ হবে। আমেরিকা ৫ লক্ষ টন চিনি নিলে তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রথম দু'বছরের মার্কিণ ঋণ দশ বছরে শোধ ক'রে দেয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীপাতিলের এই ফলপ্রসু উদ্যমের প্রশংসা ক'রে বলেন যে কিছু ক্ষতি বা অসুবিধে হ'লেও ভারতীয়দের রপ্তানী বাড়াতে হবে। কিউবার বিপ্লবের পর আমেরিকা হয়তো সেখানকার চিনি নেবে না। কিন্তু আমাদের পক্ষে এ কৌতুকাবহ এই কারণে যে, আমরা এককালে জাভা প্রভৃতি স্থান থেকে যে পথে চিনি আমদানী করতাম সে পথেই, অর্থাৎ কলকাতার বন্দর পথে আমরা আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ দেশে চিনি রপ্তানী করছি। কিন্তু অত্যধিক দামের চাপে স্বদেশে যদি চিনি তেতো হ'য়ে ওঠে তবে এ আনন্দ বা গৌরব পরোপুরি উপলব্ধি করা যাবে না।

॥ চোর ॥

২১শে আগষ্ট রাত্রে লণ্ডনের ন্যাশানাল গ্যালারি থেকে গোয়ার বিখ্যাত 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' আলেখ্যখানি অপসারিত হয়েছে দেখা যায়। এ চোরেরই কাজ ব'লে সংবাদে জানা যাচ্ছে। ছবিখানি এই কিছুকাল আগে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল। তারপর ওটি গ্যালারির দোতলায় প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে সযত্নে রাখা হয়। গ্যালারি বন্ধ হ'য়ে যাবার পর এক বা একাধিক ব্যক্তি চিত্রটি অপসারণ ক'রে থাকবে। কি উদ্দেশ্যে কে জানে। নিয়েই বা কি করবে? ছবি দেখবার জন্যই; গোপনে রাখার জন্য নয়। ও ছবি বেচলেই বা কে কিনবে? এক নষ্ট করা—এমন প্রবৃত্তিও হবে?

॥ ঘরে ॥

১৮ই আগষ্ট—১লা ভাদ্র ঃ পাক্ বিমান কর্তৃক বিগত ৭ মাসে ১৪ বার ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন—লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ভি. কে কৃষ্ণমেননের বিবৃতি।

'রাষ্ট্রপতি (ভারত) পদের জন্য দুইবারের বেশী প্রার্থী হওয়া অনুচিত' —রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর অভিমত ব্যক্ত।

১৯শে আগষ্ট—২রা ভাদ্র 'ফরাক্কা বাঁধের কাজ চলিয়াছে ঃ কাজ স্থগিত বা বন্ধ রাখার ইচ্ছা সরকারের নাই'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

করিমগঞ্জ (আসাম) সীমান্তে ভারতীয় গ্রামে সশস্ত্র পাকিস্তানীদের হানা—একজন নিহত ও দুই ব্যক্তি আহত—গুলীবর্ষণের পর সহস্রাধিক টাকার সম্পত্তি লুন্ঠন।

২০শে আগষ্ট—৩রা ভাদ্র ঃ 'ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থাকা চাই'—দিল্লীতে শ্রীভেঙ্কটেশ্বর কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ এস রাধাকৃষ্ণণের দাবী।

কল্যাণীতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের উদ্বোধন।

'উৎপাদন সম্প্রসারণ সত্ত্বেও ভারতে দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি—কৃষি ও শিল্পে অগ্রগতি ঃ বৈদেশিক লেন-দেনের অবস্থার আরও অবনতি'—১৯৬০-৬১ সালের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট।

২১শে আগষ্ট—৪ঠা ভাদ্র ঃ কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলে ক্রেতাদের মৎস্য বর্জন আন্দোলন শুরু—মৎস্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিভিন্ন বাজারে পিকেটিং—রাজ্যসরকারের মৎস্য দপ্তর কর্তৃক মৎস্য সংকটের কারণ সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ।

'আসামের ভাষা-হাঙ্গামার ব্যাপারে সাধারণ তদন্ত বর্তমানে সমীচীন হইবে না'—রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

'পাঞ্জাবী সুবা আলোচনার ভিত্তি হইলে সাক্ষাতে প্রস্তুত'—প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) পত্রের উত্তরে শিরোমণি আকালী দলের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীসন্ত ফতে সিং-এর উক্তি—অনশনরত মাষ্টার তারা সিং-এর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির সংবাদ।

২২শে আগষ্ট—৫ই ভাদ্র ঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে প্রস্তাবিত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্র-ভারতী' নামকরণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

'প্রাচ্য-প্রতীচ্য, শান্তিপূর্ণ আলোচনাই জার্মাণ সমস্যা সমাধানের পন্থা'—রাজ্যসভায় পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

পাটের ন্যূনতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি —ডাঃ রায়ের সহিত ভারতীয় পাটকল সমিতির প্রতিনিধিদের বৈঠক।

মাছের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কলিকাতায় ক্রেতাদের প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত—শহরতলীর বিভিন্ন বাজারেও মাছ কেনাবেচা বন্ধ।

২৩শে আগষ্ট—৬ই ভাদ্র ঃ দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আকালী নেতা শ্রীসন্ত ফতে সিং-এর দীর্ঘ আলোচনা—আকালী নেতৃবর্গের সহিত নেহরুর পত্রালাপের বিবরণ সংসদে পেশ।

চড়া দরে মাছ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি—শীঘ্রই কলিকাতায় প্রচুর মাছ প্রেরিত হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিলের ঘোষণা।

ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি—রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৪শে আগষ্ট—৭ই ভাদ্র ঃ 'পাঞ্জাবী সুবা' গঠন প্রশ্নে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও সন্ত ফতে সিং-এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা।

মৎস্য-মূল্য-বৃদ্ধি-বিরোধী গণবিক্ষোভকে ব্যাপক রূপদান—অষ্ট বামপন্থী দলের মিলিত উদ্যম—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথসভা ও মুখ্যমন্ত্রী সকাশে ডেপুটেশন প্রেরণ।

লোকসভায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভোটাধিক্যে অনুমোদিত।

॥ বাইরে ॥

১৮ই আগষ্ট—১লা ভাদ্র ঃ রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে পর্তুগালের অভিযোগ—দাদরা ও নগর-হাভেলির অন্তর্ভুক্তি পররাজ্য গ্রাস বলিয়া বর্ণনা।

জাপান কর্তৃক ভারতকে ৮ কোটি ডলার ঋণ দান—টোকিও-এ সংশ্লিষ্ট দুই সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৯শে আগষ্ট—২রা ভাদ্র ঃ বার্লিন সম্পর্কে পশ্চিমী প্রতিবাদ সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক অগ্রাহ্য—পূর্ব বার্লিনের অবলম্বিত ব্যবস্থায় পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা।

পশ্চিম জার্মাণীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে আমেরিকা বদ্ধপরিকর—মার্কিণ ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের বার্লিন (পশ্চিম) আগমন।

২০শে আগষ্ট—৩রা ভাদ্র ঃ 'কাশ্মীর প্রশ্নে শ্রীনেহরুর (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) নীতি অযৌক্তিক ও অর্থহীন'—পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের আর একদফা ভারত-বিরোধী বিষোদ্গার।

মার্কিণ যোদ্ধ-বাহিনীর প্রথম দলের বার্লিনে প্রবেশ—পূর্ব জার্মাণীর মধ্য দিয়া অগ্রগমন—সোভিয়েট ও পূর্ব জার্মাণ সরকার কর্তৃক সীমানায় কোনরূপে বাধা না দেওয়ার সংবাদ।

২১শে আগষ্ট—৪ঠা ভাদ্রঃ 'বার্লিন লইয়া যুদ্ধ পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে'—জাপান সফরকালে সোভিয়েট প্রথম সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ আনাস্তাস মিকোয়ানের হুঁসিয়ারী—গণ-চীনের পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনের অধিকার আছে বলিয়া মন্তব্য।

'টিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের আক্রমণ পূর্বপরিকল্পিত'—সাধারণ পরিষদের (রাষ্ট্রসংঘ) বিশেষ অধিবেশনে টিউনিসীয় প্রতিনিধির অভিযোগ।

২২শে আগষ্ট—৫ই ভাদ্র ঃ রাশিয়ায় আণবিক আক্রমণের জন্য পাকিস্তানের ঘাঁটি ব্যবহারের ষড়যন্ত্র—পাকিস্তান কর্তৃক সোভিয়েট অভিযোগ অস্বীকার।

চলাচলের উপর পূর্ব জার্মাণ সরকারের আরও কড়াকড়ি—পূর্ব বার্লিনে পদব্রজে ঢুকিতে চাহিলেও পশ্চিম বার্লিনবাসীদের ছাড়পত্র চাই—পূর্ব হইতে পশ্চিম বার্লিনে গুলী চালনায় অভিযোগ—পশ্চিম বার্লিন কর্তৃপক্ষের সতর্কবাণী।

২৩শে আগষ্ট—৬ই ভাদ্রঃ বার্লিনের দুই অংশেই বিপুল পরিমিত সৈন্য সমাবেশ—সীমান্তরেখা বরাবর মিত্রবাহিনীর (পশ্চিমী) টহল।

রুয়াণ্ডা ও উরুণ্ডিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা—শতাধিক ব্যক্তি নিহত ও পাঁচশত জন আহত হওয়ার সংবাদ।

বার্লিন প্রসঙ্গে পশ্চিমী ত্রিশক্তির নিকট সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন নোট প্রেরণ—ধ্বংসাত্মক কার্যের জন্য পশ্চিম বার্লিনে যাইবার বিমানপথ ব্যবহারের প্রতিবাদ—পশ্চিমী শক্তিবর্গ কর্তৃক নোট পর্যালোচনা—ওয়াশিংটনে মিত্রপক্ষীয় কূটনীতিকদের গোপন বৈঠক।

২৪শে আগষ্ট—৭ই ভাদ্রঃ বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি—২৪টি রাষ্ট্রের যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত।

অভয়ংকর

॥ সাহিত্যিক-সমাচার ॥

আমাদের দেশে সাহিত্যিক-সমাচার পরিবেশনের রীতি এখনও গড়ে ওঠেনি, এমন কি সাহিত্যিকের মৃত্যু-সংবাদও সংবাদ নয়। সাহিত্যিক-সমাচার বা লিটারারি-গসিপ প্রকাশ করা বিদেশে রীতি আছে এবং পাঠকসাধারণ তা আগ্রহসহকারে পাঠ করেন। 'অমৃত'-র সমকালীন সাহিত্য বিভাগে মাঝে মাঝে কিছু সাহিত্যিক এবং সেই সঙ্গে সাহিত্য-সমাচার বিতরণের চেষ্টা করা যাবে।

সংবাদপত্র সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কিছু উদাসীন মনে হয়, নইলে সকলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অনেক খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে, যা খুবই অকিঞ্চিতকর। অথচ এক-জন প্রবীণ সাহিত্যিকের মৃত্যুসংবাদ মৃত্যুর অনেকদিন পরে 'A' চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হয়। 'A' কথাটির অর্থ—বিজ্ঞাপন, আর লেখকটির নাম—রাজেন্দ্রলাল আচার্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাহিত্যিকের সংবাদমূল্য কম।

স্বর্গতঃ রাজেন্দ্রলাল আচার্য প্রবীণ সাহিত্যসেবী। বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুল ভার্ণের চমকপ্রদ উপন্যাসগুলি তিনি অনুবাদ করেছিলেন এবং বাংলায় জনপ্রিয় করেন। টলস্টয়ের "রেসারেক্সন" উপন্যাসের অনুবাদও তিনি করেছিলেন 'পুনর্জন্ম' নামে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। এছাড়া 'বাঙালীর বাহুবল' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটিও তাঁরই লেখা। রাজেন্দ্রলাল আচার্য পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন, তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

আর একজন সাহিত্যিক ৪ঠা আগস্ট তারিখে পরলোকগমন করেছেন, তিনি কবি ও সাংবাদিক সুবোধ রায়। সুবোধ রায় 'কল্লোল' ও 'কালিকলমের' যুগের লেখক। 'বিজলী' (সাপ্তাহিক), দৈনিক বঙ্গবাণী, সাপ্তাহিক খেয়ালী ও মাসিক চিত্রালীর সঙ্গে তিনি সম্পাদনাসূত্রে জড়িত ছিলেন। এই সদানন্দময় পুরুষ 'কল্লোলে'র কালের সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আবার আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়েরও অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। অচিন্ত্যকুমার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কল্লোল যুগে' লিখেছেন ঃ

"ছোটো বেঁটেখাটো মানুষটি এই সুবোধ রায়। অফুরন্ত উচ্চহাস্যের ও উচ্চরোলের ফোয়ারা। প্রচুর পান খান আর প্রচুর কথা বলেন। আর উচ্চগ্রামের সেই কথায় আর হাসিতে নিজেকে অবারিত করে দেন।"

সুবোধ রায় 'কালিকলম' সম্পাদক মুরলীধর বসুর সহপাঠী ছিলেন, গত বছর শীতকালে মুরলীধর পরলোকগমন করেছেন। সুবোধ রায়ের মৃত্যু তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছে বেদনাদায়ক।

শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ) ম্যাগসেসাই পুরস্কার লাভ করেছেন নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য। বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতার এই প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মাননার অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ অভিনন্দন জানিয়েছেন, দেশ-বিদেশ থেকেও অনেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্র আজ যখন উপর-মহলের কাছে উপেক্ষা এবং উপহাস লাভ করেছে সেই সময়ে এই পুরস্কারলাভ এক হিসাবে বাংলা-সাংবাদিকতার গৌরব-বৃদ্ধি। শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী মুখ্যতঃ সাংবাদিক, কিন্তু 'ট্যাক্সিচালক' সংক্রান্ত একটি রম্য রচনায় তাঁর অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভাও লক্ষ্য করেছি। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

প্রবীণ অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে এই বছর বঙ্গীয় কংগ্রেস গুণীজন হিসাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, তিনি অসুস্থ তাঁর বাড়ি গিয়ে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য স্বর্গতঃ পরশুরামের বন্ধু এবং 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের লেখক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের পৌত্র এবং হরিনাভি গ্রামের অধিবাসী। স্বভাবসুলভ রসিকতার জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয়। সম্বর্ধনার প্রতিভাষণে তিনি বলেন ঃ "দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে অনেক প্রিমিয়ম দিতে হয়, কথাটা ঠিক। আমিও দিয়েছি। কিন্তু ডিভিডেন্ড পাওয়া যেতে পারে বড়ো রকমের। আমি তা পাব। তারই প্রতীক্ষা করছি। আমি আমার শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো সেই ভারতবর্ষে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন।" এইদিন ভট্টাচার্য-মহাশয় স্বদেশী আমলের কয়েকটি অতিপরিচিত ঘটনার উল্লেখ করেন।

কবি রাধারাণী দেবীকেও বঙ্গীয় কংগ্রেস সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন ১৮ই আগস্ট। তাঁর 'লীলাকমল', 'বনবিহগী', 'সিঁথি মৌর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সাহিত্য-রসিকদের তৃপ্ত করেছে। সম্বর্ধনার উত্তরে রাধারাণী দেবী বলেন ঃ "বাংলা সাহিত্যের দুনিয়া থেকে আমি অবসর গ্রহণ করেছি। সে অবসর স্বেচ্ছাকৃত, যখন দেখলাম যে আমার শিল্পীসত্তা শিল্পাদর্শের সমকক্ষ হচ্ছে না তখনই বিদায় নিয়েছি। আমি সাহিত্যের নিত্য-কালের আদর্শে বিশ্বাসী—খণ্ডকালের নয়।"

এই বছর ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি যে চারজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে সম্মানিত করেছেন তার মধ্যে একজন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। তিনি ইতিপূর্বে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' ও 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেছেন।

১৮ই আগস্ট তারিখেই ইণ্ডিয়া ব্রাদার হুড সোসাইটি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে তাঁর "অখণ্ড অমিয়—শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থ রচনা সমাপ্তির জন্য সম্বর্ধিত করেছেন। 'পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরমা-প্রকৃতি সারদামণি' ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দে'র পর অচিন্ত্য-কুমার এই আর একটি সুবৃহৎ জীবনী-সাহিত্য রচনা করলেন। তাঁর 'গরিয়সী-গৌরী' ও 'করুণাধন' নামক জীবনী দুটিও সমাপ্তির পথে।

কুমার সিং হলে অশীতিপর বৃদ্ধ জৈন দার্শনিক ও লেখক পূরণচাঁদ সাম-সুখাকে সম্বর্ধিত করা হয়। এই সম্বর্ধনার আয়োজন করেন স্থানীয় জৈনগণ এবং বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরাগী-বৃন্দ। এই উপলক্ষ্যে সংগঠকবৃন্দ বিগত ষাট বছর ধরে তাঁর যে সব রচনা প্রকা-শিত হয়েছে তার এক সংকলন গ্রন্থ উপহার দান করেন। শ্রীযুক্ত সামসুখা এই সম্বর্ধনায় অভিভূত হয়ে বলেন—

"তাঁর বাঙালী বন্ধুরা যে তাঁকে এত ভালোবাসেন তা তিনি জানতেন না।"

কেরী-সাহেবের দ্বি-শতবার্ষিকী উৎসব বাংলাদেশে মহা আড়ম্বরে বিগত ১৭ই আগস্ট তারিখে প্রতিপালিত হয়েছে। এই সূত্রে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় আবার নতুন করে কেরী-সাহেবের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। কেরী-জীবন অবলম্বনে একটি নাটকও অভিনীত হয়েছে।

যোহান ভোলফ্ গাঙ ফন্ গ্যোতে'র জন্ম উৎসব ২৮শে আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে মোক্ষমূলার ভবনে ২৩শে আগস্ট, ২৬শে আগস্ট, ২৭শে আগস্ট এবং ২৮শে আগস্ট মহাকবি গ্যোতের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি কবিগুরুর বিখ্যাত নাটক 'ফাউস্ত' মূল জার্মান ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলী।

অবনীন্দ্র পরিষদ আগামী ১লা সেপ্টেম্বর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৯১তম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব পালন করবেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আগামী সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিনি প্রায় তিন মাসকাল যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করবেন।

শতাব্দী বৎসরে একটি বিশেষ 'টেগোর এওয়ার্ড' বা ঠাকুর পুরস্কার প্রদানের সংকল্প করেছেন সাহিত্য আকাদেমি। শতাব্দী বৎসরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গবেষণা, রচনা, সম্পাদনা বা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য মূল্যায়নে যে লেখকের গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে, তাঁকে এই পুরস্কার দান করা হবে। ষোলটি ভারতীয় ভাষার যে কোনো একটিতে রচিত গ্রন্থ পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হবে। পুরস্কারের মূল্য ১০,০০০ টাকা। দিল্লীতে সাহিত্য আকাদেমি ও ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্সের সংযুক্ত সাহিত্য-সম্মেলনে আগামী ১১ই নভেম্বর এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন যা সর্বপ্রথম কলিকাতায়, পরে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এইবার ১৭ই নভেম্বর তারিখে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হবে। সারা ভারতের প্রায় ২০০ জন সাহিত্যসেবী এই সম্মেলনে যোগদান করবেন।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াই, বি, চাবনকে সভাপতি করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন মাসতি ভেংকটেশ আয়েংগার, বিখ্যাত কানাড়ী লেখক। এই সম্মেলনে ইংরেজী ভাষায় লিখিত নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী পাঠ এবং আলোচনা হবে : "বাস্তবতার সাহিত্যিক মূল্য", "কবিতায় আধুনিকতা", "ভারতের থিয়েটার", "সাহিত্য সাময়িক পত্রিকার সমস্যা", "লেখকের ব্যবসায়িক সমস্যা", "বেতার ও লেখক" এবং "লেখকের কর্মে সমালোচনার উপকারিতা"। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় মহাজাতি সদনে প্রতি বছরের মত 'শরৎ সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে। শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা এবং শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন নাটক অভিনীত হবে এই চারদিনব্যাপী উৎসবে। প্রতি বছরের মত এবারও তিনজন প্রখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। গত বৎসর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র এই সম্মেলন কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়েছেন।

এইবার একটি চমকপ্রদ বিদেশী খবর—

ব্রিটেনের সর্বোত্তম Angry young Man হলেন বিখ্যাত নাট্যকার জন অসবর্ন। তিনি বামপন্থী পত্রিকা 'Tribune'-এ বার্লিন সংকটে তাঁর দেশবাসীর মনোভাব উদ্ঘাটিত করে এক 'ঘৃণার পাঁচালী' রচনা করেছেন, একটি পত্রের মাধ্যমে।

অসবর্ণ রচিত Look Back in Anger একটি বিখ্যাত নাটিকা, তাঁর এই ঘৃণার পাঁচালীতে পিছনে তাকান ত্যাগ করে তিনি ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবেছেন, এবং তার ফলে লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকার হেডলাইনে এবং বি, বি সির প্রসারিত সংবাদের মাধ্যমে তাঁর এই

অাঁগ্নগর্ভ বাণীর অংশ বিশেষ প্রচারিত হয়েছে।

অসবর্ন শুরু করেছেন এই ভাবে—"এ চিঠি ঘৃণার চিঠি, হে আমার স্বদেশবাসী এ চিঠি তোমাদের উদ্দেশ্যে লিখিত, আমার স্বদেশবাসীর অর্থ এক্ষেত্রে তারাই যারা এদেশকে কলঙ্কিত করেছে। যে সব মানুষ তাদের বাতিকগ্রস্ত অঙ্গুলি-হেলনে দৃষ্টিহীন, দুর্বল, এবং বিশ্বাসবঞ্চিত আমার দেশকে মৃত্যুমুখে নিয়ে চলেছে। তোমরা খুনী আর আমার মস্তিষ্কে তোমাদের হত্যা করা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই।

আমার মস্তিষ্কে খুন টগবগিয়ে উঠেছে, আর আমার হৃদয়ে তোমাদের সবাকার জন্য একটি শাণিত ছুরিকা বহন করছি। ম্যাকমিলন এবং তুমি গেটস্কেল—বিশেষ করে তুমিই। আমার ইচ্ছা করে তোমাদের সকলকে তোমাদের ঐ নোংরা পারিষদসহ যদি ফাঁসীতে লট্‌কাতে পারতাম, তোমাদের ঐ ঘৃণিত Oder-Neisse-Line-এর অপরাধে, আর সেই সঙ্গে দশজনের মধ্যে সাতজন আমেরিক্যানকে—(এই দশজনের মধ্যে সাতজন আমেরিক্যান সাম্প্রতিক এক 'পাবলিক ওপিনিয়ন পোলে' বলেছেন যে তাঁরা বার্লিনের জন্য লড়বেন)।"

অসবর্ন আরো লিখেছেন—"আমি খোশ মেজাজে ওয়েস্টের জন্য তোমাদের প্রাণ বিসর্জন করতে দেখব, যদি আমার সামান্যতম অংশ বাঁচাতে পারি, তোমরা সবাই চলে যাও, বার্লিনের জন্য মরো, ডেমোক্রেসি বাঁচাও, তাকে লাল দস্যুর হাত থেকে ত্রাণ করো, যা খুশী করগে যাও।"

অসবর্নের চিঠির শেষাংশ তার নিজের ভাবাতে এবং যেভাবে ওদেশের সংবাদপত্রে এবং বি-বি-সি থেকে প্রচারিত হয়েছে সেইভাবেই উধৃত করা শ্রেয়: "Damn your England, you are rotting now, and soon you will disappear"—এবং চিঠির শেষে পাঠ— "In sincere and utter hatred, your fellow countrymen."

অসবর্ন যদিচ Angry—তিনি এখন আর Hungry ন'ন। খ্যাতি এবং অর্থ তাঁর প্রচণ্ড। তাঁর একখানি জেগুয়ার গাড়ি আছে, তিনি তাঁর ছুটির অবসর কাটান প্রমোদ-বাগিচার ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায়। সেই ভ্যাগাবান থেকে তিনি ১৭ই আগস্ট তারিখে বলেছেন: 'বার্লিন পরিস্থিতিতেই আমার চিত্ত-বিক্ষোভ ঘটেছে এবং এই চিঠি লিখেছি, তবে আমি সংবাদপত্র দেখিনি প্রায় সপ্তাহখানেক, সুতরাং বর্তমান অবস্থা জানি না।"

জন অসবর্নের সাম্প্রতিক নাটক "Luther" লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁর স্ত্রী মেরী উরি স্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন-এ্যাভনের শেক্সপীয়ার থিয়েটারে 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের নায়িকা।

এই Angry young man বর্তমান যুগের এবং জীবনের প্রতিচ্ছবি। বৈপরীত্য এবং বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

আজ রাজা কাল ফকির—(উপন্যাস) স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক-সাহিত্য। কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি অল্পকালের ভিতর উপন্যাসকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'আজ রাজা কাল ফকির' তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক রাজেন্দ্রকুমার বা রাজা অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে একরকম রূপার চামচ মুখে দিয়ে মানুষ, ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সে ফকির হয়ে গেল। সে দেখল নিঃস্ব অবস্থায় তার কেউ সহায় নেই, কেউ তার বন্ধু নয়, নারীর প্রেমও দুর্লভ, মল্লিকা তাই তাকে অবহেলা ও অপমানে জর্জরিত করে। বন্ধু অসীম ভুলে যায় তার অপরিসীম সাহায্যের কথা—ফলে রাজা সুরার অমৃতধারায় জীবনের ব্যথা ও বেদনা ভুলতে চায়, সেই সময় দেখা আরিয়েৎ-এর সঙ্গে, সেই তার পুনরুজ্জীবনের পথে সহায়ক, সে রাজাকে গভীর পাঁক থেকে তুলে আবার মানুষ হওয়ার সুযোগ দান করে। রাজা, মল্লিকা, হরিপদ, অসীম, প্রভৃতি চরিত্রাবলী নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, মঁসিয়ে গিউম চরিত্রটি অনবদ্য। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমধুর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীতে উপন্যাসটি আশ্চর্য করুণ-মধুর কাহিনী হিসাবে সার্থক হয়েছে।

প্রচ্ছদ চিত্র মনোরম। ছাপা সুন্দর।

সেকালের বুখারায়—স দ রু দ্দী ন আইনী। অনুবাদ—বিনয় মজুমদার। প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (পি) লিমিটেড। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

সদরুদ্দীন আইনীর মূল রুশ কাহিনী থেকে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিনয় মজুমদার। অনুবাদ এতই সুন্দর ও সাবলীল যে, গ্রন্থটিকে অবলীলাক্রমে পড়া যায়। আত্মকথনের ভঙ্গীতে প্রাচীন বুখারার জীবন সম্পর্কে এই কাহিনীটি দুটি বিভিন্ন খণ্ডে রচিত। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে পুরানো দিনের আমেজ চমৎকার ফুটেছে। প্রথম খণ্ডে দুটি গ্রামের কথা এমনই অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে বর্ণিত যে পাঠকালে আমাদের বাংলাদেশের গ্রামীন জীবনের কথা মনে পড়ে। দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে গ্রামের মানুষের শহরবাসের বৃত্তান্ত। এই গ্রন্থটির সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশের জন্য অনুবাদক এবং প্রকাশক অভিনন্দনযোগ্য। শুধু গ্রন্থের প্রারম্ভে সদরুদ্দীন আইনীর জীবন ও সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে কিছু বিবরণ থাকা উচিত ছিল।

প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ সুরুচিগত।

আহির ভৈ রোঁ—শ্রীপারাবত। গ্রন্থ জগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·০০

শ্রীপারাবত রচিত আহির ভৈ রোঁ সাগরখালি নদীর ধারে হংসপুর গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের একটি আলেখ্য। বঙ্গ-ভঙ্গের পর 'বর্ডারের' নিকটস্থ গ্রামগুলির সমস্যা কিরূপ ছিল, আইন ও পুরুষ-পরম্পরাগত সংস্কার যে একত্রে চলতে পারে না তা লেখক দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি সামাজিক প্রশ্নেরও অবতারণা করেছেন। মানুষের মজ্জাগত সংস্কার ও বিশ্বাস যে নূতন কোন পরিস্থিতিকে হঠাৎ গ্রহণ করতে পারে না, তা দেখা যায় মেজুদ্দিন ও অবনী মণ্ডলের আলোচনার মধ্যে।

উপন্যাসখানির প্রারম্ভিক ঘটনাগুলি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। টাকার প্রলোভন যে কত ভয়াবহ হতে পারে এবং সে প্রলোভন যে নিজের কন্যারও সর্বনাশ করতে পারে, তা দেখতে পাওয়া যায় হরেকেষ্টর শ্বশুরের আচরণে ও খানিকটা প্রাণকেষ্টর ব্যবহারে। সাত বছরের মেয়ে বালিকা বধূ ক্ষুদীর মনের যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা বিশেষ উপভোগ্য। উপন্যাসখানি যতই পরিণতির দিকে এগিয়েছে ততই উমা ও লক্ষ্মীর চরিত্র একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে এবং হরেকেষ্ট ও নীলুর হৃদয়ের দ্বন্দ্ব স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মীর জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি উমার চারিত্রিক জটিলতা, নীলুর শোক, হরে-

কেষ্টর বিহ্বলতা, নন্দর পরিবর্তন, কুন্দীর বালিকাসুলভ চাপল্য অথচ গাম্ভীর্য, সবই মানবোচিত হয়েছে। প্রচ্ছদপট ও ছাপা মোটামুটি ভালই।

কৌতুকপুরের রূপকথা তারকদাস চট্টোপাধ্যায়। পুঁথি ঘর—২১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি—৬। দাম—৭.০০।

গাঙ্গেয় উপত্যকার ছোট একটি গ্রাম কৌতুকপুর। নিম্নশ্রেণীর মানুষ দুলেরাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক রয়েছে যারা নিজেদের অবসর ও অকাজের সময়টুকু পরের কুৎসা নিয়েই মেতে থাকে। দুলের ছেলে দুর্দান্ত দুঃসাহসী পঞ্চুর সাথে তার বউয়ের বনিবনা হল না। পঞ্চুর পৌরুষত্বে আঘাত দিয়ে যখন তার বউ অন্যের ঘরে যায় তখন চরম অত্যাচার নেমে আসে বউয়ের কপালে। রাগ করে চলে যায় বউ বাপের বাড়ী। হারিয়ে যাওয়া সাবিত্রীকে নিয়ে ভুলে থাকতে চাইল পঞ্চু। কিন্তু থাকতে পারল কই। গ্রামের জমিদার তার বাল্যবন্ধু ভূপতি মজুমদার মিথ্যা অজুহাতে তাকে জেলে পাঠাল টাকার জোরে। সাবিত্রী পঞ্চুর হাতে তৈরী ফসলের দিকে তাকাতে তাকাতে ঘরে ফিরে এল।

ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় দুটি সমাজের মানুষের রূপ ফুটিয়েছেন সুন্দরভাবে। "ছোটমোক" যারা শত রকমের সামাজিক অব্যবস্থাকে চোখে দেখে না, স্বাভাবিক বলে মনে করে; সেইগুলো ভদ্রলোকের ইন্ধনসংযোগে কতটুকু জঘন্য রূপ ধারণ করে তার পরিচয় পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে। পল্লী-মানুষের কুসংস্কার, দয়াদিদিমার নিঃস্বার্থ কর্মযজ্ঞ, অভয় মোড়লের সত্যবাদিতা আশ্চর্য রূপ লাভ করেছে। যে সত্যনিষ্ঠা, স্বাভাবিকতা অনেক সময় ভদ্রসমাজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আঞ্চলিক উপন্যাসের গোত্রে ফেলে বিচার করলে বলা যায় যে, গ্রন্থটির মধ্যে সে সমস্ত গুণের অভাব নেই যা থাকলে আঞ্চলিক মানুষের নিখুঁত চিত্র ফুটে। —সংলাপ সৃষ্টিতে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব কম নয়। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় সমালোচিত "সুর ও বাণী" গ্রন্থের লেখকের নাম বিমানচন্দ্র পাল।

দুই চোখের দেখা—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম ৩.০০।

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের জগতে শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী। তাঁর লেখনী কেবলমাত্র গল্প-উপন্যাস রচনার মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে বিচিত্র জীবন সম্পর্কে আলোচনায়ও নিবদ্ধ রয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। দার্জিলিং, কলকাতার কফি হাউস, ময়দান আর রেসকোর্স, গঙ্গার তীর, কলকাতার বৃষ্টি, পূজোর বাজার প্রভৃতি দেখা দেয় সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ রূপে। যে লঘু-তুচ্ছ ঘটনাগুলি আমাদের চোখে কোনরূপ মূল্য নিয়ে দেখা দেয় না—সেগুলি শিল্পীর দৃষ্টিতে এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তারই সুমধুর প্রকাশ রয়েছে এ গ্রন্থে। অত্যন্ত লঘু-চালে বর্ণনা করবার ফলে গ্রন্থখানির সরস রূপ পাঠকের চোখে সহজেই ধরা দেবে।

রাবীন্দ্রিকী—ধীরানন্দ ঠাকুর। বুক-ল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ। ১নং শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়কর। বিশ্বের সত্য ও সুন্দর নানা রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল তাঁর মনশ্চক্ষে।

তারই স্বীকৃতি শতবর্ষ পরে জানাচ্ছে সমগ্র বিশ্বের সত্যসন্ধানী মানুষেরা। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী বৎসরে প্রকাশিত রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন "রবীন্দ্রিকী" গ্রন্থখানি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থের অন্যতম বিশিষ্ট প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য।" রবীন্দ্র-মানসে বুদ্ধের বাণী কতদূর প্রভাবিত করেছিল গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সহজবাদ শুধু তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সেই ভাব আত্মিক ও রূপশ্রীর মধ্য দিয়ে যে রূপময়তা সৃষ্টি করেছে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় "রবীন্দ্রনাথের সহজবাদের মূলসূত্রে" প্রবন্ধে। "রবীন্দ্র কাব্যে প্রেম", "রবীন্দ্র কাব্যে আশাবাদ", "রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব" বিষয়গুলি নিয়ে বহুতর আলোচনা বাঙলা সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নেই আলোচিত হয়েছে সত্য, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি সে ক্ষেত্রেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

শ্রীযুক্ত ঠাকুরের রচনাভঙ্গী যথেষ্ট স্বচ্ছ এবং যুক্তিময়। উদ্ধৃতির বাহুল্যে কোন ক্ষেত্রেই পাঠক মনে বিরক্তির ভাব উদ্রেক করে না। বক্তব্য বিষয়কে দীর্ঘ না করে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই শুভ বর্ষে এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করায় লেখক ও প্রকাশক উভয়কেই ধন্যবাদ।

এক অঙ্কে শেষ—কিরণ মৈত্র। সিটি বুক এজেন্সী, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিঃ—৯। দাম ২·২৫।

সাম্প্রতিক কালের নাট্যকারদের মধ্যে কিরণ মৈত্র অন্যতম। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে জীবন ও মানুষের প্রতি দরদমাখা একটি শিল্পী-মন ফুটে ওঠে। 'বুদ্বুদ', 'ভাগ্যে লেখা' ও 'অন্ধকারায়' এই তিনটি একাঙ্কিকার সমষ্টি "এক অঙ্কে শেষ"। 'বুদ্বুদে' একজন বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনার মর্মান্তিক হাহাকার ফুটে উঠেছে সার্থক পরিবেশ সৃষ্টির গুণে। ধর্মের প্রতি মোহ কেটে গেছে; স্বামী-স্ত্রী মিলে অপর মানুষের কন্যাকে গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষায় অকৃত্রিম স্নেহমমতা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে তখনই এসেছে সেই কন্যার মৃত্যু-সংবাদ; সকরুণ বেদনাময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সমাজের 'উচ্ছিষ্ট' দুটি মানুষ নিজেদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিল তা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় তিরোহিত হবার আশংকা দেখা দেয় 'ভাগ্যে লেখা' নাটকে। কিন্তু সেই অর্থ যখন জাল বলে প্রতিপন্ন হল, তখন তাদের মধ্যে পুরনো ঐক্য ফিরে এল। অনির্দেশ্য বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নিজেদের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথ পরিক্রমায় তারা বেরিয়ে পড়ল। অর্থ মানুষের অন্তরের প্রীতি ও ভালবাসার মধ্যে যে অশুভ সংকেত সূচনা করে তারই সুনিপুণ আলেখ্য এই নাটকখানি। শেষ নাটকটি 'অন্ধকারায়' অন্ধ মানুষদের অভিশপ্ত জীবনের একটি করুণ চিত্র। সর্দারের অত্যাচারে তারা মূক, কিন্তু একত্র মিলিত ক্ষেত্রে পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথায় মুখর। 'রক্তকরবী'র অদৃশ্য মানুষে রঞ্জনের আগমন-বার্তা যক্ষপুরীর জীবনযাত্রায় যে নতুন জীবনের সুর এনে দিয়েছিল, তেমনি আলোচ্য নাটকে অদৃশ্য দাদাবাবুর চোখ ভাল হয়ে যাওয়া আর ঘরে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিতে নাটকটি গতি-চঞ্চল।

মোট কথা তিনটি একাঙ্কিকাই বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে রচিত। নাটকীয় ভাব ও রূপ সৃষ্টিতে নাট্যকারের ক্ষমতার দৌর্বল্য প্রকাশ পায় নি। চরিত্রানুগ সংলাপ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে সর্বত্র। নাটকের শেষ বিচার মঞ্চে, শ্রীমৈত্রের নাটকগুলি দর্শনে ও শ্রবণে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা নাটকগুলির সফলতারই নিদর্শন। তাঁর কাছ থেকে আরও উল্লেখযোগ্য আঙ্গিকসম্পন্ন নাটক প্রত্যাশা করি।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) ডঃ মনোরঞ্জন জানা। ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিঃ—৯। দাম—৮·০০।

রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে উপন্যাস অনেকটা উপেক্ষিত, এ তথ্য অপ্রিয় হলেও সত্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ আলোচনার বই কয়েকটি মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথ কবি। তাই তাঁর উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে এ অভিযোগও করা হয়েছে যে, উপন্যাসগুলিকে তিনি কাব্য করে তুলেছেন। এ অভিযোগ অসত্য। আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে তা সহজেই বোধগম্য হবে।

রবীন্দ্রনাথের চোখে সমাজ ও সভ্যতা যে রূপে নিয়ে দেখা দিয়েছিল তা কেবলমাত্র কাব্য বা নাটকের মধ্যেই রূপায়িত হয়নি, উপলব্ধ জীবনসত্য উপন্যাসগুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশলাভ করেছে। আলোচ্য গ্রন্থে সেই সত্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের উপলব্ধ সত্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। গ্রন্থকার তা উপন্যাসগুলির মধ্যে যথাযথভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সাময়িক উপলব্ধ সত্যকে অতিক্রম করে কালে কালে বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাকে যে নানারূপে প্রকাশ করেছেন, উপন্যাস আলোচনায় ডঃ জানা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন সে সত্য দেশকালের গন্ডীতে আবদ্ধ না থেকে চেতনালোকের দ্বৈত স্বরূপের সংঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুন জাতি, নতুন মানুষ, নতুন সভ্যতার স্বপ্ন ধরা দিয়েছিল কবির চোখে।

রবীন্দ্রনাথের লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে নয়খানি উপন্যাস আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। অর্থাৎ তিনখানি উপন্যাস বাদ দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রভাব-জীবনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থগুলিই যথেষ্ট। 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'চতুরঙ্গ', 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি' এগুলির ব্যাখ্যা ও রবীন্দ্র-জীবনসত্য বা আদর্শকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। বিভিন্ন মানুষের আদর্শ ও তত্ত্বের মধ্যে কি দারুণ সংঘাত ঘটতে পারে তার পরিচয় যেমন পাওয়া যায় উপন্যাসে তেমনি আলোচ্য গ্রন্থে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করে নতুন আলোকদানের চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ: প্রথম খণ্ড শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস : দাম : সাড়ে তিন টাকা। পরিবেশক : জিজ্ঞাসা।

কয়েক বছরের মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সজ্ঞান শ্রোতাদের কাছে বিশেষ ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক জীবনে ওটা একটা বিশেষ ধরনের ফ্যাসান। তাই অলিগলিতে গজান সঙ্গীত শিক্ষালয়ে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে। এবং ভাবনার কারণ সেখানে। কারণ রবীন্দ্র সংগীতের যে বিশেষ ভাব-

মণ্ডল আছে তা যেমন শিক্ষকের অজ্ঞাত, ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তা তেমনি অবহেলার বিষয়। তাই রাগসম্মত গান গাওয়া হলেও প্রাণের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। তার কারণ হচ্ছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিধিবন্ধ ও সুসঙ্গত শিক্ষার অভাব। বাণী ও সুর সম্পর্কে গভীর চেতনা না থাকলে কিছুতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিচিত্র রূপও থাকে অজ্ঞাত। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পাঠক্রম-মালা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গের প্রথম খণ্ড রচনা করেছেন। উল্লিখিত কারণে এই পুস্তক নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। শ্রীযুক্ত দাসের প্রচেষ্টা এই জন্য আরও অভিনন্দনীয় যে, তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে অবিমিশ্র রাগ-সঙ্গীতের পর্যায়ে রেখে বিচার করেন নি, আবার তাকে রাগ-সঙ্গীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখতেও অপারগ। রাগ-সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েও রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিজস্ব মহিমায় সমাসীন। আশা করা যায় সঙ্গীতের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই পুস্তক আদরণীয় হবে।

প্লেটোর দি রিপাব্লিক—অনুবাদক বসন্তকুমার রায়চৌধুরী। প্রকাশক—অনুবাদক। ৪৫এ, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৩-৫০ টাকা।

প্লেটো ছিলেন গ্রীক পন্ডিত সক্রেটিসের শিষ্য। সক্রেটিসের চিন্তা-চেতনা একদিকে যেমন প্লেটোর মনোজগতে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল, তেমনি প্লেটোর জীবনদর্শনও তাঁর স্বীয়-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দর্শন জগতের চিন্তাধারায় সক্রেটিস মানবের সুন্দর রূপকে চেয়েছিলেন সত্যের মধ্যে উপলব্ধি করতে। আর প্লেটো চেয়েছিলেন জীবনের সুন্দর রূপটাকে প্রকাশের মধ্যে দেখতে। সক্রেটিস তাঁর সত্যের জন্য মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু প্লেটোকে তা করতে হয়নি।

সক্রেটিস চিন্তাকে গ্রন্থমধ্যে আবন্ধ করে রেখে যাননি। কিন্তু প্লেটো গুরু সক্রেটিসের সরল চিন্তাকে দর্শন জগতে উন্নীত করে রেখে গেছেন। সক্রেটিসের চিন্তা সকলের বোধগম্য। কিন্তু প্লেটোকে বুঝতে হলে দর্শন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। প্লেটোর দার্শনিক চিন্তাকে সরলরূপে দেখলে সক্রেটিসই সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠেন। সক্রেটিস সরল, প্লেটো দার্শনিক যুক্তিময়।

প্লেটোর যুগে গ্রীস ছিল নগর-রাষ্ট্রের সমষ্টি। সেখানে জনগণের ভোটের দ্বারা আইন তৈরী হলেও কার্যত একনায়কতন্ত্রই বর্তমান ছিল। তাই আজকের জগতে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায়, প্লেটো ছিলেন তার বিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন একজন দার্শনিক রাজাকে, যিনি অনেকটা রামায়ণের রামের মত। "রিপাবলিক" গ্রন্থে তাই প্লেটোর সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, শ্রমবিভাগ, জ্যোতিষ, যুদ্ধ-পদ্ধতি, বিদেশীদের প্রতি ব্যবহার, স্ত্রীলোকদের কথা, সাম্যবাদ, ডাক্তারদের কথা প্রভৃতি বিষয়ক দার্শনিক মতবাদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কতকগুলি উপাখ্যান সংযুক্ত হয়ে গ্রন্থখানিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

"রিপাবলিকের" বহু ইংরিজী অনুবাদ আছে। অনুবাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়চৌধুরী তার মধ্য থেকে জয়েটের গ্রন্থখানিকে নির্বাচিত করেছেন। এত দিন এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হয়নি। অনুবাদের দোষ-ত্রুটি এখানে বড় কথা নয়। এ-ধরনের একটি মূল্যবান গ্রন্থের প্রথম বাংলা অনুবাদকের প্রশংসা করতে হয় সর্বতোভাবে।

নান্দীকর

॥ আজকের কথা ॥

॥ আরও সাধারণ নাট্যশালা চাই ॥

বাঙালী চিরকালই নাটকের ভক্ত এবং সম্প্রতি সেই ভক্তি বেশ কিছুটা বেড়েছে। এমনই বেড়েছে যে, সওয়া-চারটি (ভবানীপুরের থিয়েটার-সেণ্টার সমেত) সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখে তার মন উঠছে না, সে 'বহুরূপী' 'রূপান্তরী', 'শৌভনিক', 'চতুর্মুখ', 'রঙ্গসভা', 'গন্ধর্ব' প্রভৃতি শতেক নাট্যকে দলের অভিনয় দেখছে সাগ্রহে, পকেটের পয়সা খরচ করে। তাই আজ-কাল শুধু যে প্রতি সন্ধ্যাতেই প্রত্যেকটি সাধারণ রঙ্গালয়ের মঞ্চগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে, তা নয়, এমন কি রবিবার এবং অপরাপর সাধারণ ছুটির দিনেও বেলা নটা থেকে একটা পর্যন্ত বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীর পদ-তাড়না থেকে ওদের মুক্তি নেই। সেদিন দেখলুম, কোনো সাধারণ রঙ্গালয়ে আনকোরা নতুন নাটকের উদ্বোধন হবে বেলা ৩টায়, অথচ বেলা ১টা পর্যন্ত একটি বহিরাগত নাট্যকে দল মঞ্চকে অধিকার করে রইলেন। অভিজাত মঞ্চ নিউ এম্পায়ার থিয়েটার প্রধানতঃ সিনেমা-গৃহ রূপে ব্যবহৃত হলেও রবিবার সমেত প্রায় প্রতিটি ছুটির সকালে বহুরূপী এবং আরও অনেক নাট্য-সম্প্রদায়ের কৃপায় ওটি থিয়েটার গৃহে পরিণত হয়। এ-ছাড়া মহাজাতি সদন, আকাদামী অব ফাইন আর্টস, মহারাষ্ট্র নিবাস, সুভাষ ইনস্টিটিউট, রবীন্দ্র সরোবর ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট প্যাভিলিয়ন প্রভৃতি মঞ্চ-সমন্বিত সাধারণ স্থানগুলিকে শহরের বিভিন্ন নাট্যকে দলগুলি বছরের প্রায় সব কটি দিন এমন করে অধিকার করে থাকেন যে, কলকাতা শহরে আজকাল সভা-সমিতি করবার জন্যে স্থান মেলা দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, দর্শক-সাধারণের নাটক দেখবার ক্ষুধাকে আমাদের ঐ সওয়া-চারটি সাধারণ রঙ্গালয় পরিতৃপ্ত করতে পারছে না। এবং ব্যবসা যখন দ্রুত গতিতে সচল, তখন একটি নাটককেই মাসের পর মাস নয়, বছরের পর বছর ধরে অভিনয় করে হাজার রাত্রির রেকর্ড স্থাপন করা যায় কিনা, সেই দিকেই মঞ্চ-মালিকদের নজর বেশী। তবে, শুধু যে অভিনয় দেখবারই লোক বেড়েছে, তা' নয়, অভিনয় করবার লোকও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে এবং অবস্থা দেখে মনে হয়, অভিনয় দেখবার লোক যতগুণ বর্ধিত হয়েছে, তার তুলনায় অভিনয় করবার লোক বৃদ্ধি পেয়েছে অন্ততঃ দশগুণ। চোখ চাইলে দেখতে পাওয়া যায়, খেলা-ধুলোর প্রতি ঝোঁক আছে, এমন কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়েকে বাদ দিলে গোটা বাঙালী জাতটার মেয়েপুরুষের মনের মধ্যে অভিনয় করবার বাসনা রয়েছে—কারো বা জাগ্রতভাবে, আবার কারো বা সুপ্ত। মস্ত বড় ডাক্তার, প্রচুর নাম-ডাক এবং রোজগার, অথচ দেখা যায়, সুযোগ পেলেই অভিনয় করতে নেমে পড়েন। গভর্ণমেণ্টের আই, এ, এস, অফিসার, অভিনয় করবার জন্যে রীতি-মত পাগল। গৃহস্থঘরের বৌ, সুন্দরী এবং ছেলেমেয়ের মা, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন—"ওঁর একার আয়ে আর কুলচ্ছে না, ভাই। মনে করছি, খুকুটা আর একটু বড়ো হলেই ফিল্মে নামব—

সুধীর মুখার্জি পরিচালিত "দুই ভাই" চিত্রে উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী

অগ্রদূত পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উত্তরায়ণ" চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী।

ও'র আপত্তি নেই। অন্যায়টা কি? আর তুমি বোধ হয় জান না—স্কুলে 'কৃষ্ণার্জুন' অভিনয়ে কেষ্ট সেজে আমি সোনার মেডেল পেয়েছিলাম।" কথা শুনতে শুনতে পাশের বাড়ীর মেয়েটির দৃষ্টিও যেন কি এক ছবি দেখতে পায়; বলে—"আপনি বৌদি আমাকেও সঙ্গে নেবেন; আমাকে অবিশ্যি হিরোইন করবে না, তবে সাইডে তো নামতে পারি।" সত্যিই, আজকে অভিনয়কে, প্রথম না হোক অন্ততঃ দ্বিতীয় পেশা হিসেবে যাঁরা বেছে নিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের আর্থিক অসচ্ছলতাকে যথাসম্ভব দূর করার জন্যেই এ পথে এসেছেন। 'অভিনয় আমার ধ্যান, অভিনয় আমার জ্ঞান, অভিনয় আমার জীবন'—শিশির-কুমারের মতো এই মনোভাব নিয়ে ক'জন অভিনয়-কলার সাধনায় মেতেছেন, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আজ 'অভিনয় করবার শিল্পী যত আছেন, ক্ষেত্র তত নেই।' তা ছাড়া কলকাতার লোকসংখ্যা যখন পনেরো লক্ষ ছিল, তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা ছিল কখনও চার, কখনও পাঁচ। আজ যখন এই শহরে ওই পনেরো লক্ষের অন্ততঃ তিনগুণ লোকের বাস, তখন গাণিতিক নিয়মানুসারে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সংখ্যাও হওয়া উচিত বারো থেকে পনেরো। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তৈরী করবার অনুমতি দিতে নারাজ। তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা একটু চোখ খুলে গোটা পৃথিবীটার দিকে তাকান। নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, টোকিও প্রভৃতি শহরের লোকসংখ্যার অনুপাতে কতগুলি করে রঙ্গমঞ্চ আছে, তার হিসেব নিন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও চিন্তা করবার চেষ্টা করুন, বর্তমানের জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের পক্ষে নির্দোষ আনন্দ উপভোগের এবং তারই সঙ্গে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে রঙ্গালয়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

॥ একটি চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী ॥

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর প্রেক্ষাগৃহে সেদিন তারু মুখোপাধ্যায় প্রোডাকসন্-এর নবগঠিত চিত্র "ইঙ্গিত"-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীটিতে আমাদের চিত্রজগতের কয়েকজন প্রযোজক, পরিবেশক, কলা-কুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সাংবাদিকের সঙ্গে বহু বিদেশী ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন দর্শকরূপে এবং কিছুক্ষণের জন্যে ছিলেন প্রখ্যাত মনীষী ডঃ কালিদাস নাগ। প্রদর্শনীর প্রারম্ভে দ্বারদেশে পুষ্প-স্তবক দান, প্রদর্শনীর মধ্য-বিরতিতে মিষ্ট পানীয় এবং প্রদর্শনী অন্তে উচ্চাঙ্গের চা-পানের বন্দোবস্ত ছিল। কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তা অনুকরণযোগ্য।

"ইঙ্গিত"-এর পরিচয়-লিপি গ্রহণে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। একটি পাগল ডাস্টবীন থেকে একটি ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে নেয় এবং তাই খুলে ধরতেই

"হাম মাতওয়ালে নওজোয়ান" চিত্রে সৌয়দা খান ও জনৈক শিল্পী

নজরে পড়ে "তারু মুখার্জি প্রোডাক্‌-সান্‌" কথাকয়টি বাংলা এবং ইংরাজীতে। এ-ছাড়া একটি স্তম্ভের গায়ে একটি ফলকে লেখা আছে—"পৃথিবীর জনগণের উদ্দেশে উৎসর্গী-কৃত"—এবং এও উভয় ভাষাতেই। মানুষের চলার পথের ওপর ইতস্ততঃ ছড়ানো ছেঁড়া কাগজের ওপর বাংলা এবং ইংরাজী ভাষাতে লেখা চিত্রের বিভিন্ন পরিচয়-লিপি দেখানোর পর মূল গল্পের আরম্ভ।

সংলাপহীনতা এবং পরিচয়-লিপিতে ইংরাজীর প্রয়োগ দেখে মনে হয়, বিদেশের বাজারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ছবিটি তৈরী হয়েছে।

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

আশায় বাঁধিনু ঘর : কনক প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেডের চিত্র; ১১২৯৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, প্রযোজনা ও পরিচালনা : কনক মুখোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা : ভি. বালসারা; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : দেওজীভাই; চিত্রগ্রহণ : দিব্যেন্দু ঘোষ; শব্দধারণ : বাণী দত্ত; সংগীত-গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশ : বিজয় বসু; সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; ভূমিকায় : ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, হরিধন, নৃপতি, ঠাকুরদাস, শৈলেন, সন্ধ্যারাণী, রঞ্জনা, গীতা দে, তপতী ঘোষ প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্‌ প্রাঃ লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ২৫শে আগস্ট থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

বৌদির আদরের কিশোর দেওর সুবু যখন তাকে ভাইফোঁটা দেবার জন্যে তার কোনো দিদি নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করলে, তখন বৌদি নিজেই দেওরের কপালে ফোঁটা দিয়ে তার দিদি সেজে বসল এবং দিদিরই মতো দেওরের শুভাশুভ ভাবনাকে নিজের করে নিল। গোল বাধল, যখন সুবু প্রবেশিকা পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে নিজেকে উচ্চ-তর শিক্ষায় যোগ্য করে তুলল। দাদা ভোলানাথের সাধ অনেক, কিন্তু সাধ্য একটুও নেই। তার ওপর তার আত্মা-ভিমান তাকে ধার-কর্জ করে টাকা যোগাড় করতে বলে, কিন্তু ভিক্ষে চাইতে বাধা দেয়। ঋণে তার জমি-বাস্তু কুসীদজীবী গোঁসাইয়ের কাছে বন্ধক এবং জমিদারী সেরেস্তায় সামান্য কাজ করে যা উপার্জন হয়, তাতে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলাই ভার। এ হেন অবস্থায় জমিদার মহেশ চৌধুরী যে মহেশ চৌধুরী ভোলা-নাথেরই পৈত্রিক জমিদারী নিলামে কিনে জমিদার হয়ে বসেছেন, তিনি—প্রস্তাব করলেন, সুবুর ভবিষ্যতের সমস্ত ভার তিনি নেবেন, তাকে তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্যে ঘরজামাই হিসেবে গ্রহণ করে এবং ভোলানাথকে তিনি দশ হাজার টাকা দেবেন বিবাহের পর সুবুর সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক না রাখবার জন্যে। এই চরম অপমানকর প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবার পরেও স্ত্রী সতীর অনুরোধে এবং সুবুর ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা মনে রেখে ভোলানাথ শেষ পর্যন্ত মহেশ চৌধুরীর কাছে ঘাড় পাতলেন। কিন্তু দশ হাজার টাকার লোভে ভোলানাথ নিজের ভাইকে জমিদারের কাছে বেচেছে, এই নিন্দায় যখন গ্রামের আকাশ-বাতাস ভরে উঠল, এবং ভোলা-নাথ এর প্রতিবাদে একটি কথাও বলল না, তখন সুবু পর্যন্ত দাদাকে ভুল বুঝল এবং এই অমানুষিক হৃদয়-হীনতার জন্যে শেষ অবধি দাদাকে সে চরম শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হ'ল। এই ভুল

মৃণাল সেনের "পুনশ্চ" চিত্রে কণিকা মজুমদার, সতী দেবী এবং পাহাড়ী সান্যাল

বোঝাবুঝির ফলে সতীর হৃদয় গেল ভেঙে। কুলালক্ষ্মী গোঁসাইয়ের কাছে মামলায় হেরে ভোলানাথ যখন ভগ্নহৃদয় ও রুগ্নদেহ স্ত্রীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে রওনা হল, তখন দাদার দশ হাজার টাকা নেওয়ার কথা সর্বৈব মিথ্যা জেনে সুবু উন্মত্তের মত ছুটল দাদা বৌদির পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে এবং উভয় পক্ষের মিলনে গল্পের হল সমাপ্তি।

মাত্র হৃদয়াবেগসর্বস্ব এই গল্পটিরও সার্থক চিত্রায়ন সহজেই সম্ভব হ'ত, যদি না বিবাহরাত্রিতে দাদা-বৌদির কাছে ছুটে এসে দাদার দশ হাজার টাকা নেওয়া সম্বন্ধে সুবুর স্থির নিশ্চয় হবার পর থেকে অনুশোচনাদগ্ধ মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুশয্যার পূর্ব পর্যন্ত গল্পের ভিতরে বহু রসব্যাঘাতকারী অবান্তরতাকে স্থান দেওয়া হ'ত ছবির দৈর্ঘ্যকে বাড়াবার জন্যে। বিশেষ করে কলকাতায় সুবুকে চামেলী বাইজীর বাড়ী নিয়ে যাওয়া এবং চামেলীর রাতারাতি 'দেবদাসে'র চন্দ্রমুখীতে পরিণত হওয়া শুধু যে গল্পের পক্ষে একান্ত অপ্রয়োজনীয়, তাই নয়, হাস্যকরও বটে। এই বৃহৎ ত্রুটি ছাড়াও গল্পটির বহু ঘটনার মধ্যে এত বেশী অসম্ভাব্যতা আছে, যা দর্শককে গল্পের সংগে একাত্ম হতে প্রতিনিয়তই বাধা দেয় এবং যার ফলে ছবির মাধ্যমে রসসৃষ্টির প্রয়াস হোঁচট খায় পদে পদে।

মধুরেণ চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যারাণী

'আশায় বাঁধিনু ঘর'-এর চমৎকারিত্ব হচ্ছে এর পাত্র-পাত্রীদের সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়। এমন এক-সুরে বাঁধা চড়া পর্দার অভিনয় বহুদিন বাংলার চলচ্চিত্র জগতে দেখা যায়নি। স্নেহময়ী বৌদিদি সতীর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর হৃদয়ঢালা আবেগপূর্ণ অভিনয় দর্শক-মনে গভীর রেখাপাত করে। দেওয়ান রঘুনাথ ঘোষালের সংবেদনশীল হৃদয় মূর্ত হয়ে উঠেছে ছবি বিশ্বাসের চলনে, বলনে, কণ্ঠস্বরের সূক্ষ্ম তারতম্যে এবং সাজ-সজ্জায়। অসিতবরণের সহজ স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে ভোলানাথের ভ্রাতৃবাৎসল্য, পত্নীপ্রেম, অন্তরের সারল্যও যেমন অবলীলাক্রমে ফুটে উঠেছে, তেমনই প্রকাশিত হয়েছে চরিত্রটির উপায়হীন, চিন্তাগ্রস্ত এবং অভিমানাহতের ভাব। প্রথম জীবনে ব্যবসায়ী এবং পরে জমিদার মহেশ চৌধুরীর বুদ্ধিমত্তা ও আভিজাত্য আহরণের প্রতি দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের ব্যর্থতাকে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সংগে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন কমল মিত্র। যুবক সুবুর চরিত্রে বিশ্বজিৎকে মানিয়েছেও যেমন চমৎকার, তেমনি তিনি যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন অভিনয় করবার, তার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করেননি। এ ছাড়া গীতা দে

উদ্যম দেখা গেছে। ছবির সংলাপ সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী। এবং পরিচালক হিসেবে কনক মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ছবির প্রতিটি দৃশ্যেই। কাহিনী দুর্বল না হলে 'আশায় বাঁধিনু ঘর' অনায়াসেই একটি সার্থক চিত্রসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারত।

"আশায় বাঁধিনু ঘর" চিত্রে—ছবি বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ এবং রঞ্জনা ব্যানার্জি

সৌদামিনী, হরিধনের গোঁসাই, তরুণকুমারের পণ্ডিত, রঞ্জনার রাণী প্রভৃতি ছবির সকল চরিত্রই যথাযথভাবে সুঅভিনীত। চামেলী বাইজীর ভূমিকায় তপতী ঘোষও যথেষ্ট সুঅভিনয় করেছেন, যদিও তাঁর গৃহীত চরিত্রটি লেখকের কৃপায় ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় তাঁর অভিনয়-প্রচেষ্টাই হয়েছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

ছবির আর একটি সম্পদ হচ্ছে এর চিত্রগ্রহণের নৈপুণ্য। ছবির বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণেও যেমন অসামান্যতা দেখা গিয়েছে, ভিতরের বহু দৃশ্যেও তেমনি আলো-ছায়ার খেলা ছবির ভাবপ্রকাশে সহায়তা করেছে। ছোট ছোট ফ্ল্যাশব্যাকের চিত্রগ্রহণে বিস্ময়োদ্রেককারী অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। শব্দগ্রহণের কাজও পরিচ্ছন্ন। ছবির ভিতর চারখানি গান আছে। গানগুলির রচনা প্রায় নিম্ন-শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের গদ্যের মত নীরস; কষ্টকর মিল এবং ছন্দরক্ষার দুর্বল প্রয়াসের ছড়াছড়ি। সুরের মধ্যেও কোনো বৈচিত্র্য নেই। বরং গানের তুলনায় আবহ-সংগীত বহু স্থানেই দৃশ্যানুযায়ী ভাবপ্রকাশক। তবে পুনঃ শব্দযোজনা বা রি-রেকর্ডিং-এর পর অনেক দৃশ্যেই আবহ-সংগীত হঠাৎ থেমে গিয়ে কর্ণ-পীড়াদায়ক হয়েছে। এবং এরই জন্যে ছবির সম্পাদনার কাজকে নিখুঁত বলতে বাধছে, যদিও অন্যান্য দিকে প্রশংসনীয়

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। চৌরঙ্গীর নিকটবর্তী লোয়ার সার্কুলার রোড ও ক্যাথিড্রাল রোডের সংযোগস্থলে নির্মীয়মান এই নাট্যশালাটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে বলে শোনা যাচ্ছে। লণ্ডন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রাক্তন ডাইরেক্টর হার্ভার্ট মার্শালের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পশ্চিমবঙ্গের কনস্ট্রাকশন বোর্ড ভবনটির নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধান করছেন। তিন একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালাতে ১১০০ দর্শকের বসবার উপযোগী প্রেক্ষাগৃহ থাকবে এবং এর ঘূর্ণায়মান মঞ্চটি হবে ৩৬ ফুট চওড়া। তাপ-নিয়ন্ত্রিত এই নাট্যশালাটি নির্মাণ করতে খরচ পড়বে ৪৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা।

*

রসিক জনসাধারণের কাছে নতুন শিল্পীকে পরিচিত করানো বা দেশ-

নির্মল ঘোষ পরিচালিত "দশচক্রে" একটি দৃশ্যে শৈলেন মুখার্জি, তুলসী চক্রবর্তী ও হরিধন মুখার্জি।

বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীকে রসিকজনের সামনে যথারীতি মর্যাদা সহকারে উপস্থাপিত করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বর্তমান ভারতে এতদিন ছিল না। সুখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে গেছেন তাঁর জীবদ্দশায় এবং তিনিই আমাদের কলকাতার রসিক-সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিলেন উদয়শঙ্কর, তিমিরবরণ, পি সি সরকার, বালা সরস্বতী, গুরু নাম্বুদ্রি, মণিপুরের নর্তকী থম্বলসেনা, রুক্মিণী আরুণ্ডেল, রাগিণী দেবী, পোয়ে নৃত্যবিশারদা মিয়া তানচি প্রভৃতি শিল্পীর। সুখের কথা, সম্প্রতি 'শো এণ্টারপ্রাইজেস অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে এই কলকাতা শহরে, যাঁরা সানন্দে এই গুরু দায়িত্ব বহন করবার জন্যে এগিয়ে আসছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি-জগতে একটি মূল্যবান সংযোজনা রূপে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমাদের মধ্যে বরণ ক'রে নিচ্ছি এই আশায় যে, ভারত ও বহির্জগতের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এবং উঠতি শিল্পীরা এ'দের সুচারু ব্যবস্থায় নিজেদের প্রকাশের এবং প্রচারের সুষ্ঠু সুযোগ লাভ করবেন। এ'রা যে দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী হ'তে চলেছেন, তারই প্রাথমিক অর্থ-সংগ্রহের জন্যে 'শো এণ্টারপ্রাইজেস অব ইণ্ডিয়া' ৭ই থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গড়িয়াহাটা সিংঘী পার্কে একটি 'নৃত্য-গীত-নাটক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। অনুষ্ঠানসূচীতে যে সব আকর্ষণীয় নাম দেখা যাচ্ছে, তাতে এ'দের সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো দ্বিধা নেই।

আগামী সংখ্যা থেকে শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় লিখিত একটি মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনী

হিমাচলম

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক 'অমৃত'

*

॥ মধুরেণ ॥

এ সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি বাংলা চিত্র শ্রীমান পিকচার্সের 'মধুরেণ' কলিকাতার রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। কাহিনী : ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, চিত্র-নাট্য ও সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য, পরিচালনায় : শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে আছেন :—সন্ধ্যারাণী, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, পদ্মা দেবী, নিভাননী, কবিতা রায় প্রভৃতি। কালীপদ সেনের সুরারোপে, মানবেন্দ্র, নির্মলা মিশ্র, সনৎ সিংহ প্রভৃতি নেপথ্যে কণ্ঠ নিবেদন করেছেন।

"রামদাদা" চিত্রে চাঁদ ওসমানি

*

॥ সাউথ প্যাসিফিক ॥

কোলকাতার জ্যোতি সিনেমায় মুক্তি পাবে বিশ্বের প্রথম টড্-আও চিত্র "সাউথ প্যাসিফিক"। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের পর ছবিটি মুক্তিলাভ করেছে। বহুবিখ্যাত কলাকুশলী ও চিত্রতারকার সমাবেশেই চিত্রটি খ্যাতিলাভ করেনি; এর বিশেষত্ব হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে। যা চিত্রজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শব্দ, রঙ, চিত্রগ্রহণ প্রভৃতি দর্শকচিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করবে।

*

॥ "ডাকঘর" ॥

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে বিশ্বকবির 'ডাকঘর' নাটকটি ২০শে আগস্ট পৌরিক সংঘের রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে শ্রীশিশির [illegible] পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। [illegible] শিল্পীদের অভিনয় বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে এবং দর্শকবৃন্দকে অশেষ আনন্দ দান করে। এদের মধ্যে সুধার চরিত্রে মধুমিতা, মাধব দত্তের ভূমিকায় অমিত রায়, ঠাকুর্দারূপী গণেশ চট্টোপাধ্যায়, অমলের চরিত্রে সঞ্জিৎ সিংহ এবং মোড়লবেশী সুনীল পালের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

*

॥ "পণরক্ষা" ॥

'নবরূপ' নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন 'নবরূপ' গোষ্ঠী। এই নাটকে বংশীর চরিত্রে দিগ্বিজয় বোস, রসিকের ভূমিকায় শিশির চক্রবর্তী, বিশু খুড়োর চরিত্রে বিভাস মুখোপাধ্যায়, মাষ্টাররূপী মণি বিশ্বাস, গোপালরূপী মিহির চক্রবর্তী, জানকী নন্দীর ভূমিকায় ফটিক সেন এবং সৈরীর চরিত্রে রমা বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের অশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। আবহসঙ্গীত পরিচালনা করেন গৌর দাস। তাঁর আবহসঙ্গীত অশেষ প্রশংসা লাভ করে।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া—৫ম টেস্ট

ইংল্যাণ্ড : ২৫৬ (পিটার মে ৭১, কেন ব্যারিংটন ৫৩। ডেভিডসন ৮৩ রানে ৪, গণ্ট ৫৩ রানে ৩ এবং ম্যাক্‌কে ৭৫ রানে ২ উইকেট) ও ৩৭০ (৮ উইকেট। রমণ সুব্বারাও ১৩৭, ব্যারিংটন ৮৩, মার্রে ৪০, এলেন নট আউট ৪২। ম্যাককে ১২১ রানে ৫ এবং বেনো ১১৩ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া : ৪৯৪ (পিটার বার্জ ১৮১, নর্মান ও'নীল ১১৭, ব্রেন বুথ ৭১, সিম্পসন ৪০, গ্রাউট নট আউট ৩০। এলেন ১৩৩ রানে ৪, ষ্ট্যাথাম ৭৫ রানে ৩ এবং ফ্ল্যাভেল ১০৫ রানে ২ উইকেট)।

১ম দিন (১৭ই আগষ্ট) : ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের ৮ উইকেটে ২১০ রান। এলেন এবং ষ্ট্যাথাম যথাক্রমে ৭ ও ২ ক'রে নট আউট।

২য় দিন (১৮ই আগষ্ট) : ২৫৬ রানে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের সমাপ্তি। অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৯০ রান। নট আউট থাকেন বার্জ ৮৬ এবং বুথ ৩৩ রান ক'রে।

৩য় দিন (১৯শে আগষ্ট) : ৪৯৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের সমাপ্তি। ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে ৩২ রান। উইকেটে সুব্বারাও ১৯ এবং পুলার ১৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (২১শে আগষ্ট) : ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসে ৪ উইকেট পড়ে ১৫৫ রান। উইকেটে সুব্বারাও ৬৯ এবং ব্যারিংটন ৩৫ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৫ম দিন (২২শে আগষ্ট) : ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসে ৮ উইকেট পড়ে ৩৭০ রান। এলেন ৪২ এবং ষ্ট্যাথাম ৯ ক'রে নট আউট।

১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া উভয় দেশের টেস্ট সিরিজের মোট ৫টা টেস্ট খেলার মধ্যে ২-১ খেলায় জয়লাভ ক'রে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' এবং 'রাবার' লাভ করেছে। অস্ট্রেলিয়া লর্ডসের ২য় এবং ওল্ড ট্রাফোর্ডের ৪র্থ টেস্ট খেলায় জয়লাভ ক'রে 'এ্যাসেজ' খেতাব লাভের যোগ্যতা আগেই পেয়ে যায়। ৫ম টেস্ট অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলা ড্র যাওয়াতে অস্ট্রেলিয়ার হাতে 'রাবার' খেতাবও এসে যায়। মোট ৫টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জয় ২, ইংল্যাণ্ডের ১ (ম্যাঞ্চেষ্টার) এবং খেলা ড্র ২ (এজবাস্টনের ১ম এবং ওভালের ৫ম টেস্ট)।

গত সংখ্যায় তিন দিনের (১৭ই থেকে ১৯শে আগষ্ট) খেলার বিবরণ পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ৫ম টেস্ট খেলা ড্র যাওয়ার পক্ষে যে সব ঘটনার আভাস দেওয়া হয়েছিল তা সত্যে পরিণত হয়েছে—ইংল্যাণ্ডের মোটা রান এবং বরুণদেবের কৃপালাভ।

খেলার ৩য় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৪৯৪ রানে শেষ হ'লে তারা ২৩৮ রানে অগ্রগামী হয়। বাকি ৫০ মিনিটে ইংল্যাণ্ড কোন উইকেট না হারিয়ে ৩২ রান করে। অর্থাৎ ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের তখনও ২০৬ রানের প্রয়োজন ছিল। ৪র্থ দিনের খেলার সূচনায় ইংল্যাণ্ডের দারুণ বিপর্যয় দেখা দেয়। ১৫ মিনিটেরও কম সময়ের খেলায় পূর্ব দিনের ৩২ রানের সঙ্গে মাত্র ১ রান যোগ হয়, এদিকে ২টো উইকেট পড়ে যায়। ম্যাক্‌কে খেলার সূচনা করলেন এবং আরম্ভের প্রথম ওভারের ৩য় বলে পুলারকে কট্-আউট করলেন। অল্পক্ষণ পরেই ম্যাক্‌কের ২য় ওভারের একটা বল 'হুক' করে ডেক্সটার ডিপ স্কোয়ার-লেগে গণ্টের হাতে সোজা 'ক্যাচ' তুলে দিলেন। আধ-ঘণ্টা খেলার পর বরুণদেব যেন ইংল্যাণ্ডের খেলার ভাঙ্গন রোধ করার জন্যই মাঠে নেমে এলেন। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। বৃষ্টির দরুণ নির্ধারিত খেলার সময়ের ৩ ঘণ্টা বাদ যায়। বেলা ৪টার সময় (স্থানীয় সময়) পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। বৃষ্টি হ'লেও পীচ খুব বিপজ্জনক হয়নি। ব্যাটসম্যানদের ভিজে পীচে খেলাতে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি বললেই চলে।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় নেমেছিলেন রমণ সুব্বারাও। তাঁর নির্ভীক এবং দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ইংল্যাণ্ড খেলার প্রথম দিকের বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে। এই দিন ৩য় উইকেটে মে'র সঙ্গে জুটি বেঁধে দলের ৫০ রান তুলে দেন। সুব্বারাও এবং ব্যারিংটনের নট আউট ৫ম উইকেটের জুটিতে ৬৫ রান উঠে যায়।

৫৮ রানে ৪টে উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করেন ম্যাক্‌কে। ৪ উইকেট পড়ে ইংল্যাণ্ডের ১৫৫ রান দাঁড়ায়।

৫ম অর্থাৎ শেষ দিন খেলার সূচনা করলেন আগের দিনের অপরাজেয় ৫ম উইকেটের জুটি সুব্বারাও এবং ব্যারিংটন। ইংল্যাণ্ড তখনও ৮৩ রানের

পিটার মে

রমণ সুব্বারাও

কেন ব্যারিংটন

পিছনে পড়ে আছে; পরাজয় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার মত অবস্থা মোটেই নয়। সুব্বারাওয়ের আহত পা, তাঁর হয়ে অপর খেলোয়াড় রান নিচ্ছেন। রান ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো। দলের ২৪০ রান উঠলে ইংল্যান্ড আর রানের ব্যবধানে পিছিয়ে রইলো না।

লাঞ্চের সময় দেখা গেল ইংল্যান্ডের ২৪৫ রান, ৪ উইকেট পড়ে। ইংল্যান্ড মাত্র ৭ রানে এগিয়েছে। উইকেটে আছেন সুব্বারাও (১২৭) এবং ব্যারিংটন (৬৪)। ৫ম দিনের প্রথম আড়াই ঘণ্টার খেলার ৫ম উইকেটের জুটিতে তখন ৯০ রান উঠেছে।

লাঞ্চের পর ৫ম উইকেটের জুটি ভাঙ্গার জন্যে বেনো আক্রমণাত্মক খেলার ব্যূহ রচনা করলেন। সুব্বারাও এবং ব্যারিংটন খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলতে থাকেন, বিশেষ করে ম্যাক্কেরবল। এই-ভাবে লাঞ্চের পরের খেলায় ১৭ রান যোগ হয়ে মোট রান দাঁড়াল ২৬২। এই ২৬২ রানের মাথায় বেনোর বলে সুব্বারাও 'স্টেট-ড্রাইভ' করলেন আর বেনো সেই 'ক্যাচ'টা লুফলেন। সুব্বারাও নিজস্ব ১৩৭ রাণ ক'রে আউট হ'ন। এই রান তুলতে তাঁর ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় লাগে। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে সুব্বারাও-য়ের এই দ্বিতীয় বার সেঞ্চুরী। তাঁর ১৩৭ রানের মধ্যে বাউণ্ডারী ছিল ১৫টা আর ওভার-বাউন্ডারী ১টা। ম্যাক্কের বলে হুক ক'রে সুব্বারাও ছয়ের বাড়ি মারেন। দলের ৫ম উইকেটের জুটিতে সুব্বারাও এবং ব্যারিংটন ১৭২ রান তুলে দেন।

ইংল্যান্ডের হাতে তখন জাত ব্যাটসম্যান বলতে কেউ নেই। ব্যারিংটনের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটে খেলতে নামলেন উইকেট-রক্ষক জন মারে।

দলের ২৮৩ রানের মাথায় অর্থাৎ সুব্বারাওয়ের বিদায়ের পর ২১ রান যোগ হলে ব্যারিংটন নিজস্ব ৮৩ রান ক'রে বেনোর বলে 'কট-আউট' হলেন। ও'নীল ছুটে গিয়ে বল লুফলেন। ৭ম উইকেটে মারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন টনি-লক। লক 'গোল্লা' ক'রে আউট হ'ন দলের ২৮৩ রানের মাথায়। অর্থাৎ ২৮৩ রানের মাথায় ব্যারিংটন এবং লক আউট হ'ন। ইংল্যান্ডের ভাগ্যাকাশে আবার কাল মেঘ দেখা দেয়। ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস শেষ হতে আর কতক্ষণ! যে তিনজন খেলোয়াড় আউট হ'তে বাকি, তাঁদের উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না—যে কোন সময় আউট হ'তে পারেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন কোন বোলার মুছে ফেলতে পারে? অষ্টম উইকেটের জুটি উইকেট-রক্ষক জন মারে এবং বোলার এলেন ইংল্যান্ডের পক্ষে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় খেললেন।

চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান উঠল ৩৩০, ৭টা উইকেট পড়ে। ৮ম উইকেটের জুটিতে তখন মারে এবং এলেন যথাক্রমে ২৯ ও ২৩ রান ক'রে নট-আউট আছেন। ইংল্যান্ড ৯২ রাণে অগ্রগামী। খেলা ভাঙ্গতে প্রায় ৭৫ মিনিট বাকি ছিল। এই সময়ে ৮ম উইকেটের জুটিতে ৩৭ রান ওঠে।

দলের ৩৫৫ রানে মারে নিজস্ব ৪০ রান ক'রে আউট হ'ন। ৮ম উইকেটের জুটিতে মারে এবং এলেন ৭২ রান তুলে দেন। খেলার নির্ধারিত সময়ে দেখা গেল, ইংল্যান্ডের ৩৭০ রান উঠেছে, ৮টা উইকেট পড়ে। বোলার ডেভিড এলেন ৪২ রাণ এবং স্ট্যাথাম ৯ রান ক'রে নট-আউট রইলেন।

ইংল্যান্ডের পক্ষে ৫ম টেস্ট খেলা ড্র করার কৃতিত্ব রমন সুব্বারাওয়ের। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে তিনি অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট খেলায় তিনি ক্রিকেট অনুরাগী দর্শকসাধারণকে প্রচুর আনন্দ এবং বেদনা দিয়ে গেলেন।

টেস্ট সিরিজে গড়পড়তা

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া—১৯৬১

১৯৬১ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের গড়পড়তা তালিকায় উভয় দেশের পক্ষে ব্যাটিংয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার উইলিয়ম লরী (৫২·৫০) এবং পিটার বার্জ (৪৭·৪২)। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে ইংল্যান্ডের তিনজন খেলোয়াড়—রমন সুব্বা রাও (৪৬·৮০), কেন ব্যারিংটন (৪৫·৫০) এবং ডেভিড এলেন (৪৪·০০)। ষষ্ঠ স্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার নীল হার্ভে (৪২·২৫)। ৭ম স্থান লাভ করেছেন দু'জন, অস্ট্রেলিয়ার ব্রেন বুথ (৪২·০০) এবং ইংল্যান্ডের টেড ডেক্সটার (৪২·০০)। বুথ খেলেছেন দুটো টেস্টের [illegible] ইনিংস, অপরদিকে ডেক্সটার পাঁচটা টেস্টের ৯টা ইনিংস।

বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ডেভিডসন (গড়পড়তা ২৪·৮৬) প্রথম এবং ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন টেড ডেক্সটার (মোট নয়টা উইকেট—গড়পড়তা ২৪·৭৭)।

টেস্ট সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রাণ

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ৪৬৮ রাণ—রমন সুব্বা রাও।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৪২০ রাণ—উইলিয়াম লরী।

টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ২৩টা—এ ডেভিডসন।

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ২০টা—এফ ট্রুম্যান।

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১৮১—পিটার বার্জ, ৫ম টেস্ট, ওভাল।

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১৮০—টেড ডেক্সটার, ১ম টেস্ট, এজবাস্টন।

টেস্ট সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া (৫) : নীল হার্ভে ১১৪ (১ম টেস্ট এজবাস্টন), উইলিয়াম লরী ১৩০ (২য় টেস্ট, লর্ডস) ও ১০২ (৪র্থ টেস্ট, ম্যাঞ্চেস্টার); নর্মান ও'নীল ১১৭ (৫ম টেস্ট, ওভাল); পিটার বার্জ ১৮১ (৫ম টেস্ট, ওভাল)।

ইংল্যান্ড (৩) : টেড ডেক্সটার ১৮০ (১ম টেস্ট, এজবাস্টান); রমন সুব্বা রাও ১১২ (১ম টেস্ট, এজবাস্টান) ও ১৩৭ (৫ম টেস্ট, ওভাল)।

টেস্ট সিরিজে আর্থিক পুরস্কার

১৯৬১ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ খেলার প্রাক্কালে ইংল্যান্ডের এক প্রখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই দুই দেশের টেস্ট সিরিজে এক বিরাট অঙ্কের

উইলিয়াম লরী

ডেভিডসন

কেন ম্যাককে

আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। ক্রিকেট খেলাকে প্রাণবন্ত এবং চিত্তাকর্ষক করাই ছিল পুরস্কার দাতাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। মোট ৬,৮৮০ পাউন্ড নগদ পুরস্কারের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছে ৬,১২০ পাউন্ড এবং ইংল্যান্ড মাত্র ৭৬০ পাউন্ড।

অস্ট্রেলিয়ার কুশলী ব্যাটসম্যান নর্মান ও'নীল ওস্তাদের খেলা খেলেছিলেন; তিনি টেস্ট সিরিজের শেষ খেলা—৫ম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১১৭ রাণ ক'রে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী করেন। তাঁর আগে এবং পরে দু'দলের মোট ৭টা সেঞ্চুরী হয়েছিল। কিন্তু ও'নীল তাঁর এই ১১৭ রাণের উপরই দুটো পুরস্কার (মোট মূল্য ৮০০ পাউন্ড) পেয়ে যান—অন্য খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরী বা ব্যক্তিগত রাণ পুরস্কারযোগ্য হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার পুরস্কার—৬,১২০ পাঃ

টেস্ট সিরিজে দ্রুতগতিতে রাণ ঃ

অস্ট্রেলিয়ার পুরস্কার ২৮০০ পাঃ

টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট ঃ ২৩টা এলান ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া); পুরস্কার ৪০০ পাউন্ড।

সর্বাধিক 'ক্যাচ' (উইকেট কিপার বাদে) ঃ ৭টা—ববি সিম্পসন (অস্ট্রেলিয়া); পুরস্কার ৪০০ পাউন্ড।

উইকেট-কিপারের পক্ষে সর্বাধিক ক্যাচ (১৫টা ক্যাচের বেশী) ঃ ২১টা—ওয়ালি গ্রাউট (অস্ট্রেলিয়া); পুরস্কার ৪০০ পাউন্ড।

টেস্ট খেলায় জয় ঃ দু'টি টেস্ট খেলায় জয়লাভের ফলে অস্ট্রেলিয়া মোট ১,১২০ পাউন্ড পুরস্কার (প্রতি টেস্টে ৫৬০ পাঃ) পায়।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট ঃ ৬টা—রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া); পুরস্কার ২০০ পাঃ।

সর্বাপেক্ষা কম সময়ে সেঞ্চুরী ঃ নর্মান ও'নীল (অস্ট্রেলিয়া)—১৬৮ মিঃ

নর্মান ও'নীল

সময়ে তাঁর শত রাণ পূর্ণ হয়। পুরস্কার ৪০০ পাউন্ড।

দ্রুতগতিতে ব্যক্তিগত রাণের হার ঃ নর্মান ও'নীল (অস্ট্রেলিয়া) প্রতি ২·২৫ মিনিটে ১ রাণ। পুরস্কার ৪০০ পাঃ

ইংল্যাণ্ডের পুরস্কার—৭৬০ পাউন্ড

টেস্ট খেলায় জয়লাভ ঃ ৩য় টেস্ট খেলায় জয়লাভের দরুণ পুরস্কার ৫৬০ পাউন্ড।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট ঃ ৬টি—ফ্রেডী ট্রুম্যান। পুরস্কার ২০০ পাঃ।

এই পুরস্কার দুজন পান—রিচি বেনো এবং ফ্রেডী ট্রুম্যান (প্রত্যেকে ২০০ পাঃ হিসাবে)।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ—১৯৬১

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম টেস্ট (এজবাস্টন) ঃ খেলা অমীমাংসিত।

ইংলণ্ড ঃ ১ম ইনিংস ১৯৫ রান ও ২য় ইনিংস ৪০১ রান (৪ উইকেটে)।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৫১৬ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

দ্বিতীয় টেস্ট (লর্ডস) ঃ অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জয়ী।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস ২০৬ রান ও ২য় ইনিংস ২০২ রান।

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ৩০৪ রান ও ২য় ইনিংস ৭১ রান (৫ উইকেটে)।

তৃতীয় টেস্ট (লিডস) ঃ ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ২৩৭ রাণ ও ২য় ইনিংস ১২০ রান।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস ২৯৯ রান ও ২য় ইনিংস ৬২ রান (২ উইকেটে)

চতুর্থ টেস্ট (ওল্ড ট্রাফোর্ড) ঃ অস্ট্রেলিয়া ৫৪ রানে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ১৯০ রান ও ২য় ইনিংস ৪৩২ রান।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস ৩৬৭ রান ও ২য় ইনিংস ২০১ রান।

পঞ্চম টেস্ট (ওভাল) ঃ খেলা অমীমাংসিত।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস ২৫৬ রান ও ২য় ইনিংস ৮ উইঃ ৩৭০ রান।

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ৪৯৪ রান।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
ফোন : ৫৫-৫২৩১
কলিকাতা—৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

একটি উৎকৃষ্ট
হ্যারিকেন
KISAN BRAND

অমৃত

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড, ১৮শ সংখ্যা,—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 8th September, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলির ভিতরে ঐক্যভাব বৃদ্ধির জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিল উপস্থিত করেছেন পার্লামেন্টে। এই বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হলে এর সাহায্যে ভাষা, ধর্ম, জাতি ইত্যাদির বিষয়ে আন্দোলন করা বা লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানানো বন্ধ করা যাবে। এই ধরনের প্রতিবাদকারীদের তিন বৎসর পর্যন্ত কারাবাসের বিধানও থাকবে ঐ আইনে। অতএব. আইন-রচয়িতারা আশা করেন, এরপর ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যের আবহাওয়া বিরাজ করবে। পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষ এখনকার মতো ভারতের জাতীয় ঐক্যকে খণ্ডবিখণ্ড করবে না।

বাস্তবিক এমন একটা ব্যাপার ঘটলে তার চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে! কিন্তু তা হবে বলে মনে হয় না। অদূর অতীতে আমরা এমন সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, যাতে কোনো কিছুই আর শিশুর সারল্যে গ্রহণ করা সহজ নয়। এমন কি, এই বিলটি উপস্থিত করার পিছনেও যে সন্দেহ আর বিদ্বেষ নেই তা মেনে নেওয়াও কঠিন।

শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়ে ভারতে মোটামুটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আদর্শকে রূপায়িত করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই অন্য ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জাতির অস্তিত্ব আছে, এবং সমগ্র দেশটিকে শতধাবিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত তা থেকেই যাবে। বর্তমান জগতে এই রকম ক্ষুদ্রায়তন রাজ্য যে সব দিক দিয়েই অসুবিধাজনক তা বুঝতে কষ্ট হয় না। দেশের ভবিষ্যৎ দুর্গতি ও দুর্বলতার কথা বিবেচনা করলে এই ধরনের আত্মক্ষয়ী প্রবণতাকে রোধ করাই বরং আমাদের কর্তব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাষাগত সংখ্যালঘু যখন রাজ্যগুলিতে থাকবেই তখন তাদের নায্য বিকাশের পথে যা কিছু বাধা সেগুলি অপসারণ না করলে বিভেদের এই দূষিত আবহাওয়া কেবল আইনের প্রভাবেই নির্মল হয়ে যাবে এমন আশা করা দিবাস্বপ্ন মাত্র।

তাছাড়া আরও একটি প্রশ্ন আছে, এবং সেইটেই বর্তমান পটভূমিতে সবিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। রাষ্ট্রনীতিতে কপোলকল্পনার স্থান নেই; বাস্তব পরিস্থিতির মোহহীন বিশ্লেষণের ভিতর দিয়েই সে নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। অপ্রিয় হলেও এ সত্য আজ অকপটে স্বীকার করা দরকার যে, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করার মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহই ভারতে ভাষা-বিভ্রাটের মূল উৎস। হিন্দী-ভাষীরা এদেশে সংখ্যাগুরু, এই যুক্তিতে অহিন্দীভাষীদের উপর সেই ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কালক্রমে রাজ্যগুলির মধ্যেও যে-ভাষা-ভাষী লোকেরা সংখ্যাগুরু তাদের ভিতরে সংক্রামিত হয়েছে। আসামের সাম্প্রতিক ভাষাজুলুমের স্বরূপ দেখে আমাদের নেতৃবৃন্দ শঙ্কা বোধ করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁরা আত্মানুসন্ধান না ক'রে এবারও নির্দোষীকে আসামীর কাঠগড়ায় টেনে আনার ব্যবস্থা করছেন।

ধরা যাক, বর্তমান বিলটি লোক-সভায় গৃহীত হওয়ার পর বিহারে বা আসামে স্কুল-কলেজে বাংলা পড়ানো নিষিদ্ধ করে হিন্দী এবং অসমীয়াকে একমাত্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হল। তখন ঐ দুই রাজ্যের সংখ্যালঘু বাঙালী সন্তান-দের সে ব্যবস্থা নির্বিচারে হজম করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকবে না। কারণ বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভের দাবি অবশ্যই তখন হিন্দী বা অসমীয়ার বিরুদ্ধে বিভেদাত্মক আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত হবে, এবং পরিণামে নেমে আসবে তিন বৎসর কারাবাসের ন্যায়দণ্ড।

বাস্তব পরিস্থিতিতে এমন একটা সম্ভাব্যতা অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ এবং সদিচ্ছা-প্রণোদিত মনে হলেও প্রস্তাবিত আইনটি যে সন্দেহ ও বিদ্বেষ থেকেই জন্মলাভ করেনি, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন। এবং কে না জানে, বিদ্বেষ থেকে যার উৎপত্তি তা কখনো সৌহার্দ্যের দ্যোতক হ'তে পারে না!

আইনটি লোকসভায় গৃহীত হওয়ার আগে জনমত সংগ্রহের জন্যে তার উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবিত ধারাগুলি অচিরে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া উচিত।

প্রেম

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্ত সমীরে ভাবি রয়েছে তোমার বাসা—সে ভ্রম দুর্মর;
কুসুমে রয়েছো ভাবি গন্ধ হ'য়ে—চিনে নিতে হয়নি যে শেখা,
সন্ধান মেলেনি তাই; এ জীবন ক্ষয় ক'রে বৃথা পুঁথি লেখা
ক্রমাগত প্রেম নিয়ে; সে ভুলের শুল্ক দিয়ে হৃদয় জর্জর।

মনোভব যাঁর নাম মনের কোথাও তাঁর আছে স্থায়ী ঘর
এ বিশ্বাস রাখা শক্ত; বস্তুত মেলে যে তাঁর নিয়মিত দেখা
দেহের দেহলীপ্রান্তে—এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে আমি নই একা,
আরো আছে নানা জন যারা বলে দেহ ভাঙে, প্রেম অনশ্বর

আকাশ-পাতাল খুঁজি—কোথা তুমি আছো ওগো অনশ্বর প্রেম?
বিজ্ঞানের খুড়ো বলে—দ্যাখো ঐ হোথা বুঝি হতেছে নিলেম।
পিচ্ছিল কয়েক ধাপ নেমে গিয়ে চিনে ফেলি এক লহমায়—

জোৎস্নায় খুঁজেছি যাকে মেয়েদের মুখে কিংবা আকাশে ঈথারে,
এবার পেলাম তাকে. দেখি দিব্যি ঝুলে আছে মাংসের বাজারে;
লোকে আসে, কড়ি ফ্যালে, হরদম সের দরে কিনে নিয়ে যায়॥

*

* *

অধীর সরকার

সীমন্তিনী

আমি তো দেখেছি তারে সায়াহ্নের স্তিমিত মায়ায়
সন্ধ্যার প্রণামে নত, পিঠের উপরে এলোচুল,
মুখে নেই লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম নেই কোনো হাতে
এবং পরেনি সে তো চারুকর্ণে শিরীষের দুল।

সন্ধ্যার পুরবী বাজে শুনো ঘরে রাতের অমৃত,
সদাস্নাতা সীমন্তিনী দূরের আকাশে চোখ রেখে
কী যেন অস্ফুট স্বরে কোন মন্ত্রে জানায় প্রার্থনা—
সপ্রেম সুস্নিগ্ধ স্পর্শে দেবে মা কি সব গ্লানি ঢেকে?

সে এক আশ্চর্য স্বাদ। জীবনের কন্টকিত পথে
দিকে দিকে শব্দ তার আনন্দিত আশ্বাসে মধুর;
চোখে তার মেঘমায়া অশ্রু ঝরে হৃদয়ে হৃদয়ে—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

রবীন্দ্রনাথকে

গোপাল ভট্টাচার্য

প্রত্যহের বিষবাষ্পে দুচোখের জ্বলন্ত অঙ্গার
উত্তর মেরুর হিম, তার নিচে মাছের মতন
আমাদের জন্মদিন কোনমতে বাঁচে। সংগোপন
ইচ্ছার কোরক তার ফুটে উঠে হাসেনি একবার।
বাজপাখীর মতো তবু ঝড় এসে নিয়ে গেল আর
স্বপ্নের ওপারে তাকে দিয়ে হাসল। সারাক্ষণ—
নিষ্প্রদীপ ঘর যেন নিস্পন্দ পাথর। এ জীবন
কালের দর্পণে দ্যাখো নিষ্ঠুর কার্টুন। অন্ধকার।

ক্লান্ত পথ টেনে নিয়ে যেতে যেতে চমকায় পথিক—
কোনখানে একটি গান হাসছে নব জাতকের মতো
আলোগোর স্পর্শে যেন চোখ মেলল স্বপ্নেরা আহত
পথিক নতুন দেখল আছে তার উদার দশদিক।
আকাশের আল্পনাকার আলো আলো এসে দিল ডাক
আমাদেরও জন্মদিন হোক এই পঁচিশে বৈশাখ॥

আমরা সকলেই আধুনিক হ'তে চাই। আধুনিক না হলে আমাদের ইজ্জত থাকে না। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতো অনেকেই আমরা হেরে যাই। আমাদের নাম থাকে শুধু 'অল্‌সো র‍্যান'-এর তালিকায়।

এই নিয়তি কেবল ব্যক্তির নয়, জাতিরও। আবার কোনো বিশেষ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাতেও এই একই হার-জিতের খেলা চলছে দেখতে পাই। বিশ্বাস না-হয় তো আধুনিক বাংলা গানের ব্যাপারটাই দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে।

অবশ্য প্রথমেই প্রশ্ন হতে পারে, আধুনিক বলতে আমি কী বুঝি? সবিনয়ে নিবেদন করব, আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু সেইসংগে আরো একটা কথা আমি বলব, ও'রা যা বোঝেন তাতেও আমার সায় নেই।

যা-কিছু 'অধুনা' ঘটছে তাকেই আমি নির্বিচারে 'আধুনিক' বলে স্বীকার করব না। যেমন, গান-বাজনার কথা উঠল বলে বলছি, সরস্বতী পুজো থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পর্যন্ত যে-কোনো একটা ছুতো পেলেই মাইক-ভাড়া ক'রে চে'চানো, বা তাশা-পার্টির বাজনা, এগুলিকে কিছুতেই আমি আধুনিক বলে মানতে রাজি নই। তা হোক না সে যতোই অধুনাতম আবিষ্কার!

আসলে আধুনিকতা আর সম-সাময়িকতা ঠিক এক বস্তু নয়। রবীন্দ্র-নাথের সংজ্ঞা ব্যবহার করে বলা যায়, সম-সাময়িক ব্যাপারের বেশীর ভাগই হল ফ্যাশান, আর আধুনিকতা হল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক স্টাইল। মুখোশ এবং মুখশ্রীতে যতোখানি পার্থক্য, ফ্যাশান এবং স্টাইলের পার্থক্যও ঠিক ততোখানি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাংলা গান এই রকম একটা ধার-করা ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। এবং ততোধিক দুঃখের বিষয়, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের এই বাহারী জৌলুশে অনেকেই দেখছি বিগলিত-প্রায়!

কিন্তু আর বোধহয় দেরি করা উচিত নয়। চোখের এই রঙিন ঠুলিটা এবার খুলে ফেলা দরকার। আধুনিকতার নামে সুরের সঙ্গে এই কানামাছি খেলা-যে নিতান্তই একটা খেলো জিনিস, তা স্পষ্ট ক'রে বলা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। নয়তো, আমার দৃঢ় ধারণা, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা দুশ্চিকিৎস্য ভাবে সুর-কালা হ'য়ে পড়বে, এবং তখন গভীর রাত্রির নাসিকাধ্বনিকেও হয়তো তারা সঙ্গীত বলে বাহবা দেবে।

বাস্তবিক অবিলম্বে এই জুলুম-বাজি বন্ধ হওয়া দরকার। একথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না যে, আমরা যারা আধুনিক গল্প-উপন্যাস, চিত্র-প্রদর্শনী বা হাল-আমলে-তোলা নতুন ধরনের চলচ্চিত্র থেকে রসগ্রহণ করতে পারি, তারা আধুনিক গানের মর্মোপলব্ধিই করতে পারছিনে। গানের চরম সার্থকতা হল শ্রুতিতে। শোনামাত্র যে স্বরসমন্বয় মনকে ক্লিষ্ট এবং উদভ্রান্ত করে তোলে, তাকে আর যাই বলা হোক গান বলা যায় না।

তারপর গানগুলির 'কথা' বা লিরিক।। সত্যি বলতে কি এমন অর্থ-হীন শব্দসমষ্টি যে 'গান' বলে বাজারে চলতে পারে তা ভাবতেও লজ্জা বোধ হয়। এই মেরুদণ্ডহীন ক্লীবত্বই কি বাংলাদেশের গীতরচয়িতাদের আধুনিক অবদান। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কারণ বাংলাদেশের মহত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হ'য়েছে গানের মধ্য দিয়ে। কারণ আমাদের রয়েছে চণ্ডীদাস রামপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ, নজরুল। আমরা কি সত্যিই এতদূরে ঐতিহ্যবিচ্যুত হ'য়ে পড়েছি যে, সে সবই এখন অন্য জন্মের কথা।

তাই যদি হয়, তবে বাংলা গানের এখন পুনর্জন্ম হওয়া উচিত।

* * * *
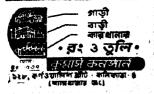
কথায় বলে, কুকুরে মানুষ কামড়ালে সেটা কোনো সংবাদ হয় না, কিন্তু মানুষে কুকুরকে কামড়ালে সেটা সাড়ম্বরে খবরের কাগজের শিরোধার্য হয়। সেই-জন্যে, রেল লাইনের লেভেল ক্রসিঙে মাঝে মাঝে লরী বা বাস রেলগাড়ীর ধাক্কায় কুপোকাত হওয়ার খবর যখন পড়েছি তখন উৎসাহিত হইনি। কিন্তু লরী আর বাসের দাপটে রেলওয়ে যখন আর্তনাদ তুলেছে, তখন বিস্মিত হ'তে হয়েছে বই কি।

ব্যাপারটা ঘটেছে এই পশ্চিমবঙ্গেই। শোনা গেল, আমাদের লাইট রেলওয়ে-গুলি নাকি বাস ও লরীর পরিবহণাত্মক আক্রমণে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। কল-কাতার যাত্রী-পরিবহণের ব্যবস্থা বর্ত-মানে সরকারী দখলে শশিকলার মতো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'চ্ছে! নিজ Bus-ভূমে পরবাসী বেসরকারী বাসগুলি এখন গ্রামসংযোগের জন্যে তৎপর। আর লরী? তার দাপটে শহর এলাকাতেই প্রাণ পকেটে নিয়ে বেরোতে হয়, শহরের বাইরে সে তো মূর্তমান বিভীষিকা। বাস ও লরীর এই সাঁড়াশী অভিযানে লাইট রেলওয়েগুলির যে নাভিশ্বাস উঠবে তাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু ঢালের উল্টোদিকেও একটা ছবি আছে। আর সে ছবিও হয়তো তেমন মনোরম নয়। বিজ্ঞানে জানা যায়, এনার্জিগুলি প্রায় জীবাত্মার মতোই বহুরূপী। তাপ, শব্দ, আলো, এগুলি অবলীলাক্রমে একে অন্যের চেহারা নিতে পারে। তাই যদি হয়, তবে 'লাইট' রেল-ওয়েগুলি কেনই-যে 'সাউণ্ড' রেলওয়ে হ'তে পারছে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। নিজেদের ব্যবসা-পদ্ধতি ঠিক 'সাউণ্ড বেসিসে' চলছে তো?

অবশ্য তাতে মস্ত বড় একটা অসু-বিধে হ'ত এই যে সরকারী নেকনজর আকৃষ্ট হ'ত না এদিকে। স্নেহান্ধ পিতার মতো আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও বাউণ্ডুলে ছেলেটার পিছনেই বেশী ছুটোছুটি করেন। লরী এবং বিশেষ করে বাসগুলিকে এখন বনবাসে পাঠানোর সুপারিশ হলেও আশ্চর্য হব না।

* * *

এক কাঠুরে নারী একসঙ্গে চারটি সন্তানের জন্মদান করেছেন, রাশিয়ার এ খবরে আশ্চর্য বোধ করার কিছু নেই। কিন্তু এলাহাবাদের কাছে এক গ্রামে যে-নারী একসঙ্গে তিনটি সন্তানের জননী হ'য়েছেন তাঁর জন্যে বিচলিত বোধ করছি।

সন্তান অবশ্যই প্রাণের চেয়ে প্রিয়। এবং বাৎসল্য অত্যন্তই পবিত্র বস্তু। এদেশে এবং ওদেশে এই বাৎসল্য ভাব নিয়ে কতো শিল্প-সাহিত্যই যে কালজয়ী হ'য়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সে সবই হল ভাবজগতের জিনিস, বস্তু-জগতে তার অনুপ্রবেশ তেমন সুখকর হ'য়ে ওঠে কি?

যেমন ধরুন, ফুলশয্যা। কল্পনায় ব্যাপারটা যতোই মনোরম লাগুক, সত্যি-সত্যি একরাশ ফুলের উপর শোয়া কখনোই তেমন আরামদায়ক হ'তে পারে না। ভালোলাগার জন্যে দরকার ফুল-শয্যা নয়, ফুলের ছোঁওয়া-লাগা শয্যা অথবা শয্যার পাশে কিছু ফুল।

বাৎসল্যের বেলাতেও ঠিক তাই। সন্তানের জন্যে সত্যিকারের স্নেহ ফুটে ওঠার জন্যেও দরকার তার আশে-পাশে কিছু শূন্যতা। কিন্তু যে ঘরে শুধুই অজস্র সন্তান, সেখানে বাৎসল্যও হবে অত্যন্ত ক্ষীণস্রোতা, এবং নির্জীব।

বিশেষ ক'রে আমাদের এই দেশে এবং আমাদের কালে। খাদ্যাভাব আর ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সরকার যখন পরিবার-পরিকল্পনার জন্য মরীয়া হ'য়ে উঠেছে, তখন প্রকৃতির এই অযাচিত দাক্ষিণ্যকে পরিহাস ছাড়া আর কী বলব!

এককালে শতপুত্রের জননী হওয়া আশীর্বাদে গান্ধারী গৌরবান্বিতা বোধ করেছিলেন। কিন্তু একালে তেমন আশীর্বাদের কথা শুনলে সন্তান না চোখের সামনে ফুটে ওঠে কাঙালী ভোজনের বিভীষিকা।

এলাহাবাদের গ্রাম্য জননীর জন্য সমবেদনা বোধ করছি। জানি না তিনি আমাদের এই ভারত-জননীরই প্রতীক কিনা!

অবনীন্দ্রনাথ স্মরণে

*

অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা

দেখি ফোহারা উঠছে গোলাপ-বাগে,—
উঠছে পড়ছে তালে তালে
মণি-মঞ্জীরের ছন্দ ধরে,—
—উল্‌সে উঠছে গোলাপজল ফুহরী দিয়ে,—
ঝর্ণা বইছে উপবনে
আবীরে চন্দনে মদে মেহ্‌দিতে রাঙ্গানো॥

॥ শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিকের সৌজন্যে॥

*

অবনীন্দ্র-স্মরণে

বীরেন্দ্র মল্লিক

এমনি ত হয়;
কখনো বা কোনো এক
প্রকৃতির প্রবুদ্ধ চেতনা
জীবনের স্রোতে ভেসে ভেসে
জগতের ঘাটে লাগে এসে।

এ-সৃষ্টির বিচিত্র বিস্ময়,
নদী মাঠ পাহাড় কান্তার,
আরো দূর সাগরের দ্বীপ,
কিংবা কোনো মুছে-যাওয়া বালিয়াড়ি পাড়,
অথবা সে-কোন্ সূর্য
রঙে যার মন্ত্রমুগ্ধ সীমাহীন দিগ্বলয়
তাহার চিন্তায় আসি
নীরবে গোপনে কথা কয়।
অনন্ত-রহস্য-ঘেরা এই অন্ধকার
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করে তার দ্বার।

চারিদিকে প্রশ্ন শুধু
ধাঁধাঁ আর অজস্র জিজ্ঞাসা;
এর মাঝে রেখে যান এ'রা
এক ফোটা আলোকের অসীম পিপাসা।

এমনি ত এক ঢেউ
এসেছিল এইখানে;
আমাদের এত কাছে ভাই;
মোরা তার দিয়েছিনু এক পরিচয়,
রেখেছিনু "অবনীন্দ্র" নাম।
আমি এক এ-দেশের কবি
সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে করি তাঁহাকে প্রণাম।

অবনীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার দত্ত

সময়টা ১৯৪৩ সাল। অবনীন্দ্রনাথ **তখন জীবন** সায়াহ্নে। বরানগরের গুপ্ত-**নিবাসে থাকেন** কিন্তু শান্তিনিকেতনের **সঙ্গে সম্পর্ক** একেবারে কাটেনি। মাঝে **মাঝে** আশ্রমে গিয়ে এক-নাগাড়ে বেশ **কিছুদিন** কাটিয়ে আসেন। বসন্ত-উৎসব **উপলক্ষে** শান্তিনিকেতনে গেছি। **সৌভাগ্যক্রমে** শিল্পীগুরু তখন শান্তি-নিকেতনে আছেন। বিকালবেলা গেলাম **দেখা** করতে। উত্তরায়ণের বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন। কাছে আর **কেউ ছিল** না। বার্ধক্যের ছাপ দেহের **চারিদিকে**। নাকের উপর নেমে-আসা **কালো চশমা**। খোঁচা খোঁচা দাড়িসুদ্ধ **শুকনো মুখ**। তার মধ্যে চোখ দুটি **কিন্তু** অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ও প্রখর। সর্বাঙ্গ-**ঢাকা জোব্বা** পরনে। দেখলাম আরাম-**কেদারার** হাতলে ও সামনের টেবিলে **নানা** আকারের কাঠ আর গাছের **ডালপালার টুকরো**। বুঝলাম এগুলি **তাঁর সেই** বিখ্যাত 'কুটুম-কাটাম' মূর্তি **তৈরীর উপাদান**। চোখের দৃষ্টি কমে **এসেছে, হাতও** কাঁপে, তাই তুলিকে **দিয়েছেন বিশ্রাম**। তার বদলে হাতে **উঠেছে বাটালি**। আশ্চর্য লাগে ভাবতে **এই শিল্পীই তাঁর** সারা জীবনের সাধনায় **কত না** আশ্চর্য-সুন্দর ছবি এঁকে আধুনিক **ভারতীয়** চিত্রকলার মোড় **ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।**

অবনীন্দ্রনাথ **যখন** ছবি আঁকতে **আরম্ভ করেন তখন** ভারতীয়ের কাছে ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্য ছিল সম্পূর্ণ-ভাবে অপরিজ্ঞাত। এমন কি অবনীন্দ্রনাথ নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল রাজ-পুত চিত্রকলার পর ভারতীয় শিল্প-কলার ধারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে হাতে-খড়ি হয় ইউরোপীয় টেকনিকে গিলহার্ডি ও পামারের কাছে। এঁদের কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথ অংকন-বিদ্যার প্রাথমিক কয়েকটি খুঁটিনাটি রপ্ত করেছিলেন। এর পর ১৮৯৪ সালে অবনীন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে পাটনা 'কলমে' (Kalm) আঁকা কয়েকটি ছবির দর্শন পান। ছবিগুলির 'ডেকরেটিভ' দিকটা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে 'কৃষ্ণলীলা', 'বুদ্ধের জীবন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং 'কালিদাসের কবিতা' প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনেকগুলি ছবি আঁকেন। ছবিগুলিতে রঙ ব্যবহারের চমৎকারিত্ব বিশেষ লক্ষণীয়। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হোল হ্যাভেল-সাহেবের। হ্যাভেল অবনীন্দ্র-নাথকে মোগল ও পারসিক পদ্ধতির কয়েকটি ছবি দেখিয়ে তাঁর সামনে এক নতুন রূপজগতের দ্বার উন্মোচন করে দিলেন। ফলে সৃষ্টি হোল অবনীন্দ্র-নাথের বিখ্যাত ছবি 'সাজাহানের মৃত্যু'। এই ছবিতে সম্পূর্ণভাবে না হ'লেও অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে অনেকটা প্রতি-ষ্ঠিত করেছিলেন। সময়টা তখন ১৯০০ সাল। ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ওমর খৈয়াম গ্রন্থের চিত্রসমষ্টি রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। 'ওমর খৈয়াম' চিত্রাবলী অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিত্র-রীতির বিবর্তনে একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ। ১৯১১ সালে পুরীতে শিল্পীগুরু অনেকগুলি দৃশ্যচিত্র আঁকেন। সমুদ্রের নীল আর সৈকতের পাশুটে রঙ একত্রে মিলে অপূর্ব সৃষ্টি এই দৃশ্যচিত্রগুলি। অবশ্য এই কালে অবনীন্দ্রনাথের পশুপাখীর চিত্র আঁকা, রবীন্দ্রনাথের নাটকের চিত্র তৈরী, পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ণ প্রভৃতি কাজ একই সঙ্গে চলছিল।

১৯১৯-২০ সালে অবনীন্দ্রনাথ হিমালয়ের কতকগুলি দৃশ্যচিত্র আঁকেন। ভারত-আত্মার প্রতীক হিমালয়কে উপলব্ধি করার ব্যাপারে এই চিত্রগুচ্ছ বিশেষ সহায়ক। এই সময়ে শিল্পী মন থেকে বিখ্যাত মোগল বাদশাহের প্রতি-কৃতি অংকন করেন। মন থেকে আঁকা বলে এগুলি হুবহু নকল নয় কিন্তু আদর্শ সৃষ্টি। ১৯২৫ সাল নাগাদ অবনীন্দ্রনাথ পর পর কিছু জীবজন্তুর ছবি আঁকেন যেখানে রেখার অতি সংক্ষিপ্ত ব্যবহার আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অবনীন্দ্র-নাথ একচালের তুলি ব্যবহারে বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শিল্পী-গুরুর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বাঙলার গ্রামের দৃশ্যচিত্র। বাংলার গ্রামের সত্যিকারের মাটির স্বাদ ফুটে উঠেছে এই সমস্ত ছবিতে। ১৯৩০ সালে সৃষ্টি হোল অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত আরব্যরজনী উপন্যাসের চিত্রা-বলী। উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি ও অংকনভঙ্গীর সাবলীলত্বে এগুলি অন-বদ্য সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'ওয়াশ্' পদ্ধতিতে আঁকা এই ছবিগুলির উজ্জ্বলতা সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৮-৩৯ সালে শিল্পী চিত্রায়িত করেন 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' ও 'কৃষ্ণ মঙ্গলে'র কাহিনী। এগুলির গুরুত্ব আরব্যরজনীর চিত্রাবলীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। অবনীন্দ্রনাথের শেষ বড় কাজ হচ্ছে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আঁকা 'শেষ যাত্রা'র দুটি ছবি। এরপর তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বার্ধক্যের জন্য ভাঙাচোরা কাঠ-কাটরা নিয়ে 'কুটুম-কাটাম' নামে খেলনা সৃষ্টি করে গেছেন। একথা আমরা গোড়াতেই বলেছি।

ভারতের গৌরবময় শিল্প-ঐতিহ্যের লুপ্তধারার পুনরুজ্জীবন শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র অবদান মনে করলে ভুল করা হবে। পুনরু-জ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলাকে সম্পূর্ণ নতুন পথে অনেকদূর এগিয়ে দিয়ে গেছেন। মোগল-পারসিক ও জাপানী পদ্ধতির অনুকরণ নয়, সেগুলিকে সাঙ্গীকৃত করে নব সৃষ্টিটাই অবনীন্দ্রনাথের জীবনের মূল কথা। 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট' প্রতিষ্ঠা অবনীন্দ্র-নাথের জীবনের আর একটা বড় কাজ। এই প্রতিষ্ঠান মারফতই অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-সাধনা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্য দিয়ে স্থায়ী রূপ লাভ করে। প্রকৃত শিল্পী শুধু নিজে সৃষ্টি করেন না; অপর মানুষকেও নবসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেন। আচার্য নন্দলালই শুধু অবনীন্দ্র-নাথের একমাত্র শিষ্য নন। তাঁর অনু-গামীর সংখ্যা বহু। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশ্লে-ষণ এখানে সম্ভব নয়। তবে সেই বিখ্যাত উক্তি বোধ হয় সকলেই জানেন : "অবন শুধু ছবি আঁকে না ছবি লেখে।" তাঁর পালক ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো-আংলা, রাজ-কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ চিরায়ত শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পুণ্য জন্মদিনে শিল্পীগুরুকে আমাদের অন্তরের প্রণতি জানাই।

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ন রায়

শুধু দু'জনের ব্যাপার নয়। কেদার আর বদরীর নাম শুনে দুই থেকে দশজনে উঠলো। ডাঃ গুণেন যাদুবিদ্যা জানে কিনা জানি না—কিন্তু দশজনেরই টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

হিমালয় আমাকে চিরদিনই আকর্ষণ করে। স্বামী অখণ্ডানন্দ বহু ব্রহ্মচারী-শিষ্য সঙ্গে নিয়ে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের সময় লালগোলায় গিয়ে তিন-চারদিন থাকতেন। আমার যখন বার-তের বছর বয়স, সেই সময় স্বামীজী লালগোলায় আমাকে জলধর সেনের একখানি হিমালয়-ভ্রমণ কাহিনী উপহার দিয়েছিলেন। তাই কেদার-বদরীর পথে হিমালয়-ভ্রমণ আমার আশৈশব কল্পনা।

৬ই অক্টোবর। বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এসে পড়েছে। অন্তরে অনেক কিছু আশা নিয়ে রাত পৌনে ন'টায় 'ডুন এক্সপ্রেসে' আমরা চেপে বসলাম।

৭ই সন্ধ্যা প্রায় ছ'টার সময় আমরা লক্ষ্ণৌ স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখান থেকে আটটা সাড়ে আটটায় ছিদৌলি স্টেশনে গিয়ে গাড়ী প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপার কী?

সেখান থেকে আবার লক্ষ্ণৌ পশ্চাদপসরণ। শুনলাম নাকি ওদিকে ট্রেণ যাবে না।

কী হ'ল, সেদিন জানতে পারিনি।

লক্ষ্ণৌ নবাবের দেশ কিনা,—পিছু তো হটতেই হবে। কিংবদন্তী আছে, নবাব ওয়াজিদ্ আলী শা' তাঁর নাচমহল থেকে বেরিয়ে "মেরা জুত্তা ঘুমা নেহি দিয়া" বলে পালাতে পারেননি, ইংরেজের হাতে নাকি বন্দী হয়েছিলেন।

যাই হোক আমাদের গাড়ী কানপুর, আলিগড়, চন্দোসী পরিভ্রমণ করে, হাত ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত, সতেরো ঘণ্টা 'লেট' করে ৮ই অক্টোবর প্রায় রাত বারোটায়, আমাদেরও বারোটা বাজিয়ে, হরিদ্বার স্টেশনে "বাপ্ বাপ্" শব্দে স্টীম ছেড়ে, আমাদের প্ল্যাটফরমে উগলে দিলে।

এই দীর্ঘ সময় ট্রেণে বন্দী হয়ে থাকা বড়ই বিরক্তিকর। বাটা কোম্পানীর এক নবদম্পতি হরিদ্বার যাচ্ছিলেন। তাঁরা ছিলেন অন্য কামরায়। হাওড়া থেকে ট্রেণে উঠবার সময়েই আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সেই ভদ্রলোকটিকে ডেকে ব্রিজের আড্ডা ট্রেণের মধ্যেই জমিয়ে

চার ধামের এক ধাম বাকী। সে আশা বার বার তিনবার ব্যর্থ হয়েছে। হরিদ্বারের টিকিট কিনেও ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছি।

হপ্তাখানেক আগে ডাক্তার গুণেন রায়কে বিশেষ করে বলে রেখেছিলাম, তোমাকে 'নিরাময়' নিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত থাকতে হয়, তুমি আসছে বছর ঠিক এমনি সময়ে তোমার কর্ম-জীবন থেকে নিজেকে অন্ততঃ মাস খানেকের জন্যে আলাদা করে নিও। তোমায় আমার সঙ্গে কেদার-বদরী যেতে হবে—জানোই ত' বছর দশেক আগে আমার একবার করোনারি থ্রম্বোসিস হয়েছিল।

ঠিক এমনি সময়ে খবরের কাগজে দেখলাম, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ বদরী-নারায়ণ তীর্থযাত্রা করেছেন। ভাবলাম, এই সময় চটীগুলো নিশ্চয়ই পরিচ্ছন্ন থাকবে— রাস্তাঘাটগুলোও অনেকটা পরিষ্কার হবে— কাজেই আমরাও পশ্চাদ্ধাবন করি। ওদিকে ঠিক একই সময়ে ডাঃ গুণেন রায়েরও মনে একই কথাই জেগে উঠল। গুণেন রায়ের সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। তিনি আমাদের মিলিত প্রচেষ্টা ও স্বীয় অধ্যাবসায় দিয়ে নিরাময় টি. বি. স্যানাটোরিয়ামটি গড়ে তুলেছেন—তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক।

১৯৬০ সাল।

৬ই অক্টোবর যাত্রার কথা মনে হ'ল বটে, কিন্তু আজ তো চার তারিখ। ট্রেণের টিকিট এত শীগগির মেলা তো সম্ভব নয়। তার ওপর বার্থ রিজার্ভেশনের ভীষণ ঝামেলা। পুজোর ছুটিতে এবার অসম্ভব ভিড়—কলকাতার দম-বন্ধ করা গণ্ডীর হাত থেকে বাইরে গিয়ে সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চায়।

গিয়েছিলাম। সহযাত্রী পিসতুতো ভাই শ্রীমান নীরেন্দ্রনারায়ণ, তাঁর দৌহিত্রী বুলবুল, যিনি এখন এম, এ, পড়ছেন আর বাড়ীতে মাষ্টার রেখে ফ্রেঞ্চ পড়েন, আমি আর সেই ভদ্রলোকটি মিলে ব্রিজ খেলে কিছুটা সময় কাটানো গিয়েছিল।

প্ল্যাটফরমে নেমে দলবল সব ষ্টেশনের একটু নীচেই যে ওয়েটিং রুম আছে, সেখানে আস্তানা নিলে। ভিড়ের জন্য নিদ্রার সুবিধা নেই। কাজেই আমি সেই প্রকাণ্ড ষ্টেশনের একপাশে আমার কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমোবার যো কী? কাছেই এক জোড়া বুড়োবুড়ী বেদম কাশির ঐকতান জুড়ে দিয়েছে, সুতরাং কম্বল গুটিয়ে উঠে পড়তে হ'ল। রাত্রে ষ্টেশনমাষ্টার নেই, অগত্যা তাঁর এ্যাসিস্টান্টের শরণাপন্ন হ'লাম। তিনিও তাঁর অফিস-ঘরের মধ্যেই একটি বড় কাঠের টেবিলের ওপরে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করছিলেন। আমার দুরবস্থার কথা তাঁকে জানাতেই তিনি টেবিলের ওপর থেকে তাঁর স্বত্ব-স্বামিত্ব ছেড়ে দেবার পরই আমিও তাঁর তক্তুতাউসে উঠে সটান্ লম্বা হ'লাম।

৯ই অক্টোবর। হরিদ্বারের মত ষ্টেশনের বিরাট গোলমাল সত্ত্বেও আমার ঘুম ভাঙেনি—এত ক্লান্ত। এদিকে আমার পিসতুতো ভাই নীরেন আমাকে খুঁজে সারা। আমি যে ষ্টেশন-রুমের মধ্যে একটা টেবিলকে খাট বানিয়ে তার ওপর লম্বমান—এটা তার কল্পনারও বাইরে। তাই আমাকে খুঁজে বের করতে তার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। তার ধাক্কা খেয়েই আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসেই বলি, 'চলো মুসাফির বাঁধো গাঁঠোরি।' ষ্টেশনের ল্যাভেটরীতেও ভীষণ ভিড়। কাজেই এক ঘটি জল আনিয়ে প্ল্যাটফরমের এক কোণে হস্তমুখ-প্রক্ষালন পর্ব সেরে নিলাম।

৯ই অক্টোবর—এবার যাত্রা হল শুরু। আমাদের দলটি নেহাৎ ছোট নয়। দু'টি চাকর ও একটি ঝি নিয়ে সর্বসাকুল্যে আমরা দশজন। দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। কিছু মুখে দিয়ে পৌনে সাতটায় ষ্টেশন ত্যাগ। তারপর মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে বাস ষ্ট্যান্ড। সওয়া আটটায় হৃষিকেশে রওনা হ'লাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে সেখানে যেতে। হৃষীকেশে নেমেই গেলাম গঙ্গাস্নানে—মনে মনে বলি, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' সুন্দর দৃশ্য! নানা রঙের পাথরের ওপর দিয়ে গঙ্গার স্বচ্ছ ধারা নেমে আসছে। সেখানে নাকি মাছকে খাওয়াতে হয়। কাজেই মুড়ি-মুড়কি কিনে ছিটিয়ে দেওয়া গেল। তারপর জলে নামতেই তাদের ল্যাজের আঘাতে প্রাণ অতিষ্ঠ। আমরা মৎস্যভুক বাঙালী কিনা—তাই বুঝি তারা ইয়ার্কি শুরু করেছে। আর আমরাও হরিদ্বারে নেমেই অহিংস পথের পথিক হয়েছি।

স্নানান্তে আমাদের সকলেরই হোটেলে চাপাটি ভক্ষণ। পেটপুজো সেরে নিতে সামান্য একটু দেরী হ'ল বৈকি। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হ'ল, সে আমাদের জন্যে দু' আড়াই ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করবে—তিনি যাতে খুশী হ'ন তার কসুর হবে না। আরও কয়েকজন যাত্রী সায় দিল। তারাও আমাদের মতই হৃষীকেশে সব কিছুই দেখে নিতে চায়।

স্বর্গাশ্রম হৃষীকেশ— চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। ভাগীরথীর ওপারে দক্ষিণতটে মনোরম তপোভূমি। লোকে বলে—ভগবান বিষ্ণু এক বৈশ্য ঋষিকে এখানে উদ্ধার করেন। তপস্যার জন্য বহু সাধু মহাত্মা এখানে বসবাস করে থাকেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ধারার সঙ্গমে ত্রিবেণীতটে শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীর মন্দির। হৃষীকেশে ভরতজীর প্রাচীন মন্দির, চন্দ্রেশ্বর মহাদেব, সোমেশ্বর মহাদেব ও ভগবান বরাহের মন্দির আছে। পাঞ্জাবী ও সিন্ধীরা ছত্র খুলেছে। এখানেই কালী কমলিওয়ালার পঞ্চায়েতী সত্র আর প্রধান কার্যালয়। হৃষীকেশের অন্তর্গত কৈলাসাশ্রম, রামনগর আত্মবিজ্ঞান ভবন, রামাশ্রম ও ধন্বন্তরি মন্দিরেও দেখলাম যাত্রীর সংখ্যা কম নয়।

আমরা চারটে ডাণ্ডী নিলাম—আর ষোলজন গাড়োয়ালী কুলী। প্রত্যেক ডাণ্ডী চারজন কুলীতে বইবে। এক একটা ডাণ্ডী ডিঙির মত দেখতে—যেন একটি বড় খেলনা। একজন কোনো রকমে বসতে পারে। আরোহী যদি ওজনে বেশ ভারী হয়, তা হলে আরও দুজন অতিরিক্ত কুলী। আমাদের মধ্যে কেউ এত ওজনদুরস্ত মানুষ ছিল না। মালপত্র বইবার জন্যেও ছ'জন গাড়োয়ালী আর নেপালী কুলী। তাদের সর্দার ডবল বাহাদুর—যিনি এর মধ্যেই একশ বার কেদার-বদরী চড়াই উৎরাই করেছেন। বাক্স, বেডিং, গুণেন রায়ের ওষুধপত্রের একটি সুটকেশ, রান্নার সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি তার উপরেই ভার দিয়ে আমরাও নিশ্চিন্ত হ'লাম। তিনিও সব জিনিসপত্তর বুঝে নেওয়ার পর, ছ'জন কুলীসমেত, নিজের অস্তিত্বের একটি যেন বিরাট সার্থকতা আছে, এমনি ভাব দেখিয়ে আমাদের বাসেই এসে উঠলেন। সত্যিই তো, তাঁদের ছাড়া তো আমাদের গতি নেই—বহু মাল বইবার শক্তি রাখে তারা—অতএব একটু দেমাক থাকবে না তো কী!

পথে মুনির চরা—সেখানে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে যাত্রীরা স্বর্গাশ্রম ও গীতা-ভবন দেখতে যায়। লছমনঝোলা পার হয়ে আমাদের বাস হু হু করে ছুটে চলে—আমার মনের গতি তার চেয়ে ঢের বেশী!

সন্ধ্যা সাতটায় আমরা দেবপ্রয়াগ হয়ে শ্রীনগর পৌঁছলাম। শ্রীনগর নাম হলে কী হয় নগরটি একেবারেই বিশ্রী—যেমন ধুলো তেমনি নোংরা। গিয়ে দেখি, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। কোথাও আশ্রয় পেলাম না। কারণ ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ বদরীতীর্থ পর্যটন করে, সেই দিনই আর এক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীনগর পৌঁছবেন। তাই তাঁর সঙ্গোপাঙ্গোদের জন্য তীর্থযাত্রীদের উপযোগী যেখানে যা-কিছু আস্তানা ছিল, সবই রিজার্ভ হয়ে গেছে—ন স্থানং তিল ধারণং।

'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই'—কী করা যায়? রাত কাটাই কোথায়? একজন এসে দন্তবিকশিত করে খবর দিলেন—"একটা নতুন দোতলা বাড়ী তৈরী হচ্ছে,—সেখানে চলুন।"

আশ্বস্ত হ'লাম—নতুন দোতলা বাড়ী, আর চাই কী? কিন্তু গিয়ে দেখি, দোতলার ছাদ তখনও হয়নি—দরজা, জানলা, দু'একটা ছাড়া সবই বাকী। নীচে দোকান—দুধ, পরটা, ফুলুরি, ভাত, আলু, সন্দেশ—যাত্রীরা যে যা চায়, ভনভনে মাছি-বসা ঐ খাদ্যগুলি অনায়াসে কিনতে পারে। তার পাশেই আবার নর্দমা—কী যে দুর্গন্ধ, বলা যায় না। কিন্তু কী করা যায়, পেট তো আর কোনও কথা শোনে না—তাই ডাক্তার হয়েও গুণেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সেখানে প্রত্যেকের অভিরুচি অনুযায়ী ঐ অপরূপ ভোজ্যদ্রব্যগুলির প্রস্তুতির কথা বলে দিতে বাধ্য হল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই নাকি রাজেন্দ্র প্রসাদ পি-

ডব্ল্যু-ডি'র বাংলোয় এসে উঠবেন, শুনেই আমিও সটান একটা লাঠি আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—'দীন যথা যায় দূরে রাজেন্দ্রসংগমে তীর্থ দরশনে।' প্রায় তিন ফার্লং পাহাড়ে উঠবার পথ—মাঝে মাঝে হ্যাজাক লন্ঠনের চোখধাঁধানো আলো ঘন অন্ধকারকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে পথচারীর সুবিধে করে দিয়েছে। এখানে সেখানে পুষ্পস্তবক, গেট ও ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। সেই উজ্জ্বল আলোকিত পথে উপরে উঠে বাংলোয় পেঁছে দেখি, শ্রীনগরের যাঁরা মাতব্বর ব্যক্তি, প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদের আগমন-প্রতীক্ষায় তাঁরা সবাই অপেক্ষমান—ওখানকার বালিকাসম্প্রদায়ও মাল্যহস্তে দণ্ডায়মান।

আমি তাঁদের সামনে দিয়ে হন্ হন্ করে উঠে আসতেই, ওখানকার হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের মধ্যে সতর্ক কৌতূহল ও মৃদু গুঞ্জন; দু'একটি লোকেরও, হয়তো আই. বি. ডিপার্টমেন্টের হবেন, আমাকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত নাঙ্গা-শির দেখেই, আমার প্রতি সন্দেহাকুল দৃষ্টি। তার পরেই আমি প্রশ্নবাণে জর্জরিত। "কাঁহা সে আতে হে"—কোন্ কামকে লিয়ে ইঁহা পর আনা হুয়া, আপকা শুভ নাম"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাংলার পাঁচনে তৈরী হিন্দী ভাষা আমারও কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—প্রেসিডেন্ট-সাহেবকে দেখতে এসেছি—আর কোন কৈফিয়ত দেবার নেই।

ঠিক এমনি সময় নীচে মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি শুনলাম। —জয় রাষ্ট্রপতি কী জয়!

যে যার নির্দিষ্ট স্থানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রাজেন্দ্র প্রসাদও এসে পড়লেন। কন্যা-কুমারীদের শঙ্খধ্বনি ও মাল্যদান পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পরই সেখানকার স্থানীয় প্রতিনিধিদের সংগে ফর্মুলা অনুযায়ী নমস্কার প্রতি-নমস্কার শেষ করেই তিনি বাংলোয় ঢুকে পড়লেন।

আমি হে পাতকী আছি পড়িয়া দূরে সরিয়া গো। রাজেন্দ্র প্রসাদের মিলিটারী সেক্রেটারী ঠিক সামনেই একটি কুরসিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় নেতিয়ে পড়লেন এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়বৃন্দের কাছে তাঁকে যে সেদিন কত পরিশ্রম করতে হয়েছে, তারই একটা ফিরিস্তি দিয়ে বোধ হয় আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন। আমিও শনৈঃ শনৈঃ তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হতেই, আমার প্রতি একটি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিবাণ ছুঁড়লেন—ভাবার্থ—'কিবা প্রয়োজনে মাগিয়াছ দর্শন আমার?' আমি বিনা দ্বিধায় তাঁকে আমার নাম ধাম ও পরিচয় জানিয়ে বলি—

—আমি সুদূর বাংলাদেশের এক সামান্য লেখক। আমিও কেদার-বদরীনাথের তীর্থযাত্রী। রাষ্ট্রপতি তীর্থ করে ফিরে চলেছেন—ভাবলাম তাঁর সংগে একবার দেখা করে যাই। আমি তাঁর অপরিচিত নই—হয়তো আমাকে তাঁর মনে থাকতে পারে।

মাধ্যাকর্ষণের গবেষণায় নিউটনের মুখ যতটা না গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, পঞ্জাব-অধিবাসী মিলিটারী সেক্রেটারীর মুখখানা তদপেক্ষা আরও বেশী গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি তির্যক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "এও কি সম্ভব? তিনি এত ক্লান্ত, পথিমধ্যে কয়েকস্থানে নির্দিষ্ট কর্মসূচী পালন করতে হয়েছে; তা ছাড়া এপয়েন্টমেন্ট নেই—তবে তিনি আশ্বাস দিলেন, "আপনি যদি দেখা করতে চান, দিল্লী আসুন, আমি আপনার ইন্টারভিউ করিয়ে দেব। এখানে অসম্ভব।" বাক্যটি সমাপ্ত করেই তাঁর মুখখানা উত্তর-দক্ষিণ দুলিয়ে দিলেন।

আমার গলাটা বোধহয় একটু উঁচু পর্দায় বেজে উঠলো—

—আমি তো বলেইছি কোনও স্বার্থ বা প্রয়োজনের তাগিদে দেখা করতে আসিনি। এই আমার কার্ড রইল—তাঁকে আমার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেবেন। আমি এখন চল্লাম।

কথার শেষ না হতেই দেখলাম, সেক্রেটারী মহোদয় হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েই দু'চার কদম এগিয়ে গেলেন এবং কার সংগে যেন মুহূর্তকাল কথা বলেই ফিরে এসে আমায় ডাক দিলেন।

আমি ডাকবাংলোর উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে বারান্দার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর সংগে কথা বলছিলাম,—কাজেই বুঝলাম না, এত ঝটিতি তাঁর মত পরিবর্তনের কারণ কী!

বারান্দায় উঠেই ঘরে ঢুকতে যাব—তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন—আমাদের রাষ্ট্রপতি।

দেখলাম, মাথায় গান্ধীটুপি নেই; তিনি কখন যে বারান্দার এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলেন— আমার মোটেই বোধগম্য হয়নি। আমি নমস্কার করতেই, তিনিও সহাস্যে প্রতিনমস্কার দিয়ে ভিতরে বসতে বললেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বলি—'আপনি যেখান থেকে ফিরে এসেছেন, আমিও সেই পথের যাত্রী—তবে আমি কেদার হয়ে বদরী যাব। আমার সংগে বহু লোক—এখনও আস্তানা ঠিক হয়নি— কাজেই এখুনি চলে যেতে হবে। আপনি ভক্তিমার্গের মানুষ,—তাই একবার দেখতে এলাম।"

এটা ওটা সেটা কিছু কথা হ'ল। হিন্দী ভাল জানি না, কিন্তু বলার দুঃসাহস আছে। রাষ্ট্রভাষায় অগ্রসর হবার পর যেই আট্‌কে যায়, অমনি সটান ইংরেজীতে ফিরে গিয়ে বক্তব্যটা শেষ করে ফেলি। এই রকম দু'চার মিনিট চলার পর বিদায় নিলাম।

কার ইংগিতে জানি না, মিলিটারী সেক্রেটারী তখন খুব তৎপর হয়ে দু'জন গার্ড সংগে দিলেন আমাকে আস্তানায় পেঁছে দিতে। ফিরে আসার সময় ভাবলাম, এই বৃদ্ধ বয়সে, এত ক্লান্তি সত্ত্বেও, এই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি আলাপ করলেন এইটিই হোল তাঁর মহানুভবতা। ক্ষমতার মদিরা পান করে যাঁরা বিচলিত হ'ন না, যাঁরা আসনের উত্তাপকে অতিক্রম করে চলে ফিরে বেড়ান, তাঁদেরই চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

আমি পথ ভুলেছিলাম। যাই হোক, বহু জিজ্ঞাসাবাদ করে যথাস্থানে পেঁছে দিয়ে গার্ড দুটি সেলাম বাজিয়ে ফিরে গেল।

আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে। ইতিমধ্যে মেয়েরা কিছু মুখে দিয়েই ওপরের ছাউনী-হীন ছাতে শুয়ে পড়েছেন—মাথার ওপর একখানা ভাড়া-করা সতরঞ্চি—চারদিকে দড়ি বেঁধে টাঙ্গানো এবং সেইটিই ছাদ বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কী? আর ওই রকম তিন দিকে তিনটে ভাড়া-করা চটের দেয়াল বানিয়ে তৃপ্তির সংগে নিদ্রা দিচ্ছেন।

এদিকে নীরেন, তার পুত্রদ্বয়, ডাক্তার গণেন ও এড্‌ভোকেট গণেন, আমার প্রতীক্ষায় নীচে দোকান ঘরের এক কোণে হৈ-হল্লার মধ্যেও চুপ করে বসে আছে, যেন তারা কত চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। আমরা সবাই মিলে ইয়া বড়া লিট্টি ভয়সা দুধের সংগে ভিজিয়ে গাদা বন্দুকের মত আমাদের গলার নলীতে ঢুকিয়ে দিলাম। দুটো খাটিয়া, প্রত্যেকটি চার আনা ভাড়ায় নগদ আট আনা দোকানদারের হাতে অগ্রিম দিয়ে এক রাত্রির জন্যে দখল পাওয়া গেল—ঐ দুটি একসংগে ভিড়িয়ে নীরেন ও আমি পাশাপাশি শুয়ে পড়ি।

গুণেন ও গণেন নীচেই কম্বল বিছিয়ে শয়নের উদ্যোগ-পর্বে মন দিলে।

চোখে ঘুম আসে না—হৈ-হল্লা মন্দীভূত হয়ে এলেও যেন থামতে চায় না। নীরেনের কানে মুখ লাগিয়ে তার-স্বরে গান জুড়ে দিলাম—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা"। তারও আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে পার্শ্বপরিবর্তন। ওদিকে কলরবও থেমে গেল—আমরাও ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন, ১০ই অক্টোবর। ভোর হয়েছে।—চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা—সূর্য দেখার নাম নেই। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় গুণেন ও গণেনের ঘুম ভাঙলেও তারা যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না। তাদের ঠেলে তুলে দিয়েই আমাদের সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যে যার আপন গেলাস নিয়ে চা-পানে মত্ত। আমিও ভৈসা দুধ খেয়ে নিলাম। বাস পৌনে ছটায় রওনা হ'বার কথা—সেখানে প্রায় পঁচিশ মিনিট বিলম্ব—কারণ নীরেনের প্রাতঃকৃত্যাদি শীগগির শেষ হয় না। ড্রাইভারের ঘন ঘন হর্নের আওয়াজ। নীরেনের স্ত্রী পরিমলের মিঠে-কড়া ঝঙ্কার, আর সেই সঙ্গে আমারও হুঙ্কারে সে অপ্রসন্নচিত্তে বাসে উঠতেই মোটর ছেড়ে দিলে। সেই বাস রুদ্র-প্রয়াগে পেঁৗছলো বেলা নটায়। এখানে মোটামুটি বাজার আছে। লটবহর তো কম নয়। সব কিছু আমাদের 'হেড্' কুলি ডবল বাহাদুরের জিম্মায় দিয়ে আপন আপন অভিরুচি অনুযায়ী আবার সকলের দুধ, চা, মিষ্টি ভক্ষণ শুরু হ'ল। তারপর স্নানাদির পালা।

সেখান হ'তেই ধর্মশালা শুরু। আমি একটু ওপরে পি-ডব্ল্যু-ডি'র মালীকে নগদ একটি মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে ছোট ডাক-বাংলোর স্নানঘরে ব্যবস্থা করে নিলাম। কেনাকাটা অনেক কিছু হ'ল। দুটো লণ্ঠন, ডজন দুই মোমবাতি, আর পাহাড়ে উঠবার জন্যে, নীচে ছুঁচলো লোহার শূল-লাগানো লম্বা বাঁশের লাঠি প্রত্যেকের জন্যে কেনা হ'ল।

ডাকবাংলোয় যেতে সামনেই একটা ব্রিজ পড়ে। স্নান সেরে আসবার সময় আমি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে পাহাড়ী ঝরণার নেচে আসার ছন্দ দেখছিলাম। খাবারের ডাক পড়তেই চমক ভাঙলো। খাবার ডিপার্টমেণ্ট গুণেনের হাতে—সেদিকে কোনও ত্রুটি ছিল না। এক-সঙ্গেই খেতে বসলাম—নীরেনের ভূরি-ভোজনের বহর দেখে মনে হ'ল আর সাত-দিন তার না খেলেও চলবে। সেকালে ফলারে বামুনের খাওয়া দেখেছি—এ যেন তাকেও হার মানিয়ে দেয়। যেমন চাওয়া—তেমনি পাওয়া, যেমন মুখে দেওয়া, অমনি শেষ হওয়া—ঔদরিক বটে এই নীরেন। আমরা সবাই উঠে পড়লাম। তার সব কিছু শেষ হ'তে অতিরিক্ত কুড়ি মিনিট সময় লাগলো। কড়া তাগাদা সত্ত্বেও ভ্রূক্ষেপহীন আহারে সময় নেওয়া দেখে মনে পড়ল কবির কথা—"পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।" শেষটায় তাকে হাত ধরে উঠিয়ে নিলাম।

সেই দিনই বেলা তিনটেয় আমরা সকলে পদব্রজে রওনা হ'লাম। সেখান থেকে এক-তৃতীয়াংশ মাইল হণ্টনং করে একটা পুল পার হয়ে, অপর পারে বাস-ষ্ট্যাণ্ডে যাওয়া গেল। একটু তাড়াতাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, টিকিট-ঘর খুললেই, আমরা সব আগের থেকে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে নেব। লোক তো কম নয়—নিজেরা সাতজন—একটি বৃদ্ধা ঝি—যে গুণেনকে মানুষ করেছে, আমার দুটি ভৃত্য আর চারটে ডাণ্ডীর ষোলজন গাড়োয়ালী কুলী, ছ'টা ঘোড়ার সহিস আর মাল বইবার ছ'জন কুলী। আমাদের এদিকে ছড়িদাররা যেমন ষ্টেশনে যাত্রীকে নিতে আসে, ওখানে ঘোড়ার সহিসরাও তেমনি রুদ্রপ্রয়াগের ওপারে বাস-ষ্ট্যাণ্ডেই হাজির হয়। তাদের বাস-খরচাও আমাদেরই দিতে হবে।

তিনটে বাসের মধ্যে একটি অচল। কোন্ ব্যাধিতে ভুগছেন কে জানে! বাকী দুটো বাস—এক-একটায় চব্বিশ জনের বেশী নেবে না। অর্থাৎ আমাদেরই প্রায় দেড়খানা বাসের প্রয়োজন। ভৃত্য রতি-কান্তকে লাইনের দ্বিতীয় স্থানে দাঁড় করিয়ে দিলাম। অনেকক্ষণ পর টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি খুললো। পাঁচ সাত মিনিট পরেই ভাঙা গলায় বেখাপ্পা আওয়াজ—"দেখুন, ভেড়েরা বেইমানি করছে।" আমরা তো পাশেই ছিলাম—শুনলাম নাকি কাউণ্টারের ভেতরেই পুলিশের কৃপায় ইতিমধ্যেই সাতজনের টিকিট হয়ে গিয়েছে। এই রকমের আর কিছুটা চললেই আমাদের রুদ্রপ্রয়াগ ফিরে গিয়ে আবার পরের দিন চান্স নিতে হবে। এই শুনেই গুণেনের এটম্ বম্ব ফাটার আওয়াজ। ইতিমধ্যে কতক-গুলি দালাল পুলিশের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। তৎসঙ্গে জিন্দাকীর্তন ও উক্তি "জনতার পুলিশ কখনই বেইমানি করতে জানে না।"

গুণেনও ছাড়বার পাত্র নয়। আস্তিন গুটিয়ে কাউণ্টারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েই সিরিয়াল নাম্বার টুকে নিয়ে বেরিয়ে এল। মহা হট্টগোল—আমাদের সমবেত চিৎকারে আমরাই জয়যুক্ত হ'লাম। কলকাতার পথে-ঘাটে কিছু সংখ্যক জনতার মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে "আমাদের দাবী মানতে হবে"—শ্লোগান সহ মাঝে মাঝেই যে-সব দৃশ্য দেখা যায়, এবার আমাদের ক্ষেত্রেও সেই ন্যায্য দাবীটা খুব কাজে লেগে গেল।

সব টিকিট কেনা শেষ হয়ে যাবার পরই আমরা বাসে চেপে বসলাম। যেখানে পৌনে পাঁচটায় ছাড়বার কথা—সেখানে, আধ ঘণ্টা বিলম্বে সওয়া পাঁচ-টায় বাস ছাড়লো। সূর্যদেব পাহাড়ের অন্তরালে থাকলেও, তখনও দিনের আলো নিভে যায়নি। আমরা কুণ্ড চটীর অভিমুখে রওনা হ'লাম। কিছুদূরে না যেতেই একটা চেক্-পোষ্টে বাধা পেলাম। সেই সদাচারী জনতার পুলিশ আমাদের পেছনের বাসেই এসে চেক্-পোষ্টের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শুনতে পেলাম—খাঁটি রাষ্ট্রভাষায় অফিসারদের বলছে—"ঐ যাত্রীরা T, A, B, C, সার্টিফিকেট না দেখালে যেতে দেবে না, অথবা সবাইকে T, A, B, C, ইনজেক্শন দিয়ে তবে ছাড়পত্র দিতে পার।"

এই নিয়ে আবার গুণেনের সঙ্গে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা। সে বল্লে—"আমি নিজে ডাক্তার, আমার নামাঙ্কিত কাগজে সার্টিফিকেট দিচ্ছি—এই আমার রেজি-ষ্টার্ড নাম্বার। তাছাড়া ডাক্তারী বিজ্ঞানে বলে, এখুনি ঐ বীজাণু শরীরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলে বরং উল্টো ফল হবে।"

শেষটায় রফা হোলো। গুণেনের কাছ থেকেই একটা সার্টিফিকেট আদায় করে তারা আমাদের মুক্তি দিলে।

আবার ইনজেকশন নিতে হবে শুনেই নীরেনের মুখণ্ড পরিশুষ্যতি। এই সংকট মোচনের পর তারও ধড়ে প্রাণ এল।

ঝামেলা কম নয়। শুধু T, A, B, C-র ইনজেকশন নিলে চলবে না—তার সঙ্গে আবার নাম ধাম পেশা সব কিছুর বিবরণ চাই।

নীরেন নামটা অনায়াসেই লিখে ফেললে, ধামটা লিখতেও কষ্ট হোলো না—পেশায় পৌঁছে আমার দিকে চেয়ে জানতে চায়—

—কী লিখব? ভ্যাগাবণ্ডিজ্‌ম্?

—স্বচ্ছন্দে। ভবে এসে ঘোরার তো শেষ নেই—ভ্যাগাবণ্ড লিখতে দোষ কী?

যে যার আসনে কায়েম হতেই বাস ছেড়ে দিলে। আড়াই ঘণ্টা পরে, পৌনে আটটায় আমরা কুণ্ড চটীতে পৌঁছলাম।

অন্ধকারে পথ-ঘাট সব ডুবে আছে—কিছু দেখার উপায় নেই। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই টর্চ—তার ওপরেও দুটো লণ্ঠন জ্বালিয়ে নেওয়া হ'ল। প্রায় দু ফার্লং খাড়া চড়াই-এর পর কুণ্ড চটীর আস্তানায় এসে কুলীরা মালপত্র নামিয়ে দিলে। (ক্রমশঃ)

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ উনিশ ॥

এরপর আর সব গিয়ে ঐ একটি কথাই মনে গেঁথে রইল প্রশান্তর—স্বাতি বলেছে বিশাখা তার বোন হলে বন্ধ করাতই টুইশনের টাকাটা, রজতের ওপর তো জোর নেই।

ব্যঞ্জনায় স্পষ্টই দাঁড়ায় প্রশান্তর ওপর জোর আছে।......কিসে এই জোর?

যে কমলটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তাদের দুজনকে নিয়ে, এই কথা, এই প্রশ্ন যেন তার মধ্যকেন্দ্র হয়ে রইল। আরও এগিয়ে এল স্বাতির দ্বারা, স্বাতির ঘর আরও আপন ঘর হয়ে উঠল। ভালোবাসা তো শুধুই সুখ নয়; শুধুই যা সুখ তা এত অন্তরঙ্গ তো হ'তে পারে না। স্বাতিদের বেদনা, স্বাতিদের লজ্জাও আরও নিবিড় হয়ে উঠল প্রশান্তর বুকের মধ্যে।

কিছু করা যায় না?

—এবার কিন্তু একটা নিরুপায় প্রশ্নের আকারেই শেষ হয়ে রইল না ব্যাপারটুকু। কিছু একটা করতেই হবে; না করে উপায় নেই।

যেটা ছিল মাত্র অবসর কালের চিন্তা সেটা কর্মের মধ্যে পর্যন্ত প্রবেশ করে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল।

এই সময় অভাবিতভাবে একটা সুযোগ হঠাৎ এসে উপস্থিত হোল।

কিছু বাতিল-করা কাঠ-কাটড়া, লোহালক্কর, করুগেটেড শীট, এস্বেস্টস্ ইত্যাদি পড়ে ছিল কলোনি আর পুলটা যেখানে হচ্ছে সেইখানে, ইতস্তত ছড়ানোই। একদিন মাইল তিনেক দূরের বাবলা বলে এক গ্রাম থেকে তিনজন ভদ্রলোক এসে দেখা করলেন প্রশান্তর সঙ্গে—যদি মালগুলো নিলামে পাওয়া যায় তো ও'রা নেবেন।

"কি দরকার?"

—প্রশান্তর কতকটা অনাবশ্যক কৌতূহলেরই প্রশ্নে ও'রা জানালেন একটা স্কুল স্থাপন করছেন গ্রামে। এর-মধ্যে অনেক জিনিস ও'দের কাজেই লাগবে, বাকিগুলো ও'রা বিক্রয় করে টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন, লটে কিনলে সস্তাই তো পাবেন আশা করেন। স্কুল, সুতরাং ও'রা প্রশান্তর সহানুভূতির আশা করেই এসেছেন।

প্রশান্তর মনে একটা চিন্তার স্রোত নেমেছে। পাচকঠাকুর চাটুজ্জেকে ডেকে সবার জন্যে চায়ের কথা বলে দিল।

তারপর যা কথাবার্তা হোল তা থেকে জানতে পারল বেশ ভালভাবেই তোড়জোড় করে কাজে নেমেছেন এ'রা। এ প্রান্তে স্কুলের বেশ অভাব, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করতে প্রস্তুত, তবে অর্ধেকটা টাকা এ'দের যোগাড় ক'রে দেখাতে হবে। কয়েকটা গ্রাম নিয়েই উৎসবের ঢেউ উঠেছে, একজন জমি দিয়েছে স্কুলের জন্যে, সামনের মাসেই দিন স্থির হয়েছে স্কুলের বনেদ দেওয়ার জন্যে। নতুন সেশন থেকেই যাতে স্কুলটা চালু হয়ে যায় তার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রশান্ত জানাল যে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। এখানে যে মালগুলো আছে সেগুলো যতটা সম্ভব ও'দের সুবিধা ক'রে দেবে, তা ভিন্ন রেলের অন্যান্য জায়গাতেও যে নিলাম হয় তার সঙ্গে এ'দের সংযোগ ঘটিয়ে যাতে কিছু অর্থাগম হয় তার চেষ্টা করবে; এ'রা নিলামে কিনে যাতে সেইখানেই বিক্রয় করে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা ক'রে। অবশ্য যতটা তার শক্তি আর আয়ত্তের মধ্যে সম্ভব। তা ভিন্ন অন্যভাবেও কিছু টাকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবে—ওদের হাতে অনেক ঠিকাদার থাকে তো।

ওর উৎসাহের বহর দেখে ও'রা কিছু বিস্মিতই হোলেন; একেবারেই অপ্রত্যাশিত তো। একটা এমন প্রভাবশালী লোক, এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে রয়েছে। ও'দের যে সমিতি রয়েছে তাতে একটা খুব উ'চুতে স্থান দিয়েও নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। অভূতপূর্ব সাফল্যের আশায় মনে একটা উদ্দীপনা এসে গেছে। যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজন সমিতির সভাপতিই। টের পাওয়া গেল এ'র মাতার নামেই স্কুলটা হবে, ইনিই জমি আর একটা মোটা অঙ্কের টাকা

দিয়েছেন। ইনি সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে প্রশান্তকেই সেখানে আহ্বান করলেন।

প্রশান্ত জানাল—ঠিক এই ধরনের কোন লোভে সে প্রস্তাব করেনি, তা ভিন্ন সরকারী কর্মচারী হিসাবে সম্ভবও নয় তার পক্ষে এইভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা। তবে তার একটা স্বার্থ আছেই।

জানাল সেটা। তার একজন নিকট-আত্মীয় আছেন, তাঁকে শিক্ষকদের মধ্যে উ'চুর দিকেই একটা স্থান দিতে হবে। জানাল—অযোগ্য ব্যক্তি তিনি নয়। এম-এ, তবে সংস্কৃতয় এম-এ। আর ট্রেনড্ নয়, শিক্ষণ-বিষয়ে সার্টিফিকেট নেই কোন, অভিজ্ঞতা তো নেই-ই। এ-সবের ওপর আজকাল খুব জোর দেওয়া হয় বলেই বলল প্রশান্ত, অনাথা তাঁর পাণ্ডিত্য বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই; তার সংগে বিদ্যানিষ্ঠা, চরিত্র—সে সব দিক দিয়ে একজন আদর্শ শিক্ষকই। আর স্থানীয় লোকই।

ও'রা তিনজনে নিজেদের মধ্যে পরামর্শের জন্য একটু উঠে গেলেন। তিনজনের মুখেই উৎসাহে দীপ্ত। একটু পরে ও'রা ফিরে এলেন। যিনি সভাপতি —তিনজনের মধ্যে বয়সও তাঁরই কম, বললেন—তিনি আজই এ-সম্বন্ধে উত্তরটা দিতে পারতেন, তবে অন্য সবাই মনে করতে পারে তাঁর মায়ের নামে স্কুল বলে এবং তিনি জমি প্রভৃতি দিয়েছেন বলে একটা অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করছেন, আর সবাইয়ের অভিমত না নিয়ে। তিনি এই পর্যন্ত আজ কথা দিলেন যে প্রশান্তর আত্মীয়ের জন্য একটা ভালো রকম জায়গাই রাখা থাকবে, তবে এ-বিষয়ে পাকা-রকম বলবার জন্যে পরদিন পর্যন্ত সময় নিলেন। এই সময়ই আবার আসবেন ও'রা।

পরদিন আরও দু'জন এলেন ও'দের সংগে। তার মধ্যে একজন প্রস্তাবিত স্কুলের সেক্রেটারি। শিক্ষিত যুবক, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। পরিচয়ে টের পাওয়া গেল সে-ই স্কুলের হুজুগটা তুলে আর সবাইকে টেনে এনেছে এর মধ্যে। ঘোরাফিরা করা, যাঁদের হাতে স্কুলের মঞ্জুরি তাঁদের সংগে দেখা-শোনা করা, সব এই করে; রাজনৈতিক মহলেও খানিকটা গতিবিধি আছে। কাল যে আসতে পারেনি, তা কলকাতা-তেই এই উদ্দেশ্যে গিয়েছিল বলে। বেশ আনন্দ হোল যুবকটির সংগে আলাপ করে প্রশান্তর। সেই জানালো, ওরা একটা জরুরী মিটিং ডেকে কথাবার্তা স্থির করে ফেলেছে। প্রশান্তর আত্মীয়কে ওরা হেডমাষ্টার করেই নিয়োগ করে নেবে। উনি এম-এ, স্থানীয়, আপত্তির কিছু নেই, যদি বা কিছু ওঠে কথা ওপর মহলে তো সে ঠিক করে নিতে পারবে।

একটু অদ্ভুত উদ্দীপনার হাওয়া এসে গেছে কাল থেকে। প্রশান্ত উঠে গেল। ভেতর থেকে একটা পাঁচশত টাকার চেক কেটে নিয়ে এসে সভাপতি ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলল—"এটুকু আমার ব্যক্তিগত সাহায্য। একটা কথা আপনাদের জোরের সংগে বলছি—আপনাদের কখনই একথা মনে হওয়ার কারণ হবে না যে আমি এইভাবে আপনাদের অনুগ্রহ কিনে নিচ্ছি।"

ঠিক হোল, আপাতত স্কুলের প্রস্তুতিপর্বের কাজ-কর্মের জন্য একশত টাকা করে দেওয়া হবে। স্কুল চালু হয়ে গেলে তখন পাকা ব্যবস্থা।

এত বড় একটা আনন্দের সংবাদ, প্রশান্তর মনে হোল তখনই মোটর বের করে ছুটবে স্বাতিদের বাড়ি। তারপর সে-ঝোঁকটা সামলে অফিসেই চলে গিয়ে নিলামের জন্য বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা চিঠি লেখালো হেড-অফিসে—বর্ষা এসে গেছে, জিনিসগুলো আরও নষ্ট হবে, তা ভিন্ন চুরির ভয়ও রয়েছে—কিছু গেছে বলেই সন্দেহ হয়—চৌকিদারি করবার জন্য একটা লোক রাখাই দরকার, কিন্তু সে খাতে অযথা একটা খরচ না ক'রে তাড়াতাড়ি নিলাম করে দেওয়াই ভালো। চিঠিটা তখনই ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে জীপে করে ঘুরে ঘুরে একটা আন্দাজও করে নিল, কত আর কি ধরনের মাল আছে, কি মূল্য হতে পারে।

ব্যাপারটা ওকে যেন পেয়ে বসল একেবারে। সন্ধ্যায় স্বাতিদের বাড়ি গিয়ে এত অন্যমনস্ক রইল, কথাবার্তায় এমন ভুল হয়ে যেতে লাগল মাঝে মাঝে যে একটা ছুতো করে সেদিন চলেই আসতে হোল অন্যদিনের চেয়ে আগে। একটু চিন্তিতই ক'রে রেখে এল দু'জনকে।

পরদিন গেলই না স্বাতিদের ওখানে, ভাবল মনের দুর্বলতায় স্বাতির জেরায় প'ড়ে যদি বলেই ফেলে কথাটা তো সে একটা মস্তবড় ভুল ক'রে ফেলা হবে। বস্তুতঃ একদিনের কথাবার্তার ওপরই নির্ভর তো। সন্ধ্যার আগেই জীপটা পাঠিয়ে আনিয়ে নিল বিশাখাকে।

বিশাখা এসে জানাল, খুবই চিন্তিত আছেন দুজনে। মুখটা একটু ভার করেই অনুযোগের স্বরে বলল—"আমায় এগিয়ে দিতে আসতে আসতে দেখলাম স্বাতিদির চোখ ছলছল করে উঠেছে প্রশান্তদা', কাল থেকেই তো কিছু বুঝতে পারছেন না।"

নিঃসংশয়িত পথে এ আবার নূতন বিপদ উপস্থিত! প্রশান্ত গোপেশ্বরকে আটকেই রেখে একটা চিঠি লিখে দিল স্বাতির নামে। লিখল—সায়েব এবার এসে কয়েকটা বাড়তি কাজ দিয়ে গেছে, তাই নিয়েই পড়েছে। চিন্তার কিছুই নেই। দু' তিনদিন বোধ হয় এখন নিজে নাও আসতে পারে। চিন্তার একেবারেই কিছু নেই।

তারপর পুনশ্চ দিয়ে লিখল, এ চিঠিটা যেন লাহিড়ীমশাইকেও পড়ে শুনিয়ে দেয়।

এটুকু লেখবার সময় একটু আত্মগ্লানির হাসিও ফুটল মুখে। এও একটা ভুল করে বসছিল।

পরদিন সকালেই গোপেশ্বরের হাতে একটা চিঠি দিয়ে কলকাতায় হেড-অফিসে ওপর মহলে তার এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিল—নিলাম সংক্রান্ত তার চিঠিটার কতদূর কি হোল খোঁজ নিয়ে যেন তাড়াতাড়ি বের করিয়ে পাঠিয়ে দেয় মঞ্জুরিটা। গোপেশ্বর সেইদিনই

রাত দু'টার গাড়িতে ফিরে এল, সব ঠিক হয়ে গেছে। প্রশান্তর বন্ধু চিঠিটাও দস্তখত করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে গোপেশ্বরের হাতে।

অদ্ভুত দ্রুত বেগে কাজ হয়ে যাচ্ছে, যেন একটা ডাকগাড়িরই গতিতে। স্বাতিদের বাড়ি যাওয়ার জন্য মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। সেইটে সামলাতেই আবার মনটা বাস্তবের দিকে ঘুরল। এবার রূঢ় বাস্তব মনে হোল যেন চোখ রাঙিয়েই চেয়ে রয়েছে তার দিকে!

এ কি করতে যাচ্ছিল সে! নিতান্তই অপরিচিত কয়েকজন এসে কয়েকটা লোভের কথা শোনাল, আর সে হন্তদন্ত হয়ে সেই কথা বলতে যাচ্ছিল স্বাতিদের? মিথ্যা হলে দারিদ্র্যের ওপর কি একটা রূঢ় আঘাত যে দাঁড়াত সে-কথা একবার ভেবে দেখবার বুদ্ধিটা যোগাল না? এই চিন্তার সূত্র ধরেই আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গিয়ে শরীরটা যেন হিম হ'য়ে গেল; কি ক'রে কিছু খোঁজ না নিয়েই নিতান্তই ভাবাবেগে পাঁচশত টাকার একটা চেক কেটে দিয়ে দিল ওদের হাতে!......আত্ম-ধিক্কারে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে।

অফিসেই রয়েছে। কাজের স্তূপ সামনে রেখে চিন্তা। অস্থির করে দিয়েছে। একটা কথা মনে হ'তে দেয়াল-ঘড়িটার ওপর নজর গিয়ে পড়ল। এখনও সময় আছে, ট্রাঙ্ক-কল দিয়ে ব্যাঙ্কে মানা করে দেবে—চেকটা আপাতত যাতে ক্যাশ না করা হয়।

টেলিফোন যন্ত্রটায় হাত দিয়েছে, বাইরে জীপের হর্ণের শব্দ হোল; বিশাখাকে বাড়িতে নামিয়ে চলে এসেছে গাড়িটা।

মন যখন খুব উত্তেজিত, সামান্য কিছুতেই নূতন পথ ধরে ছোটে। ফাইলগুলো তুলে রাখতে বলে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল প্রশান্ত। মোটরে গোপেশ্বরকে তুলে নিয়ে, ছুটল স্বাতি-দের বাড়ির রাস্তা ধরেই।। চলেছে বাবলা গ্রামে, ঐ পথ। ছুটে যেতে যেতে চকিতে একবার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল বাড়ির দিকে। দুটি মোড়ায় দুজনে বাইরের বারান্দাতেই বসে। একটি মুহূর্ত, তাতেই মনে হোল, মোটরে নজর পড়তেই দুজনে একেবারে চকিত হয়ে উঠেছেন। মনে হোল লাহিড়ীমশাই যেন দাঁড়িয়েই পড়েছেন উত্তেজনায়। মোটর গাছের আড়াল হয়ে গেল।

বিশাখা নেই, ও'র তো বাড়ির ভেতর স্বাতিকে নিয়ে পড়ায় মেতে থাকবার কথা।

॥ কুঁড়ি ॥

যিনি সভাপতি—ত্রিলোক চৌধুরী, তাঁর বাড়িতেই গিয়ে উঠল প্রশান্ত। বেশ সম্পন্ন পাড়াগেঁয়ে গৃহস্থ বলে মনে হোল। কিছু পাকা, কিছু মেটে মিলিয়ে দো-মহলা বাড়ি। বাইরেটা খোলা উঠান, একদিকে গোটাপাঁচেক মরাই। তারই সামনাসামনি দুটো পাকা ঘর।

মোটরের শব্দ শুনে প্রথম ঘরটা থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে তিনজনকে চিনল প্রশান্ত, ত্রিলোক চৌধুরী, সেক্রেটারি নিখিল রায় আর একজন মেম্বার বামনদাসবাবু। এত বিস্মিত হয়ে গেছেন সবাই যে প্রথম অভ্যর্থনার কথাটাও বেরুল না কারুর মুখে। প্রশান্ত এগিয়ে যেতে যেতে বলল—"সকাল সকাল কাজ হয়ে গেল, ভাবলাম একবার দেখাই করে যাই আপনাদের সঙ্গে, আলাপ হোল—গ্রামটা তো দেখাও হয়নি....."

"আসুন, আসুন, আস্তেআজ্ঞে হোক. ......আপনি দয়া ক'রে আসবেন—ভাবতেও পারা যায়নি...কল্পনাতীত..."

তিনজনেই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন; সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। একটা বড় চৌকির ওপর ফরাস পাতা, খুব পরিষ্কার নয়, কিছু কাগজ-পত্র, খাতা, বই ছড়ানো রয়েছে। একটা দোয়াতদানি, একটা বালির পুঁটুলি। চারিদিকে কয়েকটা মোড়া বসানো। ঘরের একধারে তিনখানা চেয়ার। জন-পনেরো লোক রয়েছে ঘরে। প্রশান্ত একটা মোড়াতেই বসতে যাচ্ছিল, সেক্রেটারি নিখিলবাবুই তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা চেয়ার এনে বসালো। নিজেরা বসল সবাই। নিখিলই বলল—"আপনি দয়া করে এলেন, আমাদের ভাগ্যি; আমরা কালই আপনার ওখানে যাচ্ছিলাম।"

আবেগের মাথায় একটা হয়তো ভুলই করে বসছিল মনে হওয়ায় প্রশান্ত খানিক সতর্ক, সংযতবাক। যতটা পারছে লক্ষ্য করে যাওয়ার দিকেই মন। একটু হেসে বলল—"নতুন কিছু হয়েছে আর?"

"অনেক কিছুই।"—নিখিলই বলল। আমাদের একটা মিটিংই ছিল আবার আজ। এ'রা সবাই মেম্বার।"

টেলিফোন যন্ত্রটায় হাত দিয়েছে...........

এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিল সবার। প্রথম সাক্ষাতের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে আসতে লাগল। ত্রিলোক চৌধুরী একবার উঠে ভেতরবাড়ি হয়ে এলেন।

নিখিল বলল—"আপনার চেকটা আমাদের মস্তবড় এক আশীর্বাদ হয়ে এল। হবেই তো। আপনি নিজগুণে

আমাদের আপন করে নিয়েছেন, যেটা আমাদেরই কাজ ছিল সেটা নিজের করে নিয়ে বুক দিয়ে পড়েছেন, ফল হয়েছে—ক'খানা গ্রামের উৎসাহ একেবারে চরমে উঠে গেছে ক'দিনে। আমাদের এস্টিমেট ত্রিশ হাজার টাকা জমির দাম ধরে, চৌধুরীমশাইয়ের টাকা আর জমির দাম ধরে পাঁচ হাজার টাকা উঠেছিল, এই দিন তিনেকে সেটা এগারো হাজারে উঠে গেছে, চৌধুরীমশাই-ই নিজের নগদটা ডবল করে দিয়েছেন। আর একটা জিনিস আমরা পেয়ে গেছি। যা আপাততঃ আমাদের চিন্তার মধ্যেই ছিল না—সামন্তমশাইদের দুই সরিক মিলে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড ক'রে দিলেন, স্কুল থেকে খানিকটা এগিয়েই।"

মুখে মুখে খবর পেয়ে লোক জড় হয়ে গেছে বাইরের বারান্দায়, উঠানে। বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে।

বাড়ি থেকে চা, হালুয়া, চন্দ্রপুলি এল। আহার পর্ব শেষ হলে, কমিটির সবার অনুরোধে (অগ্রণী নিখিল রায়ই) স্কুলের জায়গা, খেলার মাঠ সব দেখেও এল প্রশান্ত। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটি।

ঘুরে এসে আবার ঘরে বসল। একটা প্রবল আবেগ ঠেলে উঠছে ভেতর থেকে প্রশান্তর। নিলামের চিঠিটা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। পকেটে ক'বার হাতটা আপনি গিয়েও পড়ল, টেনে টেনে নিল। আশঙ্কা হয়েছিল একটা মস্তবড় ভুল হয়ে যাচ্ছিল না কি, তাই হঠাৎ কিছু ক'রে বসবে না ঠিক ক'রেই এসেছে।

এবার আরও একটা কঠিন প্রলোভন এসে পড়ল। নিখিল বলল—"এবার আমরা যার জন্যে কাল আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। আজকের মিটিংটা ডাকা হয়েছে সেদিনকার কথাটা পাকা ক'রে ফেলবার জন্য।...এই আমাদের রেজোলিউশন।"

একটা খাতা খুলে সামনে ধরল। লাহিড়ীমশাইয়ের নিয়োগের প্রস্তাবটা রয়েছে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। শুধু নামের জায়গাটা বাদ। ও যতক্ষণ পড়ছে একটা খাতার মধ্যে থেকে একটা চিঠিও বের করল, নিয়োগপত্র, বলল—"এইটে নিন্ এবার। নামটা শুধু বসিয়ে দিতে হবে, খাতাতেও, এতেও।"

একটা আবার নূতন সমস্যা এই নাম! কিন্তু এদিকে ততটা খেয়াল ছিল না প্রশান্তর। প্রশ্ন করল—"টাকাগুলো আপনারা কোন্ ব্যাঙ্কে রেখেছেন?"

সামলে বলল—"মানে বেশ সেফ্ তো, আজকাল ব্যাঙ্কগুলোর যা অবস্থা।"

ছোকরা বেশ বুদ্ধিমান, কথাটা লুফে নিয়ে বলল—"হ্যাঁ, ঠিক। ওগুলো তো দেখানই হোল না আপনাকে—যখন পেয়েই গেছি এখানে। চৌধুরীমশাই, যান তো ব্যাঙ্কের বইটা নিয়ে আসুন—আর সেই সঙ্গে জমির দস্তাবেজটাও।"

প্রশান্ত সামলে নিল, বলল—"থাক, নিয়ে আসবার কি দরকার? বলছিলাম ব্যাঙ্কটা সেফ্ তো? এত কষ্ট করে সংগ্রহ করা টাকা...হ্যাঁ, এই দেখুন, আমি যা করতে এলাম সেইটিই ভুলে ব'সে আছি।"

ব্যাঙ্ক-বইয়ের কথাটা চাপা দিয়ে পকেট থেকে নিলামের চিঠিটা বের করে বলল—"এই দেখুন, অর্ডার এসে গেছে—লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়েছি কাল রাত্তিরে। এবার আপনারা গিয়ে ডেকে নিন মালগুলা তাড়াতাড়ি। সরকারি ডাকের ওপর সামান্য কিছু চাপিয়ে ডেকে নেবেন। ঠিকেদাররাই তো নেয় এ-সব। আমার টেপা থাকবে, দাঁড়াবে না কেউ।"

নিয়োগ-পত্রটাও নিল দস্তখত করে। বলল—ডাক নাম ধরে অমুক কাকা বলেই জানে বরাবর। আসল নামটা পরে বসিয়ে নিলেই হবে, বইয়ের রেজলিউশনেও। আপাতত নিয়ে যাচ্ছে, খুব উৎসুক হয়ে রয়েছেন তো।

আর দ্বিমত করল না প্রশান্ত। একটা তীব্র উৎকণ্ঠাতেই যে কাটছে দুজনের, বিশেষ করে স্বাতির, তার শেষ প্রমাণও তো এই ঘণ্টা দুয়েক আগে পেয়ে গেল আসার পথে।

যখন নামল স্বাতিদের বাড়ি তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। দুজনের মধ্যে স্বাতি তখনও এইদিকেই; সামনে যে ছোট বাগানটা করেছে অনাথ, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বেড়া থেকে ঝিঙে তুলে আঁচলে সংগ্রহ করছে, ওকে দেখে এগিয়ে আসতে প্রশান্ত একটু হাসি মুখেই প্রশ্ন করল—"আপনার কতগুলি হোল?"

হাসি দেখে মুখের ভাব অনেকটা সহজ স্বাতির, প্রশ্নটাতে একটু বিস্মিত হয়ে বলল—"কি কতগুলি হওয়ার কথা জিগ্যেস করছেন?...ও! ঝিঙে? কি করব?—কাজ নেই কোনও...আপনি যে..."

"অকেজো লোকেরই কাজ ওটা তাহলে?" নেমে এগিয়ে আসতে আসতে বলল প্রশান্ত। বলল—"বেশ, তার ফয়সালা হচ্ছে এখুনি, আগে অনাথকে, ...এই যে অনাথ, একবার এদিকে এসো।"

অনাথ বোধহয় স্বাতির ফরমাসেই একটা ছোট্ট ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, বলল—"ওটা রেখে দাও, কুলুবে না।"

ও এগিয়ে এলে দুজনকে সঙ্গে ক'রে আবার মোটরের কাছে গেল প্রশান্ত। খোলের মধ্যে একটা বেশ বড় চাঙারিতে নানা রকম তরিতরকারি, একটাতে কলা, আম; দুটো হাঁড়িতে দাদখানি চাল আর সোনা মুগের ডাল, নীচে সের চার-পাঁচের একটা রুই মাছ। গাঁয়ের সওগাত।

দুজনেই বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল। প্রশান্ত অনাথকে বলল—"নিয়ে চলো ভেতরে। তোমার কাজ অনেক, তাড়াতাড়ি কলোনিতে গিয়ে আমার বাড়ি থেকে চাটুজ্জেকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে। রজত আর বিশাখাকেও ব'লে আসবে, আজ হে'সেল এখানেই। আমি কোন সময় গিয়ে নিয়ে আসব।"

"কিন্তু এসব..." প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল অনাথ।

"সে রিতিহাস পরে শুনবে"—ওর ভাষার নকল করে বলল প্রশান্ত—"আগে নিয়ে এসো ভেতরে। বেরিয়ে যাও তাড়াতাড়ি।"

"আসুন"। ব'লে ঘুরে স্বাতিকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগুল। প্রশ্ন করল—"কাকা কোথায়? বেড়াতে গেছেন?"

"বাবা?"—বুঝলেও 'কাকা' কথাটা ওর মুখে নূতন বলেই প্রশ্ন করল স্বাতি। এক হিসাবে, আপনিই যেন বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা; বেশ একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েছে তো! প্রশান্ত বলল—"হ্যাঁ, আজকে এই নতুন সম্বন্ধটা পাকা করে এলাম যে।"

"বাবাকে একটু জোর করেই পাঠিয়ে দিলাম বেড়াতে।...মনটা বড় চঞ্চল হয়ে রয়েছে ও'র—ক'দিন থেকেই।...আপনি"

"আসুন ভেতরে; হচ্ছে।"—সি'ড়িতে পা দিয়ে বলল প্রশান্ত।

(ক্রমশ)

রবীন্দ্রসাহিত্যের জগৎ

নারায়ন চৌধুরী

রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে যদি কোন মৌলিক পার্থক্য থেকে থাকে তবে তা হল, প্রথমটির আবহাওয়া বিষামৃতময়, দ্বিতীয়টির আবহাওয়ায় শুধুই অমৃতের সিঞ্চন। আধুনিক সাহিত্যের আবহাওয়ায় শ্বাস নিতে বাস্তবিকই এক এক সময় বড় কষ্ট হয়। তার কারণ, সে সাহিত্যের মূলগত কোন ত্রুটী নয়, তার কারণ আধুনিক কালে জীবনের মান অনেক নেমে গেছে এবং যেহেতু সাহিত্য জীবনেরই প্রতিফলন মাত্র সেই হেতু আধুনিক সাহিত্যের সুরও তদনুপাতে নীচে নেমে গেছে।

আধুনিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায় অবিচার, কুশ্রীতা কদর্যতা। অন্যায় অবিচার আগের যুগেও ছিল, কিন্তু কুশ্রীতা ও রুচিবিকার এমন নিরাবরণ হয়ে পূর্বে কখনও দেখা দেয়নি। এ-যুগের যা-কিছুতে হাত দেওয়া যায়, হাতে রুচির স্থূলতার ছোঁকা লাগে। প্রকৃতির স্বভাব-দৃশ্যগুলিকে বাদ দিলে, মনুষ্যকৃত যে-কোন দৃশ্যের দিকে তাকানো যায় তার অধিকাংশেরই প্রকট প্রচারধর্মিতা ও প্রদর্শনবাদিতায় চোখে জ্বালা ধরে। জমায়েতে মজলিসে দশ-জনার মধ্যে গিয়ে অথবা রাস্তায় ঘাটে পথ চলতে গিয়ে যে-সব কথা অনাহূত-ভাবে শুনতে হয় তাতে অনেক সময় কানে হাত-চাপা দিয়েও রেহাই পাওয়া যায় না; এমনই মর্মভেদী সে সকল শব্দ ও বাক্যের রূঢ়তা ও কার্কশ্য। আর রাজধানী শহরে বাস করা সত্ত্বেও ক্রমাগত ন্যাসিকার উপর অপরিচ্ছন্ন গন্ধের যে পীড়ন চলে তা কহতব্য নয়। মোট কথা, আধুনিক কালের জীবনযাত্রায় সকল ইন্দ্রিয়ের উপরই কোন-না-কোন ভাবে স্থূলতার অবাঞ্ছিত অত্যাচার চলছে আর তার ফলে বেঁচে থাকার মধ্যে যথেষ্ট মাধুর্য আর রোমাঞ্চ থাকলেও জীবন-ধারণ ব্যাপারটা বিষের ছোঁয়া লেগে কেবলই তেতো হয়ে উঠছে। এ-যুগে বেঁচে থাকাটাই একটা প্রাণান্তকর পরীক্ষা।

জীবনযাপনের এই যে ছাঁচ, বেঁচে থাকার এই যে বিশেষ বাস্তবিক অনুভূতি, এর প্রভাব অনিবার্যভাবে গিয়ে পড়ছে সাহিত্যের উপর। সাহিত্য জীবন-ধর্মী। সুতরাং জীবনকে অনুসরণ না করে উপায় নেই। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, জীবনের অসৌন্দর্য সাহিত্যেও সংক্রমিত হচ্ছে এবং সাহিত্যকে মলিন করে তুলছে। সাহিত্য অমৃতের ক্ষেত্র, অথচ আমরা দেখছি আধুনিক সাহিত্যের সুধাপাত্র থেকে বলকে বলকে হলাহল উপচে পড়ছে। সাহিত্যরস পান করতে গিয়ে পদে পদে জিভে তেতো স্বাদ লাগছে। এই কটুগন্ধী তিক্ততার আবেশে গোটা আধুনিক সাহিত্যের আবহাওয়া-টাই এক-এক সময় শ্বাসরোধকারী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এর জন্য আমরা আধুনিক সাহিত্যকে দোষ দেব না, দোষ দেব জীবনকে। জীবনের সুর নেমে যাচ্ছে বলেই তো সাহিত্যেরও সুর নেমে যাচ্ছে। জীবনে রুচি-দৈন্য আর নগ্নতা আছে বলেই তো সাহিত্যেও রুচি-দৈন্য আর নগ্নতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে পড়ছে, আর তাইতে সাহিত্যের পরিমন্ডলের মধ্যে সময় সময় নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতার চাপ সহ্য করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষতঃ চিত্ত যাঁদের অনুভূতি-পরায়ণ, রুচি মার্জিত, তাঁদের পক্ষে এ চাপ সহ্য করা খুবই কঠিন। আধুনিক সাহিত্যের অতিবাস্তব জীবনধর্মিতা ক্লিষ্টতার কারণ না হয়েই পারে না।

কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের আব-হাওয়ায় এলে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এখানে আকাশ অনেক বড়, হাওয়া অবাধ। হাওয়ায় আবিলতার গন্ধ নেই, আকাশের উদার-বিস্তৃত সুনীলি-মায় ধূমের কলঙ্ক-মসীরেখা নেই। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই চোখের মুক্তি, দিগন্তের দিক্‌চিহ্নহীন বিস্তার। রবীন্দ্র-সাহিত্যে রূপায়িত যে-সকল চিত্র-চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তার থেকে আজকের মানুষ আমরা কত দূরে সরে এসেছি! তাদের চলা-ফেরার জগৎ আমাদের নিকট অস্পষ্ট-ধূসর হয়ে এসেছে। অনেক মূল্যের বিনিময়েও সেই জগতে আজ আর আমাদের ফিরে যাবার উপায় নেই। আজ আমরা ওই জগতের পানে তাকিয়ে সকাতর দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে পারি, কিন্তু সেই বিশেষ স্বাদ-গন্ধের পরিমন্ডলটিকে আর এ কালের পটভূমিতে ফিরিয়ে আনতে পারি না। 'মনসা মথুরো-ভ্রমণ'-এর মত আজ মনে মনেই শুধু ওই জগতে বিচরণ করা যায়, আর তা থেকে কল্পনায় যতটা সুখ আহরণ করা সম্ভব তা আহরণ করা যায়।

কিন্তু এই মনোভ্রমণেরই দাম অনেক। শ্বাস-রোধকারী পীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতে হলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুন্দর জগতে আশ্রয় না নিয়ে আমাদের গত্যন্তর নেই। এ জগতে বাস্তবতার ঠাসাঠাসি নেই, প্রতিযোগিতার তাড়না নেই, জীবিকার প্রয়োজনে আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা গলদ্‌ঘর্ম শ্রমের ঘানিতে জুতবার আবশ্যকতা নেই। এখানে কর্ম যেমন আছে তেমনি কর্মের বিরাম আছে, অব-সর সুপ্রচুর; খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দুদন্ড চোখকে জিরিয়ে নেবার প্রক্রিয়ায় বাধা দেবার কেউ নেই। জীবন এখানে মন্থর লয়ে চলে, কখনও কখনও গতি তার শম্বুকের মত, তা হলেও সে চলায় চোখের পীড়া নেই, চোখের বিমর্দন নেই। সে জগতে হাত-পা ছড়িয়ে বসবার মত অনেক খোলামেলা জায়গা চারদিকে বিছানো আছে।

কিন্তু হায় সে কাল আর নেই! একাল ব্যস্ততায় আর নিরবসরতায় ঠাসা। পদে পদে এখানে অসুস্থ প্রতি-যোগিতা, উত্তেজিত কর্মের বিক্ষেপ। চলায় অস্থিরতা, বলায় আঘাত-প্রত্যাঘাত, চিন্তায় পাপবোধ। পথ চলতে এখন প্রতি পদক্ষেপে কুশ্রীতার সঙ্গে ঠোক্কর খেতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাল আর এ কালের মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, আর তাইতে এ কালের চেহারাই পাল্টে গেছে বলে মনে হয়। আমাদের সামাজিক মন আর ব্যক্তিগত মন দুইয়ের উপরেই যুদ্ধোত্তর যুগের ছোঁয়া লেগে তার ধারা-ধরণ রূপান্তরিত করে দিয়ে গেছে বলা যায়।

ভুললে চলবে না রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরেরও কিছু বেশী কাল আশাবাদী আবহাওয়ায় লালিত হয়েছে। উনিশ শতকের লিবারেল-বুর্জোয়া সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছেন। এই সংস্কার ইউরোপ থেকে এদেশে ভেসে এসেছিল। অমিত

আশাবাদ আর আনন্দ এই সংস্কারটিকে ধারণ করে আছে। উনিশ শতকের ইউরোপে, বিশেষ পশ্চিম ইউরোপে, আশা আর আনন্দ ছাড়া কিছু কথা ছিল না। আশা আর আনন্দ তখন ইউরোপের আকাশে-বাতাসে সঞ্চরমাণ ছিল এবং সেই অপরিমেয় আশার প্রেরণায় জীবনের বিস্তার ও নব নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটে চলেছিল। ইংলণ্ডের ভিক্‌টোরীয় যুগে এই সম্প্রসারণবাদী আশাশীলতা বিশেষভাবেই প্রকট হয়েছিল। টেনীসন আর ব্রাউনিঙ্‌ তাঁদের কাব্যে সেই আশার সুরটিই বিশেষভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের সেই সময়কার আশাবাদী মনোভাব ও উদার নীতি যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কল্পনাকে প্রভাবিত করেছিল সে কথা কবি নিজেই স্বীকার করে গেছেন। শেষ বয়সের অমূল্য রচনা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে কবি বলেছেন—"আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।......... এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়-বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ।"

এর থেকে বোঝা যায় ইংরেজী সাহিত্যের খাত-বয়ে-আসা আশাবাদ আর আনন্দবাদ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কল্পনাকে কী গভীরভাবেই না প্রভাবিত করেছিল। সেই আশা আর আনন্দের ঐতিহ্য রবীন্দ্র-কল্পনাকে পঞ্চাশ বছর একটানা ধারণ করেছিল। একদিকে উপনিষদের আত্মসমাহিত প্রশান্তি ও ত্যাগের আদর্শ, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ক্রমপ্রসার্যমাণ কর্মবাদ ও উদার নীতি রবীন্দ্র-জীবনে দুটি স্থায়ী ভাবের মত কাজ করেছে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পূর্ব-পর্যন্ত। এই দুই স্থায়ী ভাবের আবেশে কবি তাঁর সাহিত্য-জীবনের ওই বিস্তৃত পর্বে যা-কিছু লিখেছেন তার মধ্যেই আশা আর আনন্দ, সৌন্দর্য আর প্রেমের সুরটাই সব ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ-পূর্ব রবীন্দ্র-সাহিত্যের গদ্য পদ্য সকল রচনায় এমন একটা রসগূঢ়তা আছে যা জীবনকে অনুপ্রাণিত করে, আশান্বিত করে, উন্নীত করে। ওই রসের জগতে কিছুক্ষণের জন্যে নিঃশ্বাস নিলেও মনের স্বাস্থ্য ফিরে যায়, চিত্ত আশায় ও আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে।

পূর্বেই বলেছি, বর্তমান কালের ক্লিন্নতা ও কদর্যতার শ্বাসরোধী আব-হাওয়া থেকে মুক্তি যাঁরা খুঁজছেন তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্য একটা মস্ত বড় আশ্রয়-ভূমি। ওই আশ্রয় আশা ও আশ্বাস দিয়ে ঘেরা। জীবনের প্রতি বিশ্বাস সেখানে বিপর্যস্ত হয় না, বরং অধিকতর পুষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষের প্রতি ভালবাসা নূতন শক্তি লাভ করে। আজকের দিনে সমাজ-জীবনের ধাঁচটাই এমন হয়ে গেছে যে, মানুষকে ভালবাসতে আর সাধ যায় না। কিন্তু একবার রবীন্দ্র-সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করলে মানুষকে ভালবাসায় যে কত সুখ ও তৃপ্তি, তার স্বাদ বোঝা যায় এবং এই সত্য পৃথিবীতে আমরা জন্মলাভের সঙ্গে পেয়েছি বলে অনির্বচনীয় চরিতার্থতায় আমাদের মন ভরে যায়। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য তাপিত আর সন্তপ্ত আর আশাহত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই এক পরম নির্ভরের স্থল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচিত অগণিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত, তাঁর ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছ, তাঁর গল্পগুচ্ছের গল্প, তাঁর কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, খেয়া প্রভৃতি কাব্য, গীতাঞ্জলি, গীতালি ও প্রবাহিনীর গান, মধ্য-বয়সে রচিত তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ এবং 'গোরা' পর্যন্ত তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস—এ সকল পড়লে মন অপূর্ব আনন্দরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং তার থেকে জীবনে পথ চলার নূতন সংকেত ও বল যেন খুঁজে পাওয়া যায়। অপরের প্রতিক্রিয়ার কথা সঠিক বলতে পারব না, আমার তো রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংস্পর্শে এলেই প্রাণে যেন মুক্তির হাওয়া বইতে থাকে, স্বপ্ন-জগতের দরজা যেন চকিতে মনশ্চক্ষুর সামনে খুলে যায়, জীবনধারণের একটা অর্থ মেলে এবং প্রাত্যহিকতার মালিন্যের চেতনা মন থেকে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে এমন একটা স্বাদ আছে যা পাঠকের হৃদয়-তন্ত্রীকে উচ্চ রুচির পর্দায় চকিতে বেঁধে দেয়।

এ পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভাষার কুহক দিয়ে তৈরী, তাঁর শব্দ-ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের বিশেষ জাদুর দ্বারা মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্র-চরিত্রগুলিকে সমাজের যে স্তর থেকেই নির্বাচন করুন না কেন, তাদের সঙ্গে আমরা কেমন এক-প্রকার সাজুয্য অনুভব করি এবং এই অনুভূতিতে আমাদের মধ্যে একটা তৃপ্তির বোধ সঞ্চারিত হয়। তার উপর কবির সহজাত রস-রসিকতা ও কৌতুকচ্ছটা মনের বেদনাকে ভুলিয়ে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মহৎ লেখকের একটি প্রধান গুণই হল ওই নিরাবিল হাস্যরস। এই হাস্যরসের প্রসাদে অতি-ক্রূর ঘটনার নিষ্ঠুরতাও নরম হয়ে পাঠকের মনে আঘাত করে, তাঁর চিত্তে অতি হৃদয়বিদারক বিয়োগান্ত ব্যাপারের বেদনাও সহনীয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথে এই প্রকারের নির্মল হাস্য-রসসৃষ্টির ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে ছিল। জীবনের মণিভাণ্ডারে সঞ্চিত অপরিমেয় আশা আর আনন্দের উৎস হতেই যে এই হাস্যরসধারা প্রবাহিত হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তবে রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গভীর ঘা খেয়েছিল। তিনি এতকাল যে স্বপ্ন ও আনন্দলোকে বাস করে আসছিলেন তার ভিত্তিভূমি যুদ্ধের বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতায় প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হল; তাঁর লেখায়ও সেই পরিবর্তিত মনোভঙ্গীর ছাপ পড়ল। শুধু যে কবির রচনার ধারারই বদল হল তা-ই নয়, তাঁর রচনার শৈলীরও বদল হল। ভাষা-ব্যবহার গেল বদলে, আঙ্গিকে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। লেখার বিষয়ও বদলাল, রীতিও বদলাল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সময়টা 'সবুজ পত্র' পত্রিকার প্রভাবের কাল। সবুজ পত্র বাংলা সাহিত্যে নূতনত্বের বাণী নিয়ে এসেছিল। আনকোরা আধুনিকতার প্রচার পত্রিকাটির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মানুষকে নির্বিশেষ ভাল বা মন্দের আধার কল্পনা না করে শুভাশুভময় মিশ্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী কল্পনা করার রেওয়াজ—যা যুদ্ধোত্তর আধুনিক সাহিত্যেরই একটি প্রধান রেওয়াজ—সবুজ পত্রের পোষকতায় বাংলা সাহিত্যে এই সময়ে সবিশেষ কৌলীন্য লাভ করে। সবুজ পত্রের নায়ক প্রমথ চৌধুরী চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্ত মনের পরিচয় দিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি ভাষা-ভঙ্গীতে বিপ্লবাত্মক রূপান্তর সাধন চেষ্টায় অগ্রণী হলেন। সাধু ভাষাকে কথ্য ভাষায়

ভেঙে সহজ করার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী ভাষা অগ্র-পথিক রূপে একটা প্রধান কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।

দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ সবুজ পত্রের যুগের এই নবীনতাকে বিশেষ ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কবির জীবনে যুদ্ধ-কালের সূচনা আর বাংলা সাহিত্যে সবুজ পত্রের আবির্ভাব (১৯১৪) সমসাময়িকতার প্রসাদে একটা বিশেষ অর্থময় সহাবস্থিতি রূপে দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ প্রচলিত সমাজ-জীবনকে প্রবলভাবে নাড়া দিল; সবুজ পত্রের নবীনতার আন্দোলনও বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারাকে প্রবলভাবে মথিত-সংক্ষুব্ধ করে তুলল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনে এই দুই আলোড়নেরই ছাপ পড়েছিল এবং তার ফলে দেখা গেল, এই সময় থেকে এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ যা-কিছু লিখেছেন তার মধ্যেই কিছু-না-কিছু এবং কোন-না-কোন ভাবে আধুনিক মনোভঙ্গীর ছায়াপাত ঘটেছে। পঞ্চাশ-পূর্ব রবীন্দ্রনাথ আর পঞ্চাশোত্তর রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনেক তফাত। কি বিষয়বস্তুর নির্বাচনের দিক দিয়ে, কি ভাষা-ব্যবহার আর আঙ্গিকের ক্ষেত্রে। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের রচনা-শৈলীতে গভীর পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছিল। সে এমন পরিবর্তন, যাকে প্রায়-বৈপ্লবিক বলা যায়। এই সময়ে কবির চিন্তার বিস্তার ও বৈচিত্র্য ঘটেছিল এবং তাঁর কাব্য-কল্পনা পূর্ব অধ্যায়ের তুলনায় আরও গভীরতাশায়ী হয়েছিল। কবির দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর গণতান্ত্রিক ও সমাজমুখী মনোভাবের প্রসার এই পর্বেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে জগতে প্রবেশলাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করি, সে এই কালের রবীন্দ্র-সাহিত্যের জন্য নয়, তাঁর প্রাক্-পঞ্চাশ সাহিত্যের জগৎ। যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধপরবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা content বা বক্তব্য বিষয়ের সমৃদ্ধির দিক দিয়ে অনেক-কিছু লাভ করেছি, তবে তদনুপাতে হারিয়েছিও অনেক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও মধ্য বয়সের সাহিত্যে যে অমিত আশা আর আনন্দের স্বাদ আছে, সে স্বাদ আর পরিণত জীবনের সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাই না। প্রাক্-পঞ্চাশ রবীন্দ্র-কাব্যে শান্তি আর স্বস্তির গভীর আশ্বাস আছে, একটা পরম নির্ভরতার ক্ষেত্ররূপে আমরা ওই কালের রবীন্দ্র-কাব্যভূমিকে আঁকড়ে ধরতে পারি। কিন্তু কবির পরবর্তীকালীন কাব্য থেকে আর সে আশ্বাস তেমনভাবে পাই না। তার মানে এ নয় যে, পঞ্চাশ-পঞ্চাশোত্তর কাব্য-জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অপকর্ষ ঘটেছিল: তার মানে এই যে, যুগের বদল ঘটেছিল। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের আঘাতে-সংঘাতে মানুষের মনের চেহারা আর অবিকৃত ছিল না, তার ভিতর নানা মানস-কূটের (complex) অলক্ষ্যে সঞ্চরণ ঘটে তার রূপান্তর সাধন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ওই যুদ্ধ-পরবর্তী মনকেই রূপায়িত করেছেন তাঁর যুদ্ধোত্তর কালের রচনায়—গদ্য ও পদ্য উভয়ত্র। সেইজন্যে ওই কালের রচনায় মনের আরোগ্যের নিদান আর তেমন পাই না, যেমন পাই তাঁর প্রথম ও মধ্য বয়সের রচনায়। কবির যুদ্ধোত্তর যুগের রচনার সঙ্গে এ-কালের সাহিত্যের মেজাজগত ঐক্য আছে। এবং সেইটে একটা কারণ যার জন্য আমরা ওই পর্বের সাহিত্যের প্রতি যত-না আকৃষ্ট হই তার চেয়ে বেশী আকৃষ্ট হই পূর্ব-বর্তী পর্বে রচিত রচনাবলীর প্রতি। কারণ যা অপরিচিত, যা বিপরীতধর্মী, তার প্রতিই মানুষের মন আকৃষ্ট হয় বেশী। যা সমানধর্মী পরিচিত অভ্যস্ত, তার প্রতি পরিচয়জনিত এক ধরনের ঔদাসীন্য সূচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

> **অনিবার্য কারণবশতঃ 'ইস্রেলে কয়েকটি দিন'-এর দ্বিতীয় কিস্তি এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না।**
>
> **'অমৃত' সম্পাদক**

তার উপর পাঠকদের মধ্যে যাঁদের মন আধুনিক জীবনের নিষ্করুণ রূঢ়তার দ্বারা উপদ্রুত, আধুনিক সাহিত্যের নিরাবরণ বাস্তবতার হাঁফ-ধরা পরিবেশে যাঁদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, যাঁরা জীবনে শোক-তাপ পেয়েছেন, অন্য নানা ভাবেও বেদনা পেয়েছেন সুপ্রচুর, তাঁদের নিকট তো প্রাক্-পঞ্চাশ রবীন্দ্র-সাহিত্য এক অসাধারণ শান্তি ও আশার আকর বিশেষ। তাপিত মানুষ শান্তির আশায় ধর্মের শরণ নেয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের শরণ নিলেও তাঁরা পারেন।

প্রদর্শনী

কলারসিক

উপস্থিত করা হলো ১৯৬১ সালের এই ২৬শে আগস্ট! তাও নবনির্মিত অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর সুরম্য ভবনে নয়, রামকিঙ্করের প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচিত হয়েছে পার্ক স্ট্রীটের জীর্ণপ্রায় আর্টিস্ট্রি হাউসের দমবন্ধ অন্ধকার ঘরে! প্রদর্শনীর আয়োজন অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর মত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কিন্তু করলেন না, এর আয়োজনে এগিয়ে এলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত ক্যালকাটা আর্টস কাউন্সিল নামে সদ্য-সংগঠিত একটি প্রতিষ্ঠান।

শিল্পী রামকিঙ্কর

অনেক দুঃখেই কথাগুলো বলতে বাধ্য হলাম। আর, এই ভূমিকার সঙ্গে আরো কিছু বক্তব্য বলা প্রয়োজন বোধ করছি। না হলে রামকিঙ্করকে বুঝার পটভূমি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাঠক-দের কাছে এবার সেই বক্তব্যই পরিবেশন করছি।

সেদিন রামকিঙ্করের প্রদর্শনী উদ্বোধনের প্রাক্কালে যখন শিল্পীকে সমবেত সাংবাদিকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন সেখানে আর-একজন শিল্পী বিদেশী শিল্প-সমালোচকদের চোখে রামকিঙ্কর কী বিরাট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তার কিছু কাহিনী শোনালেন আমাকে। ইনি রামকিঙ্করের প্রায় সমসাময়িককালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনে দীর্ঘকাল প্যারিস, লণ্ডন, ইতালী ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন শহরেও কাটিয়ে এসেছেন। বর্তমানে ইনি বাঙলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যার হস্তশিল্প সংস্থার আঞ্চলিক অধিকর্তার দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত। এঁর নাম শ্রীপ্রভাস সেন। প্রভাসবাবু বল্লেন, একবার ইতালীর একজন বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। আলাপের সময় প্রভাসবাবুর হাতে রামকিঙ্করের ভাস্কর্যকলার কয়েকখানি ফটোগ্রাফ দেখে শিল্প-সমালোচকটি নাকি প্রায় চমকে উঠে বলেন, 'ইনি আপনার দেশের শিল্পী? এতবড় প্রতিভার কথা আপনার দেশ জানাবার প্রয়োজন বোধ করলো না অন্য দেশের মানুষদের কাছে? আমাদের দেশের শিল্পীরা তথা সারা ইউরোপ বিমূর্ত শিল্পকলার যে প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়ে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে—ইনি দেখছি সে-পথে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছেন। এমন শিল্পী দেশে থাকতে আপনি এসেছেন ইউরোপে শিল্প-শিক্ষা করতে?'

লণ্ডনের 'ডেলী ওয়ার্কার' পত্রিকার শিল্প-সমালোচকের মুখেও রামকিঙ্কর সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ উক্তিই শুনেছেন প্রভাসবাবু। প্যারিসেও তাঁর একই অভিজ্ঞতা। এ খা নে কা র শিল্প-সমালোচকরাও মনে করেন, রামকিঙ্কর পৃথিবীর আধুনিক ভাস্কর্য-শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

যে শিল্পী বাঙলা তথা ভারতের গর্ব সেই শিল্পীর ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত শিল্প-সাধনার ৬৭টি নিদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্যি সৌভাগ্যের কথা। দীনভাবে হলেও

পিকনিক

॥ বাঙলা দেশের গর্ব : শিল্পী রামকিঙ্কর ॥

শান্তিনিকেতনের শিল্পী রাম-কিঙ্করের নাম ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে আজ বিশ্বের শিল্পরসিক ব্যক্তিদের কাছে সুপরিচিত। এ আমাদের গর্বের কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য কলকাতাবাসীর। এখানকার শিল্পরসিক ব্যক্তিদের কেউ কেউ শান্তিনিকেতনে যেয়ে রামকিঙ্করের শিল্প-কর্মের সঙ্গে পরিচিত হলেও এতদিন অধিকাংশ কলকাতাবাসীর কাছে তাঁর শিল্প-কর্ম ছিল প্রায় অজ্ঞাত। অথচ ১৯২৫ সালে এই অজ্ঞাত শিল্পীকে আবিষ্কার করে-ছিলেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়। কলাভবনে শিক্ষার্থীরূপে ভর্তি হওয়ার সময় তিনি নির্বাচনী পরীক্ষায় যে ছবি এঁকে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন তাই হাতে করে শিল্পাচার্য শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুকে নাকি বলেছিলেন: 'নন্দ, একে আর কি শেখাবি। এ-যে দেখছি প্রায় সবই শিখে এসেছে।'

তারপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত মনীষীর হাত ধরে যিনি শিল্পের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিলেন, অবনীন্দ্র-নন্দলালের ক্ল্যাসিক্যাল চিত্ররীতিতে আঁকতে আরম্ভ করে যিনি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাঙলা দেশের ভাস্কর্য ও শিল্পধারায় প্রবর্তন করলেন আধুনিক যুগের বিমূর্ত রীতি-পদ্ধতি, তাঁকে—সেই প্রাণবন্ত প্রতিভাবান শিল্পীকে, বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণ-কেন্দ্র কলকাতা শহরে এককভাবে

এ.ট্ ফ্রম হেভেন

এই পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা নবগঠিত ক্যালকাটা আর্টস কাউন্সিলের কাছে কৃতজ্ঞ।

রামকিংকর মুখ্যতঃ ভাস্কর্য-শিল্পী। বৃহদায়তন ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলিতে তাঁর কল্পনা-প্রতিভা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির অসাধারণ ক্ষমতা, এমন আশ্চর্য দক্ষতায় ও ব্যঞ্জনাময় কারু-নৈপুণ্যে বিধৃত হয়েছে—যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত গাঙ্গুলী (১নং), অবনীন্দ্রনাথ (৫নং), শ্রীমতী শঙ্খ চৌধুরী (৯নং), হাসি (৭নং), প্রীতি পান্ডে (৮নং) ও মাদুরা সিংহ (১৫নং) তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড রুক্ষ সৌন্দর্য নিয়ে রামকিংকরের হাতে আবক্ষ মূর্তিতে ভাস্কর্যের চিরকালীন সম্পদে পরিণত হয়েছেন।

ভাস্কর্য-শিল্পের বিমূর্ত আঙ্গিক-প্রকরণেও এ-দেশে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। ইউরোপে যখন 'কিউবিজম' 'সুররিয়ালিমজ' প্রভৃতি শিল্প-আন্দোলন মানুষের মনে নতুন শিল্প-জিজ্ঞাসার জন্ম দিচ্ছে, প্রায় তারি সমসাময়িককালে শান্তিনিকেতনের নিভৃতে বসে রামকিংকরও সুররিয়ালিস্টিক পদ্ধতিতে সংযোজন করে চলেছেন তাঁর স্মরণীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সম্পদ। এ-এক বিস্ময়কর পরিণতি। ক্লাসিক পদ্ধতিতে যাঁর শিল্পী-জীবন শুরু, বিমূর্ত-পদ্ধতিতে উত্তরণ তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও শিল্প-শক্তির পরিচয়। বস্তু-বিচ্ছিন্ন ভাবমূর্তির নির্বিশেষ অভিব্যক্তির এমনি কয়েকটি ভাস্কর্য-নিদর্শন এই প্রদর্শনীতেও স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে 'ফ্রুটস অফ হেভেন' (১৩নং), 'মিথুন' (৪নং), 'কচ ও দেবযানী' দেখে দর্শকেরা উপলব্ধি করতে পারবেন রামকিংকরের শিল্পী-সত্তাকে। রামকিংকরের অজস্র ভাস্কর্য-নিদর্শনের মধ্যে মাত্র ১৫টি এসেছে এই প্রদর্শনীতে। যদি কোন দিন শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর উল্লেখযোগ্য সব ভাস্কর্য-কলার নির্দশন এনে কলকাতায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় তবে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আমার বিশ্বাস। অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান করতে পারেন না কি এই আয়োজন?

আমি পূর্বে বলেছি রামকিংকর মুখ্যতঃ ভাস্কর্য-শিল্পী। কিন্তু চিত্রকলাতেও তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে আশ্চর্যভাবে। তাঁর ভাস্কর্যকলার মত চিত্রকলাও যেমন রঙে আর রেখায় প্রাণবন্ত, তেমনি গতিময় ছন্দে আর বিন্যাসে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা উদ্ভাসিত। মানুষ আর জন্তুর আকৃতি শিল্পীর প্রধান আকর্ষণ হলেও বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতির ঊষর সৌন্দর্যও চমৎকারভাবে চিত্রায়িত হয়েছে রামকিংকরের তুলির স্পর্শে। তেলরঙে আঁকা অনেকগুলি চিত্রে ভাস্কর্যের বলিষ্ঠতা রঙে আর রেখায় যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। রূপদক্ষ শিল্পীর এমন বুননী-বিন্যাস খুব কম আধুনিক শিল্পীর করায়ত্ত। আর সবচেয়ে বড় কথা, বিমূর্ত শিল্পকলার অন্যতম পথিকৃত হয়েও ইনি ইদানীংকালের বিমূর্ত শিল্পীদের মত স্বদেশের জল-মাটি, আলো-হাওয়া তথা ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয়ে চিত্র রচনায় প্রবৃত্ত হর্ননি। তাঁর চিত্র দেখার পর বিভ্রান্ত হতে হয় না বরং চিত্রের ভাষা এবং প্রতীক আমাদের ভাবনার দিগন্তকে বিস্তৃত করে দেয়। এখানেই তো শিল্পের সার্থকতা। (৩৫ নং) প্রভৃতি চিত্রে ফুটে উঠেছে রূপমুগ্ধ দ্রষ্টার নিপুণ দক্ষতা। প্রতিকৃতি চিত্রেও রামকিংকর যে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাও স্মরণযোগ্য। 'স্বপ্নময়ী' (২২ নং), 'মিসেস বড়ুয়া' (২৫ নং), 'বিনোদিনী' (২৭ নং) প্রতিকৃতি চিত্রের অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

এই প্রদর্শনীতে জলরঙের যে ১২খানি চিত্র আছে সেখানেও রামকিংকরের বৈশিষ্টময়তা বিদ্যমান। বীরভূমের নিঃসর্গ দৃশ্য এমন হাল্কা রঙের অনুপম ছন্দে আমি আর বিধৃত হতে দেখিনি কোনো শিল্পীর হাতে।

পাম গ্রোভ

রামকিংকর বাঙলা দেশের সেই দুর্লভ প্রতিভার সার্থক শিল্পী।

এই আলোচনায় সব কথা ব্যাখ্যা করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। সীমাবদ্ধ পরিসরে শুধু এইটুকু বলা যায় রামকিংকর জীবন-রসিক শিল্পী। একদিকে তিনি জীবনের প্রচণ্ড সমালোচক, আবার অন্যদিকে জীবন ও প্রকৃতির রূপমুগ্ধ দ্রষ্টা। 'নিউ শিফ্‌ট' (২৯নং), 'হিন্দু-বিধবা' (৩৪নং), 'দি বিল্ডারস' (১৯ নং)—এ তাঁর তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনা তুলির মুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর 'গার্ল এন্ড ডগ' (৬ নং), 'বিশ্রাম' (৯ নং), 'শীতের নিঃসর্গ' (১৬ নং), 'বসন্ত' (২০ নং), 'তালকুঞ্জ' ক্ষুদ্রাকৃতি এক একটি জলরঙের ছবিতে তিনি স্বচ্ছন্দে অনেকগুলি আকৃতি-প্রকৃতিকে স্থান করে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে জলরঙের অনেকগুলি চিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে যেন গীতি-কাব্যের ব্যঞ্জনাময় ধর্ম। ২খানি গ্রাফিক চিত্রের কাজও আছে প্রদর্শনীতে।

এই আলোচনা শেষ করার আগে আবার বলছি : রামকিংকর সর্বাঙ্গীণ শিল্পী, বাঙলা দেশের গর্ব। তাঁর প্রদর্শনী আরো ব্যাপক আকারে সুষ্ঠু-ভাবে কলকাতায় আবার অনুষ্ঠিত হোক, আজ শুধু এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি কলকাতার শিল্পরসিক ব্যক্তিদের বর্তমান প্রদর্শনীটি দেখে আসতে অনুরোধ করছি।

অনবরত বাগচী-র শিকার কাহিনী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

অনবরত বাগচী বললেন—"হ্যাঁ। একটি হীরের আংটি দিয়ে আমি একটি বাঘ, একটি সাপ ও একটি গণ্ডারকে মেরেছিলাম। কিন্তু সে কথা শোনবার আগে আপনাদের জানতে হবে বুড়ো অ্যান্‌সন সাহেব উনিশশো পঞ্চান্ন সালের মিস মিচিগানকে বিয়ে করল কেন।"

আমরা অনবরত বাগচীর সব কথা বিশ্বাস করতে সচেষ্ট হলাম।

অনবরত বাগচী বললেন— "ডরোথী পার্কার পঞ্চান্ন সালে সুন্দরীদের কম্পিটিশনে মিস মিচিগান হয়েছিলেন। এ্যান্‌সন জেনসেন মিচিগান স্টেট থেকে সুন্দরীদের খরচ-খরচা দিয়ে পাবলিসিটি দিয়েছিল। হলিউড যুগে এজেন্টদের কাছে ধর্না দিয়ে ডরোথী যখন হয়রান, তখন এ্যান্‌সনকে বিয়ে করে বসলো। কিছু দিন বৌকে হীরে দিয়ে মুড়ে রেখে হঠাৎ দেখা গেল এ্যান্‌সনের কারবার ফেল। শেষকালে তেল কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে এদেশে উপস্থিত। লোকটার ঘোর সন্দেহবাতিক। মালিকের হাটুতে বসে ডরোথী বিআর খাচ্ছে এই দেখেই সে মালিককে বোতল ছুঁড়ে মারল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে জলডুবিতে কেন সে জলডুবির একস হাইনেস-এর সংগে ঘুরেছিল, সে কথা যদি জানতে চান তাহলে আপনাদের জানতে হবে জলডুবির মাটিতে তেল কেমন করে পাওয়া গেল।

জেনে রাখুন, জলডুবি থেকে একশো মাইল উত্তরে তখন তেল কোম্পানী আর ভারত সরকার পেট্রোল খুঁজে পেয়েছে। জলডুবির মহারাজার তখন জলে ডোবার অবস্থা। এ্যান্‌সন জেনসেনকে হাতী চড়িয়ে তিনি নিয়ে এলেন। মেমসায়েবকে তাঁবু দিয়ে হারেম বানিয়ে দিলেন। এ্যান্‌সন মাটি শুঁকে-টুঁকে বললে—ইওর হাইনেস, এর তলায় পেট্রোল টুবটুব করছে। তুমি অবস্থা ফিরিয়ে ফেলবে। আমি তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দেব। আমায় কি দেবে বল?

জলডুবির মহারাজা মোটা টাকা কবুল করে বসলেন। তারপর অ্যান্‌সন গামবুট পরে কলী কামিন আর জিওলজিস্ট নিয়ে জলডুবির মাটি ঠুকরে বেড়াতে লাগল।

এমনি করে তিন মাস কাটল।

তেল আর মেলে না। অ্যান্‌সন রাগের চোটে গোঁফ উপড়ে ফেলল! গাঁয়ের পুরনো বুড়োরা বলতে লাগল—তেল আর কি একটা আশ্চর্য জিনিস। আগে আগে আমরা মাটিতে তীর ছুঁড়তাম। অমনি পিচকিরি দিয়ে তেল উঠতে থাকত। সে সব জায়গা রাজামশাই দেনার দায়ে খুড়তুতো ভাইকে বেচে দিল। এখন খুড়তুতো ভাই তার জমি থেকে লাল হয়ে গেছে। মহারাজা আঙুল চুষছেন। সন্ধ্যাবেলা এ্যান্‌সন তাঁবুতে ফিরে ডরোথীর সংগে ঝগড়া করে। ডরোথী বলে—বুড়ো, তুই আমাকে টাকা দে। আমি দেশে চলে যাই। টাকা না পেলে সব গয়নাগাটি মহারাজাকে বেচে দেব।

এ্যান্‌সন বলে—ডার্লিং, অমন সর্বনাশ ক'রো না। মহারাজ রোজ রাতে দু'জন পাকা চোরকে ডরোথীর বাংলোতে পাঠান। তারা সারা গায়ে সরষের তেল মেখে গয়না চুরি করতে ঢোকে। অ্যান্‌সন রোজই তাদের জাপটে ধরে। তারা পিছলে পালিয়ে যায়। ডরোথী মনের সুখে ঘুমোয়। গয়নাগুলো সে কোমরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। অ্যান্‌সনকেও সে বিশ্বাস করে না। অ্যান্‌সন রোজ সকালে মহারাজাকে বলে লোক দুটোকে গন্ধতেল মাখতে বলো। নইলে গ্রীজ। সরষের তেলের গন্ধ ভেরি ব্যাড। মহারাজা বলেন— হোআট নন্‌সেন্স। আমার ক্ষেতের সরষের তেল! অ্যান্‌সন বলে—ভেরী গুড ফর ফ্রায়েড্ ব্রিঞ্জল। নো গুড ফর থিভ্‌স।

এইরকম সময়ে আমি গিয়ে পোঁছ-লাম।

আমি গিয়ে পোঁছলাম কমিশনার কারিআপ্পার চিঠি পেয়ে। কেননা, তত-দিনে, জলডুবির বাঘটি সতেরোটি সুন্দরী মেয়েকে মেরেছে। আঠারো নম্বর সুন্দরী মেয়ে বলতে ডরোথী জেন্‌সেন। অতএব, বাঘটিকে মারবার জন্যে আমারই ডাক পড়লো।"

অনবরত বাগচী নস্যি নিয়ে বাঘের এই প্রেমিক-প্রেমিক অথচ হিংস্র-হিংস্র চরিত্রটির ব্যাখ্যা করলেন।

বললেন—"বাঘটার সুন্দরী মেয়েদের ওপর দুর্বলতা ছিল। সে পুরুষদের ধরতো না। কালো কুচ্ছিত মেয়েদের ছুঁয়ে দেখত না। কারিআপ্পার শাশুড়ীকে যখন ধরে নিয়ে গেল, মনের আনন্দে কারিআপ্পা অফিস ছুটি দিয়ে দিয়ে-

ছিল। কিন্তু উল্টেপাল্টে রং দেখে-টেখে বাঘটা মিসেস আয়ারকে ঠিক সন্ধ্যেবেলা পোঁছে দিয়ে গেল।

মহারাজ তাঁর চার-নম্বর বৌকে রং মাখিয়ে-টাখিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন। কিন্তু জিভ দিয়ে চেটে তাঁর আসল রং দেখবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁপাতে

......বলে ডরোথী......

হাঁপাতে বাঘটা প্যালেসের দোতলায় এসে মহিলাকে বসিয়ে দিয়ে গেল। তিনি দেখেন তাঁর তিন সতীন আর স্বামী মিলে আনন্দে সিদ্ধির শরবত খাচ্ছেন। দেখে রাগের চোটে রাজবাড়ীর খাস রাঁধু-নীর বৌকে নিয়ে তিনি বাঘের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। রাঁধুনীর বৌটির ওপর মহারাজার নেকনজর ছিল। বলতে নেই তার গায়ের রংটংগুলোও দিব্যি ছিল। বাঘটা তাকে নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। মনের দুঃখে মহারাজা তিন দিন বাড়ী এলেন না। মাচায় বসে বসে দেশী মদ খেলেন। কিন্তু সে সব কথা অবান্তর।

আমি অনুধাবন করে বুঝলাম, বাঘটার মধ্যে প্রথমটা প্রেমিক চরিত্রটা প্রবল থাকে। সে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের সামনে নিজে ডিগ-বাজি খেয়ে উলটে-পালটে নানারকম ভাবে নিজের আকুলতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। এ্যান্‌সনের স্বচক্ষে দেখা। তারপর, সেই সব লাফঝাঁপ করতে করতে যখন ক্ষিদে পেয়ে যায়, তখন, এবং এক-মাত্র তখনই হয়তো—কিন্তু সে সব কথাও থাক।

আমি যখন জলডুবি পোঁছলাম, তখন বিকেল হয়েছে। ফরেস্টবাংলোর সামনে ফোয়ারার ধারে, কলাপাতা রঙের ঝালর-দেওয়া ঘাঘরা, আর ফুলের মালা পরে ডরোথী পার্কায় একলা বসেছিল।

আমি টুপি খুলে বললাম—সুন্দরী, তোমাকে রক্ষা করবার জন্যেই আমি এসেছি। আমি বাগচী।

—দি গ্রেট হান্টার?

বলে ডরোথী আমার দিকে চাইল। তৎক্ষণাৎ, আপনাদের বোধহয় না বললেও চলবে, আমরা দু'জনে দু'জনের প্রেমে পড়ে গেলাম।

ডরোথী আমায় বলল— এ্যানসনের সঙ্গে জঙ্গলে থাকতে থাকতে আমি জংলী হয়ে গেলাম। পেট্রোলিয়াম-এর কথাটা রাজাকে কেন বলেছে এ্যান্‌সন আমি জানি। আসলে এ্যান্‌সনের হাতে একটি পয়সা নেই। আমি যেতে চাইলে সে তাই বাধা দিচ্ছে। তা ছাড়া......

বলে সে আমাকে একটা ভীষণ চক্রান্তের কথা বলল। সে বলল, এখন তাকে নিয়ে এ্যান্‌সনের ভীষণ মুশকিল। এ্যান্‌সন চেষ্টা করছে জলডুবির মানুষ-খেকোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একবার ডরোথীর সামনে হাজির করতে। আমি বললাম—তাতে ওর স্বার্থ কি? ডরোথী বললে—বুঝতে পারছ না? আমাকে বাঘটা ধরে নিয়ে যাবে। আমার গয়না-

গয়নাগুলো নিয়ে ও সহজেই পালাতে পারবে। কেননা, রাজা আর বেশীদিন আমাদের এভাবে রাখতে পারবে না। আমি বললাম—আমাকে তলব করে আনবার প্রয়োজন কি ছিল?

ডরোথী বলল—আহা, বুঝতে পারছ না? গয়নাগুলো ত' আমার কাছেই থাকে। আমাকে বাঘটা মারবে। তুমি মারবে বাঘটাকে। গয়নাগুলো পাবে অ্যান্‌সন। কিন্তু আমি তা হ'তে দেব না।

আমি আর ডরোথী প্ল্যান করলাম। ডরোথীকে সামনে বসিয়ে আমি বাঘটাকে ডেকে এনে মারব। তারপর অ্যানসন আর রাজাকে বেঁধে রেখে জিপ নিয়ে পালাব দূরে। এরোড্রোম থেকে প্লেন নেব। কলকাতা হয়ে সোজা অ্যামেরিকা। তারপর ডরোথী আর আমি কোন সমুদ্রের ধারে হোটেল খুলব।

—টাকা পাব কোথায়?

ডরোথী বলল—আমার গয়নাগুলো ত' কলকাতায় বেচব না। স্টেট্‌স-এ গিয়ে বেচব। রাজাকে যখন তুমি বাঁধবে দেখবে ওর কোমরে ট্রেজারীর সমস্ত টাকা বাঁধা আছে। ও কি রাণীদের বিশ্বাস করে?

সব জলের মতো সহজ তরল বোধ হলো। তাই, অ্যান্‌সন যখন এল, তাকে আমি সহজভাবে অভ্যর্থনা করতে পারলাম।

এবং সেই রাতেই, অ্যান্‌সনের অনুমতি নিয়ে আমি আর ডরোথী জঙ্গলে গেলাম।

বাঘ এল না। জঙ্গলে জোঁক ছিল, বিছে ছিল। হাজার হাজার কাঠ-পিঁপড়ের বাসা ছিল। তবু, সময় বৃথা নষ্ট না করে আমরা ঘুরে ঘুরে বাঘের খোঁজ করলাম।

বাঘ এল না।

এদিকে সকলের মেজাজের মিটার তখন ধাপে ধাপে উঠছে। ডরোথী আর অ্যান্‌সন দিনরাত ঝগড়া করছে। রাজার ভাবগতিক বোঝা যায় না। তবে অ্যান্‌সন আমাকে বলছে—জিপটা নিয়ে আমি তুমি ডরোথী তিনজনেই পালাই চল।

আমি কিছু বলছি না।

এমনি সময়ে ডরোথী বলল দেখ আর দেরি করে লাভ নেই। একসঙ্গে সবগুলো সম্ভব হবে না। আমি আর তুমি পালাই চল। আপাততঃ কামশনারের কাছে পালাব। সে নিশ্চয় আমাদের একটা বন্দোবস্ত করে দেবে।

তাই ঠিক করলাম। রাত যখন একটা হবে। ডরোথী আসবে। আমি আর সে পালাব। অ্যান্‌সনের স্কুটারটা ডরোথী নিয়ে আসবে। স্কুটার চড়ে চল্লিশ মাইল পালানো আমার কাছে কিছু না।

আমি জলডুবির মহারাজার বিখ্যাত লেকটির পাশে গিয়ে বসলাম। রাইফেলটা পাশে রেখেছি। মনের মধ্যে একটা বিষণ্ণতার ভাব। বাঘ মারতে এলাম। বাঘ উধাও। বাঘিনী নিয়ে পালাচ্ছি আমি, এটা যেন ঠিক বীর-শিকারীর কোডে পড়ছে না। মিলছে না।

একটা বাজতে পাঁচ। হঠাৎ পায়ের কাছে, জলের নিচে একটা শব্দ। একটা আলোড়ন। মশায়, মহারাজার পোষা কুমীরটির ঘোলাটে চোখ দুটো আমি সামনে দেখতে পেলাম।

কুমীরটাকে মারা আমার পক্ষে অত্যন্ত সোজা। কিন্তু, আমি চিন্তা করতে লাগলাম, মহারাজার পোষা কুমীর, তাকে মারবার কি কোন অধিকার আছে আমার? ঘাড়ের কাছে কে নিশ্বাস ফেলল।

তখন ঘাড় ফিরিয়ে আমি যা দেখলাম, তাতে আমার রক্তও ঠান্ডা হতে থাকল। আমার ঘাড়ের কাছে ভালবেসে নিশ্বাস ফেলছে একটি সাপ। ঐ সব জলা জায়গা ছাড়া বুঝি গোখরোর অমন বেয়াড়া সাইজ হয় না। আর, সবচেয়ে আপত্তিকর কথা হলো, সাপটা আমার দিকে চাইছে না। সে আমার ওপাশে যার দিকে চেয়ে আছে, চেহারা থেকে বুঝতে আর দেরি হলো না, সে-ই হলো জলডুবির সেই বিখ্যাত বাঘ। যে আমাকে এখানে টেনে এনেছে। যাকে না পেয়ে রোজ আমি এইখানে, এই অবস্থায় বসে আছি।

আমি আমার ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। আমি স্মরণ করতে লাগলাম ভারতীয় বাঘশিকারীদের ভগবান কুমুদ চৌধুরীকে এবং জিম করবেটকে। আমি প্রার্থনা করলাম এবং মনশ্চক্ষে দেখলাম. করবেট, তার গোঁফ, তার প্রিয় কুকুর রবিনকে। চৌধুরীমশায়ের চেহারাও স্মরণ করলাম। আমি অনতিবিলম্বে তাঁদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছি, এ কথাও ভাবতে অসুবিধে হলো না।

বাঘটা অনেকদিন কোন শিকার পায়নি।

সাপটা নিঃসন্দেহে ভালবেসে একটি ছোবল দেবে।

কুমীরটা অতি সহজে আমাকে হজম করতে পারবে।

তখন আমি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলাম। এবং যারা ছোটদের গল্প লেখে, তাদের কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমি অপরাধ করেছি। তারা যখন শিকারীদের ডাঙায় বাঘ এবং জলে কুমীর-এর মধ্যে বসিয়েছে, আমি তাদের মুন্ডপাত করেছি। আজ এই অন্তিম সময়ে আমায় বুঝতে হলো, যে তারা সত্যদ্রষ্টা, তারা ভুল করেনি। আমি চোখ বুজতে চাইলাম।

চোখ বুজতে পারলাম না। তখন সমস্ত দৃশ্যটায় একটি চমৎকার ব্যালে নৃত্যের কম্পোজিশন এসেছে।

কুমীর এগোচ্ছে। এক-দুই-তিন-চার......

সাপটা দুলছে। পাঁচ-ছয়-সাত-আট...

বাঘটা ল্যাজ নাড়ছে। নয়-দশ-এগারো-বারো......

আর নয়। এবার একটা কিছু হোক। আমার সমস্ত নার্ভগুলো চেঁচিয়ে উঠল।

একটা কিছু হলো।

ডরোথী এবং অ্যানসন এবং রাজা একসঙ্গে এল। আমি শুনলাম ডরোথী বলছে—সমস্ত গয়নাগুলো ঝুটো? জাল? তুমি সেগুলো কলকাতায় বেচে দিয়েছ? আমাকে ঠকিয়েছ? আমি বাগচীর বন্দুক দিয়ে তোমাকে......

অ্যানসন বলছে—ডরোথী সব ঝুটো। সব জাল। কিন্তু আংটিটা সত্যি। ওটা তোমার আঙুল থেকে আমি খুলতে পারিনি। তাছাড়া, ঐ আংটিটার হীরেটা ভীষণ দামী। ডরোথী!

—আমি বিশ্বাস করি না।

বলে ডরোথী সাপটার ল্যাজটা মাড়িয়ে দিল। দিয়ে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল।

ডরোথী নয় বাঘটা।

দীর্ঘদিন পরে সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখে বাঘটা যেভাবে উল্লাসে চীৎকার করল, তা আপনারা ভাবতে পারবেন না।"

আমরা, শ্রোতারা তখন গল্পের এই ধরনের না-বলে-না-কয়ে বিপজ্জনক

মোড় নেওয়ার ধাক্কায় প্রায় ধরাশায়ী হয়েছি। অনবরত বাগচী বললেন ঃ

"ডরোথী আংটিটা খুলতে চেষ্টা করছে। বাঘটা লাফ দিচ্ছে। সাপটা ঝুঁকে পড়েছে। কুমীরটা হাঁ করেছে। ডরোথী আংটিটা খুলল। আংটিটা ছুঁড়ল। মশায়, মেয়েরা যখন বুঝতে পারে পুরুষরা তাদের ঝুটো গয়না দিয়ে ঠকিয়েছে, তখন তারা সাপের ল্যাজে পা দিয়ে বাঘের দিকে ছুটে যেতে পারে এ আমি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

এবং আমার রাইফেলটা তখনই ছুটে গেল। আমি সচক্ষে দেখলাম আমার রাইফেলের গুলী বাতাস থেকে ডরোথীর আংটিটা লুফে নিয়ে নিদারুণ ভেলোসিটিতে মাটি ফুটো করে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা, এ্যানসন, ডরোথী সবাই ঐকতানে চেঁচিয়ে উঠল। আমি চোখ বুঁজলাম।"

—"তারপর?"

—"তারপর? মশায়েরা কল্পনা খাটান। মগজের পরিধি বিস্তার করুন। কেননা, নইলে এ দৃশ্যের উপসংহার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। সাপটা ছোবল দিয়েছিল বাঘটাকে। বাঘটা সাপটার মাথা কামড়ে বিষের জ্বালায় মরতে মরতে লেকে ঝাঁপ দিয়েছিল। কুমীরটা সাপ ও বাঘকে একসঙ্গে গিলতে গিয়ে যেভাবে মরলো, তার ডাক্তারী নাম হলো অ্যাস্ফিক্সিআ। অর্থাৎ গলায় ফাঁস লাগা। অর্থাৎ গলায় সবটা আটকে দমবন্ধ হয়ে অতি বেদনাদায়ক মৃত্যু।"

—"তারপর?"

—"তখন আমাদের চোখের সামনে হীরের আংটির ফুটো থেকে, মাটির তলা থেকে পিচকিরি দিয়ে তেল উঠছে। হীরের ধাক্কা কি কম? খাঁটি হীরের ধাক্কায় জলডুবির নরম মাটি ফুটো। এবং সঙ্গে সঙ্গে তেলের আত্মপ্রকাশ। সেই তেল দেখে রাজা অ্যানসনকে জাপটে আদর করছে। ডরোথী অ্যানসনকে বলছে—ডার্লিং। কেননা, ডরোথী তখনই সেই তেলের ফোয়ারার মধ্যে অনেক হীরের আংটি, অনেক সাচ্চা পাথরের ঝলকানি দেখতে পাচ্ছে। আমি যে সেখানেই আছি। আমি যে একটা মানুষ সেদিকে ডরোথী একবারও তাকাল না।"

তিনি অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন। একটি গল্পের ঘায়ে আমাদের মহামান

রেখে তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তিনি ছাতি নিচ্ছেন। তিনি সিগারেটের টিন পকেটে রাখছেন। আমরা শুনলাম তিনি বলছেন—"ডরোথী পার্কার এবং অ্যানসন জেনসেন এখন গরমকালে শখ করে সুইটজারল্যান্ড যায়। মোটর চড়ে বিলেত যায় তেহেরাণ হয়ে। মশায়রা মেয়েদের বিশ্বাস করবেন না। এ আমার জীবন দিয়ে শেখা এক নির্মম অভিজ্ঞতা।"

ছাতাটা খুলতে খুলতে তিনি বললেন—"বিদায়।"

আমরাও বললাম—"বিদায়।"

আমাদের গলায় কোন উত্তাপ ছিল না। কেননা, আমি আমার ছাতাটাকে বিদায় জানালাম। রাজেনবাবু বিদায় জানালেন তাঁর সিগারেটের টিনটিকে।

আমরা বুঝলাম, ওদের সঙ্গে আমাদের আর কোনদিন দেখা হবে না।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

পঞ্চম আসর

[রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানাস্থানে নানাবিধ আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। আশা করা যায়, তার ফলে, তাঁর রচনার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। এই আসরে তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি করে ছত্র তুলে দিচ্ছি। কোন্ বইয়ের কোন্ রচনা বা অধ্যায় থেকে তোলা, বলতে হবে। জানিয়ে রাখি, প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিই অতি বিখ্যাত রচনার অংশ। দশটি উদ্ধৃতি আছে। আটটির উত্তর নির্ভুল হলেই বুঝব রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে আপনার বেশ পরিচয় আছে। পাঁচটির উত্তর ঠিক হলেও মন্দ নয়। উত্তর অন্য পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।]

(১)

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম,
আমার রয়েছে বিশ্বলোক।

(২)

সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে।

(৩)

মুক্তবেণী বিবসনে,
বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝ খানে
পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

(৪)

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথচাইল্ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে সে খৃস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের?

(৫)

'রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন চোর,
নইলে নগরপাল রক্ষা নাহি তোর—মুণ্ড
রহিবে না দেহে।'

(৬)

আসল মানুষটি যে তার লাগে না,
সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার—
সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।

(৭)

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের
স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।

(৮)

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কি বলেছিল?

সে বলেছিল, 'সেই মানুষ আমার কাছে এল যে মানুষ আমার দূরের।'

(৯)

তফাত যাও। তফাত যাও। সব ঝুট্ হ্যায়! সব ঝুট্ হ্যায়!

(১০)

যার যাহা বল তাই তার অস্ত্র পিতঃ,
যুদ্ধের সম্বল। ব্যাঘ্র সনে নখে দন্তে
নাহিক সমান, তাই বলে ধনুঃশরে বধি
তার প্রাণ কোন্ নর লজ্জা পায়?

দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার এক একটা অঞ্চলের এক এক ধরনের গন্ধ। এই গন্ধের প্রকৃতি দিয়ে তাবৎ অঞ্চলের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। লখ্‌নউ, ঢাকা বা ইত্যাকার প্রাচীন শহর সম্পর্কে একই অভিজ্ঞতা। এস্‌প্ল্যানেডের কোনো গন্ধ নেই। কারণ এই এক এলাকা, আজও যার কোনো ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি।

কলকাতার কলেজ-পাড়া বা বই-পাড়া বলতে যা বুঝি—গোলদিঘির পূর্ব-পশ্চিম আর উত্তরের সামান্য ভূখণ্ড, নবীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-চর্চা ও দেশব্রতের তীর্থভূমি এই যে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল—তার বুকে দাঁড়িয়ে আমি প্রত্যহ দেড়শো বছরের ইতিহাসের স্পর্শ পাই। ক্বচিৎ বকুলের সুবাস, কখনো তেলেভাজার হাল্কা গন্ধ, কখনো বা কাঁচা কফির ভারী গন্ধ আর নতুন ও পুরনো বইয়ের এক বিচিত্র, মিশ্র সুবাসে এখানকার বাতাস সর্বদা আমাকে উতলা করে।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলিতে হ্যালহেড সাহেব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ ছাপালেন। এই ব্যাকরণে বাংলা টাইপ প্রথম ব্যবহৃত হল। হরফ তৈরি করলেন কোম্পানীর এক কর্মচারী নাম উইল-কিন্স। শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার তাঁরই শিষ্য। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল।

বস্তুত বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ধারাবাহিক ইতিহাস সেই থেকে শুরু। এবং আশ্চর্য এই যে, বাংলা সাহিত্যে যেভাবে একশো বছরে মধ্য যুগ থেকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ (মেঘনাদবধ কাব্য ও দুর্গেশনন্দিনী : প্রথম প্রকাশ যথাক্রমে ১৮৬১ ও ১৮৬৫), বাংলা পুস্তক ব্যবসায়ও তেমনই মাত্র দেড়শো বছরে সূতিকাগার থেকে নির্গত হয়ে একেবারে আধুনিকতম উৎপাদন ব্যবস্থার পর্যায়ে পরিণত।

এর মধ্যে ফুটপাতে পুরনো বই বিক্রির উদ্ভব করে, কিভাবে, কেন—এর ইতিহাস আমার জানা নেই। বইয়ের দোকানীদের মধ্যে কিছু কিংবদন্তী চালু আছে। তবে, তার ইতিহাসিক মূল্যই বা কি!

বস্তুত, কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে কতদিন আমার মনে হয়েছে বাংলা দেশে রেনেশাঁস কালচারের শ্রেষ্ঠ সুফল এই কলেজ-পাড়া এবং কলেজ-পাড়ার সব থেকে বড় বিস্ময় এই পুরনো বইয়ের দোকানগুলি।

হিন্দু কলেজ, ইয়ং বেঙ্গলদের গোলদিঘি সংস্কৃত কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজ, মাধববাবুর বাজার ভেঙে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ভবন, তারপর এ্যালবার্ট হল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট এবং অজস্র বইয়ের দোকান আর ছোট-বড় পাবলিক হল নিয়ে এই যে অঞ্চল—হয়তো ভবিষ্যতে এর চেহারা পালটাবে। হিন্দু স্কুল ভেঙে বাক্স ধাঁচের বাড়ি উঠেছে। এমন কি সেদিন শতাব্দীর অস্থি, সিনিটের ভগ্নস্তূপও নিলামে বিক্রি হল। গোলদিঘিতে বিদ্যাসাগরের প্রস্তরমূর্তি বিবর্ণ, বিষণ্ণ। কিন্তু আমি জানি এই অঞ্চলের ঐতিহ্য এবং গরিমা অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন, যতদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং আর বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীটের ফুটপাত আলপনার মতো অলংকৃত থাকবে দেশ-বিদেশের বইয়ে।

সে কি আজ? সেই যখন ঘোড়ার ট্রাম—

রুপোর ফ্রেমে বাঁধা পুরু চশমার কাঁচে বুড়োর হাসি ছলকে উঠল। কপালের রেখায় মাথার চুলের মতোই বয়েসের রঙ।

এ্যালবার্ট হলের দিকে আঙুল তুলে বলল, তখন এখানে বাড়ি ছিল না। সমস্ত জায়গাটা বাবুরা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন। আর সারি সারি পুরনো বইয়ের দোকান বসে গেল।

অবশ্য এ হল গবেষকের বিষয়। কবে এবং কিভাবে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে পুরনো বইয়ের ব্যবসা শুরু হল সে তথ্য উদ্ঘাটনের মধ্যে বাংলা দেশ, বিশেষ শহর কলকাতার কালচারের ওপর

নতুন আলোকপাত সম্ভব বলে মনে করি।

সেই বাঁধানো চত্বরে যখন একদিন এ্যালবার্ট হল উঠল, যখন পুরনো বইয়ের দোকানীরা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল--সেও কি আজকের কথা? আর কলেজ-পাড়া বদলাতে বদলাতে নামাবলীর মতো সর্বাঙ্গে ধারণ করল নতুন বইয়ের দোকান, হল বই-পাড়া। ফুটপাতেও স্কুল-কলেজের খাতা আর নতুন বইয়ের দোকান বসে গেল। কিন্তু সেই অকৃত্রিম ব্যবসাটি তবু উঠল না।

আমার বাপের ঠাকুর্দা—বুড়ো আবার গল্প শুরু করছিল। আমি তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করলুম, ও কে?

ফুটপাতে উবু হবে বসে পুরু একখানা বইয়ের মলাট লাগাচ্ছিল ছোট একটি ছেলে। মস্ত একটা কাঁচি দিয়ে ধারগুলো সমান করে কাটল। তারপর কলমের উল্টো পিঠ দোয়াতে ডুবিয়ে বড় বড় আর কাঁচা হরফে খুব যত্ন করে লিখল বঙ্গদর্সন। হেসে বললাম, বানান ভুল হল যে। ছেলেটি অপ্রস্তুত হয়ে বুড়োর দিকে তাকাল। বুড়ো বলল, আর বাবু! পাঁচ পুরুষে বইয়ের ব্যবসা, লেখাপড়া কিছু শিখিনি। এই তো আফসোস।

পুরুষানুক্রমে ব্যবসা। আর উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ অসামান্য দক্ষতা। বাংলা-সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থাটি বুঝবেন এদের বই সাজানোর ধরনে। পাঠক-রুচির হেরফেরের সঙ্গে কত বইকে পেছনের সারিতে যেতে দেখলাম আর কত বই সামনে চলে এল! তাছাড়া সহজাত অভিজ্ঞতায় ক্রেতার চেহারা দেখে, চাউনি দেখে বুঝে নেয়—কে কি দরের পাঠক। কোন্ বই তাকে কিনতেই হবে। ফলে খোলা বইয়ের বাজারে যে লেখক কোনোদিন বেস্টসেলার নন—এখানে হয়তো তাঁরই অসীম মূল্য। কোন্ বইয়ের সংস্করণ বর্তমানে ছাপা নেই, কোন্ বই নতুন সংস্করণে প্রচুর পাল্টে গিয়ে আগের সংস্করণকে মূল্যহীন করেছে, কোন্ বই নতুন সংস্করণে দাম বাড়িয়েছে যার ফলে পুরনো সংস্করণের মুদ্রিত মূল্য দেখে দরদস্তুর চলবে না, কোন্ বই গবেষক আর ছাত্রের পক্ষে অপরিহার্য, কোন্ বই 'রেয়ার' যার ফলে 'টাকায় এর দাম হয় না'—ইত্যাদি খবর এরা নিখুঁতভাবে জানে এবং শোনায়। আর বস্তুত, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যের ছাত্রের লাইট হাউস্ এই পুরনো বইয়ের দোকান। যে বই, যে পত্রিকা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বা সাহিত্য পরিষদের পাঠাগারে জীর্ণ হয়ে গেছে—হয়তো কাঁচা আর অপটু হস্তাক্ষরে ভুল বানানে লেখা মলাটে তা এখানকার কোন বইয়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রয়েছে।

আর শুধু কি তাই? বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশালয় থেকে আরম্ভ করে বটতলার প্রকাশনা পর্যন্ত যাবতীয় স্তরের যাবতীয় ধাঁচের বইও এখানে দেখবেন। সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী, যৌন তত্ত্ব, দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার বাঁধানো লট, লুপ্ত আর্ট ম্যানুয়াল, ঊনবিংশ শতাব্দীর অজস্র লেখকের বিস্মৃত গ্রন্থ, চালু সিনেমা পত্রিকা আর বিদগ্ধ মাসিকের শারদীয় সংখ্যা, কোনো দুর্গোৎসবের কর্মিটির চটি বিবরণী (যাতে মাত্র একটা রঙীন আর্ট প্লেট আছে), বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বর্ষ-সংকলন (যা ছাত্র ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারেন না), আর রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ-শাস্ত্র-ধর্ম বিষয়ক যাবতীয় গ্রন্থ, নক্ষত্র-বিদ্যা, কবিরাজি গ্রন্থ, টোট্কা চিকিৎসা-শাস্ত্র, লৌকিক, অলৌকিক আর ভৌতিক ও মানবিক নানা বিষয়ের অজস্র বই যা বাংলা দেশে ছাপা হয়েছে, ছাপা হয়—সবই দেখতে পাবেন এখানে।

আর আছে বিদেশী গ্রন্থ—প্রধানত ইংরেজী ভাষায়। সস্তা পকেট বুক থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত বনেদী সংস্করণ ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্য—সম্ভাব্য যে কোনো বিষয়ের বই।

বিদেশী বই সম্পর্কে এদের অভিজ্ঞতা একটু কম স্বীকার করতেই হবে। পুরনো বইয়ের দোকানের বনেদী খদ্দেররা ইংরেজি বইয়ের জন্য সাহেব-পাড়ায় যেতে বেশি অভ্যস্ত। ফলে এদের কাটতিও কম। তথাপি এ ক্ষেত্রেও একটা সহজাত ভূয়োদর্শনবলে এদের বড়-একটা ঠকতে দেখিনি। এক বিলিতী রোমান্টিক কবির প্রাচীন কাব্য সংকলন তিরিশ টাকায় আমার সামনে বিক্রি হল, যার দাম আমি তিন টাকার বেশি দিতে প্রস্তুত নই। যিনি কিনলেন তিনি আমাকে পরে বইয়ের ভেতর হাতে-লেখা একটি নাম দেখালেন, বইয়ের মালিকের নাম, যে হস্তাক্ষরটির জন্য অনেকে হয়তো তিনশো টাকাও দিতে চাইতেন।

কিন্তু তোমরা বই পাও কোথায়?

আমার প্রশ্নের উত্তরে বুড়ো হাসল। উত্তর দিতে ইতস্তত করছে স্পষ্ট বুঝলাম। লুঙ্গির খুঁট দিয়ে

গলাটা অকারণে মুছল। বলল, আপনারাই কেনেন, আপনারাই বেচেন।

তাতে আর কত বই হয়? এ তো তোমাদের লক্ষ বইয়ের কারবার?

হ্যাঁ, আছে। আরও পথ আছে। দালাল ঘোরে, খবর আনে অমুক বনেদী বাড়ির ভিতর ধ্বসে গেছে। সোনা-দানা পোশাক-আশাক ফার্ণিচার-ছবি একে একে বিক্রি হচ্ছে। এরা গিয়ে বাড়ির বহু মূল্যবান লাইব্রেরিটা অল্প দামে কিনে নেয়। একসঙ্গে একজনে এত টাকা ফেলতে না পারলে তিন-চার মালিকে যৌথভাবে ব্যবসায় নামে। এই বুড়ো আজ চল্লিশ বছরে কলকাতার কত কত পরিবারকে এইভাবে ভেঙে যেতে দেখেছে। কলকাতার ওঠা-নামার সাক্ষী এই কলেজ স্ট্রীট।

বুড়োর সেই অভিজ্ঞ কপালের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তার চোখে এক দার্শনিকের ভঙ্গি। আর মনে পড়ল এই পারিবারিক লাইব্রেরির বাঁধানো, সোনার জলে গৃহস্বামীর নাম-ঠিকানা লেখা কত বই দেখে কতবার আমি কলকাতার বনেদী সমাজের লুপ্ত চেহারা এই কলেজ স্ট্রীটে প্রত্যক্ষ করেছি।

শুধু কি বাড়ির লাইব্রেরি? কত ছোটখাট পাব্লিক লাইব্রেরি হঠাৎ গজিয়ে ওঠে আর হঠাৎ উঠে যায়। সেই বইও এখানে আসে।

আর আছে দপ্তরীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত। যে প্রকাশক দীর্ঘ দিন টাকা দিয়ে দপ্তরীর ঘর থেকে নিজের বই ছাড়াতে পারলেন না, দপ্তরী তার ফর্মা বেচে নিজের পয়সা উসুল করে। প্রায় জলের দরে সেই ফর্মা এদের হাতে পড়ে আর যেমন তেমন মলাটে ফুটপাতের শোভা বাড়ায়। কিংবা নতুন বই দপ্তরীই লট ধরে বেচে দেয়। তাছাড়া কিছু চালাক দপ্তরীও আছে যারা চালু বইয়ের দু-চারখানা সরিয়ে নিয়ে এদের হাতে দেয় এবং মালিককে বোঝায় প্রেস বই কম ছেপেছে।

আজকাল বাংলা বইয়ের কাটতি বেড়েছে। তিন দিন, সাত দিন বা এক মাসে সংস্করণ হচ্ছে। তার রহস্যও এরা জানে। যে বই আজ প্রথম বেরোবে, সেই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ (যার তারিখ ধরা যাক লেখা আছে আশ্বিন ১৩৬৮, যদিও মাসটা এখন আষাঢ়) সেই দিনই ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে। শুনে প্রকাশকের মাথায় হাত। সে এক তুমুল কাণ্ড!

কিন্তু পুরনো বইয়ের ব্যবসা পড়তির দিকে। আগে কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত অনেক দোকানে পুরনো বইয়ের রীতিমতো ব্যবসা ছিল। আজ সে সব ঘরে স্টেশনারী বা কাপড় বা জুতোর দোকান। সস্তা দামে চকচকে মলাটে আজ এত নতুন জনপ্রিয় বই পাওয়া যাচ্ছে, এত ধরনের, যে সাধারণ পাঠকদের বড় একটা অংশই কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাত থেকে বইয়ের দোকানে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছে। তাছাড়া নতুন বইয়ের ব্যবসায় অসীম নৈরাজ্য। অজস্র ছোটখাট প্রকাশক আজ হচ্ছে, কাল উঠে যাচ্ছে। অনেকে হয়তো কোনো বই চালাতে পারল না। কেউ কেউ লেখকের সঙ্গে চুক্তি করেছে প্রথম সংস্করণ এগারোশো ছাপাবে, ছাপল পাঁচ হাজার পাঁচশো। এদের সমস্ত বাড়তি বই সম্পূর্ণ নতুন কণ্ডিশানে এক-চতুর্থাংশ দামে কিনে নেবার মতো প্রকাশক-ব্যবসায়ীও আছেন। তাঁদের লোক ট্রেনে, গ্রামে, গঞ্জে ঘুরে ঘুরে আধা দামে সেই বই বেচে দিচ্ছে। এতে যেমন লেখকের সর্বনাশ, তেমনই সৎ প্রকাশকদের, আর তারই জের সামলাতে হচ্ছে এই নিরীহ ফুটপাত-আশ্রয়ীদের। তাছাড়া চিরকালই এদের সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বটতলা। আজকাল কলেজ স্ট্রীটে একেবারে এদের সামনে 'বটতলা' উঠে আসছে, এসেছে।

আমি সেই গোপন হৃৎপিণ্ড দেখেছি।

বহুকাল ভেবেছি ফুটপাতে রেলিংয়ে রোজ এই এত বই কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়? এই এত-গুলি লোকের গোপন ভাণ্ডার কলেজ স্ট্রীট কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?

হঠাৎ এক দিন তা আবিষ্কার করলাম। এ্যালবার্ট হলে ঢুকলেই দুটো দেয়ালে চোখ আটকে যায়। একটা দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে ফোটোর দোকানের বিজ্ঞাপন আছে। অন্য দেয়ালে অজস্র লেটার বক্স। দেয়াল দুটো সমান্তরাল ভাবে থাকায় ভেতরে ঢোকার এক স্বাভাবিক পথ আছে, তাতে কোনো দরজা নেই। সেই পথ পেরিয়ে অন্ধকার সরু বারান্দা, লম্বায় এই বিশাল বাড়িটার সমান। এই গোপন পথটুকুর খবর খুব অল্প লোকই রাখেন। কারণ কোনো দিনই কারো সে খবরে প্রয়োজন হয়নি।

সেই নিবিড় অন্ধকার গলিটায় পুরনো বই আর কাঁচা কফির জমাট গন্ধ। ডান দিকে বিশাল এক গুদাম ঘর, তাতে তাকে-তাকে বই সাজানো। তবু সব ধরে না। গলির মধ্যে দেয়াল ঘেঁষে অজস্র প্যাকিং কাঠের আলমারি বোঝাই বই। কিন্তু তাতেও সব ধরে না। গলির মধ্যে দেয়াল ঘেঁষে থরে থরে বই খোলা পথে এমনি পড়ে আছে। পৃথিবীর জ্ঞান, বাংলা দেশের সাধনাকে বুকে করে রেখেছে সেই অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, অন্ধকার, অপ্রশস্ত গলিটা।

আর আশ্চর্য এই যে, পুরনো বইয়ের সঙ্গে সেই আদি যুগ থেকে এ্যালবার্ট হলের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আজও অটুট, সকলের অজান্তে অটুট। এবং এই বিশাল বাড়িটার সমস্ত আলোর চাবিকাঠিও এই গলিতে। একেবারে শেষে বিরাট এক বোর্ডে অজস্র মেইন, ইলেকট্রিক কানেকশানের মেইন, সামনে দাঁড়ালে ভয় হয়, গা ছমছম করে। অন্ধকার, ঝুলে ভরা, পুরনো বই আর কাঁচা কফির জমাট গন্ধে নিথর সেই গলিটার এদিকে রাশি রাশি দেশ-বিদেশের পুরনো বই, ওদিকে গোটা বাড়ির সমস্ত ইলেকট্রিক আলোর মেইন সুইচ বোর্ড।

সিনেট হল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। হিন্দু কলেজের পুরনো বাড়ি গেছে। প্রেসিডেন্সীর মাঠেও নতুন বাড়ি উঠল। এখনও বাংলা দেশের রেনেশাঁসের সব গৌরব আর গ্লানি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে এই এ্যালবার্ট হল। অধুনা সেখানে কফির দোকান বসেছে। এর পেছনেও ইতিহাসের কোন্ অদৃশ্য ইঙ্গিত কাজ করছে জানি না।

তবু আমার অনুভবে পুরনো বই আর কফির গন্ধ মিলেমিশে আমার মনে মানব সভ্যতার দেশীয় ও আন্ত-র্জাতিক ঐতিহ্যের এক বিচিত্র স্বাদ আনে। আর তখনই বুঝি কিভাবে বদলাতে বদলাতে এ্যালবার্ট হল ও পুরনো বইয়ের দোকান আজও অটুট আছে।

কারণ অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হলেও সেই অন্ধকার একফালি গলি কলেজ স্ট্রীটের বুকে প্রত্যহ আলো জ্বালাচ্ছে, রক্ত প্রবাহিত করছে, হৃদস্পন্দন অক্ষুণ্ন রেখেছে।

তাই কলেজ স্ট্রীট আজও কলকাতার হৃদয়।

মনটা একদম খিঁচড়ে ছিল। পথ চলতে দিবাকরের পা উঠছে না, তবু অনেকখানি পথ এখনও ওকে চলতে হবে।

বৈশাখের দুপুর। যেমন অসহ্য গরম, তেমনি ঝাঁ ঝাঁ করছে কড়া রোদ—ছাতিতে সানায় না। দু'ধারে ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা। রাস্তার বেলে মাটি দুপুরের রোদে তেতে আগুন হয়ে উঠেছে, জুতোর তলা ফুঁড়ে তার তাপ পায়ের তলায় এসে লাগছে। গরম বাতাসের হলকা মাঠের উপর দিয়ে ছুটে এসে ঝলসে দিচ্ছে মুখ চোখ, জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে গায়ে। রাস্তার ধারে এখানে ওখানে দু একটা বাবলা গাছ। তাদের ছায়া নেই। ফাঁকা রাস্তা ফাঁকা মাঠ আর ফাঁকা আকাশ মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে দুপুরের রোদে।

কলকাতায় অভয় হালদার লেনে ওর কাকার বাসায় পিছনদিককার যে ঘুপসি ঘরটাতে ওর আস্তানা, সেই ঘরে ওর নড়বড়ে তক্তপোশের উপর গুটিয়ে-রাখা বিছানার উপর আড় হয়ে পড়ে কোনও গরমের দুপুরে দিবাকর অনায়াসে কল্পনা করতে পারত এই দুপুর, কল্পনা করে ভোগ করতে পারত এই দুপুরের রুদ্রতা, হয়তো আওড়াতেও পারত মনে মনে :

> রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে
> শুষ্কজল শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
> হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ—

সেই রুদ্র বৈশাখ আজ তার চোখের সামনে, কিন্তু তার রূপ নজরে পড়ল না দিবাকরের।

দু মাসের ছুটি তার শেষ হয়ে এসেছে। ছোট বোনের পাত্রের সন্ধানে দশ বার পনের মাইল হেঁটে হেঁটে কত গ্রাম ঘুরল এই দুমাস ধরে, কত লোককে গিয়ে ধরল, ধরনা দিল গিয়ে কত লোকের বাড়িতে। এইবার অনেক আশা করে, আশা নয় শুধু, একরকম স্থির-নিশ্চয় হয়েই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তার বড় বোনের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম, অনেকবার এসেছে এই গ্রামে এর আগে, পথঘাট লোকজন সবই চেনা-জানা। পাত্রপক্ষও। মেয়ে—দিবাকরের বোন তাদের দেখা, পছন্দও করা—

একটা গ্রামের মধ্যে এসে পড়ল দিবাকর। চাষাভূষোর গ্রাম। কয়েকখানা মাটির ঘর— কোনটার বেড়া দেওয়া রাস্তার দিকে, কোনটার নেই। বেড়ার গায়ে একখানা শাড়ি মেলে-দেওয়া, একখাবলা ছেঁড়া শাড়িটার একদিকে। একটা বাড়ির উঠানে পোঁতা বাঁশের ডগায় বসে একটা কাক, পথের উপর রোদ বাঁচিয়ে বসে একজন বাবলার গাঁড়ি চেঁচে গরুর গাড়ির ঝুরো তৈরি করছে। দিবাকরকে দেখে জিগেস করল, বাড়ি কুথায়? একটা কুকুর লম্বা জিব বার করে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। একটা ডোবা পড়ল পথের ধারে, তলায় সামান্য একটু ঘোলা জল। ডোবার খোলে নেবে দিবাকর ছাতির কাপড়টা ভিজিয়ে নিল। গ্রাম পেরিয়ে আবার মাঠ। কেটে-নেওয়া ধান গাছের, পাট গাছের খোঁচা খোঁচা গোড়ায় ভরতি, দিগন্ত পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ, ছায়াশূন্য রোদপোড়া মাঠ আর মাঠ। চোখ মেলে চাইতে পারে না দিবাকর, ঝিম ঝিম করে ওর মাথার মধ্যে।

যে বয়সে তরুণ মন হাল্কা মেঘের মতো ভেসে বেড়ায় নানা রঙের কল্পনা থেকে কল্পনায়, ডুবে থাকে সুন্দর স্বপ্নে, সেই বয়স দিবাকরের। কল্পনা নিশ্চয় ছিল, হয়তো স্বপ্নও ছিল কিছু, শুধু সময় ছিল না। গ্রামের মাইনার স্কুলের পড়া শেষ করে বাপ মা ছেড়ে গিয়ে উঠেছিল কলকাতায় তার উকিল কাকার বাসায়, পড়াশোনা করতে। চক্ষুলজ্জার দায়ে আশ্রয় মিলেছিল—অনেকটা অবাঞ্ছিতের অনধিকার প্রবেশের মতো। সেখানে তখন কাকির বাপের বাড়ির দিককার ডেপুটি মুনসেফ, প্রফেসার, ডাক্তার, উকিল আর বড় চাকরেদের ভিড়, তাদের আওতায় গরিব বাপের গেঁয়ো ছেলের দিন কেটেছে কোণঠাসা হয়ে, চোরের মত। সেই সব উন্নততর মানুষে পাড়াগেঁয়ে ছেলের মন টানল, আপন করল না। হয়তো বা খেয়ালই করেনি কেউ, একটা ছেলে আছে তাদের কাছাকাছি যার নাম দিবাকর। বছরের পর বছর কাটল। পড়াশোনা চলল কিন্তু মমতার অভাবে স্নেহলিপ্সু বালক-মন গেল শুকিয়ে কাঠ হয়ে। কাছছাড়া হয়ে বাপ মা গেল মন থেকে দূরে সরে, আর যাদের মাঝখানে দিন কাটল তারা রাখল তফাত করে। সকলের মাঝে থেকেও এই নিশঙ্ক তাই একলা। মন খুলবার কেউ নেই, জীবন তাই দিবাকরের কেবল মনে মনে।

সেই মন আজ একেবারে খিঁচড়ে গেছে। একটা প্রবল ধিক্কার তার সমস্ত মন বিষিয়ে তিতো করে দিয়েছে : এই মানুষ! তার কৈশোরের, তার প্রথম যৌবনের সব অবহেলা সত্ত্বেও যে বিশ্বাস ছিল জোর, সেই বিশ্বাসই যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ভরসা করার, আঁকড়ে ধরার মতো কিছু হাতড়ে পাচ্ছে না মনের মধ্যে। অনেক আশা করেছিল। কি প্রশান্ত কপাল! কি স্নেহ-মাখানো চোখের দৃষ্টি! কি সব মিষ্টি কথা! শ্বেতশ্মশ্রু শুভ্রকায় বৃদ্ধকে মনে হয়েছিল সেকালের ঋষি। একবার যদি বলেন এই বয়সে এতবড় গুরু দায়িত্বের বোঝা নিয়েছ ঘাড়ে, বইছ হাসিমুখে, এ যুগে এতো আদর্শ ছেলের কাজ। ধন্য মনে করব নিজেকে, পুত্রের বাপ হওয়া সার্থক মনে করব বাবা যদি আমার ছেলের এমনি দায়িত্ববোধ এমনি কর্তব্যজ্ঞান হয়। একটু পরেই বলেন, টাকাকড়িই কি বাবা সব? ও কেউ সঙ্গে করে আনেও না, নিয়েও যায় না কেউ সঙ্গে করে। আসল হচ্ছে এই—বলে নিজের বুকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, একদিন লাঠিঘাড়ে স্বদেশী করে বেড়িয়েছি গ্রামে গ্রামে ঘুরে, আজ সংসারে বদ্ধ হয়েছি বলে কি তোমার মতন ছেলেকে পীড়ন করব দর কষাকষি নিয়ে। তারপর দিবাকর যতবারই কথাটা পাড়তে গেছে বৃদ্ধ হেসে অভয় দিয়েছেন, কিছু ভেব না বাবা, কোনও কিছুতেই আটকাবে না......। কানে বাজছে এখনও কথাগুলো! ভড়ং? সবটাই মুখোশ? মানতে বাধা লাগে দিবাকরের মনে।

কখন অজানতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, হুঁস হতে নিশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলল, ম্যান লিভস টু লার্ন, সান্ত্বনা পেল না।

ছুটি ফুরতে দেরি নেই, ফুরলে গিয়ে উঠতে হবে কলকাতায় অভয় হাল-

দ্বার লেনে, কাকার বাসায়, সেখানে—আর একটা নিশ্বাস উঠে এল দিবাকরের বুকের তলা থেকে।

ওর পাশের খবর বেরলে ওর কাকা বলেছিল, এইবার চাকরির চেষ্টা কর এবং চেষ্টা করে চাকরি যখন ও পেল ওর কাকা তখন বলেছিল, ইচ্ছে করলে এখন এখানে থাকতেও পার, ইচ্ছে করলে আলাদা ব্যবস্থা করতেও পার। আলাদা ব্যবস্থা করা হয়ে ওঠেনি—কর্তব্যের খাতিরে ওর মারও অনিচ্ছে, হয়তো ভেজাল ছিল কিছু প্রাণের টানেরও। কাকার সংসারের একটেরে রয়েই গেছে দিবাকর, ওর জীবনের সমস্যা, ওর যা দায় সব ওর নিজের নিঃসঙ্গ মনের মধ্যে নিয়ে কাকার জগতের এককোণে আর একটা খণ্ড জগতের মতো।

ওকে দেখে ওর কাকা একবার জিজ্ঞাসা করবে, কি হল? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই নথিপত্রে মন দেবে। মর্মান্তিক কাকার এই চুপ করে যাওয়া, একটা অমোঘ অস্ত্র এ কাকার তূণের ওর নিজের কাছে ওকে ছোট করার। চুপ করে গিয়ে মুখ ফুটে বলার চেয়ে বেশি করে কাকা আর একবার বুঝিয়ে দেবে, কত কাজের লোক দিবাকর! সে যে পারল না তার হতাশার চেয়ে ওর কাকার সেই ব্যঙ্গ যে কত বেশি—

মাঠের উপর দিয়ে একটা দমকা বাতাস এসে দিবাকরের নাক মুখ গা ধুলোয় ধুলো করে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল। ঘামের উপর ধুলো লেগে সর্বাঙ্গ চিটপিট করে উঠল। থেমে ছাতিটা মুড়ে দু পায়ের মধ্যে চেপে ধরে কোঁচার কাপড়ে দিবাকর মুখ হাত মুছে ফেলল, তারপর ছাতি খুলে মাথায় দিয়ে আবার চলতে শুরু করল। পায়ে ফোসকা উঠেছে, জল পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে, শুকনো মুখের মধ্যে বালি গিয়ে দাঁতে লেগে কিচকিচ করছে, থুতু ফেলে, রুমাল দিয়ে মুছেও যাচ্ছে না। পথশ্রান্ত মনমরা দিবাকরের পথ চলতে পা আর ওঠে না।

তবু বাড়ি ফিরতে হবে, আর ফিরে গিয়ে ওর মাকে বলতেও হবে সব কথা। অনেক আশা করে আছে ওর মা, এত-দিনে নিষ্পত্তি হবে ভাবনার। যে কথা দিবাকর গিয়ে শোনাবে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে দিবাকর চোখের উপর, ছেলের মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারবে না ওর মা শুনে। নিষ্পত্তি না হওয়ার সমস্ত দায়িত্ব যেন ওর মার! নিশ্বাস ছেড়ে বলবে, আমার কপাল! ঐ টুকুই শুধু নয়। যত হাসি মুখেই করুক, যতই করুক দিবাকর, যেন কোনও ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে ওর মা টের পেয়েছে যে, সুখ নেই দিবাকরের এই কর্তব্য করায়। ছেলের এই নিরানন্দ কর্তব্য-সাধনের পালা যে সাঙ্গ হল না, চললই—মার ব্যথা লাগবে সেখানে। সে ব্যথা গুমরে বেড়াবে মার বুকের মধ্যে, শুধু বেড়ে যাবে ছেলের যত্নের মাত্রা আর কারণে অকারণে মেয়ে-টাকে বকা। বললে মা বোঝে না, নিজের ভাগ্যের দোষ দেখাবে, কিন্তু দুটো আতিশয্যের একটারও একতিল কমবে না। এর যে বেদনা, এর যে লজ্জা, তারই ভারে ক্লান্ত পা দুটো দিবাকরের অবশ করে তুলছে। কিন্তু অনেকখানি পথ বাকি এখনও, অনেকক্ষণ এখনও চলতে হবে দিবাকরকে।

চলতে হবে, চলছেও। চলছে আর একটা নিরুপায় অসহায়তায় তার মনটা কেবলি রী রী করছে। কেন জন্মেছিল তার বোনটা? কেনই বা সে নিজে জন্মে-ছিল? যদি ওরা ভাই বোনে নাই জন্মাত, যদি কোনও মানুষই না জন্মাত কোন-কালে, কি ক্ষতি হত? কোন অভাব ঘটত বিশ্ব সংসারের? কি উদ্দেশ্য এই মানুষ সৃষ্টির? এই জঘন্য নীচ নিরুপায় মানুষ সৃষ্টির। সেন্সলেস, আটারলি সেন্সলেস!

ঝোঁকে ঝোঁকে দিবাকরের পায়ের গতি বেড়ে গেল। কত পথ এসে ওর এক সময় খেয়াল হল, যেখান থেকে আর একটা পথ গিয়েছে তিন চার মাইল দূরে স্টীমারঘাটের দিকে সেই তেমাথার বুড়ো বটগাছটার কাছে এসে পৌঁচেছে। মানে, ওদের গ্রাম এখনও মাইল পাঁচেক, পড়ন্ত বটগাছটার নিচে অনেকখানি জায়গা রোদে লম্বা পাঁচ মাইল। দিবাকর থামল। জুড়ে ছায়া। ছায়ায় এসে ছাতিটা মুড়ে ঠেকনো করে দিবাকর দাঁড়াল।

কুথায় যেতি হবে?

বুড়ো মুসলমান একজন, দিবাকরের নজরে পড়ল এতক্ষণে, গামছা পেতে বট-গাছের তলায় শুয়ে। ফোকলা মুখ, শাদা দাড়ি গোঁফ, কোঁচকানো গায়ের চামড়া, খাটো টানা পরা। বাঁশের চটার পাঁচন একটা পাশে পড়ে। দিবাকর জানাল ওদের গ্রামের নাম।

যেয়্যানে, শুনে বুড়ো বললে, মুখ, চোখ রোদ্দুরে নাল হয়ে উঠেছে, জিরুয়ে ন্যাও কতক্ষণ গাছতলায় বসে।

বর্তে গেল দিবাকর—কত যেন আদর করে আপ্যায়ন করল আপনার জন কেউ। গিয়ে বসল শির-ওঠা গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। গল্পে গল্পে বুড়ো পরিচয় দিল নিজের। মাইল টাক দূরের গ্রামে বাড়ি। সংসার এখন ছেলেদের, তারাই দেখাশোনা করে। বুড়ো সকালে দুটো খেয়ে চলে আসে গরু ছাগল নিয়ে চরাতে মাঠে। দুপুরে তারা চরে বেড়ায়, বুড়ো এই গাছতলাটায় এসে শুয়ে থাকে। রোজই। পরিচয় শেষ করে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, গিইলে কুথায়?

দিবাকর বলল।

কি করতি?

দিবাকর সব বলল।

শুনে বুড়ো একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, তোমাগোর ভদ্দর নোকের ও তো চিরকালই রয়েছে। কতি লজ্জা করে, আমাগোর চাষাভুষোর মধ্যিও ঢুকেছে ঐ রোগ। হ্যাতো দিতি হবে, ত্যাতো দিতি হবে, চোখির পরদা নেই আর মানুষির।

বুড়ো চুপ করে গেল। বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে দিবাকরের দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। একটু পরে পা দুটো ছড়িয়ে দিল, ছাতার বাঁটটা গলায় বাধিয়ে বুকের উপর দুহাতের মুঠোয় সেটা ধরে ও একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙ্গল বেলা আর নেই তখন। চেয়ে দেখল, বুড়ো নেই, কখন উঠে গেছে। কোথা থেকে একটা পথের কুকুর এসে শুয়েছে খানিকটা তফাতে, শুয়ে শুয়ে মাছি তাড়াচ্ছে মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে লেজ নেড়ে। রোদ নেই আর, শেষ বিকেলের ছায়া নেমেছে পথের উপর, পথের ধারের মাঠে, মাঠের মধ্যে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের প্রকাণ্ড দীঘিটার জলের উপর। ছায়া পড়ে গভীর কালো জল দূরে থেকে আরও কালো দেখাচ্ছে। ওদিককার পাড়টা খানিকটা উঁচু, তার উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটা ছাগল। গরু চরছে মাঠের এখানে ওখানে, কোনটা মুখ তুলে এক একবার শান্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখছে। গামছাখানা মাথায় জড়িয়ে পাঁচন হাতে বুড়োটা গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে তার গরু-ছাগল। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে, ডগডগে লাল সূর্য। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বালি-হাঁস উড়ে গেল। মাঠের কাছে পথের ধারের ঘাসের উপর কাঠবিড়ালী বেড়াচ্ছে কতকগুলো। একটা থামকা ছুটে রাস্তা পেরিয়ে দিবাকরের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বারকতক চেয়ে দেখল ওকে, তারপর চট করে ফিরে ছুটে চলে গেল লেজ তুলে। ছোটবেলাকার দুহাত মেলে দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে খেলার মত একটা ঘূর্ণি হাওয়া পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে পথের উপর। ডাইনে ঝুঁকে পড়ে আঁচল দুলিয়ে একদল বউ মাটির কলসী কাঁখে গল্প করতে করতে গ্রামে ফিরছে দীঘি থেকে জল নিয়ে। একটা শুকনো বাঁশের পাতা কাঁপতে কাঁপতে বাতাসে ভেসে এসে একজনের মাথার কাপড়ে আটকে গেল......

চেয়ে চেয়ে দেখে খুশীতে দিবাকরের মন ভরে গেল। কি আশ্চর্য! কোথাও কোনও ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, জগৎ-সংসার জীবন যেন আনন্দময় অর্থ-পূর্ণতায় টলটল করছে।

দিবাকর উঠে পড়ে আবার চলতে শুরু করল।

প্রস্তুত হোন—
অদূরে শরতের
শোভাযাত্রা
মনে হতে পারে হাতে এখনও সময় আছে, কিন্তু আসলে তা নয়। হঠাৎ দেখবেন শরতের শোভাযাত্রায় আপনি পিছিয়ে পড়েছেন। সকলের আগে ছেলেমেয়েদের কথা। এদের সাজগোজেই উৎসবের শোভা। এদের জন্য চাই সরেস জুতো, ফ্যাশনমাফিক, মাপসই। এদের আজই নিয়ে আসুন বাটার দোকানে।
ট্রিম ৪.২৫—৫.২৫
ফ্যানসি ৫.৫০
চঞ্চল ৮.২৫—৯.৫০
চম্পা ৩.৭৫—৪.৭৫
মোকাসিন ৩.৫০—৪.২৫
৯.৫০—১৩.৫০
জ্যাকি ১১.২৫—১৫.৫০
ডলি ৫.৭৫—৯.৭৫
মনে রাখবেন, দিন যত বাড়ে, ভিড় তত বাড়ে। সুতরাং আসুন সকালের দিকে। সকালের বাজার —আরামের বাজার।
Bata

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

মহাবলীপুরম্

চিত্রগ্রহণ ও রচনা : শিশিরকুমার চৌধুরী
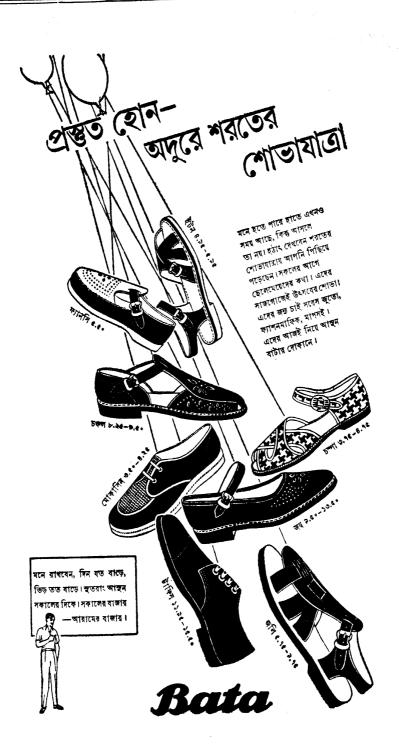
মন্দিরময় ভারতের সুন্দরতম মন্দির-গুলির মধ্যে মহাবলীপুরমের সৈকত মন্দির বা সোর টেম্পলের স্থান আছে কিনা, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু ভয়াল তরঙ্গলাঞ্ছিত বেলাভূমির শেষসীমানায় দাঁড়িয়ে গৌরবময় অতীত ইতিহাসের সাক্ষী এই প্রস্তর-দেউল যে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী সে বিষয় তর্কের অতীত।

সৈকত মন্দির মহাবলীপুরমের বিশেষ আকর্ষণ, কিন্তু একমাত্র নয়। পল্লব যুগের মনোলিথ শিল্পের সুন্দর-তম নিদর্শনগুলিও এখানেই রয়েছে। আরো আছে শিলাময় পর্বতগাত্রে ও গুহার অভ্যন্তরে অসংখ্য অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন। মহাবলীপুরমকে বাদ দিয়ে, ভারতদর্শন কখনও সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

মাসাধিককাল সরকারী কার্যব্যপদেশে আমরা মাদ্রাজ-প্রবাসী, অথচ মহাবলী-পুরম দর্শনের সৌভাগ্য থেকে আজও আমরা বঞ্চিত। সবুরে মেওয়া ফলবে এরূপ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও যেন ক্রমেই ফিকে হ'য়ে আসছিল। কর্তা মালানী-সাহেবেরই দিন স্থির করার কথা, কিন্তু বহুবার আশা দিয়েও পাকাপাকি দিন স্থির আজও তিনি করেননি।

অবশেষে আগস্টের শেষাশেষি মহাবলীপুরম যাত্রার দিন স্থির হলো, এবং অতি সাবধানী দু' একজন বন্ধুর ভবিষ্যৎবাণী 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই' ব্যর্থ করে, নির্দিষ্ট দিনেই আমরা মহাবলীপুরমের পথে পা বাড়ালাম।

মাদ্রাজ থেকে মহাবলীপুরমের দূরত্ব মাত্র ৫৩ মাইল। এই দূরত্ব অতিক্রম করার অনেক ব্যবস্থাই আছে, তবে বাসে ভ্রমণই সবচেয়ে সুবিধাজনক। বিশেষতঃ ছুটির দিনগুলোতে সরকারী বাসগুলি এ ব্যাপারে যাত্রীসাধারণকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকে।

আমরা সদলে যে বাসে মাদ্রাজ ছাড়লাম তার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা হয়েছিল। যদিও সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুরু করার কথা, তবুও চিরাচরিত ভারতীয় রীতিতে দেরি হ'ল যথেষ্টই।

রোমে থাকাকালীন রোমানদের মত আচরণই বিধেয়। এ কারণে কেউ যদি চীনে গিয়ে আরসোলা-চচ্চড়ি বা চট্টগ্রামে গিয়ে দেদার লঙ্কা গলাধঃকরণ করতে শুরু করেন তবে তাঁকে শ্রদ্ধাই জানাব, অনুসরণ করব না। কিন্তু মাদ্রাজের কৃষ্টি, নির্দোষ কফির বাটিতে। তাই মাইল ত্রিশেক চলার পর আমাদের মালানী-সাহেবের প্রাণটা যখন হঠাৎ 'কফি' 'কফি' করে উঠল, তখন আপত্তি উঠল না কোন তরফ থেকেই। ফলে পথের পাশের একটা রেঁস্তোরায় আমা-দের পায়ের ধুলো পড়ল এবং সময়ও নষ্ট হ'ল বেশ খানিকটা। অবিশ্যি লাভের ঘরটিও একেবারে শূন্য রইল না। লেবু-জাতীয় এক রকমের ক্লান্তিহর ফল এখানে সস্তায় প্রচুর সংগ্রহ করা গেল।

'কফি' তৃষ্ণার শান্তির পর আবার এগিয়ে চলার পালা। শুরুতে পথের দু'পাশে ছিল সবুজ ধানের আস্তরণ আর নারকেল গাছের সারি। এবার দৃশ্যপট ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে সবুজের সমারোহ কমছে। উঁকি দিচ্ছে রুক্ষ পাথুরে জমি। মাঝে মাঝে ক্যাশুরিণা বন বালিয়াড়ির বন্যতা ঢাকবার চেষ্টা করছে। কোথাও না থেমে বাস এসে পৌঁছল 'তিরুকালুকুণ্ডরম্'এ।

এই শহরেই, ছোট একটি পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে প্রসিদ্ধ দেবস্থান 'পক্ষী-তীর্থম্'। পাহাড়ের সানুদেশে সুদৃশ্য তোরণ ও প্রবেশদ্বার। ওপারে, উপরে উঠে-যাওয়ার সিঁড়ি। প্রবেশদ্বারে শুধু ক্যামেরা ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই দক্ষিণা দিতে হ'ল এক টাকা। প্রায় পাঁচশত উঁচু সিঁড়ি ভেঙে আমরা পর্বত-শীর্ষে উঠে এলাম।

যদিও একটি প্রাচীন শিবমন্দির এখানে রয়েছে, তবু পক্ষীতীর্থম্-এর প্রধান আকর্ষণ, চিল জাতীয় দুটি পক্ষী। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এ দুটি বহুদূর থেকে এসে পূজারীদের হাত থেকে আহার্য গ্রহণ করে। বহু ধর্মপ্রাণ নরনারী এই অলৌকিক দৃশ্য দেখবার জন্যে সে সময়ে এখানে সমাগত হন। পক্ষী দুটি অজর, অমর এবং শাপগ্রস্ত দেবতা বলে এখানে নানা কিংবদন্তী আছে। নাস্তিকের চোখে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই বুজরুকি। তাঁরা বলেন যে, আফিমের সাহায্যে দুটি পক্ষীকে বশীভূত করে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা খুব আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। মন্দির পার্শ্বে গুহার অভ্যন্তরে এক মৌনী সন্ন্যাসীকেও দেখা গেল। সাধুবাবা নিতান্তই আধুনিক। মনে হলো পরিবেশ সৃষ্টিই তাঁর সেখানে অবস্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য। পক্ষীতীর্থমের নৈসর্গিক দৃশ্য সুন্দর তবে সানুদেশে 'তিরুকালু-কুণ্ডরম্'-এর দৃশ্য আরো চমৎকার। অপেক্ষা করে পক্ষীদেবতাদের স্বাগতম জানাতে পারি এতটা সময় আমাদের হাতে ছিল না। তার ওপর মালানী-সাহেবের তাড়া। অতএব কিঞ্চিৎ ভিন্ন-পথে আবার নীচে নেবে এলাম। স্থানীয় একটি হোটেলে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের পালা সেরে নেয়া হ'ল। ঠিক বারোটায় আবার আমরা পথে নামলাম।

এবার রাস্তার দুধারে বালিয়াড়ি, ফণীমনসার ঝোপ আর ক্যাশুরিণার বন। মধ্যাহ্ন রোদ্রে চারিদিক উজ্জ্বল। বাতাসে সমুদ্রের সংকেত।

মহাবলীপুরমের সীমানায় পৌঁছু-লাম আধ ঘণ্টার মধ্যেই। পূর্ব-নির্দেশ-অনুযায়ী বাস সোজা এসে দাঁড়াল পঞ্চমনোলিথ মন্দির-সমষ্টির ধারে।

বহুদিন পূর্বে মনীষী এইচ. জি. ওয়েলসের একখানা বই পড়েছিলাম। নায়ক এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার

করেছেন, যাতে চেপে বসে একটা হাতল ঘোরালেই মুহূর্তে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেছনে ফেলে ভবিষ্যতের পৃথিবীতে পেশছে যাওয়া যায়।

ওয়েলস্-এর সেই কল্পনারই বাস্তব রূপ যেন দেখতে পেলাম বাস থেকে নেমে, অকস্মাৎ মনোলিথ সমষ্টির সম্মুখীন হ'তে। বিংশ শতাব্দীর রুদ্ধ আগল খুলে ইতিহাসের রাস্তা বেয়ে যেন মুহূর্তেই পেশছে গেলাম, হিন্দু সংস্কৃতির পরম গৌরবময় অধ্যায়ে। কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ধৈর্য ও শিল্প-বোধের পরিচয় এই মনোলিথ মন্দির-গুলি বহন করছে, ভাষায় তার বর্ণনা অসম্ভব।

তেরশত বৎসর পূর্বে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে পল্লব বংশীয় নরপতি প্রথম নরসিংহ বর্মণ (৬৩০-৭০) এগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। যতদূর জানা যায় এই মন্দির-সমষ্টিই ভারতের প্রথম মনোলিথ ভাস্কর্য। এই সমষ্টিতে রয়েছে পাঁচটি মন্দির, একটি হস্তী ও একটি সিংহের প্রতিমূর্তি। সব ক'টি মনোলিথেই একটি মাত্র পাথর কুঁদে বার করা। তদানীন্তন প্রথানুযায়ী এগুলোকে যুক্ত করা হয়েছে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর নামের সংগে। কোন ঐতিহাসিক তথ্য এই নামাকরণের পেছনে নেই। মন্দিরগুলো সাধারণতঃ রথ বলেই পরিচিত। যথা, 'ধর্মরাজ' বা 'যুধিষ্ঠির' রথ, ভীম রথ, অর্জুন রথ, নকুল-সহদেব রথ ও দ্রৌপদী রথ। ধর্মরাজ রথটি পঞ্চ-মন্দিরের মধ্যে প্রধান ও সুবৃহৎ। এই রথগাত্রে শিব-পার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটি অনেকের মতে পল্লব ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দ্রৌপদী রথটিও অসামান্য নারীসুলভ লালিত্যের অধিকারী।

চোখভরে ভাল করে সবকিছু দেখবার আগেই হুকুম এলো, এগিয়ে চল। বিশ্বের বিস্ময়—পাঁচটি রথ-দর্শন যাঁদের আধ ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হয় তাঁরা নমস্য। অতএব আমাদের রথও আবার সচল হ'লো।

খানিকটা এগিয়ে এসেই থামতে হ'লো। সামনে ছোট একটি পাহাড় পথ অবরোধ করেছে। চড়াই পায়ে-হে'টেই ভাঙতে হবে। বাস অন্য রাস্তায় গিয়ে, পাহাড়ের অপর দিকে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

এই পাহাড়ের গুহায় এবং শিলাময় গাত্রেই রয়েছে অসংখ্য কালজয়ী ভাস্কর্য। এগুলির মধ্যে প্রধান অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত, পঞ্চপাণ্ডব মণ্ডপ, কোনেরি মণ্ডপ, রামানুজ মণ্ডপ, কৃষ্ণ মণ্ডপ, কোটিকাল মণ্ডপ, মহিষমর্দিনী গুহা, বরাহ গুহাদ্বয়, ত্রিমূর্তি গুহা, রেয়ালা গোপুরম্, ওলাক্কানাথ মন্দির ইত্যাদি। প্রথম উল্লিখিত 'অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত' শুধু মহাবলীপুরমেরই নয়, পর্বতগাত্রে খোদিত ভারতীয় ভাস্কর্যের সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেব দেবী, চন্দ্র সূর্য, কিন্নর অপ্সরা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, সর্প, হস্তী মার্জার ইত্যাদির কতশত প্রতিকৃতি যে এই বিরাট কল্পনায় স্থান পেয়েছে, তা বলা দুঃসাধ্য। মহাভারতের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা, অর্জুনের তপস্যা ও মহাদেবের বরে পাশুপত অস্ত্রলাভই এই দৃশ্যাবলীর বিষয়বস্তু। কিন্তু কিরাতার্জুনের দ্বন্দ্বের কোন দৃশ্য নেই বলে অনেকে একে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের আখ্যায়িকা বলেও মনে করেন। এই রচনাবলীর মধ্যে শিশুসহ হস্তী-মাতার যে একটি প্রতিকৃতি রয়েছে তা সত্যিই অপরূপ। কতখানি শক্তির অধিকারী হ'লে এরূপ রচনা সম্ভব, সে কথা চিন্তা করে সেই অজানা শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হ'য়ে আসে।

মহাবলীপুরমে একটি সরকারী ভাস্কর্য বিদ্যালয় আছে। সেখানকার অনেক শিল্পীই এই হস্তীমাতার প্রতিকৃতিটির অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসল ও নকলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মহাবলীপুরমের পরবর্তী দর্শনীয় মহিষমর্দিনী গুহা। এই গুহার অভ্যন্তরে রয়েছে বৃহৎ লম্বা একটি হল ঘর। হলের দু'পাশের দেওয়ালে দুটি লম্বা প্যানেল, তার একটিতে অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণু, অপরটিতে মহিষ মর্দিনী রূপিনী অষ্টভূজা দেবী দুর্গা। ইলোরার মহিষমর্দিনীর সঙ্গে এই রচনার বিশেষ মিল আছে। দুটি প্যানেলই অসাধারণ সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ মণ্ডপের শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ আর একটি অসাধারণ রচনা। ইলোরাতেও এই দৃশ্য আছে। কিন্তু তুলনায় মহাবলীপুরম্-ই শ্রেষ্ঠতর। এই গুহার পাথর কিঞ্চিৎ কোমল ও শ্বেতাভ।

বরাহ গুহাদ্বয়ও মহাবলীপুরমের বিশেষ আকর্ষণ। প্রথম গুহার রচনা বরাহ অবতার, গজলক্ষ্মী ও মহিষীগণ-সহ পল্লব বংশীয় নৃপতিদ্বয়ের আলেখ্য উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় গুহার রচনাবলী প্রথম অপেক্ষা উন্নততর। বরাহ অবতার, গজলক্ষ্মী, চতুর্ভুজা দুর্গা, বলি নিধন ইত্যাদি রচনার প্রতিটিই বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

'শ্রীকৃষ্ণের মাখনের গোলা' বলে পরিচিত অনেকগুলি বৃহদাকার গোল পাথর একস্থানে ছড়িয়ে আছে। এরূপ স্থানে পাথরগুলোর অবস্থিতি সত্যিই একটু বিস্ময়জনক।

মহাবলীপুরমের আরো বহু আকর্ষণ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে যা আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ দেখা সেদিন অসম্ভব ছিল। অশেষ অতৃপ্তি নিয়েই পাহাড়ের অপর ধারে আবার বাসে চাপলাম। গন্তব্যস্থল, সৈকত মন্দির বা সোর টেম্পল।

মহাবলীপুরমের অন্য নাম 'সেভেন প্যাগোডাস্' বা 'সপ্ত প্যাগোডা'। এই নাম এদেশে প্রথমাগত ইউরোপীয়গণ কর্তৃক আরোপিত বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ তখনও বর্তমান 'সৈকত মন্দিরের' পাশে আরো ছ'টি মন্দির ছিল, যা প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী

ধর্মরাজ রথ

সৈকত মন্দির

হারিয়ে গেছে গত কয়েক শত বৎসর পূর্বে সমুদ্রগর্ভে।

মহাবলীপুরম সপ্তম শতাব্দীতে পল্লব সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর ও নৌঘাঁটি ছিল। বস্তুতঃ পল্লব নরপতি প্রথম নরসিংহ বর্মণের উপাধি 'মামল্লা'ই মহাবলীপুরম্ নামের উৎস। 'মামল্লাপুরম্' কালক্রমে মহাবলীপুরমে রূপান্তরিত হয়েছে। 'সেভেন প্যাগোডাস' নামকরণ সম্ভবতঃ সৈকত মন্দিরের স্থাপত্যের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা-স্থাপত্যের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকার জন্যেই হ'য়ে থাকবে।

সোর টেম্পলের পূর্ব অলিন্দে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অবিরাম গর্জন শুনছিলাম, আর দেখছিলাম বঙ্গোপসাগরের ঐরাবত-সদৃশ বিশাল তরঙ্গমালা উন্মত্ত ক্ষুধা নিয়ে এগিয়ে আসছে। পর পর ছ'টি মন্দিরকে গ্রাস করেও রাক্ষুসীর খিদে মেটেনি, তাই সফেন দংষ্ট্রা মেলে সপ্তমটিকেও সে গ্রাস করতে চায়। সাগরের এই কীর্তিনাশা রূপ দেখতে দেখতে তামিলনাদের ১৩শত বৎসর পূর্বের ইতিহাস যেন চোখের সামনে

ভেসে উঠল। মনে পড়লো পল্লববীর মহারাজা প্রথম নরসিংহ বর্মণের কথা, যাঁর অমিত শৌর্যের কাছে মহাবীর পুলকেশীও পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, যাঁর বন্ধুপ্রীতির ফলে সিংহলরাজ তাঁর সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন, যাঁর দুর্দম অজেয় নৌ-বাহিনী হিন্দু-সংস্কৃতির আলো পৌঁছে দিয়েছিল দিকে দিকে, নিকট ও সুদূর প্রাচ্যে, অসংখ্য ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-সমূহে।

সুপ্রাচীন এই কীর্তিকে সমুদ্রগ্রাস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বেলাভূমিতে আজ গড়ে তোলা হয়েছে সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর যা না থাকলে ঢেউ এসে সোজাসুজি আঘাত করতো মন্দির-গাত্রে। বাধা পেয়ে সমুদ্র গর্জে ফুঁসে উঠছে, আর উৎক্ষিপ্ত জলরাশি থেকে লবণাক্ত বাষ্পজাল ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। মন্দিরের ক্ষয়িষ্ণু প্রস্তরগাত্র দেখলে বুঝতে পারা যায়, এই লবণাক্ত বাষ্প-জালের বিধ্বংসী ক্ষমতাও কিছু কম নয়।

মহাকালের রথের গতিকে পাথরের বাঁধে রোধ করা যাবে কি?

"নকুল সহদেব রথ"—পাশে মনোলিথ হাতী

শ্রীকৃষ্ণের মাখনের গোলা

অয়স্কান্ত

॥ পাভলভ ও মনোবিজ্ঞান ॥

ইতিপূর্বে রক্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পাভলভের কথা উঠেছিল। কথা ছিল, পাভলভের যুগান্তকারী গবেষণা কন্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌ সম্পর্কে ভবিষ্যতের কোনো সংখ্যায় আলোচনা তোলা হবে। ইতিমধ্যে কলকাতার পাভলভ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমাদের হাতে এসেছে। পত্রিকাটির নাম 'মানব-মন'। সম্পাদকীয় ভূমিকায় বলা হয়েছে, "এই পারমাণবিক যুগে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষের জানা প্রয়োজন—সে কি ও কেমন। লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করার ফলে, একসঙ্গে বাস করার ফলে, তার মধ্যে যে সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও ভালবাসার উন্মেষ হয়েছে—তার প্রভাব কতখানি তা জানা দরকার—বৈজ্ঞানিক আলোচনার মাধ্যমে। অন্ধ পাশব কামনা-বাসনা, না মানবিক সদ্‌গুণ—কোনটি বেশী শক্তি-শালী তার বোঝা দরকার। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের সূত্র ও তথ্যাবলীর সঙ্গে তার আশু পরিচয় অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে পাভলভ ইনস্টিটিউটের সভ্যগণের এই প্রচেষ্টা—'মানব-মন'-এর প্রকাশন। সকল মানুষের সহযোগিতা ও সহানুভূতি আমাদের কাম্য ও পাথেয়।" বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা-ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করাটা কিছুকাল আগেও নিশ্চয়ই দুঃসাহস বলে মনে হত। কিন্তু হালের বাঙালী পাঠকরা এই প্রমাণ যথেষ্ট দিয়েছেন যে পাঠক হিসেবে তাঁরা খুবই সিরিয়াস। কাজেই, আশা করা চলে, 'মানব-মন'ও পাঠক-মহলে সমাদৃত হবে। আমরাও পাভলভ ইনস্টি-টিউটের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই উপলক্ষে পাভলভ সম্পর্কে আমাদের প্রতিশ্রুত আলোচনা তুলছি।

বহুকাল পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল যে এই জগৎ-সংসারের কেন্দ্রে রয়েছে সে। তাকে ঘিরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু আয়োজন। সমস্ত ব্যাপারে তারই প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা।

পর-পর তিনটি আঘাত মানুষকে এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বিচ্যুত করেছে।

প্রথম আঘাত কোপারনিকাসের তত্ত্ব। মানুষের ধারণা ছিল যে পৃথিবীর অবস্থান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে। পৃথিবীকে ঘিরেই সূর্য-গ্রহ-তারার আবর্তন। কোপারনিকাসের তত্ত্ব জানি-য়েছে যে পৃথিবী হচ্ছে আমাদের এই সূর্যের একটি গ্রহ মাত্র—তাও নিতান্তই মাঝারি আকারের। আবার এই সূর্যও নিতান্তই একটি তারা—তাও মাঝারি আকারের। সূর্যের মতো কোটি কোটি তারা নিয়ে আমাদের এই ছায়াপথ, বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় গ্যালাক্‌সি। এমনি কয়েক লক্ষ গ্যালাক্‌সি নিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব। অসীমের কাছ-ঘেঁষা এই মহাবিশ্বে পৃথিবী নিতান্তই তুচ্ছ, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

দ্বিতীয় আঘাত ডারউইনের ক্রম-বিকাশ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব জানিয়েছে যে জীব হিসেবেও মানুষের অস্তিত্ব অলৌ-কিক কোনো ব্যাপার নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন ও ক্রমবিকাশের পথেই মানুষের জন্ম এবং গোরিলা শিম্পাঞ্জী ওরাং-ওটাং জাতীয় জীবরা মানুষেরই জ্ঞাতি-ভাই। এই তত্ত্ব মানুষকে স্বরচিত স্বর্গ থেকে টেনে নামিয়েছে।

এবং তৃতীয় আঘাত পাভলভের কন্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌। এই তত্ত্ব জানি-য়েছে যে মানুষের আবেগ অনুভূতি ও জৈবিক ক্রিয়াকাণ্ড বিশেষ কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। মানুষ প্রায় একটা যন্ত্রের সামিল। মানুষের যে-মনকে এত-দিন সর্বনিয়ন্তা বলে মনে করা হত সেই মনকেও আসলে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। আর এই মস্তিষ্ক হচ্ছে পুরোপুরি একটি বাস্তব পদার্থ এবং অন্যান্য বাস্তব পদার্থের মতো এই পদার্থটিও পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপরে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার সূত্রগুলোকেই পাভ-লভের যুগান্তকারী গবেষণা কন্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌ ব্যাখ্যা করেছে, যা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন।

॥ কন্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌ ॥

অন্যান্য অনেক বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতো কন্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌-এর তত্ত্বটিও খুবই সহজ ও সরল। এতই সহজ ও সরল যে পাভলভ সম্পর্কে জর্জ বার্ণার্ড শ' মন্তব্য করেছিলেন—লোকটা একটা শার্লাট্যান। বাংলায় বলা যেতে পারে মহা-চালবাজ। জর্জ বার্ণার্ড শ' হয়তো এই কারণে মন্তব্যটি করেছিলেন যে কন্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌-এর ব্যাপারটি এতই সহজ ও সরল যে তা নিয়ে আবার কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না। আর বিষয়টি একেবারেই নতুন নয়। এমন কি সার্কাসের ট্রেনাররাও যে-পদ্ধতিতে জন্তুজানোয়ার-দের ট্রেনিং দেয় তাও কন্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌।

অবশ্য এ-ধরণের যুক্তির আশ্রয় নিলে পৃথিবীর অনেক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই বাতিল হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের উল্লেখ করা চলে। কে না জানত যে আপেলফলের বোঁটা খসলে ফলটি মাটিতেই পড়বে। কিন্তু এই রোজকার জানা ঘটনাকেই নিউটন যখন বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন তখন বোঝা গেল যে এই সামান্য ঘটনার মধ্যে কত অসামান্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিহিত ছিল।

পাভলভের মূল এক্‌স্‌পেরিমেন্টটি নিশ্চয়ই সকলেরই জানা। সেই কুকুর আর ঘণ্টাধ্বনি আর মাংসের টুকরো। একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে একটি ঘরে আনা হল, যে-ঘরে বাইরে থেকে কোনো আওয়াজ ঢুকতে পারে না। গবেষক নিজেও রই-লেন ঘরের বাইরে। এই কুকুরটির স্যালিভারি ডাক্‌ট্‌ বা লালা নিঃসরণ গ্রন্থিতে অপারেশন করে আগেই একটি কাচের ফানেল লাগানো হয়েছে আর এই ফানেলের সঙ্গে লাগানো হয়েছে রবারের টিউব। টিউবের অন্য প্রান্ত ঘরের বাইরে। কাজেই গবেষক ঘরের বাইরে থেকেই টের পেতে পারেন কুকুরের লালা-গ্রন্থি থেকে কি পরিমাণ লালা বেরিয়ে আসছে। আর গবেষক যদিও কুকুরটিকে পর্যবেক্ষণ করছেন কিন্তু কুকুরটি গবেষককে দেখতে

পাচ্ছে না। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে এমন একটি অবস্থা তৈরি করা হয়েছে যাতে কুকুরের পক্ষে উদ্দীপনার অন্য কোনো কারণ ঘটতে না পারে।

এই গেল প্রস্তুতি। এবারে আসল পরীক্ষাকার্য। ঢং করে ঘণ্টা বাজানো হল। আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মুখের সামনে ধরা হল মাংসের টুকরো। এই খাবার দেখে ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখ থেকে লালা ঝরা উচিত। ঝরেও। কিন্তু কাচের ফানেল ও রবারের টিউবের মধ্যে দিয়ে সেই লালা গিয়ে জড়ো হয় বাইরের একটা পাত্রে। গবেষক বুঝতে পারেন কি-পরিমাণ লালা ঝরছে। এই ব্যাপারটাকেই একবার নয়, দুবার নয়, বারবার ঘটানো হয়। তারপরে এক সময়ে লক্ষ্য করা যাবে যে ঘণ্টাধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মুখ থেকে লালা ঝরতে শুরু করেছে।

এই ছিল পাভলভের আদি এক্স্‌পেরিমেণ্ট। এবং এরই ভিত্তিতে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা কণ্ডিশনড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌। এই ইংরেজি কথাটার বাংলা করা হয়েছে শর্তাধীন পরাবর্ত। ব্যাপারটাকে ভালোভাবে বোঝা দরকার।

গোড়ায় কয়েকটি সংজ্ঞা জেনে নিতে হবে। কুকুরটির সামনে দুটি উদ্দীপককে প্রায় একই সঙ্গে হাজির করা হচ্ছে। একটি ঘণ্টাধ্বনি; অপরটি মাংসের টুকরো। এই ঘণ্টাধ্বনিকে বলা হয় কণ্ডিশনড্‌ স্টিমুলাস বা শর্তাধীন উদ্দীপক। মাংসের টুকরোকে বলা হয় আনকণ্ডিশনড্‌ স্টিমুলাস বা শর্তহীন উদ্দীপক। সাধারণ বুদ্ধিতেই আমরা বুঝি যে মাংসের টুকরো কুকুরের পক্ষে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো অবস্থাতেই উদ্দীপক হতে পারে। এই কারণেই এই উদ্দীপকটিকে বলা হয়েছে শর্তহীন। আর ঘণ্টাধ্বনি এমনিতে কোনো কুকুরের মুখ থেকেই লালা ঝরাতে পারবে না। কিন্তু বেশ কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই যদি কুকুরের মুখের সামনে খাবার তুলে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে শুধু ঘণ্টাধ্বনিতেও কুকুরের মুখ থেকে লালা ঝরছে। অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনিকে যদি উদ্দীপক হতে হয় তাহলে একটি শর্ত পালিত হওয়া দরকার। এই কারণেই ঘণ্টাধ্বনিকে বলা হয়েছে শর্তাধীন বা কণ্ডিশনড উদ্দীপক। আর এই শর্তাধীন উদ্দীপক কুকুরের মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই নাম কণ্ডিশনড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌। এই নামকরণ কেন তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বোঝা গিয়েছে। কোনো কিছু ফিরিয়ে দেওয়াকেই বলা হয় রিফ্লেক্‌স্‌। শারীরবিদ্যায় এই শব্দটির সাহায্যে এমন সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বোঝানো হয় যা কোনো কিছুর জবাবে ফিরিয়ে দেওয়া। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। চোখে বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগলে আমরা চোখের পাতা বন্ধ করি। এখানে বুঝতেই পারা যাচ্ছে যে বাতাসের ঝাপ্‌টা হচ্ছে উদ্দীপক এবং শর্তহীন উদ্দীপক। এই শর্তহীন উদ্দীপকের জবাবে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী এমন একটা কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছে যার ফলে চোখের পাতা বন্ধ হওয়া। অতএব চোখের পাতা বন্ধ হওয়াটা হচ্ছে একটি রিফ্লেক্‌স্‌। কিন্তু এই রিফ্লেক্‌স্‌ কি কণ্ডিশনড্‌ বা শর্তাধীন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ যে-কোনো সময়ে যে-কোনো অবস্থাতেই চোখে বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগুক না কেন চোখের পাতা বন্ধ হবেই।

কিন্তু ইচ্ছে করলে এই চোখের পাতা বন্ধ হওয়া রূপ রিফ্লেক্‌স্‌টিকেও শর্তাধীন বা কণ্ডিশনড্‌ করে তোলা যায়। অবশ্যই একটি পরীক্ষাকার্যের মধ্যে দিয়ে। ব্যবস্থাটি হবে এই ধরণের: একজন মানুষের কানে ইয়ারফোন লাগানো হবে আর চোখে বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগাবার ব্যবস্থা। এই ইয়ারফোনের সাহায্যে কানে শব্দ করা হবে আর পরক্ষণেই চোখে বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগবে। বেশ কয়েকবার এ-ব্যাপারটা ঘটাবার পরে দেখা যাবে, বাতাসের ঝাপ্‌টা না থাকা সত্ত্বেও কানে শব্দ হবার সঙ্গে

সঙ্গেই মানুষটির চোখের পাতা বন্ধ হচ্ছে। এক্ষেত্রে চোখের পাতা বন্ধ হবার ব্যাপারটি শুধু রিফ্লেক্‌স্ নয়, শর্তাধীন বা কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রিফ্লেক্‌স্ দু-ধরনের হতে পারে। শর্তহীন বা আন্‌-কন্ডিশন্‌ড্ এবং শর্তাধীন বা কন্ডিশন্‌ড্। আন্‌কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্ যে-কোনো সময়ে একই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন, চোখে বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগলে আমরা চোখ বন্ধ করি, হাতে ছ্যাঁকা লাগলে আমরা উত্তাপ থেকে হাত সরিয়ে নিই, ইত্যাদি। কিন্তু কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌সের জন্যে কতকগুলো শর্ত যথাযথ ভাবে পালিত হওয়া দরকার।

আবার, কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্ একবার তৈরি হয়ে যাবার পরে চিরকালই টিকে থাকে এমন কোনো কথা নেই। তবে সহজে যাবার নয়। ঘন্টাধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের লালা ঝরবে একথা ঠিক। কিন্তু তারপরেও যদি কুকুরের সামনে খাবার হাজির না হয়, এবং এ-ব্যাপারটা যদি প্রতিবারেই চলতে থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে লালার পরিমাণ কমতে কমতে শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থাৎ যে কন্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্‌স্‌টি তৈরি হয়েছিল তা লোপ পেল। এখানেও একটি কথা আছে। প্রথম বার লোপ পাবার পরেই যে চিরকালের মতো লোপ পাবে—তা নাও হতে পারে। পরবর্তী কালে হয়তো দেখা যাবে, ঘন্টাধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মধ্যে আবার উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এবারেও যদি খাবার হাজির না হয় তাহলে এই উদ্দীপনা হবে খুবই ক্ষণস্থায়ী। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়ায় এই যে কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্ একবার তৈরি হয়ে যাবার পরে তার রেশ বহুদিন পর্যন্ত থেকে যায়।

এবারে একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের সমস্ত আবেগ ও অনুভূতির মূলে রয়েছে এই কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্। একই জিনিস দেখে কারও ভালো লাগছে, কারও খারাপ লাগছে—এ-ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে এতদিন পর্যন্ত নানা উদ্ভট তত্ত্ব হাজির করা হত। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই শেষ পর্যন্ত টিকত না। এখন কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্-এর তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করে দেখা যাচ্ছে যে একই জিনিস দেখে কারও ভালো-লাগা বা কারও খারাপ-লাগার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। যেমন ধরা যাক নীল রঙ, যা নিয়ে আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম। একই রঙ নীল, কিন্তু কেউ সেটাকে পছন্দ করে, কেউ করে না। এক্ষেত্রে নীল রঙটি হচ্ছে কন্ডিশন্‌ড্ স্টিম্যুলাস বা শর্তাধীন উদ্দীপক। আর ভালো-লাগাটা বা খারাপ-লাগাটা হচ্ছে কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্। এই কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্ কেন একক্ষেত্রে ভালো-লাগার অনুভূতি আর কেনই বা অপরক্ষেত্রে খারাপ-লাগার অনুভূতি তা নিশ্চয়ই অনুমান করা চলে।

আবার এই রিফ্লেক্‌স্‌টি কন্ডিশন্‌ড্ বলেই চিরস্থায়ী নয়। তা লোপ পেতে পারে বা পাল্‌টে যেতে পারে। এই কারণেই মানুষের পছন্দ বদলায়, রুচি বদলায়, আদবকায়দা বদলায়। কথাগুলো শুনতে যতোই সহজ হোক কিন্তু এর তাৎপর্য খুবই গভীর। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, এই কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্-এর মাধ্যমেই পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে জীবজগৎ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে আবার আমাদের আলোচনা তুলতে হবে। কারণ এই বিষয়টির সঙ্গে আরো বহু বিষয় জড়িত। কিন্তু কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্ সম্পর্কে মূল ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা থাকলে পরবর্তী সমস্ত আলোচনাই অর্থহীন মনে হবে। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্যে আরো দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই সংখ্যার আলোচনা শেষ করছি।

একটি বড়ো কাচের পাত্রে জল রয়েছে। পাত্রটির মাঝ-বরাবর আরেক খন্ড কাচ বসিয়ে পাত্রটিকে দু-ভাগে ভাগ করা হল। এবারে একভাগে রাখা হল বোয়াল মাছ, আরেক ভাগে কুচো চিংড়ি। এক্ষেত্রে চিংড়ি শর্তহীন উদ্দীপক, কাজেই চিংড়িকে দেখা মাত্রই বোয়াল খাবার জন্যে ছুটে আসবে। কিন্তু মাঝখানে রয়েছে কাচ। কাজেই বোয়ালকে সেই কাচে গুঁতো খেতে হবে। এমনি চলুক কিছুকাল ধরে। বোয়াল মাছকে হাজার লক্ষ বার গুঁতো খেতে হোক। তারপরে একসময়ে দেখা যাবে, চিংড়ি দেখার পরেও বোয়াল আর ছুটে আসছে না। অর্থাৎ, যে-বোয়াল আগে চিংড়ি দেখলেই খাবার জন্যে ছুটে আসত—যা ছিল তার ক্ষেত্রে আন্‌কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্—সেই বোয়ালই এখন চিংড়ি দেখার পরেও নির্বিকার—যা এক্ষেত্রে কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্। কাচের গায়ে গুঁতো খাওয়া—এই কন্ডিশন্‌ড্ স্টিম্যুলাস একটি আ ন্‌ ক ন্ডি শ ন্‌ ড্ রিফ্লেক্‌স্‌কে বিশেষ একটি কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্-এ পরিণত করেছে।

একটি ছেলে খরগোশ দেখলেই ভয় পায়। এক্ষেত্রে খরগোশ কন্ডিশন্‌ড্ স্টিম্যুলাস আর ভয়-পাওয়াটা কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্। এবারে ছেলেটির হাতে এক খন্ড চকোলেট দেওয়া হল আর খরগোশটিকে রাখা হল অনেকটা দূরে। দেখা যাবে ছেলেটি এবারে যেন একটু কম ভয় পেয়েছে। এ-ব্যাপারটা চলতে থাকুক। ছেলেটি দিনের পর দিন চকোলেট খাক আর খরগোশটি একটু একটু করে কাছে আসুক। শেষকালে দেখা যাবে, খরগোশটি ছেলেটির প্রায় কোলের কাছে এসে বসেছে তবুও ছেলেটি ভয় পাচ্ছে না। কন্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্‌স্-এর ব্যাপার যদি বুঝতে পারা গিয়ে থাকে তাহলে এ-ব্যাপারটি কেন ঘটল তাও নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হবে না।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ আঠার ॥
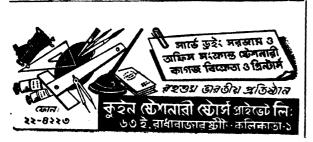
আমাকে বোধ হয় ভূতে পেয়েছিল। তা নৈলে—যার আকিঞ্চনে আমার এখানে থাকা, তাকে অমন নিষ্ঠুর আক্রমণ করব কেন? হেনা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমার যেন চমক ভাঙ্গল। যে-কঠিন কথাগুলো তাকে আড়ালে বললে মানিয়ে যেত,—সর্বসমক্ষে সে-কথাগুলি তার পক্ষে অসম্মানজনক হচ্ছে, এটি আমার চোখ এড়িয়ে গেছে।

কৌতুকের বিষয় এই, সম্প্রতি সর্বসম্মতিক্রমে আমি হয়ে উঠেছি সংকেতগড় প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা। সম্ভবত সমস্ত ক্ষমতাটা লাভ করার ফলেই আমার মধ্যে কতকটা উগ্র আত্মাভিমানের জন্ম হয়ে থাকবে। আমার ক্ষমতাই হয়ত আমার এই ঔদ্ধত্য এনেছে! নিজেকে আমি ধিক্কার দিচ্ছিলুম।

মাত্র কিছুদিন আগে মহারাজার সভাপতিত্বে সংকেতগড়ের লোকেরা এক সভা ডেকে আমার গলায় মালা দিয়েছিল। সেই সভায় বলেছিলুম, সংকেতগড়কে সৃষ্টি করেছেন তিনজন—শ্রীমতী হেনা, মণিপ্রসাদ এবং এই সভার সভাপতি। আমি এখানকার একজন সেবক মাত্র।

কথাটা আমার শুধু বিনয়ভাষণ ছিল না, সত্য ছিল। আমি হেনার হাতে তৈরি, এবং আমার এই প্রতিষ্ঠা তারই অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফল। আজ মতবিরোধের জন্য তাকে অবসর গ্রহণ করতে বলাটা আমার পক্ষে সমীচীন কিনা জানিনে, কিন্তু সংকেতগড়ের স্বার্থরক্ষা অবশ্য প্রয়োজন—এটি আমি যুক্তিসহ বিশ্বাস করি। হেনার সঙ্গে আদর্শের সংঘর্ষে সেইজন্য তখন ভয় পেলুম না।

নিজের বাংলায় যখন ফিরে এলুম তখন অপরাহ্ন। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের পাতায় পাতায় এখনও জল জমে রয়েছে। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া ছিল। ঘরটি খুলে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিলুম। এ বাংলাটি আমার নিজস্ব এবং এখানে আমি একা থাকি। আমরা অনেকেই স্বাবলম্বী—এবং নীতিগতভাবে আমরাও এটি মেনে নিয়েছি। আমার একটি লোক আছে, সে এসে ঘরদোরের কাজ ক'রে দিয়ে যায়। কিষণ থাকে হেনার বাংলায়। আমাদের আহারাদির ব্যাপারটা হেনার বাংলাতেই হয়ে থাকে।

একদা দুজনে মিলে স্থির করেছিলুম, দুজনের বাসা হবে পৃথক। দুজনের চারিপাশে থাকবে অবারিত অবকাশ। প্রতিদিন প্রভাতে একজন আরেকজনকে আবিষ্কার করব। দুইজনের মাঝখানে থাকবে একটি ব্যবধান, সেটি আমরা নৈকট্যের আনন্দে ভরিয়ে তুলব। আমাদের এবাগানে থাকবে গোলাপ, ওবাগানে থাকবে সূর্যমুখী। এখানে ডাকবে পাখী, ওখানে শুনব ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জন। এখানে উষার আকাশ যখন ধীরে ধীরে জ্যোতির্ময়ের রক্ত-লেখায় রঙ্গীন হয়ে উঠবে, ওখানকার ছায়াবৃত দিগন্তে রজনীর শেষ তারকা তখন মলিন চন্দ্রের সঙ্গে বিদায় নিতে থাকবে। প্রতিদিন আমাদের নতুন ক'রে চেনাচিনি হবে।

কিন্তু কার্যত তা হয়নি। মাঝে মাঝে প্রভাতকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখেছি, হেনা বেরিয়ে আসছে আমার বাংলো থেকে, এবং আমি রয়েছি তার বাংলায়! দুজনে হেসেছি, এবং দুজনের এই কৌতুকজনক আচরণ নিয়ে আমোদ করেছি। কখনও আমার ঘরে খুঁজে পেয়েছি তার চুলের ফিতা, চিরুনি, এবং তার ঘরে পাওয়া গেছে আমার পকেটের রুমাল।

বিছানায় শুয়ে যখন মণিপ্রসাদের বিমর্ষ মুখখানার কথা ভাবছিলুম, তখন প্রতিদিনের মতো বাইরে কিষণের পায়ের শব্দ হল। রোজ ঠিক এই সময় সে কেটলি ক'রে চা, এবং কিছু খাবার আনে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজেই প্রশ্ন করলুম, তোর মাতাজি ফিরেছেন? একবার ডাক ত, কিষণ।

কিষণ সাড়া দিল না দেখে মুখ ফেরালুম। সামনে হেনা দাঁড়িয়ে। হেনার নির্বিকার মুখশ্রী যথেষ্ট উৎসাহজনক মনে হল না। বললুম, কিষণ গেল কোথা?

নেই।—হেনা জবাব দিল।

চিন্তিত কণ্ঠে আমি বললুম, রাজ-বাড়ি থেকে ছেলেটাকে রোজ গাড়ি পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে।—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনে।

হেনা বলল, কিষণ ওখানে পড়াশুনো করে। রত্না দেবী ওর জন্যে মাস্টার রেখেছেন!

আশ্চর্য, কোথাকার কোন্ রাস্তা-ঘাটের পথো একটা ছেলে, তার কপাল এমনি করে ফিরল?

চা ঢালতে ঢালতে হেনা বলল, কারো কপাল ফেরে, কারো বা পোড়ে! হিংসেই বা কেন, দুঃখই বা কি জন্যে?

আমি খুব হেসে উঠলুম। বললুম, তোমাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই হেনা, ভারি চমৎকার চা করেছ! রংটা আজ যেন খুলেছে! ওকি, তোমার কই?

হেনা বলল, চা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

সে কি, সবই যে ছাড়লে একে একে, আমি বললুম,—এক বেলা খাওয়া ছেড়েছ, মাথায় তেল দাও না, ধোপদস্ত

ভাল শাড়ি পরতে দেখিনে, রাত্রে ঘুম নেই—

ফর্দ বাড়িয়ো না! চা খেয়ে নাও, বাসন নিয়ে চলে যাব,— আমার কাজ আছে।—হেনা চুপ করে দাঁড়াল।

আমি হেনার মুখের দিকে তাকালুম। তারপরে বললুম, তুমি কি সত্যিই রাগ করেছ, হেনা?

হেনা একটু হাসল। বলল, কিষণ নেই তাই নিজেই চা এনেছি। রাগ দেখাবার জন্যে নিশ্চয় আসিনি। তোমার চা খেতে কি দেরি হবে?

পেয়ালাটা আমি রাখলুম একখানা টুলের ওপরে। পরে বললুম, হ্যাঁ, একটু দেরি হবে। তোমার সময় কি বড্ড কম?

হেনা জবাব দিল না, কেটলিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। বারান্দা থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। আমি ওইখানে ওইভাবে চুপ করে বসে রইলুম। চা পড়ে রইল। কতক্ষণ একভাবে বসেছিলুম নিজেরই মনে নেই। যখন সচেতন হলুম দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এবং বাইরে যার পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলুম সে ব্যক্তি বারান্দায় উঠে এসে সাড়া দিল, সাব?

বিছানা থেকে নেমে এসে দেখি, রাজবাড়ির একজন গোমস্তা। সে নমস্কার জানিয়ে আমার হাতে একখানা চিঠি দিল। হাতের লেখাটা চেনা,—স্বয়ং মাধবেন্দ্রের। চিঠিখানা আমি খুললুম, এবং ভিতরে এসে আলো জেলে আগাগোড়া পড়লুম।

বাইরে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি মুখ বাড়িয়ে বলে দিলুম, তুমি যাও।

চিঠিতে রাজামশাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি দুপুরেই একটু দুর্ভাবনা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন আমরা লক্ষ্য করেছি। এই চিঠিতে সেই অস্বস্তিই প্রকাশ পেয়েছে। লিখেছেন দুপুরবেলায় আপনাদের তর্কাবিতর্কের কথাগুলি আমি তোলাপাড়া করে দেখেছি। আপনারা সুদূর বাঙ্গলাদেশ থেকে এখানে এসে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। আপনাদের নিঃস্বার্থ অধ্যবসায় দেখে উপলব্ধি করেছি আপনাদের মন সর্বভারতীয়। জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা বা সমাজ— কোনটাই আপনাদের কাজে বাধা ঘটায়নি। আপনাদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সকলের জন্য অবারিত ছিল। সেইজনাই আজ সর্বান্তঃকরণে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনাদের মতবিরোধ যেন মনোমালিন্যে পরিণত না হয়। আমার এই এলাকার সমস্ত নরনারী এই কথা বিশ্বাস করে, আপনারা হলেন আদর্শ স্বামী স্ত্রী। সংসারী হয়েও আপনারা উভয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপন করছেন। আপনাদের সেবা প্রীতি, স্বার্থত্যাগ, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-বাসনের জলাঞ্জলি,—এগুলি এদেশে উদাহরণস্বরূপ। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আপনার স্ত্রী যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হন এবং আপনাদের বিতর্কের যেন অবসান ঘটে। শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী হেনা দেবীকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাঁর কাছে আবেদন করছি, তিনি যেন সংকেতগড়ের কল্যাণকর্মে পূর্বেকার মতোই নিয়োজিত থাকেন। ইতি।

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, হেনার বাংলায় এখনও আলো জ্বলেনি। মাঝে মাঝে সে এই সময়টায় মেয়েদের তাঁত-বোনার কারখানায় যায়। কখনও কখনও তাকে নৈশ পাঠশালায় তদন্তের কাজেও যেতে দেখেছি। সম্প্রতি শিবন্তীর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন আগে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। সে এখন আছে গ্রামান্তরে তার পিত্রালয়ে।

আমার কেমন একটু সন্দেহ হল। চিঠিখানা হাতে নিয়েই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে এবাংলায় এসে উঠলুম। ঘরখানা খোলা। সন্ধ্যার পর কাজকর্ম সেরে ঝি চলে গেছে। ঘরের ভিতরে ঢুকে আলোটা জ্বাললুম, এবং যা সন্দেহ করেছিলুম ঠিক তাই,—হেনা শুয়ে রয়েছে বিছানায়।

আলোটা জ্বালবার পরেও সে এতটুকু নড়ল না বা সাড়া দিল না। অথচ আলোটা জ্বেলে তার দিকে চেয়ে থাকাটা একটু অশোভন। একটু অসতর্ক অবস্থাতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং আলোটা আমি নিবিয়ে দিলুম। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই আমি দেখে নিতে পারলুম,—প্রায় দুবছরের মধ্যে যা আমার চোখে পড়েনি! আমারই ঔদাসীন্য ও অযত্নের ছায়া পড়েছে হেনার সর্বাঙ্গে। দুঃখে সুখে বেদনায় যে আমাকে ছাড়া আর কিছু জানেনি, অন্য কিছু ভাবেনি এবং আমার জন্য যার স্বার্থত্যাগের ইতিহাস আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না, তার ওপর যথেষ্ট সুবিচার করেছি কিনা,—আজ হঠাৎ আমার সেই সন্দেহ হল। গত এক বছরের মধ্যে তাকে একটি ভাল কথা বলিনি, তার স্বাস্থ্যের খোঁজ করিনি, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা-অসুবিধার কোনও খবর রাখিনি,—এবং লক্ষ্যও করিনি আমার এই ঔদাসীন্যের আড়ালে একটু একটু করে সে শুকিয়ে উঠেছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই, যে-হেনা নতুন নতুন পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া থাকত না, সে যে গত দুবছরে তার সমস্ত কাপড়চোপড়গুলি অভাবগ্রস্ত মেয়েমহলে বিলিয়ে দিয়েছে, আমি সেজন্য তাকে একখানি শাড়ি পর্যন্ত কিনে দিইনি। অথচ প্রতিদিন তাকে সাবান দিয়ে কাপড় কাচতেও দেখেছি!

নিঃশব্দে অপরাধীর মতন দাঁড়িয়ে ছিলুম কতক্ষণ। কিন্তু সহসা এমন একটা ভাবাবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করল যে, সংযম হারাবার ভয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। বোধহয় আমার স্খলিত-পদে কিছু শব্দের আভাস ছিল, তাই পিছন থেকে হঠাৎ হেনার সাড়া পাওয়া গেল, কে?

থমকিয়ে গেলুম। জবাব দিলুম, আমি।

হেনা চুপ করে গেল। বোধ হয় অপেক্ষা করছিল, আমি ভিতরে ঢুকব। কিন্তু আমি ততক্ষণে বারান্দা থেকে নেমে যাচ্ছিলুম।

হেনা উঠে বাইরে এসে ডাকল, চলে যাচ্ছ, পার্থ?

ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম, তুমি ঘুমোচ্ছ দেখেই চলে যাচ্ছিলুম। সেই ভাল, তুমি বিশ্রাম নাও, হেনা—

হেনা কোনও জবাব দিল না। আমি সোজা গিয়ে আমার বাংলায় ঢুকলুম। আমার হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে যে আর্তস্বরটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজেই কান পেতে শুনছিলুম, সেটা মানুষের নয়। সেটা যেন ক্ষুধার্ত, বিকলাঙ্গ, শক্তিজর্জর, চির অনাদৃত এক রুগ্ন জন্তুর। আপন জীবনের দিকে যতদূর চেয়ে দেখছি, আমার বুকের ভিতরকার বিশ্বজোড়া মহাশূন্যলোকে সমস্ত ছন্দের পতন ঘটেছে, সমস্ত তাল কেটেছে, সমস্ত গ্রহে-উপগ্রহে ঠোকাঠুকি লেগেছে! সূর্য ঠিকরে গেছে দক্ষিণে, চন্দ্র উত্তরে গিয়ে রাহুগ্রস্ত হয়েছে, এবং আকাশজোড়া সম্মার্জনীহস্তে প্রকাণ্ড

এক ধূমকেতু অগ্নিচক্ষুরা চক্ষে আমার দিকে প্রেতহাস্যে চেয়ে রয়েছে! যেন ভয়ভীষণ শাসনের দ্বারা আমাকে চারিদিক থেকে বলছে, তুমি অবিচার করেছ, অন্যায় ও অধর্ম করেছ! ভালবাসা তুমি চেনোনি, একান্ত আপনজনের মূল্য দিতে শেখোনি, যে-তপস্বিনী অপর্ণা বিগত বিশ বৎসরকাল যাবৎ তোমার একান্ত অনুগামিনী,— তোমার পীড়নের তলায় তার সকল মর্যাদা, সম্মান, সততা, স্বার্থত্যাগ, ভালবাসা আজ ধূলোবলুণ্ঠিত।—আমি যেন চারিদিকের প্রেতদলের বক্র হাসির হাহাকার শুনতে পাচ্ছিলুম।

কতক্ষণ মনে নেই, সহসা পায়ের শব্দ পেয়ে সাড়া দিলুম, কে?

হেনা এসে ঘরে ঢুকল। বলল, ক্ষমা করো পার্থ, তোমার দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। এই নাও—

আন্দাজে টুলের ওপর চায়ের পেয়ালা রেখে হেনা বোধ হয় নিঃশব্দে চলেই যাচ্ছিল, আমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরলুম। হেনা আজ ছাড়াবার চেষ্টা করল না, শান্তভাবে আমার অধীর আলিঙ্গনের মধ্যে চুপ করে রইল। কিন্তু তখনই অসংযত উন্মত্তকণ্ঠে আমি বললুম, হেনা, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এ-কথা কি নতুন করে বলতে হবে? তোমাকে দুঃখ দিলে আমি যে অনেক বেশি দুঃখ পাই, একি জান না তুমি?

হেনা কতক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, এবার দুঃখের শেষ হোক!

বল, বল হেনা, কেমন করে তার শেষ হবে?—ভগ্ন স্খলিতকণ্ঠে পুনরায় আমি বললুম, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানল তুমি আমার স্ত্রী, কিন্তু তুমি কেন কোনদিন আমাকে স্বামী বলে স্বীকার করলে না? কেন তোমার সমস্ত জীবন শুকিয়ে গেল, কেন আমাকে তুমি পুড়িয়ে ছারখার করলে?

ঘরে আলো জ্বালতে দাও পার্থ!—শান্তকণ্ঠে হেনা আবেদন জানাল।

না, না হেনা, অন্ধকার থাক্—আমি অধীর উদ্বেলিত কণ্ঠে বলে উঠলুম, আজ অন্ধকারে আমাদের মন মুখোমুখি হোক। আজ আমাকে শুনতেই হবে, কেন তোমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে ঘুরে ঘুরে মরলুম, তুমিই বা কেন এত কাছে থেকেও আমার কাছে পৌঁছতে পারলে না! হেনা, আমায় একবার বল আমি তোমার কাছে সত্য হতে পেরেছি কিনা,—একি, তোমার গা এত গরম যে? জ্বর হয়েছে?

হেনা বলল, ও কিছু না,—অমন অনেক দিন থেকেই হচ্ছে!—ছাড়ো, পার্থ।

আমি ছাড়লুম না। কিন্তু হঠাৎ নিজকে সংযত করলুম। শান্তকণ্ঠে বললুম, ও, তাই তুমি ঘুমোচ্ছিলে। তাই বুঝি একবেলা খাও না! গান বন্ধ করেছ, সেই হাসি নেই, এক কথায় চটে যাও, রাত্রের দিকে জেগে থাকতে পার না! কিন্তু কই, আমাকে এতদিন বলনি ত? কাল সকাল থেকেই আমি তোমার চিকিৎসা ধরব, হেনা।

তোমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে!—নিরাসক্ত কণ্ঠে হেনা বলল।

হাত বাড়িয়ে পেয়ালা নিয়ে আমি এক চুমুকে চা খাওয়া শেষ করলুম। পরে বললুম, এখন বুঝতে পাচ্ছি কেন তুমি ক্লান্ত হও কথায় কথায়! আমাকে তুমি ক্ষমা কর, হেনা।

হেনা কথা বলল না। এবার আমি তাকে বসিয়ে দিলুম বিছানার ওপর। বাইরে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না ছিল, তারই এক ঝলক এসে পড়েছে দরজার ধারে। হেনা বিছানার ওপর বসে রইল কতক্ষণ, তারপর নিজেই যখন সে একটু কাৎ হয়ে পড়ল, তখন বুঝলুম কি প্রকার অসুস্থ শরীরে সে আমার চা-টুকু তৈরি করেছে। আমি হেনার পাশে বসে তার মাথার দিকটা কাছে টেনে নিলুম। তার গা, গলা, কপাল, হাত—বেশ গরম।

প্রায় এক বছর আগে হেনা আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনেছিল। সেই কথাটা মনে করে অধীর আবেগ-বিহ্বলতায় আমি যখন অন্ধকারে কাঁপছি, সেই সময় হেনা ডাকল, পার্থ?

সাড়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত, এ-কথা বুঝেই হেনা পুনরায় বলল, এ কি করছ? আজ আমার সমস্ত লজ্জা এমন করে ঘুচিয়ে দিতে বসলে কেন?

ভগ্নকণ্ঠে বললুম, আমি তোমার স্বামী হেনা!

সে ত' আজ নতুন নয়, পার্থ। দশ বছর বয়স থেকে দশ লক্ষবার এই স্ত্রী যে তোমার গলায় মালা দিয়ে এসেছে! আজ সেই বাঘিনীর মরা দেহটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ, কেন? এ কি আজ তোমারই ভাল লাগছে? কেনই বা এমন করে চোখের জল ফেলছ?

আমি চুপ করেছিলুম।

হেনা শান্তকণ্ঠে বলল, কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে না, পার্থ। আমি জানি, ভুল আমি করিনি,—আমি সার্থক! যখন পেরেছি, তোমাকেই টেনে নিয়েছি আমার বুকের কাছে। তুমি টেনে নেবে, সে অপেক্ষা করিনি। কিন্তু এবার সন্দেহ হচ্ছে আমার মনে। আজ তোমার সঙ্গে মতে মিলছে না বলেই কি কাছে টেনে নিচ্ছ? এ যে ঘুষ, পার্থ!

আমি বললুম, চুলোয় যাক্ মত-বিরোধ, চুলোয় যাক্ সুকেতগড়। চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই, হেনা।

হেনা এবার আমার দিকে ফিরল। বলল, ছি পার্থ, মানুষের মহৎ কল্যাণের কাজ হাতে নিয়েছ। নিজের সুখের জন্য কাপুরুষের মতন পালিয়ে যাবে? সে যে বিষম অপমান!

তুমি কেন তবে ছুটি নিতে চাইলে হেনা?

আমি?—হেনা একটু মলিন হাসি হাসল,—ছুটি যে তোমরাই দিলে! তুমি ত জানতে গভর্ণমেণ্টের ওপর আমি টেক্কা দিতে আসিনি! শিল্পনগর গড়ে তোলা আমাদের কাজ নয়, সে-কাজ গভর্ণমেণ্টের। আমি ভেবেছিলুম, এটি হবে আমাদের তপস্যার ক্ষেত্র, জীবন-শিল্প রচনার আশ্রম। চেয়েছিলুম সরল জীবনযাত্রা, ছোট ছোট জীবনের গভীর শান্তি, মহৎ মনুষ্যত্বের প্রকাশ,—আধুনিক যুগের বিষশ্বাস থেকে মুক্তি। স্বার্থের সংঘাত, সংগ্রামের উত্তাপ, কলহ-সংঘর্ষের রণক্ষেত্র, লোভ এবং বিদ্বেষের নোংরা হাওয়া—এরা হল শিল্পনগরের পরিচয়! এর থেকে আমি তোমাকে নিয়ে দূরে যেতে চেয়েছিলুম, পার্থ।

চল হেনা, তাই আমরা যাই। আমার একান্ত অনুরোধ—

হেনা বলল, ছেলেমানুষ তুমি! তোমার চলে যাওয়া মানে বিশ্বাস-ঘাতকতা! তুমি গেলে আমার সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হবে, বাঙ্গালীর পরিচয়

হবে কলঙ্কিত। কিন্তু আমি আর এখানে থাকব না, পার্থ।

হেনার মুখের উপর মুখ রেখে বললুম, এমন কথা বলতে নেই, হেনা। কোথা যাবে তুমি?

হেনা মলিন হাসি হাসল। বলল, কোথা যাব! তুমি মনেও ক'র না পার্থ, আমি অসুস্থ থাকব। তোমার থেকে শক্তি নিয়েই আবার আমি মাথা তুলে দাঁড়াব। তোমাকে ভালবাসি—সেই জোরেই আবার গিয়ে দাঁড়াব অন্য কোথাও! নতুন কর্মী আবার খ'ুজে বার করব, আবার তাদের কানে দেবো নতুন মন্ত্র,—এই ইষ্টমন্ত্র যে পেয়েছিলুম আমার ছোটকাকার কাছে! আমি ত' কখনও হার মানব না, পার্থ!

বিহ্বল কণ্ঠে বললুম, তাহলে কোনও দিন তোমাকে কাছে পাব না?

মস্ত আদর্শ আর পরিকল্পনা ভাসিয়ে দিয়ে শুধু দেহ নিয়ে তোমার কাছে থাকতে পারব না, পার্থ।

হেনাকে আমি একান্ত কাছে টেনে নিয়েছিলুম এবং তার অন্তর্গূঢ় নিবিড়-তার মধ্যে কেমন যেন অশ্রুবিহ্বল রহস্য-পাথারের তলায় অন্ধ আবেগে তলিয়ে গিয়েছিলুম।

চুপি চুপি গাঢ় জড়িতস্বরে এই মায়াবিনী আমার কানে কানে বলল, তুমি দেখ, আবার নতুন পথ খ'ুজে বার করব, নতুন কাজ আবার তুলে নেবো। তোমাকে আবার ডাকব আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে! আমার এই হৃৎপিন্ডের সমস্ত শিরা-উপশিরা ছি'ড়ে সেই রক্তে আবার তোমার পুজো দেবো, তুমি দেখে নিয়ো, পার্থ। মনেও ক'র না আমি

তাহলে কোনও দিন তোমাকে কাছে পাব না?

হেনা মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলল চিরদিন যাতে দুজনে একান্ত কাছা-কাছি থাকতে পারি, সেই চেষ্টাই ত' করেছিলুম! কিন্তু তা হ'ল না। জীবনের

ক্লান্ত,—স্বপ্নেও ভেবো না আমার এ-স্বাস্থ্যের বাঁধুনি ভাঙবে কোনদিন!

জ্যোৎস্নার আলো ঘুরে গেছে দরজা থেকে জানলার ধারে। রাত্রি কত

আমাদের জানার দরকার ছিল না। আমাদের দুই মুর্ছিত দেহ যেন ঠিক সর্পালিঙ্গনের মধ্যে বাঁধা পড়েছিল। কিন্তু সে কতক্ষণ কারও মনে নেই। হেনা এক সময় নিজেই সেই নাগপাশ ছাড়িয়ে উঠল এবং কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিল। তারপর কি মনে করে একবার আঁচল দিয়ে আমার মুখখানা মুছিয়ে এবং কপালের চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে এক সময় সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত্রের দিকে কিষণ আমার ঘরে খাবার দিয়ে গিয়েছিল এক সময়ে। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলুম, তোর মাতাজি কি করছেন? কি খেলেন?

কিষণ বলে গিয়েছিল তিনি এক বাটি গরম দুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম, আগামীকাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে মহারাজার পারিবারিক চিকিৎসককে এনে হেনার চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। আমি নিজে তার পথ্য ও শুশ্রূষার ভার নেবো। হেনার এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

রাত্রির অনেকটা অংশ আমি বিনিদ্র ছিলুম। নিজের ঔদাসীন্য ও অপরাধকে আমি যেন কোনমতেই ক্ষমা করতে পারছিলুম না। বোধ করি সেইজন্যই মধ্যরাত্রির কোনও একটা সময় আমি বিছানা ছেড়ে উঠে চন্দ্রালোকিত উঠোনের দিকটা পেরিয়ে গিয়ে হেনার জানলায় মুখ রেখে দেখছিলুম সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে! তার ঘুম ভাঙানো আর উচিত হবে না মনে করে আমি ফিরে এলুম। রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলুম।

কিন্তু প্রভাত ঠিক কখন হয়েছিল আমার মনে নেই। আমার ঘুম ভাঙাল কিষণ। বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, রৌদ্র উঠেছে অনেক উ'চুতে। অন্যদিন এমন সময় আমার দুবার চা খাওয়া, স্নানাদি এবং জলযোগ—সবই শেষ হয়ে যায়।

ঘুম ছাড়িয়ে আমি উঠে বসতেই কিষণ বলল, সাব, মাতাজিকো নাহি মিলতি! কাঁহা গৈ, মালুম হ্যায় আপকো?

কিষণের উদ্বিগ্ন মুখখানার দিকে আমি কতক্ষণ নির্বোধের মতো চেয়ে রইলুম, পরে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে এ-বাংলায় এসে উঠলুম। হেনার বাক্সর কব্জাটা খোলা, ছোট

হ্যাণ্ডব্যাগ এবং চটিজুতো জোড়াটা নেই, গতকালকার সাবান-কাচা শাড়িখানা আনলায় দেখছিনে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার গায়ের চাদরখানাও দেখতে পেলুম না। হেনা প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত ঘর ছেড়ে কোথাও যায় না, কেননা, আমাকে নিয়ে তাকে নানা লেখাপড়া ও হিসাবপত্রের কাজে বসতে হয়। তাছাড়া রান্নাবান্না ও স্নানাহারের কথাটাও থাকে।

হেনা নেই কোথাও। হলদে রোদ্দুরটা যেন বলছে, না, সে নেই! বাইরে পাখি-জগৎ, সামনে সুকেতগড়ের বিরাট শূন্যতা—ওরাও যেন বলছে, সে নেই! আমি হঠাৎ একবার চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিলুম। কিন্তু চারিদিকের গ্রামাঞ্চলের মাঝখানে হেনার নাম ধরে চিৎকার করলে সেটা আমাদের মর্যাদার পক্ষে শোভন হবে কিনা সেটি ভেবে চুপ করে গেলুম।

আমাকে সে যে শুধু না জানিয়ে গেল তাই নয়, তার পথের এবং গন্তব্যেরও কোনও নিশানা রেখে গেল না। কবে ফিরবে, অথবা ফিরবে কিনা, চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা করবে কিনা, তাও জানিয়ে যাবার দরকার মনে করল না। কিষণকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিরর্থকভাবে হাঁটতে হাঁটতে সেই মস্ত কলাবাগানটা পেরিয়ে মোটরবাসের রাস্তাটার উপর এসে দাঁড়ালুম এবং পথের দুইদিকের অন্তহীন দূরত্বের দিকে একবার তাকিয়ে কিষণকে বললুম, ওরে, রাজবাড়িতে গিয়ে তুই খবরটা দিয়ে আয়। বলগে, তোর মাতাজি বিশেষ জরুরী কাজে ভোর চারটের মোটরবাস ধরে ষ্টেশনের দিকে গেছেন।

খবরটা নিয়ে কিষণ ছুটতে ছুটতে চলল।

হেনা যাবার আগে বলেছিল, মানুষের কল্যাণের কাজে হাত দিয়েছ। আজ নিজের সুখের জন্য সেই কাজ ছেড়ে কাপুরুষের মতন পালিয়ে যাবে? সে যে বিষম অপমান!

আমার এক বছরের ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল, আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। কিন্তু হেনা এমন একটা জটিল কর্মজালে আমাকে জড়িয়ে দিয়ে গেছে যে, ছুটি বাড়িয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং আমি দিল্লীর কর্তাদের কাছে একখানি দরখাস্ত পাঠিয়ে আরও তিন মাস ছুটির আবেদন জানালুম। এটিও

বিনাবেতনের ছুটি। জানি এ ছুটি মঞ্জুর হবে।

মনে মনে অন্য একটা কথা চাপা ছিল। আমি হেনার চিঠির জন্য অপেক্ষা করছিলুম। প্রায় তিন সপ্তাহকাল হয়ে গেল, তার কোনও খোঁজ খবর নেই। নিশ্চয় জানি, অসুখ তার বাড়লে সে যেখানেই থাক্ আমাকে ডাকবে। কিন্তু সে এখন ভারতের কোন্ প্রান্তে গিয়ে উঠেছে এটুকু অন্তত জানতে পারলে সুখী হতুম। দিন পনেরো আগে ভেবে-চিন্তে একখানা চিঠি লিখেছিলুম বুড়িপিসিকে। তার জবাব এসেছে। হেনা দেশের দিকে যায়নি, বুড়িপিসির চিঠিতে সেটি সুস্পষ্ট। হেনা বলে গেছে, আমার জন্যে ভয় পেয়ো না কোনদিন। নতুন কাজ আবার হাতে নেব, সেদিন তুমি ঠিকই জানবে।

প্রথম কয়েকদিন কিষণ তার মাতাজির জন্য আড়ালে আবডালে কেঁদে বেড়িয়েছিল। সে ভেবেছিল মাতৃস্নেহের মধ্য দিয়ে সন্তান একটি ব্যক্তিগত অধিকার খুঁজে পায়। কিষণের সেই অধিকার-বোধ সাংঘাতিক আঘাত খেয়েছে। আজ কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি কিষণ আবার তার লেখাপড়ায় মন দিয়েছে। তার বিশ্বাস, আমি যেন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আছি, এবং বোধ করি সেইজন্যই সে আমার সর্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ঘরের কাজকর্মের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে। কিষণ নিয়মিত পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়।

আমি এখানে নানা লোককে স্তোক-বাক্য দিতে বাধ্য হয়েছি। প্রায় সকলেই জানে, আমি হেনার নিয়মিত চিঠি পাই এবং সে এখন রয়েছে লক্ষ্ণৌতে তার ভগ্নীর ওখানে। ভগ্নী গুরুতরভাবে পীড়িত, এবং হয়ত সেই ভগ্নীকে নিয়ে হেনাকে শীঘ্র কলকাতায় যেতে হবে।

প্রথম দিকে মহারাজার ধারণা হয়েছিল হেনা বুঝি সত্যিই রাগারাগি করে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। পরে তিনি আমার কাছে কল্পিত কাহিনীটি শুনে আশ্বস্ত হন। তাঁর স্ত্রী রত্না দেবী হাসিমুখে আমাকে বলেন, আপনার সৌভাগ্য, এমন স্ত্রী আপনি পেয়ে-ছিলেন!

আমিও সেদিন চায়ের আসরে হেসেছিলুম। বললুম, আমার স্ত্রীর ধারণা কিন্তু এর বিপরীত!

মহারাজা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে-ছিলেন। রত্না দেবী বললেন, আপনি যখন সুকেতগড়ে আসেননি, সেই সময় আমরা দেখতুম, আপনার প্রতি হেনা-দিদির কী গভীর শ্রদ্ধা আর অনুরাগ! তিনি বলতেন, আমি যা কিছু করছি সবই চৌধুরীসাহেবের কল্পনা—তাঁরই ইচ্ছায় সব হচ্ছে। এর মধ্যে আমার নিজের কোনও কৃতিত্ব নেই!

মহারাজা শুধু ছোট্ট কথায় বললেন, আদর্শ স্বামী-স্ত্রী!

মণিপ্রসাদের মন থেকে সন্দেহটা কিন্তু ঘোচেনি। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। সম্পূর্ণ এক বৎসরকাল মণিপ্রসাদ ছিল হেনার প্রায় নিত্যসঙ্গী। সুকেতগড়ের প্রারম্ভিক কাজগুলি তারাই দুজনে পরিচালনা করেছে। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। মাথার উপর দিয়ে তাদের গেছে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। আহার জোটেনি, আশ্রয় মেলেনি—এমনও গেছে অনেকদিন। কিন্তু সেই সুযোগে মণিপ্রসাদ ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছিল তার 'দিদি-বহেনকে'। হেনার মনোজগতের সঙ্গে তার পরিচয় কম নয়। তার মনে একটা সুদূর এবং প্রচ্ছন্ন সংশয় বরাবরই থেকে গেছে যে, হেনার সঙ্গে আমার লৌকিক বিবাহটা একেবারেই ঘটেছে কিনা। কিন্তু এ নিয়ে মণিপ্রসাদ কোনওদিন কারও কাছে আলোচনা করেছে, এ খবর আমার জানা নেই। হেনার প্রতি মণিপ্রসাদের যে অপরিসীম শ্রদ্ধানুরাগ দেখেছি সেটি দুর্লভ। হেনা মানুষ খুঁজে বার করতে জানে।

শিবন্তী ফিরে এসেছে তার স্বামীর কাছে। আমি তার শিশুপুত্রের জন্য একটি দাই মোতায়েন করেছি। বাচ্চাটির খাদ্যতালিকা আমিই নির্দেশ ক'রে দিয়েছি। প্রসবের দুমাস পরে শিবন্তী আবার যখন তার স্বাস্থ্যশ্রী এবং লাবণ্য নিয়ে আমার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল, আমি মণিপ্রসাদের সামনেই তাকে বললুম, বৌমা, আমি তোমার ভাসুর। সেই অধিকারেই তোমাকে একটি সৎপরামর্শ দিচ্ছি। এখানে এখন তোমার অনেক কাজ। সুতরাং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তোমার দ্বিতীয় সন্তান না হলেই সুকেতগড়ের কর্মীরা বিশেষ সুখী হবেন!

মণিপ্রসাদ মুখ লুকোবার চেষ্টা পেল, এবং শিবন্তী মুখ রাঙা করে কি একটা কাজের অছিলায় ঘর ছেড়ে পালাল। এর আগে কিন্তু শিবন্তী যেদিন এখানে এল, সেইদিনই সে আমার কাছে এসে আঁচলে চোখ মুছে প্রথম প্রশ্ন করেছিল, দাদাজি, আপনি দিদিকে যেতে দিলেন কেন?

বাঃ,—আমি বললুম, কী বলছ তুমি, শিবন্তী? মেয়েরা আজকাল পৃথিবীময় বোন পাতিয়ে বেড়ায়! তা নৈলে তোমাকেই বা আজ পেতুম কোথায়?

শিবন্তী করুণ কণ্ঠে বলল, উনি যে বলছেন, দিদি আর কোনদিন ফিরবেন না এখানে?

বিলক্ষণ!—ফিরবেন না মানে? মণি-প্রসাদ এখনও মানুষ চেনেনি! আমি রয়েছি এখানে, তোমরা সবাই রয়েছ, চারদিকে তাঁর এত কাজ পড়ে রয়েছে, —না ফিরে তিনি যাবেন কোথায়? দাঁড়াও, এগুলো তুমি নিয়ে যাও বৌমা—

শিবন্তীর শিশুপুত্রের জন্য হেনা কয়েকটি সুন্দর ফুলকাটা রঙীন জামা নিজের হাতে বানিয়ে রেখেছিল, আমি সেগুলি হেনার বাক্স থেকে বার ক'রে শিবন্তীর সামনে এগিয়ে দিলুম। পরে বললুম, তিনি নিজের হাতেই এগুলো তোমাকে দেবেন মনে করেছিলেন, কিন্তু সে আর হল কই?

গর্বোজ্জ্বল আনন্দে শিবন্তী জামা-গুলি সেদিন তুলে নিয়েছিল।

হেনা বিশ্বাস করত, মানুষে নিজে যদি বড় হয়, সেইটিই তার একমাত্র শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তার অন্য পরিচয় নেই। এখানকার সামন্ত রাজপরিবার এবং রাজসম্পদ তাকে একটি দিনের জন্যও অভিভূত করেনি। সে শুধু খুশী ছিল মাধবেন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর সদ্ব্যবহারে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এই রাজ-পরিবারের কয়েকটি চিরাচরিত অভ্যাস এবং কুসংস্কারকে সে তাড়িয়েছিল। এ বাড়ির পর্দাপ্রথাকে সে রাখেনি। বিশেষ বিশেষ তিথিতে রাজদর্শনের প্রথাকে সে হটিয়েছে। কুলগুরু রাজার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবেন, এটি চলবে না। শিশুরা ময়ূরের পালক-ওয়ালা জরির পাগড়ি প'রে ছোটকাল থেকে রাজা সাজতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে পৃথক থাকে, এটি অসহনীয়। কাছারি থেকে মুর্শিদাবাদের কায়দা রেওয়াজ তুলে দিতে হবে। হাটতলায়

গিয়ে রাজার পাইকরা চোখ রাঙিয়ে 'প্যালা' তুলবে না!

রাজপরিবারে হেনা বিপ্লব এনেছিল, এবং বিস্ময়ের কথা এই, রত্না ও মাধবেন্দ্র প্রমুখ রাজবাড়ির ছেলে-মেয়েরা হেনার এইসব প্রস্তাবগুলি সানন্দে গ্রহণ করেছিল। রাজপুরোহিত হেনার প্রতি রুষ্ট ছিলেন।

এই সম্পর্কেই একদিন আলোচনা করতে গিয়ে যখন হেনার বংশপরিচয় নিয়ে কথা উঠল, সেইদিন মহারাজা ও রত্না দেবী প্রথম আমার মুখ থেকে শুনলেন, বাংলাদেশের আধুনিক ছেলেমেয়েরা আজকাল আর বংশ-গৌরবের তোয়াক্কা রাখে না! রাজা-রাজড়ার নাম শুনলে তারা এখন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। হেনার পিতৃপিতা-মহরাও রাজা উপাধিধারী ছিলেন এবং সিপাহী-বিদ্রোহের কালে হেনার পূর্বপুরুষরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। মাধবেন্দ্র আমার গল্প শুনে চমৎকৃত হলেন। তাঁরা জানতেন, হেনা শিক্ষিত মেয়ে মাত্র। কিন্তু যখন শুনলেন, সে বিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট ছাত্রী এবং এম-এস-সিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান পেয়েছে, তখন তাঁদের যেন একটু চমক ভাঙলো। তাঁরা এটি একবারও শোনেননি, হেনা প্রচুর সম্পত্তি ও অর্থের মালিক। তাঁরা এইটিই শুনে এসেছেন, সমস্ত টাকা নাকি আমিই যুগিয়ে এসেছি।

সেদিন আলোচনাসূত্রে মহারাজা বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তবে একটি প্রশ্ন করি। জবাব দেওয়া না দেওয়ার আপনার ইচ্ছা।

কি বলুন?

আপনারা স্বামী-স্ত্রী, অথচ আপনারা পৃথক পৃথক বাংলায় রাত্রি-বাস করেন। আপনারা কি আজও কৌমার্যব্রতী?

বললুম, আপনাদের অনুমান বহু-লাংশেই সত্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে-প্রাণবহ্নিকণা সমস্ত জীবসৃষ্টির মূল উপাদান, মানুষের বেলায় সেটিকে পরম মহিমায় এবং মহৎ কীর্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। তিনি এখানে তারই সাধনায় বসেছিলেন।

রত্না দেবী মুগ্ধচক্ষে চেয়ে বললেন এ সম্পর্কে হেনাদিদির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে একদিন আমি অভিভূত হয়েছিলুম।

মাধবেন্দ্র আমার সামনে ঝুঁকে প'ড়ে উৎসুক দৃষ্টিতে বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আপনি আরেকটু ভেঙে বলুন।

এটি উপলব্ধির ব্যাপার, রাজা-সাহেব,—আমি বললুম, এখানে তিনি আমাকে এনে নিজে বসেছিলেন কঠোর অগ্নিপরীক্ষায়। তাঁর ছিল অতি কঠিন আত্মনিগ্রহ! অগ্নি ছিল তাঁর কাছে, এবং আমি ছিলুম দাহাবস্তু! আমার মধ্যে তিনি সঞ্চার করতেন সেই আদিম বাসনার অগ্নিজ্বালা! আমি দগ্ধ হতুম তিলে তিলে। আমার প্রতি অণু-পরমাণু, প্রতি শিরা-উপশিরা, প্রতি নিঃশ্বাস, প্রতি ভাবনা, আমার প্রাণমূলে, আমার অন্ত্রতন্ত্র—দাউ দাউ করে জ্বলত এবং আমার ভিতরকার লৌহসত্ত্ব সেই অবিরাম দাহনে ধীরে ধীরে ইস্পাতে পরিণত হত! আমার আগুনের আভায় তিনিই অভিব্যক্ত হতেন!

আপনার দিক থেকে ভিন্ন-প্রতিক্রিয়া ছিল না?

ছিল, উন্মত্তভাবেই ছিল!—আমি বললুম, কিন্তু ওইখানে ছিল তাঁর যাদু। তিনি বিস্তার করতেন তাঁর প্রকাণ্ড দিগন্তজোড়া ইন্দ্রজাল! তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠের গানে কত জ্যোৎস্নারাত্রি অশ্রু জরোজরো হয়েছে, প্রাণগঙ্গায় জোয়ার উঠেছে কতবার, বসন্তের বনে বনে কেঁদে উঠেছে কত পাখী তাদের রক্তাক্ত কণ্ঠে। সেই ইন্দ্রজালের ভিতর দিয়ে দেখতুম আমারই বেদনাকে আমারই যন্ত্রণাকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন শ্রাবণ-গগনের বিশ্বব্যাপী কালোমেঘের ছায়ায়-ছায়ায়! সেই হ্লাদিনী শক্তির এক হাতে থাকত হোমকুণ্ডের আগুন, অন্য হাতে দেদীপ্যমান প্রদীপ! তিনি জানতেন, আমি তাঁর রণরঙ্গের একমাত্র অস্ত্র, তাঁর কর্মক্ষেত্রের প্রধান উপকরণ, এবং তাঁর সকল পূজার আমিই নৈবেদ্য!

আমার এই ভাবোচ্ছ্বাসগুলি বাংলায় বলতে পারলে সুখী হতুম। কিন্তু আমার ভয় ছিল, পাছে মাধবেন্দ্র এবং রত্না দেবী এগুলিকে হেনার স্তাবকতাস্বরূপ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, আমার সন্দেহ মিথ্যা, কেননা বিদায় নেবার সময়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বললেন, তিনি যেদিন ফিরবেন সেদিন আমরা তাঁর জন্য একটি নাগরিক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করব। কিন্তু আপনার সঙ্গে মতবিরোধের ফলে তিনি যদি সুকেতগড়ে আর না ফিরতে চান তাহলে ভারতবর্ষের যে কোনও জায়গাতেই তিনি থাকুন না কেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে সেখানে গিয়ে তাঁর পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনব।

রত্না দেবী বললেন, একথা আপনি হেনাদিদিকে লিখে পাঠাবেন!

আমি আমার সম্মতি জানিয়ে সেদিন বিদায় নিলুম।

মাস দুই আমার কেমন ক'রে কাটল, এবং কি কি কাজ নিয়ে ছিলুম, এ প্রশ্ন যদি কেউ করে তবে সন্তোষজনক জবাব দেওয়া কঠিন। আমার ধারণা, চাকা যখন ঘোরে সে নিজেই নিজের গতি পায়। সম্প্রতি এক কামারশালা বসেছে,—বসে গেছে একটা রংয়ের কারখানা। জাতার বদলে এসেছে গম পেষাইয়ের কল; সুতো তৈরি হচ্ছে মেসিনে। মনে হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে বহুকাল থেকে জনতার ক্ষুধা চাপা ছিল, এবার যেন তারা লক্ষ লক্ষ হাত বাড়িয়ে দাবি জানাচ্ছে! দানবের ঘুম ভেঙেছে, সে ক্ষুধার খাদ্য চায়।

মাঠের প্রান্তে টিলা পাহাড়ের উপর গড়ের যে ভগ্নাবশেষ আজও কোনও-মতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ঠিক নিচে ছিল ছোটখাট একটা বিল। শীতের দিনে মাঝে মাঝে পাখীরা ওখানে আসে। হেনা বলত, ওটাকে দীঘি বানাতে পারলে ওর চার কোণে চারটি হাওয়া-মহল তৈরি করা যেত। ঝাঁসির রানীর সরোবরটি দেখোনি? এদিকে স্নানের ঘাট, আর ওপাশে মন্দির,—চার কোণে চারটি হাওয়া-মহল! শুক্ল-পক্ষে ওটা দেখতে বড় সুন্দর হয়! অতল রহস্য জলের তলায়, আর ওপর দিকে চন্দ্রহাস রাত্রি! ধু ধু জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসা!

কথাটা মণিপ্রসাদ এবং শশিবতী কান পেতে শুনেছিল। সেইজন্য আজ দুমাস হল মণিপ্রসাদ আমার সম্মতি আদায় করে প্রায় শতখানেক লোক লাগিয়ে মাটি কেটে চলেছে। আগামী বর্ষার আগে তারা কাজ শেষ করবে। এদিকে নির্দিষ্ট সীমানা জরিপ করার পর চারটি হাওয়া-মহল এবং বাঁধানো ঘাট নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। রাজাসাহেব নাকি মণিপ্রসাদকে বলেছেন, ওই বৃহৎ জলাশয়টি হেনাবেনের নামে উৎসর্গ করা হবে!

হেনার কোনও খবর আজও পাইনি। তার স্বকীয় চিন্তাধারা বোধ করি কারও

সঙ্গেই মেলে না, তাই চিঠিও একখানা লেখেনি। সে আপন আদর্শে সত্য, এবং আপন সত্যে প্রতিষ্ঠিত,—সেখানে কারও সঙ্গেই সে আপোসরফা করতে প্রস্তুত নয়। সে বলত, সভ্যতার ইতিহাসের কালে কালে কোটি কোটি মানুষ এসেছে এবং চলেও গেছে,—কেউ তাদের খোঁজ-খবর রাখেনি। শুধু দেখে এসেছি তাদের বিপুল জনতা অন্ধকার থেকে উঠে এসে অন্ধকারের দিকে অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু তাদেরই ভিতর থেকে মাথা তুলেছে এক একজন, যারা জন্ম-জরা-মৃত্যুঞ্জয়ী! তুমি ভুলে যেয়ো না, পার্থ, আমি রথ টেনেছি সেই পাঁচ হাজার বছরের মৃত্যুঞ্জয়ীদের প্রাণ থেকে। তারা জনতা নয়, তারা ব্যক্তি কীর্তি মোছে, জনতা নিশ্চিহ্ন হয়, কিন্তু ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকে আবহমান-কালের সত্যের ওপর। অদৃশ্যলোক থেকে তারা যোগাচ্ছে অমৃত, মন্ত্র দিচ্ছে ব্যক্তি-সাধনার, মৃতসঞ্জীবনী দিচ্ছে একক তপস্বীকে। মানুষের সকল ভাবনাকে তারাই নিয়ন্ত্রিত করে।

হেনার ঘরটাকে খালি রেখেছিলুম কিছুদিন, তারপর আমি একদিন এসে দখল করেছি। কালক্রমে নানা সামগ্রী এ ঘরে জায়গা পেয়েছে নানা আসবাব-সজ্জা,—যেগুলি আজ তাদের অর্থ হারিয়েছে। ছেঁড়া একখানা শাড়ি ঝুলছে, দু একটা জামা এখানে ওখানে, দাঁড়াভাঙা চিরুনি সস্তা দামের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো আয়না দু'চারটে টিপ-বোতাম আর সেফটিপিন,—এমনি আরও এটা ওটা। স্টীলের ট্রাঙ্ক খোলা পড়ে রয়েছে কাপড়চোপড়ও আছে তার ভিতরে, আছে কিছু কিছু টুকটাক সামগ্রী, কিন্তু আমি ওগুলো আর নাড়াচাড়া করিনি। ট্রাঙ্কের তলার দিকে আমার খান তিনেক ধুতি আর পাঞ্জাবি বিশেষ যত্নে পাট ক'রে রাখা ছিল, এবং তারই পাশে একটা পুঁটলিতে ছিল একগোছা টাকার নোট। এ টাকা কিষণের, আমি জানতুম। কিষণের মাসিক বেতনের টাকা হেনার কাছেই জমা হচ্ছিল।

কিষণকে ডেকে বললুম, তোর খাতে অনেক টাকা জমেছে রে। টাকা নিবি?

কিষণ থমকিয়ে প্রশ্ন করল, ক্যা হোগা রুপেয়া সাব?

কেন খরচ করবি! ঝাঁসিতে গিয়ে সিনেমা দেখবি, হোটেলে ভালমন্দ খাবি, মোটর চড়বি,—মন্দ কি?

কিষণ কতক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাল। পরে বলল, নহি সাব, কোই জরুরৎ নহি!

আমি ক্লান্ত হয়ে হেনার চৌকি-খানার ওপর বসলুম। কিছুক্ষণ পরে কিষণ আমার জন্য চা তৈরি ক'রে নিয়ে এল। ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, ঘরসংসারে কি তোর মন নেই, কিষণ?

কথাটা বুঝতে না পেরে কিষণ একটু অবাক হয়ে তাকাল,—ক্যা সাব?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আমি বললুম, চল্ কিষণ, আবার আমরা যাই সেই গড়মুক্তেশ্বরে, নয়ত হরিদ্বারে,—সেখানে গিয়ে আবার দোকান দিইগে। তুই রুটি ভাজবি, আমি আটা শানব। যাবি কিষণ?

নহি, সাব। মাতাজি যব তক নহি লওটেঙ্গে—

আরও কি যেন কিষণ বলতে গেল, আমি গলাটা পরিষ্কার ক'রে বললুম, মাতাজি হয়ত আর ফিরবে না, কিষণ!

কিষণ আবার আমার দিকে তাকাল। পরে বলল, আপনি এসব কথা একেবারেই ভাববেন না। মাতাজি ঠিক আসবেন। য়্যায়সা কর্বাক্ত নহি হো শক্তা, সাব।

আমি চা খেয়ে বাইরে গেলুম। কিন্তু বাইরেটা দেখলে আজকাল আমি যেন ভয় পাই। চারিদিকে করাল চক্ষু মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রেতচ্ছায়ার মতো অগণিত জিজ্ঞাসার চিহ্ন! তাদের প্রশ্নগুলি জানি, তাই নিজের মুখেই বিড়বিড় করে তাদের জবাব দিয়ে যাই। হেনার চলে যাবার আগের দিন রাতে তার অসুস্থ দেহটাকে আমি কোলে টেনে নিয়েছিলুম,—কিন্তু সেই দেহে কি সাড়া জাগাতে পেরেছিলুম?

সে যে আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেনি তার কি কোনও প্রমাণ পেয়ে-ছিলুম? যে-দেহটা বুকের মধ্যে নিয়ে পরম অমৃতের আস্বাদ পাচ্ছিলুম, সেটা কি জীবন্ত ছিল, না শুধু মৃতদেহ? নিস্তরঙ্গ, নিরাবেগ এবং নির্লিপ্ত সেই রাত্রির রহস্যময়ী হেনা কি ভিতরে-ভিতরে আপন আক্রোশে দগ্ধ হচ্ছিল? কই, টের পাইনি ত? তবে কি এই কথাই জেনে রাখব আমি তার নিদ্রিত অগ্নিবাসনাকে উজ্জীবিত করার জন্য বনান্তরের মতো অন্ধকারে লেহন করছিলুম? কই, হেনা ত' তার চির-দিনের অভ্যাসমতো সেদিন আমাকে সতর্ক করেনি!

নিজের প্রতি ঘৃণায় আমার সর্ব-শরীর যেন কিলবিল করতে লাগল। একথা বিশ্বাস ক'রে নিতে আমার বাধল না যে, আমার প্রতি অসহ্য ঘৃণার ফলেই হেনা আমাকে চিঠি দেয়নি, এবং আমার ন্যায় এক পশুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

রাজাসাহেবের কাছে একথা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল, সুকেতগড়ের যিনি প্রাণপ্রতিমা, তিনি আর ফিরবেন না। অন্তত দীর্ঘকাল অবধি তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। পাছে আমি বিব্রত বোধ করি এজন্য শিবন্তী অথবা মণি-প্রসাদও এসব আলোচনা থেকে বিরত রয়েছে। আমি নিজে কতকগুলি প্রাত্যহিক তদন্তের কাজে লিপ্ত থাকি। চিকিৎসা কেন্দ্রটির সঙ্গে একটি প্রসূতি-সদন সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। কুটির-শিল্পের মধ্যে মাদুর, শতরঞ্চি, গামছা ও তাঁতের কাপড়,—এগুলির একত্র কাজ চলছে। রং প্রস্তুতের কাজটি জমে উঠেছে। ঘি মাখন তৈরি হচ্ছে। পিতল ও তামার বাসন, লোহার তাওয়া, বালতি ও গাগরি,—এগুলির কারখানায় সবাই কর্মব্যস্ত। কর্মীমাত্রই বেতন-ভোগী। কিন্তু উৎপাদিত সামগ্রীগুলি বিক্রি হবার পর যে লভ্যাংশ থাকে তার থেকে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ পায় কর্মীরাই। এই প্রতিষ্ঠানের দ্রুততর উন্নতি ঘটেছে এই কারণেই। হেনার হাতে ছিল এই বিরাট ও জটিল অঙ্কের হিসাব। আমার কাছে এর অনেকটাই দুর্বোধ্য। মণিপ্রসাদ মাঝে মাঝে আমাকে এখানকার লাভ-লোকসান এবং আয়ব্যয়ের হিসাবটি সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা পায়।

আমি যে কাজে আছি সে আমার নিজের নয়—এই ভাবনাকে এড়ানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। এ কাজ হেনার, এ পরিকল্পনাও তার, আমি এর পরিচালক মাত্র। আমি সরকারি কর্মী, এবং আমার কর্মধারা ভিন্নপ্রকার। হেনা ছিল এর মধ্যে, তাই আমি এসেছিলুম। সে এখানে চিরকাল থাকবে, এই সর্তেই এখানে আমি জীবন কাটাতে চেয়ে-ছিলুম। সমস্ত কাজের মধ্যে তার স্পর্শ পেতুম, সেই কারণে এই প্রতিষ্ঠান জীবন্ত ছিল। আজ সুকেতগড়ের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে এর প্রাণ-

হীনতাটাই আমার চোখে পড়ছে। আমি এর গুরুভার থেকে মুক্তিকামনা করছি। সুকেতগড় চিরস্থায়ী হোক, কিন্তু আমি তার তলায় চাপা পড়তে পারিনে।

আমার ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। রাজাসাহেব জানতেন, আমি দিল্লী ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু তাঁর ধারণা, সুকেতগড়কে ছেড়ে আমি বেশিদিন কোথাও থাকতে পারব না, শীঘ্রই আবার আমি আসব। দিল্লী থেকে সুকেতগড়ে এসে পৌঁছতে মোট উনিশ-কুড়ি ঘণ্টা লাগে। প্রতি মাসে অন্তত বার দুই এসে মণিপ্রসাদকে শলা-পরামর্শ দিয়ে যাব, এটি সকলের ইচ্ছা।

আমার ধারণা ছিল, তিনচারজন প্রাণী ছাড়া আমার যাবার সংবাদ অপর কেউ জানে না। সে ধারণা আমার ভুল। চাষী ও মজুর থেকে আরম্ভ করে কামারশালার লোক পর্যন্ত দেখা করে যেতে লাগল। অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে আসতে লাগল উপহার। গোটা কয়েক ফুলের মালা পর্যন্ত জুটে গেল। আমি নিতান্ত নির্বোধ নই। আমি জানি এগুলি সবই হেনার প্রাপ্য। নিজে তাকে দিতে পারল না এই কারণে আমার ভিতর দিয়ে তার কাছে পৌঁছনো। পুতুলের সামনে পুজো দিয়ে প্রাণ-প্রতিমার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য পাঠানো!

সেদিন মাধবেন্দ্র এবং রত্না দেবী হঠাৎ আমার ঘরের সামনে এসে গাড়ি থামালেন। আমার ঘরটি বড় গরীব, তার ওপর এলোমেলো এবং অগোছাল। ওঁরা এসে ঘরে ঢুকতেই আমি হাসিমুখে বললুম, এ ঘর কিন্তু রাজারাজড়ার উপযুক্ত নয়। কোথায় আপনাদের বসাব?

মাধবেন্দ্র বললেন, আপনার পাশেই আমরা বসতে জানি, মিঃ চৌধুরী।

রত্না দেবী হাসিমুখে বললেন, এঘরটি আমাদের কাছে নতুন নয়। এ তীর্থে অনেকবার এসেছি।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, এই ঘরে কতদিন হেনা বহেনের সঙ্গে শলাপরামর্শ তর্কবিতর্ক করে গেছি। তখন আমরা মেঝেতে বসতুম চৌকিও ছিল না।

মাধবেন্দ্র বসলেন একখানা খুরসি টেনে নিয়ে। বললেন, সুসংবাদ দিতে এলুম কিনা জানিনে, তবে খবরটি এই, দিল্লী থেকে আজ টাকা এসে পৌঁছেছে। ঠিক টাকা অবশ্য নয়, টাকার পরোয়ানা।

বললুম, শুনে সুখী হলুম, রাজাসাহেব।

রাজাসাহেব বললেন, কিন্তু এ টাকার সঙ্গে আমাদের ব্যথা জড়িয়ে রইল, মিঃ চৌধুরী। টাকা পেলুম, কিন্তু খুব সম্ভব হেনাদিদিকে হারালুম!

আমি নতমুখে চুপ করে রইলুম।

রাজাসাহেব একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, একটি অনুরোধ আপনাকে করব, সেটি আপনাকে রাখতে হবে।

আমি মুখ তুললুম। রত্না দেবী বললেন, এ অনুরোধ আমারও।

বেশ ত', বলুন?

মাধবেন্দ্র বললেন, আপনারা আমার এখান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন, এটি আমরা কোনওমতেই সইব না। বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাস আপনাদের দুজনকে নিয়ে নতুন ক'রে লেখা হবে। আপনাদের স্বার্থত্যাগ ও সেবাব্রত চিরদিন সবাই মনে রাখবে।

বললুম, আপনাদের ভালবাসা যাঁর পাবার কথা—

রত্না দেবী বললেন, হ্যাঁ, আপনার মারফত তাঁকেও জানাতে চাই।

মাধবেন্দ্র এবার বললেন, আগামীকাল আমার বাড়ির নাটমন্দিরে আপনার জন্য একটি বিদায়-সম্বর্ধনার আয়োজন করেছি আপনাকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে!

আমি হাসলুম, বললুম, আমাকে মাঝখানে বসিয়ে আপনারা মুখের ওপর সুখ্যাতি করতে থাকবেন, আর আমাকে মুখ বুজে সেগুলি গিলতে হবে? আপনারা জানেন কি, সম্বর্ধনা মানেই অত্যুক্তি?

রত্না দেবী খুব হেসে উঠলেন।

রাজাসাহেব বললেন, আমার অনুরোধ এখনও শেষ হয়নি। সুকেতগড়ের নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমরা আপনার হাতে একটি টাকার তোড়া উপহার দেবো, সেটি আপনি গ্রহণ করলে আমরা কৃতার্থ হব!

কথাটায় চমক লাগল। বললুম, এটি যে বকশিস মনে হচ্ছে, রাজাসাহেব! এটিতে কিন্তু হেনা দেবী আঘাত পেতে পারেন!

কিন্তু আমাদের এই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন গ্রহণ না করলে আমরাও যে ব্যথা পাব, মিঃ চৌধুরী! —রাজাসাহেব বললেন, একথা আমাদের কেবলই মনে হবে আমরা আপনাদের দুজনকে সর্বস্বান্ত ক'রে ছেড়েছি।

আপনাদের ভালবাসা কি টাকার চেয়ে বড় নয়?

রত্না দেবী বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু জনসাধারণের চক্ষু ত মন বিচার করে না, বস্তু বিচার করে। ওই টাকার তোড়ার সঙ্গে সকলের ভালবাসাই জড়ানো থাকবে। এ উপহার আপনাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, দাদাজি।

এর পরে আমার কি বলা উচিত কিছু ভেবে না পেয়ে আমাকে চুপ ক'রে যেতে হল।

আরেকটি কারণে আমরা আপনার কাছে এসেছি। —বলে মাধবেন্দ্র হাসলেন।

সেটি কি প্রকার? —আমিও হাসলুম।

রত্না দেবী বিনা ভূমিকায় বললেন, একটি ভিক্ষা দিন—

ভিক্ষা? —একটু অবাক হয়ে বললুম, রাজারানীকে ভিক্ষা? কৌতুক মন্দ নয়?

রত্না দেবী বললেন, তামাশা করলেও হাত পাতবো। কিষণকে ভিক্ষা দিন।

মানে—?

রাজাসাহেব বললেন, ছেলেটিকে বড় ভাল লেগেছে আমাদের। এমন গুণবান বালক সচরাচর চোখে পড়ে না। ওকে আমরা পালন করতে চাই। একটি উদ্দেশ্যও আছে আমাদের।

এবার হেসে উঠলুম। বললুম, উদ্দেশ্যটা আমার অজানা নয় রাজাসাহেব। কিষণের চেহারাটি অতি সুশ্রী। আপনার কন্যাটির সঙ্গে বেমানান হবে না!

রত্না দেবী বললেন, আমার মেয়েটি এই বারোয় পড়েছে।

বললুম, এই খবরটি শুনে হেনা দেবী খুব খুশী হবেন।

মাধবেন্দ্র বললেন, আমাদের বাড়িতেই ত' কিষণ পড়াশুনো করে। তা সেদিন ওকে জিজ্ঞেস করলুম, চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কি তুমি দিল্লী চলে যাবে, কিষণ? কিষণ তৎক্ষণাৎ বললে, আমি আর কোথাও যাব না। —আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন যাবে না? কেন? তিনি তোমার মনিব। কিষণ জবাব দিল, আমার মাতাজির হুকুম এখানেই থাকব। এ আমার মাতাজির কর্মভূমি।

আমার গলার ভিতর থেকে কিছু একটা উঠে এসেছিল, কিছু বলতে পারলুম না। রত্না দেবী ও মাধবেন্দ্র আনন্দিতচিত্তে একসময় বিদায় নিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

॥ সার্থবাহ ॥

স্পেনের উপন্যাস

বিদেশী চলচ্চিত্রের আনুকূল্যে কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে বসে বুলফাইটের চমকপ্রদ দৃশ্য আমরা অনেকেই দেখেছি। সত্যই জীবন নিয়ে খেলা! বালিঢালা, বৃত্তাকার ক্রীড়াক্ষেত্রে সভ্য মানুষ আর বন্য বৃষ লড়তে আসে। তোরেরো বা বৃষ-শত্রুর বাম হস্তে তলোয়ার, দক্ষিণ হস্তে লাল আংরাখা বা মুলেতা। মুলেতা নাচিয়ে নাচিয়ে তোরেরো বৃষকে নির্দয়ভাবে ক্ষিপ্ত করতে থাকেন, নাকচ করেন তার প্রতিটি গোঁ-ধরে তেড়ে-আসা বেগ, আপন আস্ফালনের ভারে কাবু হতে দেন নির্বোধ ষণ্ডকে। এবং পরিশেষে তলোয়ারটি বিদ্ধ করেন তার হৃদ্‌পিণ্ডে।

এই বুলফাইটের জন্মভূমি স্পেন এবং এখনো স্পেনের জাতীয় জীবনে বৃষ-যুদ্ধ বা করুরিদা দে তোরোস একটি সঙ্গত প্রমোদের স্থানে অধিকার করে আছে। স্পেন, অর্থাৎ রোমকদের সেই প্রাচীন 'হিস্পানিয়া'; দোন কিহোতে * ও সাঞ্চো পান্থার দেশ।

বৃষযুদ্ধের তাৎপর্য যদি দুঃস্বপ্নময় পশু পরাক্রমকে মানুষের শক্তির কাছে হারমানান হয়, তবে থেরবানতেসের উপন্যাসেও আমরা পাই বাস্তব ও মানবিক জীবনেরই আরেক জয়ের ইঙ্গিত : কাল্পনিক, উদ্ভট বা অলীকের শত্রুতা পর্যুদস্ত করে বাস্তববোধ ও সুবুদ্ধি ষোড়শ শতাব্দীর ঐ রোমান্সেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ স্পেনের ভাবনার জগতে এই মতো মানুষিক কর্ম ও প্রতিভার কাছে বর্বরতার নিধন হওয়া জীবনসংগ্রামের নামান্তর। এই সক্রিয়তা স্পেনীয়দের জীবনবোধকে বহুকাল ধরে চঞ্চল ও সজীব রেখেছিল। আর, বলা যায় যে এই সক্রিয়তার অভাবেই আধুনিক স্পেনের সাহিত্য, বিশেষতঃ উপন্যাস, অনেকাংশে ব্যাহত। জীবনযাপনপদ্ধতির যে-প্রবলতায়, বাস্তবের যে-প্রখর অধ্যয়নে থেরবানতেস ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনে উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেছিলেন, সেই সাধনা হিস্পানী উপন্যাসের বিশশতকী রূপায়ণে অনুপস্থিত।

'লা বিদা এস সোয়েনিও,' বা 'জীবনটা স্বপ্ন' সপ্তদশ শতকের নাট্যকার, কালদেরণের একটি নাটকের নাম ছিল। এই শিরোনামায় এ যুগের মহত্তম হিস্পানী, উনামুনোও একটি রচনার প্রেরণা পেয়েছেন। মনে হয়, জোরালো এক জীবনচর্যার ফাঁকে ফাঁকে এইরূপ অস্পষ্ট বিরাগ, যার মূলে আরবী ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়, স্পেনের শিল্পীকে থেকে থেকে নাড়া দিয়েছে এবং বর্তমান কালেও স্পেনের মানসলোকে— হয়ত উনামুনোর দর্শন মারফতই,— একজাতীয় বাস্তববিমুখতা সৃষ্টি করেছে যা উপন্যাস-সাহিত্য নির্মাণে সহযোগিতা করে না।

> 'সার্থবাহ' নামের আড়ালে জনৈক বহু-ভাষাবিদ তরুণ অধ্যাপক একে একে অনেকগুলি ইউরোপীয় সাহিত্যের রত্নাবলীর সঙ্গে পরিচয় ঘটাবেন আমাদের।
>
> সম্পাদক 'অমৃত'

উক্ত ভূমিকা অবশ্য পুরো হতাশা-ব্যঞ্জক নয়। কারণ বর্তমানকালে স্পেনের উপন্যাস-সাহিত্য য়ুরোপীয় উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে যতোই অপুষ্ট হোক না, তা একেবারে নৈরাশ্যজনক বা কক্ষচ্যুত নয়। কিন্তু ভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল। কারণ মদ্য, গীটার, নাচ, বুলফাইট আর কমলালেবুর দেশ বর্ণময় স্পেন, তার মাদ্রিদ ও বার্থেলোনার মত শহরগুলির রোমাঞ্চকর, জটিল পরিবেশ নিয়ে উপন্যাসের রসদ যোগাতে যথেষ্ট অকুণ্ঠ হবে এমন ধারণা পোষণ করা সাধারণের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কার্যতঃ কিন্তু বিশ শতকের হিস্পানী উপন্যাস নিস্তেজ, অবিচিত্র এবং বহুলাংশে অপরিণত। এর কারণ পূর্বোক্ত বাস্তববিমুখতা ত' বটেই, কিন্তু তার আগে আরও একটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্পেনের চিন্তাজগতে একটা বিশিষ্ট দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বৃহত্তর য়ুরোপের প্রভাব সম্বন্ধে স্পেন বিরুদ্ধভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। প্রগতিশীল জীবনযাত্রার ও মননের যে আলোড়ন তখন সারা য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়েছিল, তার ঢেউ স্পেনের অন্তরাত্মাকে কলুষিত করে দেবে এই আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন স্পেনের রক্ষণশীল গোষ্ঠী বা কাসতিথিসতাস্। তাঁরা স্পেনের দেশজ ঐতিহ্যকে য়ুরোপীয়তা অর্জন করাতে নারাজ ছিলেন। আরেকদিকে অবশ্য য়ুরোপীয়তা অর্জনের তাগিদ নিয়ে কতিপয় লোক কাসতিথিসমোর বিপক্ষতা করেছিলেন। এই দ্বন্দ্ব স্পেনের পক্ষে সুফলপ্রসূ হতে পারত না কিছুতেই এবং তা হয়ওনি। কারণ, শেষপর্যন্ত, কতকটা আমাদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের মতন, য়ুরোপীয়তায় বিলম্বিত দীক্ষা ঘটল স্পেনের।

স্পেনে উপন্যাসের অগ্রগতি কাসতিথিসমোর রুগ্ন মানসিকতায় নিশ্চয় ব্যাহত হয়েছিল। এক হিসেবে এই কাসতিথিসমোর জন্যে স্পেনের শিল্পসাধনা বিশ শতকের শুরু থেকে গৃহযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত প্রায় ৪০ বৎসর য়ুরোপীয় ভাবনার ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছিল। কাসতিথিসমোর প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়াতে হয়েছিল উনামুনো থেকে ওর্তেগা ই গাসেত্ পর্যন্ত স্পেনের চিন্তানায়কদের এবং সাম্প্রতিক হিস্পানী উপন্যাসের পথ পরিবর্তন হল স্পেনের সেই রক্ষণশীলতা থেকে য়ুরোপীয় কেন্দ্রত্বে পৌঁছানোর সাধনা।

এই শতাব্দীর শুরুতে স্পেনের বেশ ক'জন ঔপন্যাসিক সরল, সাহিত্যিক যশোপ্রার্থীর দায়িত্বে লিখছিলেন। য়ুরোপীয় উপন্যাসের ঐকান্তিক নিরীক্ষা-পরীক্ষার যে দায় জয়স, মান বা ফকনরের, সে দায় এ'দের কারুকে তাড়িত করেনি। এ'রা স্পেনের দেশজ আবহাওয়ায় ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসে মনোনিবেশ করেছিলেন, যদিও এ'দের মধ্যে অন্ততঃ দুজনের নাম করতে হয় যাঁদের বাস্তববোধ প্রায়-

---

* য়ুরোপীয় উপন্যাসের জনক, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় থেরবানতেস (Cervantes) -এর দুই অমর চরিত্র : **Don Quijote & Sancho Panza !** এই য়ুরোপীয় নামগুলির প্রচলিত বাঙলা সংস্করণ হল সারভান্তিস, ডন কুইক্সোট এবং সাঙ্কো পাঞ্জা। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধমালায় য়ুরোপীয় নামধামের উচ্চারণ সেই দেশের রীতি অনুসারেই অপরিবর্তিত রাখা হবে।—লেখক

যুগোপযোগী আয়তন লাভ করে। বিথেন্তে ব্লাসকো ইবানিয়েথ ও বেনিতো পেরেথ গালদোস। ইবানিয়েথ অপেক্ষা গালদোস নিঃসংশয়ে বড় শিল্পী হলেও, প্রথমজন তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মননেও লোমহর্ষকের আমদানি করতে পারতেন বসাল্লভাবে এবং তাই দ্বিতীয়জনের চেয়ে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। ইবানিয়েথের জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে হলিউডের দৌলতেঃ তাঁর 'সাঙ গ্রে ই আরেনা' (রক্ত ও বালুকা) 'লোস কুয়াত্রো হিনেতেস দেল আপোকালিপ্‌সিস' (আপোকালিপসের চার ঘোড়সওয়ার)-এর মার্কিন ফিল্ম সংস্করণ হয়।

গালদোস প্রথমতঃ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় 'রোমান্স' রচনার প্রয়াস করেছিলেন। (প্রসঙ্গতঃ হিস্পানীর চোখে ইংরেজী 'রোমান্স' আর 'উপন্যাসে' খুব প্রভেদ নেই; আর এই 'রোমান্স' রচনার তাগিদও হিস্পানীর পক্ষে যে দুর্মর তার প্রমাণ সেনিয়র মাদারিয়াগা। সালভাদর দে মাদারিয়াগা অক্সফোর্ডের স্প্যানিশ-বিদ্যার অধ্যাপক, নামজাদা শেক্সপীয়র-সমালোচক, কবি ও রাজনীতিবিদ এবং ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় সিদ্ধহস্ত।) জাতীয়তাবাদের নানা দিক, সমাজ-সংস্কারের উপায় চিন্তা এবং সর্বোপরি চরিত্রসৃষ্টি গালদোসের রচনায় আকর্ষণীয়ভাবে ধরা পড়ে। 'দোনিয়া পেরফেক্তা' ও 'গ্লোরিয়া' থেকে 'ফোরতুনাতা ই হাথিনতা' পর্যন্ত গালদোসের ঔপন্যাসিক বিবর্তন উন্নতিতে চিহ্নিত। গালদোসের প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন হিস্পানী সমালোচক যে-কথা বলেছেন তা উপন্যাস-শিল্পের টেকনিকগত বিষয়ে সর্বকালেই স্মর্তব্য। গালদোসের ঔপন্যাসিক হিসাবে সার্থকতা, উক্ত সমালোচকের মতে, উদ্ভূত হয়েছিল তাঁর একটি তথাকথিত দোষ থেকে —দোষটি গালদোসে কাব্যের অভাব *। গালদোস প্রোপাগ্যাণ্ডার গদ্যে লিখতেন এবং সেই কারণেই হয়ত তাঁর অনেক চরিত্র নির্মমভাবে বাস্তবসম্মত, অলংকরণ বা কাব্যিক ঔজ্জ্বল্য তাতে নেই।

ইবানিয়েথ ও গালদোস ছাড়া ও-সময়ের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক আরো তিনজন মোটামুটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেনঃ পালাথিও বাল্‌দেস, পিও বারোহা এবং মিগোয়েল দে উনামুনো। শেষোক্ত জন অবশ্য দার্শনিক হিসাবেই সুপরিচিত, তবু হিস্পানী উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য রকমের। এবং পিও বারোহাকে শ্রীযুক্ত জে বি প্রিস্টলে যদি বা ডিকেন্সের সমগোত্রীয় বলে রেহাই পান, উনামুনোর পংক্তি নির্ধারণ করতে তিনি অক্ষম।

সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক (পরে রেক্টর) মিগোয়েল দে উনামুনো পশ্চিম য়ুরোপের এক খ্যাতনামা দার্শনিক। ১৯৩৬-এর শেষদিনে, স্পেনের জাতীয়তাবাদীদের নজরবন্দী থাকাকালীন, এঁর মৃত্যু হয়। একাধারে পণ্ডিত, অধ্যাপক, দার্শনিক, প্রবন্ধকার, কবিত্বময় উনামুনো তাঁর জীবনে বেশ ক'খানি উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক দুইই হিস্পানী উপন্যাসের আচরিত শিল্পে উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, উনামুনোর উপন্যাসের ভাবগত বৈশিষ্ট্য। নেহাত উপাখ্যান নিয়ে তাঁর উপন্যাসের সঞ্চার হলেও, তার পরিণতি যেন অনিবার্যভাবে কোনও একটা ধারণার বিশ্লেষণেই পৌঁছে যায়। বোধ হয় উনামুনোই 'রোমান্সের' দায়মুক্ত হিস্পানী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে!

সমানে দার্শনিকত্ব ও কবিত্ব বজায় রেখে উনামুনো উপন্যাসের মাল-মশলা যোগাড় করেন যে-জীবন থেকে তা সরাসরি বস্তুতান্ত্রিক না-হলেও রূপকথার জীবন নয়। সে-জীবন ঘটনাবহুল এবং স্বকীয় সম্পদে মহনীয়। কিন্তু যে-চোখে উনামুনো জীবনকে দেখেছিলেন তাতেই ছিল এক অতীন্দ্রিয় আচ্ছন্নতার ঘোর, যার ফলে সত্য আর প্রহেলিকার তফাতটা তাঁর কাছে হারিয়ে যেত। পরিচিত ও সর্বথাগ্রাহ্য বাস্তব ছাড়া উনামুনো প্রায়-মরমীর আতিশয্যে অন্যতর বাস্তবের অস্তিত্বও সমঝাতে চাইতেন তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের এবং সে-সঙ্গে পাঠকদেরও। এই অস্বচ্ছতা তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস 'আমর ই পেদাগোহিয়া' (প্রেম ও শিক্ষণ) কিংবা 'পাথ এন লা গোয়েরো' (যুদ্ধে শান্তি)-তে প্রকট না হলেও, ১৯১৪-তে প্রকাশিত 'নিয়েবলা' (কুয়াশা)-তে এমনই বেমানান স্থায়িত্ব পায় যে উনামুনো উপন্যাসটিকে রক্ষা করতে গিয়ে এক আজগুবি genre discrimination-এর শরণস্থ হন। জেম্‌স জয়স যেভাবে 'পোমেস্‌' নামকরণ করেন তাঁর 'এক পেনিতে লেখা একটা কবিতাগুলির' (সম্ভবতঃ poems আর ফরাসী pommes, 'আপেল'-এর যোগফল?), সেইভাবে 'নিয়েবলা'-কে যথাযথ উপন্যাস বলে অভিহিত করতে না পেরে উনামুনো তার সাহিত্য-সত্তা নির্ণয় করেন 'নিভোলা' এই আবিষ্কৃত নাম দিয়ে। স্পেনের 'নভেলা' বা উপন্যাস, ও 'নিয়েবলা' বা কুয়াশা,—এই দুয়ের যোগে 'নিভোলা'র উৎপত্তি। জীবনের ব্যাখ্যাতা উনামুনো যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই এই

* G. Martinez Sierra : Obras Completas : MOTIVOS, Madrid, 1920.

'নিভোলা'র আলো-আঁধারিকে লালন করেছেন।

উনামুনো-বর্ণিত বস্তুজগৎ ও নিসর্গ তাদের বাহ্যিক স্বরূপের উপর যেন অন্তর্চেতনার এক ছায়াচ্ছন্নতা মাখে : নরনারীর বাসনা, কামনা আর নিয়তির ক্রিয়াকলাপের যে কথকতা উনামুনো করেন তাতে বৈজ্ঞানিক কূটিলতা নেই, আছে এক প্রগাঢ় সারল্য, যার সঙ্গে মিশে আছে কোনও অতল বিস্ময়বোধ। এ ধরনের বর্ণনায় কবিতার কলা ঔপন্যাসিকের পক্ষে অব্যবহার্য ত' নয়ই বরং উনামুনো যেন গালদোসের পূর্বোক্ত সার্থক 'অকাব্যিকতার' বিরোধিতা ক'রে, তাঁর 'ত্রেস নোভেলাস এথেম্‌প্লারেস ই উন প্রোলোগো' নামক সঙ্কলয়িতায় উপন্যাসকে সোজাসুজি কবিতার, ঔপন্যাসিককে কবির, সমান করে তোলেন।

উনামুনোর সবচেয়ে সার্থক উপন্যাস বোধ হয় 'আবেল সাঞ্চেথ'। বাইবেলের আবেল ও কেনের উপাখ্যানটির এক আধুনিক অনুসৃতি উনামুনোর 'আবেল সাঞ্চেথ' আধুনিক স্পেনীর জীবনে পুরাকালীন সেই ভয়াবহ অসূয়ার মাৎসর্যের কাহিনীটি খুঁজে বার করেছে। কাহিনীর সারমর্ম হল এই—আবেল সাঞ্চেথ আর হোয়াকুইন মোনেগ্রো—এ দুই হিস্পানী, ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব যাদের, বড় হয়ে তাদের বিভেদটা টের পেল জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। আবেল বিদ্যাবুদ্ধিতে ও চারিত্র্যে হোয়াকুইনের নাগাল পায় না বটে, কিন্তু সমাজ-সংসারে তার আদর আর হোয়াকুইনের কোণ-ঠাসা হওয়া যেন পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। হোয়াকুইনের প্রথম প্রেম এলেনার সঙ্গে সেই এলেনা নির্মমভাবে তাকে নাকচ ক'রে স্বামিত্বে বরণ করল আবেলকে। হোয়াকুইনের সঙ্গত ঈর্ষাকে যেন আরো উস্কানি দেবার জন্যেই একদিন আবেল বন্ধুকে পড়তে দিল বায়রণের কাব্যনাট্য 'Cain : A Mystery !' হোয়াকুইন যদি আবেলের প্রতি তার ঈর্ষার উন্মেষে প্রথমটা হতচকিত দুর্বল বোধ করে থাকে, অ্যাডামপুত্র ভ্রাতৃহন্তা কেনের বায়রণিক ভাষ্য প'ড়ে সে টের পেল যে, ভাগ্যের চক্রান্ত [illegible] বঞ্চনা যোগাতে নেহাত খামখেয়ালীই করে, তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানার যুক্তি আর থাকে না। তাই হোয়াকুইনের মত্তা- ঈর্ষা [illegible] পেল [illegible] উঠল তার নির্দোষ বন্ধু [illegible] [illegible] এক [illegible] বিনাশ। [illegible] আগে আরো এগিয়ে এলো দুই বন্ধু, আবেল আর হোয়াকুইন। চিত্রকর আবেলের পুত্র আর চিকিৎসক হোয়াকুইনের কন্যা অসম অভিভাবকত্বের নানা ঝকমারি সহ্য করে বয়োপ্রাপ্ত হল। হোয়াকুইনের কন্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করল আবেলের পুত্রকে। কিন্তু যে অন্তর্নিহিত কলুষতা হোয়াকুইনকে এই রকম সংশ্লেষের দিকে টেনে এনেছিল, নিয়তি যেন সেই কলুষ ঈর্ষার পরিসমাপ্তি চাইল না। তৃতীয় পুরুষে, নাতি এসে হোয়াকুইনকে আরো একবার বুঝিয়ে দিল যে ছবি-আঁকা দাদুকে নাড়ী-টেপা দাদুর চেয়ে ভাল লাগে। পরিশেষে একদিন বচসার শেষে হোয়াকুইন আবেলের গলা টিপে ধরল, আবেল মারা গেল।

'আবেল সাঞ্চেথ'-এর পরিকল্পনায় অবশ্য উনামুনো যেমন সাহায্য পেয়েছেন তাঁর নিজস্ব বিষাদ-ভাবনার (দেল সেন্তিমিয়েন্তো ত্রাজিকো) তেমনি তাঁকে সাহায্য করেছেন উনিশ শতকী দু'জন কবি, বায়রণ ও বোদলেয়ুর। উনামুনো 'আবেল সাঞ্চেথ' প্রসঙ্গে বলেন যে, হোয়াকুইনদের জীবনেই বেঁচে থাকার মহত্তর সংস্থান, আর পাপের যে পরিবেশ তাতে ছোট ছোট কেনের সঙ্গে ছোট ছোট আবেলরাও খেলছে।

ঈশ্বর-নিন্দার ঝাঁঝ উনামুনোতে অশোভন, নয়ত তাঁর 'আবেল সাঞ্চেথ' বোদলেয়ুরের 'আবেল ও কায়্যাঁ' কবিতার দুই অদ্ভুত জাতির (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অপূর্ব অনুবাদে 'সুয়োরাণী মায়ের ছেলে' আর 'দুয়োরাণী মায়ের ছেলে') ক্ষমাহীন দ্বন্দ্বের কালাপাহাড়ী ভাষণ, যার প্রকৃত আবেগ কবিতার শেষ দু পংক্তিতেই :

কেনের-গোষ্ঠী, স্বর্গে চ'ড়ু,
ভুঁয়ে ছুঁড়ে ফ্যাল ভগবান!

মাদারিয়াগা তাই উনামুনোকে 'স্পেনের দন্তয়ভস্কী' আখ্যা দেন।

উনামুনোর সমসাময়িক অন্যান্য হিস্পানী ঔপন্যাসিকদের আর দু'জনের নাম করলে স্পেনের প্রাক্‌-গৃহযুদ্ধ পর্যায়ের প্রখ্যাত, কথাশিল্পীদের মোটামুটি পরিচয় শেষ হয়। এঁরা হলেন : রামন মারিয়া দেল বালিয়ে—ইনক্লান ও রামন পেরেথ দে আইয়ালা। এই গোষ্ঠীর মধ্যে তরুণতম, আইয়ালার ঝোঁক [illegible] বিদ্রূপাত্মক রচনার দিকে। বালিয়ে-ইনক্লান বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত জীবিত থাকলেও উপন্যাসের মাধ্যমে জিইয়ে রেখেছিলেন শিল্পের সেই ক্ষয়রোগকে যার আসল বীজ নিহিত আছে অষ্টাদশ শতকে।

গৃহযুদ্ধের বৎসরগুলি স্পেনে উপন্যাসের পক্ষে বড় নিষ্ফল কাল। ফরাসী প্রতিরোধ-সাহিত্যের তুল্য কোনও আভাঁ-গার্দ স্পেনের ঐ সঙ্কটের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায়নি। কোনও ভোরকর রা আরাগঁ-র হদিশ মেলে না ও-সময়ের হিস্পানী সাহিত্যে। ১৯৩৬-এ ফ্রাঙ্কোর 'ফালানহিস্তা'দের হাতে লোরকার মৃত্যু সমস্ত হিস্পানী সাহিত্যের যেন বাক্‌-রোধ ঘটাল। উনামুনো ও আইয়ালা এবং পরে লোরকা যে অগ্রগতির সূচনা করেছিলেন তা থেকে সরে গিয়ে আলবের্তি বা বারোহা, হোর্জে গুইল্লেন বা রোসা চাথেল হিস্পানী সাহিত্যকে যুগযন্ত্রণার কবল থেকে সাময়িক মুক্তি দেবার চেষ্টা করলেন। পপুলার ফ্রন্টের পরাজয় স্পেনে সাহিত্যকে আরো নির্জীব করল এবং হিস্পানী লেখকরা হয় মৌন অবলম্বন করলেন সন্ত্রস্তভাবে, কিংবা হিমেনেথের সাবেকী চালে শান্তি খুঁজলেন। অধুনাতম কালে হিমেনেথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাটি ছাড়া তেমন তাৎপর্য-পূর্ণ কিছু বোধহয় যুদ্ধোত্তর স্পেনের সাহিত্যে ঘটেনি। সাহিত্যের দুর্গতিতে আহত বোধ ক'রে সেন্সর-প্রিয় সরকার পর্যন্ত স্পেনের লেখকদের সুযোগ-সুবিধা দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এমনকি 'এদিতোরা নাথিয়নাল' (জাতীয় প্রকাশ) নামে এক সংস্থারও পত্তন করলেন স্পেনের সরকার। কিন্তু তেজালো সেন্সরের লঘুকরণও হিস্পানী লেখকদের সরকারী সাহিত্য-সেবার সহযোগিতা করতে শেখাল না। অনুন্নত উপন্যাস সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল।

কবিতার বই অবধি দক্ষিণ আমেরিকায় প্রকাশিত করতে হল নির্বাসিত শিল্পীকে। অবশ্য ১৯৫০-এর পর থেকে স্পেনের দূষিত সাহিত্যিক আবহাওয়া ক্রমে অপসৃত হচ্ছে : মাদ্রিদের সরকার রাশ ঢিলে করে দিয়েছেন, হয়ত বা কৃষ্টির মুখ চেয়েই! সাম্প্রতিক কালে অন্ততঃ দুজন হিস্পানী ঔপন্যাসিকের লেখা য়ুরোপের সাধুবাদ লাভ করেছে : কামিলো হোসে থেলা ও মাস আউব। স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত আউবের ট্রিলজি—'কাম্পো থের়্রাদো' (আটক দেশ), 'কাম্পো দে সাঙগ্রে' (রক্তাক্ত দেশ) ও 'কাম্পো আবিয়ের্তো' (খোলা দেশ) হিস্পানী উপন্যাসে উজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি। এই সূত্রে উল্লেখনীয় ইংলণ্ড-প্রবাসী হিস্পানী আর্তেরো বারেয়ার রচনাবলী বিশেষতঃ তাঁর আত্মজীবনীর সুরে-সাধা তিন খণ্ড উপন্যাস।

ফলের রস

পশুপতি ভট্টাচার্য

বর্তমান যুগে ফল খাওয়ার দিকে অনেকেরই ঝোঁক হতে দেখা যাচ্ছে। সকলেই এখন বুঝেছে যে, ভাত, ডাল, মাছ, তরকারি প্রভৃতি রান্না-করা খাদ্য ছাড়াও গাছের ফল প্রভৃতি কিছু অকৃত্রিম প্রাকৃতিক খাদ্যও খাওয়া দরকার। শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এখন ভিটামিন-চেতনা জেগেছে। আমরা এখন জানতে পারছি যে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে সকল রকম প্রয়োজনীয় খাদ্য ছাড়াও কিছু ভিটামিন খাওয়া দরকার,—অথচ কোনো জিনিসকে রাঁধতে গেলেই তার ভিতরকার অনেক ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে সেই কারণেই স্বাভাবিক অবস্থাতে ফল প্রভৃতি খাওয়ার এত প্রয়োজনীয়তা। আমরা এখন জানতে পারছি যে, প্রকৃতি আমাদের শস্যাদি দিয়েছে রেঁধে খাবার জন্য, আর ফলাদি দিয়েছে না-রেঁধে প্রাকৃতিক অবস্থাতেই খাবার জন্য।

কিন্তু ফলগুলি গোটা অবস্থায় চিবিয়ে খাওয়া ভালো, না রস করে খাওয়া ভালো? এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে এখন জাগছে।

অবশ্যই ফলকে চিবিয়ে খাওয়া সবচেয়ে ভালো। তাতে তার যা কিছু সারবস্তু সমস্তই পাওয়া যায়, কোনো জিনিসটাই বাদ যায় না। তার ভিটামিন, তার ধাতব সম্পদ, তার প্রোটিনাদি, তার সারক বস্তু সবগুলিই আমাদের কাজে লাগে। সাধারণ পক্ষে বলতে হয় যে, ফল জাতীয় খাদ্য সোজাসুজিভাবে চিবিয়ে খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ফলের রস করে খাওয়া সম্বন্ধে অর্থাৎ ফলকে ছেঁচে বা থেঁতো করে বা নিংড়ে তার রসটি বের করে নিয়ে তা পান করার সপক্ষেও অনেক কথা বলবার আছে। প্রথমত, চিবিয়ে খেতে গেলে কিছু মেহনত করতে হয়, এবং তাতে খানিকটা সময় দিতে হয়। এখনকার দিনে অনেকেরই বসে বসে ফল চিবিয়ে খেতে থাকার মতো সময়ের অভাব। রস করে খাওয়া হলে সেই মেহনত ও সময়টুকু বেঁচে যায়। দ্বিতীয়ত, ফল চিবিয়ে খেতে হলে অনেকটা পরিমাণেই খেতে হয়, তাতে ফলের দ্বারাই এমন পেট ভরে যায় যে, অন্যান্য খাদ্য খাবার জায়গা থাকে না। কিন্তু যদি তার রস করে খাওয়া যায় অর্থাৎ পানীয়রূপে খাওয়া যায়, তবে অল্প খেলেই ফল খাওয়ার কাজ হয়ে যায়; সাধারণত ফলের রস আধ কাপের মতো খেলেই যথেষ্ট, তার বেশী দরকার হয় না। আহারে বসে প্রথমেই আধ কাপ পরিমাণে কোনো ফলের রস খেয়ে নিলাম, তাতে গলাটাও ভিজলো, ফলের ভিটামিনগুলিও খাওয়া হলো এবং তারপর অন্যান্য খাদ্য যথারীতি খেতে শুরু করলাম। এতে কাজও হয়, পেটও ভার করে না। অবশ্য ফলকে নিংড়ে খেলে তার কতক কতক জিনিস ছিবড়ার সংগে বাদ পড়ে যায় কিন্তু আসল জিনিস ভিটামিন বাদ যায় না।

এই সকল কারণে অনেক সময়ে ফল খাওয়া অপেক্ষা ফলের রস করে খাওয়াই সমীচীন হয়। অবশ্য এমন ফলও আছে যার রস করে খাওয়া চলে না। যেমন, কলা, যেমন লিচু। এগুলি আস্তই খেতে হবে, তদ্ভিন্ন উপায় নেই।

আস্ত ফলের মধ্যে থাকে পেক্টিন, ক্যালসিয়ম, সালফর, ফসফরাস এবং অ্যামিনো-অ্যাসিড বা প্রোটিন যথা লাই-সিন, ট্রিপটোকেন ও মেথিওনিন। ফলের রসের মধ্যে পূর্বোক্ত জিনিসগুলির পরিমাণ কতকটা কমে যায়, কিন্তু ফসফরাস ও প্রোটিন পুরোই থাকে, সুতরাং রস নিংড়ে খেলে ঐগুলি বরং বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায়।

কেবল ফলই নয়, কোনো কোনো কাঁচা তরকারি এবং শাকসব্জিও ছেঁচে রস করে নিংড়ে খাওয়া যায়। তরকারির মধ্যে বীট

জিনিসের নাম করা যায়—টোম্যাটো এবং গাজর। এই দুটি জিনিসের রস সংগ্রহ করা সহজ, এবং তা বিশেষ উপকারী। শাকসব্জির মধ্যেও দুটি জিনিসের নাম করা যায়—বাঁধাকপি ও পালংশাক। এগুলিকে ছেঁচেও যথেষ্ট রস বার করা যায়। এই সব রসের মধ্যে প্রচুর ক্যালসিয়ম, লৌহ ও সি এবং বি ভিটামিন মেলে।

ফলের মধ্যে রস করে খাবার উপযুক্ত ফল—লেবু, আম, কাঁঠাল, তাল, আনারস, তরমুজ, খরবুজা, আঙুর বেদনা। আর দুটি জিনিসের নাম করা যায় যা ঠিক ফলের রস না হলেও ফলের রসের মতোই উপাদেয়। একটি হলো আখের রস, আর একটি খেজুরের রস। আখ নিংড়ে রস করে খাওয়া পশ্চিম দেশে খুবই প্রচলিত, এবং তা সদ্য সদ্য নিংড়ে খাওয়া হয়, তার জন্য একরূপ যন্ত্রও ব্যবহার করা হয়। খেজুরের রস বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে শীতকালে অনেকেই খেয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে শর্করা ও ভিটামিন যথেষ্টই থাকে।

বলা বাহুল্য, ফলেরই হোক বা অন্য কিছুরই হোক, তার রস করে খেতে হলে সদ্য সদ্য তা নিংড়ে বার করেই খাওয়া উচিত। রস বার করে অধিকক্ষণ ফেলে রাখলে বাতাস লেগে তার অনেক গুণ নষ্ট হয়ে যায়, এবং তার মধ্যে বীজাণু প্রভৃতি প্রবেশ করে তা মহা অনিষ্টকারীও হতে পারে। অনেকে আম, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতির রস অনেক আগের থেকে তৈরি করে রাখেন এবং খাবার সময় তা পরিবেশন করেন। এরূপ ব্যবস্থা নিরাপদও নয়, উপকারীও নয়। অনেকে তা রেফ্রিজারেটরে রাখেন বটে, কিন্তু তাও বহুক্ষণের জন্য রাখা যুক্তিযুক্ত নয়।

আজকাল ফলাদি থেকে পুরোপুরিভাবে রস নিংড়ে বের করবার উপযোগী যন্ত্রও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। একটি যন্ত্র কিনে রাখলে বহুকাল তার দ্বারা কাজ চলে। ঐরূপ যন্ত্রের সুবিধা এই যে, তার দ্বারা সকল রকম জিনিসেরই রস নিঃশেষে বার করা যায়, এবং ফলের খোসাগুলিও তাতে বাদ যায় না।

ফলাদির রসের দ্বারা নানারূপ রোগের চিকিৎসারও সাহায্য হয়ে থাকে। আমাদের দেশের কবিরাজেরা তাঁদের ওষুধের অনুপান হিসাবে বহু প্রকার শাকপাতার রস ছেঁচে খাবার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, অনেক স্থলে ওষুধ অপেক্ষা অনুপানের মাত্রাই অনেক বেশী হয়। তাঁরা বলেন যে, ঐরূপে সদ্য সদ্য ছেঁচে বার-করা রসের অনুপান ব্যতীত তাঁদের ওষুধের কাজই ভালো হয় না। আর আমরা সকলেই জানি যে, টাইফয়েড রোগে চিবিয়ে খাবার কোনো পথ্যই দেওয়া যায় না। তখন ফলের রস ও পানীয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনো পথ্য দেওয়া নিষিদ্ধ।

তদ্ভিন্ন আরো অনেক রকম ব্যাধিতে ফলের রসের ব্যবস্থা করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। রাশিয়াতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক রক্তচাপবৃদ্ধিতে অন্যান্য খাদ্য বন্ধ রেখে কেবল ফলের রসের ব্যবস্থা করে দেখেছেন, যেখানে রক্তচাপের মাত্রা কোনো ওষুধে কমানো যায় না সেখানে এই ব্যবস্থায় তা কমে। হার্টের রোগেও এইরূপ ব্যবস্থায় ফল পাওয়া গেছে। আরো একরূপ অস্বাভাবিক অবস্থাতে এর দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া গেছে—স্থূলতা। ভাত রুটি খাওয়া বন্ধ করে কিছুদিন যদি দুধ ও ফল এবং ফলের রস খেয়ে থাকা যায় তবে স্থূলতা শীঘ্রই কমে গিয়ে দেহ স্বাভাবিক হয়ে যায়।

হাঁপানি, মাথাধরা এবং অনিদ্রা রোগেও এতে সারে। আমেরিকাতে এই সকল ব্যাধির শতজন রোগীর উপর এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। ওষুধের দ্বারা যখন তাদের কষ্ট দূর করা গেল না, তখন সকল খাদ্য বন্ধ করে কিছুদিন তাদের ফলের রস খাইয়ে রাখা হলো। যখন তারা সুস্থ বোধ করতে লাগল তখন ধীরে ধীরে তাদের স্বাভাবিক খাদ্য দিতে শুরু করা হলো।

আরো এক রকম রোগে পরীক্ষা করা হয়েছে, কোনো ফলের রস নয়, কিন্তু কেবল বাঁধাকপির রস দিয়ে। পরীক্ষা করা হয়েছে পেটের আলসার রোগে। গ্যাসট্রিক আলসার রোগে কেবল দুধের পথ্য দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়াতে তেরো জন আলসার রোগীকে দুধ ছাড়া প্রচুর পরিমাণে বাঁধাকপির রস দেওয়া হতে লাগল। মাত্র পনের দিন পরে এক্স-রে পরীক্ষায় দেখা গেল যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পেটের ভিতরকার ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেছে। যে ডাক্তার এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি বলেন যে, বাঁধাকপির রসে প্রচুর পেক্‌টিন থাকে। সেই পেক্‌টিন পেটের ভিতরকার ঝিল্লীগাত্রে একরূপ প্রলেপের মতো লেগে থাকে এবং ঘায়ের সমস্ত বিষাক্ত রসকে টেনে নেয়, তাতেই ঘা এত শীঘ্র শুকিয়ে যায়।

আরো একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা ক্যান্সার রোগে বিশেষ ফল পেয়েছেন। তিনি এই নিয়ে একটি বই লিখেছেন। তিনি তাঁর ক্যান্সার রোগীদের কেবল ফলের রস ও আনাজ প্রভৃতির রস খাইয়ে রাখেন। তিনি বলেন যে, এতে সোডিয়ম খাওয়া একেবারে বাদ হয়ে যায়, তাতেই বিশেষ উপকার হয়। কেবল ফলের রস নয়, অনেক কাঁচা জিনিসের রস তিনি তাদের খেতে দেন।

কাঁচা জিনিসের রস খেয়ে অনেক রকম রোগে উপকার হতে আমরাও দেখেছি। যে সকল পুরোনো যক্ষ্মারোগীর কাশের সঙ্গে রক্ত ওঠে, তাদের প্রত্যহ তাজা দূর্বোঘাসের রস ছেঁচে খেতে দিয়ে দেখা গেছে, তাতে তাদের রক্ত বন্ধ হয়েছে ও তারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়েছে। কাঁচা করলার রস খেয়ে ডায়েবিটিস রোগীকে আরোগ্য হতে দেখা গেছে।

যাই হোক, মোটের উপর ফলের রস ও কাঁচা আনাজাদির রস খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। অন্ততপক্ষে কিছু পরিমাণ ফলের রস সকলে না হোক অনেকেই প্রত্যহ খাবার ব্যবস্থা করতে পারে। জল যেমন ঢক্‌ঢক্‌ করে এক গ্লাস খেয়ে ফেলা যায়, ফলের রস অতটা খাওয়া প্রয়োজন হয় না, বরং বেশী খেলে অনিষ্ট হতে পারে। আধ কাপ মাত্রায় ফলের রস খেলেই যথেষ্ট।

স্নবতত্ত্ব

রত্নাকর

'স্নব' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কেন যে নেই ভেবে পাই না—বাংলাদেশে স্নবের তো দেখি অভাব নেই।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছিলেন আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সব কিছুই তরজমা—হয় একেলে বিদেশী থেকে নয় সেকেলে স্বদেশী থেকে। কথাটা পুরো সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি স্নবারি বস্তুটা আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে নিয়েছি, কিন্তু বিনে তরজমায়। প্রতিশব্দের অভাবটা বোধ হয় সেই কারণেই।

তবে প্রতিশব্দ না থাক, ইংরেজি-বাংলা অভিধানে স্নব কথাটির অর্থ-নির্দেশ আছে—তা হচ্ছে বড়োলোক-ঘেঁষা মানুষ। কিন্তু এ অর্থনির্দেশ গ্রহণযোগ্য নয়। যে লোক ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন বোনে সে নিশ্চয়ই স্নব। কিন্তু যে লাখ টাকার গদিতে শুয়ে প্রলেটারিয়াট বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে চায় তাকে আমরা কি বলব? কিংবা যাঁরা পঁচিশ কি পঁয়ত্রিশ টাকার টিকিট কিনে ক্রিকেট মাঠে ঢুকে সারাদিন খানাপিনা করেন এবং পরের দিন খবরের কাগজ দেখে জেনে নেন কে কেমন খেলেছে, যাঁরা নীল আলো জেলে লেবু-চা খেতে খেতে চোখ বুজে 'মুনলাইট সোনাটা' শোনেন এবং সমঝদারের মত মাথা নাড়েন কিন্তু অস্থানে বা যাঁরা সিজারের পাওনা চুকিয়ে দেবার জন্যই আর্ট একজিবিশনে হাজিরা দেন বা মিউজিক কনফারেন্সে নিশি জাগেন তাঁদেরই বা স্নব ছাড়া আর কি নামে আখ্যাত করব?

অক্সফোর্ড ডিকশনারী লিখেছে সামাজিক মর্যাদা বা কাঞ্চন-কৌলীন্যের ওপর যার মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা আছে বা সামাজিক কুলপঞ্জীতে যারা খাটো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে যে লজ্জিত আর যারা উঁচু তার সঙ্গে যার ব্যবহার দাসসুলভ, যে বাইরেকার লক্ষণ দেখেই বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে—সেই স্নব। এ-অর্থনির্দেশ আমার হাতের কাছের ইংরেজি-বাংলা অভিধানের থেকে আরও একটু ব্যাপক সন্দেহ নেই এবং ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে হয়ত সত্যও ছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মানুষের সমাজ বদলায়, রুচি-অভিরুচি বদলায়—বদলায় সেই সঙ্গে ফ্যাশনও। আর ফ্যাশনের সঙ্গে স্নবারির যে একটা আত্যন্তিক যোগ আছে তাতো সুবিদিত।

নীলরক্তের স্নবারি এককালে আমাদের ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করত—আজকের গণতন্ত্রের থুড়ি সমাজতন্ত্রের, বাজারে তা মেকী পয়সা। হাওয়া এখন বরং উল্টো দিকে। ব্যাঙাচির মত ল্যাজ খসিয়ে ব্রাহ্মণের অন্ত্যজ সমাজে জলচল হওয়া বা রাজা-মহারাজা খেতাবের পৈতে গলা থেকে খুলে ঘুন্সির মত কোমরে জড়িয়ে প্রলেটারিয়েট বনে যাওয়ার দৃষ্টান্তও আজকের যুগে বিরল নয়। কাজেই অক্সফোর্ড ডিকশনারীকেই বা বেদবাক্য বলে মেনে নেই কি করে!

কিন্তু শব্দতত্ত্বের আলোচনা আর টেনে বড়ো না করলেও চলবে। আমরা এখানে কোন দর্শনের তত্ত্ব প্রতিপাদন

করতে বসি নি। কাজেই সংজ্ঞা যদি নিশ্ছিদ্র নাও হয় তাতে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তা ছাড়া সংজ্ঞার ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে স্নবারির মতো অতবড় একটা বিষয়কে আঁটানো সম্ভবও নয় হয়তো।

থ্যাকারে এক সময় স্নবারির মহাভারত রচনার প্রয়াস করেছিলেন কিন্তু বায়ান্নো দফা ফর্দ রচনা করেই ঘায়েল হয়ে তাঁকে থামতে হয়েছিল। বলতে হয়েছিল, গড়তে হবে পীরামিড আর আমি মাত্র বায়ান্নটা ইঁট সাজিয়েছি। অতএব মানে মানে এইখানেই থেমে যাওয়া শ্রেয়।

স্নবারির একটা নিশ্ছিদ্র সংজ্ঞা খোঁজা বা যতরকমের স্নবারি আছে তার একটা প্রমাণ-সাইজের তালিকা করতে যাওয়া সত্যিই পণ্ডশ্রম। আসলে পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যা নিয়ে স্নবারি করা অসম্ভব এবং আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর স্নব। একটু অতিশয়োক্তি হল সম্ভবত। এমন কতগুলি রোগ আছে, আলডাস হাক্সলি বলেছিলেন, যা নিয়ে কাউকে স্নবারি করতে দেখা যায় না। কুষ্ঠরোগ নিয়ে কেউ বড়াই করছেন, একথা ভাবা যায় না। তবে কি না, সামান্যোক্তি মানেই কিছুটা অতিশয়োক্তি। কুষ্ঠরোগ না হোক, যক্ষ্মা-রোগ-স্নব বিরল নয়। এমন লোক আমাদের অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে, বিশেষ করে অল্পবয়স্কদের মধ্যে—কীটসের মত কুসুমিত যৌবনে মরে যাওয়ার কল্পনা যাদের রোমাঞ্চিত করে। মোপাসাঁ নাকি উপদংশ রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। এমন কথা অনেককে বলতে শুনেছি, উপদংশের দংশনই নাকি তাঁর কলমকে দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি লিখিয়ে নিয়েছে। যাঁরা এমন কথা বলেন তাঁদের উপদংশ-স্নব বলতে বাধা কী? যাঁরা পুরোন বাড়ি ভেঙে নতুন ডিজাইনের বাড়ি করেন, পুরোন গাড়ি বাতিল করে লেটেস্ট মডেলের গাড়ি কেনেন, চলনে-বলনে বসনে-ভূষণে যাঁরা সব সময় নিভাঁজ মডার্ণ হতে চেষ্টা করেন তাদের আমরা অনায়াসে বলতে পারি মডার্ণিটি-স্নব। আর্ট-স্নব আছে দু'রকমের। এক দলকে বলা যেতে পারে নিষ্কাম আর্ট-প্রেমিক। আর্ট একজিবিশনে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখে আর তা নিয়ে আলোচনা করেই এ'রা খুশি থাকেন। অন্য দল—তাঁদের কি নাম দেব? সকাম আর্ট-প্রেমিক?—বুঝুন আর না বুঝুন, এ'রা ছবি কিনে বেড়ান। কেননা, ছবি শুধু রুচির নয়, সামাজিক মর্যাদারও বিজ্ঞাপন। ভালো ছবির দাম যে বিস্তর। তেমনি অনেকে বই কেনেন, পড়বার জন্যে নয়, ঘর সাজাবার জন্যে। 'পয়সাতো সকলেই রোজগার করতে পারে—কিন্তু কালচার?' ছবি, বই—এ-সবই কি কালচারের বিজ্ঞাপন নয়? এ'দের যদি কালচার-স্নব বলি— দোষ হবে কী? তবে হয়ত এক্ষেত্রে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে। কালচার-স্নব আমরা কে নই?

কিন্তু না, তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। স্নব অসংখ্য। স্নবারিরও আছে নানা রকমফের। আর স্নব নিয়ে স্নবারি করা নিরর্থক। কেননা, স্নব এবং স্নবারির কিছু সামাজিক প্রয়োজনও আছে।

মডার্ণিটি-স্নব আছে বলেই অর্থনীতির চাকা ঘুরছে। যাঁদের গাড়ি কেনার পয়সা আছে—একটা গাড়ি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যদি তাঁরা আর একখানা গাড়ি না কিনতেন তাহলে গাড়ি যারা তৈরী করে তাদের ব্যবসা কি করে চলত? সেক্ষেত্রে গাড়ি-নির্মাতাকে হয়তো শ' কথিত রেকেজেস লিমিটেডের মত প্রতিষ্ঠান সত্যি সত্যি খুলতে হত—চালু গাড়িকে অচল করে দেবার জন্য। সকাম আর্ট-স্নব আছে বলে শিল্পীরা তবু দুটো পয়সা পান। লোকে ঘর সাজাবার জন্য বই কেনে তাই লেখকেরা খেয়ে-পরে আছেন।

স্নবারির স্বপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি এই যে, সমাজে তা কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। হাক্সলির ভাষায় বলা যায়, অনেক মাছি থাকলে কুকুর যেমন ঘুমোতে পারে না, অনেক স্নবারি থাকলে সমাজও তেমনি সারাক্ষণ জেগে থাকে। যে কোন রকমের স্নব হতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। সামাজিক স্নব সব সময় "সিংহ শিকারের" ধান্দায় ঘোরে। মডার্ণিটি-স্নবের অষ্টপ্রহর দুশ্চিন্তা থাকে—যুগের থেকে সে পেছিয়ে পড়ল কিনা। আর চিন্তা (এবং দুশ্চিন্তাও) যে এক ধরণের কাজ কে তা অস্বীকার করবে?

আর কাজের যদি নিজস্ব কোন সদর্থক মূল্য থাকে তাহলে মানতেই হয় সব স্নবারিই ভালো—কেননা সব স্নবারিই মানুষকে কোন-না-কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে।
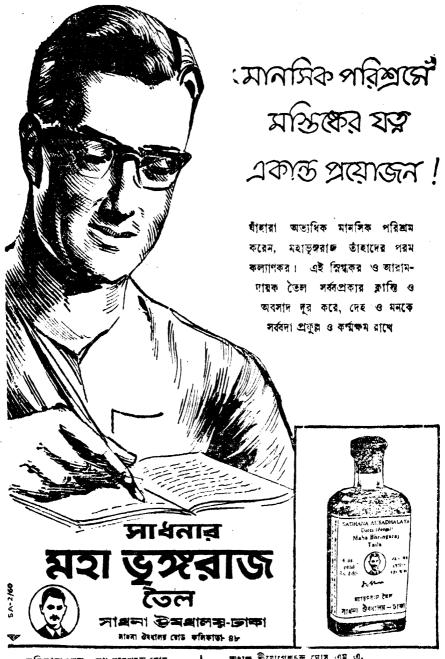
দেশে বিদেশে

॥ ব্রেজিল ॥

দক্ষিণ আমেরিকায় রাষ্ট্রবিপ্লব একরকম দৈনন্দিন ব্যাপার। ওখানকার রাষ্ট্র-বিপ্লব অনেকটা পুতুল নাচের মতো; কার অঙ্গুলি নির্দেশে এই সব উদ্ঘটন ঘটে। জনসাধারণের সঙ্গে এই সব ওলট-পালটের কতটা সংশ্রব বা সম্পর্ক বলা কঠিন। তাই ব্রেজিলের অঘটনটিও বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের পুনর্বিন্যাস উপেক্ষণীয়ও নয়। প্রেসিডেণ্ট কোয়াড্রস পদত্যাগ ক'রে বলেছেন, আমি প্রতিক্রিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছি। তিনি ঘোষণা করেন যে, চেম্বার অব ডেপুটিজের স্পীকার রেনিয়েরি মেজিলি অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট-রূপে কার্যভার নিচ্ছেন, লোকে যেন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তাঁর এই আবেদন সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। সংবাদে দেখা যাচ্ছে কয়েকশত বিক্ষোভকারী রিও-ডি-জেনেইরোতে মার্কিন দূতাবাস আক্রমণের চেষ্টা করে। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই ছাত্র। কোয়াড্রস মন্ত্রিসভার সব মন্ত্রীও অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট রেনিয়েরি মেজিলির কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা অগ্রাহ্য করার অধিকার পার্লামেণ্টের, সেনাবাহিনীর নয়। ব্রেজিলের সেনাপ্রধান ভাইস-প্রেসিডেণ্ট গুলার্টের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণের কথা আছে। এদিকে ব্রেজিলিয়ান কংগ্রেস পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। এমন কথাও হচ্ছে যে, অন্তত সাংবিধানিক কাঠামোয় কোয়াড্রসের শাসনদণ্ড পুনর্লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।

অর্থাৎ, গোলমালটার সূত্র অনুমান করা যাচ্ছে এবং কোন প্রতিক্রিয়ার কাছে কোয়াড্রস পরাজিত হলেন তাও যেন স্পষ্ট হয়ে আসছে। পরদিনই এক নির্ভরযোগ্য মহলের সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল ওডিলিও ডেনিসের নেতৃত্বে এক সামরিক গোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকার এও আর একটি লক্ষণ। জেনারেল ডেনিস কোয়াড্রস সরকারেরই যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন এবং রেনিয়েরির অস্থায়ী সরকারেও সেই দপ্তরের মন্ত্রী। আর দু'জন মন্ত্রী এডমিরাল সিলভিও হেক ও জেনাঃ গ্রুন মসও তাঁদের স্ব স্ব দপ্তর আগলে আছেন। সংবাদ এই যে, এঁরা ভাইস প্রেসিডেণ্ট গুলার্টকে প্রেসিডেণ্ট পদ অধিকার করতে দেবেন না। তিনি চীনদেশ সফরে গেছলেন এটি তাঁর একটি অপরাধ হ'য়ে আছে। গুলার্টের সমর্থকেরা বলছেন, গুলার্টকে প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণে বাধা দিলে ভারী গোলমাল হবে। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলছেন, গুলার্টকে বাধা দিলে পৃথক সরকার গঠন করা হবে। কংগ্রেসকে জরুরী অবস্থার ঘোষণার জন্য বলা হয়েছে। এবারে সেই পুতুল নাচের কথাটা। মার্কিন সরকার প্রেসিডেণ্ট কোয়াড্রসের পদত্যাগ ঘটিয়েছেন, আমেরিকার রাষ্ট্রদপ্তর এমন কথা সরাসরি অস্বীকার করেছেন। কম্যুনিস্ট সংবাদপত্রের এ অভিযোগ মিথ্যা—রাষ্ট্রদপ্তর থেকে একথাও জানানো হয়েছে। কিন্তু অবস্থা এমন যে, কোয়াড্রস ব্রেজিল ত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। তিনি থাকলে তাঁর উত্তরাধিকারীর পক্ষে তা বিঘ্নস্বরূপ হ'তে পার। শ্রমিকেরা জঙ্গী ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন, সামরিক কর্তৃপক্ষ বলছেন, সব ঠিক হ্যায়। গুলার্টের সুবিদিত বিরোধী গয়ানবারার রাজ্যপাল রেডিও, টেলিকমিউনিকেশান প্রেস অফিস প্রভৃতি দখল করেছেন। ফেডারেল সেনাবাহিনী কিছু বলেনি। যোগাযোগটা যেন স্পষ্ট।

॥ কঙ্গো ॥

কঙ্গোর রাষ্ট্রনীতিতে কাটাঙ্গার বিরোধ একটি বড় রকমের উৎকণ্ঠা। কঙ্গোর বৈঠক, পার্লামেণ্ট গঠন, প্রতিনিধিত্ব কোনো-কিছুতেই যে কাটাঙ্গার প্রীতিপদ কিছু থাকে না। একটা কিন্তু থেকেই যায়। আভ্যন্তরীণ বা আন্তরিক যা-ই হোক, এখানে যে বেলজিয়ানদের প্রাধান্য এটি সুবিদিত। সুতরাং, শান্তি-প্রতিষ্ঠার নামে অনেকেই মনে করেন, বিদেশী প্রভাবের কাঁটাটি সর্বাগ্রে না তুলতে পারলে সাম্রাজ্যবাদের আঁশটে গন্ধ কিছুতে যাবে না। ওখানে যে রাষ্ট্রপুঞ্জের খবরদারি সেনাদল আছে তাদের প্রতিনিধি মিঃ এস ও'ব্রায়েন মিঃ শোম্বেকে অবস্থার অবনতি নিবারণের সাহায্যে লিওপোল্ডভিলে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন। কাটাঙ্গা সরকার এটিকে চরমপত্র ব'লে অভিহিত করেছেন। মিঃ শোম্বেকে অনুরোধ করা হয়েছে তিনি যেন এসে কেন্দ্রীয় কঙ্গোলীজ সরকার মিঃ এডুলার সঙ্গে কথা কন। তা যদি তিনি না করেন তবে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীকে এডুলা সরকারের অনুকূলে নিয়োগ করা হবে এবং কাটাঙ্গার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। মিঃ শোম্বে জানিয়েছেন, তিনি বরং মৃত্যু বরণ করবেন কিন্তু হুমকিতে আপোষ আলোচনা করবেন না। তিনি কঙ্গো সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান চান, কিন্তু সেনাদের ভয়ে যদি সে সমাধান চাইতে হয়, তবে তিনি বরং মরবেন। তিনি হুমকিতে ভয় পান না,—আন্তর্জাতিক সংস্থার হুকুমে তিনি লিওপোল্ডভিলেও যাবেন না। তিনি মিঃ এডুলার কাছ থেকে কোনো আমন্ত্রণ পাননি।

এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ খবরদারিদল কাটাঙ্গার ১৩,০০০ পুলিশ ও সৈনাকে নিরস্ত্র করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। কাটাঙ্গার রাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, লিওপোল্ডভিলের জাতীয় পার্লামেণ্ট থেকে কাটাঙ্গার ডেপুটি ও সেনেটারদের চলে আসতে বলা হচ্ছে। বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সঙ্গে কথা বলা নিরর্থক। কাটাঙ্গার সৈন্যদের নিরস্ত্র করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ কঙ্গোলীজ সরকারকে ১৫০০ সৈন্য কাটাঙ্গায় পাঠাবার জন্য বলেছে। যদি তাই হয় তবে বলতে হয়, এ যুদ্ধ এবং "আমরা তীর-ধনুক নিয়েও লড়াই করব। সকল দেশবাসীকে অভ্যুত্থানের জন্য অনুরোধ করব।" এদিকে কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের আইরিশ সেনাদল বিমানবন্দরে কাটাঙ্গা পুলিশ দলকে নিরস্ত্র করেছে। দুইজন শ্বেতকায় অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছে। কাটাঙ্গী সেনাদল পরিখা খনন করছিল এবং নিষেধ মানছিল না। কাটাঙ্গীদের দিক থেকে বাধা এলে শ্বেতকায় অফিসারদের লক্ষ্য ক'রে গুলী ছোঁড়া হবে—এই আদেশ। মিঃ এডুলা জানিয়েছেন যে, তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জকে কাটাঙ্গা সেনাবাহিনী থেকে বিদেশী অফিসারদের অপসারণের অনুরোধ জানিয়েছেন। এই বিদেশী অফিসার বিতাড়নে রাষ্ট্রপুঞ্জের তৎপরতার কাছে মিঃ শোম্বে শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করেছেন এবং দেশবাসীকে শান্ত ও ভদ্র থাকবার জন্য অনুরোধ করেছেন। এর পর কাটাঙ্গা সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০ বেলজিয়ান অফিসারকে কর্মচ্যুত করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল ক'রে যে কয়েকজন বিদেশী অফিসারকে নিরস্ত্র করেন তার মধ্যে ইংরাজও আছে। তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে চায়নি, কিন্তু বলপ্রয়োগ করা হবে জানানো হলে রাজী হয়। মিঃ শোম্বে বলছেন, কাটাঙ্গার স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে ব'লে তিনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন।

॥ দুর্যোগ ॥

বেশ দুর্যোগের মধ্যে পড়া গেছে বলতে হবে। বেশী দামে (বা খুসী দামে) মাছ বেচতে দিতে হবে, নইলে মাছ বেচব না। বেশী দামে মাংস বেচতে দিতে হবে, নইলে মাংস একেবারেই বেচা বন্ধ ক'রে দেব। বেশী ভাড়া দিতে হবে, খুশিমতো যাত্রী নেব, নইলে ট্যাক্সি চালাব না। আমাদের দাবী মানতে হবে

নইলে ট্রাম চলবে না (এবং বেছে বেছে অফিস টাইমে)। ডিমের দাম চড়া, তরকারীর দাম চড়া। রাস্তায় জল জমলে, আবর্জনা জমলে বা আলো না জ্বললে, নালিশ করেছেন কি পাল্টা হুমকি—রবিবার আবর্জনা তুলব না, আলো জ্বালব না। এই সব দুর্যোগের মাঝে কলকাতার জীবন চলছে। তারপর যদি বর্ষা নামে সহরের জল আর সরে না, ট্রাম বাস আর চলে না; কিন্তু নাগরিককে চলতে হয়, কেননা, সে না চললে সংসার অচল হয়। এ নিয়ে অনেক হৈ-চৈ হয়, কাণ্ডারীহীন সাধারণ লোক নিষ্ফল ক্রোধে এগিয়ে আসে, নেতৃত্বের পরিধি বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দলগুলো ছুটে আসে, কিন্তু কোন ফল হয় না। আবার সব থিতিয়ে যায়, সব ঝিমিয়ে পড়ে, দুর্যোগের ক্যারাভান আপন মনে চলে। আজ মাছের দাম উঠেছে চার টাকা ছেড়ে আট টাকায়—যুদ্ধকালেও ১৯৪০ সালে আমরা মাছ খেয়েছি চার আনা সেরের। ডিম তরকারীর দর ঐ অনুপাত। মাংস বেচব না বলার অহঙ্কার কারও ছিল না। চালের দাম এখন ২৩-এর নীচে নেই; তখন তিন টাকায় চাল পাওয়া যেত—এক মণ! আজ ১৭ টাকার নীচে ভদ্রলোকের পরবার মতো ধুতি নেই, তখন ঐ কাপড়ই হ'ত দু টাকায়—একখানা নয়, এক জোড়া। দ্বিতীয়ত নাগরিক জীবনে সংঘবদ্ধতার এমন দাপট ছিল না। ট্যাক্সিওয়ালা যাত্রী পেলে একবারও গন্তব্যস্থল জানতে চাইত না, সানন্দে যাত্রী বহন করত। ট্রামে অসংখ্য রুটও ছিল না, গোণাগুণতি ট্রামও ছিল না, আর ট্রামকর্মীরা অফিস টাইম আর পুজোর টাইম বেছে বেছে আকস্মিক ধর্মঘটেও সাহস পেত না। হ্যাঁ, বেসরকারী বাসগুলোর নির্যাতন ও অভদ্রতা অস্বীকার্য; কিন্তু আজ রাষ্ট্রীয় পরিবহণই বা কোন্ স্তরে নেমে এসেছে? আজকে স্টেট বাস চলতেই একটা নরলোলুপ রাক্ষসের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্লাবন হয়, ঝড় হয়, প্রাকৃতিক কোনো তাণ্ডব হয়, বোঝা যায় এসব মানুষের সইতে হবে। অর্থনীতির যতই কচকচি আমরা যে তালিকাটি দিয়েছি তার কোনটি নিবার্য নয়? আসলে, আমাদের দ্রব্যোৎপাদন নয়, আমাদের পতন হয়েছে নৈতিক, যতই বিশ্বধর্ম আন্তর্জাতিকতার কথা বাড়ছে, ততই কাছেই মানুষটির কথা ভুলছি। প্রত্যেকের সম্মুখে যেন ঐ রেলের নোটিশটি ঝুলছে : চোর জোচ্চোর আর পকেটমার নজদিক হ্যায়।

॥ ডিপথিরিয়া ॥

কলকাতায় ডিপ্‌থিরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে এবং এই মৃত্যুকে যে নিবারণ করা বা প্রতিহত করা যাচ্ছে না, তার প্রমাণ গত দশ বছরে (১৯৫১ থেকে ১৯৬০) ২,৫০০ মৃত্যু ঘটেছে। গত বছর মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৮৪; এ বছরের প্রথমার্ধেই ২৪০ পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই হারে গেলে পূর্ণসংখ্যা হবে ৪৮০।

কথাগুলো করপোরেশনের সভায় উঠেছে এবং কয়েকজন ডাক্তার কাউন্সিলার এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সহরের নোংরা ও আবর্জনাকে এই রোগপ্রকোপের জন্য তাঁরা প্রধানত দায়ী বলেছেন। কিন্তু কলকাতার এই নোংরা ও আবর্জনা সরাবে কে? সুভাষচন্দ্রের মতো দৃঢ়চিত্ত লোকেরাই কাবু হ'য়ে গেছেন, করপোরেশনকে কর্তব্যনিষ্ঠ করা যায়নি। তাঁর সঙ্গে এখনকার ব্যক্তিদের তুলনা না করাই ভাল। অত দূরবর্তী দিন বাদ দিলেও বলা যায় গত পনের বছরে এমন একটি মানুষের আবির্ভাব হয়নি যিনি কলকাতাকে আবর্জনা, কলুষ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে পারেন। অতএব ও কথা বাদ দিয়ে আর কোন পথে বিশেষ ক'রে শিশুদের এই ভয়াবহ রোগ থেকে বাঁচানো যায় সেকথা ভাবতে হবে। কলেরা যেমন মোটামুটিভাবে গরীব-বড়লোক কিছু ভেদ করে, এ রোগ নির্বিচারে সকলকে আক্রমণ করতে পারে এবং ক'রে থাকে। কলকাতার আবহাওয়াটাই নানা কারণে কলেরা-বসন্ত-যক্ষ্মা-ডিপথিরিয়ার বীজাণুতে আকীর্ণ; এখানে তাই একমাত্র বাঁচার উপায়—টীকা নেয়া। কলেরা-বসন্ত-ডিপথিরিয়ার টীকা আছে; যক্ষ্মার বিসিজি আছে। তবু কলকাতায় এই কয়টি রোগই যে রকম মহামারীরূপে দেখা দেয় এমন আর কোথাও নয়। শ্রীরাজাগোপালাচারী তখন এখানকার রাজ্যপাল; সহরে প্লেগের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, লোকে প্লেগের টীকা নিচ্ছে। আতঙ্কিত এই নাগরিকদের উদ্দেশ করে তিনি একটি অনুষ্ঠানে বললেন, আপনাদের ভয় নেই। প্রথম যখন এখানে আসি এখানকার কলেরা-বসন্তের মৃত্যুসংখ্যা দেখি, তখন আমি হতবাক হ'য়ে যাই। অত মৃত্যু 'গা-সহা হ'য়ে' গেছে, কোথাও কোনো উদ্বেগ নেই, সে তুলনায় প্লেগের মৃত্যু কটা হয়েছে? সুতরাং, ধ'রে নেয়া যায়, ডিপথিরিয়া মহামারীমৃত্যুও আমাদের একদিন গা-সহা হ'য়ে যাবে—সপ্তাহে সপ্তাহে ওর পরিসংখ্যান সংবাদপত্রের একটা নগণ্য স্থান অধিকার করে থাকবে শুধু।

॥ রোম-বঙ্গ ॥

ইতালীর রোম সহরে একটি বিদ্যায়তন আছে; তার নাম ইটালীয়ান ইন্সটিটিউট ফর দি নীয়ার এণ্ড ফার ইস্ট। এর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডঃ গিউসেপ্পি টাক্কি। তিনি নিজে সংস্কৃত তিব্বতী চীন প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত। তিনি ভারতীয় ভাষা, বিশেষ ক'রে হিন্দী ও বাংলা ভাষা সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহশীল। ভারত সরকারের সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যে এখানে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে এসেছে। কিন্তু বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা দীর্ঘকালের মধ্যে করা যায়নি। গত দু'বছর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রীরবিউদ্দিন আহ্‌মেদ নামে এক পশ্চিমবঙ্গবাসী ইতালীয়ান ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করেছেন এবং এই যোগাযোগে তিনি ডঃ টাক্কির সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানে একটি বাংলা শিক্ষা বিভাগ খুলেছেন। তাতে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে এবং ইতালীয়ান ও ইউরোপীয়ান শিক্ষাভিলাষীরা এখানকার বাংলা ক্লাশে যোগ দিচ্ছেন। এই শিক্ষার্থীরা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা ও সাহিত্য জানতে চান।

শ্রীআহ্‌মেদ সম্প্রতি কলকাতায় আছেন। তিনি রোমের ঐ প্রতিষ্ঠানে একটি বাংলা গ্রন্থাগার খুলতে চাইছেন। তিনি আশা করছেন বাঙালী গ্রন্থকারগণ এই বিষয়ে তাঁকে তাঁদের বই দিয়ে সাহায্য করবেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে দু' হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এসব তথ্য সংবাদপত্রে পরিবেশন করেছেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজেও ঐ প্রতিষ্ঠানটির সদস্য। তিনি বলছেন, তিনি দু'বার ঐ বাংলা ক্লাশটি গত দুই বছরে দেখে এসেছেন, কাজ ভালই চলছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইতালীয়ান-ইউরোপীয়ানদের পরিচিত করতে হলে এমন একটি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা তিনি অপরিহার্য মনে করেন। তিনি এও আশা করেন যে, এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অগ্রণী হবেন এবং বাংলা শিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য ইতালীয়ানদের কলকাতা আসতে সাহায্য করবেন। বলাবাহুল্য, ডঃ চ্যাটার্জির এই প্রস্তাব সকলেই সমবেত কণ্ঠে সমর্থন করবে।

॥ ঘরে ॥

২৫শে আগষ্ট—৮ই ভাদ্র : 'পাঞ্জাবী সুবা' গঠন প্রশ্নে দিল্লীতে নেহরু-ফতে সিং আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত—মাষ্টার তারা সিং-এর (আকালী নেতা) অনশন অব্যাহত থাকিবে বলিয়া ঘোষণা।

২৬শে আগষ্ট—৯ই ভাদ্র : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের (৭৮) কলিকাতা বাসভবনে জীবনদীপ নির্বাণ।

দমদম বিমান বন্দরে মালবাহী ডাকোটা বিমান ধ্বংস—তিনজন বিমানকর্মী আহত —ছয় ঘণ্টার জন্য বিমান চলাচল বন্ধ।

তৃতীয় যোজনাকালে (পঞ্চ বার্ষিক) কলিকাতা—দিল্লী পথে তিনটি সড়ক নির্মাণ—ভারতীয় সড়ক ও পরিবহণ সংস্থার (কলিকাতা) সভায় কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের ঘোষণা।

২৭শে আগষ্ট—১০ই ভাদ্র : পশ্চিমবঙ্গে পরাজিত আসনগুলির (লোকসভা ও বিধানসভা) জন্য কংগ্রেস-প্রার্থী মনোনয়ন—১০৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০১টি কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা।

পাটের সর্বনিম্ন দর নির্ধারণের আবশ্যকতা নীতিগতভাবে স্বীকৃত—দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের আলোচনা।

গোয়া-দমন ও দিউ-এ পর্তুগীজ সরকারের সামরিক তোড়জোড়—'ন্যাটো'র সূত্রে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র মজুত ও সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধি—পার্লামেন্টে গোয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতির জের।

২৮শে আগষ্ট—১১ই ভাদ্র : আকালীদের পাঞ্জাবী সুবা প্রতিষ্ঠার দাবী প্রত্যাখ্যান—পাঞ্জাব পরিস্থিতি সম্পর্কে লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি —মাষ্টার তারা সিং-এর নিকট অনশন-ত্যাগের আবেদন।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী মৈত্রী (নির্বাচনী) গঠন সম্পর্কে ছয়টি দলে মতৈক্য —দুইটি দলের (এস ইউ সি ও ওয়ার্কার্স পার্টি) যুক্ত ফ্রণ্ট ত্যাগ।

২৯শে আগষ্ট—১২ই ভাদ্র : 'পাঞ্জাবী সুবার দাবী স্বীকৃত না হইলে অনশন পরিহার করিব না'—অনশনের পঞ্চদশ দিবসে সাংবাদিক বৈঠকে (অমৃতসর) মাষ্টার তারা সিং-এর ঘোষণা।

লোকসভা কর্তৃক 'ব্লিৎস' সম্পাদক শ্রীকরঞ্জিয়াকে ভর্ৎসনা—সংসদের অধিকারহানি ও অবমাননার জের।

৩০শে আগষ্ট—১৩ই ভাদ্র : 'যাহাই ঘটুক না কেন, জাতীয় সংহতির বৃহত্তর স্বার্থে পাঞ্জাবী সুবার দাবী স্বীকার করা অসম্ভব'—রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সুস্পষ্ট ঘোষণা।

'গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের ধর্মস্থানে প্রবেশে আইনত বাধা নাই'—মাষ্টার তারা সিং-এর (অনশনরত) বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী প্রসঙ্গে লোকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিবৃতি।

৩১শে আগষ্ট—১৪ই ভাদ্র : ভারতীয় সংসদে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে মাছের সর্বোচ্চ মূল্য (খুচরা) ঘোষণা—মৎস্য ব্যবসায়ী, বামপন্থী নেতৃবর্গ ও পৌর প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে অনুমোদন।

বহু বিতর্কিত ভারতীয় দণ্ডবিধি (সংশোধন) বিল লোকসভায় গৃহীত।

॥ বাইরে ॥

২৫শে আগষ্ট—৮ই ভাদ্র : 'পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ আত্মহত্যারই সামিল হইবে'—করাচীতে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের বক্তৃতা —ভারতের শক্তি বৃদ্ধির সংবাদে শেষ পর্যন্ত পাক প্রেসিডেন্টের চৈতন্যোদয়।

২৬শে আগষ্ট—৯ই ভাদ্র : সোম্বেকে (কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট) লিওপোল্ডভিলে গমনের জন্য চরমপত্র দান—কাতাঙ্গা বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ—কাতাঙ্গা মন্ত্রিসভা কর্তৃক চরমপত্র প্রত্যাখ্যান।

পশ্চিম বার্লিনে প্রবেশাধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারী—সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট পশ্চিমী শক্তিবর্গের জরুরী নোট।

২৭শে আগষ্ট—১০ই ভাদ্র : ব্রেজিলে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা গ্রহণ—অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট (রিনিয়েরী ম্যাজিলি) কর্তৃক সামরিক সরকার গঠন।

কাঠমাণ্ডু-এ নেপাল-চীন সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত—এভারেষ্ট প্রসঙ্গ ও ভারতের সহিত সাধারণ সীমান্তের প্রশ্ন অমীমাংসিত।

২৮শে আগষ্ট—১১ই ভাদ্র : পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে ব্যাপক সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা—রাজনৈতিক সমতা বিধানের নামে শ্বেতকায় পর্তুগীজদের সংখ্যা বৃদ্ধির মতলব।

২৯শে আগষ্ট—১২ই ভাদ্র : 'কাশ্মীর লইয়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হইলে দুইটি দেশই ধ্বংস হইবে'—লাহোরের জনসভায় পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

'বার্লিন সংকটের দরুণ রাশিয়া সামরিক প্রস্তুতি ও সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবে'—ক্রেমলিন হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে সংকল্প ঘোষণা—বার্লিনের প্রশ্নে পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতি পুনরায় কঠোর সতর্ক বাণী।

৩০শে আগষ্ট—১৩ই ভাদ্র : সোভিয়েট ইউনিয়নের পুনরায় পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত—অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন বোমা তৈয়ারীর পরিকল্পনা—যে কোন সময় পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরের অভিপ্রায় প্রকাশ।

'আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরায় শুরু করিলে পরিণতির জন্য রাশিয়াকেই বিশ্বের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে'—মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মন্তব্য।

৩১শে আগষ্ট—১৪ই ভাদ্র : গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ঢাকায় বিশেষ সামরিক আদালতে লেঃ কর্ণেল ভট্টাচার্যের (ভারতীয় সামরিক অফিসার) বিচার আরম্ভ—আলোচ্য মামলা প্রসঙ্গে আদালতের গোপন অধিবেশন চালনার সিদ্ধান্ত।

নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানার্থে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বেলগ্রেড উপস্থিতি।

শব্দকল্পদ্রুম

উত্তর

১। 'মহুয়া' কাব্যের 'বিদায়' কবিতা।
২। 'জীবন স্মৃতি'র 'গঙ্গাতীর' অধ্যায়।
৩। 'চিত্রা'র 'উর্বশী'।
৪। 'স্বদেশ' গ্রন্থের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধ।
৫। 'কথা' কাব্যের 'পরিশোধ' কবিতা।
৬। 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয়ের উক্তি।
৭। 'বলাকা' কাব্যের 'বলাকা' কবিতা।
৮। 'লিপিকা' গ্রন্থের 'মেঘদূত' কথিকা।
৯। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে মেহের আলির উক্তি।
১০। 'কাহিনী' গ্রন্থের 'গান্ধারীর আবেদন'।

অভয়ঙ্কর

পরলোকে জ্যোতির্ময় রায়

সুসাহিত্যিক শ্রীজ্যোতির্ময় রায় পরলোক গমন করেছেন, এ সংবাদে আমরা অত্যন্তই মর্মাহত। ছোটগল্প, হালকা প্রবন্ধ ইত্যাদির রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও 'উদয়ের পথে'র লেখক হিসাবেই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত 'উদয়ের পথে' অতি সহজেই জনচিত্ত জয় করেছিল এবং এই সাফল্যের পর জ্যোতির্ময়বাবু ক্রমে চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা ও পরিচালনার দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এখন যে পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তার একজন অগ্রবর্তী স্রষ্টা হিসাবে জ্যোতির্ময় রায়ের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সংবাদ-সাহিত্য

কেরোসিনের আলোর স্বল্প অন্ধকার আর প্রচুর ধূমের মধ্যে একদল মানুষ বসে আছে, তার মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে পড়ে যাচ্ছেন, দূরে ছোট ছেলেমেয়ের দল অস্বস্তি বোধ করে একটু হল্লা করার উপক্রম করতেই বুড়োদের কাছ থেকে ধমক খাচ্ছে, চুপ করে থাকার নির্দেশ, গোল কোরো না। ঘটনাটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, গ্রামে সংবাদপত্র এসেছে, তাতে লেখা আছে শহরের হালচাল, রাজধানীর সংবাদ, এমনকি সাগরপারের দেশের বিচিত্র সংবাদও আছে। সংবাদপত্র এসে পৌঁছেছে, পল্লীবাসীর জীবনে সেটি একটি বিশেষ ঘটনা।

এই দৃশ্য শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে, এশিয়ায়, লাতিন আমেরিকায় এবং আফ্রিকার পক্ষেও প্রযোজ্য। এই সমাবেশের একমাত্র কারণ শুধু অশিক্ষা নয়। যে-গ্রামে অনেকেই পড়তে পারেন, সেখানে সংবাদপত্র ক্রয় করার সামর্থ্য হয়ত একজনেরই আছে। এই একখানি সংবাদপত্রও আবার একাধিক পরিবারের চাঁদায় কেনা হয়েছে, তাই তা হাতে-হাতে ঘোরে।

শহরের সংবাদপত্রের সম্মান সর্বোচ্চ। প্রভাতের সর্বপ্রথম কর্ম হল এই সংবাদপত্র পাঠ। মুক্ত বায়ু, আলো এবং জলের মত সংবাদপত্রের পাতায় যা লেখা থাকে তাকেও স্বতঃসিদ্ধ বলেই গ্রহণ করা হয়। যতক্ষণ খবরের কাগজ ঠিক সময়ে আসে সব ঠিক, কিন্তু যদি তার সাইকেল পাঞ্চার হয়ে যায়, কিংবা বড় রাস্তায় ভ্যান থেকে ডেলিভারি পেতে দেরি হয় আর বাড়িওলার কাছে সেই সংবাদপত্র পৌঁছাতে দেরি হয় তাহলে হুলস্থূল বাধে। বাড়ির সবই কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। কর্তার চায়ের পেয়ালায় তুফান ওঠে, চা বিস্বাদ ঠেকে। গৃহিণীর তরকারিতে লবণ সংযোগ করতে ভুল হয়। ছেলেমেয়েদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগে, স্কুলে যেতে অস্বস্তি বোধ হয়।

কিন্তু এই যে চতুর্থ রাষ্ট্র হিসাবে খ্যাত সংবাদপত্র, তার সম্মান কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী। মোট সংবাদ দেখা হলেই তখন দেখতে হয়, শোক-সংবাদ, বিজ্ঞাপন, হারান-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ তারপর বিগত বৎসরের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারিণীর মত খবরের কাগজ বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হয়। ইংলণ্ডে ওরা সংবাদপত্র মুড়ে মাছ কিনে আনে, আমরা চানাচুর খাই, আর অনেকে শীতের রাত্রে ফুটপাথে বিছিয়ে সুখশয্যা বানিয়ে অকাতরে নিদ্রা যায়, কিংবা মাসকাবারের অনেক দেরি থাকলে গৃহিণী নিঃশব্দে শিশি-বোতল-কাগজ-ওলাকে যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে সাংসারিক বাজেটটা কোনো রকমে অবশ্যম্ভাবী ঘাটতির হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলেন।

কিন্তু সংবাদপত্র পাঠের নেশা আজ বেড়ে চলেছে। আমাদের বাংলাদেশে আগেকার কালে 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাণী' 'বসুমতী'র সাপ্তাহিক সংস্করণ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হত। ঘরে-বাইরের সকল সংবাদ থেকে দেশবাসী ওয়াকেবহাল থাকতেন। জাতীয় আন্দোলনে সর্বসাধারণের আগ্রহ এই ভাবেই বেড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের এক বিরাট ভূমিকা আছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (আগে বাংলা ও পরে ইংরাজী), সোমপ্রকাশ, পরে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্', দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা' (পরে 'লিবার্টি' ও 'বঙ্গবাণী'), যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'এ্যাডভান্স', উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বসুমতী', কলুটোলার 'হিতবাদী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'নায়ক', 'হিন্দুস্থান' (বাংলা), 'বৈকালী', (সান্ধ্য-দৈনিক), সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু', 'লাঙল', উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মশক্তি', বারীন্দ্রকুমারের 'বিজলী' ইত্যাদি অসংখ্য উল্লেখযোগ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের মাধ্যমে বাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি, রুচি ও মেজাজ গড়ে উঠেছে বিগত চল্লিশ বছরে। অসহযোগ আন্দোলন, লবণ-আন্দোলন, আগষ্ট বিপ্লব, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ, নৌ-বিদ্রোহ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশবিভাগ প্রভৃতি ব্যাপারে ধীরে ধীরে মানুষের সংবাদপত্র পাঠের আগ্রহ বর্ধিত হয়েছে, সম্ভব ক্ষেত্রে অনেকে একাধিক পত্রিকাও কিনে থাকেন। তাই আজ ভারতের সাতখানি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রের মধ্যে চারখানির জন্মকেন্দ্র কলিকাতা এবং তার মধ্যে দুখানি বাংলা ভাষায়, একথা মনে হলে বাঙালীমাত্রেরই গর্ব অনুভব করার কথা।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সংবাদ-পরিবেশন, সংবাদ-সজ্জা, সম্পাদকীয় রচনা-পদ্ধতিতেও পরিবর্তন ঘটেছে প্রচুর। স্যার আশুতোষ পরলোকগমন করেন ১৯২৪-এর ২৫শে মে তারিখে, ২৬শে মে তারিখের বাংলা সংবাদপত্রে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় তার নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

"......সেই স্মিতহাস্য — সেই হাস্য পরিহাস — সেই রসালাপ — সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত নয়নের দৃষ্টি — আজ সেই সব স্মৃতির জপমালা হইয়া রহিল। রহিলেন না স্যার আশুতোষ — শ্রদ্ধার অবলম্বন — বাঙ্গালার গৌরব — বাঙ্গালীর সম্বল — বঙ্গজননীর

অঞ্চলের নিধি স্যার আশুতোষ! নাই — যার ভক্ত-সন্তান — নাই বাঙ্গালীর সর্বস্ব — নাই বাঙ্গালীর বিরাটপুরুষ —বাংলা আজ অন্ধকার!"

—(বসুমতী)

"বাঙ্গালার ইন্দ্রপাত হইয়াছে; বঙ্গ-জননীর কন্ঠহারের অত্যুজ্জল মধ্যমণি খসিয়া পড়িয়াছে; বাঙ্গালী জাতির গৌরবসূর্য মধ্যাহ্ন আকাশেই অস্ত-মিত হইয়াছে। ......দেশ ও সমাজের এই ক্ষতি পূর্ণ হইবার নহে। কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কে রোধ করিবে?"

—(আনন্দবাজার পত্রিকা)

"স্যার আশুতোষ একবারই আসিয়া-ছিলেন — প্রয়োজন হইয়াছিল তাই আসিয়াছিলেন। কার্য্য শেষ হইয়াছে চলিয়া গেলেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি — তাঁহার প্রেরণা বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করুক — বাঙ্গালীর সাধনাকে জয়মণ্ডিত করুক। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

—(নায়ক)

"প্রদীপ্ত কর্মস্রোতে জ্বলিতে জ্বলিতে তাঁহার জীবনের অবসান হইয়াছে. কর্মজীবনের মধ্যাহ্ন ময়ূখ-মালা লইয়া যে প্রখর ভাস্কর অস্তমিত হইয়াছেন সায়াহ্নের স্তিমিততা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী এই শক্তিধর পুরুষের পুরুষকারের কাছে আজ মস্তক অবনত করে।

—(দৈনিক হিন্দুস্থান)

"আশুতোষের চিতাচুল্লীর আগুনে সমগ্র বাঙ্গালীর বুকে বুকে যে রাবণের চিতা জ্বালিয়ে তুল্ল, তা নির্বাপিত না হওয়া পর্যন্ত আশুতোষের কীর্তির, আশুতোষের শক্তির সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

কাঁদ বাঙ্গালী, কাঁদ বাঙ্গালী, যা হারালে তার জন্য আজ কাঁদ, শোকের জ্বালা প্রশমিত কর—তারপর ভেবে দেখো কি হারিয়েছ, আর তারপর দেখবে কি তোমার কর্তব্য।

(—বৈকালী—সান্ধ্য-দৈনিকপত্র)

উপরোক্ত উধৃতি থেকে পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, মাত্র পাঁইত্রিশ বছরে শুধু রচনা-রীতি কি পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে তাই বলে তা যেন অশ্রদ্ধা না করা হয়, কারণ সাম্প্রতিক রচনাও আগামী পাঁইত্রিশে এর চেয়েও পরিবর্তিত হবে এবং কি ভাবে পরি-বর্তিত হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়।

এ ছাড়া আরো লক্ষ্য করার আছে, তখন একখানি সান্ধ্য দৈনিকপত্রও ছিল এবং তার ভঙ্গীও ছিল প্রগতিমূলক, কারণ আজ পর্যন্ত বোধকরি কথা ভাষায় সম্পাদকীয় ঐ 'বৈকালী' পত্রিকা ছাড়া আর কোনো দৈনিকে ব্যবহার করতে কেউ সাহসী হননি। সেদিক দিয়ে আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী।

আজও বাংলাভাষায় প্রায় ছ'খানি দৈনিক পত্রিকা আছে, আর যে বৃদ্ধি পাবে তা মনে হয় না, বরং দু-একখানি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বর্ত-মানকালে সংবাদপত্র একটি বিরাট শিল্প-সদৃশ এবং সেই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে হলে আধুনিকতম সরঞ্জাম চাই, তবে প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, এ সবের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অথচ এই বাংলাদেশে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অতি স্বল্প পুঁজিতে এককালে একাধিক সংবাদপত্র ছিল। —সমস্যাটা আজ সর্বত্র। বিলেতী সংবাদপত্রেও এই সংকট উপস্থিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও প্রখ্যাত সাংবাদিক উড্রো ওয়াইআট সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে বলেছেন—ব্রিটেনের জনসংখ্যা এমনই ঘনসংবদ্ধ যে লণ্ডনে বসে একটি জাতীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করে সব বাড়িতেই রেল, রাজপথ এবং বিমান-যোগে প্রত্যুষের ব্রেকফাস্ট টেবলে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং ফ্লীট স্ট্রীটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদসহ সর্বাঙ্গীণ সংবাদ সমন্বিত সংবাদপত্র প্রকাশ প্রচেষ্টা বাতুলতা। তিনি আরেকটি কথা বলেছেন সেটি তাঁর ভাষাতেই উধৃত করছি:—

"The cost of production is enormous, particularly as Union restrictions involve employment of more men than are really necessary, and advertising agents are quick to advise their clients when one national Newspaper has less pulling power than its rivals."

ওদেশে সাপ্তাহিক পত্রিকার অবস্থাও সংকটাপন্ন, মাসিক পত্রিকাও ক্রমে উঠে যাচ্ছে। এবং আশা করা যায় আগামী দশ বছরে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাতীয় দৈনিক ভিন্ন পাঠযোগ্য কিছু থাকবে না।

শ্রীযুক্ত ওয়াইআট তাই পল্লী অঞ্চলে গিয়ে ছোট দৈনিক পত্রিকা চালনার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

আমাদের বাংলা দেশেও অবস্থা অনুরূপ। মাত্র দুখানি দৈনিকপত্র প্রচার সংখ্যার প্রভাবে হেসে-খেলে চলে, আর যা আছে তার অবস্থা সচল বলা যায় না। ফলে সংবাপত্র এবং সংবাদ-পত্রকে ঘিরে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার অবস্থা সংকটাপন্ন। দীর্ঘকাল ধরে গঠিত ট্র্যাডিসান অনুসারে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বহু কৃতী সাহিত্য-সেবী নিযুক্ত আছেন। যখন দেশ স্বাধীন হয়নি তখন তাঁদের রচনা নানা-বিধ অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছে। প্রবল জনমত গঠনে সাহায্য করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাস্তুহারা সমস্যা, বেরুবাড়ি ও আসাম সমস্যা সম্পর্কেও বাংলার সংবাদপত্র অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। শুধু সংবাদ নয়, সম্পাদকীয় মন্তব্যও বাঙালী পাঠকের মনোভঙ্গী গঠনে সহায়তা করেছে। এমন এক সময় ছিল যে উচ্চশিক্ষিত বঙ্গসন্তান বাংলা সংবাদপত্র পাঠ করতেন না, ইংরেজী এবং বাংলা সংবাদপত্রের মূল্যও ছিল যথাক্রমে এক আনা এবং দুই পয়সা, আজ সে ব্যবধান অন্তর্হিত। যে কোনো ভাষায় রচিত সংবাদপত্রের সঙ্গে সমান আসনে বাংলা সংবাদপত্র সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। বাংলা সংবাদপত্র লোকশিক্ষার সহায়ক এবং আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি বাংলা-সাহিত্যের অগ্রগতিতে বাংলা সংবাদ-পত্রের দান অপরিসীম। সংবাদপত্র অতি সহজ ভঙ্গীতে জনসাধারণের মধ্যে বাংলার আধুনিকতম সাহিত্য প্রচেষ্টার পরিচয় দান করে বাঙ্গালী পাঠককে আগ্রহান্বিত করে তুলছে। ভাষা-রীতির

কি রচনায় কি কথা-বলার ভঙ্গীও সংবাদপত্রের দ্বারা প্রভাবিত।

স্বাধীনতালাভের পর বাংলা সংবাদ-পত্রের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। বিচ্ছিন্ন, দ্বিধাগ্রস্ত, হৃতগৌরব জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সংবাদ-পত্রের। সুখের বিষয় বাংলার সংবাদ-সাহিত্যিকরা সে বিষয়ে সচেতন।

সংবাদ পরিবেশনের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন হয়েছে। আজ সেই সংবাদ প্রায়-কাহিনীর মত পরিবেশিত হচ্ছে, অনেক সময় অনাবশ্যক লঘু রসের সৃষ্টি বা জোর করে রবীন্দ্রনাথের লাইন তুলে শিরোনামা দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে তরলীকৃত করা হয় বটে, তবু জনগণের বোধ-গম্য করে এবং তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সব রচনা প্রকাশিত হয় জাতি গঠনে তার মূল্য কম নয়। আজ সংবাদপত্র পাঠ করে বাঙালী পাঠক বাংলার 'লোক-সংস্কৃতি', 'সাহিত্য' 'অতীত ইতিহাস' প্রভৃতি অতি সহজেই জানতে পারে। আগে বাংলা সংবাদপত্রের 'ম্যাগাজিন বিভাগ' ছিল না। 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকায় এই বিভাগটি সর্বপ্রথম চালু করা হয়. সেই বিভাগের সর্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রবোধকুমার সান্ন্যাল। প্রবোধকুমার স্বয়ং সাহিত্যিক এবং সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকায় 'যুগান্তর' পত্রিকার 'সাময়িকী' বিভাগ অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তার ফলে আজ সব পত্রিকাতেই 'সাময়িকী' পৃষ্ঠার মাধ্যমে রবিবার কিছু সাহিত্য পরিবেশন করা হয়। এ ছাড়া 'যুগান্তরে' প্রকাশিত 'ছেড়ে আসা গ্রাম' 'কাল পেঁচার বঙ্গ দর্শন', 'গ্রন্থ বার্তা' 'প্রাসাদপুরী কলকাতা', দৈনিক বসু-মতীর 'বাংলার পাঠাগার', 'কলকাতার পথঘাট' প্রভৃতি, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'মনীষী জীবনকথা', 'কমলাকান্তের আসর' প্রভৃতি বিশেষ রচনাগুলিও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বর্তমানে এশিয়ার সব দেশেই শিক্ষার প্রসার ঘটছে, জনসাধারণের গড়-পড়তা আয়ের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জনসংযোগ সমস্যা আজো অতিশয় তীব্র। উন্নতিশীল দেশসমূহের পক্ষে সংবাদ-সরবরাহ-ব্যবস্থার যদি যথেষ্ট উন্নতি না হয় তাহলে সমৃদ্ধির সম্ভা-বনা কম। ইউনেস্কোর মতে যদি কোনো অঞ্চলে দশ কপিরও কম দৈনিক পত্রিকা পেঁছায়, পাঁচটির কম রেডিয়ো থাকে এবং প্রতি একশত মানুষের জন্য অন্ততঃ দুটি সিনেমার আসন না থাকে তাহলে সেই দেশ অনগ্রসর এবং তার আশু সমৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। এশিয়ার দেশসমূহে শহরেই সংবাদপত্র কেন্দ্রীভূত। ক্ষুদ্র শহরে সংবাদপত্র প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা নেই। সেই জন্য পল্লী অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এবং তাদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দানের চেষ্টা হচ্ছে। বাংলার সাংবাদি-কতার মান আজ অনেক উচ্চে। সংবাদকে সাহিত্যের সঙ্গে সমান আসনে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই সব বাঙালী সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই আজো জীবিত, এ আমাদের সৌভাগ্য। সংবাদ-পত্র জগতে টেলিভিসনের সঙ্কট উপ-স্থিত হতে অনেক বিলম্ব আছে। যেদিন আসবে সেদিন সর্বনাশ নিশ্চিত, কারণ উল্লো ওয়াইআট বলেছেন—"the pulling power of the Telivision advertisements is colossal" —যে কদিন টেলিভিসন না-এসে পৌছয়, বাংলাদেশের সংবাদ-সাহিত্য জনগণের মর্মমূলে আরো গভীর হয়ে প্রবেশ করুক এই আমাদের বাসনা।

নতুন বই

THE FOUR CHAMBERED HEART
—Anais Nin Rupa & Co., 15, College Sq., Cal.-12 4.50 nP.

বিদেশের মত স্বদেশেও যে পেপার ব্যাক এডিশন ভালভাবে চলতে পারে,

রূপা কোম্পানীর সাম্প্রতিক প্রকাশন তার প্রমাণ। এই সুলভ সংস্করণের সুযোগে বহু পাঠক বিদেশী মূল্যবান গ্রন্থের সংগে পরিচিত হতে পারবেন।

আলোচ্য উপন্যাসের দুটি খণ্ড —The Four Chambered Heart এবং Children of the Albatross. শ্রীমতী নিন ইতিমধ্যে আমেরিকায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এদেশে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়। কারণ শ্রীমতী নিন কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের পাঠকদের আকৃষ্ট করতে চান না। লক্ষ্য তাঁর বিশ্লেষণে এবং মনের নিভৃতে, যেখানে অস্পষ্ট আলোকে রহস্যময়তা গাঢ় হয়ে থাকে, সেখানে। প্রচলিত অর্থে ত্রিকোণ প্রেমের এই উপন্যাসকে যদি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা হয় তবে মনে হয় লেখিকার প্রতি গভীর অবিচার করা হবে। কারণ শ্রীমতী নিনের সমস্ত দৃষ্টি কাব্যের ওপর নিবন্ধ। তাই এই উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করছে কাব্যের ঐক্যের ওপর। বলা যায় যে শ্রীমতী নিন সেই ঐক্য অর্জন করেছেন। ভার্জিনিয়া উলফের মতই তিনি কোমল ও অতীন্দ্রিয় জগতকে উদ্ভাসিত করতে চান। কিন্তু ভঙ্গী ও দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উলফের স্বগোত্র নন। এই ধরণের রচনা সাধারণত ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে এবং সেই জন্য পাঠকের কাছে সমস্যা হয়ে ওঠে রচনা ও তার জগৎ। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসের সব চেয়ে বড় গুণ এই যে, পাঠকও লেখিকার অদ্ভুত সূক্ষ্ম অনুভূতির জগতে স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন এবং সেই যাত্রা অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। একথা বলা যায় যে, শ্রীমতী নিন দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী এবং এই উপন্যাস পাঠকের প্রিয় হবে।

স্তেফান জেবায়াইগের গল্প সংগ্রহ —(দ্বিতীয় খণ্ড) : অনুবাদ : দীপক চৌধুরী, প্রকাশক : রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ—১২। দাম : পাঁচ টাকা।

অনুবাদ সাহিত্য, দুঃখের হলেও সত্য, খুবই দুর্বল। ইতিপূর্বে অনুবাদের প্রতি যে মমতা এসেছিল তা পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে নি। কারণ যথার্থ অনুবাদ হয় নি। পাঠকরা তাই আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমি শ্রীযুক্ত দীপক চৌধুরীর সংগে সম্পূর্ণ একমত এই কারণে যে, আমিও বিশ্বাস করি "অনুবাদকের দায়িত্ব মূল লেখকের প্রায় সমপর্যায়ের। এমন কি, বহুক্ষেত্রে অধিকতর।" শ্রীযুক্ত চৌধুরী বাংলা উপন্যাসে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক হয়েও অনুবাদে হাত দিয়েছেন। তাতে অনুবাদ কর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কাজে তিনি যে সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ তাঁরই উপন্যাসের নামাকরণ 'পাতালে এক ঋতু'। আলোচ্য গ্রন্থে পাঁচটি গল্প অনুদিত হয়েছে—খেলার রাজা দাবা, পলাতক, অপরিচিতার পত্র, চন্দ্রালোকিত কানাগলি এবং লে পোরে লা। এর মধ্যে খেলার রাজা দাবা এবং অপরিচিতার পত্র পাঠকের কাছে অল্পাধিক পরিচিত। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এই দুটি গল্প শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। প্রসঙ্গত গল্প নির্বাচনের জন্য শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হয়। তিনি এমন গল্প নির্বাচন করেছেন যার সরাসরি আবেদন আছে বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। ফলে গল্পের মৌল আবেদন বিদেশী পটভূমির প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করতে সক্ষম। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ খুবই বিরল। আশা করা যায় এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হবে। বাঙালি পাঠকেরাও বিদেশী পরিমণ্ডলের সার্থক ও যথার্থ রূপান্তর দেখে তৃপ্ত হবেন।

মেঠাইপুরের রাজা—বিশ্বনাথ দে। ১·৬০ ন. প.

ল্যাম্পোস্টের বেলুন —মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২·০০ ন. প. শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ ৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২।

বই দুখানি বড়দের আশ্বস্ত করবে কেননা, ছোটদের হাতে তুলে দেবার মত ভাল বইয়ের সংখ্যা আদৌ বাড়ছে না। ছোটদের জন্য গল্প লেখা শক্ত কাজ। এ কাজে বিশ্বনাথ দে রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গল্প এবং বলার ভঙ্গি সহজ এবং আকর্ষণীয়। কিন্তু মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য হতাশাজনক। বাংলা পদ-বিন্যাস রীতি তাকে জানতে হবে, ভাষাকেও কৃত্রিমতামুক্ত করতে হবে। 'ল্যাম্পোস্টের বেলুনে'র গদ্য এমনি, মনে হয় যেন কাঁচা হাতের অনুবাদ পড়ছি। 'রেড বেলুন' নামে এক বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্রের কথাও তখন মনে পড়ে। কিন্তু গল্প তিনি তৈরী করেছেন বেশ ভালভাবেই। এ বইটি বড়রাও পড়তে পারেন।

দুইটি বইয়েই অজস্র ছবি আছে। প্রকাশনার কাজ সুরুচিকর।

ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা—চিত্ত ভট্টাচার্য : ফ্রেণ্ডস বুক ক্লাব, কলিকাতা-৭। দাম ২·৫০।

'ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা' চিত্ত ভট্টাচার্যের প্রথম গল্পের বই। বইটিতে দশটি গল্প আছে। কিন্তু প্রথম বই বলেই কাঁচা লেখা নয়। পড়ে মনে হল, লেখক দীর্ঘদিন ধরে রচনাচর্চা করে আসছেন। গল্পবলার মধ্যে অযথা প্যাঁচ নেই. আবার চিত্ত ভট্টাচার্যের চরিত্রগুলিও অনাধুনিক নয়। 'ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা' গল্পটি সুন্দর ও মনস্তত্ত্বমূলক। 'বিন্দু-সাধন' গল্পের পরিমল ডাক্তার একটি আশ্চর্য চরিত্র, 'সহযাত্রী' এবং 'ভরা অশেষের ধনে' দু'টি নতুন ধরনের গল্প। বইটির প্রচ্ছদপট এবং পরিচয়লিপি আরও একটু সুন্দর হওয়া উচিত ছিল।

বৃত্তান্ত : সাঁ জন প্যার্স : অনুবাদ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : প্রফুল্লচন্দ্র দাস, চাঁদনী চক, কটক-২। দাম : ১·৫০ নঃ পঃ।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কলকাতার ফরাসী সাহিত্যের প্রেমিকদের মজলিসে সাঁ জন প্যার্সের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি সাড়া তোলেনি। তার কারণ হয়ত প্যার্সের কবিতা এমন কঠোর মানব-কেন্দ্রিক ও উজ্জ্বল যা রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তিদের পক্ষে সহ্য করা অসাধ্য। প্রবাসী প্রকাশক-অনুবাদককে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে হয় এই কারণে যে. দূরে থেকে তারা বাংলা কবিতার আন্দোলনকে সাহায্য করেছেন এবং একটি কলঙ্ক মোচন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সাহিত্যের পাঠক ইংরাজীর মাধ্যমে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতেন। বলা বাহুল্য, এই পরিচয়ে ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকে ষোলো আনা। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে। কারণ কবিতা দেশের জল হাওয়া মাটীকে এমনভাবে গ্রহণ করে যে তাকে অন্য মাটীতে রোপণ করা দুঃসাধ্য। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় সরাসরি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে

বাংলা কবিতার পাঠকদের ঋণী করেছেন। কবিতার অনুবাদ সুন্দর। প্যার্সের কবিতার বাহন গদ্য। গদ্য রীতিতে কাব্য রচনার বিরল ঐতিহ্য আছে ফরাসী সাহিত্যে। প্যার্স পূর্বসূরীদের ঋণ গ্রহণে অকুণ্ঠ। কিন্তু বাংলা গদ্য কবিতায় অভিপ্রেত দ্যাচা আনা বেশ কঠিন। সে দিক বিচার করে বলা যায় যে পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনেকাংশে সফল। কিন্তু এই অনুবাদের অন্যতম দুর্বার আকর্ষণ হল নোবেল সমিতির ভোজসভায় কবির ভাষণের অনুবাদ। ইতিপূর্বে এদেশের কোন পত্রিকায় এই মহৎ ভাষণটির কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। প্যার্সের কবিতাকে গভীরভাবে বুঝবার পক্ষে এই ভাষণটি খুবই মূল্যবান। কারণ এখানে প্যার্স জীবন ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। সংশয়পীড়িত মানুষের দিকে চেয়ে গভীর বিশ্বাসে কবি বলেছেন : "পারমাণবিক তেজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কবির মাটীর প্রদীপ কি দিতে পারবে তাঁর কাম্য দীপ্তি? পারবে, যদি মানুষ মনে রাখে মাটীকে।.. আর, কবির পক্ষে, তাঁর কালের দুষ্ট বিবেক হওয়াই যথেষ্ট দায়।" এই অনুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি।

কাঞ্চনরঙ্গ— শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত। প্রকাশক : গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দাম : আড়াই টাকা।

'বহুরূপী' সম্প্রদায় বাঙলার নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। সেই প্রখ্যাত সম্প্রদায় সম্প্রতি শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ' পরিবেশন করে বাঙলার নাট্যামোদী জনসাধারণকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। পুস্তকাকারে নাটকটি প্রকাশিত হওয়ায় বাঙলার অপেশাদার নাট্য-সংস্থাগুলি এবার সেটি অভিনয়ের সুযোগ পেলেন।

কাঞ্চনমূল্যে যেখানে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে সেখানে ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়ে মানুষের সত্যকার মর্যাদা প্রকাশ করে নাট্যকারদ্বয় তাঁদের মানবিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকে এমন কয়টি নাটকীয় মুহূর্তও সৃষ্টি হয়েছে যা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। নাটকের আঙ্গিক-প্রকরণেও এক দুঃসাহসিক পরীক্ষায় সফল হয়েছেন নাট্যকারদ্বয়। সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে সূত্রধরের সাহায্যে যে সমগ্র চরিত্র ও নাটকীয় বক্তব্য প্রথম দৃশ্যেই উপস্থিত করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই নাটকটি। মাঝে মাঝে অবশ্য অতিনাটকীয় বক্তব্য ও সংলাপ মন পীড়িত হয়, তবু সামগ্রিকভাবে বাস্তবানুগ চরিত্র-চিত্রণ এবং সংলাপ রচনার দক্ষতায় নাটকটি সাধারণ পাঠকদেরও ভাল লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শিল্পী সূর্য রায়ের সুন্দর প্রচ্ছদপটসহ গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা মনোরম। আমরা নাটকটির সমাদর কামনা করি।

নাট্যাঞ্জলি (নাটিকা সংকলন)— জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি কলেজ রো, কলিকাতা ৯। দাম—দশ টাকা।

বারটি ছোট-বড় নাটিকার সমন্বয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর এই নাট্য-সংকলনটি গ্রথিত। নাট্যকার নাট্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং আধুনিক নাটকের পদ্ধতি ও প্রকরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাঁর ভূমিকাটি সুলিখিত এবং নাটক সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা বোঝার পক্ষে সহায়ক। তাঁর রচিত নাটিকাগুলির মধ্যে 'মাস্টার', 'বিচার', 'বেকারের স্বপ্ন' রসোত্তীর্ণ হয়েছে। 'ডাইভোর্স' নাটিকার মধ্যে প্রহসনের প্রচেষ্টা আছে এবং অনাবশ্যক উক্তির দ্বারা হাসানোর দিকে লক্ষ্য আছে। এর মধ্যে 'জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন' এবং 'গজকচ্ছপে' দেশপ্রেমের ইঙ্গিত আছে কিন্তু পরিবেশনভঙ্গী প্রাচীন এবং কাহিনী দুর্বল। নাটকীয় গতি ভাষার এবং ভঙ্গীর দোষে ব্যাহত হয়েছে।

ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ ত্রুটিহীন।

রবিচ্ছবি—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। গীতবিতান, ২৫বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিঃ—২৫। দাম ছয় টাকা।

রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল যে সমস্ত ব্যক্তির তাদের মধ্যে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্তও একজন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা কার্যে যোগদান করেন। কাজে-অকাজে বিভিন্ন সময়ে তিনি কবির সম্পর্কে এসেছিলেন। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পাশেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ সমস্ত ঘটনার মূল্য রয়েছে যথেষ্ট। স্বাক্ষর-লেখন, নাট্য-প্রসঙ্গ, অভিনয়-উৎসব, রবীন্দ্র-পরিচয় সভা প্রভৃতি সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যাবে এই গ্রন্থ থেকে। পরবর্তীকালে দুর্বল মানুষ আর মূক পশুপক্ষীদের ব্যথা-বেদনায় রবীন্দ্রনাথের লেখনী বার বার প্রতিবাদ জানিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এ সত্য গড়ে উঠেছিল শৈশবকালে উপলব্ধ পারিপার্শ্বিক অন্যায় ও অসত্য কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণের অনুলেখকদের নাম সংযুক্ত হয়েছে একটি বিশেষ অধ্যায়ে। দীনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বক্তব্যে সত্যতার বিকৃতি ঘটেনি। সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-জীবনী রচনার জন্য বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে এ গ্রন্থ থেকে। তাই এ গ্রন্থখানির মূল্য কম নয়।

জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। লেখক : অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। ৬।১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। দাম : চার টাকা।

সম্প্রতি বাংলার চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের ঝোঁক পড়েছে গবেষণার দিকে। আমাদের অতীত ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে তাঁরা ব্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে জাতীয় বিকাশ অসম্ভব। সুতরাং নিঃসন্দেহে এইসব প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের গবেষণার কাজে বহুদিন ব্যাপৃত। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাঁরা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও চিন্তাধারার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জাতীয় আন্দোলনে দান অনস্বীকার্য। তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা তাঁর চরিত্রকে অনন্যতা দান করেছে। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডন সোসাইটি। সেখানে মিলিত হতেন সেই সময়ের বুদ্ধিমান তরুণ সম্প্রদায়, যাঁদের অনেকেই আজ প্রসিদ্ধ। সতীশচন্দ্রের প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশিত হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপকৃত হবেন।

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

॥ চলচ্চিত্র কুশলীদের শিক্ষা ॥

১৯৪৯ সালে ভারত সরকার যে চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেছিলেন, তার অনেকগুলি সুপারিশের মধ্যে একটি ছিল—চলচ্চিত্র-কুশলীদের যথারীতি শিক্ষা দিয়ে তাদের গুণপনার উন্নতি বিধান। এই সুপারিশকে কার্যকরী করার জন্যে ভারত সরকার সম্প্রতি পুণাতে "ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া" স্থাপন করেছেন। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পুঁথিগত বিদ্যা লাভের সংগে সংগে যাতে ছাত্ররা ব্যবহারিক বিদ্যাতেও রীতিমত ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত একুশ একর বিস্তৃত প্রভাত স্টুডিওটি কিনে নিয়েছেন এবং সেইখানেই এই শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে। যাঁরা চলচ্চিত্র শিল্পে চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ এবং সম্পাদনার কাজে ব্রতী রয়েছেন এঁদেরও জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্যক প্রসারিত করবার জন্যে এখানে তিন মাসে সম্পূর্ণ একটি সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক শিক্ষাক্রম বা refresher course-এর ব্যবস্থাও আছে। এবং ইতিমধ্যেই একদল চলচ্চিত্রকুশলী এই সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে যোগ্যতার ডিপ্লোমা নিয়ে যে এখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সে-সংবাদ আমরা পেয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের সংবাদ-চিত্র মারফত। এই রিফ্রেশার কোর্সের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীজগানন জাগীরদার যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন এখানকার কিছু সংখ্যক চলচ্চিত্রকুশলীর মধ্যে এই শিক্ষা গ্রহণের সদিচ্ছা দেখা গেলেও পুণা যাতায়াত এবং সেখানে কম-বেশী তিন মাস থাকার খরচ বাবদ মাথা পিছু পাঁচ-ছ'শো টাকা ব্যয় করা শিক্ষা গ্রহণেচ্ছুদের সাধ্যাতীত হওয়ায়, মনে হয়, এখান থেকে একজনও এই শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে পুণায় যাননি। অথচ বাংলা চলচ্চিত্রের যাঁরা কর্ণধার হয়ে রয়েছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলেই হাজার চার-পাঁচ টাকা ব্যয় করে অন্ততঃ জন কয়েক কুশলীকে এই শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাতে পারতেন, তাঁদের স-বেতন ছুটি মঞ্জুর করে। এবং তাঁরা শিক্ষা শেষ করে ফিরে এলে ফলাফল বুঝে সাব্যস্ত করতে পারতেন, আরো কুশলী ওখানে পাঠানো যুক্তিসংগত কিনা। কিন্তু তাঁরা তা করেননি; উল্টে তাঁদের প্রতিনিধি-স্থানীয় কয়েকজনের কথাবার্তা থেকে এইটেই সুপরিস্ফুট হয়েছিল যে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে কলাকুশলীদের শিক্ষা লাভ করার তাঁরা ঘোরতর বিরোধী। প্রথমেই তাঁরা মনে করেন, আমাদের কলাকুশলীরা এই সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম থেকে বিশেষ কিছু লাভবান হবেন না এবং দ্বিতীয়তঃ, সত্যিই যদি কিছু তাঁরা শিখে আসেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের কাজের বিনিময়ে বেশী পারিশ্রমিক দাবী করে বসবেন। তাছাড়া কুশলীরা যা জানে, তারই যখন তারা উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না এবং বহু কুশলীই কর্মহীনভাবে দিন যাপন করছে, তখন তাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষার ব্যবস্থা বিলাসিতার নামান্তর মাত্র। ইনস্টিটিউট যে পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ এবং সম্পাদনা শেখাবার জন্য প্রতি বৎসর প্রতি বিভাগে দশজন করে ছাত্র নেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মতে এ থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে বেকারের সংখ্যা বাড়ানো হবে। অর্থাৎ এঁরা বলতে চান, যেমন চলছে, তেমনি চলুক, অযথা কতকগুলো টাকা নষ্ট

মৃণাল সেন প্রোডাকসন্স-এর 'পুনশ্চ' চিত্রের একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

'মধুরেণ' চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস

করে এইসব ব্যাজে হাঙ্গামা বাঁধানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমাদের দেশ এখনো যথেষ্ট উন্নত নয়। আমাদের চলচ্চিত্র-রাজ্যের শিল্প-পতিরা বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচা ফিল্ম, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি নির্বিচারে আনিয়ে কলাকুশলীদের দিয়ে এমন ছবি তৈরী করাতে ব্যস্ত থাকেন, যা তাঁদের সিন্দুকে টাকা জমতে সাহায্য করবে। চলচ্চিত্র-শিল্পকে যদি সত্যিই তাঁরা ভালোবাসতেন, তাহলে তাঁরা আমাদের শিল্পকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার হাত থেকে সর্বপ্রথম মুক্ত করতে চাইতেন এবং আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে আমাদের কুশলীরা যাতে চলচ্চিত্র সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে, সেই জন্যে চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণাগার স্থাপনে যত্নবান হতেন। এবং চলচ্চিত্র-কুশলীদের শিক্ষার জন্যে "ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া'কে শুধু যে সাদরে বরণ করে নিতেন, তাই নয়, ভারতের যে-কটি রাজ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী আছে, তার সব কটিতেই এই ধরণের প্রতিষ্ঠান যাতে গড়ে ওঠে, সেজন্যে সচেষ্ট হতেন। আজ আমরা শারীরিক ক্ষত দূর করবার জন্যে অভিজ্ঞ সার্জেনের সহায়তা অবলম্বন করি এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার জন্যে প্রসূতি-সদনের শ্বারস্থ হই। আজ ব্যবসার পরিচালনার ব্যাপারটাও পাঠ্য-বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন হয়েছে মেয়েদের গৃহ-বিজ্ঞান। আজ মোটর-মিস্ত্রী, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী থেকে সুরু করে বাড়ীর নক্সা-প্রস্তুতকারক, ঢালাই-ওলা প্রভৃতি সকলেই যখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষালাভ করবার জন্যে ব্যগ্র, তখন চলচ্চিত্রকুশলীরাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথার্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন? বিশেষ যখন জনসাধারণের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব অন্য যে কোনো শিল্প থেকে বেশী, তখন সেই শিল্প রচনায় যাঁরা ব্রতী, তাঁদের উপযুক্ততা লাভের জন্যে যে রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা যিনি অস্বীকার করেন, তিনি নিশ্চয়ই জেগে ঘুমানোর ভান করেন।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকভাবে পুঁথিগত এবং ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করে নতুন নতুন কলাকুশলী চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে, এ ধারণাও অমূলক। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন নিকৃষ্ট টাকাকড়ি উৎকৃষ্ট টাকাকড়িকে বিদূরিত করে (bad money drives good money out of circulation), এক্ষেত্রেও তেমনই উৎকৃষ্ট কলাকুশলী নিকৃষ্ট কলাকুশলীকে চিত্রজগত থেকে সরে যেতে বাধ্য করবে এবং ক্রমে শিক্ষিত কলাকুশলীদের জ্ঞানের সাধারণ মানোন্নতি হওয়ার ফলে চলচ্চিত্র-জগৎ উপকৃতই হবে।

কথা উঠতে পারে, 'ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া'র মত প্রতিষ্ঠান থেকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জ্ঞান

লাভ সম্ভব কিনা। একটা নূতন কোনো কিছু আরম্ভ করতে গেলে প্রথমে তাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাই স্বাভাবিক। এখানে প্রথম প্রথম দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয় যে, পাঠ্যক্রমই ভালোভাবে প্রস্তুত হয়নি কিংবা কোনো কোনো বিষয়ে অধ্যাপনা তেমন ভালো হচ্ছে না; কিন্তু ক্রমে সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে, এ-আশা করা অন্যায় নয়। একটি সুন্দর পরিবেশে কয়েকজন কলাকুশলী চলচ্চিত্র বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁদের হাতের কাছে আছে চলচ্চিত্র-বিদ্যা সম্পর্কিত বহু পুস্তক এবং পুস্তক থেকে আহৃত জ্ঞানকে হাতে-নাতে পরীক্ষা করবার জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি, এবং এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে জনকয়েক অধ্যাপক তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে সদাই উৎসুক, এই কি চলচ্চিত্র-শিক্ষা কেন্দ্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

জ্যোতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত টড-আও পদ্ধতিতে নির্মিত "সাউথ প্যাসিফিক" চিত্রের একটি দৃশ্যে মিট্‌জি গেনর

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

মধুরেণ (ন?) : শ্রীমান পিকচার্স-এর ছবি; ৮২৪২ ফুট দীর্ঘ ও ৯ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : বিধায়ক ভট্টাচার্য; পরিচালনা : শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : সুহৃদ ঘোষ; চিত্রগ্রহণ : দিব্যেন্দু ঘোষ; শব্দধারণ : পরিতোষ বসু; সম্পাদনা : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা : কালীপদ সেন; গীত-রচনা : শান্তি ভট্টাচার্য; ভূমিকায় : ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, সন্ধ্যারাণী, কবিতা রায়, নিভাননী, পদ্মা প্রভৃতি। চণ্ডিকা পিকচার্সের পরিবেশনায় গত ১লা সেপ্টেম্বর থেকে রাধা, পূর্ণ প্রভৃতি চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।
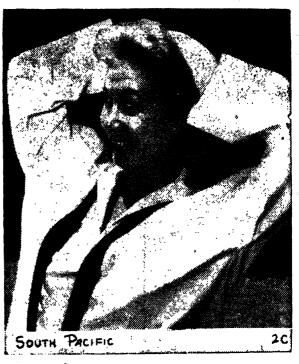
"মধুরেণ সমাপয়েৎ"—সব ভালো, যার শেষ ভালো; "মধুরেণ" গল্পেরও সমাপ্তি ঘটেছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির শেষ হয়ে উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলনের ইঙ্গিতে। গল্পটি বাঙলা ছবিতে বহুবার বহু রকমে দেখা মামুলী ধরণের। বিবাহের রাত্রে বরপণ দিতে না পারায় প্রস্তাবিত বিবাহ ভেঙে গেলে কুলমান রক্ষার জন্যে যখন গাঁয়ের কীর্তন দলের ওস্তাদ, গেঁজেল ছেলে ভূতনাথকে ধ'রে এনে সীতার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হ'ল, তার পর মুহূর্ত থেকে শ্রীমান্ ভূতনাথ দল এবং গাঁজা দুই-ই ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীর সান্নিধ্যে দিবারাত্রি কাটাতে লাগল। মাসীমা বলেন, বৌ ভূতোকে জাদু করেছে। সঙ্গীরা যখন এসে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, গাওনার বায়না নেওয়া হয়ে গেছে, এ যাত্রা রক্ষা করো, ভূতদা', তখন আড়াল থেকে সীতা বললে, ও যাবে এবং নিজে জোর ক'রে স্বামীকে কীর্তন গাইতে পাঠিয়ে দিল। ভূতনাথের কিন্তু আশংকা ছিল, সে স্ত্রীর সান্নিধ্যচ্যুত হ'লেই আবার ব্যোম্ ভোলানাথ তার স্কন্ধে ভর করবে, এমনই দুর্বল তার মন। এবং হ'লও তাই। সে কীর্তন সেরে গাঁজা ধরল এবং যতবারই স্ত্রীর কথা স্মরণ ক'রে বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয় ততবারই কোনো না কোনো দিক থেকে বাধা পায়। এদিকে তার অনুপস্থিতির সুযোগে দুশ্চরিত্র গ্রাম্য যুবক শঙ্কর বারংবার সীতার মন ভাঙাবার চেষ্টা করে এবং মাসী শঙ্করের আনাগোনাতে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে কুৎসা রটনা করেন। গাঁজার

বিজ্ঞোর ভূজনাথ নিজের স্ত্রীর কলংক-কাহিনী শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ী এসে সীতাকে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং পরক্ষণেই স্ত্রীর বিহনে জগৎ আঁধার দেখে তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ছুটে যায়।

এই দুর্বল অলীক কাহিনীকেও হয়ত' চিত্রনাট্য এবং পরিচালনার গুণে দর্শক-সমক্ষে একটি আবেগপ্রধান চিত্ররূপে উপস্থাপিত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তা হয়নি। কলাকৌশলের সকল বিভাগে এতখানি দীনতাসম্পন্ন ছবি সাম্প্রতিককালে আমাদের চোখে পড়েনি। আজকের দিনে নয়নাভিরাম না হোক, অন্ততঃ দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রগ্রহণ আমরা সকল বাঙলা ছবিতেই আশা করি। কিন্তু আলোকচিত্র পরিচালনায় সুহৃদ ঘোষের মত যশস্বী শিল্পীর নাম থাকা সত্ত্বেও চিত্রগ্রহণের কাজ এমন অবিশ্বাস্য খারাপ হ'ল কি ক'রে, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ছবির শিল্পনির্দেশও তথৈবচ। যেন-তেন-প্রকারেণ খাড়া-করা স্পষ্ট—মাটি শুকোয়নি, জোড়ের দাগ স্পষ্ট—কিন্তু তাতেই চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। মুখরক্ষা করেছেন সংগীত-পরিচালক কালীপদ সেন। তাঁর সুরারোপে অধিকাংশ গানই সুগীত হয়েছে এবং সুপ্রযুক্ত ও সুচিত্রিত হ'লে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারত অনায়াসেই।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, কবিতা রায় প্রভৃতি শিল্পীর অভিনয়শক্তি সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্টই ধারণা আছে। কিন্তু এ-ছবিতে তাঁদের সেই ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ কোথায়? তার ওপর সন্ধ্যারাণীকে নববধূ নায়িকার ভূমিকায় আজও মানায় কি?

মাত্র আট হাজার ফুট দীর্ঘ ছবিতে এতবেশী ফ্ল্যাশ-ব্যাক-এর ছড়াছড়ি যে, মনে হয়, সম্পাদককে টেনে-বুনে ছবির দৈর্ঘ্য বাড়াবার চেষ্টা করতে হয়েছে। এবং আরও মনে হয়, একটি বহুদিন আগের তোলা ছবিকে যা-হোক ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি নতুন নাম দিয়ে দর্শক-সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়েছে সব ভালো, যার শেষ ভালো দেখবার দুরাশায়। রাধা এবং পূর্ণের মত অভিজাত চিত্রগৃহে এহেন ছবির মুক্তি দিয়ে নিজেদের সুনামকে যথেষ্টই ক্ষুণ্ণ করেছেন।

বিবিধ সংবাদ

চীন মঞ্চের একচ্ছত্র সম্রাট মেল্যান-ফ্যাং করোনারি আর্টেরিও স্লেরটিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গেল ৮ই আগস্ট ৬৭ বছর বয়সে ইকলোক ত্যাগ করেছেন। পঞ্চাশ বছরের উপর ধরে তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন বিভিন্ন ভূমিকায়। এমনকি কিছুদিন আগেও তিনি স্ত্রী-চরিত্রে অবতরণ ক'রে দর্শকদের বিস্ময় বিমুগ্ধ করেছেন। Stylized acting-এ তাঁর জোড়া সমগ্র চীন রঙ্গমঞ্চে কেউ ছিল না। বিখ্যাত পিকিং অপেরার তিনি ছিলেন স্তম্ভস্বরূপ। আমরা শোকার্তচিত্তে তাঁকে স্মরণ করছি।

হলিউড চিত্রশিল্পে কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ প্রযোজক রজার এইচ. লুইস্ সম্প্রতি ইউনাইটেড আর্টিস্টের সংস্রব ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে প্রযোজনার কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি ১৪ই আগস্টের ফিল্ম বুলেটিন পত্রিকায় স্বাধীনভাবে প্রযোজিত এবং খ্যাতনামা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "আহ্বান" চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-প্রতিষ্ঠানদের প্রযোজিত চিত্রের নির্মাণ-ব্যয়ের একটি হিসাব দাখিল করেছেন :

স্বাধীন প্রযোজনায় প্রস্তুত ছবির নাম ও ব্যয়

স্যাডো	৪০,০০০ ডলার
সি স্যাডেজ আই	৬৫,০০০ ডলার
জাজ্ অন্ এ সামার ডে	২,১৯,০০০ ডলার
প্রাইভেট প্রপার্টি	৫৯,০০০ ডলার
দি কানেক্শান	১,৭৫,০০০ ডলার
মোট	৫,৫৮,০০০

খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের তোলা ছবির নাম ও ব্যয়

জোসেফ এণ্ড হিজ ব্রিদ্রেণ	১৫,০০,০০০ ডলার
(কলম্বিয়া কর্তৃক শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত)	
টাইপী	১৫,০০,০০০ ডলার
(অ্যালায়েড আর্টিস্ট দ্বারা পরিত্যক্ত)	
লেডী এল্	২০,০০,০০০ ডলার
(এম-জি-এম এখনও চিত্রগ্রহণ শুরু করেননি)	
ক্লিওপেট্রা	৩০,০০,০০০ ডলার
(টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স এখনও চিত্রগ্রহণ শুরু করেননি)	
মিউটিনি অন দি বাউন্টি	১,৬০,০০,০০০ ডলার
(এম জি এম্ কর্তৃক সমাপ্তপ্রায়)	
মোট	২,৪০,০০,০০০ ডলার

এর পর ব্যয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে টিপ্পনী নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন।

দশরূপক সম্প্রদায় ১০ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে পরেশ ধর রচিত মৌলিক নাটক "কালপুরুষ"কে মঞ্চস্থ করবেন।

নটলীলা সম্প্রদায় রবীন্দ্রশত-বার্ষিকী উপলক্ষে আসছে ১১ই

রূনেসাঁ ফিল্মসের "ঢেউয়ের পরে ঢেউ" চিত্রে শঙ্কর ও শম্পা

সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যা ৬টায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে কবিগুরুর "যোগাযোগ" অভিনয় করবেন। নাট্যরূপদান এবং নির্দেশনার ভার নিয়েছেন অমল নাগ।

বঙ্গীয় নাট্য সংসদ

গত ২৩শে আগষ্ট কাশিমবাজার ভবনে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় বঙ্গীয় নাট্য সংসদের ১৯৬১—৬২ সালের কার্যনির্বাহক সমিতিতে সর্বশ্রী সোমেন্দ্র-চন্দ্র নন্দী (সভাপতি), আরতি রায় ও গোবিন্দভূষণ ঘোষ (যুগ্ম সম্পাদক), গৌরচন্দ্র ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ) উমা দাস-গুপ্তা, অদিৎ কুণ্ডু ও রমেন লাহিড়ী (সদস্য) এবং ষোড়শীকুমার মজুমদার ও ধীরেন্দ্রনাথ রায় (পরিচালক) নির্বাচিত হয়েছেন। সংসদের সপ্তম একাঙ্ক নাট্যোৎসবে ৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর সোমেন্দ্র নন্দী রচিত "সুন্দরম", "একটি সভা" ও বার্ণার্ড শ'র "দুটি চরিত্র" এবং রমেন লাহিড়ী রচিত "রাজযোটক" এই চারিটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ হবে।

॥ উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্মোৎসব ॥

আগামী শনিবার ৯ই সেপ্টেম্বর বাগ-বাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থা-গার ভবনে সন্ধ্যা ৭টায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাসের সভাপতিত্বে বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা মহামতি উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্ম জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

শামা ও পিয়া মিলন কী আস

এ-সপ্তাহে দুটি হিন্দী ছবি মুক্তি-লাভ করছে। প্রথমটি তসবীরিস্থানের 'শামা'। লেকজার ভকতের পরিচালনায়, গোলাম মহম্মদের সুরসংযোজনায় এবং সরাইয়া অভিনীত 'শামা' কলিকাতার সোসাইটী, প্রভাত, চিত্রা, রূপালী, ছায়া, রূপম, পার্কশো ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন—নিমনী, বিজয় দত্ত, তরুণ বোস, কুমার ও কামো প্রভৃতি। চিত্রটি পরিবেশন করছেন দাগা পিকচার্স।

দ্বিতীয় হিন্দি ছবি, বিজয় ফিল্মসের 'পিয়া মিলন কী আস'। চিত্র এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেনঃ এস এন ত্রিপাঠী। কাহিনীকার ও ও প্রযোজক জে এস কাশ্যপ এবং বিভিন্নাংশে রূপদান করেছেন অমিতা, মনোজ, নন্দিনী চোকর, জীবন, সুন্দর, কুক্কু ও ডেইজী ইরাণী। ইন্দু পিকচার্সের পরিবেশনায় কলিকাতার জনতা, ম্যাজেস্টিক, কৃষ্ণা, পূর্ণশ্রী, পিকাডিলী, অলকা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত সফরে এম সি সি

এম সি সি কর্তৃপক্ষ আগামী শীতকালের ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং সিংহল সফরের উদ্দেশ্যে ১৬ জন খেলোয়াড়কে এম সি সি দলে নির্বাচন করেছেন। দলের অধিনায়ক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সাসেক্স কাউণ্টি এবং ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত চৌকস টেস্ট খেলোয়াড় টেড ডেক্সটার। ওয়ারউইকসায়ার দলের জে কে স্মিথ দলের সহ-অধিনায়ক হয়েছেন। মিডলসেক্স কাউণ্টি দলের সব থেকে বেশী তিনজন খেলোয়াড় এম সি সি দলে স্থান পেয়েছেন। ২ জন ক'রে খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে এই ৪টি দল থেকে—গ্লসেস্টারসায়ার, ল্যাঙ্কাসায়ার, সারে এবং কেণ্ট। এসেক্স, সাসেক্স, নটিংহাম, হ্যাম্পসায়ার এবং ওয়ারউইকসায়ার থেকে একজন ক'রে খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলেছেন এমন খেলোয়াড় এম সি সি দলে আছেন সাতজন—টেড ডেক্সটার, মাইক স্মিথ, ডেভিড এলেন, কেন ব্যারিংটন, টনি লক, জন মারে এবং জিওফ পুলার।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে পূর্বে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এমন খেলোয়াড় আছেন দু'জন—পিটার রিচার্ডসন (কেণ্ট) এবং বব্ বার্বার (ল্যাঙ্কাসায়ার)। পিটার রিচার্ডসন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ইতিপূর্বে ২৫টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। এই ২৫টা খেলায় তাঁর মোট রাণ ১৬২৩ (গড় ৪০·৫৭) এবং সর্বোচ্চ রাণ ১২৬ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, নটিংহাম, ১৯৫৭) এবং টেস্ট সেঞ্চুরী ৫টা। এক সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের নিয়মিত ওপনিং ব্যাটসম্যান ছিলেন। ১৯৫৮ সালেও তিনি অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড সফরে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মোট ৭টা টেস্টের মধ্যে ৬টা টেস্ট খেলেছিলেন।

ল্যাঙ্কাসায়ার কাউণ্টি দলের বব বার্বার ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মাত্র একটা টেস্ট খেলেছেন—১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এম সি সি দলের সঙ্গে ১৯৫৯ সালে কানাডা এবং ১৯৬০-৬১ সালে নিউজিল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিলেন। এসেক্স দলের অল্-রাউণ্ডার বেরী নাইট ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১ম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এম সি সি দল সফরের উদ্দেশ্যে ১লা অক্টোবর স্বদেশ ত্যাগ করবে।

ভারত সফরকারী এম সি সি'র অধিনায়ক টেড ডেক্সটার

তারা ক্রিকেট সফর শুরু করবে পাকিস্তানে। পাকিস্তান সফরের প্রথম দফায় আছে একটা টেস্ট খেলা নিয়ে তিনটে খেলা। পাকিস্তান সফর তালিকার প্রথম তিনটে খেলা শেষ করে ২৭শে অক্টোবর এম সি সি বোম্বাইয়ে আসবে। ভারত সফরে তাদের প্রথম খেলা পড়েছে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে, ২৮শে অক্টোবর। ৮০ দিনে ভারত সফর শেষ ক'রে এম সি সি পুনরায় পাকিস্তান সফর তালিকা ধরবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের ৩য় সপ্তাহে দলটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে সিংহলে তিনটি ম্যাচ খেলবে।

নিম্নলিখিত ১৬ জন খেলোয়াড় ভারত সফরকারী এম সি সি দলে নির্বাচিত হয়েছেন :

টেড ডেক্সটার (সাসেক্স)—অধিনায়ক, মাইক স্মিথ (ওয়ারউইকসায়ার)—সহ-অধিনায়ক, ডেভিড এলেন (গ্লসেস্টারসায়ার), বব্ বারবার (ল্যাঙ্কাসায়ার), এলেন ব্রাউন (কেণ্ট), কেন ব্যারিংটন (সারে), ব্যারী নাইট (এসেক্স), জিওফ্রে মিলম্যান (নটিংহামসায়ার), টনি লক্ (সারে), জন মারে (মিডলসেক্স), পিটার পারফিট (মিডলসেক্স), জিওফ পুলার (ল্যাঙ্কাসায়ার), পিটার রিচার্ডসন (কেণ্ট), এরিক রাসেল (মিডলসেক্স), ডেভিড স্মিথ (গ্লসেস্টারসায়ার) এবং ডেভিড হোয়াইট (হ্যামসায়ার)।

নির্বাচিত এম সি সি দল সম্পর্কে টাইমস পত্রিকা মন্তব্য করেন—"এই সকল তরুণ খেলোয়াড়দের থেকেই আগামী বৎসরের শেষ দিকে এ্যাশেজ-এর সন্ধানে ইংল্যাণ্ড থেকে যে দলটি অস্ট্রেলিয়াতে খেলতে যাবে, সেই দলে কয়েকজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হবেন।"

মে, কাউড্রে, সুব্বারাও, স্ট্যাথাম অথবা ট্রুম্যানের সমকক্ষ বিশিষ্ট খেলোয়াড় দলে নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় ব্রিটেনের অধিকাংশ জাতীয় সংবাদপত্র দুঃখ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু পত্রিকাগুলি সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, ইংল্যাণ্ডের বর্তমান দলটি ভারসাম্য হয়েছে এবং এই দলের খেলোয়াড়রাই একদিন "এ্যাশেজ" সন্ধানে বের হবে।

দলের খেলোয়াড়দের গড়পড়তা বয়স ২৬ বছর।

॥ সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥

এডওয়ার্ড আর ডেক্সটার (সাসেক্স)—অধিনায়ক। জন্ম মিলানে (ইটালী), ১৫।৫।১৯৩৫। ডান হাতে ব্যাট করেন। ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে কেম্ব্রিজ ব্লু। ১৯৫৮ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৬০ সালে সাসেক্স দলের অধিনায়কের পদলাভ।

টেস্ট ম্যাচ (২২)—নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩ (১৯৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯); অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৭ (১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৬১); ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২ (১৯৫৯); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ (১৯৫৯-৬০) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫ (১৯৬০)।

খেলার ধরণ আক্রমণাত্মক। দর্শনীয় ব্যাটসম্যান হিসাবে খ্যাত; ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার। টেস্ট খেলায় সাফল্য : মোট খেলা ২২, মোট রান ১৪১৫, ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ১৮০, সেঞ্চুরী সংখ্যা ৪ এবং উইকেট লাভ ২৫।

১৯৫৯ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের বিপক্ষে ডেক্সটার দুটো

টেস্ট খেলায় তিনটি ইনিংসে মোট ৫৮ রান করেন, সর্বোচ্চ রান ছিল ৪৫। উইকেট পান ৭১ রানে তিনটে। টেস্ট খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান—১৮০ (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট, এজবাস্টন, ১৯৬১)।

মাইকেল জে কে স্মিথ (ওয়ারউইকসায়ার): সহ-অধিনায়ক। জন্ম লিসেস্টারে, ৩০-৬-১৯৩৩। ডা হাতে ব্যাট করেন। ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে অক্সফোর্ড ব্লু। কেম্ব্রিজের বিপক্ষে ১৯৫৪ সালে নট আউট ২০১, ১৯৫৫ সালে ১০৪ এবং ১৯৫৬ সালে ১১৭ রান মোট তিনটি সেঞ্চুরী করে রেকর্ড করেন। ১৯৫৭ সালে ওয়ারউইকসায়ার দলের অধিনায়কের পদলাভ।

টেস্ট খেলা (১৫)—নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩ (১৯৫৮), ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২ (১৯৫৯), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ (১৯৫৯-৬০), দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪ (১৯৬০) এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১ (১৯৬১)।

১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে দুটো টেস্টের তিনটে ইনিংসে মোট ২০৭ রান করেন, সর্বোচ্চ রান ১০০। ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওভালে রমন সুব্বা রাও এবং মাইকেল জে কে স্মিথ তৃতীয় উইকেটের জুটিতে যে ১৬৯ রান করেন, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে তাই সর্বোচ্চ রান। টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান—১০৮।

টেস্ট খেলায় সাফল্য: মোট খেলা ১৫, মোট রান ৭৬৫, ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ১০৮, সেঞ্চুরী ২ এবং ক্যাচ ১১টা।

ডেভিড এলেন (গ্লসেস্টারসায়ার): জন্ম ব্রিস্টলে, ২৯-১০-১৯৩৫। ডান হাতে ব্যাট করেন; অফ্-ব্রেক বোলার।

টেস্ট খেলা (১১): ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ (১৯৫৯-৬০), দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ (১৯৬০) এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪ (১৯৬১)। টেস্ট খেলায় সাফল্য: মোট খেলা ১১, মোট রান ৩২৯, ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ৫৫। ৮৭২ রানে ২৬টা উইকেট।

রবার্ট বার্বার (ল্যাঙ্কাশায়ার): জন্ম ম্যাঞ্চেস্টারে, ২৬-৯-১৯৩৫। ন্যাটা ব্যাটসম্যান, কিন্তু ডান হাতে লেগ-ব্রেক বল দেন। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে কেম্ব্রিজ ব্লু।

টেস্ট খেলা (১): দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১ (১৯৬০)। গত বছর এম সি সি দলের সংগে নিউজিল্যাণ্ড এবং ১৯৫৯ সালে কানাডা সফর করেন।

এন্টনি ব্রাউন (কেন্ট): জন্ম নটিংহামে, ১৯-৬-১৯৩৫। ডান হাতে ব্যাট করেন; ফাস্ট বোলার।

কেনেথ ব্যারিংটন (সারে): জন্ম রিডিংয়ে, ২৪-১১-১৯৩০। ডান হাতে ব্যাট করেন এবং সময়ে সময়ে লেগ্-ব্রেক বল করেন।

টেস্ট খেলা (২১): দঃ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ (১৯৫৫); ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫ (১৯৫৯); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ (১৯৫৯-৬০); দঃ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪ (১৯৬০) এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ (১৯৬১)। পাকিস্থান সফর (১৯৫৫-৫৬)। ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫টা টেস্টে মোট ৩৫৭ রান করেন, সর্বোচ্চ রান ছিল ৮৭। ৫টা উইকেট পান ১৩৫ রানে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫টা টেস্ট খেলায় তাঁর মোট রান ৩৬৪ এবং সর্বোচ্চ রান ৮৩।

ব্যারী নাইট (এসেক্স): জন্ম চেস্টারফিল্ডে, ১৮-২-১৯৩৮। ডান হাতে ব্যাট করেন এবং ডান হাতে ফাস্ট-মিডিয়াম বল দেন। চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি। ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৫৯ সালে ইংল্যাণ্ডের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় মাত্র পাঁচ রানের জন্যে মরসুমের 'ডাবল' (১০০০ রান এবং ১০০ উইকেট) খেতাব লাভে বঞ্চিত হন। তাঁর মোট রান দাঁড়িয়েছিল ৯৯৫ (৪৯ ইনিংসের খেলায় ১৩ বার নট আউট) এবং মোট উইকেট লাভ ১০১ (২৩৮০ রানে)।

জিওফ্রে মিলম্যান (নটিংহামশায়ার): জন্ম বেডফোর্ডে, ২-১০-১৯৩৪। একজন দক্ষ উইকেট-কিপার এবং নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান।

জি এ আর লক (সারে): জন্ম লিম্পসফিল্ডে, ৫-৭-১৯২৯। ডান হাতে ব্যাট করেন। লেফট্-আর্ম স্লো স্পিনার হিসাবে খ্যাতি। ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের টেস্টে বল 'থ্রো' করার দোষে যখন তিনি পুনরায় অভিযুক্ত হন তখন অনেকেরই দৃঢ় ধারনা হয় লকের টেস্ট খেলোয়াড় জীবনের এইখানেই শেষ হল। কিন্তু তিনি তাঁর বোলিংয়ের স্টাইল বদলে ফেলে ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনটে টেস্ট খেলার স্থান করে নেন। উইকেট অবিশ্যি খুব বেশী পাননি ২৫০ রানে তিনটে (গড় ৮৩·৩৩)। ভারত সফরে এম সি সি দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং টেস্ট খেলার দিক থেকে সকলের থেকে তিনি অভিজ্ঞ খেলোয়াড়।

এম সি সি দলের সংগে সফর করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (১৯৫৩-৫৪), পাকিস্তান (১৯৫৫-৫৬), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯৫৬-৫৭), অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড (১৯৫৮-৫৯)।

পাকিস্তান সফরে মোট ৮১টা উইকেট (গড় ১০·৭১) পান এবং ২ বার 'হ্যাট-ট্রিক' করেন।

টেস্ট খেলায় সাফল্য: মোট খেলা ৩৪, মোট রান ৪১৪, সর্বোচ্চ রান ৩০। ১২৬ উইকেট ২৮০৪ রানে।

প্রখ্যাত ক্রিকেট বার্ষিকী 'উইসডেন' কর্তৃক নির্বাচিত বছরের সেরাপাঁচজন খেলোয়াড় অধ্যায়ে ১৯৫৩ সালে লক স্থান লাভ করেন। 'প্লেফেয়ার' ক্রিকেট বার্ষিকীতে 'বছরের সেরা দশজন খেলোয়াড়' অধ্যায়ে লক সাতবার স্থান পান—১৯৫২ থেকে ১৯৫৮।

জন মারে (মিডলসেক্স): জন্ম কেনসিংটনে, ১-৪-১৯৩৫। উইকেটকিপার। ডান হাতে ব্যাট করেন। উইকেট-কিপার হিসাবে ১৯৫৭ সালে (মোট রান ১০২৫ এবং ১০৪ জনকে আউট) এবং ১৯৬০

সালে 'ডাবল' খেলেন পঞ্চম টেস্ট খেলা (৫) : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে (১৯৬১)।

পিটার পারফিট (মিডলসেক্স) : জন্ম বিলিংফোর্ডে, ৮-১২-১৯৩৬। ন্যাটা ব্যাটসম্যান এবং রাইট-আর্ম মিডিয়াম বোলার। ১৯৬১ সালের ক্রিকেট মরসুমে ১,৩২৮ রান (২টা সেঞ্চুরী-সহ) করেন।

জিওফ্রে পুলার (ল্যাঙ্কাশায়ার) : জন্ম সুইটনে, ১-৮-১৯৩৫। ন্যাটা ব্যাটসম্যান। ১৯৫৬ সালে পেশাদার খেলোয়াড় জীবন গ্রহণ করেন। টেস্ট খেলা (১৬) : ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৩ (১৯৫৯); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ (১৯৫৯-৬০); দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ (১৯৬০) এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ (১৯৬১)। ১৯৫৯ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতবর্ষের বিপক্ষে তিনটে টেস্টে মোট ২৪২ রান করেন, সর্বোচ্চ রান ১৩১।

টেস্ট খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান—১৭৫, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৯৬০।

পিটার রিচার্ডসন (কেন্ট) : জন্ম ৪-৭-১৯৩১। ন্যাটা ওপনিং-ব্যাটসম্যান। টেস্ট খেলা (২৫) : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ (১৯৫৬); দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৫ (১৯৫৬-৫৭); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ (১৯৫৭); নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৪ (১৯৫৮); অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪ এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২ (১৯৫৮-৫৯)। টেস্ট খেলায় সাফল্য: মোট খেলা ২৫, মোট রান ১৬২৩, সর্বোচ্চ রান ১২৬, সেঞ্চুরী সংখ্যা ৫।

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান : ১২৬ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, নটিংহাম, ১৯৫৭)।

এরিক রাসেল (মিডলসেক্স) : জন্ম ৩-৭-১৯৩৬। ওপনিং-ব্যাটসম্যান। ডান হাতে খেলেন। ১৯৬০ সালের ক্রিকেট মরসুমে ২,০৫১ (গড় ৩৭·৯১) রান করেন। ১৯৬০-৬১ সালে নিউজিল্যাণ্ড সফরে যান। ৮টা খেলায় মোট ৩৩০ রান (গড় ২৫·৩৮) রান করেন; সর্বোচ্চ রান ছিল ১১১। ১৯৬১ সালের ক্রিকেট মরসুমে সর্বপ্রথম ১০০০ রান করেন।

ডেভিড স্মিথ (গ্লসেস্টারসায়ার) : জন্ম ৫-১০-৩৪। ডানহাতে ব্যাট করেন। মিডিয়াম-ফাস্ট বল দেন। ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি আছে। ১৯৬০-৬১ সালে নিউজিল্যাণ্ড সফরে এম সি সি দলে স্থান পান। সফরের দশটা খেলায় মোট ১৪২ রান (গড় ১২·৯০) এবং ৮৭৫ রানে ৩২টা উইকেট পান।

ডেভিড হোয়াইট (হ্যাম্পসায়ার) : বয়স ২৫। রাইট-আর্ম ফাস্ট মিডিয়াম বোলার।

ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

অস্ট্রেলিয়া : ১৯৮ (বুথ ৪৯, বেনো ৪২। বেলী ৬৫ রাণে ৪ উইঃ) ও ১৫০ (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ও'নীল নট আউট ৮৫)।

এসেক্স : ১৫৪ (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ জি স্মিথ নট আউট ৬৬, বার্কার ৫৬। কুইক ৩৫ রাণে ২ উইকেট) ও ১৩৯ (মিশন ৪০ রাণে ৩, ম্যাকেঞ্জি ২৯ রাণে ৫ এবং বেনো ৩২ রাণে ২ উইকেট পান)

৫ম টেস্ট ড্র যাওয়ার পর সফরের পরবর্তী খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৫৫ রাণে এসেক্স

পঞ্চম টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে নর্মান ও'নীল (অস্ট্রেলিয়া) ব্যাট করছেন। ১ম ইনিংসে ১১৭ রাণ ক'রে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব হিসাবে ও'নীল ৪০০ পাউণ্ড পুরস্কার পান।

কাউণ্টি দলকে পরাজিত করে। ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের এই দশম জয়।

এসেক্স দলের অধিনায়ক ট্রিভর বেল্লী অস্ট্রেলিয়া দলের থেকে ৪৪ রাণে পিছনে পড়ে থেকেও দলের ১৫৪ রাণের (৩ উইকেটে) উপরে ১ম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কও সৌজন্যের দিক থেকে মাথা নীচু করলেন না—২য় ইনিংসের খেলায় দলের ১৫০ রাণ (২ উইকেটে) উঠলে এসেক্স দলকে ২য় ইনিংস খেলতে মাঠ ছেড়ে দিলেন। তখন খেলার মত সময় ছিল ১৪০ মিনিট—এই সময়ে ১৯৫ রাণ তুলতে পারলে এসেক্স জয়ী হ'ত। কিন্তু মাত্র ১৩৯ রাণে তাদের ২য় ইনিংস শেষ হ'লে অস্ট্রেলিয়া ৫৫ রাণে জয়ী হয়।

হ্যাম্পসায়ার : ১৯৪ (ডি লিভিংস্টোন ৫২) ও ২২১ (হর্টন ৫৮। গন্ট ৩৩ রাণে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ২৫৫ (হার্ভে ৭২, বুথ ৭৯। বার্ডেন ৩৯ রাণে ৪ এবং ওয়াসেল ৮৮ রাণে ৩ উইকেট) ও ১৬৫ (৫ উইকেটে। গ্রাউট ৪২। ওয়াসেল ৫১ রাণে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল সফর তালিকায় কাউন্টি দলের বিপক্ষে তাদের শেষ খেলায় ৫ উইকেটে ১৯৬১ সালের ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হ্যামসায়ার দলকে পরাজিত করে।

হাতে ৫ ঘণ্টার বেশী সময় নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা সুরু করে। খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ১৬১ রাণের প্রয়োজন ছিল। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো ছয়ের বাড়ি মেরে জয়লাভের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চার রাণ তুলে দেন।

জেণ্টলম্যান : ১৯৫ (কির্বি ৬০। সিম্পসন ৩৯ রাণে ৩ উইঃ) ও ৩২৫ (৮ উইকেটে। জে কে স্মিথ ৯০ এবং বেডফোর্ড ৬৩। ম্যাকেঞ্জি ৩০ রাণে ৩ এবং ম্যাককে ৮৪ রাণে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৪২২ (লরী ১০৯, ও'নীল ৭৫, বার্জ ৭৪ এবং সিম্পসন ৪৩। মার্লার ১৮৪ রাণে ৬ এবং ডেক্সটার ৪৯ রাণে ৪ উইকেট)

খেলা ড্র যায়। অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের রাণের ফলাফলে ২২৭ রাণে এগিয়ে যায়। কিন্তু জেণ্টলম্যান দলের ২য় ইনিংস শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যায়—৮ উইকেট পড়ে ৩২৫ রাণ ওঠে।

এই খেলায় উইলিয়ম লরী তাঁর ১০৯ রাণের মধ্যে ৯০ রাণে পৌঁছলে ইংল্যান্ড সফরে তাঁর ২০০০ রাণ পূর্ণ হয়। যুদ্ধোত্তরকালের ইংল্যান্ড সফরে এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে মাত্র তিনজন ২০০০ রাণ করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন—১৯৪৮ সালে ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৫৩ সালে নীল হার্ভে এবং ১৯৬১ সালে উইলিয়াম লরী। ইংল্যান্ড সফরে প্রথম এসে তাঁর সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। সফরের খেলায় এ পর্যন্ত উইলিয়াম লরী ৯টা সেঞ্চুরী করেছেন (দলের পক্ষে সর্বাধিক সেঞ্চুরী)।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ

১৮৭৬ থেকে ১৯৬১

	মোট খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	খেলা ড্র
ইংলণ্ডে	৮৬	২৫	২০	৩৮
অস্ট্রেলিয়াতে	৯৭	৩৮	৫৩	৬
মোট	১৮৩	৬৩	৭৬	৪৪

মোট রাণ

[১৮৩টি টেস্ট খেলায় উভয় দেশের মোট রাণ সংখ্যা]

	মোট রাণ	উইকেটে
ইংল্যান্ড	৮৪০৩০	২৯৬৩
অস্ট্রেলিয়া	৮৪১২৬	৩০০১

সেঞ্চুরী সংখ্যা

অস্ট্রেলিয়া : ১০৬
ইংল্যান্ড : ১২৬

সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৯টি— ডন্ ব্র্যাডম্যান
ইংল্যান্ড : ১২টি— জে বি হবস্

একটি ম্যাচে সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৭টি, নটিংহাম, ১৯৩৮। ইংল্যান্ডের পক্ষে ৪টি সেঞ্চুরী—ই পেণ্টার (২১৬*), সি জে বার্নেট (১২৬), ডেনিস কম্পটন (১০২); এল হাটন (১০০)

অস্ট্রেলিয়া (৪) : এস জে ম্যাকক্যাব (২৩২); ডি জি ব্র্যাডম্যান (১৪৪*); ডবলউ এ ব্রাউন (১৩৩)।

* নট আউট।

চৌকস খেলোয়াড়

ইংল্যান্ড : উইলফ্রেড রোডেস (১৭০৬ রাণ এবং ১০৯ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : এম এ নোবল (১৯০৫ রাণ এবং ১১৪ উইঃ); জি গিফিন (১২৩৪ রাণ এবং ১০৩ উইকেট)

ব্যাটিংয়ে বৃহত্তম সাফল্য

(১০০০ রাণের বেশী)

ইংল্যান্ড : হার্বার্ট সাটক্লিফ (৬৬·৮৫)
অস্ট্রেলিয়া : ডন্ ব্র্যাডম্যান (৮৯·৭৮)

অপরাজেয় ওপনিং ব্যাটসম্যান

(ইনিংসের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত)

ইংল্যান্ড : ২ জন—আর এ্যাবেল এবং লেন হার্টন

অস্ট্রেলিয়া : ৫ জন—জে ই ব্যারেট; ডবলউ বার্ডসলি; ডবলউ উডফুল (২ বার) এবং ডবলউ এ ব্রাউন।

বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা

স্বাধীনতা সপ্তাহ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস প্রতি বছর সংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত গুণীজনের সম্বর্ধনার আয়োজন করে থাকেন। ১৯৬১ সালে স্বাধীনতার চতুর্দশ বার্ষিকী উপলক্ষে গুণীজন সম্বর্ধনায় শ্রীতেজেশ সোমের (বাঘাবাবু) সভাপতিত্বে ক্রীড়াবিদ হিসাবে শ্রীবলাইদাস চট্টোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ইংলিশ লীগ ক্রিকেটে মানকড়ের কৃতিত্ব

ভারতের প্রাক্তন চৌকশ টেস্ট খেলোয়াড় ভিনু মানকড় বোলটন (ল্যাংকাসায়ার) লীগে টঙ্গের পক্ষে আরও দু'বছর পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

এ বছর মানকড় টঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ব্রাডশ'র বিরুদ্ধে এক খেলায় তিনি ৩২ রাণে মোট ৮টি উইকেট পান; ব্রাডশ মোট ৮৫ রাণ করে। তিনি অবশ্য নিজ দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি, তাঁর দল মাত্র ২৬ রাণ সংগ্রহ করে। এই রাণের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত রাণ ছিল ১৮।

সম্প্রতি কয়েকটি খেলায় তাঁর বোলিং সাফল্য বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি সেই সকল খেলায় ৪০ রাণে ৪ উইকেট, ৬৩ রাণে ৬ উইকেট ও ১৪ রাণে ৩ উইকেট পান। একটি খেলায় দুই ইনিংসে তাঁর রাণের সংখ্যা ছিল ৫৩ ও ৪৮।

॥ ডেভিস কাপ ॥

আমেরিকান জোন-ফাইনালে আমেরিকা ৩—২ খেলায় মেক্সিকোকে পরাজিত করেছে। প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক সেমি-ফাইনালে আমেরিকা খেলবে ভারতবর্ষের সঙ্গে।

আমেরিকান জোন-ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে মেক্সিকো ২—১ খেলায় অগ্রগামী হলে সারা বিশ্বের টেনিস মহলে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। প্রথম দিনের খেলায় দুই দেশই একটি ক'রে সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়। মেক্সিকো প্রথম সিঙ্গলস খেলায় জয়লাভ করেছিল, কিন্তু খেলার দ্বিতীয় দিনে মেক্সিকো ডাবলসের খেলায় জয়ী হলে আমেরিকা পিছিয়ে পড়ে। যুদ্ধ পরবর্তীকালের ডেভিস কাপের খেলায় (১৯৪৬ থেকে ১৯৬০) আমেরিকা মাত্র একবার (১৯৬০ সালে) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠতে পারেনি। সুতরাং তুলনায় দুর্বল দেশ মেক্সিকোর কাছে আমেরিকার এই রকম খেলা কেউ কল্পনা করতেও পারেনি। মোটের উপর আমেরিকা শেষ দিনের ২টো সিঙ্গলসে জয়ী হয়ে কোন রকমে মুখরক্ষা করেছে। মেক্সিকোর দুর্ভাগ্য! তারা আর একটা

রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ইস্টার্ণ রেলওয়ে (গ্রীণ) দলের অধিনায়ক টি সোমের হাতে রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভের পুরস্কার দিচ্ছেন।

মাত্র খেলায় জয়ী হলেই আমেরিকার বিপক্ষে জয়লাভের গৌরব লাভ করতো।

ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার মধ্যে যে দেশ জয়ী হবে তারা প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলবে ইটালীর সংগে। ইণ্টার-জোন ফাইনালের বিজয়ী দলই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবে গত দু' বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সংগে। ১৯৬০ সালের ডেভিস কাপ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় ইটালীকে পরাজিত ক'রে ডেভিস কাপ লাভ করে।

ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলার তারিখ পড়েছে ১৬ই থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর।

॥ ইণ্টার-রেলওয়ে ফুটবল ॥

খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত ১৯৬১ সালের ইণ্টার-রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী ইস্টার্ণ রেলওয়ে (গ্রীন) ২—০ গোলে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে। ভারতীয় অলিম্পিক খেলোয়াড় পি কে ব্যানার্জি দলের পক্ষে দু'টি গোলই দেন।

ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নসীপ

১৯৬১ সালের ইংলিশ কাউণ্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হ্যামসায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়নসীপ লাভ করেছে। প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ বছরের ইতিহাসে হ্যামসায়ার দলের এই প্রথম চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ। গত দু' বছরের (১৯৫৯-৬০) চ্যাম্পিয়ান ইয়র্কসায়ার দল এবং হ্যামসায়ার দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। হ্যামসায়ার গত দু' বছর লীগের তালিকায় যথাক্রমে ৮ম এবং ১২শ স্থান লাভ করেছিল। কাউণ্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ইয়র্কসায়ার দল এ পর্যন্ত ২৫ বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—৪ বার হিসাবে ১৯২২-১৯২৫; উপর্যুপরি ৩ বার হিসাবে ১৯০০-১৯০২; ১৯৩১-৩৩ এবং ১৯৩৭-৩৯। ১৯৪৯ সালে ইয়র্কসায়ার দল মিডলসেক্স দলের সংগে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ানসীপের খেতাব পায়। উপর্যুপরি ৭ বারের (১৯৫২-১৯৫৮) চ্যাম্পিয়ান সারে কাউণ্টি দলের একটানা একাধিপত্য রোধ ক'রে ইয়র্কসায়ার দলের পর পর দু'বার (১৯৫৯ ও ১৯৬০) চ্যাম্পিয়ান হওয়ার দরুণ বেশীর ভাগ লোকের ধারণা ছিল এবারও ইয়র্কসায়ার দল চ্যাম্পিয়ানসীপ পাবে। কিন্তু কাউণ্টি ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অঘটন ঘটে গেল—গত বছরের দ্বাদশ স্থান অধিকারী হ্যামসায়ার শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হ'ল।

গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে হ্যামসায়ার দল অপ্রত্যাশিতভাবে ১৪০ রাণে ডার্বিসায়ার দলকে পরাজিত করলে এবং অপরদিকে তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়র্কসায়ার দল ওয়ারউইকসায়ার দলের বিপক্ষে খেলা ড্র করলে চ্যাম্পিয়ানসীপের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়। শেষ খেলায় ইয়র্কসায়ার দলের কাছে হ্যামসায়ার দল পরাজয় বরণ করলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না।

ডার্বিসায়ার দলের বিপক্ষে 'জীবন-মরণে'র খেলায় হ্যামসায়ার ৩০৬ এবং ২৬৩ রাণ (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ) করে। ডার্বিসায়ার দলের রাণ দাঁড়ায় ৩১৮ ও ১১১। ডার্বিসায়ার দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় হ্যামসায়ার দলের সিমবোলার ডেরিক স্যাকলটন ৩৯ রাণে ৬টা উইকেট পান। প্রধানতঃ তাঁরই বোলিং সাফল্যের দরুণ ডার্বিসায়ার দলের ২য় ইনিংস ১১১ রাণে শেষ হয় এবং হ্যামসায়ার দল ১৪০ রাণে খেলায় জয়লাভ ক'রে একটা খেলা বাকি থাকতেই লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২২শে শ্রাবণের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ

কখনো মেঘ

প্রচ্ছদ ও গ্রন্থনের অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল

দাম চার টাকা

কানাই সামন্তের

রবীন্দ্র প্রতিভা

প্রাণের তাগিদে প্রবৃত্ত হয়েছেন লেখক—সহৃদয় পাঠক মাত্রেই তাঁর সহযাত্রী ও সহযোগী হবেন।

চৌদ্দখানি আর্ট প্লেটে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর, তাঁর আঁকা ছবি ও পেন্সিল স্কেচ্, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ।

দাম দশ টাকা

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

৭ই আষাঢ়ের বই

নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস

প্রথম বসন্ত

দাম আড়াই টাকা

অজিতকৃষ্ণ বসুর উপন্যাস

সানাই

দাম আড়াই টাকা

বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ ঃ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর** ৫·৫০

"......লুপ্ত রত্নোদ্ধারের ন্যায় গ্রন্থকার সেই অজ্ঞাত, বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করে যে নূতন আলোর সন্ধান দিয়েছেন, তাতে সাহিত্যের সম্পদ হিসাবেও বটে, ইতিহাসের উপাদান হিসাবেও বটে, গ্রন্থখানি সকল শ্রেণীর পাঠকের উপভোগ্য হয়ে থাকবে। কাহিনীর কৌতূহল, রচনার সরসতা, পাঠকের চিত্ত এমনভাবে আবিষ্ট করে রাখে যে, এর অন্য সব দিক বাদ দিয়ে শুধু সুখপাঠ্য রচনা হিসাবেও বইখানি একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ওঠা যায় না।"

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের **উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল** ৩·০০

"......আলোচ্য বইটিতে যাঁর লেখনী থেকে নেপালের রোমাঞ্চকর সংগ্রামের বিবরণ পাওয়া গেল তিনি সেই সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন। বলে রাখা ভালো, বইটি সেই সংগ্রামের এ্যাকাডেমিক ইতিহাস নয়। সেজন্য এখানে ঐতিহাসিক তন্ময়তার (অবজেকটিভিটি) সন্ধান করা নিরর্থক। এর পরিবর্তে আমরা যা পাই তা একটি ব্যক্তিগত, উষ্ণ হৃদয়ের উত্তাপ এবং অনেক নেপথ্য-কাহিনী। কূটনৈতিক কারণে নেপালের সংগ্রামে সাহায্যকারী অনেক ব্যক্তি ও বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাম বইটিতে প্রকাশ করা যে সম্ভব হয়নি তা অবশ্য কৌতূহলী পাঠকের কিছুটা অতৃপ্তির কারণ হবে। সে অতৃপ্তির অনেকটাই ক্ষতিপূরণ হবে অবশ্য লেখকের অন্তরঙ্গ বর্ণনাগুণে। বইটির যোগ্য সমাদর সুতরাং বাঞ্ছনীয়।"

শান্তিদেব ঘোষ **গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য** ৩·০০

"......শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের কাছে আমরা আরো দুটি কারণে কৃতজ্ঞ। গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্যের তাৎপর্য তিনি যথাযথভাবে আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেছেন। দ্বিতীয়ত আমাদের শিক্ষায় নাচের একটি বিশিষ্ট স্থান তিনি করে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। নৃত্য-নিঃস্বতা এবং গ্রামের কাছে আমাদের ঋণ শোধ করার কথা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং পরে গুরুসদয় দত্ত স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উৎসাহে আমাদের জাতীয় সরকারও এ ব্যাপারে অর্থানুকূল্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের মত বিশিষ্ট নৃত্যবিদের আগ্রহে যেন সেই উৎসাহ একটি সম্ভ্রম ও পূর্ণতা পেল। গ্রামের সঙ্গে শহরের শুভদৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর পুরোহিতের কথা আমরা ভাবতে পারি না।

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পান্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
ফোন : ৫৫-৫২৩১
কলিকাতা—৩

সূচীপত্র

ইণ্ডিয়া
ষ্টীল ফার্ণীচার
নিরাপত্তা ও সৌন্দর্যের জন্য!
ইণ্ডিয়া ষ্টীল ফার্ণীচার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 15th September, 1961
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ অচ্ছেদ্য। শিক্ষাজগতে যদি কোনো গুরুতর বিপর্যয় ঘটে, তবে তার প্রতিক্রিয়াতে সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিতে পারে। সেইজন্যে মাধ্যমিক শিক্ষকগণের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের বিষয়ে আমরা অত্যন্তই উৎকণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে শিক্ষক সমিতি বর্তমানে ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমরা কামনা করি, আলোচনার মাধ্যমে বাকী সমস্যাগুলিরও মীমাংসা করা সম্ভব হবে, এবং শিক্ষা-ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

একথা সর্বজন-স্বীকৃত যে, আমাদের শিক্ষাজগতে বর্তমানে নানা-দিকেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন তার অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু তার আগেও শিক্ষায় পরিস্থিতি যে ত্রুটিহীন ছিল তা বলা যায় না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, বহুমুখী শিক্ষা ইত্যাদি অনেক প্রস্তাব আমাদের স্মৃতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত করেছে। কার্যক্ষেত্রে সেগুলি কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে তা সন্দেহের বিষয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সরকারী কর্মকর্তাগণ কোনো পরিকল্পনাই দীর্ঘদিন চালু রাখতে পারেননি। বিদ্যালয়গুলির বাৎসরিক পরীক্ষা-গ্রহণের সময় ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে নির্ধারিত হওয়ার পর আবার গত বছর থেকে ডিসেম্বরের দিকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছে। প্রাথমিক ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো ওঠানামায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজী শিক্ষা তিনটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তাধীন থাকায় বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হ'চ্ছে না।

তাছাড়া পাঠক্রম অনুযায়ী পাঠ্য-পুস্তকের অভাব, এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যোগ্য শিক্ষকের অনটন তো আছেই। সমস্ত কিছু মিলে পরি-স্থিতিটা যেন ক্রমেই ভয়াবহ হ'য়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে ছাত্রদের উপর জুলুম যা চলার তা অব্যাহতভাবেই চলছে। সরলমতি মানবশিশু নিয়ে এরকম অস্থিরচিত্ত গবেষণা শেষ পর্যন্ত জাতির পক্ষে যে অত্যন্তই ক্ষতিকর হয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই।

এইসব শিক্ষামূলক সমস্যার সঙ্গে শিক্ষকদের স্বল্প বেতন এবং চাকরির অনিশ্চয়তা ইত্যাদি প্রশ্ন জড়িত হয়ে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে উঠেছে। এককালে শিক্ষাদানের যে-বৃত্তিকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত, এখন সেই বৃত্তির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি-দের রাজপথে মিছিল করে জীবিকার দাবি ঘোষণা করতে দেখলেও আমরা বিচলিত হই না।

বলা বাহুল্য, তাতে আমাদেরও যে কিছুমাত্র সম্মানবৃদ্ধি ঘটে এমন মনে করার কারণ নেই। তবে সুখের বিষয়, বর্তমানে সেই পরিণতির গতি-রোধ করা সম্ভব হ'য়েছে। আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে একটা সম্মানজনক মীমাংসায় আসার জন্য অনুরোধ জানাই।

আশা করা যায়, সেই রকম সুস্থ আবহাওয়ায় সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা-বিধির প্রবর্তন হয়তো অসম্ভব হবে না।

নদীগুলি মরে গেছে

রাম বসু

নদীগুলি মরে গেছে। বালি ঝড়ে রুদ্রাক্ষ আকাশ
চিৎকার আছড়ায় শূন্যে।—আমরা করিনি আবিষ্কার
যক্ষলোক, প্রেম, জন্ম। স্থিতিমূলে কল্লোল সুবাস
স্বপ্নাতীত। কোন দেব কোন পশু উপাস্য এবার?

আঘাতে আবৃত্ত স্মৃতি। দূরে গত-স্রোতের স্বাক্ষর
জ্বলন্ত হীরার বুকে ঝুঁকে মুখ দেখে দশ দিক
কবে যেন শুনেছিলে বন্দরের শেষ কণ্ঠস্বর
মোহিত রক্তের মধ্যে, ভুলে যাও পরাস্ত নাবিক।

অশ্রু-উৎসে কাঁটা ঝোপ। হারিয়েছি উত্তরাধিকার
পায়ে বায়ু বিদ্ধ পাখী। খোলা চোখ তৃষ্ণায় তর্পণ
বুকে নিয়ে পৃথিবীর করোটির শুভ্রতার ভার
কে হবে অভয় মুদ্রা, আনন্দিত স্থিরতা, অর্পণ।

দুঃসাধ্য ছায়ার ভার। নির্বাসিত নিজের নির্জনে
ভাঙা গড়া একই কথা। দিনের মশাল নিভে গেলে
ছিন্ন মর-অম্র প্রেত নক্ষত্রের আলোয় ঘর্ষণে
দেহ সেঁকে মেঘে কোন মতে পাতার আগুন জ্বেলে।

পটভূমি ধ্বংসস্তূপ। ক্ষত-চিহ্ন সর্বাঙ্গে নিশ্চল
আমরা জানি না কেউ আমাদের যথার্থ নিয়তি
কলসী অঙ্গার কাঠ পাশে অবগাহনের জল
হে পূষণ, ঋতুচক্র কি নির্দেশ আমাদের প্রতি?

চুম্বক বিনষ্ট। প্রাচীন ললাট থেকে অস্ত প্রায়
আলো, প্রতিধ্বনি। দ্যাখো দ্রুত লুপ্ত তীব্রতা, তোরণ
নিজেকে সাজাও দৃশ্যে জ্বালো ছিন্ন উল্কার জ্বালায়
জীবন বিধ্বস্ত তীর্থ, ইতঃস্তত ম্লান সম্মোহন।

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

পরিমল চক্রবর্তী

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। খরতোয়া হৃদয়ের হ্রদে
বাসনার ছায়া কাঁপে; ওই দূরে মহুয়ার বনে
কে যেন হৃদয় চায় অন্য এক হৃদয়ে হারাতে।
কে যেন সন্তর্পণে এসে চুপচাপ স্নিগ্ধ ভীরু পায়ে
হেঁটে যায় যৌবনের দীর্ঘ পথে, হাঁটে শূন্য মনে
আমার বুকের শান্ত ছায়াচ্ছন্ন নির্জন পাড়াতে।

চিনেও চিনিনা তাকে। মনে হয় : লক্ষ যুগ আগে
সে যেন আমার-ই ঘরে বেদনার অনন্ত কবরে
শুয়ে ছিল স্থির হয়ে জীবনের যন্ত্রণার শেষে।
যেন তার নগ্নদেহ আকাশের সান্দ্র সন্ধ্যারাগে।
(ব্যাকুল আর্তিকে পুষে অনুভবে বাউল প্রহরে)
আমি-ই ছিলাম সূর্য, স্বপ্নাতুর প্রেমিকের বেশে।

বসন্ত জাগ্রত আজ। বসন্ত জাগ্রত হয়ে দ্বারে
আমাকে বেঁধেছে আহা যৌবনের এ-কী অন্ধকারে।

মতান্তর

অমলকান্তি ঘোষ

যাঁরা এই পৃথিবীতে বহুকাল বেঁচে আছে, তাঁদের অনেকে
আমাকে জানিয়েছিল, "কোন মহাসাগরের নীল জল থেকে
মাথা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক শ্যামলিম দ্বীপ,
সরল-লোকের-চোখ—ভরা গ্রাম, নেই তার সুখের জরিপ..."
আমি যেন উড়ে যাই শিথিল মেঘের মতো কথা কলরোলে।...
ঘরে ফিরে এসে দেখি সে-দ্বীপের নাম নেই স্মৃতির ভূগোলে।

যাঁরা এই পৃথিবীতে বহুকাল বেঁচে আছে, তাঁদের অনেকে
জনতার বহু দূরে দাঁড়িয়েই বলেছিল জনতাকে ডেকে,
"যেখানেই থাকো তুমি তা-ই ঘর, তা-ই সুখ, বৃথাই ভ্রমণ,
মানুষের এ জীবনে নেই কোন রূপময় দ্বীপের শরণ।"...
তখন ভীড়ের মাঝে কিছু লোক বলেছিল, "হে অনুভাবী,
ফেরাও তোমার কথা, দেখো চেয়ে, আমরা সে-দ্বীপের নিবাসী।"

সংস্কৃতের নাম দেবভাষা। কিন্তু দেবতারা ঠিক এই ভাষাতেই কথা বলেন কিনা তা হলপ করে বলা কঠিন। আমরা জানি, আর্যগণ ভারতবর্ষে আসার পরে যে সব মন্ত্রে দেবতাদের স্তবস্তুতি করেছিলেন তার ভাষা অপৌরুষেয়, এবং যেহেতু ঈশ্বর স্বয়ং এগুলির বক্তা সেইহেতু এই মন্ত্রগুলি অত্যন্ত পবিত্র।

কিন্তু বৈদিক যুগের এই ভাষা আর পরবর্তীকালের ভাষা, যা সুসংস্কৃত হ'য়ে 'সংস্কৃত' নাম ধারণ করেছে, তা নিশ্চয়ই এক নয়। এক হলে সংস্কৃত জানলেই বেদ পড়া চলত, বহুকাল ধরে মোক্ষমূলর প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হত না।

সে যাই হোক, সর্বসাধারণ বেদের অর্থ বুঝতে না পারলেও ভারতবর্ষে ধর্মকর্ম অচল হ'য়ে থাকেনি। বৈদিক ভাষা, যা ছিল প্রকৃত দেবভাষা, তার জায়গা দখল করল সংস্কৃত। আর এই ভাষাতেই সহস্রাধিক বছর ধ'রে ভারতীয় হিন্দুদের সমস্ত রকম ঐহিক ও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম চলতে থাকল। দেবতারা যে সে ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি এমন মনে করার কারণ নেই।

কিন্তু অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ব্যাপারটাই আলাদা। তাঁরা সম্প্রতি এক ফতোয়া জারী ক'রে জনৈক প্রথিতযশা বাঙালী সুরসাধককে জানিয়েছেন, মার্গ-সঙ্গীত হিন্দী ভাষায় না গাইলে উন্মার্গগামী হবে, সুরলক্ষ্মীর পক্ষে তার অর্থোদ্ধারের ঝক্কি পোহানো অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই বাংলা গানে মার্গসঙ্গীত পরিবেশনের অনুমতি দিতে তাঁরা অক্ষম।

অক্ষমকে ক্ষমা করাই সাধারণ ভদ্রতা। কিন্তু প্রশ্নটা সেখানে নয়। প্রশ্ন হল এই যে, বাংলা গানে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পরিবেশন করলে তা তেতো লাগবে কেন?

ভারতের আদি সঙ্গীত সামগান। শুদ্ধতার দিক দিয়ে, বৈদিক ভাষার বাইরে অন্য যে-কোনো ভাষা ব্যবহার করাই তো অপাঙক্তেয় ব্যাপার। কিন্তু

তা সত্ত্বেও যেহেতু কালক্রমে প্রাকৃত, হিন্দী, উর্দু ইত্যাদিতে অনায়াসে সুরের রসাস্বাদন করা সম্ভব হ'য়েছে, তখন বাংলাই বা জল-অচল হ'য়ে থাকবে কেন?

নাকি, আকাশবাণীর এই দৈব-বাণীটি ফাঁকি দিয়ে শতকিয়া শেখানোর জন্যেই একটা কৌশল মাত্র? সকালে নিয়মিত হিন্দী শিক্ষার আসর বসিয়েও যখন বাঙালীর বাঁকা ঘাড় সোজা করা যাচ্ছে না, তখন গানের বিশল্যকরণীর নামে যদি হিন্দীর গন্ধমাদনটি চাপিয়ে দেওয়া যায় তারই ফন্দী?

সবিনয় নিবেদন, এ ফন্দীর মোহিনী-মায়ায় আমরা বন্দী হতে রাজী নই।

গানের শুদ্ধতার অজুহাত বিশুদ্ধ একটি বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের আসল মাধুর্য হল তার রাগরাগিণীর ঐশ্বর্য, গানের পদ-গুলি সেখানে নিছক একটা অবলম্বন মাত্র; এবং সকলেই জানেন, অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হাস্যকর রকম তুচ্ছ।

তুলনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা ধরুন। গানের পদ ও সুর সেখানে অঙ্গাঙ্গী-সম্পৃক্ত, একটিকে বাদ দিলে অন্যটির মহিমাও হয়ে ওঠে খর্বিত।

কিন্তু সেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতেরও তো হিন্দী অনুবাদ হয়েছে এবং গাওয়াও হচ্ছে, কই, তখন তো আমরা 'শুদ্ধ'-বাগীশদের দৈববাণী শুনিনি?

তাতে অবশ্য আমাদের কোনো খেদ নেই। অনুবাদের ঘোমটার আড়াল দিয়ে হলেও যতো বেশী শ্রোতা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মুখশ্রী দেখতে পায়, ততোই আমরা আনন্দিত। কিন্তু শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই 'ওয়ান-ওয়ে ট্র্যাফিকে'র সুবিধাবাদী মনোভাব আমাদের মোটেই অন্তরঙ্গ মনে হয় না।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত হিন্দীপদে গাইলেও বাঙালী তার রসাস্বাদন করতে পারে। শীতের মরশুমে গানের জলসার সময় একবার কলকাতায় এলেই তা আকাশ-বাণীর দেবদূতেরা দেখতে পাবেন। মজিলস ব্যাপারে শীত ঠেকিয়ে সারারাত ফুটপাতে বসে থাকে তখন শ্রোতারা। গান-যে তাদের অবকাশরঞ্জনী নয়, তাতে সন্দেহ করা চলে না। বরং বলা যায়, গান তাদের প্রাণের জিনিস এবং কানেরও। সেই কানে বাংলা পদ ঢুকলেই তারা লম্বকর্ণ হয়ে যাবে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করলে আকাশবাণীর কর্ণধারদের বলতে হয়, তাঁরা অন্যের চোখের মণিতে নিজেদেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছেন।

অবশ্য এমন হতে পারে যে, অনেক আগেই তাঁরা কানের আপদ চুকিয়ে রেখেছেন। দুটো কানই!

* * *

যতো গুড় ততো মিষ্টি বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মিষ্টত্ব বেশী বাড়ালে ক্রমে সেটা তিক্তস্বাদ হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, সকলে একথা স্বীকার করেন না। সেইজন্যে বড়কে আরো বড় করার দিকে একটা অস্বাভাবিক ঝোঁক যেন মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল।

এখন সত্যের চেয়ে সত্যাগ্রহ বেশী বড়, দেশের চেয়ে উপদেশ। আকারে বাড়লে ব্যাপারটা যে প্রকারেও বড় হ'য়ে ওঠে এমন একটা ধারণার হাত থেকে এখন আর আমাদের অব্যাহতি নেই।

কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র লেখক হিসাবে যখন মুদ্রিত দেখি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ

> আগামী সংখ্যা থেকে স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর অত্যন্ত আকর্ষণীয় উপন্যাস
>
> **দি না ন্তে র র ঙ**
>
> ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।
>
> সম্পাদক 'অমৃত'

ঠাকুর, তখন দুঃখিত বোধ করলেও বিস্মিত হওয়ার পথ থাকে না।

অবশ্য আমরা সকলেই জানি, শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামের আগে শ্রী বর্জন করেছিলেন এবং জীবদ্দশায় তাঁর সমস্ত গ্রন্থই নিছক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামাঙ্কিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু তাতে আমরা নিরস্ত হব কেন? মহাপুরুষেরা অমন বিনয় সব-সময়েই প্রকাশ করেন; আমরা আধা-পুরুষেরা যে সে বিনয়ে কর্ণপাত করিনে সেইটুকুই তো আমাদের একমাত্র পৌরুষ!

সে কথা নয়। আমার শুধু একটিমাত্র বক্তব্য আছে। বাড়াতে যখন হবেই তখন অতো কমে সন্তুষ্ট হব কেন? এককালে রবীন্দ্রনাথ শ্রী দিয়েই নাম লিখতেন, তারপর সম্মানবৃদ্ধির সংগে সংগে শ্রী ত্যাগ করেছেন। সেই বর্ধিত সম্মানের পটভূমিতে একটিমাত্র শ্রী অত্যন্তই কম-জোরি বলে মনে হচ্ছে। আমার ধারণা, পর পর দুটি শ্রী দিলে নামটির গুণগত পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।

তখন পরশুরাম লিখিত 'শ্রীশ্রীসিদ্ধে-শ্বরী লিমিটেড' নামক গল্পের পাশা-পাশি "শ্রীশ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামটিও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষমা করুন!)

* * *

পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। বৃষ্টি হলে কলকাতা শহরের পথ-ঘাটেরও সেই অবস্থা হয়। হবেই, কারণ কলকাতা পৃথিবীর বাইরে নয়!

এই সাদা কথাটা কেন যে কর্পো-রেশন কর্তৃপক্ষ এতদিন আমাদের শুনিয়ে দেননি তাই ভেবেই অবাক হচ্ছি। তা না করে, পয়ঃনালীগুলোতে কোথায় ক'ফুট পলি জমেছে, কেন সেগুলো পরিষ্কার করা হয় না, বা বড় বহরের নালীই বা কেন বসানো হয় না, এসব কুতর্কের রসদ জোগান তাঁরা।

কে না জানে বাঙালী নদীমাতৃক দেশের মানুষ। জল দেখে কবে ভয় পেয়েছে তারা? 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' সেই বাংলা দেশের বংশধর হয়ে আমরা যদি কলকাতার রাস্তায় ৩।৪ ফুট জল দেখেই মূর্ছা যাই তো সে লজ্জা আর যারই হোক নিশ্চয়ই কর্পোরেশনের নয়।

তাছাড়া জল দেখে ভয় পাওয়াও দেহমনে সুস্থতার পরিচায়ক নয়। শুনেছি পাগল হলে লোকে জলের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চান, এবং পাগলা-গারদে অনেক সময় জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেই পাগলদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আর যদি মনের কথা বাদ দিয়ে শরীরের কথাই তুলতে হয় তো বলতে বাধা, জলাতঙ্ক এমন একটা রোগ যে নামটা শুনলেই তার মধ্যে কুকুরের দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

এমন তো হতে পারে না যে, গোটা কলকাতা শহরের মানুষকেই পাগলা কুকুরে কামড়েছে। তবে আর এমন জল দেখলে সকলে আঁতকে ওঠেন কেন? জল-যে কতবড় একটি সামাজিক সমতার বিধানকর্তা তা কি কেউ ভেবে দেখেননি? 'এইখানে আসিলে সকলেই সমান'—শ্মশানের বিষয়ে সেই অপূর্ব ভাবো-চ্ছ্বাস নিশ্চয়ই সকলেরই মনে আছে। কলকাতার রাস্তায় বেশ প্রমাণ সাইজের জলোচ্ছ্বাস ঘটলেও 'সকলেই সমান'!

কাজেই পঞ্চাশহাজারী মোটরের চড়নদার থেকে সরকারী বাসের ঝুলন-দার পর্যন্ত সকলেরই জলের ব্যাপারে মতৈক্য ঘটা উচিত। আসুন, সকলে মিলে আমরা সরকারের সামনে একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করি। (উত্থাপন করি কথাটা অত্যন্তই সেকেলে, এখন ওর মানে বোঝে না কেউ! বরং বলা যেতে পারে, রাখি।) আমরা প্রস্তাব রাখি যে, কলকাতার পয়ঃনালীগুলো যেমন আছে তেমনি থাক। রাস্তায় জল জমলে ম্যানহোলগুলো খোলারও কোনো দরকার নেই। শুধু স্টেট ট্রান্সপোর্টের আয়ত্তে একটা অক্জিলারী ফেরী সার্ভিসের ব্যবস্থা রাখা হোক। আমরা তখন সেই সরকারী খেয়া নৌকায় বসে কোরাসে গান ধরব—'ঝর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে, ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো......হাইয়ো হাইয়ো হাইয়ো।'

এমন একটা থ্রিল থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি একথা ভাবতেও আমার কন্ঠরোধ হচ্ছে। দরকার হয় তো আমি চাঁদা পর্যন্ত দিতে রাজি। আপনারা কী বলেন?

শরৎ প্রসঙ্গ

নরেন্দ্র দেব

রবীন্দ্র-যুগের সবচেয়ে বড় দান বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবরচিত নাটিকা 'কালের যাত্রা' শরৎচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করে তাঁকে লিখেছিলেন, "আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই,—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব-সমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে-দেশে যুগে-যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে। তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে। তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখ দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক........."

শরৎচন্দ্রের লেখনী, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বিশেষভাবে বঞ্চিত, উৎপীড়িত, অবমানিত ও নানাভাবে আহত নর-নারীকে নিয়েই জটিল মানব-সমাজ ও রহস্যময় মানব-জীবনের ইতিহাস রচনা করে গেছে, একথা সর্বজনস্বীকৃত। তবে, একথাও তো অস্বীকার করা চলে না যে, সে চিত্রগুলির মধ্যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিভিন্ন হলেও চরিত্রের নব নব বৈচিত্র্য বড় একটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এগুলি অল্প-সংখ্যক নর-নারীর চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সুসমালোচক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলতেন, "যখন কোনো সাহিত্যিক লোক-সমাজের নিকট একজন বিশিষ্ট লেখক বলে গণ্য হন তখন তাঁর সঙ্গে সাহিত্যের সঙ্গে লোকসমাজকে পরিচিত করে দেবার কোনো সার্থকতা নেই।" সুতরাং, শরৎ-সাহিত্য আলোচনা থেকে বিরত থাকাই ভাল।

শরৎচন্দ্র পঞ্চাশ পার হতে না হতেই নিজেকে বৃদ্ধ বলে ঘোষণা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু, বুড়ো তিনি কোনওদিনই হননি। তাঁর সাহিত্যের যে রস তা বরাবরই যৌবন-বেদনা-রসে পরিপুষ্ট অমৃতপ্রসাদ। অথচ তিনি নিজে একথা স্বীকার করে গেছেন যে, চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ তাঁর ঠিকরে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে কারও মুখ তিনি কখনও দেখতে পাননি। তাঁর কাছে চাঁদ আকাশের একটা জ্যোতিষ্ক মাত্র! ফুলের কোনও বিশেষ আবেদন সৌরভলিপিতে রচিত হয়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছয়নি কখনো। অর্থাৎ তিনি যেন কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও কোনও কবি-সুলভ ভাবপ্রবণতার দৌর্বল্য নেই।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের একাধিক রচনা এর বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। শরৎচন্দ্রের অনুরাগী পাঠকেরা কেউই তাঁর এই ঘোষণাকে সত্যভাষণ বলে স্বীকার করে নিতে পারবেন না। অবশ্য, এ কথা ঠিক যে, তিনি কখনও কল্পনার রূপকথাকে সত্যের ছদ্মবেশ পরিয়ে সাহিত্যের সভায় শোভাবর্ধনের জন্য এনে হাজির করেননি। ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় যতটুকু তিনি আপন অন্তর দিয়ে অনুভব ক'রে সত্য বলে জেনেছেন, সেইটুকুই পরিবেশন করেছেন। ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি শরৎসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান ও প্রধান সৌষ্ঠব। তথাপি একথা বলা অন্যায় হবে না যে, শরৎসাহিত্য সম্পূর্ণ বাস্তববাদী নয়। তিনিও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতোই রোম্যান্টিক। তাঁর কলমের ছোঁয়া লেগে কত ছন্নছাড়া, উচ্ছৃঙ্খল, অভাগা মানুষও প্রেমের মহানুভবতায় প্রণম্য হয়ে উঠেছে।

শরতের প্রথম আলো এসে পড়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়। 'বড়দিদি' গল্পটি সকলের এত ভাল লেগেছিল যে কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে সত্যই একজন প্রতিভাবান নূতন লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। সেদিন সবার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ওটি ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা।

এরপর কুন্তলীন পুরস্কারের গল্পগুলির মধ্যে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু গল্পটিতে লেখকের নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সুতরাং শরৎচন্দ্র সেদিনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেলেন। সেদিন কেউই জানতে পারেনি যে, ওটি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেনামে শরৎচন্দ্রের লেখা।

অতএব একথা বোধ করি বলা চলবে না যে, 'মন্দির' বা 'বড়দিদি' গল্পের মাধ্যমেই বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে যথার্থই শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। তবে, সে পরিচয় হ'ল কবে?

শহরের তদানীন্তন একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র 'যমুনায়' যখন 'রামের সুমতি' গল্পটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হ'ল সেই দিনই এদেশের পাঠকেরা প্রথম জানতে পারলেন যে, সত্যই তবে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে।

যাঁর রচনা পড়ে আমরা আনন্দ পাই, সংলাপে মুগ্ধ হই, সেই কথাশিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের জন্য অনুরাগী অনেক পাঠক-পাঠিকাই ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু, সকলের পক্ষে সে সুযোগ লাভ বড় একটা হয় না। তবে সাহিত্যিক মহলের অনেকেরই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। শরৎদা গ্রামের মানুষ। শহরের চাল তাঁর মধ্যে কোনো বেচাল আনতে পারেনি। তাছাড়া, দীর্ঘকাল ব্রহ্মপ্রবাসে অবস্থানের ফলে বাংলাদেশের অনেক নোংরামি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

গ্রামের সঙ্গে যে তাঁর কত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল 'পল্লী সমাজ' পড়লে তা বোঝা যায়। বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, পণ্ডিত মশাই প্রভৃতি গ্রন্থেও সে পরিচয় প্রচুর রয়েছে। শহরের ছবি শরৎ গ্রন্থাবলীর যেখানে যতটুকু আছে দুঃখের বিষয় তার বেশির ভাগই নগরের কলঙ্কিত অংশের ছবি। কিন্তু এই

কলঙ্ক-পঙ্কেও পঙ্কজিনী যে জন্মায় শরৎচন্দ্রের সন্ধানী দৃষ্টি তা এড়ায়নি। 'সাবিত্রী', 'চন্দ্রমুখী' প্রভৃতি তার সাক্ষ্য বহন করে এনেছে।

সে যাই হোক, এই অতুলনীয় শক্তিশালী লেখকের সৃষ্টচরিত্র নিয়েও আজ আলোচনা করতে চাই না। আমার সুযোগ হয়েছিল শরৎচন্দ্রের মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের ও "যমুনা" সম্পাদক বন্ধুবর ফণীন্দ্রনাথ পালের সহযোগিতায় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার। সে পরিচয় ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পৌঁছেছিল। সৌভাগ্যক্রমে বহুদিন—বহুরাত্রি তাঁর সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছি। তাঁর জীবনের বহু অভিজ্ঞতার গল্প শুনেছি তাঁর মুখে। তাঁর উদার হৃদয়ের মাধুর্য ও চরিত্রের মহৎ ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভাল না বেসে পারিনি।

আজ সেই আশ্চর্য মানুষটির জীবনের গুটিকয়েক ব্যক্তিগত কাহিনী শোনাতে এসেছি 'অমৃত' লোকের বন্ধুদের অনুরোধে। যতদূর স্মরণ হয়, এর কিছু কিছু সম্ভবতঃ পূর্বে দু'-একবার বলেছি। হয়ত এ ক্ষেত্রে তার অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তা হোক্। ভাল যা তা বার বার শুনতেও ভাল লাগে।

জলধর সেন, যিনি বাংলার সাহিত্যিক মহলের দাদা ছিলেন, তিনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "শরৎ-সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে, অনেক বিশ্লেষণ, ব্যবচ্ছেদও হয়েছে। আরও হবে জানি। তুফানও তুলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা সত্য, যা শিব, যা সুন্দর, পরিণামে তার জয় হবেই। শরৎচন্দ্র কোনওদিন 'নষ্টচন্দ্র' হবেন না।"

দাদা আরও বলেছেন, "শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাকতেন, পরে রূপনারায়ণের তীরে তাঁর পাণিত্রাসের দুর্গম আবাসে গিয়ে থাকতেন, আমাকে প্রায়ই তাঁর কাছে যেতে হত। সাহিত্য আলোচনার জন্য নয়, অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। সেখানে প্রায়ই অনেক সাহিত্যিকের সমাগম দেখেছি। সেখানে কেউ জিজ্ঞাসা করছে, কিরণময়ীকে পাগল করলেন কেন? কেউ কৈফিয়ৎ চাইছেন, আপনি অন্নদা দিদির খোঁজ-খবর আর দিলেন না কেন? ইন্দ্রনাথকে কোথায় নির্বাসিত করলেন? আবার কোনও অর্বাচীন হয়ত প্রশ্ন করে বসলো, আপনার শেখরচন্দ্রের সমাধান কি? ইত্যাকার নানা প্রশ্নে শরৎচন্দ্রকে তাঁরা প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন।

শরৎচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসতেন। প্রসন্ন বদনে তাঁর কোনও বিকার নেই! আমি ভাবতুম এই লোকটির সহিষ্ণুতা কী অপরিসীম!"

দাদা লিখেছেন, "ওসব কথা থাক! সাহিত্যিককে ছেড়ে মানুষ শরৎচন্দ্রের কথা কিছু বলি। শরৎচন্দ্রের একটা কুকুর ছিল। বিলিতী নয়। খাঁটি দিশী। তার নাম রেখেছিলেন 'ভেলু'। কুকুরটি দেখতে ছিল কদাকার, আর আচরণও ছিল অতি অভদ্র। যে-কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন তিনিই জানেন যে অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে তেড়ে এসে সে অভ্যর্থনা করতো! শরৎদর্শনপ্রার্থীবৃন্দ ভেলুর এই ভীষণ সম্ভাষণে আত্মরক্ষার জন্য দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন। শরৎচন্দ্র ভেলুর গর্জন শুনেই ব্যাপার বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেই বলতেন, এই ভেলু! কী হচ্ছে? ভেলু অমনি চুপ। মেষশাবকের ন্যায় শুড় শুড় করে ঘরে চলে যেত।

এই ভেলুকে শরৎচন্দ্র যে কী ভালবাসতেন বলতে পারিনি। শুধু ভেলুকেই নয়, সমস্ত জীবজন্তুর উপরই শরৎচন্দ্রের যে কি স্নেহের টান ছিল, তার তুলনা মেলে না। এই ভেলুর একবার খুব অসুখ হয়েছিল। বাড়ীতে কুকুরের ডাক্তার এনে যত রকম চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র অজস্র অর্থব্যয়ে তা করালেন। রোগ কিছুই কমলো না দেখে শেষ পর্যন্ত বেলগাছিয়ার পশু হাসপাতালে ভেলুকে নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে সারাদিন তিনি ভেলুর কাছে বসে থাকলেন। আহার নিদ্রা ভুলে তিনি ভেলুর সেবা করেছেন। কিন্তু, ভেলু সেরে উঠলো না। হাসপাতালেই তার মৃত্যু হল। শরৎচন্দ্র প্রিয়জনবিয়োগে শোকাভিভূতের মতো কাতর হয়ে পড়লেন। ভেলুর মৃতদেহ সস্নেহে বহন করে এনে শিবপুরের বাড়ীর প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করলেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে আমি সেই দিনই গেলাম শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে দেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শরৎচন্দ্র বালকের মতো কেঁদে উঠে বললেন, 'দাদা, আমার ভেলু আর নেই!' মুখ দিয়ে কথা বেরুল না আর। এই আমার শরৎচন্দ্র!"

এই ভেলুর ব্যাপার সম্বন্ধে আমার নিজের দু'-একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। দাদার মতো আমিও প্রায় প্রতি

রবিবার আর ছুটির দিনে সকালে শরৎদার বাড়ী যেতাম। কোনো কোনো দিন সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বিকেলের দিকে শরৎদার সঙ্গেই কলকাতায় ফিরতেম। একদিন ও'র শিবপুরের বাসা বাড়ীর বসবার ঘরে বসে আছি, শরৎদা সেই ঘরে বসেই লেখাপড়াও করেন। কোনও ভক্ত তাঁকে একটি দামী 'রোল্‌টপ-রাইটিং ব্যুরো' উপহার দিয়েছিল। সেটি ঘরের এক পাশে অনাদরে পড়েছিল। শরৎদা ব্যবহার করতেন না। তিনি সেই সাবেকি চালে তক্তাপোষের উপর সামনে একটি চৌকি রেখে লিখতেন।

একদিন আমি সেখানে বসে থাকতে থাকতেই উপহার এল দেখলুম কোনও অনুরাগিনীর কাছ থেকে এক থালা 'আবার খাবো' সন্দেশ। সন্দেশের থালার উপর একখানি চিরকুটে দু'লাইন মিনতি লেখা আছে—'গ্রহণে কৃতার্থ হবো,—ইলা', কে এই ইলা জানিনি, জানতে চাইওনি! তবে, দেখলুম সন্দেশের থালা ঘরে আসা পর্যন্ত ভেলু তার চারপাশে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে লাগলো। শরৎদার সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি একটি সন্দেশ নিয়ে ভেলুকে আদর করে খেতে দিলেন। ভেলু সেটি তৃপ্তির সঙ্গে চেটে-পুটে খেয়ে শেষ করে শরৎদার মুখের দিকে করুণ নেত্রে চাইতেই শরৎদা তাকে আবার একটা সন্দেশ খেতে দিলেন। ভেলু আরও চায়। শরৎদাও দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত সন্দেশের থালা খালি হয়ে গেল।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। বললুম, শরৎদা' এটা কি হ'ল? সে মহিলাটি আপনার খাবার জন্য এত যত্ন করে সন্দেশ পাঠালেন, আপনি তা না খেয়ে নিঃশেষে সব কুকুরকে খাওয়ালেন? শুনলে তাঁর মনে কী কষ্ট হবে ভাবুন তো? শরৎদা হেসে বললেন, ওই তো তোমাদের দোষ। কোনও জিনিসই তলিয়ে দেখবার বা বোঝবার চেষ্টা করো না! ইলা আমায় সন্দেশগুলি পাঠিয়েছিল কেন? আমি খেয়ে তৃপ্ত হবো এই আশাতেই তো? আচ্ছা, এখন বোঝো, আমি নিজে সন্দেশ না খেয়ে আমার ভেলুকে খাইয়ে কত বেশি পরিতৃপ্ত হয়েছি। এত তৃপ্ত কি নিজে খেলে হ'তে পারতুম। সুতরাং, ইলার অর্ঘ্যদান ব্যর্থ হওয়া দূরে থাক বরং সর্বরকমে সার্থক হ'ল ব'লে আমি মনে করি।

আমি একেবারে চুপ! ভাবলুম, সত্যই তো! শরৎদা ঠিকই বলেছেন। আমি তো এভাবে ব্যাপারটাকে বিচার ক'রে দেখিনি!

শরৎদার এই ভেলুর সম্বন্ধে আর একটা ভারি মজার গল্প মনে পড়ছে। সেদিন রবিবার ছিল। সকালেই শরৎদার বাড়ী এসেছি। কথায় কথায় অনেক বেলা হ'য়ে গেল। বেথুন কলেজের একজন অধ্যাপক এসেছিলেন তাঁর কাছে। শরৎচন্দ্রের রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন। কবি গিরিজাকুমার বসুও সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ হয়ত মস্ত কবি হ'তে পারেন, কিন্তু আমরা এই মিস্টিক্‌ কবির রচনা কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁর ওই জীবন-দেবতার রহস্য আজও ভেদ করতে পারিনি। ওই যে তাঁর সেই ঔপনিষদিক ভূমার ধূমাচ্ছন্ন ব্যাপার আমাদের কাছে নিতান্ত অস্পষ্ট, আবছা আর ঝাপ্‌সা লাগে। ওর মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য মনে হয়। আপনার লেখায় কিন্তু কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। যতবার পড়ি ভাল লাগে। মুগ্ধ হয়ে যাই।'

শরৎদা বললেন, তার কারণ কি জানেন প্রোফেসর মশাই, আমরা যে লিখি আপনাদের জন্যই। আপনারাই আমাদের পাঠক। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ লিখেন আমাদের জন্য। আমরাই তাঁর পাঠক। তাই আমাদের কোথাও একটুও অস্পষ্ট ঠেকে না!

এমন সময় তাঁর বাড়ীওয়ালা এলেন ভাড়ার তাগাদায়। প্রোফেসার এই সুযোগে সরে পড়লেন। কবি গিরিজাকুমার বসু তখন শিবপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ীতেই থাকতেন। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। সেদিন পাঁজিতে সম্ভবতঃ কিছু একটা বারব্রত ছিল। শরৎদার জীবনসঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবী প্রকৃত 'হিন্দু নারী' ছিলেন। বারো মাসে তেরো পার্বণ, কোনোটাই বাদ দিতেন না। দান, ধ্যান, গঙ্গাস্নান, পুজো, ব্রাহ্মণভোজন লেগেই থাকতো। হিরণ্ময়ী দেবী নিজে প্রত্যহ পতির পাদোদক পান না করে জলগ্রহণ করতেন না। বাড়ীর ভিতর থেকে সেদিন ঠাকুর এসে হুকুম জারি করে গেল—'মা বলে পাঠালেন, নরেনবাবুকে আজ এখানে খেয়ে যেতে হবে।' শরৎদার [illegible]

উপায় ছিল না। হিরণ্ময়ী দেবীর গভীর প্রেম, অক্লান্ত সেবা, দেবদ্বিজে ভক্তি, অকৃত্রিম ধর্মানুরাগ এবং সর্বোপরি তাঁর সুগঠিত দেহের রূপলাবণ্যে শরৎচন্দ্র একেবারে মুগ্ধ ছিলেন। কতবার তাঁকে বলতে শুনেছি বড়বৌয়ের রং খুব ফর্সা না হ'লেও অমন 'ফিগার' বাঙালী মেয়ের মধ্যে খুব কম দেখা যায়!

বৌদির সম্বন্ধে শরৎদার এই পক্ষপাতমূলক উক্তিগুলি অবশ্য আমরা বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিতুম। কারণ, শরৎদার চোখে যে প্রেমাঞ্জন মাখানো দৃষ্টি ছিল, আমাদের তা' ছিল না। তবে এ বলছি অনেক আগের দিনের কথা। তখনও মহাযুদ্ধ বাধেনি। শরৎদা' সবে ব্রহ্মদেশ ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরেছেন তাঁর স্বর্গীয় বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সনির্বন্ধ চেষ্টায় ও ভারতবর্ষ প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন ছত্রিশ আটত্রিশের বেশি নয়, আর হিরণ্ময়ী দেবী পূর্ণ পরিণত যৌবনে বিকচ কমলের মতো নিটোল।

হিরণ্ময়ী দেবী বাল্যে বা কৈশোরে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গিনী হবার পর শরৎদাই তাঁকে বহুকষ্টে লেখাপড়া শেখান। তবে সেটা প্রাথমিক শিক্ষার বেশি অগ্রসর হয়নি। যুক্তাক্ষর দিয়ে নাম। বেশ কসরত করেই বৌদিকে সই করতে হ'ত। হিরণ্ময়ী দেবী সম্পূর্ণ পর্দানসীন মহিলা ছিলেন। শরৎদার আদেশ ও অনুমতি ছাড়া কারুর সামনে বেরুতেন না। আমাদের 'ঠাকুরপো' বলে যথেষ্ট স্নেহ সমাদর করলেও কখনো মাথার কাপড় খুলে আমাদের সামনে বেরুতেন না।

সেদিন বৌদির ব্রত-উদ্‌যাপন থাকায় মধ্যাহ্নভোজনটা বেশ গুরুতরই হ'ল। আহারান্তে আমাদের বাইরের ঘরে চলে আসতে বেলা প্রায় দুটো হয়ে গেল। এসে দেখি বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক তখনও ঘরের এক কোণে বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে ভাড়ার টাকাটা তখনও সেইভাবেই ধরে আছেন। আর, তাঁর সামনে থাবা পেতে ভেলু বসে আছে তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। ভয়ে তিনি এক পা নড়তে পাচ্ছেন না! আমার তো তাঁর এই বিপন্ন অবস্থা দেখে বড়ই করুণা হল। বেচারা কুকুরের ভয়ে নড়তে চড়তে পারছেন না। শরৎদাও বাড়ীওয়ালার সেই [illegible]

অবস্থা দেখে লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন। ভেলুকে কাছে টেনে নিয়ে ব'ললেন, যান, এইবার চট্ করে চলে যান। তাইতো! এতখানি বেলা হয়ে গেল। আপনার নাওয়া খাওয়া হয়নি এখনও। ছি ছি ছি। যান, এই বেলা পালান। বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। আপনি আটকে পড়েছেন জানতুম না!

বাড়ীওয়ালা হাঁফ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলো।

আর একটি কুকুরের গল্প বলি। এটা শিবপুরের ঘটনা নয়। সামতাবেড়ে দেখেছি। শরৎচন্দ্র পাণিত্রাসে রূপনারায়ণের তীরে নিজের বাড়ী করবার পর প্রায়ই সেখানে গিয়ে থাকতেন। কিন্তু, শরৎদার প্রতি আমাদের এমন একটা প্রীতির আকর্ষণ ছিল যে, তাঁর সঙ্গলাভে আমরা প্রায়ই সামতাবেড়ে ছুটতুম। মাঠের উপর দিয়ে ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আল ভেঙে, খানা ডোবা পুকুর পাড়ের বাঁশের সাঁকো পার হয়ে প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে আমরা শরৎদার বাড়ী গিয়ে হাজির হতুম। এই পথকষ্টটুকু সহ্য করে সেখানে একবার উপস্থিত হ'তে পারলেই, বস্! নিশ্চিন্ত। সারাদিন পরমানন্দে কাটিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় ফিরে আসতুম। শরৎদার বাড়ী যেতে হলে বাগনান পার হয়ে 'দেউলটি' ষ্টেশনে নামতে হ'ত। যেবার সস্ত্রীক যেতুম তাঁকে একদিন আগে জানালেই তিনি পাল্কী পাঠিয়ে দিতেন ষ্টেশনে। কাজেই মেয়েদের সেখানে যাবার কোনও কষ্টই হ'ত না।

একবার আমরা তাঁকে কোনও খবর না দিয়ে স্বামীস্ত্রী হেঁটেই সামতাবেড়ে গেছলুম। ভোরের গাড়ীতে। তবু শ্রান্ত ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হ'য়ে সেখানে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় দশটা বাজে। দেখি শরৎচন্দ্র তাঁর বাড়ীর সামনে বাগানের এক কোণে ঘাসের উপর বসে গুটি কয়েক সদ্যজাত কুকুরছানাকে তুলোর পলতে ক'রে অতি সযত্নে দুধ খাওয়াচ্ছেন!

এ দৃশ্য দেখে আমাদের আর এক নিশীথ রাত্রের ঘটনা মনে পড়ে গেল। শরৎদার বালিগঞ্জের বাড়ী কিছুদিন আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শরৎদা এ বাড়ীতেই থাকেন। মাঝে মাঝে সামতাবেড়ে যান। কলকাতার বাড়ীটার নাম রেখেছিলেন 'আমার শহরের বাসা'। আর, সামতাবেড়ের সেই রূপনারায়ণ নদীর তীরের 'মাঠকোটাকে' বলতেন 'আমার দেশের বাড়ী'। যাই হোক, কলকাতায় যখন থাকতেন, তখন প্রতিদিনই সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী এসে বসতেন। আমরা তখন তাঁর বাড়ীর খুব কাছেই বাসা করে আছি। শরৎদা গল্পে গুজবে, আলাপে আলোচনায় এমন আসর জমিয়ে রাখতেন যে, রাত বারোটা না বাজলে তাঁর বাড়ী ফেরার হুঁস হত না। আমরাও মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেই বিচিত্র জীবন-কাহিনী শুনতাম। সময় যে কোথা দিয়ে চলে যেত কিছুই টের পেতাম না। এখন আপসোস হয়, শুধু মুগ্ধ হ'য়ে না শুনে যদি সেই গল্পগুলি খাতায় টুকে রাখতুম, তাঁর জীবনের কত অত্যাশ্চর্য ঘটনাই না লোকে জানতে পারতো!

অত রাত্রে শরৎদাকে আমরা আর একলা ছেড়ে দিতুম না। দুজনেই তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁকে পণ্ডিতিয়ার মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতুম। একদা মধ্যরাত্রে আমাদের সান্ধ্য-আসর নৈশ-নিস্তব্ধতার মধ্যে সমাপ্ত হবার পর চলেছি দুজনে শরৎদাকে পৌঁছে দিতে। মহানির্বাণ মঠের কাছাকাছি এসে কচি শিশুর গলার কান্না শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মহানির্বাণ মঠে সে সময় প্রাচীর ঘেরা হয়নি। কাঁটা গাছের বেড়া। ঝোপঝাড় জঙ্গল। ফুটপাথ বাঁধানো হয়নি। সেখানেও বড় বড় গাছ। সেই গাছের আড়ালে অন্ধকারে ঝোপের ধারে শরৎদা আবিষ্কার করলেন একটি ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটুলির মধ্যে একটি শিশু কাঁদছে। শরৎদা সেখানে বসে পড়লেন। শিশুটিকে সযত্নে পুটুলি খুলে বার করে দেখেন—সদ্যজাত শিশু! তার গায়ে অসংখ্য পিঁপড়ে লেগেছে। তিনি মায়ের মতই, আহারে! বাছারে! মরে যাই! কত কষ্টই না পাচ্ছে! বলে ছেলেটিকে পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন। আমার স্ত্রীকে বললেন রাধু! শিগ্গীর তোমার বাড়ী থেকে একটু ঈষৎ গরম দুধ আর তুলোর পলতে করে নিয়ে এসো দেখি।

তাঁর আদেশ পালন হ'তেই শিশুটিকে ঠিক এই আজকের মতই তুলোর পলতে করে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে আমাকে বললেন, তুমি যাও, এখনি থানায় টেলিফোন ক'রে দাও, তারা এসে ছেলেটিকে কোনও 'শিশু সদনে' নিয়ে যাক। আমার স্ত্রী বললেন, না বড়দা, আমি নিয়ে যাই। মানুষ করবো। শরৎদা বললেন, আপত্তি ছিল না রাধু, যদি পথে-পরিত্যক্ত শিশু না হ'তো। এর পিছনে একটা করুণ ইতিহাস রয়েছে। পরে হয়ত ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

টেলিফোন পেয়ে পুলিশ এসে যে পর্যন্ত না ছেলেটিকে থানায় নিয়ে গেল,
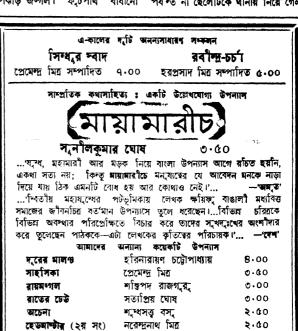
শরৎদা সেখান থেকে নড়লেন না। পুলিশকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে রিপোর্টে সাক্ষী হয়ে তবে বাড়ী ফিরলেন। রাত্রি তখন দুটো হয়ে গেছে।

সেদিন সামতাবেড়ে শরৎদার বাড়ী ঢুকেই সেই দৃশ্য দেখে আমরা অবাক! প্রশ্ন ক'রে জানা গেল কোনও অজ্ঞাত-পরিচয় পথের কুকুর তাঁর বাগানে ঢুকে এই বাচ্চাগুলি প্রসব করে গেছে। সে যেখানেই থাক ঠিক সময়ে এসে কিন্তু বাচ্চাগুলোকে স্তন্যপান করিয়ে যায়। হঠাৎ কাল থেকে সে আর বাচ্চাদের কাছে আসেনি। নিশ্চয় সে বিপদে পড়েছে বা মারা গেছে। চারিদিকে লোক লাগিয়েছি তাকে খোঁজ করতে। যে তাকে খুঁজে আনতে পারবে তাকে দশ টাকা বখ্‌শিশ দেব।

এমন সময় দু'জন লোক হন্তদন্ত হ'য়ে এসে বললে, পেয়েছি বড়বাবু! হাই, কামারদের বাড়ীর শুকনো মজা কুয়োতার মধ্যে পড়ি রয়েছে। প্রাণে বেঁচে আছে। আনব তুলে? শরৎদা বললেন, এখনি তুলে আন্, আরও পাঁচ টাকা বখ্‌শিশ বেশি পাবি। ছুটলো তারা। আমরাও এ ব্যাপারে উৎসুক হয়ে উঠলুম। ক্ষণকাল পরেই কুকুরটাকে এনে তারা হাজির করে দিলে। মাতৃহারা ছানাগুলি মাকে পেয়ে আনন্দে কুঁই কুঁই করে উঠলো। সে আনন্দে শরৎদার মুখও উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! প্রতিশ্রুত বখ্‌শিশ তিনি তৎক্ষণাৎ লোকদুটিকে দিলেন।

জীবজন্তুর প্রতি এমনিই গভীর মায়ামমতা ছিল শরৎদার। বাগানের একধারে দু'টো বেশ মোটাসোটা গাট্টা-গোট্টা বোকা-পাঁঠা পরস্পরের সঙ্গে শিং ঠুকে লড়াই করছিল। শুনলুম, এ দু'টি বুগকে শরৎদা কসাইদের কবল থেকে উদ্ধার করে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন। এদের নাম ধরে ডাকলেই এরা শরৎদার কাছে দৌড়ে আসে। অপরিচিতরা কাছে গেলে শিং নেড়ে গুঁতিয়ে দিতে আসে।

শরৎদা যখন মোটরগাড়ী কিনে-ছিলেন তখন তাঁর গাড়ীর চালক কালীকে প্রথমদিনেই বলে দিয়েছিলেন যে, যেদিন তুমি রাস্তায় গাড়ী চালাবার সময় কোনও কুকুর, বিড়াল, ছাগল বা হাঁস মুরগী চাপা দেবে সেইদিনই কিন্তু তোমার চাকরি যাবে। অতএব পথে দেখে-শুনে সাবধানে গাড়ী চালিও।

দীন দুঃখী দরিদ্র নরনারীর প্রতিও তাঁর দয়া ও অনুকম্পার সীমা ছিল না। একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। চলেছি তাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে কি একটা জিনিস কিনতে গড়িয়াহাটের দিকে। শীতকাল। সম্ভবতঃ পৌষ মাস। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা ছাতা নিয়েই বেরিয়েছিলুম। গড়িয়াহাটের মোড়ে আসতেই এক বুড়ি শরৎদার সামনে কিছু ভিক্ষার জন্য হাত পেতে দাঁড়ালো। বৃষ্টিতে কাপড় চোপড় ভিজে গেছে। শীতে কাঁপছে। শরৎদা তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে তাঁর মনিব্যাগ বার করে বুড়ির হাতে উপুড় করে ঝেড়ে দিলেন। নোট টাকা, রেজকী মিলিয়ে সে অনেক টাকা হবে।

এটাকে আমার একটু বাড়াবাড়ি আর শরৎদার বোকামি বলেই মনে হ'ল। সে কথা বললুম! একটু মৃদু আপত্তিও জানালুম। বুড়ি মলে হয়ত ওর কাঁথার তলা থেকে কয়েক হাজার টাকা বেরুবে। শরৎদা আমার কোনও কথায় কান না দিয়ে বুড়িকে বললেন, এই শীতে ঠাণ্ডায় আর বেরুবেন না। যে কদিন চলে এইতে চালিয়ে নেবেন। পরে আবার দেবো। ফুরিয়ে গেলে আমার কাছে আসবেন। আমারই পকেট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে তাইতে নিজের নাম ঠিকানা লিখে বুড়িকে দিলেন।

তাঁর দেশের গ্রামে গিয়েও দেখেছি তিনি গরীব গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। ঔষধ দেন। সে ঔষধে কাজ হয় তার প্রমাণ পেলুম ক্রমবর্ধমান রোগীর ভীড় দেখে। মনে হল বামুনের মেয়ের প্রিয়নাথ ডাক্তার বোধ করি শরৎদা নিজেই। শুধু কি ওষুধ দিয়ে আরোগ্য ক'রেই নিশ্চিত হ'তেন? রোগী সেরে উঠে পথ্য করবে কি করে? টাকা পয়সা পাবে কোথায়। শরৎদা নিজেই তাদের কিনে পাঠাচ্ছেন দেখি,—মাগুর মাছ, শিঙি মাছ, বেদানা, আপেল, সাবু, মিছরি, দাদখানি চাল। সারা গ্রাম তাই শরৎদার কথায় ওঠে বসে। দাদাঠাকুর বলতে তারা অজ্ঞান।

গ্রামের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে একা বহন করতেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই বা ভাইপো কেউই অকুলে সাহায্য না করায় শরৎচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবী কায়ক্লেশে সে ব্যয় নির্বাহ করতেন।

দরিদ্র গ্রামবাসীদের শুধু ঔষধ পথ্যই নয়, শরৎচন্দ্র তাদের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের জন্যও বিশেষ উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। এদেরই জন্য তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণ করেছিলেন। সর্বদাই এদের কল্যাণের জন্য তাঁকে সচেষ্ট দেখা যেত। জলধরদাও একথা বলতেন। তিনি লিখেওছেন—"একদিন প্রাতঃকালে শরৎ-চন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশ ছোট বড় সাইজের মিলের ধুতি শাড়ী থাকে থাকে সাজানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ভোলা সেগুলি ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে বেঁধে প্যাক করে ফেলছে। আর শরৎ তখন গড়গড়ার নল ফেলে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে টাকা, আধুলি, সিকি, দু'আনি গুণে গুণে কাগজে মোড়ক করে নাম লিখে লিখে রাখছেন।

আমি ভাবলুম বড় বৌমার বুঝি কোনও ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে তাই এত কাপড় চোপড় যাচ্ছে? আর, হয়ত কাঙালী বিদায়ও হবে তাই এত আনি-দু'আনি নিয়ে যাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? দেশে বুঝি ব্রত-প্রতিষ্ঠা কিছু আছে, তারই আয়োজন হ'চ্ছে বোধ হয়। শরৎচন্দ্র আমার দিকে চেয়ে বললেন, না দাদা, 'ব্রত-ফ্রত' কিছু নয়। বুঝলুম সে আসল কথাটা ভাঙতে চায় না। গোপন করারই ইচ্ছে। বললুম, ব্রত উদ্‌যাপন যদি না হবে তবে এত নতুন কাপড় আর দক্ষিণার পয়সা নিয়ে যাচ্ছ কেন?

শরৎ ম্লান মুখে বললেন, দাদা, আমাদের গাঁয়ে, শুধু আমাদের গাঁয়েই বা কেন বলি, আশপাশের আর পাঁচ-খানা গ্রামেরও গরীব দুঃখী লোকজন-গুলোর যে কি দুর্দশা দেখলে আপনার কান্না পাবে। পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই, সে যে কি ভীষণ দুরবস্থা!...শরৎ আর বলতে পারলে না। তার দুই চোখ সজল হয়ে উঠলো।"

আজ কত কথাই যে তাঁর মনে পড়ছে। এবার এই পর্যন্ত থাক। পরে আবার হবে।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। উনিশ ।।

ঝাঁসি ছাড়িয়ে ট্রেন চলেছে আগ্রার দিকে। অজানা প্রান্তর পেরিয়ে যাচ্ছি। বাইরে জ্যোৎস্নার আভা আছে,—কিন্তু ধূসর অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে কিছু দেখা যায় না। কিষণকে রেখে এলুম সুকেতগড়ে। ছেলেটা আন্দাজে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল আমি যাচ্ছি দিল্লীর কোনও একটা অনির্দিষ্ট ঠিকানায়। দুঃখের মধ্যেই যাচ্ছি মনে ক'রে ছেলেটার চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়েছিল। মাধবেন্দ্র রত্না দেবী শিবন্তী মণিপ্রসাদ কিষণ—এরাই এসেছিল ষ্টেশনে। বিদায়ের পালাটায় বিষাদের আভাস ছিল।

আমার সঙ্গে এসেছে কেবলমাত্র একটি সুটকেস। পিছনে পড়ে রইল মস্ত এক সংসার, সেটা সুকেতগড়,—হেনার সৃষ্টিলোক। একদা দিল্লী থেকে হেনা এনেছিল প্রচুর আসবাবসজ্জা,—সেগুলি সুকেতগড়ের কাজে লেগেছে আর যা কিছু রইল সব হেনার। সে ফিরবে আবার সুকেতগড়ে, এ প্রত্যাশা থাক্! মানুষের কল্যাণকর্ম অসমাপ্ত রেখে সে কোথাও স্থির থাকতে পারবে না, সৃষ্টির প্রেরণায় আবার তাকে ফিরতে হবে। যদি খবর পাই কখনও, সে ফিরে এসেছে,—আবার আমি আসব।

নিয়তির চক্রান্তটা একে একে সব কেড়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। আনন্দের প্রতীক, সুখের উপকরণ, প্রত্যহের অনুপ্রেরণা, জীবনের স্পন্দন,—কোনটাই ধরে রাখতে পারছিনে। সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত যেটা,—হেনার সান্নিধ্য —এবার যেন সেইটিই সর্বাপেক্ষা অনিশ্চিত মনে হচ্ছে। বাইরের ওই ধূসর চন্দ্রাভার দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে ভাবছিলুম, তিন মাস ধ'রে কেউ কি এমনি একান্ত করে প্রহর গুনেছে? কেউ কি আমার মতো গুনেছে বুকের স্পন্দনধ্বনি তিন মাসে কতবার ধুকধুক করে? এটা নতুন যে, জীবনের একান্ত প্রিয়জন হঠাৎ অকারণে নিরুদ্দেশ হয়। শুধু তাই নয়, আপন পিছন-পথের সব পায়ের চিহ্নও মুছে-মুছে চলে যায়। হেনা বলত, তুমি দেখ, আমি ছড়িয়ে থাকব সমস্ত ভারতবর্ষে,—আর এখানে ওখানে সেখানে হয়রান হয়ে তুমি আমাকে খুঁজবে!

উত্তরে তামাশাচ্ছলে আমি প্রশ্ন করতুম, জনৈক স্ত্রীলোকের অন্বেষণে ভারতময় ঘুরব সে কেমনধারা কথা?

হেনা বলত, এমন হতে পারে ওই অন্বেষণের সূত্রেই দেখতে পাবে মানুষ কোথায় মহৎ কল্যাণকর্মে জীবনপাত করছে! হয়ত দেখবে কোথাও নিভৃত তপোবনে যজ্ঞহুতাগ্নি জ্বলছে, তারই সামনে নতুন কালের জীবন-সাধক ভবিষ্যযুগের নবমন্ত্র রচনায় বসেছে!

আমি বলতুম, এ যেন কাব্যকল্পনার মতো শোনা যাচ্ছে!

তা কেন হবে? হেনা বলত, যার চোখ আছে খোলা, মন আছে সজাগ, সেই দেখবে। প্রতিভা পথ খুঁজে পাচ্ছে না, শক্তিমানের মাথা হেঁট হচ্ছে অপমানে, কারও রথের চাকা বসে গেল পাঁকের মধ্যে, আবার কারও চোখে বা জল ঝরছে অহেতুক উৎপীড়নে। এগুলোর কোনটাই কবি-কল্পনা নয়,—চোখ থাকলেই দেখবে এই সব নিয়েই জীবনের বিরাটত্ব!

চলন্ত গাড়ির দোলায় তন্দ্রা আসছিল, এবং ওরই মধ্যে বসে ভাবছিলুম হেনা যদি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তবে তাকে ধরতে গেলে আমাকে আরও এক বছরের জন্য আপিসে ছুটি নিতে হবে। কখনও বনজঙ্গলে, কখনও সমুদ্রের ধারে, কখনও পাহাড়ে পর্বতে, আর নয়ত দিল্লী-বোম্বাই কলকাতা! কিন্তু একটা কথা বিগত তিনমাস কাল ধরে আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে এই, হেনা নিজের চারিদিকে এমন রহস্যের আবরণ কেন টেনে দিল?

পরদিন দিল্লী ষ্টেশনে যখন গাড়ি এসে থামল, সকাল তখন প্রায় সাড়ে আটটা। গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই দূরের থেকে ডাক এল, পার্থদা—?

আমি ফিরে তাকালুম। একটি উনিশ কুড়ি বছরের সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবান তরুণ যুবা হাসিমুখে এসে আমার হাত ধরল। আমি বললুম, পোষ্টকার্ডখানা তাহলে বন্ধুবর সুকুমারের হাতে ঠিক পড়েছিল দেখছি! তুমি কতক্ষণ এসেছ, দেবু?

দেবু বলল, আপনার গাড়ি এক ঘন্টা লেট্। আমি এসেছি ভোর সাতটায়। দাদা আর বড় বৌদি দুজনেই বলে দিয়েছে আপনাকে বিনয়নগরের বাড়িতে নিয়ে যেতে।

বললুম, সুকুমারের এই সব ছেলেমানুষি কথায় কান দিয়ো না, দেবু। কেরলবাগের মেসে আমি ভালই থাকব,—তোমার দাদা-বৌদিদিকে আমিই একদিন নেমন্তন্ন করে পাঠাব,—বলো তাঁদের।

দেবু আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে এক সময় বলল, পার্থদা, দেড় বছর পরে আপনাকে এ কি চেহারায় দেখছি বলুন ত? প্রথমত থার্ডক্লাসে আপনার মতন এত বড় অফিসারকে দেখব আশা করিনি। তার ওপর কী কাহিল হয়েছেন আপনি দেখেছেন কি?

হেসে বললুম, দেবু, তোমার এই অভিমানময়ী বক্তৃতার ফাঁক দিয়ে আমার

সুটকেসটি না অদৃশ্য হয়! ওটি কিছু মূল্যবান।

সুটকেসটি দেবু হাতে করে নিল। পরে বলল, না, সত্যি বলছি পার্থদা। দাদা-বৌদি আপনাকে দেখলে চমকে যেত! নিজের জামা-কাপড়ের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে কি দেখেছেন? কই, আপনাকে ত কখনও ছেঁড়া পাজামা আর ময়লা শার্টে দেখিনি? মাথার চুলের চেহারাটা কেমন দাঁড়িয়েছে, আয়না ধরে দেখবেন চলুন।

আমি খুব হাসছিলুম। এবার বললুম, একটু আস্তে বল দেবু, শুনবে কেউ। আমি যে মাঠ-ময়দান আর বন-জঙ্গলে ঘুরতুম হে! সে সব জায়গায় কি ফিটফাট থাকা যায়? নাও, চলো—

দেবু চলতে চলতে বলল, সেখানে কি ধোপা নাপিতও নেই?

সব আছে!—আমি বললুম, কিন্তু আমরা শহর থেকে যে অনেক দূরে থাকতুম! ভারি চমৎকার ছিলুম, বুঝেছ দেবু?

সে ত' দেখতেই পাচ্ছি, পার্থদা!—ও কি, কি হল?

বললুম, না, এমন কিছু না। চটিজুতোর ফিতেটা ছিঁড়ে গেল!

দেবু আমার পায়ের দিকে চেয়ে হেসে উঠল। বলল, চটি যে আপনার একদম ছেঁড়া! সেই মান্ধাতা আমলের! আপাতত যা হোক ক'রে বাইরে আসুন, একখানা ট্যাক্সি ধরি। অবাক করলেন আপনি। দাদা-বৌদি শুনলে কি বলবে বলুন ত? সেই ভাল, ও'দের সামনে আর যাবেন না! ও'রা ভয় পাবেন আপনাকে দেখে! কেরলবাগেই চলুন—

আমি হাসছিলুম। বললুম, মনে হচ্ছে তুমি গিয়ে বেশ ফলাও করে সুকুমারকে সব বলবে, কি বল দেবু?

দেবু বলল, নিশ্চয় বলব! আপনি নিজের ওপর এই অত্যাচার করবেন, আর আমার বলতেই যত দোষ? আসুন,—গাড়ি একখানা আছে দেখছি!

দেবু আমাকে নিয়ে গিয়ে একখানা ট্যাক্সিতে তুলল।—

আন্দাজ বেলা দশটায় আমরা কেরলবাগের একটি ছোটখাট মেস-বাড়িতে এসে উঠলুম। এটি আমার বিশেষ পরিচিত। মাদ্রাজি, পাঞ্জাবী, মারাঠি মিলিয়ে জনকুড়ি চাকুরে লোক এখানে থাকেন। কিন্তু এ-মেসটি বাঙালীপ্রধান। এখানে সুকুমারের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকার জন্য দোতলার একটি ঘর এবং তৎসংলগ্ন স্নানাগারটি বরাবরই রিসার্ভ করা থাকে। সুতরাং দেবুর সঙ্গে আমাকে দেখামাত্রই এই মেসের ম্যানেজার নকুল ঘোষ মশাই হাসি মুখে সেই ঘরটি খুলে দিলেন এবং গলা বাড়িয়ে নিচের তলার দিকে কা'কে যেন ডেকে তৎক্ষণাৎ প্রাতরাশের ফরমাস করলেন।

ঘরটি বিছানাসমেত সুসজ্জিত। সুতরাং কেবলমাত্র সঙ্গে একটি সুটকেস নিয়ে এসে ঢুকলে কোনদিক থেকেই অসুবিধা হবার কথা নয়। দেবু আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, কলেজ থেকে ফিরে আবার আপনার খবর নেব, পার্থদা। আমার কাছে আপনার কথা শুনলেই দাদা-বৌদি ছুটে আসবেন। তবে সন্ধ্যের আগে আসতে পারবেন মনে হচ্ছে না। আপনি কিন্তু কোনও এনগেজমেন্ট্ করবার আগে দাদাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে নেবেন।

হাসিমুখে বললুম, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। দু'-চারদিন নেমন্তন্ন না খাইয়ে তোমরা ছাড়বে না। এই ত?

দেবু হাসিখুশী মুখে তখনকার মতো বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এ-ঘর আমি দেখে গেছি অনেক-বার, কিন্তু থাকিনি। এখন থেকে থাকব এবং যতদিন অবধি সরকারি বাংলো আবার না পাই ততদিনই এখানে থাকব। আর কিছু না হোক, আমার চারপাশে যারা রয়েছে তাদের নিয়েই ত' আমাকে দিন কাটাতে হবে। সস্ত্রীক সুকুমার, অধ্যাপক তাপস মিত্র, ড্রামাটিক ক্লাবের অর্জুন গুপ্ত, ডেপুটি নিখিল-বাবু, মানজাপ্পা সাহেব, হরনাম সিং—এদের সঙ্গে মিলিয়েই ত' আমার কর্ম-জীবন। সুতরাং প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে বন্ধু ও পরিচিত মহলে আমন্ত্রণ এবং আপ্যায়নের সমারোহের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে যেদিন পুনরায় আমার দপ্তরে গিয়ে উপস্থিত হলুম, সেদিন আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি কতখানি হয়েছে জানিনে, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদের চাকচিক্যে আমার উর্ধ্বতন অফিসার মহাশয়ের চেয়ে কম ছিলুম না!

বলতে গেলে বিগত দেড় বছর ধরে একটা মানসিক বিপর্যয় ঘটে গেছে, সন্দেহ নেই। আমি যেন মায়া-লোকে বিচরণ ক'রে ফিরেছি, চোখে যেন আজও লেগে রয়েছে মোহাঞ্জন। সর্বাপেক্ষা যেটা বাস্তব, যেটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবনধারণের প্রশ্ন, যেটা অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের কথা, যেটা পারিপার্শ্বিক সমাজের সুখদুঃখ, শোক-তাপ, আনন্দ-বেদনার কথা,—সেটার দিকে আমার চোখ ছিল না এতদিন, এটা লজ্জার কথা। অতএব আমি যে কেবল বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আমার ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটি জটিল কাজের মধ্যেই নিজকে ছড়িয়ে দিলুম তাই নয়, সমাজজীবনে যে সকল বন্ধুবান্ধবকে এতদিন ধরে অনেকটা অনাদর এবং অনেকখানি ঔদাসীন্যের সঙ্গে এড়িয়ে চলেছিলুম—নিজের গরজেই আবার তাদেরকে একে একে খুঁজে বার ক'রে আমার প্রত্যহের শূন্য অবকাশগুলিকে ভরিয়ে তুলবার চেষ্টা পেলুম। আমি নিজে মোটরড্রাইভ জানতুম, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে একখানি গাড়ি কিনে আমার সর্বপ্রকার ছুটোছুটির সুব্যবস্থা ক'রে নিলুম। একই দিনে কোথাও তাস-পাশা নিয়ে বসলুম, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে গেলুম টেনিস কোর্টে, সন্ধ্যায় গেলুম কোথাও বিলিয়ার্ডস-এ, রাত্রে কোথাও 'মৌমাছিদের' 'ডিনারে', অথবা তার চেয়েও আকর্ষণীয় স্থান—রাত্রের নাচ-মহলে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এবার আমার আনন্দ ও সুখ চাই, আমার কাঁচা বয়সের সম্ভোগ চাই, আমার চারিদিকের জীবন-ব্যবস্থার সমারোহ চাই। কেউ যদি কখনও আমার কানে মন্ত্র দিয়ে থাকে, তুমি যোগী-তপস্বী হও, তুমি আজীবন ব্রহ্মচর্য-পালনের মধ্যে থাকো, আত্মনিগ্রহ তোমার লক্ষ্য হোক, ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য তোমার দরকার নেই—তবে সে ভুল করেছে। আমাকে যদি কেউ বলে থাকে আমি ভীরুস্বভাব এবং দুর্বলপ্রকৃতি, কিংবা মেরুদন্ডহীন,—তবে সে সত্য বলেনি। যারা আমার কানে কানে এত-কাল বলে এসেছে আমি একটু বেশি রকমের সচ্চরিত্র, একটু বেশি সংযম-প্রিয় এবং মহিলা-মহল সম্বন্ধে একটু বেশি উদাসীন,—তাদের সেই ভুল ভাঙ্গা দরকার। কিন্তু সে-ভুল কেমন ক'রে ভাঙ্গতে হয়, আমি জানিনে। প্রণয়বিলাস আমার জানা নেই, এবং সেটা চোখে মুখে হাস্যে লাস্যে কেমন করে প্রকাশ করতে হয় এ আমার অজ্ঞাত। তরুণী মহিলারা অত্যন্ত সংযত সৌজন্যে আমার সঙ্গে কথা বলেন।

সম্ভবত আমার পঞ্জরাস্থির নিগড়েলোকে যে-হেনা বাস করে, যাকে আমি চির-জীবনের মতো ভুলে যেতে চাই, এবং যার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চাই, হয়ত প্রেতিনীর মতো তারই ছায়া আমাকে ঘিরে থাকে, মহিলারা দিব্যদৃষ্টিতে সেটি পর্যবেক্ষণ করেন। হেনা বলত, দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল আত্মদর্শন। নিজকে দেখো, নিজকে জানো—তবেই সংসারকে জানবে! আমি এখন নিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমি আদর্শবাদী নই, লোককল্যাণকর্মে আর আমি অনুপ্রাণিত নই, সুকেত-গড়ের ভালমন্দে আমার কিছু যায়-আসে না। আমার লোভ, মোহ, আসক্তি, ক্ষুধা, আনন্দ-বেদনা, সম্ভোগস্পৃহা,—সমস্তই আর পাঁচজনের মতো। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মধ্যে রয়েছে সেই আদিম জন্তুটি—যেটি অসংযত, বর্বর, বন্য, যেটি নিত্য লালাসিক্ত,—হেনা যেটিকে বারম্বার উৎখাত করতে চেয়ে-ছিল! এই কথা আমি ভুলতে চাই কেউ আমাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিল, কেউ চেয়েছিল আমার জীবনকে বিড়ম্বিত করতে। হেনা বলত, দুই তটে বাঁধা গঙ্গা হল পুণ্যবতী, পাপনাশিনী; কিন্তু গঙ্গা যখন পদ্মায় পরিণত তখন সে কূলনাশিনী,—সে ছোটে সর্বনাশের কাজে। তোমার মধ্যে আছে সেই গঙ্গা,—সেই গঙ্গাই আমি! আমাকে নিয়ে তুমি গঙ্গায় থাক, পদ্মায় যেয়ো না, পার্থ!

এ সব উপমা-অলঙ্কারে আত্ম-বিস্মৃত হবার মতো মতিভ্রম আর আমার নেই। হৃদয়ের মধ্যে আর যন্ত্রণার লেশ-মাত্র দেখিনে, আকাশে আর কোথাও বাদল-মেঘের সংঘর্ষ শুনতে পাইনে। কবে যেন মনে করেছিলুম, সেই আকাশ বুঝি বিষণ্ণ বিরহে চিরপাণ্ডুর, কিন্তু আমার সে-ধারণা সত্য নয়, ওইটিই আমার প্রকৃতি।

আমার দপ্তরের সহকর্মীদের ধারণা, বিলাসবৈভবের মধ্যে আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমি প্রায় প্রতি মাসে পুরনো গাড়ি বেচে নতুন গাড়ি কিনছি। সাড়ে সাতশ' টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি ফ্ল্যাট নিয়েছি, এবং আমার পাচক, ভৃত্য মালী ও ড্রাইভার মিলিয়ে মোট পাঁচজন আমার বেতনভোগী লোক। প্রতিমাসে আমি যা বেতন পাই তার তিনগুণ খরচ করি—কারণ আমার একাউন্টে হেনার প্রচুর টাকা গচ্ছিত রয়েছে! সে আমাকে অযথা অনেককাল ধরে হয়রানি করেছে, সুতরাং ক্ষতিপূরণ নেবার নৈতিক অধিকার আমার ছিল বৈকি। সকালের দিকে ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে সবান্ধবে ব্রেকফাস্ট খাই, এবং গোলাপের পাপড়ি চটকানো জলে স্নান সেরে যখন দপ্তরে গিয়ে ঢুকি, তখন আমার সঙ্গে একটি সুগন্ধ এপাশে ওপাশে ঠিকরে যায়, এবং আশেপাশে গুঞ্জন ওঠে। আমার ভাব ও ভঙ্গীর মধ্যে সম্প্রতি একটি আত্মাভিমান প্রকাশ পাচ্ছিল। দিল্লী শহরের সর্বাপেক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ হোটেলে আমি আমার বিলিয়ার্ডস-এর বন্ধু ও বান্ধবীদের নিয়ে লাঞ্চ ও ডিনার খেয়ে বেড়াচ্ছিলুম, এবং অচেনা ব্যক্তিরা অনুমান করছিল যে, আমি লোহা-চিনি-কাপড়-সিমেন্ট অথবা ঔষধপত্রের অসাধু এক কারবারী, আর নয়ত 'স্টার'-পরিবৃত কোনও এক বোম্বাই সিনেমা চিত্রের 'প্রডিউসার'। অনেকের ধারণা আমি লেখাপড়া করি 'শাদা' টাকার, কিন্তু লেন-দেন করি 'কালো' টাকার! কেউ বলে, আমি সম্ভবত সভ্যভারতের সর্বশেষ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী! সে যাই হোক, নিত্য নূতন মূল্যবান পোষাকের জন্য আমি ইতিমধ্যেই দিল্লীর বড় বড় হোটেলে এবং কুলীন সমাজে বেশ খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলুম।

এ জীবনে হেনাকে আমি একটি মনের মতো উপহার গছাতে পারিনি, তার জন্য মনে-মনে আর বিক্ষোভ পোষণ করিনে। কিন্তু হেনাকে বাদ দিয়ে যে বিশ্বভুবন আমার সামনে আজ প্রতিভাত, সেখানে দেখছি অনেক মেয়ে! তারা আমার হাত থেকে আইভরি সেট, মুক্তোর মালা, জড়োয়া নেকলেস বা সাচ্চাজরির কাজ-করা বহু মূল্যবান রেশমী শাড়ি পেলে সুখী হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি সামগ্রী ওদের হাতে তুলে দিতে আমি একটু আড়ষ্ট বোধ করি, পাছে ওদের কারও ভিতর থেকে আমার সেই এককালের হারানো হেনা হঠাৎ বেরিয়ে হাসিমুখে আমার দিকে তাকায়! কিন্তু না, আমারই ভুল, ওদের কারও মধ্যেই হেনা নেই!

পৃথিবী কী ক্ষুদ্র ছিল আমার সামনে। হেনা স'রে যাবার পর দেখছি, বিরাট অবারিত জগৎ। শাসন নেই কোথাও, মনের বাঁধন নেই—বাধ্য-বাধকতা নেই কারও সঙ্গে। স্বল্পবিত্ত বন্ধুরা আমার ধরণ-ধারণ দেখে ভয়ে ভয়ে স'রে গেল, মধ্যবিত্তরা কানাকানি ক'রে এড়িয়ে গেল, এবং উচ্চবিত্তরা আমাকে সাদরে ডেকে নিয়ে আমার ব্যাংক-ব্যালান্সের তথ্যটা নিরূপণের চেষ্টা পেল। আমার বিশ্বাস, সুকেত-গড়ের মহারাজা মাধবেন্দ্র সিংও এখন আমাকে নূতন চেহারায় দেখলে যথেষ্ট দুর্ভাবনায় পড়ে যেতেন! বলা বাহুল্য,
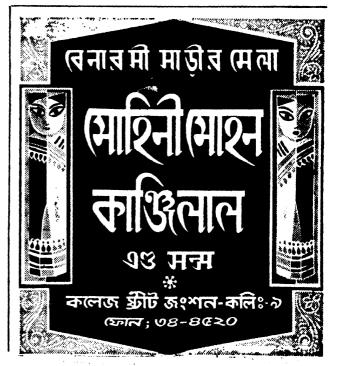
বিগত নয়-দশ মাস কালের মধ্যে মাধবেন্দ্র, মণিপ্রসাদ, শিবন্তী, কিষণ, এমন কি রত্না দেবীর কাছ থেকেও বহু চিঠিপত্র আমার দপ্তরে এসে পে'ীছেছিল। কিন্তু জবাব দেওয়া দূরে থাক, দুই ছত্র পড়তে না পড়তেই একে একে সেগুলি ছি'ড়ে জঞ্জালের ঝুড়ির মধ্যে ফেলেছি! পুরনো জীবনের কোনও ছোঁয়াচ আর আমি চাইনে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে আমি মানুষ, আমি বস্তুবাদী, দেহবাদী,—আমার চোখ এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মহলে সম্প্রতি শুনেছি, আমার আগেকার যোগ্যতা নাকি পরিপূর্ণভাবে ফিরে এসেছে, এবং পাশ্চাত্য জগতের সুপ্রসিদ্ধ একটি রাজধানীতে নাকি শীঘ্রই আমাকে ভারতের ট্রেড-এজেন্ট ক'রে পাঠানো হবে। উন্নতি কেমন ক'রে অনিবার্য হয় এ আমি জেনেছি! আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দেশের কোথাও গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারলে আমার নানাবিধ মানসিক বিকারের অবসান ঘটবে এবং এই ভারতীয় জটিলা-কুটিলাদের সংস্পর্শ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সেইখানেই বিবাহ ক'রে ব'সে যেতে পারলে জীবনটা সুখে ও স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারবে!

রাত্রের দিকে বাড়ি ফিরতে রোজই আমার একটু দেরি হয়। তবে সাধারণত বারোটার আগে ফিরিনে। প্রথম দিকে সুকুমারের মতো দু-চারজন সহজলভ্য হিতকামী আমাকে একটু-আধটু সতর্ক ক'রে দিত, ইদানীং তা'রা আর আমার কাছাকাছি আসে না।

রাত্রে নিজের গাড়ি নিয়ে ফিরে যন্ত্রচালিতের মতো যখন ফ্ল্যাটে এসে ঢুকি, তখন কোন কোনও দিন আমার দুজন ভৃত্য এসে আমাকে একটু সামলিয়ে ভিতরে নিয়ে যায়। নতুন বন্ধুরা তারিফ করে বলে, আমি নাকি বেশ টলটলে অবস্থাতেও মোটরের ষ্টিয়ারিং শক্ত হাতে ধরে ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে আসতে পারি! আমার মতো 'ব্রেক' কষতে নাকি অনেকেই জানে না। কিন্তু যেদিন কোথাও গাড়িটি রেখে ট্যাক্সিযোগে বাসায় ফিরি, সেদিন নাকি আমাকে অনেকটা বেহুঁস অবস্থাতেই ভৃত্যরা গাড়ির ভিতর থেকে তুলে এনে সোজা বিছানায় শুইয়ে দেয় এবং পরের দিন আপিস যাবার মাত্র ঘন্টাখানেক আগে কোনমতে উঠি। আমি অবশ্য সম্প্রতি আমার শয়নকক্ষের পাশে একটি ছোটখাটো 'সেলার'ও পোষণ করি। মুশকিল এই, ইদানীং সুস্থচিত্তে থাকলে আমি যেন নিজের ভিতরে কে যেন একজনের কান্না শুনতে পাই! সে যেন কাঁদে রাজা ভবানীপ্রসাদের বাগানবাড়িতে, হিনুর ফুলবাগানে, মশিদির বাড়ির বারান্দায়, তাজমহলের পাথরের বেঞ্চিতে, পুরির সমুদ্রতটে, পাটনা ষ্টেশনের প্লাটফর্মে, দমদম বিমানঘাঁটির পথে। যে কাঁদে সে আমি, অন্য কেউ নয়! ইতিহাসের কালে কালে যারা কে'দেছে, যারা কে'দে গেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যে,—আমার কান্না যেন তাদের কান্নাকে ছাপিয়ে উঠতে চায়! সেই কান্নাকে থামাতে পেরেছি যে-বস্তুর সাহায্যে, সেটি আমার নিকট মহামূল্যবান।

গত রাত্রে যথারীতি আমাকে ধরাধরি করে এনে ভৃত্যরা বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। সকাল আন্দাজ দশটায় ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, আমার পাশে নানাবিধ ঔষধ, আইস্‌ব্যাগ, ভিজা তোয়ালে, জলের পাত্র ইত্যাদি। পরনে আমার আপিসের প্যান্ট, কিন্তু শার্টটি ছে'ড়া মেঝের উপর ভাঙা কাঁচের টুকরো এবং নানা নোংরা—না থাক্, বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। আমি উঠতে গিয়ে আবার বসলুম, এবং আমার মাথায় পুনরায় জল দিতে বললুম। অনুভব করছি আমি এখনও বিশেষ অসুস্থ।

ঘন্টাখানেক পরে স্নানে যাবার আগে আপিসে ফোন করে বললুম, লাঞ্চের পরে যাচ্ছি! উপযুক্তভাবে বরফ জলে স্নান সেরে যখন প্রাতরাশ নিয়ে খেতে বসলুম তখন আমি অনেকটা সুস্থ। আমার ঘরের চাকরটি টেলিফোন ক'রে আমার গাড়িটি পাঠিয়ে দিতে বলল,—অর্থাৎ সে জানে, এ গাড়ি প্রায় প্রতিরাত্রে আমি কোথায় রেখে আসি। অতঃপর সে যখন আমার আপিসের ফাইলগুলো গোছাচ্ছিল, তখন একখানা বিচিত্রিত চিঠির প্রতি আমার চোখ পড়তেই প্রশ্ন করলুম, ওখানা কবে এল রে? কা'র চিঠি?

ভৃত্য বলল, ইয়ে বহুৎ রোজকা পুরানা চিট্‌ঠি হ্যায় সাব, আপ ইসকো ফেক্ দিয়া থা। হম্ উঠাকে রাক্‌খা—

ফেলে দিয়েছিলুম তবে কুড়িয়ে রাখলি কেন?

খানসামা আমাকে বোঝালো, এ চিঠিখানা রেজেষ্ট্রি হয়ে আসে প্রায় মাস দেড়েক আগে। আপনি পকেট থেকে এ চিঠি বাইরে ফেলে দেন, আমি তুলে রাখি। তারপর আপনার ময়লা জামার সঙ্গে চলে যায় ডাইইং ক্লিনিংয়ে। তাদের কাছে প'ড়ে থাকে সপ্তাহ তিনেক। তারা এ চিঠি পাঠিয়ে দেয় এই কিছুদিন আগে। চিঠিখানা খোলা হয়নি তাই রেখে দিয়েছি,—যদি কখনও খোঁজ পড়ে।

কই দেখি, নিয়ে আয় ত?

খানসামা চিঠিখানা হাতে দেবার পর লক্ষ্য করলুম, চিঠিখানা সুকেতগড়ের। বললুম, হ্যাঁ, এই জন্যেই ফেলে দিয়েছিলুম মনে পড়ছে!—যা, ছি'ড়ে ফেলে দিয়ে আয়।

টোক্কা মেরে চিঠিখানা ছুড়ে দিলুম এক দিকে। আমার পুরনো জীবন এবং সুকেতগড় সম্বন্ধে আমার সুগভীর বিরক্তি কি প্রকার শিকড় নামিয়ে বসেছে, সেটি আরেকবার যেন এই সূত্রে উপলব্ধি করলুম।

রেজেষ্ট্রারী-করা চিঠি অন্তত একবারটি না পড়েই ছি'ড়ে ফেলতে খানসামা যেন একটু ইতস্ততঃ করছিল। তারপর সে নিজেই বলে উঠল, সাব, ইস্‌কো অন্দরমে দুসরা এক লেফাপা হ্যায়—

কই দেখি?

খানসামা সেই রেজেষ্ট্রিকরা কভারের ভিতর থেকে একখানা খামসুদ্ধ চিঠি বার করল। হাতের লেখা দেখেই চিনলুম, এটি খুড়িমার। মনে পড়ছে প্রায় দেড় বছরের মধ্যে খুড়িমার কোনও চিঠি পাইনি। এখানা তিনি লিখেছেন প্রায় দুমাস আগে সুকেতগড়ের ঠিকানায়। তা'রা এটি সযত্নে রেজেষ্ট্রারী ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছিল। খুড়িমা লিখছেন:

খোকন, তুই কোথায় আছিস কেমন আছিস আমরা কেউ জানিনে। এই নিয়ে তিন মাসের মধ্যে ১০।১১ খানা চিঠি তোকে লিখলুম। একখানারও জবাব পাইনি। এই আমার শেষ চিঠি জানবি। তুই যে আমাদের সঙ্গে এই রকম আচরণ করবি আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। দ্বিজু চাকরি নিয়ে ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে। তোর কাকা পুরীতে রয়েছেন বাতে পঙ্গু। আমার এখানে আর কেউ নেই। তোকে

আগেই লিখেছি, আজ আট মাস হতে চলল বুড়িপিসি মারা গেছে। শেষ কান্না তোর জনোই সে কে'দে গেল। তারপর এদিকে প্রায় তিন মাস হল, হেনা কী অবস্থায় এখানে এসে উঠেছে সে তুই জানিস। তোকে কিছু না জানিয়ে সে নিজের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে যোগ নিয়ে কোথাও সে জায়গা পায়নি। তার মুখে তোদের সব কাহিনী শুনেছি। এতে লজ্জা বা আড়ষ্টতার কি আছে? এত' আনন্দেরই কথা! তোরা না আধুনিক? আর আমার বলবার কিছু নেই, খোকন। এ কত বড় দুর্ভাগ্য যে, আজ হেনার দিকে আর চাইতে পারিনে! তুই যেখানেই থাকিস, এ চিঠি পেয়েই চলে আসবি। ইতি খুড়িমা।"

শেষ ছত্রটা হেনার হাতের: "শ্রীচরণেষু, দেরি ক'র না, চলে এস।—তোমার হেনা।"

হঠাৎ একটা তারস্বর আর্ত হয়ে উঠেছিল গলার কাছে: তোমার হেনা? মিথ্যে কথা! আমার নও তুমি! তুমি কারও নও!—কিন্তু তারপর কি করলুম অতটা মনে পড়ে না। বিগত দুই মাস কালটা অতিক্রম করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে সহসা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলুম একদিকে। জনবহুল কেরল-বাগের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ভাবছিলুম একটা কৃত্রিম ঘৃণ্য জীবনযাত্রার নরককুণ্ড ছেড়ে পালাচ্ছি সেইদিকে, যেদিক থেকে এসেছে আমার বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীর ডাক! বহুদূর পর্যন্ত ছুটে গিয়ে থামলুম। না, কলকাতা ঠিক এত কাছে নয়, দৌড়ে পেঁছতে গেলে দেরি হবে! অবশেষে ট্যাক্সিতে উঠলুম এবং বায়ুবেগে এসে পেঁছলুম বিমান আপিসে। এখন বেলা সাড়ে বারোটা, দেড়টার প্লেনে টিকিট নেই! ভাল কথা! কিন্তু একখানা প্লেন চার্টার করা যায় ত? তা কেন যাবে না? তবে টাকা লাগবে অনেক! কত টাকা? বলুন, চেক-বই আমার পকেটেই রয়েছে! খোঁজ নিন, যে কোনও বড় ব্যাঙ্কে আমার টাকা আছে! এই আমার নাম আর আপিসের ঠিকানা,—ইচ্ছে হলে ফোন ক'রে জানুন!—আরে, সেনগুপ্ত যে?

পাশ থেকে সেনগুপ্ত হাসিমুখে উঠে এলেন। আমি ওঁদের পরিচিত। ব্যস, আধঘণ্টার মধ্যেই আমার চার্টার-করা প্লেন ছাড়ছে!

আমার ড্রাইভারকে ফোন করে বললুম, এখনই বিশেষ কাজে কলকাতা চললুম। আপিসে একটা খবর দিয়ো। কবে ফিরব, অথবা ফিরব কিনা—কিছু জানিনে!

আড়াই বছর পরে উল্কার মতো ঠিকরে এসে পড়লুম কলকাতায়। ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি পেঁছতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগল। সন্ধ্যার কিছু দেরি ছিল। গাড়ি-ভাড়া চুকিয়ে আমি নেমে এলুম।

কেন জানিনে প্লেনের ভিতরে ঘণ্টা চারেক চুপ ক'রে বসে থেকে আমার ব্যস্ততা গেছে কমে। চিঠি পেঁছবার দুমাস পরে যে-ব্যক্তি আজ এসে মাত্র পেঁছল তার দ্রুততা অর্থহীন। আমি নির্বোধ নই। বুড়িপিসির মৃত্যুর দশ মাস পরে শোক-সন্তাপের পাট উঠে গেছে। আমি এতদিন পরে ফিরে নতুন ক'রে পুরনো শোকের উদ্বোধন করতে গেলে বেমানান হবে। সে আমি পারব না।

এ আমার নিজের বাড়ি, কিন্তু আজ যেন সেই চিন্তায় জোর পাচ্ছিনে। বাড়িতে ঢুকবার আগে নিজকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছিল, সেইজন্য সর্বাগ্রে গেলুম খুড়িমার ওখানে। আশ্চর্য, ওঁদের বাইরের ঘরে বসেছে একখানা মনোহারীর দোকান, এবং পাশের দরজায় মোটা তালা লাগানো। দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলুম, জ্ঞান চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী দিন কুড়ি আগে স্বামীর কঠিন ব্যাধির সংবাদ পেয়ে পুরীতে গিয়েছিলেন। মাত্র দুদিন আগে তিনি ফিরেছেন। আপনি পিছনের গলিতে গিয়ে সি'ড়ির দরজায় দেখুন ওটাও তালাবন্ধ কিনা। যদি বন্ধ থাকে তাহলে জানবেন তিনি পাশের বাড়িতে আছেন!

গলির দরজায় তালাবন্ধ দেখে আমি ফিরলুম। সাহস হারাচ্ছিলুম দুই পায়ে, বোধ হয় আমি কাঁপছিলুম। কেউ যদি এসে আমাকে প্রচণ্ড একটা নাড়া দিত, কিংবা অন্তত হাত ধ'রে টেনেও নিয়ে যেত, তাহলে ভাল হ'ত।

সাধারণত পরের দুঃখে, বিপদে ও বেদনায় সুমিষ্ট ভাষায় সান্ত্বনা দিতে পারি, কিন্তু বজ্রাঘাত যদি নেমে আসে নিজের মাথার ওপর? আমাকে সান্ত্বনা দেবার যে কেউ নেই! আমি যে চিঠি পাবার দুমাস পরে এসেছি! আমি যে দিল্লীর পথে পথে টাকা ছড়িয়ে এতদিন ভোগবিলাসে মত্ত ছিলুম। আমার নিজের টু'টি টিপে ধরবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কী যন্ত্রণায় মানুষ মাথা ঠোকে, আত্মনাশ করে, আগুনে ঝাঁপ দেয়—চোখেই দেখতে পাচ্ছি!

রায় বাহাদুরের মহলটার পাশ কাটিয়ে সি'ড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই উপর দিকে একসঙ্গে কয়েক-জনের গলার আওয়াজ ও সি'ড়ি দিয়ে নামবার মতো মসমস শব্দ পাওয়া গেল।

আমি সিঁড়ির তলার দিকে সরে এলুম, এবং আত্মগোপন করব কিনা যখন ভাবছিলুম, সেই সময় ও'দের কথাবার্তা শোনা গেল।

একজন বললেন, আমাদের প্রেসক্রিপ্সন্‌মতো যদি আপনারা না চলেন, যদি সময়মতো ঠিক পথ্য না পড়ে—আমরা কি করতে পারি বলুন—?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, আমাদের হাতের মধ্যে আর নেই—! তা ছাড়া বুঝতেই পারছেন এসব দামী ওষুধ,—খরচপত্র নিয়ে এভাবে টানাটানি আর কদ্দিন চলতে পারে! আমাদের অসুবিধে বুঝতেই পারছেন!

নারীকণ্ঠে শোনা গেল, দেখুন, আমিও এ'দের ছেড়ে যেতে পারিছিনে! অসুবিধে সকলেরই হচ্ছে—

মহিলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন।

আমি চট্‌ ক'রে সিঁড়ির পাশ থেকে এবার বেরিয়ে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালুম। আমি যেন আকস্মিক বিস্ময়! ওরা তিনজনে থমকিয়ে গেল। মহিলা বললেন, আপনি কে?

পার্থ চৌধুরী!—গলা আমার বসে গিয়েছিল।

মুখের একটা আর্ত আওয়াজ করে মহিলা এক পা পিছিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকরা দুজনেই বললেন, আমরা ডাক্তার ......কিন্তু আপনি অনেক দেরি ক'রে ফেলেছেন, মিস্টার চৌধুরী........ ইনি নার্স বীণা সেন........

আমি ছুটে ওপরে উঠে যাচ্ছিলুম, কিন্তু নার্স পলকের মধ্যে আমার পথ অবরোধ করলেন,—না, যাবেন না—

কেন?

ক্ষমা করবেন। আপনার পক্ষে অসংযত হওয়া এখন চলবে না,—বিপদ ঘটে যেতে পারে। দাঁড়ান, ইনি ডাক্তার মিত্র, উনি ডাক্তার গুপ্ত—ও'রা দুজনেই স্পেশালিস্ট...... ও'দের কথা আগে শুনুন—রোগীর অবস্থা ভাল নয়—

ডাক্তার মিত্র বললেন, আর কিছু না হোক, আপনি রোগীর ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থাটা এখনি করুন! এসব রোগী খেতে না পেলে কি বাঁচে? শুনতে পাই উনি অনেক পৈতৃক টাকার মালিক হয়েছিলেন—!

ডাঃ গুপ্ত বললেন, আমরা কি তাহলে নতুন ক'রে আবার চিকিৎসা ধরব? কি বলেন?

আমার গলাটা বোধ হয় হঠাৎ আরও নেমে গিয়েছিল, সেজন্য একটা বিকৃত স্বর বেরিয়ে এল,—এক্ষুণি ধরুন, যত টাকা লাগে—

বলতে বলতে আমি কিছু না দেখে পকেট থেকে টাকা বার করলুম। তাঁরা বললেন, বেশ, আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তাহলে সব নিয়ে আবার আসছি—?

ডাক্তার দুজন বেরিয়ে যাবার পর নার্স তাঁর শাদা জোব্বার পকেট থেকে কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে দ্রুতহস্তে কি যেন কয়েকটা লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না! আগে ছুটে যান বাজারে—শিগ্‌গির এগুলো নিয়ে আসুন—

দুর্বল কণ্ঠে বললুম, তার আগে ওপরে গিয়ে একবার রোগীকে দেখে আসব না—?

বীণাদেবী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, তার আগে রোগীর কিছু খাওয়া দরকার, মিঃ চৌধুরী! তিন চার মাস ধ'রে ও'র যে খাওয়া জুটছে না!

আমি ছুটে বেরিয়ে যাবার আগে একবার ফিরে দাঁড়ালুম। আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, বলতে পারেন আমার খুড়িমা কি ওপরে আছেন?

খুড়িমা! বীণাদেবী বললেন, ও, না—তিনি নেই!

কোথা গেছেন?

একটু থমকিয়ে বীণাদেবী বললেন, তিনি টাকার যোগাড়ে বেরিয়েছেন। বোধ হয় হাতের বালা জোড়াটা বেচে ফিরবেন!

অপমানের আঘাতে নিজের মুখখানা কালিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সেই মুখ লুকিয়ে পলকের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেলুম।

ফিরে আসতে বোধ হয় আধ ঘণ্টারও কিছু বেশি লাগল। ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠছিলুম। কিন্তু পায়ের শব্দ পেয়েই নার্স আবার ছুটে এলেন এবং আমার হাত থেকে ফল-পাকড় ইত্যাদি নিয়ে বললেন, দেখুন, আপনি যদি রোগীর সামনে গিয়ে অশান্ত হয়ে পড়েন, সেটা ও'র পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক হবে। বরং উনি আগে কিছু খেয়ে একটু সুস্থ হোন—

খোকন! খোকন তুই এসেছিস?—পিছন দিকে সিঁড়িতে খুড়িমার ব্যাকুল বিদীর্ণ কণ্ঠ শোনা গেল। ছোকরা চাকর নীলু রয়েছে তাঁর সঙ্গে। তিনি উঠে এসে আমাকে ধরে সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন, তুই তাহলে বেঁচে আছিস, খোকন? আমি যে বিশ্বাস হারিয়েছিলুম রে—।

আমি কি যেন বলতে গেলুম, কিন্তু খুড়িমা সেটি চাপা দিয়ে আবার কেঁদে বললেন, দয়ামায়া কিছু কি তোর নেই, খোকন? মেয়েটাকে এমনি করে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে মারলি? খেতে দিলিনে, পরতে দিলিনে, আশ্রয় দিলিনে, রোগের ওষুধ পর্যন্ত দিলিনে তুই? তুই কি মানুষ?

আমি খুড়িমার মুখের দিকে তাকালুম। খুড়িমা পুনরায় আমার হাত ধরে ডুকরে উঠলেন, এমন অনাচার ক'রেই যদি মেয়েটাকে মারবি তাহলে কেন গেলি তুই হেনাকে বিয়ে করতে?

বিয়ে! আমি হতবাক, বিস্ময়-বিমূঢ়! খুড়িমা পুনরপি কেঁদে কেঁদে বললেন, কেউ কোথাও কখনো কি শুনেছে খোকন যে, স্বামী দাঁড়িয়ে রইল সামনে সব ঐশ্বর্য দুহাতে নিয়ে, আর পায়ের তলায় বুকের ছাতি ফেটে তার স্ত্রী শুকিয়ে মরে গেল?

বীণাদেবী এবার রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এবার আপনি ঘরে যেতে পারেন! উনি অবশ্য জানেন না আপনি এসেছেন!

আমার সঙ্গে সঙ্গে খুড়িমা ও বীণাদেবী ঘরে এলেন। আমরা পায়ের শব্দ করিনি। ঘরে দপদপ করছে সন্ধ্যার আলো, কিন্তু হেনার সুদীর্ঘ সিঁথিতে তার চেয়েও বেশি দপদপ করছে চওড়া সিঁদুর! এত চওড়া যে, মনে হয় একটু আগে হোমাগ্নি-যজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে আমিই যেন তা'র ললাটে এই প্রশস্ত সিন্দুর লেপন ক'রে দিয়েছি! হেনার বাঁ হাতে এয়োতির নোয়া, দুহাতে শুধু দুগাছি শাঁখা। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওপাশে নিজের ঘরে হেনা জায়গা নেয়নি, আমারই ঘরে আমারই বিছানাটায় সর্বনাশী তার শেষশয্যা পেতেছে! শীর্ণ হাত দুখানা দেখলে যেমন ভয় করে, তেমনি আতঙ্ক হয় যে-কঙ্কালের ওপর হাত দুখানা স্থির হয়ে রয়েছে, তার দিকে তাকালে। কিন্তু, আশ্চর্য, সেই

দুটো বড় বড় চোখ তেমনি চাপা কৌতুকে উচ্ছলিত! এক সময় হেনা ঈষৎ হাসল প্রেতিনীর কটাক্ষের মতো। ভাঙ্গা গলায় খুশী মুখে বলল, বীণাদি, বেশ খেললুম কিন্তু! আমি ভাল হয়ে উঠে তোমার বরের জন্যে সোনার টোপর গড়িয়ে দেবো, দেখো!

বীণাদি সহাস্যে বললেন, অত টাকা পাবে কোথা?

বাঃ, আমার স্বামীকে তোমরা অত গরীব মনে করো কেন, বীণাদি? এই ত, আর মাত্র চার বছর বাকি, এ আর কতটুকু? সুকেতগড়ের চুক্তি ফুরোলে উনি সোজা চ'লে আসবেন এখানে, তখন দেখো।—কে?

খুড়িমা তাঁর আর্তকণ্ঠ আঁচল চেপেও সামলাতে পারলেন না, সেইজন্য ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি এতক্ষণ পরে নিশ্চিতভাবে জানলুম, হেনার চোখের দৃষ্টি অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে!!

হেনা বলল, নীলু বুঝি আবার ফোঁপাচ্ছে চর্চাকিপিসির জন্যে? ওই ছেলেটাকে দেখলেই মনে পড়ে আমার কিষণকে,—সেই যার কথা তোমাকে বলেছিলুম, বীণাদি! সত্যি, একান্ত ক'রে মা ব'লে যে ডাকে তার চেয়ে আপনজন আর বোধ হয় কেউ নেই! তোমার ছোট মেয়েটিকে দিয়ো বীণাদি, আমি মানুষ ক'রে তুলব!

বেশ, ভাল কথা! তা হলে একটু তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো!

উঠবই ত, আমার অনেক কাজ বাকি এখনও! তোমরা কেউ জান না।

বীণাদি এবার আমাকে ইঙ্গিত করে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিলুম। একথা মনে আছে ডাক্তার এখনি আসবে। তবু আমি ঘরের বড় আলোটা নিবিয়ে সবুজ আলোটা জ্বাললুম, এবং নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে হেনার শিয়রের কাছে গিয়ে বসলুম।

কে? বীণাদি?

হেনার কপালে হাতখানা রাখলুম। একটু চমকে উঠে হেনা তার একখানা হাত আমার হাতের উপরে রাখল, তারপর চোখ বড় বড় ক'রে দেখবার চেষ্টা করল। ভগ্ন-জড়িত এক প্রকার আওয়াজ ক'রে বলল, বিশ্বাস করতে ভয় করছে কেন? এ কি সত্যি?

আমার কণ্ঠস্বর অনেক নিচে তলিয়ে গিয়েছিল। তবু রোগীর কোনও প্রকার ভাবাবেগ না আসে, সেজন্য আমি হেনার মুখে ও কপালে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বললুম, সত্যি বৈকি হেনা!

তুমি তবে এসেছ, পার্থ?

বিলক্ষণ! স্ত্রীর অসুখ শুনে কতদিন বাইরে থাকা যায়?

সহসা অধীর চাঞ্চল্য নিয়ে হেনা বোধ করি ওঠবার চেষ্টা করল। আমি বাধা দিয়ে তার মুখের ওপর মুখ রেখে বললুম, না, উঠো না, লক্ষ্মীটি।

হেনা চুপ ক'রে গেল। অনেকক্ষণ পরে সে শুধু বলল, পার্থ, কেন যে সেই শেষরাত্রে তোমাকে না বলে চলে এসেছিলুম, জান?

আরেকদিন শুনব হেনা, আজ নাই বললে?

হেনা ঈষৎ হাসল। কিন্তু তার আধ-মরা দুই চোখের কোণ বেয়ে জল নেমে এল। তারপর শান্ত এবং অতি মৃদুস্বরে বলল, অসুখ শরীরে সেদিন লোভ আমাকে পেয়ে বসেছিল! হার মানলুম নিজের কাছে। ভাবলুম তোমাকে না জানিয়ে আগে তোমার স্ত্রী হই, তারপর একে একে সব তোমার কাছে চেয়ে নেব। এবার সেরে উঠে আমরা দুজন একসঙ্গে থাকব, কেমন পার্থ?

নিশ্চয়!—আমি বললুম, তোমাকে নিয়ে যাব যশিদির বাড়িতে, ওখান থেকে আর কোনদিন কোথাও নড়ব না।

কিন্তু তোমার সুকেতগড়?

বললুম, তুমি যদি সেখানে কখনও যেতে চাও, আমিও যাব!

ক্লান্তকণ্ঠে হেনা বলল, আমাদের অনেক কাজ এখনও বাকি, না পার্থ? তবে এবার বাংলা দেশ, কেমন? সবচেয়ে গরীব অঞ্চল বেছে নেব, সেই হবে আমাদের তীর্থ!

হঠাৎ এবার প্রশ্ন করলুম, আলমারির চাবি তুমি কেন খুলতে দাওনি, হেনা? এত খরচপত্তর, আমি উপস্থিত নেই,—এ তুমি কি করেছ?

শীর্ণ মুখে হেনা হাসল। বলল, ওই-জন্যেই ত' খুলতে দিইনি, পার্থ। ও যে সব তোমার তোমার অনুমতি ছাড়া খুলব কেন? হোক না অসুবিধে, মৃত্যুই কেন হোক না তার চেয়ে! ছি—। একি তোমার উপার্জনের টাকা যে, আমি চোখ বুজে খরচ করব? তোমার মতন ওরা আমার মনের কথা বোঝে না পার্থ!

চাবি কোথায় রেখেছ?

এই ত' আমার মাথার তলায়!

দরজা ফাঁক ক'রে বীণাদেবী ঢুকলেন। বললেন, ডাক্তার এসেছেন, মিঃ চৌধুরী।

আমি উঠে পড়লুম। হেনা শুধু বলল, তুমি বুঝিয়ে বলো ত' ডাক্তারকে, ও'রা আমাকে চশমা দিন, আমি যে ভাল দেখতে পাচ্ছিনে!

বীণাদেবী বললেন, এই ত' ভাল হয়ে এসেছ হেনাদি, চশমা আর লাগবে না!

খুড়িমা বললেন, হেনা বাকি রাখেনি কোথাও। ভাওয়ালি, ধরমপুর, মাদ্রাজ, দার্জিলিং—এসব জায়গা সে হয়ে এসেছে। চিঠি দিয়ে তোকে ব্যস্ত করেনি, পাছে তোর কাজের ক্ষতি হয়। তোরা লেখাপড়া শিখেছিস পার্থ, আশা-আকাঙ্ক্ষাও তোরা জানিস, কিন্তু ঠিক পথ তোরা চিনিস নে! মানুষ হতে পারলিনে তোরা।

খুড়িমা চোখের জল ফেলছিলেন। আমি নতমুখে বসেছিলুম। আমিই পরোক্ষভাবে হেনার আসন্ন মৃত্যুর জন্য দায়ী,—একথা বসে বসে উপলব্ধি করছিলুম। আমার চেয়ে নবেন্দু অনেক বেশি উপযুক্ত পাত্র ছিল,—তার হাতে হেনা
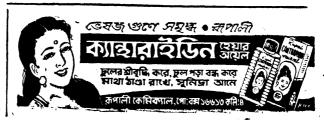
অন্তত প্রাণে বাঁচত, সুখে থাকত। ভ্রান্ত বুদ্ধি, অস্পষ্ট চিন্তাধারা, অপরিণামদর্শী আদর্শবাদ এবং আমাদের প্রকৃতিগত অজ্ঞান,—এরা টেনে এনেছে আমাদের ধ্বংসের পথে। কেউ কি শুনেছে কোনদিন, স্বামী হয়ে স্ত্রীকে পাঠালো অজানা দেশে,—এবং তার খোঁজ নিল না এক বছরে? একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে, ঘরের সামনে আলমারিতে রইল অজস্র ধনভাণ্ডার, চাবি রইল বালিশের তলায়,—আর মেয়েটা মাথায় সিঁদুর নিয়ে প্রতিদিন বিনা চিকিৎসায় বিনাপথ্যে শুকিয়ে মরতে বসল? কী বলে গেল ডাক্তার? বলল, রোগীর সমস্ত বুকের ভিতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে! অপমানে, অনাচারে, অনাদরে—লক্ষ লক্ষ হেনার বুক এদেশে যেমন ঝাঁঝরা হয়!

খুড়িমা কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেলেন। ডাক্তাররা বলে গেছে, সত্যি, আশ্চর্য করেছেন আমাদের মিসেস হেনা চৌধুরী। কী কঠিন প্রাণ,—পাথরের মতো অটুট, কিছুতেই ভাঙতে চায় না! এ প্রাণ আত্মগত নয়, দেহগত নয়, এ হ'ল মজ্জাগত প্রাণ! মৃত্যু হার মেনে যাচ্ছে যেন! ঠুকে ঠুকে ভাঙো, কুরে কুরে কাটো, হাড়ের ভিতর থেকেও শাঁস বার করে নাও,—তবুও দেখো নড়ছে! সমস্ত দেহ তিলে তিলে অসাড় হয়ে গেছে, কিন্তু আদিম সেই অগ্নিবাসনার মৃত্যু তখনও হয়নি,—তারা এসেছে মুখের উপরকার জ্যোতির্ময়তায়, দুই আশ্চর্যসুন্দর চোখের দিব্যবিভায়!

কঠিন বজ্রদণ্ডে হেনার অস্থি নির্মিত হয়েছিল!

বীণাদেবী বললেন, আর কিছু নয়, আপনার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে! আগে এলে আর কিছুদিন দেখতে পেতেন। আপনাকে স্পষ্টই আমার বলা উচিত, ডাঃ মিত্র আর গুপ্ত —এঁরা জবাব দিয়ে গেছেন। আর বোধ হয় দু'একটা রাত—। আপনি এবার হেনাদির কাছে-কাছে থাকুন—!

আমি হেনার কাছে গিয়ে বসলুম। সে যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায় কথায় কথায়। কোথায় যেন সে খোঁজ পেয়েছে অজানা মহাসাগরের অতল তলের ডাক, তারই বীজমন্ত্র নিয়ে জপ করতে চাইছে! হেনার ললাটে, অধরে, কণ্ঠে, বক্ষে আমার অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠাধর নিবিড়ভাবে স্পর্শ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল,—কিন্তু কই, আজ ত' আর হেনার অঙ্গে অঙ্গে সেই সর্পিনী ফণা তুলে উঠছে না। মনে পড়ছে, কানপুর জেলার সেই গঙ্গার ধারে একদিন অন্ধকারে বসে বলেছিলুম, হেনা, দেহমাত্রই পঙ্কিল, মনে রেখ! হেনা আমার মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, ভয় দেখিয়ো না, পার্থ। ওকথা আমিও মানি। কিন্তু এই পাঁকের ভিতর থেকে ভেসে উঠেছে দুটি রক্তকমল তোমার দিকে ঊর্ধ্বায়িত হয়ে। তোমার করস্পর্শে তারা পল্লব মেলবে! তুমি আমার সত্যনারায়ণ সূর্য!

এক সময় হেনা জাগল। চোখ খুলে বলল, ঘুমোইনি, শুধু ঘুম আসছে! ডাক্তার বোধ হয় ঘুম পাড়াতেই চায়। আমি সেরে উঠে তোমার কাছে ক্ষমা চাইব, পার্থ।

কিসের ক্ষমা, হেনা?

গভীর অস্পষ্ট কণ্ঠে হেনা বলল, ওই যে তোমাকে না জানিয়ে দুহাতে শাঁখা পরেছি? বিশ্বাস করো পার্থ, এ তোমার বিছানা আমার জন্যেই ছিল! এবার তুমি এসেছ, আমার হাত ধরে তুলবে! এবার উঠে তোমাকে নিয়ে চলে যাব, সব পেছনে ফেলে বিবাগী হয়ে চলে যাব!

হেনার চক্ষু আবার নিমীলিত হয়ে এল। দেখতে পাচ্ছি মহানিদ্রার একটা কালো ছায়া রাহুর মতো তাকে তিলে তিলে গ্রাস করছে। কিন্তু হেনার ধারণা, তার ঘুম পাচ্ছে!

বীণাদেবী একখানা ছোট চামচের সাহায্যে হেনাকে একটুখানি তরল খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা পেলেন। কিন্তু ঠোঁটের কোণ বেয়ে সেটুকু ফিরে এল! কণ্ঠনালী পর্যন্ত হেনাকে মৃত্যু অধিকার করেছে।

আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব ছিল না!

হেনা তার পায়ের দাগ রেখে চলে গেল অনেক দূরে পর্যন্ত। সেই পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে আমিও যেতে পারব

ওরা ভয় পাচ্ছে পাছে না সারি!

তোমার সম্মান, আমার মান সম্ভ্রম!—অতি শীর্ণ কণ্ঠে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে পুনরায় সে বলল, এ সম্মান মানুষের কাছে,—যাদের কাছে শুধু বিয়ে বড় হয়নি! যারা চিনবে তোমাকে আর আমাকে! আমার ওপর রাগ করো না, পার্থ। সেরে উঠে তোমাকে সব বলব!

কবে সেরে উঠবে তুমি?

হেনা হাসল। বলল, ওরা ভয় পাচ্ছে পাছে না সারি! পার্থ, ওরা জানে না, বহুদূরে। বাংলা দেশ পেরিয়ে সেই চিহ্ন চলে গিয়েছে ভারতের সর্বত্র। হেনা বলত, খুঁজে দেখো যদি আমি নিরুদ্দেশ হই! অরণ্যে যেয়ো, যেয়ো সমুদ্রে, নয়তো পর্বতে, যেয়ো মরুভূমিতে! শুধু পায়ের দাগ কেন, আমার হৃৎপিণ্ডের সব রক্ত ঝরিয়ে দিয়ে যাব পথে পথে,—সে-চিহ্নও খুঁজে নিয়ো! তুমি দেখো পার্থ, কিছুতেই আমি হারিয়ে যাব না!

[সমাপ্ত]

ইস্রেলে কয়েকটি দিন

শ্রীলেখা ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্বদিগন্তে উষার লাজরক্তিম স্পর্শে সোনালী সূর্য জেগে উঠলো, আর সেই সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠলো ইস্রেলের ঘুমন্ত রাজধানী জেরুসালেম।

সুপ্রাচীন জেরুসালেম। চিরন্তন ধর্ম-বৃক্ষের প্রাচীনতম একটি শাখায় খোদাই করা আছে এই নামটি। আজকের এই আধুনিক নগরীর কর্মব্যস্ত রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলুম এই কি সেই জেরুসালেম, একদিন যার গগনপট ধূলিতে সমাচ্ছন্ন করে যুদ্ধযাত্রা করতেন রোমান রাজপুরুষেরা, ঘোমটা ঢাকা নম্র-মুখী তরুণীরা কুয়ো থেকে জল বহন করে কাঁচা পথ বেয়ে মাটির কুটিরে ফিরে যেতেন, শ্মশ্রুশোভিত বিজ্ঞ scribe ও pharisee-দের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় অভ্রভেদী মন্দিরের প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠতো......। আজকের জেরুসালেমের বক্ষবিদীর্ণ করে যানবাহনে পরিপূর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথ চলে গেছে, দুই পাশের সৌধশ্রেণী আবারও ইহুদী জাতির বিস্ময়কর অগ্রগতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুগোল বিশাল Synagogue-গুলি, অত্যাধুনিক প্রমোদকেন্দ্র, বিখ্যাত হোটেল ও রেস্তোরাঁ, বিভিন্ন কল-কার-খানা......কিছুরই অভাব নেই। বিচিত্র নূতন অভিজ্ঞতা পিতা ও কন্যা দুজনেই সমান উৎসাহে ভাগ করে নিচ্ছিলুম, এমন সময় ছন্দপতন হ'লো—

সুসজ্জিত বিপণীকেন্দ্রের দিকে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্রই তাঁর উৎসাহ-বহ্নি এক মুহূর্তে নিভে গেল। আমাকে তৎক্ষণাৎ তিনি বোঝাতে আরম্ভ করলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে লোভনীয় পসরাগুলি নাকি আসলে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং কেবলমাত্র সাজানোর গুণেই নাকি ঐগুলি অতো আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতায় বাবার এই কথায় কিছুমাত্র আস্থা প্রকাশ করলুম না। আমাদের বিপণী অভিযানে গমনোদ্যত দেখলেই বাবার মুখভাবে যে মানসিক উদ্বেগ প্রকাশ পায় তা সত্যিই দর্শনযোগ্য। বিদেশ ভ্রমণে এই উদ্বেগ ও শঙ্কা বাবার প্রায় নিত্যসঙ্গী। বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যা সম্বন্ধে বাবা একটু অতিরিক্ত সচেতন এবং বিপণী-কেন্দ্রগুলি থেকে কন্যা, পুত্রবধূআদিকে দূরে রাখবার সুকঠিন সাধনায় সর্বদাই তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করে রাখেন।

সদ্যোগঠিত রাজ্য ইস্রেল, কিন্তু বিচিত্র সুন্দর তার রূপ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদীরা সাগ্রহে এসে সম্মিলিত হয়েছেন এই নবজাত ইহুদীরাজ্যে। ইস্রেলবাসীদের গাত্রবর্ণ, ভাষা ও ব্যবহারে তাই রীতিমত বৈষম্য ধরা পড়ে। এঁদের কেউ এনেছেন অর্থ আর কেউ বা সামর্থ, কিন্তু সকলেই এনেছেন আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছা, উৎসাহ আর উদ্দীপনা। বিরাট বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব'য়ে আনা অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যসম্ভারে ভ'রে উঠেছে ইস্রেলের ভাণ্ডার। তারই পরিপূর্ণ গৌরবে জেরুসালেমের এক প্রান্তে গড়ে উঠেছে বিরাট হিব্রু বিশ্ব-বিদ্যালয়—ইস্রেলের গর্ব—সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অন্যতম পীঠস্থান।

বিশাল ইউনিভার্সিটির কলগুঞ্জনে ধ্বনিত হলগুলি, অসংখ্য পদক্ষেপে সচকিত সোপানশ্রেণী, উচ্ছ্বসিত কলরবে আলোড়িত ক্রীড়াভূমি, একের পর এক ঘুরে দেখছিলুম। জ্ঞান-সাধনায় সমাহিত অধ্যাপকবর্গ, উৎসুক চঞ্চল ছাত্রবৃন্দ সকলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন জয়-যাত্রার পথে অগ্রসরমান আজকের ইস্রেলের বাস্তব চিত্রটি।

সব থেকে আকৃষ্ট হলুম মূল্যবান রত্নরাজিতে পূর্ণ লাইব্রেরিটি এবং সর্বা-ধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত সুপ্রশস্ত লেক্‌চার থিয়েটারটি দেখে। একটি ইস্রেলী তরুণী হিব্রু ভাষাতে সমবেত ছাত্রদের কিছু বলছিলেন, আমাদের দেখে ভাষণ বন্ধ করলেন না, শুধু স্মিতহাস্যে বিদেশী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানালেন। সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ইস্রেল তার বিদেশী বন্ধুদের। হিব্রু ইউনিভার্সিটিতে একটি ভারতীয় ছাত্র এখন নিউক্লিয়ার ফিসিক্সের একটি শাখায় গবেষণারত এবং গত বছরে আটজন ভারতীয় ছাত্রকে ইস্রেলী গভর্ণ-মেন্টের বিভিন্ন ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে বলে শুনলুম।

হিব্রু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের এক প্রান্তে বিশাল জলাশয়গুলি ঘিরে বহু বিচিত্র অজানা যন্ত্রপাতির সমাবেশ লক্ষ্য করলুম। এইখানেই চলেছে New Solar Generator আবিষ্কারের পথে Dr. Tabor এবং তাঁর ছাত্র-বৃন্দের সুকঠিন সাধনা। ভগবানের প্রসন্ন দান সূর্যরশ্মিকে বন্দী করে মানবের কল্যাণ কামনায় নূতন এক অব-দানের প্রচেষ্টা সমগ্র পৃথিবীর সুপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আধুনিক জেরুসালেমের যান্ত্রিক সভ্যতা পিছনে ছেড়ে চলে এলুম জেরু-সালেমের প্রাচীন অংশে। এইখানেই দূরে......অনেক দূরে একটি গির্জার কারুকার্যখচিত চূড়া আকাশ পানে উঠে গেছে। ওই সেই বেথলেহেম যেখানে মানব-ইতিহাসের বিশেষ শুভ লগন-

প্লানির একটি উদিত হয়েছিলো। মাটির বুকে জন্ম নিয়েছিলো একটি পুণ্য-প্রদীপশিখা—মানবপ্রেমিক যীশুখৃষ্টে। নিজের সমগ্র জীবন দিয়ে অহিংসার বাণীকে রূপ দিয়ে গেলেন যিনি, নিষ্ঠুর মানুষের হিংসা তাঁকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে উঠেছিলো। জেরুসালেমেরই মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে কুখ্যাত Golgotha, যেখানে মানুষের ক্ষুদ্রতার বিষ-নিশ্বাস তিলে তিলে নিভিয়ে দিয়েছিলো মহান্ প্রেমের দীপ্তিটুকু। তবু সেই চরম মুহূর্তেই আকাশ বাতাস স্তব্ধ হয়ে শুনেছিলো ক্ষমাসুন্দর সেই বাণী—
"Father, forgive them for they know not what they are doing."

বিশ্বপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত কণ্ঠ বর্তমান যুগেও অনুরণিত হয়। তাই অহিংসার অপার্থিব শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই মাটির পৃথিবীর মানুষেরাই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেও হত্যাকারীকে ক্ষমা জানিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যান কোনো মানবোত্তর লোকে।

সত্যি বিচিত্র বটে এই পৃথিবী। ইস্রেল ও জর্দনের সীমারেখায় পৌঁছে

দেখলুম দিগন্ত প্রসারিত বিপুল ছবিখানির একটি কোণে Dead Sea-র আভাস ফুটে আছে, আর নিকটেই রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে বিখ্যাত ওমার মসজিদের গোলাকার গম্বুজটি। শুনলুম মুসলমানদের কাছে মক্কা-মদীনার পরেই এই মসজিদটিই নাকি পবিত্রতম স্থান। একই মাটির বুকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে গির্জা ও মসজিদ, অথচ ইস্রেল ও জর্দনের সুরক্ষিত সীমা-প্রান্তে সশস্ত্র প্রহরার তাড়নায় গাছপালা পশুপক্ষীগুলি পর্যন্ত যেন সন্ত্রস্ত হ'য়ে রয়েছে। ইস্রেল ও জর্দনের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা, চেহারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে প্রায় কোনোই বৈষম্য নেই, তবুও মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অলঙ্ঘনীয় এক দুস্তর ব্যবধান।—শুধু ইস্রেল-জর্দন কেন, নিকটে আর দূরে সর্বত্রই দেখি একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

সন্ধ্যালোকে রাঙা পথ বেয়ে ফিরে চললুম তেল-আভিভ অভিমুখে। জেরুসালেম থেকে প্রায় ষোল-সতেরো মাইল দূরবর্তী হ'তে না হ'তে সহসা যেন স্বদেশের একটি বিচ্ছিন্ন প্রান্তে এসে পৌঁছলুম। ইস্রেলে আগত ভারতীয় ইহুদীদের বসতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এখানকার অধিবাসীরা জায়গাটির নামকরণ করেছেন Messilat Zion অর্থাৎ কিনা The Royal Road to Zionism।... তেল-আভিভ পৌঁছবার আগে আরও একবার যাত্রা ভঙ্গ করতে হলো। কিছু খাদ্য গ্রহণের অভিলাষে নেমে একটি রেস্তোরাঁর নাম নজরে পড়লো—স্যামসন রেস্তোরাঁ। গাইড মহাশয় লক্ষ্য করে এগিয়ে এসে বিশেষ একটি দিকে হস্ত-প্রসারিত করে সগর্বে জানালেন যে, এই-ই নাকি সেই স্থান যেখানে বিপুল-বপু স্যামসনের সঙ্গে মদিরাক্ষী ডেলাইলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো। বিস্ফারিত নেত্রে নির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে মাথা হেলিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলুম, যেন সেই বিখ্যাত মানব-মানবী এখনই আমার সম্মুখে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। গাইড ভদ্রলোকটি অতঃপর সন্তুষ্ট চিত্তে গিয়ে গাড়ীতে আরোহণ করলেন।

তেল-আভিভে পর পর কয়েকটি দিন একই ছন্দে কেটে গেল। প্রতিদিন সকালে প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করে পিতাপুত্রী বেরিয়ে পড়ি Hotel Sheraton অভিমুখে, সেখানেই চলেছে I. P. I-এর বিরাট সম্মেলন। স্বরা সারাটি দিন ধরে সংবাদপত্রসমূহের দর্শন ও দুর্দশার আলোচনা করেন আর আমি কিছু পরেই নিজের হোটেলে ফিরে সম্মুখবর্তী স্বর্ণোজ্জ্বল বেলাভূমিতে নেমে যাই। রোদ্মুখী ফুলের বলবাহার ছড়িয়ে

ছড়িয়ে রয়েছে স্নানার্থীর দল, সমুদ্রের কল্লোলকে ছাপিয়ে উঠেছে তাদের উচ্ছ্বসিত কলরব। সুস্থ সবল প্রাণশক্তির এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সত্যিই আকর্ষণীয়। সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ-প্রাচুর্যের পরে ফিরে এসে জানালাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখি রাত্রের তেল-আভিভের রূপ। আলোয় গানে ঝলমলে নগরী, তার পাদমূল বেষ্টন করে মেডিটেরেনীয়ানের টলোমলো বুকে চাঁদের ম্লান হাসির আলপনা ঝিকমিক করছে।

কর্মছন্দে যতি টেনে একটি উজ্জ্বল প্রভাতে বাবা ও আমি রওনা হলুম নাজারেথের পথে। প্রায় তিন ঘণ্টার পথ, প্রখর রৌদ্রের অসহনীয় উত্তাপ। রাস্তার দুই ধারে সযত্নপালিত গাছগুলি বিশীর্ণ মূর্তি নিয়ে ম্রিয়মাণভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর তাদের ফাঁক দিয়ে যতোদূর দৃষ্টি যায় ততোদূরে কবির ভাষায় :

"রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে
চোখে।"

এই বিস্তীর্ণ বালুপ্রান্তর কিন্তু সমতল নয়, অজস্র সোনালী ঢেউ উঠে নেমে গেছে। মাঝে মাঝে ছোটো পাহাড়, রুক্ষ পাথরে তার অঙ্গ, তবু তারই কোলে আশ্রয় নিয়েছে দরিদ্র জনবসতি-গুলি। ক্ষুদ্র আবাসগুলি নীল রঙে রঞ্জিত।—কেন?—কেননা আরবরা মনে করেন নীল রঙ অশুভ-অমঙ্গলকে দূরে রাখে। আর শুনলুম, এই সব দিকে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সকলেই প্রায় আরবীয়। আধুনিক নগরের যুগোপযোগী জীবন-যাত্রা এঁদের নাকি মনোমত নয়, তাই বহু কষ্ট স্বীকার করেও নির্জনতার মধ্যেই চাষবাস করে জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আমাদের দেশের মতই চাষের কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব লক্ষ্য করলুম। জলের অপ্রাচুর্যে কৃষকদের বর্ণনাতীত দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হয়, বহুদূর থেকে গাধার পিঠে জল বয়ে আনাই একমাত্র উপায়। অথচ তেল-আভিভের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি ধুয়ে ভগবানের বিগলিত করুণারাশি দিগন্তে মিলিয়ে গেছে।

অবশ্য জলসমস্যা সম্বন্ধে ইস্রেলী গভর্ণমেণ্ট যে যথেষ্ট সচেতন তার প্রমাণ পেলুম নির্মীয়মাণ বা সদ্যসমাপ্ত বৃহৎ reservoir-গুলি দেখে। রুক্ষ পট-ভূমিকায় বহুযত্নে সিঞ্চিত নবাঙ্কুরের বিকাশ লক্ষ্য করলুম। অলিভ কুঞ্জগুলির

ছায়াময় সৌন্দর্য সত্যিই মনোরম। বালির উপরে নগর গড়েই ক্ষান্ত হননি ইহুদীরা, নিসর্গ শোভার প্রতিও তাঁদের লক্ষ্য দেখে মুগ্ধ হলুম।

এ' কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে আমার বাবার মত মনোযোগী শ্রোতা অতি দুর্লভ। যাত্রাপথে একে একে Mount Tabos, Mount Olivet, ছোট্টো সুন্দর Cana গ্রাম, Iron Valley ইত্যাদি আরো কতো ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ নগর, পাহাড়, প্রান্তর পাশে ফুটে উঠেই দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল। বাল্যে সঞ্চিত স্মৃতির ভান্ডার খুলে স্থানগুলির ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা জড়িয়ে বাবাকে প্রভূত জ্ঞান দান করছিলুম। সারগর্ভ ভাষণগুলি শুনে বাবার মনে যে কি ভাবের উদয় হচ্ছিলো তা বাবাই জানেন। তবে তাঁর মুখভাবে যথোচিত বিস্ময় ও সম্ভ্রমের প্রকাশ দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি বুঝি আর কন্যার পাণ্ডিত্যের কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। অহংকারে স্ফীত হয়ে উঠলুম এবং তুলনামূলকভাবে মনে পড়ে গেল দুটি নবীন শ্রোতার কথা। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী যারা দুর্ভাগ্যবশতঃ বয়সানুক্রমে পরিবারে আমার পরবর্তী স্থান দুটি লাভ করায় আমার অভিভাবকত্বের প্রতি শ্রদ্ধামাত্র প্রকাশ করে না। কেবল যে আমার বিজ্ঞতা ও জ্ঞান-গাম্ভীর্যের অন্তঃসারশূন্যতা তারা অতি অনায়াসেই ধরে ফেলে তাই নয়, উপরন্তু সেই ভুল-ত্রুটির অকুণ্ঠিত সমালোচনা করতেও তাদের কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জার বালাই দেখা যায় না। বলাই বাহুল্য যে ঐ বিষয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রীটি স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই তার দাদার থেকেও প্রগতিপন্থী এবং কে-যে তাঁকে অধিকার দিয়েছে তা যদিও জানি না, তবুও সবিস্ময়ে দেখি তাঁর সুনীল নেত্রের মধুর শাসনে শুধু আমি কেন, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই সন্ত্রস্ত থাকে।

স্নেহ-স্মৃতির কোল থেকে চকিতে বর্তমানে ফিরে এলুম। গন্তব্যস্থলে প্রায় পৌঁছে গেছি। পাহাড়ের সর্পিল পথ বেয়ে উপরে উঠবার সময় দেখলুম নিচের দৃশ্যাবলী কি অপরূপ সুন্দর! সোনারঙের মরুভূমির আভাস মিলিয়ে গেছে, নিচে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ঘুমন্ত Jesrael valley, তার সর্বাঙ্গে সবুজ, বাদামী ও গাঢ় বাদামী রঙের শস্যসমারোহ। শুনলুম আগে এখানে বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছিল, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের জন্মস্থল। সম্প্রতি ইহুদীরা বহুযত্নে জল-নিষ্কাশন করে এটিকে উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। অজস্র ইউক্যালিপ্টাস দাঁড়িয়ে আছে,—ঋজু ও দীর্ঘ,—তাদের পত্রব্যজনেই একটি অস্বাস্থ্যকর জমি আজ রোগবীজাণু থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

পাহাড়ের চূড়ায় বসানো ছবির মত নাজারেথ গ্রাম। যীশুখৃষ্টের বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবন এই শান্ত গ্রামটির রুক্ষ পরিবেশে ছায়াচ্ছন্ন ভাবে কেটেছে। বর্তমানে নাজারেথ দুটি গির্জার জন্য সুবিখ্যাত। প্রথমটি হলো The church of Annunciation যেখানে পবিত্র-সরলা এক গ্রাম্য কুমারীর কাছে দেবদূত দৈববাণী এনেছিলেন, "Hail Mary, full of grace. the Lord is with thee." খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ এই স্থানটি তাঁরা যত্নে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলুম ছায়া-শীতল ভূগর্ভে। একটি গুহার অনাড়ম্বর অভ্যন্তর, সেটির স্বাভাবিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, অসমতল ভূমি, পাথুরে দেওয়াল, নিচু ছাত। শুধু এক কোণে একটি মর্মর-বেদী নির্মিত হয়েছে। ছাতের একটি ছিদ্র দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবিষ্ট হয়ে পরিস্ফুট করে তুলেছে পার্থিব জগতের সব থেকে পবিত্র, সবচেয়ে সুন্দর, শাশ্বত-মধুর ভাবমূর্তি—মা ও শিশু।

দ্বিতীয় গির্জাটির নাম The church of Nativity। এইখানে মেরী ও যোসেফ বালক যীশুকে সযত্নে প্রতিপালন করেছিলেন। উপরে ছিল যোসেফের কারিগরির দোকান আর তার নিচেই তাঁদের বাসস্থান। আবারও নেমে যেতে হলো ধরিত্রী মায়ের অভ্যন্তরে। সেই একই পরিবেশ, উঁচুনিচু কর্কশ গুহাগাত্র, ছাতের একটি ছিদ্র মাত্র আলো-বাতাসের প্রবেশদ্বার। গ্রীষ্মের দাবদাহে বড়ো বড়ো কলসে ভরে জল রেখে দিতেন মেরী, সেই কলসগুলি দৃঢ়ভাবে যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে যে আঙটা গলিয়ে বন্ধনী ব্যবহার করতেন সেইগুলি আজও বিদ্যমান। তিনটি আঙটা, তিনটি প্রাণীতে গঠিত একটি সামান্য ছুতোরের ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতীক। তখন কে ভেবেছিল যে এই অকিঞ্চিৎকর
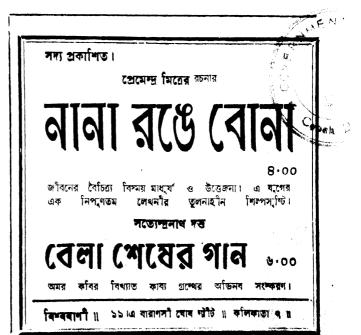
বাসস্থান দেখতে দুর্গম পথের ক্লেশ সহ্য করে আসবে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর দল।

শীতল ভূমিতল ছেড়ে আবার প্রখর আলোয় বেরিয়ে এলুম, সংগে সংগে মন্দিরের পান্ডাদের মতই চতুর্দিক থেকে ছেঁকে ধরলো বিক্রেতারা, "নাজারেথের সুপবিত্র মাটি", "নাজারেথের সুপবিত্র জল"...... সব কিছুই সুপবিত্র! কথিত আছে যে, স্বয়ং যীশু জেরুসালেমের মন্দির থেকে ব্যবসায়ীদের বিতাড়িত করেছিলেন, বলেছিলেন, "Do not turn my Father's house into a place of bartar." আর আজ কিনা......!! আমাদের গাইড ভদ্রলোক জানালেন যে, এখানে এসে এখানকার একটি গাইডকে সংগে নিতেই হয়, সেই আমাদের ঘুরিয়ে দেখাবে। কোনো একবার গাইড ভদ্রলোকটি নিজেই কিছু যাত্রীদের স্থান-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে গির্জা দুটি পরিদর্শন করিয়েছিলেন, অন্য কোনো গাইডের সাহায্য নেননি। ফলে ফিরে এসে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখেন, একটি নয়, দুটি নয়, চার চারটি টায়ারেই বিরাট বিরাট কয়েকটি ছিদ্র তাঁর দিকে ব্যাদিত বদনে চেয়ে রয়েছে। বলাই বাহুল্য এর পরে ভদ্রলোক আর কখনও নিজের পাণ্ডিত্যের উপরে নির্ভর করেননি।

ফিরতি পথে পড়ন্ত বেলার আলোয় রাঙানো Sea of Galilee-র (আসলে একটি লেক মাত্র) একাংশ চোখে পড়লো। বাল্যস্মৃতি আলোড়িত করে পরিচিত নামটি বিস্মৃতির আবরণ উন্মোচন করে বহু ঘটনার বর্ণনা আলোয় নিয়ে এলো...... যেমন যীশুখৃষ্টের জলের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে লেক পেরিয়ে যাওয়া বা পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাত্র মাছ দিয়ে অগণিত ভক্তের ক্ষুধা শান্তি করা। (হায় বর্তমানের মৎস্য-সমস্যা-সংকুল-দিন!)

দূরে মেডিটেরেনীয়ানের সুনীল আভাস আবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। সাগরতীরে গড়ে উঠেছে ইস্রেলের অসংখ্য Kibbutzimগুলির একটি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বহু সমস্যার সমাধানকল্পে আজ বহু দেশে যে collective settlement গড়ে উঠেছে kibbutzim তারই ইস্রেলী সংস্করণ। এমনই এক kibbutzim পরিদর্শন করতে কিছুক্ষণের জন্যে নাথানিয়া শহরে এলুম। নিটোল মুক্তোর মত ছোট্টো শহর নাথানিয়া, ইস্রেলের একটি স্বাস্থ্য-নিবাস। আকাশ-নীল জলরাশি অতলের রহস্য নিয়ে দূর-প্রসারিত, বর্ণাঢ্য ফুলের মধ্যে হাস্যচঞ্চল শিশু-সৌন্দর্য, তারুণ্যের কলগুঞ্জন আর বয়স্ক দৃষ্টির প্রসন্ন আলোয় গোধূলি-বেলাটি অনির্বচনীয় মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

ইস্রেলে কয়েকটি দিনের স্মৃতি অন্তরের মণিকোঠায় ভরে নিয়ে আজ তেল-আভিভ ছেড়ে চলে যাব গ্রীস দেশের আথেন্স শহরে। ভোরের আলো প্রকাশমান হ'তে না হ'তেই মালপত্র গুছিয়ে বাবা ও আমি নিচে নেমে এলুম। লবীতে বসে অপেক্ষা করছি কখন ট্যাক্সি আসার খবর পাব। কিছুক্ষণ পরে যখন দুজনেই অধৈর্য হয়ে উঠেছি তখন দেখলুম মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত অত্যন্ত সম্ভ্রান্তদর্শন একটি ভদ্রলোক এসে লবীতে প্রবেশ করলেন। কি মনে হলো বাবাকে বললুম, "বাবা, ওই বোধ হয় আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার।"

বাবার মুখে একটি উচ্চাংগের হাসি ফুটলো যার অর্থ বেশ প্রাঞ্জল—অমৃতং বালভাষিতম্। ঠিক তখনই ভদ্রলোকের দৃষ্টি আমাদের উপরে পড়লো। এগিয়ে এসে বিনীত নমস্কারান্তে তিনি জানালেন ট্যাক্সি বাইরে অপেক্ষমান এবং তিনিই ট্যাক্সি-চালক। কোনো মন্ত্রবলে বাবার হাসিটি তৎক্ষণাৎ আমার মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো এবং রীতিমত প্রশস্ত রেখায়।

আবছা আলোছায়ামাখা পথ দিয়ে এয়ারপোর্ট অভিমুখে যাওয়ার সময় অন্যমনস্কভাবে হিব্রু ভাষায় বলা খবর শুনছিলুম। সচকিত হয়ে উঠলুম, "রাবীন্দ্রানাথ টেগোরি" শুনে। ট্যাক্সি ড্রাইভার জানালেন পরের দিন ইস্রেলের প্রধানমন্ত্রী Ben Gurion-এর পৌরোহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি স্মৃতিসভা তেল-আভিভে অনুষ্ঠিত হবে। আরো শুনলুম দিন পনেরো আগে একটি বিরাট অথচ অনাড়ম্বর জনসভায় বিশ্বব্যাপী সুমহান এই ব্যক্তিত্বের জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ইস্রেলী জনসাধারণ তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ভোরের হাওয়ায় শীতল স্পর্শ ছাপিয়ে ভারতে উদিত বিশ্বজোড়া রবি-প্রতিভার কিরণে সমস্ত হৃদয় আনন্দে গর্বে বহুবারের মত আবারও ভরে উঠলো। মনে পড়লো এই তেল-আভিভেই একটি হোটেল-বয় ভাঙা ইংরেজিতে বিনীত আবেদন জানিয়েছিল—ইস্রেলে সব বই পাওয়া যায় না, তাই ভারতীয় দেখে সে অনুরোধ জানাচ্ছে আমরা কি ইস্রেলী টাকায় মূল্য ধরে নিয়ে তাকে ভারত থেকে গান্ধীজীর জীবনীর একটি ফরাসী অনুবাদ পাঠিয়ে দেব!

এঁরাই তো ভারতের অমর সন্তান যাঁদের বক্ষে ধারণ করে সমগ্র বিশ্বকে ডেকে সে বলে "শৃন্বন্তু বিশ্বে—অমৃতস্য পুত্রাঃ—বেদাহম্"। এঁদেরই ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মসাধনায় ভারতের অমৃতধারা শান্তির বাণী বহন করে আজও প্রবহমান।

মেঘের স্তর ছাড়িয়ে উঠে এসেছি উপরে, এখন শুধু নিঃসীম নীলাকাশের শান্তি। মনে পড়লো ইস্রেল ভূমিতে জনসাধারণ একে অপরকে অভিবাদন-সম্ভাষণে বলে "Shalom" অর্থাৎ কিনা "শান্তি"। পিছনে ছেড়ে আসা ইস্রেলের উদ্দেশ্যে আমার ভারতীয় অন্তর তাই কামনা জানালো : শান্তির শুভ্র ছায়া নেমে আসুক তোমার উপরে। সুপ্রাচীন ভারতভূমির সংগে বহু দেশের মত সদ্যোগঠিত ইস্রেলেরও সাম্য-মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হোক—সে বন্ধন যেন কোনো দিন ছিন্ন না হয়!

চেয়ে দেখলুম পশ্চিম দিগন্তে এখনও সুপ্তির কৃষ্ণযবনিকা বিস্তৃত রয়েছে, কিন্তু আকাশ প্রান্তরের অর্ধগোলাকৃতি পূর্বপ্রান্তে অতিপ্রশস্ত রামধনুর বর্ণলেখার মধ্যে জেগে উঠছে নবীন সূর্য। আশায় ও বৈচিত্র্যে ভরা একটি নূতন দিনের উন্মেষ। —সমাপ্ত।

সাইকেল পাগলের দেশ

ভ্রাম্যমাণ

কয়েক বছর আগে ফরাসী বাহিনীর সৈন্যদের ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তর দিতে পারে শতকরা পঁচিশজন মাত্র। কিন্তু শতকরা সাতানব্বুই জনই 'ট্যুর দ্য ফ্রান্সের' বিজয়ীর নাম বলতে পারে।

'ট্যুর দ্য ফ্রান্স' একটি প্রতিযোগিতার নাম। এতে সাইকেলে ২৭৫০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। শুরু হয় বুয়েন থেকে। বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে আল্পস ডিঙিয়ে ইতালি; তারপর দক্ষিণ ফ্রান্সের পিরেনিং, সেখান থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে লয়ের বরাবর প্যারিসে পৌঁছে প্রতিযোগিতা শেষ হয়। রোদেপোড়া, ধুলোমাখা প্রতিযোগীরা প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় সাইকেলে চাপেন, রাত কাটান ত্রিবর্ণ পতাকাশোভিত শহরে। এরা যে শহরে রাত্রিবাস করবেন সে শহর ধন্য হয়ে যায়। সুতরাং এই সুযোগ লাভের জন্য শহরগুলিকে চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। শহর তা দিতেও পারে, কারণ রেস্টুরেণ্ট এবং দোকানের বিক্রিও তখন শতকরা চল্লিশ ভাগ বেড়ে যায়। মাসাধিক কাল আগে থেকেই হোটেলগুলি ভর্তি হয়ে যায় এবং ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলির বিক্রিও এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে শতকরা দশ ভাগ বেড়ে যায়। ফ্রান্সে যত সাইকেল রেস হয়, পৃথিবীর কোন দেশেই তা হয় না। বছরে প্রায় তিনশোটি। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ টুর দ্য ফ্রান্স।

প্রতিটি ফরাসী পুরুষ টাকা বা খাদ্যের থেকেও যে জিনিসটি বেশি ভালবাসে, তার প্রতীক হল সাইকেল। আবেগ, মর্যাদাবোধ সবকিছুই জড়িয়ে আছে এই দ্বিচক্রযানটির সঙ্গে। ফ্রান্সে মোটর-চড়ার থেকেও সাইকেল-চড়া বেশি গর্বের। মদ্যপানের সময় তাই টোস্ট করা হয়, "মানুষের বন্ধু সাইকেল, দীর্ঘজীবী হোক।" ষাঁড়ের-লড়াই মারফত স্পেন যেমন তার হিংস্রতা মোক্ষণ করে ঠিক তেমনি সাইকেল-রেস মারফত, ফরাসীরা শৌর্য উপাসনার আর্তি প্রকাশ করে। এর চরম প্রকাশ ট্যুর দ্য ফ্রান্সে।

প্রতিযোগীরা যে পথ, যে গ্রাম, যে শহর দিয়ে যায়, সেখানকার স্কুল-ব্যবসায় ইত্যাদি তখন বন্ধ রাখা হয়। না রেখে উপায়ও নেই। মানুষ তখন রাস্তার ধারে ঘন্টার পর ঘন্টা, প্রতিযোগীদের প্রতীক্ষায় থাকে। এই প্রতিযোগিতা 'লা অটো' নামে এক খেলাধুলোর কাগজের উদ্যোগে প্রথম শুরু হয়। বিজ্ঞাপন-দাতারাই খরচ-খরচা দেয়। প্রতিযোগীদের পিছনে মোটরে চেপে এইসব বিজ্ঞাপন-দাতারা লাউড-স্পীকারে নিজেদের জিনিসের গুণকীর্তন করতে করতে যায়, এজন্য তারা ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের দেয়। দুটি ফরাসী সংবাদ-পত্র এখন এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা।

প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও বেশ জমকালো, সঙ্গে থাকে রেডক্রশের তিনটি গাড়ি এবং নার্স। সাইকেলে চলাকালীন অবস্থায় এই নার্সরা প্রতিযোগীদের ব্যাণ্ডেজ করে দিতে পারে। আর থাকে ছোটখাট কামারশালা এবং মেসিন শপ। ট্রাকভর্তি অতিরিক্ত সাইকেল এবং সাইকেলের অংশও সঙ্গে যায়। উদ্যোক্তাদের একটা বড় খরচ, সাইকেলে চলাকালীন অবস্থায় প্রতিযোগীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা। এই বছর প্রতিযোগীরা খেয়েছেন এক হজার রোস্ট চিকেন, তিনশো পাউণ্ড চকোলেট, সাড়ে পাঁচ হাজার গ্যালন মিনারেল ওয়াটার, খাদ্য-তালিকায়, শ্বেত মদ্য বা ভাজা খাবার নিষিদ্ধ, এতে পেশী সংকোচন ঘটে।

হেলিকপ্টারে রিপোর্টাররা প্রতিযোগীদের মাথার উপর ঘুরে বেড়ায়। হিংস্র পার্বত্য পথে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়ায়ে-ব্যস্ত প্রতিযোগীদের মরীয়া চেষ্টাও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। প্যারিসের এক গ্যাস কোম্পানি থিয়েটার পার্টি ভাড়া করে, যেখানে যেখানে প্রতি-যোগীরা রাত্রিবাস করবে সেখানে বিনা-মূল্যে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

জীবনপণ করে প্রতিযোগীরা ট্যুর দ্য ফ্রান্স প্রতিযোগিতায় নামে। অর্ধেকেই শেষপর্যন্ত অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। পড়ে গিয়ে বা ধাক্কায় আহত হয়ে বহুজনই মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হন। শুভানুধ্যায়ীদের উৎসাহের আতিশয্যেও বিপদ ঘটে। গত বছরে ফ্রান্সের সম্ভাব্য-বিজয়ী পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে শির-দাঁড়া ভেঙেছিলেন। বেশির ভাগ চালকই অনুশীলন করতে গিয়ে বছরে
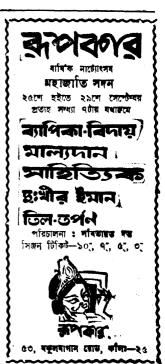
পাঁচ-ছ'বার হাড় ভাঙেন। স্পেনের ফেদারিকো বাহামন্টি ১৯৫৭-র প্রতিযোগিতা থেকে অবসর নেবার সময় চিৎকার করে বলেছিলেন, "এ ধরনের যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই।" তাঁর ট্রেনার অনুনয় করে বলেন, "তোমার স্ত্রী, তোমার দেশ, ফ্র্যাঙ্কো এদের নামে অনুরোধ করছি।" "কখনো না, না, না।" বাহামন্টি জবাব দেন। অবশ্য দু'বছর পরে তিনি আবার যোগদেন এবং বিজয়ী হন।

এই প্রতিযোগিতায় দশটি প্রতিযোগীর এক একটি টিম করেছিল ন'টি দেশের এবং ফ্রান্সের তিনটি অঞ্চলের প্রতিযোগীরা। এ'রা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেন যে, তাঁদের মধ্যে দ্রুত চালককে জয়ী হতে তাঁরা সাহায্য করবেন। সাহায্য বলতে, বাতাস থেকে আড়াল করা, অন্য প্রতিযোগীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া ইত্যাদিই বোঝায়। ১৯৫৭ সালের বিজয়ী জ্যাক আঁকোয়েতিলকে ১৯৫৯ সালে তার দলের লোকেদের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করতে হয়। এমন কথা ছিল না, সুতরাং এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি গত বছর প্রতিযোগিতায় নামতে অস্বীকৃত হন। এ বছর দলের সভ্যদের কাছ থেকে পূর্ণ আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে, তবে তিনি প্রতিযোগিতায় নামেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি আট মিনিট এগিয়ে থাকেন, সপ্তাহ শেষে প্রতিযোগিতার শেষ বরাবর দলের থেকে তিনি এত এগিয়ে যান যে পথে 'বিশ্রাম' নিতে শুরু করেন। এই প্রতিযোগিতায় বহুবারই বিজয়ীদের কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে প্রথম হতে দেখা গেছে।

প্রতিযোগিতায় বহু ঘটনা ঘটে যা বীরত্ব এবং শঠতা, এ দুইকেই উদঘাটিত করে। বেয়োন শহরে ইউজীন ক্রিস্টোফের এক ব্রোঞ্জ মূর্তি রাখা হয়েছে। ১৯১৩ সালে তিনি একই সঙ্গে তৃতীয় সাইকেল এবং কাঁধের হাড় ভাঙেন। ভাঙা সাইকেল, ভাঙা কাঁধে চাপিয়ে তিনি চোদ্দ মাইল হেঁটে গিয়ে এক কামারশালায় হাজির হন। নতুন ফ্রেম তৈরী করে তিনি আবার প্রতিযোগিতা শুরু করেন। অবশ্য জিততে পারেননি। এরই পাশাপাশি আরেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯২৬ সালে একদল প্রতিযোগী ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়েন। পথচলতি এক বাসে তাঁরা উঠে বসেন। সারা দিন তাঁরা বাসে চড়ে পথ অতিক্রম করেন। অবশ্যই বাস-ড্রাইভারকে তাঁরা ঘুষ দেন। এতে অন্য প্রতিযোগীদের থেকে তাঁরা আধ ঘণ্টা এগিয়ে যান। কিন্তু বাস-ড্রাইভার প্রতিযোগিতার এক কর্তাব্যক্তির কাছে সাতচল্লিশ জনের বাস-ভাড়া চেয়ে বসাতেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়।

আগে প্রতিযোগীরা বেলজিড্রিন বা হাইপোডারমিক ইনজেকসন নিয়ে সাইকেল চালাতেন, এখন তা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। হ্যান্ডেলে এখন তাঁরা বোতলে করে 'বলবর্ধক' পানীয় ঝুলিয়ে নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামেন। প্রত্যেকেরই গোপন ফর্মুলা আছে। তবে বেশিরভাগই, ফলের রস, ডেকস্ট্রস, ভিটামিন কম্পাউণ্ড ইত্যাদি নিয়ে চলেন।

এত কষ্ট সহ্য করে মানুষ কেন এই প্রতিযোগিতায় নামে? বিশ হাজার টাকা পুরস্কারের জন্যই কি? তাও দলের লোকেদের সঙ্গে ভাগ করে বিজয়ীকে নিতে হয়। আসল লাভ বিজ্ঞাপন এবং চেহারা দেখিয়েই হয়। এতে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিজয়ী ব্যক্তি আয় করেন। এ ছাড়া সম্মানের ব্যাপার তো আছেই। খবরের কাগজে তখন, 'এঞ্জেল' বা 'ঈগল' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। ফরাসীরা জানে এই প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করা মানেই বন্ধুলাভ এবং পরিবারের সম্মানবৃদ্ধি।

খোলস

রজত সেন

'আমি কি তোমার পেটের মধ্যে ছিলাম, মা?'

'হ্যাঁ' বালিশের ওয়াড়ের সেলাইটা পরীক্ষা করল স্নেহলতা।

'পেট থেকে বাইরে এলাম, মা?'

'হুঁ।'

হঠাৎ বৃষ্টির ঝমর-ঝম। আর হাওয়ার দৌরাত্ম্য। বৃষ্টির ছাঁট আসছে জানালা দিয়ে; স্নেহলতা উঠছিল জানালা বন্ধ করতে। 'মা!' হঠাৎ একটা ভয়-পাওয়া আর্তনাদের মত শোনালো অমিয়র গলা।

চাকা থামিয়ে দিল স্নেহলতা। অমিয়র দৃষ্টি তার পেটের উপর স্থির হয়ে আছে; অকারণ শাড়ির আঁচলটা সে টানাটানি করল। বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের গর্জন, গাছপালার হিল্লোল, কিছুই কানে এল না স্নেহলতার, আতঙ্কে বিস্ফারিত অবিশ্বাস্য দুটি শিশু-চোখ; চুলের গোছা হাওয়ায় দুলছে কপালের উপর, আর সেলাই-কলের ওপাশে স্নেহলতা স্পষ্ট দেখতে পেল অমিয়র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে!

'কেমন করে পেট থেকে বেরিয়ে এলাম, মা?'

স্নেহলতা ক্ষিপ্র-হাতে চুলে একটা পাক দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ইস! সব ভিজে গেল!' প্রায় দৌড়ে গিয়ে জানালা বন্ধ করল সে, দুটোই; তারপর আর দুটো। 'চল্, খেতে যাবি! তোর বাবা রোজ এত দেরি করে কেন রে? আজ জিজ্ঞেস করবি, কেমন?' অমিয়র একটি নিস্পন্দ হাত ধরে স্নেহলতা তাকে টেনে তুলল।

বাগানে গাছের ছায়ায়, ঘাসের উপরে সেই সাদা পোকাটি, যেটা বাল্বের চার-পাশে ঘুরছিল। প্রজাপতির বাচ্চার মত। উড়ে গেল গাছের ডালে; সাদা ফুল ঝুলছিল; ফল নয়, বাল্ব; বাল্ব নয়, সাদা ডিম। পোকাটা আশ্চর্য উপায়ে ডিমের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ডিমটা দুলতে লাগল বাতাসে, বেলুনের মত বড় হতে লাগল; ডিমের মধ্যে ঘোলা জল, তার মধ্যে পোকাটা সাঁতার কাটছে, পা বাড়িয়ে, পাখা মেলে! কি আশ্চর্য! পোকাটা পোকা নেই, অমিয়। অমিয় সাঁতার কাটছে, হাত-পা নাড়ছে, হাবু-ডুবু খাচ্ছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার; চোখ খোলা, কোন্ দিকে যাবে? রুদ্ধ! সাদা খোলস! মসৃণ, সাদা

"গোপালের পড়িবার বই নাই।" "মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে।" "যাদব এখনও শুইয়া আছে।" "রাখাল সারা-দিন খেলা করে।" 'মা!'

'কি বাবা?'

'রাখাল সারাদিন খেলা করে কেন, মা?'

সেলাই-কলে সূঁচটা নামাতে গিয়েও থেমে রইল; স্নেহলতা হাসল, 'রাখাল দুষ্টু কিনা! তাই।'

'মা, আমি দুষ্টু?'

'তুমি? তুমি খুব, খু-ব ভাল! পড়।'

জানালার বাইরে ভিজে বাতাস, বাতাসে বৃষ্টির গুঁড়ো; ইলেকট্রিক বাল্বের চারপাশে একটা সাদা পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে; উত্তপ্ত বাল্বের উপর বসবার চেষ্টা করল, ঘুরে পড়ল নিচের দিকে! 'পোকাটা কোথা থেকে এল মা?'

'বাইরে থেকে উড়ে এল, বাগান থেকে?'

রেডিও-সেট-এর উপর চৌকো ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। জোড়া-খাটের পাশ থেকে দেওয়াল পর্যন্ত সবুজ গালিচা। দমকা হাওয়ায় বইটা বন্ধ হয়ে গেল। কোঁচানো কাপড়টা দু'আঙুলে টান করে চাকার হাতলটায় একটা পাক দিল স্নেহলতা। 'পোকাটার মা নেই, মা?'

'আছে, আছে বৈকি?' হাতলের সঙ্গে চাকা ঘুরছে, 'আর পড়বে না?',

দেওয়ালের মত, বার বার হাত পিছলে যাচ্ছে তার! কোথাও একটু ফাঁকা জায়গা নেই। অমিয় চীৎকার করে উঠল, কেউ শুনতে পেল না সে চীৎকার, কেউ কোথাও নেই। আর সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, সে ডাকল, মা—মা—শব্দটা বার বার মিলিয়ে যাচ্ছে মুখের কাছে!

'অমি! অমি! এই যে আমি, মা, এই যে!' স্নেহলতা অমিয়কে টেনে আনল বুকের মধ্যে! 'না, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি—'

তাপস-এর ঘুম ভেঙে গেল, পাশ ফিরতে ফিরতে জিজ্ঞেস করল, 'কি, স্বপ্ন দেখেছে বুঝি?'

'হুঁ।'

'কি খেয়েছিল?'

'কি আবার খাবে, তুমি ঘুমোও ত!'

একটা গভীর নিঃশ্বাস, খাটটায় অতি-মৃদু কয়েকটি দোলা; তারপর সব চুপচাপ।

উঁচু বুকের উপর মুখটা ফিরাল অমিয়; খোলা চোখ, নিঃশ্বাসটা গভীর, গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকনো খটখটে। 'স্বপ্ন দেখছিলে, ঘুমিয়ে পড় ত!'

অমিয় কথা বলবার চেষ্টা করল ঃ আশ্বাসের প্রার্থনা। একটি শব্দও বেরুল না তার মুখ দিয়ে। মা-র বাহুবন্ধনটা আলগা করবার চেষ্টা করল সে, মাথাটা নামিয়ে আনল বালিশে।

'ঘুমোও, বাবা! ঘুমিয়ে পড়!'

যখন ভোর হল, মেঘলা-ভোর; দুটি একটি কাক ডেকে উঠল, ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট, অস্পষ্ট-অন্ধকার, অমিয়র চোখ দুটি খোলা।

মশারির ফাঁক দিয়ে জানালার বাইরে আকাশটা চোখে পড়ে, শ্লেট-রঙের আকাশে ধোঁয়াটে আলোর আভা। সেই রং দেখা দিল আকাশে, সেই দেওয়াল, সেই খোলস, যেখানে মাথা লাগছিল তার, যেখানে বার বার পিছলে গিয়েছিল তার হাত! সেই কষ্ট আবার, সেই আকুলি-বিকুলি! চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল অমিয়!

তারপর, একসময়ে, মেঘের ফাঁক দিয়ে গাছপালা ডিঙিয়ে একটুকরো নরম রোদ এসে যখন মশারির কিনারে এসে লাগল, চোখ খুলে অমিয় তাকাতে পারল চারপাশে, নিঃশ্বাসটা তার স্বাভাবিক হয়ে এল।

"টেল মি নট ইন মোর্নফুল নাম্বারস্—" গম্ভীরকণ্ঠ যুগলকিশোর-বাবু থামলেন, 'তুমি শুনছ না, অমিয়?'

'শুনেছি, মাস্টারমশাই, ও আমি জানি, আপনি আমায় শুধু বলুন—গ্রেভ ইজ নট দি কমন গোল—নয় কেন?'

যুগলকিশোর নিকেল-ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে চাদরের প্রান্তে মুছতে লাগলেন; সাদা-কালো মোটা গোঁফের উপর উদ্ধত নাকটা প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে; প্রশান্ত চেহারায় ঐ একটুখানি যা ঔদ্ধত্য।

'না, মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা নয়।' তেমনি শান্ত, মৃদু আর বিশ্বাসী গলা।

'শেষ কথা নয়? না হোক। কিন্তু বলুন শেষ পরিণতি নয় কেন?'

'না, তাও নয়'

'আমি বলছি, তাই; জীবনের আর সব কিছুই অদল-বদল হতে পারে,' টেবিলটার উপর একটু ঝুঁকে পড়ল অমিয়, 'কিন্তু একমাত্র সত্যি—যার এতটুকু নড়চড় হবে না, সেটা হচ্ছে মৃত্যু।'

শার্টের পকেট থেকে কালো-সুতোয় বাঁধা ট্যাঁক-ঘড়ি বার করে সময় দেখলেন যুগলকিশোর; ঘড়ি রাখলেন যথাস্থানে, মাথা দুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা ত বটেই, তা ত—কিন্তু কথা কি জান, অমিয়, তবু বলব মৃত্যুর চাইতে জীবন অনেক বড়, জীবন—'

'বড় হোক, কিন্তু মৃত্যুই ত এই বড় জীবনের শেষ কথা। আচ্ছা, মাস্টারমশাই! গ্রেভ না বলে যদি বলতেন ডেথ, তাতে কি ক্ষতি হত?'

চশমাটা আবার খুলতে গিয়ে সামলে নিলেন যুগলকিশোর; 'ক্ষতি? ডেথ শব্দটা কানে ঠেকত। গ্রেভ অনেক ধ্বনি-ব্যঞ্জক, মধুর—'

'না।' কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসল অমিয়, 'গ্রেভ অনেক হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, ভয়ংকর!' গলা কাঁপতে লাগল তার; এমন কি পাতলা ঠোঁটের কোনাও, 'মৃত্যু বলতে শ্মশানের কথা মনে পড়ে, চিতা জ্বলছে, তবু মাথার উপর খোলা আকাশ। আর কবর?'

যেন কঠোর কোনো জিজ্ঞাসা! আজ পর্যন্ত অমিয়কে হঠাৎ এমন বিভ্রান্ত হতে যুগলকিশোর দেখেননি। একটু যেন হিসাবের বাইরে, কিছু যেন বেনিয়মী। এমন ছাত্রের কাছে অনেক কিছু আশা করেন তিনি; এটাও লক্ষ্য করেছেন, সেই গোড়া থেকেই—

'আপনিই বলুন, মাস্টারমশাই!'

যুগলকিশোর চমকে উঠলেন। কি হল হঠাৎ এর?

'কফিনের মত এমন নিশ্ছিদ্র আর হৃদয়বিদারক পৃথিবীতে আর কি আছে? বাক্সের মধ্যে একাকী এক দেহ! ডালার উপর পেরেক মারছে একটি একটি করে!' অমিয়র সমস্ত শরীরটা কাঁপছে, ঝড়ের ঝাপটায় যেমন করে কাঁপতে থাকে গাছের শাখা।

'তারপর সেই বাক্স নামানো হবে মাটির নিচে!' দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকল অমিয়! ঘন নিঃশ্বাসের শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন যুগলকিশোর।

'আর—তারপর বাক্সটার ওপর পড়বে মাটির স্তূপ!' হাতে-ঢাকা মুখ নামালে সে টেবিলের উপর।

যুগলকিশোর চেয়ারটা টেনে আনলেন কাছে, অমিয়র কাঁধে হাত রাখতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিলেন; 'শোন, শোন অমিয়, মুখ তোল! এই বয়সে এমন ভেঙে পড়লে চলবে কেন? নিশ্চয় তোমার মনে কোনো এক লুকানো বেদনা রয়েছে, যে-বেদনা তোমায় এমন কাতর করে ফেলছে, কিংবা—'

মুখ তুলল অমিয়, হাত সরাল; যুগলকিশোর বিস্মিত হলেন, শুকনো চোখ; কিন্তু যন্ত্রণার রেখাগুলি অস্পষ্ট নয়; আর এমন যন্ত্রণা!

'তুমি—'

যুগলকিশোর তাঁর বক্তব্য শেষ করবার আগেই অমিয়র হাতের ধাক্কায় খালি পেয়ালা আর প্লেট মাটিতে পড়ে ঝনাৎ করে উঠল; ভাঙা টুকরোগুলির দিকে তাকিয়ে অমিয় সামান্য একটু হাসল; মুখের রেখাগুলি আবার নরম আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

আর একবার ঘড়ি দেখে মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন। পিছনে অমিয় তাকে অনুসরণ করল।

নিচে নামবার সিঁড়ি, বাইরের বসবার ঘর, দরজা, তারপর বারান্দার লাগোয়া কিছু ফুলের গাছ। রাস্তায় নামবার আগে পর্যন্ত যুগলকিশোর অনুভব করলেন অমিয়কে কিছু বলা দরকার, কিন্তু কিছুই বলা হল না তাঁর।

ফুটপাতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল চায়ের পেয়ালা ছিল অনেক দূরে, কি করে লাগল অমিয়র হাতের ধাক্কা?

দরজাটা বন্ধ হবার সংগে সংগেই এক হাজার মৌমাছির গুঞ্জন এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। ছাই-রঙের ত্বুস, পাম্পসুর উপর খয়েরী রঙের মোজা দেখা যাচ্ছে; ছোট কপালটার ভাঙ্গা টেরির স্খলিত চুলের গোছা; চশমা, চশমার নিচে ধূর্ত, সাবধানী চোখ; কাঁচি-শাসিত সাদা-পাকা গোঁফ। গোটা তিনেক বই হাত থেকে টেবিলে রেখে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কে ডি ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেই চাউনি ছুঁড়ে মারলেন: আই এ্যাম হিয়ার জেন্‌টল্‌মেন, নো নয়েজ।

চেয়ারে বসবার আগে: 'উইল এনি অফ্ ইউ প্লীজ ক্লোজ দি উইনডো।'

অমিয় দাঁড়িয়ে বলল, 'ঐ একটি জানালাই ত খোলা আছে, এত লোক ঘরে—সাফোকেশন মনে হবে, স্যার।' অমিয় দাঁড়িয়ে রইল।

একে মেজাজ, তার উপর বিদ্যার অহংকার, বি-এ ক্লাসের পাঠ্য-বই, কে, ডি-র বিরুদ্ধাচরণ অনেকখানি সাহসের দরকার, ভারি ত ইনটারমিডিয়েট-এর সবে-গোঁফ-ওঠা ছোকরা! কে, ডি, জি অমিয়কে দেখতে লাগলেন, ইচ্ছে করেই চোখের পলক ফেললেন না; যেন আগে কোনোদিন দেখেননি তাকে, যেন তাঁর ছক-কাটা দর্শন-জীবনে হঠাৎ নূতন কোনো তথ্য নজরে পড়ল, বা শিশু যেমন চিড়িয়াখানায় নূতন কোনো জীব দেখে বিস্মিত হয়; কে, ডি, গুপ্তর বীতরাগ আর তাচ্ছিল্য প্রকাশের এই প্রচলিত রীতি। 'উইল এনি অফ ইউ, প্লীজ—'

অনুরোধের ছদ্মবেশে চাপা আদেশ। সেরা ছাত্র বিজনবিহারী উঠে জানালা বন্ধ করে দিল।

'থ্যাংকস!'

অমিয় বসে পড়ল। জানুয়ারী মাসের কড়া ঠাণ্ডায় তার মনে হল পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালটা মুছতে পারলে ভাল লাগত!

কালিদাস গুপ্ত দাঁড়িয়েই বক্তৃতা করেন, চেয়ারে বসে হাত নাড়া এবং কাঁধের ভঙ্গি করার বিস্তর অসুবিধা। ভুঁড়ের তলায় হাত ঢুকিয়ে নিখুঁত-ভাঁজ-করা সাদা রুমাল বার করে প্রায় নিঃশব্দে নাক পরিষ্কার করলেন কে, ডি, রুমাল ঢুকিয়ে রাখলেন কোটের হাতায়।

রথীন অমিয়র কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, 'এবারে শুরু হবে, মাও, দেন!'

'মাও, দেন—' কে, ডি, গুপ্ত থামলেন, একবার তাকিয়ে নিলেন ক্লাশের শেষ পর্যন্ত, আর একবার বন্ধ জানালাটার দিকে, 'ইয়েস্, ইট্ ওয়াজ এ্যাবাউট দি ডেফিনিশন অফ্ লজিক; দেয়ার আর মেনি,—ইউ টু, যদি নিতান্তই কথা বলার প্রয়োজন থাকে, ক্লাশের বাইরে গিয়ে কথা সেরে আসতে পার'

চুপচাপ।

'আর্ণল্ড বলেন, লজিক ইজ দি সায়ান্স অফ্ আনডারস্ট্যাণ্ডিং ইন দি পারস্যুট অফ ট্রুথ।'

অমিয় দাঁড়াল; 'হোয়াট ইজ ট্রুথ?'

ঘুলঘুলি দিয়ে একটা চড়াই পাখি উড়ে এল। এত লোক, এক ফোঁটা শব্দ নেই! ফুড়ুক করে উড়ে পালাল চড়াই। আর কেউ দেখুক বা না দেখুক, অমিয় দেখল। বাইরে আকাশ! নীল আকাশ! আহা! অবারিত, মুক্ত আকাশ!

'সী-ডাউন!' হয়ত অনেক জোরে চীৎকার করবার ইচ্ছা ছিল কে, ডি-র, কিন্তু ওর চাইতে গলা আর উঠল না।

'আই ওয়াণ্ট এ্যান আন্‌সার!' মুক্ত আকাশের জোর অমিয়র গলায়।

কে, ডি, গুপ্ত কাঁপতে লাগলেন, রুমাল বার করতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। 'ডোণ্ট বি এ ফুল!' এমন বেসামাল গলা আজ পর্যন্ত কোনো ছাত্র দেখবার সুযোগ পায়নি, 'দেয়ার আর মেনি ট্রুথ্‌স, ফর ইন্‌স্টান্স দি সান রাইজেস্—'

'নিজি!' অমিয় বলল, 'দি সান উইল নট রাইজ সাম ডে!'

রাগ সামলাতে হল কে, ডি-কে: না, তিনি ফাঁদে পা বাড়াবেন না, 'মানেটা কি হে?'

'মানেটা সোজা, মানেটা হল সূর্য একদিন উঠবে না, অর্থাৎ সূর্য একদিন নিবে যাবে; যেমন এ-পৃথিবীটাও কয়েক কোটি বছর আগে ছিল একটি খুদে সূর্য; আজ নিবে গেছে, তেমনি সূর্যেরও একদিন মৃত্যু ঘটবে!' অমিয়র গলাটা ধারালো আর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে; 'তাহলে দাঁড়ালো, এ-পৃথিবীতে কিছুই সত্যি নয়!'

কে, ডি-র মুখ দেখে মনে হল উত্তর খুঁজছেন। আর ছেলেরা খুশী। কেমন মুখের উপর জবাব! আর—ঐ মুখ-চোরা ছেলেটি ত কম নয়!

কানের একটা ছোট্ট ভঙ্গিতে বোঝা গেল কালিদাস গুপ্ত কিছু সার-কথা বলবেন। কিন্তু তার আগেই অমিয়র বক্তব্য শোনা গেল: 'কিন্তু একটা সত্যি আছে: সেটা হচ্ছে: টু-ডে ইউ এক্‌জিস্ট, টু-মরো ইউ ডোণ্ট।'

কে, ডি, আর সহ্য করতে পারলেন না, 'জাস্ট হোয়াট্ ডু উই মিন বাই দ্যাট্?'

'ইজি! আজ আপনি আছেন, কাল থাকবেন না, কাল আপনি মরবেন। আর এটাই হচ্ছে এ-পৃথিবীতে পরম সত্যি, আর একমাত্র সত্য!' প্রখর আর সংশয়হীন গলার শব্দটা ক্লাশের শেষ ছাত্রটি পর্যন্ত শুনতে পেল।

রথীন যোগ করে দিল, 'ইয়েস্, ক্যারেক্ট!' ওর গলাটা আরও উঁচু।

এই প্রথম। হ্যাঁ, কে, ডি, জি-র অধ্যাপনার ইতিহাসে এই প্রথম প্রতিবাদ, প্রথম সীমাহীন ঔদ্ধত্য! আর এই কান দুটি উষ্ণ হয়ে ওঠা! রক্তের এই আকুলী! মাথার কুয়াশায় কথা হারিয়ে যাওয়া! বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল ওঁর কিছু কথা, কোনো একটা কথা বলতে! 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, অমিয়;' এটা সন্ধির গলা: তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন, কিন্তু এই সব অর্বাচীন ছেলে। 'জীবন আর মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কি জান হে?' যেন তিরস্কার, যেন তাচ্ছিল্য।

'জানি', বলল অমিয়, 'যেটুকু জানবার, সেটুকু জানি; আপনি জন্মেছেন অন্যের যন্ত্রণায়, মরবেন নিজের যন্ত্রণায়, আমিও তাই, আমাদের প্রত্যেকেই তাই!' মুখ ঘুরিয়ে নিল সে চারদিকে; 'প্রথম যন্ত্রণা অন্যের, দ্বিতীয় যন্ত্রণা আমার, সেই শেষ দিন, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত! সেই ভয়ের হাত থেকে আমার আপনার পরিত্রাণ নেই, সেতুর অন্য প্রান্তে কালো মৃত্যু হাত বাড়িয়ে আছে!' সার্জের পাঞ্জাবির হাতায় কপাল মুছল সে, তার যে গলাটা কাঁপছে, এটা প্রায় সবাই বুঝতে পারল; ওর গলার শব্দ আর চোখের দৃষ্টি কে, ডি-র বুদ্ধি আর অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করল খানিকটা! কে একজন চাপা-গলায় বলল, 'বেশ জমালো দেখছি!'

বন্ধ জানালাটার দিকে তাকালেন কালিদাস, বন্ধ ঘরে হয়ত এবারে একটু অস্বস্তি লাগছে!

'আর—জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে যত অর্থহীন জিজ্ঞাসা', অমিয়র গলাটা

চীৎকারের মত শোনালো, 'মৃত্যুকে ভুলে থাকবার যত অপদার্থ দর্শন।'

সেই মৌমাছি-গুঞ্জন, আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল।

বইগুলি পর্যন্ত নিতে ভুলে গেলেন প্রফেসর গুপ্ত, চাদরের প্রান্ত কাগজের কুমিরের মত লুটিয়ে চলে গেল তাঁর পিছনে।

ঘষা-কাঁচের উপর লেখা : ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। লিফ্‌ট ওঠানামা করছিল, অমিয় ব্যবহার করেনি; লম্বা করিডোর; আরও দু'একটি অফিস। আর একবার তাকাল, সে অক্ষরগুলির দিকে; দরজার পাশেই টুলের উপর বেয়ারাটা ঝিমুচ্ছে, খাকী কোটের উপর লাল সুতোর মনোগ্রাম টি, কে, এম, সারা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দরজাটা একটু বেশি জোর দিয়েই ঠেলল অমিয়।

রেক্সিন-মোড়া প্রশস্ত টেবিলের উপর স্তূপীকৃত কাগজপত্র, দুটো টেলিফোন, আধা ডজন ফাউন্টেনপেন, বড় কাঁসার বাটির মত এ্যাসট্রে, আধ-পোড়া চুরুট আর পোড়া-কাঠির খেলাঘর।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাপস মুখার্জী কলম থামিয়ে তাকাল, 'ও, এসো! বাড়িতে কথা বলবার আর উৎসাহ থাকে না, আর—কাজকর্ম এত বেড়ে গেছে!'

অমিয় এগিয়ে এল, বড় ঘরটার চারদিকে তাকাল : প্রশস্ত, কিন্তু তবু কেমন যেন বন্ধ চারদিকে, বন্ধ জানালার উপর খসখস ঝুলছে, জল-ছিটানো খসখস, মৃদু, অস্পষ্ট গন্ধ! বাইরে থেকে অনেক বেশি ঠান্ডা, পাখা ঘুরছে, আস্তে! তবু—অমিয়র নিঃশ্বাসটা কেমন যেন ভারি হয়ে আসছে!

'বোস!'

অমিয় বসল চেয়ারে।

টেলিফোন কল্। সংক্ষিপ্ত, মৃদু কথার আদান-প্রদান। ক্লিক!

'খাবে কিছু, ঠান্ডা?'

অমিয় মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা ছিল আমার,', সেল-এর চশমাটা খুলে টেবিলে রাখল তাপস মুখার্জী, 'বোস, তোমার শরীর ভাল যাচ্ছে না কেন? তুমি কি কারণ খুঁজছ?'

অমিয় বলল; 'কেন, শরীর ত ভালই আছে।'

'না, ভাল নেই, অনেকদিন থেকেই তুমি রোগা হচ্ছ, তোমার মা-রও তাই বক্তব্য, আমাকে বলেছেন, কয়েকবার, এটা শুধুমাত্র পড়ার চাপ নয়। তোমার রেজাল্টটা, আমি ভেবেছিলাম, আরও ভাল হবে; তা—সে যাক, তাতে কিছু এসে যায় না; পরীক্ষার পর তোমাকে প্রস্তাব করেছিলাম, পুরী যাও, তুমি গেলে না; তারপর আরও যখন গরম পড়ল, বললাম, দার্জিলিং বেড়িয়ে এস, মা-কেও নিয়ে যাও, তুমি গেলে না। ব্যাপারটা কি? কিসে তুমি ভুগছ?'

হাসবার চেষ্টা করল অমিয়, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, বাবা।'

'না, ব্যস্ত হইনি, মনে হচ্ছে একজন ভাল ডাক্তারের কাছে—'

'না, তার কোনো দরকার নেই।'

'নেই? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আজ নয়, অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছে, তুমি কষ্ট পাচ্ছ, কোনো রকম কিছু—'

অমিয় মুখ নামাল, 'না, না, কিছুই নয়।'

বেয়ারা এল চিঠিপত্র নিয়ে, সই করতে হবে; পাশের ঘর থেকে অস্ফুট কথাবার্তা আর টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ! চিঠির ফাইল রেখে চলে গেল বেয়ারা।

'বি-এ পড়বে ত?'

কপাল থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে অমিয় বলল, 'আমার আর পড়তে ইচ্ছে করছে না বাবা!'

'বেশ ত! সামনের মাস থেকে তুমি এখানেই কাজ কর; আলাদা ঘর করে দেব তোমায়, বিজনেসটা ত তোমাকেই দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত! একটা কাজ নিয়ে থাকলে, দেখবে, ভাল লাগছে; সুরেনবাবুকে বলব, একটু একটু করে সব শিখিয়ে বুঝিয়ে দেবে; এখন হাত-খরচ বাবত, ধর, দুশ পাবে; কলেজ ছাড়লেও, পড়া তুমি ছাড়বে না, সে আমি জানি, কেননা ও নেশাটা অন্য সব নেশার চাইতে তীব্র; কিন্তু আমি চাই, তুমি বিয়ে কর, চাই মানে—আমার এটা ইচ্ছা, আর কয়েকমাস পরে তুমি উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পড়বে, আমি এমন বয়সে বিয়ের পক্ষপাতি, ফ্রাসট্রেশন শুরু হবার আগেই, অবশ্য তাড়াহুড়োর কিছু নেই; জানি না কি নিয়ে তুমি চিন্তা করছ—যদি আদৌ কিছু একটা নিয়ে মন তোমার ব্যস্ত থাকে, তোমার মনে নূতন একটা চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য—সামথিং প্লেজ্যান্ট এ্যান্ড ইনটারেস্টিং, কোথায় যাবে এখন? চল, কোনো ঠান্ডা জায়গায় গিয়ে ঠান্ডা কফি খাওয়া যাক, বা আর কিছু?'

ঠান্ডা ঘর? মানে বন্ধ ঘর। 'আমি এখন বাড়ি যাই, বাবা!'

'বাড়ি যাবে? একটু ঘোরাঘুরি করলে ভাল লাগত তোমার, সব সময়েই ত ঘরে বসে থাক; কি তোমার দরকার জান, অমিয়? প্রচুর হাওয়া আর প্রচুর খাদ্য! আচ্ছা, যাও, লিফ্‌ট ব্যবহার কোরো, আর হীরা সিংকে বললে পৌঁছে দিতে!'

সিঁড়ির কাছে পৌঁছবার আগেই উপর থেকে লিফ্‌ট এসে থামল; দু'জন লোক দাঁড়িয়েছিল তারা ঢুকল লিফ্‌টে; দরজাটা বন্ধ হবার একটা শব্দ হল, অমিয়র হৃদপিণ্ডে প্রতিধ্বনিত হল সে-শব্দ! লোহার খাঁচার মধ্যে পাঁচজন লোক; খাঁচা নয়, কফিন, কবরের যাত্রা! লিফ্‌ট আর দেখা গেল না; হাত বাড়িয়ে দেওয়ালে ভর দিল অমিয়, চোখ বন্ধ করল।

ফেয়ারলী প্লেস-এর ফুটপাতে চামড়া-ঝলসানো রোদ, অমিয় উপরে তাকাল, নীল আকাশ; আর—একটা দমকা হাওয়া এসে কপালটা ছুঁয়ে গেল; নিঃশ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে এল অমিয়র।

ঘরের মধ্যে ঘর; পার্টিশনের দরুণ জানালাটাও ভাগ হয়ে গেছে; ভাগ-করা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অমিয়; মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান, আবার দেওয়াল, ঘরের মধ্যে ঘর, ছোট ঘরে সাড়ে-পাঁচ-ফুট মানুষ, দেহের খাঁচায় অস্থির হৃদ-পিণ্ড! বাঁ-হাতটা বুকের কাছে তুলে ধরল অমিয়! রক্ত ছুঁড়ে দেওয়া নয়, বন্ধন থেকে মুক্তির কাকুতি! এখানে, এই অফিস-ঘরে অর্ধেক জানালা, অর্ধেক জানালা, কিন্তু অনেক বড় আকাশের দিগন্ত ইশারা। এমন একটি রাত্রি কি আসবে না? স্বপ্নহীন রাত্রি? 'অমি, তোর খাটটা আমার ঘরে নিয়ে আসতে বলছি! তুই আমার কাছে শুবি, আজ থেকে!'

'কেন মা?'

'রাত্রে স্বপ্ন দেখে গোঁ গোঁ করিস, আমার ভয় করে, এ-ঘরেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এত বয়স হল, এখনও তোর স্বপ্ন দেখার বাতিক গেল না?'

'স্বপ্ন কি কেউ ইচ্ছে করে দেখে, মা?'

'সারাদিন চুপচাপ বসে তুই কি এত ভাবিস? ভাবলেই ত মাথা গরম হয়!'

'ভাবি কোথায়? বই পড়ি, দেখ না?' অমিয় একটুখানি হেসেছিল।

'দেখি, বইটা শুধু খুলেই রাখিস চোখের সামনে, মন ঘুরে বেড়ায় কোন্ রাজ্যে কে জানে?'

মা-র চোখ এড়াবার জন্যই অফিসে পালিয়ে আসে অমিয়। বুঝে নিয়েছে সব, কাজ শিখেছে; আট মাসের মধ্যেই সে একজন জুনীয়র ডাইরেক্টর; টেবিলে যখন বসে, দৈত্যের মত কাজ করে, অফিসের কর্মচারীরা অবাক হয়ে গিয়েছে : এত অল্প বয়সে এমন বুদ্ধি আর এমন উদ্যম। কিছু লম্বা হয়েছে, আর কিছু রোগা; গোঁফ কামায় না; সুকুমার মুখে ঐ-টুকুই যা প্রবীণতার ছাপ; কাজ করবার সময় শান্ত চোখ দুটি জ্বলতে থাকে, যত অস্থিরতা, যত

উন্মাদনা, শরীরের শক্তি নয়, শিরার শক্তি! তারপর অর্ধেক জানালা, আর অনন্ত আকাশ; সেই উ'চানো কাঁধ আর নেই, নিস্পন্দ হাতদ্যুটি ঝুলছে, আর শূন্য দৃষ্টির অন্তরালে, মনের গহনে শৃঙ্খলিত জীবন-পাখির ডানা-ঝাপ-টানি! বারে বারে নিঃশ্বাসটা ভারি হয়ে আসে। 'আমি, আমার কথা শুনবি, বাবা?'

'কি মা?'

'বিপিনবাবুর মেয়েকে বিয়ে কর্; আমি ত দেখেছি সে-মেয়েকে! এবারে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে! বিয়ে কর্, আমি বলছি—তোর আর একা থাকা চলবে না!'

'একা? তুমি নেই?'

'আছি, অনেক দূরে; দেখ্, হয়ত কথা বলবার লোক পাবি, হয়ত বন্ধু পাবি, হয়ত মনের কথা খুলে বলবার কারুকে দরকার তোর, বুঝতে পারছি না কিছু, কিন্তু এমনভাবে জীবনধারণ করা তোর চলবে না, তুই কথা দে!'

অমিয় চেয়ারে এসে বসল; বুঝতে পারল : সে হাসছে। কিছু খাবার আনালে হয়, দুপুরবেলা তার খাবার অভ্যাস নেই, কেমন যেন ক্ষিধে পাচ্ছে, কলিং-বেলে আস্তে একটা চাপড় মারল সে!

মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে অমিয়র ঘরটা দেখা যেত, ওকে সবসময়ে দেখা না গেলেও তার সান্নিধ্যটা উপলব্ধি করত স্নেহলতা; খোলা দরজার দরুণ, এমন কি রাত্রেও, ঘুমের ঘোরে অমিয়কে যেন কাছেই অনুভব করত সে। আর আজ, অনেক রাত্রি এখন, দু'তিন দিনের হৈচৈ আর বিশৃঙ্খলার পর তাপস মুখার্জী ঘুমে অচৈতন্য, দরজাটা যে কে বন্ধ করল টের পেল না স্নেহলতা; পর্দা, ঝুলছিল, পাখার হাওয়ায় দুলছিল পর্দা, নরম, নীল আলো এসে পড়ছিল স্নেহ-লতার ঘরে। অন্ধকার ঘর, অনেক পরিশ্রম আর ক্লান্তির পর সমস্ত পেশী যেন ঘুমেরই প্রার্থনা করছিল, কিন্তু চোখ বুজে পড়েই রইল স্নেহলতা। বন্ধ চোখের নিচে ঘন অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে অতি-কাতর অতি-সজীব সন্তান-সঙ্গহারা একটি মনের নিঃশব্দ ক্রন্দন!

আর—বন্ধ দরজার এ-পাশে :

নীল-ধোয়া ঘর, জোড়া-খাটে নূতন বিছানা, মেহগনী পালিশ আর কাপড়ের ঘ্রাণ। নূতন বৌ হাত বাড়িয়ে পাখার পয়েন্ট বাড়িয়ে দিল, ড্রেসিং টেবিলের দেরাজের উপর স্তূপীকৃত নূতন বই, সবই বাংলা, দুটি ইংরেজী : ডিভাইন কমেডি আর ওয়ার এ্যান্ড পীস্। অমিয় ওয়ার এ্যান্ড পীস তুলে নিল। মনে মনে কেমন যেন হালকা বোধ করছিল সে, আর—কেমন যেন অতি-মৃদু চাঞ্চল্য, বিকাশের, বিস্তৃতির চাঞ্চল্য! শিয়রে লম্বা স্ট্যান্ডে নীল বাল্‌ব জ্বলছিল; পড়া যায়; আধ-শোয়া অবস্থায় বই খুলল সে; অমিয় পড়েছে : বিশ্ব-সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যত উপন্যাস রচিত হয়েছে আজও এটি শ্রেষ্ঠ, নায়ক-হীন উপন্যাস, নায়কত্বে বিশ্বাস করতেন না টলস্টয়। বই-এর উপর চোখ রেখে কথাগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগল অমিয়, অজ্ঞাতে সংশয় দূরে হল তার : তোমার যদি ইগো না থাকে—তবে কিসের কষ্ট তোমার? কিসের সমস্যা আর দুঃখ? দূরের মানুষ আর পথের মানুষের সঙ্গে আজ এই প্রথম মুহূর্তে একান্ত বোধ করতে লাগল সে, খোলসের নায়কত্ব পরি-হার করে অবজ্ঞাত মনটা পথের ধুলোয় এসে নিস্কৃতি পেল যেন! বইটা বন্ধ করল সে! 'এখানে আসবে?'

গলার স্বরে নিজেই বিস্মিত হল সে। তবু মনে হল : এ যেন মুক্তির আহ্বান, ব্যাপ্তি আর বিলুপ্তির আহ্বান!

'বনছায়া! বেশ ত নাম তোমার, কেমন যেন একটা সান্ত্বনা জড়িয়ে আছে তোমার নামের সঙ্গে! বোসো না।'

পাখার হাওয়ায় মশারির ঝালর কাঁপছে, নীল আলো, ওয়ার এ্যান্ড পীস, হেদার-কোটি-ক্যান্থারাইডিন, আর অস্পষ্ট দুটির গলার শব্দ! একতলায় দেওয়াল-ঘড়িতে দুটো বাজল।

'ঘুম পাচ্ছে, না? অনেক বকালাম তোমায় মানা কোরো।'

'বাতি নিবিয়ে দেবো?'

'দাও।' বইটা সরিয়ে রাখল অমিয়!

বনছায়ার সান্ত্বনা তার পাশে; জানালার বাইরে ইস্পাত-নীল আকাশ, মিনিট কয়েক লাগল তার ঘুম আসতে!

প্রকান্ড সাদা ডিম। পোকাটা আশ্চর্য উপায়ে ডিমের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ডিমের মধ্যে ঘোলা জল, তার মধ্যে পোকাটা সাঁতার কাটছে, পা বাড়িয়ে, পাখা মেলে! পোকাটা পোকা নয়, অমিয়! অমিয় সাঁতার কাটছে, হাত-পা নাড়ছে, হাবুডুবু খাচ্ছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার; চোখ খোলা; কোন্ দিকে যাবে সে? বন্ধ! সাদা খোলস, মসৃণ, সাদা দেওয়ালের মত, বার বার হাত পিছলে যাচ্ছে তার, কোথাও এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই। অমিয় চীৎকার করে উঠল, কেউ শুনতে পেল না সে চীৎকার, কেউ কোথাও নেই, বারে বারে চীৎকার করতে লাগল সে, আর সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না—

'এই! এই শোনো, শোনো! এই!'

অমিয় চোখ খুলল; বনছায়া প্রায় তার বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে! 'আলোটা জ্বালব?'

'না!'

'খারাপ স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি? কপালটা ঘেমে গেছে তোমার!' বনছায়া আঁচল দিয়ে তার কপাল আর ঘাড় মুছে দিল।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়, ও কিছু নয়!'

বনছায়া বিছানায় গা এলিয়ে দিল, কাঁধের সঙ্গে কাঁধ ঠেকিয়ে।

অন্ধকার আর তেমন অন্ধকার নয়! বনছায়ার শান্ত, গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অমিয়। কিন্তু এই স্বপ্ন! এই শ্বাসরুদ্ধকর স্বপ্ন! যে-স্বপ্নে মৃত্যুর ইশারা!

তবু—তবু সে জানে, এই স্বপ্নের জন্য সমস্ত স্নায়ু তার উন্মুখ হয়ে থাকে, উদ্যত বন্দুকের ট্রিগারের মত, সেই শব্দের মত, সেই মৃত্যুর মত! কোথায় একটা লুকানো বিশ্বাস তার মনের গহনে সূর্য-খণ্ডিত ছায়ার মত আসা-যাওয়া করছে, অবিরাম, অন্ত-হীন। কে জানে, এই স্বপ্নই একদিন মুক্তি দেবে তাকে, আকাশ নয়, বাতাস নয়, কেন জানি বার বার মনে হয়, হয়ত, এমন আসা তার শেষ অবলম্বন, শেষ অদৃশ্য পথের সন্ধান!

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল বনছায়া; একটা হাত রাখল অমিয়র বুকের উপর, তার কাঁধের প্রান্তটা ডুবে রইল বনছায়ার স্বল্পাবৃত বুকের মধ্যে!

কোথায় সেই স্বপ্ন, স্বপ্ন হারিয়ে গেল আশ্চর্য এক বাঁশীর সুরে, রক্তের বাঁশী! মুক্তির সুর, যন্ত্রণা-নিরসনের সুর! অমিয় আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, হাত রাখল বনছায়ার পিঠে। বনছায়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল! একটি মুহূর্ত! সে আরও সরে এল অমিয়র কাছে!

আকর্ষণের তীব্রতায় ক্ষণেকের জন্য বনছায়া বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল; প্রথম রাত্রি, হয়ত তার মনে এতটা প্রস্তুতিও ছিল না, আর—এই কৃশকায় লোকটির এতখানি উন্মত্ততা অনুভব করে ভয় পেল সে, নিঃশ্বাসটা কখন নিতান্তই ক্লেশকর হয়ে উঠেছে। ঠোঁট কামড়ে ধরল বনছায়া।

অমিয়র সব কটা সরু আঙুল বন-ছায়ার গলার মধ্যে প্রায় ডুবে গেল।

চীৎকার করে উঠল বনছায়া, গলা থেকে অমিয়র হাত সরাতে শরীরের সব-টুকু জোর লাগল তার! খাট থেকে প্রায় লাফ মেরে মাটিতে নামল সে, ক্ষিপ্র হাতে জামা গায়ে দিল, শাড়ি জড়াল, আঁচল তুলল মাথায়, তারপর দরজা খুলে সে এল স্নেহলতার ঘরে!

'কে ?'

অস্পষ্ট কান্নার শব্দ।

'কে ?'

'আমার সংগে চল অমিয়!'

'কোথায় বাবা ?'

'ডাক্তার তরফদার, আমি এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট করেছি, শহরের সেরা ডাক্তার, অক-

আকর্ষণের তীব্রতায়... বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল

পটে তোমার মনের সব কথা খুলে বোলো; তুমি কষ্ট পাচ্ছ, অন্যকে কষ্ট দিচ্ছ, আমার অনেক আগেই উচিত ছিল তোমাকে ডাক্তার দেখানো, তোমার কি উচিত নয় সুস্থ হয়ে ওঠা?'

জামাটা গায়ে দিল অমিয়, নিঃশব্দে!

গাড়িতে, সারা পথ, একটি কথা বলল না অমিয়!

বাড়িতে ঢোকবার আগে পিতলের ফলকে নামটা চোখে পড়ল অমিয়র, ডাঃ এন. এন. তরফদার, অনেকগুলি উপাধি। নিচে ছোট অক্ষরে লেখা মেণ্ট্যাল ডিজিস্ স্পেশালিস্ট! এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠল সে।

ঘরে ঢুকেই অমিয়র মনে হল আলোর অভাব, দরজায় পুরু পর্দা, জানালায়ও তাই। প্রৌঢ়, ছোটখাটো লোকটি মুখ তুলে বলল, 'আসুন।'

'এই আমার ছেলে অমিয়! টেলি-ফোনে যতটুকু আমি জেনেছি, দেখেছি, বলেছি সব, আমি কি বাইরে অপেক্ষা করব ?'

'হ্যাঁ।'

তাপস মুখার্জী বাইরে গেলে ডাক্তার তাকে পাশের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বোসো!

অমিয় বসল চেয়ারে, তাকিয়ে রইল ডাক্তারের মুখের দিকে; পুরু গোঁফ, পুরু চোখের ভ্রূ, কেমন যেন নির্ভর-যোগ্য চেহারা!

'বেশ সহজ হয়ে বোসো, তারপর বলো কি তোমার ট্রাবল্স্।'

'নো ট্রাবল্স্!' একটু উদ্ধত গলায় উত্তর দিল অমিয়।

'আই সী! আচ্ছা, তোমার স্বপ্নের কথা বলো। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আমি ডাক্তার, কাস-টোডিয়ান অফ ইয়োর সিক্রেটস কোনো সংকোচ কোরো না, তোমার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে কোনো এক স্বপ্নের কবলে পড়েছ তুমি, কোনো এক সূক্ষ্ম অথচ কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্ব; আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি! কোনো এক স্বপ্ন জড়িয়ে আছে তোমার সংস্কারের সংগে, তোমার রক্তের সংগে,—সেই স্বপ্নই হচ্ছে তোমার কমপ্লেক্স, এর প্রতিক্রিয়া তোমার জীবন ছাড়িয়ে—আচ্ছা তুমি বল, কোনো সংকোচ বা দ্বিধা কোরো না।' ডাক্তার থামলেন, ও'র কথাগুলি সারা ঘরে বিশ্বাস ছড়িয়ে দিল।

'হ্যাঁ, স্বপ্ন!' বেশ খানিকটা সময় নিয়ে বলল অমিয়, গলাটা কাঁপল তার, 'কিন্তু তারও আগে বলি : হঠাৎ, মাঝে মাঝে মনে হয় নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, দম আটকে আসছে; খোলা চারিদিক, তবু মনে হয় হাওয়া নেই, তবু মনে হয়—'

পুরো এক ঘণ্টা নিল অমিয় তার কথা শেষ করতে, শেষের দিকে বাক-রোধ হল তার, টেবিলের উপর ভেঙে পড়ল সে; ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগল দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে! ডাক্তার বাধা দিলেন না, একটি কথা বললেন না; অমিয় তার জীবনের কান্না শেষ করে মুখ তুলল, কান্নায় যে এত তৃপ্তি, এত গভীর সুখ সে কোনোদিন জানতে পারে নি। 'সেদিন যদি বনছায়া বাধা না দিত,—তা হলে—তাহলে জানি না, কি হত! আমি আমারই মৃত্যু চেয়েছিলাম,' খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল অমিয়।

'শোন! এই স্বপ্ন! এটা তোমার মনের একটা অবসেশন, একটা বদ্ধমূল ধারণা বা চেতন-অনুভূতি! ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একটা চেতনা তার মনে বাসা বাঁধে, জরায়ুর মধ্যে ঘুমন্ত শিশুর মনেও হয়ত এমন এক চেতনা থাকে, মুক্ত হবার, মুক্তি পাবার চেতনা, বলা যায় না জোর করে কিছু, কিন্তু তা থেকেই হঠাৎ কখনো কখনো মনে হয় চারিদিকে বন্ধ হয়ে আসছে, অন্ধকার আলোবাতাসহীন গহ্বরে যেন তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু চেয়ে দেখ, চারিদিকে খোলা!' ডাক্তার উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে দিলেন, আবার ফিরে এলেন চেয়ারে। 'এই ঘর, এই দেওয়াল চারিদিকে, শুধু শুধু খোলা, চারদিক খোলা—ভাববে আকাশের কথা, উন্মুক্ত আকাশের কথা! মৃত্যুর কথা বলছিলে? কফিন? কিন্তু খোলা আকাশে কবেই ত তার মুক্তি ঘটে গেছে!' সেই বিশ্বাসের গলা, আত্ম-প্রত্যয়ের গলা! ডাক্তার কথা বলে চলেছেন।

অমিয়র চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

'এরও একটা নাম আছে, কি জান? একে বলে ক্লস্ট্রোফোবিয়া এই বন্ধ জায়গায় শ্বাসরোধ হয়ে আসছে—এমন চিন্তা! এমন কাঁদবারই তোমার প্রয়োজন ছিল, এসো না, বাইরে দেখবে, এস, কোথাও বন্ধ নেই, সব খোলা, সব খোলা!' ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন বন্ধ দরজাটার দিকে, দু'হাতে দরজাটা খুলে ফেললেন, 'কই, কোথায় বন্ধ? দেখ, সব খোলা!'

অমিয় সোজা হয়ে দাঁড়াল, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারল, অতি সহজে, অতি স্বচ্ছন্দে।

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

উড়িষ্যার মন্দির

রচনা ঃ প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্প-স্থাপত্যে উড়িষ্যার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শিল্প ও কলাক্ষেত্রে পূর্ব-ভারতের এই রাজ্যটি যে কতখানি উন্নত হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় রয়েছে এর নামের মধ্যেই। কলাশিল্পে উৎকর্ষ লাভ করেছিল বলেই এই দেশের নাম রাখা হয়েছিল "উৎকল"। ভৌগোলিক অবস্থানের অনুকূলতার ফলে উত্তর ও দক্ষিণের সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল উড়িষ্যা। প্রাচীন যুগে উড়িষ্যার শিল্পচেতনার প্রকাশ হয়েছিল প্রধানতঃ দু'টি ক্ষেত্রে—স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে। তবে শিল্পের এ দুটি ক্ষেত্রে পৃথক নিদর্শন উড়িষ্যায় বিশেষ পাওয়া যায় না—এ দু'য়ের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছিল মন্দির-শিল্প। উড়িষ্যার মন্দিরশিল্প ভারতের গৌরব।

উড়িষ্যার মন্দির-নির্মাণে বিবিধ স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটলেও এখানকার স্থাপত্যশিল্পের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতীয় আর্য স্থাপত্য-রীতির সর্বোত্তম অকৃত্রিম পরিচয় মেলে এখানে।

উড়িষ্যার শিল্প-সমৃদ্ধির ইতিহাস খুঁজতে হলে ফিরে যেতে হবে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। উড়িষ্যা তখন পরিচিত ছিল কলিঙ্গভূমি নামে। উড়িষ্যার শিল্পী বাটালির ঘায়ে হাতুড়ির আঘাতে পাহাড়ের বুকে যে অনুপম শিল্পসৃষ্টি করে গেছে তার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে পরবর্তীকালে। এতেই প্রমাণিত হয় সে যুগের শিল্পীরা পাথরের ওপর খোদাই করার কাজে কত দক্ষ ছিল।

গুরুত্বের দিক থেকে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহা-মন্দিরগুলির। খৃস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের এই নিদর্শনগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায় সে যুগেও শিল্পকলার ক্ষেত্রে উড়িষ্যা বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জোড়া পাহাড় কেটে নির্মিত হয়েছিল এই গুহা-মন্দিরগুলি। গুহার সংখ্যা অনেক। এগুলির স্থাপত্য বিস্ময়কর। ভাস্কর্যের নিদর্শনও মেলে গুহাগুলিতে। মানুষের মূর্তির সঙ্গে এখানে বৃক্ষ-লতাদি ও প্রাণীমূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। জৈন সাধুদেরই আবাস ছিল এই গুহাগুলি। জৈনশিল্পের এরূপ প্রাচীন নিদর্শন ভারতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের স্বর্ণযুগ হল ভৌম রাজাদের রাজত্বকাল ও তাদের উত্তরাধিকারী সোমাকুলি কেশরী রাজাদের আমল। ভৌম রাজাদের শাসনকাল মোটামুটি ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে তিনশ' বছর, আর তাদের উত্তরাধিকারীদের শাসনকাল ভৌমদের পর আরও দেড়শ' বছর।

ভৌম রাজাদের রাজধানী ছিল জাজপুর। তাই সে যুগে জাজপুর হয়ে উঠেছিল উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। কতগুলি মন্দির ও স্তূপ যে এখানে গড়ে উঠেছিল এখন আর তা জানা সম্ভব নয়, তবে এখানে-ওখানে ছড়ানো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় মন্দির ও স্তূপের সংখ্যা ছিল অগণিত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল তখন, এমন কি এই দুই ধর্মের পাশাপাশি অধিষ্ঠানও তখন আদৌ বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। জাজপুরের ২০ মাইল দক্ষিণে রত্নগিরি ও ললিতাগিরিকে বৌদ্ধশিল্পের রত্নখনি বলা চলে। স্থাপত্যের দিক থেকে এগুলি কতখানি উঁচে স্থান পেতে পারে তা বিতর্কের বিষয় হ'লেও এ সব জায়গায় যে দেবমূর্তি পাওয়া গেছে ভাস্কর্যের দিক থেকে তা অনুপম। দেবমূর্তিগুলির মধ্যে একটা প্রাণস্পন্দন, সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু জাজপুরে অথবা উক্ত গিরি-মন্দিরগুলির বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্য-নিদর্শনসমূহের কোনটিতেই স্থাপত্য-রীতির পূর্ণ স্ফুরণ হয়নি। তবে ভুবনেশ্বর, পুরী ও কোনারকের মন্দির স্থাপত্যের মধ্যে স্থাপত্যরীতির একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত রূপ দেখা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির-স্থাপত্যের যে রূপ-সুষমা লক্ষ্য করা যায় তা জগতে অভূতপূর্ব। ভুবনেশ্বরের মন্দির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে উড়িষ্যার মন্দির-শিল্প সম্পর্কে সাধারণ-ভাবে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে। এখানকার প্রতি মন্দিরগাত্রেই দেব-দেবীর অসংখ্য মূর্তি; তাছাড়া সাধারণ মানুষ, পশুপাখীর মূর্তিরও অভাব নেই।

মন্দিরগুলিতে মোটামুটি একই সাধারণ গঠন-রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এখানকার মন্দিরের দুটি অংশ। মন্দিরের প্রধান অংশটিকে বলা হয় "দেউল"। দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরে এর নাম "বিমান"। এরই ওপর নির্মিত হয় মন্দিরের শিখর বা চূড়াটি। বিমানের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ "গর্ভ-গৃহ" নামে অভিহিত। গর্ভগৃহের মধ্যেই থাকে দেবমূর্তি। দেউলের সম্মুখের অংশটিকে বলা হয় "অন্তরাল"। এটি গর্ভগৃহে প্রবেশের অলিন্দবিশেষ। এই 'অন্তরাল' একদিকে 'বিমান' ও অন্যদিকে 'জগমোহন'কে যুক্ত করেছে। জগমোহন "মণ্ডপ" নামেও অভিহিত। জগমোহন হ'ল সমাবেশ কক্ষ। বিমান, অন্তরাল ও জগমোহন—এই তিনের সমবায়ে মন্দিরের পূর্ণাঙ্গ রূপ। উড়িষ্যার মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে এই জগমোহন সাধারণতঃ চতুষ্কোণ আকৃতির এবং এর ছাদটি পিরামিডসদৃশ। উড়িষ্যার কোন কোন মন্দিরে দু'একটি মণ্ডপও আছে, যেমন, নাটমন্দির, ভোগ-মন্দির ইত্যাদি। জগমোহনের সম্মুখ-ভাগেই এগুলি নির্মিত দেখা যায়। তবে এগুলি মূল পরিকল্পনার অন্তর্গত নয়।

(২)

ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার মন্দিরনগরী। কিংবদন্তী আছে ভুবনেশ্বরে একটি হ্রদকে ঘিরেই নাকি এককালে গড়ে উঠেছিল সাত হাজার মন্দির। আজ আর সে সবের কোন চিহ্নই নেই। তবে এখনও

মুক্তেশ্বর মন্দির ফটো : অনু দাস

ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরশিল্প দেখতে হ'লে আসতে হবে ভুবনেশ্বরে। এখানকার মন্দিরগুলির সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভুবনেশ্বর অজস্র মন্দির বুকে ধরে রেখেছে, তন্মধ্যে লিঙ্গরাজ মন্দিরের মহিমাকীর্তন লোকের মুখে মুখে। বিশ্বখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির ভারতের গৌরব। ওড়িয়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-রীতির সর্বাধুনিক নিদর্শন মেলে লিঙ্গরাজ মন্দিরে।

লিঙ্গরাজ মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১০০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। অনেকের মতে ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এই লিঙ্গরাজ মন্দিরটি। এই মতের প্রধান পরিপোষক ফার্গুসন প্রমুখ পন্ডিতগণ। ফার্গুসন বলেছেন : "the finest example of a purely Hindu temple in India" দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সোমাকুলি কেশরীবংশের রাজারা উড়িষ্যায় শাসনক্ষমতা হাতে পান। প্রথম যুগের কেশরী রাজান্বয় মন্দির নির্মাণ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যযাতি কেশরী ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়! কেশরী রাজাদের আমলে নির্মিত অতি অল্প কয়েকটি মাত্র মন্দিরের অস্তিত্বই

পুরীর জগন্নাথদেবের প্রাঙ্গণ ফটো : [illegible]

মুক্তেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ তোরণ

ফটো ঃ সুজিত মিত্র

বজায় রয়েছে, তবে উজ্জ্বলতা ও জাঁকজমকের দিক থেকে লিঙ্গরাজ মন্দির অপর সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

দৈর্ঘ্যে ৫২০ ফুট ও প্রস্থে ৪৬৫ ফুট এক বিশাল আয়তন জায়গা জুড়ে প্রশান্ত গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিঙ্গরাজ মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক মন্দির উপনিবেশ। আরও ৬৫টি ছোটখাটো মন্দিরের সমাবেশ ঘটেছে এখানে। লিঙগরাজ মন্দিরের সুউচ্চ শিখরটি কয়েক মাইল দূরের দর্শকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর উচ্চতা ১২৭ ফুট। শিখরগাত্র সমতল নয়, উপর থেকে নীচে লম্বালম্বি কতকগুলি ভাগে বিভক্ত।

মূল পরিকল্পনায় লিঙ্গরাজ মন্দিরের একটি বিমান ও একটি জগমোহন ছিল। এই বিমানটি উড়িষ্যায় শ্রীমন্দির নামে অভিহিত ছিল। এই শ্রীমন্দিরেই ত্রিভুবনেশ্বরের মূর্তির অধিষ্ঠান। যিনি ত্রিভুবনেশ্বর তিনিই লিঙ্গরাজ। গর্ভগৃহ বা অন্তর্প্রকোষ্ঠে শিবের প্রতীক স্বয়ম্ভূলিঙ্গের অধিষ্ঠান। নাটমন্দির ও ভোগমন্দির সম্ভবতঃ এক শতাব্দী পরে নির্মিত হয়ে থাকবে, কিন্তু মূল

লিঙ্গরাজের মন্দির

ফটো ঃ সুজিত মিত্র

স্থাপত্য-রীতির সঙ্গে এগুলি সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই গড়ে উঠেছে। মন্দিরগুলির অভ্যন্তর ভাগ নিরলঙ্কার হলেও মন্দিরের বহির্গাত্রের শিল্পকর্ম উড়িষ্যার ভাস্কর্য-শিল্পের উৎকর্ষের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই চৌহদ্দির অন্যান্য মন্দিরগুলির মধ্যে ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, অনন্তবাসুদেব, পার্বতী, ভগবতী ও কেদারেশ্বরের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের পরই নাম করতে হয় রাজারানী মন্দিরের। লালপাথরে গড়া এই মন্দিরটি শিল্পসৌষ্ঠব ও কারুকার্যের দিক থেকে অনিন্দ্যসুন্দর। সম্ভবতঃ একাদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই কোন সময়ে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়ে থাকবে। যে লাল পাথর দিয়ে এই মন্দিরটি নির্মিত স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে 'রাজারানীয়া'। হয়ত বা এই থেকেই মন্দিরের নামকরণ হয়ে থাকবে। মন্দিরের দেয়ালগাত্রে ক্ষোদিত রয়েছে নানাবিধ ফুল, লতা-পাতা, গাছ, নারীমূর্তি—নানা বিচিত্র রূপে, নানা বিচিত্র ভঙ্গিমায়। নিছক মন্ডনশিল্পের উৎকর্ষের দিক থেকে রাজারানী মন্দির উড়িষ্যার অন্য সমস্ত মন্দিরকে অতিক্রম করে গেছে। মন্দির গাত্রের নারীমূর্তিগুলির মধ্যে এক দুর্লভ সামঞ্জস্যবোধ, প্রকাশের বলিষ্ঠতা ও পরিকল্পনার পবিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে এই মন্দিরে।

ভৌম রাজাদের শেষআমলের সৃষ্টি মুক্তেশ্বর মন্দির। কারও কারও মতে এটি তাদের উত্তরাধিকারী কেশরী রাজাদের প্রথম আমলের সৃষ্টি। মুক্তেশ্বর মন্দির আকারে ছোট হলেও ঐশ্বর্যে মহান। নয়নমনোহর এই মন্দিরটির একটিমাত্র তোরণ বৌদ্ধ-রীতিতে তৈরী। তোরণটির অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। পন্ডিতেরা মনে করেন, এই তোরণটি উচ্চতর শিল্পপ্রতিভা ও শিল্প-দক্ষতাসম্পন্ন কোন শিল্পীর রচনা।

ভারতীয় আর্য স্থাপত্যের একটি প্রাচীন নিদর্শন ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দির। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগের ওড়িয়া স্থাপত্যের এক রমণীয় দৃষ্টান্ত এই মন্দির। এটি নির্মিত হয়েছিল ৭৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। পাথরের বুকে শিব-পার্বতীর বিবাহ এক অতুলনীয় শিল্প-সৌন্দর্যের নিদর্শন।

আর একটি প্রাচীন মন্দির-শিল্পের নিদর্শন বৈতাল দেউল। অবশ্য গঠন-রীতিতে এর সঙ্গে পরশুরামেশ্বর মন্দিরের যথেষ্ট পার্থক্য। এই মন্দিরে যেমন দ্রাবিড়ীয় মন্দির-শিল্পের কিছুটা ছাপ রয়েছে, তেমনি এর স্থাপত্য-রীতিতে বৌদ্ধ চৈত্যেরও প্রভাব বিদ্যমান। ঐতিহাসিকদের মতে এর নির্মাণকাল সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দী। মন্দিরগাত্রে মহিষাসুরমর্দিনী, অর্ধ-নারীশ্বর প্রভৃতি মূর্তি ও অন্যান্য কারুকার্য সহজেই মনোহরণ করে।

৩

পুরীর জগন্নাথ মন্দির—মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লিঙ্গরাজ মন্দিরের অনেক পরে নির্মিত হলেও জগন্নাথ মন্দির ও লিঙ্গরাজ মন্দির মূলতঃ একই রীতিতে গঠিত। জগন্নাথ মন্দির সম্ভবতঃ ১১৩৫—৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি চারটি অংশে বিভক্ত—জগমোহন, দেউল, ভোগমন্দির ও নাটমন্দির। দেউলের ওপর মন্দিরের সুউচ্চ শিখর। ভোগ-মন্দির ও নাটমন্দির পরবর্তীকালে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। দৈর্ঘ্যে ৪৪০ ফুট ও প্রস্থে ৩৫০ ফুট এক বিশাল আয়তনের জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে জগন্নাথ মন্দির। এর চারপাশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এর নাম মেঘনাদ প্রাচীর।

দেউল বা পূজাকক্ষের মধ্যে রয়েছে তিনটি দেবদেবী মূর্তি—কৃষ্ণ, তাঁর ভাই বলভদ্র ও ভগ্নী সুভদ্রা। মন্দিরের প্রবেশপথে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কিছু কিছু ঘটনার চিত্র ক্ষোদিত রয়েছে। এর প্রবেশদ্বারে ও দেওয়ালগাত্রে দেখা যায় পাথরে খোদাই-করা সিংহ ও সান্ত্রী-মূর্তি।

প্রধান মন্দিরটির চারপাশে ছোট-বড় নানা ধরনের ত্রিশ-চল্লিশটি মন্দির অম্লানগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরকে কেন্দ্র করেও এই-রকম মন্দিরের সমাবেশ ঘটেছে, তবে পুরীর মন্দিরের সঙ্গে তার কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পুরীর মন্দিরের ক্ষেত্রে আশপাশের মন্দিরগুলির সমাবেশ হয়েছে মূল মন্দির অপেক্ষা উঁচু জমিতে; তাই বৌদ্ধ স্তূপের প্রভাবই যেন এগুলির ওপর বেশি বলে মনে হয়।

পুরীর মন্দিরের দেবমূর্তির প্রাচীনত্ব ও উদ্ভবের কথা আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। জগন্নাথদেবের মন্দির ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। আমরা এখানে "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থ থেকে আবুল ফজল বিবৃত কাহিনীটি উদ্ধৃত করছি : "এই মন্দিরে চারি হাজার বৎসরের পুরাতন চন্দনকাষ্ঠনির্মিত কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁহাদের ভগ্নী সুভদ্রার মূর্তি স্থাপিত আছে। কথিত আছে যে, নীলকর পর্বতের মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজধানী নির্মাণের জন্য কোন উৎকৃষ্ট স্থান নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে একজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ বহু অনুসন্ধানে এই স্থান মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁহার মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। এই স্থান স্থির করিবেন কি আরও অগ্রসর হইয়া অন্য কোন স্থান দেখিবেন, এই চিন্তা ব্রাহ্মণের মনে উদিত হয়। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, একটি কাক সমুদ্রে স্নান করিয়া উপরে উঠিয়া সমুদ্রকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিলেন। তিনি কাককে প্রণাম করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাক উত্তর করিল, 'আমি দেবাংশসম্ভূত, কোন এক মুনির অভিশাপে আমি এই কাকদেহ ধারণ করিয়াছি। এই স্থান পরম পবিত্র। যদি কেহ এখানে বাস করে এবং একান্তমনে ভগবানের আরাধনা করে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে। আমি বহুদিন হইতে এখানে বসিয়া আছি। আমার শাপাবসানের সময়ও আসিয়াছে। তোমার যদি ধর্মে মতি থাকে, তাহা হইলে এইস্থানে কিছুদিন অবস্থান কর, তাহা হইলে এই স্থানের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিবে।' কাকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সেই স্থানেই দিনকতক অবস্থান করিয়া স্থানমাহাত্ম্য দর্শন করিলেন। তৎপর রাজার নিকটে গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলে রাজা ঐ স্থানে এক বিশাল পুরী নির্মাণ করিলেন। রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন বলিতেছে, 'অমুক দিনে অমুক সময়ে সমুদ্রের তীরে বায়ান্ন ইঞ্চি লম্বা এবং দেড় হাত প্রশস্ত একখানি কাষ্ঠ ভাসিতে দেখিবে। সেই কাষ্ঠখন্ড তুলিয়া আনিয়া সাতদিন গৃহমধ্যে গোপনে রাখিও। এই সাতদিন পরে গৃহ খুলিয়া যে মূর্তি পাইবে, তাহাই মন্দিরে স্থাপিত করিয়া পূজা করিবে।' যথাসময়ে মূর্তি পাওয়া গেল। রাজা মহাসমারোহে দেবপ্রতিষ্ঠা করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সুলেমান গুরজানির সেনাপতি বিখ্যাত কালা-

পাহাড় উড়িষ্যা জয় করিয়া জগন্নাথের মূর্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু অগ্নি দেবমূর্তি দগ্ধ করিতে পারে না। পরে ঐ মূর্তি সাগরজলে নিক্ষেপ করেন। তৎপরে উড়িষ্যার রাজগণ পুনরায় সেই মূর্তি পান।" (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত)।

৪

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার ওড়িয়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষের অনন্যসাধারণ নিদর্শন কোনারকের সূর্যমন্দির। পুরী থেকে কুড়ি মাইল উত্তর-পূর্বে এক নিবিড় নির্জনতার মধ্যে আপন মহিমাগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে প্রশান্ত শিল্পশ্রী নিঃসঙ্গ এই সূর্যমন্দির। প্রায় সাত শ' বছরের পুরানো এই মন্দিরের সর্বাঙ্গে এখন জীর্ণতার ছাপ—মন্দিরের সুউচ্চ শিখরটি তার উচ্চতার অনেকখানিই এখন হারিয়ে ফেলেছে; মূল মন্দিরটি যাকে 'বিমান' বলে, অর্থাৎ যেখানে বিগ্রহের অধিষ্ঠান, তা এখন কাল-কবলিত, আর যা দেখে এখন তাবৎ বিশ্ব বিস্ময়বিমুগ্ধ তা হ'ল 'জগমোহন', অর্থাৎ মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশ প্রাঙ্গণ, যেখানে জনসাধারণ বিগ্রহ দর্শন মানসে সমবেত হ'ত। কালের করালগ্রাস কাটিয়ে উঠে এই জগমোহন আজও মূল মন্দিরের অতীত গৌরবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই মন্দিরের কথা বলতে গিয়ে অকপটে স্বীকার করেছেন : "এমন উৎকৃষ্ট কারুকার্য আর কোন মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় না।" (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ থেকে) আবুল ফজল এখানেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরও বলেছেন : "রাজা নরসিংহদেব ইহা নির্মাণ করিয়া অতুল গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন।"

মন্দিরটির নির্মাতা গঙ্গারাজ বংশের রাজা নরসিংহদেব। নরসিংহদেবের রাজত্বকাল ১২৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ১২৫০ থেকে ১২৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কোনারক মন্দির নির্মিত হয়ে থাকবে। এই মন্দির নির্মাণ করতে রাজা নরসিংহদেব যেরূপ অর্থব্যয় করেছিলেন, এখন তা রূপকথার মতই শোনাবে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে : "এই মন্দির নির্মাণ করিতে উড়িষ্যাদেশের দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব ব্যয়িত হয়।" মন্দির নির্মাণে নরসিংহদেব যে অজস্র অর্থ অম্লানবদনে ব্যয় করেছিলেন, তাতে তাঁর শিল্পনিষ্ঠা ও ধর্মপ্রাণতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেই নাকি রাজা নরসিংহদেব এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন।

কোনারক মন্দিরের নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সংস্কৃত 'কোনার্ক' শব্দটির অর্থ "সূর্যের কোণ"। উড়িষ্যা রাজ্যের এই অঞ্চলটি সূর্যদেবকে নিবেদন করে দেওয়া হয়েছিল বলেই এর নাম 'কোনার্ক' বা 'কোনারক'। অপর একটি মতে বলা হয়েছে, শ্রীক্ষেত্রের এই কোণ দিয়ে সূর্য ওঠে বলেই এরূপ নামকরণ হয়েছে।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। কবি বলেছেন :

"সাহিত্য (তথা শিল্প) কি কলা-কৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল

হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে মানুষ আপনার ঐশ্বর্য দ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে; ইহাতেই সৃষ্টি-নৈপুণ্য; ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা। ......পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সূর্যোদয়ের মহিমা দেখিল—অমনি বহুশত ক্রোশ দূর হইতে পাথর আনিয়া সেখানে আপনার করজোড়ের চিহ্ন রাখিয়া দিল; তাহাই কনারকের মন্দির। সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ।... ”

কোনারক মন্দিরের পরিকল্পনাটি সত্যই অভিনব। মন্দিরটি যেন সূর্যদেবের এক বিশাল রথ। সূর্যদেবের গমনাগমন সপ্তাশ্বচালিত রথে। তাই এই সূর্যমন্দিরেও দেখি সামনের দিকে সাতটি সুসজ্জিত ঘোড়া, দু'পাশে চব্বিশটি ছোট-বড় চাকা। পাথরের রথচক্রগুলিতে আশ্চর্য সুন্দর অলংকরণ, খোদিত ধাবমান অশ্বগুলির দেহের রেখায় রেখায় তীব্র গতির ছন্দ। দশ ফুট উঁচু চাকাগুলির ওপর পাথরের পাটাতন, আর তার ওপরই মন্দিরটির দু'টি অংশ—দেউল ও জগমোহন—গড়ে উঠেছে। ভোগমন্দির ও নাটমন্দির মূল মন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন। সব মিলিয়ে মোট আয়তন হবে দৈর্ঘ্যে ৮৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৫৪০ ফুট।

মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য দেখে দর্শক বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়। মধ্যযুগীয় সামাজিক জীবনধারার একটা মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায় প্রস্তরে খোদিত ভাস্কর্যের মধ্যে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিবিধ রূপের পরিচয় শিল্পী রেখে গেছে পাথরের বুকে তার বাটালির আঘাতে। একটা গোটা সমাজই যেন তার রীতি-ব্যবস্থা, শিল্প-সংস্কৃতি ও আবেগ-ধর্ম নিয়ে পাথরের বুকে বন্দী হয়ে আছে।

মন্দিরের গায়ে, রথের চাকায় যেমন আছে নানাবিধ নক্সা, জাফরি, তেমনি মন্দিরগাত্র কুঁদে কুঁদে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানা মানব-মানবীর মূর্তি—নানা রূপে, নানা সাজে, নানা ছন্দে, আর পশুপাখীর মূর্তি; সমস্ত কিছুই প্রকৃত ভারতীয় শিল্পসাধনার প্রতীক ও শিল্পঐতিহ্যের বাহন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি মন্দিরের গায়ে, নাগরিকদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার কিছু পরিচয়। শোভাযাত্রা করে নাগরিকেরা চলেছে—শৃঙ্খলা, সংযম ও ঐক্যের প্রতীক। শোভাযাত্রীরা সহাস্য-বদন—কারণ জীবনে তারা শান্তির সন্ধান পেয়েছে। কোথাও দেখা যায় নর্তকীর মূর্তি—লাস্যময়ী তরুণীর দেহের লীলায়িত ছন্দে নানাভাবের প্রকাশ—কোথাও একক, কোথাও বা যুগ্ম অথবা দলবদ্ধ। কোথাও দেখা যাবে সংগীতের আসর বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। কেউ মৃদঙ্গ, কেউ বা বাঁশী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সুরজাল বিস্তার করে আপন সুরের মাধুর্যে আপনিই আত্মহারা হয়ে আছে। যুদ্ধ-যাত্রার দৃশ্যও বাদ যায়নি। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বীরেরা চলেছে যুদ্ধে। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী-আরোহী সৈনিকের সাজসজ্জা ও অস্ত্রসজ্জা যেমনি নিখুঁত ও কারুকার্যময়, তেমনি ঘোড়া, হাতী প্রভৃতির সাজসজ্জাও দ্রষ্টব্য বস্তু। এ ছাড়া আছে নরনারীর দৈহিক মিলনের অজস্র দৃশ্য—বাহুতে-বাহুতে মিলন, অধরে-অধরে মিলন, এমন কি যৌনমিলনও বাদ যায়নি।

কোনারকের এই নারীপুরুষ মিলন দৃশ্যগুলি নিয়ে কত বিরুদ্ধ সমালোচনাই না হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। তথাকথিত রুচিবাগীশের দল নাসিকা কুঞ্চিত করে এই অনুপম ভাস্কর্যের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকেন। কিন্তু তথাপি রসশিল্পের বিচারে এসকলের মূল্য আদৌ কমেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই সকল মূর্তির মধ্যে বুঝি উগ্র কামনার মাদকতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, মনে হয় এরা যেন লালসা ও ইন্দ্রিয়সেবার প্রতিমূর্তি। নরনারীর অন্তরের আদিম কামনাকে লোক-চক্ষুর সামনে এমন নগ্নরূপে তুলে ধরার জন্য অনেক সময় এগুলির স্রষ্টার প্রতি মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু এগুলির শিল্পমূল্য সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। বস্তুতঃ এরূপ নিপুণ সৃষ্টি আর কোন যুগে কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ।

মন্দির-ভাস্কর্যে এই কামনার প্রকাশ এরূপ ব্যাপকভাবে কেন হল? এর একটা কারণ আছে বৈকি। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার সংগে সংগে তান্ত্রিক ধর্ম-মতের উদ্ভব হয়েছিল। তান্ত্রিক মতাব-লম্বীরা বিশ্বাস করে, আত্মার শুদ্ধি ও আত্মার মুক্তি সম্ভব হয় কেবলমাত্র তখনই যখন মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে—সেই অভিজ্ঞতা যেমন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, তেমনি ইন্দ্রিয়ভোগের অভিজ্ঞতাও বটে। এই তান্ত্রিক প্রভাবেরই বহিঃপ্রকাশ কোনারকের মন্দির গাত্রে। এই প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে না পেরে সেকালের সমাজসচেতন ও যুগসচেতন শিল্পী মানুষের অন্তরের সহজাত স্বাভাবিক কামনাকে ভাষা দিয়েছে পাথরের বুকে।

কিন্তু এইসব মূর্তি ও আনুষঙ্গিক সব কিছু আপাতদৃষ্টিতে অশালীন মনে হলেও প্রকৃত রসের মাপকাঠিতে এগুলির মধ্যে শিল্পীর লোকোত্তর প্রতিভার সন্ধান মেলে। শিল্পী যেন তার অন্তরের সমস্ত আবেগ ঢেলে এগুলিকে রূপদান করেছে। প্রাণের প্রাচুর্যভরা এই সৃষ্টিগুলির মধ্যে দেখা যায় প্রকাশের বলিষ্ঠতা, শিল্পীর সামঞ্জস্যজ্ঞান ও পরিমিতিবোধ। বিশেষ করে নারীদেহবল্লরীর লীলায়িত ভঙ্গিমার মধ্যে আছে সজীবতা, আছে সতেজ প্রাণের স্পর্শ, মোহময়তা ও অসীম সৌন্দর্য। কোনারকের ভাস্কর্য-সুষমা মনকে যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে আপ্লুত করে দেয়। ভুবনেশ্বরের পরশুরামের মন্দিরে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতির উন্মেষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল তারই পরিণত ও সার্থক-তম প্রকাশ কোনারকের সূর্যমন্দির।

সমস্ত দিক বিচার করে পণ্ডিতপ্রবর ফার্গুসনের কথারই প্রতিধ্বনি করে বলতে হয় কোনারকের সূর্যমন্দির হচ্ছে: "a living testimony to the speculative daring and the artistic sensibility of a people which once knew to live, love, worship and create in heroic proportions".

উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিঃসন্দেহে ভারতের গৌরব। সামগ্রিক বিচারে দেখা যায়, উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একটি অপরটি থেকে অবিচ্ছেদ্য এবং একটি অপরটির অনুপূরক। বস্তুতঃ উড়িষ্যার স্থাপত্য বৃহৎ আকারে ভাস্কর্য ছাড়া আর কিছুই নয়। উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যকে যদি মানুষের দেহ বলে কল্পনা করা যায় তাহলে মন্দিরগাত্রের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও মূর্তিগুলিকে মানুষের হৃদয়ের সূক্ষ্ম, কোমল ও গভীর অনুভূতি বলা যায়।

প্রতিবেশী সাহিত্য

॥ হিন্দী গল্প ॥

॥ ভূমিকা ॥

ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ আধুনিক হিন্দী-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

একশো বছর আগেও খড়ীবোলী, অর্থাৎ আধুনিক নমুনার হিন্দী গদ্যে কোন সাহিত্য ছিল না—এমন কি ১৯২৫ সাল পর্যন্ত খড়ীবোলী গদ্যে কোন সার্থক সাহিত্যের নিদর্শন নেই।

আধুনিক হিন্দীভাষা-সাহিত্যের অগ্রগতিতে বাঙ্গালীর দান সর্বাগ্রগণ্য। তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৮৮৮ সালে পাঞ্জাব থেকে প্রথম হিন্দী মহিলা-পত্রিকা 'সুগৃহিণী' প্রকাশ করেন বাঙ্গালী মহিলা হেমন্তকুমারী দেবী। ১৮৫৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্র (দ্বিভাষিক) 'সমাচারসুধাবর্ষণ'-এর সম্পাদক ছিলেন শ্যামসুন্দর সেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রতিবেশী সাহিত্যের মধ্যে সর্বপ্রথম হিন্দীভাষাতেই অনুদিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিককালের বহু কবি-সাহিত্যিকের লেখা হিন্দীতে অনুদিত হয়েছে।

নতুন নতুন ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দাবলীর অভাবে হিন্দী লেখকেরা বাংলা থেকে বহু শব্দ আহরণ করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে বাংলার প্রভাব ব্যাতিরেকে হিন্দী সমৃদ্ধ হয়নি।

আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে আধুনিক হিন্দীসাহিত্য নিঃসন্দেহে প্রেমচন্দের যুগ পার হয়ে এসেছে। হিন্দী ছোটগল্পের ক্ষেত্রে গত পনেরো বছরের মধ্যে বিশেষ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ হয়েছে। শক্তিশালী ছোটগল্পলেখক-লেখিকাদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে যশপাল, রুদ্র, মোহন রাকেশ, মহাদেবী বর্মা, অজ্ঞেয়, অশক, ভারতী, কমলা যোশী, মার্কণ্ডেয়, মহতো, হোমবতী, উগ্র, মোহন সিং সেঙ্গর, রাজেন্দ্র যাদব, রাওরি, বিষ্ণুপ্রভাকর, হর্ষনাথ, নরোত্তমপ্রসাদ নাগর, অমৃত রায়, অঞ্চল, ঊষাদেবী মিত্রা, কাঞ্চনলতা, সুভদ্রা, সুমিত্রা প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের।

যশপাল নিঃসন্দেহে বর্তমান হিন্দী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। ঘটনার কুশলীগ্রন্থনে, চরিত্রের সজীব চিত্রণে, পটভূমির বৈচিত্র্য ও বিশালতায় এবং দুস্থ জীবনের অঙ্গীকারে যশপালের আসন পুরোভাগে। মহাদেবী বর্মার ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে নারীজীবনের কান্নাহাসির নিপুণ চিত্র। বর্তমান গল্পের লেখক হর্ষনাথ স্বল্পপরিসরে বহু সার্থক ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ গল্পের অনুবাদ পরিবেশিত হল।

—অনুবাদক

একদিনের ভালবাসা

রচনা ঃ হর্ষনাথ

অনুবাদ ঃ বোম্মানা বিশ্বনাথম্

জলে-টানা রেখার মত সময়ের ব্যবধান লুপ্ত হল। একঘেঁয়ে লাগল এ-জীবন। আর সেখানে মন টিকল না। কালকেই আবার আপিসের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছে করছে। গত ছ' মাস ধরে বাইরে আছি।

আজ আপিসে এসেছি। সেই গতানুগতিক দৃশ্য। টেবিলে এক-গাদা ফাইল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস। কয়েকটি কাগজের উপরে একটি পেপার-ওয়েট, পিনকুসন। কাগজের কয়েকটি টুকরো ছড়িয়ে আছে। আমার টেবিলের সামনের দেওয়ালে একটি দাগ আজও আছে। দেওয়ালির সময় আপিসে চুনকাম করা হয়েছিল কিন্তু সে-দাগ এখনও মুছে যায়নি। বোকারাম চাপরাসিটাও একই রকম আছে। সেই মোটা খাকী-জামা আর প্যান্ট। আর আগের মতই কথায় কথায় বলছে, জী হুজুর। পেছনে সেও তার সহকর্মীদের সঙ্গে বড়বাবু থেকে শুরু করে সাহেবদের ভেংগায়।

বউ মারা যাওয়ার পর এই শহরে মন গুমরে উঠল। আপিসটা যেন আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তার থেকে একটু মুক্তি পাওয়ার জন্য মাসছয়েক কাটিয়ে এসেছি বাইরে। কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি। মনের উপর যে পাথরটা চেপে বসেছিল, তা কিছুটা হালকা হল। কিন্তু এতদিন পরে আপিসে বসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আবার অতীতের ক্লান্তি আমাকে যেন জড়িয়ে ধরেছে। মন অবসন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। আমার জীবন-বৃক্ষ যেন শুকিয়ে আসছে। আর এ-গাছ ফলেফুলে ভরে উঠবে না। বাইরে গিয়ে ভালই ছিলাম।

—শম্ভু এক কাপ চা দে।

আগের মতই 'জী হুজুর' বলে শম্ভু চলে গেল। চা আমি একটু বেশী খেতাম এখন সে-মাত্রাটা আরও বেড়ে গেছে। চা-ছাড়া একমুহূর্তও যেন কাটতে চায় না। আপিসে আর এক মুহূর্ত মন বসছে না। কাজে একাগ্রতা নেই। গুমরে উঠছি। ভাবছি আর এক কাপ চা খেয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে। না, এ-শহরে আর একদিনও টিঁকতে পারব না। কাল ভোরের ট্রেনেই বেরিয়ে পড়ব। যে-দিকে দুচোখ যায়।

আমার ঘরের সামনের বাড়ির দেয়ালগুলো সেই পুরনো গেরুয়া রঙের। পর্দা টাঙানো রয়েছে জানলায়। কী বিশ্রী রঙ বাড়িটার!

ও-বাড়ির জানলা খোলা। খোলা থাকলে আমার কী! খোলা থাকে থাকুক, এ-এমন কি নতুন ঘটনা। গোটা বাড়িটা যেন একটি কবর রচনা করেছে।

শম্ভু চুপি চুপি এসে টেবিলে চা রেখে গেল। শম্ভু দুক্ষেপনে কাজ করে। খুব বুদ্ধিমান চাকর। কিন্তু তার এই চুপিচুপি কোন কাজ করাও আমার কাছে আজ একঘেঁয়ে ঠেকছে। এই নিঃশব্দভাব আমাকে যেন গিলে খাবে। প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতিই আমার একটা

বিতৃষ্ণা জাগছে। কোন কিছুই ভাল লাগছে না। শুধুমাত্র এই চায়ের কাপ আমার কাছে প্রিয় জিনিস। হাজারবার কেউ চা দিয়ে গেলে আমি না করব না। একমাত্র এটাতেই একটু স্ফূর্তি পাই—আর কোনটাতেই নয়।

ওই বিশ্রী বাড়ির জানলার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! এর আগে ওখানে ওকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। হয়তো কোন নতুন ভাড়াটে এসেছে। শম্ভুকে ডেকে জিজ্ঞেস করব আগের ভাড়াটে চলে গেছে কি না। ওদের ঘরে তো কোন বয়স্থা মেয়ে ছিল না। স্বামী-স্ত্রীতে ছিল। ওদের জীবনে কোনদিন বসন্ত এসেছে বলে মনে হয়নি। যখন-তখন ঝগড়া বাধত। শম্ভু ওদের হাঁড়ির খবর রাখত। চাকরবাকরদের একটা স্বভাব অন্যের বাড়ির গোপন খবর রাখা। একদিন জানিয়েছিল, বাবু এই বুড়োটা খুব বদমায়েশ। বউকে হামেশাই মারধোর করে। শম্ভু ঐ ভাড়াটের বউয়ের পক্ষে ওকালতি করত আমার কাছে।—আচ্ছা বাবু তো বাবু ছেলেমেয়ে হয়নি, তার জন্য ঐ বউ কি দোষ করেছে। এসবে তো আর তার হাত নেই।

জানলার কাছে আবার কে যেন দাঁড়াল। একটি ডাগর মেয়ে। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। অবিবাহিতা। বয়স কত হবে? ওর বয়স জেনে আমার কি দরকার। বছর কুড়ি হবে মনে হচ্ছে।

মনে কেমন একটা চাঞ্চল্য। অতীত স্মৃতির রোমন্থন।...... সন্ধ্যার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয় তখন তারও বয়স ছিল কুড়ি।......

—শম্ভু কাপটা নিয়ে যা।

শম্ভু কাপটা নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। কাপটা তুলতে তুলতে হঠাৎ কি যেন একটা ভেবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওরও হয়তো কিছু বলার ছিল।

এখন সে দ্বিতীয়বার চা রেখে গেল। অতিরিক্ত চা খাচ্ছি বলে কি সে কিছু বলতে চায়? বলছে না কেন!

সে মেয়েটি আবার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। তাই তো! সে আমার দিকে যখন তাকাচ্ছে আমিই বা তার দিকে তাকাবো না কেন? তাতে ক্ষতি কি?... কেন জানি না ছিপছিপে যুবতীর চেহারা আমার বেশ পছন্দ। সন্ধ্যার চেহারাটাও ঠিক এই ধরনেরই ছিল। আর এই মেয়েটির রঙ, সামান্য একটু লম্বা মুখ, নাক আর চোখ সবকিছুর মধ্যেই সন্ধ্যার চেহারার সঙ্গে মিল আছে। একটা বিষয়ে ব্যতিক্রম দেখছি। এর চোখে উদাস ভাব। এই ছাঁচের মুখের সঙ্গে চাউনিটা মানাচ্ছে না। এ মুখের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ যেন মানানসই......

ঠিক এই ভাবেই আমি সন্ধ্যার দিকেও তাকিয়েছিলাম প্রথমবার। আমার ঘরের সামনের ঐ বাড়িতেই ওরা ভাড়াটে হিসেবে এসেছিল। ঐ জানলার কাছেই তাকে একদিন দেখতে পেয়েছিলাম। প্রথম দর্শনে সন্ধ্যার যে চেহারা আমার মনে গেঁথে গেল তা আজও জ্বলজ্বল করছে। আজও আমার মনে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। ঐ জানলার কাছেই টেবিলের পাশের চেয়ারে সে বসেছিল। কি একটা বইয়ে সে মগ্ন ছিল। তার চোখেমুখে চিন্তাগম্ভীর ভাব। আমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ এক সময় চোখ তুলতেই আমাকে সে দেখতে পেল। আমি অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে আমার দিকে দারুণভাবে চটে গিয়ে তাকাল। ভেবেছিল তার ভয়ে আমি জানলা বন্ধ করে দেব। তার সেই ক্রোধ-দৃষ্টি আমার চমৎকার লাগল। ঠোঁট চেপে হাসলাম। সে দড়াম করে জানলা বন্ধ করে দিল।

তাইতো! এ মেয়েটাও দেখছি জানলার পাশে সরে দাঁড়িয়েছে। হয়ত সন্ধ্যার মত এও আমার ওপরে তেলে-বেগুনে চটে গেছে। কিন্তু কই জানলা তো বন্ধ করল না। শুধু সরে গেছে। সন্ধ্যার মত দড়াম করে তো জানলা বন্ধ করল না। হয়ত সন্ধ্যার সেই তেজ এর-মধ্যে নেই। সেই জন্যই তো সন্ধ্যা তার তেজদীপ্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এল, আর জিদ ধরেই চলে গেল......কেউ চটে গেলে আমার মনে তা বেশী রেখাপাত করে না। সন্ধ্যার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বারবার চোখের শাসানিতে আমাকে যখন ঠাণ্ডা করতে পারল না তখন সে আমার দিকে একটুকরো কাগজ বুলেটের মত ছুঁড়ে দিল।

আমি তাড়াতাড়ি সে-কাগজের টুকরোটি কুড়িয়ে নিয়ে দেখি তাতে দুলাইন লেখা আছে—তোমার কি লজ্জা-সরম বলতে কিছু নেই? এভাবে কোন ভদ্রমহিলার দিকে তাকাতে তোমার লজ্জা করে না? চেষ্টা করেও কি একটু সভ্য হওয়া যায় না? তারপর পুনশ্চ দিয়ে আরও দুকথা লেখা আছে। তুমি যদি ভদ্র না হও তবে আমি বাধ্য হব বাবাকে জানাতে। তারপর নিজের গর্দানটি বাঁচাতে তোমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

তারপর সে ভেবেছিল আমি সভ্য হব। অন্তত নিজের গর্দানটি বাঁচাতে শুধরে যাব। কিন্তু আমার মনে চাপল জিদ। অত যদি পর্দানশীন হতে চায় তো জানলা বন্ধ করে না কেন! আমি কেন নিজের জানলা বন্ধ করতে যাব।

পরের দিন ভারী মজার ঘটনা ঘটেছিল। জানলাটা বারবার খুলেছিল আর বন্ধ করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত হার মেনে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল একটি সন্ধিপত্র। কিন্তু চিঠির ভাষার মধ্যে রাগ আছে, জিদ আছে, অবশ্য তার সেই জিদ আজীবন ছিল।

দয়া করে আমাকে একটু পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে দিন। আমার যথেষ্ট উপকার করছেন, আর করবেন না।

এ বছর আমার বি এ পরীক্ষা। জানলা বন্ধ করে আমি পড়তে পারি না। দম আটকে যাবার যোগাড় হয়। তাই আপনার কাছে আর্জি আপনি একটু সভ্য হোন।

আমি তার অনুরোধ রক্ষা করিনি। জানলাও বন্ধ করিনি। তবে জানলার কাছে দাঁড়াতাম না। তারপর একদিন হঠাৎ তার চোখে দেখেছিলাম আমার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব......

ভাল কথা, এ-মেয়েটি কি ভাবছে? এ-মেয়েটির চোখেমুখে কোন রাগ নেই, কোন জিদ নেই, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার কোন ব্যঞ্জনা নেই। একটি নির্বিকার মুখ। কি চায় মেয়েটি! হয়ত মন তার চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু কেন তা বুঝব কি করে। তার প্রতি আমার এই সমবেদনা জাগল কেন? তার জন্য আমার মন আর্দ্র হল কেন? 'কেন'-এর কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। ভালই হয়েছে। মেয়েটি চটে গিয়ে সরে গেছে জানলা থেকে।

শম্ভু মাঝে মাঝে বোকার মত কথা বলে। কেউ জিজ্ঞাসা করুক বা না করুক তার যা বলার সে বলবেই। ঘরে ঢুকেই বলল, হুজুর ঐ সামনের বাড়িতে কোত্থেকে দুজন এসেছে। একজন যুবক আর একটি যুবতী...। ওর কথা আমার শুনতে ভাল লাগল না। ধমক খেয়ে চলে গেল সে।

আমি সন্ধ্যার কথা ভাবছি।...তারপর সন্ধ্যার সঙ্গে আমার বিয়ে হল...... কিন্তু সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? সন্ধ্যার মধ্যে সত্যি একটা তেজ ছিল। তার বাবার মনেও কম জিদ ছিল না। আমার সঙ্গে বিয়ে করায় ভদ্রলোক চটে গিয়ে ও-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। ওদের পরে একটি সিন্ধী পরিবার এসেছিল। সে পরিবারে একটি যুবতী ছিল কিন্তু আমি তাকে কোনদিন দেখিনি, সন্ধ্যা দেখেছে। একদিন আমাকে শাসিয়ে সন্ধ্যা বলল, দেখ এই জানলাটা বন্ধ করে দাও।

সন্ধ্যার কথা আমি বুঝতে পারিনি। জানতে চাইলাম, কেন?

গর্জে উঠে সে বলল, কেন-টেন বুঝি না, এই জানলাটা একেবারে বন্ধ করে দাও। ও-বাড়ির মেয়েটার তো আর লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই। আর তুমিও নিজের অভ্যেস......

চট করে মেজাজ বিগড়ে গেল। আমিও চিৎকার করে বললাম, ছোট-লোকের মত কথা বলছ কেন? আমাকে কি লোফার ভেবেছ?

—তুমি লোফার না কি সেটা আমার জানতে বাকি নেই।

মুখে অত্যন্ত খারাপ একটা কথা এসে গিয়েছিল। চেপে যেতে চেষ্টা করেও বলে ফেললাম, নিজেকে দিয়েই সব মেয়েদের বিচার কর নাকি?.........

আমার সে কথার জবাবে সন্ধ্যা আমাকে দিয়েছিল তার শবদেহ। তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে গোটা শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে সে পুড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে। আমাকে বাঁচানোর জন্য একটি চিরকুট অবশ্য রেখে গিয়েছিল।

—শম্ভু চা দিয়ে যা তো, ভাই।

মেয়েটা বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার প্রতি আমার মনেও একটা দুর্বলতা আসছে। দু'একদিনের মধ্যেই ওর স্বামীকে চা-খেতে নেমন্তন্ন করব। ওর সঙ্গে যে লোকটি আছে সে তার স্বামী ছাড়া আর কে হবে। দুজনকেই নেমন্তন্ন করব। সেই সুযোগে মেয়েটার সঙ্গে দুটো কথা বলব। আহ্, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার মন এত চঞ্চল হয়ে উঠেছে কেন?

কাল সারারাত চোখের পাতা ফেলতে পারিনি। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করেছি। চোখের সামনে ভাসছে ঐ তারা-মেয়েটির মুখ।...আমার প্রতি তার নিশ্চয়ই দুর্বলতা আছে। আমার সঙ্গে সে কথা বলতে চায়। সেই আবেদনের ছাপই আছে তার চোখে। সে নিজের মন মেলে ধরতে চায় আমার কাছে। ওর সঙ্গের লোকটা কে? মেয়েটির বিয়ে না হয়ে থাকলে আমি বিয়ের প্রস্তাব করব।......তাতে কোন দোষ বা পাপ নেই। একা আমি বাঁচতে পারব না। যে-বাঘ একবার রক্ত খেয়েছে...

তাই তো! ও-বাড়ির জানলাটা বন্ধ কেন? কোন সাড়াশব্দ নেই! আশ্চর্য!

শম্ভু কি যেন বলতে যাচ্ছিল—কাল। না এখন আমি কারো কথা শুনতে চাই না। কারো সম্পর্কে নয়। শুধু শুনতে চাই ঐ মেয়েটির কথা, শুধু জানতে চাই ওর সম্পর্কে। তাই তো, জানলাটি বন্ধ কেন? সে গেল কোথায়?

—হুজুর, চা।......হুজুর, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি। ও-বাড়িতে যে ভাড়াটিয়া এসেছিল সে, হুজুর, পয়লা নম্বরের লোফার। ঐ মেয়েটিকে ভাগিয়ে এনেছে। কাল রাত্রে পুলিশ খোঁজাও করে ওদের দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে।

অয়স্কান্ত

॥ ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ॥

নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ) মুখপত্রে সম্প্রতি এই পরিষদের ১৯৫৯-৬০ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। এই বিবরণী থেকে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে একটি ছবি পাওয়া যেতে পারে।

বিবরণীতে বলা হয়েছে যে গত বছরে এবং তার আগের দু-বছরে কুড়িটি গবেষণাগারে কাজ হয়েছে। এই কুড়িটি ছাড়াও আরো দুটি গবেষণাগার শীঘ্রই কাজ শুরু করবে। একটি হচ্ছে দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, অপরটি দিল্লীর সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান মেডিসিনাল প্ল্যান্টস অর্গানাইজেশন। অর্থাৎ, একটি হচ্ছে যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত এবং অপরটি ওষুধ-তৈরি সাজসরঞ্জাম সম্পর্কিত। এ ছাড়াও আরো কয়েকটি গবেষণাগার নির্মাণের প্রস্তাব আছে। একটি হচ্ছে বাঙ্গালোরে ন্যাশনাল এয়ারোনটিকাল ল্যাবরেটরি, একটি জোড়হাটে রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি এবং একটি সেন্ট্রাল সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টস অর্গানাইজেশন। ইতিমধ্যে কলকাতায় ১৯৫৯ সালের ২রা মে তারিখে একটি শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত জাদুঘর খোলা হয়েছে, যার নাম বিড়লা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেক্‌নোলজিকাল মিউজিয়াম।

বিবরণী থেকে জানা যায় যে আলোচ্য বছরে নতুন ১০২টি গবেষণামূলক কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। মোট হিসেবে বর্তমানে ১০৬টি কেন্দ্রে ৩৭১টি নতুন গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে। শুধু এই সংখ্যা থেকেই খানিকটা ধারণা হতে পারে, ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বর্তমানে কত ব্যাপক। বিবরণীতে আরো বলা হয়েছে যে আলোচ্য বছরে প্রকাশিত গবেষণামূলক নিবন্ধের সংখ্যা ৫০০।

পরিষদের সহায়তায় আরো দুটি সমবায়মূলক গবেষণা সংস্থা গড়ে উঠেছে। একটি হচ্ছে ভারতীয় রাবার উৎপাদনকারীদের গবেষণা সংস্থা। পুণার জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগারের সহযোগিতায় এই সংস্থার পক্ষ থেকে একটি গবেষণা-কেন্দ্র ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। আর অপরটি হচ্ছে পেইন্ট বা রং-সংক্রান্ত গবেষণার সংস্থা।

বিবরণীটি দীর্ঘ। এবং এই বিবরণীতে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, পদার্থ, রসায়ন ও অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণাগারে কি-কি ধরনের কাজ হয়েছে। স্বভাবতই বিবরণীটি তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্যে। তবে টেকনিকাল ভাষায় লেখা প্রায়-দুর্বোধ্য এই বিবরণীটি পাঠ করলে সাধারণ পাঠক হিসেবে আমাদের উল্লসিত হবার কারণ আছে। কারণ এই বিবরণীতে যে-সমস্ত গবেষণা-কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে তা খুবই ব্যাপক এবং বহুবিস্তারী। এমন কি, পৃথিবীর সঙ্গে অন্যান্য গ্রহের বেতার-যোগাযোগ সম্পর্কেও কিছু গবেষণা হয়েছে। আর বিবরণীর সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক দিক হচ্ছে এই যে পুণার জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগারের অধিকাংশ গবেষণাই খাদ্য ও সার সংক্রান্ত। পদার্থবিদ্যার গবেষণার বিবরণীতে প্রশংসনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে নতুন নতুন যন্ত্র তৈরি করার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

॥ নির্ধূম জ্বালানি ॥

ভারতে প্রতি বছরে গৃহস্থালীর প্রয়োজনে যদি শুধু কয়লা ব্যবহার করা হত তাহলে বছরে ১০ কোটি টন কয়লা প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজনের অনেকখানিই (শতকরা ৯৫ ভাগ) মিটে যায় ঘুঁটে ও কাঠখড় পুড়িয়ে। শতকরা মাত্র আড়াই ভাগ প্রয়োজন মেটানো হয় কেরোসিন, কয়লা ও বিদ্যুতের সাহায্যে। তবুও হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে আগামী দশ-পনেরো বছরের মধ্যে শুধু শহরাঞ্চলেই কয়লার চাহিদা হবে সাড়ে-তিন কোটি টন। এই সাড়ে-তিন কোটি টনের মধ্যে পশ্চিম বাংলাতেই খরচ হবে পঁচিশ লক্ষ টন, আর বিহারে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টন।

আমরা জ্বালানি হিসেবে যে কয়লা ব্যবহার করি তাকে বলা হয় সফ্‌ট্ কোক। এই কোক তৈরি হয় খনি থেকে তোলা কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে। বর্তমানে ভারতে আঠারো লক্ষ টন কোক তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে যে-পদ্ধতিতে কোক তৈরি হয় তার ফলে কাঁচা কয়লার অনেকগুলো মূল্যবান উপাদানই খোয়া যায়। এমন কি শেষ পর্যন্ত যে কোক পাওয়া যায় তাও নিকৃষ্ট ধরনের। তা থেকে ভালো উত্তাপ পাওয়া যায় না এবং প্রচুর ধোঁয়া বেরোয়। শহরাঞ্চলে এই কয়লার ধোঁয়া একটা উপদ্রব বিশেষ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

গত কয়েক বছরে কোক তৈরি করার পদ্ধতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় জ্বালানি গবেষণা সংস্থায় ও হাইদ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণাগারে গবেষণা চলেছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু উৎকৃষ্ট কোক তৈরি করা নয়, কোক তৈরি করার বর্তমান পদ্ধতিতে যেসব মূল্যবান উপাদান খোয়া যাচ্ছে সেগুলোকে উদ্ধার করা ও ঠিকভাবে কাজে লাগানো। কারণ এই উপাদানগুলো থেকে নানা প্রয়োজনীয় রং ও ওষুধ তৈরি হতে পারে। হাইদ্রাবাদের গবেষণাগারে এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি যন্ত্রও বসানো হয়েছে এবং এই যন্ত্রে যে নতুন ধরনের কোক তৈরি হচ্ছে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'কোলসাইট'। এই কোলসাইট বাজারেও বিক্রি হচ্ছে এবং ক্রেতা-সাধারণের কাছে সমাদৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় জ্বালানি গবেষণা সংস্থাতেও কোক তৈরি করার নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে কাজে পিছিয়ে নেই। আশা করা চলে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই গৃহস্থালীর প্রয়োজনে আমরা যে কোক ব্যবহার করব তা থেকে একদিকে যেমন বেশি উত্তাপ পাওয়া যাবে, অন্যদিকে তা হবে পুরোপুরি নির্ধূম। এবং কাঁচা কয়লার যেসব মূল্যবান উপাদান এতদিন খোয়া যাচ্ছিল তারও পুরোপুরি ব্যবহার শুরু হবে। এটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব যে একটা বড়ো রকমের অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে গণ্য হবে তা নয়, কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কোক তৈরি

করার জন্যে কাঁচা কয়লাকে এমন বেহিসেবী পোড়ানো হয় না।

॥ বিজ্ঞান-সাহিত্য ॥

'দি ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' প্রকাশিত 'দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স' পত্রিকার বর্তমান জুলাই সংখ্যার শেষে একটি পুস্তক-তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকাটিতে ১৯৬১ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত বিজ্ঞানের বইগুলির নাম পাওয়া যাবে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় পপুলার সায়েন্স, অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের জন্যে বিজ্ঞানের বই, এগুলো হচ্ছে তাই। কৌতূহলী পাঠকরা গুনে দেখতে পারেন, তালিকায় মোট ২৯টি বইয়ের নাম আছে। সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি, বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে একটি, গণিত সম্পর্কে একটি, পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে সাতটি, রসায়ন-বিদ্যা সম্পর্কে একটি, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে পাঁচটি, ভূতত্ত্ব সম্পর্কে তিনটি, জৈব-রসায়নবিদ্যা সম্পর্কে একটি, প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে পাঁচটি এবং যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কে চারটি। এই ২৯টি বইয়ের মধ্যে কতকগুলো বই আছে বিশেষ করে ছোটদের জন্যে লেখা। প্রত্যেকটি বই চিত্র-সম্বলিত। যেমন, একটি বইয়ের নাম 'ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে স্তন্যপায়ী জীব'। ১৮৫ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ৩২টি রঙীন প্লেট ও ৫৭টি ফটোগ্রাফ আছে। দাম ২১ শিলিং। এমনি প্রায় প্রত্যেকটি বইয়ের বিজ্ঞপ্তি পড়েই বোঝা যায় যে বইগুলো সাধারণ পাঠকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। আর এই হচ্ছে বছরের প্রথমার্ধে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা। আশা করা চলে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আরো বেশি না হোক, সম-সংখ্যক বই নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে।

এই খবরটি এত বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এর সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সভার মুখপত্র 'গ্রন্থ জগৎ'-এর আগস্ট মাসের সংখ্যায় নতুন বইয়ের তালিকায় ২১৮টি বইয়ের ঘোষণা আছে। তালিকায় কোনো সময়ের উল্লেখ নেই কিন্তু বইয়ের নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে, এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে এই ২১৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আতঙ্কের কথা এই যে এই ২১৮টি বইয়ের মধ্যে একটি মাত্র বই পাওয়া যাচ্ছে, যেটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত। দ্বিতীয় আর কোনো বই নেই যাকে বিজ্ঞানের বই বলা যেতে পারে। অবশ্য জ্যোতিষীর বই আছে একটি। বাদবাকি প্রায় সবই উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক-কবিতা সাহিত্য-সমালোচনা। উপন্যাসের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি— প্রায় একশো।

অথচ একটু আগেই উল্লেখ করেছি, ভারতে ১৯৫৯-৬০ সালে গবেষণামূলক নিবন্ধের সংখ্যা ছিল ৭০০। এ-বছরে নিশ্চয়ই আরো বেশি। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, যাঁরা বিজ্ঞানের গবেষণা করেন তাঁরা সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই লেখার কাজকে একেবারেই গুরুত্ব দেন না। অথচ ইংলণ্ডে, আমেরিকায় ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সাধারণ পাঠকের জন্যে সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই লিখেছেন সেরা সেরা বিজ্ঞানীরা। এমন কি আমাদের চোখের সামনেই একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অধ্যাপক জে-বি-এস হলডেন। তিনি এই বয়সেও এবং কলকাতার এই অনভ্যস্ত আবহাওয়াতেও একদিকে যেমন গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করে চলেছেন, অন্যদিকে সাধারণ পাঠকের জন্যে সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। শোনা গিয়েছে, বিজ্ঞান-সাহিত্যের জন্যে নির্দিষ্ট আকাদেমী পুরস্কারের জন্যে দু-একবার নাকি ভারতীয় ভাষায় লেখা উপযুক্ত বই পাওয়া যায়নি।

॥ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ॥

তবে গত কয়েক বছরে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক যতো লেখা প্রকাশিত হয়েছে, পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে এমন বোধ হয় আর কোনো সময়ে হয়নি। পুরোপুরি বিজ্ঞানের আলোচনা নিয়ে অন্তত দুটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকায় সপ্তাহে অন্তত একটি দিন বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে বিশেষ স্তম্ভ নির্দিষ্ট থাকে। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেও বিজ্ঞান এখন আর অপাঙক্তেয় নয়। তাছাড়া বাংলা বিজ্ঞান-বইয়ের দ্রুত সংস্করণ নিঃশেষ হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলায় বিজ্ঞান-সাহিত্য কখনোই অনাদৃত হবে না।

তবুও আক্ষেপের কারণ থেকেই যাচ্ছে। সত্যিকারের বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনার কাজে উৎসাহিত হননি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তা এখনো পর্যন্ত অননুসৃত। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তও পরবর্তী সাহিত্যিকদের তেমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে নিশ্চয়ই আমরা দাবি করতে পারি যে তিনি বাংলাভাষায় সুন্দর একটি বিজ্ঞানের বই লিখুন। তাঁর আলোচনা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেবেন যে অত্যন্ত দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয়ও তিনি মাতৃভাষায় অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বলতে পারেন। তিনি যদি কলম ধরেন তাহলে হয়তো বাংলাভাষায় অতুলনীয় বিজ্ঞান-সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। এমনি আরো অনেকেরই নাম করা যেতে পারে। জীবিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্তত একজনের কথা বলতে পারি যিনি কয়েক বছর আগে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সম্পর্কে অতি চমৎকার একটি বই লিখেছিলেন। তিনি কেন গল্প-উপন্যাস লেখার মধ্যেই সময় করে নিয়ে আরো কয়েকটি বিজ্ঞানের বই লিখবেন না। সাম্প্রতিককালে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। বিশেষ করে একদল তরুণ লেখক প্রবন্ধ-সাহিত্যে নতুন প্রাণের সাড়া জাগিয়েছেন। কিন্তু সকলেরই নজর সাহিত্যের দিকে, তারপরে বড়ো জোর ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতির দিকে। বিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত তরুণ লেখকদের কাছে দুয়োরানীর মতো অনাদৃত।
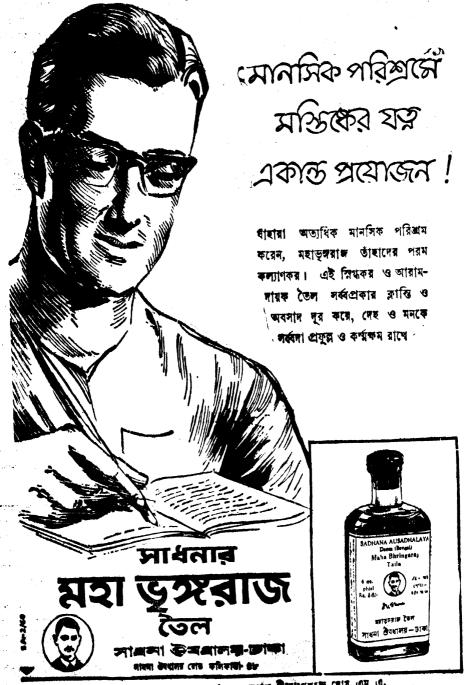
মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
SADHANA AUSADHALAYA
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র — ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য
অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ একুশ ॥

কয়েকদিন পরের কথা। এর মধ্যে আরও বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে স্বাতিদের জীবনে; আরও ঠিক-ভাবে বলতে গেলে লাহিড়ীমশাইয়ের জীবনে। উনি স্কুলের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। শুধু প্রস্তুতি-পর্বের চিঠি-পত্র লেখালেখির কাজই নয়, উনি স্কুলই বসিয়ে দিয়েছেন কিছু কিছু করে। গ্রামের জমিদার সেনগুপ্তেরা এক রকম কলকাতাবাসীই হয়ে পড়েছিল, জমিদারি যাওয়ার পর আরও সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে, লাহিড়ীমশাইয়ের চেষ্টাতেই তাঁদের বাড়িটা চেয়ে নিয়ে তাতে স্কুল বসানো হয়েছে; আরও কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করে নিয়ে। একটা সমস্যা একটু রয়েই গেল, স্কুলের বই আর নিয়োগ-পত্রে ও'র নামের কথাটা নিয়ে। ওটার জন্য আপাতত কিছু আটকাল না। নিয়োগপত্রের প্রশ্নটা তুললেনই না লাহিড়ীমশাই নিজে, প্রশান্ত নিয়ে রেখেছে বলে একটা কথা হয়ে গিয়েছিল গোড়ায়, কাজের উন্মাদনার মধ্যে সেটা সেইখানেই রইল দাঁড়িয়ে। এ'দের দিকে। ওদিক থেকে কথাটা ওঠেনি। 'হেডমাষ্টার-মশাই', 'লাহিড়ীমশাই' বলেই চলল। দু'এক মুখে ক'বার যে প্রশ্ন স্বাভাবিক কৌতূহলেই উঠে থাকবে, সেটা একটা স্থায়ী রূপ নিল না। পাড়াগাঁয়ে নাম ধ'রে ডাকবার রেওয়াজও নেই, ঐভাবেই চলল। নূতন স্কুলের অন্যসব কথার সঙ্গে হেডমাষ্টার মশাইয়ের পড়ানর-যশ নিয়েই গ্রামটা মেতে রইল।

শুধু একজনের মনটা এইদিকে রইল পড়ে। প্রশান্তর। এই যে উঠছে না কথাটা, এটা নিতান্তই একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। এখন সবই কাঁচা কাজ, চলে যাচ্ছে, তবে উঠবেই কথা কোন দিন। চিন্তা করে, উপায় ভাবে। খুব সতর্ক-ভাবে অনাথের মনে টোকাও দিল বার দুই। আরও কিছু নতুন 'রিতিহাস' সংগ্রহ হোল; কিন্তু নামের বেলায় সতর্কই রইল অনাথ।

একটা সম্ভাবনা রইল, মাসের শেষে জানা যাবে, মাইনে নিয়ে কি নামে দস্তখত দেন। দৈবক্রমে সেটাও ওর একেবারে চোখের নীচেই হয়ে গেল। পরের মাসে গোড়ার দিকে দিন তিনেক বাড়িই বসে রইলেন লাহিড়ীমশাই, একদিন বর্ষায় ভিজেছেন, শরীরটা একটু অসুস্থ ছিল। তৃতীয় দিন স্কুলের চাকর ও'র মাইনেটা আর একটা খাতা নিয়ে এল। কুড়ি তারিখ থেকে কাজ আরম্ভ করেন—প'চাত্তর টাকা প্রাপ্য। বিকাল বেলা, গরমের জন্য বাগানেই বসেছিল সবাই। প্রশান্ত কাছেই চেয়ারে ব'সে ছিল, নিতান্ত যেন অনবধানভাবেই লক্ষ্য ক'রে দেখল লাহিড়ীমশাই দস্তখত দিলেন—ডি, লাহিড়ী।

ও সমস্যাটুকু লেগেই রইল প্রশান্তর।

তবে মাত্র ঐটুকুই। আর সব রকমেই ও'দের জীবনের দিকচক্রটা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। মনের মতো কাজ পেয়ে মনটি বেশ প্রসন্ন থাকে লাহিড়ী-মশাইয়ের। স্কুলটা খুব দূরেও নয়। বাবলা গ্রামটা কলোনি থেকেই তিন মাইল, যেমন সেদিন ও'রা বলেছিলেন। স্বাতিদের বাড়ি থেকে মাত্র মাইল খানেকই পড়ে। গ্রামের বাইরে এই দিকেই স্কুলের নিজের বাড়ি তোয়ের হচ্ছে, তাতে আরও কিছু কমেই যাবে পথ। তারপর মাঠ ভেঙে সোজা পথে গেলে আরও কম, পোটাক পথই দাঁড়াবে। বাড়ি থেকে দেখাই যাবে স্কুলটা। এখন অবশ্য প্রশান্তর জীপেই যাচ্ছেন-আসছেন। ভবিষ্যতে প্রশান্ত না থাকলেও পথটা মোটেই কষ্টকর হবে না।

বাকি থাকল ও'র অন্য এক কষ্টের কথা। মনের কষ্ট, যেটাকে স্বাতি ও'র লজ্জা ব'লে চালাল, অর্থাৎ বিশাখাকে পড়ানর জন্যে মাইনে নেওয়া। এরই কথা তো ভাবছিল প্রশান্ত যখন বাবলার এ'রা সব স্কুলের প্রস্তাবটা নিয়ে এলেন।

এটা ও'র দিক থেকেই ওঠা দরকার। তবে প্রশান্ত নিশ্চিন্ত আছে। এখন মনটা স্কুল নিয়েই রয়েছে; তা ভিন্ন টাকাটা নিজের হাতে করে নেন না ব'লে পড়ছেও না মনে ; তবে এক-দিন-না-এক-দিন পড়বেই এবার।

ও'র মাইনে নেওয়ার সময় আবার ওর বুদ্ধিটা হঠাৎ যুগিয়ে গেল। লাহিড়ীমশাইয়ের নির্দেশে স্বাতিই টাকাটা নিয়ে অনুপুকে ডেকে তার হাতে

দিয়েছে, প্রশান্ত বলল—"ভাবছি রজতকে কাল সকালে আপনার কাছে একবার পাঠিয়ে দোব, একবার দেখুক এসে।"

"যেন বেশি টাকা দেখেছেন আমার?" —কথাটা বলেই এমন জোরে হেসে উঠলেন লাহিড়ীমশাই যে স্বাতিকেও হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিতে হল। একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়ল প্রশান্ত, বলল—"না—সে কথা নয়। পেমেন্ট্ সম্বন্ধেও দেখছি ও'রা খুব হুঁসিয়ার—তাই ভাবছিলাম—মানে, তিনদিন তো হয়ে গেল সর্দিটা ছাড়ছে না……"

সকালবেলা নিজেই নিয়ে এল রজতকে।

স্কুলেরই কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন লাহিড়ীমশাই; মনটা ওদিকেই। স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক দেখে-শুনে একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে উঠে যাচ্ছিল রজত, বাবলাতেই একটা কেস্ দেখতে যাবে, এসে প্রশান্তকে সঙ্গে করে ফিরবে, লাহিড়ীমশাই অনাথকে ডেকে ওর ফি'টা দিয়ে দিতে বললেন।

রজত লজ্জিতভাবে বলল—"আপনি এখনও সেই ভাবটা ধরে রেখেছেন?"

"দোষ প্রশান্তর, আমি কি করব? আমার অনেক টাকা দেখে বন্ধু ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এসেছে।"—নিজেও হেসে উঠলেন আর সবাইকেও যোগ দিতে হোল।

প্রশান্ত বলল—"আমি রজতের হয়েই বলি—আপনার আশীর্বাদে ওর এখন কল্ হচ্ছে ভালোই……"

"তোমাদের শুভেচ্ছায়, আমার তো একটা আয়ের পথ খুলেছে। যখন ছিল না তখনও নিয়েছিলে—আমার যুক্তির জোর ছিল বলেই তো। না, ভেবে দ্যাখো।…… অনাথ তুইও বোকার মতন হাঁ করে রইলি যে?—দেবে ফিটা ও'র হাতে তুলে, তা নয়। ব্যাটার যত হচ্ছে ততই লোভ বাড়ছে।"

হয়তো তাই। অনাথ একটু কম্পিত হস্তেই একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরেছে, ও'র যুক্তিটা অভীপ্সিত পথ ধরল না, বিশাখার মাইনে বন্ধ করার কথাটা তুললেন না উনি দেখে প্রশান্ত একটু দমেই গেছে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না, স্বাতি অল্প হাসি নিয়ে ঘাড় হেঁট করেই ছিল, মুখ তুলে বলল —"আমার ধৃষ্টতা হয়, তবু একটা কথা বলি?"

"বল না মা।" লাহিড়ীমশাই বললেন। একটা সংস্কৃত শ্লোকও বললেন। যার মানে হয়—স্ত্রীবুদ্ধি দুর্বোধ্য—প্রলয়ংকরী হয়ে সম্পদের সময় কখনও কখনও অনিষ্ট সাধন করলেও বিপদের সময় চিরদিনই শুভংকরী হয়ে ইষ্টসাধনই করে।

প্রশান্তও বলল—"বলুন না—হ্যাঁ, বলুন—আমিও তাহলে ধৃষ্টতার একজন সঙ্গী পেয়ে বাঁচি।"

স্বাতি বলল—"একদিকের আশীর্বাদ আর একদিকের শুভেচ্ছাতেই যখন সব হয়ে যাচ্ছে, তখন সে-দুটোকেই থাকতে দিন না। আমি তো বলব টাকা দেওয়া-নেওয়ার কথা দুদিকেই বাদ থাক তাহলে।"

কন্যার প্রশংসায় মুখটা দীপ্ত হয়ে উঠেছে লাহিড়ীমশাইয়ের। যেন একটা হেঁয়ালি নিয়েই ওদের দুজনের মুখের দিকে চাইলেন, একটু হাসিমুখ ক'রেই বললেন—"বেশ, আমি ফি দেওয়া বন্ধ করলাম। আর কিছু বলবার আছে তোমাদের?"

রজত বলল—"শুধু এইটুকু যে সরস্বতী লক্ষ্মীর ওপর চটা। আমিই অবশ্য লাভে রইলাম, শেষ পর্যন্ত, তবু কথাটা তো সত্যিই।"

একটু হাসি উঠল। প্রশান্ত বলল—"একবার অনাথের মতটা নেবেন না?"

অর্থাৎ যেন নেওয়াতেই চায় মাইনেটা। অনাথ স্পষ্ট কিছু না বুঝলেও, সবাই হাসছে দেখেই হাসিমুখে ফিরে যাচ্ছিল, লাহিড়ীমশাই বললেন—"ও-ব্যাটার সদ্য পাঁচটা টাকা যে বাঁচল, এইতেই খুশী। কত যে ডুবল আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবে?"

একটা ঘর ফাটানো হাসি উঠল।

ও'র মনটা খুব প্রসন্ন। বিশাখার মাইনেটা যে নিতে হবে না এতে যেন আরও প্রসন্ন হয়ে উঠলেন দিনদিন। মনে আছে একদিন স্বাতি প্রশান্তকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিল—সংস্কৃত সাহিত্যই বাবার মনটা ভেতরে ভেতরে সরস ক'রে রেখে ও'কে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ও'র ওপর দিয়ে যে ঝড়-ঝাপটা গেছে, অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত।…… আজকাল মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গতায় আর গভীর নির্ভরতায় যেমন নিজেদের জীবনের এখানে-সেখানে পর্দাটা একটু ক'রে তুলে ধ'রে আবার তখনি সতর্ক হয়ে গিয়ে নামিয়ে দেয়।

সেই সরসতাটুকু আবার আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। স্বাতি না বললেও প্রশান্ত তো সব জানেই। দেখে বিস্মিতই হয়, পেছনের সবটুকুই জীবন থেকে মুছে ফেলে যা পেলেন তাই দিয়েই যেন নূতন জীবন গ'ড়ে তোলবার আনন্দে লীন হয়ে আছেন লাহিড়ীমশাই।

যা ছিল তার কাছে অকিঞ্চিৎকরই; তবু নূতন জীবন যা দিল তাই বা কম কি? প্রাচুর্য নেই, তবে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। যা নিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন চিরদিন—বিদ্যা, তা অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়েছেন, একটা সুদূর-প্রসারী পথই খুলে গেছে জীবনের সামনে। তারপর এই প্ল্যানিটুকু গেল মুছে—বিশাখাকে পড়াবার জন্যে টাকা নেওয়া।

আরও আছে। সে যে আবার এই নব-জীবনের কী অপূর্ব দান—ভাবতে গেলে সে আনন্দের যেন কূল খুঁজে পান না লাহিড়ীমশাই। স্বাতি-প্রশান্তর সম্বন্ধ, সেটা দিন দিনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সন্দেহাতীত হ'য়ে উঠেছে। বাপের বুকের এ আনন্দ যে কী আনন্দ! কথাটা এখন সবাই জানে। এখানে জানে, কলোনিতে জানে, বাবলায় পর্যন্ত জানে সবাই যে, হেডমাস্টার মশাইয়ের মেয়ে স্বাতি-ঠাকরুণের সঙ্গে পুল-কলোনির বড় সায়েবের বিয়ে ঠিকঠাক; কবে না হয়ে যাচ্ছে।……হঠাৎ বাইরে থেকে এসে বিশাখার ঠাট্টা শুনে বাইরে তাঁকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়েছে কিছুক্ষণ। অনাথ তো প্রায়ই বকুনি খাচ্ছে। কখনও গয়নার প্যাটার্নের কথা তুলে, কখনও আরও উদ্ভট কিছু।…… নিয়ম হিসাবে প্রশান্তর জীপ ওকে আফিসে পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টা খানেক পরে বিশাখাকে স্বাতিদের বাড়ি নিয়ে যায়। তারপর তাকে নামিয়ে বাবলায় চলে যায় লাহিড়ীমশাইকে নিয়ে আসতে। একদিন কাজ না থাকায় তার আগেই বাড়ি ফিরে বারান্দায় পা দিয়েছেন, বিশাখার গলার আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালেন। সেও মাত্র এই এসেছে, বোধহয় উঠান পর্যন্ত যায়নি, হাসির দমকে দমকে বলে যাচ্ছে—"ও স্বাতিদি, কোন্ চুলোয় গেলে—শীগ্গির এসো— আমি পেট ফুলে মলুম।……শুনেছ?—কাল নাকি অনাথ-কাকা জ্যাঠামশাইয়ের কাছে কষে ধমক খেয়েছে—বাড়িতে নাকি দুটো নতুন কোঠা ঘর তোলবার কথা বলতে গিয়ে-

ছিল......কেন রে? হঠাৎ নতুন ঘর?... বলে ইন্‌জিয়ার-জামাইবাবুর জন্যে—তোমাদের বাড়ির রেওয়াজ নাকি জামাইকে ঘরজামাই ক'রে রাখা... ধমক খেয়ে আবার সেকথা নাকি 'প্রশান্তদাকে গিয়ে বলেছে—প্রশান্তদা বলেছেন দাদাকে—শুনে পর্যন্ত আমার যে কি করে কাটছে—কখন্‌ রাত পোয়াবে—স্বাতিদিকে বলব খুড়ো-ভাইঝির চক্রান্ত ক'রে প্রশান্তদা'কে পিঁজরেয় পোরবার কথা—উফ!—বাবাগো!—হ্যাঁ স্বাতিদি'—সত্যি?......"

এতদূর পর্যন্ত নিশ্চিত।

লাহিড়ীমশাইয়ের মনটা সরস হোক, কিন্তু ভাবালু প্রকৃতির মানুষ নয় তিনি কোন কালেই। তবু এ-আনন্দের জন্য দোসর খোঁজেন, কোনও নিভৃত চিন্তার মধ্যে স্বাতির মায়ের জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, চক্ষু হয়ে ওঠে সজল।

॥ বাইশ ॥

শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি; বৎসর প্রায় পূর্ণ হয়ে এল।

কদিন ধরে একটানা বৃষ্টি চলেছে। প্রবল বন্যায় কূল ছাপিয়ে উঠে পড়েছে নদী। কাজকর্ম প্রায় বন্ধ।

বিকেলবেলা, তবে চেহারাটা হয়েছে যেন সন্ধ্যার মতো। বাড়ির পেছনে একটা ছোট আগাছার ঝোঁপে একটা ঝিঁঝি অবিরত ডেকে যাচ্ছে।

বারান্দা থেকে দূরে নদীর খানিকটা দেখা যায়। একটা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে সেই দিকে চেয়ে বসে ছিল প্রশান্ত। বৃষ্টিটা একটু নরম হয়ে এসেছে, তা ভিন্ন হাওয়া উল্টো দিকে, ছাটটা বারান্দায় ঢুকছে না। মাত্র একটু আগে এসে বসল। হাতে একটা চুরুট।

এলোমেলো চিন্তা এসে জুটছে মনে, একটার সংস্পর্শে আর একটা।...... মা এসেছিলেন হঠাৎ। হঠাৎই মনে হোল, কিন্তু মা এসেছিলেন স্বাতিকে দেখে যেতে। ওখানে গিয়ে দেখেছেন, এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে দেখেছেন। এক-আধদিন নয়, দিন দশেক ছিলেন, তার সব কটাই এইভাবেই কেটেছে, অবশ্য বেশিভাগই এইখানে আমিয়ে।......মা যেন দো'টানার মধ্যে প'ড়ে গেছেন মনে হোল। এও এমন একটা ট্র্যাজেডী—এই অকাল-সন্ধ্যার সঙ্গের সাওয়া এমন মিলে গেছে যে, মনটাকে ঝিমিয়ে দিচ্ছে।

দোটানার অর্থ—স্বাতি তাঁর মনটা একেবারেই দখল করে নিয়েছে বেশ বোঝা যায়; সে তো নেবেই, স্বাতির মতো একটা মেয়ে। কিন্তু অন্য একটা টানও আছে, খুব ক্ষীণ, খুব প্রচ্ছন্ন হলেও যেন ধরা যায়। কথাটা হচ্ছে, প্রশান্তর বিবাহে মার মস্তবড় একটা আশা ছিল মনে। স্বাভাবিকই তো খুব, বাবা হঠাৎ অমন করে মারা গেলেন। প্রশান্তকে নিয়েই সামলে উঠছে সংসারটা। আর, এমন একটা ছেলে বিবাহের বাজারে! দোষ দেয় না প্রশান্ত। যাওয়ার সময় অবশ্য জোর ক'রে বলে গেলেন তিনি আশ্বিনের পর আর ঘর খালি থাকতে দেবেন না, তবু... অযথাই একটা বিষণ্ণতা ছেয়ে গেল মনে, যা হয়তো এই অকাল-সন্ধ্যা আর ঝিল্লীরবের সৃষ্টি-মাত্র।

মা থেকে মনটা বিশাখার ওপর গিয়ে পড়ল। সত্যি নাও হতে পারে, তবু এখানেও যেন কোথায় একটা কান্না লেগে রয়েছে—এই একটানা ঝিঁঝির সুরের

সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা মিল আছে। বিশাখাই চিঠি দিয়ে আনিয়েছে মাকে। বিশাখা স্বাতি আর প্রশান্তর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতভাবে পারছে দুজনকে কাছাকাছি আনবার প্রাণপণে চেষ্টা করছে। অথচ কোথায় যেন কিছু একটা আছেই এই চেষ্টার মধ্যে যা হাসির সঙ্গে চোখের জলের মতো করুণ। কবে একটা বাংলা নভেল পড়েছিল—তাতে একটা মেয়ে নিজের দয়িতকে অন্য একটা মেয়ের হাতে তুলে দিল। বড় মর্মন্তুদ ব্যাপারটা। অবস্থা-চক্রে প'ড়ে বঞ্চিত হওয়া এক, আর নিজের হাতে হাসিমুখে তুলে দেওয়া এক। বড় জটীল ব্যাপার। ইনজিনীয়ার মানুষ, বুঝত না এসব, বোঝেও না এখনও অত। হয়তো কিছুই নয়ও, বইটা পড়েছিল বলেই মনে হচ্ছে এরকম।

হয়তো বা সত্যিই কিছু গেছে থেকে। একটা জিনিসের এক সময় যেন আঁচ পেয়েছিল একটু প্রশান্ত। তাকে নিয়ে রজত যেন কিছু এ-বিষয়ে আশা পোষণ করত। ভাইয়ের সেই আশা বোনের মনে কি সংক্রমিত হয়নি? তার রেশ মনের কোথাও কি আটকে নেই?... চাপা মেয়েদের বোঝা আরও শক্ত।

বড় শক্ত এসব। বড় করুণ। ভাবতে চায় না প্রশান্ত। কিন্তু কি আছে আজকের এই স্তিমিত বর্ষার মধ্যে, এই অকাল-সন্ধ্যার নিসঙ্গতায়— সরাতেও পারছে না চিন্তাগুলো।...... রেডিও শুনছিল, বন্ধ করে দিয়ে এসে বসেছে। একটা কীর্তন, মাথুর। সখী বিশাখার শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূতালি। গঞ্জনা, ভর্ৎসনা, ধিক্কার; রাধার কি অবস্থা করেছে সে—নিঠুর শ্যাম!......ঐ থেকেই বোধহয়—শুধু নাম-সাদৃশ্যেই বিশাখার কথাটা এত বেশি করে মনে পড়ছে আজ...... রাধার সখী কি শুধু রাধার হয়ে দূতালিই ক'রে গেল চিরদিন? সম্ভব কি ছিল সেটা?

দিন চারেক আগের আরও একটা ছোট্ট ঘটনা। তখন মা ছিলেন, আসার সুবিধা ছিল বিশাখার. প্রায়ই আসত। হঠাৎ বৃষ্টির একটু ধরন পেয়ে এসে উপস্থিত সেদিন।

"চলুন, স্বাতিদিকে নিয়ে আসি প্রশান্তদা।"

"হঠাৎ!"—বিস্মিত হয়ে চাইল প্রশান্ত।

"বড় একলা একলা বোধ হচ্ছে। না হয় ওখানেই যাই চলুন। তাও না হয়, এ পোড়া বিষ্টিটা থামিয়ে দিন কোন রকমে। ইনজিনীয়ার মানুষ তো; কত কি তো করছেন আপনারা।"

গাড়িতে উঠে বলল—"না, আমায় নামিয়েই দিয়ে যান বরং।"

"কেন?" আবার বিস্মিত প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"কেন......তা......" —একটু টেনে বলল বিশাখা। "মা একলা রয়েছেন তো। দাদাও হাসপাতালে।"

কী সব রহস্যময় যেন। ওকে এসব নিয়ে কখনও যে মাথা ঘামাতে হবে তা ভাবতে পারেনি।

আরও একটা কথা—ওর মনও কি একেবারে মুক্ত ছিল? কখনই কোন রেখাপাত করতে পারেনি কি বিশাখা?...... এখন অবশ্য সবটুকুই স্বাতি।

স্বাতিতে এসে মনটা একটা যেন আশ্রয় পেল। একটা স্বস্তি, তাই থেকেই ওভারসিয়ারের ভাই বিমানও এসে পড়ল—সে সেদিন পুলের দিকে তাদের নৈশ অভিযানের সাথী হয়েছিল; যাকে টেনে বিশাখাকে সেদিন অত কথা বলল স্বাতি। এও তো হতে পারে—দুই সখীতে একত্র হলে বিমানের কথা ওঠে বলেই স্বাতির কাছে যেতে চেয়েছিল বিশাখা, যেমন প্রশান্তর কথাও হয় নিশ্চয়। প্রশান্ত মনে মনে বলে—তাই হোক; হে ভগবান তাই যেন হয়।

অনাথ এসে উপস্থিত হোল।

অনাথ এল, স্বাতি যখন পূর্ণভাবে মনটা দখল ক'রে ফেলেছে। অবশেষ তো কিছু রাখেও না স্বাতি। কোথাও একটু সংশয় থাকে না। একটা বেদনা থাকে, কিন্তু সে এমনি এক বেদনা, যে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে ইচ্ছে করে তার মধ্যে।

আজ আবার যেন আরও পরিপূর্ণ করে আনছিল; এই ভরা বর্ষা, ভরা নদী, চারিদিকে বর্ষাপুষ্ট গাছপালার এই ভরা সবুজের মতোই। একটা বেদনাও আছে বৈকি, শূন্য ঘরের বেদনা, কিন্তু তাও এত মিষ্ট! তার মধ্যেই ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল প্রশান্ত, হঠাৎ হালকা বৃষ্টির শব্দর ওপরে একটা পতপত আওয়াজ শুনে রাস্তার দিকে চাইতে দেখল, মাথায় একটা বড় টোকা দিয়ে অনাথ আসছে। হাতে রেশন-ব্যাগটা।

"তুমি যে হঠাৎ, অনাথ? আজ তো হাটবারও নয়।...... খবর ভালো তো?"

অনাথ রেশন-ব্যাগটা দেয়াল ঘেঁষে রেখে টোকাটা ঝেড়ে তার ওপর ঠেস দিয়ে রাখল। একটু তফাতে হাঁটু মুড়ে দুটো হাত একত্র ক'রে বসতে বসতে বলল—"খবর ভালো।...... মা-মণি বললে—একবার দেখে আসবে না অনাথকাকা?"

কথাটা প্রায়ই বলে। কেমন একটু বেসুরো লাগে কানে, তাই একদিন একটু ঘুরিয়ে জিগ্যেস করেছিল স্বাতিকে প্রশান্ত। স্বাতি প্রায় শিউরে গিয়ে দিব্বি গেলে ব'লে উঠেছিল—"মাইরি বলছি বলিনি আমি! আমার কি গরজ!"

—সঙ্গে সঙ্গে নিজের অদ্ভুত মন্তব্যেই বিপর্যস্ত হয়ে বলেছিল—"কী পাগল বলুন তো অনাথকাকা!"

পরে একটু হাসিও উঠেছিল। কিন্তু বারণ করে দেওয়াও হয়নি, কোথা থেকে যেন একটা কুণ্ঠা এসে পড়ে। এখন আর অনাথের ও-কথাটা ধরে না প্রশান্ত।

তবু আজ ভাবটা অন্যদিনের চেয়ে যেন একটু আলাদা। উঁকি মেরে ঘরের ভেতর দিকে বার দুই দেখল। বার দুই টোকাটার দিকেও। কি বলবে প্রশান্তও যেন বুঝে উঠতে পারছে না। পরে একটা কিছু বলবার জন্যেই যেন প্রশ্ন করল—"একটু চা দেবে? দিকই না, কি বল?"

"চাটুজ্যে মশাই আছেন নাকি?"—এমন ভাবে প্রশ্নটা করল একটু চকিত হয়ে যে এটাও বেশ খাপছাড়াই মনে হোল প্রশান্তর। অনেকটা যেন না থাকলেই ছিল ভালো। প্রশান্ত হেঁকে চাটুজ্যেকে দু'কাপ চা করে দিতে বলে দিল।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটুকু যেতে চাইছে না। এই সময় বাতাসটা হঠাৎ পাক খেয়ে ভেতরের দিকে ঘুরে পড়ায় টাটকা ফুলের গন্ধ ম-ম করে উঠল সমস্ত বারান্দাটায়। গন্ধটা ছিলই একটু একটু, অনাথের সঙ্গে এসেছে, তবে অন্যমনস্ক থাকায় অতটা খেয়াল হয়নি। একটা বলবার কথা পেয়েই যেন প্রশ্নটা করল প্রশান্ত—"থলেয় ফুল নাকি অনাথ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—একটু নড়েচড়ে বসল অনাথ।

"জুঁইয়ের গন্ধ মনে হচ্ছে। নিয়ে এলে, না, হাসপাতালের বাগান থেকে নিয়ে যাচ্ছ?"

অনাথ কিছু উত্তর না দিয়ে উঠল। একবার বাড়ির ভেতরের দিকে সেইভাবে

চেয়ে নিয়ে ঢোকাটা সরিয়ে ব্যাগটা নিয়ে এল, তারপর তাই থেকে একটি মাঝারি গোছের জুঁইফুলের গোড়ে বের করে তুলে ধরল, মুখে একটু একটু হাসি, একটু গর্বের ভাব, মনে হয় যেন সংকোচও তার সংগে।

"বাঃ, চমৎকার মালাটি তো!......"

—মালার প্রশংসাতেই কণ্ঠস্বরটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে হঠাৎ সংগে সংগে একটু খাদে নেমে পড়ল; আমতা আমতা করেই প্রশান্ত বলল—"কে গাঁথল?—মানে...তুমি এমন সুন্দর মালা গাঁথতে... না, কিনলে?......"

"কিনব! কলকাতা শহর কিনা!"—চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অনাথের ......আর এ-মালা অনাথ আবাগের-ব্যাটার কাঠখোট্টা হাত দে বেরুবে!"

"তবে!......" কি যেন শুনতে হবে সেই ভয়ে গা'টা সিরসির করে আসছে।

অনাথ শুরু করেছিল—"মা-মণি ভেন্ন এমন মালা......"

"পাঠিয়ে দিলেন এখানে!......... আমায়!......"

"থলের ফুল নাকি অনাথ?"

—কথাগুলো মুখ দিয়ে বের করতেও যেন মাথা কাটা যাচ্ছে প্রশান্তর। এ কী ক'রে বসল স্বাতি হঠাৎ! শরীরটা ঝিম-ঝিম করে আসছে। সম্ভব হয় কি ক'রে? স্বাতি—এত শিক্ষিতা, সবচেয়ে বড় কথা, এত যার সূক্ষ্ম মাত্রা-বোধ, সে হঠাৎ কি করে এমন একটা বিসদৃশ কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। হাত বাড়িয়ে নেবে কি ক'রে? না নিলে অনাথের কাছেও যে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা......

চাটুজ্যে চা নিয়ে এল। আরও যেন মাথা কাটা গেল। হাতে করে চা নিতে মালা নেওয়া না-নেওয়ার প্রশ্ন বন্ধ থেকে গুছিয়ে ভাববার একটু সময় পেয়েছে, অনাথ মালাটা একটু তুলে ধরে চাটুজ্জেকেই প্রশ্ন করল এবার—"কেমন হয়েছে গো চাটুজ্জোমশাই?"

কি বলবে ধাঁধায় পড়ে কোনরকমে 'ভালোই তো, তুমি চা খেয়ে লাও" বলে চাটুজ্যে সরে পড়বে, অনাথ বলল—"দ্যাবতার জন্যে পাঠ্যে দিলে মা-মণি।"

একটা অসহ্য অবস্থা যাচ্ছে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও চাটুজ্জ্যের কুণ্ঠিত দৃষ্টিটা মনিবের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। কোনরকমে আর একবার "তা মন্দ কি?"—বলে তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়েছে, প্রশান্ত এ-প্রসংগটা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই বলল—"তা বেশ, রেখে দাও ঘরে।"

একটু থতমত খেয়ে গিয়ে অনাথ প্রশ্ন করল—"পরিয়ে দেবেন না দ্যাবতাকে?"

"দেবতা!"—'দেবতা' সে নিজে নয় জেনে আশ্বস্ত হ'লেও বিস্মিত-ভাবেই প্রশ্ন করল প্রশান্ত। "দেবতা কোথায় এখানে?"

কোমর পর্যন্ত বেঁকিয়ে ভেতরের দিকে চাইল অনাথ, বলল—"উই যে ঘরে বিরাজ করছেন।"

যতটা পারল সমীহ করেই বলল—"আলো করে রয়েছেন ঘর।"

তবু আবিষ্কার করতে না পেরে বিস্মিতভাবেই ওর নির্দেশ লক্ষ্য করে প্রশান্ত বলল—"কৈ দেখাও তো। এসো।"

বারান্দার শেষে বৈঠকখানা; তার ওদিকে একটা ছোট ঘর। কোচ-চেয়ার-টেবিল ঘরে প্রশান্তর পেছনে পেছনে অগ্রসর হতে হতে অনাথ বলে যাচ্ছে—"সেখেনকার মতন এখেনেও দ্যাবতা রয়েছেন জেনে—চাটুজ্জোমশাই আমায় সিদিন বললে কিনা—তাই মা-মণি কদ্দিন থেকে বলছে—মালা করে দোব অনাথ-কাকা, নে' যেও। তা ফুরসতও ছেল না—আর মনের মতন মালা গাঁথবে তার ফুলও তো ছেল না......সেই যে চাটুজ্জোমশাই বললেন না সিদিনকে?... অবিশ্যি শিবঠাকুরও, কেন্টঠাকুরও নয়, আমাদের দ্যাবতার মতনই—তবু তো..."

মখমল-ঢাকা সেলাইয়ের কলটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল হাতজোড় করে মাথাটা হেঁট ক'রে।

চাটুজ্যে দেরি দেখে নিজেই কাচের গেলাসে করে চা নিয়ে আসছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর পা টিপে পিছু হটিতে-হটিতে সরেও পড়ল। পেটের হাসি চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়েছে, তবু কি মনে হোল প্রশান্তর, ঢাকনাটা আর খুলল না। অনাথকে বলল—"তা রেখে দাও মালাটা ওর ওপরই।......চা'টা খেয়ে এসো তাড়াতাড়ি, তোমাদের ওখানেই যাব একবার।"

বারান্দায় ফিরে গিয়ে দুলে দুলে হাসল এক চোট। একটা কুটীল সমস্যা মিটে গিয়ে, হাসিটা যেন আরও তোড়ে বেরুতে চাইছে।...... আর, এ-হাসির সাথীও চাই একজন।

(ক্রমশঃ)

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছোট্ট একটা গলি—দুপাশে স্যাঁত-সেঁতে অন্ধকার ঘর, ভেতরে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। তার থেকে যে পরিমাণ কার্বন বিষ ওঠে, গোটা রাত নাকের ভেতর ঢুকলে আমাদের সকলেরই এক-সঙ্গে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। ঐ রকম ঘটনা হামেশাই সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। আগন্তুকদের অভ্যর্থনায়, প্রত্যেক চটীরই এখানে-সেখানে দড়ি-বাঁধা ছাগল-ভেড়ার দল সমস্বরে যে যার বুলি ছাড়তে থাকে। আমাদেরও তাদের সামিল করে নিতে চায় কিনা কে জানে! চটীর মালিকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা—কেউ ডাকে, এইদিকে আসুন, ভাল থাক-বেন। আবার কেউ হাতের তিন আঙ্গুল নাচিয়ে ইশারা করে, আমার চটীতে বহুত আরাম। কিন্তু ব্যারামের আশঙ্কায় আমরা সবাই ভটস্থ হয়ে উঠলাম। অবশেষে সেই ছাগল-ভেড়ার দলকে বাঁশ দিয়ে ঘিরে এক কোণে সরিয়ে দিয়ে আমরা সেই চটবিছানো খোপগুলিতে নিজেদের আস্তানা পাতলাম। সেগুলিকে আর ঘর বলে না, এক-একটা যেন বড় রকমের পায়রার খোপ। সঙ্গে আমাদের যা খাবার ছিল, কেউ খেল, কারও বা খাওয়ার প্রবৃত্তি হ'ল না। রাত কাটানোই প্রধান সমস্যা। কাজেই, যে যার নিজের গরজে এঘরে সেঘরে বিছানা পেতে নিলে। আমি ও নীরেন ঐরূপ আলাদা একটি অবর্ণনীয় কক্ষে শ্রান্তদেহে আপনাপন শয্যায় লুটিয়ে পড়লাম। এখানেই ঠাণ্ডা পেলাম বেশ। কোণ থেকে ছাগল ভেড়া ডেকে উঠল।

ভোরে উঠেও সেই ছাগল-ভেড়ার ডাক। নীরেনকে ঠেলে তুলে গান ধরি—

ও সে ভেড়ার ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি
ছাগল ডাকে জেগে!

নীরেনের দীর্ঘশ্বাস ও খেদোক্তি—

—তা বটে, খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হলেও ওদিকে আর নজর দেবার উপায় নেই—অন্ততঃ হরিদ্বারে পা দেবার পর থেকে।

এগারোই অক্টোবর। প্রত্যূষেই চা না পেলে শুধু নীরেন কেন, অনেকেরই মাথা ধরে। আমারও দুধ না পেলে তদ্রূপ। তাই, মুখ হাত পা ধুয়ে, সব চায়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। চটীতেই চা ও দুধের নোংরা দোকান।

ডবল বাহাদুরের ডাক পড়তেই, সেও ডবল পা ফেলে হাজির। বেডিংপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ছ'জন কুলী আগেই রওনা হ'ল। সেখান থেকে গুপ্তকাশী আড়াই মাইল খাড়াই পথ। ছেলেদেরই হাঁপ ধরে যায়—বয়স্কদের তো কথাই নেই।

আমরা প্রস্তুত হলেও, আমাদের চার-জন ডাণ্ডীওয়ালা তখনও তৈরী হয়নি। যাবার সময় গুণেন বার বার আমাকে শুনিয়ে গেল—

—জানেন তো, আপনার করোনারি এ্যাটাক হয়েছিল, মাস কয়েক বিছানায় শুয়েছিলেন। এই খাড়াই পথ, এক পা'ও যেন হেঁটে আসবেন না। তারপর বয়সের কথাটাও মনে রাখবেন।

ডাক্তার তার লম্বা-চওড়া উপদেশ ও বক্তৃতা সাঙ্গ করে লোহার শূল-লাগানো একটা দীর্ঘ বাঁশের লাঠি নিয়ে এগিয়ে গেল, তার সঙ্গে গণেন, অনুজা, সেই বৃদ্ধা ঝি আর দুই ভৃত্য রতি ও ঘোঁতা।

একদিন শিকারের জন্যে কত দুস্তর জঙ্গল, কত বিপদসঙ্কুল পার্বত্যপথ অতিক্রম করেছি—কিন্তু আজ?

বয়সের শাসনকে মন মেনে নিতে চাইলো না। আমিও অনুরূপ একটি লাঠি নিয়ে, নীরেনদের কাউকে কিছু না বলে, এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাই। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দেখি, সত্যিই খুব সঙ্কীর্ণ আর খাড়াই পথ। আমার পক্ষে হেঁটে যাওয়াটা অত্যন্ত কষ্টকর। তবু, আমার সেই ফেলে-আসা দিনের দুঃসাহসী মন এই অক্ষমতাকে স্বীকার করতে চায় না। বেলা ৯-৪৫ মিনিটে সেই পাক্কা আড়াই মাইল পথ খাড়া পাহাড় বেয়ে গুপ্তকাশীতে পৌঁছলাম। একটানা উঠে আসায় হাঁপও ধরেছে যেমন, ক্লান্তও হয়েছি ততোধিক। আমার

এবম্প্রকার অবস্থা দেখেই গুণেনের মুখখানা ভারী হয়ে উঠল। কিছু পরেই আমার খালি ডান্ডী আর তিনখানা বোঝাই ডান্ডী এসে হাজির।

সকলের পাল্লা করে আমার ওপর অজস্র বাক্যবাণ শুরু হয়। অনুজার মা রেগে আগুন, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে ফিরে যাওয়ার জেহাদ ঘোষণা করেন। 'বড় বহিন'কে বুঝিয়ে ঠান্ডা করার ভারটা পরিমলের ওপর দিয়ে কিয়ৎকাল আমিও গা-ঢাকা দি।

যথারীতি মেয়েরা তাড়াতাড়ি ডাল-ভাত লুচি তরকারি তৈরী করে নিলে। গরম জল এক এক বালতি নগদ মূল্য বারো আনা দিয়ে কারও বা কাক-স্নান, কারও বা তৈল-বিমর্দনান্তে বিলম্বিত স্নান। আমিও বিলম্বিতের দলে। স্নানান্তে শঙ্কর ভগবান দর্শন। গুপ্ত-কাশীর ছোট্ট বাজারে পুজোর উপকরণ সবই পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে, কেউ পঞ্চোপচারে, কেউ দশোপ-চারে পুজো দিলে। আর একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার বিষয়। তীর্থযাত্রীরা গুপ্তভাবে দান করে। বস্ত্রাচ্ছাদিত একটা পেতলের গেলাসে অভিরুচি অনুযায়ী অর্থ রাখা হয়। কে কত দিলে, কেউ কাউকে বলবে না, এই যা সুবিধে। পুজোর পর সবার মুখেই একটা তৃপ্তির ভাব দেখা দিলেও, যখন একসঙ্গে সব খেতে বসা গেল, আমি তখনও অপাঙক্তেয়; আমার সেই হেঁটে-আসাটা কেউ ক্ষমাসুন্দর চক্ষে মেনে নেয়নি।

এখন ঘোড়া ঠিক করার পালা। যে পরিচারিকা গুণেনকে আঁতুড় ঘর থেকে মানুষ করে তুলেছে, সেই আয়ার জন্যে একটি কান্ডী ঠিক করা হ'ল। কান্ডী-ওয়ালা দাবি করলে, সামনের চাল-ডালের দোকান থেকে আয়াকে তুলাদণ্ডে মেপে দু'টাকা সের হিসাবে ওজনের সঙ্গে গুণ করে তবে মাইল প্রতি ভাড়া নির্দিষ্ট হবে। বুড়ী ঝির ভয়াবহ আপত্তি—সেখানেই একটা খণ্ডযুদ্ধ। চাল-ডালই ত' ওজন করা হয়, মানুষ আবার ওজন হবে কী? ওতে নাকি পরমায়ু কমে যায়। গুণেন ডাক্তার, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাই তার কাজ; তাই বাধ্য হয়েই তাকে তার আয়ার এই ইচ্ছাটি মেনে নিতেই হ'ল। সকলের মধ্যেই হাসির একটা তুমুল তুফান ওঠে—লাভের অঙ্কে দেখা গেল, মেঘ কেটে গিয়েছে—আমার প্রতি সকলের বিরূপ মনোভাব এতক্ষণে স্বরূপে এসে দাঁড়ালো। কান্ডীওয়ালার কান্ড দেখে, আমরা তাকে বর্জন করলাম।

গুণেন, গণেন আর অনুজা, দুই ভৃত্য রতি ও ঘোঁতা এবং বুড়ী ঝি'র জন্যে গুণেন ছ'টা ঘোড়া ঠিক করে নিলে। প্রত্যেক ঘোড়ার ভাড়া মাইল প্রতি নগদ চৌদ্দ আনা—পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা নয়।

আয়াকে ঘোড়ার সঙ্গে ওপর নীচ দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হ'ল, যাতে ডিগবাজি না খায়।

গুণেন, গণেন ও অনুজা ঘোড়ায় উঠতেই, ভৃত্য দুটিও অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসল; দেখে মনে হয় যেন মহম্মদ তোগলকের শাগরেদ দুই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা পাহাড় ডিঙিয়ে চীন অভিযানে চলেছে।

আমরাও চারজনে ডান্ডীতে উঠে বসলাম। জীবনের তটপ্রান্তে এসে স্কন্ধে আরোহণ এই প্রথম। উঠবার সময় ডান্ডীওয়ালারা আওয়াজ দিলে, জয় কেদার বোঢা কী জয়! পরে তাদের কাছেই কসরত করে জেনে নিলাম—বোঢা মানে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ কেন? যাঁর দর্শনে চলেছি, তিনি কী বৃদ্ধ না চিরতরুণ?

তরঙ্গিত হিমালয়ের শান্তগম্ভীর মৌনতাই কী তার অধিপতিকে বৃদ্ধত্বে অভিষিক্ত করেছে, অথবা বৈচিত্র্যময় জীবনের চিরনবীন, চিরতরুণ শিব-স্বরূপ রূপটিকেই মানুষ পরমাত্মীয়-রূপে 'কেদার বোঢা' এই স্নেহ-সম্ভাষণে অভিনন্দিত করতে চায়!

গুপ্তকাশীর মন্ত্রগুপ্তির কবল থেকে মুক্ত হয়ে, আমরা ব্যাপ্তির পথে রওনা হ'লাম।

ডান্ডী চলে, পশ্চাতে অশ্বারোহী ও পদাতিক কুলী। মাইল খানেক এগিয়ে যাওয়ার পরই পেছন থেকে ডাক এল, "মৎ যাও, লৌট্ আও"—একবার নয়, বার বার।

এ কী? যাবার বেলা পিছু ডাকে।

তবে কী মত-পরিবর্তন হ'ল? আজকের যাওয়াটা কী স্থগিত? মনে হ'ল গুণেনের কণ্ঠস্বর। আবার ডাক আসে পেছন থেকে—মৎ যাও, আজ

লোট্ আও। আবার সেই সতর্কবাণী! চারজন ডান্ডীওয়ালাও বার বার সেই ডাক শুনতে পায়। প্রথমে তারা কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না—অগত্যা বাধ্য হয়েই বিশেষ বিরক্তি ভাব নিয়ে ডান্ডীবাহীদের প্রত্যাবর্তন।

আমাকে দেখেই গণেনের প্রশ্ন—

—আবার ফিরে এলেন কেন?

—কী রকম? তোমরাই তো ডাকলে!

—কৈ, না।

—তবে বার বার এ ডাক কোত্থেকে এল? তোমরা তো নীচেই আছ। আমরা সবাই শুনলাম, অথচ তুমি শুনতে পাওনি?

—কৈ, না। রাস্তায় তো কেউ নেই, আমি আর গণেন ছাড়া কে ডাকবে?

উপায়বিহীন। ঘণ্টাখানেকের ওপর ঠায় ভিজে, প্রায় পৌনে সাতটায় ফাটা চটীতে পৌঁছনো গেল। দুর্জয় শীতে সবাই থর থর করে কাঁপছে। সঙ্গে খাবার ছিল—কিন্তু কেউ মুখেও দিলে না—সবাই অল্প-বিস্তর অসুস্থ। ঘরের এক কোণে নীরেন গুটিসুটি হয়ে বসে আছে, যেন ভিজে বিড়ালটি।

আমারও দারুণ গাত্রকম্প—তার-পরেও বিভ্রাটের পর বিভ্রাট, কুলীরা তখনো এসে পৌঁছোয়নি। কাজেই ভিজে কাপড় ছেড়ে যে গরম কাপড় গায়ে দিয়ে নেব, তারও উপায় নেই। তাছাড়া, গণেনের ওষুধের বাক্সও ডবল বাহাদুরের জিম্মায়—তাঁরা যতক্ষণ না শুভাগমন করেন, আমরা সবাই ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে আছি। ধুকের

মাইল পথ উঠে আসা, করোনারি পেশেন্ট আমি, কিসের আকর্ষণ আমাকে এই দুর্জয় শক্তি ও বেপরোয়া সাহস যুগিয়েছিল? দেহকে অস্বীকার করে, ইচ্ছা-শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলাম—সেটা আমার পক্ষে উচিত কী অনুচিত জানি না, কিন্তু এই যে আত্মীয়-পরিজন আমার ওপর বিরূপ হয়ে উঠল এটা তাদের ভালবাসায় অভিমান হলেও, তাকে উপযুক্ত মূল্য দেবার কথা কেন ভুলে গেলাম, কিংবা আমার নিজের ইচ্ছা আর কোনও ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়েই আমাকে এই পার্থিব স্নেহ প্রীতি ভালবাসার প্রতি ক্ষণিকের জন্য উদাসীন করেছিল কিনা কে জানে!

আর ওই যে সতর্কবাণী—'মৎ যাও, লোট্ আও'—আর কেউ শুনতে পেল না, শুধু আমি আর চারজন ডান্ডীওয়ালা ছাড়া—এই বা কী এবং কেন? কার বাণী? এ কী কোনও মহাপুরুষ পর্বত-কন্দরে বসে এই মঙ্গল-কামনা করলেন, অথবা সে কী কোনও অশরীরী ভাবধারা যা এই তীর্থপথে আমাদের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে? তারই কোনও সূক্ষ্ম আলো-তরঙ্গ শব্দতরঙ্গে রূপায়িত হয়ে আমাদের নির্দেশ দিয়েছিল—আমাদের পরিচালিত করেছিল? যাই হোক না কেন, সমস্ত মিলে আমার কাছে কী যেন একটা প্রহেলিকার মতই মনে হ'ল।

মনে মনে কত রকম এই সব চিন্তার ঊর্ণনাভ রচনা করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি, জানি না। পরে শুনেছিলাম, ডবল বাহাদুর তার কুলীবাহিনী ও মাল-পত্র সমেত ঘণ্টাদুই পরেই এসেছিল—কিন্তু আমাকে আর সেই রাত্রে কেউ জাগায়নি।

ফাটা চটী

ডান্ডীবাহীরা ডান্ডী ফিরিয়ে আপন মনেই বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলতে থাকে। আমিও এই অজানা ডাকের এলোমেলো চিন্তায় ডুবে যাই। এ কী অদ্ভুত রহস্য!

বেলা পাঁচটায় বিউং চটীতে একটু দাঁড়ালাম। যে যার অভিরুচি অনুযায়ী চা দুধ ইত্যাদি খেয়ে নিলে। বেচারা ডান্ডীওয়ালাদেরও খাইয়ে দিলাম।

আকাশে ঘন মেঘ, তা সত্ত্বেও আমরা তিরিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই ফাটা চটীর অভিমুখে রওনা হলাম। মাঝপথে ঝুমঝুম বৃষ্টিধারা নেমে এল আর সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল বাতাস।

আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। ওয়াটারপ্রুফ নেই—সব দিক দিয়েই

মধ্যেও কেমন একটা কনকনে ব্যথা হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠল। অগত্যা ফাটা চটীর দোতলার একটা ঘরে ভিজে কম্বল বিছিয়েই আমাকে শুইয়ে দিলে। ঠান্ডা শরীরটাকে গরম করে নেবার জন্যে যে একটা সিগারেট টানব, তারও উপায় নেই। গণেন ডাক্তার চোখ রাঙিয়ে বসে আছে—এ অবস্থায় ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ। আমি চা খাই না—তবুও ঔষধার্থে কড়া দুধবিহীন এক কাপ গরম চা গণেন একটু একটু করে আমাকে খাইয়ে দিলে। চা-অনভ্যস্ত দেহে সেটা ওষুধের মতই ক্রিয়া করে।

শুয়ে শুয়ে চিন্তা করি, আজ গোটা দিনটাই যেন একটা বিপর্যয়। সকালে কারও নিষেধ না শুনে, সেই খাড়া আড়াই

সেই ভিজে ঠান্ডা কম্বলের ওপর সুনিদ্রা সম্ভব না হলেও, গোটা রাত ঘুমিয়েই কেটে গেল। ভোরের দিকে হঠাৎ একটা ডাক কানে আসতেই, চোখ মেলে সামনে এক জোড়া পুরু মোটা কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে দুটি চোখ দেখতে পেলাম। সমস্ত মাথাটিকে মোটা আলোয়ানে মুড়ি দিয়ে শ্রীমান নীরেন তারা আমাকে ঠেলে তুললে।

১২ই অক্টোবর। ফাটা চটীর ফাটা প্রভাব। এক রাত্রির মধ্যেই, আমাদের সবারই হাত পা মুখ ফেটে চৌচির। সবাই মিলে যদি মণখানেক ক্রিমও মাখে, তাহলেও সেই ফাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ভোর ছ'টায় উঠে বেশ সুস্থ বোধ করলাম। ইতিমধ্যে সবাই ভোরের কাজগুলি সেরে নিয়েছে। চা দুধ

কুণ্ড চটী

খাওয়াও শেষ। আমিও এক গ্লাস গরম দুধ পান করে প্রস্তুত হই। কথায় আছে ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। আগেই আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, তাই আমাদের যাত্রার পূর্বেই মালবাহী কুলীদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তারা যেন গৌরীকুণ্ডায় গিয়ে অপেক্ষা করে। আমরা ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শন করে সেখানে পৌঁছে যা'ব।

গুপ্তকাশী থেকেই নাগেশ্বর পাণ্ডা আমাদের পিছু নিয়েছে আর সারাপথ ত্রিযুগী নারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আমাদের মনকেও তৈরী করে নেবার সাধ্য-সাধনা করে চলে। হরপার্বতীর বিয়ে সেখানেই হয়েছিল, আর তিন যুগ ধরে সেই যজ্ঞের আগুন এখনও জ্বলছে —এই তার বক্তব্যের সারাংশ। মানুষের সংশয়ী মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। জ্ঞান এসে ভক্তির পথে যুক্তির বাধা সৃষ্টি করে, ভক্তি সোজাসুজি মনের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে বিচারকে ওলটপালট করে মুক্তির নির্দেশ দেয়—তাই, ভক্তির পথেই জীবনদেবতাকে এত আপন করে পাওয়া যায়। নইলে, এত দুঃখ, এত কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করে কাতারে কাতারে লোক ছুটে যায় কেন? ত্রিযুগী নারায়ণের দিকেও আমাদের মনের গতি যে নাগেশ্বর পাণ্ডার অনুকূলেই গিয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সেই রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই মন্দাকিনী আমাদের সঙ্গিনী হয়েছেন। তিনি আসছেন ওপর থেকে মাটির বুকে নেমে, আর আমরা চলেছি উজানে, পাথরের পথ বেয়ে ওপরে। তাঁর বুকে জেগে ওঠে পাহাড়ের গান, আর আমরা চলেছি মাটির আকুলতা নিয়ে সেই পাহাড়ের শিখরে। তিনি আসছেন কোন্ অনাদি সংগীত বুকে নিয়ে, আর আমাদের বুকেও তারি তরঙ্গ নিরন্তর দোলা দিয়ে সেই সংগীতের উৎসমূলে পৌঁছে দিতে চায়।

কাটা চটী ছেড়ে, ত্রিযুগী নারায়ণের পথে প্রথমেই রামপুর চটী। পৌঁছে দেখি, একটি অতিকায় মেদবহুল যাত্রীকে ডাণ্ডীতে ছ'জন বয়ে এনেছে। মাথায় রং-বেরং-এর পাগড়ি, গায়ে গলাবন্ধ কোট। চারজনের বইবার শক্তি নেই বলেই আরও দুজন। আগে ও পেছনের চারজন যখন হিমসিম খেয়ে যায়, তখন অতিরিক্ত দুজন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। পেছনের দুটি খালি ডাণ্ডীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে এনেছেন। চাল-চলনেও মাত্রাধিক বাহুল্য। স্ফীতোদর বিরাট ওজনসই বপুখানি বয়ে এনে কুলীরা তাঁকে মৃত্তিকায় নামিয়ে দস্তুর-মত হাঁসফাঁস করে। স্থূলদেহে একটা কিম্ভুত কিমাকার সাজ-পোশাক। পার্বত্য প্রদেশের ছেলেমেয়েরা এই অপরূপ সচল বস্তুটি দেখবার জন্যে ভিড় জমিয়েছে। সঙ্গে আছেন আর-একটি ডাণ্ডীতে তাঁর সহধর্মিণী, অশ্বপৃষ্ঠে কতিপয় ভৃত্য, আর আছে সেই ধরনের একটি পাণ্ডা, দেহের দিক দিয়ে সেও যেন যজমানের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। দুটি কাণ্ডীতে এসেছে পরিচারিকাদ্বয়, আর একজোড়া কাণ্ডীতে আছে এক-জোড়া ছাগল। তারা মাঝে মাঝেই ঊর্ধ্ব-মুখে করুণ স্বরে ডাক ছাড়ে। শুনলাম, শেঠজীর নাকি ছাগদুগ্ধ না হলে চলে না। কবিরাজের অব্যর্থ মহৌষধ ছাগলাদ্য ঘৃতের সেই নাকি প্রধান অনুপান।

সঙ্গে একটি বিরাট বাহিনী, তাই ভদ্রলোকটি নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার তালে অল্পদরের মামুলি মিষ্টি কথা বিলিয়ে যান; পাঁচটা শব্দের মধ্যে তিনটা 'ভেইয়া' শোনা যায়—এই সম্বোধনগুলি যে নেহাত মেকি, সেটা তখুনি বোঝা গেল, যখন চা-পানের জন্যে ডাণ্ডী-ওয়ালারা শেঠজীর কাছে হাত পাতে। তিনি তাদের হটিয়ে দিয়ে বাজখাই গলায় বলেন—'সব ফালতু বাত্ ছোড়ো'। তাঁর নাকি চায়ের 'পুইসা' দেবার কথা নয়। যাতায়াতের যা' চুক্তি হয়েছে, সেটা তিনি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবেন। তার অতি-

গুপ্তকাশী

রিক্ত এক কপর্দকও তিনি দিতে রাজী নন।

যারা মানুষকে ভালবাসে না, অথচ পারের কড়ি কুড়োবার আশায় থাকে, যাদের ঘরের কড়ি জমার-ঘরে শূন্য, তাদের ঐহিক ও পারলৌকিক দুকূল বজায় থাকে কিনা, কে জানে!

আমিও ডাণ্ডী থেকে নেমে, শেঠজীর এই বিরাট শোভাযাত্রা দেখে ধন্য হ'লাম। ডাণ্ডীওয়ালারা চা-পানের জন্যে সামান্য দুটো পয়সা পেলে না বটে, কিন্তু সেই বিরাট বপুটিকে বহাল তবিয়তে রাখার জন্যে যে ছোটাছুটি আর সন্ত্রস্ত-ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল, তাকে সমারোহ ছাড়া আর কী বলব? চুরির ভয়ে রুপোর বাসন আনতে হয়তো সাহস হয়নি—তাই জার্মান-সিলভারের কানা-উঁচু থালায় নানাবিধ ফল-মিষ্টান্ন ওদেরই সামনে একটির পর একটি তিনি মুখে ফেলতে লাগলেন, বেচারী স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে পতি পরমগুরুর সেবায় অক্ষয় পুণ্য অর্জন করেন। ভোজন-পর্ব শেষ হতেই আচমন—সেও আর এক দৃশ্য। তারপর মশলার কৌটো—অম্বুরী তামাকের সুদৃশ্য গড়গড়া—তীর্থপথেও এই জাঁকজমক। সমস্ত ব্যাপারেই দেখলাম শেঠজীর কেমন একটা গর্বিত উন্নাসিক ভাব,—ঐশ্বর্যের মাদকতায় ভরপুর। নিজের অস্তিত্ব ছাড়া যেন জগতে আর কিছু থাকতে নেই। মনে পড়ে যায় বিশ্বকবির বিশ্ব-কথা—

"নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলি করি অপমান"

কিন্তু কোনও ঐশ্বর্য দেখেই এবারের মত আমার চমক লাগার কিছু নেই। রুপোর চামচ মুখে নিয়েই এসেছিলাম; ঈশ্বরের কৃপায় আরো অন্য কিছু ঐশ্বর্যের সন্ধানও হয়তো পেয়েছি; কিন্তু সেইটিই জীবনের বড় কথা বলে কখনো মনে স্থান পায়নি। ভগবান কাউকে দিয়েছেন পার্থিব ঐশ্বর্য, কাউকে দিয়েছেন দেহের সম্পদ, কাউকে যশ, কাউকে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মহিমা; যাকে যেখানে বসিয়ে এই বিরাট পৃথিবীকে তিনি যেভাবে সাজিয়েছেন, সেই কাঠামোতে প্রতিষ্ঠার অহমিকাকে যিনি জয় করতে না পারেন, তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকার কিছু নেই। জীবনের চলাপথে কত কিছুই তো দেখলাম, কেউ বা গেরুয়ার পারমিট নিয়ে, আশ্রম বানিয়ে, ফোঁটা তিলক কেটে আপন গর্বে অনমনীয় হয়ে আছেন, প্রচারের মহিমায় তাঁরা অন্ধ, দু'-আনা সত্যি আর চোদ্দআনা মিথ্যের খিচুড়ি বানিয়ে আমাদের স্মরণীয় ব্যক্তিদের কাহিনী পরিবেশন করে যান,

এই পর্যায়ের আলোক-চিত্রগুলি মুকুলকান্তি ঘোষ কর্তৃক গৃহীত

এঁরা নিজেদের শক্তিকে আবিষ্কার করেন না; স্বকল্পিত মহিমায় স্ফীত হয়ে করেন শুধু আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ। এঁরা যে তথাকথিত সাধনার (?) কোন্ স্তরে পড়ে আছেন, আর কথায়, লেখায়, ভজন-সাধনে ভানুমতীর খেলু দেখিয়ে আমাদের বোকা বুঝিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেন, সেটা তাঁদেরই ভাল জানা আছে। কত অর্থবান ব্যক্তিকে দেখেছি, বিত্তের উত্তাপে আর সব-কিছুকে নস্যাৎ করতে চা'ন; কিছু সংখ্যক শিল্পী লেখক ও কর্মীকে দেখেছি, প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত অধীর। যাঁরা এই মোহ ও দুর্বলতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, তাঁদের আমি নমস্কার করি। কিন্তু অনেক কিছু পেয়েও জগতের ঐশ্বর্যকে যাঁরা ছাড়িয়ে ফেলেছেন, আশা ও আকাঙ্ক্ষার দোলায়, জগতের শান্ত স্থিতির প্রতি যাঁরা লক্ষ্যহীন, জীবনে তাঁদের সম্বল কী, এই কথাই শুধু চিন্তা করি। আবার কখনও মনে হয়, যে যেভাবে থাকতে চায়, বেশ তো, থাকুক না, আমি কেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠি, কেন এটা-ওটা চিন্তা করে, মনকে ভারাক্রান্ত করি? দুনিয়ার মালিক যিনি, তাঁর তো কিছু অগোচর নেই। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই যে আদর্শের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি, যাঁদের চিন্তাধারা আমার রক্তের মধ্যে মিশে আছে, তা'কে আমি কী দিয়ে বিদায় দেব? সেই আদর্শের পরিপন্থী কিছু দেখলেই আমার মন কেন যেন বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের এই জাঁকজমকের মেলায় নিজেকে কিছুতেই হারিয়ে দিতে পারি না। তাই আড়ম্বরকে পরিহার করেই তৃপ্তি পেয়েছি বেশী।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার পিতামহ 'মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের কথা। তিনি চাতুর্মাস্য ব্রত করতেন। প্রত্যহ রাত তিনটেয় উঠে পুজো আহ্নিক সেরে, সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই তিনি নগ্নপদে বেড়াতে যেতেন। গৈরিকাবৃত অগ্নিবর্ণ প্রাচীন পুরুষটির হাতে থাকত বাঁশের লাঠি। সেই সময় আমারও ডাক পড়ত। একদিন বেড়িয়ে ফিরবার পথে লালগোলা স্টেশনে গিয়েছেন। তখনই কলকাতার গাড়িটাও 'ইন' করল। মহারাজা দেখলেন এক বাবু ট্রেন থেকে নেমে ফুলকাটা কোঁচা হাতে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন খুব বিব্রত। তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, কুলীর অভাবে তিনি তাঁর বেডিং আর গ্লাড্‌স্টোন ব্যাগটি নামাতে পারছেন না। তাঁকে বিপন্ন দেখে মহারাজা স্বয়ং গাড়িতে উঠে মালপত্র নামিয়ে দিলেন—শুধু তাই নয়, জঙ্গীপুর যাওয়ার গোযানও ঠিক করে দিলেন। লালগোলা থেকে জঙ্গীপুর তের-চৌদ্দ মাইল পথ। গোযানে বা পদব্রজেই সে যুগে যেতে হ'ত, এখনকার মত মোটর বা বাস সার্ভিস ছিল না। ভদ্রলোক মহারাজাকে কোনও সাধারণ লোক মনে করে কিঞ্চিৎ বখশিশ দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখনই অন্য কারো কাছে শুনতে পেলেন যে তাঁর সামনে স্বয়ং লালগোলাধিপতি, তখন তাঁর সে কী লজ্জা, সে কী কুণ্ঠা। যোগীন্দ্রনারায়ণ মৃদু হেসে বললেন, তাতে কী হয়েছে? কুলী তো মানুষই—না হয় আমিই আপনার জন্যে এই কাজ-

টুকু করে দিলাম—তাতে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে!

মনে পড়ে আমার পূজনীয় সদালাপী ও সদাচারী পিতৃদেবের কথা। আহারে-বিহারে কী অনাড়ম্বর, কী সরল উদাসীন জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন তিনি। অথচ কী বড়, কী ছোট, কী ধনী, কী নির্ধন, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই তাঁর সে কী আত্মীয়ের মত ব্যবহার! মনে পড়ে আমার মাতামহ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কথা। তাঁর কাছেই বাল্যকালে দীর্ঘ দশ বছর কাটিয়েছি। বিদ্যায় ও জ্ঞানে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন; কিন্তু কোথাও কখনও তাঁর জ্ঞানের গভীরতার কথা বা তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের উল্লেখ করলেই তিনি লজ্জায় মরে যেতেন—যেন সেই সব কথা কানে যাওয়াটাই কত অপরাধ।

বিবর্তনবাদকে যদি মানতে হয়, তবে তার জন্যে আমাদের কিছু জমা রাখতেই হবে। ভগবানের দেওয়া বহুধা ঐশ্বর্যের মর্যাদা বহন করে, তাকে সার্থক করে তোলার মধ্যেই তো তার বীজ! সেই বীজকে অংকুরায়িত ও পল্লবিত করে তবেই আমরা জন্মজন্মান্তরের ফুল ও ফলের সন্ধান পাই। বর্তমানের কর্মফলই আর এক জন্মে আমাদের সংস্কার হয়ে ফিরে আসবে, সেই হবে আমাদের ব্যাংক ব্যালান্স—তার ওপরেই চেক ভাঙিয়ে খেতে হয়। তাই ঐশ্বর্যের সমারোহ আর অহেতুক জাঁকজমক দেখলেই মনটা কেমন যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেঠজী কেদারের পথে কিসের স্বপ্ন নিয়ে চলেছেন? সে কী তাঁর অগাধ বিত্তের ফিকে জৌলুষ—না দেবাদিদেব দর্শন?

যাঁরাই হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনী বলেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন, তিনি হিমালয় ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই ভ্রমণে এসেছেন, কেউবা বলেন, কলকারখানায় ঘেরা মসীসমাচ্ছন্ন বদ্ধ শহরের জরাজীর্ণ সভ্যতায় তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন—সহজ নিঃশ্বাস নেবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতির এই অফুরন্ত আনন্দধারায় নিজেকে সজীব করে তুলতে চান; কেউ এসেছেন, মন কী চায়, তারই খোঁজে, কেউবা তীর্থ দর্শনে। যেভাবেই যিনি আসুন না কেন, বিধাতার এই সাজানো বাগান দেখলে তাঁর মন এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠবেই।

(ক্রমশ)

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ষষ্ঠ আসর

॥ কথার মানে — পূর্বপক্ষ ॥

[পনেরটি শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেক শব্দের পাশে কয়েকটি করে অর্থ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটিমাত্র অর্থ ঠিক। আপনি যেটি ঠিক করেছেন সেটি দাগ দিয়ে কিংবা একটি কাগজে লিখে রাখুন। উত্তর অন্যত্র আছে। সবগুলি শেষ না করে উত্তর দেখবেন না। যদি বার বা বার-র বেশী প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে বাংলা শব্দের ওপর আপনার বেশ দখল আছে। আট থেকে দশ পর্যন্ত শুদ্ধ হলেও মন্দ নয়]

১। **তথাকথিত**
(ক) সেই স্থানে যাহা বলা হইয়াছে।
(খ) যাহার নাম সকলে জানে; বিখ্যাত।
(গ) ঐ নামে প্রকাশিত।
(ঘ) নানা বিশেষণে অভিহিত।

২। **কান্তার**
(ক) নিবিড় বন।
(খ) চন্দ্রকান্ত মণি।
(গ) রূপবতী কান্তিবিশিষ্টা রমণী।
(ঘ) যে স্বামীর পত্নী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

৩। **পল্লবগ্রাহী**
(ক) বহু শাখা-প্রশাখা পরিপূর্ণ বিরাট বনস্পতি; বৃহৎ বৃক্ষ।
(খ) নিরেট বোকা।
(গ) যাদের নানা বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান আছে।
(ঘ) পদ্মফুল।

৪। **আপন**
(ক) আপসোস, অনুতাপ।
(খ) আপনাআপনি।
(গ) দোকান।
(ঘ) নিরুপায়।

৫। **পরশ্রীকাতর**
(ক) অন্যের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে যে পুরুষ।
(খ) ঈর্ষাপরায়ণ।
(গ) পরের দুঃখে যে হৃদয়বেদনা অনুভব করে।
(ঘ) সচ্চরিত্র।

৬। **তারতম্য**
(ক) ইতরবিশেষ।
(খ) তামার নির্মিত তারযন্ত্র।
(গ) দরদাম।
(ঘ) উজ্জ্বলতম তারকা।

৭। **প্রগল্ভ**
(ক) অতিশয় বিবেচক ও বুদ্ধিমান।
(খ) নির্লজ্জ।
(গ) লজ্জাশীল।
(ঘ) গর্ভস্থ সন্তান।

৮। **তাৎপর্য**
(ক) আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত আছে যাহার।
(খ) সেই পরিমাণ।
(গ) ভাবার্থ।
(ঘ) অনুমান।

৯। **পারম্পর্য**
(ক) পরমেশ্বরের কৃপা।
(খ) পরস্পরের হিত চিন্তা।
(গ) ক্রমান্বয়।
(ঘ) পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তা।

১০। **ঘুণাক্ষর**
(ক) স্বপ্নের ঘোর।
(খ) বাঁকাচোরা।
(গ) কিছুমাত্র।
(ঘ) অক্ষরজ্ঞানহীন।

১১। **অনবদ্য**
(ক) অতিশয় নিন্দনীয়।
(খ) অবধ্য।
(গ) অসম্বন্ধ বা নিরর্থক বাক্য।
(ঘ) নির্দোষ।

১২। **উল্লুক**
(ক) গাধা।
(খ) বানর।
(গ) শিয়াল।
(ঘ) ভেড়া।

১৩। **ওতপ্রোত**
(ক) এপার-ওপার।
(খ) আগাগোড়া।
(গ) পরিব্যাপ্ত।
(ঘ) উত্থান পতন।

১৪। **শৈবলিনী**
(ক) সখী।
(খ) শিবের উপাসিকা; শৈবধর্মাচরণ করেন যে রমণী।
(গ) নদী।
(ঘ) সুন্দরী।

১৫। **মেদুর**
(ক) মধুর।
(খ) শ্যামবর্ণ।
(গ) মেদবহুল।
(ঘ) ভেক।

॥ কলারসিক ॥

তরুণ শিল্পীদের চিত্রকলা :

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবন দু' দুটো চিত্রকলার প্রদর্শনীতে মুখর হয়ে উঠেছে। উত্তর দিকের প্রদর্শনী-কক্ষে প্রায় শত তরুণ শিল্পীর সমাবেশ আর দক্ষিণের কক্ষে শ্রীমতী টুটু লাহিড়ীর একক প্রদর্শনী। শরৎ-সন্ধ্যার কলকাতা এই প্রদর্শনী ঘিরে যে সরব হয়েছে, দীর্ঘকাল পরে প্রদর্শনী কক্ষে নানা নর-নারীর ভিড় দেখে সেটাই অনুমান করা গেল।

কলকাতার তরুণ শিল্পীদের এই সম্মিলিত প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন 'ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি' নামক নবগঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য এঁদের মহৎ। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শিল্পীদের একসংগে সংগঠিত করে সমবায় পদ্ধতিতে স্টুডিও পরিচালনা, জনজীবনের সংগে শিল্পীর যোগাযোগ সাধন, দুঃস্থ শিল্পীকে সাহায্য প্রদান, প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীকে জনসমক্ষে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, 'জীবনের জন্য শিল্প'—এই নীতিতে আস্থা জ্ঞাপন এবং সমস্ত দলাদলি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সংগঠনকে পরিচালনা করাই তরুণ শিল্পী-সঙ্ঘের মূলে বিঘোষিত নীতি। শেষ পর্যন্ত এ'রা সার্থক হোন, সংগঠন জয়ের পথে এগিয়ে চলুক—এই শুভ কামনা জানিয়ে এবার প্রদর্শিত চিত্রকলা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা যাক্।

সবেমাত্র যাঁরা চিত্র-কলা শিক্ষা শেষ করে বিদ্যালয়ের বাইরে এসেছেন এবং এখনও যাঁরা কলা-বিদ্যার ছাত্র, তরুণ শিল্পী-সংঘের আয়োজিত প্রদর্শনীতে তাঁদেরই সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং প্রতি বছর সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনীতে আমরা এতকাল যা পেয়ে এসেছি এই প্রদর্শনীতেও মোটামুটি তারি উন্নততর রূপ আস্বাদন করা গেল। এই প্রদর্শনী দেখেও অনুমান করা যায় বাঙলার চিত্রকলার ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে ধাবিত, কোন্ তরুণ শিল্পী নিষ্ঠা এবং সাধনার পথে অগ্রসর হলে ভবিষ্যতে প্রতিভাবান শিল্পীরূপে স্বীকৃতি পাবেন, কিংবা কোন্ শিল্পী শুধু সংঘের জোরে রঙ আর রেখা নিয়ে খেলায় মেতেছেন, ইত্যাদি।

জীবন ॥ শিল্পী : টুটু লাহিড়ী

সমগ্র প্রদর্শনীটি জল-রঙ, তেল-রঙ, গ্রাফিক ও ভারতীয় শৈলীর চিত্র এবং ভাস্কর্যকলার নিদর্শনে সমৃদ্ধ। সর্বমোট ১৪০টি শিল্প-কর্ম উপস্থিত করা হয়েছে দর্শকদের সম্মুখে। এর মধ্যে জল-রঙের বিভাগটিতে সবচেয়ে উন্নততর মানের চিত্রকলা স্থান পেয়েছে। গ্রাফিক চিত্রকলার বিভাগটিও মন্দ নয়। কিন্তু তেল-রঙের চিত্রকলা এবং ভারতীয় চিত্রকলার বিভাগ দুটি এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে দুর্বলতম সংযোজন। ভাস্কর্যের বিভাগটি তরুণ ভাস্কর্য-শিল্পীদের নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বহন না করলেও নিষ্ঠা এবং নৈপুণ্যের স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল।

জল-রঙের মাধ্যমে অংকিত চিত্রগুলির মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে শিল্পী পাঁচু গুপ্তের 'ভোরের সভা' (৮৪নং), সব্যসাচী গুপ্তের 'ভোরের আলো' (১০৭নং), প্রদীপ বসুর 'কুঁড়ে ঘর' (৭৪নং), তিমির দত্তের 'কে, জি, ডক' (১৩৩নং) এবং অমিতা পালের একখানি নিসর্গ চিত্র (২১নং)। এঁদের কম্পোজিশান, বলিষ্ঠ কল্পনা এবং রঙ প্রয়োগের নৈপুণ্য সত্যি সুন্দর। অঞ্জু চৌধুরীর 'কানা গলি' একটি ভাল রচনা হতে পারতো কিন্তু শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তু অনুযায়ী রঙের সুষ্ঠু প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যান্য কাজগুলি খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও দর্শকদের একেবারে হতাশ করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

তেল-রঙে অংকিত চিত্রগুলি দেখে একটা প্রশ্ন জেগেছে মনে। আমাদের ছাত্রেরা কি বিদ্যালয়ে তেল-রঙ নিয়ে

খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অবকাশ কিংবা সুযোগ পান না? অথবা আর্থিক দিক দিয়ে তেল-রঙে কাজ করার মত সামর্থ্য কি নেই তাঁদের? দুটো দিক যদি সত্যি হয় তবে ভাববার কথা। কারণ, এই বিভাগে কোনো তরুণ শিল্পীই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন উপস্থিত করতে পারেননি। শুধু এই প্রদর্শনীতে নয়, অন্য প্রদর্শনীতেও একই দৈন্য লক্ষ্য করা গেছে। তবু আলোচ্য প্রদর্শনীতে শ্রীমতী অনীতা রায়-চৌধুরীর 'কম্পোজিশান' (৮নং), কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'প্রসাধন' (৫১নং), প্রদীপ বসুর 'মির্যাতীত' (৭৩নং), সুনীত-কুমার বসুরায়ের স্টীল 'কম্পোজিশান' (১২২নং) ও অনুরাধা রায়ের 'ভিখারী' (১৩৭নং) মোটামুটি শিক্ষানবিশীর স্তর অতিক্রম করে শিল্পগুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীমতী মিলি পালের 'সাগর সৈকতে' (৫৭নং) কমার্শিয়াল কাজ হিসাবে প্রশংসা পাবে; তেল-রঙের চারুচিত্ররূপে ওটিকে প্রশংসা করতে না পারায় আমি দুঃখিত। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিমল ব্যানার্জির ১৭নং ও ২৬নং চিত্র দুটিও অনেকের ভাল লাগতে পারে। অন্যান্য কাজের মধ্যে নতুনত্ব নেই, এমন কি অনেক শিল্পী তেল-রঙ ব্যবহারেও দক্ষতা অর্জন করেননি এখনো। আশা করি এ'দের সকলের নিকট থেকে আমরা ভবিষ্যতে আরো সুন্দর তেল-চিত্র দেখার সুযোগ পাবো।

গ্রাফিক চিত্রকলার বিভাগটিতে কয়েকটি ভাল নিদর্শনের সন্ধান পাবেন দর্শকেরা। এর মধ্যে অরুণ মুখার্জির 'সংবাদপত্রের হুংকার' (১৩নং), কানাই চক্রবর্তীর 'মায়ের প্রতীক্ষায়' (৪৮নং), সুহৃদ মুখার্জির 'জেলে' (১০৯নং) ও সুদীপ্ত বসুর 'মধ্যাহ্নভোজন' শিল্পীর বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি এবং সুন্দর কম্পোজিশানে চমৎকার শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভারতীয় চিত্রকলার বিভাগে প্রায় সকল কাজ নিষ্প্রাণ অনুকরণে বৈশিষ্ট্য-হীন। শিল্পী সুরেণ ঘোষ, মানবেন্দ্র বড়ুয়া এবং শংকর আইচ কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রশংসার যোগ্য।

ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি পূর্বে দেখেছি বলে মনে হল। এই বিভাগে ভোলানাথ কর্মকারের 'সার্কাস' (৩০ নং), মধুসূদন চক্রবর্তীর 'মা ও ছেলে' (৬৫নং), তরুণকুমার পালের 'পাঠরতা' (১৩৫নং), শ্যামলী খাস্তগীর ও প্রণব মজুমদারের দারু নির্মিত ভাস্কর্য-শিল্প সকলেরই ভাল লাগবে বোধহয়।

একসঙ্গে এত শিল্পীর এত শিল্প-কর্মের বিচার করা সত্যি কঠিন। বিশেষ করে দু-তিন ঘণ্টা ধরে অ্যাকাডেমীর ঐ গুমোট ঘরে ঘুরে বেড়ানো দুঃসহ যন্ত্রণা বিশেষ। এই অবস্থায় কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়তো আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। সামগ্রিক-ভাবে আমার বক্তব্য ঃ তরুণ শিল্পীদের এই সমবেত প্রচেষ্টা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও অভিনন্দনীয়।

* * *

অ্যাকাডেমীর দক্ষিণের কক্ষে শিল্পী টুটু লাহিড়ীর একক প্রদর্শনী দেখে তৃপ্তি পেয়েছি। ইনিও তরুণ শিল্পী। এই বোধহয় তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। কিছু ড্রয়িং বাদে সবই তেল-রঙের কাজ। পঞ্চাশখানি তেল-রঙে অংকিত চিত্র নিয়ে তিনি দর্শকদের সম্মুখে উপ-স্থিত। তরুণ শিল্পীদের সম্মিলিত প্রদর্শনীতে তেল-রঙের কাজ দেখে হতাশ হয়ে এখানে এসে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো। জীবনের নানা রঙে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, বলিষ্ঠ এ'র চিত্রকলা। তেল-রঙে এ'র অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য অনেক-গুলি চিত্রে বলিষ্ঠ জীবন-চেতনায় পরি-স্ফুট হয়ে উঠেছে।

ইনি মূলতঃ বাস্তবধর্মী চিত্র-শিল্পী। কিন্তু বাস্তবের অনুকরণ যে শিল্প নয় এই চেতনা এ'র অনেক-গুলি চিত্রে ভাব-ব্যঞ্জনায়, রঙে-রেখায় সুন্দর শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে এ'র 'জীবন' (৪০নং) নামক চিত্রটি। যন্ত্রণা-জর্জর জীবনের ঊর্ধ্বে যে নর-নারী তার দুর্দমনীয় শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইছে—এই চিত্রে আশ্চর্য বলিষ্ঠতায় তাই ব্যক্ত হয়েছে। রেখা আর রঙের প্রয়োগে এমন ব্যঞ্জনা দৃষ্টি সহজে ভুলবার নয়।

এছাড়া 'শিলচর', ১৯শে মে, ১৯৬১' (৩৫নং) আসামের সাম্প্রতিক বর্বরোচিত পটভূমিকায় শিল্পীর আশা-বাদী মনের পরিচয় বহন করলেও চিত্র হিসাবে খুব সার্থক নয়। বরং তার 'অন্ধকার ঘর' (১৯নং), কিংবা 'অমাবস্যা' (৩৩নং) নামক নামের আড়ালে দুটি নারীর অন্ধকার জীবন এবং অবরুদ্ধ কান্নার আবেগ অপূর্ব দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে বলে আমার ধারণা।

কয়েকটি চিত্রে শিল্পী বিমূর্ত ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে যেয়ে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। 'নীল মরুদ্যান' এমনি একটি রচনা। 'মা'-র প্রতিকৃতি এবং ইউরোপের পটভূমিকায় রচিত কয়েকটি চিত্রও প্রশংসার যোগ্য।

ভবিষ্যতে আমরা এই বলিষ্ঠ শিল্পীর আরো চিত্র-প্রদর্শনী দর্শনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

শব্দকল্পদ্রুম

[illegible] উত্তর ঃ

১। তথাকথিত। (গ) ঐ নামে প্রচলিত বা ঐ প্রকারে উক্ত; কিন্তু ঐ নাম বা উক্তির যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ইংরেজী so-called।

২। কান্তার। (ক) নিবিড় বন। ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসংকুল পথ। প্রয়োগ ঃ "কেমনে কহিব সে কান্তার-কান্তি আমি" —মেঘনাদ-বধ কাব্য।

৩। পল্লবগ্রাহী। (গ) যাহার নানা বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান আছে। যে পল্লব চয়নের মত নানা বিষয় থেকে কিছু কিছু চয়ন করে। তুঃ ইংরেজী jack of all trades।

৪। আপস। (খ) আপনাআপনি, পরস্পর। প্রয়োগ ঃ আপসের মামলা আপসে মিটমাট হয়ে গিয়েছে।

৫। পরশ্রীকাতর। (খ) ঈর্ষাপরায়ণ। পরের শ্রী অর্থাৎ ভাল দেখিয়া যে কাতর হয়।

৬। তারতম্য। (ক) ইতরবিশেষ। কম-বেশি। তরতম = ন্যূনাধিক, তাহার ভাব তারতম্য।

৭। প্রগল্ভ। (খ) নির্লজ্জ; দাম্ভিক; উদ্ধত; ধৃষ্ট; সাহসী; যে অসংকোচে কথা বলে।

৮। তাৎপর্য। (গ) ভাবার্থ; মর্ম। ইংরেজী purport।

৯। পারম্পর্য। (গ) ক্রমান্বয়; পরম্পরাগত ক্রম; পরম্পর হবার ভাব; অনুক্রম।

১০। ঘুণাক্ষর। (গ) কিছুমাত্র; ইঙ্গিত-মাত্র। কাগজে বা কাঠে ঘুণ ধরলে অক্ষরের মত যে দাগ হয় তাই থেকে এই অর্থ এসেছে। প্রয়োগ ঃ "ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়নি।"

১১। অনবদ্য। (ঘ) নির্দোষ; অনিন্দ-নীয়; সুন্দর।

১২। উল্লুক। (খ) বানর; ঘন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘবাহু বনমানুষ জাতীয় বানর; ইংরেজী gibbon। তার থেকে হল নির্বোধ।

১৩। ওতপ্রোত। (গ) পরিব্যাপ্ত; সর্বত্রব্যাপ্ত।

১৪। শৈবালিনী। (গ) নদী; শৈবাল অর্থাৎ শেওলা আছে যাতে এই অর্থে।

১৫। মেদুর। (খ) শ্যামবর্ণ; স্নিগ্ধ। প্রয়োগ ঃ "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্"—গীতগোবিন্দ।

দেশে বিদেশে

॥ ডাঃ মিত্র ॥

মৃত্যু শোকাবহ, বিদেশে মৃত্যু আরও শোকাবহ। এমন মৃত্যু হয়েছে আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্রের। তিনি ইউরোপের ভিয়েনা সহরে একটি প্রসূতিবিদ সম্মেলনে সহসভাপতিত্ব করতে গেছলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে তাঁর একমাত্র সন্তান ডাঃ শ্রীমতী জয়শ্রী রায়চৌধুরী খবর পান ডাঃ মিত্র হৃদ্‌রোগে কাতর হয়েছেন। এই মঙ্গলবার অপরাহ্নেই খবর আসে ডাঃ মিত্র সোমবার রাত্রে পরলোকগমন করেছেন। এই অপ্রত্যাশিত খবরে অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি উপাচার্যরূপে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান পাবার আগেও চিকিৎসাব্যবসা ও বিদ্যাক্ষেত্রে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালটি তাঁর উদ্যম ও অধ্যবসায়ের একটি স্থায়ী কীর্তি। তিনি এই হাসপাতালের ডিরেক্টর ছিলেন এবং তাঁর ক্যান্সার চিকিৎসারীতিও জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

শ্রীমতী মিত্র স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। বিদেশে এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিপর্যয়ে তিনি কি রকম অসহায় বোধ করছিলেন অনুমান করা যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিমানযোগে ডাঃ মিত্রের মৃতদেহ কলকাতায় আনার উদ্যোগ আয়োজন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যয়ভার বহন করবেন। ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁর মরদেহ কলকাতায় পৌঁছচ্ছে।

তাঁর জন্মস্থান যশোহরের নড়াইলে; বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্গত। ১৮৯৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে এম-বি ডিগ্রী লাভ করেন, বার্লিনে ১৯২৪ সালে এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-আর-সি-এস হন। ১৯২৬ সালে তিনি আর জি কর হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ডিরেক্টর পদলাভ করেন। ওখানকার প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের তিনি হলেন অধ্যক্ষ। ১৯৫১ সালে ডাঃ মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব দি মেডিকাল ফেকাল্টি হন। ১৯৪৯ সালে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ডবলিউ এ সি'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে ডাঃ মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ লাভ করেন। তিনি এক বছরের মধ্যেই পরীক্ষার্থীদের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মতো চিকিৎসক ও প্রিয়ভাজন ব্যক্তির অভাব বাংলার এই দুর্দিনে বিশেষভাবে অনুভূত হবে। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই।

॥ নিরপেক্ষ ॥

ইউরোপ মহাদেশে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের এক সম্মেলন হয়ে গেল। উপস্থিত রাষ্ট্রের সংখ্যা পঁচিশ। নিরপেক্ষ অর্থে যারা সেন্টো-সিয়াটো অথবা সোজা পরিভাষায় ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী পক্ষেও নেই, ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রপক্ষে বা সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষেও নয়। জগৎ জানে, এই পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত এবং এর স্থূলে নাম হচ্ছে একদিকে আমেরিকা আর একদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন। এর গূঢ়ার্থ হচ্ছে, মুখোমুখি মোকাবিলা করার শক্তি এদেরই আছে এবং সে শক্তি কারিগরি বিজ্ঞানের, সমর-অস্ত্রের এবং পরমাণবিক বোমার। নিরপেক্ষদের মধ্যে উদ্যোগী হচ্ছে ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া এবং এতে আছে ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্ম এবং আফ্রিকা ও আরবের কতকগুলি রাষ্ট্র। এই নিরপেক্ষ সম্মেলন উদ্বোধনের মুখে মুখে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঘোষণা করল যে, তারা আবার পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালাবে। পরমাণবিক বোমা একটা ঊর্ধাকাশে ফাটানোও হল। এর ভস্মরাশি কোথায় কোথায় পড়েছে তা বিজ্ঞানীরা বলবেন কিন্তু আঘাতটা লাগল জগৎ জুড়ে। সুতরাং, নিরপেক্ষ যারা তারা তাদের সম্মেলনেও সেই আঘাতের বেদনায় মুখরিত হল। এমনিতেই, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনের সূচনাতেই কথাটা উঠেছিল যে, আমরা যুদ্ধের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। সেই সন্ধিক্ষণে ঘোষণা ও বিস্ফোরণ। পূর্ব বার্লিন-পশ্চিম বার্লিন, পূর্ব জার্মাণী-পশ্চিম জার্মাণী নিয়ে যে ঘনঘটা ছিল তাকে লক্ষ্য করেই নিরপেক্ষরা পৃথিবীতে ঘনায়মান যুদ্ধের কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তা একেবারে যেন সশব্দে স্বীকৃত হল। সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষদের অন্য সব কথা গৌণ হয়ে গেল। মুখ্য কথা হল, যুদ্ধ হবে কি হবে না। যদি না-হওয়াটাই আকাঙ্খিত বা কাম্য হয় তবে এই যুদ্ধের আশু নিশ্চিত সম্ভাবনাকে নিবারণ করবে কে বা করতে পারে কে? সবাই একরকম সমস্বরে বললেন, যুদ্ধ করার সত্যিকার ক্ষমতা যারা রাখে কেবল তারাই এ যুদ্ধ নিবারণেও ক্ষমতা রাখে। অতএব নিরপেক্ষরা উভয় পক্ষকেই বলবেন, দোহাই তোমাদের, অস্ত্র সম্বরণ কর, বিরোধের মীমাংসা আপোষে কর। মজা এই, যারা সত্যিই যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে, তারা বলছে, আমরা যুদ্ধ তো চাই না, শান্তি চাই। শান্তি চায় না অপর পক্ষ। ব'লে একে অপরকে দেখিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং, নিরপেক্ষরা বলছেন, এদের দুইয়ের মিলন ঘটানো চাই। এর মধ্যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির স্বীকৃতি এই যে সালিসী বা মধ্যস্থতাও নয়, আসল শক্তিমানদের কাছে আবেদন করার অধিক ক্ষমতা তাদের নেই। নিরপেক্ষ থেকে, যুদ্ধ বাধলে, কারও পক্ষে দাঁড়ানোটাও পক্ষপাতিত্ব হয়ে দাঁড়াবে। সোভিয়েট-মার্কিণ ঋণ বা সাহায্য নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব কি?

॥ বিস্ফোরণ ॥

বার্লিনের প্রশ্নটি আকাশে উঠেছে; কেননা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ঐখানেই পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ঘোষণায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা পরমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা আরম্ভ করছেন। মার্কিণ মহল জানাচ্ছেন ওটা আর ভবিষ্যৎ সঙ্কল্পে নেই, ইতিমধ্যেই তিনবার বিস্ফোরণ ঘটে গেছে এবং বায়ুমন্ডলে এই বিস্ফোরণ সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মারাত্মক। এবং এই মারাত্মক কথাটিই বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ সম্মেলনে উঠেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, প্রেসিডেন্ট নাসের প্রভৃতি এ বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে নিন্দা করেছেন। সবাই বুঝতে পারছেন যে ঠান্ডা যুদ্ধ এবার একেবারেই গরম যুদ্ধের চৌহদ্দিতে অবতীর্ণ হল। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রমহলে স্থির হয়েছে একদল

প্রতিনিধি আমেরিকায়, আর একদল প্রতিনিধি সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে যুদ্ধ নিবারণের আবেদন জানাবেন। কে বা কারা প্রতিনিধি হবেন এই নিয়ে সামান্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। কেননা, সংবাদে প্রকাশ, শ্রীনেহরু স্বয়ং তাঁর পূর্বনির্ধারিত সফর-সূচীকে এই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মস্কো প্রতিনিধিদলে শ্রীনেহরু আছেন। মস্কো প্রতিনিধিদলে তিনি ছাড়া ঘানার প্রধানমন্ত্রী মিঃ নক্রুমা আছেন। এঁরা দুজনেই, বিশেষ করে শ্রীনেহরু, কেননা তিনি আমন্ত্রিত, সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। শ্রীনেহরু নিরপেক্ষ সম্মেলনে দুটি কাজ করেছেনঃ একটি বিস্ফোরণের নিন্দা, আর একটি খণ্ডিত জার্মাণীর স্বীকৃতি। বিস্ফোরণের নিন্দা নিরপেক্ষ ও পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রমহল সমর্থন করবেন—সোভিয়েট মহল করবেন না। খণ্ডিত জার্মাণীর স্বীকৃতি-প্রস্তাবে পশ্চিম-পক্ষে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। দুই-পক্ষকেই অসুখী করা যদি নিরপেক্ষতা হয় তবে নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের মুখপাত্র নিরপেক্ষ প্রমাণিত হয়েছেন। কিন্তু আমাদের সন্দেহ, আমেরিকা বা সোভিয়েট ইউনিয়নের যতদিন এমন নিরপেক্ষ মুখপাত্রের দরকার হবে ততদিন শ্রীনেহরুর নিরপেক্ষতা নিন্দা-যশে সমাদৃত হবে এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি সমাদরও পাবেন। যুদ্ধ না হলে আমাদের লাভ, যুদ্ধ পিছিয়ে রাখতে পারলেও আমাদের লাভ কিন্তু এটা কতদিন করা যাবে এবং তা করতে গিয়ে কতজনের অপ্রীতিকর হব? একে তো নিরপেক্ষ থাকাটাই যারা কোনো-না-কোনো পক্ষ তাদের প্রীতিপ্রদ নয়, তার ওপর মনঃপূত কথা না বলতে পারলেও তো বিপদ। সোভিয়েট ইউনিয়ন বলছে, পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ পশ্চিম জার্মাণীকে সামরিক শিবিরে পরিণত করেছে। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এ কথাটারই প্রতিধ্বনি করেছেন বলে তিনি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের নিন্দা লাভ করেছেন। মার্শাল টিটো বলেছেন, আজ পশ্চিম জার্মাণীতে সেই পুরোনো ফ্যাসিস্টদেরই প্রাধান্য। সোভিয়েট ইউনিয়ন বলছে, আমাদেরও তাই যুদ্ধাস্ত্রগুলো পরীক্ষা করে সুনিশ্চিত হতে হচ্ছে। আমেরিকা বলছে, বাজে কথা, ও নিতান্ত যুদ্ধ বাধাবার ছল মাত্র। এর মাঝে নিরপেক্ষ আমরা—আমাদের মরণ। আমাদের এমন শক্তি নেই [illegible] [illegible] দিতে পারি।

॥ পাল্টা ॥

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ কেনেডিও ঘোষণা করেছেন যে, আমেরিকা পরমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা চালাবে। এ সোভিয়েট ইউনিয়নের পাল্টা বললে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিবাদ করে বলবে, আমাদেরটাই পাল্টা। কেননা, সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন স্বেচ্ছায় বিস্ফোরণ বন্ধ রেখেছে তিন বছর—ঠিক সেই সময় ফ্রান্স পরীক্ষা চালায় নি? ফ্রান্স মানে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অন্যতম প্রধান শরিক। যাই হোক, আমেরিকার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই যে, রুশ সরকারের অব্যাহত বিস্ফোরণ পরীক্ষার পর তাদের গত্যন্তর ছিল না। তবে এ পরীক্ষা বীক্ষণাগারে ও ভূগর্ভে চালানো হবে—যাতে না বায়ুমণ্ডল থেকে ভস্মরাশি উড়ে এসে পৃথিবীকে বিষাক্ত করে। এ ঘোষণা শুনে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন, আমেরিকার এই বিস্ফোরণ সিদ্ধান্তের কারণ বুঝতে দেরী হয় না; তবে তাঁরা আপাততঃ পরীক্ষা চালাবেন না। সোভিয়েট রুশিয়া পাঁচ দিনে তিনটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আমেরিকার বিস্ফোরণও সেপ্টেম্বরেই হবে। মার্কিণ মহল একথাও বলেছেন, বোঝাই যাচ্ছে যে, সোভিয়েট রুশিয়া মানব-কল্যাণের জন্য উৎকণ্ঠিত নয়। এখনকার মার্কিণ আয়ুধটি নাকি যথেষ্ট উপযুক্ত নয়, সুতরাং, একমাত্র পরীক্ষার দ্বারাই এর বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্ভব। অর্থাৎ, যে যা করছে তা-ই হয় মানব কল্যাণের জন্য না হয় বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য। অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাব। এরই মধ্যে একটি সুলক্ষণ এই যে, সোভিয়েট ইউনিয়ান বেলগ্রেডে প্রতিনিধিমণ্ডলীকে গ্রহণ করেছেন, শ্রীনেহরু-নক্রুমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ অনেকক্ষণ কথা কয়েছেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডিও বেলগ্রেড প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো (ইন্দোনেশিয়া) ও প্রেসিডেন্ট কাইটার (মালি) সঙ্গে ১২ই সেপ্টেম্বর আলাপ করতে রাজী হয়েছেন। ইতিমধ্যে ওপর থেকে পরমাণবিক ভস্মরাশি এবং ভূগর্ভ বিস্ফোরণে পৃথিবীর যদি ধ্বংস না হয় তো অন্তত যুদ্ধবিরতির একটা অবকাশ পাওয়া যাবে। আরও একটি কথা, ১২ই সেপ্টেম্বর নিরপেক্ষদের সঙ্গে আলাপের দুদিন পর পাশ্চাত্ত্যপক্ষে চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বার্লিন ও জার্মাণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। মানবজাতির এই চরম দুর্দিনের [illegible]

যে, কোনো জাতিগত স্বার্থ নয়,—[illegible] নিবৃত্ত হবে এবং বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সনির্বন্ধ আবেদনে শক্তিমান রাষ্ট্রপ্রভুরা অস্ত্র সম্বরণ করবেন।

॥ ঢাকের দায়ে ॥

সত্যি ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী হয়ে গেল। খবরটা ত্রিবেন্দ্রামের। সরকারী আমলাতান্ত্রিক প্যাঁচে পড়ে এক ঘোড়া বিক্রী করতে গিয়ে এই বিপর্যয়। ঘোড়াটা বুড়ো। কিন্তু যে সে ঘোড়া নয়, রাজ-প্রহরীদের ঘোড়া। সরকার ঠিক করলেন, ওকে বিক্রী করবেন। সবাই বললেন, বেশ বেশ তাই। রাজপ্রহরীর ঘোড়ার আভিজাত্য রক্ষায় হাটে নিয়ে এসে তো আর তার বিক্রী হতে পারে না—যে, দড়ি দিয়ে টানলাম, পেছনে ঠেঙালাম এমনি ক'রে অশ্রদ্ধার সহস্র চক্ষুর সামনে ওকে নিলামে তুললাম? তাই বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'তে লাগল। বিজ্ঞাপনে এক-দুই-তিন ক'রে ৫০০ টাকা খরচ হ'য়ে গেল। সুতরাং, আশা করা যায়, লোকে এই রাজকীয় ঘোটকটিকে লাভ করার জন্য উদার হস্তে তার যোগ্য দাম দেবে। তখন ঐ বিজ্ঞাপনের মূল্যটাও উঠে আসবে। কিন্তু রাজ্যসরকারের এত তোড়জোড়ের পর অর্থভাণ্ডার থেকে পঞ্চশত মুদ্রা-ব্যয়ের বিনিময়ে রাজকীয় ঘোটকের মূল্য পঞ্চদশ মুদ্রায় এসে থেমে রইল। সকল আভিজাত্যের বোঝা নিয়ে ঘোড়াটি পনের টাকায়ই বিক্রী হ'য়ে গেল। বাংলাদেশে হ'লে এমনটি হ'ত কিনা বলা কঠিন। কেননা, এখানে রিটায়ার্ড লোকেদের বড় কদর; প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ও বয়সের ভারে কুব্জ বা অথর্ব হ'লেও মোটা মাইনেতেই একসটেনসানের পর একসটেনসান এখানকার রেওয়াজ। ঘোড়াটার দুঃখ এই, ওর দানা খাওয়ার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই—থাকার মধ্যে আছে অতিরিক্ত দুখানা অথর্ব পা। কিন্তু যিনি কিনলেন তাঁর কথাটাও ভাবতে হয়। ১৫ টাকা তো হ'ল ঘোড়ার দাম, ওর আস্তানা চাই, ওর তদারক চাই—এবং দানা চাই। গরু নয় যে, ঘুঁটে হবে। সে বেচারা এই পনের টাকায় বুড়ো ঘোড়া নিয়ে আমরণ কত খেসারৎ দেবে কে জানে—৫০০ না ৫০০০? মা কি ঐ ঘোড়া (রোগ) ক্রেতার বসতবাটি (আর মনসা দেবী) সুদ্ধ [illegible] যাবে?

॥ ঘরে ॥

১লা সেপ্টেম্বর—১৫ই ভাদ্র ঃ 'রাষ্ট্র-সঙ্ঘে শিখদের দাবী (পাঞ্জাবী সুবা) উত্থাপিত হইলে অনশন ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত'—মাষ্টার তারা সিংএর অনশন ত্যাগের নূতন সর্ত—আকালী নেতার স্বাস্থ্যাবস্থার দ্রুত অবনতি।

২রা সেপ্টেম্বর—১৬ই ভাদ্র ঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধির সুপারিশ নীতিগতভাবে অনুমোদন—মন্ত্রিসভা বৈঠকে পে-কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত।

মাষ্টার তারা সিং-এর অনশন ভঙ্গের পরিবর্তিত সর্ত—'শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে সালিশ মানিলে অনশন ত্যাগ করিতে পারি।'

৩রা সেপ্টেম্বর—১৭ই ভাদ্র ঃ পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ৫৫ জন কমিউ-নিষ্ট গ্রেপ্তার—অমৃতসরে কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে তল্লাসী—শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় সরকারী কার্য-ব্যবস্থা।

দেশের সীমান্ত রক্ষায় সর্বক্ষণ সচেতন থাকিতে জনগণের প্রতি আহ্বান—দিল্লীতে জাতীয় মার্ক্সবাদী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সর্বদলীয় সম্মে-লনে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা—বিভেদ সৃষ্টি-কারীদের প্রতিহত করার জন্য 'ভারত সর্বাগ্রে' অভিযান চালাইবার প্রস্তুতি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৮ই ভাদ্র ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে আগরপাড়া রেল ষ্টেশনে সশস্ত্র ডাকাতি—সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারকে গুলী করিয়া ৭ হাজার টাকা লুণ্ঠন—গোয়েন্দা কুকুর 'লাকি'র সহায়তায় ঘটনা সম্পর্কে ১ ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার মীমাংসা না হইলে ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে শিক্ষকমণ্ডলীর কর্ম-বিরতি—সাংবাদিক বৈঠকে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের ঘোষণা।

মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবন—প্রায় ৪ লক্ষ নর-নারী ও শিশু অশেষ দুর্গতির সম্মুখীন।

৫ই সেপ্টেম্বর—১৯শে ভাদ্র ঃ দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষক ধর্মঘট, পাটকল প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে মুলতুবী প্রস্তাব নামঞ্জুর—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় স্পীকারের (বঙ্কিমচন্দ্র কর) রুলিং।

'পাঞ্জাবী সুবা'র দাবী মানিয়া না লওয়া পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ করিব না'—অনশনের দ্বাবিংশ দিবসেও আকালী নেতা তারা সিং-এর দৃঢ় মনোভাব।

৬ই সেপ্টেম্বর—২০শে ভাদ্র ঃ ব্যাপকভাবে পাকিস্থানীদের অনুপ্রবেশ ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ—লোকসভায় বিতর্ককালে সদস্যদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

মাষ্টার তারা সিং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন (নিরপেক্ষ) মানিতে প্রস্তুত নহেন—অনশন ভঙ্গের জন্য উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের আবেদনও প্রত্যাখ্যান।

৭ই সেপ্টেম্বর—২১শে ভাদ্র ঃ প্রবল বন্যার ফলে কটক ও বালেশ্বর জেলায় (উড়িষ্যা) কয়েক সহস্র নর-নারী আটক—খাদ্য ও ঔষধাদি সহ ব্যারাকপুর বিমানঘাটি হইতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর দুইখানি বিমান প্রেরিত।

ন্যায্য মূল্যে মৎস্য বিক্রয়ের দোকান খোলা এবং মাছ বিক্রেতা ও আমদানী-কারকদের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা—প্রশ্নটি রাজ্য সরকারের (পশ্চিমবঙ্গ) বিবেচনাধীন আছে বলিয়া বিধান সভায় মৎস্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

১লা সেপ্টেম্বর—১৫ই ভাদ্র ঃ মধ্য এশিয়ায় বায়ুমণ্ডলে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের পুনরায় আণবিক পরীক্ষা সুরু—বিস্ফোরণের সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র বিভিন্ন মহলে গভীর উদ্বেগসঞ্চার।

বিশ্বে নূতন সামরিক সংঘর্ষ বন্ধের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান—বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ ২৫-জাতি শীর্ষ-সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট টিটোর (যুগো-শ্লাভিয়া) উদ্বোধনী ভাষণ।

২রা সেপ্টেম্বর—১৬ই ভাদ্র ঃ পাক্-শ্বেতপত্রে আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে অঞ্চল সম্প্রসারণের অভিলাষ পোষণের অভিযোগ—পাক্-আফগান সম্পর্কে তিক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি।

বিশ্বসঙ্কট সমাধানে বৃহৎ শক্তি-বর্গের মধ্যে আলোচনার দাবী—বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বক্তৃতা—সার্বিক নিরস্ত্রীকরণ একমাত্র সমাধান বলিয়া মন্তব্য।

৩রা সেপ্টেম্বর—১৭ই ভাদ্র ঃ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়ো-জনীয়তা—বেলগ্রেডে শ্রীনেহরু (ভারত), টিটো (যুগোশ্লাভিয়া), নাসের (আরব প্রজাতন্ত্র), নক্রুমা (ঘানা), উ নু (ব্রহ্ম) ও সোয়েকার্ণোর (ইন্দোনেশিয়া) মধ্যে গোপন আলোচনা।

'পশ্চিম বার্লিন সোভিয়েট-বিরোধী গুপ্তচরের ঘাটিতে পরিণত হইয়াছে'—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট রাশিয়ার অভিযোগপূর্ণ নোট।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৮ই ভাদ্র ঃ বায়ু-মণ্ডলে আণবিক পরীক্ষা চিরকালের মতো বন্ধ করার ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ-প্রস্তাব—৯ই সেপ্টেম্বর মধ্যে রাশিয়ার অনুকূল সাড়া না পাওয়া গেলে প্রত্যা-হৃত হইবে—লণ্ডনে সাংবাদিক বৈঠকে বৃটিশ-মুখপাত্রের ঘোষণা।

ভিয়েনার হাসপাতালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মিত্রের (৬৫) জীবনদীপ নির্বাণ।

৫ই সেপ্টেম্বর—১৯শে ভাদ্র ঃ রাশিয়া কর্তৃক পুনরায় বায়ুমণ্ডলে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ—ইঙ্গ-মার্কিণ সর্বশেষ আবেদন কার্যতঃ প্রত্যাখ্যান।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসে অবি-লম্বে ক্রুশ্চেভ-কেনেডি বৈঠকের আবে-দন—মস্কো ও ওয়াশিংটনে বিশেষ মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা—বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ-জাতি শীর্ষ-সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

৬ই সেপ্টেম্বর—২০শে ভাদ্র ঃ সেপ্টেম্বর মাসেই আমেরিকা কর্তৃক পুনরায় আণবিক পরীক্ষা সুরু—বায়ু-মণ্ডলের পরিবর্তে ভূনিম্নে পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোষণা।

শান্তি-দৌত্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও প্রেসিডেন্ট নক্রুমা মস্কো উপনীত—নেহরুর সহিত আলোচনা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের সহায়ক হইবে বলিয়া ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) আশা প্রকাশ।

পাক্-আফগান কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন।

৭ই সেপ্টেম্বর—২১শে ভাদ্র ঃ ক্রেম-লিন প্রাসাদে (মস্কো) ক্রুশ্চেভ ও শ্রীনেহরুর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—জার্মাণ প্রশ্ন ও আণবিক পরীক্ষা-প্রসঙ্গ সমেত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা।

সমকালীন প্রসঙ্গ

অভয়ঙ্কর

॥ সমরসেট্ মম্ ॥

বেভারলি নিকলস তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন পঁচিশ বছর বয়সে আর সাতাশীর প্রান্তে পেঁাছে সমরসেট মম্ স্থির করেছেন যে স্মৃতিচারণ রচনা করবেন. যদিচ সেই স্মৃতিচারণ এখনও প্রকাশিত হয়নি, সেই গ্রন্থ নিয়ে শুরু হয়েছে প্রাক্-প্রকাশন কানাকানি। সবাই বলছে এইবার মম্ এতদিনে যখন আত্মকথা লিখছেন তখন সকলের ওপর বেশ একহাত নেবেন। সমরসেট মমের সাহিত্য জীবন ঘিরে আছে আরনল্‌ড্ বেনেট, জর্জ বার্নার্ড শ, জন গলসওয়ার্দি, আলডাস হাক্সলি আর নোয়েল কাওরার্ড প্রভৃতি সাহিত্যিকরা, এঁরাই তাঁর সমকালীন লেখক। সমসাময়িকরা সর্বদা তাঁদের সতীর্থদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকান না, অনুদার মন্তব্য, অশালীন উক্তি এবং তাচ্ছিল্য সর্বকালের সাহিত্যিককেই সইতে হয়েছে। মম্‌কে কম সইতে হয়নি। তরুণ লেখক হিসাবে যখন সাহিত্যজীবনে প্রবেশ করেছিলেন মম্ তখন তাঁর প্রকৃতি ছিল লাজুক। একটু তোত্‌লামির টান ছিল তাঁর কথায়, তার জন্যও ছিল কুণ্ঠা, সেই সময় একজন বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক তাঁকে একদিন বলেছিলেন পিঠ চাপড়িয়ে মুরুব্বিয়ানা চালে—"ও সব নাটক-ফাটক তোমার হবে না, ও ছেড়ে দাও, নাটক লেখা ছাড়ো, তোমার থিয়েটার-সেন্স্-ই নেই।" সেই সমালোচককেই ত্রিশ বছর পরে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেন স্বয়ং সমরসেট মম্।

মমের রচনা-শৈলী এতই সরল যে তাকে ভুল করে কৃত্রিম বলা যেতে পারে, কিন্তু মমের মত আর কেউ রচনা-শৈলীর চূড়ান্ত উৎকর্ষতার জন্য বোধহয় পরিশ্রম করেন না। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস—'Of Human Bondage' এক হিসাবে আত্মজীবনীমূলক। প্রথমে ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে এই উপন্যাস তিনি রচনা করেন, অনেক প্রকাশকের দোর থেকে সেই উপন্যাস প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এল। অনেক বছর পরে, মম যখন নাট্যকার হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন একদিন বসলেন সেই পুরাতন উপন্যাস নিয়ে, পুরো দুটি বছর পরিশ্রম করে পুনর্লিখিত হয়ে উপন্যাসটি প্রকাশিত হল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। আজ সেই উপন্যাস ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে ক্লাসিকের সম্মানলাভ করেছে। তাই সমরসেট মম্ রচিত আত্মজীবনীর জন্য তাঁর অনুরাগী পাঠক উন্মুখ হয়ে আছে, বিশেষতঃ এতকাল বহুবার প্রকাশককে তিনি বিমুখ করেছেন, এমন কি, আর লিখবেন না এই প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, তাই এই সংবাদ শুভসংবাদ।

ইতিমধ্যে রিচার্ড করডেল লিখিত একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন মমের একমাত্র প্রকাশক হাইনেম্যান। গ্রন্থটির আয়তন বৃহৎ, তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুলিখিত, সেই কারণে উল্লেখযোগ্য।

সমরসেট মম্ এতদিন সকলকে নিরস্ত করেছেন, জীবনী-রচনার ব্যাপারে কাউকে উৎসাহ দেননি। বলেছেন আমার জীবন ঘটনাবহুল নয়, তাঁর ধ্যান-ধারণা, মানসিকতা সম্পর্কিত সংবাদ অতি অল্প।

সমরসেট মমের জনপ্রিয়তা অসীম, তাই জীবনী-শিকারীরা তাঁকে ছাড়বার পাত্র নয়। রিচার্ড করডেল রচিত এই জীবনীটি মমের জীবন-সম্পর্কিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভূমিকাপাঠে জানা যায় যে স্বয়ং মম্ লেখককে কিছু কিছু তথ্যাদি দান করেছেন এবং নানাবিধ সাহায্য করেছেন, এমন কি কয়েকটি ফটোগ্রাফও দিয়েছেন। কয়েকটি অল্প বয়সের ছবিও এই গ্রন্থে আছে।

তবু, এত সাহায্য এবং উপদেশ সত্ত্বেও করডেলের এই আত্মজীবনীতে অনেক কথাই বলা হয়নি, অনেক উহ্য রয়ে গেছে। লেখক তাই তাঁর বিষয়বস্তুর চরিত্রের সাধারণত্ব সম্পর্কে এবং তার হেতু সম্পর্কে কোনো যুক্তি দান করতে পারেননি, এমন কি আধুনিক জীবনী-সাহিত্যের যা সর্বপ্রধান উপাদান, কোনো নাটকীয় কিংবদন্তী কিংবা কাহিনী [illegible] গেছে না-জানা [illegible] মাঝে। অথচ সমরসেট মম্‌কে ঘিরে কিছু কিছু রটনা এবং ঘটনা ছড়িয়ে আছে।

মিঃ করডেল বলেছেন সমরসেট মমের এতটুকু দারিদ্র্য ছিল না, প্রথম নাটকের সাফল্যের জন্য মুখ-চেয়ে বসে থাকতে হয়নি, পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে একশো পঞ্চাশ পাউণ্ডের বাঁধা আয় ছিল।

তাই যা নিছক শাদাসিধে তথ্য তা আছে এই গ্রন্থে। মমের জীবনের উত্তর-কালের কোনো ইতিহাস যা তাঁর মুখ-

নিঃসন্দেহে কোনো ঘোষণা এই গ্রন্থে নেই, যা মমের রচনায় নেই। সেক্ষেত্রে গ্রন্থটির জীবনী-অংশের চেয়ে সমালোচনা-অংশের দিকে তাকাতে হয়। দুঃখের বিষয় সেই অংশটুকুও মাঝে মাঝে হতাশাব্যঞ্জক। সংক্ষিপ্ত, যুক্তি ও বিশ্লেষণ যথোপযুক্ত নয়। সমরসেট মমের সাহিত্য-পাঠকের কাছে তাই কিছু কিছু মন্তব্য অসম্পূর্ণ এবং অসার্থক মনে হবে।

"Of Human Bondage," "The Moon and Sixpence" ও "Cakes and Ale"

এই তিনখানি গ্রন্থের বিশ্লেষণ অতি সুন্দর এবং সুষ্ঠু বলা যায়। করডেল বলেছেন এই গ্রন্থ তিনটি মমের জীবনীর উপযোগী তথ্যে সমৃদ্ধ। প্রথমটিতে আছে মমের তরুণ বয়সের ছবি আর সর্বশেষ গ্রন্থে আছে সেই রমণীর কথা যার প্রেম তাঁকে মুগ্ধ করেছে, ধন্য করেছে।

অবশিষ্ট অংশে জীবনীকারকে সতর্ক হতে হয়েছে, সমালোচনার সীমা তিনি অতিক্রম করেননি। কোনো রকমের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা তিনি করেননি, এতটুকু নিজস্ব মতামত আরোপ করে বিজ্ঞানসম্মত জীবনী রচনার রীতি ক্ষুণ্ণ করেননি। এক জায়গায় বলেছেন: "It is possible that "Sheppey" is the most underrated of Maugham's plays. Sean O'casey considers it as one of the masterpieces of the modern theatre." এই মন্তব্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবেন না। নাটকটির অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকারও হয়ত আজ সন্দিহান।

আর এক জায়গায় করডেল লিখেছেন—
If Maugham never wrote a novel as richly poetic and elemental as "Sons and Lovers", he never wrote one as meaningless and dull as "Kangaroo": —এই জাতীয় মন্তব্য যে-কোন পাঠকের কাছে হাস্যকর ঠেকবে। এই কারণেই গ্রন্থটি উচ্চাঙ্গের জীবনীসাহিত্য বা সমালোচনাসাহিত্যের শ্রেণীতে বসানো যায় না। মিঃ করডেল অবশ্য পরিশ্রম-সহকারে মমের গ্রন্থাবলীর প্রকাশসংক্রান্ত বহু বিস্তারিত তথ্য এবং তৎসম্পর্কিত সমকালীন সমালোচকের মন্তব্য সংগ্রহ করেছেন।

মিঃ করডেল সমরসেট মমের গল্প-লেখক হিসাবে মূল্যায়নে যে নম্বর দিয়েছেন, নাট্যকার হিসাবে তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্য দিয়েছেন। যেমন "The Circle" নামক নাটকটিকে "Saint Joan" কিংবা "The Cherry Orchard"-এর সমগোত্রীয় হিসাবে উল্লেখ করা প্রগল্‌ভতা মনে হবে।

উপন্যাসকে তিনি যথাযথ স্থান দিয়েছেন এবং তার সমর্থনে মমের প্রসিদ্ধ উক্তিই ব্যবহার করেছেন: "I know where I stand; in the very front row of the second-raters". মিঃ করডেল কিন্তু সমরসেট মমের সাহিত্য-কর্মের একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের চেষ্টা করেননি। তাঁর প্রচেষ্টায় অখণ্ডত্ব নেই। যে-লেখকের এত প্রতিভা, এত জনপ্রিয়তা, তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে সাহিত্যের কোনো বিভাগে কি অখণ্ড সাফল্য লাভ করেননি? তাঁর ছোটগল্প-গুলির অধিকাংশ ঔজ্জ্বল্যে এবং বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। সেই গল্পগুলি কি শুধু মোপাসাঁর গড়া জগতে উদ্দেশ্যহীন বিচরণ মাত্র? সমরসেট মমের সাহিত্য-জীবন যদি উপন্যাস, নাটক ও ছোট-গল্পের ত্রিধারায় বিভক্ত না হত, তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টা ও উৎসাহ যদি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সীমিত থাকত তাহলে কি তাঁর ছোটগল্প মহত্তর হয়ে উঠত?

উপন্যাস কতকগুলি শুধু ভালো নয়, সার্থক ও সফল হয়েছে। কিছু হয়ত প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত নয়, নাটকের বিচার কোনোদিনই যথাযথ হয়নি এবং নাট্য বিচারের মাপকাঠিতে হয়ত দুটি-মাত্র নাটক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। তবে একথাও বিচার্য যে আজ থেকে বহু বছর আগে যে সব নাটক রচিত হয়েছে, তার বক্তব্য, আঙ্গিক ও বিন্যাস বর্তমানের নিরিখে অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে। সেই কারণে তাঁর নাটকের পক্ষে কালজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প।

অন্য বিভাগে তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ থাকায় নাট্যকার মমের প্রতিভা কতখানি ব্যাহত হয়েছে সেই বিচারেরও প্রয়োজন আছে। সমরসেট মম্ সার্থক জনপ্রিয় লোক, পেশাদার লেখক, দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক ইত্যাদি নানাবিধ বিশেষণ তাঁর প্রতি আরোপিত হয়,—কিন্তু সমা-লোচক মম সম্পর্কে কেউ কিছু বলেননি। মমের অন্তরে এক কঠোর সমালোচক আছে, যার ভ্রূকুটির ভয়ে তিনি একদিন নাট্যরচনা ত্যাগ করেছেন, আরো পরিণত বয়সে পৌঁছে উপন্যাস রচনাও ছেড়েছেন, কিন্তু কেন? এ কি আত্ম-বিশ্বাসের অভাব? অন্তরে গভীর অবিশ্বাস থাকার ফলেই এমনটি ঘটা সম্ভব। সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে সমরসেট মমের জীবনের এই সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি এবং ট্রাজেডি। কোনোদিনই এক পথে বিচরণের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি নেই মমের, অশান্ত মন নিয়ে তিনি তীরে তীরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভাঙার ওঠার আগ্রহ দমন করেছেন। আপনার শক্তি, প্রতিভা, সামর্থ সম্পর্কে সব কিছু জেনে ফেলা তাই শিল্পীর জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিশাপ।

মিঃ করডেলের মন্তব্য এবং বিশ্লেষণে ত্রুটি থাকলেও তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা ভবিষ্যতের জীবনী-

কারের পক্ষে সহায়ক হবে। এমন কি মমের অনুরাগী পাঠকের পক্ষে একটা নিজস্ব বিচারে পৌঁছানো সহজ হবে। যতদিন মমের 'আত্মজীবনী' প্রকাশিত না হবে, ততদিন মিঃ করডেলের গ্রন্থটিকেই প্রামাণ্য জীবনী হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

বুড়ো ও সাগর (অনুবাদ)— আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। অনুবাদঃ লীলা মজুমদার। প্রকাশক—প্রফুল্লচন্দ্র দাস, চাঁদনী চোক, কটক—২। দাম—৭·৭৫ নয়া পয়সা।

হেমিংওয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত উপন্যাস 'The old man and the Sea' বাংলায় অনুবাদ করেছেন লীলা মজুমদার। প্রথমেই বলে রাখা ভালো এই লীলা মজুমদার ও বিখ্যাত সরস গল্প-লেখিকা লীলা মজুমদার এক নন। এই গ্রন্থ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, পরে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পায় পুলিটজার প্রাইজ আর ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে 'নোবেল প্রাইজ'। এই গ্রন্থে হেমিংওয়ে এক অনাবিষ্কৃত জগৎ পাঠকের চোখের সামনে এনেছেন। এক হিসাবে এটি একটি 'প্রতীক' উপন্যাস। এই উপন্যাসটিতে বৃদ্ধ ধীবর সান্টিয়াগোর জীবনের বাণী সুগভীর অর্থে ভরা। পরাজয়কে সে স্বীকার করে না, জীবন সংগ্রামে মাথা তুলে সে দাঁড়াবেই এই তার পণ। শ্রীমতী লীলা মজুমদার অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থটির মুদ্রণ অপরিচ্ছন্ন—প্রচ্ছদটি মূলের অনুকরণ হওয়ায় ভালোই হয়েছে।

স্বপ্নলিপি—(উপন্যাস)—খগেন্দ্র দত্ত। বুক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দু' টাকা।

খগেন্দ্র দত্ত 'পরিচয়' পত্রিকায় কয়েকটি সুন্দর গল্প লিখেছিলেন সেগুলি স্মরণে আছে। তিনি লেখেন কম, কিন্তু ভালো লেখেন, তাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার কথা নয়। 'স্বপ্নলিপি' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি মুদিয়ালী, পাহাড়পুর প্রভৃতি অঞ্চল, যা বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্গত। বর্তমান কালে মধ্যবিত্ত সমাজ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, মধ্যবিত্তের আকৃতি ও সমস্যাটুকু কিন্তু সর্বত্রই এক ধরনের। অকিঞ্চন ও অনুরাধার জীবনের যে সমস্যা সে সমস্যা আজ সব মধ্যবিত্তের। রুগ্ন স্বামীকে সেবা করার জন্য স্ত্রীদের কি লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে হয়। এই দুঃখকর জীবনের বিচিত্র চিত্র 'স্বপ্নলিপি'তে অপরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়েছেন তরুণ লেখক। ঘটনাবিন্যাসে ও স্বচ্ছন্দভাষার গুণে গল্প কোথাও ব্যাহত হয়নি, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটানে পড়ে যাওয়া যায়। শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর হয়েছে।

জোয়ার ভাঁটা— (গল্প)—সমরেশ বসু। বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

সমরেশ বসু বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। এই তরুণ লেখক অতি অল্পকালের মধ্যে বাংলার সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব আসন বিছিয়ে নিয়েছেন, তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক এবং বিস্ময়কর। গল্প ও উপন্যাস এই দুটি ক্ষেত্রেই লেখক অপূর্ব শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর সাম্প্রতিক গল্প-সঞ্চয়ন। বিবরমুক্ত, অপরিণত, নিয়ত, বিষের ঝাড়, জোয়ার ভাঁটা, জীবিকা, বাইরে এই সাতটি বিখ্যাত গল্প এই সঞ্চয়নে সংযোজিত হয়েছে। সমরেশ বসুর গল্পের উপজীব্য যে-সমাজের মানুষ তারা সর্বজন-পরিচিত, তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা ও বেদনার [illegible] পরিচিত অথচ উপেক্ষিত দিকটাই তিনি তাঁর কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন অতি অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। "জোয়ার ভাঁটা" সঙ্কলনের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন 'জোয়ার ভাঁটা' ইদানীংকালের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ঘটনাসংস্থাপন ও আঙ্গিকের দিক থেকে বিশেষ সমৃদ্ধ।

পৌষের গান—(কাহিনী)—অবনীদেব মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক-সাধারণ পাবলিশার্স। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ঃ তিন টাকা।

অবনীদেব মুখোপাধ্যায় রচিত 'পৌষের গান' এক হিসাবে একটি বিস্ময়কর কাহিনী। সমাজের নীচের তলায় যারা থাকে তারা আজো যেন সাহিত্যের আসরে হরিজন। অবনীদেব অতিশয় সাহসিকতার সঙ্গে তাদের সুখ-

দুঃখ, ব্যথা ও বেদনার ইতিহাস 'পৌষের গানে' লিপিবদ্ধ করেছেন। মান[illegible] গান' [illegible] উদারভাবে পরিবেশিত হওয়ায় কাহিনীটির মধ্যে একটি নিস্তেজাল গ্রাম্য আবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পল্লী পরিবেশে যে জীবন প্রস্ফুটিত হতে পারে না, নানা বাধা এবং বিঘ্নের মধ্য দিয়ে জীবনকে ব্যাহত করতে হয় পদে পদে, একদিন তারা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সর্বগ্রাসী কারখানা নামক নবযুগের তীর্থমন্দিরে। লেখকের রচনা-নৈপুণ্যে গ্রন্থটি অতিশয় সুখপাঠ্য হয়েছে। গ্রন্থ-পরিচিতিটিও চমৎকার। ছাপা ও প্রচ্ছদ মনোরম।

চাঁদের হাট (একাঙ্ক নাটিকা সংকলন) **—সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। প্রকাশক : এন মুখার্জি, প্রদীপিকা। ৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।**

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী দীর্ঘকাল বাংলার নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে কাজ করছেন। তাঁর কয়েকটি নাটিকাও ইতি-মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নাট্য-কার বার্নার্ড শ, আগসট্ স্ট্রীনবার্গ, নোয়েল কাওয়ার্ড, লুইজী পিরান-দেল্লো প্রভৃতি প্রখ্যাত নাট্যকারদের রচনারীতির অনুকরণে ও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে সব নাটিকা রচনা করেছেন, তার মধ্যে দশটি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত। কয়েকটি রচনা পরীক্ষামূলক হলেও প্রশংসনীয়। শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী অসামান্য নিষ্ঠা এবং কৃতিত্ব সহকারে এই নাটিকাগুলি রচনা করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সভা, চাঁদের হাট, টেবিল, চেয়ার ও জৈবিক আমাদের ভালো লেগেছে। মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

মহামানবের সাগর তীরে—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, ৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা ২০। মূল্য ৪·০০

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের সংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'মহামানবের সাগর তীরে' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অ-বঙ্গভাষী ভারতীয়দের মধ্যে বঙ্গভাষা প্রসারের জন্য ঘোষ মহাশয় সাধারণ্যে বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ আলোচিত গ্রন্থখানির মধ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাভাষী অবাঙ্গালী ও বিদেশীয়রা বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-নাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে যে সকল আলোচনা করেছেন সেগুলি সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে লিখিত রচনাকারদের মধ্যে আছেন—ভারতের রাষ্ট্রপতি, তেলেগু গোপাল রেড্ডী, তামিল ঈশ্বরচন্দ্র শেখর শাস্ত্রী, গুজরাতি শিবকুমার যোশী, ওড়িয়া লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, চীনে কুমারী তান ওয়েন, মারহাঠী সরোজিনী কমতনুরকর, মার্কিনী ব্রাউন, জার্মান ফিশার, রাশিয়ান গুরুগনেফ, ব্রহ্মদেশীয় মাঙ সেও মিন, আফগানী মুসলমান হবিবুল্লা, হিন্দু নরসিংদাস, খৃষ্টান ফাদার ফালোঁ, দ্রাবিড় শ্রীনিবাস, অনার্য নেকী লামু প্রভৃতি পঁয়ত্রিশ জন। নিবন্ধ-প্রবন্ধ ব্যতীত কয়েকজন কবিগুরুর উপর কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন এই গ্রন্থের জন্য।

মহামানব রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের সর্বজনীন আবেদন এই সঙ্কলনের মধ্যে যেন সার্থক রূপ পরি-গ্রহ করেছে। বাংলা না-জানা বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশবাসীর কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের একটি অপূর্ব নিদর্শন এই গ্রন্থ। কয়েকখানি চিত্রও এই গ্রন্থের শোভা বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থখানির নামকরণের সঙ্গে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের ভূমিকার অংশবিশেষের যথেষ্ট তাৎপর্য আছে।

আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

পশ্চিম দিগন্তে—শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য ৫·০০

গল্প, উপন্যাস ও কবিতার বইয়ের তুলনায় ভ্রমণ-কাহিনী অপেক্ষাকৃত অল্পই প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায়। অথচ ভ্রমণ-কাহিনী সুলিখিত হলে গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কিছু কম উপ-ভোগ্য হয় না। আলোচিত গ্রন্থখানিও একটি উল্লেখযোগ্য সুলিখিত ভ্রমণ-কাহিনী। লেখক নিজে সাহিত্যিক হওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যের মহা-সম্মেলনে তাঁকে যেতে হয়েছিল আমেদাবাদে, এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি প্রভাস, সোমনাথ, জুনাগড়, গিরিনার, দ্বারকা, ভেটদ্বারকা, আবুপাহাড়, অচলগড়, বোম্বাই, কান-হেরি, যজ্ঞেশ্বরী, এলিফ্যান্টা, ইলোরা, দৌলতাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, অজন্তা, জব্বল-পুর, ভূপাল, সাঁচী, বিদিশা, ঝাঁসী, খাজুরাহো, পান্না, সারনাথ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, কিংবদন্তী ও বিভিন্ন ঘটনা-সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানমাহাত্ম্যগুলি এমন সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন গ্রন্থকার যে পাঠকের সমক্ষে প্রত্যক্ষ-দর্শনের আনন্দ বহন করে আনে। আর্ট পেপারে মুদ্রিত কয়েক-খানি ফটোচিত্র এই গ্রন্থের শোভাবর্ধনে প্রভূত সাহায্য করেছে। প্রচ্ছদপটটিও মনোরম।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

॥ আজকের কথা ॥

॥ একটি বিচিত্র চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ॥

ফিল্ম-ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা হয়নি বা কোনো শব্দধারক যন্ত্রের (Sound recording machine) সাহায্যে যন্ত্রসংগীত গৃহীত হয়নি, এমন কি, সংগীত-সৃষ্টির জন্যে কোনো বাদ্যযন্ত্রেরও সাহায্য নেওয়া হয়নি, অথচ একটি আবহসংগীতসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র প্রস্তুত হয়ে সাধারণ্যে দেখানো হয়ে গেল এবং দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ-বিস্মিত রসিকজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করল, এমন কথা পাঠক বিশ্বাস করবেন কি? কিন্তু বিশ্বাস করুন, বা নাই করুন, সত্যই এই ঘটনা ঘটে গেল ২৯-এ ও ৩০-এ আগস্ট তারিখে কলকাতার ইলাকো হাউসের ম্যাক্সমুলার ভবনে। কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ঐ দুই সন্ধ্যাতেই নরম্যান ম্যাক্‌লারেন-এর পরীক্ষামূলক চিত্রাবলীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

"ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড অব কানাডা"র প্রযোজনায় নরম্যান ম্যাক্‌লারেন-এর পরীক্ষামূলক চিত্রগুলি রসিক দর্শকদের মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে। ফিল্মের উপর কতকগুলি সরলরেখার কম্পন, কতকগুলি ছোট-বড় বস্তুর নানা ছন্দে নর্তন এবং বিবর্তন, সরল, বক্র, বৃত্তাকার, অর্ধ-বৃত্তাকার, স্থূল এবং সূক্ষ্ম রেখাবলীর বিচিত্র গতিভঙ্গির সঙ্গে এমন অদ্ভুতপূর্ব আবহ-সংগীতের সমাবেশ—রসিকদর্শকের চোখের সামনে যে বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) ভাব-সমারোহের সৃষ্টি করেছিল, তা দর্শক-চিত্তকে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকের সন্ধান দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, স্থূল-বস্তুর (concrete object) কি এমন প্রয়োজন, যদি এই সতত সঞ্চরমান রূপরেখাই মনের মধ্যে এমন ভাবের স্পন্দন জোগাতে পারে! ফিল্মের বুকে ব্রাশ, তুলি, রঙ ও কালির সাহায্যে যে এমন বিস্ময়কর চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা রীতিমত কঠিন। "এ-ফ্যান্টাসি", "ক্যুগী ভুগ্‌ল", "লাইন্‌স অ্যাণ্ড সার্কল", "বিগিন ডাল কেয়ার"-এর প্রত্যেকটিই বিচিত্রভাবে উপভোগ্য। আবার প্রত্যেকটি ফ্রেমকে দু' সেকেণ্ড ধরে ফোটোগ্রাফ করে "নেবারস্‌" ছবিতে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটি ফুলের স্বামিত্ব নিয়ে যে ঝগড়া, তার পরিণতি হিসেবে দুই পরিবারের ধ্বংস দেখালেও আসলে তা অপূর্ব কৌতুক-চিত্রে পরিণত হয়েছে। এ-ও নরম্যান ম্যাক্‌লারেন-এর এক বিচিত্র পরীক্ষামূলক চিত্র।

ম্যাকলারেন-এর চিত্রাবলীর সঙ্গে যে-দুটি জার্মান স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র

হুস্‌বিরিস্তানের "শামা" চিত্রে সুরাইয়া

দেখানো [illegible], তার মধ্যে [illegible] গড়ে তুলল, তারই বিবরণী পেশ করা চিত্রকলা [illegible] বিভিন্ন দৃশ্যের সাহায্যে। [illegible] হ্যান্ [illegible] "অ্যান্ড [illegible] নো সী";—দ্বিতীয়টিতে, যেখানে একদিন সমুদ্র ছিল, সেখানে মানুষ তার অদম্য বৈজ্ঞানিক [illegible] বলে কেমন ক'রে একদিন সমুদ্রকে নিশ্চিহ্ন ক'রে বিরাট শহর

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

পুনশ্চ : কাহিনী : আশীষ বর্মণ। চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও প্রযোজনা : মৃণাল সেন। চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা, দুর্গাদাস মিত্র প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা : সমরেশ রায়। শিল্প-নির্দেশনা : বংশীচন্দ্র গুপ্ত। সম্পাদনা : গঙ্গাধর নস্কর।

ভূমিকায় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, এন বিশ্বনাথন, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, গীতালী রায় প্রভৃতি। চিত্রটি জনতা পরিবেশিত।

২২শে শ্রাবণের পর 'পুনশ্চ' মৃণাল সেনের একটি পরম প্রত্যাশার ছবি। আজকের বাংলা ছবির মান উন্নয়নে যে কজন অগ্রদূতের পরিচালকের নাম করা যায় তাঁদের মধ্যে মৃণাল সেন নিঃসন্দেহে অন্যতম।

অজয় কর পরিচালিত "অতল জলের আহ্বান" চিত্রের একটি দৃশ্যে তন্দ্রা বর্মণ

পুনশ্চর কাহিনী আজকের মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ-সুখের আলেখ্য। জীবিকার অমোঘ তর্জনী-হেলনে একটি মুহ্যমান প্রেমের কাহিনী পুনশ্চর মূল উপজীব্য। সুবোধ বাসন্তীকে ভালবাসে। কিন্তু সুবোধ জানে তার একার উপার্জনে তাঁদের মিলিত সংসারের চাকাটা চলবে না। তাই ভবিষ্যৎ সুখোদয়ের দিকে যাবার জন্যেই বাসন্তী চাকরী নিল একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানে যার উচ্চপদস্থ অফিসার হলেন জনৈক বিপত্নীক ভদ্রলোক মিঃ মুখার্জি। বাসন্তীর বাবা অবশ্য প্রথমে আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ব্যাপারটি মেনে নিতে হয়েছিল অবস্থার চাপে। বাসন্তীর দাদা রবির চাকরী গিয়েছিল ইউনিয়ন করতে গিয়ে। হয়ত মুচলেকায় অপমানের মধ্যে

গেলে চাকরীটা ফিরেও পেতে পারত। কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ একটি অভিমানী মর্যাদা তাকে মাথা নোয়াতে দেয়নি জীবিকার যূপকাষ্ঠে। স্ত্রীর অভিযোগ, বাবার কটূক্তি তাকে শুধু দিনের পর দিন কর্কশ করে তুলল সংসারের প্রতি। ইতিমধ্যে সাধারণ মানবিক নিয়মেই বাসন্তী করুণাপরবশ হয়ে উঠল মিঃ মুখার্জির ব্যক্তিগত জীবনের বেদনায়। তাঁর অপরূপ ব্যক্তিত্ব, বিপত্নীক সংসার, পুত্রের প্রতি অসাধারণ মমতা বাসন্তী অবহেলা করতে পারল না। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, বয়স, বাসনার নানা-দিক থেকে টানা-পোড়েনে সে যেন এক নতুন অন্ধকারে প্রবেশ করল। সুবোধকে বলতে শুনল বাসন্তী যে, সংসার বাসন্তীকে ব্যবহার করছে। কিন্তু বাসন্তীর ভাবনা সুবোধও কি তাকে চাকরী নিতে বলেনি? তাহলে বাসন্তী কি শুধুমাত্র ব্যবহারেরই সামগ্রী। সুবোধকেই বাসন্তী একমাত্র দায়ী করল। সুবোধ নিজের অক্ষমতাকে ঢাকতে চাইছে বাসন্তীকে দিয়ে। আঘাত পেয়ে সুবোধ চলে গেল একটি কয়লা-খনির চাকরিতে। সুবোধের চলে যাওয়াতে যেন সম্বিত ফিরল বাসন্তীর দাদার। একটা গ্রামের স্কুলের চাকরী নিয়ে চলে গেল

মৃণাল সেন প্রোডাকসন্সের "পুনশ্চ" চিত্রের নায়িকা কণিকা মজুমদার

স্ত্রীকে নিয়ে। ইতিমধ্যে বাবা পেনসেন নিলেন। সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এল বাসন্তীর কাঁধে। কিন্তু বাসন্তীকে তার অতিকষ্টে পাওয়া চাকরীটা ছাড়তে হল যখন মিঃ মুখার্জি নীরবেই বিয়ের প্রস্তাব করলেন বাসন্তীর কাছে। যদিচ মিঃ মুখার্জির প্রেম নিবেদনের মধ্যে কোনো অসম্মান ছিল না, কিন্তু নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষার আসল রূপটিকে চিনতে পারল বাসন্তী। সুবোধকে আসতে চিঠি লিখল পলাশপুরে, যেখানে নিজেকে লুকোতে গিয়েছিল সে। এবং পলাশপুরেই শেষ পর্যন্ত দুটী বিক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত মনের সেতুবন্ধন ঘটল।

পুনশ্চর কাহিনী সম্পূর্ণ আধুনিক জীবনের ভেতরের ইতিহাস। পরিচালক মৃণাল সেন বাস্তবের পর্দাতেই ছবির সুরটিকে বেঁধেছেন। পুনশ্চর সমস্ত কটি চরিত্রই স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। চিত্রে পরিচালকের পৃষ্ঠপোষণাধন্য চরিত্রের অনুপস্থিতি একটি অনুপম আনন্দের কারণ। এমন কি বাসন্তীর বেকার দাদাও চিত্রে একটি অপদার্থ ভিলেন হিসেবে রূপায়িত না হয়ে যুক্তিগ্রাহ্য একটা গোটা আজকের মানুষের কারুণ্যে প্রতিষ্ঠিত। বলতে গেলে পুনশ্চে কোনো 'ভিলেন' নেই। কিংবা হয়ত মধ্যবিত্ত জীবনের অক্ষম অর্থনীতিই এই ছবির একমাত্র ভিলেন।

২২শে শ্রাবণের পর পুনশ্চে মৃণাল সেনের পরিণতি স্বভাবতঃই কালের নিয়মে উপস্থিত। যদিও চিত্রভাষার প্রয়োগে ২২শে শ্রাবণের সংস্কারমুক্তি বর্তমান ছবিতে ঘটে নি। পুনশ্চের প্রথমার্ধ পরিবেশ রচনায় অতিরিক্ত ভাবে নিয়োজিত। বাসন্তীর অফিসের দৃশ্যে বারবার ডিকটেশন দেবার দৃশ্যটি কাহিনীর অগ্রগমনে বিশেষ কিছু সাহায্য করেনি। তেমনি সিনেটের অংশাংশ,

অখিল চিত্র প্রতিষ্ঠানের "মিথুনলগ্ন" চিত্রের একটি দৃশ্যে দীপিকা দাস ও অসিতবরণ।

নদীর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি কিংবা বড়-বাজারের দৃশ্যগুলি ছবির বাহিরঙ্গ-সজ্জার পক্ষে উপযোগী হলেও কাহিনীর ঐ অন্তরাবেগকে তীক্ষ্ম করেনি। আরেকটি দৃশ্য সংস্কারচিত দর্শকের পক্ষে চক্ষু-পীড়ার কারণ হতে পারে। দৃশ্যটি হল চাকরী পাবার পর বাসন্তীর প্রতি আদরের বাড়াবাড়ির অংশটি। দৃশ্যটি স্ববিরোধীও বটে। কারণ বাবা-মা'র খুব একটা আগ্রহ ছিলনা বাসন্তীর চাকরী গ্রহণে। বাবার পেনসন পাবার পরই বাসন্তী তাদের সংসারের একান্ত নির্ভর হয়ে পড়েছিল। পুনশ্চের শেষাংশটি প্রায় দর্শকদের কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সমস্যাটা তবু সমস্যাই থেকে যায়। হয়ত এরপর বাসন্তীর বাবা মার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করবে সুবোধের ওপরে। নাকি বাসন্তী বিয়ের পরও চাকরী করবে বাবা মার জন্যে? তা'হলে সুবোধ কি কলকাতার বাইরের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসবে? এসব প্রশ্নের উত্তর পুনশ্চে নেই।

ক্যামেরার কাজে শৈলজা চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কয়েকটি রাত্রির দৃশ্য, লিফটের ওঠা-নামা, লণ্ড সটে মিঃ মুখার্জির সিগেরেট খাওয়ার দৃশ্য, কিংবা কালী ব্যানার্জির মুখের একটি ক্লোজ-আপ মাউনটিং পুনশ্চ ছবিটিকে মনে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করবে। অভিনয়াংশে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় এন, বিশ্বনাথনের। একটি বিপত্নীক স্নেহশীল পিতার চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। বিশ্বনাথনের পরেই বাসন্তীর বৌদির ভূমিকায় শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাম উল্লেখ্য। অন্যান্য চরিত্রে সুপরিচিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ নিজেদের সুনাম রেখেছেন।

পুনশ্চের সংগীত পরিচালনায় সমরেশ রায় কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

বিবিধ সংবাদ

॥ কাঞ্চনরঙ্গ ॥

"অন্বেষা" গোষ্ঠীর প্রযোজনায় শ্রীশম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত "কাঞ্চনরঙ্গ" নাটকটির অভিনয় হবে আগামী ৮ই অক্টোবর, রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে। বর্তমান সমাজের কঠিন সত্যকে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হ'য়েছে এ নাটকে। নাটকটি পরিচালনা করবেন স্বদেশ বসু। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করবেন শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদর্শন দাস, বিমল দে, স্বপন বসু, শ্যামল দত্ত, সুনীল চক্রবর্তী, নির্মল ঘোষ, কমলা দাস ও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় পরিচালক স্বয়ং।

*

এ হপ্তাতে দু'খানি বাঙলা ছবি মুক্তি পেল। গেল কাল, বৃহস্পতিবার, ১৪ই থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে অখিল চিত্র প্রতিষ্ঠানের "মিথুন লগ্ন"। শিব ভট্টাচার্য ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং এতে সুরারোপ করেছেন শৈলেশ দত্ত-গুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অসিতবরণ, আশীষকুমার, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, মলিনা, তপতী, পদ্মা এবং দীপিকা দাস।

*

এবং আজ শুক্রবার ১৫ই থেকে শ্রী, ইন্দিরা, প্রাচী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে

মুক্তি পাচ্ছে মৃণাল সেন প্রোডাকসন্স-এর "পুনশ্চ"। মৃণাল সেন পরিচালিত এবং জনতা পিক্‌চার্স পরিবেশিত এই ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, শেফালী প্রভৃতির সংগে চিত্রজগতে নবাগত, এন্‌, বিশ্বনাথন্‌কে।

*

এবং "ডাইনী"র পরে রূপবাণী, ভারতী এবং অরুণায় আসছে বহু-প্রতীক্ষিত চিত্র 'সপ্তপদী'। উত্তমকুমার প্রযোজিত এবং অজয় কর পরিচালিত, আলোছায়া প্রোডাক্‌সান্স-এর এই ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অনেক দিন বাদে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনকে হেমন্তকুমারের সুরারোপ এই ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ।

*

সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ১৯৬১ সালের ২৭-এ অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, ইতালী, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি ৩৬টি দেশ অংশ গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপুঞ্জ ও তার বিশেষ সংস্থাগুলিও এই উৎসবে যোগ দেবে। দিল্লীর পর এই উৎসব কলকাতায় হবে ৩রা থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত, মাদ্রাজে হবে ৭ই থেকে ১৩ই নভেম্বর এবং সবশেষে বোম্বাইয়ে হবে ১০ই থেকে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত।

॥ "শিল্পাঞ্জলি" চিত্র প্রতিষ্ঠান ॥

অবু ঘটকের কাহিনী অবলম্বনে এবং বীরেন ঘোষের পরিচালনায় শিল্পাঞ্জলি চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবির মহরৎ হয়ে গেছে বম্বের সেণ্ট্রাল স্টুডিওতে। অলোক দাশগুপ্ত এবং সরদার মালিক রয়েছেন যথাক্রমে আলোক-চিত্র গ্রহণ ও সংগীত পরিচালনায়। আলোচ্য চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে আছেন আজরা, অসীমকুমার, অভি ভট্টাচার্য, তরুণ বসু, সুলোচনা, অসিত সেন, দেবীকা, পদ্মা দেবী প্রভৃতি।

॥ তরঙ্গ ॥

স্বৈরথের পরিচালনায় শক্তি ফিল্মস প্রোডাকসন্সের "তরঙ্গ" গড়ে উঠেছে মুক্তিপদ দাসের কাহিনী অবলম্বনে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কালীপদ সেন। চিত্রনাট্য ও শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে শক্তিময় ঘোষাল ও সত্যেন রায়চৌধুরী। চরিত্রচিত্রণে

গত ১লা সেপ্টেম্বর ইউনাইটেড নিউ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে রাধা প্রেক্ষাগৃহে চিত্র প্রদর্শনী ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় ডাঃ বিমল চন্দ্র, মেয়র রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ও জ্যোতির্বিকাশ মিত্র ভাষণ দেন

আছেন কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, দীপক মুখার্জি, তুলসী চক্রবর্তী শোভা সেন, নৃপতি প্রভৃতি।

॥ পথের ঠিকানা ॥

অমল দত্তের পরিচালনায় এবং রথীন্দ্রমোহন বসু রায়ের প্রযোজনায় "পথের ঠিকানা" চিত্রটি জ্ঞানেশ মুখার্জি এবং নবাগত নায়িকা শ্রীমতী সঞ্চিতাকে নিয়ে চিত্রগ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ননীলাল মুখার্জি।

॥ অবগাহন ॥

স্পার্টান ফিল্মসের প্রথম চিত্রার্ঘ "অবগাহন"-এর কাজ সুরু হয়েছে। কাহিনীকার রণজিৎ সিকদার। চিত্রনাট্য করেছেন অমলেশ চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন দ্বিজু ভাওয়াল, প্রবীর কুমার, মমতাজ আহমেদ খাঁ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, অনুরাধা গুহ (বোম্বে)। গীত-রচনা ও সংগীত-পরিচালনায় থাকবেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমার প্রদ্যোত নারায়ণ।

॥ "মেরী সুরৎ তেরী আঁখে" ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' 'মেরী সুরৎ তেরী আঁখে' হিন্দী চিত্ররূপ নিয়ে দেখা দেবে খুব শীঘ্রই। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শচীনদেব বর্মণ।

অশোককুমার, অলোককুমার, অপর্ণা পারেখ প্রভৃতিকে দেখা যাবে ছবির ভূমিকাতে।

॥ একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ॥

গত ১লা সেপ্টেম্বর পূর্ণ 'রাধা' প্রেক্ষাগৃহে সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় ইউনাইটেড মিউ অর্গানাইজেশন-এর উদ্যোগে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সাহায্যকল্পে 'অপরাজিত' চিত্র প্রদর্শনী ও বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন শ্রীজ্যোতির্বিকাশ মিত্র (জাতীয় শিক্ষক), সভাপতির আসন অলংকৃত করেন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন ডাঃ বিমল চন্দ্র।

শ্রীজ্যোতির্বিকাশ মিত্র মহাশয় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, এই সমস্যার আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। ইউনাইটেড মিউ অর্গানাইজেশনের সভ্যবৃন্দ যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তা এই সমস্যা প্রতিকারের চিহ্ন। এই প্রদর্শনী হতে লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ তারা দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ে সাহায্যকল্পেই ব্যয় করবে।

সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর ভাষণে এই সঙ্ঘের কর্মীদের সংপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক সাহায্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা খুবই আশাপ্রদ।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমণীমোহন কর, শ্রীবলাইচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রদীপ গোস্বামী, শ্রীজে কে শীল, শ্রীপুষ্প পাল, শ্রীমদন শীল, শ্রীঅজয় বিশ্বাস এবং আরও অনেকে।

॥ উত্তর-পূর্ব ইংল্যাণ্ডের ভারতীয় ছাত্রদের একটি সংগীতানুষ্ঠান ॥

উত্তর-পূর্ব ইংল্যাণ্ডের ভারতীয় ছাত্রগণ একটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।

নিউকাসল-আপন-টাইনে আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ জন শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করবেন। এ'রা সকলেই হয় ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, না হয় নিকটবর্তী কোন কারিগরী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত, যিনি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন : "আমরা স্থানীয় অধিবাসীদের ভারতীয় নৃত্য ও সংগীত সম্পর্কে একটি ধারণা দিবার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছি। দুই ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য, যথা ভারত নাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী এবং সেই সংগে লোকনৃত্য ও বহুবিধ ভারতীয় সংগীত পরিবেশিত হইবে। অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হইলে আমি শহরের অন্য কোন বড় হলে এই ধরনের আর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিব"।

শ্রীগুপ্ত ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে টাউন প্ল্যানিং শিক্ষা করছেন এবং এক্ষণে তিন বৎসরের একটি কোর্সে দুই বৎসরের শিক্ষা পূর্ণ করেছেন।

॥ কান্না ॥

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত অগ্রগামীর 'কান্না' চিত্রের কাজ সমাপ্তির পথে। আলোকচিত্র ও সুর-সংযোজনায় আছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও সুধীন দাশগুপ্ত। উত্তমকুমার এবং নবাগতা নন্দিতা বসুর সংগে অন্যান্য চরিত্র সৃষ্টিতে আছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, শোভা সেন, শ্যামল ঘোষাল, সবিতা সিন্‌হা প্রভৃতি।

॥ চতুর্মুখ সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বোধ নাটকের পুনরাভিনয় ॥

চতুর্মুখের সাফল্যমণ্ডিত নাটক 'নির্বোধের' পুনরাভিনয় আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর রঙমহলে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত নাটকখানি চতুর্মুখের শক্তিশালী অভিনেতৃগোষ্ঠী অসামান্য দক্ষতায় মঞ্চে রূপায়িত করেছেন। এ'দের মধ্যে আছেন প্রেমানন্দ ভট্টাচার্য, অসীম চক্রবর্তী, সবিতা মুখার্জী, তৃপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়, অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক রায়, লোকনাথ চন্দ্র, অমর দত্ত, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সুধীর দে, প্রাণতোষ লাহা প্রভৃতি। পরিচালনা—প্রেমানন্দ ভট্টাচার্য। সংগীত—নির্মল চৌধুরী।

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল সফরের তালিকা অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর খেলা শেষ করেছে। প্রথম শ্রেণীর মোট ৩২টা খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৩, হার ১ (৩য় টেস্ট) এবং খেলা ড্র ১৮। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩য় টেস্ট ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া আলোচ্য সফরে ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলের বিপক্ষে একদিনের খেলায় ৮ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করেছে। এ দুটো হার হয়েছে উপর্যুপরি এবং উভয় ক্ষেত্রেই ৮ উইকেটে। গত ১৯৫৬ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে প্রথম শ্রেণীর মোট ৩১টা খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয় ৯টা এবং হার ৩টে ছিল। ১৯৬১ সালে যেমন একটা খেলা বেড়ে মোট খেলা দাঁড়িয়েছে ৩২, তেমনি ১৯৫৬ সালের তুলনায় জয়লাভের সংখ্যা ৪টে বেশী এবং পরাজয়ের সংখ্যা ২টো কম। ১৯৫৬ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' এবং 'এ্যাসেজ' লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৬১ সালের সফরে অস্ট্রেলিয়া ২-১ টেস্ট খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' পেয়েছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘ ৩টে সিরিজ অপেক্ষার পর যে 'এ্যাসেজ' সম্মান পুনরুদ্ধার করেছিল তা তাদের হাতছাড়া করতে হয়নি।

১৯৩৪ সালে বিল্ উডফুলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরে আসে এবং ২—১ টেস্ট খেলায় জয়ী হয়ে 'এ্যাসেজ' পুনরুদ্ধার করে। সেই থেকে উপর্যুপরি ৬টা টেস্ট সিরিজে (১৯৩৪-১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে) অস্ট্রেলিয়াকে 'এ্যাসেজ' হাতছাড়া করতে হয়নি; এই সময়ে অস্ট্রেলিয়া রাবার পায় ৫ বার। ১৯৩৮ সালে উভয় দেশই একটা ক'রে টেস্টে জয়ী হলে এবং ২টো টেস্ট ড্র গেলে টেস্ট সিরিজ ড্র যায়। কিন্তু 'এ্যাসেজ' অস্ট্রেলিয়ার হাতেই থেকে যায়। উডফুলের পর অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ডন ব্র্যাডম্যান। ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া কখনও 'এ্যাসেজ' হারায়নি। ১৯৫৩ সালে, ৬টা টেস্ট সিরিজ পর (বছরের হিসাবে ১৯৩৪ থেকে ১৯৫২) ইংল্যাণ্ড 'এ্যাসেজ' পুনরুদ্ধার ক'রে উপর্যুপরি ৩টে টেস্ট সিরিজে (১৯৫৩, ১৯৫৪-৫৫ এবং ১৯৫৬) 'এ্যাসেজ' এবং 'রাবার' লাভ করে। পরবর্তী ১৯৫৮-৫৯ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংল্যাণ্ড ০—৪ টেস্ট খেলায় পরাজিত হ'লে 'এ্যাসেজ' এবং 'রাবার' অস্ট্রেলিয়ার হাতে চলে যায়। ১৯৬১ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া ২—১ টেস্ট খেলায় জয়ী হ'লে 'এ্যাসেজ' ও 'রাবার' অস্ট্রেলিয়ার হাতেই থেকে যায়।

অস্ট্রেলিয়াকে আজ নিঃসন্দেহে ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান আখ্যা দেওয়া যায়।

১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড-সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে ৮ জন বোলার ৫০টা বা তার বেশী উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

১৯৫৩ এবং ১৯৫৬ সালের ইংল্যাণ্ড-সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান দলের যথাক্রমে ৭ জন এবং চারজন বোলার ৫০ অথবা আরও বেশী উইকেট লাভের গৌরব লাভ করেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া দলের উইকেট-কীপার ওয়ালি গ্রাউট মোট ৬০ জন ব্যাটসম্যানকে (কট ৫১ ও স্টাম্পড্ ৯) আউট করেছেন। যুদ্ধ-পরবর্তী কালের ইংল্যাণ্ড-সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের উইকেট-কীপার হিসাবে ৫০ জনকে আউট করার কৃতিত্ব গ্রাউট-ই প্রথম লাভ করলেন।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

গিলিগ্যানের একাদশ ঃ ৩৬০ (ডবলউ এ্যালে ১০২, এম নর্ম্যান ৮৪। কুইক ১১৭ রানে ৩ উইকেট) ও ২৮৬ (এম নর্ম্যান ৫৬; হিচকক্ ৫২। ডেভিডসন ৪৫ রানে ৩ এবং ও'নীল ৪৪ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩৬৪ (নর্ম্যান ও'নীল ৮১, ডেভিডসন ৬৫, সিম্পসন ৬২, বেনো ৫০। লক ৯১ রানে ৩ এবং হিচকক্ ১২৭ রানে ৪ উইঃ) ও ২৮৩ (৭ উইকেটে; হার্ভে ৬৫, ব্রেন বুথ ৭৩, ডেভিডসন ৬০। লক ১১০ রানে ৫ উইকেট)

প্রথম দিনের খেলায় গিলিগ্যান-একাদশ দল ১ম ইনিংসে ৩৬০ রান করে। ঐ দিনেই অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ৪ উইকেটে ২০৩ রান তুলে দেয়।

খেলার ২য় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৬৪ রানে শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৪ রানে এগিয়ে যায়। অধিনায়ক রিচি বেনো আধ ঘণ্টায় পিটিয়ে খেলে ৫০ রান তুলে দেন। বেনো ৭টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী করেন। অপর দিকে ডেভিডসন তাঁর ৬০ রানের মধ্যে ৪৫ মিনিটে ৫৮ রান করেন; গিলিগ্যান একাদশ দলের ২য় ইনিংস এই দিনেই ২৮৬ রানে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে মোট ৫½ ঘণ্টার খেলায় দুই দল মিলে মোট ৪৪৭ রান তুলে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। দুই দিনের ১১ ঘণ্টার খেলায় মোট রান দাঁড়ায় ১০১০ (গিলিগ্যান ৩৬০ ও ২৮৬ এবং অস্ট্রেলিয়া ৩৬৪)। খেলা ভাঙ্গার ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে গিলিগ্যান-একাদশ দলের ২য় ইনিংস শেষ হওয়াতে অস্ট্রেলিয়ার আর ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ২৮৩ রানের প্রয়োজন হয়। খেলার ৩য় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৭টা উই-

কেটে পড়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৮৩ রান উঠে গেলে তারা ৩ উইকেটে জয়লাভ করে। এই ২৮৩ রান তুলতে ১৪১ মিনিট সময় লাগে। এই থেকেই মেরে খেলার বহর বুঝতে পারা যায়। মেরে খেলে দর্শকসাধারণের মধ্যে আনন্দের রোল তুলে ছিলেন নীল হার্ভে এবং ব্রেন বুথ। হার্ভের মোট ৬৫ রানের মধ্যে ছিল ১২টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী। সময় লেগেছিল ৪৫ মিনিট। বুথ ৫১ মিনিটের খেলায় ৭৩ রান তুলে দেন—বাউণ্ডারী করেন ১১টা এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী। দলের ৭০ রানে ৩য় উইকেট পড়ে গেলে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে হার্ভে-বুথ আধ ঘণ্টার কিছু কম সময়ে দলের ৮৭ রান তুলে দেন। টী-র সময় ১১০ রানে অস্ট্রেলিয়া দলের ৫টা উইকেট পান। এই খেলায় মোট ১,২১৩ রান উঠে ১৩½ ঘণ্টার কিছু কম সময়ে। দলের ২৩২ রানে ৬ষ্ঠ উইকেট (গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি) পড়ে গেলে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের আশা অনেক কমে যায়; কিন্তু খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন ডেভিডসন। মার মার ক'রে তিনি ব্যাট চালালেন; আর দ্রুতগতিতে রান উঠতে লাগলো। ৫৫ মিনিটে তিনি ৬০ রান ক'রে আউট হলেন। বাউণ্ডারী করলেন ৮টা এবং ওভার-বাউণ্ডারী ১টা।

টি এন পিয়ার্স একাদশ : ৩৭৫ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জন এডরিচ ১১০, মে ১০০, ডেক্সটার ৫৭, ফ্রেডী ট্রুম্যান নট আউট ৮০। ম্যাককে ১৩৬ রাণে ৩ উইকেট।

ও ৩৭৩ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জি স্মিথ ১০০, ডেক্সটার ১১০, জে এম পার্কস ৬০, মে ৪১। ম্যাককে ১১০ রানে ৪ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ৩১২ (ও'নীল ৬৩, বার্জ ৭১, বুথ ৭৭, জার্মান নট-আউট ৮০। ট্রুম্যান ৫৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ৩৫৯ (৭ উইকেটে। বেনো ৪১, সিম্পসন ১২১, বার্জ ৪৯।

১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে প্রথম শ্রেণীর খেলার তালিকায় এইটাই ছিল অস্ট্রেলিয়ান দলের শেষ খেলা। অস্ট্রেলিয়া সফরের এই শেষ খেলায় ৩ উইকেটে জয়ী হয়।

প্রথম দিনে ৩½ ঘণ্টার খেলায় পিয়ার্স দল ৮ উইকেটে ৩৭৫ রান তুলে ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ১০৭ রান ওঠে। জন এডরিচ এবং পিটার মে'র সেঞ্চুরী এবং ঝড়ের গতিতে ট্রুম্যানের নট-আউট ৮০ রান খেলার মাঠে উপস্থিত ১৫০০০ দর্শক প্রাণ খুলে খেলা উপভোগ করে। অস্ট্রেলিয়া ১টা উইকেট হারিয়ে খেলার বাকি সময়ে ৬৩ রান করে। খেলার ২য় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩১২ রানে শেষ হ'লে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের রান সংখ্যার উপরে মাত্র ১৭ রানে অগ্রগামী হয়।

লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার ৪ উইকেট পড়ে ২২৮ রান দাঁড়িয়েছিল।

লাঞ্চের পর অস্ট্রেলিয়া উইকেটের মায়া ছেড়ে দিয়ে তেড়ে বল পিটিয়ে খেলতে থাকে। ফলে উইকেট তাড়াতাড়ি পড়তে আরম্ভ করে। দলের উইকেট-রক্ষক জার্মানই কেবল নিজের উইকেট রক্ষা করতে পেরেছিলেন; ৫৪ মিনিটের খেলায় ৮০ রান ক'রে নট-আউট রয়ে যান। একবার এলেনের এক ওভার বলে ২৬ রান তুলে কিভাবে বল পিটিয়ে রান তুলতে হয় জার্মান দেখিয়েছিলেন। এলেনের এই ওভারের একটা বলকেও তিনি বাদ দেননি। রান বথাক্রমে এইভাবে ওঠে : ৬-৬-৪-৪-৪-২। ওভার-বাউণ্ডারী এবং বাউণ্ডারীর ছড়াছড়ি। সেই সংগে দর্শকদের আনন্দরোল!

বার্জ ৫৮ মিনিটে ৭১ রাণ করে আউট হ'ন। বুথ নিজস্ব ৭৭ রাণ করেন ৮১ মিনিটে। তাঁর রাণে ছিল ১টা 'ছয়' এবং ১২টা 'চার'। বুথ ও জার্মানের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৭৪ রাণ ওঠে মাত্র ২৫ মিনিট সময়ে।

পিয়ার্স দল এই দিন ২য় ইনিংসের খেলায় ৩টে উইকেট হারিয়ে ২৫০ রান তুলে দেয়। জি স্মিথ (১০০) এবং টেড ডেক্সটার (১১০) সেঞ্চুরী করলেন। দুটো ইনিংসে তাদের মোট ৪টে সেঞ্চুরী হ'ল। অদ্ভুত মিল দেখা গেল, ১ম ইনিংস এবং ২য় ইনিংসের সেঞ্চুরী রানের সংখ্যা একই রকম—১০০ এবং ১১০ ক'রে।

খেলার তৃতীয় দিনে পিয়ার্স দল ব্যাটের রাশ টেনে ধরে, আর ২য় দিনের মত বেপরোয়া খেলা নয়। ৬ উইকেট পড়ে দলের ৩৭৩ রান উঠলে অধিনায়ক পিটার মে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। তখন ৪ ঘণ্টার মত খেলার সময় পড়ে। খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে জিততে হ'লে ৩৫৭ রান তুলতে হবে অর্থাৎ ঘণ্টায় ৮৯ রান। অভিজ্ঞ টেস্ট খেলার অধিনায়ক পিটার মে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই সময়ের মধ্যে ৩৫৭ রান তুলে জয়লাভ করা অসম্ভব মনে ক'রেছিলেন, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো তা সম্ভব প্রমাণ করলেন। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ৭৪ (কোন উইকেট না পড়ে)। ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলতে নেমেছিলেন রিচি বেনো এবং ববি সিম্পসন।

এক ঘণ্টার খেলায় ১ম উইকেটের জুটিতে ১০০ রান ওঠে। এই রানের মাথায় বেনো নিজস্ব ৪১ রান ক'রে আউট হ'ন। ২য় উইকেটের জুটিতে খেলতে থাকেন সিম্পসন এবং ও'নীল। সিম্পসন দৃঢ়তার সংগে খেলে ৫৫ মিনিটে নিজস্ব ৫০ রান তুলেন। কিন্তু তাঁর জুটি ও'নীল নিজের উপর আস্থা রেখে খেলতে পারেন নি। ৩৪ রান ক'রে আউট হন। আর ১৯ রান তুলতে পারলেই ১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে তাঁর ২০০০ রান পূর্ণ হ'ত।

সিম্পসন সেঞ্চুরী (১২১ রান) করেন—এবারের ইংল্যাণ্ড সফরে তাঁর ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরী। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৫৭ রাণ ৭ উইকেটের বিনিময়ে তুলে দিয়ে ৩ উইকেটে জয়লাভ করে।

সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম

সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার সাফল্য এখন আর সংবাদপত্রের বুক জুড়ে বের হয় না। মহাকাশ অভিযানের সাফল্য কাহিনীর কাছে সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম বা উত্তুংগ পর্বত-শৃংগে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের সংবাদ লোকের মনে এখন আর বিশেষ বিস্ময়ের উদ্রেক করে না।

সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল এপার-ওপার প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা বাটলার সাহেব খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি মোটা টাকার নগদ পুরস্কার নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁর নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার ফলাফল খবরের কাগজে বুক জুড়ে ছাপা হ'ত। বাটলার সাহেবের শখ মিটে গেছে, তিনি তাঁর আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার উদ্যম মানুষের উবে যায়নি। এ বছরও চারজন মহিলাসমেত কয়েকজন সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। এ বছরের চ্যানেল বিজয়িনী চারজন মহিলার মধ্যে আছেন স্কুলের সতের বছরের এক ছাত্রী—নাম মার্গারেট ওয়াইট। এ পর্যন্ত যাঁরা সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন তাঁদের মধ্যে মার্গারেট হলেন সর্বকনিষ্ঠা সাঁতারু।

পাকিস্তানবাসী ব্রজেন দাস (বয়স ৩০) এবার ১১ ঘঃ ৪৮ মিনিট সময়ে চ্যানেল অতিক্রম করেন—ফ্রান্সের কেপগ্রিজ নেজ থেকে ইংল্যান্ডের কেন্ট। এই নিয়ে তিনি পাঁচবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ক'রে সর্বাধিকবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের রেকর্ড করলেন।

ক'লকাতার নীতীন্দ্র রায় (২১) তাঁর দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। প্রথমবার তিনি ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট সাঁতার দিয়ে শেষ পর্যন্ত জল থেকে উঠে পড়েন।

২য় বারে চ্যানেল অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগে ১৯ ঘণ্টা।

এ বছরে যে সব পুরুষ সাঁতারু চ্যানেল অতিক্রম করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরায়ই প্রথম সাফল্য লাভ করেন।

ইতিপূর্বে ক'লকাতার তিনজন সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার গৌরব লাভ করেছেন—মিহির সেন, ডাঃ বিমল চন্দ্র এবং আরতী সাহা (বর্তমানে গুপ্তা)।

সর্বাপেক্ষা কম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের রেকর্ড ঃ (ক) ১০ ঘণ্টা ৫০ মিঃ (ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড)—হাসান আবেদ রহিম (ইজিপ্ট)।

(খ) ১৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট (ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্স)— হেজ জেনসেন (ডেনমার্ক)।

সাঁতারে নতুন রেকর্ড

নিম্নলিখিত রাজ্য রেকর্ডগুলি যথাক্রমে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব এবং ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাদের বাৎসরিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় স্থাপিত হয়।

সন্ধ্যা চন্দ্র

পুরুষ বিভাগ

৪×১০০ মিটার মিডলে রিলে ঃ ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন; সময় ঃ ৫ মিঃ ৮·৬ সেঃ। পূর্ব রেকর্ড ঃ ৫ মিঃ ০৮·৯ সেঃ—স্টেট ট্রান্সপোর্ট (১৯৫৭)।

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই ঃ নারায়ণ কুণ্ডু (ন্যাশনাল এস সি); সময় ঃ ১ মিঃ ১২ সেঃ।

ইন্টারমিডিয়েট

১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ঃ মধুসূদন সাহা (জগৎজননী); সময় ১ মিঃ ৭·২ সেঃ।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই ঃ মধুসূদন সাহা; সময়ঃ ১ মিঃ ১৯·৮ সেঃ।

৪×১০০ মিটার মিডলে রিলে ঃ জগৎজননী ক্লাব; সময় ঃ ৫ মিঃ ৩১·৫ সেঃ।

জুনিয়র

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক ঃ অরিন্দম চন্দ্র (সেন্ট্রাল এস, সি); সময় ঃ ১ মিঃ ২৮·৪ সেঃ।

বালিকা

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ঃ সন্ধ্যা চন্দ্র (সেন্ট্রাল এস সি); সময় ঃ ৩ মিঃ ১·১ সেঃ। পূর্ব রেকর্ড ঃ ৩ মিঃ ২·০ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র (১৯৬০)।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ঃ সন্ধ্যা চন্দ্র (সেন্ট্রাল এস, সি), সময় ঃ ১ মিঃ ২০·১ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড ঃ ১ মিঃ ২০·৭ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র (১৯৫৯)।

পুরুষ বিভাগ

১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ঃ নিমাই দাস (হাটখোলা); সময় ঃ ২১ মিঃ ১১·৬ সেঃ। এক সপ্তাহ পূর্বে তিনিই এই অনুষ্ঠানে নতুন রেকর্ড (২১ মিঃ ২১·৬ সেঃ) করেন।

পূর্ব রেকর্ড ঃ ২১ মিঃ ২৪·৮ সেঃ—মদন সিংহ (১৯৩৯)।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ঃ নিমাই দাস (হাটখোলা); সময় ঃ ৫ মিঃ ১৫·১ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড ঃ ৫ মিঃ ১৬·৭ সেঃ (কালি মণ্ডল, ১৯৫৯)।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই ঃ নারায়ণ কুণ্ডু (ন্যাশনাল এস সি); সময় ঃ ১ মিঃ ১২·৬ সেঃ।

৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রীলে ঃ বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি।

সময় ঃ ৪ মিঃ ২৯·৬ সেঃ। পূর্ব রেকর্ড ঃ ৪ মিঃ ৩১·৮ সেঃ (সেন্ট্রাল এস, সি, ১৯৫৪)।

মহিলা বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ঃ সন্ধ্যা চন্দ্র (সেন্ট্রাল এস সি); সময় ঃ ৬ মিঃ ২১·২ সেঃ। পূর্ব রেকর্ড—১৯৫৯ সালে তিনিই এই অনুষ্ঠানে নতুন রেকর্ড (৬ মিঃ ২৩·৩ সেঃ) প্রতিষ্ঠা করে-

সন্তোষ ট্রফি : বিহার রাজ্য দলের গোলের সামনে বাংলা দলের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী বলটি আয়ত্বে আনার জন্যে অগ্রসর হয়েছেন।
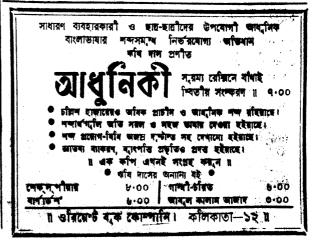
ছিলেন। জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে রেকর্ড-বোম্বাইয়ের ডলী নাজীরের—৬ মিঃ ৩০·৬ সেঃ।

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল : সন্ধ্যা চন্দ্র (সেন্ট্রাল এস সি); সময় : ২ মিঃ ৫৯·৩ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল : সন্ধ্যা চন্দ্র (সেন্ট্রাল এস সি); সময় : ১ মিঃ ২০·১ সেঃ।

রাজ্য স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৬১ সালের রাজ্য স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি অপরাজেয় সম্মান নিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। গত বছর জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণ কলিকাতা যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিম্নলিখিত চারটি দলকে লীগ প্রথায় খেলতে হয় :—

(১) জলপাইগুড়ি (নর্থজোন চ্যাম্পিয়ান), (২) দক্ষিণ কলিকাতা (ইস্টজোন চ্যাম্পিয়ান), (৩) মেদিনীপুর (সাউথ-জোন চ্যাম্পিয়ান) এবং (৪) বর্ধমান (ওয়েস্টজোন চ্যাম্পিয়ান)।

॥ খেলার চূড়ান্ত ফলাফল ॥

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পঃ	বিঃ	পঃ
জলপাইগুড়ি	৩	৩	০	০	৮	১	৬
দঃ কলিকাতা	৩	২	০	১	৮	৬	৪
মেদিনীপুর	৩	১	০	২	১	৪	২
বর্ধমান	৩	০	০	৩	০	১	০

॥ সন্তোষ ট্রফি ॥

১৯৬১ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের প্রথম লীগ খেলায় বাংলা সহজেই ৪—০ গোলে বিহার রাজ্যদলকে পরাজিত করে। বাংলা দলের পক্ষে গোল দেন এস নন্দী, এস সমাজপতি, অরুমায়াগম এবং চুনী গোস্বামী। বিশ্রাম সময়ে বাংলা ২—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। আগন্তুক বিহার রাজ্যদল খেলায় পরাজিত হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাদের গোল না দিতে পারার কারণ বাংলা দলের রক্ষণভাগের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা এবং বিহার রাজ্যদলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা—গোলের মুখে কয়েকটি গোল দেওয়ার সুযোগ নষ্ট করে।

॥ আই এফ এ শীল্ড ॥

১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা গত ২৩শে আগস্ট থেকে আরম্ভ হয়েছে। প্রতিযোগিতায় মোট ৩৭টি দলের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বহিরাগত দলের সংখ্যা ৯। যে ৮টি দলকে সরাসরি ৩য় রাউণ্ডে খেলতে দেওয়া হয়েছে তাদের নাম মোহনবাগান (গত বছরের বিজয়ী), ইণ্ডিয়ান নেভী, বোম্বাই (গত বছরের রানার্স-আপ), ইস্টবেঙ্গল (১৯৬১ সালের প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান), মহমেডান স্পোর্টিং, ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স, পাঞ্জাব একাদশ এবং মফৎলাল মিলস (বোম্বাই)। ৩য় রাউণ্ডে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৩—১ গোলে উয়াড়ীকে পরাজিত করে ইতিমধ্যেই ৪র্থ রাউণ্ডে উঠে গেছে।

৩য় রাউণ্ডের অন্যান্য খেলা এখনও শেষ হয়নি। ৩য় রাউণ্ডের খেলাগুলি এইভাবে পড়েছে :

(১) মোহনবাগান বনাম বার্ণপুর ইউনাইটেড। (২) ইণ্ডিয়ান নেভী বনাম ইণ্টার ন্যাশনাল। (৩) ইস্টার্ণ রেলওয়ে বনাম মফৎলাল গ্রুপ মিলস। (৪) মহমেডান স্পোর্টিং বনাম দিল্লী একাদশ বনাম রাজস্থানের বিজয়ী দল। (৫) ইস্টবেঙ্গল—৩ বনাম উয়াড়ী—১। (৬) এরিয়ান্স বনাম মহীশূর একাদশ। (৭) পুলিশ বনাম পাঞ্জাব একাদশ। (৮) বি এন আর বনাম ইণ্ডিয়ান নেভী।

॥ হ্যাট ট্রিক ॥

এ পর্যন্ত ১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পাঁচজন খেলোয়াড় 'হ্যাট-ট্রিক' করেছেন :

(১) পি মিত্র (বার্ণপুর ইউনাইটেড) বিপক্ষে ক্যালকাটা এফ সি; (২) এস ব্যানার্জি (রাজস্থান) বিপক্ষে কালীঘাট; (৩) এস বোস (উয়াড়ী) বিপক্ষে হাওড়া ইউনিয়ন; (৪) আপ্পালারাজু (বি এন আর) বিপক্ষে পোর্ট কমিশনার্স; (৫) তাপস বসু (ই আই আর) বিপক্ষে ক্যালকাটা জিমখানা।

সর্বাধিক গোলে জয়

বার্ণপুর ইউনাইটেড—৮ : ক্যালকাটা এফ সি—১।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
ফোন : ৫৫-৫২৩১
কলিকাতা—৩

সূচীপত্র

একটি উৎকৃষ্ট
হ্যারিকেন
KISAN BRAND

আর্ট ড্রইং সরঞ্জাম ও
অফিস সংক্রান্ত ষ্টেশনারী
কাগজ বিক্রেতা ও প্রিন্টার্স
বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান
ফোন:
২২-৪২২৩
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাইভেট লি:
৬৩ ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট - কলিকাতা-১

হুঁউ মাঁউ কাঁউ !
সন্দেশ-এর গন্ধ পাঁউ!
সন্দেশ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ চলমানকালের শ্রেষ্ঠের অমৃত ॥

শিশু-ভারতী

(ব্যংলার বুক অব নলেজ)
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত
সুপ্রশংসনের উপযোগী ফুটন্ত
মল্লিকার মতো নানা মিষ্টি রচনা।
দশ খণ্ড। মূল্য ১০০·০০

॥ শতবার্ষিকী প্রকাশন ॥

তরুণ রবি

—নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জীবন, কর্ম ও ঘরোয়া আলোচনা
লাইনো টাইপে ছাপা। ৪৲

বিদ্রোহী বালক	২·২৫
রূপকথার দেশে	২·৫০
যাদুপুরী	৩·২৫
বীর সিংহের সিংহ শিশু	২·৫০
রুশ দেশের উপকথা	২·২৫
শুধু হাসি ভেবো না	১·৫০

বিজ্ঞান গ্রন্থমালা—জগদানন্দ রায়
১৫ খানি বই

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

বাহির হইল নূতন উপন্যাস
নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অগ্নিশুদ্ধি ৩·০০

গোপার জীবনে বিয়ের আগে এসেছিল দেবীপ্রসাদ যেমন অনেক মেয়ের জীবনেই আসে কিন্তু সৌমিত্রই জীবনে তার প্রথম পুরুষ—যার দিকে সে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল—তবু এলো ঝড়, কালো মেঘ—।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কাজের কথা (২য় মুদ্রণ) ২·৫০

ডেল কার্ণেগীর 'How to win friends & Influence People'-এর বাংলা-সংস্করণ, সহজ করে লেখা। গীতা যেমন প্রতি ঘরে পাঠ করা উচিত, আজকের দিনে এই বইখানিও তেমনিই দরকার প্রতি-দিন পড়বার এবং সেই মত চলবার। চাকুরিয়া, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের পক্ষে বইখানি অমূল্য সম্পদ।

উল্লেখযোগ্য কয়েকখানা উপন্যাস
শৈলবালা ঘোষজায়ার

বিপত্তি	৫·০০
অনন্তের পথে	২·৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

কাজরী	৩·০০

ভবেশ দত্তর

অন্তরালে	২·৫০

ন্যাশনাল বুক হাউস
১৬, শিবপুর রোড, হাওড়া।
বিক্রয় কেন্দ্র
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রবোধকুমার সান্যালের কালজয়ী সৃষ্টি

পাকিস্তানের সামরিক সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত

দেবতাত্মা হিমালয়

১ম খণ্ডঃ (১০ম মুঃ) ৯·০০ ॥ ২য় খণ্ড (৫ম মুঃ) ১০·০০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

ছ' মাস সম্পূর্ণ হবার আগেই প্রকাশিত হল আশ্চর্য উপন্যাসের দ্বিতীয় মুদ্রণ

রূপ হোল অভিশাপ

৭·০০

নবগোপাল দাসের স্মরণীয় সৃষ্টি

সামাজিক দুর্নীতি দূরীকরণের অবিস্মরণীয় অধ্যায়

এক অধ্যায় (২য় মুঃ) ৩·০০

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

সীতা দেবীর অনুপম উপন্যাস

মহামায়া ৬·০০ ॥

নবগোপাল দাসের গল্পসংগ্রহ

প্রেম ও প্রণয় ৪·০০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর নবতম উপন্যাস

আয় চাঁদ ৩·০০

স্মরেশচন্দ্র শর্মাচার্যের আশ্চর্য উপন্যাস

গোধূলির রঙ ৩·৫০ ॥

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

চরণিক ৩·০০

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিকষিত হেম ৩·০০

রমাপদ চৌধুরীর

মুক্তবন্ধ ৩·০০

দিলীপ মালাকারের

নেপোলিয়নের দেশে ২·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

অ[illegible]দূত
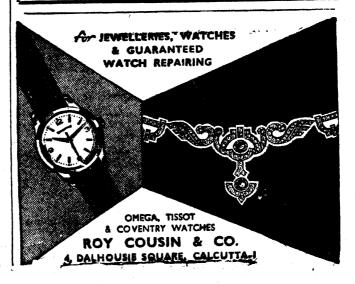
১ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ২০শ সংখ্যা—মূল্যে ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday 22nd September, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেতন কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণে যে অন্যায় ও বৈষম্যগুলি ঘটিয়েছেন তার প্রধান কারণ এই যে, বেতন পুনর্নির্ধারণের সময় তাঁরা কোনো যুক্তি-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে তিনটি প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, জীবননির্বাহ ব্যয় বা দ্রব্যমূল্যের নিরিখ পরীক্ষা ক'রে তার সঙ্গে বেতনের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা যে কোনো বেতন কমিটির প্রাথমিক কর্তব্য। অবশ্য এই সামঞ্জস্য বিধান সম্পূর্ণ সম্ভব কিনা তা নির্ভর করে সরকারের আর্থিক ক্ষমতার উপরে। কাজেই বেতন কমিটির সম্মুখে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের আর্থিক ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা এবং সেই ক্ষমতাকে অন্যান্য সওদাগরী ও শিল্পসংস্থার আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে যাচাই করে দেখা। তারপরে, তৃতীয় আর একটি প্রশ্ন থাকে। বিভিন্ন পদে কাজের পরিমাণ, যোগ্যতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রেণী সামঞ্জস্য ঘটানো। পুরাতন পে স্কেলগুলি যে সময় নির্ধারিত হয়েছিল সে সময় বিভিন্ন পদের এবং বেতনের যোগ্যতাভিত্তিক সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা বহুক্ষেত্রে অর্ধসমাপ্ত ছিল। অর্থাৎ একই কাজের জন্য একই বেতন দেওয়ার যে নীতি, সে নীতি সরকারের নিজের দপ্তরের মধ্যে যেমন সর্বত্র স্বীকৃত নয়, তেমনি এই নীতিকে সরকার, সওদাগরী অফিস ও শিল্পসংস্থা মিলিয়ে বৃহত্তর জীবিকা ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগের কোনো চেষ্টা এযাবৎ হয়নি।

কাজেই বেতন কমিটির প্রধান কর্তব্য ছিল এই তিনটি মূল নীতি বা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া। এমন কথা আমরা বলছি না যে, এই তিনটি প্রশ্নেই কর্মচারীদের সম্পূর্ণ তুষ্ট করা সম্ভব; অথবা এমন কোনো সুপারিশ দেওয়া সম্ভব যাতে এই তিনটি নীতিই সর্বাঙ্গীণ রক্ষিত হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেতন কমিটির সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ হয়েছে এইখানে যে, তাঁরা এই ত্রিবিধ নীতির ধার-কাছ দিয়ে যাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেননি। কোনো যুক্তি-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কিংবা ব্যয়নির্বাহ নিরিখ—কোনো কিছুরই সন্ধান করা এবং বিজ্ঞানসম্মত ও ন্যায়সম্মত একটি সুপারিশ পেশ করা তাঁরা কর্তব্য বলেই গ্রহণ করেননি। ফলে এই কমিটির রিপোর্টে সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রের কোনো পুনর্গঠন কিংবা পুনর্বিন্যাস সম্ভব হতে পারে না। (যদিও বেতন কমিটির কাছে সরকারের অন্যতম প্রধান প্রত্যাশা হচ্ছে এই পুনর্বিন্যাস।) কর্মচারীদের লাভ-লোকসানের প্রশ্ন যদি উপেক্ষাও করা হয়, বেতন কমিটি সরকারের প্রতিও তাঁদের দায়িত্ব পালন করেননি। অবিচার কর্মচারীদের প্রতি যেমন, তেমনি সরকারের প্রতিও ঘটেছে। যে পদ্ধতিতে তাঁরা নূতন বেতনের স্কেল নির্ধারণ করেছেন, সেটা একটা গাণিতিক সূত্র মাত্র। সেই সূত্র হচ্ছে ঃ বেতন + মাগ্‌গীভাতা + − বেতন কমিটির খামখেয়াল। সূত্রটি সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় এই ঃ বর্তমান বেতনের সঙ্গে মাগ্‌গীভাতা যোগ দিয়ে যে অঙ্কে পৌঁছানো যায়, সেই অঙ্কই নূতন স্কেলরূপে নির্দিষ্ট হচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতন কমিটি নিষ্করুণ হস্তে এই যোগফল থেকে কিছু টাকা কেটে নিচ্ছেন, অথবা উদার হস্তে কিছু যোগ করছেন। এই শেষোক্ত যোগবিয়োগের পর্বটি কোনো যুক্তি বা ন্যায়নীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং গণিতের সূত্র অনুসারে একে বলা যায় ঃ + − বেতন কমিটির খামখেয়াল।

এই খামখেয়াল যদি মন্ত্রিসভা বিনা প্রতিবাদে এবং বিনা পরীক্ষায় স্বীকার করে নিতেন তাহলে কর্মচারী মহলে বিক্ষোভ নিদারুণ আকারে দেখা দিত সন্দেহ নেই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, মন্ত্রিসভা বেতন কমিটির রিপোর্টটি আনুপূর্বিক পরীক্ষার চেষ্টা করেছেন এবং খামখেয়ালের এই দৌরাত্ম্য কতকাংশে লাঘব করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মূল নীতিগত বিভ্রান্তি দূর করা গেছে, কিংবা বৈষম্যাচরণের সমস্ত দৃষ্টান্ত সংশোধিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত হয়ত ঘোষণা করবেন। সেই ঘোষণার পূর্বে তাঁর কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যেন স্মরণ রাখেন, এই বেতন-সুপারিশটি এখনও বহু অসামঞ্জস্য এবং গলদে পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতে নানা পদ এবং নানা শ্রেণীর কর্মচারীদের কাছ থেকে তাঁকে এর জন্য নালিশ শুনতে হবে। এই নালিশ নিষ্পত্তির জন্য এবং অসামঞ্জস্য ও বৈষম্যের মীমাংসার জন্য তিনি যদি বেতন কমিটির সেক্রেটারীকেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরূপে নিয়োগ করেন তাহলে অবিচারের চূড়ান্ত করা হবে। কারণ, যে সেক্রেটারী এই ভ্রান্ত রিপোর্টের সঙ্গে জড়িত তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে কর্মচারীরা সুবিচার এবং রিপোর্টের ন্যায়সঙ্গত সংশোধন আশা করতে পারেন না। সরকার যদি কর্মচারীদের কাছ থেকে সদিচ্ছা ও সহযোগিতা চান তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে ঘোষণা করতে হবে দুটি কথা ঃ (১) বেতন কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে রিপোর্টের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইম্‌প্লিমেন্‌টেশান অফিসাররূপে নিয়োগ করা হবে না; (২) বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সরকার প্রশস্ত এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবেন। এই দুটি ঘোষণাসহ মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি যদি প্রকাশিত হয়, তাহলে বেতন কমিটির দুষ্কৃতি সত্ত্বেও কর্মচারীরা বহুলাংশে সরকারের সদিচ্ছা সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং সন্তুষ্ট বোধ করতে পারবেন।

যখন তোমাকে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

যখন তোমাকে পাই—কোনো কথা নয়—
আনত হৃদয়টাকে সঁপে
নদীর জলের মতো গান গেয়ে উঠি।
তখন তোমাকে শুধু নয়—
দিনের সমস্ত সুখ, বাগানের ছড়ানো সৌরভ,
আকাশে জড়ানো রোদ, যেন সোনা,
বন্ধুদের মধুর স্বাগত,
কফির পেয়ালা উপ্‌ছে ফেনিল সুস্বাদ,
সবি পাই, সমস্ত পৃথিবীটাকে পাই।

যখন তোমাকে আমি হারাই
বুকের দেরাজ শূন্য, অন্ধ আমি
ঘর যেন নিতান্ত দেয়াল, রিক্ত,
মহেঞ্জদড়োর কোনো ভগ্নস্তূপ,
মরা-নদী-হৃদয় বালুকা।
তখন তোমাকে শুধু নয়—
দিনের সোনালি রোদ, ফুলের বর্ণালি,
অতিথির কলরব, সমারোহ,
সব হারাই, সমস্ত সংসারটাকে হারাই।

জেনেছি নিশ্চিত,
তুমি শুধু তুমি নও,
আমি ও আমার
সমস্ত রূপোলি নদী, সব আকাশ, সকল অতিথি,
সব, সব তুমি।

একজন ক্লান্ত

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বড় ক্লান্ত, তৃষ্ণা সুগভীর,
আমার বুকের মধ্যে যুগ্‌ম এক প্রাণী বাসা বাঁধে,
এবং নিঝুম রাতে অসাড় দুচোখ যেন কাঁদে,
রক্তকণা জমে যায়, ঘেমে ওঠে পবিত্র শরীর...

কতদিন ঈশ্বর দেখিনি আমি—শৈশবে যা ছিল পরিচিত,
কৈশোর রাস্তায় রেখে প্রথম যৌবনে কোন্ ফল
তোলার আগেই হাত বেঁকে গেছে, আমি এক মূর্তিমান ভুল

বার্ধক্য আমার বন্ধু চেনে-জানে আমার অতীত......
মুহূর্ত-জোনাকি ধরতে বহু উচ্চে উঠতে গিয়ে আমি
শুনেছি হাওয়ার শব্দ, দেখেছি তারার হাসি সুশুভ্র গম্ভীর,
শূন্যে কী সম্পদ আছে সকলেই দেখি উর্ধ্বগামী,
লক্ষ্য যেন প্রত্যেকের প্রতীক্ষায় হয়ে আছে স্থির!

আমি ক্লান্ত বহুদিন, তৃষ্ণা মেটাবার কোন জলে
নিজের ব্যর্থতা ঢাকি মুখ রেখে একপ্লাস জলে।।

প্রথম প্রেম

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ট্রেনের কামরা : উঁকি মেরে যায় কাজলকন্যা সন্ধ্যা—
গ্রীষ্মকালের ফ্যাকাশে আকাশ তবু তারাহারা, বন্ধ্যা।
কথা বলবার নেই অবসর, চাকাদের গান শুনেছি,
একা বসে বসে চোখ বুঁজে আর স্বপ্নের জাল বুনেছি।
মিষ্টি হাসির শব্দে চকিতে চেয়ে দেখি, তুমি হাসলে—
পরশ পাথর হাতে নিয়ে তুমি কাছে যেন সরে আসলে।।

ওগো মেয়ে বিদেশিনী—
তোমার মনের আয়না বসানো ওই হাসিটুকু চিনি।
শিল্পী তো নই : আমার তুলিতে মোনালিসা হবে ব্যর্থ;
কবি নই, তাই দিতে পারবো না গানে বা ছন্দে অর্থ।
অনুভূতি আছে : তারি চোখ দিয়ে দেখতে পেলাম কন্যায়,
তোমার ও'চোখে ভাসছে আমার প্রথম প্রেমের বন্যা।

অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে আকাশে নামল রাত্রি;
ট্রেনের আলোরা স্মরণ করালো আমরা দুজনা যাত্রী।
দুদিনের তরে মুখোমুখি বসে, তারপর যাব হারিয়ে
ঠিকানাবিহীন কে জানে কোথায়, স্মৃতির সীমানা ছাড়িয়ে।

এ' রাত থাকবে, আকাশ থাকবে; এ ব্যথা থাকবে কন্যা—
এ' মন থাকবে, থাকবে আমার হারানো প্রেম অনন্যা।

বাংলা ভাষা অচিরে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বছরে এ বিষয়ে আইনগত সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করায় বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন। যে ভাষায় সাহিত্য রচনা ক'রে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভায় জয়মাল্য লাভ করেছিলেন, সে ভাষা যে অত্যন্তই ঐশ্বর্যশালী ও নমস্য এতে দ্বিমত থাকতে পারে না। ঈষৎ দেরিতে হলেও, এই ভাষা এখন রাজ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে জেনে আমরা খুবই আনন্দিত। কিন্তু—

হাঁ, 'কিন্তু' একটা তবু থেকেই যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, 'বাংলা' কথাটার সংজ্ঞা কী?

সকলেই জানেন, উত্তর ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির আদিজননী হল সংস্কৃত। কিন্তু সংস্কৃত মা হলেও তাদের মাসী-পিসীর সংখ্যা বড় কম নয়। আরবী-ফারসী থেকে শুরু করে ফরাসী-ইংরেজী পর্যন্ত সব ভাষারই কিছু-কিছু অন্নজল গ্রহণ করেছে এই ভারতীয় ভাষাগুলি।

বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়।

সেইজন্য বাংলাতে এখন সংস্কৃতের পাশাপাশি অনেক বিদেশী ও দেশজ শব্দও স্থান পেয়েছে সসম্মানে। কিন্তু তারা যে আছে, এটা অভিধান না দেখলে অনুভবই করা যায় না।

তবু তারা আছে। এবং আছে বলেই বাংলা ভাষা এত উন্নত।

প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত ভাষার একটা প্রধান লক্ষণই হল এই যে, কয়েক দশক পর-পরই তার ব্যাকরণ নতুন করে লিখতে হয়, অভিধানে নতুন সংযোজন অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। বাংলাও জীবন্ত ভাষা। তাই এর মধ্যেও নতুন প্রয়োগ-পদ্ধতি ও নতুন শব্দসম্ভার দেখা দেবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং স্পষ্ট ক'রে বলা ভাল, এই নতুন-পুরনো সব-কিছু নিয়ে এখন যে ভাষায় বাঙালীরা ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন, তাকেই আমরা বলি বাংলা ভাষা।

কাজেই, এই ভাষাকেই যে সরকার আইনগত স্বীকৃতি দেবেন, এমন আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না।

কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তা বোধ হয় হবার নয়। সরকারী পরিভাষার মাহাত্ম্যে ভাষার মূল উদ্দেশ্যই এখন ব্যাহত। ফরাসী সাহিত্যিক ভলতেয়ার একবার গভীর শ্লেষের সঙ্গে বলেছিলেন, "Language was given to man to conceal his thoughts". সরকারী কর্মকর্তারা বোধ হয় অত্যন্ত সরল বিশ্বাসেই স্বীকার করে নিয়েছেন কথাটা। তাদের ভাবখানা এই যে, যে-ভাষায় সবই অনায়াসে বোঝা গেল সে তো ভাষাই নয়। সে যে নেহাতই ভার্ণাকুলার ব্যাপার। যাকে দেখে অপরিচয়ের সম্ভ্রম জাগে না, যাকে আয়ত্ত করতে চোখের জল ফেলতে হয় না সে ভাষাকে কী করে বসাবেন তাঁরা ইংরেজীর রাজাসনে! তাহলে আর শিক্ষিত-অশিক্ষিতে তফাত রইল কী।

একেই বলে মানসিক পরাধীনতা। দেশ থেকে ইংরেজদের রাজত্ব লোপাট হ'য়ে গেছে অনেকদিন আগে, কিন্তু তার ছাঁচটা পুরোপুরি রয়ে গেছে আমাদের মাথায়। ইংরেজ-রাজত্বে যেমন ছিল সেই প্যাটার্নের বাইরে যেতে হলেই গা-ছমছম করে এখনো। তাই ইংরেজীর বদলে বাংলা আমদানি করলে সে বাংলাও হ'য়ে ওঠে ইংরেজীরই মতো দুর্বোধ্য। কিংবা ইংরেজীর চেয়েও দুর্বোধ্য। কারণ, একটু আগে যা বলছিলাম, দুশো বছর ধরে পরিচয়ের ফলে বহু ইংরেজী শব্দই এখন বাংলার সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। কিন্তু হাজার বছরের অপরিচয়ের ফলে অনেক আদি ও অকৃত্রিম সংস্কৃত শব্দও এখন হিব্রুর মতো দুর্বোধ্য।

দৃষ্টান্ত আমার হাতের কাছেই রয়েছে। কয়েকদিন আগে বিধানসভায় জনৈক মন্ত্রী খাঁটি আগ-মার্ক দেওয়া বাংলায় একটি বিল উপস্থিত করতে গিয়ে কী ফ্যাসাদে পড়েছিলেন, আশাকরি সকলেরই তা মনে আছে। মন্ত্রী মহোদয় যখন 'বিধেয়ক', 'অধ্যাদেশ', 'প্রকল্প', 'অধিগ্রহণ', 'সমাহর্তা' ইত্যাদি শব্দ-প্রয়োগে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন তখন জনৈক সদস্য (সম্ভবত ছেলেবেলায় 'হবর্তাবা কহিস্তাসা...' প্রভৃতি শ্লোক মনে পড়ায়) একে হেঁয়ালী-ভাষা বলে আপত্তি জানান। কিন্তু তার উত্তরে তিনি মন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণা শোনেন: 'মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাই, আমি বাংলা ভাষায় বলছি।'

বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার এই উদ্যমের জন্যে মন্ত্রীপ্রবর অবশ্যই সাধুবাদের পাত্র। কিন্তু নির্বিচারে পরিভাষা গ্রহণের ফলে তাঁর ভাষা যে সত্যিই অত্যন্ত 'মৌলিক' হয়ে উঠেছিল তা কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন? নাকি রবীন্দ্রনাথের গল্পসল্পের বাচস্পতির মতো তিনিও আমাদের 'পাজুঙ্গরিতে তিড়িতংক' লাগিয়ে 'আস্তারা ফুসকজিয়ে' দিতে চান?

আমাদের মনে হয়, যে সব কথা বহুদিন বাংলায় চলে আসছে সেগুলি ইংরেজী বা ফারসী যে ভাষা থেকেই আসুক, তাকে বাংলা বলেই মেনে নেওয়া ভাল। নয়তো সংস্কৃতের উৎস সন্ধানে গেলে শ্রোতাদের সব সময়ই একটা পকেট ডিক্‌শনারী নিয়ে চলাফেরা করতে হবে।

তাছাড়া সবকিছু জিনিসের জমকালো নাম দিলেই [illegible] পরিণামে সুখাবহ হ'য়ে ওঠে এমনও তো নয়! সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' থেকে একটা উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন:

"হিজিবিজ্ বিজ্ বলল, 'একজনের মাথায় ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু,—কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। হোঃ হোঃ হো।"

ভাবছি, ভাষা-সরস্বতীর যে মন্দির এখন সরকারী আনুকূল্যে রাজমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে, নামকরণের ধাক্কায় সেটাও পড়ে-টড়ে না যায়!

তবে, হিজিবিজ্ বিজ্ আমাদের আগেই বলে দিয়েছে, মাথার ব্যারাম না থাকলে কেউ সব জিনিসের নামকরণ করতে যায় এই যা না।

* * *

কলকাতায় বৃষ্টিকে উপদ্রব বলে মনে করা হয়। মফস্বলে কিন্তু বৃষ্টি এখন সম্মানিত অতিথি। আর ঠিক সেইজন্যেই মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, বৃষ্টির অভাবে সেখানে চাষবাস অচল হবার মত।

একেই বলে প্রকৃতির পরিহাস। কলকাতার মেঘগুলোকে যদি কোনোরকমে খেদিয়ে দেওয়া যেত গাঁয়ের দিকে, এক ঢিলে দু পাখি মারা যেত। কিন্তু, আমাদের আদেশ যে পর্জন্যদেব শিরোধার্য করবেন এমন কোনো পেনাল কোডের ধারা আমরা আজ পর্যন্ত প্রণয়ন করে উঠতে পারিনি।

তবে একটা সুখবর আছে।—

"কমনওয়েলথ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন মন্ত্রী লর্ড কেসী কৃত্রিম বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত এক সম্মেলনে প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, অভাবিত আবহাওয়ার 'অপমান' হইতে তাঁহারা যেন পৃথিবীকে রক্ষা করেন।"—রয়টার।

আশা করা যায়, অবিলম্বেই 'পৃথিবী'র 'অপমানে'র প্রতিশোধ নিতে বৈজ্ঞানিকেরা এগিয়ে আসবেন। তখন অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির হাত থেকে তো আমরা অব্যাহতি পাবই উপরন্তু সামান্য দুএকটা টোট্‌কা উপায়ের সাহায্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণও হয়ত সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

এমন বারোয়ারী এয়ার-কণ্ডিশনিঙের ব্যবস্থা হলে আমাদের মতো গরীব দেশে যে কতো সুবিধে হবে তা বলাই বাহুল্য।

লর্ড কেসীর Case-টা জয়যুক্ত হোক।

* * *

অমৃতের ১৮শ সংখ্যায় আধুনিক গান সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম তাতে এক পত্রপ্রেরক রুষ্ট হ'য়ে লিখেছেন, '......আধুনিক গান শোনার জন্যেও কান তৈরী করা দরকার। ...'

অবশ্যই। কিন্তু শুনতে আরম্ভ করলে কান দুটোই যে আগে কালা হ'য়ে যায়—সব গানই যে তখন মনে হয় বোবার সংগীত, তার কী উপায়?

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লববাদ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

লর্ড কার্জন এদেশে বিদেশী শাসনের পরিচালকরূপে বাংলা প্রদেশকে (তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা) যখন খণ্ডিত করিবার সংকল্প করেন, তখন তিনি ইংরেজ জাতির স্বার্থেই তাহা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি সত্য প্রতীচীর নিজস্ব বলিয়া প্রাচ্যের ভারতবর্ষকে যখন অসত্যের অনুরক্ত এই কথা প্রকারান্তরে বলিয়াছিলেন, তখন যে বাংলার সংবাদপত্রই তাঁহাকে মিথ্যার অনুরাগী প্রতিপন্ন করিয়াছিল, তাহাতে হয়ত তাঁহার সংকল্প-বহ্নিতে ইন্ধন যোগ হইয়াছিল। তাঁহার সেই সংকল্পের প্রতিবাদ উপলক্ষ্য করিয়া বাংলায় "স্বদেশী" ছদ্মনামে যে স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবল হয়, তাহা সাফল্যের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিল—হিংসা সে সকলের অন্যতম। "স্বদেশী" অর্থাৎ বিদেশের পণ্য বর্জন করিয়া স্বদেশে উৎপন্ন পণ্য ব্যবহার তাহার অন্যতম উপায়। সেই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া যাঁহারা তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম। বাংলায় সেই আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদিগের আন্দোলন এবং সেই জন্য তাহা সাহিত্যে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—বিপিনচন্দ্র পালের কথায় তাহা লবণ ও চিনির আন্দোলন বা বাণিজ্যের আয়োজন ছিল না। কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহাকে সেই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্মানিত আসন প্রদান করিয়াছিল এবং আন্দোলনের প্রথম অবস্থায়—যখন তাঁহার মত নেতার প্রয়োজন ছিল—তখন তিনি সেই আসনে থাকিয়া সেই আন্দোলনকে সবল ও প্রবল করিতে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাই আন্দোলনের ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে। উহার সহিত তিনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ঐক্যের প্রতীক রাখিবন্ধন পরিকল্পিত হইলে তিনিই তাহার জন্য মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্রে তখন লোক দীক্ষিত হইয়াছিল। ঐ মন্ত্রে তিনি যে ভগবানের নিকট বাংলার সমবেত প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—"বাংলার হাট" পূর্ণ হউক সে নিশ্চয়ই বিদেশী পণ্যে নহে। বালগঙ্গাধর তিলক হইতে অরবিন্দ এবং অরবিন্দ হইতে সুভাষচন্দ্র সকলকেই তিনি যথাক্রমে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহ জানাইয়াছিলেন। আর ইঁহারা সকলেই বিপ্লবী এবং সকলেরই রাজনীতি বৈদান্তিক। বেদান্তে যেমন ধর্মের পদ্ধতি বিচারে ব্যাখ্যা থাকে না—কি উপায়ে সর্বাপেক্ষা স্বল্প সময়ে ও নিশ্চিতরূপে মোক্ষ লাভ করা যায়—তাহাই তাহার লক্ষ্য—ইঁহারা তেমনই কি উপায়ে সর্বাপেক্ষা স্বল্প সময়ে ও নিশ্চিতরূপে স্বাধীনতা লাভ করা যায় তাহাই ভাবিতেন। তাঁহাদিগের কাম্য ছিল—ভারত—এক—অখণ্ড ও স্বাধীন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে উপায় প্রয়োজন—যে উপায় জাতির পক্ষে ধাতুসহ ও সহজসাধ্য সেই উপায়ই জাতি গ্রহণ করিবে—সে বিষয়ে অন্য বিচারের প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা— তাঁহার বাল্যকাল হইতে—আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার বিপ্লব-প্রীতির পরিচয়ই পাইয়া থাকি।

বাল্যকালে তিনি যে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগের সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—

"তোমারি তরে, মা, সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ"

— তাহাতে ছিল —

"যদিও ও অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে"

অসি কিরূপ কারণে ব্যবহৃত হয়, তাহা সর্বজনবিদিত— অসি যে কলঙ্কে মলিন হয়, সে ব্যবহারের অভাবে।

রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" মন্ত্র গান করিয়া তাহা ভারতবর্ষের নানা স্থানের সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে শুনাইয়াছিলেন। তিনি ঐ মন্ত্রের প্রথম অংশ মাত্র গান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই মহামন্ত্রেরই পরবর্তী অংশ—

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ
করালে,
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে?"

বাংলায় তখনও চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মমতের অধিক আদর ছিল। তাহা প্রেমধর্ম এবং তাহা অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করিবার চেষ্টা করিত—আঘাতকারীকে বলিত—

"মেরেছ কলসীর কাণা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না!"

বাংলায় প্রচলিত কথা ছিল—"কানু বিনা গান নাই।" সেই কারণে 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—অহিংসাই যে বৈষ্ণবের পরম ধর্ম "সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা; দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন; কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটব, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধার-কর্তা, আর 'সন্তানের' ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম নহে—উহা অর্ধেক ধর্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়, —'সন্তানের' বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।"

বাস্তবিক উড়িয়ারা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষরা যোদ্ধা ছিলেন—দেশ জয় করিতেন; চৈতন্যদেবের প্রচারিত নিরবচ্ছিন্ন প্রেমধর্মে দীক্ষিত হইয়া উড়িয়ারা ভীরু কাপুরুষ হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যুদ্ধ-বিরতির "পাপেই" বাঙ্গালী পরাধীন হইয়াছিল।

সে যাহাই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ—ইঁহারা প্রয়োজনে হিংসাশ্রয়ের সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সেজন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের ব্যবহারিকজীবনে গীতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "কেশরী" পত্রের সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হ'ন। ঐ বৎসর ২২শে জুন তারিখে দুইজন ইংরেজ (র‍্যাণ্ড ও এয়ার্স্ট) পুণায় নিহত হইয়াছিলেন। বোম্বাই নগরের ইংরেজ-সম্পাদিত পত্রে এমন সন্দেহও প্রকাশ করা হয় যে, ঐ হত্যাকাণ্ডের সহিত তিলক মহাশয়ের সম্বন্ধ ছিল। বোম্বাই নগরে তখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে তথায় তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবহারজীবী পাওয়া অসম্ভব। সেইজন্য কলিকাতায় স্থির হয়, কলিকাতা হইতে ব্যারিস্টার পাঠাইয়া তাঁহার মামলা চালান হইবে। সেইজন্য যাঁহারা অর্থ

সংগ্রহে সক্রিয় হইয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম। সংগৃহীত অর্থে মিস্টার পিউ ও মিস্টার গার্থ নামে দুই-জন ব্যারিস্টারকে পাঠান হইয়াছিল। ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ সম্প্রদায় তিলক মহাশয়কে বিপ্লবপন্থী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পক্ষে মামলা পরিচালনার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন বোম্বাই প্রদেশে তিলক মহাশয়ের প্রবর্তিত শিবাজী উৎসবের দৃষ্টান্তে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর সম্বন্ধে যে কবিতা রচনা করেন, তাহা সর্বজনবিদিত। শিবাজীও বিপ্লবী ছিলেন। তিনি মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া হিংসার পথে কার্য-সিদ্ধির জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেদিকেও রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীর উদ্দেশে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন।

“স্বদেশী” আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলায় নবভাববিকাশে দেশমাতৃকাকে যে অপরূপ রূপে বাঙ্গালাদেশের হৃদয় হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন—মার সে রূপে—“ডানহাতে তোর খড়্গ জ্বলে।” সে খড়্গ যে রিপুদলবারিণী দেশমাতৃকার হস্তে অস্ত্র তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্বোক্ত কয়টি ঘটনার পরে—বিশেষ “স্বদেশী” আন্দোলনে অন্যতম নেতা থাকিয়া তিনি যখন সহসা উহার অংশ “বয়কট” ঘৃণাব্যঞ্জক বলিয়া আন্দোলন হইতে সরিয়া যান—তখন তাহা অনেকের পক্ষে বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। ইংরেজ সরকার তখন অত্যাচার-প্রধান চণ্ডনীতির দ্বারা সেই আন্দোলন দলিত করিতে সচেষ্ট। কেহ কেহ তাহাই রবীন্দ্রনাথের আন্দোলন হইতে সরিয়া যাইবার কারণ বলিলেও অরবিন্দ তাহা বলেন নাই। অরবিন্দ বলেন—রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে যে সাধুর মনোভাব প্রবর্তিত করিতে চাহেন, তাহা সত্ত্বগুণসম্পন্ন জাতির আদর্শকে তাঁহার ব্যক্তিত্বে অনুরঞ্জিত করা। সুতরাং তাহা জনগণের কাজে প্রয়োগ করা সম্ভব নহে।

এই কথা বলিবার পরে অরবিন্দ বলেন—কিন্তু “বয়কট” সত্যসত্য ঘৃণাদ্যোতক নহে। ইহা আত্মরক্ষার্থ আক্রমণকারীকে আক্রমণ। যাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইতেছে, সে যে অস্ত্র কার্যোপযোগী মনে করিবে তাহাই ব্যবহার করিলে তাহার কাজ মাধুর্যময় হয় না বটে, কিন্তু তাহার পক্ষে অসঙ্গত বা অন্যায় নহে।

অরবিন্দ কোনদিন তাঁহার রাজনীতিক মত গোপন করেন নাই। তিনি বলিতেন, রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের কাজ—তাহাতে হিংসার প্রয়োজনে হিংসা অবলম্বন করিতে হয়। সেই অরবিন্দ যখন “বন্দেমাতরম্” পত্রে হিংসার সমর্থনের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া “অপরাধী প্রতিপন্ন” হ'ন নাই, তখন রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

“অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।”

বিপ্লব সমর্থনকারী অরবিন্দকে তিনি স্বদেশের আত্মার বিকাশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহার বিশেষ সহায় ও সহকর্মী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন, উপাধ্যায়ই সোৎসাহে বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র ও শিক্ষক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁহার “চার অধ্যায়ের” প্রারম্ভে সেই সহকর্মী সম্বন্ধে অকারণ উক্তি করিয়াছিলেন—তিনি (উপাধ্যায়) একটি ঝড়ের মত আসিয়া তাঁহাকে (রবীন্দ্রনাথকে) বলিয়াছিলেন—সন্ত্রাসবাদে তাঁহার পতন হইয়াছে, তাহা এবং কেন রবীন্দ্রনাথ ঐ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষ উপন্যাস হিসাবে ঐ পুস্তক উচ্চস্থানের দাবীও করে না। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি সরকারের বিশ্বাসভাজন চাকরীয়া অপূর্বকুমার চন্দ (আবুলকালাম আজাদের মত) তাঁহার স্মৃতিকথা রচনা করিয়া যা'ন, তবে একদিন সে রহস্য ভেদ করা যাইবে। কিন্তু তাহা না হইলেও আমরা সেবিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করিতে পারি। বিরুদ্ধ মন্তব্যে তিনি শেষে উপাধ্যায়ের উল্লেখ পুস্তক হইতে বর্জন করিয়াছেন এবং তাহাতে গল্পাংশের কোন ক্ষতি হয় নাই। উহা আচরণ-বাহুল্য ছিল। সন্ত্রাসবাদেও যে অপ্রীতিকর ব্যাপার প্রবেশ করিতে পারে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র “আনন্দমঠে” দেখাইয়াছেন। সেইজন্যই কল্যাণী ভবানন্দকে বলিয়াছিলেন, ভবানন্দ মরিলে উহাকে মনে রাখিবে—“ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া।” দার্জিলিংএ ইংরেজ রাজ্যপালকে হত্যা চেষ্টার মামলায় রায়ে বিচারক ঐরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হয়ত সন্ত্রাসবাদের ঐ বিপদ সম্বন্ধে লোককে সতর্ক করিয়া তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিরূপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। যে সময় অপূর্বকুমার অপ্রত্যাশিতভাবে ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন, তখন ইংরেজ সরকারের মত বাঙ্গালী ধনী প্রভৃতিও তাহা নিবারণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন—সেজন্য নানা পুস্তক প্রকাশিত ও নানা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—যখন ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ এদেশে আগমন করেন, তখন কয়জন ধনী তাঁহাকে তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য সঙ্গীত রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হয়ত এ-সময়ে সন্ত্রাসবাদকে নিন্দিত করিবার জন্য তিনদিক হইতে তাঁহাকে সাগ্রহ অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অনুরক্তদল যেমন—গান্ধীজীর অনশনে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে “পুণা চুক্তিতে” সমর্থন লইতে পারিয়াছিলেন, তেমনই তিন দিকের অনুরোধে তিনি ঐ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন—উপাধিধারীদিগের পক্ষে তাঁহার আত্মীয় মহারাজা সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, জমীদার-সভার পক্ষে তাঁহার আত্মীয় প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, বৃটিশ সরকারের পক্ষে সেই সরকারের চাকরীয়া অপূর্বকুমার চন্দ। আপাততঃ আমরা ইহাই এই ব্যাপারের আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিব।

কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বলা যায়, বাঙ্গলায় হিংসাশ্রয়ী সন্ত্রাসবাদী আসামীদিগের শিবিরে—কোন সন্ত্রাসবাদমূলক কাজের সাফল্যে অনুষ্ঠিত উৎসবের সময় বন্দীদিগের উপর ইংরেজ সরকারের পুলিস প্রহরীরা আক্রমণ চালাইলে তাহা রবীন্দ্রনাথকে এমনই বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি কলিকাতা ত্যাগের সব ব্যবস্থা বাতিল করিয়া কলিকাতায় ঐ কাজের প্রতিবাদ-সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

তিনি যে ভারতীয় বিপ্লববাদীদিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার একটি প্রমাণ দিয়াই আমরা নিরস্ত হইব। রাসবিহারী বসু ছিলেন—বিপ্লবী মহানায়ক। তিনি ইংরেজ সরকারকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে—বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন শোভাযাত্রা করিয়া নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার উদ্দেশে বোমা নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন—তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য। তাহার পরে কয় বৎসর গোপন থাকিয়া—নানাস্থানে বিপ্লব সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়া তিনি যাত্রার ছাড় (পাসপোর্ট) জাল করিয়া জাপানে গিয়াছিলেন এবং তথায় “এসিয়া এসিয়াবাসীদিগের”—এই আন্দোলন সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাইয়া যে এই বিপ্লবী, হত্যা করিতে উদ্যোগী ও ছাড় জালকারী রাসবিহারীর আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—রাসবিহারীর ও তাঁহার পরিজনগণের সহিত তাঁহার ফটোগ্রাফ। “ক্যামেরা কখনও মিথ্যা কথা বলে না।”

বাস্তবিক যে স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতে “স্বদেশী” ছদ্মনামে প্রচলিত হয় তাহার কর্মীরা যে বহু মনীষীর—এমনকি বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সহানুভূতিতে বঞ্চিত ছিলেন না, তাহার বহু প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি তাঁহাদিগের মস্তকে আশীর্বাদরূপে বর্ষিত হইয়াছিল।

(উপন্যাস)

ওর গাড়ীটা যখন এদের দরজায় এসে থামল, শহরের এ পাড়াটায় তখনও দিনের কাজের চাকাখানা পুরোদমে চলতে শুরু করেনি। রাস্তাটা যেন সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসে হাই তুলছে।

ফুটপাথের এখানে সেখানে, ভাগ্যবানেদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে, কি দৈবলব্ধ কোন দোকানের সাইনবোর্ড সুরক্ষিত রাখবার বাড়ানো শেড্-এর নীচে, যে সব হতভাগ্যের দল রাতের রাজশয্যা বিছিয়েছে, রাস্তার হোস্-পাইপ তখনও তাদের সুখনিদ্রায় ঘোলা-জল নিক্ষেপ করেনি। দোকান-পসারগুলো কেউ বা দুচোখ বোজা, কেউ বা একচোখ দেখাচ্ছে।

এক-আধটা কাগজওলা ক্রীং করে ঘণ্টি বাজিয়ে বিশেষ বাড়ীগুলির কোন খোলা জানালায় কি খোলা বারান্দায় নিত্য-বরাদ্দের কাগজখানা তাক করে ছুঁড়ে দিয়েই বোঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, এক আধটা 'সীলমারা বোতলবাহী 'মিল্কম্যান' তাদের সাইকেলগাড়ী থামিয়ে থামিয়ে 'যোগানে' বাড়ীর দরজায় ঘণ্টি মেরে জানান দিচ্ছে নিজেদের আগমন বার্তা।

বন্ধ দরজায় একটা মাত্র পাল্লাই হয়তো একটু খুলছে, অলক্ষিত কোন ব্যক্তির একখানি হাত বেরিয়ে এসে বোতলটি নিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

তৎপরতা শুরু হয়েছে শুধু চার-বাড়ী কাজ করে বেড়ানো ঠিকে ঝিয়েদের চলনে। এদের সংখ্যা মন্দ নয়, আশে-পাশে এখনো বস্তির বাহুল্য। শোনা যাচ্ছে উচ্ছেদ পর্ব নাকি শুরু হবে, কবে তা' কেউ জানে না। বস্তিবাসীরা অন্ততঃ ও নিয়ে মাথা ঘামায় না। হুজুগে উদ্বিগ্ন হবার অভ্যাস তাদের আর নেই। জানে যখন যা হবার হবে। অতএব মেয়াদের শেষ ঘণ্টাটি পর্যন্ত বিছোনো সংসারকে নিশ্চিন্তে বিছিয়ে রেখে বসে থাকবে।

এদিকটাকে এই কিছুদিন আগেও লোকে শহরতলী বলতো, সম্প্রতি শেষের উপসর্গটুকু উঠে গেছে, শহরের প্রসারিত বাহু নিজের থাবায় তুলে নিয়েছে একে। বাগিয়েছে, কিন্তু ঠিকমত বাগমানাতে পারেনি এখনো, তাই বড় রাস্তা ছেড়ে একটু এদিক-ওদিক উঁকি দিলে চোখে পড়বে জলের কল নেই—টিউবওয়েল, ড্রেন নেই—স্যানিটারী।

এদের বাড়ীটা বড় রাস্তার ওপর।

ভাল বাড়ী। আনকোরা নয়, আধা-নতুন।

এখানে যখন জমির দর ছিল জলের দরের সামিল, তখন জমিটা কিনে রেখে-ছিলেন নিরুপম, নীলাঞ্জন আর ইন্দ্রনীলের বাপ অনুপম মিত্তির। তারপর জমিটা যখন প্রায় জমির দরে এসে পৌঁছেছে, তখন রিটায়ার করে বাড়ী ফাঁদলেন মহোৎসাহে।

কিন্তু আরও এক জায়গায় যে তখন তাঁর নামে জমি বিক্রি হচ্ছে সে খবর স্বপ্নেও জানা ছিল না ভদ্রলোকের। নোটিশ এল অকস্মাৎ। স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জায়গা নয়, চলে গেলেন অনুপম মিত্তির। এখানের বাড়ীতে তখন ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে।

কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকল কাজ, তারপর আবার শুরু হল, একদিন শেষও হল। অনুপম মিত্তিরের পরিকল্পনা মতই হ'ল, ত্রুটি হল না কিছুই। ঘরের দেয়ালে রং, বাথরুমে মোজেক। সুচিন্তা মিত্তির বললেন, 'হোক! ও'র ইচ্ছে ছিল।'

শুধু গৃহ-প্রবেশের উৎসবটা অনুপম মিত্তিরের পরিকল্পনা অনুযায়ী হ'ল না। নিতান্ত অনাড়ম্বরে একদিন সুচিন্তা মিত্তির তাঁর তিন ছেলে আর

সংসার উঠোনো জিনিসপত্র নিয়ে চলে এলেন।

তারপর ঝপাঝপ এদিকে-ওদিকে বাড়ী উঠতে লাগল, ছোট, মাঝারি, বিরাট, চকচকে, ঝকঝকে, আধুনিক, অতি আধুনিক, তাদের পাশে অনুপম মিত্তিরের বাড়ীখানা প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

কিন্তু সেই নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় কিছুই যেন এসে গেল না 'অনুপম কুটিরের' বাসিন্দাদের, তারা নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন, ছক্ বাঁধা নিয়মের মধ্যে সমাহিত।

ছোট ছেলে ইন্দ্রনীল যদিবা কখনো বাইরে থেকে এসে বলে, 'ওই কোণের জমিটায় আবার বাড়ী উঠছে!' 'কে ওঠাচ্ছে বা কেমন উঠছে' এ প্রশ্ন নিয়ে দুটো কথা কেউ বাড়ায় না। হয়তো সুচিন্তা বলেন, 'তা' জমি কি আর পড়ে থাকবে?' হয়তো নীলাঞ্জন বলে, 'রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াস বুঝি, কোথায় কার কি হচ্ছে?'

নিরুপম ওটুকুও বলে না।

নিরুপম এই অঞ্চলেরই এক নতুন গড়ে ওঠা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, নীলাঞ্জন এম-এ পাশ করে বছর খানেক ঘোরাঘুরির পর বার্মাশেলে একটি মোটা মাইনের চাকরী জুটিয়ে নিয়েছে, ইন্দ্রনীল এম-এস-সি পড়ছে।

একটা চাকর আছে অনুপমের আমল থেকে, তার ওপর যাবতীয় সংসারের ভার, একটা ঠোক্কা ঝি দু'বেলা এসে মোটা কাজ করে দিয়ে যায়, ব্যস। আত্মীয়স্বজন দৈবাৎ আসেন, কারণ এ'রা কারো বাড়ী কদাচ পদার্পণ করেন।

পাড়ায় কোন কারুর সঙ্গে আলাপ নেই, নতুন এক আধজন পাড়ায় এসে প্রথম পাড়া-কর্তব্য হিসেবে দেখা করতে এসে জমাতে পারেনি। সুচিন্তা আর সুচিন্তা-তনয়দের নির্লিপ্ততায় গড়িয়ে পড়েছে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত।

ওর ট্যাক্সীখানা যদি ভরা দিনের আলোয় এসে দাঁড়াত, নিশ্চয় প্রতি-বেশীদের কৌতূহল-দৃষ্টি প্রশ্নে উন্মুখ হয়ে উঠতো, 'ব্যাপার কি, অনুপম কুটিরে আবার এল কে?' জানলা থেকে নড়ত না, কে এল না দেখে।

কিন্তু ওর ট্যাক্সীখানা যখন এদের দরজায় এসে থামল, তখন বেশীর ভাগ

বাড়ী ঘুমের আলস্যে নিথর। চাঞ্চল্য যদি কিছু থাকে তো সে সংসারের কেন্দ্র বিন্দুটিতে। রান্না, ভাঁড়ার, স্নানের ঘরে।

যেমন অনুপম কুটিরে।

অবশ্য অনুপম কুটিরের কাজের চাকা কোন সময়ই উদ্দাম ঘোরে না, চাকার ঘর্ঘরধ্বনি চারটি সভ্য শান্ত মানুষের দিনের ছন্দে আঘাত হানে না। হানে না অনুপমের বিয়োগের পর থেকে। অনুপমের আমলে ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। নিজেই তিনি সারাক্ষণ ঘর্ঘর রোল তুলে বেড়াতেন। তাঁর দৈনিক খাদ্য-তালিকায় বাহান্ন রকম পদ না থাকলে রসাতল করতেন, নিত্য বন্ধুজনকে ডেকে এনে সমারোহ করতে না পেলে ক্ষুব্ধ হতেন, এবং এতবেশী কথা নিজে বলতেন যে, বাড়ীর আর চারজন যে আদৌ বলছে না, সেটা টের পাওয়া যেত না। তা তিনি তো তাঁর সমস্ত হট্টগোল নিয়ে ভাড়াটে বাড়ী থেকেই বিদায় নিলেন।

অনুপম কুটির চির শান্ত।

এমন কি পুরনো আমলের চাকর সুবল, সে চব্বিশ ঘণ্টা বাবুর কাছে ধমক খেত, আর চব্বিশ ঘণ্টা ঝি ঠাকুর আর ড্রাইভারের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াতো, সেও শান্ত হয়ে গেছে, নির্বাক হয়ে গেছে।

সকালে উঠে সে নিঃশব্দে ঝাঁটা চালায়, একপাটি দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে দুধের বোতলটা নেয়, ঝি এলে সে দরজাকে একবার দু'হাট করে খুলে ধরে; তারপর রাতের ধোওয়া রান্নাঘরে উনুনটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাজারের থলিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। বাজারের টাকা ওর কাছেই থাকে, ফুরিয়ে গেলে চেয়ে নেয়। কেউ হিসেব চায় না, দিতে গেলে বিরক্ত হয়।

সুচিন্তাও ভোরেই ওঠেন, উঠেই শোবার ঘরের সংলগ্ন স্নানের ঘরে স্নান করতে ঢুকে পড়েন, স্নানের আগে কাউকে দেখা দেন না। ঘরটিতে নানা-বিধ শৌখিনতার উপকরণ আছে, অনু-পম মিত্তিরের পরিকল্পনা মত, শোবার ঘরেও তাই—শোবার ঘর আর স্নানের ঘর একাই ভোগ করছেন সুচিন্তা।

সুচিন্তার মুখ দেখলে মনে হয় না, খুব একটা হাহাকার তিনি মনের মধ্যে পোষণ করছেন, এবং এই আরাম-

আয়েস তাঁকে নিরন্তর পীড়িত করছে। বরং মনে হয় ঠিক এই রকম জীবনেই যেন উনি চির অভ্যস্ত। এই ঘুম থেকে উঠে এক ঘণ্টা ধরে টবে গা ডুবিয়ে বসে স্নান করে দুধ-সাদা থান আর আদ্দির ব্লাউজটি পরে আরও এক ঘণ্টা মাজা-মাজা খালি হাত দুখানি কোলের উপর জড় করে চুপচাপ চোখ বুজে বসে থেকে তবে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসা, এসে ছেলেদের তখনও ঘুম ভাঙলো কি ভাঙলো না, তা নিয়ে হৈ-চৈ না করে টেবিলের ধারে এসে খবরের কাগজখানি খুলে ধরা, এই যেন করছেন উনি আজীবন।

যেন এই সেদিনও সুচিন্তা সকাল-বেলা স্নান সেরে এসেই এক হাত চুড়ি-বালা বাজিয়ে কুটনো কোটেননি, ঘী-তেল মসলা মাংস মাছ দই নিয়ে হিম-সিম খাননি, পায়ে আলতা আর কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরেননি। নিজের খাওয়া আর স্ত্রীর পরার প্রতি সমান প্রখর দৃষ্টি ছিল অনুপমের। চওড়া-পাড়ের ভিন্ন শাড়ী পরার জো ছিল না সুচিন্তার।

জীবন যাত্রার সমস্ত উপকরণে রাজসিকতা থাকবে, এই শখ ছিল অনুপমের।

হয়তো চিরদিন এই শখের তলপী বয়ে বয়ে রাজসিকতায় এত বিমুখতা এসে গেছে সুচিন্তার। আর ছেলেরা? তারা মায়ের ধারা পেয়েছে, পেয়েছে মায়ের রুচি।

সুচিন্তা খবরের কাগজ নিয়ে বসার পর ওরা ঘুম থেকে ওঠে—নিরুপম, নীলাঞ্জন, আর ইন্দ্রনীল।

ওরা টেবিলে এসে বসে, সুবল চা এনে দেয়, সুচিন্তা ঢেলে ঢেলে এগিয়ে দেন, বলেন, 'বিস্কুট্ দেব আর এক-খানা? টোস্ট খেলে না? চায়ের সব-টুকুই পড়ে রইল যে!'

ওরা বলে, 'দাও একটা, না থাক! চা-টা কড়া লাগছে।'

খবরের কাগজখানা পড়ে প্রত্যেকেই, কিন্তু তার বিষয়বস্তু নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করে না।

নীচের তলায় ঝি সন্ধ্যা সুবলকে বলে, 'দু'বেলা আসি যাই, কারুর কথা শুনতে পাই না কেন বলতো?'

সুবল সংক্ষেপে বলে, 'বাড়ীটা বোবার বাড়ী।'

তবুও বাড়ীটা যথারীতি বোবা হয়েই পড়েছিল। সুচিন্তা তখনও তাঁর

ঘর থেকে বেরোননি, ছেলেরা ওঠেনি তখনও, এমন সময় ওর গাড়ীটা এসে থামল।

সুবল তখন গোয়ালার জন্যে দরজাটা এক পাট খুলেছে। বোতলটা দিয়ে লোকটা চলে গেল, কিন্তু সুবল চলে এল না, দেখল গাড়ীর আরোহিণী মুখ বাড়িয়ে এ বাড়ীরই নেমপ্লেট দেখছে।

'এইতো অনুপম কুটির!'

নিশ্চিত হয়ে নেমে এল সে। ভিতরে হাত বাড়িয়ে বলল 'এস বাবা!'

নেমে এলেন এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। ঈষৎ খাটো গড়ন, মাথার মাঝখানে গোল টাক, রগের পাশের চুল ধূসর, মুখে কেমন একটা অসহায় ভাব।

অসুস্থ, বুঝতে পারল সুবল, শুধু বুঝতে পারল না কে এরা। এত-দিন কাজ করছে সে, কই এদের-তো দেখেনি কখনো।

মেয়েটি যে নিতান্ত সপ্রতিভ তা অবশ্য বুঝতে দেরী হ'ল না সুবলের, কারণ দ্বিধামাত্র না করে সে সুবলকে আদেশ করল, 'একটা সুটকেস আর বেডিং আছে নিয়ে এস। আর—' দশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিল ওর দিকে 'মিটারটা দেখে দিয়ে দাও ওকে। মা আছেন?'

'মা আছেন'—একথাটা শব্দে উচ্চারণ না করে মাথার ভংগীতে জানাল সুবল।

বিনা নির্দেশেই বাপের হাত ধরে এগিয়ে এল মেয়েটা, উঠেও গেল সিঁড়ি দিয়ে, সুবল হাতে করে সুটকেস আর বেডিং নিয়ে হাঁ করে দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে।

সিঁড়িতে উঠে সামনেই টেবিল পাতা।

যেখানে সুচিন্তা আর তাঁর ছেলেরা চা খান আর খবরের কাগজ পড়েন।

'বোসো বাবা!'

বলল ও।

ভদ্রলোক অসহায় দৃষ্টি তুলে ছাড়া-ছাড়া সুরে বললেন, 'দেখলে তো, কেউ নেই। যে যেখানে ছিল সবাই মরে গেছে। তবে কেন তুমি এখানে আনলে আমায়?'

'কী আশ্চর্য! কি যে তুমি বল বাবা! সুচিন্তা পিসিমা আছেন না?'

'না নীতু না', ভদ্রলোক জেদের ভংগীতে বলেন, 'কেউ নেই, কেউ নেই, সবাই মরে গেছে।'

নীতু অথবা নীতা জোরের সংগে বলে, 'ছিঃ বাবা, ও-কথা বলতে আছে? সুচিন্তা পিসিমা কি মনে করবেন বলতো?'

'মনে করবে!'

ভয় খেলেন যেন উনি।

'মনে করবেন না? উনি বেঁচে আছেন, ভাল আছেন—'

কথা শেষ হ'ল না, সুচিন্তার ঘরের দরজা খুলে গেল, আর এ বোবা বাড়ীতে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ উঠল 'কে?'

'আমি পিসিমা'—নীতা সরে এসে প্রণাম করল, 'এসে পড়লাম আপনার কাছে।'

'এসে পড়লে! আমার কাছে এসে পড়লে!' সুচিন্তার চোখে ভয়ের ছায়া ফুটে ওঠে, 'কেন'?

'বাঃ আসতে নেই?'

সুচিন্তাও কি সহসা নীতার বাবার মত অসহায় হয়ে গেলেন? ঝাপসা হয়ে গেলেন? তাই তেমনি ছাড়া ছাড়া ভাবে বললেন, 'কোন খবর না দিয়ে? এখানে। কেন? তোমাদের তো কত আত্মীয়!'

নীতা উত্তর দেবার আগেই চমকে ওঠে, পিঠে মৃদু কোমল ভারী ভারী একটা হাতের স্পর্শে, 'দেখলে তো নীতু, বলিনি আমি? কেউ নেই, সব মরে গেছে।'

'আঃ বাবা, ওকথা বলতে নেই। সুচিন্তা পিসিমা আছেন। ভাল আছেন। ওই তো উনি।'

'তুমি আমায় ঠকাচ্ছ নীতু! সুচিন্তার স্বামীর কত টাকা, সুচিন্তার গায়ে কত গয়না!'

'ও'র গয়না সব চুরি গেছে বাবা!'

'চুরি গেছে!' একটু ম্লান হয়েই সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক, 'তা আবার কিনে দেয় না কেন? ওর সেই স্বামীটা?'

'দেবেন দেবেন। তুমি তো এসে গেছ, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'নিশ্চয়!'

সুচিন্তা এবার নিজের দরজা থেকে সরে আসেন, এতক্ষণ যে দরজাটার কপাট

দুটো সহসা বন্ধ করে দিতে পারার ভঙ্গীতে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন।

অনুপম কুটিরের বাতাসটা বুঝি একটু ভারী হয়ে উঠল। 'কতদিন এমন হয়েছে?' নিশ্বাসের মতই মৃদু প্রশ্ন।

'কিছুদিন থেকে, আস্তে আস্তে—' গভীর একটি মিনতি ফুটে ওঠে নীতার চোখে, 'আমার একটু সাহায্য করতে হবে পিসিমা।'

'সাহায্য করতে হবে! তোমায় সাহায্য করতে হবে! কিন্তু আমার ছেলেরা।'

প্রশ্ন নয়, যেন আত্ম-জিজ্ঞাসা।—

'হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নীতার কণ্ঠে কি আত্মপ্রত্যয়?

সুচিন্তার ছেলেদের কথা ধরছে না নীতা? তারা বিরুদ্ধতা করলে নীতা সামলাবে, সামলে নেবে।

'তোমরা চুপি চুপি কি কথা বলাবলি করছ?'

'এই যে বাবা, পিসিমা জিগ্যেস করছেন, তুমি সকালে কি খাও।'

'জিগ্যেস করছে? কেন?' ভুরু কোঁচকালেন উনি, 'সুচিন্তা জানে না?'

'বাঃ সে তো আগে জানতেন। এখন তুমি ডাক্তারবাবুর নিয়মে চল না?'

'ও হো হো!' হঠাৎ হেসে উঠেন উনি ঝকঝকে দাঁতের সারি মেলে, 'দেখেছ সুচিন্তা, কি রকম ভুলো হয়ে গেছি আজকাল!...কিন্তু তুমি কি সুচিন্তা? সত্যিকার সুচিন্তা? সুচিন্তার গায়ে কত গয়না!'

তিনটে ঘরের দরজায় ঝোলানো পর্দা সরে গেছে, ওরাও ঘুম ভেঙে উঠে থমকে গেছে। সুচিন্তার মত চেঁচিয়ে ওঠেনি 'কে?' বলে, শুধু ঘর থেকে বেরোতে ভুলে যাচ্ছে যেন।

এরা কে!

এরা কখন এল?

কে জানত এদের আসার কথা?

ওই বুড়ো ভদ্রলোককে কি কোনদিন দেখেছে ওরা? হ্যাঁ দেখেছে। সেই কবে যেন কোনখানে বেড়াতে গিয়ে—দিল্লী, আগ্রা? না দিল্লীতেই। কোথায় যেন বেড়াতে যেতে থমকে গিয়েছিলেন সুচিন্তা, সামনের ভদ্রলোককে দেখে তীক্ষ্ণ চীৎকারে বলে উঠেছিলেন 'কে!'

ভদ্রলোকও দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, আর তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল ঠিক এমনি একটা অসহায় ভাব। এই কি সেই মানুষটা? না সাদৃশ্য শুধু ওই ভাবটায়?

বোধহয় তাই।

কিন্তু—

তারপর কি যেন হ'ল?

ঠিক মনে নেই। পিছনে হৈ হৈ করে অনুপম এসে গেলেন মনে হচ্ছে। মা সরে এলেন।

কিন্তু ওই মেয়েটা?

না, ওই মেয়েটাকে ওরা দেখেনি কোনদিন।

'কে মা?'

ইন্দ্রনীল বেরিয়ে এসেছে, মায়ের কাছঘেঁসে দাঁড়িয়ে প্রায় বিলীন স্বরে বলছে 'কে মা?'

কে!

কি বলবেন সুচিন্তা?

কি পরিচয় দেবেন? কি দেবার আছে? সুচিন্তা মিত্তিরের কেমনতর আত্মীয় হতে পারে সুশোভন মুখুয্যে?

সুচিন্তাকে এমন বিপদে ফেলতে এল কেন ওই মেয়েটা? কি না জানি নাম যার। নাম? কই নাম তো জানেন না। জিগ্যেস করবেন?

আপাততঃ বিপদমুক্ত করলেন সুশোভনই। ওই মেয়েটাকে নাম জিগ্যেস করার বিপদ থেকে, ইন্দ্রনীলের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিপদ থেকে। মেয়ের হাতের একাংশ চেপে ধরে ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'নীতু! এরা কারা? এরা কারা?'

নীতা অনেক দিন ধরে সুশোভনকে চালাচ্ছে, তাই সে বিপন্নও হয় না বিব্রতও হয় না, হালকা স্বরে বলে ওঠে, 'বাঃ এই দেখ। সত্যিই তুমি বড্ড বেশী ভুলো হয়ে যাচ্ছ বাবা। এ'রা সুচিন্তা পিসিমার ছেলেরা না?'

'ছেলে! এত ছেলে সুচিন্তার। আমার মোটে একটা মেয়ে। বুঝলে সুচিন্তা মোটে একটা। এইটুকু ছিল যখন, তখন ওর মা মরে গেল। তারপর তো সবাই মরে গেল।'

সুচিন্তা কি ছেলেদের দিকে তাকাবেন না? ছেলেদের উপস্থিতি ভুলে যাবেন?

সেটাই বোধকরি সহজ।

তাই তিনিও হালকা গলায় বলে উঠলেন, 'বাঃ বেশ, সবাইকে মরিয়ে দিচ্ছ? এই তো আমি! আমি কি মরে গিয়েছি?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো আছ।'

আশ্বস্ত হলেন সুশোভন।

আশ্বস্ত হল বুঝি সুচিন্তার ছেলেরাও। মায়ের বাপের বাড়ীর কেউ। দূরতর সম্পর্কের অবশ্যই, ওরা যখন দেখেনি, জানে না। বুড়োটা যেন পাগল পাগল! কিন্তু ওরা এল কেন? ওদের কি আসবার কথা ছিল? আর সেই কথাটা কেবলমাত্র সুচিন্তাই জানতেন! আশ্চর্য তো! আর মেয়েটাই বা কবে কখন এত চিনল সুচিন্তাকে?

নাম জিগ্যেস করার দায় থেকে বাঁচিয়েছেন সুশোভন। তাই সহজ গলায় প্রশ্ন করেন সুচিন্তা, 'এত ভোরে তোমরা কোন্ গাড়ীতে এলে নীতু?'

নীতা হেসে ওঠে, 'আর বলবেন না পিসিমা, সে দুর্ভোগের কথা। এসেছি কি আমরা আজ? সারারাত তো ওয়েটিং-রুমে পড়েছিলাম।'

'সে কি?'

'আর কি করা? আসার কথা তো সন্ধ্যে সাতটায়, তিন ঘণ্টা গাড়ী লেট্। অত রাতে কোথায় বাড়ী খুঁজে বেড়াই বলুন, আসিনি তো কখনও।'

'আহা-হা, তা' হলে তো তোমাদের কাল বড় কষ্ট গিয়েছে নীতু? নাও তাড়াতাড়ি স্নান-টান সেরে একটু খাওয়া-দাওয়া—সুশোভন, তুমি স্নান করবে তো এখন?'

'নীতু যদি বলে।' বললেন সুশোভন।

'হ্যাঁ বাবা তাই সেরে নাও। কাল ভাল ঘুম হয়নি।'

হঠাৎ নীলাঞ্জন নীতাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'দিল্লী থেকে কোন্ গাড়ী সন্ধ্যায় এসে পেঁছয়?'

'দিল্লী থেকে! কি জানি!' সপ্রতিভ নীতাও একটু যেন থতমত খায়, 'কিন্তু আমরা তো দিল্লী থেকে আসছি না, বাবাকে নিয়ে ক'দিনের জন্যে দার্জিলিং গিয়েছিলাম।'

'ও!'

'কিন্তু আমরা যে দিল্লীতে থাকি কি করে জানলেন?'

নীলাঞ্জনের মুখে ফুটে ওঠে সূক্ষ্ম একটু ব্যঙ্গ হাসির রেখা, 'ঠিক যেমন

করে আপনি জানলেন 'আমরা 'অনুপম কুটিরে' থাকি।'

আর সন্দেহ নেই।

নীলাঞ্জন চিনতে পেরেছে। সেই দিল্লীর ভদ্রলোক। যার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে সুচিন্তা থমকে গিয়েছিলেন, তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠেছিলেন 'কে?'

সুবল সুটকেসটা নামিয়ে রেখে গেছে। ঢাউশ সুটকেস একটা, গায়ে সাদা রং দিয়ে বড় বড় করে লেখা এস্ মুখার্জি! ছোট অক্ষরে দিল্লীর একটা রাস্তার ঠিকানা।

সুচিন্তা মিত্তিরের বাপের বাড়ীর কি রকম আত্মীয় হতে পারে এস মুখার্জি! সুচিন্তার বাপের বাড়ীর কে কোথায় থাকে দিল্লীতে? যেমন আত্মীয় হঠাৎ বাক্স বিছানা নিয়ে এসে চড়াও হতে পারে? এ আবার কি! এ কেন! না, তরুণী মুখ দেখে বিগলিত হচ্ছে না নীলাঞ্জন। বিরক্ত হচ্ছে।

ওঁরা স্নান করতে গেছেন।

সুচিন্তা নীতাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এসে একটু উঁচু গলায় ডাকলেন, 'সুবল!'

ঝি সন্ধ্যা চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলে উঠল 'কে!' এতদিন কাজ করছে যে, এ গলা তো শোনেনি কোনদিন!

'আজ্ঞে যাই।' সশব্দ সাড়া দিয়ে ওঠে সুবল, সঙ্গে সঙ্গে চমকেও ওঠে। নিজের গলাটা নিজের কানেই অপরিচিত লাগে।

'দুজনের মত খাবার বেশী কোরো সুবল!'

'আচ্ছা।' চলে যাচ্ছে সুবল, আবার ডাকলেন সুচিন্তা, 'আর শোনো, ভাল মিষ্টি কিছু আনতে পারবে?'

আর বোধহয় চমকে উঠবে না সুবল, এবার অভ্যাস হয়ে যাবে নিজের গলার স্বর, 'পারবো না কেন? কি আনবো বলুন?'

'যা হয়। আচ্ছা রসগোল্লা, রসগোল্লাই। টাকা দিই?'

'টাকা আছে।'

সুবল সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে। সহসা নীলাঞ্জনের চড়া গলা তার পিঠের ওপর আছড়ে পড়ল, 'এগুলো এ রকম মাঝখানে বসিয়ে রেখেছিস কেন?' সেই সুটকেস আর বেডিং।

যোবা বাড়ী কি কথা কয়ে উঠল?

উত্তাল হয়ে উঠল? চঞ্চল হয়ে উঠল?

'আগে আমাদের জানালে ক্ষতি ছিল না কিছু। বারণ করতাম না নিশ্চয়।'

সুচিন্তার ঘরে এসে দাঁড়াল নীলাঞ্জন।

ছেলের এই আকস্মিক অভিযোগের প্রশ্নে কি চমকে উঠবেন সুচিন্তা? আহত হবেন? এর জন্যে কি এতক্ষণ প্রস্তুত হচ্ছিলেন না? সব প্রথমেই কি নীতার সামনে নিজেকে অসহায় প্রশ্ন করেননি 'আমার ছেলেরা!'

বললেন, 'তুমি ভুল করছ নীলাঞ্জন, জানা আমারও ছিল না।'

'এটা একটা অদ্ভুত রকমের অবিশ্বাস্য ঘটনা নয় কি?

'কিন্তু এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ঘাঁটি হিসেবে এ বাড়ীটা বেছে নেওয়া হল কেন!'

'এই 'কেন' টা তো আমিও বুঝতে পারছি না।'

'সত্যিই কি আর একেবারে পারছ না?' বলে চলে যায় নীলাঞ্জন, সুচিন্তাকে স্তব্ধ করে দিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে নীতা যখন ওর বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, সুচিন্তা বড়ছেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, 'নীতা আমাকে না জানিয়ে ওর বাবাকে নিয়ে হঠাৎ এখানে চলে এসেছে—একথা তুমি বিশ্বাস কর না?'

নিরুপম মার দিকে তাকাল, বলল, 'একথা কেন বলছ মা?'

"একথা তুমি বিশ্বাস কর না?"

সুচিন্তা মুখ তুলে তাকালেন, তাঁর শান্ত সভ্য ছেলেকে সহসা কেন অসভ্য মনে হল। তবু নিজে তিনি শান্তই থাকলেন, 'জগতে কত অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো ঘটে, এটাকে তারই একটা বলে ধরে নাও না।'

'ওঁর তো মাথার দোষ দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ মানসিক রোগেরই রোগী। চিকিৎসা করাবার জন্যে কলকাতায় এসেছে। লুম্বিনীতে দেখাবে।'

'বলবার কারণ হয়েছে। মনে হচ্ছে নীলাঞ্জন বিশ্বাস করতে পারছে না, ক্ষুব্ধ হচ্ছে।'

'ক্ষুব্ধ হবার কি আছে?'

'আমি যদি তোমাদের না জানিয়ে এমন একটা কিছু করি, যেটা তোমাদের অসুবিধাকর, তাহলে তো যথেষ্টই কারণ থেকে যায় ক্ষুব্ধ হবার।'

নিরুপম হাতের বইখানায় চোখ

নামিয়ে বলে, 'তা সেটা যখন তুমি করনি, তখন তো সব কিছুই মিটে যাচ্ছে।'

সুচিন্তা ছেলের সেই আনত মুখের দিকে তাকালেন; দেখলেন পরম নির্লিপ্ততা। যেন এখনই যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—'কি প্রসঙ্গ চলছিল তোমাদের? ও বলতে পারবে না। ভেবে-চিন্তে বলবে 'কি জানি, মনে পড়ছে না।'

নীলাঞ্জন যুদ্ধের আসরে নেমে এসেছিল, সেটায় অপমান বোধ করে-ছিলেন সুচিন্তা। কিন্তু নিরুপম যে ভূণটাতেই হাত দিল না, সেটাই কি সুখের আর সম্মানের মনে হচ্ছে? কেন ও অমন নির্লিপ্ত থাকবে?

সুচিন্তা এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই কি বদলে গেলেন? ভুলে গেলেন ওইটাই তো এই অনুপম কুটিরের সাধনা! তিক্ত-স্বরে বললেন, 'কিন্তু নীতা যে কে, এ প্রশ্ন উঠছে না কেন তোমার মনে? জানতে চাইছ না কেন?'

'বাঃ আমার জানার কি দরকার? নিশ্চয় এমন কেউ, যে সহজেই এভাবে আসতে পেরেছে।'

সুচিন্তা কি ছেলেকে কৈফিয়ত দেবেন?

বলবেন, 'না বাপু, এমন কেউ না। আমি ওকে চোখেও দেখিনি কখনো। ও দুঃসাহসে ভর করে এমনি এসে পড়েছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। ওর পাগল বাপকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী উঠতে লজ্জা করেছে, তাই এই অনাত্মীয়ের বাড়ীতে এসে হানা।'

বলবেন কি, 'দেখ্ দিকি কী মুস্কিল, আমাদের এই শান্তির সংসারে—'

না, তা' তিনি বলতে পারলেন না, বরং উল্টো কথাই বললেন, 'ও'দের তো একটা ঘর ছেড়ে দিতে হবে, এসেছেন যখন।'

নিরুপম আর একবার বই থেকে চোখ তুলল, বলল 'বেশ তো মা, যে ক'দিন দরকার আমি নীচের ড্রইং রুমেই বেশ কাটিয়ে দিতে পারবো।'

'নীচেয়!'

'তাতে কি? কেউ কি নীচের তলায় থাকে না?'

সুচিন্তা বললেন, 'থাকে না তা' বলছি না, কিন্তু অত বেশী অসুবিধেয় পড়বার দরকার কি? তার থেকে কয়েকটা দিন যদি ইন্দ্র আর তুমি এক ঘরে—'

নিরুপমকে একথা বলার কথা নয়। নিরুপমকে সুচিন্তা জানেন। এক ঘরে দু'টো মানুষ থাকা ওর মতে সব থেকে রুচিবিগর্হিত। বলে, নির্জনতাই যদি নষ্ট হ'ল তো রইল কি?' আগের বাড়ীতে প্রত্যেকের ভাগে এক একটা ঘর কুলোতো না, কারণ অনুপমের অতিথি অভ্যাগত আত্মীয় কুটুম্বের দলের কেউ না কেউ, দু'জন কি একজন, থাকতোই বাড়ীতে। নীলাঞ্জন আর ইন্দ্রনীল বরাবর একটা ঘরেই শুয়েছে, থেকেছে, পড়েছে, কিন্তু নিরুপম কখনো না। সিঁড়ির ঘর দাও তাও ভাল, তবু সেটা যেন নিজস্ব হয়। এ বাড়ীতে তো সে ব্যবস্থা কায়েমই আছে। তিন ছেলের তিনটে ঘর করেছেন অনুপম।

অথচ আজ প্রস্তাবটা নিরুপমের কাছেই করলেন সুচিন্তা।

কেন করলেন?

নীলাঞ্জনের ওপর বিরক্ত হয়ে?

না কি নিরুপম যে কথা রাখবে না তা বুঝেই? প্রস্তাবটা নাকচ হোক এটাই চাইছেন সুচিন্তা! কিন্তু কেনই বা তা' চাইবেন?'

নাকচই হল, নিরুপম ওর অভ্যস্ত মৃদু হাসি হেসে বলল, 'তার থেকে নীচের তলায় থাকা তো অনেক কম অসুবিধেজনক মা।'

সুচিন্তা কি চাইছিলেন ঈশ্বর জানেন।

কিন্তু হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন তিনি, 'কেউ কি করে না করে বলছিলে না? তা দরকার পড়লে কেউ নিজের ঘরে ছোট ভাইকে একটু জায়গা দেয় না?'

অনুপম কুটিরের দেওয়াল কি চমকে উঠল নতুন এক শব্দের ধাক্কায়? এ শব্দ তো সে কোনদিন শোনেনি।

'কী আশ্চর্য, এতে তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন মা?' নিরুপম অবাক হয়ে বলে, 'এর চাইতে তুচ্ছ ব্যাপার সংসারে আর কি আছে, আমার তো জানা নেই। বাড়ীতে অতিথি এসেছেন, নিজেদের অভ্যস্ত ব্যবস্থার কিছু পরি-বর্তন করে নিতে হবে, এই তো? এটাকে একটা সমস্যায় পরিণত করে লাভ কি? আমার তো নীচের তলায় থাকায় কোন অসুবিধে হ'ত না।'

'ওখানে কোথায় শোবে তুমি?'

'কেন ডিভ্যানটার ওপর? সুন্দর শোব।

ক'দিন ওরা থাকবে ঠিক তো নেই, বললেন সুচিন্তা। সুচিন্তা কি জমি প্রস্তুত করছেন? অনেকদিনও যে থাকা সম্ভব সেটাই ধরিয়ে দিচ্ছেন ওদের সত্তার মধ্যে, ধারণার মধ্যে?

কিন্তু নিরুপম আতঙ্কিত হ'ল না, বিস্ময় প্রকাশ করল না, হেসে বলল, 'তাতে কি? অস্থায়ী ব্যবস্থাই যদি স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে ওঠে; সেটাও অভ্যাস হয়ে যায় মানুষের।'

কিন্তু সুচিন্তার আজ হ'ল কি? উনি কি হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করবেন ঠিক করেছেন? তাই গম্ভীর মুখে বলেন, 'স্থায়ী হয়ে উঠবে এতদূর না ভাবলেও চলবে। যাক্ ঠিক আছে, তোমাদের কারুরই অসুবিধেয় পড়বার দরকার নেই, ওদিকের ছোট ঘরটায় থাকবো।'

'ছোট ঘর' বলতে বোঝায় সিঁড়ির পাশের দিকের বাক্স সুটকেসের ঘরটা। ঘরটা ভাল, জানলা আছে দক্ষিণে, কিন্তু সংসারের যাবতীয় বাড়তি মাল তো ওই ঘরেই।

'ছোট ঘরে থাকবে?'

নিরুপম অবাক হ'ল, 'ওই বাক্স-বোঝাই ঘরে?'

'বোঝাই হালকা করে নেব। ওরা দু'জন মানুষ—বড় ঘরটা না দিলে পারবে কি করে; রাতে বাপের কাছাকাছি থাকতে হয় নীতাকে। খেয়ালী মানুষ কখন কি করে বসেন।"

নিরুপম ফের হাতের বইখানায় চোখ নামিয়ে বলে, 'অতিথির জন্যে নিজেই যদি তুমি এতটা কৃচ্ছ্রসাধন করতে চাও মা, এ প্রসঙ্গের তো কোন দরকারই ছিল না। ভালই তো! তুমি যা কিছু করবে, বুঝেই করবে নিশ্চয়।'

বইটার ওপর শুধু চোখ ডুবিয়ে ফেলল না নিরুপম, যেন মনটাও ডুবিয়ে ফেলল।

কিন্তু ওর ওই আনত মুখের রেখায় রেখায় ক্ষীণ একটা হাসির আভাস ফুটে উঠল কেন?

সুচিন্তা যাতে স্তব্ধ হয়ে যান, চলে আসেন, তেমনি হাসির আভাস।

সুচিন্তা চলেই এলেন।

আর অন্য কিছু না ভেবে কেবলই ভাবতে লাগলেন নিরুপম হাসলো কেন!

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন, তারপর মনে করলেন হয়তো বইটার বিষয়বস্তুর মধ্যে নিশ্চয় কোন হাসির খোরাক ছিল? নইলে সুচিন্তা এমন কি করলেন যে, সুচিন্তার অদ্ভুত রকমের নির্লিপ্ত ছেলেও বাপের হাসি হাসবে?

মনে করে স্বস্তি পেলেন।

(ক্রমশঃ)

বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী মন্দির

মন্দিরের অন্ত নেই বাংলাদেশে। বহু যুগ থেকে মন্দির তৈরী হয়ে আসছে। চূড়ান্ত গৌরব পেয়েছিল গুপ্ত যুগের স্থাপত্য। সাত শতকে এদেশে এসেছিলেন হুয়েং-সাং। তিনি নিজে প্রায় তিনশ' মন্দির দেখেছেন। অবশ্য তারপর একশ' বছর বাংলার ইতিহাসে নানা বিপর্যয় এসেছে। আবার পাল বংশের রাজত্বে বাংলাদেশ পেয়েছিল শান্তি ও নিরাপত্তা। তারপর থেকে বহুধাবিস্তৃত হয়েছে বাংলার মন্দির-স্থাপত্য এবং তার ইতিহাস। উত্তর ভারত কিংবা দক্ষিণ ভারত থেকে পৃথক ভাবে গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব গঠন-রীতি।

বাংলাদেশের প্রতি জেলায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মন্দির। তাদের অনেকের হয়ত কোন ইতিহাস নেই। অনেকগুলি আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পাহাড়-পুরের মত প্রাচীন নয়। অতীতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে হয়নি। গবেষণা হয়নি তার নির্মাণ-রীতি, কিংবা ইতিহাস নিয়ে। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ-প্রান্তে বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে আরো বহু মন্দির। তাদের সবগুলি এখনও ধ্বংস হয়নি। স্থাপত্য-রীতির দিক থেকে তারা আকর্ষণীয়। ইতিহাসের নজির হিসাবে তারা মূল্যবান। তারা বহন করে চলেছে বাংলার সংস্কৃতি-সাধনার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এমনি একটি প্রাচীন মন্দির আছে হুগলী জেলার বংশ-বাটীতে, লোকে যাকে বলে বাঁশবেড়ে।

খুবই প্রাচীন জায়গা এই বংশবাটী। সুরধুনি কাব্যে দীনবন্ধু লিখেছেন :

পরিপাটি বংশবাটী স্থান মনোহর
যে দিকে তাকাই দেখি সকলি সুন্দর।

তারও আগে, আকবর বাদশার আমল থেকে শোনা যায় বাঁশবেড়ের নাম। কিন্তু রাঘব দত্ত থেকে বাঁশবেড়ের প্রাধান্য। রাঘব দত্ত আসলে বর্ধমানের লোক। জমিদার হিসাবে নাম ছিল। ১৬৫৬ সালে সম্রাট শাজাহান তাঁকে দিলেন একুশটা পরগণার জমিদারি। তার আওতায় ছিল বাঁশবেড়ে। কিন্তু বর্ধমান ছাড়েননি রাঘব দত্ত। বাদশা তাঁকে দিয়েছিলেন চৌধুরী উপাধি।

বর্ধমান ছেড়ে বাঁশবেড়েতে বাস করতে আরম্ভ করেন রাঘবের ছেলে রামেশ্বর। বাপের চেয়েও কড়া জমিদার রামেশ্বর। খাজনা বাকি থাকলে কোন ক্ষমা নেই। উৎখাত হতেই হবে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন বাদশা আরঙ্গজেব। বড় অর্থাভাব আরঙ্গজেবের। মারাঠারা বিব্রত করছে। যুদ্ধ মানে অগাধ অর্থব্যয়। সুতরাং খাজনার দিকে শ্যেনদৃষ্টি থাকে বাদশার। পাকা জমিদার পেয়ে সন্তুষ্ট বাদশা উপাধি দিলেন রামেশ্বরকে "রাজামশাই"। এ হল ১৬৭৯ সালের কথা।

বাড়ীর চারিদিকে গড় বানালেন রামেশ্বর। গ্রামটা ছিল বাঁশবনে ছাওয়া। বাঁশের গায়ে বাঁশ দিয়ে যেন জাফরি বোনা। বর্গীর হাঙ্গামার সময় এই বাঁশ-বন অনেক সাহায্য করেছে। কোন ক্ষতি করতে পারেনি মারাঠারা। এই গড়ের ভেতর রামেশ্বর প্রতিষ্ঠা করলেন বাসুদেবের মন্দির ১৬৭৯-৮০ সালে, উপাধি পাবার বছরেই। মন্দিরের গায় লেখা আছে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে :

মহী-ব্যোমাঙ্গ শীতাংশু গণিতে
শক বৎসরে
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে
বিষ্ণু মন্দিরং॥

বাসুদেবের মন্দির তাই বাঁশবেড়ের সবচেয়ে পুরানো মন্দির। মন্দিরটি ইটের। বলা হয় মন্দিরটি বাংলা রীতিতে গড়া। ছাদের ওপর গম্বুজ। সামনের দিকে মন্দিরের গায়ে পোড়া-মাটির কাজ। তাতে নানা পৌরাণিক কাহিনী চিত্রিত।

রামেশ্বরের ছেলে গোবিন্দ দেব। গোবিন্দ দেব মারা যেতেই তার প্রাপ্য জমিদারি বেহাত হয়ে গেল। কারণ, তখনও কোন সন্তান হয়নি গোবিন্দ দেবের। নবাবের কৃপায় গোবিন্দ দেবের জমিদারির কিছুটা অংশ নিলেন বর্ধমানের মহারাজা, আর কিছুটা দখল করে বসলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

হংসেশ্বরীর পাশের মন্দির' ফটো : অলক দে।

গোবিন্দ দেব মারা যাবার তিন মাস পরে জন্ম হল নৃসিংহ দেবের। কিন্তু জমিদারি আর ফিরল না। আবেদন-নিবেদন চলতে থাকলো। ক্ষমতায় এলো কোম্পানী। হেস্টিংস ব্যবস্থা করে দিলেন কয়েকটা মৌজা নৃসিংহ দেবকে। কৃতজ্ঞ নৃসিংহ দেব ১৭৮৮-৮৯ সালে গড়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন সৌষ্ঠবহীন স্বয়ম্ভবা কালী মন্দির, বিষ্ণু মন্দিরের উত্তর দিকে। আর হেস্টিংসের জন্য এঁকে দিলেন বাংলাদেশের মানচিত্র।

নৃসিংহ দেব পন্ডিত। ১৭৯২ সালে তিনি কাশী যান।

"শান্দমীণ কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব রায় গত্ত কাশী।"

কাশীতেই তিনি তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হন। নিজেই "উড্ডিশ-তন্ত্রের" অনুবাদ করেন। কাশীতে পরিচয় হয় খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণের সংগে। তিনি কাশীখণ্ডের অনুবাদে সাহায্য করেন।

"তার সাথে জগন্নাথ মুখুজ্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥"

১৭৯৯ সালে আবার বাঁশবেড়ে ফিরে আসেন নৃসিংহ দেব। তখনই তিনি হংসেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কাজ শেষ করে যেতে পারেননি নৃসিংহ দেব। তিনি মারা যান ১৮০২ সালে। মন্দিরের কাজ অব্যাহত রাখেন তাঁরই রাণী শঙ্করী। তখন মন্দিরের প্রথম তলা তৈরী করা হয়েছে মাত্র। কাশী থেকে রাজমিস্ত্রি এসেছিল এর জন্য। ১৮১৪ সালে রাণী শঙ্করী মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। খরচা হয় পাঁচ লাখ টাকারও বেশী। তারপর রাণী করেছিলেন তুলা দণ্ডের আয়োজন। তাতে ব্যয় হয়েছিল আরো এক লাখ। শোনা যায় পাল্লার একটাতে বসেছিলেন রাণী অন্য পাল্লায় রাখা হয়েছিল সেই পরিমাণ রুপো। দান-ধ্যানে ব্যয় হয়েছিল আরো কত টাকা।

কিন্তু ছেলের সঙ্গে বনিবনাও হয়নি মায়ের। ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন কোর্টে। তিনি চেয়েছিলেন জমিদারির মালিকানা। নীচু আদালতের রায় গিয়েছিল ছেলের পক্ষে। প্রতিবাদে রাণী আপীল করেছিলেন উঁচু কোর্টে। শেষকালে মা ও ছেলের মধ্যে রফা হয়। মা পেয়েছিলেন দেবসেবার জন্য কয়েকটি মৌজা।

হংসেশ্বরী মন্দিরের নকসা করেছিলেন রাজা নৃসিংহ দেব নিজে। এই মন্দিরটি বারাণসীর স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শে তৈরী। মন্দিরের গায়ে ফলক আঁটলেন রাণী :

শাকাব্দে রস-বহ্নি-মৈত্র গণিতে
শ্রী মন্দিরং মন্দিরং
মোক্ষদ্বার চতুর্দশেশ্বরং সমং
হংসেশ্বরী-রাজিতং
ভূপালেন নৃসিংহ দেব কৃতিনারব্ধং
তদাজ্ঞানুগো
তৎপত্নী গুরুপাদ পদ্মনিরতা
শ্রীশঙ্করী নির্মমে॥

তন্ত্রমতে মানুষের শরীর মাপা হয়। ষটচক্র ভেদের পাঁচটি নাড়ী আছে।

হংসেশ্বরীর মন্দির। ফটো : অলক দে।

ষটচক্রের প্রধান কথা আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। শরীরের মধ্যে যে শক্তি-রূপিনী কুলকুণ্ডলিনী আছে তাকে জাগ্রত করা। মেরুদণ্ডের ডান দিক থেকে পিঙ্গলা আর বাঁ দিক থেকে ইড়া নাড়ী চলে গেছে। সুষুম্না জ্যোতির্ময়ী নাড়ী। আকাশ থেকে পৃথিবী এবং পৃথিবী থেকে আকাশে আরোহণ করার উপায় এই নাড়ী। ইড়াকে বলে গংগা ও বরুণা, পিঙগলাকে যমুনা ও অসি এবং ইড়া সুষুম্নাকে বলে সরস্বতী। ইড়া পিঙগলা আর সুষুম্নার সংগম হল প্রয়াগ।

ইড়া বামস্থানে পিঙগলা দক্ষিণে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী
দক্ষিণে যমুনা বয়
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে
ত্রিবেণী তাহারে কয়।

বজ্রাখ্যা নাড়ীর মধ্যে আছে অতি-সূক্ষ্ম চিত্রিণী নাড়ী। এই নাড়ী ষটপদ্ম ভেদ করেছে। এই পাঁচটি নাড়ীর প্রতীক হয়ে আছে হংসেশ্বরী মন্দিরের পাঁচটি সোপান।

মন্দিরের গর্ভগৃহে কুণ্ডলিনী শক্তি-রূপী হংসেশ্বরী। শবরূপী শিবের নাভিপদ্মের ওপর দেবী প্রতিষ্ঠিত। চারিবর্ণে চতুর্দলপদ্মে কুলকুণ্ডলিনীর আধার। দেবীমূর্তি নিমকাঠে নির্মিত এবং তার বর্ণ নীল। মন্দিরের ছাদ বারাণসীর স্থাপত্যের নিদর্শন। মন্দিরের তেরোটি চূড়া। বারান্দা ও কোণায় আছে আটটি। এদের চেয়েও বড় চারটি চূড়া আছে মাঝখানে। কিন্তু সবচেয়ে বড় চূড়াটি ঘাট থেকে সত্তর ফিট লম্বা। প্রতি চূড়ার মধ্যে স্থাপিত হয়েছে একটি করে শিব মূর্তি। আর মন্দিরের গর্ভ-গৃহে দেবী-উপবিষ্ট শিব মূর্তি নিয়ে হংসেশ্বরী মন্দিরে আছে চতুর্দশ শিব। এই হল চতুর্দশেশ্বর মূর্তি। বারান্দায় বারোটি কারুকার্যখচিত স্তম্ভ। উত্তর দিকের বারান্দা দিয়ে ওপরে উঠবার জন্য তিনটি সিঁড়ি। মন্দিরের চত্বর সাড়ে চুয়াল্লিশ বর্গফিট। দক্ষিণ দিকে, অর্থাৎ মন্দিরের সামনে নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরের আয়তন ২২ ফুঃ ২ ইঃ × ২১ ফুঃ ১০ ইঃ। কিন্তু মন্দিরের প্রাচীনত্ব এবং তার বৈশিষ্ট্য সাম্প্রতিক সংস্কারে কিছু অংশে খর্ব হয়েছে।

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমার শৈশব-চেতনার প্রথম উন্মেষের ফলে যে-সঙ্গীতের সুরধ্বনি কানে ভেসে আসতো, তা সব সময় হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হত না। তখন আমার বয়স চার বৎসর হবে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যাহ্নকাল ছিল সে সময়টা। কানাইলাল, খুদিরামের গল্প সেকালের যুগান্তর পত্রিকা থেকে পড়ে শোনাতেন আমাদের বাড়ীর অভিভাবকেরা। কিছুই বুঝিনি প্রায় তখন। পরে জেনেছি যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। যাই হোক, আমাদের ৫৩নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীটি ছিল স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যতম কর্মকেন্দ্র। সেই যুগের প্রাতঃস্মরণীয় নেতৃবৃন্দও প্রায়ই আসতেন সে বাড়ীতে। স্বর্গীয় পিতৃদেব ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তখন ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ক্লার্কসাহেবের সঙ্গে বাসন্তীপ্রতিমাভঙ্গের ঐতিহাসিক মোকদ্দমায় জড়িত ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গোড়াপত্তনে ব্যাপৃত। সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ী স্বেচ্ছাসেবকদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও দ্বিজেন্দ্রলালের উদাত্ত গলার স্বদেশী গানে সরগরম থাকত।

এই পরিবেশের মধ্যে একজন বিখ্যাত সঙ্গীতকারের সাক্ষাৎ পাওয়ার সৌভাগ্য আমার প্রায়ই ঘটতো। তিনি আমাদের মতোই ময়মনসিংহের লোক। স্বদেশী গানের প্রাণবন্ত পরিবেশনে তাঁর সমতুল্য গাইয়ে তখন কমই ছিলেন। তাঁর নাম হল ব্রজেন গাঙ্গুলী। উত্তরকালে ইনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও বেশ নাম ক'রেছিলেন। স্বদেশী গানের সঙ্গে "তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী" ইত্যাদি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরমাধুর্য তাঁকে সেদিনের সাঙ্গীতিক জগতে বাংলা গানের একজন শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পীর আসন দান করেছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানই সে যুগে সবথেকে জনপ্রিয় ছিল। তারপরেই উল্লেখযোগ্য হল দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দীপনাময় স্বদেশী গান। আমার পিতৃদেব স্বদেশী ভাবধারার এই সব ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও নাট্যাভিনয় ও খেলাধুলোর জগতে দেশের একজন অগ্রণী পুরুষ ছিলেন। আকৈশোর তিনি গৌরীপুরের সখের যাত্রা ও কলকাতায় স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সংগীত সমাজের সৌখিন নাট্য বিভাগের অভিনয় অনুষ্ঠানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্বর্গীয় অমর দত্ত ছিলেন তাঁর সহ-অভিনেতা। অন্যদিকে ক্রীড়া বিভাগেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বিশেষত ক্রিকেট খেলায় স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায়ের প্রধান শিষ্য হিসাবে কলকাতা টাউন ক্লাবের তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। তাছাড়া বেঙ্গল জিমখানারও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এক্ষেত্রে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সারদারঞ্জন ছিলেন কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। তাঁরও জন্মস্থান ময়মনসিংহে। গণিত ও সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট খেলাতেও ইনি খুব পারদর্শিতা লাভ করেন এবং বাঙালীদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার ইনিই প্রথম প্রবর্তক। যা হোক সঙ্গীত বিদ্যার দিকে বাবার প্রথম আগ্রহের সূচনা হ'লো, যখন তাঁর অভিনয় ও ক্রিকেটের সহযোগী বন্ধুদের আমন্ত্রণে স্বর্গীয় মৃদঙ্গাচার্য মুরারী গুপ্তের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের প্রেরণা পেলেন। এ সব আমার জন্মের পূর্বের ঘটনা। সঙ্গীতরসিক মাত্রেই জানেন, মুরারী গুপ্ত কলকাতায় মৃদঙ্গ সঙ্গতের প্রচলনে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। বাবার যৌবনকালে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মুরারী গুপ্তের শিষ্য হন। এঁদের মধ্যে স্বর্গীয় দুর্লভ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবা গল্প ক'রতেন যে, মুরারীবাবু যখন শিক্ষা দিতেন তখন অনেকগুলি কাগজের টুকরো তাঁর কাছেই গাঁথা থাকতো। তিনি প্রতি শিষ্যকে এক একটি টুকরো কাগজে তাঁদের উপযোগী বিভিন্ন মৃদঙ্গের বোল লিখে দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাজিয়ে দেখাতেন।

বাল্যকাল থেকেই যাত্রাভিনয়ের গানে ও থিয়েটারের কন্সার্টে ঢোলক বাজাবার সখ ও অভ্যাস বাবার ছিল। মুরারীবাবু তাঁকে এ অভ্যাস বর্জনের উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু বাবা ঢোলক বাদন ত্যাগ করেননি। পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত ঢোলক বাদকগণ বাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ঢোলক পরিত্যাগ না ক'রলেও মৃদঙ্গ বিদ্যা ভালো ক'রে আয়ত্ত করার দিকে তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না। মৃদঙ্গ অভ্যাসের জন্যেই তিনি তখন ধ্রুপদ গায়কদের সঙ্গে নিয়মিত সঙ্গতের চর্চা ক'রে চ'লতেন। এই সময়ে 'সঙ্গীত-সমাজের' সঙ্গীত

বিভাগে নামজাদা সংগীত-শিল্পীদের সাপ্তাহিক জলসার অনুষ্ঠান হ'তো। কলকাতার ঠাকুর রাজপরিবার ও অন্যান্য অভিজাত ঘরের দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত গুণীরা নিয়মিত সংগীত পরিবেশনের জন্য 'সংগীত-সমাজ' থেকে মাসিক বৃত্তি লাভ ক'রতেন। সৌখীন সংগীত-শিল্পীদের মধ্যে তখন স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়ালের সম্মান খুবই উচ্চস্থানে ছিল। বাবার সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং 'সংগীত সমাজে' তাঁর গানের সঙ্গে প্রায়ই বাবার মৃদঙ্গ সঙ্গত অনুষ্ঠিত হ'তো। মুরারীবাবু ও কলকাতার বিখ্যাত ধনী কেশব মিত্র সৌখীন বাজিয়ে হিসাবে 'সংগীত সমাজে' মাঝে মাঝে মৃদঙ্গ বাদন পরিবেশন ক'রতেন। অবশ্য 'ভবানীপুর সম্মিলনী'ই যে কেশববাবুর সংগীত সাধনার নিজস্ব ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত ছিল, এটা বলা দরকার।

সে যুগের সংগীতের পরিবেশের কাহিনী বর্তমানে অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। কিন্তু তখনকার ইতিহাসের উদ্ধার ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কলকাতায় এই সময়ে ধ্রুপদ সংগীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তানসেন বংশীয় বাহাদুর খাঁ ও হরিদাস স্বামীর শিষ্যধারার বিশিষ্ট অনুগামী মথুরাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ 'ধ্রুপদী' বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিষ্ণুপুর রাজদরবারের পূর্বগৌরব যখন অস্তমিত, তখন সেখানকার নানা গুণীজন কলকাতার ঠাকুর রাজ-দরবারে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে ধ্রুপদ সংগীতের চর্চা বিশেষভাবে আরম্ভ করেন। এ'দের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদু ভট্টের নাম অত্যন্তই উল্লেখযোগ্য। তাঁদের আদর্শে শুধু কলকাতায় নয়, সারা বাংলাদেশে, এমন কি পূর্ববঙ্গেও ধ্রুপদ সংগীতের সাধনা বিস্তৃতি লাভ করে। যদিও খেয়াল ও টপ্পা গানের প্রচলন তখনও ছিল, তবু উচ্চাঙ্গ মার্গ সংগীত বলতে ধ্রুপদকেই বুঝাতো। খেয়াল ও টপ্পার স্থান ছিল ধ্রুপদের আনুষঙ্গিক হিসাবে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলি শা যখন মেটিয়াবুরুজে ইংরাজ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রলেন, তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণও পূর্ববিরোধ ভুলে গিয়ে তাঁকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসবাসের সুযোগ করে দেন।

সংগীত-প্রেমিক ওয়াজেদ আলি ক্রমে সংগীতের একটি বড় দরবার প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর মেটিয়াবুরুজের বাড়ীতে। তানসেন বংশীয় বাসৎ খাঁ দু'বছর তাঁর দরবারের অধিনায়ক হিসাবে থেকে কলকাতায় মার্গ সংগীতের আদর্শ প্রচারে সাহায্য করেন। বাসৎ খাঁ শুদ্ধবাণীর ধ্রুপদ গাইতেন ও রবাব বাজাতেন। ঠাকুর রাজ-দরবার ও অন্যান্য কাছাকাছি দরবারের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর বংশধর ও শিষ্যদের কাছ থেকে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উচ্চাঙ্গ সংগীতের বহু দুর্মূল্য রত্ন সংগ্রহ ক'রেছেন। বাসৎ খাঁর পরে তাজ খাঁ, মোরাদ আলি খাঁ ও আলি বক্স এই তিনজন ধ্রুপদী তাঁদের উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনে কলকাতাবাসীদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়ে গেছেন। ওয়াজেদ আলি শা'র মৃত্যুর পর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটি উৎকৃষ্ট সংগীত দরবার তাঁর রাজভবনে গ'ড়ে তোলেন। এই দরবারে মেটিয়াবুরুজের দরবারের নানান গুণী স্থায়ীভাবে আশ্রয় পান। আর তাঁরাই কলকাতায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্রোত অব্যাহত রাখেন। এ'দের মধ্যে মোরাদ আলি খাঁ, আলি বক্স ও দৌলত খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'খেয়ালী'দের মধ্যে তসদ্দুক হোসেন খাঁ, কালে খাঁ, বাদল খাঁ প্রভৃতি গুণীগণ যদিও সুবিখ্যাত ছিলেন, তবু প্রতি দরবারেই তখন 'ধ্রুপদী'গণই সম্মান পেতেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কাছে বেতিয়ার ধ্রুপদী শিবনারায়ণজী ও তাঁর খেয়ালগায়ক ভ্রাতা গুরুপ্রসাদজী প্রায়ই সমাগত হ'তেন। এ'রা অকাতরে সংগীত শিক্ষাও দিতেন। এইভাবে বিভিন্ন ঘরানার গুণীগণের সমারোহে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কলকাতা মহানগরী ভারতের মার্গ সংগীতের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল। এবং ধ্রুপদই ছিল তখন মার্গ সংগীতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অবশ্য ধ্রুপদের সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালেরও সমাদর খুব কম ছিল না। অন্যদিকে লঘু রাগসংগীত হিসাবে 'টপ্পার'ও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট ছিল। তাই আমরা দেখতে পাই যে, যদু ভট্ট থেকে আরম্ভ ক'রে দৌলত খাঁ পর্যন্ত সংগীতের রত্নস্থানীয় গুণীগণ মার্গ সংগীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হিসাবে ধ্রুপদ গানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদাঙ্গ খেয়াল গাইতেন, আবার জনমনোরঞ্জনের জন্য লঘু রাগ-সংগীত হিসাবে টপ্পা-গানেরও ব্যবহার ক'রতেন। রবীন্দ্রনাথের গানেও আমরা এই একই ধারার অনুসরণ লক্ষ্য ক'রে থাকি। তাঁর সাংগীতিক অবদানের প্রথম পর্বে তাঁর রচিত ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত ও কিছু খেয়াল ও টপ্পার তানযুক্ত বাংলা গান ঐ সময়ে বিদগ্ধ-সমাজে ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া এনে দেয়। ওদিকে নাট্য-সম্রাট গিরীশচন্দ্র ঘোষও তাঁর রচিত নাটকে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাগ-সংগীতের মর্যাদা দিয়ে চলেছেন। আমার পিতৃদেব ছিলেন একদিক দিয়ে গিরীশচন্দ্রেরই শিষ্য। ফলে নাট্যসংগীতেই তিনি প্রথম আকৃষ্ট হন এবং নাট্যাভিনয় উপলক্ষ্যেই সংগীত সমাজে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বৎসর। একদিকে তিনি মুরারীমোহনের কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা ক'রতেন, অন্যদিকে অভিনয়ের আনুষঙ্গিক ভাবে কনসার্টে ঢোলকও বাজাতেন। এই সময় মৃদঙ্গের সঙ্গত চালাতে পারবেন বলে তিনি বেতিয়ার 'ধ্রুপদী' অযোধ্যাপ্রসাদকে কয়েক বৎসর নিজের বাড়ীতে নিযুক্ত ক'রে রেখেছিলেন। পিতার ত্রিশ বৎসর বয়সে আমার জন্ম হয়, তার আগেই অযোধ্যাপ্রসাদ দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমি বাল্যকালে গল্প শুনেছি যে অযোধ্যাপ্রসাদ যখন বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে প্রথম গৌরীপুরে আসেন, তখন প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে তিনি স্বরসাধনা ক'রতেন। তাঁর মন্দ্র-সপ্তকের আওয়াজ শুনে প্রথম প্রথম তাঁর ঘরের কাছাকাছি গ্রামবাসীরা সেটাকে বাঘের গর্জন মনে ক'রে ভয় পেত। পরে যখন তারা জানতে পারল যে ওটা বাঘের গর্জন নয়, অযোধ্যাপ্রসাদেরই গলা সাধার আওয়াজ, তখন তারা আশ্বস্ত হ'লো। সে রকম গলা আজকাল লাখে মেলে এক।

পোশাক

শিশির আচার্য

জনাকীর্ণ ব্যস্তসমস্ত ফুটপাথের ওপর দুজনে একই সময়ে দাঁড়িয়েও উভয়ের মনে হল ঃ এতবড় একটা ঘটনায় কেউ চমকাল না, হঠাৎ তীক্ষ্ণতায় খরতর হয়ে উঠল না ইন্দ্রিয়গ্রাম। কয়েক মিনিট নীরবে থেকে তারা তাদের দুপাশের জনস্রোতকে পিছলে যেতে দেখল, যেন শব্দ শুনল, মানুষের, ট্রাম-বাসের। এমনভাবে কোনোদিন দেখা হবে, হতে পারে, এ সম্বন্ধে তারা কোনোদিন ভাবেনি। কিংবা ভেবেছে দেখা হলে দুজনেই না-চেনার ভান করে সরে যাবে। কারণ পুরনো স্মৃতি পুরনো ক্ষত হিসেবে দেখাই ভালো, তাকে উসকে তুললে এই নতুন পরিবেশে ঘা হয়ে দগদগে হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু দুজনের কেউই পালাতে পারল না। এক-একসময় এমন ধরনের বিমূঢ়তা মানুষকে পঙ্গু করে তোলে। বিশ্রী অস্বোয়াস্তি। অথচ কাজের তাড়া দেখিয়ে শ্রমের পবিত্র তাগিদ দেখিয়ে দুজনে দুদিকে স্প্লিন্টারের মতো ছিটকে পড়লে কিছু দোষাবহ হত না।

তারপর তারা অপ্রস্তুত দ্বিধার ভাবটুকু যেন শাড়ির মতো গুছিয়ে নিল, পাকা অভিনেতা হয়ে উঠল। রুমালে গলার ঘাম মুছছিল অনুপম, সেই অবসরে কণিকা জিগ্যেস করল ঃ 'অনেকদিন পর!'

'অ-নে-ক দিন পর!' কণিকার বলা কথাটাকে মনে মনে ইলাসটিকের মতো বড় করে দেখল অনুপম, হালকা পশমের বলের মতো খেলল শব্দগুলি নিয়ে, কিছু বলল না।

'...এভাবে দেখা হবে কেউ ভাবিনি —' বলল কণিকা।

অনুপম এখন অনুভব করতে পারছে কণিকা চোখ দিয়ে তার আপাদ-মস্তক দেখছে, তার কোট-প্যান্ট, নেকটাই, হাতের ফোলিও ব্যাগ পর্যন্ত। অনুপম অসুস্থ বোধ করছিল। বোধ [illegible]। এইজন্য যে কণিকা একদিন [illegible] পোশাক নয়, গোটা আত্মাকেই দেখেছে। সেই আত্মীয়তার ভাব তার কণ্ঠস্বরে ফুটে না উঠলেই বরং খুশি হবে অনুপম।

'চলো না। কাজ আছে কিছু? অই পুকুরপাড়ে একটু বসি।' কণিকা প্রস্তাব করল। কাজ নেই? মনে মনে বলল অনুপম ঃ তবে কি শুধুশুধুই এই ধড়াচূড়া, এই ফোলিও ব্যাগ। আজও কি ও তাকে বেকার কর্মনাশা ভাববে। বলল, 'চলো।' হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে সময় মূল্যবান এই জ্ঞান সমঝে দিতেও ভুলল না সে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে অনুপমের আগেই কণিকা রাস্তা পেরোল। রাস্তা পেরোতে আজ আর কোনো ভীরুতা নেই ওর। ওর পার-হয়ে-যাওয়া গতিকে লক্ষ্য করল অনুপম। দীর্ঘ শরীর, সরু গলা, ঈষৎ কুঁজো পিঠ। ওই শরীরটাকে কোনোদিন কি চিনত অনুপম! কিছু উত্তাপ, স্পন্দন, কোমলতা—তার কোনো রেশ আজো কি চেতনায় আনতে পারে? না। অনুপম যেন চেঁচিয়ে বলল, না।

তৃণশয্যা দেখিয়ে কণিকা বলল, 'বোসো!'

অনুপম আজো বসল, তবে পকেট থেকে সদ্যভাঙা রুমাল বার করে।

পুকুরের জলে ক্ষীণ সূর্যরশ্মি কাঁপছে তিরতির করে। ঝাঁকড়া মাথা গাছটা ঝিরঝির করে কাঁপছে।

কণিকার চোখ সম্মুখ পানে প্রসারিত। ওর পিঠে রোদ। চুলে ছেঁড়া-ছেঁড়া রোদের ঝালর। হাঁটুর ভাঁজে হাতদুটো জড়-করা।

'কী আশ্চর্য, না?' কণিকা বলল।

'কী?' আলতো হাতে ঢিলটা জলে ছুঁড়ে মারল অনুপম, একটা শব্দ, বৃত্তাকার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল জলময়, অনুপম তাকিয়ে থাকল সেইদিকে।

'এই জীবনটা...' আস্তে গলায় বলল কণিকা।

অনুপম ওর মুখের দিকে চোখ রাখল। জীবনটা!... জীবন কি, কতটুকু জীবন দেখেছে কণিকা সেদিনের সেই ফার্স্ট ইয়ারে-পড়া রুগ্ন ভীরু দুর্বল মেয়েটা। বলতে পারে কাকে বলে জীবন। বেঁচে-থাকা, টিঁকে-থাকা। এই জীবন। অস্তিত্বই জীবন। জামা-কাপড় পরা, চলতে-ফিরতে পারা, কথা বলতে, হাসতে, গান গাইতে। এই জীবনে

আশ্চর্য কি! তুমি চেতন হও অচেতন হও জীবনের তুমি শরিক।'

বলল : 'জীবনে আশ্চর্য কি আছে?'

'নেই?'

'না। জলহাওয়ার মতোই স্বাভাবিক ...সাদা, পানসে—'

কণিকা বলল, 'হবে। তবু আশ্চর্য লাগে। কেমন মায়া লাগে।'

অনুপম বলল, 'মায়া!'

'হ্যাঁ। শিশুকে বুকে চেপে ধরলে যেমন লাগে—'

ওর ঘরোয়া উপমায় চমৎকৃত হল, হতে হল অনুপমকে। কিন্তু জীবন কি শিশু, শৈশবে ফিরে গিয়েই তাহলে জীবন পাওয়া যায় বলো। এমন চিন্তাটা বলতে পারল না কণিকাকে। তার নিজেরই মনে হল বড় বাজে ভেবেছে, কথার মানে হয় না কোনো।

'তাহলে তুমি বলতে চাও উত্তাপই জীবন...' বলল অনুপম, কথা না বলে ভালো দেখায় না বলে।

'না। মায়াটুকু।' বলল কণিকা।

অনুপম বুদ্ধিমানের গলায় হাসল। 'মায়া কি কখনো জীবন হতে পারে! জীবন জ্বলজ্যান্ত বাস্তব...'

কণিকা সে-কথার ধার দিয়ে না-গিয়ে বলল, 'এই যে তাড়াহুড়োর মাঝ থেকে খানিকটা অবকাশ ছিনিয়ে নিয়ে এই ঘাসের ওপর এসে বসেছি, মনে হল জীবনটা কি আশ্চর্য। তোমার ভালো লাগছে না?'

অনুপম বলল, 'ভালো লাগার কোনো পরিধি আছে নাকি? ভালো লাগাতে চাইলে সবখানেই তুমি ভালো লাগাতে পারো। রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপ মুখে নিয়ে বসে থাকতেও এমন কিছু খারাপ লাগত না।'

'তাই বুঝি?' কণিকা অন্যমনস্কের মতো বলল। বোধহয় ও স্মৃতি-অবগাহন করছিল। আসলে সব ভালো-লাগার পেছনে অতীত দিনের রোমন্থন লুকিয়ে রয়েছে। একটা অনুভব। এমনি একটি পুকুরের নিস্তরঙ্গ সৌন্দর্য, ঘাসের গালিচা, আর অস্তিত্বকে ঘন করে বুঝতে পারবার মতো প্রশান্তি।

অনুপম উপস্থিত এ ধরনের চিন্তায় বিশ্বাসী নয়। তার মনে হয় দেখা হওয়ার পর এখানে এই পুকুরের ধারে বসবার প্রস্তাব করবার সঙ্গে সঙ্গেই কণিকার মন অতীতাশ্রয়ী হয়েছে। পুরনো দিনের ভালো-লাগা নিয়েই সে এখানে এসেছে। জীবনটা তাকে তাই মায়ার পাকে জড়িয়ে ধরেছে। অনুপম নিজেকে এত বোকা ভাবতে পারে না। অতএব অনুপম একটি সিগারেট ধরাল।

'থাকগে। ওসব কথা।' কণিকা হাসির ঢেউ ফোটাল ঠোঁটে, ফুটল কিনা তাও লক্ষ্য করল না। এক-এক সময় মানুষ চিন্তার ত্বরিতগতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাসির সম্পূর্ণ মুদ্রা ফোটাবারও সময় পায় না। একটু থেমে কণিকা শেষ করল কথাটা : 'বলো তোমার গল্প বলো—'

গল্প! অনুপম শব্দটাতে চমকাল। যেন তার আঁকা শক্তিশালী চিত্র দেখে কেউ মন্তব্য করেছে : ঘোড়ার মুখটা ভালো হয়েছে। গল্প! অনুপমের জীবনটা গল্প! তুমি কি জানো না গল্প বুনবার বিলাসিতা অনুপম রায়ের নেই। তার কাছে জীবনসংগ্রাম—বলিষ্ঠ, দৃপ্ত। সে একজন সংগ্রামী মানুষ! এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন শহরটা যত থাবা মেরেছে ততই বুক মেলে দাঁড়িয়েছে অনুপম। ভয় পায়নি, বুকের জোর বেড়েছে। যেন ফুসফুসের জোরটা পরীক্ষা করবার জন্যে জোরে জোরে শ্বাস টানল সে। কণিকা ভুলে যাক, চাঁদিনতাপাতার জাফরিকাটা দিনগুলির ভাবালুতাকে নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরেছে অনুপম। কণিকা জানুক যে-মন নিয়ে সে আজ ঘাসের বুকে এসে বসেছে, অনুপম সে-মন নিয়ে বসেনি। নেহাত ওর অনুরোধই তাকে এখানে হাত ধরে টেনে এনেছে।

'কই, কথা বলছ না কেন?' কণিকা এবার হরিণের মতো ওর দীর্ঘ সরু গলা ফেরাল তার দিকে, ওর চোখ দুটো চকচক করছিল।

একটু নড়ে বসল অনুপম। সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। তারপর কেশে বলল, 'কী বলব বলো? গল্প বলবার দিন কী-আর আছে...'

কণিকা এবার অকৃত্রিম হাসল। এবং অনুপমের চেষ্টা-করা গাম্ভীর্য যেন টোল খাবে, এমন মনে হল। কণিকা বলল, 'যা তোমায় মানায় না তা করতে যেও না।'

'মানে?' ওর খাপছাড়া উদ্ধত মন্তব্যে অনুপমের বিস্ময়ের চোট।

'মানে, তুমি একাই জীবন দ্যাখোনি, আমরাও কিছু দেখেছি বৈকি। যত গম্ভীর হতে চেষ্টা করো মনে মনে তুমি যে খুশি হওনি একথা হলপ করে বলতে পারো?'

'খুশি অখুশির প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে?' ক্ষুণ্ণ গলায় আবার একটি সিগারেট ধরাবে কিনা ভাবল অনুপম।

কণিকা হাসল না, বলল, 'রাগ কোরো না। পরীক্ষা করছিলাম। তুমি আজো কত সহজে রেগে উঠতে পারো।'

অনুপম বলল, 'অ।'

'এই শহরটা...' কণিকা ফের বলল, 'যেন সহজ হতে স্বাভাবিক হতে ভুলে

গেছে। আদালতের হাকিমের মতো কেমন একটা অদ্ভুত মুখ করে থাকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওর ওই মুখোশ-টিকে ধারালো নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলি। তুমি আমি সবাই কেমন বদলে গেছি, কেমন...' দম নিল কণিকা।

অনুপম আশ্চর্যের মতো ওর দিকে চেয়ে রইল। যেন এতক্ষণ ধরে যেটাকে সে অহংকার বলে তুলে ধরতে চেয়েছিল তার দীনদশাকে নগ্ন করে দিল কণিকা। মনে মনে একটু বাহাদুরি দেখাবার লোভ ছিল নাকি তার। একটু ঈর্ষার শিখায় জ্বালিয়ে তুলতে কণিকার মনকে।

কণিকা বলল, 'ভেবো না পুরনো দিনের আবেগকে স্মরণ করে তোমাকে এই নির্জন পুকুরের ধারে নিয়ে এসেছি। হয়তো কোনো কিছু না ভেবেই কেবল-মাত্র চেনা লোককে নিয়ে দুদণ্ড বসবার লোভ। এম্নিই।' একটু থেমে : 'জানো অনুপম, এমন ক্লান্ত লাগে একেকদিন...' কণিকা হাই তুলল।

ওর হাই-তোলা ভাবটুকু ভালো লাগল না অনুপমের, ভালো লাগল না নিজেকে ওর ক্লান্তির সঙ্গী ভাবতে। কোথায় যেন একটা অপমানের কাঁটা খচখচ করে। অপমান! যেন ওর পৌরুষকে খর্ব করে দিচ্ছে কণিকা, একটি মেয়েকে ক্ষণিক সঙ্গসুধা দিয়ে উজ্জীবিত করবার শৌর্য নেই তার।

'বললে না তো কী করছ এখন?' কণিকা সহজ গলায় জানতে চাইল।

'চাকরি করছি—' ওষুধ খাওয়া গলায় বলল অনুপম : 'একটা মেডিকাল ফার্মে।'

'ভালোই আছ তাহলে?'

'চলে যাচ্ছে।'

কণিকা কি ভাবল এর পর। আলতো হাতে ঘাসের গায়ে বুলোল। তারপর বলল, 'সত্যি আশ্চর্য—'

'আশ্চর্য!' এবার বিস্ময়ের আওয়াজটুকু প্রকাশ না করে পারল না অনুপম।

'আশ্চর্য নয়?' হাসল কণিকা : 'তুমি চাকরি করছ। মস্ত মানুষ হয়েছ।'

অনুপম বলল, 'এতে আশ্চর্যের কি আছে?'

'না, নেই? আমাদের পাড়ার ছেলে অনুপম রায়, প্রায় আত্মীয় বলা যেতে পারে।' কণিকা বলল, "মহিলামহলে যার খ্যাতি ছিল অক্ষয়, পাড়ার নতুন জামাইকে গান শোনাবার জন্যে যার ডাক পড়ত অন্দরমহলে, দুপুরের ঘুমকাড়া কুমারী মেয়েদের তাসের আড্ডায় যে ছিল নিত্যসঙ্গী, সেই অনুপম রায় আজ কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। গর্ব হয় না?'

'কণিকা!'

'সেদিনের একটি বেণীদোলানো রোগাভোগা সংসারের নেহাত বাড়তি একটি ভীরু মেয়েকে মনে পড়ে তোমার অনুপম? মনে পড়ে কী সহজে সেই অরক্ষিত দুর্গকে একদিন জয় করেছিলে? মনে পড়ে সেই মেয়ে শিবরাত্রিতে সেই পুরুষটিকে পতি বলে কল্পনা করেছে?'

'কণিকা!'

'ভয় পেও না। এই কয়েক বছরে এই শহর আমাকে অনেক চালাক করেছে। কিন্তু একটি ধাঁধা আমি কিছুতে মিলোতে পারিনে: যদি তাকে গ্রহণ করবে না বলে ঠিক করেছিলে, তবে উড়ো চিঠি দিয়ে তার বিয়ের সম্বন্ধটা কেন ভেঙে দিয়েছিলে তুমি! মেয়েটি কি অপরাধ করেছিল, কী অপরাধ করেছিল ওর গরীব বাপ-মা?"

অনুপম পুকুরের শেলেট-জলের দিকে চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ পাথর হয়ে রইল। তারপর বলল, 'সব মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে?' কণিকার চোখের তারা দীর্ঘ হল। 'তুমি বলছ মিথ্যে?'

'হ্যাঁ মিথ্যে।' অনুপমের চোখ জ্বলছিল। 'সব তোমার বানানো। আজকের যে বিশ্বাস নিয়ে তুমি কথা বলছ সেদিন এত জোর তোমার ছিল না। প্রণয়ীর ঊর্ধ্বে আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে তোমার সাহস ছিল না। সেদিন বলেছিলাম বাড়ি ছেড়ে আমার সঙ্গে পথে বেরিয়ে আসতে। তুমি কথা দিয়েছিলে আসবে। এসেওছিলে। বলতে : তোমার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারব না। কী, বলোনি?'

কণিকা ঘাড় নাড়ল। 'বলেছিলাম। কিন্তু তার কারণ অন্য—'

অনুপম বলল, 'জানি। থার্ড-ইয়ার-পড়া অর্বাচীন ছাত্রের সঙ্গে বেরিয়ে-পড়া তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই, তাই তুমি একজন অভিজ্ঞকে খুঁজেছিলে যে তোমার স্বামী হতে পারবে!"

মাঠের বুকে ছায়া-ছায়া সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আকাশ ঘোলাটে। পুকুরের জল কালো হয়ে উঠেছে। অনুপম এই ঘোলাটে অন্ধকারেও পাশের মেয়েটির মুখ দেখতে পায়, দেখতে পায় কাজল দুটি চোখের তারা। অনুপমের মনে হয়েছিল সমস্ত পরিবেশটুকু উত্তেজনায় ফেটে পড়বে। কিন্তু, না, কণিকা স্থির, স্তব্ধ। এমনকি, আশ্চর্য হল অনুপম, সে নিজেও কিছুমাত্র উত্তেজিত হয়নি। ভেবেছিল জোরে হাওয়া দিয়ে বেলুন-টাকে ভীষণ ফুলিয়ে তুলবে, কিন্তু তার আগেই কখন সমস্ত হাওয়া বেরিয়ে গেছে। ফাঁসা বেলুনের দিকে বেকুব কিশোরের মতো চোখে চেয়ে রইল।

অনুপম। অনুপম জানে ওই কথাগুলি নতুন করে বলা শুধু সেদিনকার অক্ষমতাকে ঢাকবার চেষ্টা করা। সত্যিই সেদিন কণিকাকে সঙ্গী করে পথে বেরুতে পারত না। যদি সত্যিই কণিকা তৈরি হয়ে আসত অনুপম কী বলত তাকে। কী করত আজো ভাবতে পারে না। কণিকা তাকে দুস্তর লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। নাকি সে অনুপমের কথার-অতীত মনের ভাব বুঝেছিল। বুঝেছিল তার নকল বীরপুরুষ চেহারাটা।

কিন্তু...কণিকা অমন চুপ করে আছে কেন। দুই হাতের ভারে দেহভার ন্যস্ত করে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে সে। সন্ধ্যার এলোমেলো হাওয়ায় ওর চুলগুলি উড়ছিল। কণিকার ঠোঁট দুটো বোজা। হঠাৎ পাশ ফিরে কণিকা বলল, 'বিয়ে করেছ?'

অনুপম যেন হাতে মারাত্মক অস্ত্র পেয়ে গেল। প্রতিশোধের তীর দেবে বিষাক্ত গলায় জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'জানতাম।' বলল কণিকা।

আর, অকস্মাৎ মনে হল অনুপমের: কথাটা অত জোর করে উচ্চারণ না করলেই হত। কে জানে, জোর করে বলেছে বলেই হয়তো তার সত্যতা সম্পর্কে অবিশ্বাস করে বসতে পারে কণিকা। কিন্তু যা ভেবেছিল, কণিকা তো যা খেল না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল না, এমনকি চমকালোও না। যদি এখন বৈষ্ণবকবিদের লক্ষণ মিলিয়ে স্ত্রীর আপাদমস্তক বর্ণনা দেয়, তাহলেও কি অসূয়াপরায়ণ হয়ে উঠবে না মেয়েটা? অন্তত কোনো সুশ্রী মেয়ের কাছে অন্য মেয়ের রূপবর্ণনা ভালো লাগে না বলেই শুনেছে। এই সন্ধ্যাটা এখন এই মুহূর্তে বিবর্ণ বিস্বাদ ঠেকে অনুপমের অনুভূতিতে। যেন এক রসালো উপন্যাস থেকে খসে-পড়া অর্থহীন বাজে একটি পৃষ্ঠা। সাথিত্ব এমন একটি বস্তু যা পরস্পরকে প্রভাবিত করে, দুটি চৈতন্যের মোটামুটি সংহতি আনে। আজকের সন্ধ্যায় দুজনে দুজনের সঙ্গী, কিন্ত কোনো সংহতি-মন গড়ে ওঠেনি। যেন বিশৃংখল ঐক্যহীন জনতা।

কণিকা বলল, 'সুখী হয়েছ?'

অনুপম উত্তরের জন্যে হাতড়াতে লাগল, তারপর বলল, 'সুখের বেশি লোভ করিনি, তাই অল্পেই সুখী হয়েছি।'

কণিকার দাঁতগুলি অন্ধকারে ঝিকিয়ে উঠল: 'চিনিজানি লোকদের সুখের চেহারা দেখলে ভারি ভালো লাগে।'

অনুপম চুপ করে রইল।

আকাশে একটি-দুটি করে তারা ফুটে উঠেছে। মেঘগুলি ইতস্তত ছুটোছুটি করছে। চিনেবাদামঅলা পেছন দিয়ে হাঁক দিয়ে গেল।

'যাব একদিন তোমার সংসার দেখতে। কোন্‌দিকে থাকো?'

'যেয়ো।' অনুপম বলল। ঠিকানাও জানাল।

কণিকা বলল, 'ভয় পেলে না?'

'কেন?'

'যদি তাকে সব কথা বলে দিই—?'

অনুপম হাসল, অনেকক্ষণ পর হাসতে পারল সে। বলল: 'একটি পুরুষমানুষের জীবনে বিয়ের আগে কিছু মেয়ে আসবে না একথা কোনোদিন না-বললেও আমার স্ত্রী বিশ্বাস করবে না।'

কণিকা বলল, 'তুমি মেয়ে-মনকে চেনো না তাহলে?'

অনুপম বলল, 'হয়তো চিনি না। তবে এইটুকু ভাবতে পারি যে, তুমি চলে যাবার পর রাত্রে আমার বুকের কাছে ঘেঁষে এসে আমার স্ত্রী বলবে: মেয়েটি কি হ্যাংলা বলো তো?'

কণিকা হাসল। হাসির তরঙ্গে ওর ঊর্ধ্বাঙ্গকে দুলতে দেখল অনুপম। হাসতে-হাসতেই কণিকা বলল, 'তুমি এমনভাবে কথাগুলো বলো যেন সত্যি।'

'সত্যি নয়?'

'সত্যের মতো। প্রায়-সত্যি।' কণিকা বলল।

অনুপম গম্ভীর হল। সেদিনকার ঘনিষ্ঠ মেয়েটি আজ যেন তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। নিরীহ ভীরুতার মোড়ক ভেঙে হয় অতি-বেশি প্রগল্‌ভ অথবা অভিনয় করছে। যেন আজ নিজের হাতে সে সাপুড়ের বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। কী বলতে চায় কণিকা, কী করতে? পুরনো দিনের আবেগের সম্মান না-হয় না-ই করল, কিন্তু বর্তমানকে কি দিয়ে সে ভরতে চায়! সন্ধ্যে বহুক্ষণ উতরে গেছে। কণিকার ওঠবার নাম নেই।

কণিকা বলল, 'আচ্ছা আপিস থেকে বাড়ি ফেরো? দেরি হয়ে যাচ্ছে না?'

অনুপম বলল, 'হচ্ছে বৈকি।'

'বউ ভাববে?'

'ভাবাই স্বাভাবিক।'

'কি বলবে বাড়িতে গিয়ে, কেন দেরি হল?'

'দেরি করার কৈফিয়ত আমার স্ত্রী চাইবে না।'

কণিকা বলল, 'আদর্শ পত্নী তো।' একটু থেমে: 'কেন? সত্যি কথাটা বললে কি হয়?'

অনুপম বলল, 'বলবার ফুরসতই দেবে না ও। তার আগেই তাড়া দিয়ে চানের ঘরে পাঠাবে, খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে চা করতে ছুটবে।'

'এ—তো!' কণিকা ভ্রূভঙ্গ করল, অন্ধকারেও তার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করল অনুপম। 'ছেলেপিলে হয়নি বুঝি?'

অনুপম হাসল এবার। 'হবে না কেন? দুটি ছেলে এক মেয়ে......'

কণিকা বলল, 'ঘোরতর সংসারী দেখছি।'

অনুপম গম্ভীর গলায় বলল, 'কেন? সংসারী হবার অধিকার নেই নাকি আমার?'

'বা, কেন থাকবে না? নইলে তুমি পুরুষমানুষ প্রমাণ হবে কি করে? আবার কণিকা চুপ করল, আবার দুর্বোধ্য হল ওর অস্তিত্ব, অন্ধকারে অন্ধকার হল আক্রোশে। এবং কেমন জানি একটা গুমোট আক্রোশে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল অনুপমের এই মূক অন্ধকারকে। অনুপমের হঠাৎ মনে হল কণিকা যেন এই অন্ধকার শহরটার মতো হয়ে উঠেছে, যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অথচ যাকে দূরেও রাখা যায় না। এই দীর্ঘ কয়েক বছরেও নাগরিক মনকে বুঝতে পারেনি অনুপম। মফস্বল জীবনের আধা-শহুরে আধা-গ্রামীণ চেতনায় গোঁজামিল হয়ে উঠেছে সব কিছু। পারবে তুমি কলকাতা ছাড়তে? অনুপম নিজেকেই প্রশ্ন করে। পারবে না। পুরনো

গণিকার মতো কলকাতার আকর্ষণ কাটানো দুঃসাধ্য। অনুপম স্বীকার করল।

'কিন্তু তুমি কি করছ বললে না তো?' নিজের টালমাটাল নৌকোটাকে সামলে নতুন কোনো ঢেউ আসবার আগেই অনুপম প্রশ্ন করল।

কণিকা বলল, 'মেয়েমানুষ কিছু করে না, হয়।'

'কি হয়েছ তুমি?'

'মাস্টারনি।' কণিকা বলল।

অনুপম বলল, 'রোজগার করছ তাহলে?'

'হ্যাঁ। তবে তোমার মতো মস্ত রোজগার নয়।' কণিকা হাসল।

'বিয়ে করোনি?'

'না। এখনো হয়নি।' কণিকা বলল।

একটু স্তব্ধ থেকে অনুপম জিগ্যেস করল : 'বিয়ে করোনি কেন?'

কণিকা বলল, 'হল না। মন্দ কি? এই তোমরা বিয়ে-করা লোকরা দাম্পত্য জীবনে যখন মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠবে তখন আমরা রইলাম ফাউয়ের মতো।'

অনুপম এবার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলল : 'কী বলতে চাও তুমি? তুমি কি মনে করো আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া?'

'তোমার গলায় যেন অপ্রসন্নের সুর—'কণিকা বলল : 'রাগ করলে অবশ্য কথা বলা যায় না। কি বলছিলে আমার বিয়ের কথা? তা আছে নাকি তেমন ভালো পাত্র? সম্বন্ধ করবে? আমার পছন্দ তো জানো? এই ঠিক তোমার মতো বর চাই। দেবে?'

অনুপমের হৃদয়ের মধ্যে কি যেন ছটফট করছিল। বোধ হয় মফস্বলী লোভটা। কিন্তু, না। এতদূরে এসে এখন আর নতুন করে শুরু করা যায় না। অনুপম এই শহরের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে না। ওর গায়ে কোটপ্যান্ট, গলায় নেকটাই, হাতে ফোলিও ব্যাগ। এদেরকে দাম দিয়ে পোষণ করতে হয়েছে, ওরা তাদের মিটমিটি চোখে তাকে কৃপাকটাক্ষ করবে, এ সইতে পারবে না অনুপম। অনুপম রায়—মেডিক্যাল ফার্মের প্রতিনিধি।

একটু থেমে অনুপম বলল, 'চেষ্টা করব।'

কণিকা বলল, 'কোরো।'

সন্ধ্যা-রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের দিকে চেয়ে অনুপম বলল, 'এবার কিন্তু উঠতে হয়।'

কণিকা বলল, 'না। আর একটু বসি।'

অনুপম হাসল। 'পুলিশ এসে পড়লে কিন্তু তাড়া দেবে।'

'কেন?'

'সন্দেহ করবে।'

'কি সন্দেহ করবে? আমরা দুজনে লাভার, এইতো? করুক না। মিথ্যে হলেও রোমাঞ্চ আছে তো?' কণিকা হাসল : 'সত্যি-সত্যি তো আমরা তা নই।'

অনুপম চুপ করে রইল। কোনো কথা বলতে পারল না।

কণিকা হঠাৎ কেমন ভুতুড়ে গলায় বলে উঠল : 'আজ রাত্রে তোমার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসবে, না?'

'কণিকা!' অকস্মাৎ দারুণ গ্রীষ্মে যেন সারা দেহে আগুন ধরে যাবার মতো হল অনুপমের। মনে হল এই নেকটাই কোট-প্যান্ট খুলে হালকা হয়, মাঠের দামাল হাওয়া খোলা শরীরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক। হৃদয়ের সেই ছটফটানিটা লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো উদ্দাম হোক। কিন্তু কিছুই পারল না অনুপম। শহরবাসের ইতিহাস তার পোশাকে গভীরভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে, সে-ইতিহাস মোছা এত সহজ নয়! আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে—অনুপম নিজের মনে বলল। কিন্তু, সে কাঁদতেও ভুলে গেছে, আরো অনেক কিছুর মতোই কান্না তার আসে না। মনে হল কণিকাকে প্রস্তুত হবার অবকাশ না দিয়ে এক ছুটে পালিয়ে যায় এখান থেকে। কিন্তু, তাও পারল না অনুপম। আমি কাঁদতে পারব না, পালাতে পারব না, জামাকাপড়ের বোঝাও নামাতে পারব না গা থেকে। তবে আমি কী পারব? বসে থাকতে, নিঝুম, পাষাণ হয়ে।

কণিকা বলল, 'তোমার শরীর কী ভালো নেই?'

'না। কে বললে?' অনুপম বলল। আমি হারব না, হারতে পারিনে। আমি ঘোরতর সংসারী, আমার স্ত্রী, আমার ছেলেমেয়ে, আমি তাদের ভালোবাসি। কণিকা জানুক তাদের জন্যে সে প্রাণ দিতে পারে, তার রোজগারের টাকা শুধুমাত্র তাদেরকে

স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্যে। কিন্তু কথাগুলি বলেও যেন জোর পায় না সে, শুধু ফুলিয়ে রাখবার জন্যেই বারবার ফাঁসা বেলুনে ফুঁ দিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। ভাগ্যিস অন্ধকারে তার ফোলা ভাঙাচোরা মুখ-চোখে রক্ত ঠেলে-ওঠা শ্বাসরোগীর মতো চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না কণিকা। আরো কয়েকটি মিনিট, তারপর কণিকা বিদায় নেবে। তার বিজয়-আনন্দে বুকভতি নিশ্বাস নেবে অনুপম।

'একটা গল্প শুনবে?' কণিকা বলল।

আবার গল্প! অনুপম চমকালো।

'একজন পুরুষমানুষের গল্প। যাকে বলে আধুনিক ধোপদুরস্ত।' কণিকা একটু নড়ে বসল। 'এই শহরতলিতে বাড়ি। বাড়িতে কুয়ো আছে। তা একদিন বেচারী তৃষ্ণায় ছাতিফাটা হয়ে সবে বালতি জলে নামিয়েছে, এমন সময় বলা-নেই কওয়া-নেই তারই এক কলিগ ঢুকে পড়েছে উঠোনে, কুয়োতলার ধারে। আধুনিক বাবুটি সতীর্থকে জানতে দেবার আগেই দড়িসুদ্ধ বালতিটা ফেলে দিলেন কুয়োতে। সতীর্থ জিগ্যেস করল : কী করছেন? বাবুটি উত্তর দিল অম্লান বদনে : এই কুয়োর জল দেখছিলাম।' কণিকা গল্প শেষ করল।

অনুপম ভীষণ নাভাস হয়ে বলল, 'এ-গল্পের মানে?'

কণিকা হাসল। 'গল্পের আবার মানে কি। গল্প গল্পই।'

'কিন্তু এ-গল্প আমাকে শোনানোর মানে কি? আমি...........আমি—' তোতলাতে লাগল অনুপম।

'তোমাকে যেন গল্পটা খুব ভাবিয়ে তুলল?' কণিকার গলা ধারালো শোনাল। 'এমনভাবে ভাবিত হবে জানলে তোমাকে বলতাম না। গল্পটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিনা? বাইরের ঠাট বজায় রাখতে কত ঘটিবালতিই যে মানুষকে ফেলে দিতে হয়।'

বাইরের ঠাট! কথাটায় আবার চমকাল অনুপম। কণিকা কি তাকে কিছু ইঙ্গিত করছে। কণিকা কি ভেবেছে তার এই সাহেবী পোশাক, ফোলিও ব্যাগ সবকিছুই অন্তঃসারশূন্য! ভিতর থেকে খুলে কোম্পানীর প্যাড্ দেখাতে পারে অনুপম। দেখাতে পারে যদি খুব জেদ করে এখনই। যদি তার সংসারী রূপটা দেখতে চায় কণিকা, সে আসতে পারে। তা না করে শুধু-শুধু একজন কৃতবিদ্য মানুষকে সন্দেহ করা! কণিকা এ তোমার অন্যায়—মনে মনে বলল অনুপম। সাত বছর আগের ঘনিষ্ঠতার আলোকে একটি মানুষকে বিচার করতে যাওয়া উচিত নয়। একে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে না। সাত বছরে পরে মানুষটিকে বদলাতে হয়েছে, কারণ কিছুই স্থির নয়। বিবর্তনবাদ যদি তুমি মানো তাহলে তুমি আমার বিশ্বাসকে মানতে বাধ্য। কিন্তু, কী আশ্চর্য, এত সব সারগর্ভ উপদেশ কিছুই সে শোনাতে সাহস পেল না কণিকাকে।

কণিকাই এবার প্রস্তাব করল : 'চলো। এবার ওঠা যাক।'

'একটু বোসো।' কোনো কিছু না ভেবেই ওকে বসাল অনুপম।

আবার হৃদয়ের সেই ছটফটানিটুকু উদ্ব্যস্ত করে তুলল অনুপমকে। একটা দুঃসহ গুমোট। জামাকাপড় ছেড়ে ফেলার মতো প্রদাহ। কিন্তু পোশাক গায়ে তোলার মতো তাকে হঠাৎ ছাড়া অত সহজ নয়। অনুপম পুরুষমানুষ, সে জানে তার পোশাকই আসল। এই পোশাকে বেশ মানায় তাকে। ট্রামেবাসে এমন প্রমাণ আছে।

'যথেষ্ট সময় কি বসিনি?' কণিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ওর দীর্ঘশরীরটা স্তব্ধ পুষ্পিত লতাগুচ্ছের মতো। স্লিপারে পা গলাল সে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে আগন্তুক একটি ক্লান্তির মুদ্রাকে আটকাল, তারপর ঘাসের বুকে পা বাড়াল।

অনুপম ঘাড় হেঁট করে ওকে অনুসরণ করতে লাগল। নিরুত্তর। হঠাৎ যেন কি-একটা বলতে চাইছিল সে. কণিকা ফিরে দাঁড়াল : 'কি?' 'না কিছু নয়।' অনুপম মনে স্ফূর্তির ভাবটাকে টেনে আনবার জন্যে সিগারেট ধরাল। না। বলতে পারবে না অনুপম, হঠাৎ অন্ধকারকে উচ্চকিত করে কলকাতা তার আলোকপ্রপাত মেলে ধরেছে। সেই আলোতে অনুপম জানে তার পোশাক উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, সে যে নিজেই একটা প্রদর্শনী এইটে ভেবে অনুপম খুব খুশি হল। যাক। এই সন্ধ্যা তার পতন ঘটায়নি। সে যে শেষপর্যন্ত জিতে গেছে, এইটেই আনন্দের কথা।

ট্রাম ছুটে আসছিল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকাল কণিকা।

'ভালো কথা—' কণিকা বলল : 'সেদিন মাসিমার সঙ্গে দেখা হল গড়িয়াহাট মার্কেটের কাছে।'

'মাসিমা!'

'হ্যাঁ। তোমার মার সঙ্গে—' কণিকা এগিয়ে গেল ট্রাম ধরতে : 'দুঃখ করছিলেন তুমি এই সাত বছরের মধ্যে কোনো চাকরিই যোগাড় করতে পারোনি। খুব টানাটানিতে চলেছে সংসার।' ট্রামের পাদানিতে পা দিয়েছে কণিকা : 'আচ্ছা চলি।'

অনুপম ট্রামের পোস্টটি দুহাতে আঁকড়ে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না তার দেহজোড়া খিঁচুনি কাঁপুনিটা বন্ধ হয়।

ঝরিয়াদের গটুলের চোলক মোতিয়ারী

অলকা রায়

মধ্যপ্রদেশের অংশ হলেও বাস্তারের প্রান্তদেশে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশও মিশেছে। তিনটি প্রদেশের মিলন-তীর্থ। একই জেলার ভিতর প্রাকৃতিক পরিবেশের এমন বৈচিত্র্য ভারতের অন্যত্র খুব বেশী নেই। অধিবাসীদের অধিকাংশই উপজাতি—মারিয়া, মুরিয়া, ঝরিয়া, ডরলা ইত্যাদি। তাদের আচার-বিচার চাল-চলন ভাষা আর কৃষ্টিতে রয়েছে কত বৈচিত্র্য আর স্বাতন্ত্র্য। সব উপজাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ছাড়িয়ে গেছে ঝরিয়াদের জীবন-রস ভরপুর সংস্কৃতি। ঝরিয়াদের সমাজ তারুণ্যের ঐশ্বর্যে গড়া।

রায়পুর স্টেশন থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে চলে গেছে বাস্তার জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র জগদলপুর শহর পর্যন্ত। প্রায় দু'শ মাইল দীর্ঘ। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। বাস্তার জেলায় এসে রাস্তা মালভূমির উপর উঠে গেছে। বাসে চড়ে আরও চল্লিশ মাইল গেলে পাবেন কোন্ডগাঁও নামে তহশীল শহর। কোন্ডগাঁওয়ের চারদিকেই মুরিয়া-দের বসতি। ঝরিয়া দেশে যেতে হলে কোন্ডগাঁওয়ে নেমে পড়বেন। বাস বদলি করে ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গেলেই পাবেন। নারানপুর নামে আর একটি ছোট শহর। ঠিক শহর বলা যায় না। কয়েকটি বাঁধান রাস্তা, দু-চারটি সরকারী অফিসবাড়ী আর কিছু বাস-ট্রাকের আনাগোনা ছাড়া শহর বলে পরিচয় দেবার মত কোন ছাড়পত্র পায়নি নারানপুর। মনোরম পরিবেশ। দিগন্তে বিধৃত নীলাভ আবুজমার শৈল-শ্রেণী। উত্তর-পূর্বে ঝরিয়াদের পল্লী ছড়িয়ে আছে। সে সব গ্রাম থেকে পায়ে-চলা রাস্তা মিশেছে নারানপুরে। কয়েক মাইল হেঁটে গেলেই পাবেন তাদের পল্লী।

চলুন মাইল আষ্টেক দূরের গ্রাম আমাসরাইতে চলে যাই। পায়ে-হাঁটা রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে আমরা ঢুকে পড়লুম একটি বনের ভিতর। গভীর বন কিন্তু পরিসর বেশী নয়। একা এ পথে চলবেন না। শার্দুলরাজের আবির্ভাব সব সময় হয় না তবে চিতার দর্শনলাভ হতে পারে যখন-তখন। বন পেরিয়ে রাস্তা চলে গেছে মাঠের উপর দিয়ে। দু'ধারের ক্ষেত-খামারে ধান আর জোয়ারের চাষ হয়। ঝরিয়ারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কিন্তু এখন শীতের শেষ, তাই চারদিকের জমি বিবর্ণ ঘাসে ঢাকা।

একটা মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে না? গন্ধটা আসছে ডান দিকের ঘন পল্লবিত মহুয়া গাছের সারি থেকে। ফুলে ফুলে ভরে গেছে পল্লবিত শাখা। মহুয়ার শাখায় হরিয়ালদের নিমন্ত্রণ-সভা বসে গেছে। প্রতিটি ফুল মিষ্টি রসে টইটুম্বুর। ভোরে যদি আসেন দেখতে পাবেন ঝরিয়াদের ছেলে-মেয়েরা মহুয়া তলায় এসেছে, হরিয়ালদের মতই মহুয়া ফুলের টানে। ঝাঁকা ভর্তি করে নিয়ে বাড়ীর আঙিনার মাচাতে শুকোতে দেয়। দুর্দিনের খাদ্য। সামান্য চালের সাথে মহুয়া ফুল মিশিয়ে খিচুড়ি তৈরী হয়। তাছাড়া সরাব? মহুয়ার সরাব না হলে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানই হয় না। পঞ্চায়েতের সভাতে মহুয়া সরাব চাই, বিয়ের ভোজের পর মহুয়ার দারু অপরিহার্য। মহুয়ার বীজ থেকে পাওয়া যায় রান্নার তেল।

আরও এগিয়ে এসেছি আমরা। মাঝে মাঝে কারিঞ্জী গাছ আমাদের দৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছে। বহু-বাহু রাবণের মত চারিদিকে ডাল-পালা ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। আর চোখে পড়ছে ছোট বড় অজস্র খেজুর গাছ। খেজুর গাছ থেকে এরা বড় একটা রস বের করে নেয় না, তবে খেজুর গাছ আর এক ভাবে ওদের রসনার তৃপ্তি দেয়। খেজুর গাছে পাওয়া যায় এক রকম পোকার শূককীট। ফিকে হলুদ রঙের, এক একটার ওজন প্রায় এক ছটাক। নরম তুলতুলে, চর্বিতে ভরা। ঝরিয়ারা বলে ছিন্দকীরা। ছিন্দ মানে খেজুর গাছ। ইলিশ বা ভেটকীর ফ্রাইয়ের নামে আমাদের রসনা যেমন রসস্থ হয় ছিন্দকীরার ফ্রাইয়ের নামে ঝরিয়াদের জিবেরও একই দশা হয়।

প্রায় এসে গেছি আমাসরাইতে। সামনেই ভরা-যৌবনা তন্বীর মত নয়নাভিরাম দেহ নিয়ে যে তরুবীথি দাঁড়িয়ে আছে ঝরিয়ারা তার নাম দিয়েছে শাল্পী ঝাড়। তাল নারকেল গাছের সমগোত্রীয়। ইংরেজীতে বলে সাগু পাম। প্রভাতে শাল্পী তলায় প্রবীণ নবীনদের জমাটি আসর বসে যায়। প্রত্যেকের হাতেই থাকে পাতায় তৈরী ঠোঙ্গা—ঝরিয়ারা বলে চিপড়ী। দুটো পাতা জোড়া দিয়ে এক লহমায় তা বানিয়ে নেয়। সবাই বসে থাকে শাল্পীর গাঁজানো রসের আশায়। একজন শাল্পী গাছে উঠে শাল্পী রসের হাঁড়ি নামিয়ে নিয়ে আসে। গাছের হাঁড়িতে থেকেই রস গেঁজে ওঠে।

মাদলের শব্দ ভেসে আসছে না? আর তরুণ তরুণীদের কণ্ঠের কল-

কল্লোল? নিশ্চয়ই ঝরিয়াদের ছেলে-মেয়েরা আসছে! হ্যাঁ, তারাই তো আসছে। এগিয়ে আসছে ওরা। আদি-বাসী তরুণ-তরুণীদের নামে আমাদের মনে যে রোমান্টিক ছবি ভেসে উঠে তার অন্ততঃ কিছুটা পরিচয় ঝরিয়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পাবেন। এক কথায় বলা যায় তরুণ-তরুণীদের কৃষ্ণশ্যামল দেহে লাবণ্যের কার্পণ্য নেই। সে লাবণ্যের সাথে মিলেছে বিচিত্র ভূষণ। মণি-জহরৎ-সোনা-দানায় গড়া নয়, রকমারী রঙীন পুঁতিতে গড়া অলংকার। নয়নাভিরাম ডিজাইনে তরুণীরা নিজেরাই তৈরী করেছে। পুঁতির মালা রয়েছে ছেলে-মেয়েদের গলায়, মেয়েদের মাথা আর কপাল ঘিরে ও ছেলেদের পাগড়ী জড়িয়ে। পুঁতির দুল দুলছে কানে। তরুণ-তরুণীদের হাতে পায়ে ধাতুর বালা। দেখুন মেয়েদের কানের ধার থেকে আরম্ভ করে চুলের চারদিকে কতগুলি করে চিরুনি গোঁজা। চিরুনির গোড়া ধাতুর পাতে বাঁধান। আপনি ভাবছেন তরুণীদের খোঁপা জড়িয়ে রয়েছে একগোছা নাম-না-জানা ফুলের মালা। আসলে ওগুলো ফুল নয়—কড়ি। কড়ির মালা স্তবকের মত করে চুলে জড়ানো হয়েছে। ছেলেদের ছোট ধুতি কটিবাসের কাজ করে, হাঁটু পর্যন্তও তা নেমে আসে না। মেয়েদের সরু লালপেড়ে শাড়ীর আয়তনও প্রায় তাই—হাঁটুর নীচে তারও স্থিতি নেই। যেটুকু আবরণ না হলেই চলে না সেটুকু আবরণই শুধু স্বীকার করে নিয়েছে। ছোট শাড়ী আঁটসাঁট করে দেহে জড়ানো, তাতে ঊর্ধ্বাঙ্গের বঙ্কিম রেখা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষিত।

—তোমরা কে গো? কোথায় যাচ্ছ?

আমাদের সামনে আসার পর সমস্ত দলটির কলস্রোত একটু মন্থর হয়ে এসেছে। বছর বাইশ বয়সের যে ছেলেটির মাথার পাগড়ীতে রামধনু আঁকা ময়ূরপুচ্ছের পালক গোঁজা, সে এগিয়ে এল। বেশ হাসিখুশী সপ্রতিভ ভাব।

—নমস্তে সাব। আমরা গোটুলের চেলিক মোতিয়ারী। যাচ্ছি এরকার কাপসীর বিয়েতে যোগ দিতে।

চেলিক মোতিয়ারীরা চলে গেল উচ্ছ্বসিত বন্যাস্রোতের মত। শুধু কানে আসছে অপসৃয়মান মাদলের শব্দ, দু'এক কলি গান আর অকারণ কণ্ঠ-স্বরের উচ্চরব।

—গটুল?—গটুল হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের নৈশ ক্লাব, চেলিক মোতিয়ারীরা তার সদস্য-সদস্যা। নৈশ ক্লাব বল্লে সব কিছু বুঝায় না, গটুল নৈশবাসও।

চলুন এগিয়ে যাই বাঁ দিকের শাল্পী বীথি ঘেঁষে। ওই তো গটুল-বাড়ী দেখা যাচ্ছে। মাটির দেওয়ালে আর খড়ে চালে তৈরী ঘর। আঙিনাতে আর একটি ঘর, তাতে বেড়া নেই। পঞ্চায়েতের সভা বসে ঐ খোলা ঘরে। গটুল ঘিরে কাঠের গুঁড়ির বেড়া, গটুলের সীমা নির্দেশক। মাঝখান দিয়ে ঢুকবার রাস্তা। ছেলে-মেয়েরা বড় হলে মা বাবা তাদের গটুলের সদস্য করে দেয়। এ গ্রামের গটুলে হয়তো আছে বিশ জন ছেলে আর পনেরো জন মেয়ে। তাদের বয়স হয়তো বার থেকে বাইশের ভিতর। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তরুণ-তরুণীদের মিলনতীর্থ গটুল। নিশি যাপনের কুঞ্জবন। তাছাড়া আদিবাসী সমাজের পূর্ণাঙ্গ সভ্য-সভ্যা হবার শিক্ষা পায় তরুণ-তরুণীরা এখানে। গটুলেই হয় সমাজকর্তব্যবোধের গোড়াপত্তন। নিয়ম-মানুবর্তিতা রয়েছে, শৃংখলা রয়েছে, সদস্য-সদস্যাদের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে। পদমর্যাদা হিসাবে দায়িত্বভার। গটুল শাসনের পুরোধায় যে রয়েছে তাকে বলা হয় দেওয়ান বা মোকদ্দম। মুন্সি নানা অনুষ্ঠানের খতিয়ান রাখে। কোটোয়ার ছোট ছেলে-মেয়েদের আচার-ব্যবহারে নজর রাখে। চালকীর উপর তামাক সরবরাহের ভার। মেয়েদের পুরোধায় রয়েছে বেলোসা। তবে দেওয়ানের তুলনায় তার ক্ষমতা অতি সীমিত। বয়স বাড়বার সংগে সংগে সদস্য-সদস্যাদের পদোন্নতি হয়।

দিনের বেলায় গটুল নিঃশব্দ প্রাণহীন। ছেলেরা হয়তো চলে গেছে মাঠের কাজে বড়দের সাহায্য করতে। বনে কাঠ কাটতে, জংগলে মধু, কন্দ, ছিন্দকীরা আর পিঁপড়ার বাসা খুঁজতে। পিঁপড়ারা গাছে পাতা দিয়ে তৈরী করে বাসা। তাতে থাকে অজস্র পিঁপড়ে আর তাদের শূককীট। পিঁপড়ে আর তাদের শূককীট দিয়ে যে চাটনী তৈরী হয়, তার উপর ঝরিয়াদের পক্ষপাতিত্ব আছে। মেয়েরাও চলে যায় বাড়ীতে, ঘরসংসারের কাজে মায়েদের সাহায্য করতে। মুরগী শূকরের পরিচর্যা করতে হয়, জল আনতে হয় বা ধান ভানতে হয়।

সন্ধ্যার পরই আসে গটুলের জোয়ার। বিকালের দিকে কোন মোতিয়ারী এসে গটুলের চারধার পরিষ্কার করে, দেওয়াল আর আঙিনাতে মাটি গোবরের প্রলেপ দেয়। সন্ধ্যার আগে কোন চেলিক এসে গটুল ঘরে বা বাইরে এক কোণে আগুন জেলে দিয়ে যায়। নৈশাহার শেষ করে চেলিকরা আসতে শুরু করে। আগুনের ধারে বসে শুরু হয় গল্প-গুজব। মাদল বাজে দ্রিম দ্রিম—ছোট বড় নানা আকারের মাদল—রকমফের নাচের জন্য। একজোট হয়ে হঠাৎ মেয়েরা গটুলের দিকে ছুটে আসে সশব্দে, উচ্চকণ্ঠে

তাদের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়। চন্দ্রালোকিত রজনী হলে চলে সমষ্টি-গত নাচ। চেলিক মোতিয়ারীদের মিলিত কণ্ঠে চলে গান, বাজে মাদল। মেয়েরা গেয়ে ওঠে—

রেরেলা রেলা রেরেলা রেলা রেরেলা
পুট প্যারোন্ডা পালর পোড়োলা
ব্যাগনে পুঙ্গার পুংঘাটা ইনজোর
বোর দাদান মিহছি অয়্যা রাত?
লাহারু দাদান মিহছি অয়্যা রাত
বেসে পুঙ্গার পাগা ইনজোর,
পাগাট পুঙ্গার মিহছি হিইয়া কাত
রেরেলা রেলা......(ইত্যাদি দোহা)

অর্থাৎ—

উইটিপির বুনো গাছে
ফুল ফুটেছে সই
কাকে দিবি বল না আমায়
মনের মানুষ কই?
ময়ূরে মাথায় পাগড়ী আছে
ভারী চমৎকার
গুঁজে দিব বুনো ফুল
সেই পাগড়ীতে তার।

নাচের শেষে পদমর্যাদায় আর বয়সে যারা ছোট তারা মাতবর চেলিকদের আনুগত্য ও নমস্কার জানায়। তারপর মোতিয়ারীরা বসে যায় চেলিকদের চুল ও দেহের পরিচর্যা করতে, চুল আঁচড়ান ও তেল মালিশ চলে। তারপর ঘুমাবার উদ্যোগ। ঘুমোতে যায় চেলিক মোতিয়ারী জোড়ায় জোড়ায়। বেশীর ভাগ গটুলের জোড়া বাঁধবার কোন নিয়ম নেই। দেওয়ান ঠিক করে দেয় কোন চেলিক কোন মোতিয়ারীর রাতের সাথী হবে। হয়তো দিন কয়েক জোড় ঠিক থাকে, তারপর আবার ভেঙ্গে যায়। জোড়-ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলে। তবে স্থায়ী বন্দোবস্ত যে কোন কোন গটুলে নেই, তা নয়। সে সব গটুলে নির্দিষ্ট চেলিক মোতিয়ারীদের বাঁধন আলগা হয় না, যতদিন গটুল জীবন চলে। এ সব গটুলের নির্দিষ্ট চেলিক মোতিয়ারীদের ভিতর পাকা বন্দোবস্ত থাকলেও তা সারা জীবন স্থায়ী হয় না। বিয়ের পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। চেলিকরা গটুল-বৌকে বিয়ে করবে এমন কোন কথা নেই। বরং প্রায়ই সে রকম বিয়ে হয় না। বিয়ের পরই গটুল বিহার-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কৈশোর আর প্রথম জীবনের প্রাণাবেগভরা দিনগুলির স্মৃতি গটুল আঙিনার মাটির সাথে মিশে থাকে, তাই গটুল থেকে বিদায় নেওয়া কম বেদনাদায়ক নয়। আসন্ন বিয়ের আগে বিদায়ী মোতিয়ারীকে ঘিরে বন্ধুবান্ধবীরা গায়—তুমি ছিলে গটুলের প্রাণ—তুমি সন্ধ্যায় আসতে গটুল পরিষ্কার করতে হাতে কুলো আর ঝাঁটা নিয়ে—ময়ূরের মত নেচে নেচে তুমি গটুল পরিষ্কার করতে—তোমার চেলিক ম্রিয়মাণ, তাকে ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ? চেলিক যখন বিদায় নেয় তখনও সবাই গান গেয়ে তাকে বিদায় দেয়—

ডিন্ডোরাজো জোরাজো নোনা।
ইস্তে রাজো পুটে নোনা।
নিয়া ওয়্যানা গটুল নোনা।
পারমাকোরো গটুল নোনা।
ডাওয়া কেইডা গিকি নোনা।
তিনা কেইডা যারগা নোনা।

অর্থাৎ—

যাচ্ছ চলে গটুল ছেড়ে
পাবে না ভাই আর
একটু স্বোয়াদ মুক্ত জীবনটার
মোষের শিংয়ের মতো তোমার—
রূপটি ছিল খাসা,
সন্ধ্যা বেলায় মাদুর হাতে
নিত্য যাওয়া আসা।

সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানের বিশেষতঃ বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে চেলিক মোতিয়ারীদের যোগ রয়েছে। অনেক দায়িত্ব তাদের উপরে, তারাই উৎসবের প্রাণ। এক গাঁয়ে বিয়ে হলে পাঁচ গাঁয়ের চেলিক মোতিয়ারী জমা হয়—নাচে গায় কাজকর্ম করে, উচ্ছ্বাসের আবেগে ঘুরে বেড়ায়। তেহার পর্ব আছে, আছে পৌষ পার্বণ, চৈত ভান্ডার আর দেওয়ালি। দেওয়ালি উৎসবের নাচ অনেক দিন চলে। এটাই নাচের সব চেয়ে বড় উৎসব। নাচের জন্য এক গটুলের মোতিয়ারীরা চলে যায় অন্য গ্রামের গটুলে ভিন গাঁয়ের গটুলের চেলিকদের সাথে মিলবার আশায়। উৎসবের আগে মোতিয়ারীরা জল্পনা কল্পনা করে কোন কোন গাঁয়ে যাবে নাচতে, কোন গাঁয়ের চেলিকদের মনে জোয়ার আনতে পারবে, কোথায় গেলে মনের মতন গটুল পাওয়া যাবে, কোথায় জমাটি আসর বসতে পারে। নির্দিষ্ট দিনের প্রভাতে কিছু আচার-অনুষ্ঠানের পর একটি ঝাঁকা নিয়ে বের হয়ে পড়ে মোতিয়ারীর দল নির্দিষ্ট গটুলের উদ্দেশ্যে। চাল ডাল খাবার মাগে বাড়ী বাড়ী অন্য গাঁয়ের চেলিক-দের খাওয়াবে বলে। মোতিয়ারীরা পৌঁছুলে চেলিকরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভিন গাঁয়ের মোতিয়ারীদের অভ্যর্থনা করা হয়। চেলিকরা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে। নিজেদের গাঁয়ের মোতিয়ারীদের সেদিন চেলিকরা বিশেষ পাত্তা দেয় না—যত আদর ভিন গাঁয়ের মোতিয়ারীদের। গাঁয়ের মোতিয়ারীরাও অন্য গটুলে যাবার জন্য ব্যস্ত। মোতিয়ারীরা গ্রামান্তরে এসে নাচতে শুরু করে। নাচ গান খাওয়াদাওয়া চলে রাত পর্যন্ত। তারপর রাত কাটায় চেলিকদের সাথে। এদের সব নাচ আর গান এক তাল বা এক সুরে বাঁধা নয়। বিভিন্ন ভঙ্গী, বিভিন্ন সুর আর বিভিন্ন পদ। খাবার মাগতে মাগতে মোতিয়ারীদল গেয়ে ওঠে—

দাদারে ওয়াইয়া মুনকেরে কোরকা কিতন
পার্কে সে পুরেকা কিতন, দাদা।
মুর ওয়াইজ পাত জালিয়াল দাদা।
পিন জোরাতে ময়না কিতন দাদা।
রাচাটে গাড়া কিতন দাদা।
কেনা ইয়ে মান ওয়ান আইয়েন দাদা।
কা ওইর চত হিটাপ আয়ার দাদা।
জিওয়া তুন কামি কেমা দাদা।
নিয়ারে পোরে পায়কোম দাদা।

অর্থাৎ—

ও-দাদা
(তোমার) বাড়ীর সামনে গোয়াল ঘর
পিছনে গোলা আছে।
চালার উপর ময়ূর ঘোরে
খাঁচায় ময়না নাচে।
আঙ্গিনাতে গরুর গাড়ী
(তোমার) ধনের সীমা নাই—
মোদের ঝুড়ি ভরা চাই।
একটি বোঝার তরে আছি
অল্পে তুষ্টি নাই.
(দিবে যদি) মোদের আশিস
পাবে ভাই।

অন্যান্য সব উৎসবেও নাচ একটি প্রধান অঙ্গ। হুলকী নাচের ছন্দে মোতিয়ারীদল গায়—

আরিং কোরিং বাদর রোয়,
পোরন বাদর পয়ান্ডা রোয়।
ডারকা পিয়ো দার দার রোয়।
জিমতি পিয়ো জিম্ জিম্ রোয়।
দোরী ঊধা হানডো রোয়।
ডাক্কা পেহছোর হানডো রোয়।

অর্থাৎ—

মেঘে মেঘে আকাশ ঢাকা
নামল বাদল ধারা,
রিমঝিমানী গানের শেষে
সাঁঝের বেলায়,
বন্যা বাঁধন হারা—
আপন বেগে পথ করে নেয়
সাঁঝের বন্যাধারা।

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফাটা থেকে রামপুর তিন মাইল পথ, সেখান থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ সাড়ে চার মাইল সোজা চড়াই। রামপুর থেকে সওয়া মাইল দূরেই পাটাগড়ের পুল—সেখান থেকে একটি পথ চড়াই পার হয়ে ত্রিযুগীনারায়ণ যায়, আর একটি পথ যায় কেদারনাথ। পাটাগড় থেকে ত্রিযুগী-নারায়ণ তিন মাইলের কিছু বেশী।

বেলা বারোটা দশ মিনিটে ত্রিযুগী-নারায়ণের মন্দিরে পৌঁছানো গেল। দেখলাম মন্দিরের সামনে সত্যিই হর-পার্বতীর বিবাহ-কালীন যজ্ঞের ধুনী তখনও জ্বলছে—পাণ্ডারা এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে দেখালো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও সরস্বতীর নামে চারটি ছোট ছোট কুণ্ড —কোনও কুণ্ডে স্নান, কোনটিতে তর্পণ কোনওটার জল পান করা হয়—সব জায়গাতেই পুরোহিত ব্যবস্থা। সরস্বতী কুণ্ডের মধ্যে সোনালী রংয়ের ছোট ছোট সাপ। জলে হাত ডুবিয়ে তর্পণ করা গেল। মন্দিরের মধ্যে বেশ অন্ধকার—তাই টর্চ বা মোমবাতি সংগে নিতে হয়, নইলে ভাল করে সবকিছু দেখা যায় না। স্থানটি সত্যাশ্রয়ী—সেখানে গেলেই মনে হয়, কত যাগ-যজ্ঞ এখানে হয়েছে—তার প্রভাব তিন যুগ ধরে এই স্থানটিকে এক অপূর্ব শুচিতার ভরে তুলেছে। হর-গৌরীর যজ্ঞস্থলে কিছুক্ষণের জন্য বসেছিলাম—মনে একটা গভীর তৃপ্তি—দেহের শ্রান্তি কোথায় বিলুপ্ত হয়েছে, নিজেকে হারিয়ে দেওয়ার এমন জায়গা বুঝি আর নেই।

কার ডাকে চমক ভাঙলো। আবার উঠতে হবে—চলতে হবে—পৌঁছতে হবে জীবনেশ্বরের চরণে।

পুরি, হালুয়া, আলুর তরকারি সবই অখাদ্য, তারপরেও দুর্মূল্য। ঘোড়াওয়ালা ডাণ্ডীওয়ালা সবাইকেই খাইয়ে দেওয়া হ'ল—আমরাও যে যতটুকু পারি গলাধঃকরণ করে নিই—সবারই পেটে যে দুর্ভিক্ষের ডাক!

রওনা হ'লাম সাড়ে তিনটেয়—গৌরী-কুণ্ডা চটীতে পৌঁছলাম সাড়ে ছটায়। পথে আরও অনেক ছোটখাটো চটী। ডাণ্ডীবাহীরা চা খেয়ে নেয়, কেউ বিড়ি ফোঁকে, কেউ বা তামাক টানে। আমিও কী একটা রসে ভরপুর মন নিয়ে এদিকে ওদিকে চেয়ে থাকি।

কুলীরা মাল নিয়ে আধ ঘণ্টা আগেই গৌরীকুণ্ডায় পৌঁছে গিয়েছে। চটীটা মোটামুটি ভাল। সব চেয়ে সুবিধে হল, গৌরীকুণ্ডের গরম জল। স্থানটি ভীষণ ঠাণ্ডা—তাই সারাদিন স্নান না হলেও, তপ্ত কুণ্ডের জল পেয়েও ছেড়ে দিতে হ'ল।

সেখানেই আলাপ হ'ল টেম্পল কমিটির প্রেসিডেন্টের সংগে। তিনি সস্ত্রীক কেদারনাথ হয়ে ফিরছেন—বদরীর পথে উখীমঠ হয়ে যাবেন। ইনি উত্তর প্রদেশের গভর্ণমেন্ট-মনোনীত, বেশ মোটাসোটা অমায়িক ভদ্রলোক। এক-জোড়া তা'দেওয়া পাকা গোঁফ তাঁকে আরও বেশী দর্শনীয় করে তুলেছে। অনেকদিন খবরের কাগজের সংগে সম্বন্ধ নেই। গণেনের কাছে একটি পকেট ট্রান-জিসটার রেডিও ছিল—তাতেই শুনলাম, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বন্যায় ভেসে গিয়েছে, ছাব্বিশজনের মৃত্যু, লক্ষ্ণৌ ও পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলের রেলপথ-যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মনে পড়ল, এই জন্যেই আমাদের নাক-ঘুরিয়ে কানধরার মত আঠারো ঘণ্টা লেট্ করে হরিদ্বার পৌঁছতে হয়েছিল।

প্রেসিডেন্টের নাম আচার্য ব্রজ-বিহারী মিশ্র—নিবাস আজমগড় জেলা। তিনি দু'খানা চিঠি লিখে দিলেন—একটি কেদারনাথ টেম্পল কমিটির নামে, যা'তে তাদের নিজেদের 'রেস্ট হাউসে' আমাদের থাকার সুব্যবস্থা হয়—অথবা অন্য যেসব 'রেস্ট হাউস' আছে, সেখানে যদি আমরা উঠি, তাহলে টেম্পল-এর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা যেন আমাদের যথাযথ তত্ত্বাবধান করেন।

গৌরীকুণ্ডা চটীতেই কেদারনাথ-প্রত্যাগত কতিপয় মাদ্রাজী আমাদের সামনের ঘরেই আস্তানা নিয়েছিল। মোমবাতি জ্বালিয়ে, আমি নীরেন, গুনেন আর গণেন ব্রিজ খেলতে বসে

গেলাম। ওদিকে হ্যাজাক্ লাইট্ জ্বালিয়ে মেয়েরা রান্নার কাজে ব্যস্ত। খাবার তৈরী হতে কিছু বিলম্ব আছে। তদ্রূপ মাদ্রাজীরাও তাদের রান্নার কাজে অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছে।

আহারান্তে শয়নেরই বিধি—কিন্তু তার উপায় কী? মাদ্রাজীদের সংক্ষিপ্ত ভোজনপর্ব সমাপ্ত—তারা স্ত্রী-পুরুষে চক্রাকারে বসে স্তোত্রপাঠ শুরু করে দিয়েছে—হয়তো সারারাতই চালাবে। বুঝলাম, ঘুমের দফা গয়া!

যাক্ শুয়ে তো পড়ি। ঘুম আসে, ভালই, নচেৎ গোটা রাত সমবেত কণ্ঠের শৈব-সঙ্গীত শুনেই কাটিয়ে দেব—অলাভের কিছু নেই।

চোখ বুঁজে শুনছিলাম—খাঁটি সংস্কৃত মন্ত্র, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সুরে আলংকারিক ব্যঞ্জনা একটু বেশী থাকলেও উদাত্ত কণ্ঠের মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেই ধ্বনি-তরঙ্গ আমার বুকের তারে কী যে স্পন্দন তোলে—তারই আবেশে ঘুমিয়ে পড়ি।

তেরই অক্টোবর। ভোর চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় একটা বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কুন্ডু-চটীতে ভেড়ার ডাকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠেছিলাম ছাগলের ডাকে, এবার কিন্তু স্তোত্রগানের মধ্যে ঘুমিয়ে জেগে উঠলাম গাধার ডাকে—কথঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে বৈকি! নাগেশ্বর পাণ্ডা আমাদের জন্যে একটি অতিরিক্ত মালবাহী গর্দভ ইতি-মধ্যেই সংগ্রহ করে রেখেছে, এই সুসংবাদ বহন করে শ্রীমান নীরেন আনন্দে আমার বিছানার উপরেই বসে পড়ল। কুলীদের পৌঁছতে দেরী হবে বলে এই বিশিষ্ট জন্তুটির পৃষ্ঠে অতি প্রয়োজনীয় মাল-পত্রগুলি আমাদের সঙ্গেই যাবে—যাতে কেদারনাথ পৌঁছে তখনকার মত আমাদের কোনও কষ্ট না হয়, তাই এই সাবধানী ব্যবস্থা।

গৌরীকুণ্ড থেকে খুব ভোরেই রওনা হতে হবে, কারণ সাত মাইল খাড়াই পথ—বেলা বারোটার মধ্যে না পৌঁছলে সেদিন আর মন্দির-দর্শন ও পূজাদি হবে না। বেলা একটায় মন্দির বন্ধ হয়, খুলবে সেই সন্ধ্যারতির সময়।

তাড়াতাড়ি উঠে, দুধ চা ইত্যাদি পান করে তৈরী হলাম। নাগেশ্বর পাণ্ডা সত্যিই খুব করিতকর্মা লোক; অল্প বয়স, তাই খুব চটপটে এবং ঠিক

কেদারনাথের মন্দির ফটো : মুকুলকান্তি ঘোষ

জায়গায় সব ঠিক ঠিক বন্দোবস্ত করে চলেছে।

ছ'টা পনেরো মিনিটে আমরা রওনা হলাম। জনবিরল পথ—মন্দির-বন্ধের সময় এসে গেল—তাই লোকজনের তেমন সমাগম নেই। পথিমধ্যে মাঝে মাঝে কেদার-প্রত্যাগত যাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হলেই তারা "জয় কেদারনাথ জী কী" ধ্বনি দিয়ে ওঠে, আমাদেরও অন্তর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই জয়ধ্বনি দিয়ে চলে।

কেবল দেখলাম, চড়াই-এর পথে এক জোড়া পশ্চিমদেশীয় স্বামী-স্ত্রী, সঙ্গে একটি মেয়ে, হেঁটেই চলেছে। সবারই সুগোল সুঠাম দেহ। পুরুষটির মাথায় মস্ত একটা গাঁঠরি—তাদের সমস্ত সংসারটাই তার মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড় ভেঙ্গে উঠে যায়। তাদের শরীরে আছে যৌবনের রক্ত আর পেশীর উষ্ণতা। মেয়েটির হাতেও ছোট্ট জলের কুঁজো। বছর সাত আট বয়স। বাপ-মায়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না—অনেক পিছিয়ে পড়ে। তখনই কপোত-কপোতীর অশ্রান্ত কলগুঞ্জন থেমে যায়—মেয়েটি না আসা পর্যন্ত তার বাপ-মা দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে বিরাট গাঁঠরিটাও মাথাবদল হয়। পুরুষটিও মেয়েকে তুলে স্কন্ধে চাপায়, হাতে জলের পাত্র। পশ্চাতে স্ত্রী।

সার্থক এদের পথ চলা!

দেখে মনে হ'ল স্বামী-স্ত্রী দু'টি হলেও তারা অ-দ্বিধ—কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, কত কষ্ট স্বীকার করেও এরা চলেছে দেবাদিদেব দর্শনে—অন্তরে আছে ভগবৎ প্রেমের অগ্নিময়ী বাসনা। জিজ্ঞাসায় জানলাম, হরিদ্বার থেকেই পায়ে হেঁটে আসছে।

দুঃখের তপস্যাই যে আনন্দের তপস্যা!

কী অপরূপ দৃশ্য! সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে, যতদূর দৃষ্টি যায়, সুন্দরের কী বিরাট অভিব্যক্তি! এ ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। কলিকাতা মহানগরীর মত অজস্র জনতার স্রোত নেই, এখানে আছে পথচারীর অন্তরের ভক্তির বন্যা আর অজস্র নীরব কল্লোল। সেখানকার মত চোখ-ঝলসানো বিজ্ঞাপন-সাহিত্য নেই, এখানে আছে বিশিষ্ট জ্ঞাপনের জন্যে তীর্থগামীদের প্রাণে একটা অজানা বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ। শহরের কৃত্রিম পূর্ণতা আছে, এখানেও কিন্তু শূন্যতার মধ্যে একটা পূর্ণতা অন্তরের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করে খুলে দেয়, আর সেই পর্বতশ্রেণীই যেন সেই পূর্ণতাকে বেষ্টন করে তাকে আদরে ঘিরে রেখেছে। এখানে শহরের সেই রাস্তার চৌমাথায় বা প্রমোদউদ্যানে বিভিন্ন রংয়ের বিদ্যুদ্দীপ্ত ফোয়ারা নেই—এখানে আছে কঠিন পাহাড়ের বুক চিরে এক একটা রুক্ষ, নগ্ন, জড়-সমাধিপ্রাপ্ত শৈলতাপসের গা বেয়ে নেমে-আসা স্বতঃ উৎসারিত জলধারা। তার গতি আছে, আর ভাষা আছে, তার বুকে আছে সাতরঙা সূর্যের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা!

চার মাইল পথ অতিক্রম করে, বেলা ন'টা নাগাত রামবাড়ায় পৌঁছলাম। সেখানেও আর এক দফা খাওয়ার পালা। সাড়ে ন'টায় আবার রওনা দিলাম। এখান থেকে কেদারনাথজী সোজা উঠতে হবে। পথও অল্প চওড়া। দূরে টুকরো টুকরো খাড়াই পাহাড়—তাদের ছুঁচলো মাথায় তুষার-প্রপাত—দেখে মনে হয়, অর্চনারত বিশ্বপ্রকৃতি কোন্ অদৃশ্য শৈলাধিপতির পূজায় করেকটি নৈবেদ্যের ডালা সাজিয়ে রেখেছে।

ডাণ্ডীর কুলীরা থামতে থামতে চলেছে—কেউ আগে, কেউ পিছে, কেউ ওপরে, কেউ নীচে, আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছি। দুটো পাহাড় পাশেই ওপর থেকে খাড়া আমাদের পথের ধারে নেমে এসেছে। আমার ডাণ্ডীবাহী কুলীরা আমাকে নিয়ে কিছুটা ওপরে উঠে এসেছিল। প্রায় হাজার ফিট নীচে দিয়ে লজ্জাজড়ানো ছন্দে মন্দাকিনী কলস্রোতা—তার কুলুকুলু ধ্বনি আর বাতাসের শাঁ শাঁ আওয়াজ ভেদ করে কী যেন একটা সঙ্গীতের মত শোনা যায়। ক্রমেই সেই শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দুচোখ বুঁজে শুধু কান দুটিকে জাগিয়ে রাখি—সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সেই সঙ্গীত—যেন কোনও স্তোত্রগান। এখানে, এই নির্জন পর্বতশীর্ষে এমন মিষ্টি গান কে গায়? আশেপাশে চারিদিকে চেয়ে দেখি—কোথাও কোনও লোকালয় তো নেই। ডাণ্ডীবাহী কুলীদের জিজ্ঞেস করি, কাছাকাছি কোনও বসতি আছে কিনা—হয়তো রেডিও আছে—সেখান থেকেই সঙ্গীত ভেসে আসে। কুলীরা সবিনয়ে জানায়—কোথাও কিছু নেই। তাদের আবার প্রশ্ন করি—তোমরা কোনও গান শুনতে পেয়েছো?

তারা মাথা দুলিয়ে জানায়,

—না কিছু না।

তবে এ কী? কার সঙ্গীত? কে গাইছে? কোথায় সেই সঙ্গীতের উৎস? সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে মনের অতলে ডুবে যাই—একী আমার অন্তরলোকের কোনও প্রেরণা—না, বহির্জগতের কোনও অদৃশ্য ইঙ্গিত, সঙ্গীতের মাধ্যমে আমাকে অজানার অভিসারে পথের সন্ধান দিয়ে যায়? না, এও কি কোনও সুরের প্রহেলিকা?

প্রহেলিকা নয়—একাধিকবার, বহুবার পরিষ্কার শুনতে পেলাম শব্দস্বর-বিশিষ্ট বেদোক্ত সামগানের উদাত্তমধুর গম্ভীর সুরস্রাবী ধারা—মাঝে মাঝেই 'ওঁ হরি ওঁ' 'ওঁ হরি ওঁ' ধ্বনির মধ্যে স্বরমাত্রিক যতি। সেই সুরে আমি বিভোর হয়ে গেলাম। চারজন কুলীর ওপরে ডাণ্ডীতে চলেছি—সে চেতনাও বুঝি তখন আর নেই।

মনের এই নির্বিকল্প অবস্থা কতক্ষণ ছিল জানি না, দেওদখনীতে ডাণ্ডীবাহী কুলীরা ডাণ্ডী নামিয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো—'কেদার বোাা কী জয়!'

সামনেই তাকিয়ে দেখি, অপরূপ দৃশ্য। অনতিদূরে তুষারমৌলি পাহাড়ের সানুদেশে কেদারনাথজীর মন্দিরের চূড়া উর্ধ্বে উঠেছে—আকাশের গায়ে পর্বতরাজির পটভূমিকায় শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দির কত যুগ-যুগান্তরের স্মৃতিময় গৌরব বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। দেওদখনী থেকে শুধু মন্দিরের চূড়াই দেখা যায়, আর তার পাশেই ক্রমোচ্চ পর্বতের গায়ে শুভ্র তুষারের ওপর প্রতিফলিত সূর্যকিরণের অপরূপ খেলা যেন কোন্ এক অপার্থিব জগতে নিয়ে চলে।

নাগেশ্বর পাণ্ডা কিন্তু আমাদের দেওদখনীতে পৌঁছবার আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে কেদারনাথে চলে গিয়েছে—সঙ্গে নিয়েছে টেম্পল কমিটির প্রেসিডেন্টের সুপারিশ-চিঠি। আগে থেকেই সে আমাদের জন্যে সব রকম সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে রাখবে, যাতে সেখানে পৌঁছে আমাদের কোনও অসুবিধে না হয়।

দেওদখনীতেই আমার সঙ্গীরা এসে মিলিত হোল। নীরেন ভায়া তার পুরু কাঁচের চশমাটি ভাল করে মুছে আবার চোখে দেয়—দেওদখনীতেই দেব-দর্শনের পুণ্য অর্জন করা চাই।

কেদারনাথ আর মাত্র এক মাইল পথ। সেখান থেকে বেশ কিছুটা চড়াই উৎরাই-এর পর আবার প্রায় খাড়া চড়াই উঠতে হবে। আগে পিছে আমরা আবার চলতে থাকি, এবার আর বেশী ছাড়াছাড়ি নয়—আমাদের সবারই মনের একাগ্রতাও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে—তাই সঙ্গীরা সঙ্ঘশক্তির ওপরেই বেশী আস্থাশীল হয়ে উঠলেও, আমি অনেকটা এগিয়ে গেলাম।

মন্দিরের কাছাকাছি প্রায় দু ফার্লং পথ বাকী থাকতে, ডাণ্ডীবাহীরা আমাকে নামিয়ে দিয়ে বললে—এখান থেকে হেঁটেই মন্দিরে যেতে হয়।

তথাস্তু। হাঁটাপথের মাঝখানে একটা ছোট্ট ব্রিজ—মন্দাকিনীর দুই ধারা মন্দিরকে বেষ্টন করে সেখানে এসে মিলিত হয়েছে—যেন দেবাদিদেব মহাদেবের চরণ ধৌত করে তাঁর মহিমা কীর্তনের অনুরাগে ছুটে চলে।

বেলা ১১-৩৫ মিনিটে মন্দিরের সম্মুখে পোঁছে গেলাম।

"শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট" নিয়ে, কেদারনাথ আপন মহিমায় স্বয়ংপূর্ণ হয়ে বিরাজমান। পঞ্চকেদারের অন্যতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এই তীর্থভূমি। পৌরাণিক প্রামাণ্যে বলা হয়, কেদারে মহিষের পৃষ্ঠের ন্যায় দ্বিতীয় কেদার মধ্যমহেশ্বর নাভির আকারে, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ এবং কল্পেশ্বরে জটা। মন্দিরে পূজা করে শিবলিঙ্গের আলিঙ্গন করতে হয়। বিগ্রহ লিঙ্গাকৃতি নয়, শ্যামবর্ণের বিশাল শিলা। স্কন্দপুরাণে শ্রীশঙ্কর ভগবান বলেছেন, বদরীক্ষেত্রের অন্তর্গত কেদাররূপে আমার যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁকে দর্শন, স্পর্শন ও ভক্তিভাবে পূজন করলে কোটী কোটী জন্মের পাপ বিধৌত হয়ে যায়। কর্মফলের ক্ষয় হওয়ায় জন্মান্তরের প্রয়োজন আর হয় না। মনে পড়ল সেই বাণী—"রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" এ তো আর শুধু পুরীধামে ছুটে গিয়ে রথের ওপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করলে বা রথ টানলেই যে পুনর্জন্ম হয় না—এমন নয়, এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই হ'ল—এই দেহরূপ রথে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মাকে দর্শন করলে পুনর্জন্ম হয় না। এই দেহ কোন্ দেহ, এই আত্মা কোন্ আত্মা—যিনি সমস্ত বিশ্বে বিশ্বনাথরূপে বিশ্বময় হয়ে আছেন, "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা"—সেই পরমাত্মাই কি এই আত্মার মধ্যে স্বয়ংপ্রকাশ—শ্রীশ্রীকেদারনাথের আত্মময় চাক্ষুষরূপের অন্তরালেই কি এই দেহাশ্রিত আত্মার পরম সন্ধান?

মনে মনে এই সব ভাবধারা যেন কোথায় নিয়ে যায়—আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই বিরাটের সামনে নিজেকে শুধু সঁপে দিতে চাই।

মন্দিরের পাশেই বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি, এক সাধু তাঁর কুটীরের সামনে স্থির হয়ে বসে আছেন। চোখ মেলে

প্রসন্নকিরণ ছড়িয়ে আমার দিকে চাইলেন—সে দৃষ্টিতে মনে হ'ল ঠিক যেন রঞ্জন-রশ্মির মত সেই চোখের আলো আমার মনের গোপনতম প্রদেশ তাঁর সামনে উন্মুক্ত করে দেয়।

গুপ্তকাশীতেই ফলাহারী বাবার কথা প্রথম শুনেছিলাম। গৌরীকুণ্ডায় এসে টেম্পল্ কমিটির প্রেসিডেন্ট আচার্য ব্রজবিহারী মিশ্রের কাছে ফলাহারী বাবার অনেক কিছু অলৌকিক বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল। শীতের ক'মাস যখন মন্দির বন্ধ থাকে, বরফে চারিধার ঢেকে যায়, কাক পক্ষীটিও থাকে না, তখনও তিনি এই মন্দিরেই অবস্থান করেন। আশ্চর্য তাঁর সাধনা, অদ্ভুত তাঁর তপশ্চর্যা!

কেদারনাথজীর মন্দিরের পাশেই সেই সাধুর মর্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে আমিও দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছি, শুনলাম তিনিই ফলাহারী বাবা। এক পা' দু'পা করে এগিয়ে যেতেই ফলাহারী বাবা নির্দেশ দিলেন,

—আগে পূজা-পাঠ কর, দেবদর্শন হোক, পরে আবার এসো।

এমন সময় পেছন থেকে নীরেনের কণ্ঠস্বর কানে এলো—

—এই যে দাদা এখানে!

সবাই ইতিমধ্যে নীচে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে এসেছে।

আমরা ধুলো পায়েই সব একসঙ্গে নাগেশ্বর পাণ্ডার হেফাজতে মন্দিরের দ্বারে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ কেদারনাথজীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ আমি যেন তন্ময় হয়ে গেলাম। পাণ্ডা মন্ত্র পড়ায়—ধ্বনি কানে আসে—কথাগুলি শুনতে পাই না। দুই চোখে দরবিগলিত ধারা, শূলী, শম্ভু, শিব কল্পতরুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর অখণ্ড আলোকে কিছু-ক্ষণের জন্যে আমি যেন এক দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত লোকে চলে গেলাম। সমগ্র সত্তা যেন জ্যোতির সাগরে ডুবে গেল।

সম্বিত ফিরে আসতেই আমারও কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো পুজার মন্ত্র।

নাগেশ্বর পাণ্ডা অনুষ্ঠান ও উপকরণের কোনও ত্রুটি রাখেনি। স্বহস্তে কেদারনাথজীকে ঘৃত মালিশ করে গঙ্গাজলে স্নান করানোর পর বিল্বপত্রে অঞ্জলি দিলাম। দুই হাতে আলিঙ্গন করতেই শরীরের সব গ্লানি, মনের সমস্ত আবিলতা যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল। যোড়শোপচারে কেদারনাথজীর পুজো শেষ হ'ল প্রায় একটায়। এবার মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই প্রথম দালানের চারদিকে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্তি ও বাম দিকে নরনারায়ণ বা ভোগমূর্তি দর্শন করি—তারপর দ্বিতীয় দরজার দক্ষিণ দিকে পার্বতী দেবী ও বাম দিকে লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করে আমরা মন্দিরের বাইরে এলাম। মন্দিরে প্রদক্ষিণের সময় অমৃতকুণ্ডে মার্জন, তারপর নীলকণ্ঠ ও ঈশানেশ্বর মহাদেব দর্শন করা গেল।

টেম্পল কমিটির রেস্ট হাউসেই আমাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। বেশ সুন্দর সাজানো-গোছানো বাড়ী। নাগেশ্বর পাণ্ডার তদারকে মোটা পুরি, হালুয়া আর আলুর তরকারি, মন্দিরের ডান দিকে এক হালুইকরের দোকানে যথেচ্ছ খেয়ে নিলাম। পুরি এত মোটা আর চিমড়ে যে দাঁতে কেটে চর্বনের উপায় নেই—শুনলাম, ওটাই নাকি ওখানকার রাজভোগ। আহারান্তে, রেস্ট হাউসে আসতেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো। একে ১১৭৫০ ফিট্ উর্দ্ধে কেদারনাথের মন্দির, তার ওপর বৃষ্টি—এমন কাঁপন দিয়ে ঠাণ্ডা নামলো যে কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়—ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপে। একে ফাটার বৃষ্টিতে সবাইকে ফাটিয়ে দিয়েছে—তার জের এখনো কাটেনি—প্রায় সকলেরই শরীর খারাপ, আবার এই কেদারনাথ পাহাড়ের অতিরিক্ত শীত—সবাই হাত পা' গুটিয়ে যে যার বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

সেই ফলাহারী বাবার ডাক আমার মনে তখনো পাক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই বৃষ্টির বাধা মানবো কেন? কোনো রকমে বর্ষাতি দিয়ে মাথাটা ঢেকে ফলাহারী বাবার কুটীরে যাই। কেদারনাথ মন্দিরের পাশেই ছোট্ট একটি কুটীর। সামান্য পথ, জলের ঝাপ্টায় তবু বেশ একটু সময় লাগলো।

কেদারের পথে অনেক কিছু কষ্ট হয়েছে, অনিয়ম অসুবিধার অন্ত ছিল না, কিন্তু আনন্দও পেয়েছি প্রচুর। আজ এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল—এই তো আমার আপন ঘর, আমার রক্তের সঙ্গে, আমার আত্মার সঙ্গে, আমার সমস্ত জীবনের অনুচিকীর্ষার সঙ্গে এর নিগূঢ় বন্ধন—স্থান ত্যাগ হলে মানুষ বুঝি এমনি ভাবেই নিজেকে ফিরে পায়।

ফলাহারী বাবার কুটীরে পৌঁছে বসলাম। অদূরে আরো একটি লোক অতি সাধারণভাবে বসে আছেন। এই দুরন্ত শীতে আমরা যেখানে ডবল্ মোজা পরে কোটের ওপর পুরু ওভার-কোট চাপিয়ে শীতের শাসনকে অতিক্রম করতে পারি না—সেখানে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রসন্ন দৃষ্টি, মৃদু হাস্যে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"বৈঠো"। আবার বললেন, "ইধার আও, হামারা নজদীক বৈঠো।"

প্রণাম করে তাঁর কাছে ঘেঁসে বসলাম। অদূরে আরো একটি লোক তাঁর কাছে বসেছিল। আগেই শুনে-ছিলাম, সাধু কোনও অর্থ গ্রহণ করেন না। তবে চা চিনি দুধ দিলে ফিরিয়ে দেন না। এখানে আসার সময় গুঁড়ো দুধের টিন, চা ও চিনির কথা ভুল হয়নি। গৌরীকুণ্ডা থেকেই সেগুলো যোগাড় করেছিলাম। সাধুজীর সামনে সেগুলো রেখে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রণামীস্বরূপ দিয়ে যেন কতদিনের পরিচিত, এমনি একটা দাবী জানিয়ে বলি—"শুনেছি আপনি অর্থ গ্রহণ করেন না, কিন্তু, আপনার সেবায় এই অর্থের সদ্ব্যয় হোক, এই আমার আকাঙ্ক্ষা—আপনাকে নিতে হবে।"

সাধুর সুতীক্ষ্ন চোখ দুটি আর একবার জ্বলে উঠলো। স্বহস্তে গ্রহণ না করে একটা স্থান দেখিয়ে বল্লেন—

—ওই ওখানে রেখে দাও।

ফলাহারী বাবাকে জিজ্ঞেস করি—

—এই দারুণ শীতে খালি গায়ে আপনি কেমন করে থাকেন? যখন এখানে কোনও প্রাণী থাকে না—বরফে সব ঢেকে যায়—তখনও আপনি এখানেই বাস করেন, এটা কী করে সম্ভব?

ফলাহারী বাবা উত্তর দিলেন—কেদারনাথজীর ইচ্ছা। শীত গ্রীষ্ম দ্বন্দ্বের মালিক তিনি—যেমন রাখেন তেমনি থাকি—কিছুই অসুবিধে হয় না।

—আচ্ছা, যখন বরফে সব ঢেকে যায়, তখন কী করেন?

—ওই যে ওখানে খুন্তি রাখা আছে, সেটা দিয়ে বরফ কেটে ঘরের বাইরে যাই।

—শুনেছি, এই সব মোটা আর বড় বড় গাছের গুঁড়ি, যার একটাও আট

দশজন লোকও কখনই বয়ে আনতে পারে না—এগুলো কেমন করে এখানে আসে? গৌরীকুন্ডায় শুনলাম, এ সব নাকি আপনা থেকেই হাজির হয়?

ফলাহারী বাবা আমার এই প্রশ্নের উত্তর আর দিলেন না।

মনের মধ্যে অনেক কথা গুমরে ওঠে। ফলাহারী বাবাকে জিজ্ঞেস করি—

—চিঠি লিখে যদি কিছু জানতে চাই, উত্তর পাব কী?

এবার অপর লোকটি মুখ খুললেন—

—চিঠি এলে সে সব পড়া হয়, কিন্তু কোনও উত্তর দেওয়া হয় না।

—কিন্তু আমার যে অনেক কিছু জানবার আছে। জীবনের পথে যে সব অঘটন ঘটে গিয়েছে, তার মধ্যে যা কিছু অলৌকিক বলে আমি তার রহস্যভেদ করতে পারিনি—সেগুলির মীমাংসা কী—আপনার কাছে জানতে চাই।

ফলাহারী বাবা বল্লেন—

—বেশ, বল কী তোমার কথা।

আমি আমার জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি তাঁর কাছে একে একে নিবেদন করি, তিনি একটি একটি করে তার দুর্বোধ্য রহস্য খণ্ডন করে দেন। যদিও আমি ইতিপূর্বে আরো অনেক জ্ঞানী সাধুমহাপুরুষকেই আমার এই সব কথা জিজ্ঞেস করেছি—তাঁদের কাছেও যে উত্তর পেয়েছি, এঁর কাছেও অনুরূপ জবাব পেলাম। তাঁর বৈদ্যুতিক প্রভাব আমার উপর ক্রিয়া করেছিল কিনা, জানি না—কিন্তু তাঁর সাধনালব্ধ বিজ্ঞানময় উত্তরগুলি অবনত শিরে গ্রহণ করলাম। পাঁকাল মাছের উপমা না দিলেও, তিনি যা' বললেন, তার অর্থ ওই রকমই। বেশ জোর দিয়েই তিনি বললেন—

সব কিছু লৌকিক আসক্তির মধ্যে নিমগ্ন থাকলেও, তোমার মনকে তা' কখনও গ্রাস করতে পারেনি, ঠিক যেন জলে ডুবে নাক জাগিয়ে নিঃশ্বাস নেবার মত। যা' তুমি বলছ, তার সঙ্গে তোমার পূর্বজন্মের যোগ আছে। তাই তোমার জীবনেও সেই সব অদ্ভুত ও অলৌকিক দর্শন ও শ্রবণ সম্ভব হয়েছে।

তখন তাঁকে জানাই আমার আসার পথে সেই সংগীত শ্রবণের কথা—কী তার রহস্য, তাও জানতে চাই। আর কেউ শুনলো না—অথচ বারংবার আমার কানে এত সুস্পষ্ট হয়ে বেজে উঠলো সেই স্তবগান, আর সেই 'ওঁ হরি ওঁ' মন্ত্র এই বা কী এবং কেন?

ফলাহারী বাবা মাথাটা একবার দুলিয়েই বলে উঠলেন—তুমি ঠিক শুনেছ—তুমি ভাগ্যবান্—এ রকম আরও দু'চারজনের ভাগ্যে হয়েছে।

বেশী প্রশ্ন করতে সাহস হয় না—কী জানি যদি অবিশ্বাসের কোনও সুর আমার অজ্ঞাতে আমার কথায় প্রকাশ পায়। তবুও আবার তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করি—

—এ কার গান? কোন্ সংগীত? কেমন করে শোনা যায়? সবাই শোনে না কেন?

ফলাহারী বাবা নিজের বুকে একটা আঙ্গুল স্পর্শ করলেন, তারপর দু'হাত ঊর্ধ্বে দুলিয়ে উচ্চারণ করলেন—"সবই কেদারনাথজীর কৃপা।"

এই বলেই তিনি ধুনীর ওপর বসানো ঘটী থেকে গেলাসে চা ঢেলে আমার হাতে দিয়ে বললেন—'পিয়ো'—

চা খাই না—তার ওপর চিনি দেওয়া—করি কী?

মন্ত্রমুগ্ধের মত হাতে তুলে নিলাম।

অমৃতের আস্বাদন কী, সেটা না জানলেও মনে হ'ল, এই বুঝি অমৃত!

এবার সাধু আমাকে বিদায় দিয়ে বল্লেন—

—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, মন্দিরে গিয়ে আরতি দর্শন কর।

মাতালের মত টলতে টলতে বাইরে এলাম। বুঝলাম, অপার্থিব সেই সংগীত শ্রবণের জটিল রহস্যের ভার তিনি আমার ওপরেই চাপিয়ে রাখলেন। আমাকেই সেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় থাকতে হবে—শুধু আজ নয়, আজীবন।

আমি জানি, অনেকেই হয়তো আমার এই কথাগুলি অবিশ্বাসের হাসি নিয়ে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু আমাদের এই লৌকিক জীবনেই আকস্মিকভাবে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে, তাকে নিয়ে খেলা করা যায় না, বা পছন্দ ও প্রয়োজন মত তাকে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না। সর্বতশ্চক্ষু ভগবানের কাছে ফাঁকি নেই।

এই সব অঘটন যা জীবনে ঘটে যায়, তাকে আকস্মিক বা বলব কেন? ভাব, চিন্তা ও কর্মজগতে যে সূক্ষ্ম পারস্পরিক সংযোগ আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাবই হয়তো কোনও ঘটনাকে আকস্মিক প্রমাণ করতে চায়। আমার জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি হয়তো এমনি কোনও কার্যকারণ শৃংখলে বাঁধা আছে। নিছক ঘটনা বলে তাকে উপেক্ষা করতে পারি না—কারণ ঘটনাই বাস্তব সত্য। যে অচিন্তিত অনুভূতি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে অন্তরের ইন্দ্রিয়রাজিকে সজাগ করে দিলে, তার

ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির ফটো : মুকুন্দকান্ত ঘোষ

কি কোনও তাৎপর্য নেই? পথের এই যে কুড়িয়ে পাওয়া দান, তার কি কোনও সার্থকতা নেই?

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, শীতের কামড় আরও তীব্র, ফলাহারী বাবার কুটীরের ছাদে পেঁজা তুলোর মত বরফ, পাহাড়ের দীর্ঘছায়া এসে পড়েছে মন্দিরের প্রাঙ্গণে। সন্ধ্যে হচ্ছে এলো! তাড়াতাড়ি রেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে গেলাম। আরতির সময় আসন্ন—ওদের ডেকে নিয়ে আসি।

আস্তানায় পৌঁছে দেখি, এক এক-জন দু'তিনখানা করে লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। চেঁচিয়ে সোরগোল তুললাম বটে, কিন্তু দেখা গেল, কম্বল-গুলো শুধু নড়েচড়ে উঠলো। কারো মুখপঙ্কজ দৃষ্টিগোচর হ'ল না।

রতিকে ডাক দিয়ে বলি—

—মন্দাকিনীর জল এক ঘটি নিয়ে আয় তো—নীরেনকে শুদ্ধ করে নিই।

বাস্, এই একটি মন্ত্রেই কাজ হয়ে গেল।

নীরেন কচ্ছপের মত মুখ বের করে কী যেন বলতে চায়। দাঁতে দাঁতে ঐক্যতান বাদ্য, ঠোঁটে ঠোঁটে কম্পিত কোলাকুলি, শুনলাম—গণ্ডা কয়েক অস্পষ্ট ব্-ব্-ব্-ব্-ব্ শব্দ। সর্দিতে নাক বোঝাই—ভারী গলায় কী বল্লে—তার বাচ্যার্থ এই—আমায় রেহাই দাও দাদা, আমার সমস্ত শরীর অবশ।

আর একবার সজোরে নির্ঘোষ করি

—কে যাবে এসো, আমি চললাম। আর দেরী নয়।

তাতেও কারো সাড়া নেই।

মন্দিরে গিয়ে দেখি, দু' মিনিটেই আরতি শেষ হয়ে গেল। এত স্বল্পক্ষণ-স্থায়ী আরতি কেন, বুঝলাম না। হয়তো অত্যধিক শীতের জন্যই পূজারী কেদারনাথজীর কাছে মনে মনে এই বন্দোবস্তটুকু করে নিয়েছেন। ভাবলাম, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। তিনি বাইরে আসতেই আমিও হাত বুলিয়ে সেই প্রদীপ শিখার উত্তাপ মাথায় ছোঁয়ালাম। পূজারীও মন্দিরের মধ্যে অন্যান্য বিগ্রহের সামনে আরতি করে যান, আমি তাঁর অনুসরণ করি।

বাইরে এসে একবার ভাবলাম—আবার সাধুর কাছে যাই। আবার চিন্তা করে দেখি প্রায় গোটা দিনটাই তো তাঁর কাছে কাটিয়েছি—এখন আর না যাওয়াই ভাল।

চুপ করে বসে থাকা আমার কোষ্ঠীতে লেখে না। আমি বম্ বম্ করে তিন পাক মন্দির প্রদক্ষিণ করি। এমন সময় পাণ্ডাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি বললেন,

—পশুপতিনাথ থেকে আজ সন্ধ্যায় এক অঘোরপন্থী সাধু পদব্রজেই এখানে এসেছেন। তিনি সর্বভুক্—অখাদ্য কুখাদ্য বিচার করেন না—যা পান তাই খান!

—কোথায় তিনি?

—যেখানে আজ আপনাদের মধ্যাহ্ন-ভোজ হয়েছে, সেই খাবারের দোকানের পাশেই তিনি আড্ডা গেড়েছেন।

গিয়ে দেখি, সাধুর মাথায় এলো-মেলো জটা—দুই চোখে দুটো জ্বলন্ত ভাঁটা বসানো আছে। পাশেই টক্‌টকে সিঁদুর-মাখানো ত্রিশূল—বাঘের চামড়া পেতে, এক উৎক্ষিপ্ত চাউনি নিয়ে উগ্র তপস্বী সমাসীন। আরও দেখলাম, কুকুরের বিষ্ঠা কুড়িয়ে নিয়ে, নিজের মন্ত্র ত্যাগ করে ভোজ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে যাচ্ছেন—দ্বিধাহীন, বিচারহীন, বিকারহীন—আর কী অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালাগাল—এত অশ্রাব্য যে কানে আঙ্গুল দিতে হ'ল।

ভাবলাম, এ কী সাধনা রে বাবা! কোন্ অসাধারণ স্তরে উঠলে মানুষের এই সব ভেদবুদ্ধির জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। যদিও ইতিপূর্বে বামাচারী, কাপালিক, অঘোরপন্থীদের দেখেছি, কৌতূহল থাকলেও, এ'দের নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিনি।

হাঁটি হাঁটি পা' পা' করে দু এক কদম এগিয়ে গেলাম। সভয়ে জিজ্ঞেস করি

—আপনি কোন্ পন্থী?

রক্তচক্ষু তুলে বললেন

—অঘোরী।

—আপনার আশ্রম কোথায়?

—তামাম দুনিয়া।

তারপরেই নিজের মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিতেই, তাঁর জটাগুলো যেন কথা বলে উঠলো। একটা জবরদস্ত্ হাঁক ছাড়লেন।

—চেত্ রে চেত্ রে চেত্।

ঝুলির মধ্যে হাত দিয়ে চক্‌চকে চাক্‌তির মত কী একটা বের করেই আমার সামনে ধরলেন।

—নে বেটা, সঙ্গে রাখিস্—হর হর বম্ বম্ ভোলানাথ!

কিছু প্রণামী দেওয়ার উদ্দেশ্যে পকেটে হাত দিতেই সাধু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—

—যা যা, যা দিবি, সব কেদার-নাথজীকে দিস্—আমি তাঁর কাছেই চেয়ে নেব—এখন আমার সামনে থেকে সরে যা!

আর কথাটি নয়—সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চাদপসরণ।

রেস্ট হাউসে ফিরে এসেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। এতক্ষণে উদর-দেবতা সচেতন হলেন। কিন্তু ওদিকে কোনও উদ্যোগ-আয়োজন নেই। কাজেই রামবাড়া থেকে প্রস্তুত করে আনা লুচি আর আলুর দম দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে নিই। নিদ্রাদেবীর আরাধনার প্রয়োজন ছিল না। তিনি যেন তৈরী হয়েই ছিলেন; চোখ বুজতেই আমাকে বন্দী করে নিদ্‌মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা ৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Maha Bhringaraj
Taila
SA-2/60

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ তেইশ ॥

এ-হাসির সাথী স্বাতির চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ হতেও পারে না; মালা দেখেই প্রশান্তর কি আশা হয়েছিল সেকথা তাকে বলতে হবে তো— হাসিচ্ছলেই, আশঙ্কার কথাটা বাদ দিয়েই। আজকাল দুজনের সঙ্গে সম্বন্ধ ধরে ওদের আলাপ প্রায় এই পর্যন্ত এগিয়ে আসে, মালাবিভ্রাটের সুযোগে আর একটু এগুক না।

তারপর......আর একটা কথা মনে পড়ে গেল প্রশান্তর—মস্তবড় একটা সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় এই সুযোগে। সেলাইয়ের কলটা স্বাতির জন্যই কেনা, কিন্তু দিয়ে উঠতে পারা যাচ্ছিল না, এইবার একটা রাস্তা হোল। বেশ একটি কৌতুক-অভিনয়ও হবে যার মধ্যে লাহিড়ীমশাইও যদি একটু এসে পড়েন তো এমন কিছু দোষের হবে না।

গোড়া থেকেই আরম্ভ করে দিল সেটা। অনাথকে বলল—"তোমার মালা দেখে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল অনাথ। দেবতা এক রয়েছেন, অথচ তাঁর একটু সেবা হয় না। না থাকে দুটো ফুল, না দেওয়া হয় একটু ধূপ-ধুনো। মালার কথা ছেড়েই দাও, আজ তুমি এনে একটা দিলে, তাই, তাও দেখ না কতদিন থেকে আনব-আনব করে—আর সত্যি রোজ নিয়ে আসা তো সম্ভবও নয়—ফল এই দাঁড়িয়েছে, নিজের ঠাকুর নিজেই ভুলে বসে আছি, সে তো দেখলেই!"

মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলও নিজের মূঢ়তায়। অনাথ বলল—"তাই তো ভেবে সারা হচ্ছি—ঘরের দ্যাবতাকে চিনিয়ে দিতে হবে এ কেমন......"

"......নাস্তিকের বাড়ি।" —ওর কথাটা এইভাবে পূর্ণ করে দিয়ে, ওকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে এগিয়েই চলল—"তাই আমি ঠিক করলাম তোমাদের ওখানেই রেখে আসি না হয় ঠাকুরকে; আদর-যত্ন খাবেন, সুখে থাকবেন।"

অন্যদিক দিয়েও ভাল হোল। চাটুজ্যের কাছেও মালার রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেলে সে এসে চৌকাঠের একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে কৌতুকটা উপভোগ করছিল, প্রশান্ত তাকেই ঠাকুরকে তুলে দিতে বলল জীপে—কি করে সাবধানে তুলতে হয় অনাথকেও দেখিয়ে দিতে বলল। চাটুজ্যে অনেক কষ্টে হাসি চেপে কলটা নিয়ে গিয়ে জীপে বসিয়ে দিল। অনাথকে পাশে বসে ধরে থাকতে বলে, গাড়িটা গ্যারাজ থেকে বের করে স্বাতিদের বাড়ির দিকে চলল প্রশান্ত। মনটা খুব প্রফুল্ল। বৃষ্টিটা আরও ধরে এসেছে, কয়েকদিনের পরে আজ এই প্রথম। মেঘে ফাটলও ধরেছে জায়গায় জায়গায়। কৌতুক-অভিনয়ের দ্বিতীয় দৃশ্যটা কি দাঁড়াবে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। খুব আস্তে আস্তে ড্রাইভ করছে, মাঝে মাঝে অনাথকে তাগিদ দিচ্ছে, বেশ যেন সাবধানে ধরে থাকে। ঘুরে দেখছেও মাঝে মাঝে। দেবতা গড়িয়ে পড়লেই তো সব পন্ড।

লাহিড়ীমশাই বাইরের বারান্দায় একরাশ বইখাতার মধ্যে বসে ছিলেন। প্রশান্ত আসতে আসতেই দেখল তিনজন লোক ছাতা মাথায় দিয়ে বাবলার দিকে যাচ্ছে, খানিকটা দূরে। নিশ্চয় স্কুল-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই ওদের সঙ্গে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল। প্রশান্তকে দেখে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—"এসো, এসো প্রশান্ত। বাঁচালে। কী একলাই যে পড়ে গেছি—মানে এই বৃষ্টির জন্যে আর কি—তিনদিন স্কুলেও যাইনি—রেনি ডে (Rainy day) দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে—বাপে-বেটিতে পুরনো বইগুলো টেনে টেনে...এসো, বসো... ওটা কি মালা জড়ানো।"

যেটা মইলা দিতে দিতে আসছিল এতক্ষণ, কুন্ঠাবশে গলায় গেল আটকে। ফাঁক পেয়ে অনাথই আরম্ভ করে দিল—

"দেবত্যা......"

"দেবতা!"—বিস্মিতভাবে প্রশান্তর মুখের দিকে চাইলেন লাহিড়ীমশাই। একটু রহস্যের মধ্যে দিয়ে অনাথের গল্পটাই বিবৃত করবার ইচ্ছা ছিল প্রশান্তর, তারপর হাসিচ্ছলে বলত ওরা খুড়োভাইঝিতে যখন [illegible] [illegible]

চিনেছে, ওদের হেফাজতেই রেখে যাবে ঠিক করেছে। কিন্তু কিছুই মুখ দিয়ে বেরুল না, উনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ তুলে চাইতে ওর দৃষ্টিটা বর্ধিত কুণ্ঠায় আরও নতই হয়ে গেল। অনাথ বলে চলল—

"অবিশ্যি শিবঠাকুরও নয়, কেষ্টও নয়, আমাদের দ্যাবতার মতনই দ্যাবতা। তা তবু তো হেনস্তা হতে দেওয়া চলে না—অথচ দেখলুম, হচ্ছে—চাকরবাকর নিয়ে সংসার—ওনারও সময় নেই..,তাই বললুম......"

বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, একটু যেন রাগের ভাবই—ভালো হোক মন্দ হোক, দেবতাকে ঠাঁইনাড়া করার দায়িত্বটা নিজের ঘাড়েই নিতে চায়। প্রশান্ত লজ্জিতভাবেই বলল—"নামাও।"

বারান্দায় উঠে এলেও মাথায় করেই দাঁড়িয়ে ছিল অনাথ, খুব সন্তর্পণে নামিয়ে মাদুরের ওপর রাখল। অজান্তে যদি কিছু অপরাধ হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্যে মখমলের ওপর একবার হাতটা চেপে কপালে ঠেকাল। প্রশান্ত কুণ্ঠিত হাসিটা ঠোঁটে নিয়ে মখমলটা তুলে নিল, রহস্যটা যাতে আর এক মুহূর্তও না থাকে সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভও করে দিল, লজ্জিতভাবে মাথাটা হেঁট করেই—"কোম্পানীর এজেন্ট এসে গছিয়ে দিয়ে গেল একটা—জানেনই তো কি রকম নাছোড়বান্দা ওরা—মাসে মাসে কিছু করে দিয়ে যেতে হবে—মনে করলাম স্বাতিদেবীর দরকারে লাগতে পারে—একলা থাকেন..."

—কে মাসে মাসে শোধ দিয়ে যাবে মূল্যটা সেটা উহ্য রইল। গ্রহণ করেছেন লাহিড়ীমশাই কন্যার হয়ে, মুখের প্রসন্ন-ভাবটি আরও ভালো করে ফুটে উঠেছে। বললেন—"একলা? একলা থাকবার পাত্রী কিনা সে! একটু বৃষ্টি ধরেছে, আর গাঁয়ে ঢুকে পড়েছে বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিতে!...তা নিয়েছ তো নিয়েছ, কিন্তু একটা খরচের রাস্তা খুলে দিলে যে—আর গাঁয়ে ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি কেউ কি খালি গায়ে থাকতে পাবে?"

"সে খরচ জোগাবে ঐ চাটুজ্যে। ভানার ঘাড় যোগাবে!"

—অনাথ। দুজনেই চোখ তুলে চাইতে গোঁফ দুটো ফুলিয়ে হনহন করে ভেতরে চলে গেল। লাহিড়ীমশাই হেঁকে বললেন—"ওরে, তোর মা-ঠাকুরকে ডেকে আন। বৃষ্টিটা ধরেছে, আমি ভাবছি একটু বেড়িয়ে আসব।"

চাটুজ্যের ওপর রাগের সূত্র ধরেই সেলাইকল-দেবতার সমস্ত কাহিনীটা বলে গেল প্রশান্ত, পূর্বাপর মিলিয়ে সেই যে এ-অনর্থের মূলে এটা তো বেশ টের পাওয়া যায়। শেষ হলে বলল—"আপনি যদি একটু ঘুরে আসতে চান তো আমার মনে হয় বেরিয়ে পড়াই ভাল, কখন আবার বৃষ্টিটা এসে পড়বে। তা ভিন্ন বেলাও পড়ে আসছে।"

—উনি যে সুযোগটা করে দিচ্ছেন সেটাকে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে নেওয়া আর কি।

"মন্দ বলনি। তাহলে হয়েই আসি, কি বলো?"—উঠতে উঠতেই কথাগুলা বলে লাহিড়ীমশাই ভেতরে চলে গেলেন। কামিজ গায়ে দিয়ে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন—"এতক্ষণ একলাই থাকবে?"

প্রশান্ত বলল—"কতটুকুই বা? আমি ততক্ষণ বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি; পড়া তো হোল না জীবনে।"

"বিনা মেহনতেই পাবে?"—হেসেই জবাবটা দিয়ে, "ঘুরে আসি আমি তাহলে" —ব'লে নেমে গেলেন লাহিড়ী-মশাই।

জীবনের সন্ধিক্ষণে এক এক সময় এক একটা কথা অদ্ভুত অর্থ নিয়ে এসে পড়ে। মনে হয় জীবন-নিয়ামক কোন্ এক অদৃশ্য দেবতা উৎকট শ্লেষ হানল একজনকে নিমিত্ত করে।......মেহনতও করতে হোল না প্রশান্তকে সম্পদলাভের জন্য।

একখানা বেশ মোটা সংস্কৃত বই সামনে পড়েছিল। লম্বা-চওড়া, মোটা পিজ্-বোর্ডের মলাট দিয়ে ভালো করে বাঁধানো। এদিকে কিনারায় কাগজের রংটা দেখে মনে হয় খুব পুরানো, কয়েক জায়গায় ক্ষয়েও গেছে। অলস কৌতূহলেই পাতা ওলটাতে গিয়ে এক জায়গায় আপনিই খুলে গেল বইটা; সেকালের একটা ছোট আকারের পোষ্ট কার্ড বুক-মার্ক হিসাবে খানিকটা বের করে গোঁজা আছে। ঠিকানার দিকটাই সামনে পড়ল। লেখা রয়েছে—দারুকেশ্বর

ঠিকানার দিকটাই সামনে পড়ল

"বললাম ক'বার, শিখে নাও। সংস্কৃত হ'ল সব বিদ্যার খনি, ওর ভেতরে কি সম্পদ যে লুকনো আছে!"

"সম্পদলাভের কপালও হওয়া চাই তো।"—হেসে বলল প্রশান্ত।

লাহিড়ী, তার নীচে গ্রাম, পোষ্টাফিস, জেলা। নামের ওপরেই দৃষ্টিটা আটকে রইল অনেকক্ষণ, প্রথমটা শুধু এই হিসাবেই যে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হোল লাহিড়ীমশাইয়ের নামটা। তারপর

একসময় হঠাৎ সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন তড়িৎ-প্রবাহ খেলে গিয়ে মনে হোল মাথার চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। দারুকেশ্বর প্রশান্তর বাবারও নাম।

এও মুহূর্ত কয়েকের জন্যই। আবার শান্ত হয়ে এল মনটা, অবশ্য আপনি-আপনিই নয়, চেষ্টা করতে হোল। দুটো নাম এক হয়েছে তো কি হয়েছে? নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার, এর দ্বারা তো কিছুই প্রমাণ হয় না। দৃষ্টিটা ঠিকানার ওপর গিয়ে পড়তে আর একটু শান্ত হয়ে এল মনটা। না, ওদের জেলা নয়, এ গ্রাম, এ পোষ্টাফিসের নামও শোনেনি কখনও প্রশান্ত। বাবার বন্ধু, একেবারে স্যাঙাৎ তা হলে শুনত না? এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ যে ছিলেন জীবনে তাও তো শোনেনি।......কি লেখা আছে চিঠিটায় না হয় দেখবে?

উৎকট কৌতূহলের ঝোঁকে প্রায় উলটেই ফেলেছিল চিঠিটা, শিক্ষাসংস্কার বাঁচাল ওকে—এ-কাজ কখনও করেনি, আর, করবে তা একেবারে লাহিড়ী-মশাইয়েরই বেলায়! স্বাতির বাবা!

বইটা বেশ শব্দ করেই বন্ধ করে দিল তাড়াতাড়ি, পোষ্ট কার্ডটা ভেতরে ঠেলে প্রায় লুপ্ত করে দিল বইয়ের মধ্যে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন কুলুপের মধ্যে বন্ধ করে একেবারে ঘুরিয়ে নিল মনটা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আসা তাইতে।......কখন আসবে স্বাতি? তাকে যে দিতে হবে কলটা—লাহিড়ীমশাইয়ের ফিরে আসবার আগেই দিতে না পারলে দেওয়ার মাধুর্যের অনেকখানিই যে বাদ পড়ে যাবে।......জুঁই ফুলের গন্ধটা যেন একটা সাড়া জাগিয়ে নাকে এসে ঢুকল হঠাৎ। সামনেই রয়েছে, অথচ এতক্ষণ যেন তার সব গন্ধ গুটিয়ে নিয়ে পড়ে ছিল।......দেবে কোথায়? এটা যে বড্ড বিরস পরিবেশ। উপহার দেওয়ার নাকি যোগ্য স্থান? অনাথ আসুক, বাগানে নিয়ে যাবে।......দেরি করেই আসবেন নিশ্চয় লাহিড়ীমশাই, সবই তো বুঝেছেন।......কিন্তু এ কি?—বড্ড যে দেরি করছে স্বাতি। পাঁচখানা ঘর নিয়ে তো গ্রাম, করছে কি এতক্ষণ ধ'রে?

না হয় দেখবেই একবার চিঠিটা?

॥ চব্বিশ ॥

হটাৎ মনটা চিঠিতে ফিরে আসতে সমস্ত শরীরটা আবার যেন ঝনঝন করে উঠল। বাবা তার আত্মহত্যা করে মারা যান। কেন!

অসহ্য বোধ হচ্ছে। স্বাতির জন্য সে-অধৈর্যতা গিয়ে আর যেন এক মুহূর্ত টিকতে পারছে না এখানে। স্বাতি এসেই টের পেয়ে যাবে চিঠির কথা—চিন্তার বিশৃঙ্খলতায় মনে হচ্ছে যেন টের পেয়েই গেছে—টের পেয়েই গেছে সে। প্রশান্ত ওর বাবার স্যাঙাতের ছেলে—যাঁর জন্য ওরা এরকম সর্বস্বান্ত হোল।

বাড়িটা অরক্ষিত থাকবে। কিন্তু অত আর ভাবতে পারছে না। তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে লিখল—একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে হটাৎ চলে যেতে হোল—গোপেশ্বর ডাকতে এসেছিল।

একটু নিরিবিলিতে মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে হবে। আর পারছে না। কলটার কথা মনেও পড়ল না।

বাসায় গিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে এলিয়ে বসল প্রশান্ত; বাবার আত্মহত্যার সূত্র ধরে, নিজেদের পারিবারিক জীবনের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে দৃষ্টি বুলিয়ে যেতে লাগল। একটা কথা পূর্বে এমন-ভাবে চিন্তা করে দেখেনি, আজ নূতন পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়ই জাগাচ্ছে মনে। ওদের পারিবারিক জীবনের একটা বড় অংশের সম্বন্ধে ও নিজেই বিশেষ কিছু জানে না।

গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরই বাবা ওকে তাঁর এক বন্ধুর হেফাজতে দক্ষিণ ভারতে সুদূর বাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দেন। সেখানে যখন ও বি-এস-সির ছাত্র সে সময় পিতৃবন্ধু বদলি হয়ে যান। প্রশান্ত কিন্তু বাবার নির্দেশে সেখানে হোষ্টেলে থেকে বি-এস-সি পাস করে, তারপর সেইখানেই পাঁচ বছরের ইন্‌জিনিয়ারিং কোর্স শেষ করে। এরপর সেখান থেকেই বম্বে হয়ে বিলাতে চলে যায় পড়ার জন্য। বাঙ্গালোরের এই দীর্ঘ দশ বছরের প্রবাসের মধ্যে খুব বেশী আসেনি দেশে।

বাঙ্গালোরের তুলনায় দেশ ভালোও লাগত না তেমন, মনের দিক দিয়ে যেন যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অনেকটা। বাবাও পড়ার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় অল্প কয়েকদিন পরেই ফেরত পাঠিয়ে দিতেন ওকে। ছোট সংসার ওদের—বাবা, মা, প্রশান্ত তাঁদের একমাত্র ছেলে, আর প্রশান্তর বোন উমা।

যখন গেল বাঙ্গালোরে, বাবা তখন কলকাতার থেকে একটা সওদাগরি অফিসে চাকরি করেন, শনিবারে শনিবারে আসেন বাড়ি, গ্রামের আর সব কলকাতার চাকুরেদের মত: প্রশান্ত যায় একরকম পিতৃবন্ধুর দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করেই। উনি বাঙ্গালোর ছেড়ে চলে যাওয়ার একটু আগে থেকেই প্রশান্তদের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম একবার এসে কলকাতাতেই উঠল; ওরা গ্রাম ছেড়ে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গেছে। ভাড়া বাড়ি। দ্বিতীয়বার প্রায় বছর দুই পরে এসে নিজেদের বাড়িতেই উঠল। মাঝারিগোছের নূতন স্টাইলে বেশ ভালো বাড়ি। তৃতীয়বার এসে দেখল, মোটর হয়েছে। প্রত্যক্ষ যোগ নেই, সুতরাং উন্নতির কারণটাও একটা সহজ অনাড়ম্বতার সঙ্গে পেয়ে যেতে লাগল—অফিসে ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছে বাবার। যোগ্যের চিরকালই হয়ে আসছে, এই জ্ঞানই যথেষ্ট, কৌতূহল এটা ডিঙিয়ে আর ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করেনি কখনও। এর পরেই বিলাতে চলে গেল। বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, একমাত্র ছেলেকে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন—এটা তো প্রশান্তও আশা করে ব'সে ছিল।

আজ মনে হচ্ছে এই যে তাকে বরাবরই বাইরে ঠেলে রাখা—এটা হচ্ছে যেন একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ীই। অবশ্য যদি মেনে নেওয়া যায় বাবাই ছিলেন লাহিড়ীমশাই-এর সেই বন্ধু। মনটাকে কে যেন ওদিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। মন যেদিকে চলে, সেইদিককার যুক্তিও প্রবল হয়ে ওঠে। দারুকেশ্বর নামটা খুবই একটা অসাধারণ নাম, খুবই অল্প শোনা যায়। দুটো দিক যেন বড় বেশি মিলে যাচ্ছে। মিলের ঝোঁকেই একটা কথা মনে হয়ে মনটা অনুশোচনায় ভরে গেল। শুধু সংস্কারের বশে মস্ত বড় একটা ভুল করে বসেছে। পোস্টকার্ডের ঠিকানাটা টাইপ করা ছিল, নাই পড়ুক সেভাবে, উল্টে দেখলে হাতের লেখাটাও দেখতে পাওয়া যেত, বোঝা যেতো বাবার কি অন্য কারুর। আর কোন উপায় নেই। নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে প্রশান্তর। এমন অবস্থাতেও অনুশাসন মেনে চলার এত বাড়াবাড়ি! বাবার সম্বন্ধে এই রকম কুটীল সন্দেহটাও তো অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারত!

এর সঙ্গে সঙ্গেই, এই পথ ধরেই একটা উজ্জ্বল আলোকরশ্মি এসে পড়ল মনে। এত সহজ, অথচ কোথায় যে ছিল এতক্ষণ।

অনাথ দেখেছে লাহিড়ী মশাই-এর বন্ধুকে। একবার নয়, অনেকবার, নানাভাবে। একেবারে নিঃসংশয়িত প্রমাণ।

প্রশান্ত উঠে সোজা হয়ে বসল, উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। দুটো হাতের আঙুলগুলোই চেয়ারের হাতলের ওপর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গলায় একটু অনাবশ্যক জোর দিয়েই প্রশান্ত হাঁকল—'ঠাকুর! গোপেশ্বর কোথায়? আছে গোপেশ্বর?'

গোপেশ্বরই ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, বলল—"ডাকছেন আমায়?"

"এখুনি গাড়িটা বের করে বেরিয়ে যা তাড়াতাড়ি, অনাথকে নিয়ে আয়। ......কোথায় চললি আবার! এই দ্যাখো!"

অনাথ একটা মস্ত বড় প্রমাণ নষ্ট করে যেন পালাবে কোথায়! গোপেশ্বর বলল—"কোটটা নিয়ে নিচ্ছি।"

—রেলের মনোগ্রাম বসানো খাকি কোট। আজকাল গোপেশ্বরেরও এদিকে খুব লক্ষ্য। একরকম মনিব-পত্নীর বাড়িই তো, ঠাটটুকু বজায় রেখেই যাওয়া-আসা করতে চায়।

"আবার কোট!......বেশ; যা শিগগীর।" অধৈর্যভাবে বলে উঠল প্রশান্ত।

একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার মুখে মনটা অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বারান্দাটায় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল প্রশান্ত। কিছুই যেন গুছিয়ে ভাবতে পারছে না। তারপর আর এক ব্যাপার করে বসল। হাত ঘড়িটা ঘরের মধ্যে চলে গেল। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে পুলের কারখানায় ফোন করল—মালবাহী লরীটা যেন সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চাটুজ্যেকে ডেকে স্টোভ জেলে কিছু পাউরুটি টোস্ট করে টিফিন-কেরিয়ারে দিয়ে দিতে বলল তাড়াতাড়ি; কিছু ফল থাকে তো, আর কিছু বিস্কুট।

জীপে করে শুধু অনাথই না, লাহিড়ীমশাইও এসেছেন, সঙ্গে স্বাতিও। চাটুজ্যে জানাল, প্রশান্ত সামনের গাড়িতেই কলকাতা চলে গেছে। না, কিছু বলে যায়নি।

হয় নিশ্চিত প্রমাণের সম্মুখীনই হতে পারল না প্রশান্ত, নয়তো এর চেয়েও যদি আরও সুনিশ্চিত প্রমাণ কিছু থাকে—একেবারেই অকাট্য প্রত্যক্ষ, তো তারই সন্ধানে গেল চলে।

(ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

ইডেন গার্ডেনের রনজি স্টেডিয়ামে একটি অভিনব ধরণের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন চলেছে, এ-খবর হয়তো অনেকেই কাগজে দেখেছেন। খবরের সংগে ছবিও বেরিয়েছে। ছবি দেখে বোঝা যায়, চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি এটি তা থেকে একেবারেই আলাদা। 'বিজ্ঞানের কথার' পাঠকরা নিশ্চয়ই এই অভিনব ধরনের চলচ্চিত্র সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে আছেন। ইতি-মধ্যে এই চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিস্তৃততর খবর জানিয়ে ইউ-এস-আই-এস থেকে একটি সমাচার-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য দুটি ছবি সমেত এই সমাচার-পত্রটি আমরা সম্পূর্ণ মুদ্রিত করলাম।

* * *

॥ অভিনব চলচ্চিত্র প্রদর্শনী : 'সারকারামা' ॥

ইডেন গার্ডেনের রণজি স্টেডিয়ামে নবনির্মিত এক বিচিত্র গম্বুজাকৃতি মণ্ডপে ২২শে সেপ্টেম্বর এক অভিনব চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে। এর নাম 'সারকারামা'। গোলাকৃতি এই প্রেক্ষা-গৃহের সর্বদিকেই রয়েছে চলচ্চিত্রের পর্দা। অর্থাৎ পর্দার পরিবেষ্টনীর মধ্যেই আপনাকে বসতে হবে আর সেই অবস্থায় আপনার মনে হবে আপনি যেন সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্র-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের এই চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে আমেরিকার বর্ণাঢ্য দৃশ্যাবলী আর নানা বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল আমেরিকার মানুষ অতি বাস্তব ও জীবন্ত মনে হবে আপনার কাছে।

'সারকারামার' জাদু-ক্যামেরার চোখ আপনাকে একেবারে আমেরিকার কেন্দ্র-স্থলে এনে হাজির করবে। কলকাতার রণজি স্টেডিয়ামে গম্বুজাকৃতি প্রেক্ষাগৃহে বসে আপনার এই অনুভূতি জন্মাবে আপনি যেন সশরীরে আমেরিকায় রয়েছেন। 'সারকারামা' ক্যামেরার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও যেন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করে চলেছেন। 'সারকারামা' নিশ্চয়ই আপনাকে স্থান কাল ভুলিয়ে দেবে, আপনার মনে হতে থাকবে যে এই চলচ্চিত্রের জগতেই আপনি বিচরণ করছেন।

কার্টুন চলচ্চিত্রের উদ্ভাবক চলচ্চিত্র নির্মাণশিল্পে অন্যতম দিক্‌পাল ওয়াল্‌ট ডিজনীর নবতম আবিষ্কার এই 'সারকারামা'।

এই চলচ্চিত্রে আমেরিকার পূর্ব উপকূলে অতলান্তিকের তীর থেকে পশ্চিম উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত সারা যুক্তরাষ্ট্রই তার বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও বর্ণসমারোহ নিয়ে দর্শকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। নিউ ইয়র্ক পোতাশ্রয়, নিউ ইয়র্ক শহর, বিখ্যাত টাইমস্ স্কোয়ার, ভারমণ্ট রাজ্যের একটি গ্রাম, ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামসবার্গ, রাজধানী ওয়াশিংটন, সানফ্রান্সিস্কো, বিখ্যাত হুভার বাঁধ, সংরক্ষিত অরণ্য এলাকাসমূহ, পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময় গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন —একের পর এক এমনি আরও কত কিছুর সংগে দর্শকের পরিচয় হবে। দর্শকই হয়ে উঠবেন এই চলচ্চিত্রের নায়ক। গোটা চলচ্চিত্র জুড়ে তিনিই যেন চলেছেন কখনো হেঁটে বা গাড়িতে, কখনো বিমানে, কখনো কারখানায়, কখনো

"সারকারামা" প্রেক্ষাগৃহ

স্পারমার্কেটে, কখনো কোনো পল্লী অঞ্চলের ব্যবসাকেন্দ্রে বা কোনো স্কুলে।

কেমন করে এ সম্ভব হচ্ছে? আসলে 'সারকারামা' ক্যামেরা ১১টি চলচ্চিত্র ক্যামেরার সমষ্টি। একটি কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে বহির্মুখী ১১টি লেন্স সমন্বিত ক্যামেরাটি মোটরগাড়ির ওপরে একটি উঁচু পাটাতনে যা বিমানের তলার দিকে স্থাপন করা হয়, তারপর একই সংগে চারিদিকের ছবি তুলে নেওয়া হয়। ফিল্ম ডেভেলাপ করার পর ১১টি প্রোজেকটর বা প্রক্ষেপক যন্ত্রকে বিদ্যুৎ শক্তিতে যুক্ত করে একই সংগে গোলাকৃতি প্রেক্ষাগৃহের সর্বদিকে ১১টি স্ক্রীনের ওপর তা থেকে আলোকসম্পাত করা হয়। প্রত্যেকটি স্ক্রীন বা চলচ্চিত্রের পর্দা ১০ ফুট উঁচু ও ১৩ ফুট লম্বা।

॥ জিওডেসিক ডোম—স্থাপত্য-শিল্পের নবতম অবদান ॥

যে গম্বুজাকৃতি প্রেক্ষাগৃহে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় সেটির নির্মাণ-কৌশলও কম বিচিত্র নয়। ভারতে এর আগেও জিওডেসিক ডোম বা গম্বুজাকৃতি মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু 'সারকারামা' মণ্ডপটি নির্মাণের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। মাত্র জন কুড়ি লোক তিনদিনের মধ্যে এটির নির্মাণ সমাপ্ত করতে পারে।

ভূমিতে এই প্রেক্ষাগৃহের ব্যাস হবে প্রায় ১০০ ফুট এবং উচ্চতা ২৮ ফুট। প্রথমে ঐ আয়তনের মেঝে তৈরি করা হয় কংক্রিটের সাহায্যে। কয়েক শ' অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক ও টিউব জুড়ে মণ্ডপের কাঠামোটি নির্মাণ করা হয়। নির্মাণকার্য শুরু হয় মণ্ডপের সবচেয়ে ওপরের দিক থেকে। কিছুটা নির্মাণের পর একটি বিরাটকায় বেলুনকে ঐ কংক্রিটের মেঝের ওপর বায়ুপূর্ণ করে স্ফীত করা হয় এবং ঐ প্রিফেব্রিকেটেড কাঠামোর অংশটি ভূমি থেকে ঐ স্ফীত বেলুনের সাহায্যে উচ্চে তোলা হয়। তারপর ঐ কাঠামোর চারিদিকে আবার টিউব ও ডিস্ক জোড়া দিয়ে বেলুনটি স্ফীত করে কাঠামোটিকে আরও উচ্চে তোলা হয়। এইভাবে নির্মিত গোটা কাঠামোটি একটি খোলা ছাতার আকৃতি লাভ করে। তারপর কাঠামোর নিচে সেই বেলুনের সাহায্যেই ধূপালী নাইলনের আচ্ছাদন আটকে দেওয়া হয়। এইভাবে মণ্ডপটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই মণ্ডপ নির্মাণকার্যে বিপরীত পন্থা আশ্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ, একেবারে ওপর থেকে নির্মাণকার্য শুরু করে শেষ করা হচ্ছে একেবারে নিচে এসে। নানা মাপের ৬০০ টিউব, ১৫০টি প্যান ও ডিস্ক ও প্রায় ২৪০০ নাট-বল্টু দরকার হয় এই মণ্ডপ নির্মাণের কাজে।

এপর্যন্ত বিশ্বের সাতটি দেশের রাজধানীতে 'সারকারামা' প্রদর্শনী হয়েছে। লক্ষ লক্ষ দর্শক এই অভিনব চলচ্চিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

রণজি স্টেডিয়ামে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

॥ টেলিভিশনের মাধ্যমে জনশিক্ষা ॥

টেলিভিশন এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে শোনা কথা। এই কলকাতার মতো শহরেও মাত্র একবার আমরা টেলিভিশনের অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। এই রণজি স্টেডিয়ামেই, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে টেলিভিশনের প্রচলন হতে এখনো ঢের দেরি। ইউরোপে ও আমেরিকায় শুধু যে টেলিভিশনের প্রচলন হয়েছে তাই নয়, জনশিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও টেলিভিশনকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং তাতে যে আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়েছে তা দেখে শিক্ষাবিদরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন খুবই উপযোগী। আমাদের দেশে টেলিভিশন তো দূরের কথা, চলচ্চিত্র ও রেডিওকেও এখনো পর্যন্ত আমরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারিনি। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করা যেত তাহলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক নিশ্চয়ই নীরস বলে মনে হত না এবং বই মুখস্ত করার অনন্যোপায় দায় থেকে হয়তো তারা বেঁচে যেত।

যাই হোক, সম্প্রতি দিল্লী থেকে খবর এসেছে যে দিল্লীর আকাশ-বাণীর উদ্যোগে ভারতে টেলিভিশনের মাধ্যমে জনশিক্ষার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এবিষয়ে কয়েকটি আলোচনা-বৈঠকও হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে দিল্লীর ১৫০টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টেলিভিশনের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রায় তিনশো শিক্ষককে টেলিভিশনের যথাযথ প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এই ১৫০টি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে সপ্তাহে তিন দিন করে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় টেলিভিশনে শিক্ষা দেওয়া হবে।

॥ কলকাতার প্ল্যানেটেরিয়াম ॥

কলকাতায় অদূর ভবিষ্যতে টেলিভিশন প্রবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অন্য একটি বিষয়ে আমরা খুবই ভাগ্যবান। ভারতের প্রথম প্ল্যানেটেরিয়ামটি এই কলকাতাতেই তৈরি হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই নাকি প্ল্যানেটেরিয়ামের কাজ শেষ হবে। বিদেশে যাঁরা প্ল্যানেটেরিয়াম দেখে এসেছেন তাঁদের কাছে শুনেছি, প্ল্যানেটেরিয়াম এমন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা যা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। আশা করা চলে, অন্ততঃ এই প্ল্যানেটেরিয়ামকে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষা দেবার জন্যে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারব। কলকাতার প্ল্যানেটেরিয়াম সম্পর্কে এই স্তম্ভে ইতিপূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। উৎসাহী পাঠকরা ২২শে আষাঢ় তারিখের ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যাটি দেখে নিতে পারেন।

রূপান্তর

জগদীশ মোদক

প্রতি বছর মার্চের শুরুতে যখন রাস্তার ধারে সারিবদ্ধ মেহগিনি আর গুলমোরের গাছ থেকে ঝির ঝির ক'রে অবিরাম পাতা ঝ'রতে শুরু করে, শুকনো ঝরাপাতায় সারা পথটা ছেয়ে যায়, মাঝে মাঝে দক্ষিণের এক একটা দমকা বাতাস এসে খেয়ালখুশিতে সেই পাতাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়, যখন সামনের মাঠটার ওপারে বড়ো শিমুল গাছটা রক্তিম হ'য়ে ওঠে, আর উদাস-দুপুরে মাঝে মাঝে কোকিল ডেকে ওঠে, তখন কি জানি কেন, মহুয়াবনীর কথা আমার মনে প'ড়ে যায়। মনে পড়ে লতিকার কথা।

বারো বছর আগেকার কথা। তবু কেন জানি না প্রতিবার ঠিক এই সময়টিতে বারো বছর আগেকার অতীত যেন কথা ক'য়ে ওঠে।

কথা কয়। কাছে টানে। একটা আকর্ষণবোধে প্রতিবারই মনে বড়ো চাঞ্চল্য অনুভব করি।

বরাকরের ধারে সেই অরণ্যভূমি, সেই টিলা, সেই মহুয়া-মাতাল বাতাস—যে প্রাকৃতিক পরিবেশে আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, সেই জায়গাগুলি দেখার এবং সেখানে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে মনটা বড়ো ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

বারোবছর ধ'রে এমনি হ'য়ে আসছে। প্রতিবছরই যেতে ইচ্ছে হ'য়েছে। কিন্তু যাবো যাবো ক'রে যাওয়া আর হ'য়ে ওঠে না। ঝামেলা তো কম নয়। চাকরী আছে, সংসার আছে, তাছাড়া দু'শো মাইল পথ যাবো বললেই আর যাওয়া হ'য়ে ওঠে না।

অগত্যা মনের সেই ইচ্ছেটিকে প্রতিবারই টুঁটি চেপে ধ'রে রাখতে হ'য়েছে। কিন্তু এবার বুঝি তা আর পারলুম না। দু'বেলা রাস্তা দিয়ে যেতে-আসতে পায়ের তলায় শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যেন বড়ো বেশী মুখর ক'রে তুলেছে, ইচ্ছেটিকে প্রবল ক'রে তুলেছে। তাই সমস্ত প্রতিকূলতাকে দাবিয়ে যাওয়ার জন্যে মনস্থির করলুম। অফিসে কয়েকদিনের ছুটি নিলুম। বাড়ীতে বললুম, একঘেয়েমিতে মনে বড়ো অবসাদ এসেছে, যাই কয়েকদিনের জন্যে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।

এই ব'লে একদিন সত্যিই বেরিয়ে পড়লুম।

মহুয়াবনীতে আমার প্রথম-যৌবনের কয়েকটি বছর কেটেছে। মাত্র তিনটি বছর। কিন্তু সেই তিন বছরের স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছতে চায় না।

বাবা মারা যাওয়ার পর কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে যখন নানা জায়গায় চাকরীর চেষ্টা করছি, সেই সময় মেজ মামার কাছ থেকে ডাক এলো।

মহুয়াবনীতে থেকে অভ্রের কারবার ক'রে মামা বেশ দু'চার পয়সা করেছেন। আমাকে তাঁর ব্যবসা দেখাশোনার কাজেই লাগিয়ে দিলেন।

কৈশোর থেকে আমার মনটা বড়ো ভাবালুতায় ভরা ছিল। নিরিবিলিতে ব'সে বাঁশী বাজাতুম, প্রেমের কবিতা আওড়াতুম। তাই কাজটা আমার কাছে তেমন পছন্দসই মনে হয়নি। তবু চাকরী খোঁজার তিক্ত অভিজ্ঞতায় সেইটাই আমার কাছে যথেষ্ট পাওয়া ব'লে মনে হ'য়েছিল। তাছাড়া চাকরীর জন্যে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মনে কেমন একটা অবসাদও এসে গিয়েছিল। তাই মামার প্রস্তাবে সায় দিয়ে সেইটাই আঁকড়ে প'ড়ে থাকলুম।

মামার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার মূলে আরেকটা কারণ ছিল; মহুয়াবনী জায়গাটি আমার কাছে বড়ো ভালো লেগে গিয়েছিল। বাংলার বাইরে তার আগে কখনো কোথাও যাইনি। তাই সেখানকার পাথুরে ডাঙা, অরণ্যসমাকুল পরিবেশ, নির্জন নদীতীর—সবকিছু আমার চোখে মোহের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল।

রোজ বিকেলে কাজকর্ম সেরে বেরুতাম। কোনোদিন শাল-পলাশের বনে, কোনোদিন চড়াই-উৎরাই প্রান্তরে, কোনোদিন বা বরাকরের নির্জন বালুকাবেলায়। বরাকরের ধারে একটা বড়ো সুন্দর টিলা আবিষ্কার করে-ছিলুম। বসবার জন্যে সেই টিলাটিকে বেছে নিয়েছিলুম। নির্জনে তার ওপর ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতুম। কোনোদিন বা বসে বাঁশী বাজাতুম। নির্জনতায় সেই সুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো।

সেই সুর শুনেই ওরা বুঝি এক-দিন পায়ে পায়ে ওইখানে চলে এসে-ছিল। তা নাহলে ওই নির্জনে কেউ সাধারণতঃ আসতো না।

সন্ধ্যের আব্‌ছা আলোয় কাছের আরেকটা টিলায় ওরা দুই ভাইবোন চুপচাপ বসে আমার বাঁশী শুনছিল। কখন এসে বসেছিল টের পাইনি। টের পেলুম তখন, যখন বাঁশী থামিয়ে নদীর চরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যের আবছা আলোয় দু'টি ছায়া-মূর্তিকে চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখে প্রথমটায় চম্‌কে উঠেছিলুম।

তারপর থেকে সেই টিলার ওপর ওদের প্রায়ই দেখা যেতে লাগলো। দেখি তবু আমার কাছে ওরা রহস্যই থেকে যায়। দিনের আলোয় স্পষ্ট চেহারাটা কোনোদিন আর দেখা হয় না।

এমনি করেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। দিনে দিনে যেন একটা অদ্ভুত সম্পর্কও গড়ে উঠলো; এক পক্ষ শোন-বার আরেক পক্ষ শোনাবার জন্যে বসে থাকে। তবু পরস্পরের কাছে তারা অজানাই থেকে যায়।

পরিচয় হয় বড়ো অদ্ভুত এবং আকস্মিকভাবে। মামীমাকে একদিন এক বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গিয়ে সেখানে ওকে আবিষ্কার করি। তারপর আলাপ-পরিচয় হতে খুব বেশী সময় লাগেনি। কেননা মেজমামার পরিবারের সঙ্গে ওদের পরিবারের বেশ একটা

সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। দুই বাড়ীতে যাওয়া-আসার পাটটা প্রায় লেগে থাকতো। তাইতে অতো তাড়াতাড়ি অমন ঘনিষ্ঠ হ'তে পেরেছিলুম।

এক একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে আমরা চ'লে যেতুম বরাকরের সেই নির্জন বালুকাবেলায়। কোনোদিন সেই নির্দিষ্ট টিলাটির ওপর গিয়ে পাশাপাশি বসতুম। গল্পে গানে মুহূর্তগুলি মুখর হ'য়ে উঠতো। কোনোদিন বা শখ ক'রে খালি পায়ে নরম বালির ওপর পায়চারী করতুম। মাঝে মাঝে আবার মান-অভিমানের পালাও চলতো। সামান্য কোনো ত্রুটিতেই অভিমানে লতিকার মুখ ভার হ'তো। চোখে জল আসতো। সে-জল আমাকেই মুছিয়ে দিতে হতো। আবার পরিহাস ছলে কখনো কিছু বললে সে আমার পিঠের ওপর গুম্ গুম্ করে কিল বসিয়ে দিতো।

লতিকার সঙ্গে এমন একটা মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠা সত্ত্বেও একটা দৈন্য-বোধ মাঝে মাঝে আমাকে বড়ো পীড়া দিতো। লতিকাদের সচ্ছলতার সঙ্গে আমার দুরবস্থার তুলনা ক'রে মনটা সংকোচে ছোট হ'য়ে যেত।

তবু স্বপ্ন দেখতুম, যদি কোথাও ভালো একটা চাকরী পাই তো লতিকাকে নিয়ে নিশ্চয় ঘর বাঁধবো। নির্জনে ব'সে কতোদিন লতিকাকেও একথা বলেছি। আশার স্বপ্নে ওরও চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই সংকল্পকে সফল করার জন্যে আমার চেষ্টারও অন্ত ছিল না। কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে অনবরত দরখাস্ত পাঠাতুম। এবং অনেক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত একটা চাকরী পেয়েও ছিলুম।

কিন্তু তা এমনই সময় পেলুম, যখন এই পাওয়াতে মনে ব্যর্থতার বেদনাই বেশী করে বেজেছে। তাই ভাবি, মাস-দুই আগেও যদি চাকরীটা পেতুম তাহ'লে আমাদের স্বপ্ন আমাদের আকাঙ্ক্ষা এমন ক'রে বিফল হতো না। কারণ তার মাসখানেক আগেই হাজারীবাগের একটি ছেলের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, বিয়ের কথা পাকাপাকি হ'য়ে যাওয়ার পর লতিকা একদিন আমার বুকে মুখ গুঁজে কি কান্নাটাই না ক'রেছিল। কাঁদছিল আর বলছিল,—চলো আমরা অনেকদূরে কোথাও পালিয়ে যাই।

লতিকা সেদিন অমন দুঃসাহসিক হ'য়ে উঠলেও আমার মনে কিন্তু অতো-খানি জোর ছিল না। তাই নিজেকে শান্ত করতে না পেরেও ওকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলুম। ওর অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকে নিয়ে গভীর বেদনায় আপ্লুত হ'য়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলুম,—লতিকা,—ভালোবাসার মৃত্যু নেই। নাই বা আমরা পরস্পরকে পেলুম, তবু এই যে ভালোবাসা—এই ভালোবাসা তো আমাদের জীবনে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, তাই বা কম কি!

লতিকা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল,—আমি মানি না, ওসব ছে'দোকথা বিশ্বাস করি না। তুমি আমায় কোথাও নিয়ে চলো।

আমি বড়ো বিচলিত বোধ করছিলুম। লতিকার চোখের জলে আমারও যে মাঝে মাঝে স্থৈর্যের বিভ্রম ঘটছিল না এমন নয়। তবু অনেক কষ্টে তাকে চেপে রেখে বলেছিলুম,—ছি লতিকা, তা কি ক'রে হয়। বাস্তব জগৎটা যে ভালোবাসার দাস নয়। সেখানে নানারকম চাহিদা আছে। তা না মেটাতে পারলে যে ভালোবাসাও টে'কে না।

জানি না, আমার কথায় লতিকা সেদিন কতখানি সান্ত্বনা পেয়েছিল। তবে আমি নিজেকে যে এতটুকু শান্ত রাখতে পারিনি—সেকথা এখনও বেশ মনে আছে।

এরপর বেশ নির্বিঘ্নেই লতিকার বিয়ে হ'য়ে গেল। আর আশ্চর্য, তার এক মাস পরে আমিও একটা সরকারী চাকরী পেয়ে মহুয়াবনী ছেড়ে দু'শো মাইল দূরে চলে গেলুম। তারপর সুদীর্ঘ বারো বছরে জীবনে কতো কি না হ'য়ে গেল। বিয়ে থা' ক'রে আমি এখন রীতিমত সংসারী। সিনেমা, থিয়েটার, তাসপাশা, অগণিত বন্ধু-বান্ধব, আহ্লাদি-বউ এবং ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ সুখেই আছি। তবু কেন জানি না মহুয়াবনীর সেই দিনগুলির কথা আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি লতিকার কথা।

আমার কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে যে পীচঢালা সড়কটা গেছে, তার দু'পাশে সারিবন্ধ মেহগনি আর গুলমোরের গাছ। পাতাঝরার দিনগুলিতে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে-আসতে কেমন যেন একটা অরণ্যসুর শুনতে পাই। ঝরাপাতার সেই মর্মরধ্বনিতে যেন অরণ্য-সমাকুল মহুয়াবনীর কথা মনে পড়ে যায়। মনটা ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। বরাকরের ধারে সেই অরণ্যভূমি, সেই টিলা, সেই মহুয়ামাতাল বাতাস,—যে প্রাকৃতিক পরিবেশে আমার প্রথম ভালোবাসার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, সেই জায়গাগুলিকে আবার দেখতে বড়ো ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয়, সেখানে ঘুরে বেড়াতে।

বারো বছর পরে এসে দেখলুম, মহুয়াবনী ঠিক তেমনই আছে। সেই পথঘাট, সেই অরণ্য, সেই নির্জন নদীতীর, নদীতীরের সেই টিলা। কোথাও এতোটুকু পরিবর্তনের আঁচড় পড়েনি। দু'শো মাইল দূরে থেকে যে আকর্ষণ বোধ করেছি, মহুয়াবনীতে এসে সে-আকর্ষণ যেন আরও তীব্র হ'য়ে উঠেছে। কেমন যেন সম্মোহিতের মতো সেই সব জায়গাগুলোয় ঘুরে বেড়াই, যেখানে বারো বছর আগের হাসিকান্না, আনন্দ-বেদনা পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। বারো বছর আগে নদীর ধারে যে টিলাটির ওপর গিয়ে বসতুম, রোজ বিকেলে সেখানে এসে বসি। বিকেলের আবছা আলোয় নির্জনে ব'সে থাকতে থাকতে মনে হয় যেন লতিকার অশরীরী সত্তা আমার পাশে এসে বসেছে। আমার দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে। মৃদুস্বরে কথা বলছে। আমি যেন তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। স্পর্শ পাই। সেই অনুভূত সত্তার কোমল অঙ্গে পালক বুলোনোর মতো স্নেহের মৃদু পরশ বুলোই।

প্রতিদিন বিকেলে নির্জন নদীতীরে টিলার ওপর ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি অভিভূত অবস্থায় কেটে যায়।

সেদিন যেতে একটু দেরী হয়েছিল। বিকেলের আলোটা একেবারে ম্লান হ'য়ে এসেছিল। আকাশে গাছের পাতায় যেন লাজুক মেয়ের ভীরু চোখের মতো একটা ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। বিমুগ্ধ চোখে সেই আকাশ আর গাছ-গাছালি দেখতে দেখতে ধীরপায়ে নদীর ধারে সেই টিলার দিকে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম। যেতে গিয়ে দূর থেকে দেখলুম, কে যেন সেই টিলার ওপর অনড় হয়ে বসে আছে। শেষবেলার আবছা আলোয় দূর থেকে তাকে চিনতে পারলুম না। কৌতূহলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। কাছে এসে চমকে উঠলুম। নিজের চোখকে প্রথমটায় যেন

বিশ্বাস করতে পারলুম না। মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছি।

লতিকারও ঠিক আমার মতো অবস্থা। পলক না ফেলে সেও আমার দিকে অবাকচোখে তাকিয়ে আছে। বিস্ময়ে দু'জনেই নির্বাক। বারো বছর পরে এইখানে এইভাবে যে আমাদের আবার দেখা হবে তা কেউই কল্পনা করিনি। অনেকক্ষণ পর তার গলা থেকে অস্পষ্ট স্বর বেরুলো,—তুমি!

আমি কোনো কথা বলতে পারলুম না। একইভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। ওকে দেখছিলুম আর ভাবছিলুম, এই কি সেই লতিকা, বারো বছর আগে যার সৌন্দর্যের মাধুরী আমার চিত্তকে আবেশে ভরিয়ে রাখতো! এই থপ্‌থপে বিশ্রী চেহারার সঙ্গে তো সেই চেহারার এতোটুকু মিল নেই।

লতিকাও আমার দিকে তাকিয়ে বুঝি ওইসব কথাই ভাবছিল। কারণ এই বারো বছরে আমারও তো চেহারার কম পরিবর্তন হয়নি। শরীরের মেদ বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথার চুল কমেছে। সামনের দিকটা প্রায় টাক পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে।

অনেকক্ষণ নিরবতার পর লতিকা একসময় জিগ্যেস করলো, —বারো বছর পরে হঠাৎ মহুয়াবনীতে কি মনে করে?

কেন এসেছি—সেকথা কবুল করতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকলো। বললুম,—এমনি কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি।

একটু থেমে আমি আবার বললুম,—তা কয়েকদিনের জন্যে এসে যে তোমার দেখা পাবো—তা আশা করিনি।

লতিকা বললে,—আমিও দিন-কয়েকের জন্যে মায়ের কাছে এসেছি। আজই এসেছি।

আবার কিছুক্ষণ নিরবতায় কেটে গেল। লতিকা এক সময় বললে,—ব'সো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন!

মনের সমস্ত ঘোর যেন কেটে গিয়েছিল। বললুম,—না, আর বসবো না। সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, চলো এবার ফেরা যাক।

ফেরার পথে লতিকা বললে,—কাল একটু বেলাবেলি এসো, ব'সে গল্প করা যাবে।

জিগ্যেস করলুম,—কোথায় আসবো?

—কেন, আজ যেখানে এসেছিলে।

একটু থেমে লতিকা আবার নিজে থেকেই বললে,—জানো মহুয়াবনীতে এলেই এখানে আসার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করে। না এলে থাকতে পারিনে। রোজ এসে এই জায়গাগুলি দেখে যাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই টিলাটার ওপর ব'সে কাটিয়ে দিই।

—তাই নাকি!

হ্যাঁ। —লতিকা সংক্ষেপে জবাব দিলে। জবাব দেওয়ার সময় বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়লো।

আবার আমি কথার খেই হারিয়ে ফেললুম। কি যে বলবো কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলুম না।

রাস্তার মোড়ে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে লতিকা আরেকবার বললে,—তাহ'লে কাল আসছো তো?

—হ্যাঁ।

কথা দিলুম বটে, কিন্তু বাড়ীর দিকে আসতে আসতে সারাটা পথ শুধু ভাবতে লাগলুম, এই স্থূলাঙ্গী মহিলাটির প্রেমের স্মৃতিই কি আমার মনে ব্যাকুলতা জাগিয়ে আমাকে দুশো মাইল দূরে টেনে এনেছে! আশ্চর্য।

নিজের মূঢ়তাকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগলুম। সেইদিন রাত্রেই মহুয়াবনী ছেড়ে চলে এলুম।

* * *

এরপর ভেবেছিলুম সব মোহ ছুটে যাবে। মহুয়াবনীর সব স্মৃতি মন থেকে মুছে যাবে। কিন্তু তা আর গেল কই। তারপর তো আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল।

এখনো তো মনে তেমনি ব্যাকুলতা বোধ করি। এখনো প্রতিবছর মার্চের শুরুতে যখন রাস্তার ধারে মেহগিনি আর গুলমোরের গাছ থেকে ঝির ঝির ক'রে অবিরাম পাতা ঝ'রতে শুরু করে, শুকনো ঝরাপাতায় সমস্ত পথটা ছেয়ে যায়, মাঝে মাঝে দক্ষিণের এক একটা দম্‌কা বাতাস এসে খেয়ালখুশিতে সেই পাতাগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়, যখন সামনের মাঠটার ওপারে শিমুল গাছটা রক্তিম হ'য়ে ওঠে, আর উদাস দুপুরে মাঝে মাঝে কোকিল ডেকে ওঠে—তখন মহুয়াবনীর কথা মনে প'ড়ে যায়। মনে পড়ে সেই-লতিকার কথা। ঠিক আগের মতো। এখনও মনে তেমনি চাঞ্চল্য অনুভব করি।

না আজকের লতিকার ওপর আর কোনো আকর্ষণ নেই। তবে বারো বছর আগের সেই মেয়েটির সত্তা এখনও আমার মনের মধ্যে মিশে আছে, এবং মহুয়াবনীর যে প্রাকৃতিক পরিবেশে তার হাসিকান্না আনন্দবেদনা ছড়িয়ে আছে সেই জায়গাগুলির প্রতি এখনও তেমনি আকর্ষণ র'য়ে গেছে। তাই মাঝে মাঝে বড়ো ইচ্ছে হয় সেই [illegible] দেখতে। সেখানে ঘুরে বেড়াতে।

কিন্তু লতিকার সঙ্গে আর যেন দেখা না হয়।

সমন্বয় সাধক রবীন্দ্রনাথ

সুধীরচন্দ্র কর

দেশে দেশে মানুষে মানুষে সমন্বয়ের সাধনা-নিরত কবিকে তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় চিরকালের বাণীগাথা উৎসর্গ করতে দেখা যায় এই ব'লে যে,—

"দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

নানা দেশের যা ঐশ্বর্য, প্রাচীন মহেঞ্জোদারো থেকে আধুনিক আফ্রিকারও যা মহৎ পরিচয় তার অনুসন্ধান ও আলোচনা গদ্যে-পদ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের এক বিপুল অংশ অধিকার ক'রে আছে। এদেশের বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত বৌদ্ধ-সাহিত্য লোকগাথা বহুদিক দিয়েই বহু তথ্যোদ্ধারে ও তত্ত্বব্যাখ্যায় নব আলোক-সম্পাতে ভারতের মহিমাকে তিনি আরো সমৃদ্ধ ক'রে তুলে ধরেছেন বিশ্বজনের কাছে। দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে পরস্পরের অন্তরঙ্গতা যাতে গড়ে উঠে সেজন্য দীনবন্ধুভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন ও নিজামহাউস-সমন্বিত আন্তর্জাতিক মিলন-কেন্দ্র রচনা করে গেছেন তিনি তাঁর বিশ্বভারতীতে। রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়-সাধনা-প্রসঙ্গে প্রথমতই এই কথাগুলি সকলের মনে জাগবে। কথাগুলি মনে জাগবে এই-জন্যে যে,—মেলানোই ছিল তাঁর কাজ, এই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। দেশকালের সীমানা-ছাড়ানো তাঁর কবিতাও মিলেছে এসে সাধারণ-লোকের সঙ্গে 'ঐকতানে'। কবির সমন্বয়-মুখী সাধনার পরিচয় নানাদিক দিয়েই ছড়িয়ে আছে। নানা সূত্র ধ'রে তার অনুশীলন বিভেদের প্রাবল্যের মধ্যে চিরদিনই সকলকে শুভের দিকে পথনির্দেশ করবে।

সমন্বয়ের প্রথম প্রচেষ্টাটি পরিলক্ষিত হয় তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবজীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের মধ্যে; জীবনের প্রথম স্তর শৈশব থেকেই তার প্রবর্তনা তিনি শুরু করেন। প্রকৃতির ঝড়-ঝঞ্ঝাময় পিঙ্গল রুদ্রতার সঙ্গে জীবনের উপর দিয়ে ব্যাপ্ত রয়েছে শত ধারাপাতের শ্যামল স্নিগ্ধতাও। দুইই আমাদের পরম পাথেয়। কিন্তু একদিন ছোটদের ভাগ্যে এ-ধারার ছেদ ঘটেছিল। শহরের এমন কি গ্রামের মধ্যেও, স্কুল-কলেজাদিতে চলছিল টেবিল-বেঞ্চির রাজত্ব। ইঁট-কাঠের মৃত কাঠামোর মধ্যে চলত খাঁচার পাখির বুলি-সাধা। খোলা প্রান্তরে গাছপালার তলায় কবি ছেলেদের নিয়ে বসলেন। প্রকৃতির যোগের যাদু-প্রভাব তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেবের সাহচর্যে থেকে অতি শৈশবেই। পরে তিনি লিখছেন,—"আমার অতি বাল্যকালেই মা মারা গিয়েছিলেন, তখন বোধ হয় আমার বয়স ১০।১২ বৎসর হইবে। তাঁহার মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পূর্বে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃতসর হইয়া ডালহৌসী পর্বতে ভ্রমণ করিতে যান—সেই আমার বাহিরের জগতের সহিত প্রথম পরিচয়।...এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তিন মাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছিলাম ইহাতেই ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।" শৈশবের কথায় পরেও লিখেছেন,—"স্কুলঘরের বাইরে যে-আকাশটা বাধাহীন, সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।" (জয়ন্তী ভাষণ ১৩৩৮)। কবি তাঁর বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক ক্লাস ছাড়াও পর্বে-পর্বে নানা ঋতুউৎসবে, বন-ভোজনে, পরিভ্রমণে, খেলাধুলা—সব-কিছুতেই প্রাকৃতিক পরিবেশের যোগ অপরিহার্য করে রেখে গেছেন।

কিন্তু কবির আশ্রমে তা ব'লে যন্ত্রের প্রতি বিমুখতা নেই।—সে-ও কবির কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছে। বিদ্যুৎ, মুদ্রণযন্ত্র এবং ইঁট-পাথরও এখানে কাজে লেগেছে; শ্রীনিকেতনে পূজা পেয়েছে কলের তাঁত, ট্রাক্টর—'বিশ্বকর্মার' বিচিত্র শক্তির মহিমায়।

শিল্পের ক্ষেত্রে,—চারু ও কারু-কলায় দুই দিকেই কবির প্রোৎসাহ সমুজ্জ্বল। শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনে এবং সংগীতভবনে দেখা যায়, ভারতের নানা অঞ্চলের চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য ও সংগীতের সুষ্ঠু সমাবেশে তিনি একান্ত যত্নশীল। নানা জ্ঞানী-গুণীর কীর্তিকলার এবং শিষ্যশাখার বিস্তারে ভারতীয় শিল্পকলার আন্দোলন এখান থেকেও অনেকখানি পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এর মধ্যে নানা আঙ্গিকের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও সংমিশ্রণের ধারাও অব্যাহত থেকে নূতন-নূতন প্রেরণায় শিল্পসৃষ্টি সম্ভব করে চলেছে বরাবরই। পাশ্চাত্য-ধারার যোগ তার মধ্যে তত সুস্পষ্ট না হলেও, কবির নিজের আঁকা চিত্র-সম্ভারে সে-প্রবর্তনারও সাদর সমাদর লক্ষণীয়। কবির সংগীত দেশী-বিদেশী সুরসংগমের এক অপূর্ব নিদর্শন। শান্তিনিকেতনের নৃত্যেও কতদিকের কত ছন্দ এসে সুষমার মন্দাকিনী বইয়েছে, তার পরিচয় কবির নৃত্য-নাট্যগুলির রূপায়ণে ও উৎসব-অনুষ্ঠানের আনন্দলোকে সুব্যক্ত। আজকের লোকের মুক্ত মনোক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক নব-উজ্জীবনের সমৃদ্ধি আনয়নে এই ধারাগুলির দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু, লোকের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অর্থ এবং সামাজিকতার দিকে কিঞ্চিদধিক সাহায্য-কর ও সৌষ্ঠবসাধনের উপযোগী হয়ে নানা দেশীয় আঙ্গিকের সাক্ষ্য জোগাচ্ছে শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনের রুচিকর কাঠ, চামড়া, বাঁশ, বেত, গালা ও তাঁতের শিল্পউপঢৌকনগুলি। দেশ-বিদেশে তা সমাদৃতও হয়েছে। শুধু আঙ্গিকের সমন্বয় নয়, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের উপলক্ষে পূর্বপশ্চিমের নানা মানুষের যোগ-ও ঘটেছে এখানকার নানা বিভাগে-বিভাগে। কত দেশের কত জাতির কত মানুষ যে এসেছিল মানুষের সমন্বয়-ধারার দিক দিয়ে তার বিচিত্র ইতিহাস একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়। তাদের মধ্যে বিখ্যাত অনেক আছে, অবিখ্যাত আছে আরো বেশি।

কবির মধ্যে জ্ঞান-ব্রহ্মের তাগিদের সঙ্গে অন্ন-ব্রহ্মের তাগিদও সতত রয়েছে সক্রিয়। শান্তিনিকেতনের মন্দিরের পাশেই দেখা যায়, শিল্প-ভবনের কারিগরী দ্রব্যাগার। এ-যুগের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীরও তিনি সমন্বয়সাধন করেছেন সমাজগত ও

ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রে। কেবল ধর্ম নিয়ে থাকলে খাওয়া-পরা মেলা আজকালকার দিনে দুষ্কর। স্বাধীন ও সৎভাবে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা থাকলে ধর্মচর্চা হয় সোনায়-সোহাগা। তিনি তাই বুঝে ধর্মের পাশে কর্মকেও ধর্মেরই অঙ্গ করে তুললেন। মহাভারতের সমাজে আমরা এমনিভাবেই ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় দেখতে পাই ধর্ম-ব্যাধ সংবাদে। এককালে তত্ত্ববিদ্যার সেবাই শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছিল মুখ্য। কিন্তু কবি তার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চাকেও সমাদর ক'রে স্থান দিলেন। জীবনের সম্পূর্ণতাবিধানের কোনো আয়োজনই যেন বাকি রাখবেন না। স্বদেশ-বিদেশ, নূতন-পুরাতন সকলেরই যথাযোগ্য সমাবেশ চেষ্টায় শান্তিনিকেতনের জীবনধারা আজ আগের চেয়ে নানাদিকে প্রসারিত। সবদিক দিয়ে সেই সমাবেশ সুষ্ঠু হয়ে না উঠুক, সকলেরই স্বীকৃতি আছে তার মধ্যে—এই মহত্ত্বেই সে-জীবন মূল্যবান।

জীবনের বাস্তব দিকে, ভাত-কাপড়ের আয়োজনে হস্ত ও যন্ত্র-শিল্পকে যেমন তিনি কাজে লাগিয়েছেন শিল্পভবনে, তেমনি অর্থবিজ্ঞানের সমবায় আন্দোলনের ধারাকেও তিনি সাগ্রহে ডেকেছেন আমাদের দেশে। আয়র্ল্যাণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E. রচিত "National Being" বইখানি একবার কবির হাতে পড়ে। "সমবায় জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে।" তিনি তা থেকে দেখতে পান। "তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে", কবির কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়—অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি—এ-কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট ছিল।

কবি লিখছেন, "আয়র্ল্যাণ্ডে স্যার হরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়-জীবিকা প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন, তখন কত বাধা, কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল, অবশেষে বহু চেষ্টার পর সফলতার কী রকম শুরু হয়েছে, "National Being" পড়লে তা বোঝা যাবে।"

এই বইটি পড়তে পড়তে কবির যা মনে হয়েছে, সে-কামনাটিও কবি এই সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন,—"এমনি ক'রেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটি মাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূরে করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তাহলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন।" সে-সাধক দেশেরই হোক আর বিদেশেরই হোক, তিনি সকল মানুষেরই আত্মীয়। সেই মানুষকেই তিনি চেয়েছেন।

সংঘাতে হোক, সম্মেলনে হোক, নানা দেশের, নানা রাষ্ট্রের মধ্যেও পরস্পর যোগাযোগ ঘটছে। যার মধ্যে বেটুকু কল্যাণের আয়োজন দেখা যাবে, তাকে স্বীকার না করলে নিজেদেরই ঠকতে হয়। ভারতবর্ষে মুসলমান ইংরেজ সকলের দানকেই কবি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে, গায়ের জোরের অলৌকিক প্রভুত্ব সমন্বয়-নীতির পরিপন্থী। সেই জেনেই তিনি বৈদেশিক যোগ কামনা ক'রেও রাষ্ট্রে তার আধিপত্য বরদাস্ত করেন নি। এমন কি, জনচিত্তের উপর স্বাদেশিক নেতৃত্বের জুলুম-আস্ফালনকেও তিনি সমান জোরেই ধিক্কৃত করেছেন।

তাঁর চেষ্টা ছিল আত্মশক্তি উদ্বোধনের আয়োজনক্ষেত্রে জন-সমাজকে মেলানো। পল্লীগ্রাম ছিল তাঁর প্রাণকেন্দ্র। সেখানে শুধু দেশের চাষী-মজুরদের ডাক দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বিদেশের সাধারণের কাছে গিয়েও মানুষের মেলবার কথা বলেছিলেন। এণ্ডরুজ, এলম্‌হার্স্ট, পিয়ার্সন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কর্মীদের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। এ-বিষয়ে সাড়া দেবার একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ মেলে কবির দ্বিতীয় খণ্ড 'চিঠিপত্রে'। রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন : "রথী, জেনীভাতে Madame Dina বলে একটি মহিলার সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ হল, তাঁর স্বামী ছিলেন ভারতবর্ষীয়। স্বামীর স্মরণার্থে ভারতবর্ষে কিছু একটা ভালো রকম দান করার এঁর সংকল্প। এ-সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করাতে আমি বললুম, আপনি নিজে যে-দান উপযুক্ত মনে করেন, তাই দিন। তিনি আপনা হতে বললেন : "ইলেকট্রিক আলো এবং জল।" শুধু শান্তিনিকেতনে নয়, গ্রামের লোকেরাও যাতে আলো জল পায় এই তাঁর ইচ্ছে। ...শুধু যদি আলো জল পাই তাহলে আর কিছু না

পেলেও, এবারে য়ুরোপে আমার আসা সার্থক হবে।" (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০)। চিন্তার জগতে বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গীর সমন্বয়-সাধনের সঙ্গে জনসেবার কাজেও প্রাচ্যের একটি পল্লীঅঞ্চলে পাশ্চাত্যের মানুষকে এনে তিনি মিলিয়েছিলেন হাতে-কলমের কাজে ও বহুদিনের বিপুল অর্থসাহায্যের নিষ্ঠায়।

এর পরে তাঁর মস্কো যাবার কথা এই চিঠিতেই আছে। সেখান থেকে সব দেখে-শুনে এসে রথীন্দ্রনাথকে আর একখানি পত্রে লিখছেন : "সব-সময় কথা ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে।

"...দেশের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। অনেক কিছু ওলটপালট হবে। এই সময়ে বোঝা যত হাল্কা করতে পারব সমস্যা ততই সহজ হবে।...

ইতি ৩১ অক্টোবর, ১৯৩০।"

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেদিনের কথাটা দিনদিনই বড়ো হয়ে উঠছে। অবস্থা ও অধিকার নিয়ে মারামারি বাধছে যত্র-তত্র। "রায়তের কথা" প্রবন্ধে কবি বলছেন : "রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি।...আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো বাবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে-বলে-কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে।" কবি বলতে চান, উচ্চ-নীচ, ছোটলোক বা বড়লোক বলে শ্রেণী ভাগ করে, ছাপ দিয়ে আলাদা করে দেখলে কী হবে—মানুষ আলাদা জীব নয়।

এক মানুষ সর্বত্র। অন্যদের বঞ্চিত করে নিজের ভোগদখল বাড়াবার যে সুযোগ-সন্ধান-প্রবৃত্তি, তা সকল শ্রেণীর মধ্যেই আছে—জমিদার, মহাজনরাই শুধু সে-দোষে দোষী নয়; ছোটো ছোটো সাধারণ রায়তের মধ্যেও সেই একই প্রবৃত্তি কাজ করছে। সুযোগ মিলে না তাই, নয়তো অনেক স্থলে তাদের দুষ্প্রবৃত্তি সুপ্ত থেকে নখদন্ত বিকাশেরই সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। কবি বলছেন : "রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে।" মানুষের প্রবৃত্তির বদল চাই; মানুষকে রায়ত বা জমিদার বলে দেখা কোনো কাজের নয়,—মানুষের সমাজ একই। প্রত্যেক মানুষই সেই সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যেকের শক্তির উদ্বোধন দরকার। নিজেই যাতে সে সকল বাধা জয় করতে পারে, নিজের পায়ে খাড়া হয়ে চলতে পারে—এটি করা চাই। কবি বলছেন : "যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে; কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

"কেমন করে সেটা হবে, সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানিনে—জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে।" (আষাঢ় ১৩৩৩)।

শ্রীনিকেতনে গ্রামের কাজ শুরু করবার আগেও নিজের জমিদারীতে তিনি সর্বসাধারণকে এই এক-মানুষের সমাজে মেলাবার আয়োজন করেন। এ-কাজ রাষ্ট্র-আন্দোলনের চেয়ে বড়ো কাজ। সামাজিক কাজ। ভারতে রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজকেই তিনি বড়ো কাজের ক্ষেত্র বলে জেনেছেন। সমাজের বিধানে এখানে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে;—ইতিহাসের নজীরে তিনি তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। নিজের কাজের ক্ষেত্রেও, রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরতা ছেড়ে, সাধারণের সম্মিলিত চেষ্টার শক্তিকেই তিনি সম্বল করে চলেছেন বরাবর। সমাজের ভিতর থেকে মানুষকে তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। একখানি চিঠিতে লিখছেন, "আমাদের জমিদারীর মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লী-সমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে, পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, শালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্ম-গোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য-সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান, তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দু-পল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দু-ধর্ম হিন্দু-সমাজের মূলেই একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে, যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দু-সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।" (৩০, আষাঢ়, ১৩১৫)।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মানুষের অসংগতির বহর দূর করবার কাজে কবি তাঁর বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েও অগ্রসর হন। মাটির ঘরে অনাড়ম্বর সহজ জীবন,—শোওয়ায়, বসায়, খাওয়া-দাওয়ায়, ঘরঝাঁটে, কাপড়-জামা কাচায়, বাগান করায়, হাটে-মাঠে হুটোপুটি করে চলায়, সাঁওতাল গাঁয়ে এবং হরিজনদের পল্লীতে নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াতে যাওয়ায়, জীবনের মানে-মানে-সমন্বয় ঘটেছে অহরহ-ই। সেখানে ভদ্র-অভদ্রের সীমারেখা টানা শক্ত। এই শিক্ষা এবং সমজীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, সমাজের মধ্যে শতস্তরে শতখানে যখন এরা ছড়িয়ে পড়বে, তখন আশা করা যায়, অবতরিত গঙ্গাধারার মতো এদের জীবনই সমাজকে ভরিয়ে দেবে মমতায়, স্নিগ্ধতায় ও উর্বরতায়। কবি একখানি পত্রে লিখছেন,—"উঁচুদরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই। যাহারা সচরাচর মেসে খাইয়া কষ্টে পড়াশুনা চালায়, তাহারাই আমার এখানে পড়িতে আসে,

অতএব তাহাদেরই উপযোগী বেতনও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।...আদরে ছেলেদের আদর বাড়াইয়া দেওয়াই তাহাদের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা।" (৪ঠা ভাদ্র. ১৩১৬)।

এককালে এইরূপে শিক্ষা দিয়ে মানুষ গড়ার কাজই কবি হাতে নিয়েছিলেন। কবির আকাঙ্ক্ষা সবটা পূর্ণ হোক আর না হোক, একটা পথের রেখা এ-থেকে আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মানুষে-মানুষে ছোটবেলা থেকে সমন্বয় প্রতিষ্ঠাই তার মূলে লক্ষ্য।

কবি তাঁর 'চরকা' প্রবন্ধে একস্থানে বলেছেন,—"ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয়;" তিনি বলেছেন,—"জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সবচেয়ে প্রশস্ত; এখানে ছোট-বড়ো, জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে—মরণেরই ডাকের মতো এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়, যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানব-শক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য, তাহলে রিপুর হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারি।" (ভাদ্র, ১৩২২)।

সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষে ধর্মের দিকে লোকের এত ঝোঁক যে, জীবনযুদ্ধে পরাঙমুখ অনেকে লোটা-কম্বল সার করে সরে পড়েই লোকের চক্ষে সাধু হয়ে থাকেন। এতে বড় একটা নিন্দে নেই। না খেয়ে মরাকে 'অদৃষ্ট' বলে মেনে নিই। অধ্যবসায় ও স্বাধীন চেষ্টায় জীবিকা সংস্থানের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। উদ্যমের মাত্রা আরো কম। ব্রত-পার্বণ তত্ত্বকথার আমদানি রয়েছে অনেক, শাখা-উপশাখায় হাজার মত দেশের অলিতে-গলিতে ছড়ানো। বৈচিত্র্য ভালো কিন্তু বিরোধ ঘোচে না যে। কবির 'বিদ্যাভবনে' নানা দেশের সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় বিরুদ্ধমতের মধ্যে অনেক স্থলে সাদৃশ্যও প্রকাশ পেয়ে থাকে। বিচার এবং 'বেদনা' হল এই সনাতন জ্ঞান-ধর্মের পথনির্দেশিকা। তারই আলোকে কাঁটে-কচালের পথ ছেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে এক ব্যাপক ও স্থায়ী সমন্বয়-সাধনার নীরব সূচনা দেখা দিল। যদিও তার ধারা জনকয়েক মনীষীর মধ্যেই রইল সক্রিয়, কিন্তু তার প্রভাব জ্ঞানান্বয়ে তাঁদের গবেষণা, বক্তৃতা ও পত্রপত্রিকার মধ্যে দিয়ে হয়ে চলল জনসমাজেও সুদূরপ্রসারী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সীমারেখা সেখানে সহৃদয়তায় হতে লাগল ক্ষীয়মাণ। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার ও তার প্রকাশনা বিভাগের পত্রপত্রিকাদির কার্যকারিতাও এক্ষেত্রে স্বীকার্য। বিশেষভাবে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'-র সূত্রে মহাদেশগুলিতে ক্ষীণ হলেও, যে সংস্কৃতির বন্ধন রচিত হয়ে চলেছে, তার মূল্যও কম নয়। কবির নিজের বিশ্বভ্রমণ সেই-রকমই একটি সুহৃদমণ্ডল-সৃষ্টির সহায়ক হয়ে আছে। সেই ভ্রমণ সার্থক করেছে তাঁর এই বাণীকে—

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে,
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে-দেশে মোর দেশ আছে,
আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়ে সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে-ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

বিদেশী যাদের ঘরে ডেকে এনেছিলেন, তাঁদের কবি আত্মীয়ের মতোই দেখেছেন। তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে যথাসম্ভব তাঁদের রীতি অনুযায়ীই সব ব্যবস্থা করতেন। শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার প্রণালীতে এবং উৎসব-অনুষ্ঠানে দেশীয় ঐতিহ্য সুরক্ষিত কিন্তু পাশাপাশি মিলে রয়েছে তারই মধ্যে নানা দিগ্-দেশীয় রীতিনীতির প্রতিও স্বাঙ্গীকরণের উদার প্রবণতা। গাছের তলায় ক্লাসগুলিতে আসন থাকে পাতা কিন্তু ভোজনশালায় টুল-টেবিলে কাঁসার থালাবাটি পায় শোভা, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে হয় পরিবেশন। ঘর-বাড়িতে স্থাপত্যের মধ্যেও দেশী-বিদেশীর ছাঁদ রয়েছে মিশানো। মন্দিরের উপাসনায় বেদমন্ত্রের সংগে সমবেত প্রার্থনা, আচার্যের ভাষণ ইত্যাদিতেও নানা রীতির সমাবেশ ঘটেছে। নানা পর্ব ও ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্‌যাপনের মধ্যেও জাতিধর্মনির্বিচারে সকলদিকেরই যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। ভাষায়, পরিচ্ছদে, খেলাধুলায়, সামাজিক আদর ও আপ্যায়নে নিয়তই এখানে নানা দেশের নানা লোকের সম্মিলনে আপনি বিভিন্ন ধারায় সমন্বয় সকলকে সিঞ্চিত করে চলেছে।

সকলের উপরে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উজ্জ্বল উত্তুঙ্গ স্বর্গ;—কবি সেখানে উত্তীর্ণ। কিন্তু সকলে তো সেখানে পৌঁছয়নি। আংশিক ব্যক্তিগত সিদ্ধি দিয়ে তিনি সাধনায় সম্পূর্ণতা বোধ করলেন না। পরমস্তরে পৌঁছেও

তাই নেমে এলেন আবার সকলের মধ্যে সকলের সমষ্ঠিগত সামাজিক উন্নয়নে। জীবনে জীবন মিশিয়ে সকলের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে চাইলেন বাস্তবে—সেখানে কামার, কুমার, ছুতোর, তাঁতি এমনকি মেথর-মুদ্দফরাস ও বারাঙ্গনা প্রভৃতি—"ওরা কাজ করে।" 'শিশু-তীর্থে' কবি সেই ওদের মিছিলের সঙ্গে মিশে চলেছেন সংঘ-মুক্তির সাধনায়। সেখানে সংঘের অধিনেতাকে আঘাত ক'রে হত্যা করা হয়। তারও পরে চলে যাত্রা। যেখানে এসে সে-যাত্রা থামে সেখানে—

পথের দুই ধারে দিকপ্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষে স্নিগ্ধ বায়ু-
হিল্লোলে দোলায়মান,—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে
ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে
নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা
শান্তগতিতে প্রবহমান।
কুমোরের চাকা ঘুরছে গুণ গুণ স্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে
যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ,
সোনার খনি,
মারণ-উচাটন মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?

কবির সমন্বয়ভরা ভাবী সমাজের চিত্র এই। সবাই সেখানে প্রাণের ধর্মে সম্বন্ধ। সকলে যার-যার কাজ ক'রে খায়। কেউ কাউকে ঠকিয়ে রাজার দুর্গ, সোনার খনির মালিক হয়ে বসে না। একের সঙ্গে অন্যের জীবনধারা সমন্বিত, এমনকি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষেরো জীবনছন্দে মিল আছে।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনানেত্রে যে-মানুষকে মহেঞ্জোদারোর প্রাগৈতিহাসিক সীমানায় দেখেছেন, তাঁকে তাঁর কালে মাঠে, কলে, খনিতে চাষী-মজুরের মধ্যেও দেখালেন। তার আগেই "মানুষের ধর্ম" তাঁর লেখা হয়েছে। সেখানে দার্শনিক বিচারের দ্বারা মানুষকে পেয়েছেন তিনি "এক-দিকে ব্যক্তিগত সীমায়, আরেক দিকে বিশ্বগত বিরাটে।" শিক্ষায়, সাহিত্যে নানা অনুষ্ঠানে মানুষের এই দুই সত্তার অনুভূতি-ধারাকেই তিনি বিচিত্র পথে মুক্তি দিয়েছেন, পরস্পরের আপেক্ষিকতা দেখিয়ে।

তাঁর 'শেষ লেখায়' আদি অন্তের সব কিছুই সমন্বিত হয়ে মিলেছে এক মহাসত্তার সংগ্রামে।—সেখানে "সম্মুখে শান্তি পারাবার।" বিচিত্র ছলনাজাল ইহলোকের শেষ পর্যন্তই কবির পথ আকীর্ণ ক'রে থাকে,—কবি তা পেরিয়ে যেতে-যেতে শেষ বলায় তাকে ব'লে রেখে যান :

"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

এই শেষ কথাটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সার কথা। ছলনা কথাটি দ্বারা বাস্তব সূচিত হয়েছে। বাস্তবকে কবি 'ছলনাময়ী' বলেছেন, বলেছেন সে প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বকে চিহ্নিত করে।—তার সংস্রবে প'ড়ে মহৎ মানুষ "বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু, এই নিয়ে তাহার গৌরব।" 'দুঃখের রাত্রির বেশে বাস্তবই ভয় দেখায়,—'অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার'। কবি বলেছেন—বাস্তবের লীলা—"দুঃখের পরিহাসে ভরা।"

"যতবার ভয়ের মুখোস তার
করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা,
জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে
পদে এই বিভীষিকা।"

কিন্তু মানুষের ভূমিকা হচ্ছে এই বাস্তবের সঙ্গে বুঝে চলার। কবিকেও তা' বুঝে চলতে হয়েছে। কেবল অভয়ের দ্বারা "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধার" থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যান মহতেরা; তাই তাঁরা মানুষের মধ্যে চিহ্নিত হন মহৎ ব'লে। অনায়াসে তাঁরা ছলনা সহেন, এই তাঁদের মহত্ত্ব। সেই ছলনাটুকু সইতে পারার পুরস্কার হচ্ছে—চারিদিকের সকল অশান্তির মধ্যে থেকেও "শান্তির অক্ষয় অধিকার।" আর সে-অধিকার লাভ ঘটে ছলনাময়ী এই বাস্তবেরই [illegible] বাস্তবের হাত থেকে! তখন আর সে ছলনাময়ী নয়,—সে নেয় তখন বরদাত্রী বরাননার কল্যাণী ভূমিকা।

এটি কেবল কবির কাব্যোপলব্ধির কথা নয়, জীবনের সাধনারও পরম দান। জীবনটাকে তিনি "শিশুর" মতো ক'রে দেখেছেন খেলা বলে।—

"জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা।" চারধারে ছলনার জাল ফেলে, মুখোশ প'রে ফেরে বাস্তব। সে-খেলার পর্ব আমরা বয়সের অভিজ্ঞতা বুদ্ধির সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি। আমাদের সাবালকত্ব, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, মৃত্যু,—সবই জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। বাস্তব তার ছলনা-জাল মেলে দিয়ে সর্ব ক্ষেত্রেই পদে পদে বাধা দিচ্ছে; তেমনি পদে-পদে প্রতিক্ষেত্রে বড়ো হবার বেগ যোগাচ্ছে আবার সে-ই। সেটাও একটা ছলনা। তার এই লীলা লক্ষ্য ক'রে কবি তাকে খেলার সঙ্গিনীর মর্যাদাই দিয়েছেন: তার দান যত তিক্ত হোক, ভয়ংকর হোক, তাকে বর্জন করেননি বা অবজ্ঞাও দেখাননি। বরং শেষ কথায় শেষ সুরটুকু বেজেছে একটু সাধুবাদপূর্ণ আন্তরিকতায়।

কবি এক পত্রে লিখছেন,—"...হঠাৎ এক-একবার একটা দিক হইতে দৃষ্টি যে একটু খোলসা হইয়া যায় তাহাতে যেটুকু পাওয়া যায় তাহার চেয়ে আভাস পাওয়া যায় অনেক বেশি—তখন বোঝা যায় এ একটা খেলা হইতেছে, লুকাচুরি খেলা, ইহা ধরা না ধরার মিশ্রিত খেলা—ইহাতে অত্যন্ত বেশি হতাশ হইবার দরকার নাই—কেননা, এটুকু জানা গেছে যে, যিনি খেলাইতেছেন তিনি কাছেই আছেন—তাঁহাকে না ধরিলে খেলা শেষ হইবে না। তিনি আছেন, তিনি আছেন, বাস্ আর ভয় নাই—তিনি যেমনি ভান করুন, তিনি আছেন এইটেই আমার পক্ষে প্রচুর—আমার সমস্ত ভয় ভাবনা ইহার মধ্যে ছায়ার মতো বিলুপ্ত হইতেছে। যাহা হয় তাহাই হউক এইটে খুব জোর করিয়া বলিয়া তারপরে কোমর বাঁধিয়া খেলিতে লাগা যাক্। সে খেলার মধ্যে সবই আছে—ভাবও আছে রূপও আছে, আনন্দও আছে, তপস্যাও আছে, এড়ানোও আছে, ধরা দেওয়ার আছে।..." (চিঠিপত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৩ কার্তিক-পৌষ পৃ ৮৯-৯১, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত)।

শেষ-যাত্রার আরো আগে থেকেই কবি ব'লে এসেছেন গানে—

'যা পেয়েছি প্রথম দিনে
সেই যেন পাই শেষে,
দু'হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই
শিশুর মতো হেসে ॥
যাবার বেলা সহজেরে
যাই যেন মোর প্রণাম সেরে
সকল পন্থা যেথায় মেলে
সেথা দাঁড়াই এসে।

খুঁজতে যারে হয় না কোথাও
চোখ যেন তার দেখে,
সদাই যে রয় কাছে
তারি পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে
তারেই যেন যাই গো ব'লে,
এই জীবনে ধন্য হলেম
তোমায় ভালবেসে ॥"

তাঁর জীবন-দেবতার প্রতি এই প্রণতির মধ্যে বাস্তবের প্রতি প্রীতিটুকুও আছে মেশানো। বাস্তব, আদর্শ ইহলোক, পরলোক, স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল পথেরই মোহানা হয়ে বিরাজ করেন তাঁর "বিশ্বেশ্বর জীবনেশ্বর"। তিনিই সমগ্র বোধের কেন্দ্রস্থল। "সকল পন্থা যেথায় মেলে"—তাঁর কাছেই তিনি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বিষয় যত জটিল হোক, জট খুলতে হবে, সহজ স্বাভাবিক সত্যকেই চাই দেখা। কারণ সব বিষয়েই আসল রূপটি হচ্ছে সহজ। এইখানে দেখি, পরমতত্ত্বকে উপরোক্ত গানের সঙ্গে সত্যই বিশেষিত করেছেন একটি শব্দে—তিনি "সহজ"। কঠিন বিচিত্র ছলনাজাল তার চারদিকে। কিন্তু সে তার খেলার চাতুরি-ভরা মায়াসৃষ্টি। সে জালের ফাঁস খোলা যায়। সব খেলাটুকু সেই খেলারই মধ্যে। খুলে ফেল্লেই সহজ দেয় ধরা। বাস্তবের জটিলতা যতই কঠিন মনে হোক, তার সামনে যেতে হবে, জট খুলে সহজের সঙ্গে মিলে "শান্তির অক্ষয় অধিকার" আমাদের সকলকেই লাভ করতে হবে।

সংসারের বাস্তবের প্রতি কবির এই সহজ বেদনার সুর বাস্তব পৃথিবীর লোক ভুলতে পারবে না। তাঁর বিচার তাঁর বোধের অনুগামী। বিচার এবং বোধের সাহায্যে খণ্ড-অখণ্ড সকল সত্তার মাঝেই তিনি প্রবেশ করেছেন।—গুরুর বেশে নয়, সঙ্গীর গৌরবে। তার ফলে তাঁর সংসর্গ আমাদের মতো খণ্ডদৃষ্টির কোন্-এক ফাঁকে সহজে আকৃষ্ট করে নিয়ে যায় তাঁর অখণ্ডবোধে।

এ কথা সত্য, কবি শুধু কথাই গাঁথেননি, তিনি সমানে কাজ করেছেন। কিন্তু কথা ও কাজটা তাঁর বড়ো কথা নয়। তিনি কবি। সকলের বড়ো কাজটি হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি। কথা ও কাজকে তিনি মিলিয়ে চলেছেন তাঁর সৃষ্টির পথে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি কাব্যে ও কর্মে, নানাকে তাদের মানা বাধা সত্ত্বেও মিলিয়ে নিয়ে তিনি গেঁথেছেন তাঁর অপরূপ মালাটি। সমন্বয়ের কথাগুলি তাঁর সেই মালা গাঁথারই ইতিহাসমাত্র।

তাঁর 'আবেদন' দিয়েই তাঁকে বিচার করতে হবে,—বুঝে নিতে হবে।—কবি 'চিত্রা' কাব্যে এক সময়ে লিখেছিলেন :

"প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা। নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

প্রাচীন সাহিত্য—পূর্বপক্ষ

[শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে যে সব নাম জানা সম্ভব প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করছি। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাহিত্যের ইতিহাসে আজকাল যা পাঠ্য আছে এর কোনো প্রশ্নই তার বাইরে যায়নি। আমার বিশ্বাস পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অনেকে দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবেন। আটটি শুদ্ধ হলেই সন্তোষজনক, ছটি হলে মন্দ নয়। সঠিক উত্তর অন্যত্র আছে।]

১। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন্ গ্রন্থের জন্যে বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন?

(ক) বেহুলার ভাসান। (খ) রামরসায়ন। (গ) চণ্ডীমঙ্গল। (ঘ) গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কার লেখা?

(ক) ঈশান নাগর। (খ) নরহরি সরকার। (গ) লোচন দাস। (ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৩। গীতগোবিন্দ কোন্ কবির রচনা?

(ক) জয়দেব। (খ) বিদ্যাপতি। (গ) চণ্ডীদাস। (ঘ) বৃন্দাবন দাস।

৪। শিবায়ন রচয়িতা রামেশ্বরের পদবী কি?

(ক) ভট্টাচার্য। (খ) চক্রবর্তী। (গ) আচার্য। (ঘ) দাস।

৫। রায়গুণাকর কোন্ কবির উপাধি?

(ক) হরেকৃষ্ণ দীঘাড়ী। (খ) রামপ্রসাদ সেন। (গ) কুলুইচন্দ্র সেন। (ঘ) ভারতচন্দ্র রায়।

৬। কুলীন-কুল-সর্বস্ব কোন্ জাতীয় গ্রন্থ?

(ক) উপন্যাস। (খ) নাটক। (গ) কাব্য। (ঘ) অভিধান।

৭। কমলে কামিনীর বর্ণনা কোন্ কাব্যে আছে?

(ক) চণ্ডীমঙ্গল। (খ) মনসামঙ্গল। (গ) ধর্মমঙ্গল। (ঘ) কালিকামঙ্গল।

৮। কালকেতুর স্ত্রীর নাম কি?

(ক) লহনা। (খ) খুল্লনা। (গ) সর্বশী। (ঘ) ফুল্লরা।

৯। বেহুলার বাবার নাম কি?

(ক) চাঁদ বেনে। (খ) সায় বেনে। (গ) ধর্মকেতু। (ঘ) মুরারি শীল।

১০। একটি বৈষ্ণব পদের কয়েক ছত্র শুনিয়ে আজকের পালা সাঙ্গ করছি। কিন্তু বিপদ হল, এক ছত্র ভুল ছাপা হয়েছে। 'অজ আম কর খল'র জায়গায় যতদূর মনে পড়ছে এই রকম কিছু ছিল :

(ক) ভণে বলরাম দাসে। (খ) কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে। (গ) ভণয়ে গোবিন্দদাসে। (ঘ) কহে নরোত্তমদাসে। —কোন্‌টা ঠিক?

সই কে বা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
....
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
'অজ আম কর খল' কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর নানারকম জালজোচ্চুরির খবরে হরদম সরগরম থাকে। তার কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে ছবি ও ভাস্কর্যের দাম খুব চড়া।

বিংশ শতককে একেবারে চমকে দিয়েছিলেন যিনি, তিনি ইতালীর আলসেও দোসেনা। আজ পর্যন্ত, জালিয়াতির লিস্টে তাঁর নাম সর্বোচ্চে।

অথচ সত্যিই হয়তো আলসেও দোসেনা দোষী নন। ভুল করে ভাগ্যের পরিহাসে তিনি মাইকেল এঞ্জেলোর যুগ থেকে চার শতক পরে জন্মেছিলেন।

ইতালীয় রেনেসাঁর শিল্প রোমের এই অখ্যাত ভাস্করটিকে মুগ্ধ করতো। নিজের ছোট্ট স্টুডিওর কোণায় বসে বসে তিনি নিজেকে কখনো বত্তিচেলি, কখনো এঞ্জেলো, কখনো বা দ্য ভিন্সি ভেবেছেন। বছরের পর বছর স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঁর ব্যক্তিত্বে এক আশ্চর্য রূপান্তর এলো। চার-পাঁচশো বছরের পুরনো মার্বেল যোগাড় করে তিনি মূর্তি গড়তে শুরু করলেন। চিত্রশিল্পী মার্তিনির বিখ্যাত ছবির অনুসরণে তিনি ম্যাডোনা ও শিশু যীশুর একটি অনবদ্য মূর্তি গড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর হাতে রূপ পেলো গ্রীসের স্বর্ণযুগের বিস্মৃত সব দেবদেবীর মূর্তি। নিজের সৃষ্টির আনন্দে বিভোর শিল্পী এই সব শিল্পকর্মকে আসল বলে বাজারে চালাতে চাইলেন না। তাঁর মূর্তিগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজেকে মনে হলো জাতিস্মর কোনো বিগত যুগের ভাস্কর। আলফ্রেডো ফাসোলি এবং পালেসি নামে দুজন আর্ট-ডীলার এই শিল্পীর মাথায় কলঙ্কের বোঝা টেনে আনলেন।

তাঁরা দোসেনিকে নামমাত্র মূল্য দিয়ে এই সব ভাস্কর্যের বিক্রয়-স্বত্ব কিনে নিলেন। তারপর নিউইয়র্ক, বোস্টন, রোম, বার্লিন ও মুনিখ-এর বিদগ্ধ বিচারকমণ্ডলীর সামনে নিয়ে গেলেন এই সব মূর্তি। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তবু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে তাঁরা রায় দিলেন এই মূর্তিগুলো নিশ্চয় কোন রেনেসাঁ ও তৎপূর্ব যুগের একাধিক শিল্পীর গড়া।

বিশ্বের বড় বড় মূ্যজিআম-এ এইসব মূর্তি বিক্রি করে ফাসোলি ও প্যালেসি বিশ লক্ষ ডলার রোজগার করলেন। একটি গ্রীক দেবীমূর্তি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে বিক্রি হয়েছিল বলে জানা যায়।

রঙ-বেরঙ

বিশ্ববারা

হঠাৎ ১৯২৮ সালে বিভিন্ন মূ্যজিআমের কর্তৃপক্ষরা সচকিত হলেন। তাঁরা আবিষ্কার করলেন, বহুবিদগ্ধ সমালোচক ও দর্শকদের প্রশংসাধন্য অনিন্দ্য ভাস্কর্যগুলো আর কিছুই নয়, জালিয়াতি।

অবশেষে ইতালী সরকার দোসেনি সম্পর্কে সব তথ্য প্রকাশ করলেন। দোসেনিকে কেউ বললেন জালিয়াত, কেউ বললেন চোর, আবার কেউ কেউ বললেন (মুনিখ ও নিউইয়র্ক-এর মূ্যজিআম কর্তৃপক্ষ তাঁদের মধ্যে অনাতম) শিল্পীর কল্পনা যদিও ধার-করা তবু তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য-সুষমাকে অবহেলা করা চলে না।

ফাসোলি ও প্যালেসি টাকাকড়ি নিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। দোসেনি দারিদ্র্যে, কলঙ্কে ও ধিক্কারে নিমজ্জিত হয়ে শোচনীয় মৃত্যুতে বিলুপ্ত হলেন সাত বছর বাদে।

১৯৫৮ সালেও সেন্ট লুই মূ্যজিআম-এর পৃথিবী-বিখ্যাত 'ডায়না ও মৃগশিশু' মূর্তিটি দোসেনি'র তৈরী এ হেন গুজব রটেছিল।

আজ সব গোলমাল থিতিয়ে যাবার পর সমালোচকরা মনে করেন, দোসেনি সত্যিই যেন রেনেসাঁ যুগের এক ভাস্কর। নিয়তির পরিহাসে যাঁর জন্ম বিংশ শতকে। তাই তাঁর রেনেসাঁ-ভাস্কর্যের লক্ষণ-চিহ্নিত মূর্তিগুলো অমন করে সকলকে মুগ্ধ করতে পেরেছিল। তাঁকে ঠিক হীন, অর্থলোভী জালিয়াতের দলে ফেলা চলে না।

* * *

সম্পূর্ণ আর এক রকম স্বপ্ন দেখেছিলেন রাল্ফ ডেভিড হেলফার। তিনি দশ বছর বয়সে স্বপ্ন দেখেন নানাজাতের পোকা-মাকড়, কেঁচো, কেন্নোই, বিচ্ছু আর মাকড়সা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তিনি তাদের মুখের ওপর দিয়ে হাঁটাচ্ছেন আর এক অপার্থিব আনন্দের অনুভূতি তাঁকে রোমাঞ্চিত করছে। আজ ত্রিশ বছর বয়সে হেলফার পোকা-মাকড় ও সাপকে নানারকম কৌশল শেখাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর প্রিয় গৃহপালিত পোষাদের মধ্যে আটটি অজগর, বারোটি বোড়া, অজস্র র‍্যাটল সাপ, শংখচূড়, কুমীর, কচ্ছপ, দুটি সিংহ এবং অগণিত মাকড়সা ও বিছে অন্যতম।

এই আমেরিকান খেয়ালী মানুষটিকে চিত্র-নির্মাতাদের প্রায়ই দরকার হয়। ষাটটি ট্যারান্টুলা মাকড়সাকে নাচ শিখিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে ট্যারান্টুলারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অভিমানী। শখ করে বেড়াতে বেরুবার সময়ে তারা তাঁর সঙ্গী হয়। সেই ভয়ে হেলফার-এর মোটরে কেউ চড়তে চান না।

একটি বিখ্যাত মরুচিত্রে হেলফার কাঁকড়া-বিছেদের নাচ শেখাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব বারোটি কাঁকড়া-বিছেকে তাঁর শার্টের ওপর হাঁটতে দেখে পরিচালক ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। হেলফার সেখান থেকে চলে আসেন। তিনি বলেন তাঁর কাঁকড়া-বিছেরা মনে এত আঘাত পেয়েছিল যে তারা কয়েকদিন ভাল করে খায়নি পর্যন্ত।

মাছি, গঙ্গাফড়িং, ঝিঁঝিপোকা আর কালো মাকড়সারা নাকি অবাধ্য, স্বেচ্ছাচারী এবং খামখেয়ালী।

একটি মাছি ম্যাপের ওপর বসবে বলে, ওআর্নার ব্রাদার্স হেলফারকে দিয়ে রোজ হাজার হাজার মাছি ধরাতেন। প্রতিটি মাছির জন্যে তাঁদের ছয় পেনি করে দিতে হয়েছিল।

নায়ক-নায়িকাদের পোশাক পরে, তাঁদের 'বদলী' সেজে হেলফারকে অনেক অদ্ভুত কাজ করতে হয়েছে। একটি বিষাক্ত আফ্রিকান সাপ-এর খোলস সাঁড়াশি দিয়ে টেনে খোলবার সময়ে তার বিষের ছিটে লেগে হেলফারের হাত গুরুতর জখম হয়েছিল।

আর একবার, সাবুর 'বদলি' সেজে একটি বন্য অজগরকে শরীরে জড়িয়ে খেলা করতে গিয়ে হেলফারকে সাপটি পিষে ধরে চাপ দিতে থাকে। তাঁর সহকারীরা সাপটিকে উলটো পাক দিয়ে খুলে ফেলে। সাবু এই দৃশ্যটি তাঁর ক্যামেরায় ধরেছিলেন।

অবসর বিনোদনের জন্যে হেলফার একটি পূর্ণবয়স্ক অজগরের মুখ হাঁ করিয়ে তার আড়াই শো'টি দাঁত গুনতে ভালোবাসেন।

নয়তো, খালি হাতের চেটোতে দুটি কাঁকড়া-বিছেকে নাচ করানো তাঁর অন্যতম প্রিয় নেশা। উচ্চিংড়েকে হাইজাম্প করিয়েও তিনি দেখে থাকেন।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুর গল্পসায়েব ও-দেশেও আছেন। তবে বিচিত্র খামখেয়ালের দেশ আমেরিকায় হেলফারকে নিয়ে কেউ গল্প লিখে তাঁকে অমর করেননি।

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

॥ সার্থবাহ ॥

॥ স্পেনের নাটক ॥

স্পেনের লোকেরা যে যথেষ্ট মাত্রায় নাট্যকে তার অন্ততঃ একটি বিচিত্র প্রমাণ তা'রা কিছুকাল আগেও দিয়েছে। ১৯৪৭ সালে মাদ্রিদের এক প্রখ্যাত নাট্যশালায় স্পেনের জনপ্রিয় নাট্যকার হাথিন্তো বেনাবেন্তের রচিত একটি নাটক অভিনয়ের পর দর্শকেরা এতো আহ্লাদিত হয় যে অশীতিপর বেনাবেন্তেকে কাঁধে করে তারা মাদ্রিদের রাজপথে হল্লা করতে বেরোয়। বলা বাহুল্য, এই জয়োল্লাস অভিনীত নাটকটির সার্থকতার কথাই বলে। আর মঞ্চকে কেন্দ্র করে এই রকম চাঞ্চল্য স্পেনীয়দের তীব্র জীবনবোধেরই এক অভিব্যক্তি। একটি নাটককে নিয়ে এমন হৈচৈ মনে পড়ায় শুধু গত শতাব্দীর আরেকটি অভিনয় রজনী, যখন প্যারিসে ভিক্তর উগোর 'এরনানি' রক্ষণশীলদের প্রবল প্রতিরোধের মধ্যে মঞ্চস্থ হয়। সেদিন অবশ্য রোমান্টিকদের আর উগো-বিরোধীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা সহজেই হাতাহাতিতে পেঁছেছিল, কিন্তু 'এরনানির' জয়ে উগো-শিষ্যদের জয়োচ্ছ্বাস মাদ্রিদের ঘটনাকে-ও ম্লান করে দিয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ 'এরনানির' বিষয়বস্তু স্পেনেরই একটি ঘটনা। উগো যে নাটকীয় বস্তুর সন্ধানে ফ্রান্স ছেড়ে স্পেনে গেছিলেন তার একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে স্পেনের জীবনে নাটকীয় কাহিনীর গঠন ও নাটকীয় মুহূর্তের আবির্ভাব অনেকখানি স্বচ্ছন্দ। অর্থাৎ স্পেনীয় জীবনের দারুণতা নাটককে কষ্টকল্পনা করে কদাচই। এবং এই কারণেই বোধহয় হিস্পানী নাট্যকারদের সৃষ্টি প্রায়শঃ সুপ্রচুর। রেনেশাঁসের যুগে স্পেনের নাট্য-সম্রাট, লোপে দে বেগা পাঁচশখানি নাটক রচনা করেছিলেন (সে নাটকগুলির অধিকাংশই আবার গদ্যে নয়, পদ্যে লিখিত)। তার পর স্পেনের স্বর্ণ-যুগের তথাকথিত বারোক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কালদেরণের রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা শতাধিক এবং এ ছাড়া কালদেরণ অসংখ্য ধর্মসংক্রান্ত একাঙ্কিকা বা 'আউতো'-ও লেখেন। এযুগেও এচেগারে ও বেনাবেন্তে নাটক রচনায় হিস্পানী উর্বরতার অপলাপ ঘটতে দেন নি: এচেগারের ও বেনাবেন্তের রচিত নাটকের সংখ্যা যথাক্রমে—৬৩ ও ১৪৭।

সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নাট্যকারদের কেউ—কাম্যু বা ব্রেখত্, সার্ত্র বা ইয়নেস্কো, জেনে বা বেকেট,—অবশ্যই স্পেন থেকে আসেন নি। এমন কি একথা বলাও অন্যায় হবে না যে ঠিক সমসাময়িককালে স্পেনের নাটক যে পুনর্গঠনমূলক আবহাওয়ার মধ্যে লালিত হচ্ছে তা নেহাতই দেশজ, তার আন্তর্জাতিক আবেদন সামান্য। কিন্তু য়ুরোপীয় নাটকের আধুনিকতম পর্যায়টির অগ্রবর্তী পর্যায়, যার প্রতিনিধিত্বে ছিলেন ফরাসী জিরোদু, ইতালীয় পিরান্দেল্লো ও আইরিশ শ, নিশ্চয়ই স্পেনের বেনাবেন্তে ও পরে, গারথিয়া লোরকাকে উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররূপে গণ্য করেছিল। উক্ত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরেকজন হিস্পানী নাট্যকার, যিনি তাঁর নাট্য-প্রতিভার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ

করেন প্রভ'সাল কবি মিস্ত্রালের সংগে একই বছরে—হোসে এচেগারে।

এচেগারে, বেনাবেন্তে, লোরকা ও এ'দের সংগে ঔপন্যাসিক গালদোস—এই চারজন স্পেনের আধুনিক নাট্য সাহিত্যে খ্যাতনামা। এ'দের আশেপাশে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ঃ গ্রোগোরিয়ো মার্তি-নেথ সিয়েররা, কুইনতেরো-ভ্রাতৃদ্বয়, এদুয়ার্দো মারকুইনা ও বালিয়ে ইনক্লান। স্পেনের সাম্প্রতিকতম নাটক উক্ত নাট্য-কারদের অধিকাংশকেই জীবিত পায়নি যদিও তাঁদের প্রভাব শুধু হিস্পানী নাটকের নয়, য়ুরোপীয় নাটকের অগ্র-গতিতে-ও যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে। বিশেষতঃ 'পোয়েটিক ড্রামা' বা কাব্য-নাট্যের যে য়ুরোপীয় অভ্যুত্থান আমরা লক্ষ্য করি ত্রিস্তাঁ ৎসারা থেকে এলিয়ট পর্যন্ত তার জন্য স্পেনের উল্লিখিত নাট্য-কারদের কাছে ঋণ স্বীকার অবশ্য কর্তব্য।

হোসে এচেগারে স্পেনে আধুনিক নাটকের প্রবর্তক। মেজাজের দিক থেকে রোমান্টিক হলেও এচেগারে ইবসেনের আদর্শে বাস্তবমুখী হবার চেষ্টা করেন এবং হিস্পানী নাটককে তার উনিশশতক-পর্যন্ত স্থায়ী সেকেলে ভাব থেকে মুক্তি দেন। এচেগারের আগে পর্যন্ত স্পেনের নাটকে যেন ষোড়শ শতাব্দীর লোপে দে বেগার চর্বিতচর্বণই হচ্ছিল। এচেগারেই প্রথম সচেতনভাবে নাটকে জীবনবোধের গভীরতা আমদানি করতে চাইলেন। অবশ্য এচেগারের পক্ষে বার্নাড শ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না একেবারেই, কারণ যে স্পেনের মাটিতে এচেগারের জন্ম, সে স্পেন আগাগোড়াই নাটক আর কাব্যে গুলিয়ে ফেলেছে। প্রেমের প্রাচুর্যে ও দার্শনিকত্বের ভারে সমান পুষ্ট হিস্পানী নাটকের ঐতিহ্যে কবিত্ব দুর্মরভাবে বর্তমান এবং এচেগারের—বা অন্য কোনও স্পেনীয়ের পক্ষেই,—নাটকে কবিত্ব বর্জন করে বাস্তব-সন্ধান সম্ভব ছিল না।

এচেগারেও তাই কল্পনাপ্রবণ। রীতি-মতো নাটক ও মেলোড্রামার ছক তাঁর অনিবার্যভাবে জানা হয়ে গেছিল। মহত্ত্বের ধারণা, বীরত্বের কল্পনা বা উপ-যুক্ত ভাষা—এসব কিছুরই অভাব ছিল না এচেগারের নাট্য-কলায়, কিন্তু গলদ ছিল তাঁর বাস্তবের সাধনাতেই। তাই কবিত্বই এচেগারের নাটকে আধুনিক দর্শক বা পাঠককে বেশী অভিভূত করে। উক্ত বৈশিষ্ট্যের বাহক এচেগারের প্রসিদ্ধ নাটক দুটি ঃ 'ও লোকুরা ও স্যান্তিদাদ' ('হয় ক্ষিপ্ততা নয় সাধুতা') আর 'এল গ্রান গালেওতো' ('মহান্ গালেওতো')। দ্বিতীয়টি সমধিক পরিচিত। গালেওতো, যাঁর নামোল্লেখ আছে দান্তের পায়োলো ও ফ্রাঞ্চেসকা-র বাহিনীতে ('ইনফের্নো' ৫), তিনি যেন অবৈধ প্রেমের ঘটকালি করেন যুগযুগ ধরে—এই রকম এক রূপকের ব্যাখ্যায় এচেগারের নাটকটি রচিত। গালেওতো-রূপ প্রতিবেশীর কুৎসারটনা নায়িকা তেয়োদোরাকে মিলিত করে এরনেস্তোর সংগে। তেয়োদোরার স্বামী মিথ্যা কুৎসায় আত্মহারা হয়ে পত্নীকে বাধ্য করেন এরনেস্তোকে প্রণয়ী হিসাবে গ্রহণ করতে। অর্থাৎ গালেওতো-রূপ শক্তি, তা মানুষেরই হোক বা গুজবেরই হোক, অনধিকার প্রণয় সংঘটিত করে।

নাটকের আখ্যানভাগে নিঃসন্দেহে নূতনত্ব আছে এবং নাটকের আবহাওয়া বাস্তববাদী। মিথ্যা সন্দেহ, ভুল-বোঝা কুৎসার চাপ—এ জাতীয় অশুভ শক্তি মানুষের জীবনে সর্বকালেই দুর্বি-পাক সৃষ্টি করে। স্পেনীয়দের জীবনে এই ভুল-বোঝা খুব সহজে ধারাল রূপ নেয় এবং দম্পতির সুখ ছিন্নভিন্ন ক'রে দেয়।

সম্পূর্ণ অমূলক এক সন্দেহের বশে নবদম্পতির জীবনে দুর্যোগ দেখা দেয় বেনাবেন্তের নাটক 'রোজাস দে ওতোনিয়ো'তে ('শরতের গোলাপ')। * নববিবাহিত দম্পতি পেপে ও মারিয়া আন্তোনিয়া এক ভুল-বোঝা ও তদনুসৃত সন্দেহাদিতে বিপর্যস্ত হয়ে ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। প্রকৃত কারণ যে কী—তা বাইরের কেউ কেন, ওরা দুজনেই জানত না। সন্দেহের তিলকে দাম্পত্যজীবনে তাল-করার প্ররোচনা সহজলভ্য, কাজেই মারিয়া আর পেপে অসহায় মাৎসর্যে ডুবে বিচ্ছেদের একমাত্র তীরে ওঠার অপেক্ষায় থাকে।

পেপের থিয়েটারে গিয়ে রাত-কাটা'ন বা সহরের পথে একলা, উন্মন ঘুরে বেড়ান নিয়ে কথা হয়। মারিয়া উট্‌কো সন্দেহের জালে আটকে আপন অনষ্ট সতীত্ব নিয়ে বড়াই করার প্রবৃত্তি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিল। মারিয়ার পিতা গনথালো আর বিমাতা ইসাবেল,—তাঁদের জীবনে-ও এককালে অশান্তি ছিল এবং তাঁদের বর্তমান, কষ্টার্জিত দাম্পত্যশান্তি অনেকখানিই সহ্যশীলা ইসাবেলার দান। তাঁরা পুত্রী-জামাতার সন্দেহজর্জরিত জীবনে সুখের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কামনা ক'রে পেপেদের বাড়ী আসা-যাওয়া করেন, সমাধানের তদ্বির করেন দুজনারই কাছে। শেষ পর্যন্ত ইসাবেল অশান্ত, ক্ষুব্ধ মারিয়া আন্তো-নিয়াকে বিবাহিতা নারীর আত্ম-বিসর্জনের যুক্তি শোনান ঃ

"সরল, সুখের প্রেম, যা কেবল চেনে আলেয়া আর কামনা, ক্ষণস্থায়ী—একটি বসন্তে তার সব ফুল ঝরিয়ে ফেলে। পত্নীর প্রেম, স্থির বিশ্বস্ত সেই প্রেম, আশায় বুক বাঁধতে জানে যা,—তারই তরে ফোটে আমাদের ফুল, দেরীতে—ফোটা ফুল, শরতের গোলাপ। প্রেমের ফুল ত' নয়, আত্মদানের অশ্রুতে সজীব-রাখা, কর্তব্যের ফুল, হৃদয়ের সুরভি তাতে লেগে লেগে এক চিরন্তনের স্বাদ।"

এচেগারের রীতিমতো নাটক থেকে বেনাবেন্তের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ কমেডি হিস্পানী নাটকের অগ্রগতি নির্ণীত করে। পরবর্তী পর্যায়ে মার্তিনেথ সিয়েররা ও কুইনতেরো-ভ্রাতৃদ্বয় এই অগ্রগতিতে তাদের বিশিষ্ট অবদান যোগ করেন। কুইনতেরো ভ্রাতৃদ্বয়—সেরাফিন ও হোয়াকুইন কুইনতেরো দুজনে যৌথ-ভাবে যে বিচিত্র ধরণের নাটক রচনা করেন তাতে আন্দালুসিয়ার অধিবাসী-দের ছন্দোময় জীবনযাত্রা ও প্রাণচাঞ্চল্য অপূর্বভাবে রূপায়িত হয়। জীবন-সম্ভোগই যেন এ'দের নাটকের বিষয়বস্তু।

কাব্যের প্রতি হিস্পানী নাট্যকারদের প্রবণতার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। সেই প্রবণতার চরম উৎকর্ষ দেখা যায় ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার নাটকে। বস্তুতঃ লোরকার নাটকগুলি কাব্য-নাট্য, যদিও এলিয়টের নাটকগুলির মতো সর্বতোভাবে কবিতায় লিখিত নয় সেগুলি। লোরকার পূর্বে স্পেনে কাব্য-নাট্যের সাধনা যে দুজন অন্ততঃ করে-ছিলেন—এদুয়ার্দো মারকুইনা ('লাস ইহাস দেল থিদ' বা 'ওস্তাদের মেয়েরা') ও ঔপন্যাসিক বালিয়ে-ইনক্লান ('কোয়েন্তো দে আব্রিল' বা 'এপ্রিল কাহিনী'), তাঁরা লোরকা-সৃষ্ট নাটকীয় গুরুত্ব ও কাব্যিক অভিনবত্বের হদিশই পাননি। চরিত্রসৃষ্টি, বাচন ও আঙ্গিক—সবই লোরকার কাছে বিস্ময়কর নূতনত্ব ও তীব্রতা লাভ করে। কবিতা ও নাটকের এক অভূতপূর্ব সঙ্গম ঘটান লোরকা; তাঁর নাটকে কাব্য বাড়তি ঐশ্বর্য নয়, নাটকের সংগে বোনা, অন্তরঙ্গ এক কারুকার্য।

মাত্র আটত্রিশ বছরের জীবনে লোরকা বেশী লেখার অবসর পাননি। বাইশ বছর বয়সে কবিতায় লেখা তাঁর প্রথম নাটক ঃ 'এল মালে ফিথিয়ো দে লা

---

*Rosas de Otons : Jacinto Benavente. Colleccion Austral, Espasa —Calpe, S.A.

মারিপোসা' (প্রজাপতির অভিশাপ); 'লা কাসা দে বেরনারদা আলবা' ('বেরনারদা আলবার গৃহ'), ১৯৩৬ সালে লেখা, তাঁর শেষ নাটক। এ দুয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি নাটকই লোরকা লিখেছিলেন।

মুখ্যতঃ কবি হলেও নাট্য-আন্দোলনের সংগে লোরকার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। এক সময় তিনি ভ্রাম্যমাণ য়ুনিভার্সিটি থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন। নাটকে মন তাই তাঁর বিশেষভাবেই ছিল। কিন্তু সেই সংগে ছিল বাস্তব ও স্পেনীয় জীবনের গতিবিধি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। তাই তাঁর নাটকে আপাত-অবাস্তব বা অতিনাটকীয় ঘটনার ব্যবহারেও বাস্তব কমজোর নয়। আর বাস্তবের পাঠে লোরকার এমন মর্মস্পর্শী বোধ যে বাস্তব কাহিনীতে তিনি প্রতীকের ছায়াপাত ঘটান সহজে। 'ইয়েরমা' নাটকে বন্ধ্যা ইয়েরমা তার নির্বীজ অথচ কামপরায়ণ স্বামী, হুয়ানকে গলা টিপে হত্যা করে। তার যুক্তি এই যে বার্থ উপভোগের বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেয়ে চিরবন্ধ্যাত্ব মেনে নেওয়াতেই তার নারীত্বের মর্যাদা। স্বামীকে হত্যা ক'রে প্রয়োন্মাদিনী ইয়েরমা বলে : নিজে মেরেছি আমি আমার ছেলেকে! 'বোদাস দে সাঙগ্রে' ('রক্ত পরিণয়') প্রণয়ের ভীষণতা রূপায়িত করে একটি গ্রাম্য অনাড়ম্বর কাহিনীর মাধ্যমে। বর বিয়ে করতে এসেছে, কনে সেজেছে, নিমন্ত্রিতেরা হাজির, বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠান শেষ হয়ঃ—হঠাৎ জানা গেল কনে পালিয়েছে তা'র পুরানো প্রেমিক, বিবাহিত লেওনার্দোর সংগে। বরের মা তাঁর পুত্রকে হেঁকে বললেন : এ ষড়যন্ত্র, প্রতারণা! ছোটো ওদের পিছু!......তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো লেওনার্দো আর কনে অরণ্যের অন্ধকারে আশ্রয় খোঁজে। সন্ত্রস্ত তবু উদ্দাম প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলন হয়। তারপর প্রতারিত বর আর দুঃসাহসী লেওনার্দো ছুরিকা-যুদ্ধে মৃত্যুর চিরাচরিত পথে মীমাংসা মানে। একটি ছুরিকা দুজনের মৃত্যু ঘটায়, দুটি বিকট আর্তনাদে এই বিশৃংখল প্রেম কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ঐ ছুরিকা, যা এ নাটকে প্রেমেরই আশ্চর্য প্রতীক, যবনিকাপাতের পূর্বে যেন চোখের সামনে নাচে, কনে বলে :

> আর এইটে হ'ল ছুরি
> একটা ছোট্ট ছুরি
> বাগিয়ে ধরাই যায় না হাতে...

কনের মা বলেন :

> বাগিয়ে ধরাই যায় না হাতে
> তবু কেমন বেবাক্ কাটে
> চমকে-ওঠা মাংস......।

লোরকা, বেনাবেন্তে ও মার্তিনেথ সিয়েরার মৃত্যুতে স্পেন তার নাট্য-সাহিত্যের দিকপালদের হারিয়েছে। সামাজিক নাটকে বেনাবেন্তে এবং কাব্য-নাট্যে লোরকা যে কীর্তি ও প্রতিশ্রুতি রেখে যান, সমগ্র য়ুরোপের নাট্য-প্রচেষ্টাকে তা সাহায্য করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু স্বদেশে তার মর্যাদা রক্ষা মোটেই যথেষ্ট হয়নি। বরং পূর্ণাংগ নাটক রচনার দায়িত্ব এড়াবার জন্য হিস্পানী নাট্যকারেরা একাঙ্কিকার সাধনায় মগ্ন হয়েছেন সাম্প্রতিককালে। বর্তমানে একাঙ্ক নাটক হিসাবে স্পেনে যা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার নাম 'জেনেরো চিকো' বা প্রহসন। সমালোচনা ও ব্যংগ, প্রধানতঃ সামাজিক, 'জেনেরো চিকো'র উপজীব্য। রিকার্দো দে লা বেগা এই ধরণের নাট্য-রচনার পথপ্রদর্শক। অন্যান্য যাঁরা স্পেনে 'জেনেরো চিকো'র রচয়িতারূপে খ্যাতি-লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কার্লোস আর্ণিচেস ও ভিতাল আথা প্রধান।

দেশে বিদেশে

॥ পেথিক লরেন্স ॥

লর্ড পেথিক লরেন্স তিনদশক থেকে পাঁচদশক অবধি ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি পূর্ব এডিনবরা পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিতর্ককালে তিনি যে জ্ঞান ও হৃদয়ের পরিচয় দেন তাতে বিরোধী দলের সদস্যরূপে তাঁর খুব সুখ্যাতি হয়। ১৯৩১ সালে তিনি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের সদস্য হয়েছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের সংগে একই বৈঠকে ভারত প্রশ্নের মীমাংসায় এই হচ্ছে প্রথম ঐতিহাসিক বৈঠক। ১৯৪৫ সালে শ্রমিক দলের জয়-লাভের পর মিঃ এটলী পেথিক লরেন্সকে ভারত-রক্ষ রাষ্ট্রসচিবের পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর এই নিয়োগে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মহলে আশার সঞ্চার হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষে যে ক্যাবিনেট মিশন আসে তার নেতৃত্ব ছিল তাঁর এবং তাঁর সংগে ছিলেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস ও মিঃ এ ভি আলেকজাণ্ডার। লর্ড ওয়াভেল তখন বড়লাট। মিশন এসেই এখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজন্যবর্গের চ্যান্সেলারের সংগে আলাপ আরম্ভ করেন। তখন পেথিক লরেন্সের বয়স ৭৫-এর কাছাকাছি। কিন্তু মিশন ব্যর্থ হল। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম লীগের দাবী-পূরণে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রসম্পর্কে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাদে আঞ্চলিক শাসন প্রবর্তিত হোক। নেতৃবৃন্দের তা গ্রহণ-যোগ্য হয়নি। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ এটলী বৃটিশশাসনব্যবস্থা প্রত্যাহারের একটা নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করলেন। লর্ড ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। এপ্রিল মাসে লর্ড পেথিক লরেন্স পদত্যাগ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স য়্যাক্ট (ভারত স্বাধীন আইন) যথাসাধ্য সমর্থন করেন এবং নতুন দুটো ডোমিনিয়নের মধ্যে যাতে সৌহার্দ্য থাকে তার জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

লর্ড পেথিক লরেন্সের মৌলিক নাম ছিল ফ্রেডারিক উইলিয়াম লরেন্স, বিয়ে হবার পর তাঁর স্ত্রীর নাম পেথিক তাঁর নামের সংগে যুক্ত করেন। সেই থেকে পেথিক লরেন্স। ১৮৭১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম আলফ্রেড লরেন্স। ইটন ও কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর এই শিক্ষা-জীবন বহু কৃতিত্বে চিহ্নিত। এশিয়ার নানা দেশ ঘুরে এসে আইন পড়ে ব্যারিস্টার হন। এর সংগে সমাজ সেবার কাজ চলতে থাকে। দুবছর "লেবার রেকর্ড ও রিভিয়ুর" সম্পাদনা করেন। তারপর মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং সস্ত্রীক নয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অনশন ধর্মঘট করেন। জোর করে খাওয়ানো হয়। পাঁচ সপ্তাহ পর কারামুক্তি হয়। মামলার খরচ দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে দেউলিয়া বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে তিনি শান্তিবাদী ছিলেন এবং বৃটেনের যোগদান তিনি সমর্থন করতে পারেননি। দু'একবার ব্যর্থ হবার পর তিনি ১৯২৩ সালে উইনস্টন চার্চিলকে হারিয়ে শ্রমিক সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সালে তিনি দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। তিনি অর্থশাস্ত্রে অনেক বই লিখেছেন। মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু পেথিক লরেন্স অমর ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন।

॥ রাসেল ॥

শান্তি রক্ষায় মুচলেকা দিতে অস্বীকার করায় সত্যাগ্রহী দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। রাসেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একখানি মেডিক্যাল সার্টি-ফিকেট পেশ করার সংগে সংগে ম্যাজি-স্ট্রেট ঐ দণ্ড হ্রাস করে সাতদিন ধার্য করেন। অর্থাৎ দণ্ড বহাল রইলই। শান্তির জনাই তাঁর সংগ্রাম, অথচ তাঁর কাছেই শান্তি রক্ষার মুচলেকা দাবী হাস্যকর নয়, লজ্জাকর। এই ৮৯ বছরের মানবকল্যাণকামী দার্শনিকের বিরুদ্ধে এই দণ্ডাদেশ শুনে উপস্থিত লণ্ডন-বাসীরা ধিক্কার ধ্বনি দিয়ে উঠে এবং ক্রোধে 'ফ্যাসিস্ট' শব্দটি উচ্চারণ করে।

তাঁর অপরাধ তিনি পরমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ বা প্রয়োগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপনে গণ-উপবেশনের কর্ম-সূচী নিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর মতাবলম্বীদের "শতজনের কমিটি" নামে অভিহিত করা হয়। তাঁদেরই ৩৭ জনের ওপর শান্তিভংগের শমন জারী হয়েছিল।

আদালতে উপস্থিত এক লণ্ডনবাসী লর্ড রাসেলের দণ্ড ঘোষণার পরে পরেই চীৎকার করে বলে : আহা, বুড়ো মানুষ!

তাঁর স্ত্রীরও সাতদিনের কারাদণ্ড হয়েছে। আরও যাঁদের ওপর কারাদণ্ড বিধান হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছে রেভাঃ মাইকেল স্কট ও ডাঃ আলেক্স কমফর্ট—এ দু'জনের এক মাস করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বরাবর লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যাঁরা জগদ্বিখ্যাত চিন্তা-নায়ক তাঁদের সংগে রাষ্ট্রনায়কদের সম্পর্ক বিবাদের। কারণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে সাধারণত স্বল্পবুদ্ধি বৈষয়িক লোকেরাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হলেও গ্যালিলিও-সক্রেটিস প্রভৃতি থেকে এই রাসেল পর্যন্ত কোন চিন্তানায়কেরই পর্যায়েই রাষ্ট্র-নীতিকরা নন। তাঁদের দৃষ্টি নিঃসন্দেহে সংকীর্ণ স্বার্থদৃষ্ট—জাতির বা রাষ্ট্রের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ বলে তাঁদের দৃষ্টি সে সীমার বাইরে যায় না। রাসেলের ভাগ্য এই যে, তিনি গ্যালিলিও-সক্রে-টিসের যুগে জন্মাননি, তাই কারাদণ্ড হল। সেকালে এজন্য প্রাণদণ্ডও হতে পারত। রাসেলের কারাদণ্ড ইতিহাসের গতিপথে একটি চিরকালের দুঃখবহ চিহ্ন হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রনায়কদের চোখে আজও মানবকল্যাণের পথটা অস্পষ্ট।

॥ রপ্তানী ॥

বণিক সমাজকে কিছু পণ্য রপ্তানীর জন্য বাধ্য করার উদ্দেশ্যে সরকার আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করছেন। স্বভাবতই এনিয়ে বণিক মহলে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। তা নিরসন করার জন্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডী রপ্তানী উন্নয়ন পর্ষদকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, বাধ্যতামূলক রপ্তানীর জন্য আইন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করার আগে বিশিষ্ট বণিকসভাগুলোর সংগে পরামর্শ করা হবে। তিনি বলেছেন, তৃতীয় পরিকল্পনা যদি সফল ও সার্থক করতে হয় তবে পণ্য রপ্তানী অপরি-হার্য। দেশের অর্থনীতিতে আজ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বেচ্ছা প্রণোদিত উদ্যোগে যদি সন্তোষজনক ফল না পাওয়া যায় তবে কিছু পণ্য রপ্তানীর জন্য সংরক্ষিত রাখতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করার উদ্দেশ্যে আইন করতে হবে। উত্তরোত্তর রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগের কৃতসংকল্প। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তাঁরা সর্ববিধ সাহায্য করতেও প্রস্তুত। তিনি আশা করেন, আজ রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা নিরাকরণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো উদ্যোগী হবে। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বছরে ৩,৭০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করা, পরিমাণ অবশ্যই পণ্যবিশেষে বিভিন্ন রকম হবে। এজন্য, শুধু নির্দিষ্ট উৎপাদন নয় উদ্বৃত্ত উৎপাদনের প্রয়োজন হবে এবং অব্যাহত চেষ্টায় রপ্তানীযোগ্য বাজারের সন্ধান করতে হবে। এই সম্পর্কে তিনি

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে চা ও পাট উৎপাদনের কথাও পরিসংখ্যানযোগে উল্লেখ করেন।

এ সবই নিঃসন্দেহে অর্থশাস্ত্রের কথা। সাধারণের অশাস্ত্রীয় কথা হচ্ছে যে, দুইটি পরিকল্পনাতেই খাদ্য ও ভোগ্য পণ্যের দর যেরকম আকাশ-ছোঁয়া হয়েছে এবং সাধারণের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছে তাতে এই রপ্তানী পরিকল্পনা বোঝার ওপর বোঝা হয়ে পড়তে পারে। চিনি রপ্তানীতে অর্থশাস্ত্রের সাম্য হয়তো রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু মাছ-মাংস ডিম তরিতরকারী অন্নবস্ত্র যানবাহন প্রভৃতি নবমূল্যায়নের জন্য শুধু ওপর দিকে লাফাচ্ছে। চিনি রপ্তানীর ধারা ও রীতি আমাদের যেভাবে সহায়তা করবে তা খুব ভরসার কথা নয়। দ্রব্য-মূল্যের উর্ধ্বগতিরোধ ও মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রামান হ্রাসও কি অর্থশাস্ত্র নয়? দেশকে বিষম দুর্বিপাকে রেখে পরদেশে ডাম্পিং করে স্বদেশের পরিকল্পনা খাতে কিঞ্চিৎ অর্থাগম সুস্থ অর্থশাস্ত্রের অনুশাসন বলে অনেকেই মনে করেন না। সেদিক থেকে রপ্তানী নীতি এক দেশ-দর্শী না হয়ে পড়ে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ লজ্জা ॥

আমাদের পরম লজ্জার সঙ্গে খবরের কাগজে পড়তে হচ্ছে যে, সোভিয়েট রুশিয়ায় প্রস্তাবিত রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ড এক লক্ষ ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। এ আমাদের লজ্জার না হয়ে পূর্ণ গৌরবেরই হতে পারত যদি আমাদের সরকার রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩ খণ্ডে প্রকাশ করার প্রস্তাব করে পাঠকদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আগাম তুলে না রাখতেন। হিসেব করলে দেখা যাবে তাঁরা সাত আট মাসে দুখণ্ডের বেশী ছেপে প্রকাশ করতে পারলেন না। আমাদের ছাপা হচ্ছে ৫০,০০০; এক লক্ষ নয়।

এই নতুন সংস্করণ রুশ রবীন্দ্র রচনাবলীর আগে ১৯৫৭ সালে আট খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করা হয়েছিল। এবারকার সংস্করণটি বৃহত্তর এবং ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। রুশ রবীন্দ্র রচনাবলীর নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে আছে ১২টি গল্প ও দুটি উপন্যাস। অন্যান্য খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমগ্র রচনা সন্নিবেশ করা হবে। আমাদের মতো বাংলা থেকে বাংলায় পুনর্মুদ্রণ নয়; তাতেই আমরা ঘামিয়ে অস্থির; শেষ করতে পারব কিনা, কে ভরসা দেবে? শিক্ষা বিভাগ নীরব। রুশ সংস্করণের অসুবিধা হল, বাংলা ভাষায় লেখা রবীন্দ্র রচনাকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করতে হয়েছে, তারপর সম্পাদনা ও মুদ্রণ। অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ শেষ, এখন মুদ্রণ চলছে। রচনাকালের সময়ক্রম অনুসারে এই নতুন [illegible] হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের [illegible] চনা, ভারতবর্ষ ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতাবলী ও স্মৃতিচারণ শেষ দুই খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়েছে। যারা আকাশে নিউক্লিয়ার বোমা ফাটায় তারা রবীন্দ্র রচনাবলীও লক্ষ সংখ্যায় ছাপে। আমরা মাত্র একটি কাজ নিয়েছি; তাও ছেপে উঠতে পারলাম না। রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রাহকেরা এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

॥ গেজেট ॥

সরকারী কাজে বাংলা ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ চলতি অধিবেশনেই যে বিল আনছেন তা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিলটির নাম হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাষা বিল (১৯৬১)। আইন হলে বিধানমণ্ডলী ও প্রশাসনিক কাজে এই ভাষাই সরকারী মর্যাদা পাবে। এ সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রযুক্ত হবে। কবে কোথায় প্রযোজ্য তা অবশ্য বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো হবে।

এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জানাই। সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করলে সে ভাষা পরিপুষ্ট হতে বাধ্য। যে ভাষা সরকারী ভাষা হয় সে ভাষার দিকে নানা কারণে লোকের ঝোঁক যায়। ইংরেজী আমাদের সরকারী ভাষা ছিল; কেবল চাকরীর জন্য নয়, সে তো নিঃসন্দেহে বড় আকর্ষণ ছিল, বিরোধীতার জন্যও আমাদের ইংরেজী ভাষা গরজে শিখতে হয়েছে। সাহিত্য বিজ্ঞান পড়তেও আমাদের ইংরেজী শিখতে হয়েছে; কেননা, শিক্ষা ক্ষেত্রে বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেউই মাতৃভাষার প্রয়োজন বোধ করেনি বলে এ ভাষা ছিল উপেক্ষিত। নিতান্ত বিরোধীতার মধ্যে বাংলা ভাষা পরিপুষ্ট হয়েছে; অনুকূল অবস্থা থাকলে আজ তা সহস্র ধারায় প্রবাহিত হতে পারত। ঐ বিদ্রোহের মধ্যে স্বতন্ত্র দেশের সাহিত্য ও সংবাদপত্র, আরও কিছুপর, শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলার স্বীকৃতি বাংলাভাষা আজ যা সেই স্তরে এনেছে। কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রে একটা প্রবল অভিমান ও ক্ষোভের প্রকাশ থেকেই গেছেল। সমৃদ্ধ ইংরেজী ভাষায় আমরা প্রভূত উপকৃত হয়েছি সন্দেহ নেই কিন্তু একটা বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেছি বলে একটা অন্যায় অভিমান এবং অহংকার জেগেছে—এবং এই অভিমান ইংরেজী-অনভিজ্ঞ বৃহত্তর জনসাধারণকে দূরে ঠেলে দিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার করেছে। ফলে একটা

১। (গ) চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি কবিকঙ্কণ। সেই কারণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডী বলে খ্যাত।

২। (ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৩। (ক) জয়দেব।

৪। (ক) রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

৫। (ঘ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। এ'র অন্নদামঙ্গল বিখ্যাত গ্রন্থ।

৬। (খ) রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত কুলীন-কুলসর্বস্ব একটি সামাজিক নাটক।

৭। (ক) চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি শ্রীমন্ত কাহিনীর মধ্যে এই কমলে-কামিনীর উপাখ্যান আছে।

৮। (ঘ) ফুল্লরা।

৯। (খ) সায় বেনে।

১০। (খ) কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

জাতীয় সংহতি আদৌ গড়ে ওঠেনি। আজ এই স্বীকৃতির ফলে, সরকারী দপ্তরে, বিধানসভায়, আদালতে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে, বক্তৃতামঞ্চে এবং সামাজিক জীবনের সকল স্তরে বাংলা ভাষীদের মধ্যে মানসিক একাত্মভাবের সৃষ্টি হবে —এ এক পরম লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার শব্দদৈন্য, কি প্রশাসন কি বিজ্ঞান, সর্বত্র ঘোচাতে আমরা বাধ্য হব। তবে এ বিষয়ে একটি সতর্কতার প্রয়োজন। কয়েকটি পণ্ডিত বসিয়ে কতকগুলো কৃত্রিম শব্দ আরোপ কিছুতেই ভাল হবে না, ওটা আত্মঘাতী হবে মাত্র। বিদেশী শব্দ মোটামুটি চালু হয়ে গেছে যথাসম্ভব সেগুলোই রাখতে হবে এবং সংস্কৃত আছে বলে অপ্রচলিত শব্দও প্রচলিত করার জন্য শাসনদণ্ড উদ্যত করতে হবে—এমন কিছুতেই যেন না হয়। আগামীকালের পরিপুষ্ট ভাষায় অনেক ইংরাজী, অনেক হিন্দী, অনেক নেপালী, অনেক ওড়িয়া, এমন কি অসমীয়া ভাষা থাকবে, ক্ষতি নেই। বরং মাতৃভাষাকে অলংকৃত করার সে-ই পথ। তারপর ভাষা নিজের পথ নিজেই কাটবে।

॥ ঘরে ॥

৮ই সেপ্টেম্বর—২২শে ভাদ্র : পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিকল্পে রাজ্য সরকারের উদ্যম—বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনান্তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি— আপোষ-মীমাংসার আশায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ধর্মঘট ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত।

গোয়া, দমন ও দিউ-এ পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের অব্যাহত সামরিক প্রস্তুতি—আরও অস্ত্রশস্ত্র মজুত ও মাইন স্থাপন—ভারত সরকারের সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পাটের সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত।

৯ই সেপ্টেম্বর—২৩শে ভাদ্র : কলিকাতা ও মোগলসরাই'র মধ্যে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচল আগামী জানুয়ারী মাস হইতে শুরু হইবে বলিয়া রেল-কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে ঘোষণা।

১০ই সেপ্টেম্বর—২৪শে ভাদ্র : 'সাধারণ ও পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণই বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম প্রশ্ন'—আন্তর্জাতিক সঙ্কট নিবারণে শ্রীনেহরু (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) ও ক্রুশ্চেভের (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) মতৈক্য—মস্কোর আলোচনার পর ভারত-সোভিয়েট যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার বহু গ্রাম ও সহরসমেত বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত—ইন্দোরে ১৪ জন যাত্রী-সহ বাস জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ।

১১ই সেপ্টেম্বর—২৫শে ভাদ্র : বার্লিন প্রশ্নে ক্রুশ্চেভ ও কেনেডির বৈঠক হইবে বলিয়া শ্রীনেহরুর আশা প্রকাশ—বেলগ্রেড ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরান্তে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর সাংবাদিকদের নিকট প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি—বার্লিন সমস্যার সমাধান সম্ভবপর বলিয়া মন্তব্য।

'আগামী ছয় মাসে আমদানীর কড়াকড়ি হ্রাস করার সম্ভাবনা নাই'—দিল্লীতে আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী কে পি রেড্ডীর ঘোষণা—রপ্তানী জোরদার করিয়া তোলার জন্য শিল্পপতিদের প্রতি আহ্বান।

১২ই সেপ্টেম্বর—২৬শে ভাদ্র : ভিয়েনা হইতে ৮ দিন পর ডাঃ সুবোধ মিত্রের (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) মৃতদেহ বিমানযোগে কলিকাতা আনয়ন—দমদম হইতে কেওড়াতলা মহাশ্মশান পর্যন্ত বিরাট শোকযাত্রা।

'অবস্থা বিপজ্জনক সত্ত্বেও যুদ্ধরোধ করা সম্ভব'—দিল্লীতে সংসদীয় কংগ্রেস দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

১৩ই সেপ্টেম্বর—২৭শে ভাদ্র : 'বেতন কমিটির সুপারিশ 'অসংগত' ও কর্মচারীদের স্বার্থবিরোধী'— সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রতিনিধিদের উক্তি।

বিহার মন্ত্রিসভার (কংগ্রেসী) বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ১৯৬-৩৬ ভোটে অগ্রাহ্য।

১৪ই সেপ্টেম্বর—২৮শে ভাদ্র : 'পাটের আগামী মরশুমের পূর্বেই সর্বনিম্ন মূল্য ঘোষণা—চাষীদের অধিক ঋণদানের প্রস্তাব নীতিসঙ্গতভাবে স্বীকার—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি।

মাংস ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত—ডাঃ রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) সহিত পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সমিতি প্রতিনিধিদের আলোচনার ফল।

॥ বাইরে ॥

৮ই সেপ্টেম্বর—২২শে ভাদ্র : 'সমগ্র মানবজাতি পুনরায় আর একটি সর্বনাশা যুদ্ধের সম্মুখীন'—মস্কো-এ রুশ-ভারত মৈত্রী সভায় শ্রীনেহরু ও মঃ ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা—অবিলম্বে জার্মাণ সমস্যা সমাধানের জন্য রুশ প্রধানমন্ত্রীর হুঁসিয়ারী।

৯ই সেপ্টেম্বর—২৩শে ভাদ্র : পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের পাশ্চমী প্রস্তাব রাশিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য—বৃটেন ও আমেরিকার নিকট ক্রুশ্চেভের জবাব প্রেরণ—জার্মাণ শান্তি-চুক্তিই মূল প্রশ্ন বলিয়া উল্লেখ।

প্যারিসে প্লাস্টিক বোমা ফাটাইয়া প্রেসিডেন্ট দ্য গলকে হত্যার চেষ্টা—ফরাসী নায়কের কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা—ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দুইজন প্রাক্তন জেনারেল গ্রেপ্তার।

জার্মাণ শান্তি-চুক্তি ব্যাপারে নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান—রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের পরিকল্পনা— সম্মেলনে ভারতের যোগদান প্রশ্নে নেহরুর সহিত কথাবার্তা।

কাতাঙ্গায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রেসিডেণ্ট শোম্বের চূড়ান্ত চেষ্টা—কেন্দ্রীয় কঙ্গোলী সরকারের অভিযান প্রতিরোধে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত।

১০ই সেপ্টেম্বর—২৪শে ভাদ্র : 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ' বাধানো হইলে সাম্রাজ্যবাদীদের সমাধি রচিত হইবে'—ষ্ট্যালিনগ্রাডের জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী।

১১ই সেপ্টেম্বর ২৫শে ভাদ্র : রাশিয়া কর্তৃক মেগাটন শক্তিসম্পন্ন বোমা বিস্ফোরণ—একদিনে দুইটি পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার সংবাদ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের চরমপত্র কাতাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট শোম্বে কর্তৃক অগ্রাহ্য—নির্দেশ অনুযায়ী লিওপোল্ডভিলে (কঙ্গোর রাজধানী) যাইতে নারাজ।

১২ই সেপ্টেম্বর—২৬শে ভাদ্র : প্রখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক আর্ল রাসেল (৮৯) কারাদণ্ডে দণ্ডিত—আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণ আন্দোলন চালাইবেন না বলিয়া মুচলেখা দিতে অস্বীকৃতির জের।

শান্তি মিলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকার্ণো ও মালির প্রেসিডেন্ট মোডিবো কেইটা—ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সহিত সাক্ষাৎকার।

১৩ই সেপ্টেম্বর—২৭শে ভাদ্র : প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী কর্তৃক কাতাঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ দখল—কাতাঙ্গা কঙ্গোর একটি প্রদেশে পরিণত—রাজধানী (এলিজাবেথভিল) হইতে প্রেসিডেণ্ট শোম্বের পলায়ন।

মার্কিণ যান্ত্রিক মহাকাশচারীর পৃথিবী প্রদক্ষিণ—পৃথিবীর কক্ষপথে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ প্রেরণের প্রাকমহড়া।

১৪ই সেপ্টেম্বর—২৮শে ভাদ্র : বার্লিন সমস্যা লইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষ আলোচনা—প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ উভয়েই সম্মত।

'কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দাবী'—বৃটেনের সাধারণ বাজারে যোগদানের প্রশ্নে শ্রীমোরারজী দেশাই'র (ভারত) সর্ত আরোপ—আক্রায় কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে ভাষণদান।

অভয়ংকর

॥ চিরায়ত দর্শন ॥

পরলোকগত রাজশেখর বসুর ভূমিকা ও অনুবাদ সংবলিত হয়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, এতে সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই আনন্দিত হবেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হিন্দুর এক বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুর ধর্মজীবনে গীতার স্থান তাই অনেক উঁচুতে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, গীতা বেদের সর্বোত্তমভাষ্য।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের একটা সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের যে প্রচেষ্টা ভগবদ্‌গীতা আছে, তেমন আর কোথাও নেই। বিভিন্ন ধরণের মতবাদ এই মহাগ্রন্থে একত্রিত হওয়ায় ভগবদ্‌গীতা সুদীর্ঘকাল ধরে মানবমনে প্রেরণা সঞ্চার করে আসছে। গীতা এক হিসাবে সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ, গীতার মধ্যে হিন্দুধর্মের যে মূল সুর অর্থাৎ উদারতা, তা আছে, গীতায় জ্ঞানযোগে তাই আছে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ
পার্থ সর্বশঃ॥"

(যারা যেভাবে আমার ভজনা করে, আমি তাদের সেইভাবেই তুষ্ট করি। হে পার্থ, সর্বপ্রকারে মানুষে আমার পথ অনুবর্তন করে।) এমন কি অন্য দেবতার পূজা করলেও অবিধিপূর্বক আমারই পূজো করে একথাও বলা আছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটি সুসংহত গ্রন্থ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে যুগে যুগে তার বিচার হয়েছে, আজো সেই বিচার ও বিশ্লেষণের সমাপ্তি ঘটেনি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকবৃন্দ গীতার সমন্বয়ী সেশ্বর-ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গীতার মর্মবাণী ব্যাখ্যা করেছেন।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গীতাপাঠ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "আমার কুটিরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে—ভগবদ্‌গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য ঈশ্বরের মহিমা উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রহিয়াছে—ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই। পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকছটা দিগ্-দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে—আমাদের ঐ ক্ষুদ্র দীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে। উহা হইতে যে এক প্রকার সূক্ষ্মবাষ্প উদ্‌গীরিত হইতেছে তাহাতে আমাদের দেশের বায়ু পবিত্র হইতেছে : আর সেই বাষ্পনিচয়ের শ্বেতাভ্র হইতে বিন্দু বিন্দু শান্তিবারি যাহা আমাদের ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে সিঞ্চিত হইতেছে তাহা মৃত সঞ্জীবনী সুধা, তাহা অমরত্বের সোপান।"

মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ "উদ্ধরেৎ আত্মনানাং নাত্মানং অবসাদয়েৎ" আত্মাকে আত্মার বলে তুলবে, অবসন্ন হতে দেবে না, এই বাণীর মধ্যে এক অপূর্ব উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন। তাঁর 'গীতাপাঠ' গ্রন্থটি ইদানীং দুষ্প্রাপ্য কিন্ত 'গীতাপাঠের' ভূমিকা হিসাবে এই সুন্দর গ্রন্থটি অতিশয় মূল্যবান।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে আছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবসানে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে বলেন—গীতার সমস্ত উপদেশ বিস্মৃত হয়েছি, আর একবার বলুন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলেছিলেন :

"ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন
তন্ময়া।"

আমি যে ব্রহ্মতত্ত্ব তোমাকে বলেছি তা যোগযুক্ত হয়ে বলেছি, আজ আর তা বলা সম্ভব নয়।

ব্রহ্মবিদ্যা গীতার প্রতিপাদ্য এবং গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগযুক্ত অবস্থায় প্রদত্ত বাণী। গীতায় ব্রহ্মবিদ্যা স্বীকৃত, আর তারমধ্যে যেসব ধর্মতত্ত্ব আছে তা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত, গীতায় নির্গুণব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে সগুণ ব্রহ্মে রূপান্তরিত করা হয়েছে আর মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের এবং উপনিষদবর্ণিত পদ্ধতির স্বীকৃতি আছে। গীতার এই মতবাদকে সাংখ্যবাদ বলা হয়েছে। সাংখ্য ও যোগের ব্যাখ্যাও গীতাতে আছে। গীতায় পঞ্চমহাভূত, বুদ্ধি, অহংকারকে প্রকৃতির অভিব্যক্তি দানের চেষ্টা করা হয়েছে। সাংখ্যের মত পুরুষ এখানে নিষ্ক্রিয় হিসাবে গণ্য করা হয়নি। নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী মত গীতায় সংকলিত, একটা সমন্বয় প্রচেষ্টা আছে কিন্তু সেই বক্তব্য কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল এবং অনির্দিষ্ট। উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে পরিস্রুত অবস্থায় গীতায় গৃহীত হয়েছে, গীতার মধ্যে সকল মতের সমন্বয়সাধন চেষ্টাই সর্বপ্রধান এবং গীতার সেইখানেই বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানমার্গের জন্য এবং কর্মমার্গের জন্য যে ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন তার নির্দেশ গীতায় আছে।

গীতায় বলা হয়েছে যে যোগী সর্বভূতাত্মভূত হন, যোগযুক্ত আত্মা সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে অবস্থিত দেখেন। মহাভারতে সর্বাত্মতাপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সর্বগত, সর্বাত্মা এবং সর্বতোমুখ হওয়া মহাভারত ও গীতার শিক্ষা। যিনি সর্বাভূতাত্মভূত তিনিই পরাগতি লাভ করেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—"ময়াততমিদং সর্বং"—। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং সর্বাত্মক, মুক্তজীবেরও সেই অবস্থা।

এই সব কারণে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরী গীতা-ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে বলেছেন :

"ভারতে সর্ববেদার্থো
ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা।"

মহাভারত সর্ববেদসার, আর তার সারতত্ত্ব আছে এই ভগবদ্‌গীতায়। সেই কারণে গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। সকল শাস্ত্রের সার।

গীতার ভাষা অতি সুললিত, সহজ এবং সরল। গীতা ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বা তারও আগে রচিত। গীতা ও মহাভারত সমকালীন রচনা সে বিষয়ে পণ্ডিতরা নিঃসংশয়। গীতার রচনাভঙ্গী সরল,

তার ভাষাপ্রকরণ পাণিনিসম্মত নয় যার ফলে গীতার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর Hinduism and Buddhism নামক গ্রন্থে গীতা সম্পর্কে লিখেছেনঃ—

"The Gita may be described as a compendium of the whole Vedic doctrine to be found in earlier Vedas, Brahmanas and Upanishads, and being therefore the basis of all the later developments, it can be regarded as the focus of all Indian Religion." এই উক্তির জের টেনে আলডুস হাকসলী বলেছেন—"But this 'focus of Indian Religion' is also one of the clearest and most comprehensive summaries of the Perennial Philosophy ever to have been made. Hence the enduring value, not only for Indians, but for all mankind."

Perennial Philosophy বা চিরায়ত দর্শন সম্পর্কে আলডুস হাকসলী এক অপূর্ব আলোচনা করেছেন স্বামী প্রভবানন্দ ও কবি ক্রিস্টোফার ঈশারউড অনূদিত ভগবদ্‌গীতা—The Song of God গ্রন্থের ভূমিকায়।

মধুসূদন সরস্বতী, বলদেব বিদ্যা-ভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী মনীষীগণ ভগবদ্‌-গীতার ব্যাখ্যা করেছেন এবং তা আজ আদর্শ ব্যাখ্যা হিসাবে প্রচলিত। এঁদের মধ্যে মধুসূদন পঞ্চদশ শতাব্দীতে গীতার টীকা রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী, তাঁর 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক গ্রন্থ তাঁর অসা-ধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। উপরোক্ত মনীষীগণ স্ব স্ব মতানুসারে গীতার ব্যাখ্যান করেছেন। দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'গীতাপাঠ' গ্রন্থটিতে সহজ ও সরল ভঙ্গীতে অতি দুরূহতত্ত্ব বোঝানো হয়েছে।

পরলোকগত মনীষী রাজশেখর বসু মহাশয়ের অনূদিত 'বাল্মিকী রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় লাভ করেছেন। এবং আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, স্বর্গীয় রাজশেখর বসু 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন, তা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। রাজশেখর বসুকৃত এই অনুবাদ গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে এক অতি মূল্যবান ভূমিকা। 'অমৃত' পত্রিকার সূচনায় এই ভূমিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং 'অমৃত' পাঠক-পাঠিকারা রাজশেখর বসুর গীতার ভূমিকার পরিচয় ইতিপূর্বেই লাভ করেছেন।

রাজশেখর বসু ছিলেন বৈজ্ঞানিক, তাঁর মন যুক্তিবাদীর মন, ভক্তিরসের আদ্রতায় তাঁর দৃষ্টি কুয়াশার বাষ্পে আচ্ছন্ন ছিল না, তাই উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ এবং অতিশয়োক্তিহীন তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং সুললিত। তিনি ভূমিকায় বলেছেন ঃ "বেদান্ত ও সাংখ্যসূত্র গ্রন্থ প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক। কি করে এই সকল তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করতে হয় তার বিস্তারিত বিধান নেই, যিনি মোক্ষকাম তাঁকে নিজ বুদ্ধির দ্বারা বা অপর শাস্ত্রের সাহায্যে সূত্রনির্ণীত তত্ত্বসকল কাজে লাগাতে হয়। পাতঞ্জলসূত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি দুইই আছে: ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ ইত্যাদির সম্বন্ধ-নির্ণয় এবং কি করে প্রাণায়ামাদির সাহায্যে যোগৈশ্বর্য ও মুক্তিলাভ করা যায় তারও প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। গীতাতে দার্শনিক তত্ত্ব বিস্তর আছে, তথাপি মুখ্যতঃ এতে ব্যবহারিক বিদ্যাই কথিত হয়েছে।...... গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা ethics নয়। নীতিশাস্ত্র বলে এই কাজ ভালো, এই কাজ মন্দ। কিন্তু গীতাকার অধি-কন্তু বলেন ঃ এইরূপে জীবনযাত্রা নিরূপিত কর, তবেই যা শ্রেয় তাতে মন বসবে, যা হেয় তাতে বিরাগ জন্মাবে।"

এইভাবে অতি সরল ভঙ্গীতে লেখক গীতার ব্যাখ্যান করেছেন। যুক্তি এবং উক্তির তীক্ষ্ণতা এবং বক্তব্যের স্পষ্টতার জন্য রাজশেখর বসুকৃত অনূদিত এই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতার উক্তি পাওয়া যায়, এবং ২৫শ থেকে ৪২তম পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ আঠারোটি অধ্যায়ে এর শেষ। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের শ্লোকাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

গীতাকে উপনিষদ বলা হয়, যেহেতু এর মধ্যে আছে আত্মজ্ঞানের সারমর্ম, আর বেদের মত গীতার উপদেশ তিন-ভাগে বিভক্ত কর্ম, উপাসনা এবং যজ্ঞ। প্রথম পরিচ্ছেদ ভূমিকা, দ্বিতীয় সমগ্র গ্রন্থের সার। স্বার্থবিহীন কর্ম যার মধ্যে ফলাশা নেই তার শিক্ষা আছে গীতায়, তবেই আত্মার মোক্ষ। নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করলে সহজে সিদ্ধিলাভ হয়, এবং যিনি কর্মযোগী তিনিই জ্ঞানযোগী। গীতার মূল বক্তব্য মোক্ষলাভ, নিজের জীবনের যা স্বধর্ম তা সাধনের মধ্যেই সেই মোক্ষলাভ সম্ভব।

চিরায়ত দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সম্পর্কে তাই আলডুস হাক্‌সলী বলেছেন ঃ

"The Bhagvad Gita is perhaps the most systematic scriptural

statement of the Perennial Philosophy. To a world at WAR, a world that, because it lacks the intellectual and spiritual pre-requisites to PEACE, can only hope, to patch up some kind of precarious 'armed truce', it stands pointing, clearly and mistakably, to the only road of escape from the self-imposed necessity of self-destruction."

ধ্বংসোন্মুখ জ্বন্ধ জর্জর পৃথিবীর কাছে গীতা এক অপরূপ অধ্যাত্মদর্শন।

রাজশেখর বসু ও তাঁর ভূমিকায় বলেছেন, "গীতায় শান্ত সহিষ্ণু মৃদু অহিংস হবার বহু উপদেশ আছে, কিন্তু ক্লীবের তুল্য পীড়ন সইতেও নিষেধ আছে। দুষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতার উপলক্ষ। 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব বৃজ্যেস্ব'—এই বাক্য বহুস্থলে গীতাধর্ম বিবৃতির সহিত জড়িত আছে।

রাজশেখর বসু গীতার উদ্দেশ্য, সাংখ্য, যোগ, কর্ম, কর্মযোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, ব্রহ্ম ও নিষ্কাম-কর্ম, ধর্ম ও স্বধর্ম, গীতার দার্শনিক মত, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ও গীতায় ভক্তি-বাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অতি সংক্ষিপ্ত এবং সরল ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন। উপসংহারে—গীতাকে কেন যোগশাস্ত্র বলা হয় তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—"গীতায় বহু প্রসঙ্গ আছে যা অনেক আধুনিক পাঠকের ধারণার বিরোধী, জন্মান্তরবাদ, দেহ থেকে উৎক্রান্ত সূক্ষ্ম শরীর। দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব এমন কি ঐতিহাসিকত্ব অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হতে পারে। গীতার অনেক অংশ দুর্বোধ্য, ভাষ্য-টীকাকারগণেরও ব্যাখ্যাও বহুস্থলে বিভিন্ন। কিন্তু সমস্ত অস্পষ্ট ও বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও যা থাকে তা অতুলনীয়। বহুপূর্বে বহু প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে রচিত হলেও গীতায় সর্বকালের উপযোগী শ্রেষ্ঠ সাধনাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।"

ভূমিকা, মূল শ্লোক, অন্বয় ও অন্বয়ানুগামী অনুবাদ অতিশয় মনোজ্ঞ হয়েছে। গীতার সমগ্র শ্লোকাবলী প্রচলিত অন্বয় না করে বাংলা শব্দবিন্যাস প্রণালীতে করা হয়েছে, মূলে যে শব্দ অনাবশ্যক অন্বয়ে তা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে, মূলে যা উহ্য তা দেওয়া হয়েছে এবং মূলের শব্দ যথাসম্ভব অনুবাদে বজায় রাখা হয়েছে। এইভাবে এমন একটি মহাগ্রন্থ অনূদিত হওয়ায় সমগ্র গ্রন্থটি একটি মূল্যবান সাহিত্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এমন একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সরল গীতানুবাদ সম্ভবতঃ আর নেই। রাজশেখর বসু আজ পরলোকে, এই অনুবাদ গ্রন্থ তাঁর বিরাট সাহিত্যকীর্তির আর এক পরিচয়। তাঁর স্মৃতি তিনিই রক্ষা করে গেছেন এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাধ্যমে। *

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ রাজশেখর বসু অনূদিত। প্রকাশক : এম সি সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

নতুন বই

একুশ বছর (গল্প)—জরাসন্ধ। প্রকাশক : গ্রন্থপ্রকাশ। ৬৪, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : তিন টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

জরাসন্ধকৃত লোহ-কপাট, তামসী, ন্যায়দণ্ড, পাড়ি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আজ বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত এবং অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। জরাসন্ধ বর্তমানে মূলতঃ উপন্যাসলেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেও বাংলা সাহিত্যে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে তাঁর প্রথম আবির্ভাব গল্পলেখক হিসাবে। তখনকারকালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অনেকগুলি গল্প প্রশংসা লাভ করেছিল। সেই কারণে জরাসন্ধের গল্প-গ্রন্থ "একুশ বছর" একটি বিশিষ্ট গল্পসংগ্রহ। এই গ্রন্থে দশটি গল্প সংযোজিত হয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে দাগী, কর্মযোগী, মালাচন্দন, সমাধান ও একুশ বছর বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। আঙ্গিক ও বক্তব্য অতিশয় সরল হওয়ায় পাঠকের গল্পগুলিতে অতি স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। 'প্রধান অতিথি' গল্পটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ও রস-রচনাতেও যে লেখকের কৃতিত্ব অল্প নয় তার পরিচায়ক। যাঁরা 'জরাসন্ধে'র অনুরাগী

পাঠক, 'একুশ বছর' তাঁদের আনন্দবর্ধন করবে।

ব্যঞ্জনবর্ণ— অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্রালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম : ৪·০০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জীবন আর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পট-ভূমিকায় গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রায়তন হলেও চরিত্র সংখ্যা কম নয়। কলেজে পড়বার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে যে এক নতুন ধরণের চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে তার ফলে তাদের সকলে একত্রিত হল, বিভিন্ন ধরণের পারিপার্শ্বিক ঘটনা তাদের বার-বার বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতেও সকলে বিচ্ছিন্ন। চরিত্র-গুলি মোটামুটি স্বাভাবিক স্বকীয়তায় বিকশিত। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আরও উল্লেখযোগ্য আঙ্গিকসম্পন্ন উপন্যাস কামনা অযৌক্তিক হবে বলে মনে করি না।

গৃহস্থ বধূর ডায়েরী— বাসবদত্তা। ভারতী বুক স্টল। ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : ৭·০০।

একালের বাসবদত্তার চোখে সংসারের নিত্যকার 'ঝামেলা' সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে যেমন তার সংসার তেমনি আছে আত্মীয়-স্বজন- পাড়াপ্রতিবেশী-বন্ধুবান্ধব। সংসারের অভাব অনটনেই সে শুধুমাত্র উত্যক্ত নয় ছেলেদের দৌরাত্ম্য— বাজার হাট—জিনিসের দুর্মূল্য— পাড়াপ্রতিবেশীর দুঃখ-বেদনা— আত্মীয়-স্বজনের বিবিধ খবর রাজ-নীতি সবকিছুই আজকের বাসবদত্তার মনে প্রভাব রেখে যায়। স্বামীর প্রতি ভক্তি তার অপরিসীম। তাই শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও সুন্দর করে সংসার-টাকে গড়ে নিতে পেরেছে। তবুও সে তার অভাব-অভিযোগ নিবেদন করেছে অন্ত দেবতার পদপ্রান্তে।

গ্রন্থখানি ছদ্মনামে রচিত : একজন শক্তিমান কথাশিল্পী রয়েছেন এর পশ্চাতে। দৈনিক পত্রিকার প্রকাশকালে এর সাবলীল রচনাভঙ্গী সহজেই পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এই নতুন ধরণের গ্রন্থ-খানির সুযোগ্য স্থান হবে বলে মনে করি।

শরৎচন্দ্রের প্রণয় কাহিনী— (কাহিনীধর্মী জীবন-কথা)— গোপালচন্দ্র রায়। প্রকাশক : সাহিত্য সদন, এ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

গোপালচন্দ্র রায় উৎসাহী গবেষক, তিনি বহুস্থানে ঘুরে এবং বহুজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আবি-ষ্কার করেছেন আবার অনেক বহু পরি-চিত উক্তি ও ঘটনার একত্র সমাবেশে গ্রন্থ রচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে তিনি শরৎচন্দ্রের জীবনে যে-সব নারীর আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভূমিকায় লেখক শরৎচন্দ্রের এক বিখ্যাত পত্রের উদ্ধৃতি-দান করেছেন : "দেখোনি, বাঙলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।"

এর জন্য শরৎচন্দ্র নিজেই অবশ্য অনেকাংশে দায়ী, তিনি অনেক মজলিসে নানা রকম গালগল্প করতেন সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে এবং এমনভাবে গল্প করতেন যে তা সর্বদা সত্য বলে মনে হত। সেইসব গল্পের সূত্র ধরে অনেক কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে, যেমন ভূমিকায় 'শরৎচন্দ্র' নামক এক আজগুবি এবং নক্কারজনক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোপালচন্দ্র স্বয়ং এই রকম এক ফাঁদে পড়েছেন, যখন প্রবাসী গিরীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থ বিশ্বাস করে। যতদূর স্মরণ আছে শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের প্রায় প্রতিদিনকার সঙ্গী নরেন্দ্র দেব এই গ্রন্থের নিন্দা করেছেন এবং গিরীনবাবুর তথ্যাদি অতিরঞ্জিত এবং মিথ্যা বলেছেন। 'ব্যর্থপ্রণয়' নামক পরিচ্ছেদটি তাই অসার্থক। 'রজকিনী'র— গল্পটি একটি শরৎচন্দ্রীয় রসিকতা। 'হৃদয়-দৌর্বল্য' নামক পরিচ্ছেদটি এমনই কিছু সত্য ও কিছু মিথ্যার সংমিশ্রণে গঠিত। এই গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছেদ হিরন্ময়ী দেবী। লেখক অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে এবং শ্রদ্ধাসহকারে হিরন্ময়ী দেবীর কথা লিখেছেন। গোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ভক্তিমান, তিনি শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাই তাঁর কাছ থেকে অধিকতর

প্রামাণ্য এবং তথ্যানুগ গ্রন্থই আশা করেছিলাম। গ্রন্থটি কিন্তু আগাগোড়া সুখপাঠ্য এবং কৌতুহলোদ্দীপক।

জনশিক্ষার কথা—(শিক্ষা সম্পর্কিত নিবন্ধ)—নিখিলরঞ্জন রায় ও ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা-১২। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। দাম : পাঁচ টাকা।

নিরক্ষর এবং কেবলমাত্র স্বাক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে। জনমত ও জনশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ, আমাদের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা এবং সেইসঙ্গে ডেনমার্ক, চীন, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলের জনশিক্ষার কথাও আলোচিত হয়েছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, 'নিরক্ষর জনসাধারণের বিদ্যাশিক্ষা আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মহাঋণ'। এই ঋণ শোধ করার জন্য আমাদের সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। লেখকদ্বয় অসামান্য কৃতিত্বে সে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাই তাঁরা ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়— (স্মৃতিচারণ)—জসীম উদ্দীন। গ্রন্থপ্রকাশ, ৬৪, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম : তিন টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

'নক্সী কাঁথার মাঠ' ও 'রাখালী'র কবি জসীম উদ্দীনকে বাঙালী কোনোদিন ভুলতে পারে না। দেশ-বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আছেন, কর্মসূত্রে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন, তাঁর কৈশোর ও যৌবনের রঙ্গভূমি দেখে যান। পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হয়, কথা ওঠে আগের দিনের সাহিত্যের বিভিন্ন ও বিচিত্র আসরের, যা এ যুগে আর নেই, হওয়া হয়ত সম্ভব নয়। সেই কবি জসীম উদ্দীন লিখেছেন 'ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়'। রবীন্দ্র-তীর্থে, অবন ঠাকুরের দরবারে, আর নজরুল এই তিনটি মানুষকে ঘিরে কবি জসীম উদ্দীনের জীবনের গোড়ার দিক যেভাবে গড়ে উঠেছে ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায় তিনি সেই বিচিত্র স্মৃতিচারণ অতি সহজ ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়, কবি সেদিন জসীম উদ্দীনের কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করে তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিশ্বকবির স্নেহ ও সাহচর্য কিভাবে সেদিনের তরুণ কবিকে উদ্দীপিত করেছিল তার পরিচয় আছে এই গ্রন্থে। অবনীন্দ্রনাথ জসীম উদ্দীনকে অতিশয় স্নেহ করতেন, অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল জসীম উদ্দীনের বন্ধু, অবনীন্দ্রনাথ, মোহনলাল, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সম্পর্কে যে ছোট-খাটো রেখাচিত্র নিপুণ রেখাচিত্রীর মত কয়েকটি আঁচড়ে জসীম উদ্দীন ফুটিয়ে তুলেছেন তা অপরূপ শিল্পসৃষ্টি হিসাবে প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য। জসীম উদ্দীনের অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, সহানুভূতি সমস্তই এই স্মৃতিচারণের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে বাংলার সাহিত্যজগতের বিয়োগান্ত চরিত্র নজরুল সম্পর্কে। নজরুলের ঘরোয়া রূপ জসীম উদ্দীন এ'কেছেন। সেই সদানন্দময় আত্মভোলা পুরুষটি জসীম উদ্দীনের রচনায় যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। কবি নজরুলের সঙ্গে প্রথম জীবন থেকে জসীম উদ্দীনের পরিচয়, তাই নজরুলের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তিনি আঁকতে পেরেছেন। "ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়" গ্রন্থটি

বর্তমানকালের একটি মনোরম রম্য-রচনা গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। গ্রন্থটিতে কয়েকটি ছবি থাকলে ভালো হত। ছাপা ও প্রচ্ছদ মনোরম।

যুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র (রাজনীতি) —এডওয়ার্ড কারদেজ। অনুবাদক —প্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস (পি) লিঃ। ২০ নেতাজী সুভাষ রোড। কলিকাতা—১। দাম : ৫.৭৫ নয়া পয়সা।

চীনা সংবাদপত্র বা চীনা সরকারী মুখপাত্ররা যুগোশ্লাভিয়ার বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এবং বিশেষ করে সাম্যবাদী দেশসমূহের সংগে সক্রিয় সহ-অবস্থান নীতি সম্পর্কে যুগোশ্লাভিয়া যে নীতি গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করছেন। বর্তমান গ্রন্থে এডওয়ার্ড কারদেজ তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি চীনা আদর্শবাদ, সহ-অবস্থান ও মার্কসবাদ, ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধ, যুদ্ধ কি অপরিহার্য, সশস্ত্র বিপ্লব কি অপরিহার্য, কোনটা বৈপ্লবিক এবং কোনটা নয় এবং সর্বশেষ চীন-যুগোশ্লাভ মতবিরোধ সম্পর্কে প্রায় পনেরটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যুক্তি ও বিশ্লেষণ সহকারে জবাব দিয়েছেন। সমাজতন্ত্রের আদি সমাজ, সাধারণ সমাজ ও নব-বিধানের মধ্যে যে মতবিরোধ কিভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং কোথায় পৌঁচেছে বর্তমান গ্রন্থটি তার উদাহরণ। প্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দুরূহ গ্রন্থ অত্যন্ত কৃতিত্বের সংগে অনুবাদ করেছেন।

ছাপা ভাল তবে গ্রন্থটির মূল্য অনাবশ্যকভাবে অধিক।

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী —২য় পর্ব। ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য : তিন টাকা।

এই খণ্ডে 'বহুবাজার শিশুহত্যার মামলা' এবং 'খিদিরপুরে মাতৃহত্যা' এই দুই রহস্য-কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। লেখক স্বয়ং একজন প্রখ্যাত পুলিশ-অফিসার। কর্মব্যপদেশে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যুক্তির দ্বারা কিভাবে সেইসব রহস্য সমাধান করেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনী দুটি রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মত মনোরম এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও উপভোগ্য। 'বহুবাজার শিশুহত্যা মামলার কাহিনী'টি এই গ্রন্থে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলেও কোনো একটি মাসিক পত্রিকায় আজো ধারাবাহিকভাবে চলছে, এই গ্রন্থে তার উল্লেখ নেই। ছাপা এবং প্রচ্ছদ ভালো নয়।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

॥ আজকের কথা ॥

।। চিত্রনাটক ।।

সাধারণতঃ আমরা বলি—চিত্রনাট্য, কিন্তু কথাটা চিত্রনাটক-ই হওয়া উচিত। যা মঞ্চে অভিনীত হয়, তাকে আমরা নাটক বলি। কিন্তু নাটক অভিনীত হবার জন্যে যখন আজ মঞ্চ ছাড়াও অন্ততঃ আরো দু'টি মাধ্যম রয়েছে, তখন মঞ্চে অভিনয়ের জন্যে যে-নাটক লেখা হয়, তাকে মঞ্চ-নাটক আখ্যা দেওয়াই যেমন সংগত, তেমনি চলচ্চিত্রায়ণের জন্যে যে-নাটক, তাকে বলা দরকার—চিত্রনাটক এবং বেতারের মারফত যে-নাটক পরিবেশিত হবে, তার নামকরণ হওয়া উচিত—বেতার-নাটক। অবশ্য গ্রামোফোন-রেকর্ডও আর একটি মাধ্যম; তবে রেকর্ডেও নাটক শুনতে হয় ঠিক বেতারেরই মতো। কাজেই বেতার ও রেকর্ড জড়িয়ে বেতার-নাটকের সাধারণ নাম দেওয়া যেতে পারে—শ্রাব্য-নাটক বা শ্রব্য-নাটক।

আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের নির্বাক যুগে কি ধরনের চিত্রনাটক ছিল, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ছবি যখন থেকে কথা কইতে সুরু করেছে, সে আমলের প্রথম উল্লেখযোগ্য চিত্র-নাটক যে দেবকীকুমার বসু লিখিত 'চণ্ডীদাস', এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, চলচ্চিত্রের যে প্রধান গুণ গতি-শীলতা, তা প্রথম পরিলক্ষিত হয় এই "চণ্ডীদাস"-এই। এর পর প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেছে এবং এই সময়ের মধ্যে অনেক ভালো বাঙলা ছবিকে আমরা রুপালী পর্দায় প্রতিফলিত হতে দেখেছি।— কিন্তু যে-সব চিত্র-নাটককে অবলম্বন ক'রে এই ছবিগুলি গড়ে উঠে-ছিল, তার ক'খানিকে আমরা মুদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি?—বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে, একখানিকেও নয়। অথচ মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ রঙ্গশালায় অভিনীত হবার কিছু দিনের মধ্যেই মৌলিক নাটককে মুদ্রিতাবস্থায় পড়বার সুযোগ হয় আমাদের; এমন কি, বহুপঠিত উপন্যাসের নাট্যরূপগুলিও সসম্মানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কারণ, তাও কেনবার এবং পড়বার লোকের অভাব হয় না। বহু লোক মুদ্রিত মঞ্চ-নাটক পড়বার পর অভিনয় দেখতে যান; আবার কেউ কেউ অভিনয় দেখবার পর নাটকটি প'ড়ে দেখেন। এবং উভয় ক্ষেত্রেই যথার্থ অভি-নয়ের সঙ্গে মুদ্রিত মঞ্চ-নাটকটি মিলিয়ে দেখবার সুযোগ পাওয়ার দরুণ নাট্যা-মোদীদের তুলনামূলক বিচার-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় চিত্রামোদীদের সে-সুযোগ নেই। এক-খানি চলচ্চিত্র যত ভালোই লাগুক না কেন, যতদিন সেখানি চলছে, ততদিনের মধ্যে বার কয়েক দেখে আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া চিত্রামোদীর ঐ ছবি সম্পর্কে আর কিছু করবার উপায় নেই। হয়ত' কেউ কেউ তাঁদের মনের মুকুরে ঐ ছবির কয়েকটি স্মরণীয় দৃশ্য বা দু'-একটি বাক্যাংশ ধ'রে রেখে দিতে পারেন। এবং যদি কখনও ছবিখানির পুনঃ প্রদর্শন হয়, তা'হলে তখন আবার ক'রে দেখে তাঁর স্মৃতিপটে ধরা, ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে-যাওয়া ছবিকে আর একবার উজ্জ্বল ক'রে নিতে পারেন। নইলে বিখ্যাত ছবির কয়েকখানি স্থিরচিত্রই উত্তর কালের

'খিলাড়ী' চিত্রে জবীন জালিল

চিত্রামোদীদের কাছে ছবির খ্যাতির একটি অকিঞ্চিৎকর এবং অসম্পূর্ণ নিদর্শন বহন ক'রে নিয়ে যায়। যদি মুদ্রিত চিত্রনাটক হাতের কাছে পাওয়া যেত, তা'হলে চিত্রামোদীরা সেই নাটকের সঙ্গে ছবিকে মিলিয়ে দেখে কেমন ক'রে কোন্ দৃশ্য চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, তা দেখে একটি অনাস্বাদিত তৃপ্তিরসের সন্ধান পেতেন। তা ছাড়া চিত্রনাটক পাঠ ক'রে চিত্ররসিকজন সেই নাটকে কি ভাবে লেখক দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে উত্তরণের পথে নাট্যবস্তুর সমাবেশ সাধন করেছেন,

মৃণাল সেন পরিচালিত "পুনশ্চ' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

তা দেখতে পেতেন। এ ঘটনা আদৌ বিরল নয় যে, কোনো চলচ্চিত্র সাধারণ্যে সমাদর লাভ করতে অসমর্থ হ'লে চিত্র-নাট্যকার ছবির রূপায়ণে তাঁর চিত্রনাট্যের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করা হয়নি ব'লে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন। এক্ষেত্রে চিত্র-নাটকটি মুদ্রিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হলে তাঁর অভিযোগের যাথার্থ্য প্রমাণের সুযোগ পাওয়া যেত।

হলিউডে লুইস্ মাইলস্টোন প্রযোজিত "দি নর্থ স্টার" ছবিটি মুক্তি পাবার পর এই ছবির চিত্রনাটক-লেখিকা লিলিয়ান হেল্‌ম্যান তাঁর লেখার প্রতি অবিচার করা হয়েছে ব'লে সাধারণ্যে অভিযোগ আনেন। এবং তাঁর চিত্রনাটকটি যখন ভাইকিং প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর অভিযোগ যথেষ্টই গুরুত্ব লাভ করে। এ ছাড়া মুদ্রিত চিত্র-নাটক পাঠ করার ফলে চিত্রনাট্যকারদের তাঁদের বিশেষ শিল্পকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান যে বহুগুণে বর্ধিত হবে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। ছবির সাফল্য-অসাফল্যের মূলে চিত্র-নাট্যকারের দায়িত্ব অনেকখানি, এ-কথা যখন সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়েছে, তখন আমাদের চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং পরিচালকের হাতে তাদের অষ্টাবক্র মুনি হয়ে ধনুষ্টংকারত্ব প্রাপ্তি ঘটবার বদলে

পীযূষ বসু পরিচালিত "শিউলিবাড়ী" চিত্রে দিলীপ রায় ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের চিত্রনাটক পাঠ ক'রে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি? অবশ্য, এর থেকেও বড় কথা আছে। চিত্রনাটক মুদ্রিত হ'তে সুরু হ'লে এর লেখকেরা মাত্র চলচ্চিত্র প্রযোজকদের অনুগ্রহপুষ্ট জীব না থেকে যথার্থ সাহিত্যিকের মর্যাদা পেতে পারেন এবং শিল্প-সৃষ্টির অত্যুজ্জ্বল নির্দশন স্বরূপ তাঁদের রচনা বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে স্থান করে নিতে পারবার সুযোগ লাভ করবে।

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?—অন্য দেশের কথা জানি না; কিন্তু হলিউডের বহু বিখ্যাত ছবির যেমন মুদ্রিত চিত্র-নাটক নেই, তেমনি আবার কিছু ছবির চিত্র-নাটক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ডাড্‌লে নিকল্‌স্ এবং জন গ্যাস্‌নারের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কুড়িটি শ্রেষ্ঠ চিত্র-নাটক", "১৯৪৩-৪৪-এর শ্রেষ্ঠ চিত্র-নাটক" এবং "১৯৪৫-এর শ্রেষ্ঠ চিত্র-নাটক"—এই বই তিনখানি খুবই প্রসিদ্ধ হ'লেও পুনর্মুদ্রণের অভাবে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এ ছাড়া র‍্যান্ডম হাউস প্রকাশিত করেছেন জোসেফ, এল্, ম্যান্‌কিউইজের 'অল অ্যাবাউট ইভ', ভাইকিং প্রেস লিলিয়ান হেল্‌ম্যানের 'দি নর্থ স্টার' এবং থিয়েটার আর্টস্ ম্যাগাজিনের ১৯৫১ সালের আগস্ট সংখ্যায় বেরিয়েছিল ডাড্‌লে নিকল্‌সের অপরূপ চিত্র-নাটক 'দি ইন্‌ফরমার'। চিত্র-নাটক প্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি সম্ভবতঃ চিত্র-নাটকে ব্যবহৃত 'ফেড ইন্', 'ফেড আউট', 'ডিজল্‌ভ্ টু', 'কাট্', 'এল্-এস' (লং শট), 'সি-ইউ' (ক্লোজ আপ) প্রভৃতি বহু প্রায়োগিক বা টেক্‌নিক্যাল শব্দ, যাদের অত্যধিক উপস্থিতি ধারাবাহিক পাঠের পথে হোঁচট খাওয়ায় বারে বারে। কিন্তু মুদ্রিত এই সব প্রায়োগিক কথা যে যথাযথ ব্যবহার করতেই হবে, এ-রকম কড়া নির্দেশের প্রয়োজন কি? ডিজ্‌ল্‌ভের সাহায্যে যখন দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া হবে, তখন এ-কথা বললেই কি যথেষ্ট হবে না যে, প্রথম দৃশ্যটি ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সেখানে দেখা যাচ্ছে...... ইত্যাদি? এবং একটি দৃশ্যের মধ্যে কোথায় লং শট, আর কোথায় বা ক্লোজ-আপ কিংবা কোন্‌খানে ক্যামেরা স্থির আর কোথায় বা গতিশীল, এরও উল্লেখ না করলে বা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করলে কিংবা গতিশীল ক্যামেরার ক্ষেত্রে 'যখন সে কথা বলছে, তখন তার মুখচোখের ভাব নিরীক্ষণ ক'রে দেখবার জন্যে আমরা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেলুম'—গোছের বাক্য প্রয়োগ করলে মহা-ভারত অশুদ্ধ হবে না।

আমাদের এই যান্ত্রিক যুগে আজ মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রেই অভিনয়ে বাস্তবতা, হৃদয়গ্রাহিতা বা বিশেষ ভাব প্রকাশের সহায়তাকল্পে কত রকমই না যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্য নিচ্ছে। আর যে-চলচ্চিত্র মঞ্চাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত গণ্ডীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে অভিনয়কে সীমাহীন পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে, সেই চলচ্চিত্র অমোঘভাবে যে বস্তুর উপর একান্ত নির্ভরশীল, সেই চিত্র-নাট্যকই বরাবর লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাবে, এ অবস্থাকে মুখ বুজে মেনে নেওয়ার মত মূর্খামি আর কি হ'তে পারে?

চলচ্চিত্র আসলে একটি চলমান দৃশ্য-বস্তু; কাজেই তার সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে না, এ-যুক্তি যাঁরা প্রদর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জেগে ঘুমোবার ভান করেন। মঞ্চ-নাটকেরও ত' আর একটি নাম হচ্ছে দৃশ্যকাব্য; সে-কাব্যও ত' রচিত হয় দৃশ্য হবার জন্যেই। অথচ যত রকমের সাহিত্য-সৃষ্টি আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয় ঐ মঞ্চ-নাটকই। কাজেই মুদ্রণের উপযুক্ত ক'রে লেখা হ'লে বিরাট পটভূমিকা এবং সীমাহীন ব্যাপ্তি সংবলিত চিত্র-নাটক যে একদিন শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-সৃষ্টি ব'লে রসিকজনের স্বীকৃতিধন্য জয়মাল্য লাভ করবে না, এমন কথা হলপ ক'রে বলতে পারা যায় কি?

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

মিথুন-লগ্ন : অখিল চিত্র প্রতিষ্ঠানের ছবি : ১১২৭৩ ফুট দীর্ঘ; কাহিনী : বিমলেন্দু ঘোষ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : শিব ভট্টাচার্য; সংগীত-পরিচালনা : শৈলেশ দত্তগুপ্ত; চিত্র-গ্রহণ : বিজয় দে; শব্দ-ধারণ : নৃপেন পাল; আবহ-সংগীত রচনা : হৃদয় কুশারী; শিল্প-নির্দেশনা : স্বপন সেন; সম্পাদনা : নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য; ভূমিকায় : অসিতবরণ, আশীষকুমার, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, সন্তোষ সিংহ, শিশির বটব্যাল, নবদ্বীপ হালদার, দীপিকা দাস, মলিনা, পদ্মা, তপতী ঘোষ, আরতি দাস, সাধনা রায়চৌধুরী প্রভৃতি। ইস্টার্ন মুভিজ ও আর-আর-ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় গেল ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"সারকারামা"র উদ্ভাবক ওয়াল্ট ডিজনী (বামে দণ্ডায়মান) যন্ত্রটি দ্বারা চলচ্চিত্র তোলবার কৌশল দেখাচ্ছেন।

একটি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর কাজ ক'রতে ক'রতে নিজের ক্ষণিক অসাবধানতার ফলে কিভাবে স্কুলের টাকা খুইয়ে ফেলে এবং পুলিশের সম্মুখীন হবার ভয়ে দূরে দেশে আত্মগোপন ক'রে থাকবার সময়ে ঘটনাচক্রে একজন সংসাহসী যুবকের মনে দাগ কাটতে সমর্থ হয় ও পরে টাকা চুরি যাওয়ার যথার্থ কারণ প্রকাশিত হবার পর নিজের সম্মানিত স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, 'মিথুন লগ্ন'এ সেই কাহিনীই বিধৃত হয়েছে। এবং এরই সঙ্গে পাশা-পাশি চালাবার চেষ্টা হয়েছে নায়িকার কলেজে-পড়া ভাইয়ের সঙ্গে একটি ধনী-কন্যার প্রেমের কাহিনী অত্যন্ত অবান্তর ভাবে।

মূল কাহিনীটিকে যথাযথ ঘটনা-পরম্পরা এবং চরিত্রায়ণের সাহায্যে একটি রসসিদ্ধ চিত্রনাট্যের মারফত একটি বলিষ্ঠ এবং উপভোগ্য চিত্রে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু ওরই সঙ্গে একটি মামুলী প্রেমের চিত্র জুড়তে চাওয়ার ফলে চিত্র-নাট্যকার শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরতে পারেননি; ফলে, চিত্র-নাট্য শুধু যে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই নয়; ছবির প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত

অগ্রদূতের "উত্তরায়ণ" চিত্রে উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দর্শককে গল্পের খেই ধ'রে থাকতে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছে এবং বহু দর্শকেরই মনে হয়েছে, দৃশ্যগুলি অকারণেই ঘটে যাচ্ছে। আবার ছবির গ্রন্থি মোচনের জন্যে আসল অপরাধীর স্বীকারোক্তির দৃশ্যগুলিও এসে পড়েছে দর্শকমনের মধ্যে কোনো রকম কৌতূহল বা সাসপেন্স না জাগিয়েই, অত্যন্ত মামুলীভাবে। সমস্ত ছবিটার মধ্যে একটিও নাট্য-মুহূর্ত খুঁজে পাওয়া গেল না; যদিও তার একাধিক সুযোগ ছিল। কতকগুলি ঘটনাকে অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো হয়েছে, কার্যকারণের সম্পর্ক না রেখেই। তাই ছবি দেখতে দেখতে দর্শক কোথাও একান্ত হয়ে উঠতে পায় না।

ছবিতে নায়ক অসিতবরণ এসেছেন অর্ধপথে এবং সে সত্ত্বেও তাঁরই সহজ স্বচ্ছন্দ অভিনয় মনে বেশ দাগ কাটে। সহানুভূতিশীল ডাক্তার গাঙ্গুলীর ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। প্রেমিকা ধনীকন্যা রূপে তপতী ঘোষ তাঁর অভিনয়ের ভিতর আবেগ সঞ্চার করতে পেরেছেন। চৌর্যাপরাধে অপরাধিনী অপর্ণার ভূমিকাকে আরতি দাস তাঁর সু-অভিনয়ের গুণে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। দীপিকা দাস মঞ্চের একজন কৃতি অভিনেত্রী। চলচ্চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় এই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। মঞ্চসুলভ বাচনের ফলে বহু স্থানে তাঁর বাক্যের শেষাংশ শব্দধারণ যন্ত্রে ধরা না পড়ায় অশ্রুত রয়ে গেছে। এবং মঞ্চে যে-ভাবাবেগ প্রকাশ, তাঁকে মুগ্ধ দর্শকের প্রশংসা আহরণে সাহায্য করে, সেই ভাবাবেগই চলচ্চিত্রে তাঁকে সহজ অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে বাধা দিয়েছে। চিত্রাভিনয়ের বিশেষ টেক্‌নিক আয়ত্ত হ'লে তিনি চিত্রজগতেও তাঁর স্থান ক'রে নিতে পারবেন, এ আশা করা অন্যায় নয়। অপরাপর ভূমিকায় অভিনয় সাধারণ পর্যায়ের।

চিত্রগ্রহণে বিজয় দে সর্বত্র সমতারক্ষা করতে না পারলেও, বহু স্থানেই আলোছায়ার সমাবেশে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্ত ঘটনা উপযোগী সুর সংযোজন করেছেন। আবহ-সঙ্গীত ছবির ভাব প্রকাশে সাহায্য করেছে। সম্পাদনা অত্যন্ত দুর্বল—দক্ষ সম্পাদকের হাতে এই ছবিই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারত। শিল্প-নির্দেশনার কাজ বহু স্থানেই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

ইডেন গার্ডেনের রঞ্জি স্টেডিয়ামে নব-নির্মিত এক বিচিত্র গম্বুজাকার মণ্ডপে ২২-এ সেপ্টেম্বর এক অভিনব চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে। এর নাম 'সার্কারামা'। ১৯৫৬ সালে বিখ্যাত চলচ্চিত্র স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিজনী এই 'সার্কারামা'র উদ্ভাবন করেন। ১১টি ১৬ মিঃ মিঃ ক্যামেরাকে একটি গোলাকৃতি ডিস্কের ওপর বহির্মুখী ক'রে বসানো হয়। পরে ঐ ডিস্ককে মোটরগাড়ীর উপরে একটি উঁচু পাটাতনের উপর বা এরোপ্লেনের তলায় অনড়ভাবে স্থাপিত করা হয়। চলন্ত মোটরগাড়ী বা এরোপ্লেন থেকে ঐ ১১টি ক্যামেরাকে একসঙ্গে চালিয়ে দিলে চতুর্দিকের দৃশ্যাবলী একই সঙ্গে উঠতে থাকে। পরে ঐ ছবিকে ডেভেলপ এবং প্রিন্ট ক'রে ১১টি প্রোজেক্টার বা প্রক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে একই সঙ্গে রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই পর্দাগুলি প্রথমোক্ত গম্বুজাকার মণ্ডপের ভিতর দিকের সবখানি দেওয়াল জুড়ে টাঙানো হয়। এবং দর্শকেরা মণ্ডপের মধ্যে ব'সে বা দাঁড়িয়ে পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্যগুলি দেখেন। প্রতিটি পর্দার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১৩ ফুট এবং উচ্চতা ১০ ফুট।

যে-প্রদর্শনীটি ২২-এ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত রঞ্জি স্টেডিয়ামে দেখানো হবে, তাতে ২২ মিনিট কালের মধ্যে দর্শকেরা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল থেকে সুরু ক'রে নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন, সান্‌ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি হয়ে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত ভ্রমণ ক'রে আবার এরোপ্লেনযোগে ফেরত আসতে পারবেন। প্রত্যেকেরই মনে হবে,

তিনি নিজে যেন এই সমস্ত জায়গা দিয়ে সশরীরে হাজির হয়ে এলেন, এমনই জীবন্ত হবে এই প্রদর্শনীর প্রতিক্রিয়া।

•

[illegible] প্রাঃ লিমিটেডের নির্মীয়মাণ ছবি 'শিউলি বাড়ি' সুবোধ ঘোষের 'নাগলতা' অবলম্বনে গৃহীত হচ্ছে। এর পরিচালনা, সঙ্গীত-পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণে রয়েছেন যথাক্রমে পীযূষ বসু, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও দীনেন গুপ্ত। এবং বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে উত্তমকুমার, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, ছবি বিশ্বাস, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতালি রায়, মাঃ অমল প্রভৃতি। ছবিখানির তত্ত্বাবধান করছেন তপন সিংহ এবং তিনিই এর চিত্রনাট্যও লিখে দিয়েছেন।

•

নিশীথ চক্রবর্তীর প্রযোজনায় শ্যামলী পিকচার্স শরৎচন্দ্রের সামাজিক কাহিনী 'আলো ও ছায়া'র চলচ্চিত্রে রূপদান করছেন। চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার ভার নিয়েছেন যথাক্রমে বিপ্রদাস ঠাকুর, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত দাস ও নরেশ ঘোষ। 'ষড়ভুজ' নামে এক কলাকুশলী গোষ্ঠী ছবিখানির পরিচালনা করবেন।

•

অবশেষে আবেদন-নিবেদনে অভীষ্ট লাভ হল। আমরা পোলিশ ছবি 'অ্যাশেস্ অ্যান্ড ডায়ামণ্ডস্'-এর কথা বলছি। ভারত সরকার এই প্রসিদ্ধ ছবিটির

'পিয়া মিলন কী আশ' চিত্রে অমিতা ও মনোজ

সাধারণ্যে প্রদর্শন নিষিদ্ধ ক'রে আদেশ জারী করার ফলে চিত্র-রসিক মহলে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ ব্যক্তিদের কাছে ছবিটি প্রদর্শন করবার পর তথ্য এবং বেতার কর্তৃপক্ষ ছবিটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নিয়েছেন। কাজেই আস্‌ছে মাসের প্রথম সপ্তাহে কল্‌কাতায় যে পোলিশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হবে, তাতে ছবিখানি প্রদর্শিত হ'তে কোনো বাধা রইল না। এই সপ্তাহব্যাপী ফেস্টিভ্যাল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানতে হ'লে চিত্ররসিকরা সিনে ক্লাব অব ক্যাল্‌কাটার ৬২, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটস্থ অফিসে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

•

রঙ-বেরঙ নাট্যগোষ্ঠী রবীন্দ্র-রচনা 'তোতা-কাহিনী'কে বিচিত্র ও নবতম আঙ্গিকে পরিবেশন করবেন আস্‌ছে ২৪-এ সেপ্টেম্বর, বেলা ১০টায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। মণীন্দ্র মজুমদারের নির্দেশনায় এই নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন ডলি চট্টোপাধ্যায়, তারক ধর, সঞ্জয়

অগ্রগামী পরিচালিত ও তারাশংকর রচিত 'কান্না' চিত্রে উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু
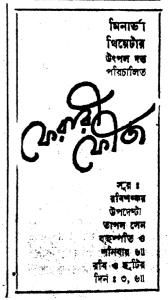
ভট্টাচার্য, চিত্ত রায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত রায় প্রভৃতি শিল্পীরা।

*

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে হাওড়া সম্মিলনীর সভাবৃন্দ গেল রবিবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, চিন্তামণি রোড পার্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটিকাটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন।

*

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী ও ক্লাবের ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেণ্ট্রাল ক্লাব আস্‌চে ২০এ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করবেন।

*

আস্‌চে ২৫-এ থেকে ২৯-এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যে ৭টায় মহাজাতি সদনে 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠীর বার্ষিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় ঐ পাঁচ দিন যথাক্রমে অমৃতলালের 'ব্যাপিকা-বিদায়', রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান' (নাট্যরূপ : বীরু মুখোপাধ্যায়), বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' ও অমৃতলালের 'তিলতর্পণ' অভিনীত হবে।

"ওয়াণ্টেড" চিত্রে সয়েদা খান

॥ একলা চলরে ॥

ডাঃ রবিন ঘোষের পরিচালনায় এবং তাঁরই কাহিনী অবলম্বনে মাধবী চিত্রমের "একলা চলরে" চিত্রের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আলোকচিত্র গ্রহণ এবং সুর-যোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুহৃদ ঘোষ এবং অনিল বাগচী। চরিত্রাংশে আছেন মলয়া, দীপক, শিবশঙ্কর, বীরেন, নৃপতি, নীলিমা, হরিধন, অনুপ, অপর্ণা প্রভৃতি।

॥ সূর্যের মতো সমুদ্র ॥

গন্ধর্ব নাট্য সংস্থার "সূর্যের মতো সমুদ্র" একাংক নাট্যোৎসবের সাম্প্রতিক প্রযোজনা মিনার্ভায় দর্শকবৃন্দকে

নাটকাভিনয় বিশেষভাবে তৃপ্তি দেয়। তরুণ নাট্যগোষ্ঠীর অনুশীলন ও দুঃসাহস সত্যই বিস্ময়কর এবং প্রশংসনীয়। প্রযোজনা ও প্রশংসনীয় অভিনয়ের কৃতিত্ব সামগ্রিকভাবে শ্যামল ঘোষের। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে আছেন গিরিশংকর, কনিষ্ক রায়, অবনী ভট্টাচার্য, অনিতা চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র।

॥ অতল জলের আহ্বান ॥

প্রখ্যাত পরিচালক অজয় কর আর ডি বনশল প্রযোজিত 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রের চিত্রগ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিওতে।

প্রতিভা বসুর "অতল জলের আহ্বান"-এর কাহিনী নিয়ে আলোচ্য চিত্রটি গড়ে উঠেছে। এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তন্দ্রা বর্মণ এর নায়িকার ভূমিকায় দেখা দেবেন। অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলিতে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়,

অজয় কর পরিচালিত 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রে ছায়া দেবী ও ছবি বিশ্বাস

ছায়া দেবী, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুর-যোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত কর আলোচ্য চিত্রে আলোক-চিত্র নির্দেশেরও দায়িত্ব নিয়েছেন।

।। আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ।।

১১ই সেপ্টেম্বর লাইট হাউসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন দিবসে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শিশু চলচ্চিত্রের আবশ্যকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শিশুদের ধ্যান ধারণা চিন্তা অর্থাৎ শিশুদের জগতকে নিয়ে যেমন গড়ে ওঠে শিশু সাহিত্য তেমনি শিশু-জগত কেন্দ্র করে গঠিত হবে তাদের স্বতন্ত্র চিত্রজগত। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি. ভি. কেশকার বলেন. যে, ভারত সরকার শিশু চলচ্চিত্র সমিতি নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা করেছেন; এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্থকতা লাভ করবে দেশের অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষক সমাজ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তির মাধ্যমে। "শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ" আয়োজিত এ উৎসব যেমন আনন্দ দেবে শিশুদের তেমনি চিত্রনির্মাণকারীদের উৎসাহ দান করবে এই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য।

এই উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সমেত পঁচিশটি দেশ হতে শতাধিক চিত্র পাওয়া গেছে এবং আরও পঞ্চাশটি দেশ তাদের চলচ্চিত্র পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালের শিশু বিভাগে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এই চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯৫৭ সালে সোভিয়েৎ শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের পর থেকে এই উৎসব বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আধুনিক শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক। চলচ্চিত্র মাধ্যমেই তার সার্থকতা সম্ভব। আমাদের দেশের পরিচালক ও প্রযোজক মহল ব্যবসায়িক এবং শিক্ষাদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে এক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারেন অনায়াসেই। এই সহজ অথচ কঠিন কাজের পথে তাদের অগ্রসরতা অনতিবিলম্বে ঘটুক বলে কামনা করি।

খেলাধুলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়ান দলের ইংল্যান্ড সফর—১৯৬১

১৯৬১ সালের ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া মোট ৩২টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় যোগদান করে। এই খেলার মধ্যে ৫টি ছিল টেস্ট ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে জয় ১৩, হার ১ (৩য় টেস্ট) এবং খেলা ড্র ১৮। পাঁচটি টেস্ট খেলার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ২, ইংল্যান্ডের জয় ১ এবং খেলা ড্র ২।
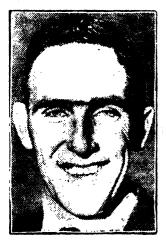
এলেন ডেভিডশন

এই বত্রিশটি প্রথম শ্রেণীর খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে ৬ জন খেলোয়াড় ১০০০ রাণ অথবা আরও বেশী রাণ করেছেন। অপর দিকে বোলিংয়ে ৮ জন বোলার ৫০টি অথবা তারও বেশী উইকেট পেয়েছেন। যুদ্ধ পরবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়া ইতিপূর্বে ইংল্যান্ড সফরে এসেছিল তিনবার (১৯৪৮, ১৯৫৩ ও ১৯৫৬)। কিন্তু পূর্বের এই তিনটি সফরে এত বেশী বোলার এই সম্মান লাভ (৫০ বা তার বেশী উইকেট) করেননি।

ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন উইলিয়াম লরী—মোট রাণ ২,০১৯ (গড়পড়তা ৬১·১৮)। নর্ম্যান ও'নীল তালিকায় ২য় স্থান লাভ করেছেন (মোট রাণ ১,৯৮১, গড়পড়তা ৬০·০৩)। মাত্র ১৯ রাণের জন্যে তিনি ২০০০ রাণ পূর্ণ করার সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন গণ্ট (৮৪৫ রাণে ৪০টা উইকেট, গড়পড়তা প্রতি ২১·১২ রাণে ১টা উইকেট)। সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন এলেন ডেভিডসন, ৬৮টা। তার পরই উল্লেখযোগ্য রিচি বেনোর ৬১টা।

উইলিয়াম লরী

রমণ সুব্বারাও

আলোচ্য ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯টা। ১৯৪৮ সালের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ছাড়া আর কোন দেশই ইংল্যান্ডের মাটিতে এত বেশী সংখ্যায় সেঞ্চুরী করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে ডন্ ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে ৫৭টা সেঞ্চুরী ক'রে ইংল্যান্ডে সফরকারী ক্রিকেট দলের পক্ষে রেকর্ড স্থাপন করে। ডন্ ব্র্যাডম্যান একাই করেছিলেন ১১টা সেঞ্চুরী।

২০০০ রাণ বা তার বেশী : ৬ জন—
উইলিয়াম লরী (২,০১৯ রাণ), নর্ম্যান ও'নীল (১,৯৮১ রাণ), রোনাল্ড সিম্পসন (১,৯৪৭ রাণ), নীল হার্ভে (১,৪৫২ রাণ), পিটার বার্জ (১,৩৭৬ রাণ) এবং ব্রেন বুথ (১,২৭৯ রাণ)।

৫০ উইকেট বা তার বেশী : ৮ জন—
এলেন ডেভিডসন (৬৮ উইকেট), রিচি বেনো (৬১ উইঃ), লিণ্ডসে ক্লাইন (৫৪ উইঃ), গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি (৫৪ উইঃ), কেনেথ ম্যাককে (৫২ উইঃ), ফ্র্যাঙ্ক মিশন (৫১ উইঃ), রোনাল্ড সিম্পসন (৫১ উইঃ) এবং ইয়ান কুইক (৫০ উইঃ)।

সেঞ্চুরী সংখ্যা : ৩৯

	সেঞ্চুরী সংখ্যা	সর্বোচ্চ রাণ
উইলিয়াম লরী	৯	১৬৫
নর্ম্যান ও'নীল	৭	১৬২
রোনাল্ড সিম্পসন	৬	১৬০
নীল হার্ভে	৫	১৪০
পিটার বার্জ	৪	১৮১
ম্যাকডোনাল্ড	৪	১৪০
ব্রেন বুথ	২	১২৭*
কেনেথ ম্যাককে	২	১৬৮

* নট আউট

কলিন কাউড্রে

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে : ১৫। কলিন কাউড্রে (এম সি সি এবং কেণ্ট)—৩, টেড ডেক্সটার (ইংল্যান্ড এবং পিয়ার্স একাদশ)—২, সুব্বারাও (ইংল্যান্ড)—২, প্রেসডি (গ্লামর্গান)—১, গার্ডনার (লিসেস্টারশায়ার)—১, এলেন (সামারসেট)—১, জে এইচ এডরিচ (পিয়ার্স একাদশ)—১, পিটার মে (পিয়ার্স একাদশ)—১, জি স্মিথ (পিয়ার্স একাদশ)—১, জি পুলার (ল্যাঙ্কাসায়ার) ১, এ্যালে (গিলিগ্যান)—১।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ : অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে—১৮১ পিটার বার্জ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ম টেস্টে)। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে—১৮০ টেড ডেক্সটার (১ম টেস্ট)।

একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী : ১৪৯ ও ১২১—কলিন কাউড্রে (কেণ্ট)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে কোন খেলোয়াড় এ কৃতিত্ব লাভ করতে পারেননি।

॥ ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলায় পুরস্কার ॥

১৯৬১ সালের ক্রিকেট মরসুমে নিম্নলিখিত চারজন খেলোয়াড় খেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভের জন্য পুরস্কার (১০০ গিনি এবং বিশেষ কাপ) লাভ করেছেন।

গিলবার্ট পার্কহাউস (গ্লামর্গাণ) : নর্থহ্যামটন দলের বিপক্ষে ৭০ মিনিটে শত রাণ ক'রে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে শত রান করার জন্য ১০০ গিনি এবং একটি বিশেষ কাপ লাভ করেন।

টনি পিয়ার্সন (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) : লিসেস্টারশায়ার দলের বিপক্ষে এক ইনিংসে ১০টা উইকেট (৭০ রানে) নিয়ে এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট লাভের জন্য পুরস্কার পান।

পিটার ওয়াকার (গ্লামর্গাণ) : ৬৯টা ক্যাচ লুফে মরসুমে সর্বাধিক ক্যাচ ধরার জন্যে পুরস্কার লাভ করেন।

জন মারে (মিডলসেক্স এবং ইংল্যান্ড) : উইকেট-রক্ষক হিসাবে এ মরসুমে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার জন্য ১০০ গিনি এবং বিশেষ কাপ লাভ করেন।

॥ আমেরিকান লন্ টেনিস ॥

১৯৬১ সালের আমেরিকান ন্যাশনাল লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেছে। ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার প্রতিযোগিতায় এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁরই স্বদেশবাসী প্রতিযোগিতায় ৩নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমারসনের কাছে ফাইনালে পরাজিত হন। এমারসনের জয়লাভ অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়; গত জানুয়ারী মাসে অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে এমারসন লেভারকে পরাজিত করেছিলেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতার ফাইনালে লেভার তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় মোটেই দিতে পারেননি। লেভারকে খুবই বিমর্ষ এবং ক্লান্ত দেখায়; তাঁর কিলিং ভঙ্গি এবং চাবুকের মত ব্যাক-হ্যান্ড মার—যাঁর জন্যে দর্শক সাধারণ পথ চেয়েছিলেন, লেভার শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিরাশ করেন। এমারসনই কোর্ট চষে খেলেছিলেন। এই নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ৬ জন খেলোয়াড় আমেরিকার সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলাটিও অতি সাধারণ পর্যায়ের হয়েছিল। গত বছরের বিজয়িনী আমেরিকার মিস ডার্লিন হার্ড বৃটেনের মিস হেডনকে পরাজিত করতে ৪৫ মিনিট সময় নিয়েছিলেন। খেলার কোন জৌলুষ ছিল না। অসুস্থতার কারণে মিস হার্ড এবার ইউরোপের টেনিস মরসুমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে ১নং বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৪নং বাছাই খেলোয়াড় মাইক স্যাঙ্গস্টারকে (বৃটেন) পরাজিত করেন। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ৩নং বাছাই রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) মেক্সিকোর রাফেল ওসুনাকে (অবাছাই খেলোয়াড়) পরাজিত করে ফাইনালে রড লেভারের সঙ্গে মিলিত হন। মহিলাদের সেমি-ফাইনালে গত বছরের বিজয়িনী মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে খেলেন বৃটেনের অ্যান হেডনের সঙ্গে। হেডন ফাইনালে যান অপর দিকের সেমি-ফাইনালে এ্যাঞ্জেলা মর্টিমারকে (বৃটেন) পরাজিত ক'রে।

মিস ডার্লিন হার্ড মেয়েদের ডাবলস ফাইনাল খেলাতেও জয়লাভ করেন অস্ট্রেলিয়ার লেসলি টার্ণারের জুটিতে। এই নিয়ে মিস ডার্লিন পাঁচবার ডাবলস খেতাব পেলেন।

॥ আই এফ এ শীল্ড ॥

গত বছরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দল ৩য় রাউণ্ডে ৯-০ গোলে বার্ণপুর ইউনাইটেড দলকে এবং ৪র্থ রাউণ্ডে ৩-০ গোলে ইন্টারন্যাশনাল দলকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। বার্ণপুর ইউনাইটেড দল ১ম রাউণ্ডের খেলায় ৮-১ গোলে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত ক'রে এ বছরের আই এফ এ শীল্ড খেলায় সর্বাধিক গোলে জয়লাভের গৌরব লাভ করেছিল। সেই বার্ণপুর দলেরই বিপক্ষে মোহনবাগান ৯-০ গোলে জয়ী হয়ে সর্বাধিক গোলে জয়লাভের রেকর্ড করে। অদৃষ্টের কি পরিহাস!

৪র্থ রাউণ্ডের খেলায় মোহনবাগান দলের পক্ষে গোল করেন সালাউদ্দীন ১ এবং অমল চক্রবর্তী ২। অমল চক্রবর্তী নিজের চেষ্টায় দুটো গোল দেন। মোহনবাগান আরও কয়েকটি গোল দেওয়ার সুযোগ নষ্ট করে। বিজিত দলের গোলরক্ষক পি দত্ত দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে কয়েকটি অবধারিত গোল বাঁচান।

ইন্টার ন্যাশনাল দল এ বছরের প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান লাভ করে। কিন্তু শীল্ডে তারা ভাল খেলে চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত উঠেছিল। প্রথম রাউণ্ডে ভবানীপুরকে ৪—১ গোলে, দ্বিতীয় রাউণ্ডে বনবিহারী দলকে ৪—২ গোলে এবং তৃতীয় রাউণ্ডের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে। এয়ার ফোর্স দলের বিপক্ষে প্রথম দিন খেলাটি ১—১ গোলে ড্র হয়েছিল।

সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান দলের সঙ্গে খেলবে ইস্টার্ণ রেলওয়ে বনাম রাজস্থান দলের বিজয়ী দল।

ইস্টার্ণ রেলওয়েকে প্রতিযোগিতার ১ম রাউণ্ড থেকে খেলতে হয়। ১ম রাউণ্ডে ৬—০ গোলে ক্যালকাটা জিমখানা, ২য় রাউণ্ডে ২—০ গোলে বালী প্রতিভা এবং ৩য় রাউণ্ডে ৫-০ গোলে বোম্বাই-এর মফৎলাল গ্রুপ মিলস দলকে

পরাজিত করে। ৪র্থ রাউন্ডে রেলদলের খেলা পড়েছে রাজস্থানের সঙ্গে। ৩য় রাউন্ডের খেলায় রেলদল গোল দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি। প্রকৃতপক্ষে তাদের এত বেশী গোলে জয়লাভের কারণ তাই। বোম্বাইয়ের মিলস দল আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় এবছরই প্রথম খেলতে আসে। খেলার মধ্যে তারা গোল দেওয়ার যে সব সুযোগ পায় তার সদ্ব্যবহার হ'লে কখনই ঐ দিনের খেলায় তাদের হার হ'ত না।

সারাদিনের বৃষ্টিতে মাঠ শোচনীয় অবস্থা ধারণ করে। ফলে আগন্তুক দলকেই বেশী অসুবিধায় পড়তে হয়।

৪র্থ রাউন্ডের খেলায় ইস্টার্ণ রেল-দলের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজস্থানের খেলা পড়ে ১ম রাউন্ড থেকে। রাজস্থান অনায়াসেই ৭-২ গোলে কালীঘাট এবং ৪-১ গোলে দিল্লী একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে ৩য় রাউন্ডে ১-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে হারিয়ে দেয়।

১৯৬১ সালের প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল ৩য় রাউন্ডে ৩-১ গোলে উয়াড়ী এবং ৪র্থ রাউন্ডে ৩-১ গোলে মহীশূর একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে এবছরের শীল্ডের খেলায় সর্বপ্রথম সেমি-ফাইনালে ওঠে।

মহীশূর একাদশ ২-১ গোলে এরিয়ান্স দলকে পরাজিত ক'রে ৪র্থ রাউন্ডে উঠেছিল।

ইস্টবেঙ্গল এবং মহীশূর একাদশ দলের ৪র্থ রাউন্ডের খেলা খুবই উপভোগ্য হয়। বিরতির সময় ইস্টবেঙ্গল দল ২-১ গোলে অগ্রগামী থাকে। খেলার বিচারে মহীশূর একাদশ দলের বেশী গোলের ব্যবধানে হেরে যাওয়ার কথা নয়। খেলার কোন কোন বিষয়ে আগন্তুক দল স্থানীয় দলের থেকে উন্নত ছিল। যেমন আক্রমণ ভাগের গঠনমূলক খেলা। কিন্তু তারা ইস্টবেঙ্গল দলের গতি-বেগের সঙ্গে তাল রেখে খেলতে পারেনি। তাদের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা ইস্ট-বেঙ্গল দলের আক্রমণ ভাগের গতিবেগ প্রতিরোধ করতে না পারায় দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

পুলিশ তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় পাঞ্জাব একাদশ দলের কাছে ১—২ গোলে পরাজিত হয়। প্রথম রাউন্ডে ২—০ গোলে হুগলী দলকে এবং ২য় রাউন্ডে ৩—১ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলকে পরাজিত করেছিল।

চতুর্থ রাউন্ডে পাঞ্জাব একাদশ দলের সঙ্গে খেলবে ইন্ডিয়ান নেভী দল। ৩য় রাউন্ডের খেলায় ইন্ডিয়ান নেভী প্রথম দিনে বি এন আর দলের সঙ্গে খেলা ড্র করে। দ্বিতীয় দিনে তারা অতিরিক্ত সময়ের খেলায় বি এন আর দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে চতুর্থ রাউন্ডে ওঠে।

খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি—উভয় দলই একটা করে গোল দেয়।

নেভী দলের ইনাস প্রথম গোল করেন। প্রথমার্ধের খেলায় নেভী দল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার আট মিনিটে রেল দলের তারালু গোলটি শোধ দেন।

অতিরিক্ত সময়ের খেলার প্রথমার্ধের তৃতীয় মিনিটে নেভী দলের ইনাস নিজ দলের দ্বিতীয় গোল এবং দ্বিতীয়ার্ধের ছয় মিনিটে দলের তৃতীয় গোল (তাঁর নিজেরও) দিয়ে 'হ্যাট-ট্রিক' করার গৌরব লাভ করেন।

রেলদল হারের খেলা খেলেনি—নিয়মিত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধের খেলার শেষ দিকে তারাই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু গোল দেওয়ার কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে।

একদিকের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে খেলবে: চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় ইন্ডিয়ান নেভী বনাম পাঞ্জাব একাদশ দলের বিজয়ী দল।

রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা

১৯৬১ সালের রাজ্য সন্তরণ প্রতি-যোগিতার (২২শ বাৎসরিক অনুষ্ঠান) পুরুষ বিভাগে নিমাই দাস এবং মহিলা বিভাগে সন্ধ্যা চন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নিমাই দাস ফ্রি স্টাইল অনুষ্ঠানের চারটি বিভাগে (১০০, ২০০, ৪০০ ও ১,৫০০ মিটার) জয়লাভ করেন। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে সন্ধ্যা চন্দ্র চারটি বিভাগে যোগদান ক'রে প্রত্যেকটিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই তিনি নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপন করেন। এই রেকর্ডের মধ্যে ২টি সর্ব-ভারতীয় রেকর্ড।

রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় চার দিনের অনুষ্ঠানে মোট ৭টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।
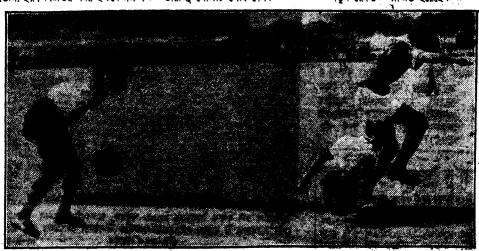
ইস্টবেঙ্গল বনাম মহীশূর একাদশের ৪র্থ রাউন্ডের খেলার একটি দৃশ্য : ডান দিকে পড়ে গেছেন নীলেশ সরকার এবং তাঁর মাথার উপর টমাস। বাম দিকে বালু বলটি ধরতে চেষ্টা করছেন।

নিমাই দাস

॥ নতুন রাজ্য রেকর্ড ॥

পুরুষ বিভাগ

১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল : নিমাই দাস (হাটখোলা); সময় ২০ মিঃ ৫৪·৪ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ২১ মিঃ ২৪·৮ সেঃ—মদন সিংহ, ১৯৩৯ সাল।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক : নারায়ণ কুণ্ডু (ন্যাশনাল এস সি); সময় ১ মিঃ ১২·৮ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ১ মিঃ ১২·৮ সেঃ—নারায়ণ কুণ্ডু, ১৯৬০ সাল।

ইণ্টারমিডিয়েট

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক : রঞ্জিৎ ব্যানার্জি (ছাত্র এস সি); সময় ১ মিঃ ২০·৮ সেঃ।

৪×১০০ মিটার মিডলে রীলে : ন্যাশনাল সুইমিং এসো; সময় ৫ মিঃ ৩৬·৮ সেঃ।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল : সন্ধ্যা চন্দ্র (সেন্ট্রাল এস সি); সময় ১ মিঃ ২০·২ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ১ মিঃ ২০·৭ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র, ১৯৫৯ সাল।

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল : সন্ধ্যা চন্দ্র (সেন্ট্রাল এস সি); সময় ২ মিঃ ৫৮ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ৩ মিঃ ০২·০ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র, ১৯৬০ সাল।

৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল : সন্ধ্যা চন্দ্র

সন্ধ্যা চন্দ্র

(সেন্ট্রাল এস সি); সময় ৬ মিঃ ২১·২ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ৬ মিঃ ২৩·৩ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র, ১৯৫৯ সাল।

ভারতীয় রেকর্ড—৬ মিঃ ৩০·৬ সেঃ—ডলি নাজির (বোম্বাই)।

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক : সন্ধ্যা চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এস সি); সময় ১ মিঃ ২৫·৯ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ১ মিঃ ২৭·৫ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র, ১৯৫৯ সাল।

ভারতীয় রেকর্ড : ১ মিঃ ২৯·৫ সেঃ—সন্ধ্যা চন্দ্র।

এই সাতটি নূতন রাজ্য রেকর্ডের মধ্যে আছে দু'টি সর্বভারতীয় রেকর্ড। পুরুষদের ১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক অনুষ্ঠানের সময় পূর্ব রেকর্ডের সঙ্গে সমান হয়েছে।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন (৩৯ পয়েন্ট), ২য় স্টেট ট্রান্সপোর্ট এ সি (৩৬ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় হাটখোলা (২৮ পয়েন্ট)।

ইন্টার মিডিয়েট : ১ম ন্যাশনাল সুইমিং এসোঃ (২০ পয়েন্ট), ২য় ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ (১৬ পয়েন্ট) এবং ৩য় ছাত্র এস সি (১০ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব এবং ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন (প্রত্যেকে ২০ পয়েণ্ট)।

বালিকা বিভাগ : ১ম সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব (১৯ পয়েণ্ট), ২য় বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি (৫ পয়েণ্ট)।

বালক বিভাগ (১৬ বছরের নীচে) : ১ম সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব (২৩ পয়েণ্ট), ২য় ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন (১৫ পয়েণ্ট) এবং ৩য় শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব (৯ পয়েণ্ট)।

ভেটারেন্স ক্লাব কর্তৃক নির্বাচিত ১৯৬১ সালের ক্যালকাটা ফুটবল মরশুমের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় টি বলরাম অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীসত্যধন ঘোষালের হাত থেকে ট্রফি গ্রহণ করছেন ১৭-৯-৬১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

আসল
ভল্লা ফুটওয়্যার কোং
৪৩/২, গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা-১৯

একটি উৎকৃষ্ট
হারিকেন
KISAN BRAND

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১২ই আশ্বিন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 29th September, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের যে আইন এই সপ্তাহে বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে জনসাধারণের অভিনন্দন লাভ করবে। ইতিহাসের দিক থেকেও একথা উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাংলাভাষাকে সরকারী মহাকরণে প্রবেশাধিকার দেওয়া হল! কিন্তু সরকার একথা নিশ্চয়ই মনে রাখবেন যে, বাংলাভাষার উপরে সরকারী শীলমোহর চাপানোর ফলে বাংলাভাষার তাঁরা কোনো মর্যাদাবৃদ্ধি করেননি। অথবা সাহিত্যে যে ভাষা প্রকাণ্ড গৌরবের অধিকারী তাকে তাঁরা কোনো অতিরিক্ত সম্মানেও ভূষিত করেননি। বাংলাভাষার পক্ষে এই অলংকার নূতন বটে, কিন্তু মহামূল্যবান অলংকার নিশ্চয়ই নয়। বরং এর ফলে নিঃসন্দেহে সরকারের গৌরব, আত্মসম্মানবোধ এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। যদি তাঁরা সদিচ্ছা সহকারে এবং সাদর স্বীকৃতির দ্বারা জনসাধারণের মাতৃভাষাকে রাইটার্স বিল্ডিংসে স্থান দেন, যদি এই আইন শুধু আইনেই সীমাবদ্ধ না থাকে তাহলে রাইটার্স বিল্ডিংসের ভাষার দাসত্ব দূর হবে। মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার দ্বারা সত্য-সত্যই মহাকরণের দ্বার হয়ত খুলে যেতে পারে সোনার মন্দিরে।

কেননা একথা আমরা বিশ্বাস করি এবং গণতন্ত্রের মূল বাণী এই যে, শাসনের ভাষাকে জনতার মর্মবাণীর কাছাকাছি এনে দিতে হবে। সে আজ কোনো বিদেশী বুলির দ্বারা সাধ্য নয়। যেদিন প্রশাসনিক গৃহের হৃদস্পন্দন জনতার হৃদস্পন্দনের সংগে এক সূত্রে গ্রথিত হবে সেদিন মহাকরণের দরজা সোনার মন্দিরের প্রবেশদ্বার উন্মোচিত করতে পারে। সেই উদ্বোধন একমাত্র মাতৃভাষায়ই সম্ভব, যে ভাষা কোটি কোটি মানুষের অন্তরের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করবে সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে।

কিন্তু সংগে সংগেই একথাও নিশ্চয়ই মনে রাখা দরকার যে, ইংরাজি যে বৃহৎ ক্ষেত্র জুড়ে—প্রশাসনে, বাণিজ্যে ও জীবিকার ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল, সেখান থেকে তাকে অপসারিত ক'রে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য কতকগুলি প্রস্তুতি দরকার। সে প্রস্তুতি বিগত ১৪ বৎসরের মধ্যে তিলমাত্রও অগ্রসর হয়নি। সেদিকে চিন্তা, আগ্রহ বা উদ্যম এতদিন দেখা দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলা যদিও ভারতবর্ষে সর্বোত্তম ভাষা এবং সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালিনী রূপে স্বীকৃত ও সম্মানিত, তথাপি সরকারী ক্ষেত্রে তার স্বীকৃতি ঘটল সকলের পরে। হিন্দীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তুতিতে নিযুক্ত আছেন গত ১৪ বৎসর যাবৎ, তার সামান্যও এখানে বাংলার জন্য ঘটেনি। এমনকি, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষারও পরে বাংলা আজ সেক্রেটারিয়েটে প্রবেশের ছাড়পত্র পেল।

কিন্তু কার্যে ও ব্যবহারে বাংলাকে সামগ্রিকভাবে প্রচলিত করার জন্য একটি নূতন পরিভাষা সংকলন, নূতন টাইপরাইটার উদ্ভাবন এবং ব্যবসায়িক ও সরকারী পত্রালাপের জন্য বিধিবদ্ধ ভাষা প্রণালী তৈরী করা—প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে এগুলি অবিলম্বে দরকার। অতীতে যে পরিভাষা সংকলন করা হয়েছিল, তা জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারেননি এবং সে ভাষা জনসাধারণের কাছে ইংরাজির চেয়ে কম দূরবর্তী, বা দুর্বোধ্যও নয়। ঐ পরিভাষা বাংলা কৌতুকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ব্যবহারে আসেনি। কারণ ওটা পণ্ডিতের মাতৃভাষা হতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের মাতৃভাষা কিছুতেই নয়। কাজেই সর্বাগ্রে এই পরিভাষা সংকলন এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ও সরকারী কার্যের জন্য উপযোগী বাক্‌বিন্যাস, শব্দাবলী এবং রচনা প্রণালী নির্ণয়ের জন্য আমরা চাই যে, সরকার অবিলম্বে একটি পরামর্শদাতা মণ্ডলী গঠন করুন এবং শুধু পরিভাষা নয়, টাইপরাইটার ও শর্টহ্যাণ্ড প্রণালী ইত্যাদি অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রস্তুতির জন্য তাঁদের অভিমত ও সুপারিশ গ্রহণ করুন। মোটকথা এই যে, যদি বাংলাকে শুধু আইনের স্বীকৃতি বা শীলমোহর দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য না হয়, যদি আমরা প্রশাসনকে সহজ এবং জনতার আত্মীয় করে তুলতে চাই, তাহলে সাহিত্যের জীবন্ত এবং প্রবহমান ভাষা যাতে সরকারী সেরেস্তার ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে তার জন্য প্রস্তুতিও এই শুভলগ্নে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষেই আরম্ভ হোক্—ভাষার দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে সরকারও মুক্ত হোন্, জনতাও দুই শতাব্দী-ব্যাপী এই বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাক্।

নিষ্ফল

উমা দেবী

বীজ মরে গিয়ে হয় অঙ্কুরের উদ্ভাবন,
ফুল মরে গিয়ে এক ফল;
এ সব তুলনা আছে বহু—জানি তবু
তারা তো রূপের রাজ্যে অরূপের নিরুচ্ছ্বাস অস্তিত্ব কেবল।
মানুষের মধ্যে শুধু রূপ হয়ে ওঠে অপরূপ—
তাকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব।
মৃত্যু এসে তাই
সে রূপ বিনষ্ট ক'রে দিলে
ডুবে যায় গান এক, মুছে যায় চিত্রালী বর্ণের,
হারায় কাব্যের কথা।
আর তাকে ফিরে আনা যায় না কখনো
কারো মনে—কোনো ধ্যানে—দুষ্প্রাপ্য—দুর্লভ।

দর্শন বলেছে, আত্মা নির্মোক-মোচন
বার বার করে যায় জন্ম-জন্মান্তরে
—মৃত্যু-ছলনায়।

বিজ্ঞানও বলেছে কিছু হারায় না জেনো
সে শুধুই অন্যভাবে অন্য কোনো অস্তিত্বের নিশ্চিত বন্ধনে
ধরা দেয়। শক্তির কি অবক্ষয় আছে?
ক্ষয় নাই তাই—যে দিকেই চাই
থাকে সে প্রচ্ছন্ন রূপে।

কবি বলে হায়!—যে হারায়
হারিয়ে সে যায় চিরকালের মতন।
ফুলের যে রূপ—সে কি শুধুই নির্বাস
আত্মার অরূপ কান্তি?
যে বর্ণে যে স্পর্শে আর আকৃতির নিশ্চিত প্রত্যয়ে
নিজেকে সে মেলেছিল—
আর কি সে মেলা হয় মৃত্যুর তুহিন নেমে এলে?
তাই তো দেখি না যাকে সে শুধুই স্বপ্ন হয়ে ভাসে
হৃদয়ের রক্তাক্ত আকাশে।
গোপনে বহায় শিরা ধমনীতে সব রক্ত—শাদা অশ্রুজল
—স্মৃতিরা নিষ্ফল।

*

কার জন্যে জ্বলে তারা

অতীন্দ্র মজুমদার

হতভাগ্য মেয়েটির সারারাত ঘুম নাই চোখে।
কেবলই জানলায় বসে দরজা ধরে ব্যাকুল প্রত্যাশা
আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে রাত জাগে। কার জন্যে। সে তো
স্পষ্ট করে বলতেও পারে না। খালি চাওয়ার যন্ত্রণা
তার সর্বদেহে জ্বলে, বুক কাঁপে দুরুদুরু; হাতে
রজনীগন্ধার কুঁড়ি ভয়ে ভয়ে ফুটতেও পারে না
এমনই চঞ্চল তার দেহ মন। গান বন্ধ বুঝি,
কথাগুলি অস্ফুট, কিংবা কথা নেই, ঠোঁট থর থর,
কী যেন বলতে চায়, কাকে যেন কাছে চায়, তার
দৃষ্টির প্রদীপ জ্বলে অন্ধকারে পথ দেখবে বলে॥

প্রায় নিশুতি রাত্রে হাওয়া আমলকী বনে নিরুপায়
করাঘাত করে; ঘাসে নেহাতই নিস্পৃহভাবে ঝরে
দুটি একটি মালতী করবী; তারা হয়ত বা ভাবে
নির্মল শিশিরে নেবে স্নান সেরে; তারায় গোষ্পদে
আকাশের প্রতিবিম্ব প্রতিরাত্রে যে-ভাবে চমৎকার
আজো সেই একভাবে ধরা দেয়। জোনাকির টিপ
কপালে জ্বালিয়ে নিয়ে সারারাত হিজলেরা জাগে॥

আর জাগে হতভাগ্য মেয়েটির দুটি কালো চোখ,
কার জন্যে জ্বলে তারা স্পষ্ট করে বলতেও পারে না॥

পশ্চিমবঙ্গে আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল—রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। আপাততঃ এইটিই সর্বকনিষ্ঠ। এবং এটিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হল ছয়। দুষ্ট লোকেরা যদি বলে, সরকার এখন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে 'ছ' 'ছ' আনা দরে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন, তবে আমরা, সংস্কৃতি-অনুরাগীরা, নিশ্চয়ই সে প্ররোচনায় কর্ণপাত করব না; কিন্তু এই নবীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র যে ত্রুটিমুক্ত একথাও বলা যাবে কিনা সন্দেহ।

প্রথমে নামকরণটাই ধরা যাক। সকলেই জানেন, রবীন্দ্র ভারতী নামে একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল ইতিপূর্বেই। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় সেই প্রতিষ্ঠানটির নতুন নাম রাখা হয়েছে রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি প্রতিষ্ঠানেরই নামের প্রথম শব্দ দুটি একরকম থেকে গেল। ওদিকে আবার রয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তার সঙ্গেও এই নবীন বিশ্ববিদ্যালয়টি শেষের দুটি শব্দে একাত্ম। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই রকম—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি। সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের নাম ও সৃষ্টির সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। জানি না, হয়তো এইভাবে রবীন্দ্র-সাধনার ত্রিবেণী সংগম দেখানোই হয়তো কর্তৃপক্ষের মনোগত বাসনা ছিল, কিন্তু নামের এই 'থোড় বড়ি খাড়া......খাড়া বড়ি থোড়'-এর মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নাম রাখলে ক্ষতি হত না।

সে যাই হোক, এ যাবৎ কাল যদি আমরা আটজন হেনরী বা চৌদ্দজন লুইয়ের ঠিকুজি কুলজী মুখস্থ করে থাকতে পারি তো রবীন্দ্রনাথের নামে তিনটি প্রতিষ্ঠানকেই বা গুলিয়ে ফেলব কেন? আসল প্রশ্ন হল, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এতটা আধিপত্যের সার্থকতা কী?

কিন্তু সে প্রশ্ন আলোচনার আগে আমরা আরো একটা প্রশ্ন উত্থাপন করি। উদীয়মান এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উদ্দেশ্যের পার্থক্য কতটুকু? জানা গেছে প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি— 'রবীন্দ্রনাথের সৃজনমূলক অবদানের গবেষণা এবং চারুকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক ইত্যাদি সংস্কৃতি সাধনার কেন্দ্র হইবে।' অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপকতর উদ্দেশ্যের মধ্যে এগুলিও কি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য নয়? তাই যদি হয়, তবে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে রাজ্যসরকার কি এই কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, বিশ্বভারতীতে উক্ত উদ্দেশ্যগুলি অবহেলিত? অথবা এমনও কি হতে পারে যে, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এখন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই একটি 'সর্বার্থসাধক' প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে নির্বিশেষ হয়ে উঠছে, তাই বিশেষভাবে রবীন্দ্রচর্চার জন্যেই আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার? এই প্রশ্নগুলি আগে স্পষ্টভাবে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এবং হয়নি বলেই দুষ্ট লোকে মনে করতে পারে, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণে যাঁরা প্রবেশাধিকার পাননি, সেইসব অ-পদস্থ রবীন্দ্রবিদ্‌গণই এবার পদস্থ হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসবেন। তাই যদি হয় তবে দু'পক্ষের চাপান-উতোরে ব্যাপারটা কবিগানের মতোই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিভিন্ন সুরে-সাধা রবীন্দ্রনাথের মহিম্নস্তব শ্রবণ করলেই যে আমাদের কবিভক্তি হু হু করে বেড়ে যাবে এমন সার্টিফিকেট দেওয়া কঠিন।

মনে হয়, অবিলম্বে একটি বে-সরকারী কো-অর্ডিনেশান কমিটি গঠন করে এই বিভিন্ন ভারতীয় রবীন্দ্র গবেষণাকে একসূত্রে গ্রথিত করা দরকার। নয়তো তীর্থদর্শনে আগত সরলমতি গ্রামবাসীর মতোই আমরা পাণ্ডার আক্রমণে ধরাশায়ী হব। সেই সিরিয়ো-কমিক নাটকের করুণ অভিনয় থেকে আমাদের অব্যাহতি পাওয়া দরকার।

*

আর ভয় নেই। ইতালির মিলান শহরের এক খবরে প্রকাশ, হার্টের মধ্যে ছুরিকাঘাতপ্রাপ্ত জনৈক যুবককে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করে সেলাইয়ের দ্বারা হার্ট-মেরামত করার ফলে সে বেঁচে উঠেছে। যে সার্জেন এই বিশ্বকর্মার কাজটি নিষ্পন্ন করেছেন তিনি অত্যন্তই

অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যা হতে নিয়মিত প্রকাশ করা হবে।

—সম্পাদক "অমৃত"

সজ্জন এবং সাধুবাদের পাত্র। তাঁর এই সেলাই-কৌশলটি পৃথিবীর অন্যান্য সার্জেনগণ আয়ত্ত করে ফেললে 'বুকে ছোরা মারা' ব্যাপারটা আর তেমন ভয়াবহ মনে হবে না। সে অপরাধে কাউকে ফাঁসিকাঠেও ঝুলতে হবে না। অতএব তখন আমরা নির্ভয়ে ছুরিকাহত হতে এবং ছোরা মারতে এগিয়ে যেতে পারব।

অবশ্য এমন একটা আবিষ্কার যে ঘটবে তা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। কারণ 'প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী'। শুধু আলঙ্কারিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থেও মনুষ্য-জগতে 'ছোরা-মারা' ব্যাপারটা এখন এমন ব্যাপক হ'য়ে উঠেছে যে, এর একটা প্রতিষেধক না আবিষ্কৃত হলে খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হত।

বরং ছোরা আবিষ্কারের পর ছোরা-মারার প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হ'তে কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হল কী করে সেই ভেবেই অবাক হ'তে হয়।

যাইহোক, এই গতিতে এগোলে চলবে না। এই হারে এগোলে বন্দুক-পিস্তলের গুলী-লাগা হার্টের মেরামতি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হতে আরো কয়েক শতাব্দী পার হ'য়ে যাবে। সে অসহ্য!

সার্জেনদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা বর্তমান জগতের ঋষিকল্প ব্যক্তি—ইচ্ছা করলেই অসাধ্যসাধন করতে পারেন। দ্বিধাবিভক্ত হার্টকে যখন তাঁরা একাগ্র করতে পেরেছেন, গুলীবিদ্ধ হার্টকেও কি নিশ্ছিদ্র করতে পারবেন না? পৃথিবীবাসী এই দ্বিপদ জীবেরা কী রকম হিংস্র হ'য়ে উঠছে তা কি তাঁরা বুঝতে পারছেন না? হাতে তাদের হাজার রকম হাতিয়ার প্রস্তুত, এখন ঐ হার্টবস্তুটির একটা বিলিব্যবস্থা হলেই অত্যন্ত আধুনিক ধরনের এক 'মৃগয়া'য় মেতে উঠতে পারে তারা।

তখন সুকুমার রায়ের ভাষায়—'খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না', অর্থাৎ মারছে কিন্তু মরছে না। সে এক ভারি মজার ব্যাপার হবে যাই বলুন।

*

পশ্চিমবঙ্গে 'লাঠি সমিতি' স্থাপিত হয়েছে। এতদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আবেগারুদ্ধ লাঠি-সম্ভাষণ কাজে লাগল দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে লাঠি অবশ্য তার জাতি খুইয়ে বসে আছে। আজ ভিখারী বা পুলিশ ছাড়া লাঠি আর এখন অন্য কারো হাতে শোভা পায় না। 'লাঠি সমিতি'র উদ্যোক্তাবৃন্দ সেই লাঠিকে আবার পূর্বমহিমায় স্থাপিত করতে অগ্রসর হ'য়েছেন জেনে ভালোই লাগল।

তবে সামনে আসছে ইলেকশন। লাঠিগুলো যেন লাইসেন্স করিয়ে বাজারে ছাড়া হয়। নয়তো মানুষের চেয়ে লাঠির সংখ্যা এবং জোর বেশী হ'য়ে উঠলে লাঠিই হয়তো মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবে।

তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কথাকেই ঘুরিয়ে নিয়ে আবার হয়তো বলতে হবে—'হায় লাঠি, তুমি এ কী উল্টো বুঝ বুঝিলে!'

সাধু, সাবধান!

কবি ও তাঁর ছবি

অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের ছবি কি? কেন ভাল, তার ভিতর কি আছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু না করলে সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা শক্ত।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার ইতিহাস আগে জানা দরকার। তাঁর ছবি আঁকা একেবারে আকস্মিক। তিনি ছবি আঁকব বলে কোনদিন গোড়ার দিকে ছবি আঁকেননি, ছেলেখেলা করতে গিয়ে হঠাৎ ছবি ফুটে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লেখার কারবারী, কোন দিনও ভাবেননি যে তিনি হবেন রেখার কারবারী। কালি ও কলম ছিল তাঁর অস্ত্র, তুলি আর রং নয়। সূর্য যেমন সারাদিন প্রখর আলো দিয়ে সন্ধ্যায় রঙেতে মেঘেতে কত ছবি এঁকে বিদায় নেয়, এও কতকটা সেই রকম। সারা জীবন লেখার কারবার করে, যাবার আগে রেখার ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা।

তিনি কি করে লেখা থেকে রেখায় এলেন তার একটা ইতিহাস আছে। লেখকমাত্রই পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। বেশীর ভাগ লেখক সোজাসুজি লাইন টেনে কাটাকুটি করে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় একটু তারতম্য হল। তিনি কাটাকুটি এমন ভাবে কলম বুলিয়ে করতেন যে, সেগুলো এক একটা এক এক রকমের নক্সার আকার ধারণ করত। একটার সঙ্গে আরেকটার বিশেষ মিল থাকত না। ষাট প'য়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত এই ব্যাপারটা তিনি অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারে করেছিলেন। সকলে যেভাবে কাটাকুটি করেন, রবীন্দ্রনাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবার কারণ কি? সব লেখককে দু'চার ছত্র লেখার পর চিন্তা করতে হয় এবং কাটাকুটি করতে হয়। কোনও লেখক বলতে পারেন না যে কলম ধরলুম আর রেলগাড়ির মত হুহু করে চল্লো। খানিক লেখা খানিক থেমে বসে ভাবা, এ সকল লেখককেই করতে হয়। এবং রবীন্দ্রনাথকেও করতে হয়েছে। লেখা এবং না-লেখার এই সময়টুকু কেউ ভাবে চোখ বুজে, কেউ আকাশের দিকে চেয়ে, কেউ কলমের ডগা মুখে দিয়ে, কেউ বা সামনে রাখা গোলাপ গুচ্ছের দিকে চেয়ে, যার যে রকম অভ্যাস—আমার কিন্তু মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই সময়টায় কলমের ডগা দিয়ে কাটাকুটিগুলোর উপর কালি বুলিয়ে যেতেন, এবং সেগুলো ক্রমশঃ একটা রূপ নিয়ে লেখার মাঝে মাঝে রেখার বাঁধন দিয়ে একটা সুন্দর নক্সার আকার নিত। কেউ যদি তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁর এই কাটাকুটির সঙ্গে সেই সময়কার তাঁর চিন্তাধারার একটা সামঞ্জস্য ও অর্থ আবিষ্কার করতে পারেন।

চীনে অক্ষরগুলোর একটা সৌন্দর্য আছে। প্রত্যেক অক্ষরগুলো এক একটা নক্সা বলা যেতে পারে, Persian Caligraphy দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। উর্দ্দু অক্ষরগুলো কি সুন্দর, আবার তার চারধারে নানা রূপের রেখার টান দিয়ে যখন বাঁধন দেওয়া হয় তখন সবটা মিলিয়ে একটা অপরূপ নক্সার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলো হল এই পর্যায়ের, লেখাকে রেখার বাঁধনে ঘিরে দিয়ে সুন্দর একটি নক্সার সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলি প্রায়ই গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের হাতে আসত। কবির লেখার সঙ্গে ছবি দিতে হবে, গগনকে কিংবা অবনকে বল এঁকে দিতে। চিত্রশিল্পী দুই ভাই পাণ্ডুলিপি-গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় প্রায়ই নিজেদের ভিতর বলাবলি করতেন, "দেখেছ কি সুন্দর কাটাকুটির কায়দা, যেন এক একটা ছবি।" একদিন কথা-গুলো কবির কানে গিয়ে উঠল। তিনি দু'ভাইকে ডেকে বল্লেন, "তোমাদের কি মাথা খারাপ, কই এতদিন ধরে আমার পাণ্ডুলিপি কত বড় বড় প্রকাশক ও সম্পাদকের হাত দিয়ে গেছে, কেউ তো কখনও একথা বলেননি?" দু'ভাই হেসে বল্লেন, "জহুরী না হলে কি জহরত চেনে?" এই শুরু হল কবির লেখা থেকে রেখার [illegible]জাগরণ। জীবনের সায়াহ্নে তিনি [illegible]চেতন হয়ে রেখার ভিতর দিয়ে ভাব-প্রকাশের রাজ্যে প্রবেশ করলেন, ছবি তিনি আঁকলেন বিনা তুলিতে এবং রঙের বদলে রঙীন কালিতে, কলমের সাহায্যে। বেহালা-বাদককে বা কোনও যন্ত্রবাদককে যেমন খুব কম বয়সে ছড়ি টানতে ও আঙুল চালানো অভ্যাস করতে হয়, সেই রকম তুলির কারবারীকে কম বয়সে তুলি-ধরা ও টান-টোন দেওয়া অভ্যাস করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন কলম ধরতে ওস্তাদ, তাই বেশী বয়সে যখন ছবি আঁকা শুরু করলেন তখন তুলি ধরার বয়স চলে গেছে, কি করেন? তুলির বদলে কলম ও কালি চালাতে লাগলেন। ইংরেজীতে যাকে বলে pen & ink। কালি ও কলমের কাজ, রঙের বদলে তরল রঙের কালি বা পেলিক্যান ইঙ্ক ব্যবহার করলেন।

তাঁর আঁকা সব ছবিই কালি কলমের স্তরে পড়ে, তাই যখন তাঁর ছবি দেখব তখন মনে রাখা দরকার এগুলো pen and ink drawing—তাহলে ছবি বোঝার রাস্তা অনেক সহজ হবে। কালি কলমে ছবি আঁকার একটা সুবিধা হচ্ছে, দিনে অনেকগুলো ছবি আঁকা চলে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ ছবি এঁকেছিলেন গড়পড়তা দিনে পাঁচখানা। তাই আমরা তাঁর কাছে থেকে পেলাম প্রায় দু' হাজার ছবি, পনেরো বৎসরের ভিতর। এই ধরনের ছবি সংখ্যাহীনভাবে সৃষ্টি করা জল রঙে কিংবা তেল রঙে কোনদিনও সম্ভব নয়। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব আছে ও তাঁর আরো বড় কৃতিত্ব হল একটা মাথায় দশ ঘণ্টায় এত রকমারি ছবি উদয়। মনে ছবি না এলে আঙুলের ডগায় তা বেরোয় না এ কথা সব শিল্পীই জানেন। রবীন্দ্রনাথ সারা-দিন কবিতার রাজ্যে বিচরণ করতেন—যত ছবি মনের কোণে জমে উঠত তা ছবি হয়ে ফুটে কাগজে বেরত। আমি নিজে দেখেছি একটার পর একটা ছবি তিনি টপ্ টপ্ করে এঁকে চলেছেন, ঠিক কালিঘাটের পোটোদের মত। তাঁর কলম হঠাৎ কাগজের উপর এক জায়গা থেকে শুরু করে নানা ঘোরপেঁচ খেয়ে এঁকে-বেঁকে যখন থামত, তখন দেখা যেত সেটা একটা সুন্দর রেখার ও ছন্দের রূপ ধারণ করেছে। একে বলে রেখার ভিতর দিয়ে সুরের ঝঙ্কার।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লেখার এবং সুরের ভাণ্ডারী, তবে হঠাৎ কেন রেখার

কারবারী হলেন, এ কথাটা একটু ভেবে দেখা দরকার। শিল্পীদের তিনি বলতেন : "তোমাদের বেশ, গোটা কতক টান ও এখানে-ওখানে কিছু রং, ব্যাস হয়ে গেল সব কিছু প্রকাশ। আমাদের বেলায় দিস্তের পর দিস্তে কাগজের শ্রাদ্ধ করে তবে একটা ভাবের প্রকাশ—"। তিনি কথার সঙ্গে সুর বেঁধেও নিশ্চয় মনের ভিতরের রূপটি প্রকাশ করতে পারেননি, তাই শেষজীবনে ছবির মাধ্যমে তাঁর এই প্রচেষ্টা। তাঁর আঁকা ছবি দেখলেই মনে হয় সুর এবং ছন্দের ভিতর দিয়ে যেটা তিনি প্রকাশ করতে পারেননি, সেই ভাবটা তিনি চেষ্টা করেছেন রেখা ও রঙের মাধ্যমে আমাদের দিতে। তাই তাঁর ছবির নাম নেই, যার মনে যে ভাব আসে তাই ভেবে নিতে পারে। কিন্তু যদি শিল্পীর মনের ছবি তার সৃষ্টিতে ধরা না পড়ে সে তো ভাল কথা নয়। আঁকলুম কাক, লোকে বল্লে বা বেশ টিয়েটি এঁকেছে, এ কেমন কথা। এ রকম হলে কি করে চলে, অতএব দাও ছবির একটা নাম, আর ভুল হবে না। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনও নাম নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি মনে করতেন, ছবির ভাবটি হল মুখ্য, কাকই বল আর টিয়াই বল কিছু এসে যায় না যতক্ষণ নিজের মনের ছবি তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ড্রয়িং এবং টেক্‌নিকের বালাই নেই, শুধু রেখা এবং রং ও ছন্দের খেলা। মানুষ জন্তু পাখি গাছ বাড়ি যা কিছু তিনি এঁকেছেন সব সৃষ্টিছাড়া। ঠিক যেন ছোট শিশুর আঁকা ছবি। শিশুরা যেমন শুধু রেখার টানে এবং রঙের ছোপ দিয়ে মনের ছবি প্রকাশ করে নিজের অজ্ঞাতসারে, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই জিনিস এঁকেছেন নিজ অনুভবে, রবীন্দ্রনাথ কোন দিনও ড্রয়িং শেখেননি। তাই তাঁর ছবিতে ড্রয়িংয়ের ত্রুটিহীন সম্পূর্ণতা খুঁজতে যাওয়া ভুল হবে, তাঁর আঁকা জন্তু ও পাখিগুলো সব কাল্পনিক প্রাগৈতিহাসিক বলা যেতে পারে। বাড়ি ঘরগুলো কোনও যুগের নয়, গাছপালা বনের ছবিগুলো সৃষ্টির গোড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। বেশীর ভাগ ছবি গতিহীন স্তব্ধ, যেন হঠাৎ এক জায়গায় থিয়ে থেমে গেছে, সুরের শেষ মূর্ছনার মত। যখনি মানুষের ছবি এঁকেছেন, তার না আছে হাত না আছে পা, সবি ঢেকে দেওয়া হয়েছে শুধু ভাবটুকু রেখে। এর একটা কারণ হল তিনি ড্রয়িং জানতেন না, এবং দ্বিতীয় কারণ হল তাঁর ছবিতে এগুলোর ভিতর দিয়ে কিছু প্রকাশ করবার ছিল না। তিনি মনে করতেন, মানুষের মুখটাই আসল। তাই আমরা দেখতে পাই তাঁর ছবি মানুষের মুখে ভরা। কত রকমের মুখ এঁকেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এখানে মনে রাখা দরকার যে তিনি বেশির ভাগ মুখ এঁকেছেন—সেগুলো কুশ্রী, একটাও সুন্দর নয়। এর কারণ মনে হয় কুৎসিতের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্যের প্রকাশ। শুধু মুখ এঁকে ভাবের প্রকাশ করতে গেলে সে মুখটার নাক, কান, চোখ ও ঠোঁট ইত্যাদি এমন ভাবে বাঁকা-চোরা করে আঁকতে হয় যাতে হয়ত মুখটা কুৎসিত দেখায়। কিন্তু যে ভাবটি প্রকাশ করতে চাই সেটি ঠিক ঠিক ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা মুখগুলো দেখলে ঠিক এই কথা মনে হয়।

মেঘের ডাক, পাখির গান, বাঘের গর্জন, হাওয়ার কানাকানি, ডালের ঝাপটা সবের ভিতর নানা সুর, ফুটিয়ে তোলে চোখের সামনে নানা রকমের ছবি। সৃষ্টির প্রথম ভাষা হল সুরের ভাষা, কথা নেই, লেখা নেই, রেখা নেই শুধু সুরের ঝঙ্কার, এক একটা সুর এক এক রকমের ছবি এঁকে চলেছে মনের পর্দায়। মানুষ যখন গুহায় বাস করত, তখন তার ভাষা ছিল না, কথা বলার ছিল কেবল মাত্র কতগুলো শব্দ। কিন্তু কানে তার সুর পৌঁছে গেছে এবং চোখে সে ছবি দেখছে, এবং পাথরের টুকরো বা কাঠ-কয়লা দিয়ে সেই সব ছবি গুহার গায়ে এঁকে রাখছে। এর পরে দেখতে পাই ছবির ভাষা, তারপর হল অক্ষরের সৃষ্টি এবং পুঁথি লেখা।

সাত সুরের ওলটপালটে ও যোগ-বিয়োগে এক এক রকমের ছবি ফুটে ওঠে। আবার শুধু রেখার টানে ও রঙের ছন্দেও শিল্পী এঁকে চলেন ছবির পর ছবি। শেষে আসেন কবি ভাষা ও ছন্দে এঁকে দিতে মনের ছবি। সবাই এক কাজের কাজী, শুধু তিন শিল্পীর তিন রকমের বাহন—এই যা তফাত; বাহনের তারতম্যে তিন শিল্পীর প্রকাশ তিন রকম। সুরকার কত সহজে তাঁর মনের ছবি এঁকে দেন, চিত্রশিল্পী শুধু একটা কাগজের উপর রেখা ও রঙের বাঁধন দিয়ে তাঁর মনের ভাবটি প্রকাশ করলেন, আর কবি সুর ও ছন্দ দুই মিলিয়ে প্রকাশ করলেন মনের কথা।

সুর যতটা দেয়, ছবি অত দিতে পারে না এবং ভাষা যা বলতে চায় সেই শেষ কথাটি বলতে গিয়ে কথা ফুরিয়ে যায়। বিশ্বকবির বেলায় ঠিক তাই হল। শেষজীবনে তিনি আবিষ্কার করলেন সুর, ছন্দ ও ভাষার সাহায্যে তিনি যা বলতে চান তার অনেক কিছু বলা বাকি থেকে যাচ্ছে, তাই তাঁকে রেখার আশ্রয় নিতে হল অনেক না-বলা কথা প্রকাশের জন্য।

এই রাস্তা ধরে যদি তাঁর ছবি দেখা যায় তাহলে বোঝবার পক্ষে অনেক সহজ হবে।

সুদূর পূবে যেখানে প্রথম সূর্য ওঠে সেই জাপানের ছবিগুলি একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সবটাই শুধু সাদা কাগজ, দুই এক জায়গায় কালো রেখার ছন্দময় টানটোন এবং একটু-আধটু হাল্কা রঙের ছোঁয়া, ঠিক যেন প্রভাতের মলিনতাহীন শুচিময় হাওয়া ও আলো। এবার এগিয়ে যাই চীন দেশে, সেখানকার বেশীর ভাগ ছবি কালো-সাদায় আঁকা, শুধু আলো-ছায়ার খেলা। এবার আসি নিজের দেশে ভারতের ছবিতে। দেখি শুধু রঙ-বেরঙের মেলা, রেখার ছন্দে ভরা যেন মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যের আলোয় প্রকৃতির রঙ ও রেখা জ্বলজ্বল করছে। শেষে যাই পশ্চিম মহাদেশে, সেখানে ছবি আঁকা হয়েছে খুব কাল রঙ দিয়ে, সবটাই অন্ধকার, তার মাঝে এখানে-ওখানে আলোর উজ্জ্বল আভা, যেমন রাতের অন্ধকারে উজ্জ্বল তারার বাহার। রবীন্দ্রনাথের ছবি এর কোনও স্তরে পড়ে না, তাঁর আঁকা ছবিগুলো একেবারে নিজস্ব, কারুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না, না জাপানী না চীনা, না ভারতীয় কিংবা পশ্চিমী। এগুলো এক কথায় রাবীন্দ্রিক। তাঁর ছবিতে পাই রেখার ছন্দ, আলো-আঁধারের খেলা, এবং কবির খেয়ালের স্বপ্ন, কালো ও সাদা রেখার টানে কাগজটা ভরে দেওয়া হয়েছে হিজিবিজি কেটে। তবে এই কাটা-কুটির মধ্যে চমৎকার একটি সুর ও ছন্দ রয়েছে। প্রাণে যে সুর বাজল, চোখে যে রঙ লাগল, একেবারে হুবহু তার প্রতিকৃতি সাদা কাগজে ফুটে উঠল। এই হল তাঁর ছবির সার্থকতা। ছবির না আছে উৎকৃষ্ট ড্রইং না আছে ভাল টেকনিক, শুধু আছে রেখা ছন্দ ও আলোছায়ার সুরের

এতেই ফুটে উঠেছে কবির প্রাণের কথা, আর কি চাই?

রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলোকে 'পেণ্টিং' বলা ভুল হবে, কারণ সবগুলিই খাঁটি 'ড্রইং'। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবির ছবির প্রদর্শনী ও সমালোচনা সারা দেশব্যাপী চলেছে। প্রদর্শনী দেখে ও সমালোচনা পড়ে সাধারণ মানুষের কবির ছবির সম্বন্ধে জ্ঞান যে বাড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নিশ্চয় ছবি দেখা খুব ভাল, কিন্তু যে সমস্ত সমালোচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে ছবির বিষয় বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। বেশীর ভাগ সমালোচকরা শিল্প-পণ্ডিত, শিল্পী নন, তাই তাঁদের সমালোচনায় পাণ্ডিত্য আছে যথেষ্ট, নেই শুধু ছবির সৌন্দর্য বা গুণাগুণের কথা।

ছবির সমালোচনা হচ্ছে বড় বড় কতকগুলো দাঁত-ভাঙ্গা ইংরেজী শব্দের সাহায্যে এবং যত রকম সম্ভব ও অসম্ভব বিশেষণ প্রয়োগে, এটা ঠিক যেন শিল্পীর গলায় পদক ঝুলিয়ে দিয়ে শিল্পী ও তাঁর সৃষ্টিকে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা—"দেখ কত বড় শিল্পী এবং কি সুন্দর তার সৃষ্টি"। কিন্তু এটাতো সৃষ্টির অন্তরের কথা নয়, এটা হল বাহিরের খোলস। শিল্পী ছাড়া ছবির আসল রূপটি কি এবং কোন জায়গায় তার সৌন্দর্য ও রস, তা বুঝিয়ে বলতে সাধারণ সমালোচকদের দল কোন দিনও পারবেন না। শুধু কলমের জোরে কতকগুলো বিশেষণ যোগ করলেই ছবির সমালোচনা হয় না। যে সমালোচকের কলম ও তুলি দুই চলে, তিনিই কেবল ছবির বিচার অতি সুন্দর ও সহজ কথায় করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের ছবি পশ্চিমে দেখানো হয়েছিল এবং বহু সমালোচনাও ঐ সম্বন্ধে হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে পাই কতকগুলো বিশেষণ প্রয়োগে বোঝাবার চেষ্টা : যা দেখছ এ একেবারে অপূর্ব সৃষ্টি। আমাদের দেশের সমালোচকেরা এইগুলোর নজির দিয়ে বলে থাকেন, যেহেতু পশ্চিম রবীন্দ্রনাথের ছবি ভাল বলেছে, অতএব চোখ বুজে তোমরাও মেনে নাও, এত বড় শিল্পী পৃথিবীতে জন্মায়নি। তার পরেই শুরু হয় বড় বড় কথার ও বিশেষণের প্রয়োগে ছবির ব্যাখ্যা। ডুবে যায় ছবির রস ও রূপ, ফুটে উঠে শুধু কথার পাণ্ডিত্য এবং অক্ষর জুগিয়ে যার মানে জানবার জন্য অভিধান খুলতে হয় বারবার। ছবির একটা ভাষা আছে, সেই ভাষা শেখা হলে তবে ছবির সঠিক রূপ প্রকাশ পায়, বেশীর ভাগ সমালোচক এই ভাষা জানেন না, তাই ছবির রস গ্রহণ করতে অক্ষম। অলঙ্কার-শাস্ত্রের পণ্ডিত ছবির সমালোচনা করতে গিয়ে এমন অস্ত্র চালান যে ছবির প্রাণটি চলে গিয়ে শুধু পড়ে থাকে কাঠামোটা। এই হল সব দেশের সব সমালোচকদের কথা। দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্তি এখন ঘরে ঘরে দেখতে পাওয়া যায়, অফিসের টেবিলে, মন্ত্রী মহাশয়দের খাসকামরায় ও লাট-বেলাটের প্রাসাদে। জিজ্ঞাসা করুন এই মূর্তির সৌন্দর্য কোথায়? বেশীর ভাগ নিরুত্তর, অথবা উত্তর হল "অপূর্ব, ঠিক যেন উদয়শঙ্করের নাচ"। এর পরেও কি জানতে চান সমালোচকদের শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান? ফরাসী দেশের বিখ্যাত প্রস্তর-শিল্পী রোঁদা, দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ মূর্তি দেখে এক সমালোচনা ও প্রশংসা লিখেছিলেন, সেটা পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয় এবং উপলব্ধি করা যায় যে শিল্পী ছাড়া শিল্পের সমালোচনা হয় না। ভাস্কর রোঁদা তাঁর শিষ্যদের Venus de millo-এর মূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করতেন রাতের আঁধারে প্রদীপের আলোয় যখন তার রূপটি ফুটে উঠত। এ রকম করে ক'জন সমালোচক ছবি বা মূর্তি দেখেন? মনে হয় শতকরা একজনও নয়। তবে খাঁটি সমালোচনা তাঁদের কাছ থেকে কি করে আশা করা যেতে পারে? কেউ করেন প্রশংসা, কেউ করেন নিন্দা, অথবা দুই-এ মিশিয়ে একটা ব্যাখ্যা, পড়ে দেখুন সবই মিথ্যা, আসল কিছুই বলা হয়নি শুধু কতকগুলো বড় বড় কথা লিখে চমক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা মাত্র হয়েছে।

কেবল সমালোচনা পড়ে মাথা খারাপ না করে লোকে যদি বেশী করে ছবি দেখে তাতে অনেক বেশী জ্ঞান হয় এবং আনন্দ পায়। এদিক থেকে দেখে মনে ছবির যত বেশী প্রদর্শনী হয় তত ভাল। মূল ছবি না দেখে ছবির সস্তা খেলো মুদ্রণ দেখে তার বিচার করা একেবারেই উচিত নয়। সমালোচনা করবার আগে দিনের পর দিন ছবিটি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে তার রূপ ও রস আকণ্ঠ পান করে তবে সমালোচনা করা উচিত। প্রদর্শনীতে গেলুম, ক্যাটালগে কতকগুলো নোট লিখে নিয়ে বাড়ি এসে এক কলম লিখে কাগজে পাঠিয়ে দিলুম, ব্যাস হয়ে গেল। এই কাজ যাঁদের তাঁদের কলম থেকে খাঁটি সমালোচনা পাওয়া মানে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের ছবির ভিতর রকমারিত্ব নেই, কতকগুলো ছবি দেখলেই মন ভরে
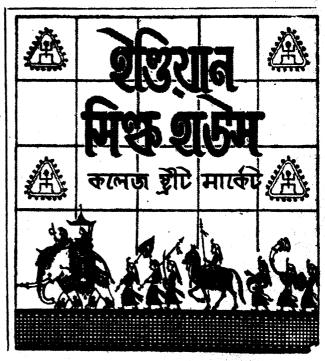
[illegible] দেখলে মনে হয় একই ধরনের ছবি, ফ্রেমার আরশ্যাতে নতুনত্ব [illegible] চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের সব ছবির [illegible] এক ধরনের, বেশীর ভাগ কালো-সাদায় আঁকা, landscape-গুলোর বেলায় কিছু রং ব্যবহার করেছেন. কবির ছবির ভঙ্গিটা হল মুখ্য, রেখার ছন্দে ভরা, যে ক'খানা গতিশীল ছবি এঁকেছেন বেশীর ভাগ নাচের ভঙ্গি, মুখের ছবিগুলো গাম্ভীর্যে ভরা, অন্য বিশেষ কোন ভাবের প্রকাশ তাতে নেই। তাঁর ছবিতে composition-এর অভাব খুব, বেশী ছবিই একক, অর্থাৎ একটা মানুষ, একটা মুখ, একটা জন্তু বা একটা বাড়ীর কিছুটা। তাঁর ছবিতে composition পাওয়া যায় landscape-গুলোর বেলায়। গাছের সার বসিয়ে নিকট ও দূর বোঝানো হয়েছে perspective-এর সাহায্যে। জলে মাছ খেলা করছে, জলের বাইরেটা অন্ধকার ভিতরটায় আলো, এর দ্বারা মনকে একেবারে জলের ভিতর টেনে নিয়ে যায় মাছগুলোর দিকে. এ ছবিতে সব কিছুই স্থির শুধু মাছের গতি ও জলের নাড়া গতিশীল। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের একখানা ছবি দেখেছিলুম সেটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সব ছবি two dimensional. three or four dimension-এর কোন চেষ্টা নেই, মনে হয় আধুনিক ফরাসী শিল্প তাঁর উপর একেবারে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, এবং ঐ ধরনের শিল্প তিনি পছন্দ করতেন না।

ফরাসী দেশে এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি যাঁরা আঁকেন, তাঁরা এক একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী, তাঁরা প্রথম জীবনে ছবি আঁকার কায়দা একেবারে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে শেষকালে এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবিতে পৌঁছান, এ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি আঁকা মানে সারা জীবনের শিক্ষা ও সাধনা ভুলে গিয়ে আবার নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া, এই ভাবে ছবির সাধনা আমাদের দেশে কোন শিল্পী করেননি, রবীন্দ্রনাথও না। সেই কারণে কবির ছবিতে বিদেশীর ছোঁয়া একেবারে নেই।

গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব কবির ছবিতে অনেক ক্ষেত্রে বেশ পরিস্ফুট। মেক্সিকোর মায়া, মিশর এবং সেরামোনিক শিল্পের প্রভাবও তাঁর ছবিতে আছে। প্রিমিটিভ শিল্পের ছাপ অনেক ছবিতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে পাখি ও জন্তু-জানোয়ারগুলোর ভিতর।

এই সব প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যখন রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখি তখনি এগুলো যে কবির আঁকা, তা নামসই করা না থাকলেও তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়। তাঁর ছবিতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা আছে যা তাঁর একেবারে নিজস্ব, সেই জন্য অন্য কারুর আঁকা বলে ভুল হয় না।

বহু ছবি এঁকেছেন, সব ছবির প্রদর্শনী একসঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়, তাই বিশ্বভারতী যদি ক্রমশঃ এক-একটি প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে এগুলি আমাদের সামনে প্রকাশ করেন, তাহলে শিল্পী, এবং শিল্প-ছাত্রদের শিক্ষার অনেক সাহায্য হবে।

কবিতা, গান এবং সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য অফুরন্ত ঐশ্বর্য রেখে গেছেন এবং শেষজীবনের কয়েক বৎসরে রেখে গেলেন ছবির ভাণ্ডার যা আমরা সারা জীবনে দেখে শেষ করতে পারব না, অতএব কি করে তাঁর ছবির খাঁটি সমালোচনা করা সম্ভব! সমালোচনা পড়ার চেয়ে ছবি দেখলে অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করা যায়। শিল্প-গুরুদের এক একদল ছাত্র সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া উচিত, ছবি দেখবার কালে ছাত্রদের ছবির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা দরকার এবং কি করে ছবি দেখতে হয় তার শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রভাবাচ্ছন্ন মন নিয়ে প্রদর্শনী দেখতে যাবেন না, মুক্ত মন নিয়ে যাবেন, এইরূপ মনের শান্ত অবস্থায় ছবি দেখতে দেখতে কোনও কোনও ছবি মনের ভিতর গভীর ছাপ দেবে. এর পর বার বার ঐ ছবিগুলি খুঁটিয়ে দেখলে শেষ পর্যন্ত চিত্রশিল্পীর মানস প্রতিমা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করলেন বিশ্ব, বহু যুগ চলে গেল, তারপর একদিন মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করে এক শাস্ত্র লিখলে, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহতারার বিষয়ে। প্রথমে হয় সৃষ্টি পরে হল শাস্ত্র। শিল্পীও আগে আঁকলেন ছবি, গড়লেন মূর্তি, পরে পণ্ডিত এসে শাস্ত্রের বাঁধন ও নিয়মে তাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেল্লেন। শিল্প হয়েছিল বলেই শিল্প-শাস্ত্র লেখা হল, এই কথাটি মনে রাখতে হবে; শিল্পী যদি শুধু শাস্ত্র মেনে কোনও নিয়ম লঙ্ঘন না করে ছবি আঁকেন, সেগুলো হবে খাঁটি academic ছবি, কোন কালেও সেগুলো আর্ট বলে স্বীকৃতি পাবে না। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা একেবারে খুব বেশী রকম অশাস্ত্রীয়, সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙ্গেচুরে তচনচ করে দিয়ে, তিনি এমন ছবি আঁকলেন যা কোন নূতন গোত্রে পড়ে না, তাঁর ছবির জন্য একেবারে নূতন ব্যাকরণ তৈরি করতে হবে. সে লোক কোথায় যে এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে। সামনে তো কাউকেই দেখছি না. হয়ত ভবিষ্যতে এক পাণিনি একদিন আসবেন, তিনি এই সব ছবির আসল ব্যাখ্যা ও শাস্ত্র আমাদের বুঝিয়ে দেবেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে বহু রসবেত্তা বহু আলোচনা করেছেন এবং করছেন। তাতে করে তাঁর সঙ্গীত ও সাহিত্যের একটা ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ এখন তাঁর গান ও লেখা ঠিক রকম বুঝতে পারে এবং রসগ্রহণও করে। এই ভাবে রবীন্দ্র-চিত্রকলার একটা নূতন শাস্ত্র নিশ্চয় একদিন তৈরি হবে এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝবার রাস্তা সহজ হয়ে যাবে। তবুও শেষ পর্যন্ত একথা মানতেই হবে, যত যাই হোক, চোখে ছবি না দেখলে শুধু শাস্ত্র পড়ে শিল্প-জ্ঞান কোনদিনও হবে না। অতএব পণ্ডিত তৈরি করুক শিল্প-শাস্ত্র। স্নাতকরা তাই নিয়ে গবেষণা করে চলুক যুগের পর যুগ ধরে। কিন্তু আমরা চলি প্রদর্শনীতে ছবি দেখতে নিয়ম-কানুন, ব্যাকরণ, শাস্ত্র ইত্যাদি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে। প্রাণভরে ছবি দেখে রঙে, রসে ও সুরে মন ভরে নিয়ে ঘরে ফিরে যাই।

মোট কথা হল ছবির প্রদর্শনী হওয়া চাই এবং বড় বড় শিল্পীদের স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী প্রদর্শনী হওয়া দরকার। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবি আজকাল আমরা দেখতেই পাই না, কারণ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ওয়ারিসগণ সেগুলো নানা জায়গায় নানা লোককে বিক্রি করে দিয়েছেন, অতএব তাঁর ছবি চিরদিনের জন্য অতীতের গর্ভে লীন হয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথের অদৃষ্ট তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চেয়ে কিঞ্চিৎ ভাল। কারণ তাঁর ছবি প্রথমে কলকাতার যাদুঘরে কিছু রাখা আছে আমাদের জন্য। দ্বিতীয় নয়াদিল্লীর ন্যাশন্যাল গ্যালারী অব মডার্ন আর্টস-এর মিউজিয়ামে ভারত সরকার যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছেন দেশ-বিদেশের লোক দেখবে বলে। এ ছাড়া, কলিকাতার রবীন্দ্র-ভারতীর সংগ্রহে প্রায় তিনশত ছবি আছে লোহার বাক্সে বন্ধ গুদাম-জাত হয়ে, ভবিষ্যতে অন্ধকার হতে আলোকে আসবার আশায়, রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার ছবি বিক্রি করেছেন কিছু ভারত সরকারকে, কিছু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। মস্ত সংগ্রহ প্রায় ১৫০০ ছবি দিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সদনে। ভারত সরকার তাঁর ছবির স্থায়ী প্রদর্শনী দিল্লীর ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করবেন আমরা জানি না। রবীন্দ্র-সদনের সংগ্রহ আপাততঃ তৎসংলগ্ন ঠাণ্ডা-গারদে জমা করা আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এগুলির প্রদর্শনী যে করবে হবে তার খবর এখনও আমরা পাইনি। প্রদর্শনী খোলা হলে ছবি দেখে আবার কিছু লেখবার আশায় রইলুম।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ পঁচিশ ॥

পাওয়া গেল প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

দেখল এত বড় একটা পারিবারিক রহস্য এতদিন ধ'রে যে অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে তার কাছে, তার কারণও থেকে গেছে।

মায়ের কাছে প্রশ্ন করে এই প্রথম জানল বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বাক্সয় একটা চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিটা বের করেও দিলেন তিনি। তার মধ্যে থেকেই এতদিন না জানানর কারণটাও টের পেল প্রশান্ত· যদিও মা তার ওপরও একটু দেরি করে ফেলেছেন।

মৃত্যুর কারণ বাবা কিছুই লিখে যাননি, শুধু তাঁর মৃত্যুর পর কি অবস্থার মধ্যে কোন সময় কি করতে হবে তার একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তবে কিছু লেখা না থাকলেও ব্যবসায়ে অসাফল্যই যে মৃত্যুর কারণ এটা ভালো রকমই বোঝা যায়। লিখেছেন—বাজারে কিছু ঋণ আছে, তবে বাড়িটা স্ত্রী-ধন, এর দিকে কেউ হাত বাড়াতে পারবে না। না পারলেও প্রশান্ত কোন জায়গায় স্থায়ী-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেলেই ওরা এ বাড়ি বিক্রি ক'রে ওর চাকরির স্থলে চলে গিয়ে থাকবে, কিংবা উষার পড়ার অসুবিধা হ'লে কলকাতাতেই বাসা করে থাকবে; শেষের দিকে প্রশান্তর এক দূর-সম্পর্কের মামা এসে ওদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরই অভিভাবকত্বে। বাজারে গুটিতিনেক জায়গায় ঋণের নাম করেছেন বাবা। বাড়ি বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে সেটা সেই তিন জায়গায় ভাগ করে দিতে বলেছেন। তার মধ্যে একজন সিনেমা অভিনেত্রী। প্রশান্ত চিনল, আগে ভালোই নাম ছিল, এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে; আর কিছুই শোনা যায় না। দ্বিতীয় একজন বাঙালী ব্যবসায়ী, চিনল না প্রশান্ত, তবে ঠিকানা সব ক্ষেত্রেই দেওয়া আছে, বের করে নিতে পারবে। তৃতীয় যে লাহিড়ীমশায় তাতে আর সন্দেহ রইল না। পোস্টকার্ডের নাম-ঠিকানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

বিক্রয়লব্ধ টাকাটা কিভাবে ভাগ করতে হবে তারও একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন। অর্ধেকটা দেওয়া হবে লাহিড়ী-মশাইকে অবশ্য তিনি কে, তাঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে কিছুই লেখেননি। প্রশান্ত জিগ্যেস করে দেখল, তার মাও বিশেষ কিছু জানেন না। প্রশান্ত চেহারার বর্ণনা করতে অনেক মিলিয়ে বললেন, যেন বার দুই-তিন দেখেছেন বাড়িতে। অনাথের কথার সঙ্গে বেশ মিলে যায়, বাড়িতে বড়-একটা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন না লাহিড়ীমশাইয়ের সাঙ্গাত।

অন্য দুজনের ঋণ সম্বন্ধে লেখা আছে, লাহিড়ীমশাইকে দিয়ে বাকি অর্ধেকটা ঐ দুজনকে সমভাবে ভাগ করে দেওয়া।

মা যে কেন এতদিন বলেননি তাও কতকটা টের পাওয়া গেল চিঠি থেকেই। শেষের দিকে নীচে দাগ কেটে লেখা আছে, প্রশান্ত বেশ ভালো ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাড়ি বেচার মতো অবস্থা না হ'লে তাকে যেন এ সম্বন্ধে কিছুই বলা না হয়। তেমনি, অবস্থা হলে যেন বিলম্বও না করা হয়।

কম্পিত হস্তে চিঠিটা পড়ে গেল প্রশান্ত; সাঙ্গ হ'লে মাকে তার প্রথম কথাই হোল—'তবু দিন কতক আগে তুমি জানাতে পারতে মা।'

চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে কথাটা বলে মুখের দিকে চাইতে দেখল মা যেন এই তিরস্কারটুকু শোনবার ভয়ে একটু জড়োসড়ো হ'য়েই ওর দিকে চেয়ে বসে আছেন। একটু চুপ করে থেকে অপ্রতিভ-ভাবে মগ্নকণ্ঠেই বললেন,—'এইবার বলব ঠিক করেছিলাম বাবা।'

অনুশোচনায় মনটা ভরে গেল প্রশান্তর। মনের চঞ্চলতার জন্যেই, আর লাহিড়ীমশাইয়ের ইতিহাস জানে আর দুরবস্থাটা প্রত্যক্ষ করে এসেছে বলেই কথাটা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে, কিন্তু বুঝল বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। অনু-শোচনার মধ্যে বুঝতে পারল এতদিন মনটা একটা দিক নিয়ে পড়ে থাকায় তার জীবনের আর একটা দিক, যেটা নিকটতর

সেটা অলক্ষিতই থেকে গেছে। প্রায় দেড় বৎসর হোল সে বিদেশ থেকে ফিরেছে। আজ যেন এই প্রথম বুঝল ফিরেই মায়ের যে শোকার্ত মূর্তিটি দেখেছিল সেইটিই স্থায়ী হয়ে গেছে ও'র জীবনে। বুঝলও, কেন। ছেলে একরকম গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েই দেশে ফিরলেও—সেখান থেকেই এক হিসাবে চাকরিটা পেয়ে এসেছে—এই চিঠিটা, এই রহস্যটা ও'কে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ করে করে এসেছে এতদিন। কেন পুষে রাখা এই রহস্য তাও তো বুঝল ও'র উত্তর থেকে। যেমন কণ্ঠস্বরে বলা, দৃষ্টিতে যে কারুণ্য নিয়ে, তাতে যেন আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠল সমস্তটুকু।

বাবা যে ও রকম নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে গেলেন, শুধু তো তাই নয়। একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেলেন। মা যদি প্রশান্তর এ রকম চাকরি পাওয়া যথেষ্ট পাওয়া না মনে করে থাকেন, যদি ছেলের বিবাহ দিয়ে পূর্বাবস্থা খানিকটা ফিরিয়ে আনবার স্বপ্ন দেখে থাকেন তো দোষ দেবে কি করে?

একেবারেই নিঃস্ব পিতার মেয়ে স্বাতির সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনায়,—সুনিশ্চিত সম্ভাবনাই বলা যায়— ও'র সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তাই এবার বলবেন ঠিক করেছিলেন। দুটি কথায় মা যেন ওঁর সমস্ত আশা, সমস্ত নিরাশা, অধিকন্তু সমস্ত লজ্জা উজাড় করে বের করে দিলেন। লজ্জাটা যেন একটা অসংগত লোভের লজ্জা যা তাঁকে স্বামী আর সন্তান দুজনের কাছেই অপরাধী করে তুলেছে।

শ্রাবণশেষের দীর্ঘ দিনটা যে কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেল যেন বুঝতেই পারল না প্রশান্ত। ভালোয়-মন্দয় মেশানো এমন পরস্পর-বিরোধী চিন্তার সম্মুখীন আর কখনও হয়েছিল কিনা জীবনে, মনে পড়ে না।......স্বাতি চিরদিনের জন্য হারাল জীবন থেকে। কি যে এক সমস্ত-জীবন-শূন্য-করা চিন্তা! কিন্তু কঠোর সত্য। বাবার কলঙ্কিত জীবনের ছাপ মুখে নিয়ে ঐ সর্বস্বান্ত পরিবারের সামনে আর গিয়ে দাঁড়ানো যাবে না। আগের দিকে এর পাশেই আছে বাবার ঋণশোধের নির্দেশ। যা সর্বনাশ হোল লাহিড়ী-পরিবারের তাদের হতে তার তুলনায় কিছুই নয়; তবু যে অবস্থায় রয়েছেন ও'রা বর্তমানে, সে-হিসাবে অনেকখানিই বৈকি, কম করে, ধরলেও বাড়িটা থেকে কোন্-না হাজার পঞ্চাশেক পাওয়া যাবে? অর্ধেকটা লাহিড়ী-মশাইয়ের। স্বাতির বিয়ে দিয়ে—উপযুক্ত হাতেই পড়বে স্বাতি এ রকম একটা সম্পূর্ণ বিরোধী মর্ম-নিংড়ানো চিন্তাও রয়েছে। লাহিড়ীমশাই ত নিজের বাকি জীবনটা সচ্ছলতার মধ্যেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। এর পাশে পাশেই এসে পড়ছে মায়ের মুখখানি।......আজ এও একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠে মনটাকে স্বাতির সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনাটাকে শতগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে—স্বাতির মায়ের সঙ্গে ওর নিজের মায়ের মিল। দুজনেই নিতান্ত নিরীহ, সংসারে স্বামীর ওপর নির্ভর ছাড়া কিছুই শেখেননি, তাঁদের স্বামীর আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেননি কখনও। যা পেয়েছেন—সুখ হোক, দুঃখ হোক, মাথা পেতে নিয়ে গেছেন। তাইতেই তাঁদের সর্বনাশও ডেকে এনেছেন, অবশ্য দুজনে দুভাবে।......আজ এত মর্মভেদী দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা, মুখখানি ধীরে ধীরে আবার দীপ্ত হয়ে উঠছে। এত দুঃখের মধ্যেও আনন্দ হয় বৈকি।...... ও'কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে; যে মূল্যেই উনি চান তাঁর উপযুক্ত সন্তানের জন্য।... স্বাতির জন্য বেদনা কি তাঁর মনেও জাগবে?

ভালো চিন্তা করতে বেদনা এসে পড়ে; তেমনি বেদনাময় চিন্তার গায়েও তো ভালো চিন্তা এসে পড়ছে; কিন্তু এ কেমন ভালো যাকে মনের সমস্তটুকু দিয়ে গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

অস্থির হয়ে কাটাল দিনটা প্রশান্ত বাড়িতেই এ-ঘর, ও-ঘর, এ বারান্দা—ও বারান্দা করে। ওর জীবনের আর-একটা ট্রাজেডী, এখানে ওর বন্ধু নেই, কারুর কাছে গিয়ে বুকটা হালকা করবে, একটা পরামর্শ চাইবে সে উপায় নেই। সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে পড়ে পার্কে খানিকটা বেড়াল। মনটা একটু শান্ত হয়ে এসেছে। রাত এগুলে পার্ক নিরিবিলি হয়ে আসতে একধারে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে দুদিনের যা অভিজ্ঞতা সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছোবার চেষ্টা করতে লাগলো। করলও একটা ঠিক।

একটু রাত করে ফিরল। মা বেশ উদ্বিগ্নই ছিলেন, পোড়-খাওয়া মানুষই তো, ছেলের হঠাৎ ভাব-পরিবর্তনে তার দিনটাও অশান্তিতেই কেটেছে—অফিসের কাজেই দেরি হয়ে গেল বলে যতটা পারল নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করল। তারপর আহার সারা হয়ে গেলে তাকে আর মুকুন্দ-মামাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে আর সব কিছুই বাদ দিয়ে মাত্র দুটি কথা বললো। মা ওর বিবাহের সম্বন্ধ দেখুন, ধীরেসুস্থে যেমন পছন্দ তাঁর, আর মুকুন্দ-মামাও বাড়িটার জন্যে খদ্দের দেখুন। এটা যত তাড়াতাড়ি পারেন।

আজকের দিনটির ছাপ রয়েছে দুটির ওপর, ভালোয়-মন্দয় পরস্পর-বিরোধী।

উষাকে একেবারে বাদ দিয়ে গেছে, বাইরে রেখে গেছে এ অশান্তির। এধারেও মাকে বলল, তাকে যেন কিছু জানানো না হয়। যথাসময়েই টের পাবে তো।

মা বললেন,—'বিয়ের কথাটা বলতে দোষ কি? খুশীই হবে তো।'

মুহূর্ত কয়েক চোখ তুলে ভাবল প্রশান্ত। বলল,—'থাক না এখন। কোথায় কি ঠিক নেই তো। হুজুগে পড়ে পড়া নষ্ট করবে।'

॥ ছাব্বিশ ॥

কলোনিতে ফিরে এসে কাজের মধ্যে একেবারে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। অবশ্য নিতান্ত যান্ত্রিকভাবেই, এদিক থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই। নয়ত মনের সঙ্গে, কাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই। সকালে বেরিয়ে যায়, ফেরে খানিকটা রাত হয়ে গেলে। পরিত্রাণ পেতে চায় প্রশ্ন থেকে। লাহিড়ীমশাই, স্বাতি: তাদের মনের অবস্থা যে কি যাচ্ছে আন্দাজ করতে পারে। প্রশান্ত স্বয়ং না গেলেও তাঁরা যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারেন; যাচ্ছে না বলেই সম্ভাবনাটা আরও বেশি। চাটুজ্যের কাছে শুনল, দুদিন সে ছিল না, রোজ সকালে একবার ক'রে এসেছেন দুজনে। অনাথ রোজ বিকালে এসেছে, রাত আটটার গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পরে খানিকটা অপেক্ষা করে তবে ফিরেছে। ওর অবস্থা আরও বাড়িল। স্বাতি কাকা বলে, তাই গোড়ায় একদিন চাটুজ্যের কাছে দুঃখ করেছিল—সেলাইকল নিয়ে প্রশান্তের এভাবে ঠাট্টা করায়। নিজেকে বোধহয় খুড়শ্বশুরের পদবীতেই বসিয়ে থাকবে। এদিকে কিন্তু বার বারই চাটুজ্যেকে বলেছে, ইন্‌জিনিয়ার-বাবুকে বলতে যে এ নিয়ে ওর কোন অভিমান নেই, ওরও নয়—লাহিড়ীমশাই বা স্বাতিরও নয়। সবচেয়ে এড়িয়ে চলেছে বিশাখাকে প্রশান্ত। তাকেই বেশি ভয়, কেননা সে একেবারেই কাছে,

যে কোন সময় এসে যেমন খুশি প্রশ্ন করতে পরে, তার নিজের দিক দিয়েও, আবার ও'দের হয়েও। গোপেশ্বরকে বলা আছে ওকে সকাল সকাল জীপে করে দিয়ে আসবে, তারপর আবার গিয়ে সংধ্যার আগেই নিয়ে আসবে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে—বিশাখা, অনাথ, স্বাতি কিংবা লাহিড়ীমশাই—যে কেউ হোক, বলবে বর্ষা প্রবলভাবে এসে পড়ায় কাজে কতকগুলো নতুন সমস্যা হঠাৎ দেখা দিয়েছে, সেগুলো সামলাতেই ও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, ডাইনে-বাঁয়ে দেখবার অবসর নেই। বলবে রোজই ও'দের খোঁজ নেয় ওর কাছে। চাটুজ্যেকেও ওই কথাই বলে দিয়েছে।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। দুদিন সবাইকে এড়িয়ে থেকে তৃতীয় দিনে ধরা পড়ে গেল। ধরাও পড়ল এমন লোকের কাছেই যার সম্বন্ধে ওর কোন আশঙ্কা ছিল না। লোকটা রজত।

একটু কৌতূহল যে দেখিয়েছিল রজত, ও ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ঐ ছে'দো কথা দিয়েই বেশ নিবৃত্ত করে দিয়েছিল প্রশান্ত; বর্ষা নেমে পর্যন্ত রোগের প্রকোপ বেড়েছে আশ-পাশের গাঁয়ে; দু'একটাতে কলেরা দেখা দিয়েছে মহামারীর আকারে, রজতেরও ফুরসত নেই। জবাবদিহি দিয়েছে প্রশান্ত খুব স্বাভাবিকই, কৌতূহল আর নতুন করে উঁকি মারেনি মনে।

তৃতীয় দিন রাত ন'টার সময় যখন ওরই জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেল তখনও কিছু ব'লে গেল না রজত। যখন ফিরে এল তখন সাড়ে এগারোটা। গ্যারাজে গাড়িটা তুলে দিয়ে একটু ইতস্তত করে প্রশান্তকে ঘুম থেকে ওঠাবেই ঠিক করেছে, দ্যাখে সে জেগেই ব'সে আছে বারান্দায়। বলল—"কি ব্যাপার, এত রাত পর্যন্ত জেগে যে!"

"এত আর কি? আজকালকার রাত।" প্রশান্ত উত্তর করল।

কিছু না বলে ভেতর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এল রজত। পাশে বসে বলল—"ভালোই হোল, আমি তোমায় তুলতেই যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ হে, কি ব্যাপার বলো দিকিন?"

"কিসের কি ব্যাপার?" —একটু সতর্ক হয়েই ফিরে চাইল প্রশান্ত।

এসে পর্যন্ত একবারও ও'দের ওখানে যাওনি।"

"দেখতেই তো পাচ্ছ কি রকম ব্যস্ত রয়েছি।"

একটু চুপ করে থেকে রজত বলল—"দ্যাখো, আমি তোমার এই রাতদুপুরে ইজিচেয়ারে পা তুলে দিয়ে চুরুট টানা-টাকেও কি রকম ব্যস্ত থাকার প্রমাণ বলে ধরে নিতে রাজি আছি, কিন্তু এমন মানুষও তো থাকতে পারে—অনেকখানি তোমারই সৃষ্টি—যে তোমার চরকির মতন ঘুরে বেড়ানোটাকেও কাজে ব্যস্ত থাকার প্রমাণ বলে মানবে না।"

"কে সে জানতে পারি?"—নির্লিপ্ত-কণ্ঠেই বলবার চেষ্টা করল প্রশান্ত, নির্লিপ্তভাবে ধোঁয়ার কুণ্ডুলী ছেড়ে।

"কে সে তা টের পেয়েছ, তবু না হয় বলছি।" —রজত বলল—"তার আগে গোড়ার কথাটাও বলে নিই একটু। আজ বিশাখা আমায় ওখান থেকে এসে [illegible]—দাদা, তোমরা তো [illegible]—গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিতে পারো'... লক্ষ্য করেছ তো ওটারও বেশ মুখ ফুটেছে আজকাল...জিজ্ঞেস করলাম—'কার মই কেড়ে নিয়েছি বলছিস?—আমি তো মইয়ে তুলে স্বর্গেই পাঠাচ্ছি একটার পর একটাকে দেখছিস্।' বললে—'ঠাট্টা থাক্। স্বাতিদির কথা বলছি--তোমার বন্ধু'--ভাষাটা লক্ষ্য করে যেও প্রশান্ত 'তোমার বন্ধু সেই যে সেলাইএর কল উপহার দিতে গেলেন—দেওয়াও হোল না, রেখে হঠাৎ খালি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন—তারপর একেবারে আর ওমুখো হননি। কাজ ছিল, দু'দিন, বাইরে ছিলেন, তারপর এই তিনদিন ধরে তো এখানেই রয়েছেন—এতই কাজ একে-বারে যে একটুখানি ফুরসত করে ব'লে আসতে পারলেন না—কি ব্যাপার, কেন

এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—কিন্তু এলেন কেনই বা এ-ভাব..."...

"ভাবের কথাটা স্বাতি বলেছে? না বিশাখাই? —মুখ ফুটেছে সেটা তো আমিও দেখছি।"

"হয়তো বিশাখাই, কিংবা স্বাতির কাছেই শুনে বলেছে। কিন্তু কথাটা যে একেবারে স্বাতির মনের কথা এটা জানতে তো আমার বাকি নেই।"

"ব্যস্ত যে আছি বিশ্বাস করেনি তাহলে?"

"বিশ্বাস করবে বলে তুমি আশা কর? দেখো প্রশান্ত, তোমার যা বৃত্তি, যা কাজ, তাতে হৃদয় জিনিসটার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবার নয় স্বীকার করি। আমার সম্বন্ধ আরও কম, আমি আবার ওটাকে আর পাঁচটা জিনিসের মতন চেরা-ফাঁড়ার জিনিস বলেই জানি। কিন্তু তবু একথাটা সহজভাবেই বুঝতে পারি যে, স্বাতিদেবী তোমার এটাকে কাজের ব্যস্ততা বলে কোন জন্মেই বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

"হেতুটা জানতে পারি?"

"হেতু—স্বাতি তোমায় ভালো-বাসেন।"

"আমিও তো বাসি তাকে।"

"তফাত আছে। তোমার, অর্থাৎ বেটা-ছেলেদের ভালোবাসা হোল শখ, মেয়েদের ভালোবাসা তাদের বৃত্তি। ভালোবাসা যেখানে বৃত্তি, মনের একমাত্র সম্বল, উপজীবিকা, সেখানে তা খাঁটি। আর খাঁটি ভালোবাসা অসপত্ন—তার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে, যেখানে সে, সেখানে আর অন্য কিছু থাকতে পারে, কিংবা থাকলেও তাকে সরিয়ে প্রধান হয়ে থাকতে পারে। ভালোবাসা হচ্ছে—যাকে বলা যায়..."

প্রশান্ত মুখটা ঘুরিয়ে অল্প হাসতে থেমে গেল রজত। বলল—"বলবে কাব্যি করছি? বেশ থামলাম। কিন্তু আমি দেখে এলাম স্বাতিদেবী বিশ্বাস করেননি তোমার কাজে..."

"তুমি গিয়েছিলে?"—একটু বিস্মিত হয়ে চাইল প্রশান্ত।

"সেখান থেকেই আসছি। বিশাখা বলবার পর থেকে মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল। কিছুই তো জানতাম না এসব। রাগ ধরেছিল তোমার ওপর, ঠিক করলাম বলব তোমায়, কিন্তু ভেবে দেখলাম—চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন না ক'রে—পরের মনের ঝাল নিজের মনে নিয়ে বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। তবে এমন-ভাবে যাইনি যাতে মনে হতে পারে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি তোমার হয়ে। ঐ পথেই গেছি—চারিদিকে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে—ও'দের সাবধান করে দেওয়ার জন্যে যেন নেমে পড়লাম। 'যেন' বলতে যাই কেন? —দরকারও তো, এত-দিন যাইনি, সেইটেই তো ত্রুটি হয়ে গেছে।"

"কি দেখলে?"—চেষ্টা সত্ত্বেও প্রশান্তর কণ্ঠে একটু ঔৎসুক্য উঠল ফুটে।

রজত বলল—"একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম আজ। আমরা শরীর নিয়েই চিরকাল ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। মনের দিকে যাওয়ার তেমন অবসর হয়নি, তার ওপর কবি-ঔপন্যাসিক এরা দল বেঁধে রটিয়ে দিয়েছে—মন নাকি নিতান্তই অজ্ঞেয় একটা বস্তু, তাই কথাটাকে মেনে নিয়ে বসে আছি। কিন্তু দেখলাম—এমন কিছু অজ্ঞেয় বা হেঁয়ালি নয়। সেই যে কথায় বলে হাঁ করলেই বুঝতে পারা—সেটাই খাঁটি সত্যি। এ ক্ষেত্রে অবশ্য এক-জন হাঁ করলেন আর একজন মুখ বুজেই রইলেন, কিন্তু বুঝতে দুজনকেই বেশ তো পারা গেল।"

"কি রকম?"—এগিয়ে দিল প্রশান্ত।

"হাঁ-করা অর্থাৎ কথা কইলেন লাহিড়ী-মশাই। দেখলাম বেশ বিশ্বাস করে গিয়েছেন তোমার কথা। আমার বিবরণ শুনে—আমি কাজে সংকট-সমস্যার কথাই বললাম—হঠাৎ বর্ষাটা বেড়ে যেতে—তা আমার কথা শুনে বললেন—এ সব কাজে সমস্যা আছেই পদে পদে, যেন বেশ শান্ত মনে দেখে-শুনে কাজ করে যাও। পাছে ও'দের জন্যে ভেবে ভেবে মাথা খরে তোমার কাজের ক্ষতি হয়, (প্রশান্ত একটু চেয়ে হাসল), তাই বলে দিলেন তোমার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই, বিশাখার মুখে খবর তো পাচ্ছ, উনি অনাথকেও দরকার হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। বললেন,—স্কুলের দিক দিয়েও কোন নূতন কথা নেই। আরও সব অনেক কথা—যা থেকে স্পষ্টই মনে হয় তোমার কাজে ব্যস্ত থাকার কথা তোমার চেয়েও বেশী করে বিশ্বাস করে নিয়ে তোমার চেয়েও বেশী করে চিন্তিত আছেন।"

এই দ্বিতীয় শ্লেষে প্রশান্ত আবার একটু হাসল দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে। রজত বলল—"বাকি থাকে, যে একেবারে মুখ খুলল না তার কথা।"

"কিছু জিজ্ঞেস করলে না স্বাতি?"

ওপর-পড়া হয়ে খবর নিতে গেছি কেমন আছেন—রাত করেই গেছি, কিছু জিজ্ঞেস না করে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকবেন এই রকমই কি মেয়ে? হলে তাঁর কথা নিয়ে রাতদুপুরে আমি কি তোমার শান্তিভঙ্গ করতে আসি? জিজ্ঞেস করেছেন হঠাৎ এত রাত করে গেছি কেন। চায়ের দরকার নেই বলতে জোর করেই সে আপত্তি বাতিল করে স্টোভ জেলে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এসেছেন। সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার দরকার নেই বলতে একটু কড়া করেই শুনিয়ে দিয়েছেন, আমরা ডাক্তাররা পরকে উপদেশ দিতেই ওস্তাদ, নিজে যে রুগী ঘেঁটে এলাম সেদিকে খেয়াল নেই। আর যা বলবার সবই বলে-ছেন—ভালো করে মুখ খুলে, মুখ খোলেননি শুধু তোমার কথা নিয়ে। সব কথা বলেছেন বলেই আরও আশ্চর্য, একবার মুখ ফসকে গিয়েও তোমার কথা বলে ফেলেননি......"

"নিশ্চিন্দি আছে বলেই।" —প্রশান্ত মন্তব্য করল।

একটা যে দৃষ্টি নিয়ে চাইল রজত তাতে তিরস্কার তো আছেই, তার সঙ্গে আছে অপরিসীম বেদনা। বলল—"কথাটা বেশ সহজেই তো বের করতে পারলে মুখ দিয়ে। প্রশান্ত, আমি যখন গেলাম—প্রায় সাড়ে দশটা—লাহিড়ীমশাই ভেতরে কি করছিলেন জানি না,—বারান্দায় উঠে দেখি স্বাতিদেবী দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন,—নিশ্চয় জীপের শব্দ শুনে সব কাজ ফেলে বেরিয়ে এসেছেন—কি আশা নিয়ে তা' তুমি বুঝতেই পারছ। কী যে

নিরাশা, সেইটেই দেখলাম আমি। বুদ্ধিমতী মেয়ে, তখনই অবশ্য সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাই বা পারলেন কই? ও'র প্রথম প্রশ্ন—'খবর ভালো তো ডাক্তারবাবু?' বুকের মাঝ-খানটা চেপে ধরেছিলেন একটু, সেটাও দৃষ্টি এড়ায়নি আমার—বুঝতেই পারছ কেন, কিসের ভয়ে রাতদুপুরে ডাক্তার দেখে বুকটা ধক-ধক করে উঠেছে। বললাম—'হ্যাঁ খবর বেশ ভালোই—মানে, আমাদের সবার খবর—প্রশান্তও অফিসের কাজেই বাড়ি গিয়েছিল, ভালোই আছে। তবে গ্রামগুলো একটু বিগড়েছে। আজ গিয়েছিলাম এদিকে, মনে করলাম আপনাদেরও একটু সাবধান করে দিয়ে যাই।'...... ঐটুকু ভয়, ঐতে যা প্রকাশ পেল—(তোমার কাছে হয়ত এখনও পায়নি)—তারপর আর তোমার কথা একেবারেই তোলেননি। শুনে গেছেন, আমি তো যতটা পেরেছি বাড়িয়েই বলে গেছি—কাজ থেকে চোখ ফেরাবার অবসর নেই তোমার—শুনেছি নাকি পুল আবার ঢেলে সাজাতে হবে—যতটুকু বুদ্ধিতে এল, বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করলাম—শুধু মুখ বুজে শুনে গেলেন—একটা মন্তব্য করলেন না কোনখানে।

তোমার উপহারটাও দেখলাম—সবার কাছে যেটা এত হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; গল্পটা তো ছড়িয়ে পড়েছে মুখে মুখে। দেখলাম ঘরের কোণে একটা মোড়ার ওপর রাখা রয়েছে সেটা। মখমল সেইরকম ঢাকা—সেই রকম একটা মালা ঝোলানো তার ওপর, যেমন শুনেছি, শুধু মালাটা টাটকা নয়। নিশ্চয় সেই মালাটা, হয়তো তুমিই দিয়েছিলে পরিয়ে। সবার হাসির জিনিস একজনের জমাট কান্না হয়ে পড়ে রয়েছে এক ধারে।"

চুপ করল। ডাক্তার মানুষ একটু ভাবাবেগ এসে গেছে, একটু যেন অপ্রতিভই। তারপর প্রশ্ন করল—"কি হোল বলতো?"

"কিছু যে হয়েছেই ধরে নিচ্ছ কেন? স্বাতির মতন তুমিও বিশ্বাস করছ না?" —প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল রজতের, বলল—"ইনফ্লুএঞ্জা হলে বুকে স্টেথো-স্কোপ বসিয়ে ধরে ফেলা যেত লুকুবার চেষ্টা করছ কিনা। সে উপায় তো নেই। যাই হোক, বলবার হোলে বোল'। এত-খানি টেনে তুলেছ পরিবারটাকে তুমিই, আবার গভীর একটা খাদের মধ্যে ফেলে দিও না।" (ক্রমশঃ)

বাচস্পতি বার্নার্ড শ

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এ কথা বলতে আজ বাধা নেই যে, শ'র অধিকাংশ নাটকে তাঁর অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই আমাদের চমৎকৃত করে। তাঁর নাটকের নাট্যরস অপেক্ষা এই চমৎকারী নাটকীয় সংলাপই আমাদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধি-প্রখর সরস চটুল বাকপটুতায় বার্নার্ড শ'কে তাঁর পূর্বসূরী ডক্টর জনসনের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা যায়।

তথাকথিত সাহিত্যের শুদ্ধতায় শ'-র বিশ্বাস ছিল না। দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি—চলতি কালের ইত্যাকার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে যত চিন্তা, সমস্যা এবং যত আন্দোলন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল তার অধিকাংশই প্রতিফলিত হয়েছিল শ-র রচনায়। জীবিতাবস্থায় শ' সাহিত্যের দিকপাল সম্রাটের মতোই রাজত্ব করে গেছেন। গণতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের জয়ধ্বনি এই যুগনায়কের মুখ থেকে লোকে মন্ত্র-মুগ্ধের মতো শুনেছে। কিন্তু বিশেষ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ অপসৃত হবার পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় শ', ওয়েলস্ প্রমুখ সাহিত্যিকদের স্বপ্নে-পাওয়া ইউটোপিয়ার আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যে গণতান্ত্রিক আদর্শকে পশ্চিমের রক্ষা-কবচ মনে হয়েছিল তার অসারতা প্রমাণিত হলো। এই দুই স্বপ্ন-দ্রষ্টা মহারথীর বাণী লোকের কানে পূর্বের মত আর বিশ্বাসযোগ্য শোনাল না। এবং হয়তো তারই জন্যে এবং শ'কে সঠিকভাবে বুঝতে না পারার জন্যেই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ-র খ্যাতি কথঞ্চিৎ ম্লান হয়ে এসেছে। সেজন্যেই কি-না জানি না শ'-র স্মৃতি-বার্ষিকীর উদ্যোগ-আয়োজনে কার্পণ্য এতই প্রকট যে, চোখে লাগে। বহু লেখককে, এমন কি শেকস্‌পীঅরকেও দুই শতকের ওপর প্রকৃত রসবেত্তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল; তেমনি হয়তো শ-কেও ভবিষ্যতের বোদ্ধা উত্তরপুরুষেরাই তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে সক্ষম হবেন।

শ-এর মতে সাহিত্যে নানান্ তত্ত্ব, বিতর্ক, মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্ত সমস্যারই স্থান আছে। তাই শ সাহিত্য-রচনা করতে বসে সাংবাদিকতা করেছেন—এমন অপবাদও তাঁকে রক্ষণশীল সমালোচকের মুখ থেকে শুনতে হয়েছে। শ আসলে 'নাট্যকারের মুখোস-ধারী প্রচারক', এমন উৎকেন্দ্রিক সমালোচনাও তাঁকে করা হয়ে থাকে।

একথা ঠিক যে বার্নার্ড শ যুগ-নায়কের মতো শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তাঁর ভাষায় 'মূঢ় মনুষ্যসমাজকে'। তির্যকশ্লেষে ও বক্রোক্তিতে, কখনো বা উচ্চহাসির চাবুকে শুধরে দিতে চেয়েছেন যখনি কোনো দোষ, ত্রুটি ও দুর্বলতা তাঁর চোখে পড়েছে। শুধু নাটক লিখেই খুশী হননি, দীর্ঘ অবতরণিকা জুড়ে দিয়েছেন প্রায় সবকটি নাটকের গোড়ায়। তবু শ-র নাটক শিল্পরসসমৃদ্ধ নয়—এমন উক্তি বাতুলতার নামান্তর। নাটকের অবতরণিকাটুকুতেই শ'র জ্ঞান বিতরণের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়েছে। বাকি যা সারবস্তু নাটকে সঞ্চারিত হয়েছে তাতে হয়তো ভালোই হয়েছে—তাঁর নাটকাবলীকে অন্তত বিশিষ্ট ও অনন্য করেছে।

শ' কমেডিগুলোর পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছেন 'এ্যান্টি রোমান্টিক'। এই-গুলিরও নাটকীয়ত্ব ছাপিয়ে যা প্রথমে মনকে অভিভূত করে তা হচ্ছে শ-এর সুনিপুণ বাক্‌চাতুর্য।

শ-এর ব্যঙ্গ-কণ্টকিত উচ্চহাসির আড়ালে প্রচন্ড অভিমান ও জ্বালা থাকলেও স্বভাবতই তা' নৈর্ব্যক্তিক। যুক্তিশাণিত প্রাজ্ঞ মনের কাছে তার আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশ সঞ্জাত বিভিন্ন সমস্যা—নাটকের কুশীলব মানুষ শুধু উপলক্ষ্যমাত্র। শ-র পারিবারিক পরিবেশ আলোচনা করে দেখলেই তাঁর 'এ্যান্টি রোমান্টিকতা'র উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। আশৈশব যে দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে, এবং বালক বয়স থেকেই জীবিকা অর্জনের কথা যে পরিমাণ ভাবতে হয়েছে তাতে স্বপ্নবিলাসের অবসর তিনি বিশেষ পাননি। বরঞ্চ মনকে অভাবনীয়ভাবে শক্ত করতে পেরে-ছিলেন বলেই যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণপূর্বক বহিঃস্থিত ও আন্তরিক সমস্যার সমাধান করে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা-লাভ করেছিলেন। কিংবা সমস্যার সম্পূর্ণ নিরাকরণ না করতে পারলেও এর মূল কারণগুলি উপলব্ধি করে সমাজের কৃত্রিম মূল্যবোধকে তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ ও উচ্চহাসিতে উড়িয়ে দিতে পেরে-ছিলেন। তাই শ-র নাটকে যুক্তি-শাসিত ক্লাসিক্যাল মেজাজ প্রায় ড্রাইডেনী যুগের আবহাওয়াকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তাঁর সরস নাটকাবলীর মধ্যে হয়তো 'ক্যান্ডিডা' নাটকই এর ব্যতিক্রম। কিন্তু বলাবাহুল্য তাও রোমান্টিক উচ্ছ্বাসবর্জিত।

চৈতন্যের উপরে দেশ-কালের ও জীবনধারার প্রভাবের কথা মেনে নিলে এর কারণ অনুসন্ধান করা দুরূহ হবে না। শ' জন্মেছিলেন ১৮৫৬ সালে। তার বারো বছর পূর্বেই 'গ্রেট হাঙ্গার' নামে সমধিক পরিচিত প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ আয়ার্ল্যান্ডের জনসংখ্যার অর্ধেক গ্রাস করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশের ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষই প্রথম ও শেষতম নয়।

ফরাসী বিপ্লব ও নাপোলিয়' যুদ্ধের ধাক্কায় ইংলন্ডেও চোদ্দ বছর ধরে অজন্মা চলছিল। ইংলন্ড ও আয়র্ল্যান্ডে এই দুর্ভিক্ষের আক্রমণের প্রতি-তুলনা প্রায় মেলে মধ্যযুগীয় প্লেগ-নামক সংক্রাম রোগে—যা গোটা জাতটাকে নিশ্চিহ্ন করতে বসেছিল। দুর্ভিক্ষের আক্রমণে বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রের মতো আয়র্ল্যান্ডে শ জন্মেছিলেন। যে-দেশের অধিবাসীরা মূলত প্রোটেস্ট্যান্ট, সেই দেশে শ পরিবার ছিলেন গোঁড়া প্রোটেস্টান্ট। মা ছিলেন বনেদী অভিজাত শ্রেণীর মেয়ে আর বাপ উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারসম্ভূত খামখেয়ালী উড়নচন্ডে স্বভাবের লোক--জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। এই অদ্ভুত

পরিবারে স্বভাবতই শ' ছিলেন নিজস্ব-স্বভাব, আত্মীয় পরিজনের দলছাড়া। পারিবারিক আর্থিক সংকটের জন্যে টাকা রোজগারের তাগিদে সুকণ্ঠী সুগায়িকা মা দুই বোনকে নিয়ে ইংলন্ডে রওনা দিলেন। এই নিরানন্দ পারিবারিক পরিবেশে মা-র গানই বাড়ীকে সুরে ভরিয়ে রেখেছিল। এই সংগীতের স্পর্শে শ সমস্ত অভাব ভুলে যেতেন। কিন্তু কী-ই বা করা। বাবার সঙ্গে শ-কে ডাবলিনে থাকতে হলো। এক ল্যান্ড এজেন্টের আপিসে শ একটা কাজ জুটিয়ে নিলেন, যার বার্ষিক বেতন আটচল্লিশ পাউন্ড। ছেলের সাহিত্য, সংগীতানুরক্তির প্রতি বাবা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। শ লন্ডনে মার কাছে গিয়ে থাকবার মনস্থ করলেন। লন্ডনের বাড়ীতে কারো কাছেই অভ্যর্থনা মিললো না। না মা, না বোন, কেউ বিশেষ খুশী হলো না তাঁর আকস্মিক আগমনে। তাই শ'র স্বভাব একটু করে শক্ত হয়ে গেল। ডাবলিনে যে ব্যক্তি ছিল বন্ধু-মহলে জনপ্রিয়, ক্ষুরধার কথাবার্তায় সতেজ স্ফূর্তির ফোয়ারা, সে হয়ে উঠলো গম্ভীর, চাপা-দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন ভিন্নতর এক ব্যক্তি।

ঔপন্যাসিক হওয়ার ইচ্ছা শ-র মনে গোপন বাসা বেঁধেছিল। কঠোর পরিশ্রমে পাঁচ-পাঁচখানা উপন্যাস শেষ করে বসেই রইলেন—বিভিন্ন প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়েও ছাপানো গেল না। তাই ষষ্ঠ উপন্যাসের দুটি পরিচ্ছেদ লিখে রাগে-দুঃখে আর শেষই করলেন না। বাইরের জগতের নির্মম অবহেলায় নিজের শক্ত খোলসের মধ্যে আত্মলীন হয়ে থাকলেন। জন-সমাজের মূঢ়তায় মনে ক্ষোভ ও অবজ্ঞার পাহাড় গড়ে উঠলো।

ডাবলিনে চাকরি করার সময় শ' যদিও হাতে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে-ছিলেন তবু ইংলন্ডে এসে মার রোজগারে জীবনধারণ করতে হচ্ছে বলে যথেষ্ট গ্লানি তাঁর মনে জমে উঠেছিল। যে-ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসে দুপুর বেলায় লেখা-পড়া করতেন সেখানেই একদিন উইলিয়ম আর্চর বলে এক সহৃদয় স্কচ্‌ম্যানের সঙ্গে দেখা হতেই শ-র ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। আর্চর ও শ-র মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। এই আর্চর শ-র কাছে একদিন একটি ভালো চাকরির প্রস্তাব আনতে শ' তাঁকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বল্লেন, "নিজের লেখা-পড়া নিয়ে আমি যথেষ্ট কর্মব্যস্ত: কিন্তু বার্নার্ড শ বলে একজন অসাধারণ প্রতিভাধর আইরিশ-ম্যান আছেন, একমাত্র যিনি এই দায়িত্ব-পূর্ণ পদের উপযোগী।" এই বাক-নৈপুণ্য শ-র মুখেই মানায়।

ঔপন্যাসিক হিসেবে ব্যর্থ হলেও শ-র জীবনে অবশেষে সার্থকতার অভাবনীয় আগমন ঘটলো। সংগীত-শিল্প ও নাট্যকলার অসামান্য প্রতিভা-দীপ্ত সমালোচনায় তিনি অদ্বিতীয় হয়ে উঠলেন। তারপর অনেক পরে ধীরে ধীরে, চল্লিশ বছর বয়েসে হাত দিলেন নাটক রচনায়।

ইতিহাসের তখন মোড় ঘুরেছে: 'ফেবিয়ান সোসাইটির' ধ্যান-ধারণা লোকের মনে কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেছে। শ-র নাটকের জনপ্রিয়তাও একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে।

উনিশ শতকের শেষপাদেও এমন ধারণা অটুট ছিলো যে, সাহিত্য মূলতঃ চিত্ত-বিনোদনের বস্তু। সাহিত্যিককে সমাজতাত্ত্বিক বা সমাজসংস্কারকের পদে পাঠকেরা ছিলো দেখতে নারাজ।

চার্লস ডিকেন্সের মতো ঔপন্যাসিককে গল্প-বলার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্যে পাঠকসমাজ সহ্য করে নিয়েছিল—তা গল্পচ্ছলে তিনি যতই উপদেশ দিন না কেন। ডিকেন্সের 'নিকোলাস নিকলেবি', 'অলিভার টুইস্ট', 'ডেভিড কপারফিল্ড' শ এবং গলস্‌ওয়ার্দির নাটকের মতো উদ্দেশ্য-মূলকও বটে। চিত্তবিনোদন অপেক্ষা জীবনকে বোঝা, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করা সেই নাটকা-বলীর লক্ষ্য। ইংলন্ডের আবহাওয়ায় তখন

সমাজসংস্কারের আবহাওয়া এসেছিল। ডারুইনবাদ, মার্কস্‌বাদ প্রভৃতি বিজ্ঞানের ক্রমব্যাপ্তিতে স্বদেশের তথা বিশ্ব-মানবের সমস্যাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যে-যে প্রতিভাধর সাহিত্যিক অনুভব করেছিলেন—গলস্‌ ওয়ার্দি, বার্নার্ড শ ও এইচ, জি, ওয়েলস্‌ সকলেই সেই সাহিত্যিকগোষ্ঠীভুক্ত। নাটক ছাড়াও অনেক বই শ লিখেছেন। প্রবন্ধ হিসেবে সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং সমাজচিন্তাবিদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার জন্যে সিডনি ওয়েবের মতো ব্যক্তির প্রভাব তাঁর জীবনে কার্যকরী হয়েছিল। সিডনি ওয়েবের মস্তিষ্ক ছিল বিশ্বসমস্যা সমাধানের একটি কারখানা বিশেষ। রাশি রাশি সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন হতো সেখানে।

যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী বার্নার্ড শ ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। শ' বলেছেন, "মানুষের মনের স্তরেই বাঁচবার ও তার ক্রমবিকাশের ইচ্ছাশক্তির উৎস নিহিত। এই শক্তির উৎসকে 'প্রাণশক্তি' আখ্যা দেওয়া যায়। এই 'প্রাণশক্তি'ই বিশ্বলীলার নিয়ন্তা। মানুষ এই 'প্রাণশক্তি'র বিরুদ্ধাচরণ করে পাপের পথে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষের উচিত স্বীয় প্রতিভা ও শক্তি বিকাশের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া। এর অন্যথা হলে, 'প্রাণশক্তি'র অমর্যাদা করলে সে প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথের মত বিশ্বলোক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, সেই অতিকায় ম্যামথেরা পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এগোতে পারেনি। দারিদ্র্য, ব্যাধি, অজ্ঞানতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শ্রেণীভেদ মানুষের সহজ সুন্দর জীবন-যাত্রার বিপক্ষে এবং তার জের-টেনে-চলা সমাজব্যবস্থা এই 'প্রাণশক্তি'র বিরুদ্ধাচরণ করে।" তিনি যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যেও এই বক্তব্য নিহিত। এ কথা অনেকে হয়তো ভুলে গেছে যে, শ এবং কের হার্ডি—এই দুইজন লেবর পার্টির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কেননা, সোস্যালিষ্ট শ-র মনে এ-বিশ্বাস দৃঢ় ছিলো যে, সঙ্ঘবদ্ধ সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার মধ্যেই মানুষ প্রকৃত বাঁচতে পারে। যে সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থের তাগিদেই অহর্নিশ মশগুল সেখানে তারা আত্যন্তিক আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে অতিকায় হস্তিসদৃশ পৌরাণিক যুগের 'মাস্টোডেন' নামক প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতই চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

ইংরেজিতে যাকে 'উইট' বলে তার হীরক-দীপ্তিতে এবং 'প্যারাডক্সে'র চমকে শ-র প্রায় প্রতিটি নাটকের সংলাপ উজ্জ্বল এবং তার অনুবাদ করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'আর্মস এ্যান্ড দি ম্যানে'-র মত সরস নাটকের এক সংলাপে শ মন্তব্য করেছিলেন যে, যুদ্ধ কাপুরুষদের ক্ষেত্র এবং প্রতিটি সৈনিকই এক একটি কাপুরুষ।

এই দুর্নিবার 'প্যারাডক্সে'র খোঁচা আপাত-বিরোধী মনে হলেও এবং তদানীন্তন দেশপ্রাণ ইংলন্ডবাসীর মধ্যে মৌচাকে নিক্ষিপ্ত এই ঢিলটি ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও এই 'ফিয়ার-কমপ্লেক্স'-এর যুগে তার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু বুঝতে পারা মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

'ক্যানডিডা', 'হার্টব্রেক হাউস', 'সেন্ট জোন', 'লেডি ওয়ারেনস্‌ প্রফেসন'-এর মতো হার্দ্য নাটকের সংলাপ তো অবিস্মরণীয়।

'হার্টব্রেক হাউস'-এর নাটকীয় চরিত্রের জবানীতে, শৈশবের প্রকৃত আত্মীয়তার বন্ধনচ্ছিন্ন দুঃখময় পারিবারিক স্মৃতিতে নির্যাতিত হয়েই কি শ মন্তব্য করেছিলেন?—

"............this house without foundation, I call it a heart break house."

শ-র নাটকের দীপ্তি আজও অম্লান, তার প্রভাব আজও অটুট। পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশের প্রেক্ষাগৃহে তাঁর নাটকের অনুষ্ঠান আজো সগৌরবে অনুষ্ঠিত হয় অভিনয় রজনীতে।

নিউইয়র্কে শ-র 'পিগম্যালিয়ন' নাটক অবলম্বনে রচিত 'ফেয়ার লেডি' বহুদিন অভিনীত হয়ে পূর্বেকার সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। অবশ্য শ বেঁচে থাকলে এই নাট্যরূপ অনুমোদন করতেন কিনা সন্দেহ! কেননা, তাঁর জীবদ্দশায় 'আর্মস এ্যান্ড দি ম্যান' অবলম্বনে রচিত জনপ্রিয় অপেরা 'চকোলেট সোলজার'-এর অভিনয় করিয়ে এক থিয়েটার কোম্পানী প্রচুর অর্থলাভ করেছিল। শ সেই লভ্যাংশের এক কপর্দকও গ্রহণ করতে রাজী হননি, নিজস্ব নাটকের বিকৃতি দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। শ রুষ্ট হলেও এই অপেরা-রূপের সাফল্যের আর একটি কারণ হয়তো এই যে, শ-র নাটকে অপেরার প্রভাব বর্তমান। শৈশবের সংগীত পরিবেশ ও মাতৃ-প্রভাবই হয়তো এর জন্যে দায়ী।

বুদ্ধিদীপ্ত রঙ্গ-রসিকতা ও প্রাণ-শক্তিতে পূর্ণ ছিলেন বার্নার্ড শ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। দুর্মুখে বলে সোজা কথায় কোনো সোজা জবাব তিনি দিতে জানতেন না, সব কিছু বাঁকা করে দেখাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচনা পাঠ করলে সংবেদনশীল পাঠকের বুঝতে ভুল হবে না যে, 'উইট' ও 'প্যারাডক্স' প্রভৃতি বাক্যালংকার ব্যতীত সরস ও বিদগ্ধ মনীষীর বাক্‌প্রতিভা ক্রিয়া করতো না। এই প্রাণপ্রাচুর্য হয়তো তাঁকে শতজীবী করতো কিন্তু দুঃখের বিষয় বাগানে একদিন কাজ করতে করতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তিনি পায়ের হাড় ভাঙলেন। সেই আঘাত থেকে সামলে উঠতে আর পারলেন না। চুরানব্বই বছর বয়েসে তাঁর দেহাবসান ঘটলো। অনেক দেরীতে নিজেকে আবিষ্কার করলেও শ ছিলেন জাত-নাট্যকার। তাঁর নাটকের সংলাপের সরসতা তাঁর পূর্বসূরী শেক্সপীঅরের কমেডির সংলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বার্নার্ড শ-র জনপ্রিয়তাই তাঁকে 'আইরিশ শেক্সপীঅর' আখ্যায় ভূষিত করেছিল।

অনেক সময় মনে হয় মানুষ বুঝি প্রকৃতির একটি বেওয়ারিশ সৃষ্টি। সৌর-জগতের বিধিবন্ধ কোন-কিছু নিয়ম-কানুন-ই এ মানতে রাজি নয়। জোর করে মানাতে গেলেও তার বিপদ অনেক। আকাশের বুকে হাজার-হাজার, লাখ-লাখ, কোটি-কোটি নক্ষত্রের মত মানুষের এ-মনও অযুত বিস্ময়ে ভরা। বিস্ময়, চমক। আর তার সঙ্গে অতৃপ্ত বাসনা-কামনার একটা জ্বালা-ও বটে। এই জ্বালা তার অবচেতন মনের প্রাণময় অংশটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে বিন্দুমাত্র-ও কার্পণ্য করে না। এই বোধ হয় মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় ট্র্যাজিডি। যাকে ধ'রে বাঁচতে চাই, সে-ই আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

অথবা এ-পান্থশালায় সমস্তটাই বুঝি প'ড়ে-পাওয়া চোদ্দআনা। যা পেলাম সেটুকু না পেলেও কারো কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। যা পাইনি তা পেলেও হয়ত জীবনে চাওয়ার চাহিদা মিটতো না। যা পেলাম, ততটুকু পেলাম—তার বেশী আর কিছু চাইব না—এইটাই জীবনের সহজতম সুর। অথচ আপোষহীন কী একটা দারুণ উত্তেজনা আশাভঙ্গের চোরাবালিতে আমাদের দিন-দিন, প্রতিদিন ঠেলে দিচ্ছে। আমরা ডুবছি। জানি, মুহূর্তমাত্র পরেই আমাদের অস্তিত্বের শেষবিন্দুটি পর্যন্ত বিস্মৃতির চোরাবালির গোপন স্তরে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে। আমাদের মাথার ওপর উৎক্ষিপ্ত বালির স্তর নির্বিবাদে আপনার গুহামুখ বন্ধ ক'রে ভোজনক্লান্ত অজগরের মত ঘুমিয়ে পড়বে। তবু আমাদের চেতনা নেই। যযাতির মূর্খতায় আমাদের কামনার চিতা চির-বহ্নিমান।

তাই যদি না হবে তাহলে তোমাকে আজ এই চিঠি লিখতে বসব কেন? মান-অভিমান-অভিযোগ মানুষের স্বাতন্ত্র্য-বোধের নাকি সজাগ প্রহরী। ভুলে যেয়ো না, প্রেম-ভালবাসা-শ্রদ্ধা-ভক্তি আর কৃতজ্ঞতা একদিনে হঠাৎ গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার বছর ধ'রে মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাস। বিবর্তনবাদের ধারাবাহিকতার প্রায়-শেষ সীমান্তে মানুষের শিল্যোট দেখতে পাও সেটা আর কিছু নয়, সমাজনিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের একটি চরম অবমাননা। যাযাবর থেকে ট্রাইব, ট্রাইব থেকে ক্ল্যান, ক্ল্যান থেকে সমাজ। বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস আজ বুঝি ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। তারই তটভূমির ওপর যুগ-যুগান্তের অট্টহাসি কালের কুটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান। এ তরঙ্গের বেগ রোধ করবে কে? কেউ না। না তুমি। না আমি।

তাই অতীত আর পঙ্গু শরীর দুটোই আমার কাছে সমান। দুটোকেই আমি খরচের খাতে ফেলে দিয়েছি। না দিলে জীবনের কাছে হার স্বীকার করতে হ'ত আমাকে। কিন্তু কোন-কিছুর কাছেই হার স্বীকার করাটা আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে। তাই যেদিন তোমার কাছে আমি চরম আঘাত খেলাম সেদিন, আজ অস্বীকার করে লাভ নেই, হঠাৎ কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। একটা অবিশ্বাস্য আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যে পড়লে মানুষ যেমন হঠাৎ জড় হয়ে যায়। কিন্তু এ-কথাটাও তুমি অবিশ্বাস করো না যে আমার সেই মানসিক, আর তারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে শারীরিক জড়ত্ব, খুব বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। আমার আত্মসম্মানই সেদিন আমাকে সেই গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তিলে-তিলে যা গড়েছিলাম, মুহূর্তে তাকেই ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়েছিলাম। আমার সমস্ত মুখর অতীতকে মূক করে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম সেদিন। সে কাঁপুনি বাতের লতার মত নয়। কালবৈশাখীর

ঝড়ে ঊর্ধ্বশির অশ্বত্থের মত। সেদিন তোমার ওপর ঘৃণা আর বিদ্বেষই ছিল আমার ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র পাথেয়।

কিন্তু আজ......

আজ হঠাৎ নববর্ষায় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। নিজেকে ভুলে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল। অন্ধকারের রাজ্য ছেড়ে হঠাৎ রাশি-রাশি আলোর রাজ্যে ঢুকে পড়লাম যেন। কালো-কালো জলভরা মেঘ। সমুদ্রের ছায়া এদের বুকে। একটু পরেই হয়ত বর্ষণ শুরু হবে। হোক। আমার চোখে আজ জল নেই। ঈষানের মেঘের মতই আমার এ-মন ক্ষয়িষ্ণু গণ্ডী অতিক্রম করে মেঘরাজ্যে পাড়ি জমিয়েছে।

বিশ্বাস কর, আমার চোখে আজ আর জল নেই। মনে নেই বিদ্বেষের কোন কালো মেঘ। উত্তর-বৃষ্টির ধোয়া-মোছা রঙিন দিগন্তের নেই কোন সমারোহ। কোন রিক্ততা, কোন বৈরাগ্যের নির্লিপ্ততা আমার মনকে আজ ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারেনি।

জানি নে, এটা আমার স্নায়ুর অবসাদ কিনা। কতক্ষণ যে আকাশে-বাতাসে মেঘলোকের এই পরমাশ্চর্য অনুভূতিটিকে আমার আত্মীয় করে রাখতে পারব, তা-ও আমার কাছে সমান অজানা। হয়তো এর সবটাই ক্ষণিক। তা হোক। তবু এই মুক্তির আনন্দকে কিছুতেই অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছি নে।

একদিন আমার চোখে ছিল রঙিন নেশা। রক্তে ছিল উগ্র মাদকতা। উদগ্র সুরার মত জ্বালাময়। তুমি ছিলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের সেরা দাম্ভিক ছাত্র। প্রফেসরদের খুশী করতে তুমি। মন দোলাতাম আমি। তুমি ছিলে পড়াশুনায় কৃতী। মোটর-চালনায় আমার কৃতিত্ব ছিল অনস্বীকার্য। তুমি আসতে কাপড়ের ওপর একটা পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে। আমি আসতাম নিত্য ফ্যাশনের ঢেউ তুলে, বিশ্ববিদ্যালয় সরগরম করে। তুমি থাকতে মির্জাপুরের একটা মেসে। আমার বাবার ছিল বিরাট প্রাসাদ। মোজাইক-করা চারতলা বাড়ীর মেঝে ছিল স্প্রাক্সো দিয়ে পালিশ করা। দম্ভ থাকার কথাছিল আমারই।

অথচ তোমার কাছে আমার সব কিছু হারিয়ে ফেললাম কেন বল তো! বন্ধুরা হাসত। কেউ-কেউ কটাক্ষ করত। কেউ বা পিছনে রটাত কুৎসা। বাবা-মা রাগ করতেন। আত্মীয়-স্বজনে টিটকারি দিতেন। আমি বিস্ময়ে অবাক হতাম। পুরুষ-বন্ধুর অভাব ছিল না আমার। লাঞ্চ, ডিনার, নাচ—কোন কিছুতেই অরুচি ধরাতে পারত না কেউ। আমি নিজেও বুঝতে পারতাম না কেমন করে, আর কিসের জন্যে, তোমার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম।

কী ছিল তোমার মধ্যে?

রূপ? থাকে থাক। তা নিয়ে মুগ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই আমার। কারণ রূপের জৌলুষ থাকার কথা আমাদের। আমার বাবা ছিলেন কলকাতার বনেদী বড়লোক। আমার দাদামশায় ছিলেন আরও বেশী বনেদী। তাঁর এক পূর্ব-পুরুষ ছিলেন লর্ড হেস্টিংস-এর ব্যানিয়ান। ইংরেজ-প্রভুদের চাহিদা মিটিয়ে নিজে যা রোজগার করে গিয়েছেন তার পরিমাণ অনেক। তাঁর অধঃস্তনেরা সেই অর্থ বাক্সবন্দী করে রাখেননি। কেউ বাড়িয়েছেন; কেউ বা কমিয়েছেন। বনেদীয়ানার কৌলিন্যই নাকি এইখানে। কামনার অতৃপ্তি তাঁদের রুচিকে গর্হিত করেনি। সুন্দরী নারীর সওদা করতে তাঁদের মত নির্মম আর দক্ষ সওদাগর পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও কেউ রয়েছেন কিনা জানিনে।

আমার সত্তর বছরের দাদামশায়ের কাহিনী জান? তিনি যাচ্ছিলেন নৌকোয় চেপে জমিদারি দেখতে। নদীর ঘাটে লক্ষ্য পড়ল একটি নাবালিকার ওপর। অপরূপ সুন্দরী। চৌদ্দ বছর বয়স তার। খবর পেলেন মেয়েটি পাশের গাঁয়ের একটি দরিদ্র পূজারীর। পাইক ছুটল ব্রাহ্মণের খোঁজে। নিয়ে এল বেঁধে। জ্ঞানী, দুঃস্থ, সৎ ব্রাহ্মণ। এ-অপমানে সেদিন তাঁর চোখ ঝলসিয়ে আগুন বেরোয়নি। ছাপিয়ে ঝরেছিল জল।

টাকার চাপে সেদিন দাদামশায়ের মনুষ্যত্ব হয়ত সত্যিই উবে গিয়েছিল। না হলে এক মুঠো টাকার দামে মেয়েটিকে সওদা করতে চেয়েছিলেন কেন? দুঃস্থ ব্রাহ্মণ সেদিন কিন্তু টাকার লোভে নিজেকে হারালেন না। যা হারালেন তার দাম অনেক অনেক বেশী। মেয়ে।

ঠিক দুটি বছর পরে দাদু মারা গেলেন। একটি মাত্র মেয়ে, ষোল বছরের ভরা যৌবন আর সৌন্দর্য, আর তাদের চেয়েও অকরুণ হিমালয়ের মত নিরেট দীর্ঘ ভবিষ্যৎ নিয়ে দিদিমা বিধবা হলেন।

আমার রূপের কাছে তুমি দাঁড়াবে কেমন করে?

রূপ, পয়সা, আভিজাত্য—কোনটাই তোমার ছিল না। অন্তত, আমার মত। ছিল তোমার দম্ভ। আর সে-দম্ভ তোমার অভ্রভেদী। দম্ভের রেডিয়ম তোমার সর্বাঙ্গ থেকে ছিটকে বেরিয়ে সামনে যাকে পেত তাকেই দগ্ধ করে মারত। হাঙরের দাঁতের মত চিক্কণ ধারালো তার দাঁত।

তুমি কি আমাকে অজগরের তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে আকর্ষণ করেছিলে?

তুমিও কি অজগর?

সংসারের সকলের কাছ থেকেই যখন ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের কিল হজম করছি, তখন আমার একমাত্র বন্ধু ছিল অনিতা। সেই নম্র, ভীরু মেয়েটি। বড়-বড় ডাগর দুটি চোখ। ঠোঁটের ওপর মিলিয়ে-যাওয়া হাসি। উত্তেজনা নেই। আকর্ষণ নেই। জৌলুষ নেই। রূপ? তাই বা কোথায়? অত্যন্ত সাদা-মাটা। কখনও কড়া কথা বলতে পারত না কাউকে। অত্যন্ত সাধারণ।

হয়ত সেই জন্যেই তার সঙ্গে আমার অতটা মিলতো।

হঠাৎ একদিন কী জানি কেমন করে আমার মনের কপাট একটু আলগা হয়ে গেল অনিতার কাছে। বেশ বুঝতে পারলাম ও একটু আঁতকে উঠল। তোমার ওপর আমার যে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব ছিল সেটা ওর না-জানার কথা নয়। কিন্তু কোনদিন ও আমায় এতটুকু সাবধান করেনি। লক্ষ্য করলাম ঝড়ো-রাতের বিদ্যুতের মতই ওর মুখের বিকৃতি চকিত, ক্ষণস্থায়ী। আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে একটু চেয়ে রইল ও। সেদিন বুঝতে পারিনি। আজ এতদিন পরে ওর সেই বড়-বড় চোখ দুটির করুণ আবেদন অতলস্ত সমুদ্রের ভাষা নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে।

মাত্র একটু হাসল অনিতা। বললে, সে কী রে?

বললাম ঃ কেন? দোষটা করেছি কোথায়?

সে বললে ঃ দোষ নয়। ভুল।

আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দৃঢ়-কণ্ঠে সে আবার বললে ঃ ভুলই করেছিস তুই।

আবার একটু হাসলে অনিতা। মুক্তোর মত চকচকে ধারাল দাঁতের পংক্তির ওপর সে-হাসি ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল।

শারীরিক আর মানসিক গতিতে আমি চিরকালই একটু উদ্দাম। একটু বেশী উদ্দাম।

বিরক্ত হয়ে বললাম : হাসছিস কেন বল!

এবার সে আর হাসল না। একটু গম্ভীর হয়ে বলল : কেন মরতে গেলি?

বাবা শেষ কথা জানিয়ে দিলেন : আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে তোমার বিয়ে।

তা জানতাম। পাত্রও বাবা ঠিক করেই রেখেছেন। কলকাতার নবীন ব্যারিস্টার। উদীয়মান-ও। শেখর ভট্টাচার্য। বিরাট বাড়ী। গাড়ী-ও ক-খানা। কলকাতার উচ্চ সমাজের শোকেসে বৈদূর্যমণি।

মা ছলছল চোখে বললেন : তোর এত বড় বন্দরটাকে তুফানে ভাসিয়ে দিলি রে? মেয়েছেলের জীবনে এই বিয়েটাই হল বিপজ্জনক। এর ঝক্কি তুই নিজের মাথায় কিছুতেই নিস নে মা।

সেইদিনই প্রথম ভয় পেলাম। দ্বিধা এল, দ্বন্দ্ব এল। আর এল আশঙ্কা। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। এতদিন একটি প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাসে দুর্নিবার বেগে দুকূলহারা হয়ে ছুটে চলেছিলাম। মায়ের আশংকাই প্রথম জোগালো বাধার সৃষ্টি করল তাতে।

কিন্তু তবুও পিছিয়ে পড়লাম না। ঠিক সেইদিন রাত্রে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তুমিও এলে। অথবা আমার প্রবল উচ্ছ্বাসে তুমিও হারিয়ে ফেললে নিজেকে।

বর্মা। নতুন পৃথিবী। নতুন মানুষ। নতুন আকাশ। নতুন বাতাস। আমি নতুন। আর তুমি? আজ কেমন সন্দেহ হচ্ছে। তুমি হয়ত পুরানোই রয়ে গেছলে।

নতুন পরিবেশে আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

সেই তিনটি বছর! বাঁধন-ছেঁড়া দিন-রাত্রির জোয়ার। অনাবিল আনন্দের দিন।

তুমি কথা বলতে কম। চিন্তা করতে বেশী। তাই তোমাকে বুঝতে পারিনি।

তাছাড়া ছিল সেই ঝরনার জল। ঝরনার ধারে অশোক-পলাশে ঘেরা ছোট্ট প্যাগোডা। তার ভেতর বুদ্ধমূর্তি। লোকালয় থেকে দূরে, গভীর জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়, ইতিহাসের এই গোপন কক্ষ। তারই ভেতর তথাগত। বড় সুন্দর, বড় শান্ত। সেই পাইন-বনঝাউ-দেওদার বনছায়া।

বন-ভোজনের দিনগুলি? ফরেস্ট অফিসার মিঃ ব্রাউন, তাঁর স্ত্রী, আর তাঁদের ছোট্ট মেয়ে ডলি। সারকিট অফিসের বড়সাহেব, তাঁর মজলিসী স্ত্রী। প্রবাসী বাঙালী ক্যাপ্টেন প্রবীর চৌধুরী, সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

আর সেই যে মেয়েটি আমাদের দুধ বিক্রী করত? উত্তর বর্মার ছোটখাট বেঁটে মেয়েটি। সমাজের নিচু স্তরের মানুষ। পরিশ্রম না করলে বাঁচতে পারত না তারা। মেয়েটিও কি ভীষণ খাটিয়ে! জানালার পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতাম। কোলের বাচ্চাটাকে পিঠে ঝুলিয়ে মাঠে-মাঠে গরু চরিয়ে, ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। রোদ-জল-ঝড় মাথায় করে কখনও বা পাহাড়ের নিচে বসে-বসে ঘাস কাটছে। তার যে কত অভাব তা তাকে দেখলেই বোঝা যেত। অথচ একটা দিনও তার মুখ থেকে নিজের দুঃখের একটা কথাও শুনতে পাইনি।

যে মেয়েটি আমাদের কাছে মাংস বিক্রী করত তাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। স্বামী বৃদ্ধ। হাঁপানীতে ভুগছে কতকাল। কাজ করার ক্ষমতা নেই। বড় ছেলেটা যুদ্ধের বাজারে নিখোঁজ। আর দুটো জোয়ান ছেলেকে গত যুদ্ধের সময় জাপানীরা বেগার ধরে নিয়ে গেছল। বেদম খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত বুকে পাথর চাপা দিয়ে মেরেছে। বুড়ী তিনদিন তিনরাত একটা জঙ্গলে লুকিয়েছিল। ইংরেজরা বর্মায় ফিরে এসে ওদের ঘর-বাড়ী সব আবার নতুন করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবু দমেনি বুড়ী। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে ষাট বছরের বুড়ী নতুন করে সংসার পেতেছে। অতীতকে সহজভাবে মেনে নিয়েছে। জীবনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে শেখেনি। এই বৃদ্ধাকে মনে-মনে অনেক দিন প্রণাম করেছি আমি।

অনেক স্মৃতি-বিস্মৃতির চিত্রশালায় ঘেরা সেই তিনটি বছর। আমার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে অমূল্য সঞ্চয়। সেদিন আরও একটু সজাগ হলে দেখতে পেতাম এই পৃথিবীকে। বুঝতে পারতাম মানুষের সভ্যতাকে।

বুঝিনি। কারণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম আমি। অনেক হাসি-কান্না মান-অভিমান আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আগাছার মত ছেয়ে থাকত।

নদীর স্রোত আর জীবনের স্রোত। এ-দুই এর ভেতর মিল নেই। নদীর স্রোত যায় আবার ফিরে আসে। জীবনের স্রোত যাকে একবার ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে আর ফিরে না। ফিরলেও ঠিক তেমনটি আর ফেরে না।

সেই জীবনের প্রবল স্রোতের ঘূর্ণিতেই তলিয়ে গেলাম আমরা।

অনেক দিনের মত সেবারেও তুমি ব্যবসার খাতিরে জঙ্গলে গিয়েছিলে। আমাদের বাংলো থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে বর্মী পাহাড়ের শাল-পিয়াল-সেগুনের জঙ্গল। কাটাই শুরু হয়েছিল। সেই লগ বোঝাই হবে ওয়াগনে। যাবে পোর্টে। পোর্ট থেকে চালান যাবে বিদেশে। শীত থেকেই এই কাঠ-চেরাই শুরু হয়। ছোট-বড়-মাঝারি নানান রকমের গাছ। কোনটাকে কাটতে হবে, কোনটাকে ছাঁটতে হবে। কারও খুঁড়তে হবে গোড়া, কোথাও জ্বালাতে হবে আগুন। অনেক লোক খাটে এই সময়। অনেক লোক যাতায়াত করে। কুলি থেকে কনট্রাক্টার।

এবারের মেয়াদ একটু বেশী। সাত দিনের জায়গায় একুশ দিন। তোমার পার্টনার বিশেষ কাজে কলকাতায় আসাতেই নাকি তোমার খাটুনি বেড়েছিল। আমাকে দেখাশোনা করার ভার দিয়ে গেছলে ক্যাপ্টেন প্রবীর চৌধুরীর ওপর। মিঠে-স্বভাব, স্বল্পভাষী প্রবীর চৌধুরী। তোমার বিশেষ বন্ধু।

একুশ দিনের মেয়াদ গড়িয়ে এক মাস। তারপর আরও পনের দিন। পনের দিনই তো? ক্যালেন্ডারের সেই ২৩শে মাঘ আমাদের বিয়ের তারিখ। আশা করেছিলাম, যেখানেই থাক ঐ দিনটি তুমি ভুলবে না। কিন্তু তুমি ভুললে। অন্তত তুমি এলে না। আমার চোখের ওপর দিয়ে ২৩শে মাঘ অনাদরে ফিরে গেল।

লাল কাঁকরের রাস্তার দিকে চেয়ে-চেয়ে ঝড়ো বাতাসের মতই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম আমি। হঠাৎ মনে হল আমি একা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবহীন।

বাবা-মার ওপর হঠাৎ প্রচণ্ড একটা অভিমানে ফেটে পড়েছিলাম। আমার ওপর সুবিচার করেননি তাঁরা। আমাদের সংসারে কোন দিনই মেয়েদের স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। ছিল স্বাচ্ছন্দ্য। অর্থের কাছে, অলংকারের কাছে, সচ্ছলতার কাছে, আর এদেরই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আলস্যের কাছে নিজেদের আহুতি দিয়েছিলেন তাঁরা। স্বাধীন মানুষের জীবনে এতটা অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য থাকার কথা নয়।

এই সাধারণ গণ্ডী থেকে আমিই কেবল সরে এসেছিলাম। বাবা-মা আমাকে অতটা স্বাধীনতা কেন দিয়েছিলেন জানিনে। কিন্তু একবার স্বাধীনতার স্বাদ বোঝার পর আর দাসত্বকে স্বীকার করে নিতে পারিনি। পারব না কোনদিন—এই ছিল আমার দম্ভ। বিধাতাপুরুষ বোধ হয় মুখ টিপে হেসেছিলেন। তা না হলে, এক জায়গার শিকল কেটে আর এক জায়গায় ধরা দিলাম কেন? ব্যক্তিত্বই যদি না হারাব তাহলে তোমার অভাবে নিজেকে অতটা অসহায় মনে করেছিলাম কেন?

সেদিন হঠাৎ এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু করল। বন্ধ ঘরের বাতাসকেও বিদ্রোহী করে তুললো। আমাকেও কি তুলেছিল? হয়ত বা। ঝড় বড় সংক্রামক।

নিদারুণ নিঃসংগতা! মাঝে-মাঝে উট্‌কো হাওয়ার মত চিলের ডাক সেই দৈত্যদীঘল নিঃসংগতাকে ব্যঙ্গ করে যেত। ধুলো-বালি-ঝড়, মেঠো পথ, আর দূর চক্রবালে মিলিয়ে যাওয়া সূর্যাস্তের সমারোহ। এরাই ছিল আমার সংগী।

হ্যাঁ, আর আসতেন তোমাদের প্রবীর চৌধুরী। নিয়মিত। ভদ্রলোকের দায়িত্বজ্ঞান অসীম। ধৈর্যের দৈর্ঘ্য বুঝি তার চেয়েও বড়। কথা বলতেন কম। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি অন্তর্ভেদী। বড় জোরালো। রাজ্যের পত্রপত্রিকা সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। বসে-বসে গল্প করতেন। সঙ্গে করে বাঁচে নিয়ে যাবার চেষ্টাও করতেন। কখনও বা ব্যালেতে।

আমার ওপর তাঁর সহানুভূতিটাই বুঝি প্রবল ছিল। আমার যেন মনে হয়েছিল তাই। আর এই মনে-হওয়াটাই তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। কেউ আমাকে অনুকম্পা করছে জানতে পারলে তাকে সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত। প্রবীরবাবুর ভদ্রলোকী মনোভাব তাই আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে আকাশে নেমে এল মেঘ। কাল-কাল মেঘ। বঙ্গোপসাগরের বাত্যাবিক্ষুব্ধ জলকণাগুলি বর্ষার আকাশ ছেয়ে দিলে। বিপুল মেঘগর্জনের মধ্যে অগ্নিবর্ষী বিদ্যুতেরা সাপের মত কিলবিল করে উঠল।

পিয়ানোর কাছে চুপটি করে বসেছিলাম আকাশের দিকে চেয়ে। কখন যে পিয়ানোতে মাথা ঠেকিয়ে ফোঁপাতে শুরু করেছি বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ পিঠের ওপর কার আলতো হাত পড়তেই চমকে উঠলাম। দেখলাম প্রবীর চৌধুরী চুপটি করে পিছনে দাঁড়িয়ে। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ল আমার।

প্রবীরবাবু বললেন ঃ ত্রিলোকেশবাবুর ফিরতে এখনও দেরি রয়েছে, মিসেস চৌধুরী।

—কি করে জানলেন?

কোন উত্তর দিলেন না প্রবীর চৌধুরী। একটু হাসলেন মাত্র। সে-হাসি বেদনার, না, ব্যঙ্গের—আজও ঠিক বুঝতে পারিনি।

সেদিন কিন্তু আরও উত্তেজিত হয়ে রুক্ষভাবে প্রশ্ন করেছিলাম ঃ কি করে জানলেন আপনি? কি? চুপ করে রয়েছেন কেন? জবাব দিন।

প্রবীরবাবু হঠাৎ কোন উত্তর দিলেন না। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখলেন আমার দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে বর্ষণক্লান্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠলাম ঃ জবাব দিচ্ছেন না কেন?

অত্যন্ত শান্তভাবে আমার দিকে চেয়ে প্রবীরবাবু বললেন ঃ আপনি উত্তেজিত। তা না হলে বলতাম, সে-কথা আপনার না জানাই ভাল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম ঃ আপনাকে আমি চিনিনে মনে করেন? আপনি.........আপনি...... কিসের লোভে এখানে আসেন? স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার! যান...... বেরিয়ে যান এখান থেকে।

চমকে উঠলেন প্রবীরবাবু। একটা তীব্র বেদনার ছাপ পড়ল তাঁর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন ঃ যাচ্ছি, যাচ্ছি।

হঠাৎ একটা বজ্রপতনে চারপাশ ঝলসে গেল যেন। বাইরে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। সেই দুর্যোগ মাথায় করে প্রবীরবাবু বেরিয়ে গেলেন। সামান্য একটু ভদ্রতা, একটু সৌজন্যবোধ। তা-ও হারালাম মুহূর্তের উন্মাদনায়।

সেদিন অনেক চেষ্টা করেও প্রবীরবাবুর আসল কথাটা বুঝতে পারিনি। পারলাম আরও মাসখানেক পরে।

ফিরে তুমি এসেছিলে ঠিকই। কিন্তু আগের-তুমি নও, পরের-তুমি।

সত্যি কথা বলতে কি, খুশী হয়ে অভ্যর্থনা করতে পারিনি তোমাকে। পুরো দুটি মাসের জমানো অশ্রুর ঢল নেমেছিল আমার তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে। সেই উদ্‌গত অশ্রুর চাপকে সংযমের বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখতেই আমার সমস্ত শক্তি খরচ করতে হয়েছিল। আনন্দ করার শক্তি তখন পাব কোথায়?

দেরি করে ফেরার কৈফিয়ত তোমার কাছে চাইনি আমি। কিছুটা আশংকা করলেও যখন তুমি দেখলে আমি যথেষ্ট দূরত্ব রেখে চলেছি তখন তুমিও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে।

অথবা আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে হল না বলেই বোধ হয় নিজের কাছে কৈফিয়ত দেবার তাগিদে তুমি তোমার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেললে। ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করতে তুমি। কিন্তু আমি বেশ লক্ষ্য করতাম তোমার সেই আগেকার অনায়াস পদক্ষেপ বারবার অস্বস্তির বাধায় হোঁচট খাচ্ছিল। চোখে মুখে একটা ক্লান্তির দৈন্য। ঘুমোতে-ঘুমোতেও অনেক সময় চমকে উঠতে তুমি।

সেদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে আমাকে ঃ প্রবীরবাবু তোমার দেখাশোনা করতেন তো?

বললাম ঃ আমার দেখাশোনা আমি নিজেই করতে পারি। তার জন্যে প্রবীরবাবুর দরকার নেই।

তুমি বলেছিলে ঃ তা কি হয়? এই বিদেশ-বিভুঁই-এ একজন বন্ধুর দরকার সব সময় থাকে। তা ছাড়া, আমায় আবার বেরোতে হবে তো!

প্রশ্ন করলাম : কোথায় ?

বললে : জঙ্গলে।

বললাম : আর জঙ্গলে তোমার যাওয়া হবে না।

বললে : সে কি হয়? টমাস কোম্পানীর কাছে জঙ্গলটা বিক্রী করে দেবার সব ব্যবস্থা পাকা।

আশ্চর্য হয়ে বললাম : সে কি? এ সব সংবাদ তো আমার জানা ছিল না।

তুমি একটু হেসে বলেছিলে : সব কথা নাই বা জানলে!

আমি চুপ করে গেলাম। তোমার মন্তব্য স্বীকার্য বলে নয়। অশ্রদ্ধেয় বলে।

একটু চুপ করে থেকে তুমি প্রশ্ন করেছিলে : প্রবীরবাবু আসছেন না কেন?

বললাম : তাঁকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

ইচ্ছে। কিন্তু আমার চলা তো কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

আমার উত্তর শুনে তুমি চুপ করে গেছলে। কিন্তু সারা মুখ জুড়ে তোমার সেদিন ফুটে বেরিয়েছিল অবজ্ঞার একটা হাসি।

আমার শেষ কথাটা তোমায় জানিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন : জঙ্গলে যাওয়া তোমার চলবে না।

হঠাৎ তোমার চোখে মুখে একটা ক্লান্ত অপরিতৃপ্তির ছটা চকচক করে উঠল। তোমার নিজস্ব ভাষায় তুমি বললে : মানুষ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, শীলা। মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার ব্যক্তিস্বাধীনতা। আমার সেই স্বাধীনতায় তুমি হাত দিতে যাচ্ছ।

নিজের কানকে সেদিন বিশ্বাস করতে পারিনি আমি।

দ্বিতীয় আর কোন কথাও হয়নি তোমার সঙ্গে।

হঠাৎ আবার একদিন চলে গেলে।

......সব কথা নাই বা জানলে।

তুমি একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে : কেন?

বলেছিলাম সেদিন : আমার খুশী।

তুমি আরও বিরক্ত হয়ে বলেছিলে : তোমার খুশীতেই কি জগৎ চলবে বলে মনে করেছ?

ঘাড় বাঁকিয়ে আমিও সেদিন জবাব দিয়েছিলাম : জগৎ না চলে সেটা তার

বেয়ারা এসে সংবাদটা জানিয়ে গেল আমাকে।

আবার একা। আগে তবু তোমার ফিরে আসার আশা ছিল। এবার কেবল দীর্ঘ সর্পিল ভবিষ্যৎ। ফিরতেও পার। আবার ইচ্ছে হলে নাও পার।

একা। লাল কাঁকরের রাস্তা। মাঝে-মাঝে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া। বর্ষী

পাহাড়ের ওপর দূরে বনানীর ক্লান্ত অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস। আর আমি।

সাতটি দিন। মনে হল সাতটি মাস যেন।

শেষকালে আর থাকতে না পেরে প্রবীর চৌধুরীরই শরণাপন্ন হতে হল।

প্রবীর চৌধুরী আমাকে একটু লক্ষ্য করলেন। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! সেদিনের সেই অপমানের কোন চিহ্ন এখনও কোথাও রয়েছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলাম। কিছুই খুঁজে পেলাম না।

তিনি গাড়ী বার করে বললেন : আসুন আমার সঙ্গে।

তিনি যেন সবই জানেন। কেন এসেছি, কোথায় যাব, কিছুই অগোচরে নেই তাঁর।

তবু জিজ্ঞাসা করলাম ভয়ে-ভয়ে : কোথায়?

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে প্রবীরবাবু বললেন : যেখানে আপনি যেতে চান।

রেঙ্গুন শহরের চল্লিশ মাইল উত্তরে ছিল আমাদের বাংলো। তারও প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আমাদের জঙ্গল। আমাদের মোটর তীব্রবেগে ছুটে চলল দক্ষিণের দিকে।

জিজ্ঞাসা করলাম : এদিকে কেন?

প্রবীরবাবু বললেন : ত্রিলোকেশ-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হলে এই একটি পথই রয়েছে, মিসেস চৌধুরী।

চুপ করে রইলাম। দুপাশের গাছ-পালা ছাড়িয়ে হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমাদের মোটর। এর ভেতর প্রবীরবাবু একটি কথাও বলেননি। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। সেখানে কোন ভাবান্তর নেই। একটি সুকঠিন লোহবর্মে সমস্ত কিছু ঢেকে রেখেছেন।

বললাম, অর্থাৎ বলতে বাধ্য হলাম : আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে সত্যিই দুঃখিত।

প্রবীরবাবু বললেন : আপনি দুঃখিত কিনা তা নিয়ে ভাবছিনে। আমার সম্বন্ধে আপনার মনে যে নোংরা ধারণা জন্মেছে তাই দূর করার কিছুটা চেষ্টা করছি মাত্র। কিন্তু এর সমস্ত দায় আর দায়িত্ব আপনার। আমার নয়।

একটি হোটেলের সামনে গাড়ী থামিয়ে বললেন : আমি অপেক্ষা করছি। আপনি দোতলায় উঠে যান।

দোতলার একটি ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকেই আঁতকে উঠলাম। তোমাকে দেখে নয়। তোমার সঙ্গিনীকে দেখে। দুজনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিলে সমুদ্রের দিকে চেয়ে।

তোমরাও সেদিন আমাকে দেখে আঁতকে উঠেছিলে। ভূত দেখলে মানুষ যেমন করে আঁতকে ওঠে।

কিন্তু অদ্ভুত কৃতিত্ব তোমার। একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে তুমি একটু বিদ্রুপের সঙ্গে বলেছিলে : শেষ পর্যন্ত স্পাইগিরি শুরু করলে? ছিঃ!

কোন উত্তর দিইনি আমি। হঠাৎ কেমন হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম। টেবিলের ওপর তোমার রিভলভারটা পড়েছিল। সেটাকে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। লক্ষ্যটা কার দিকে ছিল আজ ঠিক স্মরণ করতে পারছিনে।

হঠাৎ অনিতার চীৎকার কানে এল : আমাকে মেরে ফেল, শীলা। আমাকে। দোষ ওর নয়। আমার।

অনিতাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে তুমি। বললে : তার আগে আমাকে মার।

একবার চেয়ে দেখলাম। তোমার দিকে। একবার অনিতার দিকে। কী-যে দেখলাম জানিনে। হো হো করে হেসে উঠলাম। তারপরেই রিভলভারটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে এলাম।

প্রবীরবাবুকে বললাম : এক্ষুনি চলুন প্রবীরবাবু। এক্ষুনি।

গোটা শরীরটা আমার কাঁপছিল তখন। পাহাড় ফাটার আগে পৃথিবীটা যেমন করে কাঁপে। ভেবেছিলাম বাঁচতে গেলে বোধ হয় আত্মহত্যাই করতে হবে। গাড়ীতে বসে অনেক কথাই ভাবছিলাম। মানুষের কামনা-বাসনার বুঝি আর তৃপ্তি নেই। মহারাজ যযাতি ষাট হাজার বছর ভোগের পরেও যার নিবৃত্তি করতে পারল না—তাকে মানুষ নিবৃত্তি করবে কেমন করে?

বাড়ীতে ফিরে দেখলাম আত্মহত্যার ভাপটা কখন বাষ্প হয়ে উবে গিয়েছে। তার বদলে পাহাড়-ই ফাটলো। রাশি-রাশি আগুন, আর গলানো পাথরের ছিটানি। তোমার-আমার অনেক ছবি ছিল। সব পুড়িয়ে ফেললাম। ড্রেসিং টেবিল ভাঙলাম। শার্সি ভাঙলাম। চাকরকে বকলাম। চীনা মেয়েটি দুধ দিতে এসে অনর্থক ধমক খেল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।
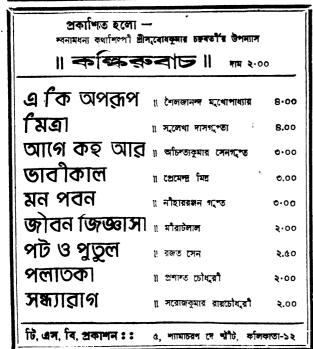
ঘুম ভাঙল সকাল বেলা। তোমার চিঠি এল। অনেক কথা লিখেছিলে তুমি। তার মধ্যে দুটি কথা অতি স্পষ্ট। অনিতাকে ছাড়া তোমার চলবে না; আর প্রবীরবাবুকে আমি বিয়ে করলে তুমি খুশী হবে।

ঘৃণা এল তোমার চিঠি পড়ে। গোটা পুরুষজাতের ওপর নেমে এল বিরক্তি। প্রেম-ভালবাসার ওপর ধিক্কার। সেদিন ভেবেছিলাম, মানুষ আসলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ার। নিজের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই তার সকল কথার সেরা কথা। সকল চিন্তার সেরা চিন্তা। এই পঞ্চাশ হাজার বছরের ইতিহাস কেবল বঞ্চনার ইতিহাস। নর-নারীর মিলনের ব্যর্থতা, আর যৌবনের অভিশাপের কথা ভাবতে-ভাবতে সেদিন মায়ের সেই তুফানে বন্দর ভেসে যাওয়ার কথাটাই বারবার মনে পড়তে লাগল।

হারানু-মারু জাহাজের ডেকে বসে কালো সমুদ্রের ক্রম-প্রক্ষিপ্ত তুফানের দিকে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ মনে হল জীবনটাও তো এই রকমই উত্তাল কল-রোলে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে এগিয়ে চলছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। এক অভিজ্ঞতা থেকে অন্য এক অভিজ্ঞতা। মনটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল। অনেকদিন পরে নিজেকে ভুলে মায়ের কথা মনে পড়ল। মাকে টেলিগ্রাম করলাম : যাচ্ছি।

ডেকের ওপর কত লোক। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু। সকাল থেকেই সোরগোল পড়ে যায়। কত রকমের আনন্দ, উচ্ছ্বাস, কত রকমের জল্পনা-কল্পনা। কেউ যাচ্ছে বিদেশে, কেউ ফিরছে দেশে। কারও মুখে অনিশ্চয়তার কৌতূহল, কেউ আবার নিশ্চয়তার আনন্দে মাতোয়ারা। এদের

তবু একটা ঘাট ছিল। এদের ছিল তবু একটা দল। আমার ঘাটও ছিল না, দলও ছিল না। তবু এদের দেখেই আনন্দ হচ্ছিল। পৃথিবীটা যে বৈচিত্র্যে ভরা—এই কথাটা সেদিনই যেন মন দিয়ে প্রথম উপলব্ধি করলাম।

হয়ত এর জন্যে সমুদ্রই দায়ী। বৃহত্তের আবেদন এইখানেই। বৃহত্তের মুখোমুখী এলে কোন ক্ষুদ্রতাই মনের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারে না। তাই বোধ হয় সমুদ্রকে সমুদ্র-দৃষ্টি দেখার সুযোগ সেদিনই প্রথম আমার জীবনে এসে হাজির হয়েছিল। আমার একান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মনের ওপর এই মহাশূন্য তার বিস্মৃতির প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। আমার জীবনের সংকীর্ণতা, আর একান্ত ব্যক্তি-গত হাহাকার সেই তরঙ্গের মত ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। সেদিনই যেন প্রথম আবিষ্কার করলাম, কোন মানুষের ওপর নির্ভর করে জীবন বাঁচে না। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে চাওয়াই মানুষের বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। ঠিক সেই সময় মনে হল, আনন্দ করার অধিকার মানুষের যেমন নেই, তেমনি নেই শোক করার বিলাস। সমুদ্রের মত নিজেকে ছড়িয়ে দিতে না পারলে পদে-পদে অপমৃত্যুর বন্ধুর পথে হোঁচট খেতে হবে।

কলকাতার বন্দরে এসে দাঁড়ালাম। সেই পুরানো কলকাতা। আমার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের কলকাতা। বড় ভাল লাগল। মনে হল যেন আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধুর কাছে ফিরে এসেছি। জেটিতে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে গঙ্গার শোভা দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ কানে একটি অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল : দিদিমণি!

ঘুরে চেয়ে দেখি আমাদের বাড়ীর চাকর ভজহরি। এক মুখ হেসে আমাকে দেখছে।

বললাম : ভজুদা, ভাল রয়েছ? বাবা-মা-দাদারা?

ভজহরি ছোট্ট একটি ঢোক গিলে বললে : বাবু নেই।

বাবা নেই! এক বছর আগেই মারা গিয়েছেন।

ফিরে এলাম বাড়ীতে। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদলাম। এতদিন কাঁদতে পারিনি বলেই হয়ত তোমার ওপর আমার মন ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে ছিল।

আজ মেঘমুক্ত আকাশের মতই আমার মন তোমার ওপর অনুকম্পায় ভরে গেল। অনিতার ওপর মায়া এল। যে মানুষ প্রিয়-বিচ্ছেদ এত নিঃশব্দে সহ্য করেছে, একটিও কথা বলেনি, তার কাছে আমার দস্যুতা কত ছোট হয়ে দেখা দিলে। অনিতা যে কিসের তাগিদে অতদূর ছুটে গিয়েছে তা যেন আজ বুঝতে পারলাম।

মনুষ্যত্বের আদালতে আমিই আজ আসামী। তাই বর্তমান-তুমির ওপর থেকে আমার সমস্ত মিথ্যার অধিকার তুলে নিলাম। তবু একদিন তোমাকে পেয়ে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তাকেও একেবারে ফাঁকি বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে। আমার অভিজ্ঞতার সে-ও একটি অমূল্য সঞ্চয়।

আমার নতুন মানুষ। নতুন পৃথিবী।

কেবল এই কথাটিই তোমাকে জানিয়ে দিলাম। আর কিছু নয়।

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৪ই অক্টোবর। প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে গেল। সবাই ভীষণ কাবু—তবু কোনো রকমে নড়েচড়ে উঠে বসেছে। ভোরে উঠে বিছানায় বসেই নীরেনের বিমর্ষ বদন—তারপরই বিলাপের পালা—এ যেন সেই অজের বিলাপকেও হার মানিয়ে দেয়।

—দু'হাত দূরে থাকা সত্ত্বেও আরতি-দর্শনের সৌভাগ্য হল না—এ কী বিধির বিড়ম্বনা—কী অদৃষ্ট—কী হতভাগ্য আমি—এত পাশে তবু—

রবীন্দ্রনাথের গানে একটু মোচড় দিয়ে নীরেনের কানে ঢেলে দি—

—হ্যাঁ ঠিক কথাই তো—

এত পাশে আছো তবু হয়নি জাগারে—কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগারে।

—আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।

—যদি কাটা ঘায়ে মলম লাগিয়ে দিই, আপত্তি নেই তো? চল, তোমাকে এক অঘোরীবাবার কীর্তিকলাপ দেখিয়ে আনি—চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে।

নাগেশ্বর পাণ্ডা আমার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন—

তিনি নেই, শুনলাম, আশে-পাশেই কোথাও গিয়েছেন—আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসবেন।

—যাক বাঁচা গেল; ঘুমের ঘোর না কাটতেই অঘোরের পাল্লায় পড়েছিলুম আর কী!

এক রাত্রি কোনো রকমে কাটিয়ে আমরা আজই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। কারণ দুর্জয় শীত আর খাদ্যাদি সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না। হাতমুখ ধুয়ে আমি সটান বেরিয়ে গেলাম মন্দির-দর্শন করে আবার সেই সাধুর কুটীরে। তিনি মৃদুহাস্যে আমাকে বসতে বললেন। দেখলাম, পাথরের ছাদ বেয়ে গুঁড়ো তুষারকণা ঝরঝর করে গলে পড়ে। আমি বসতেই, আগে-পিছে আমাদের সবাই মন্দির-দর্শন করে একে একে সাধুকে ঘিরে বসে পড়ল। নাগেশ্বর পাণ্ডাও হাজির। আমি প্রস্তাব করি—সাধুর সামনেই সুফল দেওয়া হোক্। সাধুজী হয়তো আগেই নাগেশ্বর পাণ্ডার মনের বাসনা টের পেয়েছিলেন, এবার স্ব-ইচ্ছায় তাকে উপদেশ দিলেন—বুঝলে পাণ্ডাজী, সুফল নিয়ে খচ্ খচ্ কোরো না—যা' ও'রা হৃষ্টচিত্তে দেন, তাই সন্তুষ্টচিত্তে নিয়ো।

মনে হল, সুফল দেবার আসল কর্তা যিনি, তিনিই তা দিয়ে থাকেন,—এ সব তো শুধু একটা লৌকিক আচার। অন্ততঃ এই বিশ্বাস নিয়েই তো জীবনের এতটা পথ পাড়ি দিলাম।

সাধুজীর কুটীরের বাইরে পাথরের ওপরে সবাই এসে বসল। যথারীতি দক্ষিণা নিয়ে নাগেশ্বর পাণ্ডাও অসংখ্য ভুলে-ভরা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে সুফল দিলেন। আমার বেলায় কিন্তু যতক্ষণ পাণ্ডাজী মন্ত্র পড়ছিলেন, আমি সাধুজীর দিকেই একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। সব শেষে, পাণ্ডাকে প্রণামী দিয়ে সাধুজীকে বললাম—"আপনার দিকে তাকিয়েই এই সুফল আমি নিলাম—। এইটিই আমার তৃপ্তি।"

দুজন বাঙালী ভদ্রলোক, পায়ে হেঁটে, আগে পেছনে আমাদের সঙ্গেই আসছিলেন। তাঁরা আগেই কেদার পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে ক্যামেরা ছিল। মন্দিরের সামনে আমাদের একটা গ্রুপ ফটো আর ফলাহারী বাবাকে নিয়ে আর একখানা ফটো তাঁরা স্বেচ্ছায় তুললেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কলকাতায় ফিরেই তাঁরা আমাদের সঙ্গে দেখা করে ফটো দেবেন।

মন্দির-প্রাঙ্গণ ছেড়ে যেতে মন চায় না। প্রাণে একটা গভীর অনুভূতি—এই তো মহাপ্রস্থানের পথ। এই পথেই পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদী স্বর্গারোহণে গিয়ে-ছিলেন। যাত্রাপথে সর্বপ্রথমেই মৃত্যু এসে দ্রৌপদীকে গ্রাস করে। ভীমের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, পঞ্চপাণ্ডবের

সহধর্মিণী দ্রৌপদীর পার্থের ওপরেই সব চাইতে বেশী আকর্ষণ ছিল—এই পাপেই তাঁর সশরীরে স্বর্গারোহণ হ'ল না। তারপর সহদেব, নকুল, পার্থ, ভীমসেন ক্রমান্বয়ে আপনাপন কর্মফলেই স্বর্গারোহণে অক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের দেহবিনাশের কারণও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির একে একে বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকেও 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজঃ' এই আংশিক সত্যভাষণের জন্যে নরক-দর্শন করতে হয়েছিল। এমন কি, পার্থসারথি পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণও স্বকৃত-কর্ম-লীলায় ব্যাধের শায়কবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁকেও জীবনের দেনা-পাওনা মিটিয়ে যেতে হয়েছিল। এই রূপকের মাধ্যমেই মহাভারতকার বোঝাতে চেয়েছেন যে, কর্মফলের অনুশাসনকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। মরজগতের শুল্ক মিটিয়ে না দিলে এই মরদেহের মুক্তি নেই—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চভৌতিক দেহের মহাপ্রস্থানকে চিত্রিত করে, এই জীবনতত্ত্বই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ভেতর থেকে কে যেন ডেকে বলে—এ তো নূতন নয়, এই তো চিরকালের চিরচেনা পথ, জন্ম-জন্মান্তরের বহু পরিচিত স্বপ্নলোকের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে যেন অজানালোকের হাতছানি দিয়ে যায়। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবি, সেই কোন্ যুগে পাণ্ডবগণ দুর্গম গহনে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তারপর আরও কত যুগ কেটে গেল, সেই পৌরাণিক মন্দিরের সংস্কার করলেন জগজ্জ্যোতি শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য দেব, যাঁর সমাধিও অদূরে মন্দাকিনী সরস্বতী, ক্ষীরগঙ্গা মহোদধি ও স্বর্গদ্বারী গঙ্গা-বিধৌত এই স্থানেরই পবিত্র বুকে। সর্বার্থসিদ্ধির প্রতীক এই তীর্থভূমি যে যুগযুগান্তকাল ধরে দেশবাসীকে কেন এত আকর্ষণ করে, তার একমাত্র তত্ত্ব ওই শ্যাম-শীলারূপী কৃতার্থনাথের চরণ-প্রান্তে—যাঁর করুণার আশ্রয় ছেড়ে যেতে মন চায় না। মন্দিরকে প্রণাম করে, সাধুর চরণধূলা নিয়ে এবারের মত বিদায় নিলাম।

'হয়তো আর এখানে আসা হবে না—এ জীবনে এই হয়তো শেষ! নিজ বাসভূমি ছেড়ে পরবাসে যাওয়ার ব্যথানিয়ে ফিরে চললাম। দুচোখ ছাপিয়ে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু নেমে এল। পঞ্চ-দশকলাসমন্বিত মৃত্যু মহাদেবের চরণে কোটী জন্মের মুক্তিকামনায় আমার জন্মজন্মান্তরের উপাসনা শ্রীশ্রীকেদারনাথ কী গ্রহণ করেছেন?

বেলা নটা তিরিশ মিনিটে আমরা কেদারনাথ ছেড়ে বদরীর পথে রওনা হ'লাম। ডাণ্ডীতে বসেও পিছন ফিরে মন্দির আর ফলাহারীবাবার দিকেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। ডাণ্ডীবাহীরা ক্রমেই নীচের দিকে চলেছে—কাজেই যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, অনিমেষ চোখে আমি পিছনের দিকে তাকিয়ে থাকি। একটা মোড় ঘুরতেই, আমার সামনে মন্দির আর ফলাহারীবাবার কুটীর অদৃশ্য হয়ে গেল। আনন্দ ও ব্যথা, তৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা, বেহিসেবী পাওয়া আর চাওয়ার দোলায় আমার অন্তর তখন ভরপুর, ডাণ্ডীর ওপরে কতদূর চলে গিয়েছি খেয়াল নেই—দেওদখনীতে এসে আবার সেই মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হ'ল। দুহাত তুলে প্রণাম করি সেই মন্দির-বিহারী ত্রিলোকনাথকে, সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে বলি—জয় কেদার বোঢা কী জয়!

উৎরাই-পথে আর কোথাও থামতে হবে না—রামবাড়া হয়ে সোজা চলে যাব গৌরীকুণ্ডায়।

ডাণ্ডী চলে; সেই জনবিরল পাহাড়ী পথের ওপর আমরা ক'জন তীর্থযাত্রী যে পথে এসেছিলাম—সেই পথেই আবার নেমে চলেছি—এপাশে ওপাশে কোথাও বা ছুটে-চলা ঝরনার ঝিরিঝিরি শব্দ, কোথাও বা একখণ্ড বিরাট প্রস্তর পৃথিবীর বুক ভেদ করে ঠেলে আকাশের দিকে উঠতে চায়। বিস্ময়ী প্রকৃতির অপরূপ খেলা—নিঃসঙ্গ আনন্দ যেন হিমালয়ের শিখরে জমাট হয়ে আছে। বহিমান সূর্যকিরণ যেন কী-এক স্তব্ধ অলসতায় নিজেকে লুটিয়ে দিয়েছে তুষারাচ্ছন্ন মৌন পর্বতচূড়ায়, চতুর্দিকের গাছপালা, পশুপক্ষী—সমস্ত কিছু সেই তপোভূমির কোলে যেন কী এক সাধনায় মগ্ন, আমি নিজের মনেই এমনি কত কী ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি। আবার কানে এল সেই গান—সেই 'ও' হরি ও" মন্ত্রের সুর। আমার খেয়াল ছিল না—তাকিয়ে দেখি, আসার পথে ঠিক এই-খানেই এই গান শুনেছিলাম—আবার ফেরার পথেও সেই স্তোত্রপাঠ আর মাঝে মাঝে 'ও' হরি ও" মন্ত্র। কান পেতে সেই দিকেই সমস্ত মনটাকে ঢেলে দিলাম—পরিষ্কার তন্ত্রীলয়সমন্বিত সেই দিব্য সঙ্গীত শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে যাই। ডাণ্ডীবাহী কুলীদের একটু দাঁড়াতে বলি—তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—আবার কী হ'ল?

তবে, এই কি সেই গন্ধর্বলোক? তাই কোনও অপৌরুষের সঙ্গীত ঢেউ-এর ওপর ঢেউ তুলে এই বায়ুস্তরে

নিরন্তর বেজে ওঠে। তাই যদি হয়, তবে আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না কেন? শুনেছি, মনের তার যদি সুরে বাঁধা থাকে, তবেই তা' ধ্বনি-তরঙ্গে ঝঙ্কার তোলে! কিন্তু শুধু অনুমান নিয়ে তো বেঁচে থাকা যায় না—তত্ত্বের দিক থেকে এর কতখানি মূল্য—সেটা না জানলে মন শান্ত হবে কেন? ফলাহারীবাবা যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাও তো এই অনুমানেরই অনুকূলে।

কুলীরা এবার আমাকেই ধমকে ওঠে: তারা আর দাঁড়াতে পারবে না। আর একটু অপেক্ষা করতে অনুনয় করে বলি—তোমরা কি কোনও গান শুনতে পাও না?'

একটি বয়স্ক কুলী বলে উঠলো—

—শেঠজী কি এখানে এসেই দেওয়ানা হয়ে যান? যাওয়ার সময় যা' দেখলাম, আসার বেলায় ঠিক তাই।

কুলীদের বলি—তোমরা যদি নেহাত থামতে না চাও—তা' হলে চল।

ডাণ্ডী চলতে থাকে—সেই গানও ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর, তারপর অস্পষ্ট হয়ে গেল। আর কিছু শোনা যায় না।

কত কথাই না মনে হয়। আমার হারানো দিনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে এই যে পথ চলা, জানা থেকে অজানার অভিযানে এই যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া এই যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, তার মালা গেঁথে আরো কতদিন চলতে হবে? তাই যাঁরা পার্থিব পথের পথিক নন, অপার্থিব আলোর দিশায় যাঁরা জীবনের আশা-আসক্তি বিসর্জন দিয়ে পথে বেরিয়েছেন, তাঁদের কাছেই আমি বারে বারে ঘুরে-ফিরে যাই। তাঁদের কাছেই তুলে ধরি আমার অন্তহীন জীবন-জিজ্ঞাসা।

মনে পড়ে, প্রথম যৌবনে স্বামী নিগমানন্দের যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু, প্রেমিকগুরু—এই তিনখানা পড়ে, অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথা আমার তরুণ হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। তাই নীলাচলে তিনি আছেন জেনে, তাঁকে দেখতে ছুটে গেলাম। প্রথমেই আঘাত পেলাম তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা বললে—দেখা হবে না। অনেক কথা কাটাকাটির পর শেষে একখানা কাগজে আমার নাম-ধাম লিখে স্বামীজীর হাতে পৌঁছে দিতে বলি।

তৎক্ষণাৎ আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকতেই তিনি হেসে বললেন,—'আপনি মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রায় গল্প লেখেন না?' মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েই তাঁকে প্রণাম করলাম। কিন্তু, যখন তিনি বললেন যে, তাঁর সাধনার শেষ হয়েছে—আর কোনও তপস্যার প্রয়োজন নেই, তখনই যেন আমার মনের আলো নিভে গেল। ভাবলাম, এর মানে কী? তা'হলে, ধ্যানের অগম্য যিনি, সেই দেবাদিদেব মহাদেব, তিনিই বা কার ধ্যান করে চলেছেন? এসব কথা বলা হয়তো আমার উচিত নয়। তিনি সাধন-মার্গে এত ওপরে আছেন, আমার মত লোকের পক্ষে তাঁর আচরণের সমালোচনা করাই হয়তো নিছক ভুল; কিন্তু এমনও সাধু দেখেছি, মন যাঁকে সহজভাবে নিতে পারেনি, যাঁকে অবিকল্প ভক্তি দিতে গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি, যাঁর কাছে মনের জটিল প্রশ্নগুলি আরও জট বেঁধে যায়, তাঁকে যদি আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে না পেরে থাকি, তবে সেটা আমারই ত্রুটি, কিন্তু আমার আচরণে কোনোদিন ভণ্ডামির লেশমাত্র নেই, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আর একবার দার্জিলিঙের কথা। ঘোড়ায় চেপে 'ভিক্টোরিয়া ফলস্' দেখতে গিয়েছি। বাহন কিছুতেই বাগ মানতে চায় না—হঠাৎ এক ছুট দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দেখা যাক এ'র অভিপ্রায় কী? কোথায় ইনি যেতে চান? ঘোড়াটা গিয়ে যেখানে থামলো, সেইটিই স্বামী অভেদানন্দের আশ্রম। আশ্চর্য, আগের দিনই আমাদের কথা হয়েছিল যে, দু-একদিনের মধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

যখন এসেই পড়েছি—সাক্ষাৎ না করে যাব না। শুনলাম, বেলা বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। তখন বেলা প্রায় একটা—কাজেই শিষ্যবর্গ জানিয়ে দিলে—এখন হবে না—ঘণ্টা দুই পরে আসবেন।

হবে না? কেন হবে না?

আমি স্বামীজীর বিশ্রাম-কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে স-চীৎকার আবেদন জানাতেই শিষ্যরা 'হাঁ হাঁ' করে তেড়ে আসে আর কি—এমন সময় ভেতরে ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা গেল। বারোটা থেকে তিনটের ভারপ্রাপ্ত যে বিশেষ শিষ্যটি সেখানে ছিলেন—তিনি স্বামীজীর কক্ষে প্রবেশ করেই বাইরে এসে আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

তাঁর সামনে উপস্থিত হতেই তিনি বললেন,

—কালই আপনার কথা মনে হয়েছিল।

কত কথাই না তাঁকে জিজ্ঞেস করি—"ছাগ হচ্ছে কামের প্রতীক—আমরা যে মায়ের পূজায় ছাগবলি দেই, সেটা তো কামের বলিদান? কিন্তু আমরা ক'জন সে কথা মনে রাখি? কালীঘাটে বলি দেওয়ার সময় মাংস খাওয়ার লোভটাই কি আমাদের বড় হয়ে ওঠে না? নিবেদিত ছাগ-মাংস আর বাজারের বৃথামাংসে তফাতটা কী?

উত্তরে স্বামীজী এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন—

—যাই থাকুক না কেন, সব দূরে গিয়ে এক সময় আসল জিনিসটাই বড় হয়ে ওঠে। কাজেই, যাঁরা মাংস খেতে চান, তাঁদের নিবেদিত মাংসই খাওয়া উচিত। "মরা মরা" করতে করতেই 'রাম রাম' মুখে আসে।

কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করি—

—মানুষের গ্রহণ করার শক্তি যদি না থাকে, নিঃস্ব হয়ে বিশ্বের কাছে হাত পেতে লাভ কী?

—ঠিক কথা। আগে জানতে হবে, "আমি কে?" তাহলেই সবকিছু আপনি এসে ধরা দেবে। সেখানেই সব সমস্যার সমাধান।

—কোনও সমাধান যখন এখানে পাই না, তখনি আমরা জন্মান্তরকে টেনে আনি কেন?

—খুব সত্যি কথা। প্রকৃতিগত বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করেও অনেক সময় কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করা যায় না। জন্মান্তরবাদ নিয়ে এককথায় কিছু বলা কঠিন—তবে জেনে রেখ, আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়েই অমরাত্মার অভিযান।

তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করি—

—জগতে প্রেমই তো মানুষকে পূর্ণ করে অধ্যাত্মপথের সন্ধান দেয়। তবে সংসার ত্যাগ করে তারা মুক্তির পেছনে ছোটে কেন?

—শুধু কোলাহলের বাইরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। তাহলেই

হবে মুক্তপুরুষ। তখন সংসার ত্যাগ করেও সে বলতে পারে, এই সংসার আমার, এই পৃথিবী আমার। ত্যাগ শূন্যতায় নয়, পূর্ণতায়।

কথাগুলি ভালো লাগলো।

মনে পড়ে কাশ্মীরে শংকরাচার্য পাহাড়ে সেই সাধুর কথা। তাঁর বয়স নাকি দু' তিনশো বছর। খবর পেয়ে ভোরে উঠেই গেলাম তাঁকে দেখতে।

ব্রিচেস্-পরা পঁচিশ বছরের যুবক আমি। আমাকে দেখেই সাধু বললেন—

—তোমার জন্যেই এবার এসেছি।

আমি বসতেই তিনি কতকগুলি অলৌকিক বিভূতি দেখালেন। হঠাৎ আমাকে বললেন—

—গায়ের জামা খুলে ফেল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আদেশ পালন করলাম। তখন তিনি কমণ্ডলু থেকে একটু জল নিয়ে ছিটিয়ে দিতেই অবাক হয়ে দেখি আমার বুকের ওপর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আঁকা হয়ে গিয়েছে।

চটুল পরিহাস করি—

—সাধুজী, এই ম্যাজিকটি আমায় শিখিয়ে দেবেন? বাংলায় ফিরে অনেক কাজে লাগবে।

তিনি হেসে বললেন,

—তুমি নিজেকে জান না—তুমি কী, কোত্থেকে এসেছো, কেন এসেছ, আর কীই বা তোমার কাজ—সেটাই আগে জেনে নাও। মনে রেখো আমিও সব সময়েই তোমার পাশে আছি—লৌকিক জগতে শেষ আর একবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

জিজ্ঞাসা করি—

—ঠিক আজ যেমন আপনাকে চোখের সামনে দেখছি, তেমনি?

—হ্যাঁ ঠিক তাই—তবে তোমার স্বপ্নেও তা হতে পারে। তার সাতদিনের মধ্যেই তোমাকে আমাদের মধ্যে টেনে নেব।

গভীর রহস্যভরা সেই উক্তি। সাধুকে প্রশ্ন করি—

—আপনি কি সেই বড় আমি—সেই সোঽহং মন্ত্রের পূর্ণায়ত দেবতা, আমাদের এই ছোট আমিকে অতিক্রম করে অদ্বিতীয়ে পেঁাছে গেছেন—যেমন একটা ফুটবলে ফুটো হয়ে, তার মধ্যেকার বদ্ধ বাতাস সীমাহীন বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়? আপনি কী সেই ত্রিগুণাতীত পুরুষ?

আমার জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর পেলাম না—মুচকি হেসে তিনি বলে যান—

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তমোগুণ হচ্ছে নীরন্ধ্র অন্ধকারে ডুবে থাকা—রজোগুণ-সম্পন্ন তাকেই বলে—যার অন্ধকার অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে—যেন ঘরে বসে ফাটা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে কিছু আলো দেখা যায়; আর সত্ত্বগুণ যেন নেটের মশারির ভেতর দিয়ে সব কিছু দেখা গেলেও তবু তার আবরণ থাকে—এই তিন অবস্থা পার হলেই সেই ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পেঁাছানো যায়।

—আপনি কি তাই?

আশ্চর্য! সাধুজী পরিষ্কার আমার নাম উচ্চারণ করে বাংলায় বল্লেন—

—ধীরেন্দ্র, তোমার মনের এই সব প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই একদিন পাবে—খোলা মন নিয়ে সংসারের পথেই এখন তুমি এগিয়ে যাও—পরমাত্মার সেবায় নিজেকে নিবদ্ধ রাখো—তাঁকে ভুলো না। যাও, আজই সন্ধ্যা সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এক আনন্দময় সংবাদ তুমি পা'বে।

সাধুর কথায় আমি যেন ক্রমেই সম্মোহিত হয়ে পড়ছিলাম। নাঃ এতো ভাল কথা নয়। সাধুদের উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্ষমতার কথা অনেক শুনেছি—বইতেও পড়েছি। এই সব নিম্নস্তরের কতকগুলি শক্তির খেলা দেখিয়ে তাঁরা আসর জমিয়ে থাকেন। এও কী সেই রকমই একটা কিছু?

সাধুদর্শনে এলেই ফুল ফল বা প্রণামী দিতে হয়—এ জ্ঞানটা টন্‌টনে আছে। একখানি দশ টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে রাখতেই, তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন—কোন্ পাতালপুরী থেকে উঠে আসা সেই জলদ-গম্ভীর স্বর—

—উঠিয়ে নাও, আমাকে কোনও কিছু দিয়ে লাভ নেই। তাঁর কাছে প্রণত হও। জানি, তুমি অনেক সাধুর কাছেই ঠকেছ—তাই শীগ্‌গীর বিশ্বাস হয় না—যাচাই করে নিতে চাও, কেমন? খুব ভাল কথা—নিজেকে সব সময় সাচ্চা রেখো—যখন-তখন হোঁচট খেতে হবে না।

সাধু মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে বলি—

—বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল; কিন্তু মানুষকে অবিশ্বাস করার দুঃখ যেন না পাই, এই আশীর্বাদ করুন।

ফিরে এলাম হাউস-বোটে। ঠিক সন্ধ্যা সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে লালগোলার টেলিগ্রাম—খুবই শুভ সংবাদ। হিসেব করে দেখলাম, যখন সাধু আমাকে সেই কথা বলেছিলেন, লালগোলা থেকে টেলিগ্রাম তার ঘন্টাখানেক পরে করা হয়েছিল।

পরদিন সকালেই ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি নেই—কোথায় চলে
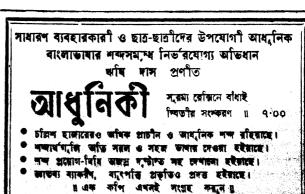
গিয়েছেন। শুনলাম, বিশ-পঁচিশ বছর অন্তর এই সাধুর কচিৎ এখানে একবার দর্শন পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রবীণদের কাছে শোনা গেল—সাধুর কোনও পরিবর্তন নেই—ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত দুবার দেখেছেন—আগেও যা' এখনও তাই। ভাষাও অনেক কিছু জানেন।

মনে পড়ে যায় এলাহাবাদের সেই বিখ্যাত পূর্ণকুম্ভের কথা। আমিও গিয়েছি পুণ্যস্নান উপলক্ষে। সাধুর সান্নিধ্যলাভ আমার একটা নেশা। কুম্ভমেলায় গিয়ে মেলা পেছনে রেখে পাড়ি দিয়েছি যমুনার ওপারে—যেখানে সারি সারি ছাউনি পড়েছে—সাধুরা আপনাপন ধুনি জ্বালিয়েছে। একটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ি। সেদিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারি না। ভেতরে বসে আছেন জ্যোতির্ময় এক সাধু—তপ্তকাঞ্চনের মত দেহের রং—তীক্ষ্ম দুটি চোখ আর বাঁশীর মত নাক—সমস্ত মুখে একটা অপূর্ব তেজস্বী ভঙ্গী। প্রথম দর্শনেই মনে হ'ল মহাপুরুষ। সামনে এগিয়ে যেতেই তিনি ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললেন। অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে আসে—আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি—তিনি একটির পর একটি উত্তর দিয়ে যান। কথায় কথায় বললেন যতই 'কিন্তু' 'কেন' এই সব জটিল প্রশ্নগুলি দেখা দেয়, ততই 'তিনি' দূরে সরে যান। কতখানি দিলাম, আর কতখানি পেলাম, এই হিসেব-নিকেশ করে তাঁকে কী কখন পাওয়া যায় না ধরা যায়? যাঁকে তুমি খুঁজে বেড়াও, তিনি তোমার মধ্যেই বিরাজ করেন—তাঁকে চিনে নেওয়াই তোমার কাজ—হ্যাঁ, তোমার জীবনের সব চাওয়া-পাওয়ার মালিকও তোমার মধ্যেই আছেন।

সবিনয়ে বলি—

—এই যে সব সাধু-মোহান্ত এখানে এসেছেন—চারিদিকে এত যে ছাউনি পড়েছে—এই কুম্ভমেলায় এ'রা সবাই পুণ্যস্নানার্থী; তবু অতি সাধারণ সংসারী জীবের মত এখানেও পরস্পর কেন এত দলাদলি, এত হানাহানি? মোহের অন্ত না হয়ে তাঁরা কেন মোহান্ধ হলেন?

সাধুজী মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে প্রসন্ন মুখেই জবাব দিলেন—

—হ্যাঁ, সে কথা বলতে পারো বটে। তবে, সবার অবস্থাই তো সাধনার শেষ প্রান্তে নয়। সাধুদের মধ্যে ভেদজ্ঞান দেখলে বড় দৃষ্টিকটু হয়, জানি। আত্মকেন্দ্রিক ধ্যান ও ধারণার দিকেই তাঁদের আকর্ষণ—ক্ষুদ্র আমিত্ব থেকে এখনও তাদের মুক্তি হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে কে কোন্ পন্থী, তাই নিয়ে অহংকার আর আত্মাভিমানই তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ওসব নিয়ে তুমি নিজেকে ব্যস্ত করে তুলো না—আপ্তকৃতিকে ব্যাপ্তির মধ্যে বিলিয়ে দাও—সেই হল ধর্মের সার কথা—জানোই তো, যত মত তত পথ।

—জানি বৈকি! একই নদীতে আমাদের সবাইকে স্নান করতে হয়। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খৃষ্টান, কত ধর্মমত, কত সম্প্রদায়, একই নদীর বিভিন্ন ঘাট—তবু, অযথা তাই নিয়েই আমরা ভেদবুদ্ধির প্রাচীর গড়ে তুলি—তা হ'লে আর সংসার ছেড়ে আসার প্রয়োজন কী?

সাধু—না কিছু নেই, যদি তেমন শক্তি অর্জন করতে পারো।

—এ'রাও তো সংসার বর্জন করে সাংসারিক গর্জনের মধ্যেই ডুবে আছেন—কিছুই অর্জন করেননি—

সাধু—ভগবানের নাম নিয়ে পড়ে থাকলে—তাঁর কৃপা একদিন হবেই।

কত সাধু-সন্ন্যাসীই তো দেখলাম। কাউকে ভাল লেগেছে, কাউকে মনে-প্রাণে নিতে পারিনি—কেউ স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়ে শক্তির পরীক্ষা দিয়ে নিজেকে প্রচার করতে চেয়েছেন, কেউ নিজের শক্তি সংহত করে অযাচিত করুণার ধারায় অভিষিক্ত করেছেন আমাকে। কে ভণ্ড, কে খাঁটি, কে বড়, কে ছোট, সে বিচার আমার নেই, কিন্তু এটা আমি লক্ষ্য করেছি, এ'দের মধ্যে অনেকেই সাধু হয়ে আসেননি—এসেছেন সাধু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমার অন্তর থেকে কে যেন চিরদিনই ডাক দিয়ে বলেছে—ঠিক জায়গায় এসেছো, এগিয়ে যাও। আবার কখনো বলেছে, না, পৌঁছিয়ে এসো। আমার অন্তর-দেবতার নির্দেশ আমি কখনো উপেক্ষা করিনি।

সমস্ত পথটা যেন আমার আচ্ছন্নের মত কেটে যায়। গৌরীকুণ্ডায় কখন পৌঁছলাম, জানি না, ডাণ্ডীওয়ালারা আমাকে স্কন্ধচ্যুত করেই হাঁক দিলে—

—গৌরীকুণ্ডা আ গিয়া, শেঠজী!

আমিও নেমে মাটিতে ফিরে এলাম। ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখি—মাথার ওপরে বহুদূরে একটা উড়োজাহাজ তার দুটো রূপালি ডানার ঝলক দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

আজ চারদিন ক্ষৌরকার্য হয়নি—সমস্ত মুখখানা যেন কদম্বফুল। ক'দিন স্নান নেই—গায়ে এক রাশ ময়লা।

চটীতে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর গালে হাত বুলিয়ে গুণেনকে বলি—

—খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কিছু পরে হলেও চলবে—যে মুখে খাব, আগে তার কিছু ব্যবস্থা করে দাও দিকি—আর তো পারা যায় না।

গুণেন ডাক্তার-মানুষ, ছুরি চালাতে ওস্তাদ। কিন্তু 'সেফ্‌টি রেজার' দিয়ে নিজের দাড়ি যদিই বা অনায়াসে নির্মূল করতে পারে, আমার গালে হাত দিয়ে সেও যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কোনও রকমে বিনা রক্তপাতেই কর্মশেষ—ক্ষৌরকার্যের পর যেন একটা পাপের বোঝা নেমে যায়।

তারপর হস্তপদ প্রক্ষালন ও তৈলমর্দন। এক বাটি তেল, খানসামা রতির দু'খানা হাত আর আমার দেহ, এই তিনের মধ্যে প্রায় তিন কোয়ার্টার ধরে ডলাই-মলাই চলার পর তপ্তকুণ্ডের জলে স্নান করে যেন পুনর্জীবন পেলাম।

গৌরীকুণ্ডায় দুটি কুণ্ড—একটি উষ্ণ জলের, আর একটি অমৃত কুণ্ড, শীতল জলের। প্রবাদ আছে, পার্বতী এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করেন এবং এই কুণ্ডের জলেই অবগাহন স্নান করেছিলেন। কুণ্ডের দক্ষিণদিকে উমা-মহেশ্বর শিলা, তার পাশেই মন্দির—তার মধ্যে গৌরী, মহাদেব, রাধাকৃষ্ণ ও জ্বালাভবানীর মূর্তি। স্নানান্তে দেবদর্শন করে চটীতে ফিরে এলাম।

নীরেন ভায়ার শ্লেষ্মাপ্রধান ধাত—তিনি বেজায় কাবু হয়ে আছেন—জল দেখলেই জলাতঙ্ক—তবু তপ্তকুণ্ডের গরম জল পেয়ে হাতমুখ ধোবার উৎসাহে নড়েচড়ে বসে। তাকে কিঞ্চিৎ তৈলমর্দন করিয়ে টেনে নিয়ে সেই গৌরীকুণ্ডে নিক্ষেপ করি—স্নানান্তে সেও একটু সুস্থ বোধ করে।

খিচুরি-পাকের তখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব। চটীতে ফিরে এসেই সে কম্বল মুড়ি দিয়ে আবার নিদ্রার চেষ্টায় থাকে। ওদিকে গুণেন, গণেন আর অনুজা তিনজনে মিলে যে কলরব তুলেছে, তাতে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়—নীরেনস্য কা কথা! অগত্যা সে উঠে

উনুনের পাশে সটান্ পৌঁছে তার যোগ্য আসন দখল করে নিলে। আমিও লাঠি-খানা বাগিয়ে ধরে বাইরে পায়চারি করতে থাকি।

নাগেশ্বর পাণ্ডা সন্ধ্যায় চটীতে ফিরে এলো।

পনেরোই অক্টোবর। খুব ভোরে ছ'টা পঁচিশ মিনিটে আমরা আবার ফাটা চটীর মুখে রওনা হ'য়ে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে এগারোটায়। সেই ফাটা চটী—যেখানে আমাদের সর্বাঙ্গ ফাটিয়ে দিয়েছিল।

স্নান খাওয়া শেষ করে আমরা সবাই বেলা তিনটেয় বেরিয়ে পড়ি। ঘন্টা দুই যাওয়ার পর পৌঁছলাম নালা চটীতে। কথা ছিল, সেখানে গিয়ে হয় উখী মঠ, নয় কুণ্ড চটী—কোথায় আমাদের গতি সেটা ঠিক করা যাবে। কিন্তু, দুর্গতি আর বলে কাকে!

আচার্য ব্রজবিহারী মিশ্র বলেছিলেন, উখী মঠে আমাদের ভাল গেস্ট-হাউস আছে, সেখানে গিয়ে উঠবেন, কোনো কষ্ট হবে না।

এমন কি, তিনি স্বেচ্ছায় একটা সুপারিশ চিঠিও লিখে নীরেনের হাতে দিয়েছিলেন। সেই লোভেই নীরেন-ভায়া আর কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিজের মনগড়া মন্তব্য আমায় জানিয়ে দিলে—

তুমি এগিয়ে যাও, আমি সবাইকে নিয়ে পেছনে আসছি।

আমিও বিনা দ্বিধায় চললাম উখী মঠের পথে।

দীপান্বিতার দিন পুজো হয়ে শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দির বন্ধ হয়। তারপর উখী মঠেই তাঁর উদ্দেশ্যে পুজো হয়, পুজারী রাওলের বাসস্থানও এখানেই।

পাহাড়ে যাওয়া-আসার পথে, সব একসঙ্গে রওনা হলেও, একসঙ্গে থাকা যায় না। কেউ পাঁচ মিনিটের পথ এগিয়ে, কেউ বা দুই মিনিট পরে, এমনি পর পর সব চলতে থাকে।

প্রথম নম্বর পরিমল আসতেই নীরেন আমার নাম করে তাকে বলেছে, দাদা রওনা হওয়ার সময় বলে গিয়েছেন—সবাই যেন উখী মঠে যায়। অবশ্য এ খবরটা আমি তখন পাইনি, গুপ্ত-কাশীতে এসে উখী মঠে যাওয়ার ষড়যন্ত্র ব্যক্ত হয়েছিল।

কিছুদূরে এগিয়ে দেখি, পেছনের ডাণ্ডীতে নীরেনের সহধর্মিণী।

তারপর আর কাউকে দেখা যায় না। মাইল দুই নেমে আসার পর একটা লোক ছুটে এসে খবর দিলে, এখন আমাদের উখী মঠে যাওয়া হবে না—কুণ্ড চটীতে ফিরে যেতে হবে।

ডাণ্ডীবাহীরা ক্ষেপে উঠল—এতটা পথ নেমে এসে আবার এতটা যে চড়াই উঠতে হবে—এ তাদের শরীরে কুলোবে না। করা যায় কী? সমূহ বিপদ। তাদের যতই বুঝিয়ে বলি—মানতে চায় না; শেষে বললে—আপনি বাড়তি টাকা দেবেন, যাব না কেন? কিন্তু আপনার পৌঁছতে ঘন্টা দুই দেরী হবে, তা' আগেই জানিয়ে রাখছি।

—তাই তো, খিদেও পেয়েছে—সঙ্গেও কিছু নেই—কী করা যায়, বল?

ডাণ্ডীবাহীদের চট্‌পট্ উত্তর—

—তা হলে সিধে রাস্তায় যাওয়াই ভাল। সোজা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেলে সময় কম লাগে—অবিশ্যি খুব বেশী খাড়াই। শেঠজী যদি কিছু বকশিশও ধরে দেন—তা হ'লে—

—বেশ, বেশ, তাই চল।

কিন্তু এই সিধে রাস্তা যে কী, তা কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম। কী বিশ্রী রাস্তা! ডাণ্ডীবাহীরা সোজা পথ ছেড়ে ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ পথে খাড়াই উঠতে লাগলো। কাঁটায় সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত—পথ নেই তবু বিপথকেই পথ করে নেওয়ার যা' দুর্দশা, তা' টের পেলাম। এত খাড়াই যে ডাণ্ডীতে বসে আমার পদদ্বয় ঊর্ধ্বে, মস্তকটি নিম্নে, যেন মাথার কোনও ওয়ারিস নেই।

ডাণ্ডীওয়ালাদের অনুরোধে করি—

—নামিয়ে দাও, আমি বরং হেঁটেই যাব।

আমার আবেদন তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর। তারাও তখুনি হাঁপ ছেড়ে বললে—

—তাই করুন শেঠজী, আমরা আর চলতে পারি না।

বাংলাদেশ থেকে যারাই আসে, তাদের ওরা শেঠজী বলেই ডাকে—ডাণ্ডীতে গেলে তো কথাই নেই।

হেঁটে তো চললাম—কিন্তু পথ কৈ? চড়াই ওঠবার লাঠিও সঙ্গে নেই। কোমর ঝুঁকিয়ে, মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে চলতে গেলেই বুকে খিল ধরে যায়। পা ফসকে যাওয়ার আশঙ্কাও কম নয়। তাছাড়া কাঁটাবনের আলিঙ্গনকে এড়িয়ে চলাও কঠিন। ডাণ্ডীওয়ালারা ডাণ্ডী মাথার ওপর উঁচু করে সামনে এগিয়ে যায়, তাদের মধ্য-স্থলে, ডাণ্ডীর ঠিক নীচেই আমিও হামাগুড়ি দেওয়ার মত গুটি গুটি পা' ফেলি। কিছুক্ষণ চলার পর আর পারি না—দাঁড়িয়ে পড়ি। আবার ডাণ্ডীতে উঠি—আবার নেমে যাই—এই কসরৎ করে শেষটায় ওপরের রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। বেশ খানিকটা পরে পরিমলের ডাণ্ডী দেখা গেল। তবে তিনি আর নামেননি—আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে ডাণ্ডীতেই বসে-ছিলেন। তাঁকে জানিয়ে দিলাম—নীরেনের খামখেয়ালিতেই এত কষ্ট পেতে হ'ল।

৬-১৫ মিনিটে আমরা গুপ্ত-কাশীতে পৌঁছলাম। নীরেন তখন এক গ্লাস গরম চা মুখে নিয়ে খুব মশগুল—সবে তোয়াজ করে চুমুক লাগিয়েছে, চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমীলিত; তাকে সামনে পেয়েই, তার সহধর্মিণী পরিমলের ঝাঁঝ-মেশানো অজস্র, অনুক্ত অনুযোগ। আমি তার ভাশুর কিনা, তাই গলা চড়িয়ে দেবার উপায় নেই। এতক্ষণের দুর্ভোগ ও ক্লান্তিতে কুইনিন মিক্‌শ্চার সেবনের মত পরিমলের চোখ মুখের অবস্থা—উখী মঠের দিকে নীরেনের পথ-নির্দেশের গবেষণায় গভীর অনাস্থা প্রকাশ করে, সঞ্চিত বিরক্তির কাবাব বানিয়ে, সে নীরেনের চায়ের সঙ্গে 'টা'ও যোগ করে দিলে। ভাবলাম সেই নীতিশাস্ত্রের কথা—কারণ নইলে কার্য হয় না।

দেখলাম, নীরেনের অক্ষিযুগল আর আধখোলা নেই সম্পূর্ণ বন্ধ। চিরাভ্যস্ত ভঙ্গীতে এই তিরস্কারটুকু সে পুরস্কার বলেই বরণ করে নিতে চায়।

লক্ষ্য করি, সেদিন নৈশভোজনেও বাক্যালাপ বন্ধ। তবে নীরেন চেষ্টায় আছে পত্নীর মনের অবস্থাটা যদি কোনো রকমে মেরামত করা যায়। নীতিবাক্য স্মরণে আসে—"দাম্পত্যে কলহে চৈব," বহু আড়ম্বর থাকলেও সেটা যে লঘু-ক্রিয়ায় সমাপ্ত হবে, ইথে কোনো সন্দেহ নেই।

(ক্রমশ)

অয়স্কান্ত

॥ পঞ্চম আন্তর্জাতিক জৈব-রসায়ন কংগ্রেস ॥

আগস্ট মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে মস্কোতে পঞ্চম আন্তর্জাতিক জীব-রসায়ন কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫৭টি দেশ থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানি, বুলগেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন ও অন্য কয়েকটি দেশ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন মস্ত এক-একটি দল। কংগ্রেসের ২৮টি বিভাগে মোট ২৭৭০টি নিবন্ধ পাঠ করা হয়েছিল।

ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ এই যে মস্কোতে যখন এই অধিবেশন শুরু হয় তখন অন্য একটি ব্যাপার উপলক্ষে সারা শহরে বান-ডাকা উৎসব চলেছে। ব্যাপারটি হচ্ছে হেরমান তিতোভের সম্বর্ধনা। সকলেই জানেন, মহাকাশ-যাত্রায় জীব-রসায়নের একটি বড়ো রকমের ভূমিকা আছে। ভবিষ্যতের মহাকাশ-যাত্রীকে একাদিক্রমে সপ্তাহ বা মাস বা বছর পর্যন্ত মহাকাশে কাটাতে হতে পারে। সে-অবস্থায় তার বেঁচে থাকার উপযোগী ব্যবস্থা ও পরিবেশ রচনা করা দরকার। এই দায়িত্বপালনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নেবেন জীব-রসায়নবিদরা। কাজেই ঘটনার এই যোগাযোগকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চতুর্থ আন্তর্জাতিক জীব-রসায়ন কংগ্রেসটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভিয়েনায়, তিন বছর আগে। সেই কংগ্রেসে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল তিন হাজার। বর্তমান কংগ্রেসে প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়াতে একথাই প্রমাণ হচ্ছে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অধিকতর সচেতন হয়ে উঠছেন।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ইউনিয়নের সভাপতি স্যার রুডলফ পিটার্স তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, "নিউক্লিয়ার গবেষণার চেয়েও জীব-রসায়নের গবেষণা এখন অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আর নিউক্লিয়ার গবেষণার সঙ্গে জীব-রাসায়নিক গবেষণার একটি পার্থক্য এই যে জীব-রাসায়নিক গবেষণা সমগ্রভাবে মানুষের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত।" জীব-রসায়নের এই সৃজনশীল ভূমিকার জন্যেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন রোগ ও পীড়ার কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে কংগ্রেসে বেশ কিছুটা আলোচনা উঠেছিল। বিশেষ করে আলোচনা উঠেছিল ক্যানসার, পোলিও ইত্যাদি ধরনের কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে।

তবে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই কংগ্রেসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছিল তত্ত্বমূলক নীতির আলোচনায়। জৈব পদার্থের গড়ন ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানবার ও জানাবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

কিন্তু সমস্ত আলোচনার পরেও কংগ্রেসে সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে। বিখ্যাত সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী ওপারিন এ-সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে ওপারিনের তত্ত্বের মূল কথাটি আমরা আগের একটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। সেই তত্ত্বটিকেই তিনি আরো অনেক বিশদভাবে ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।

আমি এই সংক্ষিপ্ত সংবাদটি লিখছি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট উইলিয়ামসনের রিপোর্টের ভিত্তিতে। এই রিপোর্টে কোথাও উল্লেখ নেই, ভারত থেকে কোনো প্রতিনিধি এই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন কিনা। অনুমান করতে পারছি, যোগদানকারী ৫৭টি দেশের মধ্যে ভারতও অন্যতম। এবং ভারতীয় প্রতিনিধিও নিশ্চয়ই একটি নিবন্ধ পাঠ করেছেন। এই নিবন্ধটি কোনো না কোনো ভাবে প্রকাশিত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ পাঠকের কাছে এ-ধরনের খবর নিয়মিত পরিবেশন করার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই—এটা নিশ্চয়ই আক্ষেপের কথা। এখনো পর্যন্ত ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে সবচেয়ে সহজে খবর সংগ্রহ করা যায় বিদেশী পত্রিকা পড়ে। এই প্রসঙ্গে ভারতের জীব-রসায়ন সম্পর্কিত গবেষণা সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করতে পারলে আমি খুশি হতাম।

॥ বিজ্ঞানের দ্বৈত শাখা ॥

ওপরের আলোচনায় জীব-রসায়ন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজি বায়ো-কেমিস্ট্রির বদলে। অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি বা জৈব রসায়নের সঙ্গে এই শব্দটি গুলিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। পাঠককে এ-বিষয়ে সচেতন থাকতে অনুরোধ করছি।

জীব-রসায়ন শব্দটি শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এই শব্দটির মধ্যে বিজ্ঞানের দুটি পৃথক শাখা উল্লিখিত হয়েছে। একটি জীববিদ্যা, অপরটি রসায়নবিদ্যা। অর্থাৎ জীব-রসায়ন বিদ্যাটি এই দুটি পৃথক বিদ্যার সমন্বয়। হালে বিজ্ঞানের এ-ধরনের দ্বৈত শাখা একাধিক। যেমন অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স, যা অ্যাস্ট্রোনমিও বটে আবার ফিজিক্সও বটে। যেমন জিও-কেমিস্ট্রি। যেমন জিওফিজিক্স। বিজ্ঞানের যতো অগ্রগতি হচ্ছে, যতোই এক-একটি শাখার প্রত্যেকটি উপ-শাখা নিয়ে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে—ততোই দুই শাখার মধ্যে পার্থক্য যাচ্ছে ঘুচে। হালের একজন জীববিজ্ঞানীকে অনেক পরিমাণে রসায়নবিদ হতে হবে, জ্যোতির্বিদকে হতে হবে পদার্থবিদ; অর্থাৎ অবস্থাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার সমৃদ্ধির জন্যে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সহযোগিতা প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। কিছুকাল আগেও দেখা যেত, বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানের এক-একটি বিশেষ শাখার ওপরেই হয়তো সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ থাকছে এবং তার ফলে অন্যান্য সমস্ত শাখা অবহেলিত হচ্ছে। মনোযোগের দৃষ্টান্ত হিসেবে পদার্থবিদ্যার উল্লেখ করা চলে। অবহেলার দৃষ্টান্ত হিসেবে মনস্তত্ত্বের। কিন্তু হালে

বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর-নির্ভর-শীলতা এতই বেশি যে মনোযোগ ও অবহেলার মধ্যেও একটা মাত্রা বজায় থাকে।

॥ গবেষণার সুযোগ ॥

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও জীব-রসায়নবিদ অধ্যাপক জে বি এস হলডেন ভারতে রয়েছেন, এবং এই কলকাতাতেই রয়েছেন—এ আমাদের পক্ষে মস্ত এক সৌভাগ্য। গত কয়েক বছরে অধ্যাপক হলডেন নানা পত্র-পত্রিকায় যে-সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন তার অনেক-গুলিই হচ্ছে আমাদের দেশে জীব-রাসায়নিক গবেষণার সম্ভাব্য বিষয় সম্পর্কে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই তিনি একথাটি বার বার বলেছেন যে, ভারতে জীব-রসায়ন সংক্রান্ত গবেষণার বিপুল ক্ষেত্র পড়ে আছে। সত্যিকারের আগ্রহী গবেষকরা যে-কোনো একটি বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। এজন্যে মস্ত গবেষণাগারের প্রয়োজন নেই, অর্থব্যয়ও খুব সামান্যই। বিষয়টিকে বিশদ করার জন্যে তিনি নিজের জীবন থেকে একটি দৃষ্টান্ত একাধিক প্রবন্ধে দিয়েছেন। মানুষের শরীরে লবণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে তিনি একবার একাদিক্রমে বেশ কিছুদিন ঘুমোতে যাবার আগে বিনা জলে লবণ খেয়ে ফেলতেন। অভিজ্ঞতাটি নিশ্চয়ই খুব প্রীতিকর নয়, কিন্তু তাঁর মতে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে এই শারীরিক ক্লেশ অনায়াসেই সহ্য করা চলে। আর তাঁর মুখে এই উপদেশ নিশ্চয়ই শোভা পায়, কারণ তাঁর অধিকাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিজের শরীরের ওপরেই প্রযুক্ত হয়েছে। অবশ্যই তিনি এমন আরো অনেক গবেষণার বিষয় উল্লেখ করেছেন যাতে কোনো শারীরিক ক্লেশ নেই। যেমন, তাঁর মতে, গাছের নারকেল, পুকুরের কচুরিপানা, হাঁস বা মুরগির ডিম, বা এমনি ধরনের অজস্র বিষয় আছে যা নিয়ে খুবই প্রয়োজনীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণা চলতে পারে। কই মাছ ও মাগুর মাছ নিয়ে তো তিনি নিজেই গবেষণা করেছেন এবং একথা ঠিক যে, মাছ নিয়ে সত্যিকারের গবেষণা যদি উৎসাহিত হত তাহলে পশ্চিম বাংলায় মাছের এমন দুর্ভিক্ষ হতে পারত না। অধ্যাপক হলডেনের একজন ছাত্র কেঁচোর মাটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। গবেষণার বিষয় শুনে অনেকে হয়তো হেসে উঠবেন। কিন্তু এই হাস্যকর বিষয়টিও যে কত গুরুতর তা বোঝাবার জন্যে শুধু একটি কথা বলাই যথেষ্ট। কেঁচো সারা বছরে যে-পরিমাণ মাটিকে তলা থেকে ওপরে নিয়ে আসে তা পরিমাণের দিক থেকে এতই বেশি যে, এ-ব্যাপারটির ওপরে জমির উর্বরতা ও গুণাগুণ অনেকখানি নির্ভর করে।

এমনি ভাবে ভাবতে বসলে এই আমরাই এমন আরো অনেক গবেষণার বিষয় উল্লেখ করতে পারি, যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমাদের কাছে অনস্বীকার্য। যেমন, আরো উন্নত ধরনের বীজধান তৈরি করার ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা চলতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায়, প্রতি বছরেই ফলনকে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে আরো বেশি জমিতে চাষ দিয়ে নয়, আরো উন্নত ধরনের বীজ তৈরি করে ও আরো উন্নত ধরনের চাষের ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত আমরা ফলনের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে পারিনি।

আর ভেষজের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে তো আক্ষেপ জানানো ছাড়া আর কিছুই বলার থাকে না। আমাদের দেশে দেশীয় চিকিৎসা-মতে অজস্র ধরনের ভেষজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা চলে, কোনো কোনো ভেষজে সত্যিকারের কাজও হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত দেশে দেশীয় চিকিৎসা-মতে ব্যবহৃত ভেষজ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে এবং প্রয়োজন-মতো ভেষজগুলি আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়েছে। আমাদের দেশে এই অত্যন্ত জরুরি বিষয়েও উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো গবেষণা এখনো পর্যন্ত হয়নি। অথচ, খুব সম্ভবত আমাদের দেশেই এই বিশেষ বিষয়ের গবেষণা সবচেয়ে বেশি সার্থকতা লাভ করতে পারত।

॥ জীব-রসায়নবিদ্যার ভবিষ্যৎ ॥

পঞ্চম আন্তর্জাতিক জীব-রসায়ন কংগ্রেস উপলক্ষে লেখা ওপারিনের একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি। ওপারিন লিখেছেন : "জীব-রসায়নবিদ্যা অভাবিতপূর্ব উন্নতির যুগে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির সমস্ত রহস্যকে পুরোপুরি ভাবে আয়ত্ত করার পথে তা অগ্রসর হয়ে চলেছে। তবে একথা ঠিক যে জীব-রসায়ন-বিজ্ঞানীদের পথ মোটেই সুগম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিশ্বাস তাঁদের আছে যে আশ্চর্য এক সম্ভাবনাকে তাঁরা রূপায়িত করে তুলবেন। ক্যানসার বা কার্ডিও-ভাসকিউলার ও মানসিক বৈকল্য বা এ-ধরনের অন্যান্য অসুখকে তাঁরা নিশ্চয়ই জয় করতে পারবেন। তাঁরা এমন সব সাফল্যও অর্জন করবেন যা শিল্পে ও কৃষিতে প্রযুক্ত হবে। ফোটো-সিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকেও তাঁরা নিশ্চয়ই আয়ত্ত করবেন এবং মহাকাশ-অভিযানের নতুন দায়িত্ব পালনেও তাঁরা সক্ষম হবেন।"

বিজ্ঞানীদের ধারণা, জীব-রসায়ন-বিদ্যার ক্ষেত্রে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন সমস্ত কাণ্ডকারখানা ঘটবে যাকে এক কথায় বলতে হবে চমকপ্রদ। পদার্থবিদরা যেমন পরমাণুর ভেতরকার রহস্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন তেমনি জীব-বিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটিত করবেন জীবনের রহস্যকে। জৈব ব্যাপারের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষের কর্তৃত্ব আরো অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হবে। খুব সম্ভবত বংশগতির ব্যাপারটিকেও এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে যার ফলে জীব-জগৎ ও উদ্ভিদজগৎকে খুশিমতো পাল্টে দেওয়া চলবে।

এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রূপায়ণে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদেরও নিশ্চয়ই কিছু অবদান থাকা উচিত।
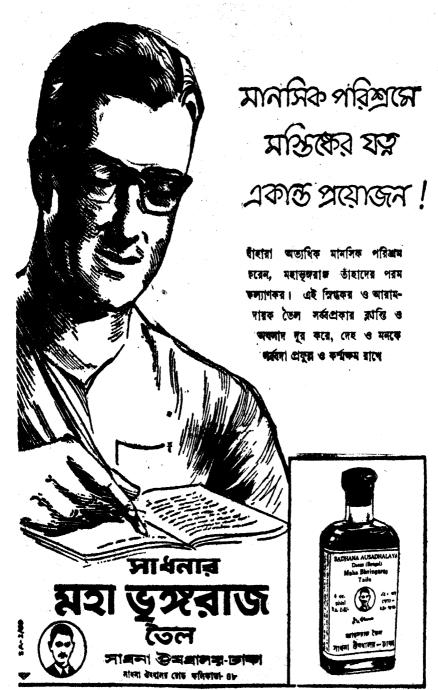
মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকক্ষণ পরে, অনেক বেলা করে ফিরল নীতা বাপকে নিয়ে, ইন্দ্রনীলকে নিয়ে। ইন্দ্রনীলকেও টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে। ভজেছিল ওকেই, 'চলুন আমার সঙ্গে, কলকাতার পথঘাট চিনিয়ে দেবেন। আমি তো একেবারে আনাড়ি।'

'কেন, কলকাতায় কখনো আসেন-নি?'

'বাঃ আসবো না কেন? সে তো বাবার সঙ্গে বাবার বালিকা-কন্যা হয়ে। আর এসেছি তো আত্মীয়দের বাড়ী। তারা খাইয়েছে, বেড়িয়েছে, সিনেমা দেখিয়েছে, বাবা তাদের সকলকে নিয়ে একসঙ্গে তিন চারখানা ট্যাক্সীর শোভা-যাত্রা করে কলকাতা চষেছেন, আমার কি দায়-ছিল পথ চেনবার?'

ইন্দ্রনীল কি সহসা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল অনুপম কুটিরের তুহিন শীতলতা ভেঙে আলোর উত্তাপ প্রবেশ করেছে দেখে! কথা কইতে না পেয়ে পেয়ে কি দমবন্ধ হয়ে উঠেছিল তার? তাই কথা কইবার সুযোগ পেয়ে এত উল্লসিত হয়ে উঠেছিল যে, এত বেশী কথা কওয়া যে এ বাড়ীতে অনিয়ম, তা ভুলে গিয়েছিল?

হেসে উঠে বলেছিল ইন্দ্রনীল, 'মেয়েরা আবার অনেক সময় ইচ্ছে করে বালিকা থাকতে চায়। অথবা নাবালিকা।'

'মেয়েদের ইচ্ছের খবর এখুনি থেকে জানতে শুরু করেছেন? খুব লায়েক ছেলে তো?'

'লায়েক বলে নিজেই তো স্বীকার করলেন। পথ-নির্দেশকের ভার দিলেন।'

'সেটা নেহাত কৃপা করে। দাদারা যে বিরাট কাজের লোক।'

'আমাকেই বা অকর্মা বলে ঠাওরালেন কেন?'

'মানুষ দেখলেই তাকে চিনে ফেলতে পারি, এমনি একটা গুণ আমাকে দিয়েছেন ভগবান।'

'তা' হলে—ইন্দ্রনীল হেসে ওঠে, 'দেখা যাচ্ছে, ভগবৎদত্ত শক্তিও মাঝে মাঝে ফেল করে।'

'আচ্ছা দেখা যাবে।'

সুচিন্তা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর ছোট ছেলের আলো-আলো মুখের দিকে। এত কথা ও শিখল কবে? এত খুশী ও হচ্ছেই বা কিসে?

আরও অবাক হ'লেন সুচিন্তা, অবাক হয়ে কূল পেলেন না যখন ওরা ফিরে এল।

দেখলেন এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই দুজনে দুজনকে 'তুমি' বলছে।

কিন্তু ওদের দিকে বেশী তাকাবার সময় পেলেন কোথা সুচিন্তা, সুশোভন যে ও'র বড্ড বেশী কাছে সরে এসেছেন, আস্তে আস্তে বলছেন, 'দেখ সুচিন্তা, তোমার ওই ছেলেটা তো ভাল নয়।'

সুচিন্তা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকান, খেয়াল করেন না সুশোভন তাঁর কত কাছে সরে এসেছেন।

কি হ'ল, পাগল ভেবে ইন্দ্রনীল কি ও'কে অসম্মাননা করেছে কিছু?

প্রশ্ন করলেন না, শুধু তাকিয়ে থাকলেন।

'তুমি ওকে একটু বকে দিও।' বললেন সুশোভন, 'গাড়ীতে সারাক্ষণ ও আমার মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করেছে।'

তবু ভাল, এই কথা!

আশ্বস্ত হলেন সুচিন্তা।

কিন্তু—সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হলেন কি? হলেন না। মনে করলেন এটা কি? এটা কেন হল!

সুশোভনের মেয়ে কেমন, তা' সুচিন্তার জানা নেই, হয়তো সে বেহায়া বাচাল, হয়তো চিরদিন যে বাপের আওতায় মানুষ হ'ল তার মত না হয়ে ওর সেই মায়ের মতই প্রকৃতি হয়েছে ওর, যে-মা ওকে পৃথিবীতে একলাই ফেলে রেখে চলে গেছে। কিন্তু নিজের ছেলেকে

তো তিনি জানেন। দাদাদের মত ভারিক্কী হয়তো সে নয়, তাই বলে এত হালকা এত চপল? একটা মেয়ে দেখামাত্রই আত্মহারা হয়ে যাবে?

কিন্তু নিজেও কি তিনি আত্মস্থ আছেন? বলতে পারছেন কি 'ছি সুশোভন, এত কাছে আসতে নেই। ওইখানে গিয়ে বস।'

না, তা পারলেন না, শুধু পাগলের এই দুশ্চিন্তাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে বললেন, 'এই কথা! ছেলেমানুষেরা অমন করে। জান না সেই তোমার ঠাকুমা বলতেন, 'ছেলেতে ছেলেতে কথা, কথায় কথায় স্বন্দ্ব।' মনে নেই তোমার ঠাকুমার কথা?'

'ঠাকুমা! আমার ঠাকুমা! আমার ঠাকুমার কথা তোমার মনে আছে সুচিন্তা?' সহসা আবেগভরে সুচিন্তার বাহুমূল চেপে ধরেন সুশোভন, বলেন, 'কী আশ্চর্য্য, এ্যাঁ? আমি কেন সব ভুলে যাই বলতো?'

সুচিন্তার সারা মুখে যেন একটা উত্তাপ ওঠে।

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

না, না এ সম্ভব নয়, এ সম্ভব নয়। এই বেপরোয়া পাগলকে বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়া চলে না। আজই তিনি বলবেন নীতাকে—। বলবেন 'আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি, তুমি আমার এমন ক্ষতি করতে এলে কেন?' বলবেন—'তোমাদের তো কত আত্মীয়!'

আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গেলেন, কিন্তু পারবেন কেন? পাগলের জোর মোক্ষম জোর, কাঁধটা আরও প্রবলভাবে চেপে ধরলেন সুশোভন, সকৌতুকে বলে উঠলেন, 'চল চল, আমরা একলা গিয়ে সেই ছেলেবেলাকার গল্প করি গে।'

সুচিন্তা হতাশভাবে তাকাল নীতার দিকে।

নীতা দুই চোখে মিনতি ভরে তাকায়, তারপর বাপকে টেনে নেওয়ার ভঙ্গীতে হাত ধরে বলে ওঠে, 'আচ্ছা বাবা, বেশ লোক তো তুমি! এখন তোমরা মজাসে ছেলেবেলার গল্প করবে? বেলা হয়েছে না? খিদে পেয়েছে না আমাদের?'

'খিদে? ও তাইতো! তাইতো!' চেয়ারে বসে পড়লেন সুশোভন, 'আমারও বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'ডাক্তাররা তো বার বার এই কথাই বলছে।'

নীতা মাথা হেঁট করে বলে, 'বলছে এই এক ধরনের মনোবিকলন। এ একটা বিশেষ টাইপ। সর্বদা শূন্যতাবোধ, মনে হয় পৃথিবীতে আমার কেউ কোথাও নেই, সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, মরে গেছে। যে লোক সামনে রয়েছে, তার মৃত্যু-শোকে আকুল হয়ে কান্না, এই সব। বাবাও হঠাৎ একদিন কাঁদিতে শুরু করলেন আমার মেয়ে মরে গেছে বলে। কষ্ট করে যে বোঝাতে হল। ঠিক সে অবস্থাটা অবশ্য দু'চারদিনই ছিল। এখানে যতটা দেখাবার দেখানো হয়েছে, ডাক্তার দেশে নিয়ে গেলাম, ভাল লাগল না। পথে বেরোলেই চীৎকার করেন 'পড়ে যাবি পড়ে যাবি।' লজ্জায় মারা যাই। সকলেই বলছে—একবার দক্ষিণীতে—কিন্তু ওই এক কথা, সব ডাক্তারই বলছেন, 'প্রধান ওষুধ স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘিরে রাখা। বুঝতে দেওয়া তোমার সবাই আছে, কেউ মরে যায়নি, কেউ তোমাকে ছেড়ে চলে যায়নি—'

সুচিন্তা ঈষৎ কঠিন স্বরে বলেন, 'কিন্তু সেটা যে এখানে সম্ভব হবে, এমন কথা তোমার মাথায় এল কেন? আমাকে তুমি চেন না জানো না, জীবনে কখনো দেখনি—,

নীতা মুখ তুলে সামান্য হেসে বলে, 'না দেখলেই কি চেনা-জানা হয় না?'

'আমার পক্ষে এটা একটা রহস্য। জগতে তাঁর সবাই আছে এটা বুঝতে দিতে হ'লে তো অনেকের মধ্যে নিয়ে গিয়েই রাখা উচিত। চারিদিক থেকে যারা স্নেহ-মায়া দিয়ে ঘিরে রাখতে পারবে।'

নীতা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'তা' হয় না! অনেক লোক দেখলে উনি ভয় পান। এমন একজনকে দরকার, যার মধ্যে রোগীর মনের সমস্ত শূন্যতার পরিপূর্ণতা।'

দপ্ করে, জ্বলে উঠলেন সুচিন্তা, যেটা শুধু নীতার কাছে নয়, তাঁর নিজের কাছেও অভাবিত। জ্বলে উঠে বললেন, 'সেই একজন যে আমি হতে পারি—এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তোমায় বললে কে?'

নীতা ম্লান স্বরে বলে, 'কেউ বলেনি, আমি নিজেই ভেবেছিলাম। আমি জানতাম পিসিমা, আপনি বিব্রত হবেন, বিপন্ন হবেন, কিন্তু বিরক্ত হবেন তা' ভাবিনি।'

সুচিন্তা নিভে যান।

ব্যাকুলভাবে বলেন, 'তুমি আমার মুশকিলটা বুঝতে পারছ না নীতা! আমার ছেলেরা বড় হয়েছে।'

'বড় হয়েছে বলেই তো ভরসা করে এসেছি। ও'রা বুঝবেন। ও'রা অবশ্যই জানেন এ থিয়োরি। মনোবৈকল্যের একমাত্র ওষুধ একটু স্নেহ-কোমল মনের স্পর্শ, যেটা কৃত্রিম নয়, ভাড়া-করা নার্সের নয়। আপনার ছেলেরা হয়তো বুঝেও বিরক্ত হবেন, কিন্তু তা'তে আপনার কতটুকু ক্ষতি?'

সুচিন্তা' শুধু হাসি হাসলেন, 'ক্ষতির পরিমাপ করবার সাধ্য তোমার নেই নীতা! বয়স হ'লে, ছেলেদের মা হলে বুঝতে পারবে। গুরুজনদের চাইতে অনেক বেশী সমীহ করতে হয় লঘুজনকে।'

'এ কথা যে একেবারে বুঝতে পারি না পিসিমা, তা নয়,' নীতা বললে 'কিন্তু এও যে বুঝতে পেরেছি আপনারা চিরকাল দু'জনে দু'জনকে কত বেশী ভালবেসে এসেছেন।'

সুচিন্তার মুখটা আবার ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল, বললেন, 'গুরুজনদের সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা আমরা কখনো করতাম না নীতা!'

নীতা অবিচলিত মুখে বলে, 'কেন করতেন না? ভালবাসা জিনিসটাকে ভয়ানক একটা গোপনীয় বলে ভাববারই বা আছে কি? জানলেই বা আপনার ছেলেরা, জীবনে আপনি কাউকে ভালবেসেছিলেন! ও'রা যদি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, সহানুভূতিশীল হন, অবশ্যই আপনার মনের নিঃসঙ্গতা বোঝবার ক্ষমতা ও'দের হবে।'

'এই একটা জায়গায় স্বামীপুত্র কখনো সহানুভূতিশীল হয় না নীতা! হতে পারে না।'

'অভ্যাসের অভাব! দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের দরকার। আর সে পরিবর্তন আমাদেরই আনতে হবে। এ শুধু আমি এই এক ক্ষেত্রে বলছি না পিসিমা, সকলের কথা ভেবেই বলছি। আমি এটা মনের সঙ্গে বিশ্বাস করি বলেই না সাহস করে আপনার কাছে চলে আসতে পেরেছি। জানি ভালবাসার শক্তিতে অনেক কিছুই সম্ভব। সেই শক্তির জোরে আপনি অনেক কিছু তুচ্ছ করতে পারবেন। আর সেই পারার মধ্য দিয়েই একটা মানুষকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন বিলুপ্তির পথ থেকে, ধ্বংসের পথ থেকে। এ আমার আপনার কাছে নয়, মানুষের মানবিকতার কাছে আবেদন। রোগীকে সেবা করবার মতই শুধু একটু স্নেহ-মমতার স্পর্শ দেওয়া। আপনাকে তো চেষ্টা করতে হবে না, বানাতে হবে না, অভিনয় করতে হবে না।'

সুচিন্তা হতাশ কণ্ঠে বলেন, 'আমাকে যে চেষ্টা করতে হবে না, বানাতে হবে না, এই খবরটা তুমি কোথায় পেলে সেটাই শুধু বুঝতে পারছি না।'

'আমি আপনাকে চিরদিন জানি পিসিমা। বাবার ডায়েরী এক যত্নের নিভৃতে দেখেছি আপনার ছবি, আপনার ঠিকানা, খাতার পাতাভর্তি আপনার নাম। একটা পাতায় বারে বারে লেখা সুচিন্তার নতুন বাড়ীর ঠিকানা।'

সুচিন্তা বুঝি এবার লজ্জিত হতেও ভুলে যাচ্ছেন, অশ্রুতপূর্ব এই কাহিনী তাঁকে বিহ্বল করছে, বিকল করছে। তাই ধূসর-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন নীতার দিকে।

নীতা আবার বলে, 'এদিকে আমার ভীষণ অমায়মনস্ক তো! আর বাড়ীতে আমার সর্বত্র অবারিত হস্তক্ষেপ, তাই সেই নিভৃতের, নির্জনতা যখন-তখনই এসে ধরা দেয় আমার কাছে। একদিন দুষ্টুমি চাপল মাথায়, দিব্যি আলগা আলগা হয়ে বললাম, 'সুচিন্তা কে বাবা?'

তখনো এমন হয়ে যাননি, তখন খালি সবকিছু ভুলে যান। বুঝতে পারিনি ব্রেণ ফেল করছে, মনে করতাম বেশী ভুলো হয়ে যাচ্ছেন। আমার প্রশ্নে চমকে উঠলেন, বললেন, 'সুচিন্তার কথা তোমায় কে বলল?'

নিরীহ ভাবে বললাম, 'তোমার টেবিলে একটুকরো কাগজে একটা ঠিকানা লেখা ছিল দেখলাম, 'সুচিন্তা মিত্র অনুপম কুটির। কে বাবা?'

বাবা উত্তর না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কই, সে কাগজ কই?'

বললাম, 'ও মা—সেতো ঘর-টর ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।'

'ফেলে দিয়েছে।' বলে একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, 'সুচিন্তা কে, সে কথা জেনে তোমার কোন লাভ নেই।'

আমি তো চিরকাল বেপরোয়া, বললাম, 'বাঃ তোমার চেনা লোক আমি চিনতে পাব না? বললেন, 'আমার সব

চেনা লোককে তুমি চেন? চেন আমার অফিসের লোকদের সবাইকে?'

যুক্তির কাছে হার মানলাম। কিন্তু 'সুচিন্তা' কে, সেটা স্পষ্ট হলো। তারপর তো ক্রমশঃ রোগ ধরা পড়ল, বদলে গেলেন, আত্মস্থতা হারিয়ে ফেললেন। ছেলেমানুষের মত হয়ে গেলেন। তারপর সেই একদিন—সারা বাড়ী তোলপাড় তচ্‌নচ্‌ করে কী যেন খুঁজতে লাগলেন, কাউকে কিছু জিগ্যেস নেই। চাকররা ধমক খেয়ে পালাচ্ছে। হঠাৎ যেন হতাশ হয়ে আমায় বলে উঠলেন, 'সুচিন্তার চিঠিগুলো কোথায় গেল বল তো নীতা? সেই রেশমী ফিতে-বাঁধা একতাড়া চিঠি! এত খুঁজছি, কোথাও পাচ্ছি না। তুই একটু খোঁজ না মা, আমার সেগুলো বড্ড দরকার। হারালে চলবে না।'

আবার সুচিন্তার কান মাথা মুখ সব দিয়ে বুঝি আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছে। তীব্রস্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'সে কথা তুমি বিশ্বাস করলে?'

'কোন কথা?' নীতা এই রাগের ঠিক খেই ধরতে পারে না।

'ওই কথা! ওই চিঠির কথা! জীবনে কখনো আমি ওকে চিঠি লিখিনি।'

'কখনো লেখেননি?'

নীতার চোখে অসীম প্রশ্ন, নীতার কণ্ঠে অনন্ত বিস্ময়।

'না না—ককখনো না। তুমি তো খুঁজলে, পেলে তুমি?'

নীতা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'না!'

'তা' হলে তুমি কেন ভাবলে না এটা পাগলের পাগলামি।'

নীতা ম্লান স্বরে বলে, 'তখনো অতটা বুঝতে পারিনি। তা' ছাড়া ভাবলাম এটা আর এমনই বা অসম্ভব একটা কি! তাই খুঁজলাম, অনেক খুঁজলাম, পাওয়া গেল না। রেগে চেঁচিয়ে এক করলেন। বললেন, 'দূর করে দেব সবাইকে, বাড়ী থেকে বার করে দেব। সব কটা একের নম্বরের চোর হয়েছে।'... জোর করে ঘুমের অষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হ'ল। পরদিন থেকে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন, নিস্তেজ হয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, 'সবাই মরে গেছে।'

সুচিন্তাও বুঝি ঠাণ্ডা মেরে গেলেন, স্তিমিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'তার মানে তখনই ব্রেণ একেবারে ফেল করছে। তাই অবলম্বনের আশায় মন-গড়া একটা চিঠির তাড়া খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন!

'হয়তো তাই!'

'হয়তো নয় নীতা, নিশ্চয়। বিশ্বাস কর, আমরা কেউ কাউকে কোনদিন চিঠি লিখিনি।'

'আশ্চর্য!' নিশ্বাস ফেলে নীতা।

'কিন্তু আমাকে এখন কি করতে হবে বল?'

'বললাম তো আপনাকে, শুধু আপনার কাছে কিছুদিন আশ্রয় দিতে হবে আমাদের! শুধু বাবার কোনও আচরণ যদি আপনাকে বিব্রত করে সেটা পাগলের খেয়াল বলেই ক্ষমা করবেন। আপনার কাছাকাছি কিছুদিন থাকতে পেলেই বাবা সেরে উঠবেন পিসিমা!'

মিনতি ঝরে পড়ে নীতার কণ্ঠে।

সুচিন্তা ম্লান হাসেন।

'তুমি ছেলেমানুষ নীতা, আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তা' করলে আমার ছেলেরা আমায় ক্ষমা করবে কেন?'

'আপনার বয়সের একটা সম্মান নেই?'

তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে নীতা।

সুচিন্তা আর একবার হাসেন। 'বয়সের সম্মান? মেয়েদের? আশির আগে নয়।'

'মেয়ে হয়ে এই আত্মঅবমাননাকর কথা বলছেন আপনি?'

'না বললেই কি জিনিসটা মিথ্যে হয়ে যায় নীতা? আমার ছবির কথা বলছিলে না? ওই রকম একটা ছবি, ছোট্ট ছবি আমার কাছেও ছিল। ছিল কোনও এক সুদূর অতীতে। সেকালের ভাবপ্রবণ যুগের ছেলে-মেয়ে তো?' একটু হাসলেন সুচিন্তা, 'সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, মা-বাপের মুখ হেঁট করবো এতবড় দুঃসাহসের কথা কল্পনা করতেও পারি নি, 'সমাজের পায়ে আত্মবলিদান করলাম,' এমনি একটা সেন্টিমেন্ট খাড়া করে, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওই ছবি বিনিময়!... কোন এক মুহূর্তের অসতর্কতায় সে ছবি পড়লো অন্যের হাতে!' সুচিন্তা আবারও হাসলেনই, 'তোমরা এ যুগের মেয়েরা হয়তো বিশ্বাসই করতে পারবে না, সেই ছবি নিজে হাতে করে পোড়াতে হল আমায় তাঁর সামনে। আগুনে ফেলে দিয়ে নয়, মোমবাতির শিখায় ধরে। চেয়ে চেয়ে দেখতে হ'ল কেমন করে কুঁকড়ে উঠছে মুখটা, ঝলসে যাচ্ছে চোখ দুটো, পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে সবটা। শিউরে উঠছ? না শিউরে ওঠবারও কিছু নেই, খুব যে একটা ভয়ানক অত্যাচারী মানুষ ছিলেন তিনি তাও নয়, তাঁর কাছে পবিত্রতার আদর্শ ওই রকমই ছিল। আমাকে যন্ত্রণা দিতে চাননি, হিন্দু নারীর পবিত্রতার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।'

'তারপরও তাঁর সঙ্গে সংসার করে চললেন আপনি?'

'এই শোন পাগলা মেয়ের কথা! করবো না তো যাবো কোথায়? তা'ছাড়া এইটুকু মাত্র সান্ত্বনা ছিল লোকটা অবোধ।'

'তা' আপনার ছেলেরা তো অবোধ নয়?'

'নয় বলেই তো আরও ভয়।'

'কেন ভয় করতে যাবেন?' নীতা জোরের সঙ্গে বলে, 'আমি তো কোনদিন আমার বাবাকে দুর্বলচরিত্র ভেবে ঘৃণা করতে বসিনি। ও'রাই বা তেমনটা করবেন কেন? মানুষ শুধু তার পরিবারের সম্পত্তি, মানুষের সম্পর্কে এটাই শেষ কথা হবে কেন? প্রত্যেক মানুষেরই পারিবারিক জীবনের ঊর্ধ্বে আর একটা জীবন থাকে, অন্তত থাকতে পারে, সেই তার মানসিক জীবনকে পরিবারের আর সকলের শ্রদ্ধা করা উচিত। তা' হোক সে জীবন তার আধ্যাত্মিক জীবন কি শিল্পী জীবন, কি প্রেমের জীবন।'

'উচিত মেনে সবাই চললে পৃথিবী তো স্বর্গ হতো নীতা!'

'মানাতে হবে পিসিমা! অপরের অকারণ অসন্তোষকে ভয় করাটা ছাড়তে হবে। দেখবেন অগ্রাহ্য করতে করতেই তার ধারালো দাঁতটা ক্ষইয়ে এনেছেন আপনি। সমাজের সব পরিবর্তনই এমনিভাবে আসে। অগ্রাহ্য করে করে।'

'ভালমন্দের বিচারটাও তো আগে করতে হবে? কেবলমাত্র অগ্রাহ্য করার মধ্যেও তো কোন বাহাদুরি নেই?'

'সে তো অবশ্যই পিসিমা! ভাল সেটাই যাতে আমার বিবেক পীড়িত না হয়, মন্দ সেটাই যাতে আমার আত্মা আহত হয়। মনে করবেন না আমি কেবলমাত্র আমার নিজের স্বার্থের দিক দেখেই বলছি। সাধারণভাবেই বলছি, আপনার এই বয়সে, যখন দেহমন অনেক অবিচলতাময়ুক্ত, আপনার চিরদিনের প্রিয়জনের জীবনরক্ষা করতে, তাঁকে একটু স্নেহ-সাহচর্য দিতে কি আপনার বিবেক

পীড়িত হবে? ভেবে দেখুন, যদি তা হয়, আপনাকে অনুরোধ করবো না। কিন্তু পিসিমা, কেউ জলে ডুবে যাচ্ছে দেখলে কি তাকে তুলতে গিয়ে লোকে দ্বিধা করে—ডুবন্ত মানুষটা মেয়ে না পুরুষ, কমবয়সী কি বুড়ো-হাবড়া?'

"তারপরও তাঁর সঙ্গে সংসার করে চললেন আপনি?"

'তুলনা তো কতই আছে নীতা, যুক্তি আর তুলনা এক নয়। সুশোভনের কী পরিচয় দেব আমি? যদি কেউ জিগ্যেস করে 'কে উনি?' উনি এখানে কেন?'

আপনার এখানে তো কৌতূহলী আত্মীয়র ভিড় নেই পিসিমা?'

সুচিন্তা সচকিত হয়ে বললেন, 'ভিড় নেই একথা তোমায় কে বলল? আমার বাড়ীর তুমি কি জানো?'

'কত কি!' বলে হেসে ওঠে নীতা।

'হাত গুনতে জানো, এমন কথা তো বিশ্বাস করতে পারি না, এই দু'ঘন্টার মধ্যে বাড়ীর সব গল্পই করে ফেলেছে বুঝি আমার বোকা ছেলেটা।'

'বোকা নয়, সরল!' আবার হাসে নীতা, 'এ বাড়ীতে যে কোনও গল্প নেই, সেই গল্পই করেছে। আপনারা সকলেই গম্ভীর বলে ওর আর দুঃখের শেষ নেই। বলে আমাদের বাড়ীতে আমরা পাল্লা দিয়ে সভ্য হবার সাধনা করে চলেছি। দাদা ফার্স্ট, মা সেকেণ্ড, মেজদা থার্ড, আমি ফেল্। কিন্তু জোর করে মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতে হয় আমাকে, পাছে আশ্রমপীড়া ঘটাই।'

সুচিন্তা কি বলবেন ভেবে না পেয়েই বোধহয় বললেন, 'হ্যাঁ ও বরাবরই একটু ইয়ে। ওদের বাড়ীর ধারা কিছু পেয়েছে ও।'

নীতা হেসে ফেলে বলে, 'গঙ্গা গোমুখী, কার মধ্যে যে কোন ধারা সুপ্ত আছে, নিজেই জানে না কেউ। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ অকস্মাৎ ঘটে।'

সুচিন্তা মনে মনে বললেন, 'তুমি কি এলে আমার এই শান্ত স্তব্ধ হিমাচলের স্তব্ধতা ঘুচিয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করতে?' ভাবলেন, 'কি জানি কেমন মেয়ে! একটু কি বেশী অগ্রসর? বেশী বেহায়া?'

ইন্দ্রনীল ছেলেমানুষ!

ইন্দ্রনীলের কথাটা ভেবে মন খুঁতখুঁত করতে লাগল।

'সকালে তো আপনার সঙ্গে চেনাই হ'ল না।' নিরুপমের ঘরে এসে হানা দিল নীতা। না বলতেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'সেই যা একবার দেখলাম।'

এ আবার কেমন সপ্রতিভ মেয়ে!

ভাবল নিরুপম, মুখে বলল, 'চেনা হওয়া কি এত সহজ?'

'সহজ তো নয়ই,' হেসে ওঠে নীতা, 'কিন্তু শক্ত কাজেই তো আনন্দ।'

নিরুপম ঘরে আছে, অথচ তার হাতে বই নেই, এ রকমটা বড় দেখা যায় না, হাতের সেই বইটায় চোখ ফেলে সে বলে, 'ইন্দ্র গল্প-টল্প করতে পারে।'

'তার মানে আপনি পারেন না।' নীতা অমায়িক মুখে বলে, 'এর থেকে সোজাসুজি বলে দিলেই হ'ত বড়দা, 'তুই আমাকে জ্বালাতন করতে আসিস না, তুই আমার ঘর থেকে দূর হ।'

বড়দা!

তুই!

নিরুপম বোধকরি এই বাক্‌বিন্যাস-ভঙ্গীতে ঈষৎ চমৎকৃত হয়। চোখ তুলে দেখে। না, মোহিনীমায়ার চোখ নয়। হেসে বলে, 'তার মানে হচ্ছে আমি মোটেই গল্প চালাতে পারি না।'

'না-ই বা পারলেন, ঘরে একটু-আধটু ঢোকবার অনুমতি দিলেই বর্তে

যাব। ঈস্ কত বই! সারাদিন ধরে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছি।'

নিরুপমও ভেবে কথা চালাতে পারে?

সে বলে, 'তা' ঢুকে পড়লেই বা বাধা দিত কে? দরজা তো খোলাই ছিল।'

'খোলা দরজাই তো সবচেয়ে ভয়ংকর। বিশ্বাসের প্রহরী অদৃশ্য থেকে বাড়ী পাহারা দেয়।'

'কতদূর পর্যন্ত পড়েছ তুমি?'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে একেবারে সাদা কথায় চলে আসে নিরুপম। চলে আসে আপনি থেকে 'তুমি'তে। বড়দার মতই কথাবার্তা কয়।

'এই সেরেছে! মাস্টারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ঠিক ধরে ফেলেছেন তো, এ বেচারার কোন্‌খানটা কাঁচা! পড়তে আর পেলাম কই?' একটু বুঝি নিশ্বাস পড়ে নীতার। বলে, 'থার্ডইয়ারে পড়তে পড়তেই তো বাবার এই অসুখ করলো। একা রেখে যাওয়া যায় না, গেলে স্বস্তি পাই না, বাবাও কাজের সময় পূর্ণ না হতেই রিটায়ার করলেন, তারপর থেকেই তো চলছে এই।'

'কতদিন অসুখ তোমার বাবার?'

'এই তো প্রায় তিন সাড়ে তিন বছর।

আর কত কথা কইবে নিরুপম?

সাধ্যের অতিরিক্তই কয়েছে।

তাই ফের সে হাতের বইয়ে মনঃসংযোগ করে। নীতা উঠে পড়ে ঘুরে ঘুরে বই দেখতে থাকে। সত্যিই বটে, 'ঈস্' করার মত বই। দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আলমারির পাশে ওটা কি? নীল মোটা কাপড়ে জড়ানো দেয়ালে ঝুলছে।

তানপুরা!

আর আলমারির মাথায়।

'তানপুরা, বাঁয়া তবলা! ঈশ! আপনার বুঝি খুব গান-বাজনার সখ?'

'আমার?' হেসে ওঠে নিরুপম, 'সখ ছিল বাবার। আমার বাবার। যখন-তখন গানের মজলিশ বসতো বাড়ীতে।'

'আঃ কী মজা ছিল আপনাদের!'

'মজা!'

'মজা নয়? গান এত ভাল লাগে আমার! অর্গ্যান নেই?'

'তাও আছে।'

'আমি বাজাবো!'

'পারো বুঝি?' নিরুপম হেসে বলে, 'অনায়াসে বাজিও, শুধু আমি যখন বাড়ী থাকবো না।'

'কেন? আপনি ভালবাসেন না?'

'না। অসহ্য!'

'গান আপনার অসহ্য? ও বড়দা, আপনি তো তা'হলে মানুষ খুন করতে পারেন। আমি এই চললাম রেডিও খুলতে। তাই ভাবছি রেডিও কেন বোবা হয়ে পড়ে আছে।'

'আমাকে তা'হলে বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে।'

'আচ্ছা দেখবেন, একদিন এমন গান গাইবো, যে—'

'—যে পাড়াসুদ্ধ সকলকে পাড়া থেকে চলে যেতে হবে, কেমন এই তো?' গম্ভীরভাবে বলে নিরুপম। কিন্তু সেই গাম্ভীর্যের অন্তরালে একটু কৌতুকের ফল্গুধারা বোধকরি উঁকি মারে, আর তারই প্রশ্রয়ে খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে নীতা।

এ হাসির শব্দে ওপাশের ছোট ঘর থেকে চমকে উঠলেন সুচিন্তা, এ পাশের ভাল ঘর থেকে নীলাঞ্জন।

এত হাসে কে?

কার ঘরে হাসছে এত!

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন সুশোভন।

'আমাকে একলা ফেলে কোথায় চলে এসেছিস নীতা! আমার ভয় করে।'

নীতা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'কোথায় যাব? এই তো বড়দার সঙ্গে চেনা-জানা করতে এসেছি। ভয় করছে—তোমার? ভূতের ভয়?'

হাসতে থাকে মজা করে করে।

'এই দেখ!' সুশোভন ঘরে ঢুকে এসে খাটের একধারেই বসে পড়ে বলেন, 'কি যে তুই বলিস! ভূতের ভয় কি? তোরা আমায় ফেলে কোথায়ও চলে গেলি না কি,—'

'সে কি, তা' কেন যাবে?' নিরুপম স্নেহ-কোমল স্বরে বলে, 'তাই কি যায় কেউ?'

না, এই সৌম্যদর্শন অসহায় মুখ ভদ্রলোকের প্রতি বিরূপতা আসছে না তার, বরং মমতাই আসছে।

'যায় না বলছ?'

আশ্বস্ত হল সুশোভন। তার পর সকৌতূহলে বলেন, 'তুমি যেন কে হও এ বাড়ীর?'

'ও কি বাবা, উনি যে এ বাড়ীর বড়বাবু, সুচিন্তা পিসিমার বড়ছেলে।'

'ও বুঝেছি, সুচিন্তার তো ছেলাই ছেলে। তুমি বড়? কি পড় তুমি?'

'পাগল' নামক জীবটা মানুষের কাছে চির কৌতূহলকর, যেন সে কি এক রহস্যের খনি, প্রশ্নোত্তরের ঢিল ফেলে ফেলে সন্ধান মিলবে সেই রহস্যের। তাই পাগলের সঙ্গে কথা বলতে মজা পায় মানুষ, পায় কৌতুকের নেশা।

স্বল্পবাক নিরুপমও সেই নেশায় মাতে বুঝি। তাই উত্তর দেয়, 'পড়ি না কিছু।'

'পড় না? এত বড় ছেলে পড়ালেখা কর না—সেটা তো ঠিক না।'

'না বাবা, উনি পড়ান।'

'পড়ান? কাকে?'

'ছাত্রছাত্রীদের। ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি।'

সুশোভন মোটা ভুরু দুটো কপালে জোড়া করে এনে বলেন, 'তবে যে বললে সুচিন্তার ছেলে? এত বড় ছেলে কখনো সুচিন্তার হতে পারে?'

'কী আশ্চর্য! পারবে না কেন? তোমার আমি এতবড় মেয়ে না?'

'তুমি আবার কত বড়! এই তো সেদিন ফ্রক পরে বেড়াতে!' সুশোভন বলেন, 'যাই, দেখি সুচিন্তাকে জিগ্যেস করিগে।'

'জিগ্যেস করবে? কি আবার তুমি জিগ্যেস করবে?'

'ওই যে, এতবড় ছেলে কেন সুচিন্তার!'

'থাক্ বাবা, ও তুমি জিগ্যেস করতে যেও না,' নীতা বাপকে আকর্ষণ করে, 'পিসিমা দুঃখিত হ'বেন।'

'দুঃখিত হবে? তবে থাক, তবে থাক।'

'বাবা গান শুনবে?'

'গান?' উৎসাহিত হয়ে ওঠেন সুশোভন, 'গাইবি? চল চল শুনিগে।'

মেয়ের হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে যান তিনি।

'এইভাবে চালিয়ে চলেছেন?'

মৃদুস্বরে বলে নিরুপম।

নীতাও মৃদুস্বরে বলে, 'উপায় কি! তবে ও'কে চালানর চাইতে বেশী মুশকিল আশপাশের সুস্থমস্তিষ্ক লোকেদের চালান। ও'র কথা বা ও'র আচার-আচরণগুলোকে কেউ ক্ষমা করে চলতে বা উড়িয়ে দিতে রাজী হয় না, সহজদের মত সমান গুরুত্ব দিতে চায়। ওই জন্যে ট্রেনে তো একজনের সঙ্গে ঝগড়াই হয়ে গেল আমার।'

'নীতা কী এত কথা কইছ তুমি, সুচিন্তার বড়ছেলের সঙ্গে? চল চল, গান শোনার দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।'

নীতা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে, 'গাইব কি? এ'রা তো এ'দের বাজনা-টাজনাগুলো দিতেই রাজী হচ্ছেন না।

'রাজী হচ্ছে না? কে রাজী হচ্ছে না শুনি?' সুশোভন ক্রুদ্ধ স্বরে বলে ওঠেন, 'সুচিন্তাকে বলে দেব না!'

'তাই যাই বাবা! বলে দিয়ে বকুনি খাওয়াই তো এ'দের।' বলে হাসিমুখে বাপকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নীতা।

(ক্রমশঃ)

আহারের পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা

॥ পুষ্প বসু ॥

প্রত্যেক মা তাঁদের সন্তানদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন, এবং এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আজকালকার এই দুর্মূল্যের দিনে সকলের মুখেই ঐ এক কথা শুনতে পাওয়া যায়, "পোড়োবাজারেও আগুন লাগল! এমন ছেলেপুলেদের খেতে দেবো কি? ডাল-চচ্চড়ি খেয়ে কি আর ছেলেপুলে বাঁচবে না তাদের স্বাস্থ্য থাকবে!"

কথাটা যে খুবই সত্যি, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়! আমাদের শরীর ধারণের পক্ষে প্রধান খাদ্য হচ্ছে, মাছ, মাংস, ডিম, ফল আর দুধ। কিন্তু এই সব খাদ্যই বর্তমানে যে অসম্ভব দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে তাতো আমরা সবাই মনেপ্রাণে অনুভব করছি। তবে আমি বলব, আমাদের অর্থাৎ মায়েদের এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করে নিতেই হবে—যার যেমন অবস্থা। বাজার থেকে যা আসবে, যেমন ডিম, আলু, পটল, কুমড়ো, পেঁপে, কাঁচকলা, ডুমুর, শাক ইত্যাদি এর মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে নানাভাবে যত্ন ও ধৈর্য সহকারে রান্না করে ছেলেপুলেদের সামনে ধরে দিতে হবে।

রান্নাবান্নার নানাবিধ প্রক্রিয়া ও উপকরণের কথা প্রায়ই শোনা যায় এবং চোখে পড়ে সংবাদপত্রসমূহের মহিলা-বিভাগে, এবং অল ইণ্ডিয়ার রেডিওর মহিলা মহলে ও মাসিক পত্রে। কিন্তু বর্তমানে আমরা তাতে বিশেষ উপকৃত হই বলে আমার মনে হয় না। আজকাল রান্নার বই অনেক বেরিয়েছে, আমরা ইচ্ছা করলে এইসব রান্নার বই থেকে নানাবিধ রান্না ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত প্রণালীগুলি শিখে নিতে পারি। কিন্তু আমাদের গেরস্ত-পোষা দৈনন্দিন খাবারের প্রয়োজন বা চাহিদা বোধ হয় ঠিকমত মেলে না, অথচ অধুনাকালে তারই প্রয়োজন বেশী। অল্প খরচায় মাছ, মাংস, ডিম ছাড়াও ভাল স্বাস্থ্যকর খাওয়া কিভাবে হতে পারে সেই সম্বন্ধে আমরা যদি একটু সচেতন হই এবং পরিশ্রম ও ধৈর্য সহকারে আহারের ব্যবস্থা করি, তাহলে অল্প খরচায় আমাদের ছেলেপুলেদের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকবে এবং অভিভাবকরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

এমন এই খাবারের ব্যবস্থা—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, অবশ্য স্থান সংকুলানের জন্য আমি খুব সংক্ষেপে বলছি —সকালে দুধের পরিবর্তে খেতে দিন আদা-ছোলা, আটার রুটি অথবা গুড়-মুড়ি, এর সঙ্গে যে কোন একটি ফল, যথা—পেয়ারা, শশা অথবা নাসপাতি যা যখন জোটে, উপরন্তু দিতে পারলে ভাল হয়। যেমন প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে একটি করে মুরগীর ডিম, অবশ্য ডিমটি সিদ্ধ না করে একবার মাত্র ফুটন্ত জলে এক মিনিট ফুটিয়ে সেই ডিম খাওয়া এবং শীতকালে টোমাটো সস্তা, সে জন্য ডিম টোমাটো আলু-সিদ্ধ ও কড়াইসুঁটি একত্রে মিশিয়ে নুন ও গোলমরীচ পাঁউরুটির সঙ্গে, অতি উপাদেয় যাকে বলে, অর্থাৎ আহার ওষুধ দুইই হয়।

ভাত পাতে—সবুজ টাটকা শাক-সব্জি, যাতে অধিক পরিমাণ ভিটামিন ও উপকারিতা আছে, যেমন লাউ, বাঁধাকপি, কাঁচা পেঁপে, পটল, ডুমুর, পালমশাক, বিট গাজর সীম ইত্যাদি। তেতো রোজই কিছু খেলে ভাল হয় ভাত-পাতে, হয় শুক্তো, নচেৎ নিম-বেগুন ভাজা, উচ্ছে-আলু ভাতে, পলতার বড়া। মসুর ডাল মাংসের কাজ করে, পিঁয়াজ ফোড়ন দিয়ে ডাল, আর সব রকম আনাজ খোসাশুদ্ধ সেদ্ধ করে, তাতে সামান্য হলুদ জীরা মরীচ ও ধনে বাটা ও লবণ দিয়ে নাবিয়ে নিন, তারপর এক চামচ ঘি দিয়ে পেঁয়াজ
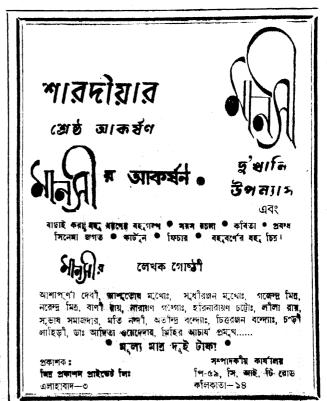
ভেজে সাঁতলান, আদা বাটা ও একটু দুধ দিয়ে নাবিয়ে নিন, ঘন বা পাতলা ঝোল—যে যেমন ভালবাসে সেইমত করা দরকার। ভেতো, ডাল, ঝোল এবং যে কোন একটা অম্বল বা চাটনী।

মধ্যাহ্ন ভোজন, টিফিন বা জলখাবার—পাঁউরুটি মাখন, কলা, মোহনভোগ, বাড়ীতে তৈরী জ্যাম-জেলী। একঘেঁয়ে খাবার রোজ না দেওয়াই ভাল, প্রায়ই খাবারের এবং তরকারীর অদল বদল করা চাই। যেমন টিফিনে পাঁচ-ছটি ছেলে-মেয়ের জন্য দুটি ডিমের সংগে আলু সেদ্ধ, ধনেপাতা কাঁচালংকা কুচিয়ে মিশিয়ে নিয়ে বড়া করা। আবার আটা ময়দার সংগে কুমড়ো আলু সেদ্ধ চটকে মিশিয়ে, তাতে গোলমরীচ, নুন একটু মিষ্টি, ধনেপাতা, পিয়াজ, আদা, রসুন-বাটা মেখে, লুচির মত নেচি করে কচুরীর মত ভাজুন। ঘি কম থাকলে, পরটার মত চাটুতে সেঁকে নিলেও খেতে খুব ভাল লাগে। কোনদিন নারকোল ইত্যাদি দিয়ে আলুকাবলী, বাড়ীতে ব্যাসন দিয়ে বেগুনী অথবা পেঁয়াজী মুড়ি বা চিঁড়ে ভাজার সংগে পরিবেশন করুন।

রাত্রির আহার—আটার রুটি, ডাল, একটা (নিরামিষ) কালিয়া অথবা ডালনা, পিঁয়াজকুঁচি দিয়ে বেগুন পোড়া, আলু পটল সিদ্ধ করে গোলমরীচ নুন দিয়ে সামান্য ঘিয়ে সাঁতলে নাবান। আর একটা চাটনি, পরিশেষে একটু গুড় রুটি দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করুন। কাজেই দেখুন, অল্প খরচে মাছ, মাংস, ডিম ছাড়াও নানাবিধ আহারের ভাল ব্যবস্থা করা যায়।

এরপর বলছি পরিচ্ছন্নতার কথা।—রান্নাঘর এবং খাবার জায়গা সর্বদা পরিস্কার রাখা চাই, মাছি, পিঁপড়ে, আরশোলা, মাকড়শা, ইঁদুর প্রভৃতি যেন খাবারঘর ও রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় না থাকে। খাবার-দাবার সর্বদা জলে বসিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখা উচিত এবং সব খাবার ভাত তরকারী সর্বদা গরম খেতে দেবেন।

এরপর রুগীদের অর্থাৎ রুগ্ন অসুস্থ ছেলেমেয়েদের খাবারের কথা কিছু বলছি—যে সব রুগ্ন, পেটরোগা ছেলেমেয়ে অনবরত খাবারের জন্য বায়না ও ঘ্যান-ঘ্যান করে তাদের জন্য বাড়ীতে বেলের মোরব্বা, কুমড়োর মেঠাই, বার্লির পুডিং, সাবুর পায়েস, সুজির রুটি, কাঁচকলা পটল টোমাটো সিদ্ধ দিন। এরপর যার যেমন অসুখ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে সেইমত দেবেন ; যেমন কমলালেবু, সরবতীলেবু, বাতাবী লেবু, আপেল আনারস, কালোজাম ও পানিফল ইত্যাদির সংগে বার্লি মিশিয়ে পায়েস, পুডিং, সরবৎ সব রকমই হতে পারে। এইসব খাবার সাজিয়ে সুস্বাদু সুন্দর করে পরিবেশন করলে রুগীরা পরম তৃপ্ত হয়।

পাশ্চাত্য দেশের একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার বলেছিলেন, আহারীয় দ্রব্যাদি সর্বদা সুন্দর সুস্বাদু করে সাজিয়ে পরিস্কার পাত্রে স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশের মধ্যে রুগীকে খাওয়ালে তাদের মন প্রফুল্ল হয়—রোগও অর্ধেক কমে যায়। অতৃপ্তি করে যত ভাল পথ্যই খাওয়া যায় তা হজম হয় না। শুধু সাবু, বার্লি দুধ বিস্কুট টোস্ট মাখন ফল সবই সুন্দর সুগন্ধ করে পরিস্কারভাবে দেওয়া যায়।

আমাদের ছেলেপুলেদের হোটেলে খাবার দুর্বার লোভ। বিলাতী খানা আর এমন কি! তবে লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় খাবার জায়গাটির এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলে ওরা, যে মনে হয় এমন ভাল খাবার বুঝি হয় না! পরিস্কার টেবিল-ক্লথের উপর—টেবিলে সাজান ঝকঝকে কাঁচের বাসন, কাঁটা-চামচ, নুন মরীচ সস্ ইত্যাদি রাখার পাত্রটির কি বাহার! ফুলগুলি সাজান, মাঝে আবার ফুল-দানীতে ফুল, তারপর আহার করতে করতে শোন মধুর গীতি-বাদ্য-নৃত্য। খাবার আর এমন কি! মুরগী বা পাঁঠার ঠ্যাং সিদ্ধ, কিছু সবজি আলু সিদ্ধ বা ফ্রাই, সাইড ডিসে কাটলেট চপ ইত্যাদি ফ্রায়েড রাইস, আর একটা কারী, সবশেষে পুডিং।

যাই হোক, মোটমাট কথা দাঁড়ায় বাঙ্গালীরা সবচেয়ে ভাল ও নানাবিধ খেতে জানে ; এত রকম খাবার, তরী-তরকারী, পঞ্চাশ রকম ব্যাঞ্জন, অর্থাৎ এত দীর্ঘ খাবারের তালিকা অন্য কোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই—তা হবে না-ই বা কেন, বাঙ্গালীর গেরস্তপোষা খাবারের সংগে, যার যেটি ভাল রান্না—সবই আয়ত্ত করে নিয়েছে বাঙ্গালীরা। যেমন বিলাতী ও মোগলাইখানা—বাঙ্গালীরা খেতে জানে, তবে একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশের দিকে দৃষ্টি রাখলে এই অমৃত ও মধুরতার বুঝি শেষ পাওয়া যাবে না।
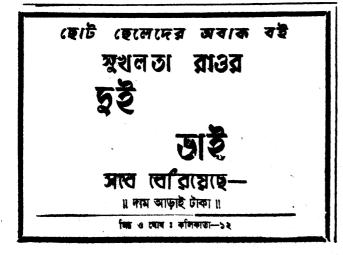
—বিছানা নইলে ছেলের পড়া হয় না!

রাগের মাথায় মাঝে মাঝে ছেলেকে এই নিয়ে তিরস্কার করেছে বটে, কিন্তু নিজেও ভালো করেই জানে, এই বিছানাটুকু ছাড়া তার ঘরে আর বসবার জায়গাই বা কোথায়।

একতলার ছোট্ট ঘর। যদিও বাড়িটা দোতলা, ওপরেও খানতিনেক ঘর আছে—তবু যে তাকে একতলার এই এঁদো ঘুপসি ঘরে থাকতে হয় তা একান্তই ভাগ্যদোষে। ভাগ্যদোষে সে এ বাড়ির বড়বৌ, মেজবৌ, সেজবৌ না হয়ে হয়েছে ছোটবৌ। আর ভাগ্যদোষেই তার কপালে এমন স্বামী, যার উপায় অন্য তিন দাদার চেয়ে অনেক কম। তবু কেন যে এ বাজারে শাশুড়ি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটিকে সংসারী করে দিলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। এর জন্যে যে দুঃখ-কষ্ট, তা ততখানি ইলার নিজের জন্যে নয় যতখানি তার স্বামীর কথা ভেবে।

চার ভাইয়ের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোটো, কিন্তু আশ্চর্য ধীর স্থির স্বল্পভাষী। নিজের সংসারের দুঃখ অভাব তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারেন অথচ প্রতিকার করতে পারেন না।—পাষাণভার সেই ধৈর্য ইলা যত দেখে ততই সহানুভূতিতে তার হৃদয় ভরে ওঠে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। মনে হয়, তুচ্ছ মুখের কথায় তাঁর দুঃখের দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরে একটি ছোট্ট বাতায়নও খুলে দেওয়া যাবে না।

ওপরের তিনখানি ঘর তারাই পেয়েছে যারা এ বাড়িতে প্রথম বৌ হয়ে এসেছে। তাদের ঘরও ছোটো। তবু সাজানো-গোছানো। ড্রেসিং-টেবিল, সিলিং-ফ্যান থেকে একটি লোকাল সেট রেডিও পর্যন্ত তিন বৌ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিনে ঘর সাজিয়েছে। ইলার সে-সব কেনার ক্ষমতাও নেই—ইচ্ছাও নেই।

ইচ্ছাও নেই?

তা অবশ্য ইলা জোর করে বলতে পারে না। ওদের মতো অবস্থা হলে তখন কিরকম ইচ্ছে হত কে জানে।

ওরা তিন বৌ দুপুরে এ ওর ঘরে যায়। হাসিগল্প করে। সে হাসিগল্প যে কতখানি কৃত্রিম তা ইলা বুঝতে পারে। তাই সেই কৃত্রিমতার মধ্যে ও যায় না। অবশ্য তাকেও কেউ ডেকে আনে না। তা বলে এদের কারো সঙ্গে যে প্রীতির সম্পর্ক নেই তা নয়। কথাবার্তা আছে—ছেলেমেয়ের অসুখ-বিসুখ করলে খবর নেওয়া আছে—কাছে গিয়ে বসা আছে। সেখানে তখন যে কেবল নিছক কৃত্রিম কর্তব্য তা নয়, একটি ব্যাকুল আন্তরিকতাও আপনা-আপনি প্রত্যেকের ভেতর জেগে ওঠে।

নিজের ঘরটি ছাড়া ইলা মাঝে মাঝে আর-একটি ঘরে যায়। ঘরটি শাশুড়ির। সিঁড়ির ওপর ছোট্ট একফালি ঘর। না আলো, না বাতাস। এ ঘরে কেউ ইলেকট্রিক পাখার ব্যবস্থা করে দেয়নি। গদি-সমেত খাটও নেই। সেই নিরাভরণ নিঃস্ব ঘরে মাঝে-মধ্যে ইলা নিজেই গিয়ে শাশুড়ির জন্যে পান সেজে দেয়—পাকা চুল তুলে দেয়।

এ নিয়ে অন্যেরা নানা কথা বললেও ইলা জানে, সে কোনো স্বার্থের কথা বা নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা একটি দিনের জন্যেও তাঁর সামনে উচ্চারণ করেনি। তবু যে কেবল ঐ বৃদ্ধার কাছেই যায়, তার কারণ, এ বাড়িতে ঐ একটি মাত্র ঘরই আছে, যেখানে ইলা তার ঘরেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

ইলার ঘরে দামী আসবাবপত্র নেই বটে—তবু একটি বড়ো খাট আছে। খাটটি এমনিতেই যথেষ্ট উঁচু, তা সত্ত্বেও ইঁট দিয়ে আরও উঁচু করা হয়েছে। তার নীচে খানকতক বাসন-কোসন, গোটাকতক পুরনো ট্রাঙ্ক-সুটকেশ, একটা কাচ-ভাঙা লণ্ঠন। ড্রেসিং-টেবিল নেই সত্যি—কিন্তু বড়ো একটা টেবিল আছে। তাতে খোকনের পড়ার বই থেকে আরম্ভ করে গ্লাক্সোর টিন, ফুলহীন ফুলদানি, ধোপার হিসেবের খাতা, একখানা মলাট-ছেঁড়া সিনেমা পত্রিকা, চুলের ফিতে সবই আছে। ওদিকে রয়েছে একটা আলনা—অগোছাল শাড়ি-কাপড়-জামায় ঢাকা পড়ে গেছে। আর একেবারে কোণে ছোট্ট একটি কাঠের ফ্রেমে রয়েছে লক্ষ্মীর পট। প্রতি বৃহস্পতিবারে ইলা পুজো করে গোপনে।

না, ঘরে বাড়তি এতটুকু জায়গা নেই যে মাদুর পেতে খোকন পড়তে বসবে। বাইরে থেকে কেউ বেড়াতে এলে তাকেও

বসতে হয় ঐ খাটে। বিছানার চাদরটা কেচে কেচে জীর্ণ-বিবর্ণ হয়ে গেছে,—মশারিটা তো ছিঁড়ে যাবার ভয়ে কাচতেই পারে না। ঘরের অবস্থা দেখে সময় সময় ইলার নিজেরই বিরক্তি ধরে যায়। উঃ! কেবল ছেঁড়া আর ময়লা! অথচ ঐটুকু ঘর। তবু সামলে উঠতে পারে না। এখন অভাবের সঙ্গে সঙ্গে নোংরামিতেও গা ভাসিয়ে দিয়েছে। কী হবে আলনা গুছিয়ে আর রোজ রোজ বিছানার চাদর কেচে কেচে। দিন তো চলে যাচ্ছে। তা হলেই হল।

বিছানায় আধ-শোওয়া হয়ে খোকন পড়ছিল। ইলা তাই বকছিল,—বিছানায় নইলে ছেলের পড়া হয় না! ঘুম তো এল বলে!

কিন্তু খোকনের সত্যিই তখন ঘুম আসেনি, আসছিল কান্না। নিষ্ঠুর বিবেচনাশূন্য মা তাকে মস্তবড়ো একটা যোগ কষতে দিয়েছে। অত বড় অঙ্কর চেহারা দেখলেই ভয় করে তো রাইট ক'রে যোগ দেওয়া তো কোন্ ছার!

মায়ের ধমকে এবার খোকনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ইলা বললে—অমনি কান্না! আচ্ছা থাক্, এখন অঙ্ক কষতে হবে না, ইতিহাস পড়ো। বাবাঃ অঙ্কর নাম শুনলেই যেন ছেলের জ্বর আসে!

খোকনের অশ্রুসিক্ত চোখে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল। তখনই শ্লেট পেন্সিল রেখে ইতিহাসের বই খুলে দুলে দুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল।

ঠিক এমনি সময়েতেই হঠাৎ ওপরে শাশুড়ির গলা পাওয়া গেল—ওমা! কী ভাগ্যি! এত দিনে মনে পড়ল! ও বৌমা—

ইলা কৌতূহলে কান পেতে রইল। কে আবার এল মায়ের কাছে!

আগন্তুকের গলা পাওয়া গেল—কী খবর! কেমন আছেন বলুন।

কণ্ঠস্বর শুনে ইলা যেন চমকে উঠল—কার গলা!

শাশুড়ী তখন আবার ডাকছেন—ও বুলু, ছবি, গীতা—ইলা—দেখে যাও কে এসেছে!

আর বসে থাকা ইলার পক্ষে সম্ভব হল না। তখনই ওপরে যাচ্ছিল, কী মনে হল, পরনের কাপড়টার দিকে তাকিয়ে নিজেই তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা ধোপ্-ভাঙা কাপড় পরতে গেল। খোকন এমন সময় অবাক চোখের দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় বেড়াতে যাচ্ছ মা?

তার এই ব্যস্ত-চঞ্চলতা, একান্ত অকারণে কাপড়-বদলানো যে খোকন লক্ষ্য করছে তা বোধহয় ইলা টের পায়নি। লজ্জিত হল। আর কাপড় বদলানো হল না। পরনের কাপড়টাই একটু গুছিয়ে পরে নিয়ে মাথায় একটু ওপর ওপর চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে বললে—তোমার ঠাম্মা ডাকছেন, শুনে আসছি। তুমি পড়ো। উঠবে না কিন্তু। আমি এসেই পড়া ধরব। এই বলে একটু দ্রুতগতিতেই ওপরে চলে গেল।

শাশুড়ীর ঘরে তখন রীতিমতো ভিড় জমেছে। বড়ো মেজো সেজো তিন বৌ মিলে মাননীয় অতিথিটিকে ঘিরে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

ইলা মাথায় কাপড় দিয়ে সংযত-গতিতে সবার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

ইলাকে দেখেই শাশুড়ী বলে উঠলেন,—এই যে ইলা, এসো এসো, এগিয়ে এসো। তোমার সঙ্গে আবার অসিতের তো আগে থেকেই চেনাশোনা আছে।

ইলাকে দেখেই অসিত চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে একেবারে ইলার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললে—চিনতে পার?

অসিতের এই অতিপরিচিত নিঃসংকোচ নির্ভীক, দ্বিধাশূন্য আবেগে আজ কিন্তু ইলা কেমন যেন সবার অলক্ষ্যে একটু ভয় পেল। বোধহয় নিজেরও অজ্ঞাতসারেই দুপা পিছিয়ে গিয়ে হেসে বললে—নীচে থেকে গলা শুনেই ঠিক বুঝেছি।—

অসিত তেমনিভাবেই তার দুই উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি মেলে ধরে বললে—অনেক বদলেছ ঠিক, হাসিটি কিন্তু বদলায়নি।

ইলার মুখটা লাল হয়ে গেল। মুখ নিচু করে হাসল একটু।

এমনি সময় সেজবৌ একটু অস্বাভাবিক জোরেই কাছে এসে অসিতকে বললে—চলুন আমার ঘরে। এই বলে একরকম গ্রেপ্তার করেই অসিতকে নিয়ে যেতে উদ্যত হল।

অসিত যেন নিরুপায় দৃষ্টিতে একবার এদের শাশুড়ির দিকে তাকালো।

তিনি বললেন—তুমি ওদের ঘরে গিয়েই বোসো গে, পাখা-টাখা আছে।

তখন বড় আর মেজো বলে উঠল—আর আমাদের ঘরে বুঝি অতিথিকে বসতে দেবার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই?

অসিত সেজবৌয়ের চটুল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সাহস করে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে পারল না। শুধু বললে—না, তা কেন? আমি প্রত্যেকের ঘরেই যাব। আধ ঘণ্টা করে বসব। দুখানি করে গান শুনব। তারপর ছুটি।

কলহাস্যে মুখরিত তিনটি বৌ তাদের আদরের এই অতিথিটিকে নিয়ে চলে গেল। ইলাও ধীরে ধীরে নেমে এল নীচে। অন্যমনস্কভাবেই নেমে এল।

ঘরের কাছে আসতেই খেয়াল হল, খোকনের গলা পাওয়া যাচ্ছে না। চুপি চুপি কখন ওপরে চলে যায়নি তো? এখুনি চা-মিষ্টির ছড়াছড়ি হবে ঘরে ঘরে। খোকন সেখানেই হয়তো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল ইলা। না, খোকন ঘরেতেই আছে। পড়তে পড়তে কখন ঘাড় গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। আজ আর খোকনকে পড়াতে ইচ্ছে করল না। ঘুমোচ্ছে ঘুমুক। ইলা বিছানায় উঠে বসল। নাঃ, কোনো কাজেই আর মন লাগছে না। ওপরে সেজবৌয়ের ঘরে তখন হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে। ইলা সিঁড়ির দিকে জানলাটা বন্ধ করে দিলে। বড়ো বেহায়া মেয়ে কিন্তু ঐ সেজোবৌটা। এত গায়ে-পড়া—লজ্জাও করে না! অথচ এমন কেউ নিকট-আত্মীয় নয় ওদের। এ বাড়ির সঙ্গে অসিতের সম্পর্ক অত্যন্ত দূরের। কিরকম সূত্রে শাশুড়ী যেন হন ওর দিদিমা। এই কলকাতাতেই থাকে। মাঝে-মধ্যে বছরে এক-আধবার আসে। তবে ইলা এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসার পর এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ।

প্রথমবার এসেছিল বৌভাতে। এ-বাড়িতে তখন যে ওকে দেখতে পাবে ভাবতেই পারেনি। হঠাৎ দেখে কেমন চমকে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল। দুর্গ্রহের মতো হঠাৎ এতদিন পর এখানে আবার উদয় কেন? কিন্তু আশ্চর্য—এত বাক্‌পটু তবু সেদিন গম্ভীর ধীর। ও নকল গাম্ভীর্য মোটেই মানাচ্ছিল না ওকে। তবু ইলা ভাবছিল, এই ভালো। অল্প কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল,

মা কেমন আছেন, ছোটো বোন মীনার কোন্ ক্লাশ হল। মামুলি কয়েকটি প্রশ্ন যা মানায় বয়স্ক হিতাকাঙ্ক্ষীদের মুখে। ইলাও ঠিক উত্তরটুকু দিয়ে গিয়েছিল। তারপর শাশুড়ীর সঙ্গে গল্প হল। শাশুড়ী বললেন,—অজিতের বৌ কেমন এনেছি বলো।

ও তখন সেদিনের সেই লজ্জিত নববধূর দিকে তাকিয়ে নিঃসংকোচে হাসতে হাসতে বললে—আমাদের ইলাকে যে কেউ পছন্দ করে বৌ করে নিয়ে যাবে, ভাবতেই পারিনি।

শাশুড়ী অবাক হয়ে তাকালেন দুজনের মুখের দিকে। ও তখন বললে চেনা-পরিচয়ের ইতিহাস। সংক্ষেপেই বললে। বুদ্ধিমানের মতো এমন কিছু বললে না যাতে স্বভাবসিদ্ধ মেয়ে-মনে—তা কিশোরীই হোক কিম্বা বৃদ্ধা, বিন্দু-মাত্র সন্দেহ জাগতে পারে।

ইলা খোকনের বইগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল। কই ওদের গলা তো পাওয়া যাচ্ছে না! চলে গেল না কি? জানলাটা খুলল। না, ঐ যে গান হচ্ছে। মেজবৌ গাইছে। এখন তা হলে মেজ-বৌয়ের ঘরে আসর বসেছে।

জানলাটা ঠেসিয়ে দিল ইলা। হাতের কাছে ছিল উল-কাঁটা। খোকনের জন্য একটা সোয়েটার বুনছিল, নিতান্তই যেন সময় কাটাবার জন্যে সেটা নিয়ে বসল। ঠিক সময় কাটাবার জন্যে নয়, আসলে ঐ উল আর কাঁটার আড়ালে আবার সেই-সব দিনের কথা ভেবে নেওয়া চলবে। বর্তমানের চেয়ে মধুর অতীত। দূরে দিনে একান্তে বসে দূরতম ফেলে-আসা দিনগুলির সুখস্মৃতি রোমন্থনের একটা পুলক আছে, বেদনা আছে। সেইই ভাগ্যবান যার মণিমঞ্জুষায় এমনি একটি-দুটি স্মৃতিকণা চূর্ণহীরার মতো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে ওঠে।

না, আজকের এই অসিত নয়—এই যে ভীরু আত্মসমর্পণপর নারীসঙ্গ-লোভী পুরুষ—সে নয়, এর প্রতি আজ ইলার কোনো শ্রদ্ধাই নেই। কোনো আকর্ষণও না। এ বাড়িতে ও এলে বিশেষ আনন্দও নেই, না এলে চিত্ত-চাঞ্চল্যও নেই। কিন্তু একদিন ছিল অন্য রকম হাওয়া। সে অসিত আজও তার বুকে অম্লান হয়ে বেঁচে আছে। সেইসব দিনের কথা আজ হঠাৎ অনেক দিন পর ভাবতে ভাবতে কখনো ইলার মুখে ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠতে লাগল—কখনো চোখের জলে নিঃশব্দে গাল ভিজে গেল। এ চোখের জলে যে কী আনন্দ কাকে ডেকে বলবে সে কথা?

কিন্তু ওকে তো আজ একবারও বলা হল না তার ঘরে আসতে!

বলার আর কী আছে। ইচ্ছে হয় আসবে, না হয় নাই আসবে।

না না, ওকে আর এ ঘরে আসতে হবে না। যা ঘরের ছিরি। বসতেই বা দেবে কোথায়? হয়তো শেষ পর্যন্ত তার দুরবস্থা দেখে ও সমবেদনা দেখিয়ে বলবে—

ইলা সামলে নিল নিজেকে। না, দরকার নেই ওর এসে।

অনেক ঘটনাই ইলা ভাবছিল। আবার তার মন ছুটে গেল সেই দূরকালে। একদিন ঘটেছিল ভারি মজার ব্যাপার, কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না সেদিনের তুচ্ছ ঘটনাটি।

ডিসেম্বর মাস। অনেক কষ্টে দুজনে দেখাসাক্ষাৎ করে ঠিক করেছে, পরের দিন ইভনিং শো-এ একটা বই দেখবে। ইংরেজি বই। টিকিট অ্যাড্ভান্স কাটা হয়ে গেল। যার যার টিকিট তার তার কাছেই থাকল। পরের দিন মায়ের কাছে সত্যিমিথ্যে বলে কোনো রকমে একা সিনেমা দেখার অনুমতি নিয়ে এসেছিল। অন্ধকার ঘর। পর্দার ওপর ছবি পড়ছে আর এদিকে দুটি ব্যাকুল হৃদয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। এই শীতের দিনেও ওর হাতের মুঠোয় তার হাতখানা ঘেমে উঠছিল।

তারপর এক সময়ে সিনেমা ভাঙল। ওরা দুজনে বেরিয়ে এল। ঐখান থেকেই ওরা চলে যেতে পারত দুদিকে। একজন যেত দক্ষিণে, আর একজন উত্তরে। ইলা নিজেও সেইরকম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু অসিত শোনেনি। ও বললে—না, চলো, অন্তত ভবানীপুর পর্যন্ত তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

কাছেই ছিল বাস-স্টপেজ। একটা ডবল-ডেকারে দুজনে উঠে বসল। দোতলায় একেবারে সামনে নিরি-বিলিতে দুজনে বসল। ইলা স্কার্ফ আনেনি। কে আর একটা ভারী স্কার্ফ বয়ে আনে! এদিকে শীত বেশ। সামনে শার্সি-ভাঙা জানলা দিয়ে হুহু করে কন্‌কনে বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ইলাকে।

—খুব শীত করছে না?

ইলা কোনোরকমে বললে—হুঁ।

——এই নাও আমার আলোয়ানটা।

এই বলে নিজের গা থেকে আলোয়ানটা খুলে ওর গায়ে দিয়ে দিল।

আঃ এতক্ষণে বাঁচল।

—কিন্তু তোমার—?

—আমার? হাসল অসিত।—রক্ত বেশ গরম, তার ওপর খাঁটি উলের একটা সোয়েটারও আছে ভেতরে।

বাস ছুটে চলল। তারপর হাজরার মোড়ে এসে ও গেল নেমে। ও তো গেল, কিন্তু সব যেন শূন্য করে দিয়ে গেল। সেই সন্ধ্যে থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যে ছিল কাছেকাছে, সে এখন আর নেই। আবার যে কালই দেখা হবে তা তো নয়। অথচ যাবার সময় ভালো করে কথাও বলা হল না। ইলার মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল।

কিন্তু কালীঘাটের কাছে এসেই হঠাৎ ও চমকে উঠল। সর্বনাশ! ওর র‍্যাপারটা যে থেকে গিয়েছে তার গায়ে। এ নিয়ে বাড়ি ঢুকবে কী করে? যা বাড়ি— সন্দেহ একবার মধ্যমূলে হলে আর রক্ষা নেই। বাড়ি থেকে বেরোনই হয়তো বন্ধ করে দেবে। আর বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধ মানেই মৃত্যু। তখন বারে-বারে মনে হতে লাগল কেন নিতে গেল এটা। আর এমন অন্যমনস্ক ছেলেও দুনিয়ায় দুটি আছে কি? নিজের র‍্যাপারটা চেয়ে নিতেও মনে থাকে না! কিন্তু এখন উপায় কি? পুরুষের গায়ের র‍্যাপার কোন্ মিথ্যে দিয়ে লুকোবে?

টালিগঞ্জ ব্রিজ এসে গেল। দুর্ভাবনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দোতলা থেকে নামল ইলা। না, কোনো উপায় নেই। ধরা পড়বেই আজ। কিন্তু কী উত্তর দেবে? কে বুদ্ধি জুগিয়ে দেবে এই সময়?

ইলা অনামনস্কভাবে বাস থেকে নেমে পড়ল। অমনি পিছন থেকে কে যেন তার পিঠে হাত রাখল।

—এবার এই পথটুকু শীতে কষ্ট করো।

ইলা চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালো।

—এ কী তুমি! কোথায় ছিলে?

নরম গাম্ভীর্যে ছোট্ট উত্তর দিল—কাছাকাছিই। এই বলে হাসতে লাগল।

এ ঘটনা কিছুই নয়, তবু আজও, এই দীর্ঘদিন পর সে কথা মনে হলে মন যেন কেমন করে ওঠে।

কিন্তু, কই দোতলায় তো ওদের গলা পাওয়া যাচ্ছে না! চলে গেল নাকি?

পরক্ষণেই মনে হল, বোধ হয় ওরা ওদিকের ঘরে গিয়েছে—বড়বৌয়ের ঘরে।

কিন্তু সত্যিই যদি ও এ ঘরেও এসে পড়ে! বলা যায় না।

ইলা তাড়াতাড়ি উঠে আলনাটা গুছোতে লাগল। টেবিলটাও পরিষ্কার করতে হবে এখুনি।

কতদিন পর মন দিয়ে আলনা গোছাচ্ছে ইলা। গোছাতে গোছাতেই ভাবছে—না, না, ওর এ ঘরে এসে দরকার নেই।

আবার সেই র‍্যাপারের কথা মনে পড়ছে। তার র‍্যাপার বলতে কিছু নেই। আছে একটা রঙ-ওঠা ভারী স্কার্ফ। তাও খোকনই সেটা মুড়ি দিয়ে থাকে সর্বক্ষণ। সন্ধ্যের পর কোথাও বেরোতে হলে স্বামী তাঁর গায়ের চাদরটি দিয়ে বলেন—ঠাণ্ডা লাগবে, এটা গায়ে দিয়ে যাও। গায়ে দিতেও হয়। কিন্তু অনেক দিনের সেই যে ভয়টুকু এতদিন পরেও সেটা একবার বুকে ঘা দেবেই।

আলনা গুছিয়ে ইলা চটপট টেবিলটা খালি করে ফেলল। একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে দিল টেবিলের ওপর। তার ওপর ফুলদানিটা আর ছাইদানটা রাখল। বাকি জিনিসগুলো চালান দিল খাটের নীচে। খোকন ঘুমোচ্ছে, এই ফাঁকে শাড়িটাও বদলে নিল। মনে মনে বললে—কেন বাপু, আবার এই গরিবের ঘরে আসা! শুধু শুধু লজ্জা দেওয়া মানুষকে।

শাড়ি বদলে একবার আয়নার সামনে দাঁড়ালো। একটু কাজল পরবে নাকি? না থাক, বাড়াবাড়ি হবে। তবু চিরুনি দিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিল আর একবার। তারপর হাত দিয়ে বিছানার চাদর সমান করতে লাগল। আর সময় নেই, যদি আসে তো এখনি এসে পড়বে।

ঠিক এমনি সময়েতেই বাইরে জুতোর শব্দ হল। পদশব্দ অত্যন্ত পরিচিত জেনেও ইলা রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

অজিত পার্টটাইম থেকে ফিরল। হাসিখুশি মুখ। ঘরে ঢুকেই চল্লিশটা টাকা ইলার হাতে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

—পয়লা তারিখেই যে মাইনে দেবে, ভাবতে পারিনি। এই বলে অজিত ঘুমন্ত ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

—কী কিছু বলছ না যে!

এই বলে হঠাৎ উঠে বসে অবাক হয়ে বললে—বাঃ! ঘরটা যেন কেমন ছিমছাম মনে হচ্ছে।

তারপর ইলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তেমনি বিস্ময়ের সুরে বললে—তুমি কি কোথাও বেরোচ্ছ?

ইলা কোন কথা বলতে পারল না। নোটগুলো মুঠোয় শক্ত করে ধরে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুতবেগে ওপরে উঠে গেল।

চুপচাপ— সমস্ত দোতলাটা যেন নিথর নিষ্পন্দ হয়ে গেছে। তবে কি ও চলে গেছে?

না, তা কখনো হতে পারে না।

—ইলা নিঃশব্দে শাশুড়ীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কে রে? ছোটোবৌমা! কী খবর? অজিত ফিরেছে?

ইলা মাথা নেড়ে সায় দিল।

—ঐ যাঃ। তোমার ঘরে তো অসিতকে নিয়ে যাওয়া হল না। আহা ওরও খেয়াল ছিল না, আমারও ছিল না। তা তোমার তো একটু ডেকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

ইলা পাষাণমূর্তির মতো দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

শাশুড়ী সস্নেহ তিরস্কারে বললেন, —এতক্ষণে বুঝি তাকে ডাকতে এসেছ? সে এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছল বলে।

ইলা মুহূর্তে সামলে নিয়ে ধীর-শান্ত স্বরে বললে—আমি টাকাটা আপনাকে দিতে এসেছি মা। এই বলে, বিস্মিত আনন্দিত হতবাক বৃদ্ধার হাতে পাঁচটি টাকার একটি নোট গুঁজে দিয়ে ইলা দ্রুতপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

বড়ো অন্ধকার পথ—সিঁড়িগুলোও বড় সংকীর্ণ। তার ওপর দৃষ্টিও যেন কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে।

ইলা নামছে।

হাতের মুঠোয় নোটগুলো অকারণেই দলা পাকিয়ে যাচ্ছে—ধোপ-ভাঙা শাড়িটা আজ যেন সর্বাঙ্গে ছুঁচের মতো বিঁধছে। নিস্তব্ধ রোদনে বুক কেঁপে উঠছে। কিন্তু না, এক ফোঁটা জলও চোখে আসতে দেবে না।

ইলা নামছে।

শ তা য়ু

দিলীপ মালাকার

এখনও বৃদ্ধেরা আশীর্বাদ করার সময় বলে থাকেন, 'বেঁচে থাক বাবা, শতায়ু হও।' একশ বছর বাঁচা বা তারও বেশীদিন বাঁচাটা প্রায় সকলেরই কাম্য। আসলে সবাই অতদূর পেঁাছতে পারেন না বলেই শতায়ু কামনা করে থাকেন। শুধু শতবর্ষ বাঁচলেই তো হল না। বুড়ো-জবু-থবু হয়ে বাঁচতে চান না কেউ।

এদিকে মেঘে-মেঘে বেলা অনেক হচ্ছে সে খেয়াল অনেকের থাকে না। যাদের অকালে চুল পাকে তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সত্যি সত্যি বার্ধক্যে পা দিয়ে যখন দেখেন, বার্ধক্যের নোটিশ-স্বরূপ রুপোলী তারার মতন এদিকে-সেদিকে মাথার ঝোপে উঁকি মারতে শুরু করেছে, তখন যৌবনবিলাসিরা বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের ডেকে বা গোপনে স্ত্রীর সাহায্যে পাকা চুলকটা সমূলে উৎপাটন করে বৃদ্ধ যে তিনি নন অথবা হতে চান না তারই পরিচয় দিয়ে থাকেন।

রাশিয়ার শ্রীমতী লিউনভ ভ্যার্লিন্টিনেভেনা পুজাকের বয়স ১৫৮ বছর। ৯০ বছর বয়সে দেখেছেন নেপোলিয়নের অভিযান। আর ১১৪ বছর বয়সে রুশ বিপ্লব।

'মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে' যেমন, তেমনি বুড়ো হতে কেউ চান না। অটুট যৌবন রাখতে অনেকেই তো ডাক্তার-হাকিম-বদ্দির স্মরণাপন্ন হন। সে খবর কে না জানে।

তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে একপাল অকালপক্কের কাছ থেকে শোনা যাবে, 'আর কি! বয়স তো কম হল না। বুড়ো হয়েছি। এবার গঙ্গাযাত্রা হলেই বাঁচি।' এই সব অকালপক্কদের বয়স তিরিশের কোঠায়। আবার তারই উল্টো একদল সত্যিকারের বুড়ো, বাহাত্তুরে বলাই ভাল, তাঁরা 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' মুখে না আউড়ে সত্যি সত্যি তরুণী ভার্যাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন (এখন যা দিন কাল, পাড়ার ছোকরারা নাকি এই সব বৃদ্ধ বরদের 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে পাড়া হতে বিদায় দিয়ে থাকেন!)।

আসলে আমাদের দেশে গড়পড়তা আয়ু কম বলেই বোধ হয় শতায়ু কামনা করা হয়ে থাকে। যে-কোনো ঠিকুজি কোষ্ঠী খুলে দেখুন। হিন্দু জ্যোতিষিরা আয়ুষ্কাল একশ বছর ধরে নিয়ে চার ভাগে ভাগ করেন।

আয়ুষ্কাল বাড়ানোর চিন্তা আজকের নয়। যে দিন বেদ লেখা শুরু হল, সেই পাঁচ হাজার বছর আগে, তখনই শুরু হল 'আয়ুর্বেদ' লেখা। চতুর্বেদের মধ্যে 'আয়ুর্বেদ' অন্যতম। যার ফলে হিন্দু-মতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সূত্রপাত। অর্থাৎ অসুখ-বিসুখের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর চিন্তা তখনকার বৈদিক চিকিৎসকদের মাথায় হরদম খেলেছিল। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে নাগার্জুন নামে এক ভারতীয় রাসায়নিকের নাম শোনা যায়। রাসায়নিক নাগার্জুন কিন্তু সত্যিকারের রাসায়নিক ছিলেন। তিনিই প্রথমে শল্য-চিকিৎসা, ডিসটিল্ড্ ওয়াটার, পারদের নানান রকমের ব্যবহার ইত্যাদির প্রয়োগ শুরু করেন। সেই রাসায়নিক নাগার্জুন নাকি কয়েকশত বছর বেঁচেছিলেন এবং তাঁরই আবিষ্কৃত 'জীবন রসায়ন' পান করে শতবাহন সম্রাটও নাকি কয়েকশত বছর বেঁচেছিলেন। অবশ্য এর অনেক

কলম্বিয়ার জাভিয়ের পেরেরার, বয়স ১৬৭ বছর। জর্জ ওয়াশিংটন যখন মারা যান তখন এর বয়স ছিল ৯ বছর। দীর্ঘ জীবনের গোপন কথা হল এরঃ কালো কফি পান আর চুরুট ধুমপান।

গল্প পাওয়া যাবে 'কথাসরিৎসাগরে'। অনেকখানি গল্প হলেও, এর থেকে জানা যায় যে, নাগার্জুন আয়ুষ্কাল বাড়নোর হয়ত কোনো চিকিৎসার উদ্ভাবন করেছিলেন।

বার্ধক্য-নিরোধক ওষুধ আজকের কল্পনা নয়, সেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। বার্ধক্য দূরের কথা আজ-কাল তো পঞ্চাশ-ষাটের বেশী অনেকেই পেরোতে পারেন না। বাংলাদেশের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের অনেকেই তো পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যেই আজকাল সাবাড় হয়ে যাচ্ছেন। নিয়মিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বা 'যুগান্তর' যদি পড়েন তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, যে-সমস্ত বাঙালী কর্মবীর বা রাজনৈতিক নেতা মারা যাচ্ছেন তার অনেকাংশই পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। বাংলাদেশ কেন ভারতে গড়পড়তা আয়ু তো মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ। ইউনাইটেড নেশনস্ ডেমোগ্রাফিক ইয়ার বুকের (১৯৫৬) তথ্য থেকে জানা যায় কোন্ দেশে কত গড়পড়তা আয়ুষ্কাল।

দেশ	বছর	গড়পড়তা আয়ু
হল্যাণ্ড	(১৯৫০-৫২)	৭০·০
বৃটেন	(১৯৫৪)	৬৭·৬
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৫৪)	৬৭·৪
ফ্রান্স	(১৯৫০-৫১)	৬৩·৬

দেশ	বছর	গড়পড়তা আয়ু
ইতালি	(১৯৩৫-৩৭)	৫৭·৫
পর্তুগাল	(১৯৪৯-৫২)	৫৫·৫
ব্রাজিল	(১৯৪৯-৫১)	৪৯·৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	(১৯৪৫-৪৭)	৪৯·৭
মেক্সিকো	(১৯৪০)	৩৭·৯
কংগো	(১৯৫০-৫২)	৩৭·৬
ভারত	(১৯৪১-৫০)	৩২·৪

এসব সংখ্যাতত্ত্বের বড় কথা ছেড়ে দিলেও ভারতে এখনও দু'টো চারটে উদাহরণ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন অনেকেই একশ দশ কি বিশে মারা গেছেন। এই তো সেদিন সংবাদে পড়লাম পূর্ব আফ্রিকার ডারবান শহরে এক ভারতীয় মহিলা ১১০ বছরে প্রাণত্যাগ করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার স্মেদারেভস্কা পালানাকা গ্রামে এই তো সেদিন ইয়েলেনা জিভানোভিচ্ নামে এক বৃদ্ধা তাঁর ১০৮ বছরের জন্মদিন পালন করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। জিভানোভিচ এখনও সম্পূর্ণ সক্ষমভাবেই খাটছেন। সারা জীবনে মাত্র একবার, তাও ১০২ বছর বয়সে নাকি ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলেন। পশ্চিম আফ্রিকার এক বৃদ্ধ যাঁর বয়স ১১২ বছর, তাঁকে তাঁর দীর্ঘায়ুর গোপন তথ্যটা কি জানতে চাইলে বলেছেন যে তিনি মনের স্ফূর্তিতে দিন কাটিয়েছেন। তাঁর এক শতাব্দীর বয়সে ডজন খানেক স্ত্রীলোক ছিল। তারা সবাই পরলোকে। তিনি তাঁর নাতিদের নিয়ে মহাসুখে বসবাস করছেন।

মাস কয়েক আগে সোভিয়েট ইউনিয়নে একুশ হাজার বৃদ্ধ 'শতায়ু উৎসব' পালন করেছেন। এই একুশ হাজার শতায়ুদের মধ্যে ১৩,৩৫০ জন বৃদ্ধের বয়স ১০০ থেকে ১০৪, ৪১৮৩ জন বৃদ্ধের বয়স ১০৫ থেকে ১০৯ বছর, ১৩৮৪ জন বৃদ্ধের বয়স ১১০ থেকে ১১৪ বছর। অবশেষে ১১২৪ জন বৃদ্ধ ধর্মযাজকদের বয়স ১১৫ থেকে ১২০ বছর। তবে শতায়ুদের মধ্যে বৃদ্ধাদের সংখ্যাই বেশী। ৫,৪৩২ জন বৃদ্ধ আর ১৬২৭৬ জন বৃদ্ধা। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, বৃদ্ধদের সংখ্যা শহর থেকে গ্রামাঞ্চলেই বেশী। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতি এক লাখে দশজন করে শতায়ু; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১·৫; ফ্রান্সে ০·৭; বৃটেনে ০·৬ আর জাপানে ০·১।

সোভিয়েট ইউনিয়নে শতায়ুরা সুস্থ, সবলভাবে বেঁচে আছেন সাইবেরিয়ার মতন ভীষণ ঠাণ্ডা অঞ্চলে। ঠাণ্ডায় নাকি আয়ু বাড়ায়। শতায়ু বৃদ্ধরা বলেছেন যে, তাঁদের অটুট স্বাস্থ্যের আরেক প্রধান কারণ হল ককেশাস পর্বতমালাগুলের দই। রুশরা কিন্তু দৈনিক দই খায়। অবশ্য দই-এর প্রচলন প্রথম শুরু হয় বুলগারিয়ায়। তাই লাতিন ভাষায় দইকে বলে ব্যাকটেরিয়াস্ বুলোগারাস্।

শতায়ুদের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত-সমর্থ হলেন মধ্যপ্রাচের সায়েদ আলি। এঁর বয়স এখন ১৮৯ বছর। ইজিপ্তের কাইরো শহরে এখনও বেঁচে আছেন ২০০ বছরের বৃদ্ধ আমার সহাৎ। ইনি ইজিপ্তে নেপোলিয়নের বিজয় অভিযান দেখেছেন। ইনি প্রথমে একবার বিয়ে করেন ৪০ বছর বয়সে আর দ্বিতীয়বার

২০০ বছরের বৃদ্ধ আমর সহাৎ-এর বাস কাইরো সহরে। ইনি নেপোলিয়নের ঈজিপ্ত অভিযান দেখেছেন। বিয়ে করেছেন দুবার ৪০ বছর বয়সে আর ১২০ বছর বয়সে।

১২০ বছর বয়সে। কলম্বিয়ার জাভিয়ের পেরেরার বয়স বর্তমানে ১৬৭ বছর। তিনি গত বছরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন ওয়াশিংটনের ছবি নিয়ে। ওয়াশিংটন যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ছিল ছ' বছর। ন' বছর বয়সে তিনি নেপোলিয়নের রুশ অভিযান যেমন দেখেছেন, তেমনি ১১৪ বছর বয়সে দেখেছেন রুশ বিপ্লব। এখনও তিনি বিনা চশমায় সূঁচে সুতো পরাতে পারেন।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, বার্ধক্য বিতাড়ন ও আয়ু বাড়ান বা ধরা যাক মৃত্যুকেই বাতিল করতে হলে সর্বপ্রথম ভাল করে জানতে হবে জীবন-রহস্য। সে হল প্রাণীর জন্ম-উৎস। প্রাণ বা জন্ম-উৎসটা বিজ্ঞানীদের পুরোপুরি জানা হয়ে গেলে তখন আয়ু বাড়ান শক্ত হবে না। ইতিমধ্যে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পেত্রুচ্চী তাঁর গবেষণাগারের টেস্ট টিউবে রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলে (কোনো প্রাণীর শুক্রকীট দিয়ে নয়) একটি কৃত্রিম জীব সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সেই জীব বা ভ্রূণ হতে মাস দুই পর্যন্ত তার প্রতিদিনের গতিবিধি তিনি সিনেমা ছবির মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। এখনও চলছে তাঁর গবেষণা। কৃত্রিম জীবসৃষ্টির মূলে রয়েছে এ যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের দান, সে হল এ-ডি-এন। এ-ডি-এন আবিষ্কারের পর থেকে প্রাণীবিজ্ঞানের উন্নতি দ্রুত বেগে হচ্ছে। তারই বলে কৃত্রিম জীব সৃষ্টি সফল হতে চলেছে। এই এ-ডি-এন এবং আরও নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে, এমন কি হরমোন ইত্যাদির প্রয়োগের ফলে শতায়ু কেন, তারও বেশী দিন আয়ু বাড়ান সম্ভব হবে বলে প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলছেন। কিছুদিন আগে এক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এ যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার কি? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, স্পুটনিক, রকেট বা এ্যাটম বোমা নয়, সে হল এ-ডি-এন। এই এ-ডি-এন'এর ফলে জীবনরহস্য প্রকাশ পাবে।

বিগত একশ বছর ধরে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বা প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে ফল ও ফুলের, গাছ-গাছড়ার অনেক পরিবর্তন যেমন সাধিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে ইঁদুর, খরগোস, বাঁদর নিয়ে প্রচুর গবেষণা। যার ফলে কোনো কোনো বিজ্ঞানী তো এদের জাতের পরিবর্তন থেকে লিঙ্গের পরিবর্তন আনতে পেরেছেন।

শুক্রকীটের মিলনে জীবের জন্ম। তারপর তার পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু শুক্রকীট সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছেন বিভিন্ন দেশের প্রাণীবিজ্ঞানীর দল। তাঁরা জীবনের রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হলে তখন বার্ধক্য বা শতায়ু আর একটা প্রশ্ন বলেই থাকবে না। তখন ডাক্তারী চিকিৎসার মতন আয়ুর চিকিৎসা বা বাড়ান কমান চলবে।

প্রতিবেশী সাহিত্য

(মৈথিলী গল্প)

।। ভূমিকা ।।

।। উত্তর-বিহার অধ্যুষিত প্রায় দেড় কোটি মানুষের ভাষা মৈথিলী। আধুনিক মৈথিলী সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে গুণী-জ্ঞানী বাঙালীর অবদান অশেষ। কলকাতাতেই প্রথম এক উন্নত ধরনের লিপি আবিষ্কৃত ও কয়েকটি মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলী ভাষার জন্যে একটি 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে এম-এ-র পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের অনুবাদের মধ্য দিয়েই মৈথিলী কথাসাহিত্যের যাত্রা শুরু।

উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পের সমৃদ্ধি এবং লেখকের সংখ্যা অনেক বেশী। জীবনের নতুন মূল্যায়নের দিকে লেখকরা বেশী দৃষ্টি দিচ্ছেন। আঙ্গিকগত উৎকর্ষবিধানে, সুচারু-সুস্মিত ভাষাব্যবহারে ও ঘটনাবিন্যাসে গল্প-লেখকরা তৎপর। মৈথিলী ছোটগল্পে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের মাধ্যমে। ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য অধ্যাপক হরিমোহন ঝার নাম। তাঁর গল্পে সামাজিক দুঃখ-দুর্দশার ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। হাস্যরসাত্মক গল্পপরিবেশনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর পরেই শক্তিমান গল্প-লেখক হিসেবে তন্দ্রনাথ ঝা, হরিনন্দন ঠাকুর, যদুনন্দন শর্মা, মনমোহন ঝা, গিরিধর ঝা, বুদ্ধিধারী সিংহ, গঙ্গানন্দ সিংহ, ভ্রমর, প্রবাসী, উমানাথ ঝা, জলেশ্বর সিংহ, অধ্যাপক অমরনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ ঝা প্রমুখ খ্যাতিমান। তন্দ্রনাথ ঝা মাত্র কয়েকটি গল্প লিখলেও মৈথিলী কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। উমানাথ ঝা গল্পে নতুন আঙ্গিকের পূজারী। মাটি-ঘেঁষা মানুষের মনের সন্ধান পাই গিরিধর ঝা ও যদুনন্দন শর্মার গল্পে। অমরনাথ ঠাকুর প্রগাঢ় ভাবদৃষ্টি ও শিল্প-কৌশলের অধিকারী। মনমোহন ঝার গল্প জীবনধর্মী ও বাস্তবমুখী। মধ্যবিত্ত পরিবারের কান্না-হাসির কথা স্বল্পপরিসরের মধ্যে তুলে ধরতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

উত্তর-বিহারে আজো যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেনি বলে হয়ত সেখানকার লেখকদের মানস জগতেও উল্লেখযোগ্য কোন রূপান্তর ঘটেনি। মৈথিলী ছোট-গল্প মাত্রই কমবেশী সংস্কারবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। —অনুবাদক।।

সুধার খেলনা

রচনা—মনমোহন ঝা

অনুবাদ ঃ বোম্মানা বিশ্বনাথম্

বিয়ের পর এমন একটি মাসও বোধ-হয় কাটেনি যে-মাসে শ্রীমতীর সঙ্গে আমার দু-চারদিন ঝগড়া না হয়েছে। মাঝে মাঝে আমাদের ঝগড়া একনাগাড়ে দশ-বিশ দিন পর্যন্ত চলত। এক এক সময় আমার মনে হত আমাদের এ ঝগড়া সারাজীবন চলবে। কখনো কখনো অবশ্য কথায় কথায় ঝগড়া আর কথায় কথায় মিটমাট হয়ে যেত। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ নিয়েও ঝগড়া যে হত না তা নয়।

কিন্তু একটি দিনের ঝগড়ার স্মৃতি মনে গেঁথে আছে। বার্ধক্যে পা দিয়েও সেদিনের কথা ভুলতে পারি না। ঐ ঘটনার দশ বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে। সুধা জন্মেছে এই দশ বছরের মধ্যেই।

বছর কয়েক আগের কথা। পাটনা যাব। হাইকোর্টে একটা তারিখ পড়েছে। তার তিন দিন পরেই শ্রীমতীর ভায়ের উপনয়ন। চারদিন আগে থেকেই একটা বিষয় নিয়ে বাকযুদ্ধ চলছে। আমি পাটনা যাব, না তার বাপের বাড়ি যাব। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের পর আমার শ্বশুর-বাড়িতে এই প্রথম ঘটা করে একটা কিছু হচ্ছে। আর তাতে আমরা থাকব না, এ কেমন কথা!

বেরোনোর সময় ওকে বলতে গেছি, মুখ গোমড়া করে আমার দিকে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, তাহলে কি তুমি সত্যি যাবে না?

—তুমি বোঝ না কেন, এ সব মোকদ্দমার ব্যাপার, আইন-কানুনের ঝামেলা। সুযোগ পেলেই বিপক্ষদল ছোবল মারবে।

—প্রত্যেক বারেই লক্ষ্য করেছি বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা পাড়লেই কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে কোথাও চলে যাও।

—বেশ ত, বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে কাউকে পাঠাও না? তুমি কালকের গাড়িতেই চলে যাও।

আমার এভাবে কথা বলা হয়ত ঠিক হয়নি। তার চোখে ফোঁটা-ফোঁটা জল দেখা দিল। ভারী গলায় বলল, বেশ তোমার যা খুশী তাই কর।

এরপর দশ-বারো মিনিট ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দু-চার কথা বললাম। কিন্তু কোন লাভ হয়েছে বলে মনে হল না। শেষে বুঝলাম যে ওর কথা না রাখলে সে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। ওর চোখ-মুখের হাবভাব দেখে মনে হল যে সারা-জীবন সে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্টেশানে পৌঁছে ট্রেন ধরতে হবে। হাতে সময় কম। মান-অভিমানের সুযোগ এখন নেই। মেজাজটা বিগড়ে গেল। শেষে এমনভাবে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলাম যাতে সে বোঝে যে ও আমার সঙ্গে কথা না বললে আমার কোন ক্ষতি হবে না। জগৎ-সংসার যেমন চলার ঠিকই চলবে। ও যদি কথা না বলে আমিই বা বকবক করব কেন ওর কাছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে হন-হন করে হাঁটছি। মেয়েটা সোজা ছুটতে-ছুটতে এসে পেছন দিক দিয়ে জামা ধরে টেনে বলল, বাবু, আমাকেও নিয়ে দাও না?

এমনিতেই তিরিক্ষি মেজাজ, তার ওপর জামা ধরে পেছন দিক দিয়ে টান দেওয়া বিরক্তিকর, অসহ্য! বললাম, যা এখান থেকে। এও মায়ের মত প্যান-প্যান করতে শিখেছে! এই বয়সেই জিদ ধরছে।

মেয়েটি কাঁদো-কাঁদো ভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মুখে একটু কোমলভাব দেখলে হয়ত আবার সে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না ধরত। কিন্তু সে নিশ্চুপ রইল।

কুলীর মাথায় জিনিসপত্র তুলে দিয়ে হাঁটা ধরেছি। পেছন দিক দিয়ে সুধার কথা কানে এল, বাবা আমার জন্যে হাওয়াই দাহাদ নিয়ে এতো।

আমার গোটা শরীর রাগে গজ-গজ করছে। মেয়েটির ওটুকু আব্দারও সহ্য

হল না। পেছন ফিরে ছুটে এসে ওর গালে চড় কষে চিৎকার করে বলেছিলাম, তবু পিছু ছাড়বে না। আমি হাওয়াই জাহাজ নিয়ে আসবো! আর তাতে চড়ে তুই আর তোর মা দাদুর বাড়ি যাবি!

সুধা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। যে আমার কাছে চেয়েছে খেলনা, পেয়েছে চড়-চাপড়। অনেকখানি পথ হেঁটে এসেও পেছন ফিরে দেখি আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মোকদ্দমার তারিখের পরে কয়েকটি ঝামেলা এমনভাবে দেখা দিল যে উকিলের বাড়িতে দশদিন থেকে যেতে হল। নিজের কেসটা সম্পর্কে চিন্তা ত হচ্ছিলই উপরন্তু আদালতে অন্য কয়েকটা মামলার শুনানি শুনে অবাক লাগছিল। সে কদিন কোর্ট-কাছারির কথাই মনে জেঁকে বসেছিল, ঘরের কথা তেমন মনে পড়ত না।

সেদিন সন্ধ্যায় উকিলমশায়ের বড় ছেলে সুধীর কলকাতা থেকে ফিরল। আমি যে-ঘরে ছিলাম তার পাশের ঘরটাই ছিল সুধীরের। রাত এগারটা পর ওর ঘর থেকে ভালবাসার কথা শুনতে পেলাম। মাঝে মাঝে সুধীর আর তার বউয়ের হাসির উচ্ছ্বাসে আবহাওয়া সরগরম হয়ে উঠছিল। চুড়ির রিনিঝিনি এবং হাসির ফোয়ারার ফলে সারা রাত আমার চোখে ঘুম নেই। এমনিতেই বউকে চটিয়ে মেয়েকে চড় কষে ফিরেছি, তার ওপর পাশের ঘর থেকে যেভাবে ব্যঞ্জনাময় শব্দ ভেসে আসছে তাতে কার না মন বিগড়ে যায়! অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম ঘরে ফিরে গিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। তারপর শেষরাতে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। ঘুম আর আসে না। আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওর সঙ্গে আগে কথা বলব না। আর সেও যে আমার সঙ্গে প্রথমে কথা বলবে বলে মনে হয় না। পরক্ষণেই মনে পড়ল এই ধরনের প্রতিজ্ঞা তো আমরা হাজারবার করেছি, আর ভঙ্গ করেছি। এ ক্ষেত্রে হেরে গিয়েও জয়ের আনন্দ পাব। তারপর আবার চোখ বুজলাম কিন্তু ঘুম পায়নি। পাশের ঘর থেকে আবার ভেসে আসছে সেই চুড়ির রিনিঝিনি।

এই ঘটনার তিনদিনের দিন হাই-কোর্টে তারিখ ছিল। আমার জিত হল! খুশীতে মন ভরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল জগৎ-সংসারে আনন্দ-উৎসব হচ্ছে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় বাজারে যাব ভেবেছি। খালি হাতে ঘরে ফিরি কি করে। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলই বা, মামলায় জেতার আনন্দে কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত বইকি।

বাকরগঞ্জ পৌঁছে রেডিমেড কাপড়ের দোকানে ঢুকে দুটো ব্লাউজ কিনতে টাকার জন্য পকেটে হাত ঢোকাতেই হাতে ঠেকল সুধার মাটির পুতুলের একটি টুকরো। সুধা বহুবার মাটির পুতুল হাতিকে দেখিয়ে বলেছিল, বাবু, এতে চড়ে তুমি অনেক দূরে যাবে।

আশ্চর্য! যে-হাতে আমি সুধার পুতুলের টুকরো ধরে আছি সেই হাতেই ওকে চড় কষেছি! একটার পর একটা অনেকগুলো দোকানে খোঁজ করলাম হাওয়াই জাহাজের জন্য। শেষে পেলাম একটা দোকানে। পেয়ে মনে হল মামলায় জেতার চেয়ে এই খেলনাটি কিনতে পেরে আমি যেন আরও বেশী সফল হয়েছি। কে জানে সুধা এই হাওয়াই জাহাজে চড়ে কতদূর যাওয়ার কথা ভেবেছে!

ট্রেনটা পৌঁছবে রাত দেড়টায়। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন থেকে নাবার পর সাহস হল না সেই ঘন-অন্ধকারে দু মাইল হেঁটে ঘরে পৌঁছানোর। খবর পাঠালে হয়ত কেউ হ্যারিকেন নিয়ে স্টেশনে দাঁড়াত। আমাদের গাঁয়ের দিকেরও কোন যাত্রী পেলাম না। স্টেশনের কাছের একটি দোকানে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। ঘুম হল না। সকালের প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে। একমাত্র চিন্তা কখন সকাল হবে, কখন ঘরে পৌঁছব। আজ দশ-বারো দিন হয়ে গেছে ঘরছাড়া। হয়ত বউও পথ-চেয়ে বসে আছে, তার চোখেও ঘুম নেই। ওর মন খুব নরম। উদ্বিগ্ন হয়ে হয়ত চারদিকে খোঁজ নিচ্ছে। ঘরে পৌঁছে দূর থেকে হাওয়াই জাহাজটা দেখাব সুধাকে। সুধা ছুটে আসবে, খুব খুশী হবে খেলনাটি পেয়ে।

কা—কা—কা—কা।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে রাত কাটিয়ে দিলাম। পুবের আকাশ ফরসা হয়েছে। পাখির বিচিত্র ডাক। সকালে প্রথম যাকে দেখলাম সে আমাদেরই বাড়ির গরু দেখাশোনা করে। নিভে-যাওয়া হ্যারিকেন নিয়ে সে ঐ পথে ফিরছে। আমি তার ওপর প্রথমেই একটু চটে গেলাম। সেই যখন এলি, সময়মত এলি না কেন? সে বলল, বাবু, এসেছি অনেক আগেই। লাট-ফারমের এক কোণে একটু শুয়ে ছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। এইমাত্র ঘুম ভাঙালো। চোখ খুলতেই ধক্ করে উঠল। বাবু, আজ কদিন ধরেই তো আসছি......

তারপর দুজনে হাঁটছি। লোকটা ঘরের কোন খবর বলছে না। ওর মুখটা কিরকম থমথমে। চুপচাপ পেছনে পেছনে আসছি। শেষে আর থাকতে না পেরে বললাম, কি কোন খবর নেই? অমন মুখবুজে হাঁটছিস কেন?

কাঁদো-কাঁদো ভাব নিয়ে সে যা বলল তা বলার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার পাটনায় যাওয়ার দিন থেকে সুধা জ্বরে ভুগেছে। দুদিন আগে মারা গেছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত করার আগেই সে চিরকালের মত আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

তারপর আমার মনের অবস্থা কী হয়েছিল কি করে বলি। কিভাবে ঘরে পা রাখলাম, কিভাবে সেই পুতুলটি পকেট থেকে বের করে তুলে রেখেছিলাম তা বলে বোঝাতে পারব না—গভীর অনুভূতির ব্যাপার।

মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই, তারপর থেকে বউ আর আমি যখন-তখন কাঁদতাম। হাসি আমাদের জীবনে সেদিন থেকেই হারিয়ে গেছে। ঝগড়া যে একেবারেই বন্ধ হয়েছে তা নয় কিন্তু তাতে কোন প্রাণ ছিল না। ঝগড়াটা কেমন যেন কৃত্রিম মনে হত। তারপর একদিন শ্বশুরবাড়িতেও গিয়েছিলাম বউয়ের কথানুযায়ী।

আর একদিন বাপের বাড়ি যাওয়ার আগে আঁচলে একটা জিনিস লুকিয়ে আমার কাছে এনে বলল, শোন, তোমার বাক্স থেকে একটা জিনিস চুরি করেছি। বাচ্চাদের খেলনা তোমার বাক্সে রেখেছো কেন? আমার ভায়ের ছেলের অন্নপ্রাশন, তাকে দিয়ে দি খেলনাটা। দেখলাম তার হাতে সেই হাওয়াই জাহাজ। বললাম, ওটা দিও না, ওটা অন্য কাজের জন্য রেখেছি।

—আমাকেও একটু জানতে দাও না, কেন রেখেছ।

আমার বুক কেঁপে উঠল। চোখের জল চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, এটা কাছে রাখার উদ্দেশ্য হল কালেভদ্রে যার জন্যে এটা এনেছি স্বপ্নেও যদি তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাই, এতে চড়ে যাব তার কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে বউ আঁচলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল।

সুধা আজ নেই, কিন্তু সুধার ওই খেলনাটি ঝগড়ার সাক্ষী হিসেবে আমাদের দুজনের মাঝে আছে।

দেশে বিদেশে

॥ যাদবেন্দ্রনাথ ॥

প্রকৃত দেশহিতব্রতী ও আদর্শনিষ্ঠ আর একটি জ্যোতিষ্ক বাংলার রাজনৈতিক আকাশ থেকে চ্যুত হ'ল। তাঁর জীবনের সূচনা বর্ধমানের সাতিনন্দী গ্রামে হ'লেও তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলা, বাংলার সীমানা পেরিয়ে ভারতবর্ষ। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা কিছুকাল মন্ত্রী ছিলেন এবং সাম্প্রতিককালে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন; কিন্তু যাদবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের পরিচয় এতে প্রকাশ পায় না। এককালে বিদ্যাসাগরের আমলে বা প্রভাবে যাঁরা বৃহত্তর জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে এবং সম্পূর্ণ

বিলাসবিমুখ হয়ে চাদরকে অঙ্গাবরণ ও পদকে নিরাবরণ করেছিলেন, যাদবেন্দ্রনাথ সেই লোকনিন্দায় উদাসীন দৃঢ়চেতা দধীচিদের অন্যতম। কোনো উপেক্ষাও যেমন তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না, রাজকীয় সম্মানও তাঁকে অভিভূত করতে পারত না—পারেনি। তিনি দীর্ঘকাল মন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু মন্ত্রিত্বের দাপট তাঁর মধ্যে কেউ কখনো দেখেনি। তিনি মন্ত্রী পদ থেকে বিযুক্ত হ'লেন, তাতেও কেউ কখনো তাঁকে বিষণ্ণ দেখেনি। আজ হয়তো একথা আতিশয্য শোনাবে—কিন্তু সত্যিই এমন নিরভিমানী ও নিরহঙ্কার মানুষ খুবই কম। লোভ তাঁকে বশ করতে পারেনি, কোনো জাঁক-জমক তাঁকে মোহগ্রস্ত করতে পারেনি। অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ সচল জীবনযাপন করেছেন—সে জীবন বিষয়ে নিরাসক্ত কিন্তু মানুষের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ, সংসারে আকর্ষণ নেই, কিন্তু এই বিশ্ব-সংসারের মানবজাতির কল্যাণের মহৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬; রোগ হয়েছিল হাঁপানী। প্রথমে বর্ধমান রাজকলেজে, পরে কলকাতায় রিপণ ও স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিশুদ্ধ গণিতে এম-এ পাশ করেন। তারপর বি-এল ডিগ্রীও লাভ করেন। তিনি ১৯২০ সালে ওকালতি ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর দু'বার কারাদণ্ড হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর মন্ত্রীও দু'বার হন। একবার ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভায়, আর একবার ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভায়। বরাবর কংগ্রেস-সেবী থেকে তিনি শেষবয়সে আমরণ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যু অনিবার্য হ'লেও আমরা তাঁর পরলোকগমনে প্রকৃতই শোকগ্রস্ত হয়েছি।

॥ শিক্ষক ॥

শিক্ষকেরা ধর্মঘটে নামলেন বা নামতে বাধ্য হ'লেন—এ লজ্জার কথা। ধর্মঘট একদিনের বেশী অগ্রসর না হ'তেই দ্বিতীয় দিনে প্রত্যাহৃত হ'ল—তেমনি আনন্দের কথা। দাবী-দাওয়া পূরণে বা বিরোধ-মীমাংসায় সরকার পক্ষ ও বিরোধীপক্ষ উদ্যোগী হওয়াতেই এ প্রত্যাহার সম্ভব হয়েছে এটিও সামাজিক জীবনের পক্ষে সুলক্ষণ। যাঁরা সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত, মার্জিত ও চিন্তাশীল ক'রে তুলবেন, শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবন অবধি মানুষের পরিপুষ্টিকালে যাঁদের প্রভাব অতুলনীয় তাঁরা ক্ষুব্ধচিত্তে শিক্ষাব্রতের কাজ করবেন এ কেউই চান না। তাঁরা গ্রাসাচ্ছাদনে বা ভদ্রস্থ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা লাভে সমর্থ হচ্ছেন না—এ কোনো জাতির পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং, তাঁদের দাবী-দাওয়া পূরণে সরকার অগ্রণী হ'লে এটি আমরা জাতির মৌলিক কল্যাণসূত্র মনে করছি। তাঁরা সন্তুষ্ট, নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হোন সকলেরই তাই কামনা।

কিন্তু শিক্ষকদের কাছেও জনসাধারণের অথবা অভিভাবকদের কিছু দাবী-দাওয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে। জনসাধারণ ও অভিভাবকেরা শিক্ষা-ব্যয় নির্বাহ করছেন; তাঁদের দাবী—শিক্ষকগণ একনিষ্ঠ হ'য়ে পড়াবেন, ছাত্রদের শিক্ষাঙ্গনে পড়া তৈরী ক'রে দেবেন, তাদের ভেতর যে মেধা, যে প্রতিভা, যে সম্ভাবনা অস্ফুট বা সুপ্ত আছে তাকে পরিস্ফুট, জাগ্রত ও পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলবেন। কিন্তু শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ও অভিভাবকগণের অভিযোগ—শিক্ষকরা স্কুলে পড়ান না, তাঁরা প্রাইভেট টিউসানিতে অত্যধিক সময় ব্যয় ক'রে স্কুলের শিক্ষকতাকে গৌণ ক'রে তুলেছেন, প্রতি ছাত্রের দুর্বলতা বা অক্ষমতা দূরীকরণে কোনো চেষ্টা করেন না, পাঠ্যক্রম শেষ করেন না, পড়া দেওয়া পর্যন্ত কর্তব্য শেষ হয়, পড়া আদায়ের বা সংশোধনের কোনো প্রচেষ্টা নেই। অন্যান্য সরকারী বা সওদাগরী অফিসের এক শ্রেণীর কেরানীর মতো ফাঁকি দিয়ে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে থাকেন। শিক্ষকতার মধ্যে চাকুরী ছাড়াও যে অতিরিক্ত একটি প্রাণের স্পর্শ আছে, সেবার ভাব আছে, সৃষ্টির প্রেরণা আছে, সেটি আজ একান্তই অভাব। তাঁদের আর্থিক প্রাপ্তি আদায়ে যে সংঘশক্তি প্রকট, শিক্ষার উন্নয়নে জাতিগঠনে সে সঙ্ঘশক্তির কোনো পরিচয় শিক্ষক সমিতি দিতে পারেননি, এ কথাটাও তেমনি জোরের সঙ্গে বলতে চাই যেমন জোরের সঙ্গে বলছি শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া পূরণ হোক। আশা করি, শিক্ষকেরা জনসাধারণের এ দাবী বিনা আন্দোলনেই পূরণ করবেন।

॥ ভারতী ॥

এবারকার বিধানমণ্ডলীতে রবীন্দ্র-ভারতী বিল উঠেছে। এ বিল আইনে পরিণত করতে কেউ-ই বাধা দেবেন না—একথা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত ডাঃ রায় খুব খাঁটি কথা বলেছেন : যত সুন্দর হোক, কারও স্মৃতিরক্ষায় মূর্তি বা আলেখ্য প্রতিষ্ঠার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আছে। ঠিক কথা, এতে শেষপর্যন্ত একটা জড় পৌত্তলিকতায় ভক্তকে পেয়ে বসে; তাতে না হয় পূজোর পবিত্র বাণীর প্রসার, না হয় ভক্তের আত্মোন্নতি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সকল অমর কীর্তিকে অবলম্বন ক'রে যদি গবেষণা চলে, তবেই যে-দেশে তিনি জন্মেছেন, যাঁদের উদ্দেশে তাঁর এই কীর্তি উৎসারিত হয়েছে তারা লাভবান হ'তে পারে। বিলটির মধ্যে সেই অবকাশ আছে; তাঁর সাহিত্য, তাঁর সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য, তাঁর চিত্রকলা, সাহিত্যের মধ্যে তাঁর সাংগঠনিক ইঙ্গিত প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে একটা বিরাট ক্রিয়াকাণ্ড শুরু হ'তে পারে এবং আজ যা বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিক্ষিপ্ত, তা সুসংহত হ'তে পারে। সুতরাং, এ শুভ সূচনা সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের একটি বক্তব্য আছে। কর্তৃপক্ষকে আমরা এই কথাটি খেয়াল রাখতে বলব যে, পশ্চিমবঙ্গ মানে কলকাতা নয়। ইংরেজ আমলে সমগ্র বঙ্গকে কলকাতামুখী ক'রে তোলায় বাংলাদেশের যথেষ্ট সর্বনাশ

হয়েছে এবং বৃহত্তর বঙ্গ এই ক্রমবর্ধমান শহর থেকে ক্রমশই দূরে সরে গিয়ে অনাত্মীয় হয়ে উঠেছিল এবং বিনা বাধায় যে দেশ ভাগ হ'ল তারও মূলে আমাদের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে মুষ্টিমেয় শহুরে লোকের নাড়ীর যোগ ছিঁড়ে গেছল ব'লে। একে তো প্রশাসনের দিক থেকে কলকাতায়ই সকল কিছু কেন্দ্রীভূত, তার ওপর পুঁথিগত, কারিগরি, চিকিৎসাবিদ্যা এবং সকল কিছু শিক্ষায় ক্ষেত্রও কলকাতায় কেন্দ্রীভূত। এমতাবস্থায় কলকাতা শহরে লোক বাড়ে কেন এ নালিশ তুলে লাভ নেই। বিশ্বভারতী কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সন্দেহ নেই; কিন্তু তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অসামান্য চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত। রাজ্যসরকারের প্রচেষ্টা বা অনুমোদনে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে তাদের অধিকাংশ কলকাতার আশেপাশেই— যাদবপুর, কল্যাণী, বর্ধমান। আর একটির প্রস্তাব হয়েছে উত্তরবঙ্গে। মফঃস্বলে যে কয়েকটি মেডিক্যাল স্কুল ছিল সেগুলি অবলুপ্তির পর কর্তৃপক্ষই কলকাতায়ই মেডিকাল কলেজের সংখ্যা ও হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ালেন। জলপাইগুড়িতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হল, সুলক্ষণ, কিন্তু উত্তরবঙ্গ চাট্টিখানি জায়গা নয়, একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পত্তনিতে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হাস্যকর। চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর জন্য মেডিকাল কলেজ কোথায়; আইন শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায়— অথবা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তার উপাদান কোথায় উত্তরবঙ্গে? কেন না, কেবল উত্তরবঙ্গ নয়, কলকাতার বাইরে সব অঞ্চলই ছিল কর্তৃপক্ষের মানস ক্ষেত্রের বাইরে। কলকাতার বাইরে অন্যান্য অঞ্চল আফ্রিকার মত পশ্চাদপদ একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং রবীন্দ্র-ভারতীর শিক্ষালাভেও লোককে কলকাতায়ই আসতে হবে। এতে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় না।

॥ সত্যাগ্রহ ॥

আমরা সত্যাগ্রহ দেখেছি, আমরা সত্যাগ্রহের রূপ ও প্রকৃতি জানি। ইংরেজ শাসকের দৃষ্টিতে সে সত্যাগ্রহ দেখেছে, তার রূপও হয়তো দেখেছে, কিন্তু প্রকৃতি বুঝতে পারেনি। এখন সেই ইংরেজের দেশে সেই সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে এক অহিংস সত্যাগ্রহী মনীষী এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন, ইংলণ্ডেও এক দার্শনিক মনীষীর নেতৃত্বে অনুরূপ অহিংস নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেখানকার নেতা বার্ট্রাণ্ড রাসেল কারাদণ্ড ভোগ করে বেরিয়েছেন। তিনি সারা বিশ্বে এই আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন। লণ্ডনে ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রে এই সত্যাগ্রহের অপরাধে ১,৩১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন নাট্যকার জন অসবোর্ণ, শেলা ডেলানি, ফেনার ব্রকওয়ে এম-পি এবং ক্যানন জন কলিন্স। পরমাণবিক বোমার বিরুদ্ধতাই এঁদের সত্যাগ্রহের তাৎপর্য; পদ্ধতি হচ্ছে কোনো একটি বিশেষ লোকালয়ে নিরুপদ্রব উপবেশন। এদিনকার সত্যাগ্রহ শুরু হয় অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায়, দুপুর রাত অবধি চলে। ট্রাফালগার স্কোয়ার ছেড়ে আধা মাইল দূরে পার্লামেণ্ট স্কোয়ারের দিকে পা বাড়াতেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গোটা ট্রাফালগার ১৫০০ জন পুলিশ ঘিরে ফেলে। যারাই এ বেষ্টনী ভেদ করতে চেয়েছে তাদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্রাফালগার স্কোয়ারের ১৫,০০০ লোকের ভীড় জমেছিল। ধস্তাধস্তিতে পুলিশের হেলমেটগুলো মাটীতে গড়াগড়ি গেছে। এমনটি হলে আমাদের দেশে নিঃসংশয়ে গুলী চলত। পুলিশও তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার অজুহাত তুলত। অথচ লণ্ডনে ১৩১৪ জনকে গ্রেপ্তার করতে ১৫০০ পুলিশ একবার লাঠি তোলেনি, একবার কাঁদুনে গ্যাস ছাড়েনি, গুলি তো ছাড়েইনি। ধস্তাধস্তি করতে পুলিশের শিরস্ত্রাণ ধুলোয় লুটোচ্ছে এ দৃশ্য আমাদের রাজপুরুষেরা সইতে পারতেন না একথা একরকম হলফ ক'রে বলা যায়।

কিন্তু এই সর্বধ্বংসী বোমা ও বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনমত কিভাবে আলোড়িত হচ্ছে তার চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত সোভিয়েট রুশিয়ারই নাম-করা নাগরিক ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ ও আলেকজান্দার কর্ণেচুকের বিস্ফোরণ নিন্দাত্মক আবেদনে স্বাক্ষর। ঐ আবেদনে বলা হয়েছে কি ভূগর্ভে কি মহাকাশে বিস্ফোরণ সর্ববিধ বিস্ফোরণেরই তাঁরা বিরোধিতা করছেন এবং আবার বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে লক্ষ্য করে তাঁরা দুঃখানুভব করছেন। কারামুক্তির পর আর্ল রাসেল বলেছেন, যেকোনো দিন সামান্যমাত্র হিসেবের ভুলে পরমাণবিক যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। রকেট প্রস্তুত; বোমারু প্রস্তুত। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তিনি কর্মী ও বিজ্ঞানীদের এই সর্বনাশা কাজে অসহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। 'সময় থাকতে প্রতিরোধ করুন।'

॥ অবসান ॥

রাষ্ট্রপুঞ্জে সেক্রেটারী-জেনারেল পদে অধিষ্ঠান নিয়ে যাঁর বিরুদ্ধে বহু নাটকীয় ঘটনা ও বিরূপ উক্তি হয়েছে সেই দাগজালমার আগনে কার্ল হ্যামারশিল্ডের আফ্রিকার অরণ্যে জীবনাবসান হয়েছে এবং যে-অবস্থায় এই জীবনাবসান ঘটল তা নিঃসন্দেহে শোচনীয় ও শোকাবহ; কিন্তু তাঁর পদের সঙ্গে বিশ্বকল্যাণের যে ব্রত ছিল, সেই ব্রতাচারণের দিক থেকে এই মৃত্যু গৌরবের। কঙ্গোর রাজনৈতিক জটিলতায় প্যাট্রিস লুমুম্বার মৃত্যুর জন্য অশ্রুপাত করেনি বা ক্রোধ ধিক্কার দেয়নি এমন সাধুব্যক্তি পৃথিবীতে থাকতে পারে না। সেই সাধু ব্যক্তিরাই হ্যামারশিল্ডের এই আকস্মিক মৃত্যুতে

শুধু শোক নয়, ঔপনিবেশিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ধিক্কার ধ্বনি দেবেন। এই সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যক্তিগত লাভ ও লোভের তাড়নায় পৃথিবীতে কিছুতেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। আজও অতি-শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত বৃটেনেও বার্টান্ড রাসেলের মত লোককে অমানবিক কাজের প্রতিবাদে কারাবরণ করতে হয় এবং তাতে বিলাতে বেশীর ভাগ লোকেরই কোন ক্ষোভ কোন লজ্জা নাই। রাসেলের ক্ষেত্রে এবং হ্যামারশিল্ডের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মুখপাত্র হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

হ্যামারশিল্ড ১৯০৫ সালে সুইডেনের জোংকোপিংয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন, তারপর আইন পাশ করেন। ১৯৩৩ সালে স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন; ১৯৩৪ সালে ডক্টরেট লাভ করেন। দেশে ও বিদেশের সংস্পর্শে নানাপদে অধিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫২ সালে স্বদেশের ডেপুটি প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্পর্শে আসেন। ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে ৬০টি সদস্য রাষ্ট্রের ৫৭ ভোটে সেক্রেটারী জেনারেল হন।

॥ কমবেশী ॥

ভারতবর্ষে জনসংখ্যার নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার বিশ্লেষণ করে নাকি দেখা গেছে যে, গত ৬০ বছরে নারীর সংখ্যা কমে আসছে। এ হিসেব হচ্ছে ১৯০১ থেকে ১৯৬১ অবধি।

রাজ্য হিসেবে কেরালা, অন্ধ্র ও রাজস্থানে এইকালের মধ্যে উঠতি-পড়তি হয়েছে ; ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ অবধি আসাম ও বিহারে এই অনুপাত মোটামুটি স্থির ছিল। গুজরাটে সামান্য, আর মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশে মেয়েদের আনুপাতিক হার উল্লেখযোগ্য রকমে হ্রাস পেয়েছে। পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে এবার এই অনুপাতে কিছু সুলক্ষণ দেখা গেছে।

হ্রাসের দিক থেকে যদি রাজ্যগুলোকে সাজানো যায় তবে এও লক্ষ্য করার বিষয় যে, মোটামুটি ২২ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের দুই দিকে এই রাজ্যগুলো পড়েছে। এই নারী-পুরুষের হার উর্ধ্বভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগে বেশী। প্রতি এক হাজার পুরুষের অনুপাতে ২২ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের উর্ধ্বভাগে নারীর হার হচ্ছে— রাজস্থান ৯০৮; জম্মু ও কাশ্মীর ৮৮৩ পশ্চিমবঙ্গ ৮৭৯; আসাম ৮৭৭ ও পাঞ্জাব ৮৬৮। নিম্নভাগে—কেরালা ১,০২২; উড়িষ্যা ১০০২; মাদ্রাজ ৯৮৯; অন্ধ্র ৯৭৯; মহীশূর ৯৫৯; গুজরাট ৯৩৯; মহারাষ্ট্র ৯৩৫; বিহার ৯৯১; মধ্যপ্রদেশ ৯৫২।

অর্থাৎ পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা সবচাইতে বেশী কেরালা ও উড়িষ্যায়। প্রতি দুই হাজার পুরুষে (২২+২) ২৪ জন নারী উদ্বৃত্ত। পাঞ্জাবে সবচাইতে কম; প্রতি এক হাজার পুরুষে ৮৬৮ জন নারী; অথবা প্রতি হাজারে ১৩২ জন কম। প্রতি দুই হাজারে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৪—কেরালা ও উড়িষ্যায় দুই হাজারে উদ্বৃত্তের সংখ্যা ২৪। কিন্তু মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রতি হাজারে রাজস্থান ৯২; জম্মু ও কাশ্মীর ১১৭; পশ্চিমবঙ্গ ১২১; আসাম ১২৩; মাদ্রাজ ১১; অন্ধ্র ২১; মহীশূর ৪১; গুজরাট ৬১; মহারাষ্ট্র ৬৫; বিহার ৯; মধ্যপ্রদেশ ৪৮। তাহলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১২,০০০-এ ৮৪১ জন। কেরালায় ১২ হাজারে ২৬৪ জন নারী উদ্বৃত্ত হয় আর উড়িষ্যায় ১২ হাজারে ২৪। সুতরাং ২৪ হাজারের উদ্বৃত্তেও ঐ ঘাটতির সংকুলান হয় না।

এ তো গেল অঙ্ক। সমাজে তো এই তারতম্য প্রতিফলিত হতে দেখছি না। পশ্চিম বাংলার কথাই ধরা যাক, এখানে হাজারে ১২১টি মেয়ে কম। কিন্তু যৌতুক তো কমে না। ছেলে বেশী মেয়ে কম; মেয়ের চাহিদা তো বাড়ে না! না, কি মেয়ের বাবারা এখনো এখবর জানেন না? জানেন। আসল কথা হচ্ছে, হিসেব মতো যারা বাদ পড়ে যায় তারা তো বাদ পড়লই, এছাড়া অনেক চিরকুমার আছেন (অথচ ভীষ্মদেব নন), যারা বিয়ে করে তাদের বিয়ের বয়স গেছে পিছিয়ে।

॥ প্রেম ॥

মাদ্রাজের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম ভক্তবৎসলম্ রাজ্য বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, মাদ্রাজ রাজ্যে ১৯৬০-৬১ সালে অর্থাৎ এক বছরে—৭২২টি হত্যা হয়েছে এবং তার মধ্যে ১১৯টি হত্যার কারণ প্রেম। শত্রুতার জন্য হত্যা—বোঝা যায়, তার সংখ্যাও বেশী—২৪৩। বিবিধ কারণে হত্যার সংখ্যা ৩৩৪। কিন্তু নিছক প্রেম যেখানে হত্যার কারণ সেখানে একটু রোমাঞ্চ না হয়ে পারে না। "প্রেম শুধু কাছেও টানে না, দূরেও ঠেলে"—শ্রীকান্তর একথা সত্যি, কিন্তু সে দূরে ঠেলা তো সহিংস হত্যা নয়। "পিয়া মিলন কো আশে"—তার পরিণতি এই? ব্যর্থ প্রেম শত্রুতার সৃষ্টি করতে পারে; ঐ ২৪৩টি শত্রুতার মধ্যেও প্রেম নেই তো? অথবা ঐ বিবিধের মধ্যেও প্রেম লুকিয়ে নেই তো? নির্জলা সুস্পষ্ট প্রেমই হত্যার কারণ—সব হত্যা বিশ্লিষ্ট করে মাদ্রাজ পুলিশ ঐ পরিসংখ্যানে পৌঁছেছেন। বড় কয়েকটি মহাকাব্যের মূলেও এই প্রেম এবং এই প্রেম বিশ্বগ্রাসী আগুনের মতো রাজ্যের পর রাজ্য পুড়িয়ে মেরেছে। এক্ষেত্রে দাহ এক বা একাধিক দেহে সীমাবদ্ধ। প্রেম—ভালবাসাও বটে, হিংসাও বটে এবং হিংস্রও বটে; একেবারে ক্ষুরস্য ধারা। এই নিয়েই উপন্যাস। এ প্রেম ভগবদ্ প্রেম নয়, বিশ্বপ্রেম নয়, প্রকৃতি সৌন্দর্যের প্রেম নয়—এ প্রেম নরনারীর। মন্ত্রী ভক্তবৎসলম প্রশ্নোত্তরকালে সময় কম পেয়েছেন; তিনি একটি আলাদা সাংবাদিক (নাকি ঔপন্যাসিক?) সম্মেলনে প্রেম কি করে হিংস ও হিংস্র হল তা সবিশদ বলতে পারলে একটা লাভ হত এই যে, একদল উটকো-মনস্তাত্ত্বিক-ঔপন্যাসিককে প্রেম ও পরিণতির সন্ধানে অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াতে হত না। প্রেম ও হত্যা?—কি ভয়ংকর বিপরীত খেলা!

॥ বিবাহ ॥

বনবালা কপালকুণ্ডলা আন্তরিক বিস্ময়ে জিগগেস করেছিল ঃ বি-বা-হ? বিবাহ কাহাকে বলে? আজ কোন বনবালাও নেই, এমন প্রশ্নও কেউ করে না। তারপর কালক্রমে সবকাজেই একটা সর্বজনীন ব্যবস্থা দেখে আমরা অনুমান করতে লাগলাম, সর্বজনীন বিয়ে হতে পারে না? অনুমান থেকে ছবিও হয়েছে। সর্বজনীন পূজার মতো সত্যিই কোথাও সর্বজনীন বিয়ে হয়নি। কিন্তু হয়েছে ফরমোসায়, আমাদের এশিয়ার ভূখণ্ডের একটি দ্বীপে যেখানে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের রাজত্ব। সেখানে একই দিনে একই সময়ে একই হলে ২৪৬ জোড়া ছেলেমেয়ের বিয়ে হল। হলটির নাম তাইপে সিটি হল এবং উপলক্ষ্যটা ছিল ন্যাশানালিস্ট চীনের "সেনা দিবস।" বরকটিই সেনাদলের সৈন্য। সৈন্যদের জীবন, সংগ্রামের—শত্রুর মুখোমুখি। কিন্তু এই একটি বিশেষ দিনে তাদের জীবনে সংগ্রাম নয়, মিলন ঘটল, ২৪৬ জন সৈন্য শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা না কষে ২৪৬টি মেয়ের পাণিপীড়ন করল। এরকম নয় পরিবেশে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা নতুন অভিজ্ঞতা বটে। এ পর্যন্ত ওরা একসঙ্গে অ্যাটাক করেছে, ভাবনা হয়নি, কিন্তু জীবন সংগ্রামে যারা আছে তারা জানে এ প্রতিপক্ষ একক হলেও অত্যন্ত প্রবল। হউক। পাণিপীড়নের সর্বজনীন উৎসবে মিষ্টি মধুর বাণীর পর ভবিষ্যৎ সংসার সমরাঙ্গনে চীনা ভাষায় বঙ্গজ 'মিনসে' জাতীয় শব্দবান নিক্ষিপ্ত হবে না ২৪৬ জোড়া বরকনের উদ্দেশে আমাদের এই আশীর্বাদ।

॥ ঘরে ॥

১৫ই সেপ্টেম্বর—২৯শে ভাদ্র ঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতি ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন—দাবী আদায়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (কলিকাতা) হইতে বিধান সভা অভিযানের সিদ্ধান্ত—সাংবাদিক বৈঠকে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের ঘোষণা।

কলিকাতার রাজপথে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও উদ্বাস্তুদের মিছিল—দাবী-দাওয়ার ধ্বনিসহ ৪টি শোভাযাত্রার বিধানসভা অভিমুখে অভিযান—উদ্বাস্তুগণ কর্তৃক সরকারী পুনর্বাসন নীতি পরিবর্তনের দাবী।

১৬ই সেপ্টেম্বর—৩০শে ভাদ্র ঃ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বর্ধিত বেতনের হার ঘোষণা—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি—চলতি বৎসরের (১৯৬১) ১লা এপ্রিল হইতে নূতন বেতন-ক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত।

শিক্ষক সমিতি কর্তৃক সরকার ঘোষিত বর্ধিত বেতনের হার প্রত্যাখ্যান শিক্ষকদের কর্মবিরতি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত।

১৭ই সেপ্টেম্বর—৩১শে ভাদ্র ঃ 'পাঞ্জাব সম্পর্কে শেষ কথা সংসদেই বলা হইয়াছে ঃ শিখদের প্রতি বৈষম্যাচরণের অভিযোগ তদন্তকল্পে প্রস্তাবিত কমিশন পাঞ্জাবী সুবার দাবী বিবেচনা করিবেন না'—দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নূতন বেতন-ক্রম—শিক্ষক সমিতির মন্তব্যের জবাব সরকারী প্রেসনোটে অবস্থা বিশ্লেষণ।

১৮ই সেপ্টেম্বর—১লা আশ্বিন ঃ সারা পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মবিরতি ও সত্যাগ্রহ আরম্ভ—৮-দফা দাবী আদায়ে সম্মিলিত বিক্ষোভ-অভিযান।

'জুনিয়র হাই স্কুলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে অর্থ প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্ত'—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ডাঃ রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) বিবৃতি—'ধর্মঘটের হুমকীর মধ্যে শিক্ষকদের প্রসঙ্গে কোন আলোচনা চালানো সম্ভব নহে।'

১৯শে সেপ্টেম্বর—২রা আশ্বিন ঃ শিক্ষকদের কর্ম-বিরতি ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার—বামপন্থী নেতৃবৃন্দের নিকট মুখ্যমন্ত্রীর (ডাঃ রায়) প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ—সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় নূতন বেতনের হার প্রবর্তনের ব্যবস্থা।

'আকালী দল কর্তৃক শিখ গুরুদ্বারের অপব্যবহার ঃ অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দিরে বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র মজুত'—পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কাইরণের অভিযোগ।

'সাতজন ভেড়ীর মালিক ও পাইকারী মৎস্য-ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার'—মৎস্য-সঙ্কট প্রতিরোধে সরকারী কার্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিধান সভায় (পশ্চিমবঙ্গ) মৎস্য-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের বিবৃতি।

২০শে সেপ্টেম্বর—৩রা আশ্বিন ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রবীন্দ্র ভারতী বিলের প্রথম পাঠ সমাপ্ত—বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক বিলের গঠনতন্ত্র সমালোচনা।

২১শে সেপ্টেম্বর—৪ঠা আশ্বিন ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার (৭৬) স্বগ্রামে (বর্ধমানের সাতিনন্দী গ্রাম) জীবনদীপ নির্বাণ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রবীন্দ্র-ভারতী বিল গৃহীত—বিরোধী দলের সকল সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য—বিধান সভায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিলের কঠোর সমালোচনা।

'পশ্চিমবঙ্গে মোট বেকারের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার'—রাজ্য-বিধান পরিষদে শ্রমমন্ত্রী মিঃ আবদুস সত্তারের বিবৃতি।

॥ বাইরে ॥

১৫ই সেপ্টেম্বর—২৯শে ভাদ্র ঃ তুরস্কের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সেলাল বায়ার ও প্রধানমন্ত্রী (প্রাক্তন) মেন্দেরেসের প্রাণদণ্ড—কয়েকজন ভূতপূর্ব মন্ত্রীসহ আরও কয়েকজনের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা—সংবিধান লঙ্ঘন, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ প্রভৃতির অভিযোগে বিশেষ আদালতের রায়।

কাতাঙ্গায় শাসনভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে এলিজাবেথভিলে কঙ্গো সরকারের প্রতিনিধি (হাই কমিশনার মিঃ ডেভিডসন) প্রেরণ।

১৬ই সেপ্টেম্বর—৩০শে ভাদ্র ঃ তুরস্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দুইজন প্রাক্তন মন্ত্রীর ফাঁসি—সেলাল বায়ারসহ ১২ জনের মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট শোম্বের (কাতাঙ্গা) আদেশ জারী—রাষ্ট্রসংঘ হাইকমাণ্ড কর্তৃক কাতাঙ্গায় আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা।

ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) সহিত সত্বর বৈঠকে মিলিত হওয়ার অনুরোধ কেনেডি কর্তৃক অগ্রাহ্য।

১৭ই সেপ্টেম্বর—৩১শে ভাদ্র ঃ কাতাঙ্গায় যুদ্ধ-বিরতির জন্য মিঃ দাগ হ্যামারশীল্ডের (রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল) সহিত শোম্বের আলোচনা—উত্তর রোডেশিয়ার বিমানঘাঁটিতে উভয়ের মধ্যে বৈঠক।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত তুরস্কের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ আদনান মেন্দেরেসের ফাঁসি।

১৮ই সেপ্টেম্বর—১লা আশ্বিন ঃ বিমান দুর্ঘটনায় রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল হ্যামারশীল্ড নিহত—উত্তর রোডেশিয়ার জঙ্গলে বিমানের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার—কাটাঙ্গায় জেট বিমান হইতে গুলীবর্ষণের জের—ধ্বংসস্তূপ হইতে আরও ১২টি মৃতদেহ উদ্ধার।

লণ্ডনে পরমাণু অস্ত্র-বিরোধী বিক্ষোভ প্রসঙ্গে ১১ শতাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

১৯শে সেপ্টেম্বর—২০শে আশ্বিন ঃ 'মিঃ হ্যামারশীল্ডের বিমানে একাধিক বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল ঃ গুলী করিয়া ভূপাতনের সম্ভাবনা অনস্বীকার্য'—দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ।

২০শে সেপ্টেম্বর—৩রা আশ্বিন ঃ কাতাঙ্গায় সাময়িকভাবে যুদ্ধ-বিরতি—প্রেসিডেন্ট শোম্বে ও রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে চুক্তি অনুষ্ঠানের সংবাদ।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ষোড়শ অধিবেশনের সূচনায় হ্যামারশীল্ডের (বিমান দুর্ঘটনায় নিহত সেক্রেটারী-জেনারেল) প্রতি নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—টিউনিসিয়ার মুখ্য প্রতিনিধি মিঃ মঙ্গি শিলম আলোচ্য অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।

২১শে সেপ্টেম্বর—৪ঠা আশ্বিন ঃ বার্লিন প্রশ্নে ওয়াশিংটনে মার্কিণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডীনরাস্ক ও সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আঁদ্রে গ্রোমিকোর বৈঠক।

'পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ-করণ সম্পর্কে আলোচনা চাই'—রাষ্ট্র-সংঘ সাধারণ পরিষদে আমেরিকার দাবী—সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব আলোচনার্থে রাশিয়া কর্তৃক দাবী জ্ঞাপন।

এলিজাবেথভিলে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী ও শোম্বের (কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট) সৈন্যদের অস্ত্র সম্বরণ।

ব্রহ্মদেশে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব

'সোয়ে ডেগন'। এই ব্রহ্মদেশীয় শব্দটির অর্থ 'সুবর্ণ রেঙ্গুণ'। 'Land of Pagodas' বা 'প্যাগোডার দেশ' রেঙ্গুণ সবুর্ণখচিত নয়। নয়নাভিরাম সবুজ প্রকৃতিতে সমাচ্ছন্ন। চারিদিকে যে চারটি বিখ্যাত প্যাগোডা—সোয়ে ডেগন, সোলে, বটাটং ও পিস্ উন্নতশীর্ষ হয়ে দণ্ডায়মান তারা কেবল স্বর্ণমণ্ডিত নয়, বহুমূল্য প্রস্তরখচিত এবং মন্দিরগাত্র অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত। প্রত্যেক প্যাগোডায় বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি ও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকার বুদ্ধশিষ্যবৃন্দ মণ্ডলাকারে বা সারিবদ্ধভাবে পরিবৃত। প্রত্যেক প্রধান বুদ্ধমূর্তির পরিধানে সুবর্ণ বসন, দুর্মূল্য নীলা-পান্না-রুবি-হীরক-প্রস্তর-খচিত স্বর্ণোজ্জ্বল মুকুট, শিরোপরি শোভিত। কখনো তিনি দণ্ডায়মান—বরাভয়দানরত। কখনো তিনি শায়িত—শান্তমূর্তি, নিমীলিত চক্ষু, মৃদুহাস্য অধরে। পবিত্র প্রাঙ্গণে কোথাও বৃহদাকৃতি জয়ঘণ্টা, আবার কোথাও ক্ষুদ্রাকার ঘণ্টা। প্রবাদ আছে, যে যতবার ঘণ্টাধ্বনি করে তাকে ততবার বুদ্ধদর্শনে যেতে হয়। এর মধ্যে সত্যের পরিমাণ শূন্যাঙ্কের হলেও তীর্থযাত্রীর নিয়ত ঘণ্টাধ্বনিতে দিবারাত্র তীর্থস্থান জাগ্রত ও প্রতিধ্বনিত। এখানে আমরা দলবেঁধে গুরুদেবের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিব'-গানটি গাই।

সমুদ্রতটভূমিতে নদীমাতৃক প্রকৃতিময়ী সুবর্ণ প্যাগোডাভূষিত রেঙ্গুণ বাংলাদেশের প্রকৃতির কবিকে সাদর আমন্ত্রণ জানালো। বিশ্বকবি ব্রহ্মদেশবাসীর হৃদয়ের আকুল আহবানে সাড়া দিলেন। ১৯২৪ সালের ২৪শে মার্চ। রেঙ্গুণ সহরে বর্তমানে যেখানে বিখ্যাত 'Guardian' পত্রিকালয় সেখানেই রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। রেঙ্গুণ তখনো স্বদেশ। স্বদেশের কবিকে তাই যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।' কত যুদ্ধঝঞ্ঝা বর্ষে বর্ষে প্রবাহিত হয়ে গেছে তার প্রস্তরদৃঢ় বক্ষের উপর দিয়ে। প্রকৃতিমধুরা রেঙ্গুণকে স্বদেশভূমি চিরপরিত্যাগ করতে হল। সে এখন বিদেশিনী। তবু তার অন্তর-বাহিরকে কবিস্মৃতি সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে আজও। চিরজ্যোতিস্মান মূর্তি অম্লান রয়েছে তার হৃদয়ে। ব্রহ্মদেশ থেকে আবার ডাক পৌঁছল কবির বিশ্বভারতীর দ্বারে। রেঙ্গুণের Tagore Society তার উদ্যোক্তা। কবির আদর্শনিষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে এলেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যাঁকে শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের দায়িত্বপূর্ণ কাজে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন—অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয় সদলে ১৯৫৪ সালে। ক্রমাগত একই ধারায় শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রতিনিধিত্বে ছয়টি বৎসর সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রান্ত হল। সপ্তমবর্ষ এল যেন সপ্তাশ্ববাহিত প্রভাতসূর্যের শতরশ্মি বিশ্বব্যাপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথের শততম সুবর্ণ জয়ন্তী সপ্তম বর্ষে ১৯৬১ সালেই রেঙ্গুণে অনুষ্ঠিত হল।

এবারেও তিনি সদলে প্রতিনিধিত্ব করলেন। দলে আমরা এগারজন ছিলাম। এবারে 'Tagore Centenary Celebrations Committee for Burma' প্রধান উদ্যোক্তা, প্রধানমন্ত্রী উ নু যার Cheif Patron। শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত-আগত শিল্পীদলের প্রধান কর্তব্য ছিল রেঙ্গুণের স্থানীয় ব্রহ্মদেশীয় ও ভারতীয় কৃতী শিল্পীদের রবীন্দ্রসংগীতে ও নৃত্যে শিক্ষাদান এবং উভয় দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসব উদ্‌যাপন করা। প্রতি বৎসর এইভাবেই Tagore Society রবীন্দ্রজয়ন্তী নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত পালন করে এসেছেন। প্রতিবারেই পুরো দুই পক্ষকাল থেকে স্থানীয় শিল্পীদের রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারায় তাঁর সংগীত ও নৃত্যে শিক্ষিত করে তাঁদের দ্বারা সমবেত অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়েছে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নৃত্যনাট্য শ্যামা, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, ভানু সিংহের পদাবলী শান্তিনিকেতনী প্রথায় বহু কষ্টে, শ্রমে

ও নিষ্ঠায় একাধিকবার মঞ্চস্থ করা হয়েছে। তাছাড়া ঋতুসংগীতের সংগে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ নৃত্যরচনা করেও দেখানো হয়েছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শতবার্ষিকী উৎসব বলে দেশ-ব্যাপী আয়োজনের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা আলোড়ন ও ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয় ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, এই কয়েক বছরের মধ্যেই রবীন্দ্র-সংস্কৃতির একটি সুন্দর শান্ত পরিমণ্ডল ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তার প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে রেংগুণে শতবর্ষউৎসব অনুষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়ে।

ইরাবতীর শাখানদী 'পাজুণ্ডং ক্রীক'-এর তীরে সুন্দর দোতলা কাঠের বাংলো-খানি ভারতীয় শিল্পীবৃন্দের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। সকালের আলো সর্বাগ্রেই পড়ত বাড়ীখানির গায়ে। নদীর শান্তশীতল হাওয়া তার চারদিকে ঘুরে ফিরে বেড়াত। রাজকীয় অতিথি বলে শিল্পীবৃন্দের আরামের শয্যায় বিশ্রামের সুযোগ ছিল না। আকাশতরণী থেকে ব্রহ্মদেশ-ভূমিতে অবতরণ করেই সোজা রিহার্সালে যোগ দিতে হয়েছিল সেই-দিনই সন্ধ্যায়। তার পূর্ণচ্ছেদ হয়েছিল মাসান্তে সদলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে। প্রত্যহ মহড়ার শেষে নদীর তীরে রাত্রির শীতল হাওয়ার মাঝে যখন আরাম-কেদারা টেনে বসতাম, উত্তরের স্থির অচঞ্চল ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হত। ব্রহ্মদেশীয় 'পোয়ে' নাচের বাজনা দূর থেকে ভেসে ভেসে আসত। এক অপূর্ব প্রশান্তি ছেয়ে ফেলত মনকে।

সকাল বেলা। খেয়া পারাপার হচ্ছে। মাঝে মাঝে জোয়ার এসেছে, স্ফীত হয়ে যেন বুক ফুলিয়ে দাঁড়াচ্ছে নদীর জল-স্রোত। এপারে দুর্বোধ্য ভাষায় ব্রহ্ম-দেশীয়রা কথা বলছে, বৃহৎ বজরা তৈরী করছে। পারাপারের নৌকাগুলো অদ্ভুত, পেছনদিকে দুটো সুঁচলো মুখ আছে। ওপারে কারখানার চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কাকগুলো কেমন মিহি গলায় এপারে গাছে গাছে ডাকাডাকি শুরু করেছে। লণ্ড বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। সূর্য উঠেছে কিন্তু মেঘের আড়ালে। মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া। হাওয়া বইছে মৃদুমন্দ। যে দিকে তাকাই চারিদিকে সবুজের বান ডেকেছে। কিন্তু ভাববিহ্বলতার সময় এখন নয়। একটু পরেই রিহার্সালের জন্য ডাক আসবে পরি-চালক মহাশয়ের; এ-সব বিষয়ে যেমন কড়া, যুগপৎ গান শেখানোতে ও ভুল ধরতেও তেমনি ওস্তাদ! কিন্তু সে-ভুল ধরার ওস্তাদীয়ানায় যে-শিক্ষা শিক্ষার্থীর চিত্তগত হয় বলা বাহুল্য নানাদিক দিয়ে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা ভবিষ্যতে উপকারী ও বিশেষ মূল্যবান।

রেংগুণে গিয়ে আমাদের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান ৮ই মে সকালে প্রখ্যাত 'Guardin' পত্রিকালয়ে শতবার্ষিকী-উৎসবউপলক্ষে রবীন্দ্রলিপি-অঙ্কিত মর্মর ফলকের আবরণ উন্মোচন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

ফলকে ইংরেজিতে অনূদিত ছিল। প্রথমে শঙ্খধ্বনি সহকারে সভাপতিকে মাল্যচন্দনে বরণ করা হয়। উদ্বোধন-সংগীত গেয়েছিলেন শ্রীমতী নীলিমা সেন—"আমারে বাঁধবি তোরা সে বাঁধন কি তোদের আছে।' আবরণ উন্মোচন করলেন সভাপতি চিফ জাস্টিস মিনথিন। ১৯২৪ সালে ২৪শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ রেংগুণে এসে এই বাড়ীতেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতি-রক্ষার্থে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। এই উপলক্ষে সভায় দেশী বিদেশী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান-শেষে 'বুফে সিস্টেমে' 'লাইট রিফ্রেসমেণ্ট' হয়।

পরবর্তী 'বিচিত্রানুষ্ঠান' ১২ই মে রেংগুণে 'সিটি' হলে দুই সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে সুশৃংখলার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উল্লেখ-যোগ্য হল কেবল ব্রহ্মদেশীয় মেয়েদের "ওগো দখিন হাওয়া" গানের সংগে সমবেতনৃত্য, রেংগুণের বাঙালী মেয়েদের সমবেত ও একক নৃত্য এবং সমবেত-সংগীতে ছেলেমেয়েদের অংশ গ্রহণ। ভারতীয় নৃত্যের সাজে শাড়ী ও ফুলের গয়না ইত্যাদি পরে যখন নৃত্যের জন্য বর্মী মেয়েরা মঞ্চে অবতীর্ণা হলেন, তখন দর্শকমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের ও আনন্দের সঞ্চার হয়। অনুষ্ঠান-শেষে বর্মী মেয়েরা নিজেদের সাজে মুগ্ধ হয়ে সাজ-পোষাক পরিবর্তন না করেই খুশিতে স্বগৃহে ফিরে যান। অল্প কয়েক দিনের শিক্ষায় সহজেই তাঁরা নৃত্য ও রবীন্দ্রসংগীতগুলি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁদের হৃদয়ঙ্গম করার পশ্চাতে ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করার মত—যা আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীত-শিক্ষার আসরে একান্ত ভাবে অভাব বলে অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়। শুনলাম, তাঁরা বছরের এই শুভক্ষণটির

আশায় কালগ্‌নে বসে থাকেন। প্রতি বৎসর যখন অধ্যক্ষ মজ্‌মদার দল নিয়ে যান, তখন তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা, আতিথেয়তা সমগ্র মনকে সহজে অভিভূত করে এবং সংগীত ও নৃত্য শেখার আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

বাংলাদেশ থেকে এত দূরে বিদেশে তাঁরা নৃত্যে ও গানে রাবীন্দ্রীক ঢং এতটা গ্রহণ করতে পেরেছেন বলে আমাদের সত্যিই আশ্চর্য লেগেছে যা আমাদের দেশে আশেপাশেও সচরাচর লক্ষ করা যায় না। যেন তাই মনে হয় বিদেশের শতবার্ষিকীতে আমাদের যোগদান পরিপূর্ণভাবে সার্থক। ১১ তারিখের অনুষ্ঠান শেষে প্রেসিডেন্ট U Win Maung, চিফ জাস্টিস্ Dr Mycint Thein, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত R S Mani শতবার্ষিকী কমিটির সেক্রেটারী A Madhaban প্রমুখ গুণীজন গ্রীনরুমে এসে শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং সেদিনকার অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ব্রহ্মদেশীয় জাতীয় সংগীত দিয়েই বিচিত্রানুষ্ঠানের সমাপ্তি সূচিত হয়। মহড়ার সময় নিজের কৌতূহলবশত বর্মীদের কাছ থেকে জাতীয় সংগীতটি শিখি।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটিতে প্রোগ্রাম সাব-কমিটির চেয়ারম্যান স্বামী সূর্যানন্দ কর্তৃক একটি বিশেষ সভা আয়োজিত হয় (১৫ই মে সন্ধ্যায়)। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং সভায় প্রধান বক্তা কলিকাতা-আগত ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। ডঃ রায় তথ্য-বহুল সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বৈদিক, বেদান্ত, মুসলমান সভ্যতা, নৃতত্ত্ব, নানাধর্ম ও সন্তদের ভাবাদর্শের সমন্বয় উল্লেখ করে মানুষের চিরন্তন মূল সত্য ও চরিত্রের মূল্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ও কাব্যে যে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, কাব্য ও সংগীত রচনার পরিবেশও উল্লেখ করেন। সভাপতি শ্রীমজুমদার তাঁর সরস ও সহজ ভঙ্গিমাপূর্ণ ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীতের কথা ও সুর সমন্বয়, ছন্দতাল, রাগরাগিণীর সংগে সম্পর্ক, এবং বাঙালীর কথার সংগে জীবনের সংগে সংগীতের যোগাযোগ কত নিবিড় তা ব্যাখ্যা করেন; এ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা সংগীতজ্ঞ-গুণীজনের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

তার মাঝে মাঝে শিল্পীদল কর্তৃক সংগীতের আয়োজন ছিল।

বিখ্যাত 'মেয়োমেরিন ক্লাবে' ২৬, ২৭ ও ২৮শে মে তিন দিন ধরে চিত্রাংগদার অভিনয় হয়। দ্বিতীয় দিন অভিনয়-শেষে শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে ভূতপূর্ব কৃষিমন্ত্রী শ্রীউ-চী থান্ আমাদের দলের সকলকে সুন্দর সুন্দর উপহার প্রদান করলেন, আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রেংগুণে এমন সুন্দর অনুষ্ঠান আর হয়নি।'

কয়েকদিন আগে (২৪শে মে) 'রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটাল' সদলে পরিদর্শন করতে যাই। ব্রহ্মদেশবাসীর কাছে এ প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। বিবেকানন্দের বাণী "জীবে প্রেম করে যেই জন সে-ই জন সেবিছে ঈশ্বর।" তার সত্য বাস্তব রূপ দেখে পরিতৃপ্তি পাই। অনেক সুশিক্ষিতা বর্মী ও বাঙালী মেয়েরা এই প্রতিষ্ঠানে সেবাব্রত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের জন্য ট্রেনিং স্কুল, অডিটোরিয়াম, প্রার্থনাগৃহ, নিজস্ব হস্টেলের চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে। ছোট প্রার্থনা ঘরটিতে মহাত্মা, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ও যিশুর মূর্তি একই বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। এই Trinity সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক। সর্বজাতের সেবাব্রতীগণ প্রত্যহ সম্মিলিতভাবে পূজার্চনা করেন।

হাসপাতালে পুরুষ স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পৃথক পৃথক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ড, সুসজ্জিত 'অপারেশন থিয়েটার', বৃহদাকারের স্টিরিলাইজার, X'-Ray ও Deep X-Ray-র মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলো পর্যবেক্ষণ করলাম। জানা গেল, Deep X-Ray প্রতি দশ মিনিটে ব্যবহারে খরচ পড়ে দু' হাজার টাকা! অন্যান্য রোগীর মধ্যে ক্যানসার রোগীই বেশি। ক্যানসার চিকিৎসার সুবন্দোবস্তও আছে। প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী মহারাজ আত্মস্থানানন্দ রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্য হাসপাতালের দেশী ও বিদেশী সেবক-সেবিকাদের সামনে পরিবেশন করবার জন্য শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারকে ও তাঁর দলবলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। চমৎকার পরিবেশ ও প্রেক্ষাগৃহ দেখে দলবলরাই আগে রাজী হয়ে গেলেন। তখন পরিচালক মহোদয়ের পরিত্রাণের কিছুমাত্র সুযোগ রইল না বলে মহারাজ খুশি হলেন।

সে-দিন এগিয়ে এল ২৮শে মে রবিবার। সকালবেলার স্নিগ্ধ রমণীয় আবহাওয়া। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরি বৃষ্টির ধারা মৃদুমন্দ হাওয়ায় শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহে একধারে রবীন্দ্রনাথের ছবিখানি বিকচ পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত, কুণ্ডলায়িত ধূপের গন্ধে আমোদিত গৃহ। 'মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে' গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। বর্ষাপূজা প্রেম ও স্বদেশ পর্যায়ের নির্বাচিত কয়েকটি গান ও নাচ হবার পরে মহারাজ ও সেবারতা ভগিনীগণের পক্ষ থেকে প্রধান সেবিকা শ্রীমতী আনন্দ যোশী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আনন্দের ব্যাপার এই যে, ভারতীয় শিল্পীদলের দ্বারাই উক্ত প্রেক্ষাগৃহের শুভ উদ্বোধন হল এবং এখানে অন্তঃপুরচারিণী বিদেশিনীগণ রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্যের সংগে পরিচিত হতে পেরেছেন বলে তাঁরা গৌরবান্বিত ও কৃতজ্ঞ শ্রীমতী যোশীর কথায় প্রকাশ পেল।

রেংগুণ শহর ছেড়ে এবার সোজা উড়ে যাবো 'শান'দের দেশে। দেশে ফিরে যাবার সময় ঘনিয়েছে। এমন সময় ওদের কাছ থেকে শতবার্ষিকীর আহ্বান এল। এই ভ্রমণকাহিনীর আগে ক্ষুদ্র অথচ আমোদপ্রদ আর এক ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি উপস্থাপন করি। ব্রহ্মদেশের একটি বিভাগ ও প্রখ্যাত ছোট শহর পেগু (Pegu) রেংগুণ শহর থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরত্বে উত্তর-পশ্চিমে। বড় একটি বাস নিয়ে মোট এগারোখানা গাড়ী প্রায় একশ' পঞ্চাশজন যাত্রীসহ

পেগ্ন পরিক্রমায় বেরোই। পিচঢালা রাস্তায় দু'ধারে দূরে প্রান্তরে যত্র-তত্র ছোট-বড় ফয়া বা দেবস্থান চোখে পড়ে, মাঝে মাঝে কাঠের ঘর, একরকম গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া, ধারে ধারে বাঁশগাছ দিয়ে তৈরী ছোট ঘন বেড়া, মেয়েরা চাষবাস করছে, রান্না করছে, আবার বাজারেও দেখেছি—একহাতে দোকান-দারী করতে, অন্যহাতে দোকানে ঝোলানো শিশুর দোলনা দোলাতে। পথে-ঘাটে বাজারে বেশির ভাগ মেয়েরা মুখে-হাতে চন্দনের মত 'তানাকা' মেখে যাওয়া-আসা করছে। তানাকা মাখলে নাকি খুব ফর্সা হওয়া যায়। তানাকা একপ্রকার গাছের কাণ্ড থেকে তৈরী শ্বেতচন্দনের মত জিনিস। মেয়ে-পুরুষ সকলেই বর্মী-চুরুটপায়ী। অফিসের বড়-কর্তা, গণ্যমান্য মন্ত্রী, কৃষক, মেয়ে-পুরুষ, সাধারণ সকলের পরিধানে সর্বত্র সচল লুংগী। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত যে, রাস্তায় পানের পিচ ফেলা নিষিদ্ধ, নতুবা পুলিশে পাকড়াও করবে। এটি বর্মীদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টির প্রমাণ দেয়। শহরে যান-বাহন ও লোকসংখ্যা কমের জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রাফিক পুলিশের প্রয়োজন হয় না। নিতান্ত প্রয়োজনে পুলিশ বা আলোর সংকেতে দু'একটি স্থলে নিয়ন্ত্রণের কাজ চলে। শহর বা শহর-তলির পথ দিয়ে যেতে যেতে 'নাপ্পির' (পচিত মাছের তৈরী উপাদেয় বর্মী খাবার, শুটকিজাতীয়) গন্ধে পথ ও অলি-গলি মুখরিত। রেস্টুরেণ্টে, হোটেলে, গৃহে (বাঙালীর সুস্বাদু খিচুড়ির মত) বর্মীরা মুখরোচক 'খাউসোয়ে' প্রায় নিত্য খেতে ভালবাসে। রসনারসিক বাঙালীর কাছেও পরম লোভনীয় বস্তু এটি। ফল ও দুগ্ধজাত দ্রব্য মিশিয়ে তৈরী 'ফালুদা'ও আর একটি সুস্বাদু খাবার বার্মিজ ও বাঙালীর কাছে।

যুদ্ধের আগে ট্রাম-গাড়ীও ছিল। ডিজেল-চালিত ট্রেনের চল আছে। তিন চাকার থ্রি হুইলার অন্যান্য গাড়ীর তুলনায় বেশি। তিনটে সিটওয়ালা তিন চাকার সাইকেল ট্রাইশও শহরতলির পথে দেখা যায়। এগুলো সাধারণতঃ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বলে ব্রহ্মদেশীয় সরকার ওগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেবার বন্দোবস্ত করছেন।

পেগ্ন যাত্রার পথে গাড়ীগুলো রুদ্ধ-শ্বাসে অতিক্রান্ত দৌড়ে চলেছে। মাঝ-খানে 'পেগ্ন'তে অল্প বিশ্রাম ও কারও কারও চা বা বরফ-দেওয়া আখের রস পান ইত্যাদির পর পুনরায় সমবেত যাত্রা শুরু। পেগ্ন পৌঁছেই দেখি সকলের সূর্যদেব মধ্য আকাশের কাছা-কাছি এসে বিখ্যাত 'জারিং প্যাগোডা'র কনকমণ্ডিত শীর্ষ তার প্রখর দীপ্ত কিরণে অধিকতর উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। এই ফয়ায় শ্বেত-প্রস্তরের যে বিশালকায় শায়িত বুদ্ধমূর্তি বর্তমান তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ ফিট এবং উচ্চতা ৪০ ফিট। এতবড় বিরাট আকৃতির ভাস্কর্যে শিল্পীর আশ্চর্য প্রতিভাগুণে মূর্তির মধ্যে দেবভাবের অপূর্ব বিকাশ সম্ভব হয়েছে। ছোট বড় অন্যান্য ফয়ার মনো-মুগ্ধকর কারুকার্য, চতুর্দিকে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দেবালয়ের পবিত্র শান্ত-মধুর প্রকৃতির স্পর্শে অন্তর আপনমনে বুদ্ধের জয়গান গেয়ে উঠল।

পুরীতে যেমন জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিক্রয়ের আয়োজন দেখি, এখানেও ব্রহ্মদেশীয় তীর্থযাত্রীরা কলাপাতায় জড়ানো প্রসাদ শ্রদ্ধাচিত্তে ক্রয় করে। ফয়ার সিঁড়ির দুধারে নানারকম পুতুল, খেলনা ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র বিক্রীর ছোটো-খাটো দোকান থাকে। তারি মাঝে কোথাও বর্মী স্ত্রীলোকরা বুদ্ধের প্রসাদ নিয়ে সওদা করে। কয়েকটি বর্মী মেয়ের সহায়তায় প্রসাদ গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। বর্মী ভাষায় নাম 'কন্ মিন্ টো' (Kank Myin Htok)। কয়েক পর্দা কলাপাতা খুলবার পর যা দেখি ও গ্রহণ করি প্রথমবার, তা নির্ভেজাল ভাতের ডেলা ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক উৎকৃষ্ট ভূরি আহারের পর রেংগুনে ফিরে যাই। পথি-মধ্যে War Memorial। বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর। সারিবদ্ধ ছোট ছোট নানা ফুলের গাছ চিরস্মরণীয় বীর শহীদের বেদীমূলে ছায়া ও সুগন্ধশীতল হাওয়া সঞ্চারিত করছে। ১৯৩৯-১৯৪৫-এর সমর-যজ্ঞে আহুতিস্বরূপ সাতাশ হাজার মহান শহীদের স্মৃতি-ফলক দর্শককে স্তম্ভিত করে। বহু ভারতীয় বীরের নামও খোদিত রয়েছে ফলকে।

'শান' স্টেটের রাজধানী 'টাউঙ্গিজ' (Taunggyi)। শহরটি ছোট। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৪৭১২ ফিট উচ্চতায় পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তাই মনে হয় নাম হয়েছে Taung (টাউঙ্গ) = পর্বত, gyi (জি) = বৃহৎ বা বৃহৎ পর্বত। পাশাপাশি অন্যান্য শহর কালো, লোইলাম, কিংটন ইত্যাদি। কিংটন সীমান্ত শহর। আমাদের বাংলোর কিছু দূরেই সীমান্ত-রেখা চিহ্নিত ছিল। শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয় খুব সকাল সকাল উঠেই মেঘ-মেঘ-করা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা রাস্তা ধরে বেড়াতে যেতেন ঐদিকে, বেড়াবার ছলে পাহাড়িয়া বন্য সৌন্দর্য দেখার লোভে তাঁর সঙ্গ ছাড়তাম না। স্থান-কাল-পাত্রের এমন অভিনব সমাহার দেখে শান্তিনিকেতনের অভ্যাসমতো সদলে আউটিং করার ইচ্ছা তাঁর মনে উদয় হল। স্থানীয় ডাক্তারবাবুই বাধ সাধলেন। ভয় দেখালেন,—এদিকে বর্ডার এরিয়া। সময় সময় দুর্বৃত্তদলের আবি-

ভাব হয়। হঠাৎ বিদেশী দেখলে সবলে অপহরণ করে। ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়।

টাউন্‌গ্‌জিতে শান, টউঙ্গু, পলং, লিসো, লাহু ও কারেন প্রভৃতি জাতির বসবাস। টউঙ্গুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওরা শিল্পী প্রকৃতির। ভাষা 'শান'। Head of the State (রাজ্যপাল) এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের মন্ত্রীও জাতিতে শান। টউঙ্গুরা বেশি আফিম-(opium) সেবী ও স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষা কিছু অলস প্রকৃতির। শিল্প-কাজ, কৃষিকাজ বা গৃহস্থালীর কাজে মেয়েরা প্রায় সারাদিন মেতে থাকে। শানদের তৈরী শান ব্যাগ, চমৎকার কাঠের পুতুল, তাঁতে বোনা সিল্কের কাপড়, রুপোর ছুরি এখানে বিখ্যাত। রাস্তা-গুলো পিচের, কোথাও উঁচুতে উঠে গেছে, কখনো নিচে নেমে এসেছে। এখানে শহরের একধারে বিখ্যাত 'দণ্ডায়-মান ফয়া' আছে, বুদ্ধদেবের যে মূর্তি আছে, তার উচ্চতা প্রায় ত্রিশ হাতের উপর। প্যাগোডাটি পাহাড়ের উপর এত উঁচুতে যে, তার বামদিকে দূরে 'ইনলে লেক' ও পাহাড়-বনরাজিতে ঘেরা শহরকে ছবির মত মনে হয়। রেঙ্গুনে অভিমুখে ফিরে আসবার সময় আকাশ-পথে 'ইনলে লেকে'র সৌন্দর্য পুনরায় উপভোগ্য হল। ওখানে ভাসমান উদ্যান, মাঠ ও গৃহ দেখার মত। লেকে প্রচুর মাছও সংরক্ষিত। পাহাড়ের কোলে বৃহদাকার 'ত্যালাও' বা জলাধার থেকে শহরে জল সরবরাহ করা হয়। শান-স্টেটের লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। অল্পসংখ্যক বাঙালীও আছেন। তাঁরা গড়ে তুলেছেন Bengal Social Club।

এখানেও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়েছে ও'দের একান্ত অনু-রোধে। স্থানীয় বান্ডুলা সিনেমা হলে দু'দিন ধরে চিত্রাঙ্গদার অভিনয় তো ছিলই। অভিনয় শেষে তথ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীসাও কুন অপাথিরি পিয়াপ্তির পক্ষ থেকে শিল্পীবৃন্দকে এবারেও মূল্যবান উপহারে অলংকৃত করা হয়। এর পর শ্রী মজুমদার বঙ্গদেশবাসীর তরফ থেকে বলেন, শতবার্ষিকীতে কে কত অর্থব্যয় করতে পারে তার ওপর যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; শ্রদ্ধার চেয়ে আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য বেড়েছে, ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীতে ও রবীন্দ্রানুগ নৃত্যে বাংলা থেকে এতদূরে এখানকার শান অধিবাসীদের মধ্যে আগ্রহ ও আন্ত-রিকতা দেখে মন সত্যি খুশীতে ভরে ওঠে। স্থানটি অতি মনোরম। বিমুগ্ধ হতে হয় তার পরম রমণীয় সান্নিধ্যে। ওখানে আরও কয়েকদিন থাকবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না।

রুচিশীল অমায়িক মাদ্রাজী ভদ্র-মহোদয় শ্রীকুমার আপ্পানের কথা আগে মনে পড়ে। তাঁর অতিথিবৎসলতার জন্য সত্যই কৃতজ্ঞ। বিছানাপত্র সজ্জিত তাঁর সুন্দর দোতলা বাংলোটি সম্পূর্ণ আমা-দের অধিকারে ছিল। বার্মা অয়েল কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েও অতিথিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রায় উদ্বাস্তু হয়ে তাঁকে অতিথিদের খাবার-টেবিলে রাত্রির শয্যা পাততে হয়েছে। তাঁর শুভ কামনা করি।

২রা জুন ইণ্ডিয়ান মিউজিক এ্যাণ্ড আর্ট সোসাইটিতে আমাদের সর্বশেষ সঙ্গীত-নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিশেষ অসুবিধাবশতঃ নির্ধারিত সময়ে অনু-ষ্ঠান আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। সময়ানুবর্তিতার দিক থেকে এ ত্রুটি চিত্তে দুঃখ উদ্রেক করে। তা সত্ত্বেও বিদেশী ভদ্রমহোদয়গণের অসীম ধৈর্য-শীলতার জন্য কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। বার বার তাঁদের সপ্রশংস করতালি ও হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও রবীন্দ্রানুগ নৃত্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম ও গুণগ্রহণ করার পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যে ও তাঁর গানে কাব্যে সাহিত্যে যে অনির্বচনীয় ভাব পরিব্যাপ্ত রয়েছে তার সাহায্যেই অবাঙালী ব্রহ্মদেশবাসীর বঙ্গভাষায় অজ্ঞতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গীত ও নৃত্যের মর্ম গ্রহণ করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। বরং বাংলা গানগুলো এত বেশি ওদের মনকে নাড়া দেয় যে ওদের কেউ কেউ শুনে শুনেই অনেক বাংলা গান মুখস্থ করে সুন্দরভাবে গাইতেও পারে লক্ষ্য করেছি। এই প্রসঙ্গে কুমারী গ্লোরিয়া অঙ্‌থান্‌-এর কথা সর্বাগ্রেই মনে পড়ে। ব্রহ্মদেশীয় নাচে তার ডিপ্লোমাও আছে। তার নাচের ধরনটি এই রকম—ভারতীয়েরা যেমন তালে তালে পা ফেলে নাচে, ওর সেরকম নয়। তাল পড়বার একমাত্রার পর ক্ষিপ্রগতিতে পা তোলে ও খালির এক-মাত্রার পর পা ফেলে। দেখতে ভারী চমৎকার লাগে। এইভাবেই সে মদনের ভূমিকায় চিত্রাঙ্গদায় নেচেছিল। এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান—নম নম করুণা ঘন, যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়, কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা, বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে সুন্দর গাইতেও পারে, তার বাড়ীতে শুনেছি। শেষোক্ত গানের সঙ্গে নেচেও দেখিয়েছে আমন্ত্রিত ভারতীয় শিল্পীবৃন্দের অনুরোধে ওদের বাড়ীতে সুস্বাদু মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করার পরে।

বাংলা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি ব্রহ্ম-দেশবাসীর স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণের সন্ধান আর একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের সহায়তায় উল্লেখ করছি। আমাদের পাচিকার ছোট ছেলে 'যোকিন' মাত্র কয়েক দিনের মহড়ায় গাওয়া 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে,' এই ক'টি লাইন অল্প-কয়েকদিন শুনেই বেশ গাইতে পেরে-ছিল। প্রশ্রেয়া ইন্দিরা দেবীর কথা মনে পড়ে, "যাবার কাছে বোম্বাই থাকাকালীন সাহেবদের মহলে এক সময় 'মায়ার খেলা'র গানের খুব আদর হয়েছিল এবং উচ্চারণ করতে না পারলেও তারা 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি' গানে 'টোবে কেন, টোবে কেন' ব'লে ধুয়োর অংশে যোগ দিত।

রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপের নানা জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, বরাবরই বক্তৃতা শেষে নিজের ব্যাখ্যা ...
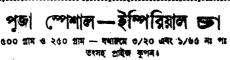
শুনিয়েছেন। কবিতা পড়বার আগে তার ইংরেজী তর্জমাটি পড়ে দিতেন যাতে বাংলা পড়াটা শোনার সময় লোকে কবিতার অর্থ বুঝতে পারে। বাংলার ছন্দ, ভাষার ঝঙ্কার ও লালিত্য লোকে সংগীতের মত মুগ্ধ হয়ে শুনত। পড়া শেষ হয়ে গেলে লোকেদের উচ্ছ্বাস আর থামত না: হাততালির পর হাততালি দিয়ে দিয়ে ওঁকে চার-পাঁচটা কবিতা আরও বেশি করে পড়িয়েছে। জার্মানীর কোন এক শহরে যখন কবি পড়ছেন "একি তবে সবই সত্য? হে আমার চির-ভক্ত—" তখন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের পিছনে দুটি মেয়ে অন-বরত কবির গলার সুরের নকলে বলছে—"এাকি তবে সবি সত্য?" দু'তিনবার শুনবার পরে তিনি যখন তাদের দিকে তাকালেন, ১৬।১৭ বছরের মেয়ে দুটি তাল দিয়ে দিয়ে লাইনটা বলছে, দুজনে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হাসি হেসে ভাঙা ইংরেজীতে বলল,—"ক্ষমা করো, এরকম মিউজিকের মতো ভাষা আর কখনো শুনিনি। কিছুতেই থাকতে পারলাম না নকল করবার চেষ্টা না করে। তোমাদের বাংলাভাষা কি সত্যিই এত মিষ্টি? না এটা টাগোরের নিজেরই বিশেষত্ব?" ঘটনাটি পরে যখন কবি শুনলেন তখন খুব কৌতুক বোধ করলেন—"জার্মান জাতের কানে ভাষার ছন্দ আর মিউজিক ঠিকমতো গিয়ে বেজেছে।"

শতবার্ষিকী সমাচার বিবৃত করতে গিয়ে উপরোক্ত ঘটনাগুলো আপাত অপ্রাসংগিক মনে হলেও প্রয়োজনীয় এই-জন্য যে, দূর বিদেশীর কানে রবীন্দ্র-নাথের কাব্য ও সংগীতের ছন্দ ও সুর যেমন ঠিকমতো গিয়ে বেজেছে, স্বদেশের হিন্দিভাষীদের কানে ঠিক তেমনভাবে বেজে ওঠেনি। তাই মনে হয় রবীন্দ্র-নাথের প্রচুর গান ও নৃত্যনাট্যগুলি ক্রমে ক্রমে হিন্দিতে অনূদিত হচ্ছে। অবাঙালী বা বিদেশীগণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ভাষায় বুঝবার আগ্রহে এবং বিশ্বকবির অমূল্য কাব্য সাহিত্য সংগীত-ভাণ্ডারের গোপন সম্পদ আহরণের আশায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাংলাভাষা শিখছেন ও পড়ছেন।

রেংগুনে মাসখানিক থাকাকালীন যত অনুষ্ঠান হয়েছে, সবগুলোতেই বাংলা গান ও শান্তিনিকেতনী ধারায় নাচ পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য বাংলা গানের তর্জমা পুর্বাহ্নে ইংরেজীতেই ছাপানো আকারে প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে রেংগুনে চিত্রাঙ্গদার যে অভিনয় হয় তার বিষয়বস্তু ইংরেজীতেই প্রোগ্রামে ছাপানো ছিল। রেংগুন থেকে চারশত মাইল দূরে শৈল-শহর টাউঙ্গ্-জিতেও এই নৃত্য-নাট্যের অভিনয়ে ইংরেজী ছাড়াও হিন্দি ও বার্মিজ ভাষায় প্রত্যেক দৃশ্য অভিনীত হবার আগে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। সেখানকার শান, টউঙ্গু প্রভৃতি অধিবাসীরা আগ্রহের সংগে অভিনয় দেখেছে ও উপভোগ করেছে।

এখানে বাঙালীদের কর্মপটুত্বের আরও নিদর্শন পাওয়া গেল। বেংগল একাডেমী বাঙালীদের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আট শতাধিক। আই-এ ও বি-এ'র ক্লাশও খোলা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয় ও পরীক্ষা গৃহীত হয়। গান নাচ অভি-নয়, শিল্পকলা ও খেলাধুলা শেখানোর ভাল বন্দোবস্ত আছে। ওখানে নিয়মিত কিছুদিন ছোটদের সংগীত শিক্ষার আসরে উপস্থিত থেকে ওদের গান শেখার সময় আগ্রহ, স্ফূর্তি, আনন্দ মিলিয়ে প্রাণ-চঞ্চল হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি সত্য-সত্যই শেখানোর আয়াসকে তিরো-হিত করে। কলকাতার ছোটদের কিংবা বড়দের সংগীত-শিক্ষার আসরে এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করি। বিদেশে বাঙালী ছেলে-মেয়েরা অনেক ফ্রি ও আত্মবিশ্বাসী মনে হল। বাঙালীরা ঘরে ঘরকুনো হলেও বাইরে সত্যিই তাঁরা মজলিশী। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুম-দারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় রবীন্দ্র-সংস্কৃতির যে সুন্দর পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে তাতে বাহ্যাড়ম্বর নেই বটে, কিন্তু অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আন্তরিকতা ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় নির্বিবাদে আগন্তুককে স্বীকার করতেই হয়। তার ফলে তাঁদের (যাঁরা রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কর্তব্যভার গ্রহণ করেন) উচ্ছ্বাসের চেয়ে কাজটাই নজরে পড়ে, ধীর অগ্র-গতি সে-উচ্ছ্বাসে চাপা পড়ে যায় না। প্রথম অগ্রণী হিসেবে Tagore Society বাস্তবিকই উচ্চপ্রশংসার দাবী রাখে। আরও ভাল লাগে বাঙালী-দের প্রচেষ্টায় গঠিত "ইণ্ডিয়ান মিউজি-ক্যাল সোসাইটি" যা ক্রমে বিশেষ সুনাম অর্জন করে ও পরে "ইণ্ডিয়ান মিউজিক এ্যাণ্ড আর্ট সোসাইটি" নামে একটি ইণ্টারনেশনাল সংস্থায় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। এখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব রকমের সংগীত ও শিল্পের চর্চা ও Demonstration প্রদর্শিত হয়। সোসাইটির আমন্ত্রণে আমাদের শিল্পী-বৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রানুগ নাচ ও গান শেষবারের মত এখানে পরিবেশিত হয়েছিল।

সবশেষে এই চিন্তাটাই মনে বার বার উঁকি দিচ্ছে যে, এখন ব্রহ্মদেশবাসীর পালা, তাঁরা আমাদের কাছে যদি শান্তি-নিকেতনী ভাষায় বলেন "লাগলো কেমন?" আমরা শান্তিনিকেতনের দল দৃপ্তকণ্ঠে 'গুরুজী কি ফতে' দিয়ে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় বলব "তে কাউন্তে" অর্থাৎ 'খুব চমৎকার' 'খুব সুন্দর'। আমাদের পক্ষ থেকে শতবার্ষিকীর বিরাট দায়িত্বপূর্ণ আয়োজন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ডাঃ আর এন শীল, শ্রী ইউ এল বড়ুয়া, শ্রী পি এন বসু, স্বামী সুর্যানন্দ এবং শ্রী বর্ধনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বেংগল একাডেমীর সদস্য শ্রীনীলকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীপ্রীতি রায় মহো-দয়ের অকৃপণ সহায়তায় ও সহৃদয়তায় আমরা মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ বিষের ধোঁয়া ॥

বার্ট্রাণ্ড রাসেল ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাহিত্য সাপ্তাহিক The Saturday Review নামক পত্রিকায় হাইড্রোজেন বোমার সঙ্গে মানবজাতির দ্বৈত-যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"I am writing not as a Briton, not as a European, not as a member of Western Democracy, but as a human being, a member of the Species of Man, whose continued existence is in doubt. The world is full of conflicts: Jews and Arabs; Indians and Pakistanis; Whitemen and Negroes in Africa; and overshadowing all minor conflicts, the titanic struggle between Communism and anti-Communism."

সমগ্র বক্তব্যটি বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে রাজনৈতিক বিবেচিত হবে, সমস্যাটা কিন্তু প্রবলভাবে মানবিক। বিজ্ঞ-বিচারক সম্প্রতি আণবিক অস্ত্র-বিরোধী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্য এই বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে দণ্ডিত করেছেন দু'মাসের জন্য। শারীরিক অসুস্থতার জন্য অবশ্য এই উননব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পণ্ডিতের দণ্ডকাল হ্রাস পেয়ে মাত্র সাত-দিন হয়েছে। এই সূত্রে বিচারক মিঃ উইলসন বলেছেন : "Great men are not always wise neither do the aged understand Judgment—"

মহৎ মানুষরা হয়ত যথেষ্ট জ্ঞানী ন'ন. বাইবেলের বুক অব যবের থেকে এই উক্তিটি গৃহীত—কিন্তু বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই হঠকারিতা সম্পর্কে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেছেন— "I admire very much Bertrand Russell's attitude to nuclear tests. I envy him."

সমগ্র ঘটনাটি তাই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে বিচার না করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা প্রয়োজন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল চিন্তাশীল দার্শনিক, দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই জাতীয় পার-মাণবিক বোমার দ্বারা এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিরাট মানবিক-গোষ্ঠীর কি পরিমাণ ক্ষতি হওয়া সম্ভব তার জন্য সতর্ক করেছেন। পূর্বোক্ত The Saturday Review পত্রিকার প্রবন্ধে তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন "All, equally, are in peril, and if the peril is understood, there is hope that they may collectively avert it."

সব দেশের চিন্তাশীল মানুষের তাই আজ সমবেত হওয়ার দিন আসন্ন, এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে তার গতি-রোধ করার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ এমনই এক মহা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত কল্পনা করেই প্রশ্ন করেছিলেন :

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছ ভালো?"

এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়? বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দণ্ডে আজ নেহরুর মত সব মানুষের মনেই এই প্রশ্ন জাগিয়েছে!

শোনা গেছে যে পৈশাচিকতায় হিরোসিমা এবং নাগাসাকি নাৎসী শাসনের কালে ইহুদী-দলনের পৈশাচিকতাকেও হার মানিয়েছে। এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে জাপান শান্তি কামনা করার পর হিরো-সিমা নাগাসাকির যথেচ্ছ ধ্বংস পৃথিবীর মানুষের মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে-ছিল। বর্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়করা মানুষ হিসাবে কেউ-ই পিশাচ নন, তবু কোনো রকম হঠকারিতার ফলে পৃথিবীর মানব-গোষ্ঠীর একটা বৃহত্তর অংশের ক্ষতি হয়, তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক একথা কেউই ভাবতে পারেন না। আজ যদি পৃথিবী হঠাৎ ধ্বংস হয় তাহলে তা বিদ্বেষ, কুটিলতা, নৃশংসতা এ সব কোনো রকম কারণে ধ্বংস পাবে না, ধ্বংস হবে মানব-গোষ্ঠীর নির্বুদ্ধিতার ফলে। তাই যে গ্রন্থ এই বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করতে চায় সেই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজন, যত বেশী মানুষ সেই গ্রন্থ পাঠ করে সচে-তন হয় ততই মঙ্গল। 'হাইনেম্যান' প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি রবার্ট জাংকের Children of the Ashes নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থের দাম পঁচিশ শিলিং। জাংক ইতিপূর্বে 'Brighter than a Thousand Suns' নামক একটি অপূর্ব গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে আণবিক বোমা কিভাবে তৈরী হয় এবং নিক্ষেপিত হয় তার কথা আছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রায় সেই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি, তবে তিনি এইবার আরো গভীরে পৌঁছেছেন। ইতিমধ্যে তিনি দুবার হিরোসিমা ঘুরে এসেছেন, সেখানকার লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের ফলে ১৯৪৫-এর ৬ই আগষ্ট প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল এবং তার পরের কথা লিপিবদ্ধ করে এনেছেন। এই কর্মটুকু লেখকের মতে— "Something between the historian .. and the newspaper reporter."

অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীযুক্ত জাংক তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাঁর রচনায় উচ্ছ্বাসহীনতা এবং সংযম বিশেষভাবে হৃদয় স্পর্শ করে। হিরো-সিমার আতঙ্ককর মুহূর্তের ছবি এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে নেই, মাত্র একটি পরিচ্ছেদে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বিধৃত। হারসে রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সঙ্গে শ্রীযুক্ত জাংকের Children of the Ashes গ্রন্থের অনেক পার্থক্য বর্তমান। কারণ তিনি সেদিনের হিরোসিমার চাইতে তার পরের কালের হিরোসিমা সম্পর্কেই বেশী বলেছেন। আর বলেছেন নিরীহ ভুক্তভোগীদের কথা।

শ্রীযুক্ত জাংক তিনটি প্রাণীর ওপর প্রধানতঃ নির্ভর করেছেন। তার মধ্যে একজন কাজুয়ো এন "a boy of imagination and integrity who was driven by his experience into a hatred of life which ultimately led to the committing of a senseless murder!" আর একজনের নাম ইচিরো কয়ামোটো। লোকটি দরিদ্র, সাধুচরিত্রের, সারা জীবন ধরে সে দুর্গতদের দুঃখহরণের চেষ্টা করছে, আর একজন কয়ামোটোর খঞ্জ স্ত্রী, তার নাম তোকি। শহরের যুদ্ধোত্তরকালীন চিত্র অতিশয় সূক্ষ্ম আঁচড়ে আঁকা, এই সুদৃঢ় তন্তুতে যে ছবি বয়ন করা হয়েছে তা যে শুধু দীর্ঘায়ত এবং বিচিত্র তা নয় কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগতও বটে। এমন একখানি গ্রন্থ-রচনা সহজসাধ্য নয়।

জাপানী, আমেরিকান বা অস্ট্রে-লিয়ান এই অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার ফলে বিকৃত আকৃতি নিয়েছে। কিছু স্পষ্টই দুর্বৃত্ত বা 'ভিলেন টাইপ', সৎ এবং সাধু মানুষেরও অভাব নেই, তার মধ্যে কারো কারো নায়কোচিত গুণও বর্তমান। 'সডোম' শহর ধ্বংস হয়ে-ছিল সে দেশে দশজনও সৎ মানুষ পাওয়া যায়নি বলে। এখানে কিন্তু অবস্থাটা বিপরীত, আগে এ নিয়ে কোনো অনুসন্ধান করা হয়নি। হিরো-সিমার হয়ত পুনরুজ্জীবন ঘটত সৎ-মানুষের সংখ্যালঘুত্ব সত্ত্বেও।

কিছুসংখ্যক অস্ট্রেলিয়ান সৈনিকের পৈশাচিক বর্বরতার কথা জানা যায়। বোমা নিক্ষেপের কয়েক বছরের মধ্যেই শহরের আকৃতি বাণিজ্যিক শহরে রূপা-ন্তরিত। অন্য শহরের জাপানীদের যে হিরোসিমার মানুষদের প্রতি কোনো কর্তব্য নেই। এমন কি শহরের যে সব হিরোসিমার অতিশপ্ত নাগরিক আজো বর্তমান তারা যেন হরিজন, প্রাথমিক

সমবেদনার কাল কবে শেষ হয়ে গেছে। যাদের অঙ্গে এখনও ক্ষতচিহ্ন আছে তাদের সাধারণ সন্তরণাগারে প্রবেশ নিষিদ্ধ। হিরোসিমার ডাক্তারবৃন্দ দাতব্য চিকিৎসাব্যবস্থার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। এমন কি জাপানের বোমা-বিরোধী আন্দোলনও আজ ব্যক্তিগত কলহ এবং ক্ষমতালোভীর দ্বন্দ্বের ফলে দ্বিধাগ্রস্ত এবং দুর্বল।

আমেরিকানদের সরকারী মনোভঙ্গী সাধারণতঃ উদাসীন এবং সহানুভূতি-হীন। হিরোসিমার দুঃখকর ঘটনার যথাযথ বিবরণ, বোমা বিস্ফোরণের প্রতি-ক্রিয়া প্রভৃতি সংবাদ পাঁচ বছর গোপন ছিল। এটমিক বোমা ক্যাজুয়ালটি কমিশন দুর্গতদের গিনিপিগের মতই গ্রহণ করেছেন। তারা কোনো রকম চিকিৎসার সুযোগ পায়নি। তোকির বাপের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহটা নিয়েও টানাটানি চলেছিল শব-ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষার জন্য, অথচ জীবদ্দশায় সে এতটুকু ওষুধপত্র পায়নি। জাপানী সরকার দমন-নীতিমূলক আইন করে-ছিলেন আর যে-হিরোসিমা যুদ্ধের পূর্বে ছিল শান্তির নীড়, যুদ্ধের পর তা শিকাগো শহরের মত গুন্ডার দলে পরিপূর্ণ।

তা বলে কি কেউ নেই! এতবড় একটা শোকাবহ ঘটনায় হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ার মত দুর্বল মানুষও সংসারে আছেন। আমেরিকান কোয়েকার প্রফে-সর সীনো একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে হিরো-সিমায় বসে স্বহস্তে নতুন গৃহ নির্মাণ করছেন। আমেরিকান মিশনারী মিস্ ম্যাকমিলনের দেবী-সুলভ প্রকৃতি এবং দুর্গতদের ক্লেশ নিবারণে ঐকান্তিক প্রযত্ন যেন সব অভিযোগ ধুয়ে মুছে দেয়। অনেক মার্কিণ ও অস্ট্রেলিয়ান সৈনিক অতিশয় সহৃদয়তা এবং সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। মেয়র হামাই-এর দৃঢ়তা, নিষ্ঠা এবং সেবাব্রত এই শহরকে প্রাণরসে উজ্জ্বল করেছে। আর আছে অনন্যসাধারণ কায়ামোটো। কয়েকজন আমেরিকান মহিলা পঁচিশ-জন আহত কুমারীকে তাঁদের দেশে নিয়ে গেছেন। কয়েকটি পর্যায়ে হিরো-সিমাকে শান্তিময় সুন্দর নগরীতে পরিণত করার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং সে চেষ্টা একেবারে বিফল হয়নি।

আণবিক বোমার শিকারের সংখ্যা কিন্তু ক্রমবর্ধমান। যেসব তথ্যাদি একদা দুষ্প্রাপ্য ছিল আজ তা সহজ-প্রাপ্য তাই শ্রীযুক্ত রবার্ট জাংক সেই সব তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করে একটি মহৎ-কর্ম সম্পাদন করেছেন। এই গ্রন্থ পাঠে যার যেমন মন, সে তেমনটি ভাবতে পারে, তবে যে যাই ভাবুক এ-কথা নিতান্ত বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষ ছাড়া সকলের মনে হবে যে, কোনো কারণেই

আণবিক, পরমাণবিক বা মহাজাগতিক বোমা ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। পাঠক বুঝবেন আজ পৃথিবী কি ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক মুহূর্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত ইংরেজ লেখিকা ইথেল ম্যানিনের The Flowery Sword বা 'পুষ্পিত খড়্গ'। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত প্রকাশক প্রতিষ্ঠান হাচিনসন, দাম পঁচিশ শিলিং। সামুরাই যোদ্ধা এবং চেরীফুলের দেশ সম্পর্কে লিখেছেন শ্রীমতী ম্যানিন। জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হৃত-গৌরব এবং কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ। শ্রীমতী ম্যানিন যথেষ্ট উদার মনোভঙ্গী এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যুদ্ধোত্তর জাপানের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। জাপানের যা নিন্দনীয়, যা রুচিহীন এবং কুৎসিত মনে হয়েছে তিনি তার নিন্দা করেছেন। তোকিয়ো, ওসাকা, কোবে প্রভৃতি শহরের বিরাট প্রাসাদ-শ্রেণী, স্নানাগারের নগ্ন-স্নান আর একঘেয়ে অরুচিকর আহার্য তাঁর ভালো লাগেনি। শ্রীমতী ম্যানিন কিন্তু জাপানের যা প্রশংসনীয়, যা সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য তার কথাও সমান উৎসাহে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হিরোসিমা এবং নাগাসিকি সম্পর্কেও তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন মহাযুদ্ধের অংশভাগী দলের দৃষ্টি নিয়ে নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। তিনি বলেছেন ট্রুম্যান এবং তাঁর সেনাপতিরা জানতেন জাপান এই যুদ্ধে পরাজিত হবে, তবু তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যুদ্ধটি তাড়াতাড়ি খতম করার প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয়তঃ আণবিক বোমার প্রচণ্ডত্ব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। শ্রীমতী ম্যানিন বলেছেন ঃ "The beauty of Hiroshima is the beauty of flowers on a grave." আর নাগাসিকিতে তাঁর দোরগোড়ায় একটা বিড়াল অতিশয় করুণ ভঙ্গীতে কেঁদেছিল, তাঁর সেদিন মনে হয়েছিল এ যেন বুভুক্ষু শহরের প্রতীক। শ্রীমতী ম্যানিন এটম বোমের কীর্তি স্বচক্ষে দেখে তার কথা লিখেছেন। 'No more Atom Bomb' আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা আছে· তাই যুদ্ধোত্তর জাপানকে স্বচক্ষে দেখে তিনি সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ ভাষায় তাঁর বক্তব্য বলেছেন।

বিষের ধোঁয়া আজ পৃথিবীকে গ্রাস করতে বসেছে, বার্ট্রান্ড রাসেলের আর একটি উক্তি আজ সকলের চিন্তা করা উচিত— "There lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge, and wisdom. Shall we instead choose death, because we can not forget our quarrels? I appeal as a human being to human beings; remember your humanity and forget the rest." 'জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতির নাম মানুষ-জাতি!' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই কথাটা যেন আমরা না ভুলি।

নতুন বই

যাত্রিদল—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ঃ ৬-৫০ নঃ পঃ।

এই জাতীয় উপন্যাস রসোত্তীর্ণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ সঞ্চার ও তা অব্যাহত রাখাও তদনুরূপ দুঃসাধ্যপ্রায়। রাজনৈতিক উপন্যাস একটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকারই কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারে। যাঁরা গুপ্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে ছিলেন (কেননা, এ আজ নিতান্তই অতীত ইতিহাস মাত্র) তাঁদের আগ্রহ হবে অনেকটা অতীত রোমন্থনের। তাঁরা খেয়াল করতে চাইবেন ঘটনা-পারম্পর্যের বিশ্বস্ত নিরিখ—যেখানে উপন্যাসের রসের চাইতে ঐতিহাসিক স্মৃতির রসই প্রবলতর। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক আছেন যাঁরা সে আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না কিন্তু সে-আন্দোলন সম্পর্কে কৌতূহল আছে। তাঁদের দৃষ্টিও হবে ঐতিহাসিক। সুতরাং, সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে টানতে এ জাতীয় গ্রন্থ একান্তভাবে ঔপন্যাসিক প্যাটার্ণ ও লজিকে রসোত্তীর্ণ হওয়া চাই। এ বইখানি সেদিক থেকে বহুলাংশে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং কতকগুলি পরিবেশ চরিত্রের স্মৃতিরেখা রেখে যায় মনে—যা ঐতিহাসিক ঘটনা পারম্পর্যের নয়, উপন্যাসেরই সৃষ্টি।

স্বপ্ন-যমুনা—(উপন্যাস)—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য। প্রকাশক ঃ গ্রন্থপীঠ। ২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ঃ তিন টাকা।

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে অনেকগুলি সার্থক উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। গল্প রচনার ভঙ্গিটুকু তাঁর নিজস্ব, অনাড়ম্বর সারল্যের সঙ্গে তিনি গল্প সাজিয়ে যান যার ফলে তাঁর গল্পের মধ্যে একটা নির্ভেজাল সারল্যের সুর পাওয়া যায়। এই উপন্যাসটির সমগ্র অংশ একটি মাসিক পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সেই কালে বিদগ্ধ সমালোচকের প্রশংসা লাভ করেছিল। ডাঃ ভট্টাচার্য তাঁর কাহিনীতে যে পটভূমি প্রয়োগ করেছেন তা পরিচিত জগতের নয়, আরণ্য প্রকৃতির বিচিত্র পটভূমিতে তিনি তাঁর কাহিনীটি বিবৃত করেছেন। ডাঃ ভট্টাচার্য নিপুণতার সঙ্গে যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তা যেমন জীবন্ত, যে আরণ্য পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন তাও তেমনই স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বৃন্দাবন চরিত্রটি চমৎকার, তার কাহিনী বলার ভঙ্গিটুকুও তেমনই মনোহর। লেখক যে স্বচ্ছন্দ গতিতে তাঁর গল্পটি এগিয়ে নিয়ে গেছেন, এবং বৃন্দাবনের মুখের কাহিনীতে অন্য ভুবনের যে অলৌকিক মায়া রচনা করেছেন তা ভাবের গভীরতায় এবং কল্পনার বলিষ্ঠতায় সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে। তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত প্রচ্ছদ-চিত্রটি মনোরম।

গোরাকালার হাট—অশোক গুহ। গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতাঃ-১২। দাম ৮-৫০ নঃ পঃ।

শ্রীযুক্ত অশোক গুহ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত। ঐতিহাসিক যুগের সেই মানুষেরা উপন্যাসের ছাঁচে পড়ে যেমন নতুন রূপ লাভ করেছে তেমনি সাধারণ মানুষও ঐতিহাসিক চরিত্রের সংস্পর্শে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই বিরাটাকার গ্রন্থটির মধ্যে।

কলকাতা নগরের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি পর্যন্ত গ্রন্থের বিস্তৃতি। ভারতের শহর আর গ্রামের মানুষই শুধু আসেনি এখানে, এসেছে বিদেশের বিভিন্ন জাতের মানুষ বিভিন্ন সূত্রে। সমস্ত মিলে একাকার হয়ে গেছে উপাখ্যানের শেষ পর্বে। গ্রন্থটি কয়েকটি পর্যায়ক্রমে রচিত। বিভিন্ন মানুষের কলকাতা আগমন-কাহিনী এ সমস্ত পর্যায়ের মধ্যে আবদ্ধ। তাই কাহিনীগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মনে হলেও শেষ পর্যন্ত সকলে নন্দকুমারের ফাঁসি অধ্যায়ে মিলিত হয়েছে। কিন্তু চরিত্রগুলি কতদূর স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বহু চরিত্রের ভিড়ে কারো উপরই যেন লেখক যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন নি।

উপাখ্যানকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করতে গিয়ে আনুসঙ্গিক নানা ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার উপরও লক্ষ্য দিয়েছেন অশোকবাবু। সেকালে প্রচলিত গ্রাম্য বুলির সাহায্যে নতুন গড়ে-ওঠা শহরটির গেঁয়ো ভাবটাই বোধহয় পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন তিনি। একশ বছর আগে লিখিত কোনো কোনো উপন্যাস, নক্সা এবং নাটকে এই ধরনের কথ্য ভাষার

কিছু কিছু নমুনা দেখা যায় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেই আদর্শটি সামনে রেখে তাতে কথ্যবুলির এমন প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছেন যে, মাঝে মাঝে দিশেহারা হ'য়ে যেতে হয়। এমন নির্বিচার কথ্যবুলি মিশ্রণের ফলে শেষ পর্যন্ত ভাষা যে অনেকটা অকথ্য চেহারা নেয়, অভিজ্ঞ লেখকের তা অজানা থাকার কথা নয়। তবু যে কেন এই বিপজ্জনক মোহে তিনি জড়িয়ে পড়লেন, সেটা খুবই বিস্ময়ের কথা।

যাই হোক, এই বৃহৎ কলেবরের বইয়ে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যাতে সেকালের কলকাতার মোটামুটি একটা চেহারা আন্দাজ করা যায়। তাছাড়া ভারতীয়গণ এবং বিদেশীরা সে যুগে কত রকম সামাজিক আদান-প্রদান ও বিরুদ্ধতার সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল তারও কিছুটা আভাষ পাওয়া যায় এতে। সে দিক থেকে বইটি উল্লেখযোগ্য।

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি—(প্রবন্ধ)

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। প্রকাশক: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা-১২। দাম: ছ'টাকা।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী দীর্ঘকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং তাঁর সেই সব সুচিন্তিত আলোচনা নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো ছিল। বর্তমান গ্রন্থে এমনই আটাশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর প্রবন্ধাবলী মূলতঃ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সমালোচকের সমাদর লাভ করেছিল। বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান, বাংলা পরিভাষা, বাংলার পুরাণ-কাহিনী, আধুনিক বাংলা ভাষা, বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি প্রবন্ধাবলীতে লেখক অতিশয় মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। বক্তব্য প্রকাশের স্বচ্ছন্দ পদ্ধতি এবং আঙ্গিকের নূতনত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। লেখকের চোরের পাঁচালি এবং রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র নামক রচনা দুটিও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত এমন বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখক অভিনন্দনযোগ্য। উত্তরকালের গবেষকগণ এই গ্রন্থ থেকে প্রভূত সাহায্য লাভ করবেন আশা করি।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ—(২য় খণ্ড)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক: এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জীবনকথা লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার। ইতিপূর্বে চার খণ্ডে সম্পূর্ণ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, পরমাপ্রকৃতি সারদামণি, কবি শ্রীরামকৃষ্ণ লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার। দিব্য জীবনীর রচয়িতা হিসাবে অচিন্ত্যকুমারের স্থান আজ বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ শিখরে। ইতিপূর্বে তাঁর 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রথম খণ্ডে তিনি স্বামীজীর জন্মকাল থেকে আমেরিকা যাত্রা পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন, যে নরেন্দ্র সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "ধ্যানস্থ হয়ে দেখে বললুম, ও নরেন্দ্র। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই এক-রূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললুম; মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।" মা সেদিন ঠাকুরের প্রার্থনা কানে নিয়েছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে মায়ায় বদ্ধ করেছিলেন, তবে সে মায়া মানব-প্রেমের মায়া, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রেম। তাই নরেন্দ্র বিবেকানন্দ হয়ে বলতে পেরেছিলেন: "গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যা, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি-ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যা, মেতে যা, উন্মাদ হয়ে যায়।" এই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা। অচিন্ত্যকুমার বীরেশ্বর বিবেকানন্দের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন, স্বামিজীর আমেরিকা জয় করে ইংলণ্ডে প্রথম পাড়ির কথা। শিকাগোর সেই বিখ্যাত ধর্ম-সভার ঐতিহাসিক ভাষণ, যে-ভাষণে স্বামিজী আমেরিকার হৃদয় জয় করেছিলেন, আর উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতের বিজয় পতাকা—তার কথা অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন তাঁর অননুকরণীয় বিচিত্র ভাষায়। মহাপুরুষের জীবনকথা স্মরণ-মনন এবং পঠনের দ্বারাই তাঁদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানান সম্ভব। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ পাঠে তারই সুযোগ অতি সহজে করায়ত্ত হবে। স্বামিজীর বাণী বিদ্যুৎ-বহ্নির মত হৃদয়-মন আলোড়িত করে তোলে এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠে। সুরুচি-সঙ্গত মুদ্রণ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য।

ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস—(শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ)—অরুণ ঘোষ। প্রকাশক: এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স। ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

শিক্ষাতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য লেখক অশেষ শ্রম সহকারে ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থে প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন, প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম, মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ত্রিধারা, শিক্ষা আইন, ইংলণ্ডে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে-ইংলণ্ড পৃথিবীর আদর্শ-স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকরী করেছে, তার শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিক বিবরণ অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গে লেখক এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। একত্রে ইংলণ্ডীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা সহজলভ্য নয়।

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

।।মঞ্চ-নাটকের অভাব ।।
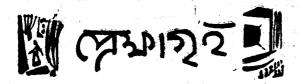
একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক খুব কমই লেখা হচ্ছে। আমাদের চারটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকালেই কথাটা যে মিথ্যা নয়, তা প্রমাণিত হ'তে দেরী লাগবে না। স্টারের "শ্রেয়সী" হচ্ছে সুবোধ ঘোষ প্রণীত উপন্যাসের দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত নাট্যরূপ। বিশ্বরূপাতে হচ্ছে কিরণ মৈত্র রচিত একাঙ্কিকা "বুদ্বুদ"কে বিধয়াক ভট্টাচার্য দ্বারা টেনেবুনে বাড়ানো "সেতু"। রঙমহলে অভিনীত হচ্ছে ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত মৌলিক নাটক "চক্র" এবং মিনার্ভাতে চলছে নট-নাট্যকার উৎপল দত্ত লিখিত "ফেরারী ফৌজ"। আর একটু পেছনে তাকালে দেখতে পাই, নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ "শ্যামলী", তারাশঙ্করের উপন্যাসের নাট্যরূপ "আরোগ্য নিকেতন", নরেন্দ্র মিত্রের গল্প অবলম্বনে "দূরভাষিণী", বিমল মিত্রের "সাহেব-বিবি-গোলাম"-এর নাট্যরূপ, শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত"-র নাট্যরূপ, নীহার গুপ্তের "উল্কা", তারাশঙ্করের "কবি", ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক "এক মুঠো আকাশ" এবং "এক পেয়ালা কফি", উৎপল দত্ত রচিত নাটক "ছায়া-নট" এবং "অঙ্গার", বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক "ক্ষুধা" ইত্যাদি। একখানিও এমন নাটকের সন্ধান পাওয়া গেল কি, যাকে

"সপন সুহানে" চিত্রে কামিনী কদম ও চন্দ্রশেখর

নিয়ে আনন্দে উল্লসিত হ'তে পারি? বলতে পারি, আমাদের গল্প, উপন্যাস, কবিতারই সমগোত্রীয় এই বিশেষ নাটকখানি। —ওদেরই মতো প্রথম পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য।

কেন এমন অবস্থা হোল? অভিনয় এবং নাটক নিয়ে যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই, ভারতীয় গণ-নাট্য সঙ্ঘের "নবান্ন" থেকে শুরু ক'রে যখন বাঙলা দেশে নব-নাট্য আন্দোলনের ঢেউ ক্রমেই পরিধি বাড়িয়ে দিগন্তপ্রসারী হ'তে চলেছে, তখন প্রকৃত নাট্য-বিভূতিসম্পন্ন নাটক-রচনার ক্ষেত্রে এমন দৈন্যকে অত্যন্ত অহেতুকভাবে বিস্ময়কর মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

অথচ একটু ভেবে দেখলে এই দৈন্যকে আদৌ বিস্ময়কর মনে হবে না। আমাদের নাটক আজ একটি যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। এতকাল আমাদের নাটকে অনুসৃত হ'ত বস্তু-তান্ত্রিক রীতি অর্থাৎ objective treatment। গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু ক'রে অপরেশচন্দ্র, এমনকি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পর্যন্ত সকলেরই নাটকে ঘটনার ভিড় এবং ঘটনাস্রোতে প'ড়ে চরিত্র কি ভাবে তাতে প্রতিক্রিয়া করছে, তারই পরিচয়। শেক্সপীয়রের অনুকরণে এঁদের সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রই ঘটনার দাস। নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে তাদের কেউ বা মহত্ত্ব প্রকাশ করছে, আবার কেউ বা হয়ে উঠছে শয়তানের অনুচর। গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটক "প্রফুল্ল"-তে যোগেশের সঞ্চিত অর্থ যে ব্যাঙ্কে রক্ষিত ছিল, সেই ব্যাঙ্ক ফেল না পড়লে কোনো কিছুই ঘটত না, যোগেশের মা উমাসুন্দরী অবলীলা-ক্রমে ট্রেনে চেপে বৃন্দাবন চ'লে যেতে পারতেন। এবং রমেশ যে অত বড় একটি মূর্তিমান শয়তান বা তারই স্ত্রী প্রফুল্ল সরলতার প্রতিমূর্তি এসব তথ্য

আলোছায়া প্রোডাকশনস্‌এর "দু'ভাই" চিত্রে সুচিত্রা সেন

জানবার কোনো উপায়ই থাকত না। এই রকমই প্রায় প্রতিটি নাটকেই—ঘটনা আগে ঘটে, তারই ফলে পরে চরিত্রের প্রকাশ বা বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ইবসেন গিরিশচন্দ্রের বহু আগে থেকেই নাটক লেখা শুরু করলেও নাটক রচনায় শেক্সপীয়রের objecive (বস্তুতান্ত্রিক) রীতি অনুসরণ করাকেই এ'রা শ্রেয় এবং নিরাপদ ব'লে বিবেচনা করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমানে এই objective treatment-কে ত্যাগ ক'রে subjective treatment বা ভাবতান্ত্রিক রীতি অবলম্বন ক'রে নাটক রচনার প্রতি লেখকরা ঝুঁকে পড়েছেন। ধরুন, "সেতু" নাটক। অসীমার বন্ধ্যাত্ব নাটকের সবখানি জুড়ে রয়েছে। আজকের নাটকে ঘটনার ভিড় নেই—এবং নাটকীয় চরিত্র ঘটনার দাসত্বও করে না। বরং উল্টে চরিত্রই ঘটনার সৃষ্টি করে। আজ নাটকের বিষয়বস্তু খোঁজবার জন্যে ইতিহাসের পাতা উল্টোবার দরকার নেই, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-উপপুরাণ ঘে'টে গল্প আবিষ্কার করবারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এত বিরোধ, এত সংঘর্ষ, এত বিপরীতমুখী চিন্তা-ভাবনার স্রোত বইছে প্রতি নিয়ত যে, যে-কোনো একটি ছোট্ট ঘটনাকে কার্য-কারণ সম্পর্ক দেখিয়ে খুঁটিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে বা দেখাতে চাইলেই একটি পূর্ণাঙ্গীন নাটক খাড়া হয়ে যাবে। মনে করি, একটি মেয়ে একজোড়া জুতো কিনবে। অমনি প্রশ্ন শুরু হবে, মেয়েটি বিবাহিত বা কুমারী? —বিবাহিত হলে তার স্বামীটি কেমন? দু'জনে ভাব আছে ত'? —তা তাই যদি থাকবে, তা'হলে মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে না এসে একা জুতো কিনতে এল কেন? কি তার উদ্দেশ্য? ঐ জুতো কেনাকে উপলক্ষ্য করে অন্য কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি? —এই রকম হাজারো প্রশ্ন নাট্যকারের মনের আনাচে-কানাচে উ'কি মারবে। এবং তিনি তারেরই মধ্যে থেকে একটি যোগসূত্র আবিষ্কার করে ভাববস্তুপ্রধান একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখে ফেলবেন।

আমাদের বর্তমানে যার অভাব হচ্ছে, তা নাটকীয় বিষয়বস্তু নয়। সেই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে নাটককে বিস্তার করবার সুষ্ঠু এবং সবল রীতি আমরা প্রায়ই খুঁজে পাচ্ছি না। তাই দেখি, মালিকপক্ষীয় জমাদারের (উৎপল দত্ত অভিনীত) ছেলেকে কেন্দ্র করে না গড়ে উঠে একটি নিতান্ত অবান্তর চরিত্রের ভালোবাসা-আশা-আকাঙ্ক্ষা 'অঙ্গার' নাটকটিতে প্রাধান্য পেল। এবং একটি অর্ধ-উন্মাদ চরিত্র শেষ পর্যন্ত প্রোটাগনিস্টের ভূমিকাভিনয় করল। "সেতু"-তে অসীমার দুঃখকে তীব্রতর করবার জন্যে সমান্তরালভাবে পত্র-বতীদের কাহিনী আমদানি করেই বিধায়ক নিবৃত্ত হননি, বেবী ফুডের কারবার এবং জাল-বেবী ফুডের চোরা-কারবার-কাহিনী সংযোগ করে "সেতুকে" অনাবশ্যকভাবে ঘটনাবহুল করে তুলেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, নাটকে বিষয়বস্তু বা content-এর অভাব নেই, রূপসৃষ্টি বা form-এই যত গোলমাল। ইবসেন-প্রবর্তিত subjective treatment এখনও আমাদের ধাতস্থ হয়নি।

এরও ওপর কথা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতালাভের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আমাদের জীবনে প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছে। নীতি-রীতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাচ্ছে পাল্টে; সামাজিক জীবনের সম্বন্ধগুলি নূতন করে নিরূপিত হচ্ছে; চিরাচরিত প্রথা-গুলির মূলে প্রবল কুঠারাঘাত তাদের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিয়েছে; বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষ মহাব্যোমচারী হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পর্ধিত প্রশ্ন তুলেছে: সকল জিনিসেরই আজ নব মূল্যায়ণে মানুষ মেতে উঠেছে। আজকের মানুষ বলছে, পিতৃআজ্ঞায় মাতৃহত্যা ক'রে পরশুরাম নিজেকে কলঙ্কিত করেছেন, প্রজানুরঞ্জনের জন্যে নিরপরাধ সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে রামচন্দ্র আদৌ পৌরুষের কাজ করেননি, যে-নারী কুষ্ঠব্যাধিপীড়িত স্বামীকে বারবণিতা লক্ষহীরার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল, সে নারীত্বের অবমাননাই করেছে। এই ধরনের চিন্তাধারা শিক্ষিত মনকে ক্রমেই অধিকার করবার চেষ্টা করছে। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আজ চরম বিশৃঙ্খলা মানব-চিত্তকে বিভ্রান্ত, অব্যবস্থিত করে তুলেছে। এ অবস্থায় সার্থক নাটক রচনা করবার মতো যোগ্যভাবাপন্ন বলিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি-সমন্বিত অসমসাহসিক লেখক কৈ, যিনি জোরের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতে পারেন, 'দর্শক আমার কথা শুনতে বাধ্য'?

বিবিধ সংবাদ

এ-সপ্তাহে যে দুটি উল্লেখযোগ্য হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা"র হিন্দী চিত্ররূপ। বিমল রায় প্রোডাকসন্সের হয়ে ছবিখানির পরিচালনা করেছেন "ভুলি নাই", "'৪২" প্রভৃতি বাঙলা ছবির খ্যাতিমান পরিচালক হেমেন গুপ্ত এবং সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন সলিল চৌধুরী। নাম-ভূমিকায় বলরাজ সাহনী ছাড়া এতে অভিনয় করেছেন বেবী সোনু, সন্ধ্যা, উষাকিরণ, অসিত সেন, তরুণ বসু প্রভৃতি শিল্পীরা। ক্যালকাটা ফিল্ম সেণ্টারের পরিবেশনায় ছবিখানি দেখানো হবে মিনার্ভা, রাধা, পূর্ণ, লোটাস, গ্রেস এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে। তপন সিংহ পরিচালিত "কাবুলীওয়ালা"র বাঙলা চিত্ররূপের পর হিন্দী চিত্রখানি বাঙলী দর্শকদের কতখানি খুশী করবে, এ-সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্টই ঔৎসুক্য আছে।

*

দ্বিতীয় হিন্দী ছবিখানি হচ্ছে নবকেতনের "হাম দোনো"। যুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত ছবিখানির পরিচালনা করেছেন অমরজীত এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জয়দেব। একটি দ্বৈত-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন দেব আনন্দ এবং দুটি বিশিষ্ট নারীচরিত্রে রূপ দিয়েছেন নন্দা ও সাধনা। কাপুরচাঁদ ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় ছবিটি দেখানো হচ্ছে রক্সি, প্রভাত, প্রিয়া, চিত্রা, গণেশ, পার্কশোহাউস প্রভৃতি ১৬টি চিত্রগৃহে।

চিত্ররথ পরিচালিত ফিল্ম এজ-এর "কুমারী মন" চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও কণিকা মজুমদার

*

গেল রবিবার, ২৪-এ সেপ্টেম্বর রঙমহল রঙ্গমঞ্চে নবগঠিত শিল্পীসংস্থা উত্তর-সরণীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের "চার-অধ্যায়"-এর নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছে। শচীন ঘোষ-কৃত এই নাট্যরূপটির পরিচালনা করেন প্রেমাংশু বসু।

*

প্রোগ্রেসিভ লিটল থিয়েটার নামে একটি নাট্যসংস্থা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে আসছে ৯ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬-৩০টায় মহারাষ্ট্র নিবাসে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন।

*

রত্নদীপ ফিল্মসের "কালচক্র"-র স্যুটিং প্রায় শেষ হয়ে এলো ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন শচীন অধিকারী। সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভি, বালসারা এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, তরুণকুমার, আশীষকুমার, তন্দ্রা বর্মণ, তপতী ঘোষ, মানসী সেন, অপর্ণা প্রভৃতি।

*

ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্র "হাসি শুধু হাসি নয়" নির্মিত হচ্ছে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার-এর চিত্রনাট্যের ওপর ভিত্তি ক'রে। ছবিখানির পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ করছেন সন্তোষ গুহরায় এবং সুরযোজনা করছেন শ্যামল মিত্র।

*

পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবার যে ছবিতে হাত দিয়েছেন, তার নাম হচ্ছে "'উঁচু পাহাড় নীচু জমি।" এতে সুরযোজনা করছেন অভিজিৎ। শিল্পী-তালিকায় রয়েছেন নির্মলকুমার, প্রবীরকুমার, অসিতবরণ, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মন প্রভৃতি।

*

এডিনবরার পঞ্চাশৎ আন্তর্জাতিক উৎসব শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উৎসবের শিল্পপরিচালক ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী বৎসরের সঙ্গীত ও নাট্যোৎসবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করবার এক পরিকল্পনা করা হয়েছে। লর্ড হেয়ারউড বলেন যে, এ-বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্টের সহযোগিতা পাওয়া যাবে এবং নিশ্চিতভাবে বলতে পারা যায় যে, উদয়শঙ্কর এবং তাঁর সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগদান করবেন।

ইডেন উদ্যানে "সারকারামা"

২১শে সেপ্টেম্বর রঞ্জি স্টেডিয়ামে "সারকারামা'র উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার চলচ্চিত্র জগতে একটি বিস্ময়কর নূতনত্বের সংযোজন ঘটল। প্রায় বাইশ মিনিট কাল ঐ অনুষ্ঠানে সম্মিলিত দর্শকেরা কখনও বোটে, কখনও মোটরে, কখনও ট্রেনে, আবার কোনো সময় ট্রামে বা পদব্রজে এবং সব-শেষে বিমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করবার অনুভূতি লাভ করে-ছিলেন।

গম্বুজাকৃতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমেই নজরে পড়ে এগারটি প্রক্ষেপণী-পর্দা (screen) সমস্ত কক্ষটিকে ঘিরে রয়েছে। একটি পর্দা আরেকটি থেকে একটি কালো রঙের সরু দণ্ড দ্বারা পৃথগীকৃত। প্রবেশপথ রুদ্ধ হলে দেখা গেল তারও ভিতর দিকে ঐ রকম একটি পর্দা—এই পর্দাটিকে হিসেবের মধ্যে নিয়েই পর্দার সংখ্যা এগারো। কক্ষটির আলো নিভে যেতে দেখা গেল, একটি কালো রঙের দণ্ডের মাঝে একটি ছিদ্রপথ থেকে আলো নির্গত হয়ে বিপরীতে অবস্থিত একটি পর্দায় পড়ল এবং শুরু হ'ল—'সারকারামা'—প্রদর্শনীর পরিচয়লিপি—'ওয়ালট ডিজনী আবিষ্কৃত সারকারামা দর্শকদের আমেরিকার পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত নিয়ে যাবে' ইত্যাদি। টাইটেল শেষ হয়ে যাওয়ার পর মুহূর্তেই এগারোটি পর্দাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় এক নূতন অভিজ্ঞতা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিউইয়র্ক বন্দরের উপকূলভাগ এবং দর্শক যেন বোটে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যান "স্ট্যাচু অব লিবার্টি"র সামনে। এর পরেই নিউইয়র্কের জন-বহুল রাস্তার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেন দর্শক—ক্যামেরার সঙ্গে দর্শক এগিয়ে চলেছেন, পাশ দিয়ে লোকজন, মোটর, বাস সব দর্শককে অতিক্রম করে পিছনে চলে যাচ্ছে—দর্শক পিছনে তাকিয়ে দেখেন সব পেছনে ফেলে তিনি এগিয়ে চলেছেন, তাঁরও পিছনে পিছনে অনেক মোটরকার ইত্যাদি আসছে। বিচিত্র অনুভূতি—স্থির জমিতে দাঁড়িয়েও মনে হয়, চলন্ত মোটরে চেপে চলেছি। বিখ্যাত টাইম স্কোয়ার দেখার পর দর্শক চলে যান পল্লীর শান্ত পরিবেশে—ভারমণ্ট রাজ্যে অবস্থিত একটি নিউ ইংল্যান্ড পল্লীতে, তারও পরে জর্জিনিয়ার উইলিয়ামসবার্গ হয়ে রাজধানী ওয়াশিংটন শহরে—এখানে লিঙ্কন স্মৃতি মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রতি-মূর্তির অত্যন্ত নিকটে দর্শককে নিয়ে যাওয়া হয় অত্যন্ত সন্তর্পণে সম্ভ্রমের সঙ্গে। ওখান থেকে আরও পশ্চিমে গ্রেট লেক এলাকায় বৃহৎ কারখানাগুলি দেখা-বার পর দ্রুতগতিতে দর্শককে উঁচুনীচু পথের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চতুর্দিকে গমের ক্ষেতের কাজ দেখাতে দেখাতে। রাতের সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহর, সংরক্ষিত বনভূমি, বিখ্যাত হুভার বাঁধ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর দর্শক

অসিত সেন পরিচালিত বাদল পিকচার্সের "আগুন" চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও অনিল চট্টোঃ

হেমেন গুপ্ত পরিচালিত "কাবুলিওয়ালা" চিত্রে সোনু ও বলরাজ সাহানী

সুধীর মুখার্জি পরিচালিত "দুই ভাই" চিত্রে সুলতা চৌধুরী ও উত্তমকুমার

প্লেনে চড়ে পৌঁছন গোল্ডেন ব্রিজ পর্যন্ত যার অপর দিকে দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগর। সেখান থেকে বিমানযোগে আবার ফিরে আসেন প্রথম জায়গায়—'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র সামনে—২২ মিনিটে ৪,৫০০ কিলোমিটার পরিমিত বিস্তৃত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে আসেন দর্শক। ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রদর্শনী সাধারণ্যের বিনামূল্যে দর্শনের জন্য খোলা থাকবে সপ্তাহের পাঁচটি দিন—সোম থেকে শুক্রবার, দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত। প্রতি শনি ও রবিবার বিশেষ আমন্ত্রিত দর্শকদের এই প্রদর্শনী দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। মনে হয়, এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যে আমাদের উৎসাহের অভাব হবে না।
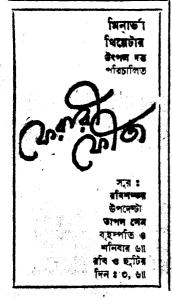
॥ সপ্তপদী ॥

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে উত্তমকুমার প্রযোজিত তারাশংকরের 'সপ্তপদী'র শুভ পদক্ষেপ সুরু হবে শীঘ্রই রূপবাণী, ভারতী, অরুণার এবং শহরতলী ও মফঃস্বলের চতুর্দশটি প্রেক্ষাগৃহে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কৃচ্ছ্র-সাধনা ও অর্থব্যয়ে আলোছায়া প্রোডাকসন্স তাঁদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করেছেন। আলোক-চিত্রী পরিচালক অজয় কর সপ্তপদীর চিত্রগ্রহণ এবং নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলার রোমান্টিক জুটি সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয়ে সহযোগিতা করেছেন ছবি বিশ্বাস, তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, ডিন গ্যাসপার, ছায়া-দেবী, পদ্মা দেবী, সীতা মুখার্জি, প্লোরিয়া ডাউনিংটন প্রভৃতি সহশিল্পিবৃন্দ। সুরের জাল বিস্তার করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ইংরিজি ও বাংলা গানে, আবহ সঙ্গীতে—গানগুলিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মুক্তি মিলার, সন্ধ্যা মুখার্জি ও হেমন্তকুমার স্বয়ং। সপ্তপদীতে বহু সামরিক দৃশ্য ও ক্রিয়াকলাপ সন্নিবেশিত হওয়ায় এখানে যথারীতি সেন্সার করানো ছাড়াও দিল্লীতে মিলিটারী সেন্সারের প্রয়োজন হয়েছে এবং সেখানেও প্রশংসার সঙ্গে ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবিটির পরিবেশক হচ্ছেন ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

॥ নট-নাট্যম্ ॥

সম্প্রতি এঁড়িয়া (বাকেশ্বর) ও শহরের বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীড় ও পোস্ট-মাস্টার অভিনয়ান্তে নট-নাট্যম্ বর্তমানে একাঙ্ক নাট্য উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। নষ্টনীড় ও পোস্ট-মাস্টারের নাট্যরূপদাতা ও পরিচালক জগমোহন মজুমদারের রচনা ও পরিচালনায় প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্ত 'ওরা কাজ করে', (জো কুরী থেকে), 'করুণা কোরো না', 'মেকাপ' ও 'প্রেত-বাণী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হবে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করবেন নট-নাট্যম্-সুখ্যাত শিল্পিবৃন্দ।

॥ একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥

আজকের দিনের রঙ্গালয়-প্রিয় দর্শকবৃন্দ এবং হয়ত কিছু নাট্য-সমালোচক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতার নাম সুপরিচিত বোধ হবে না। কিন্তু "The Indian Stage", "গিরিশ-প্রতিভা" প্রভৃতির লেখক, নাট্যবিদ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভাষায় "যতদিন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ জীবিত আছে, ততদিন প্রবোধচন্দ্র গুহের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।" সত্যিই ১৩২৯ সালের (ইং ১৯২২) শেষাশেষি—আমাদের বাংলা রঙ্গালয়ের অবস্থা যখন শোচনীয়ভাবে সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, তখন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহের বুদ্ধি, পরিশ্রম, অক্লান্ত চেষ্টা এবং সংগঠনী শক্তির গুণে যদি "আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড" গঠিত না হ'ত, তাহলে আজ বাংলা রঙ্গালয় আদৌ থাকত কিনা এবং যদি থাকত, তাহলে তার রূপ কি হ'ত, তা ঠিক কল্পনা করাও যায় না। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গদাধর মল্লিক, সতীশ সেন, কুমার মিত্র প্রভৃতিকে পরিচালক (director) রূপে একত্র করে তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নূতন রক্তের সঙ্গে প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, ননীগোপাল মল্লিক, হেমেন্দ্র রায়চৌধুরী এবং নিভাননী, কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা প্রভৃতি পুরাতনের সংমিশ্রণে শিল্পীগোষ্ঠী গঠিত করার পর নব সাজে, নব ছাঁচে—নূতন ধরণের দৃশ্যপট, ধুতি-পিরাণ প্রভৃতি দিয়ে তৈরী নূতন ধরণের বেশভূষার সমন্বয়ে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রেঃ নীতীশ, রবীন, হরিধন, জহর রায়, সত্য, অজিত, ঠাকুরদাস, শোভন, অবনীশ, অমর, মিণ্টু, নির্মল, সুখেন, দীপিকা, কুন্তলা, কবিতা, প্রণতা মিত্রা মিত্র ও সরযূবালা

লিখিত "কর্ণার্জুন" নাটক ১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসে রথের দিন (ইং ১৯২৩) দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত করা একক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহের কীর্তি বললে খুব বেশী অত্যুক্তি করা হবে না। কাগজে-কলমে উনি ছিলেন আর্ট থিয়েটারের সেক্রেটারী; কিন্তু কাজ-কর্মে উনি ছিলেন একাধারে দৃশ্যপট-সংগঠক, স্মারক, পার্ট-লেখক, টিকিট বিক্রেতা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বন্ধু এবং অভিভাবক, সিন-সিফটার এবং সবশেষে পাচক। অক্লান্তকর্মী এই লোকটিকে যাঁদের অন্তরঙ্গভাবে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা জানেন, তিনি ছিলেন আর্ট থিয়েটারের কর্ণধার; শুধু আর্ট থিয়েটারই বা বলি কেন, সময় সময় সমগ্র বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের কর্ণধার। শ্রীযুক্ত সতু সেনের কৃপায় আজ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তনা হয়েছে; কিন্তু তার আগে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেছিলেন শকট মঞ্চকে (Wagon Stage) এবং আরও বড় কথা, আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার পর সেনসাহেব অর্থাৎ শ্রীযুক্ত সতু সেন প্রথমে নিযুক্ত হন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ দ্বারাই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "ঝড়ের রাতে" নাটক পরিচালনা করবার জন্যে। ওঁকে থিয়েটারের সব্যসাচী বলা হ'ত, উনি এক সঙ্গে দুটি থিয়েটার—আর্ট থিয়েটার ও মনোমোহন থিয়েটার চালিয়েছিলেন বলে। থিয়েটার জগতে ওঁর শেষ কীর্তি "নাট্যনিকেতন" স্থাপনা। যেখানে আজকাল "বিশ্বরূপা" রঙ্গমঞ্চ এবং তার আগে ছিল "শ্রীরঙ্গম্", সেইখানে তিনিই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেন "নাট্যনিকেতন" নাম দিয়ে।

গেল রবিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর এই শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহকে তাঁরই স্বগ্রামবাসী প্রতিষ্ঠিত বানারিপাড়া সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয় দক্ষিণ কলিকাতার "গীতা ভবনে" একটি ছোট্ট মনোরম পরিবেশে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত করেন পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যক্ষ গুহঠাকুরতা, শ্রীজহর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি সজ্জনগণ বক্তৃতা করেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতার সঙ্গে আর একজন যিনি এই সভাতেই সম্মানিত হন, তিনি হচ্ছেন বানারিপাড়ার আর একজন কৃতী সন্তান, বর্তমানে দেশবন্ধু গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ, ইংরাজী সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা।
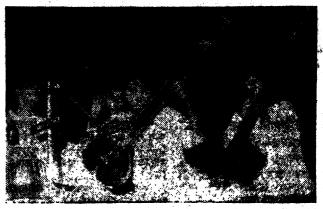
সিংহী পার্কে শো এণ্টারপ্রাইজেসের প্রযোজনায় সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠানে রবিশঙ্কর

আমেরিকায় ছাত্রজীবন শীর্ষক প্রদর্শনী

৯ই সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ইউনাইটেড স্টেট্স ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত স্টুডেণ্ট লাইফ ইন আমেরিকা অর্থাৎ 'আমেরিকায় ছাত্রজীবন' নামে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ইহার উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে বহু আলোকচিত্র ও ৩টি মডেলের মাধ্যমে আমেরিকার ছাত্রদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিচয় দানের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে আলোকচিত্রের ৩০টি প্যানেল সহ দুটি প্যানেলে আমেরিকায় অধ্যয়নরত ভারতীয় বিদ্যার্থীদের দেখা যায়। আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু পুস্তক-পুস্তিকাও প্রদর্শনীতে ছিল এবং এ সম্পর্কে সংবাদ ও তথ্যাদি জানাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এছাড়া, আমেরিকায় প্রচলিত 'রীডিং কর্নারের' মত একটি 'রীডিং কর্নার'ও প্রদর্শনীতে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর হতে ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রতিদিন বেলা ৩ ঘটিকা হতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় বিনা প্রবেশমূল্যে প্রদর্শনের জন্য।

খেলাধুলা

দর্শক

॥ অস্ট্রেলিয়ান দলের ইংল্যাণ্ড সফর—১৯৬১ ॥

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফর শেষ হয়েছে। সফরের শেষ খেলায় আয়ারল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২৮২ রানে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেছে।

১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফর তালিকার খেলায় মোট সংখ্যা ছিল ৩৭টি। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর খেলা ৩২টি, দু'দিনের খেলা ৪টি এবং এক দিনের খেলা ১টি। পাঁচদিনের ৫টি টেস্ট খেলা এবং তিনদিনের ২৭টি খেলা ছিল প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সফরের মোট ৩৭টি খেলায় মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৪, হার ২ এবং খেলা ড্র ২১। হার হয়েছে—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩য় টেস্টে এবং একদিনের খেলায় ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলের কাছে। উভয় ক্ষেত্রেই ৮ উইকেটে হার এবং উপর্যুপরি খেলায়। সফরের তালিকার শেষের দিকে ছিল ৪টি দু'দিনের খেলা—মাইনর কাউন্টিজ, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডের বিপক্ষে (দু'টি খেলা)। মাইনর কাউন্টিজ, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডের বিপক্ষে প্রথম খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করতে পারেনি; আয়ারল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২য় খেলায় জয়ী হয়ে সফর শেষ করেছে।

গত ১৯৫৬ সালের সফরের তুলনায় ১৯৬১ সালের সফরে অস্ট্রেলিয়া যেমন ৩টে ম্যাচ বেশী (মোট ৩৭) খেলেছে, তেমনি হারের সংখ্যা ৩টে থেকে কমিয়ে ২টোতে এনেছে। ১৯৫৬ সালের ফলাফল দাঁড়ায় : মোট খেলা ৩৪, জয় ১১, ড্র ২০ এবং হার ৩। ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া মাত্র একবার অপরাজেয় রেকর্ড করে, ১৯৪৮ সালে; ফলাফল—মোট খেলা ৩৪, জয় ২৫, ড্র ৯, হার ০।

॥ ডেভিস কাপ ॥

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে নিউদিল্লীতে ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার প্রথম ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলা সুরু হবে। এই খেলায় বিজয়ী দল পরবর্তী দ্বিতীয় ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলবে ইটালীর সঙ্গে। এই খেলাটি হবে রোমে, ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই অক্টোবর। দ্বিতীয় ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার বিজয়ী দল পরবর্তী ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবে গত দু' বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

ভারতবর্ষের মাটিতে বিখ্যাত ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলা এই প্রথম। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই গৌরবের বিষয়।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে আমেরিকার পক্ষ নিয়ে যাঁরা খেলবেন তাঁদের নাম আমেরিকান টেনিস ফেডারেশন ঘোষণা করেছেন। আমেরিকান ডেভিস কাপ দলে স্থান পেয়েছেন—'চাক' ম্যাকিনলে, হুইটনি রীড, ডোনাল্ড ডেল এবং মার্টিন রিসেন।

॥ সন্তরণে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ॥

সন্তরণে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাফল্য পুনরায় সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে স্থানলাভ করেছে। আর্জেণ্টিনার সন্তরণ শিক্ষক এণ্টোনিও এবারটোণ্ডো

ব্রজেন দাস

৪৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট সময়ে দু'বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। প্রথমে তিনি ইংল্যাণ্ডের ডোভার থেকে সন্তরণ আরম্ভ ক'রে ১৮ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময়ে ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজে পৌঁছান এবং সেখানে মাত্র ৪ মিনিট সময় অবস্থান ক'রে তিনি ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা সুরু করে নির্বিঘ্নে ডোভারে ফিরে আসেন। এই চার মিনিট সময়ে তাঁর শরীরে চর্বির প্রলেপ দেওয়া হয় এবং তিনি সামান্য গরম পানীয় গ্রহণ করেন।

ইতিপূর্বে কোন সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল এইভাবে (অর্থাৎ একটানা) দু'বার অতিক্রম করতে পারেননি। সুতরাং আর্জেণ্টিনার এবারটোণ্ডো ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করলেন। এ সাফল্য তাঁর প্রথম-বারের চেষ্টায় আসেনি। এ বছরই আগস্ট মাসে তিনি প্রথম চেষ্টা করেন; কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় তিনি জলে নামতেই পারেননি। গত সেপ্টেম্বর মাসের ৫ই তারিখে তিনি সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু ফ্রান্সে পৌঁছবার আগেই তাঁর ২য় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর সাহায্যকারী বোট বিগড়ে যাওয়ার দরুণ তিনি অবসর নিতে বাধ্য হ'ন। এবারটোণ্ডো ইতিপূর্বে তিনবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। এই নিয়ে তাঁর ৫ বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা হ'ল।

সংখ্যা এবং সময়ের দিক থেকে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন পাকিস্তানবাসী ব্রজেন দাস। ব্রজেন দাস সর্বাধিক বার (৬ বার) ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। তিনি ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৬ষ্ঠ বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

শ্রীযুক্ত দাস এবার ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময়ে ইংলিশ চ্যানেল (ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে) অতিক্রম ক'রে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের বিশ্ব রেকর্ড করেন। পূর্বে রেকর্ড—১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট (হাসান আবেল রহিম, ইজিপ্ট, ১৯৫০ সাল)।

॥ আই এফ এ শীল্ড ॥

১৯৬১ সালের আই. এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠেছে দুই প্রতিবেশী ক্লাব—মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে এই দুই দলের এই নিয়ে ৭ম মিলন।

মোহনবাগান এবার নিয়ে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠলো ১৫ বার। আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে ৬ বার—১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সালে। ১৯৫২ এবং ১৯৫৯ সালেও মোহনবাগান শীল্ডের ফাইনালে উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা হয়নি। এবার নিয়ে মোহনবাগান উপর্যুপরি চারবার শীল্ড ফাইনালে খেলবার গৌরব লাভ করলো।

অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শীল্ডের ফাইনালে উঠেছে ১২ বার: ১৯৫৯ সালে তারা মোহনবাগানের সঙ্গে ফাইনালে উঠেছিল, কিন্তু খেলাটি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়। ইস্টবেঙ্গল আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে ৬ বার—১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১ (উপর্যুপরি চারবার—রেকর্ড) ও ১৯৫৮ সালে। ইস্টবেঙ্গল আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উপর্যুপরি বার উঠেছে : (১)

আই এফ এ শীল্ড সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল বনাম নেভী দলের খেলায় রাইট ইন কাননের (ইস্টবেঙ্গল) গোল শোধ দিয়েছেন। বামদিকে গোলরক্ষক পড়ে গেছেন; কাননের সামনে এ্যান্টনি ও পিছনে অরুণ ঘোষ

৪ বার (১৯৪২—৪৫) এবং ৩ বার (১৯৪৯—৫১)।

প্রথম সেমি-ফাইনাল

প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এ-বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল এবং গত বছরের আই এফ এ শীল্ডের রাণার্স-আপ ইণ্ডিয়ান নেভী দল। ইস্টবেঙ্গল ২—১ গোলে জয়ী হয়। কিন্তু এই জয়লাভের জন্য তাদের দ্বিতীয়ার্ধের ১৯ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

প্রথমার্ধের খেলার ১৪ মিনিটে নেভী দলের লেফ্‌ট-আউট ইনাস এইদিনের প্রথম গোল করেন। এই গোলের পরও উভয় দলই বিপক্ষের গোলের মুখে গোল দেওয়ার মত কয়েকবার বল পায়; কিন্তু গোল হয়নি। প্রথমার্ধে নেভী দল ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। ইস্টবেঙ্গল দল প্রথমার্ধে জয়লাভের মত খেলেনি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল দল নেভী দলকে সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা করে। ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণভাগের চাপে নেভী দলের প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার দাখিল হয়। এর জন্য তারা নিজেরাই অনেকখানি দায়ী। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সুরু থেকেই তারা আত্মরক্ষামূলক খেলায় বেশী জোর দেয়। প্রায় আটজন খেলোয়াড়ই পিছিয়ে খেলতে থাকে; সময়ে সময়ে এগার-জনকেও আত্মরক্ষায় হিমসিম খেতে দেখা যায়। ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণের প্রচণ্ড গতিবেগের মুখে তাদের সেকি অসহায় অবস্থা! গোলের কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল দল ১৯ মিনিটে গোল পরিশোধ করে এবং এক মিনিটের কম সময়ের মধ্যেই পুনরায় গোল দিয়ে ২-১ গোলে অগ্রগামী হয়। ইস্টবেঙ্গল দল দ্বিতীয়ার্ধের খেলার বিচারে আরও বেশী গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করলে বলার কিছুই থাকতো না। দুর্ভাগ্যের জন্যে তাদের কয়েকটি গোল হয়নি। খেলার শেষ সময়ে নেভী দল গোল শোধ দেওয়ার সুযোগ পায়। ইনাসের কর্ণার সট বারে বাধা পেলে ইস্টবেঙ্গল দলের ফাঁড়া কেটে যায়।

ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে গোল দেন কানন এবং নীলেশ সরকার। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ১৯ মিনিটে রাইট-আউট সুকুমার সমাজপতি বিপক্ষের খেলোয়াড় কাটিয়ে বলটি সেণ্টার করেন। কানন ছুটে এসে দর্শনীয়ভাবে গোলের মধ্যে বল মারেন। বলটি সেণ্টার হওয়ার পরই শ্রীকান্ত ব্যানার্জিকে উঁচু করে বলটি তুলে দিতে দেখা যায়। বলটির জন্যে কানাই দাস এগিয়ে যান। বিপদ বুঝে গোলরক্ষক ফার্ণাণ্ডেজ গোল ছেড়ে সামনে এগিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর হাতে লেগে বলটি বেরিয়ে যায়। নীলেশ সরকার এই বলটি ধরেই গোল দেন।

এইদিনের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল তাদের পুরো শক্তি নিয়ে দল গঠন করতে পারে নি। দলের অতি নির্ভরশীল প্রখ্যাত খেলোয়াড় বলরাম মালয়ের ফুটবল খেলায় আহত হয়ে পড়েন এবং এখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। সুতরাং তাঁকে দলভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এইদিনের খেলায় নির্বাচিত খেলোয়াড় সুনীল নন্দী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এইদিনের খেলায় অনুপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত বছর আই এফ এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে ইণ্ডিয়ান নেভী দল ৩-০ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছিল।

ইস্টবেঙ্গল

৩য় রাউণ্ডে ৩-১ গোলে উয়াড়ীকে, ৪র্থ রাউণ্ডে ৩-১ গোলে মহীশূর দলকে এবং সেমি-ফাইনালে ২-১ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত করে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

মোহনবাগান—১, ০, ২ :
ইস্টার্ণ রেলওয়ে—১, ০, ০

মোহনবাগান বনাম ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলের ২য় সেমিফাইনাল খেলাটিতে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'তে তিন দিন লাগে।

প্রথম দিনের খেলাটি দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে প্রবল বৃষ্টির দরুণ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় খেলার ফলাফল ছিল ১—১। মোহনবাগান দল প্রথম গোল দেয়। মোহনবাগানের পক্ষে পেনাল্টি থেকে গোল দেন সালাউদ্দিন। রেল দলের পি সিংহ গোলটি শোধ দেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় উভয় পক্ষের রক্ষণভাগের খেলাই দর্শকদের বেশী করে নজরে পড়ে। দুই দলেরই আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা গোল দেওয়ার সুযোগ নষ্ট করেন। মোহনবাগান দলই গোল দেওয়ার সুযোগ বেশী পায়। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। মোহনবাগান অতিরিক্ত সময়ের খেলায় রেলওয়ে দলের উপর সম্পূর্ণভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে গোল দেওয়ার কয়েকটি সুযোগ পায়; কিন্তু একটাও গোল দিতে পারেনি।

তৃতীয় দিনের খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। এই দিনের খেলায় বিজয়ী মোহনবাগান দলের সঙ্গে রেল দল কোন মতেই পাল্লা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। নিজ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ভুল খেলার দরুণ রেল দল প্রথম গোলটি খায়। দীপুদাস গোল করেন। বিরতির সময়ে মোহনবাগান ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২৩ মিনিটে সালাউদ্দিনের কাছ থেকে বল পেয়ে লেফট্-আউট অরুময় দলের দ্বিতীয় গোল দেন। নিতান্ত ভাগ্য-দোষে মোহনবাগান এই দিন আরও বেশী গোলের ব্যবধানে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

আই এফ এ শীল্ডের সেমিফাইনালের তৃতীয় দিনের খেলায় মোহনবাগান দলের দীপু দাস ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে হেড দিয়ে গোল দেওয়ার চেষ্টা করছেন

মোহনবাগান

৩য় রাউণ্ডে ৯-০ গোলে বার্ণপুর ইউনাইটেডকে, ৪র্থ রাউণ্ডে ৩-০ গোলে ইণ্টারন্যাশনালকে এবং সেমি-ফাইনালে ১-১, ০-০ ও ২-০ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

পুজোয় ৭ খানি ছোটদের বই!

সুখলতা রাও-এর **খোকা এল বেড়িয়ে**

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে**

শিবরাম চক্রবর্তীর **পেয়ারার স্বর্গ**

'স্বপনবুড়ো'র **নাট্যে প্রণাম**

শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের **কিশোর কাহিনী**

ইন্দিরা দেবীর **পাখী আর পাখী**

লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরীর **টাকা গাছ**

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই আশ্বিনের বই

প্রমথ চৌধুরীর
(বীরবল)
সনেট-পঞ্চাশৎ
ও
অন্যান্য কবিতা
দাম পাঁচ টাকা

৭ই ভাদ্রের বই

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
হে ইতিহাস গল্প বলো
দাম এক টাকা বার আনা

ছোটদের বই

উপন্যাস :: লীলা মজুমদারের হলুদে পাখীর পালক ২·০০ : গুপির গুপ্ত খাতা ২·০০ : বক-ধার্মিক ১.৭৫ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পোনুর চিঠি ২·০০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর বর্মার জামা ২.২৫ ॥ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের কাদম্বরীর কথা ২.২৫ ॥ জয়ন্ত চৌধুরীর হাওয়া বদল ৩·০০ ॥ গিরীন্দ্রশেখর বসুর লাল কালো ৩·০০ ॥ অনাথনাথ বসুর ছোটদের কঙ্কাবতী ১,০০ ॥ প্রশান্ত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরীর ছুটি 'জন্মতিথি' কথাচিত্রে রূপায়িত) ২·২৫ ॥ বিমল মিত্রের মৃত্যুহীন প্রাণ ২·৭৫ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড ১.৫০ ॥ বাণী রায়ের সেই চেনা ছেলেটি ১·৭৫ ॥

গল্পগ্রন্থ :: প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প ৩·০০ : অদ্বিতীয় ঘনাদা ২.৭৫ ॥ 'বনফুল'-এর রঙনা ২·৫০ : করবী ১·৭৫ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর নিখরচায় জলযোগ ২·০০ : ভূতুড়ে-অদ্ভুতুড়ে ১·৭৫ : চুনকেরা পোষবোধ ২.০০ : হাস্নুহানা ২·৫০ ॥ রবীন্দ্র মৈত্রের আয়াবাঁশী ১·৫০ ॥ সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা ৩·২৫ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হেসে যাও ২·০০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তালনবমী ২.৫০ ॥ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের রূপকথার ঝাঁপি ২·২৫ ॥ পশুপতি ভট্টাচার্যের সুন্দর দেশের রূপকথা ২·০০ ॥ প্রতিভা বসুর সবচেয়ে যা বড় ১·৫০ ॥ বুদ্ধদেব বসুর রামা থেকে কামা ১·৭৫ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা, চলা গল্প-নিকেতন ২·৫০ ॥ ভূত ও মানুষ ২.০০ : বিশ্বনাথ দে সংকলিত শুধু হাসির গল্প ৫·০০ ॥ সুধীর সরকারের বোকা ২·৫০ ॥ সুখলতা রাওয়ের নানান গল্প ২·০০ ॥ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাঘের লুকোচুরি ২·০০ ॥ স্বামী প্রেমঘনানন্দের উপনিষদের গল্প ১·০০ : রামকৃষ্ণের গল্প ১·০০ ॥

বিবিধ :: শৈল চক্রবর্তীর ছোটদের ক্র্যাফ্‌ট ২·৫০ ॥ অচিনকুমার চক্রবর্তীর পৃথিবীর রূপান্তর ১·৫০ : সমাজ-সেবীর দিনলিপি ১·৫০ ॥ প্রভাত বসুর গান্ধীজীর গল্প ০·৫০ ॥ অনাথনাথ বসুর গান্ধীজী ১·৫০ ॥ বিধুভূষণ শাস্ত্রীর ছোটদের চণ্ডী ০·৬২ : ছোটদের গীতা ০·৬২ ॥ 'অ-কৃ-ব'র খামখেয়ালী ছড়া ১·৫০ ॥ শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের বাল্মীকি রামায়ণ (সচিত্র) ২·৫০ : মহাভারত (সচিত্র) ৩·০০ ॥

খেলাধুলার বই :: শ্রীখেলোয়াড়ের জগৎ জোড়া খেলার মেলা (১ম ভাগ) ২·৫০ : (২য় ভাগ) ২·০০ : (৩য় ভাগ) ২·০০ ॥ খেলাধুলার জ্ঞানের কথা ৩·২৫ ॥ খেলাধুলার সাধারণ জ্ঞান ১·২৫ (বোর্ড বাঁধাই) ১·৫০ ॥ বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা (১ম) ৩·৫০ : (২য়) ৩·৫০ ॥ ক্রিকেটের রাজকুমার ২·৫০ ॥

আমাদের বই
পেয়ে ও দিয়ে
সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ [illegible] কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম: [illegible]

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday 6th October, 1961
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

সংহতি সম্মেলনের উদ্দেশ্য সাধু এবং ভাষণগুলি ততোধিক শিষ্ট, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে। সম্মেলনের শেষে ৪ হাজার শব্দসম্বলিত একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে—একে যাঁরা কার্যকারিতার প্রথম পদক্ষেপরূপে গণ্য করতে প্রস্তুত আছেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। এই প্রস্তাবের সদিচ্ছা ও সংকল্পগুলি মূল্যবান সন্দেহ নেই। মূল্যবান এই দিক থেকে যে, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সমস্ত দলের প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি এবং একটি সর্বভারতীয় আদর্শবাদে স্বাক্ষর দিয়েছেন। এই আচরণবিধি এবং আদর্শবাদ কার্যক্ষেত্রে কতখানি অনুসৃত হবে, সে প্রশ্ন বাদ দিলেও, একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে, কতকগুলি বিষয়ে ন্যূনতম ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কতকগুলি বিষয়ে নেতৃবৃন্দ সমস্বরে তাঁদের নিন্দা ও সমালোচনা প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় এই জন্য যে, যাঁরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী তাঁরা অধিকাংশই ভারতবর্ষের পার্লামেন্টেরও সদস্য। এই পার্লামেন্ট নিঃসন্দেহে ভারতীয় রাজনীতির এবং রাষ্ট্রনীতির সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই পার্লামেন্টের সম্মিলনী ক্ষেত্র বা ফোরাম্ বজায় থাকা সত্ত্বেও সংহতি সম্মেলনের নূতন প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ তাঁদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। বুঝতে হবে যে, বিগত ১০ বৎসরে পার্লামেন্টের মারফৎ তাঁরা যে আদর্শ এবং নীতিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করতে পারেন নি, সেই নীতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে মৌখিক সম্মতি প্রকাশের জন্য তাঁদেরকে আজ নূতন প্লাটফর্মে মিলতে হচ্ছে। কিন্তু পার্লামেন্ট যে কারণে ব্যর্থ হয়েছে, সেই কারণেই সংহতি সম্মেলনও কি ব্যর্থ হবে না, যদি ব্যর্থতার মূল কারণগুলি দূরীভূত না হয়? অপরপক্ষে এই ব্যর্থতার মূল কারণগুলিই যদি দূরীভূত হয় তাহলে নিশ্চয়ই পার্লামেন্টের শক্তিশালী ফোরমে থেকেই নেহরুজী, কৃপালনীজী এবং অজয় ঘোষ (বা পরিবর্তে শ্রীডাঙ্গে) তাঁদের সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপনের সঙ্কল্পকে কার্যে রূপ দিতে পারেন। সংহতি সম্মেলনের দরকার হয় না।

সুতরাং একথা অনুসন্ধান করা দরকার যে, পার্লামেন্টের মহনীয় অস্তিত্ব সত্ত্বেও সর্বভারতীয় ঐক্যবোধ কেন বিপন্ন হচ্ছে এবং কেনই বা সংবিধানের মূলমন্ত্রগুলির উপরে রাজনৈতিক দলগুলি, গভর্ণমেন্ট এবং লেজিসলেচারগুলি একত্রে চড়াও হয়েছেন? পার্লামেন্ট তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হল কেন? ভারতবর্ষের গত ১০ বৎসরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে এমন বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যেখানে সর্বভারতীয় ঐক্যের বিপদ সূচিত হয়েছে, যেখানে আইনের শাসন বিপর্যস্ত এবং ন্যায়বিচার ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। ফলে দেশের সামগ্রিক ঐক্য এবং শক্তি সম্বন্ধে মানুষের শেষ অবস্থাও লুপ্ত হতে চলেছে। আসামের ঘটনাবলী তার একটি নগ্ন দৃষ্টান্ত। কিন্তু কোন্ সময় পার্লামেন্টের বিবেক দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে এবং সংবিধানের অবমাননা ও মানুষের নির্যাতনকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে? পার্লামেন্টকে দিয়ে একাজ সম্ভব হয়নি, যদিও ভারতীয় পার্লামেন্টে আমাদের নবীন এবং প্রবীণ সমস্ত শ্রেণীর নেতারাই সম্মিলিত। কারণ, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সংকীর্ণ পার্টি স্বার্থের বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ যে, তাঁদের বিবেক কুণ্ঠিত, আদর্শবাদ অস্পষ্ট এবং ভোটের প্রতিযোগিতায় তাঁরা নির্লজ্জ কাঙাল। যাঁরা ক্ষমতায় আসীন তাঁরা ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ভয়ে এত সশঙ্কিত যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে আপোষ ঘটাতে তাঁদের লজ্জা নেই। যাঁরা ক্ষমতায় ওঠার জন্য কাতর, তাঁদের পক্ষে যে কোনো উত্তেজনা এবং এজিটেশনই একটি লোভনীয় ভোজ্যবস্তু। সেখানে সেই কুৎসিৎ আহার্যের নিমন্ত্রণেও তাঁদের পাত ফেলতে কোনো আপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষমতা লোলুপতা উভয়পক্ষেই বর্তমান। এবং ক্ষমতার প্রতি অযোগ্যের এই লুব্ধ প্রত্যাশা, তাকে প্রতিনিয়ত নীচের দিকে টেনে নামাচ্ছে, তাকে সঙ্গী করছে গুণ্ডামীর, অভদ্রতার, অসদাচরণের এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক শক্তির। কাজেই প্রত্যেক দেশে সার্বভৌম পার্লামেন্ট জনতার যে তেজ, রাষ্ট্রের যে আদর্শকে প্রতিফলিত করে আমাদের নেতারা পার্লামেন্টকে সেই তেজস্বিতা এবং আদর্শ থেকে বঞ্চিত করেছেন। সংহতি সম্মেলনের দ্বারা কি সেই বঞ্চনার পথ রোধ করা যাবে? ভারতবর্ষের রাজনীতির চরিত্র কি বদলাবে?

উর্বশী

মৃগাঙ্ক রায়

সেই অর্ধবৃত্তের মসৃন ডৌল ক্রমশঃই
নীল থেকে পুরাতনী নীলে ছড়াল,
তোমার মুখের মূর্তি ভেসে ভেসে
দূর থেকে দূরে গেল। তার নিচে
আয়ুহীন অন্ধকারে তোমার আকণ্ঠ
শরীর, স্তনের উষ্ণ উর্ধমুখ, কলসীর
কণ্ঠের মতো কটি, উদ্ভিদে জড়ানো পা
শ্যাওলা শামুক, দুটি নগ্ন শ্বেত স্তম্ভ
যার গূঢ়সন্ধী পরিণত শঙ্খের মতো।

সূর্য গেল অস্তাচলে। আবার ছড়াল ঢেউ
তুমি উঠে এলে। তুমি উঠে এলে বৃথবন্ধ
ছায়া উঠে এলো, দাঁড়াল মাঠে মাঠে,
আকাশে মাটিতে চারিদিকে গর্জিত হ'ল
রোমশ দেবদারু ছায়ার হাতের হ্রেষা॥

কবির স্মৃতি-ফলকের জন্য

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দূরের আকাশে গেলে পরিস্ফুট কবির কবিতা।
সে কবি নিদাঘে তীব্র, শ্রাবণ-বর্ষণে অহর্নিশি
সিক্ত, ঝলকিত শরতেই তার চৈতন্য-সবিতা!
হেমন্তের রিক্তমাঠে চাপা দীর্ঘশ্বাস যাবে মিশি
কালের আঁধারে; মুখ স্মরণের এলাকা পেরিয়ে
বর্ষে বর্ষে নবদূর্বাদলে জাগে; বিয়োগান্ত রীতি
শৈশবের কলরবে একা, পূর্ণ যৌবনেই দিয়ে
যেতে হবে সে-কবিকে যন্ত্রণার হৃদ্‌-পদ্ম, স্মৃতি।

জানালার ধারে কবি, চির একা। হাতের কলম
স্তব্ধ শাদা কাগজের দিকে চেয়ে, হিম বিষণ্ণতা।
রাত্রির ঘনান্ধ চোখে, পায়ে পায়ে নিদ্রার অতলে
শোকাবহ স্থিরযাত্রা: আচম্বিতে অন্তিম যন্ত্রম
কবির বুকেই বেঁধে, শূন্যে শির লোটে! নীরবতা
যেন নিরবধি কাল...দূরের আকাশে তারা জ্বলে!

* * *

সতী নয়, পার্বতী

—আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

নিশি পাওয়া ঘরে আশার জোনাকি জেলে
আর কতকাল কাটাবে, ঠেকাবে ঝড়,
শুকনো ফুলের পরাগে অশ্রু ঢেলে
আর কতদিন সাজাবে বাসর ঘর!

আকালের মতো হায়-হায় চোখ মেলে
আর কতকাল বাতাসে ছড়াবে জ্বালা?

এপার-ওপার কাকের কলহে জরা,
কোকিলের দিন দূরের তেপান্তরে
মাথা খুঁড়ে মরে: হৃদয়ে তোমার চড়া
কামনার বালি এদিকে-ওদিকে ওড়ে!

চন্ডাকাশের খাই-খাই খর দিন
তোমাকে দিল কি তৃষ্ণার নীল মালা?

পলাশের কাল স্মৃতির চিতায় জ্বলে,
গঙ্গাসুর দিনে তবুও না-মেনে নতি
শ্মশান শিবের ধ্যান ভাঙাবেই ব'লে
তোমার শপথ সতী নয় পার্বতী!

তাই কি পৃথিবী [illegible]
তোমাকে দেখেই আনমনে জাগার পালা?

পঞ্জিকামতে এখন রীতিমত শরৎকাল। কিন্তু আকাশে এখনো মেঘের ঘনঘটা। বাংলাদেশে শরৎ ঋতু এখন বর্ষার আক্রমণে অস্থির।

ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' নামক কবিতাটি মনের পটে যে সম্পূর্ণতার চিত্র অঙ্কিত করত, এখন বেয়াড়া তুলির আঁচড়ে তা প্রায় কার্টুনের মতো করুণ ও হাস্যকর হ'য়ে উঠেছে। তবু মানুষের মন বস্তুটির এমনি স্বভাব যে, বারে-বারে পুরনো সুখস্মৃতিরই রোমন্থন ভালোবাসে।

জানি, রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতার দুটি পংক্তি আজ দ্ব্যর্থবোধক হ'য়ে উঠেছে। '...পারে না বহিতে নদী জলধার। মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর...' এখন এ কথাগুলিকে বাংলা ইডিয়ম এড়িয়ে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলেও ক্ষতি নেই। কারণ বাংলার নদীগুলি, বিশেষ করে গঙ্গা, আজকাল এমন অগভীর হয়ে উঠেছে যে সত্যিই 'জলধার' বহনে অক্ষম। এবং ধানও একালে তেমন করে 'ধরছে না', বা ফলছে না। তা সত্ত্বেও আমাদের মনের মধ্যেই কোথায় যেন একটা প্রস্তুতি আছে, যার ফলে 'আশ্বিন' কথাটা উচ্চারিত হলেই সমস্ত চেতনায় পুজার বাজনা বেজে ওঠে।

বাস্তবিক শরৎ কেবল আমাদের বাঙালী মনেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষীয়দের মনে, এমন কি ইংরেজের মনেও চাঞ্চল্য আনে। কীটসের 'টু অটাম' কবিতাটির কথা স্মরণ করুন। কবি যাকে 'season of .. mellow fruitfulness' বলেছেন সে যে কেবল প্রকৃতির রাজ্যে নয়, মানুষের মনলোকেও পূর্ণতার বাণী বহন ক'রে আনে, তার পরিচয় কবিতাটির মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়ানো।

আমাদের আধুনিক জীবনে সেই উপলব্ধিটার চেহারা-বদল ঘটেছে, কিন্তু জাতবদল ঘটেনি।

এখন শরৎ পূর্ণিমা-কালে আমরা হয়তো 'কুমুদ' 'কহ্লার' 'দোয়েল' 'শ্যামা'

[illegible] [illegible] করেন না। আমরা হয়তো বলব—

"...চৌরঙ্গিপাড়ে তিনটা সবুজ পোকার আলোতে ধরা পড়িয়াছে। খোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে. গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ-কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষরাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকায় এক গণ্ডা রোগা-রোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে-জলে মরুৎ-ব্যোমে দেহে-মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগ্‌বিজয়ে যাইতেন।'......

(পরশুরাম)

সেকালে রাজারা যেতেন দিগ্‌বিজয়ে, ইংরেজরা যেত শৃগাল-শিকারে। আর আমরা? আমরা যাই কাপড়ের দোকানে।

চোখ মেলে চেয়ে দেখবেন, এই কলকাতা শহরের দোকানে দোকানে শরৎ তার রাজকর নিতে শুরু করেছে। আবালবৃদ্ধবনিতার এই সান্ধ্য-অভিযানে যে উত্তেজনা, অভিমান এবং উল্লাসের বান ব'য়ে যায়, দু-দণ্ড যদি তা দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেন তবে ধীরে ধীরে আপনার মনেও সংক্রামিত হবে একটা কিছু করে ফেলার বে-হিসাবী ইচ্ছা। আর পরের দিন দেখবেন আপনিও হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন দোকানে, দর্শক হিসাবে নয়—ক্রেতা হিসাবে।

এ না করে কোনো উপায় নেই আমাদের। 'দেবগণের মর্তে আগমন' তো নিছক কবিকল্পনা নয়! সত্যিই যে বছরে এই একটিবার মাত্র দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে আসেন আমাদের মাটির পৃথিবীতে। আর তাঁদের অশরীরী প্রভাবে আমাদের পুত্রকন্যা-আত্মীয়-পরিজনরাই হ'য়ে ওঠে দেবতার মতো সুন্দর ও সুখী।

আমাদের দুঃখের সংসারে এই ক্ষণ-স্বর্গ রচনার জন্যে সত্যিই আমরা শরৎ ঋতুর কাছে ঋণী। প্রাচীন ঋষির আশীর্বাদকে তাই ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে ইচ্ছা জাগে—শরৎ তুমিও 'শারদ শত' বেঁচে থাকো!

*

ইঁদুর যে আ[illegible]র কোনো কাজে লাগে একথা আগে কখনো স্বীকার করতাম না। 'উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার'—ছোটবেলা থেকে এই পদ্য মুখস্থ করে করে আমরা ইঁদুর কেবল 'যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার' সেইটেই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু বিশাল এই সৃষ্টির রাজ্যে তারও যে একটা গঠন-মূলক অবদান আছে একথা কখনো ভেবে দেখিনি।

হঠাৎ একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংবাদ চোখে পড়ায় আমার সমস্ত ধারণা উলটে গেল।

কিন্তু সেকথা বলার আগে আরেকটা বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

পৃথিবীর জনসংখ্যা জ্যামিতিক গুণন প্রক্রিয়ায় বেড়ে চলেছে। এই হারে মানুষ বাড়তে থাকলে অদূর ভবিষ্যতেই পৃথিবীতে কী অমানুষিক ব্যাপার ঘটবে তা ভাবলেও হৃদ্‌কম্প হয়। এদিকে মহামারী, অনাহার এবং যুদ্ধও সংসার থেকে অপসারিত হওয়ার মুখে। কাজেই মৃত্যুর এ-সব পাইকারী ব্যবস্থা দুষ্প্রাপ্য হলে 'মরে বাঁচার'ও উপায় থাবে বন্ধ হ'য়ে।

অতএব কথা উঠেছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া গতি নেই। সারা পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকেরা সহজ উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় কী করে তারই গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন আজকাল।

অকস্মাৎ এরই মধ্যে ইঁদুরের আবির্ভাব। ইঁদুর দেখিয়ে দিল কী ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

বিলাতের এক খবরে প্রকাশ, পুরুষ এবং স্ত্রী ইঁদুরের গায়ে বিশেষ ধরনের গন্ধদ্রব্য প্রয়োগ করে দেখা গেছে তাদের প্রজনন-ক্ষমতা স্থগিত রাখা যায়।

ঘ্রাণের দ্বারা অর্ধেক ভোজন সমাধা হয় একথা আমরা বরাবরই শুনেছি। সুকুমার রায়ের 'গন্ধ-বিচার' কবিতায় শোনা গেছে—'গুল্ম শুঁকে মরতে হবে এ আবার কী আক্রোশ।' কিন্তু গন্ধ যে এমন একটা হিতকারী ব্যাপারের হদিস দিতে পারে আগে কখনো তা আমরা কল্পনাও করিনি।

এজন্যে ইঁদুর আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। নিউটনের সেই বিখ্যাত আপেলটির মত ইঁদুরও এখন অক্ষয় কীর্তি অর্জন করুক।

*

মহাপুরুষদের [illegible] একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে। তার বাংলা তর্জমা হল, তাঁরা 'বজ্রের চেয়েও কঠোর, ফুলের চেয়েও কোমল'।

কিন্তু পৃথিবীতে শুধু মানুষ নয়, এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলিকেও ঐ একই গোত্রে ফেলা যায়। 'মহাপুরুষ' নামের অনুকরণ করে তাদের বলা যায় 'মহাস্থান'।

এমনি এক মহাস্থান হল গাজীপুর!

হাঁ, গাজীপুর। অবাক হওয়ার কিছু নেই। উত্তরপ্রদেশে এই নামে যে একটি মাঝারি সাইজের শহর আছে তা ইস্কুল-পাঠ্য ভূগোলের বই খুললেই দেখতে পাওয়া যায়।

শহরটির এক বিশেষ পরিচয় হল, সেখানে অনেক গোলাপ বাগান আছে। সেই সব বাগানের ফুল থেকে তৈরি হয় গোলাপ জল। সমস্ত ভারতবর্ষেই এই গাজীপুরী গোলাপ জলের অত্যন্ত সমাদর।

ফুলের রাণী হল গোলাপ। যে শহরে গোলাপের এত আধিক্য সে যে অত্যন্তই কোমল তাতে সন্দেহ করা চলে না।

কিন্তু এই কোমলস্বভাব গাজীপুরেই কয়েক দিন আগে তিন ঘণ্টার বৃষ্টিতে বারো বার বজ্রপাত ঘটে গেছে।

কলকাতার মতো বিশাল শহরে ব্যাপারটা হয়তো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু কতোটুকু শহর ঐ গাজীপুর? বারো বার বজ্রাঘাতের ফলে শহরে যে ত্রাস উপস্থিত হয়েছিল তা প্রায় এটম বোমা পড়ার দুর্বিপাকের মতো। ইস্কুল, সিনেমা বন্ধ ক'রে সকলেই নাকি প্রাণ হাতে ক'রে বসে ছিল।

তা থাক। প্রাণ থাকলেই মাঝে মাঝে সে হাতে আসে, বেহাতও হয়। সে কথা নয়। আসল ব্যাপার হল, এই ডজনখানেক বজ্রাঘাত সহ্য করার পর গাজীপুরে যে সত্যিই 'গাজী' এবং মহাস্থান হ'য়ে উঠল, সেইটুকুই উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় সংগীতের সুর রক্ষণ

প্রফুল্লকুমার দাস

সংগীত শব্দটি যখন শুধু গান অর্থে প্রযুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে সংগীত ও সাহিত্যে পরস্পর গভীর সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। সাহিত্য ও সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। উভয় বিষয়েই ধ্বনি-সৃষ্টির ভিন্ন পন্থায় এই ভাব-প্রকাশের কাজটি সম্পন্ন হয়। সংগীতে প্রধানত স্বরব্যঞ্জনা তথা সুরগঠনের দ্বারা যে ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়, তার যেমন অনুরঞ্জন ও অনুরণনের গুণ থাকা আবশ্যক, সাহিত্যেও শব্দব্যঞ্জনা তথা বাক্য বা পদ-গঠনের দ্বারা যে ধ্বনি-স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়, তারও তেমনি অনুরঞ্জন ও সাবলীলতার গুণ থাকা প্রয়োজন—যার ফলে মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ভাষার লিপির সাহায্যে এই ধ্বনি-স্বাতন্ত্র্য ঠিক-ঠিক রক্ষা করা যায় সে-ভাষাই সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী। আবার সংগীতের ক্ষেত্রে যে লিপি সংগীতের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ঠিক-ঠিক রক্ষা করার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশি সহায়ক হয়, সে-লিপিই সংগীতের সুর-রক্ষণের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তা ছাড়াও অন্য কথা আছে।

ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে সংগীত কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে প্রচারিত হওয়াই চিরাচরিত নিয়ম। সংগীত আয়ত্ত করার জন্য শিষ্যের পক্ষে সংগীতাচার্যের অধীনে একনিষ্ঠভাবে শিক্ষালাভ করাই রীতি। কোনো ললিতকলার রস-কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হলে এটিই হল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অন্য দিকে সংগীতের রক্ষণ বিষয়ে আর একটি কার্যকর পন্থা আছে—সেটি হল সংগীতলিপিবদ্ধ গ্রন্থ।

আমাদের ভারতবর্ষের সংগীতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সহস্রবর্ষী সামবেদ শুধু মন্ত্রের সংকলন নয়, গানেরও সংকলন। কিন্তু বৈদিক যুগে সংগীতলিপি ছিল কিনা এবং থাকলেও তা কিরূপ প্রচলিত ও প্রচারিত হয়েছিল, সে-সব বিস্তারিত গবেষণার বিষয়। অবশ্য এই বিষয়-সংশ্লিষ্ট সকল গ্রন্থও বর্তমানে পাওয়া যায় না—নানা বিপর্যয়ে বহু গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে। বৈদিক যুগের বহু পরবর্তী কালের মতঙ্গ-কৃত 'বৃহদ্দেশী' ও শার্ঙ্গদেব-কৃত 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থে সংগীতলিপির উল্লেখ ও নির্দেশাদি পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব সংগীতলিপি বহুলভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত হয়নি। অবশ্য তার বিশেষ কারণ আছে। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে কলাকার ও শাস্ত্রকার ছিলেন একই ব্যক্তি। অর্থাৎ যিনি সংগীত অনুশীলন করতেন, সংগীত পরিবেশন করতেন, সংগীতের শিক্ষাদান করতেন তিনিই সংগীত-শাস্ত্র রচনা করতেন। এজন্য সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ ও তত্ত্বসিদ্ধ অংশে গরমিল ছিল না। কিন্তু তৎপরবর্তী মধ্যযুগে নানা কারণে সংগীতের ক্ষেত্রে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে—যার ফলে কলাকার ও শাস্ত্রকার পৃথক ব্যক্তি হয়ে পড়েন এবং ক্রমশ বহু ক্ষেত্রে সংগীত-শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ গায়ন-বাদন-ক্রিয়ার অসামঞ্জস্য ঘটতে দেখা যায়। এক কথায়, গায়ক-বাদক ও শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় এবং বহু সংগীত-রচয়িতার রচনাসমূহ লিপিবদ্ধ সংগীতের অভাবে লুপ্ত হয়।

বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে রাগ সংগীতের ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় এই দুটি সংগীত-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই দুটি পদ্ধতির উদ্ভাবনা কি কারণে এবং তার যৌক্তিকতা কি এসব বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে আমরা উত্তর ভারতীয় সংগীতের সুর-রক্ষণ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

বর্তমান যুগে উত্তর ভারতীয় রাগ-সংগীতের সুর-রক্ষণ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দুজন সংগীত-দিকপালের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তার মধ্যে একজন [illegible] পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর [illegible] [illegible] পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে [illegible] পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের বহু [illegible] কীর্তির মধ্যে সংগীতলিপি বিষয়ে চিন্তা ও উদ্ভাবনা অন্যতম। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথাতেই বলি :

'হামারে গুরুদেব পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর নে সন্ ১৮৯৫ ঔর ১৯০০ কে বীচ মে অপনী সংগীত-লিপি কো রূপ দিয়া থা। কারণ, উনহোঁনে ভারতকে সর্ব-প্রথম সংগীত মহাবিদ্যালয় কী স্থাপনা করনী থী! গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় কে নাম সে উনহোঁনে ১৯০১ মে' জো সংগীত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত কিয়া থা উসকে লিয়ে সংগীত-লিপি কা হোনা নিতান্ত আবশ্যক থা; কোঁকি উসকে বিনা ক্রমিক পাঠ্য-পুস্তকে নহী বন সকতী থীঁ। ইস সংগীত-লিপি কো পূর্ণ রূপ দেনে কে লিএ বে স্বয়ং গা কর লিপি মে' উস গীত যা আলাপ-তান কো নিবন্ধ করতে থে। আজ কা কিয়া হুআ কল জাঁচতে থে; ঔর ইস প্রকার দীর্ঘ পরিশ্রম কে বাদ এক পূর্ণ লিপি বনানে মে' বে সফল হুএ। উনকী বনাই হুই সংগীত-লিপি বহুত সূক্ষ্ম তথা পূর্ণ হৈ।'

অর্থাৎ, আমার গুরুদেব পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর ১৮৯৫-১৯০০ সালে নিজস্ব সংগীতলিপি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম সংগীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি "গান্ধর্ব মহা-বিদ্যালয় নামে যে সংগীত-মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার জন্য সংগীত-লিপির বিশেষ প্রয়োজন ছিল; কারণ, তা ছাড়া ক্রমানুযায়ী পাঠ্যপুস্তকাবলী প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এই সংগীত-লিপিকে পূর্ণ রূপ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজে বারবার গেয়ে গানের ও তানালাপের সংগীতলিপি প্রস্তুত করতেন—আজ যা প্রস্তুত করতেন পর-দিন পুনরায় তা মিলিয়ে দেখতেন—এইভাবে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর একটি পূর্ণাঙ্গ সংগীতলিপি পদ্ধতি প্রণয়নে সফল হলেন। তাঁর উদ্ভাবিত সংগীত-লিপি খুব যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর কর্তৃক উদ্ভাবিত সংগীতলিপি-পদ্ধতি যুক্তি-সম্মত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নেই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রধানত জটিলতার জন্য তাঁর অনুবর্তীগণ সে-পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করেননি—

শিষ্যভেদে তার রূপ কতকাংশে সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত হয়েছে। তা হলেও এ বিষয়ে অগ্রণী হিসাবে পণ্ডিত বিষ্ণু-দিগম্বরের কৃতিত্ব অবশ্য-স্বীকার্য।

বর্তমান যুগে উত্তর ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের কীর্তি সুবিদিত। তাঁর কৃত সংগীতের তত্ত্বসিদ্ধ অংশের 'হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি' এবং ক্রিয়াসিদ্ধ অংশের সংগীতলিপি-সম্বলিত 'ক্রমিক পুস্তক-মালিকা' গ্রন্থাবলী বহুল-প্রচারিত। যে অসাধারণ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এই সকল গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহ চয়ন করে লিপি-বদ্ধ ও প্রকাশ করেছেন, তার তুলনা কমই মেলে। এই সব গ্রন্থভুক্ত বিষয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বরোদায় সংগীত-সম্মিলনে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন :

১। যদি হম বৈদিক সময় কো ছোড় কর মহাকাব্যোঁ এবং প্রাচীন নাটকোঁ কে কাল কী ওর চলেঁ, তো হমেঁ ইসকে প্রচুর প্রমাণ মিলেংগে কি সংগীত কো সমাজ মেঁ বহুত উঁচা স্থান প্রাপ্ত থা ঔর ইসকে বৈজ্ঞানিক ঔর কলাত্মক দোনোঁ পহলুও পর ব্যবস্থিত রূপ সে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা-কার্য হোতা থা; পরন্তু উসকা বাস্তবিক রূপ ক্যা থা, ইস পর হমারে পাস কোঈ বিশ্বাসনীয় সামগ্রী নহীঁ হৈ। উস কালকে সভী সংগীত গ্রন্থ অপ্রাপ্য হৈঁ।

বৈদিক যুগকে ছেড়ে দিয়ে যদি মহাকাব্য এবং প্রাচীন নাটকের যুগ পর্যালোচনা করা যায় তা হলে সমাজে সংগীতের স্থান যে অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং সংগীতের তত্ত্বসিদ্ধ ও ক্রিয়াসিদ্ধ উভয়াংশের ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা কার্য হত, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তার পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমার কাছে নেই। সে-যুগের সব সংগীত-গ্রন্থই লুপ্ত।

২। হম দেখতে হৈঁ কি উত্তর ভারতকা বর্তমান আদর্শ উচ্চ সংগীত বহী হৈ, জিসকা প্রাদুর্ভাব ঔর প্রচলন পেশেবর মুসলমান কলাকারোঁ দ্বারা পিছলী পাঁচ শতাব্দীয়োঁ মেঁ হুআ। হমারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ জিনমেঁ সে কেবল কুছ হী আজ উপলব্ধ হৈঁ, প্রামাণিক সূত্রোঁ কে রূপ মেঁ অব দেখে নহীঁ জাতে ক্যোঁকি কঈ অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ বাতোঁ মেঁ বর্তমান ক্রিয়াত্মক সংগীত কা মার্গ বদল চুকা হৈ। হমারে প্রাচীন গ্রন্থোঁ কে বর্তমান অভ্যাস কে লিয়ে অনুপযোগী সিদ্ধ হো জানে কে কারণ হম স্বভাবতঃ অপনে অপঢ় অজ্ঞান ঔর সংকুচিত—হৃদয় ব্যবসায়ী কলাকারোঁ কী দয়া কে ভিখারী হো গয়ে হৈঁ।

দেখা যাচ্ছে, উত্তর ভারতীয় বর্তমান আদর্শ উচ্চ সংগীত বলতে তাই বোঝায়, গত পাঁচ শতাব্দী যাবৎ পেশাদার মুসলমান কলাকারগণ যার উদ্ভাবনা ও প্রচলন করেছেন। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ-সকলের কয়েকখানি মাত্র বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য প্রামাণিক তথ্যাদির সাহায্যে এখন দেখানো সম্ভব নয় যে বর্তমান ক্রিয়াত্মক সংগীতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের প্রাচীন সংগীতগ্রন্থ-সকল বর্তমানে সংগীত-অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনুপযোগী এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কারণ এই আমার মনে হয় যে আমরা স্বভাববৈগুণ্যে অশিক্ষিত, অবোধ, ক্ষুদ্রমনা ও পেশাদারী কলাকারগণের কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের এই উক্তিগুলি স্মরণে না রাখলে তাঁর সংগীততত্ত্ব ও সংগীতলিপি সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। পণ্ডিত বিষ্ণু-দিগম্বর ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সংগীত-লিপি-পদ্ধতিতে বিস্তর পার্থক্য থাকলেও উভয়েই সুর-রক্ষণ বিষয়ে একই উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম প্রয়াসে অগ্রণী হয়েছিলেন।

এই একই প্রসঙ্গে দণ্ডমাত্রিক সংগীতলিপি-পদ্ধতি এবং বিলিতী সংগীতলিপি-পদ্ধতিতে (staff notation) উত্তর ভারতীয় সংগীতের সুর-রক্ষণের বিষয় মনে আসে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিষ্ণুপুরের সংগীতজ্ঞগণ দণ্ডমাত্রিক সংগীত-লিপি বিশেষভাবে প্রচার করেন। এই পদ্ধতিতে প্রকাশিত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'সংগীত-মঞ্জরী' শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'সংগীত-চন্দ্রিকা' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ। বিলিতী সংগীত-লিপির সাহায্যে উত্তর ভারতীয় সংগীতের সুর-রক্ষণ একটি সাধু প্রচেষ্টা। এই পদ্ধতির সংগীতলিপি যে সকল গ্রন্থে অল্পবিস্তর প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'গীতসূত্রসার' (২য় ভাগ) উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিকপক্ষে 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে সংগীত-তত্ত্বসমূহের সমাবেশ ও বিলিতী সংগীতলিপিতে ভারতীয় সংগীতের সুর-রক্ষণে গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বর্তমান আলোচনায় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক সংগীত-ধারার সুর-রক্ষণের প্রশ্ন মনে আসে। এ স্থলে তার বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ না করে বাংলা গানের সংগীত-লিপি সম্বন্ধে দু-চার কথায় সূত্রপাত করব।

পূর্বে উত্তর ভারতীয় সংগীতের তথা রাগসংগীতের সংগীতলিপি সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংগীত-ইতিহাস আলোচনা করলে তারও পূর্বেকার একটি বিশেষ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সাহিত্য, দর্শন, গণিতাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ঋষিতুল্য এক ব্যক্তি বাংলাদেশে বাংলা সংগীতলিপির উদ্ভাবন করলেন। ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের কৃতী পুরুষ শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯১ শকাব্দের (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ) কার্তিক সংখ্যায় (১৪০ পৃষ্ঠার পর ১-৬ পৃষ্ঠা অতিরিক্ত সংযোজনে) 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী' ও তৎসহ পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের সংগীত-লিপি প্রকাশিত হয়। উক্ত স্থলে নামের উল্লেখ না থাকলেও এই 'প্রণালী'র উদ্ভাবক যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার অন্য প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায়। বিপিনবিহারী গুপ্ত-কৃত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ে (পৃঃ ২০৪) দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে—দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ।' তা ছাড়া, 'বালক' ১২৯২ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিভা দেবী কৃত 'সহজে গান শিক্ষা' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে, 'এখানে গীত শিখিবার যেরূপ সংকেত বলিয়া দেওয়া হইবে, তাহা ১৭৯১ শকের কার্তিক সংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কীর্তন ও বাউল বাংলাদেশের দুটি বিশিষ্ট সুরসংগীতধারা। কিন্তু সংগীত-

লিপির সাহায্যে কীর্তন ও বাউল গানের সুর-রক্ষণ বিষয়ে কোনো-বৃহৎ ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে জানা যায় না। কীর্তন ও বাউল গান ছাড়াও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প-ঐতিহ্যবাহী সংগীতও বাংলায় বর্তমান ছিল। তা ছাড়া, ব্রহ্মসংগীত-রচনার যুগ বাংলার সংগীত-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার মতো একটি রূপ। রাগসংগীতের ভিত্তিতে ব্রহ্মসংগীত-রচনা প্রবর্তনের প্রধান কৃতিত্ব রাজা রামমোহন রায়ের। রামমোহনোত্তর যুগে বহু সংগীত-রচয়িতা ব্রহ্মসংগীত এবং অন্যান্য সংগীত রচনার দ্বারা বাংলা গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন; তার মধ্যে সংখ্যার বিপুলতায় এবং সুর ও ভাবের বৈশিষ্ট্যে-বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রসংগীত এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বাস্তবিকপক্ষে, রবীন্দ্রসংগীতকে ভারতীয় সংগীতের এক অভিনব অধ্যায় বললে অত্যুক্তি হয় না।

কার্তিক ১৭৯১ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী' প্রকাশিত হওয়ার পরে ঐ 'প্রণালী' ও তার ক্রমবিবর্তিত-রূপ অনুযায়ী ক্রমশঃ উক্ত পত্রিকায় এবং ভারতী, বালক, সাধনা ইত্যাদি পত্রিকায় বিভিন্ন রচয়িতার গানের সংগীতলিপি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩০৪ সালে প্রকাশিত 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' গ্রন্থে সাহিত্য ও সংগীতবিদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি' শিরোনামায় সংগীতলিপির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং তৎসহ 'চিহ্নের নথ-দর্পণ' আখ্যায় এই ব্যাখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যোগ করেন। এই গ্রন্থের বিশেষভাবে উল্লিখিত বিষয় হল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক উদ্ভাবিত লয়-নির্দেশ প্রণালী। যে-কোনো দেশের যে-কোনো কালের সংগীতে লয় একটি অপরিহার্য মৌলিক বিষয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলেই 'স্বরলিপি-গীতি-মালা'র প্রত্যেক লিপিতে লয়-নির্দেশ প্রবর্তন করেছিলেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি' সম্বন্ধে গভীরভাবে বিচার করলে, সংগীতলিপিকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করার যে সফল প্রচেষ্টা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়, তাতে সংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যাই সর্বাধিক। তারপর বহু পত্রিকায় ও পুস্তকে রবীন্দ্রসংগীতের লিপি প্রকাশিত হয়েছে। আলোচিত গ্রন্থের পর এই-সব স্বরলিপি প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি অর্ধ শতাব্দীব্যাপী একটি সূক্ষ্ম তুলনা-বিচারের গণ্ডি নেওয়া যায় তা হলে বহু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু সে সব আলোচনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, গান কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে প্রচারিত হওয়াই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতি। কিন্তু কারো কণ্ঠ চিরকাল থাকে না, আবার সকলের ধারণশক্তিও সমান হয় না। এমতাবস্থায় সংগীত-সৃষ্টিকে রক্ষা ও পোষণ করতে হলে সংগীতলিপির সাহায্য নেওয়া একটি বিশেষ কার্যকর ও পরিপূরক পন্থা। পরিপূরক এই জন্য যে, যেহেতু মনের আনন্দ-আবেগের ফলে কণ্ঠে যে সজীব গীত-রূপের সৃষ্টি হয়, সংগীত-লিপিতে তার অবিকল প্রতিফলন সম্ভব নয়; শুধু তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে উপযুক্ত সংগীতাচার্যের পথনির্দেশ অবশ্যই নিতে হয়। তা না হলে দিক্-নিশানা পাওয়া যায় না। ব্যক্তিভেদে স্মৃতিশক্তির তারতম্যের জন্য কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে সংগীত-প্রচারে যে গরমিলের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা, সংগীত-লিপি সে স্থলে দিক্-দর্শনের কাজ করে—বিশেষ করে যে স্থলে সুর-স্রষ্টার উপর হস্তক্ষেপের অধিকারের প্রশ্ন উঠে না।

সংগীতলিপি ছাড়াও সুর-রক্ষণের অন্য পন্থা আছে—যদিও সমানভাবে কার্যকর নয়। যেমন, গ্রামোফোন রেকর্ড। গ্রামোফোন রেকর্ডে সময় সীমাবদ্ধ বলে অনেক ক্ষেত্রে গীত-রূপ খর্ব হতে দেখা যায়, অবশ্য গায়কের কণ্ঠস্বর ও গায়কির আভাস পাওয়া যায়। সে তুলনায় অধুনা-প্রচলিত টেপ-রেকর্ড অধিকতর উপযোগী। সময়ের বাঁধা-ধরা নিয়মে না গেলে চলে বলে এতে গায়কের কণ্ঠের গীত-রূপ যথাযথভাবে ফুটে উঠতে পারে। যন্ত্রসংগীত সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। সাতাশ ।।

রজতও অভিমান করেছে।

সে চলে যাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত একভাবে বারান্দাতেই চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে রইল প্রশান্ত। চিন্তার কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না। রজত এসে আরও যেন স্পষ্ট করে দিয়ে গেল স্বাতিকে। তারও এইভাবেই কাটছে; প্রশান্তর নিরুপায় ভাব, কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না; স্বাতির অভিমান, কিন্তু সে-অভিমান প্রকাশ করবার উপায় নেই, নিজের মনেই গুমরে সারা হচ্ছে।

ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। ঘরে গিয়ে শুল', কিন্তু যেন শয্যা-কণ্টকী হয়েছে। আবার বাইরে এসে বসল। রাত্রিটাও গুমট, যেন নিজের অন্তরের উত্তাপ নিয়ে স্তব্ধভাবে পড়ে আছে। একেবারে শেষের দিকে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া উঠতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠল যখন অনেকখানি বেলা হয়ে গেছে, রোদটা পাদুটার ওপর বেশ কড়া হয়ে লাগছে।

শেষরাত্রে তন্দ্রার ঘোরে কি যেন একটা ঠিক করে ফেলেছিল।...হ্যাঁ, মনে পড়ে গেছে! ঠিক করেছিল--এভাবে কাটানো সম্ভব নয় বলেই ঠিক ক'রে ফেলেছিল, নিজেদের সব কথা গোপন করে আবার যেমন সব চলছিল চলতে দেবে—রজতের এসে সব বলার পর দেখল—তার একলার জীবন নয়, আর-একটা জীবন একেবারেই যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। রজত ঠিকই বলেছে, ভালোবাসাই তার সম্বল, সে একেবারেই নিরুপায়। দুটো কথা গোপন করলে যদি তাকে বাঁচানো যায় তো করতে হবে বৈকি গোপন।

কথাটা মনে পড়ে যেতে বেশ ব্যস্ত-সমস্ত হয়েই উঠে পড়ল প্রশান্ত। মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে—চা ওখানেই—বলবে—ছুটে আসতে হোল তাকে—বলবে স্বাতি নাকি একেবারেই কিছু বিশ্বাস করেনি, উলটে রাগ ক'রে বসে আছে! অভিমানটাকে রাগ-করাতে দাঁড় করাবে আরও কড়া করে দিয়ে।

বেশ তাড়াহুড়ো করেই তৈয়ের হয়ে নিয়ে বেরুতে যাওয়ার সময় হঠাৎ অত গোছগাছ-করা মনটা আবার এলিয়ে গেল। কাল রাত্রের নিস্তব্ধতায়, তন্দ্রার কুহেলী-চৈতন্যে যা সম্ভব বোধ হয়েছিল, সহজ বোধ হয়েছিল, আজ দিনের কড়া রোদে, চারিদিকের জাগ্রত বাস্তবে কেমন যেন অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে — হীন, স্বার্থগন্ধীই — স্বাতির ভালোর নাম করে।

আরাম-কেদারাটা রোদ থেকে ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে আবার গা ছড়িয়ে দিল। চাটুজ্জেকে বলল—চা-টোস্ট ক'রে আনতে। আফিস যেতে ইচ্ছে করছে না—এদিকে এই রকম ফাঁসির-ব্যস্ততা দেখিয়ে সেখানে সমস্ত দিন চুপচাপ পড়ে থাকা—রাত পর্যন্ত, এও বড় হীন। না, এভাবে চলবে না। জীবনটাকে পৌরুষের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। যা হওয়ার নয় তাকে নির্মমভাবেই ছেঁটে দিয়ে দরকার হলে নূতন করে গড়তে হবে জীবনটাকে।

একটা সুযোগও উপস্থিত হোল; অন্তত ওর মনে হয়েছিল তাই—

আফিসে গিয়ে এই সব বিশৃঙ্খল চিন্তা নিয়েই বসেছিল টেবিলের সামনে, ঝনঝন ক'রে ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে প্রশান্ত প্রশ্ন করল—কে?

"আমি বিমান।"

"বিমান!"—একটু ধোঁকায় পড়ে তখনই আবার বলে উঠল—"ও, বিমান? আমাদের ওভারসিয়ার বাবুর ভাই? কখন এলে তুমি?"

"এই দশটার গাড়িতে।"

"বেশ, আছ তো এখন?"

"থাকব যে, কি এট্র্যাকশন আপনার কলোনীতে প্রশান্তদা?"—

একটু যেন লঘুভাবেই হাসল বিমান। কতবড় গুরু আকর্ষণ যে লঘু করবার চেষ্টা তা দেখে প্রশান্তর মুখেও একটা হাসি ফুটল। তবে ছোটদের দলে

পড়ে, 'আকর্ষণ'—যে সেও ছোটর দলেই, অনেকটা সম্বন্ধ-বিরুদ্ধই, কিছু আর বলল না। "তা বৈকি। তাহলে?"—ব'লে একটা প্রশ্নের আকারেই ছেড়ে দিল।

"তাই আমি বলছিলাম প্রশান্তদা, পুলের ওদিকটা একটা ট্রিপের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? সেদিনকার সেই রাতের মতন?"

"খুব ভালো হয়।"—হাসিতে বেশ একটু দুলেই উঠল, অবশ্য আওয়াজটা চেপে রেখে। এর পরই কিন্তু হঠাৎ উৎসাহিতই হয়ে উঠল প্রশান্ত; বলল—"সত্যি ভালো হয় হে। সেই তারপর আর একবার গিয়েছিলাম আমরা। চমৎকার। জ্যোৎস্নাটাও রয়েছে। তবে বর্ষার রাত, বেশি রাত না ক'রে সকাল-সকাল ফিরে আসাই ভালো; এই ধরো নটা, সাড়ে নটার মধ্যে।"

"এসব ট্রিপের রাত্তির যত গভীর ততই—কি যে বলে ভালো, উপভোগ্য; নয় কি প্রশান্তদা? গভীর রাতের একটা সৌন্দর্যই আলাদা তো।"

প্রশান্ত হেসে মনে মনেই বলল—'আজ্ঞে, তা আর নয়?' ফোনে গম্ভীরভাবেই সমর্থন করল—"তা বইকি। আর বৃষ্টি যে বিনা নোটিশেই এসে পড়ছে এমনও তো নয়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে। তাহলে যাচ্ছ কে কে?"

"সেই সেদিনকার দল। আপনি, স্বাতি দেবী, রজতদা, আমি,...আর হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছিলাম, বিশাখা যদি যেতে চান। আরও হোলে তো ভালোই হোত—The more the merrier, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?"

"সব ক্ষেত্রে ভ্যাজাল বেশি বাড়ে সেটা আবার ভালোও নয় তো; এই পাঁচজনেই বেশ।"—এবার এটুকু না-ব'লে যেন পারলই না প্রশান্ত। বলল—"তাহলে সবাইকে বলে রাখো। আর, হ্যাঁ, একবার কাউকে দিয়ে লাহিড়ী-মশাইকে বলে পাঠাতে হবে স্বাতির কথা।"

"আমিই যাচ্ছি।"

"না, না, তুমি নিজে যাবে কেন? এই কড়া রোদ! এতখানি পথ! আর, প্রায় সদাই তো গাড়ি থেকে নামলে।"

"আমাদের এ-বয়সে অত রোদ-ফোদ গ্রাহ্য করলে চলে?—আপনিই বলুন না। দুজনকেই বলতে হবে তো।"

"দুজন!...লাহিড়ীমশাই কি আসতে চাইবেন?"

"লাহিড়ীমশাই কেন? — বিশাখাও তো ঐখানেই রয়েছেন।"

"তাই নাকি? জানি না তো।"

"আপনার জীপে রজতদা কলে যাচ্ছিলেন, উনিও সঙ্গে গেছেন, স্বাতি দেবীদের বাসায় ড্রপ ক'রে দেবেন ও'কে। এসেই শুনলাম—রজতদার খোঁজ নিতে গিয়ে।"

"এসেই রজতের খোঁজ! শরীর তোমার ঠিক আছে তো?"

—এই প্রচ্ছন্ন ঠাট্টার মিষ্টতাটুকুরও লোভ সামলাতে পারল না।

বিমান বলল—"নাঃ, শরীরের কি হবে?—মানে—এই—ভাবলাম..."

"ঠিক আছে। তুমি একবার পাচক-ঠাকুরকে ডেকে দাও।"—হাসি চেপে আর কথাবার্তা চালানো শক্তও হয়ে পড়েছিল; ওদিকে বিমানের অবস্থাও ভাঁওতা দিতে দিতে শোচনীয় হয়ে আসছে। চাটুজ্জে এলে তাকে সবার জন্য রাত্তিরের খাবার তোয়ের করতে বলে দিল, নদীর ধারেই খাওয়া-দাওয়া হবে। চাটুজ্জে শুনে নিয়ে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, বিমান আবার নিল তার হাত থেকে। বলল—"জীপটাও এসে গেল প্রশান্তদা', রজতদা' ফিরে এসেছেন।"

"তবে আর কি। একটু থেমে যাও; আমি গোপেশ্বরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সাইকেলে করে, সে তোমায় জীপে করেই লাহিড়ীমশাইয়ের বাড়ি নিয়ে যাক।... দেখছি, তোমার যাত্রাটা খুব ভালো।"

"উনি না এসে পড়লেও যেতেই হোত।"

"সে তো বটেই। না গেলে চলত?... বেশ, তাহলে এসো। রজতকেও বলে দাও।"

এও যেন একটা ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনের গুমট কেটে যাওয়া। যৌবন-মনের স্পর্শ, কি মিষ্টি লুকোচুরি! নিজেদের দুটি মন নিয়ে কী মিষ্টি এক শম্বুক-বৃত্তি!—পৃথিবীতে আর কিছু নেই, আর কেউ নেই, বিমান-বিশাখা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না, বোঝে না!... হে ভগবান, এদের ভালোবাসার মাঝখানেও যেন আবার কিছু এসে না দাঁড়ায়।

দাঁড়ালই কিন্তু কোথা দিয়ে কি এসে।

একেবারেই জমল না আজকের নৈশ অভিযান। সবই অনুকূল; ভরা নদী, ভরা জ্যোৎস্না, কিনারার সেই মিঠে গন্ধের বুনো সাদা ফুলগুলায় যেন বান ডেকেছে; কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে রইল।

স্বাতি এসেছে, একেবারেই মৌনও নয়, কথাবার্তা হোল। তবে সে একজন পরিচিতা যুবতীর কথাবার্তা মাত্র। সে কথাবার্তা ফুলঝুরি নয় যে তার ঝলকিতে অন্য মনে আগুন ধরবে। কে এগুলো না বললে কে এগুতে পারল না বলা শক্ত, তবে দুজনেই যেন নিজের নিজের মান বাঁচিয়ে শুধু ভদ্রতার গণ্ডীর মধ্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। প্রশান্ত আর স্বাতি।

তবে ওদের বিমান আর বিশাখার দিকে খুব লক্ষ্য ছিল। প্রথমত, তাদের রাত্রিটুকুও না নিরর্থক হয়ে ওঠে! দ্বিতীয়ত, ওদের উপলক্ষ্য ক'রে নিজেদের আবদ্ধ মনকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও। সে যেন আরও মর্মান্তিক। সক্রিয়ভাবে চেষ্টাও করল—স্বাতি-প্রশান্ত, দুজনেই। বিমানের মনটা সাড়াও দিয়ে উঠল বারকয়েক, তারপর বিশাখার সাড়া না পেয়েই গুটিয়ে গেল নিজের মধ্যে। আজকের এ-রাত্রি তারই তো বেশি করে, ছুটে এসেছে অতদূর থেকে, আয়োজনেরও সবটুকুই তারই, সবাই তো জানেও সে-কথা; এখন ঔদাসীন্যটা এত স্পষ্ট, যেন লজ্জা রাখতে জায়গা পাচ্ছে না বিমান।

একবার বলেও ফেলল—"আপনি বৃষ্টি হ'তে পারে বলে ভয় করছিলেন প্রশান্তদা'। দেখুন, এক ছিটে-ফোঁটা মেঘ নেই কোথাও!"

—সবারই মনের কথা যেন তাই; একটু মেঘ উঠুক, একটা ছুতো পেয়ে ওরা মুক্তি পাক এই ব্যর্থ অভিসার থেকে। তবু চেষ্টা করল স্বাতি, কিংবা হয়তো সজ্ঞান চেষ্টা নয়, একটা পুরনো অভ্যাসেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"বিশাখা, চাতকের ডাকটা কানে যাচ্ছে না তোমার?"

প্রশ্নটা উলটে নিজের গালেই যেন একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল। বিশাখার মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটল একটু, তবে যেন একেবারেই কিছু বোঝেনি এই ভাব দেখিয়ে খুব সাধারণ একটা ঠাট্টা দিয়েই প্রসঙ্গটাকে শেষ করল, বলল—"এত জলের পরও যে-চাতক মেঘ চায়, তাকে আর কি বলা যাবে?...ঠিক বলছি না বিমানবাবু?"—বলে বিমানকেই সাক্ষী মানল।

দাদা রজতও তো রয়েছে; গা পেতে নেওয়াও যায় না স্বাতির ঠাট্টাটা। রজত যত যাই বলুক, সাধারণভাবে এসব দিকে বুদ্ধিটা সূক্ষ্ম নয় মোটেই।

স্বাতি এসেছে, প্রশান্ত রয়েছে; কথাও হচ্ছে, পরিবেশটাও অনুকূল, ও এইতেই যেন সন্তুষ্ট। কথার অল্পতার জন্য অবকাশ যা পাচ্ছে সেটা চারদিকের গাঁয়ের রোগের বিবরণ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

খাওয়া-দাওয়াটা ওখানেই সেরে ন'টার আগেই ফিরে এল ওরা।

।। আঠাশ ।।

এ যেন আরও কী একটা হয়ে গেল!

স্বাতির ব্যাপারটার জন্যে মন অনেকখানি প্রস্তুতই ছিল, ওর আরও খারাপ লাগল বিমানের প্রতি বিশাখার আচরণে। স্বাতিকে বোঝা যায়, বরং মনে মনে প্রশংসাই করে। প্রশান্ত নিজে নিরুপায় অবস্থাচক্রে, স্বাতি যে একটা সুযোগ পেয়ে যেচে এগিয়ে আসতে চায় নি এতে তার চরিত্রের দৃঢ়তাটুকুই ফুটিয়ে তুলেছে। সমস্ত ব্যাপারটাই বেদনামূলক হলেও, স্বাতিকে ভালোবাসে বলেই, যেন একটা সান্ত্বনা রয়েছে এতর মধ্যেও। কিন্তু বিশাখার হঠাৎ এ-ভাব কেন?

চিন্তাটা নিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে একটা সংশয় মনটাকে অধিকার ক'রে বসল—একি তার পুরুষদের ভালোবাসার ওপর অবিশ্বাস, স্বাতির দশা দেখে বিশাখা আর এগুতে সাহস করল না? একি প্রশান্তকে তার মৌন ধিক্কার?... আর যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা নিয়ে থাকা। মনটা যেন কঠিন মাটির স্পর্শ চাইছে।

রাত যখন এগারোটা, হঠাৎ রজত এসে উপস্থিত। বাবলা থেকে লোক এসেছে ডাকতে। স্কুলের সেক্রেটারি, সেই উৎসাহী যুবকটি, যে সবাইকে জড়ো ক'রে নিয়ে দাঁড় করাল স্কুলটা, তার অবস্থা সংকটজনক। একটা তীব্র আঘাত পেয়ে উঠে বসল বিছানায় প্রশান্ত। বলল—"সে কি! চলো, আমিও যাব।"

মোটর বের করলও নিজেই। স্টার্টও দিল, সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়ে দিয়ে বলল—"না হে, ঠিক হবে না। একলাই যাও। ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এমন সংকট অবস্থায় রোগীর মনের ওপর খারাপ প্রভাবই পড়তে পারে। মনে করতে পারে শেষ দেখা দেখতে এসেছে। তুমিই যাও। একটু দেখো প্রাণপণে লড়ে।"

হাসপাতাল হ'য়ে ভালোরকম যন্ত্র-পাতি নিয়ে আর কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল রজত।

কঠিন মাটি যে এত কঠিন আর রুক্ষ হয়ে ঠেকবে পায়ে তা ভাবতে পারেনি প্রশান্ত। সবই যেন এক মুহূর্তে ফিকে হয়ে গেল। এই সব চুলচেরা বিচার, হৃদয় নিয়ে এত অভিনয় সব হয়ে গেল নিরর্থক। মনে হোল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই জীবনটাকে যত সোজা রেখায় টেনে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিতে পারি ততই যেন মঙ্গল। ভালোবাসা, সহানু-ভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি কতগুলো অবান্তর জিনিস আমদানি করে সেই রেখাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, তার মধ্যে কাটাকুটি করে নিজেরাই যেন জটিল করে তুলি। ওর ইঞ্জিনিয়ার-মন এই রেখার উপমাটা নিয়ে যতই চিন্তা করতে লাগল—একটা পুলের প্ল্যান বা বাড়ির প্ল্যানের মতোই জীবনটা সহজ, পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। রাতটা এগিয়ে যেতে লাগল রজতের প্রতীক্ষায়।

রাত সাড়ে তিনটার সময় রজত যখন ফিরল তখনও প্রশান্ত জেগেই। রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, স্যালাইন দিয়ে আরও অন্যান্য উপায়ে
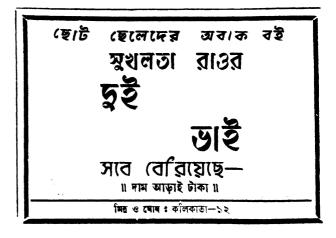
অনেকটা সামলে দিয়ে তবে এসেছে। আর ভয়ের কিছু নেই, কম্পাউন্ডারকেও বসিয়ে এসেছে সেখানে। একটু কিছু খারাপ লক্ষণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে লোক পাঠিয়ে দেবে।

বলল—"একটু চা করতে বলো চাটুজ্যেকে।"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল প্রশান্ত। চাটুজ্যেকে ডেকে তুলে গোপেশ্বরকে তার কোয়ার্টার্স থেকে ডেকে আনতে বলল। চুপচাপই গেল ততক্ষণ। গোপেশ্বর এলে তাকে জীপটা নিয়ে সেক্রেটারির বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল, কম্পাউন্ডার দরকার মনে করলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে রজতকে নিয়ে যাবে। চাটুজ্যেকে চা করে দিতে বলল।

রজত বলল—"ভালোই হোল। তুমি বরাবর জেগেই আছ?"

প্রশান্ত উত্তর করল—"কথায় বলে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ। ও তিনটের একটাও মাথাও ঢুকলে ঘুম আসে?"

"অবস্থাটা সত্যিই খারাপ হয়ে পড়েছিল।"

"সে-ভাবনাটা তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি অন্য ভাবনা নিয়ে ছিলাম। বিয়েব ভাবনা।"

"বিয়ের ভাবনা!" —পাশেই চেয়ারে বসেছিল রজত, অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে ঘুরে চাইল। বলল—"কার? ....ও বুঝেছি, মিষ্টি ভাবনা দিয়ে এই তেতো ভাবনাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলে? ভালো ভালো। আমি তোমায় জিগেস করবই মনে করছিলাম কথাটা আজকে রাত্তিরে......"

"একটা ভুল আন্দাজ নিয়ে এগিয়ে চলেছ রজত।" —মলিন হাসি নিয়ে বলল প্রশান্ত। —"আজ রাত্তিরেও কি বুঝতে পারলে না আমার পক্ষে ও-চিন্তা এখন কত মিষ্টি?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দুহাতে ওর ডান হাতটা ধরে ফেলে বলল—"তুমি স্বাতিকে বিবাহ করো রজত। অনেক ভেবে দেখলাম—এইতেই সব দিক রক্ষে হয়।"

"কী বলছ প্রশান্ত! তোমার মাথার ঠিক আছে তো?"

"অন্তত ঠিক জায়গায় আছে, তবে বল্ল তো তোমার পায়ে নামিয়ে দিচ্ছি। এটা তোমায় করতেই হবে রজত; আমি যে কী নরক-যন্ত্রনায় ভুগছি!"

গলাটা ধরে আসতে চুপ করে গেল। সামলে নিয়ে বলল—"বেশ, সবটা শোন, তারপরও রাজি না হও তো কি আর করব? ......আমার জীবনের সবচেয়ে গোপনীয় কথা রজত। শুধু তোমায়ই বলছি। শুধু একটা কথা দাও—যদি কোন কারণে বন্ধুত্বও ভাঙে আমাদের, কথাটা কারুর কাছে ভাঙবে না।"

আবার গলাটা ধরে এল। চাটুজ্যে চা দিয়ে গেল। নীরবেই পান করল দুই বন্ধুতে। রজত বলল—"বড় বিচলিত হয়েছ। দুটোর কোনটাই যে ভাঙবার নয়। ভাঙা এত সহজ?"

ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটল প্রশান্তর মুখে, সম্বন্ধ—কী করে প্রশান্তদের দ্বারাই সর্বস্বান্ত হয়ে আজ তাঁর এই দশা—কি রকম করে কথাটা টের পেল প্রশান্ত, স্বাতিকে উপহার দিতে গিয়েই—নিতান্তই আকস্মিকভাবে দুজনের অনুপস্থিতিতে অলস কৌতূহলে বইয়ের পাতাটা ওলটাতে গিয়ে।

আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে এল। একটি বেশ হালকা হাওয়া আরম্ভ হোল দক্ষিণ দিক থেকে। জীপটাও ঘুরে এল কম্পাউন্ডারকে নিয়ে। রোগী বেশ ভালোই আছে। তবু যদি দরকার হয় তো সাইকেল ছুটিয়ে দিতে বলে এসেছে কম্পাউন্ডার।

রজত বলল—"গোপেশ্বর, জীপটা ঢুকিও না, আমায় পৌঁছে দিয়ে এসো একটু।"

"আবার তুমি চললে! —এখুনি!" —বেশ চকিতই হয়ে উঠল প্রশান্ত।

"দুটোর কোনটাই যে ভাঙবার নয়"

হয়তো ভাঙন যে কত সহজ সে কথাটা মনে পড়ে গিয়েই।

তারপর আস্তে আস্তে একটি একটি করে সব বলে গেল—লাহিড়ী-মশাই কোথাকার মানুষ, কি ছিলেন; প্রশান্তদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর কী

রজত বলল—"না, বাসায় দিয়ে আসবে। ......যখন রয়েছেই গাড়িটা।"

মাত্র কয়েক গজ, শ'খানেকও নয় বোধ হয়। ক্লান্তভাবে উঠল গিয়ে। শুধু রাত জেগে রোগী পরিচর্যার ক্লান্তিই তো নয়। (ক্রমশঃ)

।। তারকেশ্বর ।।

বাংলার অতি-পরিচিত তারকেশ্বর জাগ্রত দেবতা বলে অনেকের বিশ্বাস। গাজনের সময় যাত্রীর বিরাম থাকে না। দূর-দূরান্ত থেকে আসে গাজনের সন্ন্যাসী, দণ্ডী কাটে, মানত করে। অভীষ্ট পূরণের আশায় ভক্ত আসার কামাই থাকে না কোনকালে। হাওড়া থেকে ছত্রিশ মাইল দূরের এই তীর্থস্থান কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। শাস্ত্র-বিচারের জটিলতার ভেতর না গিয়ে লোকে তারকেশ্বরকে মেনে নিয়েছে। তারকেশ্বর এখন প্রায় লৌকিক দেবতা।

কিন্তু খুব প্রাচীন নয় তারকেশ্বর। ১৭৭৯-৮১ সালে রেনেল সাহেব যে ম্যাপ এঁকেছেন তাতে তারকেশ্বরের কোন নাম নেই। ১৮৩০-৪৫ সালের সার্ভে ম্যাপে তারকেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে খ্যাতির চূড়ায় উঠেছে তারকেশ্বর।

তারকেশ্বরের মন্দির নিয়ে গল্প আছে। লোকে অতি-সম্প্রতি একে গল্প বলছে। কিন্তু আগে তা বলতো না। আগে লোকে তাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতো।

আঠারো শতকের দিকে অযোধ্যায় কায়স্থ রাজা বিষ্ণুদাস রাজত্ব করতেন। কিন্তু মুসলমানদের অধীনে রাজত্ব করতে চাননি বিষ্ণুদাস। স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলার রাষ্ট্র-জগতে তখন দুর্যোগ। বাংলাকে পছন্দ করলেন বিষ্ণুদাস। পাঁচ-শ ঘর কায়স্থ আর একশ ঘর কনৌজের ব্রাহ্মণ নিয়ে বিষ্ণুদাস উপস্থিত হলেন বালাগড়ের নিকটে রামনগরে। ভীত হল বালাগড়ের অধিবাসীরা। তাদের ধারণা বিদেশ থেকে এরা এসেছে ডাকাতি করতে। তখন মোগল সাম্রাজ্যের শেষযুগ। আকবরের 'চিরস্থায়ী স্থাপত্য' ভাঙার মুখে। মগ হার্মাদের লুটপাট, চোর-ডাকাতের রাহাজানি কথার কথা। ভয় পেয়ে বালাগড়ের লোক খবর পাঠালো নবাবকে।

তলব এলো নবাবের। বিষ্ণুদাসকে এখুনি যেতে হবে নবাবের দরবারে,—মুর্শিদাবাদে। রাজার কোন ভয় নেই। হুকুম তামিল করতে রাজা হাজির হলেন দরবারে। নানা জিজ্ঞাসাবাদের পরও মন ওঠেনি নবাবের। শেষকালে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য অদ্ভুত পরীক্ষা দিলেন রাজা বিষ্ণুদাস। হাতের মুঠোর মধ্যে নিলেন আঁচে তাতা গনগনে লোহার ডাণ্ডা। মুঠোর মধ্যে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন দরবারে। কোন দাগ পড়েনি রাজার হাতে, পুড়ে যায়নি একটুও। অবাক হলেন নবাব। এবার তাঁর বিশ্বাস হল বিষ্ণুদাস ডাকাত নয়। অযোধ্যা থেকে বাংলায় এসেছে শুধু বাস করতে। নবাব প্রীত। উপহার পেল বিষ্ণুদাস পাঁচশ বিঘে জমি—আজকের হিসাবে যার পরিমাণ হবে পনেরোশ বিঘে।

বিষ্ণুদাসের ভাই ভারামল্ল। ভারামল্ল সংসার-বিমুখ, সন্ন্যাসী। বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। এখন যেখানে তারকেশ্বরের মন্দির, আগে তা ছিল নাবাল জংলা জমি। নল খাগড়ার বনে বাঘ মহিষ ঘুরে বেড়াত। তার কিছু দূরে ছিল উঁচু জমি। লোকে তাকে বলত সিংহল-দ্বীপ। তার কিছু দূরে জট সরোবর। ভারামল্ল এই বনের মধ্যে একা। প্রায়ই এরকম থাকে। কিন্তু কোনদিন নজর করেনি। হঠাৎ সেদিন নজরে পড়ল।

জঙ্গলের মধ্যে একটা-একটা করে গরু যাচ্ছে। যখন যাচ্ছে তখন তাদের বাঁট ভারী। দুধে ভর্তি। কিন্তু যখন ফিরে আসছে তখন আর টন্-টনে-করা ভাব নেই। খালি। দেখেই মনে হয় কেউ যেন দুধ দুয়ে নিয়েছে। কৌতূহল হল ভারামল্লের। এই জঙ্গলের মধ্যে কে গরুর দুধ দুইতে যাবে?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে অবাক হল ভারামল্ল। গরুগুলো নিজেই এগিয়ে যাচ্ছে একটা পাথরের দিকে এবং তাদের সব দুধটুকু উজাড় করে দিচ্ছে পাথরের ওপর। এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলো যে পাথরের মাথায় গর্ত। রাখালেরা ওই পাথরের মাথায় ধান কুটতো। সেই গর্ত এখনো আছে।

পাথরটাকে তুলতে চেষ্টা করলে ভারামল্ল। সারাদিন পরিশ্রম করার পরও পাথরের তলা পাওয়া গেল না। রাত্রে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছিলেন তারকেশ্বর: পাথর তুলো না। বরং ওখানে মন্দির তৈরী করো। তুমি হও তার প্রথম মোহন্ত।

সকালে ভাই রাজা বিষ্ণুদাসকে ভারামল্ল বলেছিল স্বপ্নের কথা। রাজা

বিশ্বাস করলেন। তিনি সেখানে মন্দির তৈরী করে দেন। এই হল তারকেশ্বরের আদি মন্দির। ভারামল্ল হল তার প্রথম মোহন্ত। সেই মন্দির আজ আর নেই। বর্তমানের মন্দির তৈরী করে দিয়েছেন বর্ধমানের মহারাজা। হাওড়ার চিন্তামণি দের হয়েছিল দুরারোগ্য ব্যাধি। তারকেশ্বরের কৃপায় তিনি সেরে ওঠেন। কৃতজ্ঞতায় তৈরি করে দিয়েছেন বেদীর সামনের মার্বেল পাথরের হল।

অন্য গল্পে শোনা যায় মুকুন্দ ঘোষ দেখতে পায় গরুকে। মুকুন্দ ঘোষ জাতে গোপ। রাত্রে সেই স্বপ্ন পায়। মন্দিরের পাশে তাই আজো আছে মুকুন্দ ঘোষের সমাধি।

কিন্তু তারকেশ্বরের মোহন্ত সতীশচন্দ্র গিরিকে গদীচ্যুত করবার জন্য মামলা হয়েছিল হুগলী জেলা ও সেসন-জজ আদালতে। ১৯২৮ সালের ৯ই জুন আদালতে এজাহার দিয়েছিলেন সতীশচন্দ্র: "প্রথম মোহন্তের নাম ধর্মপাল। তিনিই তারকেশ্বরের মহাদেবের আবিষ্কার করেন এবং মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সন্দগিরি তারকেশ্বরের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন। রাজা বিষ্ণুদাস নামে কোন রাজা কোনকালে কোন মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি কোন সম্পত্তিও দান করেননি। অবশ্য রাও ভারামল্ল কিছু দান করেছিলেন।" আদালতে এ কথাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে তারকেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭২৯ সালে। এই রায় সমস্ত কিংবদন্তীর ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছে।

তারকেশ্বর বিখ্যাত শৈবতীর্থ। বাংলা দেশে একমাত্র চন্দ্রনাথ ছাড়া আর এত বড় শৈবতীর্থ নেই। বলা হয় তারকনাথ শিব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। বাংলা দেশে দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের মঠ তারকেশ্বর।

দশনামীদের ইতিহাস অতি প্রাচীন। শঙ্করাচার্য বেদান্তশাস্ত্র এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। বহু শাস্ত্র আলোচনা ও তর্কযুদ্ধ হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার করার জন্য ভারতবর্ষের চারদিকে চারটে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শিষ্য অনেক। কিন্তু তারমধ্যে চারজন প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। এই চারজনের শিষ্য দশজন। এই দশজন শিষ্য থেকে এসেছে দশনামী, তারকেশ্বরের মোহন্তরা দশনামী শৈব সন্ন্যাসী।

আঠারো শতকে হুগলীতে তান্ত্রিক মতবাদের বিশেষ প্রাধান্য ঘটে। এর পিছনে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে। নবাবী আমলের শেষের দিকে রাজনৈতিক আবর্তে হুগলীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী বণিকের আনাগোনা আর উত্তর-ভারতের হানাদার হুগলীর মাটিকে বিচলিত করেছে। মহানাদে এসেছে নাদতত্ত্ব: বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী মন্দিরে হয়েছে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিসাধনা। ত্রিবেণীতে যোগ-সাধনা। মাঝখানে তারকনাথ। মজার কথা এই যে শক্তি-সাধনা পুরোদমে ঠিক তখনই চলেছে যখন বাংলার মানুষ শক্তিহীন, রাষ্ট্র বিপর্যস্ত, সমাজ-জীবন বিকারগ্রস্ত ও পঙ্কিল।

দশনামী সন্ন্যাসীরা এসেছেন আঠারো শতকে। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল ১৭২৯ সালে। ঠিক তারপরেই এলো বর্গী। অবাধ লুণ্ঠন এবং অহেতুক নরহত্যায় বাংলার এক অংশ হয়ে থাকলো দীর্ঘদিন ধরে জীবন্ত নরক। মারাঠাদের ঘোড়ার খুরের ধুলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই এলো হানাদারী রাজপুত উত্তর-ভারত থেকে। অধিকার করে নিল জমি। পত্তনি হল নতুন বংশের। তাদের সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠন করতে এসেছিল শৈব সন্ন্যাসীরা। পলাশীর পর লুণ্ঠন করেনি শুধুমাত্র ইংরেজ। লুণ্ঠনের ধনরত্ন ঘরে তুলেছে শৈব সন্ন্যাসীরাও। ১৭৬৩ সালে বাংলাদেশ লুট করতে বার হয়েছিলেন দশনামী সন্ন্যাসীরা। এ কথা আজ প্রমাণিত সত্য।

তারকেশ্বরের মোহন্তরা নিজেদের তান্ত্রিক বলে দাবী করেন। মোহন্ত সতীশ গিরির মামলায় এই প্রশ্নও বিচার করা হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এমন বহু পণ্ডিতের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র বিষয় বিবেচনা করার পর জজ রায় দিয়েছেন যে তারকেশ্বরের মোহন্তরা বৈদিক সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক নন।

রেল-স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে তারকেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের দুটি ভাগ। একটি গর্ভগৃহ। সেখানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। মন্দিরটি বাংলার নিজস্ব চ্‌লাঘরের রীতিতে প্রস্তুত। মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল। সামনে চারকোনা ঢাকা বারান্দা। মেঝেটা মার্বেল পাথরের। এর আয়তন প্রায় পঁচিশ ফুট। উচ্চতা ত্রিশ ফুট। ছাদ রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই বারান্দার সামনে দীর্ঘ হল-ঘর। কয়েকটি থামের ওপর নির্ভর করে আছে ছাদ। তারকেশ্বরের মন্দিরের বাঁদিকে আছেন বাসুদেব, পটচিত্রকলা দুর্গা, অন্নপূর্ণা এবং কালিকাও আছেন। তাঁরাও নিয়মিত পূজিত হয়ে থাকেন। মন্দিরের পাশে দুধপুকুর। এই পুকুরে স্নান করার পর যাত্রীরা তারকেশ্বর দর্শন করে থাকেন। শিবরাত্রি এবং চড়ক সংক্রান্তির দিনে উৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসব এখন মেলার সমান। তারকেশ্বর তাঁর বৈদিক গাম্ভীর্য হারিয়ে ধীরে ধীরে বাংলার লোকদেবতার আসন গ্রহণ করছেন।

চিত্রাঙ্গদাকে কেউ খুন করেছিল, না সে আত্মহত্যা করেছিল, তা জানিনে। চিত্রাঙ্গদা তার নাম নয়। এ নামে আমি তাকে ডাকিওনি। পরে কখনো তার কথা মনে হলে এই নাম আমার মনে পড়ত। সে নিজে তার নাম বলেছিল রাত্রি। সেও বোধহয় তার আসল নাম নয়। তার আসল নাম সে আমায় বলেনি।

বন্ধু বিমলের চেষ্টায় চাকরি পেয়েছিলুম চরকা চক্রে। রাঙাদার নিজের ফার্ম। কিন্তু এ চাকরিতে যে বেশিদিন টিঁকতে পারব না, বিমল তা জানত। তবু আমায় রাজী হতে বলেছিল। বলেছিল ঃ অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে, পোশাকী দাম। অন্য কোম্পানি তোকে বেশি মাইনেয় বহাল করবে।

কথাটা মিথ্যা নয়। কোথাও যখন কিছু খুঁজে পাচ্ছিলুম না, রাঙাদাকে প্যাঁচে ফেলে বিমল এই কাজটা জুটিয়ে দিল। কিন্তু যখন ছেড়ে দিলুম, তখন আর-একটা কাজ সহজে জুটল। কাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে তো!

চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই চাকরি ছাড়বার আগে। বিমলের আগ্রহে যে ফ্ল্যাটে উঠে এলুম, সে তার পাশের ফ্ল্যাটে থাকত। এ কথা জেনে আমি আপত্তি করিনি। আমি আপত্তি করেছিলুম অন্য কারণে। মেসের ঘরে যখন দিব্যি চলে যায়, তখন একার জন্য একটা ফ্ল্যাটের কী দরকার!

দরকার আছে বৈকি ঃ বিমল বলল ঃ প্রেস্টিজের জন্য দরকার। একটু চাল না থাকলে কি ফার্মের কাজে উন্নতি করা যায়!

এই চাল আমাদের সর্বনাশ করছে। যে দেশের লোকের দুবেলা দু মুঠো ভাত জোটে না, তাদের আবার শৌখিনতা কিসের! আমি তো দেশছাড়া মানুষ নই! দুদিন আগে আমিই তো ফুটপাথে ঘুরে বেড়িয়েছি চাকরির চেষ্টায়। সে কথা মনে রাখলে কি মঙ্গল হবে না?

না। অতীতটা ভুলে যাওয়াই এ যুগের সভ্যতার শিক্ষা। অতীতকে অস্বীকার করে এ যুগের বুদ্ধিমান মানুষ। তাকে ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। পিছনের পরিবেশ তাকে মনে রাখলে চলবে কেন! হৃদয়ের দুর্বলতা থাক দরিদ্রের বিলাস হয়ে।

সন্ধ্যাবেলায় আরাম-চৌকিতে শুয়ে এইসব কথা মনে আসছিল। এইসব অদ্ভুত ভাবনা। সিগারেটের পোড়া অংশটা ছাইদানিতে ঠুকে চায়ে একটা চুমুক দিলুম। দু জায়গা থেকেই ফিকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। সকালে পড়বার সময় পাইনি। এখনও পড়বার ইচ্ছা নেই। রাজনীতির দলাদলি আর ক্রিকেটের খবর ভাল লাগে না। দলাদলির ময়দানে নিজেও যে সারাদিন ব্যাটে আর উইকেটে মাথা ঠুকেছি। জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে।

এখন দেখছি, চাকরি পাবার আগের দিনগুলোই ভাল ছিল। অভাবের সঙ্গে দুর্ভাবনা ছিল। কিন্তু ক্লেদাক্ত পরাধীনতা ছিল না। অন্নের অভাব বিপ্লবী করেছে আমার সমাজ-সচেতন মনকে, কিন্তু তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেনি। এখন লক্ষ্মীর ঝাঁপি উল্টে দেখছি, তার নিচে অমৃতের বদলে বিষ চাপা ছিল। সে বিষ মানুষকে তিলে তিলে মারবে।

নটবর এসেছিল চায়ের পেয়ালা নিতে। অকারণে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কী রাঁধছ এ বেলা?

নটবর আমার নূতন সংসারের পাকা কর্ণধার। বলল ঃ আজ একটু ঠান্ডা পড়েছে। ভাবছি, রাতে খিচুড়িটাই ভাল লাগবে।

অনুমতির দরকার নেই বলে সে উত্তরের অপেক্ষা করল না। পেয়ালা নিয়ে কাজে চলে গেল। গৃহিণীহীন সংসারে এরা কাজে আনন্দ পায়। দু পাঁচ টাকা কম মাইনেতেও আশ্রয় খোঁজে। আমার নটবরও যে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে শুরু করেছে, তা তার আচার-আচরণেই বুঝতে পারছি।

বাম হাতের সিগারেট এবারে ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে নিলুম, আর বাম হাতের বাহু দিয়ে ঢাকলুম নিজের চোখ দুটো। চোখ বন্ধ করে থাকলে আমরা আরাম পাই। জীবনেও যাঁরা চোখ বুজে চলেন, তাঁদের দুঃখ কম। যে যত দেখে, তার দুঃখের বোঝা তত বড়। বেশি দেখার দুঃখে মানুষ সংসার ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ কথার প্রমাণ আছে ইতিহাসে।

থাক ইতিহাসের পাতায়। আমার জীবন কেন এ মেঘে ঢাকবে! আমার ঘর আছে, সম্পত্তি আছে, বাতি জ্বালালেই এ ঘর হবে আলোকিত। তবে আমি সায়াহ্নে কেন অন্ধকারে বসে থাকি!

সত্যিই অন্ধকার হয়েছিল। কিন্তু বাতি জ্বালবার গরজ হয়নি। কখনও

একটা মশা উড়ে গেছে কানের পাশ দিয়ে, কখনও জানালার পর্দাটা শিরশির করে কেঁপে উঠেছে। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা রিক্স গেল, কি মোটর গেল, মন সেদিকে গেল না। নিঃসঙ্গ মন রইল থমথমে হয়ে।

বাহিরের বারান্দায় বুঝি নটবরের পায়ের শব্দ পেলুম। ঘরে বাতি জ্বালবে কিনা বোধহয় ভাবছে। বললুম : বাতিটা জেবলে দাও।

তারপর দরজার পর্দা সরল। কিন্তু মেঝের ওপর খসখস শব্দ পেলুম না। মিহি আওয়াজ। কান না পাতলে শোনা যায় না। মনে হল, দেওয়ালের গায়ে কেউ বাতির সুইচ খুঁজছে। নটবরের এত দেরি হয় না। বললুম : কী হল?

উত্তর পেলুম মেয়েলি গলায় : সুইচটা খুঁজে পাচ্ছি না।

চমকে সোজা হয়ে বসলুম। যেন কয়েকটা বিদ্যুতের ফুলকি এসে গায়ে পড়ল।

এই যে পেয়েছি।

বলতেই রিনঝিন করে চুড়ির আওয়াজ হল খানিকটা। পরক্ষণেই তীক্ষ্ম আলোয় সারা ঘর ঝলকে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। চোখে আমার ধাঁধা লেগেছিল। সেই আবেশের ভিতর মেয়েটিকে দেখলুম। সুশ্রী গড়ন, কিন্তু ময়লাটে রঙ। পাতলা ঠোঁটে ভয় ও সঙ্কোচ। মুখের ওপর কয়েকটা কালো দাগ, বোধহয় বসন্তের। বয়স এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে আন্দাজ করা কঠিন। সজীবতার অভাব দেখে একটু বেশির দিকেই মনে হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম : মাপ করবেন, আমি বুঝতে পারিনি। ভেবে-ছিলুম, আমার নটবর এসেছে।

সে আমি বুঝেছি।

মেয়েটির ঠোঁটে হাসি দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম। একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললুম : একটু বসবেন তো!

আপনার কাজের ক্ষতি হবে যে!

সন্ধ্যাবেলায় তো আমি কাজ করিনে, একা একা অন্ধকারেই বসে ছিলুম।

কেন, আপনার আত্মীয়স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধব?

না।

সে কি!

যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে রোজ যাবার তাগিদ নেই।

ভেবেছিলুম, এই মেয়েটি কোন কাজে এসেছে। পরে দেখলুম, না। তার কোন কাজ নেই। একা একা পাশের ফ্ল্যাটে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই সময় কাটাতে এসেছে। বলল : কদিন থেকেই আপনাকে লক্ষ্য করছিলুম। একেবারে একা থাকেন দেখে আশ্চর্য লাগে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : আপনি বুঝি কাছেই থাকেন?

কাছে মানে, একেবারে পাশের ফ্ল্যাটে। পাশের ঘরেই বলতে পারেন।

ভারি আশ্চর্য, আমি কিছুই লক্ষ্য করিনি।

সেইজন্যই তো এলাম, একা একা—

মেয়েটি থেমে গিয়েছিল। আমি বললুম : আপনিও একা বুঝি?

মা মারা যাবার পর থেকে একেবারে একা হয়ে গেছি।

আমি চকিতে তার সিঁথিটা দেখে নিলুম। শূন্য সিঁথি, কোন রঙ নেই তাতে। তার নিঃসঙ্গ জীবনের পরিচয় দিচ্ছে পরিষ্কারভাবে। আমার মনে হল, মেয়েটি লজ্জা পেয়েছে। হয়তো লজ্জা পাবারই কথা। —অমন করে তাকানো আমার উচিত হয়নি। সে হয়তো তার নিজের কথাই ভাবছে। —এমন করে আসা তার উচিত হয়নি। এই আসার ভিতর একটু যেন লজ্জা আছে। আমি নিজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করলুম : আমি—

চরকা চক্রের নতুন অফিসার জ্যোতির্ময় বসু।

আপনি চেনেন আমাকে!

মেয়েটি হাসল। কিন্তু আমার বিস্ময় গেল না দেখে বলল : আমিতো পুরুষ মানুষ নই, প্রতিবেশীর দিকে আমরা চোখ বুঁজে থাকতে পারিনে।

তখন আমরা দুজনেই বসে পড়ে-ছিলুম। লজ্জিতভাবে আমি বললুম : সত্যি কথা, আমি এতদিন চোখ বুঁজেই ছিলুম।

চোখ চেয়ে থাকলেও বিপদ। আমরা বেহায়া বলি।

তারপরই সে নিজের পরিচয় দিল ঃ আমার নাম রাত্রি, একটা মেয়েদের কলেজে পড়াবার চেণ্টা করি।

এরপর আমাদের নানা কথা হল, সময়-কাটানো অনেক অনাবশ্যক কথা। তার একটি বন্ধুর গল্পও সে শোনাল। একটি কুশ্রী মেয়ের ব্যর্থ জীবনের গল্প। বলল ঃ আমাকে দেখছেন তো, আমার বন্ধু হবারই যোগ্য।

রাত্রিকে আমি কুশ্রী মনে করি না। কিন্তু প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেলুম না। রাত্রি বলল ঃ সংসারের ঘানি টেনে-টেনেই সে বুড়ো হয়ে গেল। এখন একটা কংকাল বইছে।

যৌবন তো ফুরোবারই জিনিস। সোহাগে অনুরাগে তাকে উপভোগ করা যায়, কিন্তু ধরে রাখা যায় না। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

রাত্রি বলল ঃ সে ভাবে, রূপের অভাবই তার ব্যর্থ জীবনের কারণ, দারিদ্র্য নয়। রূপ থাকলে দারিদ্র্যকে সে জয় করতে পারত। আপনি কী বলেন?

আমি? আমি এ কথা ভেবে দেখিনি।

রাত্রির দৃষ্টিতে প্রশ্ন জেগে রইল। তাই আবার নিজেই বললুম ঃ রূপটা সব সময় কিছু নয়। নিগ্রো মেয়েকেও তো মানুষ হেলেনের মতো সুন্দরী ভাবে, শেক্সপীয়ার বলেছেন।

ও কবির কথা, সাধারণ মানুষের কথা নয়।

লায়লাও শুনেছি অত্যন্ত কুৎসিত ছিল, অথচ রূপবান মজনু তারই জন্যে পাগল হয়েছে।

এও তো সেই কবির কথা। মানুষের জীবনে কি এমন কখনও ঘটে!

হঠাৎ কোন মানুষের কথা মনে পড়ল না, ইতিহাসের গল্পও না। তবু বললুম ঃ কেন ঘটবে না? প্রেম হল দেহাতীত জিনিস, বাইরের রূপ দিয়ে তার বিচার হয় না।

রাত্রি আমাকে উপহাস করল, বলল ঃ আপনিও দেখছি কবিমানুষ।

তারপর বলল ঃ সবাই যদি কবি হত, ভাবনা ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে সবাই! একেবারে মাটি-ঘেঁষা রিয়ালিস্ট মানুষ। কাউকে ভালবাসার আগে তার দেবার ক্ষমতা দেখে—কত অর্থ কত রূপ! ভিতরের সম্পদ কি কেউ দেখে!

রাত্রির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলুম। তার বন্ধুর বেদনা যেন তারই মুখে থমথম করছে। বাষ্প উঠছে তারই বুকের ভিতর থেকে।

হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঃ আজ আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি। এবারে উঠি।

আমি বাধা দিলুম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম ঃ এমনি সময় নষ্ট করতে রোজই আসবেন, খুশী হব। আমার দুয়ার খোলা থাকবে সারাক্ষণ।

রাত্রি হাসল। বড় বিষণ্ণ হাসি।

আমি তাকে তার ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম।

রাত্রির কথা আমি সারাদিন ভেবেছি। মনে হল, নিজেকে সে লুকিয়ে রাখল আর-একটা মেয়ের নাম করে। তার ওপর থেকে আমার দৃষ্টিটা সে সন্তর্পণে সরিয়ে দিয়েছে। পাশের ফ্ল্যাটে সে একা আছে। আত্মীয়পরিজন আছে কি নেই বলেনি। কিন্তু এখানে সে নিঃসংগ। কাল সন্ধ্যাবেলায় একটু সময় কাটাবার জন্যই সে আমার কাছে এসেছিল।

তারপর?

নিজের কথা সে কিছুই বলেনি। বলতে চায়নি। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে মায়ের কথা বলেছিল। তার মা মারা যাবার পর থেকে সে একা আছে। কবে মারা গেছেন তা বলেনি, বাবা বেঁচে আছেন বলেনি। বোধহয় নেই। ভাইবোনের কথাও বলেনি। বলেছিল এক বন্ধুর কথা। তার ব্যর্থ যৌবনের কথা বলেছিল হেঁয়ালি করে। রাত্রির কণ্ঠে আমি আন্তরিকতার সুর শুনেছিলুম। তার হৃদয়ের কান্না আমার কাছে গোপন থাকেনি।

সাহস করে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। যতটুকু সে বলেছে, ততটুকুই শুনেছি মন দিয়ে। বাকিটা অনুমান করে নিতে চেণ্টা করেছি। ধৈর্য আমাকে ধরতেই হবে।

দোতলার বারান্দায় উঠে আমি থমকে দাঁড়ালুম। বাম হাতে রাত্রির ফ্ল্যাট, দক্ষিণে আমার। রাত্রি নিশ্চয়ই আমার আগে ফেরে। কিন্তু এখনি কি তার কাছে যাওয়া উচিত হবে! দেহে অফিসের পোশাক, মনে তার ক্লেদ। স্নান করে

আগে নির্মল হওয়া দরকার। ধীরে ধীরে আমি নিজের দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম।

স্নান করে চায়ের পেয়ালা আমি শেষ করলুম। ঘরের ভিতর সন্ধ্যার অন্ধকার এল ঘনিয়ে। কিন্তু বাতি জ্বালাতে কেউ এল না। বারান্দায় পদধ্বনির আশায় আশায় আমি উৎকর্ণ ছিলুম। শিরশিরে হাওয়ায় আজ শুধু জানালার পর্দাই দোলেনি, আমার মনও দুলেছে। কিন্তু কেউ আসেনি। বসন্তের বাতাস এসে দরজার বাইরে থেমে রইল, ঘরে এল না।

এক সময় আমি নিজেই এগিয়ে গেলুম। আলগোছে পা ফেলে গেলুম রাত্রির দরজা পর্যন্ত। দরজা বন্ধ। ভিতরে সে আছে কিনা জানি না। ডাকতে পারলুম না। বাইরের বাধা এসে মনকে থামিয়ে দিল। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আমি আবার নিজের ঘরেই ফিরে এলুম।

তারপর আমার অনুশোচনা এল। এ আমি কী করছি! এ কী ছেলেখেলা! মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতেই তো আমি চিরকাল চেয়েছি। আজ হঠাৎ এই দুর্বলতা কেন, কেন অস্থিরতা!

রাত্রি একটু রাতে এল। বলল: আবার জ্বালাতে এলাম।

বলতে পারলুম না যে আমি তার অনুপস্থিতিতেই জ্বলছি। সে কথা বলা যায় না। হয়তো কোনদিনই বলা যাবে না। বললুম: আমার সৌভাগ্য।

কেন?

আমাকে জ্বালাতেও কেউ চায় না, এমনি হতভাগ্য আমি।

রাত্রি হাসল, কিন্তু সেই হাসিতে নেই প্রসন্নতা। ভাবলুম, হয়তো তাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। তাই তাড়াতাড়ি বললুম: আজ আপনি ঘরে ছিলেন না?

কী করে জানলেন?

আপনার দুয়ার থেকে আমি ফিরে এসেছি।

সত্যি!

রাত্রির দুচোখ এবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার বিষণ্ণ হাসি হল অন্তর্হিত। বললুম: অফিস থেকে এসে ভাবলুম, ফিরেছেন কিনা দেখে আসি।

ডাকলেন না কেন?

আপনার দরজা যে বন্ধ ছিল।

না না, অমন ভুল করবেন না। অনেক সময় আমি দরজা বন্ধ করে ভেতরে থাকি।

তাই বুঝি!

রাত্রি এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর বলল, আজ আমাকে পেতেন না। আজ আমি আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

সেই বন্ধু!

হ্যাঁ।

আমি তার একটি বন্ধুর কথাই জানি। তবু কেন প্রশ্ন করলুম জানিনে। রাত্রিও উত্তর দিল নির্বিকারে। যেন তার আর কোন বন্ধু নেই, যেন সে আর কারও কথা আমাকে বলেনি, কোনদিন বলবেও না। একটি বন্ধুই তার সমস্ত হৃদয় রেখেছে ভরে। বেদনার সম্পদ বুঝি আনন্দের চেয়েও প্রিয়।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল নিঃশব্দে।

আমি আস্তে আস্তে বললুম: আপনি এখনও তারই কথা ভাবছেন!

রাত্রিও উত্তর দিল মৃদুস্বরে: হ্যাঁ।

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল।

শেষপর্যন্ত আমিই জোর করে বললুম: মনে হচ্ছে, কারও কাছে তার কথা খুলে বললে আপনার বেদনার ভার কমবে।

বোধহয় আরাম পাব। কিন্তু—

কিন্তু কেন, বলুন না।

দুঃখের কথা যে সুখের নয়, সকলের পাতে পরিবেশন করা যায় না।

একজনের পাতে যায় তো, আপনি অসঙ্কোচে বলুন।

রাত্রি তবু কিছু ইতস্তত করল, তারপর শোনাল তার বন্ধুর ব্যর্থ জীবনের কাহিনী। আমার মনে হল না, এ এক অসাধারণ গল্প। আমার বরং উল্টো কথা মনে হল। এমন ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। অল্প-বিত্ত সমাজের এ এক সাধারণ কাহিনী।

তার বন্ধুর নাম সন্ধ্যা। পিতার মৃত্যুর সময় সে কলেজের ছাত্রী ছিল। ভাই ছিল বোনও ছিল একটি। কিন্তু পরিবারের ভার পড়ল তারই উপর। ভাই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াত। মায়ের কাছে চেয়েচিন্তে বাপের পকেট মেরে তার হাত-খরচ চলত। ছোট বোন স্কুলে পড়ে। দেখতে ভাল। পড়াতেও মন্দ নয়। সন্ধ্যা কলেজ ছেড়ে রোজগারের চেষ্টায় লাগল।

সংসার কারও ঠেকে থাকে না। সন্ধ্যাদেরও ঠেকল না। দারিদ্র্য দেখার ভয়ে ভাই পালিয়ে গেল। সে একটা কার-খানায় কাজ করছে বলে শোনা যাচ্ছে। ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মা মারা গেছেন অসুখে। সন্ধ্যা এখন একেবারে একা।

একা কেন, বিয়ে করলেই তো পারে।

বলছি তো, দারিদ্র্য তার ব্যর্থতার কারণ নয়, সে তার রূপের অভাব। যুদ্ধ করে দারিদ্র্যকে সে জয় করেছিল। চাকরি করতে করতেই এক একটা পরীক্ষা সে দিয়েছে— পাশ করেছে। এখন ভাল কাজ করে, পয়সার সচ্ছলতাও তার হয়েছে। কিন্তু হারিয়েছে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

রাত্রি কি তার যৌবনের কথা বলছে?

কুশ্রী মেয়েরও একটা লালিত্য থাকে, সজীব জীবনের সে একটা স্বাভাবিক ঐশ্বর্য। সন্ধ্যা তার সে ঐশ্বর্য হারাল জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। সংসারের জন্য তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। নিজের দিকে তাকাবার অবসর তার ছিল না। লোকে তার বোনকে দায়ী করে, কিন্তু সে করে না। সে যা করেছে, অন্য মেয়ে হলেও তাই করত। সন্ধ্যা যাকে ভালবাসত, তাকেই বিয়ে করেছে তার বোন।

সে কি!

আমি চমকে উঠলুম।

রাত্রির মুখে আবার সেই বিষণ্ণ হাসি দেখলুম। আমার চমকানি সে উপভোগ করল, কোন উত্তর দিল না।

এবারে প্রশ্ন করতে আমার সঙ্কোচ এল না, বললুম: কী করে এমন সম্ভব হল?

সে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। সন্ধ্যার সঙ্গে সে ভদ্রলোক তাদের বাড়ি যেত। সন্ধ্যার জন্যেই যেত। ক্রমে পরিচয় হল তার বোনের সঙ্গে। নেপথ্যে তাদের পরি-চয় যে অন্তরঙ্গ হচ্ছিল, সন্ধ্যা তা জানত না। আপনি তো জানেন, বিদ্যুতে ভরা দুখানা মেঘ যখন কাছাকাছি আসে, তখন স্থানকালপাত্রের বিচার হয় না,

নিঃশব্দে বিদ্যুৎ বিনিময় হয় নির্বিবাদে। ভালবাসাই তো জীবনের বিদ্যুৎ।

কথাটা সত্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সেই বিনিময় কি আগে হয়নি?

বোধহয় না।

তবে?

লালসাকেই সন্ধ্যা ভালবাসা বলে ভুল বুঝেছিল। তার মতো কুশ্রী মেয়েকে কি কেউ সাধ করে ভালবাসে! সন্ধ্যা নিজেই নাকি এ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তার উত্তরে ভদ্রলোক বলত, 'রূপ কি শুধু দেহের? মনেরও একটা রূপ আছে, সেই রূপ পতঙ্গকে ডাকে না, মানুষকে কাছে টানে।' একদিন সন্ধ্যা নাকি বলেছিল, 'চিত্রাঙ্গদার কী হয়েছিল? অর্জুনকে সে কি কাছে টানতে পেরেছিল?' 'পারত, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা সে চেষ্টা করেনি।' আপনিই বলুন, অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করবার পরেই তো সে রূপের জন্য তপস্যা করেছিল। অর্জুনকে সে কি রূপ পাবার পরে পারেনি!

হয়তো তাই, হয়তো অন্য কিছু। কিন্তু আমরা কিছু করতে পারি কি?

রাত্রি তার গভীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে ধরল।

বললুম: চলুন না, একদিন তার সঙ্গে দেখা করে আসি।

না না: রাত্রি আর্তনাদ করে উঠল; কিছুতেই তার সঙ্গে দেখা করবেন না। পুরুষকে সে সইতে পারবে না।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম।

নিজেকে সামলে নিতে রাত্রির কিছু সময় লাগল। তারপর অনুতাপের সুরে বলল: আমাদের কিছু করা উচিত।

উচিত বৈকি।

কিন্তু কী করা যায় বলুন তো?

যা করা যায় তা আমি আগেই বলেছিলুম। কিন্তু রাত্রির তা পছন্দ হয়নি। তাই আমি তাকেই বললুম: আপনিই বলুন। আমি আপনাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করব।

রাত্রি বলল: আমি ভয় পাচ্ছি। সন্ধ্যার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এই ঘটনাকে সে যে গভীরভাবে নিয়েছে, তা তার নিঃসঙ্গতা দেখেই বুঝতে পারি।

হঠাৎ বলল: একটা কাজ করতে পারেন?

বলুন।

চিঠি লিখুন একখানা। মনে করুন, আপনি সেই বিশ্বাসঘাতক ভদ্রলোক। আপনার নিজের কথা সব খুলে লিখুন।

তার প্রস্তাব শুনে আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। বললুম: কী হবে সেই চিঠি দিয়ে?

সন্ধ্যার কাছে পাঠিয়ে দেব। দেখি, সে কী জবাব দেয়!

হাতের লেখা?

আমি যতদূর জানি, তাদের পত্র-বিনিময় হয়নি।

কিন্তু—

কিন্তু নয় জ্যোতির্ময়বাবু, আপনাকে এই উপকারটুকু করতে হবে।

আমি—

আপনি। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

অনুরোধের আবেদনে রাত্রি যেন ভেঙে পড়ল। রাজী না হয়ে আমার আর উপায় রইল না।

উঠে দাঁড়িয়ে রাত্রি বলল ঃ আজ রাতেই আপনি লিখুন, কাল সকালে আমি নিয়ে যাব।

কিন্তু কী লিখব?

রাত্রি যেতে যেতে বলে গেল ঃ যা অনেকদিন আগেই লেখা উচিত ছিল সেই বিশ্বাসঘাতকের।

চিঠি লিখতে বসে আমার ইংরেজী সাহিত্যের কথা মনে পড়ল। শ তিনেক বছর আগে এক ভদ্রলোক এমনই ফরমায়েসী চিঠি লিখতে বসেছিলেন। গ্রামের মেয়েরা তাঁকে চিঠি লিখতে অনুরোধ করত। প্রেমপত্র। এইসব চিঠি লিখে লিখে তিনি মেয়েদের মনের সংবাদ পেতেন। তারপর একদিন যা লিখে ফেললেন, তার নাম হল উপন্যাস।

কিন্তু আমি উপন্যাস লিখতে বসিনি। আমাকে চিঠি লিখতে হবে। রাত্রি আমাকে বিষয়বস্তু বলে দেয়নি। সে কাজ আমাকেই করতে হবে। পুরুষের চিঠি, কাজেই আমাকেই সব গুছিয়ে লিখতে হবে।

প্রথম চিঠিখানা আমি একদিনে লিখতে পারিনি। নিজের কৃতকর্ম কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা যায় না। নূতন করে অনুরাগ প্রদর্শনও গর্হিত হবে। বলবার শুধু একটি কথা, কুরূপা বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। কেন হয়েছে, সেই কথাটিই ভেবে পাচ্ছি না।

রাত্রি তার কথামত সকালবেলাতেই এসেছিল। টেবিলের উপর চিঠির কাগজ ছড়ানো ছিল। সেদিকে চেয়েই সে চমকে উঠল। শুধু হিজিবিজি নয়, কোন কাগজে বিচিত্র ইংরেজী অক্ষরে নিজের দস্তখত পরিবর্তনের চেষ্টা, কোন কাগজে পরিষ্কার বাঙলা অক্ষরে বেশি বেশি কালি ঢেলে 'রাত্রি-সন্ধ্যা-চাঁদ-জ্যোৎস্না-একা-তুমি-' ইত্যাদি। ফুললতাপাতাও আছে, লিপস্টিক-মাখা ঠোঁটের সঙ্গে স্বাভাবিক ঠোঁটেরও তুলনা করা হয়েছে।

কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললুম, আজ আমাকে মাপ করবেন। পরীক্ষার প্রবন্ধে আমি চিরকাল শূন্য পেয়েছি কিনা!

রাত্রি আমার দিকে তাকাল ক্লান্ত চোখে।

বললুম ঃ কাল আমি নিশ্চয়ই লিখে দেব।

রাত্রি কথা বলল না। শুধু 'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সে এল না। পরদিন সকালেও না। শেষপর্যন্ত আমিই তার কাছে গেলুম। চার-পাঁচ ঘন্টার অক্লান্ত চেষ্টায় একটা খসড়া দাঁড় করিয়েছিলুম। কাটাকুটি তার ভিতর অনেক ছিল। ভয়ে ভয়ে বললুম ঃ দেখুন তো, এটা চলবে কিনা। যদি চলে তো পরিষ্কার করে লিখে দেব।

রাত্রি ছোঁ মেরে কাগজখানা আমার হাত থেকে কেড়ে নিল। অত্যন্ত তৎপর ভাবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখল। আমি তার মুখের দিকে চেয়েছিলুম। মনে হচ্ছে সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ছে। বুক ওঠানামা করছে অপরিসীম উত্তেজনায়। আমি তার দৃষ্টিতে খানিকটা প্রসন্নতাও দেখলুম। বোধহয় তার পছন্দ হয়েছে। বললুম ঃ চলবে?

খুব চলবে, সত্যিই আপনি ভাল লিখেছেন।

হাত বাড়িয়ে বললুম ঃ তবে দিন, ভাল করে লিখে দিই।

নিজের কানেই একটা গর্বের সুর ধরা পড়ে গেল।

রাত্রি বলল ঃ না না থাক, তার দরকার নেই। এইটেই আমি পৌঁছে দেব।

সেকি, ওতে যে অনেক কাটাকুটি!

মনের পরিচয় যে ঐ কাটাকুটিতেই আছে।

তা বটে।

সন্ধ্যাবেলায় এই চিঠির জবাব পেলুম। সুন্দর হাতের লেখা, ভাষাটি আরও সুন্দর। জীবনের ব্যর্থতাকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করতে কি শক্তির দরকার, এই চিঠিতে তার খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে। পড়া শেষ করে বললুম, এবারে হুকুম?

রাত্রি দাঁড়িয়েই ছিল। বলল—অবসর মতো এর জবাব লিখবেন।

এর পরে চিঠি লেখা কতকটা সহজ হয়ে এল।

একদিন রাত্রি বলল ঃ আপনি যে এমন সুন্দর চিঠি লিখতে পারবেন, এ আমি আশা করিনি।

খামের মুখটা জল দিয়ে বন্ধ করতে করতে বললুম, এতো আপনিই শেখালেন।

আমি!

রাত্রি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

বললুম ঃ আমার বিদ্যের দৌড় তো আপনি প্রথম দিনেই দেখেছিলেন। আপনিই জোর করে লেখালেন।

তাই বলুন।

রাত্রি খানিকটা আশ্বস্ত হল।

বললুম ঃ পরিচয় থাকলে হয়তো আরও ভাল লিখতে পারতুম।

কখনও না ঃ রাত্রি অস্থির হল ঃ তার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছিল, সে কেন পালিয়ে গেল?

সবাই কি পালায়?

আপনি জানেন না জ্যোতির্ময়বাবু, নারীর কুরূপ একটা অভিশাপ।

হেসে বললুম, দেশের সব মেয়েই তো তাহলে অভিশপ্ত। সুন্দর মেয়ে আর কটা দেখি! রাত্রি আমার মুখের দিকে তাকাল বড় বড় চোখে।

বললুম, গরিবের ঘরে রূপ ফুরিয়ে যায়, রূপসী সাজে বড়লোকের ঘরে। এ রূপের কতটুকু দাম! আপনার সন্ধ্যার সে রূপের সন্ধান পেয়েছি, তার জন্যে তাকে শ্রদ্ধা করি। আমার সঙ্গে একবার পরিচয় করিয়ে দেবেন?

রাত্রিকে বড় অস্থির দেখাল, বড় অসহায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঃ চিঠিটা দিন জ্যোতির্ময়বাবু, আজ আসি।

রাত্রির গলার স্বর গাঢ় হয়েছিল। চিঠিটা হাতে নিয়েই পালিয়ে গেল।

অফিস থেকে ফিরে এসে অন্ধকারে আর বসে থাকি না। মন উদাস হয় না আকাশ-পাতাল ভেবে। বারান্দায় উঠেই রাত্রিকে দেখি, সে ফিরেছে কিনা। রোজই আমার আগে ফেরে। আমার পায়ের শব্দ পেলেই আসে বেরিয়ে। তারপর একসঙ্গে চা খাই, গল্প করি অনেক রাত অবধি।

একসঙ্গে সিনেমায় গিয়েছি, গঙ্গার ধারে বেড়িয়েছি একসঙ্গে। বলেছি ঃ এবারে তোমার সন্ধ্যাকে সরাও।

কেন?

রাত্রি যেন চমকে উঠেছে।

বলেছি : একটা বিবাহিত পুরুষকে নিয়ে আর কেন, এবারে আমাকে লিখুক। বলে হাসি।

রাত্রিও হেসে বলে : তাহলে তুমিও পালাবে।

আমি যে তার বন্ধুর কাছে বাঁধা পড়েছি। পালাবার আমার পথ কই?

রাত্রি গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, সন্ধ্যাও এমন কথা অনেক শুনেছিল। তখন তার রোমান্স হত। তারপর?

তারপর দাও না তাদের ঠিকানা। তিনজনের কথাই শুনে আসি।

শুনে আর লাভ কী হবে! তার চেয়ে ঐখানটায় বসি চল।

তারপর সকৌতুকে প্রশ্ন করেছে : বল তো, কাকে তুমি বেশি ভালবাস, আমাকে, না সন্ধ্যাকে?

হেসে বলেছি, সন্ধ্যাকে।

কেন?

সে মেয়ে আমার কাছে কিছু লুকোয়নি।

নিজেকেই তো সে লুকিয়ে রেখেছে।

সে তো তোমারই কাজ, তুমি তাকে ভয়ে লুকিয়েছ।

ভয় কিসের?

ভয় ফাঁকিতে পড়বার। সন্ধ্যা রাজী হলে যে তাকে আমি বিয়ে করব।

কুৎসিত জেনেও?

হেসে বললুম : তার রূপের কথা আমার জানা হয়ে গেছে, বাইরেটা আর দেখব না।

সত্যি!

রাত্রির চোখে আমি আবেশ দেখলুম। কেমন স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল। গঙ্গার বুক থেকে ঝিরঝির করে বাতাস আসছে। বসন্তের সায়াহ্ন ফুলের মরসুম গেছে ফুরিয়ে। তবু আমি নিঃশ্বাস নিলুম সৌরভের আশায়।

তার পরদিন রাত্রি এল না, তার পরদিনও না। তার বন্ধ দরজার সামনে থেকে আমি বার বার ফিরে এলুম। বাইরে তালা নেই, ভিতর থেকেও কোন উত্তর পেলুম না।

নটবর আমার উদ্বেগ লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার সাহস পায়নি। খেয়েদেয়ে তাকে আমি ছুটি দিয়ে দিলুম।

রাতে ঘুম এল না। সেই এক চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। এই মেয়েটা কে, তা আমাকে জানতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে তার সন্ধ্যাকে। আর আমি তাকে ফাঁকি দিতে দেব না।

এক সময় আমি দরজা খুলে বাইরে এলুম। চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শুধু আলো জ্বলছে রাত্রির ঘরে। সাবধানে আমি সেদিকে এগিয়ে গেলুম। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলুম রাত্রিকে। তার লেখবার টেবিলে কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে, টেবিলে মাথা রেখে হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে।

এই কাগজে আমি সন্ধ্যার উত্তর পাই। তার খোলা কলমটা হাত থেকে খসে পড়ল। স্তম্ভিতের মতো আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তার কথার উত্তর দিতে পারলুম না।

বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাল। তার গালের উপর কয়েক ফোঁটা অশ্রু শুকিয়ে চকচক করছে। কয়েকটা মুহূর্ত পরেই মুখ ঢেকে বলে উঠল : তুমি কেন এখানে এলে?

ইচ্ছা হল, সবলে তার হাত দুটো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিই। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও নিজের হাত ওঠাতে পারলুম না। কোনরকমে জানিয়ে দিলুম,

শুধু "আচ্ছা" বলে বেরিয়ে গেল।

আমার বাসনা হঠাৎ উদ্দাম হয়ে উঠল। আর দেরি নয়, আজই একটা জবাব চাই। আজই আমাদের বোঝাপড়া হোক।

পর্দা সরিয়ে ডাকলুম, রাত্রি!

রাত্রি চমকে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আমি তখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি।

তুমি এখানে কেন?

রাত্রির গলা কাঁপল থরথর করে।

আমার চোখ তখন চারদিকে ধাক্কা খেয়ে বেড়াচ্ছে। এতদিনের 'লেখা' আমার চিঠিগুলো তার সামনে খোলা আছে আর সামনে খোলা নীল কাগজের প্যাড। এখুনি চলে যাচ্ছি।

তারপরেই বেরিয়ে গেলুম মন্ত্র-চালিতের মতো।

রাত্রি এসে দরজা বন্ধ করে দিল। আর বাইরে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম তার কান্নার শব্দ।

পরদিন অফিসে যাবার সময় তার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে গেলুম। বাইরে থেকে কড়া নেড়ে কোন সাড়াই পেলুম না।

ফিরে এসে নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না। দরজার উপরে 'টু লেট' লেবেল ঝুলছে। বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, পুরো মাসের ভাড়া চুকি দিয়ে রাত্রি উঠে গেছে। কোথায় কাউকে বলে যায়নি।

॥ বাংলার মনসা পূজো ॥

চিত্তরঞ্জন দেব

জল আর জল। যে দিকে দু'চোখ যায় শুধু জল। নদী, নালা, খাল বিল, ঝোপ-ঝাড়ের দেশ পূববাংলা। ঋতুতে ঋতুতে তার নব নব রূপ। বর্ষায় তার রূপ বুঝি সর্বাঙ্গ সুন্দর। বিশাল দেশে চারদিকে শুধুই জল। মাঝে মাঝে এক একখানা বাড়ি যেন দিঘির বুকে এক একটি ফুটন্ত পদ্ম। রাতের আঁধারে দূরে দূরে এক একটি বাড়ি থেকে ক্ষীণ আলোকরশ্মিকে মনে হয় সাগরের বুকে বাতি ঘর (Light House)। ভিন গাঁয়ের মাঝি-মাল্লারা এই ক্ষীণ আলোক রেখার উপর নির্ভর করেই তাদের পথ খুঁজে নেয়। কানে যায় গৃহস্থ আঙিনার মনসা-মঙ্গলের সুরঃ—

"তুমি কিনা জান সাচে
উত্তর রাজ্যে চান্দ আছে,
সাধু হয়ে রাজা ভুগে,
এক মনে তোমায় পূজে,
তে' কারণে তার বংশনাশ।
অপার সমুদ্র দুঃখ,
ছয় মাস নিরাহার—
শরীর শুকায় রোগে ভোখে,
তুমি অনাথের গতি,
জীয়াও আমার পতি,
সুখ্যাতি রহুক ভূমণ্ডলে।"

পোড়ামাটির মনসার ঘট
([illegible] বাঁকুড়া)

রাতের আঁধার মিলিয়ে যায়। ভোর হতে না হতেই কর্মব্যস্ত কৃষাণকুল ব্যস্ত হয়ে পড়ে পাট কাটার তাগিদে। নৌকো যায় আউস ধান আনতে। অধিকাংশ মেয়েরাই ব্যস্ত এ সময় পাটের আঁশ ছাড়াতে। অলস মধ্যাহ্নে হঠাৎ তাদের কর্মে ছেদ পড়ে দূরে বেদেনীর কণ্ঠের সুরেলা ডাকে,—'হাপ (সাপ) খেলা দ্যাখবেন নাহি, বড় বড় বাল বাল (ভাল ভাল) হাপের খেলা—খৈয়া গুক্ষুর (গোখরা সাপ), কালনাগিনী, শংখচূড়—বালো বালো হাপের খেলা।'

কারও আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই বেদেনীরা এক বাড়ির ঘাটে এসে নৌকো ভিড়িয়ে সাপের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে উঠোনে এসে বসে। শুধুমাত্র একটু আদেশের অপেক্ষা। ব্যাস্। তারপরই ঝাঁপির ডালা খুলে বের করে মাথায় চক্কর দেওয়া বিশাল এক শংখচূড় সাপ।

সাপ ফণা তুলে হেলতে দুলতে থাকে, আর বেদেনী তার অপূর্ব কণ্ঠে মাটিতে হাত দিয়ে চাপড় মারতে মারতে কখনও বা সাপের মুখের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে থাকেঃ—

"চান্দরাজা তুমার অগো কেমন তর ঘর?
কেমনতর কারিগরে বানাইল বাসর।
তুমার মনে নাই কি রাজা বিষহরির ডর?
(হায় বিষহরির দোয়া!)
সুজন দেইখ্যা কান্দে
ঐ যে সোনার বেহুলা,
কাইন্দা কাইন্দা পদ্মের চক্ষু
হইয়াছে ফুলা ফুলা,
মনসার কানে কে গো দিছে
সোয়া স্যার তুলা,
(হায় বিষহরির দোয়া!)
কান্দে রাজা, কান্দে পরজা,
কান্দে সেনকা রাণী—
আলগোছে বইস্যা পংখী
ফেলায় চৌক্ষের পানী।
কান্দে রাজা চান্দ আর সেনকা জননী—
(হায় বিষহরির দোয়া।)"

আঞ্চলিক প্রবাদ অনুসারে লখীন্দরের মৃত্যু শুনলে তার পুনর্জন্মও শুনতে হয়। তা' না হলে অমঙ্গল হয়। তাই লখাইর মৃত্যু শুনবার পর যখন কুল-লক্ষ্মীরা বায়না ধরে, 'লখাই জীয়াও বাইদ্যানী'—তখন বেদেনীরাও পুর-নারীদের অনুরোধে আবার আর একটি সাপ বের করে তার মুখের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে থাকে, 'খা-খা-খা বক্ষিলারে (কৃপণকে) খা, গাঁইটে (ট্যাঁকে) পয়সা বাইন্ধা যে না দ্যায় তার চক্ষু উপড়াইয়া খা'—। বলতে বলতে একবার চারদিক চেয়ে নিয়ে আবার সুর টেনে টেনে গাইতে থাকেঃ—

মাটির পাত্রের উপর অঙ্কিত মনসার মূর্তি (তালেশ্বর—খুলনা)

"চান্দ রাজার দাপট গেল বাতাসে মিশিয়া
(হায় বিষহরির দোয়া)।
বেউলা-সতী কান্দে শোন
আলু থালু হইয়্যা
(হায় বিষহরির দোয়া)।
কাল-নাগিনী খাইল আজি
সোনার লখাইরে—
(হায় বিষহরির দোয়া)।
সোনার অংগ ভাসাইল সাংগুনীর নীরে—
(হায় বিষহরির দোয়া)।
তাহার দোয়ায় সূয্য ওঠে পূবের আকাশে
(হায় বিষহরির দোয়া)।
পরাণ পাইয়্যা ভেলায় বইস্যা
লখাই বুঝি হাসে
হায় বিষহরির দোয়া।"

দেখতে দেখতে এগিয়ে আসে শ্রাবণ-সংক্রান্তি। এই দিনে পূববাংলার ঘরে

ঘরে দেখা যায় মনসা পুজোর ধুম। কেউ ঘটে, কেউ বা মূর্তিতে। ঘটেই বেশী। এই মনসা ঘট একটু বিচিত্র ধরণের। সমগ্র পূর্ববঙ্গে যে একই রকমের 'মনসা ঘট' বা মূর্তি প্রচলিত তা' নয়। বাখরগঞ্জ অঞ্চলে যে সব মূর্তি বা ঘট দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে দেখা যায় মনসা-দেবীর চারখানি হাত—দেবী হংসেশ্বরী। উপরের দু হাতে দুটি সর্প-শিশু, মাথায় সর্প-মুকুট। ঘটগুলির পেটটি মোটা, তারপর আস্তে আস্তে উপরের দিকে সরু হয়ে উঠে উপরে বেশ ছড়ান। কোন কোন ঘটের মুখটি আবার মুকুটাকৃতি সরা দিয়ে ঢাকা—তাতেও সর্পাঙ্কিত। ঘটের সম্মুখ ভাগের প্রায় সবটাই জুড়ে রয়েছে নথপরিহিতা মনসা দেবীর মুখাবয়ব। দু' পাশে দু'টি কৃষ্ণ বর্ণের বিষধর সর্প। কোন কোন অঞ্চলে ঘট অনেকটা বোতলের মত। তবে এরও নিচুদিকটা সরু, পেটটা ঈষৎ মোটা, উপরটা একটু ছড়ান। এরও গায়ে মনসা দেবীর মুখাবয়ব অঙ্কিত। ফরিদপুরে অঞ্চলে যে সব মনসা-ঘট দেখা যায় তার মধ্যে কতকগুলি আছে যেগুলির গায়ে কোন চিত্র অঙ্কিত নেই। কিন্তু কতকগুলি ঘট আছে একটু অন্য ধরণের। আকারে এগুলি একটু বড়। শ্বেত বরণের। সম্মুখ ভাগে দেবী মনসার মুখাকৃতি, দুপাশে দুটি বিষধর সর্প এর সঙ্গে পৃথকভাবে যুক্ত করা। ময়মনসিংহ ও যশোর জেলায় যে সব ঘট পাওয়া যায় তার ভিতর দেখা যায় অষ্ট-নাগ একত্রে রয়েছে পর পর। মাঝখানের সাপটি একটু বড় ধরণের। ঘটের ঢাকনিটি অনেকটা মুকুটের মত। কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় চারপাশে সাপ দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রের মত—মাঝখানে দেবী মনসা বিরাজিত। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে আবার হাতী-ঘোড়ারূপী মনসা দেবীর লৌকিক মূর্তিও চোখে পড়ে।

মূর্তি বা ঘট পুজো ছাড়াও বাংলায় —বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 'মনসা কাঁটা গাছ' এবং 'ফণী মনসার গাছ' পুজো হতে দেখা যায়। এ গাছের পাতাগুলো অনেকটা ঠিক সাপের ফণার মত। পাতার চারপাশে অসংখ্য বড় বড় কাঁটা। অনেক জায়গাই ওই গাছগুলিকে মনসার (সাপ) আকৃতি মনে করে পুজো করে থাকে।

কোন কোন জায়গায় জীবন্ত সাপও পুজো পেয়ে থাকে। কর্ণাট দেশে আদি-বাসীদের ভিতর উঁই ঢিপির উপর 'মণ্ডমা'র উদ্দেশ্যে পুজো করে। কারও কারও মতে এই 'মণ্ডমা'ই 'মনসা মা'-এ রূপান্তরিত হয়েছেন। এখানে সর্প বা অন্য কোন দেব-দেবীর মূর্তি নেই— এখানে দেবী অদৃশ্য। তবে তিনি যে সর্প দেবী—অনুসন্ধানের ফলে এ খবর পাওয়া গেছে। মহীশূরে "সুদামা" নামে এক অর্ধনারী ও অর্ধসর্পাকৃতি মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকটা নাগকণ্যা-দের কল্পিত মূর্তির অনুরূপ। ময়ূরভঞ্জ স্টেটে 'খিচেংগেশ্বরী' নামে এক সর্প দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁর হাত মাত্র দু'খানি। দু' হাতেই দু'টি সর্প-শিশু, মাথার পিছনেও ছত্রাকারে বিরাট এক সাপ—দেবী ধ্যান-মগ্না। শোনা যায়, এশিয়ার একটা পুরণো জাতের মধ্যে 'এলা' নামে অর্ধ-সর্পনারীর পুজো হ'ত। তাকেও মনসার সঙ্গে তুলনা করা চলে। সিংহলেও সর্পপুজা প্রচলিত। তাদের বহু রকমের মুখোস নৃত্যের মধ্যে সর্প দেবের মুখোস নৃত্যটি অন্যতম।

তবে একথা ঠিক, ভয় থেকেই ভক্তির উৎপত্তি। মানুষ সেই স্মরণাতীতকাল থেকেই যে বিষয়ে বা বস্তুকে ভয় করত সেই সেই বিষয় বা বস্তুটিকে পুজো করতে আরম্ভ করল। এই ভাবেই হিংস্র প্রাণী সর্পের জন্য সর্পদেবী মনসা, বাঘের উৎপাতের জন্য দক্ষিণ রায়, বর্নাবিধ, বসন্ত মহামারীর জন্য শীতলা ঠাকুরাণীর পুজো বা এই রকমের দেব-দেবীই আমাদের সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। এ'রা সবাই পুরাণোক্ত দেব-দেবী না হলেও সমাজের উপর এ'দের প্রভাব বড় কম নয়। তবে এই সব লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে খুব সম্ভবত স্ত্রী-দেবতাদেরই সংখ্যা সর্বাধিক।

বাংলাদেশ সর্পবহুল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ ত' বটেই। কাজেই এখানে সর্প দেবী মনসার প্রতাপটা একটু বেশী মাত্রায়ই থাকবে এ আর আশ্চর্য কী? পূর্ববঙ্গে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পুজোর ধুম পড়লেও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম অঞ্চলে বৈশাখ মাসেও মনসা পুজো হয়ে থাকে। বীরভূমে শ্রাবণ মাসে যে মনসা পুজো হয় তার নাম দিয়েছে 'সাঁওভালী' পুজো। কেউ কেউ একে আখ্যা দিয়েছে ভূত পুজো বলে। এই জেলারই কোন কোন অঞ্চলে আবার ভাদ্র মাসেও মনসা পুজো হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহা-মারীর সময়ও শীতলা-রক্ষাকালীর সঙ্গে মনসা দেবীর পুজো হতে দেখা যায়। বাঁকুড়ায় আবার দশহরার দিন দেখা যায় মনসা পুজো করতে। বাংলার বাইরে দাক্ষিণাত্যে, বিশেষ করে নাগপুরে নাগপঞ্চমীতে মনসা পুজো পূর্ববঙ্গের মতই একটা অবশ্য করণীয় পুজো হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের মেয়েদের আবার ঐদিন নাগ-পঞ্চমীর ব্রতও করতে দেখা যায়।

পণ্ডিতগণের মতে মনসা দেবী আদৌ আর্য সমাজের দেবতা নন— তা' না হলে বেদ পুরাণে অবশ্যই তার উল্লেখ থাকত। তা'ছাড়া আর্য সমাজে নারী দেবতারও কোন স্থান ছিল না। মহেঞ্জদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের ফলে জানা যায়, প্রাক্-বৈদিক যুগে মাতৃকার পুজো বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মনসার রূপ পরিকল্পনার ভিতর অনার্য ধর্মসম্ভূত মাতৃকা পুজো বা শক্তি পুজারই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের যুগে সর্প-দেবতাকে পুরুষ বলেই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্রই সর্পদেবী নারী রূপেই পুজিতা হয়ে থাকেন।

কারও কারও মতে মনসা দেবী হলেন আদ্যাদেবী কেতকার রূপান্তর মাত্র। আদিদেব নিরঞ্জনের কাম-বাসনাম্ভূতা সর্পরাজ্ঞী মনসার সঙ্গে পর্বতবাসিনী কুমারী বিষবিদ্যার ও সিজগাছ পুজোর সংযোগের ফলে পাঁচালী-কাব্যের মনসা সৃষ্টি হয়েছে। মনসার এক নাম 'বিষহরি'। খুব সম্ভবত সংস্কৃত শব্দ 'বিষ ধরিকা' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতক পর্যন্তও কি তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত সর্পদেবী মনসার সন্ধান পাওয়া যায় না। এর পরিবর্তে পূর্ব ভারতীয় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'জাংগুলী' নামক এক দেবীর সঙ্গে বাংলার 'বিষহরি' বা মনসার বেশ সাদৃশ্য আছে। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে একটি কাব্যে মনসা দেবীকে 'জাগুলী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের অনেক পর যে সব ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় তখন থেকেই মনে হয় এই সর্পদেবী হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে আর্য সমাজে প্রবেশের অনুমতি পেলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় শৈব ধর্মের প্রভাববশতঃ মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় যে, মনসাদেবী শিবের কন্যা-রূপে বর্ণিত হয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত উপ-পুরাণগুলিতে দেখা যায় তিনি নাগকন্যা কশ্যপ কর্তৃক সৃষ্ট। পূর্বাচার্য-গণ বলেন, চাঁদ সদাগর ও মনসার বিবাদ মূলতঃ অনার্য দেবী মনসার হিন্দু সমাজে তথা আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সংগ্রামেরই সংকেত মাত্র। কারও কারও মতে এই মনসামঙ্গল কাব্য মূলতঃ শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। মনসার জয় অর্থে শাক্তপন্থীদেরই জয়। পাঁচালীকারগণ ও গীতিকারের দল তাঁদের ক্ষমতা ও সাধ্যশক্তি অনুসারে রচনা করে গেছেন এই দেবী মাহাত্ম্য। এ'দের ভিতর ময়মনসিংহের কানা হরি দত্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যই বোধহয় সর্বাধিক পুরাতন। অবশ্য পরবর্তী গবেষণায় স্থির হয়েছে বিপ্রদাস পিপলাইর মনসামঙ্গল' কাব্য নাকি এর চাইতেও পুরাতন। এ সম্পর্কে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও 'মনসামঙ্গল' কাব্যের সর্বশেষ

মনসা

রচয়িতা যে বরিশালের বিজয় গুপ্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি মনসা দেবী হলেন লৌকিক দেবী—কাজেই লোক-কবিদের ভিতর তার প্রভাব খুবই বেশী থাকা স্বাভাবিক। বাংলার নিরক্ষর চাষা-ভূষা, তাঁতী জোলা থেকে বেদে-বেদেনী, রয়ানী গায়ক সকলেই মনসার গান বেঁধেছে। তাই শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এবং গোটা মাস ধরে এখানে যেমনি শুনতে পাওয়া যায় 'বাইশারী' বা বাইশ কবি মনসামঙ্গলের গান গৃহস্থের আঙিনায় আঙিনায়, তেমনি বেদে-সাপুড়েরাও গায় সেই একই কথা তাদের নিজেদের রচিত গান ও সুরে। মেদিনীপুর, হুগলী, চব্বিশ পরগণার বিষ-বেদেরাও এই সময় বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঝাপান গান গেয়ে বেড়ায়ঃ—

"বেউলো কেঁদোনা, কেঁদোনারে—
কাঁদলে ন'খায় পাবে না।
নোহার আঁচীর, নোহার পাঁচীর
নোহার বাসর ঘর—
বেউলো কেঁদোনা রে।"

শুধু পূর্বে বা পশ্চিম বাংলায়ই নয়, উত্তরবঙ্গেও এই সময় শোনা যায় 'বিষহরি' পালাগান। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে সুদূর মানভূমের পল্লী অঞ্চলেও গৃহস্থেরা সন্ধ্যাবেলা একত্রে বসে সুর করে গাইতে থাকেঃ—

"আমি কেন এলাম লোহার বাসরে—
আসিয়ে হারাইলাম বর লক্ষীন্দরে।
খেদে কহে চিন্তামণি
বালাখণ্ড কপালিনী
দংশিল কাল ভুজঙ্গিনী,
প্রাণ গেল রে।
আমি কেন এলেম লোহার বাসরে।"

লোক-কবিদের ভিতর রয়ানী-গায়কেরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং ভদ্রলোকঘেঁষা। তাই তাদের রচনার ভাষাও অনেকটা পরিমার্জিতঃ—

"দিলাম দিলাম পুত্রবর
নাম রাখিও লক্ষ্মীন্দর
হইবা মাত্র আনিব হরিয়া।
সেনকা বলে রোঝার ঝি,
ওছার বরে কার্য কী—
না দেও বর যাইগো ফিরিয়া।।
দিলাম দিলাম পুত্র বর
নাম রাখিও লক্ষ্মীন্দর
'উঠানী'র দিন আনিব হরিয়া।
সেনকা বলে রোঝার ঝি,
ওছাড় বরে কার্য কী—
না দেও বর যাইগো ফিরিয়া।।
দিলাম দিলাম পুত্র বর,
নাম রাখিও লক্ষ্মীন্দর
বিয়ার রাত্রে আনিব হরিয়া।
তখন ছয় বধু বলে বাণী,
শোন ওগো ঠাকুরাণী—
হইলে লখাই না করাব বিয়া।"

কিন্তু বিধির লেখা খণ্ডান সম্ভব নয়। লক্ষীন্দরকেও বাসরঘরে দংশন করল কালনাগিনীতে। বেউলা বুক ফাটিয়ে কান্না সুরু করল। তার কান্নায় পাষাণ গলে যায়ঃ—

"জাগ ওগো জাগ তোমরা
ওগো কেন নিদ্রা যাও
বিষেতে ঢলিয়া পড়িল গো
তোমরা কেন জাগ না।
বিষেতে ঢলিয়া মরিল চম্পকের রাজা
কেন দেখা দিলে না।

*

হায়রে বলিয়া বেউলার ঝড়ে কান্নার ধ্বনি
ঘরে হতে শোনে সেনকা সাউ কাণী।"

এই রয়ানীর অনুরূপ গান হল পশ্চিমবঙ্গের ভাসান গান। এও মনসা ও চাঁদ বেনের বিবাদের কাহিনী। তবে ভাসান কথার অর্থ হ'ল ভেলা (লক্ষ্মীন্দরের) ভাসান। সেখানেও ঠিক এই একই সুর ধ্বনিত হচ্ছেঃ—

"সোনার নখাই মোর গেল গো ছাড়িয়া
কেমনে রাখিব প্রাণ ধৈরজ ধরিয়া।
জাগ জাগ প্রাণপতি জাগগো এখন
তোমার বিহনে মোর বিফল জীবন।"

পূর্বে উল্লেখ করেছি মনসা দেবী বাংলা তথা ভারতের অধিকাংশ স্থানে অতি সমাদরের দেবতা হলেও আদতে তিনি হলেন অনার্য দেবী। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দুসমাজে তথা আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এর পিছনে মূলতঃ ভয় ভীতি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অলৌকিক কাহিনী যুক্ত হওয়ায় সহজ সরল লোকের মনে তাঁর প্রভাব বিস্তারের পথ খুবই সহজ হয়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কে যতখানি আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, বলতে গেলে তার প্রায় কিছুই হয়নি। গবেষকগণ এ বিষয়ে সজাগ হলে, এ সম্পর্কে হয়ত আরও অনেক নতুন তথ্য পরিবেশন করতে পারবেন।

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৬ই অক্টোবর। সকাল ৬-১৫ মিনিটে গুপ্তকাশী ছেড়ে ৭-১৫ মিনিটে কুণ্ডচটীতে পৌছলাম। ছ'টি ঘোড়ার সব ক'টি সময়মত না আসায় গুণেন, গণেন, অনুজা, দুই ভৃত্য আর ঝি পদব্রজে রওনা হ'ল। ঘোড়ার সহিসরা ঘোড়া ছুটিয়ে মাঝপথে আমাদের ধরে ফেললে। চড়াই-পথে আরামদায়ক হলেও খাড়া উৎরাই-পথে ঘোড়ায় আসা বিপজ্জনক—তাই সবাই পায়ে হেঁটে কুণ্ডচটী বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে পেঁছে গেল। হাফ ডজন ঘোড়ার ভাড়া বখশিস সমেত মিটিয়ে দেওয়া হ'ল। আমরাও বাসে উঠি। নাগেশ্বর পাণ্ডাও এই পর্যন্ত এসে তার যথাযোগ্য বিদায় নিয়ে ফিরে গেল তার বাড়ীতে, গুপ্তকাশী থেকে পাঁচ মাইল দূরে উখীমঠের কাছাকাছি এক গ্রামে।

গুণেন ড্রাইভারের পাশেই তার আসন করে নিলে—আমিও ঠিক তার পশ্চাতে। এদিকে ড্রাইভার কী ভাবে জানতে পেরেছে গুণেন ভাল ডাক্তার। বাস ছেড়ে দিয়েই তার আক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। একটির পর একটি, মোট তিন নম্বর শাদি করেছে, কিন্তু পুত্র-মুখ সন্দর্শনের সৌভাগ্য তার হয়নি। চৌঠা নম্বরে সে যাবে কিনা ডাক্তারের কাছে এই পরামর্শ চায়। এদিকে গ্রামের হাকিম শলা দিয়েছে শাদি না করে দাওয়াই কর। তাই একজন বড় "দাগদরের" দাওয়াই খাবে কিনা, এখনও সাব্যস্ত করতে পারেনি।

এমন একটি জোরালো কেস্—গুণেনের জেরায় তার নাড়ী-নক্ষত্র বেরিয়ে পড়ল। সে অকপটে স্বীকার করে, সব কিছু ব্যারামই তার হয়েছিল। একটার পর একটা ঐ সব নোংরা ফিরিস্তি দিয়ে চলে আর মহোৎসাহে গাড়ী চালিয়ে যায়।

তার উক্তি শুনি—আমার মনও ক্রিয়া করে। ক্লেদাক্ত জীবনের উর্ধ্বে মানুষ যখন ওঠে, তখনই সে পশুত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনই আবার জীবন্ত, জাগ্রত, শাশ্বত চেতনায় ফিরে আসে, তখনই সে পায় মুক্তি। নচেৎ অসম্ভব।

বাস চলতে থাকে আর মন্দাকিনীও আমাদের পাশেই ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটে চলে। এক জায়গায় মন্দাকিনীর ঠিক এক ফুট ওপর দিয়েই একটি ব্রিজ। আমাদের বাস হড়্‌হড়্ করে নীচে নেমে এসেই ব্রিজ পার হয়ে আবার চড়াই-পথে উঠবে। এইটিই হ'ল চন্দ্রাপুরীর সেতু। আমরা চন্দ্রাপুরী হ'য়ে রুদ্রপ্রয়াগে চলেছি।

অঘটন এখানেই ঘটে। চন্দ্রাপুরীতে এসে সারথি চন্দ্রাহত হয়েছিল কিনা জানি না কিন্তু বাসখানা যেন পাগলের মত হুড়মুড় করে নেমে এল আর ব্রিজের ওপর উঠতেই, একটি চাকা ফস্‌কে জলে নেমে গেল। সারথির বারংবার পদস্খলন হয়েছে, রথেরই বা একবার চাকা-স্খলন হবে না কেন?

আমাদের মধ্যে হট্টগোল পড়ে গেল।

আধ ঘণ্টার অধিক বিলম্ব। কাজেই আরোহীরা আপন-আপন স্বাধীন মত ছাড়তে থাকে। আমিও বলি—সবাই তো পুণ্যার্থীর দল, আমাদের রথেরই বা দোষ কী? সেও ঝুঁকে মন্দাকিনীর জল স্পর্শ করে পবিত্র হ'তে চায়।

বাসের পঁচিশ-ছাব্বিশজন আরোহী নেমে পড়ে। সারথি একখানা দা' এগিয়ে দিয়ে, কয়েকখানা মোটা মোটা গাছের ডাল কেটে আনতে তার জাত-ভাই গাড়োয়াল অধিবাসীদের অনুরোধ জানায়। ইতিমধ্যে আরও একখানা বাস আমাদের পশ্চাতে। রাস্তা বন্ধ, তাই থামতে বাধ্য হ'ল। পেছনের ড্রাইভার আর আরোহীরাও আমাদের দুর্দশা দেখে, এগিয়ে আসে। তারাও দেখে, আমাদের বাসখানা কথক-নৃত্যের ভঙ্গীতে একপা' জলে একপা' ডাঙ্গায় কাৎ হয়ে পড়ে আছে—তবে উল্টোয়নি—এই যা রক্ষে!

তারপর দু'দুটো বাসের জোয়ান মরদ মিলে গাছের ডালগুলো দিয়ে

আমাদের বাসটিকে ঠেলে ওপরে দিল উঠিয়ে বটে, কিন্তু ইঞ্জিনের ধক্‌ধকানি আর ধোঁয়ায় আমরাও চোখে ধোঁয়া দেখলাম।

সাবাস্‌ ড্রাইভার! কোরামিন ইনজেকশনের ক্রিয়া তখনই শুরু হয়। দু'একটা নাট্‌-বল্টু টাইট দিতেই বাসের হৃৎপিণ্ড চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তারপরেই স্টার্ট।

গুণু উপদেশ দেয়—দেখ ড্রাইভার, তোমার রোগের পুঁজিপাটা মগজ থেকে বিদায় করে এবার গাড়ীর দিকে খেয়াল রাখো—এইটুকু মেহেরবাণী করো।

ড্রাইভারের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে অবজ্ঞার হাসি। তাদের জাতীয় ভাষায় কয়েক গণ্ডা বাবুজী-মেশানো যে জবাবটা শুনলাম তার বাংলা অনুবাদ এই দাঁড়ায়—

"আমার হাতে স্টীয়ারিং থাকতে কোনো ভয় নেই পিতৃদেব।"

উত্তর দিলাম আমি—তা' তো বটেই, এমন জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ থাকতে আর ভয় কী!

রুদ্রপ্রয়াগে আমরা পৌঁছলাম বেলা ১০-৪৫ মিনিটে। দোকানের নোংরা খাবার দেখেও আমরা সবাই নির্বিকার চিত্তে সেগুলো পেটে রেখে দিলাম। বেলা বারোটায় রওনা। চামোলিতে যখন আসি, তখন বেলা চারটে। এখানেই বন্ধুবর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের ভাই শ্রীমান উমাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর সঙ্গে আছেন সহস্র-কিরণ সুরানা আর আছেন শ্রীমান অমল। উমাপ্রসাদ ইতিপূর্বে দশবার কেদারবদরী করেছেন। এ সব রাস্তায় তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। হিমালয়-পর্যটন এঁর একটি নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিয়ে করেননি তাই সাংসারিক বন্ধনও কিছু নেই—খোলা মন নিয়ে খোলা পাহাড়ে ওঠানামা করেন। হিমালয়ের অনেক তথ্য সংগ্রহ করে বই ও প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি। পিপুলকোটিতে কালী কম্‌লিওয়ালার ধর্মশালায় রওনা হচ্ছিলেন। আমাদের জন্যে দুটি ঘর পিপুলকোটিতে ঠিক করে রাখার কথা তাঁকে বলে দিলাম।

আমাদের পিপুলকোটিতে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। পৌঁছে দেখি শ্রীমান উমাপ্রসাদ আমাদের জন্যে আগেই ঘর দুখানি ঠিক করে রেখেছেন। কালী কম্‌লিবাবার আশ্রম। এঁর প্রকৃত পরিচয়—স্বামী বিশুদ্ধা-নন্দ—অর্থবান ব্যক্তিদের সাহায্যে ইনি এই দেবভূমির স্থানে স্থানে বহু আশ্রম করে রেখেছেন যাত্রী-সাধারণের জন্যে। ইনি কালো কম্বল পরেই থাকতেন—তাই নাম হয়েছে কালী কম্‌লিবাবা। কয়েক মাইল অন্তর প্রায় প্রত্যেক চটীতে সাধু-সজ্জনদের জন্যে কালী কম্‌লী-বাবার সদাব্রত খোলা আছে।

এইখানেই রাত কাটিয়ে পরদিন থেকেই হয় ঘোড়া নয় ডাণ্ডী অথবা পদব্রজে চলতে হবে। কাজেই আগে থেকেই ছ'টা ঘোড়া ঠিক করে রাখা হ'ল। ডাণ্ডীওয়ালারা আমাদের সঙ্গেই বরাবর চলে এসেছে। শুনলাম, যোশী-মঠ পর্যন্ত মোটরের রাস্তা ছিল, কিন্তু দশ-বারো দিন আগে প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তাটি এখানে-সেখানে ভেঙ্গে যাওয়ায় বাস চলবে না।

ডেপুটি ইউনিয়ন মন্ত্রী ডাঃ মনো-মোহন দাসের সঙ্গেও এখানেই দেখা। জিপ্‌কারে সফরে এসেছেন। আমাদের চটীতে এসে অনেক আলাপ-আপ্যায়ন করলেন— সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। তদুত্তরে বলি—সুবিধের নামগন্ধ নেই—অসুবিধের চরম।

পিপুলকোটিতে কুষ্ঠ রোগীর প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। তিন-চারটে রোগীকে বাস-স্ট্যাণ্ডেই ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। মোড়ের মাথায় চা, পুরি, হালুয়া, মিণ্টান্ন প্রভৃতির বেশ বড়-গোছের একটা দোকান। দোকানীও সেই দুষ্টব্যাধিতে আক্রান্ত। সেখান থেকেই যাত্রীরা খাবার কিনে চলেছে। বিক্রেতারও কোনও দ্বিধা নেই—ক্রেতারও কোনও সংকোচ নেই। ভারী নোংরা পরিবেশ। উত্তর খণ্ডের এ সব অঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেউ চলে না—তার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটি বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান থাকলেও, এ বিষয়ে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন বলে মনে হ'ল না। এই পরিবেশ দেখে আমরা কেনাকাটার ধার দিয়েও গেলাম না—সঙ্গে যে চাল-ডাল, নুন-তেল, আটা-ঘি ছিল, তাই দিয়েই নৈশভোজন সমাপ্ত হ'ল। তাও কি বিপদ কম? সামনেই প্রশস্ত কাঠের বারান্দা—ঝোড়ো বাতাসে স্টোভ নিভে যায়। কোনো রকমে সেই অর্ধ-পক্ক আহার্যই ভোজন করা গেল—তারপর শয়ন ও বিশ্রাম।

এই চটীতে বিশ্রামের নামে আছে অশ্রান্ত বিরক্তি। এক জায়গায় দশ মিনিট শুয়ে থাকার ধৈর্য কারো নেই। লাখে লাখে ছারপোকার দল এসে ছেঁকে ধরে। অতিষ্ঠ হয়ে দুই চাকরের মধ্যে গবেষণা শুরু হয়ে যায়। ঘোঁতা লণ্ঠন জ্বালিয়ে বলে—আলো দেখলে ছারপোকা সেদিকে আর আসে না। রতি তাকে ধমকে দেয়—তুই-তো সবই জানিস—আলো নিভিয়ে দে, ওরা কানা হয়ে যাবে, দেখতে পাবে না। আমি এক-একবার দাঁড়িয়ে দুই পণ্ডিতের সেই অভিনব গবেষণা শুনি আর পায়চারি করি। স্মরণে আসে বাল্যকালে দেখা একটা মজার ব্যাপার। যখন আমি আমার দাদামশাই আচার্য রামেন্দ্র-সুন্দরের কাছে ছিলাম, তখন রাস্তা দিয়ে প্রায়ই একটা লোক দড়ির খাটিয়া বয়ে নিয়ে যেত, তার সঙ্গী একজন হাঁক ছাড়তো—"ছারপোকা খাওয়াবে গো?" যিনি হাঁক দিতেন, তিনি জৈন সম্প্রদায়-ভুক্ত—জীব-সেবার জন্যে দু'আনা চার আনা খরচ করে ছারপোকাদের রক্ত খাওয়াতেন। পনেরো মিনিট, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, যে যতক্ষণ ওই ছারপোকা-ভরা খাটিয়ায় শুয়ে রক্ত খাওয়াবে—পয়সাও তত বেশী পাবে। মানুষের ওপর সহিংস আক্রমণ চালিয়ে, অহিংসা ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলেন যিনি—

তাঁর এই নীতিটা আমি আজও পর্যন্ত পরিপাক করে উঠতে পারিনি। পায়চারি করি আর মনে মনে ভাবি আজ যদি সেরূপ পুণ্যকামী কোনও লোক জীবনে প্রেম বিতরণ করার জন্যে এখানে উপস্থিত থাকতেন, তবে বেশ কিছু কামিয়ে নেওয়া যেত।

ঘোতা আলো জ্বালাতেই যে বীভৎস দৃশ্য দেখলাম, তা বহুদিন মনে থাকবে। অসংখ্য ছারপোকার দল সার বেঁধে দেয়াল বেয়ে নেমে আসে—এদিকে মেঝের ওপর বিছানো চাটাই আর শতরঞ্চি ভেদ করে পিল্‌পিল্‌ করে তাদের চলা-ফেরা দেখে মনে হয়, তারা কাউকে কেয়ার করে না। ঊর্ধ্ব, অধঃ, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্রই তাদের অপ্রতিহত গতি। ঘন ঘন ডি-ডি-টি ফ্লিটের বন্যাতেও এরা কাবু হয় না—কিছুতেই ওরা জব্দ হবার পাত্র নয়।

এদিকে এ্যাড্‌ভোকেট গণেন ডাঙ্গায় মাছ তোলার মত ছট্‌ফট্‌ করে একবার এপাশ একবার ওপাশ। গুণেন কেবল গুনে যায়, কার বুকে-পিঠে ক'গণ্ডা চট্‌পট্‌ শব্দ, আর নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে একবার উঠে বসে, একবার শোয়, আবার সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে, যেন গোটা রাত ধরে পালোয়ানের আখড়ায় ডন্‌-বৈঠকের কসরত। মেয়েদের খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখি, ভেতর থেকে অর্গল রুদ্ধ। তবু অসংখ্য ছারপোকা-বাহিনীর অত্যাচারে তারাও যে কাহিল, তারই অস্ফুট কাতর গুঞ্জন শোনা যায়।

একটু এগিয়ে এক একবার উমাপ্রসাদের ঘরের সামনে দাঁড়াই—উঃ আঃ প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয় শব্দ শুনে ফিরে আসি। আর আমার কথা? এতটা পথ কষ্ট করে আসা—তার সঙ্গে বিনিদ্র রজনী যাপন—আহারের চূড়ান্ত অনিয়ম, এই তিনটির সমন্বয়ে মানুষের মেজাজ কোন্‌ পর্দায় বাঁধা থাকে সেটা আর না বললেও চলে।

বাইরে এসেই, সমস্ত বিরক্তি আর রাত্রি জাগরণের সকল গ্লানি যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—গাছপালা পাহাড় পর্বত অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে ঢাকা। ওপরে তারার দল কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কত কী কানাকানি করে—তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল। এই অন্ধকার রূপের অনুভূতি যেন আমার মনের গোপনতম অংশটুকুও উন্মুক্ত করে দিলে, অনাস্বাদিত কী এক অপরূপ আনন্দে মন ভরপুর—অকথিত কোন্‌ বাণী যেন আমার আনাচে-কানাচে ঘুরে-ফিরে নৃত্য করে—বিশ্ব প্রকৃতির রভসলীলায় বুঝি আমিই শুধু একমাত্র সাক্ষী! রজনীর শেষ যামে, সেই নীরন্ধ্র আঁধার যেন একটু ফিকে হয়ে আসে, একফালি চাঁদ একবার উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়—ক্ষণিকের আলোক-স্পন্দন জাগিয়ে চন্দ্রমার এই চমক চাতুরি আমাকেও মুহূর্তকালের জন্যে জাগিয়ে দিলে—জানিয়ে দিলে—আমি আছি—অন্ধকারেই আঁধারের শেষ নয়, তারপরও আছে আলো, আছে অভিনব প্রাণের আলোক-স্পন্দন।

পরদিন—১৭ই অক্টোবর। ভোরে একটু কুয়াশা হয়েছে। কলকাতার ধোঁয়াশা নয়। কাউকেই ডেকে তুলবার প্রয়োজন নেই। সবাই প্রায় জেগেই রাত কাটিয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম নীরেন। ভোরে উঠে দেখা গেল—কাশ্মিরী শালে কাজ করার মত, নীরেনের বুকে, পিঠে, ছারপোকার কামড়ে বিভিন্ন রকমের ছবি আঁকা—এমন কি চরণযুগলের ডবল মোজা ভেদ করেও তাদের উপস্থিতির নমুনা দেখিয়ে দিয়েছে।

সবাই যে যার আপনাপন দুর্ভোগের তালিকা পেশ করতে চায়। থামিয়ে দিলাম—

আগে আমার কথাটাই শোনো,—তারপর যা'র খুশি বলে যাও—আপত্তি নেই। কালী কম্‌লিবাবার আশ্রম—বোধ হয় তাঁর অভিপ্রায় ছিল, এখানেই যাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষাটা হয়ে যাক্‌—ছারপোকার কামড় উপলক্ষ্য মাত্র।

বাক্যটি যে এমন লাগসই হবে, তা ভাবতে পারিনি। পাশের ঘরের জনৈক গভর্ণমেণ্টের চাকুরীয়া ভদ্রলোক এসে আমাদের কাছে বিদায় চাইলেন। তিনি আমাদের আগে-পরেই আসছিলেন। দারাপুত্রকন্যাসহ তীর্থে এসেছেন—কিন্তু রাস্তার হয়রানি আর ছেলেমেয়েদের অসুখের জন্যে তিনি আর এগোতে সাহস পাচ্ছেন না—এখান থেকেই কলকাতায় ফিরে যাবেন। আক্ষেপ করে বললেন।

—বদরী আর মাত্র ৩৯ মাইল পথ, আমাদের ভাগ্যে সেটাও হল না। তীরে এসেও নৌকাডুবি।

তিনি বিদায় নেবার পরই নীরেনকে বলি—

—দেখলে তো যা' বলছিলাম। আত্মশুদ্ধির সোপান কী? চিন্তায় কার্যে হয়তো কিছু অন্যায় আমরা করেছি, তাই বুঝি রক্ত মোক্ষণ করেই তিনি আমাদের অগ্নিশুদ্ধ করে নিলেন। এবার ওপরে ওঠার পথ পরিষ্কার।

এই কথাটি বোধহয় নীরেনের মনঃপূত হয়েছিল। তাই পাপপুণ্যের জমাখরচ করে তার প্রসন্ন মুখ আত্মতৃপ্তিতে সাময়িক সুপ্রসন্ন হয়ে উঠতে না উঠতেই, সে পেটে হাত দিয়ে হঠাৎ মুখবিকৃতি করে—

—কী হ'ল?

ভায়া পেটে হাত বুলিয়ে বলে—হঠাৎ ব্যথা করে উঠলো কেন?

তারপরই তার উর্বর মস্তিষ্কের সুচিন্তিত মন্তব্য শুনলাম—
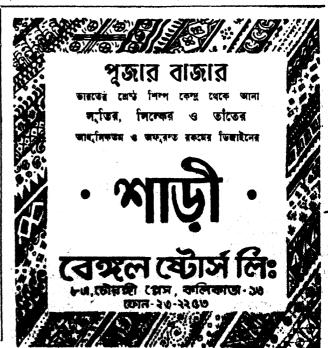
—হয়তো কাল রাত্রে গণ্ডা কয়েক ছারপোকা পিষ্ট হয়ে পেটে গিয়েছে তারই ফল।

সাবাস দিবে বলি—নোবেল প্রাইজ পাবার উপযুক্ত কথাই বটে।

ভোর রাত্রি।

সোজা বেরিয়ে উমাপ্রসাদের খবর নিতে গেলাম। দেখি, তাঁরা যাত্রার উদ্যোগ করছেন। বেডিং বেঁধে তৈরী, হেঁটেই পাড়ি দেবেন। যতবার এসেছেন, ঠিক সময়ে ওঠেন, ঠিক সময়ে বিশ্রাম করেন, ঠিক সময়ে যাত্রা আরম্ভ হয়।

সহস্রকিরণকে বলি—

—এই কুয়াশা ভেদ করে তোমার সহস্রকিরণকে নামিয়ে আমাদের গায়ে পৌঁছে দাও।

ইনি অধুনা পর্বতারোহণ শিক্ষা-কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছেন। মুখ ফিরিয়ে উমাপ্রসাদকে বলি—

—তারপর উমাপ্রসাদ, ছারপোকা অক্ষৌহিনী-বাহিনীর অভ্যর্থনা তোমাদের কেমন হ'ল?

তিনি জবাব দিলেন—

—বিলক্ষণ! তবে আপনাদের নিশ্চয়ই তেমন কিছু হয়নি। ওঘরে অনেকটা কম। গতবার এসে ওখানেই ছিলাম কিনা।

প্রত্যুত্তরে বলি :

—ওজন করে কে দেখেছে, বল? এই যদি কমের নমুনা হয়, তবে বেশী কা'কে বলে জানি না। একটা কথা মনে রাখা উচিত। উত্থান-পতন জগতের নিয়ম। এবার আমাদের ঘরেই ছারপোকা বংশবৃদ্ধির রজত-জয়ন্তী উৎসব।

দোকানের কিছু খাওয়া চলবে না। তাই ডাক্তার গুণেনের নির্দেশে ভোরে উঠেই রতিকান্ত 'পাউডার মিল্কের' দুধ বানিয়ে উমাপ্রসাদ, সহস্রকিরণ, অমল ও আমাদের সবাইকে খাইয়ে দিলে। সহস্রকিরণ, যাঁর নামটাকে ছোট করে শেষীকিরণ বলে ডাকা হয়, তিনি এক কোণে তাঁর এ্যাটাচী থেকে জিনিসগুলো দশবার বের করেন, আবার দশবার গুছিয়ে রাখেন। উমাপ্রসাদ সেই না দেখে মন্তব্য করলেন —ওর স্বভাবই এই, একটা সূঁচ পর্যন্ত কোথায় রেখেছে মনে না থাকায় খুঁজে খুঁজে, প্রত্যেক বারের আগেই অবধা এই রকম করাটা ওর স্বভাবের একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার ফলে আমাদের একটু দেরি হয়। তাড়া দিলেও নির্বিকার—কোনো কথায় কর্ণপাত করেন না—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জিনিসটি উদ্ধার না হয়—ততক্ষণ ছেড়ে দেবার পাত্র ন'ন। তার ফলে আমাকেই ভুগতে হয় বেশী।

শেষীকিরণ তাঁর অমূল্য সম্পত্তি আবিষ্কার করে তবে ছাড়লেন। পিঠে কম্বল ঝুলিয়ে, এ্যাটাচী হাতে বললেন,

—আমি তৈরী, চলুন।

তাঁরা পদব্রজেই যাত্রা করলেন। বলে দিলাম—আমরাও আসছি— কুমারচটীতে আবার দেখা হবে। সেখানেই স্নানাহার সেরে আবার চলো মুসাফির—

ডাণ্ডী ঘোড়া সব হাজির। এবার আর বুড়ী ঝিকে ঘোড়ার সংগে কষে বাঁধতে হয়নি। কেদারের পথে ওঠানামায় সাহস বেড়েছে। নীচে নেমেই কতকগুলি লোকের জটলা শুনলাম।

গতকালই নাকি একটা বাঘকে দুটো কুকুর তাড়া করে মাইল দুই দূরে হত্যা করেছে! কুকুর তো নয়, যেন এক একটা কালো বাঘ; যেমন কেঁদো, তেমনি লোমশ-ভয়াল মূর্তি; চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে-পড়া লোমের ভেতর দিয়ে যেন অগ্নিবর্ষণ করে।

চলতি পথে আমার ডাণ্ডীবাহীদের জিজ্ঞেস করি

—তোমরা তো পাহাড়ের পথে হরদম ওঠানামা কর, কখনো বাঘ চোখে পড়েছে, না ডাক শুনেছ?

উত্তর পেলাম—ইধর নেহি। কেদারনাথজীকো রাস্তামে—শ' রোজকে অন্দর এক রোজ দেখনে মিলতা হ্যায়। কভি কভি রাতমে গর্জনভী শুনা যাতা।

ডাণ্ডী চলতে থাকে। দেখা গেল, ঠিক তেমনি চেহারার একটা জাঁদরেল কালো কুকুর সেই পিপুলকোটি থেকে আমার সঙ্গ নিয়েছে। যেখানেই ডাণ্ডী নামায়, সেও বসে আর আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার যখন রওনা হই, সেও গা-ঝাড়া দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

আগে পেছনে সবাই আসছে, কাউকে দেখে মনে হয়, রুশে এস্কিমো, কেউ যেন এ্যামেরিকান্ কাউ-বয়, কাউকে মনে হয় রেড্ ইণ্ডিয়ান্, কেউ বা অ্যাংলো-খদ্দের যোদ্ধা, আর আমাদের বুড়ী ঝিকে দেখায় যেন; কোনও উগ্রতপস্বী, শুভ্র কেশরাশি দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর জটিল এক ঝুঁটি বেঁধেছে।

মাঝে মাঝে বদরী-তীর্থ প্রত্যাগত যাত্রীদের সংগে দেখা হলেই, তারা চিৎকার করে বলে—জয় বদরী বিশালা কী জয়—

আমরাও সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে চলি।

বদরীনারায়ণের পথে প্রায়ই দেখা যায়, দলে দলে ছাগল ভেড়া, সংগে কয়েকজন লোক, আগে পিছে কুকুর। ছাগল ভেড়ার লোম কেটে, তাদেরই পিঠে চাপিয়ে নিয়ে চলেছে। হায় রে ছাগল ভেড়ার দল!

এক এক স্থানে তারা বিশ্রাম করে, ঐ সব নিরীহ জন্তুগুলিও পাহাড়ের উঁচু নীচু উপত্যকায় এদিক ওদিক চ'রে বেড়ায়। কুকুরের কড়া পাহারা—বিপথে গেলেই তাড়িয়ে নিয়ে আসে। যূথভ্রষ্ট হবার উপায় নেই। আমার সংগী কুকুরটাও তেমনি আমাকে পাহারা দিয়ে চলে। আমি থামলে সেও দাঁড়িয়ে যায়, আবার যখন চলতে থাকি, সেও আগে আগে পাহাড় বেয়ে ওঠে।

মেষরক্ষকের দল যখন বিশ্রাম করে, আমিও ডাণ্ডী থেকে নেমে তাদের কাছে গিয়ে বসি—শুরু হয় নির্বাক যুগের চলচ্চিত্র। আমিও তাদের ভাষা বুঝি না, তারাও হাঁ করে আমার কথা শোনে আর মাথা নাড়ে। আমাদের দু' পক্ষের কারো কথা কারো বোধগম্য হয় না। শেষটায় আমাদের ডাণ্ডীওয়ালাদের জিজ্ঞেস করে জানলাম—ঐ লোমে কম্বল তৈরী হয়। সেই সব লোমের বাণ্ডিল বিক্রী করে তারা আলু কিনে আবার তাদেরই পিঠে চাপিয়ে দেরাদুন মুসৌরী প্রভৃতি স্থানে যে সব গদী আছে, সেখানে বিক্রী করে। যা লাভ হয়, তা'তেই তারা সংসার চালায়।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই অলকনন্দা আমাদের সংগী হয়েছেন। তাঁর নেমে আসার গান শোনা যায়—কিন্তু কী যে বলতে চায় তা' বুঝতে পারি না। মানুষ যখন নীড় রচনা করেনি, যখন সে তার নিজের ভাষা পায়নি, তখন হয়তো অলকনন্দার অশ্রান্ত আলাপন তার অনধিগম্য ছিল না। মানুষ যখন ভাষা পেল, তখনই হয়তো প্রকৃতির ভাষা বুঝবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। দূরে, এক একটা পাহাড় আকাশের গায়ে এক এক মূর্তি ধারণ করে আছে, কোনওটা যেন দাঁত বের-করা বিরাট দৈত্যের মত, কোনওটাকে দেখে মনে হয় যেন বিরাট ঐরাবত, কোনওটা যেন শান্ত সমাহিত পুঞ্জীভূত তপস্যা। কোনও একটি পাহাড় যেন কাফ্রীর মাথা—পাথরের গায়ে স্তরে স্তরে নেমে এসেছে

কাফ্রীর কোঁকড়া চুলের মত ঢেউ খেলানো শ্যামলতা—শুনলাম সেগুলি গাড়োয়াল রাজ্যের চা-বাগান।

বেলাকুচি ছাড়িয়ে খানিকটা পথ গেলেই একটা বিরাট ভাঙ্গন। রাস্তা ভেঙ্গে বাস-চলাচলকে ব্যাহত করেছে। সাধারণ যাত্রীরা পায়ে হেঁটেই যান—ডান্ডী, কান্ডী ঘোড়ায় যাঁরা যেতে চান, তাঁদেরও বিশেষ অসুবিধে নেই। পিপুলকোটি থেকে যোশীমঠ বিশ মাইল পথ সহজগম্য হওয়া সত্ত্বেও এখন দুর্গম হয়ে উঠেছে। অলকনন্দা আমাদের ডাইনে, পাশেই একটি গুহার মধ্যে স্বয়ম্ভু মহাদেব। দেখতে গেলাম। টপ্ টপ্ করে জল ওই শিবলিঙ্গের ওপর অবিরাম পড়ে। কোন্ সুড়ঙ্গপথে এই জল আসে খুঁজে বের করা কঠিন।

সামনেই অলকনন্দার ওপর একটা ব্রিজ পার হয়ে একটু পথ গেলেই দু ফার্লং-এর একটা চড়াই। এইটি মোক্ষম সর্টকাট্। মাত্র দু-ফার্লং উঠেই প্রায় দেড় মাইল পথের সংক্ষেপ করে নেওয়া যায়। খুব বেশী খাড়াই আর অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ, কোথাও এক ফুটের বেশী চওড়া নয়, কোথাও বা তার চেয়েও কম; অত্যন্ত এবড়োখেবড়ো, তার ওপর ভাঙ্গা—ডান্ডীতে বা ঘোড়ায় চেপে যেতে দস্তুর-মত ভয় করে—পদব্রজেও আশঙ্কা কম নয়। একটু অসাবধান হলেই হাজার ফুট নীচে তলিয়ে যেতে হবে। আমার ডান্ডীবাহীদের পদস্খলন হতেই, আমি নীচে নেমে পড়ি। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! মাত্র ইঞ্চি চারেক ডান দিকে কাত্ হলেই, নিজের অস্তিত্বকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

সংকীর্ণ চড়াই পথে মেয়েদের ডান্ডী থেকে নামার কথাই ওঠে না—। নীরেন কিন্তু নির্বিকার। আঁখি দুটি মুদ্রিত, হয়তো ইষ্টমন্ত্র জপ করে চলেছে। গুণেন, গণেন আর অনুজাও ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ে উঠতে থাকে। বুড়ী ঝি একবার নেমেই আবার ঘোড়ায় উঠে বসে। তার পাহাড়ে উঠবার শক্তি নেই। ভৃত্য দুটির 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব—একবার যখন জানোয়ারের পিঠে চেপে বসেছে, কপালে যাই থাক্ না কেন, আর তারা নেমে পাহাড় ভেঙ্গে উঠবে না। একেই অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ, তার ওপর মাঝ-খানে একটা জায়গায় এমন ভাঙ্গা যে পথের আকৃতি হয়েছে ইংরেজি 'V' অক্ষরের মত, অনেকটা ঢালু নেমে আবার কোণ থেকে সোজা ওপরে উঠতে হয়। সেটুকুও আবার জলে ভিজে কর্দমাক্ত আর পিচ্ছিল। দেড় মাইল পথ যাওয়ার সময়কে কমিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই সংকীর্ণ দু-ফার্লং চড়াই পথে এতটা কষ্ট বরণ করা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময় লাগলো তার চাইতে ঢের বেশী। উপরন্তু মৃত্যুভয়কেও অর্জন করা গেল।

বড় রাস্তায় এসে আবার আমরা চলতে থাকি। এবার গোলাপকোটিতে পৌঁছে যাব। আগে-পিছে সবাই চলেছি। পথে এক একটা চটীতে আমরা সবাই একত্র হই। কেদারের পথেও ঠিক এমনি হয়েছে। কারণ, ডান্ডীবাহীরা পরিশ্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝে চা-তামাক খেয়ে নেয়। এবারও সামনেই যে চটীতে ডান্ডী-ওয়ালারা বিশ্রাম নেবে, সেখানে পৌঁছবার আগেই মাঝপথে দেখা গেল, নীরেনের ডান্ডী সামনে পড়ে রয়েছে। রথ আছে, আরোহী নেই। ডান্ডীবাহীরাও মনের সুখে বিড়ি তামাকে সুখটান দিয়ে চলেছে। তাদের জিজ্ঞেস করি—

—বাবু কোথায়?

উত্তর পেলাম—শেঠজীকো পেট্ মে বহুৎ দরদ, ইস্‌লিয়ে ঝোরাকে নাগিচু গিয়া—

ইতিমধ্যে নীরেনের সহাস্য বদনে প্রত্যাবর্তন।

খালি ডান্ডী দেখিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানাই—

'তোমার আসন শূন্য হে বীর, পূর্ণ কর।' তাহ'লে বল, ছারপোকা ভক্ষণ করে তোমার পেট কামড়ায়নি—কারণটা তা'হলে—অন্য কোনো খানে।

পথটা গোলাপকোটির ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। চড়াই ভেঙ্গে গোলাপ-কোটিতে যেতে হয়। সুন্দর গোলাপ ফুল দু'চারটে এদিক ওদিক ফুটে আছে—একগাল হাসি নিয়ে যেন আমাদের অভিবাদন জানাতে চায়। ফুলের মরশুম না হলেও প্রকৃতির কৃপণতা নেই। সেখান থেকে রওনা হয়ে কুমারচটীতে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে বারোটায়।

এখানেও কালী কমলিবাবার চটী। উমাপ্রসাদ পূর্ববৎ আমাদের জন্যে দুটি ঘরের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। আমরা পৌঁছে দেখি সবেমাত্র তাঁর স্নান সমাপ্ত হ'ল। শেষকিরণ পশ্চাতে। ডাক দিয়ে বলি—শেষকিরণ, এই শেষবারের মত এক বালতি গরম জল চাই, তার বন্দোবস্ত কর। অনেকদিন স্নান হয়নি —আজ দেহ সংস্কার না করলে আর চলে না। ইতিমধ্যে আমি দাড়ি সংস্কার করে আসি। গরম জলের চাহিদা অনেকের, কিন্তু আমারই অগ্রাধিকার রইল, বুঝলে?

এখানে আরাম হলেও বিরাম নেই। আহারের পর বিশ্রাম না করেই সবাই আপনাপন বাহনে উঠে পড়ি। আগেই উমাপ্রসাদকে যোশী মঠে দুটি কামরার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছি। শুধু আমাদের জন্যেই নয়, অন্যান্য সঙ্গী যাত্রীরাও তাঁকে যখনই অনুরূপ অনুরোধ জানিয়েছে, তিনি তখনই তার সুব্যবস্থার চেষ্টা করেছেন।

কুকুরটিও আমাদের সঙ্গেই। পথেই হেলাঙ্গ চটী। সেখানেও ডান্ডীবাহীরা পূর্ববৎ বিড়ি তামাক খায়। আমিও হেলান দিয়ে ধূমপান করি। নৈসর্গিক সৌন্দর্য হাতছানি দিয়ে আমাকে তার অপরিসীম মাধুর্যে ডুবিয়ে দেয়। অজস্র চন্দ্রমল্লিকা ফুটে রয়েছে। কী চমৎকার ফুল—মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই মালী-বৌ এক গোছা ফুল তুলে আমাকে দিয়ে গেল—বখশিস পেয়ে তারও মুখ ফুলের মত হেসে ওঠে।

রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে যোশী মঠে পৌঁছুলাম। কালী কমলির ধর্মশালায় উমাপ্রসাদ আমাদের জন্যে দু'খানা ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন।

টেম্পল কমিটির প্রেসিডেন্ট আচার্য ব্রজমোহন মিশ্রও সদস্যবৃন্দের সঙ্গে তখন যোগী-মঠে উপস্থিত। তাঁদের বিশ্রাম-কক্ষে গিয়ে আলাপ জমানো গেল। ডাঃ মনোমোহন দাস দু'এক ঘন্টার জন্যে সেখানে এলেও আমাদের খোঁজ খবর নিতে ভোলেননি।

আচার্য ব্রজমোহনকে দেখলাম যেন বেশ একটু চঞ্চল—তিনিও রেডিও শুনতে চাইলেন। উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রীসভায় ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ আর চন্দ্রভান গুপ্তের মধ্যে প্রতিযোগিতার কী ফলাফল—তাই জানবার জন্যে তিনি যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দু'জনেই কংগ্রেসী—তাই সোজা-সুজি জিজ্ঞেস করি—কার হলে তাঁর সুবিধে হয়। তিনি সম্পূর্ণানন্দ পন্থী, পন্থজীর পন্থাবলম্বী ব্যক্তির প্রতিই তাঁর বিশেষ আস্থা।

এখানেও রাজনীতি? অনতিবিলম্বেই তার প্রমাণ পেলাম। গণেন রেডিও বাজিয়ে শোনায় কিন্তু ও সব খবর কিছু না পেয়ে প্রেসিডেন্ট মিশ্র বেশ চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন।

প্রেসিডেন্টের ঘর থেকে ফিরে এলাম। গুণেন, গণেন সঙ্গে আছে। কালী

কমলিবাবার চটীতে, আমাদের আস্তানায় ফিরেই দেখলাম—একটি ঘরে দুই মহাপ্রভু বেজায় তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। তাঁদের বিষয়বস্তু গান্ধীবাদ।

গুজরাটী টুপী পরিহিত জনৈক ভদ্রলোক গান্ধীবাদের সরস ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন। জনৈক পাঞ্জাবনিবাসী ভদ্রলোক বোধ হয় উগ্র নীতির পক্ষপাতী। আমি এ সব বিষয়ে নেহাত অনাড়ী, রাজ-নীতি বা আজ-নীতির ধার দিয়েও যাই না, হঠাৎ এই ধরনের তর্ক-যুদ্ধের অবতারণা হলে 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' পন্থাই অনুসরণ করি। আমার সেখানে অনধিকার প্রবেশ হলেও, কার কী রকম যুক্তি এবং তর্ক, তাই কান পেতে শুনছিলাম। দেখলাম, এক পক্ষের যুক্তিটা যখন বেশ জোরালো, অপর পক্ষের কণ্ঠের উগ্রতা ততোধিক চড়া।

গুজরাটী ভদ্রলোক হিন্দী ভাষায় সবে আরম্ভ করেছেন,—

—মহাত্মাজী যুগাবতার, গীতা তাঁর আদর্শ, একাধারে তিনি যীশু, কৃষ্ণ ও বুদ্ধের পরিপূর্ণ অবতার—অহিংসার—

আর যায় কোথায়? মদ্রপুংগব যেন ফেটে পড়লেন—

—আরে রেখে দিন—ওই নাম দিয়েই তাঁকে আপনারা অপমান করেছেন। আমাদের আবার অহিংসা কী? গান্ধীজী প্রেম ও অহিংসার জয়গান করেছেন। সত্যের পূজারী তিনি বলেছেন, "for the sake of truth, I can roll down the Himalayas, yet I am miles away from it."

কথার দাপটে গুজরাটী ভদ্রলোক খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন—একটা কিছু ধরে যেই গোড়া পত্তন করতে যাবেন—তাঁরই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মদ্রবীর বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠে বলে যান—

গান্ধীজী বিরাট পুরুষ—এটা একবাক্যে মানি—কিন্তু তিনি কি নির্ভুল? জানেন, শ্রীকৃষ্ণ এই কথাও বলেছেন—যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তার হোতা ছিলেন কে? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, গান্ধীজীর অবলম্বন ঐ গীতার যিনি উদ্গাতা। যাক্ এ সব কথা—আসল ব্যাপার কী জানেন? মানুষ ভুল করেই থাকে—গান্ধীজীও মানুষ—তাঁরও হয়তো ভুল হয়েছে—সেটা মেনে নিয়ে এগিয়ে চলাই মানুষের কাজ। তিনি যীশুও নন, কৃষ্ণ নন, বুদ্ধও নন, তিনি গান্ধীজী, এবং সমসাময়িককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ, এই আমাদের কাছে যথেষ্ট।

এই বলেই আমার প্রতি সগর্ব দৃষ্টিপাত ও প্রশ্ন—কী বলেন?

আমি নিরুত্তর।

তাঁর দ্রু-যুগল তখন দোতলা ছেড়ে তেতলায় উঠেছে—আখড়ার প্রকাণ্ড পরাক্রান্ত এক পালোয়ানকে চিৎ-করে যেন তার বুকের ওপর চেপে বসেছেন।

এমন সময় বেয়ারা একখানা চিঠি এনে গান্ধীপন্থীর হাতে দিলে। খামে 'ইকনমি স্লিপ' আঁটা।

সেটা চোখে পড়তেই মদ্রপুংগব আর একবার জ্বলে উঠলেন—

—এই দেখুন না, 'ইকনমি স্লিপ'-এর মানে হচ্ছে কী না ব্যয়-সঙ্কোচ! যেখানে কোটি কোটি টাকা বরবাদ হচ্ছে—সেখানে বাইরে একটা লেফাফা-দুরুস্তর ভান দেখিয়ে কী হবে?

তিনি আর দাঁড়ালেন না—লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সেদিনের দিনপঞ্জী এখানেই শেষ!

আঠারোই অক্টোবর। সকাল ৭-১৫ মিনিটে যোশী মঠ ছেড়ে রওনা হ'লাম। একটু যেতেই শ্রীশ্রীশংকরাচার্যের মন্দির। সেখানেও তিনি তপস্যা করেছিলেন। শুনলাম, রোজ সেখানে দেড়মণ ভোগ হয়। ফেরবার পথে যোশী মঠে ওপরের গদী আর অন্যান্য দর্শনীয় সব কিছু দেখব—এই ঠিক করে তখনকার মত আমরা বেরিয়ে পড়ি।

এ্যাডভোকেট গণেনের সাজসজ্জা পারিপাট্যের দিকে অখণ্ড মনোযোগ—সহিসের হাতে তার ট্রানজিস্টার রেডিও—দেখে মনে হয়, কোনও খানদানী ঘরের নবাব; ঠান্ডী পোলাও, বাইগনকে কোপ্তা আর সরসোঁকে আরক অর্থাৎ পান্তাভাতে বেগুন পোড়া আর সরষের তেল ছিটিয়ে খাওয়া কোনও মাসিক পঞ্চমুদ্রা-ভাতা-প্রাপ্ত নবাবী মসনদের দুঃস্বপ্ন নয়। গণেনের ঘোড়ার সহিসটির বয়স বারো-তের, নেহাত বাচ্চা—নাম ঠান্ডা—ভারী সুন্দর গান গায়—মাঝে মাঝে সেও সুন্দর গান ছাড়ে—আমাদেরও তালে তালে মাথা দুলতে থাকে।

পথেই বিষ্ণুপ্রয়াগ—এই হ'ল পঞ্চম ও অন্তিম প্রয়াগ। কেদার-বদরীর পথে পঞ্চপ্রয়াগ অতিক্রম করতে হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চশুদ্ধি—পঞ্চপ্রয়াগের তীর্থসলিলে সম্পন্ন হলেই পুরুষোত্তমের চরণে পৌঁছুবার যোগ্যতা আসে। দেব-প্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ ছাড়িয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে সেই পঞ্চ-শুদ্ধির আয়োজন সমাপ্ত হ'ল। বাসে নন্দপ্রয়াগের পাশ দিয়ে আসার সময় আমার মনে এল অভূতপূর্ব একটা আলোড়ন। এখানেই নন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম স্থল। আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের সর্বশেষ আশ্রম ও সমাধি। জিজ্ঞেস করতেই বাস-ড্রাইভার দেখিয়ে দিলে। আমার কৌলিক দীক্ষাগুরু না হলেও, আমার প্রকৃত দীক্ষাগুরু, আমার জীবনকে যিনি দিয়েছেন অনেক, যাঁর অনেক কৃপা পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, সেই স্বর্গীয় স্বামী অদ্বৈতানন্দের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। সঙ্কল্প করি, বদরীনাথ থেকে ফেরবার পথে নন্দপ্রয়াগে নামতেই হবে।

পান্ডুকেশ্বর পৌঁছুলাম বেলা ১১-১৫ মিনিটে। সেখানেও উমাপ্রসাদ আমাদের অগ্রবর্তী। চটীতে দুপুরে যথারীতি স্নান ও আহারাদি সমাপন এবং বেলা চারটের আবার 'স্ট্রাইক দি টেন্ট্', ভেবেছিলাম, এখান থেকেই সোজা বদরীনাথ চলে যা'ব। চটীতে চটীতে থামা আর লট বহর নামানো-ওঠানো—এর ক্লান্তি আর সহ্য হয় না। কিন্তু ডান্ডীওয়ালারা জানালে, হনুমান চটী থেকে বদরীনাথ অত্যন্ত খাড়াই পথ—তারা একসংগে আজই অতটা উঠতে পারবে না। অগত্যা হনুমান চটীতেই রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত করা হ'ল।

কিছুটা দূরে থেকেই দুপাশে দুটি পর্বত দেখা যায়। ডাইনে নর ও বামদিকে নারায়ণ পর্বত—দুটিতে মিলে বিষ্ণুপ্রয়াগেই গিরিসংকটের সৃষ্টি হয়েছে। নর ও নারায়ণের পৌরাণিক ইতিহাস শুনলাম। তাঁরা ছিলেন দুই ঋষি, ধর্মরাজ ও মাতামূর্তির সন্তান। ভগবানের অংশ নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। যেমন যুগে যুগে তিনি অবতীর্ণ হ'ন। নরনারায়ণ দুই নাম বটে, কিন্তু তাঁরা একই দেবতার দুই অংশ—যেমন দ্বাপরে এসেছিলেন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে। নর ও নারায়ণ দুজনেই তপস্যার জন্যে হিমালয়ে আসেন।

জননী মাতামূর্তির মন সায় দেয় না—তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তখন নর ও নারায়ণ শপথ করেন, তাঁরা মাঝে মাঝে মাতাকে খবর দেবেন। কিন্তু তাঁদের খবর না পেয়ে, পিতামাতা তাঁদের খুঁজতে বেরোলেন। নর ও নারায়ণ দুই পাহাড়ের রূপ ধরে এখানেই থেকে যান—তখন তাঁদের খুঁজে বের করা কঠিন। মায়ের আকুলতা দেখে নারায়ণ রূপ ধারণ করে মাকে দর্শন দেন। মাতামূর্তিও বলেন—তিনিও তপস্যা করবেন। ওদিকে পিতা ধর্মরাজও বসুধারায় তপস্যা করতে চলে গেলেন, এই হল পৌরাণিক কাহিনী। মাতামূর্তির মন্দিরে উৎসব ও মেলা হয়। বছরে একদিন বদরীনাথ ও উদ্ধবের ভোগমূর্তি এই মন্দিরে এনে পুজো হয়ে থাকে।

অলকনন্দার এপাশে বদ্রীনাথ—তার ওপাশে নারায়ণ পর্বত—সবার পেছনে তুষারাচ্ছন্ন চৌখাম্বা—২৩৪২০ ফুট উঁচু। সার্ভে ম্যাপে বদ্রীনাথ পাহাড়কে চৌখাম্বা বলে। তার চারটে শৃংগ। সর্বোচ্চ হ'ল চৌখাম্বা। দেখে মনে হয়, চতুর্মূর্তি মহাযোগী। পাশাপাশি স্থির বসে আছেন—শুভ্র জটাজূট সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। সুনিপুণ তুলিকায় আঁকা কোন্ অদৃশ্য মহাকবির বিচিত্র স্বপ্ন।

(ক্রমশঃ)

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তারপর?

তারপর আশেপাশের সমস্ত বাড়ীর জানলা খুলে পড়ে সমস্ত জানলায় উৎসুক মুখের ছবি ফুটে ওঠে।

অনুপম কুটিরে গান!

এর চাইতে বিস্ময় আর কি আছে!

মিষ্টি মেয়েলি গলা, সে গলা যেন গানের পর গানে ঢেলে দিতে চাইছে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি আর আকুলতা!

রাত্রির বাতাস মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

পাড়ায় তো এবাড়ীর সংগে ও-বাড়ীর সে-বাড়ীর সংগে, আর-এক বাড়ীর আলাপের বন্ধন-সূত্র দৃঢ়।

সকালবেলাই লালবাড়ীর মেয়ে হলদেবাড়ীর মেয়েকে, গোলাপীবাড়ীর মেয়ে সাদাবাড়ীর ছেলেকে ছুটে এসে বলে, 'কাল রাত্তিরে গান শুনেছ?'

'শুনেছি বৈকি। ব্যাপার কি বলতো?'

'বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কেউ এসেছে মনে হচ্ছে।'

'সন্ধান নিতে হবে।'

কেন সন্ধান নিতে হবে, সন্ধান নিয়ে কার কি ইষ্ট সিদ্ধি, তা কেউ ভাবে না।

সন্ধানের আশায় সুযোগ খোঁজে ওরা।

সুবলের বাঁধা নিয়ম ঘুচেছে।

ওকে যখন-তখন দোকানে যেতে হয় আজকাল —রসগোল্লা আনতে, ডালমুট আনতে, ঝালমুড়ি আনতে।

লালবাড়ীর মেয়ে ধরলো একদিন ওকে।

'এই শোন।'

'আজ্ঞে।'

'তুমিই তো অনুপম কুটিরে কাজ কর?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের বাড়ীতে কে এসেছে বল তো?'

সুবল গম্ভীরভাবে বলে, 'মায়ের ভাইঝি, আর তার বাপ।'

'মায়ের ভাইঝি আর তার বাপ!'—এমন উচ্চাংগের বাংলা লালবাড়ীর মেয়ে কখনো শোনেনি। হেসে উঠে বলে, 'মায়ের ভাই আর ভাইঝি এসেছেন তাই বল।'

'তা' আর বলি কি করে বলুন? শুনতে পাই তো মুখুজ্যে।'

'মুখুজ্যে? মানে? ও ও'রা মিত্তির, তাই না?'

'হ্যাঁ কায়েত!'

'তা' হলে বোধহয় বন্ধু-টন্ধু কি বল?'

সুবল আত্মস্থভাবে বলে, 'তাই হবে। আর কি কি জানতে চান বলুন?'

লালবাড়ীর মেয়ে লাল হয়ে উঠে বলে, 'জানতে চাইবার আবার কি আছে? গান শুনতে পাই, তাই জিগ্যেস করছি। আচ্ছা ঠিক আছে।'

রেগে ঠরঠরিয়ে বাড়ী ঢুকে যায় সে। তবে খুব হতাশ হয়ে নয়। কিছুটা রহস্যের আঁচ পেয়ে গেছে। অনুপম কুটিরের গিন্নীর ভাইঝি আর তা'র বাপ এসেছে, যে বাপ কায়েত নয় বামুন।

হলদেবাড়ীতে খবরটা বলতে ছোটে সে।

গোলাপীবাড়ীর আবার সহসা খুব সুবিধে জুটে গেছে। চারবাড়ী কাজ করা ঝি সন্ধ্যা সম্প্রতি তাদের বাড়ী কাজে লেগেছে। অতএব ওবাড়ীর রহস্য ভেদের

আশায় উঠোনের ধারেই বসে পড়ে গোলাপীবাড়ীর মেয়ে।

'তুমি সামনের ওই বাড়ীতে কাজ কর না?'

'হ্যাঁ, এই তো দু'বছর কাজ করছি।'

'ওমা, তাহলে তো ওদের সবই জানো।' ওবাড়ীতে একটি মেয়ে বড় সুন্দর গান গায়, নতুন এসেছে ও, তাই না?'

'হ্যাঁ গো, এই তো কদিন। ওরা বাপ-বেটিতে আসা অবধি তবু তো বাড়ীটা মানুষের বাড়ী বলে মনে হচ্ছে, নইলে মাগো, যেন বোবায়-পাওয়া বাড়ী! কেউ কারুর সঙ্গে একটা কথা কইত না, গিন্নী কখনো ডেকে বলত না, 'সন্ধ্যা, এইটা কর।'

এখন তো তবু ডাকে।

এই সেদিন বলল, 'সন্ধ্যা, দোতলার দালানটা একটু মুছে দিয়ে যাবে, জল পড়ে গেছে। চাকর বাড়ী নেই।' আগে হলে দিদিমণি, সারাদিন হয়তো ওই জল গড়াতো, যেকালে মুছতো, মুছতো। এখন তো তা চলবে না। মানুষজন রয়েছে। তায় আবার বুড়ো নাকি একটু পাগল-পাগল।'

পাগল-পাগল!

গোলাপীবাড়ীর মেয়ে উৎসাহে গোলাপী হয়ে উঠে বলে, 'ওমা সে কি? ভয় করে না তোমাদের?'

'আহা সে কি আর কামড়ানো পাগল? টের পাবার কিছু নেই, চাকরটা বলে তাই শুনি।'

'কে হয় ওরা গিন্নীর?'

'কি জানি দিদিমণি, চাকরটা তো বলে 'কেউ হয় না। বন্ধু-মন্ধু হবে। গিন্নীকে তো নাম করে করে ডাকে।'

গিন্নীকে নাম করে ডাকে কেউ হয় না! বোবায়-পাওয়া বাড়ী ওদের আসায় কথা কয়ে উঠেছে। এতগুলো তথ্য জেনে ফেলে, শাদাবাড়ীতে ছোটে সে।

'এই শুনেছো, বুড়ো নাকি পাগল। আর ওদের নাকি কেউ হয়না। অথচ গিন্নীকে নাকি নাম ধরে ধরে ডাকে।'

সাদাবাড়ী ঠোঁট উল্টে বলে, 'ফোঃ! তবে তো সবই জেনেছ। গায়িকা যে অনুপম কুটিরের ছোট ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে—সে খবর রাখো?'

'তার মানে?'

'এর আবার মানে কি? জগতের আদিমতম স্বাভাবিক ঘটনা। মরুভূমিতে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি নেমেছে, মরুভূমি মুহূর্তে শুষে নিচ্ছে।'

'কত বড় মেয়ে?

'ঠিক্ তত বড়, যাকে—মরুভূমিতে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা যায়।'

'কেমন দেখতে?'

'তোমার চেয়ে অন্ততঃ কুড়িগুণ ভাল।'

'ও তাই বুঝি? তা-হলে নাকে দড়ি শুধু একা অনুপম কুটিরের ছোট ছেলে-কেই পরায়নি?'

'তা' ছাড়া কাছে-পিঠে—আর নাক কই?'

'অভাব কি? সামনেই তো রয়েছে।'

'হায় ঈশ্বর! এ নাকের ব্যবস্থা যে কবেই হয়ে গেছে। তবে দেখে একটু ঈর্ষা জাগল বটে।'

'তা' জাগবে বৈকি। এখন বোধহয় শুধু কুড়িগুণের পথের দিকেই তাকিয়ে থাকবে?'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'তোমরা বড় আদেখলে!'

'তোমরাও কম নয়।'

'ভাবছি মেয়েটার সঙ্গে ভাব করলে কেমন হয়?'

'কী, আমাকে ভাব করতে বলছ?'

'এই ইস! খুব সুবিধে হয় তাহলে কেমন? ওসব চলবে না। ধর আমি যাবো। গিয়ে বলবো, 'কী চমৎকার গান গা'ন আপনি, বাড়ী বয়ে এসে না বলে পারলাম না।' সেই সূত্রে জমিয়ে নেব।'

'কার সঙ্গে? এতদিন যে তিনটি জমাট বরফের পাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে তাকিয়ে থাকতে, তাদের সঙ্গে? কিন্তু আর আশা নেই, মনে হচ্ছে। গিয়ে দেখবে হয়তো উষাকরস্পর্শে সব বরফই গলতে শুরু করেছে।

'অসভ্যতা কোর না। অবিশ্যি হতেও পারে। তোমরা তো ওই রকমই হ্যাংলা'।

'তোমরাও কম নয়। কাদের মেয়ে কাদের ছেলেকে নাকে-দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে তাতেই হিংসেয় প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।'

'হিংসে!'

'না তো কি? ভালবাসায় উথলে বাড়ী বয়ে গিয়ে একজন মেয়ে আর-এক মেয়েকে প্রশস্তি জানিয়ে আসছে, এতো আর স্বয়ং ভগবান বললেও বিশ্বাস করা যায় না? হিংসের জ্বালায় দেখে আসবার মতলবে ওই প্রশস্তিটা ছুতো করতে পারে।'

'পৃথিবীর সব রঙ তোমরাই মুছে ফেললে।'

'সাধ্য কি? সেই রঙ-এর গোলা আবার কুড়িয়ে নিয়ে তাই এন্তার মুখে গালে নখে ঠোঁটে লেপছ তোমরা।'

'চিরকালই লেপেছে। চিরকালই মেয়েরা প্রকৃতির রং আর সম্পদ আহরণ করে সেজেছে। কবি ব্যঙ্গ করে বলেননি, পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গেই গেয়ে

উঠেছেন, 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!'

'এই সেরেছে,—সিরিয়স হয়ে উঠছ যে! তুমি সিরিয়স হয়ে উঠলে, বড় ভয়ানক দেখায়।'

'রেগে যাচ্ছি কিন্তু।'

'সেটা ভাল।'

'সত্যি যাই না একদিন?'

'এখনও তো আমার মতাপেক্ষী হবার কারণ ঘটেনি। তোমার মাকে জিগ্যেস করে যেও।'

'বাঃ একটু সামনের বাড়ীতে বেড়াতে যাব, তার আবার মাকে জিগ্যেস, এ ও তা!'

'তা' বটে। এই যে আমার প্রেমে পড়েছ, মাকে কি আর—'

'এই খবরদার! নিজেকে অত প্রাধান্য দিও না বলছি।'

'এই সামান্য কাল্পনিক সুখটুকুও কেড়ে নিতে চাও? বেশ!'

যাদের নিয়ে এত আলোচনা, তারা তাকিয়েও দেখে না। এতদিন নিজেদের নিয়মে নিমগ্ন ছিল তারা, এখন অনিয়মে নিমগ্ন।

ভোরবেলা ছোট্ট ঘরটি থেকে বেরিয়ে স্নানে যাবার আগেই নীচে নামেন সুচিন্তা গোয়ালার সততা তদারক করতে। পাশের বস্তির একটা গোয়ালাকে ঠিক করা হয়েছে গরু নিয়ে সামনে দুধ দুয়ে যাবে সে, সুশোভনের দরকার।

নিজে দাঁড়িয়ে দুধটা দুইয়ে রান্না-ঘরে তুলে দিয়ে তবে শান্তি পান সুচিন্তা। আশ্চর্য, এই একটা রুচিহীন কাজ করতে হচ্ছে বলে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে না সুচিন্তার মুখে, বরং তীক্ষ্ন লক্ষ্যের রেখা ফুটে ওঠে, মুখের প্রত্যেকটি খাঁজে। ওরা গোয়ালারা বড় ধূর্ত হয়, খোলা চোখকেও ফাঁকি দেয়।

রান্নাঘরেও এসে দাঁড়াতে হয় সুচিন্তাকে। বলতে হয়, 'রান্নাটা আজ একটু সকাল সকাল চাই সুবল, দিদিমণিরা বেরোবে।' বলতে হয় 'রান্নায় মশলা-টশলা একটু কম দিতে বলি সুবল, ভুলে যাও কেন? বেশী তেল-মশলা খেতে ও'র ডাক্তারের মানা।'

পাগলের খামখেয়ালে হয়তো ভোর-বেলাই গানের ঝরনা বয়। নিরুপম ঘুম ভেঙে উঠে স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে থাকে, নীলাঞ্জন ঘরের মধ্যে অস্থির পদচারণা করে বেড়ায়, আর ইন্দ্রনীল সরাসরি ঝরনার ধারে গিয়ে বসে।

কেটলীর চা ঠান্ডা হয়ে যায়।

খবরের কাগজের পাট খোলা হয় না।

এ এক আশ্চর্য মায়াবিনী মেয়ে!

কখনো গুরুতর আলোচনায় গম্ভীর সিরিয়াস, কখনো অহেতুক তর্কের মুখরতায় উদ্দাম, কখনো হাল্কা হাসিতে উচ্ছল। চিত্ত বিমুখ রাখা কঠিন।

তবু সে কঠিনের সাধনা নীলাঞ্জন করে।

গান শুনে ঘরে পায়চারি করে, কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে না 'বাঃ বেশ তো?'

নীতাই কাছে এসে বলে, 'কি, মেজদা, মুখে যে একেবারে বাক্যি নেই? আমার গানের ছটায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন বুঝি?'

নীলাঞ্জন চোখ তুলে তাকায় শুধু।

নীতা বলে, 'কথা বলুন কথা বলুন, বকতে হয় বকুন, দু'খা বসিয়ে

দিতে হয় দিন, নির্বাক ভর্ৎসনা করবেন না। দেখে বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।'

'ভর্ৎসনা কিসের? ভালই তো।'

'তাহলে 'বাঃ বেশ' এসব বলবেন তো?'

'সব সময় কি বলেই বোঝাতে হয়?'

'তবে নাচার।'

বলে হাত উল্টে হতাশের ভঙ্গী করে পালায় নীতা। আবার হয়তো এক সময় আসে, 'বাবাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে মেজদা, আজ তো রবিবার, নিয়ে চলুন না আমাকে।'

নীলাঞ্জন ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন ইন্দ্র? ও আর রাজী হচ্ছে না বুঝি?'

'রাজী হচ্ছে না? হুঃ। ওতো সব সময় একপায়ে খাড়া, কিন্তু আমিই ওকে নিয়ে যেতে চাই না। বাবাকে বোঝাতে হয় আমাদের গাড়ীতে আপনারা যাচ্ছেন নিজেদের দরকারে। রোজ রোজ একজন-কেই দেখলে সন্দেহ হবে।'

'রোজ রোজ যানই বা কোথায়?'

'মনঃসমীক্ষকের বাড়ী। ডাক্তার পালিত আছেন না?'

'শুনেছিলাম না লুম্বিনীতে দেখাতে এনেছেন!'

নীলাঞ্জনের দৃষ্টি-তীব্র রুক্ষ।

নীতা নির্বিকার।

'এনেছিলাম তাই, ডাক্তার পালিত বলছেন, থাক আরও কিছুদিন। জমি তৈরি করতে হবে। কিছুতেই যেন টের পান না উনি, ওঁকে মেন্টাল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্য কোন গল্প বানিয়ে—'

'আপনার বাবাকে দেখলে মনে হয় না উনি কোন অসুখে ভুগছেন। মনে হয় ওঁর প্রকৃতিটাই খাপছাড়া কাণ্ড-জ্ঞানহীন।'

'তা' তো নয়। কাণ্ডজ্ঞানহীনতাটাই অসুখ।'

নীলাঞ্জন আরও রুক্ষস্বরে বলে, 'সেটাও সবক্ষেত্রে নয়। কই উনি খেয়ে হাত ধুতে তো ভোলেন না? আর হাত ধুয়ে লবঙ্গ খেতে? ঘুমের আগে পোশাক বদলাতে তো ভোলেন না? চান করে এসে চুল আঁচড়াতে? শুধু

"সব সময় কি বলেই বোঝাতে হয়?"

সামাজিক নিয়ম-কানুন, ব্যবহারিক শোভন-অশোভনতার ব্যাপারেই কাণ্ড-জ্ঞানহীনতা দেখা যায়।'

'ডাক্তার বলেন এরকম রোগীদের তাই হয়।'

'মানসিক রোগের চিকিৎসকরা হালে পানি না পেলেই অমন অনেক কথা বলে।'

'কিন্তু সুস্থ মানুষদেরই কি সব সময় কাণ্ডজ্ঞান থাকে? থাকে শোভন-অশোভনতার দায়? এই তো আপনি, এই যে কথাগুলো বলছেন এটা কি শোভন? আমরা আপনাদের অতিথি, অসুবিধেয় পড়ে এসেছি। আর এই রকম কটূবাক্যে বিদ্ধ করছেন আমাকে?'

'আপনাকে আমি কিছুই বলিনি।' বলে গুম হয়ে যায় নীলাঞ্জন।

নীতার সঙ্গে ব্যঙ্গের দাহে জ্বলতে থাকে মনে মনে। অথচ দাহের আকর্ষণও দুর্বার।

কিন্তু দাহের আকর্ষণ দুর্বার কি শুধু নীলাঞ্জনেরই? এই দুর্বারতায় কি বাড়ীর প্রায় সকলেই ভুগছে না?

এই দাহটাও অনুপম কুটিরের এক মস্ত অনিয়ম।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

॥ সার্থবাহ ॥

॥ স্পেনের কবিতা ॥

দক্ষিণ স্পেনের পাহাড়ঘেরা ঐতিহাসিক ভূখণ্ড কর্দোবার রূপ দুই যুগের দুই হিস্পানী কবির চোখে যে ভাবে প্রতিভাত তা'র মধ্যে কবিতার প্রগতি যেন নিশ্চিতরূপে সূচিত হচ্ছে :

হে প্রাকার সমুন্নত, মিনার নিচয়
অভিষিক্ত মর্যাদায়, শৌর্যে ও বৈভবে।

—সপ্তদশ শতকের হিস্পানী কবি লুইস দে গংগোরা তাঁর 'আ কর্দোবা' (কর্দোবার প্রতি) কবিতাটির শুরু করেন এইভাবে। 'কানথিয়ন দে হিনেতে' (অশ্বারোহীর গান) কবিতায় লোরকার উদ্দিষ্ট-ও ঐ কর্দোবা, কিন্তু তা হ'ল :

করদোবা
সুদূর ও একা;

আর, লোরকার কর্দোবাযাত্রী অশ্বারোহী শ্রান্ত, স্বচ্ছভাবে সে মেনে নিয়েছে তা'র অভিযানের ব্যর্থতা :

কালো টাট্টু, মস্ত চাঁদ;
জলপাই বোঝাই আমার থলে।
যদিও রাস্তা জানা আমার,
কভু পৌঁছব না করদোবায়।

বিষয়বস্তু এক, চোখ আলাদা। ভাষণে আকাশপাতাল প্রভেদ। সতেজ, উদ্যমশীল গংগোরা; নিবিড়, অবসন্ন লোরকা।

লুইস দে গংগোরা থেকে ফেদেরিকো গার্থিয়া লোরকা তিনশ' বছরের ইতিহাস। তবু আধুনিক হিস্পানী কবিতার প্রসঙ্গে গংগোরাকে স্মরণ-করা অযথা নয়। কারণ যে 'পরিশীলিত শৈলী'র (এস্তিলো কুলতো) সাধনা গংগোরাকে অলংকার-প্রবণ করেছিল—এবং যা পরবর্তীকালে ফরাসী সমালোচনায় দুষ্ট 'গংগরিজম' ব'লে সাব্যস্ত হয়েছিল, তা'র নানাবিধ অনুকরণ স্পেনের কাব্যচর্চা নিয়ন্ত্রিত করেছিল বহুকাল যাবৎ। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও গংগরিজমের ছোপ হিস্পানী কবিতায় যেন লেগেই থাকত। এমনকি বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পর্যন্ত নিন্দিত গংগোরার স্বপক্ষে স্পেনের আধুনিক কবিদের কেউ কেউ দাঁড়িয়েছিলেন।

এক হিসাবে স্পেনীয় কবিদের বাচন সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন গংগোরা। তাঁর বিশিষ্ট শৈলী কবিতায় আলংকারিক কৌশলের সংগে সংগে ভাবগত জটিলতার পরিবেশন করতেও শিখিয়েছিল। আর, বাচনে কুশলী হওয়া শব্দদক্ষ হওয়াকে প্রাথমিক প্রয়োজন ব'লে মেনে নেয়। তাই স্পেনে আধুনিক কবিতার উদ্ভব প্রথমতঃ শব্দদক্ষতাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে। এ ছাড়া, শব্দের প্রতি স্পেনীয় কবিদের দরদ স্বাভাবিক। তাঁর কারণ হিস্পানী ভাষা। হিস্পানী শব্দগুলির উচ্চারণে এমন গীতিসুলভ সাবলীলতা, গঠনে স্বরের ও ব্যঞ্জনবর্ণের এমন সুষম বিন্যাস যে স্পেনের কবিদের পক্ষে শব্দের ইন্দ্রজালে হারিয়ে-যাওয়ার অবকাশ আছে। তাই দেখা যায় যে, স্পেনে তথাকথিত আধুনিকতা বা 'মোদেরনিজমো'র প্রবর্তক, কবি রুবেন দারিয়ো শব্দদক্ষ হওয়ার জন্যই যেন কবিতা লিখতে বসেছিলেন।

রুবেন দারিয়ো অবশ্য গংগোরাকে, —বা স্পেনের অন্য কোনও কবিকে,— নজির হিসাবে খাড়া করতে সম্মত ছিলেন না। কারণ, তিনি যে-প্রভাব সাদরে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, তা ছিল ফরাসী পার্নাসিয় গোষ্ঠীর। স্পেনের ভাষা তাঁর মাতৃভাষা হলেও, দারিয়োর জন্মস্থান মধ্য-আমেরিকার নিকারাগুয়া, এবং খাঁটি স্পেনীয় ঐতিহ্যে তাঁর আস্থা-ও ছিল কম। এরেদিয়া প্রমুখ ফরাসী পার্নাসিয় কবিরা (প্রসঙ্গতঃ, এরেদিয়া ছিলেন আদতে হিস্পানী, তাঁর জন্মভূমি কিউবা ; তিনি হিস্পানী ভাষাতে-ও কবিতা লিখেছিলেন।), যাঁদের মুখ্য বক্তব্য ছিল 'আর্টের জন্য আর্ট', দারিয়োকে মুগ্ধ করেন। উক্ত কবিবৃন্দের আদর্শ ও রুচি বহন ক'রে দারিয়ো মাদ্রিদে আসেন হিস্পানী কাব্যের মোড় ফেরাতে। হিস্পানী কাব্যে ঢাক পিটিয়ে আধুনিকতা আনলেন দারিয়ো। এবং যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যই ক্ষমতাবান কবি, আদর্শের ধারায় তাঁর কবিতা কাব্য হ'ল না। বরং পার্নাসিয় কবিধর্মে তাঁর প্রতিচ্ছবি ফুটেল নিখুঁতে, প্রশংসনীয়। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে রুবেন দারিয়োর দুটি কাব্যগ্রন্থ : 'কান্ত আ লা আর্জেন্তিনা ই ওত্রোস পোয়েমাস' (আর্জেন্তিনা প্রশস্তি ও অন্যান্য কবিতা) ও 'কান্ত এরর‍্যান্তে' (ভ্রাম্যমাণ গান) আঙ্গিক ও শব্দদক্ষতার কারণে হিস্পানী কাব্যের পাঠকদের তাক লাগিয়েছিল। শব্দের যাদুকর দারিয়ো কেবল ধ্বনিগত মাধুর্যে কী বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করতে পারেন পাঠকের মনে তা' বোঝা সম্ভব একমাত্র হিস্পানীতে দারিয়োর কবিতা পাঠ করলেই।—

লেহানাস বানদাদাস দে
পাহারোস মানচান
এন ফন্দো ব্রুম্রিদো দে
পালিদো গ্রিস
('সিনফোনিয়া এন গ্রিস মাইওর')

*

(সুদূর পাখীর ঝাঁক
কলংকিত ক'রে দেয়
বিবর্ণ শাদায় মাজা দিকচক্রবাল)

যথাযথ উচ্চারণে উপরোক্ত হিস্পানী পংক্তি দু'টি যে আশ্চর্য অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলে তা'র পাশে তাদের অর্থগৌরবও বুঝি তুচ্ছ!

আধুনিক স্পেনীয় কবিদের যদি মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, তাহলে তা'র একটি দারিয়ো-প্রভাবান্বিত। অপরটি, নবীনতর ও বিশৃংখল, নির্দেশিত হয় লোরকা ও তাঁর পরবর্তীদের দ্বারা। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আবার কয়েকজন কবি আছেন যাঁদের জন্মভূমি স্পেন নয়। যেমন, প্রথমোক্ত শ্রেণীতে স্বয়ং রুবেন দারিয়ো নিকারাগুয়ার লোক; খেজায় বালিয়েহো পেরুর; হুলিয়ো রাইস্সিগ উরুগুয়ের। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীতে অস্পেনীয় বেশ ক'জন কবিই খ্যাতনামা : চিলির কবি পাবলো নেরুদা এবং মেক্সিকোর কবি ওকতাবিয়ো পাথ হিস্পানী কবিতার দুই দিকপাল। এ দুজন ছাড়া আছেন মেক্সিকোর এফ্রাইন উয়ের্তা ও আলি চুমাথেরো, আর্জেন্টিনার মহিলা-কবি সিলবিনা ওকাম্পো ও অন্যান্যেরা। (এই সকল অস্পেনীয়-দের ভৌগোলিক বিশিষ্টতার বোঝবার জন্য 'হিস্পানী' না-বলে 'হিস্পানো-মার্কিনী' বলা হয়ে থাকে, কিন্তু

বর্তমান প্রবন্ধে 'হিস্পানী' আখ্যাটি নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে।)

প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীর তিনজন প্রধান কবি—অবশ্য ইস্পানিক প্রতিনিধিত্ব করেন: আন্তোনিও মাচাদো, হোর্জে গুইয়েন ও হুয়ান রামোন হিমেনেথ। মাচাদোর কবিতায় চমকপ্রদ অভিনবত্ব নেই; মেজাজ রুক্ষ বা ঝাঁঝালো না, অশান্ত নয়; পরিবেশ দেশগত; উপজীব্য সাধারণ এবং রোমান্টিকতা প্রকট। দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বহু ভাষাবিদ্ মাচাদো তাঁর বৈদগ্ধ্য জাহির করার চেষ্টা কমই করেছেন তাঁর কবিতাতে। বরং তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, বক্তব্যে ও বাচনে তিনি কদাচই তির্যক। প্রধানত বর্ণনাধর্মী তাঁর কাব্য, আর তাতে ধরা পড়ে মাচাদোর বিচিত্র পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। মাদ্রিদের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রাচীন নগরী সোরিয়া সম্পর্কে মাচাদো:

মৃত শহর
ভদ্রমহোদয়দের, সৈনিকদের
আর শিকারীদের,
শতখানেক বনেদী-গন্ধ-লাগা
পরিবারের নামাঙ্কিত
ঢাল-আটকানো ফটকগুলির,
অনাহারী ডালকুত্তাদের,
চিমসে, প্রখর ডালকুত্তাদের,
যারা পিলপিল করে
নোংরা গলিঘুঁজির দৌলতে,
আর মাঝরাতে হুংকার দেয়
যখন কাকেরা ডেকে ওঠে! *

গুইয়েন ভাববাদী; তাঁর বাচনে ও ভাবনায় এযুগের দুজন ফরাসী কবি, ভালেরি ও ক্লোদেলের প্রভাব টের পাওয়া যায়। তাঁর 'দুরন্ত মৃত্যু' ('মুয়েতে আ লো লেহস') কবিতায় তিনি মৃত্যুর অন্বয় করেন ভালেরি-সোজন, অনাড়ম্বর প্রতীক-ব্যবহারে: 'শাদা দেয়াল আমায় মানাবে তার নিয়ম, তার ব্যতিক্রম নয়'। অল্প কটি শব্দে অপূর্ব আলেখ্য নির্মাণ করেন গুইয়েন:

রাস্তা আঁকে
উত্তরোল পপলারে পপলারে
বৃষ্টির মুখচোখ।

নোবেল পুরস্কার লাভের পর ইদানীং হিমেনেথ অবশ্যই অধিকতর আলোচিত হয়েছেন। কিন্তু হিস্পানী কবিতার পাঠকদের কাছে বহু পূর্ব থেকেই সমাদৃত হিমেনেথ। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব গদ্য-কবিতার এই জটিল যুগে আন্তরিকভাবে গীতিধর্মের চর্চায় তাঁর কাব্যকে নিয়োজিত রাখা এবং তা-সত্ত্বেও আধুনিক কবিতার ভাবগত পরিবেশ থেকে দূরে সরে না-যাওয়া। গংগোরা ও দারিয়োর যোগ্য উত্তরাধিকারী, হিমেনেথের কবিতায় ভাবের আশ্চর্য সমাবেশ। 'আবছায়া গোধূলি যা সত্যদের দেয় মিথ্যা ক'রে', কিংবা, 'দুর্নিরীক্ষ্য যেমন সেই মৃদুহাসি যা'র লোপ হ'ল হাসিতে'—এরকম চমকপ্রদ ভাবনা হিমেনেথের কাব্যে ছড়ানো।

রুবেন দারিয়ো মারফত যদি স্পেনের কবিদের য়ুরোপীয় কাব্যাদর্শের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে থাকে, তবে গারথিয়া লোরকা ও রাফায়েল আলবের্তি সেই পরিচিতির ক্ষেত্র প্রসারিত ও উন্নীত করেন বিস্ময়করভাবে। লোরকা ও আলবের্তির সঙ্গে আরও কয়েকজন কবি হিস্পানী কাব্যের ব্যাপ্তি ও গুরুত্বের এই সাধনাতে তাঁদের অবদান যোগ করেন। এ'দের মধ্যে উল্লেখ্য—রিকার্দো মলিনারি, বিথেন্তে আলেগ্সান্দ্রে, পেদ্রো সালিনাস, মিগোয়েল এরনানদেথ, পাবলো নেরুদা ও ওকতাবিয়ো পাথ।

উক্ত গোষ্ঠীর কবিবর্গের মধ্যে লোরকা নিঃসংশয়ে অগ্রগণ্য। লোরকা হিস্পানী কবিতায় এক সর্বতোগ্রাহ্য নূতন আবেগের পথনির্দেশ। বাচন, আঙ্গিক ও বিষয়ের মিলিত অভিনবত্বে তাঁর কবিতার তুল্য-মূল্য আর কোনও সমকালীন য়ুরোপীয় কবির কবিতা মনে-করা কঠিন। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে লোরকার লিপ্তি তাঁকে হয়ত নিছক কাব্যমোদীদের কাছে অপ্রেয় করতে পা'রত, কিন্তু কেবল নিঃসন্দেহ কবিত্বের শক্তিতেই লোরকা তাঁদের কাছে বরেণ্য। (প্রসংগতঃ, লোরকার কবিতা সম্বন্ধে একটি শ্রেষ্ঠ আলোচনা এসেছে মার্কিণ প্রবন্ধকার কনরাড একেন-এর কলম থেকে।)

একদিকে মৌলিক স্পেনীয় ঐতিহ্যে আন্দালুসিয়ার ছন্দ, গান ও গংগোরা-দারিয়ো নির্দেশিত কাব্যকৌশলের সফল প্রয়োগ, এবং অন্যদিকে স্যাম্বলিজম (প্রতীকবাদ) থেকে সুররিয়ালিজম পর্যন্ত কাব্যিক প্রক্রিয়তার যথাযোগ্য উপলব্ধি, লোরকার আশ্চর্য কবিতাকে গঠিত করে। রূপকথা, লোক-গাথা ও ইতিহাস—লোরকার ছন্দ, উপমা ও অনুভবের পথ বেয়ে অপরূপ কবিতায় উত্থিত! এর ওপর আছে তাঁর নাটকীয়ত্বের নিশ্চিত বোধ। আর, সর্বকিছুর পর, আছে তাঁর মানবিকতার গুরুত্ব, সহানুভূতি, জীবন-দেখার চোখ, বেদনা-বোধের ধার। বুলফাইটে নিহত বন্ধুর উদ্দেশ্যে রচিত লোরকার 'লিয়ান্তো পর ইগ্নাথিয়ো মেহিয়াস'-কাব্যে কবিতা আর ব্যথা যেন শব্দের যাদুতে অভিন্নসত্তা!—

ওরে, দেখতে চাই না আমি:
চাঁদকে ব'ল, সে আসুক্,
বালির ওপর ইগ্নাথিয়োর রক্ত
ওরে, দেখতে চাই না আমি!

রাফায়েল আলবের্তি বুদ্ধিজীবীর কাব্যে বিশ্বাসী, যদিও গৃহযুদ্ধের সময়ে লোরকার ঢঙে অনেক 'রোমান্সে' বা গাথা রচনা করেছিলেন তিনি। ছাত্র-জীবনে ফ্রান্সে ও জার্মানীতে থাকার সুযোগ হয়েছিল তাঁর এবং হয়ত সেই কারণেই আধুনিক য়ুরোপীয় কবিতার আদল তাঁর এতো জানা। চিত্রকল্পের বাহাদুরী ও সেই সঙ্গে শ্লেষের ব্যবহার তাঁর কবিতায় সহজেই ধরা পড়ে। মৃত দেবদূতদের উদ্দিষ্ট ক'রে আলবের্তি বলেন:

লুকোও, লুকোও ওদের তোমরা:
বিস্মৃত পাইপগুলির অনিদ্রার ভিতর,
আবর্জনার মৌনে ব্যাহত নালার
ভিতর......
বইএর কোনও শব্দ ঢেকে-দেওয়া
মোমের ফোঁটার তলায়...
(লোস আঞ্জেলোস মুয়ের্তোস)

আলেগ্সান্দ্রে, মলিনারি ও সালিনাস: এ'দের স্বকীয়তা যেমন সুনির্ধারিত, তেমনি এ'দের কাব্যের প্রকৃতি যে অনেকখানি ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও ভাববাদী, একথা বলা অসংগত হবে না। মিগোয়েল এরনানদেথ কাব্যচর্চা শুরু করেন

---

* 'Campose de Soria': The Oxford Book of Spanish Verse, Second Edtion, 1940, pp. 374-376. উক্ত কবিতাটির কোনও ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান প্রবন্ধকারের জানা নেই। মাচাদোর ও আলোচিত অন্যান্য হিস্পানী কবিদের কিছু ইংরেজী গদ্য-অনুবাদ পাওয়া যাবে জে, এম, কোহেন সম্পাদিত The Penguin Book of Spanish Verse.

মাচাদো ও হিমেনেথের কবিতা প'ড়ে; পরে প্রাচীন গংগোরার কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। এরনানদেথের কবিতা, এক কথায়, প্রাণবন্ত। সে কবিতা আলবের্তি বা লোরকার সাহিত্যিক সুষমা না-পেলেও, উজ্জ্বল, অকৃপণ। পাবলো নেরুদা তাঁর জন্মভূমি চিলি ও তা'র মানুষকে তাঁর কাব্যের প্রাথমিক উপজীব্য করেছেন; কিন্তু মহৎ কবিতা যে-অর্থে দেশকালপাত্রের সীমানা অতিক্রম করে, নেরুদার জীবন্ময় ও বহুধাসমৃদ্ধ কবিতা সে-অর্থে আন্তর্জাতিক। ওকতাবিয়ো পাথ আধুনিক হিস্পানী কবিতাকে নূতনতর পরিণতির দিকে নিয়েছেন ঃ তাঁর কবিতায় বিশ শতকের অতিকথিত নৈরাশ্য ও অবসাদ, কিংবা, স্পেনীয় 'গাথা'র রোমাঞ্চ যেন ঠাঁই পায় না, পরিবর্তে জাগরূক এক শান্ত বিক্ষোভ আর মানবিক আর্তি। দার্শনিক ভণিতা করে নয়, সহজ মানবিক উদ্বেগে পাথ জানতে চা'ন—

> প্রেম—সে কি তবে
> দ্বিধাবিভক্ত আতঙ্ক
> আলিঙ্গনে যে দু'টি শরীর
> তোমার নিঃসাড় ছায়ায় তা'রা বন্দী?

আধুনিক হিস্পানী কবিতার প্রতিশ্রুতি অজস্র। মাচাদো, লোরকা, আলবের্তি ও পাথে পেঁৗছে সে প্রতিশ্রুতি নিঃস্ব হয়নি। আরো অনেক কবিত্বের সাক্ষ্যে গরিয়সী হয়েছে স্পেনের ভাষা ও সাহিত্য। অধুনাতন-কালে হিস্পানী কবিতা যে সকল প্রথম শ্রেণীর কবির রচনায় পুষ্ট হয়েছে তাঁদের মধ্যে কার্লোস বোসোনিয়ো, বিতেন্থে গাওস ও ক্লাউদিয়ো রোদ্রিগেথ সমধিক প্রসিদ্ধ। গাওসের 'প্রোফেথিয়া দে রেকোয়েরদো' (স্মৃতির অন্বয়) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হিস্পানী কাব্যে ক্রিয়াশীল নূতনতর এক অভিনিবেশের সন্ধান দেবে ঃ মনন ও মরমের পরিচ্ছন্ন যোজনায় গাওস যে-কবিতার সৃষ্টি করেছেন তা একাধারে রাইনর মারিয়া রিলকে ও লাতিন মরমী সান হুয়ান দে লা ক্রুথকে স্মরণ করায় ঃ

> যদি কখনও বা আমাদের ওপর চড়াও
> হয় ঈশ্বরের প্রামাণ্য অস্তিত্ব কোনও
> 　　　মেঘ কিংবা গোলাপফুলের,
> কিংবা কোনও নিস্তল, দিব্য দৃষ্টি
> 　　　ধরে থাকা দুনয়নের
> মাধ্যমে।—দুর্বার জ্ঞানে আকস্মিক মন্দ
> 　　　ধাক্কা-ও
> লাগে ঈশ্বরের সঙ্গে সুনিশ্চিত,
> 　　　কখনও নদীর
> নিষ্কলুষ বোধে, তা'র কলস্বন
> 　　　তরঙ্গের ভীড়ে...
> যদি কখনও বা—আলোকে, জোয়ালে
> 　　　জলে,—থাকেন ঈশ্বর
> এতো অন্ধভাবে। যদি এ জগৎ
> 　　　মিথ্যা কথা বলে।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

অষ্টম আসর

॥ কথার মানে—পর্বপক্ষ ॥

[পনেরটি শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেক শব্দের পাশে চারটি করে অর্থ দেওয়া আছে। তার মধ্যে একটি শুদ্ধ। আপনার যেটি শুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে সেটি দাগ দিয়ে কিংবা কাগজে লিখে রাখুন। উত্তর অন্যত্র দেওয়া আছে। সবগুলি শেষ না করে উত্তর দেখবেন না। বারটি প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল হলে খুব ভালই। আট থেকে দশ পর্যন্ত শুদ্ধ হলেও মন্দ নয়।]

১। **সীমন্ত**
(ক) দুইটি দেশের মধ্যবর্তী অমীমাংসিত স্থান।
(খ) ভাগ্যবান্।
(গ) কেশবীথি।
(ঘ) অসীম।

২। **শ্রীফল**
(ক) দাড়িম্ব।
(খ) বেল।
(গ) শুভ পরিণাম।
(ঘ) মন্দ পরিণাম।

৩। **শ্বাপদ**
(ক) বিপৎসংকুল।
(খ) হিংস্রজন্তু।
(গ) গভীর অরণ্য।
(ঘ) রাজপদ।

৪। **লক্ষণা**
(ক) লক্ষ্মণের স্ত্রী ঊর্মিলা।
(খ) শব্দের শক্তিবিশেষ।
(গ) অভিজ্ঞান।
(ঘ) সুলক্ষণ।

৫। **রেয়াত**
(ক) রেষারেষি।
(খ) রোখ।
(গ) অনুগ্রহ।
(ঘ) লাল রং।

৬। **মুরজ**
(ক) নারায়ণ।
(খ) পিচকারি।
(গ) মৃদঙ্গ।
(ঘ) মূর্ছাগত।

৭। **ভবদীয়**
(ক) পার্থিব।
(খ) ভবিষ্যদ্‌বংশীয়।
(গ) আপনার।
(ঘ) সমুদ্র।

৮। **বীরবৌলি**
(ক) বীরশ্রেষ্ঠ।
(খ) কুণ্ডল।
(গ) বরবধূ।
(ঘ) মহাদেব।

৯। **প্রত্যুদ্গমন**
(ক) চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে এক বিষয়ে মনোনিবেশ।
(খ) বাধা পেয়েও অগ্রসর হওয়া।
(গ) অভ্যর্থনার জন্যে যাওয়া।
(ঘ) অভিবাদনের উত্তরে অভিবাদন।

১০। **দেউটি**
(ক) গৃহের প্রবেশদ্বার।
(খ) প্রদীপ।
(গ) দেবালয়।
(ঘ) দেবতার পরিচারিকা।

১১। **ধোঁকার টাটি**
(ক) ডালবাটার তৈরি তরকারি।
(খ) ভুলের মাসুল।
(গ) দরমার বেড়া।
(ঘ) মোটা সুতোর বড় থলে।

১২। **শীকর**
(ক) জলবিন্দু।
(খ) শীতল।
(গ) চন্দ্রকিরণ।
(ঘ) হাতীর শুঁড়।

১৩। **শিঞ্জিনী**
(ক) স্বর্ণালংকার।
(খ) ধনুর্গুণ।
(গ) ভ্রমরের গুঞ্জন।
(ঘ) চোখের কাজল।

১৪। **বিবিক্ত**
(ক) স্বতন্ত্র।
(খ) অব্যক্ত।
(গ) বিবদমান।
(ঘ) অবিবেকী।

১৫। **পাষণ্ড**
(ক) বিধর্মী।
(খ) পিশাচ।
(গ) মূর্খ।
(ঘ) পার্শ্বে স্থিত।

অয়স্কান্ত

॥ প্রাগৈতিহাসিক কাল ও প্রত্নবিদ্যা ॥

জীবজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ কেন? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে 'মানুষ হাতিয়ার তৈরি করতে পারে। মানুষকে বলা হয় 'হাতিয়ার নির্মাণের' ক্ষমতা-বিশিষ্ট জীব। এমনিতে মানুষের শরীরের দিকে তাকিয়ে বড়াই করার মতো কিছু নেই। একটা হাতির গায়ের জোর দশ-বিশটা মানুষের গায়ের জোরের সমান। মানুষ ঘোড়ার মতো ছুটতে পারে না, গিরগিটির মতো গায়ের রঙ পাল্টাতে পারে না, কচ্ছপের মতো শক্ত খোলার মধ্যে গা-ঢাকা দিতে পারে না। পাখির মতো ডানা নেই মানুষের, শকুনির মতো ধারালো চোখ নেই, বাঘের মতো থাবা নেই। তবুও মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠ, তার কারণ মানুষ হাতিয়ার বানিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। বিচিত্র সাজসজ্জা থাকা সত্ত্বেও পশু-পাখিরা একান্তভাবে পরিবেশের ওপরে নির্ভরশীল। কিন্তু মানুষ তার হাতিয়ারের সাহায্যে পরিবেশকে খুশীমতো পাল্টে নিতে পারে।

মানুষের গায়ে ঘন লোম নেই বটে কিন্তু সে অনায়াসে ঘন লোমের পোশাক বানিয়ে নিতে পারে। জন্তু-জানোয়ারের মতো সে গর্তে আশ্রয় নেয় না, তার বদলে মজবুত ঘর-বাড়ি বানায়। মানুষের থাবা বা বিষ না থাকুক, মারাত্মক অস্ত্র আছে। পাখির মতো ডানা না থাকুক, দূরবীন হাতে আছে।

এই হাতিয়ারের জোরেই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠ।

আর তাই মানুষ সব সময়েই চেষ্টা করে কি করে তার হাতিয়ারকে আরো উন্নত করে তোলা যায়। এই কারণেই এক যুগের মানুষের সঙ্গে অন্য যুগের মানুষের শারীরগত কোনো তফাত না থাকলেও হাতিয়ারগত তফাত খুবই বেশি। এক যুগের মানুষ অন্য যুগের মানুষের চেয়ে এগিয়ে আছে না পিছিয়ে আছে তাও এই হাতিয়ারের রকমফের দেখেই বোঝা যেতে পারে। এই কারণেই প্রত্নবিদরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক কালের হাতিয়ার সন্ধান করে ফেরেন। আর বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ারের উৎকর্ষগত প্রভেদ বিচার করে সমগ্র প্রাগৈতিহাসিক কালের মানব-বিকাশের ধারাটিকে আবিষ্কার করেছেন।

হাতিয়ার বলতে আমরা কি বুঝব? যা কিছু মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে তাই হাতিয়ার। এক টুকরো পাথরও হাতিয়ার হতে পারে। আর সত্যি সত্যিই মানুষ প্রায় ছ-লক্ষ বছর ধরে পাথরের টুকরোকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এখনকার জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকতে পারে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পক্ষে এক টুকরো পাথরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারাটাই প্রায় একটা বৈপ্লবিক আবিষ্কার। এবং এই হাতিয়ার তৈরি করার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞানের জন্ম।

ভূ-বিজ্ঞানীরা যেমন শিলালিপি থেকে ভূত্বকের গড়ন ও বিবর্তনকে জানতে পারেন, জীব-বিজ্ঞানীরা যেমন ফসিল থেকে জীব-জগতের ইতিহাসকে উদ্ধার করেছেন, তেমনি হাতিয়ারকে বিশ্লেষণ করে প্রত্নবিদরা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ইতিবৃত্তকে আবিষ্কার করেছেন। কোনো এক বিশেষ সময়ের মানুষ কি-কি যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছে তা থেকেই সেই সময়ের মানুষের চিন্তা, ধারণা, সমাজের গড়ন, জীবনযাপনের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জেনে নেওয়া যায়। শার্লক হোমস যেমন একটি তামাকের পাইপ দেখেই পাইপের মালিক সম্পর্কে খুঁটিয়ে বর্ণনা করতে পারেন, তেমনি পারেন প্রত্নবিদরা একটি হাতিয়ার দেখে এক যুগের মানুষের সামগ্রিক জীবন সম্পর্কে।

যেমন ধরা যাক, কোনো এক সময়ের মানুষ হাতিয়ার বলতে শুধু পাথরের হাত-কুড়ুল ব্যবহার করেছিল। তাহলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে সেই মানুষরা তখনো পর্যন্ত চাষ করতে শেখেনি। হাত-কুড়ুলের গড়ন ও পারিপাট্য দেখে সে সময়ের মানুষের হাতের কাজের দক্ষতা সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা করা যাবে। এমনিভাবে সব মিলিয়ে গোটা যুগটা সম্পর্কেই একটা ধারণা হতে পারে।

অথচ একশো বছর আগেও কেউ-ই বিশ্বাস করত না যে ঈশ্বরের পুত্র মানুষকে কোনো এক সময়ে শুধু পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল। যদিও ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ স্বীকৃতি পেয়েছিল আরো অনেক বছর পরে। মানুষ ও জীবজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্ম-পুস্তকের ব্যাখ্যাই তখনো গ্রাহ্য ছিল। এই সমস্ত ব্যাখ্যার মূল কথা ছিল এই যে মানুষ চিরকালই ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত এবং সেই কারণেই মানুষ চিরকালই মানুষ; মাঝে মাঝে মহাপ্রলয় হয়েছে, সৃষ্টি ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু মানুষ আগেও ছিল পরেও আছে; এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে যা কিছু দরকার হতে পারে সমস্তই তাকে প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই কেউ যদি বলে যে মানুষ এক সময় শুধু পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করেছিল, অন্য কোনো হাতিয়ার তার ছিল না—তবে এই উক্তিটি জঘন্যতম ঈশ্বর-নিন্দা হিসেবে বিবেচ্য হত।

কিন্তু একজন মানুষ ছিলেন যিনি এই জঘন্যতম ঈশ্বর-নিন্দা করতেও ভয় পাননি। পুরাতত্ত্বকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব তাঁর এবং এই দিক থেকে পুরাতত্ত্বের তিনি জনক। তাঁর নাম জ্যাক বুশে দ্য প্যার্ত (১৭৮৮—১৮৬৮)। ফ্রান্সের সোম নদীর ধারে আবেভেই নামে ছোট মফস্বল শহরের মানুষ তিনি। হঠাৎ এই অঞ্চলেই মাটির তলা থেকে তিনি অনেকগুলো পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন। এবং তিনিই এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যে, একসময়ে মানুষের হাতিয়ার বলতে ছিল এই পাথরের টুকরোগুলোই।

জ্যাক বুশে দ্য প্যার্তের জীবনী যেমনি বিচিত্র, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। উনপঞ্চাশ বছর বয়েস পর্যন্ত তাঁকে দেখে বোঝা যায়নি যে তাঁর বিশেষ ঝোঁকটা কোন্ দিকে। তিনি অনায়াসেই নাট্যকার বা গীতিকার হিসেবে নাম করতে পারতেন। রাজনীতির দিকে গেলে বিপ্লবীরা তাঁকে তাঁর সমাজতন্ত্রী মতবাদের জন্যে মাথায় তুলে রাখত। শেষ-পর্যন্ত দেখা গেল, নাট্যকার না হয়ে, এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষের প্রথম আসার সময়ে যে নাটকটি জমে উঠেছিল সেই নাটকটি পড়ে দেখার জন্যে তিনি উঠে-পড়ে লেগেছেন। উনপঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবন শুরু আর আশি বছর বয়েসে তাঁর মৃত্যু—এই একত্রিশ বছরের জীবন এক অতুলনীয় একক সংগ্রামের ইতিহাস।

॥ যুগ-বিভাগ ॥

প্রাগৈতিহাসিক কালকে খুব মোটা-মোটা দাগ টেনে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে প্রস্তরযুগ, তারপরে ব্রোঞ্জযুগ, তারপরে লোহযুগ। প্রস্তর-যুগকে আবার তিনটি উপযুগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে প্রাচীন, তারপরে মধ্য, তারপরে নব্য। নামকরণ শুনেই বোঝা যাচ্ছে, গোটা যুগের প্রথম অংশটিকে বলা হয়েছে পুরনো, শেষের অংশটিকে নতুন। ইংরেজীতে যথাক্রমে প্যালিওলিথিক (Palaeolithic) ও নিওলিথিক (Neolithic)। আর এই দুই অংশের মাঝখানের মধ্য উপযুগটিকে ইংরেজীতে বলে মেসোলিথিক (Mesolithic)।

মানুষের লিখিত ইতিহাস মাত্র পাঁচ হাজার বছরের। তার আগে প্রাগৈতি-হাসিক কালের ব্যাপ্তি প্রায় ছ-লক্ষ বছর ধরে। এই ছ-লক্ষ বছরকেই প্রত্নতত্ত্বের দৃষ্টি থেকে বিচার করে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে একটি যুগের নামের ভিত্তিতে রয়েছে পাথর, অপর দুটির নামে দু-ধরনের ধাতু। আসলে এই নামকরণ হয়েছে হাতিয়ার-তৈরির উপকরণ থেকে। একেবারে গোড়ার দিকে হাতিয়ার-তৈরির উপকরণ ছিল পাথর, তারপরে ব্রোঞ্জ, তারপরে লোহা।

॥ পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার ॥

পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। হাতিয়ারের নামকরণ হয়েছে জায়গার নামে, সেই বিশেষ জায়গা যেখানে হাতিয়ারটির প্রথম আবিষ্কার। যেমন, ফ্রান্সের শেলে থেকে পাওয়া পুরনো পাথর যুগের বিশেষ ধরনের হাতিয়ারের নাম হয়েছে শেলিয়ান। এই হাতিয়ার-গুলোকে বলা হয় হাত-কুড়ুল। এই হাত-কুড়ুলেরও আবার নানা ধরন আছে। কোনোটা ছুঁচলো, কোনোটা থ্যাবড়ানো, কোনোটা গোল, কোনোটা চ্যাপটা, এমনি নানান ধরনের। এক এক রকম হাত-কুড়ুলের এক এক রকম ব্যবহার।

বাংলাদেশের বদ্বীপ অঞ্চলে, অর্থাৎ পলিমাটি দিয়ে গঠিত অঞ্চলে, এখনো পর্যন্ত পুরনো পাথর যুগের কোনো হাতিয়ার পাওয়া যায়নি। তবে মেদিনী-পুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলকে এর সঙ্গে যুক্ত করা চলে না। প্রায় একশো বছর আগেই ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা-খনি অঞ্চল থেকে ও বাঁকুড়া থেকে পুরনো পাথর যুগের তিনটি হাত-কুড়ুল আবিষ্কৃত হয়েছিল। তিনটি হাত-কুড়ুলই পাওয়া গিয়েছিল মাটির ওপর থেকে। তারপরে একেবারে সাম্প্রতিক কালে বাঁকুড়ার কংসাবতী ও কুমারী উপত্যকা থেকে এবং বাঁকুড়া শহরের কাছে দামো-দরপুর থেকে পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে।

বিহারের সিংভূম অঞ্চলটি প্রাগৈতি-হাসিক নানা নিদর্শনের জন্যে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত। প্রায় একশো বছর ধরে এই অঞ্চল থেকেও নানা হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। চাইবাসা ও চক্রধরপুরের নদীর ধার থেকেই অধিকাংশ আবিষ্কার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের নৃতত্ত্ব বিভাগের শ্রীঅশোককুমার ঘোষ ১৯৫৯ সালে চাইবাসা শহরের কাছে রোরো উপত্যকা থেকে প্রচুর সংখ্যক পুরনো পাথর যুগের হাত-কুড়ুল আবিষ্কার করেছেন। 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এ-সম্পর্কে একটি নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার গত আগস্ট সংখ্যায় লিখিত একটি প্রবন্ধেও তিনি বিষয়টির উল্লেখ করেছেন।

শ্রীঅশোককুমার ঘোষের উল্লিখিত প্রবন্ধ থেকেই আরো কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আমি এখানে উপস্থিত করছি।

মানভূমের নিমাদি রেল-স্টেশনের কাছে প্রায় ছ বর্গ মাইল আয়তনের একটি জায়গা থেকে বেশ কিছু পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। তেমনি পাওয়া গিয়েছে হাজারিবাগ, সেরাইকেলা ও মানভূম থেকে।

প্রায় চৌদ্দ বছর আগে শান্তি-নিকেতনের আর-এন-ঠাকুর ও এস-এন-কর মহম্মদ জেলার ভীমবন্ধ গ্রাম থেকে ভারি সুন্দর একটি হাত-কুড়ুল কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তারপরে ১৯৫৭ সালে এই একই অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে ছ'টি পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার।

পূর্ব-ভারতে সবচেয়ে বেশি পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে উড়িষ্যা থেকে। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সমস্ত আবিষ্কার। ১৯৩৯ সালে পি-আচার্য ও ই-সি ওয়রম্যান কিছু সংখ্যক পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার আবিষ্কার করেন কুলিয়ানা, বারিপাড়া, কুচাই প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। তবে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের জন্যে বিহারের সিংভূমের যেমন খ্যাতি, তেমনি খ্যাতি উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের। ১৯৩৯—৪০ সাল কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। সেই সময়েই কামতাবেরিয়া, কৌলিসুতা, নুয়াবেরি ও প্রতাপপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রচুর সংখ্যক পুরনো পাথর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তী কালে এই অঞ্চলে আরো কয়েক-বার সফল প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান হয়েছে। উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা ও বৈতরণী নদীর ধার থেকেও কিছু কিছু পুরনো যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে।

আসাম থেকে এখনো পর্যন্ত পুরনো পাথর যুগের কোনো হাতিয়ার পাওয়া যায়নি।

পূর্ব-ভারতের মেসোলিথিক হাতিয়ার সম্পর্কে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

* * *

॥ নিরীহ সূর্য ও দুরন্ত সূর্য ॥

১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে সৌর-কলঙ্কের পরিমাণ হবে সবচেয়ে কম। সূর্যের গায়ে কতকগুলো কালো কালো বিন্দু প্রায় সব সময়েই দেখা যায়। কখনো বেশি, কখনো কম। এই বিন্দুগুলোকেই বলা হয় সৌর-কলঙ্ক। ১৯৬৪ ও ৬৫ সালে সূর্য হয়ে উঠবে প্রায় নিষ্কলঙ্ক, অর্থাৎ প্রায় নিরীহ। স্থির হয়েছে যে পৃথিবী ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরে এই নিরীহ সূর্যের প্রভাব সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা পরিচালিত হবে। স্মরণ থাকতে পারে, ইতিপূর্বে ১৯৫৭ সালটি আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান বর্ষ হিসাবে পালিত হয়েছিল। আবার এই ১৯৫৭ ও পরবর্তী ১৯৫৮ সাল ছিল সূর্যের সবচেয়ে কলঙ্কিত সময়। অর্থাৎ সূর্য হয়ে উঠেছিল দুরন্ত। পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের ওপরে এই দুরন্ত সূর্যের প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়ে আছে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে নিরীহ সূর্য সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেলে দুয়ে মিলিয়ে একটি পূর্ণতর সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই নিরীহ সূর্য সম্পর্কিত গবেষণার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্টার ন্যাশনাল্‌স্ অফ দি কোয়ায়েট সান', সংক্ষেপে আই-কিউ-এস-ওয়াই (IQSY)।

ইতিমধ্যেই কোনো কোনো বিজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এই নিরীহ সূর্যের আমলে পৃথিবীর বেতার সংযোগ ব্যবস্থায় বড়ো রকমের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

বাহার ২.১০—২.৬০
জয় ৯.৫০—১৩.৫০
জুপিটর ৭.৫০—১১.৫০
রাজা ১২.৯৫
শরতের শোভাযাত্রা... চলুন মেলামেশার মহোৎসবে
দীপা ৯.৫০
এই মহোৎসব আজ
শরতের পথে অগ্রসর।
সকলের কর্তব্য সপরিবারে যোগদান।
তার জন্য এখুনি প্রস্তুত হতে
হবে। নতুন বেশে সাজতে হবে।
নতুন জুতোয় চলতে হবে। সেরা
জুতো পাবেন বাটার দোকানে।
পদশোভার এখানে বিচিত্র আয়োজন।
রুচিরা ১২.৯৫
ইজি ২২.৯৫
মনে রাখবেন, দিন যত বাড়ে,
ভিড় তত বাড়ে। সুতরাং আসুন
সকালের দিকে। সকালের বাজার
—আরামের বাজার।
মেজর ২৪.৯৫
Bata

রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে মিনতি আজো দেখতে পেল, ওরা দু'টিতে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। ছেলেটির গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি, তলা থেকে ফর্সা গেঞ্জির আভা উঁকি মারছে। সাদা ঘাড়ের ওপর অল্প অল্প পাউডার ছিটানো। কোঁকড়ানো চুল উল্টে দেওয়া। রোজকার মত আজও মোড়ের মাথায় এসে ছেলেটি মুখ মুছল। তারপর ডানদিকে ঘাড় একটু বেঁকিয়ে ঈষৎ পিছিয়ে-পড়া মেয়েটির দিকে তাকাল।

মেয়েটির পরনে লাল রং-এর সিল্কের শাড়ী, লাল ব্লাউজ। ঠোঁট অল্প একটু লাল। বোধ হয় আলতো করে লিপস্টিক বুলিয়েছে। ডান হাতে কাপড়ের বটুয়া। মেয়েটি তাড়াতাড়ি দু'পা এগিয়ে এসে বাঁদিকে ঘাড় ফেরাল। ছেলেটির সঙ্গে বোধ হয় চোখ মিলল ওর। কেননা, ও-ও হাসল। মোড়ের উল্টোদিকের এই দোতলার রেলিং-এ ভর দিয়ে মিনতি স্পষ্টই দেখতে পেল।

সাত মাস আগেও মিনতি দেখেছে, এই গলির মুখ দিয়ে ছেলেটিকে একলা যেতে-আসতে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সকাল সাড়ে ন'টার সময় একটা সিগ্রেট টানতে টানতে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে যেতে। আর সন্ধ্যার মুখে ক্লান্ত পায়ে ঈষৎ এলোমেলো চুলে আবার সিগ্রেট মুখে এই পথেই ফিরে আসতে। একলা। তারপর এই গলির ভেতর দিয়েই সাত মাস আগের এক শীত-সন্ধ্যায় একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে গেছে কলরব করে। রেলিং-এ হুমড়ি খেয়ে পড়ে মিনতি দেখেছে। কোলের উপর সোলার মুকুট রেখে ছেলেটি সিল্কের পাঞ্জাবি পরে আরো তিনজন লোকের সঙ্গে বসে আছে উজ্জ্বল মুখে এবং আর একটা সন্ধ্যার মুখে আবার একটা ট্যাক্সি ফিরেছে শব্দ করতে করতে। তখন ছেলেটির পাশে আর একজনকে দেখা গেছে। লাল চেলীর আড়ালে মিষ্টি আর লজ্জিত মুখ নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে।

আর, এর কিছুদিন পর থেকেই মিনতি দেখে আসছে, দু'টি উজ্জ্বল মুখ শেষ বিকেলের ছায়া গায়ে মেখে এ-গলি দিয়ে হেঁটে গিয়ে রোজ মোড়ের মাথায় তাদের বাসার সামনে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটি একটি পান কেনে। মেয়েটির হাতে তুলে দ্যায়। আর নিজে একটি সিগ্রেট কিনে দোকানের ঝোলানো দড়িতে ধরিয়ে নেয়। তারপর হাসতে হাসতে হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়।

আজ সাত মাস ধরে ঠিক এই ব্যাপার রোজ ঘটে আসছে। মাঝে মাঝে অল্প দু'-চারদিন ছাড়া। সেই দু'-চার-দিন মিনতির বড় কষ্টে গেছে। কি হল ওদের? রোজ দেখাটা মিনতির প্রায় অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। না, বুঝি অভ্যাসের চাইতেও বেশী। একটা নেশা। না দেখতে পেলেই ছট্‌ফট্ করে উঠেছে মন। বৌটি বুঝি বাপের বাড়ী গেছে? নাকি, ছেলেটিরই কোনো অসুখ-বিসুখ করল? না, তা নয়। কেননা, ছেলেটিকে তো সকালেও অফিসে যেতে দেখেছে। মিনতি কল্পনার জাল বুনেছে ওদের কথা ভেবে। যেন এক সুন্দর খেলা।

বোধহয় ঝগড়া করেছে মেয়েটি। হয়তো অফিস থেকে ফেরার পরে জল-খাবার দিতে দিতে মেয়েটি বলেছে—বুঝলে, ভারতী-তে ভালো বই এসেছে কাল থেকে। 'পথে হোলো দেরী'। চলো না যাই।

আলুর চচ্চড়ি দিয়ে রুটি চিবোতে চিবোতে ছেলেটি হয়ত বলেছে—এক-দিনেই তো আর বই শেষ হয়ে যাচ্ছে

না। দেখলেই হবে দু'-চারদিন বাদে। ভিড়টা একটু কমুক।

তোমার দেখানোর ইচ্ছে নেই, তাই বলো না কেন? মেয়েটি অভিমানে ঠোঁট উল্টেছে। ছেলেটি অল্প হেসেছে—বড্ড অবুঝ তুমি। ভিড়ের মধ্যে দেখে তুমিই কি আরাম পাবে! তার চাইতে রববারে চল, আরাম করে দেখা যাবে।

—থাক্‌গে, দরকার নেই এখন।—বলে মেয়েটি উঠে গেছে। ছেলেটি তখন পিছু পিছু উঠে গিয়ে বলেছে—বাঃ, ওমনি রাগ হয়ে গেল?

—বারে, রাগ আবার হল কোথায়? মেয়েটি ফিকে হেসেছে।

—বেশ, চলো তাহলে সিনেমায়। তৈরী হও চট্‌পট্‌।

—না, মাথাটা কেমন যেন টিপ্‌টিপ্‌ করছে এখন। আজ আর যাব না। আর কিছু না বলে মেয়েটি শুধু বিছানার ওপর উপুর হয়ে পড়েছে।

মিনতি বুঝি কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পায় মেয়েটির অভিমানস্ফুরিত অধর, আধো-বোজা কালো চোখ আর ছেলেটির হতভম্ব ভাব। জানলায় সন্ধ্যার হাত-ছানি। আজ আর ওদের বেরুনো হোলো না।

ভাবতে ভাবতে মিনতির ঠোঁটই কখন অজান্তে ফুলে ওঠে। চোখের পাতা নেমে আসে। অভিমানে বুক ওঠানামা করে। রেলিং-এ দুই কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে দুই হাতের তালুর মধ্যে মুখটা রেখে মোড়ের উজ্জ্বল আলোগুলোর দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে।

পরদিনই হয়তো ওদের আবার দেখা যায়। মেয়েটি অনর্গল কথা বলছে আর হাসছে। ছেলেটিও হাসছে, তবে অল্প। ওরা দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। নিশ্চয় সিনেমা-হলের দিকে চলল ওরা।

ছেলেটি হয়তো বলছে—নাও, এবারে সন্তুষ্ট তো।

—হ্যাঁ, আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যেন তোমার আর মাথাব্যথার অন্ত নেই। রাখো! মেয়েটি সকোপ কটাক্ষে তাকিয়েছে।

ওদের হাঁটার ভঙ্গীতে যেন এই কথাগুলো ছিটকে পড়ছে। নেশা-ধরা চোখে তাকিয়ে থাকে মিনতি। এক অদ্ভুত আনন্দ বোধ করে সে। বুঝি সে-ই জিতে গিয়ে সিনেমায় চলেছে।

আজো ওরা দুটিতে হেঁটে এসে মোড়ের মাথায় দাঁড়াল। ছেলেটির গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, মেয়েটির পরনে লাল সিল্কের শাড়ী। ছেলেটি পান কিনল, তারপর দুজনে গল্প করতে করতে বাঁ দিকের রাস্তায় পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেলিং ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মিনতি। অন্ধকারের দিকে তাকাল, ওদের দুটিকে নিয়ে একটু ভাবল। কল্পনার জাল বুনল। ওদের বাড়ীর ছবি দেখল, জানলার পর্দা, ঘরের টেবিল, ওদের সাজ-গোজ, খিল-খিল হাসি। তারপর বেরিয়ে-পড়া বাইরে বেড়াতে।

ছেলেটি মোড়ের মাথায় আসবার আগে হাসছিল। মেয়েটি হাসছিল। মিনতি হাসল। ছেলেটি আর মেয়েটির আনন্দের কথা ভেবে তার খুব আনন্দ হল।

দিনকয় হোলো ওদের আর বিকেলে দেখা যাচ্ছে না। আবার কি হল ওদের?

না, দিনচার পরেই আবার দেখতে পাওয়া গেল ওদের। সকালের চিলতে রোদ্দুর গায়ে মেখে ছেলেটি আর মেয়েটি রিক্সায় চেপে চলেছে। সকালের দিকে রিক্সায় কেন? অসুখ-বিসুখ নাকি? না, দুজনেরই মুখে চাপা আনন্দে উজ্জ্বল। সকালের রোদের মত। তবে? মিনতি বুঝতে পারল না। খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

কয়েকদিন বাদে আবার সকালে ওদের রিক্সায় দেখা গেল। আবারও দিনকয় পরে। সেদিন মিনতি ফিক করে হেসে ফেলল। হ্যাঁ, সে যা ভেবেছে তাই। মেয়েটির বাচ্চা হবে তাই নিশ্চয় মাঝে মাঝে হাসপাতালে যাচ্ছে দেখাতে।

মিনতি ওদের দেখল। আর কল্পনার জাল বুনল। শরীরটা যেন কেমন ভালো লাগছে না গো। মেয়েটি হয়তো হাই তুলতে তুলতে বলেছে।

—এ্যাঁ? ছেলেটির উদ্বিগ্ন স্বর।—ডাক্তার ডেকে আনি তাহলে?

—যাঃ! মেয়েটি লজ্জা আর গর্বের হাসি হেসে মুখ ঘুরিয়েছে।—ও এ সময়ে একটু-আধটু শরীর খারাপ সবারই হয়।

—উঁহু। ওই করে করে অবহেলা করা তো উচিত নয়।

এমন কিছু নয়। গা'টা একটু ঢিপ ঢিপ করে। ঘুরতে-ফিরতে ইচ্ছে করে না তেমন।

—তাহলে আজ আর বেড়াতে গিয়ে কাজ নেই।

পরপর কয়েকদিন এমনিভাবে গিয়েছে। তারপর ছেলেটি এক সকালে জোর করেই মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে দেখাতে। এবং তখন থেকে ঐ মাঝে মাঝে।

আজও হাসপাতাল থেকে দেখিয়েই ফিরছে। মিনতি দেখল, ছেলেটির চোখ-মুখে চাপা গর্ব আর পৌরুষের হাসি। মেয়েটির শরীরে লাবণ্যময় কৃশতা। আর চোখে স্বপ্নিল লজ্জার হাসি। ও মা হবে। রিক্সায় গা ঘেঁষে বসে-থাকা প্রিয় পুরুষটির সন্তানের মা। এ তার লজ্জা, তার গর্ব। তার সুখ।

—কি হবে বলো তো? ছেলেটি হয়তো জিজ্ঞেস করেছে।

—জানি না যাও! কৃত্রিম কোপে মেয়েটি অসহভাবে মুখ ঘুরিয়েছে।

—আমি জানি। ছেলে হবে দেখে নিও তুমি। ছেলেটি ওর কানের কাছে ফিস্-ফিস্ করে বলেছে। তারপর দুজনেই অল্প হেসে উঠে স্বপ্নে বুঁদ হয়ে গিয়েছে হয়তো।

রিক্সায় ওদের মাঝে মাঝেই দেখা যেতে লাগল এবারে। মেয়েটির শরীরে মাতৃত্বের সজল মেঘ ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে। আর ছেলেটির চোখে ক্রমশঃ উদ্বেগ। মেয়েটির চাপা মুখ জড়ানো ক্লান্তির কথা ভাবতে ভাবতে কখন মিনতির মনে হয় তার শরীরটাই বুঝি ভারী হয়ে গেছে, চলনে মন্থরতা এসেছে।

আরো কিছুদিন গেল। তারপর এক বিকেলে দেখা গেল, একটা রিক্সা খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে চলেছে মোড়ের দিকে। মেয়েটার চোখে-মুখে যন্ত্রণা। মাথাটা ছেলেটির ঘাড়ের ওপর মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছে। ছেলেটি ওর পিঠের পিছনে হাতের বেড় দিয়ে সাপটে ধরেছে।

ও, ব্যথা উঠেছে। হাসপাতালে চলল এবারে। মিনতি ঝুঁকে পড়ে দেখল।

ছেলেটি আজ ঘন ঘন এ পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে। নিশ্চয় হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। দ্রুত চলন-ভঙ্গিমা। ভীষণ ব্যস্ত নিশ্চয়। প্রথম

ছেলে হচ্ছে! বোধহয় কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটি। ভাবল মিনতি।

কিন্তু একি! পরদিনই নজরে পড়ল মিনতির। দুপুরের খররৌদ্রের মধ্যে

দিয়ে ছেলেটি ফিরছে। কোনোদিকে চোখ নেই। চুল এলোমেলো। রোদে পুড়ে মুখ কেমন কালচে কালচে দেখাচ্ছে। ক্লান্ত, যেন ভীষণ ক্লান্ত পায়ে হাঁটছে। যেন আর কিছু করবার নেই, সব ফুরিয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে কথাটা মনে হোল মিনতির। আর সংগে সংগে ধক্ করে উঠল বুকে। মেয়েটির কি তাহলে—তাহলে? যেন চোখের সামনে দেখতে পেল হাসপাতালের বেড। সাদা কাপড় দিয়ে মুখ পর্যন্ত সারা শরীর ঢাকা মেয়েটির। পাশে কালো স্ক্রীন দিয়ে অন্য সব পেশেন্টদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। নিস্তব্ধ, ভীষণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে বেডটা।

হ্যাঁ, নিশ্চয় এই হয়েচে। অনেক আশা করেছিল ছেলেটি! সব ফুরিয়ে গেল। ছেলেটির মনে নিশ্চয়ই ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ওর কষ্টের কথা ভেবে মিনতির মনে বড় কষ্ট হল।

তিনদিন ধরে ছেলেটি এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছে। তিন দিন ধরে মিনতি বিষণ্ণ চোখে ওকে দেখেছে। মনে হয়েছে,

তার কোলে……ন্যাকড়ায় জড়ানো একটি ছোট্ট পুঁটুলি!

ছেলেটির অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নেই। নিজের জামা-কাপড়ের দিকে নজর নেই। কতটা ময়লা হয়েছে বা কি রকম পাট নষ্ট হয়েছে। হয়তো দুনিয়া সম্বন্ধেই ও উদাসীন হয়ে গিয়েছে। মিনতি কল্পনায় [illegible] ছেলেটি বাড়ী ফিরল। উদাস পায়ে ঘরে ঢুকল। বিছানার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শূন্য বিছানা, শূন্য ঘর। হাওয়ায় জানলার গেরুয়া রং-এর পর্দাগুলো কাঁপছে শুধু। আনমনে দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখ তুলে দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বিয়ের পরে ওদের জোড়ে-তোলা ছবি। মেয়েটি এখনো সলজ্জ চোখে হাসছে। যেন দম-বন্ধ হয়ে আসবে, আর বেশীক্ষণ ঘরটায় থাকলে। ছেলেটি অস্থির পায়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। আর পেছনে হাসিমুখে মেয়েটা একদৃষ্টে তাকিয়েই রইল। ভাবতে ভাবতে মিনতির চোখ দুটোই সজল হয়ে ওঠে। যেন ছবির মত সে-ই তাকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু তিন দিন পরে মিনতি ভীষণ-ভাবে চমকে উঠল। চোখ কচলে তীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে রেলিং-এর ধারে ছুটে এল সে। সকালের রোদ ভেঙে একটা রিক্সা এই গলির দিকেই মন্থর-গতিতে এগিয়ে আসছে। আর সেই রিক্সায় কারা? ছেলেটি, আর কি আশ্চর্য মেয়েটিও! এবং তার কোলে, এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ন্যাকড়ায় জড়ানো একটি ছোট্ট পুঁটুলি! তবে?

তবে যা কল্পনা করেছে মিনতি, সব ভুল! ছেলেটি অমনভাবে যাতায়াত করেছে, অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিল বলে। আর তারই ওপরে মিনতি এক ভুল ইচ্ছার জাল বুনেছে।

দু'হাত দিয়ে শক্ত করে রেলিং জড়িয়ে ধরল মিনতি। ঝুঁকে পড়ল ভালোভাবে দেখবার জন্য। হ্যাঁ, ছেলেটি খুব গম্ভীর থাকার চেষ্টা করছে তার সদ্যলব্ধ পিতৃত্বের দায়িত্ববোধে। কিন্তু মাঝে মাঝেই হেসে ফেলছে। আর মেয়েটির শীর্ণ মুখে অপরূপ হাসি। গর্বের, মাতৃত্বের আর সাফল্যের। আলতো করে পরম স্নেহে একটা পুঁটুলিকে দুহাতে ধরে রেখেছে কোলের মধ্যে। যেন রোদ না লাগে।

বাড়ীর তলা দিয়ে রিক্সাটা ঠুন-ঠুন করে চলে গেল। মিনতি মেয়েটির হাসি দেখল, আনন্দ দেখল। তারপর হঠাৎ নিজের দিকে তাকাল অনেক দিন পরে। তার উনিশ বছরের নিষ্ফলা কুমারী শরীরের দিকে। আর মেয়েটির মুখের কথা ভেবে ভীষণ-ভীষণ ঈর্ষা হল তার।

বাংলাদেশে কাঠখোদাই

সুব্রত ত্রিপাঠী

আজকাল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমরা নানা ধরণের কাঠ-খোদাই ছবি দেখি। বাংলার শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই আধুনিক কাঠ-খোদাই পদ্ধতি খুব বেশী দিনের নয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে চিত্রশিল্পের এই বিশেষ বিভাগটি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত আধুনিক এই বিশেষ পদ্ধতির আগেও এ দেশে কাঠ-খোদাইর চলন ছিল। তখন এ ধরণের শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্র হিসেবে তা ব্যবহৃত না হলেও ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।

মুদ্রাঙ্কনের প্রথম যুগে কাঠের ফলক খোদাই করে শিল্পীরা আসল ছবির প্রতিরূপ মুদ্রণ করতেন। যে কোন ধরণের অঙ্কিত চিত্র সামনে রেখে তার অনুকরণে কাঠে খোদাই ক'রে রূপে রেখায় আসলের একটা নকল গড়ে তোলাই ছিল শিল্পীদের কাম্য। ইউরোপের শিল্পধারায় এ ধরণের পদ্ধতির চরম উৎকর্ষ আমরা দেখি ষোড়শ শতাব্দীতে ডুরের ও হোলবাইন দুই প্রখ্যাত শিল্পীর হাতে।

এই গতানুগতিক পদ্ধতির অবসান ঘটালো ক্যামেরার আবির্ভাবের সঙ্গে। ক্যামেরা ও নানা ধরণের প্রসেস্ প্রয়োগে অতি অল্প মূল্যে ও অতি অল্পশ্রমে আগের চেয়ে সুন্দরভাবে গ্রন্থাদিতে চিত্রসংযোজন করা এনগ্রেভিংয়ের সৃষ্টি ঘটলো। কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্র হ'তে এর পাততাড়ি উঠলেও শিল্পক্ষেত্র হতে এই ধরণের চিত্ররীতি একেবারে দূরে সরে পড়লো না। নন্দনশিল্পের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি এক বিশেষ স্থান পেল। শিল্পীর হাতে এর পুনর্জন্ম হ'ল। দূরপ্রাচ্যের চীন দেশেও কাঠ-খোদাইর প্রতিলিপি একটি স্বতন্ত্র ধারায় চরম উৎকর্ষ লাভ করল। নবজাগরণের এই সূচনা হ'ল প্রথম ফ্রান্সে। ফ্রান্সের পর ক্রমে ক্রমে আর সব দেশে এই রীতি স্বীকৃত হ'ল।

সাধারণতঃ আমরা বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে যে সকল চিত্র দেখি তা শিল্পীর সৃষ্ট ছবির আলোকচিত্র ও প্রসেস্ এনগ্রেভিংয়ের সাহায্যে তৈরী ব্লকের ছাপমাত্র। শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এতে অনেকখানি ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু কাঠ-খোদাই শিল্পে শিল্পীর হাতের ও প্রাণের স্পর্শ আছে। শিল্পী সেখানে এক টুকরো কাঠের ফলক নিয়ে কল্পিত ছবিতে বুলি চালিয়ে খোদাই করেন। আর এই খোদিত কাঠের ফলক বা ছাঁচের ছাপই হ'ল কাঠ-খোদাই ছবি। তীর্থক্ষেত্রে যে সব ছাপা নামাবলী বিক্রি হয় তা এই কাঠের ফলক হতে মুদ্রিত। এসব থেকেই অনুমান করা যায় যে আমাদের দেশে পূর্বে এ শিল্প-পদ্ধতি কাগজ অপেক্ষা কাপড়ের উপরেই বেশী প্রয়োগ হ'ত।

কিন্তু আমাদের দেশে ললিতকলার নবজাগরণের সাথে সাথে এই শিল্পধারারও ক্রমবিবর্তন দেখা দিল। আচার্য নন্দলালের নিপুণ হাতে এর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হ'ল। এঁর সাথে শান্তিনিকেতন কলাভবনের দু' একজন ছাত্রও এই পদ্ধতির বিশেষ চর্চা শুরু ক'রলেন। নন্দলাল প্রদর্শিত পথে অনুগমন করে এঁরা এ দেশীয় কাঠ-খোদাই

কাঠ-খোদাই

সুব্রত ত্রিপাঠী

কাঠ-খোদাই সুব্রত ত্রিপাঠী

সম্প্রতি এদেশীয় শিল্পধারায় যে প্রগতি দেখা দিয়েছে সেই বিচিত্রমুখী প্রগতি ললিতকলার বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে। কাঠ-খোদাই পদ্ধতির মাঝেও নব উদ্যম দেখা দিয়েছে। চীন সোভিয়েত প্রভৃতি দেশে এই বিশেষ চিত্ররীতি বর্তমানে বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়েছে। এমন কি এই কাঠ-খোদাই চিত্রপদ্ধতি তাঁদের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মূলে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে বর্তমান প্রাগগ্রসর জীবনযাত্রাকে এত অধিক পরিমাণে এগিয়ে দিতে পেরেছে। এর মূলে আছে ঐ সব শিল্পীদের গভীর অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যে। তাই ও-দেশীয় শিল্পীরা তাঁদের অনায়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সরল ও সরস সৌন্দর্যকে মিশিয়ে যে কারুকর্ম করে চলেছেন তা বর্তমান জগতের শিল্প-রসিকদের সাথে সাথে জনমনেরও প্রেরণা ও আনন্দ অনুভবের স্থল হয়ে উঠেছে। এদেশীয় শিল্পীরা যদি এই সকল দেশের কাঠ-খোদাই শিল্পীদের থেকে প্রয়োজনীয় পাঠ গ্রহণ করেন এবং তার সাথে যদি দেশীয় রূপরীতি ও ঐতিহ্যকে মিশিয়ে নিয়ে আপন আপন প্রাণের মাধুরী দিয়ে সৃজনী প্রতিভায় শিল্প রচনায় ব্রতী হন তা হ'লে হয়তো এই বিশিষ্ট শিল্পক্ষেত্রে আমাদের দেশও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

কাঠ-খোদাই সুব্রত ত্রিপাঠী

শিল্পকে অনেকখানি উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এঁদের চিত্রে আমরা ভারতীয় শিল্পকলার প্রতিরূপ দেখতে পেলাম।

কই দেখি হাতটা?

হাতের ভাগ্য বিচারে দরকার নেই: এখন দেখুন দেখি পা দুটো বাঁচবে কিনা?

ডি. ডব্লিউ. গ্রিফিথ

প্রভাতকুমার দত্ত

"The task I'm trying to achieve is above all to make you see".
—Griffith.

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগের প্রথম দিকে এক রীলের ছবিগুলি, যা দেখাতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগতো, সেগুলি ছিল মঞ্চাভিনয়েরই নামান্তর। মঞ্চের সঙ্গে ফিল্মের তখন কোন পার্থক্যই ছিল না। ছবি তোলার টেকনিকটা ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে। ক্যামেরা সেকালে একটা নির্দিষ্ট স্থানে দৃশ্যের সামনা-সামনি ভাবে বসানো থাকতো। তার একেবারেই নড়চড় হোত না। অভিনয়ের পাত্রপাত্রীরা ক্যামেরার সামনে অভিনয় করে যেতেন। এক একটা দৃশ্য থাকত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রতি দৃশ্যই চিত্র-কাহিনীকে এক ধাপ করে এগিয়ে দিত। ক্যামেরা এক স্থানে থাকার জন্য চিত্রে পাত্র-পাত্রীদের পাশ ও পেছন দিক থেকে কিম্বা ক্লোস-আপে দেখবার উপায় ছিল না। ফিল্ম টেকনিকের এই অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় ১৯০৮—১০ সাল নাগাদ আমরা প্রথম পরিচয় পাই ফিল্ম টেকনিকের জনক গ্রিফিথসের।

ফিল্মে আসার আগে গ্রিফিথ নানা কাজে হাত দিয়েছিলেন। প্রথমে কিছুদিন নাটক ও কবিতা রচনা করেছিলেন এবং এতে সফল না হওয়ায় পত্রিকার চাঁদা আদায়ের এজেন্সী নিয়েছিলেন। এর পর ক্রমান্বয়ে জাহাজ ও বাড়ী তৈরীর কাজেও তিনি নিযুক্ত হন। তাঁর বাবা ছিলেন হৃতসর্বস্ব কনফেডারেট বাহিনীর একজন কর্ণেল। নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষে তিনি শার্দুর 'টস্‌কা' নাটকের চিত্রনাট্য লিখে এডিসন স্টুডিওর পোটার নামক ভদ্রলোকের কাছে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর চিত্র-নাট্যটি বাতিল করে দেন বটে, তবে গ্রিফিথকে তাঁর নির্মীয়মান ছবি Rescued from an Eagle's Nest-এ মূল ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ দেন। দিনে পাঁচ ডলারের বিনিময়ে তিনি এই কাজ পান। তখন তাঁর টাকার খুব দরকার, কারণ সবে বিবাহ করেছেন। পোটারের বইতে কাজ পাওয়ার কয়েক মাস পরে তিনি আরও কতকগুলি চিত্রনাট্য লিখে Biograph Studio-তে হাজির হন। এবারে অবশ্য চিত্রনাট্যগুলি কিছু কিছু বিক্রী হয়, তবে তাঁকে আবার অভিনয় করতেও বলা হয়। অর্থের টান তখনও থাকায় এ আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করার পর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী Biograph প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

গ্রিফিথ ফিল্মের ক্ষেত্রে সৃষ্টিমূলক যা কিছু কাজ করেছিলেন তা প্রধানত এই Biograph-এ থাকার সময়ই। গ্রিফিথকে যখন ফিল্ম টেকনিকের জনক বলা হয়, তখন এই কথাই বোঝায় যে, তিনি ফিল্মের যে আদত ভাষা, তার যে শিল্পের দিক, সেটি আবিষ্কার করে-ছিলেন। তিনি একার চেষ্টায় চলচ্চিত্রকে তার কাঁচা অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থায় রূপান্তরিত করেন। তাঁর কাছে প্রতিটি নতুন ফিল্মই ছিল একটি চ্যালেঞ্জ বিশেষ। কারণ তিনি মনে করতেন একটি নতুন ছবি মানে টেকনিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আর একটি সুযোগ। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তিনি কখনও কার্পণ্য করেননি। ফিল্ম টেকনিকের ব্যাপারে গ্রিফিথ প্রথম যে কাজটি করেন তা হোল পুরানো ক্যামেরা সংস্থাপনের পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে দর্শক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দূরত্ব ঘোচানো। তিনি দেখলেন যে, সমগ্র দৃশ্যের মধ্যে যে অংশটি গুরুত্বপূর্ণ শুধু সেই অংশটুকুতেই ক্যামেরা ফোকাস করলে চলে। কারণ দর্শকের কাছে তাহলে চিত্রের আবেদন আরও ঘনীভূত রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। শুধু যা তাৎপর্য-পূর্ণ তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতেই ফিল্মের উৎকর্ষ। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ভিত্তি করেই গ্রিফিথ ক্যামেরাকে যেদিকে প্রয়োজন সেদিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ভঙ্গী বা একটি প্রতিক্রিয়াকে আরও ঘনিষ্ঠ করে দেখাবার জন্য ক্যামেরাকে তিনি অভিনেতাদের কাছে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। নতুন জিনিসকে প্রথমে কেউই সহজে গ্রহণ করতে পারে না। তাই গ্রিফিথ যখন ক্লোস-আপ পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনে ব্যস্ত, তখন কোন কোন সমালোচক রব তুললেন যে, জনসাধারণ কেন অভিনেতাকে অর্ধেক দেখার জন্য টিকিট কিনবেন। প্রতিবাদ আসলেও নতুন প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয় এবং একটি নিয়মের সূত্রে আসে তবে তা সমাজ শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে নেয়। গ্রিফিথের ক্লোস-আপ পদ্ধতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

গ্রিফিথ দেখলেন যে, মঞ্চ আর ফিল্ম মোটেই এক জিনিস নয়। মঞ্চে যা ঘটে ফিল্মে ঠিক সেই জিনিষটা ঘটতে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। যেমন মঞ্চে আমরা দেখি অভিনেতা দরজা খুলল, ঘরে প্রবেশ করল এবং তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ক্রমশ মঞ্চের মধ্যবর্তী স্থানে এসে দাঁড়াল। মঞ্চে এ জিনিসটা বিরক্তিকর না হলেও পর্দায় তা বিরক্তিকর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ফিল্মের শিল্পগত আবেদন বহুগুণ বেড়ে যায় যদি আনু-ষঙ্গিককে বাদ দিয়ে কেবল মূল ঘটনার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা হয়। গ্রিফিথ সেই জন্যে তাঁর ছবিতে ঘটনা থেকেই দৃশ্য আরম্ভ করেছেন এবং ঘটনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেছে। তিনি দৃশ্যের কম্পোজিশন ও আলোকসম্পাত সম্পর্কেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি দেখলেন যে, একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অভিনীত বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করলে চিত্রের গতিময়তা বেড়ে যায়। পুরানো যে প্রথা অর্থাৎ সামনাসামনি বা উপর থেকে আলো ফেলা, তার দ্বারা এ জিনিস সম্ভব নয়। তাছাড়া গভীর ছায়া এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জোরালো আলো পাশাপাশি ব্যবহার করে দৃশ্যের দৃষ্টি-গত আবেদন নিবিড় করা চলে। আর একটি উপায়ে দর্শকের চিত্তে মানসিক প্রতিক্রিয়া বা স্পন্দের সৃষ্টি করা যায়। তা হোল একটি দৃশ্য যে সময় পর্যন্ত পর্দার উপর থাকে সেই সময়কে কমিয়ে ফেলা। একটা দৃশ্যকে যতই সংক্ষিপ্ত করা যায় ততই দর্শকের মনের উত্তেজনা বাড়তে থাকে। গ্রিফিথ ১৯০৭ সালে Lonely Villa নামে তাঁর একটি

বইতে এই নীতি প্রথম প্রয়োগ করলেন। কয়েকজন চোর দরজা ভেংগে বাড়ীতে প্রবেশ করতে উদ্যত। বাড়ীর কর্তা বাইরে ছিলেন তিনি টেলিফোনে জেনেছেন যে তাঁর স্ত্রী-পুত্র বিপদের সম্মুখীন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আসছেন। চোরেরা দরজা ভাংগার চেষ্টা করছে। মা তাঁর পুত্র-সন্তানদের রক্ষায় ব্যস্ত। এই দৃশ্যগুলি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততরভাবে দেখিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে দর্শকের মনে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্লোস-আপ বস্তুটির উপর জোর দেওয়ার জন্য মঞ্চ থেকে যে সমস্ত শিল্পী গ্রিফিথের ছবিতে অভিনয় করতে আসেন তাঁদের অভিনয়ধারা অনেকটা বদলাতে হয়। মঞ্চে ক্লোস-আপ দেখানোর কোন উপায় নেই। সুতরাং অভিনেতাদের অনেকটা কৃত্রিম উপায়ে চড়াগলা এবং অংগভংগীর সাহায্যে সেই অভাব পূরণ করতে হয়। কিন্তু ক্যামেরা যখন অভিনেতাদের মুখের কাছে সরে এল তখন তাঁদের আরো শান্ত ও স্বাভাবিক অভিনয়পদ্ধতি গ্রহণ করতে হোল। গ্রিফিথ মঞ্চের শিল্পীদের ফিল্মের উপযোগী করে নিজেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেন। Biograph-এ থাকার সময় গ্রিফিথ-এর কাছে কাজ করতেন যে সমস্ত শিল্পীরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ'দের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন মেরি পিকফোর্ড, লিলিয়ান গীস, ম্যাবেল নরম্যান্ড, লায়োনেল ব্যারিমুর ইত্যাদি। যাঁরা মঞ্চাভিনয়ের ভংগী পরিত্যাগ করতে পারেননি তাঁদের পক্ষে গ্রিফিথ-এর কাছে কাজ করা সম্ভব হয়নি।

ক্লোস-আপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে গ্রিফিথ দেখলেন যে এর দ্বারা নির্জীব বস্তুকে দিয়েও অভিনয় করানো যায়। একটা ছুরি, মদের বোতল, চিঠি, টেলিফোন বা বন্দুক—যে কোন জিনিসের খুব কাছে থেকে ক্লোস-আপ নিয়ে তা সাদা পর্দায় প্রতিফলিত করে গল্পের মধ্যে এগুলির গুরুত্বকে বোঝানো যায়। সব জিনিসটা নির্ভর করে বস্তুগুলির গল্পাংশে উচিত সংস্থাপনের উপর। এমনিতে বস্তু বস্তুই। কিন্তু প্রকৃত উদ্ভাবনশীল পরিচালকের হাতে পড়লে রূপালী পর্দায় বস্তুর একটা সজীব ভূমিকা সৃষ্টি হতে পারে। সজীব রক্তমাংসের মানুষ অভিনয় ক্ষমতা থাকলে তিনি নিশ্চয়ই ভাল অভিনয় করবেন। কিন্তু নির্জীব বস্তুকে অভিনয়ের ভূমিকা দেওয়া সহজ কথা নয়। গ্রিফিথের একটা ছবিতে দেখা গেল যে, নায়িকা দুটি ডাকাতকে একটি সাধারণ লোহার রেঞ্চ দিয়ে দূরে ঠেকিয়ে রাখলো। লং-সটে ডাকাতদের কাছে মনে হয়েছিল যে ওটি একটি পিস্তল। কিন্তু ক্লোস-আপে দেখা গেল যে, বস্তুটি সাধারণ রেঞ্চ ছাড়া আর কিছু নয়।

ফিল্ম টেকনিকের একটা বড় কথা হোল যে শুধু কথোপকথন দিয়ে অভিনয়ের মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা যায় না। একটা ছবি কেবলমাত্র কথা দিয়ে ঠাসা হলেই তা ভাল ছবি হবে না তা সে কথা যতই শিল্পসম্মত উপায়ে উচ্চারিত হোক না কেন। কথোপকথন থাকলেই যদি ভাল ছবি হোত তবে যে ছবিতে যত কথা বেশী সে বই তত ভাল। কিন্তু মানুষ ছবিতে ভংগী, আবেগ, প্রতীক ইত্যাদি চায় সেখানে কথার কোন স্থান নেই। আর ক্লোস-আপের সাহায্যে এই সমস্ত জিনিষগুলি সুন্দরভাবে ফোটানো যায়। যেমন থিয়েটারী ভংগীতে অভিনয় করে একটা আবেগ প্রকাশের চেয়ে ক্লোস-আপে একজন অভিনেতার হাত, চোখ

বা ঠোঁট অনেক সময় গভীর অর্থবহ হতে পারে। ধরা যাক, পানাসক্ত স্বামীর এক অপরাধের বিচারের শেষদৃশ্য। দীর্ঘ শুনানীর পর জজ রায় দিতে প্রস্তুত। ভদ্রলোকের স্ত্রী রায়ের কথাগুলি শোনার জন্য কোর্টরুমে উপস্থিত। ঘর ভর্তি লোক, স্বামী কাঠগড়ায়, স্ত্রী রায়ের কথার জন্য উদগ্রীব। ক্লোস-আপে দেখানো হোল যে তিনি অত্যন্ত বিচলিতভাবে অঙ্গুলিগুলি নাড়াচাড়া করছেন। এখানে এই অঙ্গুলি সঞ্চালন একগাদা কথার চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশী অর্থবহ। ক্লোস-আপ টেকনিকের একটা বড় সুবিধা এই যে এখানে পরিচালক সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে যেটুকু দেখা প্রয়োজন শুধু সেইটুকুর উপরই দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করতে পারেন। এখানে ছবির কাহিনীর স্ফুরণের পক্ষে যা গুরুত্বপূর্ণ তাই কেবলমাত্র দেখানো হয় এবং তা অভিনেতা বা তার অংশ, কোন বস্তু যাই হোক না কেন। ক্লোস-আপে হাত, চোখ বা ঠোঁটের সঞ্চালন দেখালে চরিত্রের অন্তরতম তাৎপর্যকে পরিস্ফুটিত করা যায়। কারণ ইঙ্গিত অনেকখানি অর্থের নিবিড়তা সৃষ্টি করতে পারে। এতে বাস্তবধর্মী ছবি হয় এবং তার মানবিক আবেদনও বেড়ে যায়। ফিল্ম টেকনিকের জনক গ্রিফিথ ঠিক এইভাবে চিন্তা করেই তাঁর প্রতিটি ছবি নির্মাণ করেছিলেন।

১৯১১-১২ সাল নাগাদ বায়োগ্রাফের মালিকের সংগে গ্রিফিথসের একটি মতবাদগত বিরোধের সৃষ্টি হয়। গ্রিফিথের মত সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা চিরকাল দশ মিনিটের এক রীলের ছবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। গ্রিফিথ প্রথমে Enoch Arden নামে দু' রীলের এবং পরে Judith of Bethulio নামে চার রীলের আরেকটি ছবি তুললেন। বায়োগ্রাফ প্রতিষ্ঠান ফিল্ম ট্রাস্টের নিয়ম অনুযায়ী এক রীলের বড় ছবি তোলাকে বরদাস্ত করলেন না। তাঁরা গ্রিফিথকে পরিচালকের পদ থেকে ব্যবস্থাপকের পদে নামিয়ে দিলেন। গ্রিফিথের মত প্রতিভা এ অপমান সহ্য করবেন কেন? তাই গ্রিফিথ বায়োগ্রাফ ছেড়ে মিউচুয়াল কোম্পানীতে যোগদান করলেন। এই প্রতিষ্ঠানে থাকার সময়ই তিনি তুললেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি The Birth of a Nation.

The Birth of a Nation তিন ঘণ্টা সময়ের বার রীলের ছবি। ছবির গল্পটি তিনি পেয়েছিলেন টমাস ডিক্সন লিখিত 'দি ক্ল্যান্সম্যান' নামক বই থেকে। ঘটনাটি হচ্ছে গৃহযুদ্ধ, তৎপরবর্তীকালের পুনর্গঠন ও কুক্লাক্স ক্ল্যানের অভ্যুত্থান সংক্রান্ত। গ্রিফিথ ছিলেন দাক্ষিণবাসী এক কনফেডারেট অফিসারের পুত্র। ফলে বিষয়বস্তুটির প্রতি তিনি সহজেই আকৃষ্ট হন। ঘটনার বিরাট পটভূমিকা ও তার দোলা তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। গ্রিফিথ তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে বইটি তুলতে আরম্ভ করেন। ১৯১৫ সালে The Birth of a Nation মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গতিতে তা দর্শকসাধারণকে আলোড়িত করে। বইটিতে একটি পুরো অর্কেস্ট্রার সংগীত ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্প টেকনিকের দিক থেকে যতটা উন্নত পর্যায়ে এসেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আজ The Birth of a Nation-এর গুণাবলী আমাদের কাছে ধরা পড়বে না। তবে ১৯১৫ সাল নাগাদ ফিল্ম টেকনিকের যে অবস্থা ছিল সেই পটভূমিকায় The Birth of a Nation একটি যুগান্তকারী ছবি। তদানীন্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ছবিটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। আলোচ্য ছবিটির বিষয়বস্তু নিয়ে কিন্তু গভীর মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। টমাস ডিক্সনের The Clansman গ্রন্থটি ছিল পুরোমাত্রায় নিগ্রো-

বিদ্বেষী। চিত্ররূপ দেওয়ার সময় গ্রিফিথ কাহিনীর খোলাখুলি নিগ্রো-বিদ্বেষ জিনিষটাকে বহু পরিমাণে মোলায়েম করে নিয়েছিলেন; কিন্তু এ সত্ত্বেও ছবিতে জাতি-বিদ্বেষ জিনিসটা অনেকটা প্রচ্ছন্ন থেকে গিয়েছিল। তাই এটি মুক্তি পাওয়ার পর আমেরিকার রাস্তায় জাতিসংঘর্ষ বেধে যায় জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। বইটিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে তারা নিগ্রোদের হাত থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। গ্রিফিথ ভেবেছিলেন পর্দায় মন্দ নিগ্রোদের পাশে বিশ্বস্ত কয়েকটি নিগ্রো চরিত্র খাড়া করে জাতি-বিদ্বেষের প্রশ্নটিকে চাপা দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু হলে কি হবে আসলে তিনি একজন কনফেডারেট অফিসারের পুত্র। তাই অজানতেই নিগ্রো-বিদ্বেষের খানিকটা ছাপ তাঁর বইতে পড়েছিল। যাই হোক বিষয়ের দিক থেকে The Birth of a Nation যতই পার্থক্য সৃষ্টি করুক, টেকনিকের বিচারে এটি অনবদ্য সৃষ্টি সন্দেহ নেই। ছবিটিতে গ্রিফিথ ক্যামেরাকে যতভাবে ব্যবহার করা যায় ততভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন। প্রত্যেকটি দৃশ্য প্রত্যেকটি ভঙ্গী বারবার খুঁটিয়ে চিন্তা করে তবে সেগুলিকে পূর্ণরূপ দিয়েছিলেন। সম্পাদনার ব্যাপারেও তাঁর ক্ষমতায় যতটুকু করা সম্ভব ছিল ততটুকু করার তিনি মোটেই কার্পণ্য করেননি। এতটা পরিশ্রম করেছিলেন বলেই The Birth of a Nation সত্যিকারের উঁচু দরের শিল্পসৃষ্টি হতে পেরেছিল। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ নিয়ে যাঁরা ফিল্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে আসেন তাঁদের সফলকাম হতে হলে চিত্রনাট্য, দৃশ্য নির্বাচন, সম্পাদনা সব দিকেই সমান নজর রাখতে হয়। আশ্চর্যের কথা এই যে ফিল্মশিল্পের শিশু অবস্থাতেই গ্রিফিথ এই কথার তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

Birth of a Nation এর পর গ্রিফিথ আরো কয়েকটি ছবি তোলেন। সেগুলি হোল যথাক্রমে Intolerance (1916), Broken Blossoms (1919), Way Down East (1920) এবং Isn't Life Wonderful? (1924) তবে Birth of a Nation অনন্য সৃষ্টি। ছবিটি তোলার পর ৫০ বছরের বেশী কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গ্রিফিথস্-এর আদর্শ আজকের দিনের যে কোন শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালকের আদর্শ হওয়া উচিত। গ্রিফিথ সত্য সত্যই ফিল্ম টেকনিকের জনক।

শব্দকল্পদ্রুম

॥ কথার মানে— উত্তরপক্ষ ॥

১। **সীমন্ত**

(গ) কেশবীথি, মাথার সিঁথি।

প্রয়োগ : "ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে। সর্বাঙ্গে গোলাপ আভা সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।" —বিহারীলাল

২। **শ্রীফল**

(খ) বেল।

৩। **শ্বাপদ**

(খ) শ্ব অর্থাৎ কুকুরের মত পা যার, শিকারী জন্তু, হিংস্র জন্তু।

৪। **লক্ষণা**

(খ) মুখ্য অর্থের বাধা ঘটলে যার দ্বারা মুখ্য অর্থের সঙ্গে অন্য অর্থের বোধ হয়, শব্দের সেই বিশেষ শক্তিকে লক্ষণা বলে। যেমন, দেশের লজ্জা— দেশবাসীর লজ্জা।

৫। **রেয়াত**

(গ) অনুগ্রহ, দয়া, অব্যাহতি, চক্ষুলজ্জা।

৬। **মুরজ**

(গ) মৃদঙ্গ।

প্রয়োগ : "আন মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা।" —রবীন্দ্রনাথ

৭। **ভবদীয়**

(গ) আপনার, তোমার।

৮। **বীরবৌলি**

(খ) কুণ্ডল, বীরের কর্ণালঙ্কার বিশেষ। প্রয়োগ : "যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বন্ধু তেতোলার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম।" —রবীন্দ্রনাথ

৯। **প্রত্যুদ্গমন**

(গ) আগমনকারী মান্য ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে যাওয়া, মান্য ব্যক্তির বিদায়কালে তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর যাওয়া।

১০। **দেউটি**

(খ) প্রদীপ, মশাল। দেউটি কথাটি এসেছে দীপবর্তিকা থেকে।

প্রয়োগ : "আজ্য মরি সুবর্ণ দেউটি তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি দশ দিশ।" —মধুসূদন

১১। **ধোঁকার টাটি**

(গ) দরমা বা ডালপালার বেড়া যার আড়াল থেকে শিকারী শিকার করে। যে বস্তু প্রকৃত জিনিসকে গোপন রাখে। প্রয়োগ : "এই সংসার ধোঁকার টাটি।" —রামপ্রসাদ

১২। **শীকর**

(ক) জলকণিকা, বায়ুচালিত জলবিন্দু।

প্রয়োগ : "আর কিছুই বুঝি নাই— কেবল মন্দাকিনীনির্ঝর-শীকর এবং কম্পিত দেবদারু এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। —রবীন্দ্রনাথ

১৩। **শিঞ্জিনী**

(খ) ধনুকের ছিলা, ধনুর্গুণ।

১৪। **বিবিক্ত**

(ক) স্বতন্ত্র, পৃথক।

প্রয়োগ : "তাই সাহিত্য নাটকে একটি ঘটনাপর্যায়কে বিবিক্ত করিয়া লইয়া তাহারই নিবিড় বিকাশের মধ্য দিয়া রসের পরিণতিকে অবিচ্ছেদে দেখাইতে হয়। —রবীন্দ্রনাথ

১৫। **পাষণ্ড**

(ক) বিধর্মী, ধর্মে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, দুরাচার।

দেশে বিদেশে

॥ মাতৃ-ভাষা ॥

আমাদের মাতৃভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা পেল; এজন্য পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্ত-মান সরকার চিরকাল বাঙ্গালীদের প্রশংসাভাজন হয়ে থাকবেন। এবং এই পশ্চিম বাংলায়ই প্রথম আরও একটি ভাষা মহকুমার পর্যায়ে সরকারী ভাষার স্বীকৃতি পেলো। এটি বাঙ্গালীর উদার স্বভাবের আর একটি পরিচয়। পশ্চিম বাংলায় যদি বাংলা, নেপালী ভাষা ছাড়াও সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষা স্ফূর্তি পায় তো সে পশ্চিম বাংলার গৌরবেরই হবে। মূলত পশ্চিম বাংলার বা বাঙ্গালীর শ্লোগান সকল মাতৃভাষা বিকাশলাভ করুক, প্রত্যেক ভাষাভাষীর সহজ প্রতিভা বিশ্বে যোগ্যস্থান অধিকার করুক। কিন্তু আপাততঃ আমাদের আনন্দ, 'আমরি বাংলা ভাষা' কুণ্ঠিত পদক্ষেপে দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমান্তে এবং সরকারী দপ্তরখানার সীমান্তে বিচরণ করত; আপন শক্তিতে বাংলা ভাষা যেদিন বিশ্বের সমাদর লাভ করল সেদিনও সে সরকারী স্বীকৃতি পায়নি। তারপর সে আপনাতে আপনি বিকাশলাভ করেছে। স্বাধীনভারতে এর যোগ্য স্বীকৃতি অবধারিত ছিল; কিন্তু যে বিলম্ব হ'ল তাও অপরিহার্য মনে করি। একথাটা মনে রাখা দরকার, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কোন বিপ্লবের ভেতর দিয়ে আসেনি; এসেছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ভেতর দিয়ে। যাঁদের হাতে ক্ষমতা ছিল তাঁরা ছিলেন ইংরাজী ভাষা-ভাষী। তাঁরা সমগ্র শাসনব্যবস্থাকে ক্রমে ক্রমে ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করে-ছিলেন এবং যাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তা-ন্তরিত হ'ল তাঁরাও (মাতৃভাষা যাই হোক) ব্যবহারিক দিক দিয়ে ইংরাজী ভাষাভাষী ছিলেন। শাসন ক্ষমতা হাতে আসার পর রাতারাতি তাকে ভাষান্তরিত করার যে অসুবিধা তা তাঁরা কালক্রমে বুঝতে লাগলেন। ইংরাজী ভাষা বিদ্বেষ-বশত বিতাড়ন যত সহজ মনে হয়েছিল কার্যত তা সহজ হল না। বাংলা তথা ভারতের সমাজ ও শিক্ষা জীবনেও এর অনুপ্রবেশ এত গভীর যে, তাকে বল-প্রয়োগে উৎপাটন করলে সমগ্র জীবনটাই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। উৎপাটন করাও যাচ্ছিল না। প্রশাসন, আইনকানুন, জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা সর্বত্র এই বিদেশী ভাষার অনস্বীকার্য অস্তিত্ব। নেতারা ক্রমে আরও উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, বিদেশী শাসক হিসেবে ইংরাজ জাতের উপর বিদ্বেষ সঞ্চার করা এবং সে বিদ্বেষ ইংরাজী ভাষায় সঞ্চারিত করা ঠিক হয়নি। ইংরাজ শাসক হিসেবে আমাদের যাই করে থাক আমরা ইংরাজী ভাষা থেকে অমৃত তুলেছি। ইংরাজী ভাষার জন্য জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের পার্থক্য ঘটেছে একথাও ঠিক নয়, মনে রাখতে হবে এ সংস্কৃত ভাষার দেশ এবং বর্ণাশ্রম অধ্যুষিত ব্রাহ্মণের দেশ। এই বুদ্ধিজীবীরাও জন-সাধারণের মাথার উপর পা রেখে এসেছে। আসল কথা হচ্ছে শিক্ষাবিস্তার: সে চেষ্টা সংস্কৃত আমলেও হয়নি, ইংরাজ আমলেও হয়নি; তার কারণও এক: সংস্কৃতাভিমানী ব্রাহ্মণেরা বা পাশ্চাত্য-সভ্যতাভিমানী ইংরাজরা চায়নি এদেশের আপামর জনসাধারণ 'রাজভাষা' শিখুক। শিক্ষাবিস্তারকে মানদণ্ড ধরলে কি সংস্কৃতাভিমানী কি পাশ্চাত্য সভ্যতাভি-মানী ইংরাজদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াত জনসাধারণের ভাষাকে, মাতৃভাষাকে পরি-পুষ্ট করা। একদেশদর্শিতার জন্য তা হয়নি। আজ আনন্দের কথা, মাতৃভাষা সরকারী (বা রাষ্ট্রভাষা) হ'ল। সরকারী বা রাষ্ট্রভাষার মৌলিক তাৎপর্য হচ্ছে এমফ্যাসিস বা আণ্ডারলাইনিং (অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য) দেওয়া। যাকে সরকারী পর্যায়ে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দেওয়া গেল তার পাশে অন্য ভাষা থাকবে তার নিজস্ব গুণে। ইংরাজীর পাশে বাংলা ভাষা যেমন ছিল, বাংলা ভাষার পাশে ইংরাজী ভাষা তেমনি থাকবে: ক্ষতি তো নেইই, বরং লাভ। ইংরাজী আমাদের চিন্তাধারা ও ভাষাপদ্ধতিতে যে সাহায্য করেছে: সে যদি নিজগুণে বাংলার পাশে থাকে, থাক না, ইংরাজী-ভাষী ভারতীয়ও তো আছে। সুতরাং, বিরোধীপক্ষের কেউ কেউ এমন একটি শুভসূচক অভিনন্দনযোগ্য বিলকেও যে খোলামনে গ্রহণ করতে পারেননি এ তাঁদের দুর্বল যুক্তিবোধেরই পরিচায়ক।

॥ দুই পক্ষ ॥

১৯৫৮ সালে ৪২ দিনব্যাপী ট্রাম-কর্মীদের যে ধর্মঘট হয়েছিল ত্রিপক্ষীয় মেহতা কমিটি সে সম্পর্কে রায় দিয়েছেন। কমিটি স্পষ্টতই এজন্য দুই-পক্ষকে দায়ী করেছেন। শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের যে অর্থকষ্ট হয়েছে তাকে অযাচিত বলা যায় না। কিন্তু ট্রাম-যাত্রী জনসাধারণের যে দুর্ভোগ ও অর্থকষ্ট হয়েছে তা একান্তই অযাচিত। আজও সে দুর্ভোগের শেষ নেই—যদিও ধর্মঘট শেষ হয়েছে। রুট দেদার বেড়েছে, গাড়ী বাড়েনি, ভাড়া বেড়েছে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়েনি। আর ট্রামচালনা যেন কর্মীদের খানিকটা মর্জি-মেজাজের ওপর হচ্ছে। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম সার্ভিসের দুর্দশার মূলে কারণগুলো এবং তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এই কমিটির বিবরণীতে প্রকাশ পাওয়ায় এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে। এই কমিটির মন্তব্য আরও এই কারণে উল্লেখ ও উদ্ধৃতিযোগ্য যে, এই কমিটিতে শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিও ছিলেন। শ্রমিকপক্ষে ছিলেন ডাঃ রণেন সেন (এ-আই-টি-ইউ-সি), শ্রীনারায়ণ দাশগুপ্ত (হিন্দ মজদুর) এবং শ্রীকালী মুখার্জি (আই-এন-টি-ইউ-সি); মালিক-পক্ষে ছিলেন : শ্রী এস কে সিংহ (এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া), শ্রী কে এল চনচানিয়া (অল ইণ্ডিয়া অর্গ্যানিজেশান অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এমপ্ল-য়ার্স), শ্রী কে কে কাপানি (অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গ্যানিজেশান); কমি-টির চেয়ারম্যান ছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব শ্রী আর এল মেহ্‌তা। এরকম তদন্ত কমিটি এই প্রথম। ৪৪ জন সাক্ষ্য দেন, ৪০টি দলিল পেশ করা হয়। কমিটির রিপোর্ট সেণ্ট্রাল ইমপ্লিমেণ্টেশান কমিটি গত বছর অক্টোবরে বিবেচনা করেছেন ও কতকগুলি সুপারিশ করেছেন।

মূল রিপোর্টে বলা হয়েছে : ট্রেড ইউনিয়নের অস্ত্রাগারে যত হাতিয়ার আছে তার মধ্যে ধর্মঘট-ই হচ্ছে শেষ অস্ত্র যা অন্য সব হাতিয়ার ব্যর্থ হলে প্রযোজ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে একেবারে সূচনা থেকে একমাত্র যে অস্ত্রটি প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি ধর্মঘট। রকমারি ধর্মঘট—আকস্মিক ধর্মঘট, প্রতীক ধর্মঘট, স্বতস্ফূর্ত ধর্মঘট এবং দেড়মাস পরি-ব্যাপ্ত ধর্মঘট। কি ফল হয়েছে? শ্রমিকরা ১০ লক্ষ টাকা মজুরী খুইয়েছে, কোম্পানী ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব হারিয়েছে। যাত্রীসাধারণ দেড়মাস ধরে এই সুলভ পরিবহণের সুযোগ থেকে

বঞ্চিত হয়েছে। শ্রমিকরা আজও অসন্তুষ্ট।

আর? কোম্পানী ছ'বছরের চেষ্টায় তিনটি সরকারী তদন্তের পর এক নয়া পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করতে পেরেছেন; কোনো গোলমাল, কোনো হাঙ্গামা, তেমন কোনো অভিযোগ হয়নি। এক সময়ে শ্রমিকদের যা দিতে চাওয়া হয়েছিল, পাঁচ ভাগের তিন ভাগ মাত্র পেয়েছে তাও এক বছর বিলম্বের ও অনেক চেষ্টার পর। এতে কি লাভ?

রিপোর্টে একথাও বলা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কাজ বন্ধ রেখে বিরোধের মীমাংসা যদি না করতে হয় তবে কোম্পানীকে সমষ্টিগত বোঝাপড়ার একটি উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এবং সংযুক্ত পরামর্শের জন্য একটি কর্তৃ-স্থানীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিণামে একটি সংযুক্ত পরি-চালনা পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ডিপোতে কার্যকর ওয়ার্কার্স কমিটি গঠন শিল্পক্ষেত্রে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেণ্ট্রাল ইমপ্লিমেণ্টেশান কমিটি বলেছেন, যে ক্ষেত্রে নেতাদের নিষেধ সত্ত্বেও কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট করে বসে সেখানে তার দায়িত্ব যথাস্থানেই ন্যস্ত করতে হবে এবং এই ধরণের আচরণ-বিধিভঙ্গের কথা সংশ্লিষ্ট কর্মী ও কেন্দ্রীয় ইউনিয়নকে জানিয়ে দিতে হবে। কোম্পানীর দিক থেকে আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে এইভাবে: বিভিন্ন ডিপোতে তাঁরা অভিযোগ প্রতিফলিত ও নিরাকরণের জন্য ওয়ার্কার্স কমিটি অথবা অন্য কোনো সমষ্টিগত বোঝাপড়ার উপায় উদ্ভাবন করেননি। মেজারিটি ইউনিয়নকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাঁরা আর একটি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধাদি সম্পর্কে বিলম্ব ঘটানো আর একটি আচরণবিধি-লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত। ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডারে ছোট বড় শৃঙ্খলাভঙ্গের পার্থক্য অস্পষ্ট।

পক্ষান্তরে, ট্রাইবিউনালে যেসব বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে তৎসম্পর্কেও একটা আন্দোলনের মনোভাব জাগিয়ে রেখেছে ইউনিয়নগুলো। বিরোধের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হল এমন শান্তাবস্থা কখনো সৃষ্টি করা হয়নি।

॥ টাক ॥

ফ্রান্সে অক্টোবর মাসে এক টাক সম্মেলন হবে। উদ্যোক্তা জাতীয় টেকো সংঘ এবং অনুষ্ঠানস্থল হচ্ছে প্যারিসের উপকণ্ঠ। কর্মসূচীতে আছে খানাপিনা নাচগান। উপসংহারে এক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হবে। যিনি সুপুরুষ বলে বিবেচিত হবেন তিনি পুরস্কার পাবেন।

বলা বাহুল্য, গোটা ব্যাপারটাই একান্তভাবে পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ (যদিও আজকাল কোন কোন মেয়ের মাথায়ও টাক দেখা যায়)। খানাপিনাও পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং নাচগানও। সমবেত এই পুরুষ টাক-ওয়ালাদের মধ্যে যিনি সুন্দরতম প্রতিপন্ন হবেন তিনি পুরস্কার পাবেন। নিঃসন্দেহে টাকও তার সৌন্দর্যের অন্যতম অঙ্গ হবে।

আমাদের অনুমান ভুলও হতে পারে। খানাপিনায় বা নাচগানে আলু-লায়িতকুন্তল শকুন্তলারাও থাকতে পারেন—স্ত্রী অথবা বান্ধবী হিসেবে। কারণ, আমাদের দেশে টাক ও টাকার নৈকট্য সম্পর্কে একটা সংস্কার আছে। এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আগেই টাকের জন্যতো নয়ই টাকার জন্য কোন-না-কোন সুন্দরী কোন-না-কোন টাকওয়ালা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন। টাক-ওয়ালা বা টেকোদের সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতা কি তাঁদের সামনেই হবে? বিচারকই বা কে বা কারা হবেন? পুরুষ বিচারক কোনো কাজের কথা নয়—সেখানে অংক, জ্যামিতি, অ্যানাটমি যাই থাকনা কেন, প্রাণের আবেগ নেই। সুতরাং, এ বিচারভার যাঁদের ওপর পড়া উচিত তাঁরা মহিলা। বায়োলজি তাই বলে। কিন্তু সে মহলের রায় টাকার দিকে না গিয়ে টাকের দিকেই যে যাবে তার প্রতিশ্রুতি কোথায়?

॥ চিনি ॥

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল চিনি সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণা করেছেন। বলা যায়, অবস্থা-বিপাকে তাঁকে এই ঘোষণা করতে হয়েছে। নীতিটা হচ্ছে এই যে, চিনি লেনদেন, বিতরণ ও মূল্যের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তা তুলে নেয়া হল। কি অবস্থায় তুলে নেওয়া হল?—গত দুবছরব্যাপী চিনির যে অনটন ছিল তা এখন অভূতপূর্ব উদ্বৃত্তে পরিণত হয়েছে। এখন অবিক্রীত মজুদ চিনির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ লক্ষ টন। যে অবস্থাটাকে নিরাপদ বলা যায় তারও দ্বিগুণ। আর—একমাত্র স্টেট ব্যাংকই চিনির হিসেবে ১৪ কোটি টাকা অগ্রিম দিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের ফলে শ্রীপাতিল চিনির দাম বাড়বে এমন আশংকা তো করেনই না, মারাত্মক রকমে

না পড়ে যায় এই সরং তাঁর আশংকা। এই কারণে সরকার চিনিকল থেকে বাজারে চিনি বেরোনোটা নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রত্যেক মাসে কতটা বেরোতে পারবে সরকার তাই শুধু স্থির করে দেবেন; বাকীটা মিলওয়ালারা যাকে খুসী বেচতে পারবে। (কথাগুলো বোঝা গেল না; একে অর্থনৈতিক গোলকধাঁধা বলা যায়)। বিনিয়ন্ত্রণের পর মূল্যসাম্য রক্ষার জন্য অতিরিক্ত দুই লক্ষ টন চিনি ছাড়া হয়েছে—পূজো ও দেওয়ালীকে মধুরতর করার জন্য, দরকার হলে আরও চিনি ছাড়া হবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে, অনটনের সময় মিল মালিকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য যে কর-লাঘব করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হল। দ্বিতীয়ত কলগুলির উৎপাদন-সীমা বেঁধে দেওয়া হল গত বছরের সর্বাধিক উৎপাদনের পরিমাণ থেকে শতকরা দশ ভাগ কম। এজন্য যে ইক্ষু উদ্বৃত্ত হবে তা গুড় ও 'খণ্ডেশ্বরী' উৎপাদনে নিয়োগ করা হবে।

এর সংগে একটু ইতিহাসও দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে যে চিনি হয়েছিল তা প্রয়োজনের রেখায় রেখায় মিলে যায়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ অবধি উৎপাদন ক্রমশই কমতে থাকে। দাম বেড়ে যায়। সরবরাহও কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ন্যায্য দামে মোটামুটি সমবণ্টনের জন্য বিতরণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হয়। একদিকে ইক্ষুর দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়, আর একদিকে মিল-উৎপাদন ক্ষেত্রে কর-লাঘব করে দেওয়া হয়। এর পর থেকে ক্রমশই উৎপাদন বাড়তে থাকে। এখন একেবারে উদ্বৃত্ত। এই অবস্থায় সরকারকে নীতি পাল্টাতে হল। সে নীতি বিনিয়ন্ত্রণের এবং আন্তঃরাজ্যে চলাচলে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার। কিছুদিন গড়িয়ে না গেলে এ গোলক-ধাঁধাঁর কিছু বোঝা যাবে না। এখন যতটা পারা যায় ভোগ করা যাক।

সংবাদে প্রকাশ, কলকাতায় বাজারে মণ করা তিন টাকা পড়ে গেছে।

॥ বিড়ি ॥

চার্চিলের মুখখানা মনে পড়লেই একটি চুরুট এসে পড়ে। চুরুট ছাড়া ওমুখ অঙ্গহীন। আমাদের দেশে হুঁকো বাতিল হয়ে গেছে। সেই বসে-বসে কুচি-কুচি করে তামাক কাটা, লালি গুড় দিয়ে মাখা বা কলকে নিয়ে রান্নাঘরে গিন্নীর কাছে আগুন চাওয়া, টিকে জ্বালানো, এসব জ্বালা আজকাল আর নেই; কেন না, ওটা ছিল অনেকটা মজলিসী। এখন চলমান পোড়া তামাক হচ্ছে সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, পাইপ। পাইপটা বেশীরকমের অ্যারিস্টোক্রেসী, চুরুটটা আধা, সিগারেট মধ্যবিত্ত, বিড়ি একেবারে 'গণ।' সব চাইতে সংখ্যায় যারা বেশী অথচ তামাকের নেশা চাই তারা হচ্ছে বিড়িপায়ী। খবরে প্রকাশ, চেষ্টা করলে ভারতের বাইরেও বিড়ি চালানো যায় এবং তাতে কিছু বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করা যায়। শ্রী ভি বি রাজা কলকাতায় বিড়ি তামাক বণিক সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে জানিয়েছেন যে, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, বোর্নিও, মালয়, আফ্রিকা এবং আরবের কোথাও কোথাও বিড়ি চালানো যায়।

॥ স্বল্পায়ু ॥

সিরিয়াতে একটি স্বল্পায়ু বিদ্রোহ ঘটে গেল। বিদ্রোহ করেছিল সেনারা। তারা দাবী করেছিল যে, তারা বিনা রক্তপাতে শাসনাধিকার নিয়েছে। দামাস্কাসের বেতারবার্তা ঘোষণা করে যে, এইচ্ছে নাসেরের উৎপীড়ন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সাত ঘণ্টা পরই ঐ দামাস্কাস রেডিওই ঘোষণা করে যে, বিদ্রোহের তাপ উবে গেছে। বিদ্রোহী সিরিয়ান অফিসারদের দাবী চুকিয়ে দেবেন সংযুক্ত আরবের যুদ্ধ-মন্ত্রী মার্শাল আবদুল হাকিম এই প্রতিশ্রুতি দিলে বিদ্রোহের অবসান ঘটে। অতঃপর অবস্থা স্বাভাবিক হল এবং একটা মীমাংসাও নাকি হয়ে গেছে। এদিকে প্রেসিডেন্ট নাসের কাইরো রেডিওতে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি অনুগত সিরিয়ান সৈন্যদের বিদ্রোহ দমনের জন্য অগ্রসর হতে নির্দেশ দিয়েছেন। (২৮শে) সারা সকাল ধরে দামাস্কাস রেডিও বিদ্রোহীদের ইস্তাহার প্রচার করেছে, বিদ্রোহাবসানের পর সেই রেডিওই সংযুক্ত আরবের কথা বলতে থাকে। বিদ্রোহের উত্তাপ যখন চরমে তখন বিদ্রোহীরা দামাস্কাস রেডিও দখল করে বলে, "আমরা স্বাধীন থেকে মর্যাদার সংগে বাঁচতে চাই আমাদের রক্ত তা প্রত্যক্ষ করবে" সিরিয়া তার সত্তা হারাতে রাজী নয়—এই নাকি বিদ্রোহের মূল কথা। সম্ভবত, সকল ঐক্য সংহতির প্রচেষ্টার মূলেও ঐ কথা—জোর করে সকলকার বৈশিষ্ট বৈচিত্র ও দীর্ঘ সংস্কারের সত্তা হারিয়ে কেউই ভাষায় বর্ণমালায় আচার-আচরণে একাকার হতে চায় না। আমাদের জাতীয় সংহতি সম্মেলনের সময়ই এটি ঘটল, এর কি কোন তাৎপর্য আছে?

মার্শাল প্রতিশ্রুতি ভংগ করায় আবার বিদ্রোহীরা ক্ষমতা দখল করে।

॥ এভারেস্ট ॥

এভারেস্টের একটা নিজস্ব গৌরব ছিল। দুর্গম দুরারোহ বলে নানা কথা কাহিনীও ছড়িয়েছে। তারপর আরম্ভ হল মানুষের দুর্দান্ত অভিযান। মানুষ কোথাও অপরাজিত থাকতে চায় না। বার-বার অভিযান ব্যর্থ হল। কিছু অপঘাত হল। সংস্কারবাদীরা বললে, নগাধিরাজ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এভারেস্ট আরোহণে নেপালের অনুমতি নিতে হত। নেপালও মাঝে মাঝে সংস্কারবশত গররাজী হয়েছে। কিন্তু একদিন মানুষের (তার মধ্যে হিমালয়েরই কোলে পরিপুষ্ট-এক সন্তান ছিল) পদার্পণ হল পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গে। এর পরও দু-একটি ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে। হঠাৎ একদিন চীনারা দাবী করে বসল তারা সে চূড়ায় উঠেছে। অনেকেই বিশ্বাস করল, অনেকেই করল না। কিন্তু তারপর উঠল এভারেস্টের ওপর চীনাদের দাবী। এ দাবীও কেউ কেউ উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু না, দেখা যাচ্ছে, চীনারা ফরমোসায় পদার্পণ করতে পারুক না পারুক এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখবেই। এই নিয়ে নেপালের সংগে টানাহ্যাঁচড়া চলছিল শোনা গেছল; কিন্তু সে যে কতটা তা এখন স্পষ্টাকারে জানা যাচ্ছে। চীনারা আনুষ্ঠানিকভাবে নেপালের কাছে প্রস্তাব করেছে যে, এভারেস্ট চীন ও নেপালের এজমালি সম্পত্তি বলে বিবেচিত হোক। অথবা সার্বভৌমত্বের আধাআধি বখরা। এই প্রস্তাব এমন সময়—যখন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত মীমাংসার কথা চলছে। সীমান্ত এখন এভারেস্টের চূড়ায় এসে ঠেকল।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২২শে সেপ্টেম্বর—৫ই আশ্বিনঃ বেতন কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশ—৪ শত টাকা পর্যন্ত বেতনপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫্ টাকা বেতন বৃদ্ধি—১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতেই নূতন বেতনের হার চালু বলিয়া গণ্য।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্যদের গভীর উদ্বেগ—বৃদ্ধির কারণ নির্ণয়কল্পে তদন্ত কমিটি নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট দাবী।

২৩শে সেপ্টেম্বর—৬ই আশ্বিনঃ 'শিল্প উন্নয়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ কারিগর'—দাশনগরে (হাওড়া) কারিগরী শিক্ষণ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শ্রম ও পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ভাষণ—দেশের যুবকগণের প্রতি কারিগরী শিক্ষা গ্রহণে ডাঃ রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) আহ্বান।

বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন প্রশ্ন বিবেচনা—ডাঃ রায়ের বাসভবনে কংগ্রেসের প্রাদেশিক নির্বাচনী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

২৪শে সেপ্টেম্বর—৭ই আশ্বিনঃ 'যুদ্ধ পরিহারই বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন'—কানপুরের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

শিলচর ও করিমগঞ্জ মহকুমা উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা—আসাম রাজ্যপাল কর্তৃক আদেশনামা জারী—সশস্ত্র বিদ্রোহীদের তৎপরতার দরুণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার কংগ্রেস প্রার্থী (বিধানসভা নির্বাচন) মনোনয়ন-পর্ব কার্যতঃ সম্পন্ন—১লা অক্টোবর হইতে নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু।

২৫শে সেপ্টেম্বর—৮ই আশ্বিনঃ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বাংলাকে সরকারী ভাষা ঘোষণা—দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং মহকুমায় বাংলার সহিত নেপালী ভাষাকেও সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দান।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠানুযায়ী মূল্য নির্ধারণের আদেশ (সরকারী) বাতিল—সংবিধান বিরোধী বলিয়া সুপ্রীম কোর্টের রায়।

২৬শে সেপ্টেম্বর—৯ই আশ্বিনঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বেতন কমিটির রিপোর্ট লইয়া আলোচনা—বিভিন্ন দলের সদস্যদের অসন্তোষ প্রকাশ ও রিপোর্টের কঠোর সমালোচনা।

আসাম বিধানসভায় সরকারী ভাষা (সংশোধন) বিল উত্থাপন—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবি পি চালিহা কর্তৃক বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা।

সরকারের (কেন্দ্রীয়) সহিত অকালী প্রতিনিধিদের আলোচনা ব্যর্থ—দিল্লী হইতে ফিরিয়া অমৃতসরে অকালী দলের নেতা সর্দার গুরুনাম সিং-এর উক্তি।

২৭শে সেপ্টেম্বর—১০ই আশ্বিনঃ প্রত্যেক শিক্ষকেরই (পশ্চিমবঙ্গ) বেতনের হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা—শিক্ষক প্রতিনিধি-দলের সহিত আলোচনাকালে ডাঃ রায়ের বক্তব্য।

অনুন্নত দেশগুলির দ্রুত উন্নয়নে অগ্রসর রাষ্ট্রগুলিকে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান—দিল্লীতে 'ইকাফে'র উদ্যোগে আহূত এশীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচয়িতা সম্মেলনের দাবী।

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় (ফুটবল) মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দল যুগ্মবিজয়ী হিসাবে ঘোষণা—ফাইন্যালে উপর্যুপরি দুইদিন খেলায় গোল শূন্য ড্র হওয়ায় নূতন নজীর সৃষ্টি।

২৮শে সেপ্টেম্বর—১১ই আশ্বিনঃ জাতীয় সংহতি সাধনে সর্বদলীয় আচরণ-বিধি প্রণয়নের আহ্বান—দিল্লীতে সংহতি সম্মেলনে উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের উদ্বোধনী ভাষণ—দেশের শুভশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) আবেদন।

॥ বাইরে ॥

২২শে সেপ্টেম্বর—৫ই আশ্বিনঃ 'শান্তি আলোচনায় যোগদানে সর্বসময় প্রস্তুত'-বেলগ্রেড সম্মেলনের আবেদনের উত্তরে ক্রুশ্চেভের (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) ঘোষণা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সহ জোট-বহির্ভূত রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃবৃন্দের নিকট পত্র প্রেরণ।

২৩শে সেপ্টেম্বর—৬ই আশ্বিনঃ হ্যামারশীল্ডের (রাষ্ট্রসংঘের পরলোকগত সেক্রেটারী জেনারেল) বিমানে নিহত যাত্রীর দেহে একাধিক গুলী প্রাপ্তি—রোডেশিয়া সরকারের ঘোষণায় তথ্য প্রকাশ।

২৪শে সেপ্টেম্বর—৭ই আশ্বিনঃ নিরস্ত্রীকরণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ ও 'ট্রয়কা' (ত্রয়ী) ব্যবস্থায় পরিচালনার দাবী—পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে রাশিয়ার নূতন প্রস্তাব—রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্টের (টিউনিসিয়ার মঙ্গি শিলম) নিকট উপস্থাপিত রিপোর্টে বক্তব্য পেশ।

'বার্লিন রক্ষায় প্রয়োজন হইলে আমেরিকা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করিবে'—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভ্রাতা এটর্ণী জেনারেল রবার্ট কেনেডির ঘোষণা—আণবিক বোমা খাতে মার্কিণ সরকার কর্তৃক দুই শত কোটি ডলার ব্যয়।

২৫শে সেপ্টেম্বর—৮ই আশ্বিনঃ পরমাণু পরীক্ষা বন্ধের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নকে দৃঢ় আহ্বান জ্ঞাপন—রাষ্ট্র-সংঘ সাধারণ পরিষদে প্রেসিডেন্ট কেনেডির জোরালো বক্তৃতা—ধাপে ধাপে নিরস্ত্রীকরণের জন্যে প্রস্তাব—বার্লিন সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দাবী—রাশিয়ার 'ট্রয়কা' পরিকল্পনা অগ্রাহ্য।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ত্রি-পর্যায় নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা পেশ—কেনেডির বক্তৃতার পরই রাষ্ট্রসংঘে উপস্থাপিত—রাশিয়া কর্তৃক প্রস্তাব বিবেচনার আশ্বাস—নূতন মার্কিণ পরিকল্পনায় বৃটেন ও ফ্রান্সের পূর্ণ সমর্থন।

২৬শে সেপ্টেম্বর—৯ই আশ্বিনঃ এই বৎসরের (১৯৬১) মধ্যেই জার্মাণ শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য সোভিয়েট ইউ-নিয়নের দৃঢ় দাবী—সাধারণ পরিষদে (রাষ্ট্রসংঘ) রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ আঁদ্রে গ্রোমিকোর দীর্ঘ ভাষণ—নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির যোগ-দানের অধিকার স্বীকার।

২৭শে সেপ্টেম্বর—১০ই আশ্বিনঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক প্রেসিডেন্ট কেনেডির (মার্কিণ) আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব কার্যতঃ বাতিল—প্রশ্নটি সাধারণ ও সামগ্রিক নিরস্ত্রী-করণের অঙ্গীভূত করার দাবী—সাধারণ পরিষদে রুশ স্মারকলিপিতে ৮ দফা নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব।

মার্কিণ অর্থমন্ত্রী ও পদস্থ অফিসার-মণ্ডলীর সহিত ওয়াশিংটনে ভারতীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র বৈঠক—ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক প্রয়োজন সম্পর্কে কথাবার্তা।

২৮শে সেপ্টেম্বর—১১ই আশ্বিনঃ প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরুদ্ধে সিরিয়ার সৈন্য বাহিনীর বিদ্রোহ—যুদ্ধমন্ত্রী কর্তৃক দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতিদানের পর বিদ্রোহের সাময়িকভাবে অবসান।

এভারেষ্টের উপর কম্যুনিষ্ট চীনের নেপালের সহিত যুগ্ম মালিকানা দাবী—নেপালের পক্ষ হইতে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত।

অভয়ংকর

॥ বাংলা যাত্রাগান ॥

২০শে ভাদ্র তারিখে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে বঙ্গীয় নাট্য-সংগঠনী আয়োজিত এক সপ্তাহব্যাপী নিখিল বঙ্গ যাত্রা-উৎসবের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবির, সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

নানা কারণে এই উৎসব-অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য। আজকাল আমরা লোক-সংস্কৃতির দিকে বিশেষ আগ্রহশীল। যে কোনো একটা উৎসব-অনুষ্ঠানে লোক-সংস্কৃতির নমুনা প্রদর্শনের চেষ্টা করি। এবং একথাও স্বীকার্য যে এইভাবেই কিছু কিছু পুরাতন ধারা নির্বাণোন্মুখে প্রদীপের মত টিম্ টিম্ করছে। লোক-শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যাত্রাগান একদা আমাদের বাংলার গ্রামে গ্রামে সাংস্কৃতিক রুচি গঠনে সহায়তা করেছে এবং পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত করেছে, ধর্ম ও অধর্মের বিচার করতে শিখিয়েছে।

ইদানীং যাত্রাগান কিঞ্চিৎ ফ্যাসন-বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। থিয়েটারই যে সমাজে সিনেমার আক্রমণে মুমূর্ষু, সেখানে যাত্রার যে এই দুর্দশা ঘটবে এ আর বিচিত্র কি! তবু আজ থেকে ত্রিশ বছর আগেও বাংলাদেশে যাত্রাগানের বিশেষ প্রভাব ছিল। পেশাদার দল ছাড়া অনেক শৌখীন নাট্য-সমাজ পালা যাত্রা-গান করতেন। তাঁদের পালাগুলি মূলতঃ পৌরাণিক আখ্যানের ভিত্তিতে গড়া হত। উচ্চাঙ্গের ধামার-ধ্রুপদ-খেয়াল গানের সুরে বাংলা কথা বসিয়ে জুড়ি-গান রচিত হত। সেই সব গানের সুর দিতেন সাময়িক খ্যাতনামা সঙ্গীত-কাররা। এই সব যাত্রার পালা দুপুরে শুরু হয়ে একাদিক্রমে বারো চোদ্দ ঘণ্টা ধরে চলত। শিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের এমন মহা-মিলন-ক্ষেত্র আর দেখা যায় না। শৌখীন দলের আবার নিয়ম ছিল যে-সব বাড়িতে যাত্রাগান করতেন, সেখান থেকে পাথেয় ভিন্ন আর কোনও অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করতেন না। পুরোপুরি শৌখীন।

পেশাদারী দল সাধারণতঃ ধনীগৃহে ও বারোয়ারীতলায় (তখনও সর্বজনীন উৎসব আসরে অবতীর্ণ হয়নি) অভিনয় করতেন, অর্থের বিনিময়ে। এই সব যাত্রা-সভায় ইতর-ভদ্র সকলে উপস্থিত হয়ে রাতভোর যাত্রা শুনতেন, যাত্রা ভাঙলে কার গান ভালো এবং কার অভিনয় ভালো এই আলোচনা করতে করতে প্রত্যুষে বাড়ি ফিরতেন। যাত্রার 'হিট্' সঙ্গীত মুখে মুখে ফিরত।

এখনকার মানুষের হাতে অবসর নেই, তা ছাড়া সিনেমার উন্নত কলা-কৌশলে চোখ এমনই ঝলসিত যে, যাত্রার চুনমাখা মুখ এবং ভেলভেটের ছেঁড়া ভীমের গদা বিসদৃশ মনে হয়, তার ভিতর অতীত দিনের সেই চোখ-ধাঁধানো বিস্ময় খুঁজে পাওয়া যায় না।

শোভাযাত্রা, তীর্থযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা, ভাসান যাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি কথাগুলির অর্থ মিছিল বা প্রসেশন। বাঙালীর যাত্রাগানও তেমনই একটা ধারা-বাহিক বিরামবিহীন সচল প্রদর্শনী। রঙ্গনৃত্য-গীত-অভিনয়-রস পরিবেশনই যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই রীতি অতি প্রাচীন, এবং নানা কালের ঘাটে ঘুরে তার বর্তমান আকারে পেঁাছেচে। একদা একটি বিশেষ কোনো উৎসবের অঙ্গ ছিল যাত্রা। মুসলমান রাজাদের আমলে বাংলা যাত্রাগানের রূপান্তর ঘটে। শ্রীচৈতন্যের কালে যাত্রাগানের পরিবেশন বিশেষ জন-প্রিয়তা লাভ করে। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সহায়তা করে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যে' আছে, "কবিওয়ালা-গণের সঙ্গে যাত্রাওয়ালা দলের উল্লেখ আবশ্যক। সখী সংবাদ গান অপেরার ন্যায়, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যাভি-নয়। এদেশে শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রাই প্রথম অভি-নীত হইত বলিয়া বোধ হয়,—শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রার সাধারণ নাম ছিল 'কালিয় দমন'; কিন্তু এই যাত্রা শুধু নামের অর্থে সীমাবধ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই 'কালিয় দমন' যাত্রায় অভি-নীত হইত।...... যাত্রাগুলির সর্বাদৌ 'গৌর-চন্দ্রিকা' পাঠ হইত, তাহাতে বোধ হয় মহাপ্রভুর পরে যাত্রাসমূহ বর্তমান আকারে প্রবর্তিত হইয়াছিল।"

মহাপ্রভু নিজে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে 'রুক্মিণী হরণ' পালায় অভিনয় করেন। এই চন্দ্রশেখর 'হরি বিলাস' নামক পালা-গানের রচয়িতা এবং তাঁর নামানুসারেই 'শেখরী' যাত্রার প্রচলন।

'কালিয় দমন' পালাকার শিশুরাম ছিলেন বীরভূমের অধিবাসী। তাঁর এই পালাগানে কীর্তন-ঝুমুরের সংমিশ্রণ ছিল। এই যাত্রাগানের নবরূপায়ণে বাংলা-দেশ মেতে উঠল, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালাগানের মনোহারিত্বের আলোচনা হতে লাগল। নতুন নতুন দল গড়ে উঠতে লাগল বিভিন্ন অধিকারীদের নেতৃত্বে। শালিখার বদন অধিকারীর 'কৃষ্ণলীলা' আর লোচন অধিকারীর 'অক্রুর সংবাদ' বাংলার রসিক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করল। দীনেশচন্দ্র সেন যে 'কালিয় দমনের' উল্লেখ করেছেন তার অধিকারীর নামও বিখ্যাত। কীর্তনীয়া হিসাবে খ্যাতি লাভ করার পর যাত্রার দলের ছোকরা গায়ক হিসাবে ভর্তি হয়ে যাত্রার ইতি-হাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর নাম গোবিন্দ অধিকারী।

কৃষ্ণ-যাত্রার মত রাম-যাত্রা, চণ্ডী-যাত্রা, ভাসান-যাত্রাও অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। রাম-যাত্রায় খ্যাতিলাভ করেন বর্ধমানের জয়রাম অধিকারীর দল। 'কাল পেঁচা' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'কলকাতা কালচারে'** দুঃখ করেছেন—"থিয়েটারের ইতিহাস-প্রসঙ্গে ঠাকুর পরিবার, পাইকপাড়া ও শোভাবাজারের রাজবংশ এবং কলকাতার অন্যান্য বড়লোক বাবুদের কথা আমরা যতটা জানি, তার তুলনায় শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম-সুবল, পরমানন্দ, প্রেমানন্দ, গোপাল উড়ে, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী প্রভৃতির কথা কতটুকু জানি? অথচ রঙ্গালয় বা রঙ্গাভিনয়ের কোন ইতিহাস যাত্রাগান বা তার অধিকারীদের বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়।"—যাত্রা আমাদের বাংলা নাট্য-ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিত। যাত্রাগানের সুদীর্ঘ ক্রম-বিকাশের ধারা যদি পাওয়া যেত তাহলে বঙ্গ সংস্কৃতির একটা লুপ্ত পরিচ্ছেদ খুঁজে পাওয়া যেত।

বিদ্যাসুন্দর পালার জনপ্রিয়তা অতি-শয় বৃদ্ধি পায় তার অন্তর্নিহিত আদি-

রসের প্রাধান্যের জন্য। গোপাল উড়ে এই পালাগানের জন্য প্রখ্যাত। ভারতচন্দ্রকে তিনিই যেন সাধারণের মধ্যে প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। "কামিনীতে কামিনী ফুলে নিতুই নেয়ায় চোরে, রাজ-বাড়িতে নিত্যি নূতন ফুলে যোগাই কেমন করে?" গোপাল উড়ের একটি বিখ্যাত গান। হীরা মালিনী আর বিদ্যা, গোপাল উড়ের পাল্লায় পড়ে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর শিষ্য কৈলাস বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের খ্যাতিও কম নয়। কৈলাস বারুই নিম্নলিখিত বিখ্যাত চুট্‌কির রচয়িতা—

"গা তোলরে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশ বনে ডাকে কাক,
মালি কাটে কপি শাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক
যায় বাগান।"

রুচির বালাই না থাকলেও এই সব সর্বজনবোধ্য এবং রিয়ালিস্টিক চুট্‌কি সহজেই জনপ্রিয় হয়েছিল।

'কৃষ্ণ-যাত্রা'য় বীরভূমের পরমানন্দ ও তারপরে শ্রীদাম-সুবল বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। লোচন অধিকারীর গানে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর লোচনকে অজস্র অর্থদান করেন। ফলে প্রচারিত হয় যে, লোচনের এমন শক্তি যে, তার গান শুনলে মানুষের আর কোনো চৈতন্য থাকে না। তাই নাকি কেউ সাহস করে তাকে গানের আমন্ত্রণ জানাতে চাইত না। কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ অধিকারী, কাটোয়ার পীতাম্বর যেমন কৃষ্ণ-যাত্রায়, পতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চাঁদ তেমনই রাম-যাত্রায় খ্যাতিলাভ করেন। ফরাসডাঙার গুরুপ্রসাদের চণ্ডী-যাত্রা ও বর্ধমানের লাউসেন বড়ালের মনসার ভাসানেরও জনপ্রিয়তা কম নয়। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ছিলেন মহাপ্রভুর সহচর সদাশিব কবিরাজের বংশের দশম পুরুষ। নদীয়ার ভাজনঘাটে তাঁর জন্ম, কিন্তু পূর্ববঙ্গে কৃষ্ণ-যাত্রার প্রচলন তিনিই করেন। কৃষ্ণকমলের 'স্বপন-বিলাস', 'রাই-উন্মাদিনী' এবং 'বিচিত্র বিলাস' প্রভৃতি বিখ্যাত পালাগানের বহু গান পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের মুখে প্রচলিত ছিল। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই কৃষ্ণকমলের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাধাপদ জুইরাজের 'কৃষ্ণ-যাত্রার' দলটির পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন মহাত্মা শিশিরকুমার।

তখনকার ধনীরাই যাত্রাগানের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। অনেক জমিদার যাত্রার দল প্রতিপালন করতেন। একদিকে কবি-গান, পাঁচালী আর অন্যদিকে যাত্রার পালাগান সেদিন বাংলাদেশকে মাতিয়ে রেখেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে যাত্রাগান শুনতে ভালোবাসতেন, দেব-দেবীর কথা শুনে তিনি অনেক সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে যাত্রা-গানের আসরে কি অপূর্ব আনন্দ লাভ করেছিলেন তার পরিচয় আছে তাঁর 'ছেলেবেলায়'। অবনীন্দ্রনাথ যাত্রার পালা-গানে বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাঁর নিজের

ছোট পালাগানগ্নলির রচনার প্রেরণা এই শৈশবের স্মৃতি।

বর্ধমানের মতি রায় 'তরণীসেন বধ' পালাগানের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মতি রায়ের দলের খ্যাতি অনেক দিন পর্যন্ত শোনা গেছে। এক হিসাবে গোপাল উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী, মতি রায় প্রভৃতির আসন আধুনিক কালে পালাযাত্রার সর্বোচ্চ শিখরে। চন্দননগরের মদন মাস্টার যাত্রায় জুড়ি-গান প্রচলন করেন। এই মদন বন্দ্যোপাধ্যায় মাকি স্কুল-মাস্টার ছিলেন।

তারপর এল পেশাদার অপেরার দল। ওদিকে শৌখীন নাট্য-সমাজের চাপে যাত্রার দল ক্রমশঃ 'বাবু' সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠ-পোষকতা থেকে বঞ্চিত হতে লাগল।

ভূষণ দাসের দল, বেহালা-বড়িশার শ্যামচাঁদ চ্যালির দল একদা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই শতকের প্রথম দিকে শ্যামচাঁদের ভাগ্নে অক্ষয় দাস যে দলটি গড়েছিলেন সেই দলও অনেক-দিন পর্যন্ত আসর জাগিয়ে রেখেছিল।

গণেশ অপেরা, শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলও একদা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। বাংলাদেশের যাত্রা-অভিনয়ের ইতিহাসের আর এক বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র স্ত্রীলোকরাই কয়েকটি মহিলা যাত্রা পার্টি গড়েছিলেন। তার মধ্যে 'ত্রৈলোক্য-তারিণীর দল', 'রাধা বিনোদিনীর দল' ও 'কটা গোলাপীর দল' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখন আর মেয়েদের দল নেই।

যাত্রাদলে অভিনয় করে যাঁরা পরে রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াচিত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনকড়ি চক্রবর্তী ও ফণী রায় (পংকজ কবিরত্ন), ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, তুলসী চক্রবর্তী, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ উল্লেখ-যোগ্য।

বাংলাদেশের স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তক মুকুন্দ দাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কয়েকবার মুকুন্দ দাস কারা-বরণ করেছিলেন। ভূষণ দাস ও শংকর চক্রবর্তীও এই ধারার অনুগামী।

আজো যাত্রার পুরাতন ঐতিহ্য যিনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং যাত্রাভিনয়ে আধুনিক আঙ্গিকের প্রবর্তন করেছেন, তাঁর নাম ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। আধুনিক ভঙ্গীতে যাত্রার নাটক রচিত হচ্ছে, রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্রের টেকনিক্ তাতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তবু একটি অতি প্রাচীন লোক-শিল্প হিসাবে যাত্রাকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। সেইদিকেই বর্তমান উদ্যোক্তরা নজর দিয়েছেন। ক্লাসিক রীতির সঙ্গে তাঁরা আধুনিকতার সংমিশ্রণ করছেন। জন-প্রিয়তার জন্যও তাঁরা সচেষ্ট তাই এই উৎসব-আয়োজন।

নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস শতবর্ষের কিন্তু যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস শত-শত বর্ষের, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁরা আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন তারজন্য তাঁরা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। তবে এই সূত্রে একথাও চিন্তা করার প্রয়োজন যে যাত্রাগানের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

।। সংক্ষিপ্ত সমাচার ।।

আচার্য বিজয়চন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী বিগত ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়েছে। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকেদারনাথ চট্টো-পাধ্যায়। সভায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব, শ্রীনির্মল বসু প্রভৃতি আচার্য বিজয়-চন্দ্রের জীবন ও কর্ম এবং বিশেষ করে প্রত্নতত্ত্ব ও উড়িষ্যার সংস্কৃতির পুনরাবিস্কার প্রচেষ্টায় তাঁর নীরব সাধনার উল্লেখ করেন। আধুনিক ওড়িয়া ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেন আচার্য বিজয়চন্দ্র। রমাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় আচার্য বিজয়চন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলীর পুণর্মুদ্রণের জন্য আবেদন জানান।

আচার্য বিজয়চন্দ্র শিক্ষক, গবেষক এবং সুরসিক কবি হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পুরাতন 'স্বদেশ' এবং 'বঙ্গ-বাণী'তে তাঁর যে সব সরস কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা নেই। একালে সে ধরণের প্রচেষ্টা একমাত্র ইংরাজ কবি অগডেন ন্যাসের কবিতায় পাওয়া যায়। অনাড়ম্বর হলেও এই শতবার্ষিকী আয়োজন উল্লেখযোগ্য। বিজয়চন্দ্রকে বাঙ্গালী ভুলতে বসেছে।

পুলিৎসার পুরস্কার-বিজয়িনী কবি—১৯৬১-র সাহিত্যে পুলিৎসার পুর-স্কার পেয়েছেন ফিলিস ম্যাকগিনলী। ম্যাকগিনলীর কাব্যগ্রন্থটির নাম "টাইমস থ্রী : সিলেকটেড ভার্স ফ্রম থ্রী ডিকেডস"—ত্রিশ বছর ধরে লিখিত ৩০০টি নির্বাচিত কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত। শ্রীমতী ম্যাকগিনলীর বর্তমান বয়স ৫৬ বছর। হালকা ছন্দের কবিতা রচনায় ম্যাকগিনলীর সমকক্ষ বর্তমানে আমেরিকায় আর কেউ নেই। ইতিপূর্বে তিনি আমেরিকার পোয়েট্রি সোসাইটির এডনা সেন্ট ভিনসেনট মিলে পুরস্কার পেয়েছেন।

শরৎ সাহিত্য সম্মেলন—প্রতি বছরের মত এবারও শরৎ সাহিত্য সম্মেলন অতিশয় সাফল্যের সঙ্গে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির বিস্তারিত ভাষণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। শরৎ সাহিত্যের মূল সুর সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেছেন। শেষদিনটি বাংলার তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী কবিশেখর কালি-দাস রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারা-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তারাশঙ্করবাবু অসুস্থ থাকায় সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ তাঁর ভবনে উপ-স্থিত হয়ে সম্বর্ধিত করেন। সম্মেলন

কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের প্রামাণ্য জীবনী ও একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

নতুন বই

তিন কাহিনী—(উপন্যাস সংগ্রহ)—বনফুল। প্রকাশক : গ্রন্থ প্রকাশ। ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'বনফুল' বাংলা সাহিত্যে একটি অতি-পরিচিত নাম। সরস রচনায় যে বিচিত্র ধারা তিনি প্রবর্তন করেছেন আজো সে পথে নতুনের আগমন ঘটেনি। ইদানীংকালে যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমস্যা সম্পর্কে নির্ভীকত্বের পরিচয় দান করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। 'তিন কাহিনী' সেই বনফুলের তিনটি অতি পরিচিত কাহিনীর সঞ্চয়ন। বনফুলের প্রথম জীবনের তিনটি বিখ্যাত কাহিনী 'তৃণখণ্ড', 'কিছুক্ষণ', ও 'বৈতরণী তীরে' এই গ্রন্থে সংযোজিত। 'কিছুক্ষণ' কিছুদিন পূর্বে সিনেমায় প্রদর্শিত হয়েছে, 'বৈতরণী তীরে' একদা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছিল। আজ থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে এই কাহিনীগুলি প্রথম প্রকাশিত হলেও তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আজো অম্লান। কালজয়ী সাহিত্যের নিদর্শনস্বরূপ 'তিন কাহিনী' তাই এক উল্লেখযোগ্য প্রকাশন। কানাই পাল অঙ্কিত প্রচ্ছদটি ভালো।

আলো থেকে অন্ধকারে—(অনুবাদ)—জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন। অনুবাদ—নিখিল সরকার। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে টেক্সাসের ডলাস নামক শহরে শ্বেতাঙ্গ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসী দেশে তিনি চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁর অধিকতর আগ্রহ। সঙ্গীতের মাধ্যমে উন্মাদের চিকিৎসায় যখন তিনি নিযুক্ত সেই সময় য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রকোপ সুরু হল। ডাক্তারি ছেড়ে সেনা দলে নাম লেখালেন গ্রিফিন। প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধরত অবস্থায় গ্রিফিনের চোখের দৃষ্টি কমে এল, ক্রমে তিনি দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারালেন। দশ বছর অন্ধকারে থাকার পর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। ইতিমধ্যে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। The Devil rides outside, Nuni এবং The scattered shadows প্রভৃতির লেখক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন গ্রিফিন। মন তাঁর অশান্ত, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের বিভেদ, তাদের নির্যাতন প্রভৃতি তাঁর চিত্তকে উৎপীড়িত করে তোলে। অবশেষে শ্বেতাঙ্গ গ্রিফিন কৃষ্ণাঙ্গ সেজে লুসিয়ানা মিসিসিপি, আলবামা, জর্জিয়া প্রভৃতি চারটি অঙ্গরাজ্য ঘুরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন "আলো থেকে অন্ধকারে" নামক এই বিচিত্র আত্মকথায়। Sepia নামক নিগ্রো পত্রিকায় প্রকাশকালে রচনাটি মার্কিণ জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করে। নিখিল সরকার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন।

দুটি ফুল দুটি প্রাণ —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তুলিকলম, ১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম ৩-০০।

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নতুন করে কোন পরিচয় দানের আবশ্যক আছে বলে মনে করি না। বহুদিন ধরে বাঙলা সাহিত্য তাঁর সজীব হস্তস্পর্শ লাভ করে আসছে। বয়সের ভারে সেখানে এতটুকু ক্লান্তি আসেনি। তার বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর এই সাম্প্রতিকতম গ্রন্থে।

ঘটনার মধ্যে নতুনত্ব না থাকলেও সরস বর্ণনাভঙ্গীই কাহিনীর রসাস্বাদনের পক্ষে সহজ ও সুন্দরভাবে সহায়তা করেছে। প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার সঙ্গে সমাজজীবনের একটি প্রধান সমস্যা নায়ক নায়িকার জীবনালম্বনে ফুটে উঠেছে। তৃতীয় নারী চরিত্রের দাবী বা চঞ্চলতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রয়েছে। এতগুলি চরিত্রকে এক সঙ্গে স্ব স্ব রূপে পরিস্ফুট করা শক্তিশালী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। গ্রন্থটির যোগ্য সমাদর ঘটবে বলে মনে করি।

নিগ্রো ছেলে —রিচার্ড রাইট। অনুবাদ : নিখিল সেন। শিশু সাহিত্য সংসদ। ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলি-১২। দাম ৭-০০

"ব্ল্যাক বয়ের" বাংলা অনুবাদ "নিগ্রো ছেলে"। কাহিনী গড়ে উঠেছে আমেরিকায় নিগ্রোদের জীবনকে অবলম্বন করে। কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ দ্বন্দ্বের সাহায্যে মানুষে মানুষে যে বিদ্বেষ আর জিঘাংসা, পশুবৃত্তির চরমতম বহিপ্রকাশ ঘটেছে সভ্য আমেরিকার বুকে তার সুনিপুণ আলেখ্য আলোচ্য গ্রন্থ। জীবন-প্রাতে পিতৃহারা অনাথ আতুরের মত ঘুরে বেড়ায়, অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে আত্মীয় পরিজনদের কাছে, দলবদ্ধ শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণে অতিষ্ঠ, ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে, নানা জায়গায় কাজ করতে করতে তার মনে জাগে মুক্তির স্বাদ—উত্তরাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায়—তারা সুস্থভাবে বাঁচতে চায়। রাইটের জীবনস্পর্শে গ্রন্থটি এত মধুর হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীখ্যাত এ বইটির দ্বিতীয় বাঙলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক শ্রীযুক্ত সেন যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে অনুবাদকার্য সমাধা করেছেন। জিজ্ঞাসু পাঠকের দৃষ্টি নিশ্চয়ই পড়বে এই বিখ্যাত বইটির উপর।

চীনা মাটি —অনুবাদ—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক : রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। দাম ছয় টাকা।

চীনের আধুনিক কালের বিখ্যাত রচয়িতাদের ছোটগল্প আর রম্যরচনার সংগ্রহ। ১৯১৯-এর আন্দোলনের ফলে চীনে কথ্যভাষা সাহিত্যের বাহন হবার মর্যাদা লাভ করে। এদিকে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় বহু চীনা সাহিত্যিক চীনা ভাষায় ইউরোপীয় ও জাপানী সাহিত্যের অনুবাদ করতে থাকেন। ফলে চীনের প্রাচীন লোকসাহিত্যের ওপর এইসব বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক চীনা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হল। আশ্চর্যের কথা গোড়া থেকেই এই সাহিত্য বাস্তবধর্মী আর ভাবালুতার বিরোধী। আলোচ্য বইয়ে প্রায় কুড়িটি গল্পের অনুবাদ আছে। অতি সুন্দর ঝরঝরে অনুবাদ। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। অমিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল চীনে চীনাভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন এবং তাঁর সাহায্যে মূল ভাষা থেকে অনেকগুলি গল্প অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। ছাপা

বাঁধাই সুন্দর। এ ধরণের একটি বইয়ের প্রয়োজন ছিল।

শ্রীশ্রীকুমুদবান্ধব জীবনকথা—অধ্যাপক শ্রীবিরজাবান্ধব চট্টোপাধ্যায়, এম এ প্রণীত—মূল্য ৪ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান :—(১) শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, (২) শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ দত্ত, ৭৯, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সুযোগ্য ভক্তশিষ্য আচার্য শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিতকথা লিপিবন্ধ হয়েছে। স্বর্গত কুমুদবান্ধব ছিলেন একজন আদর্শ অধ্যাপক, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা, সাধক-পুরুষ। জনকল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর আদর্শ জীবন সাধারণ্যে ভাল করে প্রচারের জন্য যে যে বিষয়ের বর্ণনা করা আবশ্যক লেখক তা সংযত সংহত ভাষায় চিত্তাকর্ষক করে এই পুস্তকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন।

আচার্য কুমুদবান্ধব একাধারে ভক্ত, কবি ও দার্শনিক ছিলেন। পুস্তকের প্রথমেই 'শ্রীমদ্‌গুরু বন্দনা' শীর্ষক ভজন সংগীতটি তাঁহার কবিত্বশক্তি ও গুরু ভক্তির পরিচায়ক। গ্রন্থকারের উপক্রমণিকা একটি পান্ডিত্যপূর্ণ রচনা। শ্রীকুমুদবান্ধবের রচিত নানাবিধ প্রবন্ধ, চিঠিপত্র এবং ভাষণ হতে লেখক বহু প্রবন্ধে উপদেশাবলী সংগ্রহ করে জীবনকথার শেষে যোজনা করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে কুমুদবান্ধবের অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা 'রচনা সংগ্রহ'রূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'জ্ঞান ও ভক্তি', 'উপাস্য নিরূপণ', 'শ্রাদ্ধকৃত্য', 'শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম', শাস্ত্র ও সদাচার', 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব', 'সৎপ্রসঙ্গ'গুলি শ্রদ্ধাবানের হৃদয়ে মণিমালারূপে বিধৃত হবে। 'বেদান্তসার' কবিতাগুলিতে জটিল দার্শনিকতত্ত্ব সকল অতি সরল ও স্বল্প ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। মাত্র এগারটি কবিতায় সমগ্র বেদান্তের সার ছন্দে বিধৃত হয়ে পাঠকের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করেছে।

রবীন্দ্র বিচিত্রা —(প্রবন্ধ)—প্রমথনাথ বিশী। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : সাড়ে পাঁচ টাকা।

১৩৬১ থেকে ১৩৬৮ সালের মধ্যে গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ হয়েছে, প্রবন্ধ গ্রন্থের পক্ষে এটা নিঃসন্দেহ শুভলক্ষণ। এই নূতন সংস্করণের ভূমিকায় দেখা গেল যে কয়েকটি প্রবন্ধ অন্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ায় এই গ্রন্থে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তার বিনিময়ে দুটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত করে কলেবরটি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যের পাঠান্তর, রবীন্দ্রনাথের খণ্ডোপন্যাস, শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, রবীন্দ্র-সাহিত্যে গান্ধী চরিত্রের পূর্বাভাস, বাঁশরী সরকার, রবীন্দ্রকাব্যে একটি প্রতীক, জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা, ছিন্নপত্রের কবি, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অনাহত কবিতা প্রভৃতি বিখ্যাত রচনাগুলি এই গ্রন্থে যথারীতি আছে। লেখকের রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ও জ্ঞান আছে এই প্রবন্ধের মধ্যে তার পরিচয় পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। মৌলিক চিন্তা ও অনাড়ম্বর পরিবেশন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যে "রবীন্দ্র বিচিত্রা" একটি মূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হবে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র —মনি বাগচি। জিজ্ঞাসা। ৩৩, কলেজ রো, কলিঃ-কাতা-৯। দাম ৪-৫০ নঃ পঃ।

১৯৬১ সাল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মশত বার্ষিকী বৎসর। শুধুমাত্র বিজ্ঞানী হিসাবেই প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণ্য নন। শিক্ষাব্রতী, দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবক হিসাবে তাঁর কর্মময় জীবন থেকে শিক্ষনীয় বহু বিষয় রয়েছে আজকের বাঙালীর পক্ষে। গৌরবমণ্ডিত ছাত্রজীবন হতে আমৃত্যুকাল তিনি বিভিন্ন মানুষের সম্পর্কে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বের দরবারে উচ্চস্থান লাভ করেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে একটি গৌরবজনক অধ্যায়ের সূচনা। তাঁর বক্তৃতা ও পত্রাবলীর থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতিসহযোগে গ্রন্থকার এই মনীষীর জীবন পর্যালোচনার চেষ্টা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সামগ্রিক রূপলাভ না করলেও গ্রন্থকারের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়।

তপোময় তুষারতীর্থ— (ভ্রমণ)—সুকৃতি রায়চৌধুরী। পূর্বাচল প্রকাশনী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা-১২। দাম : সাড়ে বার টাকা।

সুকৃতি রায়চৌধুরীর এই ভ্রমণ-কাহিনী শুধু তীর্থযাত্রীর ভক্তিরসাপ্লুত ভ্রমণ-কথা নয়, তিনি পথের নেশায় আকুল হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন বিশাল ভারতের গিরিকন্দর, সিন্ধু, তটিনীতীর চির-উৎসুকের দৃষ্টিতে দেখার জন্য। অধ্যাত্ম-সাধনা বা জীবন-জিজ্ঞাসার মোহের সূক্ষ্ম ভাবপ্রবণতায় তিনি বাঁধা নন, তার মধ্যে তীর্থযাত্রী, ট্যুরিস্ট ও সাইটসিয়ার এই তিন সত্তার মিলন ঘটেছে। ভূমিকায় প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেছেন—"লেখক যে সকল স্থানে ভ্রমণে গিয়াছিলেন সে

সকলের বিবরণ পর্বেও একাধিক লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তরুণের যে-উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা, যে-অস্থিরতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা ঘর ছাড়িয়া কণ্টকর ভ্রমণে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহার প্রভাব বৈজ্ঞানিকের বা ধর্মজ্ঞানরতের রচনায় প্যাওয়া যায় না।" শ্রীযুক্ত রায়-চৌধুরীর অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় 'তপোময় তুষারতীর্থ' একটি অনবদ্য ভ্রমণ-কাহিনী হয়ে উঠেছে। তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য আছে, সোজা ও বাঁকা চোখে তাকিয়ে নিস্পৃহভাবে জীবন-দর্শনের শক্তি আছে, তাই এই গ্রন্থটি ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে সার্থকতালাভ করেছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে নিম্নলিখিত পুস্তক-পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছে:—

মন্টিমধু রবীন্দ্র-রংগ সংখ্যা—কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত।

স্বগত—রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা—সুব্রত সান্যাল ও গোপাল ভট্টাচার্য।

ছোটগল্প—রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা—লালমোহন দাস, সুভাষ বসু।

আবাহন—রবীন্দ্র-শতবর্ষ সংখ্যা—সুধীন্দ্রকুমার পালিত।

কবিপত্র (কবিতার ত্রৈমাসিক)—তরুণ সান্যাল ইত্যাদি।

চতুরংগ—হুমায়ুন কবীর।

পঁচিশে বৈশাখ—রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী জন্ম-জয়ন্তী কেন্দ্রীয় পরিষদ, দিল্লী।

দেয়াল—শৈলেন্দ্রনাথ বসু, সুখেন্দু ভট্টাচার্য।

মাসের খবর—রাধাদামোদর মিত্র।

সপ্তর্ষি—ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বাটা-নগর।

গ্রাম-সেবকের চিঠি— পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ উন্নয়ন বিভাগ।

রবিপ্রকাশ—সুখময় বসু ও সুধীর সেন।

বহ্নিশিখা—উত্তমকুমার দাস।

ইঙ্গিত—সমর ঘোষ।

নবান্ন—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

ঘরে বাইরে—কনক মুখোপাধ্যায়।

মাসিক বসুমতী—প্রাণতোষ ঘটক।

উত্তরা—সুরেশ চক্রবর্তী, কাশী।

কল্যাণী—শংকর সেনগুপ্ত।

মহিলা মহল (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী শ্রদ্ধা-স্মরণ সংখ্যা)—অঞ্জলি বসু।

ভারতবর্ষ—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও —শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান—প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশত-বর্ষ সংখ্যা—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

বর্তিকা—শ্রীঅরবিন্দ মন্দির Sri Aurobindo Mandir Annual Jayanti Number 20

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

॥ছবির মুক্তি ও ছবিঘর॥

পঞ্জিকা খুলে দেখলুম, মা আসছেন হাতীতে চেপে, যার ফল হচ্ছে—"গজেচ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।" জলদা যে, তা তো প্রতিনিয়তই টের পাওয়া যাচ্ছে, ড্যালহাউসী স্কোয়ারের মতো জায়গাতেও যখন প্রায় সাঁতার কেটে রাস্তা পার হ'তে হয়, আর ট্রামবাস অচল হয়ে পড়ে—অবশ্য অনেক সময় বাস পূর্ব-নির্ধারিত পথ ছেড়ে অনেক ছোট বড় রাস্তা ধ'রে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে চেষ্টা করে—ঐ ড্যালহাউসী স্কোয়ার থেকেই জল ভেঙে, কাদা ঠেলে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করতে করতে বাড়ী পৌঁছুতে সন্ধ্যে ছ'টার জায়গায় রাত এগারোটা হয়। কিন্তু ঐ পরের কথাটুকু যে ফলবেই অর্থাৎ বসুন্ধরা না হোক, আমাদের এই 'সোনার বাঙলা'য় ধানচাল ভালো রকম হবে, সে-কথা আমরা হলফ ক'রে বলতে পারি না, বলতে পারেন হয়ত' আমাদের সরকারের সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান বিভাগ।—কিন্তু যে ভেবে পঞ্জিকার পাতা উল্টেছিলুম, তাতো মিলল না। আমাদের এই পশ্চিম-বঙ্গের চলচ্চিত্র-রাজ্যের যা বর্তমান অবস্থা, তাতে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলুম যে, মা এবার নিশ্চয়ই ঘোটকারোহণে বঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণা হচ্ছেন, নইলে সব জায়গাতেই এমন ছত্রভঙ্গের ভাব কেন? তিন তিনখানা—দু'খানি হিন্দী এবং এক-খানি বাঙলা—ছবির মুক্তির ব্যবস্থা সব ঠিক, বার-তারিখ-সময় এবং নির্দিষ্ট ছবিগুলির নাম পর্যন্ত ঘোষিত হয়ে গেল। আমরা মনে মনে খুশী হয়ে উঠলুম, বেশ কিছু দিন বাদে কয়েকখানি ভালো ছবি দেখতে পাব ভেবে, ও হরি, হা হতোস্মি! সুনীল শারদ আকাশ থেকে আচম্বিতে বজ্রপাতের মতো ২১-এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী সিংহ রায় দিলেন, "সিনেমা শিল্প সম্পর্কে ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম বেতন আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬০ সালের ১৬ই মে তারিখে সিনেমা শিল্পের ন্যূনতম বেতন ধার্য ক'রে যে বিজ্ঞপ্তি জারী করেছেন, তা অসিদ্ধ এবং সেই কারণে তা নাকচ করে দেওয়া হ'ল।"

অজয় কর পরিচালিত আলোছায়া প্রোডাকসন্সের 'সপ্তপদী' চিত্রে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

বিজ্ঞপ্তিটিকে অসিদ্ধ বিবেচনা করবার অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, সিনেমা-শিল্পে ন্যূনতম বেতন ধার্য করবার উদ্দেশ্যে যে-উপদেষ্টা কমিটি গঠিত করা হয়েছিল, তাতে তিনজন স্বতন্ত্র সদস্যের মধ্যে দু'জন ছিলেন খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম বিভাগীয় কর্মচারী, যাঁরা নাকি আইন অনুসারে "স্বতন্ত্র সদস্য" হিসাবে গণ্য হ'তে পারেন না। অথচ শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর আগে বিভিন্ন শিল্পে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের জন্যে যে-কটি উপদেষ্টা পরিষদ (যতদূর জানা আছে, অন্ততঃ তেরটি) গঠন করেছিলেন, তার সব কটিতেই সরকারের শ্রম বিভাগীয় কর্মচারীরা "স্বতন্ত্র সদস্য" হিসেবে ছিলেন। এবং উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশ মত কাজ করতে সরকার সব সময়ে বাধ্যও নন। মনে হয়, কোনো বিশেষ শিল্পের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্যই সরকার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে থাকেন।

যাত্রিক পরিচালিত 'কাঁচের স্বর্গ' চিত্রে [illegible]

যাই হোক, বিচারপতি শ্রী সিংহের রায় পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থাকে বেশ ঘোরালো ক'রে তুলেছে, যার ফল আপাততঃ একটি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব বিরাজ করছে। বিধানসভাতে শ্রীজ্যোতি বসু এই গুরুতর পরিস্থিতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শ্রম-মন্ত্রী শ্রীআবদুস সত্তার বলেন যে. বিচারপতি শ্রী সিংহের রায় পর্যালোচনা করার পর রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং আশ্বাস দেন যে, সে-ব্যবস্থা ন্যূনতম বেতন আইন যাদের জন্যে হয়েছে, তাদের পক্ষেই হবে।

কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতদিন না কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন, ততদিন পর্যন্ত শ্রমিক এবং মালিক, কোনো পক্ষেরই স্বস্তি নেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ছবির দর্শক-সম্প্রদায় ও কাগুজে সমালোচকবৃন্দও আশাপথ চেয়ে বসে থাকতে বাধ্য। চিত্র-রসিক মহলের শারদীয়া পুজোর আনন্দ কি শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাসে ভ'রে উঠবে?

॥ একটি নাট্যোৎসব ॥

"রূপকার" শিল্পীসংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব পালিত হ'ল গেল সোমবার, ২৫-এ থেকে শুক্রবার, ২৯-এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিন প্রতি সন্ধ্যায় ৭টা থেকে। এঁরা এই পাঁচ দিনে পর পর অভিনয় করলেন—অমৃতলালের "ব্যাপিকা-বিদায়", রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান'-এর বীরু মুখোপাধ্যায়-কৃত নাট্যরূপ, বীরু মুখোপাধ্যায়ের "আহিতাগ্নিক". তুলসী লাহিড়ীর "দুঃখীর ইমান" এবং অমৃতলালের "তিলতর্পণ"। পর পর পাঁচ দিন ধরে অভিনয় করবার জন্যে অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত ভালো জায়গা সংগ্রহ করতে না পেরেই রূপকার-গোষ্ঠী তাদের উৎসব-স্থল করেছিলেন "মহাজাতি সদন"কে। এ-কথা বলার কারণ এই যে. প্রকাণ্ড বড় প্রেক্ষাগৃহ এবং বিস্তৃত মঞ্চ থাকা সত্ত্বেও "মহাজাতি সদন" শব্দ-প্রক্ষেপন বিষয়ে গুরুতর ত্রুটি থাকার জন্যে মাত্র যে অভিনয়ের জন্যেই অনুপযুক্ত, তা নয়, যে-সব অনুষ্ঠানে মাত্র দেখা ছাড়াও শোনবার কিছু থাকে, সেই সব অনুষ্ঠানের পক্ষেই অত্যন্ত পীড়াদায়ক স্থান। তাই "রূপকার"-গোষ্ঠী তাঁদের অভিনয়কে দর্শকদের শ্রবণযোগ্য করবার জন্যে মঞ্চে প্রচুর—কম ক'রে পাঁচ-সাতটি মাইক্রোফোন-এর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সবিতাব্রত দত্তের নেতৃত্বে "রূপকার" ক্রমেই যে একটি শক্তিশালী শিল্পী-গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে, এর বহু নিদর্শনই পেলুম এঁদের এই নাট্যোৎসবের মাধ্যমে, যেমন পেলুম নাটক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এঁদের পুরাতনের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধার পরিচয়। "ব্যাপিকা-বিদায়" এবং "তিল-তর্পণ"এর অভিনয়ে মঞ্চের ওপর সেই বিস্মৃতপ্রায় বিগত দিনের আবহ ফুটিয়ে তোলার যে ঐকান্তিক সমষ্টিগত চেষ্টা দেখতে পাওয়া গেল, তা যে ঐ গোষ্ঠী সম্বন্ধে সমবেত দর্শককে রীতিমত শ্রদ্ধাবান ক'রে তুলেছে, এ-কথা অনস্বীকার্য।

আজ থেকে প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে মিনার্ভা থিয়েটারের "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। এবং সে-অভিনয়ের ছবি কালের ব্যবধান খুব বেশী মলিন করতে পারেনি। তাই "রূপকার" অনুষ্ঠিত "ব্যাপিকা বিদায়" দেখতে দেখতে স্বভাবতঃই সেই পুরাতন চিত্র বারংবার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। সমালোচক-মন বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাই দুই অভিনয়ের মধ্যে একটি তুলনামূলক দৃষ্টিকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

"ব্যাপিকা বিদায়"-এর ঘটনা যদিও মাত্র একটি দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তবুও অমৃতলালের "ব্যাপিকা বিদায়" একাঙ্কিকা নয় এবং একটি মাত্র দৃশ্যেও অভিনীত হয়নি। যত দূর মনে পড়ে, এই "প্রমোদ প্রহসন"টি তিনটি দৃশ্যে অভিনীত হয়। "মিনার্ভা"র অভিনয়ে সঞ্জীব চৌধুরী এবং ঘনশ্যামের ভূমিকায় কুঞ্জলাল চক্রবর্তী এবং হীরালাল চট্টোপাধ্যায় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন। কুঞ্জবাবুর মুখের 'ইয়ে কায়দা হো গয়া বিবি, ইয়ে কায়দা হো গয়া; দেহেলি, পঞ্জাব, পেশাওয়ার মে জিন্দগি গুজর গয়া' আর হীরালালবাবুর চমৎকারের নাম শুনে "মিষ্টি! স্বদেশের মত মিষ্টি!" ব'লে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করা যে শুনেছে এবং দেখেছে, সে-ভাগ্যবান জীবনে ভুলতে পারবে না। তবু বলব, বঙ্কিম ঘোষের ঘনশ্যাম এবং সবিতাব্রত দত্তের সঞ্জীব চৌধুরী আমাদের খুশীই করেছে। অবশ্য "ব্যাপিকা-বিদায়"-এর সঞ্জীব চৌধুরী যে মস্তবড় কালোয়াতি গাইয়ে ছিলেন, তা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলুম সবিতাব্রতর অভিনয় দেখে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এও আবিষ্কার করলুম যে, সবিতাব্রত দত্ত শুধু একজন শক্তিশালী অভিনেতাই নয়, তিনি একজন যথার্থ উঁচুদরের গাইয়ে। যে অনায়াস-ভঙ্গীতে তিনি সেদিন সঞ্জীব চৌধুরী বেশে দর্শকদের মধ্যে মার্গ সঙ্গীতের সুরজাল রচনা করলেন, তাতে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, আমরা কোনো মিউজিক কনফারেন্সের আসরে বসে আছি। এতে অবশ্য নাটকও যে মধ্যপথে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছিল, এ-তথ্য নিশ্চয়ই সবিতাবাবুর অজানা ছিল না। আর একটি কথা। উপযুক্ত অঙ্গ-সজ্জা সত্ত্বেও সবিতাবাবুকে তাঁর যুব-

কোচিত চলন-ফেরন-বাচনের জন্যে যথেষ্ট বয়স্ক ব'লে ভ্রম হচ্ছিল না।

তুলনামূলকভাবে বলতে পারি, মিনার্ভার "ব্যাপিকা বিদায়"-এর মিঃ ও মিসেস রায় থেকে "রূপকার"-এর মিঃ ও মিসেস রায় সব দিক থেকেই ভাল। মুক্তি গোস্বামী ও নির্মল চট্টোপাধ্যায় চেহারা, সাজগোজ এবং অভিনয়—তিনের জন্যেই অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। গীতা দত্তের "চমৎকার" অভিনয়ের দিক দিয়ে বেশ ভালো; কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই সে-যুগের আঙুরবালার মত সুকণ্ঠের অধিকারী নন এবং তাঁর মত উচ্চ পর্যায়ের গাইয়েও নন। সবশেষে যিনি ব্যাপিকা অর্থাৎ দজ্জাল শাশুড়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি যথাসম্ভব সু-অভিনয়ের চেষ্টা করলেও সর্বত্র সমতা রক্ষা করতে পারেননি। এই ভূমিকাটিতে নগেন্দ্রবালা তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর স্থূলাঙ্গ অন্য বহু ক্ষেত্রে তাঁর অভিনয়কে—এমন কি তাঁর সমগ্র অভিনয়-জীবনকে বাধাগ্রস্ত করলেও এই বিশেষ ভূমিকাটিতে তাঁকে অত্যন্ত সাহায্য করেছিল। এবং সে-যুগের বহু নাট্যবেত্তার সুচিন্তিত মত হচ্ছে, নগেন্দ্রবালা যদি স্থূলদেহা না হয়ে পড়তেন, রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁর স্থান হ'ত তিনকড়ি, বিনোদিনী, তারাসুন্দরীর সংগে একই পংক্তিতে।

"তিলতর্পণ"-এ রূপকার-গোষ্ঠী খোদার ওপর খোদকারি করেছেন। এবং বলতে বাধা নেই, নাটকের প্রারম্ভ ভাগে "কমলাকান্তের জবানবন্দী"র যোজনা রসিক-জনোচিতই হয়েছে। পুরাতন আবহ-সৃষ্টির জন্যে গোটানো পর্দার ব্যবহার এবং মধ্যে ঐকতান-বাদন দর্শককে নিশ্চয়ই অন্ততঃ চল্লিশ বছর পেছিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তবে প্রতি দৃশ্য পরিবর্তনেরই ফাঁকে নেপথ্য থেকে ঐকতান বাদন অভিনয়কে অনাবশ্যক দীর্ঘ ক'রে তুলেছে এবং নাটকের প্রবহমান রঙ্গরসকে ব্যাহত করেছে অনাবশ্যকভাবে। অভিনয়ে প্রত্যেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে নিজ নিজ ভূমিকার রূপদান ক'রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং ওরই মধ্যে যদি বিশেষ ক'রে নাম করতেই হয়, তবে কমলাকান্তের ভূমিকায় সবিতাব্রত দত্ত ও বাপ্পারাওএর ভূমিকায় বঙ্কিম ঘোষের অনবদ্য অভিনয়চাতুর্যের উল্লেখ করব। এবং প্রসন্ন গয়লানীর ভূমিকায় বাণী দাশগুপ্তার।

দ্বিতীয় দিনে এ'রা করেছিলেন বীরু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত, রবীন্দ্রনাথের "মাল্যদান"। সহকারের ঘনসান্নিধ্যে একটি বনলতা যেমন সহসা মঞ্জরিত হয়ে ওঠে, তেমনি একটি অপরিণত মনের মেয়েকে দিয়ে নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রেমের খেলা খেলাতে খেলাতে একদিন হঠাৎ সেই খেলা রূপান্তর গ্রহণ করে কি মর্মান্তিক সত্যবস্তুতে পরিণত হয়, তারই এক অপরূপ মধুর আলেখ্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মাল্যদান" গল্পে। রবীন্দ্রনাথের মার্জিত রুচি, তাঁর কাব্যময় ভাষা এবং রসপরিবেশনে মুন্সিয়ানার সংগে সম্যক পরিচয় না থাকলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহসেরই নামান্তর। শক্তিমান নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায় মূল গল্পের নাট্যবস্তুটিকে ঠিকই রূপায়িত করেছেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও রুচির প্রতি সম্যক দৃষ্টি দেননি, একথা আমরা বলতে বাধ্য; একটি মাত্র কক্ষ-দৃশ্যের মাধ্যমে সমস্ত ঘটনাকে দেখানোর অন্যায় চেষ্টাতেও নাটক যথেষ্টই ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লে মনে হয়। বিশেষ ক'রে অসুস্থ কুড়ানীকে ঐ একই কক্ষের মধ্যে একরকম হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসা ঐ বিশেষ দৃশ্যের নাট্যরস-সৃষ্টিতে অত্যন্ত বাধা পেয়েছে। অভিনয়ে প্রত্যেকেই দলগত ঐক্যের পরিচয় দিয়েছেন—একটি অখণ্ড রূপ ফুটিয়ে

নীতিন বসু পরিচালিত 'গংগা যমুনা' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা ও দিলীপকুমার
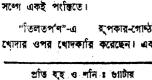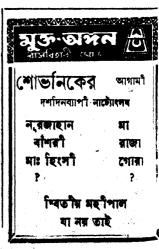
তুলতে চেয়েছেন সকলে মিলে। তবে ওরই মধ্যে বিশেষ ক'রে নাম করব ধনার-বৌ-এর ভূমিকায় অসামান্য চরিত্রাভিনেত্রী বাণী দাশগুপ্তার। পটলরূপে ঝর্না দেবী হাসিতে-কান্নায়-বাচনে ভঙ্গীতে-চাউনিতে-ইঙ্গিতে চরিত্রটিকে মূর্ত করে তুলেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং তেমনই হয়েছে সরলতার প্রতিমূর্তি, প্রকৃতির দুলালী কুড়ানী বেশে গীতা দত্তের স্বচ্ছন্দ অভিনয়।

অপর দু'দিনের অভিনয় আমরা দেখিনি ব'লেই সে-সম্পর্কে নীরব থাকতে বাধ্য হলুম।

"রূপকার"-গোষ্ঠী এই নাট্যোৎসব উপলক্ষে একটি অত্যন্ত শোভন পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এই পত্রিকায় পাঁচ দিনের অভিনয়সূচীর সঙ্গে আছে বহু নাট্য-বিষয়ক রচনা, যার মধ্যে তুলসী লাহিড়ীর 'নাটক ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ', শচীন সেনগুপ্তের 'আগামী কালের প্রস্তুতি', ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভরতনাট্যশাস্ত্র', অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'নাটকে কৌতুহল', ডঃ অজিতকুমার ঘোষের 'অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ', সুনীত মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে যাত্রাদলের ভূমিকা' প্রভৃতি বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। আমরা 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠীর দীর্ঘজীবন এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ কামনা করি।

অসিত সেন পরিচালিত ও তারাশঙ্কর রচিত "আগুন" চিত্রে সৌমিত্র ও কণিকা মজুমদার

তার ছন্নছাড়া সমাজপরিত্যক্তার পরিবেশ থেকে নিজ দেহসৌন্দর্যকে পণ্য করে এবং মাদকতা ও ধার্মিকতার মুখোশকে আশ্রয় ক'রে সহসা একদিন চিত্রতারকার দীপ্তি নিয়ে জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই ছবিখানি 'বর্তমানের কথা' হিসেবে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

* * *

এরই সঙ্গে পরিতোষ সেন অঙ্কিত চিত্রাবলীর ওপর আট মিনিট স্থায়ী একটি দলিল-চিত্র দেখানো হয়। শ্রীসেনের অঙ্কনধারার ক্রমবিবর্তন দেখিয়ে এই চিত্রখানির পরিচালনা করেছেন শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী এবং নেপথ্য-ভাষণ ও সঙ্গীতের ভার নিয়েছেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত।

* * *

বিবিধ সংবাদ

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

গেল ২রা অক্টোবর, সকাল ১০-৩০-এ ম্যাজেস্টিক সিনেমায় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে জন ক্রমওয়েল পরিচালিত "দি গডেস" ছবি দেখানো হয়। বর্তমানে যে-ভাবে একটি নগণ্য নারী

ঝংকার সংগীত-চক্র গেল ৩০-এ সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর—তিনটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পালন করেন রবীন্দ্র সরোবরের স্টেডিয়াম হলে। এই অনুষ্ঠানে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌরোহিত্য করেন এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও ডঃ বি এন মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

* * *

দি সার্কেল ক্লাব

রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে "দি সার্কেল ক্লাব" গেল ২রা অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার সময় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' অভিনয় করেন। ডঃ কালিদাস নাগ এবং তুষারকান্তি ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

প্রতিষ্ঠান-সম্পাদক দিলীপ রায়ের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর সভাপতি এবং প্রধান অতিথিরূপে ডঃ কালিদাস নাগ ও

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সংক্ষেপে দু'চার কথা বলেন। এর পর আরম্ভ হয় 'চোখের বালি'র অভিনয়। শ্রীমতী হাসি দাশগুপ্তার দেওয়া নাট্যরূপে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন সবিতা চৌধুরী (রাজলক্ষ্মী), লীলা বসু (অন্নপূর্ণা), হাসি দাশগুপ্তা (দিদিমা), ইতি চট্টোপাধ্যায় (বিনোদিনী), আরতি চট্টোপাধ্যায় (আশা বা চুণি), অমিয় চট্টোপাধ্যায় (মহেন্দ্র), নীতিন রায়চৌধুরী (বিহারী) প্রভৃতি আরো অনেকে। অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে যে-অভিনয়, সেখানে ভালো-মন্দর কোনো প্রশ্ন থাকেনা; সবাই মিলে অভিনয় যে হচ্ছে এবং সবাই মিলে সেই অভিনয় প্রাণ ভ'রে দেখছে, সেইটেই বড়ো কথা। তবু ওরই মধ্যে যদি কারো কারো বিশেষ ক'রে নাম করতে হয়, তাহ'লে আশা, রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের ভূমিকায় যথাক্রমে আরতি চট্টো, সবিতা চৌধুরী, ইতি চট্টো এবং অমিয় চট্টো-রই নাম করতে হয়। সার্কেল ক্লাবের আনন্দ দেওয়া এবং পাওয়ার সাধু উদ্দেশ্য যেন বহুকাল পর্যন্ত অটুট থাকে।

* * *

গেল ২৫-এ সেপ্টেম্বর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ঘুঘুডাঙ্গা শাখা ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'মরু-ঝঞ্ঝা' নাটকটি অভিনয় করেন নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট মঞ্চে।

* * *

ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণে কল্লোল ফিল্ম প্রযোজিত এবং মৃণাল সেন পরিচালিত "বাইশে শ্রাবণ" ছবিটি আগামী লণ্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলি থেকেই এই ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনের জন্যে চিত্র নির্বাচিত হয়। এর আগে যে-দু'খানি ভারতীয় ছবি এই উৎসবে দেখানো হয়েছে তা হল সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার' ও 'জলসাঘর'।

* * *

পোলিশ চিত্রজগতের প্রধান তিন পরিচালকের অন্যতম আন্দ্রেজ মুনক গেল ২০-এ সেপ্টেম্বর হঠাৎ মোটর দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। মুনক-এর আধুনিকতম ছবি "ব্যাড্ লাক্" কান ও লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছিল। 'সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা' আয়োজিত আসন্ন পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবিখানি দেখানো হবে।

* * *

চলচ্চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে গেল ৩০-এ সেপ্টেম্বর আমেরিকা যাত্রা করেছেন। সেখানে তিনি চলচ্চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কয়েকটি বক্তৃতাও দেবেন। ছয় সপ্তাহব্যাপী সফরের মধ্যে তিনি সান্-ফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম বিচারকের কাজও করবেন। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ১লা নভেম্বর থেকে ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত।

* * *

গেল ২৪-এ সেপ্টেম্বর বার্ণপুরের 'মুক্তধারা সম্প্রদায়' তাঁদের রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকটি অভিনয় করেন স্থানীয় ভারতী-ভবন মঞ্চে। ব্যক্তিগত ও দলগত অভিনয়ে, মঞ্চ-সজ্জায়, আলোক-সম্পাতে, সঙ্গীত ও আবহ-শব্দ যোজনায় অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দিয়ে এঁরা দুরূহ রূপক নাটকটিকে রসোত্তীর্ণভাবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শোনা গেল, আসানসোল অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে নাটকখানি অভিনীত হবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

* * *

সত্যজিৎ রায় সম্প্রতি দার্জিলিং গিয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী ছবির চিত্রনাট্য রচনাকে [illegible] করবার জন্য। ছবির গল্পও তাঁর নিজেরই লেখা। আশা

কর। যাচ্ছে। নভেম্বরের প্রথম দিক থেকেই ছবিখানির স্যুটিং শুরু হবে।

॥ বিচিত্রার অনুষ্ঠান ॥

দক্ষিণ কলিকাতার সর্বাধুনিক সাংস্কৃতিক সংস্থা "বিচিত্রা" আগামী ১১ই অক্টোবর, বুধবার, ১৯৬১, একাডেমি অব ফাইন আর্টস্ হলে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব পালনের আয়োজন করেছে। বিচিত্রার নাট্য-পরিচালক শ্রীতরুণ মিত্রের পরিচালনায় কবিগুরুর "অরূপরতন" নাটকটি ঐ দিন মঞ্চস্থ হবে। আলোক-সম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীরঞ্জিত মিত্র।

সংস্থার সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—"অতীতের প্রবহমান ধারা ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যেই "বিচিত্রার" প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা ও বিশেষ করে নাট্য-শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক চর্চাই হবে বিচিত্রার ব্রত। এ ব্রতে উৎসাহী রসিকজনের সহানুভূতি ও সহায়তা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্বল।"

ঐ দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং সুসাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

॥ সারা বাংলা আন্তঃ অফিস একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ॥

আনন্দম্ আয়োজিত সারা বাংলা আন্তঃঅফিস একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা এবারও নবনির্মিত কাশী বিশ্বনাথ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে। ২১টি নাটক এবার মনোনীত হয়েছে। ২১০০ দৈনিক পত্র ও ৬০০ ঋতু-পত্র বিতরণ করা হবে। অগ্রে আবেদনকারিগণ অগ্রাধিকার পাবেন। যে-কোন অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুমোদনক্রমে একজন মাত্র একটি পত্র পেতে পারেন। ১০ই অক্টোবরের পরে কোন প্রবেশপত্রের জন্যে আবেদন গ্রহণ করা হবে না। প্রতি-

---

এম কে জি প্রোডাকসন্সের 'মা' চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও বিকাশ রায়

যোগিতার মধ্যে আছেন ঃ—কোটস্ অব ইণ্ডিয়া, ট্রেজারি বিল্ডিং, সাপ্লাই একাউণ্টস্, ডিফেন্স একাউণ্টস্, স্টেট ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, হোম ট্রান্স-পোর্ট, স্টেট পাসপোর্ট, জয় ইঞ্জিনীয়ারিং, জে কে স্টাফ, টি পি এম, এ আই ডি, আই সি আই, স্টেশনারী অফিস, কলিঃ কর্পোরেশন একাউণ্টস্, ল্যাভলক লুইস, এ্যাটলাস ষ্টিটন, পঃ বঃ মধ্য-শিক্ষা-পরিষৎ, ক্যালটানস্, বালিগঞ্জ রেলিং, মাণিকতলা রেশনিং অফিস প্রমোদ সংস্থাগুলি।

।। উদয়নের অনুষ্ঠান ।।
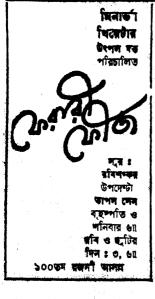
রবীন্দ্রনাথের বাসভবন উদয়ন-এর অনুভাবে যার নামকরণ এমন সংস্কৃতি আজ্ঞা উদয়ন আসর তাদের রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ—তথা শারদোৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আগামী ৯ই অক্টোবর মহালয়া দিবসে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় মহাজাতি-সদনে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবে।

যে সুর-মন্দির প্রতিষ্ঠান শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে কাঠমাণ্ডু থেকে কোয়েম্বাটোর, চণ্ডীগড় ও বোম্বাই থেকে ডিব্রুগড় ও আগরতলা পর্যন্ত সর্বত্র সুখ্যাতি অর্জন করেছে, সেই সুরমন্দিরই এই উপলক্ষ্যে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' মঞ্চস্থ করবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যারা তাঁর নৃত্যনাট্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতী নৃত্যবিদ বালকৃষ্ণ মেননের নৃত্যপরিচালনায় তিনি নিজেই বজ্রসেনের নৃত্যাংশ অভিনয় করবেন। কোটালের ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি নাগ এবং শ্যামার ভূমিকায় নিপুণা শিল্পী চিত্রামণ্ডলের সঙ্গে আর যাঁরা থাকবেন তাঁরা সবাই কৃতী ও অভিজ্ঞ শিল্পী। কণ্ঠ-সঙ্গীতে নেতৃত্ব করবেন সন্তোষ সেনগুপ্ত।

বহু পরিবেশিত এই 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য আজও যাঁরা দেখেননি তাঁদের কাছে এই সুযোগ লোভনীয়ই মনে হবে। নৃত্যনাট্যের পূর্বে মিতালি গোষ্ঠি রবীন্দ্রনাথের শরতের গান পরিবেশন করবেন।

॥ চতুরঙ্গ সম্প্রদায় ॥

আসছে ১৩ই অক্টোবর চতুরঙ্গ সম্প্রদায় মহারাষ্ট্র নিবাস মঞ্চে 'বনফুল' রচিত 'তিন ভান' অভিনয় করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিন ভান কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটক নয়। বনফুলের তিনটি বাছাই করা 'ভান' একত্রে পরিবেশন মাত্র। 'ভান' তিনটি যথাক্রমে 'লেহ্য', 'নবসংস্করণ' এবং 'কবয়ঃ'। পরিচালনায় বরুণ দাশগুপ্ত। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবে চতুরঙ্গের সভাবৃন্দ।

খেলাধূলা

দর্শক

।। আই এফ এ শীল্ড ।।

১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার কথা লোকের অনেক দিন মনে থাকবে। দু'দিনের খেলাতেও ১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। কোন্ দল প্রথম ছ' মাস শীল্ড রাখবে তার জন্যে টস্ করা হয়। টসে মোহনবাগান জয়ী হয়েছে।

আই এফ এ শীল্ডের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে এই প্রথম দু'টি দলকে একই বছরে বিজয়ী হিসাবে দেখা গেল। নক্-আউট টুর্নামেণ্টে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ান নেই—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল ১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ডের খেলায়। ১৯৬০ সালের প্রখ্যাত ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় দু'দিন ফাইনাল খেলার পরও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অতিরিক্ত সময়ে খেলতে রাজী না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং প্রখ্যাত ফুটবল প্রতিযোগিতা তিনটি—দিল্লীর ডুরাণ্ড কাপ, বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ এবং ক'লকাতার আই এফ এ শীল্ড। এই তিনটি প্রতিযোগিতার যে কোন একটিতে জয়লাভ করার গৌরব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে ১৮৮৮ সালে, রোভার্স কাপ ১৮৯১ সালে এবং আই এফ এ শীল্ড ১৮৯৩ সালে। গত বছর ডুরাণ্ড কাপের ফাইনালে নক্-আউট টুর্নামেণ্টের প্রচলিত রীতি-নীতি প্রথম ভঙ্গ করা হয়। এ বছরের আই এফ এ শীল্ডের খেলাতেও তাই করা হল। এখন রোভার্স কাপ বাকী রইল। ফুটবল ইংরেজদের জাতীয় খেলা এবং তাদেরই নিয়মে আমরা ফুটবল খেলি। ইংলণ্ডের বিখ্যাত এফ এ কাপ প্রতিযোগিতা—নক্ আউট টুর্নামেণ্ট; ১৮৭২ সালে সুরু হয়েছে। এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে কখনও দু' দলকে একই বছরের এফ এ কাপ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়নি। ১৯৫২ সালে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান-রাজস্থান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। দু'দিন খেলা ড্র যায়; কিন্তু দু' দলকে যুগ্ম বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। খেলাটি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৬১ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ক'লকাতার দু'টি জনপ্রিয় ফুটবল দল—মোহনবাগান এবং ইস্ট-

আই এফ এ শীল্ড

বেঙ্গল খেলেছিল। খেলায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল—কিন্তু দু' দিনেরই খেলা উচ্চাঙ্গের হয়নি। কারণ ২য় দিনের অতিরিক্ত সময় খেলেও কোন পক্ষই গোল করতে পারেনি। গোলই যেখানে জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি সেখানে কোন দলই যদি গোল দেওয়ার একাধিক সহজ সুযোগ পেয়েও গোল দিতে না পারে তাহলে খেলাটিকে মোটেই উচ্চ পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের ভাল খেলার দরুণ যদি এক দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা গোল দেওয়ার সুযোগ না পায়, তা হলে অন্য কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয়নি।

প্রথম দিনের খেলায় মোহনবাগান দল গোল দেওয়ার যে সব সহজ সুযোগ পায় সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারলে তাদের আর দ্বিতীয় দিন খেলতে হ'ত না।

ফাইনালের প্রথম দিন ইস্টবেঙ্গল দল তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। সেমি-ফাইনাল খেলার দ্বিতীয়ার্ধে তারা যে রকম দাপটের সঙ্গে খেলে গত বছরের রানার্স-আপ ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে নাস্তানাবুদ করেছিল মোহনবাগানের বিপক্ষে ফাইনালে সেই ইস্টবেঙ্গল দলই যে খেলছে তা ভাবতে গিয়ে অনেকেই হতাশ হয়েছিলেন। ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা মোহনবাগান দলের গোল মুখে বেশীবার বল নিয়ে আসতে পারেনি এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের আক্রমণধারা মোহনবাগান দলের রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়দের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যায়।

অপর দিকে মোহনবাগান দল প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় যে রকম খেলেছিল এবং খেলায় গোল দেওয়ার যে রকম সহজ সুযোগ পেয়েছিল তাতে তারা একাধিক গোলে জয়ী হলে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ত না। কিন্তু আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের চরম ব্যর্থতার দরুণ তাদের হতাশ হয়ে মাঠ ত্যাগ করতে হয়। খেলা শেষ হওয়ার দু' এক মিনিট আগেও মোহনবাগানের গোল দেওয়ার একটা সহজ সুযোগ নষ্ট হয়। দীপু দাসের সেণ্টার থেকে লেফট আউট অরুময়নৈগম গোল লাইন থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে বল পান; গোলে অসহায় গোলরক্ষক ছাড়া আর কেউ

ছিল না। কিন্তু এলোপাতাড়ি ভলি মারার দরুণ বলটি বারের উপর দিয়ে ছুটে যায়। যে অসহায় অবস্থায় গোল-রক্ষক দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে বলটি ঠেলে দিলেই যথেষ্ট হ'ত। এই দিনের খেলায় উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন মোহনবাগান দলের জার্নেল সিং।

দ্বিতীয় দিনের খেলার ছবি সম্পূর্ণ অন্য রকম। প্রথম দিনের মত দ্বিতীয় দিনে একতরফা খেলা হয়নি। এইদিন ইস্টবেঙ্গল আগের দিনের থেকে অনেক

আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার ফলাফল :

১৯৪৫ ইস্টবেঙ্গল ১ : মোহনবাগান ০
১৯৪৭ মোহনবাগান ১ : ইস্টবেঙ্গল ০
১৯৪৯ ইস্টবেঙ্গল ২ : মোহনবাগান ০
১৯৫১ ইস্টবেঙ্গল ০, ২ : মোহনবাগান ০, ০
১৯৫৮ ইস্টবেঙ্গল ১ : মোহনবাগান ০
১৯৫৯* মোহনবাগান : ইস্টবেঙ্গল
১৯৬১ মোহনবাগান ০, ০ ইস্টবেঙ্গল ০, ০

* ১৯৫৯ সালে খেলা পরিত্যক্ত হয়।

ভাল খেলেছে। কিন্তু কোন মতেই উচ্চাঙ্গের খেলা বলা যায় না। খেলার এক সময়ে মোহনবাগান বিপক্ষ দলের রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়দের ভুল খেলার দরুণ আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল অল্প সময়ের মধ্যেই সামলে নিয়ে প্রতি আক্রমণ চালায়। দুই দলই গোল দেওয়ার কয়েকটি সহজ সুযোগ পায় কিন্তু অতি তৎপরতা এবং

আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী আটটি ভারতীয় দল

মোহনবাগান—৬ বার; **ইস্টবেঙ্গল**—৬ বার; **মহমেডান স্পোর্টিং**—৪ বার (১৯৩৬, ১৯৪১—৪২ ও ১৯৫৭); **পুলিশ**—১ (১৯৩৯); এরিয়ান্স—১ (১৯৪০); বি এণ্ড এ রেলওয়ে—১ (১৯৪৪); **ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ (বোম্বাই)**—১ (১৯৫৩); **রাজস্থান**—১ (১৯৫৫)।

একই বছরে আই এফ এ শীল্ড ও ফুটবল লীগ কাপ

এ পর্যন্ত সাতটি দল একই বছরে আই এফ এ শীল্ড এবং প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হিসাবে লীগ কাপ জয়ী হয়েছে। সাতটি দলের মধ্যে আছে এই তিনটি ভারতীয় দল :

মহমেডান স্পোর্টিং—২ বার (১৯৩৬ ও ১৯৪১)

ইস্টবেঙ্গল—৪ বার (১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০ ও ১৯৬১*)

মোহনবাগান—৩ বার (১৯৫৪, ১৯৫৬ ও ১৯৬০)

* ১৯৬১ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীল্ড জয়।

ঢিলেমির জন্যে সুযোগগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গোলপোস্ট এবং বারে বল লাগার ঘটনাগুলি সম্পর্কে যদি খেলোয়াড়দের অভিযুক্ত না ক'রে দলের দুর্ভাগ্য বলে ধরা হয় তাহলে বলবো এইদিন ইস্ট-বেঙ্গল দলের ভাগ্য ভাল ছিল না। দ্বিতীয় দিনে প্রথমার্ধের খেলার ২৭ মিনিটে মোহনবাগানের লেফট আউট অরুময়কে গোল থেকে মাত্র তিন গজ দূরে বল পেতে দেখা যায়। কিন্তু তিনি ফাঁকা গোল পেয়েও গোল দিতে পারেননি। এই দিনের খেলায় তাঁর থেকে আর কেউ গোল দেওয়ার এমন সহজ সুযোগ পাননি।

এই দিনেও জার্নেল সিং ছিলেন মাঠের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং তাঁর পরই রাম বাহাদুর।

মোহনবাগান : সনৎ শেঠ; পি সাংখল, জার্নেল সিং ও টি রহমন; কেম্পিয়া ও অমিয় ব্যানার্জি; দীপু দাস, অমল চক্রবর্তী, সালাউদ্দিন, চুণী গোস্বামী ও অরুময়নৈগম।

ইস্টবেঙ্গল : অবনী বসু; বি দেব-নাথ, অরুণ ঘোষ ও চিত্ত চন্দ; শ্রীকান্ত ব্যানার্জি ও রাম বাহাদুর; সুকুমার সমাজপতি, কানন, নীলেশ সরকার, সুনীল নন্দী ও বালু।

রেফারী : নৃসিংহ চ্যাটার্জি।

মোহনবাগানের গোলরক্ষক সনৎ শেঠ ঝাঁপিয়ে পড়ে বুলটি ধরছেন। ছবির বামদিকে ইস্টবেঙ্গল দলের সুনীল নন্দী। পিছন দিকে জার্নেল সিং, কেম্পিয়া এবং নীলেশ সরকার।

॥ ডেভিস কাপ ॥

ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল

দিল্লীর ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের হার্ড কোর্টে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলায় আমেরিকা ৩—২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে ইটালীর সঙ্গে জোন ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

প্রথম দিন উভয় দেশই একটি ক'রে সিংগলস খেলায় জয়লাভ করে। দ্বিতীয় দিনে আমেরিকা ডাবলস খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়। তৃতীয় দিনের দু'টি সিংগলস খেলার মধ্যে প্রথম সিংগলস খেলায় আমেরিকা জয়লাভ করলে খেলায় জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়। দ্বিতীয় সিংগলস খেলায় ভারতবর্ষ জয়ী হ'লে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় আমেরিকার জয় ৩ এবং ভারতবর্ষের ২।

প্রথম দিনের দু'টি সিংগলস খেলার মধ্যে আমেরিকা জয়ী হয় প্রথম সিংগলসে এবং ভারতবর্ষ দ্বিতীয় সিংগলস খেলায় জয়লাভ করে খেলার ফলাফল সমান করে। প্রথম সিংগলস খেলায় এ বছরের উইম্বলেডনের সিংগলস খেলার রাণার-আপ চাক ম্যাকিনলে স্ট্রেট সেটে তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। মুখার্জি'র 'ভলি'গুলি দর্শনীয় হলেও ম্যাকিনলের জোরালো 'সার্ভিস' এবং দর্শনীয় 'গ্রাউন্ড স্টে'র কাছে শেষ পর্যন্ত মুখার্জিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। 'ব্যাক-হ্যান্ড' এবং 'প্লেসে' মুখার্জি যথেষ্ট দুর্বলতার পরিচয় দেন। তৃতীয় সেটে মুখার্জি আপ্রাণ চেষ্টা করে খেলেছিলেন; পর পর দু'টো সেটে হার স্বীকার করার পর চাকের মত খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের বিপক্ষে তিনি যে এরকম প্রাণপণ করে খেলবেন তা কেউ আশা করতে পারেন

হুইটনি রীড

নি। তৃতীয় সেটে ম্যাকিনলে ৯-৭ গেমে মুখার্জিকে পরাজিত করেন। তৃতীয় সেটের খেলায় মুখার্জি দু'বার—৫।৪ গেমে এবং ৬।৫ গেমে অগ্রগামী হয়েছিলেন। ম্যাকিনলে-মুখার্জি'র খেলা শেষ হ'তে ৯৫ মিনিট সময় লাগে।

প্রথম দিনের দ্বিতীয় সিংগলস খেলায় রমানাথন কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে হুইটনি রীডকে পরাজিত করেন। রীড প্রথম এবং তৃতীয় সেটে কিছুটা খেলে-

ডোনাল্ড ডেল

ছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় সেটে একদম খেলতে পারেন নি—কৃষ্ণান তাঁকে ৬-১ গেমে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলসের খেলায় আমেরিকা ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। আমেরিকার পক্ষে খেলেছিলেন চাক ম্যাকিনলে এবং ডোনাল্ড ডেল; অপরদিকে ভারতবর্ষের পক্ষে জুটি ছিলেন রমানাথন কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎলাল; ভারতবর্ষ প্রথম সেটে জয়ী হয় ৭-৫ গেমে; কিন্তু পরবর্তী তিনটি সেটে পরাজিত হয়। প্রেমজিৎলালের দুর্বলতার সুযোগে আমেরিকা খেলায় প্রাধান্য লাভ করে। কৃষ্ণান খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও প্রেমজিৎলালের ত্রুটির জন্যই ভারতবর্ষকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়। শেষ সেটে কৃষ্ণানকে একাই গোলরক্ষা করতে দেখা যায়; কিন্তু তখন আমেরিকার হাতের মুঠোতে খেলা চলে গেছে। বিশেষ কিছু করার ছিল না। ডাবলসের খেলাটি শেষ হ'তে ১১০ মিনিট সময় নেয়।

তৃতীয় দিনের প্রথম সিংগলস খেলায় হুইটনি রীড স্ট্রেট সেটে ভারতবর্ষের উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করলে আমেরিকা ৩—১ খেলায় জয়ী হয়ে জোন-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

মুখার্জি এই দিন মোটেই খেলতে পারেন নি। অপরদিকে রীড পূর্ব দিনের তুলনায় অনেক উন্নত ধরনের খেলার পরিচয় দেন।

এই দিনের দ্বিতীয় সিংগলস খেলায় ভারতীয় চ্যাম্পিয়ান রমানাথন কৃষ্ণান ৬—৩, ৪—৬, ১—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে এ বছরের উইম্বলেডন ফাইনালের রাণার-আপ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় চাক ম্যাকিনলেকে পরাজিত ক'রে ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করেন। কৃষ্ণানের এই জয়লাভ আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ম্যাকিনলে এই দিনের পরাজয় যেমন সহজে ভুলতে পারবেন না, তেমনি কৃষ্ণানও কোনদিন ভুলবেন না তাঁর এই দিনের গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ। ম্যাকিনলে কোর্টের চারপাশ চষে ঝড়ের গতিতে খেলেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণানকে ধৈর্যচ্যুত করতে পারেন নি।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

চাক ম্যাকিনলে ৬-৪, ৬-৪ ও ৯-৭ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান ৬-৪, ৬-১ ও ৭-৫ গেমে হুইটনি রীডকে পরাজিত করেন।

চাক ম্যাকিনলে এবং ডোনাল্ড ডেল ৫-৭, ৬-০, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে রমানাথন

চাক ম্যাকিনলে

কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন।"

হুইটনি রীড ৬—২, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান ৬—৩, ৪—৬, ১—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে চাক ম্যাকিনলেকে পরাজিত করেন।

ভারতবর্ষ

১৯৬১ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইস্টার্ণ-জোনে ভারতবর্ষ ৪-১ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে, ৫—০ খেলায় থাইল্যান্ডকে এবং ইস্টার্ণ জোন ফাইনালে ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে মূলে প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ওঠে।

আমেরিকা

আমেরিকান জোনে আমেরিকা ৫—০ খেলায় ওয়েস্টইন্ডিজকে, ৫—০ খেলায় ইকোয়েডরকে এবং জোন ফাইনালে ৩—২ খেলায় মেক্সিকোকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের সংগে মিলিত নয়।

খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'চাক' ম্যাকিনলের বয়স ২০ বছর। আমেরিকার বাছাই খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্যায় তালিকায় তিনি প্রথমে ৪র্থ স্থান পান। কিন্তু ২নং ও ৩নং বাছাই খেলোয়াড় পেশাদারবৃত্তি গ্রহণ করায় ম্যাকিনলে ২য় স্থানে উঠে যান। গত বছর তিনি ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন। ১৯৬১ সালের আমেরিকান ন্যাশনাল লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে ডেনিস রলস্টোনের সহযোগিতায় তিনি খেতাব লাভ করেন।

মার্টিন রিসেন ডাবলসের খেলোয়াড়, বয়স মাত্র ১৯ বছর। তিনিই দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। গত বছরের সাফল্য লাভের উপর ভিত্তি ক'রে রিসেন এবং তাঁর জুটি রামসে আর্ণহার্ট বাছাই তালিকায় ২য় স্থান লাভ করেন। এ বছর ক্লে কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার ডাবলসের খেলায় তিনি রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছেন।

হুইটনি রীড ১৯৫৬ সালে ক্যানাডার বিপক্ষে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন। বাছাই তালিকায় তিনি আছেন ৬ষ্ঠ স্থানে; বয়স ২৯ বছর। তিনিই দলের বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড়। এ বছর তিনি ক্যানাডিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার সিংগলস ফাইনালে জয়ী

রমানাথন কৃষ্ণান

হয়েছেন। ১৯৬১ সালের আমেরিকান ন্যাশনাল লন টেনিস প্রতিযোগিতায় রীড ৩য় রাউন্ডে অপ্রত্যাশিতভাবে ম্যাকিনলেকে পরাজিত করেন।

ডোনাল্ড ডেল এ বছরের ক্লে কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার সিংগলস খেলায় রানার-আপ হয়েছেন। বয়স ২৩ বছর। বাছাই তালিকায় তিনি ৭নং খেলোয়াড়।

॥ ইউরোপীয় ভারোত্তোলন ॥

ভিয়েনাতে বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার সংগে ইউরোপীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়া ইউরোপীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতাতেও শীর্ষস্থান লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল ঃ ১ম রাশিয়া (৪৪ পয়েণ্ট); ২য় পোল্যান্ড (৩০ পয়েণ্ট) এবং ৩য় হাঙ্গেরী (২৫ পয়েণ্ট)।

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার সাতটি বিভাগে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তাঁরাই ইউরোপীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় (ফেদারওয়েট বিভাগ বাদে) প্রথম স্থান লাভ করেন।

॥ বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ॥

ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রাশিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল ঃ ১ম রাশিয়া (৪২ পয়েণ্ট); ২য় আমেরিকা (২৪ পয়েণ্ট) এবং ৩য় হাঙ্গেরী (১৯ পয়েণ্ট)। ফিনল্যান্ড এবং জাপান উভয় দেশই ৯ পয়েণ্ট করে যুগ্মভাবে ৫ম স্থান লাভ করেছে।

মোট ৭টি স্বর্ণপদকের মধ্যে রাশিয়া পেয়েছে ৪টি, পোল্যান্ড ২টি এবং আমেরিকা ১টি।

মিডল হেভীওয়েট বিভাগে পোল্যান্ডের ২৮ বছর বয়সের ইঞ্জিনীয়ার পালিনস্কি ২টি বিষয়ে নতুন বিশ্বরেকর্ড করেন—মোট ওজনে এবং ক্লিন ও জার্কে। পলিনস্কি মোট ওজন তুলেছেন ৪৭৫ কিলোগ্রাম। পূর্ব বিশ্বরেকর্ড ৪৭২·৫ কিলোগ্রাম—আর্কাডি ভোরোবিভ (রাশিয়া)। ক্লিন ও জার্কে পালিনস্কি ১৯০ কিলোগ্রাম তুলে দ্বিতীয় বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব রেকর্ড ১৮৫·৫ কিলোগ্রাম।

বিভিন্ন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারীদের নাম এবং মোট ওজনের (যা তোলা হয়েছে) তালিকা—

বিভাগ	প্রথম স্থান অধিকারী	মোট ওজন
হেভীওয়েট ঃ	জুরী ভ্লাসোভ (রাশিয়া)	৫২৫ কেজি
মিডলওয়েট ঃ	আলেকজান্দ্রা কুরিনোভ (রাশিয়া)	৪৩৫ কেজি
ব্যান্টমওয়েট ঃ	স্টোগোভ (রাশিয়া)	৩৪৫ কেজি
লাইট-হেভী ঃ	রুডলফ্ প্লাকফেন্ডার (রাশিয়া)	৪৫০ কেজি
লাইট ওয়েট ঃ	ওয়ালডেমার বাজানোয়াস্কি (পোল্যান্ড)	৪৩২·৫ কেজি
মিডল-হেভি ঃ	আয়ারনুজ পালিনস্কি (পোল্যান্ড)	৪৭৫ কেজি
ফেদার ওয়েট ঃ	আইজ্যাক বার্গার (আমেরিকা)	৩৭৬·৫ কেজি

কেজি=কিলোগ্রাম।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সদ্য প্রকাশিত :

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ

কখনো মেঘ ৪·০০

[প্রচ্ছদ ও গ্রন্থণের অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল]

কানাই সামন্তের

রবীন্দ্র প্রতিভা ১০·০০

প্রাণের তাগিদে প্রস্তুত হয়েছেন লেখক—সহৃদয় পাঠক মাত্রেই তাঁর সহযাত্রী ও সহযোগী হবেন ॥

চৌদ্দখানি আর্ট প্লেটে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর, তাঁর আঁকা ছবি ও পেন্সিল স্কেচ, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সমৃদ্ধ।

মোহন লাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভারতীয় শিল্পকলা ও বিচিত্র শিল্পসাহিত্য রচয়িতা
অবনীন্দ্রনাথের সাধনার পীঠস্থান

দক্ষিণের বারান্দা ৪·০০

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই আশ্বিনের বই

প্রমথ চৌধুরীর
(বীরবল)
সনেট-পঞ্চাশৎ
ও
অন্যান্য কবিতা
পাঁচ টাকা

৭ই ভাদ্রের বই

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
হে ইতিহাস গল্প বলো
এক টাকা বার আনা

পূজায় *৭ খানি ছোটদের বই !*

সুখলতা রাও-এর **খোকা এল বেড়িয়ে** ২·৩০

[অনেকগুলি ছবি আছে। স্বনামধন্যা লেখিকার এই গল্পগুলি শিশুদের মনকে মাতিয়ে দেবে।]

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে** ২·০০

[প্রবীণ লেখক গল্প বলার যাদুকর। গল্পগুলি পড়ে ইতিহাসের নিবিড় পরিচয়ের সঙ্গে গল্পের যাদুতে ছোটরা মোহিত হয়ে যাবে।]

শিবরাম চক্রবর্তীর **পেয়ারার স্বর্গ** ২·০০

[শিবরামের গল্প চিরকালই হাসির ফুলঝুরি। এ গল্পগুলির গোড়াতে হাসি, মধ্যে হাসি, শেষে হাসি—সর্বত্র হাসি।]

লীলা মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরীর **টাকা গাছ** ১·৭০

[ছোটদের এই মনোরম উপন্যাসখানি পড়তে বসলে শেষ না করে ছাড়তে পারা যায় না।]

'স্বপনবুড়ো'র **নাট্যে প্রণাম** ৩·০০

[রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, শ্রীঅরবিন্দ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—যাঁরা ভারতকে গড়েছেন, তাঁদের জীবনের একটি করে মনোরম ঘটনার অভিনব নাট্যরূপ।]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের **কিশোর বাহিনী** ১·৫০

[নচিকেতা, একলব্য, ধ্রুব, শুনঃশেপ, উপমন্যু, বভ্রুবাহন প্রভৃতি মহান কিশোর-চরিত্রের কাহিনী মধুর গল্পে বর্ণিত।]

ইন্দিরা দেবীর **পাখী আর পাখী** ৩·০০

[বইখানি যদিও পক্ষী-বিজ্ঞানের বই, কিন্তু লেখিকা লিখেছেন গল্পের বই-এর মতন প্রাঞ্জল, মধুর ও কৌতূহলোদ্দীপক করে। অজস্র পাখীর ছবিতে ভরা।]

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন [illegible] ২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা — বিষয় — লেখক

সূচীপত্র

কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১

সূচীপত্র

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২৩শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 13th October, 1961
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

গত সপ্তাহে আমরা সংহতি সম্মেলনের রাজনৈতিক দিকের কার্যকারিতার বিষয়ে আলোচনা করেছি। রাজনীতি আমাদের জীবনকে এখন অষ্টভুজের মতো জড়িয়ে থাকলেও সংহতির প্রশ্নে সংস্কৃতির গুরুত্বও বড় কম নয়। আজকাল ভাষা উপলক্ষে যে বিতণ্ডা, হানাহানি এবং রক্তপাত ঘটছে সেও মূলত সংস্কৃতিরই প্রশ্ন। কাজেই বিশাল এই ভারতরাষ্ট্রের জাতীয় জীবনে একটা সংহতির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হলে যে রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমস্যারও আলোচনা হওয়া দরকার তাতে সন্দেহ নেই।

কথাটা শুনতে আমরা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলেও এর সত্যতা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক দেশ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হল এদেশের অন্তরাত্মার বাণী। নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধান এই বিবিধের মাঝে মহান মিলনের রূপ প্রত্যক্ষ করাই ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকের আজন্ম সাধনা। কিন্তু সেই সাধনায় কোথাও হয়তো মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। তাই ভাষা, পরিবেশ এবং পরিধানের খণ্ডিত রূপই হ'য়ে উঠেছে প্রধান, জাতীয় মিলনের মহান সত্য এখন দিবাস্বপ্নের মতো মিলিয়ে যেতে বসেছে।

এর একটা প্রধান কারণ দলীয় রাজনীতি। সেকথা আমরা গতবারই উল্লেখ করেছি। পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক দলই যে শাসনযন্ত্র অধিকার করার জন্য জনসাধারণের কাছে ভোটভিক্ষায় এগিয়ে আসবে এ তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু দলীয় শাসনের পঞ্চবার্ষিক মেয়াদের বাইরেও দেশের একটা অস্তিত্ব থেকে যায়। নির্বাচনে এ-দল বা ও-দল যেই ক্ষমতায় আসীন হোক, তাতে জনগণের বিশেষ কিছু এসে যায় না, যদি নাকি প্রত্যেকটি নির্বাচন-প্রার্থী দলেরই জাতীয় জীবনের মূল লক্ষ্যের বিষয়ে একটা মোটামুটি মতৈক্য থাকে।

দুঃখের বিষয়, ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সেরকম কোনো মতৈক্য নেই। ফলে প্রত্যেকটি নির্বাচন-যুদ্ধেই এত পরস্পর-বিরোধী কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় যে, তারা কোন আদর্শের জন্যে জীবনধারণ করছে তারই খেই হারিয়ে ফেলে। এবং বলাই বাহুল্য, মনের জগতে এই অরাজক অবস্থা বেশীদিন চললে পরিণাম খুবই ভয়াবহ হ'তে বাধ্য।

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে এই মানসিক নৈরাজ্যের পরিচয় অত্যন্ত উৎকটভাবেই আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন আমরা সদাচার, সুনীতি ইত্যাদি যুগ-যুগার্জিত সদ্‌গুণগুলি পদদলিত করছি, জাতীয় জীবনেও তেমনি স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীপ্রীতির তাড়নায় পরমতসহিষ্ণুতা, স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি উপহাসাস্পদ হ'য়ে উঠেছে। অন্যদিকে বৈষয়িক উন্নতির যে বর্ণাঢ্য চিত্র প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরা হ'য়েছে, তাতেও এখন আমরা যেন আস্থা রাখতে পারছি না। প্রকৃত প্রস্তাবে, কেন-যে আমরা জীবনধারণ করে চলেছি, সেই লক্ষ্যই এখন বিলীয়মান।

এই পটভূমিতে, জাতীয় নেতৃবৃন্দ যে একটি মহাসম্মেলনে একত্রিত হ'য়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ করেছেন, সেটা ঈষৎ বিলম্বিত হলেও, সুলক্ষণ বলেই স্বীকার করতে হয়। প্রতিনিধিরা যে একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি ও সর্বভারতীয় আদর্শবাদে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাও অত্যন্ত উৎসাহজনক।

এককালে ভারতবর্ষে এক বিশিষ্ট জীবনাদর্শ আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার দার্শনিক ভিত্তি ছিল উপনিষদ ও বেদান্তে, কিন্তু জনমানসে তার ভাবচ্ছবি রূপায়িত হ'য়ে উঠেছিল রামায়ণ-মহাভারতের কালজয়ী চরিত্রগুলির আদর্শেই। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষে সহস্র বৎসরব্যাপী বহু উত্থান-পতনের ভিতরও সেই সুচেতনার প্রভাব এখনও একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে যায়নি। ভারতবর্ষকে যদি এই নতুন যুগে নতুনভাবে সংহত করে তুলতে হয়, তবে সেই সাংস্কৃতিক জগতের পুনর্গঠনের দিকেও আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে।

জাতীয় নেতাগণ তৎপর হ'য়েছেন। তাঁদের আচরণবিধি তাঁরা ভবিষ্যতে কতোদূর মেনে চলবেন তা অজ্ঞাত। কিন্তু দিল্লীর সম্মেলনে সংস্কৃতিবিদেরাও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এবং সম্মেলনের বাহিরে যে-সব শিল্পী-সাহিত্যিক ও অগণিত সাংস্কৃতিক কর্মী দেশের প্রতিটি অঞ্চলে আপন-আপন সাধনায় ব্যাপৃত রয়েছেন, তাঁরা সকলেই যদি জাতীয় সংহতি গ'ড়ে তোলার আদর্শে আত্মনিয়োগ করেন, তবে সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়তো একেবারে ব্যর্থ হবে না।

আমাদের সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা কি এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? নাকি সবই রাজনীতির উপর ছেড়ে দিয়ে জীবনে হতাশার ভারকেই আরো দুর্বহ করে তুলবেন?

একটি সন্ধ্যা

আনন্দ বাগচী

রেলিঙে রোদ্দুর জ্বলে, কন্টিকারী ফুলের বাহারে
বইগুলো চতুর্দিকে, স্রোতে ভাসছে বিচিত্র মানুষ,
কলেজ স্ট্রীটের সন্ধ্যা, ফেরিঅলা,
গ্যাসের শিখায় ছায়া দোলে,
সমুদ্র দেখিনি কেউ তবু অন্ধকারে অবিরাম
ঢেউয়ের ঝাপট্ খাই, করুণ শহরে জল ঝরে,
ভূগোল ঘুলিয়ে ওঠে ইতিহাস শূন্যে মিশে যায়
আহত পাখির মত, আকাশের মুখ ঝাপসা ক'রে
কৃত্রিম আলোর মালা হাহাকারে কার কণ্ঠ খোঁজে।
অন্তহীন নিঃসঙ্গতা কফি হাউসের বাইরে ঘোরে॥

* * *

কোন্ গাছে কী নামের ফুল

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

মনের ভিতরে কার মুকুটের আলো; কে দেখায়
বিকেলে তোমার মুখ, নিশীথে তোমার মুন্ডগুলি।
দুধিয়ে ফুটেছে জ্যোৎস্না, স্ফুট উচ্চারণ সব ভুলি,
ভুলে যাই অবগাহনের দৃশ্য, লুণ্ঠিত ধুলায়।
কোন গাছে কী নামের ফুল ফোটে আজ; জলেস্থলে
কোনো করতলে নেই দয়ার্দ্র পল্লব, তবু কী নীরবে
স্বর্ণাভ হরিণ আসে প্রেমহীন দেহের সৌরভে,
রামধনুকের রং তোমাকে দেখায় কী কৌশলে!

হে প্রতিবিম্বিত, যদি প্রিয় বন হঠাৎ ঝলকে
উন্মোচিত ক'রে দেয় তারে—তার ও-মুখমণ্ডল,
শোভা পায় অস্তিত্বের গহনে, আবর্তহীন শোকে;
তবু কি ফেরানো যাবে সেই দিন, গোধূলিসকল!
বৃক্ষের নিকটে এই লক্ষ্য রাখি, কখনো আলোকে—
দিতে পারি তার হাতে বৃষ্টিসিক্ত আমার কমল।

অপ্রমেয়

মায়া বসু

দু হাতে ঢেকেছি মুখ। এইবার আনো অন্ধকার
চাঁদ যদি নাই থাকে দীপ জ্বালো অগণ্য তারার
অসীমিত সন্ধ্যাকাশে! গোধূলির অন্তিম স্বাক্ষর
তরঙ্গিত তমসায় লুপ্ত হোক বিশ্ব চরাচর।

ধানেশ্রীর সুরে বাজে পূরবীর সায়াহ্ন সারং
বিষাদের মূর্চ্ছনায় ধরো তুমি তোড়িতে বরং,
বিরহের রাগিনীকে। তারপর নবীন আশায়
মূর্ত হোক আশাবরী সমুৎসুক দীপ্ত বাসনায়।

দু হাতে ঢেকেছি মুখ। দুই হাত ভরে তুমি আনো
অফুরন্ত ভালবাসা; প্রজ্বলন্ত প্রদীপে রাঙানো
নিবিড় তমসাবৃতা নিশীথের আলোক বর্তিকা
শ্বেত শুভ্র সীমন্তের স্থির বন্ধ বিদ্যুতের শিখা।

রাগাবিদ্ধ অন্তরের উচ্চারিত ধ্যান মন্ত্র স্তবে,
ভরে তোল চিত্ত মোর অপ্রমেয় প্রেমের গৌরবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সম্প্রতি এক জনসভায় আমাদের অনুরোধ করেছেন, আমরা যেন 'অন্তরের ভাষা'র দিকে বেশী করে নজর দিই।

মুখের ভাষা বর্তমানে যে পরিমাণ মুখর হ'য়ে উঠেছে তাতে প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত এতই বিভ্রান্ত বোধ করছেন যে, এখন অন্তরের ভাষার দোহাই না দিয়ে আর তিনি তাল সামলাতে পারছেন না। কিন্তু ঐ 'অন্তরের ভাষা' ব্যাপারটা কী?

গান্ধীজী মাঝে মাঝে এ ধরণের কথা বলতেন। জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যখনই তিনি সামনে কোনো সঙ্কট অনুভব করেছেন তখনই 'ঐশী প্রত্যাদেশ' বা অন্তরের বাণীর জন্যে অপেক্ষা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ। আধুনিক যুগে বাস করেও কায়মনোবাক্যে এমন ভগবদ্ ভক্তি খুবই দুর্লভ। জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটিতে জনসাধারণের সংগে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থেকেও তাঁর অন্তরাত্মা ছিল ঈশ্বরেরই লীলাভূমি এবং এই জন্যেই তিনি মহাত্মা।

কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো ঈশ্বরের উপর সে রকম আস্থা স্থাপন করে কর্মনির্বাহ করেন না। ভক্তির চেয়ে যুক্তি, (কখনো বা হৃদয়াবেগ) এবং ঈশ্বরের চেয়ে মানুষের সুপরিকল্পিত সমাজ-কর্মিষ্ঠতার প্রতিই তাঁর পক্ষপাত অনেক বেশী। কাজেই তিনি যখন অন্তরের ভাষার কথা বলেন তখন বিষয়টা যে ঈশ্বর-চেতনার সংগে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন অনুমান করা অন্যায় হবে না।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় কী?

এর হদিশ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' নামক কবিতায়। মোক্ষদা তার দুরন্ত ছেলে রাখালকে কপট ভর্ৎসনায় 'চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে' ব'লে নিয়ে গিয়ে ঝড়ের প্রতিকূলতায়, যাত্রীসাধারণের

আতঙ্কিত ধিক্কারে সীতাই সাগরের জলে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। তখন সে তার পূর্ব-উচ্চারিত মৌখিক প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ ক'রে 'অন্তর্যামী'র উদ্দেশ্যে সকরুণ এক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল :

"শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা। শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা।"

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুরও হ'য়েছে সেই অবস্থা। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তিনি (এবং তাঁরা) জনসাধারণের কাছে ভাষাভিত্তিক রাজ্য, আঞ্চলিক সংস্কৃতির নিরাপত্তা ইত্যাদির বিষয়ে অনেক ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। এখন স্বাধীন হওয়ার পর গণদেবতা সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে উসুল করে নিতে উদ্যত। শ্রীজওহরলাল এখন তাই গ্রাম্য রমণী মোক্ষদার মতোই 'জননীর অন্তরের কথা'র দোহাই দিতে শুরু করেছেন।

কিন্তু মোক্ষদার বেলাতে যেমন দেবতা সে প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেছেন, শ্রীনেহরুর বেলাতেও তেমনি গণদেবতা এখনও নিরুত্তর।

তবু প্রশ্নটা যে উঠেছে সেও মন্দের ভালো বলতে হয়। দেবতা আর কোথাও আছে কিনা তা জানিনে, কিন্তু মানুষের অন্তরে যে আছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের মনুষ্যত্ব এবং মানবিকতাই হল সেই দেবতা। তাকে যদি আমরা জাগ্রত করতে পারি আজকের পাশবিকতার অনেকটাই হয়তো তাতে রোধ করা যাবে।

শ্রীনেহরু হয়তো সেই অন্তরশায়ী মানবিকতার উদ্বোধনের জন্যেই আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি অনেক কথা বলেন। অনেক কথার ঠিক মতো ব্যাখ্যারও হয়তো সময় পান না। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন, তা ঈষৎ হেঁয়ালীর মতো শোনালেও এত গভীরও প্রয়োজনীয় যে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে এখন তা সাহিত্যের অধ্যায়ে স্থান পাওয়া উচিত। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা এদিকে নজর দিন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও এ বিষয়ে অনেক কিছু করণীয় আছে। দেশ তো কেবল জমিজমা, কল-কারখানা, প্রোজেক্ট-প্ল্যানিং দিয়েই চেনা যায় না, দেশের আসল পরিচয় হল মানুষে। আর মানুষের জন্যেই এসব বৈষয়িক সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়ার মতো এখন মানুষের মনুষ্যত্বকে অবহেলা করে আর সব কিছুকেই বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

জানি, এর কারণও আছে। এই স্ববিরোধিতার কারণ খুঁজতে হয়তো যেতে হবে অর্থনীতি এবং সমাজনীতির গভীরে। কিন্তু সাংস্কৃতিক কারণও কি তুচ্ছ করার মতো? আজ বাংলাদেশে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে সে কি মানুষকে সুরুচির দিকে, মানবিকতার দিকে উদ্বোধিত করছে? কোনো সাহিত্যিকই সে দায়িত্ব পালন করছে না এমন বললে অন্যায় বলা হবে। কেউ কেউ নিশ্চয়ই করছেন। কিন্তু সাহিত্যের গরিষ্ঠাংশে যে যুক্তিহীন গড্ডালিকা প্রবাহ চলছে, পাঠক-সাধারণের বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে যে যৌনসর্বস্বতা এবং বীভৎসতার কারবার জাঁকিয়ে বসেছে তার চাপে সৎ লেখক কি এখন ক্রমেই কোণঠাসা হ'য়ে পড়ছেন না? মেকী টাকার দাপটে ভালো টাকা যেন ক্রমেই বাজার থেকে উধাও। এই-দিক থেকে বিচার করে দেখলে স্বীকার করতেই হবে, আমরা সংস্কৃতিকর্মীরাও, আমাদের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে পারছি নে। ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলার সৎসাহসও যেন হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

দেশ গঠনের পুরো দায়িত্বটা রাজনৈতিক নেতাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা যে ডামাডোলের বাজারে যা-ইচ্ছে-তাই লিখে লুঠের মাল সরাচ্ছি, এরও কি কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না? কজন লেখক আজ বলতে পারেন, তিনি অন্তরের ভাষাকে রুপায়িত করছেন—তাঁর লক্ষ্য চাহিদা মতো মালের যোগান দিয়ে রাতারাতি দু' পয়সা রোজগার ক'রে নেওয়া নয়?

আমাদের আত্মানুসন্ধান করা উচিত!

* * *

"মাননীয়া মহাশয়া, বাংলাদেশে তো আপনি পাঁচ বছর হল আছেন। এর মধ্যেও আপনি বাংলা শিখলেন না। একে দুর্ভাগ্যই বলতে হয়। কেননা, পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ভাষার রসাস্বাদন থেকে আপনি বঞ্চিত থাকলেন।"

উপরের উক্তিটি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের। বলেছিলেন মাননীয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে। বাঙালী যক্ষ্মা রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাদের মনোব্যথা হৃদয়ঙ্গম না ক'রে রাজ্যপাল দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে। তারই প্রত্যুত্তরে ডাঃ রায়ের ঐ সস্নেহ মন্তব্য।

ডাঃ রায় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ভবিষ্যতে কোন অবাঙালী ব্যক্তি বাংলায় রাজ্যপাল হ'য়ে এলে তিনি যদি বাংলা ভাষার শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন, আমরা খুশী হব। এবং আশা করা যায়, তিনিও খুশী হবেন।

* * *

ইংলণ্ডের এক কারখানার মালিক রাত্রে পাহারা দেওয়ার জন্যে কোনো পাহারাওয়ালার ব্যবস্থা না করে চারটি অ্যালসেশিয়ান কুকুরের উপর নির্ভর করতেন। মালিক ইংরেজ হলেও বোধ-হয় কবি-সমালোচক এলিয়টের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এলিয়ট কবিতার বোধ্যতা-দুর্বোধ্যতার বিষয়ে একটি উপমা দিয়ে বলেছেন, কবিতার মানে হল সেই রকম ব্যাপার যেভাবে ছিঁচকে চোরেরা পাহারাদার কুকুরকে হাড়-মাংস ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে চুরির কাজ সমাধা করে। কারখানা-মালিক এ উপমা প'ড়ে থাকলে কুকুরের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতেন না।

কারণ খবরের অপরাংশে দেখা যাচ্ছে, এক চোর তার নিজের অ্যালসেশিয়ানটি (স্ত্রীং) উক্ত কুকুর চতুষ্টয়ের (পুং) কাছে ছেড়ে দিয়ে তাদের পাহারা-রূপ তপস্যায় বিঘ্ন ঘটায়। এবং পুং কুকুরেরা স্ত্রীং কুকুরের ছলা-কলায় অন্যমনস্ক হলে সেই সুযোগে চোর মহাশয় তাঁর নিজের কাজ সমাধা করেন।

পাহারাদার কুকুরগুলিকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। কুনকী হাতির আকর্ষণে বুনো হাতী ফাঁদে ধরা পড়ে, অপ্সরীর নৃত্যকলায় বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ ঘটে, মাতাহারীর মোহিনীমায়ায় জাঁদরেল যুদ্ধবিদের গুপ্ততথ্য ফাঁস করতে হয়। কাজেই সামান্য সারমেয়র আর দোষ কি!

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।' যারা ধরা পড়ে তারা অনেক সময় বিপাকে পড়ে বটে, কিন্তু যারা পড়ে না তারাও যে সুখে থাকে না!

বনমহোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতময় আজ বনমহোৎসব হয়, গ্রামে, শহরে, মহানগরীতেও বৃক্ষরোপণ-উৎসব চলে। মহাসমারোহে আনন্দকোলাহলে নৃত্যগীতেমুখরিত এই উৎসবের প্রবর্তক যে রবীন্দ্রনাথ, তাহা হয়তো আজ অনেকের স্মরণে আসে না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে গ্রামের যোগ ছিল বহু বৎসরের। উত্তরবঙ্গে তাঁর জমিদারির মধ্যে তিনি কি পরিমাণ চলাফেরা করতেন, প্রজা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতেন, তার সাক্ষ্য বহন করছে ছিন্নপত্রাবলী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালির কবিতাগুচ্ছে। গ্রাম-উন্নয়নের পরিকল্পনা কয়েকবারই গ্রহণ করেছিলেন। কীভাবে গ্রামের কাজ করতে হবে তার বিস্তারিত সংবাদ পাই তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে। এই সব কাজের মধ্যে তিনি কৃষির উন্নতির জন্য কত পরিকল্পনাই না পেশ করেছিলেন। কীভাবে খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধি করা যায়, বিকল্প শস্য বা কন্দাদি রোপণ করে কীভাবে লোকের পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা যায়, তার জন্য কত কথাই ভেবেছিলেন এবং সাধ্যমত কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

জীবনের মধ্যবয়সে এলেন রাঢ়ের তৃণশূন্য, তরুশূন্য, স্বল্পবারি বীরভূম জেলায় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। বিশ বৎসর কেটে গেল। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে তাঁর গ্রাম উন্নয়নের প্রয়াস একাধিকবার আরম্ভ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়—গভর্নমেন্টের কুদৃষ্টিতে পড়ে।

মনে আছে শান্তিনিকেতনে তিনি ছাত্রদের দিয়ে গাছ পুঁতিয়ে তার সেবার জন্য তাদের উদ্বোধিত করতেন। কিন্তু তখনো এটাকে দেশব্যাপী সমস্যা বলে তাঁর মনে আসেনি। আমাদের দেশে বৃক্ষরোপণ পুণ্যকর্ম ছিল। ছড়ার মধ্যে আছে "আম কাঁঠালের বাগান দেবো, ছায়ায় ছায়ায় যেয়ো।"

প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপণ কবি করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯১৬ সালে আমেরিকায় গিয়েছিলেন বক্তৃতা সফরে। ক্লেভল্যান্ড নগরীতে এলেন ১৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ সালে। সেখানকার শেক্সপীয়র গার্ডেন বিখ্যাত পার্ক; কবিকে সেখানে নগরবাসীদের অনুরোধে বৃক্ষরোপণ করতে হয়েছিল। গত বৎসর শেক্সপীয়রের ত্রিশতবার্ষিকী উৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন; এবার শেক্সপীয়রের নামে উৎসর্গিত উদ্যানে ভারতের সেই কবিকে দিয়ে আমেরিকানরা একটি বৃক্ষরোপণ করালো—তিনটি মহাদেশ এশিয়া, ইয়ুরোপ, আমেরিকা বাঁধা পড়লো একটি সূত্রে।

ছয় বৎসর পর। শ্রীনিকেতন স্থাপিত হয়েছে, এলমহার্স্ট জানেন মানুষ ভূমি-লক্ষ্মীর বিত্ত-অপহারক। মাটি থেকে মানুষ সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করে, সেই মাটিকে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য ফিরিয়ে দেয় না—তাই শীর্ণ মৃত্তিকা পর্যাপ্ত ফসল দিতে অপারক। এই সব আলোচনা শুনে কবির মনে হয় মাটির কথা—শুনতে পান 'মাটির ডাক'—

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে
যাই চলে যাই মুক্তি সুখে,
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে...।

এই কবিতাটি যে দিন লিখেন, সেই দিনই এই গানটি রচেন—

ফিরে চল মাটির টানে
যে-মাটি আঁচল পেতে
চেয়ে আছে মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে।।

মাটির সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক সম্বন্ধের কথা কাব্য ও গানে এই প্রথম রূপ নিল।

১৯২৫ সাল। কবির জন্মদিনের উৎসব মহাসমারোহে শান্তিনিকেতনে উদ্‌যাপিত হলো। কলকাতা থেকে বহু লোকসমাগম হয়েছে। উত্তরায়ণের উত্তর দিকে পথের ধারে 'পঞ্চবটী' প্রতিষ্ঠা হলো। এই শান্তিনিকেতনে প্রথম বৃক্ষরোপণ। রবীন্দ্রনাথ এই দিনের জন্য গান লিখলেন—

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ।।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে
হে মোহন প্রাণ।

এই গানের প্রত্যেকটি শব্দ বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় ব্যাখ্যাত হতে পারে।

১৯২৬ সাল। কবি গেছেন ইউরোপ সফরে। ঘুরতে ঘুরতে এসেছেন ভিয়েনা। লিখলেন "গাছপালার প্রতি ভালোবাসা" পত্র-প্রবন্ধ—

"গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতারা; ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।"

মধ্যয়ুরোপ ঘুরতে ঘুরতে শরীর গেল বিগড়ে; বাধ্য হলেন হাঙ্গেরীতে এসে বালাতন হ্রদের তীরে এক স্বাস্থ্য নিবাসে আশ্রয় নিতে। ১৯২৬ নভেম্বর মাসে সেই হ্রদের তীরে রবীন্দ্রনাথকে একটি লিণ্ডেন বৃক্ষের চারা পুঁততে হলো। সেখানে সেদিন লিখলেন এই কবিতাটি—

পান্থপাখির রিক্ত কুলায় বনের গোপন ডালে
কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে।।

এই গাছের জন্য কবি একটি কবিতা লিখে দেন— সেই ফলকটি এখনো আছে—

হে তরু, এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মর ধ্বনি
পথিকেরে কবে,
ভালোবেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।"

এই গাছটি এখনো আছে। ১৯৩০ সালে কবি যখনে আমেরিকায়, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পৃথিবীময় একটা সাড়া পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ। হাঙ্গেরীর লোকেরা খবর পেয়ে বালাতন ফুরাদে গিয়ে দেখে কবির হাতে পোঁতা গাছটি বেশ সতেজ আছে। তারা জানায় কবি নিরাময় হয়ে উঠবেন। তাদের বিশ্বাস গাছ যখন বেঁচে আছে কবি তখন মরতে পারেন না।

১৯২৮ সাল। বর্ষামঙ্গল উৎসব বহু বৎসর থেকে হয়ে আসছে। সেটি কেবল আনন্দ উৎসবই ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও বাস্তববাদী। তাই বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে এবার বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তন করলেন। দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে বাস করছেন; তিনি জানেন বীরভূম এককালে বৃক্ষপূর্ণ ছিল। কিন্তু লোহচুর পোড়াবার জন্য বনচ্ছেদন এমনভাবে চলেছিল যে, আজ সে-দেশের কঙ্করময় পাঁজর গিয়েছে বের হয়ে—শ্যামল ধরণীর সকল শোভা অবলুপ্ত। তাই বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে বনমহোৎসব প্রয়োজন করে সমাজজীবনে তার স্থান নির্দেশ করতে চাইলেন। এই বৎসরের জন্য কবিতা, গান লিখলেন—সেগুলি তাঁর 'বনবাণী' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চভূতের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখলেন ঃ পাঁচজন 'ভূত' সেজে বসলেন—মাঙ্গলিক কবিতা লিখলেন শিশু-তরুর উদ্দেশে—

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক,
হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্
সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল
কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে
করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ।'

কবির বিজ্ঞানী মন বৃক্ষের স্বরূপ-মধ্যে প্রবেশ করছে; এই বোধ কবির বহু কবিতা ও গদ্যে নানা সময়ে ব্যক্ত হলেও এখন থেকে তা নূতন রূপ পেলো—সে তার ব্যবহারিক রূপের অর্থ উপলব্ধি।

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসবের পর দিন (১৫ জুলাই ১৯২৮) শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। এ-ও মাটির সঙ্গে মানুষের যোগসাধনের জন্য উৎসব।

১৯২৮ সাল হতে প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনের পল্লী-উন্নয়ন এলাকার মধ্যে এই বৃক্ষরোপণ উৎসব চলে আসছে।

১৯৪২ সাল থেকে কবির মৃত্যু-দিনে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালিত হয়ে আসছে। অতঃপর ১৯৫০ সাল থেকে ভারত সরকার বনমহোৎসব প্রবর্তন করেন; রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ভারতময় প্রচার হয়ে আসছে সেই দিন থেকে।

এই প্রবন্ধ শেষ করার পূর্বে কবির 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতার কিয়দংশ উধৃত করছি—

"অন্ধভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে
সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ
আদিপ্রাণ;
ঊর্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের
প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ'পরে;
আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।
......ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু
দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে
তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী, দিলে তারে
পরম সম্মান।
......তব প্রাণে প্রাণবান
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব
তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব,
তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই
কাব্য-অর্ঘ লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।"

প্রতিমা শিল্পের ক্রম বিকাশ

বজ্র সেন

আশ্বিন শেষ হয়ে এল। পুজোর বাজনা বাজতেও দেরি আছে। কখনো মেঘ আর রোদ্রের খেলা কখনো আকস্মিক দু'এক পশলা বৃষ্টি। তবু পাকাপাকিভাবে না হলেও শরতের আভাস এসে পেঁাচেছে। রোদ্দুরের মুখ দেখা গেলেই কীরকম পুজো-পুজো লাগে। এরই সঙ্গে পটোপাড়াতে সাড়া পড়ে গেছে। কুমারটুলি, কালিঘাটে আটচালার নীচে প্রতিমা তৈরীর পালা শুরু হয়েছে। ছেলেবেলায় পুজোর আগে দুপুরবেলা নানা ছলছুতোয় বেরিয়ে গিয়ে বারোয়ারীর আটচালাতেই সর্বক্ষণ কাটতো। শিল্পী একমনে প্রতিমা তৈরী করছে তাই বসে বসে লক্ষ্য করতুম আর মনে মনে দিন গুনতুম পুজোর আর কদিন বাকি! শালকাঠের পাটার ওপরে শক্ত করে লম্বা লম্বা বাকারি কিংবা গরাণকাঠের ডান্ডা পুঁতে পুঁত কাঠামো তৈরী করা হতো। সেই কাঠামোয় যেদিন থেকে খড় বেঁধে মোটামুটি শরীর ও হাত-পা-এর আকার আনা হতো সেদিন থেকেই বুকের মধ্যে আনন্দের স্রোত বইতে শুরু করে দিত।

সেই আনন্দময় স্মৃতির টানেই পুজোর আগে পটো-পাড়ার দিকে আজও আমরা অনেকে পা বাড়াই প্রতিমা-নির্মাণ দেখার নেশায়। মদনমোহনতলায় নেমে ডানদিকে কুমারটুলিতে ঢুকে বাঁহাতি মোড় ঘুরলেই দেখা যাবে সারি সারি আটচালায় সারিবন্দী অর্ধসমাপ্ত প্রতিমা। কোনোটির শুধু কাঠামো তৈরী হয়েছে। কোনোটিতে খড় বেঁধে বেঁধে শরীর ও হাত-পায়ের আকৃতি আনা হয়েছে। বাঁশের কঞ্চি পুঁতে তারই সাহায্যে বিভিন্ন মূর্তির নানান কায়দায় দাঁড়াবার বা বসবার ভঙ্গি স্থির করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি যে ভীষণ অসুর ভবিষ্যতে এক পায়ে সামনে হাঁটু গেড়ে ও একপা পিছনে ছড়িয়ে দিয়ে বীরের মত মা-দুর্গাকে খোলা তরোয়াল আস্ফালন করবে, তারও বীরদর্পের ভঙ্গিটি স্থিরীকৃত হচ্ছে সামান্য কঞ্চিরই সাহায্যে। মুখব্যাদান করে যে সিংহ ধাবমান, তার মাথার খোঁচা খোঁচা খড়গুলি রূপান্তরিত হবে কুঞ্চিত ভীষণ কেশরদামে। উলুবেড়ের এঁটেল মাটির সঙ্গে তুঁষ মিশিয়ে কোনো একমেটে প্রতিমাকে শুখোতে দেওয়া হয়েছে। আবার এঁটেল মাটি ও বেলে-মাটিতে গোময় ও পাটের কুচি মিশিয়ে যে পলেস্তারা তৈরী হচ্ছে—তাই দিয়ে প্রতিমাকে দোমেটে করা হবে। লক্ষ্য যাতে ফাট না ধরে। এরপরেও আবার কাচান মাটি দিয়ে প্রতিমাতে 'ফাইন্যাল টাচ' দেওয়া হবে। হাত-পায়ের জোড়ের জায়গাগুলি ছেঁড়া ন্যাকরা এঁটে দিয়ে কাচান মাটি দিয়ে দিয়ে মেজে দেওয়া হবে প্রতিমার শরীর। মুখ ও হাতের আঙুলে তৈরী হবে ছাঁচে। শুধু ছাঁচে তৈরী হলেই হবে না। হাতে 'চিয়ারি' কাটি (পাতলা বাঁশের তৈরী) নিয়ে চেঁচে-ছুলে প্রতিমার মুখে নিবিষ্টমনে ফুটিয়ে তুলতে হবে নিখুঁত ভাবটি। একেই বলা যায় 'ফিনিশ' দেওয়া। অবশ্য ডাকসাইটে নাম-করা প্রতিমার মুখ এই সর্টকার্ট পদ্ধতিতে তৈরী করা চলবে না। তার জন্যে সন্তর্পণে শিল্পীকে হাতেই কাজ করতে হবে। পাতলা বাঁশে চিয়ারি কাটির সাহায্যে সযত্নে মুখ-চোখ-নাক-কান ফুটিয়ে তুলতে হবে। পরতে পরতে মাটির কাপড় পরাতে হবে খাঁজ কেটে কেটে। তৈরী হবে মাটির কঙ্কণাদি যাবতীয় অলঙ্কার। তারপর রঙ চড়বে নিপুণ শিল্পীর তুলিতে। মাখানো হবে ঘামতেল। জ্বলজ্বল করবে প্রতিমা রূপের ঔজ্জ্বল্যে। মাটির কাপড় পরানো পছন্দ না হলে রেশমী বা অন্য সিল্কের কাপড় বায়না দাও। আনো জরির অলঙ্কার। বায়না-মাফিক সব তৈরী করে দেবে এই সব নিপুণ পটুয়ারা। সমিতির কোনো চ্যাংড়া সভ্য হয়তো বায়নাক্কা তুলবে—দুর্গা প্রতিমা বা লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মুখখানা যেন অমুকের মত কি তমুকের মত হয়। নিদেনপক্ষে কার্তিকের মুখ যেন অমুক অভিনেতার মুখের আদলে তৈরী করা হয়। পটুয়ারা তাও করে দিতে পারবে। নেহাত উপায় নেই বলেই হয়তো গণেশ, অসুর এবং সিংহের মুখের ওপর কারচুপি চলে না। বছরের পর বছর তারা নির্বিকার ভাবেই অবস্থান করে। হয়তো ভবিষ্যতে অসুরকেও আর সাবেক রাখা যাবে না। হয়তো কোনো বলবীর্যসম্পন্ন ফ্রীস্টাইল বিখ্যাত

কুস্তিগীর অচিরেই তাকে স্থানচ্যুত করবে।

এই উপলক্ষ্যে দুর্গা প্রতিমার ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা নেহাত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলাদেশে বহু-পূর্বে অষ্টধাতুর তৈরী মহিষমর্দিনীর মূর্তি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে পাল যুগ থেকে আরম্ভ করে মুসলমান বিজয়ের পূর্বকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চালচিত্রহীন মহিষ-মর্দিনীর মূর্তি সর্বাধিক পরিচিত ছিল। সিংহের পিঠে ডান পায়ের ভর রেখে ত্রিভঙ্গঠামে দেবী দশপ্রহরণ দিয়ে অসুরকে বধ করছেন। তাঁর বাম পা মহিষাসুরের পিঠের ওপরে অবস্থিত। মহিষনির্গত অসুর তরোয়াল নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী। এই মূর্তির অনুকরণে এখনো প্রতিমা নির্মাণ করা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে কোথাও কোথাও। পঞ্চদশ- শতকের পুঁথিপত্র এবং ষোড়শ শতকে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায় দেবী লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিকেয় এবং গণেশের সঙ্গে একই মণ্ডলে অবস্থিত। তারপর থেকে বাংলা-দেশে দশভুজার যে প্রতিমা অত্যন্ত পরিচিত ছিল—কাঠ বা পাথরে খোদাই করা মূর্তির সঙ্গে সেই প্রতিমার আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। **আকর্ণবিস্তৃত দীঘল চোখ, তীক্ষ্ণ নাসা, তীব্র দৃষ্টি সম্মুখভাগে প্রসারিত এবং শূলাবিদ্ধ অসুরের দিকে ঈষৎ আনত। মাথার** ওপরে পৃষ্ঠভূমি চালচিত্রে সুশোভিত। সেই চালচিত্রে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর ছবি। দেবী দুর্গার মাথার ওপরে মহাদেব। তার পাশে একটি গৃহের মধ্যে দেবী দুর্গা। তার পাশে দক্ষের ছবি। এই উপায়ে রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রাধা, নারদ ইত্যাদি বহু দেবদেবীর ছবি চালচিত্রে শোভা পাচ্ছে। নীচের দিকে ঘোড়া ও হাতীর পিঠে সওয়ার হয়ে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ সিংহারূঢ়া জয়দুর্গা ও কালীর সঙ্গে সংগ্রাম-রত। সাবেকী রীতির এই প্রতিমা আজকাল সার্বজনীন বারোয়ারী পুজোয় অত্যন্ত বিরল। ওরিয়েণ্টাল স্টাইলের প্রতিমা বারোয়ারীতলায় খুবই দেখা যায়। এই ধরনের প্রতিমায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ প্রভৃতি দুর্গা প্রতিমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট। এছাড়া 'অজন্তা স্টাইলের' প্রতিমাও বহু দেখা যায়। কাঁচুলিতে সজ্জিতা ও নাভির নীচে বস্ত্র-পরিহিতা দেবী দশভুজা লীলায়িত ভঙ্গিতে অসুর নিধন করছেন। নানান শিল্পরীতিতে গঠিত প্রতিমার জন্যে বায়না আসে এই পটুয়াদের কাছে। শিল্পীরা সাধ্য-মত এই প্রতিমা গড়ে সরবরাহ করেন। নিম্নতম চল্লিশ টাকা থেকে দেড় হাজার আড়াই হাজার এবং তদূর্ধ্ব মূল্যেরও প্রতিমা এই অঞ্চলে গড়া হয়। প্রতিমাকে ক্রেতার পছন্দমাফিক সাজ পরানো হয়। আগেকার দিনে ডাকের সাজের প্রচলন ছিল। সোলাকে চাদরের মত পিটিয়ে পাতলা করে, সেই সোলার কাঁপের সঙ্গে আগাগোড়া জরি দিয়ে বুনে যে পরিচ্ছদ নির্মিত হতো তাতেই প্রতিমার অঙ্গ সজ্জিত করা হতো। **জরি দিয়ে তৈরী হতো প্রতিমার আভরণ। জরির পরিচ্ছদ ও জরির অলঙ্কারে বসানো হতো চোখ-ধাঁধানো সলমা, চুমকি এবং জামিরা (পেটানো তামার উজ্জ্বল টুকরো)।**

এইসব দ্রব্যাদি অধিকাংশ বিলেত থেকে আমদানি করা হতো বলে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে ডাকের সাজ উঠে যায়। এরপরে সামনে-আঁচল সিল্কের শাড়ী দিয়ে দুর্গা প্রতিমাকে সাজাবার রেওয়াজ হয়। মাটির পরিচ্ছদ এবং মাটির রঙ-করা অলঙ্কারাদি দিয়ে প্রতিমার রীতি আগেও ছিল, এখনও আছে। এছাড়াও রেশমের কাপড় কিংবা অন্য সিল্কের পরিচ্ছদ দিয়ে দুর্গা প্রতিমা সজ্জিত করার রীতি বহুক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয়।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ উনত্রিশ ॥

রজতকে সব কথা বলা হয়নি প্রশান্তর। ওর আজকের সংকল্পের মধ্যে, জীবনকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করার মধ্যে আবার একটা কথা ছিল যা তন্দ্রাহীন রাত্রে ও ভেবে ভেবে ঠিক করেছে; বিশাখাকেই বিবাহ করবে। বিবাহটা হঠাৎ ওর কাছে একটা নেহাত প্রয়োজনীয় অথচ বিরস কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেমন অন্ন-সংস্থানের জন্য এই চাকরি; স্বাতির ব্যবস্থার পর ও-হাঙ্গামাটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো। আর ভেবে দেখল বিশাখাকে বিবাহ করাটাই ও-হাঙ্গামাটাকে খুব কমের ওপর দিয়ে কাটিয়ে ওঠা।

টাকা-আনা-পাইয়ের দিক দিয়েও হিসাবটা কষে দেখল—মায়ের সাধ-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও দিব্যি মিলে যাচ্ছে। রজতের বাড়ির অবস্থা ভালো, নিজেও উপার্জন করছে; এর ওপর বাড়ি বিক্রয়ের পর প্রশান্তর কাছ থেকে লাহিড়ীমশাই টাকাটা পেলে একটা মোটা রকমই যৌতুক পাচ্ছে রজত; সব মিলিয়ে বিবাহের বাজারে প্রশান্তর মূল্যটাকে মায়ের চাহিদা মতোই সে দিতে পারবে। আরও একটা কথা এর মধ্যে আছে। স্বাতির সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হওয়ার আগে প্রশান্ত এমন প্রমাণ কয়েকবারই পেয়েছিল যাতে মনে হয় বিশাখাকে নিয়ে প্রশান্ত সম্বন্ধে একটা আশা রাখত রজত। খুবই স্বাভাবিক তো; এমন উপযুক্ত পাত্র, এদিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওদের বন্ধুত্ব বিদেশ থেকে, এখানে এসে আরও বেড়েছে অন্তরঙ্গতা, আশা করা কিছু অন্যায় হয়নি। অন্যায় হয়নি যদি এমন বিশ্বাসও ছিল মনে যে প্রশান্তর মনটাও বোনের দিকেই ঝুঁকে রয়েছে।

মনে পড়ে যে দিন ব্যাঞ্জোটা কিনে দেয় বিশাখাকে, সেদিন পর্যন্ত রজত বলে ফেলেছিল—"দেখো, তুমি ওর খরচের অব্যেস করে দিচ্ছ না তো?"

—অর্থাৎ নিজেকেই তো শেষ পর্যন্ত ভুগতে হবে।

মনের আনন্দে বলে ফেলেছিল। তারপর থেকেই অবশ্য টের পেতে লাগল বন্ধুর মনের গতি কোন্ দিকে।

খুশীই হবে রজত; অবশ্য এই পরিবর্তিত অবস্থায়। ওর বাস্তব দৃষ্টিটা আরও প্রখর।

আর এরই জোরে ওকে রাজী করানও সহজ হবে স্বাতিকে বিবাহ করতে।

তুলত এ কথাটাও; কিন্তু সকাল হয়ে গেল। তা ভিন্ন, এর তত তাড়া-হুড়াও তো নেই।

তোয়ের হয়ে গেল প্ল্যানটা; একটা বাড়ির কিংবা পুলের প্ল্যানের মতোই। মায় এস্টিমেট পর্যন্ত; কত খরচ, কি বৃত্তান্ত, সব কিছু। কয়েক দিনের অশান্তিটা কেটে গিয়ে স্বস্তি অনুভব করল প্রশান্ত। গা-ঝাড়া দিয়ে যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে প'ড়ে স্নান প্রাতরাশ পর্যন্ত প্রাতঃকালের যা যা কাজ সব সেরে নিয়ে আফিসে চলে গেল। আর ফাঁকির ব্যস্ততা নয়, অনেক কাজ জমে গেছে ক'দিনে।

একটানা কাজ চলল। আফিস, তারপর পুলে গিয়েও খুঁটিনাটি পর্যন্ত তদারক। কাজ করতে করতে কাজের একটা উন্মাদনা এসে গেছে। কোনও দিন হয়তো এল বাসায় দুপুরের খাওয়াটা সারতে; ফোনে বলে দেয়; নয়তো ঢালা হুকুম, আফিসেই যাবে খাবার। এইভাবে দিন দশেক কাটবার পর একদিন একটু রাত করেই এসে দ্যাখে—মা মুকুন্দ-মামাকে সঙ্গে করে উপস্থিত। এসেছেন আটটার গাড়িতে। ফোন করতে যাচ্ছিলেন স্টেশন থেকে, কলোনীর লরিটা পেয়ে চলে এসেছেন। উনি এসেছেন প্রশান্তর বিবাহ ঠিক করতে; বিশাখার সঙ্গেই।

এর আগে একদিন যে উনি আসেন স্বাতিকে দেখতে, সেটা বিশাখার একটা চিঠি পেয়েই। বিশাখা চিঠি দিয়েছিল প্রশান্তর বোন উষাকে। বহু পূর্বে, রেল-কলোনীতে আসার গোড়ার দিকে ওদের বন্ধুত্ব হয়, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। বিশাখা উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিল স্বাতির কথা। একটা আশঙ্কাও ছিল, এত ভালো, অথচ নিতান্তই গরীব ঘরের মেয়ে প্রশান্তদা' আশা জাগাচ্ছেন মনে, ওর কিন্তু ভয় হয়।

ঠিক কতখানি আশা জাগাবার সন্ধান পেয়েছিল বিশাখা, সত্যই কোন রকম

আশঙ্কা হয়েছিল কিনা মনে, জানা দুষ্কর। এ-বয়সের মেয়েরা কোথাও ভালোবাসার গন্ধমাত্র পেলেই তাই নিয়ে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়, মনগড়া হাসি-কান্নার সংযোগে একটা রোম্যান্স দাঁড় করিয়ে তৃপ্তি-অতৃপ্তির আস্বাদ পেতে চায়। এও হয়তো তাই।

তবে প্রশান্ত জানত কথাটা, তাই বাড়ি থেকে আসবার সময় মাকে বারণ করে দেয় বাড়ি-বেচা আর বিয়ে—কোনটার কথাই জানিয়ে কাজ নেই উষাকে। মা তাই নিয়েও আসেননি তাকে সঙ্গে ক'রে।

বিশাখার সঙ্গে প্রশান্তর বিবাহ, অবস্থার সঙ্গে একটা রফা ও'র। প্রৌঢ়ত্বে-বার্ধক্যে এসে দূরত্ব বুদ্ধির জন্যই যৌবনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো মানুষের কাছে ফিকে হয়ে আসে, আবছা হয়ে আসে; মন নিয়ে হাসি-কান্নার ব্যাপারগুলো আর তেমন তীব্রভাবে প্রতিভাত হয় না তাদের কাছে। স্বাতিকে একদিন ভালো লেগেছিল তাঁর ছেলের, আজ কোনও কারণে লাগছে না—দুটোই অনেকটা গৌণ ও'র পক্ষে। এতদিন বিয়ে করতে চাইছে না এই কথাটাই হয়ে পাড়েছিল মুখ্য, আজ মুখ্য হয়ে পড়েছে, সে চাইছে বিয়ে করতে। বিশাখা মেয়েটি ভালো, স্বাতির চেয়ে রংটা আরও মাজা, যেন মনে পড়ছে চুল আরও একটু ঘন, স্বাতির চেয়ে থাকে কাছে—দৃষ্টির নীচেই একরকম, সুতরাং বিশাখাও যে ছেলের মনে রেখাপাত করেনি কখনও এটা সম্ভব মনে হয় না। তারপর, এই সম্ভাবনাটুকুর ওপরই বেশ দেওয়া যায় বিবাহ। তারপর সময়ে মিলিয়ে যায় মনের খুঁতখুঁতিনি কিছু যদি থাকে। ...এই তো নিত্য হচ্ছে দুনিয়ায়। দেখে এলেন তো এত বয়স পর্যন্ত।

গিন্নীরা এই লাইন ধরেই ভাবে। কর্তারা তো বটেই; তারা আবার বেটা-ছেলে। মানদাদেবীর সিদ্ধান্ত, স্বাতির অভাব তবুও বিশাখা খানিকটা মিটিয়ে দেবে। একটা রফা।

টাকার দিকটাও একটা রফাই করলেন। রজত ঠিক তাঁর ছেলের ন্যায্য মূল্য দিতে না পারলেও একেবারে খালি হাতে বিদায় করবে না। বাড়ির অবস্থা ভালো, নিজের উপার্জন আছে, ঐ একটি মাত্র বোন।

এই আপোস-রফার মধ্যেও কোথাও যদি কিছু নৈরাশ্য থেকে গিয়ে থাকে তো একটা মস্ত আশ্বাসও রইল; উনি ছেলেকেই সবার ওপরে রেখে এসেছেন বরাবর। স্বাতিকে যখন চেয়েছিল, উনি আপত্তি করেননি; মিলল না যে, সে ওদের নিজেদের মধ্যেকার কথা। উনি নিজে হ'তে বিশাখাকে এনে বসাচ্ছেন, অনেকটা স্বাতির স্থান পূর্ণ করতে পারবে বলেই; অর্থের কথাও বড় ক'রে ভাবছেন না। নয়তো বিয়ের বাজারে এ-ছেলের মূল্য!

ওর কথাগুলো সবই তো সত্য।

আগে অবশ্য প্রশান্তকেই বললেন। প্রশান্ত আপত্তি তো তুললই না কোন রকম, অধিকন্তু এক কথাতেই আদর্শ ছেলের মতো ঘাড় হেঁট করে একটু লজ্জিতভাবে হেসে এমন মেনে নিল যে নিজের আন্দাজের যথার্থতা দেখে বেশ আত্মপ্রসাদই অনুভব করলেন মানদা-দেবী। অর্থাৎ, তাহলে সত্যই বিশাখা রেখাপাত করেছিল মনে।

পরদিন সকালে প্রশান্ত আফিসে চলে গেলে রজতের কাছেও তুললেন কথাটা, তাকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে। এইখানে একটু ধাক্কা খেলেন। রজতের মুখটা কোথায় উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠবে, তার জায়গায় যেন আরও নিভেই গেল, একটু আমতা আমতা ক'রে বলল—"বিশাখার বিয়ের কথা বলছেন মা? ......প্রশান্তর সঙ্গে?"

একটা ধাক্কাই খেলেন মানদাদেবী। ছেলের মা—প্রশান্তর মতো ছেলের মা অনুগ্রহ বিলাতে এসে অনুগ্রহের ভিখারিণীতে পরিণত হয়ে গেছেন। অপ্রতিভ ভাবেই প্রশ্ন করলেন—"কেন বাবা? ও-কথা বললে যে?"

"প্রশান্তকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? ...আমি নিজেই আপনার কাছে যাব মনে করেছিলাম, মা।"

'জিজ্ঞেস করেছি বৈকি বাবা। সে আমার কথায় রাজি হবে না এমন ছেলে ও তো নয়।"

একটু ঘাড় হেঁট করেই রইল রজত, তারপরই তার চৈতন্যটা ফিরে এল—স্বাতির দিকে হঠাৎ মনটা চলে গিয়ে কি ভুলটা হয়ে যাচ্ছে! সামলে নেওয়ার চেষ্টা ক'রে বলল—"তাহলেই নিশ্চিন্দি। আমি আপনার কাছে যে যাব-যাব করছিলাম মা, সে এই জন্যেই—অসুখ-বিসুখের এমন হিড়িক পড়ে গেছে যে কোন মতেই হয়ে উঠছিল না। বিশাখা আপনার পায়ে জায়গা পাবে, এ তো কল্পনাতেও আসে না—নেহাত আপনার নাকি দয়া আমাদের ওপর, তাই......"

কথার রাশি দিয়ে ভুলটা ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল। সফলও হোল। হয়তো একটু খুঁত কোথাও আটকে রইল মানদাদেবীর মনে, তবে সেটাও আস্তে আস্তে মিলিয়েই এল। সরল প্রকৃতির মানুষ, গোড়ায় একটু ধোঁকায় পড়ে যাওয়ার জন্য চাটুবাদটুকু আরও বরং মিষ্টই লাগল, বললেন—"যাক্, আমার যেন মনে হয়েছিল আপত্তি আছে তোমার। বিশাখা মেয়েটিকে আমার পছন্দ বাবা। তবে, উপযুক্ত ছেলে, জোর করে নিজের পছন্দ চালাব, তা কেন করতে যাব বলো?"

স্বাতির কথাও এনে ফেললেন। বললেন—"লাহিড়ীমশাইয়ের মেয়ের কথা শুনেছিলাম—কৈ, তখনও তো আপত্তি করেনি। এবার দেখলাম মত বদলেছে, নিজে হ'তেই বলে এল......"

"বললে প্রশান্ত?"

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল রজত। তবে এবার সতর্ক ছিল বলে এমন সংযত হয়ে যে মানদাদেবী অতটা ধরতে পারলেন না। মনটা প্রসন্ন রয়েছে, রজতকেও প্রশান্তর সঙ্গে এক ক'রে নিয়ে একটু হেসেই বললেন—"আজকালকার ছেলে হ'লেও মুখ ফুটে বলবে সে-ধরনের ছেলে তো তোমরা নও। তবে, তাতে কি আটকায় আমাদের বুঝে নিতে বাবা? বললে—চাও তো দেখতে পার বিয়ের সন্ধান।...কেন রে বাপু! এক জায়গায় তো করছিলিই নিজে ঠিক, আপত্তি তো করিনি। তারপর নিজেই ভেবে ভেবে এই আন্দাজটা মনে এল। তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। আবার কথায় কথায় মত বদলায়, এও তো ঠিক নয়।...তোমাকেই কথাটা বলছি বাবা—মায়ের মন, বুঝতেই পার। যতক্ষণ না দু'হাত এক হচ্ছে, ধুকপুকুনি থাকবেই লেগে।" আবার একটু হাসলেন। অন্যমনস্কতার মধ্যেও সতর্ক ছিল রজত, বলল—"আজ্ঞে, সে আর বুঝছি না।"

"আর, ভুলও তো করিনি বাবা, কেন করবে বলো, মা-ই তো ওর। কথাটা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তো টের পেলাম—আন্দাজটা মোটেই ভুল হয়নি আমার। ...যাক্, তাহলে তোমারও অমত নেই। এবার তাহলে তোমার পিসির কাছে পাড়তে পারব কথাটা। বিকেলবেলায় যেন

বাসাতেই থাকেন তিনি। আর, যাবেনই বা কোথায়? এই তো জায়গা।"

"আপনি কেন যাবেন মা? একে তো একটা চিঠি দিয়ে তলব না ক'রে নিজে হ'তে ছুটে এসেছেন, এর লজ্জাই রাখবার জায়গা নেই আমার। পিসিমাকে পাঠিয়ে দোব। এমনি অবশ্য পায়ের ধুলো যত পড়ে ততই ভালো। তবে তার তো ঢের সময় আছে।"

বিশাখাও জানল। মানদাদেবী এসেছেন শুনে ও যখন তোয়ের হয়ে নিয়ে দেখা করতে এল, রজত তখন বেরিয়ে গেছে, উনি মুকুন্দ-দাদার সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়েই গল্প করছেন। বিশাখা ও'কে প্রণাম করবার জন্যে এগুতে বললেন—"আগে ও'কে করো মা, আমার দাদা।...তোমার মামা হ'ন।" তারপর ও'কেও প্রণাম করা শেষ হ'লে পাশে বসিয়ে, বুকের সঙ্গে একটু জড়িয়ে ধরেই বললেন—"এই আমার নতুন মেয়ে তোল দাদা।" আঙুলে চিবুকটা একটু তুলে ধরে বললেন—"কেমনটি হবে বলো। তুমি হয়তো দেখওনি আগে।"

ওখান থেকে তাড়াতাড়িই ফিরে এল বিশাখা একটা ছুতো ক'রে। কিছুই সন্দেহ নেই, তবু পিসিমাকে প্রশ্ন করল "হঠাৎ প্রশান্তদা'র মা কেন এসেছেন জান পিসিমা?"

উনি উত্তর করলেন—"এসেছেন তোমার ভাগ্য নিয়ে মা। রজু সেই কথাই তো ব'লে বেরিয়ে গেল এইমাত্র। আমিও যাচ্ছি নেয়ে পুজোটুকু সেরে নিয়ে। সকাল হতেই একটা এত ভালো খবর—ওপর-পড়া হয়ে এসে বলছেন গিন্নি, বিশ্বাস করাও তো শক্ত। তাই বলছিলাম রজুকে—হ্যাঁরে, খ্যাঁই-টাই সম্বন্ধে কিছু পেলি আঁচ কথাবার্তায়? ...ছেলে তো নয়, হীরের টুকরো—মাঝ কলকাতার ভেতর থেকে ও-ছেলেকে লুফে নেওয়া—ঐ তো লাহিড়ীমশাইও চেষ্টা করেছিলেন যেমন শুনতে পাই..."

বয়েস হয়েছে, বকা অভ্যাস, ব'কে চললেন।

রজত একটু দেরি ক'রে ফিরল হাসপাতাল থেকে। প্রশ্ন করল—"হ্যাঁরে বিশা, শুনেছিস কথাটা—প্রশান্তদা'র মা কেন এসেছেন?"

"শুনেছি।"—ওর খাওয়ার জোগাড় করতে করতে বলল বিশাখা।

"তাহলে? আজকাল তো তোদের মতও জানতে হচ্ছে। আমরাই শুধু, যেখানে পড়েছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম।"

"আমাদের মত নেওয়াও যা, না নেওয়াও তা—তাই জিজ্ঞেস করে।"—

"........তোমার মামা হন।"

অন্য বারান্দা থেকে কথা কইছিল: বলতে বলতে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল —"আমি একবার বাড়ি যাব দাদা, অনেকদিন যাইনি।"

"বাড়ি যাবি কি! খুব ছুটি দেখেছিস আমার?"

"কেন, প্রশান্তদা'র মা তো যাচ্ছেন। আজই যাচ্ছেন ও'রা। ও'দের সঙ্গেই যাব আমি, শুনব না।"

"লোকে বলবে কি!—শাশুড়ী না হ'তে হ'তে...এত ফূর্তি..."

"হয়েছে, থামো। লোকের বলার ভয় করতে গেলে তো বিয়েও পণ্ড হয়।"

—বলতে বলতে পেছন ফিরে এগিয়ে যেতে যেতে ও-বারান্দায় গিয়ে বলল,

—"যাবই আমি দাদা। মত না দিলে আমারও মত নেই—এই ব'লে দিলাম কিন্তু।"

॥ ত্রিশ ॥

অনাথ আসে না আর।

একটা যে কিছু হয়েছে এটা তো খুবই স্পষ্ট, শুধু কি থেকে কি হয়েছে, সেইটেই পারছে না বুঝতে। খুবই অশান্তিতে কাটছে। এলে কিছু হদিশ পায়, গোপেশ্বর রয়েছে, চাটুজ্যে রয়েছে। গোড়ায় গোড়ায় ক'দিন গিয়ে যে টের পায়নি কিছু, তখন ওরাও কিছু জানত না বলেই। এতদিনে আর নিশ্চয় বাকি নেই ওদের জানতে, কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই। একদিন হঠাৎ দিব্যি দিয়ে বসল স্মৃতি।

বিশাখা রোজই নিয়মিতভাবে আসে, আজকাল যেন আরও ঘড়ির কাঁটা ধ'রেই। সাধ্যমতো কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করে অনাথ, কিন্তু পুল-কলোনীর দিকের কথা নিয়ে এমনই নীরবতা যে ওরও মুখও যেন কে শপথ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে—যে-বিশাখা নাকি একটু সুবিধা পেলেই প্রশান্তকে টেনে স্মৃতিকে কুটুস-কুটুস ক'রে কামড় দিতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল, সরে সরে থাকতে হোত অনাথ-কাকাকে।

মনের অশান্তিতে কাটছিল, নিরুপায় ভাবে, তারপর আজ বিশাখাও না যাওয়ায় বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে লাহিড়ী-মশাই ওকে ডেকে একবার দেখতে বললেন। ও'র বিশেষ কিছু ভাবান্তর নেই। ওদিকে স্কুল আর এদিকে বাড়ির দুটি ছাত্রী নিয়ে জ্ঞান-চর্চায় গা ঢেলে দিয়েছেন। প্রশান্ত কাজের মানুষ, কাজের চাপে প'ড়ে আসতে পারছে না—

এই পূর্ণ-বিশ্বাসে ওদিকটায় দিব্য নিশ্চিন্ত আছেন।

অনাথকে বলতে সে একটু চটেই উঠল। এতদিনের আক্রোশ মিটিয়ে গোঁফ-জোড়াটা ফুলিয়ে বলল—"তা পায়ের শেকল খোলা হবে তবে তো যাব—সেটা খোলার ব্যবস্থা করো আগে।"

"তোর পায়ে শেকল! —এ তো প্রথম শুনলাম। সারা দুনিয়া এক করে বেড়াচ্ছিস।"

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে কথাটাকে আর এগুতে দিল না স্বাতি, বলল:

—"ও বাবা, আমি কবে রাগের মাথায় দিব্যি দিয়েছিলাম, সেই কথা বলছে অনাথ-কাকা। দেখছই তো, গোঁফে আর হুঁস থাকে?"

আজ আর দেরি হোল না অনাথের: যেতে-আসতে যতটা লাগে তার ওপর মাত্র আরও কিছুক্ষণ।

ও চলে গেলে, লাহিড়ীমশাইয়ের মনটা চঞ্চল লক্ষ্য ক'রে স্বাতি বলল—"তুমি তাহলে আজ না হয় একটু সকাল সকালই বেড়ানোটা সেরে আসবে বাবা? তাই এসো বরং। অনাথকাকার দেরি হবেই; সন্ধ্যের পর ক্ষীরির দিদিমা থাকলেও কেমন যেন ভয়-ভয় করে।"

লাহিড়ীমশাই বললেন—"বেশ, তা' হলে হয়েই আসি, বাবলাতে একটু কাজও আছে। তাড়াতাড়িই ফিরব। ডেকে দিয়ে যাই ওকে।"

"না বাবা, থাক।" —যেন ভয় পেয়ে একটু হেসেই বলল স্বাতি।—"এখন ওকেই ভয়, যা গজর-গজর করে বুড়ী। এখন তো দরকারও নেই, বেশ বেলা রয়েছে। দরকার হয়, নিজেই ডেকে নোবখন।"

ও'র সঙ্গে পড়ছিলই, উনি চলে গেলে বই তুলে এ'দিক-ওদিক ক'রে কাটল খানিকটা; পরিষ্কার আসবাবপত্রগুলো আবার ঝেড়ে-ঝুড়ে,—গোছানো জিনিস-গুলো আবার গুছিয়ে। আজ বইয়ের দিকে মনটা যেন যাচ্ছেও না ওর।

বিশাখা না-আসার জন্য নয়। ওটাকে ও তেমন বড় করে দেখতে পারছে না—একদিন না-আসা, নিতান্তই কোন একটা সহজ স্বাভাবিক কারণে হয়েছে নিশ্চয়। ওর মনটা বরং হালকাই আছে আজ। একটা মানুষ রোজ আসছে, তার সঙ্গে এত কথা, তার কাছ এত জানবার, অথচ দুজনের কেউই মুখ খুলতে পারছে না—একটা পাষাণ-ভারই বুকের ওপর চেপে থাকে তো; সেটা নেই আজ।

তার ওপর এও একটা নূতন জিনিস হোল; অনাথ গেল খবর নিতে; নিশ্চয় দুটো বাড়িরই খবর নিয়ে আসবে। শপথ দিয়ে তুলে নিতেও তো পারছিল না।

হালকা মনে এটা ঝেড়ে ওটা গুছিয়ে হালকাভাবেই ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আজ অনেকদিন পরে ঘরের কোণে সেলাইয়ের কলটার ওপর নূতন ক'রে নজর পড়ল। বিশেষ কিছু ভাবল না স্বাতি, মনটাকে ভালোমন্দ ভাবনা থেকে টেনে রাখলই বলা ঠিক। শুধু শুকনো মালাটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিল, মখমলের ঢাকনাটা তুলে, ঝেড়ে আবার পরিয়ে দিল। শুধু একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়ল।

বাগানে গিয়ে কিছু ফুল তুলে এনে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটার চারদিকে গুছিয়ে রাখল। তাঁরই একটা গান নিয়ে গুনগুন করছে। এরপর আলমারি থেকে ব্যাঞ্জোটা বের করল।

অনেকদিন হাত দেয়নি ব্যাঞ্জটাতে। আলমারির মধ্যে থেকেও ঢাকনাটাতে ধুলো জমে উঠেছে। খুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে বাগানের দিকে এগিয়েছে—আজ একটু বাজাবে—অনাথ এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল—"মা-মণি!"

কালো মুখটা তামাটে হয়ে উঠেছে, থমথম করছে, গোঁফজোড়া উঠছে ফুলে। সমস্ত পথটা শুধু রাগ জমাতে জমাতে এসেছে অনাথ।

"কি অনাথকাকা?" ভীতভাবে প্রশ্ন করল স্বাতি। —"বিশাখা..."

রক্তবর্ণ চক্ষু থেকে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল অনাথের। স্বাতি আর্তভাবে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল—"কি অনাথকাকা? —বিশাখার!...ও'দের...!"

"ও মা-মণি, তানার ভালোই হয়েছে" —হাউহাউ করে কেঁদে উঠে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল অনাথ, বলল—"ইনজিনিয়ার-দাদাবাবু বিয়ে করছে তানাকেই—একি হোল! —আমরা কি করলুম যে এমন সব্বনাশ!..."

"চুপ করো অনাথকাকা—তুমি এর জন্যেই এত..."

সহজ কণ্ঠেই, তবু কথাটা আটকে গেল, যেন সমস্ত শরীরটা কাঠ হয়ে গেছে বলেই। তাইতেই হাত থেকে ব্যাঞ্জোটাও গেল পড়ে। গলাটা আবার তখনই ঠিক ক'রে নিয়ে বলল—ঠোঁটে একটু হাসি টেনে নিয়ে এনেই বলল—"ওঠ, বাঃ! অথচ এত ভালোবাস ও'দের দুজনকে—লোকে শুনলে বলবে কি!..."

ঠাণ্ডা করল অনাথকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। কিংবা ওর মুখে এ-ধরনের কথা শুনে স্তব্ধবাকই হয়ে গেল অনাথ, বলা যায় না। এরপর ব্যাঞ্জোটা নিয়ে বাগানে গিয়ে বসল।...যেন লড়াই চলেছে ওতে আর ব্যাঞ্জোতে, কোনমতে সুরে বাঁধা পড়তে দেবে না নিজেকে। কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে স্বাতি তন্ত্রীর ওপর প্লেকট্রামের ঘা দিতে আবিষ্কার করল তখন পড়ে গিয়ে চামড়ার একটা জায়গায় ছেঁদা হয়ে গেছে। অথচ এতক্ষণ যে এটুকু কেন বুঝে উঠতে পারেনি ভেবে পেল না!

এরপর কোলের ব্যাঞ্জোর দিকে চেয়ে চেয়ে ওর চোখেও জল নামল।

লাহিড়ীমশাই বেড়িয়ে এসে বাইরেই অনাথের মুখে শুনলেন কথাটা। অনাথ রাস্তার দিকের বাগানটায় এটা-ওটা করে মন বসাবার চেষ্টা করছিল। বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে খানিকটা দেরি হোল তাঁর। কিন্তু মন্তব্য করলেন না; একটু যেন টলতে টলতে গিয়ে বারান্দায় সিঁড়িটায় বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

তারপরও বিশেষ কোনও প্রশ্ন-মন্তব্য নেই। শুধু মাঝে মাঝে—"এ কি ক'রে হতে পারে! এ কী হোল!"

কাকে করবেন প্রশ্ন যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। নিজের মনেই করে ওঠেন, অনাথকেও করেন। তারপর এক সময় স্বাতিকেও করে বসলেন। সেদিন নয়। সেদিন শুধু বার দুই নিজেকে, একবার অনাথকে। বাকি সময়টা চুপচাপই কাটল। মাঝে মাঝে দৃষ্টি গিয়ে স্বাতির ওপর পড়েছে, চোখাচোখিও হয়ে গেল তার সঙ্গে। রাতটা এই করে কাটল।

স্বাতি থামতে গেছে। নিজের চিন্তাটা একেবারে নেই আর। আড়ালে পেলেই অনাথকে বলছে—"কি হবে অনাথকাকা? আবার সেই ভাবটা ফিরে আসছে যে বাবার! কেন বলতে গেলে তুমি!"

সামনে মুখটা প্রসন্ন ক'রে কাজ দেখিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বই নিয়ে পড়ায় বসবার চেষ্টা করছে ও'র সঙ্গে—বসছেনও; শুধু মন বসছে না বেশিক্ষণ।

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে স্বাতিকে পড়াতে ব'সে হঠাৎ বললেন—"আজও বিশাখা আসবে না মা।...ওদের কথাটা শুনেছ বোধহয় অনাথের কাছে? কি হবে বলো তো?"

মুখের পানে চেয়ে রইলেন যেন মনের ভেতরটা খুঁজছেন। স্বাতি বেশ সহজভাবেই হেসে বলল—"শুনেছি বাবা। ভালোই তো হচ্ছে; দুজনেই কত ভালো, বুঝে দেখো না।"

আরও হাসিটাকে বাড়িয়ে বলল—"আমার শুধু ভাবনা, এখানে হবে, না, কলকাতায় গিয়ে। ভোজটা মারা যায় তাহলে।"

প্রাণপণে চারদিকে হাসি ঝরিয়ে চলেছে। ওর চোখের জল ঝরে বাগানের নিভৃতে।

এর পর আরও চরমেই ঠেলে উঠল ব্যাপারটা হঠাৎ।
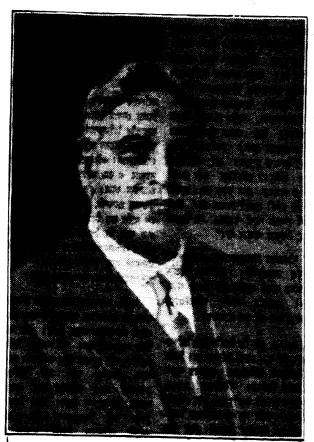
(ক্রমশঃ)

ডঃ নীলরতন সরকার

সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কর্ণ বলেছিলেন ঃ

দৈব্যায়াত্তং কুলে জন্ম
মদায়াত্তং হি পৌরুষম্।

"কোন্ বংশে আমি জন্মেছি তাতে আমার কোন হাত ছিল না। সেটা ভাগ্যের অধীন। কিন্তু আমার যেটুকু পৌরুষ তার অধিকারী আমি।"

একশত বৎসর পূর্বের কথা।

২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবারের কাছে নেত্রা ছিল একখানি নগণ্য গণ্ডগ্রাম; সেই গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে নীলরতন জন্মগ্রহণ করেন। সে দিনটি ছিল ১লা অক্টোবর, ১৮৬১ সাল। একটি ক্ষুদ্র বীজ যেন কোথা থেকে খসে পড়ল। না পেল জল, না পেল হাওয়া, না পেল সূর্যের আলো। এমন অবস্থায় বীজের সাধারণতঃ অপমৃত্যুই হয়ে থাকে। কিন্তু সেই বীজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে পাথরের ভেতর থেকে সে রস সংগ্রহ করে বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হল। এমনই প্রাণশক্তির প্রাচুর্য নিয়ে জন্মেছিলেন নীলরতন। পদে পদে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেছেন। কত বাধা-বিঘ্ন সামনে এসে পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অদম্য ছিল তাঁর অধ্যবসায়, অবিচলিত ছিল তাঁর ধৈর্য আর অপরাজিত ছিল তাঁর সংযম। কঠোর ছিল তাঁর জীবনসংগ্রাম। কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা, অসীম ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বলে জীবনের উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় শত বাধা, সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম করে কঠোর বিপদ আর দুঃখ দারিদ্র্যকে পরাভূত করে জীবনকে সফলতার সঙ্গে পরিসমাপ্ত করতে পেরেছিলেন নীলরতন।

বারো বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। অর্থাভাবে মায়ের উপযুক্ত চিকিৎসা হল না। চোখের সামনে দেখলেন চিকিৎসার অভাবে মায়ের মৃত্যু। অন্তরে কঠোর আঘাত পেলেন নীলরতন। প্রতিজ্ঞা করলেন ডাক্তার হব। পনের বৎসর বয়সে (১৮৭৬) গ্রামের বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এইবার আরম্ভ হল তাঁর জীবনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম। অর্থ নেই যে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবেন। ডাক্তার হবার আন্তরিক আগ্রহে তিনি ক্যাম্পবেল স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে চার বৎসর কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে সফলতার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। তারপর যোগ দিলেন মেট্রোপলিটান কলেজে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এফ, এ আর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এর মধ্যে লোক গণনায় যোগ দিয়েছেন, পরীক্ষায় পাহারা দিয়েছেন, শিক্ষকতা করেছেন। যখন যা পেয়েছেন তাই করে অর্থ সংগ্রহ করে শিক্ষার এক এক ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এইবার এক এণ্ট্রান্স স্কুলে পেলেন প্রধান শিক্ষকের পদ। আজ হতে ৭৭ বৎসর পূর্বের কথা। তখন প্রধান শিক্ষকের পদের বেতন ছিল সামান্য। তিনি সে পদও ত্যাগ করলেন। যোগ দিলেন এক গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে। কিছু অর্থ সংগ্রহ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। এর মধ্যে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পরের বৎসর এম, ডি ডিগ্রী লাভ করলেন। নিজের একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ে পরীক্ষা সমুদ্র উত্তীর্ণ হলেন। সাধনার দীপ্তিতে তাঁর জীবন প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিলে তিলে তিনি জ্ঞানের মণিমুক্তা সঞ্চয় করেছেন। এইবার নিজের সঞ্চিত জ্ঞান তিনি সার্থক করে তুললেন জনসেবায়, দেশসেবায়।

নীলরতনেরা ছিলেন পাঁচ ভাই, দুই বোন। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন অবিনাশচন্দ্র। তিনি দিনমানে অন্য কাজ করতেন। আর সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজে হিসাব নিকাশের কাজ করতেন। তিনি যেখানে বসে কাজ করতেন সেই গ্যাসের আলোয় পড়বার জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যায় মেজ ভাই নীলরতনকে সেখানে নিয়ে যেতেন।

গ্যাসের আলোয় বসে তিনি তাঁর পড়া তৈরি করতেন।

নীলরতনের তৃতীয় ভাই ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। তাঁর আর্ট প্রেস ছিল। আর চতুর্থ ভাই ছিলেন স্বনামধন্য শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার। 'হাসি-খুসি' প্রভৃতি বিখ্যাত শিশুসাহিত্য রচনা করে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। নীল-রতনের আর এক কনিষ্ঠ ভাই ছিলেন। তিনি দেহত্যাগ করেন।

নীলরতনের দুই ভগ্নী ছিলেন। নীলরতনের আসামে চা-বাগান ছিল। বড় ভগ্নীপতি সেই চা-বাগান দেখাশোনা করতেন। তিনি আসামেই এক নদীতে জলে ডুবে মারা যান। নীলরতনের ছোট ভগ্নীপতি ছিলেন প্রবোধচন্দ্র মহলা-নবীশ। ব্রাহ্মসমাজের গলির পাশেই কার (সরকার) মহলানবিশের ডাক্তারখানা ছিল। তাঁর পুত্রই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

এম, ডি উপাধি ভূষিত হয়ে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নীলরতন স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। যত্ন করে রোগী দেখেন। একাগ্র হয়ে রোগ নির্ণয় করেন। সুতরাং রোগী শীঘ্র নিরাময় হয়। সুযোগ্য ও বিচক্ষণ চিকিৎসক বলে শীঘ্র তাঁর যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তার ওপর তাঁর ছিল সৌম্য মূর্তি। ডাক্তার যদি রোগীকে রোগমুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন রোগীরও ডাক্তারের ওপর একটা আস্থা জন্মায়। সুতরাং তিনি শুধু জনপ্রিয়ই হলেন না, প্রতিভা-বান চিকিৎসক বলেও খ্যাতি লাভ করলেন।

একবার হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কাকা কালীচরণ ঘোষের অসুখ হয়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে ডাকা হ'ল। নীল-রতন তখন মেয়ো হাসপাতালে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেছেন। মহেন্দ্রলাল সরকার আসবেন শুনে নবীন চিকিৎসক নীল-রতন তাঁর চিকিৎসার প্রণালী দেখবার জন্য সেখানে এলেন।

মহেন্দ্রলাল রোগীর ঘরে এসে যুবক হেমেন্দ্রপ্রসাদকে বললেন, "ওহে ছোকরা, গাড়ী থেকে আমার চোঙাটা নিয়ে এসত।" হেমেন্দ্রপ্রসাদ গাড়ী থেকে চোঙা নিয়ে এলেন। চোঙাটা এক বিঘত লম্বা। রোগীর বুকে বসিয়ে নীচু হয়ে চোঙার অপর দিকে কান দিয়ে শব্দ শুনতে হত। তখন রবার লাগান বর্তমান আকারের স্টেথেসকোপ সৃষ্টি হয়নি। ডাঃ মহেন্দ্র-লাল কালীচরণ ঘোষের বুকে চোঙা লাগিয়ে কোন অসুখের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। তখন একজন মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে ডাঃ নীলরতনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন মহেন্দ্রলাল নীল-রতনকে বললেন, "তুমি ত খুব ভাল ছেলে হে! তবে মেয়ো হাসপাতালের চাকরি ছাড়লে কেন? সেখানে ত বহু রোগী দেখতে পেতে। বহু অভিজ্ঞতা হত। প্রাইভেট প্রাকটিসে কটা রোগী দেখতে পাবে? এক কাজ কর। প্রত্যহ চারটির বেশী রোগী দেখবে না। আর বাকী সময়টা শুধু পড়বে। না পড়লে কিছু শিখতে পারবে না।"

নীলরতন মহেন্দ্রলালের এই উপদেশ কখনও ভোলেননি। প্রতিদিন তিনি ডাক্তারির নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করে-ছেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে নীলরতনের কৃতকার্যতার এই হল মূলমন্ত্র।

এম, এ, এম, ডি উপাধিধারী চিকিৎ-সক তখন খুব বেশী ছিলেন না। তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নীলরতন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। সেই সময় সিণ্ডিকেটে কারমাইকেল মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করবার প্রশ্ন ওঠে। অনেকে তাতে আপত্তি করেন। নীলরতন বলেন, যদি বিধান-চন্দ্র রায় এম, ডি, এফ, আর, সি, এস, এল, আর, সি, পিকে কলেজ মেডিসিনের অধ্যাপক করে নিতে পারেন তবে কলেজকে এম বি পড়াবার এফিলিয়েশন দেবেন। তাই হল। সেই দিন থেকেই বিধানচন্দ্র কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন।

এইবার নীলরতনের দৃষ্টি পড়ল ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার মানের প্রতি। যাতে এ দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান উচ্চতর বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও আদর্শের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় ও ভারতীয়গণ যাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণার সুযোগ পান তার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করবার সময় যাতে চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারতের সুযোগ সুবিধা ও ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা হয় তার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। তা ছাড়া যাতে প্রত্যেক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্রেরা গবেষণা করবার সুযোগ পান তার জন্যও যত্নবান ছিলেন। তিনি কলকাতার বহু প্রধান বেসরকারী হাসপাতালের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজ এদেশ থেকে বিদায় নেবার আগে আমরা দেখেছি যে, ভারতীয় চিকিৎসকেরা ভারতীয় মেডি-ক্যাল সার্ভিসের বৃটিশ সদস্যদের সমকক্ষ হয়েছিলেন। এটা হয়েছিল ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারীর প্রচেষ্টার ফলে। এর পেছনে ছিল তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টা, উদ্যম ও সৎসাহস। সে যুগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও এম, ডি, এল, আর, সি, পি ও এফ, আর, সি, এস হয়েও মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক হবার যোগ্যতা লাভ করতে পারেননি। অধ্যা-পক হয়েছিলেন ক্যাম্পবেল স্কুলে।

যদিও নীলরতন সারাজীবন ডাক্তারি করেছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে তাঁর একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল। তাঁর মন ছিল পরীক্ষামূলক। সব বিষয়েই তিনি পরীক্ষা করে দেখতে ভাল বাসতেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর সব জিনিস শেখবার জন্য, জানবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল ছিল। নানা বিষয়ে তিনি বই কিনতেন। তাঁর কর্ম-বহুল জীবনের স্বল্প অবসরটুকু কাটত এই বই পড়ে। সব সময়েই তাঁর দৃষ্টি থাকত কোথায় কোন্ বিষয়ে কি গবেষণা চলছে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়েন্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। কোথাও কোন ভাল কাজ হয়েছে শুনলে তাঁর মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে নানা রকমে সাহায্য করেছেন।

স্বদেশীযুগের সময় থেকে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগ দেন। ন্যাশা-নাল কাউন্সিল-এর সংগঠন কাজের মধ্যে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও নীলরতন দুজনেই এই প্রতিষ্ঠানের জয়েণ্ট সেক্রে-টারী ছিলেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠানটি পরে ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পরিণত হয়।

এখন এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি তার আজীবন ট্রাস্টী ছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন, ডাক্তারিতেও তেমনি তাঁর করুণাভরা একটি সজীব হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যেত। অনেক দুঃখ দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে তিনি লেখা-পড়া শিখেছিলেন। জ্ঞানের মণিমুক্তা আহরণ করেছিলেন। তাই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর স্নেহ ও বেদনা। তাঁর বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যা কিছু করেছেন তার মূলে ছিল ছাত্রদের প্রতি তাঁর অন্তরের দরদ।

নীলরতনের চিকিৎসা-পদ্ধতির মূলে ছিল মানব-হিতৈষণা। মানুষের রোগ-যন্ত্রণা দূর করতে হবে, তাকে বাঁচাতে হবে এই ছিল তাঁর সাধনা। রোগীকে হাতে নিলে তার টাকার কথা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যেত। রোগী অর্থ দিতে পারবে কিনা সে কথা তিনি চিন্তা করতেন না। তাঁর আত্মীয়-স্বজন কত গরীব ছাত্র বা অন্য রোগীকে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছেন। তারা তাঁকে এক পয়সাও ফি দেয়নি। তাতে তাদের প্রতি তাঁর যত্নের কোন ত্রুটি হয়নি। রাজবাড়ী ও দরিদ্রের কুটীরের রোগীর মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য করতেন না।

রোগীর প্রতি তাঁর ব্যবহারে দেখা যেত তাঁর গভীর করুণা। রোগীকে ঔষধ দেওয়া, তার পথ্যের ব্যবস্থা করা, এ সব ডাক্তারই করে থাকেন। তাঁর লক্ষ্য থাকত কি করে রোগীর মন প্রফুল্ল হয়। তাঁর কথায়, ব্যবহারে, চেহারায় রোগী অসীম ভরসা পেত। মরণাপন্ন রোগীর পাশে গিয়ে যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন তাঁর সেই বরাভয় মূর্তি দেখে শুধু রোগীর নয় সকলেরই মনে এক নূতন আশার সঞ্চার হত। নীলরতন সরকার এসেছেন। আর কোন ভাবনা নেই। রোগীর অন্তরে এই যে নির্ভরতা, এতেই রোগীর মন প্রফুল্ল হয়ে উঠত। মনের এই নির্ভরতা রোগ সারাতে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করত।

কোন রোগীর চিকিৎসা করবার সময় তিনি আহার-নিদ্রা সব ভুলে যেতেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁর নিজের শরীরও ভগ্নপ্রায় তখন একদিন রোগী দেখতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেল। তিনি বাড়ী ফিরলেন না। বাড়ীর লোক ত চিন্তিত হয়ে উঠল। নানা স্থানে টেলি-ফোন করা হল। হাসপাতালে, থানায়। অবশেষে রাত তিনটায় তিনি বাড়ী ফিরলেন। কোথায় ছিলেন? সকলে জিজ্ঞাসা করল। একজন রোগীর পাশে রাত দশটা থেকে তিনি বসেছিলেন। বাড়ীতে খবর দিতেও তাঁর মনে ছিল না। বাড়ীর লোকে যখন অনুযোগ করল, তিনি বললেন, "নিজের খাওয়া-দাওয়া, ঘুমোনোর কথা ভাবতে গেলে আর রোগী দেখা হয় না।"

খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশ ও প্রশংসা লাভের জন্য অথবা অর্থোপার্জনের জন্য তিনি ডাক্তারি করেননি। ডাক্তারি করাই ছিল তাঁর স্বভাবের ধর্ম। যশ ও অর্থ অযাচিতই এসেছে।

নিজের পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়, ধৈর্য ও সংযম তাঁকে সমগ্র ভারতের চিকিৎসা-জগতের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিদেশেও তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল। অর্থও তিনি প্রচুর উপার্জন করেছেন। নীলরতন সরকারই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় চিকিৎক, যিনি তাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতায় ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসকদেরও প্রশংসা-ভাজন হয়েছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ইউরোপে যান তখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল, এল, ডি আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, সি, এল উপাধিতে ভূষিত করেন।

নীলরতন এম, এ, এম, ডি পাস করার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। আশুতোষের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর শূন্য স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউ-ন্সিল অব পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচিং ইন আর্টস ও সায়ান্সের ১৯২৪-২৭ পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন।

তিনি ১৯১৯ সালের ৩১শে মার্চ থেকে ১৯২১ সালের ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৩৩-৩৯ পর্যন্ত নীলরতন ছিলেন ডীন অব দি ফেকাল্টি অব সায়েন্স আর ১৯৩৯-৪১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ডীন অব দি ফেকাল্টি অব মেডিসিন। ১৯১৭ সালে গভর্ণমেন্ট তাঁকে 'সার' উপাধি দেন।

নীলরতন এত কাজ করেছেন কিন্তু সব সময়েই তিনি নিজেকে প্রকাশ করার বিরোধী ছিলেন। তিনি সর্বদাই নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে ভালবাস-তেন। কাজ হলেই হ'ল। তাতে তাঁর কোন কৃতিত্ব আছে কিনা লোকে নাই বা জানল। তাঁর স্বভাবের মধ্যে একটা সহজ নম্র ভাব ছিল, একটা বিনয় ছিল যার জন্য সংসারের হাটে তিনি ঠেলাঠেলি করেননি। বরং নিজেকে পিছনে রেখে কাজ করে গিয়েছেন। সহকর্মীদের সঙ্গে মতভেদ হলে তিনি চুপ করে যেতেন বা সরে দাঁড়াতেন। কোন বাদানুবাদ অথবা সমালোচনাও তিনি করতেন না। তিনি এতই পরমতসহিষ্ণু ছিলেন।

তাঁর মধুর স্বভাবের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য ছিল বিনয়। যেখানে তাঁর নিজের মত প্রকাশ করবার অবাধ অধিকার ছিল সেখানেও তিনি অপরের মতকে উপেক্ষা করেননি। নবীনতম চিকিৎসক যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, তাঁকে যখন ডাকা হয়েছে, তিনি বলেছেন যে ব্যবস্থা ঠিকই হয়েছে, তবে এই রকমভাবে একটু বদলানো যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। সভা-সমিতিতেও যখন সভাপতিত্ব করেছেন তখন ঠিক সেই রকম করেই সব-চেয়ে সামান্য যে সভ্য তার মতও জিজ্ঞাসা করেছেন। এর কারণ হল সকলের সম্বন্ধেই তাঁর একটা শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্র-নাথ একবার তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মানুষ মহৎ না হলে বড় ডাক্তার হতে পারে না।'

নীলরতন এত মহৎ ছিলেন যে, কখনও কারও নিন্দা করেননি বা অপরে নিন্দা করলেও তা শুনতে চাইতেন না। তাকে থামিয়ে দিতেন।

বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত ও সংকটমুহূর্তে তাঁর প্রতিভা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তিনি কখনও এ সবের সামনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন না। একটা কিছু নতুন উপায় বার করতেন। তখন তাঁর বয়স কম। এক হাসপাতালে কাজ করেন। একজন রোগীকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন obstruction of the intestines —অস্ত্রোপচার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। কোন সার্জেনকে ডেকে আনবার সময় নেই। অথচ তিনি অস্ত্র-চিকিৎসা করতেন না। কিন্তু তিনি কোন দ্বিধা না করে তখনই নিজ হাতে এত বড় একটা অপারেশন করলেন। আর তাইতেই রোগীটি বেঁচে গেল।

নীলরতনরা ছিলেন সাত ভাই-বোন। তাঁদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী নিয়ে এক বিশাল পরিবার তিনি প্রতিপালন করতেন। ছোটবোনের ছেলে-মেয়ে, নাতিনী-নাতনী ছিলেন তিরিশ জন। বড়বোনের ছিলেন চল্লিশ জন এ ছাড়া ভাইদের বউরা, জামাই ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্ব। এ'দের প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার

কথা তিনি চিন্তা করতেন। বৃহৎ বনস্পতির মত সকলকে নিজের আশ্রয় দিয়ে ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁর রুগ্না স্ত্রী বিছানায় উঠে বসতে পারতেন না, তখন তিনি সারা দিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে আগে নিজের হাতে স্ত্রীকে আহার করিয়ে তবে নিজের মুখে অন্ন তুলতেন।

শুধু তাঁর আত্মীয়-স্বজনের প্রতিই যে তাঁর সহৃদয়তা ছিল তা নয়। তাঁর বন্ধু-বাৎসল্য ছিল অসাধারণ। বন্ধুদের বিবাহ-উৎসবে তাঁর ছিল সবচেয়ে আনন্দ ও উৎসাহ। বন্ধুদের কন্যার বিবাহেও তিনি তেমনি উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছেন।

মাঘোৎসবে উদ্যান-সম্মেলনে যাবেন। তাঁর এক বন্ধুকে ডাকতে গিয়ে দেখেন তিনি বিরসবদনে বসে আছেন। ব্যাপার কি? "কাল মকদ্দমা—ব্যারিস্টারের ফি লাগবে হাজার টাকা। অথচ হাতে পয়সা নেই।" নীলরতন এই কথা শুনে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বন্ধুর কোলে হাজার টাকার নোট ফেলে দিয়ে বললেন, "এর জন্য বাগানে যাবেন না! এবার হোল ত! উঠুন এবার যাওয়া যাক্।" নীলরতনের এই বন্ধু-বাৎসল্য বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বোম্বে, মাদ্রাজ, সিংহল থেকে তাঁর বাড়ীতে লোক এলে অতিথি হত। তিনি বাইরের লোককে ঘরে ডেকে এনে আনন্দ পেতেন।

রোগীর সঙ্গে তাঁর শুধু দেনা-পাওনার সম্পর্কই ছিল না। তারকনাথ পালিত রোগী হয়েই তাঁর কাছে এসেছিলেন বটে, কিন্তু পরে দিনের পর দিন তাঁর গাড়ী এসে নীলরতনের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। রোগীর সঙ্গে সম্বন্ধ বন্ধুত্বের সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল।

একবার দার্জিলিঙের বাড়ীতে এত লোককে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছেন যে, রাতের পর রাত বসবার ঘরে ক্যাম্প-খাট ফেলে তিনি নিজে ঘুমিয়েছেন।

বাড়ী যখন এই রকম অতিথিতে পূর্ণ তখন খবর পেলেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক ডঃ কালিস (Dr. Cullis) দার্জিলিং স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। বোধ হয় কোথাও থাকবার জায়গা পাননি।

নীলরতন একজনকে বললেন, "যাও কলিস-সাহেবকে ডেকে নিয়ে এস। এক রকম ক'রে এর মধ্যেই হয়ে যাবে এখন।"

একবার প্যাট্রিক গীডস্-এর (Patrick Geddes) পত্নী কলকাতায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন হ্যারিসন রোডে তাঁর বাড়ীতেই রোগিণীকে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর বাড়ীতেই সেই বিদেশী মহিলার মৃত্যু হয়। শ্মশান পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করলেন।

দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। সাবানের কারখানা, ট্যানারী, চা'র বাগান ও অন্যান্য ব্যবসা করে তাতে যথেষ্ট সময় ও অর্থ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ীর মন ছিল না। কোন্ উন্নত উপায়ে দেশে ভাল জিনিস তৈরি করতে পারেন সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি পয়সার দিকে মন দেননি। সুতরাং তাঁর সব ব্যবসাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একে একে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর হ্যারিসন রোডের বাড়ী (এখন সুরযমল নাগরমলের বাড়ী) বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একটুও বিচলিত হননি। তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। সেই ভয়ংকর সংকটের দিনে তিনি হাসিমুখে বললেন, "কলকাতায় ২০্ টাকা দিলে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তাতেই আমার চলে যাবে।" অন্তরে তখনও তাঁর অটল ধৈর্য, প্রাণে তাঁর নির্ভীক শান্তি।

নিজের যখন এই অবস্থা তখন একদিন তাঁর কন্যার পরিচিত একটি মুসলমান মেয়ে তাঁর বাড়ীতে এসে একতলা থেকে তাঁকে লিখে পাঠায় যে তার ভয়ানক বিপদ। ৫০০্ টাকা দরকার।

বাড়ীর কাউকে কিছু না বলে নীলরতন তখনই তাঁকে ৫০০্ টাকা দিয়ে দিলেন। পরে তাঁর নিজের মেয়েও যখন এই নিয়ে তাঁকে অনুযোগ করে তখন তিনি বললেন, "একজন ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে এইভাবে অপরের দ্বারস্থ হওয়া যে কতবড় দুঃখজনক তা তোমরা বোঝ না। নইলে তোমরা এমন কথা বলতে পারতে না!" ঘোর দুর্দিনেও তিনি তাঁর অন্তরের দরদ হারাননি। তখনও তাঁর শির উন্নত। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। অন্তর শান্ত, সংযত ও সমাহিত।

বাংলার এক গৌরবময় যুগে নীলরতন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নীলরতন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। বিপিন ও জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর দু'বৎসর পূর্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র রায় ও জলধর সেন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মান। মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬২), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩)ও তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪), আশুতোষ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫)ও প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলা যায়। চিত্তরঞ্জন দাশ, যদুনাথ সরকার, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নীলরতনের অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। এতগুলি মনীষী বাংলায় যখন জন্মগ্রহণ করেন, নীলরতন বাংলার সেই গৌরবময় যুগে জন্মগ্রহণ করে চিকিৎসা-বিদ্যা, মহানুভবতা, ও শিল্প-স্থাপনে কারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। এঁদের প্রায় সকলের সঙ্গেই তাঁর ছিল আদর্শের যোগ, কর্মের যোগ, হৃদয়ের যোগ। তিনি নিজেও ছিলেন সেই মহামানব গোষ্ঠীর একজন। প্রায় সকলেই একে একে তাঁর পূর্বেই দেহত্যাগ করেছিলেন। ক্রমেই তিনি সঙ্গীহীন হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর শরীরও জীর্ণ হয়ে আসতে লাগল।

তাঁর জীবনের পরিধি ছিল বিস্তৃত। সেই জীবন ছায়া ফেলেছিল দীর্ঘ-প্রসারী। কিন্তু তিনি এইবার হতে লাগলেন নিঃসঙ্গ বনস্পতি। রবীন্দ্রনাথের অস্ত্রোপচার করা যখন স্থির হয় তখন নীলরতনকে খবর দেওয়া হয়নি। কারণ তখন তাঁর স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু ষাট বৎসর ধরে তিনি যে চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চা করে এসেছেন তা তখনও ভোলেননি। কবির অন্তিমকালে কবি ডাক্তার-বন্ধুকে স্মরণ করলেন। তিনিও বন্ধুশ্রেষ্ঠ কবি-সম্রাটের পাশে গিয়ে বসলেন। কতবার নীলরতন বন্ধুকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু এখন? এখন সব্যসাচীর হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়েছে। তাঁর দুই চোখ জলে ভরে এল।

মৃত্যুর অল্পদিন আগেও তিনি খবর পেলেন যে তাঁর বন্ধু হেরম্বচন্দ্রের পত্নী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। "আমি তাঁকে দেখতে যাব না! তা কি হতে পারে? আমি ডাক্তার ত বটে!"

তখন তাঁর দেহ জীর্ণ। সেই দেহ নিয়ে তিনি রোগিণীর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তাঁর চিরসাথী সেই স্টেথেসকোপটি নিতে ভোলেননি। সেদিনও তিনি রোগিণীর মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করেছেন।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে। বৈশাখী পূর্ণিমার আগের দিন। অপরাহ্ণ। নিঃশব্দে এই মহৎ জীবনের পরিসমাপ্তি হল। গিরিডিতে শুক্লা চতুর্দশীর জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীতে উশ্রী নদীর জলস্রোতের মাঝখানে নিবিড় নক্ষত্রখচিত নির্মল আকাশের নীচে তাঁর নশ্বর দেহ চিতাভস্মে পরিণত হল।

এক মহান অনাড়ম্বর, মধুর ও গৌরবময় জীবন, তেমনি শুভ্র পবিত্র ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিলীন হয়ে গেল। কীর্তির চেয়েও তিনি ছিলেন মহৎ।

মাত্র একটা রাত। এই রাতটি পোহালে কাল তপন বাঙ্গালোরে চলে যাবে। সেখান থেকে সটান বিদেশে পাড়ি দেবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ রাতটাও তিলে তিলে কেটে যাচ্ছে। রাত নিশ্চয়ই সাড়ে বারোটা হবে।

তপনের পাশে শুয়ে বন্দনা বার বার ঘেমে উঠছে। পাখা চলছে, তবু ঘামছে। কি অসহ্য গুমোট আজ। বন্দনা পাশ ফিরলো।

মন মেলে রেখেছিলো টান টান করে এতক্ষণ। এবারে চোখ মেলল।

জানলার বাইরে এরিয়েলের তারে ওটা কি ঝুলছে? অন্ধকারে কি বিশ্রী-ভাবে দুলছে ওটা। একটু ভয় ভয় করে। ভাল করে তাকিয়ে আন্দাজ করতে পারে। ওটা একটা ঘুড়ি। তারে আটকে রয়েছে, হয়ত কদিন ধরে আটকে আছে, আজকের মত করে লক্ষ্য করেনি ও।

মন যেন উঁচিয়ে রয়েছে আজ। কেন?

কেন বন্দনা জানে। বিয়ের পর সত্তরটি দীর্ঘ জাগ্রত রাত কেটে গেছে। একটা কথা বলব বলব করেও বলা হয়নি। সে কথা কেউ জানে না। তপনের জানা উচিত।

এতগুলো রাত কেটে গেল। সত্তরটা রাত। কত হাসল, কত বলল, কত জানল, কত জানালো, এই একটা মাত্র কথা ওকে বিয়ের পর থেকে সত্তরটা রাত্রেও বলা হোল না।

আর একটা মাত্র রাত। এরপর আবার তপনের সঙ্গে কবে দেখা হবে কে জানে?

অন্ধকার দেয়ালগুলোর দিকে তাকায় বন্দনা। নিশ্ছিদ্র মোটা দেয়াল। কি কালো আর কি কঠিন। দেয়ালগুলো না থাকলে কেমন হোত। আকাশের তলায় খোলা-মেলায় তপনের পাশে শোয়া? লজ্জা হয়। তবু যেন মনে হয় এই কঠিন দেয়ালের ভেতর বন্ধ হয়ে থাকার চেয়ে সেটা অনেক ভাল হোত।

কিছু গোপন থাকত না, কিছু অজানা থাকত না। দেয়ালে বন্দী হয়ে এমন করে হাঁপিয়ে উঠত না ও। তপনের একটা হাত এসে ওর খোঁপার ওপর পড়ে।

তবে কি তপন জেগে রয়েছে? তপন কি জানতে পারছে যে তপনকে ওর দিন দিন ভাল লাগছে না। কোথায় যেন আটকাচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, তপনের সবই ওর জানা। তপনকে ভাল লাগবার মত কিছুই আর পাচ্ছে না। তপনের হাতটা মুখের কাছে এসেছে। ঘামের গন্ধ হাতে। একটুও ভাল লাগছে না।

তপনকে ও এই সত্তর দিন যা বলেছে তাই শুনেছে। চিরকাল যা বলবে তাই শুনবে। ভিজে-ভিজে চোখে তাকাবে। যেন কিছু একটা চাইতে হলে ভিক্ষে চাইবে। ওর খুশি হলে ও দেবে, না হয়তো ভিক্ষে দেবে না।

একটু অভিমান হবে, আবার একটু আদর পেলেই হাসবে।

অসহ্য! বন্দনা সহ্য করতে পারছে না।

কেন যে এমন হচ্ছে? বন্দনা আজ পর্যন্ত ওকে জানাতেই পারল না যে তপনই ওর আটাশ বছরের জীবনে এক-মাত্র পুরুষ নয়। পুরুষ ও দেখেছে।

তার কথা তপনকে সত্তরটা রাত বলি বলি করেও বলা হয়নি। আশ্চর্য!

অথচ সেই অন্য পুরুষের কথা তপনকে বলতে পারলে ও বোধহয় তপনকে ভালবাসতে পারত। তপন রাগ করলেও ভাল লাগত। ক্ষমা করলেও ভাল লাগত। আঘাত পেলেও ভাল লাগত।

তপন যে পুরুষ সেটা তপন তখনই টের পেত। সজাগ হোত। এখনকার মত

ভিখিরীর মত নিজেকে একমাত্র পুরুষ ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে নিস্তেজ হোত না।

পাশের বাড়ি থেকে একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে।

একটা বালতি পড়ে যাবার শব্দ। তারপর একটা গেলাস ভাঙ্গার শব্দ।

বন্দনা এ পাশ ফেরে। অন্ধকারে তপনের মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গরম হাতখানা বন্দনার নরম গলায় যেন ফাঁসের মত জড়ান।

পাশের বাড়ির বৌটার গলা শোনা যাচ্ছে। স্বামী মদ গিলে আসে মাঝে মাঝেই রাত্রে। আজও মদ খেয়ে এসেছে নিশ্চয়।

বালতি ছুঁড়েছে। গেলাস ভেঙেছে। এবার বৌটাকে মারবে।

চড়-কিল খেয়েও বৌটা সাধবে। লোকটা জড়ান গলায় বলবে, গেট-আউট! বেরিয়ে যাও। চাই না তোমাকে। বেরোও।

শুনতে বন্দনার ভাল লাগে। মুখে বলে—জানোয়ার। অমানুষ।

মনে কিন্তু কোথায় এর একটা অদ্ভুত স্বাদ পায়। গেট-আউট। তোমাকে চাই না।

একবারও যদি তপন বলত, গেট-আউট। তোমাকে চাই না।—ওর বোধহয় ভাল লাগত। রাগ করত, কাঁদত, কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না যে ওর ভালও লাগত।

তপন ওকে টানতে চেষ্টা করে, নিজের আরও কাছে।

বন্দনা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তবে কি তপন জেগে রয়েছে?

হ্যাঁ, তপনও জেগে রয়েছে। শোবার পর থেকেই জেগে রয়েছে। চোখ বুঁজেই রয়েছে বেশী সময়। এক-একবার চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছে। ভয়, বন্দনাকে ভয় নয়। ভয় মাধবীকে নিয়ে। মাধবী যদি হঠাৎ একদিন এসে পড়ে সব বলে দেয়, কি ভীষণ ব্যাপার হয়ে যাবে। তার চেয়ে বন্দনাকে সব কথা খুলে বলাই ভাল।

কিছুতেই যেন বলতে পারছে না তপন, ও নিজেই ঠিক বুঝতে পারছে না। তবে কি তপন এখনো মাধবীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চায় না?

বার বার মাধবীর শেষদিনের মুখ-খানা ওর মনের ওপর ভেসে ওঠে। গালের ওপর চোখের লোনা জলের দাগ। মোটা নাকের ডগাটা একটা বড় ভিজে সুপারির মত।

তপনের কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু উপায় ছিল না।

মাধবীকে ও বিয়ে করার কথা কল্পনাও করতে পারত না।

মাংস মাঝে মাঝে খাওয়া চলে, তেল মশলার মাংস কি আর রোজ খাওয়া যায়? রোজ খেতে হলে একটু ডাল ভাত শুকতো-টুকাতোই ভাল।

মাধবীকে বিয়ে করা যায় না। দরিদ্রের মেয়ে মাধবী। প্রখর রোদের মত তেজী, মোটা অজগরের মত অল্প কঠিন অক্ষয় ওর যৌবন। পেটা শরীরখানা মস্ত মজবুত।

মাধবীকে বিয়ে করা যায় না।

শেষদিনে অবিশ্যি মাধবী বলেছিলো, ভয় নেই। তোমার বৌকে কখনো দেখতেও আসব না। দেখতে এলে রেগে-মেগে যদি কিছু বলে বসি!

কিন্তু যদি কোন দিন এসে পড়ে! কি ফ্যাসাদই যে হবে!

বন্দনার রোগা দেহটার ওপর একটা হাত রাখে তপন।

কি আশ্চর্য! বন্দনার গায়ে মাংস এত কম—আর এত ঠাণ্ডা। ওর হাতখানা যেন শিশিরে ভেজা বাঁখারির আঁটির ওপর গিয়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে এত খারাপ লাগে! আপনা-আপনিই মনে পড়ে মাধবীর কথা। মাধবীর যৌবন অটুট। তবু মাধবীর কথা আড়ে-ঠাড়ে বলে রাখাই মঙ্গল। বন্দনা তার স্ত্রী, তার কাছে এমন সব কথা গোপন রাখা শুধু অন্যায় নয় অধর্মও বটে।

সত্তরটা রাত কেটে গেল। কাল তাকে চলে যেতে হবে বাঙ্গালোর। এতগুলো রাত্রির এত ঘন্টা সময়ের ভেতর মাত্র দশটা মিনিট এই কথাটা একটু আভাস দিলেই হোত!

তপন পারেনি। ভয়ে নয়, আতঙ্কে নয়। কেন যে বলতে পারেনি সেইটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ কথাটা না বলতে পারলেও স্বস্তি পাচ্ছে না। একটা মৃদু যন্ত্রণার মত কথাগুলো সব সময় মনের ভেতর বিঁধছে। যে মন যথারীতি বন্দনাকেই দিতে হবে সবটুকে। সেখানে কোথায় যেন একটা বাধা পড়ছে। এর চেয়ে বলে ফেললে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যেত। একদিক থেকে বোধকরি ভালই হোত, মাধবী আর কখনো এলে তার ওপর কোন গোপন-দাবি আর করা যেত না—অন্ততঃ বন্দনার ভয়ে।

এমন একটা নিস্তেজ মন নিয়ে বন্দনার পাশাপাশি শুতে হোত না।

আজ বলবে। আজ তাকে বলতেই হবে।

আর-একবার হাত বাড়ায় তপন। বন্দনাকে টানে। কাছে টেনে নিয়ে বলবে সব কথা।

উঃ কি ভাপসা গরম!

বন্দনা ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো। তবে তো বন্দনা জেগে রয়েছে। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রইল তপন। দেখতে পেল বন্দনা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

অসহ্য লাগছে বন্দনার। অন্ধকারে পাশের বাড়ির ছাতের তারের ওপর আটকে-যাওয়া ঘুড়িটা দুলছে বাতাসে। ওটা কেন যে আটকে রয়েছে। ছিঁড়ে পড়ে গেলেই তো পারে। অসহ্য লাগে বন্দনার।

জানলা দিয়ে চোখ পড়ে পাশের বাড়ির একতলার ঘরের দিকে। জানলা দিয়ে দেখা যায়, খেতে বসেছে ভাড়াটেদের ওই লোকটা। লোকটা রোজ রাত বারোটার পরে ফেরে। বোধহয় কোন দোকানে কাজ করে। লোকটা নীরবে খেয়ে উঠে পড়ে।

বৌটা হাঁটুর কাছে শাড়ি গুটিয়ে স্বামীর পাতে খেতে বসে; রোগা পায়ের ওপর পা তুলে পা দুটো টান-টান করে দেয়—যেন দুটো শুকনো ডাল জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে। কি বিশ্রী!

বৌটার পাতে তরকারিও নেই একটু। শুধু ডাল আর ভাত।

ভাত কটি অল্প অল্প গ্রাসে অনেক-ক্ষণ চিবিয়ে খাচ্ছে। যেন প্রতিটি গ্রাসের পুরো আস্বাদ উপভোগ করতে চাইছে। তাও কটি তবু ফুরিয়ে যায়। পাত চাটছে বৌটা। উঠে আবার দুখানা রুটি নিয়ে এলো আর একটু গুড়। কি আরামে খাচ্ছে, কখনো চোখ বুঁজে কখনো দেহটা দোলাতে দোলাতে। পেটের আগুনে জ্বলে গেছে দেহখানা। তবু দুলছে, এইটুকু খাওয়ার আরামে।

স্বামীটা বিছানার ওপর বসে একটা বিড়ি ধরিয়েছে। মুখে একটা শুল্

করছে। যেন মুখের কোন জায়গায় যেটুকু খাদ্য লেগে রয়েছে, সেটুকু জিভ দিয়ে পরিষ্কার করে জিভে একটা শব্দ করছে। কি বিশ্রী শব্দটা!

গা ঘিন ঘিন করে বন্দনার।

আবার ও এসে পড়ে বিছানার কাছে। তপন কি ঘুমোচ্ছে? একটু আগেও বোধহয় জেগে ছিল। আবার ঘুমোল কিনা কে জানে?

একটু যেন ভয়ে ভয়ে আলতোভাবে পাশে আবার শুয়ে পড়তে যায় বন্দনা। পিঠে কি একটা লাগতে চমকে ওঠে। হাত দিয়ে জিনিসটা অনুভব করে, একটা পেন্সিল। পেন্সিলটাও তপন তুলে রাখেনি, কাগজপত্তরগুলো কেন যে শিয়রের কাছে রেখে শোয় ও।

জিজ্ঞেস করলে বলে,—ছোটকালের অভ্যেস। বই কলম পেন্সিল কাগজ শিয়রে না থাকলে কেমন একটা অস্বস্তি হয়।

কি অদ্ভুত অভ্যেস তপনের।

বন্দনা নিজেও তো পড়াশুনো কম করেনি। তপন বাঙ্গালোরে চলে গেলেই আবার পড়া আরম্ভ করবে। এম-এ পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে। এবারে না দিলে আর হবে না। বিয়ের পরে দেরি হয়ে গেলে আর হয় না। সুজাতার হল না। মানসীর হোল না। বাচ্চা কোলে এলো, পড়াও গেল। বিয়ের পরে মেয়েদের এই এক জ্বালা।

সে কারো কথা শুনবে না। এম-এ পরীক্ষা এবার দেবেই।

জয়ন্তকে সে কথা দিয়েছিলো। এম-এ পাস তাকে করতেই হবে।

জয়ন্তর কথা মনে পড়তেই আবার বিস্বাদ হয়ে ওঠে মনটা। জয়ন্তর কথাটা তপনকে বলাই ভাল। এতে আর অন্যায়টা কি? জয়ন্ত তাকে ভালবাসত, এতে সে কি করতে পারে? তার দোষটা কোথায়? সোজা বললেই হোল, জয়ন্ত তাদের বাড়ি আসত, তাকে ভালবাসত, সে বড়-একটা পছন্দ করত না।

কথাটা কি সত্যি বলা হবে? সে কি সত্যিই পছন্দ করত না?

সে কি জয়ন্তকে কিছুই দেয়নি?

না হয় বললেই হবে, ছেলেটার ওপর একটু মায়া পড়েছিলো।

শুধু কি তাই? সব কথা কি বলা যাবে? আরও অনেক সন্ধ্যার কথা রয়েছে, যেসব সন্ধ্যায় জয়ন্তকে সে কিছুই দিতে বাকী রাখেনি। সে নিজেই কেঁদেছে। সে সব কথা কি বলা যাবে?

বললেই বা। সবই যদি সে বলে, তপন কি আর করবে? তপনের মত ছেলে কিই বা করতে পারে? সব বলাই ভাল।

বন্দনা আস্তে আস্তে তপনের দিকে হাত বাড়ায়।

হাতটা লাগে বালিশের ঢাকায়। তপন কোথায়?

ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে বন্দনা। ও বালিশ থেকে অনেকটা নেমে শুয়েছে। এত সরে শুয়েছে কেন তপন? বন্দনা বালিশের ঢাকার কাপড়টা চেপে ধরে। ইচ্ছে করে ঢাকাটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কি বিশ্রী! বালিশের তেলচিটে আসল রূপটা ঢেকে রাখতে হয় পরিষ্কার ধবধবে ওয়াড় পরিয়ে। তার চেয়ে ঢাকাটা না-থাকাই কি অনেক ভাল নয়?

সমস্ত স্নায়ুর জোরে ও চেপে ধরে বালিশের ঢাকার কাপড়টা। ছেঁড়ে না। বড় শক্ত। নতুন ঢাকা। এত সহজে ছিঁড়বে না। পুরনো হলে আপনা-আপনি ছিঁড়ে যাবে।

তবে কি পুরনো হয়ে ছেঁড়াই ভাল?

সমস্ত জোর দিয়ে ওয়াড়টা চেপে ধরে বন্দনার দুর্বল শরীর কেঁপে ওঠে দুবার। হাঁপিয়ে ওঠে বন্দনা। হাতটা এলিয়ে পড়ে ওর। তেমনি শুয়ে থাকে অসাড় হয়ে।

তপন বিছানার একটু নীচে নেমে শুয়েছে। ওর মাথাটা ভারী লাগছে, একটু যন্ত্রণাও হচ্ছে। বালিশের ওপর মাথা রাখতে ভাল লাগছে না। বালিশের নীচে মাথাটা নামিয়ে দিয়ে একটু যেন আরাম লাগছে।

কাল চলে যেতে হবে। বন্দনাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। আবার ছুটি নিয়ে কবে আসতে পারবে কে জানে? এই সত্তরটা রাত্রেই একা শোবার অভ্যাসটা যেন কেটে গেছে। একা একা ঘুমোতে হবে ভাবতেই যেন কেমন ভয়-ভয় করে।

অভ্যাস কি অদ্ভুতভাবে তৈরি করে মানুষকে! তপন ভেবে অবাক হয়, ভীতও হয়।

শরীরটি তপনের যত বড়, ভয়টাও তত বড়। শরীরে শক্তি আছে কিন্তু মনে ভয় আছে। ও একটু ভীতুমানুষ বরাবরই।

কারণটা ঠিক বোঝে না, তবে একটা কথা বোঝে যে ও অনেক কথাই চেপে

থাকতে ভালবাসে। এ চাপা স্বভাবটা ওর যত বাড়ে, ভয়টাও তত বাড়ে।

বন্দনাকে তো এ'কটা দিন ভয় করেই এসেছে, আর ভয় করতে চায় না। ও বেশ বুঝতে পারে, ও যদি ওর সব কিছু গোপন কথা বন্দনাকে বলে ফেলতে পারে তবে ভয় ওর আর কিছুতেই থাকবে না। মনে মনে এটা বুঝতে পেরেও কেন যে বলতে বাধছে, ও সেইটে বুঝতে পারছে না।

মাধবী কি ওর স্বামীকে সব কথা বলতে পারবে?

মাধবীর মত মেয়ে পারতে পারে। এমন কি বন্দনাকেও সব কথা বলে বসতে পারে। দুঃসাহসী মেয়েটা হলহল করে কথা বলে। গ্রাহ্য করে না কাকেও।

ওর ভীতু স্বভাব দেখে মাধবী কত হাসত, ঠাট্টা করত।

চোর—চোর—একটা চিৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে ওরা দুজনই। তপন উঠে আলোটা জ্বালে।

ঘড়ির দিকে তাকায় বন্দনা, রাত প্রায় দুটো।

আবার শব্দটা শুনতে পাওয়া যায়। —চোর—চোর—ধর—ধর।

ওরা দুজনেই জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না।

ওরা দেখতে পায় সারা গলিটার ভেতর অনেক লোক ঢুকেছে দৌড়োতে দৌড়োতে।

—ওই যে ওই খাটালের ভেতর ঢুকছে।

—চোবাচ্চাটা দ্যাখ না। লুকিয়েছে ব্যাটা।

—ওই ঘরের পাশটায় ওটা কি? দূর, একটা খাটিয়া খাড়া করা রয়েছে।

—ব্যাটা কি পালাল?

—শালা পালিয়েছে!

আস্তে আস্তে কথাবার্তা কানে আসে। দু চারটি করে লোক কথা বলতে বলতে ফিরে আসছে।

—পালিয়েছে।

—তক্ষুনি-তক্ষুনি দৌড়ে গে ধরতে পারলে হোত!

লোকগুলো ক্রমে ফিরে যায়। সবাই ফিরে যায়।

আবার সেই ফাঁকা সরু গলিটা নির্জন হয়ে ওঠে।

বন্দনা ধীরে ধীরে জানলার গরাদ থেকে হাত নামায়। তাকায় একবার তপনের দিকে আড়চোখে।

বন্দনা এতক্ষণে কথা বলতে পারে। একটা নিশ্বাস ফেলে তপনের হাতের ওপর নিজের হাতখানা ঘসতে ঘসতে বলে—চোরটা পালাল?

তপন বন্দনার পিঠে হাত রাখে। একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—হ্যাঁ।

বন্দনা যেন আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে,—চোর ধরা কি অত সহজ?

তপন একটু চমকে ওঠে। বন্দনার কনুইয়ের হাড় বুকে কি শক্ত লাগছে!
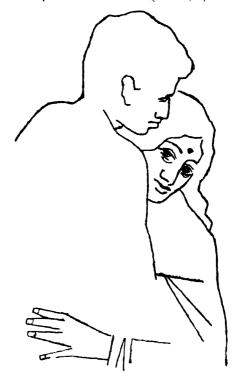
.....ভয় পেয়ে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে তপনকে।

তপনও একবার তাকাতে চেষ্টা করে।

দুজনই দুজনকে যেন ভয় করছে। কেন কে জানে?

বন্দনা এসে শুয়ে পড়ে। তপন ধীরে ধীরে এসে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়ে।

বাইরে একটা খস্ খস্ আওয়াজ হতেই বন্দনা ভয় পেয়ে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে তপনকে।

তপন খুব আস্তে আস্তে বলে,—ভয় নেই। বোধহয় বেড়াল।

তপন নিশ্বাস চেপে খুব আস্তে আস্তে বলে,—চোরটা কিন্তু ঠকিয়ে গেল!

বন্দনা চমকে ওঠে। পিঠের ওপর তপনের হাতখানা কি ঠাণ্ডা! যেন মড়ার হাত!

নিশ্বাস চেপে দাঁত চেপে বলে বন্দনা,—ভালই হয়েছে, আবার হাঙ্গামা হুজ্জুত, থানা-পুলিশ! মার-ধোর!

—যা বলেছ।—হেসে ওঠে তপন।

বন্দনাও এবার খিল খিল করে হেসে ওঠে।

লোক-সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

সুধীর করণ

প্রাচীনতম সমাজের আর্থিক অবস্থার ভিতর দিয়েই মানুষের প্রথম সংস্কৃতির আবির্ভাব,—এ কথা সমাজ-বিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকেই সহজ-বোধ্য। বর্তমানে 'সংস্কৃতি' শব্দটি নানাভাবে নানাজনের কাছে গৃহীত এবং সাধারণতঃ, শব্দটি সংকুচিত রূপেই পরিচিত। মানুষের সম্যক কৃতি, সম্যক চিন্তা এবং সম্যক স্বপ্রকাশ-কেই সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের কথাই এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কথা যদি মনে রাখা যায় যে, সংস্কৃতি মানুষের বিলাস নয়, এমন কি নিছক সৃষ্টিও নয়, এরও প্রয়োজনীয় দিক আছে, তাহলে সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করার পক্ষে বহু বাধা নিবার্য বলে মনে হবে। আসলে সমাজ-ব্যবস্থার নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে, বাস্তব প্রয়োজনের জন্যই তার উদ্ভব ঘটে। তাই সমাজের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

মানস-সম্পদ সংস্কৃতির মুখ্য পরিচিতি বহন করে বটে; সঙ্গে সঙ্গে একটি সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবন-ধারণের উপকরণ, উৎপাদন প্রথা এবং ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনযাত্রার স্বরূপকেও প্রকাশ করে। তাই একই কালে কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে কৃষি-অনির্ভর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। মানুষের আদিম শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত সমাজের যে অগ্রগমন, তা'র মধ্যেও এই সংস্কৃতির পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। শ্রমজীবী এবং পরশ্রমজীবী সমাজের মধ্যে, শ্রমনির্ভর অথবা বুদ্ধিনির্ভর সমাজের মধ্যে একই কালে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কোন না কোন রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই একই দেশ-কালের অধীন গ্রামবিধৃত জনমণ্ডলীর সাধারণ কৃতিকে আমরা লোক-সংস্কৃতি নাম দিয়ে সংস্কৃতির জাতিভেদ অনিবার্যভাবেই স্বীকার করে নিই।

লোক-সংস্কৃতি শব্দটির ভাব-পরিমণ্ডলে লোক-মানসের সম্পদই আমাদের কাছে সহজগ্রাহ্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একথা মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে যে শুধু সৃষ্টি-সম্পদ ছাড়া জীবনচর্যার নানাবিধ অভিব্যক্তি, আচার-আচরণ প্রভৃতিও এর পরিধিভুক্ত। আচার্য সুনীতিকুমারের অভিমতে 'লোকযান' শব্দটি এক্ষেত্রে সুষ্ঠুার্থবাহী। জনসমাজের জীবনচর্যা পদ্ধতির অভিব্যক্তিই লোকযানের অঙ্গীভূত। এক্ষেত্রে লোক-সমাজের মানস-সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'লোক-সংস্কৃতি' এবং নানাবিধ বিশ্বাস-আচরণ (যথা : জাদুবিশ্বাস, ভূতবিশ্বাস এবং তদনুযায়ী আচরণ), রীতি-নীতি ও প্রথাগত বিশিষ্টতা (দিন-ক্ষণ-তিথি-বার-ব্রত-উপবাস-পর্ব-পার্বণ সম্পর্কিত) প্রভৃতি বোঝাতে লোকযান শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে 'লোকযান' অধিক পরিমাণে রক্ষণশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অগ্রজের আদিম বিশ্বাসের পরিপোষক। এর সব কিছুই প্রায় চর্চা-নিরপেক্ষ, সব কিছুই প্রায় ধারাবাহিক। বলাবাহুল্য, মানুষের সব কিছু ক্রিয়া-আচারই লোকযানের অন্তর্ভুক্ত নয়। শস্য উৎপাদনের জন্য ধান্য রোপণ করা—লোকযানের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু ধান্য-রোপণের পূর্বে ক্ষেত্র-দেবতার অর্চনা করা লোকযানের বিষয়ীভূত। ধান্য রোপণের সময় শ্রমজীবিনীদের যৌথসংগীত লোকযানের অঙ্গীভূত, যদিও এক্ষেত্রে লোক-সংস্কৃতি শব্দটি বাঞ্ছনীয়। লোক-যান ঠিক আদিম নয় কিন্তু আদিম-সম।

লোক-সংস্কৃতিতে মানস-চর্যার উন্নত দিকটি পরিস্ফুট। লোকসাহিত্যে, লোক-সংগীতে, লোকনৃত্যে অথবা অন্যবিধ লোকশিল্পে এমন একটি প্রথাবদ্ধ আদিমতা, এমন একটি ব্যাপক সারল্য এবং প্রায় চর্চা-নিরপেক্ষ গতানুগতিকতা বর্তমান যা কোনক্রমেই ব্যক্তি-চেতনা দ্বারা পরিমার্জিত নয়। যৌথ সংহতি এবং দৃঢ় সামাজিকতাই এর প্রাণসত্তা। সাঁওতালদের যৌথসংগীতে, যৌথনৃত্যে, পশ্চিম সীমান্ত-বাংলায় টুসু গানে, ভাদু গানে, দাঁড়শাল ঝুমুরে, করম নাচে, ধান্য-রোপণের সংগীতে, বিবাহ-গীতিতে এই শুদ্ধ লোক-সংস্কৃতি পরিপূর্ণরূপেই পরিদৃষ্ট হয়। আসলে, লোক-সংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে যেই মুহূর্তে ব্যক্তি-চেতনা (পারসোন্যালিটি) প্রতিভাত হয়, সেই মুহূর্ত থেকেই লোক-সংস্কৃতিতে রূপান্তর অনিবার্য। এরই ফলে, আঞ্চলিক লোকসাহিত্য, লোকসংগীত কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি-চেতনাবাহী, কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর নৈর্ব্যক্তিক। উৎপাদন-ব্যবস্থা, আর্থিক পরিস্থিতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, এবং গোষ্ঠী-সমন্বয়ের নানাবিধ উপকরণে সংস্কৃতির জন্ম হয় বলেই, একই দেশে, একই কালে, একই ভাষা-বর্গের মধ্যেও বিশিষ্ট আঞ্চলিকতার উদ্ভব হয়। সমতল বাংলা এবং পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার মানভূম, ধলভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাই অনেকাংশে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সমতল বাঙলার লোকসংগীত ক্রমশঃ যৌথ-ধর্মবর্জিত হয়ে গ্রাম্য-মানস চিহ্নের পরিচয় বহন করছে। মৌলিক লোক-ধর্ম তাতে কোন-না কোন রূপে ক্ষুণ্ণ। কিন্তু এও অনিবার্য,—যেহেতু সংস্কৃতি কোন-দিনই স্থাবর নয়, গতিশীলতাই তা'র একান্ত ধর্ম।

লোক-সাহিত্যের মূল অংশগুলি সংগীত, ছড়া, প্রবাদ, রূপকথা, উপকথা প্রভৃতির মধ্যেই পরিস্ফুট। এর মধ্যে লোকসংগীতই সর্বব্যাপী। অন্ততঃ পক্ষে লোকসংগীতের মধ্যে লোকবৈশিষ্ট্য নানাভাবেই বিদ্যমান। এর গতানুগতিকতা'ও যেমন সহজলভ্য, গীতিশীলতাও তেমনি অলভ্য নয়। ভাবে, ভাষায় ও সুরে, লোকসংগীত পরিবেশ-প্রভাবিত। উচ্চাঙ্গের সংগীতের সঙ্গে এর পার্থক্য স্পষ্ট, যদিও লোকসংগীতই ক্রমবিকাশের পথে উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে সংগীত-স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করেছে।

লোকসংগীতের মধ্যেও স্তরভেদ আছে। সমতল বাংলার জারী, সারি, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোকসংগীতের মধ্যে যে ধরনের বিশিষ্টতা, টুসু, ভাদু, ঝুমুর প্রভৃতিতে তা' অন্যতর। বাংলাদেশের পদাবলী কীর্তন, শ্যামাসংগীত, বাউল সংগীত বর্তমানে লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না। যদিও এ বিষয়ে মতান্তর

শরতে আজ কে এলোরে

ফটো : শিশিরকুমার চৌধুরী

বর্তমান, তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই সব সংগীতের মধ্যে লোকচারিত্র অল্প, সজ্ঞান আধ্যাত্মিক প্রয়াসে এর গণ্ডী সীমিত। এবং কোন ক্রমেই এই সংগীত শিক্ষা-নিরপেক্ষ, চর্চা-নিরপেক্ষ নয়। তা' ছাড়া একটি বিশেষ ব্যক্তি-চেতনা এর মধ্যে স্থান লাভ করে এ জাতীয় সংগীতের ধর্মকেই পৃথকরূপে পরিস্ফুট করেছে।

সহজ অনুভূতি, প্রত্যক্ষ পরিবেশ-প্রভাব, অকৃত্রিম ভাষা, কাব্যরচনার অ-প্রয়াস প্রভৃতি লোকসংগীতের মৌলিক ধর্ম। লোকসংগীতের রচয়িতারা সজ্ঞান কবি নয়। কাব্যমাধুর্য বা সুরমাধুর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা সংগীতের জন্ম দেননি। যৌথচেতনা দ্বারা প্রবুদ্ধ টুসু, ভাদু, ঝুমুর প্রভৃতি গান এর প্রমাণ দেয়। লোকসংগীত যতো মৌলিক যতো আদিম,—তা' ততোবেশী নারীদের অধিকারভুক্ত। কারণ নারীরাজ্যের শিক্ষা-হীনতা, তা'দের গতানুগতিক জীবনধারা, পুরুষদের অপেক্ষা ঢের বেশী রক্ষণশীল। পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার গানে যৌথচেতনা ঢের বেশী প্রকট ব'লে, এর মধ্যে লোক-চরিত্র ঢের বেশী স্পষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি-চেতনার মাধ্যমে যে জাতীয় ঝুমুরের উদ্ভব ঘটেছে, তা' ক্রমশঃ লোক-ধর্ম বিচ্যুতির দিকে। বৈষ্ণব পদাবলী-প্রভাবিত ঝুমুর এই কথারই সাক্ষ্য বহন করছে। এই ধরনেরই মৌলিকতা-বর্জিত, ক্রম-অগ্রসারী সংগীতকে সহজে বোঝার জন্য 'গ্রাম্য সংগীত' নামটিই গ্রহণযোগ্য। বলা বাহুল্য, মৌলিক লোক-সংগীতের অধিকাংশই আমাদের কাছে সমাদরণীয় হতে পারে না, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব গানে অতি সহজ ভাষার মধ্যেও একটি স্পষ্ট ব্যঞ্জনা লাভ করা যেতে পারে।

চণ্ডীদাস-রচিত পদ আমাদের হৃদয়ে আবেদন পৌঁছে দিতে পারে আজও। চণ্ডীদাসের অনেক গানে মৌলিক লোক-ধর্ম পরিস্ফুট, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাবে, ভাষায়, সুরে, প্রকাশে তা' আমাদের উচ্চতর সংস্কৃতিরাজ্যের বস্তু। একটি বিশেষ পদের কথাই বলি :

সই কেমনে ধরিব হিয়া—
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারই আঙিনা দিয়া।

এর সারল্য, অকৃত্রিমতা, স্বয়ম্প্রকাশ-ধর্ম একটি বেদনাহত অনুভূতির সৃষ্টি করেছে, কিন্তু শুধু অংশবিশেষ দিয়ে নয়, সমগ্র চণ্ডীদাস পদাবলী বিচার করে—আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যে—এ গানগুলির ব্যঞ্জনা আমাদের কাছে এক বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করে।

পশ্চিম সীমান্ত-বাংলায় রচিত এবং যৌথভাবে দাঁড়শাল ঝুমুরে গীত আর-একটি গানের উদাহরণ দিচ্ছি। গানটি পরিপূর্ণভাবে লোকসংগীত এবং আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় বিধৃত ব'লে এর সহজ আবেদন আমাদের কাছে আকস্মিক নাও হতে পারে। তবু গানটির মধ্যে যে অনুভব আছে, তা'র মূল্য অল্প নয় :

আমার বঁধু হাল করে কেঁদ-
কানালির ধারে।
হায়, হায়, মাথার ঘাম মুখে পড়ে,
দেখে হিয়া ফাটে।
ননদিনী লো, আমি নিজে যাবো
বাসিয়াম (পান্তাভাত) দিতে।

একটি কৃষক-বধূর হৃদয়-বেদনা, তার প্রেমের পরিচয় দিয়েছে এইভাবে। এ সব গানের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলী, শ্যামা-সংগীত বা বাউল সংগীতের ভাষা ও ভাবের পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। তবে শুধু ভাষা ও ভাব দিয়েই সংগীতের বিচার হয় না; সুরের প্রকাশেই তাকে চেনা যায়।

বলা বাহুল্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ, সমাজ-ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের সংগীতের জন্ম দেয়। নগর-সংস্কৃতিপুষ্ট সংগীতের সঙ্গে লোকসংগীতের তাই গুণগত এবং রূপগত পার্থক্য সহজদৃষ্ট।

পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার জনগোষ্ঠী এবং সমতল বাংলার জনগোষ্ঠী পৃথক পরিবেশে, পৃথক আর্থিক ব্যবস্থায় পরি-পুষ্ট হয়েছে, তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য—অনিবার্য। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার সমতা, শিক্ষাদীক্ষার সমতা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতির রাজ্যে পরি-বর্তন বহন করে আনে।

লোক-সংস্কৃতি, প্রত্যক্ষভাবে নগর-নির্ভর জনসমাজে অথবা শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত জনমানসে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। গ্রাম-বিধৃত সংস্কৃতি শহরমুখি হলেই বিনষ্ট হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল অথবা গ্রামজীবনের প্রতি সহানুভূতি লোক-সংস্কৃতির প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করে মাত্র। অবশ্য লোকযানের অঙ্গীভূত বহুবিধ সংস্কার অতি সংগোপনে শিক্ষিত জনমানসেও তার ছাপ রেখে যেতে পারে। কৃষি-নির্ভর সংস্কৃতি থেকে ধাপে ধাপে উঠে যে জনগোষ্ঠী নগর-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, সেই জনমণ্ডলীর মধ্যে সংস্কারের মতো, ফল্গুধারার মতো লোক-সংস্কৃতিও তার ছাপ রেখে যায়, প্রভাব নয়। প্রভাব মূলতঃ বহিরাগত, ছাপ—বর্জিত অংশের অবশিষ্ট। বাঙালী সংস্কৃতিতে উচ্চ এবং নিম্নমানের সংস্কৃতিগত মিলনের অংশ একটি সমন্বয়ের মধ্যেই পরিস্ফুট। কিন্তু একথা স্বীকৃত যে, সংস্কৃতিরও জাতিভেদ আছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতি, গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতি, কোলকাতা-কালচার কলকারখানা-বিধৃত অঞ্চলের সংস্কৃতি, প্রভৃতির মধ্যে কোন না কোনরূপে বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। অধুনা নানা কারণে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ বর্ধিত বলে গ্রাম-সংস্কৃতির মধ্যেও পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আছে।

এই গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্যেই, সংস্কৃতির প্রবহমানতা বজায় থাকে।

কৃষি-নির্ভর, গ্রাম-নির্ভর জনজীবনের সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার টুসু, ভাদু, ঝুমুর প্রভৃতি গানের মধ্যে জনজীবনের দৈনন্দিন শ্রমচর্যার এমন একটি ঘনিষ্ঠতা আছে, যার ফলে এই কথাই মনে হয় যে সংস্কৃতির আদিতে শ্রমের ভূমিকাই ছিল প্রধান। জীবিকার সঙ্গে এই সব গানের সম্পর্ক আজও তুচ্ছ নয়। সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হয়। পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার জনজীবনের পরিবর্তন নানাকারণে মন্থর ব'লে এই অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির রূপে লোক-চরিত্র অতি স্পষ্ট। সমতল বাংলার সঙ্গে নানাদিক দিয়ে এর পার্থক্য সহজদৃষ্ট। শ্রমচর্চা এবং যৌথচেতনা আজও এই আঞ্চলিক সংস্কৃতির বহু বৈশিষ্ট্যের অন্যতম।

প্রতিবেশী সাহিত্য

॥ মারাঠী গল্প ॥

॥ ভূমিকা ॥

মারাঠী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শত শত বাংলাগ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। শুধু বাংলা থেকে অনুবাদই নয় বাংলার পট-ভূমিকায় উপন্যাস, নাটক ও গল্প মারাঠী ভাষায় কম রচিত হয়নি। প্রসংগক্রমে দেশভাগের আগে হিন্দুমুসলমান সমস্যাকে কেন্দ্র করে এস, আর, বিওয়াল-করের রচিত 'সুনীতা'র নাম করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি মারাঠী বিদগ্ধজন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল।

মারাঠী গল্পসাহিত্যের রূপরেখাকে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। ১৯৩৯ এর আগে পর্যন্ত একটি যুগ। ১৯৪৩ পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। এবং ১৯৪৩ এর পর থেকে আজ পর্যন্ত তৃতীয় যুগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মারাঠী ছোটগল্পের মান উন্নত হতে পারেনি কিন্তু '৪৩-এর পর থেকে রচিত ছোট-গল্পসমূহে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। মানব-মনের বিচিত্র দিকের উদ্ঘাটন হতে লাগল। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এবং মানুষের প্রাত্যহিক জীবন স্থান পেল ছোটগল্পে।

মারাঠী ছোটগল্পলেখকদের মধ্যে এন, এম, ফাড়কে, বোকিল, অরবিন্দ গোখলে, গংগাধর গাড্গীল, পি, বি, ভাবে, ভেংকটেশ মাডগুলকর, আন্নাভাউ সাঠে, ডি, বি, মোকাসী, মনমোহন নাতু, উমাকান্ত ঠোমরে, শশীকান্ত, সদানন্দ রেগে, রণজিত দেশাই, এ, ডি, ভার্টি, মহাদেব যোশী, অম্বাদাস অগ্নিহোত্রী, ডি, এম, মিরাসদার, শংকর প্যাটেল, জি, ডি, মাডগুলকর প্রমুখ জনপ্রিয়।

ফাড়কে ও বোকিল মারাঠী ছোট-গল্পের জনক। অরবিন্দ গোখলে ও গংগাধর গাড্গীল মানুষের জীবন ও মনের কুটিল দিকটাই ফুটিয়ে তুলেছেন। গংগাধর গাড্গীলের রচিত এক একটি গল্প পাঠকমহলে ব্যাপক বিতর্কের অবতারণা করে। তিনি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

পি, বি, ভাবে গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর চরিত্রাংকনে ও ঘটনাবিন্যাসে পুরুষোচিত দৃঢ়তার পরিচয় পাই। শব্দগ্রন্থনায় মুন্সীয়ানা তাঁর আছে। কল্পনা-বিলাসের চেয়ে তাঁর গল্পে ভাবনৈকট্যের প্রাধান্য বেশী। তবে সাধারণ পাঠকমহলে তিনি প্রেমের গল্পরচয়িতা হিসেবেই খ্যাত।

ভেংকটেশ মাড্গুলকর ও আন্নাভাউ সাঠের রচনায় স্থান পেয়েছে মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ মানুষের জীবনবেদ।

লেখিকাদের মধ্যে শ্রীমতী কসুমা-বতী দেশপাণ্ডের নাম সর্বাধিক খ্যাত। সর্বাধুনিক ছোটগল্পে ও সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে গতানুগতিকতা, চিরা-চরিত প্রকাশরীতি, মতের গণ্ডী এবং রূপকল্পের বাঁধন ভাঙবার সুর ঝংকৃত হচ্ছে।

এ, ডি, ভার্টির ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত মনের অতলান্ত প্রদেশে সঞ্চিত এক একটি বিচিত্র মনোভাব লেখনীর কয়েকটি আঁচড়ে প্রকাশ পেয়েছে। —অনুবাদক।

একগলা যৌবন : একটি জিদ

রচনা—এ ডি ভার্টি

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

মনে করুন, কোন প্রেমিকার প্রতীক্ষায় পরিষ্কার বিছানার উপর সেজেগুজে বসে আছেন। বার বার ঘড়ির দিকে দেখছেন আর দরজার কাছে ছুটে গিয়ে গোড়ালি তুলে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাচ্ছেন। ঘড়ির কাঁটার সংগে সংগে আপনার বুকের ভেতরও ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ হচ্ছে। আর ঠিক সেই চরম মুহূর্তে যদি অন্য কেউ আসে তখন আপনার মেজাজ কি রকম হবে। আপনার যাই হোক না কেন এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।

সুরেন্দ্র নলিনীর অপেক্ষায় বসে আছে। নলিনী কথা দিয়েছে ঠিক পাঁচটার সময় তার ঘরে আসবে। পাঁচটা বাজতে আর দেরী নেই। কারো মন পেতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে পথচেয়ে বসে থাকা উচিত। সুরেন্দ্র সাড়ে চারটে থেকে তৈরী হয়ে বসে আছে।

দরজায় কে যেন টোকা দিল। সুরেন্দ্র লাফিয়ে উঠল। নলিনী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না! বুকের ভেতরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। বহু প্রতীক্ষার পর অনেক বছরের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যেন সে এখন পাবে। দরজা খোলার সংগে সংগে ঠিক করল বলবে, তুমি ঠিক সময় এসেছো। সত্যি তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালবাস। কিন্তু দরজা খোলার সংগে সংগে কথা-গুলো মুখে আটার মত আটকে গেল। আগন্তুকদের দেখে সুরেন্দ্রের মুখ লম্বা হয়ে গেল। চেহারার রঙ গেল পালটে। সামনে দেখতে পেল এক বুড়োর সংগে বুড়ীকে।

—আপনারা কাকে চান? সুরেন্দ্র নিজের রাগ চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে বলল। সে ভেবেছিল ওরা বাড়ির নম্বর ভুল করে এখানে এসেছে।

—আপনার সংগেই দেখা করতে এসেছি।

তারপরেই বুড়োটা সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। বুড়ীও থপ্‌থপ্ করে পা ফেলে সুরেন্দ্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কোত্থেকে বুড়োবুড়ী হাজির হয়েছে কে জানে। সুরেন্দ্র ভেতরে ভেতরে দারুণ চটে গেলেও ভদ্রতার খাতিরে বাইরে তা প্রকাশ করছে না। আড়চোখে কটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, বসুন।

এই 'বসুন' শব্দটি এমনভাবে বলল সামান্য একটু চালাক লোক হলেই বুঝতে পারত যে ওর মুখ থেকে যে বসুন কথাটি বেরিয়েছে তা 'চলে যান'—এই অর্থ বহন করে। কিন্তু বুড়োটা হয় তা বুঝল না অথবা লোকটা ঘড়েল। বলল বুড়ীকে, বস না, দাঁড়িয়ে হাঁ করে কী দেখছ! তারপর নিজে একটি চেয়ারে বসল।

সুরেন্দ্রের কপালের রেখাগুলো আরও স্পষ্টতর হলো। চোখেমুখে বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এর আগে বহুবার ওর এই ঘরে কন্যাদায়গ্রস্ত দম্পতিরা এসে বিরক্ত করেছে। সেদিনও সে ওদের সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। চলনে-বলনে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। আজকেও ভাবল, এরা নিশ্চয়ই বিয়ের কথা পাড়বে। হয়ত বলবে, তোমার বাবার সংগে আমার খুব আলাপ ছিল, তিনি আমার বন্ধু ......ইত্যাদি। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, কি করি, কত মাইনে পাই ইত্যাদি।......যেদিন থেকে নলিনীর সংস্পর্শে এসেছে সেদিন থেকে সুরেন্দ্র বুড়োদের সংগে কথা বলাই একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। লোকটার অদ্ভুত একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো নিজের সম্পর্কে কিছুই জানাতে চায় না। এমন কি নলিনীকেও কিছুই জানায়নি। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব একটা জিদ আছে।

একদিন নলিনী জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার মাইনে কত বল ত?

তারা পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছে বলেই নলিনী এ-প্রশ্ন করেছিল।

—কেন? মাইনে জেনে তুমি কি করবে? আমার মাইনের সংগে তোমার কি সম্পর্ক? আমার মাইনের খবর জেনেই কি আমাকে বিয়ে করবে কিনা ঠিক করবে?

অন্য একদিন নলিনী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কে কে আছে বল ত? প্রশ্নটা শুনেই সুরেন্দ্র তেলে-বেগুনে চটে গিয়ে বলল, কেন, তুমি কি আমায় বিয়ে করবে, না আত্মীয়দের কাউকে?

কতবার কতভাবে তার সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করেও নলিনী ব্যর্থ হলো। একটি কথাও তার পেট থেকে বের করতে পারল না। আর একদিন নলিনী বলেছিল, কাল বিকেলের চা আমাদের বাড়িতে খেয়ে আসবে।

—এখন তোমার বাড়িতে যাব কেন?

—যাবে না কেন?

—আগে বিয়ে হোক।

—বিয়ে হয়ে গেলে ত তুমি জামাই সেজে যাবে। তখন কি আর চা খেতে ডাকবো?

—দেখ, তুমি আমাকে কচি খোকাটি মনে করবে না। তোমার বাবার ওসব চাল আমি বুঝি। চা-খাওয়ানোর বায়নায় ডেকে পাঠিয়ে উনি আমাকে দেখতে চান —এই ত?

—দেখলেই বা ক্ষতি কি। ভাবী জামাই কেমন হবে তাকি একটু দেখতে ইচ্ছে করে না?

—কিন্তু আমাকে তো বিয়ে তুমি করবে। তোমার পছন্দ হলেই হলো।

শত চেষ্টা করেও নলিনী তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেনি। সুরেন্দ্র নিজের সিদ্ধান্তে অটল। অনেক পীড়াপীড়ি করলে বলত, আমি তোমার সামনে বসে আছি। যতবার দেখার আমাকে দেখে নাও। কিন্তু মাইনে, আমার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করো না—ওসব কী আর আমাদের ভাল-বাসাকে গভীরতর করবে।

নলিনী চুপচাপ থাকে। সুরেন্দ্রও জিদ বজায় রাখতে চায়। কিন্তু সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠলো। একদিকে সে কোনক্রমেই নিজের পরিচয় দিতে চায় না, অন্যদিকে নলিনীর মা-বাবাও তার সম্পর্কে কিছু না জেনে এ বিয়েতে মত দেওয়ার পাত্র নয়।

অনেকদিন ধরেই সুরেন্দ্র বিয়ের প্রস্তাব করছে। আর দেরী করা উচিত নয়, কিন্তু নলিনী বলে, আমি ত বিয়ে করতে গররাজী নই, কিন্তু তুমিই তো জিদ ধরে বসে আছ।

—জিদ তো আমি ধরে বসিনি। বসে আছে তোমার বাবা।

—কি করে তা বল? নিজের একমাত্র মেয়েকে কার হাতে তুলে দিচ্ছে তার সম্পর্কে কিছুই কি জানতে ইচ্ছে করে না তাঁদের?

—অতই যদি হয় তা'হলে নিজের একমাত্র মেয়ে যাকে ভালবাসে তাকে বিশ্বাস.........

—তোমাকে দেখছি বটে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তোমার সম্পর্কে ত আমি কিছুই জানি না। বুঝি না কেন তোমার এই গোয়ার্তুমি।

—নলিনী, এটা আমার গোয়ার্তুমি নয়, সিদ্ধান্ত। আমার নিশ্চিত মত হলো ভালবেসে যারা বিয়ে করে তার মধ্যে অন্য কারো নাক গলানো উচিত নয়। কাউকে সেই সুযোগ দিতেও আমি রাজী নই।

তারপর থেকে উভয়পক্ষেরই অস্বস্তি বাড়তে লাগল। পরস্পরকে পেয়েও পায় না।

নলিনী কোনক্রমেই বাবা-মাকে রাজী করাতে পারেনি।

সুরেন্দ্র তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু নিজের মত সে কোনক্রমেই বিসর্জন দেবে না।

নলিনীর আসার সময় ত হয়ে গেছে। বিরক্তির স্বরে সুরেন্দ্র বলল, দেখুন আমি এখন বিয়ে করার কথা চিন্তা করছি না।

বুড়ো হো-হো করে হেসে বলল, বা চমৎকার। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কন্যাদায়গ্রস্ত ভেবেছেন। তা ভাববেন বৈকি!

সুরেন্দ্র সান্ত্বনা পেল। বলল, তাহলে বিয়ের কথার জন্য আপনি আসেননি তো?

—আজ্ঞে না। অবশ্য আমার মেয়ে একটি আছে, তাকে নিয়ে যেরোনোও দায় —একবার যে ওর দিকে তাকায় চোখ ফেরাতে পারে না...... কিন্তু এখন ওসবের প্রশ্নই ওঠে না। আজকালকার মেয়ে ত, নিজের জীবন-সাথী নিজেই খুঁজে নিয়েছে। আমাদের শুধু আশী-র্বাদ করার কাজটিই বাকি আছে।

নলিনী যে-কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি কথাগুলো সেরে নিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সুরেন্দ্র ঠাণ্ডা মাথায় বলল, এত কষ্ট করে কেন এলেন বললেন না ত?

—আমরা এই লোকগণনা করতে বেরিয়েছি। দশ বছরে একবার আদম-সুমারী হয় তাতো জানেন। আমরা জানতে চাই আপনার জাত, বয়স, বিষয়-সম্পত্তি, চাকরি.........

সুরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আর কিছু বলতে সাহস করল না। রাগে গজগজ করতে করতে বলল সে, ক্ষমা করবেন, আপনি যা-কিছু জানতে চাইলেন তার একটিরও জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই।

—বলার মত কিছু না থাকলে আপনি কি করে বলবেন। তবে এসব আমি নিজের স্বার্থে জানতে চাইছি না। দেশের স্বার্থে আপনার উচিত এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া। আমাদের রাষ্ট্র-পতির বিশেষ অনুরোধ। দশ বছর অন্তর যে লোকগণনা হয়, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আমরা সেই কাজেই বেরিয়েছি।

তারপর বুড়োটা ঝোলা থেকে ছাপানো কয়েকটা ফরম বের করে প্রশ্ন করল, আপনার নাম?

—সুরেন্দ্র ভগবন্ত যোশী।

—জাতীয়তা এবং ধর্ম?

—ভারতীয়, হিন্দু।

—আপনি কি ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ।

—আপনার গোত্র?

—শাণ্ডিল্য।

—আপনি কি বিবাহিত?

—এখনো অবিবাহিত আছি।

—তাহলে বিয়ে করছেন না কেন?

—এসব প্রশ্নও ফরমে আছে নাকি?

বুড়ো হো-হো করে হেসে বলল, না এমনি। আচ্ছা আপনার বয়স?

—পঁচিশ বছরে পড়েছি।

—জন্মস্থান?

—অমলনের, পূর্বখান্দেশ।

—আপনি কি বাস্তুহারা?

—না।

—আপনার মাতৃভাষা কি মারাঠী?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আর কোন ভাষায় আপনি কথা বলেন?

—প্রেমের।

—এ-আবার কোন-দেশী ভাষা?...... আচ্ছা যাক্ গে। আচ্ছা দয়া করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিন তো। নিজের পেট নিজেই চালান না অন্যের গলগ্রহ......?

—আমি আত্মনির্ভর।

—খুব ভাল কথা। আচ্ছা, আপনি কি মালিক, চাকর, না স্বাধীন ব্যবসায়ী?

—কখনও মালিক কখনও চাকর।

—মানে?

—আমি সবসময় স্বাধীনভাবেই চলি কিন্তু......কিন্তু—

—হ্যাঁ—হাঁ বলুন, সংকোচ করার কিছুই নেই। আমরা তো জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নই যে ফাইন করবো।

—আমি এক তরুণীর দাস।

—বা! আপনি ত মশায় বেড়ে লোক। প্রেমের ভাষায় কথা বলেন, তরুণীর দাস! যাক্ সেকথা। আচ্ছা, আপনার মাসিক আয় কত?

—তিনশো।

—অন্য কোন আয় আছে? অর্থাৎ আপনার দেশের বাড়িতে বিষয়-সম্পত্তি...

—দেশে হাজার ত্রিশ-চল্লিশেকের বিষয়-সম্পত্তি আছে।

—আপনি ত এখানে থাকেন—দেশের ও-সব কে দেখে?

—বাবা দেখেন।

—আপনার ভাইবোন?

—দুটি।

—দুজনেই কি ভাই?

আজ্ঞে না। আমার একটি বোন আছে।

—বোনের বিয়ে হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনার এসব প্রশ্ন কি ফরমে আছে?

—তা অবশ্য নেই। বুড়ো হয়েছি ত মেয়ের সন্ধান থাকলে ভাল পাত্র যদি পাই......

—দয়া করে ওসব আপনাকে করতে হবে না। আপনার যা প্রশ্ন তাড়াতাড়ি সেরে নিন।

সুরেন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আপনার লেখাপড়া?

—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-কম পাশ করেছি।

—বেকার আছেন নাকি? যদি থাকেন তো কতদিন ধরে?

—বেকার নই।

—নারী না পুরুষ?

—দেখে কি মনে হচ্ছে?

—ক্ষমা করবেন। ফরমের ছাপা প্রশ্নগুলো দেখে দেখে করছি তো তাই। না সত্যি আপনি ভাল লোক, বেশ ভদ্রলোক।

তারপর সুরেন্দ্র পায়চারি করতে করতে এমন ভাব দেখাল যেন সে পরিষ্কার বলতে চায়, আপনারা বেরিয়ে যান। অবস্থা বেগতিক দেখে বুড়ো বুড়ীকে বলল, তোমার কোন প্রশ্ন নেই তো? বুড়ী ঘাড় নাড়ল।

—অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি অতি ধৈর্যের সংগে আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আপনার মত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ধৈর্যশীল লোক খুব অল্পই আছে।

তারপর বুড়ো যেতে যেতে বলল, আমরা এসে হয়তো আপনাকে অসুবিধায় ফেলেছি। এই সময় হয়ত অন্য কারোর আসার কথা ছিল। আচ্ছা আরেকবার আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা যাচ্ছি। কই চল পাশের বাড়িতে যাই।

ওদের চলে যাওয়ার পর সুরেন্দ্র আবার গোড়ালি তুলে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাল। আশ্চর্য, নলিনী এখনও আসছে না। কিছুক্ষণ পরে আবার পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, কতদিন আগে থেকে আজকের সাক্ষাতের কথা পাকা হয়েছিল...... আজকেই তার বিয়ের মত দেওয়ার কথা। হয়ত বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে সাহস করছে না। অতীতের মত আজকেও হয়ত নানা অজুহাত খাড়া করে বলবে, দুদিন পরে বলবো, অত তাড়া কিসের। তারপর মুখ ভার করে চলে যাবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখতে পেল নলিনী আসছে। আজকে তার হাঁটার মধ্যে যেন নতুন একটা তেজ আছে। আছে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। ঘরে ঢোকার সংগে সংগে সুরেন্দ্র তার চোখ-মুখে প্রফুল্ল ভাব দেখে বলল, বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে! কিন্তু এতো দেরী করলে কেন? আমি সেই কখন থেকে...

—বিশ্বাস করো, এর জন্য আমি দোষী নই। আমি তো চারটের সময় তৈরী হয়ে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় বাবা-মা আমাকে ঘর-আগলাতে বলে কোথায় বেরিয়ে গেল। আমার ওপর হুকুম দিল যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে ঘরে ঠায় বসে থাকতে। তুমি ত জান আমাদের ঘরে আর কেউ নেই। এ-অবস্থায় কি আর করি বল। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসেছিলাম।

—তোমার বাবা-মা? সত্যি কথা বলতে কি জান, এই বুড়োরা আমাদের প্রত্যেকটি কাজে বাদ সাধে। এইজন্যই ওদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। তুমি জান না আমার এই মুহূর্তে যে কি রাগ হচ্ছে ওদের ওপর।

—কিন্তু আমি এমন খবর এনেছি যে শুনলে তোমার সব রাগ জল হয়ে যাবে।

—সত্যি? কি বলতো?

—বাবা-মা তোমার সংগে বিয়ে করার মত দিয়েছে।

—মত দিয়েছে! আমি আগেই ভেবেছিলাম—আমার জিদের কাছে ওদের মাথা নোওয়াতেই হবে। খুব তো তোমার বাবা চেষ্টা করছিলেন আমার পরিচয় জানার, কই পারলেন না তো? শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হলো।

—এই মাত্র বাবা বললেন যে, তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর।

—কিন্তু উনি আমাকে দেখলেন কোথায়?

—কি বলছ তুমি! উনি তো তোমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। নিজের চোখে তোমাকে দেখেছেন।

—অসম্ভব।

—তাহলে ওনার কাছে যা শুনেছি বলবো?... তোমার মাসিক আয় তিনশো টাকা, তোমার গোত্র শাণ্ডিল্য, হাজার চল্লিশেক টাকার বিষয়-সম্পত্তি আছে...

—কিন্তু এসব তুমি জানলে কি করে?

—আমার মনের মত আর একটি কথাও আমি জানি।

—সেটা আবার কি?

—তুমি প্রেমের ভাষায় কথা বলো আর একটি তরুণীর দাস, তাই না?

—এ্যাঁ!

সুরেন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। নলিনী হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেল বিছানায়।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যে অনুপম কুটির প্রখর দিনের আলোতেও ঘুমিয়ে থাকতো, রাত্রির অন্ধকারেও সে জেগে বসে থাকে।

বাক্স বোঝাই-করা ঘরের দক্ষিণের জানলাটা খুলে সুচিন্তা আকাশ-পাতাল চিন্তা করেন।

কিসের ফাঁদে পা দিয়েছেন তিনি?

এ কী করে চলেছেন!

যে সুদূর অতীত মৃত্যুর শীতলতায় স্তব্ধ হয়ে মাটির গভীর স্তরের নীচে পড়েছিল, তাকে আবার কথা কয়ে উঠতে দিলেন কেন?

এরকম অদ্ভুত অবস্থায় কতদিন চলবে? প্রায় মাসদুই হয়ে গেল ওরা এসেছে, তার মধ্যে ঈশ্বর জানেন সুশোভনের কতটুকু কি লাভ হল, কিন্তু সুচিন্তার ক্ষতির তুলনা হয় না।

সুচিন্তার সংসারের শৃঙ্খলা গেল, জীবনের শৃঙ্খলা গেল। আর অনুপম কুটিরের সেই মৌন গাম্ভীর্যের বেদীর উপর সুচিন্তার যে সম্ভ্রান্ত সম্মানের সিংহাসন ছিল, তাও গেল।

ছেলেদের সামনে কিছুতেই সহজ হ'তে পারেন না সুচিন্তা, সহজে সামনে বেরোতে পারেন না। ওরা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, অকারণ কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

অথচ আবার ওদের জন্যেও স্বস্তি নেই।

নীতাকে বুঝতে পারেন না সুচিন্তা। কেমনতর মেয়ে ও? অতি-সরল, না অতি-চতুর? ও কি নিজের দিন কিনে নেবার জন্যে সুচিন্তার তিনটে ছেলেকে নিয়েই খেলাচ্ছে? না কি ওর তরুণী দেহের মধ্যে আজও একটি বালিকা বাস করছে? কিন্তু অনেক বড় বড় পাকা পাকা কথা ওতো বলে।

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে যখন হৈ হৈ করে, খুনসুড়ি করে, কারণে অকারণে তাকে বাইরে টেনে বার করে নিয়ে যায়, রোদে ঘেমে যত ইচ্ছে বেলা করে ফেরে, উদ্দাম তর্কে খেতে রাত দশটা বাজায় এবং এত জুলুমেও ইন্দ্রনীলের মুখে শুধু আলো ফোটাই দেখেন, তখন সুচিন্তার মনে হয় ছেলেটাকে বুঝি মায়াবিনী একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।

আবার পরক্ষণেই যখন দেখেন নিরুপমের ঘর থেকে খিল খিল করে হাসির আওয়াজ আসছে, তখন মনে করেন, আগের ধারণাটা তাঁর ভুল, শিবের তপস্যাভঙ্গ করবার জন্যেই উঠে-পড়ে যুদ্ধে লেগেছে ছলনাময়ী; মদন আর বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে।

কিন্তু আবার সব কেমন গুলিয়ে যায়।

বিভ্রান্ত হয়ে যান নীলাঞ্জনের সঙ্গে ওর সম্পর্কের জটিলতা দেখে।

জটিলতাই তো সন্দেহজনক।

দুজনে কাছাকাছি এলেই কেন লাগবে ঠোকাঠুকি? কেন তার থেকে ক্ষণে ক্ষণে ঠিকরে উঠবে আগুন।

ভেবে ভেবে হাল ছেড়ে দেন সুচিন্তা। হালছাড়া মনে ভাবেন, বাজে মেয়ে, একেবারে বাজে মেয়ে। বাপের মত হয়নি, নিশ্চয় মায়ের মত হয়েছে। কাউকে ভালবাসবে না ও, শুধু তিনজনকে নিয়েই খেলাবে।

কিন্তু সুচিন্তার এত বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন সংযত স্বল্পবাক ছেলেরা সকলেই ওই একটা বাজে মেয়ের হাতে খেলছে কেন, সে কথা ভাবেন না সুচিন্তা। ভাববার প্রথা নেই বলেই হয়তো সেই খোলা জানলাটার চোখ পড়ে না।

প্রথা নেই, সত্যিই প্রথা নেই।

ছলনাময়ীরা মানুষকে 'ভেড়া' বানায়, এই অপবাদ অনন্তকালের,

'মানুষ' যদি মানুষ হয় তো কেন সে ভেড়া বলে, এ প্রশ্ন কেউ তোলে না। সুচিন্তাও তোলেন না। শুধু মনে মনে বলেন, ও তো কেবল আমার ছেলেদেরই খেলাচ্ছে না, আমাকেও যে খেলাচ্ছে। কিন্তু আর নয়, আর নয়।

রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন 'আর নয়'। কালই বলবেন ওকে, 'হল তো অনেক-দিন, উন্নতির কিছু দেখেছ কি? সেই তো এখনও ছেলেমানুষের মত আচার আচরণ! তবে আর কেন? এবার মুক্তি দাও আমাকে। দেখতে পাও না আমার ছেলেদের মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না আমি!

ছেলেরা?

তারাও হয়তো এখনকার মত শুধু বাঁকা কটাক্ষে তাকিয়েই ক্ষান্ত হ'ত না, ব্যঙ্গ করতো আমাকে, তীব্র প্রশ্নে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে বলতো, 'তোমার বাল্যপ্রণয়ী তোমার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে, এ দৃশ্য আমরা অহরহ সহ্য করবো কেন? তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে না, তুমি এখন ওদের সমস্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছ বলে।

কিন্তু ক'দিন তা' পারবে তুমি?

যেদিন তোমার আঁকা মোহের কাজল মুছে যাবে, সেদিন প্রতিবাদে ঝন-ঝনিয়ে উঠবে না আমার সংসার? অনেক সমুদ্র পার হয়ে সমুদ্রের কিনারে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি, আবার কেন আমাকে উত্তাল সমুদ্রে ঠেলে দিচ্ছ?

বলবেন, সবকিছু বলবেন বলে স্থির সঙ্কল্প করে রাখেন সুচিন্তা, কিন্তু সকাল হতেই কোথা দিয়ে ভেসে যায় সঙ্কল্প। উত্তাল হয়ে ওঠেন তিনি নিজেই। দুধের জন্যে, গরম জলের জন্যে, তাড়াতাড়ি খাবারের জন্যে টানা-পোড়েন করেন—নীচে থেকে ওপর থেকে নীচে।

তারপর যেই দুটি নীলচে কাঁচের দৃষ্টি তুলে একটি ভারী ভারী ভরাট গলা কথা কয়ে ওঠে, কাছে এসে বলে ওঠে 'সুচিন্তা, সকাল থেকে তোমার এত কি কাজ বল তো? সকাল থেকে আকাশে কত রং, কত আলো, সব হারিয়ে গেল, কিছু দেখাতে পারলাম না তোমায়, তখন সুচিন্তারও বুঝি সব হারিয়ে যায়। হেসে ফেলে বলেন, 'আলো আবার হারিয়ে গেল কোথায়, এই তো কত আলো!'

'ওতো রোদ্দুর! ওতে রং কই? কত রং ছিল! ঠিক সেই আমাদের ছেলে-বেলাকার আকাশের মত। সেই যে তোমা-দের চিলেকোঠার ছাতে উঠে দেখতাম আমরা।'

থাকতো সুচিন্তার চিলেকোঠার ওপর। সেখান থেকে ছোট একটা আঁকশির সাহায্যেই নামিয়ে আনা যেত সেই স্বর্ণস্তবক।

সুশোভনের ঠাকুরমার বাণেশ্বর সারা বোশেখ চাঁপার অর্ঘ্য চান, আর সুশোভন চায় ঠাকুমাকে অর্ঘ্য জোগাতে।

.....শিবের তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যেই উঠে-পড়ে যুদ্ধে লেগেছে ছলনাময়ী।

চিলেকোঠার ছাত।

মুহূর্তে সে তার অপূর্ব রোমাঞ্চ নিয়ে বহুকালের পথ অতিক্রম করে শহরতলির এই কাঁচের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। চিলেকোঠার ছাত। যেখানে নিজেদের চতুর ভেবে নিশ্চিন্ত থাকা নির্বোধ দুটো ছেলেমেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আঁকশি দিয়ে চাঁপা ফুল পাড়ছে।

প্রকান্ড বোশেখী চাঁপা গাছটা তার সোনালী স্তবকের সম্ভার নিয়ে নুয়ে

কারণ ঠাকুরমার কাছে অনেক প্রশ্রয়। কাজেই আঁকশি নিয়ে চুপি চুপি পাশের বাড়ীর দোতলার ছাতে উঠে যায় সে। কিন্তু শুধুই কি ঠাকুরমার অর্ঘ্যের যোগান দিতে শেষরাত থেকে শয্যা-কণ্টকী ধরে সুশোভনের?

তা যতই চুপি চুপি যাক, সুচিন্তার শ্যেন দৃষ্টির কাছে পারবে? সঙ্গে সঙ্গে সুচিন্তাও নিজের ঠাকুরমার কাছে গিয়ে লাগিয়ে দেবে না, 'ওই দেখ ঠাকুমা, দস্যিটা ফের সেই ছাতে গিয়ে উঠেছে।

তোমার গোপাল ঠাকুরের জন্যে একটা ফুল রাখবে না। দাও তো তোমার একখানা চেলি তসর। জড়িয়ে নিয়ে যাই একবার।'

ঠাকুমা বকে উঠে বলতেন, 'থাক তোমাকে আর এখন রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ছাতে উঠতে হবে না, 'ভনা' আমায় ফুল দিয়ে যাবে।'

'ভনা' অর্থে সুশোভন।

ঠাকুমার শ্বাশুড়ীর নাম ছিল নাকি সুষমা, তাই সুশোভনকে পুরো নামে ডাকবার জো ছিল না তাঁর।

সুচিন্তাও মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপাতো 'ভনা ভনাভন্ মাছি ভনভন ভন।'

সুশোভনও অবশ্য প্রতিদান দিতে ছাড়ত না, মুখ ভেঙিয়ে বলতো 'সুচিন্তা, তা ধিনতা।' তা সেটা ভাবের সময়। ফলচুরির ব্যাপারে মনে করা যেতে পারতো দুটিতে পরম শত্রু।

'ভনা আমায় ফুল দিয়ে যাবে!' ঠাকুমাকেই ভেঙিয়ে উঠত সুচিন্তা, 'তা'তেই কেতাথ হয়ে যাবে তুমি। নিজের ধনে ভিখিরি! কেন, ও দস্যি সব ফুল নির্মূল করে নিজের ঠাকুমার জন্যে নিয়ে যাবে, আর তোমাকে অছেন্দা করে দুটো ফেলে দিয়ে যাবে কেন শুনি?'

সুচিন্তার ঠাকুমা তথাপি নিজের নাতনীকেই বকতেন, 'অছেন্দা করে দিতে যাবে কেন লা! দিব্যি ভক্তি ছেন্দা করেই দেয়। তুই হুড়োমি করতে যেতে না পেয়ে মরছিস তাই বল। না না, যেতে হবে না তোকে। তোর মা রাগ করে!'

'মার কথা বাদ দাও। মা তো তুমি সকালবেলা সংসারের কাজ ভাসিয়ে দু-ঘণ্টা পুজো কর বলেও রাগ করে। ঠাকুর-দেবতা বলে কার মন আছে এ বাড়ীতে?'

কার্যসিদ্ধির জন্যে বিভীষণের ভূমিকা নিতেও পশ্চাদপদ হয় না সুচিন্তা।

তা' কার্যসিদ্ধি হয়ও।

ঠাকুমা গুম্ হয়ে গিয়ে বলেন, 'আচ্ছা যা তুই, দেখি তোর মা কি বলে!'

সেই বলার সূত্র ধরেই তিনি 'দু ঘণ্টার শোধ তুলে ছাড়বেন, এই সংকল্প নিয়েই বোধকরি ঘসঘস করে চন্দন ঘসতে থাকেন। বলা বাহুল্য সুচিন্তার প্রার্থিত চেলি তসর যাই হোক একখানা ছুঁড়ে দিতে ভোলেন না।

একই চালাকিতে বেশীদিন কাজ চলে না, আবার অন্য উপায় খুঁজতে হয়। অতএব বেচারা সুশোভনকে দু'চার দিন পাপের ভয় অগ্রাহ্য করেও গোপালের ঘরাদ্দ বন্ধ করে নিঃশব্দে নেমে যেতে হয়।

ঠাকুমা দু'ঘণ্টার ওপর আরও দু দণ্ড চাপিয়ে অপেক্ষা করে করে বলেন, 'ওরে চিন্তে, ভনা কি এখনো গাছ ঠেঙাচ্ছে? দেখ দিকি?'

সুচিন্তা মুখ ঘুরিয়ে বলে 'ওমা তোমার ভনা তো কোন কা-লে চলে গেছে। কেন দেয়নি ফুল?'

'কই না তো!'

'ওই দেখ ছেন্দা ভক্তির বহর!'

বলে চোখ ভুরু সাধ্যমত কায়দা করে সুচিন্তা। না, তার আর পাপের ভয় নেই, ফুলচোরকে শিখিয়ে দিয়েছে সে এক আঁজলা ফুল গোপালের নাম করে জলে ভাসিয়ে দিলেই পাপ কেটে যাবে।

'যাচ্ছি আমি' বলে কোমর বাঁধতে বসে সুচিন্তা।

'যাবি আবার কোথায়?'

'কেন উচিত কথা শুনিয়ে দিতে। ওবাড়ীর ঠাকুমাকে বলব। আপনার বাগেশ্বরই ঠাকুর? আর গোপাল বুঝি বাগের জলে ভেসে এসেছে?'

'রক্ষে বিবহরি, তোমায় আর পাড়ায় গিয়ে কোঁদল করতে হবে না।' বলে থামিয়ে দিতে চাইতেন ঠাকুমা, কিন্তু এক্ষেত্রে 'দাদু' সুচিন্তার পৃষ্ঠ-পোষক হ'তেন। বলতেন 'তা' সত্যি. এটা ওদের ছেলের অন্যায়। বলা উচিত।'

অতএব উচিত কথা বলতে ওবাড়ী যেতে হয় সুচিন্তাকে।

সুশোভন প্রশ্ন করতো, 'তুই য ছাতে উঠেছিলি, ঠাকুমা টের পায়ান তো?'

'না!'

'পেত টের। আর তুইও হাড়ে হাড়ে টের পেতিস যদি একবার পা ফসকাতিস। এক চোখ বুজে সূর্যের রং দেখতে দেখতে পড়ে মরছিলি তো আরটু হলে।'

'কেন, বাবুর তো চোখ খোলা ছিল, ধরতে পারা যেত না? তা' কেন, আমি পড়ে হাড় ভাঙি এই ইচ্ছে।'

'তা সত্যি বলতে কি, হয় সে ইচ্ছে। ঠাঙ্ খোঁড়া করে বসে থাকলে তোর আর বেশ বিয়ে হয় না।'

সূর্যের সাত রঙ কি সেই বালিকা মুখের পটে ফুটে উঠত?

না, এখন আর মুখের পটের সে মসৃণতা নেই, সাত রঙের ছ'টা রঙই অকেজো হয়ে গেছে সেখানে। এখন যেটা ফুটে ওঠে, সেটা শুধু লাল রঙ।

লজ্জা লজ্জা লজ্জার রঙই শুধু সম্বল।

তবু সেই এক রঙা মুখেই সুশোভনের কথার উত্তর দেন সুচিন্তা, 'তা' সেই ছেলেবেলাতেই আছি বুঝি যে, অজ্ঞান হয়ে আকাশের রঙ দেখবো। বয়েস হয়নি?'

সুশোভন হতাশ হয়ে বলেন, বয়েস হয়ে গেছে! ওঃ! কিন্তু সুচিন্তা, আকাশের তো বয়েস হয় না! বয়েস হয় না পৃথিবীর! মানুষেরই শুধু বয়েস হয়ে যায় কেন? চারিদিকে সব ঠিক রইল, অথচ মাঝখান থেকে মানুষগুলো অন্য রকম হয়ে গেল, কি আশ্চর্য বল তো?'

এই আশ্চর্যের প্রশ্ন আবার ওঠে বিনিদ্র রাতে দক্ষিণের জানলা খুলে বসে। আকাশে যখন আর কোন রঙ নেই, শুধু একটাই রঙ। অন্ধকারের রঙ।

হ্যাঁ মানুষই শুধু বদলে যায়। যেতেই হয়। না হয়ে উপায় নেই। বদলাতে না চাইলেই লোকে বলে 'পাগল।'

কিন্তু সুচিন্তারও পাগল হলে চলবে কেন?

কালই বলে দেবেন নীতাকে সেকথা।

(ক্রমশঃ)

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ন রায়
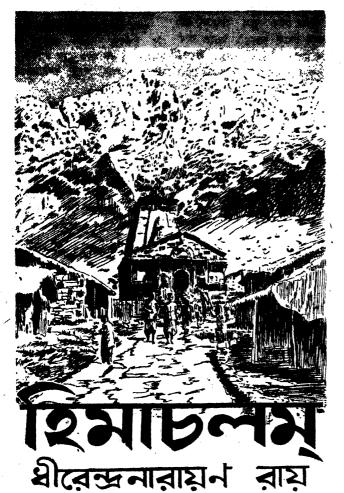
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেদারের পথে গুপ্তকাশীর পর থেকেই চোখাম্বার শৃঙ্গ দেখা যায়—পথের বাঁকে কখনো অদৃশ্য হয়, আবার কখনও সূর্যকিরণে ঝলসে ওঠে। তুঙ্গনাথ থেকেও চোখাম্বার অপরূপ উচ্চতা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

হনুমান চটীতে অত্যধিক ঠাণ্ডা—উমাপ্রসাদ এখানেও আগেই আমাদের জন্যে দুটি ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। পাণ্ডুকেশ্বর চটীতে তৈরী-করা খাবার সংগেই ছিল। সেগুলি আহার করেই রাত কাটিয়ে দিলাম।

১৯শে অক্টোবর। ভোরে উঠেই নীরেনের মধ্যে বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করি। হনুমান চটীতে এককালে হনুমানের অধিষ্ঠান ছিল কিনা জানি না, কিন্তু রামসেবক হনুমানের মত এখান থেকেই শ্রীমান নীরেন হাতজোড় করে শ্রীশ্রীবদরীনাথের ধ্যানে তন্ময় হয়ে উঠলো। "আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে"—এই কথা বলে আর এধার-ওধার লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বারবার কপালে দু'হাত ঠেকায়।

আকাঙ্ক্ষা কার নেই? জন্ম-জন্মান্তরের কত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তো আমরা পৃথিবীতে আসি; যেভাবেই হোক না কেন, প্রাক্তনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে যাঁর জিনিস তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়াই তো আমাদের কাজ।

হনুমান চটী থেকে যত শীগ্‌গীর বেরিয়ে পড়া যায়, ততই মঙ্গল। প্রায় পাঁচ মাইল পথ বাকী। কুলীদের আগেই রওনা করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যাত্রা করলাম বেলা আটটায়। হনুমান চটী থেকে এক মাইল দূরে ঘোরাসিল পুল পার হয়ে আরো এক মাইল যাওয়ার পর বংডগ পুল। এখান থেকেই খুব চড়াই পথ। এত খাড়াই যে ডাণ্ডীওয়ালাদের মাঝে মাঝেই ডাণ্ডী নামিয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। পথে কয়েকটি ছোট ছোট চটী, কোনওটা যাত্রীর আশায় এখনও খোলা আছে। অধিকাংশই বন্ধ। অত্যধিক শীতে বেশীর ভাগ গাড়োয়ালী মালিক নীচে নেমে গিয়েছে।

দেখলাম, বদরীনাথ-প্রত্যাগত এক দঙ্গল ভিন্‌দেশীয় স্ত্রীলোক ওপর থেকে নেমে আসছে—সংখ্যায় অন্ততঃ চল্লিশ জন। সংগে মাত্র দু'টি পুরুষ। যারা তীর্থ করে ফিরে আসে, নূতন যাত্রীর সংগে পথে দেখা হলে, প্রথানুযায়ী তারাই জয়ধ্বনি দেয়। আমাদের দেখেই মায়েরা একসংগে বদরীবিশালের জয়গান করে ওঠে। দেখলাম, বেচারা পুরুষ দু'টি নিষ্ক্রিয়—সক্রিয় হচ্ছেন মাতৃ-মণ্ডলী। লেফ্‌ট হ্যাণ্ড ড্রাইভের যুগ কিনা!

আধ মাইল দূরে দেওদখনী—এখান থেকেই শ্রীশ্রীবদরীনাথজীর মন্দির দেখা যায়। আমাদের দলবল সব এখানেই এক-সংগে হওয়া গেল। নীরেনের প্রাণে অকথিত পুলকের ভাষা—চোখে-মুখে তারই স্বীকৃতি। গুণেন, গণেন, অনুজা আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। আমরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে বলি "জয় বদরী-বিশালা কী জয়।" চারিদিকের পাহাড়ে পাহাড়ে তারই প্রতিধ্বনি।

সামনে আর মাত্র পৌনে এক মাইল পথ—আমাদের মন উধাও হয়ে ছুটে যায়—যেন আর পথের বন্ধনকে স্বীকার করতে চায় না। ডাণ্ডী চলে, ঘোড়ায় যারা এগিয়ে আসছে, তাদেরও আর কোনোদিকে দৃক্‌পাত নেই। ঝি চাকর পর্যন্ত চুপ। সবাই চলেছে বহু আকাঙ্ক্ষিত দেবদর্শনে, যে যার পুঁজি অনুযায়ী মনের গভীরে নিজেকে হারিয়ে দেয়। বহির্জগতের কোনো কিছুই যেন আর তাদের চোখের সামনে নেই। এই যে একান্তভাবে পথ-চলা, এই যে একান্ত-ভাবে নিজের মধ্যে ডুবে-যাওয়া, এই কি ভগবদ্দর্শনের প্রস্তুতি? জানি না, কে কতটা গহনে ডুবে যেতে পারে, জানি না, প্রাক্তনের কতখানি সঞ্চয় থাকলে, চেতনার সাগরতলে সেই অপরূপ জ্যোতির্ময়ের সন্ধান মেলে। কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের এই লীলানিকেতনে, প্রকৃতির উন্মুক্ত চৈতন্যে স্নিগ্ধ হয়ে পুরুষোত্তমের অবাঙমানসগোচর বিভূতির কণামাত্র লাভের আশায়ই তো এ জন্মের পথ চলা।

বিগ্রহের সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভ করে বিগৃহীত হওয়ার জন্যেই তো তাঁর কাছে চলেছি।

চড়াই থেকে সমতলভূমিতে নেমে সামনেই শ্রীশ্রীবদরীনাথের পবিত্র ধাম। ডান দিকে অলকনন্দা। দেওদখনী থেকে আধ মাইল দূরেই অলকনন্দার পুল— নদী চলেছে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে—দিক-দিগন্ত মুখরিত করে—ভাবাময় অপ্রতি-হতগতি। ডান্ডীওয়ালারা কিছু আগেই, যেখান থেকে পাথর-বাঁধানো পথ শুরু হয়েছে, ডান্ডী থেকে আমাদের নামিয়ে দিলে। শুধু কঠিন পাথরে তৈরী পথ সে তো নয়, ভক্তির সোপানে সাবলীলতার ইঙ্গিত। যৌবনের শক্তি যেন ফিরে গেলাম—মনে হ'ল যেন দু'পায়ে পাখা বেঁধে উড়ে যাই। পুল পার হওয়ার সময়, পথ থেকে একটু নেমে অলকনন্দার জল স্পর্শ করি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোটবড় পাথরের টুকরো-বিছানো সেই পথটুকু আবার এমন যে, একটু হোঁচট খেয়ে জলে পড়লেই অলকানন্দার তোড়ে কোথায় যে ভেসে যাব, তার ঠিকানা নেই।

সামনেই শ্রীবদরীবিশালাজীর প্রাচীন স্বর্ণমন্দির। পূব দিকে প'য়তাল্লিশ ফুট উঁচু দরজা—এইটেই সিংহদ্বার। মন্দিরের সামনে পৌঁছেই আটকে গেলাম।

আমাদের ঠিক আগেই চলছিলেন টেম্পল কমিটির প্রেসিডেন্ট আচার্য ব্রজবিহারী মিশ্র, পশ্চাতে সভ্যবৃন্দ। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে সেখানে বেশ একটু সমারোহ দেখলাম। তাঁর সমস্ত ললাটে চন্দনলেপন, ভজনখানেক পুষ্প-মাল্যদান, প্রশস্তিবাচন, কিছুই বাদ গেল না। কয়েকজন একসঙ্গে বিভিন্ন আকৃতির শিঙ্গা ফুঁকতে থাকে তার সঙ্গে দুন্দুভিনিনাদ। আমিও ঠিক তাঁদের পশ্চাতে।

তখনো আমার দলের আর কেউ এসে পৌঁছয়নি—তাই তাদের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট অভিনন্দন-উৎসব চাক্ষুষ করার সৌভাগ্যটাও হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমাদের দলবল এসে পড়তেই, আমরা ধুলোপায়ে মন্দিরে উঠলাম।

শ্রীশ্রীবদরীনাথের সামনে দাঁড়িয়ে দু'চোখে জল আর বাধা মানে না। অবিরল ধারায় ঝরে পড়ে। অন্তরের সমস্ত আকুতি নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই—হে পুরুষোত্তম, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, তোমার চরণে সমীপস্থ হবার শক্তি দাও। তোমার মহিমা বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই, বিন্দুতেই তুমি সিন্ধুদর্শন করাতে পার, দেহের সীমায়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ-ভরা এই পার্থিব জগতে তুমিই দিতে পার দেহাতীত, কালাতীত, বিজ্ঞানাতীত অনন্তের অনুভূতি।

মনে হ'ল যুগ যুগান্তর কাল ধরে আমি যেন একটি মাত্র আকিঞ্চন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনে ওই ধ্যানময় বিগ্রহ, অখণ্ড জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্তী আলোকস্তম্ভ—নিখিলকারণ-সাগরে চিদানন্দহেতু, চোখের সামনে সব-কিছু মিলিয়ে যায়,—নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আর বোধ রইল না—যেন বোধির মাঝে নিমজ্জিত হয়ে অপার আনন্দে আমার দেহ তখন কী এক অজানিত আবেগে মুহুর্মুহুঃ কেঁপে ওঠে।

সমস্ত শরীর টলে উঠল। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি—এমন সময় গুণেন দু'হাতে আমায় জাপটে ধরলে। শরীরের শিহরণ তখনও থেমে যায়নি—অনুভূতির অনিরুদ্ধ অমৃতক্ষরণ বুঝি তখনও অবাধে চলেছে। সেই সহস্রদল পদ্মের কারণ-বারি পান করার জন্যে চেতনার সাগর-পারে দাঁড়িয়ে একী অমৃতময়ী পিপাসা!

কী দেখলাম, কী পেলাম—হিসেব-নিকেশ কে করে? যা' পেয়েছি, তাকে বুকে রাখাই কঠিন, প্রাণের তুফানে বুঝি ক্রমাগত দুলতে থাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তকে তো ধরে রাখা যায় না। তবু, দেহের অণুতে অণুতে যদি সেই পাওয়াকে স্পর্শাকুল করে তুলতে পারি—তবেই তো এবারের মত ভজন-পূজন সাঙ্গ হয়।

মন্দির থেকে সজল চোখে বেরিয়ে এলাম। ভাবামৃত-হৃদয় পরিপূর্ণ আনন্দে মুগ্ধ। তুমি কি 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়?'

গুণেন ও নীরেন আমার সঙ্গেই আছে।

নীরেনের উক্তি কানে আসে—

—ভাগ্যে গণু তোমাকে ধরে ফেলেছিল, নইলে হয়তো আজ একটা কুকান্ড হয়ে যেত।

—কুকান্ড আবার কী মৃত্যু যে জন্মেরই দোসর—সঙ্গে নিয়েই পথ চলে—কিন্তু রাজাধিরাজের চরণে জীবনান্ত হওয়া, এর চেয়ে লোভনীয় মৃত্যু আর কী হতে পারে, ভাই।

গুণেনের এক বন্ধু বদরীনাথে এসে মৌনীবাবার ফটো তুলেছিল; এক কপি ফটো দিয়ে সে বলে দিয়েছিল যেন সাধুর কাছে পৌঁছে দেয়। আমি আগেই সেখানি হস্তগত করেছি—পকেটেই ছিল। তাছাড়া যোশীমঠেই জেনে নিয়েছিলাম, মৌনীবাবা কী গ্রহণ করেন। নীরেনকে বলি—

—চল নীরেন, ধুলোপায়েই মৌনীবাবাকে দর্শন করে আসি।

গুণেন ডাক্তারী প্রেসক্রপশন ছাড়ে—তিন ফার্লং পথ—দেখছেন না, কী ভীষণ খাড়াই। আপনার কখনই যাওয়া উচিত নয়।

আমি তখন উচিত-অনুচিতের বাইরে।

বদরীনাথজীর মন্দিরের পাশেই যে পাহাড়টি উঠে গিয়েছে, দেখা গেল,

তারই বেশ কিছু ওপরে একটি গুহার মত—সামনে এক সাধু বসে আছেন। এতটা দূর থেকে কিছুই স্পষ্ট দেখা না গেলেও মনে হ'ল যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে তাঁর চোখ দুটি। দুহাত তুলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলাম—কিন্তু অচল, স্থির সেই মূর্তি—ওধার থেকে কোনও ইঙ্গিতই পাওয়া গেল না।

তাঁর সঙ্গে তখনই দেখা না করলে যেন সুস্থির হতে পারি না। বদরীনাথ মন্দিরের আশেপাশে যে দু-একটি দোকান তখনও ছিল, সেখান থেকেই চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ, কিছু শুকনো ফল প্রভৃতি নিয়ে গেলাম। গন্ধ বোধ হয় রাগ করেই ফিরে গেল।

পথ খুব খাড়াই—উঠবার সময়েই টের পাইয়ে দিলে। কিন্তু মন যখন বল্গাছাড়া হয়ে সেইদিকেই ছুটে চলে, তাকে বাধা দেবই বা কেন?

নীরেনকে বলি—চল, আর দেরি নয়, আজই এখুনি সাধুর দর্শন চাই।

নীরেন বহুক্ষণ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিল—এবার জিজ্ঞেস করলে—বদরী-নাথজীর দর্শন পেলে, দাদা?

ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে তাকে চুপ করে থাকতেই ইঙ্গিত করি।

কী বলব? দর্শন পেয়েছি কিনা? কেমন দর্শন হোলো? এমনি সব অবাস্তব প্রশ্নের উত্তর দেই কী করে? এতো শুধু এই দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নয়, এ যে চিত্তের মণিকোঠায় বিদ্যুৎ-স্ফুরণ—সে তো অনুভূতির, ভাষায় তার রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। আমার প্রতি-দিনের পূজায় আমি যে এই শুধু চেয়েছি—নারায়ণ, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, তোমার চরণের সমীপস্থ হবার শক্তি দাও। কিন্তু শেষ-কালে তুমি আমার সেই শক্তিটুকুও কেড়ে নিয়ে, নিজেই আমার বুকে এসে এমন করে কাঁদিয়ে দিলে—আমার 'আমিত্ব'কে ভেঙেচুরে সব-হারানোর নেশায় পাইয়ে দিলে! তাই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তা'হলে আর যেন আমাকে দূরে রেখো না—হয় তুমি আমাকে তোমার মধ্যে আকর্ষণ করে নাও না হয়, তুমি এসে আমার প্রাণে অধিষ্ঠান কর অনির্বাণ, অবিকল্প অভিন্নস্বরূপে। তোমার চিন্ময়ী মাধুরী নিয়ে তুমি নিমেষহীন হয়ে আমার বুকে নিত্য বিরাজ কর।

চড়াই পথে এই সব কথা ভাবি আর মাঝে মাঝেই হোঁচট খাই। এক সময় নীরেন আমাকে থামিয়ে দুহাতে বেশ একটু নাড়া দিয়েই বলে উঠল—

—একটু সাবধানে চল দাদা, তোমার পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

উত্তর দিলাম—

—বিশ্বাসঘাতক আর কেউ নয়, ভাই জড়বাদী মনের আত্মঘাতী বাসনা—আমাদের অহংকার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পণ্ডিত বলেছিল বটে—'অহম্ অহম্ করোতি ইতি অহংকার'।

—তাই তো বলছিলাম কার অহং, আমরা ভুলে যাই—আমাদের খোলসটাই 'বড় আমি'কে ঠকায়। ভগবানের কৃপায় হঠাৎ যা পাওয়া যায়, নিজেদের দোষেই সেটা আবার হারিয়ে ফেলি। অহংকে সোঽহং করা যায় না। এই তো জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা—সব চাইতে বড় ট্রাজেডি!

এক একবার বসি—এক একবার উঠি—প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কি, কিছু-দূর উঠেই মৌনীবাবার গুহা আর দেখা যায় না। আমরা পথ হারালাম।

শ্রীনগরেও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে ফেরবার পথে এমনি হয়েছিল। নীরেন আর আমি পরস্পরের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকি। তাকে বলি—

—তুমি একটু এগিয়ে দেখ, ঠিক পথটা কোন্‌দিকে—আমাকে ইশারা করলেই এগিয়ে যাব।

সেও বীরবিক্রমে পাহাড় ভাঙতে থাকে, তবু কোনও হদিশ পায় না। সে নিজেই পথ হারিয়েছে, আমাকে আর পথ দেখাবে কী? বেগতিক দেখে আমিও হাঁপাতে হাঁপাতে তার সঙ্গ ধরি।

এমন সময় দেখা গেল, ভালুকের মত দেখতে একটা কাল রং-এর কুকুর ছুটে আমাদের দিকেই আসছে। কাছে আসতেই নীরেন চিৎকার করে ওঠে—

—এ কী? এটা যে সেই কুকুর, যেটা পিপুলকোটি থেকেই আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি।

আমারও চিনতে কষ্ট হোল না—ঘাড়ের ওপর দিয়ে একটা মাত্র সরু সাদা দাগ গলা বেষ্টন করে পেট বরাবর নেমে গিয়েছে—যেন 'কালো বামুনের ধলো পৈতে!'

গম্ভীর হয়ে বলি—

—তোমার বরাতজোর আছে, নীরেন, সেই দ্বাপরে এক কুকুর যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রার সঙ্গী হয়েছিল—সেটাই এখন অব্দি হিমালয়ের পথে পথে একে ও'কে তা'কে পথ দেখিয়ে চলেছে কিনা, বুঝতে পারি না, তবে তোমার ওপরে নেকনজর আছে।

নীরেনও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গেই একটা যুৎসই জবাব দেয়।

নেকনজরটা আমার ওপরে নয়, বরং তোমার ওপরেই। জন্তুজানোয়ারে আমার কিছুমাত্র ভরসা নেই—তুমিই তাদের নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলে।

—কী শিকারের কথা বলছো? সেদিন আর নেই রে ভাই, এখন নিজেই শিকার হয়েছি—যদি তাঁর কাছে স্বীকৃতি পাই।

যাই হোক, দেবতাত্মা হিমালয়ের আশীর্বাদের মতই সেই কুকুরটি আমাদের পথ দেখিয়ে চলে, আমরাও তার পেছনে পেছনে শিষ্ট বালকের মত চলি। আমরা বসলে সেও বসে পড়ে। এক জায়গায় উঠে সে একবার ওপরে তাকায় আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে চায়। সেখানে গিয়েই গুহাটি দেখতে পেলাম। আশ্চর্য, কুকুরটি সোজা নেমে চ'লে গেল।

ধীর পদবিক্ষেপে আগে-পিছে আমরা দুজন গুহার সম্মুখে এসে পড়লাম। পাহাড়ে উঠবার আগে, নীচে দূর থেকে তাঁকে সামনে দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু উঠে দেখলাম, তিনি সেখানে নেই, গুহার অভ্যন্তরে চলে গিয়েছেন। ঢুকে পড়া উচিত কিনা, এসব গবেষণা না করেই, আমরা দুজনেই বাইরে জুতো খুলে সোজা ভেতরে চলে গেলাম। সাধুর জন্যে দু'দুটো থলিতে যেসব খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করে দু'জনেই কাঁধে ঝুলিয়ে বয়ে এনেছিলাম, সেগুলো তাঁর সামনে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করি। আমাদের দিকে তিনি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সে চোখে কী ছিল? নির্লিপ্ত কৌতূহল, না অভীপ্সিত জিজ্ঞাসা? দুই চোখের কৃষ্ণতারকার মধ্যে যেন কী এক শীত, শান্ত, ভাস্বর দ্যুতি! মৌনীবাবা মুহূর্তের জন্য একবার আমাদের দুজনের ওপরে চোখ বুলিয়ে হাত তুলে বসতে বললেন।

একে একে আমার প্রশ্নগুলি তাঁর সামনে মেলে ধরি, তিনি কখনও মাথা নাড়েন—কখনও স্থির; কখনো বা মুখে হাসি ফুটে ওঠে। পাশেই শ্লেট পেন্সিল রাখা ছিল। তাতেই উত্তর লিখে দেন, আবার কখনও ইশারায় প্রশ্নের মীমাংসা করেন।

বুকের মধ্যে এক-একটি প্রশ্নের ঢেউ যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে। তাঁকে জিজ্ঞেস করি সেই অলৌকিক সঙ্গীত-শ্রবণের রহস্য। মৌনীবাবাও কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভেবে নিলেন, তারপর শ্লেটে লিখে দিলেন পরিষ্কার দেবনাগরী অক্ষরে—ঠিক শুনা হ্যায়, বহুৎ আচ্ছা, পরমাত্মা খুস্ হ্যায়।

দ্বিতীয়বার তাঁকে প্রশ্ন করি—

—কোন্ পথে গেলে তাঁকে ধরা যায়?

মৌনীবাবা লিখে দিলেন—সম্মার্গম্।

—সে তো সোজা কথা নয়। একটু বুঝিয়ে দিন—সেটা কি নিবৃত্তির পথে কিংবা প্রবৃত্তির—

মৌনীবাবা শ্লেটের এপিঠ ওপিঠ দেখিয়েছেন—যার অর্থ—

—একই লক্ষ্যের দুটো পথ।

কথা যেন আর শেষ হয় না। আবার বলি—

—প্রবৃত্তির পথেই তো সংশয়ের খেলা—সেটাকে কাটানো যায় কেমন করে?

মৌনীবাবার হাত শ্লেটের ওপর চলতে থাকে—

—প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত কামনাগুলিই মানুষের মনকে চঞ্চল করে আর সেই কারণেই সংশয় দেখা দেয়।

—সে তো গীতারও কথা— কিন্তু তাকে কেমন করে অতিক্রম করা যায়?

—তোমার সাধুমনের একাগ্রতায়— আর চাই তীব্র পুরুষকার।

—সেই পরম পুরুষ যা করান, তাই তো পুরুষকার।

মৌনীবাবা মাথা নেড়ে ইশারায় জবাব দিলেন—জরুর।

আমার পিছনে বসে নীরেন উস্‌খুস করছিল—কী যেন তারও জিজ্ঞাস্য আছে। কিন্তু মৌনীবাবা একটু অন্যমনস্ক হয়ে উঠলেন। বারে বারেই ওপরের দিকে হাত তোলেন, আর পেছন ফিরে তাকান—সেদিকে তখন আগুন জ্বলছে—বোধ হয় কোনও ক্রিয়াকর্ম আছে। কাজেই আমার অজস্র হিন্দীবাতের ছেদ টানতে হোলো। পকেট থেকে ফটোখানা বের করে তাঁর সামনে রেখেই বলি—এবারের মত এই শেষ দেখা—বুকের যে অসুখ আছে, আর বোধ হয় এদিকে আসা হবে না—সাধুকে বললাম—

—আমি কালই বদরীধাম ছেড়ে চলে যেতে চাই। মৌনীবাবা মাথা দুলিয়ে অসম্মতি জানালেন। তার পরই তিনটি আঙ্গুল দেখিয়ে তিনরাত্রি বাসের নির্দেশ দেন।

এর পরই তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান—সে ধ্যান ভাঙ্গাবার সাহস নেই। প্রণাম করেই বেরিয়ে আসি।

বাইরে এসেই নীরেনকে বলি—

—এসব স্থানে এলে মনে হয় যেন আপন ঘরেই ঘোরাফেরা করি— কোনও কিছুর পরোয়া থাকে না।

নীরেন সর্বদাই বাক্‌পটু, শুধু সাধুসন্ন্যাসীর সামনে গেলেই অবাক। দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেই অনুনয় করে—

ভগবান না করুন, এমন ইচ্ছে যদি কখনও হয় তোমার, আমাকে চেলা করে নেওয়া চাই কিন্তু। সে তো পরের কথা—এখন বেলা কটা, তার খেয়াল আছে কি? আচ্ছা ঝানু লোক তুমি, সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই আদা নুন খেয়ে লেগে থাক—কিছু আদায় না করে ছেড়ে দেবার পাত্র নও।

প্রত্যুত্তরে বলি—সে কথা অবিশ্যি বলতে পারো—যেখানে যা পাই ঝুলিতে তুলে রাখি। পথ-চলার সম্বল চাই তো।

—একবার কিন্তু তুমি এক সাধুকে দেখে সটান পাড়ি দিলে।

—সে কী? কোথায়?

—কলকাতার কাছেই—নামটা মনে নেই। এক নতন সাধু এসে জাঁকিয়ে বসেছেন শুনে, আমরা দুজনেই গিয়েছিলাম। দিব্যি আশ্রমখানা— সাধুর দরজার সামনে থেকেই তুমি ফিরে এলে—কিছুতেই ভেতরে ঢুকলে না।

—কেন, বল তো?

—আঃ তোমার মনে নেই? ঘরের ভেতরে পুরু গদীর ওপর সাধুজী অঙ্গনা পরিবৃত হয়ে অঙ্গসেবা নিচ্ছিলেন, আর আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন, দেখেই তুমি 'এবাউট্ টার্ণ'!

—ওঃ, সেই সাধুর কথা? আমার খাতায় ও'র নাম নেই। জান না? সতাং সকৃত সঙ্গীতমীপ্সিতং পরম্—

এবার নীরেন দোহাই দেয়—

—ওই অনুস্বর বিসর্গের কচ্‌কচি থামাও—পেটে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে কাব্যি ভাল লাগে না। জানোই তো স্কুলে সংস্কৃতের ক্লাশটাই ছিল আমার টিফিন পিরিয়ড্।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম—মনের ভার অনেকটা হাল্কা।

মৌনীবাবাকে অবহিত করার জন্যে রাষ্ট্রভাষায় আমার কসরত আর অজস্র লিঙ্গভুলের বহর দেখে নীরেন চমৎকৃত একটা টিপ্পনীও সে ছেড়ে দিলে—

—তোমাকে কোবিদ উপাধিটা এখনও দেয়নি কেন?

—তাদের দুর্ভাগ্য, আমার নয়।

নীরেন খুব চোস্ত হিন্দী জানে। আমার তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকায় মুশকিলে পড়ে যাই—বিশেষ এই হিন্দী ভাষাভাষীর স্বর্ণযুগে।

পথে পা' বাড়িয়েই নীরেন প্রশ্ন করে—মৌনী থাকার অর্থ কী?

—আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। কাশীর মৌনীবাবা—মহাশক্তিমান্ যোগী। তুমি তো দেখেছ তাঁকে—লালগোলাতেও আমার কাছে তিনি বহুবার এসেছেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় পুরীধামে—সে আজ সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা। সুন্দর একটি দৃশ্য চোখে পড়ল। অস্ত-গামী সূর্য ধীরে ধীরে যেন সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে যায়। সুদূর-প্রসারী অপলক দৃষ্টি মেলে তিনি নীল সাগরের দিকে তাকিয়েছিলেন—ছোট বড় ঢেউ-গুলি এসে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ে। আমার সঙ্গে ছিলেন সেই অগ্নিযুগের বারীন ঘোষ—তিনিই সেই শান্তোজ্জ্বল মহামৌনীকে চিনিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চাইলেন—মাথায় হাত দিলেন। মহামৌনী সাধুর চোখে যুগ-যুগান্তের আশ্বাসবাণী। রোজ সন্ধ্যায় বারীনদা তাঁর কাছে গিয়ে ঘণ্টা দুই ধ্যান করতেন। আমিও তাঁর কাছে যেতাম। কেন জানি না, সেইদিন থেকেই আমার ওপর তাঁর অহেতুকী করুণা। বেশ বুঝতে পারি, আমার জন্যে তাঁর অন্তরে একটা আকুলতা আছে।

নীরেন সায় দিয়ে বলে : সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। তোমার কাছেই শুনেছি তিনি সোঽহং মন্ত্রের উপাসক। পুরীতে তোমরা একসঙ্গে মন্দিরে যেতে—তিনি কিন্তু প্রণাম করতেন না—শুধু দারুব্রহ্ম মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতেন—

—সেই মৌনীবাবা যখন আমার সঙ্গে কামরূপ কামাখ্যা হয়ে শিলং গিয়েছিলেন তাঁর দেখাদেখি আমিও সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকতাম—কিন্তু দু'এক মাস চালিয়ে আর পারিনি। মৌনী মানে কী জানিস? আমার মনে হয়, মনকে অ-মন করে সেই অসীমের দিকে যাঁরা ছুটে যান—তাঁরাই মৌনী।

উৎরাই-পথে এক পা এগিয়েই নীরেন বলে—আমিও একবার চেষ্টা করে দেখব না কী?

আর কিছু বলার ফুরসত হ'ল না। হঠাৎ সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা কাতরোক্তি।

তাকে তুলে ধরেই জিজ্ঞেস করি—

—কী হ'ল? তোমারই পা এবার বিশ্বাসঘাতকতা করে কেন? তুমিই যে আসবার পথে এই সতর্ক বাণীটি আমার ওপরেই প্রয়োগ করেছিলে?

নীরেনের একটা মিহি সুর কানে আসে—

—দাঁত ভেঙ্গে গেল যে!

—বিষদাঁতটা ভেঙ্গেছে তো?

—হ্যাঁ সেইটিই; কিছুদিন যাবৎ স্থানচ্যুত হয়ে বড় বিষময় হয়ে উঠেছিল।

নীরেনের সাধুভাষায় পরম প্রীত হলাম। স্থানচ্যুত ভায়াকে স্বস্থানে দাঁড় করিয়ে বলি—

—যাক, আমিও বাঁচলাম।

—কিন্তু আমি বাঁচিনি।

—কেন?

—আমার যতগুলি দাঁত ভেঙ্গেছে, সবই ইঁদুরের গর্তে দিয়েছি—এখানে পাই কোথায়?

—সে আক্ষেপে লাভ কী? বদরী-নাথে এসেও ইঁদুরের গর্ত খুঁজে বেড়ানোটা কি ভাল দেখায়? তুমি কি মনে কর এই বরফপড়া পাহাড়ে উঠে তারা তোমার দন্তের প্রতীক্ষায় থাল খুঁড়ে বসে আছে? তার চেয়ে, বরং আয়রণ-চেস্টে রেখে দাও—এখানে তো সেটা সঙ্গে আনোনি—তোমার ভোরঙ্গেই সযত্নে তুলে রাখো। ঘরে ফিরে যথাস্থানে ওটার সদ্গতি করবে—তাহলেই আর-জন্মে তোমার ইঁদুরের মত বেশ সাজানো ছোট ছোট দাঁত হবে, কেমন? এখানে এসেও এইসব কুসংস্কার!

(ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

॥ স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ও কাচ-কন্যা ॥

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার পড়েছে : "কাচ-কন্যার সংগে সাক্ষাৎ করুন। সাক্ষাতের স্থান—জার্মান গণ-তান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ড্রেসডেন স্বাস্থ্য প্রদর্শশালা আয়োজিত স্বাস্থ্য প্রদর্শনী।" কাচ-কন্যার কথা এতদিন আমরা শুনে এসেছি, এই প্রথম চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হল। এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, কাচ-কন্যাকে দেখা এবং কাচ-কন্যার কথা শুনতে পাওয়া সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা।

অবয়বটি অবশ্যই কাচের এবং তার ফলে স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছতা শরীরের ভেতর-কার সমস্ত অংগপ্রত্যংগ স্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, কাচ-কন্যা নিজেই নিজের শরীরের অংগপ্রত্যংগের ব্যাখ্যা শোনায়। তার ব্যাখ্যার সংগে এক-একটি বিশেষ অংশে আলো জ্বলে উঠে ব্যাখ্যাকৃত প্রত্যঙ্গটিকে আলোকিত করে। দৃশ্যটি সত্যিই অপরূপ।

প্রায় ছ-ফুট লম্বা কাচ-কন্যাটি মস্ত একটি ডায়াসের ওপরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে আর সংগে সংগে শুরু হয় ব্যাখ্যা। প্রথমে সে বলে মস্তিষ্কের কথা (বলবার সময়ে তার মস্তিষ্কটি অবশ্যই আলোকিত হয়ে থাকে), যে মস্তিষ্ক মানবদেহের সব থেকে উন্নত প্রত্যংগ। তারপরে আলো আরো নিচে নেমে আসে আর তখন শোনা যায় কাচ-কন্যা ল্যারিংক্স্ বা স্বর-যন্ত্রের কথা বলছে। এই ল্যারিংক্স্ বা স্বর-যন্ত্র গঠিত হয়েছে কয়েক খণ্ড তরুণাস্থি দিয়ে, পেশীর সাহায্যে যাদের পরস্পরের প্রতি সঞ্চালিত করা যায় এবং যার ফলে ভোকাল কর্ড বা স্বরতন্ত্রী সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। স্বরযন্ত্রের মধ্যে বাতাস প্রবিষ্ট করালে স্বরতন্ত্রী ও বাতাস দুই-ই কম্পিত হয়ে সৃষ্টি করে শব্দ। খাদ্য গলাধঃকরণ করার সময়ে এপ্নি-গ্লটিস বা উপজিহ্বাটি স্বরযন্ত্রকে রুদ্ধ করে এবং খাদ্যকে শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

তারপরে থাইরয়েড গ্রন্থি। এই গ্রন্থিটির অবস্থিতি স্বরযন্ত্রের পিছনে, শ্বাসনালীর সামনে। থাইরয়েড খাদ্য থেকে আয়োডিন সঞ্চয় করে তাকে রূপান্তরিত করে একটি বিশেষ হর-মোনে, যার নাম থাইরক্সিন। এই হরমোনটি জীবদেহের মেটাবলিজম বা বিপাককে উদ্দীপিত করে।

তারপরে ফুসফুস। কাচ-কন্যার আলোকিত অংশের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, বক্ষ-গহ্বরের অধিকাংশ স্থানই জুড়ে আছে এই ফুসফুস দুটি। ফুস-ফুসের কাজ হচ্ছে নিশ্বাসের সংগে নেওয়া বাতাসের অক্সিজেনকে রক্তে সঞ্চারিত করা, যে রক্ত অতি সূক্ষ্ম রক্তবহ নালীর মধ্যে দিয়ে ফুসফুসের বায়ুকোষগুলির চারপাশে সংবাহিত হচ্ছে। অন্যদিকে, পরিপাক ক্রিয়ার ফলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় তা রক্ত থেকে চলে যায় প্রশ্বাসে এবং শ্বাস-ত্যাগের সময়ে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সংপৃক্ত রক্ত গিয়ে পৌঁছয় হৃৎপিণ্ডে এবং সেখান থেকে শরীরের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগে।

ফুসফুসের পরে কাচ-কন্যার মুখ থেকে শোনা যায় হৃৎপিণ্ডের কথা। মানুষের শরীরের এই সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ প্রত্যংগটির অবস্থান বক্ষাস্থির পিছনে, বক্ষের বাঁ দিকে। একটি প্রাচীর বা সেপ্টাম হৃৎপিণ্ডকে দুই অর্ধে ভাগ করেছে। বাঁ দিক থেকে ফুসফুস থেকে আসা অক্সিজেনসংপৃক্ত রক্ত সারা শরীরে সঞ্চারিত হয়। আর ডান দিকে এসে পৌঁছয় সারা শরীরের কার্বন ডাই-অক্সাইড-পূর্ণ রক্ত, যা আবার প্রেরিত হয় ফুসফুসে।

তারপর প্লীহা বা স্প্লীন। উদর-গহ্বরের বাঁ দিকে, পাকস্থলীর পিছনে, বক্ষ ও উদর-গহ্বরকে বিভক্তকারী মধ্য-চ্ছদার ঠিক নিচে এই প্রত্যংগটির অব-স্থান। কাচ-কন্যার মুখ থেকে শোনা যায়, "এই প্রত্যংগটি রক্তকে বিষবিমুক্ত করে এবং ব্যাধিসৃষ্টিকারী পদার্থগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। তাছাড়া প্লীহা ব্যবহৃত লোহিত কণিকাকে বিযোজিত করে এবং তার ফলে বিমুক্ত প্লীহাতেই সঞ্চিত হয়ে নতুন রক্ত-কণিকা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।"

প্লীহার পরে অবশ্যই পাকস্থলী। এই পাকস্থলীটি আসলে একটি পেশী-গঠিত টিউব যাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত করা যায়। পাকস্থলীর গায়ে আছে অসংখ্য গ্রন্থী। এইসব গ্রন্থী থেকে পেপ্সিন ক্ষরিত হয়, যার সাহায্যে প্রোটিনের পাচন-ক্রিয়া চলে। এই পেপ-সিন খাদ্যের বীজাণুকেও ধ্বংস করে। পরবর্তী পর্যায়ে পাকস্থলীর খাদ্যমণ্ড পাইলোরাসের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে ডিওডিনামে, যার মধ্যে আছে দুটি বড়ো বড়ো পাচন-গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রস।

তারপরে অগ্ন্যাশয় বা প্যান্‌ক্রিয়াস। এই প্রত্যংগটিকে দেখা যায় পিছন থেকে। কাচ-কন্যা বলে, "অগ্ন্যাশয় দুই ধরনের রস ক্ষরণ করে। একটি হল পাচক রস যা পিত্তের মতোই প্রবাহিত হয় ডিও-ডিনামের মধ্যে, আর একটি হল ইন্-সুলিন নামক এক হরমোন যা অগ্ন্যা-শয়ের কোষ-দ্বীপ থেকে সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে শর্করার মেটাবলিজম্ বা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।"

অগ্ন্যাশয়ের পরে যকৃত বা লিভার। এই প্রত্যংগটির অবস্থান উদরের ডান-দিকে, মধ্যচ্ছদার নিচে। যকৃত যেন একটি ল্যাবরেটরি। অন্ত্রের রক্তবহ নালী মারফত পরিবাহিত খাদ্য যকৃতে এসে বিভিন্ন জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যে অতিরিক্ত গ্লুকোজ পেশীর সঞ্চিত জ্বালানি হিসেবে কাজ করে, সেই গ্লুকোজকে যকৃতে পাওয়া যায় গ্লাইকোজেন হিসেবে। তাছাড়া যকৃত রক্তকে দূষিত পদার্থ থেকে মুক্ত করে এবং পিত্ত উৎপন্ন করে।

কাচ-কন্যা বলে, "পিত্ত সঞ্চিত থাকে পিত্তাশয়ে—যকৃতের ঠিক নিচে। খাদ্যের সংগে গৃহীত স্নেহজাতীয় পদার্থকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহবিন্দুতে বিশ্লিষ্ট করে পিত্ত পাচনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। পিত্তাশয় থেকে পিত্ত পিত্তনালী বা ডাক্ট্ মারফত প্রয়োজন মতো ডিও-

ডিনামের মধ্যে প্রবাহিত হয়। দৈনিক পিত্ত-ক্ষরণ হয় প্রায় এক লিটার।"

তারপরে আলোকিত হয়ে ওঠে ক্ষুদ্রান্ত্র। এই প্রত্যঙ্গটি ৫ থেকে ৭ মিটার দীর্ঘ। কাচ-কন্যার ব্যাখ্যা শোনা যায়, "ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে খাদ্য পরিচালিত হয় অন্ত্রের পেশীগুলির অস্থির সংকোচনের দ্বারা। অন্ত্রের গায়ে যে অসংখ্য কোরক আছে, তারা এখন সম্পূর্ণ পচিত ও অন্ত্র-রস দ্বারা বিযোজিত খাদ্যকণা অবশোষণ করে নেয়। স্নেহকণাগুলি চলে যায় লসিকা প্রণালী মারফত, আর প্রোটিন ও শর্করা যায় রক্তবহ নালী বেয়ে। এই লসিকা ও রক্তবহ নালীগুলি সারা অন্ত্র জুড়ে সৃষ্টি করে এক সূক্ষ্ম ও ঘন জালিকা।"

কাচ-কন্যার মুখের ভাষাতেই পরবর্তী অংশগুলির ব্যাখ্যা শোনা যাক। মনে রাখা দরকার যে ব্যাখ্যা চলার সময়ে সারাক্ষণই কাচ-কন্যা আস্তে আস্তে ঘুরে চলে। তার হাত দুটি অনেকটা নাচের ভঙ্গির মতো ওপরের দিকে তোলা, শরীরটি ঋজু, মুখাবয়ব কাঠিন্যমণ্ডিত।

কাচ-কন্যা বলে চলে, "সীকাম হচ্ছে বৃহদন্ত্রের রুদ্ধ প্রান্ত যা বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্তের সংযোগ-স্থল থেকে উদ্গত। সীকামের একটি সংলগ্ন অংশ আছে যার দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার। এটির নাম অ্যাপেনডিক্‌স্‌, যা অ্যাপেন্‌ডিসাইটিসের উৎস। সবুজ জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত সেলুলোজ সীকামের মধ্যে বীজাণুর দ্বারা পাচন ও গাঁজন প্রক্রিয়ায় বিযোজিত হয়ে থাকে।"

তারপরে কোলন।

"কোলনের মধ্যে অন্তঃস্থিত খাদ্য-মণ্ড জলবিমুক্ত হয়ে যায়। দেহের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কোনো পদার্থ যদি তখনো অবশিষ্ট থাকে, বৃহদন্ত্রের বীজাণুরা তার বিযোজন ঘটায়। অন্ত্রগাত্রের শ্লেষ্মা-গ্রন্থি ইতিমধ্যে ঘনীভূত মল-কে শ্লেষ্মাবৃত করে। গ্রন্থিগুলির সাহায্যে বৃহদন্ত্র শ্লেষ্মা ছাড়াও পরিপাক-ক্রিয়া প্রসূত আরও অনেক ত্যাজ্য বস্তু নিঃসরণ করে থাকে।"

তারপরে বৃক্ক বা কিড্‌নি।

"উদর-গহ্বরের বাহিরে, মেরুদণ্ডের কটিদেশাংশের দক্ষিণে ও বামে আছে বৃক্ক। বৃক্কের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন ১০০০ লিটার রক্ত প্রবাহিত হয়। অতিরিক্ত জল এবং পরিপাক-ক্রিয়া প্রসূত ক্ষতিকারক পদার্থগুলি—যেমন ইউরিয়া বৃক্কের মধ্যে রক্ত থেকে পৃথক হয়ে পরিণত হয় মূত্রে। মূত্র প্রথমে জমা হয় বৃক্কের পেল্‌ভিসে এবং সেখান থেকে গবিনি বা ইউরেটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় মূত্রাশয়ে।"

তারপরে মূত্রাশয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার পরে শোনা যায় ওভারির কথা। স্ত্রী-দেহে ওভারি আছে একজোড়া। "একজন স্ত্রীলোকের জীবদ্দশায় চার লক্ষ ফলিক্‌ল্‌-এর মধ্যে পরিপক্ব হয় প্রায় পাঁচশ'টি। প্রায় আঠাশ দিন অন্তর একটি ওভাম বিমুক্ত হয়ে থাকে। নিষিক্ত হলে এই ওভাম থেকে সৃষ্টি হয় এক নতুন মানুষ। ওভামটি জরায়ুতে পৌঁছয় সূক্ষ্ম রোঁয়া বা সিলিয়া বিশিষ্ট ফ্যালোপিয়ান টিউব মারফত।"

জরায়ু সম্পর্কে কাচ-কন্যা বলে, "জরায়ু একটি শূন্যগর্ভ, পেশীগঠিত প্রত্যঙ্গ, যার দেহগাত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লীতে আছে প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থি। জরায়ু নিষিক্ত ওভামকে গ্রহণ করে এবং বর্ধমান ভ্রূণকে নয় মাস ধরে পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে যথোচিতভাবে রক্ষা করে।"

কাচ-কন্যার মুখের কথা আমি বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করলাম। যে-কোনো পাঠক বুঝতে পারছেন, ব্যাখ্যাগুলি প্রায় পাঠ্যবইয়ের লেখার মতোই নীরস। শুধু পড়লে বা শুধু শুনলে কোনো পাঠক বা শ্রোতাকেই এই ব্যাখ্যা আকর্ষণ করবে না। কিন্তু কাচ-কন্যার শরীরের ভেতরকার পর-পর আলোকিত প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে এই ব্যাখ্যা যখন শুনেছি তখন তন্ময় হয়ে শুনতে হয়েছে। এই লেখাটি যেদিন প্রকাশিত হবে তারপরেও আরো পাঁচদিন প্রদর্শনীটি সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত আছে। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব, সময় করে অতি অবশ্যই এই প্রদর্শনীটি একবার দেখে আসবেন।

আর শুধু কাচ-কন্যাই নয় অন্য আকর্ষণও আছে। প্রায় সত্তরটি ছবি ও চার্টের সাহায্যে মানুষের শরীর-বৃত্তান্ত অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। তা-ছাড়াও আছে অজস্র মডেল ও সত্যিকারের নিদর্শন। এই সমস্ত ছবি, চার্ট, মডেল ও নিদর্শনকে বাংলা ও ইংরেজি ব্যাখ্যা সমেত এমন পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ দর্শকও কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষয়বস্তুর গভীরে আকর্ষিত হবেন।

প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়েছে কলকাতার মুস্লিম ইন্‌স্টিটিউট হলে। আগামী ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রদর্শনীটি দেখা যেতে পারে।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের কাছে শোনা গেল, কাচ-কন্যা কলকাতা থেকে যাবে দিল্লীর শিল্প-মেলায়। প্রদর্শনীর অন্যান্য সমস্ত দ্রষ্টব্য বস্তু ও উপকরণ স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠানকে দান করা হবে। আর, এমন সম্ভাবনাও আছে যে, দিল্লীর শিল্প-মেলার পরে কাচ-কন্যা আবার কলকাতাতেই ফিরে আসবে এবং যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে তাহলে স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হবে।

ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির বাংলা শাখার সভাপতি ডাঃ এইচ, কে; রায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। কলকাতার আরও অনেক কৃতী চিকিৎসক উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁদের কাছে একটি প্রস্তাব নিবেদন করতে চাই। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই স্থায়ী স্বাস্থ্য প্রদর্শশালা আছে। এর প্রয়োজন আমাদের দেশেও অস্বীকৃত নয়। কলকাতাতেও এই সুযোগে একটি স্থায়ী স্বাস্থ্য প্রদর্শশালা গড়ে তোলা যায় কিনা তা বোধহয় ভেবে দেখা যেতে পারে। কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা চলে, "দি সায়েন্স অফ হেল্‌থ্‌ মাস্ট স্প্রেড অ্যামংগস্ট অল্‌।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি প্রদর্শনীতে বড়ো বড়ো হরফে লেখা রয়েছে। আমরাও নিশ্চয়ই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটিকে যথোচিত মর্যাদা দেবার চেষ্টা করতে পারি।
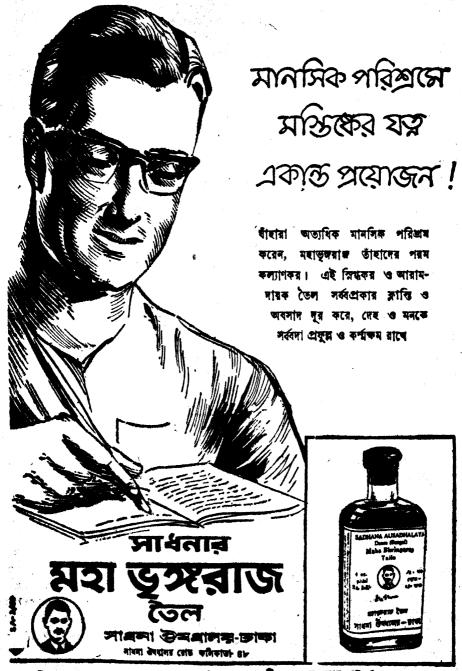
মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরামদায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
SADHANA AUSADHALAYA
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা ৪৮

অকলঙ্ক

রানু ভৌমিক

শান্ত হেমন্ত সন্ধ্যা নেমে এসেছে ধূসর আঁচল বিছিয়ে। আকাশের কোথাও নেই ডুবে-যাওয়া সূর্যের এতটুকু রাঙা আলো—এতটুকু উত্তাপ।

একটু পরেই অন্ধকার নেমে এল। তারপরেই পূব আকাশে দেখা যায় এক-ফালি চাঁদ। রূপালী শীতল জ্যোৎস্নায় দূরপ্রান্তের গ্রামগুলিকে দেখায় যেন অতিকায় আদিম জীব। এতদূরের গ্রামের ঘর দেখা যায় না—অনুভব করা যায় না গৃহবাসীদের হৃদয়স্পন্দন। শুধু প্রকাণ্ড নানা জাতের সবুজ গাছগুলি জ্যোৎস্নার আলোতে আর দূরত্বের পরি-প্রেক্ষিতে এক হয়ে মিশে কি যেন এক-একটি অদ্ভুত জন্তুর মত দাঁড়িয়ে আছে।

শূন্য মাঠে সদ্যকাটা ধানের মিষ্ট গন্ধ। চাঁদের আলোতে মাঠগুলিকে দেখাচ্ছে—দুধের নদীর মত। দুধারে দুধের নদী—মাঝখানে সবুজ দাগ। সেই দাগের শেষপ্রান্তে হঠাৎ দেখা যায় একটি কালো বিন্দু।

উঠোনের কোণের কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসে সবিতা দেখতে পায় অনেক দূর থেকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে সেই বিন্দু—এগিয়ে আসছে—আরও এগিয়ে—বিন্দু পরিণত হয় রেখায়—

অনেকক্ষণ থেকেই চুপ করে বসেছিল সবিতা। দুচোখ মেলে তাকিয়েই ছিল—কিন্তু তবুও যেন কিছুই দেখছিল না। কখন ধীরে ধীরে শেষরশ্মি মিলিয়ে গেছে সূর্যের—ওর ছোট-কাকীমা তুলসীতলায় প্রদীপ জেবলে দিয়েছেন—সে প্রদীপও নিভে গেছে—শূন্য আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠেছে তারায় তারায়—এ সব কিছুই সে দেখছিল না।

সে শুধু ভাবছিল, আকাশের অসীম শূন্যতা আর সদ্যরিক্ত ধরণীর অপূরণীয় অসীম বেদনার কথা। কোটি কোটি তারা পূর্ণ করতে পারে না—নিবিড় নীল শূন্যতা। মানবের শ্রমের মূল্য মিটিয়ে আবার শূন্যবক্ষে হাহাকার করতে থাকে ধরণী।

পুষ্পহীন বৃক্ষের নীচে একা সবিতা। দূরে ঐ বিন্দু...বিন্দু...রেখা...মানব। দূর থেকে যা ছিল অবয়বহীন—অপরিচিত—কাছে আসতেই তা হয়ে ওঠে একান্ত আপনার।

সবিতার পাশেই বসে সুহাস। আহবান জানায় না সবিতা, আহবানের অপেক্ষাও করে না সে।

—চাঁদকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কত সমস্যা ওর—তাই এত আস্তে আস্তে যাচ্ছে ও—সুহাসের হঠাৎ-বলা কথায় চমকে ওঠে সবিতা। কিন্তু তখনই সামলে নেয়।

—চাঁদের সমস্যা এখনই মিটিয়ে দিতে পারি। কালো গম্ভীর দৃষ্টি মেলে ও বলে।

—কি করে?

—বিয়ে না করে।

—বিয়ে...না...করে..., অসংলগ্নভাবে কথাগুলি প্রতিধ্বনিত করে সুহাস।

পরক্ষণেই বাঁকা চোখে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে, কার সমস্যার সমাধান করছ তুমি?

—তোমার?

—তবে চাঁদের নাম দিয়ে কেন বলছ?

—তোমার চোখ যেমন চাঁদকে দেখছে।

সুহাস ভ্রূকুঁচকে চুপ করে থাকে। সবিতা বলে, এই মুহূর্তে আমি দেখছি চাঁদ একটা সব-হারানো সব-খোয়ানো মেঘে রিক্ত সর্বহারা রক্তহীন তার দেহ, নিষ্প্রাণ তার প্রাণ—তবুও তাকে চলতে হবে। তাই সে চলে—ধীরে, ধীরে, নীরবে পাণ্ডুর পদক্ষেপে......

থামো, চীৎকার করে সুহাস। একটু থেমে ধীরে ধীরে আবার বলে, কেন এত উতলা হচ্ছ? কেন অস্থির করে তুলছ আমাকে? কেন এত ভাবছ?

—ভাবছি ম্লান হাসে সবিতা, সত্যই অনেক ভেবেছি। কিন্তু, আর ভাবব না। সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি এবারে।

—কি?

—বিয়ে করব না আমরা।

—অসম্ভব। এত দূরে এগিয়ে এসে এখন ফেরা অসম্ভব।

এতক্ষণ সবিতা তাকিয়েছিল সুহাসের দিকে। এবারে মুখ ফিরিয়ে নেয়। খোলা চুলের রাশি ঢেকে দেয় ওকে—যেন একটি কালো পর্দা।

'এতদূরে এগিয়ে এসে!' দাঁতে দাঁত চেপে ভাবে সবিতা এগিয়ে এসে—কোথায় এগিয়ে এসেছি আমরা—কতদূরে। সময়ের সংগে চোখ বুজে এগিয়ে গেলেই কি এগুনো হয়?

মনে আছে কয়েক মাস আগে সুহাসের প্রস্তাবে বাধা দিয়ে বলেছিল সবিতা, বিয়ে করতে পারব না আমরা।

—কেন? বেদনা ও বিস্ময় সুহাসের কণ্ঠে।

কেন? অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল সবিতা, তারপরে, নিজের জীবনে সবচেয়ে গোপন কথা নিজমুখে বলেছিল ওকে। চোখ জলে ভরে উঠেছিল তার। সমস্ত শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। বলেছিল, বিয়ে করতে পারব না আমরা। ভুল বুঝো না সুহাস। দূরে সরে যাব আমি।

এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত সবিতার কাহিনী শুনে যাচ্ছিল সুহাস। এবারে উঠে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সবিতার হাত। বলিষ্ঠ দুঃসাহসী সেই গ্রহণ।

সেদিন ছিল বসন্ত ঋতু। হলদে, লাল, নীল ফুলে বিচিত্র বর্ণে গন্ধে সেজেছিল পৃথিবী। তারপরে কতদিন কেটে গেছে। হারিয়ে গেছে বসন্তের সেই দিনগুলি। ফাল্গুনে যা সত্য ছিল আজ তা মিথ্যে। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত.. আজ হেমন্তের শেষবেলায় শীতের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে সেই সুহাস বলে, এতদূর এগিয়ে এসে ফেরা অসম্ভব।

শুধু গলার জোরে প্রচার করতে চায় নিজের আবেগ। হৃদয় থেকে বিতাড়িত হয়ে আবেগ কি ঠেকেছে শুধু কণ্ঠে। অরূপ অপরূপ প্রেম পর্যবসিত হয়েছে শুষ্ক কঠিন কর্তব্যবোধে।

কালো দীর্ঘ চুল দুলে ওঠে সবিতার। বলে, এগিয়ে এসেছি বলেই তো আজ বুঝতে পারলাম ফিরতে হবে।—

জীবন্ত একরাশি কালো চুলের দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে থাকে সুহাস। তার সামনে দিয়েই চলে যাচ্ছে কিন্তু সবিতাকে দেখতে পাচ্ছে না সে। যেদিকে তাকায় সেদিকেই শুধু নিবিড় কালো চুল—কুয়াশার আবরণে ঢাকা পৃথিবী।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। কালো মেঘে চাঁদ ঢেকে গেছে। তারপরে, সুহাস একটি কথাও না বলে ধীরে ধীরে উঠে যায়। দূরে সবুজ পথে একটি রেখা—বিন্দু—

রাত তখন এগারোটা। সবিতা চুপ করেই বসেছিল। হঠাৎ ভারী গলায় নিজের নাম শুনে চমকে ওঠে; পরক্ষণেই চিনতে পেরে সহজ কণ্ঠে বলে, কে? শঙ্করদা।

—হ্যাঁ, আমি। শঙ্কর সামনে এসে দাঁড়ায়, চুপ করে বসে কি ভাবছ?

—কিছু ভাবছি না। চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি। ও একটা অভাগিনী মেয়ে—যার গায়ে মা কলঙ্ক লেপে দিয়েছে।

খুব জোরে হেসে ওঠে শঙ্কর। বলে, চাঁদের কলঙ্ক তো মানুষের চোখে। আর দূরে থেকে দেখি বলেই চাঁদে কলঙ্ক দেখি—কাছে গেলে দেখব সবই মিথ্যে।

—না, মা শঙ্করদা। কাছে গিয়ে এমন কি ভালবেসেও লোকে চাঁদে কলঙ্ক দেখে।

—থাকলেই বা ক্ষতি কি? শঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, চাঁদে শুধু কলঙ্ক নেই অমৃতও আছে। অমৃতের জন্য কি কলঙ্ক সহ্য করা যায় না?

পরদিন সবিতা একটা চিঠি পেল। শঙ্কর লিখেছে, যে কথাগুলি আজ আমি তোমাকে লিখতে যাচ্ছি—তা আমি মুখেও বলতে পারতাম। কিন্তু আমার বক্তব্য যাতে বর্তমান ছেড়ে ভবিষ্যতেও কাজ দেয় সেজন্যই এই লিখিত দলিল।

তোমাকে আজ কতগুলি কথা বলছি। আমি তোমার চেয়ে দশ বছরের বড়—তাই তোমার বিষয়ে তোমার চেয়েও বেশী জানি।

তোমার মা—তাঁকে আমি কাকীমা বলতাম—খুব অল্প বয়সে বিধবা হন। তাঁর বাপের বাড়ীতে বিশেষ কেউ ছিলেন না—কাজেই অসহায় অবস্থায় তাঁকে শ্বশুরবাড়ীতেই থাকতে হয়। দিনের পর দিন যে অসহ্য কষ্ট তিনি সহ্য করেছেন—তার সাক্ষী ছিলাম আমি—দশ বছরের একটি ছেলে।

এই ভাবেই উনি কাটিয়েছিলেন চার বছর। তারপরে ও'রই এক দূরসম্পর্কের দেওর এভাবে ওর পেছনে লাগলেন যে, ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল।

আমি-ই ও'কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম স্টেশনে। সেদিন চাঁদের আলোতে ও'র অশ্রুধৌত মুখ দেখেছিলাম—সে মুখ পরম পবিত্র।

তোমাকে উনি এখানেই রেখে গিয়েছিলেন। উনি জানতেন, বাড়ী থেকে বেরুবার সংগে সংগেই উনি ত্যাজ্য হলেন—তুমিও যাতে তা না হও সেজন্যই উনি তোমাকে ছেড়ে যান। মায়ের পক্ষে এযে কত বড় ত্যাগ—তা তুমি যেদিন মা হবে সেদিনই বুঝতে পারবে। আমি বুঝেছিলাম ও'র অজস্র চোখের জলে।

উনি বলেছিলেন, সবিতাকে দেখিস। সে কথা রাখতে চেষ্টা করেছি, কাল তোমাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখেই বুঝেছিলাম সুহাসের সংগে তোমার কিছু-একটা হয়েছে। আজ সকালে ওর সংগে গিয়ে কথা বলেছি—ওকে দ্বিধামুক্ত করেছি।

সবিতা, তোমার মা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কোন খোঁজ আমরা জানি না—একথা সত্য—কিন্তু এটা এমন কি অপরাধ? এর কিছু-দিন পরেই তো মুখুজ্জেদের বাড়ীর ছোটবৌ কাশীতে গিয়ে থাকেন। তিনি

যদি সমাজের চোখে অপরাধিনী না হন তবে কাকীমাই বা কেন হবেন? সামান্য একটু ঠিকানার গণ্ডী কি মানুষকে আটকে রাখতে পারে? আর যদি কাকীমা অপরাধিনী হয়েই থাকেন—যাতে সে অপরাধের ছায়া তোমাকে স্পর্শ না করে সেজন্যই তো তিনি তোমাকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এখানে রেখে গিয়েছেন—তাঁর সেই কষ্ট ব্যর্থ হতে দিও না—মায়ের ওপর অভিমান রেখো না—সুখী হয়ো—

সুহাস আজ সন্ধ্যের সময় তোমার কাছে আসবে। ইতি শঙ্কর

শঙ্করদা নয় শঙ্কর। আলো-হাওয়ার মত যে লোকটি অত্যন্ত সহজে তার জীবনে মিশে গিয়েছিল সে যেন এক মুহূর্তে আলাদা হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

পাশাপাশি ওদের বাড়ী। সবিতাদের বাড়ীটা বড়—বাড়ীতে অনেক লোক। শঙ্করদের ছোট বাড়ী—ওরা শুধু দুজন—মা ও ছেলে। তকতকে, ঝকঝকে, শান্ত পবিত্র ঐ বাড়ীটা ছেলেবেলা থেকেই খুব ভাল লাগত সবিতার। নিজেদের বাড়ীতে মায়ের সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য হত তা থেকে নিজের কান বাঁচাবার জন্যও আরও ছুটে ছুটে যেত ও-বাড়ীতে। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত ওর যখন যা প্রয়োজন হয়েছে শঙ্কর মিটিয়েছে।

শঙ্করের বাবা যখন মারা যান তখন সে খুবই ছোট। স্কুলের গণ্ডী সবে ছাড়িয়েছে। মায়ের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও শঙ্কর আর পড়েনি। বলেছিল, ভবিষ্যতে আমি যখন চাকরি করব না—নিজের যা জমি আছে তাই চাষ করেই খাব, তখন বেশী পড়াশুনা করে সময় নষ্ট করবার কি প্রয়োজন? খানিকটা শিখলাম—যাতে কেউ ঠকিয়ে না নিতে পারে—

চাষী-ই হয়েছে শঙ্কর। অন্যান্য চাষীদের সংগে নিজে হাতে জমি চাষ করে।

সুহাস শঙ্করের আত্মীয়। কিন্তু, সুহাসের সংগে শঙ্করের অনেক তফাত। সুহাসের বাবা শহরে চাকরি করতেন—হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়াতে পুঁজি যা জমানো ছিল তাই দিয়ে এখানে বাড়ী করেছেন ও চাষের জমি কিনেছেন। সুহাসও চাকরি খুঁজছে। ও বলে, আমার দেহটা শুধু এখানে পড়ে আছে—মন রয়েছে সেই শহরে। সবিতার চোখের সামনেও শহরের অপরূপ ছবি এঁকে-ছিল সুহাস। স্বপ্ন দেখেছিল সবিতা...

সেই স্বপ্নই সত্য হতে যাচ্ছে—সুহাস আজ সন্ধ্যের সময় আসবে। অন্য-দিনের থেকে আজকের এই আগমন সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ দ্বিধামুক্ত হয়ে তাকে গ্রহণ করতে আসবে সুহাস। কিন্তু—

কিন্তু, স্বেচ্ছায় কি? শঙ্কর লিখেছে, আমি তাকে বুঝিয়েছি। আর, শঙ্কর যাকে যা বোঝায় সে তা করতে বাধ্য।

বাধ্য। শিউরে ওঠে সবিতা। শেষটা সুহাস তাকে গ্রহণ করবে ভালোবাসায় নয় ভয়ে।

উঠে দাঁড়ায় সবিতা। ধীরে ধীরে চলতে থাকে। শঙ্করের সমানে দাঁড়িয়ে ওর চমক ভাঙে।

—এস। ওকে আহ্বান জানায় শঙ্কর।

—হ্যাঁ, এসেছি। সবিতা উত্তর দেয়, আর যাব না।

শঙ্কর অবাক হয়ে তাকায়।

—আমি তার কাছেই থাকতে চাই, সবিতা বলে, যে অমৃতের জন্য কলঙ্ক সহ্য করতে পারে।

হ্যাঁ, এসেছি.........আর যাব না

শঙ্করের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই ম্লান কণ্ঠে বলে, আমি যে গরীব।

—অমৃতের জন্য কলঙ্ক সহ্য করা যায়, দারিদ্র্য সহ্য করা যায় না? হাসে সবিতা।

কতদিন পরে সে হাসল।

প্রদর্শনী

কলারসিক

কয়েকটি প্রদর্শনী

॥ চিত্রা দত্ত ॥

শ্রীমতী চিত্রা দত্তের একক প্রদর্শনী ২৪, পার্ক ম্যানসনে গত ৯ই সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ১৬ই সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন আলিআঁস ফ্রাঁসেজ নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল শ্রীমতী দত্তের ২৪টি চিত্র।

শ্রীমতী চিত্রা দত্ত তরুণ শিল্পী। ইতিপূর্বে এ'কে আমরা শিল্পী দিলীপ দাশগুপ্তের 'স্টুডিও গ্রুপে'-র সদস্যরূপে দেখেছি। সম্প্রতি ইনি এককভাবেই চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে চলেছেন। শ্রীমতী দত্ত তাঁর শিল্পীজীবনের ক্রমঃপরিণতির দিকে যে অগ্রসর হচ্ছেন এই প্রদর্শনী দেখে তা উপলব্ধি করা যায়। শিল্পীদের নারী-পুরুষ রূপে ভাগ করার হয়তো কোনো অর্থ হয় না, তবু বলছি, বাংলার মহিলা-শিল্পীদের মধ্যে ইনি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য শিল্পীর স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন। এবং সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এ'কে আধুনিক তরুণ শিল্পীদের অন্যতম সহযাত্রীরূপে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়।

আলোচ্য প্রদর্শনীর ১৪খানি চিত্রের মাধ্যম তেল-রং এবং ১০খানি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে প্যাস্টেলে। এবার জল-রঙের কোনো চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়নি কেন তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। শ্রীমতী দত্তের তেল-রঙের কাজের মধ্যে প্রতিকৃতি-চিত্র, নিঃসর্গ-চিত্র এবং দুটি ফুলের স্টাডি স্থান পেয়েছে। প্যাস্টেলের কাজের মধ্যে শিল্পী নারী-মূর্তির বিভিন্ন ভঙ্গীমার চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। অবশ্য 'টুনটুন' (১৭নং), 'জ্যাক' (১৮নং) ও 'মাধব' (২০নং) চিত্র তিনটি প্যাস্টেলে বিধৃত পুরুষ-প্রতিকৃতি।

উপরের এই হিসাব থেকে আমরা অনুমান করতে পারি শ্রীমতী দত্ত মুখ্যতঃ মানুষের দেহ-লাবণ্য নিয়েই শিল্পের জগতে বিচরণ করতে উৎসুক। আর এ-কাজে যে তিনি দক্ষতার সঙ্গেই উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন তা তাঁর তেল-রং অঙ্কিত 'পেনসিভ' (২নং), 'রেস্টিং' (৫নং), 'হামিদ' (১১নং) এবং প্যাস্টেলে অঙ্কিত 'ব্লাক কামিজ' (১৪নং), 'ওয়াশিং' (১৫নং), 'রিপোজ' (১৯নং), 'স্টাডি' (২১নং), 'কম্বিং' (২২নং), 'ইয়েলো শাড়ি' (২৩নং) ও 'টয়লেট' (২৪নং) চিত্রগুলি দেখলে যে-কোনো দর্শক উপলব্ধি করতে পারবেন। এগুলিতে শ্রীমতী দত্ত সুনিপুণ ড্রয়িং-এ দৈহিক আকৃতিকে বলিষ্ঠ রেখায় এবং রূপ-লাবণ্যকে সুন্দর রং-বিন্যাসে, চিত্র-সংস্থাপনের কৌশলে ও আলো-ছায়ার মায়ায় শিল্পের মাধুর্য দান করেছেন। আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর প্যাস্টেলে অঙ্কিত নারী-মূর্তির পোশাক-পরিচ্ছদের অপূর্ব বুননীর কাজ। শাড়ি, ব্লাউজগুলি প্যাস্টেলে

ল্যান্ডস্কেপ চিত্রা দত্ত

পোর্ট্রেট চিত্রা দত্ত

যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। সাধারণভাবে বয়ন-পারিপাট্যকে এমনভাবে রঙে বিধৃত করতে আমি অন্য কোনো তরুণ শিল্পীকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। শ্রীমতী দত্তের শুধু মধ্যবিত্ত জীবনের এই রূপ দেখে আমরা তৃপ্তি বোধ করছি না, তিনি যদি আরো নীচুতলার নর-নারীকে তাঁর শিল্পের জগতে স্থান করে দেন তবে আরো খুশী হবে আমাদের মন।

শ্রীমতী দত্তের প্রতিকৃতি চিত্র ভিন্ন 'রাতের কলকাতা' (৬নং) চিত্রখানি আমার ভাল লেগেছে। চৌরঙ্গীর পিচ-ঢালা পথে অন্ধকার রাত গাছের ছায়ায় গাঢ়তর আর বিরাট প্রাসাদগুলোর জানালা গলিয়ে টুকরো টুকরো আলোর দ্যুতি নিয়ে যে দৃশ্য তিনি ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন তাতে তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যই প্রকাশ পেয়েছে। কালো রংটা আর একটু কম হলে যেন 'কলকাতার রাত' ঠিকভাবে ফুটে উঠতো। ছবিখানির সামগ্রিক বিন্যাস সত্যি খুব ভাল। 'নিঃসর্গ চিত্র'টি (১২নং) মোটামুটি এক রকম। ফুলের স্টাডি দুটিও চলনসই কাজ বলে মনে হয়েছে।

শ্রীমতী দত্ত এই প্রদর্শনী শেষে ফরাসী সরকারের একটি বৃত্তি নিয়ে প্যারিসে যাত্রা করছেন। শিল্প-তীর্থ প্যারিসে তাঁর শিল্পী জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হোক,—আমরা আজ এই শুভ কামনা জানাই।

॥ সুন্দরী বুলগেরিয়া ॥

পূর্ব-ইউরোপের সুন্দর দেশ বুলগেরিয়া। মাত্র ১৭ বছর হলো ফ্যাসিস্ট দুঃশাসনের কবলমুক্ত হয়েছে এই দেশ। বুলগেরিয়ার সুন্দেদন
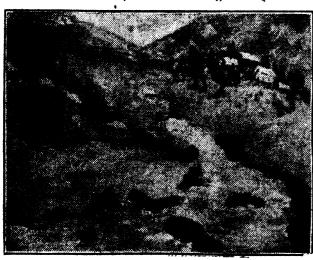
স্বাধীনতা-উৎসব উপলক্ষে কলিকাতার মানুষদের কাছে সেই দেশকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।

৭০খানি আলোকচিত্রের মাধ্যমে বুলগেরিয়ার মানুষ, সমাজ আর তার প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। আলোকচিত্র যে আজ আর্টের স্তরে কতখানি উন্নীত হয়েছে তারও পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রদর্শনীতে এসে।

বলকান দ্বীপ, সম্মুখে প্রসারিত কৃষ্ণসাগরের সোনালী সৈকত, থৈ-থৈ নীল জল, রৌদ্রকরোজ্জ্বল তীরভূমি, তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ, বনভূমি, শস্য-শ্যামল উপত্যকা, সমতলভূমি, প্রাচীন ও আধুনিক শহর-নগর, গোলাপ কুঞ্জ, আঙ্গুর লতা, নৃত্যকলা, জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, হাস্যমুখর নর-নারী প্রভৃতি প্রদর্শিত আলোকচিত্রের বিষয়-বস্তু।

আজ যখন মানুষের অফুরন্ত জিজ্ঞাসায় প্রতিটি দেশ উদ্ভাসিত তখন এই জাতীয় প্রদর্শনীর মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। অন্ততঃ ভ্রমণেচ্ছু নর-নারীকে উদ্বোধিত করার জন্য অন্যান্য দেশ যদি এমনি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন তবে ঘরকুনো মানুষেরাও সেই ফাঁকে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পেয়ে পুলকিত মনে ঘরের কোণে ফিরে বিশাল বিশ্বের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। ইন্দো-বুলগেরিয়া ফ্রেন্ডশিপ এসোসিয়েশন আয়োজিত এই প্রদর্শনীকে তাই আমরা অভিনন্দিত করছি।

॥ রেখা-চিত্রে দুই দেশ ॥

কলিকাতার পোলিশ দূতাবাস এবং অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় পোল্যান্ডের বিখ্যাত শিল্পী তাদাউজ কুলিশোভিজের এক মনোরম রেখা-চিত্র প্রদর্শনী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রদর্শনীটি অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে প্রদর্শিত হয়।

শিল্পী তাদাউজ ১৯৫৬ সালে ভারতে এসে যে-সব রেখা-চিত্র অংকন করেন এবং ১৯৫৯ সালে তাঁর মেক্সিকো ভ্রমণের সময় অংকিত হয় যে-সব চিত্র তার ৬০টি নিদর্শন নিয়ে বর্তমান প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ভারতের নর-নারী, জীব-জন্তু, সমাজ-জীবন শিল্পীর হাতে সুন্দরভাবে মূর্ত হয়েছে। শুধুমাত্র কালো কালির রেখায় কাগজের শাদা জমিনে মানুষ আর জীব-জন্তু অত চমৎকারভাবে ছন্দিত রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে ইদানীং কালে আমাদের দেশের তরুণ-শিল্পীদের কোনো প্রদর্শনীতে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেনি। সেদিক থেকে এই বিদেশী শিল্পী যে পর্য-বেক্ষণ শক্তি, শিল্প-চেতনা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভি-নন্দন যোগ্য।

প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে 'ওয়াগন' (১নং), 'নারীর মুখ' (৪নং), 'নৃত্য' (১৩নং), 'গোরু' (১৪নং), 'সাদা জন্তু' (১৬নং), 'গোরু ও বাছুর' (২২নং), 'মা' (১৯নং), 'নারী যাত্রী' (২৮নং), প্রভৃতি নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন সম্পর্কে শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্প-উপহার।

শিল্পী তাদাউজের ছন্দিত রেখা, চিত্র সংস্থাপনের কৃতিত্ব, শাদা আর কালোর সাহায্যে আলো-ছায়ার খেলা তথা সামগ্রিক শিল্প-বক্তব্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। ভারতবর্ষের বন্ধুরূপে এই শিল্পীকে তাই আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

মেক্সিকোর রেখাচিত্রেও শিল্পীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তবে এখানে শিল্পী শিল্পের অন্য মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। যতদূর মনে হয় এ তাঁর স্ব-আবিষ্কৃত শিল্পপদ্ধতি। মেক্সিকোর রেখা-চিত্রগুলিতে সাদা জমিন কাপড়, কম্বল বা চটের উপর রং লাগিয়ে সেই রঙের সাহায্যে প্রস্তুত করে নিয়ে রেখাগুলিকে পরে বিন্যাস করা হয়েছে তার উপর। এইভাবে এক ধরনের বুননীর সূক্ষ্ম কাজ পশ্চাৎপটে থাকায় বিনাস্ত রেখা এবং রং মিলে এক নতুনতর এফেক্ট চিত্রগুলিতে যে সৃষ্টি হয়েছে, এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই। কিন্তু একে শিল্পের কোন্ পর্যায়ভুক্ত করবো? গ্রাফিক আর্ট-ই বা বলবো কেন একে? এই জিজ্ঞাসা মনে নিয়ে রেখা-চিত্রগুলি দেখে প্রফুল্ল মন নিয়ে অনায়াসে বাড়ি ফেরা যায়। শিল্পী হিসাবে তাদাউজ তাই মেক্সিকোর রেখা-চিত্রেও সার্থক।

।। নারীর মুখ ।।
[ভারতবর্ষের রেখাচিত্র]

সম্প্রতি এই শিল্পী রিওডিও-জেনারিওতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনীতে রেখা-চিত্র বিভাগে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছেন শুনে আমরা আনন্দিত। যোগ্য ব্যক্তিকেই যে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আশা করি পোলিশ দূতাবাস তাঁদের দেশের আরো সুন্দর শিল্পবস্তু এমনি প্রদর্শনীর সাহায্যে আমাদের গোচরীভূত করে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে তুলবেন।

।। বোম্বাই গাড়ী ।।
[ভারতবর্ষের একটি রেখাচিত্র]

অথ বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ

অ, না, দ
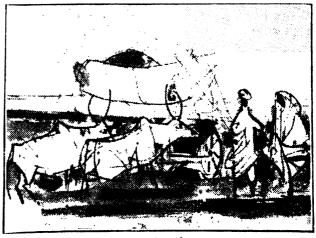
আজকাল বিজ্ঞাপনের হিড়িকটা লক্ষ্য করেছেন? আগেকার দিনে যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না, তা বলছিনে, তবে এখন যেন কিছুটা বাড়াবাড়ি। আগে 'বিজ্ঞাপনের স্থান' ছিল প্রধানতঃ পঞ্জিকায়। এখন সর্বত্র—পথে-ঘাটে, বাড়ী-ঘরের দেয়ালে, প্রাচীরে, রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টে, মায় গাছেও বিজ্ঞাপন। পথ চলতে ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে চোখ ফেরান না কেন রঙ-বেরঙের বিজ্ঞাপনে পথঘাট আচ্ছন্ন। সিনেমা, থিয়েটার, জলসা, পণ্য-দ্রব্যের বিজ্ঞাপন—রাতে আবার নিয়ন লাইটের চমকানি-ঝলকানি।

আর কেবল পথে-ঘাটেই নয়। নিত্য খবরের কাগজ খুললেই হরেক রকমের বিজ্ঞাপন নিশ্চয় আপনার চোখে পড়ে। প্রসাধনদ্রব্য থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধপত্র, খাদ্যবস্তু, বইপুস্তক, রেডিও, মোটরকার, লোহা-লক্কর পর্যন্ত যাবতীয় জিনিসের বিজ্ঞাপন। তা ছাড়া আছে কর্ম-খালি, পাত্র-পাত্রী, স্কুল-কলেজ, বাড়ী-ভাড়া, হারানো-প্রাপ্তি, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি রকমারী বিজ্ঞাপন। যে যেভাবে পারছে নিজের নিজের পণ্যদ্রব্যের—ভাল-মন্দ, খাঁটি-ভেজাল—প্রচার করছে। আবার এমন অনেক কিছু আছে যার বিজ্ঞাপনের দরকারই হয় না, অথচ আজকাল কাগজে কাগজে তারও বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে, এই যেমন স্কুল-কলেজ।

বিজ্ঞাপনেরও আছে একটা মোহ। আমি অনেক পাঠক-পাঠিকাকে জানি খবরের কাগজের ছোট ছোট বিজ্ঞাপন না পড়লে যাদের খবরের কাগজ পড়াই হয় না। বিয়ের বিজ্ঞাপন পড়তে অনেকেই বেশ মজা পান। পাত্রীর গায়ের রঙের বৈচিত্র্য বা মাত্রা তাদের অবাক করে দেয়। শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, দুধে-আলতার রঙ ছাড়া অবশ্য অনেক রকম রঙ। ওটা এক ধরণের ফাঁদ। এছাড়া, অন্য ধরণের বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভালই জানে যে, ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিতে পারলে বাজে মালও হু হু করে কাটতি হয়। এই রকম বিজ্ঞাপনের ধাপ্পায় পড়ে কত লোক ঠকছে তার হিসাব কে রাখে? এক টাকায় ঘড়ি, রুমাল ইত্যাদির বিজ্ঞাপন তো আগে আমরা দেখেছি।

এই জন্যে বিজ্ঞাপন-ভীতি অনেকেরই আছে। তাই বাড়ীর দেওয়ালে অন্য কোন স্থানে লেখা থাকে—Stick no bills—বিজ্ঞাপন মারিও না। এই সব বাজে জিনিসের ভয়ে, না দেওয়াল নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে তা কে জানে?

যা হোক, দেখে-শুনে মনে হচ্ছে এটা বুঝি বিজ্ঞাপনেরই যুগ। নিজের ঢাক নিজেকেই পিটতে হয়। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের জোরে অনেক জিনিস কেমন করে পণ্য হয়ে ওঠে তাই দেখুন। অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের দেশে এখন বিজ্ঞাপনের মান বেশ উন্নত হয়ে আসছে। বিজ্ঞাপনের ছবিগুলোর উন্নতি বিশেষ লক্ষণীয়। কয়েক বছর আগের সচিত্র বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তুলনাই হয় না।

লক্ষ্য করে থাকবেন অনেক বিজ্ঞাপন আবার বেনামী, বিজ্ঞাপনদাতার নাম-ঠিকানা থাকে না তাতে, শুধু উল্লেখ থাকে 'বক্স' নম্বর। বিশেষ করে কর্মখালি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেই এটা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত বলা চলে যে, আজকাল কর্মখালি বিজ্ঞাপনের সংখ্যা আমাদের দেশে খুব বেড়ে গেছে। কারণটা অর্থ-নৈতিক। বেকারের সংখ্যা বেশী কিনা তাই। কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করে ক'জনের চাকরি হয় ঈশ্বর জানেন।

এক সময়ে বিলাতের সংবাদপত্র-গুলোও 'বক্স' নম্বর দেওয়া চাকরির বিজ্ঞাপনে ভর্তি থাকত। কিন্তু ও দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরনের বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে।

বিলাতে ১৯৪০ সনে প্রধান একখানি সান্ধ্য কাগজে বক্স নম্বর দেওয়া বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত এসেছিল ১৮ লক্ষ। আর ১৯৫৯ সনে ঐ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫ লক্ষের কাছাকাছি। চাকরি-বাকরি আর বেচাকেনা, ফ্ল্যাট ভাড়া দেয়া ইত্যাদি ব্যাপারে আজকাল অনেকটা খোলাখুলি ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে। কেউ বড় একটা 'বক্স' নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয় না। অনেক ক্ষেত্রে টেলিফোনেই কথাবার্তা, দর কষাকষি স্থির হয়ে থাকে। সত্যি বলতে কি, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে টাকা চাওয়াটা নিন্দনীয় নয়, যদিও ১৯৩১ সনে তা ছিল। আসল কথা, বিজ্ঞাপনে আড়াল বা গোপনতার প্রশ্রয় নেওয়া এখন অনেকেই পছন্দ করে না। তাই আজকাল ওদেশে বেনামী বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমেছে।

সুখের বিষয়, আমাদের দেশেও বড় বড় কোম্পানীরা 'বক্স'নম্বরের আশ্রয় না নিয়ে সোজাসুজি নাম দিয়েই বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করেছে। বিলাতের মত এখানেও আর গোপনতার আড়াল দিতে হয় না। প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশিত হলে চাকরিপ্রার্থীরাও অনেক জিনিস বুঝে নিয়ে ঠিক স্থানে তাদের দরখাস্ত পাঠিয়ে দিতে পারে।

বিলাতের সংবাদপত্রকর্মী সংঘ কিন্তু "বক্স" নম্বরে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেয়ার বিরোধী। উক্ত সংঘ নাকি এবারে তাদের বার্ষিক সভায় এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবে। বিজ্ঞাপনদাতারা ত নিজে-দের পরিচয় গোপন করে বক্স নম্বরে বিজ্ঞাপন দিয়ে খালাস, কিন্তু ঠেলা সামলাতে হয় অন্যকে। যারা চাকরিতে নিযুক্ত আছে তারাও অনেক সময় ভাল চাকরির লোভে 'বক্স' নম্বরের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠায়। তাতে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে বহু চাকুরে নিজ নিজ অফিসেই—এমন কি নিজে যে চাকরিতে বহাল আছে সেই চাকরির জন্যই আবার আবেদন করেছে। এটা রীতিমতো জটিল ব্যাপার, তা ছাড়া এতে বিপদও আছে। বিজ্ঞাপনদাতা দরখাস্ত পড়ে টের পেয়ে যায় অফিসের কোন কর্মচারী অসন্তুষ্ট; এবং অন্য কোন কারণে অন্যত্র কাজের চেষ্টা করছে। এতে কর্মচারীর প্রতি মালিকের একটা অসন্তুষ্টির ভাব মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়। এটা মালিক বা কর্মচারীর পক্ষে মোটেই ভাল নয়। এই ধরনের ব্যাপার 'বক্স' নম্বরের মারফত আমাদের দেশে হামেশাই হচ্ছে।

আপনারা অবশ্য বলতে পারেন খবরের কাগজওয়ালারা এ ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপায় কেন? বস্তুত তাদের তেমন দোষ দেওয়া যায় না। দরখাস্তের ভিতরে কি আছে,

তারা তো টের পায় না। আর সমস্ত 'বক্স' নম্বরের বিজ্ঞাপন অনুসন্ধান করা সংবাদপত্র অপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আচ্ছা বলতে পারেন 'বক্স' নম্বরে বিজ্ঞাপন দেয়ার রেওয়াজটা কবে থেকে এবং কেন প্রচলিত হয়েছে?. ওটার হদিস কিন্তু কেউ দিতে পারছে না, এমন কি বিলাতের খবরের কাগজওয়ালাদেরও তা জানা নেই। সম্ভবতঃ কারো খাম-খেয়ালই এর জন্য দায়ী।

সাধারণতঃ এডভারটাইজিং এজেন্সীর মারফত বিভিন্ন সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনগুলো পেয়ে থাকে। তবে ছোট ছোট বিজ্ঞাপন, যেমন বিক্রয়, চাকরিখালি, চাকরীর সন্ধান, বাড়ী বা জমি বিক্রি ইত্যাদির বিজ্ঞাপন আমাদের দেশে প্রধানত এজেন্সীর মারফত না দিয়ে অনেকে নিজেরাই দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিজ্ঞাপিত ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে খবরের কাগজওয়ালারা কিছুই জানতে পারে না। এই জন্য খবরের কাগজওয়ালাদের অনেক সময় বিপদে বা অসুবিধায় পড়তে হয়।

'বক্স' নম্বরের বিজ্ঞাপনের বেলায় সংবাদপত্রগুলোকে স্বভাবতই একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। একবার বিলাতের একখানি খবরের কাগজ বেশ ফ্যাসাদে পড়েছিল। একটি লোক ছুটি উপভোগ করার মতো পছন্দসই ঘর আছে বলে বিজ্ঞাপন দেয় এবং সম্ভাব্য ভাড়াটের কাছে বায়না বাবদ কিছু আগাম দাবী করে। সাধারণত খবরের কাগজে আগেই বলে দেয়া থাকে যে, বক্স নম্বরের বিজ্ঞাপনের বেলায় দরখাস্তের সঙ্গে কেউ যেন নগদ টাকা না পাঠায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ লোকটি বেশ কয়েক হাজার টাকা কামিয়েছিল। এদিকে যারা টাকা পাঠিয়েছিল তারা লোকটির কাছ থেকে আর কোনো সাড়া পায়নি। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপার পুলিশের হাতে যায়।

বিলাতে পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগ 'বক্স' নম্বরের বিজ্ঞাপনটা কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখে। খবরের কাগজ থেকে যদি কোনো হদিস না পায় তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো ডিটেকটিভ নিজেই হয়ত বিজ্ঞাপনের জবাব দেয়।

এবারে আর এক ধরনের বিজ্ঞাপনের কথা বলা যাক।

অনেক বছর আগে লণ্ডন টাইমস এক মজার ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপতে আরম্ভ করে। এটা এখন সব কাগজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমাদের দেশের অনেক কাগজে এখন দেখা যায়। এর নাম হচ্ছে Agony Column অর্থাৎ সংবাদপত্রের 'যন্ত্রণা কলাম'। এইরূপ সংবাদস্তম্ভে থাকে হারানো, প্রাপ্তি, আত্মীয়দের নিরুদ্দেশ বা কোন কিছু গোপনীয় সংবাদ। তাছাড়া জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যু-বার্ষিকীর সংবাদও এই সংবাদস্তম্ভে থাকে। এগুলি অনেক সময় বেনামী বিজ্ঞাপনভাবে প্রকাশিত হয়। এই ধরনের বিজ্ঞাপনের একটা নমুনা এখানে দিলাম। এক ভদ্রমহিলা তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর উদ্দেশে এই বিজ্ঞাপনটি দিয়েছিল এবং ১৮৫০ সালে লণ্ডনের টাইমস পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল—ওগো, মায়া-মমতা যদি এখনও তোমার প্রাণ থেকে লোপ পেয়ে না থাকে, তাহলে শীগগির তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এসো। বিলম্বে তার হৃদয় ভেঙে যাবে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবে। তার যে দুটি আঁখির কোমল-মধুর দৃষ্টিতে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে, বিলম্বে সে দৃষ্টিও ঘোলাটে হয়ে যাবে।

"প্রকৃতির খেলা" অতুল সেনগুপ্ত

আমার দাদা আমাকে খুব ভালবাসত। এত ভালবাসা আজকালকার দিনে দেখা যায় না। নিজের ছেলেপুলে হয়নি, তাই ওর সব স্নেহ, ভালবাসা আর মনোযোগ আমার ওপরেই পড়েছিল। আর, আজ বলে নয়, বাবা যেদিন আমাদের অনাথ করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেদিন মা'র পাশে দাদাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে বুকে করে সব ঝড়-ঝাপ্টা থেকে বাঁচিয়েছিল।

তারপর মা-ও যেদিন আর রইলেন না, সেদিন আমি ভেবেছিলাম আমাদের দুঃখের রাত বুঝি আর কোনদিন শেষ হবে না। একটা ভয়ঙ্কর দুর্যোগ আমাদের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাবে, গুঁড়িয়ে-মাড়িয়ে আমাদের দেহ থেকে প্রাণটা বার করে নিয়ে যাবে। আমাদের জন্যে কখনো আর পাখী-ডাকা সকাল হবে না। কিন্তু না। তা হয়নি। দাদা ছিল, আমার দাদা। যে-দাদা আমার অল্পবয়সী মনের ভয়কে আশ্বস্ত করে একটা নিরুদ্বিগ্ন আশ্রয় রচনা করল। একটুও কাতর হলো না, হৈ-চৈ করল না। শান্ত হয়ে মা'র শেষ-কাজ করল। তারপর নিজের সবটুকু মনোযোগ দিল আমার ওপর। আমি দাদার চেয়ে অনেক ছোট ছিলাম। দাদা আমার চোখ দেখলেই মনের সব কথা টের পেত। আমি যখন যা ইচ্ছে করতাম, দাদা বুঝতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই ইচ্ছের পূরণ করতো। আর, সব সময় এই চেয়ে পেয়ে-পেয়ে দাদার কাছে আমার চাহিদার মাত্রাটা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল।

সকলে বলেছিল বাড়ীটা বদলাতে। আত্মীয়-স্বজনরা বলেছিল, এ-বাড়ীতে কেউ কোনদিন সুখ-শান্তি পায়নি, আর এই রকম পর পর দুর্ঘটনা যখন ঘটল তখন নিশ্চয়ই বাড়ীর কোন দোষ আছে। দাদা শুনল না, একটু হাসল। তারপর চোয়ালটা আবার শক্ত করে মুখটাকে ভাবলেশহীন করে তুলল।

আমি দাদার মুখের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাতাম। কথা বলতে সাহস হত না। নইলে আমার ইচ্ছে হয়েছিল বলি যে, দাদা বাড়ীটা তুমি ছেড়েই দাও। আমারও যেন কেন ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে আরো বিপদ আছে। মা মারা যাবার দিন রাত্তিরে যেমন মনে হয়েছিল, একটা প্রচণ্ড অজানা দুর্যোগ আমাদের দেহটার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাবে, প্রাণটাকে নিয়ে উধাও হবে, শুধু পড়ে থাকবে শরীরটা মাটিতে—তেমনি এখনো মনে হয়। মনে হয় একদিন-না-একদিন তেমন কিছু হবেই।

এই চিন্তাটা যখনি আমার মধ্যে চলা-ফেরা করত তখনি একটা গর্জন আমার কানের কাছে, আমার চেতনার মূলে ক্রমশ স্পষ্ট হতো। একটানা বাজতে বাজতে, বাড়তে বাড়তে শব্দটা আমার অস্তিত্বকে ছাপিয়ে যেতে চাইত। মাথা ঝিমঝিম করে শরীর হয়ে আসত অবশ। এরকমটা আমার প্রায়ই হতো। আমি দাদাকে বলতে চাইতাম, দাদা চল আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এখানে আমাদের সর্বনাশ আছে।

কিন্তু পারিনি। কোনদিন বলতে পারিনি। শুধু কতকগুলো উদ্বিগ্ন দৃষ্টির নির্বোধ আকৃতি ছুঁড়ে আমি দাদার শক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থেকেছি। দাদা আমার মুখ দেখে বলেছে, 'কিরে ওদের কথা শুনে ভয় পেয়েছিস?'

আমি চুপ।

—'কিচ্ছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই বড় হবি। আমাদের কত ভাল দিন আসবে দেখিস না!'

আমি চুপ।

তারপর দাদা যেই মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যাবে অমনি আমি হঠাৎ চিৎকার করে বলেছি : 'কিন্তু কিন্তু এখানে থাকলে তোমার যদি কোন-দিন বিপদ হয়।'

দাদা ঘাড় ঘুরিয়েছে। শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আমার কাছে এসে

মাথায় হাত বুলিয়ে একটু হেসে বলেছে, 'পাগল ছেলে।'

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমি বড় হয়েছি। দাদা বিয়ে করেছে। বৌদি এসে ভার নিয়েছে সংসারের। কিন্তু দাদার স্নেহ আমি একদিনের তরেও হারাইনি। বরঞ্চ সেটা আরো বেড়েছে।

আমি কোন কাজকর্ম করতে পারতাম না। শুধু লেখাপড়া নিয়ে থাকতাম বলে দাদা আমার জন্যে আলাদা ঘর, আলাদা লাইব্রেরি করে দিয়েছিল। আমি সেখানে নিজের মনের সঙ্গে বাস করতাম। আমার মন খুব স্বপ্নদর্শী ছিল। আমার মন প্রায় মৃত্যুর মতো নীরব হয়ে থাকত। কিন্তু সে-মৃত্যুতে আনন্দ ছিল। অদ্ভুত একটা তৃপ্তি ছিল। আর, এইজন্যে বৌদি আমাকে দেখতে পারত না। আমি কাজ করি না, শুধু বাড়ী বসে বসে দাদার অন্ন ধ্বংস করি আর নিজের মনে একলা-একলা থাকি, সেটা বৌদির পছন্দ ছিল না। দাদার সামনে ও খুব টান দেখাত অথচ আমি জানি মনে মনে কি ভীষণ অখুশীই ছিল আমার ওপর। আর, দাদা জানে না কিন্তু আমি জানি, একটা জ্যোতিষী এসে বাড়ীর সকলের কুষ্ঠি দেখে কী না কী বলে গেল, সেদিন থেকে বৌদির রাগটা ঘন ঘনই আমার ওপর স্পষ্ট হতে লাগল। আমি দাদাকে কিছুই বলতাম না এসব কথা। ঘুণাক্ষরেও জানতে দিতাম না, বৌদির দুর্ব্যবহারের কথা।

আমি বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরে বসে বই পড়ে কাটাতাম। রকম রকমের বই। তবে, ধর্মপুস্তক আমার মনকে বেশী করে টানত। তার মধ্যেই যেন আমি মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেতাম। আমার মনে হতো, আমি যেন ভেতরে ভেতরে এ পৃথিবী থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছি। ভেতরে ভেতরে এমন একটা শক্তি তৈরি হচ্ছে যার তৃষ্ণা এ জীবনের ধারাবাহিকতায় মেটে না, জীবনের নিয়ম-নির্দিষ্ট সীমানাকে ছাড়িয়ে-ছাপিয়ে দুর্বার হওয়াতেই তার পরিতৃপ্তি। আমি কোন খুন-জখম, উত্তেজনার বই পড়তে পারতাম না।

সেই দাদা আমাকে খুন করল। যে-দাদা আমায় ছেলেবেলা থেকে বুকে-পিঠে মানুষ করেছে, যাকে ছাড়া আমিও আর জীবনে কিছু জানিনা—সেই দাদা অকস্মাৎ এবং অবিশ্বাস্যভাবে আমাকে খুন করল।

সকাল থেকে সেদিন রোদ ওঠেনি। অন্ধকার অন্ধকার হয়েছিল চারদিক। মনে হচ্ছিল প্রকৃতি কিসের যেন একটা ষড়যন্ত্র করে রোদকে তার কাজ থেকে হঠাৎ সরিয়ে দিয়ে অন্ধকারকে বসিয়েছে পাহারায়। মাঝে মাঝে রোদ অপরিসীম কর্তব্যবোধে একটু একটু আলো ছড়াবার চেষ্টা করলেও, অন্ধকার যেন তার গলা টিপে টিপে ধরছে।

আমি জানলার বাইরে চোখ রেখে চুপ করে বসেছিলাম নিজের ঘরে। দিনটা বেশ ঠাণ্ডা আর রহস্যময়। দিনটা অলস এবং নিথর। এক-একটা প্রহরের দিকে যেতে তার অস্বাভাবিক সময় লাগছে, আমার মনে হলো। বাইরে কাক ডাকছে, ঘরের করুণ আলোয় চড়ুই পাখী এসে বসছে, কয়েকটা শব্দ তুলে আবার ফুড়ুত করে উড়ে যাচ্ছে। ঘরে এবং বাইরে সেই অবিচল নিস্তব্ধতার মধ্যে আরো কত অজানা শব্দ লুকিয়ে ছিল। যা এতদিনতে আমি বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু আমার অনুভূতিতে তার গোপন অভিসার বারেবারেই ধরা পড়ছিল।

'অমন অসভ্যের মত তাকিয়ে কি দেখছ?'

বৌদি ঘরে ঢুকল। দাদা অফিস বেরিয়ে গেছে।

বৌদি আমার দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টির কোণে পরিষ্কার একটা কালো অপ্রসন্নতার অন্ধকার ভেসে রয়েছে, আমি বুঝলাম। ঠিক আজকের দিনটার মতো।

—'তুমি ঘরে বসে বসে রাতদিন কি আঁটি বল দেখি মনে মনে?'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বৌদির দিকে।

—'অমন অসভ্যের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছ? জ্যোতিষী সেদিন ঠিক বলেছিল বাপু, বলেছিল ওই ছেলেকে দিয়ে আপনাদের একদিন ভীষণ বিপদ হবে। তোমার রকম-সকম দেখে এক-এক সময় আমারও তাই মনে হয়।'

বৌদি পেছন ফিরল। তার ফর্সা কাঁধের কাছে সকালের রুক্ষ চুল উড়ছে। পাতলা ব্লাউজের প্রতিরোধ ভেদ করে একটা কাঁচা-সোনা রঙের পিঠের আভাস দেখা যাচ্ছে—পিঠ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত যেন সম্পূর্ণ এক বিস্ময়ের বোধোদয়।

বৌদির কোনো ছেলেপুলে হয়নি আজো। আমার ইচ্ছে করে আমি মা বলে ডাকি। আমার অতৃপ্ত মাতৃস্নেহ ওর কাছ থেকেই পাই। ওর বুকে মুখ রেখে ছোট ছেলের মতো নিশ্চিন্ত বোধ করি। কিন্তু তা হবার নয়। বৌদি বোধ-হয় আমার সন্দেহ করে, ভাবে আমার মধ্যে একটা কুৎসিত কামনা বপ্নে ঢাকা আছে। একটু ফাঁক পেলেই, সুযোগ পেলেই লাফিয়ে উঠবে। আমি মনে মনে হাসি।

সন্ধ্যা থেকে ঝড় উঠল। ধুলো-বালি উড়ে ভরে দিল ঘরদোর। তারপর আকাশে ঘন মেঘের জমায়েত হলো। একটু পরেই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি। শুধু একটানা একটা শব্দের পতন। চারপাশে শুধু অন্ধকারের নিশ্ছিদ্র কালো চোখ, নিষ্পলক। মাঝে মাঝে বাতাস দিচ্ছে সাঁই সাঁই করে। আমি বসে বসে 'লাইফ ডিভাইন' পড়ছিলাম। দাদা বেশ রাত্তির করে ফিরল, কাক-ভেজা হয়ে। একটু পরে বৌদি আমাকে খেতে ডাকল। 'ঠাকুরপো খেতে এস।' তার গলার স্বরে বৃষ্টির চেয়েও ক্লান্ত সুর যেন।

আমি প্রতিদিনকার মতো দাদার পাশে গিয়ে বসে পড়লাম। কেউ কোন কথা বললাম না। দাদাও যেন আজ কেমন গম্ভীর, মনে হলো। একটা অস্বাভাবিক নীরবতা আমাদের প্রত্যেকের মাঝখানে পাঁচিল তুলে অটল হয়ে ছিল। শুধু বৌদির আঙুলগুলো ক্ষিপ্রবেগে এক একটা বাটি ও প্লেটের ওপর দিয়ে অতি-ক্রম করে যাচ্ছিল, আমি দেখলাম। তাতেই যা শব্দ হচ্ছিল, ঠুং-ঠাং। আমি বৌদির সেই দ্রুত অপসৃয়মান হাতের আঙুল-গুলোর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো ওগুলো আঙুল নয়, সাঁড়াশি যেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি ঘরে চলে এলাম। আলো জ্বাললাম না। মনটা আমার খুব অস্থির হয়ে ছিল। মা মারা যাবার দিন রাত্তিরে আমার যেমন মনে হয়েছিল একটা অজানা দুর্যোগ আমাদের একদিন গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে, সেরকম মনে হওয়াতে আমি বিচলিত হলাম। সেই চিন্তাটা স্ফীত হয়ে আমার কানের কাছে আবার গর্জন করতে লাগল।

শুনতে পেলাম রান্নাঘরে বাসন নাড়া-চাড়া থেমে গেল। দাদা আগেই শুতে গিয়েছিল। বৌদি কলঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল, টের পেলাম। বারান্দার সুইচটা নিভে গেল টুপ্ করে।

তখনও একভাবে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দুরন্ত হাওয়া। আমি ঘরে পায়চারি করছি। আমি এবং আমার মন। তারপর কত রাত্তির হয়েছে আমার মনে নেই, মনে নেই কখন আমার চেতনায় অবসাদ জড়িয়ে গেছে।

ভেজান দরজা ঠেলে আমার দাদা ঘরে ঢুকেছিল। কেউ টের পায়নি। বৌদি বোধহয় ঘুমোচ্ছিল অসাড়ে। বৃষ্টির ঝম-ঝমে শব্দকে ভেদ করে কোন ছোটখাট শব্দ বলিষ্ঠ হতে পারেনি। আমি বোধ-হয় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, কে যেন আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। সে মুখ আমি চিনি কিন্তু ভয়ংকর এক নিষ্ঠুর মুহূর্তে সে-মুখের আদল বদলে গেছে, খুব চেনা মানুষ হয়ে উঠেছে অচেনা।

তার হাত দুটো আমার গলা লক্ষ্য করে এগিয়ে এল। হাত নয় উদ্যত মৃত্যু। তার আঙুলগুলো যেন সাঁড়াশি। সেই সাঁড়াশির মতো আঙুলে আমার গলায় চেপে বসল। কোঁক করে একটা অবোধ আওয়াজ তুলেই আমি নিষ্পন্দ হলাম। দু'চারবার শরীরটা নিষ্ফল প্রয়াসে ছট-ফট করে উঠেই স্থির হলো। আঙুলে ক্রমশই প্রখর উদ্দীপনায় গলার তলায় নেমে আসতে লাগল। আমি তলিয়ে গেলাম অজ্ঞান সুপ্তিতে। আমাকে টেনে মাটিতে নামান হলো। শুইয়ে দেওয়া হলো চিৎ করে। আমার দেহের ওপর দিয়ে একটা দুর্যোগ প্রচণ্ড বেগে গড়িয়ে গেছে যেন। প্রাণটা উধাও হয়েছে, শরীরটাকে ফেলে। বৃষ্টির তখনো বিরাম হলো না।

সকাল হলো, পাখী ডাকল। রাস্তা-ঘাট, প্রকৃতি স্নান করার সৌন্দর্যে জেগে উঠল। কিন্তু আমি আর জাগলাম না। কেননা, আমার দাদা আমাকে খুন করেছিল।

কেন খুন করল দাদা, এ নিয়ে আমি অনেক ভাবতে চেষ্টা করছি। আমার মনে হয়েছিল, বৌদি বোধহয় আমার নামে লাগিয়ে লাগিয়ে দাদার মনে একটা ঘৃণ্য ধারণার সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বোধহয় আমি জানি না, বাবা হয়ত কিছু বিষয়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, সেটাতে ফাঁকি দেবার জন্যেই আমাকে, তার পথের কাঁটাকে সরিয়েছে দাদা।

কিন্তু এখন আমি সবার ওপর প্রতি-শোধ নেবার জন্যে তৎপর হলাম। যারা যারা আমার প্রতি অকরুণ ব্যবহার করেছে তাদের ওপর। আমার দাদা, আমার বৌদি এবং আমার এক মেশোমশাই, যাঁর কাছে আমি জীবনে একবার মাত্র গিয়েছিলাম চাকরির উমেদারি করতে। যিনি মোটা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, দামী সোফায় তলিয়ে গিয়ে খবরের কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে বলেছিলেন, 'চাকুরি কি আর গাছের ফল হে।'

এখন আমার অনেক সুবিধে। এখন আমার শরীর নেই। কিন্তু আমি আছি। মরে যাবার পর বাতাসে বাতাসে সূক্ষ্ম হয়ে আছি। এখন আমি বড়লোক মেসো-মশাইয়ের মুখ থেকে চুরুট কেড়ে নেব অলক্ষ্যে। বৌদির গায়ে বেদম চিমটি কাটব অথচ ও দেখতে পাবে না। আর দাদা, দাদা যদি ভেবে থাকে এতবড়

একটা অপরাধ করার পর ও পার পেয়ে যাবে. আমার শরীরটাকে সরিয়ে ফেলে পুলিশের চোখে দেবে ধুলো. তা হলে সে বড্ড ভুল করেছে। আমিই পুলিশে খবর দেব।

আমি ভাল করে ভোর হবার আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। সবে তখন আবছা-আবছা আলো ফুটছে। ঘরের বারান্দায় তখনও অন্ধকার জমে। মেজেতে আরশোলা ফর্ ফর্ করে বেড়াচ্ছে। ঝি আসেনি তখনো কাজ করতে। বৌদি বোধহয় তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বেচারী জানে না তার স্বামী কি মহা অপরাধে হাত কালো করে এক নৃশংস আসামী হয়েছে। জানে না একটু বেলা হলেই পুলিশ এসে ভাই-হত্যার অভিযোগে তার হাতে হাতকড়ি পরাবে। জানে না এতদিনকার দুর্ব্যবহারের জন্যে একটু পরেই আমি তাকে কি ভীষণ চিমটি কেটে শাস্তি দেব।

প্রথমেই আমি বড়লোক মেসোমশাইয়ের বাড়ী গেলাম। মেসোমশাই তখন স্লিপিং গাউন গায়ে চড়িয়ে মুখে চুরুট এ'টে বাগানে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন। আমি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কোন কথা না-বলে মুখ থেকে টপ্ করে কেড়ে নিলাম চুরুটটা। 'চামচিকে' বলে একটা গালাগাল করলাম। আমার মনে হয়েছিল তিনি আমায় দেখতে পাননি বা শুনতে পাননি আমার গালাগালি। কারণ আমি তখন দেখবার বা শোনবার অবস্থায় আর ছিলাম না। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন, তারপর একটা গোলমাল করবার চেষ্টা করতেই সেটা 'গোঁ-গোঁ'র পরিণতিতে থেমে গেল।

আমি তখন থানার দিকে এগোলাম। দাদার বিবেকের প্রতি আমার আর কোন আস্থা ছিল না। মানুষ আজকাল সব পারে, সবরকম নোংরা কাজ করেও নির্বিবাদে সাধু সেজে ঘুরে বেড়ায়। বিবেকের দংশন অনুভব করে না, ভাবে না পরলোকের কথা। তাই আমি নিজেই খবরটা থানায় দিয়ে দেব ঠিক করলাম। দাদার শুভবুদ্ধির জন্যে অপেক্ষা করলাম না।

লিনোকাট্ — সুব্রত ত্রিপাঠী
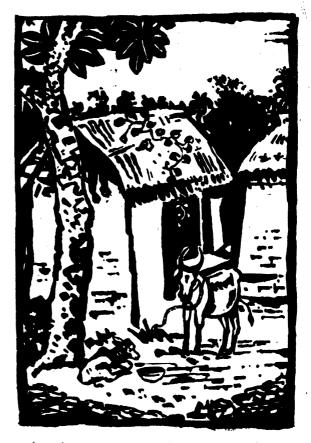
রাস্তায় তখন সবে জল দিয়েছে, ভিজে রয়েছে। আমার নিজেকে খুব হাল্কা আর মুক্ত মনে হচ্ছিল। আমি প্রায় ছুটে চলেছিলাম। পা পিছলে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে, তার ফলে কয়েকটা মন্তব্য শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কেন লোকে মন্তব্য করছিল আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। আমার পদস্খলন তাদের তো' দেখতে পাবার কথা নয়!

অত ভোরে বেশী গাড়ীঘোড়া পথে বেরোয় না। আর সকালে পথঘাট ফাঁকাও থাকে। সকলেই কিছু হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে না পথে। তবু কোত্থেকে একটা গাড়ী এসে আমার কাছেই যেন কাঁচ-কাঁচ করে থেমে গেল। আর—

—'শালা, অন্ধ না কী?'

—'পাগল বোধ হয়!'

—'আরে না-না মশাই, আপনারাও যেমন! রাত্তিরে খুব হয়েছে আর কী, বুঝতে পারছেন না?' ইত্যাদি বিভিন্ন কণ্ঠের কতকগুলো অশোভন উক্তি আমার শ্রুতিতে স্পর্শ করল। টের পেলাম রাস্তার ধারের কয়েকটা বাড়ীর জানলাও খুলে গেল ফটফট করে।

আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে। কোন আহাম্মক পথ চলতে গিয়ে গাড়ীর সামনে পড়েছিল ভেবে তার প্রতি একটা নীরব তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে আমি চটপট থানার দিকে পা চালালাম।

এই যে লাল পাগড়ী বসে রয়েছে। আমি তাকে এড়িয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ঢোকবার সময় একটা দুষ্ট বুদ্ধি জেগেছিল মাথায়। পুলিশটার লাল পাগড়ীটা খপ্ করে তুলে নেব না কি? ও তো

আমার দেখতে পাবে না। কিন্তু অনেক কষ্টে সে-প্রলোভন থামালাম।

থানার ভেতরে ঢুকতেই একটা মেয়েলী কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম আমি। বড়বাবুর ঘর থেকে আসছে।

আমি ঢুকতেই কান্নাটা স্পষ্ট হলো। একটা সুরেই কান্নাটা গোল হয়ে হয়ে ফিরছে। ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের স্পন্দনও ফুলে ফুলে উঠছিল কিছু অস্ফুট ভাব ও ভাষায়।

গলাটা আমার খুব চেনা মনে হলো। এত চেনা যে যদি বৌদিরও হয়, তাতেও আমি কিছু আশ্চর্য হব না। বৌদি! আমি খুব আনন্দিত হলাম। বৌদি তাহলে শেষপর্যন্ত বিবেকের শাসন অবহেলা করতে পারেনি! স্বামীর অপরাধে নিজেই এসেছে সব কবুল করতে!

আমার মনটা একটা ক্রুর আনন্দে ভরে গেল; আমি বিজয়োল্লাসে হাফ-ডোর ঠেলে বড়বাবুর ঘরে ঢুকলাম, ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই দুটো দরজায় আওয়াজ হলো 'খটাস'। আমি একটু ভয় পেলাম। শব্দ হলো কেন? আমি তো মৃত! মৃত মানুষের সঙ্গে শব্দের কি সংযোগ? যা মৃত তা তো শব্দহীন, স্পর্শহীন, আয়তনবিহীন।

ঘরে ঢুকতেই মুহূর্তে যেন সব ঘরটা বোবা হয়ে গিয়েছিল। ক্রন্দন নেই, স্পন্দন নেই, সংলাপ নেই—এমন কি আমার মনে হলো ফ্যানের আওয়াজটা পর্যন্ত এক আকস্মিক মৌনতায় থেমে গেছে। শুধু আছে চোখ। কতকগুলো চোখা চোখা চোখ।

ওরা কি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে—ভাবলাম আমি। ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই অশান্তি বোধ করলাম যেন। একটু বেশী ভয় ভয় করতে লাগল।

—'এই যে সেই'—মোটা আর অস্বাভাবিক ভয়াল গলায় চিৎকার করে উঠল বৌদি। আর, তারপরই ওর গলাটা ঘড়ঘড় করে উঠল। কোন কথা বেরোল না।

—'দরওয়াজা, অ্যারেস্ট হিম্, হাতকড়ী লাগাও জল্‌দী।' বড়বাবুর কণ্ঠে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল। তার দাপটে তিনি কাঁপতে কাঁপতে নিজের আসন ছেড়ে উঠে পর্যন্ত দাঁড়ালেন।

আমায় হাতকড়ি পরাল একটা পুলিশ।

আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমি পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরে রয়েছি। যেখানে জগতের শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—বহু, বহু অবরোধ পার হয়ে ক্ষীণতর শক্তিতে, কোমলতর অভিব্যক্তিতে আমার ইন্দ্রিয়কে আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে শুধু।

আমায় বিচারের জন্যে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো।

অভিযোগ, আমি আমার দাদাকে গলা টিপে খুন করেছি। সজ্ঞানে এবং আগে থেকে সব ঠিক করে। বৌদি সাক্ষী দিল, হ্যাঁ, বরাবরই ওর স্বভাবটা কিরকম যেন! নইলে যে-দাদা ওকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছে, তার এমন সর্বনাশ কেউ করতে পারে! আমার মেসোমশাই সাক্ষী দিলেন। সাক্ষী দিল রাস্তার লোক। খুন করার পর তারা রাস্তা দিয়ে আমাকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় যেতে দেখেছে!

কিন্তু তবু বিচারে আমার কিছুই হলো না।

কেননা, সরকারী ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, আমার মাথা খারাপ। চূড়ান্ত একটা মানসিক অবাবস্থায় ভুগছি আমি। আমার সিজোফেরেনিয়া হয়েছে।

ডাক্তার বললেন, আমি নাকি বরাবরই দুটো মানুষকে আমার মধ্যে লালন করে এসেছি এবং সেই দুই ভিন্নমুখী শক্তির অন্তর্লীন সংঘর্ষে আমি আমার দাদাকে খুন করেছি। হ্যাঁ, যে-দাদা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত।

এখন আমি কাঁকের হাসপাতালে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছি। হয়ত একদিন সম্পূর্ণ ভালোও হয়ে উঠতে পারব। তবে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার একটি নিবেদন আছে। আমার দাদার মতো কাউকে অত ভালবাসবেন না। কেননা, বেশী ভালবাসা মানুষকে শয়তান করে।

এলোপাতাড়ি ইতিহাস

পুলকেশ দে সরকার

পলাশী যুদ্ধের—যুদ্ধ কথাটা অবশ্য প্রচলিত সংস্কারবশত বলা, যুদ্ধ তো আর সত্যিই হয়নি—দশ বছর পর অনেক পরিবর্তন হল কলকাতায়। পুরোনো দুর্গটা সেনাবাহিনী ছেড়ে এল। ওটা হল কাষ্টমস হাউস। আরও নতুন বাড়ী হ'ল। ডাঃ সি-আর-উইলসন তাঁর 'সর্ট হিস্ট্রি অব ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল' প্রবন্ধে (যে প্রবন্ধ থেকেই বেশী উপাদান আমি ব্যবহার করেছি) দুঃখ ক'রে বলেছেন, ঐতিহাসিক অন্ধকূপ স্থানটি রক্ষার জন্য কিছু করা হয়নি। ওটি পুরোনো দুর্গেরই একটি অংশ। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেন্সিয়া লিখেছিলেন যে, ওটা এখন মালগুদামের অংশবিশেষ। এমনই মাল গাদাগাদি ছিল যে তিনি ওটা মোটে দেখতেই পাননি। দুর্গটা এখন কাষ্টমস হাউস। যারা পুরোনো জীর্ণ দুর্গটা পছন্দ করেননি তাঁরা এই অন্ধকারাঘরটিও বিস্মৃত হয়েছিলেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, ইংরেজ বানিজ্য বা বণিকের মনে পরে যাকে আতস কাচ দিয়ে খুব বড় ক'রে দেখা হয়েছে তা খুব স্থায়ী দাগ কাটতে পারেনি —তাই অনায়াসে সেটি মালগুদামে চাপা পড়তে পেরেছিল। যাও বা কিছুদিন ওর শারীরিক অস্তিত্ব ছিল মার্কুইস অব হেস্টিংসের আমলে তাও গেল—দুর্গ ও অন্ধকূপ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল—তারপর ইংরেজের উত্থান ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকূপের কল্পনা পল্লবিত হতে থাকল। ১৮১৯ সালে যখন সেখানে কাষ্টমস হাউসের ভিত-প্রস্তর স্থাপিত হ'ল তখন সকলেই কলকাতার এই উন্নয়নে হর্ষ প্রকাশ করল। অন্ধকূপে স্থানটি পর্যন্ত থাকল না ব'লে সেদিন কেউ দুঃখ প্রকাশ করেনি।

কিন্তু ডঃ উইলসনের আরও দুঃখের কারণ হ'ল হলওয়েল উদ্যোগী হয়ে যে স্মৃতিসৌধ তুলেছিলেন তাও আমল পায়নি। হলওয়েল নিজের খরচায় অন্ধকূপ কারার মৃতদের কবরে এই সৌধ তুলেছিলেন। ৪৬ ফুট উঁচু। দুই দিকে পাথরে উৎকীর্ণ ছিল মৃতদের নাম। যে বিজয়ের মধ্যে এর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল তারও উল্লেখ ছিল। ৬০ বছর কলকাতার লোকের নজরে ছিল ঐ স্মৃতিসৌধ। পুরোনো মানচিত্রে এর স্থান আছে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এর উল্লেখ করেছেন। তবে গেল কি ক'রে? ডঃ উইলসন বলছেন, হলওয়েল এর জন্য কোন তহবিলের ব্যবস্থা ক'রে যাননি। বিনাশের বাকি কাজটুকু করেছে কলকাতার জল-বায়ু। একবার নাকি বজ্রপাত হয়েছিল, অন্তত কিংবদন্তী তাই। পরবর্তী প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, কি নিদারুণ ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা! শহরের বুকে এক শোকাবহ আকৃতি। ১৮২১ সাল ওকে সজ্ঞানে ভূমিসাৎ করা হ'ল। ক্যালকাটা জার্ণালে মন্তব্য হ'ল, আমাদের মতে অনেকদিন আগেই এ ভেঙে ফেলানো উচিত ছিল। ইংরেজদের এক ভয়াবহ দুর্গতির স্মৃতি চির-জাগরুক রাখার মধ্যে কোন কল্যাণ আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু আর একজন লেখক বলেছেন, এ পাপাচার।

তারপর আরও ৮০ বছর আর কোন স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়নি। জায়গাটার কথা পর্যন্ত লোকে ভুলে গেল। মার্শম্যান, লঙ প্রভৃতি ভাল ভাল লেখক মাঝে মাঝে তাঁদের লেখায় এই শহরের পুরোনো কাহিনী বলেছেন; কিন্তু সাধারণের ভেতর এর কোন প্রভাব পড়েনি। নতুন জেনারেল পোষ্টাফিস নির্মাণের পর ১৮৮০ সালে একটা প্রস্তাব উঠেছিল।

পোষ্ট অফিসের পূবের বারান্দায় দুটো স্তম্ভের মাঝখানে একটা স্মৃতি-ফলক সংলগ্ন করার কথা হয়। ধারণা হয়েছিল এখানেই নিশ্চয় সেই অন্ধকূপ কারাকক্ষটি ছিল। তাও হয়নি। ডঃ উইলসন বলছেন, তাতে দুঃখের কিছু নেই, কেন না প্রস্তাবিত জায়গাটাও ভুল এবং পরিকল্পিত ফলকটিও ছিল উদ্ভট।

কোথায় এই অন্ধকূপ হয়েছিল সে স্থানটি নির্ণয়ের জোরালো চেষ্টা হয় ১৮৮৩ সালে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিঃ আর, আর, বেইন এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পড়েন। ফেয়ারলি প্লেসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর অফিস ভবন তৈরীর সময় সেই দুর্গের উত্তর প্রান্তীয় ভিত্তিটা তাঁর নাকি নজরে পড়ে। ডাঃ উইলসনের বর্ণনায় দেখা যায়, তার প্রাচীর 'নদী পারের ছোট্ট গেট, অস্ত্রাগার নোট করতে করতে মিঃ বেইন এগোতে থাকেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণের পর তিনি আগে যারা এর বর্ণনা দিয়ে গেছেন তাঁদের বর্ণনার সঙ্গে তাঁর রেখা মিলিয়ে দেখেন। তিনি ওরমের ইতিহাসে এর বর্ণনা অভ্রান্ত ব'লে ধরে নিয়েছিলেন। ওরমের নক্সায় ভুল চোখে পড়লেও তিনি তা উপেক্ষা করলেন। তিনি আরও ধরে নিয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব কোণের সাদৃশ্য আছে। ব্রিটিশ যাদুঘরে দুর্গের যে বড় নক্সা পাওয়া গেছে তার সঙ্গে এ ধারণার মিল নেই। এই ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে তিনি সঠিক জায়গাটায় পৌঁছাতে পারেননি বটে কিন্তু ওর কাছাকাছি, ওরই সংলগ্ন

জায়গা পর্যন্ত পেণছোতে পেরেছিলেন। এই হচ্ছে উইলসন সাহেবের সিদ্ধান্ত। মিঃ বেইন হলওয়েলের স্মৃতিসৌধ স্থানটিরও নিশানা দিতে পারেননি।

সেকালের ইংরেজদের— পরবর্তীকালে যাকে এত বড় একটা দুর্ঘটনা বলে প্রচার করা হ'ল তার জন্য—কেন যে আবেগ প্রকাশ পায়নি এবং অন্ধকূপ বা স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হ'তে দিল সহসা তার কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। স্মৃতিসৌধ নিশ্চিহ্ন হবার পর ৮০ বছর কি বিচক্ষণ ইংরেজ রাজনীতিকের অভাব ঘটেছিল। এটি রহস্যময়।

কিন্তু মিঃ বেইনের প্রচেষ্টার পর ইংরেজ রাজনীতিকেরা যেন মুক্ত আবেগে জেগে উঠলেন। মিঃ বেইনের প্রস্তাব ছিল আর কিছুটা খুড়লে—শ' তিনেক টাকার মতো খরচ পড়তে পারত—হয়তো বা গোটা অজ্ঞাত স্থানটিই উদ্ঘাটিত হ'তে পারত। এশিয়াটিক সোসাইটি কিন্তু কথাটা মেনে নিলেন। বাংলা সরকারের কাছে টাকা চাওয়া হ'ল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে খননের কাজ সুরু হ'ল, পোষ্টাফিসের পূব দিককার গেটের ভেতরে রাস্তা খুড়ে অন্ধকূপের স্থান পাওয়া গেল বলে অনুমান করা হল। চারটি প্রাচীরও নজরে পড়ল। কোন সন্দেহ রইল না এই সেই। ডাঃ উইলসন বলছেন, আসলে ওটা ছিল পূব কোণে যাবার সিঁড়িপথ। ত হোক। তাঁরা নিঃসংশয় ছিলেন; তাই গর্তগুলো ভরে তার ওপর কালো পাথরের একটা চত্বর করা হ'ল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এক মর্মরফলক পোষ্টাফিসের পূব দরজায় উৎকীর্ণ হলঃ এর কাছাকাছি ঐ যে পাথরে চত্বর, ওটি ফোর্ট উইলিয়ামে অন্ধকূপের স্থান ও আয়তন চিহ্নিত করছে—ইতিহাসে তারই নাম কলকাতার অন্ধকূপ। মিঃ বেইন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে অফিসেও একটি ফলক বসালেন। মিঃ বেইন একবার তামার চাঁদোয়ায় একটি মর্মর-সৌধ নির্মাণেরও প্রস্তাব করেছিলেন। পরে তিনি মত পরিবর্তন করেন।

আসল সমস্যাটি থেকেই গেল। আগেকার হলওয়েল স্মৃতিসৌধের স্থান আবিষ্কারের সমস্যা। একটা দশ ইঞ্চি জলের পাইপ বসানো নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির সুযোগে তিনি পুরোনো দুর্গের সেই গেটটার কাছাকাছি প্রায় পেণছে গেছলেন— কিন্তু তাঁর মাথা তখন এই কথাটা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে যে, গেটটা আরও দক্ষিণে হবে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ড্যালহৌসী স্কোয়ারে আরও খোঁড়াখুঁড়ি করেছেন, অনেক পণ্ডশ্রম হয়েছে। অকস্মাৎ ১২ বর্গ ফুটের একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেল, স্থির হ'ল ঐটিই হলওয়েল সৌধের স্থান। বলা বাহুল্য একথাও বুঝতে দেরী হ'ল না যে, ঐটুকু ভিত্তির ওপর অতবড় সৌধ দাঁড়াতে পারে না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আরও অনুসন্ধান হ'ল এবং মিঃ বেইনের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণাও হ'ল। এই অনুমানের জায়গাটি লর্ড ও লেডী ডাফরিনকে দেখানো হল। স্বভাবতই বড়লাট চাইলেন যে ওখানে একটা স্মৃতিসৌধ উঠুক। কিন্তু জায়গাটা কি ঠিক? মিঃ বেইনের অনুমানের জায়গা ছিল কারুকার্যখচিত ল্যাম্পপোষ্ট অথবা ওরই কাছাকাছি। কথা উঠল ঐ ল্যাম্পপোষ্ট সরিয়ে যখন স্যার এস্লি ইডেনের মর্মরমূর্তি বসানো হবে তখন জায়গাটা ভাল ক'রে খোঁড়া হবে। মর্মরমূর্তিটি ঠিকই বসানো হয়েছিল কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ির উদ্যোগীরা তখন কেউ ছিলেন না; সুতরাং ও কাজটি আর হয়নি।

এরপর বৃটিশ যাদুঘরে পুরোনো কলকাতার একটা বড় মানচিত্র পাওয়া গেল। ১৭৫৩ সালের, অর্থাৎ পলাশী হাঙ্গামার চার বছর আগেকার। কিন্তু খুব বড় ম্যাপ—এক এক ইঞ্চি এক একশ ফুটের সমপরিমাণ। কর্ণেল স্কটের পরিকল্পিত দুর্গ দেখাবার জন্য এটি এ'কেছিলেন কোম্পানীর গোলন্দাজ দলের মিঃ ওয়েলস। কিন্তু ওতে পুরোনো দুর্গটিও বেশ বিস্তারিত দেখানো ছিল। এর একটি ফোটো এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলকে দেওয়া হয়।

বাংলার লেঃ গভর্ণর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলি অন্ধকূপ সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়লেন। তাঁর অনুরোধে চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ই, জে, মার্টিন বিশদ ইতিহাস দিয়ে এক নোট তৈরী করলেন। একটা নক্সাও পেশ করা হল। কিন্তু কিছু মতদ্বৈধের দরুণ এ কাজটি আর এগোয়নি। ঐ যে সেই বড় মানচিত্র তার একটা নকল পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টেও দেওয়া হয়েছিল। আশা ছিল যে, কলকাতা কালেক্টরেট ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় যখন খননের কাজ হবে তখন এই মানচিত্রটি কাজে লাগবে, পুরোনো দুর্গের কাঠামোটা ধরা যাবে হয়তো। কিন্তু ১৮৮১ সালে কাষ্টমস হাউসের প্রাচীর ভাঙ্গার সময় বা নতুন প্রাচীর তোলার সময়ও এ কোন কাজে লাগানো হয়নি। কিন্তু চার দেওয়ালের মাঝে একটা চৌকোনা কক্ষ যেন আবিষ্কৃত হল। জনসাধারণের কৌতূহল এত বাড়ল যে, কাগজে এ সম্পর্কে অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়ে পত্রাঘাতও হতে লাগল।

এর পর ১৮৯১ সালে ডঃ উইলসন এসিয়াটিক সোসাইটির মানচিত্র নিয়ে অগ্রসর হলেন। বহু ধৈর্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে করতে তিনি অন্ধকূপের স্থান সম্পর্কে নিঃসংশয় হলেন। ১৮৯৫-৯৬ সালে পোষ্টাফিসের রেকর্ড রাখার পুরোনো বাড়ীটা ভেঙ্গে ফেলার পর ডঃ উইলসন তাঁর নিঃসংশয় সিদ্ধান্তকে আবার যাচাই করলেন। তাঁর কাছে পুরোনো কেল্লার গোটা গঠনটাই স্পষ্টতর হ'য়ে গেল।

এখন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কথা। ১৮৮০ সাল থেকে নানা প্রস্তাব হয়েছে; কিন্তু স্থান সম্পর্কে নিঃসংশয় না হওয়াতেই সরকার তেমন উদ্যোগী হতে পারেননি। এবার সে প্রশ্ন নেই। ১৯০০ সালের প্রথমভাগে ২৮শে ফেব্রুয়ারী জেনারেল পোষ্টাফিসের প্রাঙ্গণে এক

বিশেষ সভা হল এবং লর্ড কার্জ্জন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট কার্জ্জন নিজে জায়গাটা দেখলেন; স্থির হ'ল পোষ্টাফিসের বড় গেটের গাঁথুনিটা অপসৃত করতে হবে—যেন সেই বন্দী-শালাটি সহজেই প্রত্যক্ষ হয়। ঐ জায়গাটা কালো পালিশের মর্ম্মর দিয়ে বাঁধানো হবে, চারদিকে রেলিং থাকবে আর দেওয়ালের ওপর শ্বেত মর্ম্মর উৎকীর্ণ থাকবে। আরও স্থির হল স্যার এস্‌লি ইডেনের মূর্ত্তিটি ড্যালহৌসী স্কোয়ারেরই আর এক জায়গায় নেওয়া হবে আর মূল জায়গাটায় হলওয়েল সৌধের একটি অনুকৃতি স্থাপন করা হবে।

ডঃ উইলসন ১৯০১ সালে তারই রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তখন নিশ্চয়ই কেউ ভাবতে পারেননি যে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বৃটিশ শাসনের মধ্যেই একদল শিক্ষিত বাঙ্গালী ইতিহাসবিদের অভ্যুত্থান হবে যাঁরা এই অন্ধকূপ কাহিনীটাকেই একেবারে ভিত্তিহীন করে দেবেন। পরাজিত সিরাজ মূঢ় হ'তে পারেন, তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে এমন একটা কাহিনী জড়িয়ে দেওয়ারও হয়তো অবকাশ ছিল, কিন্তু যে 'দুর্ঘটনা' সেকালের ইংরেজেরাই ভুলে গেছল, এমন কি, স্মৃতিচিহ্ন পর্যন্ত চোখের সুমুখেই বিলুপ্ত হতে দিয়েছিল, তাদেরই উত্তরপুরুষেরা এদেশে দৃঢ়মূল হবার পর যে পল্লবিত কাহিনী মহা আড়ম্বরে প্রচার করল, এখানকার বুদ্ধিজীবীরা সেই কাহিনীকেই অবিশ্বাস্য বলে করল চ্যালেঞ্জ এবং পাল্টা এক আন্দোলন সুরু হ'ল। পরাধীন জাতির প্রতিবাদ অবশ্যই দীর্ঘকাল ক্ষীণ ও অনিয়মিত হয়েছে; কিন্তু অক্ষয় মৈত্রেয় প্রমুখ ইতিহাসবিদের সুযুক্তিকে অবলম্বন করে একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রবলতর আন্দোলনে ড্যালহৌসী স্কোয়ারে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবী জানাতে লাগলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হবার আগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। ইংরাজ স্বেচ্ছাবশে ঐ সৌধকে অপসারণ করেনি; কেননা, ও ছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসকশক্তির দম্ভস্তম্ভ। ওদের হাত থেকে শাসনদণ্ড স্খলিত হবার পর নতুন সৌধটিও ড্যালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। আজ অন্ধকূপ হত্যার পুরোনো দুর্গও নেই, প্রায় দেড়শ বছর পর সে স্মৃতিকে জাগাবার চেষ্টায় যে আর একটি সৌধ রূপপরিগ্রহ করেছিল তাও নেই। ইতিহাসের কি নিদারুণ ভাঙ্গা-গড়া!

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

নবম আসর

ক্রিয়াপদের রূপ—পূর্বপক্ষ

চলতি ভাষায় লিখতে গেলে ক্রিয়াপদের বানান নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোল বাধে। সাধু ভাষায় করিতেছি, করিয়াছি, করিতেছিলাম, করিয়াছিলাম দিব্যি লিখে যাই। সাধুভাষার ক্রিয়াপদের বানান নির্দিষ্ট পদের বিকল্প রূপ নেই বললেই হয়। কিন্তু চলতি ভাষায় স্বেচ্ছাচার চলে। এক 'করিতেছি'র চলতি রূপই কতরকম হয় দেখুন না!—ক'র্চি, কর্চি, কোর্চি, ক'র্চ্ছি, কর্চ্ছি, কোর্চ্ছি, ক'র্চি, কর্চি, কোর্চি ইত্যাদি নানান রূপ হতে পারে। র রেফ তুলে দিয়েও কেউ কেউ কচ্ছি কচ্চি লেখেন। আবার রয়ে হসন্তও দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, কর্‌ছি, ক'র্‌ছি, কোর্‌ছি, কর্‌চি, ক'র্‌চি, কোর্‌চি ইত্যাদি। এক লেখকের হাতেই একাধিক রূপ বেরোয় এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সেটা কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন, অনেকে করেননি। পদ্ধতিটা যে কি তা-ও সকলে জানেন না। এই আসরে সে বিষয়ে একদিন আলোচনা করা যেতে পারে। পাঠকদের শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করেছিল এবং একালকার মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের সকল গ্রন্থে (যেমন, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে) সেই পদ্ধতিই প্রধানতঃ অনুসৃত হয়েছে। আজকের আসরে সেই পদ্ধতি অনুসরণেই বানানের আদর্শ নিরূপিত হবে।

প্রশ্নের উত্তর আটটি শুদ্ধ হলে খুব ভাল।

কোনো ক্রিয়াপদের আদর্শ রূপ একাধিক হতে পারে। শ্রেষ্ঠতার তারতম্য বিচারে উত্তরগুলি সাজাবেন। যেমন, প্রশ্নঃ তুমি কাপড় পরিবে। 'পরিবে' ক্রিয়াপদের চলতি রূপ কি হবে? পরবে, পর্‌বে, পর্ব্বে, পর্বে, পোরবে, পোর্‌বে, পোর্বে, পোর্বে, প'রবে, প'র্‌বে, প'র্বে, প'র্বে—কোন্‌টি বা কোন্ কোন্‌টি ব্যবহার করা উচিত? উত্তর: পরবে, প'রবে।]

১· করিতেছিলে।

চলিত গদ্যে এই ক্রিয়াপদের আদর্শ রূপ কি? করছিলে, কর্চ্ছিলে, করতেছিলে, কর্‌তেছিলে, কর্‌ছিলে, কচ্ছিলে, কোচ্ছিলে, কোর্চ্ছিলে, কোর্ছিলে, ক'র্ছিলে, ক'রছিলে, ক'র্‌ছিলে—কোন্‌টি?

২· হইত।

চলতি গদ্যে কি হবে? হত, হ'ত, হোতো, হোত, হতো, হ'তো, হো'ত—কোন্‌টি?

৩· Do you come to Sehool everyday? তুমি কি রোজ ইস্কুলে—? কি দিয়ে ফাঁক পূরণ করব? আস, আসো, এস, এসো, আ'স, এ'স—কোন্‌টি?

৪· নদী বহিবে। 'বহিবে' চলতিতে কি হবে? বইবে, বোইবে, বৈবে, ববে, ব'বে?

৫· সাধু ভাষার 'উঠিও' (যেমন, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিও) চলতিতে কি হবে? উঠ, উঠো, ওঠ, ওঠো, ও'ঠ, ও'ঠো?

৬· গ্রামের লোকেরা চোরটাকে ধরিয়া বেদম পিটাইল। 'পিটাইল'-এর চলতি রূপ কি হওয়া উচিত? পিটাল, পিটালো, পেটালো, পেটাল, পিটোল, পিটোলো?

৭· 'ঘুরাইতেছ'র চলতি রূপ কি হবে? ঘুরাচ্ছ, ঘোরাচ্ছ, ঘুরোচ্ছ, ঘুরচ্ছ, ঘুরুচ্ছ, ঘুরোতেছ?

৮· সত্য কথা বলিব তাহাতে বন্ধু যদি বিগড়ায় তো বিগড়াউক। 'বিগড়ায়' ও 'বিগড়াউক' চলতিতে কি রূপ হবে?

(১) বিগড়ায়, বিগড়য়, বিগড়োয়, বিগড়ে, বিগ্‌ড়ায়, বিগ্‌ড়য়, বিগ্‌ড়োয়, বিগ্‌ড়ে, বেগড়ায়।

(২) বিগড়াক,-ক্‌, বিগ্‌ড়োক,-ক্‌, বিগড়ক, বিগ্‌ড়ক, বিগড়ক, বিগ্‌ড়ক, বেগড়াক। সর্বত্র ক-এ হসন্ত দিয়ে আরও একটা করে অতিরিক্ত রূপ হতে পারে।

৯· 'উলটাইবার'—চলতি রূপ কি? ওলটাবার, উল্টাবার, উলটোবার, উলটবার, ওলটবার, ওল্‌টাবার, উল্‌টাবার, উল্‌টোবার, উলটবার, ওল্‌টবার, ওল্টবার, উল্টোবার, উল্টোবার, উল্টবার, ওল্টবার।

১০· পাঠশালায় বসিয়া ছেলেরা নামতা আওড়াইতেছে। 'আওড়াইতেছে'—এর চলতি রূপ কি? আওড়াইতেছে, আউড়াচ্ছে, আওড়াচ্ছে?

দেশে বিদেশে

॥ পুজো ॥

এবার কলকাতায় পুজামণ্ডপের সংখ্যা হচ্ছে আঠারো হাজারের কিছু বেশী। তার মধ্যে সর্বজনীনের সংখ্যা হচ্ছে ৬২৮, আর, ব্যক্তিগত পুজার সংখ্যা ১২০০।

পুজোর সময় হৈ-হুল্লোর সুযোগে কেউ অনিষ্ট না করতে পারে এবং শান্তি ও শৃংখলা বজায় থাকে এজন্য পুজোর তিনদিন ৫০০০ পুলিশ মোতায়েন থাকবে শহর এলাকায়; বিসর্জনের দিন পুলিশের সংখ্যা হবে দ্বিগুণ—১০ হাজার।

সর্বজনীন পুজোগুলোর মধ্যে আটটিতে সবচাইতে বেশী ভীড় হয়; সে সব জায়গায় পুলিশের অস্থায়ী ফাঁড়ি বসবে একটা করে; এগুলো হচ্ছে বাগবাজার, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, গিরিশ পার্ক, ফায়ার ব্রিগেড-স্টেশন, পার্ক-সার্কাস, সংঘশ্রী, ২৩শের পল্লী, সিমলা ব্যায়াম সমিতি।

গতবারেও অনুরূপ সংখ্যক পুজো হয়েছিল এবং তাতে সর্বসাকুল্যে ২০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল।

সকলকার সহযোগিতার জন্য কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান, ফায়ার সার্ভিস, পোর্ট কমিশনার্স, ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন, ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী, কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী, পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়েছে লালবাজারে।

সতর্কতার দিক থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৬৭৯ জন দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোককে আটক রাখা হয়েছে; ৫ জনকে গুন্ডা আইনে ধরা হয়েছে। পুজো দেখতে গেরস্থরা যাতে বেরোতে পারেন, তেমন পাহারারও আয়োজন করা হচ্ছে।

॥ প্রাট ॥

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ভেরওর্ডকে যিনি হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন সেই ধনী ইংরাজ চাষী ডেভিড বেরেসফোর্ড প্রাট আত্মহত্যা করেছেন। হত্যার চেষ্টা ও আত্মহত্যার মধ্যে এই ব্যবধান-কালটুকু তিনি ছিলেন এক মনোবিকার চিকিৎসার হাসপাতালে। ১লা অক্টোবর দেখা যায়, তাঁর গলায় একটি চাদর বাঁধা। এই দিনটি তাঁর ৫৪-তম জন্ম-দিবস। গত বছর ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁকে সুপ্রীম কোর্টের জজ মৃগী রোগগ্রস্ত ও মনোবিকারগ্রস্ত বলে ঘোষণা করলে প্রিটোরিয়া জেলে পাঠানো হয়। এক মাস পর তাঁকে এক মনোবিকার চিকিৎসার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পুলিশ বলছে, এই বছরের ১৯শে জানুয়ারী তাঁকে এক দন্ত-চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি পালাতে চেষ্টা করেন। যে দু'জন ওয়ার্ডার তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল তারা তাঁকে ধরে ফেলে। প্রাটের দুই বিয়ে; প্রথম পক্ষের একটি ২৩ বছরের মেয়ে আছে, দ্বিতীয় পক্ষে দুটি সন্তান আছে।

দেখা যাচ্ছে হত্যার চেষ্টা ও আত্মহত্যার মধ্যে কালের ব্যবধান এক বছর, কিন্তু মানসিক ব্যবধান সামান্যই। হত্যা (এক্ষেত্রে হত্যার চেষ্টা) ও আত্মহত্যা—একই মানসিকতা থেকে উদ্ভূত; সামান্য অবস্থার ভেদে এক মানসিক আচ্ছন্নতা থেকে আর এক মানসিক আচ্ছন্নতায় পরিবর্তনে দুই রূপে প্রকাশ পায় মাত্র। যে হত্যা করতে পারে সে আত্মহত্যাও করতে পারে, যে আত্মহত্যা করতে পারে, সে হত্যা করতে পারে। আপাতঃবিরোধী এই মানসিক প্রকৃতি মূলত এক।

॥ দেশাই ॥

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অর্থসংগ্রহের সফরে বেরিয়েছেন। তিনি এখন আমেরিকায়। ঘুরতে ঘুরতে তিনি ১লা অকটোবর (নিউইয়র্কের) প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তাঁকে সেখানে অকস্মাৎ গীর্জায় ধর্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করা হয়।

শ্রীদেশাই কোনদিন গীর্জায় যাননি। সুতরাং তাঁর সেখানে উপস্থিতি বিস্ময়োদ্রেক করে। তাঁকে ধর্মোপদেশ দেবার জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এই অনভ্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম যে, একজন অ-খৃষ্টানকে বেদীতে ধর্মকথা শোনাবার জন্য আহবান করা হ'ল।

ও'রা তো জানেন না, ভারতবর্ষে ধর্মঅর্থকামমোক্ষ ব'লে চতুর্বর্গ আছে; পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যিনি অর্থমন্ত্রী তিনি ধর্মকথাও ভাল জানেন। আশা করা যায়, এবার আমাদের অর্থমন্ত্রীর সফর নিরর্থক তো হবেই না, ধর্মার্থে সার্থক হ'য়ে উঠবে।

॥ পশুক্লেশ ॥

আমরা ইংরাজীতে যাকে সি এস পি সি এ বলি এবং বাংলায় যাকে পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি বলি (যদিও বলি না, ইংরাজীটাই বলি), তার শতবর্ষ পূর্ণ হল ৪ঠা অকটোবর। এই দিনটিই আবার পশুদের বিশ্ব-দিবস।

১৮৬১ সালে মিঃ কোলেসওয়ার্দি গ্রান্ট মার্কুইস স্ট্রীটে তাঁর নিজ ভবনে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সংস্থাটি রাধাবাজার স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। বহুবাজার বা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে ২৭৬ নম্বরের বাড়ীটি ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। (প্রথম ইউরোপ বা বিশ্ব-যুদ্ধের দু'বছর আগে)।

৪ঠা থেকে এর শতাব্দী উদযাপন শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে একটি সভা ও প্রমোদানুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছে। প্রমোদানুষ্ঠানে লব্ধ অর্থ সমিতির পশু হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্সে দেওয়া হবে।

বলা বাহুল্য সভায় বক্তৃতা বা প্রমোদানুষ্ঠানে গান-বাজনা-নৃত্য মানুষেরাই করছে; মানুষেরাই শুনছে। এখানে পশুদের কোনো ভূমিকা থাকছে না; এদের মিছিল হচ্ছে না, সমাবেশ হচ্ছে না, গলা ছেড়ে হাঁক-ডাকের সুবিধে ক'রে দিতে একদিনের জন্য ময়দানটাও ওদের হাতে দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি, ওদের ক্লেশ নিবারণে যে সংগীত-নৃত্যের আয়োজন হ'ল সেখানে শ্রোতা হিসেবেও ওদের প্রবেশ নিষেধ। আহা!

॥ কবর ॥

কবর থেকে মৃত জামাই নিজেই উঠে এলেন; একেবারে জ্যান্ত। আর সে কবরে গেলেন শাশুড়ী; একেবারে মৃত।

খবরটা বিদেশের। রবার্টো রোড্রিগুয়েজ হৃদরোগে মারা গেলেন। তাঁকে কফিনে রেখে ধরাধরি ক'রে কবরের গহ্বরে নামানো হ'ল। এবার কবরস্থ করার পর্যায়ক্রম। যারা কবর খুঁড়েছিল, তারা এক কোদাল মাটি কবরে ফেলতেই

কফিনের ঢাকনা খুলে গেল, মৃত গুড়ি-গুড়ি কবর বেয়ে উঠে এলেন এবং তারপর চীৎকার চেঁচামিচি গালমন্দ করতে করতে বাড়ীর দিকে দৌড়। তিনি জামাই।

জামাইয়ের এহেন অবস্থা দেখে শাশুড়ী তাজ্জব, হতবাক। তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, কবরের পাশেই এলিয়ে পড়লেন—একেবারে মৃত। জামাইয়ের কবরেই তাঁকে রাখা হবে। অবশ্য তার আগে ডাক্তারেরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অভ্রান্ত হ'তে চান। আর কেন ঢাকনা খুলে মৃত বেরিয়ে আসে এবং আর একজনের মৃত্যুর কারণ হয়।

আমরা ভাবছি কবরখানার কবরও কি ভয়ানক। একবার মুখব্যাদান করল তো একটিকে না নিয়ে মুখ বুজল না। আরো ভাবছি, জামাই এবার একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখতে পারবেন এবং তার নাম হবে "কফিনে কিছুক্ষণ", অথবা "মৃত্যুর মুখোমুখি"। প্রকাশকেরা এখনই আগাম টাকা পাঠিয়ে দিতে পারেন—এর বিক্রী হবে দেদার; আর এক বইয়েই রবার্টো রে ডুরগুয়েজ বিশ্ববিখ্যাত। তারপর যা লিখবেন তাই সোনা।

॥ জীবনবীমা ॥

জীবনবীমা করপোরেশনের যে চতুর্থ বাৎসরিক রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৬০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরে নতুন কাজের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় ১৬·১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; আলোচ্য বছরে পলিসির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭ লক্ষ ১৩ হাজার; বোনাস সহ বীমার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২৮৫ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালের তুলনায় বীমার পরিমাণ বেড়েছে ৩২৭ কোটি। জীবনবীমা তহবিলের টাকা হয়েছে ৫৬০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা; ১৯৫৯ সালের তুলনায় ৫৫ কোটি ৬৩ লক্ষ বেশী। ১৯৫৯ সালে লগ্নীর পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ৪ লক্ষ ১৯৬০ সালে হয় ৬৩ কোটি ৬২ লক্ষ। জীবনমেয়াদী পলিসির হার ১৯৬০ সালে হয় শতকরা ৮·৯৬; এণ্ডাউমেণ্ট পলিসির হার শতকরা ৬৬·৫৭।

॥ আবহাওয়া ॥

রোমে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলন হ'য়ে গেল। সেখানে এই অভিমত ব্যক্ত হল যে, আমাদের পৃথিবী গত ২০ বছরে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়েছে। আমেরিকার আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ বলেছেন ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ অবধি পৃথিবীর তাপ ক্রমশঃ বেড়ে গেছে, তারপর থেকে গড়পড়তা তাপ আধ ডিগ্রী ফারেনহাইট হ্রাস পেয়েছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এর লক্ষণ সব চাইতে প্রকট; আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলে কিন্তু তাপ বৃদ্ধির লক্ষণ এখনও অক্ষুন্ন। বৃটিশ আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ১৮৫০ সাল থেকে সামান্য তাপ বৃদ্ধির ফল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে; বরফাস্তরণ সংকুচিত হয়েছে, আইসল্যাণ্ডে এখন বার্লি হয়। সোভিয়েট আর্কটিক বন্দরগুলো ছ' মাসের বদলে তিন মাস বরফাচ্ছাদিত থাকে। স্কাণ্ডিনেভিয়ার স্প্রুস ও পাইন গাছগুলো উচ্চতর হয়েছে, গ্রীনল্যাণ্ডে ঠাণ্ডা মাছের প্রাচুর্য ঘটেছে।

বাস্তবজীবনের সঙ্গে এই ঠাণ্ডা-গরম আবহাওয়ার বেশ মিল আছে। আলজেরিয়া - কিউবা - কঙ্গো - বার্লিন-সিরিয়া প্রভৃতি এলাকায়ও পরমাণবিক বিস্ফোরণে যেমন তাপ বৃদ্ধির লক্ষণ, জীবনধারণের দ্রব্যমূল্যের অপ্রতিরোধ্য ঊর্ধ্বগতি তেমনি শরীরের রক্ত হিম ক'রে দিচ্ছে। ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ সালের তাপ বৃদ্ধিটিও জার্মান ইতিহাসে পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে আশ্চর্য মিলে গেছে।

॥ ট্রাম ॥

ট্রাম-বাস যাত্রীদের আর একটি দুঃসহ দিন গেল। ট্রাম-কর্মীরা পূজা বোনাসের দাবীতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করেন, ৪৫০ ট্রামের মধ্যে রাস্তায় একটিও ট্রাম বেরোয় না, অফিসে মান্থলী টিকিট বদলাবার শেষ দিনেও টিকিট বদলানো সম্ভব হয় না। ট্রাম না থাকায় অনুমান দশ লক্ষ ট্রামযাত্রীর চাপ গিয়ে পড়ে বাসগুলিতে (অবশ্য কিছু মানুষ হেঁটেও যায়)। বাস-ট্রাম এমনিতেই অফিসবেলা বা অফিস ছুটিতে যাত্রীদের ওঠা দুঃসাধ্য; তার ওপর একটি অচল; ফলে সচলটির ওপর যত চোট এবং আসল চোট নিরুপায় যাত্রীদের ওপর। এতে ট্রাম-কর্তৃপক্ষের কিছু (অনুমান ৮০ হাজার টাকা) লোকসান হতে পারে, কিন্তু যেহেতু এটি একচেটিয়া ব্যবসায়, কোন-না-কোন রকমে এ লোকসান হয়তো পুষিয়েও যেতে পারে। ট্রাম-কর্মীদের হয়তো একদিনের বেতন লোকসান হতে পারে। কেননা, রাজ্য-কর্তৃপক্ষ এ প্রতীক ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা করেছেন; কিন্তু বোনাস পেলে বা অতিরিক্ত কাজ করলে এ লোকসানও হয়তো তাঁরা সইতে পারবেন; কিন্তু যাত্রীসাধারণের? যে দুর্ভোগ গেল তারও কোন প্রতিকার নাই, যে লোকসান হল (ট্রাম মান্থলী থাকতে বাসের টিকিট কিনতে হল, ট্যাক্সি করে যেতে হল) তাও পুষিয়ে নেবার কোন উপায় নেই। বোনাস পেলে সার্ভিস ভালো হবে এমন প্রতিশ্রুতি নেই—বোনাস না দিলেও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে না। অর্থাৎ, জনসাধারণ বা জনসাধারণের দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা ও লোকসানকে কেউ গ্রাহ্য করে না; তাদের আর্থিক লোকসান, শারীরিক লোকসান। আসলে বোনাসটা তাদের কাছ থেকেই আদায় করেন কর্মীরা। এমন তো শুনি না যে, গাড়ী চালিয়ে যাত্রীদের কষ্ট লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি দিলেন, কিন্তু ভাড়া না নিয়ে (বা সেদিনকার মজুরী না নিয়ে) অভিনব প্রতীক ধর্মঘট কর'লেন! তাহলে বোঝাপড়াটা সরাসরি হ'ত; বাজনায় বাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়া যাত্রীসাধারণের প্রাণ কণ্ঠাগত হ'ত না।

॥ বেড়াল ॥

ইংলণ্ড অন্তর্গত সাসেক্সের এক গৃহিণীর একটি বেড়াল আছে। বেড়ালটির নাম ব্লাস এবং ইংলণ্ডে এই বেড়ালটিই হচ্ছে বৃহত্তম। এর ওজন ২ ষ্টোন (২৮ পাঃ বা প্রায় চৌদ্দ সের) এবং তার আয়তন নাক থেকে লেজ অবধি ৩৯॥ ইঞ্চি (৩ ফুট ৩॥ ইঞ্চি)।

গৃহিণীর নাম শ্রীমতী আইলিন ও'নীল। বেড়ালের বয়স ১২ বছর। এর কোমরের মাপ হচ্ছে ২৭ ইঞ্চি (২ ফুট ৩ ইঞ্চি)। থুৎনি ঘুরিয়ে কান বরাবর মাথার পরিমাপ ১৪ ইঞ্চি।

এত আহ্লাদ যে, সে স্যালমন ছাড়া আর কোন মাছ ছোঁয় না, দুধের ক্রীমটুকু শুধু খায়।

॥ অতিকায় ॥

ভারত মহাসাগরে ৯,৭৪৫ ফুট তলদেশে এক অতিকায় জলজীবের বিচরণ-পথ আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানে এযাবৎ অতিকায় জলজীবের অস্তিত্ব অজ্ঞাত। এই বিচরণ-পথের ফোটো নেওয়া হয়েছে। ৪ঠা অক্টোবরের প্রাভদায় সে ফটোর প্রতিলিপি বেরিয়েছে। ভারত মহাসাগরে একটি সোভিয়েট জাহাজ থেকে গবেষণা ও সমীক্ষা চলছে। এমনি এক সময় এই বিষয়টি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিগোচর হয়।

॥ ঘরে ॥

২৯শে সেপ্টেম্বর—১২ই আশ্বিন ঃ ভাষাগত বিরোধ, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের আকুল আবেদন—দিল্লীতে জাতীয় সংহতি সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের (আচার্য কৃপালনী, শ্রীঅজয় ঘোষ প্রমুখ) বক্তৃতা।

'উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা দেশের দৈন্য ও দারিদ্র্যের মূলে আঘাত হানিতে হইবে'—কলিকাতায় উৎপাদন পরিষদের বার্ষিক সভায় পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের দাবী।

৩০শে সেপ্টেম্বর—১৩ই আশ্বিন ঃ আগামী ছয় মাসে (অক্টোবর-মার্চ) আমদানী ব্যাপারে অধিকতর কড়াকড়ি—১২০টি পণ্য আমদানীর বরাদ্দ হ্রাস বা আমদানী নিষিদ্ধ—ভারত সরকারের নূতন আমদানী নীতি ঘোষণা।

১লা অক্টোবর—১৪ই আশ্বিন ঃ অকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং-এর ৪৮ দিনব্যাপী অনশন ভঙ্গ—শিখদের (পাঞ্জাব) অভাব-অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতির জের।

দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের জন্য ছয় দফা আচরণবিধি নির্ধারিত—জাতীয় সংহতি সম্মেলনের সর্বসম্মত বিবৃতি।

ভারতের সাধনা, কৃষ্টি ও গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে সমর্থনের আহ্বান—বর্ধমানে জনসভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) দৃপ্ত ভাষণ—পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সূচনা।

প্রথিতযশা চিকিৎসক মানবদরদী ডাঃ নীলরতন সরকারের প্রতি জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি—মহানগরীতে (কলিকাতা) নীলরতনের শততম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত।

২রা অক্টোবর—১৫ই আশ্বিন ঃ কলিকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাড়ম্বরে মহাত্মা গান্ধীর ৯৩তম জন্মদিবস পালন—নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'জাতির জনকে'র উদ্দেশ্যে দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

৪৯তম দিবসে অমৃতসরে যোগীরাজ সূর্যদেবের (পাঞ্জাবী সুবাবিরোধী ও মাষ্টার তারা সিং-এর অনশনের পাল্টা অনশনকারী) অনশন ভঙ্গ।

৩রা অক্টোবর—১৬ই আশ্বিন ঃ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন লইয়া হাঙ্গামা—সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ৬ জন নিহত ও ৪৩ জন আহত—২৪ ঘণ্টাব্যাপী কারফিউ জারী।

প্রবল বর্ষণের পরিণতিতে পূর্ব রেলপথে ট্রেন চলাচলে অব্যাহত অচল অবস্থা—পাটনা, মোকামা, দানাপুর ও বকসারে কয়েক সহস্র যাত্রী আটক—হাওড়া ও দিল্লী হইতে কয়েকখানি ট্রেন বাতিল।

৪ঠা অক্টোবর—১৭ই আশ্বিন ঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে (মাদুরাই অধিবেশন) ছয়-ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কের পর নির্বাচনী ইস্তাহার অনুমোদিত—দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামই কংগ্রেসী ইস্তাহারের লক্ষ্য বলিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

আলিগড়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে এ যাবত ১২৫ জন গ্রেপ্তার।

৫ই অক্টোবর—১৮ই আশ্বিন ঃ 'কোন অবস্থাতেই আর দেশের অঙ্গচ্ছেদ করা হইবে না'—বিভেদকামীদের উদ্দেশ্যে শ্রীনেহরুর কঠোর সতর্কবাণী—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে জাতীয় সংহতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণদান।

অতিরিক্ত বোনাসের দাবীতে কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকদের একদিনের জন্য ধর্মঘট—যাত্রী সাধারণের অবর্ণনীয় দুর্গতি।

॥ বাইরে ॥

২৯শে সেপ্টেম্বর—১২ই আশ্বিন ঃ সিরিয়ায় নাসের-বিরোধী বিদ্রোহী বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ—দক্ষিণপন্থী ডাঃ মামুন ক্জাবারীর নেতৃত্বে নূতন সরকার গঠিত।

'সিরিয়ায় বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট অবস্থা মানিয়া লওয়া চলে না'—কায়রোয় প্রেসিডেন্ট নাসেরের উক্তি।

'কাশ্মীরের প্রশ্নে আপোষ মীমাংসা ব্যর্থ হইলে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন'—পেশোয়ারে ছাত্র-সভায় ভারতের প্রতি পাক্ প্রেসিডেন্টের (আয়ুব খান) হুমকী।

'কমনওয়েলথ-এর ক্ষতির কারণ হইলে বৃটেন সাধারণ বাজারে (ইউরোপীয়) যোগদান করিবে না'—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের প্রতিশ্রুতি দান।

৩০শে সেপ্টেম্বর—১৩ই আশ্বিন ঃ নূতন সিরীয় সরকারের পাঁচ দফা কর্মসূচী ঘোষণা—জরুরী আইনের বিলোপ সাধন ও মৌলিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১লা অক্টোবর—১৪ই আশ্বিন ঃ সিরিয়ায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নির্দেশ—শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ ঃ অসামরিক ব্যক্তিদের প্রতি অস্ত্র ত্যাগের হুকুম।

২রা অক্টোবর—১৫ই আশ্বিন ঃ সিরীয় প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্ণেল আব্দুল হামিদ সেরাজ গ্রেপ্তার—দামাস্কাস বেতারে ঘোষণা—সিরিয়া হইতে মিশরীয়দের বহিষ্করণ শুরু।

'প্রয়োজন হইলেই আবার জরুরী ক্ষমতা গ্রহণে প্রস্তুত'—আলজিরিয়ার প্রসঙ্গে চরমপন্থীদের প্রতি প্রেসিডেন্ট দ্যগলের (ফ্রান্স) হুঁসিয়ারী।

৩রা অক্টোবর—১৬ই আশ্বিন ঃ বার্লিনে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে আন্তর্জাতিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী—সাধারণ পরিষদে কানাডার প্রস্তাব।

রাষ্ট্রসংঘ ও কাতাঙ্গার মধ্যে আপোষ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত—রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর বিরুদ্ধে কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট শোম্বের অভিযোগ।

৪ঠা অক্টোবর—১৭ই আশ্বিন ঃ রাষ্ট্রসংঘে চিয়াং চীনের প্রতিনিধি রাখার প্রতিবাদ—সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সমগ্র কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনস্থল ত্যাগ।

৫ই অক্টোবর—১৮ই আশ্বিন ঃ ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র বৈঠক—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে উভয় নেতার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা।

রাষ্ট্রসংঘের নূতন সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগ ব্যাপারে প্রাচ্য-প্রতীচ্য একমত হওয়ার অনুরোধ—সাধারণ পরিষদে মার্কিণ ও সোভিয়েট প্রতিনিধিদের প্রতি শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের (ভারত) দাবী—রাশিয়ার 'ট্রয়কা' (ত্রয়ী) প্রস্তাবের বিরোধিতা জ্ঞাপন।

অভয়ংকর

॥ পুণ্য-পরশ-পুলক ॥

'শারদ তপনে প্রভাত পবনে কি জানি পরাণ কি যে চায়'—এই ভাব সব বাঙালীর মনে। রবীন্দ্রনাথ শরৎকে বন্দনা করেছেন তাঁর অজস্র গানে ও কবিতায়। সকলের মনের কথা বলেছেন—

"এই শরৎ আলোর কমল-বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত কিরণ মাঝে
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি,
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে॥"

বর্ষা-বিধৌত মেঘমুক্ত শারদ আকাশ, সব মানুষের মনে আনে আনন্দ, প্রশান্তি। ঘরছাড়া মানুষ এই সময় ঘরে ফেরে, ব্যথা, বেদনা, বঞ্চনা, অপচয় ইত্যাদির গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে এক স্বতোৎসারিত আনন্দস্রোতে মগ্ন হয়। সব ঋতুর মধ্যমণি শরৎ, মানব-মনে সে অনন্ত মাধুরী রচনা করেছে।

শুধু প্রাকৃতিক পরিবর্তন নয়, মানসিক এক পরিবর্তন ঘটে এই শারদ-উৎসবের শুভলগ্নে। ধর্ম যাই হোক, ঈশ্বর-বিশ্বাসী যদি নাই হই, তাহলেও শারদোৎসবের চারটি দিনের এক অপূর্ব শুচিতা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। এ ক'দিন এক ভদ্র শান্ত সমাহিত মনোভঙ্গী শিশু-সুলভ সরলতার সঙ্গে আমাদের আচ্ছন্ন করে। দুঃখ-দৈন্যে মন যতই পীড়িত থাকুক না কেন, পুণ্য-কামী না হলেও চিত্ত সহসা এক অপূর্ব উদারতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিচিত আপনজন জানায় অভিনন্দন, জ্যেষ্ঠ স্নেহাশিস, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা। যিনি অপরিচিত তিনিও পরিচিতের রূপে সকল দূরত্ব সব ব্যবধান তুচ্ছ করে এক মহা-মিলনের সেতু রচনা করেন। উদারতা আমাদের মনকে কোন্ অচেতন মুহূর্তে অধিকার করে। দুঃখবাদী মন সহসা ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে। জর্জরিত মনে জাগে অতীতের সুখস্মৃতি।

প্রতি গৃহ-কোণ আনন্দকলরব-মুখর। উৎসবের আনন্দ, ছুটির আনন্দ, পরিবেশের আনন্দ। চারিদিকে এক অদৃশ্য আকর্ষণ ছড়িয়ে আছে। উৎসবের সমারোহে পুরাতন কলহের শান্তি না হলেও বিরতি ঘটে। ব্যথিতের ব্যথায় নির্মম হৃদয়েও হয়ত জাগে করুণা।

কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে যদি এমনই মনে করা সম্ভব হত যে এই কালটিতে যে উৎসব উন্মত্ততায় আমরা আচ্ছন্ন, সেই শক্তি, সেই প্রেরণা সারা বছর আমাদের প্রাণে প্রবহমান থাকত, জনগণ, শ্রমিক-মালিক, রাজা-প্রজা সকলেই শান্তিপ্রিয়, মহানুভব, সহৃদয়, স্বার্থমুক্ত হয়ে দীর্ঘ একটি বছর যদি এমনই আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে থাকত, তাহলে হয়ত এই মাটির পৃথিবীটা নেহাত মাটি-মাটি থাকত না, শ্রীহীন রুক্ষতা থেকে ত্রাণ পেয়ে সহসা মনে হত—

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে
বাহির হ'লে জননী?
ওগো মা,—তোমায় দেখে দেখে
আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥"

তা যদি হ'ত তাহলে গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে থাকতে হত না, ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ সব অবসান। শুধু উৎসব, আনন্দ আর ছুটি। বহু সৃষ্টিজনিত জগৎব্যাপী ক্লান্তি, অন্নাভাব, অনটন সব শুধু সহানুভূতি ও সদিচ্ছার স্রোতে ভেসে যেত। রাজনীতির কংকরকঠিন পথ সহসা পীচঢালা পথের মত মসৃণ হয়ে উঠত। স্বর্গরাজ্য একেবারে করতলগত আমলকীবৎ মনে হত।

সংসারটা কিন্তু স্বপ্নরাজ্য নয়, এই ইট-কাঠ-লোহার রুক্ষ বাস্তবতার মধ্যে স্বপ্ন-বিলাসের অবকাশ কোথায়? যে কাঙালিনী মেয়ে ধনীর দুয়ারে শূন্যমনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মনের কথাটাও ভাবতে হয়। ফুটপাথের ওপর দিনের পর দিন রোদ-জল-ঝড় উপেক্ষা করে যারা পড়ে আছে তারাও আমাদের শরিক। তাদের কথাও স্মরণ করতে হয়। রোগশয্যায় শুয়ে যে ছুটির বাঁশী কানে শোনার অপেক্ষায় আছে, তাকেও মনে রাখতে হয়। রূঢ় বাস্তবের কঠিন জগতে কাব্যময় কথা তাই চীনা-মাটির বাসনের মত ভঙ্গুর। সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় অনেক দুঃখ লাঘব হতে পারে, অন্তরের উৎসব-আনন্দ বাইরে প্রকাশিত হয়ে ওঠে, তাই এই স্বল্প-কালিক আনন্দ-মুখরিত উৎসব-লগ্নের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না।

দেবাসুর যুদ্ধের পৌরাণিক আখ্যায়িকা সত্য কি কল্পনা তা জানা কঠিন, তবে এই কালের মানুষ তাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছে মানবতা যেখানে পীড়িত, সেখানে প্রয়োজন হয়েছে আত্ম-শক্তি বোধনের। সেই বোধন-সাধনায় মানুষের প্রাণশক্তি বজ্রের দৃঢ়তা লাভ করেছে। কাল-বৈশাখীর উন্মত্ত তাণ্ডবের হাত থেকে নিঃশংক পথচারী ত্রাণ পায় শক্তির সাধনায়। জাতির দুঃখকে নব-সৃষ্টির তপস্যারূপে বরণ করেই শক্তি-পূজার আয়োজন করতে হয়। শ্রী, ধী, শক্তি প্রভৃতির পূজা শুধু চারিদিনব্যাপী ক্ষণিক উন্মাদনা নয়, দীর্ঘকালব্যাপী আনন্দ-আয়োজন।

আজ এমনই আর-এক শারদোৎসব আসন্ন। আকাশের রঙ বদলেছে, ধরায় খুশীর প্লাবন, দেবীর আবির্ভাবের লগ্নে হতাশা আর বিষাদের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে হবে। তবেই আনন্দ-উৎসব সার্থক হবে।

'শিশুতীর্থ' গীতি-নাট্য রচনা করে-ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৮ সালে। তার অভিনয় হয়েছিল ২৮শে, ২৯শে, ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন ১৩৩৮ সালে,

ঠিক ত্রিশ বছর আগে। একেবারে শেষ-দৃশ্যে গীত হল—

"তিমির দুয়ার খোলা,
এসো এসো নীরব চরণে
জননী আমার দাঁড়াও
এই নবীন অরুণ-কিরণে॥
পুণ্য-পরশ পুলকে সব
আলস যাক্ দূরে।
গগনে বাজুক বীণা
জগৎ জাগানো সুরে।
জননী জীবন জুড়াও
তব প্রসাদ সুধা সমীরণে
জননী আমার, দাঁড়াও
মম জ্যোতি বিভাসিত নয়নে॥

—তারপর কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

"দ্বার খুলল। মা বসে তৃণশয্যায়,
কোলে তাঁর শিশু,—
অন্ধকারের পরপার থেকে প্রকাশমান
শুকতারার মতো।
কবি গেয়ে উঠলো, জয় হোক্
মানুষের, জয় হোক্
নব-জাতকের, জয় হোক্ চির-জীবিতের।"

শারদোৎবের মহালগ্নে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে কবি-কণ্ঠে যা ধ্বনিত হয়েছে আজও সেই জয়গান দেশ-দেশান্তরের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক, যুগ-যুগান্তরে ব্যপ্ত হোক।

জননীর আগমনে আর-একবার মানুষের, নব-জাতকের চির-জীবিতের জয় ধ্বনিত হোক, মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়ত্ব নাশ করে আমাদের সব ক্রন্দনকে দূর করুক।

নতুন বই

রোজালিণ্ডের প্রেম— (উপন্যাস)—প্রাণতোষ ঘটক। প্রকাশক : বাক সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলি-কাতা-৯। দাম : তিন টাকা।

প্রাণতোষ ঘটক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের কাহিনী অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর 'আকাশ পাতাল' ও 'রাজায় রাজায়' নামক উপন্যাস দুটিতে পরি-বেশন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। 'রোজালিণ্ডের প্রেম' উপন্যাসটি ফ্যাশন-দুরস্ত কৃত্রিম ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ইতি-কাহিনী। সোসাইটি নামক যে বিচিত্র সমাজ আমাদের দেশের উপরতলার মানুষের জন্য গড়ে উঠেছে সেই রঙীন ফানুষের ছবি এ'কেছেন লেখক সুদক্ষ শিল্পীর মত কয়েকটি মাত্র রেখায় এবং সামান্যতম রঙে। রোজালিণ্ড, সুললিতা, আর নীলকান্ত চরিত্র-চিত্রণে লেখক গভীর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীটি যেভাবে সুনিপুণ লেখক পরিবেশন করেছেন তাতে পাঠকের কৌতূহল শেষপর্যন্ত জাগ্রত থাকে। পরিচ্ছন্ন কাব্যধর্মী ভাষা 'রোজা-লিণ্ডের প্রেম' উপন্যাসের আর-এক বিশেষত্ব। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ-চিত্রটি একটি আশ্চর্য শিল্পকর্ম।

সমুদ্র আর ঢেউ— (উপন্যাস)—শক্তি-পদ রাজগুরু। দেশ প্রকাশনী। ১৬৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-কাতা-৬। দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শক্তিপদ রাজগুরু একালের এক জনপ্রিয় কাহিনীকার। প্রায় ডজনখানেক উপন্যাসের তিনি লেখক। তাই তাঁর এই সাম্প্রতিক উপন্যাসে প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি "লেখক অনেক কিছুই দেখেছেন। আর সেই দেখার অভিজ্ঞতাকে তিনি নানাভাবে পাঠক-সমাজে আপন তুলিতে রাঙিয়ে পরিবেশন করেছেন। 'সমুদ্র আর ঢেউ' সেই জাতীয় লেখা যার মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক নেই" অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। লেখকের এই উপন্যাসের উপজীব্য সামন্ত-তান্ত্রিক প্রতাপনারায়ণ নামক জমিদারের ট্র্যাজেডি। তাঁর জমিদারিতে বসেছে 'কোক ওভেন', সেই দাপট আর নেই, আর তাঁদের বংশেরই প্রদীপনারায়ণ নেয় চরম প্রতিশোধ। কালীপুরের নৃশংস হত্যা তার নতুন দৃষ্টিদান করে। প্রতিবাদ মিছিলের পুরোধা বন্দীপুরের চৌধুরী বংশের গোত্রছাড়া প্রদীপ। সামন্ততন্ত্রের পুরাতন প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে। বেশ বোঝা যায় যে, সিনেমার দিকে চোখ রেখেই এই উপন্যাসটি লিখিত। তাই এর আঙ্গিক একেবারে সিনেমা-মার্কা।

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি —(রহস্য-কাহিনী)—বররুচি। গ্রন্থ পীঠ, ২০৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-কাতা-৬। দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি' রহস্য-কাহিনীটি শেখভের একটি বিখ্যাত গল্পের ছায়ানুসরণে রচিত। লেখক 'বররুচি' একজন প্রবীণ সাহিত্যিক, পূর্বে তিনি অন্য নামে যে সব রহস্য-কাহিনী লিখেছেন তা জনপ্রিয় হয়েছে। 'স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি'তে একটি রহস্য-ঘন কাহিনী পরিবেশিত। ঘটনাটি উত্তেজক, কৌতূহলময় এবং রোমাঞ্চকর। বুদ্ধিদীপ্ত ঘটনা সংস্থাপনের জন্য কাহিনীটিতে শেষ পর্যন্ত আগ্রহ অটুট থাকে। তবে রহস্য-কাহিনীর নাম 'স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি' না হলেই মানাত। রহস্য-কাহিনীতে হৃদয়ের স্থান কোথায়? গ্রন্থটির মুদ্রণপারিপাট্য মনোরম।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বসু বিজ্ঞান মন্দির—(আলোচনা)—অবনীন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক : এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিকট-আত্মীয় এবং বিশ্বস্ত সহকারী অবনীনাথ মিত্র এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বসু বিজ্ঞান মন্দির সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দান করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "আচার্য জগদীশচন্দ্রের কর্মময় জীবনের বহিঃপ্রকাশ সমুজ্জ্বল ও সুবিশাল। তাঁহার মনীষার জ্যোতি বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রকে আলোকিত করিয়াছে, যাহা তাঁহার সূক্ষ্ম-বিচার-দৃষ্টি কার্যকরী হইবার পূর্বে অন্ধকারে আবৃত ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার আবিষ্কার ও অবদান এখন জগদ্বিখ্যাত। সে বিষয়ে এখানে কিছু বলিবার বা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁহার চিন্তা ও প্রয়াস এতটা ফলঃপ্রসু হইল কিরূপে তাহার পূর্ণ বিবরণ—এমন কি আংশিক-ভাবেও সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়

নাই।" জগদীশচন্দ্রের সহকর্মীদের অন্যতম শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মিত্র সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এই গ্রন্থ আচার্যদেবের জীবনী নয়, জীবনের আর একদিক। জগদীশচন্দ্রের শিল্প-মানসের অন্তরঙ্গ চিত্র। জগদীশচন্দ্র হিন্দু স্থাপত্যকলার অনুকরণে বসু বিজ্ঞান মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর সাধনাশ্রমের নাম দিয়েছিলেন মন্দির। সেই বিজ্ঞান মন্দির কিভাবে যে গড়ে উঠেছে অবনীনাথ তার পরিচয় দিয়েছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সংগে লেখকের বালক-বয়স থেকেই ঘনিষ্ঠতা, তাঁর যা জানা আছে তা তিনি এই গ্রন্থে নিবেদন করেছেন এবং একটি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছেন। লেখক অশক্ত দেহ তাই তিনি মুখে মুখে যা বলেছেন তা লিপিবন্ধ করেছেন সুলেখক গোপাল ভৌমিক।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল সে কথা লেখক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সমকালীন শিল্পকলার সংগে তাঁর যে আত্মিক যোগ ছিল সেকথা এ যুগের মানুষ প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। এই মুহূর্তে অবনীনাথ এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থটিতে কয়েকটি চিত্র সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রবীন্দ্র বিতান—(সংকলন গ্রন্থ) ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : এ, মুখার্জি এ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। দাম : পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশকালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারলাভের পূর্বে ১৮৭৮—১৯১৩ এই পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল ধরে বাংলার সাহিত্য-সাধকগণ রবীন্দ্র-প্রতিভার যে মূল্যায়ন করেছেন তা নানাদিক থেকে অতিশয় মূল্যবান। সম-সাময়িকদের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের পূর্বেই কবি কিভাবে সমাদৃত, প্রশংসিত, লাঞ্ছিত হয়েছেন তার ইতিহাস অতি বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। বিচারকগণ অনেক ক্ষেত্রে রস-গ্রাহিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, আবার সংকীর্ণতার পরিচয়ও দিয়েছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করেছেন শরীর-বিজ্ঞানীর মত অসীম নিপুণতায়। এইসব রচনা পুরাতন পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে, গ্রন্থাকারে অনেক রচনাই সংগৃহীত হয়নি। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় অশেষ শ্রমসহকারে এবং সুগভীর নিষ্ঠার সংগে এমনই ছাব্বিশটি রচনা উদ্ধার করে 'রবীন্দ্র-বিতানে' সংকলন করেছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রিয়নাথ সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মোহিতচন্দ্র সেন, অমৃতলাল গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যদুনাথ সরকার, ইন্দ্রপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, নবীনচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্রনাথ রায়, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দের এই রচনরাজি একত্রে পাওয়া রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচারে বিশেষ সহায়ক। 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'কবি-কাহিনী'র সমালোচনার মধ্যমে কবিকে অভিনন্দন জানান, তিনি 'রুদ্রচন্ড' সম্পর্কেও আলোচনা করেন, সে দুটি প্রবন্ধই এই গ্রন্থে আছে। এ-ছাড়া প্রভাতকুমার 'চিত্রা' সম্পর্কে, সুরেশ সমাজপতি 'রবীন্দ্রবাবুর গল্প', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'কণিকা' ও 'কথা' সম্পর্কে, প্রিয়নাথ সেন 'মানসী' সম্পর্কে, মোহিতচন্দ্র সেনের 'কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা' যদুনাথ সরকারের 'সোনাতরীর ব্যাখ্যা', সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরী' বিপিনচন্দ্র পালের 'চরিতচিত্র-রবীন্দ্রনাথ' অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'ডাকঘর', ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রাঙ্গদা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও 'অচলায়তন' প্রভৃতি অতি মূল্যবান আলোচনাগুলি এই সংকলন গ্রন্থের সম্পদ। সর্বশেষ রচনাটি প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সাহিত্য-চাবুক'। আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থে অমরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধটি না দিলেই ভালো হত, অবশ্য বিরূপ সমালোচনার নমুনা হিসাবে রচনাটি কৌতুককর। ডঃ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থারম্ভে মূল্যবান সুদীর্ঘ ভূমিকায় বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস অতিশয় কৃতিত্বের সংগে আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে 'রবীন্দ্র-বিতান' রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হিসাবে গণ্য হবে।

আইখম্যান— (সংবাদ-সাহিত্য)—সঞ্জয়। প্রকাশক। গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

জেরুজালেমের বন্দীশালায় বিচারাধীন আইখম্যানের বিচার-কাহিনী ও জীবন-কথা। নাৎসী বন্দী-শিবিরে নৃশংসভাবে ইহুদী-দলনের জন্য 'আইখম্যান' আজ পৃথিবীতে এক জঘন্যতম অপরাধী হিসাবে কুখ্যাত। তার কীর্তি-কলাপ কাহিনী আকারে লিপিবন্ধ করেছেন 'সঞ্জয়'। আধুনিক সংবাদ-পরিবেশনের রীতিতে সমগ্র কাহিনীটি বিবৃত হওয়ায় গ্রন্থটি কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছে। কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সোনাটা—(কবিতা)—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। বসুধারা প্রকাশনী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম : দুই টাকা।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত নবীন কবি। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি আছে। তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। একটি সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনায় তাঁর কৃতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। কল্যাণকুমার কিন্তু মূলতঃ কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সোনাটা'। সোনাটায় সর্বসমেত পঁচিশটি কবিতা আছে। প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য এবং কল্পনার বলশালীতায় এই নবীন কবির কবিতাগুলি অনন্যসাধারণ সার্থকতা লাভ করেছে। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে আধুনিক কালধর্মিতায়। স্বতোৎসারিত গতিতে 'সোনাটা'র কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত সুরমাধুরী পাঠক-চিত্তকে পরিপূর্ণ করে দেয়। অনুভূতির তীব্রতায় ও জীবনদর্শনের রূপায়নে কল্যাণকুমারের কবিতা অন্তরকে স্পর্শ করে। সত্যজিৎ

রায়ের আঁকা প্রচ্ছদচিত্র এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যৌন-প্রসঙ্গে—(যৌন - তত্ত্ব)— ডাঃ মদন রাণা। প্রকাশক ক্লাসিক প্রেস। ৩১।এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : দশ টাকা।

ডাঃ মদন রাণা প্রায় চার-পাঁচ বছর পূর্বে যৌন-তত্ত্ব সম্পর্কে যে গ্রন্থটি লিখে খ্যাতিলাভ করেন বর্তমান গ্রন্থটি তার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা আজ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, এমন এক দিন ছিল যখন যৌন প্রসঙ্গ আলোচনা করা বা সে সম্পর্কে কোনো কিছু লেখাও taboo ছিল, আজ সৌভাগ্যক্রমে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। যৌন-সমস্যাকে আজ আর সব সমস্যার মতই একটি স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য সমস্যা হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছি। সেই সব কারণে ডাঃ মদন রাণার এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। যৌন-সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। জটিল দাম্পত্য-রহস্য এবং নর-নারীর বিবাহ সম্পর্কিত বহু সমস্যার পথ নির্দেশ করেছেন ডাঃ রাণা। এই ধরণের গ্রন্থ রচনায় সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে অনেক বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যায় এবং অল্প শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে যথাযথ অর্থ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই গ্রন্থের লেখক তাই প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করে অনেকগুলি গ্রহণযোগ্য এবং সহজবোধ্য পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। গ্রন্থটি সর্বসাধারণের কাছে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে আশা করা যায়। গ্রন্থের শীর্ষে শুধু "প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য" কথাটি না লেখা থাকলেই হয়ত ভালো হত। যৌন-শিক্ষার প্রয়োজন সকলের, প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক উভয়ের পক্ষেই যৌন-শিক্ষা সমান প্রয়োজনীয়। 'প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' এই নির্দেশনামার ফলে হয়ত অপ্রাপ্ত বয়স্করাই গ্রন্থটির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হবে। দাম্পত্য-বিজ্ঞানের গ্রন্থ সহজ ভঙ্গীতে সর্বসাধারণের কাছে পরিবেশনের দিন সমাগত এ-কথা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই। এই সুবিশাল গ্রন্থটিতে অসংখ্য চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে তদ্দ্বারা পাঠকের সহজে বক্তব্যবিষয় বোঝার সুবিধা হবে। পরিশেষে গ্রন্থ প্রমাণপঞ্জীটিতে বিস্তারিতভাবে বহু প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ থাকায় গ্রন্থটির মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে।

ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

সুন্দরী কাশ্মীর— (ভ্রমণ)—নরেন্দ্রচন্দ্র রায়। প্রাপ্তিস্থান : রাধানাথ লাইব্রেরী, রায় কুটির, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, বন্দীপুর, ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। উচ্ছ্বাস এবং আবেগে পরিপূর্ণ এই ভ্রমণ-কথায় ইদানীং ভ্রমণ-কাহিনী নামাঙ্কিত যে সব গল্প-কথা প্রকাশিত হয়ে থাকে সেই ধরণের প্রচেষ্টা আছে। গল্প হিসাবেও যেমন সার্থক নয় ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবেও এই পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। লেখক মোহমুক্ত হয়ে শুধু ভ্রমণেই তাঁর প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখলে হয়ত সাফল্য লাভ করতেন। তবে যাঁরা ভ্রমণের সঙ্গে গল্পের ফোড়ন পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থের সমাদর হওয়া সম্ভব।

তিন পকেট হাসি —প্রবন্ধ। বসু চৌধুরী, ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা:-৯।

এক পকেট, দুই পকেট হাসির লেখক প্রবন্ধের "তিন পকেট হাসি" প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির তুলনায় এ গ্রন্থটি আরও ভাল হয়েছে। লেখকের বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা এবং ঋজুতা উল্লেখ্য। বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের নানাবিধ ব্যতিক্রম তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্যদিয়ে সচিত্ররূপে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থের যোগ্য সমাদর কামনা করি।

প্রনিকম ও উত্তরিকা (কাব্য সঞ্চয়ন) —মৃণালিনী সেন। পরিবেশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২। দাম : পাঁচ টাকা মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সব মহিলা কবিবৃন্দ বাংলা-সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁদের অন্যতমা শ্রীমতী মৃণালিনী সেন। তিনি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতির সহযাত্রিনী। সতের-আঠারো বছর বয়স থেকেই মৃণালিনী সেন কবিতা-রচনায় খ্যাতি লাভ করেন এবং পরিণত বয়স পর্যন্ত তাঁর কবিতার স্রোত অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথ একদিন এই কবিকে লিখেছিলেন—"তোমার লেখা ত' বেশ পাকা হাতের লেখা। যাদের এককালে খুব কাঁচা বয়সের বলে জানতুম মনে হয় তারা যেন সেই বয়সের কাঁচা যুগেই রয়ে গেছে কেবল আমরাই বেড়ে চলেছি। তাই যখন তোমাদের কলম থেকে পাকা গাঁথুনির ভাব এবং লেখা দেখি তখন একটু বিশেষ করে চমক লাগে, এবং বুঝতে পারি সমস্ত সংসারই চলচে।" শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের 'প্রতিধ্বনি', 'নির্ঝরিণী', 'কল্লোলিনী' ও 'মনোবীণা' নামক চারটি কাব্য গ্রন্থের আদ্যাক্ষর নিয়ে 'প্রনিকম' নামটি গ্রথিত। উত্তরকালে রচিত কবিতাগুলি 'উত্তরিকায়' প্রকাশিত। শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের কবিতায় আশ্চর্য সমাজ-সচেতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে, "বুদ্ধি ও কল্পনার অনন্যসাধারণ দীপ্তি ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য না থাকলে এই সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী সম্ভব হত না।" শ্রীমতী মৃণালিনী সেন শেলী, স্কট, হায়নে, কুপার, লংফেলো, ওয়ার্ডসার্থ প্রভৃতি বিদেশী কবিদের কবিতাগুলির যে আশ্চর্য সুন্দর অনুবাদ করেছেন তা বিস্ময়কর। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনূদিত কবিতা পাঠে যে আনন্দ পাওয়া যায়, প্রায় সেই স্বাদ মৃণালিনী সেনের অনূদিত কবিতায় পাওয়া গেল। প্রতিটি কবিতা হৃদয়ের গভীরতায় ও কল্পনার বিশালত্বে অন্তরকে স্পর্শ করে। মৃণালিনী সেনের আজ একাশীতম জন্মদিন অতিক্রান্ত। এই পরিণত বয়সেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই কাব্য সঞ্চয়নে। 'প্রনিকম ও উত্তরিকা' প্রকাশিত না হলে এমন এক প্রতিভাশালিনী কবি বিস্মৃতির অতলে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন।

সার প্রয়োগের নতুন নিয়ম

সুনীলকুমার বসু

মানবসভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই বিজ্ঞান সাধনার স্পৃহা যে গতিতে যুগের পর যুগ মানুষের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তারই দৌলতে বর্তমান যুগের ব্যবহারিক বিজ্ঞান আজ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। খেয়ালী প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা পুরোন দিনের মত এখন আর তেমন হতাশার সৃষ্টি করে না। তার অনুদ্ঘাটিত রহস্য ভেদ করে এ-যুগের মানুষ পেয়েছে বিরাট শক্তি এবং অসীম জ্ঞান। তাই চাষবাসের মধ্যেও এসেছে এক অভিনব এবং চমকপ্রদ সফলতা।

কিন্তু একথা নিশ্চয়ই অসংগত হবে না যে, সেই পুরোন দিনের প্রভাব আবার নতুন রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে। কেননা, যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে মানুষ যখন কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করে ঘর বেঁধে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করল; তখন চাষের জমির পরিমাণ সমান থাকা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে তারা একই জমিতে বারবার চাষ আরম্ভ করল। তাতে ফসলের পরিমাণ বছর বছর কমতে থাকায় যে সমস্যা উদ্ভূত হল, তার সমাধান করতে অবশ্য তাদের বেশী দেরী হল না। কারণ, মানুষ কোনদিনই চুপ করে থাকে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লক্ষ্য করে-ছিল—গোবরের নীচে চাপা ঘাস অল্প-দিনের মধ্যে আশপাশের অপেক্ষা কেমন সুন্দর সবুজ হয়ে শুকনো পচা গোবরের চাপড়া ভেদ করে মাথা তুলেছে। এই থেকেই আদিম যুগে প্রথম গোবর ও অন্যান্য পশুবিষ্ঠা সার হিসাবে জমিতে ছড়াবার রীতি শুরু হয়।

তারপর প্রায় দু' হাজার বছর আগে বৈদিক যুগে প্রাচীন ঋষিদের কাছেও সার প্রয়োগের এই নতুন নিয়ম অজ্ঞাত ছিল না। তাঁরাও গাছের পুষ্টিসাধনের জন্যে মাটিতে পশুরক্ত, হাড়, ছাই ইত্যাদি এবং গাছের ওপর থেকে "উৎসেক" বা "প্রক্ষেপ" করতেন, পশুমাংসের কাথের সংগে সর্ষে ও কয়েক রকম ডালজাতীয় শস্যের গুঁড়ো (যার মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনেক) মিশিয়ে বেশ কিছুদিন পচিয়ে নিয়ে। এই উৎসেক বা প্রক্ষেপ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে আমাদের মনে করা অসংগত হবে না যে, তাঁরা পাতায় সার প্রয়োগের যথেষ্ট সুফল পেয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সে প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় এখন বিদেশীরাই আমাদের পথ-প্রদর্শক বলতে হবে।

১৯২২ সালে ইংলণ্ডের মিঃ এফ, এ, সিরেল শাকসব্জীর ওপর এক রকম পুষ্টিবর্ধক জল প্রথম ছিটিয়ে দেন। এবং তাতে তাঁর লেটুস ও কপির ভাল ফল দেখে অন্যান্য সব্জীচাষীরাও তখন ব্যবহার আরম্ভ করে। পরে আমেরিকার এক নার্শারী পরিচালক মিঃ টমাস পি, রেলি গাছে ছিটোবার উপযোগী সম্পূর্ণ সুসম সার তৈরী করে তার নাম দিয়ে-ছিলেন 'র‍্যাপিড গ্রো' (Ra-Pid-Gro)। এতে আছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও অনেকগুলি কণিকাধাতু (Trace element)। তারপর অ্যামে-রিকার আণবিক কমিশনের কাছে মিচিগান ষ্টেট কলেজের ডাঃ এইচ, বি, তুকে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন, গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশে জলে দ্রবণীয় খাদ্য ছিটিয়ে পাতা ও মূলের প্রচুর উন্নতি করা যায়। এখন অ্যামেরিকায় এই জাতীয় সার ব্যাপকভাবেই ব্যবহার হচ্ছে। তার একটি ফর্মুলা, শুধু গোলাপের জন্যে—পটাসিয়াম নাইট্রেট ৬ আঃ, এমোনিয়াম ফসফেট ৩ আঃ, ম্যাগনিসিয়াম সালফেট ১ আঃ, ফেরাস সালফেট ½ আঃ এবং ২০ গ্যালন জল।

ইউরোপ ও অ্যামেরিকা এ বিষয়ে খুবই অগ্রসর। কিন্তু আমরা একটুও পেছিয়ে নেই। তার হাতে কলমে প্রমাণ দিয়েছেন আমাদের বোড়াল গ্রামের শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেননা, ফলিয়ার ফিডিং অন্যান্য দেশে ব্যবহার হয় কেবল পরিপূরক সার হিসাবে। আর ইনি ব্যবহার করছেন কেবল পরিপূরক নয়, সম্পূর্ণ সার হিসাবে। কিন্তু তাতে একটু খরচ বেশী পড়ে।

এই সার নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাস, কণিকাধাতু ও উদ্ভিদ হর্মোন সমন্বিত সুসম উদ্ভিদ খাদ্য। তাছাড়া এটি অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করলে পাতার ছিদ্রপথে (Stomata) শোষিত হয়ে খুব তাড়াতাড়িই গাছপালার পুষ্টি-সাধন করে। অধিকন্তু সব সময় মাটিতে সুসম মাত্রায় উদ্ভিদ খাদ্যগুলি না থাকায় এবং কণিকাধাতুগুলির কোন একটি কম বা বেশী থাকায়, কিম্বা মাটিতে নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও মেঘলা আব-হাওয়ায় বা অন্য কারণে নাইট্রোজেন ঘাটতি হওয়ায় যখন গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, তখন পাতায় সার দেওয়াই হচ্ছে সমস্যার সহজ সমাধান। উপরন্তু ফল ধরবার সময় যখন গাছের প্রচুর ফসফরিক এ্যাসিডের দরকার হয়, পাতায় সার

প্রয়োগের মাধ্যমেই তৎক্ষণাৎ সে অভাব পূরণ করা যায়। ফুল আসবার আগে মাত্র একবার প্রয়োগ করেও ধান, গম, ছোলা, মটর প্রভৃতি শস্যের বিঘাপ্রতি ফলনের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ বাড়ান যায়। ফুল ঝরবার পর প্রয়োগ করলেও যে কোন শস্য থেকে আরম্ভ করে আম, পেয়ারা, আতা প্রভৃতি ফল ও মরশুমী ফুল এমনকি শাকসব্জীর ওজন ও বীজের আকার বাড়ান যায়।

অপেক্ষাকৃত ক্ষরা মাটিতে শুকনো আবহাওয়ায় ও অল্প সেচ অধিকতর ফলদায়ক বলে, জলাভাবযুক্ত অঞ্চলের পক্ষে এই সার আদর্শস্থানীয়। ফুলের মুখে আমন ধানের গোড়ায় জলাভাব হলেও এই সার প্রয়োগের দ্বারা পুরো ফসলই পাওয়া যায়। পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে তা গাছের মূলে জাল বিস্তারে সাহায্য করে। এজন্য মরশুমী ফুল ও বাঁধাকপির মত দুর্বল প্রকৃতির গাছপালা রোপণের দু' তিনদিন আগে বীজতলায় চারায় খুব পাতলা করে একবার প্রয়োগ করলে, ঐ চারা রোপণের সঙ্গে সঙ্গে ঝুরি শিকড় নামায় এবং তাড়াতাড়ি সবল হয়ে ওঠে। তাছাড়া এই সার মিশ্রিত জলে বীজ আলু ও পেঁয়াজ ভিজিয়ে রোপণ করলে খুব তাড়াতাড়ি চারা অঙ্কুরিত হয়।

স্থানীয় প্রয়োগেও এটি যথেষ্ট কার্যকরী। তার অনেক প্রমাণও পাওয়া গেছে। যেমন, কোন গাছের একপাশে অথবা সমান আকার ফলের মধ্যে চিহ্নিত কয়েকটি ফলে বা কলার কাঁদির মধ্যে চিহ্নিত কয়েকটি ছড়ায় কিম্বা লাউ, পেঁপের একপাশে মাখিয়ে।

পাতায় প্রয়োগ করা হলেই ফলিও ফিড ক্রমশ পাতা, প্রশাখা, শাখা ও কাণ্ডকে পুষ্ট করে মূলের দিকে নামে। পাতার প্রাচুর্য সৃষ্টি না করেও আলু, কচু গাজর প্রভৃতি মূল জাতীয় ফসলের আকার ও ওজন বৃদ্ধি করে। দু'

"আমার জন্যে তোমার আজ অনেক খরচা হয়েছে—হোটেলের বিল,—থিয়েটারের টিকিট......। আমারও কিছু খরচ করা দরকার.........এই নও তোমার বাস ভাড়াটা।"

তিন ফুট উঁচু পাট চারার নীচে এসে নেমে পড়ে এমনভাবে ব্যবহার করলে বড় চারাগুলি দ্রুত বেড়ে উঠে নীচের ঘাস আগাছা ও ঘন অংকুরিত ছোট পাট চারাগুলিকে মেরে ফেলে। ফলে পাট-ক্ষেত না নিড়ালেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

ফলিও ফিডে চাষ-করা ফসলে কীট-পতঙ্গ ও ধসা রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। অধিকন্তু ডি. ডি. টি—ফোলিডল—এনড্রেকস্ ও কপার অক্সি-ক্লোরাইড জাতীয় কীটঘ্ন ও ছত্রক নাশক বিষের সঙ্গে মিশ্রণ-যোগ্য বলে কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলকেও পুনর্জীবন দান করে। ফুল ও ফল প্রসবের ফলে জীবনীশক্তিহীন গাছ-পালাকেও সতেজ ও পুনরায় ফলপ্রসূ করা যায়। এবং ফলিও ফিডে উৎপন্ন শাকসব্জী ওজনে ভারী, বর্ণে উজ্জ্বল ও স্বাদে সুমিষ্ট হয়। নামমাত্র ফলিও মিশ্রিত জলে গাছপালা স্নান করিয়ে এবং গোড়ায় সেচ দিয়ে অনভিজ্ঞ শৌখীন চাষীও সাফল্যের সঙ্গে নানারকম শাক-সব্জী, মরশুমী ফুল, গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকা চাষ করতে পারেন। অন্যান্য রাসায়নিক সারের মত ফলিও মাটির অম্লভাব বা ক্ষারাভাব বৃদ্ধি করে না। গোবর, কম্পোস্ট, পাঁকমাটি, পরমাটি অথবা সবুজ সারের সাহায্যে প্রস্তুত করা ক্ষেতে পরিপূরক সার হিসাবে ফলিও ব্যবহার সবচেয়ে লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত অবস্থায় ফলিও ফিড পুরো কাজ করে না

(১) ক্ষেতের মাটি অতিরিক্ত চাপ-ধরা, জলবসা (ডাঙা জমির বেলায়) অথবা শুকনো হলে; আর বারবার সেচ ও অতিবৃষ্টিতে মাটির ফাঁপ নষ্ট হলে। (২) দীর্ঘকাল যাবৎ গোবর সার, পাঁক-মাটি প্রভৃতি জৈবসার প্রয়োগ না করায় ক্ষেতের মাটি অনুর্বর ও চাপধরা হলে অথবা রাসায়নিক সার বা মিশ্র সার ব্যবহার করা সত্ত্বেও জৈবসার ও চুন প্রয়োগের দ্বারা মাটিকে পুনরায় চাষের উপযোগী করে তোলা না হলে। (৩) সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিতে ধুয়ে বা পাতা থেকে পিছলে মাটিতে পড়লে। কিন্তু ব্যবহারের দু' তিনদিন পরে বৃষ্টি হলেই ভাল হয়। (৪) নির্দিষ্ট মাত্রা অপেক্ষা ঘন বা পাতলাভাবে প্রয়োগ করলে অথবা তাড়াতাড়ি ফসল বাড়াবার আশায় নতুন পাতা ছাড়ার আগে (দশ-বার দিনের মধ্যে) পুনরায় প্রয়োগ করলে।

ফলিও প্রয়োগের নিয়ম :

(১) বৃষ্টির সময় অথবা আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলে সার প্রয়োগ চলবে না। রাতের শিশির শুকাবার পর প্রয়োগ করতে হবে। (২) বীজতলার মাটিতে সারজল সেচ দিতে হলে, মাটি খটখটে না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। (৩) বর্ষাকালে ডাঙাজমির ফসলে জলনিকাশ ব্যবস্থাযুক্ত ক্ষেতেই পাতার সার কার্যকরী। (৪) সম্ভব হলে সেচের পর বা ভারী বর্ষণের পর চাপধরা মাটি খুঁচে দেওয়া দরকার আর পাতা থেকে

যাতে পিছলে না পড়ে তার জন্যে প্রয়োজন হলে প্রতি দশ সের ফলিও ফিড মিশ্রিত জলে এক ছটাক গড়ে বা চিনি মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিত। (৫) সংগ্রহ করতে পারলে, স্প্রে'র (Spray) সাহায্যে না হলে পিচকারী, ঝাঁজরী, খেজুর পাতার ঝাঁটা বা হাতের সাহায্যে যতদূর সম্ভব পাতার দু'পিঠ ভিজতে হবে। (৬) ফলে প্রয়োগ করতে হলে, ফল ধরবার অব্যবহিত পর থেকে ১৫।২০ দিন অন্তর ফলের গায়ে। (৭) ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, বীট, গাজর, মূলো পালম প্রভৃতি সব্জীতে প্রতিবার সেচের দু' তিনদিন আগে। (৮) নির্দিষ্ট মাত্রা অপেক্ষা ঘন করে কখনই প্রয়োগ চলবে না। তাতে কচি চারা জ্বলে যায় এবং কোন কোন গাছের বৃদ্ধি মন্থর হয়।

দশ সের জলে এক কাঁচ্চা :

(১) বীজ বপনের পর বীজতলার শুকনো মাটি ভিজতে, সদ্য অংকুরিত দুর্বল প্রকৃতির শাকসব্জী ও মরশুমী ফুলের বীজতলা ভিজতে। (২) সদ্য রোপিত চারাগাছের গোড়ায়, স্থায়ী টবের গাছে ও যে কোন গাছপালা স্নান করাবার জলের সংগে।

দশ সের জলে এক ছটাক :

(১) দু' তিনটি সাজপাতা ছাড়বার পর বীজতলায় ও শাকসব্জীতে সেচনের জলের সংগে ওপর থেকে ঢেলে মাটি ভিজলে ভাল হয়। (২) ফুল মুখে টবের সেচনের জলের সংগে।

দশ সের জলে আড়াই ছটাক :

(১) লাউ, কুমড়া, শসা, উচ্ছে প্রভৃতি কোমল পাতাযুক্ত সব্জীতে এবং টোম্যাটো ও আলুর গাছে। (২) চারা রোপণের দু' তিনদিন আগে বীজতলায়। (৩) সব রকম মরশুমী ফুল, গোলাপ, টবে তৈরী স্থায়ী গাছপালা, পাতাবাহারী ও লনের দূর্বাঘাস সবুজ করতে।

দশ সের জলে এক পোয়া :

(১) ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যে: আখ, পাট, তুলা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলে। (২) সব রকম দাইল জাতীয় শস্যে এবং সীম ও বরবটী'তে। (৩) পালম, নটে প্রভৃতি শাক জাতীয় সব্জী'তে ও বীট, শালগম, গাজর, মূলো, রাঙাআলু প্রভৃতি মূলজ খন্দে। (৪) ঢেঁড়স, বেগুন, পটোল, চিচিংগে, ঝিঙে, ধুধুল প্রভৃতি ফসলে। (৫) পেয়ারা, আতা, আম, জাম, কাঁঠাল, বাতাবীলেবু, টক-লেবু প্রভৃতি ফলের গাছে ফুল আসবার আগে।

দশ সের জলে আধ সের :

কপি জাতীয় সব্জীতে রোপণের এক মাস পরে।

দশ সের জলে এক সের :

মাথার পাতা মুড়তে আরম্ভ করবার পর থেকে বাঁধাকপিতে এবং কুঁড়ি আসবার আগে ফুলকপিতে।

শব্দ কল্প দ্রুম

নবম আসর

ক্রিয়াপদের রূপ—উত্তর পক্ষ

১· করিতেছিলে।
চলতি রূপ : করছিলে।

২· হইত।
চলতি রূপ : হত, হ'ত।

৩· আস ধাতুর নিত্যবৃত্ত বর্তমানের চলতি রূপ: আস। বিকল্পে কখনো কখনো 'এস' হয়, সাধারণতঃ হয় না।

৪· বহিবে।
চলতি রূপ : বইবে, ববে, ব'বে।

৫· উঠিও।
চলতি রূপ : উঠো।

৬· পিটাইল।
চলতি রূপ : পিটোল, পেটাল।

৭· ঘুরাইতেছে।
চলতি রূপ : ঘোরাচ্ছে, ঘুরচ্ছে।

৮, (১) বিগড়ায়।
চলতি রূপ : বিগড়য়।
(২) বিগড়াউক।
চলতি রূপ : বিগড়ক'।

৯· উলটাইবার।
চলতি রূপ : উলটবার, ওল্টাবার।

১০· আওড়াইতেছে।
চলতি রূপ : আওড়াচ্ছে।

এ সম্বন্ধে যাঁদের উৎসাহ আছে নীচের ঠিকানায় তাঁরা অনুসন্ধান করতে পারেন। গড়িয়া ৫—৬ নম্বর বাস টার্মিনাসে নেমে টালিজনালা ব্রীজ পার হয়ে, হাটের মধ্যে "বোড়াল কৃষিশালা অফিস"। প্রায় সব দিনই সকাল ও বিকাল খোলা থাকে। বিশেষ করে সোম-শুক্রবার।

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

॥ বর্তমান ইউরোপে চলচ্চিত্রের ধারা ॥

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় কিছুদিন আগে ইওরোপ গিয়েছিলেন কর্মব্যপদেশে। ওখানে থাকাকালে বার্লিনে কিছু নতুন ইওরোপীয় ছবি দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে হালের ইওরোপীয় চলচ্চিত্রের ধারা সম্পর্কে এমন কতকগুলো নতুন তথ্য পাওয়া গেল, যা সেখানকার আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্পরীতি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করবে এবং রীতিমত আলোচনাসাপেক্ষ। কৌতূহলী পাঠকদের—বিশেষ করে চলচ্চিত্র-রসিকদের—অবগতির জন্য আমরা সেই তথ্যগুলি এখানে পরিবেশন করছি।
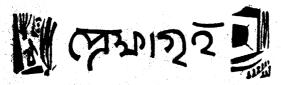
ইদানীং ইওরোপে ব্যাকরণ কেন, ভাষাই বদলে যেতে বসেছে। কোনো একটা ধারাবাহিক ঘটনা শেষ করে আর একটা ঘটনাপ্রবাহ সুরু করতে হলে প্রথা ছিল প্রথম ঘটনার শেষে ফেড্-আউট (ধীরে ধীরে দৃশ্যটিকে অস্পষ্ট করে এনে একেবারে অন্ধকার) করে পরেরটা ফেড্-

'শাস্তি' চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ইন (প্রথম রীতির বিপরীত—অন্ধকার থেকে একটু একটু করে দৃশ্যটি চোখের সামনে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হওয়া) দিয়ে আরম্ভ করা। টাইম-ল্যাপ্স্ বা দুটি ঘটনার মাঝে সময়ের ফাঁক বোঝাবার জন্যে আমরা সচরাচর ডিজলভ্-এর (এক দৃশ্য অস্পষ্ট হতে হতে তারই ওপর আর একটি দৃশ্য ভেসে ওঠা এবং প্রথমে অস্পষ্ট থেকে পরিপূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ওঠা) সাহায্য নিয়ে থাকি। কিন্তু হালের ইউরোপের চলচ্চিত্রকুশলীরা dissolve, fade in, fade out ইত্যাদি একেবারে বাতিল করে দিয়ে সমস্ত ছবি চালাচ্ছে Cut-এর (এক দৃশ্য

বিমল রায় প্রোডাকসন্স প্রযোজিত ও হেমেন গুপ্ত পরিচালিত 'কাবুলিওয়ালা'য় বলরাজ সাহনী, শিশুশিল্পী সোনু (মিনু) ও সজ্জন।

থেকে কেটে পরের দৃশ্যে আসা) ওপর দিয়ে।

বর্তমান ইওরোপের ছবিতে গল্পের ধারাও গেছে পাল্টে। এমন গল্প আর ছবি করবার জন্যে নেওয়া হচ্ছে না, যার আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান আছে। Saga ধরণের গল্প চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা একেবারে উঠে গেছে। একটি বিশেষ দিনের কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী একটি ছোট্ট ঘটনা—কতকগুলো mood বা কয়েকটা relationship—এই-ই একটা atmosphere-এর ওপর দিয়ে ছবির মাধ্যমে বলা হচ্ছে। এক একটা ছবির গল্প এমনই যে, সাহিত্যের ভাষায় তাকে বলতে গেলে দেখা যাবে যে, হয়, বলাই যাচ্ছে না, আর নয়, দু' লাইনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ছবির গল্প বা film-story সম্বন্ধে conception—চিন্তার ধারাটাই বদলে

জীবন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'সন্ধ্যা রাগ' চিত্রে কল্যাণী ঘোষ।

যাচ্ছে। ওরা বলতে চায়, ফিল্মের জন্যে যে-গল্প, সে-গল্প শুধু ফিল্মের মারফতই বলা বা বোঝা যাবে, সাহিত্যের মাধ্যমে তাকে বলাও যাবে না, বোঝাও যাবে না। অবস্থাটা কি রকম সঙ্গীন, তাই বুঝুন। ফাইন্যান্সারকে কাবু করবার মতো ক'রে গল্প ফাঁদার রাস্তা বিলকুল বন্ধ। যে-গল্প অবলম্বন ক'রে ছবি করতে যাওয়া হচ্ছে, সেটি ভালো কি মন্দ, তা ছবি হবার পরে বোঝা যাবে, ছবি সম্পূর্ণ না ক'রে অন্য কোনো উপায়ে তা জেনে ফেলবার জোটি নেই।

এখানে শ্রীরায় তাঁর দেখা ছবির মধ্যে দু'টি ছবির আখ্যান-ভাগ তার বক্তব্য সমেত বর্ণনা করলেন। প্রথমটি হচ্ছে একটি ফরাসী ছবি; নাম—"ওম্যান ইজ্ এ ওম্যান' (Woman is a Woman)। ছবিখানির পরিচালক হচ্ছেন—গোদার্ড। ছবির নায়িকা একটি নাইট ক্লাবের নর্তকী। একটি ছেলেকে সে ভালোবাসে এবং তার একান্ত বাসনা, সে মা হবে। কিন্তু ছেলেটির তাতে মত নেই আদপেই; সে বলে—'এতে তোমার

কৃষণ চোপরার "চার দেওয়ারী" চিত্রে শশী কাপুর ও নন্দা

নর্তকীজীবনের ক্ষতি হবে।' কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। ছেলেটিকে সে কোনো মতেই রাজী করাতে না পেরে একটির পর একটি ক'রে—অন্য ছেলেদের কাছে সে তার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত একটি ছেলেকে আবিষ্কার করে যে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে সম্মত হয়। মেয়েটি ভারী খুশী—এত-দিনের চেষ্টায় সে একটি ছেলেকে পেয়েছে, যে তাকে মা হ'তে সাহায্য করবে।...কিন্তু শিগ্‌গিরই তার ভুল ভাঙতে দেরী হ'ল না; কেননা, ঐ শেষের ছেলেটি তাকে স্তোকবাক্যেই ভুলিয়েছিল, আসলে সে মেয়েটির অভীষ্ট সিদ্ধি করতে আদৌ রাজী নয়। অবস্থা হৃদয়ঙ্গম ক'রে মেয়েটি যখন একেবারেই ভেঙে পড়েছে, তখন অতর্কিতে প্রথম ছেলেটি তার কাছে এসে হাজির। সে জানাল যে, সে ইতিমধ্যে তার মতের পরিবর্তন করেছে এবং সেই কারণে বহু অনুসন্ধানের পর তার কাছে এসেছে তার প্রার্থনা পূরণের জন্যে।

ছবিটি দেখলে মনে হবে, যেন ছবির rough cut বা rush print অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের জোড়া দেওয়া (প্রথম সম্পাদনার পরের অবস্থা) ছবি দেখছি; ছবির re-recording হওয়া যেন বাকী। কিন্তু আসলে তা নয়, ওটাই finished ছবি; বুঝতে হবে, ওটাই ছবির style (সৃষ্টিভঙ্গী)।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে একখানি ইতালীয় ছবি; নাম—The Night—"দি নাইট"। অ্যান্টোনিয়নি ছবিখানি পরিচালনা করেছেন। গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক। মধ্য-বয়সী স্বামী ও স্ত্রী—দু' জনেরই মনে হচ্ছে তাদের মাঝে যেন কি একটা অভাব গজিয়ে উঠেছে। এই চিন্তা ক্রমে তাদের দুজনকে দুজনের কাছ থেকে দূরে নিয়ে গেল। স্বামী একটি অল্প বয়সী মেয়ের দিকে ঝুঁকলেন, স্ত্রী একজন তরুণের প্রতি। কিন্তু কিছু সময় যেতে না যেতেই তাদের চেতনা এল ফিরে—দুজনেরই হ'ল আত্মোপলব্ধি—দুজনেই বুঝল, বয়স যে শূন্যভাবের সৃষ্টি করেছে, তা কোনো কিছু দিয়েই পূরণ হবার নয়—ঐ শূন্যকে মেনে নিয়েই হাসিমুখে দিন কাটাতে হবে দুজনে মিলে।

আমরা ভাবছি, এখানকার প্রযোজকেরা এই গল্প শুনে কি মন্তব্য প্রকাশ করবেন, তা জানি না এবং তাঁরা এগুলিকে আদৌ গল্প বলবেন কিনা, তাও জানা নেই।

এর পরে শ্রীরায় আরও কয়েকটি তথ্য শোনালেন। তিনি বললেন—

ইউরোপে আবহ-সঙ্গীতের ব্যবহার ভীষণ ক'মে যাচ্ছে। ওখানকার কুশলীদের মতে আবহ-সঙ্গীত ছবির মধ্যে একটা

"হায় মেলো" চিত্রে দ্বৈত ভূমিকায় দেবানন্দ।
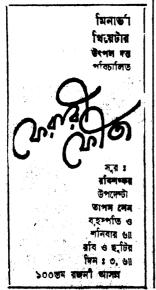
দস্তুরমত উপদ্রব—অহেতুক একটা কৃত্রিমতার সৃষ্টি ক'রে দর্শককে ছবির সৃষ্ট realistic atmosphere থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে; তাদের অকারণে make-belief সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে। আবহ-সংগীতের বদলে ওরা আবহ-শব্দের ব্যবহার করছে। কোনো দৃশ্যের যত রকম পারিপার্শ্বিক শব্দ হওয়া সম্ভব, তার সবক'টিই ব্যবহার ক'রে দৃশ্যটিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবানুগ করা হয়।

ঠিক সমান ভাবেই lighting করবার সময় আলোছায়ার সংমিশ্রণে কোনো দৃশ্যকে বা ঐ সংগে তার পাত্র-পাত্রীর চেহারাগুলোকে সুন্দর করবার বা মোলায়েম করবার যে-একটা যত্নকৃত চেষ্টা করা হ'ত, তা ওখানে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন lighting-কে realistic বা বাস্তবানুগ করবার দিকে বড্ড বেশী ঝোঁক। দিনের বা রাত্রির কোন্ বিশেষ সময়টিতে ঘটনাটি ঘটছে, আলো-ছায়ার সাহায্যে সেই বিশেষ সময়টিকে নির্দিষ্ট করার চেষ্টা প্রতি ছবিতেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—সময় নির্দেশই এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে, পাত্র-পাত্রীর চেহারা নয়।

"ঘরানা" চিত্রে আশা পারেখ

আলোকচিত্রশিল্পীরা Zoom lens-এর ব্যবহার বাড়িয়েছেন, যেমন সুরু করেছেন ক্যামেরাকে dolly, truck বা vinten-এ না চাপিয়ে হাতে ক'রে ধ'রে নিজেরা চ'লে চলমান বা ট্রাক শট্ নেওয়া। ছবির গল্প এমনভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে, যাতে পুরো ছবিটা বাইরে বাইরেই তোলা যায়; স্টুডিওর মধ্যে কৃত্রিম সেটের সাহায্যে কৃত্রিম আলোতে তোলার দরকার হয় না।

শিল্পের প্রচলিত রীতিনীতিকে ভাঙবার জন্যে পাত্র-পাত্রীদের এক শট থেকে আর এক শটে প্রবেশ-নির্গমে ডান-বাঁ পর্যন্ত মানা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে —এ যেন গায়ের জোরে ভাঙব ব'লেই ভাঙার চেষ্টা; একে iconoclastic attitude বলা যেতে পারে।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে cutting-এর ধারাও পাল্টে গেছে। long থেকে প্রথমে mid, তারপরে close-এ যে যেতেই হবে, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা নেই। প্রকাণ্ড distant long shot, তার পরেই একেবারে পর্দাজোড়া close-up হামেশাই দেখতে পাওয়া যাবে এবং দেখতে খুব খারাপও লাগে না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, গল্পের mood এবং প্রয়োজন। দেখেশুনে মনে হয়, চলচ্চিত্র-ব্যাকরণে সম্পাদনার যে-সূত্র বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা ছাড়াও অন্য অনেক অকথিত সূত্র ছিল, যেগুলোকে আজকাল কাজে লাগানো হচ্ছে।

এতদিন convention ছিল, প্রকাণ্ড mounting-ওয়ালা ছবিতেই cinemascope-এর ব্যবহার চলতে পারে। কিন্তু হালের ইওরোপের কুশলীরা অত্যন্ত ঘরোয়া ছবিতেও cinema-scope-এর ব্যবহার সুরু ক'রে দিয়েছে এবং মনে হচ্ছে, এর প্রয়োজনও ছিল; কেননা, দেখা যাচ্ছে—ছবিগুলি দেখতে বেশ ভালো লাগছে। ওরা খুব রঙ্গীন ছবিও তুলছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটা ফরাসী এবং ইতালীয় ছবিতেই বেশী। দেখা যাচ্ছে, গোড়ায় গোড়ায় যে মুষ্টিমেয় কলাকুশলী একটি ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে থেকে অনেকটা গোষ্ঠীগতভাবে নিজেদের ক্ষেত্রেই privately পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাত, আজ তারাই প্রকাশ্য ব্যবসার বাজারে বেরিয়ে এসেছে, তাদের ঐ experimental মনোবৃত্তিকে সংগে নিয়েই। অবশ্য এ-কাজে তারা যে সাহসী হ'তে পেরেছে, তার একটি বিশেষ কারণ হ'ল এই যে, তাদের বিষয়বস্তুতে তারা Sex-এর (যৌন ব্যাপারের) প্রাধান্য দিতে পারে এবং এটা তো জানা কথা, ছবির মধ্যে এই Sex-এর প্রাধান্য দর্শককে ছবির প্রতি আকৃষ্ট করতে অনেকখানি সাহায্য করে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের এখানে দু' একটা Film Society-র মাধ্যম ছাড়া ইওরোপীয় ছবি দেখার বিস্তৃত কোনো সুযোগ নেই। তাই চলচ্চিত্র ব্যাপারে আজ কোথায় কি রকম গতি-প্রকৃতি এবং তার দর্শকরা কিভাবে তাদের গ্রহণ করছে, এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে নিজেদের দেশের শিল্পকে তুলনামূলক-ভাবে বিচার করবার কোনো রাস্তাই খোলা নেই।

মুভি-টক'এর নির্মীয়মান 'শিউলি-বাড়ি'র একটি বিশিষ্ট শিশু-চরিত্রে অমল চট্টোপাধ্যায়

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

শ্রীলোকনাথ: (ওড়িয়া) রূপরাগের চিত্র; ১৫,২৮৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী: অশ্বিনীকুমার ঘোষ; চিত্রনাট্য: প্রেমেন্দ্র মিত্র; পরিচালনা: প্রফুল্ল সেনগুপ্ত; চিত্রগ্রহণ: রামানন্দ সেনগুপ্ত; শব্দধারণ: দেবেশ ঘোষ ও মৃণাল গুহঠাকুরতা; সঙ্গীত পরিচালনা: বালকৃষ্ণ দাশ; শিল্প-নির্দেশনা: সুবোধ দাশ ও সন্তোষ রায়চৌধুরী; সম্পাদনা: সুকুমার সেনগুপ্ত; ভূমিকায়: মণিমালা, উর্বশী, বারি, অক্ষয়, সৌম্যেন্দ্র, শান্তি, বিমল, খগেন, ঝুনু, ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি গেল ২৯এ সেপ্টেম্বর থেকে লোটাস সিনেমায় চলছে।

ছবির নাম "শ্রীলোকনাথ" হলেও এবং ছবির আরম্ভভাগে পৌরাণিক ঘটনার অবতারণা থাকলেও ছবিটি আসলে গার্হস্থ্য চিত্র এবং ওড়িয়া ভাষাতে এর সংলাপ হলেও আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত নয়। অবশ্য পুরীর বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ শিব "শ্রীলোকনাথ"এর মাহাত্ম্যকীর্তন এই ছবির বিশেষ উদ্দেশ্য এবং গল্পের অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের মধ্যে শ্রীলোকনাথের কৃপা ও বিরূপতাই সবচেয়ে বড় কার্যকরী শক্তি বলে ছবির "শ্রীলোকনাথ" নাম সার্থক হয়েছে।

গল্প ছবির অগ্রগতির সংগে সংগে বারে বারে মোড় ঘুরেছে এবং তারই ফলে তার কেন্দ্রবিন্দু একস্থান থেকে আর একস্থানে সরে গেছে। প্রথমে দেখেছি দুরন্ত দেবর এবং স্নেহপ্রবণা বৌদিদির গল্প, পরে এসেছে, একদিকে কিশোর-কিশোরীর প্রেম এবং অন্যদিকে নবজাত পুত্রকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী-দেবরের মধ্যে মান-অভিমানের পালা এবং শেষ পর্যন্ত দেবরের গৃহত্যাগ; এর পরে এসেছে
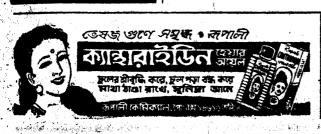
শ্রীলোকনাথের রুদ্ররোষ—যার ফলে, এক-দিকে বালক সর্পাহত হয়ে প্রাণ হারাল এবং অপর দিকে জীপ-দুর্ঘটনায় দেবর গেল হাসপাতালে। এরপর প্রায় বিশ বৎসরের ব্যবধানে। দাদা-বৌদি ঘটনাক্রমে সংবাদ পেয়ে যখন ছোটভাই বা দেবরের কাছে এসে হাজির, তখন ঐ দুর্ঘটনার জের টেনে সে ভুগছে অ্যাম্‌নেশিয়ায় অর্থাৎ স্মৃতিভ্রংশ রোগে। একেবারে প্রায় শেষাশেষি প্রকাশ পেল সর্পাহত বালক আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। নিশ্চয়ই বাবা শ্রীলোকনাথের কৃপায়; কারণ তারও নাম যে তাঁরই নামানুসারেই লোকনাথ রাখা হয়েছিল।

কিন্তু এই অতি দীর্ঘ এবং বারে বারে কেন্দ্রচ্যুত গল্পও পরিচালনা, চিত্র-গ্রহণ এবং অভিনয়ের গুণে বহুলভাবে দর্শকের মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতা রাখে। এবং বলতে বাধা নেই, বহু বাঙলা ছবির থেকেও এই ছবি উন্নত ধরনে নির্মিত। অভিনয়ে বৌদি বাসন্তীর ভূমিকায় মণিমালার অনবদ্য অভিনয় ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। অপরাপর ভূমিকায় উড়িষ্যার বিখ্যাত নট বাবি, অক্ষয়, শান্তি, বিমল, সৌম্যেন্দ্র প্রভৃতি শিল্পী পরিচালকের দাবি মিটিয়ে সুঅভিনয় করেছেন।

ওড়িয়া ছবির জগতে "শ্রীলোকনাথ" নিশ্চয়ই একট বড় পদক্ষেপ এবং এই ছবি ওড়িয়া চিত্রের ভবিষ্যৎকে নিশ্চয়ই সম্ভাবনাময় করে তুলেছে।

সংলাপহীন চিত্র 'ইঙ্গিত'-এর এক দৃশ্যে শুভ্রা ঘোষ।

বিবিধ সংবাদ

"শশুরাল"-এর রজত-জয়ন্তী উৎসব

স্থানীয় হিন্দ সিনেমায় একাদিক্রমে পঁচিশ হপ্তা চলে প্রসাদ প্রোডাক্‌সান্সের "শশুরাল" রজত-জয়ন্তী সপ্তাহে প্রবেশ করায় এই সাফল্যকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে প্রযোজক এল-ডি-প্রসাদ, পরিবেশক তারাচাঁদ বর্জাতিয়া এবং প্রদর্শক এস-পি-জয়সোয়াল—এই ত্রয়ীর পক্ষ থেকে গেল বুধবার, ৪ঠা অক্‌টোবর গ্র্যান্ড হোটেলের প্রিন্সেসে একটি চায়ের আসর বসানো হয়। স্থানীয় চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট পরিবেশক, প্রদর্শক, প্রযোজক এবং সাংবাদিক আসরে উপস্থিত ছিলেন। চা-পানের পর রায়জাদা নরীন্দ্রকুমার উপস্থিত অভ্যাগতদের অনুপস্থিত প্রযোজক এবং পরিবেশকের তরফ থেকে সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করার পর চিত্র প্রদর্শনে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করবার জন্যে হিন্দ সিনেমার শ্রীএস-পি-জয়সোয়ালকে একটি স্বর্ণখচিত, রৌপ্যনির্মিত ফলক (শীল্ড) উপহার দেওয়া হয়।

লোকনাট্যম্

মৌলিক নাটক পরিবেশনায় কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী অন্যতম নাট্যসংস্থা "লোক-নাট্যম্" আসছে ১৫ই অক্‌টোবর, সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে তাঁদের তৃতীয় নাট্য-প্রচেষ্টা, বিমল গুপ্ত রচিত "সাইকোথেরাপি" মঞ্চস্থ করবেন। মস্তিষ্ক-বিকৃতির মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একজন মানবধর্মী চিকিৎসক কিভাবে তাঁর নতুন সূত্রকে খুঁজে পেলেন, তারই এক চিত্র এই নাটকে রূপ পেয়েছে।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত "নায়িকার নাম" গল্পটির ৭৬৫ পৃঃ ২য় কলমের শেষ লাইন ৩য় কলমের ১৪ লাইনের পর বসবে।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রেক্ষা-গৃহের ৭০৬ পৃঃ দুটি চিত্রের পরিচিতি পরস্পর পরিবর্তিতরূপে পড়তে হবে।

শুভ মহরৎ

গেল সোমবার, ৯ই অক্টোবর ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে পি, এক, ভি, ফিল্মসের প্রথম চিত্র-নিবেদন "ঠগী দমন"-এর শুভ মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের ইন্সপেক্টার জেনারেল অব পুলিশ শ্রীহরিসাধন ঘোষচৌধুরী এবং পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যা শ্রীযুক্তা আভা চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিটি যুগ্মভাবে পরিচালনা করবেন শ্রীরতন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য।

*

আজ শুক্রবার, ১৩ই অক্টোবর, সন্ধ্যা ৭টায় সুখ্যাত চতুর্মুখ সম্প্রদায় তাঁদের বহু অভিনীত নাটক, অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "থানা থেকে আসছি"র পুনরভিনয় করবেন রঙমহল রঙ্গমঞ্চে, শ্রীপ্রমথানন্দ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নতুন আঙ্গিকে। অভিনয়ে পরিচালক স্বয়ং ছাড়াও অসীম চক্রবর্তী, লোকনাথ [illegible], প্রাণতোষ নাহা, দেবু কর, তৃপ্তি [illegible] ও [illegible] নন্দ্রা অংশগ্রহণ করবেন।

খেলাধূলা

দর্শক

॥ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ॥

দিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার সুইমিং পুলে অনুষ্ঠিত ১৯৬১ সালের জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় গত দু'-বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগে ১৫টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৩টিতে প্রথম স্থান লাভ করে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে। রেলওয়ে, পশ্চিম বাংলা এবং কেরালা যথাক্রমে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ স্থান পেয়েছে। মহিলা এবং জুনিয়ার বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছে পশ্চিম বাংলা।

মহিলা বিভাগে পশ্চিম বাংলার বালিকা সাঁতারু কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র তিনটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভ ক'রে এবং ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে বিজয়ী বাংলার পক্ষে যোগদান ক'রে প্রতিযোগিতায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সন্ধ্যা চন্দ্র ছাড়া আর কোন সাঁতারু এই বারের প্রতিযোগিতায় একক হিসাবে তিনটি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করতে পারেন নি। পুরুষ বিভাগে দু'টি ক'রে অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পেয়েছেন সার্ভিসেস দলের নারায়ণ সিং এবং রামদেও সিং। এই দু'জন সাঁতারু ৪×১০০ মিটার মিডলী রিলে রেসে যোগদান ক'রে দলকে জয়যুক্ত করায় গৌরবও লাভ করেছেন।

নারায়ণ সিং ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ১ম স্থান লাভ করেন এবং ৩টি রীলে রেসে যোগদান ক'রে দলকে জয়যুক্ত করেন। রামদেও সিং ১০০ ও ২০০ মিটার বুক সাঁতারে প্রথম স্থান লাভ করেন।

কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র (পশ্চিমবঙ্গ) অষ্টাদশ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে প্রথম স্থান লাভ করেন। তাছাড়া ৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলেতে প্রথম স্থান অধিকারী বাংলা দলের পক্ষেও তিনি অংশ গ্রহণ ক'রে মোট ৪টি স্বর্ণপদক লাভের গৌরব লাভ করেন।

দলগত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস ৯৭, ২য় রেলওয়ে ২৫, ৩য় পশ্চিম বাংলা ১৮ এবং ৪র্থ কেরালা ৪ পয়েন্ট।

মহিলা বিভাগ : ১ম পশ্চিম বাংলা ৪৫, ২য় দিল্লী ১২, ৩য় কেরালা ২ এবং ৪র্থ বোম্বাই ২ পয়েন্ট।

জুনিয়ার বিভাগ : ১ম পশ্চিম বাংলা ২৬, ২য় বোম্বাই ১৮, ৩য় উত্তর-প্রদেশ ১৩, এবং ৪র্থ দিল্লী ৫ পয়েন্ট।

ওয়াটার পোলো : পশ্চিম বাংলা ১১ : রেলওয়ে ১১ (যুগ্ম-বিজয়ী) ওয়াটার পোলো খেলার ফাইনালে দুই দলই এগারটি ক'রে গোল দেয়। গত বছরের বিজয়ী পশ্চিম বাংলার পক্ষে সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি দেব একাই ১১টি গোল দিয়ে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একটি খেলায় সর্বাধিক গোল দেওয়ার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। রেলওয়ে দলের পক্ষে সর্বাধিক ৮টি গোল করেন ভুবনেশ্বর পাণ্ডে।

প্রথম দিনের হিটে নীচের চারটি অনুষ্ঠানে পূর্বের ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয় :

পুরুষ বিভাগ

২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক : (১) চাঁদরাম (সার্ভিসেস)। সময় ২ মিঃ ৩৯.৯ সেঃ (হিট ১নং)

(২) রূপচাঁদ (সার্ভিসেস)। সময় ২ মিঃ ৪১.৪ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ২ মিঃ ৪২.৩ সেঃ—রূপচাঁদ (সার্ভিসেস)।

২০০ মিটার বাটারফ্লাই : শ্যামলাল (সার্ভিসেস)। সময় ২ মিঃ ৪৮.৭ সেঃ (প্রথম হিট)

(২) ওয়াশান সিং (সার্ভিসেস)। সময় ২ মিঃ ৫০.৫ সেঃ (২য় হিট)।

পূর্ব রেকর্ড : ২ মিঃ ৫১ সেঃ—এস জি লাঠি (বোম্বাই)

২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক : রামদেও সিং (সার্ভিসেস)। সময় ২ মিঃ ৪৪.১ সেঃ (১ম হিট)।

পূর্ব রেকর্ড : ২ মিঃ ৪৫.৬ সেঃ—রামদেও সিং (সার্ভিসেস)।

জুনিয়ার

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক : (১) পরিমল চন্দ্র (বাংলা)। সময় ১ মিঃ ২৮.৭ সেঃ (১ম হিট)

(২) সুবীর সেন (বাংলা)। সময় ১ মিঃ ২৮ সেঃ (২য় হিট)।

পূর্ব রেকর্ড : ১ মিঃ ২৯.২ সেঃ—এস এন গোয় (উত্তর প্রদেশ)।

দ্বিতীয় দিনের হিটে নীচের চারটি অনুষ্ঠানে পূর্বের ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়।

পুরুষ বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : রাম সিং (সার্ভিসেস)। সময় ৫ মিঃ ৫.৩ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ৫ মিঃ ৯.১ সেঃ (রাম সিং)

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : নারায়ণ কুণ্ডু (বাংলা)। সময় ১ মিঃ ১১.২ সেঃ

পূর্ব রেকর্ড : ১ মিঃ ১১.৫ সেঃ (এন সি পাল, সার্ভিসেস)

১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক : রামদেও সিং (সার্ভিসেস)। সময় ১ মিঃ ১৬.৩ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ১ মিঃ ১৭ সেঃ—রামদেও সিং (সার্ভিসেস)।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক : সন্ধ্যা চন্দ্র (বাংলা)। সময় ১ মিঃ ২৭.৩ সেঃ

পূর্ব রেকর্ড : ১ মিঃ ২৯.৫ (সন্ধ্যা চন্দ্র)

ফাইনালে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পূর্বের ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়।

পুরুষ বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল : এম এস জুলার (রেলওয়ে)।

সময় ৫ মিঃ ৮.৭ সেঃ

২০০ মিটার বাটারফ্লাই : শ্যামলাল (সার্ভিসেস)।

সময় ২ মিঃ ৩৭ সেঃ

রামদেও সিং
তিনটি স্বর্ণপদকের অধিকারী—১০০ ও ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক এবং রীলে রেস।

২০০ মিটার ব্যাক-স্ট্রোক : চাঁদ রাম (সার্ভিসেস)।

সময় ২ মিঃ ৩৮ সেঃ

২০০ মিটার ব্রেস্ট-স্ট্রোক : রামদেও সিং (সার্ভিসেস)। সময় ২ মিঃ ৪৫.১ সেঃ

৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলে : সার্ভিসেস দল। সময় ৪ মিঃ ১৯.২ সেঃ

পূর্ব রেকর্ড : ৪ মিঃ ১৯.৯ সেঃ (বোম্বাই)

৪×২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল রীলে : সার্ভিসেস। সময় ৯ মিঃ ৫৪.১ সেঃ।

৪×১০০ মিটার মিডলী রীলে : সার্ভিসেস। সময় ৪ মিঃ ৪৭.১ সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক : রামদেও সিং (সার্ভিসেস)। সময় ১ মিঃ ১৬.২ সেঃ।

মহিলা বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল : কল্যাণী বসু (বাংলা)। সময় ৬ মিঃ ২৫.৩ সেঃ।

পূর্ব রেকর্ড : ৬ মিঃ ৩০.৬ সেঃ—ডলী নাজির।

২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল : সন্ধ্যা চন্দ্র (বাংলা)। সময় ২ মিঃ ৫৮.৩ সেঃ

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক : ডিজিং লাসেন (দিল্লী)। সময় ১ মিঃ ৩৭.১ সেঃ

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক : সন্ধ্যা চন্দ্র (বাংলা)। সময় ১ মিঃ ২৮.০ সেঃ।

৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলে : বাংলা। সময় ৫ মিঃ [illegible] সেঃ।

জুনিয়র বিভাগ

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক : পি জুত্রে (ইউ-পি)। সময় ১ মিঃ ১৯.১ সেঃ

১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক : সুবীর সেন (বাংলা)। সময় ১ মিঃ ২৭.১ সেঃ

১০০ মিটার বাটার ফ্লাই : রবি টিকু (দিল্লী)। সময় ১ মিঃ ২৯.৯ সেঃ।

॥ এম, সি, সি, দলের আসন্ন ভারত সফর ॥

এম, সি, সি, দল বিমানযোগে করাচী পৌঁছে গেছে। আগামী শুক্রবার (১৩ই অক্টোবর) রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেণ্ট একাদশ দলের বিপক্ষে এম, সি, সি, দল পাকিস্তান ক্রিকেট সফরের উদ্বোধন করবে।

ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এম, সি, সি, দলের এই বারের ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একই সফরে এসে তারা দুটি দেশ—ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে মোট ৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলবে—ভারতবর্ষের সঙ্গে ৫টা এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩টে। একই ঢিলে দুটো পাখি মারার মত ব্যাপারটা। একই সফরে এম, সি, সি দুটো দেশের বিপক্ষে যে টেস্ট খেলেছে তার নজির অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলা। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এম, সি, সি কোন সফরেই দুটোর বেশী টেস্ট ম্যাচ খেলেনি। তাই নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এম, সি, সি দলের টেস্ট ম্যাচ টেস্ট ক্রিকেট খেলার ভাষায় পূর্ণাঙ্গ 'রাবার' পর্যায়ে পড়ে না।

অস্ট্রেলিয়া গত ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরে মোট ৮টা টেস্ট ম্যাচ খেললেও তিন মাসের খেলার ধকল তাদের নিতে হয়েছিল; টেস্ট ম্যাচ ছাড়া অন্য খেলার মোট সংখ্যা ছিল কম; কিন্তু এম, সি, সি'র এই দুই দেশের সফর শেষ করতে পাঁচ মাস সময় লাগবে। এম, সি, সি ভারত এবং পাকিস্তান সফরে মোট ২০টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগ দিবে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে সিংহলে খেলবে ৩টে ম্যাচ। এবারের সফরের মধ্যে অভিনবত্ব আছে। আগের মত ভারত সফরের তালিকা প্রথমে না নিয়ে এবার একটি বাবর দুদে

টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক)

এম জে কে স্মিথ (সহ-অধিনায়ক)

করবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সেখানে ৩টে (১ম টেস্টসহ) ম্যাচ খেলবে। তারপর ভারত সফরে ১৫টা খেলা শেষ ক'রে দলটি চলে যাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা সহরে ২য় টেস্ট খেলতে। ঢাকার সফর শেষ ক'রে করাচী গিয়ে পাকিস্তানের সফর শেষ করবে। এই-বারের সফরেই এম. সি. সি দল সর্বপ্রথম পাকিস্তানের মাটিতে সরকারীভাবে টেস্ট ম্যাচ খেলবে।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের কাছে এম, সি, সি, দলের এই ক্রিকেট সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে. এম, সি. সি, দলের ভারত সফর শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরই ভারতবর্ষ যাত্রা করবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে। আর পাকিস্তান ১৯৬২ সালে যাবে ইংল্যাণ্ডে খেলতে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের শেষ দু'টি টেস্ট খেলা হবে নতুন বছরে (অর্থাৎ ১৯৬২ সালে) যথাক্রমে ঢাকায় এবং করাচীতে। সুতরাং হিসাবে দেখা যায়, ১৯৬২ সালে ইংল্যাণ্ড-পাকিস্তানের মধ্যে ৭টা টেস্ট খেলা হবে—ঢাকা এবং করাচীতে ২য় ও ৩য় টেস্ট ম্যাচ এবং ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ৫টা টেস্ট।

এই সব দিক বিচার ক'রে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক রন রবার্টস আসন্ন ভারত সফরে এম, সি, সি, দলের শক্তি সম্পর্কে লিখেছেন :

"সেই জন্য মনে হয় টেড ডেকস্টারকে ভারতে এবং পাকিস্তানে উভয় দেশেই বড় রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে। জয়লাভের জন্য তাঁদের যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে। ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার যে দলটি ভারত এবং পাকিস্তানে খেলতে আসে সেই দলটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, কিন্তু এই বারের এম, সি, সি, দলটি মে, কাউড্রে এবং সুব্বা রাও'র মত ব্যাটসম্যান এবং স্ট্যাথাম এবং ট্রুম্যানের মত বোলারের অভাবে কিছুটা যে অসুবিধা বোধ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই; তাছাড়া খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় সকলেই ভারতে এই প্রথম আসছেন, অপরিচিত পরি-বেশের অসুবিধাও তাঁদের সেই জন্য ভোগ করতে হবে।

ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র লক্, ব্যারিংটন (উভয়েই সারের) এবং রিচার্ডসনের (এক সময়ে যিনি উরস্টার-শায়ারের পক্ষ হয়ে খেলেছিলেন এবং এখন কেণ্টের ওপনিং ব্যাটসম্যান) প্রাচ্যের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা আছে। এই অভিজ্ঞতা তাঁদের ভারতে এসে হয়নি, তাঁরা পরিবেশের এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন ১৯৫৫-৫৬ সালে পাকিস্তান সফরে এসে।

এম. সি. সি'র বর্তমান দলের শক্তি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে; অনেকেই বলেছেন, দলটি যথেষ্ট শক্তি-শালী নয়, পূর্ণাঙ্গ টেস্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা তাদের নেই। এই খেলা যদি পাঁচ মাস ধরে না চ'লে তিন মাস ধরে চলত তাহলে আমার বিশ্বাস, প্রবীণ খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেরই টীমে যোগদান সম্ভব হত, তাতে টীমের সাফল্যের সম্ভাবনাও অনেক বৃদ্ধি পেত।

তা যাই হোক ডেক্স্টারের দলটির কাছ থেকে দর্শকসাধারণ ভাল খেলাই আশা করতে পারেন। দলটিকে ইংল্যাণ্ডের একটি বিকল্প দল হিসাবে ধরা ভুল হবে। আগামী বৎসর 'অ্যাসেজ' অধিকারের জন্য এম, সি, সি'র যে দলটি অস্ট্রেলিয়া সফর করবে তাতে এইবারের এই দলটির অনেকেই যে অন্তর্ভুক্ত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। মে, স্ট্যাথাম এবং ট্রুম্যান আগামী অস্ট্রেলিয়া সফরে সম্মত নাও হতে পারেন; তাছাড়া সুব্বা রাও ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছেন। একমাত্র কাউড্রের যোগদান সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ নেই।

ভবিষ্যতের খেলার সুযোগ এম, সি, সি'র বর্তমান উদীয়মান খেলোয়াড়দের অনেকটা উৎসাহিত করবে বলেই মনে হয়। তাছাড়া ডেকস্টার, মাইক স্মিথ (ভাইস ক্যাপ্টেন), ব্যারিংটন, পুলার, রাসেল এবং রিচার্ডসনের মত খেলোয়াড়রা যখন দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তখন রাণ তোলার ব্যাপারেও টীমের কোন অসুবিধা হবে না।

ফাস্ট বোলিং-এর সুযোগও যথেষ্ট আছে, যদিও এই ফাস্ট বোলিং-এর গুণাগুণ পরীক্ষিত হবার অপেক্ষা রাখে। হোয়াইট, যিনি হ্যাম্পশায়ারকে জয়যুক্ত করতে সাহায্য করেন, তিনি আক্রমণ রচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন। এসেক্সের চৌকশ খেলোয়াড় নাইট এবং ব্রাউনও এই দিকে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করবেন বলে আশা করা যায়। এ'দের সংগে আছেন গ্লস্টারশায়ারের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ডেভিড স্মিথ, লক ও এলেন এবং সর্বোপরি গুগলি বোলার বারবার।" (বি, আই, এস)।

এম, সি সি, দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার বলেছেন, আমাদের বিপক্ষ দল যে রকম খেলাই খেলুক না কেন এবং খেলার পরিস্থিতি যে কোন অবস্থায় আসুক না কেন, আমরা সর্বদাই চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো। নিজ দলের খেলার শোচনীয় অবস্থার সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে বলেছেন, খেলায় কোন সময়ে হয়ত আমরা শোচনীয় অবস্থায় পড়তে পারি; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদের লক্ষ্য থাকবে দ্রুতগতিতে রান করা। অনেক যায়গায় পীচ বোলারদের সহায়ক হবে না শুনে ডেক্সটার বলেছেন, সে ক্ষেত্রে আমার মনের কথা হ'ল যত দ্রুতগতিতে পারা যায় রান তুলে বিপক্ষ দলকে আউট করার জন্যে সময় নেওয়া। 'রয়টার' সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ক্রিকেট খেলার ভাষ্যকার প্রেসলী দি।

এম, সি, সি, দলের সঙ্গে এই সফরে আসছেন। তাঁর মতে পিটার মে, কলিন কাউড্রে, ফ্রেড ট্রুম্যান, ব্রেন স্ট্যাথাম এবং সুব্বারাও দলভুক্ত না হ'লেও ইতিপূর্বে যে কয়েকবার এম, সি, সি, ভারত সফরে এসেছিল সম্ভবতঃ তাদের থেকে শক্তিশালী।

দ্রুতগতিতে এবং প্রচুর রান তুলতে পারেন এমন খেলোয়াড় দলে আছেন টেড ডেক্সটার, পারফিট, পিটার রিচার্ডসন, পুলার, ব্যারিংটন, মাইক স্মিথ এবং রাসেল। দলে চারজন ন্যাটা ব্যাটসম্যান আছেন—পুলার, রিচার্ডসন, বার্বার এবং পারফিট। দলের পক্ষে চারজন ন্যাটা ব্যাটসম্যান থাকা যথেষ্ট সুবিধার কথা।

অনেকের মতে দলের বোলিং দিকটা অপেক্ষাকৃত বেশ দুর্বল। অভিজ্ঞ টেস্ট বোলার মাত্র দু'জন, টনি লক (স্লো লেফট-আর্ম) এবং ডেভিড এ্যালেন (অফ-ব্রেক)। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের নিষ্প্রাণ পীচ তাঁদের পক্ষে সহায়ক না হতেও পারে।

এম, সি, সি, দলের খেলা বেশি ক'রে নির্ভর করছে ফাস্ট এবং ফাস্ট-মিডিয়াম বোলারদের খেলার ওপর। ফলে হোয়াইট, ব্রাউন, নাইট এবং ডেভিড স্মিথের ওপর দলের গুরুদায়িত্বের বোঝা চাপবে। ভারতবর্ষের জলবায়ু এবং মাটি যদি তাঁরা ধাতস্থ করতে না পারেন তাহলে দলের পক্ষে বিপদের কথা। বোলার হিসাবে ডেক্সটার (মিডিয়াম-পেসড), বার্বার এবং ব্যারিংটন (লেগ-স্পিন) সময়ে সময়ে দলের সহায়ক হবেন। দলে আছেন দু'জন উইকেট-কীপার—জে টি মারে এবং জি এফ মিলম্যান।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মারের সাফল্য এখনও মন থেকে মুছে যায়নি। ফিল্ডিংয়ে দলটি খুবই পাকাপোক্ত। উইকেটের নিকট দূরত্বে ক্যাচ লুফতে ওস্তাদ—লক, মাইক স্মিথ, পারফিট এবং ব্যারিংটন।

দলের ষোলজন খেলোয়াড়দের মধ্যে অপেশাদার খেলোয়াড় তিনজন—টেড ডেক্সটার, এম জে কে স্মিথ এবং আর ডবলউ বার্বার। ষোলজনের মধ্যে ইতিপূর্বে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ৯ জন—ডেক্সটার, এম জে কে স্মিথ, রিচার্ডসন, ব্যারিংটন, মারে, পুলার, বার্বার, এ্যালেন এবং লক।

॥ ডেভিস কাপের ইতিহাস ॥

দেখা যায়, পৃথিবীর অনেক বড় ব্যাপারের সূচনা হয়েছে ছোট অবস্থা থেকে—বড় থেকে নয়। ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা সম্পর্কেও ঠিক এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সরকারী-ভাবে ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতি-যোগিতাকে আন্তর্জাতিক খেলার পর্যায়ে স্থান দেওয়া হলেও ডেভিস কাপ জয়-লাভের গৌরব আরও বেশী—দলগত বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভের সমান। কারণ লন টেনিস খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পি-য়ানসীপের কোন ব্যবস্থা এ-পর্যন্ত হয়নি। ডেভিস কাপ জয়লাভের গৌরবকে তাই লন টেনিসে বিশ্ব খেতাব লাভের সমান গণ্য করা হয়। বে-সরকারী-ভাবে এ কথা সর্বত্র এমনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, সরকারী ঘোষণার আর প্রয়োজন হয়নি।

আমেরিকার তরুণ টেনিস খেলোয়াড় ডি এফ ডেভিস আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার প্রথম স্বপ্ন দেখেন। তিনি আমেরিকার লন্ টেনিস এসোসিয়েশনকে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বার্ষিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। এই দুই দেশের বার্ষিক লন টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি একটি ট্রফি উপহার দেওয়ারও প্রস্তাব করেন। তাঁরই প্রস্তাব অনুযায়ী ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার জন্ম এবং তিনি যে ট্রফিটি উপহার দিয়েছিলেন তা তাঁরই নামানুসারে অভিহিত। আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ডেভিস কাপের প্রথম খেলা শুরু হয় ১৯০০ সালে। প্রথম বছরেই ডি এফ ডেভিস আমেরিকার পক্ষে খেলেছিলেন। প্রথম বছরের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ৫—০ খেলায় জয়লাভ করে। দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯০১ সালে ইংল্যাণ্ড আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ না করায় ডেভিস কাপ আমেরিকার হাতেই থেকে যায়। ১৯০২ সালেও আমেরিকা [illegible] হয়। ১৯০৩ সালে ইংল্যাণ্ড [illegible] খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে [illegible] প্রথম সমুদ্রের পরপারে ডেভিস কাপ নিয়ে যাওয়ার গৌরব লাভ করে। ১৯০৪ সালের প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ছাড়াও অপর কয়েকটি দেশ যোগদানের অনুমতি লাভ করে। ফলে প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

১৯০৪ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে বেলজিয়াম ০—৫ খেলায় ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরে যায়। ১৯০৫ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড একযোগে অস্ট্রেলেশিয়া নাম দিয়ে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে এবং তৃতীয় বছরে (১৯০৭ সালে) ৩—২ খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ডেভিস কাপ জয় করে। অস্ট্রেলেশিয়ার পক্ষে খেলেছিলেন দু'জন খেলোয়াড়—নর্ম্যান ব্রুকস (অস্ট্রেলিয়া) এবং এন্টনি উইল্ডিং (নিউজিল্যাণ্ড)। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড 'অস্ট্রেলেশিয়া' নামে ১৯০৫ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে ১০ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠে ৬ বার ডেভিস কাপ জয় করে। ১৯২৪ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের জুড়ি ভেঙে যায়—অস্ট্রেলিয়া পৃথক-ভাবে যোগদান করে। অস্ট্রেলিয়া ঐ বছরের 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' ০—৫ খেলায় আমেরিকার কাছে হার স্বীকার করে। এরপর অস্ট্রেলিয়া চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ওঠে ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে, কিন্তু ডেভিস কাপ জয় করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ডেভিস কাপ পায় ১৯৩৯ সালে ৩—২ খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে।

১৯০০ স্নাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রথম মহা-যুদ্ধের জন্যে ৪ বছর (১৯১৫-১৯১৮) এবং দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের দরুণ ৬ বছর (১৯৪০-১৯৪৫) মোট ১০ বছর ডেভিস কাপের খেলা হয়নি। তা'ছাড়া ১৯০১ সালে ডেভিস কাপ জয়ী আমেরিকাকে এবং ১৯১০ সালে অস্ট্রেলিয়াকে কোন দেশ চ্যালেঞ্জ না করায় যথাক্রমে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া ঐ দু' বছরে ওয়াক-ওভার পেয়ে ডেভিস কাপ জয়ের সম্মান লাভ করে।

অস্ট্রেলেশিয়া উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯০৭-১৯১২) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯০৭-১৯১১) ডেভিস কাপ পায়। অস্ট্রেলেশিয়া

ক্যালকাটা হার্ডকোর্ট টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে বিজয়ী জয়দীপ মুখার্জি (ডানদিকে) এবং বিজিত প্রেমজিৎলাল (বাঁদিকে)। এই দু'জন খেলোয়াড় পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে জয়লাভ করেন।

১৯০৭ সালে পরাজিত করে বৃটেনকে এবং উপর্যুপরি তিনবার (১৯০৮-১৯১১) আমেরিকাকে। ১৯১২ সালে অস্ট্রেলেশিয়ার হাত-ছাড়া হয়ে ডেভিস কাপ বৃটেনের হাতে চলে যায়। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯১৩ সালে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা হয় ইংল্যাণ্ডের উইম্বলেডনে—আমেরিকার সংগে ইংল্যাণ্ডের। আমেরিকা ৩—২ খেলায় জয়ী হয়ে আটলান্টিকের পরপারে ডেভিস কাপ ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সুদীর্ঘ ৯ বছর আগে (১৯০৩ সালে) বৃটেনই আমেরিকার বোস্টনে আমেরিকাকে ৪—১ খেলায় পরাজিত ক'রে সর্বপ্রথম আটলান্টিকের পরপারে ডেভিস কাপ নিয়ে যাওয়ার গৌরব লাভ করেছিল।

ডেভিস কাপের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে ফ্রান্সের একটানা সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফ্রান্স ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে প্রথম খেলে ১৯২৫ সালে। ফ্রান্স উপর্যুপরি ৯ বার (১৯২৫-১৯৩৩) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ৬ বার (১৯২৭-১৯৩২) ডেভিস কাপ জয় করে। এই ছ'বার জয়লাভের মধ্যে ফ্রান্স উপর্যুপরি চারবার (১৯২৭-১৯৩০) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে পরাজিত করে আমেরিকাকে এবং ১৯৩১ সালে বৃটেন এবং ১৯৩২ সালে পুনরায় আমেরিকাকে। এই একটানা ৬ বার ডেভিস কাপ জয়লাভের পর ১৯৩৩ সালে ফ্রান্স ২—৩ খেলায় বৃটেনের কাছে পরাজিত হয়ে সেই যে ডেভিস কাপ হাতছাড়া করলো তারপর আর কখনও চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডেই উঠতে পারেনি, ডেভিস কাপ পাওয়া তো দূরের কথা। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সের সাফল্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, ফ্রান্স একটানা ৯ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে এবং একটানা ৬ বার (১৯২৭-১৯৩২) ডেভিস কাপ জয় করেছে। এই ৯ বারই ফ্রান্সের মোটমাট চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলা এবং এই ৬ বারই তার ডেভিস কাপ জয়। এ এক রকম নয়-ছয় কাণ্ড। ফ্রান্সের এই একটানা সাফল্যের মূলে ছিলেন বিশ্ব-খ্যাত "Four Musketeers"—হেনরী কোশে, জিন বোরোত্রা, জিন লাকোস্তে এবং ব্রুনো। শুধু ডেভিস কাপ কেন, উইম্বলেডন লন টেনিস চ্যাম্পিয়ান-সীপের খেলাতেও ফ্রান্স এই সময়ে (১৯২৪-১৯৩৩) একটানা একাধিপত্য বিস্তার করেছিল। ফ্রান্স ১৯২৪-১৯২৯ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি মোট ৬ বার পুরুষদের সিংগলস খেতাব পেয়ে বহিরাগত দেশগুলির পক্ষ থেকে সর্বাধিকবার উপর্যুপরি পুরুষদের সিংগলস খেতাব লাভের যে রেকর্ড করে তা আজও অক্ষুন্ন আছে। ফ্রান্সের এই জয়লাভে সহযোগিতা করেছিলেন পূর্বোল্লিখিত চারজন খেলোয়াড়। সিংগলস খেতাব ছাড়াও ফ্রান্স ১৯২৫ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে ৫ বার পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে জয়ী হয়—ফ্রান্সের পক্ষে জুটি খেলেছিলেন বোরোত্রা, লাকোস্তে, কোশে এবং ব্রুনো।

এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি দেশ ডেভিস কাপ জয় করেছে—আমেরিকা ১৯ বার (১৯০১ সালে ওয়াক-ওভার), অস্ট্রেলেশিয়া (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড) ৭ বার (১৯১০ সালে ওয়াক-ওভার), অস্ট্রেলিয়া ১০ বার, বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে আমেরিকা ৪১ বার, অস্ট্রেলিয়া ২০ বার, বৃটেন ১৬ বার, অস্ট্রেলেশিয়া ১০ বার, ফ্রান্স ৯ বার, বেলজিয়াম ১ বার (১৯০৪ সালে), জাপান ১ বার (১৯২১ সাল) ও ইটালী ১ বার (১৯৬০)।

উপর্যুপরি জয় (চার বার এবং তার বেশী): আমেরিকা ৭ বার (১৯২০-১৯২৬) এবং ৪ বার (১৯৪৬-৪৯); ফ্রান্স ৬ বার (১৯২৭-১৯৩২); বৃটেন ৪ বার (১৯০৩-১৯০৬) এবং ৪ বার (১৯৩৩-১৯৩৬); অস্ট্রেলেশিয়া ৪ বার (১৯০৭-১৯১১) এবং অস্ট্রেলিয়া ৪ বার (১৯৫০-১৯৫৩)।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকা এবং ফ্রান্স এক সময়ে ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ বছর এক-টানা আধিপত্য বিস্তার করেছিল; এই ৬ বছরে ফ্রান্স ৪ বার এবং আমেরিকা ২ বার ডেভিস কাপ জয় করে।

যুদ্ধ পরবর্তীকালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মাত্র দু'টি দেশ—অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা এক-টানা ১৪ বার (১৯৪৬-১৯৫৯) খেলেছে। এই সময়ে ডেভিস কাপ পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৮ বার এবং আমেরিকা ৬ বার। ১৯৬০ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকা উঠতে পারেনি, ইণ্টার-জোন ফাইনালে ২—৩ খেলায় ইতালীর কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। ১৯৬০ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় ইতালীকে পরাজিত ক'রে যুদ্ধ পরবর্তীকালের প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ৯ বার ডেভিস কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
SADHANA AUSADHALAYA
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৯০৩	সম্পাদকীয়	
৯০৪	আলোকিত অন্ধকার (কবিতা)	—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু
৯০৪	মন চায়	—শ্রীঝরণা দেব
৯০৪	সুরের আগুনে জ্বলছি	—শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়
৯০৫	সাত যোগিনী (গল্প)	—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
৯১০	কবি অতুলপ্রসাদ	—শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু
৯১২	প্রাচীন সাহিত্যে প্রহেলিকা	—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
৯১৪	ক্যারিকেচার (গল্প)	—শ্রীকালিদাস দত্ত
৯২৩	উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক-পত্র সম্পাদনায় বাঙালী মহিলা	—শ্রীশিবানী চট্টোপাধ্যায়
৯২৫	পরিশোধ (উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ২৪শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৩রা কার্তিক, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 20th October, 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাই। বাঙালী-জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের উৎস শারদীয়া পূজা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হ'য়ে গেলেও উৎসবের রেশ এখনো মিলিয়ে যায়নি। বাঙালীর ঘরে যতো ভাইবোন সকলে একত্র হ'য়ে আনন্দানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে যে সজীবতা আহরণ করলেন, ভবিষ্যতের পথযাত্রায় তা অমূল্য সম্পদ হ'য়ে থাকবে। আমাদের জীবনের উপর দিয়ে গত এক বছরে বহু ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যে কদিনের জন্যে অতীত দুঃখের স্মৃতিকে সরিয়ে রেখে আনন্দের আহ্বানে অমৃতাভিলাষী হ'তে পেরেছি এতে আমাদের দুর্জয় প্রাণশক্তিরই পরিচয় সূচিত হয়। এই প্রাণশক্তি আগামী দিনেও আমাদের প্রেরণার উৎস হ'য়ে থাকবে এবং আমরা সমস্ত রকম বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যেতে পারব এমন আশা করা অন্যায় হবে না।

অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় আশার আশ্রয় নবান্নের দিন সমাগত হবে। নতুন ধান গোলায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জীবনযাত্রার চাপ অনেকটা শ্লথ হ'য়ে যাবে। চালের দাম কমবে, শাকসব্জী সুলভ হবে এবং হয়তো মাছের দরও নেমে আসবে। কাজেই শারদোৎসব কেবল বর্তমান আনন্দের জন্যেই নয়, ভবিষ্যৎ সুখের সম্ভাবনার জন্যেও আদরণীয়। আমাদের আগামী দিনগুলি মধুময় হ'য়ে উঠুক এই আমাদের প্রার্থনা।

কিন্তু আমরা বাঙালী হলেও আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের কথা আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। বাঙালী-জীবনের আনন্দোৎসবের আঙিনা থেকে যখন আমরা বৃহত্তর এই স্বদেশের দিগন্তে দৃষ্টিপাত করি, তখন অমঙ্গলের মেঘ কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে দেখতে পাই।

বিহারের এক ব্যাপক অঞ্চলে আকস্মিক প্লাবনের ফলে শস্যহানি ও প্রাণহানির দারুণ বিপর্যয় নেমে এসেছে। উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি শহর থেকে রক্তাক্ত দাঙ্গার অশুভ সংবাদ আমাদের উচ্চকিত করেছে। আমরা কিছুতেই অনাহারক্লিষ্ট, শোকতপ্ত প্রতিবেশী রাজ্য দুটির অগণিত নরনারীর কথা ভুলতে পারি না। বাঙালীর চেতনা কোনো দিনই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার গন্ডীতে আবদ্ধ নয়। ভারতের যে কোনো প্রান্তেই দুর্দিনের দুর্বিপাক ঘনিয়ে উঠেছে, বাঙালী চিরদিনই সেদিকে আপন সাধ্যমত সান্ত্বনা ও সাহায্যের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে গেছে।

আমাদের উৎসব-মুখরিত মনেও বিহার ও উত্তরপ্রদেশের আর্ত নরনারীর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলেছে। আমরা তাদের দুর্ভাগ্যে সমবেদনা জ্ঞাপন করি। প্রয়োজন হলে সাহায্যদানেও অবশ্যই আমরা কুণ্ঠিত হব না। এবং আমরা বিশেষভাবে সচেতন থাকব, যাতে দাঙ্গার বিষবাষ্প আমাদের এই পবিত্র নির্মল শারদাকাশকে কলুষিত না করে।

আলোকিত অন্ধকার

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

অন্ধকার মুখ খোলে অবশেষে অর্ধস্পষ্ট স্বরে,
কানে কানে বাজে তার জমা করা যত কিছু কথা,
পুঞ্জীভূত দুঃখ সুখ স্তব্ধীকৃত মূক আকুলতা—
জড় যবনিকা খুলে একে একে উজ্জ্বল আসরে
জীবন্ত দাঁড়ায় এসে, বুঝি অন্ধকার স্পর্শ করে
মনের গভীর, বুঝি পৃথিবীর যত নীরবতা
তারো কোনো কথা আছে,—অনাহত স্থির মুখরতা—
অন্ধকার মুক্তি দেয় তাকে, সুর তোলে আমার অন্তরে।

শুকনো পাতার রীড়ে গান বাজে রিক্তরস গাছে,
পাথরেও গঙ্গা জাগে, প্রাণ পায় নদী,
নিথর নিস্তব্ধ মরু—কবিতার প্রেরণা কাঁপায়।
আকাশ-কুসুম মিথ্যা, তাই বলে মায়া তার আছে,
পৃথিবীও এই কাব্য বার বার রচে নিরবধি!
অন্ধকারো আজ তাই আলো ধরে জীবনকে ভাবায়!

মন চায়

ঝরণা দেব

নীল নীল আকাশের ওই দূর সীমানায়
মন যেন অসীমের নেশা নিয়ে ছুটে যায়।
কম্পিত বনানীর ওই ঘন শিহরণ
উন্মনা খেয়ালীর যেন প্রিয় নির্জন,
সব পথ ছাড়িয়ে
মন যায় হারিয়ে,
সেইখানে সুদূরের নীলিমার ইশারায়।

লীলা ছলে মেঘবধূ দিয়ে যায় আল্‌পনা
তারি রং নিয়ে চলে উদাসীর জাল বোনা।
চঞ্চল হৃদয়ের বিহ্বল সুরতান—
অলীকের ভাবনায় উচ্ছল মন প্রাণ,
ক্ষণিকের স্বপনে
ধরা দিই গোপনে,
আমার এ মন তাই খোঁজে সেই নিরালায়।।

*
* *

সুরের আগুনে জ্বলছি

তুষার চট্টোপাধ্যায়

সুরের আগুনে জ্বলছি। চতুর্দিকে বিস্ময়ের দাহ।
অশান্তি আঘাত করে। কণ্ঠে গাঢ় বিশ্বাসের বীণা।
লগ্নে বাজে ব্যথা, যার অন্য নাম আনন্দপ্রবাহ।
আমাকে কে ডাক দিলো আনন্দের এই যজ্ঞে কিছুই জানি না।

সুরের আগুনে জ্বলছি। অবলুপ্ত গানের ওপার
আমাকে আড়াল করে। প্রতীক্ষায় কাহার আহ্বান
বাজে। আমি হেঁটে গেলে লগ্নে খোলে আলোর দুয়ার
সুচিত্রা-কণিকা কিংবা রাজেশ্বরী-দেবব্রত বিশ্বাসের গান॥

সাত যোগিনী

অন্নদাশঙ্কর রায়

আসামে কী হয়েছিল তার বিবরণ দিতে দিতে একটু হেসে দাদা বললেন বৌদিকে, "ওগো, মনুকে সেই গল্পটা বল। সেই যেটা শুনে এসেছি আমরা চা বাগানে।"

বৌদি দাদার দিকে চেয়ে একটু সলজ্জভাবে হাসলেন। বললেন, "কোন্ গল্পটা। সাত যোগিনীর গল্প? শুনবে, মনু? সে এক বিচিত্র গল্প।"

দাদার চোখে কৌতুকের আভা। এতক্ষণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আসামের পুঞ্জ পুঞ্জ ঘটনার ঘনঘটা। এইবার বিজলীর ঝিলিক খেলে গেল।

মনু বলল, "কামরূপে তো কোনো দিন যাইনি। গেলে ভেড়া বনে যাবার ভয়। দূর থেকে শোনাই নিরাপদ। শুনি বৌদির মুখে।"

দাদার দিকে আড়চোখে চেয়ে বৌদি বললেন সহাস্যে, "তোমার দাদা যখন ভেড়া বনে যাননি তখন তোমারও ভেড়া বনবার বয়স নেই, মনু। তুমিও একবার আসাম ঘুরে এলে পারতে। সত্যি, আশ্চর্য দেশ!"

আশ্চর্য দেশ সে কথা বলতে! ছেলেবেলায় একদল বাজীকর এসেছিল রাজবাড়ীতে। তাদের হাতে ছিল একটা হাড়। বলে "কাঁউরি হাড়"। সেটা চোখে ছুঁইয়ে দিতেই তিন তিনজন বাজীকরের তিন তিনজোড়া চোখের তারা সোনার গুলি হয়ে গেল। মনু ছিল সেখানে দর্শকদের সারিতে। বিশ্বাস না করে পারে! অমন একখানা কাঁউরি হাড় তারও চাই। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলো কাঁউরি হচ্ছে কামরূপে। কামরূপ হলো কুহকের দেশ। ওরা যে কেবল ভেড়া বানায় তা নয়। সোনাও বানায়।

এর পর দু'চার কথার পর বৌদি বলতে আরম্ভ করলেন—

আসামে যাবার কথা আমরাও কোনোদিন ভাবিনি। কিন্তু সেইসব মর্মান্তিক ঘটনার খবর শুনে চুপ করে থাকতে পারলুম না। চুপ করার উল্টোটা হলো মুখ খোলা। সেটাও আমরা করলুম না। নিঃশব্দে উপস্থিত হলুম ঘটনাস্থলে। যা দেখবার দেখলুম, যা শোনবার শুনলুম, যা করবার তা সাধ্যমতো করলুম। অবস্থা কতকটা শান্ত বলে মনে হলো। তাই স্বস্থানে ফিরেছি। জানিনে ক'দিনের জন্যে। শান্তিসেনার কর্মীরা সব সময় প্রস্তুত।

পদযাত্রার পথে পড়ল একটা চা বাগান। ওড়িশা থেকে আমরা এসেছি শুনে বাগানের ওড়িয়া ভাইবোনেরা আমাদের আটক করল। একটা দিন কাটাতে হলো ওদের বসতিতে। ওদের সর্দারের ঘরে।

সর্দারের নাম বিদ্যাধর। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। কুলী বললে আমরা যা মনে করি তা নয়। আসামে বসবাস করছে দু' কুড়ি বছরের উপর। আর দেশে ফিরে যায়নি। কেন যাবে? কিসের অভাব? সোনার দেশ আসাম। জ্বরজারি এড়াতে পারলে লক্ষ্মী অচলা হয়ে বসেন। বিদ্যাধরের লক্ষ্মীমন্ত অবস্থার সাক্ষ্য চারদিকে।

লক্ষ্য করলুম ওর দুই বৌ। একটি আরেকটির চেয়ে অনেক ছোট। দু'জনে মিলে মিশে বেশ আছে। আর চার হাতে স্বামীর সেবাযত্ন করছে। বিদ্যাধরকে কিছু মুখ ফুটে চাইতে হয় না। দুই মহাবিদ্যা সব আপনি হাজির করে দেয়। আরামে আছে বিদ্যাধর। দুই সতীনে এমন সদ্ভাব কখনো দেখিনি।

একটু পরিহাস করে বললুম, "দুই রানী নিয়ে আনন্দে রাজত্ব করছ বিদ্যাধর। বাপ পিতাম'র ভিটেমাটি তোমার মনে পড়বে কেন?"

বিদ্যাধর যেন বিনয়ের অবতার। হাত জোড় করে বলল, "আপনারাই আমার গর্ভধারী পিতামাতা। আপনারা বিচার করে বলুন কোন্‌খানে আমার অপরাধ হলো।"

তা শুনে উনি বললেন, "কামরূপে এলে ভেড়া বনে যায় তা কি এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায়, বিদ্যাধর? দু'কুড়ি বছর তুমি দেশে যাওনি। তার কারণ কি এই নয় যে, কামরূপের দুই কন্যা তোমাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে? ওরা যে কাঁউরি বিদ্যা জানে তা তো প্রত্যক্ষ দেখছি।"

এর উত্তরে বিদ্যাধর যা বলল, তার মর্ম তার বৌ দুটি অসমীয়া নয়, উৎকলীয়া। বিদ্যাধর তাদের দেশ থেকে নিয়ে আসেনি, পেয়েছে আসামেই। বহুকাল হতে ওড়িয়াদের একটি সমাজ রয়েছে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন চা বাগানে। জাতের বিচার নেই। দেশে ফিরে গেলে তো আবার জাতে উঠতে হবে। এদের ও এদের ছেলেমেয়েদের কী দশা হবে! আসামের চা বাগানই সত্যিকার শ্রীক্ষেত্র।

একটু একটু করে বিদ্যাধর তার আত্মকাহিনী শোনায়।

জন্ম তার কটকের দক্ষিণে এক গ্রামে। বাপ সৎচাষী। হাল-লাঙল চারখানা।

ছেলের বয়স যখন বারো কি তেরো বছর বাপ ধরে বসল তার বিয়ে দেবে। শারিয়া বলে একটি "টোকি"র সঙ্গে। বিয়েতে কন্যাপণ কম লাগে, যদি খুকীর সঙ্গে হয়। নইলে খরচ বাড়ে।

মা বলে, "বাপের কথা শোন। বিয়ে কর শারিয়াকে।" ঠাকুমা বলে "বাপের কথা শোন্। শারিয়াকে বিয়ে কর।" পাড়ার লোকেরও সেই পরামর্শ। কিন্তু বিদ্যাধর ওকে বিয়ে করবে না। কাউকেই বিয়ে করবে না। বাবাজী হবে। বাবাজীদের উপর তার প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁদেরি একজন না হতে পারলে জীবন বৃথা।

বারো বছর বয়সের সেই বালক একদিন বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। সে বয়সে মনে হতো অতি সুদূরে। প্রায় বিদেশ বললেও চলে। কটক জেলারই উত্তরাংশে ছতিয়া গ্রামে। সেখানকার মঠ প্রসিদ্ধ। দেখেছ কখনো? ছেলেবেলায় দেখেছ।

স্বাই সুদর্শন বালকটিকে ছতিয়ার মোহন্ত মহারাজ স্নেহভরে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু দীক্ষা দিলেন না। বললেন দীক্ষার বয়স হয়নি। আগে সৎ অসৎ বিচারবুদ্ধি হোক। বিদ্যাধর সাধুসেবা করে। সাধুদের মুখে বড় বড় তত্ত্বকথা শোনে। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে শেখে। বই পড়তে হয় না শিক্ষার জন্যে।

চার পাঁচ বছর পরে কেন জানে না মোহন্ত মহারাজ তাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন। বললেন, "বিদ্যাধর, তুমি ইন্দুমতীকে বিয়ে কর।"

হতভম্ব হলো বিদ্যাধর। সে কি কোনো অপরাধ করেছে না জেনে? কই, কখনো তো কোনো বালিকার দিকে চুরি করে তাকায়নি।

মোহন্ত মহারাজ তাকে আরো কয়েকবার এই কথা বলায় সে বিদ্রোহ করল। বলল, "বিয়ে করতে মন নেই বলে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি বাপ-মাকে কাঁদিয়ে। বিয়ে যদি করতে হয় তো বাড়ী ফিরে যাব না কেন?"

মহারাজ তাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারলেন না। মঠে একজন মহাস্থবির ছিলেন। তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও বললেন, "বিদ্যাধর, তুমি ইন্দুমতীকে বিয়ে কর। মহারাজের অবাধ্য হোয়ো না।"

বিদ্যাধর নত হলো না। বলল, বাবাজী হবার জন্যেই আমি এখানে এসেছিলুম। সংসারী হবার জন্যে নয়। দীক্ষা না দিয়ে বিয়ে দেওয়া হবে জানলে কি আসতুম আমি এখানে?

মহাস্থবির বললেন, "বিদ্যাধর, কার পক্ষে কোন্‌টা শ্রেয় সে শুধু আমরাই জানি। কাউকে দীক্ষা দিই। কারো বিবাহ দিই। তুমি আমাদের শরণ নিয়েছ। আমরা তোমার সাধনার পথ নির্দেশ করছি। অমন অনুকূল সহচরী আর পাবে না। ও তোমাকে নামাবে না। বরং তুলবে। ওই বড়।"

তখন বিদ্যাধরের কতই বা বয়স। সে বুঝতে পারল না এসব কথার মানে কী। আর ইন্দুমতী তো বয়সে আরো ছোট। কোন অর্থে তার চেয়ে বড়?

বিদ্যাধর তাঁকে প্রণাম করে বলল, "আমাকে অনুমতি দিতে আজ্ঞা হোক। আমি বিদায় নিয়ে চলে যাই।"

মহাস্থবির জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে তুমি? জন্মদাতার কাছে?"

বিদ্যাধর উত্তর দিল, "না মহারাজ। দীক্ষাগুরুর খোঁজে।"

সাধুবাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "তোকে সাত যোগিনীতে খাবে।"

বিদ্যাধর ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এ কী মারাত্মক অভিশাপ দিলেন মহারাজ! এ যদি সত্যি হয় তা হলে কি সে বাঁচবে! ডাকিনী যোগিনীদের সম্বন্ধে তার আতঙ্ক ছিল। ছেলেবেলা থেকেই সে শুনে আসছে লোকে যার উপর দারুণ রাগ করে তাকে বলে, তোকে যোগিনীতে খাক। তোকে ডাকিনীতে খাক। পাজী হতভাগা বদমায়েস না বলে 'যোগিনী-খিয়া' বলে গালাগাল দেয়। তার বাঁকা অর্থ শ্মশানের মড়া।

"মহারাজ, এত বড় অভিশাপ আমাকে দিলেন!" বিদ্যাধর তাঁর পায়ে ধরে বলল।

মহারাজ রহস্যময় করে বললেন, "না রে, তা নয়। সে তুই পরে বুঝবি।"

বিদ্যাধরকে এর পরে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। না কটক জেলায়, না ওড়িশায়। কলকাতায় সে এক পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে। পাণ্ডা বলে, কামাখ্যা-দেবীর নাম শুনেছ? চল, আমি তোমাকে কামাখ্যা তীর্থে নিয়ে যাব। সেখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী দেখবে। সদ্‌গুরুর সন্ধান পাবে। এই জন্মেই মুক্তি লাভ করবে।

লোকটা ছিল আসলে এক আড়কাঠি। চা বাগানের জন্যে কুলী পাকড়াত। কামাখ্যাদেবীর মন্দির দেখিয়ে তার পরে চা বাগানে চালান দিত। বিদ্যাধর অত জানত না। মন্দির দর্শন করতে গিয়ে সে পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করল, "এরা কারা?"

পাণ্ডা বলল, "অষ্টাদশ ভৈরব ও চৌষট্টি যোগিনী।"

যোগিনী শুনে বিদ্যাধর ভয়ে বিবর্ণ। ছুটে দিতে যাচ্ছিল, পাণ্ডা তাকে যেতে দিল না। বাসায় নিয়ে গিয়ে সিদ্ধি খাইয়ে বেহোঁশ করে রাতারাতি পার করে দিল চা বাগানে। পরের দিন থেকে সে কুলী।

সেকালে সাহেব মালিকদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। একবার কুলী হয়ে ঢুকলে আর উদ্ধার নেই। তবে উন্নতি আছে। উঠতে উঠতে সর্দার হতে পারো। যতবার খুশি বিয়ে করতে পারো। দুটি তিনটি বৌ থাকলেও ক্ষতি নেই। বরং তাতেই লাভ। ওরাও তো খাটে।

কী আর করবে বিদ্যাধর। যার অদৃষ্টে যা লেখা আছে তাই তো হবে। সৎচাষীর ছেলে সে। গ্রহের দোষে চা-বাগানের কুলী। একেবারে তলা থেকে শুরু হলো তার নূতন জীবন। পূর্ব-পুরুষের সুকৃতের ফলে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠল। বরাতে ছিল, তাই একদিন সর্দার হলো। এর মধ্যে এলো ধর্মঘটের যুগ। বিদ্যাধর অটল। সে থাকতে ধর্মঘট হবার জো আছে? মালিকরা তাই তাকে কত সমীহ করেন। সর্দারজী বলে ডাকেন। বিস্তর উপহার, বিস্তর পুরস্কার পেয়েছে। জমিজমা হালগরু হাঁস-মুরগী কোনো কিছুর অভাব নেই। না, মুরগী বা তার ডিম নিজে খায় না। হুজুরদের ভেট পাঠায়।

ওদিকে সাধুবাবার সেই অভিশাপ তো না ফলে যায় না। সিদ্ধপুরুষ তিনি, অব্যর্থ তাঁর বাক্য। হাঁ, সাত যোগিনীতে তাকে খেয়েছে। সাত সাতবার তার বিয়ে হয়েছে। সকলের বড় আর সকলের ছোট এই দুটি বৌ তাকে ছাড়েনি। আর পাঁচটি তাকে ছেড়ে যে যার পতি নিয়ে ঘর করছে। সেও বেঁচেছে। এই যে বড়টা এটা তাকে বড় ভালোবাসে। আর এই যে ছোটটা, এটাও বুড়ো হাড়ে কী যে সোয়াদ পায়! কচি হাড়ের মায়ায় মজে না। এরা তাকে চিবিয়ে চিবিয়ে নিঃসত্ত্ব করে দিয়েছে। বেঁচে আছে তবু সে এদের জন্যেই। এদেরি হেফাজতে।

এখন তাকে "যোগিনীখিয়া" বলে গালমন্দ দিলে তার বোধহয় মিষ্টিই লাগবে। ভেড়া বানানো হয়েছে বললেও সে বোধকরি মানহানির মামলা আনবে না। এরা কিন্তু কেউ কামরূপিণী নয়। সাতজনেই উৎকলিনী। তা কামরূপিণী নয়ই বা কেন? কামরূপে জন্ম, কামরূপেই অবস্থান। এরাও কামাখ্যাদেবীর মন্দিরগাত্রের যোগিনীমূর্তি।

শেষেরটুকু বৌদির উক্তি নয়। দাদা তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সমাপ্ত করে দেন। মাঝে মাঝে কণ্ঠক্ষেপ যে না করেছেন তা নয়। রসের কথা বৌদির

মুখে বেধে যায়। দাদা তখন পাদপূরণ করেন।

মনু এতক্ষণ নীরবে শুনছিল। গল্পটা সত্যি বিচিত্র। কিন্তু কেমন যেন তার মনে হচ্ছিল কাহিনীটা তার অজানা নয়। তারই কোনো এক বন্ধুর জীবনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন মিল আছে। একটু একটু করে মনে পড়ছিল সেই বন্ধুটির জীবনকাহিনী। যতটুকু তার অবিদিত নয়।

"বৌদি", মনু বলল তারিফ করে, "খাসা গল্প! বিদ্যাধরের নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যায় কামরূপে, যাতে ত্রিকাল-দর্শী সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হয়। চমৎকার! অপূর্ব!"

গয়লানী যেমন নিজের দইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বৌদিও তেমনি নিজের গল্পের। "এমন গল্প কেউ কখনো শোনেনি। অদ্বিতীয়।"

"না, বৌদি," সবিনয়ে নিবেদন করল মনু, "অদ্বিতীয় নয়। এর জুড়ি আছে। শুনতে চাও তো শোনাতে পারি।"

বৌদি বললেন, "অবাক করলে, মনু। সাত যোগিনীর জুড়ি আছে?"

দাদা টিপে দিলেন, "এবার সাত যোগিনী নয়, সাত ডাকিনী।"

মনু বলল, "আগে থেকে ফাঁস করছিনে। শোন সবটা।"

কলেজে একটি নতুন ছেলে এলো। মনুর নিচের ক্লাসে। কেমন করে আলাপ হয়ে যায়। মনুর কাছ থেকে কন্টিনেন্টাল উপন্যাস নিয়ে পড়ে। রোমান্টিক ভাবে ভরপুর। একদিন তো জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে থাকে, "সাবিন! ও সাবিন!" রম্যা র'লার উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র।

ছেলেরা তাকে ক্ষ্যাপায়, "সাবিন! ও সাবিন!" কেউ কেউ তাকে সেই নামেই ডাকতে শুরু করে দেয়, "ওহে সাবিন! কেমন আছো হে?" সে যে তাতে অখুশী তা নয়। তার স্বভাবটা ঠাণ্ডা। সে কখনো রাগে না। তার চোখ দুটি আয়ত। চোখের তারা ভাবময়। তার অর্ধেক সৌন্দর্য তার চোখে। সে যেন জেগে স্বপ্ন দেখছে। বাস করছে উপন্যাসের লোকে।

পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হলো তখন সে তার বাল্য-প্রণয়ের কাহিনী শোনাল মনুকে। মেয়েটি তাকে কথা দিয়েছিল যদি বেঁচে থাকে বিয়ে করবে। কিন্তু দুঃসাধ্য রোগ। জলের মতো টাকা খরচ করেও বড়লোক বাপ তাকে ধরে রাখতে পারলেন না। সেই থেকে সলিলের অন্তরে-বাইরে বিষাদ। বাইরের বিষাদ কালে কমবে, অন্তরের বিষাদ অক্ষয়। সারা জীবন এ বিষাদ সে বহন করে চলবে। বিয়ে করবে না।

বছর কয়েক পরে বিলেতে আবার তার সঙ্গে দেখা। মাঝখানে অদর্শন। বলল, "বিলেত আসার খরচ জোটাতে পারছিলুম না। এক ভদ্রলোক দয়া করলেন এই শর্তে যে, তাঁর তিনটি মেয়ের থেকে একটিকে বিয়ে করতে হবে। বড়টি সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, ছোটটি সবচেয়ে রূপবতী। আর মেজটি সবচেয়ে নরম স্বভাবের। সংসারে শান্তি চাইলে এমনি শান্তপ্রকৃতির বধূই শ্রেয়। কী বল, মনুদা?"

টাকার জন্যে বিয়ে করায় মনুর আন্তরিক আপত্তি ছিল। সে নীরবে প্রতিবাদ করল।

বিলেতে সলিল মাসে একবার করে প্রেমে পড়ে। সব প্রেমই নিকষিত হেম নয়। গন্ধটা বন্ধুদের নাকে যায়। সলিলকে নীরবে ভর্ৎসনা করলে সে ভিজে বেড়ালটির মতো বলে, "আমি কী করব। ওরাই আক্রমণশীলা।" চড় মারতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমন করুণ দুটি চোখ যার তার গালে চড় মারবে কোন্ পাষাণ! সম্পর্ক কাটানো উচিত ছিল, কিন্তু মনু তার বন্ধুদের কখনো ছাড়ে না। সুমতির জন্যে প্রতীক্ষা করে।

"তোমার বৌ আছে।" মনু বলে, "সে কী মনে করবে!"

"বিয়ে ত করছিনে। আমার নীতি হচ্ছে এক স্ত্রী, এক সন্তান।" সলিল উত্তর দেয় অবিচল প্রত্যয়ের সঙ্গে। ইংরেজীতে বলে, "ওয়ান ওয়াইফ। ওয়ান চাইল্ড।"

হাসি পায় মনুর। "এক স্ত্রী বেশ কথা। এক সন্তান কেন?"

সলিল ছেলেটি হিউমার বর্জিত। গম্ভীরভাবে বলে, "ঐ একটিই যথেষ্ট। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বড় বেশী বেড়ে গেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই শপথ নেওয়া উচিত যে একটি সন্তানেই সন্তুষ্ট হব।"

আরো বছর কয়েক অদর্শন। তার পর আকস্মিকভাবে পাশাপাশি তাঁবুতে একসঙ্গে থাকা। মনু সপরিবারে হিমালয় থেকে ফিরছিল। সলিল একটি তহশিলে ক্যাম্প করছিল। সেও সপরিবারে। শুধু স্ত্রী নয়, স্ত্রীর কোলে একটি পুত্রসন্তান। এই তো কেমন "ওয়ান ওয়াইফ ওয়ান চাইলড।"

মনু খুশী হয়ে বলে, "তুমি তোমার কথা রেখেছ, সলিল। তুমি নিশ্চয় সন্তুষ্ট। তবে তোমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হবেন কি না এখন থেকে বলা শক্ত।"

"নো মোর। নো মোর।" সলিল বলে দৃঢ়তার সঙ্গে।

মনু লক্ষ্য করল যে, সলিলের স্ত্রী মোতির সঙ্গে তার বোন পান্নাও এসেছে ক্যাম্পে। এই সেই রূপসী ছোট বোন।

মেয়েটি চুপচাপ থাকে। বড় একটা বার হয় না। এখনো বিয়ে হয়নি। পড়াশুনো করছে, কিন্তু এ সময় কলেজে হাজিরা না দিয়ে তাঁবুতে বসে আছে কেন বোঝা যায় না। ক্যাম্প তো সারা শীতকাল চলবে।

মনু এ নিয়ে কাউকে কোনো প্রশ্ন করেনি। একদিন সন্ধ্যাবেলা সলিলই প্রসঙ্গটা তুলল। নির্জন পথে বেড়াতে বেড়াতে। বলল "মনুদা, তোমাকে একটা বিষয়ে একটু সাহায্য করতে হবে। পান্নাকে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে চাই। এ দেশে ওর পড়াশুনো হবার নয়। জানো না বোধহয়, ওর বাবা মারা গেছেন, কিছুই রেখে যাননি। তোমাকে বলিনি যে আমাকেও তিনি ফাঁকি দিয়েছেন। বিলেতে খরচ দেননি। বন্ধুদের কাছে ধার করে চালাতে হয়েছে। এবার ধীরে ধীরে শুধছি। এ রকম হবে জানলে কি বিয়ে করতে রাজী হতুম কখনো? এ বিবাহ প্রতারণামূলক ?"

মনু তাকে বলতে পারত যে টাকার জন্যে বিয়ে করতে যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাতে তার সমস্যার সমাধান হতো না। বলল, "বিয়ে যখন হয়ে গেছে একবার তখন আর নড়ন চড়ন নেই। মোতির কী দোষ! খোকনের কী দোষ! এদের তুমি সাজা দিতে চাও না নিশ্চয়। ভাই সলিল, এ ভুল শোধরানো যায় না। একে ঠিক-এ পরিণত করতে হবে। এমনভাবে জীবনটা কাটাতে হবে যাতে ভুল হয়ে যাবে ঠিক।"

সলিল মেনে নিতে নারাজ। বলল, "তা হলে প্রতারকেরই জয় হবে। ওঃ সে যে কী জঘন্য প্রবঞ্চক তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না, মনুদা। আমি স্বপ্নচারী মানুষ, কী করে জানব কার মনে কী আছে! লোকটা ছিল এক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান। রাজার নাবালক অবস্থার সুযোগ নিয়ে বহু ধনরত্ন সরায়। শুধু কি তাই! মৃত রাজার রানীদেরও ভোগ করে। স্ত্রী আত্মঘাতিনী হন। কলকাতায় ওর প্রাসাদ আছে, তবু ওর ছোট মেয়ে পান্নাকে হতে হয় মেজদির গলগ্রহ। একেই বলে আয়রনি অফ ফেট।"

"একটু আগেই তো বললে কিছুই রেখে যাননি।" মনু মনে করিয়ে দিল।

"মেয়েদের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। কিন্তু উপপত্নীদের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করে গেছেন। আমি তখন বিলেতে। কেমন করে জানব যে তিনি তাঁর পাপের সম্পত্তি প্রায়শ্চিত্তে নিয়োগ করে যাচ্ছেন। মোতিটা এক নম্বর বোকা। জানত না, জানায়নি। জানালেই বা আমি করতুম কী ছাই। কোরিয়ার নষ্ট করে দেশে ফিরে আসতুম না নিশ্চয়। সামান্য কিঞ্চিৎ অলঙ্কার ও নগদ কিছু টাকা রেখে গেছেন হীরা-পান্নার জন্যে। তা দিয়ে আজকাল একটা কেরানীর সঙ্গেও বিয়ে হয় না। এই দুই উচ্চাভিলাষিণীর এখন কী উপায়।"

"আপাতত পড়াশুনো। তার পর চাকরি।" ফতোয়া দিল মনু।

"হীরাদি সেই চেষ্টায় আছে। ও পারবে। কিন্তু পান্নার কেবল রূপেই সার। ওর পড়াশুনোয় চাড় আছে বলে মনে হয় না। শান্তিনিকেতনে গেলে হয়তো বিয়ের সুরাহা হবে। নাচতে গাইতে ছবি আঁকতে শিখলে ভালো বিয়ের সম্ভাবনা। আর চাকরি? ও মেয়ে কোনো দিন চাকরি করবে! ও যে দেওয়ানের মেয়ে! কলকাতায় ওদের প্রাসাদ আছে। যদিও সেখানে প্রবেশ নেই।" সলিল বলল সখেদে।

মনু ভেবেছিল কথাবার্তা সেদিনকার মতো শেষ। তা নয়। হঠাৎ ফস করে বলে বসল সলিল, "মনুদা, পানুকে বাঁচাতে চাও তো ওকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাও।"

মনু চমকে উঠল। সে যা ভয় করেছিল তাই। সলিল স্বীকার করল যে পান্নার দিক থেকে ভাবনার কারণ আছে। ও মেয়ের চোখে মুখে কামনার শিখা জ্বলছে। তাতে পুড়ে খাক হচ্ছে ওর নিজের শরীর। মাসের অর্ধেক দিন বিছানায় শুয়ে থাকে। একটা না একটা অসুখ। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে যায়। জোর করে খাওয়ালে বমি করে দেয়। অসুখটা যে আসলে কী তা এতদিনে ধরা পড়ে গেছে। মোতি বেচারি বোনকে নিয়ে করবে কী! কাছে রেখে সোয়াস্তি নেই। দূরে পাঠালে কে জানে কী করে বসবে। আত্মীয়রা খুবই গরিব। তাদের সংসারে পান্নার মতো অভিজাতকন্যার মানাবে কেন।

মনু নির্বোধের মতো বলল, "বেশ তো। ও মেয়ে কাকে ভালোবাসে তা জেনে নিয়ে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।"

"ও মেয়ে কাকে ভালোবাসে তা কি তুমি টের পাওনি, মনুদা?" সলিল বলল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। "যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে কি বিয়ে দেবার জো আছে?"

মনুর চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। সে স্তম্ভিত হয়ে বলল, "বুঝেছি।"

সেদিন ছোট ভাইটিকে বিস্তর হিতোপদেশ দিল মনু। বলল, "শান্তিনিকেতনে চিঠিপত্র লেখ। কিন্তু জুলাইয়ের আগে ওরা ভর্তি করবে না। ততদিন সাবধানে থেকো। এই ক'টা মাস তুমি ঠিক থাকতে পারলে হয়। বিয়ে করে যে ভুল করেছ সে ভুল একদিন ঠিক হবে। কিন্তু এ ভুল কখনো ঠিক হবে না। কাজেই তোমাকে প্রাণপণে ঠিক থাকতে হবে।"

এর দু'একদিন পরে মনু চলে গেল নিজের জায়গায়। চাকরির ধান্দায় সলিলের কথা ভুলে গেল। শান্তিনিকেতনে খোঁজখবর নেওয়া হলো না। এক মুহূর্ত অবসর থাকলে তো!

মাস কয়েক পরে কার সঙ্গে যেন দেখা হয়ে যায় কলকাতায়। কে যেন তাকে একটা মুখরোচক সংবাদ শোনায়। "ওহে তোমার বন্ধু সলিলের যে আবার বিয়ে হয়ে গেল। জানো না? কালীঘাটে লুকিয়ে বিয়ে। শালীর সঙ্গে। না করে নাকি উপায় ছিল না।"

তার মানে? তার মানে পরিষ্কার হলো আরো কয়েক মাস বাদে। পান্নারও একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। সলিলের ও মনুর উভয়ের বন্ধু বিমল। সেই জানায় মনুকে। সমর্থন করতে বলে তাকে। মনু বলে, "না। সমর্থন করব না। তবে করুণা করব।'

তা শুনে সলিল যায় চটে। করুণা! বন্ধুর কাছে করুণা! তা সে গ্রহণ করবে না। দুই বিয়ে কি কেউ কোনো দিন করেনি? ওটা এমন কী একটা মারাত্মক অপরাধ যে বন্ধুও বাম হবে! মনুও তাকে মনে করিয়ে দেয় না তার নিজেরি উক্তি "ওয়ান ওয়াইফ ওয়ান চাইল্ড।" বন্ধুমহলে ওর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শালিবাহন রাজা বলে। সলিল নানাসূত্রে ওটা শুনে থাকবে। নইলে চিঠিপত্র লেখা একদম বন্ধ করে দেবে কেন? মনুও চিঠি লেখে না। লিখতে রুচি হয় না। তার হিতোপদেশ মাঠে মারা গেছে।

বছর কয়েক পরে কানে এলো সলিল আবার বিয়ে করেছে। কাকে? বড় শালীকে? সেই বা কেন বাকী থাকে? না, তাকে নয়। সম্পূর্ণ অন্য একটি পরিবারে। এবার সবাইকে নিয়ে এক অন্নে থাকা নয়। শ্বশুর মশায় কড়া হাকিম। তিনি কড়ার করিয়ে নিয়েছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষকে ঘর থেকে বিদায় করে দিতে হবে, কোনো দিনই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এবং কোনোকালেই ওদের কাছে যাওয়া বা ওদের সঙ্গে মেশা চলবে না। সলিল অবশ্য ওদের খোরপোষ পাঠায়। ওরা থাকে দূরে একটা শহরে একই ভাড়াটে বাড়ীতে।

শালিবাহন রাজার আজব বিচার। মনু তাজ্জব বনে। এমন লোকের সঙ্গে

সম্পর্ক রাখবে কে? কিন্তু মনু তার বন্ধুদের কখনো ত্যাগ করে না। কে জানে একদিন হয়তো সলিলের সুমতি হবে। কিন্তু সুমতি হলেই বা হবে কী? একজনকে সুখী করতে গেলে তো আর দুটিকে অসুখী করতে হবেই। তালাক দিলেই বা তারা যাচ্ছে কোথায়! দ্বিতীয় বিবাহের কতটুকু সম্ভাবনা! তার পর ওই নিরীহ শিশুগুলি?

মাকে আর বাবাকে একসঙ্গে না পেলে কি আনন্দ হয়? বাপ থাকতে বাপের কাছে যেতে পাবে না, এ কী ভয়ানক দন্ড! সেকালের ধ্রুব একালে জন্মেছে। ট্র্যাজিক।

তা হলেও মনু তার বন্ধু সলিলের বিচার করবে না। একজন মানুষের বিচার আরেকজন মানুষ করতে পারে না। মানুষ কোন্ অবস্থায় পড়ে কী করে তা একমাত্র বিধাতাই জানেন, বিচার করবেন তিনিই।

মনু আপনার কাজে মন দেয়। শিব ঠাকুরের তিন বিয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। কিংবা গম্ভীরভাবে বলে, "একটা ভুল শোধরাতে গিয়ে আরেকটা ভুল করা ইতিহাসে এই প্রথম নয়। আশা করি এই শেষ। পারো তো ওর জন্যে প্রার্থনা কর।"

তাঁবুতে সেই যে দেখা হয়েছিল তার পরে আবার দেখা হয় আট নয় বছর বাদে পাটনায়। গভর্নরের শাসন। সলিল তাঁর দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণ হস্ত বললেও চলে। একরাশ শত্রু সৃষ্টি করেছে কংগ্রেসে ও সরকারী মহলে। সমাজেও কেউ ওর পক্ষে নয়। এমন লোকের অতিথি হতে সাধ করে কে চায়। তবু হতেই হলো অনিবার্য কারণে। একদিনের জন্যে। সপরিবারে। সলিল কিন্তু কথা শুনল না, আটক করল তিন চার দিন।

পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেদবৃদ্ধি ঘটেছে। অমন যে সুশ্রী সুপুরুষ তার দিকে তাকাতে গেলে চোখ ধাক্কা খায়। চুল কাঁচা পাকা। বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর বলে বিশ্বাস হয় না। ভাবপূর্ণ ওই যে দুটি চোখ ওতে উচ্চাভিলাষের সলতে জ্বলছে, আর প্রতিফলিত হচ্ছে একটি ঘোর বাস্তববাদী কাজের লোকের আত্মা। কথাবার্তায় মালুম হয় না যে ষোল সতেরো বছর আগে সে ছিল এক স্বপ্নচারী তরুণ।

বৌটিকে দেখতে তার মেয়ের মতো। কাঁচ বয়সে বিয়ে হয়েছে। মা হয়েছে। সুন্দরী। সপ্রতিভ। সামাজিক গুণ-সম্পন্ন। কোথায় যেন লাট সাহেব ওদের অতিথি হন। সাহেবকে সাহেবী কেতায় আপ্যায়ন করে। কেউ কোনো খুঁৎ ধরতে পারে না। তবে স্টেশনের মহিলারা হিংসায় নিন্দাবাদ করেন।

সলিলের পূর্বজন্মের প্রসঙ্গ সে নিজেও পাড়ে না, মনুও না। মোতি-পান্না এখন আর কেউ নয়। শুধু খোর-পোষের অধিকারী। পুরোনো চাকরকেও তো মনিবেরা পেন্‌সন দেন। জানতে ইচ্ছা করে ছেলে দুটোও কি কেউ নয়? শুধু আর্থিক সাহায্যের অধিকারী?

"যাক, এরা চারজনে তো সুখে আছে। জগতে ওই চারজনের দুঃখটাই কি চরম? এই চারজনের সুখ কিছু নয়?" মনু বলে তার গৃহিণী কেতকীকে। কেয়াকে।

"না। এরাও খুব সুখে নেই। সলিল ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে। লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে, ওর চোখে অপূরণীয় অফুরন্ত কামনা। রত্নার জন্যে ভাবনা হয়। সে কি পারবে এই হুতাশনকে তৃপ্তি দিতে? শুধু কড়া শাসনে রাখলেই কি পুরুষ বশ মানে!" কেয়ার কথাগুলো মনুকেও বিঁধল।

"ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে সেজন্যে নয়," মনু ভেবে বলে, "আর দুটি ছেলেকে দেখতে পাচ্ছে না, মানুষ করতে পারছে না বলে। রত্না যদি শাসনটা একটু শিথিল করত তা হলে এই ভাঙনটা রোধ করা যেত। কিন্তু শিথিল করবে সে কোন্ সাহসে? ও কি শুধু ছেলেদের দেখতে গিয়ে সেইখানে ক্ষান্ত হবে?"

যে সমস্যার সমাধান নেই তা নিয়ে কাঁহাতক মাথা ঘামানো যায়। মনু হাল ছেড়ে দেয়। দূর থেকে শুভকামনা জানায়।

কংগ্রেস আবার গদি ফিরে পাবে সলিল কিংবা তার চীফ বোধহয় হিসাবের মধ্যে আনেননি। চীফ চললেন দিল্লী। সলিলও চলল তাঁর সঙ্গে। দিল্লীতেও একটা পটপরিবর্তন আসন্ন হলো। বড় বড় ইংরেজভক্তরা রাতারাতি কংগ্রেসভক্ত বনে গেলেন। অথবা লীগ-ভক্ত। বেধে গেল কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের। তখন ভক্তরাই হলেন দু'পক্ষের লেঠেল। যে যতবেশী সাম্প্রদায়িক সে ততবেশী পেয়ারের। সলিল আর যাই হোক সাম্প্রদায়িক নয়। রাতারাতি ভোল ফিরিয়ে সাম্প্রদায়িক হতে অনিচ্ছুক।

দেখতে দেখতে দেশ হয়ে গেল দুভাগ। আর চরমে উঠল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সলিল এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। হতভম্ব হলো।

যারা আইন ভঙ্গ করবে তারা সাজা পাবে। এই হলো তার শিক্ষা ও সংস্কার। যারা আইন ভঙ্গ করেনি তারা শুধুমাত্র মুসলমান বলেই সাজা পাবে এ কী রকম বিচার: হতে পারে তারা প্রচ্ছন্ন পাকি-স্থানী। কিন্তু আইন যতক্ষণ না তাদের মেরে তাড়িয়ে দিতে বলছে তুমি ততক্ষণ তাদের গায়ে হাত দিতে পারো না। সরল মানুষ সলিল। এই হলো তার যুক্তি। যুক্তিটা যে ধর্ম নয় অতবড় বাস্তববাদী হয়েও সে ভুলে গেল।

তামাশা দেখ। বেছে বেছে তাকে ও তার মতো কয়েকজনকে দেওয়া হলো দাঙ্গা দমনের ডিউটি। দাঙ্গা দমন বলতে সে বুঝল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। তখনকার দিনের অভিধানে কিন্তু উলটো মানে। সলিল মনে করেছিল সোজা মানে। জীবনভর যে ভুল করে এসেছে সে আবার একটা ভুল করে বসল। সশস্ত্র হিন্দু পুলিশম্যান নিরস্ত্র পথ-চারী মুসলমানকে বেধড়ক গুলী করে মারছে দেখে সে থানায় গিয়ে রিপোর্ট করল লোকটার বিরুদ্ধে। তখন লোকটা করল কী, না সলিলকেই বিনাবাক্যে গুলী করল।

চার ঘণ্টা কি পাঁচ ঘণ্টা ধরে আহত সলিল পড়ে আছে রাজপথে। রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে। একজনও তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠায় না, কিংবা খবর দেয় না তার দপ্তরে। ঐখানেই সে মরে যেত। কী ভাগ্য একজন বাঙালী অফিসার সেই পথ দিয়ে মোটরে করে ফিরছিলেন। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন। হাসপাতালে কিন্তু না আছে ডাক্তার, না আছে নার্স। তাদের ডাকবার কথাও কারো মাথায় আসে না। সেই বাঙালী অফিসার স্বস্থানে চলে গেছেন। সলিলও কাউকে ডেকে নির্দেশ দিতে অপারগ। সেই অবস্থায় কেটে যায় আরো তিন চার ঘণ্টা। রক্ত কিন্তু সমানে ঝরে চলেছে।

অবশেষে ডাক্তারও এলেন, নার্সও এলো, টেলিফোন পেয়ে রত্নাও এসে হাজির। মিনিট পনেরো দেরি করলে আর তাকে দেখতে পেত না। সেই ক'টি মিনিট সলিল শান্তিতে কাটায়। তখনো তার জ্ঞান ছিল। ক্ষীণকণ্ঠে কানে কানে বলে, "ডার্লিং, তোমাকে আমি বড়ই ভালোবাসি। বড়ই ভালোবাসি।"

রক্ত ক্ষতিপূরণের আয়োজন চলছিল। রত্না বলে, "ভয় কী। তুমি বাঁচবেই।"

সলিল প্রশান্তভাবে বলে, "ভয় আমার একটুও নেই। ভয় ভেঙে গেছে মরণের মোহানায় এসে। তোমাকে দেখব বলেই এতক্ষণ অপেক্ষা করেছি। দেখা হলো, এবার তবে আসি। বাই বাই, ডার্লিং।"

কবি অতুলপ্রসাদ

সঞ্জীবকুমার বসু

বাংলাদেশ মনীষীর দেশ। সাহিত্য-শিক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ধর্মে-কর্মে স্বাদেশিকতায় বাংলাদেশ ভারতের অগ্রজ। শত শত বছর ধরে এই দেশে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকে এখনও সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেননি, অতুলপ্রসাদ তাঁদের একজন। বাঙালী হলেও অতুলপ্রসাদের জীবন কেটেছে গোমতীর তীরে লক্ষ্ণৌ শহরে। এইখানেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কাব্যে ও গানে, ধনে ও যশে। তাঁকে আজ ভুলে গেলেও তাঁর গানকে আমরা ভুলতে পারিনি। কবি মনের যে বেদনা তা যেন তিনি গানের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের মনোরাজ্যে। গভীর অনুভূতির এই সূক্ষ্ম প্রকাশ যেন মহাদেবের ধ্যানস্বপ্নের মত অলৌকিক। এখনও মাঝে মাঝে বেতারের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ভেসে আসে অতুলপ্রসাদের গান, কিন্তু স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, একজন আইনজীবী এতবড় গায়ক হলেন কি করে? একদা লক্ষ্ণৌ শহরের এই বিখ্যাত আইনজীবী সমস্ত উত্তরপ্রদেশকে চকিত করে তুলেছিলেন তাঁর আইনের পাণ্ডিত্যে। এই ব্যবসার মধ্য দিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করেছেন এবং এর পাশাপাশি প্রচুর দানও আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনীতে। এমন কি শেষ জীবনে দেশবন্ধুর মত তিনিও তাঁর সবকিছু দান করে যান; তাঁর নামে রাস্তা 'এ. পি. সেন রোড' আজও লক্ষ্ণৌ-এর বুকে কবির বিজয় ঘোষণা করছে।

অতুলপ্রসাদের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। বিবাহিত জীবনে অসুখী হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়। এই জন্য তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না। কিন্তু এই গভীর বেদনায় তাঁর গানের অনুভূতি জাগায়। কবি চিত্তের বেদনার বেদিতল হতে যে আকুল আহ্বান আসে কবি তাঁর গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেন; যেমনঃ—

মিছে তুই ভাবিস মন!
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন!
পাখিরা বনে বনে গাহে গান আপন-
মনে;
নাই-বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান
অকারণ।

বাংলাদেশের আধুনিক রাগপ্রধান গানের প্রথম সার্থক স্রষ্টা অতুলপ্রসাদ। সুললিত বাংলা গানে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীর কলাকৌশলের বিন্যাস করে তিনি একটি স্বতন্ত্র গীতিধারার সূত্রপাত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গানের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ভাগবতীগীতি, প্রেমগীতি, স্বদেশী গান প্রভৃতির সহিত রবীন্দ্র চিন্তাধারার মিলন লক্ষণীয়। তাঁর

স্বদেশী গানের মধ্যে "উঠো গো ভারত লক্ষ্মী", "হও ধরমেতে বীর", "বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে" প্রভৃতি গান বহুদিন ধরে জনগণের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে আসছে। তাঁর গানের ভাষা ও সুর যেন আমাদের মনে এক উন্মাদনা এনে দেয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর দরদী মনকে আমরা খুঁজে পাই তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে, যেমনঃ—

মোদের গরব, মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা
তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা

অতুলপ্রসাদ নিজেকে বলতেন 'কবি বাউল'। তিনি অবশ্য নদ-নদী-নালা, গাঙেয় উপত্যকার শ্যামল প্রান্তরের বাউল নন, তিনি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের গোমতীর ধূসর ঊষর রুক্ষ দগ্ধ প্রান্তরের বাউল, পল্লী বাংলার মালতী বকুলের শ্বেত উত্তরীয় তাঁর অঙ্গে ছিল না, তাঁর অঙ্গে ছিল শিমুল পলাশের রক্ত চিহ্নিত আলখাল্লা। বাংলা দেশের বাউলের সঙ্গে তাঁর বাউলের পার্থক্য হলেও তিনি বাউল গানগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন—সেগুলি যেন আপন মহিমায় মহীয়ান। তাঁর অন্যান্য গান-গুলির মত এগুলিও করুণায় পরিপূর্ণ।

অতুলপ্রসাদ বহুদিন ইংলণ্ডে ছিলেন এবং সেখানে থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলা ও চিত্রবিদ্যা অর্জন করেন, কিন্তু তাঁর গানের মধ্যে পাশ্চাত্যের কোন সুরের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না—এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি একবার ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ ও বিলাতী গানের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে সভায় পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা বলে তিনি পাশ্চাত্য শিল্পীদের স্তম্ভিত করেন।

ব্যক্তি হিসাবে অতুলপ্রসাদ ছিলেন চমৎকার লোক। লক্ষ্ণৌএর অবাঙ্গালী-দের মধ্যেও তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। উর্দু ভাষায় তাঁর খুব দখল ছিল। তিনি ছিলেন যেমন রসিক, তেমনি উদার। স্বভাবে ছিলেন তিনি লাজুক। মন ছিল তাঁর শিশুর মত সরল। গড়নে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি হাসি ও গল্পের দ্বারা তিনি আসর জমাতে পারতেন। সবসময় তিনি ফিটফাট থাকতেন। কম কথা বলতেন ও সামান্য তোতলা ছিলেন। অতুলপ্রসাদের জীবনে দুইজন তাঁর গানের প্রথম মর্ম বুঝতে পারেন এবং যখন অতুলপ্রসাদকে প্রথম শ্রেণীর গায়ক বলে কেউ চিনত না তখন এই দুই ব্যক্তি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায় অতুল-প্রসাদের গানের মর্ম প্রচার করেন। এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতি-চরণ' গ্রন্থে লেখেন—"অতঃপর যা হবার তাই হ'ল—ভবিতব্য কিনা আমি অতুল-দাকে তথা তাঁর গানকে ভালবেসে ফেল-লাম, শুরু করে দিলাম তাঁর গানের প্রচার, আমার নানা কন্সার্টে গাওয়ানো আরম্ভ করলাম তাঁর সুন্দর সুন্দর গান আমার ছাত্র-ছাত্রীকে দিয়ে। দেখতে দেখতে অতুলদার গান খুবই লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। সে সময় তাঁর গানের কি রকম আদর হয়েছিল, সঙ্গীতরসিকরা কয়েক-বছর আগেও বলেছেন, যথা সোমনাথ

মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, মেঘনাথ সাহা, পাহাড়ী সান্যাল, রেণুকা দাশগুপ্ত ও আরো অনেকে।"

দিলীপকুমারের চেয়ে অতুলপ্রসাদ বয়সে ১৭।১৮ বছরের বড় ছিলেন। দিলীপকুমারের পিতার সঙ্গেও তাঁর ছিল যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা। বয়সে ছোট হলেও অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দিলীপকুমারের খুব হৃদ্যতা ছিল। কারণ তাঁরা দুজনেই ছিলেন সুগায়ক। অতুলপ্রসাদের গান দিলীপকুমার খুব ভালবাসতেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে বসে দিলীপকুমার একটি গান ধরলেন। গানটি ছিল বিরহে পূর্ণ। গান গাইতে গাইতে তাঁর অশ্রু বেরিয়ে এলো; কারণ অতুলপ্রসাদের গানের মধ্যে এত গভীর ভাব ও বেদনা যা অনুভব করতে পারলে ক্ষণিকের জন্য মনটা সেইরূপ হয়ে যায়। গানের শেষে দিলীপকুমার উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন সামনেই অতুলপ্রসাদ —তাঁর চোখে জল। তখন দিলীপকুমারকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেনঃ "জানো দিলীপ এ-গানটি আমি বেঁধেছিলাম আমার জীবনের এক দারুণ দুঃখের সময়, যখন মনে হয়েছিল......যাক সে কথা আর একদিন বলব"——বলেই চোখের জল গোপন করতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সেইদিন থেকে অতুলপ্রসাদকে দিলীপকুমার নূতন দৃষ্টিতে দেখতে শেখেন।

স্রষ্টার অন্তর্লোকের বেদনাই সৃষ্টিকে করে মহৎ। শিল্পী হোক আর কবিই হোক প্রত্যেকেই বেদনাকে অনুভব করে তাঁদের সৃষ্টির মাঝে এমন জগৎ সৃষ্টি করেন—সেখানে আর কোন বেদনা থাকে না—দুঃখ থাকে না অভাব থাকে না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনী পাঠে দেখি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তাঁরা প্রায় সকলেই বেদনাকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন। তাজমহলের সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলেও প্রেমিক হৃদয়ের গভীর বেদনানুভূতি। রোমিও ও দেবদাসের যে বেদনা সে তো সাহিত্যিকের নিজেরই বেদনা। এক কথায় বলা যেতে পারে বেদনা ছাড়া কোন মহৎ-সৃষ্টি হতে পারে না। তবে প্রেমের বেদনা ও বিরহের বেদনায় অনুভূতি জাগায় বেশি। অতুলপ্রসাদের অনুভূতি জেগেছিল প্রেমের বেদনায়। বিরহ প্রেমের বড় সম্পদ। বাস্তবজীবনের ব্যর্থতা কবিচিত্তকে আকুল করে তুলেছে প্রেম সম্পদকে লাভ করবার জন্য। অথচ কবি কিছুতেই তাকে নির্দিষ্ট রূপরেখায় চিহ্নিত করতে পারছেন না। কবি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছেন—তাঁর মন এমন বার বার আকুল হচ্ছে কার জন্য। দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ কর্মে তাঁর ঔদাসীন্য। মনে মনে প্রেমাস্পদের স্মরণে স্মৃতির মালা গেঁথে চলেছেন। যেন রাধার প্রেমের মতই তাঁর মন অকারণ-কর্মে বারবার কল্পনায় ফিরে আসছেন। অথচ কার প্রীতি তাঁর এ প্রতিক্ষা কবি কোনমতেই তাঁকে নির্দেশ করে উঠতে পাচ্ছেন না। তাই কবির কণ্ঠে নিশুথী রাতের কান্না গোমতীর আকাশ বাতাসকে উতলা করে তুলেছেঃ—যেমন—

কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা;
কার লাগি এত উতলা;
কে তরী বাহি আসিবে গাহি;
খেলিবে তার সনে কি খেলা
সারা বেলা গাঁথ মালা—
ঘরের কাজে এ কি হেলা;
ছলনা করি আন গাগরি
কার লাগি বলো অবেলা;

পৃথিবীতে কম-বেশী সবাই দুঃখ পায়। কিন্তু ক'জন দুঃখকে সৃষ্টির কাজে লাগাতে পারে; গেটে বলতেন— "দুঃখ পাওয়া সার্থক যদি সে দুঃখে একটি গানও ফুটে ওঠে আঁধারের তারার মত"। অতুলপ্রসাদ ছিলেন সাধক তাই তিনি পেরেছিলেন। তাঁর এই সংগীত সৃষ্টির মূলে দিলীপকুমারের দান স্মরণীয়। দিনের পর দিন দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদের গান বাংলার নানাস্থানে গেয়ে বেড়াতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য কোথায়, একথাও বহু জায়গায় বলেছেন। আজ বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত—এঁদের গান আর ভাসে না, পরিবর্তে শুনতে পাই কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অরুচিকর কতকগুলি আধুনিক ও হিন্দী গানের গুঞ্জন।

গান রচনা ও সুর ছাড়া অতুলপ্রসাদ কয়েকবার "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" বা "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের" সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে কাণপুরে এবং ১৯৩০ সালে গোরক্ষপুর অধিবেশনে

তিনি সভাপতিত্ব করেন। এলাহাবাদে ১৯৩১ সালে অতুলপ্রসাদের নেতৃত্বে বিরাট রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; প্রকৃতপক্ষে আজ যে "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়, এই সংস্থা গঠনের মূলে কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও কাণপুরের ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন—এই দুই প্রবাসী বাঙ্গালীর চেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্ণৌ শহরে বাঙ্গালীদের যে ক্লাব আছে —বর্তমানে তার নাম বেঙ্গলী ক্লাব। তাছাড়া যুবক সমিতি নামে আর একটি ক্লাব ছিল, ১৯২৯ সালে অতুলপ্রসাদের চেষ্টায় এই সংস্থা দুটির একীকরণ হয়। আজ এই প্রতিওঠান লক্ষ্ণৌএর শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংস্থা। এছাড়া হিউয়েট রোডে অবস্থিত 'গোপাল নিকেতন' নামক বাড়ীতে "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয়, সেবাশ্রম এখন যেখানে অবস্থিত সেই জমি অতুলপ্রসাদের চেষ্টায় কেনা হয় এবং তিনি নিজব্যয়ে লাইব্রেরী ও ঔষধালয়ের তিনখানি ঘর তৈরী করে দেন। দান করতে তিনি কখনও কার্পণ্য করেননি। ব্যক্তিগত দান ছাড়াও নানা-প্রকার প্রতিষ্ঠানেও তাঁর দান স্মরণীয়: লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়েও কবির দান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যে "টেগর লাইব্রেরী" তা অতুলপ্রসাদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে অবশ্য এই কাজে আরও অনেকেরও দান আছে।

আজ একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বাংলা দেশের এইরূপ একজন উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ব্যক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী আজও রচিত হয়নি। আজও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হয়ত জানে অতুলপ্রসাদ সেন নামে একজন গায়ক বা কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনী তো শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; আইন আদালতে, দেশ সেবায়, দানে-ধ্যানে যে ছোট বড় কত ঘটনা আজও বিস্মৃতির অতল তলে লুকিয়ে আছে, সে খবর কে রাখে। কে জানে লক্ষ্ণৌ সহরের ঐতিহাসিক মোগল প্রাসাদ আদালত কক্ষে কত বাদী-বিবাদী এই অতুলপ্রসাদের কাছে ছুটে এসেছিল নিজেদের বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে। সেদিনের এই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তাঁর বাক-চাতুর্যে আইনের পাণ্ডিত্যে সমস্ত আইনজ্ঞদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, আর সেই আইনের আঙিনায় কত অভিজ্ঞতাই না তাঁর জীবনে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাময় দিনগুলির কথা আজও তো আমাদের কর্ণকুহরে এসে পৌঁছয়নি।

কবির বংশধরদের মধ্যে বর্তমানে তাঁর একমাত্র পুত্র মানষিক রোগে আক্রান্ত, কাজেই পুত্রবধূ নিজেই তাঁর সংসার পরিচালনার জন্য অর্থ রোজগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন লক্ষ্ণৌ-এ যেতেন, তখন তিনি অতুলপ্রসাদের বাড়ীতেই উঠতেন এবং কবিতা ও গান সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা করতেন। এঁদের দুজনার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আজ দুই কবিই মহাপ্রয়াণে। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে বলেছেনঃ—

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে॥

প্রাচীন সাহিত্যে প্রহেলিকা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

হেঁয়ালিটা ঠিক সাহিত্যের বিষয় নয়, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে ওটা এক সময় এসে পড়েছিল। কেমন করে এল তা জোর করে বলা যায় না তবে অনুমান করা যায়। হেঁয়ালি দেখা যায় প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে, যাতে সমাজের ছবি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। মজার খেলা হিসাবে বুদ্ধির খেলা হিসাবে হেঁয়ালির ব্যবহার সমাজে এক-দিন বিশেষ প্রচলিত ছিল। সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে কবিরা সেগুলির উল্লেখ করেছেন। তার-পর কোথাও কোথাও তারা প্রসঙ্গের বাইরেও চলে গেছে। অনেক সময় একই কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন হেঁয়ালি দেখা যায়। কোনগুলি আসল অর্থাৎ মূল কবির লেখা আর কোনগুলি নকল তা বোঝা কঠিন। কোনোটাই আসল না-ও হতে পারে।

হেঁয়ালি সহজেই প্রক্ষিপ্ত হয়। লিপিকর পুঁথি নকল করতে করতে কবির লেখা দশটা হেঁয়ালির সঙ্গে নিজের জানা আরও দশটা ঢুকিয়ে দিলেন। লিপিকর তো দূরের কথা সে কালের কবিরাও নিজের নাম জাহির করতে চাইতেন না। একালে পরের লেখা নিজের নামে চালানোর জন্যে লোকে কম ব্যস্ত নয়। সেকালে নিজের লেখাও অন্যের নামে অনেকে চালিয়ে দিতেন। প্রাচীন কাব্যের অনেক হেঁয়ালির আসল জনকরা প্রতিষ্ঠাবান্ অন্য কোনো কবির নামের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

হেঁয়ালি বা ধাঁধা জাতীয় খেলার প্রচলন শুধু এদেশেই নয়, অন্য দেশেও আছে। ক্রস ওয়ার্ড পাজ্‌ল্ তার প্রমাণ।

আমাদের দেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতরা পূর্বপক্ষে যে প্রশ্ন তুলতেন, সেও কতকটা এই ধরণের জিনিস তবে তার কৌলীন্য কিছু বেশী। ন্যায়ের ফাঁকিও ফাঁকি, প্রহেলিকাও তাই।

এই ন্যায়ের ফাঁকিই হয়তো নামতে নামতে বিবাহবাসরে বরযাত্রী ঠকানোর হেঁয়ালিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তরজায় কবির গানে যেসব প্রশ্নোত্তর সেও এরই প্রকারভেদ।

ছেলেদের পাঠশালায়, মেয়েদের স্নানের ঘাটে, বুড়োদের বৈঠকখানায়

চিরকুট

কালিদাস দত্ত

চিরকুটটি হাতে নিয়ে প্রিয়নাথবাবু একবার কেঁপে উঠলেন, তারপর ম্লান-মুখে বসে রইলেন, ভাবতে চেষ্টা করলেন।

সাধারণ ভাষায় অত্যন্ত সরলভাবে লেখা ছত্র ক'টি প্রথম দু-বার পড়েও ঠিক অর্থ বুঝতে পারেননি। তৃতীয়-বারে অর্থ স্পষ্ট হয়েছে। হাত থেকে কলম আপনিই আলগা হয়ে খসে পড়েছে, ফাইলপত্রের অরণ্যে হারিয়ে গেছে, প্রিয়নাথবাবুর খেয়াল হয়নি। শুধু চিরকুটের বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো কেমন সঙ্ঘবদ্ধ চেহারায় নিষ্ঠুর নিষ্করুণ হয়ে চোখের সামনে একটা ভৌতিক শ্মশান-নৃত্য শুরু করল।

ডেসপ্যাচার হরেনবাবু বসেন ঠিক প্রিয়নাথবাবুর পাশেই। খামের ওপর ছাপ ঠিকানা লেখার ফাঁকেই তিনি প্রিয়নাথবাবুর ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করেই সব বুঝলেন। প্রিয়নাথবাবুর ডান হাতের দুই আঙুলে ধরা চিরকুটটি ফ্যানের হাওয়ায় পরাজয়ের সাদা পতাকার মত উড়ছে। নিবুনো অর্ধদগ্ধ বিড়িটি দাঁতে চেপে ঠিকানা লিখতে লিখতেই হরেন-বাবু বললেন, কি হল, মেমো এসে গেল?

প্রিয়নাথবাবু শুনতে পেলেন না। উত্তরও দেওয়া হল না। তিনি প্রতি মুহূর্তেই এই চিরকুটের প্রতীক্ষা করছিলেন এবং প্রতি মুহূর্তেই ভাবছিলেন, আসবে না। শেষ মুহূর্তে ডাইরেক্টার্স বোর্ড নিশ্চয়ই তাঁর কথা বিবেচনা করবেন। কেননা, প্রিয়নাথবাবুর কেস্ অন্যান্য আর সকলের মত নয়, পৃথক। তিনি প্রাচীনতম কর্মী এবং অনুগত। এই কোম্পানীর শৈশব থেকে তিনি এর সঙ্গে জড়িত। এর উন্নতিতে তিনি নিজের সাফল্যের আনন্দ অনুভব করেছেন, দুঃখে নিজ পুত্রের বিয়োগ-ব্যথা পেয়েছেন। অন্যজনের সঙ্গে তাই তাঁর তুলনা চলে না। কিন্তু তবু এল। আশ্চর্য!

পিওন বিষ্টুচরণ এসে বললে, কই বাবু, পয়সা দিন না বাস-ভাড়ার। দেরি হয়ে গেল যে? জরুরী টেণ্ডার কখন লাগাব?

প্রিয়নাথবাবুর চিন্তায় ছেদ পড়ল। স্মৃতির কবর থেকে তিনি ফিরে এলেন কর্তব্যের চড়া আলোয়। প্রায় ভিন্ন-মানুষ। বললেন, হ্যাঁরে বিষ্টু, কালকের পয়সার হিসেব দিয়েছিস?

: আঃ, ফিরে এসে দেব বাবু। এখন আমায় আর জ্বালাতন করবেন না। গণ্ডা আষ্টেক পয়সা ফেলে আগে আমায় বিদেয় করুন তো। সওয়া একটা বাজে, কি করে যে টেণ্ডার বাক্সে ফেলব?

অন্যান্য দিন হলে তর্ক করতেন, শাসন করতে চাইতেন। কিন্তু আজ আর ইচ্ছে হল না। অভ্যাসবশে প্রতি-দিনের মত আজও মুখে একটা ধমক এসে গিয়েছিল, কিন্তু উচ্চারণ করার আগেই কেমন একটা ক্লান্তি বোধ করলেন। চাবি দিয়ে ক্যাশ-বাক্স খুলে গুনে গুনেই পয়সা দিলেন।

বিষ্টুচরণ পয়সা পকেটে ফেলে বললে, আপনার পাতি নেবু কটা?

কিছুদিন যাবৎ পেটে কিছু সহ্য হয় না, তাই টিফিনের সময় পাতি লেবুর রস খান, বাড়িতেও নিয়ে যান। বললেন, থাক, আজ আর লাগবে না। কি হবে আর খেয়ে!

বিষ্টুচরণ কিছু জানে না, এ কথার গূঢ় অর্থ সে বুঝল না। বললে, ওই তো আবার ঝামেলা করলেন? কেন পয়সা তো আমার কাছে আছে। দুটোই আনব ভালো বাবু!

পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে ছুটতে বিষ্টুচরণ টেণ্ডার লাগাতে উধাও হল। আর প্রিয়নাথবাবুর এই প্রথম মনে হল, বিষ্টুচরণ একটু রূঢ়ভাষী, স্পষ্ট বক্তা, কিন্তু লোক খারাপ নয়। অন্তরে ওর স্নেহ আছে। মানুষের ওপর দেখেই কি সব বোঝা যায়? আমাকে কি কেউ বোঝে?

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। তারপর ডেসপ্যাচার হরেনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, বুঝলে হরেন, চললুম।

হরেনবাবু কলম রেখে আয়েস করে আধপোড়া বিড়িটি এবার ধরালেন। বললেন, দেখছি তো মেমো এসে গেছে। আমি তো আগেই বলেছিলুম, ব্যাটারা কসাই। কর্তাদের ভালোবাসা আর মোহনবাগানের মুরগী পোষা একই।

ঃ অথচ, বুঝলে হরেন, আমি ভেবেছিলুম আসবে না। আরও এক বছর এক্সটেনশন পাব। নিমুর মা-ও সেদিন বলছিল, এই মাসখানেক আগেই যখন ইনক্রিমেণ্ট একটা দিয়েছে, তখন এ বছরটা আর রিটায়ার করাবে না। মেয়ে-মানুষের আশা তো? ভেবেছিলুম এই ইনক্রিমেণ্টের পাঁচটা করে টাকা পোস্টা-পিসে রাখব। তা আর হল না। এদিকে কি দিয়ে যে কি [illegible]—

নির্বিকার হরেনবাবু বললেন, ও সব কি আর ও ব্যাটারা বুঝবে? কপালে নোটিশের [illegible] পরিয়ে ছেড়ে দো দিলে। এখন [illegible] পাদের মতো [illegible] চরে খা—

তারপর একটু থেমে নিঃশ্বাস ফেলে বললে, আপনি তো। তবু কর্তাদের [illegible] প্রিয়পাত্র—[illegible] পেয়েছেন, আপনাকে [illegible] যেতে হলো। ছেলেবেলায় শিক্ষা হয়েছিল মন্দ, [illegible] শিখিনি [illegible] শিখিনি। [illegible] সঙ্গে "ফাইট" করে [illegible] দরকার নেই যে [illegible] ছেলেকে সে ওসব শিখতে দেখেছে?

হরেনবাবু চুপ করলেন। হঠাৎ যেন অফিসটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কানে ঝিঁ ঝিঁ করছে। শুধু কানে [illegible] শব্দ আর দূরে টাইপরাইটিং মেশিনের কঙ্কাল নৃত্য। শুকনো পাথরের ওপর যেন কতকগুলো কঙ্কালের হুড়মুড় করে ছুটে এগিয়ে আসা। হ্যাঁ, কঙ্কাল আর শুকনো পাথর। অথচ একদিন [illegible], সবুজ আর সতেজ ছিল।

॥ দুই ॥

টিফিনের পর তরুণ দু'জন কর্মী কিরণ আর তাপস এল।

কিরণ বললে, দাদু, আপনি আমাদের ছেড়ে চললেন। অনেক কাজের পর এবার আপনার অবসর। আপনাকে আমরা খুব ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দিতে চাই। তাই আপনার অনুমতি নিতে এলাম।

শুনে প্রিয়নাথবাবু প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা যেন অতি দুর্বোধ্য। শেষে বললেন, না, না, কিরণ, ওসব কোরো না। ওসব কি আমাদের সাজে? ওসব হল বড়ো কর্তাদের জন্য। সবাইকে ওসব মানায় না। ওঁরা অসন্তুষ্ট হবেন।

তাপস বললে, আর অসন্তুষ্ট হয়ে কি করবেন? ফাঁসির ওপর ডবল ফাঁসি তো আর হবে না? তা ছাড়া, অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণও নেই, এ আপনার মিছে ভয়। আমরা কিন্তু করবই।

প্রিয়নাথবাবু হাসলেন। আহা, বড়ো ভালো আজকালকার এই সব তরুণ ছেলেরা। কেমন জোর দিয়ে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কথা বলতে পারে। কত অল্প বয়সেই এরা চাকরি করতে আসে, তবু কী মায়া, কী মমতা। অবশ্য মুখে কোনদিনই তিনি এই সব ছেলেদের কথা স্বীকার করেননি, মানেননি, কিন্তু অন্তরে করেছেন। কতদিন কত ঝগড়া হয়েছে, ওদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, অ্যাকসন নিয়েছেন। নির্মমভাবে ওদের বিরুদ্ধে মেমো লিখে ফাইন করিয়েছেন, চাকরি থেকে বরখাস্তের সুপারিশ করেছেন। আর আজ সেই মেমো এসে তাঁকেই বিদায় দিল। জল্লাদেরও ফাঁসি হয়? কিন্তু আমি সত্যিই কি জল্লাদ ছিলুম?

প্রিয়নাথবাবু মৃদু, মলিন একটু হাসলেন। বললেন, বুঝবে। একদিন সব বুঝবে। পাহাড় থেকে পাথরের চাই যখন ভেঙে পড়ে, তখন তার চাটকা চেহারা, অংগে অংগে ক্ষুরধার। আমাদেরও তো একদিন সে ধার ছিল। তারপর ঝরনার স্রোতে সব পাথর মসৃণ নুড়ি হয়। ছেলেপুলে মোহ, সংসার-যন্ত্রণা করো—দাদুর কথা সব মনে পড়বে।

তাপস বলল, এমন সব পেসিমিস্টিক কথা বলেন! আপনাদের ক্ষুরধার তো দূরের কথা, মনে হয় নরুন-ধারও কোনকালে ছিল না। নইলে বিনা ওভারটাইমে রাত্রি দশটা পর্যন্ত সারা জীবন খাটুনি করে গেলেন, কি না—সায়েবদের সুনজরে থাকবেন। শুনেছি, নিজের হাতে আপনারা বড়ো বাবুদের রাস্তা থেকে টিফিন কিনে এনে দিতেন, জল গড়িয়ে খাওয়াতেন! আশ্চর্য, এটা কি বাড়ির অতিথি-সেবা—?

কিরণ বললে, আঃ! থাম্ তাপস। সেই পুরোনো কথা। ও সব কেন তর্ক আজ নয়। তা হলে দাদু, ওই কথাই রইল, আমরা আপনার অনুমতি নিয়ে গেলুম।

প্রিয়নাথবাবু বাধা দিলেন। বললেন, না, অনুমতি কিন্তু আমি দিলুম না। আটত্রিশ বছর এ কোম্পানীতে কাজ হল। যে চেয়ারে এসে প্রথম বসেছিলুম, সেই চেয়ারে বসেই বিদায় নিচ্ছি। একদিন পৃথিবী থেকেও এমনি করেই বিদায় নেব। কিন্তু এই চেয়ার এই চেয়ারই থাকবে। কত নতুন মানুষ এল, শিশু বড়ো হল, শক্ত হাত গড়ে উঠল, কিন্তু আমার চেয়ারের দুটো হাতল আটত্রিশ বছরেও গজায়নি। কোন দিন এসব কথা বলিনি, আজ বলছি। হাতল-অলা চেয়ারে যারা বসে, তাদের ফেয়ার-ওয়েল দিও, সুনজরে থাকবে, উন্নতি করতে পারবে। আমি যেমন নীরবে এসেছি, তেমনি নীরবেই যাব—।

কিরণ বললে, এ সব কী বলছেন? আমাদের খুশি আমরা আপনাকে ফেয়ার-ওয়েল জানাব। আপনার কাছে অনুমতি নিতে এসেই দেখছি ভুল করেছি।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত কথা, তবু প্রিয়নাথবাবুর ভালো লাগল। আরাম পেলেন শুনে। বেশ আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে কথা বলে এরা। বললেন, সমীরণবাবুর পার্মিশন নিয়েছ?

কিরণ বললে, না, নিইনি। নেবার দরকারও নেই। তিনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, তাঁকে সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করব।

প্রিয়নাথবাবু বললেন, সমীরণ-বাবুর পার্মিশনই আমার কনসেন্ট। তিনি যদি অনুমতি দেন, আমি মাথা পেতে তোমাদের অত্যাচার সহ্য করব। বলি হবার আগে তোমরা যদি ভালো-বেসে কপালে একটু সিঁদুর পরাতে চাও, অবলা জীব বাধা দেয় কি করে? কিন্তু এর কোনই দরকার ছিল না, কিরণ। তোমাদের কাছে উৎসব, আমার কাছে জীবনের নির্মম পরিহাস।

কিরণের খুব খারাপ লাগল কথা-গুলো। সত্যিই, খুবই আঘাত পেয়েছেন প্রিয়নাথবাবু। কোন কথা কাটাকাটি করতেই আর ইচ্ছে হল না। তবু বললে, হ্যাঁ, উৎসবই। সারা জীবন কর্তব্য-কর্ম শেষ করার পর উৎসবের আনন্দের মধ্য দিয়েই একদিন সবাই বিদায়-সম্বর্ধনা

পারে। অবশ্য আজ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার জন্য এই আনন্দানুষ্ঠান বিস্বাদ হয়তো লাগে, কিন্তু দিন তো বদলাবে। না হয়, আজ তার সূচনাটাই দুঃখের মধ্য দিয়ে আমরা করে রাখলুম। চলি তাপস, ওরা আবার অপেক্ষা করছে। আবার আসব, দাদু।

সব শুনে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সমীরণবাবু বললেন, ইন্টারেস্টিং! তবে আমাকে একটু সময় দিন, ভেবে কাল উত্তর দেব। কেমন?

কিরণ বুঝল, সমীরণবাবু তাঁর ওপর-অলাদের অনুমতি না নিয়ে নিজে অনুমতি দিতে চান না। ব্যাপার কিছুই না, তবে এর আগে এখানে এ ধরনের সাধারণ কেরানী কখনো বিদায় অভিনন্দন পায়নি।

কিরণ বললে, স্যর, এর মধ্যে ভাবার কি আছে? এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টাল ব্যাপার, তাই ক্লাবরূমে ব্যবস্থা না করে ছুটির পর নিজেদের ডিপার্টমেন্টেই সামান্য একটু আয়োজন। আর তা ছাড়া, আপনি থাকছেন সভাপতি হিসেবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার থাকছেন, চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকছেন, আপত্তির আর কি থাকতে পারে?

না, আপত্তি আর থাকল না। কারণ আপত্তি থাকলে সভাপতি থাকা যায় না। সমীরণবাবুরও রিটায়ারিং এর সময় এসে গেছে। এর আগে কোন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ফেয়ার-ওয়েল পায়নি। কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল না, কেউ দেয়নি। এই রকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হতে পারে, তিনি ভাবলেন। এবং অনুমতি দিলেন। কিন্তু মুখে বললেন, না, না, আমাকে আবার এর মধ্যে কেন? কিছু ডোনেশন নিয়ে আমাকে রেহাই দিন, বরং অ্যাকাউন্ট্যান্ট-সায়েবকে ধরুন, অল্প বয়েস, ওরা পারবে। আমি সভাপতি টভাপতি —

বলে সমীরণবাবু নববধূর মত হাসিতে একটু হাসলেন এবং হেসে কোটের ভিতরের পকেট থেকে পার্স বের করে একটি পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন। বললেন, দেখবেন, বক্তৃতার আইটেম আবার খুব বেশি রাখবেন না। আমার সেইখানেই আবার একটু বেশি ভয়, মোটে স্ট্যান্ড করতে পারি না। তাছাড়া, ও সব বক্তৃতায় হিতে বিপরীতই ঘটতে দেখি বেশি। মোটামুটি ব্যাপারটা একটু আনন্দানুষ্ঠানই হওয়া উচিত। তবে আপনাদের একজন সহকর্মী চলে যাচ্ছেন, আপনাদের কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। একই নিয়মে আবার আমাকেও যেতে হবে। যেতে সবাইকেই হয় —

সমীরণবাবুর এই দার্শনিকতার মধ্যে এই মুহূর্তে তাঁর ধর্মসুলভ কোন অভিনয় নেই। হঠাৎ খুবই বিষণ্ণ মনে হল তাঁকে। এ বিষণ্ণতা বানানো নয়। কেননা, আগের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কিছুদিন আগেই গেছেন, এবার তাঁর পালা।

কিরণ বললে, না, স্যর। বক্তৃতা একেবারে নেই বললেই হয়। অভিনন্দনপত্র-পাঠ, প্রবীণ কোন সহকর্মীর সংক্ষিপ্ত একটু স্মৃতিচারণসহ একটি ক্যারিকেচার -

ঃ ক্যারিকেচার?

সমীরণবাবু প্রায় চমকেই উঠলেন, সোজা হয়ে বসলেন, আতঙ্কের মধ্যেও একটু হাসির চেষ্টা করে আবার বললেন, ক্যারিকেচার? কিসের?

কিরণ বললে, বিল সেকশনের গৌরহরিবাবু এককালে খুব ভালো কমেডিয়ান ছিলেন। তিনিই করবেন। নিজে বানিয়েছেন। বেশ হাসাতে পারেন।

ঃ ও!

আশ্বস্ত হয়ে সমীরণবাবু চেয়ারে হেলান দিতে দিতে বললেন, খুবই ইনটারেস্টিং হবে। চমৎকার প্রোগ্রাম হয়েছে। হ্যাঁ, একটু আনন্দের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠান শেষ হওয়া ভালো। তাতে যিনি রিটায়ার করছেন তাঁর মনের ভার অনেকটা কেটে যায়। তা, গৌরহরিবাবু ক্যারিকেচার করতে পারেন জানতুম না তো? ফুল মৌন এ তেমু -

বাকিটা মনে না পড়ায় সব কিছুর ওপর, নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর, এমন কি কিরণের ওপর, প্রিয়নাথবাবুর ওপর এবং গৌরহরিবাবুর ওপর তাঁর রাগ হল, কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে না দিয়ে দার্শনিকসুলভ হেসে আবৃত্তি শেষ করলেন, যেন আর অধিক বলার প্রয়োজনই পড়ে না।

গৌরহরিবাবু বললেন তিনি ক্যারিকেচার করবেন না।

ঃ তোমরা কি ক্ষেপে গেলে? হচ্ছে একটা বিদায় অনুষ্ঠান, দুঃখের ব্যাপার - শোকসভা বললেই যথার্থ হয়, সেখানে কিনা ক্যারিকেচার? আমি ওর মধ্যে নেই।

প্রিয়নাথবাবুই উদ্ধার করলেন শেষ পর্যন্ত। কি কাজে যেন এদিকে বিল সেকশনে এসেছিলেন, শুনে বললেন, করো গৌরবাবু, ছেলেরা চাইছে, করো একটা ক্যারিকেচার। দুঃখ তো চিরসঙ্গী আছেই, ছেলেরা যদি একটু আমোদ পায়, তুমি আমি বুড়োর দল না-না বললে চলবে কেন? কি যেন তোমার সেই বরানগরের ছড়াটা?

বাস্, গৌরহরিবাবুর ঘড়িতে কে যেন দম দিয়ে দিল। হ্যাঃ হ্যাঃ করে ছেলেমানুষের মত হেসে একেবারে খুন। তাহলে করব, বলছ? তা জমবে, হাসতে হাসতে কর্তাদের চোখে জল গড়িয়ে পড়বে।

ঃ সেই বরানগরের ছড়াটা শোনাও।

গৌরহরিবাবুর ভালো লাগে খুব এসব। কমেডিয়ানের লাইনে না গিয়ে কেন যে তিনি এই শুকনো কেরানীগিরিতে ঢুকলেন সেই কথা বলে অনেকে আক্ষেপ করে। আর কেউ আগ্রহ করে তাঁর ক্যারিকেচার শুনতে চাইলে স্থান-কাল-প্রয়োজন সব কিছু তিনি ভুলে যান।

কলমটা ঠকাস্ করে ফেলে হেসে গৌরহরিবাবু বললেন, আর কি সে বরানগর আছে এখন। সে সব পুরনো কথা। ছেলেবেলায় মামাবাড়ি যেতুম, মামাদের কীর্তিকাণ্ড দেখতুম। বাবুরা যেতেন গঙ্গায় পানসি উড়িয়ে, রাস্তায় চৌঘুড়ি ছুটতো কাদা ছিটিয়ে, মুখে ফিরত মাতোয়ালা বোল, চল্ পানসি বেলঘোরিয়া। কোচোয়ান বলত, বাবু এ চৌঘুড়ি। বাবুরা বলতেন, হোক না যে ব্যাটা চৌঘুড়ি, বাতাসে উড়িয়ে দে পালখানা—। মোসায়েব বলত, বাবুমশাই, যাচ্ছি যে বরানগর—এই বলে ধরত টপ্পা—

বরানগর রসের সাগর।

এক এক নারীর তিন তিন নাগর॥

সে বরানগর আর নেই ভাই। আজকালকার বরানাগরী এ গান শুনলে পুলিশে দেবে, মানহানির মামলা রুজু করবে। তার ওপর আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়িও এখন বরানগর। এসব গান কি আর থাকবে?

গান শুনে প্রিয়নাথবাবু হাসলেন, ছেলেরা চোখ টিপে মুখ ঘোরালো। দাদুর রস আছে। এখনও বরানগর শুনতে চান। দাদু বললেন, আর গৌর-

বাবু, তোমার সেই স্টেশন-মাস্টারের ইংরেজিটা—ফ্লাই ফ্লাই—ওটা একবার করো।

ঃ না, না। এখন কাজের সময় ও সব থাক্—

ঃ আহা কাজ তো আছেই—

ব্যস্। এইটুকুই চাইছিলেন গৌর-হরিবাবু। একটু আগ্রহের সততা দেখাতে চান। ওমনিতে কি দান দেওয়া যায়? গ্রহীতার শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ না থাকলে রসের কাব্য ভূতের শ্রাদ্ধে দাঁড়ায়।

লম্বা বিরাট চেহারা গৌরহরিবাবুর। গায়ে সেই অনুপাতে মাংস থাকলে এই অফিসে আর মানাত না। পঞ্চাশের ওপর বয়স, দীর্ঘ দেহের জন্য কুঁজো হয়ে চলেন। সিংগাড় চোখের ওপর কাঁচা-পাকা দীর্ঘ ভ্রূ চোখের পাতা ঢেকে ঝুলে পড়ে চক্ষুকোটরকে ছায়াচ্ছন্ন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চালাও ফরাসের বৈঠকী মেজাজের শেষ জীর্ণ সংস্করণ। এই মুহূর্তে তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিনুত পাতলা ঠোঁটে হাসি। টেবিলে ঠেকাস করে আবার কলম ফেলে বললেন, ছাড়বে না দেখছি। তাহলে শোনো। সে অনেক কাল আগের কথা। পাড়াগেঁয়ে স্টেশনে সায়েব ইনস্পেক্টর এসেছেন তদারকিতে। দেখলেন, স্টেশনের একটা গ্যাসবাতির কাঁচ ভাঙা। ইংরেজিতে শুধোলেন, এটা ভাঙল কি করে? স্টেশন-মাস্টার তো মাইনর পাস। ইংরেজির দৌড় তো তার ঘোড়ার পাতা অবধি। কিন্তু হলে কি হয়। ইংরেজিতে উত্তর না দিতে পারলে, স্মার্ট, রেডি-উইট না হলে চাকরিতে উন্নতি নেই। মাস্টার সায়েবকে ইংরেজিতে কাচ ভাঙার ইতিহাস বুঝিয়ে বললে, এ বোন-মাউথ ভালচার, স্যার। ফ্লাই, ফ্লা-ই, ফ্ল-া-ই-ঈঃ অ্যাবভ, অ্যান্ড সাডেনলি তো ফল্—ফল্ অন দি গ্লাস-কেস অ্যান্ড থান্ থান্ থান্—। দাস ব্রোকন্ বাই দ্যাট কাউজ বোন্—

ইংরেজি শুনে সায়েব সেই স্টেশন-মাস্টারকে দশ টাকা জলপানির বখশিস দিয়েছিলেন। ওই ইংরেজি দিয়ে স্টেশন-মাস্টার শেষে নাকি ডিভিশনাল সুপারি-নটেন্ডেন্টও হয়েছিলেন। সে সব দিন কি আর আছে? সে-সব দিনে শুধু ইংরেজিতে উচ্চারণ হলেই চলত, বাংলা, হিন্দি, উর্দু সব কিছুর শুধু ইংরেজি উচ্চারণ—

হলেই চোখ মুখ ভেংচিয়ে চোখ ভ্রূ গালে চাপ দিয়ে নিচের দিকে ঠেলে সায়েবী উচ্চারণে কবিতা আওড়ালেন গৌরহরিবাবু, কারুর অনুরোধের অপেক্ষা না করেই—

হ্যামি অ্যান্টনি সায়েব জাট ফিরিঙ্গি
ডাঁড়িয়ে ঠাকি টফাটে।
র‍্যামের ভাট্ শ্যামে খায়
কাজ কি আমার ডেখাটে।।

অনেকবার শোনা গল্প, অনেকবার শোনা কাব্য। তবু প্রতিবারই নতুন মনে হয়। নতুন করে আনন্দ পাওয়া যায়। আর বেশ রসিয়ে বলতে পারেন গৌরহরি-বাবু। তাঁর বলার কায়দাটাই আসল।

প্রিয়নাথবাবু বললেন, পড়বি তো পড়—বুঝি তোমার "ফল্-বি তো ফল্" —হাঃ হাঃ, আমাদেরই দোসর। কিন্তু আমরা আর ডি, এস্, হতে পারলুম না।

সব কথা, সব হাসির শেষে একটা বিষণ্ণতা। কিছুই ভালো লাগে না। সংসার, স্ত্রী, বিধবা কন্যা, কাচ্চা-বাচ্চা শিশু, রিটায়ার্ড লাইফ—বিষণ্ণতা। অথচ, প্রিয়নাথবাবু চিন্তা করলেন, আমি কি সত্যিই পঙ্গু, অসমর্থ? আমার চোখের জোর কি এই সাতান্নতেই কমে গেছে? দু মাইল হেঁটে আমি কি এখনও অফিসে আসি না? তবু, আমার এই বর্জন কেন? বুঝি পৃথিবী থেকে শেষ বর্জনের প্রথম সিগ্ন্যাল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রিয়নাথ-বাবু বললেন, কোরো গৌরবাবু। ভালো দেখে একটা ক্যারিকেচার কোরো, ওরা বলচে।

ব'লে তিনি নিজের চেয়ারের দিকে চলতে শুরু করলেন ধীর ক্লান্ত পায়ে।

তাপস বললে, সেই পাঁঠার ক্যারি-কেচারটা করবেন, গৌরদা।

গৌরহরিবাবু চমকে উঠলেন, ওরে-ব্বাবা! শুনে সব কেঁদে ফেলবে যে! অবশ্য মন্দ হবে না, ওটা আমার বানানো নয়। প্রিয়দারই শোনা গল্প, আমায় বলেছিল। হ্যাঁ, জমবে। আর, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোও হবে।

ঃ আর তা ছাড়া, তাপস চোখ টিপে বললে, বড়ো সায়েবরা থাকবে, তারাও একটু শুনুক-না আমাদের কী অবস্থা! কিন্তু খবরদার, এখন মোটে কিছু লীক করবেন না। কেমন?

গৌরহরিবাবুর কানে তখন ওসব কোন কথাই আর ঢুকল না। তিনি তখন তাঁর সেই ক্যারিকেচারের দৃশ্যের মধ্যে তলিয়ে গেছেন।

আর দুটি দিন। মাত্র দুটি দিন আর এই চেয়ারে আমি বসব। তারপর এখান-কার আমি আর কেউ না। এই টেবিল, পেন্সিল, ছুরি, কলম, এই ফাইল, কাগজ-পত্র, এই কাচের গ্লাস, চামচ, পেয়ালা, ডিস্—

হঠাৎ মনে হল, কাচের গ্লাস, চামচ, পেয়ালা, এগুলো বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। ওগুলো আমার পয়সায় কেনা, কোম্পানীর নয়।

পরমুহূর্তে মনে হল, কি লাভ? কী-ই বা ওর দাম। সবই যদি রেখে যেতে পারি, ওগুলোও পারব। না, বরং ওগুলি আমি বিষ্টুচরণকে দিয়ে যাব। বিষ্টু-চরণ লেবুর রস করে, না যুদ্ধ করে। ওরে আস্তে আস্তে। ওগুলোর শরীর তোর মত লোহার নয়, কাঁচের। ভাঙিস্ না—

এবার ওগুলো তার ভাঙবে না, তার আগে আমিই ভাঙলো।

করেসপন্ডেন্স সেকশনের জুনিয়র কেরানী সোমনাথ হাতে একখণ্ড কাগজ নিয়ে এল। প্রিয়নাথবাবুর স্মৃতি-রোমন্থনে বাধা পড়ল।

সোমনাথ বললে, ভালো করে দেখে অ্যাপ্রুভ করে দিন দাদু। মানপত্রটা এই-রকম দাঁড়াল। সৌরেনের হাতের লেখা ভালো। আপনি দেখে দিলে আর্ট পেপারে চাইনীজ ইঙ্ক্ দিয়ে ও লিখবে। তারপর কাঁচ আর ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে দেব, গ্র্যান্ড হবে।

সোমনাথ কেরানী লেখক। কেরানী-গিরির ফাঁকে ফাঁকে গল্প, কবিতা লেখে। খ্যাত-অখ্যাত কাগজে মাঝে মধ্যে ছাপা হয়, তাইতেই সে এখানে বিখ্যাত, অবি-সম্বাদিত লেখক। কাজেই খবরের কাগজে নাগরিকদের দুর্দশার বিবরণ জানিয়ে প্রতিকার-প্রত্যাশী চিঠি, সহকর্মী বা পাড়া-পড়শির কন্যার বিয়েতে পদ্য, কিংবা এই ধরনের মানপত্র লেখার দায়িত্ব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওর ওপর এসে পড়ে। সে-ও "সময় নেই" "সময় নেই" করেও সানন্দে সাহিত্যসেবীর অবশ্যকৃত্য এই ঐতিহাসিক প্রাথমিক দায়িত্বগুলি পালন করে।

মানপত্রটি এমনই খাড়া করেছে যে, পড়ে প্রিয়নাথবাবুর নিজেরই ভয়ংকর

লাগো পেল। যে গুণগুলি প্রিয়নাথবাবুর মধ্যে আছে বলে অন্যে দূরের কথা তিনি নিজেও জানেন না, সেইগুলি আশ্চর্য শক্তিতে সোমনাথ তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছে এবং মানপত্রে উল্লেখ করেছে। বীর, ত্যাগী, সর্বংসহা ধরিত্রী থেকে শুরু করে দধীচি পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি।

প্রিয়নাথবাবু মনোযোগ দিয়ে পড়ে কাগজটি ফেরত দিলেন। বললেন, ছেলে-মেয়েরা পড়ে হাসবে যে সোমনাথ। এই কি আর বাড়ি পর্যন্ত নেওয়া চলবে?

সোমনাথ বললে, হাসবে কেন? সব জিনিসই কি সকলের চোখে ধরা পড়ে? এই ধরুন, বাড়িতে যে ছেলে বিশ্বপ্রেমের জন্য নিন্দিত, বিশ্বে সে-ই কি সকলের বন্দিত নয়? বাড়ির লোকে আর কতটুকু জানতে পারে? তারা জানে হয় ছেলে, নয় বাবা হিসেবে। মানুষের তো আরও পরিচয় আছে?

বক্তৃতা দিতে সোমনাথ থামল। কথাগুলো চমৎকার মুখে এসে গেছে। তার নিজেরই খুব ভালো লাগল। এবং ফলে এই খুশির মুহূর্তে প্রিয়নাথবাবুর অনুপমসুলভতাকে, তাঁর ক্ষমার্হনীয় অজ্ঞানতাকে সে ক্ষমা করে দিতে পারল।

শুনে প্রিয়নাথবাবু মৃদু হাসলেন। বললেন, মৃগনাভি যার আছে সোমনাথ, তার গন্ধ ঘরেও যেমন—বাইরেও তেমনি। পাহাড়ে জঙ্গলেই তার সৌরভ, অরণ্যের ভিতরেও সে নিজগুণে বিশিষ্ট। তাকে চিনতে কি কারুর বাকি থাকে? সব হরিণকে যদি মৃগনাভি বানাতে চাও, লোকে শুনবে কেন?

শুনে সোমনাথ একটু চমকাল। প্রিয়নাথবাবুর মুখে এমন কথা শুনতে পাবে এত গুণের আবিষ্কারক সোমনাথ নিজেও আগে সেটা বুঝতে পারেনি। একটু ভেবে সে হেসেই উত্তর দিলে, মৃগনাভি যে এখন কোন হরিণের একার সম্পত্তি নয়, দাদু। বিশ্বময় রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে গেছে। সকলেরই কিছু না কিছু সৌরভ আছে। [illegible] কটু গন্ধের ভিড়ে তাকে খুঁজে বের করা যে-সে লোকের কাজ নয়, বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন।

প্রিয়নাথবাবুর মত বুড়ো মানুষের সঙ্গে এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে সোমনাথের [illegible] ভালো লাগছিল না। [illegible] আর [illegible] থাকতে [illegible] তা ছাড়া, সোমনাথের কেবলই মনে হতে লাগল এই বুড়ো প্রিয়নাথ যার ওপর তার অনেক রাগ এবং ঘৃণা আছে, এখন অনধিকার চর্চা করছে। এই সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁর কথা বলার কথা নয়। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে সোমনাথ বললে, আপনার মনের অবস্থা এখন আমি বেশ বুঝতে পারি দাদু। কিন্তু এর সব জটিলতা, বৈচিত্র্য অনুভব করা শক্ত। মনে কি [illegible] হচ্ছে এখন, একটু বলবেন?

প্রিয়নাথবাবু এবার হেসেই ফেললেন। বললেন, ও, গল্প লিখবে নাকি? কিন্তু অন্যের মনের ভাব কেমন তা শুনে কি লেখা যায়? নিজে অনুভব করেই তো লিখতে হয়। সব চরিত্রই তো লেখক নিজে, ভগবানের দশ অবতারের মত। শুধু ভগবানের অবতারত্ব বাইরের রূপে, লেখকের বিচিত্র অনুভূতির আস্বাদনে অন্তরের রস-কল্পনায়।

একটু থামলেন। আবার সেই শুকনো ম্লান হাসি। বললেন, একদিন আমরাও চর্চা করেছি। তিরিশ বছর আগের পুরনো প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসীর পাতায় নিচের দিকে কবিতার শেষে খুঁজলে এখনও নাম পাবে। তবে, আমাদের সে ছিল কাবোর জল-বসন্ত, খাঁটি-বসন্ত হলে এত সহজেই দাগ মেলাতো না। সংসার-বন্যার খরস্রোতে এখন মোলায়েম নুড়ি হয়ে গেছি।

এই সব অকিঞ্চিৎকর কাব্যচর্চার মহিমা-অহমিকা-ব্যাখ্যান, এই সব তুলনা-উপমা আগেও শুনেছে সোমনাথ। শুনলে বড়ো বিচ্ছিরি লাগে। মনে হয়, সামনে আয়না ধরে তারও ভবিষ্যতের ছবির একটা ইশারা দেখিয়ে চূড়ান্ত একটা স্যাডিস্টিক আনন্দ পাচ্ছেন প্রিয়নাথবাবু। এই দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভয়েই সোমনাথ নিজের সামান্য সাহিত্য-কীর্তির কথাও প্রিয়নাথবাবুর কাছে সাবধানে গোপন রাখার চেষ্টা করে। নববধূ যেমন পারতপক্ষে অকাল-বিধবার সামনে নিজের পতি-সোহাগ প্রকাশ করে না, ঠিক তেমনি সোমনাথের মনে হয়, প্রিয়নাথবাবু ঈর্ষা-[illegible]। [illegible] ওঁর সত্যিই ভারি [illegible]।

সোমনাথের ইচ্ছে হল, মানপত্রটা ছিঁড়ে ফেলে। এই সব বুড়োরা এমনই [illegible], ক্লীব, হতাশ যে ওদের এই সুন্দর সবুজ পৃথিবীতে বাঁচারই কোন অধিকার নেই। কিছুক্ষণ আগেই সে যে মানপত্রে প্রিয়নাথবাবুর দীর্ঘজীবনের সুনিশ্চিত কামনা জানিয়েছিল, এখন তা আর বিন্দুমাত্র মনে পড়ল না, মনে রাখতে চাইল না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও সোমনাথ বুঝল যে সে খুবই রেগেছে, তার নিজের খুবই সম্ভবপর অনিশ্চয়তার আশঙ্কা স্বীকার করতে না পেরেই সে রেগে উঠেছে। প্রিয়নাথবাবু নিজের উদাহরণ মেলে ধরে তার আত্ম-বিশ্বাসে স্বেচ্ছায় আঘাত হেনেছেন।

বছর-দুই আগের ঘটনাটা মনে পড়ল সোমনাথের। অফিসের চিঠি লিখতে গিয়ে ভুল হয়েছিল একটা। এই প্রিয়নাথবাবুই সেদিন ডিপার্ট-মেন্টাল ইনচার্জকে জানিয়েছিলেন, কাজের সময় কবিতা লিখলে ভুল তো হবেই। দু-টাকা ফাইন হয়েছিল সোমনাথের। এখন পরিষ্কার হয়ে গেল —বিধবার ঈর্ষা ওটা, ব্যর্থের দীর্ঘশ্বাস! বাবার বয়েসী প্রিয়নাথবাবু, তাঁর কিনা এই নীচতা, এই ঈর্ষা! আশ্চর্য! তবু সোমনাথ নিজের রাগের জন্য মনে মনে লজ্জিত হল, কারণ নিজেকে সে সাধারণ রিপুর ঊর্ধ্বে তুলতে চায়।

প্রিয়নাথবাবু বললেন, আমাদের হয়নি। কিন্তু তোমাদের হবে। এখন দিন বদলেছে। মনের কত জোর তোমাদের। আমাদের মনের জোরও ছিল না, হয়ওনি। তোমার হবে সোমনাথ, আমি কায়মনোবাক্যে তোমাকে আশীর্বাদ করছি। আমি আর সেদিন দেখবার জন্য হয়তো থাকবো না, আমার বংশধরেরা দেখবে, তাদের চোখ দিয়েই আমারও দেখা হবে। নিষ্ঠাটা রেখো, আমাদের মত নিষ্ঠাশূন্য হয়ো না, সত্যকে দেখে ভয়ে পিছিয়ে এসো না। তুমি খুব বড়ো লেখক হবে। শুধু সবাইকে ভালোবেসো, ওইটে দরকার যেটা আমরা পারিনি।

সোমনাথের মনে হল, প্রিয়নাথবাবু একটা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন, সতর্কতাজ্ঞাপক মন্দ্রধ্বনি। প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শিশুর মত সরল, সুন্দর, নির্মল হাসি, সামনের রিটায়ারিংএর ভয়াবহতার কথা এই মুহূর্তে আর তাঁর মনে পড়ছে না, যেন পৃথিবীর মধ্যে থেকে তার সমস্ত তুচ্ছতার ওপরে তিনি এইমাত্র উঠে গেলেন। সোমনাথের মনে

হল, এ—আর এক প্রিয়নাথবাবু যিনি এই মুহূর্তে মহত্তম শিল্পীর চাইতে মহত্তম, কারণ তিনি অকুণ্ঠ মঙ্গলকামনা করতে পারেন, তিনি বিদ্বেষে ক্লিষ্ট নন, জীবনের নিপুণ শিল্প, অন্ধকার পারাপার অন্তরের আলো দিয়ে দেখেছেন, আমাকে দেখিয়েছেন।

প্রিয়নাথবাবুকে প্রণাম করে সীটে এসে বসতেই সোমনাথের মনে হল, আমি আজকাল খুব সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে উঠেছি।

।। তিন ।।

আজ শনিবার দেড়টায় ছুটি। দুটোয় অনুষ্ঠান।

প্রথম দিকে কেউ কেউ আপত্তি করেছিলেন, প্রিয়নাথবাবুকে ফেয়ার-ওয়েল জানানো একটা বাড়াবাড়ি। উনি কারুর কোনদিন ভালো করেননি, পারলে অনিষ্টই করেছেন, অন্ততঃ কাগজেঃ তাই দেখেছি। কিন্তু এসব বাধা শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। শেষে সবাই সায় দিয়েছে আচ্ছা, একটা রীতির গোড়াপত্তন তো হোক, না হয় প্রিয়নাথবাবুকে দিয়েই হোক। দুই এক বছরের মধ্যেই যাঁরা রিটায়ার করবেন, তাঁরা বিনা প্রতিবাদেই সমর্থন করেছেন, চাঁদা দিয়েছেন, কেন না অভিনন্দন তাঁরাও পাবেন। চাঁদা দিয়ে কিন্তু তারা উদাস হয়ে রয়েছেন। একটা পেন্সনের ব্যবস্থাও যদি থাকত!

উপহার সামগ্রী কেনা নিয়েও গণ্ডগোল হল। নানা মুনির নানা মত, পথ। প্রাচীনদের পরামর্শ একরকম নতুনদের প্রস্তাব ভিন্ন রকম। শেষে তারও একটা সামঞ্জস্য বিধান হয়েছে। এমন কি জলযোগের ব্যবস্থাটাও মন্দ হল না। নামে জলযোগ হলেও মাংস-রুটির ব্যবস্থা, যদিও সীমিত, মেনু থেকে বাদ যায়নি। এই মেনুর প্রস্তাবটাই সর্বসম্মতিক্রমে অতি অল্প সময়েই পাশ হয়ে গেছে। কেন না, সবটাই তো খরচ, এইটেই একমাত্র উশুল।

উদ্বোধন সঙ্গীত নিয়েও একটু গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। সুপ্রিয় ছুটির পর মাঠে-ময়দানে গায়, পরমেশ্বরবাবুরও গানের সম্প্রদায় আছে, টুইশনও আছে। পরমেশ্বরবাবু অবশ্য গানের মাস্টার হলেও, নিজে সুকণ্ঠ নন, দাঁতও পড়ে গেছে, এখনো বাঁধানো হয়নি। তিনি শিল্পের শিক্ষক, কিন্তু শিল্পী নন। কাজেই সুপ্রিয়র ওপর ভার দেওয়া হল। শুনে সুপ্রিয় বললে, সেরেছে। আরে দূর, আমার হল মাঠে ময়দানের হেঁইয়ো হাইও গান। ময়দানের আসরেই ও চলে, বাসরের গান গাই কি করে, শিখলুম কবে? ও আমার দ্বারা হবে না বাবা, পাগল নাকি?

যতীনবাবুর ওপর হারমোনিয়ামের ভার, কারণ সব চাইতে তাঁর বাড়িই কাছে। সুপ্রিয়র কথায় প্রত্যক্ষ কোন যোগ না থাকলেও এই সুযোগে তিনি নিজের দুঃখটা জ্ঞাপন করলেন, তা হলে আমি আর হারমোনিয়াম আনতে পারব না। শুনে আমার স্ত্রী সেদিন ভয়ংকর বকাবকি করেছে—

গৌতমবাবু বললেন, আঃ, তুমি থামো তো যতীনবাবু। আরও হারমোনিয়াম পৃথিবীতে আছে। কেবল স্ত্রী আর স্ত্রী—

তারপর সুপ্রিয়র দিকে ফিরে বললেন, শুধু ময়দানের গানই গাইছ, সুপ্রিয়? একটু বাসরের দিকেও চেয়ো। বাসরটাকে একেবারে তুচ্ছ করে বাদ দিও না হে। কিছু রবীন্দ্র সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ রাগ-রাগিণী শিখলে একেবারে জাত যাবে না—

সুপ্রিয় বললে, এ আপনি মিছেই রাগ করছেন গৌতমদা। আমি কি তাই বলেছি? শেখবার ইচ্ছে কার না? কিন্তু ফুরসত চাই, সুযোগ-সুবিধে চাই, তবে তো? হাতের কাছে সস্তায় যেটা পেয়েছি শিখেছি। আপনি যখন রিটায়ার করবেন তখন—ততদিনে যা ফরমায়েস করবেন পাবেন, কথা দিলুম।

অগত্যা পরমেশ্বরবাবু ভরসা।

পরমেশ্বরবাবু যে ব্যবস্থাটা করলেন সেটা মন্দ হল না, বরং সকলেরই বেশ মনঃপুত হল। তিনি বললেন, আমি তো আর গাইব না। বরং আমার একজন ছাত্রীকে নিয়ে আসব। ট্যাক্সিভাড়াটা কিন্তু দিতে হবে।

তাই সই। এই বিদায়-সম্বর্ধনা বাসরে শুধুমাত্র পুরুষের নীরস কঠোর হাত কেন, নারীর স্নিগ্ধ কল্যাণস্পর্শও একটু যুক্ত হোক। ট্যাক্সিফেয়ার তো সামান্য কথা। শুচিবায়ুগ্রস্ত যে দু-একজন মুখে একটু আপত্তি জানাল, তাদের মৃদু ধ্বনি যৌথ সমর্থনসূচক কলরবে অতলে তলিয়ে গেল। বায়ুগ্রস্তরা অবশ্য হেরে গিয়ে খুব মনোকষ্ট পায়নি।

আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। মালাটা একটু রোগাটে হয়েছে। কিন্তু প্রিয়নাথবাবুও রোগা, ভালোই মানাবে—কে যেন বললে। শেষ মুহূর্তে টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও জলযোগেই অনেকটা যুক্ত হয়ে গেছে।

বিষ্টুচরণ সকাল সকাল ফিরেছে টেণ্ডার লাগিয়ে। ছোটাছুটি করছে সে-ই সব চাইতে বেশি। দেখে শুনে মনে হচ্ছে তার প্রথম মেয়ের অন্নপ্রাশন। টেবিল চেয়ার সাজানো গোছানো, দুটো কোণ-ভাঙ্গা ফুলদানিতে রজনীগন্ধা মাপ মত বসানো, টেবিল-ক্লথে চায়ের দাগ, সেখানে একটু চুন লেপে দেওয়া কাপ ডিস পরিষ্কার করা এবং এত সাজানো ঝামেলার ফাঁকেই নিয়মিত এক-গ্লাস লেবুর সরবত করে প্রিয়নাথবাবুর সামনে হাজির হওয়া।

প্রিয়নাথবাবু শেষবারের মত ড্রয়ার খুলে দেখছিলেন, দরকারী জিনিসপত্র কিছু থেকে গেল কিনা। সরবতের দিকে তাকিয়ে বললেন, কই, আমি তো আজ পয়সা দিইনি?

বিষ্টুচরণ বললেন, ধরুন, ধরুন। আঃ, চট করে ধরুন দেখি আগে। ওদিকে একশো কাজ হাঁ করে আছে। খালি পয়সা আর পয়সা। কেন, আমি একদিন লেবু কিনে খাওয়াতে পারি না?

বিষ্টুচরণ বরাবরই মারমুখো। আজও তবু প্রিয়নাথবাবু খুশি হলেন। বিষ্টুচরণের মনটা ভালো। রুক্ষতার অন্তরালে স্নেহের স্নিগ্ধ শীতল ধারা প্রবাহিত।

ডেসপ্যাচার হরেনবাবু তোবড়ানো গালে বিঁড়ি ধরিয়ে উদাস চোখে অপেক্ষা করছেন ফ্যানের দিকে চেয়ে। তিনি চন্দননগর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করেন, চলে যেতে চেয়েছিলেন, কেউ ছাড়েনি। একদিন না হয় হোলই দেরি। কথাটা তা নয়। হরেনবাবু বড়ই প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, এ-সব আদিখ্যেতা তার ভালো লাগে না। যেতে সবাইকেই হয়, অত মায়া বাড়ানো কেন? এই অনুষ্ঠান মানেই তো মনের ওপর এক প্যাঁচ গেরো, কষ্ট বাড়ানো ছাড়া আর কি।

সীট থেকে সব চেয়ার টেনে এনে প্যাসেজে সাজানো হয়েছে। সবাই বসে

অপেক্ষা করছে। পিছনের দিকে কেউ কেউ টেবিলের ওপর চড়ে বসেছে।

পরমেশ্বরবাবুর ছাত্রীটি সেজেগুজে এসে ফ্যানের তলায় বসেও ঘামছে। পাহাড়ে ধ্বসের দাগের মত ওর জুলপির পাশে ঘামে পাউডার গলে যাওয়ার দাগ। বেচারী ছেলেমানুষ একেবারেই। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-পরিজন-শূন্য এতগুলি কৌতূহলী চোখের সামনে বড়ই বিরত হয়ে পড়েছে। বোধ হয়, এইটেই ওর জীবনের প্রথম 'ফাংশন', নতুবা এরকম ব্যাপারে আসতে সম্ভবতঃ কেউ রাজী হয় না। ওর ছোট ভাইটি দিদির পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদে পুলিশের মত। দিদির পাহারাদার।

সবই রেডি। এখন সভাপতি, প্রধান অতিথিরা এলেই হয়। কিরণ আর তাপস গেছে ও'দের আনতে ওপর তলায়।

হঠাৎ গুঞ্জরণ থেমে গেল যেন কে ছেঁকে তুলে নিল বড়ো কড়াইয়ের ফুটন্ত রসুই থেকে ভাজা মিহিদানার মত। সব শান্ত। ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার, অ্যাসিস্টান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার, চীফ অ্যাকাউন্টান্ট আসন গ্রহণ করছেন।

যথারীতি সভার কাজ শুরু হয়ে গেল।

এতগুলি বিরাট মহীরুহের সঙ্গে একাসনে বসতে প্রিয়নাথবাবুর সংকোচ হচ্ছিল, ইতস্ততঃ করছিলেন, অভ্যেস নেই, কোন দিন বসেননি। ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার সমীরণবাবু অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন প্রিয়নাথবাবুর কুণ্ঠা। দেখেও দেখেননি, চীফ অ্যাকাউন্টান্ট শুভেন্দুনারায়ণের সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলছিলেন। তারপর হঠাৎ যেন দেখলেন প্রিয়নাথবাবু দাঁড়িয়ে, অবাক হলেন, বললেন, আরে দাঁড়িয়ে কেন? প্রিয়বাবু, বসুন! আপনিই তো এ বিয়ের বর, আমরা তো সব নীতবর।

শুভেন্দুনারায়ণ বললেন, বর্বর।

সমীরণবাবু প্রিয়নাথবাবুর হাত টেনে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আরও মারাত্মক কিছু একটা রসিকতা বুঝি অনুচ্চ কণ্ঠে প্রিয়নাথবাবুর কানে কানেই করলেন। প্রিয়নাথবাবুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, মেঘের কোলে লাল রঙের মত। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

মাল্যদান, উদ্বোধন-সংগীত, মানপত্র-পাঠ, বক্তৃতা, ভাষণ, সম্বর্ধিতের নিবেদন এবং সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ হয়ে গেল।

এবার ক্যারিকেচার। তারপর সমাপ্তি-সংগীত, ধন্যবাদ-জ্ঞাপন এবং সবশেষে জলযোগ।

ডাকাডাকি পড়ে গেল ঃ কই, গৌরহরিবাবু কই?

গৌরহরিবাবু সবার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, কেননা তিনি জানতেন সামনে তাঁকে আসতেই হবে। তিনি এগোলেন।

যার ফেয়ারওয়েল সেই প্রিয়নাথবাবু সাজেননি, কোন দিন সাজেন না, সাজার অভ্যেস তৈরী করেননি বা করতে পারেননি। কিন্তু গৌরহরিবাবু সেজে এসেছেন। আদ্দির পাঞ্জাবি আধময়লা, কিন্তু গিলেকরা, আধময়লা হওয়ায় এখানে মানিয়েছে ভাল, পায়ে নিউ কাট—একটা তালি আছে কড়ে আঙুলের কাছে, কোঁচানো চওড়া কালোপাড় ধুতি—পাড়ের রঙ জ্বলে গেছে, ধুতি নতুন পাট-ভাঙা কাজেই পাঞ্জাবির চাইতে ফর্সা এবং একটু নীল বেশী, কামানো দাড়ি কিন্তু মোটা চওড়া হাড়ের করা গালে তা এখুনি কর্কশ, বোধ হয় গত রাত্রে কামানো, কারণ সকালে টাইম হয় না, মাঝে মধ্যে ব্লেড পুরনো হলেও বাসি কামানো দাড়ি মনে হয়,—তবু এতেই মানিয়েছে। আগেকার চঞ্চল ব্যানার্জির আঁকা "জামাইবাবুর" মত এসে তিনি দাঁড়ালেন। তীক্ষ্ম চোখে লক্ষ্য করলে ধরা যায় গৌরহরিবাবু যার কাঁচা-পাকা ভ্রূ ঝুলে পড়ে চোখকে ছায়াচ্ছন্ন করেছে, কানের লোম ফুলের স্তবকের মত, একটু, অতিসামান্য, ট্যারা। কানে সামান্য কম শোনেন, ফলে তাঁকে সর্বদা অন্যমনস্ক অথবা গভীর চিন্তামগ্ন মনে হয়। গৌরহরিবাবুর হাসিটি শিশুর মত নির্ভেজাল, সরল, স্নিগ্ধ স্ফূর্তিযুক্ত।

সবাই নড়েচড়ে বসল।

সমীরণবাবু একটু হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। গৌরহরিবাবু লক্ষ্য করলেন না, কারণ তিনি সব কিছু লক্ষ্য করেন না। সমীরণবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। তিনি আশ্চর্য হচ্ছিলেন। এই লোক ক্যারিকেচার করে? ওকে দেখেই তো মূর্তিমান ক্যারিকেচার মনে হয়, কার্টুন। উনবিংশ শতাব্দীর ভৌতিক কোন ক্যারিকেচার অকস্মাৎ ঢুকে পড়েছে বিশ শতকের জীবন্ত চিড়িয়াখানায়।

এটা স্পষ্ট, গৌরহরিবাবু একটু লজ্জা পাচ্ছেন, একটু সংকুচিত বোধ করছেন। তিনি বৈঠকে ক্যারিকেচার করেন, বড়ো সভায় কখনো করেননি।

ঃ সমবেত সুধীমণ্ডলী, কলারসগ্রাহী এবং আমার প্রিয় প্রিয়দা, এই বিসর্জন পালার অঙ্কে বায়না হয়েছে হাসির কিছু ভিয়েন চড়াতে হবে। মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে, অবশ্য যদিও তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা—রিফ্রেসমেন্ট অর্থাৎ জলের সঙ্গে কিছু যোগের ও ভোগের ব্যবস্থাও হয়েছে। আমার উপর দায় এসেছে আমি লোক হাসাব। বরাবরই পেরেছি, ভালোই পেরেছি। এখনও পারব বোধ হচ্ছে। কিন্তু একটা বিনীত বিনয় এই—উচ্চ গ্রামে হাসবেন না, তাতে আমি ডিস্টার্বড বোধ করি। মনে মনে হাসবেন অথবা বাড়ি গিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে। অবশ্য কোথায় যেন আমি পড়েছিলুম, হাসি এবং কান্নার মধ্যে গুণগত কোন ভেদ নেই, ভেদ শুধু মাত্রার। তাই আমরা হাসতে হাসতে এক সময় কেঁদে ফেলি অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। রাম রাম উচ্চারণের মতন আর কি, এক সময় মরা হয়ে যায়। ওটা উচ্চারণের গতির ডিগ্রি ভেদে হয়, গুণ অর্থাৎ অক্ষর যদিও একই। কাজেই যদিও মাত্রাজ্ঞান আমার না থাকে মার্জনা করবেন, অবশ্যই সম্মার্জনীর ব্যবহারে নয়।

হল্ বিশুদ্ধ। বিরাট শরীর, ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া সামনের দিকে। ঠিক কমেডিয়ানদের মত প্রতি দর্শকদের প্রতি তীক্ষ্ম নজর নেই, হাসির কথায় হাসি "ক্র্যাক" করছে কি না লক্ষ্য নেই, দেখে মনে হয় দার্শনিক কমেডিয়ান। দর্শক হাসবে কি, ভয় পেয়েছে। মনে হচ্ছে, যেন একটা কান্ড হতে যাচ্ছে। গা শিরশির করছে। ক্যারিকেচার বন্ধ করে দিলেই ভালো হয়।

গৌরহরিবাবু এবার একটু স্নিগ্ধভাবে হাসলেন। একটা অচেনা অজানা ষড়যন্ত্রমূলক পৃথিবী থেকে যেন তিনি এখানে সর্বসাধারণের মধ্যে ফিরে এলেন। আগের কথাগুলি বলার সময় তাঁকে ঠিক চেনা যাচ্ছিল না, মনে হয়েছিল তিনি যেন ভূতগ্রস্তের মত কিছু বলছেন, নিজের পরিবেশ ভুলে গেছেন। কিন্তু এবার তিনি হাসলেন, মাঝে মাঝে চোখের মণিটা নাচল।

বাইরে রোদ্দুর গনগন করছে। আকাশের রঙ নীল। কেমন একটু গরম গরম লাগছে। গৌরহরিবাবুর কপালে এরই মধ্যে ঘাম জমেছে।

গৌরহরিবাবু বললেন, আজকাল ক্যারিকেচারের সব নতুন নতুন ধরণ হয়েছে। আগে আমরা শুরু করতুম হরবোলা দিয়ে। এখন শুরু হয় চুটকি দিয়ে। নামটা শুনতে আমার খারাপ লাগে। কিন্তু আধুনিক রীতিটা আমি মেনে নিচ্ছি। প্রথমে দু-একটা চুটকির চাটনি, তারপর বড়ো স্কেচের স্কচ হুইস্কি—

পেছন থেকে কে বললে, এ বোন্-মাউথ-ভালচার হোক—

নতুন পুরোনো খুচরো চুটকি কয়েকটি হল। সবাই এখন হাসছে। সমীরণবাবু ঠোঁট চেপে নাকের পাশে আড় চোখে হাসেন, দাঁত দেখা যায় না। কিন্তু এখন মুক্ত-দশন হলেন। পারা যায় না, কে যেন ঠোঁটের অবগুন্ঠন সবলে সরিয়ে দেয়। বাসরে নববধূ চাইলেও যেমন ধরে রাখতে পারে না।

গৌরহরিবাবু এক গ্লাশ জল খেলেন। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঘাম ঝরছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। তীব্র গ্রীষ্মের হল্কা জ্বলন্ত তীরের মত এসে বিঁধছে গায়। তবু সবাই হাসছে, হাসিতে গরম ভুলে গেছে, কিন্তু গৌরহরিবাবুর কণ্ট হচ্ছে। তিনি হাসছেন না। তাঁর মনে হচ্ছে, ওরা গর্দভ, ওরা গর্দভ, কিছুই যেন ঠিক জমছে না।

ঃ আমি স্কেচটার নাম দিয়েছি "হোয়ার দেয়ার ইজ উইট্ দেয়ার ইজ ওয়ে।" বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়। বুদ্ধির অভাবেই যত আমাদের দুঃখ ভৌতিক, ইহজাগতিক এবং মানসিক। বিপথে এবং বিপদে প্রতিপদে আমরা সমাপন্ন হই। মূর্খদের তাই দুর্গতির শেষ নেই। শাস্ত্রকারেরা তাদের জন্যে লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন। অ্যারিস্টটল এদের স্থান নির্দেশ করেছেন সমাজের বাইরে অরণ্যে অথবা পর্বতের গুহায়, কারণ ওদের অনেকেই কবিতা লিখত। অথচ একটু বুদ্ধি থাকলে যে কত সহজেই প্রকট সমস্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব তা কহতব্য নয়। ধরুন, অমাবস্যার মাঝরাতে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রপুঙ্গব যে কিনা আপনার বুদ্ধি-ভ্রংশের নেট প্রফিট—হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে নাকিসুরে সারগাম সাধা শুরু করল, অ্যাঁ, অ্যাঁ, ওঁয়া, ওঁয়া—। আপনি বললেন, কি হয়েছে মাণিক? উত্তর এল, আমি রোদে বসে পিঠে খাব।

বুঝুন সিচুয়েশন। রাত্তির বেলা, হয়তো অমাবস্যা আজ—কোথায়ই বা রোদ, আর কোথায়ই বা পিঠে! আপনার পাশবিক কারণেই হঠাৎ মনে হবে, ওর পিঠেই খানকতক পিঠে বসিয়ে দেন। মা হয়তো বুঝিয়ে বললেন, খেয়ো বাবা, কাল সকালে রোদ উঠবে, পিঠে গড়ে দেব, খেয়ো। এখন লক্ষ্মী সোনা আমার, ঘুমোও দেখি। লক্ষ্মী সোনা বললে, আমি এক্ষুণি খাব—বলেই সারগাম উঁচুতে চড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গেই আপনার প্রসারিত অধৈর্য হাতটি "তোর ছেলের নিকুচি করেছে"—বলে যা করবার করে বসল। ফলে আপনার বুদ্ধির দোষে সেই নিশুতি মধ্য রাত্রে একটা হৈ-হৈ দাপাদাপি প্রকান্ড লন্ডভন্ড কান্ড, যা প্রায় নারকীয়, ঘটে গেল।

অথচ, আপনার যদি এতটুকুন উইট থাকত আপনি রেহাই পেতেন, নাকি-কান্নার মুখেও হাসি ফোটাতে পারতেন। আপনি বিছানা থেকে উঠে আপনার টেবল-ল্যাম্প অথবা কেরোসিনের কুপির ওপর একটা ঝুড়ি চাপা দিয়ে, এক টুকরো বিস্কুট, রুটি বা ময়দা জলে ভিজিয়ে বলতেন, কাঁদে না, সোনা! ওই যে কেমন রোদ উঠেছে, এই যে কেমন পিঠে দ্যাখো। নাও রোদে বসে পিঠেটুকু খেয়ে শুয়ে পড়ো। বেশি রোদ লাগিও না, জ্বর হবে।

গৌরহরিবাবু না তাকিয়েই বুঝতে পারলেন কেউ হাসছে না, হাসবেও না। সব থ মেরে গেছে। এইবার তিনি কেমন যেন আর এক রাজ্যে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন, পরিবেশ ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছেন, চোখের সামনে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত গাছের উপর শুধু একটু চোখই দেখতে পাচ্ছেন।

ঃ কিন্তু ধরুন, আপনি মাইনে পান সর্বসাকুল্যে তেষট্টি টাকা তের আনা। বেটের আশীর্বাদে এবং আপনার যৌবনের ভ্রান্তিতে কম করে কন্যে পাঁচটি। আপনি প্রাণপণে টাকা জমাতে চাইছেন, টাগ অব ওয়ারের মত টানছেন, কিন্তু সামনে ছুটে যেতে হচ্ছে, জমছে না। তার ওপর তৃতীয় কন্যে একটু বিলাসিনী, বয়স তার সাত। মাসের আটাশ তারিখে মায়ের ছেঁড়া শাড়ি পরে কোলে সেলুলয়েডের কন্যেকে নিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ইচ্ছে জানালেন বাবা, মাংস খাবো। ইচ্ছে পূরণ না হলে হৈ চৈ কান্নাকাটি, অশান্তি। বিলাসিনী তখন উলঙ্গিনী হয়ে মেজেতে কপাল ঠুকবেন, বাবাকে দাঁত কিড়মিড় করে ঘুসি দেখাবেন। অর্থাৎ রবিবারের বিশ্রামটুকু অর্থহীন। বুঝুন সমস্যা। আপনি কি করবেন?

গৌরহরিবাবু থামলেন। অন্যমনস্ক। সকলে উসখুস করছে, কেমন একটা অস্বস্তি। সভাপতি প্রধান অতিথিরা টেবিলের ওপর মাথা নিচু করে বসলেন।

ঃ আপনি কি করবেন? আপনি যাই করুন, অশান্তি বাড়বে। কিন্তু আপনি যদি নিশিকান্ত চক্রবর্তী হতেন তবে সহজেই সমস্যাটির সর্বাঙ্গসুন্দর সমাধান করতে পারতেন। কারণ নিশিকান্তবাবুর উইট আছে, কাজেই ওয়ে-ও খোলা। শুধু বুদ্ধির জোরেই তিনি বেঁচে গেলেন।

প্রথমে লঘু ডোজ দিয়ে বললেন, কাঁদে না, মা। মাংস খেলে অসুখ করে। মাংস কি মানুষে খায়? শকুনে খায়।

ঃ শকুনের অসুখ করে?

ঃ করে মা।

ঃ করুক। আমি খাব—

নিশিকান্তর স্ত্রী বললেন, তোমার হাতে পড়ে জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। কি শেখাচ্ছ? এর চেয়ে দড়ি কলসী দিয়ে বাপ-মা গঙ্গায় কেন দিল না ভাবি। তিন দিন ধরে মেয়েটা একটু মাংস খাবো খাবো করছে, কথাই কানে যায় না বাবুর!

বাবু উত্তরে নিবেদন করলেন, কান কালা হয়ে গেছে। মাসের আটাশ তারিখে মাংস? কেন, আমার মুণ্ডুটা কেটে আলু পেঁয়াজ রসুন আর একটু নুন দিয়ে কাবাব বানিয়ে দাও না? মাংস খাবে!

স্ত্রী বললেন, বাঃ, চমৎকার কথার ছিরি! ছি, ছি। কেন, সবাইর জন্যে না পারো, পারবে না জানি, শুধু মেয়েটার জন্যে পোয়াটাক—। তা-ও যদি না পারো, অত বাপ হওয়ার শখ কেন?

নিশিকান্তবাবু গুম্ হয়ে গেলেন। হঠাৎ বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে হাসি মুখে বললেন, চলরে, টুনি, বাজারে যাই। মাংস নিয়ে আসি।

টুনির নাকিকান্না আগেই থেমে গেছে। বাবা মার কথা কাটাকাটিতে সে আগেই বুঝেছে একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। হাজার হলেও মেয়েমানুষ তো, ঠিক টের পায়। চোখের জল মুছে টুনি বললে, তুমি নিয়ে এসো। আমি যাবো না। ভালো মাংস এনো কিন্তু।

দাঁতে দাঁত চেপে নিশিকান্ত বললে, কেন? তুমি যাবে না কেন, মা-মণি? একটা ল্যাবেঞ্চুসও খাবে না?

সন্দিগ্ধ বাপকে একটুক্ষণ দেখে জুতো পরে টুনি বললে, আচ্ছা, চলো তবে।

স্ত্রী বললেন, ওঃ! সোহাগ আর ধরে না দেখি? মেয়েটা এত মাংস খেতে

ভালোবাসে মাঝেসাজে দিলেই হয় এনে! দু-পয়সার তেঁতুল এক্কা মনে করে।

গৌরহরিবাবু আবার থামলেন। একটা স্বপ্নরাজ্য থেকে নেমে আসছেন। সবাই চুপ। অনেকেই বহুবার শুনেছে, কিন্তু এবার যেন আরও গভীর, অতল, অনন্ত ব্যঞ্জনা রয়েছে। গৌরহরিবাবুর বলার কায়দাও আছে। এতক্ষণ পুরুষ, নারী, শিশু কণ্ঠের অনুকরণ মাত্র হল, কিন্তু বাকিটা পুরোদস্তুর অভিনয় আর মুখ-ভঙ্গি। গৌরহরিবাবু আর গৌরহরিবাবু থাকেন না, তিনি তখন অনেক দূরের মানুষ। সমস্ত দৃশ্যটা তখন তাঁর মনের চোখে ভাসছে। তিনি আবার শুরু করলেন কোনদিকে লক্ষ্য না করে, আত্মমগ্ন শিল্পীর মত।

ঃ বাজারের গায়েই কসাইয়ের দোকান। নিশিকান্তবাবু বড় রাস্তা দিয়ে সোজাপথে না গিয়ে গলিঘুঁজি দিয়ে ঘুরে মেয়েকে নিয়ে হঠাৎ একেবারে দোকানের সামনে হাজির। রবিবারের সকাল। আংটায় দশ বারোটা তাজা ছাল-ছাড়ানো খাসি ঝুলছে সারি সারি। সদ্য কাটা একটা খাসির বুকে পা চেপে ছাল ছাড়াচ্ছে একজন। মচ মচ ছাল ছাড়ানোর শব্দ হচ্ছে। হাতে ছুরি। টস্ টস্ করে কাটা গর্দান দিয়ে রক্ত পড়ছে নিচে বাঁধানো শানের ওপর, একটা কুকুর চেটে চেটে খাচ্ছে। ঝোলানো খাসি-গুলোর গা এখনো তির তির করে কেঁপে উঠছে, ঘুমন্ত শিশুর গাল যেমন মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে।

এই বীভৎসতার মধ্যে হঠাৎ মেয়েকে অতর্কিতে ঠেলে দিয়ে চাপা হুংকার দিয়ে উঠলেন, মাংস খাবি, খাবি, খাবি?

আতঙ্কে চিৎকার করে বাপের দুই উরুর মধ্যে সজোরে মুখ চেপে বাপকে আঁকড়ে ধরে টুনি শিউরে কেঁদে উঠল, খাবো না বাবা, খাবো না বাবা, আমি আর মাংস খাবো না, কক্ষণো খাবো না—

মেয়ে কাটা খাসির মত থর থর করে কাঁপছে, ফুলে ফুলে কাঁদছে, আর নিশিকান্তবাবু—

প্রিয়নাথবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। কারুর লক্ষ্যই নেই। যে দু একজনের চোখে পড়ল, ভাবল, বাথরুমে যাচ্ছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন, হাতের পিঠ চোখে ঘসলেন। ভাবলেন, আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। এত-দিনে প্রায়শ্চিত্ত হল। ওরা কৌতুক করতে চেয়ে অজ্ঞাতেই আমার ঋণশোধ করিয়ে দিল। আই অ্যাম জাস্টলি পেড ফর মাই সিন।

তাপস পান নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছিল। করিডোরে দেখা। বললে, একি, খাওয়া দাওয়া শেষ? পান সাজতে কী যে দেরি করল লোকটা—

প্রিয়নাথবাবু বললেন, না, ক্যারি-কেচার চলছে।

ঃ আপনি?

ঃ বাড়ি। মাংস তো আমি খাই না। টুনি মাংস ছেড়ে দেওয়ার পর আমিও আর খাই না।

দিনেও আমার প্রায়শ্চিত্ত বাকি ছিল। মনেও হয়নি। হলে হয় তো গৌরকে—

প্রিয়নাথবাবুর কণ্ঠস্বর কোন দূরে জগতের ঃ কিন্তু পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত তো চাই। আমি চোখের জল ফেলতুম আর বলতুম, মা, তোকে মাংস আমি ধরাবই। হেসে গৌরী বলত, ফের? না বাবা, আর না। বিয়ের পর জোর করে-ছিলুম একদিন। তারই মাস খানেক পর, বিয়ের তিন মাস যেতে না যেতে, মা আমার সাদা থান পরে বাপের ঘরে ফিরে এল। ওর মুখের দিকে তাকালেই মনে

...টুনি মাংস ছেড়ে দেওয়ার পর আমিও আর খাই না।

তাপস কিছুই বুঝল না। বললে, টুনি? টুনি কে?

ঃ আমার সেজ মেয়ে গৌরী। যে ছোটবেলায় মাংস খেতে চেয়েছিল, আর আমি পাষণ্ড—

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রিয়নাথবাবু। কেমন বিবর্ণ, ক্লান্ত, অন্যমনস্ক এক অন্য জগতের মানুষ মনে হচ্ছে। বললেন, তোমরা জানবেই বা কি করে? আমার সেই পাপের কথা কাউকেই তো আমি বলিনি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি ইচ্ছে করে করিনি। আমার কোন পথ ছিল না। একদিন যন্ত্রণা চাপতে না পেরে গৌরকে গল্পটা বলেছিলুম ঠাট্টার ছলে, অন্য লোকের কীর্তি হিসেবে। বলে শান্তি পেতে চেয়েছিলুম, মনকে হাল্কা করতে চেয়েছিলুম। সেই নিয়ে গৌর বানালে তার ক্যারিকেচার। তোমরা শুনে হেসে ফেটে পড়তে, আর আমি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ভাবতুম, এই ঠিক, এই ঠিক, এই ঠিক। এই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। ভাবিনি, আজ এই শেষ

হত, ও যেন নীরবে বলছে, এবার? এবার তো আর জোর খাটাতে পারবে না। উঃ!

বিকেলের রোদ ক্লান্ত হয়ে অফিসের করিডোরে শুয়ে পড়েছে। দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছে পাখিরা ফিরছে। প্রিয়নাথবাবুর চোখে এক বিন্দু জল ছড়ে যাওয়া চামড়ার উপর রক্তবিন্দুর মত ক্রমশঃ ফুটে উঠল।

ঃ খাই না খাই, অন্যে দুই মেয়ের বিয়ে হোক না হোক, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় গৌরীর আমি আবার বিয়ে দেব। আমি মাংস খাব, ও-ও খাবে। নিশ্চয়ই খাবে, এত ভালোবাসত ও। আমি হারবো না, কিছুতেই হারবো না। ইন মাই ডিকশনারি দেয়ার মাস্ট নেভার বি এ ওয়ার্ড অ্যাজ ডিফিট—

উনি হাঁটতে চেষ্টা করলেন, পা টলল, পড়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকালেন মাটির দিকে, তারপর যা ঘটছে বিশ্বাস করার আগেই তাঁর চোখের পাতা ধীরে ধীরে বুজে এল।

ঠিক সেই সময় ওপরে ক্যারিকেচার শেষ হল। কৃষ্ণচূড়া গাছে পাখিদের আনন্দমুখরিত কলরব শোনা যাচ্ছে। পৃথিবী বিলাসিনী মেয়ের মত নেচে চলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্র সম্পাদনায় বাঙালী মহিলা

শিবানী চট্টোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের যে যুগপ্রবাহ চলেছে, তা হল সাহিত্য-প্রবাহ। রবীন্দ্রোত্তর বাংলাদেশের বাস্তব জগতে যত হানাহানিই চলুক আর যত দুর্দশা-দুর্দিনই আসুক না কেন, সাংস্কৃতিক গগন কিন্তু সেই পরিমাণেই আজও উজ্জ্বল। কেননা এ যুগ সাহিত্য তথা সাংবাদিকতার যুগ। যত দুঃসময়ের ঝড় বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাক না কেন, আজও সাহিত্য-পত্রিকা ও সাময়িকীর অভাব ঘটেনি সেখানে। আর এ ব্যাপারে মেয়েদের প্রচেষ্টাও স্বীকৃতির দাবী রাখে সমভাবেই। সাময়িকী সম্পাদনে তাঁদের যোগ্যতা ও আয়াস অপরিসীম—, অবশ্য খুব অল্প দিনের মধ্যে তাঁরা এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

সাময়িকী সম্পাদনায় তাঁরা হাত দিয়েছেন গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই। এ বিষয়ে মেয়েদের ক্রমবর্ধমান দক্ষতা এবং এই সুযোগে উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মোটামুটি একটা ধারাবাহিক উল্লেখের মধ্য দিয়ে সেই হারিয়ে-যাওয়া নামগুলি একবার স্মৃতির আলোকে মেলে ধরবো।

সে ত সেদিনের কথা যেদিন থেকে মেয়েরা প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করলেন, তার আগে ত সেটা চিন্তা করাও এক প্রকার নীতিবিগর্হিত কাজ বলে গণ্য হত। বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার লাভ করলো বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে, অর্থাৎ ৭ই মে ১৮৪৯ সালের পরে। বেথুন বিদ্যালয়ের নাম ছিল তখন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়। এর আগে অবশ্য দু-একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু সেখানে শিক্ষাপ্রচার অপেক্ষা ধর্মপ্রচারই বেশী হত। তখন থেকেই মহিলাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং তাঁদের নিজেদের লিখিত রচনাবলী প্রকাশের জন্যও মহিলা-পাঠ্য পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে থাকে। তাঁদের জীবনে এই নতুন দিগ্‌দর্শন করাতে অবশ্য তদানিন্তন মনীষীরাই এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা চেয়েছিলেন যে শিক্ষার মত এদিকেও মেয়েরা অগ্রণী হোন, স্বাবলম্বিনী হোন নিজেদের চিন্তার প্রকাশে।

এই সব কারণেই ১৮৫৪ সালের আগস্ট মাসে 'মাসিক পত্রিকা' হল; সম্পাদনা করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার মশাই। ১৮৬৩ সালের আগস্ট মাসে মজিলপুর-নিবাসী উমেশ দত্ত মশাই 'বামাবোধিনী' প্রকাশ করলেন। এরপর পরপর এস সি ঘোষ সম্পাদিত 'জ্যোতিরিঙ্গণ', দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অবলাবান্ধব', বঙ্গমহিলা (এপ্রিল—১৮৭৫), হেমলতা (অক্টোবর—১৮৭৩) এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মশাই ১৮৭৮ সালের মে মাসে 'পরিচারিকার' আত্মপ্রকাশ করালেন মেয়েদের মুখপত্র হিসাবে।

ক্রমশঃ যত শিক্ষার প্রসার হতে লাগলো, ততই মহিলা সম্প্রদায় নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন। সাময়িক পত্রগুলিও ক্রমশঃ মেয়েদের হাতে চলে এল, সম্পাদনার ভারও তাঁরাই গ্রহণ করলেন। এর পরবর্তী ইতিহাস সাময়িকী-সম্পাদনায় মেয়েদের সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার, তাঁদের অগ্রগতির ইতিবৃত্ত।

মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা হল— অনাথিনী, সম্পাদিকা থাকমণি দেবী। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, ১২৮২। থাকমণি দেবী সম্পর্কে যত দূর জানা গেছে, তাতে এইটুকুই বোঝা গেছে যে তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ধুলিয়ানের তদানীন্তন সাব-রেজিস্ট্রার অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা 'বঙ্গ মহিলা', ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল—১৮৭০) খিদিরপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদিকা ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদরা এবং বৌবাজারের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিত্র শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদায়িণী দেবী। সম্পাদিকার সাহিত্যিক খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। স্বয়ং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এখানে একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা না উল্লেখ করলে বোধ-হয় অন্যায় করা হবে,—তা হল তাঁর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবিতায় যোগ্য প্রত্যুত্তর দান। কবির 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতাটি বোধহয় অনেকেই পড়েছেন। তার মর্মভেদী বাক্যবাণে একালের অনেক বাঙ্গালিনীও জর্জর হয়ে পড়েন, কিন্তু তাঁরা একথা জেনে নিশ্চয় খুশী হবেন যে সমুচিত জবাব দিতে তখনকার মেয়েরাও পশ্চাৎপদ হননি। মোক্ষদায়িণী দেবী তার উত্তর দিয়েছিলেন 'বাঙ্গালীর বাবু' নামে এক কবিতা লিখে। তার কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি—এই কবিতার মর্মবাণী আজও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে হয়ত প্রস্ফুট হয়ে আছে।

> 'হায়, হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর বাবু
> দশটা হতে চারটাবধি দাসাবৃত্তি করা
> সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।
> উকীল, ডেপুটি কেহ, কেহ বা মাস্টার,
> সাবজজ কেরানী কেহ, ওভারসিয়ার
> বড় কর্ম, বড় মান, অহংকার কত
> ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
> সারাদিন খেটে খেটে রক্ত ওঠে মুখে
> পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।'

দ্বিতীয় মহিলা সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারী—১৮৭৮), সম্পাদনায় নাম ছিল হিন্দুললনা—বঙ্গমহিলা কর্তৃক সম্পাদিত, অর্থাৎ সম্পাদিকা আত্ম-প্রকাশ করেননি। এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন এডুকেশন গেজেট (১৮ই ফাল্গুন) লিখে-ছিলেন,—'হিন্দুললনা এতনাম্নী এক-খানি পত্রিকার ১ম কাণ্ড, ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা এবং কোন হিন্দুললনা কর্তৃক সম্পাদিত।......বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহাকে সম্যকরূপে অবগত থাকিলেও পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করি না।' সম্পাদিকা আত্মপ্রচার অথবা যশোপ্রার্থিনী যে কোন কারণের জন্যই না হওয়ায় আজ আর তাঁর নাম আমরা জানতে পারলাম না।

এরপর যে পত্রিকার নাম আসে, সে পত্রিকার নাম ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। যদিও পত্রিকাটির সম্পাদনায় ছিলেন পুরুষ, তবু সে চক্রের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। পত্রিকাটি দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী'। এই পত্রিকার সঙ্গে মহর্ষি পরিবারের প্রায় সবাই জড়িত ছিলেন। বাংলা সাহিত্য ভারতী পত্রিকাটির কাছে বহু ঋণী; কেন না এই পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলার সাহিত্যিক সন্তানেরা সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৯০ সাল পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন, ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিদুষী পত্নী কাদম্বরী দেবীর অকাল মৃত্যুতে 'ভারতীর' পরিচালকবৃন্দ পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়াই মনস্থ করেন। এর পর ১২৯১—১৩৩৩ সাল পর্যন্ত উক্ত পত্রিকাখানি যথাক্রমে স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর কন্যাদ্বয় হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীই পরিচালনা করেন। তা ছাড়াও যখন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ,

ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপর এর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তখনও মহর্ষি পরিবারের মেয়েদের বহু সুলিখিত রচনা পত্রিকাটিকে সুশোভিত করে তুলত।

'পরিচারিকা' বলে যে পত্রিকাখানি ১২৮৫ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠে প্রকাশ লাভ করেছিল, তার পরিচালনভার ক্রমশঃ আর নারী সমাজের উপর পড়ে। আর্যনারী সমাজের তরফ থেকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী পত্রিকাখানির সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। মোহিনী দেবীর মৃত্যুর পর ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী, তারপর তাঁর চতুর্থ সহোদরা মণিকা দেবীও কিছুকাল পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। পরে ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এর ভার নেন কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী।

১২৮৭ সালের মাঘ মাসে খৃষ্টীয় মহিলা বলে আর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মাত্র দু পয়সা দামে প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বঙ্গকামিনী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালের শেষে টালা অঞ্চল থেকে। প্রতি মঙ্গলবার এটি প্রকাশিত হত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩) বঙ্গবাসিনীর নিম্নোক্তরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল—

'এই সকল বঙ্গমহিলাগণ কর্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আশ্বিন (কার্তিক?) মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাল ভাল সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সার-ভাগ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করা হইবে।' সেকালে এই পত্রিকাখানি ভালভাবে সম্পাদিত হয়েছিল বলে পরবর্তী এডুকেশান গেজেট মন্তব্য করেন।

বৈশাখ ১২৯১-এ (এপ্রিল—১৮৯৪) প্রকাশিত হয় 'সোহাগিনী' মাসিক পত্রিকা,— সম্পাদিকা ছিলেন কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে। ১২৯২ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় বালক মাসিক পত্রিকা। বালক এক বৎসর সগৌরবে পথ চলার পর ভারতীর প্রশস্ত পথে মিলিত হয়।

১২৯৫ সালের কার্তিকে 'বিরহিনী' —সম্পাদিকা সুশীলাবালা দেবী। ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে হেমেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'পুণ্য' নামে একটি মাসিক প্রকাশিত হয়। 'পুণ্যে'র প্রথম সংখ্যায় লেখা ছিল :—

'এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের ও মানব মাত্রেরই সর্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে।' সম্ভবতঃ মেয়েদের রান্নার বিষয়ে আলোচনা এই পত্রিকায়ই সর্বপ্রথম করা হয়। তবে একটা ভুল হল— এর আগে ১৩০২ সালে আর একটি সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির নাম 'মুকুল'—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত নীতি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই ঐ বছর আষাঢ় মাসে সম্পাদনা আরম্ভ করেছিলেন, ষষ্ঠ বর্ষ থেকে হাত দেন তাঁর কন্যা হেমলতা দেবী।

২৪ বছর পত্রিকাটি চলেছিল— শেষের দিকে সম্পাদিকা হিসাবে নাম দেখা যায় লাবণ্যপ্রভা সরকারের। ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসে নতুন করে আবার পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, সম্পাদনায় ছিলেন শকুন্তলা দেবী। তৃতীয় বর্ষ থেকে বাসন্তী দেবী সম্পাদনা করেন এবং তিনিই ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি পরিচালনা করেছিলেন। পত্রিকাটি ছেলেদের কাগজ ছিল। সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মশাইও এতে লিখেছেন।

১৩০৪ সালেই (মাঘ) প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক 'অন্তঃপুর'। অন্তঃপুরের প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন সেবাব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবী। তাঁর মৃত্যুর পর হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্র এবং সুখতারা দত্ত পত্রিকাটির পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে বিরাজমোহিনী রায় সম্ভবতঃ নবপর্যায়ের অন্তঃপুর প্রকাশ করেন।

'জাহ্নবী' পত্রিকাটি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মশাই ১৩১১ সালের আষাঢ়ে প্রকাশ করেন, আর ১৩১৪ সালের বৈশাখ থেকে অশ্রুকণা রচয়িত্রী কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটির আয়ু ছিল মাত্র তিন বছর ১৩১৪-১৩১৬ সাল।

এর পরে ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিণী সরযূবালা দত্ত 'ভারতমহিলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম কয়েক বছর ভালভাবে চলবার পর ১৩ বছর বাদে এটি বন্ধ হয়। সম্পাদিকা আজও জীবিতা।

১৩১৪ সালের শ্রাবণের প্রথম দিকে একদিন 'সুপ্রভাত' হয়েছিল—কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (পরে বসু) সম্পাদিকা ছিলেন। সুপ্রভাতের পাতায় লেখা থাকতো—

'সত্য সেবা ব্রতে সিদ্ধিলাভ কর
নবশক্তি হৃদে ফুটিবে
একতা মন্ত্রের মঙ্গল ডোরে
তন্দ্রা অলসতা ছুটিবে।'

১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে শান্তিময়ী সেনের পরিচালনায় 'গৃহলক্ষ্মী' নামে আরও একটি মাসিক প্রকাশিত হয়েছিল। আর নাম না উল্লেখ করলে ত্রুটি থেকে যাবে—১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও পরে তাঁর ছেলে প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন; কিন্তু তাঁরও মৃত্যু হলে ১৩২৭-১৩৩২ (আশ্বিন-কার্তিক) পর্যন্ত তদীয় পত্নী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী পত্রিকাটির দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত মহিলাসমাজের অন্ধকার পথ আলোক-ময় করে তুলতে, তাঁদের অভাব-অভিযোগ, শিক্ষাসমস্যা ও অধিকারের কথা বলার জন্য এই পত্রিকাগুলিই তখন মুখপত্রের কাজ করেছিল। যদিও এর পিছনে ছিল পুরুষের অদৃশ্য কল্যাণ হস্ত, এবং অনেকটা সেই আদর্শেই এটি পরিচালিত হয়েছিল, তবু মেয়েদের কর্মের পথ এই পত্রিকাগুলি দ্বারাই নির্দেশিত এবং পরবর্তী যুগের পত্রিকা-গুলির ভিত্তি এখানেই স্থাপিত হয়েছিল যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পরের পত্র-পত্রিকাগুলির প্রকাশের ইতিহাস বস্তুতঃ বিংশশতাব্দীর ইতিবৃত্ত। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম থেকে আজ অবধি মহিলা পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত-গতিতে বেড়ে চলেছে। সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আর এক প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে। মোটামুটি এইটুকুই বলা যায় যে, বিংশশতাব্দীর প্রথম থেকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাসমূহ অজস্র ধারায় সাহিত্য-সমুদ্রে মিশেছে। জানি না আরও কত সংখ্যাহীন বলিষ্ঠ সাহিত্য-ধারা সাহিত্য-সঙ্গমে অবগাহন করতে এগিয়ে আসছে! কিন্তু যে দৃঢ় পদ-ক্ষেপের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সূচিত হয়েছিল, আজ বিংশশতাব্দীর উত্তরার্ধে পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আজ মেয়েদের সামনে শুধু শিক্ষাই নয়, জীবনের বিভিন্ন নতুনতর ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে, জ্ঞানের, সেবার, ধর্মের ও শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। মৈত্রীর স্বর্ণরাখী হাতে ভাবধারার বিনিময় চলেছে বিশ্বের সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহলে। তাই, আজ দেশবাসী আশা করেন যে, সাময়িকী সম্পাদনার মধ্য দিয়ে মহিলারা সাংবাদিকতার যে প্রথম পর্যায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণা হয়েছেন, এবার তাতে যৌবনের পরিপূর্ণতা লাভ করবেন তাঁরা সংবাদপত্র পরিচালনার মাধ্যমে।

[উপন্যাস]

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

॥ একত্রিশ ॥

বিশাখা যে গেল, নিশ্চয় একটা সুবিধে পেয়ে এ-পরিবেশ থেকে আপাততঃ পালিয়ে বাঁচবার জন্যই; তবে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল আবছা গোছের। সেটা অবশ্য রজতের জানবার কথা নয়, তবে পালিয়ে বাঁচবার জন্য যে গেল সেটুকু বুঝতে বাকী রইল না ওর।

বাড়ির সঙ্গে ওদের সম্বন্ধটা যে বেদনাময় একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রজত বুঝল কেন বিশাখা এই বেদনার আশ্রয় চাইছে, তাই দু একটা ঠাট্টা করল, কিন্তু বাধা দিল না কোনরকম। অবস্থা-গতিকে হতেই চলেছে বিবাহটা, হবেও। এ বিবাহের যে একটা বিষাদময় দিক আছে, স্বাতিকে নিয়ে, সেটাকে দৃষ্টির বাইরে রাখতে চায় তো কিছু বলা যায় না নিশ্চয়। পরে এও ভেবে দেখল, বিবাহ হলে কলকাতায় গিয়েই দিতে হবে। বিশাখা যদি সে সময় পর্যন্তই ওখানে থেকে যায়, সেটা হবে আরও ভালো এই পরিস্থিতির মধ্যে।

বিশাখার মন কিন্তু একটা অন্য রাস্তা ধরে চলেছে। একটা আবছা গোছের উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু করল, তারপর যতই এগিয়ে যাচ্ছে, দৃষ্টি হচ্ছে স্বচ্ছ, পদক্ষেপ হচ্ছে দৃঢ়তর। ......রজত ভাবছে, ভালো হোক, মন্দ হোক, এ বিবাহ হতেই চলেছে--নিতান্ত অবস্থা-গতিকেই; বিশাখা জানে এ বিবাহ হবে না। স্বাতি মাঝে রয়েছে--যেমন এও একটা বড় কথা যার জন্যে এ বিবাহ অসম্ভব, তেমনি আরও একটা বড় কথা আছে যার মূল্য পুলে-কলোনীতে স্বাতি ভিন্ন আর কেউ বুঝবে না। স্বাতি গেল, সে ছাড়া আর একটিমাত্র লোক যে বুঝবে, তার কাছে ছুটে এসেছে বিশাখা। বাড়ি আসার ছুতো করে, বিয়ের আগেই শ্বশুরবাড়ি ছুটে আসবার লজ্জাটা ঘাড়ে করে।

ওরা সন্ধ্যার একটু আগে পেঁছাল। বাড়ি পাচকঠাকুর আর চাকরের হেফাজতে। পাশেই এক প্রফেসর বাড়ি ভাড়া করে আছেন। বহুদিনের প্রতি-বেশী, তারপর তাঁর একটি মেয়ে স্কুলের নীচু ক্লাস থেকেই ঊষার সহপাঠিনী হওয়ায় দুটি পরিবারে খুব অন্তরঙ্গতা। মায়ের অনুপস্থিতিতে ঊষা মাত্র সকালে এসে খানিকটা থাকে বাড়িতে, তারপর কলেজ, তারপর থেকে সমস্ত সময়টুকুই ওখানে থাকে, রাত্রিকাল পর্যন্ত। এঁরা এলে ও-ও এসে উপস্থিত হোল।

বিশাখাকে দেখে বিস্ময়-পুলকে বলে উঠল—"তুমি......!"

মানদা দেবী বললেন—"আমাদের বিশাখা তো। ভুলে গেলি এর মধ্যে? অবিশ্যি হোলোও সে অনেকদিন।"

"ভুলব মানে! জিজ্ঞেস করছি, হঠাৎ এত দয়া? আমি তো এক বছর ধরে এসো এসো ক'রে হয়রান হয়ে গেলাম।"

"ডাকলেই আসতে পারে কেউ?... নাও, ঠাকুর একটু শীগ্‌গীর চা-জল-খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলো......এসো মা, আগে মুখ হাত ধুয়ে গাড়ির কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলো......"

এগিয়ে গেছেন উনি। বিশাখা একটু গলা নামিয়ে বলল—"এক বছর ধরে তপস্যার ফলও পেয়ে গেছ তো।"

"মানে!"

"শুনবেখন, ওঁর কাছেই..."

"বিশাখা—মা!" —আবার একটা হাঁক দিলেন মানদা দেবী; একটু ওদিক থেকে। "এই যে জ্যাঠাইমা!" —বলে উত্তরটা দিয়ে বিশাখা বলল—"এবার আদরের ঘটা দেখেও কিছু বুঝতে পারছ না?"

"তার মানে!"

—ওর কথার একটা মুদ্রাদোষই আরও ওদিক থেকে হাঁক দিলেন এবার। মানে খুঁজে খুঁজেই..."

"কৈগো মা, বিশাখা—আগে......"

আরও ওদিক থেকে হাঁক দিলেন এবার।

বিশাখা বলল—"আগে ঊষাকে ডেকে নিন জ্যাঠাইমা, এতকথার মানে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করছে......"

"ওর ওই এক রোগ।" একটু হাসির সঙ্গে কথা কটা ভেসে এল ওদিক থেকে। ঊষা—"হ্যাঁ মা!" —বলে ওঁর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, বিশাখা—"এই!" —বলে একটা চাপা ডাক দিয়ে নিজের ঠোঁটের ওপর বারণের ভঙ্গিতে আঙ্গুল চেপে ধরল। মানদা দেবী বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন—

"কোথায় সাবান তোয়ালে দেবে, মুখ হাত ধুয়ে নেবে বিশাখা, না ফষ্টিনষ্টি আরম্ভ করল! ...ঠাকুর, এসো ভাঁড়ার ঘরের দিকে।"

"বেশ বাবা, দুজনেরই যখন এত পায়াভারি, এই চুপ করলাম।" —কপট রাগের সঙ্গে মৌনাবলম্বন করেই বাথরুম পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করে দিল ঊষা। বিশাখাও চুপ করেই রইল, মুখ টিপে হাসির মধ্যে কপট অভিনয়ের ভাবটা যা বজায় রইল।

এরপর হঠাৎ ওপর থেকে ঊষার সুতীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"ওমা, তাই নাকি!!" মুখে সাবান মাখছিল বিশাখা, হাত থামিয়ে একটু হেসে কান পেতে রইল। খবরটা আদায় করে নিয়েছে ঊষা মায়ের কাছ থেকে। তবে যেমন ঐটুকুর পরই হঠাৎ থেমে গেল, বুঝল—ও লজ্জিত হয়ে পড়বে বলে ও-প্রসঙ্গটা তুলতে আপাততঃ যেন বারণ করেই দিলেন মানদা দেবী। বিশাখা বাথরুম থেকে যখন বেরুল, একটু আড়াল হয়ে যেন প্রতীক্ষা করেই দাঁড়িয়ে ছিল ঊষা, ওকে দেখে আড়চোখে চেয়ে একগাল হাসল। বিশাখা হাসল একটু চোখ রাঙিয়েই। মাও এসে গেছেন নীচে, ঐটুকুতেই যা একটু মন জানাজানি হয়ে রইল আপাততঃ।

চায়ের টেবিলে কথা রইল সংক্ষিপ্ত। যেটুকু হোল তাও মানদা দেবী আর বিশাখার মধ্যে প্রধানতঃ আবদ্ধ রইল—বিশাখার বাবাকে আজ ফোন করলেন না—করলেই গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন—এলই যখন, থাক্ না দুটো দিন, তাড়া কিসের এত? দুটো দিনকে একটা দিন করবার চেষ্টা করল বিশাখা।...... চায়ে আর একটু চিনি দেবে?......আর একটা সন্দেশ নিক বিশাখা......

ঊষা হঠাৎ বলে উঠল—"আমি এমন করে মুখ বুজে ব'সে থাকতে পারব না কিন্তু!"

এমনভাবে জ্বালাতন হয়ে খানিকটা গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল যে, বিশাখার সঙ্গে মানদা দেবীও ফুকরে হেসে উঠলেন। বললেন—"দ্যাখো কাণ্ড! তা ক'না কথা কত কইবি, মানা করছে কে?"

"তা'বলে ঐ নিয়ে? ......টেলিফোন ...সন্দেশ খাও...?"

আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল দুজনের হাসি। বিশাখা বলল—"নিজে তো মুখ ফুটে বলতে পারলে না; জ্যাঠাইমা খেতে বলছেন, তাও পছন্দ নয়। ওদিকে—'এক বছর থেকে ভেবে হয়রান হচ্ছি!'...... বলুন জ্যাঠাইমা? ...বেশতো, জ্যাঠাইমা দু'দিন ছিলেন না—কেমন পড়াশোনা করলে হিসেব দাও।"

"তার মানে? তোমার কাছে হিসেব দিতে হবে?"

উঠে পড়েছেন মানদা দেবী। বিশাখা একটু গলা বাড়িয়ে ফিস ফিস করে বলল—"কেন, গুরুজন হলুম তো।"

"ইস্, ভারি আমার।......"

—আর সম্ভব নয় রাশ টেনে রাখা, দরকারও নেই। মানদা দেবী ওদিকে এগিয়ে যেতে যেতেই বললেন—"তা কর না কত গল্প করবি বাপু—না হয় ছাতেই চলে যা না—খোলা হাওয়ায়—তখন বারণ করেছি, আমার সঙ্গেই কোথায় একটু জিরিয়ে নেবে, না—"

"মানে—মানে করে জ্বালাতন করবি—কি বলুন জ্যাঠাইমা?"

"মা, দ্যাখো আবার! ......ইস্! ওই মুখে আবার সন্দেশ গুঁজে গুঁজে দিতে হবে ওঁকে?"

"তাহলে যাবে ওপরে?" প্রশ্ন করল বিশাখা। বলল—"তাই চলো বরং, বড্ড গুমোটও নীচেটা।"

ঊষা উঠে পড়েই বলল—"ওমা যাব না? 'মানে' জিজ্ঞেস করবার ছাড়পত্র পেয়েছি। তাহলে একটু বোস' ভাই, একেবারে গা'টা ধুয়েই আসি। তুমি ততক্ষণ কি করবে? না হয় আর এক কাপ চা দিয়েই যাক না।"

"না, আর চা নয়।" উঠেই পড়ল বিশাখা। বলল—"আমি ততক্ষণ ওপরেই চলে যাচ্ছি বরং।"

"তাই যাও তাহলে। আমি পাশের বাড়ি থেকে দোষাকে ডেকে নিয়ে আছি।"

"না, না, আর কাউকে নয়!" সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল বিশাখা। ঊষা বলল—"কেন! বেশ ভালো মেয়ে তো। ওর নাম বিদিশা—তাই থেকে দিশা—আমি শুধু ডাকি দোষা বলে।!"

ও ঐরকম খাপছাড়া। এমনভাবে ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীরভাবে বলে গেল, বিশাখা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল—"কী জ্বালা বলো তো! মন্দ হতে যাবে কেন? করব আলাপ এর পরে। আমি যাই, এসো শীগগীর। একলাই। একজন ভালোকেই আগে সামলাই।"

—বেশ ছিল, ওপরে গিয়ে দোতলার ছাতে পায়চারি করতে করতে মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠল। একটা দমকা হাওয়ার মতো স্বাতিদের বাড়ির সঙ্গে পুল-কলোনীটা এসে পড়েছে সামনে। ...ক'দিন আগে, প্রায় এই সময়ের কথা। তখনও বিয়ের এই নূতন কথাটা ওঠেনি, অন্তত বিশাখা জানত না। প্রশান্ত হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিয়েছে, এইতেই একটা বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে স্বাতিদের বাড়িতে। ওরা দুজনে বাগানে বসে ছিল। জীপ আসতে বিলম্ব হচ্ছে—সেই কথাটাই টেনে টেনে বাড়িয়ে চলছিল। হঠাৎ বিশাখার কি খেয়াল হোল—দুর্বুদ্ধিই বলতে হয়,—ভেতরে গিয়ে ব্যাঞ্জোটা নিয়ে এসে একেবারে স্বাতির কোলে তুলে দিল, বলল—"ভালোই হোল স্বাতিদি, যখন আসবার আসবে জীপ, ততক্ষণ তুমি একটু বাজাও। জং ধরে গেছে ঘাটগুলোয়।"

হঠাৎ এনে বসিয়ে দেওয়ায় কোনও কথা খুঁজে পেল না স্বাতি—মুখটাও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—শেষে ওর কথার মধ্যেই যেন একটা অবলম্বন পেয়ে, ব্যাঞ্জোটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—"তা-ই হয়েছে......দেখছি। ঠিক ক'রে নিলে..."

এই সময় জীপের হর্ণ বেজে উঠল বাইরে, স্বাতি প্রায় উল্লসিত হয়েই বলে উঠল—"ঐ নাও, এসে গেল তোমার জীপ!"

ঐ কটা কথাই বোধ হয় ওদের জীবনে শেষ কথা হয়ে রইল,—ভাবছে বিশাখা—স্বাতির ঐ চিত্রটিই বোধ হয় শেষ চিত্র—ব্যাঞ্জো কোলে, মুখে সেই বিব্রত, কী-যে-করবে ভাব। ...আশ্চর্য! প্রশান্তদা নাকি নিজেই বলেছে বিশাখাকে বিয়ে করবার কথা! হয় কি ক'রে এটা! প্রশান্তদা-স্বাতি, দুজনকে আলাদা ক'রে ভাবতে যেন হয়রান হয়ে যায় বিশাখা। অথচ হবেই তো। নিরুপায় স্বাতিদির মুখখানা মনে পড়ছে। কি ক'রে মনে হচ্ছে নীরব ব্যাঞ্জোটা কোলে করে এখনও যেন শূন্য দৃষ্টি সামনে ফেলে বসে আছে। চোখ দুটো ভিজে আসছে বিশাখার।

॥ বত্রিশ ॥

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে ঊষা, মাঝ পথ থেকে গলার আওয়াজ শোনা

যাচ্ছে—"দ্যাখো আমার আন্দাজ ঠিক কিনা!"

তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে নিল বিশাখা, গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—"ইস্! মোটেই না।"

"তার মানে!" —ভ্রূ কুঁচকে কাছে এসে উষা বিস্মিত হয়ে বলে উঠল—"ওকি, তুমি নাকি কাঁদছিলে বিশাখা!"

"যাঃ, কই? যাঃ"—বলতে বলতেই বিশাখা উলটে ওরই ঘাড়ে মুখটা লুকিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে উষা। খানিকক্ষণ তো কিছুই বেরুল না মুখ দিয়ে, তারপর মাথায় ডান হাতটা টেনে দিতে দিতে আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলে চলল—"চুপ করো—ভাই—চুপ করো—কিছু যদি ভুল হয়ে গিয়ে থাকে, মাফ করো—হঠাৎ কি হোল?......"

কেঁদেই চলল বিশাখা; শুধু আজকের আর কালকের কান্নাই তো নয়, কতদিন থেকে জমে আসছে। অনেকক্ষণ পরে মাথাটা তুলে বাইরের দিকেই চেয়ে রইল, মুখোমুখি হতে পারছে না উষার সঙ্গে। উষাও যেন কি বলে ফেলবে এই ভয়েই মুখ খুলতে পারছে না। অনেকক্ষণ এইভাবেই কাটল। একসময় উষাই আলগা হাত কাঁধে দিয়ে বলল—"কি হোল ভাই হঠাৎ? কিছু বুঝতে পারছি না ব'লে মনটা এমন......"

ওর গলাটাও ধরে আসতে বিশাখা ঘুরে ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে একটা হাসি টেনে বলল—"এই দ্যাখো! ......অথচ আমি ওর কাছেই এলাম ছুটে তাড়াতাড়ি!"

"আমার কাছে!" —বিস্ময়ের জন্যই আবার ও ভাবটা সামলে গেল উষার। মুখের দিকে চেয়ে রইল। বিশাখাকে নিরুত্তর দেখেই বলল—"ও, হ্যাঁ, আমার আন্দাজ ভুল বলছিলে—মা যা বললেন তা সত্যি নয়?"

"হতে পারে?" বিশাখা প্রশ্ন করল।

"কেন হবে না?"

"স্বাতিদিকে মনে আছে?"

উষা নিরুত্তর হয়েই মুখের দিকে চেয়ে রইল। মানেটা যেন একটু একটু ধরতে পারছে এতক্ষণে। বলল—"কেন থাকবে না মনে? তাঁর সঙ্গে দাদার বিয়ে হওয়ার কথাও হচ্ছিল তো।"

"তারপর হোল না, সুতরাং আর সম্বন্ধ কি? এই তো?"

উষা দু'হাতে ওর ডান হাতটা ধরে ফেলল, কাতর কণ্ঠে বলল—"ঠাট্টা করছ ভাই? আমি কি ক'রে বুঝব কি হয়েছে? বিয়ের কথা হয়ে যায় না ভেঙে এমন? না ভাই, বলো।"

"কি বলব? আমি নিজেই জানি না।"—কাতরভাবেই আবার একটু হাসল বিশাখা, বলল—"শুধু এইটুকুই বুঝছি মস্ত বড় একটা অন্যায় হচ্ছে। হয়তো ভুলই একটা; কি করে অন্যায়ই এ-কথা জোর ক'রে বলব? শুধু দেখছি স্বাতিদি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। পরশু পর্যন্ত এই কথা, তারপর শুনবেন আমি রয়েছি এর মধ্যে।"

'আর দাদা?"—ভেঙে পড়বার কথা ধরেই প্রশ্ন করল উষা। বিশাখা বলল—"বেটাছেলেরা ভেঙে পড়েছে একথা কখনও শুনেছ? একটা হোল না, আর একটা। প্রশান্তদাও তাই করতে যাচ্ছেন।"

একটু বেশিক্ষণই চুপচাপ গেল এবার। তারপর উষাই যেমন ঝোঁকের উপর বলে সেইভাবে ব'লে উঠল—"না ভাই, তা'বলে আমি তোমার মায়া ছাড়তে পারব না। কি জানো, স্বাতিদিকে মাত্র একবার দেখেছি। আর, হ্যাঁ, তুমিও তো ভালোবাস দাদাকে।"

"তুমিও তো বাস।"

"বিয়ের আগেই ঠাট্টা!"—চোখ পাকিয়ে উঠল উষা।

"ঠাট্টা মোটেই নয়।" বিশাখা বলল—"তোমার মতন ক'রে ভালোবাসা যায় না?"

"তার মানে বোনের মতন?"

বেশ একটু নিরাশ হোল যেন উষা। টেনে টেনে একটু মন্দস্বরেই বলল—"তাহলে আর কি হোল?—দাদা অত অন্য রকম ক'রে ভালোবাসবার মতন—অত ভালো পাত্র—তোমার নিজের ভাইও নয়।"

একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল বিশাখা। উষা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে বলল—"হাসছি তোমার ভালোবাসার অঙ্ককষা দেখে। মস্ত বড় হিসেবে ভুল হয়ে গেছে বড় ভাই-এর মতন ভালোবেসে, নয়? তুমি এত ছেলেমানুষের মতন কথা বল—কেন যে ছুটে এলাম তোমার কাছে!"

একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল উষা, বলল—"না ভাই, এবার বুঝতে পেরেছি, বলো।"

"তুমি আসল কথাটাই এখনও বুঝতে পারনি।"

"কি কথা? কার কথা? ঐ যা বললে?"

"হ্যাঁ, তারই কথা যে ভালোবেসে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। তুমি দেখোনি, তাই বুঝতে পারছ না, আমি একটু একটু করে দিনের পর দিন দেখে এসেছি, উষা। যখন গড়ে উঠছে তখনও দেখেছি, যখন ভাঙন ধরল তখনও দেখেছি। দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি ভাই..."

"ভয়!"

"হ্যাঁ, ভয় এই জন্যে যে দেখলাম—ভাঙন একদিকেই ধরে শুধু। কি জানি, দুদিক থেকে ভাঙন ধরলে সে বোধহয় মন্দ নয়। তাতে বোধহয় ভালো করে গড়বার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাতো হয় না। একজন ভাঙে নূতন গড়বার জন্যে, বোঝে না, যার গড়বার উপায় নেই, সে কি ক'রে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। স্বাতিদির অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি।...আমি সাবধান হয়ে গেছি—তোমায় সত্যি কথা বলতে কি।"

"সাবধান!...কিসের? মানে..."—একটু সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়েই প্রশ্ন করল উষা।

বিশাখা বাইরের দিকে চেয়ে অনেকটা আত্মগতভাবে বলল—"জানি না সেটা আর এখন সম্ভব কিনা—তবে একথা তো হয়ই মনে—স্বাতিদির অবস্থাটা দেখে যে, জেনেশুনে এ-পথে পা-বাড়ানো..."

"তাহলে বাড়িয়েছিলে পা। আর তাহলে নিশ্চয় দাদার দিকেই; সেই আমার কথাই তো এল।"

"তুমি সত্যিই বড় ছেলেমানুষ।"—একটু হাসল বিশাখা।

"বেশ তাহলে বলো, অন্য কে সে?"

একটু ভাবল বিশাখা চোখ তুলে। বলল—"সাবধান হয়ে গেছি, এইটিই আমার জীবনে এখন বড় কথা ভাই। কার থেকে সাবধান হলাম সে-কথার আর দাম নেই, কেন সাবধান হলাম সেই কথাটাই

আসল।...হয়তো তোমাদের বাড়িতেই আসতে হবে আমায়, সুতরাং ও কথাটা বাদ থাকাই ভালো নয়?"

চোখ দুটো হঠাৎ ছল ছল করে এল। মুছেই নিতে হোল বিশাখাকে। ওর হাতটা ধরাই ছিল ডান হাতে, চাপ দিয়ে একটু বুকের কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল—"হ্যাঁ বাদ থাকতে দাও, লক্ষ্মীটি। এখন আমি যার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি তাইতে আমায় একটু সাহায্য করো, করতেই হবে ভাই।"

"কি করে করতে হবে বলো?"

একটু আবার ভাবল বিশাখা, বলল—"তার আগে বলো—বুঝেছ যে কাজটা অন্যায় হচ্ছে?"

"তুমি যখন বলছ..."

"আমি বলছি বলেই কি?...বেশ, তাহলে আগাগোড়াই সব বলি তোমায়।" আগাগোড়াই সব বলে গেল বিশাখা; সেই দুর্যোগের রাতের প্রথম দেখা থেকে সেলাইয়ের কল উপহার দিতে গিয়ে দেখা পর্যন্ত না করেই অন্তর্ধান। এর মধ্যেকার সমস্ত ইতিহাস—যা নিজে জানে, যা গল্পের মধ্যে দিয়ে স্বাতির কাছে শুনেছে—কি রকম করে দারুণ দুর্দশার মধ্যে থেকে ওদের টেনে তুলল প্রশান্ত, কি রকম করে আশা জাগাল স্বাতির মনে—কতদিনের কত মেলামেশার মধ্যে, টুকরো টুকরো কথা, খণ্ড খণ্ড হাসি-পরিহাসের মধ্যে যা দিন দিনই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, সংশয় ছাড়িয়ে সুনিশ্চিতের রূপ নিয়ে উঠেছে। তিন জায়গাতেই প্রীতিভোজ, প্রথম রাত্রে নদী-তীরের অভিযান।...তারপর দ্বিতীয় রাতের অভিযানের কথাও বলল—কি ক'রে দুজনের মন একটু কাছাকাছি আনবার প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রে শেষ পর্যন্ত বিশাখার মনে এই কথাই হয়েছিল—একটু মেঘ উঠুক, পালিয়ে বাঁচা যাক।

শেষের দিকে বলতে কথা আটকে যাচ্ছিল বিশাখার, চোখে জল নেমেছে, মুছে মুছে যাচ্ছে; ওর হাতটা আবার দুহাতে চেপে বলল—"এর পরেও আমায় যেতে হয়েছে উষা। সে যে কী গেছে আমার কটা দিন! কিছু বলতে পারি না, স্বাতিদি ওদিকে মুখের হাসি নিয়ে বুকের কথা চেপে যাচ্ছে—কী যে কেটেছে আমার! গায়ের জ্বালায় একদিন দাদাকেও সব বললাম—তাঁর বন্ধুকে বলতে। তারপরই এই কোপটা এসে পড়ল উষা—প্রশান্তদার এই নতুন প্রস্তাব—আমি বাঁচলাম ভাই—সত্যিই বাঁচলাম—কেন জান?—স্বাতিদির বাড়ি আর যেতে হবে না আমায়। আমি আর পেরে উঠছিলাম না ভাই...ওর হাতে মুখটা চেপে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল।

উষারও চোখ আর শুষ্ক নেই। ধরা গলাতেই বলল—"চুপ করো ভাই। আমায় মাফ করো, ঠিক বুঝতে পারিনি। বলো, কি করতে হবে, করব আমি। সত্যি বুঝতে পারিনি।"

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন সাহিত্যে প্রহেলিকা

হেঁয়ালির উত্তর

১। ঘরেতে পূর্ণিত তনু......
হেঁয়ালি নিশ্চয়॥

পূর্ণকুম্ভ

২। বিষ্ণুপদ সেবা করে......
বৎসর চাল্লিশে॥

গরুড় পক্ষী

৩। বেগে ধায় রথ......ভূতলে সারথি॥

ঘুড়ি

৪। শিরঃস্থানে নিবসে......
মুখে দিয়া কালি॥

কানে গোঁজা কলম

৫। বিধাতার নির্মাণধর
করে খান খান॥

ডিম

৬। পাষাণ জিনিয়া তার......
অবশ্য মরণ॥

শিলাবৃষ্টির শিলা

৭। মস্তকে বহিয়া আনে......
সম্বল উপায়॥

কুমারের মাটি

৮। মৎস্যে মকর নহে......
পণ্ডিত দেহ মন॥

নৌকা

৯। দেখিতে রূপস দুই ......
সভামাঝে বৈসে॥

উনুন

১০। জীয়ন্তেতে মৌন সেই......
মঙ্গল বিধানে॥

শাঁখ

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

পণপ্রথা নিরোধ কি সম্ভব?

দীর্ঘকাল প্রচলিত বিয়েতে পণ দান ও গ্রহণ পীড়াদায়ক প্রথা। এই সামাজিক প্রথা কখন কখন অত্যন্ত জবরদস্তি-মূলক হয়ে দাঁড়ায়।

বিবাহ উপলক্ষে দুই পক্ষের ভেতর যখন প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন পরস্পর কিছু উপহার আদান-প্রদান খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পণের দাবীটা গ্রহীতার খুসীমত বিপুল ও জবরদস্ত হলেই সেটা সামাজিক ও পারিবারিক দুর্গতি ঘটায়।

যদিও শাস্ত্রমতে সালঙ্করা কন্যাদান নিয়ম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রের বিধান নিরর্থক, কারণ বিবাহের পণ লেন-দেনের সামাজিক প্রথা ঠিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী গড়ে ওঠেনি। হয়তো কোন এক সময় মানুষ নিজের আনন্দের জন্যে যৌতুক ইত্যাদি দিয়েছিল, কালক্রমে সেটাই সামাজিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে।

পণপ্রথার পীড়ন যে অনেক অশান্তি, মর্মান্তিক মনস্তাপ ও পারিবারিক দুর্গতি ঘটায় সেটা অনেকেই জানেন। কাজেই এ বিষয়ে সকলে একমত হবেন।

সামাজিক কিংবা পারিবারিক রীতি রক্ষার জন্যে কন্যাপক্ষ পণ দিলে সেটা বন্ধ করার কোন উপায় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহে পণ ও যৌতুক আদান-প্রদান পীড়নমূলক ও দুর্বহ হলেও, প্রথাটি ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মনেই সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এ এমনিই সংস্কার যে এর ভেতর সবটা লোভ বা লাভ বলে ব্যাখ্যা করা চলে না।

সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী ঘরেই আত্মীয়তা করতে চান, এবং সেই মত যৌতুক আদান-প্রদানে কোনরূপ কৃপণতা করেন না। এ'রা যে কেবল ছেলের বিবাহে প্রচুর যৌতুক গ্রহণ করেন তা নয়, কন্যার বিবাহের সময়ও তেমনি ক্ষমতার অতিরিক্ত যৌতুক দিয়ে থাকেন।

এইভাবেই ক্রমশঃ যৌতুক আদান-প্রদানের ব্যাপার ব্যাধির মত সমাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং একশ্রেণীর লোকের মনে লোভ বাড়িয়ে তুলছে।

তাঁরা প্রকাশ্যে হয়তো বলবেন, পণ লেনদেন ব্যাপার অত্যন্ত গর্হিত, এমন প্রথা সমাজ থেকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত। কার্যকালে এ'রাই ছেলের বিবাহে লম্বা ফর্দ দাখিল করে কন্যাপক্ষকে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলবেন, ছেলের বিয়ের ঘড়িটা যেন রোলেক্স হয়, ওর বড় সখ ঐ ঘড়ির। হ্যাঁ, ওর আংটির হীরেটা বড়ই দেবেন। কুচো হীরের আংটি ওর পছন্দ নয়। কলমের সেটটা পার্কার ৫১ দিচ্ছেন তো, আর নমস্কারী! সেটা খান পঞ্চাশ দিলে কোন মতে সামলে নেওয়া যাবে। তা বলে যেন পঞ্চাশখানাই তাঁতের সাড়ী দেবেন না। গরদের সাড়ী দশখানা ধরুন, ছেলের দিদিমা-ঠাকুমাদের জন্যে। ও'দের প্রথম নাতীর বিয়েতে নমস্কারীতে গরদ না পেলে দুঃখ করবেন তো। আর একটা কথা, মেয়ে তো আপনারই, তার গয়না বিষয়ে আমি বেশী কি আর বোলবো। এই বাজারে পঞ্চাশ ভরি সোনা দিলে মোটামুটি গা সাজানো গয়না হয়ে যাবে। এর বেশি দেওয়ার কথা বলতে পারি না। তাহলে যে গলায় পা দিয়ে আদায় করার মত অবস্থা হবে।

আবার এমনও বরের বাবা আছেন, যিনি পাত্রী পক্ষের ঘাড় দিয়ে যাতায়াত খরচটাও আদায় করে নেন।

তিনি হয়তো থাকেন দিল্লী। তাই যাতায়াত ট্রেন ভাড়া বাবদ ২০০০ টাকা দাবী করে কনের বাবাকে যেন জুতো মেরে গরুদানের মত সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশে বলবেন, ফার্নিচার আর দিতে হবে না, নিয়ে যাওয়া বড় ঝঞ্ঝাট, তার চেয়ে ফার্নিচারের বদলে ৩০০০ টাকা ধরে দেবেন, বাস, কোন ঝামেলা পোয়াতে হোল না আপনাকে।

পাত্র যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তো এ'দের পোয়া বার। লগনসার সময় মাছের বাজারের মত তার ধারেকাছে মধ্যবিত্ত সমাজ ঘেঁসতে সাহস পাবে না। দূর থেকেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে থাকবে।

এইসব সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের পিতারা হয়তো বলবেন যৌতুক ইত্যাদি না দিলে সমাজে মান থাকে না। এবং প্রিয়জনও মনঃক্ষুণ্ণ হয়।

সম্প্রতি পণ লেনদেন বন্ধ করার জন্যে আইন পাস হয়েছে।

লক্ষ কথা না হলে যেমন বিবাহ হয় না, তেমনি বিবাহে পণ দান ও গ্রহণ প্রথা বন্ধ করতে, কয়েক বছর ধরে লক্ষ লক্ষ কথা, তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত পণপ্রথা-নিরোধ আইন পাস হয়েছে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন, এই আইনের দ্বারা কোন সামাজিক প্রথা বা দুর্নীতি বন্ধ করা কি সম্ভব? যতদূর মনে হয় পণপ্রথা-নিরোধ আইন কার্যকরী হবে না। যে আইন পাস হোল এর বাস্তব মূল্য নামমাত্র।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুর্নীতি দমনের আইনও যেমন থাকে, ফাঁকও তার সঙ্গে তেমনি থেকে যায়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এই আইনে পণ সম্পর্কে কোন সীমারেখা না থাকায়, কার্যতঃ পণ লেন-দেন যেমন চলছে, তেমনি চলবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "পণ লেনদেন অত্যন্ত গর্হিত এবং দণ্ডনীয়, কিন্তু যৌতুক হিসাবে আদান-প্রদান দণ্ডনীয় নয়।"

অবশ্য যৌতুকের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা দুরূহ ব্যাপার। দু পক্ষে যেখানে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠছে, সেখানে উপহার আদান-প্রদান খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু মুস্কিল এখানে যে, যৌতুক আদান-প্রদানের স্বাভাবিক আগ্রহের অন্তরালে পণ লেনদেনের দাবীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এই নীতিগত গর্হিত কার্যটি একমাত্র শুভবুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

অঙ্গুলি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'চাকরি ছাড়বি কেন?' ভবনাথ গর্জে উঠল : 'এ কি অন্যায় কথা!'

কৃষ্ণেন্দু চুপ করে রইল।

'চাকরি ছাড়বার কি হয়েছে?'

'চাকরিটা ছোট।'

'ছোট মানে? এত বড় ফার্মের এমন একটা ইম্পর্টেন্ট পোস্ট—'

'মাইনে কম।' ম্লান রেখায় হাসল কৃষ্ণেন্দু : 'মোটে পাঁচশো।'

'পাঁচ শো কম হল?' ভবনাথ ভেঙচে উঠল : 'একেবারে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার মত?'

'ফোর ফিগার তো আর নয়। ফোর ফিগার না হলে কি সম্ভ্রান্ত দেখায়?'

'তা ফোর ফিগার হবে আস্তে-আস্তে।' প্রবোধের সুর আনল ভবনাথ : 'চাকরিতে উন্নতির স্কোপ তো আছে।'

'সে তো ভবিষ্যৎ। এই মুহূর্তেই তো আর হচ্ছে না। এই মুহূর্তেই তো আমার মাইনে হাজার নয়।' জানলার বাইরে অকারণে একবার তাকাল কৃষ্ণেন্দু : 'ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ভবিষ্যতের কথা কে ভাবে?'

'তবে আগে একটা হাজার টাকা মাইনের চাকরি যোগাড় কর।' কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধতা রাখতে পারছে না ভবনাথ : 'তারপরে এটা ছেড়ে দে।'

'আমাকে কে দেবে হাজার টাকা?'

'না দেবে তো, তুই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবি কেন?'

'লক্ষ্মী কি হাতে থাকে? লক্ষ্মী থাকে বাক্সে। বাক্স ভাঙা দেখে লক্ষ্মী নিজেই চলে গেছে বাবা, পায়ে ঠেলতে হয়নি।' দিব্যি হাসল কৃষ্ণেন্দু।

এমন অযৌক্তিক কেউ হতে পারে ভাবতে পারে না ভবনাথ। এমন তো ছিল না কৃষ্ণেন্দু। কী হয়েছে ছেলেটার?

অবস্থার উন্নতি করতে চাস তো ভালো কথা। তাই বলে তুই হাতের পাখি ছেড়ে দিয়ে ঝোপের পাখি ধরতে যাবি? আগে ঝোপের পাখি একটা ধর, তারপর না হয় হাতের পাখি উড়িয়ে দে। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তো কখনো শুনিনি।

যদি তোর হাজার টাকার মুরোদ নেই জানিস, তবে পাঁচশো টাকা তোর কম হল? তুই একলা মানুষ, তোর কত লাগে? আমি, তুই আর নীলা।—এই তো আমাদের সংসার। তোর মা তো কবেই পরলোকে। তা নীলারও বিয়ে হয়ে গেল গত বছর। এখন শুধু বাপ আর ছেলে—আমরা দুজনে। আমার জন্যে ভাবনা নেই। একতলা থেকে যা ভাড়া পাই তাই আমার যথেষ্ট।

একটি বউ আনিস এই আমার স্বপ্ন। তা না হলে আমাকে দেখবে-শুনবে কে? দিন-দিন আমি অথর্ব হয়ে যাচ্ছি না? আর কত দিন বাঁচব? ধূসর মরুভূমিতে ছোট্ট একটি সবুজের রেখা ছিল নীলা, গৃহান্তরে চলে গিয়েছে। ভেবেছিলাম তুই এবার এই ধূসরকে শস্যায়িত করে তুলবি। কিন্তু এ তোর কি মতিচ্ছন্ন!

নিজের বাড়ি, পাঁচশো টাকায় অক্লেশে তুই বিয়ে করতে পারিস। কিন্তু কেন যে তোর কোনো কিছুতেই মন ওঠে না বুঝে উঠতে পারি না। শুধু শুধু তুই আমাকে বিরক্ত করে মারিস। তুই আমার কত আপন, আমার মত আর জানে কে। তোর দাদারা সব অকালে মরে গেল, তুই শুধু শিবরাত্রির সলতের মত মিটমিট করছিস। তোর মা চলে গেল কিন্তু আমি তোকে প্রদীপ্ত না দেখে চোখ বুজব না। কিন্তু মানুষের ঔজ্জ্বল্য কি টাকায়? শুধু মাস-মাইনেয়?

'না, তোর চাকরি ছাড়া হবে না কিছুতেই।' হঠাৎ হুমকে উঠল ভবনাথ।

'ছাড়া হবে না কি! ছেড়ে দিয়েছি।' মুখ নিচু করল কৃষ্ণেন্দু।

'ছেড়ে দিয়েছিস?' যেন সমস্ত

শরীর ছেড়ে দিল ভবনাথ। একটা চেয়ার ধরে কোনোমতে সামলাল নিজেকে।

'ওরকম বস-এর সঙ্গে চাকরি করা যায় না। বদ, বোকা, বুলি—'

আর কারণ জেনে কী হবে! কী হবে ফিরিস্তি নিয়ে? যখন বন্দুকের থেকে গুলি একবার বেরিয়ে গিয়েছে, তখন জেনে আর কী হবে কী করে বেরুল!

তবু কৃষ্ণেন্দুর আপিসে ভবনাথ গেল খোঁজ নিতে।

কই কিছু ঝগড়া হয়নি তো! কোনো কথা কাটাকাটিই হয়নি। আর হবেই বা কেন? কী নিয়ে?

তবে কোনো অপরাধ করেছে? বেআইনি গাফিলতি? তহবিল তছরূপ?

তাহলে তো থানা-পুলিশ হত।

তবে কি ধর্মঘটের আওয়াজ? কোনো ইউনিয়নী কারসাজি?

তাও তো কিছু শুনিনি।

তবে?

এই দেখুন না লেটার অফ রেজিগনেশানটা। নিজের চোখেই দেখে যান। আমার এখানে পোষাচ্ছে না। উত্তমতর, উন্নততর জীবনের আশায় ছেড়ে দিচ্ছি। সংকীর্ণকে ছেড়ে উন্মুক্তের সন্ধানে।

'আর কোনো কারণ নেই?' চেয়ার ধরে আবার নিজেকে সামলাল ভবনাথ। তারপর অসহায় চোখে তাকাল চার দিকে : 'আচ্ছা আপনারা কেউ অনুমান করতে পারেন?'

কে একজন বললে, 'মাথা খারাপ।'

শ্মশান থেকে লোকে যেমন ফেরে তেমনি ফিরল ভবনাথ।

আশ্চর্য, চাকরি খোয়াল ছেলে, আর যত দুঃখ তার? সত্যি, তার ভাবনা কি? সে কি ছেলের তোয়াক্কা রাখে? ধার ধারে? তার বাড়ি আছে, বাড়ি ভাড়া আছে। ছেলের সে মুখাপেক্ষী নয়। তার কিসের মাথা ব্যথা?

এখন তবে কী করবি? তবু না জিগগেস করে পারল না ভবনাথ।

কৃষ্ণেন্দু বললে, 'ব্যবসা করব।'

'ব্যবসা করবি?'

'হ্যাঁ, বড় লোক হব। যত বড়ই চাকরি হোক, বড় লোক হতে হলে বাণিজ্য।'

টলমা পায়ে খানিক পাইচারি করল ভবনাথ। বললে, 'ব্যবসা করতে হলে তো টাকা লাগবে!'

'তা লাগবে।' সহজেই সায় দিল কৃষ্ণেন্দু।

'পাবি কোথায়?' ভীত তীক্ষ্ম চোখে তাকাল ভবনাথ।

'আমার কাছে সামান্য কিছু আছে। বাকিটা তুমি দেবে।'

'আমি দেব? আমি দেব কোত্থেকে?' চিৎকারে প্রায় ফেটে পড়ল ভবনাথ।

'তোমার কাছে কি কিছুই নেই?' প্রায় দরদ মাখিয়ে জিগগেস করল কৃষ্ণেন্দু।

'তা যৎসামান্য থাকলেই বা। তা তোকে আমি দিতে যাব কেন?' অস্ফুটে বুঝি একটা কটু কথাও ভবনাথের মুখে এল।

কিছু কানে তুলল না কৃষ্ণেন্দু। বললে, 'তুমি মরে গেলে ও টাকা তো আমিই পাব।'

উত্তরে, ক্ষণকালের জন্যে, ভবনাথ বোবা হয়ে গেল।

এতটুকু কুয়াশা নেই, দিব্যি সরাসরি জিগগেস করল কৃষ্ণেন্দু, 'কত টাকা আছে বাবা?'

'কত আর থাকবে!' তবু সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে বলতে হল ভবনাথকে : 'প্রভিডেন্ট ফান্ডে আর গ্র্যাচুয়িটিতে যা পেয়েছিলাম তার প্রায় সবটাই গেছে বাড়ি করতে। সামান্য একটা তলানি শুধু পড়ে আছে। বলবার মত কিছু নয়।'

'না হোক, ওটা আমাকে দাও।' দিব্যি হাত পাতল কৃষ্ণেন্দু।

'তোকে দেব?' ভবনাথ সুরে ক্রুদ্ধ বিদ্রূপ আনতে চেয়েও বুঝি পারল না আনতে।

'হ্যাঁ, তোমার ভাবনা কি। নিচের তলার ভাড়া থেকেই তো সংসার চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে তোমার নিজের খরচ। তোমার ও টাকাটা মিছিমিছি তবে পচবে কেন ব্যাংকে?'

'বা, আমার আপদ-বিপদের সময় কাজ দেবে।' তড়পে উঠল ভবনাথ।

'আপদ-বিপদের সময় তো আমিই আছি।' কৃষ্ণেন্দুকে অদ্ভুত শান্ত শোনাল।

ভবনাথের মনে বুঝি ভিজে হাওয়ার ছোঁয়াচ লাগল। বললে, 'বড়লোক না হলেই কি হত না? তোর যা সঙ্গতি ছিল তাতেই কি পেতাম না মা-লক্ষ্মী?'

'পেতে না, বাবা। তোমাকে ওরা ফুল বলত।'

হেসে উঠল ভবনাথ।

'তোমার সঙ্গে থাকতেই চাইত না। আলাদা বাড়ি করতে চাইত।'

'সে কি, আমি আর কত দিন!'

'তাই তো বলি, টাকাটা তুলে নিয়ে এস।' আবার কেমন কৃষ্ণেন্দুকে হৃদয়-হীন শোনাল : 'যা এক দিন আমার হবে তা আটকে রেখে লাভ কী? এখন হাতে পেলে কত আমার উপকার হয়। লাগাতে পারি ব্যবসাতে। আর সংসারে বড়লোক হবার সিঁড়িই ব্যবসা। দেখাতে পারি আমিও উঠতে পারি সিঁড়ি বেয়ে—'

আর্ত মুখে নিজের ঘরে ফিরে গেল ভবনাথ।

তবে কি সত্যিই ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে?

নীলাকে ডাকাল ভবনাথ।

'তোর দাদার কী হয়েছে, রে, নীলা?'

'মাথা খারাপ হয়েছে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে?' চমকালো ভবনাথ : 'তার মানে?'

'তার মানে দাদা মদ খেতে শুরু করেছে।' ঘৃণায় নাকটা ছোট করল নীলা।

'কী যে বলিস তার ঠিক নেই।'

'ঠিক নেই মানে?' ঝলসে উঠল

নীলা : 'তার ঘরে গিয়ে দেখেছি বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢেলে ঢেলে খাচ্ছে।'

'ঘরে বসে খাচ্ছে। ওটাকে খাওয়া বলে না, সিপ্ করছে।' ছেলের দোষ দেখতে চায় না ভবনাথ : 'যারা ব্যবসা করে তারা অমনি এক-আধটু সিপ্ করে।'

'ব্যবসা না হাতি! কিছু করছে না।'

'বা, অতগুলো টাকা দিয়ে সেদিন সে কি কতগুলো মেসিন-পার্টস কিনল--কোথাকার কোন ফার্মকে কি সাপ্লাই করবে বলে—'

আমি দেব? আমি দেব কোত্থেকে?

'সব ধোঁয়া!' হাত ঘুরিয়ে ধোঁয়া দেখাল নীলা। 'সব নস্যি।' নস্যি দেখাল আঙুলে।

'সমস্ত টাকাটাই জলে গেল?' সামনেই একটা অন্ধকার গহ্বর দেখছে এমনি চোখ করল ভবনাথ।

'তাই তো বললে। বললে, আমি সর্বস্বান্ত। ইংরিজিতে বললে, 'বিদ্রূপে ঠোঁট ওল্টাল নীলা : 'আই য়্যাম রুইন্ড।

'তার মানে আমার অতগুলো টাকা ও নষ্ট করল?' হায়-হায় করে উঠল ভবনাথ।

'তোমার টাকা?' নীলা কৌতূহলে কর্কশ হল : 'তোমার টাকা মানে?'

'বা, কিছু টাকা আমার ব্যাঙ্কে এখনো পড়ে ছিল না?'

ও! ছিল বুঝি? তা, সব টাকাটাই তুমি ওকে দিলে?' যেন কৈফিয়ত তলব করছে এমনি ভাব নীলার।

'কত কী বলল আমাকে। কত কী স্তোক দিল!' প্রায় চুল ছেঁড়ার মত অবস্থা ভবনাথের : 'বললে, ব্যবসা করে বড়লোক হবে। বড়লোক না হলে এ রাজত্বে মান নেই, স্থান নেই। তাই ভুলে গেলাম। এক বাক্যে দিয়ে দিলাম টাকাটা।'

'কিন্তু ও টাকার সবটাই তো ওর নয়।' নীলার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা সহসা কঠিন হয়ে গেল।

'ওর নয়--এ আবার তুই কী বলছিস?'

'মানে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে তো মেয়েদেরও আজকাল সমান অংশ।' নীলা এগিয়ে এল এক পা : 'তাই ও টাকায় তো আমারও আট আনা।'

এত দুঃখেও হাসি পেল ভবনাথের। বললে, 'তুই নতুন আইনটার কথা বলছিস? তা আমি আগে মরি, তবে তো ওয়ারিশি পাবি।'

'ও, তাই বুঝি?' বোকা-বোকা মুখ করল নীলা।

'যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ ও টাকা তো আমারই টাকা। আমি তা

দিয়ে যা খুশি করতে পারি। ইচ্ছে করলে দিতে পারি বিলিয়ে। তাতে কার কী বলবার আছে?'
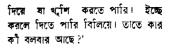
'তা হলে তুমি ইচ্ছে করলে বাড়িটাও সম্পূর্ণ দাদাকে দিয়ে যেতে পার?' নীলার দুচোখে রাগ যেন ঝলসে উঠল।

একটুও ভালো লাগল না ভবনাথের। সেই একফোঁটা মেয়ে, তার মুখে এ সব কী কথা! কই এমনটি তো সে ছিল না। মোটে বছর খানেক বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে জেগেছে বিষয়বুদ্ধি?

ভবনাথ কথা বলল না।

'তা হলে পারো আমাকে বঞ্চিত করতে?'

'এত খরচ করে তোকে বিয়ে দিলাম, গয়নাগাটি জিনিসপত্র দিলাম—তোর আবার কী চাই!'

'বা, আইন যদি আমাকে অধিকার দেয় তা হলে সে অধিকার তুমি কাড়বে কেন?' প্রায় ফণা তুলল নীলা।

এই এক বছরের মধ্যে কী রকম দুষে গিয়েছে মেয়েটা। বিষয়ের জ্বর ধরেছে গায়ে। মাথায় শুরু হয়েছে ঘূর্ণি।

কে এমন নষ্ট করল মেয়েটাকে? বাপের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছে? আওয়াজ তুলছে? আইন দেখাচ্ছে?

ভবনাথ উত্তেজিত হল না। শান্ত-স্বরে বললে, 'যার সম্পত্তি, আইনই তাকে অধিকার দিয়েছে, যেমন খুশি সে দান বিক্রি করতে পারে। যতক্ষণ সে মালিক ততক্ষণ সব তার নিজের এক্তিয়ার। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আমিই সর্বেসর্বা। মরে যাবার পর অবিশ্যি—'

নীলা কথাটা শেষ করতে দিল না। ঝামটা মেরে বললে, 'তখন যেন না দেখি যে উইল করে সর্বস্ব ঐ অপদার্থকেই দিয়ে গেছ।'

একটা যেন ছোরার ঘা খেল ভবনাথ। বললে, 'তুই তোর দাদাকে অপদার্থ বলিস?'

এতটুকু দমল না নীলা। বললে, 'অপদার্থকে অপদার্থ বলব না তো কী বলব! আসল ব্যাপারটা তো জানো না কিছু। আমি জেনেছি।'

'কী ব্যাপার?' দিশেহারার মত তাকাল ভবনাথ।

'কেন দাদার এই ছন্ন মতি। কেন দাদা চাকরি ছাড়ল। কেন মদ ধরেছে?'

নীলাটা এমনি করে বলছে, শত্রুর মত, বিপক্ষের মত! মামলার বিবাদীর মত!

'তোকে কে বলল? তুই কোত্থেকে জানলি?' তবু একবার ধৈর্য হারাতে চাইল ভবনাথ।

'দাদাই বলেছে।'

নীলার মুখে কৃষ্ণেন্দুর নিন্দা শুনবে ভাবতেই বুকের ভিতরটা ম্লান হয়ে গেল ভবনাথের। কত ভাব ছিল দু'জনে, কত ভালোবাসা! একে অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারত! দাদা বলতে নীলা অজ্ঞান আর নীলু চাইলে কিছুই অদেয় ছিল না কৃষ্ণেন্দুর। সেই নীলা এবার গাল দেবে দাদাকে। আর তাই চুপ করে শুনবে ভবনাথ।

বিয়ে করে সমর্থ স্বামী পেয়ে কী অহংকার হয়েছে মেয়েটার।

তবু কানে যা আসে শুনে রাখা ভালো। যদি কোনো প্রতিকারের হদিস পায়।

'একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিল দাদা। ইংরেজিতে যাকে বলে ওভার হেড য়্যান্ড ইয়ার্স। লোকে হাবুডুবু খায়, উনি একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেন—'

ভাষাটাও কেমন বিশ্রী হয়ে গিয়েছে নীলার! কেমন বর্বর! নির্বোধ!

'শেষে চাইল মেয়েটাকে বিয়ে করতে।'

'বেশ তো, করত।' প্রায় লাফিয়ে উঠল ভবনাথ: 'যে কোনো দেশের হোক, যে কোনো জাতের হোক, আমি বাধা দিতাম না।'

'মেয়েটাই চাইল না বিয়ে করতে।'

'চাইল না?'

'না। মেয়েটা ঘোর বিষয়ী।'

যেন কোনো অবিষয়ী মেয়ে আছে! একটু বুঝি করুণ রেখায় হাসল ভবনাথ। বললে, 'কী বললে মেয়েটা?'

'বললে, তার পাঁচশো টাকায় পোষাবে না। অন্তত হাজার-দু হাজার চাই। ফোর ফিগার চাই। আর নিচের ঘরে ভাড়াটে, উপরে তিনখানা ঘরের মধ্যে একখানাই শ্বশুরের দখলে, আর যে শ্বশুর কিনা বুড়ো হাবড়া, সেকেলে, সে বাড়ি তার কণ্টক।'

'কেন, আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত!'

'টাকা কই?' দিব্যি আঙুলে বাজাল নীলা: 'রেস্ত?'

'কী আশ্চর্য, আমাকে বললে না কেন?' মুহূর্তে আবার শান্ত হল ভবনাথ। বললে, 'তারপর কী হল?'

'মেয়েটা প্র্যাকটিক্যাল, এক দেড় হাজারী কভেনেন্টেড অফিসারকে বিয়ে করলে। ফ্ল্যাট নিলে পার্ক স্ট্রিটে। আর উনি', কী নিষ্ঠুরের মত শোনাল নীলাকে, 'অভিমানে, বড়লোক হবার স্বপ্নে চাকরি ছেড়ে দিলেন। সোনার হরিণ ছেড়ে দিয়ে গেলেন সোনার কুমিরের সন্ধানে। নর্দমায় পড়লেন। মদের নর্দমায়।'

ছি ছি, এতটুকু কল্পনাশক্তি নেই মেয়েটার। সম্বন্ধ করে গোছগাছ করে সাজানো ঘরে বিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, তাই সাধ্য নেই বোঝে এই যন্ত্রণা। কল্পনাশক্তি না থাক, বাস্তব বুদ্ধিটা তো থাকবে। শ্রদ্ধা না করুক অন্তত করবে তো একটু সহানুভূতি।

'তা আমাকে বললে না কেন? ওদের এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যেতাম অন্য কোথাও!' প্রায় তন্ময়ের মত বললে ভবনাথ: 'তারপর আস্তে আস্তে ওরা ভাড়াটেদের উৎখাত করে দিত। গোটা বাড়ি নিয়ে নিত দখলে। গোটা বাড়ির মোট ভাড়া পাঁচশো টাকা কোন না হত। পাঁচশো-পাঁচশো মোট আয় সেই ফোর ফিগারই তো হত কৃষ্ণেন্দুর। আমাকে বললে না কেন? আমি দিতাম সব ব্যবস্থা করে।'

'আবার সেই কথা?' নীলা ঝংকার দিয়ে উঠল।

স্তব্ধ হয়ে গেল ভবনাথ।

'ষোল আনা বাড়ি সেই তবে দাদাকেই দিতে? কেন, আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?' চোখে জল আনবার চেষ্টা করল নীলা: 'বানের জলে ভেসে এসেছি তো আইন আমাকে আট আনা অংশ দেয় কেন?'

ভবনাথ কথাটা গায়ে মাখল না। আপন মনে বললে, 'তাছাড়া, বয়েস হয়েছে, ক'দিন আর আছি সংসারে। পড়ব আর মরব একদিন ঝপ করে। তখন তখন ওই তো, ওরাই তো—'

মুখের কথা কেড়ে নিল নীলা। বললে, 'ও রকম যাওয়াই তো আইডিয়াল। চুপচাপ চলে যাওয়া। সময় পেয়ে ভেবেচিন্তে উইল করে চলে যাওয়াটাই বিচ্ছিরি—'

'দেখি। অমিতাভকে একবার পাঠিয়ে দিস।'

অমিতাভ ঘরের বাইরেই ছিল কান পেতে।

নীলা বেরিয়ে আসতেই অমিতাভ বললে, 'এই সঙ্গে সেই কথাটাও বললে না কেন?'

'কোন কথাটা?'

'সেই যে একটা মর্টগেজ দলিল তৈরি করে তাতে বুড়োর সই নেবার জন্যে তোমার দাদা চেষ্টা করছে—'

'ও সব মর্টগেজ-ফর্টগেজ আমি বুঝি না। সে সব তুমি জামাই, তোমাকে ডেকেছেন পরামর্শে, তুমি বোলো। আমি আইনের কথাটা মোটা করে বলেছি। আইন আমার জন্যে যা ধার্য করেছে তা থেকে আমি বঞ্চিত হতে পারব না। না, কিছুতেই না।' জয়ের আনন্দে আকাশে প্রায় পাখা মেলল নীলা।

সিঁড়ির মুখেই কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা। মাতাল হয়ে টলমলে পায়ে ঘরে ঢুকছে। মুখে বোধহয় এক কলি সিনেমার গান।

'এ সব কী?' গর্জে উঠল ভবনাথ।

কৃষ্ণেন্দু পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। দেয়ালের সঙ্গে চাইল মিশে যেতে।

'বুড়ো বয়সে সইব না এ কেলেঙ্কারি। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।' ভবনাথ সর্বাঙ্গে কাঁপতে লাগল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল কৃষ্ণেন্দু। বলতে লাগল, 'আমি কিন্তু আমার বুড়ো বাপকে ছাড়তে পারব না। ও যতই কেননা বলুক, ওল্ড ফুল, আমি বলেছি সেই ওল্ড ফুলই আমার আপনার লোক। যদি সংসার বলে আমার কিছু থাকে, কিছু হয়, তবে বাপকে নিয়ে, বাপকে ছেড়ে দিয়ে নয়। ও কত বলেছে বুড়োকে ছেড়ে একা বেরিয়ে এস, আমি রাজি হইনি। বলেছি, আমার ভারি সাধ তুমি আমার বাবার সেবা করো, আর যে মা-নাম সংসার থেকে উঠে গিয়েছে, বাবার মুখে তোমার উদ্দেশে আবার সেই মা-নাম শুনি।'

কিন্তু এত মদ যে খাচ্ছে, পয়সা পাচ্ছে কোত্থেকে? নগদ যা কিছু ছিল তা তো শেষ-পাই পর্যন্ত উধাও। ধার করছে? ধারই বা মিলবে কত দিন? রাহাজানি করছে? তা হলে থানা-পুলিশ বরদাস্ত করছে কেন?

অমিতাভই রহস্যোদ্ধার করে দিল।

নিচে ঘেঁষাঘেঁষি করে তিন ঘর ভাড়াটে। সত্তর-আশি করে ভাড়া। তাদের একজনের সঙ্গে দিব্যি ষড় করেছে

কৃষ্ণেন্দু। পঞ্চাশ টাকা মতন নিয়ে পুরো ভাড়ায় রসিদ কাটছে। আপনার হয়ে 'ফর' দিয়ে সই করে দিচ্ছে। এক বাড়িতে থাকা ছেলে বাপের এজেন্ট নয় এ কেউ মানবে না। ঠিক উশুল দেবে আদালত।

ডেকে জিগগেস করুন ভাড়াটেকে।

ভাড়ার জন্যে তাগাদা করতেই ভাড়াটে কৃষ্ণেন্দুর দেওয়া রসিদ দেখাল। ন্যাকা সেজে বললে, 'পুরো টাকাই নিয়েছেন আদায় করে।'

'কোনোদিন আমার ছেলেকে ভাড়া দিয়েছেন?' ধমকে উঠল ভবনাথ।

'তা আমরা কী জানি। উনি যে আপনার লোক নন তা কী করে বুঝব!'

ভবনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসল। 'কী সর্বনাশ!'

'তবু তো মোটে একজনের সঙ্গে বড় করেছে। আরো দুজনকে যদি হাত করে—' বললে অমিতাভ।

'তা হলে তো না খেতে পেয়ে মারা যাব।' ভবনাথ চারদিক অন্ধকার দেখল।

'তা ছাড়া আরো একটা কুমতলব ওর আছে বলে শোনা যাচ্ছে।' অমিতাভ ঘন হল।

হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল ভবনাথ।

'বাড়িটা মর্টগেজ দেবার তালে আছে। একটা স্ট্যাম্প কাগজে দলিল চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো কায়দায় আপনার সই নেবে বলে।'

'কী ভয়ংকর কথা! এ যে দেখি দিনে ডাকাতি!'

তবু সাহস করে কৃষ্ণেন্দুকে ডাকাল ভবনাথ। দিনের বেলায় যখন সে সাদা চোখে। আর আশ্চর্য, দুটো অভিযোগই সে স্বীকার করলে। যখন হাতে পয়সা-কড়ি নেই তখন এক-আধটা ভাড়াটে থেকে এক-আধ মাসের ভাড়া আদায় না করে উপায় কী! আর যখন সে ব্যবসাই করবে তখন বাড়ির মর্টগেজ ছাড়া ক্যাপিট্যাল পাবার আশা কোথায়! প্রথম-বারের ব্যবসাটা ভন্ডুল হয়ে গিয়েছে, এবার আর শৈথিল্য হবে না, অভিজ্ঞতাই মনেদের কাজ করবে। আর, সুদিনের মুখ দেখতে এবার আর দেরি করতে হবে না, বছর খানেকের মধ্যেই বাড়িটা খালাস হতে পারবে।

'তোর ব্যবসার জন্যে তুই আমার বাড়ি মর্টগেজ দিবি?' প্রায় লাঠি ও'চাল ভবনাথ।

'আহা, আমি দেব কেন? তুমিই দেবে। আমার জন্যে দেবে। যেহেতু এ বাড়ি আমার হবে।'

'একলা তোর হবে? কেন, নীলার অংশ নেই?'

'তা নীলাকে তুমি তা দেবে কেন? তুমি উইল করে আমাকে বোল আনা দিয়ে দেবে। বিয়ের পর মেয়ে তো পর, শত্রু, বিদেশী,—তাকে কি কেউ দেয়?'

'তোমাকে দেব, আর তুমি তা উড়িয়ে পুড়িয়ে মর্টগেজ-সেল করিয়ে শেষ করে দেবে!' হুংকার ছাড়ল ভবনাথ: 'বেরো আমার বাড়ি থেকে, কে শত্রু আমাকে চিনিয়ে দিতে হবে না।'

'আমার জিনিস রাখলেও আমিই রাখব, পোড়ালেও আমিই পোড়াব।' অবাক হবার ভাব করল কৃষ্ণেন্দু: 'তাতে কার কী মাথাব্যথা? আর তখন তুমি কোথায়? মানুষই থাকে না, তা তার বাড়ি-ঘর!'

ভবনাথ আর কোনো বাক্যব্যয় করল না, ডান হাতের তর্জনী দরজার দিকে তীক্ষ্ণ করে রাখল।

অনেক রাতে মাতাল হয়ে তবু বাড়িতেই ফিরতে এসেছিল কৃষ্ণেন্দু, ভবনাথ নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে দিল।

'এই ভালো হল,' অমিতাভ বললে 'এবার যদি শোধরায়! ঘা না খেলে মানুষ ফেরে না।'

তারপরেই ভবনাথ পড়ল।

কিন্তু এক কোপে গেল না। কুচি কুচি হতে লাগল।

অমিতাভ স্ত্রীকে বললে, 'এবার বাপের সেবা করো। বাবার বাড়িতে গিয়েই থাকো।'

'তা আর বলতে!' নীলা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দশ হাতে সেবা করতে লাগল।

ভবনাথ বললে, 'আমাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দে। তোর সেবায় আমাকে কেন চাইছিস মায়ায় বাঁধতে। যেতে দে তাড়াতাড়ি।'

সে কি আর শোনবার? অমিতাভ চিকিৎসার বিস্তৃত ব্যবস্থা করে। আর রাত নেই দিন নেই, শিয়রে বা পদতলে বসে আছে নীলা, মূর্তিমতী শুশ্রূষা।

'উইল কিছু করেছ বাবা?'

'না, মা।'

'তবে?'

'তুই-ই তো বলেছিলি, চুপচাপ চলে যাওয়া। তাই যাব। কোনো কিছু লেখা-পড়া করব না। যা হবার তাই হবে।'

এ কি আর এখন বলা চলে? এত পরিচর্যা, এত অর্থব্যয়ের পর? তাছাড়া, চুপচাপ গেলে, ফলটা কী দাঁড়াবে? দাদা আট আনা নীলা আট আনা পাবে। একত্র থাকা তো অসম্ভব, দুজনের দুই সংসার। তা ছাড়াই ঐ মাতাল দুশ্চরিত্রের সঙ্গে একত্রবাসও অসঙ্গত। সর্বক্ষণই গোলমাল আর বিসংবাদের ভয়। আরো কথা, ঐ ছন্নমতি তার অংশকে নিটুট রাখবে নাকি? মদের পিপাসায় গিলে খাবে, বিক্রি করে দেবে। আর সেই নিষ্ঠুর ক্রেতা ভাগ-বাঁটোয়ারা চাইবে, তার মানে নীলাকেই ভোগ করতে দেবে না, সর্বাংশে গ্রাস করবে। বাবার ছেলে-মেয়ে কেউ এ বাড়িতে থাকতে পাবে না। আর মায়ের নামে যে বাড়ির নাম ছিল, 'সুধা সৌধ' তাই হয়ে দাঁড়াবে বাগারিয়া কি চামারিয়া হাউস।

কিংবা বাড়িটার হয়তো অস্তিত্বই থাকবে না। এটুকু যোগ করল অমিতাভ। ভেঙে ফেলে নতুন প্যাটার্নে তৈরি হবে।

তা ছাড়া দুশ্চরিত্র ছেলেকে বাপ ত্যাজ্য করে এ আর নতুন কী! সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্যেই ত্যাজ্য করে।

'ওর কোনো খবর পাস?' ক্ষীণস্বরে জিগগেস করে ভবনাথ।

'কোনো খবর নেই বাবা।' আদর ঢেলে দরদ ঢেলে বলে নীলা। 'উনি কত খোঁজাখুঁজি করছেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তবু পাত্তা নেই।'

ক্ষীয়মান সমস্ত শক্তিকে যেন শ্রুতির বিন্দুতে সংহত করে ভবনাথ। এই বুঝি কোনো শব্দ শুনতে পাবে। রাত্রে থামা-থামা কড়া নাড়ার শব্দ, সিঁড়িতে ঢলঢলে শিথিল পায়ের শব্দ কিংবা সেই সিনেমার এক কলি উড়ুক্কু গান।

এ ভাবে রাখাটা ঠিক হবে না। সত্য কথাই সেদিন তাই বললে অমিতাভ।

'কৃষ্ণেন্দুর দেখা পেলাম।'

চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করল ভবনাথ।

'ঘোড়াবাগান বস্তিতে আছে।' একটু বা ব্যঙ্গ মেশাতে চাইল অমিতাভ : 'জনগণের কাজ করছে।'

ঘোলাটে চোখ চাইল বুঝি উজ্জ্বল হতে।

'বললাম আপনার অবস্থার কথা। কত আসতে বললাম। বললে যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে বাড়িতে আমি যাই না।'

'শেষ দেখা দেখে যাবার কথা কত বললেন উনি।' নীলা খোদকারি করল : 'উত্তরে বললে যেখানে সব শেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে আবার শেষ কী!'

বিকৃত ভঙ্গিতে ঠোঁট নড়ে উঠল ভবনাথের। গালাগাল দিলে। পাজি, পাজির পা-ঝাড়া—

ভবনাথের চেয়ে নীলা বেশি অস্থির। আর নীলার চেয়েও বেশি অস্থির অমিতাভ।

'তোকেই সব দিয়ে যাব নীলু।'

কিন্তু মুখে বললে তো হবে না। দলিল চাই।

'মুখে বললে শুধু আট আনা হবে।' বললে নীলা।

'মুখে না বললেও আট আনা হবে।' ব্যাখ্যা জুড়ল অমিতাভ।

সুতরাং দলিল চাই। আর দলিল মানে উইল নয়। কেননা এক বেলার উইল আরেক বেলায় বাতিল হতে পারে। তাই পাকা একটি দানপত্র দরকার। নির্ব্যূঢ় হস্তান্তর।

ছেলে চরিত্রহীন, উদ্ধত, উন্মাদ। আর মেয়েটিই বশংবদা, সেবাপরায়ণা। বাপের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হবে মেয়েকে দান করবার। এ দানে যোগসাজসের কিছু নেই। খুবই ন্যায্য, খুবই বৈধ।

'আর উইল করলেই বা কী। বদলাবার সময় কোথায়? শোক-শোক মুখ করল নীলা : 'ডাক্তার বলেছে আর বড় জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

অক্সিজেন চলেছে।

'একটা স্ট্যাম্প-কাগজে চাপানো দানপত্রের দলিল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে অমিতাভ।

নাকের নলটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলতে চাইল ভবনাথ। চাইল পাশ ফিরতে। বললে, 'আমাকে শান্তিতে যেতে দে।'

শান্তিতে যেতে হলে দলিলটা যে সই করে দিতে হয়।

'সেই যে বলছিলে বাবা, ষোল আনাই আমাকে দেবে।' মমতায় কপালে গালে হাত বুলোল নীলা : 'তা হলে দলিলটা যে সজ্ঞানে সই করতে হয়। তোমার বাড়িটা নিটুট থাকবে, মায়ের স্মৃতিটুকু ম্লান হবে না। যাবার সময় এই-ই তো তোমার শান্তি।'

'কই দে, সই করে দি।' হাত বাড়াল ভবনাথ।

বালিশ উঁচু করে তুলে ধরল দুজনে, নীলা আর অমিতাভ। সজ্ঞানে সুস্থ মনে অন্যের বিনানুমতিতে সই করে দিল ভবনাথ।

কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল, ভবনাথ মরল না।

আরো আটচল্লিশ ঘণ্টা।

ডাক্তার বললে, 'মির‍্যাকলস ডু হ্যাপেন। এ যাত্রা বেঁচে গেলেন বাবা।' বিনা ফি-তে সার্টিফিকেট দিল নীলাকে : 'যা অমানুষিক সেবা করলেন, দেবতাদের দেখবার মত।'

মুখ উজ্জ্বল করল নীলা। শুধু শুধু ম্লান করবে কেন? বাবা বাঁচুন বা মরুন, কিছুতেই কিছু আর আসে যায় না। পাশার দান পড়ে গিয়েছে। খনি দিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত সম্ভার।

বাবা যখন ভালো হয়েই উঠলেন তখন এ বাড়িতে থাকবার আর কী দরকার! নীলা তার নিজের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, চলে গেল।

আর আটচল্লিশ দিন পার হবার আগেই একদল মেয়ে পুরুষ তাদের হাঁড়িকুঁড়ি লটবহর নিয়ে দোতলায় একেবারে ভবনাথের ঘরে এসে ঢুকল।

'এ কী ব্যাপার?' চেঁচিয়ে উঠল ভবনাথ।

'আমাদের দোতলাটা ভাড়া দিয়েছেন। সেলামি নিয়েছেন ভারি হাতে।'

'কে ভাড়া দিয়েছে?'

'যার বাড়ি সে—অমিতাভবাবু।'

'কে অমিতাভ?' আরো গলা চড়াল ভবনাথ।

'আপনার জামাই। আমাদের দলিল দেখিয়েছেন। আপনার মেয়ে নীলা দেবী এ বাড়ির একা মালিক। আর দেবীও যা দেবাও তাই।' ভাড়াটেরা বললে।

আশ্চর্য, এ দুরূহ মুহূর্তে স্ট্রোক হল না ভবনাথের। শানে আছড়ে পড়ল না। দিব্যি খাড়া রইল।

দিব্যি বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

কোথায় ঘোড়াবাগান বস্তি, খুঁজতে, খুঁজতে সন্ধের দিকে এসে হাজির হল ভবনাথ।

ডাকল : কৃষ্ণ, কৃষ্ণেন্দু।

এ কী, বাবা! পাগলের মত ছুটে এল কৃষ্ণেন্দু।

'শান্তিতে চুপচাপ মরতে দিল না ওরা।' ছেলের বাহুর মধ্যে ভেঙে পড়ল ভবনাথ : 'দলিল করিয়ে নিল। শেষে দিল তাড়িয়ে বাড়ি থেকে।'

'কেন, আমার এ বস্তিই তো আছে।' কৃষ্ণেন্দু বললে, 'আমার ঘরে, আমার কাছেই তুমি থাকো। কে কাকে তাড়ায়। এক দরজা বন্ধ হয় তো আরেক দরজা খোলে। কেন তুমি ভেঙে পড়ছ? ভয় কি, আমি—আমিই তো তোমার আছি।'

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাত্তিরে জেগে-ওঠা অনুপম কুটিরের বড়ছেলেও বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার নীচে ডেক্‌চেয়ার পাতে। সেখান থেকেও আকাশের একফালি চোখে পড়ে। শহর এখানটার জমিতে থাবা বসিয়েছে, তবু আকাশটাকে এখনো মুঠোয় চেপে ধরতে পারেনি। বিছানায় শুয়ে, ডেক্‌চেয়ারে শুয়ে আকাশের গায়ে মেঘদের আসা-যাওয়া দেখা যায়, দেখা যায় চাঁদের ক্ষয় আর ক্ষয়-পূরণ, দেখা যায় আকাশে মাথা-তুলে-ওঠা-নারকেলগাছের পাতা-ঝিলমিল।

সেই ঝিলমিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝিলমিলিয়ে ওঠে টুকরো কথা, টুকরো হাসি।

'ধন্যি বড়দা, কি ছেলে আপনি! এমন সোনালী বিকেলটা, ঘর ঘুটঘুটে করে বই পড়ছেন? জানলাটাও খোলেন নি? কেন যে আপনাকে ছুটি দেয়!'...

'ও বড়দা, আপনি আজ চলুন না আমাদের সঙ্গে বাবাকে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে একা বসে থাকতে আমার ভয় করে।...মেজবাবু? তাঁর অনেক কাজ? ছোটবাবু? আর আমার তাহলে ঘুরে বেড়ালে স্রেফ্ ফেল করবে।'......

'কি বড়দা, বল্ড যে বলেছিলেন আপনি বাড়ী থেকে চলে গেলে তবে গান গাওয়া চলবে? এখন যে বড় শুনছেন?...কি, শব্দের জ্বালায় পড়তে পাচ্ছেন না তাই? ইস্ বিশ্বাস করলাম যে! তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন না?'

বড়দা! বড়দা!

বাড়ীর বড়ছেলের সম্মান!

এ সম্মানের তিলক মুছে ফেলা যায় না। এ তিলক যদি আগুনের টিকা হয়ে ওঠে, তবুও হাসি মুখে বহন করতে হবে।

আর এক ঘরে শুধু এক অশান্ত পায়ের পদচারণা। নীচের তলায় ও-ঘরে সুবল শোয়, সে ভাবে কি হল! ভুতুড়ে বাড়ীটাকে কি এবার বেহ্মদত্যিতে পেল? রাতভোর চলে বেড়ায় কে?

যে চলে বেড়ায়, সে অত খেয়াল করে না। সে মাঝরাতে হিড় হিড় করে চেয়ার টানে, খাটখানাকে টেনে টেনে একেবারে পাখার নীচেয় এনে ফেলে।

'কাকে চায় ও?'

দেয়ালকে প্রশ্ন করে নীলাঞ্জন।

না কি কাউকেই চায় না?

দাদার ঘরে ওর এত কি দরকার? দাদাটার সঙ্গে ওর এত কি কথা! দাদাটাকেও বলিহারি, ওর হাসির সঙ্গে গলা মিশিয়ে নির্লজ্জের মত হেসে ওঠে!

অনুপম কুটিরের কি অনুপমের আমলের দশা ঘটলো? সব সময় কথা, সব সময় হাসি, বাকী সময় গান! কই এতে এ বাড়ীর কারুর কিছুতে ডিসটার্ব হয় না?...আমার কথা আলাদা, আমি নিজেকে অমন হালকা করে ফেলতে পারি না। একটু হাসি, একটু দিঠি, একটু ছোঁওয়া, এ সবে আমি ভুলি না।

আমি যদি নিই তো, সব নেব, সম্পূর্ণ নেব। মুঠোয় পিষে গলিয়ে সোনার কৌটোয় ভরে রেখে দেব। যুদ্ধে নামতে হবে, দাদাটার সঙ্গে, ইন্দ্রটার

সঙ্গে। হোক। নেমেই দেখব। দেখব কতটা নামা যায়। ওকে আমায় পেতেই হবে।

আর ও-পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরএক প্রতিপক্ষ ভাবে, 'নাঃ আর না। কাল থেকে আবার বই-খাতায় হাত দিতে হবে। একদম কিছু হচ্ছে না। নীতার আক্রমণ এড়ানো যায় না, কিন্তু এড়াতেই হবে। বলতে হবে দোহাই তোমার, তোমার ওই সর্বগ্রাসী ডাকই সকল সর্বনাশের মূল!

কিন্তু আর না, পড়তে হবে।

ও ডাকে সাড়া দিলে চলবে না।

পড়তে হবে, কাল থেকে উঠে-পড়ে লেগে পড়তে হবে।......

আর সুচিন্তার সেই বড়ঘরে?

বাবার ঘুমন্ত চোখকে আলোর আড়ালে রেখে, টেবল-ল্যাম্পের কাছে মুখ নীচু করে বসে অনেক রাত পর্যন্ত চিঠি লেখে—সকল ঝঞ্ঝাটের মূল, সকল দাহের সুখ।

নীলাভ শৌখিন চিঠির কাগজে চিঠি লেখে না, লেখে সরকারী ছাপমারা আকাশচারী পত্রের পৃষ্ঠায়। ওর পিঠে সাগর-পারে গিয়ে দূতিয়ালি করবার প্রতিশ্রুতি আঁকা।

ছোট ছোট অক্ষরে পাতা ভর্তি করে নীতা, 'তোমার নির্দেশে বাবাকে নিয়ে এসেছিলাম। হঠকারিতা করে, এলে তাড়িয়ে দিতে পারবে না—এই ভরসায়। দেখছি তোমার কথাই ঠিক, বাবার চোখের সেই ধূসর ধূসর অসহায় ভাবটা যেন মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে, একটা প্রসন্ন আনন্দের স্বচ্ছ আভা ফুটে ফুটে উঠছে। সত্যিই আশা হয় এক এক সময়, বাবাকে হয়তো আবার সেই আগের মত করেই ফিরে পাবো।

তুমি যে শুধু আমার বাবার জন্যেই সাত সাগর পেরিয়ে ওখানে গেছ নতুন বিদ্যে আহরণ করতে, একথা ভাবলেই অসহ্য সুখে কানায় কানায় ভরে উঠি আমি। তুমি যতদিনে এসে পড়বে, ততদিনে হয়তো বাবা তোমার বর্তমান চিকিৎসাতেই আধাআধি ভাল হয়ে উঠবেন।

সেই মহিলাটি, যাঁকে আমি কি বলবো ভেবে না পেয়ে 'পিসিমা' বলি, বুঝতে পারি তাঁর অবস্থাটা জটিল। একদিকে তিনি বিব্রত হচ্ছেন, বিপন্ন ছেলেদের বাঁকা কটাক্ষে গুটিয়ে যাচ্ছেন, আর একদিকে মুহূর্তে মুহূর্তে আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন।

বুঝতে পারি বাবার মতন তাঁর জীবনও চিরনিঃসঙ্গ, এখন এই এক বৃহৎ শিশুর খেলায় যোগ দেওয়াই যেন তাঁর এক পরম পরিপূর্ণতা।

প্রথম যখন এলাম, মনে হয়েছিল বুড়ী হয়ে গেছেন, এখন আর যেন তা' লাগে না। মনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা থেকেও যেন অনেকগুলো বয়েস ঝরে গেছে। এক এক সময় একটা অপরাধবোধ আসে। মনে হয় বাবা যখন সেরে যাবেন, ভাল হয়ে যাবেন, বাবাকে নিয়ে চলে যাবো, তখন ওঁর কী দশা হবে?

কচ দেবযানীর সেই শেষাংশটুকু মনে পড়ে যায়......

'...আমার কি আছে কাজ, কি আমার
ব্রত।

আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে,
কি রহিবে কিসের গৌরব?

* * *

যেই দিকে ফিরাইব আঁখি,
সহস্র স্মৃতির কাঁটা...' দূর, তুমি কি আর জান না লাইনগুলো, তাই ঘটা করে লিখছি বসে বসে? তবে ও'র যে মন ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে মনকে আবার জাগিয়ে তুলে দিয়ে আমি হয়তো ও'র ক্ষতিই করলাম। অথবা ক্ষতিও নয়।

এইটুকুই ও'র জীবনের পরম সার্থকতা।

জীবনে পরম পাওয়া।

যাই হোক তাই হোক কিন্তু কি করবো বল? আমার যে তোমাকে পেতেই হবে। বাবাকে ভাল করে তুলতে না পারলে তোমার কাছে যেতে পাবো কোন পথ ধরে? যাবো কোন মুখে? অথচ 'এ জীবনটা যায় যাক?' বলে স্তিমিত হয়ে বসে থাকবার সাহস নেই। নিঃসঙ্গ জীবনের যা প্রতিক্রিয়া দেখছি।

ডাক্তারের চেম্বারে ওই কথাই হয়।

মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়েই চলেছে, তার কারণ মানুষ আর মানুষের আন্তরিকতাকে পাচ্ছে না। বড় বেশী যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে মানুষ, বড় বেশী কৃত্রিম। 'অন্তরঙ্গ বন্ধু' এটা ক্রমশঃই কথার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মন যদি মনের স্পর্শ না পায়, সে মন বাঁচবে কি করে? তুমি কবে আসছ? আর বেশী দেরি কোর না কিন্তু। দেরি করলে কি যে হয় বলা শক্ত। তোমার আহরিত মৎস্যটির দিকে তাকাবার জন্যে কাক আছে, চিল আছে, বেড়াল আছে।...... বুঝে দেখ। কত আর সামলাতে পারবো?...সবই তো লিখেছি আগে। রুগী নিয়ে এসে দেখি সবাই যেন এক

শুধু মেজজন সম্পর্কেই এখনো জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

একটি রোগী। সবাই মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে।

এদের রোগ কি জানো?

সাধারণ হয়েও নিজেদেরকে অসাধারণ ভাবা। অ-স্বাভাবিক মানে যে অ-সাধারণ নয়, এটা ওদের কেউ বোঝায়নি। বোঝায়নি, অতএব অসাধারণ হবার দায়ে এক সাধারণের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চলতে নিজেরাই ছোঁয়াচে রোগীর মত পাড়ার মাঝখানে নির্বাসিত হয়ে পড়ে আছে।

অসাধারণ হবার দায়ে বাড়ীতে কেউ কারো সংগে প্রাণখুলে হাসে না, গল্প করে না। অথচ সাধারণ, একেবারেই নিতান্ত সাধারণ। একটু টোকা দিলেই বোঝা যায়।

সুচিন্তা পিসিমাকে তবু বুঝি। চিরদিনব্যাপী নিঃসংগ জীবনের শূন্যতা ও'কে এরকম নীরব নিস্তরংগ করে ফেলেছে। আবার এক ধরনের আত্মপ্রেমিকও বটে। আপন মনের গভীরে নিমগ্ন থাকতে থাকতে আপনাকেই নিবিড়ভাবে ভালবেসে ফেলেছেন।

এই আত্মপ্রেমই এ'র জীবনের অবলম্বন। থাক, সে তবু বোঝা যায়। কিন্তু তিন তিনটে 'ইয়ংম্যান' ছেলে কেন এরকম হবে বল তো? অসহ্য লাগে না? আমি এদের সহজ করে তোলবার সাধনা শুরু করেছি। অবিশ্যি মনে হচ্ছে না খুব বেশী খাটতে হবে। ছোটটাকে তো ইতিমধ্যেই অনেকটা কায়দা করে এনেছি। বাড়ীতে বেশী সহজ হতে পারে না, বোধ করি লজ্জায় বাধে, বাইরে এসে যেন হাঁপছেড়ে বাঁচে।

তবু সত্যি বলবো, এদের প্রতি বেশ কিছু মমতার সঞ্চারও হয়েছে। বড় বেচারা মনে হয় এদের। বড়জনকে আমি ভক্তি করতে শুরু করেছি, ছোটজনকে স্নেহ করতে। শুধু মেজজন সম্পর্কেই এখনো জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

কাগজে আর জায়গা নেই, কাজেই লেনদেন অনন্ত। ইতি— (ক্রমশঃ)

ন্যাড়ামতন সেই লোকটা মরে গেছে। পদ্য লেখে, ছবিটা মনে আছে, তপু? অমল বলল। তপু দাঁড়াল না। পাছ-দুয়ারের পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখল। সেই সকাল থেকে কালো কুচ্ছিৎ হয়ে আছে। সারা গায়ে কাদা মেখে কদাকার হয়ে আছে। ও পাড়ে পালা-মাদারের গুঁড়িতে মস্ত বড় ফুটো। একটু আগে গোসাপটা ভেতরে ঢুকেছে। তলোয়ারের মত লেজটাও দেখা যাচ্ছে না আর। ঝিংলা-পোড়া সাপটা এখনো বউন্যা গাছের ডালে ঝুল খাচ্ছে। জলের কাছে দাঁড়িয়ে তপুর ভয় করছিল। মাছ ধরতে এসে ছোটদির হাতে সিঙি মাছে কাঁটা ফুটিয়েছিল। এত জল কোথায় ছিল তখন! ছোটদি কাঁদছিল। তপুর কষ্ট হচ্ছিল। ভয়। মা ছোটদিকে মারেনি।

বাঁশ বাগানের ওপাশে সাহাদের মাঠে জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ। চাষীরা পাট গাছ কাটতে এসেছে। নৌকো এসেছে। দেখতে না পেলেও লগি ঠেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে তপু। সাহাদের ছোট্ট মাঠটা এবার সত্যিকারের নদী হয়ে যাবে। তপুদের নৌকো নেই। কলাগাছের ভেলা ভাসিয়ে একদিন চুপি-চুপি নদীতে পৌঁছে যাবো। তপু ভাবল। অমলকে সঙ্গে নেবো।

গাবগাছের আড়ালে ক্যাশার পিসির ছাড়া ভিটেয় কারা ঘুর-ঘুর করছে। হয়তো পাতাল-কোঁড় খুঁজতে এসেছে টৌকানি ধোপার বউ। পুঁ[illegible] আমি খাই না। কেমন আঁশটে গন্ধ। ছোটদি খায়। বলে, 'কচ্ছপের মাংসের মত।' আমার কেঁচোর কথা মনে পড়ে। ঘেন্না হয়।

দূরে টিপ করে শব্দ হল একটা। তাল পড়ল ডাবর ঢালির গাছ থেকে। মা থাকলে ছুটে যেতো। কদমতলায় এক হাঁটু জল ভেঙে কুড়িয়ে আনতো। কেউ টের পেতো না। তপুকে বলত, 'কাউকে বলিসনে যেন আবার। বাবা গো বাবা! কী ছেলেই হয়েছে! যা পেটপাতলা! মাঝে মাঝে মা কেমন হয়ে যায়। তখন কান্না পায়—ছোটদির মত তপুকে বিশ্বাস করে না মা। পাকা বুড়ির মত কথা ছোটদির।

না জেনে বড় পুকুরে মাছ ধরার কথাটা সোনা বউদিকে বলে দিয়েছে সেদিন। রাত্তিরে এঁটো বাসন ধুতে গিয়েছিল মা। হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে ছোটদির সঙ্গে তপু। এঁটো ভাত খেতে ঘাটের কিনারে থলসে মাছের ঝাঁক এসে-ছিল। গামছা দিয়ে মা আর ছোটদি ধরে ফেলেছিল। পালিয়ে যেতে পারেনি। হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠতেই এক সঙ্গে মা আর ছোটদি ধমকে থামিয়ে দিয়েছিল। খুশির বদলে অবাক হয়েছিল তপু।

মাকে ডাকবো? তপু ভাবল। না, থাক। ভোরবেলা তালের ক্ষীর আর মুড়ি খেতে দিয়েছিল মা। তপু খায়নি। ছোটদি ঠোঁট বাঁকিয়ে ভেংচি কেটেছিল। খেয়ে-দেয়ে গুরুমার পাঠশালায় গেছে। হাসতে হাসতে ফিরে এসেছে। ছুটি হয়ে গেছে। কেন, তপু জানে না। সকালবেলা বাবা বেরিয়ে গেছে। কেমন গম্ভীর, থম-থমে হয়ে গেছে মুখটা। কথা বলেনি কারো সঙ্গে। দেখে ভয় না, কষ্ট হয়েছে তপুর।

মা বলেছিল, 'লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ। বেস্পতিবার ভরা পূর্ণিমায় কি যে-সে মানুষের মরণ হয়!' কেন যে চোখ দুটো ছল-ছলিয়ে উঠেছিল। সেই তখন থেকে মুখ ভার করে রেখেছে। কাছে যেতে সাহস পায়নি তপু। বড্ড বোকা মনে হয়েছে ছোটদির কাছে গিয়ে। এখানে

মেয়েদের বড় ইস্কুল নেই। থাকলে ছোটদিকে ভর্তি করে দিত বাবা। ছোটদি পালং চলে যাবে। মাসীমার কাছে থাকবে। ওখানে ইস্কুল আছে। তখন আর তপুর সঙ্গে কথা বলবে না ছোটদি।

—'জানিস, গুরুমা আমাকে 'প্রার্থনা' পদ্যটা পড়ে শোনাতে বলেছিল।'

মুখ ঘুরিয়ে ছাচতলায় নন্দদুলাল গাছের দিকে চেয়ে থাকে তপু। কাল সন্ধ্যায় যে ফুলগুলি পাঁপড়ি মেলেছিল এখন তারা চুপ-চাপ বিষণ্ন। আবার কালি হয়ে গেছে ফুলগুলি। দুপুরে চন্ডীর ডালে ফুলের দেখা নেই। অসম্ভব গোমড়া হয়েছে ছোটদির।

—'আমি-ও পড়েছি।'

—'কী?' চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল ছোটদি। অবাক হয়েছিল। 'কোথায় পড়েছিস?'

—'আমার বাংলা বইয়ে অনেক পদ্য আছে।' মুখ ঘুরিয়ে ছোটদিকে দেখে। হেরে যাবার চিহ্ন নেই কোথাও। বরং চোখে হাসি ফুটিয়ে তপুকে ঠাট্টা করে যেন। মজা পেয়ে হাততালি দিয়ে উঠবে এক্ষুণি।

—'তুই তো বিদ্যে বোঝাই বাবু-মশাই। কী পড়েছিস বল না।'

—'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে-বাঁকে......'

গোটা একটা পদ্য ছোটদিকে শুনিয়েছে তপু। না দেখে মুখস্থ বলেছে। চোখে পাতা না ফেলে অনেক-ক্ষণ চেয়ে থেকেছে ছোটদি। আশ্চর্য, অভিভূত হয়ে গেছে। যেন বিশ্বাস করতে পারেনি, তপুই বলেছে কিনা। অহংকার করার কথাটা মনেই পড়েনি। গোমড় খান-খান হয়ে গেছে। জব্দ করতে পেরে খুশি হয়েছে তপু।

—'আরো বলবো?' তপু তখন ক্ষেপে গেছে।

—'না।' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে তপুকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরেছে ছোটদি।

মা কিন্তু কিছুই বলেনি আজ। তপু ভেবেছিল, আদর করবে। ছোটদির মুখটা কালো করে দেবে। 'তুই কী ভাবিস ওকে? তোর মত ওর মাথায় ষাঁড়ের গোবর নেই।'

কিন্তু চুপ-চাপ শুনে গেছে মা। কিছুই বলেনি কাউকে। একমনে বঁটি পেতে বসে শুকনো সুপুরির খোলা ছাড়িয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে তো রাগা-রাগি হয়নি! বড়-কাকার মত বাবা মাকে রাগ করে না কখনো। বাবার সঙ্গে মায়ের কখনো ঝগড়া বাঁধে না। তবে, মায়ের মুখ অমন ভেজা-ভেজা কেন? চোখ দুটো ছল-ছলে? কাঁদলে নাকের ডগা লাল হয়ে যায়। কেমন ফুলো-ফুলো দেখায়। লুকিয়ে-লুকিয়ে মা বুঝি কাঁদে! কিন্তু কেন? এতদিন পরে আজ কি তার চারুদিকে মনে পড়ে গেছে? চারুদির কথা শোনালে মা এখনো কাঁদে। তপুর মনে পড়ে না। চারুদির কথা স্পষ্ট করে ভাবতে পারে না আর। ভাবতে না-পারার দুঃখটা আর তীব্র মনে হয় না। চারুদির অভাবটা আর অভাব হয়ে নেই। বুকের ভেতরে সেই দুঃসহ অস্থিরতা কেমন করে থিতিয়ে গেছে একদিন! কবে, তপু তা জানে না। টের পায়নি সেই শূন্যতা ভরাট হয়ে গেছে, উধাও হয়ে গেছে কবে।

তবে, মায়ের বুকের ব্যথাটা কি মরেনি? একেবারে উবে যায়নি সব? সেই শূন্যতার ভরাট হবে না কোনদিন? ঠিক বড় জেঠিমার মত। জটুদার জন্যে এখনো কেঁদে-কেঁদে ফিট হতে চায়। ব্লটিং পেপার কিম্বা গোলমরিচের ধোঁয়া নাকের সামনে ধরে জাগিয়ে তোলা হয়। মাকে-ও কি তেমনি করে চারুদির শোক ভোলাতে হবে। আমি তো ভাবিনে! আমার তো কষ্ট হয় না একটুও! ছোটদির? বাবার? ওরা কি মায়ের মতই চুপি-চুপি কাঁদে? ভারি বিশ্রী লাগে। বিরক্তি। অভিমানে বুক ভারি হয়ে ওঠে। দেখতে-দেখতে আশ-পাশে বন-পালা, পাখি-পাখালি, বিষ্টি, বিষ্টির শব্দ, পাছ-দুয়ারের টৈ-টম্বুর পুকুর, সাহাদের মাঠে চাষীদের গলা, নৌকোর শব্দ সব, সব ঝাপসা হয়ে আসে পলকে। তপু যেন বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। সবাইকে ছেড়ে একলা এইখানে দাঁড়িয়ে আছে কতকাল মনে নেই। আমাকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ না। মা কথা বলেনি। বলবে না। কেবল সব সময় ঠাট্টা করবে ছোটদি। মা কিছু বলবে না আর! কোনদিনই বলবে না! রাগে, দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। ঠিক চারুদির মত হারিয়ে যেতে। জটুদার মত। মা আবার চেঁচিয়ে কাঁদবে। কপাল কুটবে সারা দিন, সারা রাত। আমি আসবো না। ফিরবো না। যেমন আজ পর্যন্ত চারুদি ফিরে এল না। জটুদা-ও।

এলাচিলেবুর ডালে বসে চুপ-চাপ ঝিমোচ্ছিল। তপু দেখেনি। কী দেখে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল মাছরাঙাটা। চেঁচাতে-চেঁচাতে তপুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। পাখার বাতাস লাগল মাথায়। তপু টের পেল। টুপ করে একটা পিটুলি ফল খসে পড়ল পুকুরের জলে। শব্দটা গভীর শোনাল। মুহূর্তের জন্যে নির্জনতা ভয়ংকর মনে হল। নিজেকে নতুন করে একা মনে হল তপুর। একা আর অসহায়।

চারপাশে থালার মত ঢেউ তুলে গোলাকার ঢেউয়ের বৃত্তটা বড় হতে-হতে কোথায় মিলিয়ে গেল। ফলটা ডুবতে-ডুবতে, ডুবতে-ডুবতে ভেসে উঠল এবার। ভাসতে লাগল। ভাসতে-ভাসতে প্রায় পুকুরের মাঝামাঝি যেখানে তপু থৈ পাবে না সেইখানে গিয়ে হঠাৎ থেমে রইল। থেমে দুলতে লাগল। ফলটার দিকে চেয়ে রসগোল্লার কথা মনে পড়ল। বোশেখ মাসে কলকাতা থেকে ক্ষিতীশ মামা এসেছিল। ডোমসার বাজারে নিয়ে গিয়েছিল তপুকে। একমাত্র কানাই দাসের ছাড়া আর একটাও খাবারের দোকান নেই। আমি রসগোল্লা খেয়ে-ছিলুম। পেট ভরে গিয়েছিল। খেতে ইচ্ছে হয়নি আর। ক্ষিতীশ মামা অনেক-দিন পর-পর আসে। আবার এলে আমি অনেক বড় হয়ে যাবো। কোন ক্লাশ পড়বো তখন? সিক্স? সেভেন? এইট? তপু চোখের পাতা বুঁজিয়ে ক্ষিতীশ মামার কালো তেলতেলে, গোলগাল, হাসি-হাসি মুখখানাই দেখল।

আবার শব্দ হল। সর্-সর্, ঝর্-ঝর্ শব্দ। বাঁশবাগানের ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিলে হাওয়া। আশ-পাশের গাছ-গাছালি গা ঝাড়া দিলে। আড়া-মোড়া ভাঙলে বন-বাদার। জলের ফোঁটা পড়ে গা-মাথা ভিজে গেল তপুর। ভিজে হাওয়ায় কাদা মাটির সঙ্গে পাতা-পচা গন্ধটা টের পেল তপু। জোরে শ্বাস টানল। বুকের ভেতরে শির-শিরিয়ে উঠল।

এবারে অনেকগুলি পিটুলি ফল ভাসতে লাগল। চারপাশে ছোট-বড় অসংখ্য ঢেউয়ের বৃত্ত দেখা দিল ফের। তপুর এবার রেকর্ডের কথা মনে পড়ল। কলের গান নিয়ে এসেছিল সুকুমারদা। তপু রোজ দুপুরে ইস্কুল পালিয়ে মণিদের বাড়ি চলে যেতো। গান শুনত।

মণি বলে, রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া রেকর্ড নেই ওদের। সুকুমারদা অন্য কোন গান শোনে না। রবীন্দ্রনাথের অসুখ। ক'দিন ধরে যুদ্ধের খবর পড়া বন্ধ রেখেছে জেঠামশাই। বাবার সংগে সেই অসুখের কথাই বলাবলি করছে। কাল বিকেলে পোস্ট আপিসে গিয়েছিল বাবা। ফিরে এসে কারো সংগেই কথা বলেনি আর। জেঠামশাইকে কাঁদিতে দেখে তপু অবাক হয়ে গেছে। জলের দিকে চেয়ে তপু এইসব অসংখ্য কথা ভাবল। ভাবল। ভাবতে-ভাবতে, ভাবতে-ভাবতে অবাক হল, বিস্মিত হল। বিস্মিত হতে-হতে আহত, ক্লান্ত মনে হল। মনে হল কিন্তু পুরোপুরি অবস্থাটা অনুভব করতে না পেরে তপু অস্বস্তি বোধ করল। সেই মুহূর্তে দূরে কদম গাছের ডালে বসে মাছরাঙাটা চীৎকার করে উঠল জোর। তপু সামনে তাকাল। আশপাশে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে কেঁপে উঠল না।

আকাশে আলকাতরার মাখামাখি। দূরে বিষ্টি হচ্ছে কোথায়। এখান থেকে শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন অনেক দূরে একটুও না থেমে, না জিরিয়ে ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে কারা। তারই অস্পষ্ট অথচ অবিচ্ছিন্ন শব্দ এখানে দাঁড়িয়ে শোনা যায়। কারা হৈ-চৈ করছে। কে কোথায় কেঁদে উঠবে এখুনি।

অথচ এইখানে সবাই চুপ-চাপ। তপুর মত কিসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গাছগুলি হঠাৎ নিস্পন্দ। বাঁশের পাতাটি কাঁপে না। কখন নিথর হয়ে গেছে পুকুরের জল। বাতাস ওঠে না। ঢেউ-ও খেলে না। তপু ভাবল, কিছু হবে। এক্ষুণি এইখানে অথবা আশপাশে কোথাও কিছু হবে। জলের কাছে এগিয়ে গেল। জল দুলতে লাগল। ফুলতে লাগল হঠাৎ। তপু অবাক হয়ে পিছিয়ে গেল। পিছু-পিছু ছুটে এল জল। যেন পুকুরের মাঝখান থেকেই ফুলে উঠছে। কিনার উপচে উঠে আসছে ওপরে। ছুটে আসছে। তপুকে ছুঁতে চাইছে বার-বার। মনে-মনে কেঁপে উঠল এইবার। তপু চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে, 'ছোটদি, দেখে যা, । এই ছোটদি।'

ছোটদি এল না। সাড়া দিল না পর্যন্ত। দূরে জলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে তপু দাঁড়াল। রোয়াইল গাছটা বিকন পাতায় ছেয়ে গেছে। ন্যাড়া ডালগুলি সবুজ হয়ে গেছে ফের। কদিন থেকে টিয়ে পাখির ঝাঁকটা উড়ে আসছে। সারাদিনে কামরাঙার ডালে ডাকাডাকি, নাচানাচির শেষ নেই। মুখে চিনির দানার মত ডিম নিয়ে পিঁপড়ের মিছিল চলেছে। নারকেল গাছের মাথার দিকে এগিয়ে চলেছে। বিষ্টি হবে। মা বলেছে বিষ্টি হয়। মোটা আর কালো দড়ির মত কেঁচোটা পায়ের কাছে কিল-বিল করে উঠল। তপু সরে এল। গা ঘিন-ঘিন করছে। বউন্যা গাছের ডাল থেকে ঝুলখাওয়া জিংলা-পোড়া সাপটাকে দেখা যাচ্ছে না আর। নকুলদানার মত গর্তের ওপরে মাটির ডেলা। কেঁচোর মুখে-তোলা মাটির ছড়াছড়ি সর্বত্র। ব্যাঙটা কখন কোত্থেকে এল কে জানে! নারকেল গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসে দিব্যি আরামে টপা-টপ পিঁপড়ে গিলে চলেছে। আনারস গাছের তলায় কী খুঁটে খাচ্ছে শালিকটা! রান্নাঘরের চালা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না এখনো। মা কি রান্না চাপাবে না আজ? চাল নেই? বাবা কাল চুপি-চুপি সুপুরি বেচে এসেছে। মাকে বলেছে, 'এই নাও। মাখনসা' আট আনার বেশী দিলে না।'

—'তুমি তো একটা কথা শুনলে রাগ করবে।' মুখে হাসি ফুটিয়ে মুখ তুলেছিল মা। বাবাকেই দেখছিল।

পুরনো জামাটা ছাড়তে ছাড়তে বাবা বলেছিল, 'কী কথা?'

—'কাঁঠালটা বেচে দিয়েছি। তরকারি নিয়ে তাইজুদ্দি এসেছিল।' মায়ের মুখটা করুণ হয়ে গেল। সুন্দর দেখাল। তপুর তবু কষ্ট হতে লাগল।

—'ছেলে-মেয়ে দুটো খেতে পেলো না? কিনে তো খাওয়াতে পারিনে।'

—'ওরা কি খায় না? খেয়েছে তো কত? দুটো পয়সা এলে ক্ষতি কী?'

—'ক্ষতি নেই। ঠিকই করেছো।' বাবার গলা বুঁজে আসছিল। গলাটা

লিনোকাট   সুব্রত ত্রিপাঠী

শোনা যাচ্ছিল কি যাচ্ছিল না। হ্যারিকেনটা টিম-টিম করছিল। তেলের বড় টানাটানি। সহজে মেলে না। পয়সা দিয়ে চুরি করতে হয়। আঁক কষতে-কষতে শ্লেটের ওপরে সাপ আঁকছিল তপন্। ছোটদি মেলাতে পারছিল না ভাগটা। মা চলে গেল। অন্ধকারে রান্না-ঘরে গিয়ে কী করবে এখন? বিকেলের রান্না তো বন্ধ। দুপুরের ভাতে জল ঢেলে রেখেছে। রাঙা আলুর শাক রাঁধা আছে। কাঁঠাল বিচী ভাজা। গন্ধরাজ লেবু আর ভালো লাগে না। মায়ের চলে যাওয়া দেখে বাবার ওপরে রাগ হল। চোখ টিপল ছোটদি। সাপ মুছে অংক কষতে শুরু করে তপন্।

—'এখেনে কী করছিস রে? ইস্কুলে যাবিনে?' শন্দুর বাড়ির হরিপদ। এতক্ষণ 'কাচায়' ভেতরে কী করছিল। হাতে খালুই। বলে, 'সাহাদের পুকুর ভেসে গেছে, মনাই চক্কোত্তির ডোবাটাও। জল এইদিকেই আসছে। 'চাই' পেতে রেখে এলাম। ইস্কুলে না গেলে দেখিস কিন্তু, তপন্।'

—'ইস্কুলে যাবো।' তপন্ পা বাড়াল। হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই হরিপদর হাত ধরল। টেনে জলের ধারে নিয়ে গেল।

—'জলকম্পন হচ্ছে।' পরম অভিজ্ঞের মতই গলাটা আচমকা ভারিক্কি শোনায় হরিপদর। 'এবার জল হবে দেখে নিস। পাঁজিতে লিখেছে।'

হরিপদটা বড় হবে না কোন দিন? ও নাকি দাদার বয়সী! একটু-ও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

—'খবরের কাগজে কী লিখেছে রে?' তপন্ জিগগেস করে।

হরিপদ কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ায়। তপনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে।

—'যুদ্ধের খবর ছাড়া কী? দেশ স্বাধীন হবে দেখে নিস।' খানিক থেমে কী যেন ভাবে। মনে করে কুলিয়ে উঠতে পারছে নাকী। 'অ, কে যেন মরে গেছে তপন্। আজ ইস্কুলে না গেলি। ছুটি হয়ে যাবে। বুড়ো বয়সে বানিয়ে-বানিয়ে পদ্য লিখত লোকটা। খবরের কাগজে ছবি, নাম সব ছাপিয়ে দিয়েছে। কী মজা, না?'

—'তুই কোন ক্লাস অব্দি পড়েছিলি, হরিপদ?'

—'ক্লাস ফোর' অহংকার চুঁইয়ে পড়ে গলায়। চলতে-চলতে উত্তর দেয় হরিপদ। বাঁশঝাড়ের কাছে এসে থেমে পড়ে। 'বাড়ি যা তপন্। আমি এইখানটা দিয়ে চলে যাবো।' বাঁশতলার অদূরে নয়ানজুলিটা দেখায়। ঘোলাটে জলের স্রোতটা তির তির করে বয়ে চলেছে। 'দোয়ার পেতেছি এখানে। দেখি মাছ পড়েছে কিনা।' থলবলিয়ে এগিয়ে যায় হরিপদ।

চালতেতলায় দাঁড়িয়ে তপন্ ফুলের গন্ধ শোঁকে। বোয়াল মাছের মত চাটালো পাতার ফাঁকে শাদা ফুল। গন্ধটা কেমন ভেজা আর মিষ্টি। তপন্ কদমতলার দিকে তাকাল। পাপড়িগুলি ঝরে গেছে সব। গন্ধটুকু-ও উবে গেছে কবে। কেউ খেয়াল করেনি কখনো। তপন্ আবিষ্কার করল এই প্রথম। বুলবুলি পাখিটা চালতে ফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়ে খাচ্ছে। ঢিল ছুঁড়ে তপন্ তাড়িয়ে দিতে গেল। তক্ষুণি করমঝা ঝোপের দিকে চোখ পড়ল। পেকে কালো হয়ে আছে ফলগুলি। একটা ছিঁড়ে মুখে পুরল তপন্। টক। রক্তের মত চিবুকের পাশে গড়িয়ে পড়ছে রস।

—'তপন্, ইস্কুলে যাবিনে?' রান্নাঘরের জানলার কাছে ছোটদি দাঁড়িয়ে।

তপন্ বললে, 'যাই।'

একে একে বেরিয়ে এল সবাই। সামনের মাঠটা কালো হয়ে গেল। অসংখ্য ছাতা। গুণে শেষ করা ভার। এক সংগে গলা মিলিয়েছিল। দোতলার বারান্দা থেকে গুরু-গম্ভীর আওয়াজ এল। হেডমাষ্টার। মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল সবাই। চোখের দিকে চাওয়া যায় না। স্যার আশুতোষের খয়েরি রং ছবিটায় আংগুলে রেখে অমল বলেছিল, 'মিলিয়ে নে।' মিলিয়ে নিয়েছিল। হুবহু এক। খুঁত নেই কোথাও।

হেডমাষ্টার ক্লাশে এলে মুখ শুকিয়ে আসসি। বুক কাঁপে সব্বায়ের। গলার স্বর শুনলেই টের পাওয়া যায়। নিজের লেখা ইংরেজী গ্রামার ছাড়া আর কিছুই পড়ায় না। ভুল হলে মার নেই। তবু ভয়।

আজ কিন্তু অন্যরকম। বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। মুখ ভার করে, আফিসের ভেতরে ঢুকে গেল।

বিষ্টি পড়ছিল। তেরছা হয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছিল কাচের গুঁড়ি। ঝির-ঝির করে হাওয়া বইছে। শীত করছে। শরীরে কাঁপন ধরে যায়। ঘুড়ি ওড়াবার দিন আর নেই। সূয্যি উঠবে কবে! নাকি উঠবে না! কোনো দিনই না? ঢেউ-খেলানো টিনের চাল রুপোর মত সাদা। জল পড়লে টপ-টপ, টপ-টপ। মা কেন কাঁদে? মুখ কালো করে আছে কেন সবাই? লোকটা কি সব্বায়ের আপনার?

ধনদার হাসিটা মরেনি। বারান্দায় বসে অন্যদিনের মতই হাসছে। কালো দাড়িটা কি বিশ্রী! হাতে-হাতে সিংগাড়া, লবংগলতিকা তুলে দিচ্ছে। গুনে-গুনে পয়সা তুলে রাখছে কাচের বাক্সে। পয়সা থাকলে খেতুম। মা খেতে দিলে না কেন? রাত্তিরে চাল কিনে এনেছে বাবা। আজকে রান্নাঘরেই ঢোকেনি মা। বাবা কোথায় চলে গেছে। এত রাগারাগি কিসের? কথা বলাবলি বন্ধ হল কেন? এখন ফিরে গেলে খেতে পাবো? সকালবেলা ভাল ক্ষীর আর মুড়ি খেলে হত। আমি কি বোকা! ছোটদির পেটে পেটে বুদ্ধি। ও জানতো, সারাদিন উপোস দিতে হবে। একলা খাবার লোভে বললেনি। হিংসুক। হিংসের পুঁটলি!

চেপে বিষ্টি এল। ঝম-ঝম, সাঁ-সাঁ, সোঁ-সোঁ শব্দ করতে করতে সাদা পর্দাটা এগিয়ে এল। অশ্বত্থগাছের মাথায় দুলতে লাগল। পাতা চুঁইয়ে জল পড়বে এখুনি। চিরুনির মত নারকেল পাতাগুলি নিচু হয়ে নেমে এল। পুকুরের জল টগবগিয়ে উঠল। পেটের ভেতরে নাড়ী-ভুঁড়ি মুচড়ে উঠল। পাল্লা দিয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করল সবাই। টানা, লম্বা বারান্দাটা গিজগিজ করে। টিনের চাল বাদ্যি বাজাতে শুরু করে। একটানা অবিরাম। কারো কথাই কানে ঢোকে না। গুণ-গুনানি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। ঢাকে কাঠি পড়ে। চোখ ঝলসে গেল পলকে। অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। এক্ষুনি রাত হয়ে যাবে যেন। অমল আসেনি। শ্যামলও না। কার সংগে বাড়ি যাবো তখন। ছাতা, লণ্ঠন নিয়ে

বাবা কি খুঁজতে বেরোবে আজ? বাবার বড় কষ্ট। না মরলে কী হত লোকটার?

—'এই তপু, আয়।' বিমান ডাকে। পিঠে চিমটি কেটে টেনে নেয়।

ক্লাস এইটের দরজা দিয়ে পিল-পিল করে ঢুকছে সবাই। বারান্দাটা প্রায় ফাঁকা।

বেড়া সরিয়ে মস্ত বড় হল বানানো হয়েছে। যেন পরীক্ষা বসবে এইবার। দু' সার বেঞ্চির মাঝ বরাবর সরু পথ। সামনে তিনটে টেবিল জোড়া লেগে একটা হয়েছে। টেবিল ঘিরে অনেকগুলি চেয়ার।

ওকে! সেই লোকটা যে! কী যেন নাম? বাংলা বইয়ের সেই পদ্যটা মনে পড়ে। সত্যেনবাবু পড়াতে পড়াতে চোখে জল আনেন। কবে যেন দেখা হয়েছিল। পড়া বন্ধ রেখে গল্পের মত এই লোকটার কথাই তো শুনিয়েছেন কতবার! বলতে-বলতে গলা বুজে আসে। শুনে হাসি পায়। পাগল! বি-এস-সি বলেছেন, বই-পাগলা! অমল বলেছে, হীরালাল দাশের মতই! হেলেনার মা গুরুমার পাঠশালায় ইংরেজী দিদিমণি। মার খেয়ে কপাল ফুলিয়েছে সেদিন। হাতের মুঠি শক্ত করেই বসে থাকে তবু।

এক, দুই করে সবাই আসে। আপিস-ঘর খালি হয়ে যায়। হল-ঘর ভর্তি। ব্রজদার আসা-যাওয়া নজর এড়ায়। কেউ দেখে না ওকে। আজ বুঝি ঘণ্টা বাজিয়ে কাউকে ছুটি দেবে না ও। সবাই এখানে। ওর কাজ এঘরে-ওঘরে সবখানে।

হেডমাস্টারের আগু-পিছু সবাই ভেতরে ঢোকে। কারো-কারো মাথা হেঁট। মুখে মেঘ জমেছে সব্বায়ের। যে-যার চেয়ারে বসে পড়ে। গুঞ্জন থেমে যায়। সত্যেনবাবুর চোখের পাতা ফোলা। হোসেন আলি সাহেব একবার উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে থেকে নাক ঝাড়ার শব্দ শোনা গেল। চেয়ারে ফিরে মাথা নিচু করে কী ভাবতে লাগলেন।

হারমোনিয়াম এসেছিল। পুকুরের ওপারে সেক্রেটারির বাড়ি থেকে টেনে এনেছিল নসুদাই। গান গাওয়া হল না। অথচ গান শুনবে বলেই না তপু এমন চুপচাপ বসে আছে! সরস্বতী পুজোর রাত্রে থিয়েটার হয়েছিল। একলা নসুদাই মাত করে দিয়েছিল সবাইকে। সেক্রেটারির মেয়ে উমা নেচে অবাক করে দিয়েছিল। আর কোনদিন উমাকে দেখেনি। উমাকে দেখলে কান্না পায়। আবছা করে চারদিকেই ভাবতে ইচ্ছে করে।

বিষ্টি পড়া থেমে এল। টিনের চালে খৈ ফুটছে না তেমন। খোলা জানলা দিয়ে সারা ঘরে এক ঝলক ভিজে ঠান্ডা হাওয়ার চাদর উড়ে গেল। বনের গন্ধটা টের পেল তপু। সামনের মাঠে ভিজে ঘাস আর মাটি। কোথা থেকে দুটো বক উড়ে এসেছে। পাউডারের গুঁড়ির মত বিষ্টি আর গায়ে লাগছে না। আস্তে-আস্তে পা ফেলছে। সারা মাঠে কেঁচো খুঁজে বেড়াচ্ছে। ফুলের বাগানটা ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিয়েছে। বিষ্টির দিন ফুরোলে ব্রজদা ফের সুন্দর করে সাজাবে। সূর্যমুখী মাথা নিচু করে ভিজছে। আমার শীত করছে। জামাটা শুকিয়ে যাবে এক্ষুনি। মাঠের কোণে দরোয়ানের ছোট্ট ঘর। দেখে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। অমনি একলা রেঁধে খাবো। রাত জেগে সারা মাঠে হৈ-হৈ করে বেড়াবো। বাধা দেবার কেউ থাকবে না। চোখের জলের মত বিষ্টি। ঘর পালিয়ে রোদ এসে টিনের চালে শুল। এক-দুই করে জলের ফোঁটা গুনতে শুরু করল তপু। চাল থেকে ধোঁয়া উঠছে শূন্যে। আমার জন্যে না খেয়ে বসে আছে মা। সভা ভাঙলে সটান মায়ের কাছে চলে যাবো। চিত্তর গলা শোনা গেল। হেনার দাদা চিত্ত। তপু ফিরে তাকাল। খবরের কাগজ পড়ছে। 'সব শেষের কবিতা? মরার ক'দিন আগে লিখেছে বললে? তোমার সৃষ্টির পথ......তারপর?' কেউ বলতে পারে না। ভারি খারাপ লাগে তপুর।

শুধু পদ্য না? গদ্য-ও? অনেক-অনেক লেখা? সারা জীবনে শেষ করা যাবে না? মানুষ কত বছর বাঁচে? কত বয়েস আমার? ছোটদির......বাবার ......মায়ের? বাবা সব পড়েছে, সব?

চোখে জল নিয়ে সত্যেনবাবু বসে পড়লেন।

হোসেন আলি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

তপু বাইরে এল।

...মানুষ ছিলেন! একটা শতাব্দী! সভ্যতার সংকটের মুহূর্তে...

এর মানে? আমরা কী? আমি? একশ' বছরে শতাব্দী! সভ্যতার অর্থ? সংকটের?

—'চিত্তদা, কাগজটা দেবেন?'

—'কেন রে?'

—'পদ্যটা পড়বো।' তপু ঢোক গিলল। লজ্জায় লাল হতে চাইল।

—'ভাগ্।' চিত্ত না, নসুদাই ভাগিয়ে দিলে।

রাগে, দুঃখে, অপমানে কথা বেরোল না আর। নিঃশব্দে মাঠ পেরিয়ে দরোয়ানের ঘরের পেছনে চলে এল। চোখ মুছল। অথচ তপু জানে চিত্তর হাসি কিংবা নসুর কথা ওকে অপমান করেছে, আঘাত করতে পারেনি। রাগ হয়েছে, দুঃখ পায়নি আদৌ। তবে?

সত্যেনবাবুর কথাগুলি এখনো কানে বাজে। রবীন্দ্রনাথ মানুষ ছিলেন। আমাদের চেয়ে অনেক বড় মানুষ। জগৎ জুড়ে আজ শুধু একটা নাম! লোকটা মরে গেছে! নামটা বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে চিরকাল! আমরা বুড়ো হব! মরে যাবো একদিন! আমরাও! আমাদের নাম ধুয়ে-মুছে যাবে। তবু শত বর্ষার বৃষ্টিতেও একটা নাম ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হবে না। ঢেউয়ের পরে ঢেউ আসবে! মানুষের পরে মানুষ। আমাদের পেছনেই আসছে তাদের মিছিল। তারাও এসে পাবে একটি নাম, অসংখ্য বই।......

কী সুন্দর করে কথা সাজাতে পারেন সত্যেনবাবু! কথার মালা যেন! কথায়-কথায় ছবি! ভাবতে ভালো

লাগছে এখনো। কান্না পাচ্ছে। সতোন-বাবুর মত কাঁদতে ইচ্ছে করছে!

আমি হব, আমি হব একদিন! ঠিক চারুদি কিংবা জটুদার মতন, মা-বাবা-ছোটদি কিংবা জেঠিমা না—এমনি করে একটি নাম আর অনেক বই রেখে যদি চলে যাই, মরে যাই যদি!! হয়তো সবাইকে কাঁদাতে পারি আমিও! আমরা সবাই!

চোখ মুছতে মুছতে বাজে-পোড়া জামগাছটা দেখল। মাথাটা আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। কাঠঠোকরা পাখিটা বল্লমের মত ঠোঁটের ঘায়ে বাসা তৈরি করছে। ফুটোটা বড় হচ্ছে আস্তে-আস্তে। বড় আর অন্ধকার। এক সময় গাছের ভেতরে নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে হয়তো। তপু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মাথাটা পেছনে কাঁধের ওপরে ভেঙে কাত করে রাখল। চোখ দুটো শূন্যে তুলে কিছু দেখতে চাইল।

দরোয়ানের ঘরের চাল থেকে একটু আগের সেই রোদের ছেঁড়া আর ভেজা আর সাদা ন্যাকড়াটা চুরি হয়ে গেছে। দূরে-কাছে সবুজ বনে কালি ঢেলে দিচ্ছে কে! আবছা-অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। মেঘের ভারে আকাশ মাথার ওপরে নেমে আসতে চাইছে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে ধনুচি নৃত্য শুরু করেছে কারা। আকাশ জুড়ে দলা-দলা ধোঁয়ার কুণ্ডলি! তপু ছুটতে লাগল। বিষ্টি আসার আগে বাড়ি পৌঁছে যাবো। সামনে চাষীদের পাড়া। পাড়-বাঁধানো পুকুরের আয়না! গা ডুবিয়ে নিজের চেহারাই দেখছে আকাশ। এক কোণে পুরনো বট। খড়ের চালার পাশে কলা-পাতার হাতছানি। দাঁড়িয়ে দেখা বারণ। এক চিমটি সময় নেই হাতে। বিষ্টি, বিষ্টি, বিষ্টি!

কাঠের সিন্দুকের ওপাশে ছোট্ট কুঠুরি। লক্ষ্মীর আসন পাতা মায়ের। আবছায়ার ভেতরে ভূতের মত বসে মা। দাওয়ায় বসে উঠোনের জলে খোলাম-কুচি ছুঁড়ছে ছোটদি। উঠোনময় মোচার খোলা ভাসছে। ভাসতে-ভাসতে ছাঁচ-তলায় জমা হচ্ছে এসে। উল্টে যাচ্ছে। গা-মাথা ভিজিয়ে তপুকে ছুটে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেল। তপু ঘরে ঢুকল। ভিজে পায়ের ছাপ লেগে সারা ঘরে আলপনা আঁকা হয়ে গেল। লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ।

শুকনো জামা-প্যাণ্ট পরে তপু দারান্দার তক্তপোশের ওপরে উঠে এল। খাওয়ার কথা ভুলে গেল। খেতে ইচ্ছে করছে না আর। মা ডাকল না বলে অভিমান হল না। তপু এখন ভুলে যেতে চাইল সব, সবাইকে!

ছোটদি উঠে এল। ফিসফিসিয়ে বললে, 'খাবিনে, ভাইটি? ভাত ঢাকা দেয়া রয়েছে।'

তপু তবু চুপচাপ। যেন শুনতে পেল না কিছুই।

ছোটদি ঠোঁট ওল্টাল। ভেংচি কাটল। তপু দেখল না। নির্বিকারভাবে তক্ত-পোশে পা রেখে সিন্দুকের ওপরে উঠে বসল। ছোটদি কী ভেবে বেরিয়ে গেল। বাইরে অনর্গল বিষ্টি। আকাশটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মনে হয়। টিনের চালে আছড়ে পড়ছে, শব্দ হচ্ছে ঝম-ঝম, ঝম-ঝম। কানে তালা লাগে। এক-একটা ঝাপটা দেখে চানের পরে গামছা দিয়ে পিঠ বাঁকিয়ে মা কিংবা ছোটদির চুল ঝাড়ার কথা মনে পড়ে।

চোরের মত নিচে মাকে দেখল। চুপি চুপি উঠে দাঁড়াল তারপর। নিঃশব্দে ইতি-উতি তাকাল। যেন টের না পায়। বাবা এখন নেই। জেঠামশায়ের ঘরে। কাগজ পড়ছে। কেউ না বলে দিলেও তপু জানে। রোজ যায়। সন্ধ্যের পরে ফেরে। সুতরাং তপু নির্ভয়। মাথার ওপরে পাড়ের সুতোর তৈরী নক্সা-কাটা 'জোত'। 'জোতের' ওপরে ঝুলন্ত র‍্যাক। থরে-থরে বই সাজিয়ে রেখেছে বাবা। আর কোনদিন হয়নি, আজকে লোভ হচ্ছে দেখে। কদিন আগেকার কথাটা ভেবে শিউরে উঠল। বুকের মধ্যে ভয় আর আতঙ্ক আর দুঃখের একটা মিশ্র অনুভূতি মুহূর্তের জন্যে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে দিলে। একা-একা চোর-পুলিশ খেলতে গিয়ে লাঠির ঘায়ে গোলাপের চারাটা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে জোগাড় করেছিল বাবা। সকাল বেলা দেখে ক্ষেপে গিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠেই মার খেতে হয়েছিল সেদিন। প্রতিশোধের আশায় এইখানে উঠে এসেছিল। একে-একে অনেকগুলি বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলেছিল। বাবা টের পায়নি। যখন পাবে! না পেলেও এখন কষ্ট হচ্ছে তপুর। জানতে ইচ্ছে করছে, কোন্ বইয়ের!

বইটা হাতের কাছেই পেয়ে গেল। ওপরে জড়ানো টানা অক্ষরে লেখা নাম। ছবির মত আখর। এই নামই তো চেনা তপুর। সতোনবাবুর মুখে শোনা গল্পের সেই মানুষ। রূপকথার চেয়ে রমণীয় মুখ। নিজের বইয়ের পাতায় যে মুখের সঙ্গে দেখা হয়েছে কয়েকদিন আগে, সেই মুখ! ছবি উল্টিয়ে বুকের ভেতর মুচড়ে উঠল। বাবার ওপরে রাগ করে পাতাগুলি আমি ছিঁড়ে ফেলেছি একদিন, আমিই! দুচোখ ঝাপসা হয়ে লেখাগুলি অস্পষ্ট হতে লাগল।

মা ডাকে, 'তোর ক্ষিদে-তেষ্টা নেই? খাবিনে তপু?'

কে শোনে! তপু তখন অনেক দূরে চলে গেছে। অজানা-অচেনা কোন জগতে। সে এক নতুন রূপকথার দেশ। কানের পাশে গানের মত শোনা যাচ্ছে সে কার আপন-করা, কাছে-টানা গলা!

…'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা'

তখন ভেতরে-বাইরে দুঃখের বর্ষা সুখের হয়ে নেমেছে! এতকালের চেনা পৃথিবীর সীমা গেছে হারিয়ে!

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধীরে ধীরে নেমে এলাম। নীরেনও মুখে রুমাল চাপা দিয়ে পশ্চাতে। আমাদের আস্তানা ঠিক হয়েছিল মন্দিরের ঠিক পাশেই গুজরাট হাউসে—সেটাই সরকারী রেস্ট হাউস। রাস্তার সামনেই সিমেন্ট-বাঁধানো একটা ছোট্ট পুল—দোতলার প্রবেশ-পথ। তারি নীচে দিয়ে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে আমাদের আস্তানায় যেতে হয়। ঘরগুলো যেমন অন্ধকার তেমনি স্যাঁতসেঁতে, সূর্য-কিরণ প্রবেশের পথ নেই। প্রেসিডেন্ট-সাহেব যদিও নিজেই চিঠি দিয়েছিলেন, তবু, যেখানে আমাদের থাকবার কথা, সেই দোতলাটি তিনিই তাঁর দলবল নিয়ে দখল করে বসেছেন। আমরা তাঁদের মাথায় করে রাখি আর তাঁরা আমাদের পায়ের তলায় রাখেন, কারণ তাঁদেরই অনুমতিপত্রের কৃপায় এই অসূর্যম্পশ্য কক্ষ পেয়েছি। এই তো জাগতিক নিয়ম। কখনও নৌকার উপর গাড়ী, কখনও বা গাড়ীর ওপর নৌকা।

ফিরে এসেই গুপ্তকাশীর দ্বিতীয় অধ্যায়। কুণ্ডচটী থেকে গুপ্তকাশীর আড়াই মাইল চড়াই-পথে উঠবার ফলে আমার মাথার ওপর দিয়ে চাঁদা করে বাক্যবাণের যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল, বদরীনারায়ণে, মৌনীবাবাকে দর্শন করে ফিরে আসতেই তার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হোল।

পরিত্রাণ পাওয়া চাই তো। বেগতিক বুঝে আমি নীরেনের স্কন্ধে অহেতুক দোষ চাপাতেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে বলে :

—তা' বলবে বৈকি? দোষ করলে তুমি, বিখ্যাত ভাগ্যবান আমার।

—সেটা তো তোমার শাপে বর। আর দোষই বা কী? মৌনীবাবাকে দর্শন করাটা কি অপরাধ?

—তবে স্বীকার করতে এত কুণ্ঠা কেন?

—ঝামেলার ভয়ে।

এখানেই কিন্তু শেষ হ'ল না। একজনের পর একজন আমাকে বলেই চলেছে—অমুজার মা, অনুজা, পুত্র-স্থানীয় গুণেন, গণেশ প্রভৃতি। এমনকি ভৃত্যদ্বটিও বাদ গেল না।

গা-ঢাকা দিলাম।

প্রচণ্ড খিদে। কিন্তু কথা শুনে তো আর পেট ভরে না—বরং মাথা গরম হয়। তাই দোকানে গিয়ে কিছু দুধ আর কিসমিস খেয়ে নিলাম। তারপর সেখানেই একটা ছোট্ট ঘরে চুপ করে বসে আছি। ওদিকে খাবার তৈরী; আমার তলব পড়ে, দেখতে না পেয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি শুরু হয়েছে—দু-চারটে পাণ্ডা নীচে ওপরে খুঁজে বেড়ায়। আমি যেখানে খাবার খেয়েছি, সেই দোকানেও তারা এসে আমার আকৃতি বর্ণনা করে খোঁজ নেয়—ভেতরে বসেই আমি শুনতে পাই—আমার জন্যে নাকি হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে।

আর বসে থাকা চলে না—আত্মপ্রকাশ করি। মুখে মেঘ ও রৌদ্রের বিকাশ—গাম্ভীর্য ও হাসির সংমিশ্রণ।

আমাকে দেখেই সব ঝড় থেমে গেল। ইত্যবসরে ওদের মধ্যে ঠিক হয়েছিল, আমার ওপর আর আক্রমণ করা চলবে না। প্রত্যেকটি মুখের সরল ভাব দেখেই সেটা অনুমান করে নিতে কষ্ট হোল না।

তখন বেলা চারটে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখি, সবাই আপন আপন থালার সামনে আমার প্রতীক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে আছে। ইতিমধ্যে সকলেই তপ্তকুণ্ডে স্নান সেরে যে যার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। নীরেন, গুণেন, গণেন দাঁড়ি কামিয়ে সব ফিট্‌ফাট বাবু। কেবল আমিই বাদ পড়ে গেলাম।

নীরেন আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল।

—এই যে দাদা, উদয় হলে শেষটায়?

হ'লাম বৈকি—মেঘে ঢাকা পড়েছিলাম, সেটা কেটে না গেলে কি

আর উদয় হওয়া যায়? সূর্যের ক্ষমতা নেই—আমি কোন্ ছার।

—যাক, বাঁচালে। খিদের চোটে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি সব সিদ্ধ হবার উপক্রম।

—কেন, খেতে বারণ করেছিল কে?

—তা-কী হয়? ভোজনে চ জনার্দনম্—জনার্দনকে বাদ দিয়ে কী খাওয়া চলে?

—তা' বটে, একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো।

সকলের উচ্চগ্রামের হাসিতে সেই অন্ধকার কক্ষ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে মনে চিন্তা করি, আমার ছালের জন্যেই তারা সব একজোট হয়ে A B C D Front রচনা করেছিল—কিন্তু বুঝেও তো উপায় নেই। এইসব বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও যুক্তির সমন্বয় করে অঙ্ক কষা চলে না। তখন জীবনের ডাকটাই বড় হয়ে ওঠে।

সবে মাত্র খেতে বসেছি, এমন সময় কালো মোটা সেই চিহ্নিত কুকুরটি এসে হাজির—ঠিক আমার সামনেই, যেন কত অধিকার নিয়ে, থাবা পেতে বসে পড়ে। প্রথমেই তাকে দুধ-রুটি দিয়ে আপ্যায়ন করি। তিনিও মহাতৃপ্তির সঙ্গে উদরস্থ করে যান। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। পথ দেখাবার মাশুল আদায় করে তিনি কোথায় যে উধাও হলেন, তারপর যে তিনদিন সেখানে ছিলাম—তখন বা ফেরার পথেও আর মোলাকাত হয়নি।

সকলের ভূরি-ভোজন-পর্ব শেষ হয়ে গেল। যে যার বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

স্নানের পর আহার এই তো নিয়ম। সেদিন আমার হ'ল উল্টো—আহারের পর স্নান। রুদ্ধ কক্ষে এক ফোঁটা আলো নেই। সন্ধ্যে ছ'টার আগে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলবে না। কাজেই একটা লন্ঠন জ্বালিয়ে শিষ-পড়া চিমনির ঘোমটা-দেওয়া মিটমিটে আলোতেই তৈল মর্দন করে নিলাম। তারপর সুড়ঙ্গপথের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে রাস্তায় উঠে খানিকটা গিয়েই আবার অনেক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়ে তবে তপ্তকুণ্ডের দর্শন পেলাম। ওপরেই কম্বল খুলে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ি—প্রথমটা গা ছ্যাঁক্ করে উঠলেও পরে বেশ আরাম হ'ল। প্রায় আধঘন্টা সেই গরম জলে দলাই-মলাই করা গেল—স্নান সেরে ওপরে উঠি। মনে করেছিলাম, হয়তো শীতে খুব কাঁপন ধরিয়ে দেবে, কিন্তু ওপরে উঠেও শরীর বেশ গরম। আবার সেই কম্বল মুড়ি দিয়ে ডেরায় ফিরে যাই। দেখি সবাই বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ক্ষৌরকার্যটাও সেরে নিলাম।

আরতির সময় উপস্থিত। বহু ডাকাডাকির পর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তারপর নববস্ত্র পরিধান এবং ভক্তিগদ-গদচিত্তে সকলের সান্ধ্য-আরতি দর্শনে যাত্রা।

আমরা মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। অনতিদূরেই একটা লম্বা কাঠের রেলিং। সেখানেই আরতি-দর্শনপ্রার্থী বহু যাত্রী দণ্ডায়মান। আমরা তাদের মধ্যেই দাঁড়াবার স্থান করে নিলাম। লম্বা মানুষ, তাই মন্দিরের ভেতরে পূজা-আরতি দেখতে আমার কোনও অসুবিধা নেই; কিন্তু আর সকলে সে সুযোগে বঞ্চিত। দেখলাম টেম্পল কমিটির প্রেসিডেন্ট পদাধিকারবলে রেলিং-এর ভেতরে মন্দিরের দরজার সামনেই এক সুদৃশ্য কার্পেটে সুখাসীন। এক রাওল পূজারী ছাড়া আর কারও নাকি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার নেই।

নাই বা থাকল। ওই জ্যোতির্ময় মূর্তি যেখানে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত সেই মনের মন্দিরে যদি আমরা প্রবেশাধিকার না পাই, তবে শুধু শুধু এই মন্দিরের ভেতরে ঢুকে লাভ কী?

আরতি শুরু হ'ল। রেলিং-এর ভেতরে দু' পাশে দুটি লম্বা কাঠের আসন পাতা আছে—সেগুলো বাক্সের মত ব্যবহার করা যায়—আবার ডালা বন্ধ করে তার ওপর বসতেও অসুবিধে নেই। দুধারেই ব্রাহ্মণগণ বসে যখন যে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, ভেতরে রাওল ঠাকুরের পূজা ও আরতিও সেইভাবেই চলতে থাকে। হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরে আমাকে দেখতে পেয়েই আচার্য ব্রজ-মোহন সহাস্যে আহ্বান জানিয়ে কার্পেটের ওপর নড়েচড়ে বসলেন। আমিও এগিয়ে যাই, নীরেন, তার সহ-ধর্মিণী, এবং আমরা সবাই "দুটি দুটি দুটি লইয়া চরণ" সেখানেই গিয়ে জাঁকিয়ে বসি!

সম্মুখে শ্রীশ্রীবদরীবিশালের কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত বহুমূল্য মণি-মাণিক্য-খচিত বস্ত্রাভরণযুক্ত বিচিত্র মুকুট-শোভিত অপূর্ব মূর্তি। দক্ষিণ দিকে শ্রীকুবের ও শ্রীগণেশের মূর্তি। বামে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও নর-নারায়ণের বিগ্রহ, গরুড়, উদ্ধব এবং ছোট ছোট অনেক বিগ্রহ দেখতে পেলাম। শ্রীশ্রীবদরী-বিশালের ললাটে বসানো একটি হীরক-খণ্ডের দ্যুতি ঠিক'রে বেরিয়ে আসছে—পরম প্রার্থিত স্থান পেয়ে সে যেন অপূর্ব দীপ্তি-মহিমায় সমুজ্জ্বল। ব্রাহ্মণদের মিলিত কণ্ঠের মন্ত্র-সঙ্গীতে সমস্ত মন্দিরটি গম্‌গম্ করে ওঠে—সেই শব্দতরঙ্গের ধ্বনি শ্রীশ্রীবদরী-বিশালের চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে।

চোখের পলক পড়ে না।

নির্বাক মুগ্ধ বিস্ময়ে রাজরাজেশ্বরের আরতি দর্শন করে যাই। শেষ হতেই পূজারী প্রজ্জ্বলিত পঁচিশ দীপের ঝাড় আমাদের সামনে রেখে গেল। আমরা দীপ-শিখায় হাত বুলিয়ে ললাটে স্পর্শ করি। আরতি শেষ হলেও বাইরে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণদের সুললিত কণ্ঠের বন্দনাগীতি চলতে থাকে।

অন্তর অভূতপূর্ব মাদকতায় ভর-পুর। রাওল ঠাকুর প্রথমে প্রেসিডেন্ট আর তাঁর পত্নীকে নির্মাল্য দিলেন, তারপর আমরা পেলাম। আশীর্বাদী পুষ্প মাথায় ঠেকিয়ে পকেটে রাখি। তখন পূজারী আমাদের ললাটে পীত-চন্দন তিলক পরিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীবদরীবিশালজীর অঙ্গে যেসব অলঙ্কার পরানো হয়েছিল, আরতির পর সেগুলি একে একে খুলে নেওয়া হ'ল। রত্নখচিত মুকুটটি প্রেসিডেন্ট দেখতে চাইলেন। রাওল ঠাকুর মুকুটটি তাঁর হাতে দেওয়া মাত্র তিনি মাথায় ছুঁইয়ে বললেন—বহুমূল্য মুকুট—দাম সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। আমিও উদ্‌গ্রীব হয়ে গ্রীবা বাড়িয়ে দিতেই, প্রেসিডেন্ট-পত্নী মুকুটটি আমার মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন।

বহুমূল্য চুণী, পান্না, নীলা, মুক্তা মধ্যস্থলে বড় একখানা হীরক-খচিত সোনার মুকুটখানি সত্যিই দেখবার মত। এইসব মণি-মাণিক্যের যদি কিছু মূল্য বা মর্যাদা থাকে, তাহ'লে ঐ রাজ-রাজেশ্বরের মাথায় যখন তাদের স্থান হয় বা যখন তাঁর অঙ্গাভরণে লাগে, তখনই তাদের দ্যুতির সার্থকতা। পূজারী বদরীনারায়ণের চরণের নির্মাল্য এনে ও'দের এবং

আমাদের হাতে দিলেন। প্রেসিডেন্টকে বলি ঃ

—ফুল ফুটে আবার ঝরে যায়, এইটুকু জীবনের মধ্যে তারা কী বলে গেল—তাদের ভাষা কখনও পাঠ করে দেখেছেন?

তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

কথাটির পুনরুক্তি করলাম। উত্তর না পেয়ে আবার বলি—

—নিত্যবিলাসের উপকরণ ফুল—কত নরনারীর কণ্ঠে মালা হ'য়ে দোলে—কবরীবন্ধে তার কত শোভা; ক্লাবে, পার্টিতে, বিয়ের আসরে ফুলের কত ছড়াছড়ি, কিন্তু দেবতার চরণে ঠাঁই পাওয়াটাই তার জন্মের সার্থকতা।

এবার আচার্য ব্রজমোহন এক গাল হেসে মাথা দুলিয়ে বলে উঠলেন—জরুর, জরুর।

—তাই বলে বলছি না যে, কেউ ফুল ব্যবহার করবে না বা কেউ অলঙ্কার গায়ে দেবে না। নিশ্চয়ই দেবে—যার যা' রুচি-খুশি অনুযায়ী নিজের কাজে লাগাবে বৈকি! কিন্তু নিজেকে সেবাইত ভেবে সেগুলি যদি ভগবানের চরণে নিবেদন করি, তা হলেই ভোগ করার সার্থকতা—নইলে উপভোগে দাঁড়িয়ে যায়।

আচার্য ব্রজমোহন যেন আমাকেই বাজিয়ে দেখতে চান—

—দোনো মে ক্যা ফারাক?

—ভোগেই আনন্দ, উপভোগে কষ্ট!

বিষ্ণুপ্রয়াগ ঃ বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সংগমস্থল

আমাদের কথা বেড়ে যায় দেখে আর সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে যেতে হবে। বদরীনারায়ণের আরতি সাঙ্গ হ'বার পরই লক্ষ্মীদেবীর আরতি। কাজেই তখনকার মত বিদায় নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্ট-সাহেব আমাকে বারে বারে বলে দিলেন—রেডিওটা নিয়ে গণেন যেন তাঁর কাছে যায়। দেখলাম তিনি ডক্টর সম্পূর্ণানন্দের খবরের জন্যে এখনও সেই রকম উদ্বিগ্ন হয়েই আছেন।

বেরিয়ে এসে দক্ষিণ দিকে গম্বুজ-ওয়ালা লক্ষ্মীদেবীর মন্দির—তার পাশেই ভাণ্ডার। সেখানেই দেবতার ভোগের জন্য অন্ন পাক করা হয়।

লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে তখন আরতি শুরু হয়েছে—প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পত্নীও সেখানে উপস্থিত।

সেদিন ছিল দীপান্বিতা—মন্দিরের গায়ে, চূড়ায়, তোরণদ্বারে আলোয় ঝলমল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এখানে বিজলী বাতির কারবার চালু হয়েছে। সন্ধ্যা ছটা থেকে দশটা পর্যন্তই আলো জ্বলে। তবে, শুনতে পেলাম, আজ দীপান্বিতা উৎসব উপলক্ষে গোটা রাতই জ্বলবে।

মনে মনে ভাবি, বাইরে তো এত আলো—কিন্তু অন্তরের দীপান্বিতা হয় না কেন? ভেতরে তাঁকে কেন জ্বালিয়ে রাখা যায় না?

আচার্য ব্রজমোহনকে জিজ্ঞাসা করি—

লক্ষ্মীদেবীকে তো পেলাম—কিন্তু এখানে দেবী ভারতীর দর্শন নেই কেন? তাঁকে কী এস্থান থেকে বনবাস দেওয়া হয়েছে?

—সরস্বতী মায়ী মুনি ঋষিদের কণ্ঠেই বিরাজ করছিলেন, তাই বুঝি প্রতিষ্ঠা করেননি।

উত্তর একটা দিলেন বটে, কিন্তু মনঃপূত হ'ল না।—তাঁকে বলি ঃ

—তা হলে কী বদরীনারায়ণ, লক্ষ্মীদেবী—এঁরা তাঁদের অন্তরে ছিলেন না, তাই মন্দির গড়ে তাঁদের সামনে রাখতে হয়েছে?

—কী জানি, মশায়, এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার কর্ম নয়। যাঁরা করেছেন, তাঁরাই জানেন।

যোশীমঠ

—তাঁরা যখন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে—আপনি প্রেসিডেন্ট, আপনাকে ছাড়া আর কাকে ধরব, বলুন?

বিগলিত হাস্যে কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে আচার্য ব্রজমোহন বললেন—

—আচ্ছা এখন আসি। রেডিও নিয়ে গণেনকে পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

না-না-না, সেও কি কখনও হয়? আমি নিজেকে ভুলতে পারি—ওটা পাঠাতে ভুলব না।

পেছনে সবাই আসছিল। গণেনকে বলি—

—তোমার রেডিওটা নিয়ে শিগ্‌গীর যাও। স্বামী সম্পূর্ণানন্দের সম্পূর্ণ খবর না পাওয়া পর্যন্ত ও'র সুনিদ্রা হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে গণেনের অন্তর্ধান। যাবার আগে বলে গেল :

—খবরটা শুনিয়ে আমি এখুনি আসছি।

এক পা এগিয়ে প্রেসিডেন্ট-মহারাজ বললেন, আপনারা যাঁরা যাঁরা বদরী-নারায়ণের পুজো দেবেন, আজই, ঐ সামনের অফিসে তাঁদের নাম লিখিয়ে দিতে হবে।

জিজ্ঞাসা করি—কী রীতিনীতি, আর কতই বা পুজোর মূল্য-নির্ধারণ করা আছে?

—এই পাঁচ সিকে, এগারো টাকা, একুশ, একান্ন, একশো এক, হাজার এক, পাঁচ হাজার—

এমন লাফিয়ে অঙ্কপাত করেন, যে জাল গুটিয়ে সবটা ধরা কঠিন। তবে যাঁরা একশ এক টাকায় ভোগ দেন, তাঁদের নামে প্রতি বছর বদরীনারায়ণের পুজোর নির্মাল্য পাঠানো হয়। প্রেসিডেন্ট আরও বললেন—

—কাল আপনাদের টাকাতেই খিচুড়ি হালুয়া, ফল, মিষ্টান্ন ভোগ হবে—আপনারা সামনে উপস্থিত থাকবেন। আরতির সময় যেমন পূজারীদের একসঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ হয়, কাল পুজোর সময়ও, সেই রকমই আপনাদের প্রত্যেকের নাম গোত্র নিয়ে সঙ্কল্প করে পুজোর মন্ত্রোচ্চারণ হবে।

সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সাব-কমিটি বসে গেল। কে কত নগদ মুদ্রা দিয়ে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবে, তারই জল্পনা-কল্পনা। এমন কি, ভূতাম্বর আর ঝি

পর্যন্ত কেউ পাঁচ সিকে, কেউ বা আড়াই টাকা খরচ করে পুজো দেবার সদিচ্ছায় মেতে উঠলো। কলকাতায় বা অন্যত্রও দেখেছি, পাঁচ সিকের ভোগেও যে ফল মিষ্টি দেয়, পাঁচ টাকা দশ টাকার ভোগেও তাই—হয়তো 'দু' পাঁচটা মিষ্টি বেশী থাকে—ফুল বেলপাতার পরিমাণ বাড়ে এই মাত্র। কিন্তু শুনলাম, এখানে যে টাকার ভোগ দেওয়া হয়, সেই সম্পূর্ণ টাকাতেই ফল মিষ্টি ভোগের উপকরণ ইত্যাদির আয়োজন করে। অর্ধেক দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় লাগে, বাকী অর্ধেক যে পুজো দেয়, তার কাছেই পাঠিয়ে দেওয়ার নিয়ম।

আমি প্রস্তাব করি—বেশ তো, আমাদের অংশে যা আসবে, তাই দিয়ে ডাণ্ডীওয়ালা ষোলজন, আর পাঁচজন ঘোড়ার সহিস, তাদের পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া যাবে, কী বল? আমাদের সামান্য যা হয় একটু মুখে দিলেই চলবে, প্রসাদ কণিকামাত্র। আর যদি বেশী উদ্বৃত্ত হয়, গরীবদের খাইয়ে দিও। আমার প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থিত হতেই, প্রত্যেকের নামে একশ' এক টাকার ভোগ লিখিয়ে দেওয়া হ'ল।

মন্দির থেকে বেরিয়েই দেখি শ্রীমান্ উমাপ্রসাদ বদরীনাথের মন্দিরের চারদিকে বন্‌বন্ করে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করি :

—কৈ, তোমাকে আরতির সময় দেখলাম না যে বড়!

—ঠিক আছে, আমি না গেলেও আমি ঠিকই আছি, ওখানে বড্ড ভিড়।

—তা হলে তো চুকেই গেল—এর চেয়ে বড় কথা কী?

উমাপ্রসাদ আমাকে সংবাদ দিলেন, এক সাধু মন্দিরের চত্বরে বসে রোজ চমৎকার গান করেন। তিনি কারো সঙ্গে কোনো কথাই বলেন না—এই সময়ে শুধু ভগবানের নামগান করেন। আপনি তো সংগীতপ্রিয়, নিশ্চয়ই শুনবেন।

—সে কথা আর বলতে। আমিও দেখেছি তাঁকে—মন্দিরে ঢুকবার মুখেই বাঁদিকের একটি ঘরে থাকেন।

—হ্যাঁ, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই সময় ডানদিকের চাতালে সেতার বাজিয়ে ভজন গান করেন।

আমিও তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে সেই নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলাম। তখনও সাধুজী আসেননি—অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে—। একজন হার-মোনিয়ম বাজায়—একজন তবলা-সঙ্গত করে। তবলাবাদক বারো চোদ্দ বছরের সেই ঘোড়ার সহিস গাড়োয়ালী ছেলেটি, যার মিষ্টি গানের কথা আগেই বলেছি। দেখলাম, সেই এখানে তবলচী বনে গিয়েছে। বোল স্পষ্ট নয়, তবে তালে তালে পিটিয়ে চলার কামাই নেই। আমিও তার কাছ থেকে তবলাটা কেড়ে নিয়েই বাজাতে বসে গেলাম। হারমোনিয়মে একই ধরনের এক লাইন সুর বারেবারে বাজে—এধার-ওধার হেরফের কিছু নেই—আমিও বাজাতে থাকি। এমন সময় সাধুজীর আগমন। আমি তাড়াতাড়ি তবলা ছেড়ে তাঁকে নমস্কার করি। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন—টানা টানা উজ্জ্বল ভক্তি-মাখানো চোখ দুটিতে কৌতূহল—সেই চাউনির অর্থ—এ আবার কোন দেশের পাখী উড়ে এসে জুড়ে বসল?

মৃদু হাস্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে করতাল বাজিয়ে গান ধরলেন। তিনি এক কলি গান করেন, আর সব শ্রোতারা মিলিত কণ্ঠে সেই পদটির পুনরাবৃত্তি করে যান। এই রকম কিছুক্ষণ চলার পর তিনি সেতার বাজিয়ে গান ধরেন। দু এক লাইন ধরেন, আবার তারই সুর সেতারে ঝংকৃত হয়ে ওঠে। গান থামিয়ে একটানা কিছুক্ষণ স্তোত্রগীতি বাজিয়ে চলেন। সেতারের তারে তাঁর আঙুলগুলি বিদ্যুৎগতিতে ওঠানামা করে—আমার বুকের তারেও তারই অনুরণন।

সেতারের কথায় বহু দিনের একটা স্মৃতি মনে পড়ে যায়। অনেকদিন আগে এক সাধুসঙ্গমে গিয়েছি। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন—

—আপনার সেতার ঠিক বাজে তো?

আমি অবাক। গান-বাজনায় আমার কিঞ্চিৎ অনুরাগ আছে—এটা স্বীকার করি—। কিন্তু আমি তো সেতারী নই। তবে কেন এই প্রশ্ন?

সাধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি—তিনি হেসে বুঝিয়ে দিলেন—

—সেতার অর্থে—এই দেহরূপ যন্ত্রে ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না এই তিনটি তারে যে সঙ্গীত অবিরাম বেজে চলে, তার কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।

এবার অর্থটা পরিষ্কার হ'ল। সেতার কথাটি ফারসী। সে—অর্থাৎ 'তিন' তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র প্রাচীন

সংস্কৃত নাম 'ত্রিতন্ত্রী'। এখন অবশ্য পাঁচটি বা তারও বেশী তার থাকে। সেই ত্রিতন্ত্রী সেতারকেই সাধুজী দেহরূপ সেতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শ্রীশ্রীবদরীনাথের চরণপ্রান্তে বসে এই সাধুটিও কি সেই সেতার বাজিয়ে গান করেন? তাঁর দেহের যন্ত্রেও তাই বুঝি এমনি মন-মাতানো প্রাণঢালা সুর?

তাঁকে দেখে মনে হয়, সেই মধুর ভাব, সেই ছন্দ, সেই নামগান সব কিছুই চিরঈপ্সিতের চরণে বিলিয়ে দিয়েছেন। দিব্যজীবনের স্বাক্ষর তাঁর চোখে-মুখে।

গান-বাজনার ফাঁকে ফাঁকে সাধুজী আমার দিকে খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আর ঝটিতি মুখ ফিরিয়ে নেন। আমার মাথাও ঘন ঘন দুলতে থাকে। তিনি বোধ হয় মনে করেছিলেন, আমি একজন সমজদার লোক তাঁর দরবারে এসে হাজির হয়েছি। ঘণ্টা দুই পর গান-বাজনা থেমে গেল। আমরাও স্ব-গহ্বরে ফিরে যাবার জন্যে উঠে পড়ি। নীরেনের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। দেখি, তার জড়-সমাধি হবার উপক্রম। নিমীলিত আঁখি, বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়, মেরুদণ্ড স্থির। সবাই আপনাপন আস্তানায় ফিরে গিয়েছে, কিন্তু ভায়ার এখনও সমাধিভঙ্গ হয়নি। নীরেনের সহধর্মিণী স্বামীকে যোগ-ভ্রষ্ট করবেন কিনা চিন্তা করেন। সেটা বুঝতে পেরেই তাকে গোটা দুই ধাক্কা দিয়ে বলি :

—ওরে, যে শীত, গরম পুরিতে বরফ জমে যাবে। শীগ্‌গীর ওঠ, খাবি চল্। খাদ্যরসিক নীরেনের তৎক্ষণাৎ তপোভঙ্গ। তারপরই প্রশ্ন— গুণু, গণেন এরা সব গেল কোথায়?

চেয়ে দেখি, তারাও লোকচক্ষুর অন্তরালে সবার পেছনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দুই হাটুতে বাহুবেষ্টন করে, মাথাগুঁজে বেশ ঘুম দিচ্ছে।

নীরেন অনুরোধ জানায় আমি ডাকলে ওদের উঠতে আধ-ঘণ্টার কম হবে না—তুমি দু'মিনিটেই জাগিয়ে দিতে পারো।

—নিশ্চয়, যারা ঘুমিয়ে থাকে, তাদের জাগানোই তো আমার কাজ।

ভায়ার পাল্টা প্রশ্ন :

—আর যারা জেগে ঘুমোয়?

—তাদের জাগানো অসম্ভব—তবে কয়েক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় বৈকি—এক্ষুনি আগেই যেমন তোমার কানে মন্ত্র দিতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলে।

আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন রাত দশটা।

কথায় আছে, প্রদীপের নীচেই সর্বাপেক্ষা অন্ধকার। এতদিন তাতেই রাত কাটানো গিয়েছে, আজ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।' আলোর নীচে অন্ধকার নেই। শুধু এই ঘরগুলো নয়, মনের ঘরেও সব আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে।

আমাদের খাবার প্রস্তুত সবাই বসে পড়ি। চিবিয়ে চিবিয়ে খাই, আর বিনিয়ে বিনিয়ে গোটা দিন কে কী কেরামতি করেছি, তারই ফিরিস্তি দিয়ে যাই। নীরেন মৌনীবাবার দর্শন ইতিহাস যেই আরম্ভ করেছে, থামিয়ে দিলাম, কী জানি যদি ঈশাণকোণে মেঘ দেখা দেয়, আবার যদি ঝড় ওঠে, আবার যদি আমার ওপর মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয়।

উত্তম-মধ্যম আহারের পর আমরা যে যার বিছানায় লুটিয়ে পড়ি।

২০শে অক্‌টোবরের প্রভাতে সবার আগেই আমার ঘুম ভাঙ্গলো। কালই নৈশভোগের সময় ঠিক হয়েছিল, মন্দিরে পূজা প্রভৃতি সাঙ্গ হবার পর, সস্ত্রীক নীরেন ও আমাদের ব্রহ্ম-কপালীতে পিতৃপুরুষের তর্পণাদি ক্রিয়া করতে হবে। সেই জন্যেই পাণ্ডাকে ডাকিয়ে বলে দেওয়া হয়েছিল, যিনি শ্রাদ্ধাদি করাবেন, তিনি যেন ঠিক সময়ে আমাদের ডেকে নিয়ে যান। এই দেশের নিয়মানুযায়ী যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, সব যেন ঠিক করে রাখেন, কোনও কিছুরই ত্রুটি না হয়।

পাণ্ডার দুই-হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি—জানেনই তো পাণ্ডাজী, পিণ্ড-দানের ব্যাপার, পুন্নাম্ন নরকাৎ ত্রায়তে পিতরম' পুত্রের প্রধান কাজ।

—নীরেনও উপদেশ দেয়—

—দেখবেন পাণ্ডা-মহারাজ, আগেই দক্ষিণার কথা চিন্তা না করে ক্রিয়াটি যাতে সুসম্পন্ন হয়, সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন।

মেয়েরা আগেই তপ্তকুণ্ডে স্নান সেরে এসেছে। আমি ও নীরেন সেই অন্ধকূপে প্রজ্বলিত প্রদীপশিখার আলোকে তৈল মর্দন করে নিলাম। শ্রীবদরীনাথজীর মন্দিরের সামনে পঁয়ত্রিশ সিঁড়ি নীচে নেমে তপ্তকুণ্ডে যাওয়া যায়। এর প্রকৃত নাম অগ্নিতীর্থ বা বহ্নিতীর্থ। কুণ্ডটি পনের হাত লম্বা, বারো হাত চওড়া; সব সময়ে গরম জলে ধোঁয়া ওঠে। গন্ধক-মেশানো জল, পান করা যায় না—কিন্তু স্নান করা খুবই আরামদায়ক। তপ্তকুণ্ডের জলকে যদি প্রাণরক্ষক বলা যায়, তাহলেও অত্যুক্তি হয় না। পুরাণে আছে, তপ্তকুণ্ডে স্নান করলে হাজার চন্দ্রায়ণের ফল পাওয়া যায়। কাছেই নারদ, নৃসিংহ, বরাহ গরুড় ও কুবের শিলা। স্কন্দ-পুরাণে প্রত্যেকটির মহিমার উল্লেখ আছে। নারদশিলার পাশেই নারদকুণ্ড। শ্রীশ্রীবদরীনাথের মূর্তি এই নারদকুণ্ডেই পাওয়া যায়। শুনলাম প্রাচীনকালে শ্রীশ্রীবদরীনাথের পূজার ব্যবস্থা না থাকায় নারদ-শিলাতেই তাঁর পূজো হত।

পুরাণোক্ত বচন এই তপ্তকুণ্ডে অগ্নিদেব সশরীরে বিরাজিত হয়ে পাপীতাপীকে অগ্নিশুদ্ধ করেন। মহর্ষি ভৃগু একবার হুতাশনকে গৃহ-রক্ষায় নিযুক্ত করে তীর্থ গমন করেন। ফিরে এসে দেখেন তাঁর ধর্মপত্নী কুমারী জীবনের অনার্য প্রণয়ীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছেন। হুতাশন স্বচক্ষে দেখেও বাধা দেননি। ভৃগুর প্রশ্নে তিনি উত্তর দেন যাহা ঘটে তাহাই সত্য, সুতরাং সত্যের বিরুদ্ধেও তিনি কিছু করতে পারেন না। মহর্ষি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, 'তুমি সর্বভুক্ হও।' এই শাপমোচনের জন্যে অগ্নিদেব শ্রীশ্রীবদরীনাথের আদেশে এই কুণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পৌরাণিক গল্প যাই হোক, আপাততঃ স্নান করে বেশ আরাম পেলাম। গরম-জলে কিছুক্ষণ পড়ে থেকে আমরা উঠে পড়ি। এমন সময় গুণু ও গণেনকে

বদ্রীর পথে বরফের উপর

নৈঋত কোণে মিলিয়ে গেল। স্তোত্র ও মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে বাবা বদরীনাথের পুজো আরম্ভ হতেই আমরা স্তব্ধ—কী যেন একটা অনির্বচণীয় প্রশান্তভাব অন্তরে নেমে এল। একেই বলে বুঝি স্থানমাহাত্ম্য। কত যুগ ধরে বদরী-বিশালের পুজো চলে আসছে। কত সাধু মহাত্মা এখানে এসে ঘুরে-ফিরে গিয়েছেন। তাঁদের তপস্যার প্রভাব এখনও এই কক্ষটির মধ্যে যেন ভিড় করে আছে। নাম গোত্র উচ্চারণের সঙ্গে সকলের পুজো শেষ হতেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বেরিয়ে আসি।

এবার পাণ্ডাজী নিয়ে চললেন ব্রহ্ম-কপালীতে। সস্ত্রীক নীরেন আর আমরাও চললাম। মন্দির থেকে প্রায় চারশো ফুট দূরে এই পিতৃতীর্থ-বিধি অনুসারে পূর্বপুরুষের পিণ্ডদান করতে হয়। গয়াতে পিণ্ড দিয়েছি কিন্তু পুরাণে আছে এখানে পিণ্ড দিলে আটগুণ ফল হয়। তাছাড়া এখানে পিণ্ডদান ও তর্পণ করলে আর বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন হয় না।

স্কন্দ-পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা একদা আপনার মানসকন্যা সরস্বতীর প্রতি কামার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় শিব তাঁর শির-শ্ছেদ করেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপে সেই মস্তক মহাদেবের হাতে আটকে যায়—তখন বহু স্থান ঘুরে শিব এলেন বদরীনারায়ণে। এইখানেই তাঁর হাত থেকে মস্তকচ্যুত হয় এবং তিনিও

স্নানে নেমে আসতে দেখলাম। গণু চিৎকার করে বলে উঠল—

—শীগগীর যান, মা খুব রাগ করেছেন। মন্দিরে বসে আছেন—আর বড়বাবা, আপনাকেও—

নীরেনকে বলি—আবার দেখো, বদরীনাথজীর পুজোর আগেই তোমার পুজো না হয়!

নীরেনের উত্তর—

—পূজনীয় ব্যক্তির পুজো না হলে চলবে কেন? কিন্তু যাই বল, দাদা, ছেলেবেলায় মায়ের কড়া শাসন, তারপর স্কুলে মাস্টারের তাড়া—এখন এই বৃদ্ধ বয়সেও যদি পান থেকে চুন খসলেই গিন্নির মুখনাড়া খেতে হয়, তাহলে যাই কোথায়?

এক কথায় উত্তর দিলাম—

—সে কি আর জানি না ভাই? এখন চল, শীগগীর কাপড় বদলে মন্দিরে যাওয়া যাক।

তাড়াতাড়ি উঠে গহ্বরে ঢুকেই রেশমী জামা-কাপড় পরে আমরা ছুটে যাই মন্দিরে। অবশ্য দুজনের গায়েই দুটো পুরু কম্বল জড়ানো।

ভায়া আর আমি ভেতরে গিয়ে দেখি প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পত্নী গতকাল আরতির সময় যেখানে সমাসীন ছিলেন, আজও ঠিক সেখানেই বসে আছেন। আমাদের ... সেখানেই আমাদের অপেক্ষা ...।

নীরেনের কানে কানে বলি—

—যাক, এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলে। দেখছো না, সস্ত্রীক আচার্য ব্রজমোহন সামনেই আছেন। অতএব বৎস, ন ভেতব্যম্, দুর্ভাবনা ছেড়ে হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হও।

এগিয়ে যেতেই প্রেসিডেন্ট-সাহেব অভ্যর্থনা করে আমাদের সামনেই বসিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললেন আপলো-গোঁকে কুছ 'লেট' হো গিয়া।

আমাদের নামেই পুজো—আজ আমরা ঠাকুরের দরজার ঠিক সামনেই বসবার অধিকারী। দুদিক থেকে দুজোড়া চোখ আমাদের প্রতি অগ্নিবর্ষণ করে

বদ্রীর পথে

ব্রহ্মহত্যার পাতক থেকে উদ্ধার পান। এখানে ব্রহ্মার কপাল মোচন হয়েছিল বলেই এর নাম ব্রহ্মকপাল। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি কথা আভাস দিয়ে যায়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁরই মানসকন্যা বাণী। ভাবই সৃষ্টির মাঝে রূপ নেয়, নিত্য রূপ ভাবের দুয়ারে বন্দী, তাই বাণীর মধ্যে যে রূপ ফুটে ওঠে, ভাবময় স্রষ্টার যদি সেই রূপের প্রতি অনুরাগ সঞ্জাত হয়, তবে হয়তো পাপ সেখানেই, যেখানে সৃষ্টিতে মোহ দেখা দেয়। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার আনন্দ। তার কল্পনা বা কোনও বিশেষ অনুভূতি কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে আশ্রয় করে যখন সর্বজনীনতা লাভ করে, তখনই তা হয় সার্থক সৃষ্টি। ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চীর বিচ্ছেদ-ব্যথাকে আদি কবি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর সেই সহানুভূতিকে নিখিলের প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদব্যথার পূত-ধারায় অভিষিক্ত করে বিশ্বজনীন করে তোলেন। তাই তাঁর সহানুভূতি-আর্দ্র স্বতঃস্ফূর্ত বাক্যধারা বিশ্বের আদি শ্লোক। পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির এই মৌল প্রেরণা থেকে স্খলিত হয়েছিলেন। শিব এই আত্মকেন্দ্রিক সৃষ্টির কলুষতা থেকে সৃষ্টিকর্তাকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে স্বয়ং সেই মোহের উৎসমূলে আঘাত হেনে ভাবস্রষ্টাকেই উৎসাহিত করতে চান। কিন্তু ভাবের অভাব হলে সৃষ্টিই অচল—তাই ব্রহ্মকপালের এই মুক্তিতীর্থের পাশাপাশি ভাব, রূপ ও বিলয়ের পরমতত্ত্বই রূপকের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন পুরাণকার।

যে-শিলাটি ব্রহ্মকপাল নামে খ্যাত তার নীচেই অলকনন্দার কলোচ্ছ্বাস, সেই তো ভগবৎসঙ্গীত।

পুরোহিত আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি। প্রত্যেক পিতৃপুরুষের, মাতুলালয় ও শ্বশুরালয়ের পূর্বপুরুষদের সবার নামেই পিন্ডদান ও তর্পণ করা হ'ল।

আমি যখন পিতৃ-পিতামহের নাম করে পিন্ডদান করি, মুখ দিয়ে হঠাৎ আমার নিজের নাম বেরিয়ে গেল। পাশেই একটা আর্তনাদ শুনলাম। সামলে নিয়ে, আবার তাঁদের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে, আবার নিজের নাম বেরিয়ে পড়ে। বার বার তিনবার এমনি হ'ল। সবাই ত' ক্ষেপেই অস্থির। পিতৃপুরুষের পিন্ডদান মাথায় উঠল—আমাকে ঘিরে মহা কোলাহল। কোন অলক্ষ্য দেবতার ইঙ্গিতে আমার নিজের নাম উচ্চারিত হ'ল, কিছুতেই বাঁধ দিয়ে ধরা গেল না। পরে অনেক চিন্তা করেছি, কোনও সমাধান পাইনি।

তীর্থগুরুর কাছে শুনলাম, যাদের কথা মনে পড়ে, তাদেরই পিন্ডদান করতে হয়—এই নাকি নিয়ম। আর এই নিয়মের জ্বালায় বেলা আড়াইটে হয়ে গেল। আমি

এই পর্যায়ে প্রকাশিত ছবিগুলি মুকুলকান্তি ঘোষ কর্তৃক গৃহীত

বলি, লক্ষ্মণের মত 'আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু' বলেই সব শেষ করে দিই, কেমন?

প্রত্যেক পিন্ডের ওপর এক এক আনা দক্ষিণা রাখা আছে, তাই হয়ত পান্ডাজী আমার সাধু প্রস্তাবে মোটেই রাজী হ'ননি। এটি বুঝি তাঁরই মন-গড়া অনুশাসন।

ভয়ানক শীতের কন্‌কনে বাতাস—সর্বাঙ্গ থরথর কাঁপছে পিন্ডগুলি সব একত্র করে নীচে নেমে গেলাম—অলক-নন্দার প্রবল তোড়ে দাঁড়িয়ে আবার মন্ত্রোচ্চারণ—তারপর পিন্ড-বিসর্জন।

নীরেন ভাগ্যবান। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বহু পূর্বেই শেষ করে ফেলেছে। অন্য দু-এ'কটা ছাড়া আর কোনও নামই তার মনে পড়েনি। তার শেষ হ'ল বেলা একটায়, আমার আড়াইটেয়। কারণ, অমুকের অমুক, তমুকের তমুক, যাদের নাম এক-চতুর্থাংশ শতাব্দীর মধ্যে মনেও আসেনি, তারাই আজ পরপার থেকে আমার হাতে পিন্ড নেবার মতলবে এক-জোটে শলাপরামর্শ করে সব যেন হানা দিয়েছে।

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর—ভোর থেকে কারও কিছু আহার হয়নি। আমরা জঠর-জ্বালা নিবারণের জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। ফেরার পথেও সেই একই কথার [illegible] [illegible] কথায় সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলি—অযথা এই আলোচনায় লাভ নেই। এই পুণ্যতীর্থে দাঁড়িয়ে [illegible] কখনই নিজের নাম [illegible] আমার মুখ দিয়ে বার বার বেরিয়েছিল, আমি নিজেও জানি না—। এই নিয়ে যেন আমাকে আর উত্যক্ত করা না হয়।

সবাই চুপ। ফিরে এলাম। বড় শ্রান্ত। সব রান্না তৈরি করেই রেখেছিল—ক্ষুধার তুলনায় নামমাত্র পেটে গেল। ওদিকে ভোগের বড় বড় পরাতে হালুয়া, খিচুড়ি এসে হাজির—যৎসামান্য মুখে দিয়ে সব বিলিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপরই সটান্ উঠে মন্দিরের পাশেই এক সাধু মহা-রাজের আসরে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ—এ'র কাছেই আজ প্রেসিডেন্ট ব্রজ-বিহারী মিশ্র মধ্যাহ্ন ভোজন করেছেন। দেখলাম, বালকের মত সরল উচ্ছল হাসি। কথায় কথায় এমন গলা ফাটিয়ে হাসেন, মনে হয় মনের আনাচেকানাচে এতটুকু জঞ্জাল নেই।

সেদিনকার আলোচনার বিষয়বস্তু জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। তার সঙ্গে উপমাও চলছিল। কেউ রসগোল্লা খেতে ভালবাসে, কেউবা সন্দেশ—একই মিষ্টিস্বাদ। তেমনি জ্ঞানযোগেও তাঁর কাছে পেঁছুনো যায় আবার ভক্তিযোগেও তাঁকে পাওয়া যায়। আর কর্মযোগ? তাতেও ঠিক একই ফল, যদি নিষ্কাম কর্ম হয়।

সাধুজীর সঙ্গে আমার প্রীতি নিবন্ধ।

আমিও আলোচনায় যোগ দিলাম। করজোড়ে বলি—

—শুধু নিষ্কাম কর্মযোগ কেন? জ্ঞান ও ভক্তিও সাত্ত্বিক হওয়া চাই। তাঁকে অন্তরে অনুভব করব না, অথচ বিদ্যের পুঁজি ভাঙিয়ে কেবল বচনেই তাঁকে খুঁজে বেড়াব, সর্বাঙ্গে নামাবলীর ছাপ নিয়ে শুধু অনুষ্ঠানেই ডুবে থাকব, তাতেই জ্ঞান ও ভক্তিযোগের মূর্তকতর দেখা দেয়।

ফিরে এসেই দেখি গুরু, গান্ধর্ব ও অনুজা, উমাপ্রসাদের সঙ্গে কলুষায়

দর্শন করে ফিরে এসে মস্ত লম্বা-চওড়া গল্প ফেঁদে বসেছে।

বদরীনারায়ণ থেকে পাঁচ মাইল দূরে বারো হাজার ফুট উঁচুতে বসুধারা তীর্থ। বসুধারা একটি জলপ্রপাত—চারশো ফুট উঁচু থেকে ঝরে পড়ে—জল-কণিকা বাতাসের বেগে উড়তে থাকে। পুরাণে আছে, যে পুণ্যাত্মা, তারই গায়ে জলের কণিকা এসে পড়ে আর যে পাপী, তার দেহে নাকি সেই বসুধারার জল স্পর্শ করে না, দূরে উড়ে যায়। ঝরনার জল কিনা—অত উঁচু থেকে পড়ার সময় মাঝ-পথেই প্রবল বাতাসে নীচে পড়তে না পড়তেই শূন্যে মিলিয়ে যায়।

গুপ্ত, গণেন ওরা নিজেদের মধ্যেই পাপপুণ্যের হিসেব-নিকেশ খতিয়ে, আমার কী মতামত, সেটা জানবার আশায় আমার দিকে ফিরে চাইলে।

—কী পাপ, আর কী যে পুণ্য সেটা তো আমরাই ঠিক করে নিয়েছি। আমরাই মন-গড়া ধর্মের অনুষ্ঠান করে আত্মপ্রসাদ পাই বটে, কিন্তু এখানেই কী সব? শুধু তীর্থ-পর্যটন করলেই ধার্মিক বলে না। ভালমানুষ সেজে ঘোরাফেরা করলেই কী সাধু হওয়া যায়? তাদের মুখোশ খুলে নাও, হয়তো দেখবে, কী কদর্য, কী বীভৎস রূপ। অন্তর শুদ্ধি না হলে কর্মশুদ্ধি হবে না। তা যদি না হয়, সমস্ত জীবনের ভিত্তি নড়ে উঠবে। বসুধারায় গিয়ে কার গায়ে জল পড়েছে, আর কার গায়ে লাগেনি, সেটা নিয়ে এতো মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

বসুধারার পথ

শুনলাম—বসুধারার পথে ওরা মানা গ্রামও ঘুরে এসেছে। বসুধারার আড়াই মাইল আগেই মানা গ্রাম বা মণিভদ্রপুর—১০৫৬০ ফুট উঁচু। এখানে ভুটিয়াদের বাস—এরাই গন্ধর্ব জাতির লোক। ভারতের উত্তর সীমান্তে তিব্বতের প্রান্ত-ভাগে এই দেশ। শেষ ঘাঁটি এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে মানাধুরা গ্রাম। মানা গ্রাম হতে মানাধুরা হয়ে কৈলাস মানস সরোবর ২৪০ মাইল। মানা গ্রাম মিলিটারী ক্যাম্পের তাই বিশেষ গুরুত্ব আছে।

ভারতের উত্তর সীমান্তে ম্যাক্‌মোহন লাইনের হিসাব আর টিঁকছে না—এর মধ্যেই ভারতের সীমান্তবর্তী কয়েক হাজার বর্গমাইল জমি তিব্বত তথা চীনের কবলিত হয়েছে। ভারতের চির-পুরাতন বদরীনাথ মন্দিরও নাকি তাদের সীমানার মধ্যেই—এই নিয়ে বেশ একটা চাপা-চাঞ্চল্য সেখানে আছে, বেশ বোঝা গেল। কাশ্মীরের প্রান্তে লডক্—যার ওপর ভারতের চিরকালের স্বত্ব-স্বামিত্ব বর্তমান সেটাও নাকি আমাদের নয়, এটা শুধু শুনতে হয়নি, মেনে নিতেও হয়েছে। স্যর্ আলেক-জান্দার কানিংহ্যাম রচিত 'Ladak or Indian Tibet' বহুল প্রচারিত এই বইখানাও নাকি শুধু বাজার থেকে নয়, দিল্লীর দপ্তরখানা থেকেও উধাও হয়েছে। বদরীনাথ ও তার আশে-পাশেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে সাধু-বেশধারী ভুটিয়া তিব্বতীদের সমাগম হবে সে আর বিচিত্র কি? শুনলাম, ও'রা যে সবাই সাধু এমন নয়, সংবাদ-সংগ্রহকারী মহাশয় ব্যক্তিরাও সাধুর ভেক নিয়ে ছদ্মবেশে এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করছেন।

বদ্রীনাথের মন্দির

বদরীনাথজীর সান্ধ্য আরতির সময় এসে গেল। সবাই মন্দিরে গেলাম।
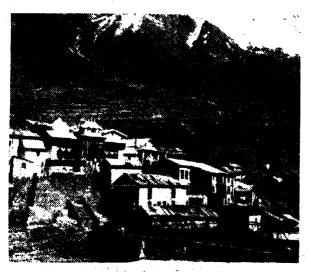
সম্পূর্ণ আরতি দর্শনের পরে লক্ষ্মীর মন্দিরে যাই, কারণ সেই দিনই সন্ধ্যায় আমাদের নামে এখানেও 'আটকে ভোগ' দিয়ে পূজো দেওয়া হ'ল। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে আটকে রাখার জন্যই বুঝি আটকে ভোগ!'

মন্দিরের চাতালে, যেখানে সেই সাধু রোজ সন্ধ্যায় সেতার বাজিয়ে নাম-গান করেন, সেখানে একটু বসি—কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমে দেহে এতই ক্লান্তি যে দশ মিনিটের বেশী বসা হোল না।

ফিরে চললাম।

আস্তানায় ঢুকবার মুখেই একজন আমার কাছে এগিয়ে এলেন, পরিচয় দিয়ে বললেন—তাঁর নাম ভগবতী চরণ নির্মোহী। তিনি গাড়োয়ালী কবি—দুখানা কবিতার বই বেরিয়েছে—তাছাড়া তিনি বদরীনাথ টেম্পল্ কমিটির অন্যতম সভ্য—গাড়োয়াল কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, অধুনা 'ভাইস' হয়েছেন; গাড়োয়াল জেলার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেও তাঁর আসন কায়েম।

দেখলাম তাঁরও ডাইনে-বাঁয়ে এক-জোড়া ফেউ। কবির কথা শেষ হতেই, দক্ষিণাঙ্গ ব্যক্তিটি সুর টেনে যান—

—গাঁয়ে বাবুজীর নিজস্ব লড়্বড়ী আছে। চমকে উঠি। লড়বড়ী কথাটা কখন শুনেছি বলে তো মনে হয় না। তিনি আবার বল্লেন :

—ইয়া মোটা মোটা কেতাব, পুঁথি-পত্তর, বহুৎ আলমারি,—বুঝে নিলাম, শব্দটা লাইব্রেরি।

এবার বামাঙ্গ সমজদারের পালা। মহাশয় ব্যক্তিটি তাঁর সুচিন্তিত এবং বহুমূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

আপলোগোকে কলকাত্তা জোড়া-সাঁকোমে রভীন্দ্রনাথকী গদ্দী হ্যায়। শুনা, উয়ে বড়ে অচ্ছে পদ লিখ্‌তে থে। উঁস তরহ্ ইয়েভি বহুৎ অচ্ছে পদ লিখ্‌তে হ্যায়।

একই নিঃশ্বাসে এবং একই ওজনে কবিদ্বয়ের তুলনামূলক বাক্যটি শ্রবণ করে পরম প্রীত হলাম। বাধিত হলাম ইনি রবীন্দ্রনাথকে একটা সার্টিফিকেট দিলেন।

কবি নাকি প্রেসিডেন্টের কাছে শুনেছেন, আমিও কিছু লিখে থাকি, তাই মোলাকাতের বাসনায় উক্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

অভ্যর্থনা জানিয়ে বলি :

বাঃ সুন্দর নামটি তো—নির্মোহী—মোহ নেই আপনার—চমৎকার!

কবি পুলকিত-গর্বে আমার এই সাধুবাদ নতমস্তকে মেনে নিলেন—তার-পরই একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা—

মোহ নিয়েই তো যত ঝামেলা। আমার অবিশ্যি তেমন কিছু নেই, শুধু একটু, ওই যাকে বলে মন্দঃ কবিযশঃ-প্রার্থী—

—উঁহু, ওটা ঠিক মোহ নয়, বরং এই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, টেম্পল-কমিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শুধু নাম্‌কা ওয়াস্তে নিজেকে জড়িয়ে রাখাটাই মোহ, কী বলেন?

আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন বটে!

—তা হলে স্বীকার করুন—আপনি নির্মোহী ন'ন।

—আপনি বহুৎ রং-দার আদ্‌মী আছেন।

—ঐ রং নিয়েই তো বরং হয়ে আছি। যে রং-এ তুলি ডুবিয়ে সাহিত্যিক গল্প লেখেন, কবিরা কবিতা রচনা করেন, চিত্রশিল্পীরা ছবি আঁকেন, সেই রং-এর কারবারী হলেও সঙ্ সাজিনি বা এতোটুকু ঢঙ্ নেই। এবার আসল কথায় আসুন—স্বীকার করুন, আপনি নির্মোহী ন'ন।

—সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে, আমাকে মেনে নিতে হয় বৈকি!

চট্ করে কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে উঠলেন—

—আসুন, দুটো কবিতা পড়ে শোনাই।

গাড়োয়ালী ভাষা আমার বিদ্যের ঘরে শূন্য হলেও ভাববিনিময়ের কোনও অসুবিধে হ'ল না। হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই কোনও প্রকারে কাজটা চালিয়ে নেওয়া গেল।

খাস্ গাড়োয়াল-ভূমিতে দাঁড়িয়ে গাড়োয়ালের কবিকে সংবর্ধনা না জানিয়ে উপায় কী? তারপরই, তিনি স্বয়ং স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে যান—সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাও দুলতে থাকে—কবিতায় ঝঙ্কার আছে, স্মরণ

আকাশ ও জীবন ফটো : জে, আঢ্য

কবি বন্ধুবর ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতি চাটুজ্জেকে, তিনি থাকলে অর্থবোধের বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার পেতাম।

সাঁসর্কোচে কবি—হিন্দী কিংবা ইংরেজীতে অর্থটা বুঝিয়ে দিলে ভাল হয়। কবি পরম পুলকিত চিত্তে দু'টি করে নিজের লাইন বলেন আর তার অর্থ প্রকট করে যান—মাঝে মাঝে ভাবের দিক দিয়ে বিকট সংকট উপস্থিত হলেও—রসরঙ্গ করা উচিত নয়—নিরঙ্কুশ হি কবয়ঃ।

এবার আমার পালা। নাছোড়বান্দা গাড়োয়ালী কবি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার কবিতা শুনতে চান।

বাংলা কবিতার শব্দ-লালিত্যকে হিন্দীতে রূপায়িত করার ক্ষমতা আর কারো আছে কিনা জানি না, অন্ততঃ আমার তো নেই। তাই আমার একটি কবিতার ভাবার্থ ইংরেজীতে শুরু করতেই বাধা দিয়ে তিনি পুনরায় দাবি জানালেন—

—হিন্দীতেই আগে মানেটুকু বুঝিয়ে দিন, তারপর আপনার কবিতা শুনব।

বিপদ কম নয়।

ঐ ভাষায় আমার কতখানি ব্যুৎপত্তি, সেটা তাঁকে সানুনয়ে পেশ করতেই তিনি অভয় দিলেন।

—যেমন করে হোক বলুন, আমি ঠিক বুঝে নেব।

নীরেনকে ডেকে বলি—

—ভাই, আমার 'জাগরণ' কবিতা তোমার কণ্ঠস্থ আছে, ওকে হিন্দীতে বুঝিয়ে দাও তো।

সে দোভাষীর কাজে নিযুক্ত হ'ল—আমিও মূল কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলাম। মাঝে মাঝে 'কেয়াবাৎ' 'বহুৎ আচ্ছা' বলেন। পরে বুঝলাম যে, দু-একটি বাংলা কথা তাঁর জানা আছে, সেটা কানে আসতেই ঐরূপ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন।

এমন সময় জনৈকের আগমন। কবি পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি মস্ত সমাজসেবী।

নীরেনের হাস্য মৃদু—যেন ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে নির্গমের পথ খুঁজে বেড়ায়। মোটা চশমা ভেদ করে তির্যক্ একটা দৃষ্টি হানতেই সমাজসেবী পরুষ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—আপ্‌কা কুছ্ বোলনা হ্যায় তো বাতাইয়ে—

আর দেখতে হল না—একেবারে যুদ্ধায় ফট—সমাজসেবীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করি—

—আপনি তো সমাজসেবী? কী রকম সমাজ-সেবা করেন? এই যে চাল-ডালের দর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে,—ভেজালে বাজার ছেয়ে গেল, চোরা কার-বার আর মুনাফালোভীদের নির্লজ্জ কারসাজি—এর কিছু কি প্রতিকার করতে পেরেছেন? দেশের লোক যে অনা-হারে অচিকিৎসায় শেষ হয়ে গেল, তার কিছু হয়েছে কি? সমাজসেবী কথাটা মুখে বললেই হয় না—কাজে তার প্রমাণ দেওয়া চাই।

এই অভাবিত আক্রমণে ভদ্রলোক একেবারে কাঠ। তিনি সভয়ে জিজ্ঞাসা করেন—

—আপ্‌লোক বাঙ্গালী?

বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলাম—জরুর।

সমাজ-সেবী আপন মনেই বলেন—

—নাঙ্গাশির বাঙ্গালী সব কুছ্ করনে শক্‌তা।

আমার মুখে হিন্দী আর ইংরেজীর তুবড়ী ছুটতে থাকে—

—তবে শুনুন সমাজসেবী মশাই, সব জাতেরই মাথায় কিছু না কিছু আছে— কারো ফেজ্, কারো ক্যাপ্, কারো পাগড়ি—গরীব লোকের মাথায় নিদেন পক্ষে একটা ছেঁড়া গামছাও বাঁধা থাকে—কিন্তু, জানেন, স্পিরিট-ল্যাম্প যখন জ্বলে, তার ওপর একটা ক্যাপ্ বসিয়ে দিলেই আলো নিভে যায়। যাদের মস্তিষ্কের বালাই নেই, তারা যা খুশি তাই মাথায় দিক, কিন্তু বাঙ্গালী খুব বুদ্ধিমান জাত কিনা, তাই মাথায় কিছু দিলেই, ব্যস্, তার বুদ্ধিটারও নির্বাণপ্রাপ্তি—অবিশ্যি এটা আমার কথা নয়, একজন বাঙ্গালী মনীষীর। জনৈক অবাঙ্গালী তাঁকে জিজ্ঞেস করে—বাঙ্গালী নাঙ্গা শির কেন? তিনি ঠাট্টা করে বললেও এই কথাগুলির মধ্যে কিছু মালমশলা আছে বৈকি! বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনধারণের জিনিসগুলো যখন উধাও হয়ে যায়—এই বাঙালী জাতটাই বেশী চেঁচামেচি করে, বুঝলেন?

কাব্যচর্চা আগেই খতম্ হ'য়েছিল। সমাজসেবারও এখানেই পরিসমাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সাধারণী পত্রিকা

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বাংলা সাময়িক-পত্রের জগতে একটি স্মরণীয় যুগ। এই অর্ধশতকে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্রের সংখ্যা আট শতাধিক। এ গুলির মধ্যে বেশির ভাগই স্বল্পায়ু; এমন কি অনেকগুলির প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যারও কোনো সন্ধান মেলে না। তবু সাময়িক-পত্রের জগতে এ এক বিস্ময়কর প্রচেষ্টার নজির।

এই সময়ে যে পত্রিকাগুলির প্রাধান্য পাঠক-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে বঙ্গদর্শন এবং সাধারণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; প্রথমটি মাসিক, দ্বিতীয়টি সাপ্তাহিক। দুটি পত্রিকাতেই জাত-রচনা ছাপা হত। বিষয়গত ও শৈলীগত মিলও পত্রিকা দুটির অনেক রচনাতেই সহজ-লক্ষ্য। এর প্রধান কারণ বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) এবং সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) শুধু যে আন্তরিক প্রীতি-বন্ধনেই আবদ্ধ ছিলেন তাই নয়, সাহিত্যিক আদর্শ-বন্ধনেও। অক্ষয়চন্দ্রের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির প্রভাব সুগভীর ও প্রত্যক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাতিশায়ী প্রতিভার প্রভাব তখন এক দল শক্তিমান লেখককে গড়ে তুলেছিলেন; তাঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম সহজেই মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক আদর্শনিষ্ঠা এবং বিশ্বাস-বলিষ্ঠ শ্রমশীলতায় বাংলা সাহিত্যে তখন এক যুগান্তর সাধিত হয়। যে লক্ষণগুলি এই যুগান্তর সূচিত করে সেগুলির মধ্যে প্রধান দুটি হল সমালোচনা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য রীতি-চিন্তার প্রভাব এবং রঙ্গ-রসিকতায় মার্জিত রুচিবোধের মর্যাদা। অক্ষয়চন্দ্রের বহু রচনাতে এই দুটি লক্ষণই সর্বাধিক মূল্য পেয়েছে। রচনা-রীতি এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর দিক থেকেও অক্ষয়চন্দ্রের অনেক লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের বলে মনে হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'চন্দ্রালোকে' শীর্ষক রচনাটি অক্ষয়চন্দ্রের এ কথা সকলেই জানেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' যখন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন 'মশক' নামে অক্ষয়চন্দ্রের আর একটি রচনা এই দপ্তরে অন্তর্গত হয়েছিল; পরে সেটি অক্ষয়চন্দ্রের 'মোতি-কুমারী' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালে। এক বছর পরেই প্রকাশিত হয় সাধারণী (১২৮০)। প্রথম দিকে পত্রিকাটি কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন-যন্ত্রে ছাপা হত। তারপর অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়ায় তাঁর বাড়ীর পাশেই সাধারণীর জন্যে ছাপাখানা তৈরি করেন। ১২৯১ সালে অক্ষয়চন্দ্র সাধারণীর ছাপাখানা চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তারপর ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাস থেকে অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব-বিভাকর পত্রিকার সঙ্গে সাধারণী মিলিত হয়ে যায় এবং নববিভাকর-সাধারণী নামে ১২৯৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হবার পর লুপ্ত হয়। ১২৯১ সাল থেকে অক্ষয়চন্দ্র নবজীবন নামে একখানি মাসিকপত্রও কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এটিও ১২৯৬ সাল পর্যন্ত চলেছিল। স্বল্পায়ু হলেও নব-জীবন সেকালের একখানি প্রথম পর্যায়ের মাসিকপত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্য-রথীরা এর লেখক ছিলেন।

বঙ্গদর্শনের মতো সাধারণীর আবির্ভাব যুগান্তরকারী না হলেও সে যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা এই পত্রিকা বহুলাংশে পূর্ণ করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার মোহ তখন অনেকটা কেটে এসেছে। এই শিক্ষার আলোক-সম্পাতেই কয়েকজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর চোখের সামনে সে যুগের অন্তরের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা-জর্জর রূপটি প্রকট হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে তাঁরা সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে মূলত এই চেষ্টাই অক্ষয়-চন্দ্রকে সাধারণী প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন : "রাজনীতি-জড়িত সাহিত্যের সক্ মিটাইবার জন্য সাধারণীর জন্ম।" এই সক্ মেটানোর চেষ্টা বঙ্গদর্শন বা তখনকার অন্য দু একটি পত্রিকার মধ্যেও দেখা যায়; কিন্তু সাধারণীতে এ চেষ্টাসমূহ প্রবলতর। তাই সাধারণীর পৃষ্ঠাগুলি থেকে সে যুগের রাজনৈতিক অবস্থার একটা নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণী প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই পত্রিকার ১ম সংখ্যায় (১১ কার্তিক, ১২৮০) প্রকাশিত অক্ষয়-চন্দ্রের এই মন্তব্যটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে : "এই পত্রিকা বর্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে। স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে বটে, কিন্তু রাজ্য-প্রণালীর আমূল পরিবর্তনও ইহার বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ইংরাজে অদ্যাপি রাজা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাসন করিতেই ব্যস্ত, কিন্তু রাজার যে প্রধান কার্য প্রজা-রঞ্জন তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই।" ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরম স্বার্থগন্ধী রূপটি ক্রমশ ভারত-বাসীর কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বিশেষ করে বাঙালীর অন্তরেই এই নববোধের বোধন, যার ফলে গড়ে ওঠে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৫১)। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর কোনো কাজের সোজাসুজি কঠোর সমালোচনা করার মনোভাব তৈরি হয়েছে আরো প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে। এর মধ্যে বিদেশী শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর অন্তরেন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে প্রতিকারের উপায় খুঁজতে শুরু করেছে, আর প্রতিবাদের ভাষা। এই ভাষারই নির্ভীক, বলিষ্ঠ ও রসমধুর সাহিত্যরূপ আমরা লক্ষ্য করেছি সাধারণী পত্রিকায়। এতে অক্ষয়চন্দ্রের বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি থেকে মাত্র কয়েকটি নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হল।

'চুল্লি না নির্বাণ হয়' প্রবন্ধে (১৫ই চৈত্র, ১২৮০) অক্ষয়চন্দ্র ইংরেজের সর্ব-গ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের রূপটিকে চমৎকার-ভাবে চিত্রিত করেছেন। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব তখন যে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর কর্মকর্তা-দের মনোভাবকে পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেছে এই রচনায় তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"ইংরাজেরাও অনলের ন্যায় সর্বভুক্। ...সর্বভুক্ ভারত-সম্পর্কীয় ইংরাজ ভক্ষ্য না পাইলে নির্বাণ হইয়া যায়, তাহাতেই প্রত্যহ বিলাতীয় যজ্ঞ বা হোম্-চার্জস্বরূপ ইন্ধন আমাদিগকে যোগাইতে হয়।"

'তুলনায় সমালোচনা' শিরোনামায় অক্ষয়চন্দ্রের দু একটি অপূর্ব ব্যঙ্গ-রচনা বঙ্গদর্শন ও সাধারণীতে ছাপা হয়। এখানে সাধারণীর পৃষ্ঠা থেকে তাঁর এই ধরনের একটি লেখার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল। ইংরেজ ও বাঙালীর মধ্যে চারিত্রিক পার্থক্য নির্ণয়ের এমন চমৎকার ব্যঙ্গাত্মক প্রচেষ্টা সে সময়ের

অন্য কোনো লেখকের লেখায় দুর্লভ। এই রচনাটি তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। সাধারণীতে ১১ পৌষ ১২৮৮ সালে এটি ছাপা হয়।

"অনেকে বলেন বটে। রাজা নন্দকুমার জাল করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজ বাহাদুর তাঁহাকে ফাঁসি দেন।

জাল বল, চুরি বল, প্রবঞ্চনা বল, এই সব পাপকার্য তাহা কেহ ঢাক বাজাইয়া রাস্তায় বসিয়া করে না। কাজেই রাজা নন্দকুমার কি করিয়াছিলেন না করিয়াছিলেন দেবতাই জানেন। কিন্তু ফাঁসি নিশ্চিত হইয়াছিল; অপরাধ না করিলে কিন্তু ফাঁসি হয় না। জিজ্ঞাসা করি, কাহার এত বড় বুকের পাটা যে সাহস করিয়া বলে নন্দকুমার জাল করে নাই। অতএব বাঙালী জালবাজ, ফেরেববাজ, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

ইতিহাস খুলিয়া দেখ, ইংরেজী ইতিহাস, তাহাতে সুস্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, নন্দকুমার জাল করিয়াছিল। ইংরেজী ইতিহাসে মিথ্যা কথা থাকা অসম্ভব; কারণ বিলাতে মিথ্যা কথা পাওয়া যায় না। তবেই বুঝ,—ইংরেজ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ইত্যাদি।

তুমি বর্বর বলিতে পার যে ইংরেজী ইতিহাসের কথায় আমি বিশ্বাস করি না। না কর গোল্লায় যাইবে, পরীক্ষায় ফেল্ হইবে, চাকরী পাইবে না। শেষে আমার মতো বাংলা লিখিয়া গ্রাহকের দ্বারে দ্বারে মূল্যপ্রাপ্তির জন্য কাঁদিয়া বেড়াইবে।

জান তো যে তুমি ইতিহাস লিখিতে জান না? তবে ইংরেজী ইতিহাস নাহিলে তোমার গতি কি? তবেই প্রমাণ হইল যে ইংরেজ মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত এবং তুমি বোম্বাই মূর্খ।..."

রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে লেখা বহু রচনা তখন সাধারণীতে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যিক মূল্য ছাড়া এগুলির তথ্যগত মূল্যও যথেষ্ট। সে সময়ে দেশের অবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ এগুলি থেকে সংগ্রহ করা যায়। 'হিন্দুমেলা'-র ওপর দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১১ ফাল্গুন ১২৮০ এবং ১৯ মাঘ, ১২৮১ সালের দুটি সংখ্যায়। দিল্লী দরবার নিয়েও কিছু সুন্দর আলোচনা ছাপা হয়। ৫ মাঘ, ১২৮১ সালের সংখ্যাটি থেকে জানা যায় অমৃতবাজার পত্রিকার দুটি অতিরিক্ত সংখ্যা তখন কিছুকাল প্রকাশিত হয়েছিল। একটিতে ইংরেজী-বাংলা দুই-ই থাকত এবং অপরটিতে কেবল ইংরেজী। এই অতিরিক্ত ইংরেজী সংখ্যাটি প্রেরিত হত বিলাতে। বাংলা সংবাদপত্রগুলি থেকে ইংরেজ-শাসনের দোষ-ত্রুটি সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনার সারবস্তু সংগ্রহ করে এই সংখ্যার ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেওয়া হত। দেশীয় ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি থেকেও কিছু কিছু উদ্ধৃত থাকত। "শুনিতে পাওয়া যায় এইরূপ অতিরিক্তের তিনশতখানি বিলাতে শ্বেতাঙ্গগণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।"

আর একটি বিশেষ মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায় ৭ চৈত্র, ১২৮২ সালের সংখ্যাটি থেকে। এই সংখ্যায় 'দেশীয় বস্ত্র' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যে বয়কট্ আন্দোলন শুরু হয়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও অনেক আগে বাংলাদেশে এ ব্যাপারে একটা প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। অবশ্য এ প্রচেষ্টার রূপ নিতান্তই ক্ষীণ ও সীমিত। কিন্তু বাংলার মাটিতে জাতীয়তাবোধের বিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাই প্রবন্ধটি থেকে সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম।

"বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে ঢাকা নগরীতে কয়েকজন উন্নত যুবা 'বিলাতীয় বস্ত্র যত পারি অল্প ব্যবহার করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করণান্তর একটি সভা স্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের দেশ বস্ত্রের নিমিত্ত দিন দিন যেরূপ ম্যাঞ্চেষ্টারের গলগ্রহ হইয়া পড়িতেছে, দেশের তন্তুবয়ন দিন দিন যেরূপ লোপ পাইতেছে, এমন সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা অতি প্রশংসনীয়।"

এই ধরনের তথ্যমূলক রচনাগুলি সমস্তই অক্ষয়চন্দ্রের নয়, অন্যান্য লেখকের লেখাও কিছু আছে।

স্যাটায়ার-জাতীয় রচনাতেই অক্ষয়চন্দ্রের দক্ষতা বেশি পরিস্ফুট। এদিক থেকে তাঁর ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ অন্যান্য রচনার সঙ্গে 'চন্দ্রালোকে' রচনাটির আকৃতি-প্রকৃতিগত বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু বঙ্কিমের প্রভাবকে স্বীকৃতি জানালেও অক্ষয়চন্দ্র তাঁর রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বকীয়তার পরিচয় রেখে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত হ্যুমারিস্ট, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র স্যাটায়ারিস্ট। হ্যুমার ও স্যাটায়ারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ নিয়ে এ পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে কম আলোচনা হয়নি। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবু স্বল্প কথায় এইটুকু স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে যে হ্যুমারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গভীর চিন্তাশীলতা ও জীবনবোধ; একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে হ্যুমারিস্ট জীবনকে দেখেন। রিক্ততা নিয়ে রসিকতা করলেও সে রসিকতার জন্ম আন্তরিক সহানুভূতির মধ্যে। কিন্তু স্যাটায়ার হল সেই মোক্ষম অস্ত্র যার আঘাতে লেখক দুনিয়ার যত ভান-ভণ্ডামি আর ফাঁকি-চালাকি ফাঁস করে দেন। এই অস্ত্র প্রয়োগে সুদক্ষ ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র।

বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনার প্রকৃতি-নির্দেশক হিসাবে 'ব্যঙ্গ', 'কৌতুক', 'রহস্য' ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহার দেখা যায়। তবে 'রহস্য' শব্দটিকে সবক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। কোনো কোনো লেখক গূঢ়তত্ত্ব বোঝাতেও শব্দটি প্রয়োগ করেছেন; যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান-রহস্য' বা রামদাস সেনের 'ঐতিহাসিক রহস্য' ও 'ভারত-রহস্য'। এ সব ক্ষেত্রে 'রহস্য' তথ্যময় বা পাণ্ডিত্যময়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুক অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'লোক-রহস্য' গ্রন্থে। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র তাঁর এই জাতীয় লেখাগুলিকে 'রহস্য' বলেই উল্লেখ করেছেন। নবজীবন পত্রিকায় 'শুধুই রহস্য' রচনাটিতে (মাঘ, ১২৯৪) তিনি লিখেছেন, "ঐহিক-পারত্রিক বড়লোকদের দেখাদেখি আমারও কিঞ্চিত রহস্য লিখিতে সাধ হইয়াছে।" এই সাধ পূর্ণ করতে গিয়ে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজকের দিনেও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। কিছু অপূর্ব রহস্য বা ব্যঙ্গ-কবিতাও তিনি লিখেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অজরচন্দ্র সরকার 'রূপক ও রহস্য' নামে পিতার এই জাতীয় অনেকগুলি রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করেন (১৩৩০)। কিছু উৎকৃষ্ট রচনা বঙ্গদর্শন ও নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'ভাই হাততালি', 'গ্রন্থরহস্য', 'গ্রাবু' ইত্যাদি এবং কলিকাতায় 'শুক-সারী-সংবাদ'। সাধারণীতে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের লেখাগুলির পরিচয় প্রদান এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য হলেও নবজীবনে প্রকাশিত 'শুক-সারী-সংবাদ' নামক অপূর্ব ব্যঙ্গ কবিতাটির কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। মনে হয় তৎকালীন 'বাবু'-সমাজকে বিদ্রূপ করাই এই কবিতাটি রচনার উদ্দেশ্য,—

"শুক বলে, আমার কৃষ্ণ
রোজ্‌গারী ছেলে;
সারী বলে, আমার রাধায়
গয়না দিবে ব'লে,
রোজ্‌গার কিসের লাগি?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
চশ্‌মা শোভে নাকে;
সারী বলে, আমার রাধায়
খুঁটিয়ে দেখবার পাকে,
নৈলে পরবে কেন?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
দাড়ি-দোলায়িত;
সারী বলে, আমার রাধার
চিরুণী-চালিত,
নৈলে জটা হ'ত।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
আল্‌বার্ট টেরি;
সারী বলে, আমার রাধার
সীঁথির অমুকারী,
টেরি পেলে কোথা?"

সাধারণীতে অক্ষয়চন্দ্রের এই ধরনের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৪ মাঘ,

১২৯০ সালের পত্রিকায় 'নব্য-বাণিজ্য' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাধারণীতে 'চনক-চূর্ণ' নামে ব্যঙ্গ-কৌতুকের একটি বিভাগ ছিল। এই বিভাগের রচনাগুলি অক্ষয়চন্দ্রের। গ্রাহকদের কাছ থেকে যথাসময়ে মূল্য না পাওয়ায় ১৯ মাঘ, ১২৮১ সালের পত্রিকায় 'চনক-চূর্ণ' বিভাগে 'অনাদায়' নামে একটি লেখা ছাপা হয়। লেখাটির শেষে গ্রাহক-চরিত্র সম্বন্ধে এই সুন্দর ব্যঙ্গ-কবিতাটি সংযোজিত হয়েছে—

"সভাজন শুন, গ্রাহকের গুণ,
পড়িতে আগ্রহ দড়।
পড়া হলে শেষ, পৈসা দিতে ক্লেশ,
মনের আক্ষেপ বড়॥
'সপ্তা' 'হপ্তা', 'সিন্ধু' 'হিন্দু'
এক যদি হয়।
'গ্রাহক' 'গ্রাসকে' তবে
ভেদ কেন রয়॥
শুন গো গ্রাহক কি তব রীতি।
টাকা দিবে নাকো এ কোন্ নীতি॥

* * *

ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে মূল্যটা দে।
ত্বরা দে, ত্বরা দেয়' টাকা ক'টা দে॥
যদি মূল্য মিলে হয় হর্ষ মনে।
অতি কাতর তোটক ছন্দ ভণে॥"

সাধারণীতে রাজনৈতিক আলোচনাই বেশি ছাপা হত। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই নিছক রাজনীতির নীরস আলোচনা নয়। "রাজনীতি-জড়িত সাহিত্যের সক্" মেটানোর যে উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণীর আবির্ভাব হয় তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল। এই সার্থকতা অর্জনের ব্যাপারে সেদিন অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় —বঙ্কিমচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রামদাস শর্মা' ছদ্মনামে ইন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ভারত-উদ্ধার' কাব্যটি সাধারণীতেই প্রকাশিত হয় (৮ মাঘ, ১২৮৪)।

পত্রিকা-সম্পাদনা ব্যাপারটি অনেক সাহিত্যিকের জীবনেই আশীর্বাদের মতো। এই আশীর্বাদের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় তাঁদের প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠার বিশেষ সুযোগ পেয়েছে। অক্ষয়চন্দ্রও ছিলেন এমনি একজন ভাগ্যবান সাহিত্যিক।

যাত্রাগান

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ধাতুগত অর্থে যাত্রার মানে হয় 'যাওয়া'। আমরা বলি, তিনি যাত্রা করেছেন কিংবা পাঁজিপুঁথি দিনক্ষণ দেখে আজও যে-হিন্দু পরিবার বিদেশ-যাত্রা করেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়, যাত্রার সময় কখন?

কিন্তু পালা-গাওয়া মানে যে যাত্রা, তার সঙ্গে এই যাওয়া-গমন ব্যাপারটার কোনো যোগাযোগ আছে কি? উড়িষ্যা বা দক্ষিণ ভারতের বহু জায়গাতেই যাত্রা গাওয়া হ'ত রাস্তার ওপর—লোকের চলন-পথের ওপর। লোকের যাত্রাপথের ওপরই গাওয়া হ'ত বলেই কি এর নাম যাত্রাগান? কিংবা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতই ঠিক? তিনি বলেছেন, সূর্যের রাশ্যান্তরে গমন—বিশেষ ক'রে তার উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন উপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত প্রায় সমস্ত পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতে তারই নাম ছিল যাত্রা।

দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁরই দারুভূত মূর্তি জগন্নাথ সম্পর্কিত যে-কোন উৎসবকেই যাত্রা বলা হয়; স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা এবং দোলযাত্রা। স্নান এবং রথে যাওয়ার পর্ব থাকলেও যাত্রার কথার সঙ্গে কিন্তু যাওয়ার কোনো সংশ্রব নেই। যাত্রা মানেই হচ্ছে উৎসব। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাচ-গান এই উৎসবের অঙ্গ ছিল ব'লেই পরবর্তীকালে লোকে এই নাচ-গানকেই যাত্রা বলতে শুরু করে। এবং এই নাচ-গানের পালা অনুষ্ঠিতও হ'ত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ বা জগন্নাথ দেবের মূর্তির সামনে। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'ও একখানি কৃষ্ণযাত্রার বই। কৃষ্ণযাত্রার মূল উদ্দেশ্য যদিও শ্রোতৃহৃদয়ে ভক্তিভাবের বান বহানো, তবু কার্যতঃ দেখা যেত, নাচ-গানের মধ্যে আদি বা শৃঙ্গার রসের ছড়াছড়ি।

মাত্র কীর্তনাঙ্গ কৃষ্ণযাত্রার একঘেয়েমিকে ত্যাগ ক'রে নতুন পালাগান জন্ম নিল সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই। চণ্ডীর বিভিন্ন অসুরবধ, মদনভস্ম, কার্তিকেয় জন্ম, দক্ষযজ্ঞ ইত্যাদি হরগৌরী সংক্রান্ত কাহিনী, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং পুরাণ-উপপুরাণ থেকে গল্প নিয়ে যাত্রার পালাগান লেখা হ'তে শুরু হ'ল। আর তা অভিনীত হ'তে লাগল মন্দির প্রাঙ্গণে, ধনীরও বহির্বাটির চত্বরে, মেলাতলায়, হাটে-বাজারে। কিন্তু সবই পৌরাণিক কাহিনী এবং পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। সম্ভবতঃ বাঙলা রঙ্গমঞ্চের জন্যে লিখিত বহু পৌরাণিক নাটকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা ব'লেই এইসব পৌরাণিক পালাগানে সংলাপ ছিল ভাঙা অমিত্রাক্ষর

ছন্দে—যাকে আমরা সাধারণতঃ গৈরিশ ছন্দ ব'লে থাকি। পুরুৎপোক খাদ্যের সঙ্গে যেমন চাটনী থাকে মুখ বদলাবার জন্যে, এইসব পালাগানেও তেমনি থাকত দু' একটি ভাঁড় জাতীয় চরিত্র, যাদের কাজই ছিল নানা রকমভাবে লোককে হাসানো। কিন্তু যাত্রায় সংলাপ অংশের চেয়ে গানের ছিল প্রাধান্য এবং দর্শককে গানের দ্বারা প্লাবিত করবার জন্যে পালার মধ্যে বিবেক বা নিয়তি কিংবা পাগলিনী গোছের স্ত্রী-চরিত্র অথবা নারদ, বিদুর, উদ্ধব বা ঐ রকম কোনো পুরুষ-চরিত্রের অবতারণা করা হ'ত। আমরা ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত উত্তর কল্‌কাতার নানা স্থানে বা হুগলী ও বর্ধমান জেলার পল্লী অঞ্চলে যে-যাত্রাভিনয় দেখেছি, তাতে গানের জন্যে জুড়ী এবং দোয়ারকী প্রথা প্রচলিত দেখেছি। একটি দৃশ্য-শেষে সেই দৃশ্য থেকে উদ্ভূত প্রধান রসটিকে অবলম্বন ক'রে কোনো একটি চরিত্র এক লাইন কথা বলতেই—ধরুন, দ্রৌপদী বিলাপ করল—"বৎস, অভিমন্যু, কোথা গেলি, বাপ?" অমনি অভিনেয়-স্থলের চার কোণে উপবিষ্ট চারজন গেরুয়া বা হলুদ বা লাল চাপকানধারী লোক দাঁড়িয়ে উঠে মন্দিরা বাজিয়ে গাইতে শুরু করত—"বৎস, অভিমন্যু, কোথা গেলি, বাপ?" এবং এরা দু' লাইন গাইবার পর ওদেরই এক পাশে উপবিষ্ট চার বা ছয় বা আটজনে গঠিত দোয়ারকী দল ঐ দুই লাইন আবার পুনরাবৃত্তি করত। শুধু তাই নয়, ঐ জুড়ীদের মধ্যে কোনো কোনো গাইয়ে গানের কোনো একটা পংক্তি নিয়ে নানা রকম তান,

'জালিয়াৎ' নাটকের একটি দৃশ্য।

কর্তব, বিস্তার দেখিয়ে নিজের গুণপনার পরিচয় দিতেন এবং ঐ সঙ্গে বাদ্যকার-বৃন্দের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ—বিশেষ ক'রে বেহালা, কর্ণেট ও মৃদঙ্গবাদকও তাঁদের ব্যক্তিগত গুণপনা দেখাবার সুযোগ নিতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করতেন না। উচ্চাঙ্গের রাগরাগিণীপূর্ণ এই সব কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত শুনে আমাদের মত সঙ্গীতানভিজ্ঞ লোকেরাও মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারতাম না। উত্তর কল্‌কাতার পেশাদারী যাত্রাদলের ঘাঁটি ছিল আপার চিৎপুর রোডের গরাণহাটা অঞ্চল। মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-পার্টি থেকে শুরু ক'রে শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর "ভাণ্ডারী অপেরা" "গণেশ অপেরা", "বীণাপাণি অপেরা" প্রভৃতি সকল যাত্রা দলই ঐ অঞ্চল আলো ক'রে থাকত। নারী এবং পুরুষ—উভয় চরিত্রই পুরুষ-দের দ্বারা অভিনীত হ'ত এবং কখনই শ্রোতার মনে প্রশ্ন জাগত না, পুরুষ নারী-চরিত্রে অভিনয় করছে কেন। এত আবেগপূর্ণ অভিনয় হ'ত এবং দর্শক তাতে এমনই তন্ময় হয়ে যেত যে, নারী-চরিত্রে পুরুষ অভিনয় করছে, এ-কথা দর্শকের মনেই থাকত না। এবং অনেক সময় এমনই নারীসুলভ কণ্ঠ এবং ভঙ্গীসহকারে পুরুষরা নারী-চরিত্রের অভিনয় করত যে, পুরুষে অভিনয় করছে ব'লে মনেই হ'ত না এবং অভিনেত্রীরাও সে-রকম আবেগপূর্ণ অভিনয় করতে সক্ষম হতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ক্রমেই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্যে এই সব পৌরাণিক পালার মধ্যে এমন অশ্লীল, ন্যক্কারজনক রসিকতার সৃষ্টি হ'তে সুরু করল এবং তাও এমন বীভৎস অঙ্গভঙ্গী সহযোগে অভিনীত হ'তে লাগল যে, রুচিমান দর্শকেরা ঐ সব পেশাদারী যাত্রার আসর থেকে পালাই পালাই ডাক ছাড়তে শুরু করলেন।

কল্‌কাতার পেশাদারী যাত্রাদল-গুলির যখন এমন ভদ্রসমাজ-বহির্ভূত অবস্থা, দেশে তখন কিন্তু স্বাধীনতা-আন্দোলনের জোয়ার চলেছে। এরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ যাত্রা-জগতে দেখা দিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁর স্বদেশী যাত্রা নিয়ে। গৈরিকরঞ্জিত পাগড়ি-পরিহিত মুকুন্দ দাসের উদাত্ত কণ্ঠের মাতৃবন্দনা গানের কথা স্মরণ করলে আজও সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

এই অবস্থাতেই উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতার সব জায়গাতেই কিছু সৌখীন যাত্রার দল গজিয়ে উঠল। ভবানীপুরের যাত্রাদলে ৺তিনকড়ি চক্রবর্তী, ৺ফণী রায়, ৺ভুজঙ্গভূষণ রায়, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ অভিনেতা গৌরবের সঙ্গে অভিনয় করতেন। উত্তর কলকাতায় "বারবেলা বৈঠক" এবং "বাণী বৈঠক" এবং রাজবল্লভপাড়ার দল অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মধ্য কল্‌কাতার শ্রীজ্যোতিষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে জেলে-পাড়ার দল অত্যন্ত সুখ্যাতির সঙ্গে "জনমাথ" যাত্রাভিনয় করেছিলেন। এই সৌখীন দলেরা কিন্তু তাঁদের অভিনেয় বিষয়বস্তুর জন্যে মাত্র পৌরাণিক

নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসবে শ্রীনিমাই সন্ন্যাস নাটকে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া। বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী ইহার আয়োজন করে।

উপখ্যানকেই আঁকড়ে থাকেননি; তাঁরা নানারূপ কাল্পনিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য কাহিনীকেও যাত্রার আসরে নিয়ে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে "বাণী বৈঠক"এর "বিজয়-বসন্ত" যাত্রাভিনয় উল্লেখযোগ্য।

মনে নয়, ১৯২৫-২৬ সালের পর থেকে যাত্রা সম্বন্ধে শহরবাসীর উৎসাহে দ্রুত ভাঁটা পড়তে থাকে এবং জনসাধারণ ঝুঁকে পড়ে সিনেমা, থিয়েটার এবং সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের দিকে। পেশাদারী যাত্রাদল শহর ছেড়ে গ্রামের পথে পা বাড়ায়। যদিও তাঁদের আস্তানা শহরেই থাকে, তবু তাঁদের অনেকেই ব্র্যাঞ্চ অফিস বা এজেন্ট খাড়া করেন বর্ধমান, আসানসোল, জলপাইগুড়ি, খুলনা, রংপুর প্রভৃতি জায়গায়।

এরই মধ্যে ১৯৩৪-৩৫ সালে হাওড়া সমাজ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে "নদের নিমাই" যাত্রাভিনয় ক'রে মাত্র কলকাতার নয়, সারা বাঙলায় একটা অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের অনুকরণে প্রসিদ্ধ নট শ্রীছবি বিশ্বাস প্রমুখ শিকদারবাগানের দল অভিনয় করেন "নদীয়া-বিনোদ" ও শ্যামবাজার সুহৃদ সম্মিলনী করেন "নদীয়া-বল্লভ"। অনুকরণ হ'লেও এই শেষোক্ত দু' দলের গীতাভিনয়ও প্রচুর সমাদর লাভ করেছিল।

এর পর প্রায় পঁচিশ বছর আমরা এবং মনে হয়, আমাদের সঙ্গে কলকাতার আপামর জনসাধারণ— যাত্রার নাম শুনিনি। হঠাৎ এই বৎসর, ১৯৬১-র সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে বলা যেতে পারে আঁতকে উঠলুম—"বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ যাত্রা-উৎসব।" স্বীকার করতে আপত্তি নেই, মনে হ'ল, এ কি পাগলামি। যে-জিনিস কালের অমোঘ গতিতে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলে বিস্মৃতির পথে দ্রুত পাদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, শুভ শঙ্খ বাজিয়ে সেই কঙ্কালসার জীর্ণ-দীর্ণ পদার্থকে ডেকে ফিরিয়ে এনে সুধীসমাজের মাঝখানে মণিময় আসন পেতে অভ্যর্থনা করার এ কি দুরন্ত পরিহাসময় প্রচেষ্টা! তারপর যখন দেখলুম কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী, মাননীয় হুমায়ুন কবির সাহেব এই যাত্রা-উৎসবের উদ্বোধন করলেন এবং সত্য সত্যই দুই সপ্তাহব্যাপী যাত্রাভিনয়ের আসর ব'সে গেল স্বর্গীয় মহারাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ঠাকুরদালানের সামনের বিস্তৃত চত্বরে, তখন প্রমাদ গুণলুম এই ভেবে যে, কর্মকর্তাদের পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে, বিভিন্ন যাত্রার দলগুলিকে প্রায় দর্শকশূন্য আসনের সামনে বৃথাই নাচন-কোঁদন ক'রে শূন্যহাতে বিদায় নিতে হবে। কতগুলি অর্থ যে অনর্থক নষ্ট হবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এমন মূর্খতার পরিচয় আজকের দিনে কেউ কখনো দেয়!

কিন্তু, না—আয়োজন-কর্তারা একটুও মূর্খ নয়; মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—আমরা মূর্খ। কারণ, টালবাহানা করতে করতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়ে সচক্ষে যা দেখলুম, তাতে তাজ্জব বনে গেছি, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। একী, রথ দোলের ভীড়—টিকিটঘরে এ কী কাড়াকাড়ি, কোনোক্রমে ফটক গলিয়ে ঢুকে সারাক্ষণ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রাভিনয় দেখবার এ কি আকুল আগ্রহ! শহর-কলকাতার বুকে এখনও যে এত অধিক সংখ্যায় যাত্রা-পাগল লোক বাস করে, এ ত' স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

তবে হ্যাঁ, যাত্রার রূপ বদলেছে, যাত্রার আসরের রূপ বদলেছে, যাত্রার সময়-কালও বদলেছে, বিষয়বস্তুও বদলেছে। বদলায়নি খালি দর্শক—যাত্রানুরক্ত দর্শকের দল। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তারা সারাক্ষণ ধ'রে যাত্রা গিলেছে—সত্যিই, হাঁ ক'রে তন্ময় হয়ে গিলেছে। ধন্য বাঙলাদেশ, ধন্য দেশের যাত্রা-পিপাসা!

প্রথম দেখলুম, যাত্রাভিনয়ে নারী-চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করছেন; চিরকেলে যাত্রা-দলের ছেলেরা সখী না সেজে হয়ত তাঁদের সঙ্গে মিশিয়ে গুটিকয়েক মেয়েকেও দলে নেওয়া হয়েছে। নারী-চরিত্রের অভিনেত্রীরা যথাসম্ভব গলাতুলে অভিনয় করলেও পুরুষ-অভিনেত্রীদের অর্থাৎ নারী-চরিত্রে পুরুষ-অভিনেতাদের অনুরূপ উচ্চ কণ্ঠের অধিকারিণী নয় ব'লে অনেক সময় এঁদের বক্তব্য শ্রোতাদের কর্ণকুহরে ঠিকভাবে প্রবেশ করে না। আসরের রূপ-পরিবর্তনই লক্ষণীয়। আগে যাত্রার আসরে ঢালা ব্যবস্থা ছিল। প্রশস্ত জায়গা জুড়ে শতরঞ্চির ওপর ধবধবে চাদর পাতা। মধ্যে যাত্রার জন্যে বেশ খানিকটা স্থান বাদ দিয়ে এক পাশে দোহারেরা, অন্য পাশে বাদ্যযন্ত্রীরা বসত এবং যাত্রাওয়ালাদের সাজঘর থেকে ঐ অভিনয়ে স্থান পর্যন্ত একটি নাতি-প্রশস্ত পথ বাদ দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলী
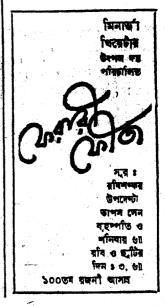
নিখিল বংগ যাত্রা উৎসবে 'ধর্মের বলি' নাটকের একটি দৃশ্যে ফরিদ খাঁ ও মুর্শিদকুলি খাঁ।

উপবেশন করত; অবশ্য আসরের এক-দিকে অনেকখানি জায়গা চিকের সাহায্যে ঘেরা থাকত—মেয়েদের সমবেতভাবে বসবার জন্যে। এ-আসরে দেখলুম, মেয়েরা আমাদেরই গা ঘেঁষে বসেছেন যত্র-তত্র—মেয়ে-পুরুষ ভেদাভেদ উঠে গেছে। সমস্ত চত্বরটাই চারদিকে গ্যালারী দিয়ে ঘেরা—এবং মাঝে দর্শকদের বসবার স্থান অল্প উঁচু কাষ্ঠাসনের ওপর চাদর বিছোনো। তাছাড়া অভিনেয় স্থানটা দর্শকদের স্থান থেকে আর একটু উচ্চতর (উঁচু Level-এ)—যাতে চতুর্দিকের উপবিষ্ট দর্শকের দেখার পক্ষে অসুবিধা না হয় এবং সেই স্থানটি তিন দিকে মোটা দড়ি দিয়ে ঘেরা—এক দিকটা খোলা আছে, অভিনেয় স্থানের অনতি-দূরে—প্রায় অগোচরভাবে অবস্থিত সাজ-ঘর থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আনাগোনার জন্যে। যদিও একটি বৈদ্যুতিক বাতির ঝাড় অভিনয় মঞ্চের মাথার ওপরে টাঙানো, কিন্তু সেই বহু-পরিচিত 'পাম্প্ লাইট' চিরতরে নির্বাসিত। মনে হয়, যে পল্লী অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি পৌঁছুতে পারেনি, সেখানের যাত্রাআসরে 'পাম্প্-লাইট' আজও সগৌরবে দেদীপ্যমান।

যাত্রার সময় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-সময়ের দেখাদেখি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কোথায়, রাত ন'টা-দশটায় শুরু হয়ে সকাল ছ'টা, এমন কি অনেক সময়েই বেলা আটটা পর্যন্ত একটানা অভিনয় চলত, আর এ দেখলুম, সন্ধ্যে সাতটায় শুরু হয়ে রাত এগারোটাতেই থতম। অবশ্য, অভিনয় একবার শুরু হয়ে একেবারে কোন রকম বিরতি না দিয়ে একনাগাড়ে শেষ অবধি চলে যাওয়াও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা—একমাত্র সিনেমা ছাড়া এ ব্যাপার সাধারণ মঞ্চেও ঘটে না।

বিষয়বস্তু তো দেখছি নিশ্চয়ই বদলেছে। অভিনীত পালাগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম দেখলুম পৌরাণিক কাহিনী এবং বেশী দেখলুম, ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক। 'মহারাজ প্রতাপআদিত্য', 'সম্রাট জাহান্দার শাহ্', 'ঠাকুর সর্বানন্দ', 'শয়তানের চর', 'সোনাই দিঘী', 'লোহার জাল', 'ধর্মের বলি' ইত্যাদি নাম।

কিন্তু দর্শক ছাড়া আর একটি জিনিসও বদলায়নি; সেটি হচ্ছে—দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্যে ভাঁড় জাতীয় ব্যক্তিদের ন্যক্কারজনক রসিকতা। অভিনেতারা এক ঢঙের অভিনয় করা ছেড়ে দিয়ে নানা ঢঙে অভিনয় করছেন;

নিখিল বংগ যাত্রা উৎসবে 'লোহার জাল' নটকের একটি দৃশ্য।

অবশ্য দূরের দর্শকদের জন্যে মুখভংগী ইত্যাদি সকলেই কমবেশী বজায় রেখে-ছেন; কিন্তু ঠিক যাকে বলি, একটি ছাঁচেঢালা অভিনয়, সেটার যেন অভাবই দেখলুম; তাতে মধ্যে মধ্যে অভিনয় ধারায় ছন্দপতন ঘটছে ব'লে মনে হ'ল। এবং কারণে অকারণে গান এখনও প্রচুর থাকলেও গানের ঔৎকর্ষ কমেছে ব'লেই বোধ হয়। যাত্রার অভিনয়ই যে মোটা তুলির (broad brush-এর) অভিনয়, তাতে সূক্ষ্ম স্বরবৈচিত্র্য বা কলা-কৌশল দেখাবার সুযোগ কম, এ সত্য আর একবার আমাদের সামনে প্রকটিত হ'ল। কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধা নেই, সমগ্রভাবে রসসৃষ্টি ক'রে ভাবাবেগে আপ্লুত ও অভিভূত করবার ক্ষমতা যাত্রাভিনয়ের আজও আছে, যেমন আছে সস্তা রসিকতা ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত ক'রে একে সর্বজনগ্রাহী করবার সুযোগ। 'বংগীয় নাট্য সংগঠনী' সংস্থাকে এই বিরাট যাত্রা-উৎসব আয়োজন করার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে যাত্রাভিনয়কে সুধীসমাজেরও উপভোগের বস্তু করে তুলতে যথাশক্তি প্রয়োগ করতে অনুরোধ জানাই।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

সাঁঝের প্রদীপ ও ঘরের আলো

সার্ভে ড্রইং সরঞ্জাম ও
অফিস সংক্রান্ত ষ্টেশনারী
কাগজ বিক্রেতা ও প্রিন্টার্স
বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান
ফোন
২২-৪২২৩
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
৬৩ ই, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২৫শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১০ই কার্তিক, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 27th October 1961.
40 Naye Paise

সম্পাদকীয়

গত কয়েকদিনের মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনেকখানি লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছে। সি-এম্-পি-ও বা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অরগানিজেশানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদে এখন এই সংস্থার পরিকল্পনা অনেকটা স্পষ্টতরভাবে দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গত সপ্তাহে মার্কিণ দূত মিঃ গল্‌ব্রেথ কলকাতা পরিদর্শন করে গেছেন এবং ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাঁর একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অরগানিজেশনের প্রধান কর্মকর্তা বা উদ্যোক্তা হচ্ছেন ফোর্ড ফাউণ্ডেশান। এর পরবর্তী ধাপে আর-একটি প্রতিষ্ঠান কলকাতায় তৈরী হবে, যাঁরা উক্ত প্ল্যানিং অরগানিজেশানের রচিত পরিকল্পনাকে বৃহত্তর কলকাতায় কার্যকর রূপ দেবেন। এই দ্বিতীয় সংস্থাটির নামকরণ হবে সম্ভবত ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান অথরিটি এবং এঁরা পৌর প্রশাসনিক ক্ষমতাও লাভ করবেন। মিঃ গল্‌ব্রেথ ভারতবর্ষে বহুবার তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, অর্থনীতিবিদ হিসাবে কলকাতার সমস্যা তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে এই সমস্যার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সম্মিলিত হতে চান। একথা বহুবিদিত না হলেও ওয়াকেফ-হাল মহলের অজ্ঞাত নয় যে, সি-এম্-পি-ও বা নক্সারচনাকারী প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে ফোর্ড ফাউণ্ডেশানকে আগ্রহান্বিত করা এবং মার্কিণ সাহায্য সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি আদায় করার ব্যাপারে মিঃ গল্‌ব্রেথ ইতিমধ্যেই তাঁর এই সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছেন।

প্রথম সংস্থাটির রচিত পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্থাটির কার্যনির্বাহের দ্বারা আশা করা হচ্ছে যে, গঙ্গার দুই তীরবর্তী ঘাট ৭০০ বর্গমাইল এলাকা একটি নূতন পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুসংবদ্ধ, পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক সমাজ-জীবনের রূপ পরিগ্রহণ করতে পারবে। বলাবাহুল্য যে, এই সুসংবদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার মূল হচ্ছে জলনিষ্কাশন, পয়ঃপ্রণালী, পথ এবং পানীয় জলের জন্য উন্নত, প্রশস্ত এবং আধুনিক আয়োজন রচনা করে দেওয়া। এই ভিত্তি উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান হয়ত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে এবং ভিত্তি রচিত হলে আশা করা যায় যে, তার উপরে একদিন আধুনিক সমাজ-জীবনের পুষ্পিত লাবণ্য হয়ত দেখা দেবে।

কলকাতার গলি, বস্তি, নর্দমা ও খাটাল যেমন বিশ্বকুখ্যাতি অর্জন করেছে, তেমনি অন্যদিকে এর অন্তরালে ৬০ লক্ষ মানুষের বঞ্চিত, রুগ্ন এবং হতাশজীবনের করুণ বাস্তব ইতিহাস নির্মম হস্তে তৈরী করেছে। ইতিহাসের বিগত দেড়শত বৎসর একাদিক্রমে কলকাতার উপরে এই নির্মমতা এবং শোষণের যে অধ্যায় রচনা করে গেছে শুধু সদিচ্ছা, রাজনৈতিক গলাবাজি এবং পাড়ার কাউন্সিলরদের দ্বারা তার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ একদিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সমস্ত অনগ্রসরতা এবং কুলী ও মজুর বস্তির অভিশাপে কলকাতার ইঁটে পাথরে গত দেড়শত বৎসর ধরে কঠিনভাবে গাঁথা হয়েছে। অন্যদিকে, এই অভিশাপ বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য এবং কলকাতা থেকে বহু বৎসর যাবৎ একাদিক্রমে অপসারিত বৃহৎ মূলধনের ক্ষতিপূরণের জন্য যে মূলধন আজ নিয়োগ করা দরকার (যা নাহলে নগরীর শ্রী এবং স্বাস্থ্য আসতে পারে না) সে মূলধনও আমাদের নেই; যে বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব এবং চিন্তা দরকার, তার সন্ধান কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না।

কাজেই পরিকল্পনার প্রথম স্তরে ফোর্ড ফাউণ্ডেশানের এবং মার্কিণ দূতের সহায়তা এবং আসল কার্য-নির্বাহের সময় ৩০০ কোটি টাকা মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদির সম্মিলিত সাহায্য আমাদের পক্ষে কল্যাণকর এবং উৎসাহজনক। তথাপি কিছু লোক নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা অতীতের অভিশাপ বন্ধনের মধ্যেই তাঁদের কায়েমী স্বার্থ রচনা করেছেন—রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক, সেই কায়েমী স্বার্থ এই উন্নয়নের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। সোজা ভাষায় উন্নয়নের বিরোধিতা করা যায় না, কাজেই মার্কিণ সাহায্যের প্রতি সন্দেহ ও উষ্মা প্রদর্শনের দ্বারা তাঁরা এক অদ্ভুত ভগ্নকন্ঠ প্রতিবাদ তুলতে চাইছেন, যে প্রতিবাদ কর্কশ, কিন্তু হাস্যকর। এর মধ্যে মূর্খতা এবং আত্মস্বার্থপরায়ণতার পরিচয় যেমন আছে, তেমনি জনসাধারণের দুর্ভোগকে নিয়ে খেলা করার প্রবৃত্তিও আছে। যাঁরা বৈদেশিক সাহায্যের ছায়া দেখে সন্দেহাতুর হয়েছেন, তাঁরা অবশ্য ষ্টীল প্ল্যান্ট এবং বাণিজ্যিক চুক্তিতে রুশ সাহায্যকে দিনরাত্রি অভি-নন্দনের জয়ধ্বনি দ্বারা স্বাগত জানাচ্ছেন। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে, সরকারী দল যদি তাঁদের কায়েমী স্বার্থ উপেক্ষা করে বৃহত্তর কলকাতা পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হতে পারেন তাহলে বিরোধীপক্ষের কোনো কোনো শ্রেণীর এই হীন প্রতিবাদও অবিলম্বে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কারণ জীবনের কোনো উন্নতি ও সুষমাকে কুৎসার দ্বারা আবৃত করা যায় না, যদি সেই উন্নতি সার্থক ও পরিচ্ছন্ন হয়।

হলুদ বাটিছে মেয়ে

জসীমউদ্‌দীন

হলুদ বাটিছে হলুদ বরণী মেয়ে,
হলুদের পাটা হাসিয়া গড়ায় রাঙা অনুরাগে নেয়ে।
দুই হাতে ধরি কঠিন পুতারে ঘসিছে পাটার পরে,
কাঁচের চুড়ী যে রিনিকি ঝিনিকি নাচিছে খুসীর ভরে,
দুইটি জঙ্ঘা দুই ধারে মেলা কাঠগড়া কামনার,
তাহার উপর উঠিতে নামিতে সোনার দেহটি তার;
মর্দ্দিত দুটি যুগল শারণী শাড়ী-সরসীর নীরে,
ডুবিতে ভাসিতে পুষ্প-ধনুরে স্মরিতেছে ঘুরে ফিরে।

হলুদ বাটিছে হলুদ-বরণী মেয়ে,
রঙিন উষার আব্‌সা হাসিতে আকাশ ফেলিল ছেয়ে।
মিহি-সুরী-গান গুণ গুণ করে ঘুরিছে হাসিল্ ঠোটে,
খুসীর ভোমরী উড়িয়া মুখের পদ্মের দল লোটে।
বিগত রাতের রভস-সুখের মদিরা-জড়িত স্মৃতি,
সারাটি পাটার হলুদে জড়ায়ে গড়ায়ে রাঙিছে ক্ষিতি।
গাছের ডালে যে বুলবুলী বসি ভরিয়া দুখানা পাখ,
লিখিয়া লইতে তারি এতটুকু মেলিছে সুরেলা ডাক।

হলুদ বাটিছে হলুদ বরণী মেয়ে,
হলুদে লিখিত রঙিন কাহিনী গড়াইছে পাটা বেয়ে।
ডোলভরা ধান, কোলভরা শিশু বুকভরা মিঠে গান,
কোকিল-ডাকান আম্র ছায়ায় পাতার কুটির খান।
চাঁদিনী রাতের জোছনা আসিয়া গড়ায় বেড়ার ফাঁকে,
কৃষাণ কণ্ঠে বাঁশীটি বাজিয়া আকাশেতে প্রীতি আঁকে।
অর্দ্ধেক রাত নকসী কাঁথাটি মেলন করিয়া ধরি,
অতি সযতনে আঁকে ফুললতা মনের মমতা ভরি।
ঘুম যেন আসি গড়াইয়া পড়ে, সুরের লতালী ফাঁদে,
মাটির ধরায় টেনে নিয়ে আসে গগন-বিহারী চাঁদে।

*

* *

আমার জাহাজ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মানুষের পাশে দেখি শুয়ে আছে প্রিয় মানুষের
সমাধি: সবার কাছে পরপার অঙ্গাঙ্গী এমন।
অসংসক্ত, স্বাভাবিক মানুষ দেখেছি আমি ঢের;
সুখী মানুষেরে আমি দেখে গেছি অনেক, জীবনে।

সকল মানুষ দৃঢ়চিত্ত নয়, কিন্তু ছায়াবাদী।
আয়নায়, জলের প্রান্তে তার স্বতোৎসার ছায়াময়
কাঠামো, শৌখিন ফোটো, দেখেছি কেমন ভালোবাসে!
শতাব্দীতে একবার ধুয়ে দেয় সমাধি, সময়।

সেই সব সমাধির ধোয়াজলে আমার জাহাজ
ভেসে আছে। জল ছাড়া তাদেরও অস্তিত্ব
কেন্দ্র ক'রে, শতাব্দীতে একবার আমার জাহাজ—
সামগ্রীর লোভে নয়, লোকোত্তর-সুখভোগে নয়,
দুরূহ খুশিতে মেতে ভেসে আছে চিরপরপারে—
সেই সব সমাধির ধোয়াজলই আমার জাহাজ!

একটি বিষাদ

ফণিভূষণ আচার্য

তোমায় আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে
অনেক মৃত-আকাঙ্ক্ষারই সগৌরবে।
গাঢ় সবুজ হাওয়ার মতো মাতাল ভোরে
সকল হিসেব চুকিয়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়ি
মাটির বুকে। মাটির নিচে অনেক দূরে
তোমার অনুভবের সুরে নতুন ছড়া
অনেক মৃত-আকাঙ্ক্ষারই সগৌরবে।

কুড়োই বসে। কেন আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে
আকাশ এবং সমুদ্রকে বুকের ভেতর।
অন্ধকারে প্রশ্ন করি : হৃদয় আমার,
ফিরে পাবার দুঃখে কেন হারাতে চাও
হাতের মুঠোর এমন মধুর শূন্যতাকে?

তবু তোমায় ফিরে পেতে ইচ্ছে করে
তবু তোমায় ফিরে পেতে ইচ্ছে করে।

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জানি না, হঠাৎ শীতের আবির্ভাবে আপনারা কে কতোখানি ব্যতিব্যস্ত, তবু পীড়িত এবং সুস্থ সকলকেই বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই। পুজোর দিনগুলি নিশ্চয়ই আপনাদের আনন্দেই কেটেছে। সপ্তমীর সন্ধ্যায় সামান্য এক পশলা বৃষ্টি ছাড়া তেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগও ছিল না। বাসে-ট্রামে ভিড় থাকলেও পদাতিকদের পক্ষে পুলিশের সহায়তা ছিল অতি চমৎকার। কাজেই নারী এবং শিশুরা নির্ভয়ে অনেক রাত পর্যন্ত উৎসব প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াতে পেরেছে এও একটা সুখবর।

এই রকম সেবামূলক কাজে পুলিশের আত্মনিয়োগও খুবই আশ্বাসজনক ব্যাপার। লাল পাগড়ী দেখলেই এখনো আমাদের মনে যে রকম সন্দেহ এসে দেখা দেয় সেটা যতো তাড়াতাড়ি কেটে যায় ততোই মঙ্গল। এই আরম্ভ শুভ হোক।

* * *

তবে ঘরোয়া খবর পুজোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ থাকলেও বিদেশী খবরে অশান্তির লক্ষণ দেখা গেছে।

রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীকুশ্চেভ তাঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতায় জানিয়েছেন, ৩১শে অকটোবর রাশিয়া একটি বৃহদাকার আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বর্তমান পর্যায়ের বোমা-পরীক্ষায় উপসংহার টানবে। এই বোমাটি ৫০ মেগাটনের, কিন্তু ১০০ মেগাটনের বোমাও রাশিয়ার হাতে আছে—তবে ফাটানো হল না এই কারণে যে তাতে রাশিয়ারও সর্বনাশ ঘটত। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে যেহেতু পণ্ডিত ব্যক্তিরা অর্ধেক ত্যাগ করেন, সেই হেতু ১০০-র জায়গায় ৫০ মেগাটনের ব্যবস্থা। অর্থাৎ সংহারের পরিবর্তে উপসংহার।

ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সারা পৃথিবীতেই এ নিয়ে আলোড়ন উঠেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তো বটেই, আমেরিকা-সহ পৃথিবীর বহু দেশই এই বিপজ্জনক পরীক্ষা থেকে রাশিয়াকে নিরস্ত হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। একে শুভ লক্ষণই বলতে হবে।

আণবিক বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করা অন্যায় এ বিষয়ে সকলেই একমত। আণবিক বিস্ফোরণের ভয়াবহ এবং সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মতানৈক্য নেই। তবু গত এক দশক ধরে কখনো এদেশে কখনো ওদেশে বোমা-ফাটানো চলছেই। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সও মাঝে মাঝে দোহারকিতে গলা মেলাচ্ছে। এখন এই প্রতিযোগিতার বাজারে চট করে কাউকে সরে দাঁড়াতে বললেই সে সরে দাঁড়াবে এমন ভরসা করা কঠিন। অবিশ্বাস এবং আতঙ্ক দুপক্ষকেই মরীয়া করে তুলেছে।

তবু বাঁচতে তো হবেই। হাল ছাড়লে চলবে কেন? আমরা সাধারণ লোক, আমরা রাজনীতির জটিল তর্কের মধ্যে না গিয়ে বলব, এ ধরণের পরীক্ষা এখনই বন্ধ করা উচিত। আগে কে পরীক্ষা শুরু করেছে, সংখ্যায় কে বেশীবার বোমা ফাটিয়েছে, কে ভূগর্ভে আর কে আকাশমার্গে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, কিংবা কার বোমা কতো মেগাটন ছিল, এসব তর্কের বৈঠকী উত্তেজনায় কালহরণ করা এখন বিপজ্জনক। ব্যাপারটা ঠিক ডিবেটিং ক্লাবের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের মত নৈর্ব্যক্তিক নয়। ইতিমধ্যেই কলকাতার আকাশ থেকে আণবিক ভস্মাবশেষ পড়তে শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত সেটা বিপজ্জনক না হ'য়ে উঠলেও, আরো বিস্ফোরণ ঘটলে যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই আমাদের বর্তমান নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ততার জন্যে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করা দরকার, যে-কোনো দেশ থেকেই হোক, আণবিক বিস্ফোরণ অতি গর্হিত জিনিস, এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার এই দুষ্টচক্র থেকে অবিলম্বেই আমাদের অব্যাহতি পাওয়া উচিত।

জানি প্রশ্ন উঠবে, আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কথায় কান দিচ্ছে কে?

কিন্তু আমরা নীরব থাকায় পৃথিবী যে খুব সুখকর অবস্থায় এসে পড়েছে এমন তো দেখা যাচ্ছে না, সরব হ'লে ক্ষতি কি? অবস্থা যেমন গুরুতর হ'য়ে উঠেছে তাতে আশঙ্কা হয়, তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগেই মানবজাতি আণবিক বিকীরণের ফলে নানা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে চিরপঙ্গু হয়ে না পড়ে! আণবিক প্রতিক্রিয়ার এই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা মনে রাখলে আমরা যারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করি, এবং আমাদের পরবর্তী পুরুষের গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রতিদিন সহস্ররকম বঞ্চনাকে হাসিমুখে সহ্য করে যাই সেই আমাদের কাছে কী থাকে আর আশা নিয়ে বেঁচে থাকার! তাই এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতেই হবে। এবং এই সজাগ মনোভাব যাতে আমাদের পরিচিত সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্যেও সচেষ্ট হ'তে হবে। আশা করা যায়, সারা পৃথিবীতে আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা এ ব্যাপারে সচেতন হ'য়ে উঠলে কোনো পক্ষই আর আণবিক বোমা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে সাহসী হবে না।

প্রায় নব্বুই বছর বয়সে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যদি এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আইনের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করতে পারেন, এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সেজন্য তাঁকে ঈর্ষণীয় মনে করে থাকেন তো আমরাই বা ক্লীবতা ত্যাগ করে প্রতিবাদ জানাব না কেন?

* * *

মাইক্রোস্কোপ অর্থাৎ অনুবীক্ষণ যন্ত্রটির এক নতুন ব্যবহার জানা গেছে এবার। শুধু রোগ-জীবানুর পরীক্ষা বা অপরাধীর পরিত্যক্ত বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ই নয়, টাকের অকৃত্রিমতা আবিস্কারের জন্যেও এবার অনুবীক্ষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

টাক পড়লে মানুষকে সুন্দর দেখায় না বলে আমাদের ধারণা। মাথার চুল-ওঠা বন্ধ করার জন্যে কতো রকম তেলের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে।' কিন্তু চুলের পায়ে দশ মণ তেল ঢেলেও যে অনেক সময় তাদের মানভঞ্জন করা যায় না, এও তো পরীক্ষিত সত্য।

তবে, টাক যে সৌন্দর্যের পরিপন্থী এমন মনে করারই বা কারণ কী? অন্তত আমরা অর্থাৎ পুরুষেরা যাই মনে করি, মেয়েরা যে টেকোদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন না তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ফ্রান্সের "জাতীয় টেকো সম্মেলনে"র এক টাক-প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতাতে পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শ্রীআদিবাত শ্রেষ্ঠ টেকোর সম্মান পেয়েছেন। আর বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন কেবল মহিলাগণ। তাঁরা প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী 'পঞ্চপাণ্ডবে'র মাথায় অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, টাকগুলো সত্যিই অকৃত্রিম টাক—ক্ষুর দিয়ে কামানো ভেজাল টাক নয়।

বলা বাহুল্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রতিযোগীদের কেশাগ্রও স্পর্শ (বা আবিস্কার) করতে পারেনি। যন্ত্রটির এই চুলচেরা বিচারের কৌশল বিচারকর্ত্রীরা নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না। এবার থেকে নারীদের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাতেও হয়তো ঐ যন্ত্রটিই তাদের মুখমণ্ডলের মসৃণতা পরীক্ষায় ব্যবহৃত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য

অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়

'আত্মপরিচয়', 'জীবনস্মৃতি', 'প্রাচীন সাহিত্য', ও 'মানসী' কাব্যের মনোযোগী পাঠকের কাছে একথা অবিদিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের ভিত্তিভূমি সংস্কৃত সাহিত্য। নিতান্ত বালককালে সংস্কৃত-শিক্ষার যে সূচনা হয়েছিল, তার সুচর্চা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রমানসের গঠন, পরিপুষ্টি ও বিকাশসাধনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। বিশ্বভারতীর আদর্শ ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতের শরণস্থ হয়েছিলেন—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"। তাঁর জীবনের আদর্শ সংস্কৃত মন্ত্রেই ব্যক্ত হয়েছে : তাঁর সাহিত্যাদর্শ এই মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা—"শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্"। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছাত্রদের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াতেন আর শিক্ষকদের পাণিনি-জ্ঞান বাংলায় অধ্যাপনায় আবশ্যকীয় যোগ্যতা বলে মনে করতেন। শান্তিনিকেতনে সকল অনুষ্ঠানের সূচনা হোত সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে। একবার চীনের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে অভিনন্দন-জ্ঞাপনের জন্য আহূত সভা রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় পরিচালনা করেন। ডক্টর উইণ্টারনিজকে বিশ্বভারতীতে পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সে উপলক্ষে সংস্কৃতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকটি অভিনীত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল যখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে 'ডি-লিট' উপাধি দানের জন্য আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাভিনন্দন জ্ঞাপন করেন সংস্কৃত ভাষায় এই বলে—

"ভবন্ত উক্ষতীর্থবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভুবঃ!

এষোঽস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতবর্ষস্য। ত্বং মাং সম্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রত্না বিদ্যাভূমির্নিমাত্মনো মানবধর্মাম্নিয়মেব মহান্তমাবিষ্কর্তুমীহতে যস্যা খলবর্থঃ সাম্প্রতং অতিতরাং গম্ভীরশ্চ অনতিপাত্যশ্চ সংবৃত্তঃ।" ইত্যাদি

তাই রবীন্দ্রমানসের কবিধাত্রী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, একথা বলা হয়তো ভুল হবে না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে সংস্কৃত জ্ঞান অপরিহার্য। বিশ্বভারতীর আদর্শ ঘোষণায় ও উপনিষদে জীবনাদর্শের সন্ধানলাভে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তা আমাদের সংস্কৃতের পটভূমি সম্পর্কে অনবহিত থাকতে দেয় না।

অধুনা রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে নানা ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংগীত অনূদিত হচ্ছে। আজ জগতের প্রতিটি অগ্রসর দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদে জোয়ার এসেছে। রুশ ভাষা থেকে স্পেনীয় ভাষা, আরবী ভাষা থেকে আইসল্যাণ্ডের ভাষায় রবীন্দ্র-রচনা অনূদিত হচ্ছে। ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত প্রধান ভাষাগুলিতে রবীন্দ্র-রচনা অনুবাদের দায়িত্ব মূলতঃ সাহিত্য আকাদামি ও তত্তৎ রাজ্যের সরকারী উৎসবসমিতি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান ও উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ সাহিত্য আকাদামি ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন। সে অনুবাদ যে কী দরের, তা রবীন্দ্র-গীতির হিন্দী সংকলন "একোত্তরশতী" দেখলেই টের পাওয়া যায়। গত মাসে নয়াদিল্লী আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-সংগীত নানা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে গীত হয়েছে। তার ফলে রবীন্দ্রসংগীতের সংহার হয়েছে। আর রবীন্দ্র-নাটকের যে হিন্দী অনুবাদ আকাশবাণী প্রচার করেছেন, তা এতই কর্ণপীড়াদায়ক ও জঘন্য যে বলা যায় না।

অথচ সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীত ও নাটকের অনুবাদ এবং তার গান ও অভিনয়ে কেউ মন দেননি। এ ভারী আশ্চর্যের। যেহেতু সংস্কৃত আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের আদি জননী, সেহেতু সংস্কৃতানুবাদ সহজসাধ্য ও মূলের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। একথাটি সরকারী কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেননি। অথচ রবীন্দ্রমানসের গঠনে ও পরিপুষ্টি-সাধনে সংস্কৃত ভাষার দান যে কত গভীর, তার যে ইঙ্গিত গোড়ায় দিয়েছি, তা থেকে এটাই প্রত্যাশিত ছিল সংস্কৃতানুবাদ অবহেলিত হবে না। সরকারী যন্ত্রে এই সৎ বুদ্ধির স্থান হয়নি। তাই "পকা ধানের ক্ষেতে" ধরনের অনুবাদ-গানেই তাঁরা সন্তুষ্ট।

কিন্তু আমাদের এই দুঃখমোচন করেছেন কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ। গত মাসে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের পনেরটি গানের সংস্কৃতানুবাদ মূল সুরে গেয়েছেন এবং 'ডাকঘর' ও 'রথের রশি' নাটকদুটির সংস্কৃত অভিনয় করেছেন। 'রথের রশি' অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্রীবিমলকৃষ্ণ মতিলাল 'রথরজ্জুঃ' নামে। আর 'ডাকঘর' নাটকের সংস্কৃতানুবাদ "বার্তাগৃহম্" করেছেন অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সাহিত্যশাস্ত্রী। এঁরা দুজন ও পণ্ডিত শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ রবীন্দ্র-সংগীতের সংস্কৃতানুবাদ করেছেন।

রবীন্দ্র-সংগীতের হাস্যকর হিন্দী অনুবাদের সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে"—এই অপূর্ব সুন্দর চরণের হিন্দী অনুবাদ হয়েছে—"লুটা দে মেরা শির তেরা চৈংরিকা গর্দা পর"। এই আসুরিক সংহারকর্মে রসিকমাত্রেরই আপত্তি আছে।

এবার সংস্কৃত অনুবাদের নমুনা গ্রহণ করা যাক। "এসো নীপবনে ছায়া-বীথিতলে নব-ধারা সলিলে" গানটির সংস্কৃত অনুবাদ করেছেন শ্রীধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী। সেটি এখানে তুলে

দিচ্ছি—মূলের সঙ্গে এর সুন্দর সংগতি লক্ষ্য করুন।

এহি নীপবনচ্ছায়া-বীথিতলম্
নবধারাসলিলৈঃ কুরু অভিষেকম্।
প্রসারয় তব মসীঘনকেশম্
বহতু তনুলতা মেঘনীলবেশম্
কজ্জলমণ্ডন-নয়নমনোহর যূথিমালা-
শোভিত কণ্ঠম্।
কাময়ে তব রূপ-বিলাসম্
শনৈঃ শনৈঃ সখি, বিকাশয় হাস্যম্
অধর-নয়ন-পুটে বিরচয় লাস্যম্
মল্লার-গীতরূপ-মঞ্জুলতানৈঃ
মুখরয়তু বাণী তে কাননপর্ণম্—
অবিরল-বর্ষণ সলিল-কলকলৈঃ গায়তু
শ্যামকুঞ্জম্
এহি নীপবনচ্ছায়া-বীথিতলম্ ॥

এই অনূদিত গানগুলি সেদিন দরদ-ভরা কন্ঠে গেয়েছিলেন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায়। মূল গান যেভাবে আমাদের মনকে রসায়িত করে, এগুলি সেভাবেই আমাদের চিত্তকে রসাপ্লুত করেছিল।

এবার নাটকের কথা। সংস্কৃত নাটকের অভিনয় যে বোঝা যায় ও উপভোগ করা যায়, তা ঐ দুটি নাটকের অভিনয়ের দ্বারা প্রমাণিত হলো। 'ডাকঘর' ওরফে 'বার্তাগৃহম্' নাটকের অভিনয় দেখে কিশোর অমলের ব্যাকুলতায় আমাদের চিত্ত সাড়া দিয়েছে, মোড়ল ও কবিরাজের প্রতি আমরা বিদ্বিষ্ট হয়েছি। ঠাকুরদা ও রাজ-কবিরাজের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছি, দৈওলা ও পাহারাওলার ব্যবহারে খুশী হয়েছি।

এখানে 'ডাকঘর' ওরফে 'বার্তাগৃহম্' নাটকের দুটি অনূদিত অংশ ও সেই সঙ্গে মূল অংশ উদ্ধার করছি। রসিক পাঠক স্বীকার করবেন এতে নাটকের উপভোগ্যতা কমেনি। দুটিই অমলের উক্তি।

১। জানামি, ভৃশংখলু জানামি। সপ্তসহোদরায়াশ্চম্পায়াঃ কাহিনীমহং জানামি। যদি সর্বে মহ্যং মুক্তিং দদতি, তদাহং গন্তুং শক্নোমি—নিবিড়বনাভ্যন্তরে যত্র মার্গো ন দৃশ্যতে তত্রৈবাহং প্রচলেয়মিতি মন্যে। সুকুমার-শীর্ণ-শাখায়াঃ পুরোভাগে, যত্র মনুয়াপক্ষী উপোপবিশ্য দোদুল্যতে, তত্রৈবাহং চম্পকরূপেণ বিকশিতুং শক্নোমি—কিং তর্হি ত্বং মে পারুল-নাম্নী অগ্রজা ভবিষ্যসি?

মূল অংশ—জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয়, আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হ'লে আমি চলে যেতে পারি—খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সরু আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুটতে পারি। তুমি আমার পারুল-দিদি হবে?

২। নাহং তজ্জানামি। প্রত্যক্ষমিব সর্বং ময়ি প্রতিভাতি। মন্যে, বহুশো ময়া দৃষ্টং সর্বং, তত্তু অনেক-দিনেভ্যঃ প্রাগেব, কদা ইতি নাহং স্মরামি। অহং পশ্যামি—রাজ্ঞো বার্তাবাহকঃ শৈলশিখরাদ্ একক এব কেবলম্ অবতরতি—বামহস্তে তস্য প্রদীপঃ, স্কন্ধে তু পত্রপেটিকা। কতি দিনানি, কতি নিশাশ্চ স কেবলম্ অবতরত্যেব। গিরিপাদং নিকষা স্রোতস্বিন্যাঃ পন্থাঃ যত্ শেষং গতঃ, তত্র বংকিমনদীপথেন স কেবলম্ আয়াত্যেব—নদ্যাস্তীরে নীবারক্ষেত্রম্—ক্ষেত্রাভ্যন্তরে যঃ খলু সংকীর্ণ পন্থাস্তেনৈব পথা স কেবলমাগচ্ছতি—ততস্তত ইক্ষু-ক্ষেত্রম্, তস্য ক্ষেত্রস্য পার্শ্বতো গচ্ছতি সমুচ্চা সংকীর্ণা পথরেখা—তেনৈব মার্গেণ স কেবলম্ আয়াতি—অহর্নিশম্ একক এব আয়াতি—ক্ষেত্রমধ্যে স্বনন্তি ঝিল্লীকীটাঃ—নদীতীরে নাস্তি কোঽপি মনুষ্যঃ, কেবলং পংকখনকঃ পুচ্ছম্ আন্দোলয়ন্ পরিভ্রমতি—অহং সর্বমেব পশ্যামি। এবম্ অন্তিকম্ আয়ান্তং তং বীক্ষতো মে বক্ষসি সমুল্লসতি আনন্দসন্দোহঃ।

মূল অংশ—তা আমি জানিনে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয়, যেন আমি অনেকবার দেখেছি, সে অনেকদিন আগে, কত দিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝর্ণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—তার পরে আখের ক্ষেত, সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাত দিন একলাটি চলে আসছে—ক্ষেতের মধ্যে ঝিঁঝি-পোকা ডাকছে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। কতই সে আসছে দেখছি আমার বুকের ভিতরে ভারী খুশী হয়ে উঠছে।

আশা করি, বন্ধন-অসহিষ্ণু কিশোর অমলের ব্যাকুলতা এই অনূদিত অংশের মধ্য দিয়ে আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে ও তার জন্য আমরা ব্যাকুল হই। রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে পাব বলে আমরা সংস্কৃত অনুবাদের দ্বারস্থ হতে পারি। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের আবেদন বাংলা ভাষার সীমা লঙ্ঘন করে কেবল ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হতে পারে সংস্কৃতানুবাদেই। ইংরেজি, রুশ বা হিন্দী ভাষায় মূলের যে রস ব্যাহত হয়, তা সংস্কৃতে অক্ষুণ্ন থাকে। তার প্রমাণ দিয়েছে সংস্কৃত-সাহিত্য পরিষদের উৎসাহী কর্মীরা। আশাকরি এঁদের এই সৎ প্রয়াস শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের সমর্থন লাভ করবে ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচার আরো ব্যাপক হবে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলী কলকাতা সংস্কৃত কলেজে এক বিরাট অনুষ্ঠানে 'কবিসার্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই সংস্কৃতানুবাদের মাধ্যমে সে উপাধি আজ বিশ্বব্যাপী সার্থকতা লাভ করুক।

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ন রায়

সহযাত্রী যাঁরা রাত্রে দু' একবার উঠে থাকেন—মাঝে মাঝে জল খাওয়া আর বাইরে যাওয়ার রীতিটা যাঁদের নীতির মধ্যে দাঁড়িয়েছে, সেই স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে নাম লিখিয়েছে শ্রীমান নীরেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু আজ তাঁরও কোন সাড়াশব্দ নেই।

একুশে অক্টোবরের প্রভাত।

আমরা সব চট্‌পট্ উঠে পড়ি—স্নানযাত্রায় আমি ও নীরেন তপ্তকুণ্ডে গিয়ে দেখি, সেই গাড়োয়ালী কবিও আমাদের আগেই তপ্তকুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে ভাবসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি তাঁর গাড়োয়ালী ভাষায় তপ্ত অভ্যর্থনা জানালেন।

—জলে ঝাঁপ দিয়েই তাঁকে অনুরোধ জানাই—

—এই গরম জলে গরম গরম কবিতা বলুন, আর মানেটাও দয়া করে বুঝিয়ে যান।

তিনিও সোল্লাসে কবিতা আওড়ান আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। আমরাও নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবার ফাঁকে ফাঁকে বাহবা দিয়ে যাই।

রাজনীতির মধ্যে থাকলেও বেশ স্বচ্ছ সরল সোজা মানুষ। আমরা এক সঙ্গেই উঠে এলাম। কবি বললেন,

—আজই আমরা চলে যাব—প্রেসিডেন্ট-সাহেবও যাবেন।

—ক'টায়?

—বেলা বারোটায়।

নীরেনের কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলি,

—যাক্, তাহলে আজ আমাদের সুপ্রভাত।

—কী রকম?

—আরে বোঝ না ক্যান? এই অন্ধকার কারাগারে দু' দুটো রাত কাটালাম—এ'রা বিদায় হলে, আমাদের বাহিনী নিয়ে রাজ্যপাট দখল করবো।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিজেদের গর্তে ঢুকবার মুখেই কবিবর বল্লেন—

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

প্রেসিডেন্ট-সাহেব তাঁর আর্দালী পাঠিয়ে খবর দিলেন, যদি দয়া করে গণেনকে দিয়ে রেডিওটা তাঁর খাস-কামরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তিনি বাধিত হবেন।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে গেলাম। গণেন সামনেই দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচনা শুনছিল। উকীল মানুষ—আমাদের পরস্পরের কথা কাটা-কাটি কন্দুর গড়ায়—তারই একটা 'ব্রিফ' মনের খাতায় টুকে রাখছিল।

তাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলাম—

—যাও প্রেসিডেন্ট-সাহেবের খাস-কামরায় গিয়ে যথাকর্তব্য সম্পাদন করে ফিরে এসো। আর বেশী দেরী করে লাভ নেই। বৈদ্যুতিক আলো পাবো না—দশটায় বন্ধ। তাহলে লালবাতি না হোক, সাদা বাতি জ্বালিয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থা সেরে নিতে হবে।

গণেন ফিরে আসতেই আমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। একবার শুধু জিজ্ঞেস্ করি—

—খবর কী? এখনও কি ডঃ সম্পূর্ণানন্দের সম্পূর্ণ সংবাদ মেলেনি?

এড্‌ভোকেটের উত্তর—সম্পূর্ণ দূরে থাক—তার নামগন্ধও নেই।

—তা হলে প্রেসিডেন্টের সদা প্রশান্ত ভাব অশান্ত হয়ে উঠেছে, কী বলিস?

—সে আর বলতে।

সে রাত্রে বিশ্বের সমস্ত ঘুম যেন আমার চোখে নেমে আসে। আমাদের

আপনারা নির্বাণ দর্শন করে ফিরে আসুন—আমি আবার এসে আমার কবিতা শোনাবো—যত শুনতে পারেন।

নীরেন আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে একটি কথা অতি মৃদুকন্ঠে ওপরে ছুঁড়ে দিলে—

—রক্ষে করুন—আর ধৈর্য নেই।

নীরেন আবার প্রশ্ন করে—

—ঠিক আজই যাবেন তো?

—নিশ্চয়।

—তাহলে খবরটা গগেনকে জানানো দরকার—আজ সন্ধ্যায় তাকে আর রেডিও শোনাতে হবে না।

ভিতরে এসেই দেখি, সব ফাঁকা—মেয়েরা নির্বাণ দর্শনে গিয়েছে—ভৃত্য দুটিও নেই। আমাদের জামাকাপড় তাদেরই জিম্মায়। বরাতজোর বলতে হবে, আমার একখানা ধুতি পেয়ে গেলাম। কিন্তু নীরেন মুস্কিলে পড়ে গেল। এদিক-ওদিক হাতড়ে কিছুই খুঁজে পায় না। তার স্ত্রীর একখানা লাল পাড় নতুন গরদের শাড়ী এককোণে রাখা ছিল—সেইটা দেখে মহা খুশী—

—এইটেই পরা যাক, কী বল?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, আজ তোমার জন্ম সার্থক, বদরীনাথজী আজ তোমাকে সখীরূপেই দেখতে চেয়েছেন—

নীরেনও যেন অকূলে কূল পায়।

ঐ নববস্ত্র পরিধান করে, তার চেহারায় বেশ একটা খোলতাই এসে গেল। 'সখি আমায় ধর ধর' এই ভাব নিয়ে সেও অঙ্গ দুলিয়ে এগিয়ে যায় আর বলে—ললিতা গো বলে দে কোথায় আমার শ্যামরায়।

তারপরেই কোমরে হাত দিয়ে সচকিত নয়নে চমকিত প্রশ্ন—

—যদি কেউ দেখে ফেলে, কী মনে করবে?

—এখানে তোমাকে চেনেই বা কে, আর আমরা ছাড়া দেখবেই বা কে?

—কেন, ছেলেরা?

—বেশ তো, ঘোমটা দিয়ে ফেলো—আর যদিই বা চিনতে পারে—মনে করবে, আজ পিতৃদেব মাতৃরূপেন সংস্থিতা। এখন ক্যালকুলেশন ছেড়ে দাও—তাড়াতাড়ি চল—নইলে দর্শন মিলবে না।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

গুণে গগেন স্নান করে উঠে আসছে। হঠাৎ চমকে তারা চোখ ফুটিয়ে প্রশ্ন করে—

—এ কী বাবা, এ কী?

—কী করবো বাবা, চাকরদের দর্শন নেই। কোথায় কাপড়টা রেখেছে, খুঁজে পেলাম না। তাই তোমাদের মায়ের শাড়ীখানাই প'রে—

—তোদের বাপ আজ মা সেজে বেরিয়ে এলেন—নীরেনের অসমাপ্ত কথাটি আমিই শেষ করলাম।

আমরা পৌঁছতেই মেয়েরা কিছুক্ষণ দেবতা দর্শন বাদ দিয়ে, নীরেনের অপরূপ কান্তি চোখ ভরে দেখছিল, আর তার সহধর্মিণীর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কী হাসি!

আজও যথারীতি সপত্নীক প্রেসিডেন্ট যথাস্থানে বসে আছেন। আরও দেখি, দুই ভৃত্য রতি আর ঘোঁতা গরুড়ের মত করজোড়ে বদরীবিশালের দিকে মুখ করে সবার পেছনে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে কী সব বকছে।

—হঠাৎ এত ভক্তি কেন রে?

উত্তর পেলাম—মানত করেছি।

—কীসের?

—আপনি আমাদের দু'সেট করে গরম জামা, মোজা কম্বল দিয়েছিলেন—তার এক সেট সঙ্গেই আছে—বাকীগুলো সুটকেশের মধ্যে শ্রীনগরে ছুটে গিয়েছে। তা'ছাড়া বাড়ী থেকে নগদ চল্লিশটা টাকাও এনেছিলাম, সেটাও তার মধ্যেই—আর এক জোড়া নূতন ধুতি—তাই দেবতার কাছে পাঁচসিকের মানত করে রাখছিলাম—যদি ফিরে পাই—লালগোলায় মা কালীর ভোগ দেব।

—ঘুষ দেওয়া হচ্ছে বুঝি?

রতির মুখে কথা নেই। ঘোঁতা আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাইলো—

—এটা ঘুষ নয়—মানত।

আশ্বাস দিয়ে বলি—বদরীনাথজী তোদের কষ্ট দেবেন না—ফিরে পাবি হারানো ধন—যা' আমিই তোদের বরদান করলাম।

বিপদে পড়লে মানুষ ভগবানের কাছে মাথা খোঁড়ে, ঠাকুর-দেবতার দুয়ারে ধর্না দেয়, যার যেমনি শক্তি মানত করে—আর কত জনে কত কীই না চায়। আবার ভোগের আনন্দে তাঁকেই ভুলে যায়। তবে বিপদে আপদে পড়লে একটা জিনিসই শুধু চোখে পড়ে—সেটা হ'ল কোনো বিশেষ অবস্থায় ভগবানের নাম স্মরণ। এ সবে আমার মন সায় দেয় না। এমনি সওদার কারবারে আমি নেই।

আমার হয় ঠিক উল্টো। বিপদ যদি ঘনিয়ে আসে, দুঃখ যখন পাই, ভগবানের ওপরে হয় দারুণ অভিমান। কেন তিনি আঘাতের পর আঘাত দিয়ে এমন বারবার যাচাই করে দেখতে চা'ন?

আর যখন তাঁর করুণার ধারা নেমে আসে, যখন আমার অন্ধকার ঘর আলোয় ভরে ওঠে—তখনই তাঁকে অন্তরে জড়িয়ে ধরি—। আর যদি বা কখনো আমার জীবনে এর ব্যতিক্রম দেখা দেয়, সেদিন যেন বিশ্ববরেণ্য কবির বাণী আমারও কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

'বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে
ফিরিয়া যেওনা কভু।'

প্রেসিডেন্ট মিশ্র একটা ছক্কা-পাঞ্জা-আঁকা রঙ্গীণ সিল্কের শাড়ী বদরীনাথের পূজারীকে দিলেন—সেটা নারায়ণকে পরিয়ে পূজো হ'ল—তারপর খুলে নিয়ে আবার তাঁকেই পূজারী ফেরত দিলেন। জিজ্ঞেস করি—

—ওটা নিয়ে কী হ'বে?

উত্তর দিলেন পূজারী—এই পবিত্র বস্ত্র ঘরে রাখলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়।

নীরেনের কণ্ঠে উদ্বেগ—

—বৌদিও গতকাল একখানা জড়ি-পাড় শাড়ী পরিয়ে পূজো দিয়েছিলেন, কিন্তু দেবতার অঙ্গ থেকে সেটা আর খুলে নিতে বারণ করলেন—তাহ'লে কী হবে?

—হবে আর কী? তোমার বুদ্ধিকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পাবে।

—সে আবার কী?

—ঐ কাপড় নিয়ে ঘরে রাখাটাই বড় কথা নয়। নববস্ত্র-পরিহিত বিগ্রহকে বাদ

মনে ধরে রাখতে পারো, তাহ'লেই মঙ্গল।

নীরেন আমার কথাটির হিন্দী ভাষ্য করতেই রাওল পূজারী একগাল হেসে বললেন—

—ঠিক হ্যায়, এহি সব্‌সে বঢ়িয়া বাত।

প্রেসিডেন্ট-সাহেবের কোনও ভাবান্তর নেই। আমার কথাটি অনুমোদন করলেও, তাঁকে দেখে মনে হল, তিনি প্রচলিত প্রথাকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছেন।

পূজার পর লক্ষ্মীদর্শন করে ফিরে এলাম। আবার কবির সঙ্গে দেখা—নীরেন পাশ কাটিয়ে চলে গেল—ধরা পড়লাম আমি।

কবির অনুরোধ—চলুন, ঐ অলকনন্দার ওপরে গিয়ে কিঞ্চিৎ কাব্যামৃত রসাস্বাদ করা যাক্—

বাহবা দিয়ে বলি—বাকীটুকুও বলে ফেলুন—'সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ'। একজন আমি, আর একজনকে ডেকে আনি।

নীরেনকে ডাক দিয়ে বলি—

—শাড়ী পরলেও তো আর হেঁসেলে ঢুকতে হবে না—তার জন্য শক্তিরূপিনীরা আছেন।

নীরেন দোমনা ভাব দেখাতেই তাড়া দিয়ে বলি,

—বেরিয়ে এসো, তবে শাড়ীটা ছেড়ে আসতে ভুলো না, নইলে কবি হয়ত আমার দিকে ফিরেও চাইবেন না।

নীরেন বেরিয়ে আসে। আমরা তিনজনই যখন অলকনন্দার পুলের ওপর, কবি তাঁর ঢিলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে সবে একটা কবিতার পূর্জা বের করেছেন, এমন সময় একজন লোক ছুটে এসে খবর দিয়ে গেল, প্রেসিডেন্ট-সাহেবের জরুরী তলব—টেম্পল-কমিটির একটা মিটিং আছে, সেটা সেরেই তাঁরা হনুমান চটীতে চলে যাবেন।

কবির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নীরেন বেজায় খুশী। সে জোর তাগাদা দেয়—

—যান, যান, আর দেরী করবেন না।

বিমর্ষ মুখে কবির প্রত্যাবর্তন। আমরা দুজনে এগিয়ে গেলাম, যেখানে নারায়ণ স্বামী সাক্ষাৎ বদরীনারায়ণের দর্শন পেয়েছিলেন, এই রকম লোকে বলে থাকে। তাঁর ঘরে যজ্ঞকুণ্ডের কাছে গিয়ে মনে হ'ল, স্থানটিতে সত্যিই সাধনার আলো ছড়িয়ে আছে। নারায়ণ স্বামী এখনও জীবিত, তবে বেশীর ভাগ তিনি সেখানে থাকেন না—লোকজন খুব উত্যক্ত করে, তাই তিনি অন্যত্র চলে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে আসেন।

ফিরে এলাম। অন্ধকার গহ্বরে খাওয়া-দাওয়া সেরে, বেরিয়ে এসে দেখি, প্রেসিডেন্ট-সাহেবের মিটিং তখনও শেষ হয়নি। ওদিকে তাঁর স্ত্রী ওপরের বারান্দায় রোদ্রে বসে আছেন, সজোরে মালা ফিরিয়ে জপ করে যান। আমাকে দেখে আক্ষেপ করেন—বার বার লোক পাঠিয়ে মিশ্রজীকে তাগাদা করি, এখনও নাকি ও'র অনেক দেরী।

সেখানেই কথার জের মেটেনি—আসল কথাটাও বলে ফেল্লেন—

—মিশ্রজী যব্ তক্ নেহি খায়েংগে—ময় ভি নেহি খাউঙ্গী।

বুঝলাম, বৃদ্ধা মহিলার খুব খিদে পেয়েছে। সটান রায় দিয়ে বসলাম—

—একটা কাজ করুন মাইজী। ঘরের বিগ্রহকে ভোগ দিয়ে যেমন গৃহীরা আহার করে, তেমনি আপনিও পতি-দেবতাকে 'দাল রোটি' নিবেদন করে ভোজন করে ফেলুন—অবশ্য আপনার যদি নিজের কোনও আপত্তি না থাকে।

কোন্ শুভলগ্নে এই নববিধানটি উচ্চারিত হয়েছিল, জানি না, কথাটি তাঁর খুব মনঃপূত হ'ল, সেটা মুখ দেখেই বুঝলাম।

—আপনি খুব ভাল কথাই বলেছেন। মিশ্রজীর কাছে শুনেছি, বিদেশে নিয়মো নাস্তি—তাছাড়া এতে অনিয়মেরও কিছু নেই।

তিনি রুদ্রাক্ষ মালাটি মাথায় ঠেকিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

নীরেনের সহাস্য উক্তি :

—তোমার হিতোপদেশে বুড়ীমা বেঁচে গেলেন।

আমরাও মন্দিরের সামনে টহলদারি করি কখন প্রেসিডেন্ট-সাহেবের মিটিং ভাঙবে, খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হবেন, আর আমরাও চড়াও হয়ে তাঁদের ঘর দখল করবো। এখানেই রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন, সেই আরামটা এক রাত্রির হলেও ছাড়বো কেন? আবু হোসেনও তো এক দিনের জন্যে বাদশা হয়েছিলেন।

প্রায় একটায় মিটিং ভাঙলো। প্রেসিডেন্ট মিশ্রজী সদলবলে বেরিয়ে এলেন। বিলম্ব দেখে আগেই তাঁর মাল-পত্র, পোঁটলা-পুঁটলি সব রওনা হয়েছে। দুটি অশ্ব তাঁদের জন্যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে, কেবল হ্রেষারবে জানিয়ে দেয়, কী হেতু বিলম্ব এত?

তাঁদের বিদায়পর্বে কোনও সমারোহ দেখলাম না—আচার্য ব্রজমোহন বললেন

—আবার হনুমান চটীতে দেখা হবে।

নীরেন বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় উত্তর দেয়—না, ও চটীতে যাব না—আমরা কাল হনুমানের মত একলাফে যোশীমঠে চলে যাব।

প্রেসিডেন্টের হাস্য :

—ফিন্ যোশী মঠমে সাক্ষাত হোগী।

গণেন পশ্চাতে দাঁড়িয়েছিল—চাপা গলায় বললে :

—এইরে, আবার রেডিও!

হঠাৎ কোত্থেকে কবির আবির্ভাব :

—আজ্ঞ তো হল না। আবার যদি কখনো দেখা হয়, আমার কবিতা শোনাবো।

নীরেন নিরুত্তর।

আমি জোর দিয়ে বলি—জরুর।

তাঁরা চলে যেতেই, আমাদের যাবতীয় মালপত্র উঠিয়ে ঘর দখল করি। প্রেসি-ডেন্টের পত্রখানা এতদিন বুক-পকেটেই আত্মগোপন করেছিল—সেটাও কাজে লাগালাম—তাছাড়া মৌখিক অনুমতিও নিয়ে রেখেছি।

গুরুজন আহ্লাদে ডগমগ—আত্মীয় পুলুকে কথাগুলি জুড়িয়ে যায়

এ্যাদ্দিন পরে সত্যি একটা ভাল জায়গা পাওয়া গেল!

গণেনও মুরুব্বীর মত সায় দেয়।

নীরেন হাত-পা' মেলে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে নাক ডাকায় আর কী! মহিলারা তাঁদের নীচেরতলা ছাড়বেন না—তিন রাত এক ঘরেই নাকি কাটাতে হয়।

দেখলাম, নীল ঘর, নীল পর্দা, নীল কার্পেট। পণ্ডিত জহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেওয়ালে ঝুলছে—প্রত্যেকটিতে একটি করে গাঁদা ফুলের মালা।

যেমন চমৎকার ঘর, তেমনি সুবন্দোবস্ত। কাঁচের ফাঁক দিয়ে রজতগিরি পর্বতমালা বেশ সুন্দর দেখা যায়—নীচে অলকনন্দার অবিরাম কলধ্বনি। তার গতি আছে, ভঙ্গী আছে, আর আছে ঐশ্বর্যের ঝলক। স্থানটি মনোরম—কবিত্বময়।

মনে হল, এই সুন্দর দৃশ্যটি কথার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখি। কাগজ কলম নিয়ে বসলাম, কিন্তু যে দুর্দান্ত শীত, কথা এলেও হাত সরে না, বাধ্য হয়ে নিরস্ত হ'লাম।

ঘরের চাইতে বাইরের ডাকটাই তখন আমার কাছে বড়। বেরিয়ে পড়ি। বাজারে বাজারে ঘুরে বিচিত্র লোকজনের বেচাকেনা দেখি—দর কষাকষি এখানেও কম নয়।

এখানে লোকজনের সমাগম বেশী বলেই যেন একটু শহর-ঘেঁষা হালচাল। কেদারনাথে মানুষের যেমন সহজ সরল জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছিলাম, এখানে তার কিছুটা ব্যতিক্রম। তবে বেশীর ভাগ দোকানপাট বন্ধ। যে কয়েকটি খোলা আছে, তাতেই লোকের ভিড়। দোকানীদের পোয়াবারো—দাঁও মারবার এমন সুযোগ আর মিলবে না। সব জিনিসই এত দুর্মূল্য কেন, জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেয়—

—অনেক নীচু থেকে মালপত্র আনতে হয়, আর দু'পাঁচদিন পরেই সব বন্ধ হয়ে যাবে—সারা বছরের খরচ চালানো চাই তো!

ঘুরে-ফিরে মন্দিরে এলাম। সেই একই সুরে চব্বিশ ঘণ্টাই হারমোনিয়াম বেজে চলেছে। কামাই নেই। শুনলাম ওরা নাকি ব্রত নিয়েছে, ছ'মাসকাল অহোরাত্র এই রকম বাজিয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা করি—

—খাওয়া-দাওয়া আরো সব কাজ আছে তো? সেটা তো আর পত্তনি দেওয়া চলে না!

জানলাম, একজন ওঠে, একজন বসে ফাঁক থাকে না। তাহলে ধর্মক্ষেত্রেও 'শিফ্‌টের' বন্দোবস্ত আছে!

কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপরই মনে হ'ল, একবার সেই সেতারী সাধুটির খোঁজ নেওয়া যাক। তিনি ঠিক সামনের ঘরেই থাকেন।

তাঁর চেলাকে বলি—ভেতরে খবর দাও তো!

সে আপত্তি জানায়—

—আমাদের এ সময় যেতে বারণ—কী করবো বলুন। চেলা হওয়ার ঠেলা তো কম নয়।

—তা বটে। গুরু মেলে লাখে লাখে, চেলা মেলে কৈ? তবু একবার বলেই দেখ না—কী বলেন!

নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খবর দিতেই আমার ডাক পড়ল।

আমাদের মধ্যে কোনও কথা নেই। তিনিও আমাকে দেখেন, আমিও তাঁকে দেখি। প্রায় ঘণ্টাখানেক এমনি কেটে গেল। কিন্তু মুখে কোনও কথা উচ্চারণ না করেও যে অনেক কিছুই বলা যায়, আবার কোনও শব্দ না হলেও যে ভাবের তরঙ্গ এসে বুকে আঘাত করে, এই উপলব্ধিটুকু নিয়েই সাধুকে প্রণাম জানিয়ে বাইরে এলাম।

মন্দিরের চাতাল থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমেই দৃষ্টিকে তুলে ধরি আকাশের গায়ে। নগাধিরাজের চূড়ায় চূড়ায় জেগে-থাকা একটা নিঃশব্দ কম্পন যেন কোন্ বিরাট মৌনতায় মিশে যায়!

সূর্যাস্তের কনকরশ্মি হিমালয়ের শৃঙ্গে অনুরাগের রাঙ্গা ফাগ মাখিয়ে দিয়েছে—তাই বুঝি যুগ-যুগান্তের রঙ্গীন স্বপ্নের ভাষা বুকে নিয়ে কার প্রতীক্ষায় হিমাদ্রি অচল, অটল!

কী রকম যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসি। দেখলাম, নীরেন, গুণু, গণেন দিব্যি ঘুমুচ্ছে। আমার হাঁকডাকে সবাই উঠে পড়ল। কিন্তু নীরেনের কোনও সাড়াশব্দ নেই। তার গায়ে-চাপানো দু'খানা মোটা কম্বল টেনে নিতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

—কী ভোর হয়ে গেল না কী?

—সেটা তো পঞ্জিকায় লেখে না—

—ওঃ এমন ঘর এমন আরাম, তাই—

—এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দেবার মতলবে ছিলে বুঝি? নাও, এখন উঠে পড়—আরাম হারাম হ্যায়।

চটপট বিছানা ছেড়ে উঠেই নীরেনের তৃতীয় বাণী—

—ওরে গুণু, গণেন, চা-টা তৈরি হয়েছে?

উত্তর দিলাম আমি—

—টা সেই সকালেই তৈরি হয়েছে চায়ের কিঞ্চিৎ বিলম্ব।

আপনাপন কর্তব্য সম্পাদন ও বেশ পরিবর্তন। তারপরই মন্দিরে গমন।

আমরা আগের দুদিন যেখানে আসন পেয়েছিলাম, সেখানেই গিয়ে বসে পড়ি। আজ শুধু প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর পত্নী নেই। নিয়মিত সান্ধ্য আরতি শেষ হতেই লক্ষ্মীর মন্দিরে যাই। তাঁরও পুজোপাঠ সাঙ্গ হতেই সেই সেতারী সাধুটির দরবারে হাজির হই। তিনি এসে পড়েছেন। আমাকে দেখেই তাঁর কাছে বসতে ইশারা করেন। পরিচয়টা আজ দুপুরেই যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—সে খবর কেউ জানতো না—তাই নীরেনের নিম্ন-কণ্ঠের আওয়াজ শুনলাম—তোমার যে বসুধৈব কুটুম্বকম্। এ'কে আবার বাগালে কখন?

সেদিন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সাধু যেন তাঁর সমগ্র সাধনাকে তারের ওপর ঢেলে দিলেন—কণ্ঠে অতীন্দ্রিয় আবেগের অপূর্ব আবেদন। সেই সুরে, সেই গান যেন কোন্ চির-রৌদ্রোজ্জ্বল লোকের স্পর্শ নিয়ে মাটির বুকে নেমে আসে।

আমিও সেই সুরের ঝর্নাধারায় স্নান করে ধন্য হই।

গান ভেঙে গেল—নেশা কাটে না। বেরিয়ে এলাম। নীরেন চিরদিনই আমার 'অনুজ লক্ষ্মণ'—সেও আমার অনুগমন করে আর জানতে চায়—

—গানের মধ্যে এমন কী পাও, যার জন্যে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেল।

আমি নিরুত্তর। উত্তর দেবার অবস্থাও তখন ছিল না। খেয়ে-দেয়ে শোবার আগে নীরেনকে জিজ্ঞেস করি--

—তখন কী সব বলছিলে, বল।

সে পুনরুক্তি করে।

উপদেশ দিই—

মাস্ম ক্লৈব্যং গমঃ পার্থ, তস্তোত্তিষ্ঠ, পরন্তপ!

—শুকিয়ে তক্তা হয়ে গেলাম, আর ত্যাক্তোত্তিষ্ঠ!

তাড়া দিয়ে বলি—ও সব গবেষণা এখন মুলতুবী থাক, এবার দোসরা নম্বর ঘুম লাগাও—কাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, তোমার জন্মদিন।

বাইশে অক্টোবর।

রাত আড়াইটেয় ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তখন না আছে গরম জল, না আছে কিছু—মাথার কাছেই ওভারকোট, সোয়েটার প্রভৃতি রাখা ছিল—টর্চ জেললে একের পর এক গায়ে চড়িয়ে নিয়েই বাইরে বেরিয়ে গেলাম—ঠান্ডা, কন্‌কনে ঠান্ডা; সমস্ত পুরু আবরণ ভেদ করে শীতের তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি আমার দেহে কামড় বসিয়ে দেয়। হাঁসুলির মত বাঁকা দ্বিতীয়ার চাঁদ পাহাড়ের মাথায় উঁকি দিয়ে তখুনি বিদায় নিতে চায়। তার সমগ্র সত্তাকে প্রকাশ করতে পারে না—তাই বুঝি এত ক্ষীণ, এত ম্লান-বিষণ্ণ পান্ডুর। আজ আমাদেরও এখানে শেষ বিদায়ের দিন, মনটা কেমন যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ব্যথার একটা রূপ আছে। উদ্দেশ্যহীন এধার-ওধার ঘুরিফিরি। একবার মনে করি—যাই না, সোজা পাহাড়ে উঠে মৌনীবাবার দর্শন করে আসি। আবার যদি পথ হারাই? পরশু দিনের বেলায় এই অবস্থা—এই রাত্রে সেই পথে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কে একটি লোক লন্ঠন জ্বালিয়ে কোথায় চলেছে—ডেকে বলি—এই নাও দু-টাকা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পাহাড়ে চল—যেখানে মৌনীবাবা আছেন—আবার সঙ্গে করে নামিয়ে আনলে আরও দুই টাকা দেব। সে প্রথমে আপত্তি জানালেও শেষটা রাজী হয়ে গেল। সে আগে আগে যায়, আমিও টর্চ জ্বালিয়ে তার পশ্চাতে।

এত খাড়াই পাহাড় যে হাঁপ ধরে যায়, এত অসভ্য ঠান্ডা, হাত-মুখ অবশ হয়ে আসে। একবার মনে হল, কাজটা ভাল করিনি। বাড়ীর কেউ যদি জানতে পারে?

কা চিন্তা মরণে রণে।

যখন সেই গুহার সামনে উপস্থিত হলাম, ভেতরে টর্চ জ্বালিয়ে দেখি তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন, পাথরের মত স্থির, প্রাণ আছে বলে মনে হল না। ধ্যানভঙ্গ করি কী করে? যদি তাঁর কোপানলে পড়ি? আবার মনে হয়, তাহলে এত কষ্ট করে এদ্দূর এলামই বা কেন?

যা থাকে কপালে—সমাধিভঙ্গ করে ফেলি—ঠিক এই ব্রহ্মমুহূর্তে যদি তাঁর আশীর্বাদ নিতে পারি তার চাইতে বড় আর কী আছে!

খুক্ খুক্, ছোটোখাটো কাশি থেকে শব্দটা বৃহত্তর করে তুলি—তবু ওদিকের সাড়াশব্দ নেই। নীরব, নিস্পন্দ, টর্চ ঠিক তাঁর চোখের ওপর ফেলে দেখি অর্ধনিমীলিত চোখে কোনো দৃষ্টি নেই, যেন তিনি কোন অতলসাগরে ডুব দিয়েছেন—কখন ওপরে ভেসে উঠবেন, আর কখন যে আমি তাঁর চোখে ধরা পড়ব ঠিক নেই।

অতএব সাধারণ মুষ্টিযোগের কর্ম নয়। গলা ছেড়ে ডাক দিই।

—সাধুজী, আমি আবার এসেছি!

একবারে ফল হল না। বারবার তিনবার আমার চীৎকারে আমি নিজেই চমকে উঠি।

সাধুজীর শরীরে স্পন্দন দেখা দিল। ধ্যানমগ্ন দুটি চোখের তারায় যেন কিসের একটা কম্পন—ভয় হল। রবিবর্মার ছবিতে শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার কোপদৃষ্টি দেখেছি তাই যদি হয়?

কিন্তু এ তো সে নয়। উন্মুক্ত উদার চোখ দুটি মেলে তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্রমে যেন দেখা দিল উদ্বেগ আর কৌতূহল, অন্তর্বেদনা আর অপরিসীম মমতা, ক্ষান্তি আর দাক্ষিণ্যে, ভরা সেই দুটি চোখে অমৃতের প্লাবন। তিনি কঠোর সন্ন্যাসী, সেই চেয়ে থাকার মধ্যে কী এক স্নেহ-মমতা, আশীর্বাদ ঝরে যায়, যেমন পাষাণ-কায়া হিমালয়ের বুক চিরে অজস্রধারা নেমে আসে।

করজোড়ে তাঁর মার্জনা ভিক্ষা চাইলাম।

প্রাণের আবেগে আবার আপনার কাছে ছুটে এলাম—আজই চলে যাব—তাই একবার দর্শন করে যাই। মন কোনও বাধাই মানল না, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও এসেছি।

এই রকম টুকরো টুকরো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলি।

মৃদু হাস্যে তিনি কিছুটা দেব-বিভূতি আমার হাতে দিয়ে ইশারায় বললেন—কপালে ফোঁটা দিয়ে নাও।

আমি আবার তাঁকে জানাই আমার সেই চিরন্তন প্রার্থনা—আপনি আশীর্বাদ করুন যেন ভগবানের সমীপস্থ হবার শক্তি পাই—তাঁর মহিমা, তাঁর করুণা বুঝবার ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

তিনি মুহূর্তকাল চুপ করে রইলেন তারপর দুহাত তুলে বরাভয় দিলেন। মন আনন্দে নেচে উঠল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। তারপর তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে উঠে পড়ি। আবার বলি এজীবনে আজকের মত আর সাক্ষাৎ দর্শন পাব না। কিন্তু মনে মনে যেন আপনার দেখা

পাই। তিনি তাড়াতাড়ি শ্লেটে লিখে দিলেন—

—আমি কে? কেউ নই। যাঁকে দেখতে চাও মনপ্রাণ দিয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁকেই স্মরণ কোরো—

—আপনার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সেই স্মরণের সেতুবন্ধ রচনা করে দিন।

তিনি বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন—

—শুভমস্তু।

তাঁকে আবার প্রণাম করে ফিরে আসি, আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে। আমার পথপ্রদর্শকের হাত ধরে টলতে টলতে নেমে এলাম—তখন একটু ফরসা হয়েছে।

ভরসা হয় না—যদি আবার ধরা পড়ি!

আমাদের সেই নির্দিষ্ট প্রাঙ্গণেই ফিরে আসার আগেই পথ-প্রদর্শককে টাকার পরিবর্তে দশ টাকা দিয়ে সঙ্গীকে বিদায় করে দিলাম।

আবাসে ঢুকেই একটা কলরব শুনছি—

আমি কোথায় গেলাম, কেউ জানে কিনা—কেউ দেখেছে কিনা—

আমাকে দেখেই চারদিক থেকে লোক চারজন ঘিরে অভিযোগ বর্ষণ করে আর কি! প্রশ্নবাণে কাহিল। এরকম হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ কী?

জলবৎ তরলং কথাগুলি মুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসে—

—শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেল, তাই একটু এধার-ওধার ঘুরে-ফিরে এলাম—জানো ত খুব ভোরে আমার একটু বেড়ানোর অভ্যেস।

তারা কেউ জানতে পারেনি যে আবার ছন্দপতন হয়েছে। আমি আবার সেই নিষিদ্ধ ফল খেয়েছি—তাই কেচ্ছাও বেশী দূর গড়ায়নি।

সকলের স্নান শেষ হয়েছে। কেবল নীরেনের বাকী। সে আমার অপেক্ষায় ছিল—এদিক-সেদিক লোক পাঠিয়ে নিজেও সে খোঁজাখুঁজি করছিল।

আজ তার জন্মদিন কিনা তাই অগ্রজকে সঙ্গে নিয়ে স্নানে যাবে, তারপর আমার পদধূলি গ্রহণ, একসঙ্গে মন্দিরে গিয়ে নির্বাণ দর্শন ও প্রসাদ ভক্ষণ—এই ছিল তার গোপন অভিলাষ। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখেই অনুজ লক্ষ্মণ যেন হাতে চাঁদ পায়, চেঁচিয়ে ওঠে—ইউরেকা!

—আর চেঁচায় না, এই মাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে—বুঝলে?

—আরে, জন্মের পরেই তো চীৎকার কান্না শুরু হয়।

—চল, এখন তপ্তকুণ্ডে একবার শেষ স্নান করে আসি।

—ষাট, বালাই, শেষ হতে যাবে কেন? জন্মে জন্মে কতবার স্নান করেছি সেটা তোমার মনে না থাকলেও খুব সত্যি কথা।

নীরেন্দ্রনারায়ণকে অভিবাদন জানাই।

—তুমি যে এরই মধ্যে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠলে হে!

ঠাট্টা করলাম বটে, কিন্তু আমারও কতবার মনে হয়েছে, এই পথঘাট, পাহাড়, পর্বত, এদের সঙ্গে যেন সবাইকার কতকালের চেনা—কত যুগের পরিচয়।

তপ্তকুণ্ডে দুজনেই স্নানে গেলাম। তবে তফাৎ এইটুকু নীরেন পূর্বেই তৈলমর্দনের পালা শেষ করে রেখেছিল, আমার সেটা হয়নি। স্নানান্তে আমরা দুজনেই ফিরে এলাম। নীরেন দাড়ি কামাতে বসল। বেশ করে সাবান মাখিয়ে ক্ষুরটা হাতে নিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে একটি চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠ কানে এলো—

আজকের দিনে দাড়ি না কামালে কি চলতো না? মন্দিরে যাবার সময় হয়েছে, উঠে পড়।

সফেন দাড়ি ঘুরিয়ে নীরেন একবার দেখে নিয়েই টিপ্পনী কাটে—

—দেখলে দাদা, আমার জন্মদিনের পয়লা নম্বর পুজো?

—আরে, অজা যুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘডম্বরে এটা তো সেই প্রভাতের মেঘডম্বর।

অগত্যা বেচারী করে কী। লক্ষ্মী-ছেলের মত গালদুটো কনকনে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে গামছা দিয়ে মোছে আর বলে—

—চল যাওয়া যাক।

নীরেনের পুলক আজ অতি মাত্রায়।

—কী ভাগ্য দাদা, আমার জন্মদিনটা এখানেই পড়ল।

—সে কথা একশবার—তবে কী জানো? শুধু সেই একটা দিন ধরে বসে থাকলেই চলবে না—প্রতি মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে নতুনের জন্ম হয়। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই জন্মদিনের মূল্য থাকলেও পারমার্থিক জগতে কোন্ জন্মদিনটা খাঁটি, সেটা কে বলবে? যদি এই বদরীনারায়ণে এসে নূতন জীবনের খোঁজ পেয়ে থাকো তাহলেই জীবিত হওয়ার দিনটি আজ এখানে সার্থক।

—তাই বল দাদা, বদরীনারায়ণেই যে আমার সেই জন্মদিনটা এসে পড়েছে, তার কি কোনো মানে নেই?

—আমি তো আগেই বলেছি—এখানে তোমার নূতন জন্ম হোক। আজ সেই ভাইফোঁটা—কোনো ভগ্নী আমাদের কাছে নেই, বদরীনারায়ণের কাছেই ফোঁটা চেয়ে নিজের কপালে দিয়ে নাও।

আমরা সকলেই মন্দিরে গিয়ে উঠলাম।

নিরাভরণ কৃষ্ণমূর্তি বদরীনারায়ণের পুজো এই সবে শুরু হয়েছে—তাঁকে স্নান করিয়ে পুজারী মন্ত্রোচ্চারণ করেন, আর একটির পর একটি পুষ্পমাল্যে দেবতার অঙ্গাভরণ করে যান। পুজো শেষ হল—তাঁর নির্মাল্য নীরেন হাত বাড়িয়ে নেয়, তারপর হরিচন্দনের ফোঁটা। আমরাও সব একে একে ফোঁটা নিলাম—তারপরই লক্ষ্মীমন্দিরে প্রণাম করেই গুনগুন্ করে মন্দির প্রদক্ষিণে লেগে পড়ি।

সবাইকে বলি—

—মালপত্রবাহীরা সব গুছিয়ে নিয়ে আগেই রওনা হয়েছে—তোমরা যাও, আমি এলাম বলে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এখুনি রওনা হতে হবে।

সঙ্গীরা সব চলে গেল। আমি আবার ছুটে বদরীনারায়ণের মূর্তির

সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। হাতজোড় করে বলি—

—জৈব জগতে তোমার দরবারে এই প্রথম, এই শেষ। আর হয়তো এখানে আসা হবে না—আমার দৈনন্দিন জীবনে যে সব কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছি—যে সব আবর্তের ঘূর্ণিপাকে পড়ে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি, জ্ঞানে-অজ্ঞানে তোমার আইন মেনে না চলার অপরাধ যদি হয়ে থাকে, তুমি ক্ষমা কর। যেখানেই থাকি না কেন, সবই যেন আমার কাছে তোমার মন্দির হয়ে ওঠে।

সমস্ত ভাররাশি যেন গ'লে চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল। হয়তো এমনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম—ভৃত্য রতিকান্ত ছুটে এসে খবর দিলে—

সবাই খেতে বসেছেন—আপনি শীগ্‌গীর আসুন।

চমক ভাঙল। আবার তাঁর চরণে আমার চিরন্তন প্রার্থনা জানিয়ে ফিরে এলাম। মালপত্রবাহীরা সব গুছিয়ে নিয়ে আগেই রওনা হয়েছে—বাসনপত্র নেই। পাতায় বসে পড়লাম।

আহারান্তে আর সবাই মন্দিরের সোপানে মাথা ঠুকে রওনা হয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে, আমিও মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাই।

প্রেমের ঠাকুর, তুমি আমার অন্তরের ভাষা পাঠ কর—তুমি আমার অনুভূতি গ্রহণ কর।

এমন সময় হঠাৎ দেখি, সেই সেতারী সাধুটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলি—

—এবারের মত চললাম—

তিনি দু'হাত তুলে অভয় দিলেন। তাঁকে নমস্কার জানিয়ে ডান্ডীতে চাপলাম। তখন বেলা এগারোটা।

যাই আর ফিরে চাই। মনে হ'ল বিদেশ যাত্রা। অলকনন্দার পুল পার হয়ে আমার ডান্ডী এগিয়ে চলে—সতর্ক, সাবধানী পদক্ষেপ—আমারও মন কেমন যেন বিষণ্ণ। নিজের দেশ ছেড়ে পরবাসে যাওয়ার দুঃখ এর চাইতে বেশী হয় কিনা, জানি না। বদরীনাথের সমতলভূমিটা পার হয়ে সামনেই কিছুটা চড়াই, পেছনে তাকালে তখনও মন্দির দেখা যায়। বারে বারেই কপালে হাত ঠেকিয়ে আমার প্রণাম যেন আর শেষ হতে চায় না।

স্বল্প চড়াই পথটুকু শেষ হতেই, ডান্ডীওয়ালারা নামতে থাকে, বদরীনাথের মন্দিরও চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেখান থেকে আধ মাইল দূরে দেওদখনী পৌঁছে আবার সেই মন্দিরের চূড়া স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

ডান্ডীওয়ালাদের বলি—

—এখানে থামো!

ডান্ডী থেকে নেমে মন্দিরের দিকে চেয়ে স্বরচিত একটি স্তোত্র আবৃত্তি করি

আছো আছো তুমি জীবনের মাঝে
আছো আছো তুমি মরণের পারে,
আছো আছো তুমি যুগে যুগে প্রভু,
তোমারে প্রণাম।

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে চির-বিরহের আর্তধ্বনি শোনা যায়।

মন্দিরের দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছি—তাড়া খেলাম—আইয়ে শেঠজী জল্‌দি চলিয়ে, বহুৎ দূর যানে হোগা—সামকো আগারি যোশীমঠমে পঁাছনা চাহি।

আবার চেপে বসি, তারাও উৎরাই-পথে নামতে থাকে—মন্দিরের স্বর্ণচূড়া অদৃশ্য হয়ে গেল। এতদিন যে আশা, আনন্দ, উন্মাদনা, উৎসাহ, উল্কার বেগে আমায় ছুটিয়ে এনেছিল—তারা সব বিদায় নিয়েছে। দেহ অবসন্ন, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে, আলোর উৎস থেকে বিদায় নিয়ে অতল অন্ধকার বুকের তলে আশ্রয় নিয়েছে।

পথের পাশে ছোট ছোট চটীগুলো সবই বন্ধ। খাড়া উৎরাই-পথে ডান্ডীওয়ালারা মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করে নেয়। কোথাও বা দোকান থেকে চা খেয়ে আসে। আমি চুপ করে বসে থাকি। আশেপাশে কোনো কিছুতেই যেন কিছু খুঁজে পাই না। ডান্ডীতে বসে থাকাও অসহ্য মনে হয়।

দেওদখনী ছাড়িয়ে প্রায় মাইল তিনেক পরেই হনুমান চটী, আসার সময় এখানেই এক রাত্রি ছিলাম। দেখি, আমার সঙ্গীরা অপেক্ষায় আছে আমি এলে আর কোথাও না দাঁড়িয়ে দিনের আলো থাকতেই সোজা যোগীমঠে পাড়ি দেওয়া যাবে।

হনুমান চটীতে ডান্ডীওয়ালা আর ঘোড়াওয়ালারা বিশ্রাম করে নেয়। কুলীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গল্প-গুজব করে। এবার আমরাই তাদের তাড়া দিলাম।

—চল, আর দেরী করে না।

সদলবলে আবার বেরিয়ে পড়ি—এবার আর কোথাও বিশ্রাম করা হবে না—সোজা চলে যাব যোশীমঠে। গাড়োয়ালী ভাইরা সে কথা শুনবে কেন? যেখানেই চায়ের দোকান দেখা যায়, তাদেরও চা-পিপাসা প্রবল হয়ে ওঠে। পথও ফুরোতে চায় না—পথচলার শক্তি আর নেই। কখনও চড়াই, কখনো বা উৎরাই পথ ভেঙে আধমরা হয়ে আমরা যখন যোশীমঠে পৌঁছলাম—তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা।

এতদিন চড়াই-উৎরাই করেছি—আজকের মত কষ্ট হয়নি। শুধু দেহে নয়, মনের দিক দিয়েও ভীষণ ক্লান্ত। এদিকে ডান্ডীওয়ালাদের কারও সর্দি, কারও পায়ে চোট লাগায় ভীষণ কাতরাচ্ছে। ডাক্তার গুণেনের জ্বরভাব—অনুজার মায়ের গল্-ব্লাডারের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যে যেন আধিব্যাধির মহামারী লেগে গেল।

বদরীনারায়ণ যাওয়ার পথে যোশীমঠে কালী-কম্‌লীর চটীতে যেখানে রাত্রিবাস করেছিলাম, সেখানে স্থানাভাব। ওপরে উঠে টেম্পল-কমিটির গেস্ট-হাউসে গিয়ে দেখি, সেখানেও একই অবস্থা। সামনের প্রাচীর-ঘেরা মাঠে দাঁড়িয়ে আছি—ওপরের শার্সির ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, হ্যাজাক্ লণ্ঠনের আলোকে কক্ষটি সমুদ্ভাসিত, ঘরের মধ্যে কয়েকটি নর-মুণ্ড—শুনলাম প্রেসিডেন্ট-সাহেব নাকি মিটিং-এ ব্যস্ত। নীচের তলায় ঢুকে দেখি, এক অন্ধকার ঘরে একটা মিটমিটে প্রদীপ জ্বালিয়ে জনৈক স্বামীজী শুয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ভীষণ জ্বর। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তার ওপর

নিউমোনিয়া হবার উপক্রম, কে একজন ডাক্তার নাকি তাঁকে বলে গিয়েছে।

আশ্চর্য এই যে, সেই শঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও তিনি আমাদের অসহায় দেখে তাঁর ঘরখানা আমাদের জন্যে ছেড়ে দিতে চাইলেন। পাশের অন্য একটা ঘরে যাওয়া মনস্থ করেই বললেন—

—আমাকে কোনোরকমে ধরে ওই ঘরের ভাঙ্গা খাটিয়ার ওপর রেখে আসুন।

মনে পড়ে গেল বিবেকানন্দের কথা—
বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

প্রবীণ বাঙালী সাধু।

আমাদের লটবহর সবই এসে গিয়েছে, শুধু যে কুলীর কাছে ওষুধের বাক্স-সমেত মালপত্র ছিল, সেই কুলীটাই তখনও এসে পৌঁছোয় নি—গোদের ওপর বিষফোঁড়া!

বাঙালী সাধুটিই কক্ষান্তরে যাবার জন্য আমাদের চাইতে বেশী অস্থির হয়ে উঠলেন। গুণু বললে—

ওষুধের বাক্সটা এলেই, আপনাকে ইনজেকশন দেব—সেরে উঠবেন।

সাধুটিকে ধরাধরি করে পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম। স্বল্পপরিসর অতি জঘন্য ঘর। তাঁর শয্যাটি উঠিয়ে এনে ভাঙা খাটিয়ায় বিছানা করে দিলাম। তিনি গা এলিয়ে দেবার সময় অতি কষ্টে বলে গেলেন—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে
তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে
তোমারি অনুভব।"

কান্তকবির এই কথাটি আমারও অতি প্রিয়। এইতো জীবন-উপলব্ধি! এর চাইতে বড় আর কী আছে?

সাধুজীকে একা রেখে যেতে মন চায় না।

তিনিই তাগাদা দিলেন:

ও'রা বাইরে কষ্ট পাচ্ছেন—আপনারা যান।

আমি চলে এলাম—গুণেন এলো না। ডাক্তার হিসেবে তাঁর পাশে বসে রইল।

এদিকে সাধু-পরিত্যক্ত সেই ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে। অনুজার মাও শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

নীচে লোক ছুটে গেল—একটা আলো ভাড়া করে নিয়ে আসার জন্যে। পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম প্রেসিডেন্ট-সাহেবের কাছে যিনি সব সময়েই আমাদের মাথার ওপরে আছেন। শুধু বদরী-নারায়ণে নয়, এখানেও তিনি আমাদের মুরুব্বী। তাঁর দুটো হ্যাজাক লাইটের একটা তিনি তখুনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নীচে নেমে এলেন, অসুখের খোঁজ-খবর নিলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন—তারপর লেনদেনের কথায় এলেন।

যদি অসুবিধে না হয়, গুণেনকে দিয়ে একবার রেডিওটা পাঠিয়ে দেবেন।

গুণেন তখন ঘরের মধ্যে উবুড় হয়ে শুয়ে আছে। ডাক ছাড়লাম—

—শীগগীর, গুণেন এদিকে শুনে যাও।

প্রেসিডেন্ট-আগমন সংবাদ আগেই তার কর্ণগত হয়েছে—সে রেডিওটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে এসে হাজির—

—চলুন, আপনার সঙ্গেই ওপরে যাই।

ইতিমধ্যে কুলীটা এসে পড়েছে। ওষুধের বাক্সটা নামিয়ে গুণেনকে দেওয়া গেল। আর তখুনি সাধুর গায়ে ইনজেকশন প্রয়োগ। অনুজার মা কোনও ওষুধ খেতে চাইলেন না। ঘোড়ার মালিক, ডাণ্ডীওয়ালা, কুলী সবাই হাসপাতালের রুগীর মত 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের কারও বুকে ব্যথা, কারও পা ফুলে ঢোল, কারও গর্দানায় ব্যথা, কেউ হাত তুলতে পারে না—কারও নাক নেই—সর্দিতে সীলমোহর করে দিয়েছে—কারও পেটের দরদ, কারও বা জ্বর—এমনি হরেক রকম ব্যাধির প্রকোপে গুণেনও অতিষ্ঠ কিন্তু সে আজ দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছে, স্থির হয়ে প্রত্যেকের ফিরিস্তি শুনে কাউকে বড়ী, কাউকে ইনজেকশন, কাউকে মালিশ, কাউকে ঘুমের দাওয়াই দিয়ে আবার সে ছুটে যায় সেই সাধুর কাছে। সাধুকে নিদ্রামগ্ন দেখে ফিরে এসে বলে—ওষুধে বোধ হয় কাজ হয়েছে।

এদিকে তার মাসীমার অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে, তাঁকে বুঝি যোশী-মঠেই হারাতে হয়। সারা দিনমান আহার নেই—দুর্বল শরীরে অকথ্য যন্ত্রণা, শুধু মনের জোরে বিশ মাইল পথ চলে এসেছেন।

অনুজা ও পরিমল ঠায় বসে—স্টোভ জ্বলতে থাকে—বৃদ্ধা পরিচারিকা গরম জলের ব্যাগ সরবরাহ করে যায়।

গুণেন এসে তাঁর বিছানার পাশে বসল—জোর করেই একটা ঘুমের ইনজেকশন দিলে।

ইতিমধ্যে আচার্য ব্রজমোহন মিশ্রকে রেডিও শুনিয়ে কখন যে গুণেন বিছানায়

এসে ঘুমিয়ে পড়েছে, লক্ষ্য করিনি। আমাদের খাওয়া-দাওয়াও কিছুই হয়নি, সে প্রবৃত্তিও কারও নেই।

খোলা আকাশের নীচে একটি জায়গা বেছে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি, আর আকাশ-পাতাল কত কী চিন্তা করি, এমন সময়ে ডাক্তার গণেন গম্ভীর মুখে বাইরে এসে বললে—

—চলুন বাবা, এক্ষুনি চলুন দেখি, মিলিটারী ক্যাম্পে গিয়ে বড় অফিসারের কাছে ধর্না দেওয়া যাক্—যদি তাঁরা দয়া করে একটা জিপ্‌গাড়ী দেন, তাহলে স্বামীজীকে ঐ 'কারে' শুইয়ে পিপ্‌ল-কোটিতে রওনা হবো।

বাধা দিয়ে বললাম—

—কে এমন পরোপকারী আছে, চাইবামাত্র জিপখানা পেয়ে যাবে—জানোই তো ওদের কড়াকড়ি নিয়ম—চল, যাচ্ছি কিন্তু সুফলের আশা কম।

আমরা সেই রাত্রে পাহাড় ভেঙে ওপরে উঠতে থাকি। গণেন টর্চ জ্বালিয়ে আগে আগে যায়, আমিও তার পশ্চাতে। বক্‌শিশ্‌ কবুল করে দোকানের একটি চাকরকে সঙ্গে নেওয়া গেল, যেন সেই রাত্রে আমরা আবার পথ না হারাই।

রুক্ষ পথে হোঁচট খাই—টাল সামলে কোনমতে পা ফেলি। দেহ আর চলতে চায় না। কিছুদূরে এগিয়ে দেখি, আমাদের ভারতীয় সৈন্যরা বড় বড় খাসী, মোরগ প্রভৃতি জবাই করে রান্না চাপিয়েছে। গণেন সেদিকেই তাকিয়ে আছে। তার গলায় কোঁৎ করে একটা বড় রকমের ঢোক গেলার শব্দ পেলাম।

কিছুটা ওপরেই মিলিটারী ডাক-বাংলো। সশস্ত্র প্রহরী হয়ে টহলদারি করে বেড়ায়।

আমরা সেখানে উপস্থিত হতেই এক বাঁশভাঙ্গা প্রশ্ন—

বেশী কথা বলার শক্তি নেই—আমার একটা কার্ড বের করে তার হাতে দিয়ে বলি :

—এতেই আমার সব পরিচয় আছে—খোদ কর্তার হাতে দিয়ে এসো—খুব জরুরী কাজ। সেও মিলিটারী কায়দায় হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়েই খট্‌মট্‌ করে ভিতরে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই তলব।

আমরা তখুনি ভিতরে ঢুকে পড়ি, দেখলাম, প্রেসিডেণ্ট ব্রজমোহনের সেক্রে-টারী সেখানেও উপস্থিত। বুঝলাম, তিনিও ঐ একই উদ্দেশ্যে সমাগত। আমাকে দেখেই সোল্লাসে বললেন—

—আপনি এখানে এত রাত্রে? কী ব্যাপার?

তাঁকে বন্দনা করে বলি—আপনি যে কারণে এখানে এসেছেন, আমিও ঠিক একই কারণে, তবে একটু তফাত এই আমি প্রাণের দায়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

খুব এক গাল হেসে তিনি মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। একটু আমেজের সঙ্গে গল্প-গুজব শুরু করতেই আমাদের দৈব-বিভ্রাটের কথা আনুপূর্বিক জানিয়ে অনুরোধ করি

—মিষ্টি করে 'না' বলার আগে 'হাঁ' কিসে বলা যায়, তাই আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন।

তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের খাস সেক্রে-টারীও সেই বিকট হাস্যে যোগ দিলেন। আশা হ'ল, এত যখন প্রাণখোলা হাসি, তখন একটা সুরাহা না হয়ে যায় না। তিনি একটু থেমে, ঝকঝকে সিগারেট-কেস খুলে একটি সিগারেট আমার হাতে দিয়ে বললেন—

—আমার 'বস্‌' কাল পিপ্‌ল-কোটিতে যাবেন—তিনি এখন 'কক্‌টেল-পার্টি'তে নীচে গিয়েছেন—এলেই তাঁকে জানিয়ে কাল প্রাতে দশটার মধ্যেই টেম্পল-কমিটির গেস্ট-হাউসে খবর পাঠিয়ে দেব—তবে দুজনের বেশী বোধ হয় নেওয়া চলবে না।

—তাহলেই যথেষ্ট, এর বেশ আমিও আশা করি না।

এমন সময় তাঁর ওপরওয়ালা 'কক্‌টেল পার্টি' সাঙ্গ করে বেশ খোশ মেজাজেই ফিরে এলেন। পরস্পরে আদান-প্রদান শেষ হয়ে গেল—মিলিটারি অফিসারটি আমাদের হয়ে সব কথা তাঁকে বললেন—আমিও দুর্বিপাকের কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলি—গণেনও ডাক্তারী শাস্ত্রের গালভরা গোটাকতক শব্দ-মেশানো বিবরণে প্রধান মিলিটারি অফিসারটিকে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়।

স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। তিনিও শিস দিতে দিতে আমাদের আবেদন তখুনি মঞ্জুর করলেন। এটাও প্রতি-শ্রুতি পেলাম—

—একটা গোটা জিপ্‌ মায় ট্রেলার-সমেত আপনাদের গেস্ট-হাউসে ঠিক দশটায় পাঠিয়ে দেব।

সানন্দে ফিরে এলাম। তখন রাত বারোটা।

গণেন ও আমি সেই সাধুর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি জেগে আছেন, যন্ত্রণা যেন কমে গিয়েছে। গণেন চট্‌পট্‌ তার মেডি-ক্যাল ব্যাগ এনে আবার একটি ইন-জেকশন দিয়ে বল্‌লে :

—আপনার খাটের একধারে নীচেই শুয়ে পড়ি।

আমি আর গণেন দুজনের বিছানা নিজেরাই বয়ে আনার উদ্দেশ্যে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি, সবাই অল্প-বিস্তর নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে, কারও সাড়া-শব্দ নেই। আমরাও সে রাতের মত সেই সাধুর ভগ্ন খট্টাঙ্গের পাশে নীচেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। স্বামীজী কত বারণ করলেন—আমাদের কষ্ট হবে—এখানে শুয়ে কাজ নেই।

আমরা তাঁর উপদেশ সরাসরি ডিস্‌-মিস্‌ করে দিলাম। (ক্রমশঃ)

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। তেত্রিশ ।।

কথাগুলো গোপন রাখারই ইচ্ছা ছিল প্রশান্তর, কিন্তু রইল না।

মা আসতে তবুও যা হোক কিছু একটা হচ্ছিল, সময়টা খাঁ খাঁ থাকছিল না। উনি চলে যেতে যেন অসহ্য হয়ে উঠল। দুটো যে দিন কাটল তাতে কয়েকবারই মনে হোল, না-হয় বাড়ি থেকেই একটু ঘুরে আসুক, কিন্তু মস্ত বড় অন্তরায় হয়েছে বিশাখা। লোকে মনে করবে তারই টানে বুঝি ছুটে গেল। অথচ আসল কথা হোল কলোনী যেন বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে।

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না দু'দিন থেকে। ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাব, বিছানাতেই এলোমেলো চিন্তা নিয়ে পড়ে আছে। নানা রকম সংকল্পও করছে, অনেক সংকল্প আবার শিথিল হয়ে যাচ্ছে নানা রকম বিরুদ্ধ যুক্তির আঘাতে। তার মধ্যে একটায় এসে মনটা একেবারে বজ্রের মতো কঠিন হয়ে উঠল। প্রশান্ত উঠে লেখবার টেবিলে বসে একটা ফুলস্কেপ কাগজ টেনে নিয়ে একটা লম্বা দরখাস্ত লিখে শেষ করল। বক্তব্য—এখানে আর একেবারেই স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে না, অন্য কোথাও বদলি হতে চায়। শেষ করে একবার চোখ বুলিয়ে গেল, তারপর পাছে আবার দুর্বলতা এসে পড়ে এই জন্যেই খামে পুরে ঠিকানা লিখে পোস্টাফিসে গিয়ে রেজিস্টারি করে আসবার জন্যে গোপেশ্বরকে ডাকতে যাবে, "কেমন আছ হে?"—ব'লে রজত এসে বারান্দায় উঠল, টেবিলে দেখে বলল—"শুয়ে থাকলেই ভালো হয় না?"

প্রশান্ত বলল—"শুয়েই ছিলাম, একখানা দরকারি চিঠি ছিল। এসো।"—আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল, রজত ঐ চেয়ারটাই টেনে নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল। প্রশ্ন করল—"আছ কেমন?"

"ভালোই তো। তুমি এই জিজ্ঞেস করতে দুপুরের রোদ মাথায় করে এলে?"

"ঠিক তোমার কাছে আসিনি। জীপটা বের করব একবার।... বলছ ভালো আছ, কিন্তু......"

"এমন সময় আবার কোথায় চললে?" বল?" —ওর ওই কথাটা চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

"যাচ্ছি স্বাতী দেবীর ওখানে..."

ছেড়ে দিয়ে, প্রশান্তর কুতূহলী দৃষ্টির উত্তরে অল্প একটু ব্যঙ্গের টোনেই হেসে বলল—"না, না, অত উঠে-প'ড়ে লাগিনি। দু'দিন থেকে যাব যাব করছি, অথচ হয়ে উঠছে না। মরা সামলাই কি আধমরা সামলাই?"

প্রশান্ত বিমর্ষভাবে হেসে বলল—"যখন যেতেই বলেছি, দুপুরের রোদ মাথায় করে যাওয়া তো ভালো লক্ষণই আমার কাছে। কিন্তু, সে যাক। তা যখন নয়, কেন যাচ্ছ এসময়?"

"একটা কথা প্রশান্ত; একটা মেয়ে, নিঃসঙ্গই বলা চলে—মনের উপর কতগুলো চাপ সে একসঙ্গে সহ্য করবে? তুমি যাচ্ছ না—এখানে থেকেও, এই যথেষ্ট, তারপর বিশাখার যাওয়া বন্ধ হয়েছে—কিভাবে কাটছে তার, কতখানি বরদাস্ত করতে পেরেছে একটু খোঁজ নেওয়াও তো দরকার। মনের ব্যাপার আমরা অতটা বুঝি না, কিন্তু নিতান্ত শরীরের দিক থেকেও তো ভেবে দেখবার কথা—একটা কঠিন অসুখও তো হয়ে পড়তে পারে। আর এইখানেই তো শেষও নয়—এরপর শুনবে আমি তোমার স্থান অধিকার করবার ষড়যন্ত্র লাগিয়েছি; তারপর—তার সঙ্গে সঙ্গেই শুনবে..."

"আমি যাচ্ছি বিশাখাকে বিয়ে করতে।"—বাইরের দিকে চেয়েছিল প্রশান্ত, ঘুরে পূরণ করে দিল ওর কথাটা, তারপর বলল—"আমি চাপ একে একে কমিয়ে আনছি রজত..."

"করবে বিয়ে স্বাতি দেবীকে!" আশা এল তো একেবারে চরম হয়েই এসে পড়ল। প্রশান্ত একটু হেসে বলল—"সেটা, উল্টে দুজনের ওপরই কত উগ্র

একটা চাপ হবে বলেই যে আমি এগলাম না, তুমি কি জান না?"

"তবে?"

"ঐ খামটার মধ্যে একটা দরখাস্ত আছে, পড়ো।"

বের ক'রে নিয়ে পড়া শেষ করে রজত একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল—"বদলি চাইছ এখান থেকে?"

"অনেকটা চাপ কমবে না? অবশ্য নিঃস্বার্থ নয়, আমারও কমবে। আপাততঃ গোপন রাখব ভেবেছিলাম। যখন টের পেয়েই গেলে, তোমারও একটা সার্টি-ফিকেট দাও, জুড়ে দিই। বরঞ্চ আর একখানা।"

রজত প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইতে বলল—"বদলি চাইলেই তো বদলি পাচ্ছ না, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আশা—চোপরাস কলকাতার জল-হাওয়া সহ্য হচ্ছে না, সরতে চায়, ওর সঙ্গে মিউচুয়াল হতে পারে। কিন্তু সেও তো একদিনে হওয়ার নয়। তাই মাসখানেকের একটা ছুটীর দরখাস্ত করব, শরীরেরই ওজুহাতে..."

"পুল-কলোনীর সব যেন ভেঙে গেল!"—বাইরের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল রজত।

প্রশান্ত বলল—"পুল-কলোনীর কিছুই তো স্থায়ী নয়। তবু পুল-কলোনীকে পেয়ে দু'একটা জিনিস হতে পারত অবশ্য স্থায়ী।" ওরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বলল—"হোল না, কি আর করা যাবে? যাক, কমাবার আর একটা উপায় যা ঠাউরেছি।..."

"হ্যাঁ, সেটা কি?"—উৎসুক দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করল রজত।

প্রশান্ত বলল—"অবশ্য সেটা হয়তো চেপে বসতে পারেনি মনের ওপর এখনও, যদিই ইতিমধ্যে কোনোরকমে কানে না গিয়ে থেকে থাকে। বিশাখাকে আমি বিয়ে করছি না..."

"করছ না!!"—চেয়ারে সোজা হয়ে উঠল রজত।

প্রশান্ত বলল—"আশ্চর্য হচ্ছ? আমি আশ্চর্য হচ্ছি এ কথাটা কি করে এক সময়ে ভাবতে পেরেছিলাম। সেন্টি-মেন্টের কথা বাদই দিলাম—বিশাখাকে কি ভাবে দেখে এসেছি বরাবর, তার সঙ্গে বিবাহ! সে কথা বাদ দিলেও এটা আমি কি ক'রে ভুলে বসেছিলাম যে এইটিই হবে স্বাতির ওপর সবচেয়ে রূঢ় আঘাত।"

একটু চুপ করল প্রশান্ত। রজতও কিছু বলল না, যা সব শুনল বুঝে ওঠা যেন শক্ত হয়ে উঠেছে। একটু পরে প্রশান্তই আবার বলল—"এই—যা ছিল আমার নিজের হাতে। এর পর যা সেটা তোমার হাতে রজত।"

"আমার হাতে!"

"হ্যাঁ, তুমি স্বাতিকে বিবাহ কোর না।"

"করবই যে এটা সম্ভব মনে করেছিলে কি করে প্রশান্ত?" একটু হাসল রজত, বলল—"যাক, আমি একটা ঐ রকম পশু, বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, বেশ লোভ দেখানো যেত স্বাতিদেবীকে; কিন্তু লুব্ধ হ'ত বলে বিশ্বাস করো তুমি? এতদিন ও'র সঙ্গে মেলামেশা করে তুমি এই বিশ্বাসটাই দাঁড় করালে মনে? তাহলে আমি তো তোমার চেয়ে ঢের সমঝদার—না মেলামেশো করেও—শুধু তোমার মুখে বিশাখার মুখে শুনে, আর একবার পুলের দিকে রাত্রির ট্রিপে দেখে বুঝেছি তিনি কি ধরণের মেয়ে।"

"তাহলে? স্বাতির কি হবে রজত?"

"যাই হোক, এ যা হতে যাচ্ছিল তার চেয়ে তো খারাপ কিছু হবে না? কি হবে—সে ভাবনা তো আর তোমার-আমার রইল না।"

"আমি আর ভাবতেই পারব না স্বাতির কথা! কী বলছ তুমি রজত!"

।। চৌত্রিশ ।।

রজত গেল না স্বাতিদের বাড়ি।

প্রশান্তর শেষ কথাগুলা শুনে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে একটু বাইরের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটা উত্তর দেওয়া হিসাবেই একটু হাসল মুখটা ঘুরিয়ে। এরপরই বলল—"উঠি এখন।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তও এল বেরিয়ে। জীপ না বের করে গেটের দিকেই এগুতে দেখে বলল—"কৈ যাচ্ছ না?"

"আর দরকার কি তেমন? কয়েকটা চাপ তো কমল।"

"একবার যাও রজত। গিয়ে কি করবে কি বলবে বুঝতে পারছি না—তবু একবার..."...

—থামের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বাঁ হাতে থামটা ধরে ডান হাতে তাড়াতাড়ি রুমালটা বের করে চোখে চেপে ধরল প্রশান্ত।

রজত ঘুরে এসে পিঠে হাত দিয়ে বলল—"এত উতলা হচ্ছ ভাই? বড় ডেলিকেট্ ব্যাপার, একটু ভেবে দেখতে দেবে না?"

ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরছিল রজত। ওঠবার আগে প্রশান্তর মুখে সে শুনল—"আমি আর ভাবতেই পারব না স্বাতির কথা?"—চোখে যে ভয় যে নৈরাশ্য দেখল, তার থেকেই নূতন ভাবনার ঢেউ উঠেছে; তারপর অশ্রুজলেও আরও খানিকটা দেখল মনের ভেতরটা, বুঝল কি ক্ষত-বিক্ষতই না হয়ে পড়েছে!

তবু, যেমন এসেছিল তার থেকে মনটা অনেক হালকা হয়েছে, শুধু এই জন্যই যে অনেকগুলো সমস্যা মিটে যাচ্ছে। আরও মিটবে। প্রশান্ত চলে গেলো রজতও চলেই যাবে এখান থেকে। বিশাখাকে প্রশান্তর বিবাহ করার কথাটা রইল না—কি অন্যায়ই যে হোত ওটা, দুজনের ওপরই!—ও-ও প্রশান্তকে জানিয়ে দিল স্বাতিকে বিবাহ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, যেমন স্বাতির সম্ভব নয় রাজি হওয়া।

মন অনেকটা শান্ত হয়েছে বলেই হঠাৎ একটা উপায়ের কথা মনে পড়ে গেল, নিতান্ত সহজ হলেও যা এতদিন পড়েনি। কথাটা একবার প্রশান্তর মনেও উঠেছিল—সবটা লুকিয়ে যেমন চলছিল তেমনি চলতে দেওয়া। ক্ষতি কি?

এত বড় একটা সোজা রাস্তা রয়েছে, অথচ রজতকেই পুরু খেয়ে খেয়ে আসা

হচ্ছে সবাই। কথাটা মনে হতে এত উত্তেজিত হয়ে উঠল রজত যে, থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে প্রশান্তকে গিয়ে তখনই বলে। তারপর অবশ্য এগিয়েই চলল বাসার দিকে, মনটাকে সংযত করে নিয়ে। আরও একটু ভেবেই দেখা যাক না।

যতই ভাব'ত লাগল, ততই মনে হতে লাগল সমস্ত সমস্যা মিটে গিয়ে যেন আবার সব কিছু নিজের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। মন্থরপদে বাসায় যেতে যেতে খানিকটা খসড়াও ঠিক করে নিল মনে মনে—কিভাবে কি করতে হবে—সমস্ত ব্যাপারটুকুতে ওর অংশ কতটা থাকবে এবং কিভাবে।

বাড়ি আসতেই পিসিমা বললেন—"তোর একখানা চিঠি আছে রে। এইমাত্র দিয়ে গেল; টেবিলে রেখে দিয়েছি।"

কলকাতার মোহর দেওয়া চিঠি দেখে একটু ত্রস্ত হস্তেই খামটা ছিঁড়ে ফেলল রজত। বিশাখা গেছে, যদিও বিশাখার হাতের লেখা ঠিকানা নয়। গোড়ায় এক-আধটা কথা পড়েই উলটে আগে নামটা দেখে নিল—'সেবিকা উষা।'

উষা লিখেছে—

শ্রীচরণ কমলেষু—

আমায় আপনি চেনেন, যদিও খুব বেশী দেখেননি। আমি প্রশান্তদাদার ভগ্নী, সেই জোরে আপনারও। এবং সেই দাবীতেই চিঠিখানি লিখতে বসেছি। অবশ্য, প্রথমেই মার্জনা চেয়ে নিলুম, কেননা ছোট বোনের কিছু ধৃষ্টতা প্রকাশ পাবে। জানিয়ে রাখি, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই লিখছি চিঠিটা, সুতরাং আশা আছে পাবই মার্জনা।

বিশাখা কাল এখানে এসেছে মার সঙ্গে। আমাদের এখানেই উঠেছে, এবং আছেও। ওর মুখে সব শুনলাম। শুনে আগে আমি আনন্দে আত্মহারাই হয়ে পড়ি। তারপর ওর মুখেই শুনলুম স্বাতিদিদির সংক্রান্ত সমস্ত কথা। শুনে অবধি আমার মনটা এমন হরিষে-বিষাদে ভরে গেছে যে, তখুনি-তখুনি আপনাকে একটা চিঠি লিখতে বসেছি।

দাদা, আমরা অসহায়, যে-ঠাকুরের কাছে বলি দেবেন, তাঁর কাছেই মাথা নীচু করে দেবতা জ্ঞানেই বলি পড়বার জন্যে প্রস্তুত থাকব। এই আমাদের অদৃষ্ট, যুগ যুগ ধরে যেমন দেখে আসছি। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, এক্ষেত্রে একটি বলি দেওয়ার নামে একসঙ্গে দুটি বলি পড়ছে না কি? আমি বিশাখার কথা ভাবছি না। সে আপনার ভগ্নী, আপনি আপনার বন্ধুর চরণে বলি দিতে চাইছেন, তার কিছুই বলবার নেই। হাসি মুখেই সে নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু স্বাতিদিদি কি অপরাধ করল? সে আপনার দুঃখ-দারিদ্র নিয়ে এক ধারে পড়েছিল—শিবতুল্য বাপ, কিছুই জানেন না, বোঝেন না,—ছল ক'রে তার চোখের সামনে এ-সুখের স্বপ্ন তুলে ধরতে

"......এমন বিচলিত হয়ে উঠলে কেন বুঝছি না তো!"

গেলেন কেন আপনার বন্ধু, তুলে ধরলেন তো পূর্ণ করলেন না কেন সে স্বপ্ন—পূর্ণ করলেন না তো তারই এক হত-ভাগিনী বন্ধুকে তার স্থানে বসিয়ে এভাবে পরিহাস করতে যাচ্ছেন কেন তাকে? এ-পরিহাসের কাঁটা যে তার বুকটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলছে দাদা। যাকে সে দেবতা বলেই জেনেছিল সেই যখন বিরূপ তখন আর কার কাছে দাঁড়াবে সে বিচারের জন্যে? আপনার বন্ধুর পরিহাসটা কি শুধুও করতে হয় উপহার দিয়েই? সেলাইকলের . . . ইতিহাসটা নিশ্চয় জানেন আপনি। স্বাতিদিদি এত সত্ত্বেও সেটাকে এখনও চোখের সামনে থেকে সরাতে পারেনি। মেয়েছেলে তো এমনি অসহায়, এক-জনকে যদি মনে স্থান দিল তো সে এমনি করেই তার আশা ধরে থেকে নিঃশেষ করে চলল নিজেকে। একথা আপনার বন্ধুকে কে বোঝাবে? দাদা, মনের দুঃখে অনেক কথাই লিখে ফেললুম, আবার ছোট বোন ক্ষমা চাইছে। অনেক কথাই বললুম বটে, কিন্তু তবুও কিছুই বলা হোল না। আপনি মহাপ্রাণ, বুঝে নেবেন। বুঝে নিয়ে একটা বিহিত করতেই হবে আপনাকে। এত বড় সর্বনাশ, যাতে দুইটি নিরীহ হতভাগিনী বলি পড়ছে তা কোন মতেই হতে দেবেন না।

বিশাখা এইখানে রয়েছে। মৃত-কল্পই হয়ে রয়েছে। মাকে অবশ্য কিছু বলেনি। তার অদৃষ্টে যা আছে তা তো মেনে নিতেই হবে।

আমি দাদাকে চিঠি দিলুম না। তাঁর যেমন নতুন মতিগতি হয়েছে তাতে দিয়ে যে কোন ফল হবে এমন আশা নেই। শেষে কি করব, কোথায় যাব, কাকে বলব সমস্ত রাত ভেবে ভেবে

তোমারই আশ্রয় নিলুম। তুমি যেমন অভিরুচি হয় করবে, রক্ষা কিম্বা বলি।

ছোট বোনের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবে। ইতি সেবিকা ঊষা।

একবার, দুবার, তিনবার পড়ে গেল রজত। লেখাটা বিশাখার। ভাষায় ভঙ্গিতে খুব সুসংগত নয়, তাহলেও ঊষাকে কিছু কিছু জানে, সে বড় ছেলেমানুষ, এতটা গুছিয়েও লেখা সাধ্য নয় তার। বিশাখা পাশে বসে লিখিয়েছে। আরও একটা কথা স্পষ্ট হল রজতের কাছে; বিশাখা হঠাৎ কেন অমন করে চলে গেলে বাড়ি যাওয়ার নাম করে। চিঠির—"কি করব, কোথায় যাব, কাকে বলব"—এ একেবারে বিশাখার মনের প্রতিচ্ছায়া। লেখায় খুব বাঁধুনি নেই,—তখুনি তখুনি লিখতে ব'সছে'র পরে সমস্ত রাত ভেবে ঠিক করেছে—'আপনার' দিয়ে শুরু, 'তোমারই' দিয়ে শেষ করা আছে—এও আছে—কিন্তু মনের আসল কথাটা খুব পরিষ্কার। বিশাখা চায় না এ বিবাহ, আর বিশাখা চায়, আবার স্বাতি-প্রশান্ত একত্র হোক। শুধু ইচ্ছাই নয়, স্বাতিকে জানে বলেই, কি সর্বনাশ তার হতে চলেছে বোঝে বলেই চায়। মনে কথাটায় ভাষা সাধ্যমত জোরালো করবার চেষ্টা করেছে, বঙ্কিমের ভঙ্গি পর্যন্ত খানিকটা এনে ফেলে। সত্যই তো, বিশাখার মতো স্বাতির এত অন্তরঙ্গ আছেই বা কে? একটু যে ইতস্ততঃ করছিল, সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে মনস্থির করে ফেলল রজত। বারান্দায় পায়চারি করছিল চিঠিটা হাতে করে, সেইভাবেই বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলল—"আমি একটু আসছি পিসিমা, যদি দেরী হয়তো সোজা হাসপাতালেই চলে যাব। কেউ এলে সেখানেই যেতে বোল।"

প্রশান্তর ওখানে যাচ্ছে। চিঠিটা দেখাবে। পথে যেতে যেতে কি ভেবে পকেটে রেখেই দিল চিঠিটা। থাক, দেখাবে না।

প্রশান্ত শুয়েই ছিল বিছানায়, ওকে দেখে বিশেষ করে ওর মুখের উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে উঠে বসল, প্রশ্ন করল—"কি, আবার ফিরে এলে যে?"

"ফিরে এলাম,"—পকেটে চিঠিটার ওপর ডান হাতটা গিয়ে পড়ল, ছেড়ে দিয়ে রজত বলল—"ফিরে এলাম—হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল প্রশান্ত, ভেবে দেখলাম এদিককার কোন কথা যদি না বের করা যায়, যেমন চলছিল তেমনি চলে তো......"

"ভেবেছিলাম সে কথা আমিও রজত।"

"তারপর?"—আগ্রহের সঙ্গে মুখটা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল রজত। বসেনি এখনও। প্রশান্ত বলল—"বোস, দাঁড়িয়ে রয়েছ।......বড্ড নীচ, স্বার্থপরের মতন কাজ হয় রজত।"

—মুখটা বিতৃষ্ণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। রজতের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠল, বলল—"এসব মনের বিলাস ছাড়ো প্রশান্ত। একজনের প্রাণ যাচ্ছে, তুমি ভাবছ তোমার নৈতিক পতনের কথা, একটা কথা গোপন রাখলে—সৎ উদ্দেশ্যে গোপন রাখলে যেন সত্যি মস্ত বড় একটা নৈতিক পতন ঘটল! তা যদি বললে তো আমি এইটেকেই বলব স্বার্থপর। বেশ তো, চুলচেরা যুক্তির দিকেই এসো। নয় কি তাই?"

"বোস।' হঠাৎ এমন বিচলিত হয়ে উঠলে কেন বুঝছি না তো।"

"অন্যায় হচ্ছে প্রশান্ত। বিয়ে তোমায় করতেই হবে ওখানে। একথাটা অটল, অনড় রেখে, এখন কিভাবে করবে সেই-টুকুই ভাবো। পরামর্শ করি এসো।"

"বোস।' তবে তো পরামর্শ।"

"দাঁড়াও, আমি আগে একবার হয়েই আসি......"

"কোথা থেকে?"

"ও'দের বাড়ি থেকে। যদি সুযোগ পাই তো কিছু একটা হিন্ট দিয়ে আসব যে সব শেষ হয়ে যায়নি। অন্ততঃ এই যে ওখানকার সঙ্গে যোগ-সূত্রটা ছিঁড়ে গেছে—তুমি যাচ্ছ না, বিশাখারও যাওয়া বন্ধ—এর জন্যে কিছু একটা মনগড়া কারণ দেখিয়ে—তাতে যত নৈতিক অধঃপতনই হোক আমার—ও'দের মনে একটা ভরসা জাগিয়ে আসি। যাই আমি।"

(ক্রমশঃ)

প্রতীক কবি মালার্মে

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৮৪ সাল। পারী। রু দ্য রোম-এর ৮৯ নম্বর বাড়ির পাঁচতলায়—প্রশস্ত একটি ঘর। শীতের সন্ধ্যা। ঘরে গনগনে আগুন জ্বলছে।

আর, আগুন জ্বলছে আয়ত দুটি চোখে। ফায়ার-প্লেসের দিকে পেছন ফিরে অনর্গল কী বলে চলেছেন মাঝারি গড়নের এক ভদ্রলোক। পাইপের ধোঁয়ার আড়ালে কেমন যেন রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে তাঁর চেহারা : মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চওড়া কপাল, সযত্ন-রক্ষিত ছুঁচলো পুরু গোঁপ, ছাঁটা চাপ-দাড়ি, আধা-টিকলো নাক। সবকিছু মিলিয়ে, শক্তিব্যঞ্জক সৌম্য মার্জিত এক ব্যক্তিত্বের পরিবেশ। কাঁধে চৌখুপি-কাটা একটা চাদর। মৃদু মৃদু হাত নেড়ে কী যেন তিনি বলছেন। আর তাঁর কথা তন্ময় হয়ে শুনছেন এক-ঘর লোক।

ইনিই কবি স্তেফান্ মালার্মে।

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পারীতে তাঁর এই ঘরে সমবেত হন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং উদীয়মান বহু কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, সুরস্রষ্টা : ভ্যার্লেন, র‍্যাঁবো, মানে (Manet), হুইস্‌মাঁস, দাবুসি, রানে গীল, জুল লাফর্গ, পল্ ক্লোদেল, আঁদ্রে জিদ্, পল্ ভালেরি, দেগাস, গোগ্যাঁ, জার্মাণীর স্টিফান্ গেয়র্গে, ইংল্যাণ্ডের অস্কার ওয়াইল্‌ড, এডমাণ্ড গস, জর্জ মুর, হুইস্‌লার উইলিয়াম, বাটলার ইয়েট্‌স প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এমনি এক সান্ধ্য-বৈঠকেই না মালার্মে লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর তরুণ এক অনুরাগী খাতায় টুকে নিচ্ছেন কাব্য-সম্বন্ধে মালার্মের বক্তব্য। বৈঠক-শেষে তরুণটির কাছে তাঁর নোটগুলো মালার্মে চেয়ে নিলেন। মৃদু হেসে বললেন, "তুমি নিশ্চয় বড্ড প্রাঞ্জল করে সবকথা লিখেছ; দাও, আমি কিছু দুর্বোধ্য করে দিই তোমার নোটগুলো।"

মালার্মের এই আপাতদৃষ্ট রসিকতার পেছনে কিন্তু বিধৃত দেখি তাঁর গভীর জীবন-দর্শন ও কাব্য-মানসেরই রীতি-বৈশিষ্ট্য। দুর্বোধ্যই ইনি হতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রতীক-বাদ (Symbolism)-এর জনক কবি মালার্মে তাঁর কবিতার ভাষাকে করে তুলতে চেয়েছিলেন আয়াস-প্রসূত, গূঢ়, রহস্য-ময়, অসাধারণ-গ্রাহ্য, যার মাঝে আত্ম-প্রকাশ করতে পারবে পরম-রহস্যের

পর্যায়ভুক্ত ঊর্ধ্বতন কোনও সত্য। কবিতার আত্মা-স্বরূপ শিখাটিকে নিবাত নিষ্কম্প রাখবার জন্যেই আঙ্গিকের মন্দিরটিকে তিনি নিখুঁত নিটোল দুর্গম করে তুলেছিলেন। ইষ্টমন্ত্রের মতই পবিত্র গুহ্য বলে তিনি কবিতাকে জানতেন। তাই, যে-ব্যক্তি কাব্য-মননের দীক্ষা পায়নি যার কোনও প্রস্তুতিই নেই মহান কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করবার, তার কাছে নিজের কবিতা দুর্বোধ্য ক'রে রাখতেই চেয়েছিলেন মালার্মে।

কবির জীবন আর তাঁর জীবন-দর্শনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অন্যায়। তাই মালার্মের জীবন-দর্শন বা কাব্য-মানস সম্বন্ধে কোনও আভাস দেবার আগে তাঁর জীবনের সাদামাটা একটা ছবি দেওয়া দরকার।

বায়রণ, শেলী, ঝেরার দ্য নার্ভাল, ভ্যার্লেন বা র‍্যাঁবোর জীবনে যে-বিদ্রোহের উগ্রতা দেখি, মালার্মের বাহ্যিক জীবনে তার নামগন্ধও নেই। শান্তিপ্রিয় সহজ সরল জীবন তাঁর অতিবাহিত হয়েছে একটি-মাত্র আরাধনায় : কাব্যের আরাধনায়। পার্থিব এই জীবনের মূলে যে-অপার্থিবতা, তারই স্বাদ মালার্মে যেন চেয়েছিলেন। পেয়েও-ছিলেন।

১৮৪২ সালে পারীতে তাঁর জন্ম। মাত্র পাঁচ বছর বয়েসে তিনি মাতৃহীন হন। ভাবুক রোমান্টিক প্রকৃতির ছেলে। অল্পবয়েসেই কবিতা লিখবেন, তাতে আশ্চর্য কী? উনিশ বছর বয়েসে, কলেজ জীবনে, তাঁর হাতে পড়ল কবি বোদল্যারের চাঞ্চল্যকর কাব্যপুস্তক 'অশিবের ফুল', (Les Fleurs du mal)! আর এডগার অ্যালেন পো'র কবিতা। এবং কলেজেরই এক তরুণ অধ্যাপকের কাছে আধুনিক সাহিত্যের প্রথম দীক্ষা পেলেন মালার্মে।

বোদল্যার আর অ্যালেন পো'র কাব্য-দর্শনের সান্নিধ্যে এসে নতুন এক দিগন্ত খুলে গেল মালার্মের সামনে : ঘৃণ্য এই বাস্তব-জীবনের প্রতি বিরাগী বিতৃষ্ণ তাঁর ভাবুক মন যেন সন্ধান পেল এক 'অন্য-কোনোখানে'র, অনন্ত এক আকাশের বার্তা। পেলেন যেন তিনি—যে-আকাশে নিত্য জন্ম নিচ্ছে শাশ্বত সৌন্দর্যের চির-প্রকাশ। 'হেথা নয়, হেথা নয়'—সুলভ বিষাদকেই তিনি লালিত করতে লাগলেন Ennui-নামে, এবং যে-বিষাদকে বোদল্যারের জীবনে অভি-হিত হ'তে দেখি Spleen-নামে। এ-যুগে, আঙ্গিকের দিক দিয়ে মালার্মে তখনো পার্নাস-পন্থী : দৃঢ়-সম্বন্ধ সর্বাঙ্গসুন্দর তাঁর কাব্য-রূপ, স্বচ্ছতায় দীপ্ত। কিন্তু এই স্বচ্ছতাকেই অনতি-কাল পরে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিলেন মালার্মে, চিরতরে। কিন্তু, ইতিপূর্বে কোনও কবির কবিতায় মেলেনি যে-চিত্রকল্প, যে-নূতনত্বের স্বাক্ষর, ধ্বনির

যে-সুষমা, মালার্মের এ-যুগের কবিতা থেকেই সূচিত হল সেই অনাগতের আগমনী।

ফ্রান্সের জীবন একঘেয়ে ঠেকতে লাগল তরুণ মালার্মের কাছে : ইংরেজী শেখানোর সার্টিফিকেট পেলেন তিনি; চ'লে গেলেন ইংল্যান্ডে। ১৮৬৩ সালে এক জার্মান তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল : কুমারী মারিয়া গেরার্ড হলেন মাদাম মালার্মে! সুখের সংসার। স্বপ্নের নীড়। শুরু করলেন তিনি শিক্ষকতা। উত্তরকালে, আজীবন তিনি ইংরেজীর অধ্যাপনাই করেন। কিন্তু প্রথম জীবনের এই শিক্ষকতা তাঁর ভাল লাগল না : দিনের শেষে স্ত্রী-কন্যা পরিবেষ্টিত স্বপ্নের নীড়ে ফিরে আসা, গতানুগতিক জীবন-যাপন করা, একেই কি মানুষ সুখ বলে? চিরন্তন সৌন্দর্যের জন্ম যে-অতীন্দ্রিয় আকাশে, তা র ই নিঃসীমতার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পেয়ে বসল, পাগল করে তুলল স্বপ্নে-জাগরণে। দুরূহ এক কাব্য-অন্বেষণে একাগ্র হল তাঁর মন। একনিষ্ঠ অন্বেষণের শেষে, পরম নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্যের যে সূক্ষ্মলোক তাঁর চোখে ধরা দিল, ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মালার্মে—কী করে তাকে বেঁধে রাখা যায় অক্ষম লেখনীর ছাঁদে?

১৮৬৬ সালে Parnasse Contemporain পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল মালার্মের দশটি কবিতা। তার মধ্যে 'জানলা', 'আকাশ' এবং সমুদ্রের হাওয়া* (এই কবিতাটির সার্থক বাংলা অনুবাদ 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত করেছিলেন, যতদূর মনে পড়ে।) কবিতা-তিনটি বহু-পঠিত, জনপ্রিয়। "আকাশ' কবিতার এক জায়গায় তিনি বলছেন:

> "আকাশটা মরে গেছে।—তোমার কাছে ছুটে এলাম, হে পৃথিবী, দাও
> নির্দয় আদর্শের আর সব
> পাপের বিস্মৃতি
> তোমার এই শহীদকে যে
> এসেছে ভাগ ক'রে নিতে
> আস্তাবলে একপাল পশুবৎ
> মানুষের শয্যাপ্রান্তটুকু!"
>
> [অনুবাদ পৃথ্বীন্দ্রনাথ]

'আকাশ'-এরই শেষ লাইনটি যেন মালার্মেরই প্রতীক হ'য়ে উঠল। এমন-কি, যে-ক্লাসে তিনি ইংরেজী পড়াতেন, দেখা গেল দিনের পর দিন তার বোর্ডে ছাত্রেরা লিখে রেখেছে এই লাইনটি :

> Je Suis hante'L'Azur!
> L'Azur! L'Azur!

(পাগল করে দিল আমায় : আকাশ! আকাশ! আকাশ! আকাশ!) কিন্তু ১৮৬৬ সালেই এগুলোকে মালার্মে 'ছেলেবেলার কবিতা'র পংক্তিতে ফেলে দিয়েছেন।

ছোট ছোট টুকরো কবিতা আর নয়। মালার্মে এমন এক গ্রন্থ রচনা করতে চাইলেন যার মাঝে প্রকাশ পাবে তাঁর সামগ্রিক কাব্য-অনুভূতির রূপ। অন্তরে তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন গহন গভীর এক শূন্যতা। মালার্মে ভুলতে চেয়েছিলেন অকিঞ্চিৎকর অলীক-প্রায় এই জীবনকে : জীবনেরই মাঝে বিধৃত এক মৃত্যুর মধ্যে নিজেকে তিনি ডুবিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলেন, যে-মৃত্যুর স্তব্ধতা তাঁর কাছে একাধারে রমণীয় অথচ ভয়ানক। এই স্তব্ধতার উপলব্ধিই—পাস্কালকে যেমন, বোদল্যারকে যেমন— মালার্মেকেও গ্রাস করতে চাইল মারাত্মক বাস্তব আকারে : স্পষ্ট মালার্মে উপলব্ধি করলেন যে ঊর্ধ্বের এক শূন্যতা যেন আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে তাঁকে যন্ত্র ক'রে। নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে একখানা আয়না রাখতে শুরু করলেন মালার্মে তাঁর টেবিলের ওপর। আয়না সরিয়ে নিলেই তাঁর মনে হতে লাগল, তিনি যেন নিরাকার অস্তিত্ব-বিহীন নিঃসীম এক শূন্য!

দুটি বড়-গোছের রচনায় হাত দিলেন মালার্মে : Herodiade-নামে একটি লিরিক নাটক এবং ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত 'একটি কিন্নরের অপরাহু'—কবিতাটি। এই কবিতা থেকেই প্রেরণা পান মালার্মের শিষ্য বিখ্যাত সুরস্রষ্টা ক্লদ দ্যবুসি তাঁর অমর প্রেলিউড Apres-midi d'un Faune রচনা করবার। দীর্ঘ দশ-বছর যাবৎ মালার্মে এই 'এরোদিয়াদ' ও 'কিন্নরের অপরাহু'—রচনাদুটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে মগ্ন ছিলেন। এই কঠিন কঠোর শৃংখলার ছাঁচে পড়ে মালার্মের রচনা, তাঁর চিত্রকল্প, তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ব্যাকরণ-গর্হিত ভাষা এতই দুরূহ দুর্বোধ্য হয়ে উঠল যে নানা মুনি নানান মত নিয়ে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন মালার্মের রচনার।

১৮৭১ সালে পারীতে বদলি হলেন মালার্মে। ১৮৭৪ সালে গিয়ে উঠলেন পূর্বোক্ত রু দ্য রোমের বাড়িতে। ১৮৭৩ সালে তেওফিল গোতিয়ে-র স্মৃতিতে লেখা Toast funebre কবিতাটি এবং ১৮৭৭ সালে 'এডগার পো-র সমাধি' কবিতাটি প্রকাশিত হ'ল : মালার্মের রচনার পালাবদলের শেষ-পর্ব এখানেই শুরু, এখানেই তাঁর সর্বশেষ পরিণতির, তাঁর অদ্বিতীয় দুর্বোধ্য আঙ্গিকের সার্থকতম সূচনা।

১৮৮৪ সাল অবধি মালার্মের খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় পাঠক এবং গুণগ্রাহীর মধ্যেই। তার প্রধান কারণ, খ্যাতি, নাম, যশের প্রতি তাঁর বিরাগ, গভীর বিতৃষ্ণা। জনপ্রিয় হবার দিকে, বাহবা পাবার দিকে তাঁর কোন লক্ষ্যই যে ছিল না, ছিল শুধু কাব্য-সরস্বতীর প্রতিই আন্তরিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা—তার প্রমাণ পাই তাঁর কবিতা-সংখ্যা থেকেই : ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে তিনি লিখেছেন মাত্র গোটা-ষাট কবিতা। অথচ তাঁর মত বিরাট প্রাণশক্তিসম্পন্ন লেখকের পক্ষে ছ'শো কবিতা লেখাও এমন-কিছু দুরূহ হত না। কিন্তু কোয়ালিটির সাধনায় মালার্মে এতদূর মগ্ন ছিলেন, নিপুণ ভাস্করের মত এক-একটি কবিতাকে মেজে-ঘষে, চেঁছে-ছুলে, ঠেলে-পিটিয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁত মর্মর-মূর্তির পর্যায়ে উন্নীত করতে তিনি এতদূর একাগ্র ছিলেন যে, কোয়ান্টিটির দিকে দৃষ্টি দেবার মর্জি বা ফুরসৎ তাঁর আদৌ ছিল না।

কিন্তু, দৈবক্রমে একই বছরে, কবি ভ্যার্লেন আর হুইসমান্ দুটি প্রবন্ধ লিখে মালার্মের নাম ও কাব্য-কীর্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন সাহিত্য-অনুরাগী পাঠক-সাধারণের। প্রতীকবাদী তরুণ সাহিত্যিক, শিল্পী, সুরস্রষ্টারা মালার্মেকে বরণ ক'রে নিলেন গুরুর পদে। প্রতি মঙ্গলবার—আগেই বলেছি—তাঁরা সমবেত হ'তে লাগলেন কবিগুরুর বাড়িতে : কাব্যের, সাহিত্যের প্রতীকবাদী সাধনা ও মনন সম্পর্কে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চালিয়ে যেতে সক্ষম মালার্মে। বছরের পর বছর ধরে তিনি যে-মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছিলেন, ১৮৯৭ সালে তাঁর সেই বহুমুখী চিন্তাধারাকে সমন্বিত করে প্রকাশিত হল তাঁর Divagation নামে প্রবন্ধ-সঙ্কলন।

১৮৯৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর, আকস্মিকভাবে মালার্মে মারা গেলেন মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়েসে। মৃত্যুর আগে যে-কবিতাটি তিনি প্রকাশ ক'রে গেলেন, তার নাম : 'পাশার চালে নিয়তিকে বিলুপ্ত করা অসাধ্য'!

মালার্মে-প্রবর্তিত পথে বিশ্ব-সাহিত্য এগিয়ে চলল আধুনিক যুগের পরিণতি-অভিমুখে।

জবানবন্দি

ঠিক সোনাডাঙ্গার মুখে।

এখানে ধলাঙ্গী নদী বাঁক নিয়েছে। এপার-ওপার দেখা যায় না। দুপারে অজগর বন। পিপুল, বনচাঁড়াল আর সুন্দরী গাছের ভিড়। ঘন ঝোপে দিনের-বেলাতেই গাঢ় অন্ধকার। মৃত্যু পায়ে পায়ে ফিরছে।

রতনগড়ের বজরা ধীরগতিতে চলেছে। হিসাবে মাজিদের একটু ভুল হয়ে গেছে। আগের বাঁকে বজরা ভিড়ানো উচিত ছিল। নলচটিতে রাত কাটিয়ে ভোর ভোর যাত্রা করলে সুবিধা হত। এখন পারে বজরা বাঁধার প্রশ্নই ওঠে না। বরং সারা রাত দাঁড় বেয়ে সকালের দিকে মোহন গাঁ পৌঁছতে পারলে সব দিক দিয়ে সুরাহা হয়।

বজরার মধ্যে বেনারসের কমলবাঈ। সঙ্গে রতনগড়ের জমিদার বল্লভ ঘোষাল।

এ শখ কমলবাঈয়ের। বজরায় ঘেড়াবে। নদীতে, নদীতে। কালিন্দী থেকে সরস্বতী, সেখান থেকে খাল বেয়ে ঢেরে ধলাঙ্গী। ধলাঙ্গী দিয়ে যাবে সাগরের মোহনা পর্যন্ত। ঘোলাজল আর নীলজলের সঙ্গম দেখবে। অথৈ জলের অন্তহীন বিস্তার।

একেবারে হাওয়া নেই। মাঝিরা পাল গুটিয়ে ফেলল। হাওয়া থাকলে কাজ দিত। পালে বাতাস লাগলে বজরা তরতর করে এগিয়ে যেত। মাঝিদের হয়রানি কম হত। এ একেবারে দাঁড় ছাড়বার উপায় নেই। চারজন জোয়ান হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে। ধলাঙ্গীর ছোট ছোট ঢেউয়ের বুকে বিদায়ী সূর্যের আবিরের ছোপ।

সূর্য অস্ত গেলেই সব অন্ধকার। একটি নক্ষত্রের লন্ঠন কোথাও নেই। আকাশের বুকে জমাট কালো মেঘের টুকরো। বলা যায় না, এই টুকরোই হয়তো বাতাসে ভর করে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে। গাঢ় কালো হয়ে উঠবে ধলাঙ্গীর জল। ঢেউয়ের চেহারা বদলাবে। গর্জন আর ফোঁসানীতে কান পাতা যাবে না। এতবড় বজরাটাকে মোচার খোলার মতন নাচাবে, হেলাবে, দোলাবে।

চার জোয়ান জোরে জোরে দাঁড় বাইতে লাগল। জল কেটে কেটে বজরা বেগে এগিয়ে চলল।

এতক্ষণ দুজনেই বজরার ছাদে ছিল। কমলবাঈ আর বল্লভ ঘোষাল। কমলবাঈ গান ধরেছিল আর বল্লভ ঘোষাল সংগত করেছিল তবলায়।

মাঝিরা তন্ময় হয়ে শুনছিল। দাঁড় যে বাইতে হবে সেকথা ভুলেই গিয়েছিল। ঢেউয়ের কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে কমলবাঈয়ের গলার সুরের যেন মিল ছিল। দুজনের বুকেই বুঝি সাগরে মেশবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

একটা গান শেষ হতেই বল্লভ ঘোষাল আর একটা গানের ফরমাশ করছিল।

এবার সেই গানটা গাও কমল।

কোনটা? কমলবাঈ মুখ তুলল।

সেই যে, সাজন্ বিন্ নিদ্ না আয়ে।

কমলবাঈ প্রথমে গুনগুন করে তারপর গলা ছাড়ল।

সাজন্ বিন্ নিদ্ না আয়ে।
উন্ বিন্ মায় তো কছু না ভায়ে।

মনে হল জল-স্থল নিথর নিস্পন্দ হয়ে সেই অমৃত-সুর-লহরী পান করতে লাগল। ধলাঙ্গী পুকুরের মতন স্থির।

নিঃকম্প। আকাশের বুকে ঘরে-ফেরা পাখীর দল নীড়ের ঠিকানা ভুলল।

গান থামতে মাঝিদের চমক ভাঙল। দাঁড় কোলে করে তারা এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। খেয়ালই ছিল না। শুধু খেয়াল নয়, তাও ছিল পাছে দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দে সুরের জাল ছিঁড়ে যায়।

এবার একটা বাংলা গান।

বল্লভ ঘোষাল ঝুঁকে পড়ল কমলবাঈয়ের দিকে।

বাংলা গান কি আর মনে আছে?

আগে তো গাইতে।

তা গাইতাম, আজকাল তোমার জ্বালায় আর গাইতে পারছি কোথায়?

বল্লভ ঘোষাল হাসল। পাকানো গোঁফে তা দিতে দিতে বলল, ওস্তাদের আসরে তো আর বাংলা গানের চল নেই। কাজেই বাংলা গান গাইবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু রেওয়াজ রাখা ভাল। আমার তো বাংলা গান খুব মিষ্টি লাগে। সুরের কসরত হয়তো তত নেই, কিন্তু প্রাণ আছে। অন্তর ছোঁবার সম্পদ।

ততক্ষণে কমলবাঈ গাইতে শুরু করেছে।

আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা,
আমি হবো না তো গৃহবাসিনী।

জলের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে গানের সুর দূরের বনানীর মধ্যে অনুরণন জাগাল। বৈরাগ্য বেদনার ব্যথা সারা প্রকৃতিকে বুঝি উদাস করে তুলল।

বুড়ো মাঝি লোচন কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছল।

খান তিনেক গানের পরে কমলবাঈ বলল, আর নয়। বড় ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এমনিতেই আমার একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। চল নীচে যাই।

তাই চল। বল্লভ ঘোষাল সায় দিল।

দুজনে নেমে যেতে মাঝিরা রান্নাবান্নার আয়োজন করতে লাগল।

বজরা গঙ্গার মাঝখান থেকে সরে এল একপাশে। ঘন ঝোপ। গাছের ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর। নিকষ কালো অন্ধকার। কোথাও আলোর সামান্য রেখাও নেই।

খুব নিঃশব্দে ঝোপ থেকে একটা ছিপ জল কেটে কেটে বজরার ধারে এসে থামল! মানুষ দেখা যাচ্ছে না ছিপের ওপর। জলের ওপর দাঁড়গুলো খুব আস্তে উঠছে আর নামছে।

কাদের বজরা গো? ছিপ থেকে কে একজন জিজ্ঞাসা করল।

লোচন একটু দূরে বসে ছিল বজরার পাটাতনের ওপর। গলার শব্দে চমকে উঠল। দুটো হাত চোখের ওপর রেখে উঁকি দিয়ে দেখল।

জায়গাটা বড় খারাপ। ভৈরব সর্দারের এলাকা। দয়া নেই, মায়া নেই, একেবারে পাষণ্ড। অর্থের জন্য করতে না পারে এমন কাজ নেই। নরহত্যা তার একটা বিলাস। মানুষকে আঘাত করায় পৈশাচিক আনন্দ।

তাই খুব আস্তে বলল, তোমরা কে গো।

আমরা শ্মশানকালীর সন্তান। গম্ভীর গলায় স্বর, এ বজরা কার বলছো না?

রতনগড়ের জমিদার বল্লভ ঘোষাল আছেন ভিতরে।

লোচন ভেবেছিল, যেই হোক জমিদারের নামে হয় তো ভয় পাবে। ইতস্তত করবে একটু। জমিদার যে বাইজী নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন সেটা বুঝবে না, ভাববে পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে সফরে চলেছেন। বন্দুক পিস্তল সঙ্গে নিয়ে।

লোচনের কথা শেষ হবার আগেই বজরাটা ভীষণভাবে দুলে উঠল। অনেকগুলো সড়কির ফলা অন্ধকারেও ঝলসে উঠল।

মাঝিরা লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়াল কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। ভৈরবের অনুচরদের চোখগুলো অন্ধকারেও জ্বলে। হাতের সড়কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। পলকের মধ্যে দুজন মাঝি আহত হয়ে ছিটকে পড়ল জলে। বাকি কজনকে ভৈরবের দল ঘিরে ফেলল।

গোলমাল শুনে বল্লভ ঘোষাল বেরিয়ে এসেছিল। হাতে বন্দুক। কিন্তু তাক করবার আগেই বিপর্যয় ঘটল। ভৈরব সর্দার নিজে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। লাঠির আঘাতে বল্লভ ঘোষালের বন্দুক ছিটকে পড়ল বজরার ওপর। ক্ষিপ্র হাতে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ভৈরব বল্লভ ঘোষালের মুখোমুখি দাঁড়াল।

বল্লভ ঘোষাল চেঁচিয়ে উঠল, প্রাণে মেরো না। যা চাইবে তাই দিচ্ছি।

ভৈরব সর্দার হাসল, এইতো লক্ষ্মী-ছেলের মতন কথা। নগদ টাকা কি আছে ছাড়ো। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, আংটি।

সঙ্গে সঙ্গে বল্লভ ঘোষাল ঘড়ি, ঘড়ির চেন, আংটি আর টাকার ব্যাগ ভৈরবের পায়ের কাছে ফেলল।

ভৈরবের এক অনুচর সেগুলো সন্তর্পণে কুড়িয়ে নিল।

জানলার ধারে কমলবাঈ এসে দাঁড়িয়েছিল। দু-চোখে ত্রাসের ঝিলিক। ঘোমটা সরে গেছে মাথা থেকে। একরাশ কুঞ্চিত চুলের রাশ বাতাসে উড়ছে।

আড়চোখে ভৈরব সর্দার সেদিকে দেখে নিল।

বল্লভ ঘোষালের দিকে চেয়ে বলল, আর নেই কিছু?

বল্লভ ঘোষাল ঘাড় নাড়ল, না।

হাতের ভোজালিটা ভৈরব সর্দার বল্লভ ঘোষালের বুকে ঠেকাল, মিথ্যা কথা বললে একেবারে খতম করে দেব। মেয়েছেলে আছে বজরায়। গয়নাগাটি আছে।

বল্লভ ঘোষালের কণ্ঠ থেকে স্বর নয়, গোঙানির শব্দ এল।

কিন্তু তাতেই কাজ হল।

জানলা দিয়ে সোনার হার, চুড়ির গোছা, কানপাশা, পায়ের তোড়া ছিটকে এসে পড়ল।

ভৈরব সর্দার নিজের হাতে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে অনুচরের হাতে দিল।

বল্লভ ঘোষালের বুক থেকে ভোজালিটা সরিয়ে নিয়ে ভৈরব সর্দার মুচকি হাসল, সঙ্গে কে? পরিবার নয়

নিশ্চয়? পরিবার নিয়ে বেরোবার রেওয়াজ তো জমিদারদের নেই।

বল্লভ ঘোষাল কোন উত্তর দিল না। বজরার পাটাতনের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়াল।

যেই হোক, আমার জানবার দরকার নেই। তবে গলাটি ভারি মিঠে। ঝোপের আড়ালে বসে বসে গোটাকয়েক গান শুনলাম।

জোয়ার আসছে ধলাংগীতে। বজরা টলমল করছে। ভিতরে টাংগানো লন্ঠনটাও দুলছে।

ভৈরবের দেহে আলোর ঝিলিক এসে পড়ছে। মাঝে মাঝে আলো, মাঝে মাঝে অন্ধকার।

সেই আলো-আঁধারে বল্লভ ঘোষাল দেখল, পরণে রক্তাম্বর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ কাঁধের ওপর দুলছে। মূর্তিমান ভৈরব। দু-চোখে ধিকি ধিকি আগুন।

লোকে বলে শ্মশানকালীর পুজো সেরেই ভৈরব সর্দার বেরিয়ে পড়ে। মায়ের দয়ায় শিকার কখনও তার হাত-ছাড়া হয় না।

ভৈরব সর্দার আর একবার চোখ ফেরাল জানলার দিকে। না, কেউ নেই সেখানে। সরে গেছে কিংবা অলংকারের শোকে মূর্ছাই গেছে কিনা কে জানে?

আমি গান শুনব। ভৈরব গলাটা খাদে নামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হল না।

বল্লভ ঘোষাল মৃদু কণ্ঠে বলল, গান?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গান। কেন ডাকাতি করি বলে গান ভাল লাগতে নেই! ভৈরব সর্দারের গলা পর্দায় পর্দায় চড়ল। রাইপুরের জমিদার-বাড়ীতে কীর্তনের আসর বসেছিল। দিব্যি ভদ্রলোক সেজে আসরের মাঝখানে গিয়ে বসলাম। শুনতামও সারারাত, কিন্তু আসরে দু বেটা পুলিশ ঘোরাঘুরি করাতে আর থাকতে সাহস হ'ল না। চলে এলাম। তখন আবার সদ্য একটা ডাকাতি হয়ে গেছে বিদ্যাধরী খালে। গোটাতিনেক মানুষের লাশ ভেসে উঠেছিল জলে। পুলিশ খুব জোর তল্লাসী শুরু করেছিল।

বল্লভ ঘোষাল এটুকু বুঝল, গান ভৈরব সর্দার বুঝুক না বুঝুক, সেটা কথা নয়। গান যখন শুনতে চেয়েছে, তখন সে শুনবেই। বাধা দিলে এ বজরায় কারো ধড়ে প্রাণ থাকবে না।

তাই সে অন্য ওজর তুলল।

কমলের শরীরটা খুব ভাল নেই। ঠান্ডা লেগে গলাটা ভারী হয়ে আছে।

ভৈরব সর্দার একেবারে বল্লভ ঘোষালের গা ঘেঁসে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমার সংগে তোমার সম্পর্কটা রসিকতার নয়। রসিকতাটা আমার ধাতেও সয় না। যা বলছি ভালোয় ভালোয় তার ব্যবস্থা কর, নয়তো সড়কির ফলায় পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে বার করব।

বল্লভ ঘোষাল শিউরে উঠল।

ভৈরব সর্দারকে চোখে দেখা এই প্রথম, কিন্তু তার নাম যথেষ্ট শুনেছে। বিদ্যাধরী খালের মুখ থেকে ধলাংগীর ফাঁড়ি পর্যন্ত ভৈরবের রাজত্ব। জল-পুলিশ আশ-পাশের গাঁ চেঁছে ফেলেছে, ভৈরবের সন্ধান পায়নি। অথচ এমন সপ্তাহ যায়নি, যখন ভৈরবের কিছু না কিছু খবর বেরিয়েছে কাগজে।

মাসখানেক আগের কথা।

বিয়ে করে নতুন বর-বউ ফিরছিল এ-পথ দিয়ে। ঠিক সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই ছোট্ট এক ছিপ এসে নৌকার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। অনেকটা আজকের মতনই।

ছিপ থেকে ভারী গলায় কে একজন জিজ্ঞাসা করল, আগুন আছে নাকি কত্তা। একটু তামুক খেতাম।

নৌকার মাঝি সরল মনে একটা চ্যালাকাঠে আগুন ধরিয়ে এগিয়ে দিয়েছিল। ছিপের দিকে ঝুঁকে পড়তেই খাঁড়ার ঘায়ে তার মাথাটা দু-ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। তারপর ছিপ থেকে একরাশ কালো কালো মানুষ নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ভৈরব সর্দার নিজে বরের ঘাড় ধরে তাকে টানতে টানতে এনেছিল।

বের কর কি আছে। তাড়াতাড়ি কর। আমার অন্য কাজ আছে।

বরের দেহে যা কিছু ছিল, সব তুলে দিয়েছিল ভৈরবের হাতে।

ভৈরব হেসেছে, বরের জিনিস তো হল, এবার কনের জিনিস কই? আসল মাল তো ঐখানেই।

কনে নিজের হাতে একটা একটা করে সমস্ত অলংকার খুলে দিয়েছিল। ভাল বেনারসী শাড়ীটা পেতে ভৈরবের দলের লোক অলঙ্কারগুলো তুলে নিচ্ছিল, হঠাৎ বরের কি মতিভ্রম হল।

কনে শেষ চুড়ি-জোড়া হাত থেকে খুলতে যেতেই এক চীৎকার করে উঠল, না, সব খুল না। একেবারে খালি হাত করা অমংগল। থাক চুড়ি-জোড়া।

কনে থতমত খেয়ে থেমে গিয়েছিল।

সাধারণভাবে একজোড়া চুড়ি ভিক্ষা চাইলে ভৈরব সর্দার হয়তো আপত্তি করত না। কিন্তু বরের বলার ভংগীতে তার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে গেল।

কেন খুলবে না? আলবত খুলবে। ভৈরব গর্জন করে উঠল।

না, খুলবে না। সব তো দিয়েছি। শেষ জোড়া থাকবে।

বর বুক ফুলিয়ে ভৈরবের মুখো-মুখি দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত কিংবা বুঝি তাও নয়। ভৈরবের হাতের সড়কিটা ম্লান চাঁদের আলোয় ঝক ঝক করে উঠল। ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্তের ধারা। একটা আর্তনাদ উঠেই সংগে সংগে মিলিয়ে গেল।

বরের প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল নৌকার ওপর।

তারপরেই আশ্চর্য কান্ড। আলু-থালু বসনে, এলো চুলে কনে ছুটে এসে ভৈরবের দুটো পা জড়িয়ে ধরল।

ওই সড়কিতে আমাকেও গেঁথে ফেল। আমাকেও শেষ করে দাও। শুধু একজোড়া চুড়ি চেয়েছিলাম, কিন্তু হাতের লোহাটুকুও রাখতে দিলে না।

আমার আর বেঁচে থাকার সাধ নেই গো। আমাকেও যেতে দাও ওর কাছে।

পলকের জন্য একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল ভৈরব সর্দার। কিন্তু ওই পলকের জন্যই। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়েছিল। এক ধাক্কায় কনেকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল ছিপের ওপর।

খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। জলপুলিশের তৎপরতা সম্বন্ধে কটাক্ষও করেছিল।

শুধু খবরটা পড়াই নয়, নিজের চোখে বল্লভ ঘোষাল দেখেও ছিল সেই কনেকে। তখন বদ্ধ পাগলী। দু'পায়ে চেন বাঁধা। হাততালি দিয়ে হাসে আর বলে, বা, বা, কি রক্ত। জোয়ান পুরুষের রক্ত। যেমনি তাজা, তেমনি গরম। এক-জোড়া চুড়ির দাম টাটকা একটা প্রাণ। হা, হা, হা।

রতনগড়ের হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছিল। সেখানেই বল্লভ ঘোষাল দেখেছিল।

সেই দৃশ্যটা ঘোষালের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খুব শান্ত গলায় বলল, বেশ তো, ঠিক আছে। গান শোনানো হবে। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনতে অসুবিধা হবে না?

দাঁড়িয়ে গান শুনতে যাব কোন দুঃখে? দিব্যি বসে বসে শুনবো। আসরে যেমন শোনে। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ভৈরব সর্দার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের অনুচরদের দিকে চেয়ে বলল, এই গুপে, এদিকে আয়।

লিকলিকে গোছের একটা মানুষ মাঝিদের কাছে খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, সর্দারের কথায় তার সামনে এসে দাঁড়াল।

তুই এখন লুঠের মাল নিয়ে চলে যা। দলের সবাইকে সঙ্গে নে। কেবল নিধে থাক। যতক্ষণ আমি গান শুনবো, ততক্ষণ মাঝিদের আগলাবে। শয়তানি করে কেউ আবার বজরা ঘাটে লাগিয়ে থানায় না খবর দিয়ে আসে।

তাই হল। নিধে ছাড়া সবাই ছিপে গিয়ে উঠল। শুধু যাবার আগে গুপে একবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি? তুমি কি করে যাবে সর্দার?

আমার কথা থাক। নিজেদের ভাবনা ভাব। আমি ঠিক সাঁতরে চলে যাব। এর আগে যাইনি নাকি!

আর কোন কথা নয়। ছিপটা তীর-বেগে জল কেটে কেটে পারের দিকে চলে গেল। অন্ধকার রাত। আকাশের শাড়ীতে একটা তারার চুমকিও নেই।

কিছুক্ষণ পর ছিপটা আর দেখাই গেল না।

এবার ভৈরব সর্দার ঘুরে দাঁড়াল।

বেশী না, গোটা তিনেক গান শুনেই আমি চলে যাব। বসবার একটু ব্যবস্থা কর।

বল্লভ ঘোষাল ভিতরে চলে গেল।

ভৈরব মাঝিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুক চাপড়ে বলল, আমি ভৈরব সর্দার। জলের রাজা। কোন রকম বেইমানি কি কোন কায়দা করলে খাঁড়ার কোপে একেবারে দু-খণ্ড করে ফেলব। জান নিয়ে আর কাউকে বাড়ীতে যেতে হবে না। হুঁসিয়ার।

ভৈরবের কথা শেষ হবার আগেই লোচন তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, দোহাই বাবা, প্রাণে মেরো না। মা কালীর দিব্যি একটু এদিক-ওদিক করব না। যা বলবে তাই শুনবো।

বল্লভ ঘোষাল বাইরে এসে দাঁড়াল।

কই এস।

ভৈরব নিধের কানে কানে কি একটা বলে বল্লভের সামনে এসে দাঁড়াল।

ভিতরে রীতিমতো আসর। গালিচার ওপর তিনটি তাকিয়া। গড়গড়ার মাথায় অম্বুরী তামাক পুড়ছে। অপূর্ব সুগন্ধ। একটা তানপুরো। দুটো তবলা।

বল্লভ ঘোষালের বন্দুকটা হাতে চেপে ভৈরব সর্দার ঢুকেই বলল, বা, তোফা বন্দোবস্ত! তা আসল লোক কই?

আসছে। তুমি বস।

দরজার কাছে ঘাঁটি আগলে ভৈরব বসল। এখান থেকে বাইরেটাও বেশ নজরে আসে। মাঝিদের মধ্যে কারো দুর্বুদ্ধি হ'লে শায়েস্তা করতে অসুবিধে হবে না।

একটু পরেই কমলবাঈ ঘরে ঢুকল।

বাইজির সাজ নয়, একেবারে অব-গুণ্ঠনবতী বধূ।

বল্লভ ঘোষাল তবলায় বসল।

কমলবাঈ অবগুণ্ঠন সরাল না। ঘোমটাটা সামান্য তুলে দিল।

তানপুরোটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে তারগুলো পরীক্ষা করল। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করল।

প্রথমটা বোধহয় ভয় আর অদ্ভুত পরিবেশের জন্যই গলাটা আটকে গেল। গলাটা ঝেড়ে ফেলে কমলবাঈ গলা ছাড়ল।

কাঁহা ছুপে ঘনশ্যাম।

বল্লভ ঘোষালের তবলার হাতও চমৎকার। গান জমে উঠল।

বৃন্দাবনের মিলন-বিরহ-গাথা। গোপিনীর অন্তরের ব্যথা যেন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ভারে, ধলেশ্বরীর ঢেউয়ের কলরোলে, মাঝিদের দাঁড়টানার ছন্দায়িত শব্দে। কোথায় লুকিয়েছে অন্তরের অন্তরতম পুরুষটি। কার মর্মের অন্তরালে। গোপিকা-জীবন বনমালীকে খুঁজে খুঁজে সকলে পরিশ্রান্ত। নিজে না ধরা দিলে পৃথিবীতে কার সাধ্য এই চতুরতম প্রেমিকটির সন্ধান করে। তাঁর লুকোচুরির রহস্যভেদ করে এমন শক্তি কার।

গান থামতে ভৈরব সর্দার তারিফ করল।

বাঃ, চমৎকার গলা, আর একটা হোক্।

কমলবাঈ বুঝি তৈরীই ছিল। শুরু করল।

বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়।

সুরেলা কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস মন্থন করে।

বল্লভ ঘোষালেরও আশ্চর্য লাগল। কমলবাঈয়ের এমন গলা যেন কেও

কখনও শোনেনি। এমন সূক্ষ্ম কাজ, এমন দরদ!

ভৈরব সর্দার মাথা নেড়ে নেড়ে তাল দিতে লাগল।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার দুয়েক কমলবাঈ গানটা গাইল। এক সময়ে গান থামল। গানের রেশ কিন্তু তখনও জড়িয়ে রইল শ্রোতাদের মনে। আকাশে বাতাসে।

ঘাড় নীচু করে ভৈরব সর্দার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখল। দু-একটা নক্ষত্র ফুটেছে। তাদের ক্ষীণ দীপ্তি ধলাঙ্গীর বুক পর্যন্ত এসে পৌঁছচ্ছে না। একপারে ঘন ঝোপঝাড়ের অস্পষ্ট চিহ্ন।

এখনও সময় আছে। বোধ হয় মাঝরাত। সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে উঠতে আর কতক্ষণ লাগবে। একবার পারে গিয়ে উঠতে পারলেই নিশ্চিন্ত। আর ভয়ের কিছু নেই। গাঁয়ের লোক তাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না। এমন আসর ছেড়ে। এমন গান ছেড়ে। কমলবাঈয়ের দিকে ভৈরব সর্দার চেয়ে চেয়ে দেখল।

ঘোমটা টেনে চুপচাপ বসে আছে। কোলের ওপর হাতটা জড়ো করে। অনেকগুলো গয়না খোয়া গেছে, সেই শোকে বোধ হয় ম্রিয়মাণ।

গয়নাগুলো হাতের কাছে নেই। কিন্তু বলা যায় না, থাকলে হয়তো ফেরতই দিয়ে দিত। এমন গান, এমন গলার পুরস্কার।

এই এক দোষ ভৈরব সর্দারের। রুক্ষ আবরণ আর নির্মম হৃদয়ের ফাঁকে কোথায় একটু দুর্বলতা লুকানো রয়েছে। গানের প্রতি দুর্বলতা। ভাল গান শুনলে হৃদয় যেন মোমের মতন গলে যায়। ভৈরবের ভৈরব মূর্তি আর থাকে না।

আর একবার বজরার ওপর ভৈরব উঁকি দিয়ে দেখল।

মাঝিরা গোল হয়ে বসেছে। মাঝখানে নিধে। হয়তো সুখ-দুঃখের গল্প হচ্ছে। কিংবা নিধে বলছে নিজের বীরত্বের কাহিনী।

এবার একটা বাংলা গান হোক। বাংলা গান আসে তো?

সোজাসুজি কমলবাঈয়ের দিকে নয়, ভৈরব চোখ ফেরাল বল্লভ ঘোষালের দিকে।

বল্লভ ঘোষাল কমলবাঈয়ের দিকে ঝুঁকল। ফিসফাস করে কথাবার্তা। তারপর কমলবাঈ গান ধরল।

মাঝি, তরী হেথা বেঁধোনাকো
আজকের এই সাঁঝে।

প্রথম লাইনেই ভৈরব নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। দুটো হাত হাঁটুর ওপর রেখে।

খুব পরিচিত গান। এ গান বাংলার পথে ঘাটে, মাঝিদের মুখে অনবরত শোনা যায়। সুরের খুব কারসাজি নেই, অস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ সঞ্চারীর মায়াময় বিন্যাস, কিন্তু প্রাণসম্পদে অপূর্ব।

মাঝিকে করুণ মিনতি। এ ঘাটে নৌকা না ভেড়াবার কাতর অনুনয়। এ ঘাটের সঙ্গে মর্মন্তুদ এক স্মৃতি জড়ানো। কাঁখে কলসী, স্বল্প ঘোমটা টানা যে বৌটি এ ঘাটের পথে জল নিতে আসত, সে খুব জানা। একেবারে কাছের লোক। নিজের লোক।

এ গান ভৈরব অনেকবার শুনেছে। তবে এমন মার্জিত, এমন সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠে নয়।

এইসব গান শুনলে ভৈরবের আজকের জীবনটা মুছে যায়। যখন ভৈরব ভৈরব হয়নি, সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেটে ঘর, ধানের গোলা। কাকচক্ষু দীঘি। বাইরে ফসলের অজস্র সম্ভার, ঘরে ধানের শীষের মতনই সতেজ, সরস এক বধূ।

নিজেকে লাঙল কাঁধে নিতে হত না, লোক ছিল। তবে তদারক করার জন্য যেতে হ'ত মাঠে। বৈঠকখানায়, চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী আসরে জীবনটা যেন শতরূপে ছড়ানো ছিটানো ছিল।

তারপর আকাশ কালো করে মেঘ জমল। বিধাতার রুদ্র অভিশাপ। কাদামাটির বাঁধ ভেঙে জল ঢুকল ক্ষেতের মধ্যে। লবণাক্ত, গৈরিক জল। ক্ষেত গেল, খামার গেল, মানুষগুলোকে আর চেনবার উপায় রইল না।

প্রকৃতির রুদ্রতা ক্রমশই মানুষের রুদ্র আক্রোশ ফুটে উঠল। নির্মম পরোয়ানা নিয়ে জমিদারের পাইক এসে দাঁড়াল। অসহায় মানুষের হাজার কাকুতি আর অনুনয়ে পাষাণ গলল না। বন্যা যে জমিটুকু রেহাই দিয়েছিল, সেটুকু গেল জমিদারের গর্ভে।

তার আগেই অবশ্য ভৈরবের চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে। মাটির নেশা ফিকে হয়ে এসেছে। জমিদারের নিগ্রহ, সবুজ ক্ষেতের মতন নিরীহ নরম মানুষগুলোকে উগ্র করে তুলেছে। যে চোখে নীবারের স্বপ্ন ছিল, সে চোখে ফুটে উঠল বৈশ্বানরের দাহ।

লাঙল ছেড়ে সবাই লাঠি ধরল। অত্যাচার তাদের অত্যাচারী করে তুলল। প্রথম প্রথম লাঠি, তারপর সড়কি, বল্লম, খাঁড়া। প্রথমে সন্ধ্যার ঝোঁকে মানুষকে ভয় দেখিয়ে শুধু অপহরণ। টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি। তারপর লোভ বাড়ল। মানুষগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠল। কেউ বাধা দিলে, বুকে ভোজালি বসিয়ে দিতে ইতস্তত করল না। সড়কি দিয়ে পেটের অন্ত্রগুলো টেনে বের করল নিস্পৃহচিত্তে।

স্থল থেকে ব্যবসার জাল ছড়াল জলে। জল-পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াল। এক খাল থেকে আর এক খালে। এক বজরা থেকে আর এক বজরায়।

নির্বিরোধ দামোদর মান্না দুর্ধর্ষ ভৈরব সর্দারে রূপান্তরিত হ'ল।

ভৈরব সর্দার বল্লভ ঘোষালের দিকে ফিরে বলল, শেষ একটা বাংলা গান শুনে উঠে যাব। নাও, গাইতে বল।

কমলবাঈ হাত দিয়ে ঘোমটাটা একটু তুলে দিল, তারপর তানপুরা সরিয়ে রেখে গাইতে শুরু করল।

আমার মন মজিল সখীরে কালার
বাঁশীতে।

মিশ্র আশাবরী। গাইতে গাইতে ঘোমটা সরে গেল মাথা থেকে। বল্লভ ঘোষাল ভ্রূ কুঞ্চিত করল, কিন্তু কমল-

বাঈয়ের চেতনা নেই, সাড় নেই। দু চোখে জলের ধারা। মোছবার কোন চেষ্টাও সে করল না।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইল।

মনে করি ভুলে থাকি,
ভুলিতে পারি না সখী,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, পাই দেখিতে।

ভৈরব সর্দার টান হয়ে বসল। বন্দুকটা কোলের ওপর নিয়ে।

কাঠের একটা থামের ছায়া পড়েছে কমলবাঈয়ের মুখে। মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বেছে বেছে এই-সব গানগুলো কেন গাইছে বাইজী! পুরোনো গান। পুরোনো দিনের গান।

ভৈরবের মনে হল তার চোখেও জল এসে যাবে। বাধা মানবে না। গালের ওপর দিয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা বুকের ওপর পড়বে। হৃদয় দ্রব হয়ে যাবে। তা হলেই সর্বনাশ। ভৈরব সর্দার মারা যাবে। সড়কি তোলার হাত হয়তো থাকবে, কিন্তু মন নয়। মন নিয়েই তো মানুষ।

অপূর্ব, অপূর্ব গলা। সময় নেই, নয়তো সারা রাত বসে বসে গান শুনতাম। উঠি এইবার।

ভৈরব সর্দার উঠবার মুখেই বিপর্যয়।

একটা লোক পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভৈরবের ওপর। সামান্য একটু ধস্তাধস্তি, তারপরই ভৈরবের দুটো হাত হাতকড়ির বাঁধনে বাঁধা পড়ল।

জল-পুলিশ।

ইনস্পেক্টর হাতের পিস্তলটা সোজা তাগ করল ভৈরবের বুকের দিকে।

হেসে বলল, বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান।

ভৈরব সর্দার গর্জন করে উঠল, নিধে।

নিধেও ফুলের মালা জড়িয়েছে হাতে। দুজনকে একসঙ্গেই ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হবে।

ইনস্পেক্টর বল্লভ ঘোষালের দিকে ফিরে বলল, আপনার এক মাঝি মশাই খুব বুদ্ধি করে জলে লাফিয়ে পড়েছিল। সেই গিয়ে আমাদের খবর দেয়। নয়তো আমাদের জানবার কোন উপায় ছিল? পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, দিব্যি গান হচ্ছে বজরায়। তখন কি আর ঘুণাক্ষরে ভাবতে পেরেছি মশাই যে ডাকাতের গান শোনার শখ।

এতক্ষণে বল্লভ ঘোষালের শোক উথলে উঠল, আমার সর্বস্ব গিয়েছে ইন্সপেক্টরবাবু, আংটি, ঘড়ি, টাকাপত্র, এঁর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার।

চিন্তা করবেন না, ইনস্পেক্টর অভয় দেওয়ার ভঙ্গীতে হাতটা তুলল, পালের গোদা যখন ধরা পড়েছে, তখন মারের চোটে সব একে একে বেরোবে।

একটি কথাও নয়। ভৈরব সর্দার মাথাটা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। চওড়া বুকটা উত্তেজনায় ওঠা-নামা করতে লাগল ধলাঙ্গীর ঢেউয়ের মতন।

বজরা আস্তে আস্তে তীরের দিকে এগিয়ে চলল। ঝোপঝাড় খুব স্পষ্ট। ফাঁকে ফাঁকে মিটিমিটি লণ্ঠনের আলো। গাঁয়ের নাম রহিমপুর। বিরাট মাছের কারবার হয় এখানে। নদীর পাড়েই থানা।

ইনস্পেক্টর বল্লভ ঘোষালকে বলল, আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে। এজাহার দিতে হবে একটা। শুধু আপনাকে নয়। ওঁকেও যেতে হবে। নিরুপায়। জানেন তো, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আদালতেও যেতে হবে দুজনকে। আপনারাই তো সবচেয়ে বড় সাক্ষী।

কমলবাঈ বল্লভ ঘোষালের দিকে নয়, সোজা চোখ ফেরাল ইনস্পেক্টরের দিকে, পরিষ্কার গলায় বলল, যা জানি সব বলতে হবে? যতটুকু জানি?

নিশ্চয়। পুলিশের কাছে কিছু লুকোতে আছে?

বেশ সবই বলব। ঘোমটা খুলে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, কমল-বাঈয়ের খেয়াল নেই। শান্ত গলায় বলল, সবই বলব। আজকের রাতের ডাকাতির কথা। আর এক রাতের অপ-হরণের কাহিনী। মুখে কাপড় বেঁধে লুট করে নিয়ে যাওয়া গৃহস্থের বউকে।

চমকে ভৈরব সর্দার মুখ তুলল।

আর থামের অন্ধকার নেই। কমল-বাঈ সরে এসে দাঁড়িয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় পরিষ্কার তাকে দেখা যাচ্ছে।

এক নজরেই ভৈরব সর্দার চিনতে পারল। এত বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও।

হাতের শিকলটা শুধু ঝনঝন করে বেজে উঠল। বুঝি চিনতে পারার আনন্দে আর বেদনায়।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুপমের আমলে একখানা গাড়ী ছিল।

পুরনো মডেলের ভাঙ্গা ঝরঝরে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী একখানা দাঁও মেরে ঝাঁ করে কিনে ফেলেছিলেন অনুপম। সেই গাড়ী চড়েই নিজেকে গাড়ীর মালিক ভেবে—পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন অনুপম। সেই গাড়ী চড়িয়েই তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে আসতেন, পাঠিয়ে দিতেন, মাসী-পিসিকে গঙ্গা স্নান করাতেন। শুধু চড়াতে পারেননি নিজের স্ত্রী-পুত্রকে।

সুচিন্তার কোনদিনই সময় হত না, আর ছেলেদের ওই অপূর্ব গাড়ী চড়ে বেড়াতে লজ্জা করতো। অনুপম বলতেন 'আরে বাবা, গাড়ীর কাজ তো তোমাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া, সে কাজ কি হয় না ওর দ্বারা? তবে ওর দোষটা কোথায়?

দোষটা বুঝিয়ে দেবার প্রবৃত্তিও হত না ছেলেদের। বলতো 'দরকার নেই।'

অনুপম বলতেন, 'কিনতাম, তোদের মনের মতন গাড়ীই কিনতাম, যদি বাড়ী-খানা না ফাঁদতাম। তা হবে, পরে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে।'

কিন্তু মেওয়া ফলানো পর্যন্ত আর অপেক্ষা করবার উপায় হল না অনুপমের। কাজেই মনের মতন গাড়ী আর হ'ল না এদের। তা' মনের অগোচর পাপ নেই, গাড়ীর আশা ফুরোল বলে যতটা না আক্ষেপ হল এদের, তার চাইতে অনেক গুণ সুখী হল, অনুপম যথাসময়ে মরে তাদের নিষ্কৃতি দিয়ে গেছেন বলে। জীবনে এই একবার ওরা বাপের ব্যবহারটাকে অভিনন্দন করল।

এই অনুপম কুটিরে যদি অনুপম নিজে আসতেন, তা'হলে তাঁর সাড়ম্বর গৃহপ্রবেশের ঘোষণার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়ে যেত পরিবারের অমার্জিত স্থূলতা। অনুপমের স্ত্রী-পুত্র যে কত মার্জিত, কত সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন, টেরও পেত না কেউ। তা'ছাড়া সমস্ত বাড়ীটাই তো তা'হলে সারাক্ষণ অভ্যাগতের পদ-পাতে পঙ্কিল হয়ে থাকতো।

সেই লোকজন, আসা-যাওয়া, খাওয়া-মাখা, হাসি-গল্প, তাস-দাবা! বাপস্!

বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে, তারপর মায়া গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি? কিন্তু সেটুকু হয়নি। সুচিন্তা আর তাঁর ছেলেদের অপরিচয়ের বর্ম পরে—পাড়ায় এসে উঠেছে, সেই বর্ম পরেই আছে এখনো পর্যন্ত।

ভাঙ্গা ঝরঝরে গাড়ীটা অনুপমের শ্রাদ্ধের আগেই বেচে দেওয়া হয়েছিল, নতুন গাড়ী কেনবার সামর্থ্য তাঁর ছেলে-দের হয়নি। অতএব বাস, ট্রাম অথবা ট্যাক্সীই সম্বল।

তা বাড়ীর সামনে দিয়ে বাসটা যেত, অসুবিধে খুব ছিল না। অসুবিধের মধ্যে, পাছে পড়শীরা কেউ সে বাসে উঠে পড়ে এক গাল হেসে বলে 'কি খবর?' তাই সারাক্ষণ ঘাড় ব্যথা করেও জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকা। কিন্তু সম্প্রতি অসুবিধে ঘটেছে। শহরতলির সীমান্তবর্তী রেলওয়ে ক্রসিংটা মেরামত হচ্ছে, তাই বাসগুলো অন্য পথ ধরেছে। এদের-ওদের তাদের সকলকেই নেমে পড়তে হয় মোড়ের মাথায়, হাঁটতে হয় খানিকটা।

সেই পথটুকু হেঁটে আসতে আসতে সহসা থমকে দাঁড়াতে হল নীলাঞ্জনকে, মোড়ের কাছেই স্টেশনারী দোকানটার কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কে?

নীতা না?

নীতা তো, নীতাই। নিশ্চয় নিজের কিছু কেনার দরকারে এসেছে। এসেছে তাতে নীলাঞ্জনের কি? সে কথা ভাবল নীলাঞ্জনও—তাতে আমার কি? কিন্তু ভেবেও নিজের গন্তব্য পথে চলে যেতে

পারল না, দাঁড়িয়ে রইল। অথচ এমনভাবে নয় যে, মনে করা যেতে পারে ও কারো প্রতীক্ষা করছে।

'আরে আপনি!'

নীতাকেই করতে হ'ল সম্বোধন। নীলাঞ্জন তো তাকে এইমাত্র দেখতে পেয়েছে। অথবা ভাল করে দেখতেও পায়নি।

'ও হ্যাঁ, এই তো ফিরছি। আপনি কোথায়?'

'আমি, এই যে কিছু সওদা করলাম। চলুন যাওয়া যাক।'

পাশাপাশি এগোতে এগোতে নীতা গম্ভীরভাবে বলে, 'আচ্ছা, আপনি কি ভদ্রতার অ আ ক খও শেখেননি?'

'তার মানে?'

আরক্ত মুখে প্রশ্ন করে ওঠে নীলাঞ্জন।

'মানে অতি সোজা। একজন ভদ্রমহিলা যদি পথে কিছু বহন করে নিয়ে যান, কোন ভদ্রপুরুষের পক্ষে সংগত কি সে দৃশ্য চোখ মেলে দেখা?'

'বহন!'

নীলাঞ্জন বাঁকা কটাক্ষে বলে, 'কিনেছেন তো একটা ক্রীম আর এক দোয়াত কালি, বহনের ওজন তো কত?'

'ওজনটাই সব নয়। নিন ধরুন, রাস্তায় কেউ দেখলে পাছে এই কালি আপনার মুখে মাথায় সেই ভয়েই দিতে হচ্ছে।'

'অসীম দয়া আপনার!' নীলাঞ্জন বলে, 'আর কোথাও যাবেন?'

'নাঃ কোথায় আর!' নীতা হতাশ নিশ্বাস ফেলে, আর কোথায়! শুনেছি এইখানে কাছাকাছি কোথায় নাকি আপনাদের 'রবীন্দ্র সরোবর'। কিন্তু হতভাগোর মত একা তো যেতে পারিনে।'

'আমাকে যদি সংগী হিসেবে অসহ্য মনে না করেন, তো যেতে পারি।'

'বাঃ আপনি এখন সারাদিনের পর কর্ম-ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরছেন!'

'ক্লান্ত আমি হই না।'

'তা হলেও, আপনারা যে রকম ঘোরতর নিয়মী মানুষ, একটু এদিক ওদিক হলেই হয়তো আপনার মা ভাববেন।'

'মা!' চিড়িক করে একটু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে নীলাঞ্জনের মুখে, 'ম র ভাবনার জন্যে অনেক বেশী দামী বিষয়-বস্তু আছে।'

নীতা একবার কি ঠোঁটটা কামড়ে ধরে?

হয়তো ধরে, হয়তো ধরে না, তবে কথা সে সহজ গলাতেই কয়, 'মানুষকে অশ্রদ্ধা করতে করতে এমন অবস্থা ঘটেছে আপনার যে, শ্রদ্ধা কথাটাই ভুলে গেছেন!'

'শ্রদ্ধা করবার যোগ্য মানুষ পেলে তবে না শ্রদ্ধা?' নীলাঞ্জন তীব্র গলায় বলে, 'তেমন মানুষের দেখা মেলে কই?'

'দুর্ভাগ্য আপনার যে, এত বড় পৃথিবীতে শ্রদ্ধা করবার যোগ্য একটা মানুষও আপনি খুঁজে পাননি। কিন্তু এর কারণ কি জানেন?'

'শুনতে পেলে ধন্য হবো।'

'কারণ হচ্ছে, নিজেকে আপনি শ্রদ্ধা করতে শেখেননি। নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শিখলে অপরকেও শ্রদ্ধা করতে পারতেন। শ্রদ্ধা করবার জন্যে লোক খুঁজতে ঊর্ধ্ব-মুখে স্বর্গপানে তাকিয়ে থাকলে তাকিয়ে থাকাই সার হয়। স্বর্গ বড় কৃপণ।'

'তার জন্যে আক্ষেপ নেই আমার।'

'আপনার নেই, আমার আক্ষেপ হয় আপনাদের জন্যে।'

'আপনি মহানারী! যাক এসে পড়েছে আপনার রবীন্দ্র সরোবর।'

'ওমা এক্ষুণি এসে পড়ল! কি আশ্চর্য বাড়ীর এত কাছে? অন্য অন্য বারে শ্যামবাজার থেকে গাড়ী করে এসেছি ঠিক বুঝতে পারিনি। চলুন বসা যাক।'

কত তাড়াতাড়ি যে সুর বদলায় নীতা।

আর তাই জন্যেই বুঝি এত আকর্ষণীয় ও।

কিন্তু 'বসা যাক' বললেই কি বসা যায়? বসবার ঠাঁই পাওয়া যায়?

এ জগতে কেউ যে কারো জন্যে এতটুকু জমিও ফেলে রাখতে রাজী নয়, তার প্রমাণ এই লেক আর পার্কগুলি।

খালি নেই, একটিও বেঞ্চ খালি নেই। এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক খুঁজলো নীতা, তারপর নীলাঞ্জনের কাছে এসে বলল, 'নাঃ কোথাও না। সমস্ত বেঞ্চ-গুলিতে এক-একটি জুটি। যুগল মিলনের লীলাক্ষেত্র একেবারে। সাধে কি আর বলেছিলাম, এখানে একা আসা মানেই জগৎকে ডেকে ডেকে জানানো 'দেখ আমি কি হতভাগা, দেখ আমার কি অক্ষমতা!'

নীলাঞ্জন আরক্ত মুখে বলে, 'আপনার হাসা-পরিহাসের ভঙ্গীটা বড় গুরুপাক, হজম করা শক্ত।'

'ওমা সে কি! এই সাদাসিধে সহজ কথাটুকুও আপনার কাছে গুরুপাক হল? ইন্দ্রনীল আপনার ছোট হলেও ঢের তারসহ।'

ইন্দ্রনীল!

ইন্দ্রনীলের নাম করতেই গম্ভীর হয়ে যায় নীলাঞ্জন। এক ফোঁটা একটা ছেলে ইন্দ্রনীল, তার সঙ্গেও তাহলে এই রকম বাচালতা করে এই মেয়েটা!

নীতা একবার বাঁকা কটাক্ষে নীলাঞ্জনের মুখভঙ্গী দেখে মনে মনে হেসে বলে ওঠে, 'কি আর করা যাবে, আসুন ঘাসের ওপরই বসা যাক।'

ঘাসের ওপর!

দু'জনে!

যে, সস্তা ভঙ্গীটা দোহাত্তা দেখা যাচ্ছে, তেমনি ভঙ্গীতে? বিদ্রোহ করে ওঠে মন।

'থাক না, নাই বা বসা হ'ল, বেড়ালেই বা ক্ষতি কি?'

'বাঃ শুধু হেঁটে মরবো? বসবো, ঝালমুড়ি খাবো, ফুচকা খাবো, তবে না 'লেকে' বেড়াতে আসার মজা!'

নীলাঞ্জন মুখ বিকৃত করে বলে, 'মজাটা কি নিতান্ত মজা করেই বলছেন, না সত্যিই ওই রকম গতানুগতিক সস্তা মজায় রুচি আপনার?'

'সস্তা মানে? সব সময় কি মানুষ দামী হয়ে বেড়াবে নাকি? সাধে বলি আপনাদের জন্যে আমার দুঃখু হয়! তেঁতুলজলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ফুচকা খাবার মজাটা যে বেচারা না বুঝলো, জীবনের আধখানাই তো তার বরবাদ।'

'মাতালরা ভাবে যে মুর্খ বোতলের মর্ম না বুঝলো তার পুরোপুরিই বরবাদ।'

'ক্ষেত্র বিশেষে সেটাও ভুল নয়। তবে......এই এই ঝালমুড়ি!'

মহোৎসাহে এগিয়ে যায় নীতা তার আঁটসাট ছিপছিপে দেহটা নিয়ে প্রায়

ছুটে। মুড়ি কেনে, চেয়ে চেয়ে নুন লঙ্কা নেয় বেশী বেশী করে। নীলাঞ্জনের কাছে এসে চোখ ভুরু নাচিয়ে বলে 'নিন, ধরুন। ফার্স্ট ক্লাশ!'

নীলাঞ্জন হাত বাড়ায় না, বলে 'আপনিই খান।'

'তার মানে? এ তো আমাকে রীতিমত অপমান!'

'আমি এ রকম জীবনে খাইনি।'

নীতা হেসে উঠে বলে, 'জীবনে কোন মেয়ের সঙ্গে লেকে এসেছেন? জীবনে করেননি বলে জীবনে করবেন না, এটা একটা যুক্তিই নয়। জীবনে তো বিয়ে করেননি, করবেন না কখনো?'

পরিবেশ মুখর করে হেসে ওঠে নীতা।

দু'হাতে দুটো ঝালমুড়ির ঠোঙা নিয়ে।

নীলাঞ্জন সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, এই লজ্জাকর পরিস্থিতিটা কার না জানি চোখে পড়ে। কিন্তু কাকেই বা চেনে সে?

গোলাপীবাড়ীর মেয়ে আর শাদাবাড়ীর ছেলে যে অদূরেই একটা বেঞ্চ দখল করে তাদেরই দিকে চারচক্ষু ফেলে বসে আছে, সে কি বুঝতে পারল ও? পারল না, তবু যতটা সম্ভব নীচু গলায় বলল, 'ওটা তো জীবনের একবারেরই ঘটনা। অপেক্ষা শুধু ঘটনাচক্রের।'

কথাটা বলে গভীর একটি দৃষ্টি ফেলে নীলাঞ্জন নীতার মুখের দিকে।

কিন্তু নীতা যেন অবোধ, নীতা যেন শিশু, সে আক্ষেপের ধ্বনি করে বলে ওঠে। 'হায় হায়, তত্ত্বকথা কইতে কইতে আমার ঝালমুড়িই গেল! নিন, ধরুন বলছি, নইলে দুটো ঠোঙাই ওই লেকের জল তাক্ করে ছুঁড়ে ফেলবো।'

'কী মুস্কিল! দিন।'

'চলুন ঘাসে বসা যাক।'

'চলুন।'

ওদিকে তখন চারখানা চোখের দুখানা গোল হয়ে ওঠে।

'তবে যে বলেছিলে মেয়েটো—ওদের ছোটছেলেটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে!'

'পর্শু পর্যন্ত তো সেই ধারণাই ছিল।' শাদাবাড়ী—হতাশ নিশ্বাস ফেলে।

'তুমি ভুল দেখেছিলে। এটা তো মেজছেলে।'

'হয়তো আগামী পর্শু তোমাকেও ধারণা পাল্টাতে হবে, দেখবে বড়র নাকে দড়ি পরিয়ে তার সঙ্গে বাদাম ভাজা খাচ্ছে।'

'মেয়েটা সাংঘাতিক খারাপ।' বলল গোলাপীবাড়ী।

'কেন খারাপের কি দেখলে?'

'আজ একজনের সঙ্গে ঘুরছে, কাল আর-একজনের সঙ্গে ঘুরছে, এটা খুব ভাল মেয়ের লক্ষণ?'

'অন্ততঃ সরল মেয়ের লক্ষণ।'

'ভাবনা নয়? তোমার চোখ দুটো তো এখন ওদের বাড়ীর ছেলেদের ওয়াচ্ করবার তালেই সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। জগতের আর কি কিছু তাকিয়ে দেখবে?'

'থামো যথেষ্ট—আরে মেয়েটা আমাদের দিকে আসছে কেন?'

শাদাবাড়ী আর কথা বলবার অবকাশ পায় না।

নীতা কাছে এসে একগাল হেসে বলে, 'আসুন না চারজনে এক জায়গায় বসা যাক। এত দূরে থেকে শুধু দেখতেই পাচ্ছেন, কথাগুলো তো শুনতে পাচ্ছেন না।'

...যুগল মিলনের লীলাক্ষেত্র একেবারে!

'সরল!'

'না তো কি! তোমার মতন ভেতর-ওপর নেই।'

'দেখ ভাল হবে না বলছি।'

'ভাল হবার আশা তো ক্রমশঃই কমছে।' শাদাবাড়ী কৃত্রিম নিশ্বাস ফেলে বলে, 'অনুপম কুটিরটা যে আবার এমন ভাবাতে শুরু করবে কে ভেবেছিল।'

'তোমার ভাবনাটা কিসের?' ঝঙ্কার দেয় গোলাপীবাড়ী।

গোলাপীবাড়ী ফের গোলাপী হয়ে বলে, 'তার মানে?'

'মানে কিছু না। ভাব করতে এলাম। বলুন আপনার নাম বলুন।'...এই ঝালমুড়ি, আর দু' আনা দেখি৷'

ওরা যখন ফেরে তখন সন্ধ্যা বেশ খানিকটা গাড়িয়ে গেছে। চারজনের তিনজন পথ সচকিত করে গল্প করতে করতে ফেরে। আর বাকী একজন প্রতিপদে নিজের অক্ষমতায় নিজের ওপর

রেগে ওঠে। কই পারছে না তো ওদের মত অমন সহজ হতে?

অনুপম কুটিরের দরজা পার হয়ে তবে গোলাপীবাড়ী, শাদাবাড়ী। নীতা গোলাপীবাড়ীর মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে, 'আসবেন কিন্তু? যদি না আসেন তো বুঝবো গান ভাল লাগাটা সম্পূর্ণ বাজে কথা।'

'আসবো, ঠিক আসবো। গান শুনতে ভীষণ ভালোবাসি আমি।'

'আমি বাসি না, এমন প্রমাণ কিন্তু পাননি আপনি।' শাদাবাড়ী এগিয়ে এসে বলে।

'বাঃ আপনিও তো আসবেন নিশ্চয়।'

ওরা চলে যেতেই নীলাঞ্জন বলে ওঠে, 'এদিকে তো বললেন আপনার বাবা ভিড় সহ্য করতে পারেন না, অথচ ইচ্ছে করে বাড়ীতে ভিড় আমদানি করছেন।' নীতা বলে, 'ভিড় নয়, সহজ হাওয়া। সহজ হাওয়ারও দরকার আছে মানুষের জীবনে। সুস্থ অসুস্থ সকলেরই।'

আর মনে মনে বলে, 'ভিড় মানেই তো নির্জনতা!'

সুচিন্তা অনেকক্ষণ থেকে চঞ্চল হচ্ছেন।

নীতা কোথায় গেল, নীলাঞ্জন এখনো এল না কেন! সুশোভন খালি খালি অনুযোগ করছিলেন 'সুচিন্তা, তুমি যেন আমার কথায় মন দিচ্ছ না।'

'বাঃ মন দেব না কেন, দিচ্ছি তো!'

বলছেন সুচিন্তা, কিন্তু বারবার বাইরের জানলার দিকে উঠে যাচ্ছেন। দেখছেন রাস্তার দিকে। আশ্চর্য, সুচিন্তা তো এমন চঞ্চল হতেন না কখনো! দৈবাৎ ছেলেদের কারো ফিরতে দেরি হলে বই নিয়ে বসতেন। এলে প্রশ্ন করতেন না, অনুযোগ করতেন না, শুধু বলতেন, 'খাবে তো এখন; না কি একটু বিশ্রাম করবে?'

আজ কিন্তু যেই ওরা এল, দুজনে একসঙ্গেই উঠে এল, সিঁড়ি দিয়ে, অনুযোগে মুখর হয়ে উঠলেন সুচিন্তা। বললেন, 'তোমাদের কান্ডখানা কী নীতা, তোমরা যে কোথাও যাবে, সেটা তো জানিয়ে গেলে পারতে। ভেবে অস্থির হতে হ'ত না।'

সুচিন্তা বদলে গেছেন।

কিন্তু সুচিন্তার ছেলেও বদলে গেল নাকি? কই এই উদ্বেগের মুখে ঠান্ডা গলায় বলল না তো 'অস্থির হবার কি আছে?' যেটা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতো। যেটা অনুপম কুটিরের পক্ষে স্বাভাবিক হতো।

তেমনি করেই তো বলতো বাপ অনুপমকে। না, সে কিছু বলল না, টুক্ করে ঢুকে গেল নিজের ঘরে দরজার পরদাটা সরিয়ে।

উত্তর দিল নীতা।

উচ্ছ্বল কণ্ঠে বলে উঠল, 'জানাবো কি গো পিসিমা, নিজেই কি জানতাম ছাই? সবই আকস্মিক। কিন্তু কী মজা যে হ'ল! 'লেকে' গেলাম, ঝালমুড়ি খেলাম, পাড়ার লোকেদের সঙ্গে ভাব করলাম—'

বদলে গেছেন সুচিন্তা, বড্ড বেশী বদলে গেছেন। নইলে অনেক দিনের ঠান্ডা হয়ে যাওয়া রক্ত তাঁর অমন আগুন হয়ে উঠল কি করে? সমস্ত স্নায়ুশিরা যে ফেটে যেতে চাইল সেই উত্তপ্ত রক্তের চাপে।

কী নির্ভয়, কী বেপরোয়া এ যুগ। কী বেহায়া এ যুগের মেয়েরা!

আর সুচিন্তা?

ভয় আর ভয়!

সারা জীবন শুধু ভয় করে এসেছেন সুচিন্তা, জীবনের প্রারম্ভে ভালোবেসেছিলেন এই অপরাধে। কোনদিন সাহস করে স্বীকৃতি দিতে পারেননি সেই প্রাণ-নিংড়োনো ভালোবাসাকে। বাল্য থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌঁছলেন, তবু সেই ভয়ংকর এক ভয় মুঠো করে চেপে ধরে রইল সমস্ত সত্তাকে। বিদ্রোহ করতে পারলেন না, ভেঙে ফেলতে পারলেন না সেই বজ্রমুষ্টি! বরং পাছে কারো চোখে ধরা পড়ে যায়, তাই ধুলোর স্তর চাপিয়ে চাপিয়ে ঢেকে রেখে এলেন সেই তাঁর আজীবনের ভালোবাসাকে।

ভয় করলেন গুরুজনদের, ভয় করছেন লঘুজনদের।

কিন্তু কেন? কেন? কেন?

সুচিন্তার সমস্ত অণু-পরমাণু যেন প্রচণ্ড বিক্ষোভে চিৎকার করে উঠতে চাইল, 'কেন! কেন! কেন!'

কারুর কোথাও ভয় করবার দায় থাকবে না, দায় থাকবে শুধু সুচিন্তার?

ওই তাঁর ছেলে, যে আজকাল বাঁকা কটাক্ষে ভিন্ন তাঁর দিকে তাকায় না। অম্লান বদনে সে এক অনাত্মীয় যুবতী মেয়ের সঙ্গে সন্ধ্যা পার করে বেড়িয়ে এল, আড্ডা দিয়ে এল, আর এল নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে।

আর সুচিন্তা? সুচিন্তা ভয় করছেন সেই ছেলেকেই তাঁর ভীরু প্রেমটুকু নিয়ে।

কেন, কেন, কেন!

উন্মত্ত রক্ত স্থির হবার আগেই, উত্তর দেবার আগেই নীতা আর-একবার বলে উঠল, 'পিসিমা বুঝি আমার ওপর রেগে আগুন হয়ে উঠেছেন বাবা?'

'পিসিমা? তোর ওপর!'

সুশোভন সহসা ভারী ভারী গলায় হেসে ওঠেন, 'রাগ করবে সুচিন্তা? রাগ কাকে বলে ও জানে? রাগ করছি আমি, কত কি মজা করে এলি তোরা, আবার ঝালমুড়ি খেয়ে এলি, আমাদের তার ভাগ দিলি না! উঃ কী ভালোই বাসতাম পিসিমার সেই ঝাল আচারের তেল মাখানো গরম মুড়ি। মনে আছে তোমার সুচিন্তা? পিসিমা তোমায় ডাকতেন, 'ওরে সুচিন্তা, আজ মুড়ি ভাজছি আসিস।'...আশা-পথ চেয়ে থাকতাম কবে পিসিমা মুড়ি ভাজবেন।...আচ্ছা সুচিন্তা সেটা দিল্লীতে না দিনাজপুরে?'

এবার হতচকিত হবার পালা নীতার।

সমস্ত উত্তাপ সংহত করে নিয়ে খোলা গলায় হেসে উঠলেন সুচিন্তা, 'দিল্লীতে? দিল্লীতে আবার কবে আমরা দুজনে কাছাকাছি থাকলাম শুনি? ...নে বাপু, খেতে বোস তোরা, ঝালমুড়ির গল্প শুনে তো আর পেট ভরবে না? কি বল সুশোভন? ॰ রোসো না আমরাও শোধ নিচ্ছি, কাল ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে ঝাল আচারের তেল মাখিয়ে মুড়ি খাবো দু'জনে ছেলেবেলার মত।'

(ক্রমশঃ)

ফরাসী বিপ্লবে একজন বাঙালী

প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

১৭৯৩ সনের ফরাসী বিপ্লবে মাঝারী স্টেটাসের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত এমন দুজন লোকের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা ফরাসী ছিলেন না। তাঁদের একজনের নাম গ্রীভ, তিনি জাতিতে ইংরেজ। আর-একজনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ১৭৯৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

ঐ তারিখে ফ্রান্সের সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর উপপত্নী কুখ্যাত মাদাম দুবারীর বিচার হচ্ছিল। সেই বিচারের সময় ইংরেজ যুবক বিপ্লবী গ্রীভের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাক্ষ্য দেন। সেই সাক্ষ্যের একাংশে উক্ত ব্যক্তি বলেন:

"আমার নাম লুই বেনেডিক্ট জামর। আমার বয়স ৩১ বৎসর। আমার দেশ বঙ্গদেশ। আমি একজন ভারতীয়।"

দ্বিতীয় অ-ফরাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটির পরিচয় এই। তাঁর নাম লুই বেনেডিক্ট জামর। এবং তিনি ভারতীয়।

জামর নামে এক যুবকের পরিচয় আলেকজান্ডার ডুমার লেখায়ও আছে। সেই যুবক ১৭৯৩ সালের ফরাসী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ডুমা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন "নিগ্রো" বলে। কিন্তু এই জামর ছিলেন বাঙালী।

কিন্তু সেই বাঙালী সন্তান সেকালে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন কী ভাবে?

যতদূর জানা যায়, ১৭৬৫ সালে কোন এক ইংরেজ বণিক তার নিজের জাহাজে করে বঙ্গদেশ থেকে চার বছর বয়সের একটি শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ছয় বছর পরে, ১৭৭১ সালে ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুই দশ বছরের বালকটিকে ক্রয় করে নেন।

আগেই বলেছি, ফরাসী সম্রাটের এক উপপত্নী ছিল; তার নাম মাদাম দুবারী। সম্রাটের স্নেহ-আদর-ভালোবাসা উজাড় করে বর্ষিত হত ঐ মাদাম দুবারীর ওপর। তার সামান্যতম অভিলাষ পূর্ণ করতে পারলেও সম্রাট যেন ধন্য হতেন। সম্রাট তাঁর উপপত্নীকে লুসিয়েন প্রাসাদের ন্যায় সেকালের সর্বোত্তম বিলাস-অট্টালিকা দান করেছিলেন।

এই মাদাম দুবারীকে সর্বদা আমোদে রাখার জন্য সম্রাটের চেষ্টার শেষ ছিল না। খেলা দেখানোর জন্য পঞ্চদশ লুই নিয়মিতভাবে জন্তু-জানোয়ার উপহার দিতেন। ১৭৭১ সালে সম্রাট দুবারীকে যে জন্তু-জানোয়ার উপহার দেন তার সঙ্গে একটি বালকও ছিল। মাদাম দুবারীর মনোরঞ্জনের জন্য অন্যান্য জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে এই বালকটিকেও নানা কৌতুক-ক্রীড়া প্রদর্শন করতে হত। বালকটির বয়স দশ বছর। আর সে কৌতুক-ক্রীড়া প্রদর্শন করত বলে তার নাম হয় জামর। জামর নামটি কৌতুকের নাম।

১৭৯৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর ৩১ বৎসর বয়স্ক লুই বেনেডিক্ট জামর তাঁর সাক্ষ্যে বলছেন: "আমার যখন দশ বছর বয়স তখন থেকে আমি মাদাম দুবারীর ক্রীতদাস।"

কিন্তু বিচিত্র ভাগ্য জামরের। মাদাম দুবারী নিতান্ত একটা খেয়ালে সহসা জামরকে অনুগ্রহ বিতরণ করে ফেলল। সম্রাটের উপপত্নীর এই করুণা লাভ করে জামরের অদ্ভুত একটি লাভ হল। ক্রীতদাস হয়েও বালক জামর লেখা-পড়া করার সযোগ পেয়ে গেল। আর সব থেকে বড়ো কথা, লেখাপড়া তার ভালো লাগল। সৃষ্টি হল একটি সুন্দর সাহিত্য অনুরাগ। এই সাহিত্যের গুণে জামর ধীরে ধীরে আপন জীবনের অপরিসীম অমর্যাদা এবং অবমাননার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে লাগলেন। বয়সের সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধির আশ্চর্য একটি সঙ্গতি রক্ষা করেই ক্রীতদাস জামর যেন অমোঘ গতিতে রুশোর অনুরক্ত হয়ে উঠলেন। শেষটায় এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, রুশোর বই পড়তে পেলে জামর আর কোনো কিছুই চাইতেন না।

এই অবস্থায়ও মাদাম দুবারীর করুণা থেকে বঞ্চিত হননি জামর। আমরা আগে বলেছি, মাদাম দুবারীর একটি অট্টালিকা ছিল যার নাম লুসিয়েন প্রাসাদ। সে সময় ফ্রান্সের খুব অভিজাত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ঐ প্রাসাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হতে পারত না। কিন্তু জামর এই প্রাসাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন মাদাম দুবারীর অনুগ্রহে। প্রাসাদের সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পত্তির তদারকেরও ভার ছিল জামরের ওপর।

এই কাজে নিযুক্ত থাকবার সময় জামরের দৃষ্টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্রীতদাসের মর্যাদাহীন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি রাজতন্ত্রকে ঘৃণা করতে শেখেন। এই শিক্ষাই জামরকে মনুষ্যত্বের মহত্বে উন্নীত করে দিয়েছে। জামরের মনে ঐ ঘৃণাটা চাপা ছিল। তারপর লুসিয়েন প্রাসাদে থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, বহু অভিজাত ব্যক্তি তাঁর প্রতি একটা ঈর্ষার মনোভাব পোষণ করতেন। সেই ঈর্ষা থেকেই তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিতেন, জামর ক্রীতদাস ভিন্ন আর কিছু নয়; আর যার অনুগ্রহে তার এই অধ্যক্ষের সম্মান লাভ সে-ও সম্রাটের উপপত্নী মাত্র।

এই বিদ্রূপ; এই অপমান জামরের মনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। সামন্ততন্ত্রের অন্যায়, ব্যভিচার, নির্মমতা দেখে দেখে তার বিরুদ্ধে তাঁর মনও যে কঠিন হয়ে উঠেছিল, মাদাম দুবারীর অনুগ্রহ তাকে কোমল করতে পারেনি। তাই ক্রীতদাস জামর মানুষ জামর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আর তাঁর সহায় হয়েছিল অভিজাতদের বিদ্রূপ আর অপমান।

১৭৭৪ সালে পঞ্চদশ লুই মারা যান, সম্রাট হলেন ষোড়শ লুই। নূতন সম্রাট প্রাক্তনের উপপত্নীকে লুসিয়েন প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করেন। কিছু-দিন পরে আবার তাকে সেই প্রাসাদে থাকতেও দেওয়া হয়। জামরের অবস্থারও কোনো তারতম্য হল না।

কিন্তু সেটা বাইরের কথা। ভেতরের কথাটা জামরের মনুষ্যত্বের কথা। মানুষ জামর স্রোতে গা ভাসিয়ে জীবন কাটাতে পারেন না। তাঁকে কাজ করতে হয়। মনুষ্যত্বের দাবি মানতে হয়। লুই বেনেডিক্ট জামর বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৭৮৯ সালে ভার্সাই-এর বিপ্লবী পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন জামর। সেই সময়েই এক ইংরেজ যুবক বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন: তাঁর নাম গ্রীভ। গ্রীভ ছিলেন জামরের ঘনিষ্ট বন্ধু।

তারপর ফ্রান্সের বুকের ওপর দিয়ে বিপ্লবের আগুন বয়ে গেল। সেই

আগুনে পুড়ল সামন্ততন্ত্র। এলো বাণী মনুষ্যত্বের—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার।

সেই বিপ্লবের আগুনে জামরেরও ক্রীতদাসত্বের কলঙ্ক পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিপ্লবের মধ্যেই তাঁর উপলব্ধি হল মনুষ্যত্বের, তার মর্যাদাবোধের। বাঙালীর ছেলের সেই মনুষ্যত্ব; সামন্ত-তন্ত্রের অভিশাপের বিরুদ্ধে তাঁর সেই অবদান আমাদের আজকের দিনের বাঙালীর পক্ষে স্মরণীয় তাৎপর্য-ভরা ঘটনা।

ভার্সাই কমিটিই মাদাম দুবারীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। গ্রীভ নিজে তাকে প্যারিসের কারাগারে বন্দী করেন। তার বিচারের সময় অভিযোগও পেশ করেন গ্রীভ।

এই অভিযোগের বিবরণে জানা যায়, সে সময় ইংলণ্ডে বহু ফরাসী অভিজাত ব্যক্তির আড্ডা ছিল। মাদাম দুবারী প্রায়ই বিলেত যেত। তার কাজ ছিল ঐ সব অভিজাত ফরাসীদের নানাভাবে সাহায্য করা। আর সেই সাহায্যের মূল লক্ষ্য ছিল প্রতি-বিপ্লবের সংগঠন। মাদাম দুবারীর এই ষড়যন্ত্রের কথা জামরই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

দুবারীর বিচারে অন্যতম প্রধান সাক্ষী লুই বেনেডিক্ট জামরের এইরূপ পরিচয় দেওয়া হয়ঃ জামর একজন ভারতীয়। মাত্র চার বছর বয়সে তাকে বঙ্গদেশ থেকে চুরি করে আনা হয়। পঞ্চদশ লুই তাকে উপহার হিসাবে দান করেন মাদাম দুবারীকে। সমগ্র জীবনে জামর নিজেকে মানুষ বলে বিবেচনা করতে পারেননি। এমনই ছিল ক্রীত-দাসত্বের বেদনা ও অমর্যাদা। কিন্তু সমস্ত গ্লানি মালিন্য উপেক্ষা করে জামর মানুষ হয়ে ওঠেন, এবং বিপ্লবের দীক্ষা গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত মাদাম দুবারী তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

দুবারীর বিচারের সময় জামর আত্মপরিচয় দেবার পর বলেছেনঃ "আমি ভার্সাই জনরক্ষা কমিটির অধীনে নিযুক্ত আছি। মাদাম দুবারীর ক্রীতদাস হয়ে থাকবার সময় আমি টের পেয়ে-ছিলাম, তিনি অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। আমি তাঁকে এই ষড়যন্ত্র পরিহার করতে বলি। তিনি আমার কথা শোনেননি। তারপর তিনি যখন জানতে পারেন যে, মারাটের ঘনিষ্ঠ সহচর গ্রীভের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, তখন তিনি আমাকে তাড়িয়ে দেন।"

মাদাম দুবারী বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছিল।

কিন্তু ফরাসী বিপ্লব দীর্ঘজীবী হতে পারল না। অভ্যুদয় হল নেপোলিয়নের। প্রতিহিংসার আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য জামর আত্ম-গোপন করেন। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এরপর পতন হল নেপোলিয়ানেরও। সেই ওয়াটার্লুর যুদ্ধ: পরাজিত হয়ে তিনি গেলেন নির্বাসনে।

তারও দীর্ঘকাল পরে ফ্রান্সে সম্রাট অষ্টাদশ লুই-এর রাজত্বকালে আবার জামরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্যারিসের এক অতি দরিদ্র পল্লীতে নোংরা এক বাসস্থানে থেকে তখন শিক্ষকতা করছিলেন লুই বেনেডিক্ট জামর। তখনো তিনি অবিবাহিত।

তাঁর শেষ জীবন কাটে অপরিসীম দারিদ্র্যের পীড়নের মধ্যে। প্রতিদিন আহারও জুটত না। দীনহীন একটি কুটিরে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় জামরের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তাঁর ঘরে অন্য কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু দেয়ালে টাঙানো ছিল দুখানা প্রতিকৃতি— মারাট আর রোবসপীয়ার। আর ছিল খান কয়েক বই —রুশোর লেখা।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

॥ কপি ছাড় ॥

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা, শিক্ষিত বাঙালীর সুপরিচিত। তারই কয়েক ছত্র তুলে দিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধে। প্রুফে ঐ কবিতাংশটি যখন ফিরে এল তখন তার অবস্থা এমন যে দেখে চোখে জল আসে। চেহারাটা কবিতার মতই আছে বটে, কিন্তু পড়তে গিয়ে খেই পাই না। কেবল দাঁড়ি কটি ছাড়া ছেদ-চিহ্ন—কমা, সেমিকোলন একটিও নেই। কোথায় যতি? কোথায় মিল? কয়েকটা অক্ষরও এখানে ওখানে ছাড় পড়েছে। বিপদের উপর বিপদ প্রুফের সঙ্গে কপি ফেরত আসেনি। সঞ্চয়িতাটি এক বন্ধু নিয়ে গেছেন। ভয়ানক রাগ হল। প্রেসকে টেলিফোন করলাম। মালিক কম্পোজিটর বাবুকে ডেকে দিলেন। বললাম, "একি কাণ্ড করেছেন মশায়? পাঠালাম কবিতা কম্পোজ করলেন গদ্য?"

কম্পোজিটর কিছুমাত্র অপ্রতিভ হলেন না। বললেন, "গদ্য নয় সার, গদ্য কবিতা। এ কালে পদ্য কেউ লেখে না সার্। কৃত্তিবাস কাশীদাসের দিন চলে গেছে। রবি ঠাকুর ভুল বুঝতে পেরে শেষ বয়সে শুরু করেছিলেন। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে পুরোনো পদ্য-গুলোকে সব গদ্য কবিতা বানিয়ে ফেলতেন।"

এরপর আর আমার তর্ক করতে সাহস হল না। আমি শুধু কাঁচুমাচু করে বললাম, "কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো তুলে দেবেন?"

কম্পোজিটর হো হো করে হেসে উঠলেন, "তাই মনে হচ্ছে বুঝি? কপি পাঠিয়ে দিচ্ছি মিলিয়ে দেখবেন। সব কথা আছে। একটি অক্ষরও কম কি বেশি হয়নি। তবে হাঁ একটু এদিক ওদিক করে দিয়েছি—দেখবেন তাতে এফেকট্‌টা কিরকম বেড়েছে।"

ভয়ে ভয়ে বললাম, "তবে কমা, সেমিকোলনগুলো থাকলে বোধ হয় ভাল হত।"

কম্পোজিটর যেন একটু তিরস্কারের সুরেই জবাব দিলেন, "কবিতায় আবার কমা সেমিকোলন! একি বিদ্যাসাগরের আখ্যানমঞ্জরী না সেকেণ্ডারী বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক। তা চান তো প্রুফে বসিয়ে দেবেন। সেট করে দেব'খন।"

প্রেস থেকে কপি এখনও ফেরত আসেনি। পাঠক যদি কবিতাংশটি ঠিকমত সাজিয়ে গুছিয়ে দেন তো বড় উপকৃত হই। শব্দগুলো চালাচালি হয়ে গেছে, তাদের স্বস্থানে বসাতে হবে। কমা সেমিকোলন বাদ পড়েছে, সে-গুলোও যথাস্থানে বসানো দরকার।

কবিতাংশের প্রুফ

ভারতের শেষে আমি বসে আজি;
যে শ্যামল দেশে,জয়দেব কবি আর
এক বর্ষাদিনে দেখেছিলা দিগন্তের
তমাল বিপিনে শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে
মেদুর অম্বর। আজি অন্ধকার দিবা
বৃষ্টি ঝরঝর,দুরন্ত পবন অতি;
আক্রমণে তার অরণ্য উদ্যতবাহু।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।
রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া পড়িতেছি
মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন মুক্তগতি
মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন উড়িয়াছে
দেশ দেশান্তরে। অন্ধকার পূর্ববঙ্গ,
করে হাহাকার

[প্রেস থেকে মূল কপি ফেরত এল। আপনার সংশোধন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়েছে কিনা মিলিয়ে দেখুন। সঠিক উত্তর অন্যত্র আছে।

গান্ধারী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

অনুষ্ঠান শেষ হতে দেরী হল না।

শুরু হবার আগে একটু ভয় পেয়েছিলাম। হয়তো কতকগুলো দীর্ঘ আবৃত্তি আর প্রবন্ধ নিরুপায়ে বসে বসে শোনার ভান করতে হবে।

কিন্তু তার কিছুই হল না। আরম্ভে দু'একটি গান। তারপরেই সভানেত্রীর ভাষণ। সবশেষে 'ভানু সিংহের পদাবলী'।

এমন নিখুঁত একটি অনুষ্ঠান, মনে হল, এত তাড়াতাড়ি শেষ না হলেই বুঝি ভাল হত। বিশেষ করে ভানু সিংহের পদাবলী।

যে মেয়েটি গানগুলো গাইল আর যে ভদ্রলোক তার সঙ্গে বেহালা বাজিয়ে গেলেন, তাঁদের অনুষ্ঠান ভোলার নয়। শেষ হয়েছে কখন, তবু মনে হচ্ছে ভায়োলিনের রেশটা এখনও কানে এসে বাজছে।

অনুষ্ঠানের শেষে উদ্যোক্তারা তাঁদের ক্লাবঘরে আমাকে নিয়ে এলেন। সামান্য জলযোগের অনুরোধ।

বললাম, ভারী খুশী হয়েছি আপনাদের অনুষ্ঠানে এসে।

ও'দের একজন অমনি বললেন, আপনার আজকের ভাষণ আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে।

মনে মনে খুশী হলাম। মুখে বললাম, আপনাদের অনুষ্ঠানে ভানু সিংহের পদাবলীর গানগুলো যে মেয়েটি গাইলেন, তাঁর গলা মনে রাখার মত। এমন নিখুঁত গলার কাজ বড়-একটা শোনা যায় না। তাছাড়া ভায়োলিনের কাজ এককথায় অপূর্ব।

ও'দের ভেতর একজন বললেন, আমাদের এই মফঃস্বল শহরে ঐ দুটি ভাইবোন ছাড়া কোন গানের আসরই জমে না।

একটু আলাপ করার ইচ্ছে হচ্ছিল। মুখফুটে কথাটা বলেই ফেললাম।

অমনি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, পরিচয় হবে বইকি। আপনার জন্যেই তো ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে। আজ রাতটা ওদের ওখানেই আপনাকে কাটাতে হবে কিনা।

কথাটা শুনে খুবই তৃপ্তি পেলাম। মুখে বললাম, সে তো বেশ আনন্দের কথা। এক রাত্তির শিল্পীর সঙ্গলাভ হবে।

ও'রা সবাই মিলে আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

শহরের এক-প্রান্তে ছিমছাম একখানা বাড়ী। সামনেই ফাঁকা মাঠ। তার ওপর আকাশ নেমে এসেছে। চাঁদের আলোয় গাছের সবুজ কি সুন্দর মল মল করছে। ঘরের ওপর উঠে গেছে একটা লতা, পাতাগুলো তার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বললাম, সত্যি আপনি শিল্পের জগতে বাস করেন সুরদাসবাবু।

কেমন বিষণ্ণ একটা ছবি ফুটে উঠতে দেখলাম সুরদাসবাবুর চোখে-মুখে।

ম্লান হেসে বললেন, আমি তো চোখে কিছুই দেখি না। তবে কে জানেন, মাধুর চোখ দিয়েই আমি দেখি। ও বসে বসে আমার কাছে ঋতুর পালা-বদলের গল্প করে।

সুরদাসবাবু অন্ধ।

মাধবী চা আর খাবার নিয়ে এল।

বললাম, এখুনি তো তোমাদের ক্লাবে জলযোগ করে এলাম ভাই। চা-টা বরং দাও, খাবারগুলো আর না।

বড় মিষ্টি আর সপ্রতিভ মেয়েটি।

বলল, অতিথিসৎকারে ত্রুটি হলে কলকাতায় গিয়ে মনে মনে দোষ দেবেন, সেটি হবে না।

হেসে বললাম, ত্রুটির কথাটাই তো বড় হয়ে মনে থাকে। আমি তোমাকে

মনে রাখতে চাই। এটা তার একটা উপায়।

ও এক প্লেট কুচো নিমকি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন, এটুকু অন্ততঃ খান। চায়ে তো শুধু চিনি। সেখানে মনে রাখার কিছু নেই। দাদা বলছিল, এই নিমকিগুলোতে নাকি নুন বেশী হয়েছে। এটাও একটা মনে রাখার উপায়।

হেসে ফেললাম।

সুরদাসবাবু বললেন, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার সঙ্গেই ওর এরকম কথাবার্তা।

নিমকি খেতে খেতে বললাম, সাত-পা এক সঙ্গে চললেই নাকি অন্তরঙ্গ হওয়া যায়। আমি তো মাধবীর সঙ্গে আজ সাত-পার অনেক বেশী হেঁটেছি। তবে আর অনাত্মীয়ের কথা তুলছেন কেন!

সুরদাসবাবু অপ্রস্তুত হলেন; আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কথা নয়, আপনি আজ আমাদের অতিথি। ওর ব্যবহারের যদি কোন ত্রুটি ঘটে যায়, তাই আগে থেকে মাপ চেয়ে রাখছি।

বললাম, মান দিয়ে আর দূরে সরিয়ে রাখবেন না। অন্ততঃ কাল সকাল অবধি, আমি যে সভায় সভা-নেত্রী হয়ে এসেছি, সে কথাটুকু ভুলে থাকতে দিন।

সুরদাসবাবু হেসে বললেন, এতে আমাদের লাভ আপনার চেয়ে অনেক বেশী।

মাধবী ঘরের ভেতর কি কাজে ঢুকেছিল। ডেকে বললাম, রান্নাবান্না নিয়ে গিন্নীপনা না করে একটু কাছে এসে বসো দেখি।

ও এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল।

বললাম, বেশ মেয়েতো, খাওয়ালে আর দক্ষিণা দেবে না।

এই যে মশলা এনে দিচ্ছি।

ও যাবার জন্যে পা বাড়াতেই হাত-ধরে বসালাম। এত অল্পে দক্ষিণার কাজ সারলে কি চলে।

বলুন কি দেব?

একটা গান শোনাও।

কোন ভণিতা ও করল না। শুধু বলল, খালি গলায় শুনবেন, না হার-মোনিয়ম নেব?

হেসে বললাম, কেন, তোমার দাদার ভায়োলিনটা বুঝি পছন্দ হল না?

মাধবী উঠে গিয়ে সুরদাসবাবুর ভায়োলিনটা এনে দিল।

গান গাইল মাধবী। তেমনি মিষ্টি গলা। একটা দুটো করে কয়েকখানা গান ওকে দিয়ে গাওয়ালাম। সুরদাস-বাবুকে বললাম, এবার আপনার একক বেহালা শুনব। যদি কষ্ট না হয়।

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে হেসে ভায়োলিনখানা কাঁধে ঠেকালেন। মানুষটিকে দেখলে আত্মমগ্ন বলেই মনে হয়। ছড়িতে একটা টান দিলেন প্রথমে। ওস্তাদ শিল্পীর হাত। আমার মনে হল, কত দূরে আকাশে যেন সুরের পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছেন, আবার ফিরিয়ে আনছেন তাদের। এমনি কতক্ষণ খেলা চলল। মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। শেষ হল এক-সময়। সত্যি যাদু আছে হাতের টানে।

কেমন কষ্ট হল নিজের ওপর। ছেলেবেলা খুব ভাল গানের গলা ছিল আমার। ছেলেবেলা শুধু বলি কেন, কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে যখন পড়ি তখনও সবচেয়ে নামকরা গাইয়ে ছিলাম আমি। আর আজ সেই গান ছেড়ে দিয়ে অধ্যাপনা আর সাহিত্যচর্চা নিয়ে পড়েছি। সত্যি, মানুষের মনের গতি কখন যে কোন দিকে যায়, তা কে বলতে পারে।

ও'র বাজনা বন্ধ হলে বললাম, বড় কষ্ট হচ্ছে, এমন সুর, এমন পরি-বেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মাধবী অমনি বলে উঠল, মাঝে মাঝে আসুন না এখানে।

সুরদাসবাবু বললেন, কাজের মানুষ উনি, কলকাতায় ফিরেই ডুব দেবেন কাজের ভেতর। তখন আসব-আসব করেও আর আসা হয়ে উঠবে না। তারপর একদিন একটু একটু করে এখান-কার সব কথাই ভুলে যাবেন।

বললাম, সুরের টানেই হয়ত এক-দিন এসে পড়ব।

হাসলেন অন্ধ সুরদাস।

সুরের মত হাসিতেও কি যেন একটা ব্যথার স্পর্শ।

সংসারে ভাইবোন আর একটি পুরোনো ঝিকেই দেখলাম। ঘরদোর সাজানোর ভেতর মাধবীর রুচির ছাপ আছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। সুর-দাসবাবু চলে গেলেন পাশের ঘরে। আমরা রইলাম এদিকের একখানাতে। আমাদের ঘরে পাশাপাশি দুটো বিছানা পড়েছিল।

মাধবী ঘরে ঢুকেই বলল, একই ঘরে দুজনের থাকাতে আপনার অসুবিধে হতে পারে, তারচেয়ে আমি পাশের ঘরে যাই।

ওর হাতটা ধরে বললাম, বরং তোমার যদি বিশেষ কোন অসুবিধে না থাকে তাহলে এসো আমরা দুটো বিছানার একটাকে ছুটি দিই।

না, না, সে কেমন করে হয়! ঐ একটুখানি বিছানায় দুজন শুলে সারা-রাত আপনার ঘুমই আসবে না।

আমি যে ঘুমুতে চাই একথা তোমাকে কে বললে?

মাধবী বলল, সারাদিন ট্রেন-জার্ণি করে এলেন। তারপর ভোরবেলাতেই চলে যাচ্ছেন। বিশ্রাম না হলে কত কষ্ট হবে বুঝতে পারছেন না।

কৌতুক করে বললাম, ঘুম পাচ্ছে বুঝি তোমার? তা তুমি ঘুমোও না, আমি একা একাই জেগে থাকতে পারব।

জাগার অভ্যেস আমারও আছে। দাদা এক-একদিন যখন বেহালা নিয়ে বসে তখন কোথা দিয়ে যে ভোর হয়ে যায় বুঝতেই পারি না।

তাই নাকি, রাত জেগে তোমার দাদা বাজনা নিয়ে বসেন!

আপনি দাদাকে চেনেন না। কত রাত যে তার এমনি কেটে যায় তার লেখা-জোখা নেই। মাঝে মাঝে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে বলি, শুয়ে পড় দাদা, আর কত জাগবে। ও অমনি বলে, সুর খুঁজছি মাধু, কিছুতেই হারানো একটা সুর খুঁজে পাচ্ছি না। জানেন দিদি, ও একটা আস্ত পাগল।

মনে হল, একটি যথার্থ শিল্পীকে দেখে গেলাম। সুর শুনলে সত্যি প্রাণ ভরে যায়।

কথার মোড় ঘুরিয়ে বললাম, একটি নতুন মানুষ ঘরে আননা কেন, তাহলে

বন্ধ হয়ে যাবে এ রকম রাত জাগার নেশা।

বলে বলে হয়রান হয়েছি দিদি, মাধবীর গলায় কেমন একটা অনুযোগের সুর বেজে উঠল; পুরোনো স্মৃতির জের টেনে এতদিন কেউ বেঁচে থাকে!

পুরোনো স্মৃতির জের কথাটা শুনেই কৌতূহল আমার বেড়ে গেল। কিন্তু মনের সে ইচ্ছাটুকু দমন করতে হল আমাকে। কি প্রয়োজন। এক রাতের অতিথি বইতো নয়। কাল সকালে চলে যাব কলকাতা। তারপর কে কোথায় থাকবে কে জানে। এতটা কৌতূহল শোভন নয়।

অন্য কথার অবতারণা করলাম, আচ্ছা মাধবী, তোমার দাদা কি জন্মান্ধ?

না, না সে এক দুঃখের স্মৃতি দিদি। তাইতো বলছিলাম, যে কোনদিন তোমার মনের খবর জানতে পারল না, তার স্মৃতির জের টেনে লাভ কি!

আত্মস্থ হয়ে কথাগুলো বলে গেল মাধবী। তারপর ওর মনে হল, আমার কথার ঠিক ঠিক জবাব এখনও দেওয়া হয়নি। তাই বলল, দাদা কেমন করে অন্ধ হল শুনবেন? আপনি তো লেখিকা, আপনার গল্পের একটা প্লট পেয়ে যেতেও পারেন।

ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকিয়ে রইলাম।

মাধবী বলল, ঘটনাটা খুবই ছোট। দাদা ম্যাট্রিকে ফোর্থ হয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে গেল। বাবা মা নেই। আমরা দুটি ভাইবোন বিধবা এক পিসিমার যত্নে মানুষ হয়েছি। তাই ছেলেবেলা থেকে আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। দাদা চলে গেল। আমার মনে সে আঘাত বড় বেশী করে বেজেছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দাদাকে ফিরে আসতে হল। দেখলাম দুটি চোখ চিরদিনের মত খুইয়ে এসেছে।

কথাটা শুনে শিউরে উঠলাম। অতীতের একটা পর্দা যেন চোখের সামনে দুলে উঠল।

বললাম, কি করে এমন হল মাধবী?

কলেজের কোন একটি মেয়ের গান শুনে নাকি মনে মনে ওকে ভালবেসে ফেলেছিল। তারপর একটি গানের অনুষ্ঠানে ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে তার কাছ থেকে পেল আঘাত। ব্যস, ঐ যথেষ্ট। ভারী সেণ্টিমেণ্টাল ও। এ্যাসিড ঢেলে নিজের চোখ দুটোর ওপরেই শোধ তুলে বসল। সে মেয়ে কিন্তু জানল না কিছুই; মনে মনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ও নিজেই।

আমার চোখের ওপর যে পর্দাটা দুলছিল সেটা এখন সরে গেছে। দুশ বছর আগেকার একটা ঘটনা শুরু হয়ে গেল মঞ্চের ওপর।

কলেজের সেরা মেয়ে। লেখাপড়ায় নাম আছে। তারচেয়েও নামডাক গানের গলায়। ইন্টার কলেজ কম্পিটিশনে সে বছর ফার্স্ট হয়ে কাপ পেয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী আর প্রফেসারদের মুখে মুখে তখন ঘুরছে আমার নাম।

একদিন কলেজের মেয়েরা অনুষ্ঠান করল একটি গানের জলসার। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, তাহাদের বান্ধবী গায়িকাকে কিছু প্রীতি-উপহার দেওয়া।

কেবল মেয়েদের অনুষ্ঠান, এ কেমন কথা! ইউনিয়নের ছেলেরা কিন্তু তা মেনে নিতে পারল না। তারা হলের বাইরে জটলা শুরু করল। তাতে মেয়েদের জিদ গেল আরও বেড়ে। কিছুতেই তারা ছেলেদের ঢুকতে দেবে না হলের ভেতর।

......ছি, ছি, মা বোন নেই বাড়ীতে!

অনুষ্ঠান শেষ হলে হলের বাইরে বেরিয়ে দেখি, ছেলেরা চারদিক থেকে হল্লা জুড়ে দিয়েছে। হাতে মেয়েদের দেওয়া উপহারগুলো নিয়ে কোনরকমে

পার করে চললাম। রাগে ফ্‌ুলছিল আমার সর্বাঙ্গ।

কি মোংরামো। সিঁড়ি দিয়ে নামছি, হ্‌ুড়মুড় করে কয়েকটা ছেলে গায়ে এসে পড়ল। হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেল উপহারগ্‌ুলো। তখন রাগে চোখ দ্‌ুটো আমার অন্ধ হয়ে গেছে। সামনে যে ছেলেটি এসে পড়েছিল, তার ওপর রাগে ফেটে পড়লাম, লজ্জা করে না আপনার মেয়েদের গায়ের ওপর এসে পড়তে!

ছেলেটি আমতা আমতা করে বলল, দেখ্‌ুন, ইচ্ছে করে এসে পড়িনি। ওপর থেকে ধস্তাধস্তির ফলে সিঁড়িতে পড়ে গেছি। ক্ষমা করবেন।

রাগে জ্বলে উঠলাম, আপনাদের ক্ষমা করে ক্ষমার অমর্যাদা করব, এমন নির্বোধ ভাবলেন কি করে! ছি, ছি, মা বোন নেই বাড়ীতে!

আরও কি যেন সব বলেছিলাম সেদিন। ছেলেটি তখ্‌ুনি সরে গিয়েছিল।

তার কয়েকদিন পরে কলেজে হৈ-চৈ পড়ে গেল। শ্‌ুনলাম, এ্যাসিড নিয়ে কাজ করবার সময় সায়েন্সের একটি সেরা ছেলে নাকি অন্ধ হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আর-একটি খবর শ্‌ুনে মনটা দমে গেল। আমি যে ছেলেটিকে সেদিন সবার সামনে অপমান করেছিলাম, এ নাকি সেই ছেলে।

পর্দাটা আবার পড়ল। মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার দাদার নাম কি ইন্দ্রনাথ?

ও অবাক হয়ে বলল, আপনি জানলেন কি করে? ওর স্‌ুরদাস নামটাই তো বহ্‌ুকাল ধরে চলে আসছে।

একটা ব্যথার ঢেউ ব্‌ুক ঠেলে উঠে আসতে চাইছিল। কষ্টে তাকে চেপে রেখে বললাম, ঘটনাটা সে সময় আমরাও শ্‌ুনেছিলাম।

মাধবী বলল, দাদার পড়াশোনায় সেইখানেই ছেদ। তারপর গান আর গান। নিজে ডুবল স্‌ুরের ভেতর, আমাকেও ডোবাল। এই দেখ্‌ুন না স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কতদিন বসে আছি, শ্‌ুধ্‌ু গান আর গান, পড়ার নাম-গন্ধ নেই। ভাবছি প্রাইভেটে আই-এটা দিয়ে দেব।

কি মনে এল, বললাম, তা দাও, কিন্তু কলেজে আর যেও না।

কেন দিদি, আপনারা তো কলেজেই পড়েছেন, তাহলে আমার বেলাতেই বারণ কেন?

ম্‌ুখে বললাম, এমন স্‌ুন্দর গলার প্রশংসা রোজ শ্‌ুনতে শ্‌ুনতে গলাটা যদি নষ্ট হয়ে যায়।

মনে মনে বললাম, আমার মত তুমিও যদি আর কোন ছেলেকে আঘাত করে বস। সে যদি স্‌ুরদাসের মত অভি-মানে অন্ধ হয়ে যায়।

কথাটা ভাবতে গিয়ে আবার শিউরে উঠল সমস্ত শরীরটা। কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত দেহে। আমি চোখ বন্ধ করলাম।

মাধবী বলল, অনেক রাত হয়েছে, এখন ঘ্‌ুমোন দিদি।

কোন কথা বললাম না। চুপচাপ বিছানায় শ্‌ুয়ে পড়লাম। মাধবী ঘ্‌ুমিয়ে পড়ল কিছ্‌ুক্ষণের ভেতর। ঘ্‌ুম্‌ুতে পারল্‌ুম না আমি। চোখ বন্ধ করে শ্‌ুধ্‌ু জেগে রইলাম।

আমার জন্যে স্‌ুরদাস অন্ধ হয়ে গেল। নষ্ট করে দিলাম এমন ম্‌ুল্যবান একটি জীবন। স্‌ুরদাস আমাকে ভালবাসত মনে মনে! যার ভালবাসা পেলে যে কোন মেয়ে ধন্য হয়ে যায়, সে ভালবাসত আমার মত মেয়েকে!

কতক্ষণ এমনি জেগেছিলাম। শেষ-রাতে একটা স্‌ুর শ্‌ুনে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। স্‌ুরদাস স্‌ুর তুলেছে তার বেহালায়। বেহাগের কর্‌ুণ স্‌ুরটা কেঁপে কেঁপে ভেসে চলেছে।

বন্ধ দ্‌ুটো চোখ বেয়ে দর দর করে ঝরতে লাগল জলের ধারা।

বসে বসে দ্‌ুটি হাত জোড় করে মনে মনে বললাম, ক্ষমা কর স্‌ুরদাস, ক্ষমা কর। আমি অধ্যাপিকা নই, আমি লেখিকাও নই, আমি সেই সঙ্গিনী যে চিরদিন অন্ধ বন্ধ্‌ুর পাশে পাশে ছায়ার মত থাকতে চায়। স্‌ুরদাস, আমি তোমার সেই গান্ধারী-সঙ্গিনী।

অয়স্কান্ত

॥ ভূগর্ভের রহস্য ॥

গত কয়েক দশকে বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের পরিধি বেড়েছে। বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির কল্যাণে মানুষ এমনই ক্ষমতাবান যে আজ আর তার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আজকের দিনের উদ্ভট কল্পনা কালই হয়ে উঠছে বাস্তব। কয়েক বছর আগেও কেউ-ই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারত না যে, রক্তমাংসের মানুষ একদিন সশরীরে মহাকাশে অভিযান শুরু করবে। কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা যে শুধু এই আশ্চর্য ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেছি তাই নয়, মানসিকতার দিক থেকেও এই ঘটনার সমস্ত তাৎপর্যকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছি। আমাদের এই স্বল্পব্যাপ্ত শিক্ষার দেশেও এই ঘটনার আলোড়ন আমাদের চিন্তা ও ধারণার পৌরাণিক জগতটাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। দ্বাপর যুগের যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে যাত্রা করেছিলেন তখনো তাঁর সঙ্গী ছিল একটি কুকুর: তবে সেই স্বর্গের পথটি থেকে গিয়েছিল আমাদের সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে। কিন্তু কলিযুগের কুকুর লাইকা যে-পথটির হদিশ দিয়েছে তা ঠিকানাহীন নয়: এই পথ ধরেই আমরা একদিন মহাবিশ্বের অঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াব। এটা সংস্কার ও বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, ঘটনার অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি। ফলে আমাদের চিন্তা ও ধারণার জগতে এজন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

তবে একথাও ঠিক যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অনাস্থাবানদের পা রাখার ঠাঁই এখনো থেকে গিয়েছে। অন্য কোথাও নয়, একেবারে এই পায়ের নিচেই। মহাকাশ সম্পর্কে আমরা যতো বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে থাকি না কেন, ভূগর্ভ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো পর্যন্ত অনেকাংশেই অনুমান ও কল্পনা-নির্ভর। তবে খুব সম্ভবত আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই পৃথিবীও আর আমাদের কাছে রহস্য থাকবে না। পৃথিবীর দেশে দেশে ভূ-বিজ্ঞানীরা এজন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

এই আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে পৃথিবীর গড়ন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া যাক।

॥ পৃথিবীর গড়ন ॥

আমাদের এই গোলাকার পৃথিবীর বাইরের দিকের যে খোলসটির ওপরে আমরা চলাফেরা করি তাকে বলা হয় ভূত্বক (Crust of the Earth)। বলা বাহুল্য, পাহাড়-পর্বত-নদী-সমুদ্রের এই ভূত্বকটি সমতল নয়। ভূত্বকের কঠিন অংশকে বলা হয় লিথোস্ফিয়ার বা অশ্মমণ্ডল আর জলীয় অংশকে হাইড্রোস্ফিয়ার বা বারিমণ্ডল।

ভূত্বক বা ক্রাস্ট মোটামুটি ত্রিশ মাইল গভীর এবং প্রধানত গ্রানাইট শিলায় তৈরী। ভূত্বকের ঠিক নিচেই তরল ব্যাসল্ট স্তর; যার গভীরতা প্রায় দু-হাজার মাইল। তরল ব্যাসল্ট স্তরের নিচে রয়েছে তরল লোহার কেন্দ্রীয় অঞ্চল, যার ব্যাসার্ধ দু-হাজার মাইলেরও বেশি।

আমরা জানি, আমাদের এই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে চার হাজার মাইল। এই চার হাজার মাইলের প্রায় সবটাই এখনো তরল অবস্থায়। আমাদের পায়ের নিচের কঠিন আস্তরটি মাত্র ত্রিশ মাইল পুরু। গোটা আপেলের তুলনায় আপেলের খোসাও অনেক বেশি পুরু এর চেয়ে।

ভূত্বকের নিচে যতোই ভেতরের দিকে যাওয়া যায় ততোই উত্তাপ বেড়ে চলে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, ভূত্বকের নিচে প্রতি হাজার ফুটে ষোল ডিগ্রি ফারেনহাইট হিসেবে উত্তাপ বেড়ে চলে। তার মানে, এই হিসেবে মাত্র ৭২০০ ফুট নিচে নামতে পারলে উত্তাপ এতই বেশি জল অনায়াসেই বাষ্প হয়ে যাবে। ভূপৃষ্ঠের গড় উত্তাপ ৬৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি। এই উত্তাপে প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে এবং অধিকাংশ পদার্থ কঠিন অবস্থায় থাকে। কিন্তু ভূত্বকের নিচে উত্তাপ বেড়ে চলার যে-হিসেব এইমাত্র দেওয়া হল, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মাত্র ৭২০০ ফুট গভীরতায় উত্তাপের মাত্রা জীবজগতের পক্ষে অসহনীয়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, ভূপৃষ্ঠের মাইল তিরিশেক নিচে উত্তাপ হবে ২২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ১২০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। এই প্রচণ্ড উত্তাপে পাথর পর্যন্ত গলতে শুরু করে।

উত্তাপের মাত্রার এই হিসেবটি যে ভুল নয় তার একটি প্রমাণও আছে। আগ্নেয় গিরির গহ্বর থেকে যে তরল লাভাস্রোত বেরিয়ে আসে তার উত্তাপও এই একই মাপের।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের পায়ের তলার যে মাটিকে এত বড় একটা আশ্রয় বলে আমরা মনে করি, সেটি ত্রিশ মাইল পুরু গ্রানাইট শিলার একটি আস্তর মাত্র আর সেটি ভেসে আছে প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত তরল বস্তুপিণ্ডের ওপরে।

অবশ্য 'তরল' শব্দটি এখানে যতো তরলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আসলে তা নয়। ভূত্বকের নিচের এই উত্তপ্ত তরল বস্তুপিণ্ডের ব্যবহারে কিন্তু কিছুমাত্র তরলতা নেই। বরং আছে নমনীয় কাঠিন্য। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। রাস্তায় যে পীচ ঢালা হয় তা এমনিতে ইটের মতো শক্ত— হাতুড়ির ঘায়ে তা ইটের মতোই টুকরো টুকরো হয়। কিন্তু এক ড্রাম পীচ উপুড় করে রেখে দিলে দেখা যাবে, তরল বস্তুর মতো পীচ ড্রামের ভেতর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। অবশ্য ব্যাপারটা ঘটতে অনেকক্ষণ সময় লাগে।

ভূত্বকের নিচের উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ডের যে তরলতার কথা এতক্ষণ ধরে বলা হল তাও কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে নমনীয় কঠিন।

॥ ভূ-অভ্যন্তরের হদিশ ॥

মহাকাশ-অভিযানে যতোই সাফল্য আসুক না কেন, একথাও ঠিক যে, আরও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই পৃথিবীটাই হয়ে থাকবে আমাদের একমাত্র বাসস্থান। কাজেই এই পৃথিবীর হাঁড়ির খবরও আমাদের যথাসম্ভব জেনে রাখা দরকার।

অথচ ভাবতে বসলে দেখা যাবে, এই পৃথিবীটা পুরাপুরি আমাদের নাগালের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর খবর আমরা খুবই কম জানি। মানুষের তৈরী রকেট আড়াই লক্ষ মাইল দূরত্ব পেরিয়ে চাঁদের দেশে গিয়ে পৌঁচেছে, আরও কয়েক লক্ষ মাইল দূরত্ব পেরিয়ে নতুন গ্রহ হয়ে সূর্যের চারিদিকে পাক খাচ্ছে, একজন রক্তমাংসের মানুষ পৃথিবীর আকাশে পুরো সতেরোটা পাক খেয়ে আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এল, কিন্তু আমাদের পায়ের তলার পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগটি এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রায় অনাবিষ্কৃত। এই সামান্য ভূত্বকের দশ মাইলের বেশি গভীরে এখনো পর্যন্ত মানুষের যন্ত্র পৌঁছতে পারেনি। আর ভূ-অভ্যন্তরের গভীরতায় সশরীরে যাত্রা এখনো পর্যন্ত দু-মাইলের বেশি নয়, কারণ এই হচ্ছে আধুনিক আমলের সবচেয়ে গভীর খনিগুলির গভীরতা।

অবশ্য একথা ঠিক যে মহাকাশ-অভিযানের ফলে বিশ্বের গড়ন সম্পর্কে

আমাদের ধারণা যতো স্পষ্ট হবে ততোই ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারব। অন্যদিকে ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা যতো স্পষ্ট করতে পারব ততোই মহাকাশ-অভিযানের সাফল্য হবে অনায়াস। অর্থাৎ একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আর মহাকাশ-অভিযানের মতো পৃথিবীর অভ্যন্তরের হদিশ নেবার ব্যাপারটাও খুবই দুরূহ ও জটিল। এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে আমরা যতোটুকু খবর সংগ্রহ করেছি তা সবই কার্যকারণ-সম্পর্কের যুক্তির ভিত্তিতে। যেমন, কোথাও যদি ভূ-কম্পন হয় তাহলে ভূপৃষ্ঠে তার কতকগুলো লক্ষণ ধরা পড়ে। তখন আমরা ভাবতে বসি, এই-এই বিশেষ লক্ষণ ধরা পড়লে পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগটি কেমন হওয়া উচিত। এই ধরনের কার্যকারণ-সম্পর্কের যুক্তির ভিত্তিতেই পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ সম্পর্কে আমাদের যা-কিছু ধারণা। হয়তো এই সমস্ত ধারণাই ঠিক। আবার হয়তো এই সমস্ত ধারণাই ভুল। হাতে-কলমে পরখ না হওয়া পর্যন্ত সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও, মানুষকে শেষ পর্যন্ত নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই পৃথিবীর গভীরতর অভ্যন্তরের দিকে হাত বাড়াতে হবে। কারণ বেঁচে থাকার জন্যেই মানুষের আরো অনেক বেশি খনিজ উপকরণ দরকার, দরকার আরো অনেক বেশি তেজের উৎস। এদিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগটি আমাদের কাছে এক অফুরন্ত ভান্ডার হিসেবে দেখা দিতে পারে। এবং এই কারণেই ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ওপরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ভূ-বিজ্ঞানীরা খুবই জোর দিচ্ছেন। এর ফলে (১) ভূ-অভ্যন্তরের ক্রিয়াকলাপ ও গড়ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে, (২) খনিজ আকর তৈরি হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানতে পারব, (৩) নতুন নতুন খনিজ আকর ও তেজের উৎস আবিষ্কৃত হবে, (৪) পৃথিবীর চৌম্বকত্বের রহস্যকে জানা যাবে (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, লুনিকের মারফত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, চাঁদের চৌম্বকত্ব নেই), (৫) খনিজ আকর তৈরি হবার আগেই বিশুদ্ধ ধাতুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব কিনা, সে-সম্পর্কে গবেষণা শুরু করা যাবে, (৬) কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় খনি তৈরি করা সম্ভব হবে, (৭) নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হবে, (৮) ভূ-অভ্যন্তরের পারমাণবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হবে, এবং (৯) পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য একটি তত্ত্ব খাড়া করা যাবে। এই ফিরিস্তিকে আরো অনেক বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত, কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ফিরিস্তিভুক্ত ন'টি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রত্যেকটিই এত গুরুত্বপূর্ণ যে, যে-কোনো একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তুলে বিপুল আয়োজনে পরীক্ষাকার্য শুরু করাটা অযৌক্তিক বিবেচিত হবে না।

এবং পরীক্ষাকার্য শুরু করতে বাস্তব অসুবিধাও কিছু নেই। বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজি এখন এতই উন্নত যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের হদিশ নিতে পারার মতো যান্ত্রিক আয়োজন এই মুহূর্তেই সম্ভব হতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

(১) ড্রিলের সাহায্যে গর্ত করে যাওয়া। এই গর্ত ডাঙ্গার জমি থেকে করা যেতে পারে, বা সমুদ্রের তলদেশ থেকেও। মার্কিন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ড্রিলের সাহায্যে দুটি গর্ত করেছেন। বর্তমানে সোভিয়েত ও মার্কিন উভয় দেশেই এ-ব্যাপারে ব্যাপক তোড়জোড় চলেছে।

(২) সীমাবদ্ধ মাপের মধ্যে লম্বভাবে বা তেরচাভাবে গভীরতর খনি খুঁড়ে যাওয়া।

(৩) ভূগর্ভ রকেট বা এ-ধরনের কোনো নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

ড্রিলের সাহায্যে গর্ত করাটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। ভূগর্ভ থেকে তরল ও গ্যাসীয় খনিজ পদার্থকে উদ্ধার করতে হলে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এখনো পর্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাঁচ মাইল গভীরতা পর্যন্ত ড্রিল করা সম্ভব হয়েছে। আরও গভীরে যেতে হলে পাথর গুঁড়ো করার নতুন কোনো পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। এই পদ্ধতি অবশ্যই হবে পুরোপুরি যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নতুন ধরনের ড্রিলিং পদ্ধতির একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছেন এবং শীঘ্রই সে-দেশে কয়েকটি অতি-গভীর ড্রিল-গর্ত তৈরি করার কাজ শুরু হবে। আশা করা চলে, এই প্রচেষ্টা যেমন একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সুগম করবে, তেমনি অন্যদিকে ভূ-অভ্যন্তরের নতুন সম্পদ-ভান্ডারকেও মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবে।

॥ ভূ-গর্ভের গবেষণাগার ॥

সীমাবদ্ধ মাপের গভীরতর খনি খোঁড়ার কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বারো থেকে ষোল মাইল পর্যন্ত গভীরে যাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এই গভীরতায় যেতে হলে শারীরিক নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা দরকার। হালে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে-সমস্ত যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে এবং উত্তাপ-নিরোধক যে-সমস্ত পোশাক ব্যবহৃত হচ্ছে তার সাহায্যেই এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কাজেই এ-অবস্থায় সুলভে একটি গবেষণাগার গড়ে তোলাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। এমনি একটি গবেষণাগার স্থাপনের সুবিধে এই যে, এখান থেকে সরাসরি ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হতে পারে, এখানকার প্রচন্ড উত্তাপকে সরাসরি কাজে লাগানো যেতে পারে এবং নতুন নতুন খনিজ পদার্থকে সরাসরি শোধন-প্রক্রিয়া মারফত উদ্ধার করা যেতে পারে।

॥ ভূ-গর্ভের রোবোট ॥

মহাকাশে যেমন রকেটের যাতায়াত শুরু হয়েছে, তেমনি ভূ-গর্ভের বিপুল বিস্তৃতিতেও অদূর ভবিষ্যতে শুরু হবে রোবোটের আনাগোনা। এই রোবোটকেও অবশ্যই পৃথিবীর অভ্যন্তরে পথ করতে হবে কঠিন গ্রানাইট পাথরের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এই পাথরকে সে গুঁড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে না, তার চেয়ে আরো অনেক অনায়াসে গলিয়ে ফেলবে বা ধোঁয়া করে উড়িয়ে দেবে। মানুষের হুকুমমতো আনাগোনা করবে। এই রোবোট নির্দিষ্ট গভীরতা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আনবে। নির্দিষ্ট গভীরতায় নেমে গিয়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে আসবে। আর ভবিষ্যতে এমন দিনও আসতে পারে যখন এই রোবোটের কল্যাণে 'গভীরতা' বা 'নামা' বা এ-ধরণের অন্য সব কথা এমন নির্বিচারে ব্যবহার করা চলবে না। কারণ, ভবিষ্যতের সেই দিনটিতে রোবোট-চালিত জাহাজ খুব সম্ভবত ভূপৃষ্ঠের একদিক থেকে রওনা হয়ে ভূ-অভ্যন্তরের মধ্যে দিয়ে সরাসরি ভূপৃষ্ঠের অন্যদিকে গিয়ে পৌঁছবে। রোবোট-জাহাজের সেই আশ্চর্য যাত্রায় গভীরতাও যেমন থাকে, তেমনি উচ্চতাও; যেমন নামা, তেমনি ওঠা। গোটা পৃথিবীর অধীশ্বর সেদিনকার সর্বজয়ী মানুষের মুখেও নিশ্চয়ই নতুন ভাষা সৃষ্টি হবে।

প্রতিবেশী সাহিত্য

পাথর

রচনা : গোরধন মহবুবরাণী

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

।। সিন্ধী গল্প ।।

॥ ভূমিকা ॥

[আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা-গুলির মধ্যে সিন্ধী সবচেয়ে পুরনো ধরনের। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১৯২১ সাল পর্যন্ত বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয় আধুনিক সিন্ধী ভাষা ও সাহিত্যের স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। বিশিষ্ট সিন্ধী শিক্ষাবিদ ও সমালোচক ডাঃ এইচ, এম, গুরবক্সানীর রচিত The hitherto published literature in the Sindhi language প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় সিন্ধী ভাষাকে তাদের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করেন। তবে ভারত সরকার আজো সিন্ধীকে আধুনিক ভারতীয় অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকার করেননি।

সিন্ধী সাহিত্যের নবযুগ শুরু হয়েছে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে। এই নবযুগের অগ্রদূত দয়ারাম গিডুমল, মূলচাঁদ কোড়ুমল, পরমানন্দ মেওয়ারাম, মূলচাঁদ দয়ারাম প্রমুখ।

সিন্ধী ভাষায় প্রথম উপন্যাস লেখেন কালিচ বেগমীর্জা ও কৌরোমল চন্দন-মল। প্রথম বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন প্রীতম দাস। লেখিকাদের মধ্যে শ্রীমতী গুলি সদারংগনী 'ইত্তোহাদ' উপন্যাস রচনা করে একাধারে সাধুবাদ ও নিন্দাবাদের সম্মুখীন হয়ে সুনামই অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র সার্থক অনুবাদিকা হিসেবেও তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর ও প্রতিশ্রুতিবান হচ্ছেন গোবিন্দ মালহী।

উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক ও কবিতায় —সবক্ষেত্রেই আধুনিক সিন্ধী লেখক-দের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেউ সমাজ-সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান না। কাহিনীর আংগিকগত চমকসৃষ্টির চেয়ে তার যথাযথ রূপায়ণের দিকে লেখকদের ঝোঁক বেশী। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। আনসারীর গল্পের আবেদন মনে নয়, মস্তিষ্কে। ঘটনা তাঁর কাছে বড় নয়। পাঠককে ভাবিয়ে তোলাই যেন মূল লক্ষ্য। সিন্ধী ছোটগল্পের ক্ষেত্রে লাল-চাঁদ, নির্মলদাস ফতেচাঁদ, জেটমল, মীর্জা নাদীর বেগ, গোরধন, মহবুবরানী, আকাসানন্দ মমতোরা, অমরলাল হিংগোরানী প্রমুখ খ্যাত। এছাড়া সুন্দরী উত্তমচাঁদ, কিরাতবাবানী, প্রতি-প্রকাশ, আনন্দগোলানী, দায় তালিব প্রমুখ প্রতিশ্রুতিসম্পঃ। সিন্ধী সাহিত্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সিন্ধী-সাহিত্য-সোসাইটি'র অবদান সর্বাধিক। বহু লেখক এর সদস্য তালিকাভুক্ত।

-অনুবাদক]

শম্মুকাকার ক্ষেতের পাশের নিম গাছের নিচে একটা পাথর পড়ে ছিল। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আমি ঐ পাথরের ওপরে বসে ধানক্ষেতের সুরভি-সৌরভ উপভোগ করতাম আর যেন বাতাসের কথা শুনতাম। সারাদিনের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে যেত। শহর থেকে দূরে, গ্রামের শেষ প্রান্তে, ঐ পাথরের ওপরে বসার আর একটি আকর্ষণ ছিল কমু।

কমু শম্মুকাকার একমাত্র মেয়ে। শৈশব থেকে তাকে আমি জানি। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। স্বভাব, চাল-চলন সহজ সরল। মেয়েটি দশ বার বছরের হলেও কথাগুলো খুব পাকা-পাকা। ওর কথা শুনে প্রায়ই ভাবতাম কমুর মন কত পরিণত। গ্রামের পাঠ-শালায় পড়ত সে, আর আমি শহরের এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সারাদিন ছাত্র ঠেঙিয়ে সন্ধ্যায় সেখানে না বসলে, কমুর সংগে দু'চার কথা না বললে ক্লান্তি যেন দূর হত না।

একদিন সেখানে গিয়ে দেখি পাথরটা নেই! তাই তো, এত বড় একটা পাথর গেল কোথায়! কে নিয়ে গেছে! কি করে পেরেছে! কেন নিয়ে গেছে? আমি ঠায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঠিক করলাম কমু আসলে এসব কথা জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাত্রি এল, কমু এলো না। মনটা বিগড়ে গেল। ওর বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। দু'পা এগোতেই দেখি শম্মুকাকা ক্ষেতে কোদাল চালাচ্ছেন। হেসে বললাম, কাকা, একি করছো! রাত হয়ে গেল তবু কাজ করছো।

—মাস্টারমশাই, এখন আমি ডবল কাজ করবো। খুব খুশী মনে বললেন।

—কেন?

শম্মুকাকা আমার কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, আজ কমুর পাকা-দেখা হয়ে গেছে। কাকার চোখে মুখে খুশী খুশী ভাব।

—মংগলকে তো মাস্টারমশাই আপনি চেনেন। বেশ সুন্দর শান্ত-নম্র ছেলে। খাটতেও পারে। আর ছেলেটা সৎও। নিজের জানাশুনার মধ্যে এর চেয়ে ভাল ছেলেও যে দেখি না। তাই ঠিক করেছি মেয়েকে ওর হাতেই তুলে দেবো।

আমি একটু হেসে চুপ করে গেলাম। মঙ্গল আমার ছাত্র। নবম শ্রেণীতে পড়ে। প্রত্যেক বছর প্রথম হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় বললাম, কাকা, চলি।

—তা কি হয়! আজ আমার কতবড় একটা শুভদিন... চলুন বাড়িতে চলুন। মিষ্টি-মুখ না করলে আপনাকে ছাড়বো না।

আমি না করতে পারলাম না। সুন্দর গুছানো একটি ছোট্ট ঘর। আঙিনায় একটি খাটিয়ায় বসে কিছুক্ষণ পরে বললাম, কাকা আজ কমুকে দেখছি না যে।

কমুর মা দরজার আড়াল থেকে বলল, কমু পুজো করতে গেছে—এক্ষুণি এসে যাবে।

আমি হেসে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কাকার দিকে তাকালাম। উনিও হেসে বললেন, আজ কি জানি মেয়েটার ঝোঁক চেপেছে। বলল, ঠাকুরের পুজো দেবো। ও—আপনি তো আবার ঠাকুর-দেবতা মানেন না, নাস্তিক।

—ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন—এই ঠাকুর-দেবতার প্রতি আমার ঠিক......

সেই মুহূর্তে কমু এসে তার ছোট্ট

ফ্লের মত হাতদুটো জোড় করে বলল, নমস্তে, দাদা।

কমু আর আমার মধ্যে প্রত্যেকদিন কোন না কোন বিষয় নিয়ে তর্ক বাধত। তর্কে হেরে গিয়ে সে বলত, আপনি ঠিক আমার কথা বুঝতে পারছেন না—আপনার মাথাটা ছাত্ররা একেবারে খারাপ করে দিয়েছে। তারপর মুখ গোমড়া করে নিত, রা করত না। আর আমি কিছু বলতে গেলে কেঁদে ফেলত।

কিন্তু সেদিন কমুকে কেমন যেন গম্ভীর দেখলাম। চুলে ফুল-গোঁজা। সেই প্রথম আমি তাকে শাড়ী পরতে দেখেছি। হাতে তার ঝকমকে থালা। বললাম, কী ব্যাপার, দিদি? আজ এসব কী দেখছি! খুব যেন ব্যস্ত, আমার সঙ্গে কথা বলারও সময় নেই মনে হচ্ছে।

কমু আমার কাছে এসে থালা থেকে কয়েক টুকরো ফল আমার হাতে রাখল। আমি তাকে চটানোর জন্য ন্যাকার মত বললাম, এসব কি, দিদি?

—ঠাকুরের প্রসাদ।

—আমি যে খাই না।

—কেন?

—আমি তোমার ঠাকুরকে চিনি না। তুমি তো জানো অচেনা লোকের কিছুই আমি খাই না।

—এই প্রসাদটা খান, আপনিও ঠাকুরের দর্শন পাবেন।

—ওটি হচ্ছে না, আগে আলাপ-পরিচয় হবে তারপরে প্রসাদ।

—বেশ চলুন, আপনাকে দর্শন করিয়ে দিচ্ছি।

হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বললাম, ঠাকুর কবে থেকে তোমাকে দর্শন দিচ্ছে বল দিকি?

—সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না, যান।

ওদের বাড়ির সামানা একটু দূরে একটা অশথ গাছ। তার নিচে ঐ পাথর। পাথরের দিকে তর্জনী দেখিয়ে কমু বলল, এই যে ঠাকুর, প্রণাম করুন।

আমি হেসে ফেললাম। যে পাথরের ওপর এতদিন আমি বসে আসছি, তার গায়ে চন্দন, ফুল আরও কত কী! কমুকে চটানোর জন্য আমি বললাম, এর ওপরে যে আমি কালকেও বসেছি।

আমার কথা কানে না তুলে সে শাসনের স্বরে বলল, ওসব জানি না, আপনি প্রণাম করবেন কিনা......

—কাকে প্রণাম করবো—এই পাথর-টাকে...... পাগলী কোথাকার!

কমু কপালে হাত ঠুকে বলল না, আপনাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। কে যে আপনাকে মাস্টারীর চাকরি দিয়েছে জানি না। আপনার মনে ইট-পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

সেদিন আমারও জিদ চাপল। বললাম, তোমার এই ঠাকুরের মনেও তো পাথর ছাড়া আর কিছু নেই দিদি।

কমুর চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, অমন কথা বলবেন না দাদা। ঠাকুরের পাথুরে মন হতে পারে না। উনি সব সময় দয়ালু।

তার প্রত্যেকটি কথায় ভগবানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছিল। আমিও মনে মনে ঠিক করলাম এতখানি অন্ধবিশ্বাস ভাল নয়, একটু টলানো দরকার। একেবারে দূর করতে না পারি মনের ভিতরে অন্তত ঠাকুরের প্রতি একটা খটকা রেখে দেবো।

কমু হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, আচ্ছা দাদা, আপনি বিয়ে করেন না কেন?

আমি হাই তুলে পুরনো একটা অজুহাত শুনিয়ে দিলাম, কাকে আর বিয়ে করবো, মনের মত একটা মেয়ে পাচ্ছি কোথায়, দিদি।

—তা কেন হবে, প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যা ঠাকুরকে পুজো করবেন, নিশ্চয়ই মনের মত মেয়ে পাবেন।

আমি একটু হেসে বললাম, তাই বলো, সেই জন্যেই বুঝি এতদিনে তুমি একটা মনের মানুষ পেয়েছো... এবার সানাইয়ের আওয়াজ শোনার জন্য কান পেতে থাকবো।

কমুর মুখ লজ্জার আরক্তিমতায় ভরে গেল। আমি আর একটু মজা করার জন্য বললাম, এবার থেকে অবশ্য আমার একটু কাজ বাড়ল।

—কী?

কমুর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, এই প্রত্যেকদিন স্কুলে মঙ্গলের পিঠে বেত চালানো!

চোখ ছানাবড়া করে কমু বলল, কেন, সে তো ভাল ছেলে শুনেছি। বলুন না দাদা, সেকি ভাল ছেলে নয়?

—হুঁ। তা এই প্রশ্ন তোমার ঐ ঠাকুরকে করলেই পারো। উনি তো সব-কিছুই জানেন।

পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল আমি ঠাট্টা করছি। ওর মন পরীক্ষা করছি। ফলে সে আরো লজ্জা পেল। ছুটে পালিয়ে গেল ঘরে।

কিছুদিন পরে রাত এগারোটার সময় দরজায় খট্‌খট্‌ আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেখি শম্ভুকাকা! মঙ্গল নাকি মোটরচাপা পড়ে আহত হয়েছে। ওকে সাহেবদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। শম্ভুকাকা আমাকে অনুরোধ করলেন, যাতে আমি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার-নার্সদের মঙ্গলকে বাঁচিয়ে তুলতে বলি। সেই হাসপাতালের নার্স মিসেস্‌ ডেভিডের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। তাকে কাকীমা বলে ডাকতাম আর তার স্বামীকে ডাকতাম কাকাবাবু বলে। পরদিন ভোরেই হাসপাতালে গিয়ে তাদের কাছে শুনলাম, রক্ত অনেক ঝরেছে। তাই এখনো ঠিক বলা যায় না কি হবে। ডাঃ উইলিয়ম মঙ্গলকে অপা-রেশন থিয়েটারে নিয়ে গেছেন।

সেদিন আমাকে মঙ্গলের কাছে যেতে দেয়নি। পরদিন সকালে হাসপাতালে গিয়ে দেখি শম্ভুকাকা সেখানে রয়েছেন। সারারাত উনি নাকি সেখানে ছিলেন। ফুটপাতে তাঁর সারারাত কেটেছে। মিসেস্‌ ডেভিড্‌ বললেন, তোমার মঙ্গলের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

—কোন উপায়েই কি তাকে বাঁচানো যায় না?

—চেষ্টার তো ত্রুটি নেই। শুধু ওষুধেই তো হয় না—ভাগ্য চাই। ঠাকুর-দেবতার আশীর্বাদ চাই।

ছুটে গিয়ে ডাঃ উইলিয়মকে জিজ্ঞেস করে একই কথা শুনলাম। সারাদিন কেমন একটা অস্থিরতা। কিছুতেই চোখের সামনে থেকে কমুর চেহারাকে মুছে ফেলতে পারছি না।

পরদিন শম্ভুকাকার সঙ্গে তাদের ঘরে ফিরে দেখি কমু নেই। অশথ গাছের কাছে রয়েছে। ঠাকুরের কাছে বারবার

মাথা কুটে মঙ্গলকে বাঁচানোর আর্তি জানাচ্ছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল।

—কাঁদছো, কেন দিদি, মঙ্গল সেরে উঠবে। ডাক্তারই তো আর সব নয়, সবার ওপরে রয়েছেন তোমার ঐ ঠাকুর। তুমি কি ঠাকুরের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছো, দিদি!

আমার বাক্যজাল বিস্তার সার্থক হলো। কমু চোখ মুছে নিয়ে বলল, আমার ঠাকুরও তো তাই বলছে, দাদা, ঠাকুর ওকে সারিয়ে তুলবে।

—তাহলে আর ভয় কিসের। যাও কাজকর্ম দেখো। কান্নাকাটি করে লাভ নেই।

কমু আমার হাতে দুটো ফলের টুকরো দিয়ে বলল, ওকে এই প্রসাদ খাইয়ে দেবেন। আমি ভাবলাম, অজ্ঞান হয়ে মঙ্গল পড়ে রয়েছে, খাবে কি করে এই ফল। ওর এই অন্ধবিশ্বাসের প্রতি আমার রাগ ধরল। কিন্তু প্রসাদটা ফিরিয়ে দিতেও পারলাম না।

বাড়ি ফেরার পথে যন্ত্রচালিতের মত হাঁটছি। হাতে সেই প্রসাদ। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওটা ফেলে দি, কিন্তু পর-মুহূর্তেই চোখে ভাসছে কমুর মুখ—তার কপাল থেকে যেন সিঁদুর মুছে গেছে...... মঙ্গল নড়ছে না। হাত থেমে গেছে...... ফলের টুকরো রুমালে বেঁধে হাসপাতালে গিয়ে মঙ্গলের বালিশের নিচে রেখে দিলাম।

সারারাত চোখে ঘুম নেই। ঐ পাথর, কমু, প্রসাদ এবং মঙ্গল বিচিত্র চেহারায় আমার চোখের সামনে ভাসছে। শেষ রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ঘুম ভাঙল বেলা এগারোটায়। হুড়মুড় করে উঠে সোজা ছুটলাম হাসপাতালের দিকে। বাইরে কাউকে দেখলাম না। শম্ভুকাকা নেই, মঙ্গলের বাবাও নেই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে মিসেস্ ডেভিডের ঘরে ঢুকলাম। সেও নেই। ডাঃ উইলিয়ামের ঘরও ফাঁকা। মঙ্গলের কেবিনে ঢুকতে গিয়ে দেখি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। আমার পা নড়ছে না—মাটি যেন সরে যাচ্ছে। আমি যেন অনেক নিচে তলিয়ে যাচ্ছি। আমার হৃৎস্পন্দন যেন যে-কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে পা টেনে টেনে এক্স-রে রুমের কাছে দাঁড়ালাম। হঠাৎ একটি নার্সকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি অবস্থা একটু বলুন না?

—কেবিন নং ষোলর কথা জিজ্ঞেস করছেন? আজ ভোর চারটের সময় তার জ্ঞান ফিরেছে।

আমি রা করতে পারলাম না। সেই আমাকে বলল, ডাঃ উইলিয়ম এবং মিসেস ডেভিড মঙ্গলের কেবিনেই রয়েছে। সেদিন আমার স্কুলে যাওয়ার কথা মনেই ছিল না। ষোল নম্বর কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম পাথরের মত। প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় কাটছিল আমার। বারটা নাগাদ দরজা খুলল। ডাক্তার আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, আর কোন ভয় নেই। আমি তাড়াতাড়ি মঙ্গলের কাছে গিয়ে দেখলাম, সে ভালই আছে। ঘুমোচ্ছে। বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে খুঁজলাম ঐ প্রসাদটা রয়েছে কিনা। নেই! গেলো কোথায়! আমি যে কাল রেখে গেছি, জ্ঞান হলে খাওয়াবো বলে। প্রসাদটা গেল কোথায়—প্রসাদটা কী হোল। তবে কি ডাক্তারই প্রসাদ খাইয়ে দিয়েছে। তার ফলেই কি মঙ্গল সেরে উঠেছে!

কিছুদিনের মধ্যেই মঙ্গল সেরে উঠল।...... পরীক্ষার পর তার বিয়ে হোল। শম্ভুকাকার বাড়ীতে সানাই বাজল। অন্য দিন ঐ অশথ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাথরের দিকে তাকাচ্ছিলাম। নিরাশ ডাক্তার...... অচৈতন্য মঙ্গল...... প্রসাদ...... কমু...... মঙ্গলের বিয়ে সব কটা দৃশ্য আমার চোখে ফিল্মের মত ঘুরছে। সেখানে আর বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না। ঐ পাথরের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, ভগবান পাথরের, না পাথর ভগবানের।

দুমাস কেটে গেল। হঠাৎ পথে চার্চের কাছে মিসেস্ ডেভিডের সঙ্গে দেখা।

—কী ব্যাপার! অনেকদিন যে তোমায় দেখিনি। চললে কোথায়?

আমি একটু হেসে বললাম, এই চার্চে যাচ্ছি।

—জানোনা বোধ হয় চার্চে নাস্তিকদের প্রবেশ নিষেধ।

—এখন তো আর আমি নাস্তিক নই, ভগবান বিশ্বাস করি। মাঝে মাঝে মন্দিরে যাই।
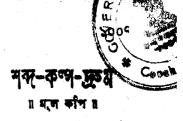
—তাই নাকি?

—হুঁ।

—কবে থেকে?

শব্দ-কল্প-দ্রুম

॥ মুল কাপ ॥

ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।
আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।
অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে।

আমার মনে পড়ে গেল প্রসাদের কথা। মিসেস্ ডেভিডকে বললাম প্রসাদের কথা।

—সেকি! তুমিই সেই প্রসাদ রেখে-ছিলে। পিঁপড়েতে যে ওর বিছানা ভরে গিয়েছিলো।... তাই বলো। আমি তো সেদিন হাসপাতালের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—আপনি তাহলে প্রসাদটা দেখে-ছিলেন?

—বিছানা ঠিক করার সময় ওয়ার্ড-বয়ের নজরে পড়েছে। সেই আমাকে দিল। তৎক্ষণাৎ ফেলে দিয়েছি। তোমার মত পণ্ডিতমূর্খ আমি আর দেখিনি!

তারপর হাসতে-হাসতে আমার মিসেস্ ডেভিড-কাকিমা চলে গেল। পরাজিত সৈনিকের মত দুপা হেঁটেই আমি বসে পড়লাম। চার্চের ঘণ্টা কানে যেতেই মনে হল যেন আমার মস্তিষ্কে কেউ হাতুড়ি পিটছে। কপালের শিরা-উপশিরাগুলো ফুলে-ফুলে উঠছে। মাথা ঘুরছে। তীব্রগতিতে পৌঁছোলাম শম্ভুকাকার বাড়িতে।

কমুর বিয়ের পর শম্ভুকাকা কোথায় যেন তীর্থ করতে গেছেন। একা ঐ কুঁড়ে-ঘরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি গেলাম অশথ গাছের নিচে। হাসি পেল সেই পাথরের দিকে তাকিয়ে। মাস দুয়েক আগে সেখানে কত ফুল-চন্দন আর প্রসাদ পড়েছিল। আজ ওসব কিছু নেই, শুধু শুকনো কয়েকটি পাতা পড়ে রয়েছে। ঠাকুর হয়তো কমুর সঙ্গে চলে গেছে। পড়ে রয়েছে আমার পাথর। আমার সেই পাথর যার ওপর...........

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

॥২॥

অযোধ্যা প্রসাদের পরলোকগমনের পর কলিকাতায় লালচাঁদ বড়ালের সংগীত সভায় পিতৃদেব সর্বদাই গমনাগমন ক'রতেন। দুঃখের বিষয় লালচাঁদ বড়ালের ধ্রুপদ-ধামারের গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয়নি। তাঁর টপ্পা, ভজন ও দাদ্‌রা গানের রেকর্ড অনেক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কণ্ঠস্বরে মাধুর্য ও ওজস্বিতা উভয়েরই সমাবেশ ছিল। ঐ সময়ে সংগীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ধমানের মহারাজার সংগীতগুরু পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সংগীতাচার্য রাধিকা গোস্বামীও কাশিমবাজারের রাজ-দরবারে প্রধান সংগীত কলাকারের আসনে বহরমপুরেই সময় অতিবাহিত ক'রতেন। কলিকাতায় এ'রা মাঝে-মাঝেই নানা অনুষ্ঠানেই যোগদান ক'রতেন ও "সংগীত প্রকাশিকা" পত্রিকায় এ'দের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হ'তো। শিবনারায়ণজী, গুরুপ্রসাদজী, আলি বক্স ও দৌলত্ খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত ধ্রুপদীগণ একে একে বার্ধক্যের শেষ দশায় উপনীত হ'য়ে পরলোকগমন করেন। এ'দের স্থান পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে আলি বক্স ও দৌলত্ খাঁ'র শিষ্য অঘোর চক্রবর্তী কণ্ঠস্বরের ও গায়কীর গুনে সংগীত রসিকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ ক'রেছিলেন। তাঁর স্বর গম্ভীর অথচ মধুর ছিল। ধ্রুপদে গমক্ ও ছুট্-অলংকারের সমাবেশে তাঁর গায়কী বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।

লালচাঁদ বড়ালের দরবারে ঐ একই সময়েই বেতিয়াঘরের কাশীনাথ বারাণসী হ'তে কলিকাতায় এসে অবস্থান ক'রতে থাকেন। কাশীনাথ কণ্ঠস্বরের সৌষ্ঠবে কলিকাতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর আসন অধিকার করেন। লালচাঁদ বড়াল এ'র নিকটেই ধ্রুপদ শিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালও কাশীনাথের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখতেন। কাশীনাথ প্রায়ই ছোট-ছোট ধ্রুপদ গাইতেন। তবে তাঁর স্বরমাধুর্য অসাধারণ রকমের ছিল। কাশীনাথের পরমায়ু সুদীর্ঘ হয়নি; কলিকাতায় আসবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কাশীনাথের মৃত্যুর পূর্বেই মারাঠী সংগীতকেশরী বিশ্বনাথ রাও কলিকাতায় পদার্পণ করেন। এ'র জন্মস্থান মহারাষ্ট্র হ'লেও বারাণসীধামেই ইনি সংগীত শিক্ষালাভ করেন। সেখানে শিবনারায়ণজীর নিকট ইনি ধ্রুপদ, ধামার ও গুরুপ্রসাদজীর নিকট হ'তে খেয়াল, তারাণা, সরগম প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। ধামারের বাটের প্রয়োগে ও দ্রুত সরগমের তানে এ'র মত কোন গুণী বর্তমান শতাব্দীতে হিন্দুস্থানে কেউ জন্মেছেন কিনা, তা বলা কঠিন। ইনি যে-কোন সংগীতের আসরে তাঁর অসাধারণ কণ্ঠস্বরের গুণে মুহূর্তমধ্যে সভার আবহাওয়ায় বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার ক'রতে পারতেন। ইনি 'সা' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুরের দীপ্তিতে ঘর ভ'রে যেত। হারমোনিয়ামের এফ্ সুরকে 'সা' ধরে ইনি গান গাইতেন। এ'র কণ্ঠস্বর পৌরুষভাবের ওজস্বিতায় মণ্ডিত ছিল এবং তা অতি তীব্র ও উচ্চ ছিল। বহু দূর হ'তে এ'র কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যেত। উদাহরণস্বরূপ :—আমাদের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে ইনি যখন সুর ধ'রতেন, তখন তাঁর তাল সপ্তকের সুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কয়েকটি বাড়ীর ছাদ্ পর্যন্ত ছড়িয়ে যেত। প্রথমতঃ লালচাঁদ বড়ালের আতিথ্যে ইনি কলিকাতায় আসেন। লালচাঁদ বড়ালকে ইনি কয়েক বৎসর শিক্ষাও দেন। এ'র শিক্ষাগুণেই লালচাঁদ তাঁর গানে চমকপ্রদ তীব্রসুরের চড়া সপ্তকে দ্রুত তান প্রয়োগ আরম্ভ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রামোফোন রেকর্ড "সখী আয়িরি" প্রভৃতি তার প্রমাণ। তবে লালচাঁদ মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন এবং বাঙালী অভিজাত সংগীত কলাকারদের মধ্যে তাঁর আসন অপূরণীয়। আমার পিতৃদেবের সহিত বিশ্বনাথ রাও'র আজীবন গভীর প্রীতির সম্বন্ধ লালচাঁদের মাধ্যমেই স্থাপিত হয় এবং মৃদঙ্গ অভ্যাসের জন্য বিশ্বনাথকে বাবা তাঁর নিজ সভাগায়করূপে নিযুক্ত করেন। মৃদঙ্গের ছন্দের সঙ্গে কণ্ঠসংগীতের লয়কারীর জন্য বেতিয়াঘরের গায়কগণকেই বাবা বিশেষ পছন্দ ক'রতেন। তাই অযোধ্যাপ্রসাদের মৃত্যুর পর বিশ্বনাথকে লাভ ক'রে তিনি বিশেষভাবেই পরিতৃপ্ত হন এবং বিশ্বনাথের সংসর্গ থেকেই ক্রমে ক্রমে লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরের দিকেও তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হ'তে থাকে। বাংলাদেশে গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচারে লালচাঁদই প্রথম অগ্রণী ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তিনি স্বয়ং হাল্কা সুরের অনেক বাংলা গানের রেকর্ড ক'রেছেন এই সকল গানের লোকপ্রিয়তার জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথ রাও'র রাগমূলক বহু বাংলা গান, হিন্দি গান ও তেলেনার রেকর্ড তিনি ক'রেছেন। বিশ্বনাথ বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাঙালী সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং নিজেও বাংলাভাষায় সাবলীলাক্রমে কথা ব'লতেন। রামপ্রসাদের কয়েকটি গানের নিজ রুচি অনুযায়ী রাগের সুরে তিনি রেকর্ড করেছেন। যথা :—"এমন কি হবে মা তারা", "জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে" ইত্যাদি। তাঁর হিন্দী রেকর্ড "হর-হর-হর ব্যোম্-ব্যোম্," "শঙ্কর মহাদেব দেব" প্রভৃতি ও "কান্ ধা-ধা-ধা", "কালিয়ন সঙ্গ" প্রভৃতি ওস্তাদী-সংগীত বহু বৎসর পর্যন্ত বাংলার ঘরে ঘরে গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে শোনা গেছে। লালচাঁদ ও বিশ্বনাথের আদর্শে গ্রামোফোন রেকর্ডে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনের জন্য বাংলার শীর্ষস্থানীয় কলাকারগণ ও জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকারা বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। স্বনামধন্য রাধিকা গোঁসাই "বিমল আনন্দে জাগোরে" "স্বপন যদি ভাঙিলে" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ মার্গ-সংগীত রেকর্ডযোগে গেয়েছেন। অঘোর চক্রবর্তী "লাল লপটান" ধামার ও "আনন্দ বল, গিরিজাপতি নগরী" ভজন, "নজ্‌রা দিল্‌বাহার" টপ্পা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গান অপূর্ব কণ্ঠে গেয়েছেন। মাননীয় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময়ে যন্ত্র-সংগীতের চর্চাতেই অধিক সময় নিযুক্ত থাকতেন এবং তিনিও সেতারের গৎ গ্রামোফোন কোম্পানীকে

উপহারস্বরূপ দিয়েছেন। জোহরাবাই, গহরজান প্রভৃতি হিন্দুস্থানী গায়িকাগণ বহু রেকর্ডে নিজ নিজ গুণপনার পরিচয় দিয়ে গেছেন। কিন্তু বাংলা-দেশেরও একজন পেশাদার গায়িকা ছিলেন, যাঁর কণ্ঠস্বরের লালিত্য ও তান-কর্তব গহরজান অপেক্ষা কম ছিল না। তাঁর নাম ছিল [illegible]। তিনি তাঁর একমাত্র গ্রামোফোন রেকর্ডে "[illegible] সখী, কুসুমে বিবিধ মধু" নামক [illegible] আমাদের একটি বাংলা ঠুংরী গানে অসাধারণ সুরবোধের প্রকাশ করেছেন। বর্তমান সময়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ক্রমে বর্ধিত হচ্ছে, কিন্তু বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে জনসমাজে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচারের প্রধান বাহনই ছিল গ্রামোফোন রেকর্ড। আমরা শৈশবে [illegible] ধামার, খেয়াল ও গ্রামোফোন রেকর্ডের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শোনবার সুযোগ প্রচুর লাভ করেছি। কিন্তু বাংলাদেশে যন্ত্র সংগীত প্রচারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বর্তমান যুগে যাঁদের নাম পাওয়া, [illegible] ১৯১০ সাল থেকে। যখন সংগীতপিপাসু [illegible] বীণ-সাধক কৌকভ্ খাঁ ও সেতার, সুরবাহারের ইমদাদ্ খাঁ কলিকাতায় সংগীত আসর অলংকৃত করে যন্ত্রের নানা অভিনব [illegible] কাজের [illegible] বাংলার মাথা [illegible] যন্ত্র সংগীতের সাধ [illegible] ছিলেন এবং তিনিই বাংলার মনে [illegible] যন্ত্র [illegible] জাগিয়ে তুলেছেন।

বাংলাদেশ ও কলিকাতায় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্র-সংগীতের চর্চাও সমভাবে চ'লে এসেছে। বর্তমান যুগে অনেকের নিকটই বাংলার যন্ত্র-সংগীতের ইতিহাস অজ্ঞাত। পুরানো যুগের স্মৃতিও বিলুপ্তপ্রায়। তাই অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে এদেশের যন্ত্র-সংগীত সাধনার অধ্যায়গুলির পুনরাবৃত্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমরা ইতিহাস পাঠে জানতে পাই যে, সম্রাট সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সাহসুজা যখন আরাকানের সুবাদার-রূপে নিযুক্ত হন, তখন তাঁর সঙ্গে মিয়া তানসেনের পৌত্র সুদাসেন বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি বীণাযন্ত্র বাজাতেন ও ধ্রুপদ গাইতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তানসেনের আর একজন বংশধর বাহাদুর খাঁকে যখন আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসেন, তখন বাহাদুর খাঁর সঙ্গে পীর বক্স নামক বিখ্যাত মৃদঙ্গীও এসেছিলেন। সেনী-গুণীগণ অর্থাৎ তানসেনের বংশধরগণ সকলেই ধ্রুপদ-আলাপ গানের সঙ্গে সঙ্গে বীণা, রবাব, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র বাজাতে জানতেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা কণ্ঠ-সংগীতের অভ্যাসে বেশী সময় দিতেন, তাঁরা দরবারে গান গাইতেন ও গায়করূপে পরিচিত হ'তেন। আর যাঁরা যন্ত্র সংগীতের সাধনায় অধিক অভিনিবেশ দান করতেন, তাঁরাই যন্ত্রী বা যন্ত্রকাররূপে পরিচিত হ'তেন। বাহাদুর খাঁ নিজে গায়ক হ'লেও বিষ্ণুপুরে বীণা, সেতার প্রভৃতির চর্চার প্রবর্তন করেন। পরে বিষ্ণুপুর দরবারে ও পঞ্চকোট-রাজদরবারে অনেক বিখ্যাত যন্ত্রকার নিজ নিজ গুণপনা প্রদর্শন করেন। এঁদের চেষ্টাতে বিষ্ণুপুরে ও পঞ্চকোটে প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধনা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। তবে সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক বৎসর পর ওয়াজেদ আলি শা যখন মেটিয়াবুরুজে সংগীতসভা স্থাপন করলেন, তখন থেকেই পূর্ণাঙ্গ সংগীতের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। কলিকাতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও যন্ত্রকারের সমন্বয় ঐ সময়ে দেখা যায়। নবাবের গুরু তানসেনবংশীয় বাসৎ খাঁ স্বয়ং ধ্রুপদও গাইতেন, রবাবও বাজাতেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আলি মহম্মদ খাঁ (বোড়কু)-কে বীণা, রবাব, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি যন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তা-ছাড়া বাসৎ খাঁ তাঁর জ্ঞাতিসম্পর্কীয় নাতি কাসেম আলি খাঁ সাহেবকেও বীণা ও রবাব শিখিয়ে-ছিলেন। মেটিয়াবুরুজই তাঁর শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এখানেই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সেতার শিক্ষার জন্য যাতায়াত করতেন। রাজা হরকুমার ঠাকুর বাসৎ খাঁকে সংগীতনায়ক উপাধিদানের পর রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর বোড়কুর নিকট কিছুদিন সেতার শিক্ষা-লাভ করেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর সতীর্থদের মধ্যে বাংলার তানসেন যদু ভট্ট ও সংগীত-কেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম চিরস্মরণীয়। প্রথম বয়সে কণ্ঠ-সংগীতে ধ্রুপদ গানের চর্চার পর কলিকাতায় এসে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যন্ত্র-সংগীত সাধনায় ব্রতী হন। ইনি মহারাজা যতীন্দ্র-মোহনের সংগীতাচার্য ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভ্রাতা রাজা সৌরিন্দ্র-মোহন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সহিত সহযোগীতারূপে বাংলাভাষায় কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ক্ষেত্রমোহনের "মৃদঙ্গ-মঞ্জরী", "পরিবাদিনী-শিক্ষা", "যন্ত্র-ক্ষেত্রদীপিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ সে যুগে বাংলার সংগীত প্রতিভার বিশিষ্ট অবদানরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। ক্ষেত্র-মোহন গোস্বামী ও রাজা সৌরিন্দ্রমোহন কলিকাতায় সেতার যন্ত্র প্রচারের বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বাসৎ খাঁ কলিকাতায় অবস্থানকালে নেপাল রাজ্যের সৈন্য বিভাগের উচ্চপদস্থ পাঠানবংশীয় নিয়ামতুল্লা খাঁ বাসৎ খাঁর শিষ্য হন। ইনি সৈন্য বিভাগে কাজ ক'রলেও বিশেষ সংগীতপ্রিয় ছিলেন ও কাবুলদেশীয় সরোদ যন্ত্র বাজাতেন। তখন সরোদে লোহার ও পিতলের তারের পরিবর্তে তাঁতের বাদ্যের প্রচলিত ছিল। নিয়ামতুল্লা খাঁ নেপাল থাকাকালে অন্যান্য ওস্তাদদের নিকট হ'তে ভারতীয় রাগ-রাগিণী শিক্ষালাভ ক'রেছিলেন। পরে সংগীতের একান্ত অনুরাগবশতঃ নেপালের চাকরী ত্যাগ ক'রে সংগীত শিক্ষার জন্য কলিকাতায় চ'লে আসেন ও বাসৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতের যে কয়েকটি আদি সরোদিয়াগণ বিগত শতাব্দীতে সরোদযন্ত্রে স্টীলের পাতা ও লোহার ও পিতলের তার প্রচলিত করেন, নিয়ামতুল্লা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইনি আলাপ ও গৎ উভয় বিষয়েই সুদক্ষ ছিলেন এবং কাসেম আলি খাঁর সংসর্গে সরোদ যন্ত্রে রবাবের বাদ্য-পদ্ধতির অনুসরণ করেন। শোনা যায় যে, ইনি যখন দ্রুত গৎ ধ'রতেন, তখন খুব কম তবলাবাদকই তাঁর সমান লয়ে সঙ্গতে সমর্থ হ'তেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় অবস্থানের পর আনুমানিক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বাসৎ খাঁ টীকারী মহারাজার সংগীতগুরু পদে অভিষিক্ত হ'য়ে কলি-কাতা ত্যাগ ক'রে গয়াধাম গমন করেন। তাঁর জীবনান্তও সেইখানেই হয়। বাসৎ খাঁর গয়াধাম গমনের কিছুদিন পরেই কাসেম আলি খাঁ রবাবী ও নিয়ামতুল্লা পুনরায় নেপালে চ'লে যান। নিয়ামতুল্লা নেপালে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করেন ও সেখানেই তাঁর দুই বিখ্যাত পুত্র কেরামতুল্লা খাঁ ও কৌকভ্ খাঁ সরোদ যন্ত্রে দীক্ষা ও শিক্ষালাভ করেন। কাসেম আলি খাঁ কিন্তু নেপালে দীর্ঘকাল থাকেন নি। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় চ'লে আসেন এবং মেটিয়াবুরুজে লক্ষ্ণৌর নবাবের দরবারের সঙ্গে তার পূর্বসম্বন্ধ বজায়

থাকে। এ'কেই ভারতের শেষ শ্রেষ্ঠ রবাবী বলা যেতে পারে। তানসেনবংশের যন্ত্রসংগীতের ঐতিহ্য এ'র প্রতিভাদীপ্ত বাজনার ঝংকারে মূর্তিমান হ'য়ে উঠেছে। ইনি যে শুধু রবাব বাজাতেন তাই নয়, বীণা যন্ত্রেও এ'র দক্ষতা কিছু কম ছিল না। তবে শিষ্যদিগকে ইনি শুধু সেতারই শেখাতেন। এ'র জীবনকাহিনী আমরা ভবানীপুরের বিখ্যাত তন্ত্রকার স্বর্গীয় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বহুবার শুনেছি। তাঁর মতে কাসেম আলি খাঁ'র মত তন্ত্রকার পূর্বভারতে কখনো আসেন নি। কাসেম আলি খাঁ মেজাজী লোক ছিলেন, অর্থের বিনিময়ে বাজাতেন না। ভবানীপুরের বিখ্যাত ধনী কেশব মিত্রের বাড়ীতে একবার সায়ংকালে এ'র বাজনার জলসা নির্ধারিত হয়। বহু ধনী ও অভিজাত ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হ'য়ে যখন সমাগত হ'লেন, তখন কাসেম আলি হঠাৎ ব'ললেন যে, তাঁর রবাব-যন্ত্রের মেজাজ ভালো নেই। সুতরাং সেই সন্ধ্যায় বাজনা হবে না। নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ মনঃক্ষোভের সহিত বিদায় নিতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু সেই রাত্রেরই শেষভাগে হঠাৎ কাসেম আলির যন্ত্রের ধ্বনি শোনা গেল। কেশব মিত্র নিদ্রাচ্ছন্ন চোখে কাসেম আলির কক্ষে এসে দেখ্‌লেন, যে ওস্তাদ তখন রবাব বাজনা সুরু ক'রেছেন। সেই মুহূর্তেই তিনি চারদিকে সংবাদ দিলেন, "কাসেম আলির মেজাজ ধাতস্থ হ'য়েছে"। "যাঁরা তাঁর বাজনা শুনতে চান, এখনই চ'লে আসুন"। স্বর্গীয় প্রমথবাবু আমাদের ব'লেছেন, তিনি সেই বাজনার আসরে নিজে উপস্থিত ছিলেন। কাসেম আলি ভোর চারটে থেকে আরম্ভ করে বেলা আটটা পর্যন্ত সমভাবে রবাবে ভৈরব রাগের আলাপ বাজিয়েছিলেন। তাঁর আলাপের সঙ্গে অন্যান্য কোনও যন্ত্রীর আলাপের তুলনা চলতো না। কাসেম আলি চার ঘণ্টা ধরে রাগের বিস্তার করেন এবং প্রতিটি তান অপর তান হতে সুর ও ছন্দের বৈচিত্র্যে পৃথক। পুনরাবৃত্তির কোন লক্ষণ তাঁর আলাপে প্রকাশ পেত না। প্রতি মুহূর্তে নূতন হতে নূতনতর তানের উদ্ভবে তাঁর আলাপ ছিল সুসমৃদ্ধ এবং বিলম্বিত হতে আরম্ভ করে দ্রুত পর্যন্ত তিনি যে কত অভিনব ছন্দের বিকাশ সাধন করতেন, তা বর্তমান যুগের গুণীদের কল্পনারও অতীত। প্রমথবাবু আরো আমাদের বলেছেন যে, দ্রুত জোড়, ঝালা ও পড়নে কাসেম আলির ন্যায় অতি দ্রুত অথচ অতি পরিষ্কার সুরেলা যন্ত্রসংগীত-বাদন এ পর্যন্ত কখনো শোনেন নি। প্রমথবাবু কিছুদিন কাসেম আলির সঙ্গ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। কলিকাতা হতে কাসেম আলি পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি রাজ্যেও মাঝে মাঝে যেতেন। একবার পঞ্চকোটে কাশীধামের স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কাসেম আলি তাঁকে রবাব যন্ত্রে কয়েকটি ধ্রুপদ বাজিয়ে শোনান। সে যুগে বিখ্যাত তন্ত্রকারগণ ধ্রুপদের সুর যন্ত্রেও তুলতেন এবং এই-ই তাঁদের যন্ত্রসংগীতের প্রধান ভিত্তিরূপে বিবেচিত হতো। কাসেম আলি খাঁ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে মাঝে মাঝে বাজিয়েছেন। ইনি প্রৌঢ় বয়সে ত্রিপুরা রাজ্যে ও পরে ঢাকার ভাওয়াল দরবারে চলে যান। পরিণত বয়সে ভাওয়ালেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে তাঁর সমাধিস্থল এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁর রবাব, সুরশৃংগার প্রভৃতি যন্ত্রও ভাওয়াল রাজপ্রাসাদে জনসাধারণের প্রদর্শনীরূপে পাকিস্থান সরকার সাজিয়ে রেখেছেন। কলিকাতায় তানসেন বংশীয় বাসৎ খাঁ ও কাসেম আলি খাঁর ন্যায় তন্ত্রকারের অবস্থিতির ফলে যন্ত্রসংগীতের উৎসাহ যে এখানে বিশেষ বৃদ্ধি পায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিয়ামতুল্লা নেপালে চলে যাওয়ার পরই এনায়েৎ হোসেন নামক বিখ্যাত সরোদী প্রথমত কলিকাতায় আগমন করেন, পরে ভাওয়াল রাজার দরবারে চলে যান। এ'র সঙ্গে আতা হোসেন খাঁ নামক তবলাবাদক প্রায়ই সঙ্গত করতেন। এনায়েৎ হোসেনের আদি নিবাস সাহারাণপুর জেলায়। ইনি তানসেনবংশীয় বীনকার আমীর খাঁর শিষ্য ছিলেন। আতা হোসেন লক্ষ্ণৌ হতে মুর্শিদাবাদ ও মুর্শিদাবাদ হতে ঢাকায় আসেন। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তী উৎসবে এ'রা দু'জন লণ্ডনের রাজদরবারে সরোদ ও তবলার অপরূপ সঙ্গতিতে পাশ্চাত্য গুণীমণ্ডলীর অতিশয় বিস্ময় উৎপাদন করেন। এনায়েৎ হোসেনের আদর্শে পূর্ববঙ্গে যন্ত্রসংগীতের চর্চা বৃদ্ধি পায়। ঢাকার ভগবান-সেতারী কাসেম আলি ও এনায়েৎ হোসেনের নিকট কিছুদিন সেতার শিক্ষালাভ করেন এবং প্রসন্ন বণিক আতা হোসেনের অতি উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। পূর্ববঙ্গের যন্ত্রসংগীত চর্চার মূলে ভগবান ও প্রসন্নের অবদান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছেন যে, ঐ একই সময়েই যদু ভট্টের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু নামক একজন কলাবিদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংগীতসভায় নিযুক্ত ছিলেন। বিষ্ণু দীর্ঘদিন আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসংগীত গাইতেন, কিন্তু বীণা যন্ত্রেও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাল্য বয়সে বিষ্ণুর বীণা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন এবং তাই আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে, তাঁর কাব্যে, নাট্যে ও গীতিতে বীণার সুরের এক রহস্যপূর্ণ মাধুর্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথ বীণা যন্ত্রের অতীব অনুরাগী ছিলেন, এতে কোন সন্দেহের কারণ নেই। আমরা ঐ যুগের আরও কয়েকজন বিখ্যাত বীনকারের নাম আজও শুনতে পাই। তাঁদের মধ্যে আন্না ঘরপুরে নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বীণাবাদকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ প্রমথবাবুর কাছে শুনতে পেয়েছি এবং পাইকপাড়ার দরবারের নন্দ দীঘল যথেষ্ট সম্মান ও পারিতোষিক নানা সংগীত-আসরে লাভ করেছেন। আন্না ঘরপুরে ও নন্দ দীঘল এ'রা উভয়েই শিষ্যদিগকে বিদ্যাদানে উৎসাহী ছিলেন। পরবর্তী বাঙালী অনেক তন্ত্রকার গোড়ায় এ'দের নিকটেই শিক্ষালাভ করেছেন, প্রমথবাবুও প্রথম জীবনে আন্না ঘরপুরের কাছে বীণা যন্ত্রের শিক্ষা পেয়েছিলেন। মেটিয়াবুরুজের দরবারে কাসেম আলির শূন্য আসন পূর্ণ করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ সুরবাহারবাদক সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ। এ'র আদি বাসস্থান লক্ষ্ণৌ, এ'র পিতার নাম ছিল গোলাম মহম্মদ খাঁ। গোলাম মহম্মদ তানসেনের দৌহিত্র-বংশীয় ও লক্ষ্ণৌ দরবারের বীনকার ওমরাও খাঁর শিষ্য হন এবং নিজেকে নিজ গুরুর দাসরূপে বিবেচনা করে গোলাম মহম্মদ নাম ধারণ করেন। ইনি বীণা শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ওমরাও খাঁ তাঁর নিজ পুত্র আমীর খাঁ ব্যতীত অপর কাউকেও বীণা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এইজন্য তিনি বড় সেতার বা সুরবাহারে গোলাম মহম্মদকে যন্ত্রসংগীতে শিক্ষিত করে তোলেন। গোলাম মহম্মদ তাঁর পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদকে ঐ বিদ্যা দান করেন। সাজ্জাদ মহম্মদ ডান হাতে দুই আঙুলে মিজ্‌রাপ পরে বীণার অনুকরণে সুরবাহার বাজাতেন। কলিকাতায় আগমনকালে তাঁর বয়স বার্ধক্যের সীমায় উপনীত হয়েছিল। ওয়াজেদ আলি শা'র মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মেটিয়াবুরুজে ছিলেন, তারপরই মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের যন্ত্রসংগীতাচার্য পদে অতি সম্মানের সহিত তিনি গৃহীত হন।

মেজদীর প্রত্যাবর্তন

চলেছিলাম সুদূর বিন্ধ্যপ্রদেশের গভীর অন্তর্বর্তী এক জন-বিরল অরণ্য অঞ্চলে। রিহাণ্ড নদীর কাছাকাছি এসে বাহনটি নিশ্চল হয়ে গেল। প্রবীণ গাড়ওয়ালী সারথীটি আমারই মত আজীবন গাড়ী চালিয়ে এলেও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সমান আনাড়ী। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যখন সে পরাভব স্বীকার করল তখন অস্তগামী সূর্যালোকে আমাদের ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিলাম, কারণ কাছাকাছি কোনও লোকালয় চোখে পড়েনি। মানচিত্র খুলে দেখলাম যে আরও আট দশ মাইল যেতে পারলে ডাকবাংলোর সন্ধান মিলতে পারে। চালক বললে যে সে গাড়ীর মধ্যে রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন হনুমানায় ফিরে গিয়ে মিস্ত্রীর সন্ধান করবে এবং দ্রুতপদে এগিয়ে গেলে আমি হয়তো দিবালোক থাকতে থাকতেই গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় পেতে পারি। ভূতত্ত্ব যার পেশা তার অদৃষ্টে এতাদৃশ ভাগ্যবিপর্যয় হামেশাই ঘটে থাকে। তাছাড়া আমি একটি দৃঢ় সংকল্প বহন করে চলেছিলাম। সুতরাং অনুমাত্র বিচলিত না হয়ে রাত্রিবাসের মত সামান্য সরঞ্জাম পিঠে বেঁধে রওনা হলাম। বলে গেলাম যে, হনুমানাগামী বাসে ফিরে এসে মালপত্র পাহারা দেবো।

ঋজু পথ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে নামছে। বাতাসে শরতের আমেজ। স্বতঃই প্রফুল্ল হয়ে উঠল মন। দীর্ঘ গোধূলি বেলার শেষভাগে সূর্যের সোনালী প্রভায় দিগন্তের পর্বতমালার পৃষ্ঠরেখা অগ্নিদীপ্ত হয়ে থাকলেও পথের উভয় পার্শ্বের ঝোপ-ঝাড়, উঁচু-নীচু ঢিবি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাঁটা গাছ, সব যেন অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। দূরাগত শৃগালের রব ও

শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ

আমার পদশব্দ প্রকৃতির নীরবতাকে বিক্ষিপ্ত না করে বরং ঘনতর করে আনলো। হাতের ঘড়িতে দেখলাম এক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে একটি মানুষ, পশু, যানবাহন বা ঘরবাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়নি। নাতি উচ্চ উদ্ভিদ-বিরল পাহাড়গুলির তলায় কোথাও কোথাও দু-এক ঘর বসতি থাকলেও অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এই দরিদ্র দেশে যারা গাছের শিকড় খেয়ে দিন গুজরান করে তাদের প্রদীপ জ্বালাবার মত অবস্থা নয়।

আমি কিন্তু আদৌ নিঃসঙ্গ বোধ করিনি। মনে হচ্ছিল আকাশের নক্ষত্র-নিচয় থেকে শুরু করে সকল স্পষ্ট, অস্পষ্ট দৃশ্যমান বস্তু যেন এক সাথে আমাকে নিয়ে চলেছে আমাদের এই সৌরলোক ছাড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনো অজ্ঞপথে, যার শেষ নেই।

সহসা স্মরণ হল আমার মেজদির কথা। শৈশবের এক দিনের স্মৃতি জাগ্রত হল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। এমনি একটি সন্ধ্যার সময় গল্প শুনেছিলাম তার কাছে মহা বীর্যশালী এক মহারাজার। তিনি দিগ্বিজয় করে রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সময় দুর্গের সিংহদ্বারের কাছে এক বটবৃক্ষের ওপর কিসের ছায়া দেখে আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যান। শরীর মন অবসন্ন হলে অতি শৈশবের লুপ্ত স্মৃতিও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে আবিষ্ট করে ফেলতে পারে বলেছিল মেজদি সেদিন। তার গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত ভাবে চিত্তাকর্ষক। জীবনের অর্ধ-শতাব্দীকাল বছরের পর বছর চলার পথে অনেক প্রিয়জনের সঙ্গে তারও চলায় বিরতি ঘটেছে বহুদিন, তবু তার কথা তীব্রভাবে স্মরণ হয় মাঝে মাঝে, কারণে অকারণে।

জনবিরল প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় হেঁটেছি বহুবার, কিন্তু আজ যেন জীবনের যাবতীয় বন্ধন, স্বার্থ চিন্তা শুষ্ক বল্কলের মত খসে পড়ে অনাবৃত করেছিল সেই শিশু চিত্তটিকে যা সানন্দ বিস্ময়ে বিভোর হয়ে গ্রহণ করত যত রাজ্যের উদ্ভট পরী-কথা।

সে দিদির অপঘাত মৃত্যু ঘটেছিল পাহাড়ের পিচ্ছিল শীলা খণ্ড থেকে পড়ে গিয়ে। সে সময়ে একমাত্র আমি কাছে ছিলাম। কোলের ওপর তুলে ধরি তার রুধিরাক্ত মাথা। সে ম্লান হেসে বলেছিল "চল্লাম ভাই, ভয় পাস্‌নি যেন, আবার একদিন আসবো।" পূর্ব আফ্রিকার উচ্চ ভূমিতে ঠিক বিষুব রেখার নিচে সূর্যাস্ত হচ্ছিল তখন অদ্ভূত উজ্জ্বল অথচ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী রক্তরাগে। অন্ধকার ঘনায়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন যখন এসে পড়েছিল তখন সে সুন্দর দেহ শবে পরিণত হয়েছে।

"আবার একদিন আসবো"—কথাগুলির অর্থ নির্ণয় করতে চেয়েছি বহুভাবে একাধিকবার। আজ ত্রিশ বছর পরে তার উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম নিবিড়ভাবে। চিন্তাধারায় বাধা পড়ল, মনে হল যেন মোটর গাড়ীর শব্দ শুনলাম। সহসা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পথ ও প্রান্তর। একটি মোটর-গাড়ী এসে থামল আমার পাশে। চালক ইংরাজী ভাষায় প্রশ্ন করলেন—, "পথে একটা জীপগাড়ী দেখলাম মাল বোঝাই, অথচ কোনো মানুষ দেখলাম না কাছে, ওটা কি আপনার?" বল্‌লাম, "হ্যাঁ, আমারই গাড়ী, ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে, তবে লোক রেখে এসেছি, ও নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও আছে, চলেছি ডাক-বাংলোর খোঁজে।

"আরও মাইল দুই যেতে হবে। চলুন, আমরাও সেখানেই যাচ্ছি—',

চালকের পাশে বসবার সময় দেখলাম যে গাড়ীর পিছনের আসনে একজন রক্তবস্ত্র পরিহিত সন্যাসী ও আরেকজন মহিলা উপবিষ্ট রয়েছেন। চালক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে, তিনি হচ্ছেন এই মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট, নাম রায়। আমি নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার আগেই বললেন—, "রেওয়া থেকে এক-জন তান্ত্রিক সন্যাসী এসে ঐ ডাক-বাংলোয় রয়েছেন, তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার বাড়ীতে, ফেরবার পথে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে নিয়ে এলাম। ইংরাজী জানেন না, অদ্ভুত ক্ষমতাবান দৈবজ্ঞ। আমার স্ত্রীতো মুগ্ধ। উনি বললেন যে, সন্যাসী হচ্ছেন অন্তর্যামী। আজ দৈবাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল—দেখি আপনার সম্বন্ধে কি বলেন। আপাতত কোনো পরিচয় দেবেন না নিজের। ভারত-বর্ষের কোন প্রদেশের লোক, কেন এসেছেন, পরে জানাবেন।

দেখতে দেখতে গন্তব্য স্থানে এসে গেলাম। চৌকিদার বোধকরি লণ্ঠন হাতে অপেক্ষা করছিল, ছুটে এসে গেট খুলে দিল। ভিতরে পেট্রোম্যাকস বাতি জ্বলছিল। সেই আলোতে তিনজন সহযাত্রীকে ভাল করে দেখতে পেলাম। পক্ককেশ সন্যাসীর শ্মশ্রু ও গুম্ফমণ্ডিত মুখখানির চক্ষুযুগলের আকর্ষণী শক্তি আছে সন্দেহ নেই। ঈষৎ তির্যক দৃষ্টি মনে হল অন্তর্ভেদী ও অসম্ভব রকম দীপ্তিমান। ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণীকে দেখেই বড়দির ছেলেবেলাকার মুখচ্ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। লাবণ্যের সঙ্গে চোখে-মুখে বুদ্ধির প্রাখর্য দেখলাম সুস্পষ্ট। খুশী হলাম।

সে-কালের ইংরাজ পি-ডবলিউ-ডি ইঞ্জিনিয়ারদের নৈসর্গিক সৌন্দর্যবোধ কতখানি উন্নত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দৃষ্টিকটু ডাক-বাংলোগুলির অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশে। পাহাড়ী স্রোতস্বিণী যেখানে মোড় নিয়েছে, সেখানে উঁচু টিলার ওপর অধিষ্ঠিত এই বিশ্রাম কুটীরটিকে মনে হল যেন অনির্বচনীয়-রূপে সুন্দর। এ অনুভূতির পেছনে কতখানি চন্দ্রালোকের ইন্দ্রজাল ছিল বলতে পারি না। মুখ হাত প্রক্ষালনের পর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত। চৌকিদার এসে সেলাম করে বললে—"সাহেব, মেম-সাহেব তলব দিয়েছেন, চা প্রস্তুত।

এইরূপে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য জীবনে বহুবার ঘটেছে। কার্যোপলক্ষে দূর দূর দেশে পর্যটনের সময় প্রবাসী বাঙ্গালীদের আতিথ্যে যে ঔদার্যের পরিচয় পেয়েছি তা অতুলনীয়। ভাবলাম নিজেকে প্রথমে অবাঙ্গালী বলে চালিয়ে সন্যাসীপ্রবরকে বিভ্রান্ত করে পরে আত্মপ্রকাশ করবো। ঘরে প্রবেশ করে দাক্ষিণ ভারতীয় প্রথায় যুগ্ম হস্তাক স্কন্ধের দিকে হেলিয়ে সন্যাসীকে

উদ্দেশ্য করে বললাম "নমস্কারম্‌" তিনি প্রতি-নমস্কার করে সম্মুখস্থ বসবার আসন দেখিয়ে দিয়ে চক্ষু নিমীলিত করে স্থির হয়ে বসলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন—, "আপনার ইংরাজী উচ্চারণ শুনে আমার স্ত্রী অনুমান করেছেন আপনি হচ্ছেন বিলাতে শিক্ষিত গুজরাটী, আমি বলেছি যে আপনি হচ্ছেন অন্ধ্র প্রদেশের লোক, সন্যাসীঠাকুর কি বলেন শুনে আপনি আপনার পরিচয় দেবেন। তবে আপনি যে ভূতত্ত্ব-বিশারদ এবং এখানে এসেছেন কুরুন্দ পাথরের সন্ধানে সে অনুমান আমরা ইতিমধ্যেই করেছি জীপগাড়ীর মধ্যে হাতুড়ি ও পাথরের নমুনা দেখে।

আমি হেসে ইংরাজীতেই বললাম—, "আপনি যখন আমাকে গাড়ী চড়িয়ে নিয়ে এলেন আর চা খাওয়াচ্ছেন তখন তার প্রতিদানে আমি একটা গল্প বলবো। যে কোনো ভাষায় ফরমাস করবেন তাতেই সম্মত হবো—ধরুন যে কোনো ইয়রোপীয় আফ্রিকান, জাপানী, চীন, অথবা ভারতীয় ভাষায়।

ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণী প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি কখনও শৈশবে কিম্বা ছাত্রাবস্থায় যৌবনে খড়গপুরে অথবা বাঙ্গালা দেশের আর কোনো জায়গায় বাস করেছেন।"

"দীর্ঘকাল দূরের কথা দুচার দিনের জন্যেও বাঙ্গলাদেশের পাঁচশো মাইলের মধ্যে কোথাও প্রবেশ করিনি।"

"তাহলে যদি বাঙ্গলায় গল্প বলতে বলি?" মেয়েটির ইংরাজী উচ্চারণ চমৎকার। ভাবে মনে হল সপ্রতিভ ও আমোদপ্রিয়। চক্ষে কৌতুকের হাসি।

যেন কতই বিব্রত হয়ে পড়লাম এমনি ভাব করে ক্ষণকাল নীরব থেকে গম্ভীর মুখে বললাম, "যখন সর্ত করেছি তখন বাঙ্গলা ভাষাতেই বলতেই হবে, কিন্তু আমি সমাহিত হয়ে থাকবো বলবার সময়। দয়া করে আপনারা কোনো প্রশ্ন করবেন না। উচ্চারণে ভুল হলে হাসবেন না যেন।"

সন্যাসী চক্ষু খুলে কিছুক্ষণ আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাছে উঠে এসে বসলেন। পাশ থেকে কানের পিছন দিকে একটি গভীর ক্ষত-চিহ্ন দেখতে পেলাম। নিমেষের মধ্যে চক্ষু সরিয়ে নিয়ে ছাদের উপর নিবন্ধ করে উপস্থিত কর্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করলাম। পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বের দেখা চেহারা সুস্পষ্টভাবে স্মরণ ছিল না, কিন্তু এ ক্ষতচিহ্ন আমার পরিচিত। ধাতস্থ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে বললাম—, "গল্পের মাঝে উঠে গেলে চলবে না, বলুন ওঁকেও।"

সন্যাসী বললেন—"ইংরাজী সমঝ্‌ আতা, আপ বলিয়ে হাম নেহি উঠেঙ্গে—বাংলা ভি জানতা হ্যায়—"

ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণী বললেন—"আমাকে দু মিনিট সময় দিন রান্নার ব্যবস্থা করে আসি। আজ আমরা এখানেই রাঁধে খাচ্ছি, অবশ্য আপনি আমাদের অতিথি।"

না তাকিয়ে টের পেলাম যে সন্ন্যাসীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও আমার দিক থেকে বিচ্যুত হয়নি। অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, উঠে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণী এসে বসে সস্মিত কৌতুকপূর্ণভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম,—"আমি যখন বাংলায় কথা বলতে সুরু করবো তখন কিন্তু কোনো কারণে আপনাদের মধ্যে কেউ কিছু জানবার জন্যে উৎসুক হলেও দয়া করে কথার মাঝে প্রশ্ন করবেন না।" মহিলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। ম্যাজিস্ট্রেট সহাস্য মুখে ও সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

"চল্লিশ বছর আগের কথা আমি ভারতবর্ষ থেকে বহু দূরে সমুদ্রপারে এক জায়গায় স্কুলে পড়তাম। আমার একজন সহপাঠী ছিল বাঙ্গালী। আমরা দুজনেই এক বয়সী ও পরস্পরের মা'কে মাসী বলে ডাকতাম। বাড়ীতে যাতায়াত ছিল প্রায় নিত্য। অনেকটা একজন আরেকজনের বাড়ীর ছেলের মত ছিলাম। আমার মত সেই ছেলেটিও প্রবাসে জন্মেছিল; কিন্তু তার দাদা, দিদিরা ভারতবর্ষে কিছু কিছু শিক্ষা পেয়ে তারপর আফ্রিকায় যায়। সেখানে অন্য কোনো বাঙ্গালী পরিবার, বিশেষ করে তাঁদের স্বজাতি ছিল না বলে মেয়েদের বিবাহ দিতে দেশে নিয়ে যেতে হত। আমার বন্ধুর পিতা তিন বছর অন্তর ছুটি পেতেন এবং সপরিবারে দেশে যেতেন ছ'মাসের জন্যে। তারপর যখন ফিরে আসতেন তখন দিদিদের মধ্যে এক একজনকে আর দেখতে পেতাম না। দেশেই শ্বশুর বাড়ীতে তাদের রেখে আসতেন। আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল যে ভগ্নী তার বয়স যখন বছর পনেরো তখন সে তার বাবা আর সঙ্গে দেশে চলে যায়। আমার বন্ধু স্কুলে পড়ছিল বলে আমাদের বাড়ীতে থেকে যায়। এই বোন যখন চলে যায় তখন আমরা দুজনে ক'দিন ধরে খুব কেঁদেছিলাম। কারণ সে আমাদের সব রকম খেলাধুলোর সঙ্গী ছিল, আর তাকে খুব ভালবাসতাম। শুনলাম তারও বিবাহ হয়ে গেছে। কিন্তু সে দেশে না থেকে তার স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আমাদের কাছে চলে আসবে। তাকে কিন্তু আমি বছর কয়েকের মত আর দেখতে পাইনি, তার কারণ ইতিমধ্যে আমার বাবা অন্য এক জায়গায় বদলি হয়ে যান। তারপর বছর তিনেক অন্য এক স্কুলে পড়ে আমি বিলেত চলে যাই। আমার বন্ধুর খবর মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের মারফৎ পেতাম। শুনলাম তার বাবা মারা গেছেন, মা দেশে চলে গেছেন, এবং সে সেই বিদেশেই অল্প বয়সে চাকুরীতে ঢুকেছে। দিদির কথা জানতে চাইলে লিখতো সে পূর্ব আফ্রিকার ভিন্ন প্রান্তে আছে, অধিক কথা জানাতো না। অন্য সূত্রে জানতে পাই আমাদের সেই আদরের দিদির বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। তার অধিক কিছু জানতে পারিনি। বছর কতক পরে আমি ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানে পরীক্ষা দিয়ে একটি চাকরী নিয়ে কঙ্গো অঞ্চলে চলে যাই। তারপর সেখান থেকে পূর্ব আফ্রিকায় ছুটিতে এসে খবর পেলাম যে আমার বন্ধু বছর দুই আগে ভিক্-টোরিয়া-নায়েঞ্জা হ্রদে জলমগ্ন হয়ে মারা

আর—। দুঃখ পাবো বলে সে খবর আমাকে দেওয়া হয়নি।

ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণী আর থাকতে পারলেন না, বলে উঠলেন,—"ওমা তিনি তো আমার মামা, আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর টিপ্‌নিশের ছেলে—"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ রাখলাম। ম্যাজিস্ট্রেট একটি অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তাঁর স্ত্রীকে মৃদু ভৎসনা করে বললেন,—"ছি সর্ত ভাঙছো কেন? সন্ন্যাসী মশাইতো দৈবজ্ঞ, তাঁর কাছেই জানতে পারবে।"

এই উক্তিতে সন্ন্যাসীর নিবিষ্টতা ভঙ্গ হল কিনা লক্ষ্য করলাম না। বলে গেলাম—"দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অপ্রস্তুতে পড়লাম। দেখলাম যে তিনি শীর্ণ মুমূর্ষুর মত হয়ে গেছেন এবং এতদিন পরে সাক্ষাতে কোনো উত্তেজনা প্রকাশ করলেন না। শান্ত শীরভাবে বললেন,—"ওঁর আসবার সময় হয়েছে তুমি এখন যাও।" ছেলেমেয়েদের দেখলাম প্রাণশূন্য, প্রায় কঙ্কালসার। ফিরে এসে তাঁর স্বামীর অমানুষিক অত্যাচারের যে সকল সংবাদ শুনলাম সে মর্মন্তুদ বর্ণনা আমার আজকের গল্পের বিষয়বস্তু নয়। আমি নাইরোবী সহরে থাকতে থাকতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। লোকে ভাবে তিনি পাহাড়ে উঠে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বাড়ীর একটি কিকুয়ু চাকর ও আর একজন দেখেছিল যে, মেজদিকে পিছন থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। চাকরটি সে কথা প্রকাশ করবার পরদিন নিহত হয়। দ্বিতীয় সাক্ষীটি পুলিশের ওপর নির্ভর না করে নিজের হাতে প্রতিশোধ নেবে বলে আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করে ভারতবর্ষে এসেছিল এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত হন্যের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, দেখা গেল যে, নাইরোবী সহরের যে মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি আমার বন্ধুর মাতা তাঁর কন্যাকে দান করে গিছলেন তার মালিকানা স্বত্ব নিজের নামে বদল করে নেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টার পর ঐ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর মেজদির স্বামী বহু টাকার ঋণ রেখে নিখোঁজ হয় আর পরিবারের বন্ধু-বান্ধবেরা ছেলেমেয়েদের তাদের দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ভার নেয়। আমি বছর কয়েক এই অভিশপ্ত পরিবারের কোনও সন্ধানই রাখবার সুযোগ পাইনি। মাঝে আর একবার বিলেত যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে যাই এক বড় খনিজ কোম্পানীর হয়ে ধাতুর সন্ধানে। নাই-উড়ুপেটের কাছে কাজ করছিলাম, এমন সময় খবর পেলাম যে তিরুপতি মন্দির দেখবার পর একজন বৃদ্ধা বাঙ্গালী মহিলা পর্বত শিখর থেকে নিম্নভূমির সৌন্দর্য দেখছিলেন, সঙ্গে ছিল তাঁর পৌত্রের পুত্র। তাদের কাতর চিৎকার ধ্বনি শুনে লোকজন এসে পরে মৃতদেহ দুটিকে অনেক নীচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে তুলে আনে। মন্দিরের একজন পুরোহিত ও আর একজন তীর্থযাত্রী পুলিশের কাছে এক জবানবন্দিতে বলে যে, তারা একজন মধ্যবয়সী লোককে এদের অনুসরণ করে যেতে দেখেছিল। পরদিন সংবাদপত্রে নাম দেখে যখন সন্দেহের অবকাশ রইল না তখন মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলাম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় একমাত্র আমি উপস্থিত ছিলাম। সামান্য যা কিছু ছিল, জিনিসপত্র তাই নিয়ে কলকাতায় রওনা হলাম। এ্যাটর্ণীর কাছে খবর পেলাম যে, বৃদ্ধার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি এবং টাকাকড়ি জলমগ্ন পুত্র ও পৌত্র-পৌত্রীদের সমানভাবে ভাগ করে গেছেন।

"জলমগ্ন পুত্র?" ম্যাজিস্ট্রেটের অস্ফুট প্রশ্নের উত্তরে বললাম—"তার মৃতদেহ যখন পাওয়া যায় নি তখন পরলোকগত বলে স্বীকার করতে তিনি চাননি—উইলের সর্ত ছিল যে তাঁর নিজের মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে পুত্রের সংবাদ না পাওয়া গেলে সেই অংশও পৌত্র-পৌত্রীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। মোট কথা সংবাদ নিয়ে শুনলাম যে আমার সেই আফ্রিকার মেজদির দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে দুই ছেলেরই মৃত্যু ঘটেছিল এবং মেয়েটি শৈশবেই হারিয়ে যায়। উত্তরাধিকারের মধ্যে আর একজন হচ্ছে বড় মেয়ের কন্যা। পশ্চিমে তার পিসীর কাছ থেকে সে মানুষ হয়েছে আর এলাহাবাদে কোন প্রবাসী বাঙ্গালীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে।"

ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণী আর স্থির থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, "দিদিমার চিঠি তো সেদিন পেয়েছি—আপনি এসব কথা কেন বলছেন?"

সন্ন্যাসী অকস্মাৎ তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সাব্ ঝুট বাত্—"

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "আহা, ওঁকে গল্প শেষ করতে দেওয়া হোক।"

আমি বললাম, "আমি কলকাতায় থাকতে থাকতেই এ্যাটর্ণীর কাছে খবর পেলাম যে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির পিতা তার কন্যার অংশ দাবী করে চিঠি দিয়েছেন। ঠিকানা সংগ্রহ করে আমি সাক্ষাৎ করবার জন্যে লোক পাঠালাম। জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে একটি উন্মাদালয় এবং অধ্যক্ষ বললেন যে, পত্রালাপ ছাড়া কোন সংবাদ পাওয়ার উপায় নেই, কারণ তাঁর বন্ধু অনন্ত বসু নাকি দক্ষিণ ভারতে গেছেন। আমি যে লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম সে ছাড়বার পাত্র নয়। সৌভাগ্যবশতঃ স্থানীয় দারোগা ছিল তার সহপাঠী। তার চেষ্টায় যে কয়েকটি পোস্ট কার্ড সংগ্রহ হল তার মধ্যে একটি এসেছিল মাদ্রাজ থেকে। পোস্ট অফিসের তারিখ দেখে বোঝা গেল যে, আমরা একই সময় সেখানে ছিলাম। অবশ্য ঠিকানা দেওয়া ছিল না। মেয়েটিকে তার বাবা কখন কি উপায়ে তার দিদিমার হেপাজত থেকে সরিয়ে ফেলেছিল তার হদিস পাওয়া যায়নি, তবে সে বেচারির কপালে অনেক দুর্ভোগ ছিল—শুনতে পেলাম যে, মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃত করে দেওয়া হয়। যাই হোক মেয়েটি ছিল উন্মাদালয়ের চিকিৎসাধীনে এবং প্রায় মাস খানেক আগে কোন মাদ্রাজী বিশেষজ্ঞকে দিয়ে অপারেশন করানো হবে বলে দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোট কথা এখানে অনন্ত

বসুর চেহারার যে বর্ণনা পাওয়া গেল তার সংগে ত্রিরূপতির অনুসরণকারীর মিল সুস্পষ্ট মনে হলো—"

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে বিরাট হাই-তুলে বললেন, "আপলোক কাহিনী শুনিয়ে, হাম্‌কো পূজা মে ব্যাঠ্‌নে পড়েগা—"

আমি বাধা দিলাম না। সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে সন্ন্যাসী বেরিয়ে গিয়ে একটি বড় বটবৃক্ষের নীচে এক শিলাসনের ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে উপবেশন করলেন। চন্দ্রালোকে আসে-পাশের ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল মনে হল কাছে এগিয়ে এসেছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চিন্তাবিষ্ট হয়ে বসেছিলেন। তাঁকে বললাম, "বাইরে খোলা বাতাসে বসলে হয় না? চলুন চেয়ার তিনখানা নিয়ে যাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করে একটি চেয়ার তুলে নিয়ে এলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আরও দুখানি নিয়ে এলেন। বোধ করি তিনি বুঝলেন যে, আমি বটবৃক্ষের প্রতি নজর রাখবার উদ্দেশ্যেই স্থান পরিবর্তন করলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণী মৃদু স্বরে বললেন, "আপনি কিন্তু এখনও নিজের পরিচয় দেন নি। আমার কেমন মনে হচ্ছে যে, আপনি বাঙ্গালী আর আমাদের আপনার লোক, হয়ত' মায়ের মুখের সংগে আপনার চেহারার একটা আদল আছে বলে—"

ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিয়ে বললেন,—"তুমি কোন্ ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছ, ফটো থেকে সাদৃশ্য অনুমান করা যায় না। মশাই শরৎকালে এই সময় এই বাঙ্গালী মেয়েটির মন যত রাজ্যের প্রবাসী ছেলেদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। প্রতি বছরই দেখি আগমনীর সময় বরাবর নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয় পরিচিত অপরিচিত একশ' মাইল পরিধির মধ্যে সকলের কাছে, ভাল মন্দ নির্বিশেষে—"

গৃহিণী বললেন, "তুমি থামো! মায়ের পূজোর ব্যাপারে ভাল মন্দ আছে নাকি? যাই হোক্ আপনি যেই হোন যখন বাংলা ভাষা জানেন তখন আমাদের আপন লোক। আপনারা বসুন আমি দেখে আসি খাওয়ার কত দেরি।"

ম্যাজিস্ট্রেট মৃদু কণ্ঠে বললেন, "সন্ন্যাসী পাহাড়ের মাথার মন্দির দেখবার জন্যে গা করলেন না আজকে, ফেরবার সময় সন্ধ্যা হয়ে আসবার সময় হঠাৎ তাঁর আগ্রহ জেগে উঠলো।—কাল থেকে আমার যাওয়া সম্ভব হবে না সে কথা জানেন বলে হয়ত' আজকে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। মোট কথা আপনার গল্পের সত্য-মিথ্যা যাই হোক, ওঁর সংগে একা মন্দির দেখতে যেতে ইচ্ছে করছে না। যদি দয়া করে আপনি সংগে যান—"

বললাম, সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় আজ রাত্রেই পাওয়া যাবে। আহারের পর আপনারা বিদায় নিয়ে গাড়িখানা কিছুদূরে রেখে ফিরে আসুন, দেখতে পাবেন আর একটি নরহত্যার চেষ্টা। যখন বলবো যে, কানের পাশের ঐ গভীর ক্ষতচিহ্ন হয়েছিল নাইরোবি শহরের হাসপাতালে ডক্‌টর টিপনিস-এর অস্ত্রাঘাতে, আর অনন্ত বোস-এর পাসপোর্টে ছিল ঐ চিহ্নের উল্লেখ, আরও যখন বলবো যে কদিন আগে যে মধ্য বয়সী গেরুয়া বস্ত্রধারী লোকটিকে একাধিক মানুষ দেখেছিল ত্রিরূপতি তীর্থস্থানে তারও ঠিক ঐ একই স্থানে ছিল একই প্রকারের ক্ষতচিহ্ন এবং সে চিহ্ন ঢাকা সম্ভব হয় নি, যেহেতু ঐ মোটা দাড়ি গোঁফের আবরণ ছিল না সে ছদ্মবেশে।"

"তার মানে?"

"দেখলেন না? চলন্ত গাড়ীর বাতাসে যে পরচুল সরে গিছলো সেটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করবার চেষ্টায় দুই হাতে মাথা ধরে তারপর সন্যাসী আসন গ্রহণ করলেন। আমার আগমনে অত্যন্ত বিচলিত না হলে হয়ত' এ ভ্রমটুকু হতো না। সত্যি কথা বলতে কি, আর একটি হত্যার চেষ্টা হবে আপনার বাড়িতে সেই অনুমান করেই আমি কাশী পর্যন্ত উড়ে এসে তারপর ঐ জীপ বাহনটিকে ভাড়া করে মির্জাপুর হয়ে ছুটে আসছি। সংগে এনেছিলাম আমার নিজস্ব সারথী ও দেহরক্ষীকে। দেখছি পথের মাঝে গাড়ি বিগড়ে ভালই হল!"

সহসা সন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন দেখে পিপ্‌রি বাঁধ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিলাম ইংরাজী ভাষায়। সন্যাসী আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করে পাশ দিয়ে ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণী বললেন যে ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু যৎসামান্য, যেন কিছু মনে না করি। সন্যাসী ঠাকুর খবর পাঠালেন যে তিনি আহারে অনিচ্ছুক এবং এক পাত্র দুগ্ধ পান করে শয়ন করবেন।

আহারের পর ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দেওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণীকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে পরের দিন তিনি মন্দির দর্শনে যাওয়ার পূর্বেই আমি নিজের পরিচয় দেবো।

সন্যাসীর ঘরের দরজা দেখলাম ভিতর হতে অর্গল বন্ধ। শুনতে পেলাম সশব্দ নাসিকাধ্বনি। চৌকিদার এক বাটি গরম দুগ্ধ এনে বললে মাতাজীর হুকুম। খাঁটি দুধের স্বাদ সামান্য তিক্ত মনে হল এবং তারপর স্বপ্নের মত অস্পষ্ট ভাবে স্মরণ হয় ঘোর নিদ্রার আবেশকে ঠেকিয়ে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা। ঘূর্ণায়মান বায়ুমণ্ডল, আসবাব পত্র, ছাদ জানালার মাঝে মাঝে দেখেছিলাম বহিঃবিচ্ছুরিত চক্ষুযুগল, উদ্যত ত্রিশূলের ফলাকা ও মুক্তকেশী মেজদির প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখশ্রী।

নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখলাম মাথার কাছে বসে আছে ম্যাজিস্ট্রেট গৃহিণী ও রৌদ্র স্নাত প্রাঙ্গণে বহুলোকের সমাবেশ হয়েছে। বাহিরে এসে বিস্ময়ের অবধি রইল না। দেখলাম শ্মশ্রু গুম্ফ ও মাথার পরচুল ভূমিলুণ্ঠিত এবং রজ্জুবদ্ধ সন্যাসী সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে অধোবদনে উপবিষ্ট। একবার মাত্র চক্ষু উত্তোলন করে আমার মুখের প্রতি বিস্মিত ভাবে তাকিয়েছিল সে যখন আমি নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম যে আমিই হচ্ছি সেই মেজদির জলমগ্ন ভ্রাতা।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "মামাবাবু, আপনি দৈব উপায়ে বেঁচে গেছেন। ভণ্ড সন্যাসী কৌশলে দুধের বাটি বদল করে আপনাকে এত তাড়াতাড়ি ঘায়েল করে ফেলবে আমরা কল্পনা করতে পারিনি। মোড়ের কাছে গাড়ি রেখে ফিরে আসতে কিছু বিলম্ব হয়ে থাকবে। হঠাৎ শুনলাম চৌকিদারের আর্তনাদ। তারপর এসে দেখি ত্রিশূল আপনার মাথার কাছে কাঠের দরজায় বিঁধে ঝুলছে আর এই ভণ্ড তপস্বী দুই হাতে মুখ ঢেকে পিছু হেঁটে পালাবার চেষ্টা করছে। চৌকিদার বলছে যে সে একটি স্ত্রীলোককে আপনার ঘরে ঢুকতে দেখে কৌতূহল পরবশ হয়ে দেখতে এসেছিল, তারপর দেখে সন্যাসীর উদ্যত ত্রিশূল তার বুকের মধ্যে ঢুকে গেল। এদেশে ছেলে-বুড়ো সকলের ভূত প্রেতের ওপর এমন বিশ্বাস যে এদের সাক্ষ্যের মূল্য দেওয়া যায় না। তবে জলজ্যান্ত ত্রিশূলটা এখনও ঝুলছে।

শাক্তপদাবলী: ভারতচন্দ্র ও ঐতিহ্য

পশুপতি শাসমল

তথাকথিত শাক্তপদাবলী আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রায় সমূহ সমালোচক যেন নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতচন্দ্রকে উপেক্ষা করেছেন; হয়ত এতটা উপেক্ষণীয় ভারতচন্দ্র নন‌ও।

কেবল সমালোচনাই নয়, শাক্তপদাবলীবিষয়ক প্রামাণ্য সংকলন-গ্রন্থে১ ভারতচন্দ্র-বিরচিত একাধিক পদের অস্তিত্ব একান্ত দুর্লভ বলে সেখানেও কবি সম্বর্ধিত হতে পারেননি। সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রসঙ্গ স্বীকার করেও বলা যায়, শাক্তপদাবলী রচয়িতা-রূপে—তথা শক্তিবিষয়ক পদরচনায় ভারতচন্দ্রের প্রয়াস অবিস্মরণীয়। যুগন্ধর শিল্পীর সৃষ্টিক্ষেত্রে সমকালীন সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকবে, এ-চিন্তা অস্বস্তিকর।

শাক্তপদাবলীর উদ্ভবকাল আলোচনা-প্রসঙ্গে সাধারণত অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধকে এবং প্রথম রচনাকারীরূপে রামপ্রসাদকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। রামপ্রসাদের অগ্রজ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য আনুমানিক ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রচিত হয়েছিল২। তখন অনুজ রামপ্রসাদের বয়ঃক্রম অনূর্ধ্ব ত্রিশ বৎসর। অতএব সমসাময়িক বলে কে যে কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। যুক্তিজাল বিস্তার করে অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা উদ্ধৃতি-যোগ্য : "রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের কাব্যের দু-এক বৎসরের পূর্ববর্তী রচনা। *** অবশ্য ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রচনা ইহার দুই-এক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে, এ-বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না৩।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রামপ্রসাদের আবির্ভাবকাল ১৭২০ খৃষ্টাব্দ ধরা হয়ে থাকে৪। পিতৃবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে সংসার পরিচালনার গুরুত্ব-পূর্ণ দায়িত্বের জন্য কোনও ব্যবসায়ী জমিদারের মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কিংবদন্তীর "দাও মা আমায় তহবিলদারী" পদটি যদি বিংশতিবর্ষীয় যুবকের রচনা হয়ে থাকে, তবে ঐ কাল সঙ্গতভাবে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনাকালের প্রায় নিকটবর্তী। কারণ, এর বহুকাল পরে রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তার ফলে সৃষ্ট হয় বিদ্যাসুন্দর আখ্যানসমৃদ্ধ "কবিরঞ্জন" কাব্য৫।

সম্ভবত তাঁর শাক্ত-গীতিকা বহু পরবর্তী কালের রচনা। শ্রদ্ধেয় শ্রীভট্টাচার্যের মতে, "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার পদাবলী রচনা করেন।"৬ এ-সময়কে শাক্তপদাবলীর উদ্ভবকাল-রূপে গ্রহণ করলে একই রামপ্রসাদের ভাবমানসে বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারার দেহ-কেন্দ্রিক উত্তপ্ত কামনামুখরতার 'বিলাস-কলা' এবং 'হরিস্মরণ'-এর মত শাক্তপদাবলীর বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আকৃতি এবং গীতিমাধুর্যের উৎসভূমির সহাবস্থান সম্পর্কে একটি বিচারসহ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ থাকতে পারে। কারণ, তন্ত্রসাধনায় অনুপেক্ষিত দেহ-প্রাধান্যকে অবলম্বন করে যাঁর আবির্ভাব বিদ্যাসুন্দর কাব্যে, তাঁরই মানস-বিবর্তনের সার্থক ফলশ্রুতি শাক্তপদাবলীর মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের বড়ু চণ্ডীদাসকে পদাবলীর চণ্ডীদাসরূপে গ্রহণ করার পশ্চাতে অনুরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। প্রথম যৌবনের বিদ্যা-সুন্দরের প্রসাধনা ও রূপোন্মাদনার অভিব্যক্তিতেই পরবর্তী শাক্তপদাবলীর সাধনবেগ ও রূপাতীতের প্রতি আকর্ষণকে অনিবার্য করে তুলেছে। বিস্তরেণ অলম্। শ্রদ্ধার সঙ্গে বিতর্কের আবর্তের দুরত্ব রক্ষা করে আমরা বলতে পারি যে, ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ সমসাময়িক এবং শাক্তপদাবলী রচনা-বিষয়ক পারস্পরিক প্রভাবসাপেক্ষতা যদি বহুদূর পর্যন্ত অস্বীকার করা যায়, তাহলে কোন অবিচার সম্ভবত হয় না।

এবারে শাক্তপদকর্তারূপে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শাক্তপদাবলী সংকলন গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের যে পদটি গৃহীত হয়েছে, তার আরম্ভ নিম্নরূপঃ—

> কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো।
> ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥
> আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে
> শিব দিতে নারে সীমা গো।
> ধর্ম-অর্থ-কাম, মোক্ষধাম নাম
> শিবের সেই সে অনিমা গো॥
> ইত্যাদি ৭

'নাম-মহিমা' শীর্ষক অধ্যায়ে সংকলক এই পদটি সন্নিবেশিত করেছেন। এতদ্বিষয়ক একাধিক পদ অন্নদামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। যেমন,

> ভবানী বাণী বল একবার।
> ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
> ভবানী ভবের সার॥৮

১। শাক্ত পদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আনুকূল্যে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ রাজসভায় স্বীকৃত হন ১১৫৩ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে এবং তিনি ১১৫৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বা ১৬৭৪ শকাব্দে বা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন।

৩। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৩য় সং, পৃঃ ৬৮১।

৪। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৬৩, ৫—৬।

৫। প্রচলিত মত যে, রামপ্রসাদ 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেন নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর মতে "দেওয়ান রাজকিশোরের নিকট হইতে তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি পাইয়াছিলেন।"

৬। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৪৯৭।

৭। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সা, প, সং, পৃঃ ১৭৯।

৮। ঐ পৃঃ ১০৬।

কিংবা এই পদটির অন্য রকম প্রকারও পাওয়া যায়,—

ভবানী বাণী বল একবার।
ভবানী ভবের সার॥
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবনদী করে পার।
ভবানী ভাবিয়া ভবানী পাইয়া
ভব তরে ভবভার॥৯

বৈষ্ণবীয়তার প্রভাব এখানে আত্যন্তিক। "নামৈব কেবলম্"-এর প্রভাবে নাম-সংকীর্তনের অনুরূপ হয়ত শাক্তপদাবলীর 'নামমহিমা' সৃষ্ট হয়েছিল; এ-প্রসঙ্গে তন্ত্রের নির্দেশও স্মরণীয়— "কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপাল-কালিকা।"

স্বাভাবিকভাবেই 'ভক্তের আকুতি'র উদ্ভাবনা। ভারতচন্দ্রের কয়েকটি পদও লক্ষণীয়। "কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো" পদটির মধ্যে নামমহিমা যেমন বর্ণিত, তেমনি দশমহাবিদ্যার প্রাসঙ্গিক অস্তিত্বও অনুধাবনযোগ্য। শাক্তপদাবলীতে সংকলিত দশমহাবিদ্যা-বিষয়ক পদগুলির কথা স্মরণীয়। পরিশেষে ভক্ত-কবিহৃদয়ের ঐকান্তিক আনুগত্য ও শরণাগতির আকুতিটি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে :

রাধানাথের দুঃখভরা নাশগো সত্বরা
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা
গো॥১০

"এ কি মায়া এ কি মায়া" ১১পদটিতে মহামায়াকে জগজ্জননীর পটভূমিকায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। পদটির শেষাংশে শাক্তপদাবলীর 'চরণ-তীর্থ' পর্যায়ের ভাবসাদৃশ্য পাওয়া যাবে :

ইহলোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া।
ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া॥

চরণতীর্থ-বিষয়ক আরেকটি পদের উল্লেখ করা যায়। কবি পদের সূচনায় অন্নপূর্ণার জয় ঘোষণার মাধ্যমে তাঁকে ভবভীতিহরারূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি যে মায়াময়ী মহামায়া, তা-ও কবির সুপরিজ্ঞাত। মহাশক্তি যে অনির্বাচ্য, অবর্ণনীয় এবং তাঁর কটাক্ষে যে সৃষ্টি-লয় হয়ে থাকে, সে বিষয় উল্লেখ করে কবি পরিশেষে সেই মহিমময়ী জননীর পদছায়া কামনা করেছেন :

ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদছায়া
ভারত বিনয়ে কয়॥১২

৯। ঐ পৃঃ ১৬৫।
১০। ঐ পৃঃ ২২।
১১। ঐ পৃঃ ২৬।
১২। ঐ পৃঃ ৭৯।

ভক্ত-হৃদয়ের ঐকান্তিক আকুতি অভিব্যক্তি লাভ করেছে নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশেঃ

উমা দয়া করগো।
বিষম শমন-ভয় হরগো॥
পাপেতে জড়িত মতি
কাতর হয়েছি অতি
পতিতপাবনী নাম ধরগো।
মা বলিয়া ডাকি ঘন
শুনিয়া না দেহ-মন
গৃহগজাননে বুঝি ডরগো॥
তুমি গো তারিণী তারা
অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চরগো।
রাধানাথ তব দাস
পূরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্র ঋণে তরগো॥১৩

পঞ্চভূতাত্মক বাসনাকেন্দ্রিক এই অস্থির জীবনাবসানের জন্য আগ্রহী ভক্ত-হৃদয় এখানে মুমুক্ষু। ভোগক্লান্ত বদ্ধজীবের মোহমুক্তির নিমিত্ত এই অভিলাষ একান্ত মর্মস্পর্শী। এ-জাতীয় আরেকটি পদের কথা উল্লেখ করা যায় :

আমারে ছাড়িও না। ভবানি।
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময় হিয়া হইও না॥১৪

এ-প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের পদ মনে পড়ে। ভারতচন্দ্রে যা অনুরোধ, রামপ্রসাদে তা অনুযোগে পরিণত :

দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতামাতা যেমন দাতা,
তেমনি দাতা আমায় হলে॥

কিম্বা তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের উক্তি "জানি, জানি গো জননী, যেমন পাষাণের মেয়ে"-এর সমধর্মী। ভারতচন্দ্রের "শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা"-র সঙ্গে রামপ্রসাদের "মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো"-এর সাদৃশ্য কষ্টকল্পনা-নিরপেক্ষ এবং খেলার প্রসঙ্গটিও উভয় ক্ষেত্রে অবতারণা করা হয়েছে। এরূপ তুলনামূলক আলোচনার দিক থেকে আরও বলা যায় যে,

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥

এই পদটির সঙ্গে রামপ্রসাদের "বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা" পদটির নিকট-সাদৃশ্য দেখা যায়। "যদি না তারিবে যদি না চাহিবে ভারত ডাকিবে কারে"-

১৩। ঐ পৃঃ ৪০।
১৪। ঐ পৃঃ ৬৫।

এর সঙ্গে "কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তো"-এর দূর-সম্পর্ক বা দূরান্বয়ী সাদৃশ্য কল্পনা করা চলে।

বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি বলা যেতে পারে যে, অন্নদামঙ্গল কাব্যকে অনুসরণ করে ভারতচন্দ্র-রচিত শক্তি-বিষয়ক পদাবলীর একটি বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে।

প্রথমত, কৌষিকী-বন্দনা শীর্ষাংশে আমরা শাক্তপদাবলীর জগজ্জননীর রূপ পর্যায়ের ভাবসাধর্ম লক্ষ্য করি। যে সকল কবি তন্ত্র থেকে মাতৃকার ধ্যান-বাণী সঞ্চয় করেছেন, তাঁদের সেই বর্ণনাগুলির মধ্যে জগজ্জননীর রূপের পূর্বাভাষ পরিলক্ষিত হয়। মহাশক্তির রূপধ্যানে হয়ত শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রভাব বিদ্যমান এবং এ-জাতীয় বন্দনার মধ্যে দিয়েই যে শাক্তপদাবলীর আধুনিক রূপের উদ্ভব হয়েছিল, এ-কথা সমালোচকের স্বীকৃতি থেকে জানা যায় : "মঙ্গল-কাব্যগুলিতে কতকগুলি সুন্দর বন্দনা-গান আছে। 'ঠাকুরাণী বন্দনা' অংশের গানগুলিতে শাক্তপদাবলীর মাতৃস্তোত্রের আভাস পাওয়া যায়।"১৫

আবার আঙ্গিকের দিক থেকেও বলা যায় যে, এরূপ তৎসমশব্দবহুল জয়দেবী কাব্যরীতি-সম্বলিত কবিতা সংকলন-গ্রন্থেও পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের আরেকটি অনুরূপ পদাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে
জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করকলিতাসি বরাভয়মুণ্ডে।।
লকলক রসনে কড়মড় দশনে
রণভুবি খণ্ডিত সুররিপুমুণ্ডে।
ইত্যাদি

কিংবা আরও উল্লেখ করা যায়ঃ

মা কালিকে।
কালি কালি কালি কালি কালি কালি
কালিকে।
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডে
মালিকে।।

অন্নদা যে বিশ্বরূপা, সে বিষয়ে কবি যত্রতত্র সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করেছেন। তাঁর রূপবৈচিত্র্য নিদিধ্যাসনপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, কাশীতে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান বর্ণনার পূর্বে কবি জগজ্জননী ভুবনেশ্বরী অথচ রতিভাবাশ্রয়ী প্রেয়সী ষোড়শী মূর্তির রূপ কল্পনা করেছেন।১৬ আরেকটি পদে গৃহলক্ষ্মী-

১৫। শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী প্রণীত, পৃঃ ৫২।
১৬। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১০২।

রূপে অন্নপূর্ণা অন্নদা হিমালয়-দুহিতা শিবানীর পরিচয় বিদ্যমান ঃ

শিবগেহিনি শিবদেহিনি শিবরোহিনি
শিবমোহিনি শিবসোহিনি গো।
গণতোষিনি ধনঘোষিনি হঠদোষিনি
শঠরোষিনি গৃহপোষিনি গো।।

একই শ্লোকে প্রিয়ার মনোহারিতা, জননীর স্নিগ্ধকারুণ্য এবং ত্রাণকর্ত্রীর প্রচণ্ডতা অপূর্বভাবে বিধৃত। অপর একটি পদে পরমকরুণাময়ী গৃহিণী-মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া।।

এখানে "একহাতে পানপাত্র আর হাতে হাতামাত্র" অবলম্বনকারী বালককে অন্নপরিবেশনরত চিরন্তন জননী মূর্তির পরিচয়টি সুস্পষ্ট।

কেবলমাত্র ইঙ্গিত বা সংকেতময় ব্যঞ্জনায় দেবী যে জননীর পদে সমাসীন তা নয়, ভারতচন্দ্র একস্থলে এতদুভয়ের ব্যবধান লুপ্ত করে দিয়েছেন ঃ

অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপন কহিলা মাতা
তার মাতৃবেশে।। ১৭

সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে গৃহীত পাঠ এবং পাঠান্তর সর্বত্রই এই অভিন্নতা সমুপস্থিত। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের শক্তির জননীত্বে পরিবর্তন সম্পর্কীয় মন্তব্যের সত্যতা এখানেই নিহিত যে, রুদ্রপ্রচণ্ড বিশ্বজননী এভাবেই পারিবারিক জননীতে পরিণত হয়েছেন। মাতাপুত্রের সম্বন্ধারোপের ফলে দেবতার মধ্যযুগীয় ঐকান্তিক নিরঙ্কুশতা বিলীয়মান, ঐশ্বর্যময়ী মহাশক্তিস্বরূপিনী মাতৃকাদেবী পারিবারিক পরিমণ্ডলে সমর্পিত।

এই ভূমিকাটুকু স্মরণ করে আমরা অনায়াসে আগমনী-বিজয়া-পর্যায়ে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব নিরূপণ করতে পারি। উমা-সমাগমে কৈলাসের উৎসবের কথাও কবি বর্ণনা করেছেন ঃ

বড় আনন্দ উদয়।
বহুদিনে ভগবতী আইলা আলয়।।
শঙ্খঘণ্টারব মহামহোৎসব
ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক
রাগ তালমান লয়।।
যত চরাচর হরিষ অন্তর
পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর কহে পুটকর
মোরে যেন দয়া হয়।।

ভারতচন্দ্রের কৈলাস শাক্তপদাবলীর হিমালয়েরই অনুরূপ। তবে একথাও অনস্বীকার্য আগমনী বিজয়া পর্যায়ে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অকিঞ্চিৎকর।

(৩)

কোনকিছু আকস্মিক সম্ভব নয়। সমস্তই ঐতিহ্যকে স্বীকার করে পুষ্টতর হয়ে থাকে। তাই ভারতচন্দ্রের পূর্বেও যে এ বিষয়ে পদরচিত হয়নি তা স্বীকার করা যায় না। কারণ ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ যদি সমসাময়িক পদকর্তা হয়ে থাকেন এবং তাঁরা যদি পরস্পর নিরপেক্ষ হয়েও প্রায় সমসাময়িক কবিতা রচনায় এমনভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকেন যারমধ্যে প্রভাবহীন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহলে অবশ্যই তাঁদের কোন পূর্বসূরীর আদর্শ-ঐতিহ্য অনস্বীকার্য, যেমন মুকুন্দরাম-দ্বিজমাধবের রচিত কাব্যদ্বয়ের পারস্পারিক প্রভাবহীন সাদৃশ্যের জন্য মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে অপর কোনও পূর্বপুরুষের পুঁথির আদর্শ স্বীকৃত হয়ে থাকে।

আমাদের সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে আপাতত পূর্ববর্তী দুজন কবির রচনাংশ অবলম্বন করতে পারি। তাঁদের একজন ষোড়শ শতাব্দীর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা দ্বিজমাধব এবং অপরজন সপ্তদশ শতাব্দীর শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ।

দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যের যে সকল পদকে 'বিষ্ণুপদ'রূপে আখ্যাদান করেছেন তাদের মধ্যে একটি পদে রামবাদ-শিববাদ-শক্তিবাদের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে।

দেবী জননী গো,
তুয়া পদপঙ্কজ সার। ধু।
এ তিন ভুবনে চাহিলু মনে মনে
তুয়া বিনে গতি নাহি আর।।
মূর্খ অধম জন অশেষ অচেতন
গৌরী-গোবিন্দ ভাবে বেদ।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন কেহ নহে ভিন ভিন
গৌরী-রাম-শিব অভেদ।। ১৮

এখানে দেবীবন্দনার ছলে রামপ্রসাদী শ্যাম-শ্যামার অভিন্নত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও এই সর্বধর্মসমন্বয় সাধনের প্রয়াস লক্ষণীয়।

এ কথা কব কেমনে।
নর নিন্দে নারায়ণে।।
যেই নিরাকার সেই সে সাকার
তাঁর রূপ ত্রিভুবনে।
তেজভাবে যোগী দেবীভাবে ভোগী
কৃষ্ণভাবে ভক্তজনে।।

কারণ তাঁর ঘটনাসমৃদ্ধ কাব্যে তিনি যেমন 'যাবনী মিশাল' ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তেমনি তাঁরই সৃষ্টচরিত্র ভবানন্দ-জাহাঙ্গীর সকলেই স্বীকার করেছেন ঈশ্বর-আল্লাহ্ এক এবং অভিন্ন।

দ্বিজমাধবের অন্য একটি পদে দেবীবন্দনা প্রসঙ্গে চরণতীর্থের জন্য ভক্তহৃদয়ের আকূতি অনাড়ম্বরভাবে উৎসারিত হয়েছে ঃ

জনমে জনমে যেন দুর্গার চরণধন
বিস্মরণ না হউক আমার।
দ্বিজমাধবে বলে দেবীপদ-কমলে
করযোড়ে করি পরিহার।।

কিংবা ব্রজবলিতে তিনি বলেছেন,

আজু জগৎ জনে দুর্গা দেখ।
কোটি কোটি জনম সফল করি লেখ।।
রত্ন-সিংহাসনে বৈঠল দেবী।
হেন লয়ে মোর মনে তুয়া পদসেবি।।

দ্বিজমাধবের আরেকটি পদ নানাকারণে উল্লেখযোগ্য ঃ

জয় ভবানী গো মা তরাইয়া নে।
তুহ্মি না তরাইলে মোরে তরাইবে কে।।
তুহ্মি মাতা তুহ্মি পিতা
তুহ্মি দীনবন্ধু।
তুহ্মি না তরাইলে ভবে
কে তরাইবে সিন্ধু।।
জগতজননী তুহ্মি জানে জগজনে।
জননী হইয়া দুঃখ দিয়
অকারণে।। * * *
দ্বিজ মাধবানন্দে এই রস গায়ে।
কৃপা করিয়া মোরে রাখ নিজ পায়ে।।

প্রথম কারণস্বরূপ বলা যায় যে, যে পুঁথিকে অগ্রাধিকারের মর্যাদা দান করে সম্পাদক তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন১৯ সেখানে এ পদের শেষাংশে দ্বিজমাধবের ভণিতা বিদ্যমান; কিন্তু দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের ভণিতাযুক্ত এই

১৭। ঐ পৃঃ ১৯। পাঠান্তর ঃ "স্বপন কহিলা আসি জননীর বেশে।"

১৮। মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ক কি, পৃঃ ৫৯।

১৯। ক, বি, পুঁথিশালা, পুঁথিসংখ্যা ২৩১৮। "১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের লেখা অতি জীর্ণ তুলোট কাগজের ছবি।"

পদের শেষ চরণের একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়।২০ পাঠান্তরে এমন কোন চমকপ্রদ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, এবং দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ যে স্বয়ং দ্বিজমাধব সে বিষয়েও সংশয় নেই কারণ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দকেই ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের পক্ষে অনুসরণ বা অনুকরণ করা স্বাভাবিক। দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের ভণিতা নিম্নরূপঃ

দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ বলে শুনরে ভবানী।
কুপুত্র হইলে তারে না ছাড়ে জননী।।

এরমধ্যে অবশ্য ইতিপূর্বে বিরচিত অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত রামপ্রসাদের অবিস্মরণীয় চরণ "কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখনতো" এর ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দ্বিজমাধবের ভণিতাযুক্ত পদের মধ্যে দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের ভণিতা-সম্বলিত পদের তাৎপর্যের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নিহিত ছিল। এবং অনায়াসে তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, দ্বিজমাধবের মধ্যে এভাবেই ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের সম্ভাবনা অংকুরিত হয়ে উঠেছে।

কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে শিবনাম কীর্তনেরই প্রাধান্য, তথাপি শক্তি সেখানে নিন্দিত নয়, বরঞ্চ বহুল-ভাবে নন্দিত। মধ্যযুগীয় কাব্যধারার মধ্যে যেমন দ্বিজমাধবের কাব্যে শিব-শিবানী-বিষ্ণুর নামকীর্তনে কোন প্রতি-বন্ধকতা উপস্থিত হয়নি, তেমনি রামকৃষ্ণের শিবায়নেও এই জাতীয় পরধর্মসহিষ্ণুতা স্বাভাবিক গুণেরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি সেই ভাবধারারই উত্তরসাধক।

কবিচন্দ্রের কাব্যে আগমনী-বিজয়া-বিষয়ক পদের সম্ভবত প্রথম নিদর্শন দেখা যায়। হিমালয়-মেনকার মধ্যে কবি প্রাত্যহিক জগতের 'মাতাপিতার বেদনা'র অস্তিত্ব অনুভব করেছেন :

শুনিয়া মুনির বাক্য কহে হিমালয়।
গৌরীর বিচ্ছেদে মুনি বিদরে হৃদয়।।
মেনা বলে নারদ কহিলে তুমি কি।
কিরূপে বঞ্চিব আমি পাঠাইয়া ঝি।।
গৌরী না দেখিলে মোর না রহে জীবন।
আর না শুনিব কানে গৌরীর বচন।।
শয়ন করিব আমি কারে করি কোলে।
গরল ভক্ষিনু নহে প্রবেশিব জলে।।

স্মরণীয় যে, রামকৃষ্ণের প্রায় একশতাব্দী পরে ভারতচন্দ্র ও রাম-প্রসাদের আবির্ভাব। আরেকটি পদে আগমনী-বিজয়ার বীজের অংকুরোদ্গম লক্ষ্যণীয় :

গৌরী গ ঝিএ জননী কি জীএ
তোমা না দেখিয়া ঘরে।।

অক্ষরপ্রয়োগে শৈথিল্য সত্ত্বেও এর অন্তর্নিহিত আর্তি মর্মস্পর্শী, শিথিল ভঙ্গিমার মধ্যে মেনকার বেদনাবিধুর মূর্তি যেন বাঙ্ময় হয়ে কাব্যে সমর্পিত।

ভক্তহৃদয়ের আকৃতি প্রকাশের দিক থেকেও কবিচন্দ্র পশ্চাৎপদ নন,

দীনদয়াময়ী নাম তোমার।
শুনিয়া ভরসা বড় হইল আমার।।

সর্বধর্মসমন্বয়কারী মনোভাব কিংবা পরমতসহিষ্ণুতাও কবিমানসে ছিল অতন্দ্র। কালিদাসের কাব্যের হরিহর-মিলন কিংবা হরগৌরী মিলনের তাৎপর্যকে২১ স্বীকার করে এই ত্রয়ীকে কবিচন্দ্রও এক পাত্রে পরিবেশন করে কাব্যসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন :

জয়তী হরিহর গৌরী মাতর
অভেদতনু তিন রাজিতে।
গরুড় বাহন বৃষভ আসন
সিংহবাহিনী সাজিতে।।

পরিশেষে সমালোচকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন : "খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলা ভাষা সর্বপ্রকার গ্রাম্যতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের সুপরিচ্ছন্ন ও শিল্পগুণসমৃদ্ধ ভাষায় পরিণতি লাভ করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছিল, কবি রামকৃষ্ণের কাব্যই তাহার প্রমাণ।" ২২ অর্থাৎ ভারতচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবেই কবিচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। ভাষা-ছন্দ-অলংকারেই কেবল নয়, ভাব কখন কখন তিনি অনায়াসে আত্মসাৎ করেছেন। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, কবিচন্দ্রের "নগনন্দিনী গ। সুরবন্দনী গ" শ্লোকের দ্বারাই যেন ভারতচন্দ্র প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন,

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি
রিপুনন্দিনি গো।
জয়কারিনি ভয়হারিনি
ভবতারিনি গো।।

সংস্কৃতপদ কিংবা তৎসমশব্দবহুল পদরচনায়ও কবিচন্দ্র একটি ঐতিহ্য-সৃজনে সমর্থ হয়েছিলেন, একটি পদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

শিবশঙ্কর শম্ভো দেহি বিভো
তব চরণে শরণং। প্রভু।
জননীজঠরবাস-যম-শাসনকর্ম-
ভবার্ণব ভয়হরণং।।১।। ইত্যাদি

বৈষ্ণবীয়তার অনুবর্তনে যেমন মধুসূদন ভারতচন্দ্রের উত্তরসূরী২৩, তেমনি শাক্তপদাবলীর আঙ্গিক গ্রহণে ভারতচন্দ্র অন্তত দ্বিজমাধব ও কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়েরই উত্তরসাধক এবং রামপ্রসাদের সমসাময়িক।

২০। ঐ পুথি সংখ্যা ৬১৫১। তারিখ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ।

২১। রঘুবংশের "পার্বতীপরমেশ্বরৌ"-এর মধ্যে যেমন পার্বতীউমা এবং পরমেশ্বর উমাপতির মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে তেমনি সভঙ্গ শ্লেষের দ্বারা "পার্বতীপ" বা পার্বতীর পতি শিব এবং "রমেশ্বরৌ" অর্থাৎ রমাপতি নারায়ণের মিলনের কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

২২। ভূমিকা, শিবায়ন, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিরচিত, সা, প,সং।

২৩। বৈষ্ণবীয়তার অনুবর্তনে ভারত-চন্দ্রের যে ভূমিকা তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ বর্তমানক্ষেত্রে স্বল্প। তবে বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের কয়েকটি পদের কথাই যথেষ্ট। তাছাড়া "মিছা দারা সুত লয়ে মিছা সুখে সুখী হয়ে" ইত্যাদি পাঠকালে বিদ্যাপতির "তাতল সৈকতে" মনে পড়ে।

পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রের "এই অপরূপ তরুতলে। হেন মনে লয় করি তুলে পরি গলে।" পদটিকে যেমন একদিকে জ্ঞানদাসের "চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ"এর ছায়াপাত তেমনি অপরদিকে ব্রজাঙ্গনা কাব্যের 'নামিছে কদমমূলে' এর পূর্বাভাষ সুস্পষ্ট। বিস্তারিত আলোচনার জন্য গ্রন্থের শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের-এর ১৩৩ পৃঃ এবং ৪৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দেশে বিদেশে

॥ অতীন্দ্র ॥

যেসব মূল্যবোধের ও আদর্শনিষ্ঠার মধ্যে বাংলা একদিন গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তারই বিশ্বস্ত উত্তরসাধকদের আর একজন মহাকালের ক্রূর হাতে অপসৃত হলেন—তিনি ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সুনাম ছিল, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ; কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা আজকের এই অশিক্ষিত অমার্জিত স্বার্থদুষ্ট সুবিধাবাদী রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন তিনি তাঁর আদর্শকে; এই আদর্শ ছিল তাঁর জীবনসত্তার সহজ সংস্কারের মতো। বৈষয়িক পদ থেকে, বাহ্যিক খ্যাতি থেকে তাঁকে বরং চ্যুত করা সম্ভব ছিল, একটি সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত এবং হৃদয়াধিষ্ঠিত আদর্শ থেকে কিছুতেই নয়। বাংলার দুর্ভাগ্য, সম্প্রতি তিনি যে মহামূল্য কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, মহাকাল তা সম্পন্ন করতে দিলেন না। আজকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের ভূমিকা কেবল অস্বীকৃত নয়, উপহাসিতও বটে। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নামে যে সরকারী ভাষ্য বিশ্বজগতে প্রচারিত হচ্ছে তা ইচ্ছাকৃত তথ্যবিকৃতিতে অনুপ্রাণিত এবং প্রকৃত তথ্যাভাবে ইতিহাস-রচনা-ধর্মবিবর্জিত অসম্পূর্ণ রচনা মাত্র। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ বসু এনার্কিষ্ট পলিটিকাল থট সম্পর্কে এক গবেষণামূলক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডার বৃটিশ মিউজিয়ামে নথিপত্র পর্যালোচনা করছিলেন। ইচ্ছা ছিল, ইউরোপের অন্যান্য জ্ঞান ভাণ্ডারও মন্থন করবেন। গ্রন্থখানি বিশ্বেরই এক অপূর্ব সম্ভার হ'ত এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীতে যাঁদের প্রচলিত রাজভাষায় সন্ত্রাসবাদী বলা হয় তাঁদেরই বিশ্বইতিহাসে তিনি বাঙ্গালী "সন্ত্রাসবাদীদেরও" যথাযোগ্য ভূমিকা ও স্থান নির্দেশ করে দিতেন। কিন্তু পাকস্থলীতে ইতিমধ্যে ক্ষতরূপে মৃত্যু বাসা বেঁধেছিল; চিকিৎসা প্রচেষ্টায় সেবার মৃত্যু পলায়নপসরণ করে; দ্বিতীয়বার মৃত্যু আসে করোনারি থ্রম্বসিস রোগে।

১৭ই অক্টোবর অপরাহ্ণে ৫২ বছর বয়সে লণ্ডনের সেন্ট প্যানক্রাস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা জেলার মালখানগরে বসু পরিবারের এই সন্তান প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ্যাবস্থায় বাংলার বিপ্লবীদলে জড়িয়ে পড়েন ও কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে বি-এ পরীক্ষায় ঈশান স্কলারশিপ পান। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং প্রজা-সোস্যালিষ্ট দলের পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন।

॥ উদ্যত ॥

শক্তিমানেরা পরস্পরকে ধ্বংসের জন্য আয়ুধ উদ্যত রেখেছেন। রাশিয়া ও আমেরিকার পরমাণবিক বিস্ফোরণ চলেছে আকাশে ভূগর্ভে। রকেট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাঁরা ৩০শে কি ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে অস্ত্র পরীক্ষা শেষ করবেন। শেষ হবে ৫০ মেগাটনের একটি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে—এটি ৫ কোটি টন টি এন টির সমতুল্য। তাঁদের ১০০ মেগাটনের বোমা আছে; তা তাঁরা ছাড়বেন না—কেন না, এর বিস্ফোরণে তাঁদেরই ক্ষতি হতে পারে।

একই দিনের খবর ঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর পরমাণবিক ডুবো জাহাজ এথান অ্যালেন আজ ৯০ ফুট নীচে থেকে এর প্রথম পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্রটি সাফল্যের সঙ্গে নিক্ষেপ করেছে এবং সেটি ১২০০ মাইল দূরবর্তী লক্ষ্যভেদ করেছে। আর—

সোভিয়েট ইউনিয়ান গতকাল আরেকটি বহু পর্যায়ের 'অতি রকেট' সাফল্যের সঙ্গে নিক্ষেপ করেছে। অকুস্থল মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা। রকেটটি ১২ হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে।

সোভিয়েট অস্ত্র পরীক্ষার যে শেষ মারটি মারছে সেটি হচ্ছে ৫ কোটি টি এন টির সমতুল্য; তার অর্থ ১৯৪৫ সালে আমেরিকা হিরোসিমা-নাগাশাকিতে যে বোমা ছেড়েছিল (আর তাতে এক লক্ষ ২০ হাজার মানুষ মরেছিল) তার ২৫০০ গুণ বড়। ১৯৪১ সালে জার্মাণ বিমান বহর একদিন ১২০০ টন বোমা ফেলেছিল, মরেছিল ১৩০০ লোক; কিন্তু ১২ শত টন বোমা ৫০ মেগাটনের ·০০২৪ শতাংশ মাত্র। বৃটিশ ও মার্কিণ বিমানবহর জার্মাণ ও জার্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলে কিঞ্চিন্যূন ২০ লক্ষ টন বোমা ফেলেছিল; তাহচ্ছে এক মেগাটনের ২৫ ভাগের এক ভাগ।

অর্থাৎ, আমরা যে-কোনদিন (দিন নয়, মুহূর্তে) ধ্বংস হয়ে যেতে পারি—ধ্বংসের আয়ুধগুলো উদ্যত।

॥ উ থান্ত ॥

রাষ্ট্রসংঘে ব্রহ্মের প্রতিনিধি উ থান্ত সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ডের স্থলাভিষিক্ত হবেন—এ একরকম স্থির। সোভিয়েট রাশিয়া "ত্রয়ী" (ট্রইকা) সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগের যে-প্রস্তাব করেছিল তা তারা প্রত্যাহার করেছে। রাষ্ট্রসংঘে মার্কিণ প্রতিনিধি—মিঃ অ্যাডলাই স্টিভেনশন জানিয়েছেন যে, সেক্রেটারী জেনারেলের পদে উ থান্তের নিয়োগে সোভিয়েট রুশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি আছে। একটা বড় রকমের বিরোধ মিটল শুনে আশ্বস্ত হতে না হতেই এ খবরও পাওয়া যাচ্ছে যে, সেক্রেটারী জেনারেলের অধীনে কতজন আণ্ডার সেক্রেটারী থাকবেন এবং তাদের কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে নেয়া হবে এই নিয়ে বিরোধ আছে। তবে আলোচনা চলছে।

যাই হোক, মনে হচ্ছে উ থান্ত সকলেরই আস্থাভাজন। তিনি উদারপন্থী বলে পরিচিত। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি আলজিরিয়া সংক্রান্ত আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতি এবং কঙ্গো ম্যালিসী কমিশনেরও সভাপতি ছিলেন। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উ থান্ত ব্রহ্ম সরকারের প্রচার বিভাগের প্রধানকর্তা ছিলেন। দীর্ঘকাল ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ নুর অন্তরঙ্গ সহচর উ থান্ত বান্দুং ও বেলগ্রেড সম্মেলনে উ নু'র সঙ্গে ছিলেন। উ থান্তের বয়স এখন ৫২।

আশা করা যায়, "এশিয়ার আলো" বুদ্ধদেবের আশীর্বাণী উ থান্তের শান্তি প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলবে।

॥ শোচনীয় ॥

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি গাছের নীচে ন'জন নিরীহ মানুষ আরও সঙ্গীসাথীর জন্য অপেক্ষা করছিল;

তারা সবাই বিসর্জন দেখতে যাবে। ভদ্রেশ্বরের কাছাকাছি। এমন সময় অসংযত প্রবল বায়ুর মতো ওদের ওপর এসে পড়ল একটি প্রাইভেট মোটর গাড়ী। একটি তিন বছরের, একটি চার বছরের একটি ন'বছরের শিশু এবং ৩৩ বৎসর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক নিহত হয়। গাড়ীটা গুপ্তিপাড়া থেকে কলকাতায় আসছিল একেবারে পূর্ণবেগে এবং পূর্ণবেগেই গাড়ীটি ওদের ওপর এসে পড়ে। গাড়ীতে ড্রাইভার ছাড়া আরও পাঁচজন যাত্রী ছিল। খবরে দেখা যাচ্ছে, রাস্তায় বেশ ভীড় ছিল এবং এই শিশু ও নারীর এই আকস্মিক অপঘাত মৃত্যু ও রক্তপাত দেখে জনতা স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে ওঠে। ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু এ কি বীভৎস মৃত্যু। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডটি একটি মরণের রাস্তা হয়েছে। প্রায় প্রত্যহ এ রাস্তায় দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। তবু পরবর্তী গাড়ীর চালকেরা সংযত হন না। সম্ভবত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের মসৃণতায় কোনো গতির মাদকতা আছে যা গাড়ীর চালককে মাতাল করে তোলে এবং এমন গতিতে গাড়ী ছাড়ে যা তার আয়ত্তে থাকে না, দুর্ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে একজনের বেহিসেবী আচরণে চারজন মারা গেছে ওখানেই, আর যে পাঁচজন আহত হয়েছে তার মধ্যে একজনের অবস্থা উদ্বেগজনক। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে গতি সংযত করার কোনো বিধি-বিধান করা যায় না কি? এ যে নিবার্য-মৃত্যু।

॥ নোবেল ॥

অধ্যাপক জর্জ ফন বেকেসিকে এবার (১৯শে অক্টোবর) ভেষজ বিদ্যায় (মেডিসিনে) মৌলিক কৃতিত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। তাঁর জন্মস্থান হাঙ্গেরী। বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন।

তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তুটি হচ্ছে এই : বাইরের শব্দ-তরঙ্গ আমাদের অন্তঃকর্ণে আঘাত করলে কিভাবে তা মস্তিষ্কে স্নায়ুর আবেগে রূপান্তরিত হয় এবং শব্দ আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। স্বভাবতই এ থেকে আশা করা যায়, জীবের বাহ্যিক জগতের সঙ্গে জীবের দৈহিক ও মানসিক আন্তঃক্রিয়া বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি কর্তা-নিরপেক্ষ তত্ত্বের ওপর এবং আমাদের মনোজগতের ওপর প্রচুর আলোকপাত করবে। কান আমাদের অন্তঃজগতে বাহ্যিক জগতের খবর পৌঁছে দেবার অন্যতম একটি অপরিহার্য প্রত্যঙ্গ। তার একটা অংশের ইংরেজী নাম ককলিয়া (অন্তঃকর্ণ); তাতে এসে শব্দ তরঙ্গ আঘাত করে। তারপর কি হয়, মস্তিষ্কে কি ভাবে শব্দের চেতনা সৃষ্টি করে—এসবই মোটামুটি অনুমান-নির্ভর ছিল। অধ্যাপক বেকেসির গবেষণা অনুমানকে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।

॥ ভেরউর্ড ॥

দক্ষিণ আফ্রিকা রিপাবলিক হবার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ডাঃ ভেরউর্ডের ন্যাশানালিষ্ট দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত এই দলের আসন সংখ্যা হয়েছে ৯২, যে ১৫টির নির্বাচন ফলাফল বেরোতে বাকী আছে সে কটিও ন্যাশনালিষ্টরা পাবে আশা করা যাচ্ছে। প্রধান বিরোধীদলের আসন সংখ্যা ৪৯। প্রগ্রেসিভ পার্টি একটি এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন একটি। ডাঃ ভেরউর্ডের ভাষায় দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্তত পাঁচ বছরের জন্য "পাষাণতুল্য শ্বেতপ্রাধান্য" প্রতিষ্ঠিত হল। ন্যাশনালিষ্টরা চার বছর আগে যে ভোট পেয়েছিল তার তুলনায় এবারকার ভোট সংখ্যা হয়েছে শতকরা ৭টি বেশী। ভোট ও আসন সংখ্যা দিয়ে যদি জনমতের পরিমাপ করতে হয় তবে বলতে হয় ডাঃ ভেরউর্ডের ন্যাশানালিষ্ট দলে নির্বাচনে জনমতের প্রতিধ্বনি হয়েছে।

কিন্তু একই সংবাদে দেখা যাচ্ছে, একদিকে যখন শ্বেতকায়দের ভোটদান চলছে তখন ১২ জন আফ্রিকান নেতা কারাগারে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁদের এক বছর করে কারাদণ্ড হয়েছে। আফ্রিকান জনসাধারণের মধ্যে যে সরকার বিরোধী মনোভাব আছে এই বারোজন নেতাই তার মুখপাত্র। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তাঁরা অবৈধ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের লক্ষ্যসিদ্ধির প্রয়াসী। গত মে মাসে রিপাবলিক বিরোধী দিবস পালনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সদস্য। প্রথমদিন তাঁদের উকিল বলেছিলেন এ'দের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা যদি যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন হয় তবে তার মানে হবে অবাধ রাজনৈতিক চিন্তা ও আলোচনার নীতিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া। নির্বাচনের দিন (১৯শে অক্টোবর) তিনি বলেছেন, এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই নির্বাচন দিনে একপক্ষ যখন অবাধে তাদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করছে এবং তাদের শাসনকর্তৃপক্ষকে বেছে নিচ্ছে, তখন আর একপক্ষকে সভ্যতার প্রাণশক্তিস্বরূপ নির্দোষ ক্রিয়াকলাপের জন্য আদালতে আসামী বলে হাজির করানো হয়েছে।

॥ সো-চীন ॥

সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়াচীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক অনেকটা রৌদ্রছায়ার লুকোচুরির খেলার মতো। মস্কোতে যে এতবড় সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেস হ'ল চীনা সংবাদপত্রগুলো কার্যত তা বয়কট করেছে; অধিকাংশ সংবাদপত্রেই দশ লাইনের বেশী বেরোয়নি, তাও ভেতরের পাতায়। পার্টির খসড়া কর্মসূচী সম্পর্কে মঃ ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার উল্লেখ নেই; উল্লেখ নেই আলবেনিয়ান কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের নিন্দা, ৫০ মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ ও সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ বিরোধের কথা। সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসের এই অধিবেশনে খোলাখুলি আলবেনিয়ার নিন্দা চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই সমর্থন করেননি। তাঁর মতে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মতপার্থক্য "পরিবারের বাইরে" আনা উচিত হবে না। এসব মতপার্থক্য ধৈর্যের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নিরসন করা উচিত। তিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই (পরোক্ষে কিন্তু প্রকাশ্যে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করে) বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক শক্তির প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আছে তদ্দিন যুদ্ধাশঙ্কাও আছে। এই কথাটা নিয়েই কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়া ও চৌ-মাওর নয়াচীনের বিরোধ—যুদ্ধ অপরিহার্য কি পরিহার্য—সহাবস্থান অবস্থা কি সংগ্রাম? কিন্তু আমাদের ভাবনা হচ্ছে, যে বাদই হোক, সে-বাদের ভূমিকম্পগ্রস্ত পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির মুখ্য কারণ হতে পারে। চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের ওপর লোলুপ দৃষ্টি আজ এভারেস্টসম উত্তুঙ্গ হয়েছে। চীনের

প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এর একটি মার্কসীয় ব্যাখ্যা দেননি তাঁর বক্তৃতায়।

॥ সমবায় ॥

মোটর-যাত্রীদের কষ্টলাঘবের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আরও একটি ভাল কাজ করলেন। প্রাক্-যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধকালীন এবং খানিকটা যুদ্ধোত্তর-কালীন বাসযাত্রীদের মনে থাকবার কথা—অসহ্য ভিড় ও বাস-কণ্ডাক্টর ড্রাইভারদের অশালীন অসদ্ব্যবহার। রাজ্যকর্তৃপক্ষ যখন ঘোষণা করলেন তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে রাজ্য-পরিবহণ ব্যবস্থা করছেন তখন সকলেই তা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে। তারপর যখন সেগুলো সত্যিই বেরোলো তখন যাত্রীসাধারণ রাজ্য সরকারকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করল। আজ রাজ্য পরিবহণের কণ্ডাক্টরদের পূর্বের মতো সদাচরণ নেই এবং ড্রাইভাররা পথিকের পক্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠেছেন একথা সত্য এবং এর জন্যে বহুলাংশে দায়ী প্রশাসনিক দুর্বলতা—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজ্যপরিবহণের আবির্ভাব সেদিন এক কল্যাণের মতো নাগরিকদের ওপর বর্ষিত হয়েছিল। তারপর সদলবলে বাঙ্গালীদের কর্ম-সংস্থানের জন্য বেবী ট্যাক্সি আমদানী করালেন তখনও তা তেমনি কল্যাণরূপে এল; কিন্তু আমাদের চারিত্রিক দোষে আমরা সুনাম-রক্ষা করতে পারলাম না। রাজ্যপরিবহণ বিভাগীয় এক-শ্রেণীর কণ্ডাক্টরের ঔদাসীন্য বা অসদাচার এবং ড্রাইভারদের বেপরোয়াভাবের মতো এক-শ্রেণীর ট্যাক্সিওয়ালাও যাত্রীদের পীড়নের কারণ হয়ে পড়ল। ডাঃ রায় যাত্রী-সাধারণের সেই কষ্টলাঘবের জন্য তৃতীয় এক প্রচেষ্টায় হাত দিলেন। দুটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের হাতে কুড়িটি ট্যাক্সি দেবার ব্যবস্থা করে, তিনি বললেন, এরা যেন কখনো কোন যাত্রীকে প্রত্যাখ্যান না করে। প্রত্যেকটি সমবায় প্রতিষ্ঠানে ১০টি করে ট্যাক্সি ও ২৫ জন করে ড্রাইভার থাকবে। এই সমবায় সমিতি দুটিকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক ১,৩০,০০০ টাকা করে ঋণ দিয়েছে। ড্রাইভাররা প্রত্যেকে ১০০০ টাকা করে দিয়েছে। প্রত্যেক সমবায় প্রতিষ্ঠানে রাজ্যসরকারের অংশ আছে ২০,০০০ করে। ঠিক হয়েছে আয়ের ৭৫ শতাংশ ঋণ পরিশোধের জন্য মজুদ করা হবে; তিন বছরে ঋণ শোধ হবে। এক-একটি ট্যাক্সির গড় আয় ৭৫০্ টাকা। এইভাবে ৩০০ ট্যাক্সি ছাড়বেন রাজ্য-সরকার স্থির করেছেন।

॥ শিক্ষক ॥

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক সভায় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি বলে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

এই সভা উদ্বোধন করতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেন বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিকদের উপস্থিতি বিঘ্নস্বরূপ হয়ে পড়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচনের হাত রাজনীতিকদের অনেকখানি—কেননা, সিণ্ডিকেটের প্রায় অর্ধেকটাই জুড়ে আছেন রাজনীতিকেরা। সেনেটের অর্ধেক রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট এবং তাঁরা রাজনীতিক।

ডঃ সেনের একথা কী বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে; কেননা, রাজনীতিকদের হাত কোথায় যে গলেত নেই তা বলা শক্ত। কিন্তু ডঃ সেন আর যেসব কথা বলেছেন তাতে অনেকেই সায় দেবেন হয়তো। তিনি বলেছেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়—এই তিনটি স্তরের মধ্যে সংযোগের অভাব বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার এক বৈশিষ্ট্য। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু স্কুল ছাড়ার পর ছেলেরা আর কোন্ কাজে যাবে তার ব্যবস্থা কিছু করেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডের শিক্ষক ইউনিয়নের এক বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন তাঁদের মজুরী বিরোধ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে ২,০০০,০০০ শিক্ষককে সক্রিয় পন্থা অবলম্বনের জন্য রাজনৈতিক দলে যোগদানের আবেদন জানিয়েছেন।

॥ নির্বাচনী ॥

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ভেরউর্ড তাঁর এক নির্বাচনী সভায় ভারত-বিদ্বেষী যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তা অনেকের কৌতুকাবহ মনে হবে। তিনি বলেছেন, বৈষম্যমূলক আচরণ, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে আছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যেসব দেশের অবস্থা দক্ষিণ-আফ্রিকার চাইতেও হীনতর সে সব দেশই দক্ষিণ আফ্রিকাকে সর্বাধিক আক্রমণ করে থাকে। অথচ ভারতবর্ষে এমন বহু লোক আছে যাদের মাথার ওপর কোনো গৃহাচ্ছাদন নেই এবং তারা পথপার্শ্বে ঘুমোয়। কথা উঠেছে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার না দেওয়ায় তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে; কিন্তু এদের যদি আপনি পথ-খরচও দেন তবু এরা ভারতবর্ষে ফিরে যাবে না। বৈষম্যের কথা যা বলা হয় তা অন্তত ভারতবর্ষের চাইতে বেশী কিছু নয়। যখন তিনি লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁকে ৩০ লক্ষ শিখের পক্ষে বলতে অনুরোধ করা হয়; কেননা তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। সিংহল থেকে তামিলদের পক্ষ থেকেও তিনি এমনি আবেদন পেয়েছিলেন।

॥ ব্যাঙ ॥

ব্যাং—এবং ভারতীয় ব্যাং—ভারতের ডলার অভাব কতকাংশে দূর করছে, এই হচ্ছে এ সপ্তাহের সব চাইতে বড় খবর। ভাবছি, বাইওলজির ছাত্রদের প্রয়োজনে না টান পড়ে। মার্কিণ ভোজে এ এক অতি উপাদেয় খাদ্য। মার্কিণ আমদানীর তালিকায় ব্যাঙের পা শীর্ষস্থানীয়। এ বছর এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ ৮৬ হাজার পাউণ্ড ব্যাংএর পা আমেরিকায় রপ্তানী করেছে। এর দাম হচ্ছে কিঞ্চিদধিক ষাট হাজার মার্কিণ ডলার। আর যে দুটি দেশ আমেরিকায় ব্যাং রপ্তানী করে তারা হচ্ছে কিউবা আর জাপান। কিন্তু কিউবা কি এখন করে?—না, আমেরিকানরা কিউবান ব্যাং খায়? চিনি তো শুনেছি কিউবা থেকে না গিয়ে ভারতবর্ষ থেকে যাচ্ছে। তাহলে চিনি আর ব্যাং হল আমাদের মুদ্রার্জনের পণ্য। কিউবা থেকে গেছল ৪৭ আর জাপান থেকে সাত হাজার পাউণ্ড। অর্থাৎ আমরাই ব্যাংএর কারবারে প্রথম। আমাদের ভেজাল প্রবৃত্তি যদি না জাগে এবং আমরা যদি নকল ব্যাং চালাতে না চাই তবে কারবারটা বেশ চলতে পারে (অবশ্য আমেরিকার ভোজন-

বিলাসীরা যদি ভারতীয় ব্যাং ছেড়ে না দেন)। হতে পারে, ব্যাংএর দুর্ভিক্ষ ঘটে গেল, কেননা, প্রকৃতিনির্ভর এদেশ দুর্ভিক্ষের দেশ। এদ্দিন আমরা মাছের সরবরাহ প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেছি।

॥ মরুপথে ॥

এ মানুষেরই বলিষ্ঠ কথা, 'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা'। যদি হারিয়েও থাকে মানুষ তাকে উদ্ধার করেছে, আবার সেখানে জলধারা বইতে শুরু করেছে মানুষের প্রচেষ্টায়। সবাই জানে, রাজস্থান মরুভূমি। কিন্তু এখানে একটি খাল খুলতে গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বললেন, প্রকৃতি মানুষের পথে যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল, মানুষ তা অতিক্রম করল, জয় করল। তিনি বললেন, রাজস্থান বীর-গাথার দেশ; কিন্তু এর চাইতে বড় বীরত্বের কাহিনী আর কি হতে পারে? খালটি রাজস্থানে হলেও এ আমাদের জাতীয় গৌরব। আগামী ২০ বছরের ভেতরে এই মরুঅঞ্চলে দশ হাজার একর ভূমি উর্বর হবে এবং এখানকার তুলনায় ২০ গুণ লোক এখানে বসবাস করতে পারবে। শুধু খাল নয়, উন্নয়ন পরিকল্পনাটি এমনভাবেই করা হয়েছে যে, এখানে কৃষি হবে, শিল্প হবে, পশুপালন হবে। বনভূমি হবে, ছোট ছোট গ্রামের পত্তন হবে, ডাক-তার যোগাযোগ হবে, শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা হবে। খালটি সম্পূর্ণ হলে এটি পৃথিবীর বৃহত্তম সেচ-ব্যবস্থা হবে এমন কথাও উপ-রাষ্ট্রপতি বললেন।

প্রধান খালটা হবে ৪২৫ মাইল, পরিকল্পনা করেছেন শ্রীকানওয়ার সাঁই। হাড়িকে থেকে রামগড়। প্রথম পর্যায়ে ব্যয় হবে ৭৬ কোটি এবং শেষ হতে পারে ১৯৬৮-৬৯ সালে। তখন ২৫৬ মাইল অবধি খালটা কাটা হবে; কিছু শাখা-উপশাখাও থাকবে। প্রথম পর্যায়ে ১৬ লক্ষ একর, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৬ লক্ষ একরে সেচ হতে পারবে।

॥ গঙ্গা ॥

এক খবরে জানা গেল, গঙ্গায় জাহাজ চলাচলে যে বাধা আছে তা দূর করার জন্য ভারত সরকার একটি দৈত্যাকৃতি ড্রেজার আনাচ্ছেন। ড্রেজারটি আসবে আমেরিকা থেকে। কোন এক মার্কিণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিছু কথা-বার্তাও নাকি হয়েছে। সংবাদটি শুভ। কেননা, গঙ্গা পলি পড়ে ভরে যাচ্ছে বলে বড়ো জাহাজ কলকাতা বন্দরে ঢুকতে অসুবিধে বোধ করছে। অসুবিধে এই যে বড় জাহাজের পক্ষে নদীগর্ভের যে গভীরতা দরকার গঙ্গায় পলির পর পলি পড়ে তা হ্রাস পেয়ে থাকে। কিছু পলি অপসারণের ব্যবস্থা আছে। তা যথেষ্ট নয় বলে আপত্তিও শোনা যায়। মার্কিণী দৈত্যকায় ড্রেজারটি যদি গঙ্গা গর্ভের এ বাধা দূর করতে পারে তবে, কলকাতা ও কলকাতা বন্দরের কল্যাণের পক্ষে যে-কোন মূল্যে তা সংগ্রহ করা উচিত। কলকাতা ও কলকাতা বন্দর রক্ষার জন্য কোনো মূল্যই অত্যধিক নয়। ভারত সরকারের এ উদ্যোগ সার্থক হোক এই আমাদের কাম্য।

॥ চন্দ্র ॥

চন্দ্রলোকে যাবার ভাড়া স্থির হ'য়ে গেছে। বলাবাহুল্য, এ ট্রেণ-ভাড়া নয়, বিমান-ভাড়া। ১৯৬৮ সাল নাগাদ চন্দ্রলোক যাওয়া ও চন্দ্রলোক থেকে ফিরে আসার ব্যবস্থা হতে পারে। রিটার্ণ টিকিটও দেওয়া হবে এবং সে টিকিটের দাম বেশ কম করেই ধরা হয়েছে—ডলারে দিলে এক কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। বছর সাতেক পরে ভাড়া আরও কিছু কমবে। এই ধরুন এক কোটি টাকা। কিছু মাল যদি নিতে চান তো পাউণ্ড পিছু যা সামান্য ভাড়া হবে তা আমাদের পাঁচ হাজার টাকার মতো। তা এখনও তো ধরুন কত লোকেই বিলেত যায় না, আমরাও না হয় কোটিপতিদের মুখে ঝাল খাব।

॥ মৃত্যু ॥

এ সপ্তাহে অনেক মৃত্যু হল, এমন মৃত্যু যা জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আমরণ বিপ্লবী অকৃতদার শ্রীকেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং সত্যাগ্রহ-প্রতীক ডাঃ সুরেশ-চন্দ্র ব্যানার্জির মৃত্যু।

শ্রীসেনগুপ্তের স্বাস্থ্য কোনকালেই ভাল ছিল না; তাঁর শীর্ণ দেহের অভ্যন্তরে একটি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী মন সক্রিয় ছিল। তিনি অনুশীলন সমিতির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অন্যতম; কিন্তু শীর্ষ-স্থানের ঔদ্ধত্য তাঁকে কখনও আশ্রয় করতে পারেনি। উপার্জন বলতে তাঁরই কিছু উপার্জন ছিল, কিন্তু সে উপার্জনের কোন কিছুই নিজের বলে দাবী করতে তাঁকে দেখা যায়নি। দল মানে দলের লোক। এই দলের লোক না খেয়ে বা না পরে আছে এ তথ্য তাঁকে যেমন বেদনা দিত এমন আর কাউকে দিত কিনা সন্দেহ। নিজের প্রয়োজনের মধ্যে ধুতি জামা অপরিহার্য বলেই রাখতেন, বাড়তি কিছুই দেখা যেত না। বন্দী-জীবনের ভাতাও তিনি অপরের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যয় করতেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে তিনি সম্ভবত এই দলের মধ্যে শীর্ষতম ছিলেন। বস্তুত, তাঁর ঔদার্য, তাঁর নিরাসক্তি, তাঁর মেধা এবং তাঁর অপরিমেয় স্নেহ—যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তাদের মুগ্ধ করেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান জুড়ে ছিলেন অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ অবধি তিনি রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে কিছুদিন কেন্দ্রীয় আইনসভায়; স্বাধীনতার পরে কিছুদিন রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকও ছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর পান্ডিত্য ছিল গভীর, কীর্তন-গায়ক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি অনিবার্য মৃত্যুর আলিঙ্গনে বিলীন হলেন বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অক্ষয় ও অমর হয়ে থাকবে।

সত্যাগ্রহীর জীবন কি? এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায় ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে দেখিয়ে দিয়ে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের মানুষ তিনি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম। গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে থাকতে সুরেশচন্দ্রের গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে তাঁর এম-বি ডিগ্রী নেওয়া হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর ডাক্তার হিসাবে কমিশনও পান। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে এ পদ তিনি ছেড়ে দেন। কংগ্রেসে ছিলেন। চাঁদপুরে চা-বাগান ধর্মঘটিদের মধ্যে ছিলেন। রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতায় এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। তারপর অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে আবার কারাদন্ড। মেরুদণ্ডে টি বি। কিন্তু অক্লান্ত সত্যাগ্রহী। ১৯৩৭এ বিধানসভায় নির্বাচিত। ১৯৫২ অবধি। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। সুভাষবিরোধী পন্থপ্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের মতানৈক্য হয় ১৯৩৯। ১৯৪০এ আবার কারাদন্ড। ১৯৪২ সালে আবার। ১৯৪৭ সালে নিঃ ভাঃ জাঃ ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৪৮ সালে ঘোষ মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হন। ১৯৫০ থেকে বিরোধী পক্ষে। কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি—তারপর প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি।

॥ ঘরে ॥

৬ই অক্টোবর—১৯শে আশ্বিন ঃ 'আপন অখণ্ডত্ব রক্ষাকল্পে ভারতকে অস্ত্রসজ্জিত হইতে হইবে'—দিল্লীতে আয়োজিত হিন্দু সম্মেলনে সভাপতি-রূপে ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (প্রাক্তন বিচারপতি) ভাষণ—পাকিস্তান ও চীনের আক্রমণ প্রত্যাহারের প্রশ্নে দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ।

৭ই অক্টোবর—২০শে আশ্বিন ঃ উত্তর প্রদেশের প্রধান প্রধান শহরে স্কুল-কলেজ বন্ধ—কয়েকটি এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী—আলিগড়ের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

৮ই অক্টোবর—২১শে আশ্বিন ঃ মীরাটে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ১৩ ব্যক্তি নিহত—শহরে পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনীর অবিরাম টহল—তিনদিনে পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

৯ই অক্টোবর—২২শে আশ্বিন ঃ কলিকাতার উন্নয়ন প্রশ্নে বিধানসভা ভবনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গ্যালব্রেথের নিবিড় বৈঠক।

বিহারের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা ও বর্ষণে প্রায় এক সহস্র নর-নারীর প্রাণ-হানির সংবাদ।

১০ই অক্টোবর—২৩শে আশ্বিন ঃ তৃতীয় পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক) রূপায়ণের জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক অর্থ লাভের আশা—আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশ সফরান্তে দিল্লী ফিরিয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র বিবৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের ষড় বামপন্থী জোটেও শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গন — আসন-বন্টনের প্রশ্নে মতৈক্যের অভাবে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দুইটি স্বতন্ত্র প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ।

১১ই অক্টোবর—২৪শে আশ্বিন ঃ বিহারের অভূতপূর্ব বন্যায় সর্বহারাদের মুক্তহস্তে সাহায্য করার আহ্বান—রাজ্যপাল ডাঃ জাকির হোসেন ও মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত ঝা'র যৌথ আবেদন।

১২ই অক্টোবর—২৫শে আশ্বিন ঃ প্রবীণ জননায়ক ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৭৬) কলিকাতায় জীবনদীপ নির্বাণ।

শ্রীরামপুরের অদূরে মাহেশে ডাকোটা বিমান দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত ও সাতজন আহত।

১৩ই অক্টোবর—২৬শে আশ্বিন ঃ ভারতীয় রেলওয়েসমূহের অগ্রগতির জন্য ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ—বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরী সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা।

১৪ই অক্টোবর—২৭শে আশ্বিন ঃ চিত্তরঞ্জনে নির্মিত ভারতের প্রথম বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন 'লোকমান্য'কে গতিদান —প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

১৫ই অক্টোবর—২৮শে আশ্বিন ঃ বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী পুরুলিয়া লোক-সেবক সঙ্ঘের নেতা শ্রীঅতুল ঘোষের (৮১) লোকান্তর।

স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের দাবীতে ২৪শে অক্টোবর সমগ্র আসামে বিক্ষোভ অভিযান—পাহাড়িয়া নেতৃ-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৬ই অক্টোবর—২৯শে আশ্বিন ঃ প্রলয়ংকর বন্যার তাণ্ডবে বিহারের চারিটি জেলার (পাটনা, ভাগলপুর, গয়া ও মুঙ্গের) অপূরণীয় ক্ষতি—একমাত্র মুঙ্গের জেলাতেই ৫ শতাধিক নরনারীর প্রাণহানি ও ৮০ হাজার গৃহ বিধ্বস্ত।

১৭ই অক্টোবর—৩০শে আশ্বিন ঃ আমেরিকায় ভারতীয় চিনি সরবরাহ ও ভারতে মার্কিণ তুলার মজুতকরণ প্রশ্ন —দিল্লীতে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীপাতিলের সহিত মার্কিণ কৃষিসচিব মিঃ ফ্রীম্যানের আলোচনা।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও পার্লামেন্ট সদস্য ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসুর (৫২) লন্ডনের হাসপাতালে পরলোকগমন।

১৮ই অক্টোবর—১লা কার্তিক ঃ মুঙ্গের জেলায় (বিহার) আবার দ্রুত গঙ্গার জলস্ফীতি—পাটনা জেলাতেও গঙ্গায় জলোচ্ছ্বাস ও জনগণের উদ্বেগ।

॥ বাইরে ॥

৬ই অক্টোবর—১৯শে আশ্বিন ঃ আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সমমর্যাদার ভিত্তিতে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত।

হোয়াইট হাউসে (ওয়াশিংটন) কেনেডি-গ্রোমিকো (মার্কিণ প্রেসিডেন্ট ও সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী) দুই ঘন্টা-ব্যাপী বৈঠক।

৭ই অক্টোবর—২০শে আশ্বিন ঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সিরিয়ার নূতন সরকারকে স্বীকার।

৮ই অক্টোবর—২১শে আশ্বিন ঃ নিরপেক্ষ প্রিন্স সুভান্না ফুমাকে লাওসের প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত—কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে প্রিন্সত্রয়ের মধ্যে মতৈক্য।

৯ই অক্টোবর—২২শে আশ্বিন ঃ পূর্ব জার্মাণীতে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত কম্যুনিষ্ট দেশসমূহের ২২ ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ—সোভিয়েট পারমাণবিক রকেট-বাহিনীর নেতৃত্বে বৃহত্তম মহড়া।

১০ই অক্টোবর—২৩শে আশ্বিন ঃ 'বার্লিন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান অবশ্যই সম্ভব'—লণ্ডন সফরকালে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর আশা প্রকাশ।

১১ই অক্টোবর—২৪শে আশ্বিন ঃ 'পারস্পারিক সম্পর্কগত উত্তেজনা প্রশমনে আমেরিকার সহিত আলোচনা চালাইতে চীন আগ্রহশীল'—চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল চেন ই'র বিবৃতি।

১২ই অক্টোবর—২৫শে আশ্বিন ঃ 'বার্লিন সমস্যা অবিলম্বে মিটিয়া যাইবার আশা নাই'—গ্রোমিকোর সহিত বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে মার্কিণ প্রেসিডেন্টের (কেনেডি) মন্তব্য।

১৩ই অক্টোবর—২৬শে আশ্বিন ঃ 'পাঁচটি সর্তে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত চুক্তি (জার্মাণ ও অন্যান্য প্রশ্নে) করিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তুত'—ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নিকট লিখিত পত্রে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

১৪ই অক্টোবর—২৭শে আশ্বিন ঃ রাষ্ট্রসংঘ প্রতিনিধি ও শোম্বের (কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট) মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত—উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দী বিনিময়ের ব্যবস্থা।

১৫ই অক্টোবর—২৮শে আশ্বিন ঃ ভারতীয় এলাকাভুক্ত কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাকিস্তানী চক্রান্তের কথা—চীনের সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে 'আজাদ কাশ্মীর' প্রেসিডেন্ট খুরশীদের উদ্যোগ।

১৬ই অক্টোবর—২৯শে আশ্বিন ঃ রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে উ থান্ট (ব্রহ্মের প্রতিনিধি) —সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সম্মতি।

রাষ্ট্রসংঘ ও কাতাঙ্গার মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্দী-বিনিময় স্থগিত।

১৭ই অক্টোবর—৩০শে আশ্বিন ঃ 'পাশ্চাত্য গোষ্ঠী মীমাংসার আগ্রহ দেখাইলে রাশিয়া এই বৎসরের মধ্যে জার্মাণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দাবী জানাইবে না'—মস্কো-এ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের ভাষণ।

১৮ই অক্টোবর—১লা কার্তিক ঃ প্রস্তাবিত মেগাটন হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ —সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আবেদন।

অভয়ঙ্কর

॥ দেশে দেশে ॥
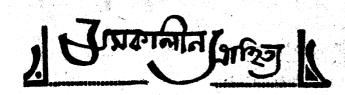
আর একটি শারদোৎসব শেষ হ'ল। আনন্দ, উত্তেজনা ও উন্মাদনার পর আজ আবার নতুন উদ্যম নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হবে, আবার আর এক শারদোৎসবের মুখ চেয়ে।

'অমৃত'-র পাঠক-পাঠিকাদের যথারীতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি, তাঁদের জীবন মধুময় হোক, আনন্দ-উজ্জ্বল হোক, প্রাণময় হোক।

এই উৎসব বাংলা দেশের জাতীয় উৎসব, তাই এই উৎসবকে ঘিরে এত আনন্দ, এমন স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব-আয়োজন।

শুধু কি প্রতিমার অলংকরণ, পুজো এবং বিসর্জনেই এই উৎসবের পরিসমাপ্তি, এর সংগে ঘিরে আছে অবকাশ ও অবসরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলার এক অপরিসীম উৎসাহ।

শরৎকালে নাকি রাজারা দিগ্বিজয়ে যেতেন, মৃগয়ায় বেরোতেন, অর্থাৎ আউটিং-এ যেতেন। বাঙালী, বিত্তের মাপকাঠিতে না হলেও চিত্তে রাজাদের চাইতে কম যায় না। তাই এই ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যে গ্রন্থটি বেদ-গীতা বাইবেলবৎ বাঙালীর হাতে শোভা পায় তার নাম টাইম-টেবল।

এই সময় গৌড়জনদের মনে প্রশ্ন জাগে কোথায় যাওয়া যায়! শৈলশৃঙ্গ, তীর্থধাম, স্বাস্থ্যাবাস। শৈলশৃঙ্গের মধ্যে দার্জিলিঙের দিকে যাওয়া কঠিন, রেল-পথে অনেক সময় লাগে, আকাশ-পথে যাত্রা করাই ভালো। অন্যদিকে অবশ্য নৈনীতাল, দেরাদুন, হরিদ্বার আছে। ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তীর্থযাত্রা করতে হলে আহার এবং ঔষধ দুই-ই হয়। ভ্রমণ-কাম-তীর্থ, যদি পুরী, হরিদ্বার, বারাণসী কিংবা দক্ষিণ ভারতে যাওয়া যায়।

শুধু যাওয়া নয়, সেইসব স্থানে আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থাও চাই। সঙ্গতিসম্পন্নের জন্য আছে হোটেলের উদার উষ্ণ আলিঙ্গন, কিন্তু মধ্যবিত্ত খোঁজেন প্রবাসী আত্মীয়ের নিরাপদ আশ্রয়। সেদিক থেকে প্রবাসী বাঙালী এই কালটায় একটু বিব্রত থাকেন। অতিথিদের মধ্যে বহুদিন বিস্মৃত রাণাঘাটের মাসি থেকে, স্কুলে এক ক্লাসে পড়া বাল্যবন্ধুও এই সময় রেজিমেণ্ট নিয়ে পরিচিত গৃহে হানা দেন।

তাই প্রশ্ন ওঠে কোথায় যাওয়া যায়। পরশুরাম বলেছেন—"বাংলার নদ-নদী, ঝোঁপ-ঝাড়, পল্লী-কুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানা-পুকুর হইতে উত্থিত যুঁইফুলের গন্ধ—এসব অতি স্নিগ্ধ কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া চলিতে। পাঞ্জাব মেল সন্-সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তাল গাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম—পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম, পুরী-কচৌড়ি, রোটি-কাবাব, dinner Sir, at Shikohabad? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রামের খুঁটি ছুটিয়া পালাইতেছে, দুপাশে আকের ক্ষেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট-ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর, অতি দূরের শ্যামায়মান বনানীকে ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়ে এক ঝলক উগ্র-মধুর ছাতিমফুলের গন্ধ।"

পরশুরাম যে ছবি এঁকেছেন—তার সংগে রেলপথের যাত্রী মাত্রেই পরিচিত। আজ থেকে প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর আগে পরশুরামের এই 'কচি সংসদ' গল্পটি লিখিত হয়েছিল। ইদানীং কাল সফরের সুবিধা আরো কমে হয়েছে, গাড়ির ভীড় আছে তার ওপর উঁচু ক্লাশে টিকিট পাওয়া দুষ্কর, পয়সা আছে, তবু পুরী-কচৌড়ীও মেলে না, ডিনারের আশা 'চিরকুমার সভার' দারুকেশ্বরদের মত সুদূর পরাহত—তবু বাঙালী মাত্রেই কল্পনা করতে ভালো-বাসেন—"গাড়ির অঙ্গে-অঙ্গে লোহা-লক্কড়ে চাকার ঠোকরে ঝিঞ্ঝির ঝাঞ্ঝার ঝঞ্ঝনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন অস্ত্, ওয়া হমীন্ অস্ত।"

হমীন্ অস্ত্—এই সেই স্বর্গপুর! পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তাহলে তা এইখানে, অর্থাৎ ট্রেনের কামরায়, রেল-ভ্রমণে, অর্থাৎ এই শারদীয় অবকাশে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ায়।

বেরিয়ে পড়ার পথে অনেক বাধা, অর্থ থাকলেও অনর্থ কম নয়, টিকিট কাটা থেকে সুরু করে হাওড়া বা শিয়ালদায় ফিরে এসে ট্যাকসী ধরে বাড়ি ফেরা সবটাই বেশ কঠিন। বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই, কারণ এসব কথা সবাই জানেন। প্রত্যেকে আমরা পরের তরে, ঘরে ঘরে গৃহিণীরা 'বলয় বাজায়ে, বাক্স সাজায়ে' কাঁদবার জন্য রেডী হয়ে থাকেন, এইসব কারণে সব-চেয়ে সহজ এবং সুগম পন্থা একটা স্থির করা গেছে, মনসা যদি স্বর্গ যাত্রা করা সম্ভব হয়, তাহলে টাইম-টেবল হাতে নিয়ে আর ভ্রমণকাহিনী পাঠ করে ছুটির আনন্দটা কাটিয়ে দেওয়া অনেক সহজ।

বাঙালীর মত ভ্রমণ-প্রিয় ভারতীয়-দের মধ্যে আর কোনো জাতি নেই। তীর্থযাত্রী বা সৌখীন সফরকারীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। বাঙালীর চিত্তে আছে রোমান্স ও এ্যাডভেঞ্চারের মাদকতা, তাই বাঙালী ঘর ছাড়ে, বাঙালী বিজয় সিংহের অভিযান থেকেই এই ঐতিহ্যের সুরু। তারপর বৌদ্ধ যুগে নেপাল-তিব্বত চীন সর্বত্র বাঙালী অভিযাত্রীর পদচিহ্ন পড়েছে। তাঁরা অবশ্য ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেননি।

ভ্রমণ সচেতনত্ব-থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণ-সাহিত্য ঠিকমত গড়ে ওঠেনি বাংলা সাহিত্যে অনেক কাল। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' 'য়ুরোপযাত্রী' 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', এক হিসাবে সর্বপ্রথম উল্লেখ-যোগ্য ভ্রমণকথা। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হল জলধর সেনের 'হিমালয়'। জলধর সেন দীর্ঘকাল ভ্রমণ-সাহিত্যের লেখক হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। সেকালে এমন কি কুড়ি-বাইশ বছর আগেও 'বিন্ধ্যাচলে কয়েক সপ্তাহ', 'বিহারে কয়দিন' জাতীয়

ভ্রমণকথা সাময়িক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে।

ভ্রমণ-সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল। তাঁর চরিত্রে আছে পরিব্রাজকের গুণ। কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি পটু, ভ্রমণের কষ্ট তাঁর কাছে কষ্টই নয়, এতটুকু সুযোগ পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়েন দেশ-ভ্রমণে। 'মহা-প্রস্থানের পথে' প্রবোধকুমারের পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের রচনা। এ ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে কিঞ্চিৎ রোমান্স সংযুক্ত থাকায়, অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রবোধ-কুমার রোমান্সধর্মী কাহিনীর লেখক, সুতরাং হয়ত 'মহাপ্রস্থানের পথে'র মধ্যে কিছু কল্পনা-বিলাসের অবকাশ আছে এই তাঁদের ধারণা। প্রবোধকুমারের 'মহা-প্রস্থানের পথে'র চরিত্রাবলী কিন্তু নিছক কল্পনা মাত্র নয়। রক্ত-মাংসে সেই সব চরিত্রের দু-একজনকে স্বচক্ষে দেখেছেন এমন ব্যক্তিও আজো বর্তমান। যাই হোক যে কোনো কারণেই হোক প্রবোধকুমারের ভ্রমণকথা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর 'দেবতাত্মা হিমালয়' আর একটি জনপ্রিয় ভ্রমণগ্রন্থ। সব রকমের জন-প্রিয়তার আর একটি নিরিখ হল অনুকরণ। প্রবোধকুমারের ভ্রমণকাহিনীর অনুকরণে আরো অনেক হিমালয় এবং অন্যান্য অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

আমাদের দেশের যাঁরা অতি বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী লিখতে পারতেন তাঁদের নাম যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, মানবেন্দ্র নাথ রায়, ও সুভাষচন্দ্র বসু। দুঃখের বিষয় এ'রা তিনজনেই নিজেদের কথা লেখেননি। স্বামীজির কথা জানা গেছে তাঁর সম-সাময়িকদের ডায়েরী বা চিঠি-পত্র থেকে, মানবেন্দ্রনাথ রায় স্বয়ং আত্মচরিত লিখলেও তাঁর পলায়নের কাহিনী আজো অজ্ঞাত, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানরহস্য একমাত্র উত্তমচাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায়। এই তিনটি মানুষের তীর্থযাত্রা বিভিন্ন ধারায় হলেও তার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব ছিল।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর মার্কিণ যাত্রায় যে বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা 'তরুণের অভিসার' নামে একটি সাময়িকপত্রে অনূদিত হয়ে কিছুদিন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থা-কারে পাওয়া যায় না। মাইকেল মধুসূদন লিখতে পারতেন কিন্তু লেখেননি।

আরো অনেকেই অনেক বিপ্লবী বাঙালী তাঁদের স্বদেশ কিংবা বিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেননি।

ডাঃ শরৎচন্দ্র বসাকের 'ভূ-পর্যটন' সেকালের একটি বিশিষ্ট ভ্রমণকাহিনী। শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি ডায়েরীতে পশ্চিমের কিছু কথা পাওয়া যায়।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ" ও "হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর" ভ্রমণ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। প্রমোদ কুমার স্বয়ং শিল্পী। তিনি অনেক স্কেচ এই গ্রন্থাবলীতে সংযুক্ত করায় গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' নামক গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের তান্ত্রিক পীঠ-স্থান ও সেখানকার সাধু-সন্তের কথা অতিশয় মনোরম ভঙ্গিতে লিখিত। সত্য-চরণ শাস্ত্রীর 'কৈলাস ও মানস সরোবর' একটি সুন্দর গ্রন্থ।

বিদেশ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'। রাশিয়া সম্পর্কে গ্রন্থটি আজো একটি আদর্শ-ভ্রমণ-কথা হিসাবে স্বীকৃত। ইদানীং কালে প্রকাশিত অন্নদাশংকর রায়ের ও মনোজ বসুর 'সোভিয়েতের দেশে দেশে', 'চীন দেখে এলাম' ও 'নতুন ইউ-রোপ ও নতুন মানুষ' দিলীপকুমার রায়ের "দেশে দেশে চলি উড়ে" প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথা-সাহি-ত্যিক মনীন্দ্রলাল বসু তাঁর য়ুরোপের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছেন কিন্তু বোধকরি তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। নরেন্দ্র দেবের 'য়ুরোপ-ভ্রমণ কাহিনী'ও সুখপাঠ্য, আর একটি চমৎকার ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন নাট্যকার শচীন্দ্র-নাথ সেনগুপ্ত তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে। গ্রন্থটি এতদিনে হয়ত প্রকাশিত হয়েছে। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।

আজকের পৃথিবী অনেক ছোট হয়েছে 'জেট, বোয়িং' ইত্যাদি ধরণের বিমানের কল্যাণে সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে রাত্রে য়ুরোপের যে কোনো অঞ্চলে বসে ডিনার খাওয়া যায়। তাই ভ্রমণের পথকষ্ট কমেছে সেই সঙ্গে আনন্দ। আজ সুদূর অঞ্চলেও বাঙালী ভ্রমণে ও কার্যব্যপদেশে যাতায়াত করছেন শ্যামবাজার—বালীগঞ্জের মত। সুতরাং বিদেশ ভ্রমণের গ্লামারও সেই সঙ্গে কমেছে। তবু টাইম টেবল দেখে বা ঘরে বসে বিচিত্র ভ্রমণ কথা পাঠ করে 'ওয়া হমীন অস্তু' বলতে বাধা কি। টিকেটের খরচটা ত' বাঁচল সেই সঙ্গে পথের কষ্ট, পাথেয় শুধু অর্থ নয় সামর্থও। তাই এই শরৎকালে মন যখন চায় ধরিত্রীর বক্ষভেদ করে সন্ সন্ করে সগর্জনে ছুটতে তখন বাড়িতে বসে একখানি সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী পাঠ করা অনেক ভালো। দুধের স্বাদ যে ঘোলেও মেটে—এ তার একটি অপরূপ নমুনা মাত্র।

নতুন বই

যদি জানতেম—(উপন্যাস) : উপেন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক : গ্রন্থশ্রী লিমিটেড, ৪৬।৫বি, বালি-গঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯। দাম : চার টাকা।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি জনপ্রিয় নাম। দীর্ঘকাল বঙ্গ সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে সেবা করে তিনি কিছুকাল আগে লোকান্তরিত হয়েছেন। 'গল্পভারতী' পত্রিকায় 'মানব সমিতি' নামে তিনি একটি উপন্যাস লেখেন মৃত্যুর কিছু আগে, এবং মৃত্যুর পূর্বে সেটিকে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশের উপযোগী করে 'যদি জানতেম' এই নামকরণ করেন; সেই উপন্যাসটি এতদিনে প্রকাশিত হয়েছে। আদর্শবাদী উপন্যাস। মাধবগঞ্জের হিন্দু মুসলমানের মিলিত-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিল—'তাঁর আদর্শ হচ্ছে এক ঈশ্বর, এক পৃথিবী এক মানব জাতি।' এই তার 'মানব সমিতি'র আদর্শ। প্রতিষ্ঠা, কবির সাহেব ও সুলং

ভান এই তিনটি চরিত্র চমৎকার ফুটেছে। রতন চৌধুরী দুর্দান্ত আর শক্তিশালী লোক, প্রতিষ্ঠাকে বিয়ে করবার চেষ্টায় নিষ্ফল হওয়ায় সে অসন্তুষ্ট। কবির সাহেব লঞ্চে প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে পালিয়ে আসছিলেন ইসমাইলপুরে এমন সময় রতন চৌধুরী আক্রমণ করল। কবির সাহেব বল্লেন—পাষণ্ড চৌধুরী! প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে চলেছি এই লঞ্চে। কিন্তু সে বলে ওঠে—মিথ্যা ভাঁওতায় ভুলি না। স্বচক্ষে চিড়িয়া দেখব। কবির সাহেব ডাকলেন প্রতিষ্ঠাকে, একবার পাশে এসে দাঁড়াও। প্রতিষ্ঠার মুখে টর্চ ফেলে দেখল চৌধুরী—তারপর 'দুম' করে আওয়াজ হল, 'ইয়া আল্লাহ' বলে কবির সাহেব লঞ্চের পাটাতনে শুয়ে পড়লেন।' কবির আহমেদকে শেষপর্যন্ত বাঁচান যায়নি। মৃত্যুর সময় তিনি বললেন রেখে গেলাম যা কিছু সম্পত্তি তোমাকে আর সুলতানকে দিয়ে গেলাম। আমাকে তোমাদের মানব সমিতির সভ্য করে নাও। প্রতিষ্ঠা হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিল আর সেই জীবনের যাত্রা পথে পেয়েছে কবির সাহেবের মত উন্নত চরিত্রের মানুষকে। 'যদি জানতেম' উপন্যাসটি এই জন্য সুন্দর ফুটে উঠেছে। উপেন্দ্রনাথের সরস লিখনভঙ্গীর জন্য কাহিনী এতটুকু শ্লথ হয়ে পড়েনি। পাঠকের আগ্রহ শেষপর্যন্ত জাগ্রত থাকে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুরুচিসঙ্গত।

সমন্বয় মার্গ —(প্রবন্ধ) শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম—৪·৫০ টাকা।

শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় 'নব বিধান' নিয়ে গবেষণা সুরু করেন প্রায় একত্রিশ বছর পূর্বে, ইতিমধ্যে তিনি প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদির পুনর্মুদ্রণ করেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে প্রবর্তিত হয়ে কালপ্রভাবে তা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের প্রভাবে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শাক্যমুনিচরিত ও নির্বানতত্ত্ব রচিত হয়। এই সব ধর্মানুসন্ধানতত্ত্ব ও তথ্যাদি সমন্বয়ে সতীকুমার এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী বৌদ্ধ চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে গবেষণা করেছেন ও বৌদ্ধযোগ-সাধনা ও নির্বানতত্ত্ব কেশবচন্দ্র তাঁর জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন সেই সমন্বয়সাধনার ইতিহাস বিধৃত করেছেন সতীকুমার তাঁর এই মহৎ গ্রন্থে। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে বহু মূল্যবান গ্রন্থের নির্যাস ও বহু মনীষীর মতামত গ্রন্থকার অশেষ ক্লেশসহকারে সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে কেশবচন্দ্র সমন্বয়বাদ যখন প্রচার করেন তা নিছক ভাবালুতা বলে উপহাসিত হয়েছিল। জীবনের বিভিন্ন স্তরে ও ক্ষেত্রে সমন্বয় মার্গের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাব আজ পরিস্ফুট। ধর্মে-ধর্মে সমন্বয় কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলনীতি। এই কারণেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ সম্ভব হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সমন্বয়বাদী। বহু মানবের বহু সাধনার ধারাকে তিনি এক করার প্রচেষ্টা করে গেছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পূর্ণ ধর্ম লাভের উদ্দেশ্যে যে সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করেন 'সমন্বয় মার্গে' আছে তার ইতিহাস। গ্রন্থটি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্মের পরিচয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্মের বিদেশে অভিযানের কথা ও তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমন্বয়সাধনার পরিলেখ। চতুর্থ অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়-অধ্যয়নের বিস্তৃত ইতিহাস। পঞ্চম অধ্যায়ে নববিধান সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম এবং সর্বশেষে নববিধান সাহিত্য সংকলন ও লেখকদের পরিচয় আছে। প্রায় আটখানি প্লেট সংযুক্ত এই মূল্যবান গ্রন্থটির দাম সাড়ে চার টাকা অত্যন্ত সুলভ মনে হয়।

কন্যা কলঙ্ক কথা —(রহস্যোপন্যাস) গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। প্রকাশক : বাক সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু অতি অল্প বয়সেই সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করেন বিভিন্ন ধরণের এক্সপেরিমেন্টমূলক রচনার মাধ্যমে। দীর্ঘদিন পূর্বে তিনি 'মহাভারত' নামে একটি আশ্চর্য গল্প লিখেছিলেন মনে আছে। 'কন্যাকলঙ্ক কথা' নামক রহস্যোপন্যাসে গৌরাঙ্গপ্রসাদ আর একটি পরীক্ষা চালিয়েছেন। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থটি সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা উধৃত করার প্রয়োজন আছে. তিনি বলেছেন—'আমাদের দেশে প্রাইভেট ডিটেকটিভ নেই অথচ সেই নিয়েই আমাদের ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা হয়। তুমি আমাদের পুলিস বিভাগের অনুসন্ধান ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছ —তাতেই তুমি সার্থক হবার সূত্রটি পেয়েছ।' কথাটি ঠিক। একে ডিটেকটিভ গল্প, তার ওপর অবাস্তব পরিবেশ পাঠকচিত্তে এতটুকু দাগ কাটে না। 'কন্যাকলঙ্ক কথা' গুপ্তভায়ার দপ্তরের ইতিহাস। সন্ধ্যাকে খুন করার জন্য অমিয় চৌধুরীর উদ্দেশ্যটা কি তা শেষ পর্যন্ত না পড়লে বোঝা যায় না। সাহিত্যরসসমৃদ্ধ এই রহস্যোপন্যাসের জন্য লেখককে ধন্যবাদ। মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

শিক্ষা-বিচিত্রা—(শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ) —শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম —৪·৫০ টাকা।

সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী নিখিলরঞ্জন রায় দীর্ঘকাল সমাজ-শিক্ষণের কর্মে লিপ্ত। 'শিক্ষা-বিচিত্রা' তাঁর গভীর অভিজ্ঞতার ফল। শিক্ষা যুগের দুই প্রান্ত পুরুষ মহামতি দার্শনিক প্লেটো ও মার্কিন শিক্ষাচার্য জন ডিউই সম্পর্কে আলোচনা করে এই গ্রন্থটি আরম্ভ করেছেন লেখক। শিক্ষা ও মনের মুক্তি, শিক্ষা সৃজনধর্মী, শিল্পশিক্ষার বুনিয়াদ, শিক্ষকের সামাজিক মান, স্কুল পরিদর্শকের ভূমিকা, কল্যাণকামী রাষ্ট্র, শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য প্রভৃতি নিবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে বিদেশের লাইব্রেরী, পাঠাগার ও প্রগতি, শিশুসাহিত্যের স্বরূপ প্রভৃতি প্রস্তাবগুলিও উল্লেখযোগ্য। জনশিক্ষার প্রসারে ও সমাজকল্যাণে এই জাতীয় গ্রন্থাবলীর আজ প্রয়োজন সর্বাধিক। মুদ্রণ বৈশিষ্ট্য ওরিয়েন্টের খ্যাতি অনুযায়ী শোভন ও সুন্দর।

॥ সমবায় রান্নাঘর ॥

বেলা দে

যত দিন যাচ্ছে তত আমাদের দুনিয়া দেখার ধরনটাই যেন বদলে যাচ্ছে। সামান্য কিছুদিন আগেও মনে হোত মেয়েদের আসল স্থান রান্নাঘর। অর্থাৎ কিনা নিজের হাতে না রাঁধলেও রান্নাঘরটির তদারকের সম্পূর্ণ ভার থাকা উচিত বাড়ীর মেয়েদের হাতে। কি রান্না হবে, কি কি লাগবে তার জন্যে, কোন্ নিয়মে রান্না হবে, সবই তাঁদের ঠিক করে দিতে হোত। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ীর গিন্নি নিজেই রাঁধতেন তাঁর খুশীমত।

কালের পরিবর্তনে বহু ক্ষেত্রেই এসব বদলে গেছে। অর্থ-সংকটের যুগ এসেছে। শুধু স্বামীর একলার রোজগারে কুলোচ্ছে না। কাজেই অনেক সময় স্ত্রীকে লেগে পড়তে হচ্ছে কাজে। বাড়ীর গিন্নিকে যদি সারাদিন বাড়ী ছেড়ে চাকুরির স্থানে থাকতে হয় তাহলে বাড়ী-ঘর-সংসার দেখবে কে? অন্য ব্যবস্থা না হয় সকাল সন্ধ্যায় হোল, মুস্কিল এই রান্না করা নিয়ে।

রান্না মানে তো শুধু রান্না নয়। রান্না। মানে হাট-বাজার, উনুন, কয়লা, ঘুঁটে, শিলনোড়া, বাসন-মাজা, ঘর-ধোয়া সব কিছু। না হয় তো মাইনে করে একজন লোককে রেখে, তার কাছে পরিবারের স্বাস্থ্যটা সঁপে দেওয়া। এসব ব্যবস্থায় অনেক সময় শক্তিতে কুলোয় না, দ্বিতীয়ত মন সায় দেয় না। বাকী থাকে তৃতীয় ব্যবস্থা, অর্থাৎ বাইরে থেকে খাবার আনানোর বন্দোবস্ত কিংবা সেখানে গিয়ে খেয়ে আসা।

তাহলে এমন একটা জায়গা চাই যেখানে ঘরে-তৈরী খাবারের নিরাপত্তাও চাই অথচ কোনো হাঙ্গামা চাই না। কিন্তু লাভের আশায় মন্দ জিনিস চালু হয় তা চাই না। শুধু নিরাপত্তা কেন ঘরে-রান্নার সরসতাও চাইব, অথচ নিজে সময় দিতে পারব না। এটা সম্ভব হতে পারে একমাত্র এক ধরণের "সমবায় রান্নাঘর" দিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে Community Kitchen। তার মানে দাঁড়াচ্ছে পাড়ার মধ্যে যাঁরা যাঁরা এই ব্যবস্থায় ইচ্ছুক তাঁরা সবাই মিলে কিছু কিছু করে অর্থ দিয়ে ও কমিটি করে ব্যবস্থাপনার ভার নিয়ে, একটা জায়গা ঠিক করে দরকার মতো রান্নার ও কাজ করবার লোকজন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়ে দস্তুর মত একটা বারোয়ারি রান্নাঘর স্থাপন করতে হবে। সেই সমবায় রান্নাঘরটি কি ভাবে চলবে, কে প্রতিদিনকার রান্নার তালিকা তৈরী করবে, খরচপত্র হিসাব রাখা ইত্যাদি সবই নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে ঐ কমিটির উপর। বাড়ীতে বাড়ীতে গিন্নিদের মাথা ঘামাতে হবে না। তাঁরা টাকা দিয়ে খাবার খাবেন, ও সমিতির মিটিংয়ে যা বলবার বলবেন।
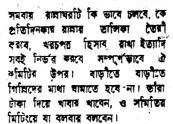
এর সুবিধা কত একবার ভেবে দেখুন। রান্নার লোক, রান্নার জায়গা ও জিনিসপত্র সরবরাহ নিয়ে সবাইকে ছুটোছুটি করতে হবে না। অবশ্য সমস্যা উঠবে নিশ্চয়ই নানা রকমের; সেগুলো বুঝে নিয়ে, সমিতিই মেটাবে।

তবে সবচেয়ে আগে ভাববার বিষয় হলো এই সমবায় রান্নাঘর করতে গেলে কিছু মূলধনের দরকার। কাজেই আমরা যদি পাড়ার কয়েকজন সহৃদয় লোককে নিয়ে একটি কমিটি করি এবং সেখানে এই ব্যবস্থা করতে পারি যে, দশটাকা, পাঁচটাকার শেয়ার বিক্রি করতে পারব তাহলে কারুরই গায়ে লাগবে না। যাঁর যেমন সামর্থ তিনি সেইভাবে শেয়ার কিনবেন। তারপর সেই মূলধন নিয়ে কাজে নামতে হবে। এই যে কার্যনির্বাহিকা সমিতির সভ্যারা নির্বাচিত হলেন, তাঁরাই ঠিক করবেন কবে কোন জায়গায় এই সমবায় রান্নাঘর খোলা হবে। এরপর ঠিক করতে হবে দু'বেলার ভাতই কেবল রান্না হবে, না জলখাবারেরও ব্যবস্থা করা হবে। শনিবার রবিবার এই রান্নাঘর খোলা থাকবে, না ছুটি থাকবে। সকলের জন্য একই রকম রান্না হবে, না সাদাসিধে রান্না ছাড়া পোলাও, কোর্মা কালিয়ার ব্যবস্থা থাকবে (অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দামে তা ঠিক হবে); এই সব বিষয় এই কার্যনির্বাহিকা সমিতিই ঠিক করবেন।

এছাড়া আরো কতকগুলো কথাও ভাবতে হবে। যেমন যাঁরা এখানে খাবেন তাঁদের আগাম টাকা দিতে হবে কিনা, অথবা মাসের প্রথমে কুপন কিনে পরে ঐ কুপন দিয়ে খাবার নেওয়া যাবে কিম্বা কিংবা মাসের শেষে বিল মিটিয়ে দেওয়া যাবে, এসবও কমিটিকেই স্থির করতে হবে। তারপর সেখানে গিয়ে খাবেন, না বাড়ীতে খাবার দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে—এগুলোও দেখতে হবে। অবশ্য আমার মনে হয় সকল রকম ব্যবস্থা থাকাই উচিত যার যেমন সুবিধা।

সবচেয়ে বড় কথা এই সমবায় রান্নাঘরের প্রচলন হলে আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিতা, অসহায় স্ত্রী[illegible]দের জীবিকার্জনের একটা পথও খুলে যাবে। সব পাড়াতেই এমন অল্পশিক্ষিতা কয়েকজন মেয়ে আছেন যাঁরা বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করবার উপযুক্ত শিক্ষা পাননি কিন্তু রান্নার কাজ নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানেন। তবে তাঁদের কিছুদিন যদি এই রান্নার বিষয়ে ট্রেণিং দেওয়া যায় তাহলে ভালমন্দ রান্নাও বেশ হয়ে যাবে। আরো শিখতে হবে রান্নার কাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

'কমিউনিটি লাইফ', 'কমিউনিটি ডিভালপমেন্ট', কমিউনিটি প্রজেক্ট এই ধরনের অনেক কথা আমরা শুনতে পাই। ইংরেজি কমিউনিটি শব্দটির অর্থই হলো সমাজগতভাবে ঐক্যবন্ধতা, কমিউনিটি লাইফ বলতে আমরা তাই বুঝি সমবেত বা সমবায়গত জীবনযাত্রা। 'কমিউনিটি কিচেন' জিনিসটার মধ্যেও ঐ সমবেত জীবনের ধারণা নিহিত আছে।

আজকের দিনে মানুষের সংগঠিত একতাবন্ধ জীবনযাত্রার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জীবিকার গোলকধাঁধায় এখন আমরা ঘুরছি। কাজেই মেয়েদেরও আর রান্নাঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে থাকলে চলবে না। পুরুষের মত মেয়েরাও সমান করে লেখাপড়া করছেন চাকরি করছেন। তাহলে তাঁরা আর কেমন করেই বা সারাক্ষণ রান্নাঘর আগলে পড়ে থাকবেন? সেই জন্যই এই সমবায় রান্নার ব্যবস্থার কথা আজ আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। মনে হয় এই সমবায় রান্নার ব্যবস্থা খুবই উন্নততর আর স্ত্রী-পুরুষ সকলের কর্মজীবনের সংগে খাপও খাবে।

সমবায় রান্নাঘর তো কারুর ব্যক্তি-গত রান্নাঘর নয়, এটি হবে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানকার কাজের ভার যতদূর সম্ভব মেয়েরাই করবেন আরো পাঁচটা চাকরির মত চাকরি হিসেবে। তাহলে এই যৌথ ব্যবস্থায় (আগেও উল্লেখ করেছি) মানুষের সময় ও খরচ দুইই বাঁচবে আর সংগে সংগে রান্নাঘরের কাজটাও সামাজিক মর্যাদা পাবে, অর্থকরী কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

এখন প্রয়োজন নতুন যুগের সংগে খাপ খাইয়ে পারিবারিক জীবনের নতুন বুনিয়াদ গড়ে তোলা। এই নতুন পদ্ধতিতে পারিবারিক জীবনের গাঁথনি যে আরো সুন্দর ও সুদৃঢ় হবে এ কথা জোর করেই বলা যায়।
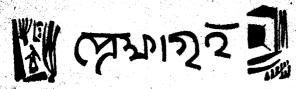
নান্দীকর

।আজকের কথা॥

"প্রেক্ষাগৃহ"-এর পাঠক-পাঠিকা সমেত পৃথিবীর সকলকে জানাই বিজয়ার প্রীতি-অভিবাদন এবং সেই সংগে কামনা করি, এই অশান্ত, উন্মত্ত পৃথিবীতে যেন শান্তিধারা বর্ষিত হয়।

●

॥ শংকর প্রতিভা ও "সামান্য ক্ষতি" ॥

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উদয়শংকর নৃত্যরসিক দর্শকবৃন্দকে উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের "সামান্য ক্ষতি" অবলম্বনে রচিত নৃত্য-লীলা (ballet)। কাশীর মহিষী করুণা কৌতুকরসে মত্ত হয়ে দরিদ্রের জীর্ণ-কুটীরে অগ্নিসংযোগ করে শীত নিবারণের জন্যে যে নিষ্ঠুর লীলায় মেতে উঠেছিলেন, তাতে জগতের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, তা' যাতে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারেন, তার জন্যে কাশী-নরেশ তাঁর প্রিয়তমা মহিষীকে ভিখারী নারীর চীরবাস পরিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন জীর্ণ কুটীর-গুলিকে আবার করে গড়ে তোলবার মতো অর্থ সংগ্রহ করবার জন্যে। দিব্যাবদান-মালা নামক পালিগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই কথিকাকে নৃত্য-লীলায় রূপান্তরিত করবার জন্যে উদয়শঙ্কর যে মননশীলতা, কল্পনাশক্তি এবং চিত্রধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা' তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা যে আজও সম্পূর্ণ কার্যক্ষম রয়েছে, তারই সাক্ষ্য বহন করছে। পূর্বে কখনও তাঁকে কেবলমাত্র [illegible] উপর প্রক্ষেপণ-যন্ত্র সাহায্যে কল্পিত দৃশ্যাবলীর চিত্র প্রতিফলিত করে দৃশ্য-রচনা করতে দেখিনি কিংবা নৃত্য-কাহিনীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাব অনুযায়ী আলো-আঁধারির সৃষ্টি করতেও দেখিনি। তাই একমাত্র রাজসভা ব্যতীত প্রতিটি দৃশ্যেই কখনও স্থির, কখনও পরিবর্তনশীল প্রতিফলিত দৃশ্যপটের সঙ্গে একাত্ম করে আলোছায়ার সংমিশ্রণের ভিতর নৃত্য-রচনা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। এবং এরই সঙ্গে রবিশঙ্কর রচিত যন্ত্র-সঙ্গীত মূল বিষয়বস্তুর ভাব-গাম্ভীর্যকে বজায় রেখে যে-ভাবে বিভিন্ন নৃত্যের নিহিতার্থকে প্রাণময় করে তুলে দর্শকবৃন্দকে রসের ঝর্ণা-ধারায় অভিসিঞ্চিত করে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মাত্র তাই নয়। রবীন্দ্রনাথের "সামান্য ক্ষতি"-তে রাজা জীর্ণ-কুটীর গড়ে দেবার জন্যে গর্বিতা রাণীকে যে-বৎসর কাল সময় দিয়ে-ছিলেন, সেই বৎসর-কালের মধ্যে তাঁর সকল অহংকার কিভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি কি ভাবে সত্যোপলব্ধির পর দীনের থেকে দীন হয়ে অর্থ সংগ্রহ

জওলা প্রোডাকসন্সের "সন্ধ্যারাগ" চিত্রে কল্যাণী ঘোষ ও অসিতবরণ

করে কুটীরবাসীদের আপন জন হয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন, মূল কবিতার অনুক্ত এই কাহিনীও উদয়শংকর চিত্রিত করেছেন নৃত্য-লীলাকে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা দিয়ে দর্শকদের সামনে তুলে ধরে, যার ফলে রসজ্ঞ দর্শক রাণীর প্রতি কাব্য-দর্শের ন্যায়বিচার (poetic justice) হতে দেখে একটি পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

"সামান্য ক্ষতি" নৃত্যলীলাতে লক্ষ্য করলুম, নৃত্যশৈলীকে (technique) যথাসম্ভব সহজ করা হয়েছে; অভিনয়-দর্পণ ও নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী প্রবর্তিত মুদ্রাভাষাকে বহু জায়গাতেই বর্জন করা হয়েছে এবং বর্তমানের উপযোগী, অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাবভঙ্গীর সাহায্যে নৃত্যরচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে এও লক্ষ্য করেছি, যতগুলি নর্তক-নর্তকী থাকলে এই নৃত্যলীলা বেশ পরিপূর্ণ জমকালোভাবে দর্শক-সমক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভব হ'ত, শংকর-সম্প্রদায়ে সে-পরিমাণ লোক নেই। লোক-সংখ্যার দীনতা চক্ষু এবং মন, দুইকেই পীড়িত করে। এ'দের আর এক বিশেষত্ব ছিল, বহু প্রকার বাদ্য-যন্ত্রকে মঞ্চের ওপর সাজিয়ে যন্ত্রীরা মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে বসে তাঁদের বাদ্য পরিবেশন করতেন। বর্তমানে এই প্রথা ত্যাগ করা হয়েছে। তার পরিবর্তে নেপথ্য থেকে মাইক্রোফোন এবং লাউড স্পীকারের সাহায্যে এবং সম্ভবতঃ টেপ-রেকর্ডার মারফত সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছে। মঞ্চের ওপর বাদ্যকার ও নর্তক-নর্তকী সমেত বহু লোকের উপস্থিতির যে জৌলস, তার অভাব প্রতিনিয়তই অনুভব করতে বাধ্য হয়েছি। এবং সব শেষে বলব, উদয়শংকর নিজে যেমন তাঁর বয়সকে অতিক্রম করে নিজের নৃত্যকলা দেখানো থেকে নিবৃত্ত ছিলেন, তেমনই উচিত ছিল অমলাশংকরের পরিবর্তে কোনো যৌবনোচ্ছল সুরূপা নর্তকীকে রাজমহিষীর ভূমিকায় উপস্থাপিত করা। লাস্যনৃত্যে যে উচ্ছল-উদ্দামতার প্রয়োজন আজকের অমলাশংকরে তার একান্ত অভাব, এ-সত্য উদয়শংকরের অজ্ঞাত নয়।

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

সপ্তপদী : আলোছায়া প্রোডাক্‌-সন্স-এর চিত্র; ১৫,৪৫৯ ফুট দীর্ঘ ও ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : বিনয় চট্টোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা : অজয় কর; শব্দধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকার; সঙ্গীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু; ভূমিকায় : উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, প্রীতি মজুমদার, পারিজাত বসু, ডিন গ্যাস্‌পার, নরম্যান এলিস, সুচিত্রা সেন, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, হেমাঙ্গিনী দেবী, গ্লোরিয়া ডাউনিংটন, মার্গারেট ড্রুমণ্ড প্রভৃতি। ছায়াবাণী-র পরিবেশনায় গেল ২০শে অক্টোবর থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কৃষ্ণেন্দু মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হিসেবে খালি লেখাপড়াতেই ভালো ছিল না, যেমন স্বাস্থ্যসৌন্দর্যে, তেমনি খেলাধূলাতেও তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও সে সহপাঠিনী রিণা ব্রাউনের মন জয় করতে পারেনি বহু চেষ্টা ক'রেও, সম্ভবতঃ রিণা বিদেশিনী এবং কৃষ্ণেন্দু ভেতো বাঙালী ব'লেই। কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধানে যেদিন কলেজে 'ওথেলো'-অভিনয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ডেস্‌ডিমোনা-বেশিনী রিণার সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু নিতান্ত বাধ্য হয়েই 'ওথেলো'র ভূমিকায় অভিনয় করল, সেদিন মুহূর্তেই রিণা প্রণয়-বিহ্বল হয়ে উঠল কৃষ্ণেন্দুর প্রতি এবং ঐ একই সঙ্গে রিণার প্রিয় বন্ধু জন ক্লেটন তার পূর্ব-প্রণয়িনীকে কাছে পেয়ে রিণাকে দিল প্রার্থিত মুক্তি। রিণা-কৃষ্ণেন্দুর প্রেম যখন পরস্পরকে

নিকটতম ক'রে তুলতে উন্মুখ, ঠিক সেই সময়েই কৃষ্ণেন্দুর সম্পূর্ণ অগোচরে তার সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পিতা রিণার কাছ থেকে তাঁর একমাত্র পুত্রকে ফিরিয়ে নিতে এলেন। রিণা, ব্রাউনের উদ্ভবকে মা-মঞ্জুর ক'রে পারল না এবং নিজের প্রণয়াসক্ত মনকে গলাটিপে ধ'রে কৃষ্ণেন্দুকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল, সে সধর্ম-পরিত্যাগী এই অজুহাতে। এর পর কৃষ্ণেন্দু হয়েছে পরহিতব্রতী, অকৃতদার ডাক্তার রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রিণা একজন ওয়াকাই (W, A, C, I,) ভগবৎবিশ্বাসী কৃষ্ণস্বামী যখন আত্মসমাহিত অবস্থায় জীবসেবা করে চলেছে, তখন নিজের অবাঞ্ছিত জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে সচেতন রিণা ঈশ্বরে বিশ্বাসহারা হয়ে নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করছে গলিত অগ্নি গলাধঃকরণ ক'রে। এই অবস্থায় আবার দু'জনে দেখা এবং পরক্ষণেই পুনরায় বিচ্ছেদ। এর পরেই আর্তের আহ্বানে কৃষ্ণস্বামী গেলেন আসাম সীমান্তে। এবং সেইখানে বিধ্বংসী বোমা বর্ষণের পর তিনি নিশ্চিতভাবে ফিরে পেলেন আহত রিণাকে।

গল্পটিকে যেমন সোজাভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করা হ'ল, ছবির দর্শকরা কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে একে পর্দায় প্রতিফলিত হ'তে দেখবেন না। কতকটা অন্তবর্তী কালকে উহ্য রাখবার জন্যে এবং বেশীরভাগ উপস্থাপনায় দুরন্ত বাহাদুরী দেখাবার জন্যে গল্পটিকে আরম্ভ করা হয়েছে মধ্যপথে, যেখানে কৃষ্ণেন্দু রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী হয়ে দীনজনে দাক্ষিণ্য বিতরণ করছেন এবং আকস্মিকভাবে তাঁর হাসপাতালে এসে উপস্থিত হ'ল সুরাসেবনে অচৈতন্য রিণা। এরপরই ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে কৃষ্ণেন্দুর কলেজ-জীবন এবং রিণার ভালোবাসা পেয়েও বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটনা। চেতনালাভের পর রিণা যখন আবিষ্কার করল, ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী তারই কৃষ্ণেন্দু, তখনই সে ছুটে চ'লে গেল নিজের বাসস্থানে। তারপর আবার অতর্কিতে পূর্ণ ওয়াফাইয়ের পোশাকে সে কৃষ্ণেন্দুর সামনে এসে নিজের অধঃপতিত অবস্থার কারণ বর্ণনা শুরু করতেই আর-একটি ফ্ল্যাশব্যাকের প্রয়োজন হ'ল তার জন্মরহস্য উদ্ঘাটিত করবার জন্যে। এরপর আসাম সীমান্তের ঘটনা। একদা শ্রীনীতীন বসু এই A. P. T. (Anti-Posteriory Treatment) প্রণালীতে তাঁর "বিচার" ছবি নির্মাণ করেছিলেন। আজ যখন সমস্ত পৃথিবীময় আন্দোলন চলছে, সোজা কথাকে সোজা ভাষায় প্রকাশ করার, তখন এই প্যাঁচালো পথে কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা ক'রে বিনয় চট্টোপাধ্যায় সুবিবেচনার পরিচয় দেননি।

রিণা ব্রাউনের ছিল কৃষ্ণেন্দুর প্রতি অহেতুক বিশ্বেষ—কিংবা, তথাকথিত বর্ণবৈষম্যজনিত বিশ্বেষ এবং সেই কারণেই ক্লেটনের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণেন্দুকে দিয়ে 'ওথেলো'র ভূমিকা অভিনয় করানোর প্রস্তাবে সে সম্মত হয়েছিল একটি সর্তে এবং সে-সর্তটি হ'ল অভিনয়কালে কোনো ছলে কৃষ্ণেন্দু তার দেহ স্পর্শ করবে না; সম্ভবতঃ সে ভুলে গিয়েছিল—অভিনয়কালে ওথেলো ডেস্‌ডিমোনাকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করে এবং তার জন্যে ওথেলোর হাত ডেস্‌ডিমোনার গলদেশ স্পর্শ করবেই করবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মন্ত্রিতচক্ষু ডেস্‌ডিমোনা-রূপিণী রিণা ওথেলো-

তারু মুখার্জি পরিচালিত ও প্রযোজিত "ইংগিত" চিত্রে লিলি চক্রবর্তী

রূপী কৃষ্ণেন্দুর দুই হস্ত দ্বারা গলা পীড়নের মধ্যে এমন কি মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমের ভাষা পাঠ করল, যাতে অভিনয়ান্তে সাজঘরের মধ্যে সে বারংবার তার নিপীড়িত গলদেশে হস্তামর্শন ক'রে অনির্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে পড়ছিল? শুনেছি, কোনো ব্যক্তির মধ্যে আসঙ্গলিপ্সা জাগ্রত করবার জন্যে তাকে নির্মমভাবে পীড়ন করার প্রয়োজন হয়; পুষ্পধনু কখন কাকে কিভাবে ঘায়েল করেন, তা সম্ভবতঃ ফ্রয়েডেরও অজানা।

কাহিনী এবং চিত্রনাট্য—দুই-ই মিলিতভাবে প্রথম ফ্ল্যাশব্যাকের অন্তবর্তী বিদ্বেষ এবং প্রেমের দৃশ্যগুলিকে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উপভোগ্য ক'রে তুলেছে। এমন কি, কৃষ্ণেন্দুকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করার দৃশ্যও অত্যন্ত মেলোড্রামাটিক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ দর্শকের কাছে হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু তারপর কৃষ্ণেন্দু যখন রেভারেন্ড ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী এবং রিণা ওয়াকাই (W, A, C, I,)—তখন বহু ছাড়া ছাড়া ঘটনা, ডিফেন্স-মিনিস্ট্রি থেকে নেওয়া বোমাবর্ষণের রোমহর্ষণ দৃশ্যাবলী, চড়া পর্দার অভিনয় এবং চমকপ্রদ কলাকৌশল— সব মিলিয়েও ছবিটি দর্শকচিত্তে বিশেষ কোনো রেখাপাত করতে পারেনি। এবং এর জন্যে প্রধানতঃ কাহিনী এবং চিত্রনাট্যের ব্যর্থতাই দায়ী।

পরিচালনা এবং চিত্রগ্রহণে অজয় কর আবার ক'রে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বহির্দৃশ্যাবলীতে, মুড্-অনুযায়ী আলোছায়ার খেলায়, এবং কয়েকটি চাতুর্যপূর্ণ চিত্রগ্রহণে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছেন। অবশ্য বহু দিন ধ'রে ছবিটি তোলার দরুণ কোনো কোনো জায়গায় তাঁর আলোকচিত্রের কাজ সমতা রাখতে সক্ষম হয়নি। শব্দধারণে এবং শব্দ-পুনর্যোজনাতেও উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিশেষ ক'রে 'ওথেলো' অভিনয়ের দৃশ্যে ওথেলোর উচ্চগ্রামের বাচনাংশে যে-ভাবে প্রতিধ্বনির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, তা অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবী করতে পারে। কাহিনীর প্রয়োজনমত হাসপাতালের অভ্যন্তর ভাগ, মেডিক্যাল কলেজের করিডোর, আসাম সীমান্তের ছাউনী, পার্ক স্ট্রীটের ইংগবঙ্গ-অঞ্চলের বাড়ীর ভিতরকার রূপ প্রভৃতি নির্মাণে অকৃপণ প্রযোজকের কৃপায় শিল্প-নির্দেশক কার্তিক বসু অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবিতে চারখানি গান আছে—দু'খানি বাঙলা এবং দু'খানি ইংরাজী; এর মধ্যে একখানি বাঙলা ও একখানি ইংরাজী গান গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচনা এবং রচনা হিসাবে দু'খানিই সার্থক। বাকী দু'খানি পুরোণো গান; এক, ইংরাজী "Happy birthday to you" আর দুই—পুরোনো শ্যামা সঙ্গীতের নকল। সুজি মিলারের গাওয়া "on the marry go round" এবং হেমন্তকুমার ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "এই পথ যদি না শেষ হয়"—দু'টিই সুর-সমৃদ্ধ, সুগীত ও সুপ্রযুক্ত। কিন্তু বাজীমাৎ করেছেন হেমন্তকুমার আবহ-সঙ্গীত রচনায়; এমন জমকালো ভরাটী, সার্থক আবহ-সঙ্গীত কদাচিৎ বাঙলা ছবিতে শুনতে পাওয়া গেছে। মোট কথা, কলাকুশলের দিক থেকে "সপ্তপদী"র সর্বত্র একটি সুন্দর নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি।

"সপ্তপদী"তে অভিনয় করেছেন ছোটবড় বাঙালী ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান—অনেক শিল্পীই এবং কেউই এমন অভিনয় করেননি, যা নিন্দার যোগ্য। তবু ঐ অনেকের মধ্যেই যে-তিন জন স্মরণীয়

অভিনয় করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন সুচিত্রা সেন, ছবি বিশ্বাস এবং উত্তমকুমার। বিদেশিনী রিণা ব্রাউনের সুকঠিন ভূমিকায় অবিরুদ্ধ করবার মত অভিনয় করবার জন্যে সুচিত্রা যে অভূতপূর্ব শ্রমস্বীকার করেছেন, তা যে-কোনো অভিনেত্রীর পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু তাঁর অভিনয় নিখুঁত নয়। বিদেশিনীর ভূমিকায় অভিনয় করা সত্ত্বেও বাঙলা তিনি বলেছেন নিতান্ত বাঙলীর মতই এবং ভাবপ্রকাশ করেছেনও একান্ত ঘরোয়া বাঙলীর মেয়েদের মতই। অবশ্য বিদেশিনীদের মত বাঙলা উচ্চরণ ক'রে কথা বললে সেটা হাস্যকর হয়ে উঠত কিনা, এ-কথাও ভেবে দেখাবার মত। তবুও বলব, রিণা ব্রাউনের ভূমিকায় আমাদের বাঙালী মেয়ে সুচিত্রা সেন যে অভিনয় করেছেন, এ-কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারা যায়নি তাঁর অভিনয় দেখে। কৃষ্ণেন্দুর সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পিতার নাতিবৃহৎ ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস বাচনে এবং অন্তর্নিহিত ভাবপ্রকাশক দৃষ্টি ও মুখভঙ্গীতে অপরূপ অভিনয় ক'রে দর্শকের মনের গভীরে অবিস্মরণীয় রেখাপাত করেছেন। উত্তমকুমার কৃষ্ণেন্দুর জীবনের গোড়ার দিকে যেমন চটুল, শেষের দিকে তেমনই ভাবসমৃদ্ধ অভিনয় করেছেন। এ-ছবিতে তিনি ফুটবল

নবকেতনের হিন্দী চিত্রার্ঘ "হাম দোনো" চিত্রে দেবানন্দ ও সাধনা

খেলেছেন, ঢোল বাজিয়েছেন, সাইকেল ও স্কুটার চালিয়েছেন, দেহশক্তি পরীক্ষা দেবার জন্যে নারকেলের ছোবড়া ছাড়িয়েছেন এবং দুই হাতের চাপে তাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন (অবশ্য শেষের ব্যাপারটা fake!), ওথেলো সেজে ইংরেজীতে অভিনয় করেছেন এবং জনহিতব্রতী পাদ্রী ডাক্তাররূপে শল্য চিকিৎসাও করেছেন। কিন্তু এ সবের পেছনে ছবিটির সর্বাঙ্গ জুড়ে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে কখনও সোচ্চার, আবার কখনও নীরব প্রেমিকরূপে এবং তাঁর সে অভিনয় হয়েছে সার্থক। রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামী বেশে তাঁকে মানিয়েওছে চমৎকার।

প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নির্মিত দীর্ঘ "সপ্তপদী" চিত্রে দর্শক মনোরঞ্জনের প্রচুরতর উপাদান আছে এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যা, তা হচ্ছে—উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের উচ্চাঙ্গের সম্মিলিত অভিনয়।

দুই ভাই ঃ ফিল্ম এন্টারপ্রাইজার্স-এর নিবেদন; ১১,৯৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনা ঃ সুধীর মুখোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ ঃ বিভূতি চক্রবর্তী; শব্দধারণঃ মৃণাল গুহঠাকুরতা; সঙ্গীত পরি-

"দুই ভাই" চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী

চালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন সেন; শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী; ভূমিকায় : উত্তমকুমার, বিশ্বজিত, জয়নারায়ণ, জীবেন বসু, তরুণকুমার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, মাস্টার তিলক, মাস্টার তরুণ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি। স্কাপ্‌স্ ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ২০-এ অক্টোবর থেকে মিনার, ছবিঘর, বিজলী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

ছোট ভাইকে মানুষ করবার জন্যে বড় ভাইয়ের আত্মত্যাগ, উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহের যতগুলি ছবি বাঙলার চিত্র-জগতে দেখা গেছে, তার মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে বৈকুণ্ঠের উইল' এবং 'প্রতিশ্রুতি।' ফিল্ম এন্টারপ্রাইজার্স-এর প্রথম চিত্র-নিবেদন "দুই ভাই"ও ছোট ভাইকে মানুষ করবার জন্যে—না, ঠিক মানুষ করবার জন্যে নয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রূপে দেখবার জন্যে বড় ভাইয়ের একান্ত আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার চিত্র। ছবিতে বড় ভাই, উৎপল চট্টোপাধ্যায় বলছেন বটে, ছোট ভাই কমলকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে তিনি নিজে বেশী লেখাপড়া শিখতে পাননি, কিন্তু কারখানার প্রাঙ্গণে তাঁর ধোপ-দুরস্ত স্যুটপরা চেহারা, তাঁর আপিসের চেয়ার-টেবিল, দেরীতে আসার জন্যে বয়স্ক কর্মীকে তাঁর ধমকানি এবং বহু কর্মীর তাঁকে যমের মত ভয় খাওয়ার ব্যাপার দেখে তাঁর কথায় প্রত্যয় জন্মানো শক্ত। তিনি যে কোনোকালে নিজেকে এক নারীসান্নিধ্য ছাড়া অন্য কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত রেখেছেন বা কোনো-রূপ কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন, এ তাঁর কথা বা ব্যবহার—কোনো কিছু থেকেই বোঝবার উপায় নেই। তিনি চমৎকার হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করেন, সুন্দর বেহালা বাজান, চাকর রেখে সুন্দর ফ্ল্যাটে বাস করেন। এবং তাঁর ভাই কমল? যার পড়াশুনার সামান্য-মাত্র ক্ষতি হবার ভয়ে তিনি যাকে সারাক্ষণ যক্ষের মত ঘিরে থাকতে চান, সেই কমল? এমন সর্বগুণান্বিত ছেলের কথা ভূভারতে কেউ বোধ করি কখনও শোনেননি। সে দাদাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ক'রেও স্বাধীনচেতা এবং দাদার মুখের ওপরই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে এতটুকু পেছপা নয়। সে এম-এর ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তে পড়তে শুধু যে দাদার গানের সঙ্গে চমৎকার তবলাই বাজায়, তা নয়; নিজেও ভালই গান গায় (হেমন্তকুমারের মতো!), অভিনয় করে, নারী বন্ধুর সঙ্গে দ্বৈত নৃত্য-গীত ক'রে প্রশংসার করতালি পায়, পার্টির কাজ করে অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের কর্মী, মিছিল করে, গ্রেপ্তার হয়ে হাজত বাস করে এবং সোৎসাহে প্রেম করে এবং এত রকম বহুমুখী কর্ম-ব্যস্ততা সত্ত্বেও দাদার মতবাদকে নস্যাৎ ক'রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। যে-দাদা নিজের জীবনে নারীকে স্থান দেননি, পাছে ছোট ভাইয়ের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ায় বাধা জন্মায়, এই ভয়ে, সেই দাদাকে ছোট ভাই নিজের জীবনের সাফল্য দিয়ে বুঝিয়ে দিল, নারীর প্রেম ও নারীর তদারকি (সাবিত্রী বিশ্বজিৎকে বলেছে—এই আট মাস যাতে তুমি ঘড়ি ধ'রে পড়াশুনো কর, সে আমাকে দেখতেই হবে) এই ভবসমুদ্রে নির্বিঘ্নে পার হবার একমাত্র পাথেয়! আবার কমলের প্রেমাস্পদা মাধুরীই বা কি আশ্চর্য মেয়ে?—সে ভোর পাঁচটায় ওঠে, রুগ্ন দাদার সেবা করে, রাঁধে সময়মত আপিস যায়, আপিস থেকে বেরিয়ে দুটো টিউশনি করে, আবার ওরই ফাঁকে পার্টির কাজ করে, গণনাট্য সঙ্ঘের 'ওরা কাজ করে' নাটকে বোম্বাই ঢংয়ে স্টেজে গায়ে বাহবা নেয় এবং ছুটিয়ে প্রেম ক'রে রাত্রি এগারোটা, সাড়ে এগারোটায় বাড়ী ফেরে এবং পরদিন আবার ভোর পাঁচটায় ওঠে। মনে হয়, আজকের দিনের যে-কোনও উপার্জনশীলা ভদ্রকুমারী এঁর কর্ম-ক্ষমতাকে ঈর্ষা করবেন—সত্যিই, এমন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য, আজগুবি কাহিনী বাঙলা ছবির পর্দায় সাম্প্রতিক কালে নজরে পড়েছে ব'লে স্মরণ হচ্ছে না। এই কাহিনীকে অসহনীয় বলেই মনে হ'ত, যদি না এর মধ্যে স্থানে স্থানে প্রচুর হাসরসসৃষ্টিকারী পরিস্থিতি এবং কথাবার্তা থাকত। যাকে ইংরাজী ভাষায় ব'লে gag,—সেই বস্তু এই কাহিনীর মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে এবং ছড়িয়ে আছে ব'লেই সাধারণ দর্শক সমস্ত যুক্তিকে রসাতলে পাঠিয়ে "দুই ভাই" ছবিটিকে দস্তুরমতো উপভোগ করছেন।

আলোকচিত্রশিল্পী বিভূতি চক্রবর্তী ছবির বহুস্থানে আলোছায়ার সমন্বয়ে রূপমাধুরীর সৃষ্টি করেছেন। নিখুঁত শব্দধারণে মৃণাল গুহ-ঠাকুরতাও প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির সব কখানি গানেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুন্দর সুরারোপ করেছেন এবং প্রত্যেকটি গান সুগীত। আবহ-সঙ্গীত যথাযথ। দৃশ্যপট কাহিনীর দাবীকে মিটিয়েছে। অবশ্য 'সজনেতলার মাঠে' অভিনয়ের জন্যে অমন প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চ এই বাঙলা-দেশের কোথাও সম্ভব ব'লে জানা নেই।

রূপায়ণে নিঃসন্দেহে উত্তমকুমারের অভিনয়ই এই ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনয়। কমল-রূপী বিশ্বজিৎ বড় ভাইয়ের পেছনেপেছনে চলেছেন। সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায় এবং সুলতা চৌধুরী, সবিতা এবং মাধুরীর ভূমিকায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন। নিজের দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা শেষে শ্রীমতী চৌধুরী তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু না আনলেই ভালো করতেন; ওতে মনে হয়েছে, তিনি বুঝি সবৈব মিথ্যা বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর আসল জীবনকে গোপন

রেখে। অপরাপর ভূমিকায় তরুণকুমার, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাস্টার তিলক উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

একটা কথা। যে-ছবিতেই কোনও স্যুটিংয়ের দৃশ্য দেখানো হয়, সেখানেই খেদের সঙ্গে লক্ষ্য করি, চিত্র-পরিচালককে একটি নির্বোধ ক্লাউন-রূপে চিত্রিত করা হয়। চিত্র-পরিচালকেরা কি সত্যিই তাই? "দুই ভাই"-এর পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় কি বলেন?

বিবিধ সংবাদ

সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী", "অপরাজিত", "অপুর সংসার" প্রভৃতি চিত্রের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশক মিঃ এডওয়ার্ড হ্যারিসন সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন। "অপুর সংসার"-এর ভারতীয় পরিবেশক ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মকর্তা শ্রীঅসিত চৌধুরী গেল শনিবার, ১৪ই অক্টোবর ক্যালকাটা ক্লাবে তাঁকে এক মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন। এই ভোজসভায় নানা কথা প্রসঙ্গে জানা গেল যে, মিঃ হ্যারিসন এবার "দেবী" এবং "দুই কন্যা" ("তিন কন্যা"র প্রথম কন্যা "মণিহারা" বাদে)—এই দু'খানি ছবির চিত্রস্বত্ব গ্রহণ করেছেন। আরও জানা গেল, যুক্তরাষ্ট্রের ১৬,০০০ চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র ৬০০টি চিত্রগৃহ সাব-টাইটেলওয়ালা বিদেশী ছবিকে সাধারণ্যে প্রদর্শনের সুযোগ দেন। বিদেশী ছবির পরিবেশন-স্বত্ব নেওয়া রীতিমত একটা ঝুঁকির ব্যাপার; কারণ, নিউইয়র্কের প্রদর্শনীতে কোনো ছবি যদি দর্শকসাধারণ কর্তৃক গৃহীত না হয়, তাহ'লে মফঃস্বলে তার মুক্তি পাবার আশা সুদূরপরাহত। অনুকূল জনমত সৃষ্টির জন্যে প্রচুর প্রচারের প্রয়োজন। "পথের পাঁচালী" [illegible] মুক্তির আগে প্রায় দু' বছর ধ'রে নানাভাবে প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্রের সমালোচনার মূল্য আছে জনমত গঠনে, যদিও সব সময় জনমত সংবাদপত্রকে অনুসরণ করে না। যুক্তরাষ্ট্রে সত্যজিৎ রায়ের ছবির জনপ্রিয়তার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ হ্যারিসন বলেন, অবিসংবাদীভাবে সত্যজিৎ রায়ের ছবির উচ্চমান (high Quality) এবং ভারতীয়তা—তাঁর ছবির ভিতর দিয়ে আমেরিকাবাসীরা ভারতকে দেখতে পায়। মিঃ হ্যারিসন মনে করেন, কোনো বিদেশী ছবি যুক্তরাষ্ট্রে সাফল্যমণ্ডিত হতে হ'লে উচ্চমানবিশিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ছবি যে-দেশে নির্মিত হয়েছে, সেই দেশ ওই ছবির মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে দর্শকসমক্ষে প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

* * *

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি যে হিমালয়ের পট-ভূমিকায় এবং ইস্টম্যান কলারে তোলা হবে, এ-খবর নিশ্চয়ই পাঠকদের জানা আছে। শ্রীরায় সদলবলে ২০-এ অক্টোবর দার্জিলিং গেছেন ছবির কাজ সুরু করবার জন্যে। পুরো নভেম্বর মাস স্যুটিং হবে প্রত্যহ এবং
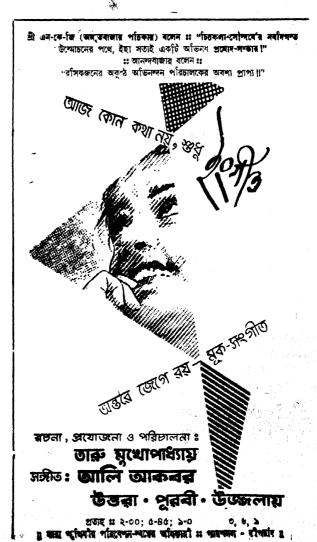
বহু প্রতীক্ষিত অজয় কর পরিচালিত সপ্তপদী চিত্রে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

সমস্ত ছবিটি তুলতে দেড় মাস সময় লাগবে, এই আশাই শ্রীরায় করছেন।

* * *

সংগীত - নাটক - অ্যাকাডেমীর রবীন্দ্র উৎসব :

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে দিল্লীর সংগীত - নাটক - অ্যাকাডেমী একটি এক মাস স্থায়ী রবীন্দ্র নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসবে যোগদানের জন্যে সমগ্র ভারত থেকে আটটি নামজাদা সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের প্রধান চারটি নৃত্য-রীতি—ভারতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী—এই উৎসবের নৃত্যনাট্যগুলির অঙ্গীভূত হবে। যে-আটটি সম্প্রদায় এই নাট্যোৎসবে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :—

(১) শান্তি বর্ধন প্রতিষ্ঠিত বোম্বের "লিটল ব্যালে ট্রুপ।" এ'রা কবির "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটিকে প্রধানতঃ ভারতীয় গ্রাম্য নৃত্যের সহায়তায় নৃত্যনাট্যের আকারে মঞ্চস্থ করবেন।

(২) নিউ দিল্লীর "ভারতীয় কলা-কেন্দ্র।" এ'রা উত্তর ভারতের কথক নৃত্যের মাধ্যমে কবির "দালিয়া" গল্পটিকে নৃত্যনাট্যরূপে উপস্থাপিত করবেন।

(৩) আমেদাবাদের "দর্পণা।" মৃণালিনী সরাভাইয়ের নেতৃত্বে এ'রা প্রধানতঃ কথাকলি ও ভারতনাট্যমের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" ও "ভানু সিংহের পদাবলী"কে মঞ্চস্থ করবেন।

(৪) কলিকাতার "বহুরূপী" সম্প্রদায়। সুখ্যাত মঞ্চ এবং চিত্র পরিচালক শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় এ'রা মঞ্চস্থ করবেন "বিসর্জন" ও "রক্ত-করবী।"

(৫) ইম্ফলের "মণিপুরী নৃত্য মহাবিদ্যালয়।" এ'রা মণিপুরী নৃত্যের সহায়তায় কবির "চিত্রাঙ্গদা"কে রূপায়িত করবেন।

(৬) আড়েয়ারের "কলাক্ষেত্র।" শ্রীমতী রুক্মিনী দেবীর পরিচালনায় এ'রা ভারতনাট্যম-রীতির নৃত্যের সহ-যোগিতায় কবির "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্যটি মঞ্চস্থ করবেন।

(৭) কলিকাতার "গীতবিতান।" এ'রা শান্তিনিকেতনের নৃত্যরীতি অবলম্বনে গুরুদেবের "মায়ার খেলা"কে রূপায়িত করবেন।

(৮) কলিকাতার "অনামিকা।" ১৯৫৯ সালে অ্যাকাডেমী অনুষ্ঠিত নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী এই সম্প্রদায়টি হিন্দীতে রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন।

নাট্যোৎসবটি ১১ই নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে দিল্লীর ফাইন আর্টস থিয়েটারে এবং তালকাটোরা মুক্তাঙ্গনে।

বাঁটোয়ারা

এ সপ্তাহে একটি মাত্র হিন্দী চিত্র মুক্তিলাভ করছে দীপ-সন্দীপ প্রোডাকসন্সের 'বাঁটোয়ারা'। পরিচালনা করেছেন করুণেশ ঠাকুর, সংগীত এস মদন এবং গীত রচনায় মজরুহ সুলতান পুরী। বিভিন্নাংশে প্রদীপকুমার, নিরূপা রায়, রেহমন, জওহর কৌল, জীবন, শশীকলা ও লীলা চিৎনীস আছেন। অমরজ্যোতি ফিল্মসের পরি-বেশনায় ওরিয়েন্ট, কৃষ্ণা, ক্রাউন, রূপালী পূর্ণশ্রী, মেনকা ইন্টালী ও অন্যত্র প্রদর্শিত হবে।

খেলাধূলা

দর্শক

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

শ্রীনগরের বক্সী গেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩—১ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু' বছর আশুতোষ স্মৃতি শীল্ড জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মোট ৬বার (১৯৪১, ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৭, ১৯৬০ ও ১৯৬১ সাল) আশুতোষ শীল্ড জয়ী হ'ল। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের ইনসাইড লেফ্ট এস. চ্যাটার্জি দলের ৩টি গোলের মধ্যে একাই ২টি গোল দেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের আরও বেশী গোলের ব্যবধানে জয়ী হওয়া উচিত ছিল। তারা কমপক্ষে গোল দেওয়ার ৬টি সহজ সুযোগ নষ্ট করে।

প্রথমার্ধের খেলার পনের মিনিটে ক'লকাতা দলের এস. চ্যাটার্জি প্রথম গোল করেন। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। কিন্তু এই সময়ের খেলায় ক'লকাতা দল গোল দেওয়ার একাধিক সুযোগ নষ্ট করে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৫ম মিনিটে ক'লকাতা দলের দ্বিতীয় গোলটি দেন এস. চ্যাটার্জি এবং খেলার ১৫ মিনিটে খুরসীদ দলের তৃতীয় গোলটি করেন। খেলা শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে মাদ্রাজ দলের নিগ্রো খেলোয়াড় সামুয়েল একটি গোল শোধ দেন।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে মাদ্রাজ দল কোন সময়েই পাল্লা দিয়ে খেলতে পারেনি; খেলার শেষ কয়েক মিনিট মাদ্রাজ দল কিছুটা খেলেছিল। গতিবেগ এবং আক্রমণ রচনার কৌশলে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল এই দিনের খেলায় যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় উত্তরাঞ্চলের কোন খেলাতেই তা দিতে পারেনি।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল তাদের উত্তরাঞ্চলের প্রথম খেলায় ৩—০ গোলে আগ্রা দলকে পরাজিত করে। ক'লকাতা দলের পক্ষে সেণ্টার ফরোয়ার্ড শ্যামল দত্ত হ্যাট-ট্রিক করেন। ক'লকাতা ৩য় রাউণ্ডের খেলায় ৫—৩ গোলে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমি-ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'তে দু'দিন লাগে। প্রথম দিনের সেমি-ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। ২য় দিনের খেলায় ক'লকাতা দল ৩—১ গোলে দিল্লী দলকে পরাজিত করে নর্থ-জোন ফাইনালে ওঠে। উত্তরাঞ্চলের অপর দিকের সেমি-ফাইনালে গৌহাটি ৫—১ গোলে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ক'লকাতা দলের সংগে উত্তরাঞ্চলের ফাইনালে মিলিত হয়। ক'লকাতা বনাম গৌহাটি দলের উত্তরাঞ্চলের ফাইনাল খেলাটির জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'তেও দু'দিন সময় লাগে। প্রথম দিন গোলশূন্যভাবে খেলাটি ড্র যায়। খেলাটি মোটেই আকর্ষণীয় হয়নি। খেলার শেষের দিকে গৌহাটি কিছুটা সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খেলায় উত্তেজনার সৃষ্টি করে। খেলার দ্বিতীয় দিনে ক'লকাতা দল ৪—০ গোলে গৌহাটি দলকে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মাদ্রাজ দলের সংগে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে এবং এই জয়লাভের দরুণ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় আশুতোষ মেমোরিয়াল ট্রফি বিজয়ী ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল

কানহাই

ওয়েসলি হল

গারফিল্ড সোবার্স

উপর্যুপরি দু'বার স্যর সুলতান আমেদ কাপ জয়ী হয়।

দক্ষিণাঞ্চলের খেলার একদিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই ১—০ গোলে মহীশূরকে এবং মাদ্রাজ ২—০ গোলে কেরালাকে পরাজিত করে। দক্ষিণাঞ্চলের ২য় দিনের ফাইনালে মাদ্রাজ ১—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ক'লকাতা দলের সঙ্গে মিলিত হয়।

ক'লকাতা দলের পক্ষে ফাইনালে খেলেছিলেন—ডি চক্রবর্তী; বি, রায় চৌধুরী, শম্ভু গুহ (অধিনায়ক) ও এস, মিত্র; প্রণব সরকার ও বলাই ব্যানার্জি; শ্যামল বসু, হেমেন কর্মকার, খুরসীদ, সন্তোষ চ্যাটার্জি এবং এ চক্রবর্তী।

বাংলা বনাম উত্তর প্রদেশ

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা ৩-২ গোলে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করেছে। বাংলা তাদের এই দ্বিতীয় খেলায় গোল দেওয়ার বহু সহজ সুযোগ নষ্ট করে। প্রথমার্ধের খেলায় বাংলা ৩-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় উত্তর প্রদেশ দুটি গোল শোধ দেয়।

॥ আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ॥

রাশিয়ার তাসখন্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ যোগদান ক'রে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। রাশিয়া প্রথম এবং মঙ্গোলিয়া তৃতীয় স্থান পায়। এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং আফগানিস্থান—এই পাঁচটি দেশ যোগদান করে।

ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন অরুণ দাস, নীলমণি দাস এবং বলবীর সিং ভাটিয়া।

ওয়েস্টইণ্ডিজ ক্রিকেট খেলোয়াড় সোবার্স-কানহাই-হল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত তিনজন ক্রিকেট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স, রোহান কানহাই এবং ওয়েসলি হল এই মরসুমের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলায় যোগদান করেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলায় এই তিনজন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের যোগদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, এই খেলোয়াড়দের উপস্থিতি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চার করবে। সোবার্সের কথা বিশেষ ক'রে উল্লেখ ক'রে বলেছেন, সোবার্স নিশ্চয়ই তাঁর আক্রমণাত্মক খেলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এবং তাঁর এই খেলা তরুণ খেলোয়াড়দের প্রভূত উৎসাহিত করবে। শেফিল্ড শীল্ড প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের যে তিন মাসের আবাসীয় যোগ্যতার প্রয়োজন এই তিনজন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের পক্ষে তা প্রযোজ্য হবে না। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সোবার্স, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে কানহাই এবং কুইন্সল্যান্ডের পক্ষে হল খেলবেন।

১৯৬১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অস্ট্রেলিয়া সফরে এই তিনজন খেলোয়াড়ই যোগদান করেছিলেন। টেস্টের ব্যাটিং এভারেজ তালিকায় কানহাই ২য় স্থান পেয়েছিলেন—তাঁর মোট রাণ ছিল ৫০৩ (গড়পড়তা ৫০·৩০)। তবে তিনিই দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রাণ করায় কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন। সোবার্স পেয়েছিলেন ৩য় স্থান—মোট রাণ ৪৩০ (গড়পড়তা ৪৩·০০)। সোবার্স ২টো টেস্ট সেঞ্চুরী করেছিলেন—১৩২, ১ম টেস্ট এবং ১৬৮, ২য় টেস্ট। কানহাই ৪র্থ টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১১৭ ও ১১৫) করার কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে কানহাই মোট ১০৯৩ রাণ ক'রে দলের পক্ষে একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে হাজার রাণ করার গৌরব লাভ করেন। ১১টা খেলায় তিনি এই মোট ১০৯৩ রাণ (গড়পড়তা ৬৪·২৯) তুলেছিলেন। ওয়েসলি হল টেস্ট খেলার বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় দলের পক্ষে ২য় স্থান পেলেও ২১টা উইকেট নিয়ে টেস্টে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন।

টেস্ট খেলায় এই তিনজন খেলোয়াড়ের সাফল্য:

	টেস্ট খেলা	মোট রাণ	সর্বোচ্চ রাণ	এভারেজ	উইকেট	এভারেজ
সোবার্স	৩৭	৩৩৫২	৩৬৫*	৫৯·৮৫	৫৫	৪৩·৪১
কানহাই	২৫	২১৪৫	২৫৬	৪৪·৬৮	০	-
হল	১৮	২৬০	৫০	১০·৬৭	৮১	২৩·৭৩

*নট আউট। ১৯৫৮ সালে কিংস্টোনে পাকিস্তানের বিপক্ষে এই নট আউট ৩৬৫ রাণ ক'রে সোবার্স এক ইনিংসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রাণের বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।

॥ বিজয় মার্চেণ্ট ॥

গত ১২ই অক্টোবর ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট [illegible] অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্টের [illegible] বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে। তাঁর পুরো নাম বিজয় মাধবজী মার্চেণ্ট; জন্ম ১৯১১ সালের ১২ই অক্টোবর। দলের অধিনায়কের পদ গ্রহণের যোগ্যতা তিনি বাল্যকাল থেকেই লাভ করেছিলেন। ১৯২৩-২৪ সালে মাত্র বার বছর বয়সে বালক মার্চেণ্ট বোম্বাইয়ের বরোদা হাই স্কুলের জুনিয়ার দল পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। ইণ্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী রাণ করেন।

মার্চেণ্টের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের সূত্রপাত হয় ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারত সফরকারী এম সি সি দলের বিপক্ষে। মোট ৩টে টেস্ট খেলায় ৬টা ইনিংসে তিনি মোট ১৭৮ রাণ ক'রে টেস্টের গড়পড়তা তালিকায় ৪র্থ স্থান পান। তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ ছিল ৫৪। অসুস্থতার দরুণ তিনি ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলতে পারেননি। ১৯৩৬ সালে তিনি ভারতীয় দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে যান। টেস্টের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ৬টা ইনিংসের খেলায় মোট ২৮২ রাণ ক'রে দলের পক্ষে ২য় স্থান লাভ করেন। তাঁর এই ২৮২ রাণই দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রাণ দাঁড়ায়। ম্যাঞ্চেস্টারের দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর ব্যক্তিগত ১১৪ রাণই শেষ পর্যন্ত টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণের রেকর্ড হয়। ১৯৩৬ সালের ইংল্যান্ড সফরে প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি ভারতীয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন—৪০ ইনিংস খেলা, ৩ বার নট আউট, মোট রাণ ১,৭৪৫, সর্বোচ্চ রাণ ১৫১, গড়পড়তা ৫১·৩২। ঐ বছরের সফরে মার্চেণ্ট ৩টে সেঞ্চুরী করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত সফরকারী লর্ড টেনিসন দলের বিপক্ষে পাঁচটা টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল পরিচালনার ভার তাঁকে দেওয়া হয়। এই গুরু দায়িত্বের বোঝা শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বাভাবিক খেলায় যথেষ্ট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি খেলায় অকৃতকার্য হন। ১৯৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দলের বিপক্ষে বে-সরকারী ৩য় টেস্ট খেলায় তিনি ১৫৫ রাণ ক'রে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। ১৯৪৬ সালে বিজয় মার্চেণ্ট ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সফরে যান। সমস্ত খেলায় ব্যাটিং এভারেজ তালিকায় মার্চেণ্ট প্রথম স্থান লাভ করেন—৪৫ ইনিংস খেলা, ১০ বার নট আউট, মোট ২৬৩০ রাণ, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ২৪২ নট আউট, এভারেজ ৭৫·১৪। সফরের প্রথম শ্রেণীর ২৬টা খেলাতেও তিনি ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পান। টেস্টের গড়পড়তা তালিকাতেও তিনি প্রথম স্থান পান—৩টে টেস্টের ৫টা ইনিংস খেলে মোট ২৪৫ রাণ, সর্বোচ্চ রাণ ১২৮, গড়পড়তা ৪৯·০০। ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের টেস্টের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় তিনি পান ৩য় স্থান; প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান পান যথাক্রমে হার্ডস্টাফ এবং ডেনিস কম্পটন। তাঁর ১২৮ রাণই ভারতীয় দলের পক্ষে টেস্ট খেলায় সর্বোচ্চ রাণ দাঁড়িয়েছিল। এই সফরে তিনি দলের পক্ষে সর্বাধিক ৮টা সেঞ্চুরী করেন—তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ ২৪২।

১৯৪৭-৪৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় দলের পক্ষে তিনি অধিনায়কের পদ লাভ করেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার কারণে অস্ট্রেলিয়া সফরে যোগদান করতে পারেননি। এবং ঐ একই কারণে তিনি ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল পরিচালনার সম্মান লাভ করেও খেলায় যোগদান করতে সক্ষম হননি।

বিজয় মার্চেণ্ট মোট ১০টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এবং কেবল ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই।

বিজয় মার্চেণ্ট

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

	মোট খেলা	মোট রাণ	সর্বোচ্চ রাণ	গড়পড়তা
১৯৩৩-৩৪	৩	১৭৮	৫৪	২৯·৬৬
১৯৩৬	৩	২৮২	১১৪	৪৭·০০
১৯৪৬	৩	২৪৫	১২৮	৪৯·০০
১৯৫১-৫২	১	১৫৪	১৫৪	১৫৪·০০

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় দলের নির্বাচিত অধিনায়ক নরিম্যান জে কণ্ট্রাক্টর

॥ ডেভিস কাপ ॥

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে ইটালী ৪-১ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' গত দু'বছরের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' ইটালীর এই দ্বিতীয়বার খেলা। গত বছরের 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' ইটালী ৪-১ খেলায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়। যুদ্ধপরবর্তীকালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা এই দু'টি দেশই শুধু একটানা খেলেছে; ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের ইণ্টার-জোন ফাইনালে ইটালী আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে আমেরিকার একটানা প্রাধান্য খর্ব করে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য এখনও অক্ষুন্ন আছে।

রোমে অনুষ্ঠিত ১৯৬১ সালের ইণ্টার-জোন ফাইনালে প্রথম দিনের প্রথম সিংগলস খেলায় ইটালীর ফাস্টো গার্ডিনি অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকার ডগলাসের কাছে হেরে যান। দ্বিতীয় সিংগলস খেলাটিতে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ অপেশাদার খেলোয়াড় নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জেলী (ইটালী) আমেরিকার হুইটনী রীডের কাছে প্রথম দু'টি সেটে হেরে যান এবং ৩য় সেটেও হুইটনী অগ্রগামী হ'ন। কিন্তু উপযুক্ত আলোর অভাবে ২য় সিংগলস খেলাটি এই দিন অসমাপ্ত থেকে যায়। দ্বিতীয় দিন পিয়েত্রাঞ্জেলি তাঁর স্বাভাবিক খেলা ফিরে পেয়ে শেষ পর্যন্ত ২-৬, ৬-৮, ৬-৪,

৬-৪ ও ৬-৪ গেমে জয়ী হন। তাঁর জয়-লাভে খেলার ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়। পিয়েত্রাঞ্জলি এবং রীডের খেলা শেষ হ'তে ২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট সময় লাগে। দ্বিতীয় দিনে তাঁরা ১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট খেলেছিলেন।

তৃতীয় দিনের ডাবলসের খেলায় পিয়েত্রাঞ্জলি এবং ওরল্যান্ডো সিরোলা ৬-৪, ৩-৬, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে আমেরিকার হুইটনী রীড এবং ডোনাল্ড ডেলকে পরাজিত করলে ইটালী২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। তৃতীয় সিংগলস খেলায় পিয়েত্রাঞ্জলী ৯-৭, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে জন ডগলাসকে পরাজিত করলে ইটালী 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে' খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ফলে চতুর্থ সিংগলস খেলার আর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। ফাণ্টো গার্ডিনি ৩-৬, ৭-৫, ৩-৬, ৮-৬ ও ৬-৪ গেমে হুইটনী রীডকে ৪র্থ সিংগলস খেলায় পরাজিত করেন।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইটালীর 'চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের' খেলাটি হবে মেলবোর্ণে, আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর।

॥ এম, সি, সি, দলের পাকিস্থান সফর ॥

প্রেসিডেণ্ট একাদশ : ২০৮ ও ১৯৫ (৮ উইকেটে ডিক্লিয়ার্ড। লক্ ৫৩ রাণে ৫। মুস্তাক মহম্মদ নট আউট ১০২)

এম, সি, সি: ১৯৭ (জাভেদআখতার ৫৬ রাণে ৭ উইকেট) ও ১৫৪ (৭ উইকেট। রাসেল ৭২)। এম, সি, সি, দল প্রেসিডেণ্ট একাদশ দলের বিপক্ষে পাকিস্তান সফরের প্রথম খেলাটি ড্র করেছে।

এম, সি, সি : ২৫২ (রিচার্ডসন ৪২, ব্যারিংটন ৫৫। আফাক ৮৯ রাণে ৬ উইকেট) ও ১০৬ (পুলার ৫৩, ডি'সুজা ৩৩ রাণে ৭ উইকেট)

গভর্ণর একাদশ : ১১৯ (স্মিথ ২৩ রাণে ৪, রাসেল ২৫ রাণে ৩ উইকেট) ও ২১০ (সাকুর আমেদ ৬০, মামুদ হুসেন ৫০। এ্যালেন ৬৭ রাণে ৭ উইকেট)

পাকিস্তান সফরের দ্বিতীয় খেলায় এম, সি, সি, দল খেলা ভাঙ্গার ৪৫ মিনিট আগে ২৯ রাণে গভর্ণর একাদশ দলকে পরাজিত করে।

॥ দলিপ ট্রফি ॥

বোম্বাইয়ে আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল ১০ উইকেটে দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত ক'রে প্রথম বছরেই 'দলিপ ট্রফি' জয়লাভ করেছে।

পশ্চিমাঞ্চল দলটি দক্ষিণাঞ্চল দল অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। পশ্চিমাঞ্চল দলে খেলেছিলেন নরী কন্ট্রাক্টর, পলি উমরিগড়, অধিকারী, রামচাঁদ, নাদকার্ণী, দেশাই প্রমুখ নামজাদা খেলোয়াড়। অপর দিকে দক্ষিণাঞ্চল দলে নামকরা খেলোয়াড় বলতে তিনজন—কৃপাল সিং, মিলখা সিং এবং জয়সীমা।

দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথমে ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ১৭৫ রাণ করে। দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দল ৯ উইকেটে ২৩৪ রাণ ক'রে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস মাত্র ১৩৯ রাণে চা-পানের ২৫ মিনিট পর শেষ হয়। খেলায় জয়লাভের জন্যে পশ্চিমাঞ্চল দলের ৮১ রাণের প্রয়োজন হয়। ৫০ মিনিটের খেলায় কোন উইকেট না পড়ে তাদের ৬২ রাণ উঠে যায়। চতুর্থ দিনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক রাণ অর্থাৎ ৮২ রাণ করে পশ্চিমাঞ্চল দল ১০ উইকেটে জয়লাভ করে।

দক্ষিণাঞ্চল : ১৭৫ (কৃপাল সিং ৭৩; উমরিগড় ৫২ রাণে ৬ উইকেট) ও ১৩৯ (দেশাই ৫১ রাণে ৪ এবং রামচাঁদ ১৮ রাণে ৪ উইকেট)।

পশ্চিমাঞ্চল : ২৩৪ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বোরদে নট আউট ৮২; কৃপাল সিং ৬৬ রাণে ৪ এবংপ্রসন্ন ৬৯ রাণে ৩ উইকেট) ও ৮২ (কোন উইকেট না পড়ে)।

॥ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ ॥

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে। ওয়াটার পোলো ফাইনালে দু' বছরের বিজয়ী ক'লকাতা দল ৩-৭ গোলে বোম্বাই দলের কাছে পরাজিত হয়েছে। ক'লকাতা দল প্রতিযোগিতায় ৫৮ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম এবং বোম্বাই দল ৪৭ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

প্রতিযোগিতায় দু'টি ক'রে অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে চারজন সাঁতারু—ক'লকাতা দলের এস কে দাস (১০০ ও ২০০ মিটার পিঠ সাঁতার), আব্দুল মতলিব (২০০ মিটার বুক সাঁতার ও ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল) এবং নারায়ণ কুণ্ডু (১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাই); বোম্বাই দলের সারং (৪০০ ও ১৫০০ ফ্রি স্টাইল)।

॥ ডি, সি, এম, ফাইনাল ॥

১৯৬১ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস্ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের রাণার্স আপ ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টার দলকে পরাজিত করে। গত বছরের ডি, সি, এম ট্রফি বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি।

সেমিফাইনালের দ্বিতীয় দিনে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৫-৩ গোলে হায়দরাবাদ সেণ্ট্রাল পুলিস লাইন দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। এই খেলায় মহমেডান দলের সাহাবুদ্দিন হ্যাট-ট্রিক করেন। প্রথম দিনের সেমি-ফাইনাল খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টার দল ৩-১ গোলে সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজ দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়।

সি, সি, আই, ব্যাডমিণ্টন

বোম্বাইয়ে ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে মালয় দেশের খেলোয়াড়রা তিনটি অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে তিনটিতেই—পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস ফাইনালে জয় লাভ করেছে।

॥ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিণ্টন ॥

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে (ছাত্র বিভাগ) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ৩—২ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত করে। ছাত্রী বিভাগের ফাইনালেও বোম্বাই জয়ী হয় ৩—০ খেলায় আগ্রা দলকে পরাজিত করে।

অস্থায়ী সম্পাদক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

SINGAPURI HAND WOVEN
G.G.LUNGI COY.,
Ganamukala
গণমুকলা
সকল সম্প্রদায়ের ব্যবহার উপযোগী প্লেন ও চেক ডিজাইনের
গণমুকলা
লুঙ্গি
সকল লুঙ্গির দোকানেই পাইবেন

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৭ই কার্তিক, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 3rd November, 1961.
40 Naya Paise.

সম্পাদকীয়

ইদানীংকালের মধ্যে ভারতীয় রেলপথের সবচেয়ে মর্মান্তিক দুইটি দুর্ঘটনা এক পক্ষ কালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি ভয়াবহ। রাঁচি এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৫২ এবং টুনডলায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুর্ঘটনায়—এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত, নিহতের সংখ্যা ১৯ জন দাঁড়িয়েছে। বিজয়া দশমীর দিন রাত্রে রাঁচি এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনাটি যেভাবে ঘটে তার করুণ এবং ভয়াবহ বিবরণ দীর্ঘকালের মধ্যে জনসাধারণ এবং ট্রেন-আরোহীদের মন থেকে মোছা যাবে কিনা সন্দেহ। কলকাতায় এর শোক যে গভীর ছায়াপাত করেছিল, তার একটি সামান্য প্রতিফলন বোধহয় সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে।

এই ধরনের ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই নিহতের সংখ্যা নিয়ে এবং দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে জল্পনা দেখা দেয়। যাঁরা ঐ বীভৎস দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁদের পক্ষে মৃত্যুর যে কোনো সংখ্যাই প্রকাশিত হোক, তা সামান্য মনে হতে বাধ্য। অতীতেও প্রত্যেক রেল-দুর্ঘটনার পর নিহতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং রেল-কর্তৃপক্ষের হিসাব জনসাধারণ সাধারণত বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করেননি। কিন্তু আজকালকার দিনে নিহতের সংখ্যা নিয়ে রেলওয়ের তরফ থেকে কোনো বড় রকমের কারচুপি ঘটানো যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি দুরূহ। কাজেই আমরা ধরে নিচ্ছি যে, রাঁচি এক্সপ্রেসে নিহতের সংখ্যা ৫২-ই।

কিন্তু এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্মারকলিপিতে রেলওয়ে বোর্ডকে জানিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ডাঃ রায় যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, তার মূল কথা হচ্ছে এই যে, দুর্ঘটনার তদন্তের নাম ক'রে ঘটনাস্থলে হতাহতের উদ্ধারকার্য প্রায় ১২ ঘন্টা স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমন সময় এই উদ্ধারকার্য বন্ধ করা হয়, যেটা আহতদের পক্ষে সংকট মুহূর্ত। এর ফলে বিধ্বস্ত কামরাগুলির মধ্যে বন্দী অবস্থায় বহু আহতের মৃত্যু অসম্ভব ছিল না। ঐ অবস্থায় কারো মৃত্যু ঘটেছে কিনা একথা এখন প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু উদ্ধারকার্য পুনরায় আরম্ভ করার পর বিধ্বস্ত ট্রেন থেকে কয়েকজন আহতকে পাওয়া গেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই বন্দী অবস্থায় আহতের মৃত্যুর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একথা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে যে, শুধু দুর্ঘটনার জন্য নয়, রেলওয়ে ব্যুরোক্রেসির তলায় আর কিছু লোক চাপা পড়ে মারা গেছে। এই নির্বোধ নির্মমতার কোনো ক্ষমা হতে পারে না।

রাঁচি এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, ইঞ্জিনটি যথোপযুক্ত অবস্থায় ছিল না এবং ইঞ্জিনচালক এই ইঞ্জিনটিকে নিতে চাননি। অবশ্য তাছাড়াও এই দুর্ঘটনার পিছনে আরও কতকগুলি গুরুতর অনবধানতার কারণ থাকতে পারে। চালকের অনবধানতা ছিল কিনা, এই হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। তিনি স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুততর বেগে ট্রেন চালিয়ে সময় মেক-আপ করতে চেয়েছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, লাইনটি উপযুক্ত ছিল কিনা, অর্থাৎ রেলকর্মীদের অনবধানতার দরুণ ঐ পাহাড়ী অঞ্চলে চড়াই উৎরাই ও বাঁকের মুখে রেল দুর্বল ছিল কিনা, অথবা কোনো নাশকতামূলক অভিসন্ধির জন্য রেলের ক্ষতিসাধন করা হয়েছিল কিনা। রেল-কর্তৃপক্ষ প্রথমেই এবং বলাবাহুল্য বিনা তদন্তেই এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, নাশকতামূলক অভিসন্ধি এই দুর্ঘটনার পিছনে ছিল। পরবর্তী কালে এই সন্দেহের সমর্থনে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে কোনো সাক্ষ্য অবশ্য পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ কেউ একথা বলেননি যে, দুর্ঘটনার পরে লুণ্ঠন বা অপহরণের কোনো ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য আরও সূক্ষ্ম দুরভিসন্ধি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এতাবৎ প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য এবং সাক্ষ্য থেকে একথা যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে, দুর্ঘটনার কারণ হয় ইঞ্জিনচালকের অনবধানতা, নতুবা রেল-কর্তৃপক্ষের অনবধানতা। অনবধানতা বা অমনোযোগ যে এই দুর্ঘটনাগুলির প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যখন আমরা রেলের দুর্ঘটনার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি দেখি। যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অমনোযোগ বা অনবধানতা দেখা দেয় সেখানেও একটু গভীরে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, ঐ ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার পিছনেও রেলওয়ের সমষ্টিগত ত্রুটি ও অবহেলা রয়েছে। কাজেই আমরা মনে করি, এ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত এবং পূর্ণ তদন্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এবং ভারতীয় রেলওয়ের বহির্ভূত ব্যক্তিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। কিন্তু রেলমন্ত্রী কি এই পরামর্শে কর্ণপাত করবেন? আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ ভারতীয় রেলওয়ের উর্ধ্বতম প্রশাসনিক কাঠামোতেও বর্তমানে দুর্নীতি এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি প্রবেশ করেছে, তার প্রমাণ রেলওয়ে পরিচালনার অন্যান্য ঘটনায় বহুবার এবং প্রতিনিয়তই দেখা যাচ্ছে।

বারট্রাণ্ড রাসেল

মনীশ ঘটক

॥ ১ ॥

স্বৈরাচারীর অস্ত্র আতঙ্ক সৃজন।
মুহ্যমান গণচিত্তে করিয়া অর্পণ
শিলাসম ভারভার, অনুক্ষণ কাল
মজ্জমান রাখা তারে। সযত্নে ভয়াল
নব নব মারণাস্ত্র করি উদ্‌ভাবন
জিয়াইয়া রাখা বক্ষে সশঙ্ক স্পন্দন।
কালে ধর্মে ইতস্তত প্রসাদের কণা
সাড়ম্বরে ছিটাইয়া, হীন লুব্ধমনা
পরস্পরকুলে রাখা ব্যাপৃত কলহে।
সত্যসন্ধ বীর কেহ জাগিলে বিদ্রোহে
কণ্ঠরোধ করা তার প্রচণ্ড পৈশাচে।
ক্ষুব্ধ জনমত যদি সুবিচার যাচে,
যুক্তি-সহ আন্দোলনে করি অস্বীকার
ন্যায়ের মস্তকে দণ্ড হানা বারম্বার॥

॥ ২ ॥

সত্যের বিনাশ নাই, স্বয়ংপ্রভ সে যে।
অনির্বাণ শিখা তার তমোহন তেজে
জ্বলিছে দহিয়া নিত্য প্রেমের অরণি।
রহি রহি আসে ঝঞ্ঝা অন্ধ বেগে ধেয়ে
পুঞ্জীভূত হয়ে—তাহে ফেলিবারে ছেয়ে
দুর্যোগের ঘনঘোরে শাশ্বত সরণি।
হে মনীষি সত্যবান, তোমার আহ্বান
যুগে যুগে উদ্দীপিতে সুখসুপ্ত প্রাণ
তখন ধ্বনিয়া ওঠে গম্ভীর নির্ঘোষে
উপেক্ষিয়া মদোন্মত্ত রাক্ষসের রোষে।
দাম্ভিক দানব হানে কঠোর আঘাত
তব সমুন্নত শিরে করি বজ্রপাত।
প্রেম-মৈত্রী-ন্যায়-ধর্ম-সত্যাশ্রয়ী বীর
অটল নিষ্ঠায় তবু লক্ষ্যে রহো স্থির॥

*

প্রজাপতি

কালিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সব প্রজাপতি আসে যারা হঠাৎ হাওয়ায়,
সারাদিন উড়ে উড়ে খেলা করে শিশির প্রান্তরে,
কখনো কাশের কক্ষে, কখনো বা ঘাসের ঝালরে,
ক্বচিৎ ক্লান্তির লগ্নে অন্তরীণ ঝাউয়ের ছায়ায়।

সারাদিন উড়ে উড়ে খেলা করে শিশির প্রান্তরে,
বিপন্ন ঋতুর আর্তি অবসিত তাদের ডানায়,
ক্বচিৎ ক্লান্তির লগ্নে অন্তরীণ ঝাউয়ের ছায়ায়,
কদাচিৎ ভেসে যায় সিতপক্ষ নদীটির চরে।

বিপন্ন ঋতুর আর্তি অবসিত তাদের ডানায়,
নয়নীল মুহূর্তের অনুক্রান্ত স্বপ্ন স্বয়ম্বরে,
কদাচিৎ ভেসে যায় সিতপক্ষ নদীটির চরে,
আমার ঘরেও আসে মাঝে মাঝে নিরালা সন্ধ্যায়

নয়নীল মুহূর্তের অনুক্রান্ত স্বপ্ন স্বয়ম্বরে
ক্রমশ নিবিড় হয়ে হৃদয়ের একান্তে ঘনায়,
আমার ঘরেও আসে মাঝে মাঝে নিরালা সন্ধ্যায়
টেবিলে বইয়ের ফাঁকে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষায় আর;

ক্রমশ নিবিড় হয়ে হৃদয়ের একান্তে ঘনায়;
আমাকে কি নদী, ঘাস অথবা প্রান্তর মনে করে?

তিন হাজার তিনশ ব্যক্তিকে পানোন্মত্ততা, প্রকাশ্য রাজপথে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসদাচরণ ইত্যাদি অভিযোগে দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে গ্রেপ্তার ক'রে শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে। এদের মধ্যে পুরুষ আছে, নারীও আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের যেমন অর্ধেক অংশ থাকে মাটির উপর আর বাকী অর্ধেকটা থাকে মাটির নিচে, তেমনি আমাদের শারদোৎসবেরও একটা পরিচয় পাওয়া যায় আলোকমালাশোভিত পূজামন্ডপে ও ধূপধুনোসহকারে প্রতিমার আরাধনায়, আর বাকী পরিচয়টা উহ্য থাকে শুঁড়ির দোকানে এবং মধ্যরাত্রির ট্যাক্সিবিহারে। ......'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র যুগ থেকে এই একশ বছরে আমাদের শহুরে 'সভ্যতা' কেমন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে তার একটা স্পষ্ট চেহারা আন্দাজ করা যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, সেই 'সভ্যতা'কে ধিক্কার দেওয়ার জন্যে তখন 'আলালের ঘরের দুলাল', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'সধবার একাদশী' বা 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' রচিত হত, কিন্তু এখন আর তা হয় না। প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র। সব যুগে বড় মাপের সাহিত্যিক প্রতিভা না থাকতেও পারে। কিন্তু সাহিত্যিক সততা? তাও কি উধাও হ'য়ে গেল দেশ থেকে? না হলে ধিক্কারের বাণী উচ্চারিত হয় না কেন—কেন দেখতে পাই না সেই ধিক্কারের মধ্যে সমবেদনার অশ্রু!

আসলে সমাজের সর্বত্র ছেয়ে গেছে এক অন্তহীন উদাসীনতা। কিছুতেই যেন আর আমাদের কিছু এসে যায় না। যে সমাজটায় বাস করছি, এতটুকু ভালোবাসা নেই তার জন্যে। এ যেন জংশন স্টেশনে ট্রেন-বদলের অবকাশে প্ল্যাটফর্মের সংসার। দুদন্ড বই তো নয়! আলাপ-পরিচয় দূরে থাক, শোওয়ার বিছানাটাও যেন ভালো ক'রে খোলা হয় না।

বলতেই হবে এটা অপরাধ। সমাজের প্রতি কর্তব্যের কথা ছেড়ে দিলাম, বড় বড় বুলি কপচালে আজকাল সকলেরই হাই ওঠে, কিন্তু নিজের প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে?—নিজের এবং নিজের সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-পরিজনের প্রতি? তা কি পালন করছি আমরা? এই সাড়ে তিন হাজার

মানুষের মধ্যে কেউই আমাদের পরিচিত নয়, একথা হলপ করে বলা কঠিন। অনেকেই হয়তো পরিচিত, কেউ কেউ বন্ধু-স্বজন, এমন কি কেউবা একেবারে পুত্রকন্যা। না, পুত্রকন্যা কথাটা এত ভয়ে ভয়ে বলার দরকার নেই। তারা সকলেই আমাদের কারো-না-কারো পুত্র-কন্যা। সমাজের মধ্যেই জন্মেছে তারা, আমাদেরই কারো-না-কারো ঘরে এবং তারা বেশীভাগই 'ভদ্রলোক'। কাজেই তাদের সমস্যা আমাদের নিজেদেরই সমস্যা। তবু আমরা উদাসীন। একে এক ধরনের আত্মঘাতী অপরাধ ছাড়া আর কি বলা যায় জানিনে।

কিন্তু এভাবে আর চলা উচিত নয়, চলতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যে-সমাজের ছবি প্রতিফলিত দেখা যাচ্ছে সেটা ভয়াবহ। নিশ্চয়ই আমরা একটা উদ্দেশ্যহীন, নীতিহীন, উচ্ছৃঙ্খল ভবিষ্যতের জন্যে জীবনধারণ করছি না। আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত রকম ক্লেশস্বীকার, আত্মত্যাগ আর স্বপ্নকামনা সবই যে ব্যর্থ হতে বসেছে, এ বিষয়ে কি আমরা কিছুতেই সচেতন হব না?

ধিক্কারের কথা একটু আগে বলেছি—বলেছি সমবেদনার কথা। সেই ধিক্কারের মধ্যে ধ্বনিত হোক আমাদের নিজেদেরও দৈনন্দিন স্খালনের আত্ম-সমালোচনা, আর সমবেদনার মধ্যে দেখা দিক অসুস্থ উত্তরপুরুষের প্রতি শুশ্রূষার মনোভাব।

একজন সামান্য পাঠক হিসাবে বাঙালী লেখকদের প্রতি এই আমার অনুরোধ, এই আমার দাবি।

●

সিনেমা আমাদের জীবনে অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে। কোনো কোনো জননেতা এতে খুশি নন। কিন্তু সিনেমার আকর্ষণ কারো খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে না। যতোদিন আরো জোরালো এবং ঝাঁঝালো কোনো আনন্দ সিনেমাকে সিংহাসনচ্যুত না করে ততোদিন সিনেমার আধিপত্য বাড়বে বই কমবে না।

তাই বলেই স্কুল পালিয়ে ছেলেরা যে সিনেমার টিকিটের জন্যে লাইন লাগায় তাকে সমর্থন করছি না। কিংবা অল্পবয়সেই ছেলেমেয়েরা সিনেমার হিরো-হিরোইন হওয়ার জন্যে কলকাতা থেকে বম্বে পর্যন্ত পাড়ি জমায় তাকেও বাহবা দিচ্ছি না।

আসল কথা হল, সিনেমা ছেলেমেয়েরা দেখবেই—মানুষ হিসাবেই আনন্দ পাওয়ার এ আকর্ষণ তাদের সহজাত।

কিন্তু আমাদের দেশে সিনেমা-শিল্প বেড়ে উঠেছে একপেশেভাবে। এখানে নানা শিক্ষণীয় বিষয় বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যেমন অবহেলিত, তেমনি ছোটদের জন্যে লেখা গল্প-উপন্যাসেরও চিত্র-রূপায়ণ দুর্লভ। কাজেই বড়দের জন্যে তৈরী সিনেমাই ছোটরা দেখে এবং দেখার ফলে প্রতিক্রিয়াটা যে খুব শুভ হয় এমন বলা যায় না।

এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় ছোটদের মধ্যে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তুলতে সরকারী আনুকূল্যের ব্যবস্থা করা, আর অন্য উপায় হল, ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে টেলিভিসান বা টি-ভি'র প্রচলন করা। দিল্লীতে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা হ'য়েছে। কলকাতায় হবে না কেন বোঝা কঠিন।

আমার তো মনে হয়, দিল্লীর চেয়ে কলকাতায় টি-ভি'র ব্যবস্থা করা আরো জরুরী।

ছাত্র-অসন্তোষ, ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি অভিযোগ কলকাতারই এক প্রধান সমস্যা। সে সমস্যার সমাধানে টি-ভি একটা বড় অংশ নিতে পারে। আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষাদানের যে নীতি এখন সর্বজনস্বীকৃত, টি-ভি সেই নীতির প্রয়োগে যে কল্পতরুর মতো ফলপ্রদ হ'তে পারে তাতে সন্দেহ নেই। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই ব্যবস্থার ফল আরো সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। আমরা আশা করব, পরীক্ষা-গ্রহণের মরশুমে প্রতি বছর একবার করে ছাত্র-সমস্যা নিয়ে সোরগোল না তুলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করে এই ধরনের গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক, এবং অবিলম্বে।

সত্যাগ্রহ ও অহিংস অসহযোগ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সত্যাগ্রহ সশস্ত্র আক্রমণকারীর সহিত সংগ্রামে নিরস্ত্রের বিজয়াস্ত্র। ইহা সংকল্পের লৌহে সংযমের রসান দিয়া ত্যাগের বহ্নিতে প্রস্তুত ইস্পাতের অস্ত্র—দধীচির পূত অস্থিতে নির্মিত বজ্রের মত কার্যকরী। এই মহাস্ত্র বাঙ্গালীর মনীষার দ্বারা উদ্ভাবিত বা বাঙ্গালীর সাধনালব্ধ এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সহিত এত সামঞ্জস্যসম্পন্ন যে; বাঙ্গালী যত সাফল্যের সহিত ইহা ব্যবহার করিয়াছেন, তত আর কেহ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর লাঠির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই।" তেমনই বাঙ্গালীর হাতে এই অস্ত্র সত্যই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বাঙ্গালীর অস্ত্রাগার হইতে লইয়া মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতে এই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন—কিন্তু বাঙ্গালীর পরিচালননৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। চৌরীচৌরায় ইহা ব্যর্থ হইয়াছিল—বোম্বাই শহরে ইংলন্ডের যুবরাজের আগমনোৎসব বর্জনে তিনি স্বয়ং নেতৃত্ব করিয়াও ইহার ব্যবহার সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেন নাই—অহিংসা হিংসায় পর্যবসিত হইলে তিনি প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়া "মুখরক্ষা" করিয়াছিলেন—ব্যর্থতার গ্লানি গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী কখনও ইহা ব্যবহারে ব্যর্থতা বরণ করিতে বাধ্য হয় নাই—সে বিজয়ী হইয়াছে।

ইতিহাসে দেখা যায়, বাঙ্গলায় প্রথম সত্যাগ্রহী নেতা চৈতন্য দেব। নবদ্বীপে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি কাজী যখন সংকীর্তন নিষিদ্ধ করিয়াছিল, তখন তিনি মানুষের প্রাথমিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে নিষেধ অমান্য করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন—প্রেমধর্ম-প্রচারক, অহিংসার পৃষ্ঠপোষক—এমন কি উড়িয়াদিগের বিশ্বাস, তাহারা যোদ্ধা-জাতি ছিল—তাঁহারা প্রেমধর্মে দীক্ষিত হইয়া—অহিংসার অনুশীলনের ফলে পরাধীন হয়। তিনিই অত্যাচারীকে বলিয়াছিলেন—

"মেরেছ কলসীর কানা—
তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?"

তাঁহার সত্যাগ্রহ সফল হইয়াছিল—ক্ষমতামদমত্ত কাজীর নির্দেশের বিষদন্ত উৎপাটিত হইয়াছিল—যেন ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে। সে ত্যাগের মাহাত্ম্যে।

গত শত বৎসরে বাঙ্গালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে গণ-আন্দোলনে এই মহাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে—জয়ী হইয়াছে—

(১) নীলকরদিগের অত্যাচার বিনাশে;

(২) ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের বহ্নি নির্বাপিত হইতে না হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় অত্যাচারী নীলকরদিগের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার জনসাধারণ আন্দোলন আরম্ভ করে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, হিন্দু ও মুসলমান সব প্রভেদ ভুলিয়া একই উদ্দেশ্যে একযোগে সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা অহিংসায় অবিচলিত ছিল—সংগ্রামের পন্থা তাহাদিগের ধাতুসহ ছিল—প্রয়োজনে নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল—কেহ তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বা মনোনীত করে নাই। নীলকররা "রাজার জাতি"—আইন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র অধিকারে অধিকারী করিয়াছিল; বিচারক ইংরেজরা তাহাদিগের বন্ধু, ক্ষমতাশালী ও ধনী ইংরেজ সম্প্রদায় তাহাদিগের সমর্থক; ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রদ্বয় তাহাদিগের সহায়। প্রজারা অশিক্ষিত, নিরস্ত্র, দরিদ্র ও দুর্বল। কিন্তু তাহারা সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইল—সংকল্প; "হাত কাটিয়া ফেল—তবুও নীলের চাষ করিব না।" মুখপাত্র কেবল একখানি সংবাদপত্র—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট।"

জনগণ কিরূপ সংকল্প লইয়া একযোগে কাজ করিয়াছিল, তাহা কলিকাতা হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত ছোটলাট সার জন পিটার গ্রান্টের "মিনিট" হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়—

"আমি যমুনা নদীর তীরবর্তী জিয়াগঞ্জ হইতে কেবল ফিরিয়া আসিতেছি। আমি ঢাকার রেলপথ সংক্রান্ত কাজের জন্য তথায় গিয়াছিলাম—নীলের ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। মাথাভাঙ্গা (চূর্ণী) নদী হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়া গমনই আমার অভিপ্রেত (ব্যবস্থা) ছিল। কিন্তু কুমার নদীতে পৌঁছিয়া যখন দেখা গেল, অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব পথে যাওয়া যায়, তখন আমার স্টীমার কুমার ও কালীগঙ্গা দিয়াই (গন্তব্যস্থলাভিমুখে) অগ্রসর হয়। এই দুইটি নদী নদীয়া, যশোহর ও পাবনা জিলাত্রয়ের কতকাংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নানা স্থানে (নদীকূলে) প্রজারা উপস্থিত ছিল। তাহাদিগের একমাত্র প্রার্থনা—সরকার ঘোষণা করুন, তাহাদিগকে (বাধ্য হইয়া) নীলের চাষ করিতে হইবে না। আমি যখন ঐ দুই নদীপথে প্রত্যাগমন করি, তখন ঊষা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত—আমার স্টীমার যখন ৬০।৭০ মাইল পথ অতিক্রম করে সেই সময় নদীর উভয় কূলে জনগণে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা এই বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করিতেছিল। নদীতীরবর্তী গ্রামসমূহের স্ত্রীলোকরাও স্বতন্ত্ররূপে উপস্থিত ছিলেন। যে সব পুরুষ গ্রামে ও দুইটি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে সমবেত ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই উভয় কূলের দূরবর্তী গ্রামসমূহ হইতেও আসিয়াছিল। ভারতে সরকারের কোন কর্মচারী যে কখন ১৪ ঘন্টা কাল

এইরূপ বিচারপ্রার্থী জনতার মধ্য দিয়া ষ্টীমারে গমন করিয়াছেন, ইহা আমার ধারণাতীত। লোক সকলেই শৃংখলা-সম্পন্ন ও সম্ভ্রমশীল; কিন্তু তাহাদিগের আন্তরিকতা অসাধারণ। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর এইরূপ কার্য যে অর্থহীন এমন মনে করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। ইহার বিশেষ অর্থ আছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার এই যে ক্ষমতা ইহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখাই সংগত।"

এ বিষয়ে বড়লাট ক্যানিং লিখিয়াছিলেন, "(এই ব্যাপারে) আমি সপ্তাহকাল যে উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছি দিল্লীর (অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের) ব্যাপারের পরে আর কখনও সেরূপ উৎকণ্ঠা ভোগ করি নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম, কোন নির্বোধ নীলকর যদি ক্রোধবশে বা ভীতিহেতু একবার গুলী চালায়, তবে তাহাতে নিম্নবঙ্গে সব নীলকুঠী অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।"

লর্ড ক্যানিং যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা যে কার্যে পরিণত হয় নাই—তাহার কারণ, বাঙ্গালী অত্যাচারে ও অনাচারে ধৈর্য হারায় নাই—সংযম বর্জন করে নাই। সে আপনার সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল—ন্যায়ের জয় হইবেই।

ইংরেজ সরকার বাধ্য হইয়া প্রজাদিগের পক্ষে "হিন্দু পেট্রিয়ট" যে দাবী করিয়াছিল, তাহাই পূর্ণ করেন—নীলকরদিগের সম্বন্ধে অভিযোগ অনুসন্ধান করিতে কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনে প্রজাদিগের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সত্যাগ্রহীদিগের জয় হয়।

বহুদিন পরে বাঙ্গলায় আবার সত্যাগ্রহ হয়। সে ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে। বাঙ্গালীর রাজনীতিক শক্তি খর্ব করিবার জন্য বাঙ্গলাকে খণ্ডিত করিবার চেষ্টা ইংরেজ শাসকেরা করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন যখন বড়লাট হইয়া এ দেশে আসিলেন, তখন একটি ঘটনায় বাঙ্গালীর উপর তাঁহার ক্রোধ প্রবল হইল। তিনি ছিলেন—অসাধারণ দাম্ভিক ও সাম্রাজ্যবাদী। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশে কথা ছিল—

"I am George Nathaniel Curzon
I am a quite superior person".

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যরূপে বক্তৃতা-প্রসংগে তিনি বলিলেন—সত্য প্রতীচীর লোকের ধর্ম অর্থাৎ প্রাচ্যের লোকরা সত্যের আদর করে না—তাহারা তোষামোদ করে—ইত্যাদি। তিনি ঐরূপ উক্তি করিয়া চলিয়া যাইলেন। তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু স্মৃতিবিজড়িত গাম্ভীর্যসুন্দর সিনেট হল ভূমিসাৎ করা হয় নাই। হলের সম্মুখে বিস্তৃত বারান্দায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মর্মরমূর্তির কাছে দাঁড়াইয়া গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা ঐ অসম্মানজনক উক্তির আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় গৈরিকবাসধারিণী এক ইংরেজ মহিলা তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদিগের কাহারও কাছে কি কার্জনের 'প্রব্লেমস অব দি ফার ইস্ট' গ্রন্থ আছে?" তিনি ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলিলেন, লর্ড কার্জন স্বয়ং কিরূপ মিথ্যাশ্রয়ী ও তোষামোদপটু তাহা ঐ পুস্তকে তিনিই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গুরুদাসবাবু বলিলেন, "ভগিনী, আমার কাছে ঐ পুস্তক আছে।" ভগিনী নিবেদিতা গুরুদাসবাবুর গাড়ীতে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন।

এক দিন পরেই 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' পাশাপাশি লর্ড কার্জনের বক্তৃতার আপত্তিজনক অংশ ও তাঁহার পুস্তকে তাঁহার লিখিত মিথ্যা কথা বলিয়া কার্যোদ্ধারের বিবরণ প্রকাশিত হইল। লর্ড কার্জন যাহাকে গাল বাড়াইয়া চড় খাওয়া বলে তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

বাঙ্গালাকে খণ্ডিত করিবার প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালীরা তাহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ-ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন:—

WHEREAS the Government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that we, as a people, shall do everything in our power

to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So help us God."

অর্থাৎ—

যেহেতু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার বাঙ্গলা খণ্ডিত করা উচিত মনে করিয়াছেন, সেইহেতু আমরা প্রতীজ্ঞা ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদিগের প্রদেশ খণ্ডিত করার কুফল নষ্ট করিতে ও জাতির একতা রক্ষা করিতে আমরা যথাসাধ্য কাজ করিব। (এ কাজে) ভগবান আমাদিগের সহায় হউন।

বাঙ্গালীর সত্যাগ্রহের ফলে ইংরেজ সরকার বাধ্য হইয়া বঙ্গ-বিভাগ পরিবর্তিত করিতে—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ এক প্রদেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর এই সত্যাগ্রহ কিরূপ সবল ও প্রবল হইয়াছিল বহুদিন পরে পঞ্জাবের রাজনীতিক নেতাদিগের অন্যতম ডক্টর সত্যপাল তাহা বলিয়াছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নির্দেশে বা পরামর্শে বল্লবভাই প্যাটেল বারদোলী তালুকে সত্যাগ্রহ নিয়ন্ত্রিত করেন। সেই সত্যাগ্রহের সাফল্যই তাঁহার রাজনীতিক জীবনের প্রথম প্রশংসনীয় কীর্তি। ব্যবস্থায় সাফল্যে প্রীত হইয়া গান্ধীজী প্রভৃতি তাহা দেখাইবার জন্য ডক্টর সত্যপালকে তথায় লইয়া যায়েন। ডক্টর সত্যপাল দেখিয়া প্রীত হয়েন এবং সত্যাগ্রহ পরিচালনকারীদিগের অনুরোধে দিল্লীতে এক সভায় তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তিনি ব্যবস্থার বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন—যিনি এই বিস্ময়কর কাজ করিয়াছেন (বল্লভভাই প্যাটেল) তিনি বিস্ময়কর ব্যক্তি এবং মন্তব্য করেন—

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কালে স্বদেশী আন্দোলন যখন পূর্ণ ও প্রবল তখন বাঙ্গালায় যাহা হইয়াছে—(বারদোলীর ব্যবস্থায়) তাহাই স্মরণ করায়।

বল্লভভাই বারদোলীতে যে প্রায় সামরিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ডক্টর সত্যপাল বলেন—

স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক সময়ে উত্তেজনার মধ্যে বরিশালের মুকুটহীন (অর্থাৎ প্রকৃত) রাজা অশ্বিনীকুমার দত্ত যাহা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহাই স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। অশ্বিনীবাবু আন্দোলন এমন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, বরিশালে বিদেশী বস্ত্র ত পরের কথা এক ছটাক বিদেশী লবণ বা চিনিও পাইবার উপায় ছিল না। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে, বরিশাল জিলার ইংরেজ শাসকও ঐ সকল (বিদেশী) পণ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

তাহার পরে ঐ অবস্থায় ক্রুদ্ধ ছোটলাট সার ব্যামফাইল্ড ফুলার যাহা করিয়াছিলেন, ডক্টর সত্যপাল তাহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়া লোককে ইতিহাসের সেই পৃষ্ঠা দেখাইয়া দিয়া মন্তব্য করেন—

ফুলার ক্রোধে বিচলিত হইয়া বরিশালের নেতৃবৃন্দকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহারা আসিলে সেই বৃটিশ আমলাতন্ত্রের লোক অশ্বিনীবাবুকে বর্বরোচিতভাবে অপমাণিত করেন। কিন্তু তাহাতে (সত্যাগ্রহী নেতা) অশ্বিনীবাবুর খ্যাতি অপেক্ষা বৃটিশ শাসনের সম্ভ্রমের অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। কারণ, সেই কাজে প্রতিপন্ন হয়—সার ব্যামফাইল্ড ফুলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হইলেও মানুষ হিসাবে হীন।

এই সত্যাগ্রহ কিরূপ সফল হইয়াছিল তাহা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ কথাপ্রসঙ্গে বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন—তিনি যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে যাইয়া বাঙ্গলায় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হয়, বাঙ্গালী জাতির—সমগ্র জাতির—আকাঙ্ক্ষা কেন পূর্ণ করা হইবে না? কেন বাঙ্গলা প্রদেশ "প্রেসিডেন্সীতে" পরিণত করা হইবে না? সেইজন্য স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি বঙ্গ-বিভাগের পরিবর্তন সাধন চেষ্টা আরম্ভ করেন।

তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন— বঙ্গ-বিভাগ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আর পরিবর্তিত হইবে না। বাঙ্গালীর সত্যাগ্রহ কিন্তু ইংরেজকে তাহা পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

এই সকলে প্রতিপন্ন হয়, বাঙ্গালীর মনীষায় সৃষ্ট, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন সত্যাগ্রহ বাঙ্গালী যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে ব্যবহার করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছে, তেমন ভারতের আর কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে শতবর্ষ পরে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা ভাষাকে তাহার প্রাপ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আসামে বাঙ্গালীরা সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা নষ্ট করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে অরবিন্দের কথা মনে পড়ে—প্রত্যেক বিরাট যজ্ঞেরই রাক্ষস থাকে; তাহারা ছলে বলে কৌশলে অপবিত্র দ্রব্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া ধর্ম নষ্ট করিবার ও হোমানল নির্বাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করে; এবং সেইজন্যই শান্তিপূর্ণ ব্রহ্মতেজে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় করিবার জন্য ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন হয়।

আমরা আসামের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিব না। কারণ, সে সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার সময় এখনও হয় নাই। আমরা কেবল লক্ষ্য করিব—১৯শে মে ১১ জন সত্যাগ্রহী নিহত হইলেও আসামে বাঙ্গালীদিগের সত্যাগ্রহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

'আর তবে ভাবনা কী।' একগাল হাসল সখীলাল : 'এবার তো সেটলিং ডেট পড়ল।'

সে আবার কী! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মনোরথ।

'ঐ যাকে সংক্ষেপে বলে এস-ডি। মামলা-মোকদ্দমার বাজারে এস-ডি শুনিস নি?' সখীলাল অবাক হবার ভাব করল।

'কী করে শুনব?' অপরাধীর মত মুখ করল মনোরথ : 'আমি কি এ লাইনের লোক? আমি গাঁয়ের এক ভ্যাদভেদে চাষা। আমি কি ইংরিজি-টিংরিজি বুঝি।'

'আগে ইসু গেল, পরে ডিসকভারি, এখন সেটলিং ডেট।'

হাঁ হয়ে রইল মনোরথ।

'মানে, এবার মামলা পেরেমপটারি বোর্ডে উঠবে।' মুখ-চোখ যথাযোগ্য গম্ভীর করল সখীলাল।

সে আবার কী।

'তুই যে একেবারে আকাট মেরে গেলি! পেরেমপটারি বোর্ডের নাম শুনিসনি!' সখীলাল মনোরথের গায়ে ঠেলা মারল। 'তার মানে এবার তোর মামলার শুনানির তারিখ পড়বে। তোর মামলা এবার শুনানির জন্যে তৈরী হল।'

'হবে? আমার মামলায় এবার শুনানি হবে?' আনন্দে থলবল করে করে উঠল মনোরথ।

সেই কবে থেকে মনোরথের হায়রানি চলেছে। এক সমন জারি করতেই এক বছরের ধাক্কা। কে একটা বিবাদী মারা গেল, তার ওয়ারিশ কায়েমমোকাম করো। ওয়ারিশদের মধ্যে দুটো আবার নাবালক, একটা নিরুদ্দেশ। নাবালক দুটোর জন্যে কোর্ট-গার্ডিয়ান বসাও, আদায় করো ফাইন্যাল রিপোর্ট। নিরুদ্দেশটার শেষ বাসস্থানের ঠিকানা জানো, সেখানে ঢোল-সহরৎ করে বিকল্প জারির ব্যবস্থা করো। ঝকমারির একশেষ।

আরো কত রকমের বায়নাক্কা।

এতদিনে পার দেখা গিয়েছে সমুদ্রের। একটি আশার বাতি টিপটিপ করে উঠেছে।

'এবার তবে যন্ত্রণার শেষ হবে।' আরামের নিশ্বাস ফেলল মনোরথ।

সখীলাল ফিকফিক করে হেসে উঠল।

"দিন ফেলবে কে?' উৎসাহ নিয়ে তাকাল মনোরথ : 'হাকিম নিজে?'

'ভাব দেখাবে হাকিম ফেলছে, কিন্তু আসল কর্মী পেশকার। তাকে দিতে হবে এক টাকা।'

'দেব। দেখো দিনটি যেন আগে পড়ে।'

'হ্যাঁ, যত শিগ্‌গির সম্ভব ও যন্ত্রণার শেষ হয়।'

'সেদিন আমাকে তো আসতে হবে না? আমার সেদিন কী দরকার!' বটতলায় একসঙ্গে দু পা হাঁটতে হাঁটতে বললে মনোরথ।

'আসতে হবে না মানে?' সখীলাল দাঁড়িয়ে পড়ল : 'না এলে শুনানির দিন জানবি কী করে?'

সত্যিই তো, না এলে চলবে কেন?

দক্ষিণ-বারাসত নেমে আট মাইল মেঠো রাস্তা পার হয়ে তার বাড়ি। তা হোক। পথকষ্ট যতই হোক, তাকে

আদালতে আসতেই হবে। তার বিচার চাই। সকল কষ্টের উপশম।

দিন-ফেলার দিনও এল মনোরথ।

কোর্টের হাতার মধ্যেই হিন্দুস্থানীর চায়ের দোকানের এক পাশে উকিল শিবপদর সেরেস্তা। সখীলালকে ডেকে জিগগেস করল শিবপদ : 'কী বলে?'

'আজকের জন্যে ফি দিতে চায় না।'

'কেন? কী হল!'

'বলে আজ কিছু করবার নেই। বলবার-কইবার নেই!'

'বলে কী!' চোখ কপালে তুলল শিবপদ।' 'ডাকো, ডাকো শিগগির।'

মনোরথ সেরেস্তায় এসে পেঁছুতেই শিবপদ হাত পাতল : 'নাও, বউনি করো।'

'আজ মাপ করুন বাবু—' মিনতির ভঙ্গি করল মনোরথ।

'এর আবার মাপামাপি কী!' শিবপদ হাঁ হয়ে রইল : 'এ তো ন্যায্য পাওনা।'

'ইস্যুতে দিয়েছি, ডিসকভারিতে দিয়েছি, এস-ডি-ওতে আর দিতে বলবেন না।'

'এস-ডি-ও কী রে! এস ডি।' সখীলাল হাসিতে ফেটে পড়ল।

'তা যাই হোক, আজ তো আর কিছু বলতে-কইতে হবে না। আজ শুধু দিনটি পড়ে যাবে। পেশকারের এক টাকা বরং দিই।' শার্ট তুলে ফতুয়ার পকেটে হাত রাখল মনোরথ।

'বলতে-কইতে হবে না মানে!' কী বলছ তুমি?' শিবপদ তেড়ে উঠল : 'আজ তারিখ নিয়ে, তারিখ ফেলা নিয়ে, দস্তুরমত হিয়ারিং হবে। এস-ডি—এস-ডি মানে কী?'

সখীলালের দিকে নির্বোধের মত তাকাল মনোরথ।

'এস-ডি মানে সাজেস্টেড ডে। তার মানে দু পক্ষের উকিল নথি থেকে প্রমাণ ঘাঁটিয়ে দেখাবে যে এই দিনে শুনানি হওয়া দরকার।' নির্ভেজাল মুখে বললে শিবপদ। 'ও পক্ষের উকিল হয়তো লম্বা করবার জন্যে বললে, ধরো সেই চৈত্র মাস, আর আমি সংক্ষেপ করবার জন্যে বললাম, ধরো এই পউষ। এখন এ নিয়ে তর্কাতর্কি। এ কি যে-সে ব্যাপার? এর জন্যে সমস্ত রেকর্ডটি তন্ন তন্ন করে পড়া দরকার—কোথায় কোন্ সাক্ষীর কী ঠিকানা, কোত্থেকে কী দলিল তলব—হাজার গন্ডা ঝামেলা—'

তর্ক করে কী বুঝবে বা বোঝাবে মনোরথ। সে শুধু মিনতি করতে পারে। তাই কান্নামাখা গলায় বললে, 'বাবু একটু দয়াদাক্ষিণ্য করুন।'

'বেশ তো, পুরো ফি ষোল টাকা না দাও, আট টাকা দাও—'

'আর পেশকারের এক টাকা।' জুড়ল সখীলাল।

'আজ কম আছে বাবু।'

'কম আছে?' কত কম আছে? মনোরথের ফতুয়ার পকেটের দিকে তাকাল শিবপদ।

'চার টাকা আছে।'

'যাক গে, ওটাকে এক থাপ্পড় করে দাও।'

ভ্যাবাচাকা খেল মনোরথ।

সখীলাল বুঝিয়ে বললে, 'তার মানে পাঁচ টাকা করে দাও। একটা পেশকারের তা ভুলে যাও কেন?' পাঁচ টাকাই দিল মনোরথ। চার টাকা শিবপদ নিলে, আর বাকি টাকাটা সখীলাল।

যেদিন খুশি যেমন খুশি দিন পড়ুক। দিন তো একটা পড়বেই। দিন না পড়ে যাবে কোথায়!

মনোরথকে সেরেস্তায় বসিয়ে কালো কোটের উপর গাউনের হিজিবিজিটা ভুর করতে করতে কোর্টের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে দিল শিবপদ। আর তারই পিছু পিছু সখীলাল।

ফিরে এলে শশব্যস্তে জিগগেস করল মনোরথ : 'কী হল?'

'আবার এস-ডি পড়ল।' শিবপদ বললে।

'আবার এস-ডি মানে? মনোরথ আঁধার দেখল চারদিক।

'তোমাকে বলছি বুঝিয়ে।' শিবপদ সেরেস্তায় তক্তপোশে বসে হাঁপ ছাড়ল। বসলে, 'তার আগে ঐ চাটগাঁর দোকান থেকে ভাঁড়ে করে একটা বেশ কড়া মিষ্টি চা দিয়ে যেতে বলো।'

চা এল ভাঁড়ে করে। রুমালে করে ধরে চুমুক দিল শিবপদ। বললে, 'হাকিমের ডায়রি ভীষণ ঠাসা, তোমার মামলার তারিখ ফেলবার জন্যে দিন পাচ্ছে না।'

'দিন পাচ্ছে না মানে!' আমার মামলার তবে শুনানি হবে না।'

'হবে। না হয়ে যাবে কোথায়?' ভাঁড়ে আবার চুমুক দিল শিবপদ : 'তবে দেরি হবে।'

'আর কত দেরি!' মনোরথ এবার বুঝি শূন্যের দিকে তাকাল।

'তা কী করা যাবে বলো! আরো অনেক-অনেক মামলা যে ফাইলে।'

'তাতে আমার কী!' মনোরথ হঠাৎ রাগ করে উঠল : 'অনেক মামলা বলে আমার মামলার তাড়াতাড়ি শুনানি হবে না? আমি দগ্ধে দগ্ধে মরব!'

'অত কোর্ট কই? হাকিম কই?'

'কেন বেশি-বেশি কোর্ট হবে না, হাকিম বসবে না?' আরো তপ্ত হল মনোরথ : 'কোর্টের অভাবে হাকিমের অভাবে মামলার নিষ্পত্তি বন্ধ থাকবে? আমি দম আটকে মরব?'

'অত কোর্ট করার মত উপরালার পয়সা কই?' জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল শিবপদ।

'কেন আমি উপরালাকে কম পয়সা দিয়েছি?'

'তুমি দিয়েছ? তুমি আবার কখন দিলে?' ভাঁড়ের থেকে মুখ তুলল শিবপদ।

'কেন, আমি কোর্ট-ফি দিই নি? আমার বিচারের মাশুল?'

'ও, হ্যাঁ, তা দিয়েছ বটে।'

'আর তা কি চারটিখানি?' খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়ল মনোরথ। বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'জমির দাম বেড়েছে বলে মামলার ভেলুয়েশান বেড়ে গেল, চলে এল সবজজ কোর্টে। কত টাকার বাড়তি

কোর্ট-ফি নিলে আদায় করে। আপনি তো সব জানেন—'

'হ্যাঁ, অনেক টাকা।' শিবপদ সমবেদনার সুর আনল।

'তবে? এত টাকা দেবার পরও আমি তাড়াতাড়ি বিচার পাব না? খালি এস-ডি পড়বে? বলবে কোর্টের অভাব?'

'তুই ভেবেছিস তোর টাকা দিয়ে কোর্ট হবে?'

'তবে আর কী হবে!'

'তোর টাকা দিয়ে বড় বড় কাজ হবে। হাসপাতাল হবে ইস্কুল হবে, রাস্তাঘাট হবে, কত কী হবে।'

'আর আমার নিজের মামলারই বিচার হবে না। হাসপাতালে-ইস্কুলে আমার দায় কী। আমার থেকে কোর্ট-ফি নিয়েছ আমাকে কোর্ট দাও, মামলার তারিখ দাও, শুনানি দাও। ট্রেনের টিকিট বেচলে, ট্রেনে চড়ালে, অথচ ট্রেন ছাড়লে না ও কেমনতরো কথা?'

'ট্রেন ছাড়লেই যে পেঁছুবে শেষ পর্যন্ত, তার ঠিক কী।' শিবপদ ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

এস-ডি এস-ডি করে তিন দফায় আরো ছ' মাস চলে গেল। প্রতি দফায় এক থাপ্পড় করে ফি নিল শিবপদ।

কিন্তু পাঁচ টাকায় কী হবে? শুনানির দিন না পড়লে রোজগার মোটা হয় কী করে? আর শিবপদর যত আর্গুমেন্ট তা শুনানির দিনটা একবার ধার্য হোক, পাঁচকে যত শিগগির পারি পঁচিশ করি।

সেই খবরই শেষ পর্যন্ত সেদিন নিয়ে এল শিবপদ।

যেন কলম্বস আমেরিকা দেখতে পেয়েছে এমনি জয়ধ্বনি করে উঠল। 'আর ভাবনা নেই। শুনানির দিন পড়েছে। আঠারোই জুন। আর আমাদের কে হটায়!'

শিবপদ এমন ভাব করল যেন কত বড় সে এককাণ্ড করে এসেছে। দিন পাওয়া মানে যেন

সখীলাল বললে, 'এ একেবারে পেরেমটরি ডেট। নট নড়ন চড়ন।'

চোখমুখ উজ্জ্বল করে মনোরথ জিগগেস করল : 'সেদিন শুনানির দিন, সাক্ষী আনব বাবু?'

'প্রথম দিনই সাক্ষী আনবে কী!' শিবপদ চাটগাঁয়ের চায়ের দোকানের দিকে তাকাল : 'প্রথম দিন তো ওপনিং করতেই যাবে।'

একবার পেট কাটাতে হাসপাতালে গিয়েছিল মনোরথ। ডাক্তারদের মুখে শুনেছিল ওপনিং করার কথা। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল মনোরথের। ভাবলে কোর্টে আবার পেট কাটবে নাকি?

সখীলাল বললে, 'ওপনিং করা মানে হাকিমকে মামলার বিষয়টা বুঝিয়ে বলা।'

'সাবজজ কোর্ট তো!' শিবপদ আরো বিশদ হল : 'বোঝাতেই লেগে যাবে সারাদিন।'

এর আবার বোঝাবার কী আছে! বিবাদী বলাই মণ্ডল অনুমতিসূত্রে মনোরথের জমি দখল করত, চেয়েচিন্তে ভিক্ষে করে একখানা খড়ো চালের ঘরও তুলেছে, এখন, এমন অকৃতজ্ঞ, বলছে তার প্রজাই স্বত্ব হয়েছে। কী করে হয়? একখানা খাজনার রসিদ দেখাক তো বুঝি। কিংবা কোনো আকলনামা। যে কোনো একটা চিরকুট। মুখের কথায় স্বত্ব হবে? ওর থাকা তো অনধিকার থাকা। দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষলে সে যে উপকারীকে দংশন করবে, এর আবার বোঝানো কী! এ তো এক কথায় বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

যে আদালত যত বেশি সম্ভ্রান্ত তার বুঝতে তত বেশি সময় লাগবার কথা এমনি ভাব করল শিবপদ। বললে, 'কোর্টের আবার নতুন সেসন পাওয়ার হয়েছে—'

'আর সেসনের মামলায় ওপনিং তো অবধারিত।' সখীলাল ফোড়ন দিল।

'না, হোক ওপনিং। সারা দিন ধরেই হোক।' এরই মধ্যে সাক্ষী সব আনতে পারি কিনা ঠিক কী।

'হ্যাঁ, সাক্ষী জোগাড় করাও আরেক বিরাট পর্ব।' সহানুভূতির সুর আনল শিবপদ।

আঠারোই জুন পঁচিশ টাকাই হেঁকেছিল, মনোরথ বললে, 'ষোল টাকা নিন বাবু। ওপনিংএর পরে না হয় আরো চার টাকা দেব।'

'কিন্তু সাক্ষীর একজামিনের দিন বা সওয়াল জবাবের দিন কিন্তু পুরো পঁচিশ টাকা চাই।' শিবপদ কোর্টের মর্যাদার উপর আবার জোর দিল : 'যে-

সে কোর্ট নয়। সেসন পাওয়ার-ওয়ালা সবজজের কোর্ট।'
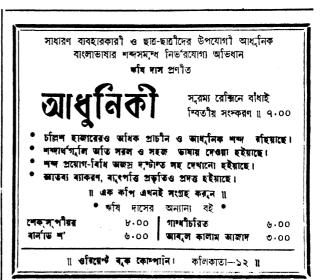
'সে অবস্থাটা আসুক, দেব পুরো টাকা।'

'আর যতদিন তা না আসে, ষোল টাকার এক তন্তু কম নয়।' হাতটা ঠুঁটো করে বাড়িয়ে ধরল শিবপদ।

কী বুঝল কে জানে, বৃহৎ আশায় বুক বেঁধে, মনোরথ ষোল টাকা দিল উকিলকে।

সখীলাল বললে, 'আর আমার এক টাকা।'

কোর্ট থেকে ঘুরে এল শিবপদ। বললে, 'সব ঠিক করে এসেছি। টিফিনের পর হবে। তুমি তিনটের সময় কোর্টে গিয়ে বসবে। বুঝলে?'

সেই আড়াইটে থেকে কোর্টের শেষ বেঞ্চিতে মনোরথ বসে আছে গ্যাঁট হয়ে, কখন তার মামলার ডাক পড়ে তারই জন্যে কান খাড়া করে আছে। আদালতের চাপরাশির মুখে তার নামটা উচ্চারিত হবে এ যেন এক অদ্ভুত কৌতুক।

কই ডাক পড়ল না মামলার। তিনটে বেজে গেল।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল শিবপদ। পেশকারের কানের কাছে কী গুজগুজে করলে। পেশকার বললে, ছ বছর বুড়ো একটা পার্টহার্ড মামলা আছে। হাকিম সেটা আগে তুলে নিল। তাই তো নেবে। আপনার মামলা তো বাচ্চা।

'পেশকারকে কিছু দেওয়া হয়নি বুঝি?' সখীলালের উপর মুখিয়ে এল শিবপদ: 'বুঝতে পারছ সব তার কারসাজি। পরের তারিখে যেন এমন ভুল না হয়।' পরে মনোরথের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার সুর ভাজল: 'কী করবে বলো। যে বুড়ো তাকেই তো আগে খতম করবে।'

'কে বলে?' খেপে উঠল মনোরথ: কত বুড়ো টি'কে থাকে আর কত বাচ্চা শিশু মরে যায় অকালে।'

'তা হাকিমের বিরুদ্ধে তো যেতে পারি না।' নিরাতির ভাষায় বললে শিবপদ।

আগস্ট মাসে দিন পড়ল।

সেদিনও কোর্টের সময় হল না। বৃদ্ধতর মামলা পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

'কোর্টের সময় না হলে কী করা যাবে বলো?'

'কেন সময় হবে না? ডাক্তারের ফি দিয়েছি কেন ডাক্তার পাব না?' মরীয়ার মত বললে মনোরথ, 'সব লেনদেনেই দাম দিলে তক্ষুনি-তক্ষুনি জিনিস পাওয়া যায়, মামলার বিচারের বেলায় দেরি কেন? তবে দাম নেয় কেন? দাম নেয় তো জিনিস কই?'

পুজোর ছুটি পেরিয়ে নভেম্বরে দিন পড়ল। আবার বড়দিন পেরিয়ে পরের বছর ফেব্রুয়ারি।

আশ্বাসের সুর বার করল শিবপদ: 'তোর মামলা ক্রমশই বুড়ো হচ্ছে।'

ফেব্রুয়ারিতেও মুলতুবি। সেই মামুলি মন্ত্র। 'ফর ওয়াণ্ট অফ কোর্টস টাইম।'

'বাবু, অন্য কোর্টে মামলাটা বদলি করে নিলে হয় না?'

'সে তো ফ্রাইং প্যান টু ফায়ারে পড়বি।' চোখমুখ ঘোরালো করল শিবপদ।

'বাঘের থাবার থেকে লাফিয়ে কুমিরের চোয়ালে।' সখীলাল প্রাঞ্জল করল অবস্থাটা।

এবার দিন পড়ল গুডফ্রাইডে কাটিয়ে।

আবার পুজো ধরো-ধরো।

'কী করা যাবে বলো।' বললে শিবপদ, 'পুরোনো একেকটা নথির চেহারা যা হয়েছে তা আর ফাইলে বেঁধে হাতে করে বওয়া যায় না। কাঁধে করেও নয়। একেকটা নথি প্রায় চার-পাঁচ বছরের ছেলের মত উঁচু। তোমারটা তো শুধু হামাগুড়ি দেওয়ার মতন হয়েছে।।'

'তা বাড়ুক, বড় হোক।' হতাশ-হতাশ মুখ করল মনোরথ: 'কিন্তু এদিকে কিছুই যখন হচ্ছে না, তখন দিনের দিন প্রত্যহ যদি ষোলটা টাকা না নিতেন বাবু। এক আধ দিন যদি মাপ করেন।' কেউই বুঝবে না জানি।, তবু বললে, 'বড় কষ্ট।'

'যত কষ্ট এই উকিলের বেলায়।' ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললে শিবপদ 'নানা বায়নাক্কায় কোর্ট যখন এটা-ওটা আদায় করে তখন তো কিছু বলো না। বেশ, দিও না, তোমার যেমন খুশি।'

শিবপদ যে রাগ করেছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। চাটগাঁয়ের দোকানের দিকে নিজেই গেল ভাঁড়ের সন্ধানে।

মর্মে-তীর-বেঁধা ভুক্তভোগী কে আরেকজন বললে, 'অমন কম্মটি করো না। শুনানির দিন শুকনো রেখো না উকিলকে।'

'শুনানি না হলেও?'

'না হলেও। টাকা দেওয়া না থাকলে হাজিরা সই করে ফাইলে করবে না কোর্টে। পেশকার হাকিমের হাতে তুলে দেবে মামলা। বলবে কেউ আসেনি, কোনো তদবির হয়নি। হাজিরা-পিটিশন পড়েনি কিছু। টুক করে মামলা খারিজ করে দেবে।'

'কী সর্বনাশ!' দিশপাশ অন্ধকার দেখল মনোরথ।

'তখন আবার রেস্টোর করতে তিন-গুণ খরচ। সুতরাং—'

সুতরাং ষোল কলার এক চিলতেও কমানো ঠিক হবে না।

তারপর আরো ছ'মাস ঘুরে গিয়ে মামলা ধরবার দিন পেল হাকিম।

এবার আবার নতুন খেলা।

'লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যেতে হবে কোর্টে।' বললে সখীলাল, 'চাপরাশিকে দিতে হবে আট আনা।'

'এই নাও শেষকালে যেন এই আট আনার জন্যেই আটকাচ্ছে।' একটা আধুলি বের করল মনোরথ: 'বই তো দেখাবে কিন্তু ওপনিং কই?'

ওপনিং হল না। বিবাদী পক্ষ সময়ের দরখাস্ত করেছে। বিবাদীপক্ষের যে প্রধান সাক্ষী, সতীশ মালাকার, সে অসুস্থ। দরখাস্তের অনুকূলে এফি-ডেভিট করেছে বিবাদী। পাল্টা এফিডেভিট দিতে পারবে মনোরথ যে

সতীশ ভালো আছে, তার এফিডেভিট মিথ্যে? তা কী করে দেবে? সে কি সতীশকে চেনে, নাকি আদালতে আসবার আগে দেখেছে তাকে বাড়িতে?

হঠাৎ ঝপ্ করে সখীলাল মনোরথের পক্ষে এক হাজিরা লিখে ফেলল। মনোরথের কোনো সাক্ষীই আসেনি, সে নিজে ছাড়া, তবু চার পাঁচ জনের নাম-ওয়ালা এক মস্ত হাজিরা দাখিল হল কোর্টে।

শিবপদ বললে, 'আমার সব সাক্ষী অকারণে ফিরে যাবে। মুলতুবি খরচ চাই।'

'নিশ্চয়ই।' হাকিম বললে, 'এস্টিমেট দিন।'

বিবাদীর লোক চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'বাদী মনোরথ ছাড়া ওদের পক্ষে কেউ আসেনি।'

'কে বললে আসেনি?' শিবপদ বললে, 'এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করছে।'

কাকের মাংস কাকে খায় না তাই বিবাদীর উকিল দাশরথি বিবাদীকে ধমকে উঠল ঃ 'ও নিয়ে আবার বচসা কী! হুজুর যা বলেন তাই দিয়ে দেবে।'

পাল্লা আবার কখন ঘোরে দাশরথির দিকে তার ঠিক কী!

হাকিম হাজিরাটা দেখল খুঁটিয়ে। পাঁচজনের জন্যে পাঁচ-ছয় তিরিশ টাকা ধার্য করলে। উকিলের ফি বাবদ ধরলে দশ। মোট চল্লিশ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হবে মনোরথকে। আজ যে টাকা সঙ্গে নেই তা জানি। পরদিন দিতে হবে নির্ঘাত। সি-পি মানে কণ্ডিশন প্রিসিডেন্ট করে দিলাম। না দিলে মামলা লড়তে পারবে না। বিবাদী, সাক্ষীসাবুদ দিতে পারবে না। মামলা একতরফা হয়ে যাবে।

পরের দিন চল্লিশ টাকা দিল বিবাদী। আর কার হাতে দেবে? শিবপদ ছাড়া লোক কই? শিবপদের হাতে দিলে।

পেশকার বললে, 'রসিদ দিয়ে দিন।'

রসিদ আর কে দেবে? রসিদ দেবে মনোরথ, আইনের চোখে যে ক্ষতিগ্রস্ত।

রসিদ খাড়া করল সখীলাল। মনোরথ অক্ষর শিখতে শুধু নামসইটাই শিখেছিল, এবার সেটা কাজে লাগল।

'বাবু, এ টাকার মধ্যে আমার কিছু প্রাপ্য নয়?' মনোরথ তাকালে কাতর চোখে ঃ 'টাকা পেলাম বলে রসিদ দিলাম অথচ কিছুই আমার পকেটে এল না।'

'অমন কথা বলতে হয় না।' সখীলাল শাসনের সুরে বললে, 'মুলতুবি খরচ চিরকাল উকিলের প্রাপ্য। যেমন ওকালতনামার চাঁদা লাইব্রেরির প্রাপ্য। যা চিরকালের রেওয়াজ তার ব্যতিক্রম হবে কি করে? উকিলবাবু কত সস্তায় তোর মামলা করে দিচ্ছে তার খেয়াল আছে?'

তা তো ঠিকই। যা রেওয়াজ তার বিরুদ্ধে বলবে কে?

কিন্তু আজ কী হচ্ছে? আজ শুনানি হবে না?

'দাশরথিবাবু পার্সন্যাল গ্রাউণ্ডে মুলতুবি চাইছে।' বললে সখীলাল।

'সে আবার কী!'

'দাশরথিবাবুর শরীর খারাপ, আসেননি কোর্টে—'

'আমাদের দিক থেকে আবার হাজিরা দেওয়া হবে না? আবার পাওয়া যাবে না খরচা?'

'না, ওটা উকিলবাবুর ব্যক্তিগত অসুবিধে যে। আমাদের দিক থেকে তাই কনসেণ্ট দেওয়া হয়েছে।' বুঝিয়ে দিল সখীলাল ঃ 'কখন কার ঠেকা হয় কিছু বলা যায়? উকিল উকিলকে না রাখলে কে রাখবে?'

আবার দিন পড়ল শুনানির।

টিফিনের পরে মনোরথ দেখল দাশরথিবাবু গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে।

ছুটতে-ছুটতে মনোরথ একাই চলে এল কোর্টে। হাকিমকে লক্ষ্য করে বললে, 'হুজুর, ধর্মাবতার, দাশরথিবাবুর অসুখ নয়, তিনি এসেছেন কোর্টে, ঐ যে কথা কইছেন গাছতলায়।'

হাকিম হাসল। বললে, 'সকালবেলায় দিকে অসুখ ছিল, দোয়ালদা কোর্টটা ঘুরে আসতেই বিকেলের দিকে ভালো হয়ে গেছে।'

চাপরাশিকে বললে, 'দাশরথিবাবুকে ধরে নিয়ে এস।'

দাশরথি তখন হাওয়া।

শিবপদ এল সাফাই গাইতে। বললে, দাশরথিকে ঠিকমত চেনে না মনোরথ।

কিন্তু হাকিম চিনল। দাশরথি আর শিবপদ দুজনকেই চিনল। মনে মনে ঠিক করল পরের দিন ধরতেই হবে মামলা। আর ভেরেণ্ডা ভাজতে দেওয়া নয়।

ফাঁকায় দিন রেখেছে এবার। লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে রেখেছে।

কোর্ট বসবার আগেই এসেছে শিবপদ। পেশকারের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলে, 'আজ কীরকম বুঝছেন?'

'আজ মনে হচ্ছে হাকিম ধরবেনই মামলা।'

'কিছুতেই ঠেকানো যাবে না?'

'মনে তো হচ্ছে না। কোনো দরখাস্তেই কান পাতবেন না আজ।'

'তবে উপায়?' শালুর ফুটোর মধ্য দিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট শিবপদ চালান করল পেশকারকে। বললে, 'একটা সেসন কেস নিয়ে আসা যায় না?'

'দেখি।' পেশকার উঠল। গেল ডিস্ট্রিক্ট জজের সেরেস্তায়। একটা রেপ কেস পেল। অন্যত্র যাচ্ছিল, সাবজজের কোর্টে ট্রান্সফার করে নিয়ে এল।

সেসন কেস কি ফেরত দেওয়া যায়? তার দাবি সর্বাগ্রে।

তা ছাড়া এ একটু বেশ নতুন ধরনের মামলা। এ কি কেউ ছাড়ে?

'আজও আমার মামলা হবে না?' ককিয়ে উঠল মনোরথ।

শিবপদ বললে, 'দায়রা এসে গেলে কী আর করা যাবে? দায়রা হচ্ছে মেন লাইনের মেল ট্রেন, তাকে পথ ছেড়ে দেবে সবাই।'

দক্ষিণ-বারাসতে নেমে আট মাইল মেঠো রাস্তা পার হতে হতে একবার থামল মনোরথ। নির্জনে একবার শূন্যের দিকে তাকাল। কান্নাভরা গলায় বললে; 'ভগবান, আর কতদিন?'

ভগবান হাসলেন। বললেন, 'আমার আদালত আরো অস্তে।'

মন্দিরে মন্দিরে

তীর্থঙ্কর

॥ গড়বেতা ও কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা ॥

খড়্গপুর থেকে সাঁইত্রিশ মাইল দূরে গড়বেতা। বহু প্রাচীন এর ইতিহাস। মুসলমান রাজত্বের প্রথম পর্ব থেকে গড়বেতার নাম পাওয়া যায় কাহিনীতে। এখনো দেখা যায় প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। লোকে বলে এটা বগড়ীর চৌহানদের গড়।

আঠারো শতকের শেষের দিকে এল চুয়াড় বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের দলে ছিলেন বগড়ীর রাজা। গনগনির মাঠে ছিল তাদের ঘাঁটি। বিষ্ণুপুর থেকে মেদিনীপুর যাবার পথে গনগনির মাঠ। চারদিকে শালবন। ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে যুদ্ধ করেছে বিদ্রোহীরা। গড়বেতা অনেক প্রাচীন।

আর প্রাচীন গড়বেতার সর্বমঙ্গলার মন্দির। বগড়ী রাজার লুপ্ত গড়ের উত্তরদিকে সাতটা বিরাট পুকুর। এই সাতপুকুরের মাঝখানে আছে সাতটা মন্দির। এই সাত মন্দিরের মধ্যে সর্বমঙ্গলার মন্দিরই সবচেয়ে বিখ্যাত।

সর্বমঙ্গলার এই মন্দির কে এবং কবে যে তৈরি করেছিলেন তা বলা যায় না। লোকের মুখে মুখে নানা কাহিনী বেঁচে আছে। এই সব কাহিনীর ওপর নির্ভর করে প্রবোধচন্দ্র সরকার "শাল-ফুল" নামে এক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি"তে বিনয় ঘোষ তার উল্লেখ করেছেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য তখন উজ্জয়িনীতে। তখন এক সিদ্ধপুরুষ বগড়ীর জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি এই অরণ্যের মধ্যে সর্বমঙ্গলার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গভীর অরণ্যের ভেতর পাথরের মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল শুধু যোগবলে। সর্বমঙ্গলা জাগ্রত দেবী। লোকের মুখে মুখে কথাটা গিয়ে পৌঁছাল উজ্জয়িনীতে,--মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কানে। দেবী-মাহাত্ম্যের কথা শুনে মহারাজা নিজে এসেছিলেন গড়বেতায়। শব-সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাল ও বেতাল নামে দুই অনুচরকে দিয়েছিলেন মহারাজকে। তারা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আদেশ অনুসারে চলবে। দেবীর আদেশ সত্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল মহারাজার। তিনি তাল ও বেতালকে তখন আদেশ করেছিলেন দেবী-মন্দিরের মুখ পূর্বদিক থেকে উত্তরদিকে ঘুরিয়ে দিতে। রাজার আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হল। সেই থেকে মন্দিরটি উত্তরদ্বারী।

আবার অন্য গল্পও শোনা যায়। জগন্নাথধামে তীর্থে এসেছিলেন গজপতি সিং। ফেরার পথে তিনি বগড়ী অঞ্চল অধিকার করে নেন এবং বগড়ী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। তিনিই নাকি স্থাপন করেছিলেন সর্বমঙ্গলার মন্দির। তা-ছাড়া আর বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ নেই। কারণ মহারাজা বিক্রমাদিত্য কোন দিন বাংলাদেশে আসেননি। তিনি যে শবসাধনা করেছিলেন এমন কোন ইঙ্গিতও রেখে যাননি পণ্ডিতেরা। অবশ্য দাঁতনে বিক্রমকেশরী বলে এক রাজা ছিলেন। তার সঙ্গে এই কিংবদন্তীর সামান্যতম যোগ থাকাও অসম্ভব নয়। যাই হোক কেউ স্থিরভাবে বলতে পারে না কবে এবং কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গড়বেতার সর্বমঙ্গলার মন্দির।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মনে করেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। "বগড়ী পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজারা যখন অধিকার বিস্তার করেছিলেন এবং যখন সরকার জলেশ্বরের অধীন ছিল বগড়ী, তখনকার ওড়িয়া স্থাপত্যকীর্তি হল সর্বমঙ্গলা মন্দির। মন্দির-নির্মাণের কাজে যে সব ওড়িয়া-শিল্পী এসেছিলেন, তাঁরাই একস্থানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতেন উড়িয়া-শাহীর মতন গ্রামে।" মন্দিরটি উড়িষ্যার রেখ-দেউলের রীতিতে তৈরি।

ভয়ংকর দেবী সর্বমঙ্গলা। মন্দিরের দ্বার থেকে প্রায় ত্রিশ হাত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ-পথ পার হয়ে দেবী-মূর্তির কাছে আসতে হয়। পূজারীর নির্দেশ ভিন্ন আসা যায় না। মন্দিরের গর্ভগৃহ অন্ধকার। আলোর সাহায্য ছাড়া কিছু দেখা যায় না। দেবী-মূর্তির বাঁ-দিকে পাথরের আসন। তাকে বলে পঞ্চ-মুণ্ডির আসন। লোকে বলে এই আসনে বসে রাজা বিক্রমাদিত্য ও বগড়ীর রাজা গণপতি সিদ্ধ হয়েছিলেন।

গড়বেতার মতনই প্রসিদ্ধ মন্দির কেশিয়াড়ীতে। এও সর্বমঙ্গলার মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন। গড়বেতার মন্দির লোককথার মধ্যে জীবন্ত।

কুকাই গ্রামের কিছু দূরে কুরুমবেড়া। দেখতে পাওয়া যাবে বিধ্বস্ত দুর্গের চিহ্ন। প্রাচীন দুর্গ। অনেক ঘটনার ঝড়-ঝাপটা গায়ে মেখেছে এই দুর্গ। ওড়িষ্যার রাজা কপিলেশ্বর দেব তৈরি করেছিলেন এই কুরুমবেড়ার দুর্গ পনেরো শতকে। পাঠান রাজত্বে ওড়িয়া প্রতিরোধ হয়েছিল এই দুর্গ থেকে। মোগল অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্বর শোনা গেছে এখান থেকে। তাদের নীরব প্রমাণ হয়ে আছে মোগলপাড়া প্রভৃতি গ্রাম। কেশিয়াড়ী অতি প্রাচীন।

শোনা যায় ছত্রিশটা গ্রাম নিয়ে কেশিয়াড়ী। বারোটা করে গ্রাম ভাগ করা। তিন ভাগ করা হয়েছিল। মাঝখানে শিবমন্দির। বারোটা মন্দির বলে নাম হল বারো মোঁড়া। গাজনের দিন উৎসব হত। প্রত্যেক মন্দির থেকে সেই দিন বার হত শোভাযাত্রা। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পতাকা। প্রত্যেক পতাকায় আলাদা আলাদা প্রতীক। কারো হাতী, কারো কুমীর ইত্যাদি। বারো দিক থেকে শোভাযাত্রা মিশতো গ্রামের মাঝখানে।

মঙ্গলমোড়া গ্রামের মাঝখানেই কেশিয়াড়ীর বিখ্যাত সর্বমঙ্গলার মন্দির। পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মন্দির। মন্দিরের পূর্বদিকে দোলমণ্ডপ আর নহবতখানা। সামনের সিঁড়ি পার হলে বারোদুয়ারী। বারোটা থিলানের ওপর বিরাট নাট-মন্দির। এই নাট-মন্দিরে আছে বিরাট ঘণ্টা। বারো-দুয়ারী থেকে পশ্চিম দিকে জগমোহন। এখানে দেবীর হোম ইত্যাদি হয়। তার-পরে সর্বমঙ্গলার পূর্বদ্বারী মন্দির। গঠন-রীতির দিক থেকে জগমোহন নাট-মন্দির এক রকম। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের মতে উড়িষ্যা-রীতির সঙ্গে বাংলা-রীতির মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টার নিদর্শন এই স্থাপত্য-রীতি।

শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৬০১ সালে। রাজা মানসিংহ শাহ সুলতানকে কেশিয়াড়ীর শাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। শাহ সুলতানের অধীনে কাজ করতেন সুন্দর দাস। তাঁর দেওয়ান ছিলেন অর্জুন মহাপাত্র। এই সুন্দর দাস আর অর্জুন মহাপাত্রের অধীনে বনমালী দাস নির্মাণ করেন এই মন্দির। বনমালী বহিরাগত নন। কেশিয়াড়ীতেই তাঁর বাস ছিল।

কিন্তু দেবী-মূর্তি ও জগমোহন নির্মিত হয় ১৬০৪ সালে। আর-একটা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, রাজা মানসিংহের ছেলে চক্রধর ভূঞা সর্বমঙ্গলার এই দেবী-মূর্তি ও জগমোহন প্রতিষ্ঠিত করেন।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

জীপটা বের করে জোরেই হাঁকিয়ে ছিল, তারপর আপনিই কখন গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। চিন্তার আবার মোড় ফিরেছে; প্রশান্তর কাতর মুখখানা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। ও আপত্তি তোলায় চটেই উঠল রজত, কিন্তু বেচারির দোষটা কি? এতবড় একটা কথা গোপন করে, এইরকম কলুষিত বিবেক নিয়ে একজনের সঙ্গে চিরটা জীবন কাটানো, যে হবে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে আপন— এ কি সম্ভব, না, উচিত? যে-কোন লোকের পক্ষেই; তারপর প্রশান্তর পক্ষে তো বটেই। নীতির কথা ছেড়ে অন্য দিক দিয়ে দেখলেও পরিণামটা ভয়াবহ নয়াকি? দীর্ঘ জীবন সামনে পড়ে রয়েছে —যদি কোন রকমে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে ভবিষ্যতে—প্রশান্তর কাছেও তো নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রকাশ হোল —তাহলে ওদের দাম্পত্য জীবন কি রকম বিষময় হয়ে উঠবে। এই স্বাতির জীবনই কি রকম দুর্বহ হয়ে উঠবে। আজকের চেয়ে কি কম দুর্বহ তা? তার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে প্রশান্তর জীবনও। অথচ আজ সাবধান হয়ে গেলে অন্তত ওর দিকটা সামলে যায়; পুরুষের কর্ম-ময় জীবন, অত দাগ বসাতে পারে না তো। অবিচার করে এসেছে প্রশান্তর ওপর। ওরও যখন অবস্থা—কী করে, কোথায় যায়, কাকে বলে।

সামনে একটা তেমাথা; একটা মেটে রাস্তা বাঁদিকে চলে গেছে। ঠিক করল জীপটা ঐখানে ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরেই যাবে। কাছে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে আগের চেয়েও উত্তেজিত হয়ে উঠল রজতের মনটা। ......শুধু স্বাতি আর প্রশান্ত নিয়েই ভাবছে, আর এক-জনকে ভুলে যাচ্ছে, যে এ-নাটোর একজন কোনরকমেই কম অংশীদার নয়; লাহিড়ী-মশাই-এর কথা। ও'র দিকটাও তো ভাবতে হয়, ও'র মনটাও তো জানতে হয়। ও'র কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল আর-একটা উপায়ও যেন থাকতে পারে। কিন্তু সে আর একমাত্র উপায়। আর, শেষ উপায়। বুকটা ধড়ফড় করছে। পাছে আবার দ্বিধা এসে পড়ে, মত বদলে যায়, সেই ভয়ে আগের চেয়েও জোরে ছেড়ে দিল জীপটাকে।

যখন দাঁড় করাল, দ্যাখে, স্বাতি দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। যেন রাস্তার দিকে অষ্টপ্রহর কান খাড়া করে রেখেছিল।

নেমে এগুতে এগুতে রজত প্রশ্ন করল—"লাহিড়ীমশাই আছেন তো?"

"তাঁর তো স্কুল খুলে গেছে অনেক-দিন—থাকেন না তো এ-সময়— কেন বলুন তো?"—মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে স্বাতির; এইটুকু বলতেই কয়েক-বার ঢোক গিলল।

"না, এমনি একটু কাজ ছিল? কখন ফিরবেন?"—একটা সংকট অবস্থার মধ্যে যেন পড়ে গেছে রজত। দাঁড়িয়েও পড়েছে।

স্বাতি এগিয়ে সিঁড়িতে নেমে দাঁড়িয়েছে, বলল—"একটু পরেই, আজ শনিবার তো। বসবেন ততক্ষণ?...... আচ্ছা, বিশাখা আসা বন্ধ মানে......মানে বিশাখা আসছে না কেন?"

দ্বিধাগ্রস্তভাবে বাড়িয়েই ছিল পা রজত, যেন আপনিই থেমে গেল পা দুটো!

স্খলিত কণ্ঠে বলল—"বিশা হঠাৎ বাড়ি গেল, প্রশান্তর মা এসেছিলেন, তার সঙ্গে।"

অদ্ভুতভাবে একটু হাসল স্বাতি। তাতে ব্যঙ্গ, বেদনা, অনুযোগ সবই আছে।

বলল—"একটা খবরও তো দিতে হয়। আমার মুশকিল হয়েছে, অনাথ-

কাকা পড়ে গেছে অসুখে। যাক্ ভালো আছে তাহলে?......বসবেন না এসে? বাবা আসছেনই তো এক্ষুনি।"

পা উঠেছিল, আবার টেনে নিল রজত। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কোনরকমে বলল—"না, বিশেষ দরকার —আমি স্কুলেই চলে যাই—ওদিকে একটা কল্ও আছে।"

শেষেরটুকু মিথ্যা কথা, আগেরটুকুতে জোর দেওয়ার জন্যই। একটা দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কোনরকমে বেরিয়ে আসা। জীপটা একটু এগিয়ে যেতে একটু অনুশোচনাও হোল একটা কথা মনে পড়ে যেতে—অনাথের অসুখের কথা বলল স্বাতি, অথচ দিব্যি চলে এল রজত। বন্ধু তো বটেই, তার ওপর এক-জন ডাক্তার। আসলে এত চারিদিকে মনটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে মনে হচ্ছে যে তখনকার কথাটা যেন এইমাত্র কানে গেল। কিন্তু ভালোই হোল। বিব্রত ভাবটা কেটে গিয়ে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসতে টের পেল, ওর লাহিড়ীমশাই-এর সংগে যা কাজ সেটা এখানে ঠিক হোতও না।

আরও একটু ভালো হোল। শরৎ-কাল প্রায় এসে গেছে, আকাশ হয়ে উঠেছে খামখেয়ালী। পরিষ্কারই ছিল, লক্ষ্য করেনি, একটা গুরু গুরু ডাক শুনে দেখল পশ্চিমে, ওর পেছন দিকে কখন মেঘ জমা হয়েছিল, মাথার ওপর এগিয়েও এসেছে। তাড়াতাড়ি জীপটা চালিয়ে দিল, হাতঘড়ি উল্টে দেখল— লাহিড়ীমশাই হয়তো বেরিয়েও পড়ে থাকতে পারেন।

ও স্কুলের কাছে আসতে আসতেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। গিয়ে দ্যাখে লাহিড়ীমশাই আর দুজন শিক্ষকের সংগে আফিস থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হোল বেরুতেই গিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে ইতস্তত করছিলেন। ওকে দেখে বললেন —"এই যে আপনিও এসে গেছেন। আমার কপাল জোর আজকে।......দাঁড়ান, আমি তাহলে খানকতক বইও নিয়ে নিই আলমারি থেকে।"

"আমরা তাহলে যাই স্যার।"—বলে শিক্ষক দুজন ছাতা খুলে নেমে গেলেন। এ'দের কিন্তু যাওয়া হোল না। বইগুলো নিয়ে উনি যতক্ষণে বেরিয়েছেন, জোরে বৃষ্টি নামল। হাওয়াটাও হঠাৎ জোর হয়ে উঠল। উনি তবু বেরিয়ে পড়বার কথাই বললেন। রজতই আপত্তি করল, বলল— "হাওয়াটা মুখের ওপরই পড়ছে। ভিজে লাভ কি মিছিমিছি?"

—ও যা করতে এসেছে তাতে এটাও অনুকূলই ওর পক্ষে। লাহিড়ীমশাই প্রশ্ন করলেন—"কোনও কলেই এসেছেন তো, দেরী হয়ে যাবে না?"

রজত জানাল—না, দেরী হবে না। ও কলেও আসেনি, ও'র কাছেই এসেছে।

"আমার কাছে! এই দুর্যোগ মাথায় করে!"—অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে উঠলেন লাহিড়ীমশাই।

"দুর্যোগটা তো ছিল না। থাকলেও আসতে হোত আমায়। চলুন, আফিসে গিয়ে বসা যাক।"

আরম্ভ করবার একটা ভালো খেই'ও পাওয়া গেল। উনি বসলে একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল—"দুর্যোগের কথায় মনে পড়ে গেল। এমনি একটা— এমনি বলি কেন?—এর চেয়েও অনেক বড় একটা দুর্যোগ যে চারিদিকে ঘনিয়ে উঠেছে আপনার চোখ এ্যাড়ায়নি বোধহয়।"

খুব বড় একটা ভুল করে বসল খুব গুছিয়ে উপযুক্ত ভাষা দিয়ে আরম্ভ করতে গিয়ে। অতিরিক্ত ভীত হয়ে উঠেছেন লাহিড়ীমশাই। বড় বড় চোখ দুটো আরও আয়ত হয়ে গিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গলা গেছে এমন শুকিয়ে যে যেন কথা বের হচ্ছে না; যেন অনেক চেষ্টা করে প্রশ্ন করলেন— "দুর্যোগ! এর চেয়ে বড়!"

"আপনি কিন্তু বড় উতলা হয়ে পড়লেন একেবারে। একটু......"

"এর চেয়ে বড় দুর্যোগ বলছেন!" —বলেই চললেন লাহিড়ীমশাই, রজতের কথাগুলো যেন কানেই যায়নি। —"এর চেয়ে বড় দুর্যোগ—প্রশান্তর কিছু হয়নি তো!—তার শরীর—অনেকদিন থেকে আসছে না সে—তার চাকরির কিছু— শুনেছি বড় বর্ষাটায় পুলের নাকি ক্ষতি হয়েছে—ওদের চাকরি—রেলের—বলে, এক পা রেলে, এক পা জেলে—কি হয়েছে তার?—কেন আসে না?

"আমি তার হয়ে এসেছি, ক্ষমা চাইতে।"

"ক্ষমা! —কিসের ক্ষমা?......ও। বুঝেছি। শুনেছি অনাথের মুখে বিয়ে করতে চায় না এখানে কিন্তু সে এমন কী একটা দোষ, যে......"

"দোষ বৈকি।"—এ সুযোগটাও বেরিয়ে যেতে দিল না রজত। বলল— "তার দোষ বলে বুঝেছি বলেই তার হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এসেছি আমি।"

"—বুঝছি না তো।"—উৎকণ্ঠিত কৌতূহলে চেয়ে রইলেন। রজত বলল— "সে যা করছে তাতে—নিরুপায়। দোষটা গোড়ায় আসলে ওর নয়, ওর বাবার। প্রশান্ত হচ্ছে আপনার বন্ধু দারুকেশ্বর রায় মশাই-এর ছেলে।"

'কে দারুকেশ্বরের ছেলে! !'—একে-বারে চিৎকার করে উঠলেন।

—ডাক্তার মানুষ, লক্ষ্য করল প্রায় উন্মাদের লক্ষণ দৃষ্টিতে। ভয় পেয়ে গেছে, কিন্তু আর পশ্চাদচারণের উপায় নেই, বলল—"প্রশান্ত। তার নিজের দোষ না হলেও সে খুবই......"

"কোন্ প্রশান্ত?"

"...যার কথা আপনি এক্ষুনি বলছিলেন। পুল-কলোনীর ইন্জি-নিয়ার।"

"পুল-কলোনীর ইন্‌জিনিয়ার প্রশান্ত রায়? বলছেন দারুকেশের ছেলে ......কি করে হবে? সেদিন পর্যন্ত এসেছে আমাদের বাড়ি—স্বাতি-মার জন্যে একটা সেলাই-কল পর্যন্ত রেখে গেল... সে কি করে স্যাঙাতের ছেলে হতে পারে?"

সবগুলো আস্তে আস্তে স্মৃতি থেকে টেনে এনে একটা সামঞ্জস্য বের করবার চেষ্টা।

একেবারে উল্ট উৎপত্তি! রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে রজত, ও'র এ লক্ষণের

কথা শুনেছিল প্রশান্তর কাছে। বৎসর খানেক আগেকার কথা, এর মধ্যে বরাবরই সহজ-স্বাভাবিকভাবেই কেটেছে—পরিচয়ও পেয়েছে একজন শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ, সুরুচিসম্পন্ন মানুষ বলেই, তাই কথাটা মনে ছিল না একেবারে, নয়তো হঠাৎ মস্তিষ্কে এমন একটা চাপ দিতে সাহস করত না। ভয় পেয়ে গেছে; সামলাবে কি করে ভেবে পাচ্ছে না। তারপর বাইরের দিকে চেয়ে উপায় হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ বুদ্ধিটা যুগিয়ে গেল ওঁর প্রশ্নটা ধরেই। একেবারে উল্টে গেল রজত, বলল—"তাহলে বোধহয়,—মানে, নিশ্চয় ভুলই হয়েছে আমার।"

কথাটা কানে গেল বলে মনে হোল না। সোজা বসেছিলেন, হেঁট হয়ে টেবিলে কনুই দিয়ে নিজের সামনের চুলগুলো খামচে ধরলেন।

একটু পরেই মুখটা তুলে বাইরের দিকে চেয়ে বললেন—"কী দুর্যোগ! এই-রকম চলবে নাকি?"

তাড়াতাড়ি উঠে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল রজত, কতকটা মনের চঞ্চলতাতেও। বেশ ভালো করে আকাশটা দেখে নিয়ে ফিরে এসে বলল—"নাঃ, এক্ষুণি পাশ অফ্ করবে। শরতের মেঘ তো, গোড়া কেটেই গেছে।"

"আপনি আমার স্যাঙাৎকে জানতেন?"—ওর কথায় কান না দিয়ে প্রশ্নটা করলেন লাহিড়ীমশাই। রজত আর-একটু বুদ্ধি খাটাল—"দ্বারিকনাথ আমি যাঁর কথা বলছি।"

"দ্বারিকানাথ?"—মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বোঝবার চেষ্টা করছেন। ধীরে ধীরে বললেন—"দয়ে বয়ে আকার রয়ে হ্রস্ব-ই......"

—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের নামের সঙ্গে প্রভেদটা বের করবার চেষ্টা করছেন।

তারপরই আবার চুল খামচে সেই-ভাবে বসে রইলেন।

এরপর কথা বেরুল একেবারে বাড়িতে গিয়ে।

দমকা ঝড়-বৃষ্টি, আকাশটা মিনিট পনেরো পরেই একরকম পরিষ্কার হয়ে গেল। স্কুলের চাকরটা ওদিক'কার সব ঘর বন্ধ করে এসে ওঁকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে ভীত হয়ে এগিয়ে আসছিল, তাকে ইংগিতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে, চুপ করে বসেই রইল রজত। তারপর বৃষ্টি ধরে গেলে ওঁকে ডেকে নিয়ে জীপে গিয়ে উঠল। অনেক-কিছুই ভয় করে নিজের পাশেই বসিয়ে রাখল ওঁকে। পথ পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে, ধীরে ধীরে চালিয়ে আসতে দেরিও হোল বেশ। কোন কথা নেই আর। রজতও আর টুকতে গেল না। এরপর একেবারে বাড়ির বারান্দায় উঠে উনি হাঁক দিলেন—"স্বাতি-মা, শোন!!"

স্বরটা একটু উঁচু পর্দায়, বিকৃতও একটু। স্বাতি উৎকণ্ঠিত ছিল,—কী দরকারী কথা কইতে গেছে রজত?—একটু হন্তদন্ত হয়েই উঠানের দিক থেকে বেরিয়ে এসে, ওঁর চেহারা দেখে চেঁচিয়েই উঠল—"বাবা!!"

"প্রশান্ত হচ্ছে স্যাঙাতের ছেলে—দারুকেশের!!"—বলতে বলতেই টলে গিয়ে চৌকির ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

॥ ছত্রিশ ॥

"বাবা গো!! কি হোল!!—ব'লে শেষ জেনেই স্বাতি গায়ের ওপরই আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল, রজত সতর্কই ছিল, দু-হাতে ওর বাহুদুটো ধরে ফেলল পাশ থেকে, বলল—"স্থির হোন, মাথাটা শুধু একটু ঘুরে গেছে, ঠিক হয়ে যাবে এক্ষুনি।"

অনাথ টলতে টলতেই এসে দরজা ধরে দাঁড়াল। মুখটা একেবারে থমথমে।

দৃষ্টি উগ্র, রজতকে উদ্দেশ করে বলল—"বেশ তো ছেল এনারা, আবার কেন আপনারা......"

"......ও অনাথ-কাকা! যাও তুমি, কিছু হয়নি, শুয়ে থাকোগে।"—ওকে সামলাতেই স্বাতি নিজেও খানিকটা সামলে গেল। হাওয়া করে মুখে জলের ঝাপটা দিতে চৈতন্য ফিরে এল লাহিড়ী-মশাই-এর।

সন্ধ্যা উতরে গেছে, তখনও রজত এখানেই। উঠানে চেয়ারে বসে বিস্মিত হয়ে দেখে যাচ্ছে সব; ভাবছে।

শক্ত মেয়ে স্বাতি। চাপা, সংযত; এমনটা আর দ্যাখেনি কোথাও। জীপ থেকে ওষুধের ব্যাগটা আনিয়ে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিয়েছে লাহিড়ী-মশাইকে, খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পরই। উনি এখন ঘুমুচ্ছেন। যেন কিছু হয়নি বাড়িতে। ঘুরে ঘুরে স্বাতি সংসারের সমস্ত পাট করে যাচ্ছে একা। ওরই মাঝে কয়েকবার অনাথকে ধমক দিয়ে শুইয়ে রাখাও আছে। তাকে ওষুধ দিয়েছে রজত। অনুযোগও করছে রজতের কাছে—সাক্ষী মানছে—"ছটফট করে ঘুরে বেড়ালে ওষুধে কাজ হবে? বলুন তো?" সবচেয়ে আশ্চর্য—যে কথা মুখে করে লাহিড়ীমশাই প্রবেশ করলেন, যা নিয়ে এত কান্ড, সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করল না। অথচ কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে গল্পও করেছে—এ ইনজেকশনে কতক্ষণ ঘুমুবেন, আর লাগবে কিনা; জিজ্ঞেস করেছে বিশাখার কথা। তাও, কবে ফিরবে সে। কেন গেছে, মা কেন এসেছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু নয়। অনুরোধের মধ্যে করেছে খানিকটা রাত পর্যন্ত থেকে যেতে ও'কে। ......থেকে যাবে রজত। বলেছে গিয়ে জীপ নিয়ে গোপেশ্বরকে এখানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। কোনই দরকার নেই, তবুও সতর্ক থাকা, কিছু হলেই সে জীপে করে নিয়ে আসবে রজতকে। তা' ভিন্ন আজ একরকম একাই স্বাতি, একটা লোক থাকাও প্রয়োজন। খুব শক্ত, সংযত। বুদ্ধিমতী তো বটেই। বুঝে নিয়েছে এইজন্যেই প্রশান্ত আসা বন্ধ করেছে। একটা স্বাভাবিক কৌতূহল থাকলেও সেটাকে দমন করেই আছে।

কিন্তু এ সংযম কি ভালো? মনের ওপর একটা অসম্ভব চাপই যাচ্ছে তো। এই বাইরের ঔদাসীন্যে ভেতরে কতটা আলোড়ন জাগিয়েছে, বুঝতে তো পারা যাচ্ছে না। এর প্রতিক্রিয়াও তো এই ধরনেরই, অনেক সময় বরং আরও স্থায়ী, আরও বিপজ্জনক।

রাতও হয়ে আসছে। রজত একবার উঠে গিয়ে পরীক্ষা করে এল লাহিড়ী-মশাইকে। দরকার ছিল না তেমন, কতকটা স্বাতির সান্ত্বনার জন্যই। ঘুরে এসে হাতঘড়িটা দেখে বলল—"রাত আটটা হয়ে গেল। ভালোই আছেন। আমি বোধ-হয় এবার যেতে পারি। একটা অনুরোধ—স্বাতি দেবী, রান্নার হাঙ্গামা করতে যাবেন না। ওখান থেকেই পাঠিয়ে দোব। গোপেশ্বরকে অবশ্য আগেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, গিয়েই। অনাথ আজ বার্লি খাক; ওখান থেকেই আসবে। আর একটা কথা।"

"কি বলুন।"

রজত একবার ঘরের দিকে চাইল। বলল—"ভালো হয় যদি বাগানেই চলেন একটু।"

"অনাথ-কাকা?......বেশ চলুন।"

—মোড়াটা তুলে নিল হাতে। রজতও বেতের চেয়ারটা তুলে নিল। বাগানে গিয়ে বসল দুজনে। রজত প্রশ্ন করল—"একটা কথা কৈ আপনি তো জিজ্ঞেস করলেন না।"

"কি কথা?"—বুঝেছে বলেই নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন করল স্বাতি।

"যা নিয়ে এতটা ব্যাপার হোল।...... প্রশান্ত যে আপনার বাবার বন্ধুর ছেলে—যাঁর জন্যে শুনি আপনারা সর্বস্বান্ত হয়েছেন।"

"উনি জানতেন এ কথাটা বরাবর?"—বেশ একটু চুপ করে থাকার পর প্রশ্নটা করল স্বাতি।

রজত বলল—"একেবারেই নয়। হঠাৎ এই ক'দিন আগে টের পেল।" তারপর কবে কি ভাবে টের পেল, বই-এর পাতা খুলতে গিয়ে, তারপর থেকেই কি অবস্থা যাচ্ছে প্রশান্তর—সেলাই-কল ছেড়ে চলে যাওয়া—কলকাতায় গিয়ে খোঁজ দেওয়া—সব এক এক করে বলে গেল, যতটা জানে; শুধু স্বাতির সঙ্গে নিজের বিবাহের কথাটা বাদ দিল।......মুখ নত করে শুনে যাচ্ছে স্বাতি, দরদর করে জল পড়ে যাচ্ছে চোখ দিয়ে, মুছলে মানছে না বলে মোছা ছেড়ে দিয়েছে।

শেষ হলে একটা কিছু মন্তব্যের সময় দিয়ে রজত প্রশ্ন করল—"কৈ, কিছু বললেন না তো।"

অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলে ধরল স্বাতি, প্রশ্ন করল—"কি বলব?"

"শত্রুর ছেলে তো আপনাদের?"

"আর-একটা দিকও তো আছে। তিনি কত বড় তাই তো স্বীকার করলেন—ব'লে পাঠাতে পারলেন......"

তারপরেই দু'হাতে মুখটা ঢেকে একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারই ফাঁকে ফাঁকে বলে চলল—"কিন্তু তবুও এ কি করলেন?—আমাদের সংসর্গ ত্যাগ করেছিলেন সেই তো যথেষ্ট—কেন জানাতে গেলেন বাবাকে? আমাকে যে তাঁকেও হারাতে হবে এবার—সবহারা হয়ে আমি এখন কোথায় দাঁড়াই বলুন—একি করলেন আপনারা? —আমার কি হবে?......" (ক্রমশ)

কবিতায় গ্রাণ্ড স্টাইল

রেজাউল করিম

সাধারণ পাঠক যখন কোন ভাল কবিতার বই পড়ে তখন সে তার বিষয় বস্তুর প্রতি এত আকৃষ্ট হয় যে, সেই কবিতার অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। "কি সুন্দর আইডিয়া! কি মহান ও উচ্চ ভাব! এ একেবারে মন প্রাণকে মাতিয়ে তোলে"—এই হল তার মনোভাব। সে কোন কবিতার আধ্যাত্মিকতা দেখে মুগ্ধ হয়। কোন কবিতার বৈপ্লবিক ভাবটাই তাকে উদ্বুদ্ধ করে। আবার কোন কবিতার মধ্যে সে দেখে নূতন যুগের ইঙ্গিত। একজন কবির ভাবের সহিত অন্য একজন কবির ভাবের তুলনামূলক সমালোচনা করতেও সে ভালবাসে। রবীন্দ্রনাথ, শেলি, কীটস, গ্যেটে, দান্তে এই সব বিশ্ববিখ্যাত কবির ভাব, চিন্তা, আদর্শ নিয়ে আমরা কত আলোচনা করি। অনেক সময় এমন হয় যে, যদি কোন কবিতা আকারে খুব বড় হয় অথবা যদি তা কোন মহাকাব্য হয় তবে পড়বার অবসর পাই না। তখন তার সংক্ষিপ্ত সারটুকু পড়ে কাব্যকে বুঝতে চাই। একেবারেই না জানা অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ জানাও ভাল। প্যারাডাইস লস্ট, ডিভাইন কমেডি, ফাউস্ট প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কাব্য ও নাটক মূল ভাষায় নাই বা পড়লাম—এমন কি সমগ্রটার অনুবাদ নাই বা পড়লাম। যদি তাদের সারাৎসারটুকু জানতে পারি তবে মন্দ কি? এইভাবে আমরা দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মিটাতে চাই।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, কাব্যের বিষয়বস্তুর যেমন একটা মূল্য আছে, তেমনি মূল্য আছে স্টাইলের বা রচনারীতির। স্টাইলের স্বাদ অন্যরূপ। সে স্বাদ অনুবাদে পাওয়া যায় না। স্টাইলটা কবির একেবারে নিজস্ব বস্তু। এ অনুকরণ করা যায় না, ধার করাও যায় না। চুরি করাও যায় না। কাব্যের সংক্ষিপ্তসার বা ভাবানুবাদ দ্বারা স্টাইলের মাধুর্য উপলব্ধি করা যায় না। কবির স্টাইল কবির নিজের ভাষায় পড়তে হবে, তবেই তো উপভোগ করা সম্ভব হবে। স্টাইল হচ্ছে কবিতার প্রাণ। পাঠককে চেষ্টা করতে হবে এই স্টাইলের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে—ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।" তাঁর এই কথাটা অত্যন্ত সত্য। গল্প বল, উপন্যাস বল, কবিতা বল, —এ সবের প্রধান কথা বিষয়বস্তু নয়—প্রধান কথা রচনা-কৌশল। তাই বলে এমন ইঙ্গিত করতে চাই না যে, বিষয়-বস্তুর কোন মূল্য নাই। তার যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু কোন লেখকের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে তাঁর রচনার কলা-কৌশল। কলাকৌশলের যদি অভাব থাকে তবে উচ্চভাব থাকলেও কোন রচনা স্থায়ী হয় না। সাহিত্যের বিচারে লেখক কি বলেছেন সেটা বড় কথা নয়, বক্তব্য বিষয়কে তিনি কিভাবে প্রকাশ করেছেন সেটেই বড় কথা। প্রকাশ-ভঙ্গীটাই রচনার প্রাণ। হোমারের অদ্ভুত ও অলৌকিক গল্প, দান্তে ও মিলটনের স্বর্গ, নরক ও পাতালপুরীর কাহিনী, দেবতা ও শয়তানের সংগ্রামের বিবরণ—এসব কথা আজকাল আর কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু কবিদের রচনারীতি, কলাকৌশল ও স্টাইল এই বিংশ শতাব্দীর পাঠককে মুগ্ধ করে। এঁদের রচিত কাব্য পড়বার সময় পাঠক কিছু-ক্ষণের জন্য সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে মনের মধ্যে বন্দী করে রেখে দেয়। এবং সমস্ত প্রকার অবাস্তব ও অসম্ভব কথাকে—কিছুক্ষণের জন্য বিশ্বাস করে বসে। এসব কাব্য পাঠ করলে অপার আনন্দ-লাভ হয়। সাধারণ পাঠক ত বটেই যাঁরা ঘোর যুক্তিবাদী ও নাস্তিক তাঁরাও কম আনন্দলাভ করেন না। বাস্তবিকই সাহিত্যের বিচারে লেখকের স্টাইল বা রচনাকৌশলের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। এক রকমের রচনারীতি আছে ইংরাজি ভাষায় তাকে বলা হয় গ্রাণ্ড স্টাইল (grand style)। কবির রচনার মধ্যে নানাপ্রকার কলাকৌশল, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে। কোন রচনা ভাব-গম্ভীর, কোনটা বা হাল্কা রসে পূর্ণ। কোন রচনার মধ্যে থাকে হাস্য-রসের প্রাচুর্য। কোথাও দেখি দার্শনিক ভাব, কোথাও দেখি বাস্তব জগতের চিত্র। এই যে গ্রাণ্ড স্টাইলের কথা বলা হল তা সব রকম ও সব ভাবের কবিতা বা রচনার মধ্যে অল্পবিস্তর থাকতে পারে। কিন্তু সব লেখকের পক্ষে গ্রাণ্ড স্টাইল প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।— ক্ষমতা সকলের হয় না। পশ্চিম দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে যে মাত্র গুটিকয়েক কবি গ্রাণ্ড স্টাইল সার্থকভাবে রচনা করেছেন। প্রাচীন যুগের হোমার, মধ্যযুগের দান্তে, তৎপরবর্তী যুগের সেক্সপীয়র, মিল্টন—এঁরাই গ্রাণ্ড স্টাইলের মাস্টার। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে কালিদাস ও বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে গ্রাণ্ড স্টাইল রচনা করেছেন।

এখন প্রশ্ন এই গ্রাণ্ড স্টাইল জিনিসটা কি? কি এর সংজ্ঞা? কোন্ বৈশিষ্ট্য থাকলে রচনাকে গ্রাণ্ড স্টাইল বলা যেতে পারে? এ নিয়ে পশ্চিম দেশের সমালোচকদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। প্রথমে উল্লেখ করব কবি ও সাহিত্য-সমালোচক ম্যাথ্যু আরনল্ডের কথা। ("On Translating Homer") হোমারের অনুবাদ প্রসঙ্গে আরনল্ড দেখিয়েছেন যে গ্রাণ্ড স্টাইলের সমস্ত বৈশিষ্ট্য হোমারের মহাকাব্যের মধ্যে আছে। তিনি গ্রাণ্ড স্টাইলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি একমাত্র হোমারের কাব্যেই বিদ্যমান আছে। আরনল্ডের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা যাক :—(১) দ্রুতগতি—(Rapidity)—অর্থাৎ গ্রাণ্ড স্টাইলের ভাষার মধ্যে থাকবে একটা দ্রুতগতি। ভাষা ভাবকে বহন করে তরতর গতিতে স্বচ্ছন্দভাবে চলে যাবে, কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হবে না। (২) সরলতা ও স্পষ্টতা—(Plainness and Directness)—গ্রাণ্ড স্টাইলের ভাষা হবে স্বচ্ছ, আড়ম্বরহীন, স্পষ্ট ও অকপট। এ স্টাইল বক্তব্য বিষয়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বলে না। সহজভাবে সব কথাকে প্রকাশ করে। পাঠ করা মাত্র তার অর্থবোধে কোন অসুবিধা হবে না। এরূপ লিখতে গেলে স্টাইল ও শব্দনির্বাচন হবে সরল, সহজ ও প্রত্যক্ষ। (৩) মহান ভাব—(Nobility)—গ্রাণ্ড স্টাইল হবে মহৎ

ভাবের বাহন। ভাবটা মহৎ হওয়া চাই। অপর দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকলেও রচনা যদি মহৎ ও সিরিয়াস না হয় তবে তা গ্রাণ্ড স্টাইল হ'তে পারে না। আরনল্ড বলেন যে, হোমারের মত সার্থক গ্রাণ্ড স্টাইল ইউরোপের কোন কবি রচনা করতে পারেননি। এই তিনটি গুণ হোমারের সহজাত সম্পদ।

আসলে গ্রাণ্ড স্টাইল জিনিসটা যে কি, আরনল্ড তা কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি। তিনি এইটুকু বলেই সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, কোন রচনায় গ্রাণ্ড স্টাইল থাকলেই তা পাঠ করা মাত্র পাঠক উপলব্ধি করতে পারবে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লেখক লঙিগনাস (Longinus) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে "On the Sublime" স্টাইলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—"sublime" বা মহান বিষয় না হ'লে কোন স্টাইলকেই গ্রাণ্ড বলা যেতে পারে না। আরনল্ডের আদর্শও কতকটা লঙিগনাসের মতই। উভয় সমালোচকই বলেন যে, গ্রাণ্ড স্টাইলকে হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ এর ঠিক সংজ্ঞা (define) দেওয়া যেতে পারে না।

বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর sublimity বা মহানত্বটাই হচ্ছে বহু সমালোচকের নিকট গ্রাণ্ড স্টাইলের প্রধান সর্ত। আরনল্ড গ্রাণ্ড স্টাইল বলতে যা বোঝেন একজন লেখক সেটাকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন, "Grand style is the style that arises in poetry when a noble nature, poetically gifted treats with simplicity or with severity or serious subject" — আরনল্ডের মতে হোমার ব্যতীত কোন কবিই খাঁটি গ্রাণ্ড স্টাইল প্রয়োগ করতে পারেননি। তাঁর মতে সেক্সপীয়ারও বিশুদ্ধ গ্রাণ্ড স্টাইলের অধিকারী নন। তিনি বলেন, সেক্সপীয়ার মাঝে মাঝে Magnificence বা বিরাটত্ব দেখাতে পেরেছেন বটে, কিন্তু তাঁর রচনা এমন সব নিম্নস্তরের স্টাইল দ্বারা ক্ষুন্ন হয়েছে যা গ্রাণ্ড স্টাইলের বিপরীত। সুতরাং মোটের উপর সেক্সপীয়ারকে গ্রাণ্ড স্টাইলের অধিকারী বলতে আরনল্ড মোটেই প্রস্তুত নন।

জর্জ সেণ্টসবেরী বর্তমান যুগের একজন বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক। সেক্সপীয়ারের স্টাইল সম্পর্কে আরনল্ড যা বলেছেন, তিনি তা মেনে নিতে প্রস্তুত নন। গ্রাণ্ড স্টাইল সম্পর্কে তাঁর অভিমত নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। আরনল্ড বলেছেন যে, সেক্সপীয়ারের রচনায় বিশেষ কোন গ্রাণ্ড স্টাইল নাই, তার উত্তরে সেণ্টসবেরী বলেন, "না, সেকথা ঠিক নয়। সেক্সপীয়ারের মধ্যে যথেষ্ট গ্রাণ্ড স্টাইলের নিদর্শন আছে :— Shakespeare held the grandstyle in the hollow of his hand, letting it loose or withdrawing it as good seemed to him, and further that the seeming almost always was good—)
অর্থাৎ সেক্সপীয়ার তাঁর হাতের মধ্যে গ্রাণ্ড স্টাইলকে রেখে দিয়েছিলেন, যখন ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ করতেন, আর যখন ইচ্ছা তাকে গুটিয়ে নিতেন। তিনি যা ভাল মনে করতেন, তাই করতেন। আর এই "ভাল মনে করাটা" প্রায় সব সময়ই ঠিক হ'ত।

সেণ্টসবেরীর নিকট গ্রাণ্ড স্টাইলের সংজ্ঞাটা আরও ব্যাপক। এর বৈশিষ্ট্য রচনার অর্থের উপর নয়,—রচনার প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর। তিনি বলেন যে, আরনল্ড যে "হাই সিরিয়াসনেসের" উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি ঠিক নয়। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে "সাব্‌লাইম"। লঙিগনাসের আদর্শও সাবলাইম। আর সেণ্টসবেরীর মানদণ্ড কতকটা লঙিগনাসের মত। তবে সেণ্টসবেরী বিষয়বস্তু অপেক্ষা প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর অধিকতর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রকাশ-ভঙ্গীই গ্রাণ্ড স্টাইলের প্রধান সর্ত। তিনি এর সংজ্ঞা দিয়েছেন— "It is the perfection of expression in every direction and mind, the commonly called great and the commonly called small, the tragic and the comic, the serious, the ironic and even to some extent the trivial (not in the worst sense of course) !
মর্মার্থ :—"বিষয়টা বড় হোক, ছোট হোক, ট্রাজিক হোক অথবা কমিক হোক, গুরুতর হোক অথবা শ্লেষপূর্ণ হোক, এমনকি বিষয়টি অকিঞ্চিৎকর হোক তাতে কিছু যায় আসে না, যদি প্রকাশ-ভঙ্গীটা সকল দিক দিয়ে, সকল প্রকারে নিখুঁত ও পূর্ণাংগ হয়—তবেই সেই রচনাকে বলা যেতে পারে গ্র্যাণ্ড স্টাইল।" সেণ্টসবেরী বলেন যে, প্রকাশ-ভঙ্গীর পরিপূর্ণতার দ্বারা রচনা এমন একটি শক্তি ও তেজ প্রাপ্ত হয় যা বর্ণিতব্য বিষয়কে transmute বা রূপান্তরিত করে দেয় এবং পাঠক ও শ্রোতাকে transport বা অভিভূত বা বিহ্বল করে তোলে। যখন কোন স্টাইল এইভাবে বিষয়কে রূপান্তরিত ও পাঠক-শ্রোতাকে অভিভূত ও বিহ্বল করে তুলতে পারে তখনই সেই স্টাইলকে বলব "গ্রাণ্ড" বা মহান। যতক্ষণ এই রূপান্তরিত ও অভিভূত করার কাজ চলতে থাকবে ততক্ষণই স্টাইলটা গ্রাণ্ড হয়ে থাকবে। রূপান্তর সাধন বা অভিভূতকরণের কাজ শেষ হয়ে গেলেই গ্রাণ্ড স্টাইলও শেষ হয়ে যায়। এর অধিকক্ষণ গ্রাণ্ড স্টাইল থাকতে পারে না। সেণ্টসবেরীর মতে কোন রচনায় perpetual grand style থাকে না। তা সম্ভব নয়। গ্রাণ্ড স্টাইল একবার কিছুক্ষণের জন্য আবির্ভূত হয়ে সংগে সংগে অন্তর্হিত হ'তে পারে। প্রয়োজনবোধে এর পুনরাবির্ভাব হ'তে পারে। কিন্তু কোন রচনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লাইনে গ্রাণ্ড স্টাইল থাকে না। কোন বিষয়বস্তুর মহান হওয়ার সাথে গ্রাণ্ড স্টাইলের নিগূঢ় সম্পর্ক নেই। কবির গৃহীত বিষয়টি একেবারে বাজে জিনিস হ'তে পারে। কিন্তু সেই বাজে জিনিসটাই বর্ণনার, স্টাইলের গুণে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে। আর তা পাঠক ও শ্রোতাকে অভিভূত করে দিতে পারে। শেক্সপীয়ার যে গ্রাণ্ড স্টাইলের সম্রাট তা প্রমাণ করবার জন্য সেণ্টসবেরী বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। সবগুলি উল্লেখ করা সম্ভব নয় বলে দু-একটি উদাহরণ উল্লেখ করব।—

Far know, my love, as easy
mayst thou fall
A drop of water in the breaking
gulf,
And take unmingled thence that
drop again,
Without addition or diminishing,
As take from me thyself, and not
me too.

এই উদ্ধৃত অংশটির অর্থ স্পষ্ট ও বেদনাবিধুর। কিন্তু এই লাইনগুলির যথার্থ সার্থকতা অর্থের মধ্যে নাই—আছে স্টাইলের মধ্যে। এখানে যে রূপান্তর ও বিহ্বলতা সৃষ্টি হয়েছে তা অর্থের জন্য নয়। এতে বিষয়ের যে রূপান্তর ও পাঠকের মনে যে বিহ্বলতা সৃষ্টি হয়েছে তা লাইনগুলির ধ্বনি-ব্যঞ্জনা, উপমা ও চিত্রাংকনের জন্য। কবি এখানে কতকগুলি উপযোগী শব্দের দ্বারা একটা বাগ্‌মূর্তি রচনা করেছেন। কতকগুলি শব্দকে ঠিক ঠিক স্থানে সজ্জিত করে তিনি পাঠকের চোখের সামনে একটা সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন। একদিকে দেখি তরঙ্গাহত

সমুদ্র, আর তার বিপরীত দিকে দেখি শুভ্র সমুজ্জ্বল একবিন্দু জল। এই এক বিন্দু জল বিশাল অম্বুধির মধ্যে মিশে বিলীন হয়ে যাচ্ছে—সেই জল-বিন্দুকে পুনরায় উদ্ধার করা অসম্ভব। কেমন করে মিশে যাচ্ছে তারই ছবিকে অপূর্ব শব্দ-যোজনা ও ধ্বনি-ব্যঞ্জনার দ্বারা দেখান হয়েছে। এখানে কতিপয় বাক্যাংশের দ্বারা ছবিটি অঙ্কিত করা হয়েছে। তারই মধ্যে গ্রাণ্ড স্টাইল নিহিত আছে। ছন্দের তালকে এমনভাবে সাজান হয়েছে যে,—এই অংশটি পড়বার সময় তরঙ্গের দোলার সহিত ছন্দের দোলাও একবার উঠছে ও একবার নামছে, কখনও বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে আবার কখনও লাফিয়ে উঠছে। আবার কখনও ভেঙেগ-চুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই সবের সমন্বয়ে এমন একটা সুসম ছন্দ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে যা অন্তর-মনকে অভিভূত করে তোলে। সেণ্টস্‌বেরীর মতে এই হ'ল গ্রাণ্ড স্টাইল। যাঁরা বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব দেন তাঁরা উক্ত লাইনকটির আসল মহিমা উপলব্ধি করতে পারবেন না।

সেক্সপীয়ার থেকে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাকঃ– (Lo! in the orient when the gracious light Lifts up his burning head). এই লাইন দুটিও গ্রাণ্ড স্টাইলের অন্যতম নিদর্শন। কি কি উপাদানের দ্বারা এই মহান স্টাইল রচিত হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব স্বয়ং সূর্যদেবের রাজোচিত মহিমা বর্ণনা করা। এ লাইন দুটির শব্দ-ঐশ্বর্যের মধ্যে একটা রহস্য নিহিত আছে। Orient, gracious ও burning এই শব্দত্রয় একটা contrasted ধ্বনি-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্কের সান্নিধ্যের মধ্যে নিহিত আছে আরও অনেক সৌন্দর্য। এই দুটি লাইনের মধ্যে কোন poetic diction বা কৃত্রিম কবিভাষা নাই। অধিকাংশ কথা অত্যন্ত সহজবোধ্য। কেন্দ্রগত ভাব ও মূর্তিটিও অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ, যেমন সহজ ও সাধারণ পায়ের নীচের তৃণ ও মৃত্তিকা। কিন্তু বাক্যাংশগুলির অবস্থিতি অত্যন্ত মনোরম। কি সহজ ভাব! কি মহিমান্বিত ভঙ্গী! বাক্যাংশগুলি orient এবং gracious শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটা সমুজ্জ্বল মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রকার প্রকাশ-ভঙ্গীর দ্বারা সেক্সপীয়ার গ্রাণ্ড স্টাইলের ভাষা সৃষ্টি করেছেন।

শেক্সপীয়ার থেকে তৃতীয় উদাহরণ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব—The uncertain glory of an April day. আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই লাইনটি অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। কিন্তু শব্দাড়ম্বরহীন এই কটি লাইনের শব্দ-যোজনার মধ্যে এত পারিপাট্য আছে, বর্ণনার মধ্যে এমন একটা সুষমা ও সৌন্দর্য আছে যে, প্রথম শ্রেণীর কবি ব্যতীত কেউ তা লিখতে পারবেন না। এ রকমের লাইন অনুকরণের অতীত। এর শব্দও পরিবর্তন করা চলবে না। পরিবর্তন করতে গেলেই সমস্ত সৌন্দর্য ও মহিমা নষ্ট হয়ে যাবে। সেণ্টসবেরী বলেন যে, পাঠকের যদি গ্রাণ্ড স্টাইলের কান থাকে তাঁর বুঝতে একটুও বিলম্ব হবে না কোথায় এর সৌন্দর্য ও কোথায় এর গ্রাণ্ড স্টাইল। এখানে যে গ্রাণ্ড স্টাইল আছে শেক্সপীয়ার বর্ণিত এরিয়েল ও অলিকুলের সঙ্গে তার সহ-অস্তিত্ব। রাসায়নিকের দোকানে প্রদীপের পাশে কিছুতেই নয়।

কোন রচনার মধ্যে গ্রাণ্ড স্টাইল আত্মপ্রকাশ করলে সেই রচনায় শেষ পর্যন্ত থাকে না। দীর্ঘ পদাবলী শব্দ-চ্ছটার মধ্যে হঠাৎ তা আবির্ভূত হয়, আবার হঠাৎ অন্তর্হিত হয়। গ্রাণ্ড স্টাইলের পরবর্তী লাইনগুলি একেবারে বাজে কথায় ভরে থাকতে পারে। ভাব ও ভাষার দিক দিয়ে তা অকিঞ্চিৎকর হ'তে পারে। শ্রেষ্ঠ কবি এই সব বাজে কথার মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত একটা ভাবকে গ্রাণ্ড স্টাইল দ্বারা অপূর্ব মহিমাময় ও সুষমায় মণ্ডিত করে তোলেন। যদি কেউ মনে করেন যে, অবিরত চেষ্টার দ্বারা গ্রাণ্ড স্টাইল প্রয়োগ করে অভিভূত করে তুলবেন তবে তা হবে নিষ্ফল প্রয়াস। যদি কোন লেখক তা করতে চান তবে তাতে কিছু অসুবিধা দেখা দেবে। তাহ'লে গ্রাণ্ড স্টাইলের জন্য লেখককে এত অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে যে, স্টাইলের অন্য সব প্রয়োজনীয় দিক অবহেলিত হবে। কেবল মাত্র ইংরাজ কবি মিল্টন perpetual grand style প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই ধরনের গ্রাণ্ড স্টাইলের জন্য মিল্টনকে শিল্পের আরও বহু লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করতে হয়েছে। তিনি বহুপ্রকার Mannerism ব্যবহার করেছেন, যাতে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে। সার্থকভাবে কোন হাল্কা ধরনের কথা তিনি লিখতে পারেননি। মনে রাখতে হবে যে, সিরিয়াস বিষয়েও হাল্কা কথা, লঘু-চপলতা ও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের কথাগুলি বলারও সুযোগ থাকা দরকার। কিন্তু মিল্টন perpetual grand style লিখতে গিয়ে এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন নি। যা গ্রাণ্ড নয় এমন কোন কথা কোন কবিতায় বা রচনায় থাকবে না, এ দাবী অত্যন্ত অযৌক্তিক। যা গ্রাণ্ড স্টাইল নয় এমন কোন রচনারীতি কোন কবিতায় আছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। আসল কথা এই লেখার মধ্যে কোথাও না কোথাও গ্রাণ্ড স্টাইল আছে কিনা? যদি থাকে তবে তাই যথেষ্ট। কতটা ungrand style আছে সেটা বিচার্য বিষয় মোটেই নয়। দীর্ঘ কবিতার মধ্যে, সংলাপের মধ্যে ungrand কথা ত থাকবেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোথাও কোথাও গ্রাণ্ড স্টাইল আছে কিনা সেটাই আবিষ্কার করতে হবে। যদি আবিষ্কৃত হয় তবে তাতে অপার আনন্দ লাভ হবে। গ্রাণ্ড স্টাইলের সার্থকতা সম্পর্কে সেণ্টসবেরির একটি উক্তি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না ঃ—
"All really grand style appeals to a certain complementary gift and faculty in the person who is to appreciate it; it is a sort of infinitely varying tally which awaits and adjusts itself to an infinite member of counterpieces. It abides; the counterpieces may get themselves ready as they can and will."

সাধারণ পাঠক কবিতার বিষয়বস্তুর অধিকতর গুরুত্ব দেন। কিন্তু সাহিত্যের সমজদারগণ অধিকতর গুরুত্ব দেন স্টাইলের বা রচনারীতির উপর। এই প্রসঙ্গে কবি এ. এল. হাউসম্যানের দুটি উক্তির কথা উল্লেখ করব।

(1) Meaning is of intellect, poetry is not —
অর্থাৎ অর্থটা বুদ্ধির বিষয়, কিন্তু কবিতা তা নয়।

(2) Poetry is not the thing, but a way of saying it—
অর্থাৎ বিষয়বস্তুটা কবিতার আসল কথা নয়, বিষয় যাই হক না কেন, কিভাবে বিষয়বস্তুকে বলা হ'ল তাই হ'ল কবিতার কাজ। কি বলা হ'ল সেটা কবিতা নয়। কিভাবে এবং কেমন করে বলা হ'ল সেই-

টাই কবিতার প্রশ্ন। কবিতাকে আমরা নানা কারণে ভালবাসি। যথা তার বিষয়-বস্তু, তার বর্ণনাভঙ্গী, তার প্রকৃতি-প্রেম, তার আদর্শ ও জীবনদর্শন, তার স্বদেশ-প্রেম, বিশ্ব-মানবতা ইত্যাদি। কিন্তু এসব গুণ থাকলেই যে কোন রচনা 'কবিতা' বলে গণ্য হবে তা নয়। অবশ্য এ সবের যে কোন মূল্য নাই তা বলি না। রচনার কবিত্ব নিহিত আছে, তার ইমোশনের তার প্রকৃত স্টাইলের ও প্রকাশ-ভঙ্গীর ভিতর। আর এই স্টাইল যদি গ্রান্ড হয় তবে তা আরও ভাল, আরও মহৎ হবে। তা হৃদয়কে আরও সার্থকভাবে অভিভূত করে তুলবে।

সাহিত্য-সমালোচক মিডলটন মারে (Middleton Murry) "Pure Poetry"—এই প্রবন্ধে বলেছেন যে, Notional or Rational (ভাগবত বা যুক্তিগত) বিষয়টা কবিতার প্রধান বস্তু নয়। তাঁর মতে কবিত্বের জন্য Notional content একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। তিনি এটা বুঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দিয়েছেন। কীটসের বিখ্যাত উক্তি—

—A thing of beauty is a joy for ever

সর্বজনবিদিত কথা। প্রবাদ আছে যে, কীটস প্রথমে যা লিখেছিলেন তা ছিল অন্যরূপ। যথা—

"A thing of beauty is a constant joy".

কীটসের স্পর্শকাতর কানে এই শেষোক্ত শব্দগুলি বেসুরো ঠেকলো। তখন তিনি তাকে পরিবর্তন করে একটি খাঁটি কবিতা লিখে ফেললেন—

—"A thing of beauty is a joy for ever".

এখানে দেখা যাচ্ছে অর্থের দিক দিয়ে এই উক্তি দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুটো উক্তি একই অর্থবোধক। এই দুটো লাইনের Notional content-এর মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ, পার্থক্য বা বৈপরীত্য কিছুই নাই। কিন্তু তবুও দেখা যাবে যে, প্রথম লাইনটা

"A thing of beauty is a joy for ever".

আসল কবিতা। এতে শব্দের এমন একটা হারমনিক ঐক্য আছে যা মনকে অভিভূত করে। চিন্তাকে পূর্ণ করে। ইমোশনকে জাগিয়ে দেয়। সুতরাং প্রথম লাইনটি কবিতা। দ্বিতীয় লাইনটি কবিতা নয়। প্রথম লাইনটি পড়ামাত্র মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে। কিন্তু দ্বিতীয়টি তা পারে না। এ ধরনের লাইন বিষয়কে রূপান্তরিত ও পাঠককে বিহ্বল করে না। বস্তুতঃ কবিতা সেই সব কথার বিদ্যুৎ-প্রবাহ, যার সাহায্যে কবির ভাবকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা যায়। যে বস্তু মনের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চার করে দেয় তা Notion বা idea নয়। তবে তা কি? টলস্টয় বলেন, তার নাম "ইমোশন"। ক্রোচে বলেন তার নাম "ইনটিউশন"। অপর একজন সমালোচক বলেছেন তার নাম Incomplete mystical experience নাম যাই হোক, কবিতার এই যে বাহাদুরী তা অপূর্ব। একেই বলে স্টাইলের যাদু।

প্রাচীন ভারতের মহাকবি কালিদাস জানতেন গ্রান্ড স্টাইল প্রয়োগের রীতি। এই নাম আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি তাঁর কাব্যের নানা স্থানে স্বভাবতঃ গ্রান্ড স্টাইল ব্যবহার করেছেন। তাঁর যথার্থ উপমা প্রয়োগ, তাঁর শব্দযোজনা, তাঁর অপূর্ব লেখন-রীতি, এমনকি ছোট ছোট কথাকে অপরূপ ভঙ্গীতে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত ও অননুকরণীয়। কালিদাসের প্রকাশ-ভঙ্গীর অপূর্ব ক্ষমতা সম্পর্কে স্বর্গীয় শ্রীঅতুল গুপ্ত যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না :—

"কালিদাসের কাব্যে ভাষায় ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ও রসোদ্বোধনের শক্তি একটা চরম পরিণতি লাভ করেছে। এই পরম উৎকর্ষের মূলে উপাদান দুটি—কালিদাসের শব্দসম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা ও তার অপূর্ব ধ্বনি সামঞ্জস্য। এর মিশ্রণে যে কথা ও ভাব কালিদাস প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার দীপ্ত পরিচ্ছন্ন মূর্তি তখনি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, যে রস তিনি জাগাতে চান। "শুচ্যেকেন্ধন ইবানল—" পাঠকের চিত্তকে তা ব্যাপ্ত করে। কালিদাসের ভাষা একসঙ্গে ছবি ও গান। রঘুবংশের যে প্রারম্ভটা প্রথম যৌবনে নিতান্ত সরল বর্ণচ্ছটাহীন মনে হয়, ভাবপ্রকাশে তার কি অদ্ভুত ক্ষমতা!

"মন্দ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপে
হাস্যতাম্।
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্-
বাহুরিব বামনঃ ॥

মনে হয় কী সহজ এ রচনা। শিল্পীর চরম কৌশল এই সহজের মায়া সৃষ্টি করেছে। এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর সহজ, মানবদেহের সামঞ্জস্য যেমন সহজ। ও এমনি সুসম্পূর্ণ যে, তাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে আমরা মেনে নিই। গড়নের যে আশ্চর্য কৌশল এই সামঞ্জস্য এনেছে তার কথা মনেই হয় না। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ—একটি মাত্র লাইনে অক্ষমের হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টার ছবি কালিদাস এঁকে তুলেছেন, আর তেমনি সেই লাইনের ধ্বনির বৈচিত্র্য ও ব্যালান্স। ভাষাপ্রয়োগের এই চরম নৈপুণ্য পৃথিবীর মহাকবিদের লেখাতেই পাওয়া যায়। যেমন শেক্সপীয়ারের— ।—" অতঃপর শ্রীঅতুল গুপ্ত শেক্সপীয়ারের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে বলছেন :—

"ভাষা যেন রেখা ও ধ্বনি দিয়ে ভাবের মূর্তি গড়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণ বাণীর অভাবে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা মহা-কবিত্ব লাভে বঞ্চিত হয়, যেমন ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের ভাষাও এই মহাকবির ভাষা; ধ্বনি-রেখা, রঙের অমৃত রসায়ন।"

হোমার, কালিদাস, দান্তে, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা সকলেই গ্রান্ড স্টাইলের সম্রাট। এঁরা গ্রান্ড স্টাইল দ্বারা নিজেদের ভাষাকে অপূর্বভাবে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন। এঁরা যে কাল-জয়ী কবি, তার একমাত্র কারণ না হতে পারে, কিন্তু অন্যতম প্রধান কারণ এঁদের রচনারীতি, এঁদের কলাকৌশল, এঁদের অতুলনীয় গ্রান্ড স্টাইল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করলে দেখা যাবে তাঁর বিরাট সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে প্রচুর গ্রান্ড স্টাইল আছে। বস্তুতঃ গ্রান্ড স্টাইল যেন তাঁর সহজাত রচনা-রীতি। এ বিষয়ে তিনি হোমার, কালিদাস

ও শেক্সপীয়ারের সমগোত্র। রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ভারতে ও বহির্ভারতে বহু সভা-সমিতির আয়োজন করা হয়েছে। সেই সব সভায় রবীন্দ্রনাথের দর্শন, তাঁর আধ্যাত্মিকতা, তাঁর স্বদেশপ্রেম, তাঁর বিশ্বমানবতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। স্বীকার করি এসব খুব ভাল কথা। বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোন কবি জীবনের এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেননি। জীবনকে তিনি বহুদিক থেকে দেখেছেন। তিনি বিরাট, বিশাল, মহান ও অদ্বিতীয়। এই সব মহৎ গুণ দেখে তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করা চলবে না। দর্শন, বিশ্বপ্রেম, মানবতা, স্বদেশপ্রেম, এসব আয়ত্ত করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ রচনা-রীতি ও গ্রাণ্ড স্টাইল আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সহজ নয়, সম্ভবও নয়। যে গুণের জন্য রবীন্দ্রনাথ অথবা অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর কবি চিরকাল বেঁচে থাকবেন, সে গুণ তাঁদের দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় নয়। যে গুণের জন্য রবীন্দ্রনাথ মহাকবির মর্যাদা লাভ করেছেন, সে গুণ হচ্ছে তাঁর উৎকৃষ্ট রচনা-রীতি, তাঁর মহান স্টাইল। রবীন্দ্রনাথের দর্শনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে আমরা সেই ভুল করব, যে ভুল করেছেন কবি ওয়ার্ডস্বার্থের অতি-ভক্তগণ। লেসলি স্টিফেন ছিলেন ওয়ার্ডস্বার্থের একজন ভক্ত। তিনি একবার বলেছেন যে,— Wordsworth's poetry is precious,because "his philosophy is sound".

তার উত্তরে ম্যাথু আরনল্ড বলেছেনঃ "ভুল কথা" "His poetry is the Reality, his philosophy is the illusion",—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে ওভাবে অকিঞ্চিৎকর বলতে চাই না। আর তা অকিঞ্চিৎকর নয়ও। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা চলবে না যে, কবির দর্শন অপেক্ষা তাঁর কবিতাই অধিকতর আদরের সামগ্রী। পাঠককে জোর দিতে হবে রবীন্দ্রনাথের রচনা-রীতির উপর।

রবীন্দ্র-সাহিত্য এক মহাসমুদ্র। অনুসন্ধান করলে তা থেকে অমূল্য রত্ন পাওয়া যাবে। বিবিধ রতনরাজির মধ্যে একটি প্রধান রত্ন হ'ল রবীন্দ্রনাথের গ্রাণ্ড স্টাইল। তাঁর মধ্যে মিল্টনের মত perpetual grand style নাই। ভালই হয়েছে যে তাঁর মধ্যে Miltonic grand style নেই। কারণ তাহলে তিনি বিরক্তিকর হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শেক্সপীয়ারের গ্রাণ্ড স্টাইল্ আছে। তিনি শেক্সপীয়ারের মত দরকার বোধে তা ব্যবহার করেছেন, আবার দরকার বোধে সংবরণ করে সাধারণ স্টাইল প্রয়োগ করেছেন। বস্তুতঃ গ্রাণ্ড স্টাইল তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে সততঃ বিদ্যমান। শেক্সপীয়ারের মত তাঁর রচনায় আছে Rounded perfection of expression and felicity of loveliness.

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সহজ অকিঞ্চিৎকর বস্তুর অভাব নাই। আবার যখনই তিনি ইচ্ছা করেছেন তখনই তিনি মহান sublime এবং grand হ'তে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ অন্য অনেক ব্যাপারে শেক্সপীয়ার না হ'তে পারেন কিন্তু গ্রাণ্ড স্টাইলের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তিনি শেক্সপীয়ারের সমকক্ষ, সমগোত্র। তাঁর দর্শন অপরে অনুকরণ করতে পারে, তাঁর তত্ত্ব-কথা যুগধর্মের প্রভাবে বাতিল হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর গ্রাণ্ড স্টাইল, তাঁর কলাকৌশল চিরকালের বস্তু,—চিরকাল ধরে তা গৌড়জনকে অনাবিল আনন্দ দান করে যাবে, তা কোনদিন পুরাতন হবে না। এখানে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট—অদ্বিতীয় শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কাব্যের চতুর্দিকে মুক্তহস্তে গ্রাণ্ড স্টাইল ছড়িয়ে রেখেছেন। প্রথমেই—'সোনার তরী' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। কবিতাটির মধ্যে তিনটি কি চারটি যুক্তাক্ষর আছে। তদ্ব্যতীত সমস্ত কবিতাটি যুক্তাক্ষর-বিহীন। কিন্তু সমগ্র কবিতাটির ছন্দ-নৈপুণ্য, ধ্বনি-ব্যঞ্জনা এমন একটা যাদু সৃষ্টি করেছে যা বারবার পড়লেও বিরক্তি ধরে না। বিষয়কে রূপান্তরিত ও পাঠককে অভিভূত ও বিহ্বল করার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে এই কবিতার। এর আধ্যাত্মিক অর্থ অস্পষ্ট ও দুরূহ। কিন্তু চিত্রাঙ্কনে, শব্দ-সম্পদের পরি-পূর্ণতায়, অপূর্ব ধ্বনি-সামঞ্জস্যে—কবিতাটি গ্রাণ্ড স্টাইলের চমৎকার নিদর্শন। এর ভাষার মধ্যে এমন একটি যাদু আছে, যা বুঝবার জন্য দর্শনের দরকার হয় না। এ ভাষা গ্রাণ্ড স্টাইলের ভাষা। এর মধ্যে এমন একটা গতিশীলতা আছে যা শ্রাবণের ভরানদীর সাথেই তুলিত হতে পারে। এ কবিতা অনুবাদের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর বিবিধ কবিতার মধ্যে প্রচুর গ্রাণ্ড স্টাইল বিদ্য-মান। বিশেষ করে উর্বশী, তাজমহল, দুঃসময়, বলাকা প্রভৃতি কবিতাগুলি দ্রষ্টব্য। "ভাষা ও ছন্দ" কবিতা থেকে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করব :—

"যেদিন হিমাদ্রি শৃঙ্গে নামি আসে
আসন্ন আষাঢ়

মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দম দুর্বার
দুঃসহ অন্তর বেগে তীর-তরু করিয়া
উন্মূল

মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল
উন্মূলে

তট অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু
বাজায়ে

ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়।"

এই লাইনকটির মাধুর্য প্রত্যেক পাঠককে মোহিত করে তুলবে। নূতন ছন্দলাভ করে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে তরঙ্গ উঠেছে, কবি আষাঢ়ের প্রথমদিকে পর্বত নির্গত জলধারার দুর্বার স্রোতের সহিত তার তুলনা করেছেন। এইভাবে কবি যে ইমেজ বা ছবি এঁকেছেন তা যেকোন দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। "তট অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়"—কি অপূর্ব ইমেজ, শব্দযোজনা কি নিখুঁত ও পরিপাটি, ধ্বনি-ব্যঞ্জনা কি সুমধুর! "বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত ছন্দোবান বিদ্ধ বাল্মীকির"—ইমেজটা কল্পনা করা যাক। ছন্দ, শব্দসম্পদ ধ্বনি ব্যঞ্জনা সব মিলে এমন একটা চিত্র অঙ্কিত দেখতে পাচ্ছি যা বিষয়কে রূপান্তরিত করেছে, এবং পাঠককে অভিভূত করে তুলেছে। এইসব উদাহরণ দেখে সত্যই মনে হবে যে গ্রাণ্ড স্টাইলের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়ারের সহিত তুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথ থেকে বেশী উদাহরণ দেওয়া সম্ভব হলো না। রবীন্দ্রনাথের পাঠকগণের নিকট অনুরোধ করব তারা যেন কবির স্টাইলের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখেন। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি করেন। স্টাইল কবির নিজস্ব সম্পদ। নিজের প্রতিভাবলে কবি তা আয়ত্ত করেছেন। কবিকে বুঝতে হলে কবির স্টাইলকে বুঝতে হবে, নতুবা কাব্য-পাঠ সার্থক হবে না।

দেবতার মন্দিরে মিথুন মূর্তি

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের নানা মন্দিরের গাত্রদেশে রতিলীলার নানা মিথুন-মূর্তির ভাস্কর্য লক্ষ্য করিয়া বিদেশী পর্যটকরা ভারতের উপাসকদের কদর্য রুচির অজস্র নিন্দা করিয়াছেন। এই মিথুন-চিত্রের নক্সা—বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন মন্দিরে বহু-কাল হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ উড়িষ্যার পুরী, কোণারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মুখপাতে এবং খাজুরাহোর মন্দিরমালার এই যুগ্মমূর্তি অত্যন্ত কুৎসিত রীতিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই মিথুনমূর্তি দেবতার মন্দিরে সন্নিবেশিত করিবার তাৎপর্য কি তাহা বর্তমান লেখক একাধিকবার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু লেখকের আলোচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সুতরাং আর-একবার এ বিষয়টি আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমেই বলা উচিত যে, এই যুগ্মমূর্তির মন্দিরে সন্নিবেশ ভারতের ও মন্দির-নির্মাতার মৌলিক কল্পনা নহে। আমাদের প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রে নির্দেশ আছে—যে মন্দিরের মুখ (*Facade*) 'মিথুন-মূর্তির দ্বারা অবশ্যই ভূষিত বা অলঙ্কৃত করিতে হইবে।' "(মিথুনৈঃ শাখা-শোধং বিভূষয়েৎ,")। সুতরাং ভারতের মন্দির-নির্মাতা-শিল্পীরা শাস্ত্র-নির্দিষ্ট একটি অবশ্য-প্রতিপালনীয় নিয়ম পালন করিয়াছেন। শিল্পশাস্ত্রে অবশ্য এই নিয়ম পালনের কোনও কারণ বা হেতুর কোনও ইঙ্গিত নাই। এই হেতুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়—একটি অপ্রকাশিত পুঁথিতে। মন্দির-নির্মাণের উপযুক্ত লক্ষণযুক্ত ক্ষেত্রের চয়নের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে-ভূমিতে সবৎস সুরভী গাভীবৃন্দ বৃষদের সহিত রতিক্রিয়া করিয়াছে—যে-ক্ষেত্রে সুন্দরীগণ পুরুষদের সহিত রতিক্রিয়া করিয়াছেন—সেই সব ক্ষেত্র বা ভূমি—সকল বর্ণের ভক্তগণের মন্দির নির্মাণের উপযুক্ত ভূমি।

সম্ভবতঃ মন্দির-নির্মাতারা ঐরূপ লক্ষণযুক্ত ভূমি অনুসন্ধান করিয়া না পাইলে বিকল্পে—মিথুন-মূর্তির দ্বারা মাঙ্গলিক রচনা করিয়া মন্দির-রচনা সার্থক করিয়া তুলিতেন। যে কারণেই হউক মন্দিরের গাত্রে মিথুন-চিত্রের আরোপন অবশ্য-পালনীয় নিয়ম বলিয়া মন্দির-নির্মাতারা অতি প্রাচীনকাল হইতে এই মাঙ্গলিক অলংকরণ রচনা করিয়া আসিতেছেন। এখন গোল বাঁধিল—মিথুনের সংজ্ঞা নির্দেশে। একদল স্থপতি বৌদ্ধ-মন্দির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "মিথুনে"র অর্থ করিলেন—স্ত্রী-পুরুষের প্রেমাসক্ত রুচিসম্পন্ন পবিত্র যুগলমূর্তির কল্পনা। বোম্বাইয়ের নিকট একটি বৌদ্ধ গুহামন্দিরে (প্রথম শতকে রচিত) এইরূপ সুরুচিসম্পন্ন যুগলমূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই ধারা অনুসরণ করিয়া অন্যান্য যুগে রচিত বৌদ্ধ-মন্দিরে এইরূপে কল্পিত মিথুন-মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। যেমন পশ্চিম ভারতের নানা গুহামন্দিরে (কার্লি, কানহেরি, ভাজার মন্দিরে এবং অজন্তার গুহামন্দিরের দ্বারের শেষ শাখার মুখপাতে ইত্যাদি) কুষাণযুগের কোনও বৌদ্ধ মন্দিরেও এইরূপ মিথুন-মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। বুন্দেলখণ্ডের অজয়-গড় স্টেটে নাচ্না'র গুপ্তকালীন মন্দিরের দ্বারে মিথুন-মূর্তির শ্রেণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ-মন্দিরে মিথুন-মূর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—তৃতীয়-চতুর্থ শতকে রচিত নাগার্জুনীকুণ্ডার—নানা উষ্ণীষপট্টকের ফলকে। এইরূপে সুপরিকল্পিত সুন্দর মিথুন-মূর্তি ভারতের মন্দির-শিল্পে আর কোথাও দেখা যায় না।

কিন্তু উড়িষ্যা ও খাজুরাহোর মন্দিরের স্থপতিরা মিথুন-মূর্তির অর্থ করিয়াছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-রূপে। তাঁহাদের মতে মিথুন হইল রতি-ক্রিয়ারত স্ত্রী-পুরুষ। সুতরাং তাঁহারা সাধারণ রুচির বিপরীত অশ্লীল পরিকল্পনায় উড়িষ্যার ও খাজুরাহোর নানা মন্দিরে তাঁহাদের ব্যাখ্যা মূর্তিমান করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার ফলে

মিথুনমূর্তি বৌদ্ধ গুহা, কুড়া, সালসেট জেলা

বিদেশী পর্যটকদের চক্ষে ভারতের এক-শ্রেণীর মন্দিরস্থাপত্য নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

কেহ কেহ মন্দিরে মিথুন-মূর্তির আরোপের উদ্দেশ্য কামশাস্ত্রে উল্লিখিত রতিক্রিয়ার নানা 'ভঙ্গী' ও 'আসনের' রূপায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উড়িষ্যার কোণারকের মন্দিরে কেবল মনুষ্য-মিথুন নহে, অনেক প্রকারের পশু-মিথুনের উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিতে পাই। কয়েকটি নাগ-নাগিনীর মিথুন এবং একটি সিংহ-মিথুন ভারতের ভাস্কর্যের ইতিহাসে অভিনব, চমৎকার নিদর্শন। এই সব পশু-মিথুনের কল্পনায়—কুরুচিকর অশ্লীল রসের কোনও অবসর নাই। অনেক মন্দিরে মিথুনের মাঙ্গলিক প্রতীক, মন্দিরের এমনস্থানে নিয়োজিত করিয়া শিল্প-শাস্ত্রের 'বিধি' পালন করা হইয়াছে, যে প্রদক্ষিণকারী ভক্তের চোখে সহজে পড়ে না। কিন্তু উড়িষ্যার ও খাজুরাহোর মন্দিরে এই মিথুন যোজনা—এমন সদর্পে নির্লজ্জ নির্ভীকতায় মূর্তিগুলি সকলের চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে যে,—সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর চক্ষুকে পীড়া দিয়া তাঁহাদের ভক্তির উপর নির্মম আঘাত করে। শিল্পীরা হয়ত বলিতে পারেন যে, তাঁহারা সরল ও নির্ভীক চিত্তে শাস্ত্রের বচন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কলাকৃতি নিন্দনীয় নহে, পরন্তু ক্ষমার যোগ্য। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, বৌদ্ধ-মন্দিরের স্থপতিগণও শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ-মন্দিরে মিথুন-মূর্তির চিত্র উৎকীর্ণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা সুরুচি ও সুনীতি বর্ধন করিয়া মিথুনে রতি-ক্রিয়ার আরোপ করেন নাই—সাধারণ প্রেমিকযুগলের চিত্র দিয়াই তাঁহারা নিয়ম পালন করিয়াছেন। এই সমালোচনার উত্তরে এক সাংঘাতিক প্রমাণ মিথুনের আসল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে। মিথুন রচনা শিল্প-শাস্ত্রের নির্দেশ হইলেও ইহার রহস্যগত তাৎপর্য 'বৃহদারণ্যোকপনিষদে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ উপনিষদে, প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে, (দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থের

মিথুনমূর্তি নাগার্জুনী কুণ্ডা, দক্ষিণ ভারত

সংস্করণ, ১৯৮ পৃঃ)—আমরা প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টির সুস্পষ্ট বিবরণ পাইতেছি ঃ "সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, সেইজন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না। তিনি আপনার দ্বিতীয় (অর্থাৎ স্ত্রী) কামনা করিলেন; তাহার পর তিনি এই-রূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষ যে রূপ হয়। তিনি এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিল। এই-জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি (পত্নী রহিত) হইয়া —এই নিজদেহকে অর্ধবৃগলের ন্যায়—অর্ধাংশ-শূন্য শস্যবীজের মত বলিয়া-ছিলেন; সেই কারণ আকাশ, অর্থাৎ শূন্যপ্রায় এই দেহ নিশ্চয়ই স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সেই প্রজাপতি, যিনি মনু নামে পরিচিত—তিনি সেই শরীরার্ধভূত স্ত্রীতে যাহার নাম শতরূপা, সেই পত্নীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন; তাহা হইতে মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল॥" ৪০॥৩॥

মিথুন-তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা ইহা অপেক্ষা সহজ ও সরল কথায় অন্য কোনও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। দেবতার মন্দিরে এই প্রতীক উৎকীর্ণ করিবার কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

তথাপি মিথুনের রূপায়ণে আমরা দুটি বিভিন্ন মতের প্রমাণ পাইতেছি ঃ-বৌদ্ধ স্থপতিগণ কেবলমাত্র আলিঙ্গন বদ্ধ প্রেমিকযুগল চিত্রিত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, (যথা অজন্তা, ভাজা, কান্হেরীর বৌদ্ধ গুহা-মন্দির) অপরপক্ষে বেশীর ভাগ হিন্দু স্থপতিগণ—মিথুন

চিত্রে রতিক্রিয়ার চিত্রায়ণ করিয়া—সাধারণ তীর্থযাত্রীদের বিপন্ন করিয়াছে। (যথা—উড়িষ্যার নানা মন্দিরে এবং খাজুরাহোর মন্দিরমালায়)। জৈন-মন্দিরেও স্থানে স্থানে মিথুন-চিত্র দেখা যায়। কিন্তু জৈন-মন্দির-নির্মাতারা বৌদ্ধদের রীতির অনুসরণ করিয়াছেন।

হিন্দু-মন্দিরে পশু-মিথুন চিত্রের কয়েকটি মনোরম কল্পনা অপরূপ সৌন্দর্যরসে আমাদের মন ভরিয়ে তোলে—আমাদের ভক্তিবাদকে আঘাত করে না। কোণারক হইতে দুই একটি নমুনার প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল। রূপশিল্পীর সুন্দর অলৌকিক কল্পনা, অন্ধ্রযুগের বৌদ্ধ-ভাস্করদের নানা মিথুন কল্পনা আমাদের মুগ্ধ করে। ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে নাগার্জুনী কুণ্ডার চৈত্যের কঞ্চুক আবরণের ফলকে। এই অন্ধ্র-শিল্পকীর্তির বিচিত্র নিদর্শন হইতে দুই-একটি উদাহরণ এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন হইল বোম্বাই প্রদেশের সালসেট্ জেলার কুণ্ডা নামক স্থানের বৌদ্ধ-গুহার যুগল-মূর্তি। খুব সম্ভবতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে রচিত। এই যুগল-মূর্তির কল্পনায় কোনও কামোদ্দীপক ভঙ্গী নাই,—এমন কি আলিঙ্গনের কোনও ইঙ্গিত নাই—অথচ এগুলি মিথুনের পাথরে খোদিত চিত্র।

কুণ্ডার একটি নিদর্শনে, একজন পরিচারক লীলাহারে দণ্ডায়মান নায়িকার পদ-সেবা করিতেছে। অপরটিতে নায়িকা লীলা-পদ্ম ধারণ করিয়া একটু সুললিত রসের ইঙ্গিত দিয়াছেন। তথাপি প্রেমালাপের কোনও ইঙ্গিত মাত্র নাই। দেখা যাইতেছে বৌদ্ধ-শিল্পীরা মিথুন-চিত্রে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

নাগার্জুনী কুণ্ডার বৌদ্ধ-স্থাপত্যে মিথুন-চিত্রে আরও কিছু অন্তরঙ্গতা—আরও কিছু সরসতার আরোপ করা হইয়াছে। এইগুলি দুই তিন শতকে, অর্থাৎ কুণ্ডার মিথুন-মূর্তির একশত বর্ষ পরে রচিত। এই প্রাচীন স্তূপের কঞ্চুকের উপর প্রায় শতাধিক সুন্দর মিথুন-চিত্র মর্মর প্রস্তরের উপর নানা সাবলীল ভঙ্গীতে খোদিত হইয়াছে। নানা ভঙ্গীতে, নানা ঘনিষ্ঠ কল্পনায়—মিথুনদের নানা লীলা-ভঙ্গী চমৎকার কলা-কৌশলে রচিত হইয়াছে—কোথাও নায়িকা নায়কের স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে নায়ককে পানীয় দিতেছেন,—কোথাও নায়িকা দর্পণ লইয়া মস্তকে কেশের বিন্যাস ঠিক করিতেছেন—পার্শ্বে দণ্ডায়মান নায়ক বামহস্তে নায়িকার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছেন। এই সব পরিকল্পনার নূতন ধারা হইল—যে প্রত্যেক চিত্রেই যুগল-মূর্তি-মকরের মুণ্ডের উপর দণ্ডায়মান। ভারতীয় শিল্পে মকর হইল কাম-দেবতার প্রতীক। আর-একটি বিশেষত্ব হইল—এই সব যুগল-মূর্তি বৃক্ষের নীচে দণ্ডায়মান—এই সূত্রে সাঁচীর বৃক্ষকা-যক্ষিনীর সহিত ইহাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। নাগার্জুনী কুণ্ডার ভাস্কর, মিথুন-মূর্তি রচনায় নানা মৌলিক কল্পনার চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। মিথুন-কল্পনায় ঐ যুগের রূপশিল্পীদের অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও বহুমূল্য।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

দশম আসর

কথার মানে—পূর্বপক্ষ

[দশটি শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেক শব্দের পাশে চারটি করে অর্থ দেওয়া আছে। তার মধ্যে একটি শুদ্ধ। আপনার যেটি শুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে সেটি দাগ দিয়ে কিংবা কাগজে লিখে রাখুন। উত্তর অন্যত্র দেওয়া আছে। সবগুলি শেষ না ক'রে উত্তর দেখবেন না। আটটি প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল হলে খুব ভালই, ছ'টি হলেও মন্দ নয়।]

১। **অম্ভোরুহ**
(ক) আম্রমুকুল
(খ) মেঘ
(গ) পদ্মফুল
(ঘ) বটবৃক্ষ

২। **আঙট**
(ক) বড় আঙটি
(খ) আঙুলহাড়া
(গ) অখণ্ড
(ঘ) অঙ্গার

৩। **উপাধান**
(ক) উপকরণ
(খ) উপহার
(গ) গাত্রাবরণ
(ঘ) তাকিয়া

৪। **কপিঞ্জল**
(ক) বানরের দলপতি
(খ) তিত্তির পাখী
(গ) কয়েতবেল
(ঘ) যাহার বর্ণ কপিল

৫। **খদ্যোত**
(ক) হাউই তারাবাজি
(খ) জোনাকি
(গ) অখাদ্য
(ঘ) খয়ের

৬। **তনিমা**
(ক) তন্ময়তা
(খ) দেহসৌন্দর্য
(গ) সূক্ষ্মতা
(ঘ) মদনপ্রিয়া রতি

৭। **দাদুরী**
(ক) মণ্ডূক
(খ) দদ্রুরোগ
(গ) সংগীতের তালবিশেষ
(ঘ) দাদু কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ

৮। **কবোষ্ণ**
(ক) অত্যন্ত রাগী
(খ) শ্রেষ্ঠ কবি
(গ) অল্প গরম
(ঘ) অতিশয় উত্তপ্ত

৯। **দেয়া**
(ক) মেঘ
(খ) ঝটিকা
(গ) দাবানল
(ঘ) ময়ূরের ডাক

১০। **দ্বিপ**
(ক) কুঞ্জর
(খ) দুই পার্দবিশিষ্ট প্রাণী
(গ) জলবেষ্টিত ভূভাগ
(ঘ) মাটির প্রদীপ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খবরটা নিয়ে এলেন স্বয়ং সুশোভনের দাদা সুবিমল। কোর্ট থেকে ফিরেই চাউর করলেন সেটা।

কোথা থেকে শুনলেন সে কথা জানানোর আগেই সারা বাড়ীতে একটা বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল। সুবিমল আইন পাস করে প্রথম জীবনে দিনাজপুরে পৈত্রিক বাসভূমিতে বসেই ওকালতি শুরু করেছিলেন। ভালোই পশার করছিলেন। কিন্তু আরও হাজার হাজার লোকের মত তাঁরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল দেশ-বিভাগের অগ্নিদাহে!

যথারীতি পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ধান, পান, গরু, বাছুর নতুন পশারের মক্কেলকুল সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে শুধু প্রাণ কটা নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন সুবিমল দিনাজপুর থেকে। আবার প্রাণ-ক'টাও সংখ্যায় নেহাৎ 'কটা' নয়, সুবিমলের নিজের সংসার, আবার নি-রোজগেরে ছোটভাইয়ের সংসার। তা'হোক, ওদের ফেললেন না সুবিমল, সবাইকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে এসে শ্যামবাজারের এই ধ্বংসোন্মুখ প্রকান্ড বাড়ীখানা কিনে ফেলে ঢুকে পড়লেন।

সুশোভন অনেককাল দেশছাড় দিল্লীতেই বসবাস। কিন্তু 'বাড়ী' বলে টান ছিল ভীষণ। দিনাজপুরের সঙ্গে সম্পর্ক উঠে যাবার খবর পেয়ে সুশোভন সমস্তটা দিন শোকাহতের মত বিছানায় পড়ে রইলেন।

রইল না? দিনাজপুর আর রইল না?

ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মুছে গেল দিনাজপুর?

পুজোর ছুটি হবার একমাস আগে থাকতে প্রতিটি দিন তবে কি নিয়ে দিন গুনবেন সুশোভন? সারা বছরের ছুটি জমিয়ে রাখবেন কিসের জন্যে?

এক বছরের মত প্রাণটা ভরিয়ে রাখবেন কোন স্মৃতি আর কোন ভবিষ্যতের ছবি দিয়ে?

একী হল। একী হল!

নিষ্ঠুর ভাগ্য চিরদিনই মানুষের অর্থ কেড়ে নেয়, স্বাস্থ্য কেড়ে নেয়, স্ত্রী-পুত্র, পরিজন, প্রিয়জন কেড়ে নেয়। সাতপুরুষের ভিটেও হয়তো বা কেড়ে নেয়, কিন্তু পিতৃপিতামহের দেশটাকে কবে কার কেড়ে নিয়েছে?

শোকাহতের মতই পড়ে রইলেন সুশোভন। বড্ড বেশী বাজল চির-কালের মত সম্পর্ক মুছে যাবার আগে একবার 'শেষ দেখা' হল না বলে।

'থাকা দুরূহ হচ্ছে' বলে সুবিমল যখন চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, সুশোভন তখন দ্রুত বার্তার তারে খবর পাঠিয়েছিলেন, 'আর দু'চার দিন থাকো, আমি ছুটি নিয়ে যাচ্ছি। শেষবারের মত একবার—'

কিন্তু ছুটির দরখাস্ত দিয়ে সুশোভন যখন ছোট একটা সুটকেসে নিজের দু'-একটা জিনিস ভরে নিচ্ছেন, ঠিক সেই সময় দাদার তার এল 'আসবার দরকার নেই, আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আর এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করা গেল না।'

আর যাওয়া হ'ল না দিনাজপুরে।

দেখা হ'ল না সুচিন্তাদের বাগানের বকুলগাছের গায়ে লুকোনো গাঁটের

খাঁজে সুচিন্তার হাতে ছুরি দিয়ে চিরে চিরে লেখা সেই 'সু' অক্ষরটা। যেটা লিখে সুচিন্তা চুপিচুপি বলেছিল, 'দেখ কী রকম চালাকি করলাম! তোমার নামের প্রথম অক্ষরটা খোদাই করে রাখলাম আমাদের বকুলগাছে অথচ লোকে দেখলে ভাববে, নিজেরই নাম লিখেছি। মজা নয়?'

কিন্তু শুধু কি বকুলগাছের গায়ে?

দিনাজপুরের বাড়ীর সর্বত্রই কি অদৃশ্য অক্ষরে লেখা নেই 'সু' 'সু' 'সু'!

সব গেল। সব গেল!

মা, বাবা, ঠাকুমা, পিসিমা সবাই হারিয়ে গেল, সব নামই মুছে গেল। সুবিমলের শ্যামবাজারের বাড়ীটা যেন আর-এক বংশের পরিচয় নিয়ে জেগে উঠেছে। এরা অন্য রকম এরা আলাদা। দিনাজপুরের পরিবেশমুক্ত বৌদিকেও যেন নিতান্ত অপরিচিত লাগে।

তবু প্রত্যেক বছর পুজোয় চলে এসেছেন সুশোভন, দিল্লীতে টিকতে পারেননি। এসেছেন, সঙ্গে অজস্র উপহার এনেছেন, এসে জলের মত অর্থ ব্যয় করেছেন, তারপর ছুটি অন্তে বিষণ্ণ মুখে মেয়ে নিয়ে রেলে উঠেছেন।।

শুধু বছর তিনেক হ'ল এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে, কলকাতায় আর আসেননি সুশোভন। নীতা আসেনি। 'বাবার শরীর খারাপ, এবারেও যাওয়া হল না' বলে চিঠি লিখে কর্তব্য সমাপন করেছে।

দাদা সে চিঠির আর আলাদা উত্তর না দিয়ে একেবারে 'বিজয়ার আশীর্বাদ-সমেত উত্তর পাঠিয়েছেন। বৌদি বলেছেন, 'বাবু এবারে গরীবের সঙ্গ-সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।'

কিন্তু আজ যা খবর নিয়ে এলেন, সুবিমল সে শুনে আর বিস্ময়ের শেষ রইল না সকলের।

নাকি মাস দুই হয়ে গেল, সুশোভন কলকাতায় এসেছেন।

আর এসে রয়েছেন কিনা সুচিন্তার বাড়ী। সেই সুচিন্তা, দিনাজপুরের পাশের বাড়ীর ঘোষেদের মেয়ে।

মানে কি এর?

সেই চার বছর আগে শেষ যেবার এসেছিল, কেউ কি কোন রকম দুর্ব্যবহার করেছিল সুশোভনের সঙ্গে? অনাদর করেছিল কেউ সুশোভনের মেয়ের?

ওমা, সে কী, সে কী! সুশোভনকে দুর্ব্যবহার! তার মেয়েকে অনাদর! যে সুশোভনের দেওয়া জামা কাপড়ে প্রায় সারা বছর চলে যায় সুবিমলের আর নি-রোজগেরে ভাই সুমোহনের ছেলে-মেয়ের!

কিন্তু যদিই অসতর্কে কোন কিছু ঘটে থেকে থাকে, ত্রিভুবনে আর জায়গা নেই সুশোভনের? তাই সুচিন্তার বাড়ী উঠতে গেলেন!

সুচিন্তা কি তবে বাড়ীর মধ্যেই, ঘর থেকে ঘর কেটে ভাড়াটে বসাচ্ছে? সেই ঘর ভাড়া নিয়েছেন সুশোভন!

কিন্তু কত দিনের ছুটি?

তবে কি অবসরই নিয়েছেন?

যে প্রশ্নের কেউ উত্তর দেবার নেই, সেই প্রশ্নে মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত সংসার।

তারপর সুবিমল বললেন, 'রিটায়ার হয়তো করেছে, তবে ভাড়া-ফাড়া কিছু নয় এমনিই আছে।'

সুবিমলের গৃহিণী মায়া গালে হাত দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ গো, সেই যে বলে না 'বাপ-পিতামোর নাম গেল হিদে জোলার নাতি।' এ যে তাই হ'ল। এত আত্ম-কুটুম থাকতে সুচিন্তা! তা' তার স্বামী-পুত্তুরেরা কিছু বলছে না?'

সুবিমল মৃদু হেসে বললেন, 'পুত্তুরেরা কিছু বলছে কিনা জানি না, তবে স্বামীর আর বলার দিন নেই। ঊর্ধ্বলোক থেকে শুধু চেয়ে দেখছেন হয়তো।'

'ওমা তাই নাকি? বিধবা হয়েছে? মায়া একটু আক্ষেপ ধ্বনি করে বলেন, 'ছেলেবেলায় মেজ ঠাকুরপোর সঙ্গে সুচিন্তার খুব ভাব ভালোবাসা ছিল।'

সুবিমল ধমকে উঠে বলেন, 'থামো তুমি, তোমাদের মেয়েদের এতও বা মনে থাকে! আমি ভাবছি হলটা কি।'

মায়া শুধান, 'তা' তোমাকে বলল কে?'

'বলল? সে বলতে গেলে অনেক কথা। আমার এক পুরনো মক্কেল কবে যেন দেখেছিল সুশোভনকে, তার আবার শালীর বাড়ী ওই সুচিন্তাদের বাড়ীর কাছে। শালীর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ দেখেছে বাপ-মেয়ে সকালে রাস্তায় বেড়াচ্ছেন।'

'আচ্ছা, সে যে ঠিক দেখেছে তার প্রমাণ কি? হয়তো কাকে দেখতে কাকে দেখেছে।'

'পাগল হয়েছ? সে হচ্ছে দুঁদে লোক।'

'তাহলে তুমি যা বলছ তাই। কিন্তু এর পরে আমাদের কর্তব্য?'

সুবিমল গম্ভীরভাবে বলেন, 'আমাদের আবার কর্তব্য কি! সে যখন সম্পর্ক রাখতে চায় না।'

মায়ার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বস্তা-বোঝাই জামা কাপড়......ট্যাক্সি চড়ে সারা কলকাতা চষে বেড়ানো, রোজ সিনেমা, থিয়েটার, আর ভোজ্যপাত্রের সমারোহময় দৃশ্য। সুশোভন যে কটা দিন থাকতেন, দৈনিক বাজারের ভারটাও যে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতেন।

শরীর খারাপ আসতে পারছিলেন না, সে আলাদা কথা। একটা বয়স্থা আইবুড়ো মেয়ে মাত্র সম্বল করে যে লোকটা দূর বিদেশে থাকে, তার শরীর খারাপ হলে যে নিকট-আত্মীয়দের কিছু করণীয় থাকতে পারে, তাও অতটা খেয়াল করেননি কেউ, কিন্তু কামধেনু কলকাতায় এসে অন্য গোয়ালে পড়ে থাকবে এ কেমন কথা? তাকে বুঝিয়ে-

বাঝিয়ে নিয়ে আসাটি মায়ার কর্তব্য নয়?

বড়ছেলেকে ডাকলেন মায়ালতা।

বললেন, 'ও'র যাচ্ছে ঠিকানা জেনে যা দিকি তুই একবার তোর মেজকাকার সঙ্গে দেখা করতে!'

বড়ছেলে বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি পারব না। বাবা তো ঠিকই বলেছেন, উনি যখন সম্পর্ক রাখতে চান না—'

'আহা চায় না সে কথা তোদের কে বলেছে?'

'বলবে আর কে? ও'র ব্যবহারই বলছে। অনেক দিন এসেছেন শুনছি অথচ একটা খবরও দেননি যখন।'

যুক্তিতে হার মেনে মেজছেলেকে ধরলেন। চুপি চুপি বললেন, 'তোর দাদা তো শুনল না, তুই যা দিকি একবার। আমাদের কর্তব্য তো করি আমরা।'

'কর্তব্য কিছু নেই। তবে বলছ যখন যেতে পারি।' আমার মনে হচ্ছে এ মতলব নীতার। খুব তো অহংকারী।'

'সে আর বলতে! অথচ মুখে দেখায় যেন কত অমায়িক।'

'কিন্তু ওই সুচিন্তা কে মা?'

'আহা সেকি আর তুই ব'ললেই বুঝবি?' মায়া বলেন, 'সেই দিনাজপুরের কোন জন্মের পড়শীদের মেয়ে।'

'তুমি চেন?'

'চিনি মানে কি, চিনতাম। তা'ও খুব দেখা-শুনো আর কবে হয়েছে। আমিও ঘর বসতে এলাম, ওরও বিয়ে হয়ে গেল!'

'মেজকাকা বোধ হয় সম্পর্ক রেখে-ছিলেন!' মনে মনে মুখ টিপে হেসে বলে সে।

এ যুগের পাকা ছেলে, মুহূর্তে সমস্ত জিনিসটার একটা ছবি ছকে নিয়েছে, কার্যকারণ বিচার করে।

'সম্পর্ক!'

মায়ালতা উদ্বিগ্ন মুখে বলেন, 'কই? জানি না তো? কখন ওর মুখে নামও শুনিনি বাবু। তা' তুই যা দিকিন, দেখগে যা।'

'যাচ্ছি যাচ্ছি। তুমি যখন একবার ধরেছ তখন না-যাইয়ে কি আর ছাড়বে?'

সুবিমল ঠিকানা দিতে চাইছিলেন না, মায়ার নির্বেদে দিলেন। ফিটফাট হয়ে বেরোল মেজছেলে।

এবং ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এসে কালি মুখে বলল, 'হয়েছে তো শিক্ষা?'

'কেন কি হল?'

শঙ্কিত মুখে প্রশ্ন করলেন মায়া।

ছেলে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'মেজকাকা আমাকে চিনতে পারলেন না।'

'চিনতে পারল না!'

আহা পারলেন না কি আর? না পারার ভান করলেন। তোমাদের সেই সুচিন্তা না কে, তিনি আবার খাবারের থালা হাতে করে এসে কত আত্মীয়তা করলেন, 'ওমা তুমি সুবিমলদা'র ছেলে, কি নাম।' খাইনি আমি, চলে এলাম।'

'বেশ করেছিস। আর নীতা? নীতা কি বলল!'

'তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না। তিনি ওদের ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা গেছেন।'

মায়ালতা খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থেকে বললেন, 'বুঝেছি।'

'সুচিন্তা, সুচিন্তা!'

ভরাট ভারী ভারী গলায় ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন সুশোভন, নীতাকে পিছনে ফেলে। পিছন থেকে দেখে অবাক হয়ে গেল নীতা। সেই আস্তে আস্তে কথা, আস্তে আস্তে হাঁটা, সেই প্রত্যেকটি ব্যাপারে মেয়ের প্রতি নির্ভরতা, কোথায় গেল সুশোভনের। একটু খাটো আর ঈষৎ ভারী গড়নের শরীরখানি নিয়ে সিঁড়িতে হাঁটছেন জোরে জোরে, ধপাস ধপাস করে।

উপরে উঠে এলেন সুশোভন।

সাড়া-শব্দ পেলেন না সুচিন্তার। ভারী রেগে গেলেন। আর গলার শব্দে সে রাগটা প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না।

'সুচিন্তা! তুমি বাড়ীতে আছ, না নেই?'

এবারে সুচিন্তা ও'র সেই ছোট্ট ঘরটি থেকে বেরিয়ে এলেন, চশমাটা আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে। এইমাত্র বোধকরি স্নান সেরে তাজা হয়ে এসে-ছেন সুচিন্তা। এসে দাঁড়ালেন যেন-বাসে যেন একটি শুভ্রতার প্রতিমূর্তি।

সুচিন্তার চুলের গোড়ায় গোড়ায় কপালের ওপর কুচিকুচি জলকণা। চশমাটা হাতে থাকার জন্যে চোখ দুটো কেমন ধূসর ধূসর।

সুচিন্তা কোন কথা বললেন না, শুধু সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সুশোভন অবশ্য এই স্থিরতার দিকে তাকিয়ে দেখলেন না, অস্থিরভাবে বলে উঠলেন, 'সব সময় কোথায় থাকো সুচিন্তা! ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না?'

অভিযোগের সুর, দাবীর সুর।

প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন সুচিন্তা, আবারও নতুন করে বিপন্ন হলেন। তাই তাঁরও গলায় অভিযোগের সুর ফুটল। 'বেশ কথা বল তুমি সুশোভন। আমার বুঝি কোনও কাজ নেই?'

'কাজ! কাজ আছে তোমার!' সুশোভন ঠাণ্ডা মেরে গেলেন না। আরও রেগে উঠলেন। 'কাজটাই তোমার বড় হল? আমার কথা শোনাটা কিছু না? কই আগে তো তুমি এমন ছিলে না সুচিন্তা?'

'আগে'র প্রসঙ্গে প্রমাদ গণলেন সুচিন্তা, তাড়াতাড়ি বললেন, 'বাঃ! কাজ-কর্ম সেরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে না বসলে? তোমার কথাটা ভাল করে শুনবো না? বল এবার শুনি। নীতা, খুব তো দেরী হল তোদের?'

'দেরী হবে না?' অভিযোগ ভুলে গেলেন সুশোভন, সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'এ কী তোমার সামনের পার্কে বেড়াতে যাওয়া? কি মজার মজার জায়গায় নীতা নিয়ে যায় আমায় জানো? এবারে কলকাতায় এসে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ও বলছে ওর নাকি ওজন বেড়ে

গেছে। কিন্তু আসল কথাটাই যে তুমি শুনতে চাইছ না সুচিন্তা?'

সুচিন্তা মৃদু হাসেন।

এ সময় পারেন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে। এ সময় তিন ছেলের এক-জনও বাড়ী নেই।

আশ্চর্য! কী আশ্চর্য রকমের বদলে যেতে পারে মানুষ।

স্নেহের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ না থাক, সভ্য হবার কঠিন সাধনায় যতই মৌন থাকুন, তবু এর আগে ছেলেরা বাড়ীতে থাকলে প্রাণটা যেন নিশ্চিন্ততায় ভরা থাকতো সুচিন্তার।

কিন্তু এখন।

এখন ছেলেরা যতক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকে ততক্ষণই যেন মনটা নিশ্চিন্ত থাকে।

তাই সুচিন্তা মৃদু হাসেন।

হেসে বলেন, 'কোনটা তোমার আসল কথা কি করে জানবো বলো?'

'কি করে জানবে বল? বাঃ চমৎকার। সব বলা হয়ে গেল। কাল থেকে তুমিও আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে বুঝলে সুচিন্তা?' খুব যেন একটা শাস্তি দেওয়া হল সুচিন্তাকে, এইভাবে জোরের সঙ্গে কথা শেষ করেন সুশোভন। 'যেতে হবে তোমাকে। বাড়ীতে বোকা হয়ে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। কাল আমরা আবার ওইখানেই যাবো—কি বলিস নীতা? সে যা মজার জায়গা সুচিন্তা!'

সুচিন্তা হেসে ফেলে বলেন, 'আমার আর মজায় কাজ নেই।'

'কাজ নেই? অমনি বললেই হ'ল কাজ নেই।' সুশোভন হয়তো কাছে খাবার-টেবিলটার ওপর [illegible] করে একটা ঘুসি মারেন, 'আমি বলছি কাজ আছে। সুস্থ লোকেদের পক্ষে মাঝে মাঝে মেণ্টাল হস্‌পিটাল দেখা দরকার—বুঝলে?'

'মেণ্টাল হসপিটাল?'

আস্তে উচ্চারণ করেন সুচিন্তা, নীতার চোখের দিকে তাকিয়ে। নীতা একটা প্রশ্রয়ের ইসারা করে। অর্থাৎ 'বলতে দাও না, দেখো না।'

'হ্যাঁ!' সুশোভন সহসা হেসে উঠে বলেন, 'তবেই তো। না হলে বলছি কেন? তুমি যদি যাও—' ফের হেসে ওঠেন সুশোভন, 'তোমাকেই হয়তো 'রোগী' বলে ভাবতে শুরু করবে, কি বলিস নীতা।'

সুচিন্তা রহস্যের ঠিক জায়গায় পেঁছিতে না পেরে—মাঝামাঝি ভাবে বলেন, 'বাঃ, আমাকে অমনি রোগী ভাববে?'

'ওই তো মজা!'

ভারী ভারী গলায় উচ্চগ্রামে হেসে ওঠেন সুশোভন।

'আমি তা ভাবতে দেব কেন?'

কথার পিঠে কথা কয়ে যান সুচিন্তা।

'দেব কেন! শোন নীতা! সুচিন্তার কথা শোন। বলে 'দেব কেন।' আমি দিলাম কেন? পাগলদের খেয়ালের প্রতিবাদ করতে আছে? নেভার নেভার। আর ওরা তো সবাই ঠিক আজেবাজে ক্ষ্যাপা পাগল নয়। রীতিমত—যাকে কি বলে তোমার সম্ সম্ হ্যাঁ—[illegible] পাগল। কথা শুনে কে ভাববে পাগল ওরা। আমরা যেতেই একজনের হঠাৎ খেয়াল হল, 'যেন আমি একটি মানসিক রোগী, আর সে নিজে বিজ্ঞ একটি ডাক্তার! তারপর ব্যাপারটা কি হল বল না নীতা?'

'তুমিই বল না বাবা!' নীতা মৃদু হাসে 'তুমিই ভাল বলতে পারবে।'

'আমিই পারবো বলছিস?'

'বলছিই তো!'

সুশোভন হঠাৎ ধূসর গলায় বলেন, 'কিন্তু কি বলছিস? আমরা কিসের কথা বলছিলাম!'

'বাঃ সেই মানসিক রোগীদের—'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ।' সুশোভন পরম কৌতুকে মুখ উদ্ভাসিত করে বলেন, 'সেই পাগলাবাবুর খেয়াল হল তিনি ডাক্তার। শুরু করলেন আমাকে জেরা।'

'জেরা!'

'আহা জেরা মানে আর কি, খালি কথার প্যাঁচ। যেন ওর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, যেন শুধু আমার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে এই ভাবে খালি কথা আর কথা! ভাবছে আমি যেন বুঝতে পারছি না। আমি কোথায় থাকি, কি কাজ করি, কতদিন কল-কাতায় এসেছি, কি কি করেছি এই ক'দিনে—তা'পর গিয়ে আমার কোনও 'হবি' আছে কিনা, বই পড়তে, সিনেমা দেখতে, খেলা দেখতে ভালবাসি কিনা, আরও কত কি। কী নিরীহ ভাব। আমি তো এদিকে সব ধরে ফেলেছি—' আবার ভরাট সুরে গমগমিয়ে হেসে ওঠেন সুশোভন, 'আমিও তাই ভাল-মানুষের মত সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। যেন বুঝতে পারছি না লোকটা সাজা ডাক্তার।......আচ্ছা তারপর কি হ'ল নীতা? মাঝে মাঝে হঠাৎ এত ভুলে যাই। নীতার জন্যেই এইটি হয়েছে আমার।'

'আমার জন্যে?'

নীতা আবদেরে গলায় বলে, 'বেশ মজা। নিজে খালি কথা বলতে বলতে অন্যকথা ভাববে, আর দোষ হবে আমার!'

(ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

॥ শব্দময় জগৎ ॥

আমরা বাস করি এক শব্দময় জগতে। আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত নানা শব্দে চিহ্নিত। এই পৃথিবীর যেখানেই আমরা যাই না কেন, কোনো না কোনো ধরনের শব্দ আমাদের শুনতেই হবে। এমনকি অনেক সময়ে শুধু শব্দ শুনেই আমরা বলে দিতে পারি কোথায় বা কোন্ সময়ে আমরা রয়েছি। পুরী বা দীঘায় যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখার আগেই সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেয়েছিলেন। তেমনি অজস্র পাখির কিচিমিচির শুনলে আমরা ভাবতে পারি যে নিশ্চয়ই কোনো বাগানে বা জংগলে এসে উপস্থিত হয়েছি। অর্থাৎ শব্দ আমাদের কাছে নিতান্তই কতকগুলো অর্থহীন ধ্বনি মাত্র নয়। শব্দের মাধ্যমে অনেক কিছুর সংগে আমাদের পরিচয়ও হয়ে থাকে। পর পর অক্ষর বসিয়ে যেমন ভাষা, পর পর ধ্বনি বসিয়ে তেমনি সুর। আর এই জগতের প্রত্যেকটি ব্যাপারের নিজস্ব একটি সুর আছে। যে-মানুষ জাগতিক ব্যাপারে যতো বেশি অভিজ্ঞ, ধ্বনিগত সুরের সংগেও তাঁর ততো বেশি পরিচয়। এমন কি সংগীতের সুর সম্পর্কেও একই কথা। সংগীতের সুরেও বিশেষ বিশেষ ধ্বনির সমাবেশ মাত্র। এই ধ্বনি-সমাবেশের সংগেও মানুষকে অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে পরিচয় স্থাপন করতে হয়। আর আমরা সকলেই জানি, সংগীতের সুর মানুষের প্রাচীনতম আবিষ্কার। প্রাচীন মিশরে, হরপ্পায় ও মাহেঞ্জোদড়োতে এমন প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যা থেকে বোঝা যায় যে সে-যুগেও সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। শব্দের মাহাত্ম্যে প্রাচীন মানুষের বিশ্বাসও বড়ো কম ছিল না। মন্ত্র উচ্চারণ করে বা সংগীতের সুর তুলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যেতে পারে, এ সব বিশ্বাসের জের আজও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা টেনে চলেছি।

শব্দ যে মানুষের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার, তা মানুষের ভাষার দিকে তাকালেও বোঝা যায়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষায় পৃথক পৃথক ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্যে পৃথক পৃথক শব্দ তৈরি হয়েছে। বাংলা ভাষায় ধ্বনিজ্ঞাপক শব্দ তো অজস্র। সুকুমার রায়ের বিখ্যাত 'শব্দকল্পদ্রুম' কবিতাটি স্মরণ করে দেখুন। "ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খটকা—ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!" এখানে ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্ শব্দগুলির এমনিতে কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এই শব্দগুলো শুনে বিশেষ ধরনের ধ্বনি সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমাদের ধারণা হয়। এমনি ধরনের শব্দ এই কবিতাটির প্রায় প্রত্যেকটি লাইনেই। শব্দগুলো আমরা চোখ দিয়ে পড়ি বটে, কিন্তু সংগে সংগে যেন কান দিয়েও শুনি। আমরা যখন পড়ি ঢন্ ঢন্, তখন এক রকমের শব্দ। আবার যখন পড়ি ভন্ ভন্, তখন অন্য রকমের শব্দ। তেমনি ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ আর ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্। ঠুক্ ঠুক্ আর চুক্ চুক্। সামান্য এক-একটি অক্ষর পালটে যাওয়ার ফলে ধ্বনির চরিত্র কিভাবে বদলে যাচ্ছে আর আমাদের কল্পনা কি-ভাবে নাড়া খাচ্ছে! একটি সোভিয়েত পত্রিকায় পড়েছিলাম, একটি বাঁধের নির্মাণকার্য চলার সময়ে প্রত্যেকটি শব্দ টেপ-রেকর্ডে ধরে রাখা হয়েছিল; পরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে শুধু সেই টেপ-রেকর্ডটি চালালেই মনে হত যেন গোটা নির্মাণকার্যের ছবিটি চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। কলকাতায় এবারবার পুজোর সময়ে কোনো কোনো প্যাণ্ডেলে লাউডস্পীকারে ক্রিকেট খেলার রীলে হতে শুনেছি। এও নিশ্চয়ই টেপ-রেকর্ডেরই কীর্তি। কিন্তু উৎসাহী শ্রোতাদের দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁরা শুধু রীলে শুনছেন না, সত্যিকারের খেলাটিও চোখের সামনে দেখছেন। এমনি দৃষ্টান্ত আরো অজস্র দেওয়া চলে যা থেকে বোঝা যাবে, শুধু কতকগুলো বিশেষ বিশেষ ধ্বনির সমাবেশ মানুষের মনে কী অদ্ভুত সব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। বনফুলের 'জঙ্গম' উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই [illegible] দেখেছেন কতকগুলো আপাত-অর্থহীন ধ্বনি এই উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্রকে কেমন অবয়ব দিয়েছে। লেখক-দের মধ্যে যাঁরা স্টাইলিস্ট তাঁদের ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ধ্বনিজ্ঞাপক শব্দের পুঁজি তাঁদের খুবই বেশি।

যাই হোক, আমরা যে এক শব্দময় জগতে বাস করি তা বলার জন্যে এত শব্দ করার কোনো দরকার ছিল না। যে কোনো সময়ে মুখ বন্ধ করে শুধু কান পেতে থাকলেও টের পাওয়া যাবে, কত রকমের শব্দ আমাদের এই পৃথিবীর বাতাসকে তোলপাড় করে চলেছে। শুধু কতকগুলো টুকরো-টাকরা শব্দই শুধু নয়, সব মিলে আশ্চর্য এক ঐকতান, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি দিন না রাত্রি, শহর না গ্রাম, মরুভূমি না অরণ্য, ডাঙ্গা না জল। আমাদের এই পৃথিবী আশ্চর্য এক শব্দলোক।

॥ শ্রবণাতীত শব্দ ॥

শব্দ নিয়ে মানুষ যে সেই প্রাচীন কাল থেকেই নানাভাবে মাথা ঘামিয়ে এসেছে তার একটি প্রমাণ মানুষের তৈরি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র। ক্রমে ক্রমে এই শব্দ-চর্চা রীতিমতো একটি বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস শব্দ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে-ছিলেন।

এইভাবে চর্চা হতে হতে উনিশ শতকের শেষদিকে এসে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে শব্দ সম্পর্কে নতুন করে জানার আর কিছু নেই। অতঃপর শুধু পুরনো জানাগুলোকেই আরো খুঁটিয়ে জানা যেতে পারে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই বিজ্ঞানীরাই আবিষ্কার করলেন যে শব্দ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক রহস্য থেকে গিয়েছে, যে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা পর্যন্ত আগে তাঁদের ছিল না। জানা গেল যে এমন শব্দও আছে যা মানুষের শ্রবণ-সীমার বাইরে, অর্থাৎ যা মানুষের কাছে শ্রবণাতীত। ইংরেজিতে বলা হয় সুপারসোনিক সাউন্ড। এই আবিষ্কার

শব্দ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য সম্ভাবনাময় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

আমরা জানি, শব্দ হচ্ছে এক ধরনের তরংগ বা ঢেউ। এই ঢেউ বাতাস বা জল বা কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হতে পারে। অবশ্যই এই ঢেউয়ের একটা উৎস থাকা চাই, যেখানে একটা কাঁপুনি তৈরি হতে পারে। যেমন, বাদ্যযন্ত্রের তার বা ঢোলকের চামড়া বা গ্রামোফোনের ডায়াফ্রাম ইত্যাদি। উৎসের এই কাঁপুনি বাতাসে এক বিশেষ ধরনের ঢেউ জাগিয়ে তোলে। এমনিতে এই ঢেউ আমরা চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এই ঢেউয়ের একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যেতে পারে।

শব্দ মোটা শোনাবে না সরু শোনাবে তা নির্ভর করে শব্দের ফ্রিকোয়েন্সির ওপরে। ফ্রিকোয়েন্সিকে বাংলায় বলা হয় পৌনঃপুন্য। কিন্তু এই ইংরেজি শব্দটি বাংলায় চলে গেছে; আমরাও এই ইংরেজি শব্দটিই ব্যবহার করব। ফ্রিকোয়েন্সি কী? পুকুরের শান্ত জলে ঢিল পড়লে ঢেউ জাগে। এই অবস্থায় জলের কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকলে আমরা দেখতে পাব, সেই বিন্দুটি একবার চুড়ো হয়ে উঁচু হয়ে উঠছে, পরক্ষণেই গর্ত হয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে এই বিশেষ বিন্দুতে যতো সংখ্যক চুড়ো বা গর্ত হচ্ছে তাই হচ্ছে এই বিশেষ তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি। শব্দের ঢেউয়ের বেলাতেও এই কথাই কথা। শব্দের যে প্রতিচ্ছবির কথা আগে বলেছি, তাতেও দেখা যাবে যে পর-পর চুড়ো ও গর্ত তৈরি হয়ে চলেছে। প্রতি সেকেণ্ডে যতো সংখ্যক চুড়ো বা গর্ত তৈরি হচ্ছে তাই হচ্ছে সেই বিশেষ শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি। এবারে সাধারণ বুদ্ধি থেকেই অনুমান করা চলে যে কম্পন যতো দ্রুত হবে, শব্দের ফ্রিকোয়েন্সিও হবে ততো বেশি। পুরুষদের গলার ফ্রিকোয়েন্সি কম, মেয়েদের গলার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি।

একটি বিষয়ে এখানে সাবধান করার আছে। আমি এখানে ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করলাম মাত্র। ফ্রিকোয়েন্সির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা এই ভাষায় দেওয়া চলবে না। শব্দ-বিজ্ঞানের যে কোনো পাঠ্য পুস্তকে এই সংজ্ঞা পাওয়া যেতে পারে।

মানুষের কান সবচেয়ে ভালো শুনতে পায় ১০০০ থেকে ৩০০০ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ। উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ কোন্ মানুষ কতখানি শুনতে পারবে তা নির্ভর করে বয়স ও ব্যক্তিগত গড়নের ওপরে। তাও বড়ো জোর সেকেণ্ডে ২০,০০০ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ পর্যন্ত। আরও ওপরের দিকের ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ শোনার ক্ষমতা মানুষের কানের নেই। এই উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সির শব্দকেই বলা হয় সুপারসোনিক সাউণ্ড বা শ্রবণাতীত শব্দ। ইংরেজি আলট্রাসোনিক শব্দটিও কখনো কখনো সুপারসোনিকের বদলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

॥ আলাদিনের দৈত্য ॥

শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের প্রয়োগ ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে শুরু হয়েছে এবং তার ফলে আশ্চর্য সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। এমন কিছু কিছু কাজ এই শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে করা গিয়েছে যা এত-দিন মানুষের অসাধ্য ছিল। যেমন ধরা যাক সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে জ্ঞান। ভূপৃষ্ঠকে যেমন আমরা খুঁটিয়ে জানতে পারি, তেমনি এই শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে খুঁটিয়ে জানা গিয়েছে সমুদ্রের তলদেশকেও। সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় কোথায় কী আছে তাও এখন প্রায় অনেকটা আয়নায় দেখার মতো করেই দেখে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক একই উপায়ে মাটির গভীরেও কোথায় কী আছে তা জানাটাও এখন আর অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করা হচ্ছে না। তেমনি, কোনো একটি পদার্থ তৈরি হবার পরে যন্ত্রের কাঠামোর অভ্যন্তরে কোথাও কোনো ফাঁক বা বাতাসের বুদবুদ থেকে গেল কিনা তার হদিশও এখন এই শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের সাহায্যে অনায়াসেই পাওয়া সম্ভব। কাগজের মিলে কাগজ তৈরি হবার সময়ে কাগজ সব জায়গায় সমান পুরু থাকছে কিনা তাও এই শব্দতরংগই সংগে সংগে জানিয়ে দেবে। সার্জারি বা শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের আশ্চর্য প্রয়োগ সম্পর্কে আগের একটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। শ্রবণাতীত শব্দতরংগ আরো যে কত কি আশ্চর্যতর কাণ্ড ঘটাবে তার পুরো একটা ফিরিস্তি দেওয়াও এত আগে থেকে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা যেন মানুষের সেবায় আলাদিনের সেই দৈত্যটিকে এনে হাজির করেছেন যার অসাধ্য কিছুই নেই।

॥ কান দিয়ে দেখা ॥

শ্রবণাতীত শব্দের জগতে জীব-জগতের সব প্রাণীই কিন্তু মানুষের মতো কালা নয়। কুকুর ও বেড়ালের এ-ব্যাপারে কিছুটা ক্ষমতা আছে। আমরা যখন পোষা বেড়ালকে 'পুষি' বলে আদর করি তখন সেই 'পুষি' উচ্চারণের মধ্যে কিছু পরিমাণে শ্রবণা-তীত শব্দতরঙ্গও সৃষ্টি হয় যা বেড়ালের কাছে অশ্রুত থাকে না। বিজ্ঞানীরা যন্ত্রের সাহায্যে হদিশ নিতে গিয়ে টের পেয়েছেন যে, আমাদের পরিচিত অনেক শব্দের মধ্যেই (যেমন টেলিফোনের ঘণ্টা বা ঘড়ির টিক-টিক) শ্রবণাতীত শব্দ-তরংগও থাকে, কিন্তু আমরা তা শুনতে পাই না। অর্থাৎ, আমাদের কানের অক্ষমতার দরুন অধিকাংশ শব্দই আমরা আংশিক শুনি।

তবে আমাদের কানের এই অক্ষমতা অন্য এক দিক থেকে আমাদের বাঁচিয়েও দিয়েছে। কারণ পশুপাখিদের ডাকে ও চিৎকারে শ্রবণাতীত শব্দতরংগ খুবই বেশি। বিজ্ঞানীরা যন্ত্র বসিয়ে টের পেয়েছেন যে, গভীর রাত্রির আপাত-নিস্তব্ধ অরণ্যেও শ্রবণাতীত শব্দতরংগের এলাকায় পশুপাখির ডাকাডাকি অশ্রান্ত ভাবেই চলে। আমরা যেটুকু শব্দ শুনতে পাই তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশি শুনতে হলে আমাদের কান-দুটো হয়তো ঝালাপালা হয়ে যেত!

তবে বাদুড়ের কিন্তু ঝালাপালা হবার মতো কান আছে বলেই বাদুড় রাত্রির অন্ধকারেও পথের হদিশ রেখে উড়তে পারে। অর্থাৎ, আমরা যদি বলি যে বাদুড় উড়বার সময়ে কান দিয়ে দেখে তাহলেও ভুল বলা হয় না। কথাটার মানে কী?

বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করেছেন যে, বাদুড় রাত্রির অন্ধকারে উড়বার সময়েও সামনের খুব ছোটখাটো বাধা সম্পর্কেও (যেমন টেলিগ্রাফের তার বা গাছের সরু ডাল) অনেক আগে থেকেই সাবধান হতে পারে। বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ। তাহলে বাদুড় পথের হদিশ পায় কি ভাবে? হালের গবেষণায় জানা গিয়েছে যে বাদুড় উড়বার সময়ে শ্রবণাতীত শব্দতরংগের ডাক ছাড়ে। সামনে কোনো বাধা থাকলে সেই ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে এবং তা শুনেই বাদুড় পথের হদিশ পেয়ে যায়। উড়বার সময়ে বাদুড়ের মুখ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশটি শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের ডাক নিঃসৃত হয়ে থাকে।

শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই শব্দতরংগ নির্দিষ্ট একটি গতিপথে সিধে সেখায় ধাবিত হয় সাধারণ শব্দতরঙ্গের মতো চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে না। এই বিশেষ গুণের জনোই শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে এত সব কাণ্ড ঘটানো সম্ভব হচ্ছে।

আশা করা চলে, অদূর ভবিষ্যতে অন্ধদের জন্যে শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গের এমন যন্ত্র তৈরি হবে যার সাহায্যে 'দেখা' চলবে।

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রভাত। সবাই উঠে পড়েছে।

গতরাত্রে আমরা কাউকে না বলে-কয়ে কোথায় গিয়েছিলাম, আর ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন, তারই কৈফিয়ত দিতে ব্যস্ত—দেখলাম, আজ অনুজার মায়ের শরীর মন্দের ভাল—তবে অত্যন্ত দুর্বল।

গুণু উঠেই চোখ কচলিয়ে হেলে-দুলে বলতে থাকে—

—বুঝলে মাসীমা, তোমার আরামের জন্যে কী সুন্দর ব্যবস্থাটাই না করেছি। ঠিক দশটায় তোমাকে একেবারে অবাক করে দেব।

আমি ইতিমধ্যে উঠে হস্তমুখ প্রক্ষালন করে নিয়েছি; তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ও গতদিন বদরীনারায়ণ হতে আসার আগে দিস্তের পর দিস্তে যে লুচি ভেজে সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল, তারই কিয়দংশ ভক্ষণ। পারতপক্ষে বাজারের কিছু খাই না। বরফের মত হিমশীতল লুচিগুলো যেন একটির সঙ্গে একটির অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা সাধন করে ফেলেছে—পরস্পরকে পৃথক করা যায় না—কোনোরকমে টেনে-ছিঁড়ে কয়েকটি লুচি বাসি আলুভাজা দিয়ে গলাধঃকরণ করি। নীরেনের যদিও দন্তচ্যুতি হয়েছে, সুখ-চর্বণের ব্যাঘাত ঘটলেও সে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, বরং বহুল পরিমাণেই উদরস্থ করে। তারপরেই কয়েকটি সশব্দ উদ্গার তুলে অনুজ ভ্রাতাটি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন।

টেম্পল কমিটির গেস্ট-হাউস থেকে অনেক উঁচুতে যোশীমঠের গদি। সোজা ওপরে উঠতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ি। দাঁড়িয়ে থাকি, আবার উঠি। পথিমধ্যে এই রকম কয়েকটা স্টেশন সৃষ্টি করে, একটু জিরিয়ে নিই। একটা পাতা-ঝরা শুকনো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে নীরেনকে বলি—

—এই গাছ যতদিন ফুল-ফল দিতো, ততদিনই বেঁচে ছিল—আজ তার দেবার কিছু নেই—তাই মরে গেল। মানুষের জীবনেও ঠিক একই নিয়ম।

—সে দুঃখ করে লাভ কী? চল—এখন যাই।

—তুমি বড্ড বেরসিক।

এমন সময় দেখি, আমার কন্যা অনুজা চোখ-মুখ লাল করে নেমে আসছে। কখন যে আমাদের কিছু না বলে আপন মনে একাই চলে এসেছে, জানতাম না। অনুজার কণ্ঠে অভিমানের সুর—

—কেন মিছেমিছি যাচ্ছেন? শংকরাচার্যের দর্শন মিলবে না—বহু চেষ্টা করেছি, ফল হয়নি।

—বলো কী? তোমার দর্শন তাঁর ভাগ্যে মেলেনি? এটা তো ভারী অন্যায় কথা।

—কী যে বলেন?

তারপরই আমার প্রতি আক্রমণ—

—আপনি পায়ে হেঁটে আবার ওপরে উঠছেন—এখুনি গিয়ে ভাইটি আর মাকে বলে দিচ্ছি।

নীরেনও উসকে দেয়—

—দাদাকে এত করে বারণ করলাম—কে কার কথা শোনে? চল্, আমিও তোর দলে—গুণুকে আর বৌদিকে বলব।

—কক্ষণো বারণ করেননি—আপনিও কম ন'ন, কাকা। মাসিমাকেও আপনার কথা বলছি, চলুন।

নীরেনের দিকে চেয়ে অনুকম্পায় সুরে বলি—

—দেখলে তো, তোমার অবস্থাও

আমার চেয়ে কম কাহিল নয়—তারপর মিথ্যে কথা বলেছ।

আমাদের দুজনের সুরই নরম। অনুজাকে বুঝিয়ে বলি—

—রক্ষে কর মা, আর জ্বালিও না—ওসব বলে কাজ নেই—চল আমাদের সঙ্গে—দর্শন পাওয়া যায় কিনা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

যেখানে বর্তমান শঙ্করাচার্য আছেন, সেই মঠের সোপানাবলী পার হয়ে এক-জন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ—তাঁকে আমাদের আবেদন খুলে বলি—তিনি নাম ধাম প্রভৃতি জানতে চাইলেন—

নীরেন সুন্দর হিন্দী বলে, মুখস্ত বলার মত সে এক নিঃশ্বাসে আমার পরিচয় দিয়ে যায়—।

পরিচয়টা আর একবার ভাল করে জেনে নিয়ে তিনি অদৃশ্য হলেন। আবার হুকুমনামা নিয়ে আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

অনন্ত শ্রীবিভূষিত আদি জগদ্‌গুরু শ্রী১০৮ শঙ্করাচার্যের গদিতে বর্তমান শঙ্করাচার্য অনন্ত শ্রীবিভূষিত জগদ্‌-গুরু শঙ্করাচার্য শ্রীশান্তানন্দ সরস্বতী।

প্রকান্ড হল্‌। ঝালর-দেওয়া মখমলের চাঁদোয়া টাঙ্গানো, উচ্চ সিংহাসনের মাঝে তাঁর আসন।

সঙ্গে আনা ফুল তাঁর চরণে ছড়িয়ে প্রণাম করে নীচে বসে পড়ি।

জগদ্‌গুরুর স্থির ধীর গম্ভীর বয়ান মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠল। পাথরের মত চুপ করে আর কতক্ষণ বসে থাকব? কথা আরম্ভ করা যাক্‌—

জিজ্ঞাসা করি—

—এই যে আমরা আপনার দর্শনের আশায় ছুটে আসি,—সেটা কি আপনার আকর্ষণ, আমাদের সংস্কার না অন্য কিছু?

তিনি বল্লেন—আকর্ষণ তো একতরফা নয়, আপনার দিক দিয়েও কিছু কম নেই—সংস্কার তো আছেই—সেই জন্যেই আমি আজ এখানে বসে আছি।

—যাঁরাই এখানে আসেন, তাঁরাই কি আপনার দর্শন পান—সকলের জন্যেই আপনি বসে থাকেন?

—দর্শন দেওয়া আর কারো জন্যে বসে থাকা এক কথা নয়—দৈনিক কিছুটা সময় গদীতে বসে থাকা আমার দৈনিক কর্মতালিকায় নির্দিষ্ট আছে।

খুঁটিনাটি সব কিছুই আমার জানা চাই।

অনুজাকে দেখিয়ে বলি—আমার কন্যা, কিছুক্ষণ আগেই এখানে এসে দর্শন না পেয়ে অভিমানে ফিরে যাচ্ছিল—

—কৈ, আমি তো সংবাদ পাইনি—

—সংবাদটা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া কি আপনার লোকজনদের উচিত ছিল না?

স্বামীজী যেন কিছুটা বিব্রত হয়েই উত্তর দিলেন—

—অবশ্যই ছিল। তবে তার কারণও আছে। আমাদের এই মরদেহের অস্তিত্ব যতদিন, ততদিন তাকে চালাতেই হবে। হয়তো নৈমিত্তিক কোনও কাজে আমার সাময়িক অনুপস্থিতির জন্যেই তখন দেখা হয়নি। তবে উনি একটু অপেক্ষা করলেই সাক্ষাৎ হোতো বৈকি!

এই বলে স্বামীজী একটি ফুল অনুজার হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

আমি আবার তাঁকে প্রশ্ন করি—

—আপনি সন্ন্যাসী, তাই মুক্ত পুরুষ। সাধারণ মানুষ তা' হয় না। তাদের আসক্তি আছে, বিদ্বেষ আছে। সংসারে থেকেও মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় কিসে?

—যত্র জীব তত্র শিব, এই জ্ঞান, সর্বকার্যে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সংযোগ, আর সচ্চিদানন্দে স্থিত হওয়াই মুক্তির উপায়।

আমার জিজ্ঞাসা তখনো শেষ হয়নি। পাদপদ্মে খোঁচা না দিলে জল পড়বে কেন?

স্বামীজীকে অনুযোগ করে বলি—

—তবু ভেদবুদ্ধি আসে কেন? আমাদের কথা নয়। যাঁরা সংসারাশ্রম ত্যাগ করেছেন—তাঁদের মধ্যেও তো এর অভাব নেই। শুনলাম, আপনার এই গদীর জন্যেই খুব গন্ডগোল চলছে—শ্রীকৃষ্ণ বোধাশ্রম স্বামীও উঠেপড়ে লেগেছেন—তার জন্যে মামলা-মোকদ্দমাও নাকি চলছে।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের চোখ দুটো বহ্নিমান হ'য়ে উঠল—মুখে মোহ-মুদ্গরের স্বরলিপি। প্রসঙ্গের ছেদ টেনে বললেন—

—মায়া-মায়া,—প্রপঞ্চাতীত না হলে উপায় নেই! জয় শঙ্কর!

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য আমাকে বারে বারে বল্লেন, প্রভু শঙ্করাচার্য যে গাছের নীচে সিদ্ধিলাভ করেন, সেই সিদ্ধ-পীঠ আমি যেন দর্শন করি। যোশীমঠের সেই পার্বত্য-নগরে, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, পুর্ণাগিরিদেবীর মন্দির, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য শ্রীব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর অক্ষয় কীর্তি—সেগুলো তিনি দেখে যেতে বল্লেন।

অনুযোগ অভিযোগের মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হলেও, শেষ পর্যন্ত জগদ্‌গুরুর সঙ্গে আমার বেশ একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তাঁর কাছে বলে যাই কেদার-নাথে যাওয়া-আসার পথে একটি বিশেষ স্থানে সেই অলৌকিক সঙ্গীত আর মাঝে মাঝেই ও' হরি মন্ত্র শ্রবণের কথা। শুধু একবার নয়, বারবার শুনেছি।

জগদ্‌গুরু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন—

—এরকম হয়ে থাকে। অলৌকিক হলেও আকস্মিক নয়। বায়ুসমুদ্রে অনাদিকালের সঙ্গীত সংস্কাররূপে ভেসে বেড়ায়; উপযুক্ত আধারে তার তরঙ্গ-ঝঙ্কার তুলবেই—এ রকম ঘটনার কথা আমি আরও শুনেছি।

—উপযুক্ত আধার কা'কে বলেন? ঐ সঙ্গীত-শ্রবণের জন্যে তো আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

—সাংখ্যে বলেছে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি সব কাজ করে যান, আপনার

মধ্যেও সেই প্রকৃতিই কাজ করে চলেছেন। 'তুমি কর বা আমি করি' এই অস্মদ্ যুষ্মদ্ শব্দের প্রয়োগটা ভুলে যাবেন,—সবই সেই সৎ—ও' তৎসৎ! আর একটি বিষয়ে খেয়াল রাখবেন—কোনও অলৌকিক দর্শন বা শ্রবণ হলেও, প্রচ্ছন্ন অহং বুদ্ধি যেন আপনার চিত্তকে আচ্ছন্ন না করে।

—সেই আশীর্বাদই করুন।

স্বামীজীকে আবার জিজ্ঞেস করি।

—ব্রহ্মকপালীতে পিন্ডদানের সময় পিতৃপিতামহের নামের সংগে আমার নামটাও হঠাৎ বেরিয়ে গেল। ইচ্ছে করে নয়, বরং আবার যাতে ওরকমটি না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক ছিলাম। তবু আবার বলে ফেল্লাম—বার বার তিনবার—এতে কিছু দোষ বা অমংগলের কিছু হবে না তো?

মঠাধীশ সহাস্যে উত্তর দিলেন—

—ভালই হয়েছে—এতে আর দোষ কী? পূর্বে সকলেই করত।

—সে তো যখন লোকে উইল করে বদরীকেদার তীর্থে আসত—ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না—এখন তো এসব স্থান ততটা দুর্গম নয়।

—কারণ যাই হোক, প্রথা যে ছিল, তাতে ভুল নেই। আর তখন যদি নিজের পিন্ডদান নিজেই করতে পারে, এখনই বা পারবে না কেন? এইটুকু বিচার থাকলেই আর কোনও সংশয় আসবে না! আপনি অনুচিত কিছু করেননি' যাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নিয়েছেন।

অনুজার দিকে চেয়ে বল্লাম—শুনলে? বাড়ীতে গিয়ে বোলো।

সামনাসামনি টাঙানো দুটি তৈল-চিত্রের প্রতি আমার চোখ পড়তেই, জগদ্‌গুরু বললেন—ডাইনের চিত্রটি প্রথম জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য দেবের, বামদিকেরটি দ্বিতীয় জগদ্‌গুরুর।

এবার বিদায় নিতে হবে: অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। আর দেরী করা উচিত নয়। অনুজাও ব্যস্ত হয়ে উঠল—তার মা এখন আছে কেমন? তা ছাড়া যাওয়ার উদ্যোগপর্ব আছে।

প্রণাম করে বেরিয়ে আসি।

স্বামীজী হাত তুলে আশীর্বাদ করেন—জয়োঽস্তু।

তিনি সংগে লোক দিলেন। তিনিও আমাদের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, তারপর ভগবান শঙ্করাচার্য যে গাছের তলে সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি দেখালেন। হাজার বছর আগের সেই বৃক্ষটি তাঁর মহিমা নিয়ে এখনও সজীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'শিবোঽহং'—"আমিই শিব"—এই মহামন্ত্র যিনি ঘোষণা করেছিলেন, সেই পরমতত্ত্বজ্ঞানী ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যদেবের সাধনার লীলাভূমি ঐ স্থানটি আমার খুব ভাল লাগলো।

নীরেন বললে—

—একটা জিনিস বরাবর দেখে আসছি—সাধুসন্তদের দরজা তোমার কাছে সব সময়েই খোলা—সবাই তোমাকে কাছে পেতে চান।

—'তা' বলতে পারো—সাধু দেখলেই পশ্চাদ্ধাবন করি—জানোই ত'

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং
তীর্থভূতা হি সাধবঃ
তীর্থং ফলতি কালেন,
সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ।

নীরেন লাফিয়ে চীৎকার করে ওঠে—আবার সংস্কৃত?

তারপরই খাদে সুর নামিয়ে একটি প্রশ্ন—

—অর্থাৎ?

অর্থাৎ কিনা 'রেডি-মেড' প্রাপ্তি-যোগ। সাধুদের দর্শনেই পুণ্য, অবশ্য যদি খাঁটি সাধু হয়। তীর্থ আর সাধু-দর্শন একই; তবে তীর্থদর্শনের ফল বিলম্বে ঘটে, কিন্তু সাধুসংগে অচিরাৎ ফল পাওয়া যায়।

যোশীমঠে ভগবান নৃসিংহ ও বাসুদেবের মন্দির। নৃসিংহ মন্দিরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, জানকী, কুবের, গরুড়, চন্ডিকা ও শ্রীবদরীনাথের মূর্তি আছে। বাসুদেবের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ মূর্তি ও বলদেবের মূর্তি শ্রীশ্রীশঙ্কর-ভগবান স্থাপন করেছিলেন।

অনুজা এসব পূর্বেই দেখে নিয়েছিল, সে ওখান থেকে একেবারে সটান্ টেম্পল কমিটির গেস্ট-হাউসে নেমে গেল। আমরাও এদিক-ওদিক ঘুরে সব দেখে-শুনে ফিরে এলাম।

এসে দেখি, সেই বাঙালী সাধুটি ইতিমধ্যেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। তাঁকেও সকালে নাকি গুণু আর-একটি ইনজেকশন দিয়েছে।

গুণু ঘরে-বাইরে আনাগোনা করে—ভোরেই সব কুলীদের ডেকে মালপত্র রওনা করে দিয়েছে। একগাল হেসে একটা বড় রকমের তুড়ি বাজিয়ে সে তার মাসিমাকে বললে—

—তোমার জন্য কাল রাত ১২টায় জিপের বন্দোবস্ত করেছি—তোমার যাতে কোনো অসুবিধা না হয়—তার সংগে আমরাও ঠাসাঠাসি করে ঐ এক গাড়ীতেই চলে যাব। আমাদেরো পোয়া-বারো—কী বল?

আর কিছু বলার প্রয়োজন হল না—মিলিটারী ক্যাম্প থেকে জনৈক আর্দালী এসে গুণুর হাতে পত্র দিয়েই একটা লম্বা সেলাম।

ইংরেজীতে লেখা—

দুঃখিত, জীপ দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

গুণুর পিঠ চাপড়ে বলি—

—মনে আছে, আজই সকালের কথা—মাসিমাকে যে অবাক করে দেবার কথা ছিল? এখন তুমিই যে হতবাক্।

গুণেনের ভ্রাতা উকীল গণেনের উক্তি—

আরও বলছিলে আমাদেরো পোয়া-বারো—এখন আমাদেরই বারোটা বেজে গেল যে!

আর্দালী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখেই—সব নিষ্ফলতার আক্রোশ গিয়ে পড়ল তার ওপর—চলা যাও, কেঁও খাড়া হ্যায়?

—হুজুর বকশিস!

—আচ্ছা খবর লে আয়া, বকশিস

তো দেনাই চাহিয়ে—নিকল্‌ যাও —ভাগো।

আশার গোড়ায় ছাই পড়ায় গুণেনের কণ্ঠস্বর যে মোলায়েম ছিল না, সেটা না বললেও চলে।

আবার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল। কেউ ডাণ্ডিতে, কেউ ঘোড়ায় আপন আপন স্থান দখল করে নিচ্ছে. এমন সময় প্রেসিডেণ্ট-সাহেবের ওপর থেকে আগমন ও আপ্যায়ন।

—এ যাত্রায় আমাদের আর দেখা হবে না—মাঝে একটা মিটিং আছে, সেখানে দুদিন থেকেই আমি বাড়ী রওনা হব।

এডভোকেট গণেনের স্বগতোক্তি—যাক, আজ থেকে আমারও অনাহারী চাকরির খতম।

আনন্দ ও নিরানন্দের দোলায় সবাই দুলছে। আনন্দের হেতু, রোগের বালাই থেকে সকলেই কিছুটা রেহাই পেয়েছে —আর নিরানন্দের কারণ—এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর পিপলকোটিতে গিয়ে আবার রাতভর ছারপোকার যন্ত্রণা।

যোশীমঠ থেকে সাড়ে এগারোটায় রওনা হলাম—বেলাকুচি হয়ে পাণ্ডু-কেশ্বর চটী পৌঁছে দেখি, ইতিমধ্যে সেটাও বন্ধ হয়েছে। আর মাঝে কোনো জায়গায় ডেরাডাণ্ডা পাতা হয়নি—চলছি তো চলছিই। উদ্দেশ্য ফুরিয়ে গেল, তাই বুঝি আমার দেহে ক্লান্তি ও অব-সাদের পর্বতভার।

ডাণ্ডীবাহীরা গলা ছেড়ে গান গায় —কিচির-মিচির ভাষা একবর্ণও বোধ-গম্য হয় না। তারা আমাদের বয়ে নিয়ে এমন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে, একটু হোঁচট খেলেই হাজার ফুট নীচে পপাত মমার চ।

যতই বলি একটু ধীরে চল, ততই দৌড় দেয়।

সামনেই দেখলাম বিরাট চায়ের আড্ডা—অনেকেই ঘিরে বসেছে— সবাই গাড়োয়ালী. কেউ বিড়ি, কেউ তামাক, কেউ চা-পানে মত্ত, আর নিজেদের মধ্যে কত না সুখ দুঃখের কথা। আমার ডাণ্ডীবাহীদের থামিয়ে বলি—ঐ জাত-ভায়ের দোকানে তোমরাও চা খেয়ে নাও —আজ ডবল পয়সা পাবে।

কী খুশী! ডাণ্ডীওয়ালারা আমাকে নামিয়ে হাত পাতে—আমি চারজনেক চার টাকা দিলাম। তারা বলে—আপনা-দের পিপুলকোটিতে পৌঁছে দিয়েই বাড়ী পালাব—কতদিন হয়ে গেল! ছ'মাস বাড়ী-ছাড়া—মন্দির খুলবার আগেই আমরা আসি—আবার বন্ধ হলেই বাড়ী ফিরে যাই—আপনিই আমাদের শেষযাত্রী। শেঠজী, কতদিন পরে বাড়ী যাব—আজ আমাদের নাচতে ইচ্ছে করে।

—তা' বেশ তো! যত খুশী নেচে নাও, কিন্তু ডাণ্ডী ঘাড়ে নিয়ে ওই কম্মটি কোরো না।

একটা প্রবাদবচন আছে—বাড়ী-মুখো বাঙ্গালী। দেখলাম, কেউ কম নয়, সব আপন আপন আবাসে ফিরে গিয়ে বহুদিন পরে প্রিয়জনের মুখ দেখবে—তাই এত আনন্দ, এত উৎসাহ!

কোন্‌ জাতেরই বা দীর্ঘদিন পরে বাড়ী ফেরার পথে বা "হোম" বলতে প্রাণ না নেচে উঠে! দোষ হয় বুঝি এই বাঙ্গালীর? সব পাখীই মাছ খায়, বদ্‌নাম হয়েছে মাছরাঙার!

জিজ্ঞাসা করি—তোমরা যে ঐসব গান গাইছিলে, তার মানে কী?

কেউ হেসে, কেউ বা কেসে ব্যাখ্যা জুড়ে দেয়—এক একজন এক এক কথার অবতারণা করে—

—এতদিন পরে বাড়ী যাচ্ছি—পরি-বারকে দেখতে পাব—সে বেচারী কত ভেবেছে—কত রাত ঘুমোয়নি—বাল-বাচ্চার মুখ মনে পড়ে—গরুটার বাচ্চা হল কিনা—আমাদের জন্যে ঘিউ করে রেখেছে।

কেউ বলে—আমার তিন তিন ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে মরে গিয়েছে—আর একটি হবার কথা—তার কী হ'ল, বেঁচে আছে কিনা—এই সব আমাদের ঘরোয়া কথা শুনে কী হবে?

—শোনার মানে আছে বৈকি! আচ্ছা বলতো—তোমরা বাড়ী গিয়ে প্রথমটা কী করবে?

—সাতদিন শুয়ে থাকবো—ভঁইসকে দুধ আর ঘিউ খাব—পরিবার পদসেবা করবে—তবে তো গায়ের দরদ যাবে।

একজন বলে—আমার বৌ মারা গিয়েছে—আর একটা ঠিক আছে—গিয়েই বিয়ে করব। আমরা ছ'মাস খাটি, ছ'মাস বসে খাই—আপনাদের কাছে যা' রোজ-গার করি, তাতেই দিন গুজরান হয়।

এই শীতেও তাদের শরীর ঘর্মাক্ত—গায়ে হাত বুলিয়ে অনুরোধ করি—

—আমাকে নিয়ে অত জোরে ছুটে যেও না!

—বহুৎ আচ্ছা!

ঠিক এই সময়েই আমার অন্যান্য সঙ্গীরা সব এসে পড়েছে—ডাণ্ডী আর ঘোড়াবাহিনী—গাড়োয়ালী ভাইরা সবাই খানিকটা জিরিয়ে নিতে চায়—। বাধা দিয়ে বলি—

—আর দাঁড়াতে হবে না—চল। সন্ধ্যের আগেই পিপলকোটি পৌঁছান চাই।

লম্বা লাইন করে আমরা একে একে উৎরাই-পথে রওনা হলাম। আমার ডাণ্ডীওয়ালাদের দ্রুত ছুটে না যেতে অনুরোধ করায়, তারা 'বহুৎ আচ্ছা' বলেছিল বটে, কিন্তু চলার সময় দেখলাম, ঠিক উল্টো—তাদের গতি এত-টুকুও হ্রাস পায়নি, বরং আরও বেড়ে গেল। মাঝপথে, আমাদের পাশ দিয়ে মিলিটারী জীপ-কার শাঁকরে বেরিয়ে যায়। তারমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর পত্নী।

গুণু আমাদের পশ্চাতে—ডাক দিয়ে বলি—

—দেখলে শ্রীমান?

উত্তর পেলাম—সেইজন্যেই তো ঘাটে এসে নৌকাডুবি।

ঠিক ছ'টায় এসে পিপলকোটিতে হাজির হলাম।

যেখানে আমরা যাবার আগে রাত কাটিয়েছিলাম, সেই কালীকমলীর

ধর্মশালার এ'রা সব উঠলেন—আমিই বিদ্রোহ ঘোষণা করি—

সবার সমস্বরে প্রশ্ন :—ছারপোকা-বিহীন ভূমণ্ডল এখানে কোথায় আবিষ্কার করবে, শুনি?

—এত শীগ্‌গীর হাল ছাড়বো না—একটা সংস্কৃত বুলি আউড়ে বেরিয়ে পড়ি—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি—

আমার সুটকেশ, বিছানা প্রভৃতি বাইরে এক কুলীর জিম্মায় রেখে রওনা দিলাম।

সামনেই স্টেজ বাঁধা। আজ রাম-লীলা হবে। সম্মুখেই গণেশের মূর্তি রাখা আছে। ভাবলাম, রামলীলা দেখেই রাত কাটিয়ে দেওয়া যাক। নীরেনের কাছে এই সাধু প্রস্তাবটি করতেই আঁতকে ওঠে—

—বাব্বাঃ, এর পরেও আবার রাত জাগা? তোমার কি কোনো বিচার-বিবেচনা নেই?

—সে কথা ঠিক—আমারও দেহের অবস্থা শোচনীয়। তবে কী জানো? এই ছারপোকার হাত থেকে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায়, একটা ফন্দি-ফিকির বাতলে দাও তো।

সে শুধু মাথা চুলকায়, কোনো হদিশ পায় না।

একজনের কাছে শুনলাম—ঐ দূরে টেম্পল কমিটির নূতন গেস্ট-হাউস হালে তৈরী হয়েছে—যদি পারেন, সেখানেই রাত্রিবাস করুন। তবে কাউকে নাকি ওখানে ঢুকতে দেয় না—কী জানি যদি তারা এলে ওখানেও খট্‌মলের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়—সেই জন্যেই নাকি এই কঠোর ব্যবস্থা।

আর কোন কথা না বলে, নীরেনকে টেনে নিয়ে সেই নবনির্মিত গেস্ট-হাউসে উঠে দেখলাম, কক্ষদ্বার রুদ্ধ। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে খুব সন্তর্পণে চেয়ে দেখি, বেশ প্রকাণ্ড হল-ঘর— এক কোণে ক্যাম্পখাট পাতা—আর একটি কোণে উজ্জ্বল হ্যাজাক্ লাইট সমস্ত ঘরের অন্ধকার তাড়িয়ে দিয়েছে। একটি লোক শয়নের উদ্যোগপর্বে ব্যস্ত—তাকে দেখেই চিনলাম—ইনিই সেই যিনি শিলিগুড়ী ক্যাম্পে গিয়ে জিপের জন্যে ধর্না দিয়েছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারী—

নীরেন কানের গোড়ায় মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে—জোরে ধাক্কা দেব নাকি?

অভয় দিলাম—ডরনা তো করনা মৎ, করনা তো ডরনা মৎ।

সঙ্গে সঙ্গেই নীরেনের উপর্যুপরি করাঘাত ও কড়ানাড়া চলতে থাকে। ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

নীরেনকে একটা ফন্দি উদ্ভাবনের জন্যে কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম; সে তার ফিকিরটা এইবার বেশ চমৎকার কাজে লাগিয়ে দিলে—চীৎকার করে বলতে থাকে—

—আরে, জল্‌দি দরওয়াজা খুলিয়ে, প্রেসিডেন্ট-সাহেবকো জরুরী চিট্‌ঠি।

ব্যস্! কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ। দ্বার মুক্ত—আমরা দুজনেই ঢুকে পড়লাম।

—আরে, আপলোক—হেঃ হেঃ হেঃ—

হাত বাড়িয়ে বললেন— কাঁহা প্রেসিডেন্টজীকো খৎ?

নীরেন পকেট থেকে গৌরীকুণ্ডের লেখা সেই অনুমতি-পত্রটি তাঁর হাতে দিয়ে হলের মধ্যস্থলে সোজা বসে পড়ল।

তিনি একটু আপত্তি জানালেন—

প্রেসিডেন্ট-সাহেবের আসতে প্রায় রাত বারোটা হবে—তিনি মাঝপথে একটা জরুরী কাজ সেরে সপত্নীক এখানেই উঠে রাত্রিবাস করবেন।

নীরেনের দৃপ্তকণ্ঠ—

—তা' করুন, আপত্তি নেই—আমরাও তো মরতে পারি না।

আমিও সরাসরি হুকুম দিলাম :

—যাও ভায়া, আমাদের বেডিং উঠিয়ে এখানেই আনো—তুমি না আসা পর্যন্ত পাদমেকং ন গচ্ছামি।

সে চলে যেতেই সেক্রেটারী-মহোদয় দুয়োরে খিল দিয়ে আপন মনেই বিড়-বিড় করে বলতে থাকেন—

—ফিন কোই আকে দিক্ করে গা—

প্রসঙ্গটি চাপা দিয়ে অন্য কথার অবতারণা করি—

এখানে এলেন কখন?

—খুব ভোরে রওনা হয়ে ঘন্টা দুই আগে—

—প্রেসিডেন্টের পথে নাকি দু'দিন দেরী হবে, তাঁর মুখে শুনেছিলাম?

—প্রোগ্রাম পলট্ গিয়া—কার্-এ এসে ওখানে ঘন্টা দুই হল্ট করে তাঁর কাজ সেরেই এখানে চলে আসবেন।

—কেন, জীপের কী হল?

—সে তো দু ঘন্টা অপেক্ষা করবে না। তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠেই যাওয়া-আসা করেন—

—রাত্রে তো এখানে ঘোড়া বা ডাণ্ডী চলে না—

—নাঃ স্পেশাল বন্দোবস্ত আছে—দু'দুটো হ্যাজাক্ লাইট, এই মাইল খানেক পথ, একজন কাণ্ডীতে, একজন ডাণ্ডীতে আসবেন। আগু পিছু চার চারজন পাইক,—

—ওঃ, তাহলে গণ্ডাখানেক খবর-দারী লোক সঙ্গে? ব্যস্ তাহলে আর ভাবনা কী?

—হেঃ হেঃ হেঃ—

আমাদের মধ্যে এইসব ঘরোয়া কথা চলতে থাকে; মাঝে মাঝেই তাঁর আসল মতলবটাও উঁকি দেয়—শেষটায় বলেই ফেললেন—

—এই ঘরখানা ছেড়ে আপনারা ঐ প্রশস্ত বারান্দায় শুয়ে পড়ুন। নীচে দুটো হরিণের চামড়া আছে—সেটাও, বলেন তো আনিয়ে দিচ্ছি।

ভাবলাম, বাহাদুর ছেলে। বাইরের এই শীতে শেষটায় অজিন-শয্যায় শয়ন না করিয়ে ছাড়বেন না।

—আপনি ধর্মবিরুদ্ধ কথা বলছেন।

—কেঁউ?

—এই শীতে বাইরে শুলেই নির্ঘাৎ নিমোনিয়া—তৎপর মৃত্যু! এই কী অতিথি সৎকারের পরাকাষ্ঠা? তার চেয়ে উপদেষ্টাকে বলি, তিনি বরং বাইরে যান—আমরাই ঘরে থাকি।

—ইয়ে বড়ি তাজ্জব কী বাত্—ক্যায়সে হো শক্তা?

—এবে হুকুমজারি করলেন যে বড়। আমাদের প্রাণটাও তো বেওয়ারিশ নয়। আপনি সেই পোপের মত কথা বলছেন যে!

—ও কৌন্ হ্যায়? ক্যা বোলা?

—টলেমি বলেছিল, পৃথিবী স্থির, সূর্যই তার চারদিকে ঘুরপাক খায়। কিন্তু গ্যালিলিও যখন ঠিক উল্টো কথাটি বললেন, এবং প্রমাণ করে দিলেন যে, তা' নয়, পোপ তাকে মৃত্যু-

দণ্ড দিলেন, কেন, জানেন? তিনি চিরাচরিত পুরনো টলেমির মতকেই আঁকড়ে ধরে বসেছিলেন।

তিনি কিছু বুঝলেন কিনা জানি না—চক্ষুতারকা স্থির—মুখে কোনও কথা নেই। এরপর যখন উপমা দিলাম—

—আপনারাও এই উত্তরখণ্ডে পোপের সামিল।

তখন তিনি মুখব্যাদান করে রইলেন।

আমি আবার বলি—

—টলেমি যেমন পৃথিবীকে অচল করে, সূর্যকে তার চারদিকে ঘুরিয়ে সচল বানিয়ে দিয়েছিলেন, আপনিও তেমনি অচলা পৃথ্বীর মত স্থির হয়ে বসে থাকুন, নাসিকায় তৈল প্রদান করে নিদ্রা যান, আর আমি কক্ষচ্যুত হ'য়ে আপনার চারদিকে সূর্যের মত ঘুরে মরি—তা' হবে না, স্যর—আজ আমি মৃত্যুহীন গ্যালিলিও। আইন অমান্যের যুগ—পোপের কথাও মানবো না।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি ঝড়ের মত বলে ফেললাম। হয়তো হিন্দীবাতের সপিণ্ডকরণ চলছিল; তিনি পুনরায় অনুযোগ করলেন—

—কেয়া সব্ বোল্‌তা হ্যায়—সমঝমে নেই আতা।

আর কোনও উপমা না দিয়ে এক কথায় বলি—

—বারান্দায় শুইয়ে আমাকে যে বধ করবেন, তা হবে না।

তিনি ক্ষান্ত হলেন। নিজের শয্যায় গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ বসে আছি—নীরেন আসে না। আমিও ঠাণ্ডা মেঝের ওপর হাতে মাথা রেখে ওভারকোট্ সমেত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। নীরেনের চীৎকার শুনেই ঘুম ভেঙে গেল।

—দরজা খোলো, দাদা, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব?

তাড়াতাড়ি উঠেই ঘড়িতে দেখি, তখন রাত দশটা।

দুই কুলী দিয়ে নীরেন বেডিং প্রভৃতি সঙ্গেই নিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকেই শ্রীমান উবাচ—

—আমি বেশ সাঁটিয়ে এলাম—যাও এবার তুমিও খেয়ে এসো।

—এতে তুমি বেশ মজবুত আছ, জানি। আচ্ছা, এবার তুমি পাহারা দাও, আমি চট্ করে কিছু মুখে দিয়ে এলাম বলে।

কালীকমলীর চটী ওখান থেকে সামান্য কিছুটা দূরে। দেখলাম, রামলীলার আখড়ায় লোকের ভিড়। ভিতরে খুব ধপড়ধাই ঢোলক পিটে চলেছে—এইটেই বুঝি তাদের অর্কেস্ট্রা। 'সিন' উঠতেই প্রথমে গণেশ-বন্দনা সুরু হল। ওদিকে প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলিয়ে শুঁড় নাচিয়ে সিদ্ধিদাতা "গ'ড়েশের" কী নৃত্য! শুনলাম, প্রথমে এই অদ্ভুত নৃত্য পরিবেশনের পর রামলীলা অভিনয় শুরু হবে। আজ নাকি রামরাবণের যুদ্ধ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখি—যবনিকা পড়তেই চলে যাই সেই ছারপোকা কামড়ের ঐতিহাসিক কালীকমলীর চটীতে।

গুণু, গণেন ও নীরেনের স্ত্রী অনেকক্ষণ আগেই খেয়ে-দেয়ে ফ্ল্যাট—কারও 'বি ফ্ল্যাটে' বা 'ডি শার্পে' নাকের বাদ্যি শোনা যায়—কত বিভিন্ন ধ্বনি-তরঙ্গের ওঠানামা। অনুজা ও তার মা জেগে আমার অপেক্ষায় বসে—তাদেরও খাওয়া শেষ। আমার ভোজন হলেই তারা শুয়ে পড়বে। অনুজার মায়ের ঠাণ্ডা-গরম মেশানো প্রশ্ন

—এখানে এসেই তো প্যালেসের খোঁজে বেরিয়েছিলে—সেটা বেশ ভালই পেয়েছ, শুনলাম। আমার শরীরটা যে ভেঙে পড়েছে, সে হুঁশটা কারও থাকে না কেন, বুঝি না।

'থার্ড পারসন্ সিঙ্গুলার নম্বর' এই "কারও" কথাটির ওপর জোর পড়ল—অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি—গলার স্বর নামিয়ে উত্তর দিই—

এই পথে আসতে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল। আগে বললে, ও পাল্লাটা ওখানে বন্ধ করে এখানেই না হয় শুরু করা যেত।

কন্যার উজ্জ্বল হাসিতে তার জননীও যোগ দিলেন।

খাবার সময় অনুজার অনুযোগ—

—বড় কাকার খাওয়ার পরেই আপনার লুচি ভাজা হয়েছিল—যা'তে এসেই আপনি গরম গরম খেতে পা'ন—তা' এত দেরী হ'ল যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম।

সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের একটি মূল্যবান সংযোগ—

—তোর বাবার কপালে থাকলেই তো গরম লুচি খাবে।

—হ্যাঁ, সে কথা একশ'বার! আমি কিন্তু এই ঠাণ্ডা দেশে ঠাণ্ডা লুচি খেতে আর ঠাণ্ডা লড়াই চালাতে খুব ভালবাসি।

আর একদফা হাসির ধুম পড়ে গেল।

আহারান্তে সটান আবার রাম-রাবণের যুদ্ধে ফিরে গেলাম।

তখন সবে আস্ফালন চলছে। দশ-মুণ্ডধারী রাজা রাবণ রাক্ষসের একবার বাঁয়ে যাওয়া আর একবার ঝম্প দিয়ে ডাইনে আসার, সঙ্গে কী হুঙ্কার। ওদিকে, ধনুর্বাণ হস্তে শ্রীরামের প্রবেশ ও ঢোলকের তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গীতে যুদ্ধ আর বাণ নিক্ষেপের ভান। দর্শকরাও একধার থেকে পাইকারী দরে হাততালি দিতে ছাড়ে না।

রাবণ বধ হয়ে গেল, সীতা উদ্ধার পেলেন—আমিও নিশ্চিন্ত হ'লাম।

কিছু সংখ্যক দর্শক সাজঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই আমিও তাদের অনুসরণ করি। ভেতরে গিয়ে দেখি, স্টেজের ওপর আর এক দৃশ্য! রাম রাবণ গলা জড়াজড়ি করে ধূমপান আর খোসগল্পে মত্ত, এখন তাদের মধ্যে আর কোনও বৈরিভাব নেই। গোঁপকামানো সীতা, দশমুণ্ডধারী রাবণ, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর অনুচর হনুমান সবাই বসে দর্শকদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে; কে কী কেরামতি দেখিয়েছে, কে একটা নূতন ধারায় প্যাঁচ্ কষেছে, তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা—আর দর্শকদের কাছে সাধুবাদ কুড়োবার অভিপ্রায়ে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা।

গেস্ট-হাউসে ফিরে এলাম। দরজায় ধাক্কা দিয়ে যাই—কারও সাড়াশব্দ নেই। তখন রাত সাড়ে বারোটা।

(ক্রমশঃ)

ঘড়িটা বাজলো। মিষ্ট মৃদু শব্দ হলেও সেই বাজনার শব্দে ক্ষেত্রনাথবাবুর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। ক'টা বাজলো, এগারোটা না বারোটা, দেখবার জন্যে হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচটা টিপলেন। ঘড়ি দেখে নিয়ে আবার বেড-সুইচ টিপলেন।

তারপর জেগে থাকবেন মনে করে রাতের নীল আলোর পানে চেয়ে রইলেন। কিন্তু আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন নিশ্চয়। কতক্ষণ পরে চোখের পাতায় কড়া আলোর তীক্ষ্ন বাণ লাগতে জেগে উঠলেন ক্ষেত্রনাথ। দেখলেন আলোকিত ঘর আলো করে ঘরের মধ্যে এক সালঙ্কারা সুসজ্জিতা সুন্দরী রমণী। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। তাঁরই গৃহিণী, গুণবতী। নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন।

ক্ষেত্রনাথ বল্লেন—"সেই এত রাত্ করলে? বল্লুম সকাল সকাল ফিরতে।"

পাখার বেগ বাড়িয়ে দিয়ে গুণবতী একটা কৌচে বসলেন ও বল্লেন—"তোমার তো ভালোই হোলো। দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে মজা করে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিলে।

"হ্যাঁ, ঘুমিয়ে নিলুম! ঘুম হয়? কখন আসবে, কখন আসবে, পথের মাঝখানে গাড়ী বিগড়োলো, না কী হোলো,—ভাবনায় কখনো ঘুম হয়?" বলে কর্তা হাই তুল্লেন।

দৃষ্টি-সংক্রমণে গৃহিণীও হাই তুল্লেন ও মৃদু হেসে বল্লেন—"না, ভাবনায় ঘুম হয় না। ভাবনায় নাক ডাকে।"

ক্ষেত্রনাথ বল্লেন—"তা ডাকুক। কিন্তু রাত করলে কেন এত?"

"ঐ বৌমাটির জন্যে। এমন হাঁ-করা মেয়ে তো আর ভূ-ভারতে দুটি নেই। সকলে বসে গেল, ও সেই ফুলশয্যের তত্ত্বই দেখছে, তত্ত্বই দেখছে। সেবারে বসাই হোলো না ওর জন্যে।"

বলতে বলতে গুণবতী উঠে দাঁড়ালেন বড়ো আয়নার সামনে, পোষাকী আভরণ খুলতে। কিন্তু আভরণ খুল্লেন না। নিজের প্রতিবিম্বের পানে চেয়ে দেখছেন, দৃষ্টি মিল্‌লো আয়নার মধ্যে স্বামীর দৃষ্টির সঙ্গে। ঈষৎ হেসে স্বামীর প্রতিবিম্বকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী দেখছো গো অমন করে?"

প্রতিবিম্ব জবাব দিল—"যাকে তুমি দেখছো, তাকেই আমিও মুগ্ধ হয়ে দেখছি।"

"আহা, কী যে বল আমি দেখছি এই জামাটা আর চলে না। বড্ডো মোটা হয়ে গেছি। আর এসব জামা কি আমাদের মানায়? বৌমার পেড়াপিড়িতে পরতে হোলো।"

আর একজনও দেখছিল। সে বধূ বরুণা। সে আসছিল শাশুড়ীর কাছে তার নিজের পোষাকী অলঙ্কারগুলি রাখতে। বারান্দায় অন্ধকার। তাই শাশুড়ী তাকে আয়নার মধ্যে দেখতে পাননি, কিন্তু সে শাশুড়ীকে ও তাঁর প্রতিবিম্বকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল।

এই বয়সেও কী সুন্দর! বসনে ভূষণে বর্ণে রূপে স্বাস্থ্যে মহিমায় সমুজ্জ্বল, কী সুন্দর! শাশুড়ীর সৌন্দর্যের ভক্ত বরুণা বরাবরই।

ক্ষেত্রনাথ বল্লেন—"থাক, থাক। খুলছো কেন? থাক্ না।"

এবার গুণবতী প্রতিবিম্ব ছেড়ে আসলের দিকে ফিরলেন। বল্লেন—"খুলবো না? সে কী গো? এইসব পরে থাকবো নাকি সারারাত? শুতে হবে না?"

প্রশ্নের জবাব দিলেন না ক্ষেত্রনাথ। বল্লেন—"বড়ো আলোটা নিবিয়ে দাও না, চোখে লাগছে।"

"লাগুক। সন্ধ্যে থেকে তো ঘুমোচ্ছ।" বলে গুণবতী খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসলেন অলঙ্কার কিছু না খুলেই। বল্লেন—"আমাদের কালে দেখতুম বিয়ের দিনেই কাগজ করতো। আজকাল আবার গায়ে-হলুদের কাগজ, ফুলশয্যের কাগজ, বিয়েতে তো আছেই। তারপর ছেলের ভাতে, পৈতেতে, জন্ম-দিনে, শ্রাদ্ধে—সে-ও তো আছে। এদের বাড়ীতে আজও কী কাগজের ছড়াছড়িই করেছে। শুধু কাগজ নয়, আবার ফটো দেওয়া।"

ক্ষেত্রনাথ বল্লেন—"সে তো তোমারই ভালো। বিয়ের কাগজ একশোখানা হলেও তোমার অরুচি নেই।"

"নেই-ই তো। বিয়ের কাগজ পড়তে ভালোবাসি আমি, তা কী করবো বল।

তোমার মক্কেলের কাগজের চেয়ে ঢের ভালো। বৌমা, কাগজগুলো দিয়ে যাও তো।"

ক্ষেত্রনাথ মৃদু হেসে বল্লেন—"মক্কেলের কাগজে রস আছে, সেই রসে শরীর পুষ্ট হয়, কেবলমাত্র যে মন হৃষ্ট হয় তা নয়।"

গুণবতী বল্লেন—"পান খাবে? মিঠে পান।"

ক্ষেত্রনাথ হাঁ করলেন। গৃহিণী দোনা থেকে এক খিলি স্বামীর মুখে গুঁজে দিয়ে, আর এক খিলি নিজের মুখে দিয়ে ডাকলেন—"অ বৌমা।"

বধূ এসে দরজায় দাঁড়াতে গুণবতী বল্লেন—"কাগজগুলো নিয়ে এসো তো বৌমা, ঐ যে ফুলশয্যের কাগজ করেছে।"

বরুণা বল্লে—"কাগজ তো আপনার কাছেই ছিল মা। আপনি পড়ছিলেন। আমি মোটে একটা পেয়েছিলুম, সেটা কে যেন চেয়ে নিলে—"

"শোনো কথা। আমি পড়লুম আর কোথায়? চশমা নিয়ে যাইনি। হাতে করেই ঘুরেছিলুম। তারপর গাড়ীতে ওঠবার সময়ে তোমার হাতে দিলুম না? বল্লুম রাখো তো বৌমা। বাড়ী গিয়ে পড়বো'খন।"

বধূ চুপ করে রইল। গুণবতী বল্লেন—"হারিয়েছ তো? নিশ্চয় গাড়ীতে ফেলে এসেছ। না বাপু, কী মেয়ে হচ্ছে সব আজকাল জানি না। কোনও দিকে হুঁস-পবন নেই। আমাদের কালে হলে বুঝতে একবার। কী করে সংসার করবে এরা?"

অপরাধিনী বরুণা নীরবে দাঁড়িয়ে দরজার পিতলের কব্জার উপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটবার বৃথা চেষ্টা করছে। সেই কুণ্ঠিতনত মুখখানির দিকে চেয়ে ক্ষেত্রনাথ বল্লেন—"বৌমা, সেকালের বৌদের কত সাবধানে জিনিসপত্র রাখতে হোতো, কত হিসেব করে চলতে হোতো তা তো জানো না। সেকালের বৌয়ের গল্প একটা বলি শোনো তবে। এসো, এইখানে বোসো। এইখানটায় বোসো, হাওয়া পাবে।"

গুণবতী বল্লেন—"এখন বসবে তোমার কাছে? ও ঘুমুবে না? নিজে ঘুমিয়ে উঠেছে বলে—"

বরুণা বল্লে—"না বাবা, আপনি গল্প বলুন। আমার কিছু ঘুম পায়নি মা।" বলে সে খাটের এক পাশে শ্বশুরের নির্দেশিত স্থানে বসলো। তাঁর পায়ের কাছে বসে আছেন গুণবতী। ধীরে ধীরে স্বামীর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি।

ক্ষেত্রনাথ বল্লেন—"কাগজ তো নেই যে পড়বে। ঐ আলোটা নিবিয়ে দাও না। নীল আলোটা তো জ্বলছে। আর সিগারেটের টিনটা দাও।"

"আমি দিচ্ছি মা, আপনি বসুন।" বরুণা সিগারেট দিয়ে বড়ো আলো নিবিয়ে দিয়ে আবার এসে বসলো।

মাথার বালিশের উপর একটা তাকিয়া চড়িয়ে তাতে পিঠ দিয়ে ক্ষেত্রনাথ কিঞ্চিৎ উঁচু হয়ে শুলেন এবং সিগারেট ধরিয়ে বল্লেন—"শোনো অনেককাল আগের কথা।

এক ভদ্রলোকের বিয়ে হয়েছে অল্প দিন হোলো। নামটার সংগে আমার নামের মিল আছে, তাই আর বল্লুম না। স্ত্রীর নাম—যাক গে, ভদ্রমহিলার নামটাও না বলাই ভালো। স্বামী গুণবান না হলেও, স্ত্রীর অনেক গুণ। সত্যিই গুণের মেয়ে। প্রধান গুণ অতি সাবধানী, অতি হিসেবী। সাবধানী ও হিসেবী হতে হলে লোককে বিশ্বাস করতে নেই তা জানো তো? লোককে মানে লোকজনকে, চাকর, বামুন, ঝি, রেলের কুলী, দোকানদার, গয়লা ইত্যাদিকে।

"একদিন সকালে বাড়ীতে জনকয়েক বন্ধু এসেছে স্বামীর। বন্ধুরা শোবার ঘরেই বসেছে। গল্পের আসর জমে উঠেছে। হঠাৎ আচিবুক ঘোমটা দেওয়া স্ত্রী প্রবেশ করলেন। স্বামী বিস্মিত হলো। তখনও স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে স্ত্রীদের কথা কওয়া মেলামেশার চলন হয়নি। অন্ততঃ সব সংসারে হয়নি। অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীর মুখের যতখানি দেখতে পেল স্বামী, তাতে মনে হোলো কী যেন বলতে চাইছেন তিনি। অবশ্যই বলবার কিছু আছে। না হলে আসবেন কেন এ ঘরে।

কিছু ইসারায় কিছু অস্ফুট কথায় স্বামী বুঝলো কাপড়ের আলমারিটা খোলবার প্রয়োজন হয়েছে। স্বামী জনান্তিকে প্রস্তাব করলো কী জিনিস দরকার সে-ই বার করে দিচ্ছে। তাকে চাবিটা দেওয়া হোক। স্ত্রী সম্মত হলেন না। তখন আলমারির সামনে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের একটু সরতে হোলো। স্ত্রী সন্তর্পণে স্পর্শ বাঁচিয়ে আঁচলের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে পাল্লার অন্তরালে আলমারির মধ্যে কী করলেন তিনিই জানেন। কিছু খড় খড় শব্দ হোলো, কাগজের শব্দ, কাপড়ের নয়। তার পর তিনি আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে কী যেন নিলেন। আঁচলের এক খুঁটে ছিল চাবির রিং, সে খুঁটটা আলমারির পাল্লায় আবদ্ধ, অন্য খুঁটে প্রয়োজনের জিনিস সংগ্রহ করতে কিছু অসুবিধে হচ্ছিল। কারণ অনেকগুলি সাগ্রহ চোখ তাঁর প্রতি নিবদ্ধ ছিল, সেই সব দৃষ্টি বাঁচিয়ে জিনিসগুলি আঁচলে পুরতে হচ্ছে, মাথার ঘোমটা ছোট হয়ে যায়, পায়ের ওপোর কাপড়ে টান পড়ে—উঃ।

ক্ষেত্রনাথ একটা পা টেনে নিলেন। পায়ে হাত বুলোচ্ছিলেন গুণবতী, তিনি কিছু বল্লেন না।

বরুণা বল্লে—"কী হলো বাবা? পায়ে কিছু কামড়ালো নাকি?"

ক্ষেত্রনাথ তখন সামলে নিয়েছেন। বল্লেন—"না, কামড়ায়নি।"

মিথ্যা বলা হোলো না। গুণবতী বল্লেন—"কিছু হয়নি।"

তার পর বল্লেন—"নাও বাপু, তোমার গল্প রাখো। বৌমাকে শুতে যেতে দাও। কী মাথামুণ্ডুর গল্প। ওরা আজকাল কত গল্প পড়ে, ওদের কি এসব ভালো লাগে।"

বরুণা বল্লে—"না বাবা, আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে। আমার একটুও ঘুম পায়নি। আপনি বলুন। তার পর? আলমারি থেকে কী নিয়ে যাচ্ছিলেন বৌটি। তার পর?"

ক্ষেত্রনাথ বল্লেন—"কী নিলেন, তা আমাদের দেখতে দেন নি। আমিও ছিলুম

সেই দলে কিনা। আঁচলে লুকিয়ে নিয়ে চলে গেলেন আলমারি বন্ধ করে। তিনি চলে যাবার পর দেখা গেল গুটি দুই তিন বড়ো বড়ো লাল লংকা আর কয়েকটা লবঙ্গ ছোটএলাচ পড়ে আছে আলমারির সামনে মেঝেতে। লাল লংকা, যা তোমরা রান্নায় ফোড়ন দাও, বেটে দাও। বন্ধুরা বল্লে—"একী ব্যাপার?"

স্বামীটা বল্লে—"তাইতো দেখছি।"

স্বামীর রিংএ ঐ আলমারির চাবি একটা ছিল। বন্ধুরা চলে গেলে আলমারি খুলে দেখলে সব নিচের থাকে কতকগুলো বাতিল কাপড় জামার অন্তরালে বড়ো কাগজের ঠোঙায় লংকা, ছোট ছোট ঠোঙায় ডালচিনি লবঙ্গ এলাচ ইত্যাদি।"

বরুণা বল্লে—"আলমারির মধ্যে শোবার ঘরে লংকা গরম মশলা?"

"হ্যাঁ। চোরের জ্বালায়। বামুন, চাকর, ঝি—সব যে চোর। সত্যি চোর কিনা ভগবান জানেন। কিন্তু বিশ্বাস কাকে আছে বল? একে বলে সাবধান, বুঝলে বৌমা?"

বধূ হাসলো। শাশুড়ী বল্লেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছে। বৌমা হাসছে তোমার ছাইভস্ম গল্প শুনে।"

বরুণা বল্লে—"না বাবা, আমি তা মনে করে হাসিনি। সত্যি বলছি।"

ক্ষেত্রনাথ বল্লেন—"বাসনকোসন রোজ রাত্রে চাবি দিয়ে রাখা হোতো। চা, চিনি, বিস্কুট, চাল ডাল ঘি ময়দা সব থাকতো চাবির মধ্যে। এমন সাবধান। কেবল সব চাবি সব সময়ে দরকার মতো পাওয়া যেত না। তাতে খুব অসুবিধে হোতো না। কারণ রোজ তো নয় দু একদিন অন্তর। আর চাবিওলা তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেই, ক্রমে তারাই ডেকে খবর নিত মাঝে মাঝে।"

আবার একবার "উঃ", বলতে গিয়ে চেপে গেলেন ক্ষেত্রনাথ, পা ঈষৎ টানলেন। বরুণা কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। নীল আলোতে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে ঐদিকেই বোধ হয় চেয়েছিল। গৃহিণীকে কর্তার পায়ে চিমটি কাটতে দেখতে পেয়েছিল।

বাইরে এসে বরুণা তখনই নিজের ঘরে গেল না। শাশুড়ীর অনুজ্ঞায় চলে আসতে হোলো,—রাত করলে গোপেন রাগ করবে,—নচেৎ তার আসতে ইচ্ছা করছিল না। এত ভালো লাগছিল। সে বারান্দার রেলিংএ দু-হাত রেখে দাঁড়ালো। কোনও কারণ বা প্রয়োজন নেই এমনি দাঁড়ালো। একটু পরে কানে এল —"ওমা, এই কাপড় পরে শোওয়া যায় কখনো? কী যে বল? কী রকম খড়মড় করে না?

শ্বশুরের কণ্ঠও শোনা গেল—"তা নয়। আসল কথা কাপড়টা লাট হয়ে যাবে, নতুন কাপড়। কেমন? গয়না কাপড় সব তো পরকে দেখাবার জন্যে। নিজের বাড়ীর লোকের জন্যে তো নয়। সত্যিই তো।"

নিজের ঘরে এলো বরুণা। গোপেন শুয়েছে, কী একটা বই পড়ছে। তাকে দেখে বল্লে—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এখনও এগুলো ছাড়োনি?

কী করছিলে?"

"মার ঘরে ছিলুম।" বলে বরুণা ড্রেসিং টেবিলের সামনের আসনটায় বসলো। সে সুন্দরী নয়, গৌরী নয়। মাত্র সুশ্রী শ্যামা। আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখতে দেখতে আপন মনে বল্লে—"কিসে আর কিসে।"

গোপেন সে কথা শুনতে পেল না। বল্লে—"কী গো, মুগ্ধ হয়ে গেলে যে নিজেকে দেখে। কাপড় গয়নাগুলো ছাড়বে, না কি পরেই থাকবে?"

আয়নার ভিতর পরস্পরের চোখ মেলবার মতো উভয়ের অবস্থিতি নয়। বরুণা স্বামীর দিকে ফিরে বল্লে—"মুগ্ধ হবার মতন নই তা আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। সে যাক। কিন্তু এগুলো নাই বা ছাড়লুম গা? পরেই শুই না। কী বল?"

গোপেন বল্লে—"সে আবার কী? ওই সব পরে শোওয়া যায়? অত বোঝা গায়ে চাপিয়ে?"

"তা যাবে না কেন? শোওয়া যায়। কারুর যদি সখ হয়, তা হলে খুব শোওয়া যায়।" বলতে বলতে বরুণার ঠোঁটে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটলো। সে রেখা গোপেনের চোখে পড়লো না। পড়লেও অর্থ বোধ হতো না তার। সে বল্লে—"তোমার সখ হয়ে থাকে তবে তাই শোও, ভালো কাপড়টার মাথা খাবে।"

বরুণা আভরণ খুলতে প্রবৃত্ত হোলো। সখ যদি কারও না হয়, তবে সে-ই বা বোঝা বইতে যাবে কার জন্যে? বরুণা বল্লে—"তুমি আর রাত করছ কেন? শুয়ে পড়। তোমার তো রাত জাগা সয় না।"

গোপেন বল্লে—"জোয়ানের আরক আছে? একটু দাও তো। খাওয়াটা বেশী হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

জোয়ানের আরক খেয়ে বই রেখে পাশ ফিরে শুলো গোপেন। বরুণা মশারিটা ফেলে দিল। তারপর হাতের কাজ সারতে সারতে স্বামীর বহুক্ষণ পূর্বের প্রশ্নের যেন জবাব দিল—"বাবা একটা মজার গল্প বলছিলেন। তাই

শুনেছিলুম। "গল্প মানে গল্প নয়, সত্যি।"

মশারির মধ্য হতে গোপেন বল্লে—"কী গল্প?"

"অনেকদিন আগের কথা। বাবা বোধহয় তখন তোমাদের মতন। এক-জনদের বৌ শোবার ঘরের কাপড়ের আলমারির মধ্যে লঙ্কা, হলুদ, গরম মশলা সব চাবি দিয়ে রাখতো। পাছে রাঁধুনী বামুন কিম্বা বাটনা-বাটা ঝি কিছু চুরি করে।"

"ও! মা'র কথা বলেছেন বাবা। তুমি বুঝতে পারোনি?"

হাতের কাজ থামিয়ে মশারির দিকে ফিরে বরুণা বল্লে—"সত্যি? আমারও একবার একবার মনে হচ্ছিল। তাই বাবার পায়ে চিমটি কাটলেন মা। তাই। কী কান্ড!" বলতে বলতে আনন্দে কৌতুকে হেসে উঠ্‌লো বরুণা।

গোপেন বল্লে—"লংকা গুণে দিতো মা বামুন ঠাকুরকে শুনেছি। বাবা বলতেন সরসেগুলো গুণেছ তো?"

বরুণা বল্লে—"তুমি তো এসব গল্প এতদিন বলনি আমাকে?"

"এ আবার একটা গল্প করবার মতো কথা নাকি? আমার অত মনেও হয়নি। নাও, শুয়ে পড়।"

একটু পরে বরুণা শয্যা আশ্রয় করলে। আর একটু পরে গোপেনের কী মনে হলো, হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর চোখ স্পর্শ করে সে বল্লে—"এ-কী? তুমি কাঁদছো? কী হয়েছে?"

চোখ মুছে নিয়ে বরুণা বল্লে—"দূর! কাঁদবো কী দুঃখে?"

"মা বকেছে বুঝি?"

"না গো। মা বকতে যাবেন কেন? কেউ বকেনি। কিচ্ছু হয়নি।"

"তবে চোখে জল এলো কেন?" কী হয়েছে বল না।"

"বলছি।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বরুণা। তারপর বল্লে—"কী বলবো? কিচ্ছু হয়নি। সে তোমাকে বোঝাতে পারবো না।"

গোপেন কোমল স্বরে বল্লে—"বোঝাতে হবে না। তুমি বল।"

আবার কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে, যেন মন স্থির করে নিয়ে বরুণা ধীরে ধীরে বল্লে—"এসব কথা বলতে নেই, গুরুজনদের কথা। বাবা কী-রকম ভালো-বাসেন মাকে এখনও। এখনও কত ভালোবাসেন। ও'দের দেখলে, ও'দের কথা শুনলে, আমার এত আনন্দ হয় যে, কী বলবো।"

"তাই কাঁদছিলে?" গোপেন বিস্মিত হয়ে বলে।

"আঃ, বলছি কাঁদিনি। তবু বলে কাঁদছিলে। আমার খুব ভালো লাগে ও'দের কথা ভাবলে। তাই—তাই চোখে জল আসে। ও তুমি বুঝতে পারবে না। যাও।"

"আচ্ছা বেশ। আমি বুঝতে পারবো না। কিন্তু তুমি এইবার ঘুমোও। লক্ষ্মী মেয়েটির মতো ঘুমোও দেখি। অনেক রাত হয়েছে।" বলে সে সাদরে স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে দিল।

"আচ্ছা।"

বরুণা নীরবে শুয়ে আছে। কিন্তু সে ঘুমোয়নি। বুঝতে পেরে গোপেন বল্লে—

"ঘুম হচ্ছে না বুঝি? গোটাকতক সোডামিন্ট খেয়ে নাও।"

সোডামিন্ট খেতে উঠলো না বরুণা। চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলো—"কী কান্ড!"

গোপেন বল্লে—"আবার কী কান্ড হোলো?" কী হয়েছে তোমার আজ?"

"আবার কান্ড হয়নি। অনেক কাল আগে হয়েছে। কাপড়ের আলমারির মধ্যে লংকা-হলুদ"—বলতে বলতে সে খিল্‌-খিল করে হেসে উঠলো। গুরুভোজন-ক্লান্ত গোপেনের বেশ ঘুম পেয়েছে তখন সে বল্লে—"পাগল হলে নাকি?"

"হ্যাঁ পাগল।" একটু চুপ করে থেকে বল্লে—"পাগলের একটা কথা রাখবে? হ্যাঁ-গা?" বলে বরুণা স্বামীর একটা হাত টেনে নিল।

গোপেন লোক খারাপ নয়। যৌবন-কালে স্ত্রীকে যতখানি ভালোবাসা দরকার ততখানিই সে ভালোবাসে বরুণকে। কিন্তু অর্ধেক রাতে ঘুমের সময় ঘুম পাবে না, এমন কথা ভালোবাসার শাস্ত্র সর্বদা লেখে না। তবু সে যতদূর সম্ভব কোমল স্বরে বল্লে—"কাল সকালে বল্লে হয় না কথাটা?"

মাথা নেড়ে বরুণা বল্লে—"না।"

"তবে বল।"

বরুণা ধীরে প্রায় অস্ফুট কন্ঠে বল্লে—"কথা রাখবে তো? দেখ, আমাকে ছুঁয়ে বলছো, কথা রেখো।" যদিও গোপেন কিছু কথা দেয়নি, সে কেবলমাত্র কথাটা বলতে বলেছে, তথাপি সে বিনা প্রতি-বাদে মেনে নিল। আবার একটু চুপ করে থেকে বরুণা বল্লে—"দেখ, আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব,......মানে যদি বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকি,—তাহলে......তখন......তুমি আমাকে খুব খু-উ-ব ভালোবেসো। কেমন?"

বিস্মিত গোপেন নীরব। বরুণা তার হাতে ঈষৎ নাড়া দিয়ে বল্লে—"কথা বলছো না কেন?"

"বলা বাহুল্য বলে।"

বরুণা বল্লে—"এখন যা ভালোবাসো, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী ভালো-বাসবে। এখন তো মা, ভাই, বোন, এখানকার বাবা, মা, কত লোক আছে—... তখন বাবা, মা থাকবেন না, ভাই-বোন ছেলেমেয়ে সকলেই নিজের নিজের সংসার নিয়ে থাকবে, তখন আমাকে তুমি ছাড়া আর কেউ ভালোবাসবে না। আমিও অবিশ্যি চাই না আর কারুর ভালোবাসা। ......তখন কেবল তুমি আমাকে ভালো-বাসবে। একটুও বকবে না।......বাবা যেমন মাকে ভালোবাসেন, ঐ রকম। অবিশ্যি আমি তো সুন্দর নই, বুড়ী হয়ে আরও কুচ্ছিত হয়ে যাব। তা হলেও তুমি আমাকে খুব ভালোবাসবে। বাসবে তো?" একটু চুপ করে থেকে আবার বল্লে—"আর যদি দেখ খুব ভালোবাসতে পারছো না, তাহলে আমাকে—আমাকে গুলী করে মেরে ফেলো। ...না, গুলী করে নয়, তাতে তোমার বিপদ হতে পারে। আমাকে বিষ দিও, লুকিয়ে খেয়ে ফেলবো।......বুড়ো মানুষ হঠাৎ কেন মরলো তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। কেমন? আমার কথা রাখবে তো?"

কথাগুলি বলতে বলতে স্বামীর করতলের উপর আপন কপালটি ন্যস্ত করে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। এখন কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গোপেনের কর-তল বরুণার অশ্রুতে ভিজে গেল। এ-অশ্রু দুঃখ-সুখের মিলিত অশ্রু। বৃদ্ধ বয়সে সকলের অনাদরের পাত্রী, সবার ভালোবাসা হতে বঞ্চিত যে অসহায় বরুণা, তারই প্রতি মমতাবশে, তার গভীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে, আবার সেই ভাবী বরুণার সেদিনের স্বামীর অপরিমিত ঐকান্তিক ভালোবাসা লাভের আনন্দে, তার সুখে সুখী হয়ে; আজকের তরুণী বরুণা চোখের জল রাখতে পারলে না। সে আবার বল্লে—"বল, আমার কথা রাখবে তো?"

গোপেন বল্লে—"আচ্ছা গো আচ্ছা।"

ভাগ্যে সেখানে সমালোচক কেউ উপস্থিত ছিল না। থাকলে জিজ্ঞাসা করতো গোপেনের এই "আচ্ছা"টা কিসের? বুড়ো হলে বরুণাকে গোপেন খু-উ-ব ভালোবাসবে? না, ভালোবাসতে না পারলে বৃদ্ধা বরুণাকে সে বিষ এনে দেবে? এ-প্রশ্ন বরুণার মনে উদয় হল না। সে খুশী হয়ে, আখেরের রাস্তা পাকা করে নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

উপন্যাসের অভিব্যক্তি

কার্তিক লাহিড়ী

পরস্পরের নিকট অপরিচিত তিনজন মহিলা। সীবন-কর্মী রিচার্ডসনের কাছে আসতেন তাঁদের প্রেমিকের কাছে চিঠি লেখাবার জন্যে। ওই মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তায় রিচার্ডসন নারী-মনের বহু রহস্যের অন্ধি-সন্ধি জানতে পারেন। পরে দুজন প্রকাশক বন্ধু তাঁকে অনুরোধ করেন একটি পত্র-সঙ্কলনের দায়িত্ব নিতে। সংকলনটি ছিল বিবরণমূলক এবং লেখা হচ্ছিল সেই সব মহিলাদের জন্য যাঁদের বিত্ত ছিল প্রচুর, শিক্ষা ছিল স্বল্প। পত্রের বিষয় ছিল—শোক-প্রকাশ, অভিনন্দন-জ্ঞাপন, পূর্বরাগ, বিবাহ এবং একটি বিশেষ অংশে ছিল রমণীয় যুবতীদের প্রতি সতর্কবাণী, যাঁদের কাজে-কর্মে বাইরে যেতে হতো এবং প্রায়ই যাঁরা অহেতুক বিপদে পড়তেন। রিচার্ডসন এই সব ব্যবসায়িক কাজ করতে করতেই উপন্যাসের মাল-মসলা পেয়ে যান এবং রচনা করেন "পামেলা" নামক উপন্যাস।

রিচার্ডসনের ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তখন সমাজে নারীদের স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত ছিল এবং প্রেম নামক বস্তুটি যে বৈধ এবং স্বাভাবিক, তা ছিল সমাজ-সম্মত। মধ্যযুগে নারী এবং প্রেম সম্পর্কে এবম্বিধ ধারণা কিন্তু অকল্পনীয় ছিল, এবং সকলেই স্বীকার করবেন নারী ও প্রেম সম্পর্কে স্বাধীন ধারণা উপন্যাসের একটি মূল উপাদান। অর্থাৎ সমাজে নারীর স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত না হলে, অথবা প্রণয়ের বৈধ অস্তিত্ব মেনে না নিলে উপন্যাসের কথা ভাবাই যায় না। রিচার্ডসন ইংরেজী সাহিত্যের প্রায় প্রথম আমলের ঔপন্যাসিক। অতএব তাঁর আগেই যে মানুষের স্বতন্ত্র মূল্য এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশ হয়েছে, এ-কথা ভাবা বাতুলতা নয়।

উপন্যাসের যে-সময় জন্ম হয়েছে, সে-সময় মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে সংগ্রামমূলক। অর্থাৎ মানুষ তখন বেরিয়ে পড়তে চায় সমাজের শাসন-অনুশাসনের অসংখ্য ষড়যন্ত্র থেকে। সে ব্যক্তি হতে চায়। যে সমাজ এতদিন মানুষকে গড্ডল স্রোতে পুত্তলিকাতুল্য করে রেখেছিল, তার আর সাধ্য ছিল না মানুষের কাঁধে জোয়াল চাপাবার। মানুষ স্বাধিকার ঘোষণায় তৎপর হয়ে উঠল এবং মানুষের যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান, তা ক্রমশ প্রকট হয়ে প্রমাণ করল, অনুভূতি ও আবেগ জগতে একটি নতুন অর্গল উন্মোচনের বিশেষ বিলম্ব নেই। এতদিন মানুষ শুনতো কাহিনী—ভূত, প্রেত, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা-অপ্সরীরা; কদাচ সে নিজের গল্পও শুনেছে, কিন্তু সে-গল্পের মানুষ অতিমানব অথবা অ-সাধারণ মানুষ; তার পরিমণ্ডল আচ্ছন্ন থাকতো অলৌকিক এবং অ-মানবীয় ক্রিয়া-কলাপে। এবার শুরু হলো হাওয়া বদলের পালা। মানুষ নিজের কাহিনীই শুনতে উদগ্রীব হয়ে উঠল, সে বুঝল যক্ষ-কিন্নরের গল্পের চেয়ে তার জীবন-কাহিনী কোনও অংশেই কম লোমহর্ষক বা রহস্যময় নয়। একটা গোটা জীবন তাই প্রয়োজন হলো সাহিত্য-শিল্পীর, যে-জীবন রক্ত-মাংসের, নানা দ্বন্দ্ব-জটিলতায় সুখ-দুঃখে দলিত মথিত এবং বিকাশময়। অর্থাৎ মানুষ যখন আপন সত্তা সম্পর্কে সচেতন হলো, সেই সময় সাহিত্যে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উদয় হয়, যে-দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন অলৌকিক কৌতূহল পরিত্যাগ করে মর্তবাসীর প্রতি নিবন্ধ। জন্ম হলো উপন্যাসের।

উপন্যাসের প্রাথমিক স্তরে তাই কাহিনীর আকর্ষণ ছিল মুখ্য। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাও যে রহস্যময় বস্তুত মানুষের যে-কোনও ক্রিয়া-কলাপ আশ্চর্য তাৎপর্য বহন করে এমন প্রেরণাই উপন্যাসের পথ প্রশস্ত করতে থাকে। অবশ্য প্রথমদিকে ঔপন্যাসিক মানুষের কল্পনারাজ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেন, ফলে প্রাচীন রাজা, মহারাজা অথবা কোনও মহান কর্মীর (যা অনেক সময় অতিমানবীয় রূপে চিত্রিত) জীবন তাঁর কাছে উপজীব্য হয়ে ওঠে, সৃষ্টি হয় রোমান্সের। যদিও রোমান্সের তালে তালে বাস্তব-মানুষকেও চিত্রিত করতে ঔপন্যাসিক বিস্মৃত হন না। রোমান্সের পাত্র-পাত্রী আমাদের চেনা-জগতের ব্যক্তি না হলেও, ঔপন্যাসিক তাদের যথাসম্ভব রক্ত-মাংসের জীবরূপে সৃষ্টি করেন এবং এই সব পাত্র-পাত্রী বাস্তব জগতের নিয়ম-কানুন যে মেনে চলে, তার প্রমাণ দিতে লেখক কসুর করেন না। মহাভারত-রামায়ণ-এর গল্পের সঙ্গে এখানেই এর প্রভেদ। রামায়ণ-মহাভারতের পাত্র-পাত্রী-দের আচার-আচরণ, কর্ম-কাণ্ড প্রায় সর্বদাই আমাদের বিশ্বাস্য ও বাস্তব জগতে অভিভূত করে এবং আমরা কখনই তাদের একান্ত পরিচিত ও আত্মীয় ভাবতে পারি না। অন্যপক্ষে উপন্যাসের সূচনা-স্তরের নায়ক-নায়িকারা আমাদের অতি-পরিচিত না হলেও, তাদের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে এমন একটা-কিছুর সন্ধান পাই, যা পেলে মনে হয়, হাঁ—এ সম্ভব, অর্থাৎ সম্ভাব্য নিয়মের অধীন হয়ে ঔপন্যাসিক কাহিনী রচনা করেন, যে-দায় মহাকাব্যকারগণ সর্বদা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তবু ওই সব মহাকাব্যে মানবিক গুণের যে সাক্ষাৎ পাই, তা আকস্মিক নয়, বরঞ্চ মহাকবিগণ যে মানুষ ছিলেন, তাঁরা এই বাস্তব জগৎ অতি বিচক্ষণরূপে আত্মস্থ করেছিলেন, তার প্রমাণ মহাকাব্যে পাওয়া দুষ্কর নয়।

॥ ২ ॥

যাই হোক। কাহিনীর প্রাথমিক আকর্ষণ থেকে এবং পাত্র-পাত্রীর বিভিন্ন আচার-আচরণ লক্ষ্য করে ঔপন্যাসিকগণ কাহিনীর মধ্যে তাৎপর্য আবিষ্কারে সচেষ্ট হলেন। কাহিনীকে উপযুক্ত পরিবেশে স্থাপিত না করলে কাহিনী বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে না, এ-কথা ঔপন্যাসিকগণ অতি সহজে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, তাঁদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। জীবনের ঘটনা উপস্থাপিত হলো উপযুক্ত পরিবেশে, ফলে উভয়ের একটি অনিবার্য নিয়মে দেখা গেল, এক-এক পরিবেশে পাত্র-পাত্রী এক-এক রকম আচরণ করে থাকে। অর্থাৎ সুখের সময় অথবা দুঃখের সময়, আনন্দের সময় অথবা দুর্ঘটনার কালে কোনও পাত্রই এক রকম থাকে না। মানবিক গুণের বিচিত্র কার্য-কারণ পাত্র-পাত্রীকে ভিন্ন পরিপার্শ্বে ভিন্নতর করে তোলে। এর ফলে ঔপন্যাসিক কাহিনী থেকে মনোযোগ কিঞ্চিৎ শিথিল করে মানুষের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হলেন। গড়ে উঠল চরিত্রের উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ রূপ! উপন্যাস রচনা হতে থাকল কাহিনী ও চরিত্রের পরস্পর মিলনে। অবশ্য এ-সময় পর্যন্ত কাহিনীর ঘনঘটাই ছিল মুখ্য, যেন কাহিনীই পরিচালিত করতো পাত্র-পাত্রীদের। উপনাস্ত মানব-মানবীর

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তখন কাহিনীর অত্যধিক চাপে অগোচরেই থাকতো। কিন্তু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টিশীল লেখককুল বেশী-দিন সহ্য করতে পারেন না। সন্ধান চলতে থাকল নতুন পথের। কাহিনীর ঘনঘটা পরিত্যাগ না করলে মানুষকে মানুষরূপে চেনা কঠিন, তাই যথাসম্ভব কাহিনী বা ঘটনার অজস্রতা পরিত্যাগ করে এমন এক উপায় উদ্ভাবন করতে হলো যাতে চরিত্রও কাহিনীকে পরি-চালিত করে। উপন্যাসের এ-স্তরে দেখা যায়, চরিত্র ধীরে ধীরে আপন স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকল। কিন্তু এহ বাহ্য। অতএব পূর্ণাঙ্গ মানুষের জন্য নামতে হলো অন্দরমহলে অর্থাৎ মনে। এতদিন শারীরিক মানুষকে পেয়েছিলাম উপন্যাসে, এবার রক্ত-মাংসের শরীরে যুক্ত এবং প্রধান হলো "মন" নামক বস্তুটি। যদিও এ-মনের অস্তিত্ব পূর্বেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং উপন্যাসে যেহেতু মনুষ্য-জীবনই মূল উপলক্ষ্য, সেজন্য "মন" বরাবর উপস্থিত ছিল, নচেৎ উপন্যাসই সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সে-মন চাপা পড়েছিল বহির্জগতের ঘটনা-বলীর আধিক্যে, তার স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব প্রায় বিস্মৃতই ছিল। বহির্জগতে মানুষ নানা অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের তাগিদে যে সব কার্য সম্পন্ন করে, অন্দরমহলে ওই কার্যগুলি তরঙ্গ তোলে এবং হয়ত তুচ্ছ কোনও একটি ঘটনায় মন আলোড়িত হয় বিপুলভাবে—এমন সংবাদ পরিবেশন ঔপন্যাসিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। সৃষ্টি হলো মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে যার প্রথম নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পাওয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্যে বেশ কিছু আগেই এ-ধারা লক্ষ্য করা যায়। কোনও সমালোচক রিচার্ডসনকে, কেউবা স্টার্ণকে পথিকৃৎ বলে স্বীকার করেন।

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচিত হবার ফলে দেখা গেল, পুরনো উপন্যাস থেকে তার অনেক পার্থক্য। এই উপন্যাস-গুলিতে ঘটনার অজস্রতা কমে গেল, স্বীকৃত হলো চরিত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। অর্থাৎ চরিত্র ঘটনাকেও চালিত করতে পারে, এ-কথা প্রমাণিত হলো। আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল, যথা—পাত্র-পাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস পেলো এবং পাত্র-পাত্রীদের বহির্জগতের চেয়ে অন্দর-মহলের সংবাদ প্রদান জরুরী হয়ে দাঁড়ালো। ফলে একটি তুচ্ছ ঘটনা মানুষের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তা দর্শানো লেখকের উপজীব্য হলো। অথচ অন্যদিকে বাইরের বিশাল জগৎ যে ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে থাকল লেখকগণ তা লক্ষ্যই করলেন না।

তবু এঁদের মধ্যে কয়েকজন লেখক বাইরের ঘটনার সঙ্গে অন্দর-মহলের আশ্চর্য মিলন সম্পন্ন করলেন। সেই লেখার একদিকে পাওয়া গেল ব্যাপ্তি, অন্যদিকে পেলাম গভীরতা। সেই সব লেখায় মানুষকে নানাদিক থেকে, নানা আলোকসম্পাতে বিরাট পটভূমিতে দেখা গেল। তলস্তয়ের "ওয়ার এণ্ড পীস", ব্যালজাকের "হিউম্যান কমিডি" এ-রকম উপন্যাসের উজ্জ্বল নিদর্শন। তলস্তয়ের উপন্যাসে রাশিয়ার বিরাট ভূমিতে স্বদেশ-রক্ষার যুদ্ধে দেখা দিল সংগ্রাম ও শান্তির কাহিনী, ব্যালজাক উনিশ শতকের ফরাসী দেশের প্রতিবিম্ব তুলে সৃষ্টি করলেন তাঁর অমর উপন্যাস।

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস সৃষ্টির পর দেখা গেল, ঔপন্যাসিকগণ কাহিনীর চেয়ে চরিত্রের প্রতি বিশেষ ঝুঁকে পড়েছেন এবং চরিত্রের এই অত্যধিক আকর্ষণের ফলে কোনও কোনো ঔপন্যাসিক উপন্যাসকে চরিত্র-চিত্রশালা করে তুললেন, থ্যাকরের "ভ্যানিটি ফেয়ার" যার অন্যতম নিদর্শন। ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণ চরিত্র-সৃষ্টিকে মুখ্য বলে গণ্য করেন এবং বিখ্যাত জে বি প্রিসট্‌লে বলেন, ইংরেজী উপন্যাসে চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতার উপরই ঔপন্যাসিকগণের স্থানের তর-তম নির্ভর করে। শরৎচন্দ্রও চরিত্র-সৃষ্টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন—"প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নিই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটা জিনিস, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।" (শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী—। পৃঃ ২০৭)

মন নিয়ে কারবার করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকগণ দেখলেন যে সচেতন মনের অন্তরালে আর একটি মন কার্যকরী, যে-মনে মানুষের অনেক কিছু গুপ্ত থাকে। সেজন্য দেহ ও মন মিশ্রিত মানুষের যে ছবি একদিন আঁকা হতো, সেই ছবি সম্পূর্ণ নয় বলে মনে হলো লেখকদের। মানুষের ব্যক্ত-জগতের পশ্চাতে যে অব্যক্ত-পৃথিবী আছে, সেই রাজ্যের সংবাদ জানানো একান্ত প্রয়োজন। সচেতন মন নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, এবার অব-চেতন মন উপজীব্য হলো উপ-ন্যাসের। মনেরও অন্দরমহলে প্রবেশ করে সেই মহলের হদিস পাওয়া ঔপন্যাসিকের অন্যতম দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল। শুরু হলো চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাসের। জেমস জয়েসের "ইউ-লিসিস" এ-শ্রেণীর উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'চেতনা-প্রবাহ'মূলক উপন্যাসে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পাঠক দাবি করতেন, বলতেন, জীবনের কাহিনী শোনাবার জন্যে। কিন্তু এ-শ্রেণীর উপন্যাসে লেখকই এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "দেখো আমি লিখেছি এক কথা, এ ভাবছে। পাঠক তুমি এর অন্তরে প্রবেশ করতে চেষ্টা কর।" পাত্র-পাত্রী যা ভাবছে তার বেশী লেখক বলেন না, পাঠকগণকে সেই অভিজ্ঞতার ভাগ নিতে হয়। সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হয়। চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাস রচনায় উপন্যাসের একটি নতুন দ্বার যেমন খুলেছে, তেমনি আগেকার বৃহৎ-জগৎ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে কয়েকজন পাত্র-পাত্রীর মানসিক জগতে সীমিত হয়েছে। এর জন্যে আক্ষেপের কারণ নেই, কারণ মানুষ একটি অসুবিধাকে অতিক্রম করতে গিয়ে আর-একটি অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং তাকে পরাস্ত করে আরও এক বাধা এসে দাঁড়ায়। এই চলিষ্ণুতার জন্য মানুষের জয়যাত্রার শেষ নেই। সাহিত্যেও সেই একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। তবে সাহিত্যে সহসা শেষ কথা বলা যায় না। চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাস, অন্তর্মুখী আত্মভাষণমূলক উপন্যাস প্রভৃতি নানা ধরনের ঔপন্যাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললেও, প্রাচীন কাহিনীমূলক উপন্যাস রচনার ধারা সমান গতিশীল। অবশ্য সে-ধারায় মন-স্তত্ত্বের প্রলেপই অধিক। তবু লক্ষ্য করার বিষয় উপন্যাসের আধুনিক পর্যায়ে যখন কাহিনীর ঘনঘটা পরিত্যাগ করা হচ্ছে, তখনও কাহিনী ও চরিত্রের সমান গুরুত্ব আরোপ করে উপন্যাস রচনা চলছে। অতএব, এরপর ঔপন্যাসিক কোনপথ অতিবাহন করবেন সে সম্বন্ধে ভবিষ্য-দ্বাণী করা সমালোচকের দায়িত্ব নয়, এবং সে-ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁর কাজও নয়। কারণ সাহিত্য ক্রমাগত সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া তার সমগ্র জটিলত্ব, দ্বন্দ্ব নিয়ে বয়ে চলবে, যে-প্রবাহে আধুনিকতম শিল্প-কৌশলের পাশাপাশি প্রাচীন পদ্ধতির সন্ধান আকস্মিক অথবা অযৌক্তিক নয়। উপ-ন্যাসের প্রথম যুগে ছিল কাহিনীর প্রয়োজন, তারপর দরকার পড়ল চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের। মনস্তত্ত্বমূলক রচনার পর কাহিনীর জটিলতা গেল ঘুচে, বাড়ল মনের জটিলতা, তারপর সৃষ্টি হলো চেতনা-প্রবাহের। অর্থাৎ শিল্পের নিজস্ব নিয়মে এক এক সময় এক এক রকমের উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছে, অবশ্য এর সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক পরি-বর্তনের একটি নিগূঢ় যোগ আছে, একথা স্বীকার্য। ভবিষ্যতের উপন্যাস মানুষকে আরও পূর্ণতররূপে তার অন্তর ও বহির্জীবনের পূর্ণ বিকাশে রূপায়িত করবে এই আশাই সমালোচক করে থাকেন এবং মানুষের পূর্ণ রূপায়ণের মধ্যেই উপন্যাসের আদিম অভীপ্সার পূর্ণতা।

কখন অন্যমনে

বিউটি সেনকে একডাকে চেনে সবাই এ অপিসে। সর্বঘটের কাঠালী কলা—নৈবদ্যের ডগে মন্ডার মত বেশ সদর্পে বিরাজ করছে সে এই অপিসে। মনে ছাপ রেখে যাবার মত চেহারা।

এককালে রূপসীই ছিল। ইটচাপা ঘাসের মত উগ্র ফর্সা রং, পোশাক-আশাকও আঁটসাট, যৌবনের শেষ চিহ্ন-টুকুও চিরনবীন, প্রকট হয়ে উঠেছে। চোখে সময়ে সময়ে চশমা, চলন-বলনে উদগ্র রূপ আর চমকে প্রকাশ। মাথা উঁচু করে চলে অপিসে, দুপাশে চেয়ে থাকে অনেকেই।

তাদের চোখের ওই নীরব চাহনির ভাষা বিউটি জানে।

মনে মনে খুশীই হয়।

—ট্যানসেন! বিউটির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

অপিসের পিছনের মাঠটুকুতে মেয়ে-দের প্যারেড হচ্ছে। রেডক্রশ ভলেনটিয়ার-দের প্যারেড। আকাশী রং-এর পাড়হীন শাড়ী আর সাদা ব্লাউস, ফাইলে সারি সারি দাঁড়ান মেয়েদের নিরীক্ষণ করছে বিউটি সেন।

—বনানী!

কালো সাদামাটা চেহারা। মুখচোরা লাজুক নতুন মেয়েটি থতমত খেয়ে যায় ওর হাঁকডাকে। বিউটি বলে চলেছে।

—চোখ তুলে দাঁড়াও। বিয়ের কনের মাথা নীচু করা কেন?

ফাইলের মধ্যে থেকে কে ফোড়ন কাটে—ভাসুর আছে কিনা?

হাসির শব্দ ওঠে মেয়েদের মধ্যে চাপা সুরে।

—স্টপ ইট প্লিজ! রাইট টার্ণ!

বিউটি সেন ধমকে ওঠে। মেয়েদেরও এই ন্যাকামো তার পছন্দ হয় না।

বিউটি সেনের অবাধ গতি সর্বত্র। করিডোরে হাইহিল জুতোর খট খট শব্দ তুলে চলে শাসনের ভঙ্গীতে। উন্নত দেহ— যৌবন-

শক্তিপদ রাজগুরু

বতী একটি নারী। জীবনের অফুরন্ত সম্পদের প্রতি যেন অপরিসীম অবজ্ঞা তার। পুরুষদের সঙ্গে টেক্কা দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

লাইব্রেরি কমিটির মেম্বর, রিক্রিয়েশন ক্লাবের অন্যতম পান্ডা। ক্যান্টিন কোঅপারেটিভ-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি। সর্বত্রই পুরুষদের সঙ্গে তার টেক্কা দেবার দুরন্ত প্রয়াস। নানা কাজে ব্যস্ত। কাজ করবে কখন সেকশনে। তবু প্রমোশনও আটকায় না। কানাঘুসো চলে ছেলেদের মধ্যে।

—কার্যে তো অষ্টরম্ভা!

কে জবাব দেয়—নিজেরাই বাবা রম্ভার দলে।

—হুঁ, তাই স্বর্গরাজ্য ওদেরই হাতে।

তাই বোধহয় অসুরকুলে দূর থেকেই অসূয়ার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। প্রমোশনের সংবাদ পেয়ে কেউ কেউ বা এগিয়ে যায় বিউটিকে অভিনন্দন জানাতে।

ওদের দিকে চেয়ে বিউটি একটু হাসে। ঠোঁটের ডগে বেশ অবজ্ঞাভরেই জবাব ফুটে ওঠে।

—ও তো মামুলী ব্যাপার।

মেয়েদের রিটায়ারিং রুমের আড্ডায় ও বেশ মুখরোচক আলোচনায় জমে ওঠে। ওদের নিজেদের তরফের কাহিনী। শম্পা ব্যাগ থেকে পাফ বের করে প্যাকাটির মত চেহারায় একটু লান-পালিশ [illegible] করতে বসে।

—[illegible] কি হলো—আগে না।

শম্পার দিকে [illegible] ছেলে যেন [illegible] ধরে লাইন লাগিয়েছে—অবশ্য শম্পার এটাই বিশ্বাস।

—কেন রে? বিউটিকে ছেড়ে তোকে শেষপর্যন্ত?

শম্পা যেন গালে চড় খেয়েছে। চুপ করে গেল।

বনানী চুপ করে বসে থাকে। ওদের কথাবার্তা শোনে। মফস্বল শহর থেকে সবে কলকাতায় এসেছে। এখানের মেয়েদের হ্যাংলামি আর ন্যাকামিতে যেন একটু অবাকই হয়েছে। ওদের সাজ-বেশ, মেকআপ আর ওই পোশাকের স্বল্পতা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। হঠাৎ বিউটিকে ঢুকতে দেখে শম্পা মুখ ফিরিয়ে নিল।

ঘরের পরিবেশ যেন বদলে যায়।

এককালে রূপসীই ছিল, বিউটি নামটাও মানিয়েছিল। আজ! যৌবনের শেষ পর্যায়ে এসেও ওর রূপের যা অবশিষ্ট আছে তাও অনেকের হিংসার বস্তু।

বিউটিও জানে শম্পার মনের রোগটা।

সবাই যেন ওর প্রেমে পড়ার জন্যই ছটফট করছে। তাই যেন একটু রসিকতা করার জন্যই বলে ওঠে বিউটি।

—হ্যাঁরে শম্পা, শুনলাম শৈল বোসকে নাকি কথা দিয়েছিস? তা মিষ্টি খাবো কবে?

শম্পার দুচোখ যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। শৈল বোস তাদের সেকসনেই নতুন এসেছে। অপিসের মধ্যে সে-ই অন্যতম সেরা ছেলে। ইংরেজিতে এম-এ। ভদ্র মার্জিত রুচি। ওর দিকে অনেকেরই নজর পড়েছে। শম্পা ঠোঁট বেঁকিয়ে জবাব দেয়।

—অবাক হবার কিছু নেই, সত্যিও হতে পারে।

শম্পা উঠে দাঁড়াল। [illegible] রং-করা কালো লিপস্টিককে [illegible]। [illegible] নাকের পাশে পাফটা বোলালো [illegible] করে বের হয়ে গেল।

বিউটি যেন জীবনের গতানুগতিক পথ ছেড়ে কেন এখানে এসে চাকরি করছে এটা যেন তাদের কাছে রীতিমত গবেষণার বস্তু। অনেক ছেলেরাই মাথা ঘামায় এই নিয়ে। রূপে, গুণে, শিক্ষা, কালচারে কোনটারই অভাব নেই। বিয়ের বাজারে ও মেয়ের চাহিদা ছিল, কোন ভালো ছেলেকে বিয়ে করে দিব্যি ঘর বাঁধতে পারতো।

ছেলেদের মধ্যে কে যেন বলে—ঘর বাঁধতে মানা। একজনের দেওয়া ভালবাসা থেকে বহুজনের নিবেদন-করা ব্যাকুলতার দাম অনেক বেশী।

কে যেন মন্তব্য করে—যাকে-তাকে মনে ধরবে কেন? ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার, আই-এ-এস না হলে বিয়ে করবে না কন্যে তাই আর বিয়ে করাই হোল না।

কথাটা বিউটি সেনও শুনেছে। মনে মনে হাসে ওদের দিকে চেয়ে।

প্রথম নজরেই বিউটি জেনে ফেলেছে ওদের এই কমপ্লেক্স। কোন দিক থেকেই তারা যে বিউটির যোগ্য নয় এইটা জেনে নিয়েই বিউটি যেন ওদের উপর সর্দারি করবার মনোভাব অর্জন করেছে। ওদের অবজ্ঞাই করে সে।

সেদিন লাইব্রেরি মিটিং-এ দেরি হয়ে গেছে অপিস থেকে বের হতে। ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকায় নেমেছে রাতের অন্ধকার। পথযাত্রীদের ভিড় কমে এসেছে। এই নিঃস্ব রূপ যেন তার চোখে নতুন ঠেকে।

শত শত জনতার কোলাহল—গাড়ীর নিষ্পেষণে মথিত-দলিত হয় যে, এমনি একক নির্জনতার মাঝে তাকে বোধ হয় নিঃসঙ্গ, বেদনাদায়ক সেই নিঃসঙ্গতা।

শৈলেন বোসকে খুব কাছ থেকে সেই সন্ধ্যায় দেখে বিউটি।

ট্রাম-স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারা। মুখে চোখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি। বাতাসে বকুল ফুলের একটু ম্লান সৌরভের আভাস।

ডালহৌসী স্কোয়ারের ইট-পাথরের ভীড়ে বকুলগাছটা তবু টিকে আছে—তবু ফুল ফোটে, অকারণেই গন্ধ বিলোয়। তারাগুলো জ্বলে নীলাভ কামনার মত ক্ষীণ দীপ্তি নিয়ে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বিউটি। সকালবেলায় বাড়ী হতে বের হয়, সারাদিন তার অবসর নেই। ঘামে চুলগুলো কপালে জড়িয়ে গেছে। বাতাসে ঝরে পড়ে শীত-শেষের ঝরাপাতা। ক্রমশঃ অনুভব করে বিউটি একে একে সব যেন ঝরছে তার। একদিন ঝরে যাবে প্রায়ান্ধকার ওই ন্যাড়া গাছটার মত। নির্জন ডালহৌসী স্কোয়ারের নিঃসঙ্গ

সত্তার মত এমনি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকবে সে।

—কোন দিকে যাবেন?

ওদিকে শৈলেন দাঁড়িয়ে ছিল। ওর ডাকে ফিরে চাইল। প্রশ্নটা তার উদ্দেশ্যেই। জবাব দেয়।

—দক্ষিণে। এদিকে ট্রামের তো দেখা নেই। গড়িয়াহাট যেতে হবে।

ট্যাক্সি ডাকে বিউটি। শৈলেনকে বলে

—চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

শৈলেন অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। হাসে বিউটি—মিষ্টি হাসি। গলার সুরটাও অকারণেই যেন সুরেলা হয়ে আসে।

—ভয়ের কিছু নেই। উঠুন।

—না, না!...শৈলেন উঠে বসলো।

মনে মনে হাসছে বিউটি: গাড়ীখানা ছুটে চলেছে রেড রোডের ওপর দিয়ে। আবছা আলো-আঁধারি পথ। বিউটির যৌবন যেন মাঝে মাঝে এমনি পরিবেশে ফিরে আসে সেই লালা আর বৈভব নিয়ে। ঠোঁটের রঙে জেগে ওঠে ম্লান কামনার নীল হাসির আভা। দু চোখের তারায় তারই প্রকাশ। বাতাসে কেমন একটা মিষ্টি গাছপালা, ঘাসের চাপা সৌরভ। শম্পার কুশ্রী চেহারা—কদর্য চাহনি মনে পড়ে।

শৈলেনের দিকে চেয়ে থাকে।

কেমন নেশা লাগে, গাড়ীর ঝাঁকানিতে দুজনের গা-এর স্পর্শ ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে।

—এখানে এলেম কেন? শুনেছি পড়াশোনায় ভালোই। ইংরাজী অনার্সও ছিল।

—আই-এ-এস দিয়েছি। যতদিন না জোটে কিছু, ততদিন any port in the storm।

চমকে ওঠে বিউটি সেন।

কেমন যেন মনে হয় ওকে দূরের মানুষ।

শৈলেনের ওই ঋজু চাহনিতে ধরা পড়ে গেছে তার মনের কোন গোপনতম দুর্বলতা।

শম্পাকে সে হিংসে করে। তাইই যেন শৈলেনকে আরও কাছে টানতে চায়। সেই গোপনতম সংবাদটা যেন প্রকাশ পেয়েছে ওর সামনে। মাথা নীচু হয়ে আসে বিউটির।

রাতের অন্ধকারে কেমন অত্যন্ত অসহায় একা বোধ হয় নিজেকে। শৈলেন বাইরের দিকে চেয়ে আছে। পাশে বিউটি সেনের দিকে নজর দেবারও যেন প্রয়োজন তার নেই।

বিউটি একটু অবাকই হয়েছে। সাধারণতঃ যাদের দেখেছে তাদের সম্বন্ধে ধারণার পুরুষদের জেমেছে যতটুকু—শৈলেন তার ব্যতিক্রম। সেই বুভুক্ষা দেখেনি সে ওর চোখে। ...মা হয় শৈলেনই তাকে ঠিক পাত্তা দিতে চায় না।

হয়তো অবজ্ঞাই! চুপ করে বসে থাকে বিউটি। কথা বলে না। নারীজাতি সম্বন্ধে যে পুরুষের কৌতূহল নেই, হয় পুরুষ নামের অযোগ্য সে, নয় তো অবজ্ঞা করে মেয়েদের। মূল্যবোধটুকুও হারিয়েছে তারা।

গাড়ীটা গড়িয়াহাট ট্রামডিপোর কাছে এসে থামলো।

ভাড়াটা দিতে যাবে বিউটি, বাধা দেয় শৈল বোস।

—সে কি। আমি আরও দূরে নামবো, ওকে সেইখানেই দিয়ে দোব।

—কিন্তু!

বিউটি কি বলবার চেষ্টা করে। শৈলেন এগিয়ে গেল ট্যাক্সিতে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বিউটি।

ক্লান্ত বোধ করে। অসহ্য ক্লান্তি আর মনের কোণে কি যেন একটা হতাশার কালো ছায়া মিশে রাতের আঁধার ভারি করে তুলেছে।

অর্থহীন মনে হয় সবকিছু। খেলার মাঝে খেলুড়ে ঘুড়ী ছোঁবার কাছাকাছি এসে যেমন দুর্দম ক্লান্তি বোধ করে—তেমনি ক্লান্তি তার সারা দেহমনে। মনে হয় এতদিন এত বেলা বৃথাই কাটিয়েছে। মুঠো মুঠো অপচয় করেছে—সঞ্চয় করেনি কিছু।

—এই যে, আপনার অপেক্ষায় বসে আছি!

পাড়ার সবুজ সঙ্ঘের সেক্রেটারি হরিপদ সাপুই বসে আছে। পেট্রল পাম্প—আর রাঁধিখানার মালিক—স্টেশনের ওদিকে কয়লার ডিপোও আছে। গায়ের রং তেমনি জেল্লাদার কালো—মাথায় কুমড়োর মত চকচকে টাক। ওকে দেখে খাতাপত্র বের করে। ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ব্যাপার। কোন ছোরিরাম ট্যাকমারিয়াকে সভাপতি করতে পারেল ওই ট্যাকমারা আর দরকার হলে ছোরির ব্যাপারটাও সহজ হয়ে যাবে।

হরিপদ হাঁ করে চেয়ে আছে। চেয়ে থাকে প্রায়ই। ওই চাহনির অর্থ বোঝে বিউটি। আজ যেন বিরক্তি বোধ করে। বলে ওঠে।

—আজ ওসব ভাববার মত ক্ষমতা নেই। বড় ক্লান্ত।

—বেশ বেশ: পরে আসবো।

হরিপদ গদগদ হয়ে ওঠে—আপনাকে চাই-ই। নাহলে এতবড় কাজ—

—এবারের মত মাপ করুন না আমায়। বিউটি বলে ওঠে।

—তাই কি হয়! আচ্ছা নমস্কার। চলুন ভেকলুবাবু, চলো সবাই।

দলবল নিয়ে বের হয়ে গেল হরিপদ। ভেকলুবাবু গিলেকরা পাঞ্জাবি আর দামী ঘড়িটা সামলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে'—

—কি ডাঁট মাইরি! যে ডেঁপটে সে। দুদিন বইতো নয়। বড় দায়ে পড়েছি—কনফারেন্স করতে গিয়ে। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া। আমরা বাবা খ' পারের ছেলে। দুই সিস দিলে—দুস্সো ছেলে বোঁ বোঁ করে এস্সে পড়বে। কাজ আটকাবে না। তারপর দেখে লিব।

হরিপদ সাপুই বলে ওঠে—আস্তে! শুনতে পাবে যে।

খালপারের ভেকলুবাবু জবাব দেয়, প্রকৃত দেশজভাষায়।

পাক! কাউকে ডরনেবালা পার্টি নাকি আমরা?

শুনতে পেয়েছে বিউটি, বুঝতে পারছে এইবার তার দিন যেন ফুরিয়ে আসছে।

মিছে কথা বলেনি ভেকলুবাবু।

রাত হয়ে আসছে। তারাজ্বলা রাত—আঁধারঢাকা রাত।

কর্মক্লান্ত কলকাতা ঝিমিয়ে পড়েছে কিছুক্ষণের জন্য। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হতাশ যেন সে—ঠিক তারই মত।

দেওয়ালেরও কান আছে। চোখ আছে অন্ধকারের।

কাল ওদের রাত্রির আঁধারে ট্যাক্সিতে পাড়ি জমানোর ব্যাপারটা নানা রসাল মন্তব্য সহযোগে পরিবেশিত হয়।

শৈলেন বোসও অবাক হয়েছে। মনটা খুশীতে ভরা—আই-এ-এস-এর খবর বোধহয় ভালই হবে।...ওদের কথায় একটু চমকে ওঠে। সেকশনের গোবিন্দবাবু উপদেশ দেন।

—ওসব থেকে সাবধানে থাকবেন দাদা। একশো সাতটির মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

হাসে শৈলেন—তাহলে একশো আট পূর্ণ হ'ল?

গোবিন্দবাবুর জবাবটা ঠিক মনোমত হয় না, চশমার ফাঁক দিয়ে একটু চেয়ে থেকে পিঠের দাদ চুলকোতে থাকেন তিনি। গজগজ করেন।

—পরে বুঝবেন? লোহাচুর খান—পরে 'শাবল' বের হলে বুঝবেন না!

হাসে শৈলেন। ভদ্রলোক শৈলেন সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ধারণা পাকাপাকি করে নিয়েছেন—শিক্ষিত হলে কি হয়, ছোকরা একটি ভিজে বেড়াল।

বিউটি কথাটা শুনে চমকে ওঠে। কাকে কি বলবে? এ যেন আসমানে থুথু ছোড়া, নিজের গায়েই পড়বে। রিটায়ারিং রুমে ঢুকতে গিয়ে চমকে দাঁড়াল। শম্পা ওর গায়ের ওপর দিয়েই বের হয়ে গেল, একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে।

ঘরের ভিতর হাসি-মশকরা কি চলছিল বুঝতে পারে বিউটি তাকে কেন্দ্র করেই। ওকে দেখে তাই থেমে গেছে সবাই।

কেমন যেন অসহ্য মনে হয়। বের হয়ে এল বিউটি।

করিডর দিয়ে আসছে। আজ তার অজ্ঞানতেই সেই উঁচু মাথা নীচু হয়ে গেছে। জুতোর শাসন-উদ্ধত শব্দটাও থেমে গেছে।

থমকে দাঁড়াল। কারা যেন হাসছে।

ওদের হাসির শব্দ তীক্ষ্ণধার ছুরির মত তার পিছনে এসে বেঁধে। সরে এল। মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসটুকুও তার নেই।

রিক্রিয়েশন ক্লাবের মিটিংও ভাল লাগে না। শরীরটা ভাল নেই বলে আজ এড়িয়ে গেল।...করিডরে...সেকশনে কাকে যেন খুঁজে ফেরে।

...শৈলেন বসু আগেই বের হয়ে গেছে কি যেন একটা খবর পেয়ে।

ট্রাম থেকে নেমে এগিয়ে আসছে গোলপার্কের দিকে হঠাৎ শৈলেনকে দেখে থমকে দাঁড়াল বিউটি। কেমন যেন ভাল লাগে।

...সন্ধ্যার অন্ধকারে লেকের দিক থেকে বইছে মিষ্টি-বাতাস।

দুজনে এগিয়ে চলে ফাঁকার দিকে।

বিউটির চলায় কেমন যেন ছন্দ ফুটে ওঠে।

সবুজ গাছ-গাছালির বুকে আঁধার নেমেছে।

কালো আঁধার নেমেছে লেকের জলে। পাখীগুলো ডেকে ডেকে থেমেছে—শান্ত হয়েছে। তারা জ্বলছে—ঝিকমিক করছে লেকের গহিনকালো জলে।

বাতাসে কাঠচাঁপার ম্লান সৌরভ।

বসে আছে বিউটি। আজ তার কণ্ঠের স্বর কেমন যেন ভারি হয়ে আসে। থেমে গেছে সারা মনের অশান্ত কলরব। শৈল বোস চুপ করে কি ভাবছে। ফিরে চাইল বিউটির কথায়।

—আমার জন্য আপনাকেও কথা শুনতে হ'ল?

ওদের ইঙ্গিতটাও শুনেছে শৈলেন। বিউটির কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আনন্দের, কোন আশার প্রকাশ। একটু তরলকণ্ঠে বলে ওঠে বিউটি।

—সত্যি! ওরা যেন কি!

কথা কইল না শৈলেন। তার মনে অন্য ভাবনা—কি যেন আশার আলো। এই আঁধারঢাকা জগৎ থেকে কোন অন্য দেশের যাত্রী সে। পিছনে এই ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার লাভ-ক্ষতির খতিয়ান টানবার উৎসাহ তার নেই।

বিউটি হাল্কা সুরে বলে ওঠে।

—তবু যদি এর কিছুটা সত্যি হোত!

গাছের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে বিউটির মুখে—চুলের ওপর। চেয়ে আছে শৈলেন।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে অনেক কাজ বাকী। বলে ওঠে,

—ও নিয়ে ভাববেন না। চলুন রাত হয়েছে।

—হ্যাঁ, চলো।

বিউটি হঠাৎ যেন খুব কাছে এসে পড়েছে। সারা দেহে ওর উদগ্র স্পর্শ।

তারা কাঁপছে লেকের কালো জলে।

কোথায় একটা রাতজাগা পাখী আর্তনাদ করে ওঠে তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দে।

ছায়ামূর্তির মত বের হয়ে এল চুপ করে শৈলেন। বিউটি একটু অবাক হয়েছে। কোথায় যেন আঘাত পেয়েছে। চুপ করে এগিয়ে গেল। কি যেন বলতে চেয়েছিল একান্তে।

শোনেনি সে কথা শৈলেন; শুনতে চায়নি।

...অফিসে আজ অনেকেই তার দিকে দিকে চেয়ে থাকে। এখানে-ওখানে জটলা, একটা খবর নিয়ে আলোচনা চলেছে। কেউ খুশী হয়েছে, কেউ হয়নি।

—তুই জানিস না? ধ্যাৎ!

বনানীই খবরটা দেয় তাকে। আই-এ-এস-এ স্ট্যান্ড করেছে শৈল বোস। অফিসে রেজিগনেশন দিয়ে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল বিউটি।

ওরা সবাই যেন হাসাহাসি করছে। চুপ করে কি ভাবছে বিউটি—শৈলেন যাবার আগে সংবাদটা তাকে দেয়নি। দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি

বিউটি যেন এই প্রথম আবিষ্কার করতে পেরেছে কত অসহায়, দুর্বল সে। নিজের অজ্ঞানতেই কি যেন চেয়েছিল একান্ত আপন করে; মনের সেই দুর্বার কামনা আজ ব্যর্থতার জ্বালায় গুমরে ওঠে।

অপমানিত হয়েছে সে।

বিউটির নিজের কাছে এই চরম ব্যর্থতা আজ প্রকট হয়ে ওঠে।

রিটায়ারিং রুমে শম্পা সহজভাবেই শীর্ণ নাকের ডাঁজে, কালিপড়া দুচোখের কোলে পাফটা বোলাচ্ছে। সহজভাবেই বলে চলেছে—

—কি হ্যাংলা মাগো! কাল তোদের ওই ফাইলিং সেকশনের সুনীলবাবু বলে কিনা—

আবার কোন কাল্পনিক প্রেম-কাহিনীর নায়িকা হয়ে উঠেছে কুশ্রী ওই মেয়েটি।

বিউটি যেন স্তব্ধ নীরব হয়ে গেছে কি এক দুঃসহ বেদনায়—অপমানে।

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

॥ সার্থবাহ ॥

॥ স্পেনের চিন্তালোক ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর স্পেনীয় চিত্রকর বেলাথকোয়েথের আঁকা তাঁর সমকালীন জাতীয় কবি লুইস দে গংগোরার মূল্যবান মুখচ্ছবি শিল্পের সুনিশ্চিত মহত্ত্ব ধারণ করেও বোধহয় দর্শকদের কথঞ্চিৎ হতাশ করে। জমকালো টাক, বঁড়শি নাক, থমকে-দেওয়া গোঁফের নীচে জেগে-ওঠা পুরু তলার-ঠোঁট, ধারাল থুতনি আর চোখের চাউনিতে অন্তর্দৃষ্টি যেন কোনও অস্ত্রের মতো সজাগ। কবি-কবি নয় একেবারেই। কিন্তু কবির পক্ষে বেমানান হলেও গংগোরার উক্ত প্রতিকৃতিতে যে কঠিন প্রৌঢ়ত্ব ও শান্ত উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠেছে, তা যেন হিস্পানী কবি বা সাহিত্যিকের মনোলোকের এক বিশিষ্ট প্রতিচ্ছবি।

কলা-বিশেষের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবনের সমস্যায় জড়িয়ে-পড়া এবং সে সমস্যার মীমাংসায় দার্শনিক পথে হাঁটাহাঁটি করা, দুশ্চিন্তায় ভোগা, জীবন-রহস্যের কারণে উদ্বিগ্ন থাকা স্পেনের সাহিত্যিকরা অনেকখানিই গা-সওয়া করেছেন। ব্রিটিশ বা মার্কিণ সাহিত্যিক-দের তুলনায় দার্শনিকত্ব ধাতস্থ করার প্রবণতা হিস্পানী সাহিত্যিকদের বেশী, বললে অন্যায় হবে না। এই প্রবণতার ফলে সাহিত্য ও দর্শনের প্রভেদ অনেক-ক্ষেত্রেই টিকে থাকেনি হিস্পানী সাহিত্যের পাতায়। স্পেনের অনেক সাহিত্যিকই শেষ পর্যন্ত চিন্তালোকের বাসিন্দা বনেছেন, নিছক সাহিত্য-সেবক না-হয়ে। আর এই একই কারণে স্পেনের অনেক দার্শনিকও আবার সাহিত্যিক ভঙ্গী আয়ত্ত-করাকে অনভিপ্রেত মনে করেননি। থেরবান্তেস, কালদেরণ থেকে উনামুনো, ওর্তেগা, সান্তায়ন ও মাদারি-য়াগা পর্যন্ত সাহিত্য-দর্শনের এ সংলাপ শোনা যায়।

বস্তুতঃ দার্শনিকত্বের প্রতি হিস্পানী লেখকের সহজাত আকর্ষণ; নিছক বস্তুতন্ত্রে, বর্ণনায় বা বিশ্লেষণে তাঁ'র যেন মাড়ীর টান নেই। কতো সহজেই না সালভাদর মাদারিয়াগা দার্শনিক ঝলক আমদানি করতে পারেন যখন তাঁর এক'টি স্বচ্ছন্দ সনেটের প্রথম পংক্তির পাঠ হয় 'রাথন দে লা সিনরাথন', অর্থাৎ, অযুক্তির যুক্তি! শিল্পের জন্মতত্ত্ববিচারে গার্থিয়া লোরকা এমন অধ্যাত্মীয় আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন যার পাশে যোয়াকো, হোরাতিয়ুস বা, এমন কি আরিস্ততিলিসের ন্যায় পূর্ববর্তী বিচারকদের নেহাতই বৈষয়িক ও গুরুত্ব-হীন ঠেকে। শিল্পের দারুণ জন্ম-মুহূর্তে, লোরকা বলেন, 'দোয়েন্দে' বা অলৌকিক শক্তি এসে শিল্পীকে ধরে। এই 'দোয়েন্দে'র স্বভাব ও কার্যক্রম বোঝাতে লোরকা যে-ঘাটে আলোচনার সুর বেঁধেছেন তা অনিবার্যভাবে দার্শনিকের। এমন কি শেকসপীয়র—সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েও মার্তিনেথ সিয়েরুরা-যে ভাববাদের কাব্যে একরোখা হয়ে লেগে থাকেন তা তাঁর আমলেতে : প্রিন্থিপে দে দিনামার্কা, বা 'লাস মুহে-রেস দে শেকসপীয়র'-এর মতো রচনায় সপ্রমাণ।

অবশ্য দরকার মতো সমালোচনার শুষ্ক গদ্যে লিখতে, পরিচ্ছন্ন ও বিশদ হতে হিস্পানী লেখকরা যে না পারেন তা নয়। উদাহরণ হিসাবে মাদারিয়াগার 'হ্যামলেট অনুবাদ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটিই ধরা যায়। এই প্রবন্ধে মাদারিয়াগা অনু-বাদের বিশেষতঃ শেকসপীয়র-অনুবাদের, ব্যবহারিক অসুবিধার বিষয়ে যে নাতি-দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তা প্রাঞ্জলতার দৃষ্টান্ত। তবু বলতেই হয় যে প্রবন্ধটি লেখা ইংরেজী ভাষায়, বিষয়বস্তুও ইংরেজী; চিন্তার জটিলতায় ভোগার সুযোগ কমই পেয়েছেন মাদারিয়াগা।

এ-যুগের অগ্রগণ্য দার্শনিকদের অন্যতম জর্জ সান্তায়না (নামটি ইংরেজী, কিন্তু উপাধি স্পেনীয়), যিনি কিশোর বয়স থেকেই আমেরিকা-প্রবাসী, এবং মার্কিণ বলেই পরিচিত, ন্যায়ত হিস্পানী। তাঁর জন্মস্থান মাদ্রিদ, এবং তাঁর পিতা ও মাতা দুজনেই ছিলেন স্পেনীয়। তাই যদিও সান্তায়না আমে-রিকায় স্থায়িভাবে বসবাস করেছিলেন, হার্ভার্ডে দীর্ঘকাল দর্শনশাস্ত্রের অধ্যা-পনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং যদিও তাঁর রচনাবলীর প্রায় সমস্তটাই ইংরেজী ভাষায় লেখা, তবু জন্মগত দাবীতে তিনি স্পেনীয়ই। কারণ সান্তায়না কোনও সময়েই স্পেনের নাগরিকত্ব বর্জন করেননি।

একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, আত্ম-জীবনী-রচয়িতা ও দার্শনিক, সান্তায়না তাঁর দর্শন-চিন্তায় সহনশীল, যুক্তি-নিষ্ঠ ও মানবিক। তাঁর যুক্তি অবশ্য সবক্ষেত্রে ব্যবহারিক মার্গে সঞ্চারপথ খুঁজে পায়নি, কারণ মূলতঃ তিনি গ্রীক দার্শনিক প্লাতোন-নির্দেশিত ভাবাশ্রিত বৃত্তিতে শিক্ষিত। কিন্তু তবু সান্তায়না তাঁর ভাষার স্বচ্ছতায় বর্তমান কালের অন্যান্য দার্শনিকদের পাশে অনেকাংশেই অজটিল। তাঁর মধ্যবয়সে লেখা 'ডায়া-লোগস ইন লিম্বো'-তে দে মোক্রিতুসের মুখ দিয়ে তিনি যা বলিয়েছেন তার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনবীক্ষা প্রকাশিত। মায়াবাদের এক অপূর্ব পশ্চিমী ভাষ্যে সান্তায়নার মুখপাত্র দে মোক্রিতুস বলেন যে, আনন্দের মতো দুঃখও এক জাগর স্বপ্ন, স্মৃতি ও সত্যের এই জীবনে যার সত্তা শুধু ধরা দেয় প্রবর্তিত, নিঃসঙ্গ প্রতিচ্ছবির মারফতই। কিন্তু প্রজ্ঞার আস্থা হারান না তবু দে মোক্রিতুস, যে প্রজ্ঞা 'মৃত্যুর চেয়েও শাণিত, এবং কেবল বীরের পক্ষেই বরণীয়'; আর যে প্রজ্ঞা প্রতিপক্ষের উন্মাদনার সঙ্গে আপনার উন্মাদনাও বুঝতে শেখায়।

কান্তিবিদ্যায় সান্তায়নার অবদান দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি প্রয়ো-জনীয় অধ্যায় বলে বিবেচিত হবে। 'দ সেন্স অফ বিউটি' নামক গ্রন্থে সৌন্দর্য-তত্ত্ব বিষয়ক পর্যবেক্ষণগুলি সান্তায়না এতো পরিচ্ছন্ন ও মনোজ্ঞভাবে উপ-স্থাপিত করেন যে, অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও কান্তিবিদ্যার আকর্ষণ দুর্বার হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ আয়তন ও

সৌন্দর্য এ দুয়ের সম্বন্ধবিচারে সান্ত্বনা: ‘খেনফোন আর্মেনিয়ার রমণীদের বর্ণিত করেছেন ‘কাল্লাই কাই মেগালাই’ (অর্থাৎ ‘সুন্দরী ও বিপুলকায়া’) ব’লে, এবং এখনও আমরা কারুকে ‘সুন্দরী ও দীর্ঘাঙ্গী’ আর কারুকে ‘সুন্দরী কিন্তু ছোট’ বলে থাকি। অতএব, আয়তন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা সবচেয়ে কম আবশ্যকীয় যেখানে, সেখানেও তার আদর্শ মানে সাধারণকে পেরিয়ে যায়। আর এর কারণ—শক্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন বাদ দিলে —হচ্ছে এই যে আয়তনের অসাধারণত্বে জিনিস চোখে পড়ে।”—এই ভাষ্যটি জানার পর আমরা রূপ-রহস্যের অন্ততঃ একটি জট সহজেই খুলে ফেললাম। এমন কি মনে হ’ল তথ্যটি ত’ আমরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারতাম! সন্দেহ হয়, ক’জন সত্যই পেরেছি? ‘দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী’ বাক্যের দুটি বিশেষণ যে দুটি বিভিন্ন গুণের সমাবেশপ্রার্থী নয়, তারা যে কেবল সুন্দরীকেই সুনিশ্চিত খোঁজে,— এ সত্যের অবলোকন অবশ্যই ব্যাকরণে নেই, যেমন থাকে না ‘পাত্রপাত্রী’র বিজ্ঞাপনে দুটি বিশেষণের বাড়াবাড়ি দেখে বিরক্ত হওয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার সংসারী মনে।

কিন্তু ডায়ালোগস ইন লিম্বো’তে তথাকথিত হাস্যমুখর গ্রীক দার্শনিক দে মোক্রিতুসের ভূমিকায় নিজেকে নামালেও, সান্ত্বনা তাঁর দার্শনিক জীবনে হালকা উচ্ছল বা পরিহাসপ্রিয় হয়েছেন একথা বলা একেবারেই সমীচীন হবে না। বাচনের স্পষ্টতা তাঁর অভি-নিবেশের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ রাখে না। জ্ঞানান্বেষণে হিস্পানী তীব্রতার সঙ্গে সান্ত্বনার দর্শনে সংযুক্ত হয়েছে পরিণত মনুষ্যত্বের প্রশান্তি। তাই গ্রীক দর্শনের ‘কালোকাগাথিয়া’র নির্দেশে সান্ত্বনা তাঁর কান্তিবিদ্যার সূত্রে নৈতিক সম্ভ্রমবোধ ও সৌন্দর্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পুনর্বার স্মরণ করেন ও তাঁর প্লাতোন-সদৃশ চিত্ত-সাম্য বিংশশতাব্দীর অনর্থ ও যান্ত্রিকতার পরিধি পেরিয়ে নন্দনের উপসংহার পায় সত্যশিবসুন্দরের ধ্যানে।

মিগোয়েল দে উনামুনো সান্ত্বনার মতো পরিচ্ছন্ন, যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রামাণিক ন’ন। তাঁর রচনা পড়লে মনে হয় উনা-মুনো এমন এক আন্তরিক উদ্বেগে ভুগতেন যা’র সরল আরোগ্য ছিল না কোনও যুক্তিসিদ্ধ সমাধানের আয়ত-ক্ষেত্রে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দেল সেন্তিমিয়েন্তো ত্রাজিকো দেলা দিদা’য় * উনামুনো পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ঐতিহ্য পুরোটা সামনে রেখে পশ্চিম য়ুরোপের বর্তমান মানসিক নিঃস্বতার তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন কতকটা উদভ্রান্তভাবে। অবিসংবাদী পাণ্ডিত্যে উনামুনো প্লাতোন থেকে ব্যের্গস’ পর্যন্ত য়ুরো-পীয় দর্শনে বহুমুখী নাস্তিক্য ও আস্তিক্যের নজির উদ্ধার করেন তাঁর মূল প্রতিপাদ্যটিতে পৌঁছবার জন্য। উনামুনোর বক্তব্যের প্রাণ একটি মস্ত আক্ষেপ : মানুষ আত্মার অমরতায় বিশ্বাস হারিয়েছে।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রশ্নে পৌঁছে উনামুনো যেমন ইংরেজ দার্শনিক বার্কেলির কৌশলী আস্তিক্য নিয়ে পরিহাস করেন, তেমনি ফরাসী জ্যুল দ্য গোলতিয়েরের চৌকোশ বুদ্ধি, যার বুলি ঠকিব-না-কভু, তাঁর কাছে অভিনন্দনীয় নয়। মনে হয় নাচতে নাচতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার বালখিল্য আর গোঁ ধরে বিশ্বাসে-মিলান বস্তুর দিকে পাদ-মেকং ন গচ্ছামি—এই দুই আতিশয্যের প্রতি সমান বীতরাগ উনামুনোর; এবং সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক, উনামুনো এই দুই চরমের পরিহার করেছেন গ্রীকদের সেই ‘মীদেন আগান’ বা মধ্যম পন্থার অব-লম্বনে। তাই ঈশ্বর কোথাও আছেন আর ঈশ্বর কোথায়ও নেই এই দুই উপপাদ্যের উনামুনীয় সংশ্লেষ : (ঈশ্বর) আমাদিগতে আছেন—‘এসিস-তিয়েনদোনোস’।

ব্যক্তি সত্তার প্রতি হিস্পানীর শ্রদ্ধা নিয়ে উনামুনো যথেষ্ট আবেগময় হ’ন কার্তেসীয় অস্তিত্ববাদ খণ্ডন করতে। তিনি বলেন, সত্য নেই দেকার্ত-ঘোষিত ‘কোগিতো এরগো সুম’ বা ‘ভাবি, তাই আমি হই’ এই নিষ্প্রাণ তত্ত্বে। সত্য হ’ল ‘আমি হই বা আছি, তাই ভাবি’। দেকার্তের নিষ্পন্দ ভাব-তন্ময়তা (বা আধুনিক ফরাসী অস্তিত্ববাদে ভিন্নতর অন্বয়ে গ্রাহ্য হয়েছে) উনামুনোকে মান-বিক সত্ত্বের উপলব্ধিতে এভাবে জাগরূক করে যে তিনি লাতিনেই কার্তেসীয় সংজ্ঞাটির প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করেন : হোমো সুম, এরগো কোগিতো; কোগিতো উৎ সিম মিকাইল দে উনামুনো—

অর্থাৎ, আমি মানুষ, তাই আমি ভাবি; ভাবি বলেই হই আমি মিগোয়েল দে উনামুনো। হিস্পানী চরিত্রের সার-বত্তা এই উদ্বিগ্ন আত্ম-নির্ণয়ে অদ্ভুত-ভাবে ধরা দেয়। আত্মার অমরতা তথা ঈশ্বর থেকে বিযুক্ত মানুষকে বিয়োগা-নুভূতির জ্বালা (সেন্তিমিয়েন্তো ত্রাজিকো) নিয়ে ভ্রাম্যমাণ দোন কি হোতের ভূমিকায় কেঁদে বেড়াতে হবে শতাব্দীর জঙ্গলে জঙ্গলে তার আত্ম-নির্ণয়ের কথা শুনিয়ে—এই আর্তনাদে উনামুনো শেষ করেন তাঁর জীবনবেদ।

মাদ্রিদ থেকে ছয়খণ্ডে প্রকাশিত ওর্তেগা ই গাস্সেতের রচনাবলীর পৃষ্ঠা-সংখ্যা পাঁয়ত্রিশ শ। উক্ত রচনাবলীতে সংকলিত হয়নি এমন আরো খানকয়েক বইও ওর্তেগার আছে। দার্শনিক প্রবন্ধকার ওর্তেগা সমানে রাজনীতি, আইনস্টানীয় পদার্থবিদ্যা, গ্যোয়্তে, কাণ্ট, চিত্রকর গয়্যা, দোন কিহোতে রোমক রাজকুলের ইতিহাস, প্রেম, অর্থ-নীতি তাঁর আলোচনার অঙ্গীভূত করে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যেও বহুপঠিত হবার

---

* ‘Del Sentimiento Tragico de la Vida : Miguel de Unamuno. Espasa-Calpe Argentina, S.A. মূল বইখানি কলিকাতায় দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান প্রবন্ধকার জে ই ক্রফর্ড ফ্লিচকৃত ইংরেজী অনুবাদ ‘Tragic Sense of Life’ ব্যবহার করেছেন। ইংরেজী অনুবাদটি সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য এই যে অনুবাদক উনামুনোর বন্ধু ছিলেন ও তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গতঃ বহু-ভাষাবিৎ উনামুনো ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ইংরেজি অনুবাদটি শুধু যথাযথই হয় না, মূল হিস্পানী সংস্করণকেও পরিমার্জিত করে।

নিশ্চিতি অর্জন করেছেন। কিন্তু অনেক লেখা ও অনেক বিষয়ে লেখা ওর্তেগার খ্যাতিবৃদ্ধির পক্ষে যে যথেষ্ট সহায়ক হয়নি একথা ওর্তেগার শত্রুও মানবে। তাঁর রচনাবলীর এক-পঞ্চমাংশও ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে কিনা সন্দেহ; য়ুরোপের চিন্তানায়কদের সংগে পংক্তিভোজনও তাঁর ভাগ্যে সচরাচর জোটে না।

তবু ওর্তেগা যে বর্তমান শতাব্দীর য়ুরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে স্পেঙলর, ক্রোচে, রাসেল, ডিউঈ বা সার্ত্রের অপেক্ষা কম উল্লেখ্য ন'ন একথা স্বীকার করতেই হয়। সমাজ ও শিল্পী, সভ্যতা ও ব্যক্তি, ঐতিহ্য ও বর্তমান—এই সকল দ্বৈতের প্রত্যক্ষ অনুধাবন ওর্তেগার দর্শনে লক্ষণীয়ভাবে কেন্দ্রত্ব পায় এবং প্রতিটি মীমাংসায় ওর্তেগা নিস্পৃহ মননশীলতার দাবীতে মানসিক সত্তার সকল জারিজুরি পুনর্বিচারের আয়ত্তে আনেন। তাই ওর্তেগার বিখ্যাত গ্রন্থ 'লা রেবেলিয়ন দে লাস মাগাস' (সাধারণের অভ্যুত্থান) আপাত অমানবিকতার সুরে বিজ্ঞাপিত করে যে আজকের জনযুদ্ধ সাধারণ মানুষকে এমন উচ্চাভিলাষী ক'রে তুলেছে যে অগণিত নেতৃত্বের সুযোগ দিতে গিয়ে সমাজ-সভ্যতার নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন ভেঙ্গে যাবে। ওর্তেগা বলেন যে, শহরে শহরে আজ যে মানুষ উপচে পড়ছে তা'র প্রতিবিধান জন্মনিয়ন্ত্রণে নেই; অভ্যুত্থানের উৎকণ্ঠায় সাধারণ-মানুষ নিজেকে বিপন্ন করেও সরকারী দপ্তরের সান্নিধ্য খ'ুজছে। যারা ছড়িয়ে ছিল আজ তা'রা এক জায়গায় এসে জমেছে, চোখে পড়ছে।

উক্ত গ্রন্থে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপন্ন হবার ষোল আনা আশংকা থাকত ওর্তেগা-ভিন্ন অন্য যে কোনও লেখকের, কিন্তু দার্শনিক ওর্তেগা যে-নিরপেক্ষ, জ্ঞান-নিষ্ঠ স্বচ্ছতায় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অপ্রিয় সত্যও বলতে পিছপা হ'ন না, তা গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থরক্ষার অনুমোদনে বিষাক্ত নয়। বাস্তবের প্রতি ওর্তেগার যে দুর্নিবার শ্রদ্ধা তাঁকে মহার্ঘ 'চিরন্তনতার মান' (সুব স্পেকিয়ে আইতের নিতাতিস) প্রবর্তিত করায় পার্থিব 'তাৎক্ষণিকের মানে' (সুব স্পেকিয়ে ইনস্তানাতিস), সেই শ্রদ্ধাই তাঁকে শিখিয়েছিল ইহজগতের সর্বস্বে আস্থা স্থাপন করতে। প্রকৃত হিস্পানীর জীবন-প্রীতিই তাঁকে শ্রেণীস্বার্থের রক্ষা বা নিপাতের ষড়যন্ত্রে ভিড়তে দেয়নি। শুরুতেই ওর্তেগা দর্শনশাস্ত্রের আভিজাত্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। রক্ত-মাংসের মানুষের বাস-করা বাস্তব তাঁর কাছে এতো শ্রদ্ধেয় ছিল যে তিনি দর্শনের চিরাচরিত পাঠ্যনির্ঘন্টকে চরম বলে মানতে নারাজ হয়েছিলেন। কেন কেবল বিশেষ বিশেষ প্রশ্নেরই প্রবেশাধিকার থাকবে দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গনে? জার্মান দার্শনিক গেয়র্ক জিমেল-এর মতো তিনিও দাবী করেন যে 'বাস্তব জীবন থেকে উদ্ভূত মানুষের জিজ্ঞাসা যতো অগভীর বা বিদঘুটে মনে হ'ক না, দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য হতে পারে তা'।

ওর্তেগা, উনামুনো ও সান্তায়না হিস্পানী চিন্তালোকের তিনটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র যেন এক আশ্চর্য আলোর আকাশ নির্মাণ করেছেন। স্পেনীয় জীবনের মর্মকে সেই আলোর নীচে পরিস্নাত দেখা যায়, যদিও মনুষ্যত্বের তীব্রতায় স্পেনের মানুষ ঘুরেফিরে অশান্ত, অনুসন্ধিৎসু। সৌন্দর্য, ঈশ্বর ও মর-জীবন—এই সত্যদের জিজ্ঞাসায় ও অন্বয়ে দোন কি হোতী—মন বাস্তব ও মায়ার বহুধা পরীক্ষিত সমন্বয়ে কসমসের বা সৃষ্টির অনুভবই ফিরে পায়। ধ্বংস নয়, সৃষ্টি; মাদারিয়াগা বলেন যে তাই সবকিছুর পর পৃথিবী থাকেই, সৃষ্টিকার্যের মহাবিস্ময় এই পৃথিবী। যাতে ধ্বংসের শক্তিরা শেষ পর্যন্ত জয়ী না হয়। কারণ সামনে একটি উদ্দেশ্য রেখে চলে সৃষ্টি, ধ্বংসের কোনও লক্ষ্য নেই। ধ্বংসে সহযোগিতা নেই, ধ্বংস মূলতঃ ব্যক্তিক। লীগ অফ নেশন্সের নিরস্ত্রীকরণ বিভাগের অধ্যক্ষ, সান-ভাদর দে মাদারিয়াগা ব্যবহারিক যুক্তি ও আশাবাদীর উত্তাপ নিয়ে তাঁর 'দি ওয়ার্ল্ডস ডিজাইন' নামক গ্রন্থে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, সৃষ্টির যে প্রশস্তি করেছিলেন আজকের যুদ্ধোত্তর পৃথিবী তারই স্মারক, যদি বা মাদারিয়াগা-কথিত 'পরমপিতার লীলা' তাঁর হিস্পানী চিত্তেরই এক দুর্মর প্রাপ্তি যা'র অংশীদার বর্তমান বিশ্বে সুলভ নয়।

মুরনাউ ও "শেষ হাসি"

প্রভাতকুমার দত্ত

১৯২০-২২ সালের জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের ধাক্কায় আচ্ছন্ন। অর্থনৈতিক মন্দা জার্মানীর জীবনকে চারিদিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এই সময়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে অনেকগুলি ছোট ছোট নির্বাক ছবি জার্মানীতে তোলা হয়েছিল। ডাঃ ক্লকোয়ের নামে এক ব্যক্তি এই ছবিগুলিকে 'স্ট্রীট ফিল্ম' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কারণ এই ছবিগুলির প্রধান ও মুখ্য পটভূমিই ছিল রাস্তা। কয়েকটি ছবি—যা এই সময়ে তোলা হয়েছিল তার নাম করলেই 'স্ট্রীট ফিল্ম' কথাটার তাৎপর্য বোঝা যাবে। যেমন দি স্ট্রীট (১৯২৩), দি জয়লেস স্ট্রীট (১৯২৫), ট্র্যাজেডি অফ দি স্ট্রীট (১৯২৭), এ্যাসফল্ট (১৯২৯) ইত্যাদি। ১৯২০ সালের পরবর্তীকালে জার্মান চিত্র-পরিচালকেরা সমাজতান্ত্রিক নতুন বাস্তবতার আদর্শে অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্ট্রীট ফিল্মে মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে ফুটিয়ে তুলে এই আদর্শকে রূপায়িত করার বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। যেমন 'দি স্ট্রীট' নামক ছবিটিতে দেখানো হয়েছিল কিভাবে এক আধাবয়সী ব্যক্তি সংসারের তথাকথিত শান্তি ও নিরাপত্তা একঘেয়ে মনে হওয়ায় শহরের বিশৃংখল জীবন-ধারার ক্ষেত্রে নেমে এসেছিলেন। কিন্তু সেখানে অত্যন্ত ভয়াবহ কয়েকটি ঘটনার সংগে জড়িত হয়ে পড়ায় তিনি দেখলেন যে, এর চেয়ে তাঁর ঘরের নিয়ম-বাঁধা শান্তির জগৎ অনেক ভাল।

ফিল্মের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, 'বাস্তবতা' সব সময়ে চিত্র-পরিচালকদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে। বাস্তবকে পরিবর্তন করা, তাকে বিকৃত করার ইচ্ছা শিল্পীর কল্পনা বা উদ্ভাবন-ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে কিন্তু পরিচালককে সব সময় দেখতে হবে যে, এই পরিবর্তন-করার প্রবণতা যেন তাঁর করায়ত্তে থাকে। পরিচালক এই ক্ষমতাকেই পর্দায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীমত বাস্তবতা সৃষ্টিতে ব্যবহার করবেন। জার্মানীতে যখন এই

মুরনাউ

স্ট্রীট ফিল্মগুলি তোলা হয় তখন আউটডোর সুটিং-এর বিশেষ রেওয়াজ ছিল না। স্টুডিও-র মধ্যে শহরের রাস্তা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি তৈরি করে নিতে হয়েছিল। কিন্তু দোকানের শো-কেস, বৈদ্যুতিক আলো, মোটর-গাড়ী প্রভৃতি খুঁটিনাটি দেখালেই যথার্থ শিল্প-সম্মত বাস্তবতা সৃষ্টি হয় না। বাহ্য বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ঘটনার অন্তর সত্যকে ধরতে হবে, শহরের এই হৈ-হট্টগোলের মধ্যে মানুষের মনের বা উপলব্ধির গভীরে কি আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে তা প্রকাশ করতে হবে। তবেই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের নতুন বাস্তবতার রূপায়ন সার্থক হবে। আর এই গভীরে যাওয়ার ব্যাপারে বস্তুর অন্তর-সত্যকে ধরার জন্য ক্যামেরাকে যিনি সম্পূর্ণ বৈপ্লবিকভাবে ব্যবহার করলেন তিনি হচ্ছেন ঐ বিশের যুগের জার্মান চিত্র-পরিচালক মুরনাউ।

মুরনাউ যে ছবিতে ক্যামেরা ব্যবহারের ব্যাপারে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন সেটির নাম The Last Laugh (১৯২৪) বা শেষ হাসি। শিকারীর বন্দুক যেমন শিকারের পেছনে পেছনে সব সময় ওঁত পেতে থাকে তেমনি ছবিটিতে ক্যামেরা মুক্তভাবে রাস্তা, জনবহুল আবাসস্থল ও হোটেলের প্রশস্ত অলিন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে। তবে এমনিতে গ্রিফিথের হাতে ক্লোজ-আপ যেমন তেমনি চলমান ক্যামেরাও একটা বিরাট বিপ্লব নয়। গ্রিফিথের আগে ক্লোজ-আপ বা মুরনাউ-এর আগে চলমান ক্যামেরা এ দুই-ই ছিল। তবে আসল বিপ্লব যেটা হোল তা হচ্ছে এই পদ্ধতিকে এঁরা তাঁদের স্বকীয় প্রতিভা অনুসারে যেরূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন। গ্রিফিথ চলমান ক্যামেরায় পশ্চাদ্ধাবনের উন্মাদনা বা উত্তেজনাকেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু মুরনাউ এর ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। 'শেষ হাসি' ছবিটির গল্প সাদাসিদে হলেও গভীর মমতায় ভরা। গল্পটি হচ্ছে বার্লিনের একটি বড় হোটেলের বৃদ্ধ দ্বাররক্ষককে নিয়ে। এই দ্বার-রক্ষকটি নিজের পদমর্যাদা ও ইউনিফর্ম সম্পর্কে খুবই গর্বিত। তবে হলে কি হবে দ্বাররক্ষকটির কাজের বয়স পেরিয়ে গেছে। সে আর বার্লিনের বড় বড় ট্যাক্সিগুলির মাথা থেকে ভারি ট্রাংক ও সুটকেস নামাতে পারে না। হোটেলের ম্যানেজার অবস্থা বুঝে দ্বাররক্ষককে হাল্কা ঝাড়পোঁছের কাজ দেন। তার পুরানো জমকালো পোষাকটা ফেরত নিয়ে তাকে একটা সাদা পোশাক দেওয়া হয়। এই হচ্ছে

'শেষ হাসি' ছবির গল্প। গল্পের এই কাঠামোর মধ্যে ছবিটিতে পদমর্যাদায় নেমে যাওয়া দ্বাররক্ষকের সঙ্গে তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সম্পর্কটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বাররক্ষকের মর্যাদাহানির জন্য যে মনোগত দ্বন্দ্ব তা পরিস্ফুট করা হয়েছে একমাত্র ক্যামেরার সুচতুর ব্যবহারে।

'শেষ হাসি' ছবির সত্যিকারের তাৎপর্য বুঝতে হলে ক্যামেরা সম্পর্কে কয়েকটি খুঁটিনাটি কথা জানা অবশ্য প্রয়োজন। এমনিতে দেখতে গেলে ক্যামেরা একটা 'অবজেক্‌টিভ' যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ক্যামেরার সামনে যা কিছু জিনিসই বসানো যাবে তারই ছবি উঠবে। কিন্তু আসলে তো তা হয় না। এখন ক্যামেরাকে তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক বা পারম্পর্যের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়। পরিচালক বা ক্যামেরাম্যান যেখানে চান সেখানে ক্যামেরাকে সংস্থাপন করেন। ক্যামেরা সংস্থাপন নানা ধরনের হতে পারে যেমন ক্লোজ-আপ, লং-সট্‌ কিংবা ওপর থেকে নীচের দৃশ্য নেওয়া বা নীচে থেকে ওপরের দৃশ্য গ্রহণ করা। পরিচালক বিষয়বস্তুকে যে ভাবে উপলব্ধি করেন অথবা দর্শকের মনে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান সেই ভিত্তিতেই তিনি ক্যামেরার স্থান নির্দেশ করেন। তাছাড়া ক্যামেরার অবজেক্‌টিভিটি লেন্সের জন্য অনেকটা সীমায়িত হয়ে পড়েছে। একমাত্র সিনেরামাতে ক্যামেরা মানুষের দৃষ্টির মধ্যে সর্বকিছুকে ধরে রাখতে পারে। কিন্তু ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরায় দৃশ্যের মাত্র ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রী অংশ ধরা পড়ে। সুতরাং পরিচালককে সব সময়েই ভাবতে হয় সমগ্র দৃশ্যের কোন অংশ রাখবেন আর কোন অংশ বাদ দেবেন। ক্যামেরার যে 'অবজেক্‌টিভিটি' সেটা সবটাই নির্ভর করছে পরিচালকের নিজস্ব শিল্প দৃষ্টির ওপর।

মুরনাউ 'শেষ হাসি' তুলতে গিয়ে দেখলেন যে, মিছামিছি বাইরের কতকগুলি দৃশ্য না তুলে যদি বৃদ্ধ দ্বাররক্ষকের পদচ্যুতি ঘটায় জন্য যে মনোবেদনা তাকে পর্দায় পরিস্ফুট করা যায় তবে কাজ হবে অনেক বেশী। অবশ্য বৃদ্ধ ব্যক্তিটির পদমর্যাদা হানির জন্য সবাই যে তার পেছনে টিটকিরি দিয়েছিল তা নয়। এ অবস্থায় একজন রাতের পাহারাদার তাকে প্রকৃত বন্ধুর মত সহানুভূতি জানিয়েছিল। প্রথমে মুরনাউ 'শেষ হাসি' ছবিটির script একভাবে তৈরী করেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর ক্যামেরাম্যান দীর্ঘ অলিন্দে বা করিডরে ক্যামেরা চলমান রাখার বিরাট সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিলেন তখন তিনি চিত্রনাট্যকে আবার ঢেলে সাজালেন। পরিবর্তিত চিত্রনাট্যে দেখি ক্যামেরা বৃদ্ধ ব্যক্তিটির পেছন পেছন তার ফ্ল্যাটবাড়ির বিরাট চত্বর অতিক্রম করে চলেছে যেখানে তার বন্ধু ও প্রতিবেশীরা অভিনন্দন জানাচ্ছে আবার কেউ কেউ পেছনে টিটকিরি দিচ্ছে ও চাপা-হাসির রোল উঠাচ্ছে। হোটেলের অন্ধকার করিডরে যখন বৃদ্ধ তার পুরানো মনের-মত পোশাকটি চুরি করতে এগিয়ে চলেছে তখনও প্রতিক্ষণে ক্যামেরা তার পিছু পিছু চলমান। এমন কি হঠাৎ অত্যধিক মদ খাওয়ায় বাইরের জগৎ বৃদ্ধের কাছে সম্পূর্ণ দোদুল্যমান মনে হওয়ার ভাবটিকেও ক্যামেরা চলমান থেকে সুন্দররূপে ধরে রেখেছে। ছবিটিতে ক্যামেরার ভূমিকা এমনই সুন্দর যে তা মূল অভিনেতার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

'শেষ হাসি' বইটির প্রথম দৃশ্যেই দেখি লং-সটে হোটেলে আটলান্টিকের প্রশস্ত লবি-কক্ষ। দৃশ্যটি ওপর থেকে নেমে-আসা একটি লিফটের সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। ক্যামেরা আস্তে আস্তে সমগ্র লবিটি পেরিয়ে ঘোরানো দরজা আর সেই গর্বিত দ্বাররক্ষকের কাছে গিয়ে পেঁছোয়। দ্বাররক্ষকের পেছনেই হচ্ছে গাড়ি ও বাসে ভর্তি চওড়া রাস্তা যেখানে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য পথচারীরা ইতস্তত দৌড়তে ব্যস্ত। এই দৃশ্যগুলি তোলার জন্য ক্যামেরা বহনের উপযোগী বিশেষ ধরনের উত্তোলক যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল। হোটেলের করিডর বা রাস্তার দৃশ্যগুলিতে ক্যামেরাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'ডলি' যন্ত্র কাজে লাগানো হয়েছিল। মাতলামির দৃশ্য শট নেওয়ার সময় ক্যামেরাম্যান তাঁর নিজের বুকে ক্যামেরা বেঁধে একটি ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসে ছবি তোলেন। 'শেষ হাসি'র কাহিনী প্রথম পুরুষেই বলা হয়েছে ঠিক যেমনভাবে বৃদ্ধ দ্বাররক্ষকটি নিজে দেখেছিল বা ভেবেছিল। ক্যামেরা বৃদ্ধের ভাবনা-চিন্তাকে এমন জীবন্তভাবে ব্যক্ত করেছিল যে সারা নির্বাক ছবিটিতে একটি মাত্র সাব-টাইটেল প্রয়োগ করতে হয়নি।

মুরনাউ তাঁর ক্যামেরাকে এত দ্রুত ব্যবহার করেছেন যে, এক মুহূর্তে আমরা দেখি বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক সুচতুর হোটেল-ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে

রয়েছে, পর মুহূর্তে ম্যানেজার হতভাগ্য বৃদ্ধটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, আবার তার পরমুহূর্তে একজন সাধারণ ব্যক্তি আনমনাভাবে তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। মুরনাউ দেখলেন ক্যামেরা দ্বাররক্ষককে দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাস্রোতকেও ফুটিয়ে তুলছে। 'শেষ হাসি' ছবিতে একটি আশ্চর্য দৃশ্য আছে যেখানে বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক তার পদচ্যুতির পর মূল্যবান ইউনিফর্মটি বুকে আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধটি ছুটে রাস্তা পেরিয়ে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় একবার হোটেলের দিকে ফিরে তাকায়। তার মনে হয় হোটেলের দেয়ালগুলি যেন দুলছে এখুনি যেন তার ঘাড়ে ভেঙে পড়বে। এই যে অনুভব একে আমরা কি বলবো? দ্বাররক্ষক যা দেখেছিল আমরা তাই কি দেখছি? অথবা ক্যামেরা আমাদের বলছে সে কি ভেবেছিল? অথবা এ জিনিস দুয়েরই সংমিশ্রণ?

'শেষ হাসি' ছবিটিতে ক্যামেরা এই-ভাবে দ্রুত চলমান থাকায় বইটি অদ্ভুত-ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছবিটি দেখতে দেখতে দর্শকের ঔৎসুক্য সব সময়ই উচ্চভাবে বাঁধা থাকে। এখানে কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, 'শেষ হাসি' ছবিটিতে আর সব কিছুকে বাদ দিয়ে ক্যামেরাকে বড় বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। এখানে ক্যামেরার সঞ্চালনের পেছনে একটা যুক্তি আছে, শিল্প-সম্মতভাবেই এর প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তা কখনও শিল্পের দাবিকে লঙ্ঘন করতে পারেনি। কারণ ছবিটিতে মুরনাউ ক্যামেরাকে বহুক্ষণ চলমান রেখে মাঝে মাঝে তাকে একেবারে থামিয়ে দিয়েছেন, তাকে সম্পূর্ণভাবে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এতে সমগ্র ছবিটিতে একটি সুসম ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে।

'শেষ হাসি' ছবিটি হলিউডের চিত্র-নির্মাতাদের ওপর অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময়ে আমেরিকার চিত্র-প্রযোজকেরা সবাই জার্মান পদ্ধতিতে ছবি তুলতে আরম্ভ করেন। 'শেষ হাসি' ছবির আদর্শে এর পর আর-একটি বিখ্যাত ছবি তোলা হয় যেটির নাম 'ভ্যারাইটি' (১৯২৫)। কিন্তু ভ্যারাইটি ছবির একটা ত্রুটি এই যে, যেমন মুরনাউ তাঁর ছবিতে ক্যামেরাকে শিল্পগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন এ ছবিটিতে তা করা হয়নি। ১৯৩০ সাল নাগাদ চলচ্চিত্রে শব্দ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার স্বাধীনতায় অনেকটা পরিবর্তন আসে। কিন্তু ক্যামেরার ব্যবহার সম্পর্কে মুরনাউয়ের যে মূল নীতি তার যে খুব বেশী অদল-বদল হয়েছে তা বলা যায় না। মুরনাউ-য়ের সময়ে ক্যামেরাকে সরানোর যে সমস্ত যান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা ছিল এখন তা সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। পর্বতের ওপরে ও সমুদ্রের তলায় এখন ক্যামেরার অবাধগতি। সুতরাং চিত্র-পরিচালকেরা এখন যে ক্যামেরার পরিপূর্ণ ব্যবহারের আরো বেশী সুযোগ গ্রহণ করবেন এটা তো খুব স্বাভাবিক। গত তিরিশ-চল্লিশ বছরের সিনেমার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে যে, ভালো ছবি তোলায় ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ একটা অন্যতম বড় বিষয়। ছবি নাটক নয় যে 'ডায়লগ' দিয়ে ছবির সাফল্য তৈরি করা সম্ভব। আজকালকার ভাল চলচ্চিত্রে আমরা দেখছি কথা কম বলিয়ে ক্যামেরার বিশেষ দৃষ্টিকোণের সাহায্যে ভাবভঙ্গি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। ছবি তোলাতে যন্ত্রের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং যন্ত্রের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার দরকার বৈকি। আধুনিক কালে চলচ্চিত্র ক্যামেরার যে টেকনিকের ওপর ভিত্তি করে এতটা সাফল্য অর্জন করেছে সেদিকে মুরনাউই হচ্ছেন প্রথম পথপ্রদর্শক। আর মুরনাউ যখন ছবি তুলেছিলেন তখনকার স্বল্পযান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধার কথা মনে রেখে 'শেষ হাসি' একটি বৈপ্লবিক সৃষ্টি নয় কি? আজকালকার ডি সিকা, রোসিলিনি, সত্যজিৎ রায়ের ওপর কি আমরা 'শেষ হাসি'র টেকনিকের ছাপ পাই না?

শব্দকল্পদ্রুম

কথার মানে—উত্তর পক্ষ

১। **অম্ভোরূহ**

(গ) পদ্মফুল। 'অম্ভঃ' মানে জল। জল হইতে যাহা উত্থিত হইয়াছে তাহা অম্ভোরূহ। তুলনীয়ঃ মহীরূহ মানে বৃক্ষ।

২। **আঙট**

(গ) অখণ্ড, গোটা। যেমন, আঙট কলাপাতা।

৩। **উপাধান**

(ঘ) তাকিয়া, বালিশ।

৪। **কপিঞ্জল**

(খ) তিত্তির অথবা চাতক পাখী।

৫। **খদ্যোত**

(খ) জোনাকি।

৬। **তনিমা**

(গ) সূক্ষ্মতা

৭। **দাদুরী**

(ক) মণ্ডুক, ব্যাং।

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

৮। **কবোষ্ণ**

(গ) অল্প গরম

৯। **দেয়া**

(ক) মেঘ

"গুরু গুরু দেয়া ডাকে।"

১০। **দ্বিপ**

(ক) কুঞ্জর, হাতী।

হস্তান্তর

কুমারেশ ঘোষ

বিয়েবাড়ি।

আলো। সানাই। বর, বরযাত্রী। কন্যাপক্ষ। মাছ-মাংস-লুচি-পোলাও-দই মিষ্টি- এবং হৈ-চৈ। যথারীতি।

নিমন্ত্রিতেরা আশীর্বাদ করলেন কনেকে। অসীমাকে। জমা হতে লাগলো টেবিল-ল্যাম্প, সিন্দুর-কৌটা, বই, পাউডার-কেস, গহনার-বাক্স ইত্যাদি আর হরেক রকমের শাড়ি উপহার।

একখানা সাধারণ ঢাকাই কাঞ্জিভরম শাড়িও এলো উপহারের মিছিলের সংগে। কোন নিমন্ত্রিতের সামাজিকতার দায় উম্ধারের চিহ্ন। শাড়িটার মধ্যে এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা, কনের নাম এবং দাতার নাম-ঠিকানা ও তারিখ।

অসীমা শ্বশুরবাড়ি গেল।

দু'মাস পরেই তার এক বান্ধবীর বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র এলো হাতে। যেতে হবে। কী দেওয়া যায়? নিজের বিয়েতে পাওয়া শাড়িগুলো বাছতে বাছতে হাতে তুলে নিলো ঢাকাই কাঞ্জিভরমখানা। লতিকে এটা মানাবে ভাল। টিকেটখানা তখনও শাড়ির মধ্যে।। অসীমা সেটা খুলে আর-একখানা কাগজে লতির নাম লিখলো। পরে নিজের নাম। সুতো দিয়ে আটকে দিলো সেখানা শাড়ির ওপরে। স্বামীর সংগে অসীমা নেমন্তন্নে গিয়ে লতিকে দিয়ে এলো সেখানা।

দুর্ভাগ্য, বছর দুয়েক পরেই অসীমা বিধবা হলো। মাস চারেক পরে তার বড় ননদের মেয়ের অসুখের সেবা করতে গেল সে ননদের বাড়িতে। অবশ্য ননদ নন্দাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে।

লতির কিন্তু ঢাকাই কাঞ্জিভরমখানা পছন্দ হয়নি। বিশেষ করে দেশী তাঁতের এত ভাল-ভাল শাড়ি থাকতে এসব শাড়ি কেনা কেন? এই করেই তো বাঙালী উচ্ছন্নে গেল। তাই স্বদেশ-প্রেমিকা লতি রাগ করেই শাড়িখানার ভাঁজ ভেংগে পরেনি। কাউকে দেবার জন্যে তুলে রেখে দিলো। সুযোগ এলো শেষ পর্যন্ত। তার পিসতুতো বোনের সাধে উপহার হিসাবে শাড়িখানাকে হস্তান্তর করলো সে। অবশ্য, তার নামের টিকিট-খানা খুলে নিলো খেয়াল করে।

কথায় বলে, মন না মতি। ননদের বাড়িতে দোতলার ফ্ল্যাটের একটি তরুণের সংগে অসীমার ভাব হলো। ভাব গভীর হলো। এবং ক্রমাগত প্রতি অংগ তার, তরুণের প্রতি অংগ লাগি কাঁদাকাদি শুরু করলো। অতএব একদিন রাত্রে দু'জনে উধাও।

লতির পিসতুতো বোনের ভারি দেমাক। সব কিছুতেই নাক সিঁটকানো স্বভাব। লতির দেওয়া শাড়িখানা দেখে ঠোঁট উল্টে বললে, আহা কী দেওয়ার ছিরি! শাড়ি না মশারি! কাজেই একদিন তাদের পাড়ার একটি মেয়ের বিয়েতে শাড়িখানায় নাম ঠিকানার টিকিট মেরে বিদায় করলো মানে-মানে। লিখে দিলো প্রীতি উপহার। মন্দাকিণীর কিন্তু শাড়িখানা পছন্দই হলো।

পালিয়ে যাওয়া সোজা। পালন করা ভারি শক্ত। ছোকরা অসীমাকে নিয়ে ভাগবার সময় বাপের ক্যাশবাক্স ভেংগে-ছিল, তাই দু'দিন বেশ স্ফূর্তিতেই কাটলো। রাঁচি, পুরী, নৈনিতালের হোটেলে-হোটেলে ফ্লার্টিয়ে যখন ট্যাঁকের পয়সা কমে এলো, তখন কলকাতায় ফিরে এলো তারা। পরে ছোকরা তার এক 'মাসী'র কাছে অসীমাকে রেখে (এক কথায় তাকে বিক্রি করে) পকেটে কিছু নিয়ে সরে পড়লো।

কে জানতো, মন্দাকিনীর স্বামীর 'ঘার-টান' আছে। বাপ ছেলেকে ঘরে টেনে রাখবার জন্যেই বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পতিব্রতার প্রেমের সংগে বার-বনিতার ভনিতার অনেক তফাত। রসিক-নাগর নিয়মিত তার মেয়েমানুষের ঘরে যাতায়াত করতে লাগলো। এবং একদিন বেরুবার সময় স্ত্রীর আলমারি খুলে একখানা শাড়ি বগলে লুকিয়ে নিয়ে তার রসিক নাগরীর শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ দিল সেই ঢাকাই কাঞ্জিভরম শাড়ি-খানা। সুশীলার মুখে একগাল হাসি। সে হাসির দাম কম নয়।

সুশীলার পাশের ঘরেই থাকে অসীমা। দু'জনের খুব ভাব। এক-সংগে খাওয়া বসা, একসংগে হাসি গল্প। দু'জনের অতীত ইতিহাস দু'-জনের কাছে আর অজানা নেই। দু'-জনের বর্তমানে কোন রেষারেষি নেই। দু'জনের অন্ধকার ভবিষ্যতের বিষয় দু'জনেই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে সব এলো-মেলো হয়ে গেল। অসীমা খুন হলো। যে 'বাবু' এসেছিলো তার ঘরে, সে অসীমাকে খুন করে তার সব গয়না নিয়ে পালালো।

কাণ্ড দেখে বাড়ির আর সব মেয়েরা ভয়ে আঁতকে উঠলো। মাসী চেল্লাতে শুরু করলো। পুলিশ এসে লাঠি ঠুকতে লাগলো। দারোগা জেরায় জেরায় জেরবার করে দিল সবাইকে। আর, সুশীলা তার প্রাণের বন্ধুর লাশখানার দিকে চেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো ছোট মেয়ের মত।

তারপর, তারপর এক সময় উঠে গেলো সে নিজের ঘরে। আলমারি থেকে বার করলো পাট না ভাংগা সেই ঢাকাই কাঞ্জিভরম শাড়িখানা। তার বাবুর দেওয়া শাড়িখানা এতদিন সে পরেনি প্রাণ ধরে। আজ তার ভাঁজ খুলে তার প্রাণের বন্ধুর পঙ্কিল মৃতদেহটাকে ঢাকা দিয়ে দিলো পরম যত্নে।

দেখা গেল, শাড়িখানারও সারা জমিটা পোকায় কাটা।

দেশেবিদেশে

॥ একখানি চিঠি ॥

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন; চিঠিখানি আর ডাকে দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি। তাঁর নাতি শ্রীচিরন্তন মুখোপাধ্যায় এনভেলাপখানি ডাকে ছেড়ে, এনভেলাপের ওপরে লিখেছেন: দাদু হাসপাতালে যাওয়ার আগেই এই চিঠি লিখে রেখেছিলেন, তাই পাঠান হ'ল। ইতি—

ডাঃ সুরেশচন্দ্রের চিঠিখানিও সংক্ষিপ্ত:

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনারা আমার শবিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। এক বছরের অধিককাল আমি অসুখে ভুগছি। বর্তমানে সকালে ও বিকালে দশ মিনিট করে হাঁটি। পরে ঘণ্টাখানেক বসি। লিখতে পারি না। ডানহাত অবশ ও কাঁপে। চোখে কম দেখি। পড়া কঠিন। কথা বলতে গেলে জিহ্বা জড়িয়ে আসে। রাত্রে ঘুম হয় না বললেই চলে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবেন যেন এ অবস্থায়ও দিনগুলি আনন্দে কাটে। আশা করি ভাল আছেন। —ইতি শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিখানি আমাদের সম্পাদকের হাতে যথাসময়ে পৌঁছোয় নি; তিনি জবাবও দিতে পারেন নি। চিঠিখানির তারিখের জায়গায় লেখা আছে—শবিজয়া।

॥ আবেদন ॥

চারদিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে আবেদন হচ্ছে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যেন পরিকল্পিত মারাত্মক ৫০ মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ না করেন এবং পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ থেকে একেবারেই বিরত হন। ব্যক্তি ও সংস্থা মানবজাতির বিপদের কথা গণ্য করে এই আবেদন করে চলেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগ্রামশক্তি ও রণসম্ভারের সঙ্গতি কত তা প্রদর্শন যদি এ সব মারাত্মক পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে তবে বলা যায়, যথেষ্ট প্রদর্শন করা হয়েছে। সাধারণভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তি স্বীকৃত। শুধু প্রদর্শন নয়, ক্রিয়া নয়, সংযমও এবং সংযম প্রদর্শনও শক্তির পরিচায়ক। শক্তিমানের পক্ষেই সংযত হওয়া সম্ভব ও শোভন। বিশ্বে সকলেই যখন সোভিয়েটের কাছে এই সংযমের আবেদন জানাচ্ছে তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বের জনমতের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানালে এবং ৫০ মেগাটন নয়, সকল পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণই বন্ধ রাখে তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন সকল দেশের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সুযোগ হারানো উচিত হবে না।

॥ বকশিস ॥

নিউইয়র্কের এক খবরে দেখা যাচ্ছে, বাফেলো বিমান বন্দরে এক কুলি ২৪শে অক্টোবর একটি মোটরগাড়ী বকশিশ পেয়েছে। বলা যায়, মজুরীর বদলে বকশিশ।

দাতা একজন নিউজীল্যান্ডবাসী; নাম মিঃ জ্যাক টিনান। তিনি ঐদিন ১৯৫৫ ওল্ডসমোবাইল মডেলের একটি গাড়ী চালিয়ে বিমানবন্দরে আসেন। গাড়ীতে যে মাল ছিল তা নামানো হ'লে কুলিকে তিনি বললেন, এ গাড়ীটি তোমার। কুলির নাম এডওয়ার্ড পেরেন্স।

কুলি ভাবল, একি ধরণের পরিহাস? সে পরক্ষণেই বলল, আমার মজুরী চুকিয়ে দেন মশাই (ঠাট্টা রাখুন)। তখন মিঃ টিনান করলেন কি বিস্ফারিত লোচন পেরেন্সের নামে গাড়ীর অধিকার লিখে দিলেন এবং চাবির গোছাও তার হাতে দিলেন।

পেরেন্স তো কিছুতেই এ অবিশ্বাস্য ঘটনা মেনে নিতে চাইল না। তখন টিনান বললেন তাঁর বৃত্তান্ত। তিনি ৭৫০ ডলারে গাড়ীটা কিনেছিলেন আমেরিকা সফরের জন্য। সফর হয়ে গেছে, এখন তিনি স্বদেশে ফিরছেন, আর ওটার দরকার নেই।

পেরেন্স যেন স্বপ্ন দেখছে এমনি ক'রে তাকিয়ে রইল। ইত্যবসরে নিউজীল্যান্ডের পর্যটক বিমানে গিয়ে উঠলেন এবং বিমান আকাশে উঠল। বেচারা পেরেন্স শুধু চোখ রগড়ায় আর আকাশের, আর গাড়ীর দিকে তাকায়। তবু ঠিক করে উঠতে পারে না—একি সত্যি?

॥ তাজমহল ॥

গত ২৩শে অক্টোবর সোমবার পূর্ণিমার রাত্রে চার লক্ষ দর্শক জ্যোৎস্না-স্নাত তাজমহল প্রত্যক্ষ করেছে।

এ লোক-সমাবেশ অপ্রত্যাশিত, কিন্তু পুলিশের বিবরণী অনুসারে কোনো দুষ্কার্য এই দর্শনকে ক্ষুণ্ণ করে নি। ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচুর পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুরাতত্ত্ব বিভাগও তাজদর্শনপথে ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কাঠের সিঁড়ি নির্মাণ করেছিলেন। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে দর্শকদের আনার ব্যবস্থা করেছিলেন উত্তরপ্রদেশ সরকার সরকারী বাসে এবং কম ভাড়ায়।

দর্শকদের মধ্যে বহু বিদেশী ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলরেইথ এবং সিংহলের শিল্প-মন্ত্রীও ছিলেন।

॥ মরু বিজয় ॥

অমৃতবাজার পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, সৌরাষ্ট্রে ৩২টি নলকূপ বসানো হয়েছিল। খরচ পড়েছে ছয় লক্ষ আট হাজার। কিন্তু ৩২টির মধ্যে ৩১টিতেই জল পাওয়া যায়নি—জল পাওয়া গেছে মাত্র একটিতে। ঐ একটি নলকূপের জলের দাম পড়ল তবে ছয় লক্ষ আট হাজার।

গুজরাট বিধান সভায় এই তথ্য পরিবেষণ করেন পি ডব্লিউ ডি মন্ত্রী শ্রীআদানি। তিনি আরও বলেন, এ হচ্ছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ এবং এজন্য ২৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল।

মরুভূমিতে যে নলকূপ বসানো হয় তা কি আর তোলা যায় না নাকি?

॥ সুখবর ॥

যুগান্তরের এক সংবাদে প্রকাশ, সঙ্গীতানুরাগীরা যাতে অল্প মূল্যে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রামপ্রসাদ প্রমুখ বিশিষ্ট গীতিকারদের গানের রেকর্ড পেতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তদুদ্দেশ্যে তৎপর হয়েছেন। ঐ সংবাদেই প্রকাশ যে, রাজ্যসরকারের শিক্ষাদপ্তর

এই সম্পর্কে শিগগিরই রেকর্ড কোম্পানী-গুলোর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

এইসব বিশিষ্ট গীতিকারদের গান রেকর্ড করার জন্য কোম্পানীগুলোকে সাহায্য দেবেন; উদ্দেশ্য এই যে, বর্তমানে যে দরে রেকর্ড বিক্রী হচ্ছে তার আদ্ধেক দামে এগুলো পরিবেশন করা।

॥ হরপ্পা ॥

হরপ্পা সভ্যতার আর একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব আড়াই বছরেরও আগে হাজার বছরব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল; কিন্তু এ আমলের মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল ৪০ বছর। সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার এই ভারতীয়েরা পলিওমাইলেটিস, পাইওরিয়া, রিকেট ও বোন-টি বিতে ভুগতেন।

আজ হরপ্পা পশ্চিম পাকিস্থান অন্তর্গত মণ্টগোমারী জেলায় অবস্থিত। ঐ এলাকা থেকে ১৯২২ থেকে ১৯৪৬ অবধি সংগৃহীত ২৬০টি কঙ্কাল পর্যবেক্ষণক্রমে এই তথ্যে পৌঁছোনো গেছে।

এই ধরণের সমীক্ষা ভারতে এই প্রথম এবং এনথ্রপোলজিকাল সার্ভের উদ্যোগে প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কাল পর্যবেক্ষণক্রমে ঐসব রোগ নির্ণয় করা হচ্ছে। কলিকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সমীক্ষা বিভাগ এই পর্যবেক্ষণ কার্য চালাচ্ছেন।

॥ নামবিভ্রাট ॥

লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ, ৫৪টি অক্ষর নিয়ে ওয়েলসের একটি রেল-স্টেশনের নামকরণ হয়েছিল। স্টেশনটি কিন্তু ছোটো। নামটি হচ্ছে ঃ Ilanfairpwilgwyngyllgogerych-windrobwyllantisillogogoch. এই নামের একটি ফলক ছিল স্টেশনটিতে। ফলকটি চুরি হয়েছে—এই হচ্ছে খবর। খবরদাতার গবেষণা এই যে, নামোচ্চারণ বিভ্রাটই এই চুরির মুখ্য কারণ। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে এতাবৎ কোনো খোঁজ পায়নি। এখন ফলকটি তো চুরি হয়েছে, অত বড় নাম দৃষ্টির অগোচরে গেছে, কিন্তু তদন্তকালে পুলিশকে বারে বারে এই নামটির উচ্চারণ করতে হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম, নড়বড়ে দাঁত পড়েও যেতে পারে। গোটা বৃটেনে আর কোথাও এত বড় নাম নেই। প্রকাশ, গত বছরও ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই ফলকটি অপসারণ করেছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আবার ফলকটি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। নামের কি মহিমা!

॥ পুরস্কার ॥

এবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুগোশ্লাভ ঔপন্যাসিক আইভো আন্দ্রিক Ivo Andric। যুগোশ্লাভিয়া এই প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করল। লেখক (অথচ কূটনীতিক) হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভে তিনি দ্বিতীয়; প্রথম হচ্ছেন ফরাসী কবি আলেক্সি লেজার। পুরস্কার দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আন্দ্রিক তাঁর দেশের ইতিহাস থেকে মানবিক পরিণাম সম্পর্কিত বিষয় মহাকাব্যের বলিষ্ঠতা নিয়ে চিত্রিত করেছেন। তাঁর নাম-করা কয়েকখানি বইয়ের নাম হচ্ছে 'মিস', 'দি ট্রাভনিক ক্রনিকল' এবং 'দি ব্রীজ অন দি ড্রিনা'।

আন্দ্রিকের জন্ম ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। সারাজেভো ও জাগরেবে তিনি লেখাপড়া করেন। তারপর তিনি কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধারম্ভে তিনি বার্লিনে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এখন তাঁর বয়স ৬৯। তাঁর যখন দু' বছর বয়স, বাবা মারা যান। মা-ই ছিলেন পরিবারের ভরসাস্থল। পরিবারটি দরিদ্র কারিগরের। আন্দ্রিক দর্শন ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন এবং দর্শনে ডক্টরেট লাভ করেন।

এবারের পুরস্কার-পরিমাণ হচ্ছে ২,৩০,০০০ টাকার সম-পরিমাণ। ১০ই ডিসেম্বর স্টকহোমে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

এর আগে খবর বেরিয়েছে মিঃ হ্যামারশীল্ডকে ১৯৬১ সালের এবং মিঃ এলবার্ট রোন লুথুলিকে ১৯৬০ সালের শান্তি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। মিঃ হ্যামারশীল্ডকে যে অবস্থায় এবং যে কারণে কঙ্গোতে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়েছে তা আজ সুবিদিত। মৃত্যুর পর নোবেল পুরস্কার দান এই প্রথম।

মিঃ এলবার্ট রোন লুথুলি দক্ষিণ আফ্রিকার একজন জুলু খৃষ্টান নেতা; জাতিবৈষম্য দূরীকরণের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকাবাসী হিসেবে মিঃ লুথুলিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পেলেন।

॥ ভুয়া ॥

নেলসনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কতকগুলো এমন জিনিস পাওয়া গেছে যা পরে ঝুটা বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিছুদিন আগে নেলসনের ফ্ল্যাগশিপ ভিক্টরীতে এক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে নেলসনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একখানি খাপ ও তরোয়াল পাওয়া যায় এবং খাপটিতে নেলসনের স্বাক্ষর। স্থির হয় যে, এই স্মৃতিচিহ্ন কোনো যাদুঘরে রাখা হবে। উপহার দুটো পান নৌ-বিভাগ। তাঁরা তাঁদের গ্রীণউইচের যাদুঘরে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ধরা পড়ে যে, এ দুটো ঝুটা মাল। নেলসনের মৃত্যুর বহুপর এদুটি নির্মাণ করা হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। অবশ্য উপহার যিনি বা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের ভ্রান্তিই হয়তো মূল কারণ; হয়তো ঝুটা উপহারটা ইচ্ছাকৃত নয়। ইতিহাসে যাঁরা তারিখ নিরিখ করেন বা ঐতিহাসিক দ্রব্য ঘাটাঘাটিতে যাঁরা অভ্যস্ত একমাত্র তাঁরাই এসব ভ্রান্তি ধরতে পারেন। কয়েক বছরের ব্যবধানে কোনো দ্রব্যের সঙ্গে কোনো অতিবিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতি জড়ানো থাকলেও সঠিক তারিখটা বের করা সাধারণের পক্ষে কঠিন।

কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে প্রায়শঃই দেখা যায় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর অপ্রকাশিত রচনা বা পত্রাদি বেরোয়—সেগুলোও আমরা একেবারে যাচাই না করে গ্রহণ করি। এখানে যদি কোনো ঝুটা মাল থাকে তবে তা ধরা আরও কঠিন। বাংলা দেশের এখান-ওখান থেকে মাঝে মাঝে কোনো পণ্ডিত পোড়া মাটির ভগ্নমূর্তি নিয়ে খবরের কাগজে হাজির হন; সব সময় অত তলিয়ে দেখা সম্ভবও নয়; ঐ সংগ্রহ-সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং সংগ্রাহক ক্রমশ খ্যাতিলাভ করতে থাকেন। তাঁর ভুল যদি কোথাও থাকে, বা মাল যদি ঝুটোই হয়, তবে তা ধরবে কে? ভুয়া পাণ্ডিত্য ধরা বোধ হয় আরও কঠিন।

॥ ঘরে ॥

১৯শে অক্টোবর—২রা কার্তিক : ঘাটশীলার অদূরে আপ হাওড়া-রাঁচী এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত—ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রায় ৫০ জন (ড্রাইভারসহ) নিহত ও প্রায় দুইশত জন যাত্রী আহত—কয়েকখানি কামরা চূর্ণ-বিচূর্ণ।

'ভারত সর্বাবস্থায় সকল ক্ষেত্রে পারমাণবিক পরীক্ষার বিরোধী'—রাশিয়ার প্রস্তাবিত ৫০ মেগাটন শক্তি-সম্পন্ন আণবিক বোমা পরীক্ষা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

২০শে অক্টোবর—৩রা কার্তিক : 'গোয়ার মুক্তি অর্জনের জন্য ভারত সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধা করিবে না'—দিল্লীতে আলোচনা-চক্রে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) দৃঢ় ঘোষণা।

দক্ষিণ রেলপথের নালী ষ্টেশনে মাদুরাইগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেণে দুর্ঘটনা—তিনটি বগীসহ ইঞ্জিন লাইনচ্যুত।

২১শে অক্টোবর—৪ঠা কার্তিক : 'খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা নাই'—কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিলের উক্তি।

'অপরাধ রোধ ও অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করাই পুলিশ বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব'—দিল্লীতে পুলিশ শতবার্ষিকী উৎসবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণ।

২২শে অক্টোবর—৫ই কার্তিক : অসুস্থতার দরুণ সোভিয়েট মহাশূন্যচারী মেজর গাগারিনের প্রস্তাবিত ভারত সফর স্থগিত।

'জার্মাণ শান্তিচুক্তি বিশ্বশান্তির পক্ষে অপরিহার্য'—যুদ্ধবিরোধী দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সংসদ আয়োজিত জনসমাবেশের (কলিকাতা) পক্ষ হইতে ঘোষণা।

২৩শে অক্টোবর—৬ই কার্তিক : কেরলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশংকা—সাংবাদিকদের নিকট কেরল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্তম থানু পিল্লাই'র মন্তব্য—কংগ্রেসের সহিত মতদ্বৈধতার ইঙ্গিত।

'পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে আবহাওয়া দূষিত হইবে'—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আশংকা প্রকাশ—মহড়া বন্ধ রাখিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট আহ্বান।

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক : স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের দাবীর সমর্থনে শিলং-এ পূর্ণ হরতাল—পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সাফল্যমণ্ডিত।

পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের অবসানকল্পে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান—সমগ্র বিশ্বে জনমত গঠন ও রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব উত্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত—পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের পরিসমাপ্তিতে বোম্বাই হইতে ইস্তাহার প্রকাশ।

মহানগরীতে (কলিকাতা) টিউব রেলওয়ে স্থাপন প্রসঙ্গে শীঘ্রই রুশ বিশেষজ্ঞ দলের আগমন—সাংবাদিকদের নিকট পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

২৫শে অক্টোবর—৮ই কার্তিক : 'দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে'—দিল্লীতে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসবে শ্রীনেহরুর দাবী—নরঘাতী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নীচ মনোবৃত্তির নিন্দা।

কেরলে পার্লামেন্টের প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেস-পি-এস-পি বোঝাপড়ার সংবাদ।

পশ্চিমবঙ্গে যড় বামপন্থী ফ্রন্টের আসনবন্টন সমস্যা অমীমাংসিত।

॥ বাইরে ॥

১৯শে অক্টোবর—২রা কার্তিক : 'বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা রাশিয়া বন্ধ না করিলে আমেরিকাও অনুরূপ পরীক্ষা শুরু করিবে'—রাষ্ট্রসংঘের রাজনৈতিক কমিটিতে মুখ্য মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ষ্টিভেনসনের ঘোষণা।

'কম্যুনিষ্ট শিবিরের আভ্যন্তরীণ বিরোধ লইয়া প্রকাশ্য আলোচনা সমীচীন নহে'—মস্কো-এ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে চৌ এন্-লাই-এর মন্তব্য—আলবেনিয়া সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধানমন্ত্রী) সমালোচনায় চীনা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভ।

২০শে অক্টোবর—৩রা কার্তিক : মেগাটন বোমা পরীক্ষা পরিহারের জন্য রাশিয়ার নিকট আর্ত আবেদন—জাপান প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্যম।

অবিলম্বে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য ভারতের দাবী—রাষ্ট্রসংঘের রাজনৈতিক কমিটিতে শ্রীমেনন কর্তৃক সংশোধিত ভারতীয় প্রস্তাব উত্থাপন।

২১শে অক্টোবর—৪ঠা কার্তিক : সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে (মস্কো) আলবেনিয়া ও ষ্ট্যালিনপন্থী নেতাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত—বুলগানিন, ম্যালেনকভ, মলোটভ (রুশ নেতৃবৃন্দ) প্রমুখের বিচার দাবী।

২২শে অক্টোবর—৫ই কার্তিক : 'এক বিশ্বই বর্তমান যুগে মানব সমাজের একমাত্র বাঁচিবার পথ'—ফ্রাঙ্কফুর্টে (পশ্চিম জার্মাণী) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মন্তব্য—জাতীয়তার ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতিকতাকে স্থান দিবার আহ্বান।

৫০ মেগাটন আণবিক বোমা পরীক্ষার বিরুদ্ধে জাপানের প্রতিবাদ রাশিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য।

দল-বিরোধীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে আনীত অভিযোগসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত—কম্যুনিষ্ট জোটে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

২৩শে অক্টোবর—৬ই কার্তিক : সোভিয়েট ইউনিয়নের ৫০ মেগাটনী হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ—রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যালিনভস্কি কর্তৃক বিস্ফোরণের সংবাদ সমর্থন।

রাষ্ট্রসংঘের পরলোকগত সেক্রেটারী-জেনারেল হ্যামারশীল্ডকে নোবেল পুরস্কার (১৯৬১) প্রদান—দক্ষিণ রোডেশিয়ার জন লুথোলীকে ১৯৬০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্পণ।

২৪শে অক্টোবর—৭ই কার্তিক : রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক সর্তসাপেক্ষে কাতাঙ্গার যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত প্রটোকল অনুমোদন।

২৫শে অক্টোবর—৮ই কার্তিক : পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন সীমান্তে পুনরায় প্রবল উত্তেজনা—মার্কিণ সামরিক পুলিশের বলপূর্বক পূর্ব বার্লিনে প্রবেশের সংবাদ।

টিউনিসিয়ায় ফরাসী বিমান কর্তৃক প্রবল বোমা বর্ষণ।

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশন দাবী—৯টি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের মিলিত প্রস্তাব।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা বাড়ীর দাম ॥

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা বাড়ী, Empire State Building (১,৪৭২ ফিট) সেদিন বিক্রি হয়ে গিয়েছে। নিউইয়র্কের Fifth Avenue এবং Thirtyforth Street-এর একটি জমির উপর এটি অবস্থিত। ১৭৯৯ সনে ৭,০০০ ডলারে এই জমি বিক্রি হয়। গত আগস্ট মাসে বাড়ী সমেত জমি বিক্রি হোল ৬৫,০০০,০০০ ডলারে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই বাড়ী বিক্রি হয়েছিল ৫১,০০০,০০০ ডলারে।

॥ দ্রুত পড়া ॥

ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন দ্রুত পড়ার একটা বাতিক দেখা যাচ্ছে। মার্কিন দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট একজন প্রধান দ্রুত পাঠক। তিনি মিনিটে ১,২০০ কথা পড়তে পারেন। বিখ্যাত ইংরাজী লেখক থ্যাকারে, জনসন ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল—এ'রা তিনজনই নাকি খুব দ্রুত পাঠক ছিলেন। দ্রুত পড়ার রেওয়াজ, যা এখন দেখা যাচ্ছে—একে একটা বাতিকের মধ্যে ফেলা যেতে পারে। ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল ও অন্যান্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট অনেকেই নানা স্থানে দ্রুত পড়ার শিক্ষা গ্রহণ করছে। আপিসে যে তাড়া তাড়া কাগজ টেবিলের উপর এসে পড়ছে, তা ঘোড়-দৌড়ের মত দ্রুতভাবে কি করে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়—সেই বিষয়ে অনেকেই এখন বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই দ্রুত পড়ার ব্যাপারে মা'রাও বাদ যাননি—শিশু যখন বিছানায় ঘুমিয়ে, আর মা শিশুর পাশে পাহারায় বসে আছে—সেই সময়ের ফাঁকে কি করে বড় বড় উপন্যাস গলাধঃকরণ করা যায়—তার বিশেষ শিক্ষা মা'রাও এখন নিচ্ছে। এই বিশেষ শিক্ষার ফলে একজন মা জানাচ্ছেন, তিনি সপ্তাহে ২০ খানা বই অনায়াসে শেষ করে ফেলতে পারেন।

এই নূতন বাতিকের প্রচলন দেখে চিন্তাশীল দর্শকরা একটু শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বলেন, দ্রুত পড়ার হয়তো সামান্য গুণ থাকতে পারে, কিন্তু একে সত্যিকার ভাল যুক্তিপূর্ণ পাঠ বলা কিছুতেই যেতে পারে না। দ্রুত-পাঠ কি সত্যি সত্যিই 'পড়া' বলা যেতে পারে? এক মিনিটে কি এক হাজার কথা পড়া ও সম্যকভাবে বোঝা যায়? সত্যিকথা বলতে কি, এই দ্রুত পড়াকে সত্যিকার পড়া বলা যেতে পারে না। কথার উপর কেবল চোখ বুলিয়ে যাওয়া মাত্র। সাধারণ পাঠকরা কোনক্রমে মিনিটে ২০০ কথা পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সত্যকার পড়া ও বোঝা মিনিটে ৫০০ বা তার কিছু বেশী পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু মিনিটে ১০০০ কথা পড়া একেবারে অসম্ভব।

॥ বশীর আমেদ ॥

পাকিস্থানী বশীর আমেদের নাম আমরা কেউই জানি না, কিন্তু কয়েক

বশীর আমেদ

সপ্তাহ আগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক কাগজে এর বর্ণনা ও ছবি বেরিয়েছে এবং আমেরিকার গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য সে পেয়েছে। যুক্তরাজ্যের ভাইস-প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন বি জনসন কয়েক মাস আগে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে বেড়াতে এসেছিলেন। পাকিস্থানের করাচী শহরের চারিদিকে বেড়াতে বেড়াতে একজন উট-চালকের সঙ্গে হঠাৎ তাঁর দেখা হয়, সে তখন উটের গাড়ী নিয়ে খদ্দেরের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জনসন বশীরের সঙ্গে আলাপ করলেন, এবং আমেরিকা যাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। বশীর আমেদের এই আমন্ত্রণ পাকিস্থানী ও আমেরিকান কাগজে ছড়িয়ে পড়িল। এর পরেই আমেরিকান জেট প্লেনে বশীরের আমেরিকা যাত্রা। বশীর আমেদের বয়স চল্লিশ বৎসর; করাচীর এক নগণ্য বস্তির মধ্যে কাদা মাটির ঘরে সে বাস করে। আমেরিকান জেট প্লেনে যাওয়া, জীবনে এই প্রথম জুতো পরা, বড় বড় হোটেলে বাস করা, বিখ্যাত সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলা, প্রেসিডেন্ট কেনেডি হতে অন্যান্য মহামান্য আমেরিকানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ—তার জীবনের এক অদ্ভুত স্বপ্নের পরিসমাপ্তি। মার্কিন দেশের লোকেরাও তাকে দেখে ও তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুব খুশি। বশীর আমেদের লম্বা গোঁফ ও চমৎকার হাসি সেখানকার সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তার এক একটা কথার মূল্য যেন লাখ টাকা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—তোমার উটের অবস্থা এখন কেমন? বশীর উত্তর দিল—উটরা অনেকটা মেয়েদের মত, তারা যে কখন কি করে বসবে তা বলা মুস্কিল। বশীরের ব্যবহারে ও কথা-বার্তায় লিণ্ডন জনসন এমন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, জেট প্লেনে দেশে ফেরবার সময় জনসন বশীরকে বললেন, তুমি যখন দেশে ফিরছ, মক্কার খুব কাছ দিয়ে, তখন মক্কায় নেমে 'হজ' করে যাও, সমস্ত খরচ আমাদের। বশীর খুব সন্তুষ্ট হয়ে হাত তুলে বলেছিল, আল্লার জয় হোক।

॥ সংগীত-নাট্যের জনপ্রিয়তা ॥

নিউইয়র্ক শহরে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চে My Fair Lady নামে একটি সংগীত-নাট্যের অভিনয় আরম্ভ হয়। আজ ১৯৬১-র শেষাশেষিও সেই নাট্য সমভাবে চলেছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন নাট্যশালায় এত বেশী দিন কোন সংগীত-নাট্য ক্রমাগত অভিনীত হয়নি। এই সংগীত-নাট্য যা টাকা অর্জন করেছে তা বিস্ময়কর। বারোটি দেশে এ পর্যন্ত এক কোটি দর্শক ৫২,০০০,০০০ ডলার খরচ করে এই অভিনয় দেখেছে। এই অভিনয়ের ৩০ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রামফোন রেকর্ড বিক্রি হয়েছে। দুই নাট্যকার এই নাটক লিখে পেয়েছেন ৮,০০০,০০০ ডলার। জর্জ বার্ণার্ড শ' লিখিত pygmalion হতে এই সংগীত-নাট্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে শ'এর সম্পত্তির মালিকরা পেয়েছেন ১,৫০০,০০০ ডলার। বিখ্যাত সিনেমা প্রযোজক Warner Brothers এই সংগীত-নাট্যের ছবি করবার জন্য ৫,৫০০,০০০ ডলার দিতে প্রস্তুত আছেন বলে ঘোষণা করেছেন। এর আগে ছবি করবার স্বত্ব হিসাবে Twentieth Century সর্বাপেক্ষা বেশী টাকা দিয়েছিলেন 'Cklahoma' নামে ছবি করবার সময়ে।

অভয়ংকর

॥ নিরালা—হিন্দি কবি ॥

হিন্দি কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি, 'নিরালা' এই ছদ্মনামে যাঁর খ্যাতি, সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রচলিত রীতি-বিরোধী কবিতা রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন 'নিরালা' তাই তাঁকে হিন্দি-সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি বলা হয়। প্রসাদ এবং সুমিত্রানন্দন পন্তের তিনি সমপর্যায়ভুক্ত, হিন্দি-কাব্যে নবযুগ প্রবর্তক ছিলেন 'নিরালা'। হিন্দি-কাব্যে 'ছায়াবাদ' নামক ভঙ্গির তিনি উদ্গাতা এবং প্রায় তিন দশক ধরে তিনি হিন্দি-কবিতার ক্ষেত্রে অধিনায়কত্ব করেছেন।

বাংলা দেশের ক্ষুদ্র তালুক মহিষাদল, মেদিনীপুরে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠির বাবা কর্মসূত্রে এসেছিলেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই মহিষাদল তালুকেই সূর্যকান্তের জন্ম।

তাঁর সম-সাময়িককালের অতিশয় শক্তিশালী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রেরণা এসেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্য ও কর্মের মাধ্যমে। এই দুজন মহাপুরুষ কিশোর বয়সে সূর্যকান্তকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে সূর্যকান্ত বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। এই সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য-সম্ভারের মধ্যে সাধকের মনোভংগী নিয়ে ডুব দিয়েছিলেন সূর্যকান্ত এবং উত্তরকালে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে তাঁর কাব্যে। কৈশোর-যৌবনের দিনগুলি তাঁর কাব্য-সাধনার পথে এনেছে বৈচিত্র্য ও গভীরতা।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'নিরালা'র প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়, সেই কবিতা দিয়েই এই মহৎ কবির কবি-জীবনের বিতর্কমূলক অধ্যায়ের সূচনা। শুরু থেকেই প্রচলিত রীতি-বিরোধী ভঙ্গী নিয়ে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'অনামিকা' রক্ষণশীল সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে লাঞ্ছনা এবং তিরস্কার লাভ করল, পরিচিত পথ ত্যাগ করে নতুন পথের প্রবর্তন-প্রচেষ্টা নিন্দিত এবং উপহসিত হল। বিরুদ্ধ সমালোচনা, বিদ্রূপ এবং উপেক্ষায় নবীন কবি অভিনন্দিত হলেন।

তাঁর একটি শ্রেষ্টতম কবিতা এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সেই কবিতা সেকালের বিখ্যাত সম্পাদক-সমালোচক মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী কর্তৃক অমনোনীত হয়। কবিতাটির অপরাধ যে সেটি ধ্রুপদীভঙ্গীমুক্ত এবং প্রচলিত ছন্দ-প্রকরণের বিরোধী, তা ছাড়া তার মধ্যে ছিল অতি-বাস্তব রোমান্টিক প্রেমের বলিষ্ঠ রূপায়ণ, সেকালের সাহিত্যে তা Taboo ছিল।

নিরালা বুঝেছিলেন যে তাঁর পূর্ববর্তী কালের হিন্দি কবিরা, কবীর, সুরদাস, ভক্ত তুলসীদাস প্রভৃতি মহৎ কবিদের পথ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। তিনি অবগাহন করেছিলেন এই পূর্বসূরীদের ভাবসমুদ্রে। তাঁর ঠিক ওপরকার কবিদের তিনি এড়িয়ে গেছেন, তাদের ছক্‌বাঁধা-গতানুগতিকতা তিনি পছন্দ করেন নি। কবীর, সুরদাস, তুলসীদাসের কবিমানসের সংগে 'নিরালা' সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন কঠোর বাস্তবের। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জীবন-দর্শনের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল তাঁর কবিতায়। এইখানেই তাঁর ব্যতিক্রম। অনুধাবনক্ষমতার প্রাচুর্য ও সৃজনী-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য 'নিরালা'র কবি-জীবনে এনেছে সার্থকতা। ভাবোন্মদনা নয়, ভাবসংহতি 'নিরালা'র কবিকৃতির সর্বোত্তম গুণ। নিরালার ছায়াবাদ তাই শূন্যাশ্রয়ী নয়। বিখ্যাত মহিলা-কবি মহাদেবী বর্মা ছায়াবাদ ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন ঃ—"ছায়াবাদ নিরালম্ব অধ্যাত্ম বা দলগত মতের পুঁজি নয়, ছায়াবাদ আমাদের অন্তরে এনেছে সমষ্টিচৈতন্য এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি, সেই সৌন্দর্যানুভূতি আমাদের অন্তরে জেগে আছে।"

প্রাচীন ভাবধারার সংগে আধুনিক রীতির এ এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। হিন্দি সাহিত্যে এই ছায়াবাদ সম্পর্কে বিরোধ থাকলেও এই মতবাদ সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং আধুনিক কবি-গোষ্ঠী প্রাচীনকালের রক্ষণশীল গণ্ডী থেকে সরে এসে এই ছায়াবাদের উদার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

নিরালাজী স্বয়ং বলেছেন—"গত তিন শতাব্দী ধরে যে সংকীর্ণ পথ দিয়ে কাব্যলক্ষ্মী চল্‌ছিলেন আমি সে পথ বিস্তৃত করেছি, কণ্টকাকীর্ণ পথকে মসৃণ, তৃণগুল্মহীন করেছি।" এই নীতির অনুসরণে তিনি হিন্দি সাহিত্যকে তাঁর মৌল-রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, সেই সংগে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনা অনুবাদ করেছেন হিন্দিতে। 'নিরালা'র বিশ্বাস ছিল বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ দ্বারাই হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। 'নিরালা'র জনপ্রিয় রচনাবলীর মধ্যে 'পরিমল', 'অনামিকা', 'গীতিকা', 'তুলসীদাস', 'নয়াপত্তে', এবং 'বেলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিরালার প্রতিভায় ছিল বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, অপূর্ব পৌরুষদীপ্ত তাঁর রচনা সাহসিকতা এবং তেজে সমুজ্জ্বল। তাঁর গীতি-কবিতায় ছিল অপূর্ব রস-মাধুরী। গান ও কবিতার এক সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন নিরালাজী তাঁর কবিতায়, এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রানুসারী। দ্বিবেদী-যুগের কাব্যপ্রকৃতির বন্ধন মুক্ত করেছিলেন 'নিরালা', কবিতাকে কাব্যময় করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

প্রাচীন প্রতীকের তিনি পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন, প্রাণ সঞ্চার করেছেন, নতুন বাক্‌-প্রতিমা, নতুন প্রতীক সৃষ্টি করেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগতের

অস্তিত্বকে সমষ্টিচৈতন্য দান করে মানুষকে সচেতন করেছেন তার পরিবেশ সম্পর্কে।

প্রকৃতির অতি-রোমান্টিক সৌন্দর্য বা অদ্বৈতবাদের রহস্যঘন সীমারেখায় আপনাকে সীমিত করেন নি নিরালা। 'ছায়াবাদী' অন্য অনেক কবি কিন্তু মিষ্টিকত্বের বন্ধন থেকে আপনাদের মুক্ত রাখতে পারেন নি। এইখানেই অন্যান্য কবিদের সঙ্গে প্রভেদ নিরালাজীর। নিরালা 'ছায়াবাদী'-রীতির শুধু প্রবর্তক নন, তিনি আধুনিক হিন্দি কাব্য ও সাহিত্যের পথিকৃৎ। প্রগতিবাদী লেখক। তাঁর প্রগতিবাদ গোঁড়ামির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তাঁকে প্রগতিবাদীদের মধ্যে অগ্রণী কবি এবং প্রয়োগবাদীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়।

'নিরালাজী' সম্পাদক হিসাবেও কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। এই কলিকাতায় বসে তিনি 'রঙিলা', 'মাতোয়ালা' সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সমকালীন একজন বাঙালী সম্পাদকের কাছে শুনেছি যে ঐ পত্রিকাগুলির মধ্যে যে অপূর্ব সম্পাদকীয় নৈপুণ্যের পরিচয় আছে তা বর্তমান কালের অনেক সম্পাদকের পক্ষে অনুকরণীয়। 'মাতোয়ালা' পত্রিকাটি ছিল বিলাতী Punch জাতীয়। নিরালার গদ্য রচনার মধ্যে 'ছাতির', 'চামার', 'কুল্লিভাই', 'বিলেসুর', 'রাকারিয়া' ও 'নিরুপমা' প্রভৃতি উপন্যাসাবলী তাঁকে হিন্দি কথা-সাহিত্যিকদের প্রথম সারিতে বসিয়েছে।

নিরালার ব্যক্তিগত জীবন ছিল দীর্ঘকালব্যাপী বেদনা ও নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ। শোক, দুঃখ, ক্লেশ তাঁকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে। অতি অল্প বয়সেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। তাঁর প্রকাশকরা তাঁকে ক্রমান্বয়ে বঞ্চনা করেছেন, আর অতিশয় কোমল হৃদয় কবির দানশীলতা ছিল অপরিসীম, যার ফলে অনেক সময় তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছেন। কিন্তু—সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর ছিল অসীম মনোবল ও সহনশীলতা যার ফলে এই দুঃখ, এই শোক তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। অপরিসীম দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি সেই সর্ব দুর্যোগের আবহাওয়া কাটিয়ে উঠেছেন।

আজীবন মানুষের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তাঁর কবিসত্তা নীরব সংগ্রাম করেছে যা কিছু অন্যায় এবং অনাচার তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, আর স্বীকৃতি লাভ করেছেন অনেক দেরীতে, পরিণত বয়সে, জীবন-মরণের সীমানায় এসে দাঁড়িয়ে। হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা) এক স্মরণীয় নাম। উত্তর-সূরীরা সকৃজ্ঞচিত্তে 'নিরালা'র কবি-কৃতির কাছে তাঁদের ঋণ স্মরণ করবেন। এই প্রবন্ধের কিছু তথ্যের জন্য ডঃ সি এল প্রভাতের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

॥ বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কবি ও অধ্যাপক বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। রোমান্টিক কবি হিসাবে তিনি কাব্যামোদীদের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করেছেন। পাঞ্জাবের বহাওয়ালপুর সরকারী কলেজ ও রাঁচীর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। তিনি 'যে দিন ফুটল বিয়ের ফুল', 'এলোমেলো', 'একুশটা মেয়ে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ও চক্রবৎ, শিবাজীর বৌ নামক উপন্যাস এবং 'অর্ধনারী' নামক নাটক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। 'অমৃত' পত্রিকার তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই তাঁর উদারতা ও বন্ধুবাৎসল্যে মুগ্ধ হয়েছেন। উর্দু ও ফরাসী কবিতায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি প্রায় আবৃত্তি করতেন ঃ

> "খুনে জীগর সরাব হায়,
> লখ্‌তে জীগর কাবাব হায়
> ইয়াদ আতি হায় কী দিল্
> মে মেহমানি হায়।"

তাঁর দিলে এই 'মেহমানি' বা বন্ধুত্বের প্রাচুর্য ছিল, তাই তিনি অবিস্মরণীয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ তারিখে বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ছোট্ট কবিতা লিখেছিলেন, সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করে তাঁর হৃদয়ের পরিচয় জ্ঞাপন করছি ঃ

> "পৃথিবীটা আজো ফলে ফুলে আছে ভরে
> আজো তো শিশুরা মার বুকে দুধ খায়,
> অশথ তলায় আজো দুর্বার বাসা—"

নতুন বই

স্বপ্ন হ'ল সত্যি— নিনা ব্রাউন বেকার। অনুবাদ—ধ্রুবজ্যোতি সেন। প্রকাশক— শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী। ৭১, **মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা**-৯। **মূল্য ঃ এক টাকা।**

নিনা ব্রাউন বেকারের বিখ্যাত গ্রন্থ Nickels and Dams নামক গ্রন্থের

বঙ্গানুবাদ করেছেন ধ্রুবজ্যোতি সেন। ধ্রুবজ্যোতি সেন ইতিপূর্বে কয়েকখানি মূল্যবান ফরাসী এবং ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এই গ্রন্থটি অনুবাদে ধ্রুবজ্যোতি সেন অপূর্ব শক্তিমত্তার পরিচয় দান করেছেন। মিঃ উলওয়ার্থ যার জন্মদিনে পাঁচ সেন্ট সম্বল নিয়ে কিছু উপহার সামগ্রী কিনতে গিয়েছিল, তারপর সারা দোকান ঘুরে পাঁচ সেন্টের জিনিস পায়নি, পেয়েছে অপমান 'কর্ণার স্টোরের' সেলসম্যানের কাছে। সেই উলওয়ার্থ অধ্যবসায় বলে উত্তরকালে দোকান তৈরী করল যেখানে শুধু পাঁচ সেন্টের জিনিস পাওয়া যায়। আমেরিকা ও য়ুরোপে এমনই শতাধিক দোকানের মালিক হলেন উলওয়ার্থ। আর ন্যু ইয়র্ক শহরের সবচেয়ে বড় বাড়ি 'উলওয়ার্থ বিল্ডিংস' দেখতে সারা পৃথিবীর মানুষ ছুটে আসে। একদিন স্কুলে মিস্ এমা পেনীম্যান তাকে নেপোলিয়ানের জীবনী পড়তে দেন, সেই গ্রন্থ পাঠেই উলওয়ার্থ জেনেছিলেন লক্ষ্য স্থির থাকলে সব অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাই সামান্য কর্মচারী ফ্রাংক উলওয়ার্থের জীবনস্বপ্ন সফল হয়েছিল। 'স্বপ্ন হল সত্যি' সেই মনীষীর জীবন-কথা, গল্পের আঙ্গিকে মনোহর ভঙ্গীতে লিখিত।

প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ চমৎকার।

বৈষয়িক উন্নতির মূলসূত্র— ডি. জি. কোসুলাস। অনুবাদ—তুষার দে। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং। ৭১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য : এক টাকা।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় কোসুলাস আইজেনহাওয়ারের উক্তি উধৃত করেছেন "—মানুষ এবং সরকার সম্পর্কে বিশ্বের অধুমা দুটি রাষ্ট্রদর্শনের অনুসরণই বর্তমান দিনের মূল সমস্যা। এই দুই মতবাদ আজ বিশ্বের জনগণের সৌহার্দ অনুগত্য এবং সমর্থনলাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ।" এই গ্রন্থে মার্কিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : মুনাফা প্রসঙ্গ, উৎপাদন ক্ষমতা, মজুরি ও মূল্য, পণ্যের ব্যাপক বাজার ও কার্টাতি, ব্যবসার জগত, সংগঠিত শ্রমিক, এই নীতিগুলিকে তুলে ধরেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, তার মূলে উদ্দেশ্য অপপ্রচারের হাত থেকে স্বদেশকে রক্ষা করা।

মার্কিন অর্থনীতির একটা কাঠামো এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আর্তনাদ— (নাটক) : মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থবিতান। ৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য— দু' টাকা মাত্র।

নব-নাট্য আন্দোলনের সবচেয়ে প্রশংসনীয় দিক হল এই যে প্রচুর নতুন নাটক প্রকাশিত হচ্ছে। মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়কৃত 'আর্তনাদ' এমনই একটি নাটক। নাট্যকার নতুন। নাটকের কাহিনী এবং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। অন্ধ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শশীকান্ত, তাঁর পুত্র, কন্যা, পাড়ার রকবাজ যুবক এবং ছদ্মবেশী লম্পট—এই নাটকের মূল চরিত্র। শেষ পর্যন্ত বিচার দৃশ্য, সেখানে রুবী (কনিষ্ঠ কন্যা) আবেগভরে বলে—

"নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমি। জন্ম অবধি দুঃখ, কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়ে এসেছি। সুখ, আনন্দ কাকে বলে তার স্বাদ এখনো পাইনি। এ জীবনে কোনদিন সুখ পাবো কিনা জানি না। তবে তার আশায় দিন কাটাচ্ছি। দুঃখ, কষ্ট, শ্রান্তির পর মানুষ চায় একটু শান্তি, একটু সুখ। তা চাওয়ার অধিকার তার আছে। সে অধিকার থেকে কেউ যদি অন্যায়ভাবে তাকে বঞ্চিত করে, তবে, সে হবে পাপী, মহাপাপী।"

রুবীর কণ্ঠে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের মর্মবাণী ধ্বনিত। নবীন নাট্যকারের নাটকটিতে ভাষার দৈন্য আছে, তবু তাঁর বলিষ্ট কল্পনায় এবং নাটকের বিষয়-বস্তুর প্রশংসা করি। অনুশীলন ও অধ্যবসায় তাঁকে সাফল্য এনে দেবে। জীবনকে তার পরিপূর্ণ মূর্তিতে যদি দেখা যায় তাহলে তার প্রতিফলন কি নাটকে কি গল্পে সার্থকতা লাভ করে। বাস্তবতার রূঢ় রূপকে নিঃসন্দেহে প্রকাশ করার প্রয়োজন, তবে শিল্পকে ক্ষুন্ন করে নয়, এই কথাটি এ যুগের নাট্যকারদের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা— নীরদবরণ রচিত, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য : তিন টাকা।

আমরা সকলেই শুনতাম যে শ্রীঅরবিন্দ পাণ্ডিচেরীতে বাস করে ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন, বৎসরের মধ্যে চারটি দর্শনদিবস ছাড়া কেউই তাঁর সাক্ষাৎ পায় না, তিনি নিজের ঘরে একাকী সর্বদা যোগসাধনা ও তপস্যায় রত থাকেন, আর বাকী সময়ে তাঁর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি রচনা করেন। কিন্তু তিনি যে অনেকেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, অনেকের পত্রের জবাব দিতেন, অনেককে নিয়ে সন্ধ্যার সময় আড্ডা জমাতেন, এ-কথা কজন জানে? উপরোক্ত বইখানি তারই লিপিবদ্ধ প্রত্যক্ষ বিবরণ। এক সময়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের পায়ের হাড় ভেঙে যায় এবং তাঁকে বন্ধনাবস্থায় কিছুকাল বিছানাতে শুয়ে থাকতে হয়। ঐ সময়ে প্রত্যহ সেবায় ও শুশ্রূষাতে নিযুক্ত থাকতেন ডাক্তার নীরদবরণ, অন্যান্য শিষ্যেরাও বিকালের দিকে এসে তাঁকে ঘিরে বসতো, এবং সেই সময়ে নানারূপে কথাবার্তা চলতে থাকতো। যার যা খুশি তাই প্রশ্ন করতো, শ্রীঅরবিন্দ তার জবাব দিতেন, কখনো বা গম্ভীরভাবে, কখনো বা পরিহাসচ্ছলে। তখন প্রচুর হাস্য পরিহাস চলতে থাকতো। কোনো প্রসঙ্গই সেখানে বাদ যেতো না। দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, রাজনীতি, কম্যুনিজম্, দেশের ভবিষ্যৎ, হিটলার প্রভৃতি থেকে শুরু করে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হিপনটিজম, জ্যোতিষ, বুজরুকি, কোনো প্রসঙ্গই বাদ যায়নি। কথাবার্তা অবশ্য ইংরেজীতেই হতো, নীরদবরণই তাঁকে অপূর্ব কৌশলে অতি সহজ বাংলাতে রূপান্তরিত করে এতে পরিবেশন করেছেন। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত এবং তাঁর সর্বমুখী প্রতিভার গুণগ্রাহী, তাঁদের পক্ষে এই বইখানি এক অমূল্য সম্পদ। এক হিসাবে একে শ্রীম লিখিত

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কথামৃতের এক একটি বাণী যেমন চিরদিন স্মরণে রাখার মতো বহুমূল্য, এই পুস্তকের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের এক একটি বাণীও তেমনি বহুমূল্য ও চিরস্মরণীয়। পুস্তকের শেষে একটি বিষয়সূচী দেওয়া আছে। যে কোনো বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত মতামত জানতে ইচ্ছা হবে, ঐ বিষয়সূচী হতে তার নির্দেশ পাওয়া যাবে।

মুখোশের মেলা—শ্রীঅখিল নিয়োগী; সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬; মূল্য : ২·৫০ নঃ পঃ। ডিমাই—১১৪ পৃঃ।

এগারটি রস-রচনা আছে। জীবনে দুঃখ বা কান্নার ভেতর থেকে যিনি আনন্দ বা হাসির উপাদান আহরণ করতে পারেন, তিনিই রসিক। কিন্তু জীবনে যে বৈষম্য বা বৈপরীত্য কান্না বা হাসির কারণ হয়, তার লজিক আর রসরচনার লজিক এক নয়। জীবনে যে আকস্মিকতার সহস্র ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তাই হুবহু রচনায় রিপোর্ট করলে তা সাধারণ পাঠকেরও গ্রাহ্য হয় না। পাঠকের গ্রাহ্য করতে হলে পাঠকের মর্মে যে লজিক আছে তার সমর্থন চাই। তাই জীবন সম্পর্কিত রচনা—তাতে জীবন প্রতিফলিত হলেও, নতুন সৃষ্টি। আলোচ্য পুস্তকে লেখক বিচিত্র চরিত্রের এক মিছিল পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন। লেখকের কথায় : চলতি দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষই মুখোশ পরে পথে চলে। (এ কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়, "প্রত্যেক মানুষই" তাই নয় বলেই প্রকৃতি বৈচিত্র্য) লেখক সেই বাহ্য আচরণের মুখোশ আর প্রকৃত অন্তঃপ্রকৃতির বৈষম্য বা বৈপরীত্য সরস ভঙ্গিতে উদ্ঘাটন করেছেন— অথবা একটি হাসির দর্পণ তুলে ধরেছেন আপনার আমার মুখের কাছে।

অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ— ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য : ছয় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি 'গ্রন্থকারের নিবেদন' ও 'কথারম্ভ'সহ আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং সর্বশেষ 'কথাসাঙ্গ' নামে সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা বিষয়ে সামান্য আলোচনায় সমৃদ্ধ। প্রথম পরিচ্ছেদ 'ইংরাজি কবিতায় অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ', দ্বিতীয় 'অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য', তৃতীয় 'বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ও সত্যেন্দ্রনাথ', চতুর্থ 'হিন্দী কবিতার অনুবাদ', পঞ্চম 'ফরাসী কাব্য ও সত্যেন্দ্রনাথ', ষষ্ঠ 'ফরাসী কবিতার অনুবাদ', সপ্তম 'ওড়িয়া সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণ' এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে আছে 'কয়েকটি কঠিন কবিতা'। পুস্তকখানির বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ঈদৃশ গ্রন্থ প্রণয়ন সহজসাধ্য নয়—তদুপরি আয়াস ও অনুশীলনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থকারের নিবেদন-প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, 'স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় ভূমিতে তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) সিদ্ধ সাধক বলে আমার বিশ্বাস।' এ বিশ্বাস গ্রন্থকারের অমূলক নয়। সত্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের প্রতি আকর্ষণ, অনুসন্ধিৎসা, ভাষা-বিজিগীষা বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। 'কয়েকটি কঠিন কবিতা' প্রসঙ্গে 'মহাসরস্বতী'র আলোচনা নিঃসন্দেহে পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সরস্বতী ও মহাসরস্বতী, অভ্র ও আবীর—'বাণী বিদ্যাদায়িনী সর্বশুক্লা সরস্বতী ও ত্রিজগতের আধারভূতা......আদ্যাশক্তি।'

সত্যেন্দ্রনাথকে কেউ কেউ অসার্থক অনুবাদক বলেছেন। তাঁদের প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে সত্যেন্দ্রনাথ মূলের সুর ও ছন্দকে, ভাব ও ভাষার মাধুর্যকে অনুবাদের মধ্যে জীবন্ত করে তুলতে পারেননি। কথাটি আংশিকভাবে সত্য হলেও হতে পারে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের নিপুণ শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত, তাঁদের কাছে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা সকল ক্ষেত্রে যে রসগ্রাহী হবে না এ কথা সত্য; কিন্তু কোন কোন অংশ যে তাঁর রসোত্তীর্ণ সার্থক সৃষ্টি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তথ্য, তত্ত্ব ও রস এই তিনের সমগ্রতাই সাহিত্য। উপকরণ অংশে তথ্য, সৃষ্টাংশে তত্ত্ব ও রস। সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য তথ্য-প্রধান, তত্ত্ব ও রস তথা উপলক্ষ্য এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রস-প্রধান, তথ্য ও তত্ত্ব উপলক্ষ্য মাত্র। সে কারণ, রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্নে সত্যেন্দ্রনাথ ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি সত্যেন্দ্রনাথ যে বঙ্গভারতীর একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। রবীন্দ্রানুসারী হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ছন্দের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের সন্ধান দিয়েছেন অপ্রচলিত, অনভিজ্ঞাত শব্দের মধ্যে রস-রহস্যের অনুভূতি। সত্যেন্দ্রনাথ কবি হিসাবে যত বড়, তার চেয়েও তিনি বড় অনুবাদক হিসাবে। প্রতিবাদ্য সেই বিষয়ের হিসাবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার, বিশ্লেষণ ও উপমার দ্বারা

প্রতিষ্ঠা করেছেন গ্রন্থকার ডঃ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থখানি চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

পিয়ারী—অবধূত। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৪·০০।

অবধূত বাংলা-সাহিত্যে আগন্তুক নন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণ-পুরের ঘাট', 'বশীকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকের সাহিত্যিক পরিচিতি স্বল্পকালের হলেও, পরিচিতির ব্যাপ্তি স্বল্প নয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি অবধূতের একখানি সুখপাঠ্য রচনা।

রসশাস্ত্রে 'বীভৎস রস' বলে একটি রসের উল্লেখ আছে। পঙ্কের কদর্যতার মধ্যেও যে রসসঞ্চার করতে সক্ষম সেই সত্যকার রসিক ব্যক্তি। অবধূত সেই ধরণেরই একজন রসিক ব্যক্তি। তাঁর রচনার মধ্যে সচেতনতার অভাব যদিও লক্ষণীয় বটে, কিন্তু এমন একটি আবেগ আছে যা হৃদয়কে আলোড়িত করে, কখনও কখনও অভিভূতও করে থাকে। অবচেতনের অতৃপ্ত ক্ষুধা বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে শান্ত থাকে সত্য কিন্তু মরে না। কোন এক বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক ক্ষণে সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং দুর্বার গতিতে পরিতৃপ্তির পথে ছুটতে থাকে। কখনও কখনও তা বিকৃত রূপও ধারণ করে। এই অন্ধ আবেগকে অবধূত সতস্ফূর্ত সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে পারেন, ফলে পাঠকচিত্তে তার আবেদন হয় সাক্ষাৎ। প্রকৃত সাহিত্যের মাপকাঠিতে এই আবেদনের স্থায়িত্ব কতখানি তা বলা যায় না, কিন্তু সাময়িকভাবে এর আবেদন অনস্বীকার্য। তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'-কার সাধন বলে একটি সাধন আছে—এই সাধনের সর্বশেষ সাধন 'মৈথুন' বা 'লতা সাধন'। কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যে দিয়ে নিবৃত্তির পথে এই সাধনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। অবধূত যেখানেই অতৃপ্ত, যৌনাকাঙ্ক্ষার অবচেতনাকে প্রকাশ করেছেন তখনই তাঁর লেখার মধ্যে যেন এই সাধনারই ছোঁয়াচ দেখতে পাওয়া যায়।

জগমোহন বিষ খেয়ে মরে আপন পৌরুষ রক্ষা করল, কিন্তু তার অতৃপ্ত বাসনা গেল না, প্যারীর ভালবাসার মানুষটির শবদেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াবার পেছনে সেই অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষা, এবং এরই পরিণতি দেখতে পাই বৃদ্ধ অন্ধ পণ্ডিত চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর মধ্যে, আর ত্রিশ বৎসর বয়স্কা মুক্তার মধ্যে। গোঁসাইজীর ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে। এ এক সদামুক্ত romantic পরিবেশ —অবধূতের সমস্ত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই পরিবেশের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে। 'পিয়ারী' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নহে, নিছক কাহিনীও নয়, ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশিত নির্যাস। ছাপা, বাঁধাই কাগজ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

॥ সংকলন ও পত্রপত্রিকা ॥

সুজনী— (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংকলন) পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকারের কর্মিসংসদ কর্তৃক প্রকাশিত দামী আর্টপেপারে ছাপা এই সুদৃশ্য ও চিত্রশোভিত ২১৮ পৃষ্ঠার সংকলনটি হাতে নিয়ে মুহূর্তে মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপির ফ্যাকসিমিলি, কবির জীবনী পঞ্জী, তাঁর আঁকা তিনখানি ছবির প্রতিলিপি, যামিনী রায় অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ছবির প্রতিলিপি, শম্ভু সাহা এবং ডোনা লুইনা কুমারস্বামীর তোলা অজস্র আলোকচিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, শিক্ষা, স্বদেশচিন্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ গৃহীত হ'য়ে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। লেখকবৃন্দের মধ্যে কবি নবীনচন্দ্র সেন, সি এফ এণ্ড্রুজ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, আনন্দ কুমারস্বামী, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, অমল হোম প্রভৃতি অজস্র নামের সাক্ষাৎ মেলে। রবীন্দ্র-বিষয়ক কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে আছেন কামিনী রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে প্রভৃতি তিন যুগের কবি। এই সুপরিকল্পিত সংকলনটির বিশদ বিবরণ ছোট পরিসরে উপস্থিত করা সহজ নয়। শিল্পাধিকারের কর্মিসংসদকে ধন্যবাদ জানাই।

বসুধারা— (শারদীয় সংখ্যা)— অস্থায়ী সম্পাদক ত্রিদিবেশ বসু। দাম ৩্ টাকা। এই সংখ্যায় বসুধারার ভূতপূর্ব সম্পাদক পরলোকগত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়ে শারদীয় আবহাওয়ায় 'হরিষে বিষাদ' এনে দিয়েছে, তবু কর্মকর্তাগণের এই কৃতজ্ঞ মনোভাবে আমাদের মনেও শ্রদ্ধা জাগে। এছাড়া আছে তিনটি উপন্যাস—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অজিতকৃষ্ণ বসু ও মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বড়ো ও ছোট গল্প লিখেছেন—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দীপক চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ইত্যাদি অনেকে। তাছাড়া কয়েকটি কবিতা ও ছবি আছে।

আন্তর্জাতিক— (শারদীয় বিশেষ সংখ্যা)। প্রধান সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। দাম ২্ টাকা। অজস্র দেশী ও বিদেশী লেখকের অনুদিত রচনার সমন্বয়ে এই সংকলনটি বর্তমান জগতের শান্তিকামী চিন্তানায়কদের ভাবধারা উপস্থিত করতে প্রয়াসী হয়েছে এবং সার্থকও হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্যাট্রিস লুমুম্বার নিবন্ধ ও ভাষণটি। অবশ্য অন্যান্য প্রবন্ধও যথেষ্ট চিন্তা-উদ্রেককারী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া জার্মাণ কবি ও নাট্যকার বারটোল্ট ব্রেখ্ট রচিত একটি নাটিকা, রুশ লেখক কনস্তান্তিন সিমোনভের একটি কাহিনী এবং ফরাসী কবি লুই আরাগ' এবং বৃটিশ গায়নার কবি মার্টিন কার্টায়ারের দুটি কবিতা। বাঙালী কবিদের মধ্যে আছেন—বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, রামেন্দ্র দেশমুখ, শঙ্খ ঘোষ, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু এবং আরো অনেকে।

আবাহন— (শারদীয় সংখ্যা)— সম্পাদক : সুধীন্দ্রকুমার পালিত। দাম দেড় টাকা। এই সংকলনে গল্প লিখেছেন— রমেশচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার ঘোষ প্রভৃতি সুপরিচিত এবং নবাগত লেখক লেখিকা। কবিতা লিখেছেন—মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং অনেক নবীন কবি। আত্মচিন্তা লিখেছেন—কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। প্রবন্ধ লিখেছেন—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, রণজিৎকুমার সেন এবং অন্যান্য লেখক।

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥
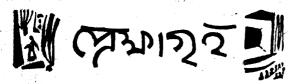
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ও ভারত

চলচ্চিত্রকে যদি কোনো জাতির সংস্কৃতির অন্যতম দ্যোতক হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে একথা অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-সৃষ্টির মহৎ নিদর্শনগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হ'লে সেই সেব দেশের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে একটি পরিমিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, যেমন সম্ভব ওই সব দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে। তা ছাড়া এই ধরণের চলচ্চিত্র উৎসবে এসে জড়ো হন বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র শিল্পী এবং কুশলীবৃন্দ। সব সময় এঁ'দের সঙ্গে সরাসরি কথা কওয়া সম্ভব হয় না বটে; কিন্তু দোভাষীর সাহায্যে এ'রা যেমন নিজেদের মধ্যেও ভাবের আদান-প্রদান করার সুযোগ পান, তেমনি যে-দেশে তাঁরা নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছেন, সে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে এবং বিশেষ ক'রে চলচ্চিত্র-শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেদের ভাব বিনিময়ের সুযোগও পেয়ে থাকেন। আজ জেট-বিমান যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দূরত্বকে সময়ের অনুপাতে প্রচন্ডভাবে কমিয়ে দিয়েছে, তখন বিভিন্ন স্থানের মানুষের মধ্যে মনের দূরত্ব কমিয়ে দিতে এই ধরণের আন্তর্জাতিক উৎসবের—সে চলচ্চিত্র সংক্রান্তই হোক বা শিল্প অথবা কৃষি সংক্রান্তই হোক—প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না।

এবং এরও পরে কথা আছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে এমন সব দেশের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, যে সব দেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত এবং যে দেশের লোকেরা চলচ্চিত্রশিল্পে আত্মনিয়োগ করে ব'লে আমাদের জানা নেই। ধরুন—আর্জেন্টিনা। দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি সম্বন্ধে ক'জন লোক বিস্তৃত খবর রাখে? এবং এই দেশ যদি কোনো চলচ্চিত্র তৈরী ক'রেই থাকে সেটি যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ ক'রতে পারে, তা আমাদের দেশে চলচ্চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট মহলের ক'জনেরই বা জানা আছে? এমন কোনো কথা নেই যে, উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শিত সকল ছবিই উচ্চাঙ্গের শিল্প-নিদর্শন হবে। কিন্তু যদি কোনো চিত্র-রসিকের পক্ষে সবক'টি ছবি দেখা সম্ভব হয়—অবশ্য এই 'যদি' প্রকান্ড বড় 'যদি' এবং প্রায় না-এর পর্যায়ভুক্ত—, তাহ'লে সেই ভাগ্যবান দর্শক শুধু যে বিভিন্ন দেশের ছবির মান সম্বন্ধেই ওয়াকিবহাল হবেন, তাই নয়, তিনি ঐ সব দেশের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে সুরু ক'রে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাদের গৃহের অভ্যন্তরভাগের সাজসজ্জা, নির্মাণ পদ্ধতি এবং শহর-গ্রাম ও প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধেও প্রায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবেন। প্রতি দেশের শিল্পরীতি সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে তাঁর এবং তিনি যদি চলচ্চিত্রকুশলী হন, তাঁর ভাবনা এই সব ছবি দ্বারা সুনিশ্চিত-ভাবে প্রভাবিত হবে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে-সব বিদেশী ছবি আসে তা হয় হলিউড নয় ইংলন্ড থেকে। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, আমরা বিদেশী ভাষা বলতে ইংরেজী ভাষাই বুঝি এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় তৈরী ছবির আকর্ষণ আমাদের কাছে কম। অবশ্য ইংরেজ শাসনের আমলে ছবি যখন কথা কইতে শেখেনি, তখনও আমরা ঐ আমেরিকান এবং ইংলন্ডীয় ছবিই দেখতে পেতুম শাসকবর্গের স্বার্থ-প্রণোদিত আমদানী নীতির ফলে। কিন্তু আজ এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব ভাষা আছে, যা তার সংলাপ নিরপেক্ষ এবং সেই কারণেই যা ছবিকে সর্বজনীনতা দেয়। ইতালীয় ছবি "বাইসিক্‌ল্ থীফ্" বা জাপানী ছবি "ইউকিওয়ারিসু"'র মর্মকথা এবং শিল্পমহিমা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের লোকেরই বোধগম্য। কাজেই আজ যথার্থ শিল্পসৃষ্টি রূপে স্বীকৃত যে কোনও চলচ্চিত্র—সে যে কোনও দেশের তৈরী হোক না কেন—, তার সংলাপের বোধ-গম্যতা ব্যতিরেকেই চিত্ররসিকদর্শককে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে। অথচ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অ-ইংরাজী সংলাপবিশিষ্ট ছবির সাধারণ্যে প্রদর্শিত হবার কোনও ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। এবং শুধু আমাদের দেশই বা বলি কেন, পৃথিবীর কোনও দেশেই সেই দেশের জনসাধারণের বোধগম্য ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার সংলাপবিশিষ্ট ছবির প্রদর্শনীর সম্ভাবনা খুবই কম। সাম্প্রতিক খবরেই জানা গেছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৬,০০০ চিত্র-গৃহের মধ্যে মাত্র ৬০০টি চিত্রগৃহ
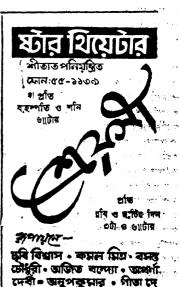
ইংরেজী সাব-টাইটেলওলা বিদেশী চলচ্চিত্র দেখাতে সম্মত হন। আমাদের সারা ভারতে চিত্রগৃহের সংখ্যা ৪,০০০ হাজারের কাছাকাছি। এবং তার মধ্যে সম্ভবতঃ একটিও চিত্রগৃহ এই ধরণের ইংরেজী বা হিন্দী সাব-টাইটেলওলা বিদেশী চিত্র দেখাতে সম্মত হবেন কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আগ্রহশীল মুষ্টিমেয় চিত্ররসিক তাই বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি মারফত তাঁদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু অসংখ্য চিত্ররসিক জনসাধারণের সে-সুযোগ কোথায়? তাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এ'দের কাছে এত কাম্য।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেরিত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের "সেভেন ডটার্স" চিত্রের একটি মনোরম দৃশ্য।

চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক উৎসব প্রথম সুরু করবার গৌরব নিঃসন্দেহে ভেনিস্-এর। ১৯৩২ সালে ভেনিস্-এ প্রথম "International Exhibition of Cinematographic Art". অনুষ্ঠিত হয়। এবং আজকের দিনের বহু লোকই শুনে অবাক হয়ে যাবেন যে, এই ভেনিস্ উৎসবের তৃতীয় বর্ষে (১৯৩৪ সালে) ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত থেকে যে ছবিখানি এই উৎসবে যোগদানের জন্যে পাঠানো হয়, তা হচ্ছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রযোজিত এবং দেবকীকুমার বসু পরিচালিত হিন্দী "সীতা"। এবং শুনে আরও অবাক হবেন যে, এই হিন্দী "সীতা" গ্র্যান্ড প্রিক্স না পেলেও একটি "Certificate of Merits". দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল। এর তিন বছর পরেই ১৯৩৭ সালে ভী, শান্তারাম পরিচালিত "সন্তুকারাম" (মারাঠী) ছবিটিও ঐ ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই উৎসব বন্ধ থাকে। কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ে ভেনিসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব সুরু হয় ১৯৪৬ সাল থেকে। কিন্তু এই উৎসবে ক্রমেই এত বিভিন্ন দেশ থেকে এত বেশী সংখ্যক ছবি প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হবার জন্যে আসতে সুরু করে যে, ১৯৫৬ সাল থেকে উৎসব-কর্তৃপক্ষ এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। তাঁরা একটি নির্বাচন-সমিতিকে দিয়ে সমস্ত ছবির মধ্যে মাত্র ১৪ খানি ছবি মূল প্রতিযোগিতায় প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করবার ব্যবস্থা করেন এবং সেই ব্যবস্থাই আজও পর্যন্ত চলে আসছে। অবশ্য এই ব্যবস্থায় কোনো কোনো মহলে ক্ষোভেরও সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, ঐ নির্বাচন-সমিতির মতামত যে অভ্রান্ত, এমন কথা কে বলছে? এবং তাঁদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রত্যাভূতি (guarantee) কোথায়? কিন্তু ক্রমেই তাঁরা এমন সব লোককে ঐ নির্বাচন সমিতির সভ্য করতে সুরু করলেন, যাঁদের চরিত্র সন্দেহাতীত। এই ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবেই ১৯৫৭ সালে সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" গ্র্যান্ড প্রিক্স দ্বারা সম্মানিত হয়। আবার এই উৎসবেরই নির্বাচন-সমিতি ১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার"কে তাঁর অপু সংক্রান্ত পূর্বতন চিত্র দু'টির অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্যবিশিষ্ট—এই অজুহাতে মূল প্রতিযোগিতার জন্যে মনোনীত করেন না।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রেরিত জাপানী চিত্র "হ্যাপিনেস অফ আস এ্যালোন' চিত্রের একটি দৃশ্য।

সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কোতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে। লেনিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ১৯১৯ সালে রুশ চিত্র-শিল্পের সম্পূর্ণ জাতীয়করণ সমাপ্ত করেন। এরই পঞ্চদশ বর্ষ পালনের জন্যেই

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হাঙ্গেরীয় চিত্র 'রেড্ ইংক'-এর একটি নাটকীয় দৃশ্য।

আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর পর বহুকাল আর কোনো আন্তর্জাতিক উৎসব না হওয়ায় সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৫৯ সালে আবার নতুন ক'রে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে ৪৬টি জাতি এবং ২৮টি ছবি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। এ'দের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র উৎসব হয় এই বছরের (১৯৬১) ৯ই থেকে ২৩এ জুলাই পর্যন্ত। কমবেশী পঞ্চাশটি দেশ এই উৎসবে যোগ দেন এবং মূল সরকারী প্রতিযোগিতায় ২৫০ খানি ছবির মধ্যে ৮২ খানি ছবি দেখানো হয়। ভারত থেকে বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য হন মেহবুব খান। মস্কো উৎসবে যে প্রধান সুর ধ্বনিত হয়, তা হচ্ছে "চলচ্চিত্র-শিল্পে মানবতা, শান্তি এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বের জন্য"।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইয়োরোপে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব করবার যেন একটা প্রতিযোগিতা সুরু হয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৪৬ সালে এডিনবরা চলচ্চিত্রোৎসব ও ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্রোৎসব, ১৯৪৮ সালে কার্লভি ভেরি ও বার্লিন এবং ১৯৫৭ সালে লণ্ডন চলচ্চিত্রোৎসবের গোড়া পত্তন হয়। ভারত ১৯৫২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের অনুষ্ঠান করে। এশিয়া দেশীয় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব হয় জাপানে ১৯৫৪ সালের ২০এ থেকে ২৫এ মে পর্যন্ত। অবশ্য এই উৎসবে ভারত নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দিলেও প্রতিযোগী দেশ হিসেবে উপস্থিত হ'তে পারেনি নানা কারণে।

ভেনিস উৎসব এবং এডিনবরার উৎসব—দুইই আগস্ট মাসে হয়ে থাকে। এবং ভেনিস উৎসবের বিশেষত্ব হচ্ছে, কোনো ছবি যদি আগের কোনো উৎসবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, সে-ছবি ভেনিস উৎসবে প্রবেশাধিকার পায় না।

কান চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ভেনিস বা এডিনবরা উৎসবের আগে জুন-জুলাই মাসে। এই উৎসবে ছবির সংখ্যা নির্দিষ্ট করার নিয়ম নেই। প্রতিযোগী দেশগুলি যে-ছবি পাঠায়, তাই সাদরে গৃহীত হয়। তবে যদি কোনো দেশ কোনো নাম-করা ছবি উৎসবে প্রদর্শিত হবার জন্যে না পাঠায়, তাহ'লে সেই ছবিকে 'বিশেষ আমন্ত্রণ' জানানো হয়। কানের প্রথম চলচ্চিত্রোৎসবেই (১৯৪৬) চেতন আনন্দ পরিচালিত হিন্দী চিত্র "নীচা নগরী" গ্র্যাণ্ড প্রিক্স লাভ ক'রে ভারতকে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করে।

এডিনবরার চলচ্চিত্রোৎসব সাধারণতঃ আগস্ট মাসে তিন সপ্তাহ ধ'রে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে নূতন শিল্পী ও কুশলী এবং চলচ্চিত্রে নূতন ধারা প্রবর্তনের প্রতি নজর রাখা হয় এবং যে-সমস্ত দেশ অন্য উৎসবে বিশেষ প্রাধান্য পায় না, তাদের নির্মিত চিত্র দেখবার জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। এডিনবরা উৎসবের শ্লোগানই হচ্ছেঃ "The Living Cinema."

বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে নাকি রাজনৈতিক মতবাদের মূল্য দেওয়া হয় এবং সেই কারণে সকল দেশ এই উৎসবে

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রেরিত বুলগেরীয় চিত্র "প্রেভর স্টার"-এর একটি নাটকীয় দৃশ্য।

প্রোগ্রাম করে না। বার্লিন উৎসবের প্রতি বিভিন্ন দেশ শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারছিল না ব'লে উৎসবের উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবার জন্যে ১৯৫৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক জুরীর ব্যবস্থা করেছেন।

লণ্ডনের চলচ্চিত্রোৎসবকে "Festival of Festivals" বলা হয়। কারণ এই উৎসবে ইয়োরোপের বিভিন্ন উৎসবে যোগদানকারী ছবির মধ্যে মাত্র উচ্চাদর্শবিশিষ্ট এবং শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান-প্রাপ্ত ছবিগুলিই দেখান হয়। সেই কারণে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর মাসে। লণ্ডন চলচ্চিত্রোৎসব শুরু হয়েছে ১৯৫৭ থেকে। এই উৎসবে ১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" ন্যাশন্যাল ফিল্ম থিয়েটার প্রদত্ত পুরস্কার "দি সাথারল্যাণ্ড ট্রফি" লাভ করে।

"কার্লোভি ভেরি" চলচ্চিত্রোৎসবে ১৯৫৭ সালে রাজকাপুর প্রযোজিত এবং শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত হিন্দী ছবি "জাগতে রহো" গ্র্যাণ্ড প্রিক্স লাভ ক'রে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানে ভূষিত হয়।

আমেরিকার সান্‌ফ্রান্সিস্কোতেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব হয়ে থাকে। এই বছর এই উৎসবের অন্যতম জুরী নির্বাচিত হয়েছেন তপন সিংহ।

১৯৫২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠান করবার ন'বছর বাদে আমাদের ভারত সরকার তাঁদের মিনিস্ট্রি অফ ইন্‌ফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং-এর উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব সুরু করেছেন গেল ২৭শে অক্টোবর থেকে রাজধানী নয়াদিল্লীতে। এই উৎসব ওখানে এক সপ্তাহ ধরে চলবে। নয়াদিল্লীর পর যথাক্রমে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ পালন করা হবে, ৩রা থেকে ৯ই, ৭ই থেকে ১৩ই এবং ১০ই থেকে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত।

এই চলচ্চিত্র উৎসবে ৩৮টি দেশ থেকে ৪০টি পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং ৫০টি দলিল চিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মনোনীত হয়েছে। দিল্লীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি বেসরকারী সমিতি চিত্রগুলিকে মনোনয়ন করেছেন।

২৭শে অক্টোবর তারিখে নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, "যে-সময়ে জগতের রাজনৈতিক আবহাওয়া আমাদের নিরানন্দ করে তুলছে, পৃথিবীর আকাশে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে এবং পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে বহু লোক এখানে এসে মিলিত হয়েছেন, পরস্পরের প্রতি জঙ্গী মনোভাব নিয়ে নয়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর করবার জন্যে।" এই উদ্বোধন উৎসবে সমাগত অতিথিদের জাপানী চিত্র "নামোনাকু মজুসিকু উৎসুকুসিকু" (Happiness of us Alone) দেখানো হয়।

উৎসব উপলক্ষ্যে আগত বৈদেশিক প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে জার্মান অভিনেত্রী কারিণ ডুর, জাপানের উরি শিরিকাওয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অভিনেত্রী ভ্যালেরিণ গেরন, হংকংয়ের জুলিয়া শীহ্ ইয়েন, ভিয়েৎনামের গুয়েন থি থুই বীনহ এবং জার্মানীর মিঃ টনি সিলার অভ্যাগতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই উদ্বোধন উৎসবে ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বৈজয়ন্তীমালা, শ্যামা, নন্দা, মঞ্জু দে, যমুনা, সরোজা দেবী, সাবিত্রী গণেশান, রাজ কাপুর, শিবাজী গণেশান, দেব-আনন্দ, অশোককুমার, বলরাজ সাহনী, শশী কাপুর, রাজেন্দ্রকুমার এবং আর, গণেশ।

চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষ্যে প্রদর্শিতব্য ছবিগুলির মধ্যে যেগুলি খুব নামকরা বলে শোনা যাচ্ছে, তাদের একটা নাতি-দীর্ঘ তালিকা এইখানে দেওয়া হ'ল :—

(১) আর্জেন্টিনার 'আমোরিনা', (২) চেকোশ্লোভেকিয়ার 'দি হায়ার প্রিন্সিপল্', (৩) ফ্রান্সের 'দি ক্রসিং অব দি রাইন', (৪) জার্মানীর 'দি ব্রীজ', (৫) জার্মানীর 'লাভ হ্যাংস্ অন্ দি গ্যালোজ', (৬) জার্মানীর 'প্রোফেসার ম্যাম্লক', (৭) হাঙ্গেরীর 'রেড ইঙ্ক', (৮) জাপানের 'হ্যাপিনেস অব আস্ অ্যালোন', (৯) রুমানিয়ার 'দি ড্যানিয়ুব ওয়েভ্স্' এবং (১০) যুগোশ্লাভিয়ার 'মিস্ স্টোন'।

১৯৫২ সালের মতই এবারের উৎসবও প্রতিযোগিতামূলক হবে না। ২রা নভেম্বরের একটি বিশেষ সমাপ্তি উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যোগদানকারী চিত্রগুলিকে ভারতের পক্ষ থেকে স্মারক পারিতোষিক দ্বারা সম্মানিত করবেন।

কলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহের উদ্বোধন করবেন পশ্চিম-

বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আজ ৩রা নভেম্বর তারিখে স্থানীয় লাইট হাউস চিত্রগৃহে। এই সপ্তাহে এখানকার পাঁচটি চিত্রগৃহে—লাইট হাউস, মেট্রো, এলিট, রাধা এবং পূর্ণ—প্রতিদিন একটি করে ৩৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং তার সঙ্গে প্রায় সমসংখ্যক দলিল চিত্র দেখানো হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলেকে চেয়ারম্যান করে এখানে যে আঞ্চলিক সমিতি গঠিত হয়েছে, তার অন্যান্য সভ্যবৃন্দ হচ্ছেন—শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা গুপ্ত, শ্রীঅজিত বসু, শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রী এস, রাউত রায়, শ্রীশ্যামলাল জালান, শ্রীসুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার, শ্রীবিহারীলাল আগারওয়াল, শ্রীরতিলাল মেহ্‌তা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগীয় স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীএস, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়।

নরেন্দ্র মিত্রের 'ভুবন ডাঙগা' অবলম্বনে পরিচালিত 'শাস্তি' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

মঞ্চাভিনয় :

রঙমহলে "চক্র" : রচনা : ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ; পরিচালনা : সলিল সেন ; সুরসৃষ্টি : ভি, বালসারা ; মঞ্চ পরিকল্পনা : অমলেন্দু সেন ; আলোক-সম্পাত : অনিল সাহা ; ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরদাস মিত্র, রবীন মজুমদার, সুরধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, শোভন লাহিড়ী, সরযূবালা, শিপ্রা মিত্র, দীপিকা দাস কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, কবিতা রায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ৩০এ শ্রাবণ, ১৩৬৮ (ইং ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬১), স্বাধীনতা দিবস থেকে চলছে।

"চক্র" নাটকের পরিচয়সূত্রে বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা নিজের স্বার্থের জন্য পারে না, সংসারে এমন কিছুই নেই...... অকল্যাণের পথে আনে যে কেবল বহুল অনর্থ তাই নয়, অনেক সময় নিজের সমাধিও তারা নিজেরাই রচনা করে ; ঐ লোকগুলোরই আর এক নাম ক্যারেয়ারিষ্ট।......"চক্রে"-এর নায়ক মনীশ লাহিড়ী......অমনি একটি careerist যে তার এগিয়ে চলার পথে যা কিছু পেয়েছে, তা যতই সুন্দর বা সফল হোক না কেন, স্বার্থের নিষ্ঠুর প্রয়োজনে সব কিছু তচনচ্‌ ক'রে দলে চলে গিয়েছে।"

'বাটোয়ারা' চিত্রে প্রদীপকুমার ও নিরুপা রায়

তবু "চক্র" নাটক দেখবার পর সন্দেহ জাগে মনীশ লাহিড়ী সত্যিই কি কেরিয়ারিষ্ট? না সে এক স্বভাব-অপরাধী? নিজের বিধবা শ্যালিকার অর্থ হস্তগত করবার জন্যে সে ত' তাকে অনায়াসেই বিবাহ করতে পারত'। তা না ক'রে অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের দায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তার এত শঠতা কেন? বিধবা শ্যালিকা সুজাতা যখন তার স্বরূপ বুঝতেই পারল, তখন মনীশ তার জ্ঞাতসারেই যদি শিশুহত্যা করত, তাকে নিবৃত্ত করবার মত বাধা কোথায় ছিল? সম্পত্তির লোভে বিবাহিতা দ্বিতীয় স্ত্রী বিজয়াকে হত্যা না ক'রে তার ভাই সুধাকান্তকে

পৃথিবীর থেকে সরে যেতে কি অধিকতর বুদ্ধিযুক্ত হ'ত না? এবং সুধাকান্তকে সাধারণ বুদ্ধি-বিবর্জিত ক'রে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি আর্সেনিক প্রয়োগই করতে হয়, তাহ'লে সে প্রয়োগ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করবেন না, মনীশ লাহিড়ী কি এমনই শিশু-সুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন বা নির্বোধ? নিজের কন্যা মাধবীর পাণিপ্রার্থী জয়ন্তকে লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্যে ঠেলে দেবার প্রয়োজনীয়তা কি? প্রথমা স্ত্রী সুলতা মনীশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তারই অবৈধ সন্তানকে [illegible] করতে লাগল কোন্ অজ্ঞাতবাসে এবং কি যাদু বলে শক্তি সঞ্চয় ক'রে?—এই রকম বহু প্রশ্ন দর্শকের মনে জাগে "চক্র" নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে।

"চক্র" নাটকের মঞ্চোপস্থাপনা এবং অভিনয়কে অনবদ্য করে তোলবার জন্যে রঙমহলের শিল্পীবৃন্দ এবং কুশলীগণ, সলিল সেনের পরিচালনায় প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। অমলেন্দু সেনের মঞ্চ পরিকল্পনা এবং অনিল সাহার আলোক-সম্পাত থেকে সুরু ক'রে ভি, বালসারার সুর-সৃষ্টি পর্যন্ত প্রতিটি বিভাগেই নেপথ্য কর্মীরা অসামান্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য আকাশের সঞ্চরমান মেঘের গতি নাটকীয়তার প্রয়োজনেও অতখানি দ্রুত করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। ওতে মনে হয়েছে, দর্শক যেন চলন্ত ট্রেণের কামরার মধ্যবর্তী ঘটনা দেখছেন।

অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগও যেমন আছে মনীশ লাহিড়ীর ভূমিকায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায় তেমনি সেই সুযোগকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেননি। তাঁর বাচন, অঙ্গবিক্ষেপ এবং পরিবর্তনশীল মনোভাব প্রকাশক দৃষ্টি ও মুখভঙ্গী চরিত্রটিকে সজীবতা দিয়ে তাঁর অভিনয়কে স্মরণীয় করে তুলেছে। সুজাতার ভূমিকায় শিপ্রা মিত্র বাচনে এবং মূকাভিনয়ের সাহায্যে অন্তরের দ্বন্দ্ব এবং ভাব প্রকাশে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পিতৃস্নেহে লালিত সরলপ্রাণা মাধবীর মিষ্ট চরিত্রটি মিষ্টতর হয়ে উঠেছে দীপিকা দাসের স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে। প্রেমময়ী মঞ্জুলার ভূমিকাকে মূর্ত করে তুলেছেন কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়। কবিতা রায় ফ্যাক্টরী কর্মী মৃন্ময়ের স্ত্রী, মলিনার ভূমিকার ব্যথা-বেদনা, সত্যনিষ্ঠাকে অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথিতযশা অভিনেত্রী সরযূবালা মনীশের প্রথমা স্ত্রী সুলতার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন। বয়স তাঁর অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্যকে অনেকখানি হরণ করে নিলেও সুলতার চরিত্র-চিত্রণে তাঁর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ বহু স্থানেই দর্শকের মনকে আলোকিত করেছে। কৌতুকাভিনেতা জহর রায় উদ্ভট চরিত্রগুলির দিকে মনোনিবেশ করেছেন অনেকদিন থেকেই। সুধাকান্তের ভূমিকায় তিনি আর একবার প্রমাণ করলেন টাইপ চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। মনীশ লাহিড়ী এবং সুজাতার অবাঞ্ছিত পুত্র ভাস্করের ভূমিকায় শোভন লাহিড়ী সাধামত সুঅভিনয় করেছেন। অপরাপর শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (হৃষীকেশ) রবীন মজুমদার (জয়ন্ত), অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃন্ময়), হরিধন মুখোপাধ্যায় (ঝুনঝুনওয়ালা) এবং অজিত চট্টোপাধ্যায় (বংশী)। সবশেষে বলতে হয়, এনাটকের সমগ্র অভিনয় স্বভাবতই মেলোড্রামাটিক, প্রয়োজনানুযায়ী আবেগ প্রবণতার সুরে বাঁধা।

মিনার্ভার "ফেরারী ফৌজ" :

"ফেরারী ফৌজ" বর্তমান যুগের ত্রিংশ দশকের প্রথম ভাগের স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত নাটক। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্য সেনকে পুরোভাগে রেখে যে বিপ্লবী দল বাঙলা দেশের গ্রামে শহরে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করেছিল, "ফেরারী ফৌজ" তাদেরই জীবনালেখ্য। ৮ই আষাঢ়ের "অমৃত"-এ "ফেরারী ফৌজ"-এর অভিনয় আলোচনার শেষের দিকে বলেছিলুম, "নবদিগন্তের সূচক 'ফেরারী ফৌজ' দর্শকচিত্তজয়ী হয়ে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসেই করতে পারি।"—"ফেরারী ফৌজ"-এর অভিনয় আবার ক'রে দেখতে গিয়ে দেখে আনন্দ হ'ল, "ফেরারী ফৌজ"-এর অভিনয় ইতিমধ্যেই অগণিত জনচিত্ত জয়ে সমর্থ হয়েছে। শেষের দিকে, কিছু পরিবর্তনের ফলে এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে তাপস সেন প্রবর্তিত চিত্তবিভ্রমকারী অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য যোজনায় বিপ্লবী শান্তি রায়ের মৃত্যু একটি মহত্তর রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সমস্ত নাটকটির একটি সার্থক সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে।

॥ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি সম্মেলন ॥

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি সম্মেলন আরম্ভ হবে আগামী ৩রা নভেম্বর থেকে পার্কসার্কাস ময়দানে। প্রদর্শনী, কবি সম্মেলন, সংস্কৃতিকচক্র প্রভৃতির সমাবেশে এ সম্মেলনটি অনন্য পূর্বানুষ্ঠিত সম্মেলন অপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। এ সম্মেলন যুগ্মভাবে সম্পাদনা করছেন মৈত্রেয়ী দেবী এবং গোপাল হালদার।
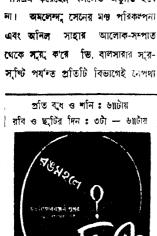
খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড—পাকিস্থান প্রথম টেষ্ট

পাকিস্থান : ৩৮৭ রাণ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জাভেদ বার্কি ১৩৮, মুস্তাক মহম্মদ ৭৬, সয়িদ আমেদ ৭৪। হোয়াইট ৬৫ রাণে ৩, বারবার ১২৪ রাণে ৩, এ্যালেন ৬৭ রাণে ২ উইকেট)।

ও ২০০ রাণ (আফাক হোসেন ৩৩। ব্রাউন ২৫ রাণে ৩, এ্যালেন ৫১ রাণে ৩ এবং বারবার ৫৪ রাণে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড : ৩৮০ রাণ (কেন ব্যারিংটন ১৩৯, মাইক স্মিথ ৯৯, এ্যালেন ৪০। মহম্মদ মুনাফ ৪২ রাণে ৪ উইকেট)।

ও ২০৯ রাণ (৫ উইকেটে। ডেক্সটার নটআউট ৬৬, বারবার নট আউট ৩৯, রিচার্ডসন ৪৮। ইনতিখাব আলম ৩৭ রাণে ২ উইকেট)।

১ম দিন (২১শে অক্টোবর) : পাকিস্থান ২৫৪ রাণ (৩ উইকেটে। জাভেদ বার্কি ১০৩ এবং মুস্তাক মহম্মদ ৪৬ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। হোয়াইট ৩১ রাণে ২ এবং বারবার ৬২ রাণে ১ উইকেট পান)।

২য় দিন (২২শে অক্টোবর) : পাকিস্থান ৩৮৭ রাণ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ইংল্যাণ্ড ১০৯ (২ উইকেটে। ব্যারিংটন ৫১ এবং এম জে কে স্মিথ ৪৫ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। মহম্মদ মুনাফ ২৫ রাণে ২ উইকেট)।

৩য় দিন (২৪শে অক্টোবর) : ইংল্যাণ্ড ৩২১ রাণ (৬ উইকেটে। রাসেল ২২ এবং মারে ৪ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন)

৪র্থ দিন (২৫শে অক্টোবর) : ৩৮০ রাণে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের সমাপ্তি। পাকিস্থান ১৪৯ রাণ (৯ উইকেটে। আফাক হোসেন ২ রাণ এবং হাসেব আসান কোন রাণ না ক'রে নট আউট থাকেন। ব্রাউন ১৮ রাণে ৩, এ্যালেন ৪০ রাণে ৩, বারবার ৩৮ রাণে ২ এবং ডেক্সটার ১০ রাণে ১টা উইকেট পান)।

৫ম দিন (২৬শে অক্টোবর) : ২০০ রাণে পাকিস্থানের ২য় ইনিংসের সমাপ্তি। ইংল্যাণ্ড ২০৯ রাণ (৫ উইকেটে। ডেক্সটার ৬৬ এবং বারবার ৩৯ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন)।

লাহোরে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্থানের প্রথম টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৫ উইকেটে পাকিস্থানকে পরাজিত করেছে। খেলার পঞ্চম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৩৫ মিনিট পূর্বে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। খেলার ৪র্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৮০ রাণে শেষ হ'লে পাকিস্থান ১ম ইনিংসের রাণ সংখ্যায় ৭ রাণে অগ্রগামী হয়ে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে লাঞ্চের কয়েক মিনিট আগে। মাত্র দুটো ওভার খেলার পরই লাঞ্চের জন্যে খেলা বন্ধ হয়। পীচের অবস্থা ব্যাটসম্যানদের সহায়ক ছিল; এই অবস্থায় খেলাটা ড্র যাবে বলেই সকলের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে আগে থেকে কিছু ধারণা করা যে কত ভুল তার প্রমাণ এক্ষেত্রেও হাতে-নাতে পাওয়া গেল। অনিশ্চিত ফলাফলের জন্য ক্রিকেট খেলার যে মহান ঐতিহ্য তা এই টেষ্ট খেলাতেও অক্ষরে অক্ষরে অক্ষুন্ন রইলো। পাকিস্থান ২য় ইনিংসের খেলায় দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পড়লো, দলের মাত্র ৯৩ রাণে পাঁচজন খেলোয়াড় অর্থাৎ দলের অর্ধেক আউট। ৪র্থ দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ৯টা উইকেট পড়ে পাকিস্থানের মাত্র ১৪৯ রাণ উঠেছে। ফলে ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে খেলাটা চলে যায় এবং ইংল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত জয়লাভের এই সম্ভাবনা হাত ছাড়া করেনি—৫ উইকেটে পাকিস্থানকে পরাজিত করে।

২১শে অক্টোবর খেলা সুরু হয়। পাকিস্থান টসে জয়ী হয়ে প্রথম দিনের খেলায় ৩ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রাণ করে। ইংল্যাণ্ডের বোলাররা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটান দিয়ে মাত্র ৩টে উইকেট পান। পীচ বোলারদের সহায়ক ছিল না। আশ্চর্যের কথা, প্রথম ত্রিশ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড ২৪ রাণে ২টো উইকেট ফেলে দেয়; কিন্তু পরে পাঁচকে বশে আনতে পারেনি। পাকিস্থানের প্রাথমিক পতন রোধ করেন ৩য় উইকেটের জুটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির 'ব্লু' জাবেদ বার্কি এবং সয়িদ আমেদ। লাঞ্চের সময় পাকিস্থানের রাণ ছিল ২টো উইকেট পড়ে ১০৫। দলের ১৬২ রাণে সয়িদ আমেদ নিজস্ব ৭৪ রাণ ক'রে আউট হলে ৩য় উইকেটের জুটি ভেঙ্গে যায়। ৩য় উইকেটের জুটিতে ১৩৮ রাণ ওঠে। সয়িদ ১৮০ মিনিট খেলে ১২টা বাউণ্ডারি করেন। ৪র্থ উইকেটে বার্কি'র সঙ্গে জুটি বাঁধেন মুস্তাক মহম্মদ। বার্কি ১০৩ এবং মুস্তাক ৪৬ রাণ ক'রে এইদিন নট আউট থাকেন। বার্কি'র ১০৩ রাণ তুলতে ২৯০ মিনিট সময় লাগে—তাঁর রাণে ১৩টা বাউণ্ডারী ছিল। টেষ্ট খেলায় বার্কি'র এই প্রথম সেঞ্চুরী। মুস্তাকের ৪৬ রাণ তুলতে ৯২ মিনিট সময় লাগে। এইদিন বার্কি এবং মুস্তাকের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৯২ রাণ ওঠে। এই দিনের খেলায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—উইকেট-রক্ষক মারের হাতে ইমতিয়াজ আমেদ 'ক্যাচ' দিয়ে আম্পায়ারের কাছে এগিয়ে যান এবং নিজেকে 'আউট' ঘোষণা ক'রে খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্থান ৩৮৭ রাণের মাথায় (৯ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। বার্কি ও মুস্তাক মহম্মদের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ১৫৩ রাণ ওঠে। এই দিন বোলার বারবারের ভাগ্য ভাল ছিল না; তাঁর বলে ব্যারিংটন, পুলার এবং ডেভিড পাকিস্থান খেলোয়াড়দের আউট করার একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

পাকিস্থানের মতই ইংল্যাণ্ডকে প্রথম ইনিংসের সূচনায় বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়—দলের ২১ রাণে ২টো উইকেট পড়ে যায়। এই ভাঙ্গনের মুখ প্রতিরোধ করেন ৩য় উইকেটের জুটি কেন ব্যারিংটন এবং মাইক স্মিথ। এই দু'জনের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণ এই দিনে আর ইংল্যাণ্ডের কোন উইকেট পড়ে না। ২টো উইকেট পড়ে দলের ১০৯ রাণ ওঠে। ব্যারিংটন ৫১ এবং স্মিথ ৪৫ রাণ ক'রে নট আউট থেকে যান।

পাকিস্থানের নামকরা বোলার হাসিব হাসান আহত থাকার দরুণ ফিল্ডিংই এইদিন করেন নি।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড ৫½ ঘণ্টার খেলায় ২১২ রাণ করে ৪টা উইকেট হারিয়ে। মোট রাণ দাঁড়ায় ৩২১, ৬ উইকেটে। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রাণ ছিল ২ উইকেটে ২০৫—ব্যারিংটন ৮৭ এবং

এম, জে, কে স্মিথ

মহম্মদ মুনাফ

স্মিথ ৯৪ রাণ। পূর্ব দিনের নট আউট ব্যাটসম্যান ব্যারিংটন এবং স্মিথ ৪ ঘণ্টা ১০ মিনিটের খেলায় ৩য় উইকেটের জুটিতে দলের ১৯২ রাণ তুলে দেন। ব্যারিংটন সেঞ্চুরী (১৩৯ রাণ) করেন কিন্তু স্মিথ মাত্র এক রাণের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। স্মিথ এবং ব্যারিংটন দু' জনেই রাণ আউট হন।

৯৯ রাণে আউট হওয়ার দুঃখ স্মিথের এই নতুন নয়। ১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ডস মাঠের ২য় টেস্ট খেলায় স্মিথ ৯৯ রাণের মাথায় উইকেট রক্ষক ওয়েটের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। তবে রাণ আউট হওয়ার দুঃখ বড় বেশী মর্মান্তিক। পাকিস্থানের বিপক্ষে স্মিথ প্রথম টেস্ট খেলায় মামুদ হোসেনের একটা বল মিড অনে পাঠিয়ে রাণের উদ্দেশ্যে দৌড় দেন; কিন্তু তাঁর জুটি ব্যারিংটন নিজের গন্ডী না ছাড়ায় স্মিথ মাঝ পথ পর্যন্ত এসে নিজের ক্রিজে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন; কিন্তু সময়ে পৌঁছতে না পারায় রাণ আউট হন। এই ৯৯ রাণকে বলা হয় 'শক্ত গাঁট'; কারণ সেঞ্চুরী করার জন্যে অস্থির হয়ে ৯৯ রাণের মাথায় অনেকেই আউট হয়েছেন। টেস্ট খেলায় ৯০ রাণের ঘরে স্মিথ এই নিয়ে চারবার আউট হলেন। স্মিথের এবারের ৯৯ রাণের মধ্যে ১৩টা বাউন্ডারী ছিল। এই '১৩' সংখ্যাটাও আবার ইংরেজদের কাছে অশুভ।

চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রাণ দাঁড়ায় ২৭১, ৩টে উইকেট পড়ে: ব্যারিংটন তখন ১২৫ রাণ ক'রে নট আউট আছেন।

কেন ব্যারিংটন ৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট খেলে ১৩৯ রান ক'রে রান আউট হন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ব্যারিংটন এই নিয়ে তিনটে সেঞ্চুরী করলেন এবং এই ১৩৯ রান তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান।

পূর্বে দুটো টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন ১৯৫৯-৬০ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে—১২৮, ব্রিজটাউন এবং ১২১, পোর্ট অব স্পেন।

এই দিন অফ্-স্পিনার হাসিব হাসান ৩১ ওভার বল ক'রে ৭৮ রাণ দিয়ে ১টা উইকেট পান। অনেক খেলোয়াড় এবং দর্শকের মতে তাঁর বোলিংয়ে 'জার্কিং'-এর লক্ষণ ছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৮০ রানে শেষ হলে পাকিস্থান প্রথম ইনিংসের রানের ব্যবধানে ৭ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিন ইংল্যান্ডের বাকি ৪টে উইকেটে ৫৯ রান উঠে মোট ৩৮০ রান দাঁড়ায়। লাঞ্চের জন্যে খেলা ভাঙ্গতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি থাকতে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। পাকিস্থান মাত্র দু' ওভার বল খেলতে পায়।

টেড ডেক্সটার

ইংল্যান্ডের এই ৩৮০ রান করতে ৯ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় লাগে।

পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা খুবই খারাপ হয়। দলের ৩৩ রানের মাথায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উইকেট পড়ে যায়। পঞ্চম উইকেট পড়ে দলের ৯৩ রানে। কিন্তু দলের শেষ খেলোয়াড়দের দৃঢ়তার জন্যে এইদিন ইনিংস শেষ হয়নি—৯ উইকেট পড়ে ১৪৯ রান দাঁড়ায়। পাঁচ রান তোলার সহায়ক ছিল: কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই পাকিস্থানের খেলায় ভাঙ্গন ধরে। ৪র্থ দিনের খেলা ভাঙ্গার মুখেই দলের ৯ম উইকেট প[illegible] এক ঘণ্টা পনের মিনিট খেলার পর বারবারের বলে বোল্ড হ'ন দলের ১৪৮ রানে।

খেলার শেষ দিনে পাকিস্থানের ২য় ইনিংস ২০০ রানে শেষ হয়ে যায়। ১০ম উইকেটের জুটিতে আফাক হোসেন এবং হাসিব হাসান দলের ৫২ রান তুলে দেন। আফাক হোসেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন। ব্রাউন, এ্যালেন এবং বারবার প্রত্যেকে ৩টে করে উইকেট পান।

খেলার এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্যে ২০৮ রানের প্রয়োজন হয়: হাতে খেলার সময় ছিল ২৫০ মিনিট। দ্রুতগতিতে রাণ না তুললে খেলায় জয়লাভ সম্ভব নয়—এই কথা ভেবেই ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সেইভাবে খেলেছিল। সময়কে পিছনে ফেলে ইংল্যান্ড রান তুলতে থাকে। এদিকে পাকিস্থানও আদা-জল খেয়ে খেলতে থাকে জয়লাভের উদ্দেশ্যে। তারা ইংল্যান্ডের ওপর এক সময়ে আধিপত্যও লাভ করে ১০৮ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে। ইংল্যান্ডের মাত্র ২ রানে ১ম উইকেট পড়ে যায় এবং ২য় উইকেট পড়ে দলের ১৭ রানে। এই ভাঙ্গনের

ডেভিড এ্যালেন

মুখে ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করেন ৩য় উইকেটের জুটি ন্যাটা খেলোয়াড় পিটার

কেন ব্যারিংটন

জাভেদ বার্কি

রিচার্ডসন এবং মাইক স্মিথ। এ'রা দু'জনে ৭০ মিনিটের খেলায় দ্রুতগতিতে কেবল দলের ৬৯ রানই তুলে দেননি, ইংল্যাণ্ডের ভিত পাকাপোক্ত করে তুলেন। ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার উভয় ইনিংসেই 'গোল্লা' করেন।

এক সময়ে খেলার গতি পাকিস্থানের পক্ষে অনেকখানা ঝুকে ছিল; কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডেক্সটাব হাল ছাড়েন নি; ডেক্সটার খুব মাথা ঠাণ্ডা করে দৃঢ়তার সংগে খেলে নিজস্ব ৬৬ রান তুলে শেষ পর্যন্ত নট-আউট থেকে যান। ইংল্যাণ্ডের ১০৮ রানের মাথায় যখন লেগ-স্পিনার ইন্তিখাব আলাম রিচার্ডসন এবং রাসেলকে আউট করেন তখন খেলা ভাঙ্গতে ১২০ মিনিট বাকি ছিল; জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ১০০ রান। ডেক্সটার এবং বারবার ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে জয়লাভের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক রান অর্থাৎ ১০১ রান তুলে দেন খেলা ভাঙ্গার ৩৫ মিনিট আগে। ফলে পাকিস্থান প্রথম টেস্ট খেলায় ৫ উইকেটে পরাজিত হয়।

চা-পানের সময় জয়লাভের জন্যে ইংল্যাণ্ডের ৬৮ রানের প্রয়োজন ছিল; তখন হাতে ছিল ৯০ মিনিট সময় এবং ৫টা উইকেট। ইংল্যাণ্ড দলের শেষ ৬৯ রাণ তুলে দেয় ৫৫ মিনিট সময়ে।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ক্রিকেট

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের আগামী টেস্ট খেলাগুলি সম্পর্কে নিখিল ভারত ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং এম সি সি দলের মধ্যে নিম্নলিখিত চুক্তি হয়েছে ঃ

টেস্ট খেলার দিনগুলিতে পিচের ওপর কোন রকম আচ্ছাদন দেওয়া হবে না। অবিশ্যি বৃষ্টি পড়লে উভয় দলের অধিনায়কের সম্মতি নিয়ে পিচের বাইরে ম্যাট পাতা চলতে পারে।

টেস্ট খেলার নির্দিষ্ট সময় ৫ দিন এবং প্রতিদিনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলা হবে। মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে ৪৫ মিনিট এবং চা-পানের জন্যে ২০ মিনিট সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কলকাতায় খেলা আরম্ভ হবে বেলা ১০টায় কিন্তু অন্যান্য স্থানে খেলা আরম্ভের সময় বেলা ১০টা ৩০ মিনিট এবং খেলা সমাপ্তির সময় ৫টা ৫ মিনিট।

সাধারণ খেলার নির্দিষ্ট সময় প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা এবং খেলা আরম্ভের সময় বেলা ১০টা ৩০ মিনিট।

বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা

আমেরিকার বিখ্যাত 'World Tennis Magazine'-এ এডওয়ার্ড সি পোটার বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের খেলার গুণাগুণ বিচার ক'রে একটি ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই তালিকাটি বিশ্বের টেনিস মহলে আধা-সরকারী তালিকা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পুরুষদের তালিকায় মিঃ পোটার যে দশজন খেলোয়াড়কে স্থান দিয়েছেন তার মধ্যে ভারতীয় এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণাণ ৮ম স্থান পেয়েছেন। পুরুষদের তালিকায় ১ম ও ২য় স্থান পেয়েছেন যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসন এবং রড লাভের। মহিলা বিভাগে ১ম স্থান পেয়েছেন বৃটেনের এ্যাঞ্জেলা মোর্টিমার এবং ২য় স্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ।

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা

নিখিল ভারত লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের সম্পাদক ভারতীয় লন্ টেনিস খেলোয়াড়দের খেলার গুণাগুণ বিচার ক'রে চলতি বছরের জন্যে খেলোয়াড়দের নামের এই ক্রমপর্যায় তালিকাটি প্রকাশ করেছেন ঃ

পুরুষ বিভাগ ঃ ১ম রমানাথন কৃষ্ণান, ২য় প্রেমজিৎলাল, ৩য় জয়দীপ মুখার্জি, ৪র্থ আখতার আলী, ৫ম নরেশ কুমার, ৬ষ্ঠ এ জে উদয়কুমার ও ৭ম ভি আর বালসুব্রামানিয়ম।

মহিলা বিভাগ ঃ ১ম মিস ডি অ্যাম্পিয়া, ২য় মিস এল পাঞ্জাবী, ৩য় মিস আর টাণ্ডানী ও ৪র্থ এল উডব্রীজ।

জুনিয়ার বিভাগ ঃ ১ম বিনয় দেওয়ান ২য় গোপাল ব্যানার্জি, ৩ এইচ এল দাস, ৪র্থ গোপাল রায়, ৫ম আর ভেঙ্কাটেসন ও ৬ষ্ঠ এস এস মিশ্র।

।। ভারত সফরে এম সি সি দল ।।

পুনায় অনুষ্ঠিত এম সি সি দল বনাম সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের তিন দিনের ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ৩৪৬ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এ জি মিলখা সিং ৭৪, এইচ কে গোরে ৫৪, এস পি গায়কোয়াড় ৫৩, প্রেম ভাটিয়া ৪৯, জে ভি দিভেচা ৪৮ নট আউট। নাইট ৪৭ রানে, বারবার ১৪ রানে এবং ডেক্সটার ৩৩ রানে ২টি ক'রে উইকেট পান)।

ও ৬৭ (৩ উইকেটে গোরে ৩০। ব্যারিংটন ৩ রানে ২ এবং পুলার ৭ রানে ১ উইকেট)।

এম সি সি ঃ ৪১৭ (ব্যারিংটন ১৪৯, পুলার ৬৪, মারে ৭৪। বিশ্বনাথ ১৬১ রানে ৬, প্রসন্ন ১১৩ রানে ২ এবং ওয়াদেকার ১১ রানে ১ উইকেট)।

ভারত সফরে এম সি সি দলের উদ্বোধনী খেলায় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দল টসে জয়ী হয়ে প্রথম দিনের খেলায় ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩৫ রান করে। মিলখা সিং, গোরে, গায়কোয়াড় এবং ভাটিয়া দৃঢ়তার সংগে ব্যাট করেন। লাঞ্চের সময় বিশ্ববিদ্যালয় দলের কোন উইকেট না পড়ে ৭৮ রান ওঠে। দলের ১১৪ রানে গায়কোয়াড়, ১৭০ রানে মিলখা সিং, ২১৬ রানে গোরে, ২২১ রানে ওয়াদেকার এবং ঘোরপাড়ে—এই পাঁচজন

খেলোয়াড় আউট হ'ন। চা-পানের সময় বিশ্ববিদ্যালয় দলের রান ছিল ১৮৫, ৫ উইকেট পড়ে। ২০০ রানের পর এম সি সি দল নতুন বল নিয়ে খেলার ভোল পাল্টে দেয়—৩৫ মিনিটের খেলায় মাত্র ২১ রান দিয়ে তারা তিনটে উইকেট পায়।

খেলার দ্বিতীয় দিনে বিশ্ব-বিদ্যালয় দল ৩৪৬ রানে (৯ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় তারা ৪ উইকেট হারিয়ে ১১১ রান করে। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ভাটিয়া এবং ইঞ্জিনীয়ার ৪০ মিনিটের খেলায় দ্রুতগতিতে ৪৯ রান করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর এম সি সি দল প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু ক'রে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান তুলে দেয়। বিশ্বনাথ ৬৫ রানে ৩টি উইকেট পান। দুলের ১১৫ রানে রাসেল, ১১৭ রানে পুলার, ১৫০ রানে পারফিট এবং ১৬২ রানে ডেক্সটার—এই চারজন পর পর আউট হ'ন।

খেলার তৃতীয় দিনে এম সি সি দলের প্রথম ইনিংস ৪১৭ রানে শেষ হয়। কেন ব্যারিংটন ১৪৯ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিশ্বনাথ ১৬১ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৪ উইকেট পড়ে এম সি সি দলের ২০১ রান দাঁড়ায়। উইকেটে কেন ব্যারিংটন ৪২ এবং মারে ২৩ রান করে নট আউট ছিলেন। তৃতীয় দিনে ব্যারিংটন এবং মারের ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ১৩৩ রান ওঠে। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৩২০, ৫ উই-কেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন ব্যারিংটন (৯১ রান) এবং নাইট (১৫ রান)। লাঞ্চের ৯০ মিনিট পর এম সি সি দলের প্রথম ইনিংস ৪১৭ রানে শেষ হলে তারা ৭১ রানে এগিয়ে যায়।

চা-পানের বিরতির ২০ মিনিট আগে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায় তাদের ৩টে উইকেট পড়ে ৬৭ রান দাঁড়িয়েছে। ব্যারিংটন ব্যাটিংয়ে যেমন ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দেন তেমনি দিলেন বোলিংয়ে ৩ রানে ২টো উইকেট নিয়ে।

রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ের ভারত বিখ্যাত রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আগামী ১০ই নভেম্বর থেকে শুরু হবে। এ বছরের প্রতিযোগিতায় ৪৬টি দল নাম দিয়েছে। এই ৪৬টি দলের মধ্যে ৬টি দল—অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ (গত বছরের বিজয়ী), ক্যালটেক্স ক্লাব, ক'লকাতার মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং টাটা স্পোর্টস ক্লাব ৩য় রাউণ্ডে 'বাই' পেয়েছে। বাকি ৪০টি ক্লাব খেলবে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র ১০টি দল দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে।

॥ সুব্রত মুখার্জি কাপ ॥

দিল্লীর গেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতি-যোগিতার সেমিফাইনালে গুর্খা মিলি-টারী স্কুল (দেরাদুন) ২—০ গোলে বোম্বাইয়ের সেন্টপলস হাইস্কুলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে।

ক'লকাতার রাণী রাসমণি স্কুল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ের খেলায় দিল্লীর মডার্ণ স্কুলকে ১—০ গোলে পরাজিত ক'রে সেমিফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে তাদের খেলা পড়ে হায়দরাবাদের চন্দ্রঘাট স্কুলের সঙ্গে।

। রাণী রাসমণি স্কুল ১—০ গোলে হায়দরাবাদের চন্দ্র ঘাট গভর্ণমেন্ট স্কুলকে পরাজিত করে ফাইনালে দেরা-দুনের গুর্খা মিলিটারী স্কুল দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

সন্তোষ ট্রফি—পূর্বাঞ্চলের খেলা

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার (সন্তোষ ট্রফি) পূর্বাঞ্চলের লীগের খেলায় বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর-প্রদেশ এবং বিহার—এই পাঁচটি প্রদেশ যোগদান করেছিল। কিন্তু বিহার একটি খেলার পর প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় উড়িষ্যা, আসাম ও উত্তরপ্রদেশ দল দু'টি ক'রে পয়েন্ট না খেলেই পেয়েছে। সম্প্রতি উড়িষ্যা দল ৬—১ গোলে উত্তরপ্রদেশ দলকে পরাজিত ক'রে ৩টে খেলায় ৫ পয়েন্ট লাভ করেছে। আসাম ও উড়িষ্যার খেলাটি ১—১ গোলে ড্র গেছে। বাংলা দল উড়িষ্যার সঙ্গে খেলবে ৩রা নভেম্বর এবং আসামের সঙ্গে ৫ই নভেম্বর। এই দু'টি খেলা হবে খড়্গপুরের সেরা স্টেডিয়ামে। বাংলা প্রথম খেলায় বিহারকে ৪—০ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় উত্তরপ্রদেশকে ৩—২ গোলে পরাজিত ক'রে ৪ পয়েন্ট অর্জন করেছে।

আসাম ৭—১ গোলে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে ৩টে খেলায় উড়িষ্যার সঙ্গে সমান ৫ পয়েন্ট অর্জন করেছে।

খেলার ফলাফল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েন্ট
বাংলা	২	২	০	০	৪
উড়িষ্যা	৩	২	১	০	৫
আসাম	৩	২	১	০	৫
উত্তরপ্রদেশ	৪	১	০	৩	২
বিহার	৪	০	০	৪	০

জাতীয় জিমন্যাস্টিক

পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত সপ্তম বার্ষিক জাতীয় জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল ৩৩৮·৬৮ পয়েন্ট পেয়ে পুনরায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে দিল্লী (২৮৬·৯৮ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান মহারাষ্ট্র (২৩১·০৭ পয়েন্ট)।

মহিলাদের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বাংলার অরুণা দাশগুপ্তা ২৬·১ পয়েন্ট পেয়ে উপর্যুপরি দু'বার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করেছেন। এই বিভাগে ২৪ পয়েন্ট পেয়ে বাসনা রায় (উত্তরপ্রদেশ) ২য় স্থান এবং অণিমা পাল (বাংলা) ২৩·৪ পয়েন্ট পেয়ে ৩য় স্থান লাভ করেন।

মহিলাদের দলগত বিভাগে অরুণা দাশগুপ্তা (বাংলা) এবং অণিমা পাল (বাংলা) যথাক্রমে ৯ ও ৮ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসীপ

পুরুষ বিভাগ—গ্রুপ 'এ'

১ম স্থান : শ্যামলাল (দিল্লী)। মোট ৬৪·১৪ পয়েন্ট। শ্যামলাল 'এ' গ্রুপে রিং, হরাইজেণ্টাল বার অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান এবং প্যারালাল বারে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

পুরুষ বিভাগ—গ্রুপ 'বি'

১ম স্থান : এস আর যাদব (সার্ভিসেস)। মোট ৫০·৬০ পয়েন্ট। যাদব ভল্ট, হরাইজেণ্টাল বার, প্যারা-লাল বার এবং ফ্রি এক্সাইজ বিভাগে প্রথম এবং প্রমেণ্ড হর্স বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

বালক বিভাগ

১ম স্থান : ভিকাজী ভোঁসলে (সার্ভিসেস)। মোট ৩৩·৪৫ পয়েন্ট।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন!
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে।
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮

সূচীপত্র

দি
বেঙ্গল ডেকরেটর
২২৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ·কলিকাতা ৬

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, ৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৭শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৪শে কার্তিক, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 10th November, 1961.
40 Naya Paise.

সম্পাদকীয়

মর্ত্যে অপ্সরীদের আগমনের ন্যায় এই দরিদ্র দেশে সম্প্রতি বিশ্বের কয়েকজন নামকরা তারকা অবতীর্ণ হয়েছেন। উপলক্ষ্য আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বলাবাহুল্য যে, দরিদ্র ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের জন্য সরকার যেসব মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এই তারকা-সমাবেশ এবং নটীর পূজা তার অন্যতম। কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী এই উৎসব সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন যে, এই উৎসবে শুধু যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরিচয় ও মৈত্রীর সূত্রই দৃঢ়তর হবে তা নয়, এর ফলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নূতন ভাবধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীও দেখা দিতে পারে।

বিশ্বশান্তি এবং মৈত্রী সম্বন্ধে তথ্যমন্ত্রীর অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরের কথা বাদ দিলে তাঁর বক্তব্যের দ্বিতীয়াংশের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন শিল্পীর এবং দেশের নূতন ভাবধারার সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটে, রুচির মানোন্নয়নের সুযোগ পাওয়া যায় এবং টেকনিক্যাল বুদ্ধি ও প্রয়োগকলার বিষয়ে আদান-প্রদান ঘটবার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। একথাও বলা বাহুল্য যে, বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র শিল্প মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসাবে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে এবং আধুনিক মনের বহু অচিহ্নিত কক্ষে ও পর্দায় তার তরঙ্গাঘাত গিয়ে পৌঁচোচ্ছে, যে পর্দায় এবং যে কক্ষে অন্য শিল্প-মিডিয়ামের প্রবেশ দুরূহ, অথবা অসম্ভব। কাজেই ভারতবর্ষে এই শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য যেসব সুচিন্তিত এবং সুষ্ঠু প্রচেষ্টা হবে আমরা তার অকুণ্ঠ সমর্থক। যেমন, আমরা ক্ষুদ্র পুঁজিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালকদের জন্য সরকারের কাছ থেকে অধিকতর অর্থসাহায্য দাবী করি, আমরা বর্তমান ফিনান্স করপোরেশনটির প্রসার ও বিস্তৃতির পক্ষপাতী এবং আমরা সেন্সর বোর্ডের কাঁচি চালানোর আতিশয্যেরও সমালোচক।

কিন্তু চলচ্চিত্র উৎসবের ফলে দেশ-বিদেশের কতকগুলি পিন্-আপ গার্ল আমদানির দ্বারা এবং তাঁদের মস্তকে রাষ্ট্রীয় আশীর্বাদ বর্ষণের দ্বারা সংস্কৃতির কোন্ মহান উন্নতি সরকার সাধন করেছেন? যে দেশে প্রমোদের, আনন্দের এবং বহির্জীবনের সুযোগ নানাদিক থেকে সংকুচিত এবং যে-দেশে অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর-ভাবে তরুণ-সমাজে তারকামোহ ভয়ংকররূপে দেখা দিয়েছে, সেখানে এই তারকাপূজাকে গভর্ণমেন্ট মহণীয় করে তুলতে চাইছেন কোন্ বুদ্ধিতে? এতে সমাজের কোন্ উপকার সাধিত হবে? চলচ্চিত্র শিল্প নিশ্চয়ই কেবল-মাত্র তারকাদের দেহলাস্যের দ্বারাই ঐশ্বর্যমণ্ডিত নয়, পশ্চাতে কথা-সাহিত্যিকদের সুকুমার চিন্তা, পরিচালকদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গবেষণা, ক্যামেরাম্যান এবং টেকনি-সিয়ানদের নিরন্তর দান ও দক্ষতা যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি চিত্র-শিল্পীর বুদ্ধি ও প্রতিভা চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত হয়েছে এবং সংগীতকারের দান এসে মিলিত হয়েছে। এই শিল্পীদের অবজ্ঞাত এবং যবনিকার অন্তরালবর্তী রেখে বিজ্ঞাপনের খাতিরে এবং মোহ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারকাদের নিয়ে প্রযোজক ও পরিবেশকেরা নাচানাচি করেন। তার অর্থ বুঝতে পারি, কারণ তাতে অর্থলাভ ও ব্যবসায়ের সুবিধা। কিন্তু যেখানে রাষ্ট্র চলচ্চিত্রকে একটি উন্নত ও আধুনিক শিল্প-মাধ্যমরূপে সমাদৃত করতে চাইছেন, যেখানে সমাজের সম্মিলিত অভিনন্দন বর্ষণের আয়োজন, সেখানেও এই নটীর পূজার সমারোহ ঘটাতে হবে? এবং এই শিল্পের অন্যান্য সৃজনশীল প্রতিভা ও দক্ষতাগুলি অস্বীকৃত থাকবে? এ কোন্ দেশী রুচি ও সংস্কৃতির অভিযান? যদি চলচ্চিত্র প্রযোজকদের দ্বারা আয়োজিত কোনো উৎসবে, যুবতী বা কিশোরী তারকাদের নিয়ে নাচানাচি করা হত হয়ত আমরা তার প্রতিবাদ প্রয়োজন বোধ করতাম না। কিন্তু এখানে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। পৃথিবীতে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরূপে মৌলিকতার এবং প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন, চলচ্চিত্রে এমন শিল্পীর অভাব নেই। চার্লি চ্যাপলিন কিংবা লরেন্স অলিভিয়ারকে সরকার সম্ব-র্ধনার বিপুলতর আয়োজন করুন। তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু এই নিছক নটীর পূজায় আমন্ত্রিত পিন্-আপ্ গার্লদের নিয়ে অত্যুৎসাহ দমিত এবং নিন্দিত হওয়া প্রয়োজন।

তৃষ্ণার আড়ালে

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

তৃষ্ণার আড়াল থেকে ও কার কণ্ঠের ধ্বনি শুনি
দুদিকে পাহাড় নদী গিরিপথ দুস্তর চড়াই
মুখরিত করে দিল প্রতিধ্বনি, উৎসের গভীরে
নদীর রজতবক্ষ কেঁপে ওঠে ঃ
রক্তিম সূর্যাস্ত দেখা তার ভাগ্যে কখনো হ'ল না।

শঙ্কিত আঁধারে দীর্ঘ পথ হাঁটছে অতন্দ্র প্রহরী
আলোক; বিস্তৃত অরণ্যে এক সুবিশাল হিংস্র অজগর
দ্যাখো, বিদ্ধ হয়ে আছে আশংকার সুতীক্ষ্ম শায়কে
প্রান্তরে সজীব তৃণ অকৃপণ সূর্যের আভায়।

অরণ্য মিনতি করে ঃ কেউ কেড়ে নিয়ো না আমাকে
শেষবার আলো দেখব, দিব্যদেহ তৃষ্ণার গভীরে।

*
* *

মাধুকরী

আশা দেবী

সেদিন নেমেছে সন্ধ্যা অবন্তীর প্রাসাদ-শিখরে
নীলাঞ্চল আচ্ছাদনে দীপ জ্বলে অভিসারিণীর,
আরতির ধূপ গন্ধে ভরে গেছে সিপ্রার সমীর,
বিফল প্রতীক্ষা মোর কেটে গেল প্রহরে প্রহরে।
আমি বধূ "যশোধরা"—শূন্য ঘরে ফেলি দীর্ঘশ্বাস
তুমি খোঁজো মদালসা চিরনটী "বসন্ত সেনা"রে,
অবন্তীর সন্ধ্যা হতে কত কাল-কালান্তের পারে
তোমার আমার মাঝে চিরদিন এই ইতিহাস!

তবুও করিনি ক্ষোভ। তবু দিই করুণ প্রশ্রয়
নভোচারী পাখীটিরে বাঁধিনি তো কনক-শৃঙ্খলে,
তোমার মুক্তির সুখ চিত্রে চিত্রে বর্ণ রাগে জ্বলে,
তোমারি সে অবন্ধন কত কাব্যে তোলে "জয় জয়।"
আমি তো একটি ফুল। রূপবনে তব মাধুকরী
ছন্দে ছন্দে বর্ণে বর্ণে মধুচক্র রাখিয়াছে ভরি॥

নারী ও নিসর্গ

পুষ্কর দাশগুপ্ত

নিসর্গে কি আছে? যেই উন্মোচিত রূপ—ইন্দ্রজালে
আমাকে ভোলায়। তার গাঢ় বর্ণ-গন্ধের আশ্বাসে
আমাকে আশ্রয়ে ডাকে। দেখি, মগ্ন সন্ধ্যায়—সকালে
সৌন্দর্য, গভীর,—ব্যাপ্ত বনস্থলী, প্রান্তর, আকাশে।

কি আছে নারীর মুখে? যা আমাকে এমন ভোলায়—
সমস্ত, সমস্ত—স্মৃতি, আনন্দ, যন্ত্রণা, সব কথা;
রহস্যের সম্মোহনে নিয়ে যায় বিভোর কোথায়—
ও মুখ, চোখের মায়া, অনুপম নিবিড় স্তব্ধতা।

মুগ্ধতার সুর বাজে অন্তরালে। নির্জন আবেশে
আমি, অভিভূত, কোন স্বপ্নময় বিহ্বল গভীরে
পৌঁছে যাই। স্রোতজলে—চেতনার নদীর শরীরে
প্রতিবিম্বে ভাসতে থাকে আশ্চর্য জগৎ যেন এসে;
এবং ঢেউয়ের শীর্ষে কারুকার্য কোমল জ্যোৎস্নার
সেখানে; ছায়ারা কাঁপে—নারী ও নিসর্গ একাকার॥

সেই লোকটিকে নিয়ে সম্প্রতি কাগজে অনেক রসিকতা করা হ'য়েছে। মধ্য-প্রদেশের সেই বনবিভাগের কর্মচারী—যিনি তিন দিনের ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে দূরবর্তী গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা প্রণামী হিসাবে রোজগার করে চাকরী স্থলে ফিরে এসেছেন। গেরুয়াকে এভাবে বিকল্প রোজগারের উপায় হিসাবে ব্যবহার করায় অনেকেই আমরা চমৎকৃত, কেউ বা বিরক্ত। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই ঘটনার গভীরতর ইংগিত আমরা কেউই ধরতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

ভেবে দেখুন, আমাদের সকলেরই রোজগার করার স্বাধীনতা আছে। চুরি-ডাকাতী বা জাল-জোচ্চুরী করে উপার্জন করলে সেটা আইনত দন্ডনীয়। অন্যান্য সমস্ত রকম উপার্জনের পথই সাধু। এমন কি 'সাধু' সাজাও। অবশ্য সাধু সেজে কাউকে ধাপ্পা দিয়ে বা ঠকিয়ে রোজগার করা দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু সাধুর কাছে স্বেচ্ছায় যে-সব টাকা প্রণামী হিসাবে আসে, সেগুলি গ্রহণ করলে অন্যায় বলা যাবে না। মধ্য প্রদেশের কর্মচারীটিও আইনের এই ফাঁক দিয়েই বেমালুম অব্যাহতি পেয়ে গেছেন। ভালোই হ'য়েছে।

বিকল্প রোজগার বা সাইড ইনকাম না করে এমন লোক সংখ্যায় খুব বেশী নয়। যাঁরা করেন না, বা করতে পারেন না, তাঁরাও খুব শান্তিতে নেই। বিশেষ করে আজকাল যা বাজার হ'য়েছে তাতে প্রধান রোজগারের ধারায় অন্য কতকগুলি শাখা রোজগার এসে বলসঞ্চয় না করলে সংসার-তরণী যখন তখন চড়ায় আটকে যাবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় সকলেই আমরা এটা-সেটা করে আরো কিছু টাকা রোজগারের চেষ্টা করি। প্রাইভেট ছাত্র-পড়ানো, দালালী, হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা, ছোট ক্লাবের ভাড়াটে হিসাবে ফুটবল খেলা বা অভিনয় করা, রেডিও প্রোগ্রাম পাওয়া, বা সাময়িক পত্রে ফিচার লেখা—সবই সাইড ইনকামের মধ্যে ধর্তব্য। এগুলি যদি দোষণীয় না হয় তবে সন্ন্যাসীর ভেক-ধারণই বা দোষণীয় কেন? আর্থিক

জগতের বাজার দর নিয়ন্ত্রিত হয় 'ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের টানাপোড়েনে।' পণ্যে লাভের আকাঙ্ক্ষায় এবং প্রণামীর বিনিময়ে পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনা যেখানে প্রবল, আসলের সংগে সেখানে অনেক নকল সাধুও যে দেখা দেবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মধ্য প্রদেশের যে অঞ্চলে আলোচ্য বন-কর্মচারী পসার জাঁকিয়ে বসে ছিলেন, নিশ্চয়ই সেখানে ডিমান্ড ছিল। মাত্র তিন দিনে সাত হাজার টাকা রোজগার করাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কাজেই তিনি না গিয়ে অন্য কেউ গেলেও ফল প্রায় একই রকম হত।

অতএব স্বীকার করতে হবে, অত্যন্ত নিপুণতার সংগে 'ফিল্ড সার্ভে' করে কাজে নেমেছিলেন তিনি, তাঁর এই ক্ষুরধার বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই দোষণীয় দেখা যাচ্ছে না, এবং সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে আমরা যে বিরক্ত, তাও ঐ বুদ্ধিরই জন্যে। সকলেই আমরা ঐ পথে বা অন্য যে-কোন অ-দণ্ডনীয় পথে সহজে বাজিমাৎ করতে চাই। কিন্তু পারি না। তিনি পেরেছেন। আমরা সকলেই তাই অল্প-বিস্তর মর্মাহত, এবং রসিকতার ভিতর দিয়ে সেই মর্মজ্বালাকে সহনীয় করার চেষ্টা করছি।

কিন্তু সত্যি কথা হ'ল এই যে, আমরা হেরে গেছি।

* * *

রাগসংগীত হিন্দী বয়ানে গাইতে হবে, আকাশবাণীর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হল এই রকম। তর্ক করে লাভ নেই। কারণ ব্যাপারটা তর্কের স্তর অনেক আগেই পার হ'য়ে গেছে। এখন আমাদের মেনে নেওয়ার পালা। মানতেই হবে, কারণ, এটা সরকারী নির্দেশ। না হলে প্রোগ্রাম মিলবে না।

কিন্তু ভারতবর্ষ এক বিরাট দেশ। হিন্দীভাষীরা এখন রাজপ্রতিনিধি মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকারে শীর্ষস্থান দখল করে আছেন। কালক্রমে যদি অহিন্দীভাষীরা সেই ঈর্ষণীয় কর্তৃত্বে আসীন হন, তখন কি হবে তাই ভেবেই কিঞ্চিৎ গোলযোগে পড়েছি। অর্থাৎ কালক্রমে যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হন দক্ষিণ ভারত থেকে, তখন? তখন কি আবার রাগসংগীত তামিল তেলেগু মালয়ালী ভাষায় গাইতে হবে?

প্রকৃত প্রস্তাবে, যে যুক্তিতে হিন্দীতে রাগসংগীত গাওয়ার ফতোয়া দেওয়া হ'য়েছে এখন, তার চাইতেও জোরালো যুক্তি তো দিতে পারবেন দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দারা।

'ট্র্যাডিশানাল' কথাটি আপেক্ষিক। ভারতীয় রাগসংগীত হিন্দী-বয়ানে গাওয়ার ট্র্যাডিশান যতো দিনের পুরনো, তার চেয়েও প্রাচীনতর ট্র্যাডিশান যদি দক্ষিণীরা দেখান, অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে?

> আগামী সংখ্যা থেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক
> জরাসন্ধের
> একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস
> ## মসীরেখা
> ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।
> —সম্পাদক, 'অমৃত'

এবং কেবল গানের ভাষায় নয়, গানের সুরও তো তখন নতুন করে বদলাতে হতে পারে! 'কর্ণাটিক মিউজিক' বলে যাকে আঞ্চলিক আখ্যায় ভূষিত করা হ'য়েছে, একদিন যদি প্রমাণিত হয়, সেই রাগরূপই ভারতের আদি ও অকৃত্রিম, তবে হিন্দী-বয়ানে গীত রাগরূপ অর্বাচীন বলে কোণঠাসা হ'য়ে পড়বে নাতো?

হায় গান, একদা তুমি মানুষকে আনন্দ দেবে বলে সংসারে আবির্ভূত হ'য়েছিলে। কিন্তু এখন আনন্দ শিকেয় তোলা থাকল, তোমার শব্দরূপ আর ধাতুরূপ মুখস্থ করতে করতে দুচোখে আমাদের ঘুম নেই। তুমি যে এমন একটা দুঃস্বপ্ন হ'য়ে উঠবে তা কে জানত?

* * *

মধ্যযুগ থেকে অদূর অতীতেও ভারতের রাজন্যবর্গের নাম হত শব্দের একটি শোভাযাত্রার মতো। ইউরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডের রাজাদেরও প্রকৃত নাম কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। এদের ভিতর থেকে একটা শব্দকে বেছে নিয়ে কাজ-চালানো গোছের একটা নাম তৈরি করে নেওয়া হয়। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে প্রত্যেক ব্যক্তির নামের সংগে তার পিতার নাম এবং জন্মস্থানের নাম সংযুক্ত থাকে। এভাবে পিতৃপরিচয়মূলক নাম আগেও ছিল—যেমন কার্ত-বীর্যার্জুন। এ নামের মানে হল, ইনি কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন (অর্থাৎ পাণ্ডু-তনয় অর্জুন নন)!

এইভাবে ব্যাখ্যামূলক নাম, বলা-বাহুল্য, সন্ধিসমাসে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশী। ফলে মনে রাখার, এমন কি উচ্চারণ করারও অসুবিধে দেখা দিতে পারে।

যেমন ধরুন, লণ্ডনের ওয়েলস অঞ্চলের একটি স্টেশনের নামে আছে ৫৪টি অক্ষর। ইংরেজী-লিপিতে লিখিত এই অক্ষরগুলিকে উচ্চারণ করতে হলে বলতে হবে—'ই লা ফে য়া র পু-ই ল গু ই ন গা ই ল গো গা রি চু ই ন-ড্রো বু ই লা নৃ টি সি লি ও গ গ চু।!'

নিশ্চয়ই এর একটা ডাকনাম আছে, কিন্তু তা অপ্রকাশ্য। কাজেই স্টেশনের কাষ্ঠফলকে লিখিত ছিল ঐ প্রবল-প্রতাপান্বিত মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত..... নামটি!

কিন্তু ইতিমধ্যে এক বিভ্রাট ঘটে গেছে। কে বা কাহারা ঐ নাম-ফলকটি স্টেশন থেকে অপহরণ করেছে। গত বছরও একবার ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাত্ররা ওটি সরিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্ভবত উপস্থিত ব্যক্তিদের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে, ঐ ফলকটিকে উপ-স্থিত করেছিলেন। এবারের অপহারক কিন্তু এখন পর্যন্ত গা-ঢাকা দিয়েই আছে।

ঈশ্বর করুন, তিনি ধরা পড়ুন আর নাই পড়ুন নাম-ফলকটিকে যেন খুঁজে না পাওয়া যায়! মনে হয়, এ নাম একবার চোখের আড়ালে গেলে আর কেউ একে দ্বিতীয়বার লিখতে পারবে না।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে —তুমি বিচিত্ররূপিণী' একথা রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে সর্বাংশে সত্য। উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের প্রথমভাগ জুড়ে প্রায় একশ বছরের ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকেরা তাঁর স্নিগ্ধতায়, সুরের মূর্ছনায়, গানের মাধুর্যে ও ভাষার লালিত্যে সম্পূর্ণভাবে মুগ্ধ ও বিস্মিত। কিন্তু তাঁর শিক্ষা-ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি বিষয়ের প্রবন্ধগুলি অপেক্ষাকৃত কম পঠিত। অথচ এই গদ্য রচনাগুলির প্রতি ছত্রে ছত্রে বিশ্বকবির আনাগোনা ও ভারতদ্রষ্টার গভীর জীবনদর্শনের ছায়া-পাত লক্ষণীয়। দেশের ও বিশ্বের প্রতিটি সমস্যাতে তিনি যে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতেন তার মর্মস্পর্শী, উপমাসমৃদ্ধ, ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনাই এগুলির অধিকাংশের বিষয়বস্তু। বাংলা দেশের উনিশ শতকের সংস্কৃতির স্বপ্না-লোকিত ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ মননের ও চিন্তার আলো দেখিয়েছেন, ভবিষ্যতের এক 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' খুলে দিয়েছেন। 'এই ভারতের মহা-মানবের সাগরতীরে' বিশ্বসভ্যতার প্রাণ-স্পন্দন তিনি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধির গভীর-তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলাদেশ বা ভারতের নানা সমস্যার আলোচনা করে-ছেন এবং সাথে সাথে সমাধানের পথও দেখিয়েছেন। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির এই নবতম ব্যাখ্যাতাকে জানতে হলে তাঁর এই প্রবন্ধগুলির প্রতি আমাদের সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে, তা না হলে আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্য মন্থনে নেমে শুধু জলবিহারের আনন্দকেই উপভোগ করব, সেখান থেকে সত্যের স্বচ্ছ মুক্তা আহরণ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারব না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গান-নাটকের বিচিত্র স্বাদ গ্রহণ করা বিশেষ দরকার তাতে সন্দেহ নেই, তবে সেখানেই একান্তভাবে বদ্ধ হওয়া আত্ম-বঞ্চনারই নামান্তর।

॥ দুই ॥

সমস্যাকে—তা সে যে কোন প্রকারেরই হোক না কেন—সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে সমাধানের পথ পাওয়ার জন্যে যে তার অখণ্ডতাকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, অন্যথায় আংশিক সমাধানের খণ্ডিত প্রচেষ্টায় যে সমস্যাটাই জটিল হয় মাত্র, একথা রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষ্যে নানা ভাবে বলেছেন। এদেশের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে তিনি সেই একইভাবে চিন্তা করে-ছিলেন এবং পরে শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার সমা-ধানের একদিকের পথ তিনি খুলে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার শুরু-বোধ হয় শিশুকাল থেকে। সেই যে ছেলেবেলায় ইস্কুলের বদ্ধহাওয়া থেকে মুক্তির জন্য আকুতি জেগেছিল সেই থেকেই আস্তে আস্তে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নষ্ট হয় এবং আপন মনের প্রবণতা ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষাদানের প্রধান সমস্যা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটতে থাকে। এর সূচনা 'সোনার তরী'র যুগ থেকে (১৮৯২-৯৪)। 'সোনার তরী' বা 'চিত্রা' কাব্যের মধ্যেই তিনি প্রথম এক অভিনব উপলব্ধির সন্ধান পান যা "মানসী" ইত্যাদি আগের রচনায় অনুপস্থিত। আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে কোন একজন জীবনদেবতার অলক্ষ্য উপস্থিতি তাঁর কাছে ধরা পড়ে। এই জীবনদেবতাই ভিন্ন ভিন্ন রূপে জীবনের এক এক পর্যায়ে আমাদের সামনে প্রতিভাত হন এবং উদার বিশ্বের অনন্ত আনন্দের ও ক্ষণিক মানব জীবনের মধ্যে পারাপারের কাজ করেন। তাঁর এই আনন্দের ভাগে যে ভাগী হতে পারে না, তাকে পিছে ফেলে 'সোনার তরী' চলে যায়। এই আনন্দের যোগ্য অংশীদাররূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষার এক বিশিষ্ট ভূমিকাকে তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমা-দের ইস্কুল-সর্বস্ব, বইয়ের দৌরাত্ম্যময় শিক্ষা-ব্যবস্থায় সে ভূমিকা পালন করা হয় না এবং তাতে অবস্থা যে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় তা তিনি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের সেই দরিদ্র লোকটির করুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বলেছেন। এই শিক্ষাব্যবস্থায় "বুদ্ধিবৃত্তিটা বেশ বলিষ্ঠ ও পরিপক্ক" হয় না এবং সেই-জন্যে "আমরা অত্যুক্তি, আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য" ঢাকবার চেষ্টা করি। কেননা যে "আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়ি-বার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল-লাভ করে" সেটাই আমাদের শিক্ষায় অনুপস্থিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এত পরিষ্কার ধারণা ও তার এত প্রাঞ্জল প্রকাশ খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। শিক্ষা যে মানুষকে তার নিজস্ব পরিচয় ও বিরাট বিশ্ব সম্বন্ধে এক অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতি দান করে এবং তাকে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াতে শেখায় একথার উপলব্ধি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলে-ছেন: "এখন আমরা বিধাতার নিকট বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও" (শিক্ষার হেরফের)। এই-ভাবে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে সামঞ্জস্যের সাধনা তাকেই তিনি 'স্বাধীন শিক্ষা' বলে বর্ণনা করেছেন। পাঠ্যপুস্তকের কালো অক্ষরের পরাধীনতায় মন ও বুদ্ধি যে শুধু ধারালো হয় না তাই নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন পদে পদে ভয় থাকে এই বুঝি ভুল হয়ে গেল, সন্তর্পণে পাঠ্যপুস্তকের নির্দেশকে অভ্রান্ত মনে করে চলতে হয়, 'আবৃত্তিগত ভীরু-বিদ্যার গণ্ডী'কে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ফলে 'শিক্ষার নাগপাশে' আমরা জড়িয়ে পড়ি, 'পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়িতে বন্দী হই; মন হয়ে পড়ে পঙ্গু, আপনাতে আপনি বিকশিত হবার শক্তি যায় হারিয়ে; শুধুমাত্র

খাঁচার পাখীটির মত 'হায়, মোর শকতি নাহি উড়িবার' বলে আক্ষেপ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু যথার্থ সুশিক্ষা "মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।......আমাদের যে শক্তি আছে তাহার চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল। ......ভারতবর্ষের মন লইয়া নানাস্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন-দীপ্তি নূতনব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে" (জাতীয় বিদ্যালয়)। প্রায় এই ধরনের **Bold exploration** of the ocean of **knowledge, unity** of purpose এবং **well-ordered and consistent system of knowledge** -এর স্বপ্ন দেখেছিলেন Aristotle. তিনি বলছেন: **"We should strain every nerve to live by the highest things in us; they may be small in substance, but in price and power they are far beyond all else".**

মহতের উপলব্ধি করানোই যে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য সেকথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। বর্তমানের সর্বকিছুকেই শ্রেষ্ঠ বলে অতীতকে অস্বীকার করা বা আত্মতুষ্টি লাভ করা একরকমের দৃষ্টি-ক্ষীণতার পরিচয়। সেইজন্যে "বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্য" আনবার কথা রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই কথারই প্রতিধ্বনি আছে Harvard Report on General Education in a Free Society -র মধ্যে যেখানে বলা হচ্ছে : "One of the aims of education is to break the stronghold of the present o: the mind. This can be done only by showing the mind the greatest things ever-achieved or dreamed. So and only so it will have a standard, an example, an inspiration." (পৃঃ ৭০)। চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করতে হবে নইলে সব শিক্ষাই ঘুরে-ফিরে গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। আর গোঁড়ামি বা দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা (myopia) থেকেই সভ্যতার অবনতির পথে যাত্রা শুরু হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন : "Superstition is bad but bigotry worse". অর্থাৎ আমার কালের, আমার দেশের বা আমার পরিধির সবকিছুই ভাল মনে করে অন্যের দিকে, উঁচুর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে নিজের কুয়োটাকেই সমুদ্র মনে হবে মাত্র, সমুদ্র বা কুয়োর বাইরের মানুষের তাতে কিছু যায় আসে না। যে শিক্ষা এই myopia-কে দূর করতে পারে না, সে নিশ্চিতই ব্যর্থ। তাতে 'অহঙ্কারের সুখটাই সম্বল হয় মাত্র, কিন্তু 'জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ' থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বঞ্চিত হই; এতে মনুষ্যত্ব পীড়িত হয় এবং নৈরাশ্যের জড়তা ও অন্ধকার আমাদের স্থাণুতে পরিণত করে। তাই রবীন্দ্রনাথের মত এই যে "আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে ভাঙিতে দেওয়াই চেষ্টার পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্যকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্থা" (লক্ষ্য ও শিক্ষা)। মানুষের শক্তিকে উদামের সঙ্গে "beyond the utmost bound of human thought" -এর দিকে চালনা করলে তবেই আমাদের শিক্ষার হেরফের দূর হয়ে সামঞ্জস্যকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ প্রশস্ত হবে এবং তবেই 'পৃথির সঙ্গে বিদ্যার এবং বিদ্যার সঙ্গে প্রকৃতির' মিল হবে।

॥ তিন ॥

এই মিলের কথাই রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের গোড়ার কথা। মানুষের কোটি কোটি বছরের অজ্ঞানান্ধকারের গভীর গহন থেকে জ্ঞানের আলোকতীর্থের দিকে যাত্রাপথে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তাদের সামঞ্জস্য করে নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টির মধ্যেই পাওয়া যায় পুনর্যাত্রার পাথেয়। একথা সমগ্র বিশ্বসমাজের পক্ষে যেমন সত্য, প্রতিটি দেশ ও মানুষের আপন চলার ইতিহাসের পক্ষেও তেমনি সত্য। এই সামঞ্জস্যের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ 'যোগসাধনা' বলে অভিহিত করেছেন। এই "যোগসাধনার মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি; ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয়, আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি" (তপোবন)। পরাক্রমের নেশা বা প্রবল স্বাতন্ত্র্যের মোহ যে মুহূর্তে কেটে গিয়ে 'সমগ্রের সামঞ্জস্য' প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই আমরা যথার্থ শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত বলে গর্ব করতে পারব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে" (শিক্ষার মিলন)। সেই বিশ্বজাগতিকতার বোধনকালে শিক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করার জন্য "আমাদের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন নিকেতন" করে তোলার জন্যে তিনি আমাদের সচেষ্ট হতে বলেছেন। সত্যলাভের ক্ষেত্রে শত বিরোধ সত্ত্বেও মিলনের বাধা নেই. সেইজন্যে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' তিনি শিক্ষা ও জ্ঞানের অতিথিশালা খুলতে চান যেখানে বিশ্বের সত্য-সন্ধানীগণ 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' তখন আর শিক্ষিত মন 'বুদ্ধির কাপুরুষতায়' নিজেকে কলঙ্কিত করবে না। এযুগের অন্যতম ভারতীয় মনীষা দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণও শিক্ষার যে ধারণা তুলে ধরেছেন তা কবিগুরুর শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর মতে "The aim of education is to make us ashamed of our narrow creeds and inflexible faiths which make even social relations difficult. Ability to cooperate with others is the true test of education among individuals as well as communities.... Liberal education aims at producing moral gifts as well as intellectual, sweetness of temper as much as sanity of outlook". (পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয় সমাবর্তন ভাষণ, ১৯৩০)। এই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবেদনার দৃষ্টি সুশিক্ষিত মনের একটি বিশেষ গুণ। এর বদলে যদি উন্নাসিকতা ও অপরের প্রতি ঘৃণার মনোভাব আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে তবে সে শিক্ষাকে নিতান্তই ব্যর্থ বলে মনে করা যেতে পারে। ঠিক এই কারণেই ভারতবর্ষে শিক্ষার তথাকথিত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগ-সূত্র হারিয়ে গেছে, সমস্ত শরীর রক্তাল্পতার জন্যে ফ্যাকাশে হয়ে শুধু মুখটাই লাল হয়েছে। এর বিষময় ফল

সম্বন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন : "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

॥ চার ॥

তাই দেশদেখা বিশ্বজোড়া চোখকে উন্মীলিত করে দেওয়া যে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য এ ধারণা তাঁর ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা' পৌরুষকে নষ্ট করে, মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্তের রসবোধের উৎসকে শুকিয়ে দেয়, এক সর্বব্যাপী আনন্দহীন অবসাদ এনে দেয়। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া হয়তো কঠিন, কিন্তু 'সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী?' সেইজন্যে শিক্ষাকে একটা সাধনা বা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং 'চিত্তের গতি অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ' করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের এ মত আজ সর্বজন-স্বীকৃত। যার যেদিকে বিশেষ প্রবণতা সেই অনুসারে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করাই শিক্ষাদানের সর্বাধুনিক পথ। কিন্তু এর সাথে সাথেই শিক্ষাকে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে এবং শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চালনা করতে হবে। নইলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে 'মাস্টারমশায়'ই হবেন; তিনি শুধু 'পাঠ' দিয়ে যাবেন কিন্তু 'প্রাণ' দিতে পারবেন না; ফলে শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসু নেত্র আর জ্ঞানাগ্নিতে কজ্জ্বলিত হয়ে শিক্ষিত মনের স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা বিকিরণে সমর্থ হবে না। কেননা শিক্ষা জিনিসটা জীবন হতে বিচ্ছিন্ন কোন কৃত্রিম বস্তু নয়। তাই কী শেখা যায় সেটা তত বড়ো নয়, সেটাকে কেমনভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করা যায় সেইটে বড়ো। তাই শিক্ষার মাধ্যমের ওপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান বাধা এই যে এখানে শিক্ষার বাহনটা ইংরেজি ভাষা। কোন বিদেশী ভাষার সাহায্যে দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আশা যে একরকম অসম্ভব এই সহজ সত্যটাকে তিনি এক সুন্দর উপমার মধ্য দিয়ে বলেছেন : "বিদেশী মাল জাহাজে করিয়াই শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া যাইবে" (শিক্ষার বাহন)। কিন্তু তাই বলে আমরা যেন ভুল না করি যে তিনি ইংরেজি শেখার গোঁড়া বিরোধী ছিলেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইংরেজি ও বাংলার দুটি ধারা সৃষ্টি করার সুপারিশ করে তিনি বললেন সাদা কালো দুই স্রোতের গঙ্গাযমুনা ধারায় বিভাগ থাকলেও তারা এক সঙ্গেই বয়ে চলে। ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষারূপে খুব ভাল করে শেখাতে হবে, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমটা যেন মাতৃভাষা হয়। তখনকার বিশিষ্ট সুধীজনেরা তাঁর এই মতের সমর্থন করেন, আজও বোধহয় কেউ বিরোধিতা করেন না, কিন্তু সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হয়েছে কিনা সন্দেহ।

ইংরেজির মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার 'পিছনে ব্যবসা ও চাকরী চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে।' ফলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ডিগ্রির বোঝা ও টাকার বস্তা বইবার জন্যে সমর্থ হওয়ার দিকেই জোরটা থাকে কেন্দ্রীভূত হয়ে। কিন্তু এতে মানুষ শুধুমাত্র সুশিক্ষিত হয় না তা নয়, পরন্তু এমন এক মনোভাবের অধিকারী হয় যাতে পুঁথির বিদ্যা-টুকুকেই সত্য বলে মনে হয় আর 'প্রাণ-বেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব' হয়ে পড়ে। এতে 'সর্বদেশ-ব্যাপী অবুদ্ধি' তো দূর হয়ই না, বরং মনটাই ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে। এর চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্য আর কোন শিক্ষা এনে দেয় না। রাষ্ট্রীয় স্বরাজের চেয়েও শিক্ষার ব্যাপারে স্বরাজলাভ আগে প্রয়োজন, কেননা ভীরু মনোভাব নিয়ে বেশিদিন স্বাধীনভাবে বাঁচা যায় না। মন যদি শৃঙ্খলিত হয়ে পাঠ্যপুস্তকের শাসনকে মেনে নেয়, তবে চিন্তার বিকাশধারা হয়ে যায় স্তব্ধ। আর তখনি সেই গণ্ডুষমাত্র জলে বিদ্যাভিমানী নানা কায়দায় নিজের কসরতের চরকিবাজী দেখাতে থাকে। এর প্রধান কারণ আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী বলে আমাদের মনের অন্তঃপুরে তার আসন পাতা হয়নি, প্রবেশপথেই তার সজীবতাটুকু শুকিয়ে যায়। "দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্ম-প্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন ভাষণ—১৯৩৭)। নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করে পুঁথির বিদ্যা কখনো সংস্কৃতিবানের জন্ম দিতে পারে না। জীবনের সকল কর্মে সমস্ত ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতার অনুশীলন, চরিত্রের বলিষ্ঠ রূপায়ণ ও নিরলস আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় মেলে বলেই রবীন্দ্রনাথের ধারণা। শিক্ষা থেকে যদি এই সংস্কৃতিটুকু বাদ যায়, তবে ক্রমশঃ অকৃত্রিম বাগাড়ম্বর বা অসৌজন্যতাকেই আমরা সম্মান করতে আরম্ভ করি, 'চিত্তের ঐশ্বর্য' হয়ে যায় অনাদৃত। সংস্কৃতির ফলশ্রুতি সম্বন্ধে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের আর একটা মত স্মরণ করা যেতে পারে : "Sweetness of temper, sanity of outlook and strength of spirit, patience, wisdom, and courage are the qualities of a cultured mind". ব্যবহারে সৌজন্য, দৃষ্টিভঙ্গীতে ঔদার্য, হৃদয়ে মৈত্রী ও সাহস, আত্ম-সংযমবোধ ও নিরভিমান জ্ঞানের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্য ও সাফল্যের মানদণ্ড হিসেবে পেতে চেয়ে-ছিলেন। শিক্ষিত মন কখনো 'গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর' ক্রীতদাস হতে চাইবে না, তার একমাত্র প্রার্থনা হবে 'বিপদে আমি না যেন করি ভয়...তরিতে পারি শকতি যেন রয়'।

॥ পাঁচ ॥

উচ্চশিক্ষার অভিমান যে কতদূর ক্ষতিকর হতে পারে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথ যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাই শিক্ষার প্রাঙ্গণ থেকে তিনি উপকরণের অনা-বশ্যক বাহুল্যকে যতদূরে সম্ভব বাদ দিতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে ভেবেছিলেন এবং তাকে আধুনিক পরিবেশে পুনর্বাসন করতে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মত : "প্রাচ্য দেশে মূল্যে বিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করিনে।...... আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্য-রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হলেও চলে।......বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে—কেননা সত্যেই তার পরিচয়" (শিক্ষার সাঙ্গীকরণ)। তাই চার দেওয়ালের

কৃত্রিমতার আবহাওয়া থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মুক্ত করে তিনি শান্তি-নিকেতনে প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। "শহরের বোবা-কালা-মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে" যাতে শিক্ষার্থীর দেহেমনে 'বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন' লাগতে পারে তার আয়োজনকেই তিনি শিক্ষাদানের আদর্শ পরিবেশ বলে মনে করতেন। উপকরণ প্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে নিজের লজ্জাকর দীনতাকে ঢাকবার হাস্যকর প্রয়াসে শিক্ষার্থীর সজীব চিন্তাশক্তি বিকশিত হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বল্পতায় অভ্যস্ত হওয়ার মধ্যেই সংযমের সাধনা চলতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষিত মন যেন অনায়াসেই দাবী করতে পারে "আমরা সুখের স্ফীতবুকের ছায়ার তলে নাহি চরি, আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।" কিন্তু তা যদি না হয়, তবে এক সর্বনাশা বস্তুর নেশায় তাকে পেয়ে বসে এবং আন্তরিক নির্জীবতার লক্ষণরূপে এক মানসিক নিরোৎসুক্য এসে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়। ফলে পরিণামে "শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানিকেই বয়ে বেড়াতে হয়, চিত্তের আনন্দের" "মর্মরিত কুজন-গুঞ্জন" আর শোনা যায় না।

॥ ছয় ॥

বিশ্বমানবিকতার জয়গানে উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ বারবার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে ছবি এঁকেছেন তা এক অতিথিশালা যেখানকার জ্ঞানের আনন্দের ভোজে প্রতিটি সত্যানুসন্ধানীর অবারিত নিমন্ত্রণ। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ বলে মনে করতেন তাই বিদ্যা দান বা গ্রহণের যে কোন রকমের কৃপণতা বা সঙ্কীর্ণ-তাকে তিনি নিন্দা করেছেন, তবে সব সময়ই অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় ও আশ্চর্য উপমার সাহায্যে। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের যে আদর্শরূপের তিনি ধ্যান করেছিলেন তার উপলব্ধিই "বিশ্ব-ভারতী"র প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলো। আমেরিকা থেকে তিনি লিখছেন (১৯১৬) যে "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সংগে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে। ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্য। বিশ্বজাগতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" (রবীন্দ্র জীবনকথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রকৃতির মুক্ত অংগনে যে আসন পাতা রয়েছে তাকে অবহেলা করে সর্বস্বান্ত হয়ে বিরাট অট্টালিকার চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী হওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না, তার কারণ কিন্তু এ নয় যে অট্টালিকার ওপর তাঁর অন্তরের ঘৃণা ছিল। তাঁর বক্তব্য শুধু এই যে "তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামী করা অর্থা-ভাববশত অসম্ভব বলে সংবাদ পাই সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতটাকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে" (শিক্ষার সাঙ্গীকরণ)। অর্থাৎ যখন অর্থাভাবের জন্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসার হচ্ছে না তখন শুধুমাত্র বসবার জায়গা তৈরীতেই সব-শক্তিকে শেষ করা অযৌক্তিক।

বিশ্ববিদ্যালয় একান্তভাবেই বিশ্বের আবার সংগে সংগেই নিজের দেশের। এর প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটা কথা আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে সর্বজন-স্বীকৃত যে শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে শিক্ষাপ্রণালীটা ততো গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষক নিজে। দেশের সংবিধান যতই নিখুঁত হোক না কেন, শাসকপক্ষ যদি সৎ না হয় তবে দেশের যেমন কল্যাণ হয় না, তেমনি প্রণালীটাকে কেবলই সংস্কারের পর সংস্কার করে শিক্ষাকে কিছুতেই সফল করতে পারা যাবে না যদি না শিক্ষকগণ তাঁদের যোগ্য ভূমিকায় আত্ম-নিয়োগ না করেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম কাজ হওয়া উচিত আদর্শ শিক্ষক গড়ে তোলা। যদি এমন কোন শিক্ষক তৈরী করা যায় যিনি "নিজগুণেই জ্ঞানদান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, যাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান করে কৃতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়", তবে বিশ্ববিদ্যালয় তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চরম সফল হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। নালন্দার দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই ধরনের অধ্যাপক ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হলো শুধু 'পরীক্ষার দেউড়ি' পার করে দেওয়া নয়, বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, গবেষণার মাধ্যমে সেই ফসলকে বাড়ানো। দেশবিদেশের কাছে আত্মশ্রদ্ধার দাবী সে এখানেই করতে পারে। সুতরাং 'কৃপণের আসক্তি' নয়, 'প্রেমিকের প্রীতি'র মনোভাব নিয়েই আমাদের বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দরজায় চাবি ঘোরাতে হবে।

॥ সাত ॥

বিজ্ঞান যতই বিচিত্র শাখায় নিজের প্রগতিকে পল্লবিত করছে, ততই শিক্ষার উদার আদর্শ সংকুচিত হচ্ছে। আজকের উচ্চশিক্ষার অর্থই হলো কোন এক বিষয়ে Specialise করা। এর অন্যতম ফল হচ্ছে জীবনের প্রতি দৃষ্টি-ভংগীর সংকোচন, এর থেকেই গোঁড়ামির জন্ম হয়। তাই এইভাবে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয় সেইজন্যে আজকে পশ্চিম দেশে শিক্ষার প্রধান সমস্যা হচ্ছে "to numanize man" (Some Tasks for Education—Sir Richard Livingstone) শিক্ষা-সমস্যার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবন-দর্শনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এগিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভি-জ্ঞতা, দার্শনিকের দৃষ্টি ও কবির উপলব্ধি দিয়ে তিনি পশ্চিমের এই সমস্যাকে আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে শিক্ষার গতি ও প্রণালীর পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষাকে শুধু অঙ্গের-ভূষণ বা বাইরের আবরণ হিসেবে নয়, তাকে অন্তরের অমৃত হিসেবে অনন্তের আনন্দের সংগে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মৃত্যুর হাত এড়ানো যাবে, তবেই 'হাস্য-মুখে অদৃষ্টেরে' পরিহাস করবার শক্তি অর্জন করা যাবে, তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে 'উদারছন্দে পরমানন্দে' বিশ্বের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো যাবে : "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ"। রবীন্দ্রশিক্ষা-দর্শনের এটাই মূলকথা।

বাসর

দীপক চৌধুরী

গতকল্যের ঘটনাটা সবার মনেই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। পরেশবাবুর মতো একজন নিরীহ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ যে এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে পারেন, তেমন বিশ্বাস আমার নিজেরও ছিল না। বলতে গেলে আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র বন্ধু। যদিও আমাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল পঁচিশ বছরেরও বেশি, তবু আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছিলাম। আমার ধারণা ছিল তাঁর জীবনে এমন কোনো গোপন কথা নেই যা আমি জানি না। গতকল্যের ঘটনার পর আমার ধারণা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বছর দুই আগে আমাদের পাড়ায় বাস করতে এসেছিলেন পরেশ গুপ্ত। আমাদের ঠিক পাশের বাড়িটাই কিনে নিয়েছিলেন তিনি। জানলা দিয়ে দেখলাম পরেশবাবু একাই ট্যাক্সি থেকে নামলেন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স বলে মনে হল। লম্বায় ছ' ফুটের কম নয়। দেখতে অনেকটা পাঞ্জাবীদের মতন। খুবই জোয়ান। প্রথম দৃষ্টিতে কাটখোট্টা বলে মনে হয়। দু' এক-মাসের মধ্যেই শুনতে পেলাম কোন্ এক বিলেতী বণিক অফিসে চাকরি করেন। হাজার দেড়েক টাকা মাসিক মাইনে। অবিবাহিত। ভাই-বোন কেউ নেই। বাবা মা মারা গিয়েছেন অনেক দিন আগেই। সঙ্গে করে দুটি লোক নিয়ে এসেছিলেন। একজন তাঁর রাঁধুনী, অন্যটি ভৃত্য। মেদিনীপুরের লোক তারা। কিন্তু আমি আমার শোবার ঘর থেকে শুনতে পেতাম, পরেশবাবু তাদের বয় আর বাবুর্চি ব'লে ডাকা-ডাকি করেন। আমাদের এই ষোল-আনা বাঙালী পাড়ার অভিধানে ও-দুটো কথার অস্তিত্ব আমরা কোনো দিনও খুঁজে পাইনি। সেই জন্য মেদিনীপুরের গৌরমোহন আর নিতাই মাইতিকে কেন্দ্র ক'রে মাধববাবুর রকে ব'সে আমরা খুব হাসিঠাট্টা করতাম।

ট্যাক্সি চেপে অফিসে যেতেন পরেশবাবু, আবার ফিরেও আসতেন ট্যাক্সি চেপে। গাড়ি ছিল না। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হতো কারো সঙ্গেই মিশতে চান না তিনি। পুজোর সময় চাঁদা চাইতে হল না। গৌরমোহনকে দিয়ে ত্রিশটা টাকা নিজে থেকেই আমা-দের ক্লাবের সেক্রেটারির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা। মাধববাবুর রকে ব'সে আমরা অনুমান ক'রে নিলাম, পরেশবাবুর জীবনটা নিশ্চয়ই ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার দিয়ে ভরপুর। যাচাই আমরা করিনি বটে, কিন্তু রকে ব'সেই আমরা যেন হাহাকারের ধ্বনিটা শুনতে পেতাম। কল্পনায় কেউ কেউ তাঁর জন্য দুঃখ বোধও করত।

বোধ হয় মাস ছয় পরে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল আমার। এম-এ পরীক্ষা হ'য়ে গিয়েছে। ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি। মাধববাবুর রকে ব'সে আড্ডা মারবার আগ্রহ আর নেই। কর্ম-জীবনের অনিশ্চয়তা মনের দিগন্তে ঝিলিমিলি দিয়ে উঠছে। এমন সময় একদিন পরেশবাবু ট্যাক্সি থেকে নেমেই দেখলেন, আমি সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন, "কি ভাই, কি দেখছ আকাশের দিকে চেয়ে? ও-পাশের ঐ তিনতলার ছাদে কেউ আছে নাকি?" মুখ টিপে হাসলেন। তারপর হাতে ধরে বললেন, "চলো, তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা যাক।"

আমার সৌভাগ্যের কথা জানতে পেরে মাধববাবুর রকে ঈর্ষার ঝড় উঠল। রাজীব বলল, "হারুদা, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও না।"

"কেন কি চাস তুই পরেশবাবুর কাছে?"

"ও-রকম একজন মুরুব্বী যদি মাথার ওপর থাকেন—"

"বি-এ পাস কর আগে তারপর দেখা যাবে।"

প্রথম পরিচয়ের দিনেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। আত্মীয়ের চেয়েও নিকটতর বলে মনে হল পরেশবাবুকে। প্রাণখোলা সরল প্রকৃতির মানুষটি। প্রত্যেক দিনই সন্ধ্যের পর তাঁর বাড়ি যেতে লাগলাম। জীবনের নানা রকমের অভিজ্ঞতার গল্প বলতেন। আমি তন্ময় হয়ে শুনতাম। অনেক দিন ভেবেছি তাঁকে জিজ্ঞেস করব কেন তিনি বিয়ে করেননি। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। হয়তো একদিন তাঁর নিজের মুখ থেকেই গল্পটা শোনা যাবে।

পরেশবাবুর চেষ্টায় চাকরি জুটে গেল আমার। ভাল চাকরি। শুরুতেই শ তিন টাকা মাইনে। খবর শুনে মাধববাবুর পুরো রকটাই থ মেরে গেল! কেউ আর আমার সঙ্গে কথা বলে না! আমাকে দেখলে রাজীব উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে। এখনো বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় আসেনি। অথচ চাকরি করার জন্য ওরই ছিল সবচেয়ে

বেশি আগ্রহ। মাঝে মাঝেই বলত, পড়াশনো ছেড়ে দিয়ে এবার সে রোজগার করতে বেরবে। অনেকেরই ধারণা ছিল রাজীব প্রেমে পড়েছে। সেই জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

যাই হোক ক্রমে ক্রমে মাধববাবুর রুকের সঙ্গে সম্পর্ক আমার লোপ পেয়ে গেল। পরেশবাবুর ড্রইং-রুমে বসে গল্প শুনি—নানা রকমের গল্প শুনতে শুনতে সময় কেটে যায়।

একদিন তিনি দেরি করে ফিরলেন। ড্রইং-রুমে বসে একটা মাসিক পত্রের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। গোরমোহন চা দিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবু কোথায় গিয়েছেন রে?"

"বন্দুক কিনতে।" মুচকি হেসে জবাব দিল গোরমোহন।

"বন্দুক?"

"হ্যাঁ, শখ হয়েছে বাঘ শিকার করতে যাবেন। পাখি মারার সাহস নেই.....তিনি যাবেন বাঘ শিকার করতে।" তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করল গোরমোহন।

ভেবেছিলাম কথা বলা শেষ হয়েছে ওর। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না সে। ঝাড়ন বুলিয়ে সোফার হাতলগুলো মুছতে লাগল। কাজটা যে অনাবশ্যক তা আমি বুঝতে পারলাম। রাত সাতটার পর ঝাড়পোঁছ করতে কখনো ওকে দেখিনি। তা ছাড়া সোফার হাতলে ধুলোমাটি চোখে পড়ল না আমার।

একটু পরেই গোরমোহন বলতে লাগল, "বন্দুক কেনা বাবুর একটা বাতিক। গত দশ বছরের মধ্যে কতবার যে বন্দুক কিনলেন—আবার বেচেও দিলেন। কিন্তু বাঘ শিকার করতে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। একবার তো সত্যি সত্যি রামগড়ের জঙ্গলে শিকার করতে যাবেন বলে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে গেলেন......তারপর রাত্রিবেলা ফিরে এসে বললেন, 'নাঃ, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে মনে হল জন্তু-জানোয়ারদের বধ করে লাভ নেই। সারাটা দিন দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়ে এলুম। মন্দিরে ঢুকে চোখ বুজে বসে থাকলেও শান্তি পাওয়া যায়।' অফিস থেকে সাত দিনের ছুটি নিয়েছিলেন। বিছানায় শুয়েই সাতটা দিন কাটিয়ে দিলেন।

দেখতে অমন লম্বা-চওড়া হলে কি হবে, আসলে বড্ড ভীতু। দুঃসাহসিক কাজ করবার জন্য ছটফট করেন, কিন্তু করে উঠতে পারেন না।"

"কত দিন ধরে এখানে কাজ করছ তুমি"

"তা প্রায় বছর দশ তো হল। এবার ভাবছি দেশে চলে যাব। আর আসব না।" ঘাড়ের ওপর ঝাড়ন ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল গোরমোহন। ওকে আমি ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবু বিয়ে করেননি কেন রে?"

"আমি কি করে জানব?" ঘুরে দাঁড়াল সে। মুহূর্তের জন্য অতীত চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল বলে সন্দেহ হ'ল আমার। তারপর বলতে লাগল, "কি একটা ভয়-রোগে ভুগছেন বাবু। বর্ষাকালটা পছন্দ করেন। সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকেন, কবে জল নামবে। কিন্তু আকাশে যখন মেঘ ঘন হয়ে আসবে, তখন তিনি ঘরের সব কটি জানলা-দরজা বন্ধ করে বসবেন। আর আমাদের ডেকে ডেকে বলতে থাকবেন, তোরা সাবধান থাকিস। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়তে পারে।' আমি যখন চাকরি করতে এলাম তখন তো তাঁর বিয়ের বয়স পার হয়ে গিয়েছে।" হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গোরমোহন ঘোষণা করল, "বিয়ে না করলে কি হবে, বাসর জাগছেন বাবু।"

"কি রকম?" কৌতূহল রুখে রাখা অসম্ভব হল।

"তা হলে চলুন, বাবুর বাসরঘরটা দেখিয়ে আনি।" ঘর থেকে আগে আগে বেরিয়ে গেল গোরমোহন। দ্বিধা করতে লাগলাম। পরেশবাবুর অজ্ঞাতসারে তাঁর গুপ্ত জীবনের সংবাদ সংগ্রহ করা উচিত হচ্ছে কিনা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। বন্ধুত্ব যখন হয়েছে, তখন তিনি নিজে থেকেই হয়তো সব কথা খুলে বলবেন আমাকে। এমন সময় বাইরে থেকে গোরমোহন তাড়া দিয়ে উঠল, "আপনিও ভয় পাচ্ছেন নাকি? চ'লে আসুন—"

ওর পেছনে পেছনে দোতলায় উঠে এলাম। পরেশবাবুর শোবার ঘরে অনেকবারই ঢুকেছি। অনেক দিন এখানে বসেই গল্প করে গিয়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। কিন্তু অন্য দুটো ঘরের দিকে নজর দিইনি কখনো। এখন মনে পড়ল একটা ঘর বন্ধ থাকত সব সময়ে। বন্ধ থাকত বলে প্রশ্ন জাগেনি মনে। অবিবাহিত মানুষের প্রাইভেসি থাকবে না সেই বা কেমন যুক্তি? হয়তো পুজোর ঘর ওটা। পঞ্চাশ বছর বয়স পার হয়ে গিয়েছে। এই বয়সে মানুষের মনে মৃত্যু সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। উদ্ধত স্বভাব নরম হয়ে আসে। স্বাস্থ্য শিবিরের খুঁটিগুলো একটু-আধটু আলগা হয়ে ওঠে বলে পুজো-আচ্চার দিকে মন যায় মানুষের। হয়তো ওই বন্ধ ঘরটাই পরেশবাবুর পুজোর ঘর। অকারণ কৌতূহলে নিজেকে আমি কোনোদিনই চঞ্চল করে তুলিনি।

আজ সেই বন্ধ ঘরটার সামনেই আমায় এনে উপস্থিত করল গোরমোহন। বাইরে দেয়ালের গায়ে গোটা চার সুইচ লাগানো ছিল। তার মধ্যে একটা সুইচের রং দেখলাম লাল—সিঁদুরের রংএর মতো একটু ফিকে, আলতার মতো ঘন নয়। খুবই অস্বাভাবিক ঠেকল। সাদা, কালো, সবুজ এবং মেটে রং-এর সুইচ আমার নজরে পড়েছে। কিন্তু লাল রং চোখে পড়েনি আমার। দূর থেকে মনে হল, গোলাকৃতি সুইচের বোতামটা যেন একটা সিঁদুরের ফোঁটা। মনোবিদ্যা সম্বন্ধে কেতাবী জ্ঞান আমার ছিল না। আমি অর্থনীতির এম-এ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হল, সিঁদুরের প্রতি পরেশবাবুর একটা অতি প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। লাল রংএর গোলাকৃতি সুইচের বোতামটা হয়তো তাঁর ব্যর্থতার প্রতীক। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে কামজ-বোতাম বলে ঘোষণা করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

বোতাম টিপে আলো জ্বালালো গোরমোহন। তারপর ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। ঘরে ঢুকব কি না ভাবছিলাম। গোরমোহন বলল, "আসুন। ভয় নেই। ঘরে ঢোকা বারণ নেই বাবুর। আমরা সবাই ঢুকি। এটা তো আর পুজোর ঘর নয়। জুতো খুলতে হবে না, জুতো নিয়েই আসুন।"

ভেতরে ঢুকলাম। সত্যিই আমরা যাকে পুজোর ঘর বলে থাকি, এটা সে রকম নয়। দেবদেবীদের মূর্তি নেই। নিখুঁত একটা বাসরঘর। জোড়াখাটের ওপর অব্যবহৃত বিছানা বালিশ। খাটের কিনারে বিলেতী নেটের মশারিটা ভাঁজ করা রয়েছে। তারই তলায় মেঝের ওপর

ছোট সাইজের একটা কার্পেট পাতা। কালিম্পং-এ তৈরি কাপড়ের দু'জোড়া বেডরুম শ্লিপার পাশাপাশি সাজানো। ধুলোবালি লাগেনি। মনে হবে গতকাল কেনা হয়েছে। ঘরের পূব কোণায় দুটো আলনা। দামী দামী শাড়ি-ব্লাউজের সংখ্যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পুজোর ঘরের চেয়েও বেশি পবিত্র বলে মনে হল আমার।

"আসুন। ভয় নেই। ঘরে ঢোকা বারণ নেই বাবুর।"

অতীতের ধূলিম্লান ব্যর্থতাকে সাফল্যের রূপ দিয়েছেন পরেশবাবু। দুটো জীবন যেন চির-যৌবনের সাকার বাস্তবের মতো সত্য হয়ে উঠেছে। বিস্মৃতির এক কণা ধুলো চোখে পড়ল না আমার।

দরজা বন্ধ করে দিল গৌরমোহন। আবার আমি নেমে এলাম নীচে। নানা রকমের উদ্ভট কল্পনায় মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সাদাসিধে মানুষটি আমার চিন্তার জালে আটকে পড়লেন। তবে কি পরেশ গুপ্তের চরিত্রটা জটিল? কিংবা হয়তো ভাবপ্রবণতাই তাঁর চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। যৌবনের একটা অতি তুচ্ছ ঘটনাকে আবেগের সাজসজ্জা পরিয়ে স্মরণীয় ক'রে রাখবার চেষ্টা করছেন তিনি। হয়তো কোথায় কবে পথ চলতে গিয়ে কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। তাঁরই স্মরণে বাসর জাগছেন পরেশবাবু। হাসি পেল আমার; লোকটি নিশ্চয়ই পুরোপলীয় যুগ এখনো অতিক্রম ক'রে আধুনিক যুগে পৌঁছতে পারেননি। কোনো একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারেননি ব'লে বাসর সাজিয়ে রেখেছেন কেন? একটা ঘরের কোনো ব্যবহার নেই। একা মানুষ। একতলাটা অনায়াসেই ভাড়া দিয়ে দিতে পারেন। ড্রইংরুমটা উঠে আসতে পারে দোতলায়। কলকাতায় যে কী নিদারুণ স্থানের অভাব তা কি তিনি জানেন না?

সিগারেট ধরিয়ে বসলাম। চাকরি পাওয়ার পর সিগারেট খেতে শিখেছি। পরেশবাবুই খাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পুরুষ মানুষের একটা নেশা করা ভাল। নইলে পুরুষমানুষকে বড় বেশি মেয়েলী-মেয়েলী মনে হয়। কথাটা সত্যি কিনা জানি না। তবে উত্তেজনায় মুখে সিগারেট টানতে যে আরাম পাওয়া যায় তাতে আর সন্দেহ নেই। কৌতূহল আর কৌতুক আমার মনে অবশ্যই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। গৌরমোহন বোধহয় আমায় মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। এক পেয়ালা চা তৈরি ক'রে নিয়ে এল সে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "বিয়েটা ভেঙে গেল কি ক'রে?"

"কি ক'রে জানব বলুন? প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। চারকুলে তো কেউ নেই—বন্ধু বলতে শুধু আপনি। হদিশ পাওয়ার পথ কোথাও নেই। তবে কাক-পক্ষীর মুখে শোনা খবর—" গৌরমোহন কথা বন্ধ ক'রে বাইরের বারান্দায় উঁকি দিয়ে এল একবার। পরেশবাবুর ফেরবার সময় হয়েছে। ঝাড়নের কোণায় গিঁট বাঁধতে বাঁধতে গৌরমোহন বলল, "আমি হচ্ছি গিয়ে আদার বেপারী, জাহাজের খবর রেখে আমার কি লাভ! তবে হ্যাঁ, বাবুর অফিসের সেই বুড়ো কেরানীর কাছে একবার শুনেছিলাম—মাঝে মাঝে পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়িতে আসতেন—তিনি—বোধহয় বাবু এলেন।" ফস ক'রে টেবিলের ওপর থেকে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে গৌরমোহন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি শুনলাম, পরেশবাবু বললেন, "বন্দুকটা শোবার ঘরে রেখে দিয়ে আয়। বুঝলি গৌর, এটা খুব সাংঘাতিক বন্দুক। জায়গা মতো লাগাতে পারলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পর্যন্ত ধুলো হ'য়ে যাবে।"

"তোমার যা গায়ের জোর বাবু, হাতের একটা থাবড়া খেলেই বাঘ-ভাল্লুকের দফা রফা হয়ে যাবে। কিন্তু গায়ের জোর তো তোমার কাজে লাগল না।"

গৌরমোহনের অনুতাপ দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে হাওয়ায় বুকে হিল্লোল তুলল। ঘরে ব'সেই

আওয়াজটা শুনতে পেলাম আমি। পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "হারু আসেনি?"

"এসেছেন সেই সন্ধ্যে ছ'টা থেকে এসে অপেক্ষা করছেন।"

"তা দিলাম?"

"দু বার। হারুবাবুকে আজ এখানে খেয়ে যেতে বলব?"

"কেন রে? কি রান্না হয়েছে?"

"মাছ মাংস দু' রকমই আছে।"

"বেশ, আমিই বলব ওকে।"

গৌরমোহন হঠাৎ কেন খেতে বলবার প্রস্তাব করল তার কারণটা বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না। সে চায় বাসরঘরের ব্যাপারটা নিয়ে আজ রাত্রেই পরেশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করি। বুড়ো হ'য়ে গিয়েছে গৌরমোহন। একটা রহস্যের ঘনমেঘ ওর বুকের ওপর চেপে বসে রয়েছে দীর্ঘদিন ধ'রে। ফাঁকা সংসারে কাজকর্ম বেশি নেই বটে, কিন্তু তবু সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। রহস্যের মেঘটা অপসারিত না হলে এ-ক্লান্তি ওর দূর হবে না। মাঝে মাঝে তাই সে বলে, "এবার দেশে চলে যাব। নাতি-নাতনিগুলো লেখাপড়া শিখছে। ওদের কাছে পড়ে থাকলেও সুখ।"

পরেশবাবুর সংসারের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এই গৌরমোহন মাইতি।

শোবার ঘরেই ডেকে পাঠালেন আমায় পরেশবাবু। অফিসের জামাকাপড় ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন। দক্ষিণদিকে দুটো জানলা। একটা বন্ধ ছিল। সেটা খুলে দিলেন তিনি। বললেন, "ইজিচেয়ারটা এইখানে টেনে নিয়ে এসো। অতো গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন হারু? গৌরমোহন গল্প-গুজব করছিল বুঝি?"

বর্মা চুরুট ধরিয়ে নিলেন পরেশবাবু। একটা সিগারেটের টিন আমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, "এটা তোমার কাছে রেখে দাও। পকেটে দেশলাই আছে তো হে?"

"আছে।" গাম্ভীর্য আমার ঘনতর হ'ল। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করছিলাম। আমার প্রশ্ন শুনে যদি রেগে যান তা হ'লে আর দুঃখের সীমা থাকবে না। মস্ত বড় উপকার করেছেন তিনি। চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন। সংসারে হয়তো ভালমানুষের অভাব নেই, কিন্তু পরোপকারী ক'জন আছে? কলকাতার পুরো এলাকায় পরোপকারীর সংখ্যা আঙ্গুলে গুনে ব'লে দেওয়া যায়, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল আজকের রাতটা যদি নিঃশব্দে কেটে যায় তা হলে আর বুঝি বাসরঘরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কোনদিনই প্রশ্ন তুলতে পারব না। গৌরমোহনের গল্প-গুজবের সম্পর্ক থাকার অনুমান তাঁর মিথ্যে নয়। নিজে থেকে প্রশ্ন করার অর্থই হচ্ছে পাল্টা প্রশ্নের অধিকার তিনি আমায় দিয়েছেন। একটু নড়েচড়ে ব'সে গাম্ভীর্য অক্ষুন্ন রেখেই বললাম, "হ্যাঁ, গৌরমোহনের সঙ্গে গল্প-গুজব করছিলাম। আপনার পুরনো লোক—"

"পুরনো নয়, বছর দশেক হবে। বুড়ো বয়সেই আমার কাছে কাজ করতে এসেছে—" থেমে থেমে কথাগুলো বললেন পরেশবাবু।

"দেখুন বয়সে আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু এমন একটা সহজ ও আন্তরিকতার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন আপনি যে, আপনাকে আমি বন্ধু ব'লেই বিবেচনা করি। গুরুজনদের মতো গুরুগম্ভীর আপনি নন। অতএব নির্ভয়ে যদি একটা প্রশ্ন করি রাগ করবেন না তো?"

"রাগ? তোমার সাতখুনও মাপ। বাসরঘরটা দেখে ফেলেছ বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দেখে কি মনে হ'ল? খুব রোমান্টিক?"

"ছেলেমানুষী। প্রচুর পয়সা আর নষ্ট করবার মতো সময়ের পুঁজি হাতে না-থাকলে কেউ অমন শৌখিনতা করতে পারে না।" সিগারেট ধরালাম আমি।

"ধরো যদি এই শৌখিনতার মূলে কোনো প্রেমের সম্পর্ক লুকিয়ে থাকে?"

"নিছক পাগলামি ব'লে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেব আমি। আমার ধারণা, কোনো একটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন আপনি। তাজমহলের দেয়ালগুলো ছুঁয়ে দেখেছি প্রেমের বাষ্প হাতে লাগেনি। শুধু মনে হয়েছে, স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব একটা নিদর্শন। শাজাহানের নামটা মনে না থাকলেও দেখবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় না মানুষ। অথচ রোমিওকে বাদ দিলে শেক্সপীয়ারের সৃষ্টি যায় নষ্ট হ'য়ে। দুটো সৃষ্টির মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান। নয় কি?"

বর্মা চুরুটটা ছাইদানির খাঁজের ওপর ফেলে রাখলেন পরেশবাবু। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "পাঁচজনকে দেখাবার জন্য বাসরঘরটা সাজিয়ে রাখিনি। ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি বাস্তববাদী হারু, তোমার কাছে এটা ছেলেমানুষীর দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। আর প্রেম যে নিরাকার তা বোধহয় লক্ষ্য করেছ?"

"হ্যাঁ। বাসরঘরে কোনো স্ত্রীলোকের ফোটো নেই।"

"আমার মনের দেয়ালে টাঙানো আছে। আমি তখন সবে চাকরি নিয়ে সাহেব কোম্পানিতে ঢুকেছি মাসিক মাইনে মাত্র দেড় শো টাকা। ঊর্মিলার সঙ্গে বছর দুই আগে থেকে পরিচয় হয়েছিল। শুরুটা এ-যুগের ছেলেদের মতোই রোমান্টিক। দায়িত্ব নেবার দায় যতদিন থাকে না ততদিন কবিতা লিখে কিংবা মান অভিমানের জের টেনে টেনে সময়টা কেটে যায়। আমারও কেটে যাচ্ছিল। তারপর চাকরি পাওয়ার পর সঙ্কট এসে উপস্থিত হল। ঊর্মিলারা ছিল ব্রাহ্মণ। আমাদের স্বজাত নয়। পঁচিশ বছর আগে অসামাজিক বিবাহ আজকের মতো সহজ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঊর্মিলা বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। অন্য জায়গায় তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হ'য়ে ছিল। ওর আগ্রহ যত বাড়তে লাগল আমার আগ্রহের স্রোতে ভাটা পড়তে লাগল তত বেশি। সে দু' পা এগিয়ে আসে তো আমি চার পা পিছিয়ে যাই। মাত্র দেড়শো টাকার ওপর নির্ভর ক'রে ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তারপর ঊর্মিলাকে না জানিয়ে এক মাসের ছুটি নিয়ে হাজারিবাগে গিয়ে ব'সে রইলাম। কলকাতায় ফিরে এসে শুনলাম ঊর্মিলার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। আমার নিজের গল্পের শুরু এইখান থেকে। খবরটা শোনবার পর হঠাৎ যেন আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়লাম। একটা অপরাধবোধ বিবেকের ওপর পাথরের মতো চেপে বসল। এ শুধু মানসিক ব্যাধি নয় হারু, দৈহিক দুর্বলতাও অনুভব করতে লাগলাম। গত পঁচিশ বছর ধ'রে সেই পাথরের ওজনটা শুধু বেড়েই যাচ্ছে। অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কি বলবেন জানি না। মনে হয় মস্ত বড় একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে পারলে বুঝি মনটা হাল্কা হ'য়ে যাবে, বিকৃত

বিবেক সুস্থ হ'য়ে উঠবে। চব্বিশ ঘণ্টার অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এক এক সময় মানুষ খুন করবার প্রবৃত্তি প্রবল হ'য়ে ওঠে। বিষ দিয়ে বিষক্ষয়ের মতো হীনতর অপরাধের দ্বারা সেই প্রথম অপরাধটাকে স্খালন করতে চাই। তোমরা কেউ আমার হিংস্র রূপটা দেখনি। কল্পনায় হাজার হাজার বাঘের খুলি লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছি। রক্তাক্ত খুলি পা-এর কাছে পড়ে রয়েছে। উন্মাদের মতো মাঝরাত্রে ছাদে গিয়ে পায়চারি করেছি। মনের ময়লা বিশোধনের উপায় খুঁজেছি আমি—ক্যাথারসিস। রেচন। উপায় কিছু খুঁজে পাইনি। হতাশ হয়ে নেমে এসেছি দোতলায়। বাসরঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লে বিশোধনের আরাম পাই আমি। এটাকে তুমি প্রেম বলতে পারো, অন্য কিছু বললেও আপত্তি করব না। উর্মিলা নিরাকার।" বর্মা চুরুটটা তুলে নিলেন পরেশবাবু। তাঁর চোখের ভঙ্গীতে হিংস্রতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। এরূপ আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি। লোকটি যে প্রেমের বেলুন আকাশে উড়িয়ে রাখেন নি সেকথা ঠিক। সুস্থ হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কঠিন মনোবিকারে ভুগছেন। বাইরে থেকে পরেশবাবুর রোগ ধরবার উপায় নেই।

আমি বললাম, "প্রথমে হয়তো অপরাধ-বোধটাই প্রবল ছিল। কিন্তু তারপরে একটা অবদমিত আকাঙ্ক্ষা আপনার মনটাকে দখল করে বসেছে। যতদিন না আকাঙ্ক্ষার উদ্‌গতি হবে ততদিন আপনি অবশ্যই পীড়িত বোধ করবেন।"

"উদ্‌গতি?" ভুরু কোঁচকালেন পরেশবাবু।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, উদ্‌গতি—সাব্‌লিমেশন্। ফলিত মনোবিদ্যায় এর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। কোনো দুঃসাহসিক কাজের দ্বারা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার রোগ থেকে মুক্তি পাবেন বলে বিশ্বাস হয় না আমার।"

"হারু—" চোখ বুজলেন পরেশবাবু, "আমার মনের সবটুকুই কি রোগ? তা হলে কি ফলিত মনোবিদ্যায় প্রেমের কোনো স্থান নেই?"

"শিল্প-সাহিত্যে থাকতে পারে—আপনার ঐ বাসরঘরে অবশ্যই নেই।"

পরেশবাবুর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

দিন দশ বারো পরেশবাবুর বাড়ি গেলাম না। তাঁকে একলা থাকবার সুযোগ দিলাম। হয়তো সেদিনের আলোচনাটা না তোলাই উচিত ছিল। দেহের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হওয়ার সংগে সংগে মনের অস্বস্তিও আর থাকবে না। অন্য যে কোনো একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেললেই স্বাভাবিকতা ফিরে পেতেন তিনি। পঞ্চাশে পা দিয়েছেন পরেশ গুপ্ত। সংসার-ধর্ম পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অনুতাপের খোঁচা লেগে লেগে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাও স্বাভাবিক।

আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে পরেশবাবুর বাড়ি ঢোকবার পথটা দেখতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যে বেলা হঠাৎ সেদিন দেখি, রাজীব গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। এবারও সে বি-এ পরীক্ষা দেয়নি। মাধববাবুর রকে বসাও ছেড়ে দিয়েছে। কেউ কেউ বলে চাকরি জোটাতে পারেনি বলে ব্যবসা করতে নেমেছে। কারো কারো ধারণা, কোন একটি কলেজের মেয়ের সংগে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। পরেশ-

---

অনিবার্য কারণবশতঃ "পরিশোধ" এই সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল না।

—সম্পাদক

বাবুর সংগে যে ওর আলাপ হয়েছে সে-খবর আমার জানা ছিল না। বোধহয় চাকরির সন্ধানে ওখানে যাওয়া-আসা করছে সে। জানলায় বসে প্রায় প্রত্যেক দিনই রাজীবকে দেখি গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে। এমনিভাবে আরও দিন পনেরো কেটে গেল। ভেবেছিলাম, সুস্থবোধ করলে পরেশবাবু নিজেই আমায় ডেকে পাঠাবেন।

মাসখানিক পর অফিস থেকে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, পরেশবাবুর ছাদের ওপর মেরাপ বাঁধা হচ্ছে! বিস্ময়ে চোখ দুটো আমার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এই বয়সে পরেশবাবু কি বিয়ে করতে যাচ্ছেন? হয়তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে তাঁর। বৌ-ভাতের আয়োজন হচ্ছে ছাদের ওপর। নিমন্ত্রণ করতে নিশ্চয়ই আসবেন তিনি। তা যদি হয় তা হলে উচিত কাজই করেছেন তিনি। অবদমিত আকাঙ্ক্ষার উদ্‌গতির ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল পথ। সারাজীবন বাসর জাগবার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি ঘটল।

তাঁর দোতলায় ঘরের জানলা খোলা। তিনি নিশ্চয়ই অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছেন। নেমন্তন্নের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। নিজেই গেলাম তাঁর ওখানে। গৌরমোহনকে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কি গৌর? ছাদের ওপর মেরাপ বাঁধা হচ্ছে কেন?"

"শুনছি, আগামীকাল রাজীববাবুর বিয়ে।"

"তার মানে?"

"রাজীববাবু এখানে বিয়ে করতে আসবেন।"

"মেয়ে কোথায়?"

"মেয়েও আসবে বাইরে থেকে। বাবু তো আজ সাতদিন ধরে অফিসে যান না। বাজার করে বেড়াচ্ছেন। শাড়ি, গহনা, বাসনকোসন কত কি জিনিসপত্র কিনেছেন। শুনলাম, লুকিয়ে বিয়ে করছেন রাজীববাবু।"

"মেয়ের বাপ-মা বুঝি রাজী নন?"

"অমন সুন্দর একটি বেকার জামাই—"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "পরেশবাবু বাড়ি নেই?"

"দোতলায় উঠে যান।"

"তুমি বরং খবর দাও—"

"আসুন আমার সংগে। মাধববাবুর রকের ছেলেরা তো যখন-তখন উঠে যাচ্ছে ওপরে। বাবুর তো দেখছি আনন্দের আর সীমা নেই! রাজীব ছোঁড়াটা কি করে যে তাঁকে পটিয়েছে বুঝতে পারলাম না। পুষ্যিপুত্রের মতো বুক ফুলিয়ে চলে। আমাদের ওপর তো দিনরাত্ত অর্ডার চালাচ্ছে! আপনি এতদিন আসেননি কেন? আমরা তো ভেবে রেখেছিলাম বাবু তাঁর বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা সব আপনার নামে লিখে দিয়ে যাবেন।"

"পরের টাকায় পোদ্দারি করার মতো মন আমার নয়।" একটু হেসে আমি একাই উঠে গেলাম দোতলায়।

শোবার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। দেখলাম, মেঝের ওপর নতুন একটা কার্পেট পাতা রয়েছে। তার ওপর শাড়ি-ব্লাউজের স্তূপ। নতুন-কেনা গোটা দশ জুতোর বাক্সের মাঝখানে বসে পরেশ-

যাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন। দৃশ্যটা আমার চোখে সত্যিই খুব অদ্ভুত লাগল।

বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "আসতে পারি কি, পরেশবাবু?"

"কে?" বোধ হয় চমকে উঠলেন তিনি।

"আমি—আমি হারু।"

"আরে এসো এসো। এতদিন কোথায় ছিলে?"

"বিছানায়।"

"তার মানে?"

"অসুখ করেছিল।" মিথ্যে কথা বললাম।

"আমায় খবর দাওনি কেন?"

"আপনি তো খবর নেননি!" কন্ঠস্বরে অভিমানের আভাস।

"হ্যাঁ, খবর নেওয়া আমার উচিত ছিল। এখন ভাল আছ তো? বসো। ঐ ইজি-চেয়ারটা টেনে নাও। এদিকে তোমার বন্ধু সেই রাজীব ছোকরা তো আমায় সাংঘাতিক ফেসাদে ফেলেছে।"

"ফেসাদটা কি?"

পরেশবাবু মিনিট দুই চুপ করে রইলেন। এক মাস আগের সেই পুরনো সিগারেটের টিনটা দেখলাম টেবিলের ওপর রয়েছে। উঠে গিয়ে টিন থেকে একটা সিগারেট বার করে নিয়ে এলাম।

পরেশবাবু বলতে লাগলেন, "ছোকরা বছর দুই আগে থেকে একটি হাতি গিলে বসে আছে। অর্থাৎ একটি শিক্ষিত এবং ধনী পরিবারের মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। রাজুদের স্বজাত। ব্রাহ্মণ। মেয়েটি আই-এ পাস করেছে এবার। তার বাপ-মা টের পেয়েছিলেন যে, রুমা একটি বেকার এবং অর্ধশিক্ষিত ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। অতএব তাঁরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন অন্য এক জায়গায়।"

"তাতে আপনার কি অসুবিধা হচ্ছিল?" ইচ্ছে করেই কণ্ঠস্বরটাকে রূঢ় করে তুললাম, "কারো বাপ-মা চান না লোফারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে।"

"তোমার কথা মিথ্যে নয় হারু। প্রথমে তো রাজীবের কথায় কান দিইনি। কিন্তু তারপর ওর কথাবার্তা শুনে মনটা গলে গেল আমার। খুব উঁচুদরের সেন্সস্‌ম্যান না হলে আমার মন সে গলাতে পারত না। কলকাতার রকে রকের অভাব নেই। কেউ কাজে লাগাচ্ছে না বলে রককে তো আমি রাবিশ বলতে পারি না। প্রথম দিন তো ধমকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'বি-এ পরীক্ষা দাও নি, চাকরি-বাকরি নেই—প্রেমে পড়বার শখ হল কেন?' রাজু বললে, 'যারা সর্বহারা তারা প্রেমে পড়বে না তো করবে কি?' বললাম, 'করবে কি! দেশ এবং দশের জন্য মরতে পারলে না? স্যাক্রিফাইস—' মুখের ওপর কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে রাজু বললে, 'গুটি কয়েক ইস্পাতের কারখানা আর দামোদর ভ্যালী, করপোরেশনের জন্য মানুষ তো জীবন দান করতে পারে না। ধর্ম কিংবা আদর্শের জন্য মানুষ মরতে পারে। রুমার প্রেম হচ্ছে আমার কাছে ধর্ম আর আদর্শের সমন্বয়। আপাতত ভারতবর্ষে এর চেয়ে বৃহত্তর আদর্শ কিংবা ধর্ম কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মাধববাবুর রকের বন্ধুরাও আমার কথায় সায় দিয়েছে। রুমার যদি অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় তা'হলে দামোদরের জলে ডুবে মরব আমি। ঐ নদীর ধারেই আমাদের গ্রাম।' বুঝলে হারু, ছোঁড়ার কথা শুনে একেবারে আস্ত একটি বোকা বনে গেলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো যা বলে তাই করি। রুমার মাপজোখ সব জোগাড় করে নিয়ে এল। এক পাটি পুরনো জুতো, গায়ের একটা ব্লাউজ, হাতের এক গাছা চুড়ি। সেই মাপে জিনিসপত্র কিনে ফেললাম সব। হাজার দশেক খরচ হয়ে গেল।"

"বলেন কি?" বিস্ময় প্রকাশের আতিশয্যটা ইচ্ছাকৃত।

"হ্যাঁ। আগামীকাল বিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত আরও পাঁচ হাজার খরচ হবে। ছোঁড়া ভা-রি চালাক। বললে, বরপক্ষে লোকের অভাব নেই। রোয়াক ভর্তি লোক। কন্যার অভিভাবকের পদে সোজাসুজি বসিয়ে দিল আমায়। কাল রাত সাতটার লগ্নে বিয়ে। তুমি এসো হারু। বাড়ি থেকে রুমা বেরিয়ে আসবে বিকেল পাঁচটায়। মা-বাবাকে বলে আসবে, সিনেমা দেখতে যাচ্ছে।"

"কাজটা বোধহয় ভাল হচ্ছে না। একটা ভদ্র পরিবারে অশান্তির বীজ বপন করছেন। আপনার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না?"

"হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে রাজুকে দামোদরের জলে ডুবে মরতে দিই কি করে?"

"বাংলা দেশের চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু হচ্ছে রাজীব চাটুজ্যে। দামোদর তো ওর কাছে একটা ডোবার মতো। রাজুকে এখনো আপনি চিনতে পারেননি। রুমার ঠিকানা আপনি জানেন?"

"জানি।" একটু থেমে পরেশবাবুই বললেন, "রুমার পিতামাতার পরিচয়ও আমার অজ্ঞাত নয়। হারু—"

ঝড়ের বেগে পরেশবাবুর ঘরে ঢুকে পড়ল রাজীব। ভাঁজ-করা একটা কাগজ পরেশবাবুর হাতে দিয়ে সে বলল, "এই নিন রুমার স্কুল-ফাইনেল পরীক্ষার সার্টিফিকেট। ওতে ওর বয়স লেখা আছে। হিসেব করে দেখুন, রুমা এই এক মাস আগে সাবালিকা হয়েছে। এই যে হারুদা, তুমি তো আজকাল উঁচু-তলার মানুষ। কাল আমার বিয়ে। তোমাকে নিমন্ত্রণ করার সাহস আমার নেই। তোমার বরং কন্যাপক্ষে যোগ দেওয়াই ভাল। কুড়িটা টাকা দিন তো—" পরেশবাবুর দিকে হাত পাতেন রাজীব।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "টাকা? টাকা দিয়ে কি করবি?"

"বা রে! কাল আমি বিয়ে করতে আসব কি পরে? একটা ধুতিও তো আস্ত নেই। ছেঁড়া ধুতি পরে বোষ্টমরাও কন্ঠী বদল করতে যায় না।"

বারো ইঞ্চি সাইজের বড় একটা পার্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পরেশবাবু একখানা একশো টাকার নোট রাজীবের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, "শুধু ধুতি পরে বিয়ে করতে আসবি কি করে? একটা রেডিমেড্ সিল্কের পাঞ্জাবি কিনে নিস। নতুন এক জোড়া জুতোও চাই। একটু দাঁড়া, দেখি তোর গেঞ্জির অবস্থাটা কি? ছি ছি, ঘাম আর গায়ের ময়লা লেগে লেগে এটাকে গেঞ্জি বলে চেনা যাচ্ছে না! রাজু তোর বোধহয় দামোদরে ডুবে মরাই উচিত ছিল।"

"দামোদর? ও তো একটা ডোবা! প্রেমের দরিয়া পার হচ্ছি, হারুদা। তুমি তো জানো আমি পয়লা নম্বরের সাঁতারু।" হাসতে হাসতে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, রাজীব।

পরের দিন যথাসময়ে অফিসে বেরিয়ে গেলাম আমি। রাজীব-রুমার বিবাহ লগ্নটা পার হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরলাম। খোঁজ নিলাম, পরেশবাবু আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কি না।

ডাকেননি তিনি। আমার অনুপস্থিতি নিশ্চয়ই নজরে পড়েনি তাঁর। দুঃসাহসিক কাজে মগ্ন হয়ে আছেন। কিংবা আমার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র স্নেহ নেই।

মাধববাবুর পুরো রোয়াকটা আজ উঠে এসেছে পরেশবাবুর ছাদের ওপর। হৈ হৈ শুনতে পাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। একবার ভাবলাম, ওখানে গিয়ে রুমা দেবীকে দেখে আসি একটু। একটি অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবকের ওপর নির্ভর করে যে-মেয়েটি আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে তার প্রতি করুণা হওয়াই স্বাভাবিক।

রাত তখন এগারোটাই হবে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। হল্লা-চিৎকারের আওয়াজ কানে এল। পরেশবাবুর বাড়ি থেকেই আওয়াজটা আসছে। মা বললেন, "হারু, একবার যা তো, দেখে আয় কি হল।"

পরেশবাবুর বাড়ির সামনে মস্তবড় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমি। মনে হল খবর পেয়ে রুমার বাবা মা ছুটে এসেছেন। সত্যিই তাই। রুমার বাবাকে দেখতে পেলাম না। একতলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন রুমার মা। গৌরমোহন বলল, "বাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তার মানে?" চিন্তাধারা জট পাকিয়ে গেল।

"একটা সুটকেস নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন।"

"কিছু বলে যাননি?"

"না। একটা চিঠি রেখে গেছেন। দেখুন তো কি লিখেছেন—" গৌরমোহনের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে নিলাম। রাজীব আর রুমা এসে সিঁড়ির ওপর অপেক্ষা করছে। সিঁড়ির তলায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রুমার মা। ওপর থেকে রাজীব বলল, "হারুদা, জোরে জোরে পড়ো চিঠিটা। আমরাও শুনি। তোমার কাছে লেখা বলে চিঠিটা আমরা খুলিনি।"

খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। পরেশবাবু লিখেছেন, "কলকাতার বাইরে চললাম। আর ফিরব না। বাড়িটা রুমার নামে দলিল করে দিয়েছি। রাজু ব্যবসা করবে বলেছিল। বিশ হাজার টাকার একটা চেক লিখে রেখে দিয়ে গেলাম টেবিলের বাঁ দিকের ড্রয়ারে। ভেবেছিলাম ওদের বিয়েতে তুমি অবশ্যই আসবে। এসে দেখে যাবে বাসরঘরটা আর খালি পড়ে নেই। রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছিলাম, তুমি এলে না। মনোবিদ্যা তোমার যাই বলুক না কেন, এলে দেখে যেতে পারতে বাসরঘরের বুক জুড়ে আজ প্রেমের সত্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। মাধববাবুর রকে তুমিও বসতে। সেই কারণে ঐ রকের প্রতি আমি কখনও বিদ্বেষ পোষণ করিনি। রাজু-রুমা তোমার প্রতিবেশী হয়ে রইল। তুমি ওদের বড় ভাই। হারু, তোমাকে একটা গোপন কথা বলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। খবর নিয়ে জানলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। আবার কবে দেখা হবে জানি না। কথাটা কি জানো?—"

শেষের লাইনটা মনে মনে পড়ে ফেললাম। ওদের কাউকে শুনতে দিলাম না। আমার সঙ্গে সঙ্গে রুমার মা-ও বেরিয়ে এলেন। বিয়ে ওদের শেষ হয়ে গিয়েছে। বাধা দেওয়ার আর কোনো উপায় নেই। নতমস্তকে তিনি গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। রুমার বাবা নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। একটা [illegible] আমার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। এক সেকেন্ড দেরি করলে, দুটি সত্যকে যাচাই করবার সময় পাওয়া যাবে না। তাতে হয়তো রুমার বাবার মনে নতুন প্রশ্নের জন্ম হতে পারে। তা হোক। গাড়িতে স্টার্ট দিলেন তিনি। দ্রুত পা-এ এগিয়ে গেলাম রুমার মায়ের কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি ঊর্মিলা দেবী?"

"হ্যাঁ।" স্বামীর দিকে হেসে বললেন তিনি।

দুঃখ বোধ করলাম, যাওয়ার আগে ঊর্মিলা দেবীকে দেখে যেতে পারলেম না পরেশ গুপ্ত।

হাসির গল্পে পরশুরাম

ফুলরানী গুহ

বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেছিলেন এক অপ্রত্যাশিত 'বিরাট মহীরুহ' দর্শন বলে। এ মহীরুহ যে শুধু এক বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব তা নয়, তাঁর সৃষ্টিও এক অপ্রত্যাশিত মহীরুহই। পরশুরামের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে প্রথম হয় হাসির গল্পের রচয়িতা রূপে। পরশুরামের পূর্বে যে বাংলা সাহিত্যে হাসির স্থান ছিল না তা নয়, তবে সাহিত্যে সে হাসির প্রকৃতি ছিল একটু অন্য রকমের। ব্যঙ্গ নক্সা প্রহসন সবই হাসির কিন্তু সকল হাসির মধ্যেই কিছুটা প্রকৃতিভেদ আছে। পরশুরামের সৃষ্টি এ প্রতিটি হাসির থেকেই পৃথক।

পরশুরামের সৃষ্টি গল্পের আকারে কিন্তু সে গল্প পড়লে এ ধারণাটাই সহজে মনে হয় যে কাহিনীর চেয়ে হাসিই যেন মুখ্য বেশী; হাসির জন্যই যেন গল্পটা, গল্পের জন্য হাসি নয়। এর মানে অবিশ্যি এই নয় যে তাঁর গল্প টেকনিকে ক্ষুণ্ণ; টেকনিকের দিক দিয়েও তা সার্থক অক্ষত।

তবে গল্পের রস জমিয়ে রাখার জন্য সাহিত্যকার অনেক সময় হাসির অবতারণা করেন রসাল চরিত্র সৃষ্টি করে, রসাল উক্তির মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে তাই গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকেও দেখা গেছে, আবার প্রমদার মায়ের মুখনিঃসৃত বাণীও শোনা গেছে 'ও আমার বড় মেয়ে গদাধরচন্দ্র'; আবার উপন্যাসকার নিজে এসেও উক্তি করেছেন, 'কোর্টশিপটা বোধহয় পাঠকের ভাল লাগিল না, হে প্রাণ, হে প্রাণাধিক একটি কথাও নাই।' কিন্তু পরশুরামের হাসিকে এ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথে যে হাসির শুরু হয়েছিল পরশুরামে তার পরিণতি। ত্রৈলোক্যনাথে একটা অবাস্তব মনোভাব, অবাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস আছে যা গল্পের সহজ সরল ভাবের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোথাও কোথাও আছে মানুষের কুটিল স্বভাবের প্রতি এক নির্মম কষাঘাত, তা ওষ্ঠে হাসির সঞ্চার করে না, শরীরকে করে বিভীষিকায় শিহরণ-কম্পিত। পরশুরামের হাসি নির্মল কুটিলতাবর্জিত; তাঁর হাসির গল্পে আছে একটা সহজ সরল ভাব, তার সঙ্গে মিশে আছে শিল্পনৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পরশুরামের আগে নির্মল হাসির স্থান ছিল বেশী বাংলা শিশু সাহিত্যে। কিন্তু বড়দের সাহিত্যে উদ্দেশ্যবর্জিত নির্মল হাসির সৃষ্টি বোধহয় পরশুরামেরই কৃতিত্ব। মানুষ হাসে অসামঞ্জস্য দেখতে পেলে, অপ্রত্যাশিত কিছু দেখতে পেলে। সেখানে নিজের দোষ ত্রুটিও হাসির উদ্রেক করে, সমাজের বিধানকে যখন যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে পারছি না তখন তার আপাতঃ অসামঞ্জস্যও হাসিয়ে তোলে; বিশ্ববিধাতার নিয়মকেও যখন বুঝতে পারছি না তখন গুরুগম্ভীরভাবে না থেকে তা নিয়ে হেসে নিলে অপরাধ কি? সে হাসি কাউকে গিয়ে বিঁধবে না, সে হাসি ব্যঙ্গ নয়, সে হাসি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা নয়, সে হাসির অর্থ জীবনকে উপভোগ করা। পরশুরামের হাসির প্রকৃতিই তাই। ভূষণ্ডীর মাঠের ভূতেদের সমাবেশ বিলিতি ভূত, খোট্টা ভূত সব যখন এসেছে শিবুর তিন জন্মের স্ত্রী আর নেত্যর তিন জন্মের স্বামীও এসে তাদের সঙ্গে মিলল কারণ আমরা পুনর্জন্মও মানি স্বরা হৃষীকেশও মানি।

এখানেই পরশুরামের হাসির সঙ্গে ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকদের বা নক্সা-সাহিত্যিকদের হাসির বৈষম্য মিলবে। নক্সা বা ব্যঙ্গ উভয়ের প্রকৃতি এক। তাঁরা মসী ধরেন উদ্দেশ্য নিয়ে অসন্তুষ্টি নিয়ে, কষাঘাত করেন ব্যক্তিবিশেষকে সমাজকে মনুষ্যজাতিকেও। বিশ্ববিখ্যাত ভলতেয়ার লাইবনিৎসের মতবাদকে বিদ্রূপ করলেন কাঁদিদ কাহিনী লিখে। সুইফ্‌ট ইংরেজী সাহিত্যের অতি প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ-লেখক। তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে রয়ে গেছে মানুষের প্রতি একটা বিজাতীয় ভাব, জীবনের প্রতি এক বিতৃষ্ণা। তিনি দেখেছেন মনুষ্যজীবন অতি নিকৃষ্ট, তার চেয়ে অশ্ব-জীবনও ভাল, নাই বা বুঝল অশ্বজাতি কাব্য-সাহিত্য। বস্তুতঃ ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক বিশ্বের মধ্যে বিধাতার কল্যাণকামী হাতের স্পর্শ পান না; বিশ্ব সৃষ্টি করে বিধাতাপুরুষ যেন নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন তাই বিশ্ব ছেয়ে যায় অকল্যাণে। এই অকল্যাণকে দূর করতে ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক ধরেন লেখনী। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের মূলে আছে এক অসন্তোষ-বোধ। নক্সার মূলেও তাই অসন্তুষ্টি আর উদ্দেশ্য। নক্সাকার দেখেন সমাজের গলদ, জাতির গলদ, দেশের গলদ; গলদকে চিত্রিত করেন বিদ্রূপ মিশিয়ে গলদ দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে। হুতোমী নক্সা সেকালের কলকাতারই বিদ্রূপাত্মক চিত্র।

পরশুরামের সাহিত্য একেবারে এদের বিপরীত-ধর্মী। তার মধ্যে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা নেই, অসন্তুষ্টি নেই, নেই উদ্দেশ্যও। তার মধ্যে আছে এক পরিতৃপ্তি, একটা সন্তুষ্টি। মনুষ্যজীবন নারকীয় ব্যাপার নয়, তা উপভোগ্যই, তার চারদিকেই হাসি ছড়ান, চারদিকেই আনন্দ। এ আনন্দ কুড়িয়ে নিয়ে হাসির পেয়ালা ভরিয়ে তোলাই পরশুরামের হাসির বিশেষত্ব। আমাদের ভাগ্যহত জীবনেও যে কত ঘটনা ঘটে যায় যা কালি-কলমের স্পর্শে অদ্ভুত উপভোগ্য হয়ে দাঁড়ায়; সেখানে স্বামী-স্ত্রীর অভিমানও কৌতুক সৃষ্টি করে, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের স্বপ্নও কৌতুকাত্মক হয়ে দাঁড়ায় আবার—আমাদের বহু-বিবাহ নিরোধক আইনও হাসির খোরাক যোগায়। আট বছরের বয়সের কৃষ্ণকলিও শাশুড়ীর কাছ থেকে সতীলক্ষ্মী আখ্যা পায়, লম্বকর্ণও বাঁয়া তবলা ইত্যাদি খেয়ে জিজ্ঞেস করে অর-র অর্থাৎ আর আছে।

আমাদের পুরোনো সাহিত্যে অনেক সময়ই আমরা দেখি অপ্সরারা গিয়ে মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভাঙেন; ঘৃতাচীও গেল জাবালির ধ্যান ভাঙতে। ঘৃতাচীর বয়স

হয়েছে। জাবালির দৃষ্টি ধরে ফেলেছে জ্যোৎস্নারেণুর ফাঁক দিয়ে কি দেখা যাচ্ছে। জাবালি-পত্নী শুদ্ধ মিশ্রিত বাংলায় তিরস্কার করছেন 'হলা দগ্ধাননে ঘেঁচী', সংস্কৃত নাটকের 'হলা শকুন্তলা'র মিশ্রিত দেশীয় ভাষায় রূপান্তর সাধন। মানুষ ভীমের পত্নী রাক্ষসী হিড়িম্বা। তাদের তনয় রাক্ষস ঘটোৎকচ বাপকে নিয়ে গেল মায়ের ব্রত পারনের উদ্দেশ্যে। হিড়িম্বার লজ্জা 'ছি-ছি! আর্যপুত্র।' গল্পটি শেষ করলেন, মহাকবি ভাস এর পর আর লেখেননি। আবার তখনকার নতুন সাহিত্যের বাংলা গল্পের নায়িকা নিয়ে হাসি 'প্রত্যেকটি নায়িকাই যেন সতী-সাধ্বী বারাঙ্গনা' ঃ বলাবাহুল্য বারাঙ্গনার সঙ্গে যে সতী-সাধ্বীত্বের বিরুদ্ধভাব আমাদের সমাজবোধের মধ্যেই নিহিত।

প্রতিটি গল্প যেন সার্থক শিল্প-সৃষ্টি; কোথাও কোন গল্পের অসামঞ্জস্য নেই অথচ প্রতিটি গল্প স্বাভাবিকভাবেই তার পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে প্রতি ছত্রে হাসি বিতরণ করতে করতে। 'কাঁচ সংসদে'র শুরু দার্জিলিং যাওয়া উপলক্ষ্য করে। গৃহিণীর বিদ্যা ফাস্ট বুক-এর ওদিকে যায় না, মুখে তার বুলি 'হোয়াট' 'হোয়াট', উপমা তার সীতা দেবীর সোনার হরিণের বায়নার সঙ্গে—সোনার হরিণের দাম কত নিয়ে। তারপর দার্জিলিং গিয়ে তাদের কাঁচ সংসদের সভ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের নামের ফিরিস্তি বর্ণনা, নকুড়-মামার দার্জিলিং সম্পর্কে মন্তব্য, কেণ্টর কোর্টশিপ ঃ সবই হাসাতে হাসাতে গল্পকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। 'হয় পদ্ম নয় কিছু এসিড' এর মধ্য দিয়ে গল্প চূড়ান্ত পরিণতি সাধিত হ'ল, কাঁচ সংসদের রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্তনে 'হৈহয় সঙ্ঘে' রূপান্তরিত হয়ে। বিরিঞ্চি-বাবার গুরুগিরি, চন্দ্র-সূর্য তার মুঠোর মধ্যে, কেবলরামের মহাদেব সাজা—নকল মহাদেবত্ব প্রকাশে লেখকের উক্তি ঃ 'মহাদেব বলিলেন আঃ ছাড়ো ছাড়ো লাগে।' আগাগোড়াই হাসি!

উপভোগ্য উপাদান, উপভোগ্য কথাবার্তা। 'কাঁচ সংসদে'র পেলারাম বি-এ পাশ করার পর কাঁচ এবং মোলায়েম হবার আশায় আশুতোষের কাছে উপস্থিত হলেন, স্যার আশুতোষ দুই ভল্যুম এন-সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাড়া করলেন—এ আশুতোষের নিজেরও উপভোগ করবার! চকোরীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবক বংশীধর প্রেমকে সার্থক করল কৌশল খেলে যার ফলে জমিদার হংসেশ্বর রায় নিজে এলেন রাজমহিষীর মান ভাঙ্গাতে 'রাজমহিষী আমায় পাগল করেছে—

আমায় টোল্ করেছে......

ঝম ঝম ঝ'ইয়া......'

উল্টো বিধানে ইংরেজরা যখন আমাদের অধীন হবে তখন আমাদের দেশীয় উচ্চারণে মেডিটারিয়ান হবে মেতিপুকুর। গবসন টোডি প্রমুখ সাহেববৃন্দ বাথরুমে গিয়ে আম খাবে, আর চোয়াল গড়িয়ে আমের রস পড়বে। আম খাওয়ার এর চেয়ে আর রসাল বর্ণনা কি হ'তে পারে।

মেম-সাহেবদের নিম্নাঙ্গের বাসকে বলা হয় স্কার্ট; এর খানিকটা বিকৃত উচ্চারণ কাঠ কথার সাদৃশ্য, চেক-কাটা থাকলে গামছার সাদৃশ্য আসে তাই কেদার চাটুজ্জে বলছে, 'কাঠ-ফাট বুঝি নে বাপু পষ্ট দেখলুম বাঁদীপোতার গামছা খাটো করে পরা।' ইংরেজী ডক্টর কথার মানে অল্প বিদ্যায় চিকিৎসকের উপরে যায় না, ডক্টরেট প্রসঙ্গে কেদার চাটুজ্জে বলছে, থিসিস লিখতে হয় তিনিই লিখবেন তাঁর নাড়ীজ্ঞান আছে। এর ওপরে কেদার চাটুজ্জের বিদ্যে আর গেল না তা তিনি যতই বঙ্কিম চাটুজ্জে, শরৎ চাটুজ্জের পরে হন না কেন!

হাস্যরসাত্মক বহু গল্পই তিনি লিখে গেছেন, তার মধ্যে পুরানো প্রেমিক-প্রেমিকার বার্ধক্যে সাক্ষাৎ হচ্ছে, নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হচ্ছে মজার মধ্যে, নির্বাচন প্রসঙ্গ নিয়ে কৌতুক আছে, সরকারের নতুন আইনের প্রতি কটাক্ষ আছে। কিন্তু কোথাও বিদ্রূপ নেই, কোথাও নির্মম কষাঘাত নেই, নেই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। যেন সর্বত্রই জীবনের রস পান করে নেওয়া হাসির পেয়ালা ভরিয়ে নিয়ে। স্বাভাবিক অকাল-বৃদ্ধ জাত আমরা, আমাদের সাহিত্যে নির্মল হাসি আনয়ন এ কম কৃতিত্ব নয়, এ কৃতিত্ব অমিততেজা পরশুরামেরই সম্ভব।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

একাদশ আসর

সনেট—পূর্বপক্ষ

দুজন শ্রেষ্ঠ কবির দুটি অতিপরিচিত সনেট ছাপতে দিয়েছিলাম। কম্পোজিটর দুটিকে একসঙ্গে কম্পোজ করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, এখন দেখছি লাইনগুলিও পর পর সাজানো হয় নি, এক কবিতার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অন্য কবিতার লাইন বসে গেছে। প্রুফরীডারও তা খেয়াল করেন নি। এর আগেও একবার এইরকম কাণ্ড ঘটেছিল, সে হয়েছিল আরও সাংঘাতিক। সে বার কবিতার লাইনগুলোও ভাঙ্গা হয়েছিল। এবারে সান্ত্বনার কথা লাইনগুলি অভগ্ন আছে। এমন কি প্রত্যেক লাইনের যেখানে যে ছেদচিহ্নটি ছিল সেটিও ঠিক তেমনি আছে, তার কিছুমাত্র এদিক ওদিক হয় নি। পাঠক চেষ্টা করে দেখুন তো লাইনগুলি যথাযথ সাজিয়ে কবিতা দুটিকে আলাদা করতে পারেন কি না। এবার আর পাসনম্বরের কথা তুলছি না, কারণ এ পরীক্ষায় ফেলের আশঙ্কা কম। উত্তর অন্যত্র আছে।

১। আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
২। (পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র,
সুধা বরিষণে
৩। দেশদেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই
মতে
৪। দেখা দিল চারিদিকে পর্বত কানন
৫। নগর নগরী গ্রাম; বিশ্বসভা মাঝে
৬। পশিল সে সুখরাজ্যে বিচ্ছেদের
শিখা
৭। নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে
৮। সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
৯। তোমার বিরহ-বীণা সকরুণ বাজে।
১০। সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে
লিখা,
১১। কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি, পিককুল-
পতি!
১২। শুনিয়াছি লোক মুখে আপনি
ভারতী,
১৩। সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিকা--
১৪। ফেলিয়া চামর ছত্র, সভা ভঙ্গ করি
১৫। নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
১৬। তোমায়; অমৃত-রসে রসনা
সিকতি,
১৭। খর রৌদ্রকরে। ছয় ঋতু সহচরী
১৮। নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ
১৯। কার গো না মজে মন ও মধুর
স্বরে?
২০। সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের
ভিতরে,
২১। উর্ধ্ব হতে একদিন দেবতার শাপ
২২। মুহূর্তে মিলায়ে গেল মায়া
কুহেলিকা
২৩। আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা
করে।
২৪। সত্য কি হে, এ কাহিনী, কহ
মহামতি!
২৫। যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা
২৬। করিয়া বহন; মিলনের মরীচিকা,
২৭। মিথ্যা বা কি ব'লে বলি?
শৈলেন্দ্র সদনে,
২৮। লভি জন্ম মন্দাকিনী
(আনন্দ-জগতে!)

॥ উপন্যাসের পাঠক ॥

সরসিজ ভট্টাচার্য

পাঠকরা উপন্যাস পড়েন কেন এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন পাঠক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাস পড়েন। পাঠকদের মধ্যেও আবার বয়সের ভেদ আছে, রুচির তফাত আছে। ট্রামে বা ট্রেনে বা বাসে, অফিস যাওয়ার পথে সহযাত্রীদের চিৎকার উপেক্ষা করে নির্বিকার চিত্তে কোন ভদ্রলোক উপন্যাস পড়ে যাচ্ছেন এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি সংসারের চাপে ব্যতিব্যস্ত গৃহিণীরা দিবপ্রাহরিক নিদ্রার পূর্বে কোন রঙচঙে মলাটওলা উপন্যাসের পাতা ওলটাচ্ছেন—এ ঘটনাও ঘটে। জানি না, নিদ্রাকর্ষণের জন্য কিনা, কিন্তু একথা সত্যি যে তাঁরা কোন কোন ঔপন্যাসিকের গোটা উপন্যাসই কখনো কখনো পড়ে ফেলেন—এবং সেইসব ঔপন্যাসিক তাঁদের মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এছাড়া আছে কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যারা কচিৎ অনুগ্রহ করে কোন ঔপন্যাসিকের একটা গোটা উপন্যাস পড়ে ফেলে। তারপর চলে সমালোচনা। বেচারা ঔপন্যাসিক। তিনি দীর্ঘদিন চিন্তা করে পরিশ্রম করে যা লিখেছেন তাকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। অনেকটা হাতে মাথা কাটার মত আর কি। তবে আমার মনে হয় পাঠকদের থেকে

আলোচনা

পাঠিকারা এ বিষয়ে বিশেষ নিষ্ঠার পরিচয় দেন। এমন পাঠিকাও দেখা গেছে যাঁরা সাগ্রহে উপন্যাস পড়েন, কাহিনী মুখস্থ করেন, বন্ধুকে শোনান, তারপর একদিন ভুলবার প্রয়োজনেই ভুলে যান। তবু এ'রাই ঔপন্যাসিকের ভরসা। কেননা এ'রাই সংখ্যায় বেশি।

পাঠক-পাঠিকার রুচি-মর্জির আলোচনা ছেড়ে দিয়ে মূল প্রশ্নে আসা যাক। জনৈক বিদেশী সমালোচক উপন্যাস পড়ার পিছনে পাঠকদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে কেউ নিছক আনন্দ উপভোগ করবার জন্য উপন্যাস পড়েন। এ'রা সাধারণতঃ হালকা ধরনের উপন্যাস পছন্দ করেন। আর এক ধরনের পাঠক আছেন যাঁরা ঔপন্যাসের মধ্যে ডুবে গিয়ে বাস্তবজগৎ থেকে দূরে সরে থাকতে চান। এক কথায়, তাঁরা সংসারের দুঃখ-কষ্ট থেকে পালাতে চান। অথবা, কোন বিশেষ ঘটনায় জড়িত হয়ে পাঠক যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, অন্যে কিভাবে সে ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়ায় তা পরখ করার জন্যও অনেকে উপন্যাস পড়েন। সেখানে তিনি নিজের সংগে উপন্যাসের চরিত্রকে মিলিয়ে নেন। এ ছাড়া আছেন অপরাধী পাঠক যিনি নিজের পাপের সমর্থন খোঁজেন উপন্যাসে। তবে অধিকাংশ পাঠকই চান একটি নিটোল কাহিনী। বিশেষ করে সে কাহিনী যদি গোয়েন্দা-কাহিনী বা ভৌতিক হয় তাহলে ত আর কথাই নেই। উপন্যাস পড়তে পড়তে তিনি শুধু চিন্তা করেন—এর পরে কি হবে। এই চিন্তা তাঁকে অধীর করে তোলে। গোয়েন্দা-কাহিনীর পাঠকের মন কখনও নায়কের পরাজয়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত, অপরাধীর ধরা-পড়ার সম্ভাবনায় উল্লসিত অথবা হত্যার নারকীয় দৃশ্যে শিহরিত। আবার এমন পাঠক খুঁজে বার করা অসম্ভব নয়, যিনি কোন বিশেষ অবস্থায় পড়ে উপন্যাসের নায়ক বা পার্শ্বচরিত্র যে ধরনের আচরণ করেছিল তাকে রপ্ত করে নেন—যদি ভবিষ্যতে তাঁরও প্রয়োজন হয়! মোটামুটিভাবে পাঠকদের উপন্যাস পড়ার পিছনের কারণ হচ্ছে এইগুলি।

কিন্তু উক্ত সমালোচক একটা কথা বলেননি। সেটা বলা দরকার। পাঠকদের সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। সচেতন ও অসচেতন। পাঠকের সচেতনতা বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে এখানে আলোচনা না করলেও চলবে। এই সচেতন পাঠকদের নিয়েই যত জ্বালা। তাঁরা কেন উপন্যাস পড়েন এ প্রশ্নের উত্তরে চোখ বুজে উপরের কারণগুলির যে কোন একটি বলে ফেললেই চলবে না। কাহিনীর চটকদারিতে তাঁরা ভোলেন না, ঘটনার ঘনঘটায় তাঁরা বিস্মিত হন না। তাঁরা উপন্যাসে আধুনিক সমাজ-জীবনের সার্থক শিল্পসম্মত প্রতিচ্ছবি খোঁজেন। কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের উগ্র প্রচার তাঁরা ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে আশা করেন না ঠিকই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বলিষ্ঠ জীবন-বোধ ও সমাজ-সচেতনতা তাঁরা আশা করেন। আর এখানেই ঔপন্যাসিকের আসল পরীক্ষা। অনেকেই হয়ত, কাহিনীর জাল বুনতে সিদ্ধহস্ত, পাঠককে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হয়ত অনেকেরই আছে কিন্তু সেটাই ঔপন্যাসিকের সার্থকতার চরম নিদর্শন নয়। যে সচেতন পাঠকেরা লেখকের কাছে ধর্ম-প্রচার নয়, আদিরসের প্লাবন নয়, ভৌতিক বা গোয়েন্দা কাহিনী নয়—জীবনমুখিনতা, বাস্তবতা ও বলিষ্ঠ আশাবাদ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ। তাঁরাই পাঠক-কুলের শিরশ্চূড়ামণি।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'কথা বলতে বলতে অন্য কথা ভাবি। আঁ, তাই তো। তুই তো খুব ঠিক কথা বলতে পারিস নীতা। বুঝলে সুচিন্তা, এই নীতাটা এমন অদ্ভুত বুঝতে পারে। অন্যকথা—অন্যকথাই তো ভাবছিলাম। আচ্ছা বলতো কি ভাবছিলাম?'

ভারী একটা কৌতুকের খুশী ঝলসে ওঠে সুশোভনের ছায়া ছায়া চোখে।

'বাঃ তুমি কি ভাবছিলে আমি কি করে জানবো?'

সুচিন্তা বল্লেন পাশকাটানো ভঙ্গীতে।

কিন্তু কে দিচ্ছে তাঁকে পাশ-কাটাতে?

সহসা সুশোভন হাতটা বাড়িয়ে ও'র কাঁধটা ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠেন, 'তুমি জানো না? আমি কি ভাবি জানো না তুমি? দিল্লীতে থাকতে তো এ রকম ছিলে না তুমি সুচিন্তা? সব তো জানতে পারতে।'

'বাবা, আবার তুমি ভুল করছো।' নীতা বাবার পিঠের ওপর হাত রাখে, 'দিল্লীতে তো শুধু তুমি আর আমি থাকি। পিসিমা তো থাকেন না।'

'থাকেন না? বল্লেই শুনবো আমি?'

সুশোভন আবার টেবিলে ঘুসি মারেন 'তুই কতটুকু জানিস? এই তো সেদিন জন্মালি! তুই যখন জন্মাসনি, তখন ছিল সুচিন্তা। সেই আমরা দুজনে এক একদিন চলে যেতাম কুতুবে, চলে যেতাম ফিরোজ শা কোটলায়, হুমায়ুন টুম্বের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতাম,—তোমার মনে পড়ছে সুচিন্তা?'

সহসা সুচিন্তা টেবিলের উপর দুই কনুই আর দুই করতলের উপর মুখ রেখে ঈষৎ ঝুঁকে বসে শান্ত গলায় বলেন, 'পড়ছে বৈ কি! আগে ভুলে যাচ্ছিলাম, এখন মনে পড়ছে।'

'পড়ছে তো—। পড়তেই হবে। দেখলি নীতা?' একটু আত্মগৌরবের হাসি হাসেন সুশোভন, 'বুঝলে সুচিন্তা, নীতা খালি ভাবে, বাবাটা বুড়ো হয়ে গেছে, ভুলো হয়ে গেছে। তোমার কোনও কথা আমি ভুলে গেছি বলুক তো ও।'

নীতা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, 'বারে, কি করে বলবো! আমি তো তখন জন্মাইনি।'

'তা'ও তো বটে। আচ্ছা সুচিন্তা, দোকানে এত ভাল ভাল কাপড় থাকতে তুমি একটা বিছানার চাদর পরে থাকো কেন? এই কথাই ভাবছিলাম তখন। তাই তো সব কি রকম গোলমাল হয়ে গেল! কিন্তু কেন পর বলতো?'

নীতা চট করে বলে ওঠে, 'কল-কাতায় আজকাল বড্ড যে ভেজাল চলছে বাবা। ভাল ভাল রং-করা শাড়ী ধোবা-বাড়ী ঘুরে এলেই স্রেফ বিছানার চাদর।'

'তা দিল্লী থেকে কিনলে হয় না?' সুশোভন রেগে ওঠেন, 'দিল্লীতে কত কাপড়!'

'আচ্ছা বাবা, এবার থেকে দিল্লীতে গিয়েই কাপড় কিনে নেবেন সুচিন্তা পিসিমা।'

'কিনে নেবে? সুচিন্তা কিনে নেবে? কেন আমাদের টাকা নেই? আমরা কিনে দিতে পারি না?'

'তাই তো বাবা—তুমিই তো কিনে দিতে পার!'

'আমি? আমি কিনে দেব বলছিস!'

'বলছিই তো!'

কথায় জোর দেয় নীতা।

ওটাই চিকিৎসা।

সুশোভন পরিতৃপ্ত মুখে বল্লেন, 'তখন দেখো সুচিন্তা, দিল্লীর রং কত খাঁটি, কত পাকা।'

'সে তো দেখছিই!'

গম্ভীর মুখে বলেন সুচিন্তা—নিশ্বাস চেপে।

'যাই আমি একটু গা-হাত ধুয়ে নিই গে—' নীতা বলে, 'সেই কখন বেরিয়েছি! যা গরম লাগছে।'

নীতার একটু হাত মুখ ধুয়ে নেওয়া মানেই, ঘন্টা খানেক।

সুচিন্তা ঘড়ির দিকে তাকালেন।

এখন সাড়ে চারটে।

আর ঠিক এক ঘন্টা পরে নিরুপম আসবে। যদি তখনও প্রসাধন সাঙ্গ করে নীতা এখানে না বসে! যদি নিরুপম এসে দেখে সুচিন্তা আর সুশোভন এই পড়ন্তবেলার 'কনে দেখা আলো' মেখে

শুধু দু'জনে মুখোমুখি বসে গল্প করছেন!

পাগলের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডে হয়তো ঠিক সেই সময় সুশোভন সুচিন্তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন, হয়তো হাত চেপে ধরেছেন, হয়তো খুব কাছাকাছি মুখ এনে একেবারে নীচু গলায় কথা বলছেন!

সুচিন্তা কী করবে তাহলে!

নীতার ওপর ভারী রাগ আসে সুচিন্তার। যখন তখনই আসে। মনে হয় নীতা যেন তাঁকে কী এক জব্দে ফেলে মজা দেখছে। কিন্তু সেটা নীতার ভুল্পস্থিতিতে। ওকে দেখলেই মনটা বদলে যায়। ওই ওর টানটান করে বাঁধা চুলের বন্ধন অস্বীকার করা কপালের উপর উড়ন্ত চুলগুলি, ওই ওর মোমে মাজা লম্বাটে ছাঁদের হাত দুখানির নিতান্ত নিরাভরণতা, ওই ওর প্রসাধন-বর্জিত নির্মল মুখ, আর সর্বদা সাদা-শাড়ীপরা পাতলা দেহখানি যেন একটা গ্লানিহীন পবিত্রতার স্বাদ বহন করে আনে। ওকে দেখলে আর মনে হয় না, ও ওর সেই অনেকদিন আগে মারা যাওয়া মায়ের মত হয়েছে।

সুশোভনের মেয়েকে সুশোভনের মতই সরল লাগে। কিন্তু নীতা চোখের আড়ালে গেলেই খালি রাগ আসে ওর ওপর। কেন কে জানে।

সুচিন্তা জানেন না, সুচিন্তার গভীরতর স্তরের মন জানে, নীতা কাছাকাছি না থাকলেই ভয়ানক একটা ভয় গ্রাস করে বসে সুচিন্তাকে। কেন সেই ভয়, কী তার রূপ জানেন না সুচিন্তা। শুধু জানেন নীতা কাছাকাছি থাকলে তিনি বুকে বল পান, মনে মনে স্বস্তি পান। সেই স্বস্তির ব্যাঘাত ঘটলেই আক্রোশ আসে মানসিক বিরুদ্ধতা আসে।

'আমিও উঠি' বললেন সুচিন্তা।

'তুমিও উঠবে!' ধমকে ওঠেন সুশোভন, 'বাঃ বেশ! তা'হলে সেই মজার গল্পটা কি আমি এই টেবিলটাকে বলবো?'

'আচ্ছা গল্পটা শুনে যাই।'

'না যাবে না। গল্প শোনা হয়ে গেলেও না। সুশোভন বেশ খোলা গলায় বলে উঠেন, 'তুমি অন্য জায়গায় থাকলে আমার বিশ্রী লাগে।'

সুচিন্তা বিপদের খেলায় পা দেন।

কেন দেন?

একা থাকার সাহসে?

'চিরজীবন তো আমি অন্য জায়গায় থাকলাম।'

সুশোভন চোখ তুলে সুচিন্তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা গলায় বল্লেন, 'এইটা যে ঠিক কি, আমি কেন বুঝতে পারি না বলতো সুচিন্তা? তুমি বলছ তুমি চিরকাল অন্য জায়গায় থাকলে, নীতা বলে তুমি দিল্লীতে থাক না, অথচ—'

'কী অথচ?'

তীক্ষ্ম প্রশ্ন করেন সুচিন্তা।

'অথচ—আমার যেন মনে হয় তুমি ছিলে। কত কত দিন আমার সঙ্গে ছিলে। তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হল—'

'আঃ সুশোভন!'

সুচিন্তা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ান, 'কী বকছো পাগলের মত?'

'পাগলের মত বকছি?'

'নিশ্চয়! আমার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছিল জানো না তুমি? অনুপম মিত্তিরের নাম শোনোনি কখনও?'

'অনু—পম! ও আই সী! তোমার সেই লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটা! যে তোমার গহনাগুলো সব বেচে খেয়েছে। কিন্তু কেন বেচে খেল বলতো? তাঁর তো অনেক টাকা।'

'তিনি তো মারা গেছেন!'

অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে ওঠেন সুচিন্তা।

'মারা গেছে!' সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন সুশোভন, 'বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে। পুলিশে গুলি করে মেরে ফেলেছে বুঝি? কেমন জব্দ! যেমন তোমাকে বিয়ে করে জব্দ করে রেখেছিল, তার শাস্তি হয়েছে।......কিন্তু সুচিন্তা তুমি তা হলে কবে আমার সঙ্গে সন্ধ্যে-বেলা জ্যোচ্ছনা গায়ে মেখে হুমায়ুন টুম্বের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে?'

'আমি তো বেড়াতাম না!' সুচিন্তা নির্লিপ্তকণ্ঠে বল্লেন, 'তোমার সঙ্গে বেড়াত তোমার বৌ!'

'আমার বৌ! সে কে?'

'কেন যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল! নীতার মা যে!'

'আবার তুমি বাজে কথা বলতে শুরু করছ সুচিন্তা—তোমার সঙ্গে ছাড়া আর কার সঙ্গে বিয়ে হল আমার? তোমার ঠাকুমা বললেন—'

সুচিন্তা গম্ভীরভাবে বলেন, 'তুমি সবকথা ভালকরে ভেবে বলতে চেষ্টা কর দিকি সুশোভন? বন্ড তুমি যা-তা বলো। রংপুরের বাড়ীতে সেই আমার বিয়ে হয়ে গেল অনুপমের সঙ্গে, তুমি একগাদা কাঁদলে মনে পড়ছে না?'

'আমি কাঁদলাম! এতবড় একটা বুড়োলোক আমি, কাঁদলাম মানে?' সুশোভন ভুরু কুঁচকে বলেন, 'তুমিও যেন কালকের হস্‌পিটালের সেই পাগলটার মত আমাকে পাগল পেয়েছ সুচিন্তা।'

'তা' তুমি কি তখন এমন বুড়ো ছিলে?' সুচিন্তা শান্ত গলায় বলেন, 'ওই আমার ছোট ছেলেটার মত কম-বয়সী ছিলে না? আমার বিয়ে হয়ে যাবে শুনে—'

'সুচিন্তা-সুচিন্তা!'

সুশোভন চেয়ার ছেড়ে উঠে দু'হাতে সুচিন্তার দু'কাঁধ জোরে চেপে ধরেন।

'সব মনে পড়েছে। সমস্ত! তোমার ঠাকুমা বললেন, 'সুচিন্তার বিয়ের সময় অনেক খাটতে হবে ভানু, পারবি তো?'

আমি ঘাড় নেড়েই ছুটে চলে গেলাম সেই আমাদের বিলিতি আমড়া গাছের তলায়। যেখানে ছোট বেলায় খেলা করতাম আমরা! বল, ঠিক বলছি কিনা বল?'

সুচিন্তা কি ভুলে গেছেন উনি সুশোভনের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। ভুলে গেছেন ও'র দুই কাঁধের উপর সুশোভনের ভারী ভারী হাতের থাবার চাপ। ভুলে গেছেন অমন-করে কারো চোখের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকবার বয়েস আর তাঁর নেই।

আর ভুলে গেছেন নিরুপমের বাড়ী ফেরার সময় নিকটবর্তী হয়ে আসছে। তাই চোখ তুলে নিষ্পলকে তাকিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলছ! বল বলে যাও।'

সুশোভন বলেন, 'আমার কান্নাটাই খালি বলছ, আর নিজে কি করেছিলে সুচিন্তা? ভাবছ সেটা ভুলে গেছি।

তুমি কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেললে না? হুঁ! ভুলে যাবার ছেলে সুশোভন মুখুয্যে নয়। সেই কাঁদা-টাঁদার পর তোমাকে আমি বাড়ীর কাছে পৌঁছে দিলাম। দিলাম না?'

সুচিন্তা ঘাড় নেড়ে বলেন, 'হ্যাঁ'।

'বললাম চোখ মুখ এত লাল করলি, বাড়ী গিয়ে কি বলবি?' তুমি বললে 'বলবো সর্দি হয়েছে।' বল কাঁটায়-কাঁটায় মিলে যাচ্ছে কিনা?'

সুচিন্তা আর ঘাড়ও নাড়ছেন না—চোখের ইসারায় বলেন, হ্যাঁ!

'তোমার বিয়ের দিন কিন্তু আমি খাটিনি।' সুশোভন সহসা হেসে ওঠেন, 'ঠকিয়েছিলাম তোমার ঠাকুমা-বুড়ীকে। বলেছিলাম জ্বর হয়েছে আমার। 'মিথ্যে জ্বর' ধরা পড়বার ভয়ে তোমার বিয়েই দেখলাম না। শুধু যখন সেই লক্ষ্মী-ছাড়া অনুপম মিত্তিরটা তোমায় নিয়ে চলে গেল, তখন স্টেশনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম রেলগাড়ী ছাড়া পর্যন্ত—'

শান্ত শীতল স্তিমিত সুচিন্তা সহসা এমন উদ্বেল হয়ে, ওঠেন কেন? কেন এমন ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন, 'তারপর তুমি কী করলে সুশোভন! বল খুব ভাল করে মনে করে করে বল তারপর কি করলে! এই সাতাশ বছর ধরে যখন-তখন শুধু ওই কথাই ভেবেছি, তারপর—ঠিক তারপর তুমি কি করলে!'

ভারী ভারী হাতের থাবা দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে।

নিজেও শিথিল হয়ে চেয়ারে বসে পড়েন সুশোভন। হারিয়ে-যাওয়া গলায় বলেন, 'তারপর আর কিছু মনে পড়ছে না সুচিন্তা। ওই রেলগাড়ীর শব্দ আর ইঞ্জিনের ধোঁয়াটা সব যেন কি রকম গোলমাল করে দিচ্ছে। তারপর কি আমি অনেকক্ষণ শুধু স্টেশনেই ঘুরে বেড়ালাম? বল না সুচিন্তা, তারপর কি আর একটা ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম? মনে করতে পারছি না সুচিন্তা—' হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন সুশোভন 'কিছুতেই মনে করতে পারছি না। শুধু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আধময়লা জামা-কাপড়-পরা একটা ছেলে, পায়ে শুধু চটি, হাতে কিছু নেই, উঠে পড়ল রেলগাড়ীতে। ছেলেটা কে সুচিন্তা?'

না সুচিন্তার উত্তর দেওয়া হ'ল না। বলা হ'ল না কে সেই ছেলেটা। দেখা গেল কখন যেন নিরুপম উঠে এসেছে সিঁড়ি দিয়ে। উঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বলছে 'কি হল!'

বলবেই তো!

বলতেই তো হবে 'কি হ'ল।'

সুশোভনের চেঁচিয়ে ওঠাটা যে শুনতে পেয়েছে সে নীচের তলা থেকে।

সুচিন্তা কি ঈশ্বর মানতেন?

মানতেন মানুষকে, ভয়ানক কোনও বিপদ থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তাঁর আছে?

ঈশ্বরই জানেন আগে মানতেন কিনা।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মানলেন। না মেনে পারলেন না। ভাবলেন সুশোভন যদি এই মুহূর্তে হঠাৎ স্মৃতি-শক্তি হারিয়ে অমন শিথিল হয়ে বসে না পড়তেন, কি হত।

কি হ'ল, তার উত্তর দিলেন সুশোভন।

'ওই ছেলেটা যে কে, বুঝতে পারছি না।'

'কোন্ ছেলেটা?'

মায়ের দিকে সামান্যতম জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিপাত করে নিরুপম।

সুচিন্তা ইসারায় দুই হাত উল্টে হতাশার ভংগী করেন।

'কোন ছেলেটার কথা বলছেন?'

'সে তুমি জানো না। টোপর মাথায়-দেওয়া অনুপম মিত্তির রেলগাড়ী চেপে চলে যাওয়ার পর, অনেক অনেক পর, আবার নতুন ধোঁয়া আর নতুন শব্দের রেলগাড়ীটায় যে ছেলেটা উঠে পড়ল, তাকে নিয়েই ভাবনা।'

নিরুপমের কানে একটা শব্দ অনেক রহস্যের বাহক হয়ে প্রবেশ করেছে। 'অনুপম মিত্তির', 'টোপর মাথায়-দেওয়া অনুপম মিত্তির।'

কবেকার কথা উঠেছে এখানে?

কোন প্রসংগ উঠেছে?

সুচিন্তা তা'হলে বাল্যবন্ধুর সংগে একত্রে বসে অতীতের রোমন্থন করছেন! কিন্তু ছেলেটা?

'ছেলেটা কি মুখুয্যে-বাড়ীর সুশোভন? ওহে সুচিন্তার বড় ছেলে, তুমি তো শুনি পড়াও। পণ্ডিত লোক। বল দিকি—তাই কি?'

'আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে আগের কথা তো শুনিনি।'

'আগের কথা তো সেই কান্নার কথা! সুচিন্তা তোমার বড়ছেলে আগের কথা শুনতে চাইছে। বলব?'

সুচিন্তা গম্ভীর আত্মস্থ।

বলেন, 'ও কথা শুনে ওর লাভ কি? ও শুনবে না। ও ক্লান্ত হয়ে এসেছে। স্নান করবে খাবে।'

কিন্তু সুশোভন যখন উদ্দীপ্ত হন, যুক্তি প্রতিবাদ টেঁকে না। তাই নিরুপমের ভাগ্যে বিশ্রামের শান্তি তাড়াতাড়ি জুটল না।

সুশোভন তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, 'ইয়ংম্যান! তার আবার ক্লান্তি! ওহে বড়ছেলে, তোমাদের বয়সে কই আমার তো ক্লান্তি ছিল না? শুধু যখন সুচিন্তা মারা গেল সবাই মারা গেল—ইস! আবার এ কি ভুল করছি আমি। নীতা রাগ করবে। সুচিন্তা আছে সবাই আছে।'

নিরুপম মৃদু হেসে বলে, 'আর আপনিও ইয়ংম্যান আছেন।'

'দূর! আমার কত চুল পেকে গেছে।'

'তাতে কি?'

মৃদু হাসির সংগে বলে নিরুপম।

কিন্তু কাকে বলে?

সুচিন্তা ভাবেন কাকে একথা বলে নিরুপম?

এই অবোধ পাগলকে? না আর কাকে।

'সুচিন্তা শোনো, শোনো তোমার বড়ছেলের কথা।'

সুশোভন টেবিলে হাত চাপড়ে হেসে ওঠেন।

সুচিন্তা এবার উঠে পড়ে বলেন, 'তুমি খালি বড়ছেলে, মেজছেলে বল কেন সুশোভন? আমার ছেলেদের কি নাম নেই?'

সুশোভন মুহূর্তে অম্লান বদনে উত্তর দিয়ে বসেন, 'তোমার যে অনে-ক ছেলে সুচিন্তা। এত নাম কি মনে থাকে?'

'কী বল পাগলের মত।' সুচিন্তা লজ্জায় ধিক্কারে ধমকে ওঠেন, 'আমার তো মাত্র তিনটি ছেলে।'

'ঠকিও না সুচিন্তা, বাজে কথা বলে ঠকিও না। অনেক ছেলে তোমার। দেখতে পাই না আমি? বাড়ীতে কত ভিড়। আর ওরা যখন থাকে না, বাড়ীটা কেমন ঠাণ্ডা—'

'নীতা তোমার হল?'

সহসা স্বভাব-বিরুদ্ধ তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ওঠেন সুচিন্তা। এই সব অদ্ভুত ভয়াবহ বিপদের কানঘেঁসা প্রসংগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই এই আর্ত আহ্বান।

আশ্চর্য। মেয়েটা করছে কি!

আজ তো যায়নি! কখন গেছে।

নীতা ঘরের ভিতর থেকে সাড়া দেয়, 'যাচ্ছি পিসিমা।'

নিরুপম কেন নিজের ঘরে ঢুকে পড়ছে না?

সুচিন্তা ভাবেন, ওরা তো এমন করে দাঁড়িয়ে পড়ে না। ওর মুখের দিকে যে তাকাতে পারছেন না সুচিন্তা।

পারছেন না তাড়া লাগাতে। যাও মুখ ধোওগে, বিশ্রাম করগে।

কিন্তু উদ্ধার করল নীতাই এসে।

ওর নিজস্ব আড়ম্বরহীন প্রসাধনে সেজে, অথচ ঝকঝক করতে করতে।

'কি হল? পিসিমা নাকি আমার পিঠে কুলো ভাঙবার ব্যবস্থা করছেন।'

'তাই উচিত তোমার মত মেয়ের।'

আদরের তিরস্কারের সুর এনে আবহাওয়া হালকা করে ফেলেন সুচিন্তা। বলেন, 'সেই কখন থেকে এই সন্ধ্যে অবধি তুমি স্নান করছ।'

'ওঃ পিসিমা কী মজা যে লাগে সন্ধ্যাবেলা স্নান করতে।'

আবদারে যেন গলে পড়ে নীতা।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় সুচিন্তার এত গলে পড়বার কোন কারণ ছিল না।

এত গলে পড়বার হেতু কে?

নিরুপম নীতার দিকে তাকিয়ে শুধু দৃষ্টি দিয়ে বলে 'তারপর কি হ'ল ওবেলা?'

বলবার কারণ আছে।

নিরুপমকে তো সঙ্গে যেতে বলেছিল নীতা, লুম্বিনীতে নিয়ে যাবার সময়! মনঃসমীক্ষক ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন দরকার নেই। ভিড় করার দরকার নেই। রোগী যেন আদৌ বুঝতে না পারে তার জন্যেই কোনও আয়োজন। তাকে ভাবতে দাও যেমন এখান-সেখান বাবার সঙ্গে বেড়াতে যায় নীতা, তেমনি যাচ্ছে। তাই নিরুপম সঙ্গে যায়নি।

কিন্তু ডাক্তার সংক্রান্ত পরামর্শের সে ভাগীদার। তাই নীতাকে ইসারায় প্রশ্ন করে কি হল ওবেলা?

ইসারা! কিসের তা কে বুঝবে।

সুচিন্তার মনটা বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর এমন দেবোপম নিরুপম, তারও এই অবস্থা!

এদিকে তো বড়দা বলা হয়!

কিন্তু নীতা ইসারার ধার দিয়ে যায় না। খোলা গলায় বলে ওঠে, 'বড়দা! শুনেছেন ওবেলার কান্ড?'

নিরুপম মৃদু হেসে বলে, 'কি করে শুনবো বলো, দেয়াল তো কথা বলে না।'

'আচ্ছা আমিই কথা বলছি।' নীতা বসে পড়ে বলে, 'তা বাবা, তুমিই একবার শুনিয়ে দাও না বড়দাকে—সেই মজার গল্পটা।'

সুশোভন বিরক্ত স্বরে বলেন, 'কিন্তু বড়ছেলে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকলে গল্প বলা যায়?'

'তাই তো!'

নিরুপম হেসে উঠে বলে—'এই বসলাম। বলুন আপনার গল্প।'

'আরে সে এক মজার ব্যাপার! একটি পাগল প্রভুর খেয়াল হল তিনি ডাক্তার। আর আমিই বুঝলে কিনা মানসিক রোগী। আমার সঙ্গে সে কত গুছিয়ে কথা! যেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তার আবার একটি এ্যাসিস্টেন্টও সাজানো আছে। সে গম্ভীরভাবে এককোণে বসে খাতা পেন্সিল নিয়ে এমন ভান করছে, যেন আমাদের কথা-টথা সব নোট্ করে নিচ্ছে। কর। 'কথা'র মধ্যে আমি যে কত

আমি সুচিন্তাকে বলছিলাম, আবার যাবো আমরা। এ সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা করেছি আমি। অস্বাভাবিকদের দেখলে আমরা টের পাই আমাদের মধ্যেও কোনও কিছু অস্বাভাবিকতা আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে চেক্ করে নেওয়া যায় নিজেকে।'

আশ্চর্য।

অবাক হয়ে ভাবেন সুচিন্তা, আর

"......পিসিমা নাকি আমার পিঠে কুলো ভাঙবার ব্যবস্থা করছেন!"

চালাকির কথা ঢুকিয়ে দিয়েছি, তা তো আর বুঝল না।'

নিজস্ব ভঙ্গীতে হাসতে থাকেন সুশোভন।

গমগমিয়ে ওঠে ছোট্ট দালানের ছাদ।

'বেশ মজা তো!'

নিরুপম বলে।

সুশোভন বলেন, 'মাঝে মাঝে মানসিক রোগীদের দেখতে যাওয়া সুস্থ মানুষদের দরকার। বুঝলে বড়ছেলে।

পাঁচজনের সঙ্গে যখন কথা বলে মানুষটা, কই তেমন করে তো ধরা পড়ে না ওর মানসিক বৈকল্য।

শুধু সুচিন্তার কাছে এলেই—

কেন!

কেন এমন হয়। জানেন না। সুচিন্তা তা জানেন না। ওকে নিয়ে সুচিন্তার তাই তো এত ভয়। তাই তো এত সুখ।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যের জয়মাল্যঃ ইভো আন্দ্রিক

* * দীপজ্যোতি সেন * *

পর পর তিন বছর তিনজন কবিকে পুরস্কৃত করার পর (কেননা, প্যাস্তেরনাক একটি উপন্যাস লিখলেও মূলতঃ তিনি কবি) সুইডিশ কমিটি পূর্ব ইয়োরোপের যুগোশ্লাভ কথাশিল্পী ইভো আন্দ্রিককে ১৯৬১ সালে ঐ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ইয়োরোপের প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত সাহিত্য ভিন্নও আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এই সাহিত্যের উপরেও যখন নোবেল কমিটির কৃপা-দৃষ্টি পড়েছে তখন হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সাগর পেরিয়ে ভারতবর্ষের লেখকদের উপরেও সেই কৃপাকণা বর্ষিত হবে। অবশ্য পুরস্কার-কমিটির বিচারকেরা চোখ থেকে রাজনৈতিক চশমা জোড়া খুলে রেখে সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হলে অচিরে তা সম্ভব হতো— এ ধারণা নিছক অনুমান নয়।

এ বছরের নোবেল-বিজয়ী ইভো আন্দ্রিকের জন্ম হয় ১৮৯২ সালে যুগো-শ্লাভিয়ার বসনিয়া অঞ্চলের ডোলাকে, এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন কারুশিল্পী; কষ্টে-সৃষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ হতো। জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই পিতৃহীন হয়ে মার তত্ত্বাবধানে আন্দ্রিকের পড়াশুনো, স্বাস্থ্যচর্চা প্রভৃতি শুরু হয়। পরে অস্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করতে যান। দর্শন শাস্ত্রে আন্দ্রিকের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনেই তিনি ডক্‌টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আন্দ্রিকের বিশ্ববীক্ষায় তাই মানবজীবনের প্রকৃত তাৎপর্য সহজে ধরা পড়ে।

আন্দ্রিকের শৈশবে ক্রোট, সার্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চল খন্ড-বিক্ষিপ্ত ছিল। সার্বিয়ার যুবরাজের যে হত্যাকাণ্ড ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের ইন্ধন জুগিয়েছিল সেই মহাযুদ্ধের প্রবল ঝড় বয়ে গেছে আন্দ্রিকের শৈশবে।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে ১৯১৭ সালে যুগোশ্লাভিয়ার খন্ড-বিচ্ছিন্ন

ইভো আন্দ্রিক

অঞ্চল ঐক্যবদ্ধ হয়ে বর্তমান যুগো-শ্লাভিয়ায় রূপান্তরিত হলো। গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়েই নীতি-গতভাবে আন্দ্রিক স্বদেশের দুর্দশায় বিচলিত হয়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে-ছিলেন। সেই যুব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়।

জেলে অবসর বিনোদনের জন্য লেখা-লেখা খেলা করতে করতেই আন্দ্রিক নিজের সাহিত্যিক সত্তা আবিষ্কার করলেন। কবি হিসেবেই সাহিত্যিক পথে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। জেলে তিনি যে কবিতা-বই লিখেছিলেন, ১৯১৯ সালে ঐগুলি একত্রে সংকলিত হয়ে 'এক্স-পোনিটো' নামে প্রকাশিত হয়। মানবিক সমবেদনায়, ভাবের সৌকর্যে, গীতল উচ্ছ্বাসময়. এই কাব্য প্রাণবন্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আন্দ্রিকের যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার নাম 'নিমিরি'। যুগো-শ্লাভ জীবনের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা এই কাব্যের মুক্তছন্দে প্রকাশের ভাষা পেয়েছে।

একাধারে দার্শনিক পণ্ডিত ও কবি হিসেবে কথঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জন করার জন্যেই কিনা কে জানে, যুগোশ্লাভ কূট-নৈতিক দপ্তর তাঁকে এ সময় উচ্চপদের একটি রাজকার্যে বহাল করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও তিনি হিটলারের বার্লিনে স্বদেশীয় রাষ্ট্রদূতের কাজ চালিয়ে গেছেন। একই জীবনে দু দুটি মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষদর্শী হবার দুর্ভাগ্য আন্দ্রিকের হয়েছে। চোখের সামনে বিধ্বস্ত হতে দেখেছেন শত্রু-অধিকৃত স্বদেশকে। বেদনা পেয়েছেন যথেষ্ট কিন্তু মনুষ্যত্বের চিরন্তন মূল্যবোধে অবিচল আস্থার জন্যেই বোধহয় ফাশিস্ত-আক্রান্ত স্বদেশের পল্লীভবনে বসে নিদারুণ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এবং ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ উপন্যাস লিখে যেতে পেরেছেন— যার অতীতকালে কাহিনীর মধ্যে বিধ্বস্ত বর্তমানের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, একা-কার অতীত ও বর্তমানকে ছাপিয়ে উঠেছে ভবিতব্যের এক শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাস।

আন্দ্রিকের প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে ঘটলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালেই তিনি মহৎ-সৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন।

১৯২০ সালের পরবর্তী সময়ে যুগোশ্লাভিয়ায় প্রকৃত অর্থে আধুনিক উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ঘটে। যদিও কথা-সাহিত্যিক হিসেবে আন্দ্রিক 'আলিজা জেরেলেজের সফর' নামে এক উপন্যাস লিখে ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন, তবুও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালেই তিনি 'বসনিয়ার কাহিনী', 'ত্রাভনিকের বৃত্তান্ত', 'কুমারী', 'বিধ্বস্ত প্রাঙ্গণ' ও 'দ্রিনা নদীর সেতু' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা শেষ করেন যা সত্যি সত্যিই খুব জন-

প্রিয় হয়ে ওঠে। শেষোক্ত গ্রন্থটি যুগোশ্লাভিয়ায় ফাশিস্ত এরোপ্লেন চড়াও হয়ে যখন বোমা বর্ষণ করছে, সেই সময় লিখিত।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে আন্দ্রিক বসনিয়ার অতীত কাহিনীকেই বেছে নিয়েছেন। বসনিয়ার অতীত কাহিনী ও প্রচলিত লোকগাথাই তাঁর প্রেরণার উৎস। বিভিন্ন সময়ে শত্রুদ্বারা অধ্যুষিত বসনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম ও পন্থাবলম্বী অধিবাসীরা অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যস্ত থাকায় বিপক্ষীয় শক্তির বিরুদ্ধে কখনও সমবেত ভাবে রুখে দাঁড়াতে পারেনি। অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিবিধ বৈষম্যে কন্টকিত অধিবাসীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহিরাগত শত্রুপক্ষ এখানে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে। তুর্কী, ক্যাথলিক, মুশ্লিম, অস্ট্রিয়ান প্রভৃতি জাতের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতালোভী ও দুর্বলের বাঁচা-মরা সংঘাত ও রক্তপাতের কাহিনী এই উপন্যাস। বসনিয়ার অধিবাসীদের ধর্মাধর্ম, ঘৃণা, ক্রোধ, ভালোবাসা, পাপ-পুণ্য সমস্ত কিছুর প্রতিবিম্ব ধরা পড়েছে এই দর্পণে। তবু এই দ্বন্দ্ব-সংশয়, কলুষ-গ্লানি তাঁর উপন্যাসের শেষকথা নয়, এই অন্ধকারেও শাশ্বত মানবাত্মার আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

যে উপন্যাসের ভিত্তিতে আন্দ্রিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেই 'দ্রিনা নদীর সেতু' গ্রন্থের কাহিনী ভিসেগ্রাদ শহরের বিখ্যাত সেতু অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। এই সেতুর উপরে দণ্ডায়মান ভিসেগ্রাদ শহরের অধিবাসী তথা এই সমগ্র সেতুটিই যেন এই উপন্যাসের নায়ক। কত রাজা কত মন্ত্রী উল্টে গেছে, যুদ্ধের পর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে; বসনিয়া ও সার্বিয়ার সীমান্তের সংযোজক এই সেতুটি যুগ যুগ ধরে মহাকালের সমস্ত সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। এই হানাহানি, কাটাকাটির পাশাপাশি সেতুর বুকের উপর দিয়ে সাধারণ মানুষের যে সহজ সাদাসিধে জীবনযাত্রা আবহমান কাল থেকে বয়ে চলেছে, সেই ধারা কখনো নিঃশেষ হবে না। তাই এই উপন্যাসে রণডংকা, জয় ভেরী, রক্তপাত ও হতাহতের আর্তনাদ ছাপিয়ে উঠেছে মানবাত্মার অব্যাহত জয়যাত্রার বাণী,—যার জন্যে আজকের দিনে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানাবে।

ছোটগল্প রচনাতেও আন্দ্রিক সিদ্ধহস্ত। 'নিউ স্টোরিস' নামে তাঁর ছোট গল্পের সংকলন যুগোশ্লাভিয়ায় হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে। 'বেস্ট সেলার' বলতে যা বোঝায় তাঁর উপন্যাসগুলিও সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। এ ছাড়াও বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও সমালোচনা তিনি লিখেছেন। তাঁর বহু গ্রন্থই, উলনার, আল্টুনবারাক প্রমুখ সমালোচকেরা কম্বুকণ্ঠে বন্দনা করেছেন—লেখক হিসেবে এমন বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী তিনি। তাঁর শেষতম বইটির নাম 'কারেকটারস্'। গত মে মাসে প্রকাশিত এই বইটি মানবসমাজের কয়েকটি চমকপ্রদ চরিত্র-চিত্র—উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক।

শিল্পীর নির্লিপ্তি বজায় রেখেও তিনি স্বীয় সময় ও সমাজ সচেতন। লেখক হিসেবে সামাজিক শুভবুদ্ধিসম্পূর্ণ আধুনিক মনের অধিকারী ইভো আন্দ্রিক।

মতামত

॥ একটি প্রতিবাদ ॥

[নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য মুদ্রিত করছি। পত্রোক্ত প্রবন্ধটির লেখক শ্রীসঞ্জীব বসু যে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন সেজন্য আমরা দুঃখিত। 'অমৃত' সর্বজনবরেণ্য কবি অতুলপ্রসাদের বিষয়ে অত্যন্তই শ্রদ্ধাশীল।

—'অমৃত' সম্পাদক]

'অমৃত'
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

২রা নভেম্বর,১৯৬১

মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত "অমৃত" পত্রিকায় গত ২০শে অক্টোবর ১৯৬১ তারিখে শ্রীসঞ্জীব বসু লিখিত আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেনের জীবনী পড়িবার সুযোগ হইয়াছে।

এই জীবনীর কিয়দংশে সত্যের বিকৃতি অবলোকন করিয়া বিশেষ দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছি। শ্রীসঞ্জীব বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 'কবির বংশধরদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র পুত্র মানসিক রোগে আক্রান্ত। কাজেই পুত্রবধূ নিজেই তার সংসার পরিচালনার জন্য অর্থ রোজগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।' এই যে মিথ্যা সংবাদগুলি শ্রীসঞ্জীব বসু মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেইগুলির সূত্র ও তথ্য তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা আমি জানি না।

এই বিষয়ে যাহা সত্য তাহার উল্লেখ করিয়া আপনাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করিতেছি।

আমার পরমারাধ্য শ্বশুর মহাশয়ের জন্ম তারিখ হইল ২০শে অক্টোবর ১৮৭১ সাল এবং তাঁহার পুত্র শ্রীদিলীপকুমার সেন কখনও 'মানসিক রোগে আক্রান্ত" হন নাই এবং বর্তমানে তিনি লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফিসের একজন কর্মী; সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ ও প্রতিপালনের জন্য অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্রবধূকে অর্থ উপার্জন করিতে হয় না।

নমস্কার জানিবেন।

ইতি
বেলা সেন

(১)

॥ শেক্স্পিয়ার ও ইবসেন ॥

সেদিন আড্ডায় এসেছিলেন কালীকান্তবাবু। এবং এসেই যা করলেন তাকে ইংরেজরা নাম দিয়েছে হাত থেকে ইঁট ছাড়া। বললেন—শেক্স্পিয়ার-এর নাটক অবজেক্টিভ্, ইবসেন-এর নাটক সাবজেক্টিভ্।

বোমার মতন ফেটে পড়লো ঘরখানা—নাট্যকার এবং দার্শনিক হাসতে হাসতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন। ভাষাবিদ খ্যা-খ্যা-রকমের একটা বিশ্রী শব্দ ক'রে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

কালীকান্ত চটে উঠলেন, বললেন—এত হাসবার কি আছে? ছাপার অক্ষরে পড়েছি কথাটা।

তাতে নাট্যকার বললেন—যাঃ সত্যি, কেন ধাপ্পা দিচ্ছেন? অমন কেউ লিখতে পারে?

দার্শনিক বললেন—নাটক কি হোসিয়ারী দোকানের গেঞ্জি নাকি? না রকম "গণেশ, সরস্বতী, সামারকুল" জাতীয় লেবেল মারতে হবে?

ভাষাবিদ বললেন—তা ছাড়া ঐ কথাগুলোর অর্থ কি? লেখক গাঁজা-টাঁজা খান নাকি?

কালীকান্ত পকেট থেকে একখানা বাংলা সাপ্তাহিক উদ্ধার করে পড়ে শোনালেন। হ্যাঁ, সত্যি। এক সমা[illegible] লিখেছেন— শেক্স্পিয়ার অব্জেক্টিভ, গিরিশ ঘোষও; এঁদের নাটকে নাকি ঘটনা আগে ঘটে, তারই ফলে পরে চরিত্রের প্রকাশ বা বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আর ইব্সেন নাকি প্রবর্তন করেছিলেন এক নূতন ধারা, সাবজেক্টিভ। এখানে নাকি চরিত্র ঘটনার দাসত্ব করে না; বরং উল্টে চরিত্রই ঘটনার সৃষ্টি করে।

ইবসেন

কালীকান্ত থামলেন না, বলে চললেন—উদাহরণও দিয়েছেন সমালোচক। আধুনিক জীবনে বিরোধ-সংঘর্ষ এত বেশী যে ইব্সেনধর্মী নাট্যকারেরা দোকানে সামান্য জুতো-কেনাকে কেন্দ্র করেই বিরাট ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই যে লিখেছে ঃ মনে করি একটি মেয়ে একজোড়া জুতো কিনবে—
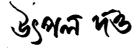
নাট্যকার বললেন—ঠাহর করে দেখুন তো দাদা একটা ইটালিয়ান নাম কোথাও স্বীকার-টীকার করা হয়েছে কিনা?

কালীকান্ত খেপে গিয়ে বললেন—অর্থাৎ?

নাট্যকার বললেন—না, বলছিলাম ঐ জুতো-কেনা কাহিনীটা সেজারে ৎসাভাতিনি নামক জগদ্বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রনাট্যকারের কল্পনা। ওটা আধুনিক ইটালিয়ান চলচ্চিত্রে নয়া-বাস্তববাদ, নেও-রিয়ালিজম-এর উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ৎসাভাতিনি। তাকে আধুনিক নাটক, তথা ইবসেনীয় নাট্যকল্পের উপমা হিসেবে ব্যবহার করে সমালোচক নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

শেক্স্পিয়ার

দার্শনিক বললেন—অজ্ঞতা নয়, এর মধ্যে সুপরিকল্পিত কোনো অপচেষ্টা আছে। কালীকান্ত যা পড়লেন তার ছত্রে ছত্রে এত ভুল যে আমার মনে হয় লেখক ইচ্ছে ক'রে সত্য গোপন করতে প্রয়াস পাচ্ছেন।

ভাষাবিদ হেসে উঠে বললেন—না হে, এসব লেখককে তুমি চেনো না। সত্যি তাঁরা জানেন না। অথচ জানেন না যে, এটা জানাতে চান না।

আরেকবার তিনজনে ছাদ-ফাটানো হাসি হেসে দাবা খেলতে বসলেন। অর্থাৎ ভাষাবিদ ও দার্শনিক বসলেন, নাট্যকার দাঁড়িয়ে চুরুট ধরিয়ে অযাচিত মাতব্বরী করতে উদ্যত হলেন।

কালীকান্ত অপমান বোধ করলেন; কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলেন না, কারণ একটু পরে চা-স্যাণ্ডুইচ্ আসবে। তাই ঝগড়ায় মাতবেন স্থির করে চেঁচিয়ে বললেন—কোথায় ভুল? এ লেখার কোথায় ভুল দেখান দিকি?

কেউ গা করে না দেখে, কালীকান্ত হেঁকে উঠলেন—বিদ্যার অহংকার ভাল নয়!

নাট্যকার বললেন— অবিদ্যার অহংকারের চেয়ে শতগুণে ভালো। দিচ্ছি আপনার প্রশ্নের জবাব, আগে চা আসুক।

আমরা ছুটোছুটি ক'রে চা-টা নিয়ে এলাম। খেতে খেতে দার্শনিক দাবা ছেড়ে দিয়ে বললেন—প্রথমতঃ ঐ সাবজেক্টিভ্-অবজেকটিভ্—ও সব কাতু-কুতু-দেয়া কথা আর ব্যবহার করবেন না, কথা দিন—তারপর বলবো।

নাট্যকার বললেন—হ্যাঁ, দাদা, আগে কথার জোহ কাটান। কথার লোভে

বুদ্ধি বিসর্জন কোনো কাজের কথা নয়। শেকস্পিয়ার-এর চরিত্র ডগ্‌বেরি (অবজেকটিভ্‌ না সাবজেকটিভ্‌ জানি না) কথার ঝকমারি ক'রে কি বিপদে পড়তো জানেন? কথার ঝংকার মানায় সুকুমার রায়কে, বা লুইস ক্যারল-এর জ্যাবারওয়াকিকে।

ভাষাবিদ তৎক্ষণাৎ বললেন—অথবা র‍্যাবোঁকে। যিনি প্রতিটি স্বরবর্ণের মধ্যে রং দেখতে পান। মনে আছে সেই বিরক্তিকর কচকচি—

"আ নোয়া, এ ব্লাঁ, ই রুজ, উ ভের্‌, ও ব্লো : ভইয়েল্‌!"

ফরাসী-টরাসী শুনলেই নাট্যকার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান; তাই হলেন। ধোঁয়া ছেড়ে ভাব দেখালেন ও কবিতাটা তাঁর পেটেই ছিল, মুখে আসেনি দুর্ভাগ্যক্রমে।

সেই সুযোগে দার্শনিক বললেন—মূল কথাটা দেখা যাক। শেকস্পিয়ার বা গিরিশ ঘোষ-এর নাটকে নাকি ঘটনা-প্রধান, ঘটনা আগে ঘটে। সেই ঘটনাচক্রে খাবি খেতে খেতে চরিত্র বিকশিত বা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ একটু উল্টে বললে দাঁড়ায়— চরিত্র ঘটনাকে প্রভাবান্বিত করে না, ঘটনাই চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে। লেখক সব গুলিয়েছেন! চরম গোলা গুলিয়েছেন। গ্রীক্‌ নাটকের আদর্শকে শেকস্পিয়ার-এর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কে যে উদো কে যে বুদো বুঝতে পারেননি।

নাট্যকার বললেন— উড়ো-উড়ো কথা শুনেছেন, ডেউস এক্‌স্‌ মাকিনার কথা। ভাগ্যচক্রে মানুষের লাঞ্ছিত হওয়ার কথা। সেটাই চাপিয়েছেন শেক্‌স্পিয়ার-এর দুর্বল স্কন্ধে। অমোঘ ঘটনাচক্রে অসহায় মানুষ—এ ইস্কাইলাস সফোক্লিস-এর যুগের কথা। "এন্টিগোনে প্রোমিথিয়ুস"-এর যুগের কথা। শেকস্পিয়ার-এর নাটক ঘটনার দাস—এ তথ্য বাইরে বলবেন না, লোকে ইঁট মারবে!

কালীকান্তের মুখ স্যান্ডুইচে ভরা। তবু দ্রুত তাকে অচর্বিত অবস্থায়ই গলাধঃকরণ করে, হঠাৎ বিষম খেয়ে বললেন— কেন? শেকস্পিয়ার-এর নাটকে ঘটনা নেই?

নাট্যকার গর্জন ক'রে বললেন—আরে দুত্তোর মশাই, কথাটা বুঝতে চেষ্টা করেন না কেন? ঘটনা তো থাকবেই; ঘটনা ছাড়া নাটক হয় নাকি? চমকপ্রদ ঘটনা, মুহুর্মুহু ঘটনা। প্রশ্নটা ঘটনা থাকে কি থাকে না নয়। নায়ক ঘটনার দাস, না ঘটনা নায়কের দাস—এটাই আলোচনা হচ্ছিল। শেকস্পিয়ার-এর নাটক কি প্রাচীন গ্রীক নায়কের মতন নিয়তির বিধানে ঘটনাস্রোতে ভেসে যায়? না, নিজের চরিত্রের দৌর্বল্যজনিত মহাপ্রমাদ সংঘটিত ক'রে ঘটনা সৃষ্টি করে, ঘটনার মোড় ফেরায়, ঘটনাকে ট্র্যাজেডির পথে টেনে নেয়— আমার ধারণা, যে কোনো কলেজের ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারটা জানেন, বোঝেন। ঐ সাপ্তাহিকের সমালোচক তাঁদের কাউকে পাকড়ে তত্ত্বটা বুঝে নিলেই তো পারেন।

কালীকান্ত দেখলাম আমার মতনই একগুঁয়ে; বলে উঠলেন—বুঝলাম না। শেকস্পিয়ার-এর নায়করা ঘটনা সৃষ্টি করেন কি? ম্যাকবেথ্‌ তো ডাকিনীদের হাতে ক্রীড়নক।

আবার হাসির হুল্লোড় উঠলো। হাসতে হাসতে চোখের জল মুছে দার্শনিক বললেন—দাদা, এগারো বছরের কোর্স চালু হয়ে গেছে ইস্কুলে; ইংরিজিতে প্রথম পেপার নিলে শেকস্পিয়ার পড়তে হয়; আপনি বরং কোনো ইস্কুলের ছাত্রকে জিগ্যেস করে নেবেন।

নাট্যকার কিন্তু হাসতে হাসতে খেপে গেলেন। বললেন—এত বই লেখা হয়েছে, আপনারা কি তার কিছুই পড়েন না? আর পড়েন না যদি, তবে ছাপার অক্ষরে শেকস্পিয়ার সম্বন্ধে লিখতে সাহস পান কি ক'রে? চেম্বার্স বা রবার্টসন-এর বই না হয় আপনাদের বোধগম্য নয়; কিন্তু ব্র্যাড্‌লিটাও কি পড়ে রাখতে পারেননি?

কালীকান্তের তখন বোধহয় গোঁ চেপেছে; বললেন—ডাকিনীরা ম্যাকবেথকে প্ররোচিত করেনি?

এবার ভাষাবিদও খেপে উঠলেন, বললেন—না, নিজের অন্তরে রাজা হওয়ার সুপ্ত বাসনা না থাকলে ম্যাকবেথ প্ররোচিত হতেন না। ডাকিনীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ম্যাকবেথ চমকে উঠলেন কেন? রাজাকে হত্যা করতে তো ডাকিনীরা বলেনি, হত্যা করলেন কেন? ব্যাংকোকে হত্যা করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তাঁকে? দূরে মশাই, শেকস্পিয়ার অমন বালখিল্য চরিত্র আঁকেন না।

এই সময় বোমা পড়লো ঘরে, নাট্যকার বললেন—এদিকে রবার্টসন সাহেব প্রায় প্রমাণ ক'রে ছেড়েছেন যে ডাকিনীর দৃশ্যগুলো শেকস্পিয়ার-এর লেখাই নয়।

কালীকান্ত ঘর্মাক্ত; বললেন—সে কি!

—হ্যাঁ! খুব সম্ভব মিড্‌লটন নামে এক নিকৃষ্ট নাট্যকারকে ডাকা হয়েছিল শেকস্পিয়ার-এর নাটকটা সংশোধন করতে। তিনি—

কালীকান্ত বললেন—কি ধৃষ্টতা!

—এই মিড্‌লটন সাহেবের একটা পুরোনো নাটক ছিল, তার নাম "উইচ" বা ডাকিনী। সে নাটকের বিস্ময়কর সাফল্য দেখে গ্লোব থিয়েটারের মালিকরা ঐ ডাকিনী-জাতীয় কিছু "ম্যাকবেথে" জুড়ে দিতে ঐ জনপ্রিয় অথচ নিরেট নাট্যকারকে আহ্বান করেন, তিনি তখন নির্মমভাবে শেকস্পিয়ার-এর ওপর কলম চালিয়ে ডাকিনী দৃশ্যগুলো জোড়েন। বড় বড় দৃশ্য—যার ফলে "ম্যাকবেথ" এখন খণ্ডিত; অতি মাত্রায় সংক্ষিপ্ত।

কালীকান্তের বিস্ময়ে বিহ্বল অবস্থা। বললেন—এ রকম প্রক্ষিপ্ত অংশের ফলে নাটকের সূত্র ছিঁড়ে গেল না কেন? যা ইচ্ছে জোর করে জুড়লে নাটকের ঘটনা-পরম্পরা, ঘটনা-সংহতি, চরিত্র-বিকাশ, এ সব বাধা পেল না?

—কে বললে পায়নি? কিছু পড়াশোনা থাকলে জানতে পারতেন ম্যাকবেথ নাটকে প্রচুর সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যার কিনারা করতে পণ্ডিতরা হিমসিম খাচ্ছেন। ডাকিনী দৃশ্যের পর ম্যাকবেথে-এর ওপর তাদের প্রভাব একরত্তিও না থাকার সমস্যা, হেকেট্‌-সমস্যা, লেডি-ম্যাকবেথের পুত্র থাকার সমস্যা, ম্যাকডাফ-ম্যালকম দৃশ্যের সমস্যা, তৃতীয় হত্যাকারীর সমস্যা, দ্বার-রক্ষক দৃশ্যের সমস্যা, বাদ-দেয়া অংশের সমস্যা। পুরো নাটকটি তালগোল পাকিয়ে গেছে। একটু ঠাহর করে নাটকটা পড়ুন, জানতে পারবেন।

কালীকান্ত একটু চুপ ক'রে ভাবলেন, আরো একখানা স্যান্ডুইচ খেলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—তাহলে বলছেন

শেক্স্পীয়র-এর নায়করা ঘটনার দাস নয়?

—এতক্ষণে ধরেছেন দেখছি, বললেন দার্শনিক।—ম্যাকবেথই যখন দাস নয়, তবে আর কে দাস? ম্যাকবেথ-এরই কিছু সম্ভাবনা ছিল ঘটনাচক্রে পড়ার। কারণ ডাকিনীরা তাকে নাকি উসকেছে। সে ম্যাকবেথই দেখলাম নিজের উচ্চাশা ছাড়া কারুরই দাস নয়; উচ্চাশা আর কল্পনা-প্রবণ মনের দাস। অন্য নায়করা তো স্বহস্তে নিজের গলা কেটেছেন। নিজে-দের দোষের জালে নিজেরা জড়িয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়েছেন—হ্যামলেট্-এর চিন্তাশীলতা আর কর্মবিমুখতা, ওথেলোর অতিরিক্ত ভালবাসা, এন্টনির বিকৃত উগ্র প্রেম, রাজা লিয়ার-এর বিশ্বাসপ্রবণতা আর বাৎসল্য, করি-ওলেনাস-এর দম্ভ, ব্রুটাস-এর রাজনৈতিক আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত। প্রত্যেকে এ'রা নিজেদের চরিত্র-প্রভাবে ঘটনা সৃষ্টি করেছেন; ঘটনার আবর্তে এ'দের চরিত্র হয়তো আরো দুর্বলতায় ফেটে পড়েছে; কিন্তু ঘটনার মূলে হোলো চরিত্র, চরিত্রের মূলে ঘটনা নয়।

এই সময়ে ভাষাবিদ টিপ্পনি কাটলেন—যাঁরা নাটকগুলোয় উপর উপর চোখ বোলান বা চার্লস ল্যাম্ব-এর সংক্ষিপ্ত-সার পড়েন, তাঁরা হয়তো শুধু ঘটনাই দেখেন। সামান্যতম নাট্যরসিকও কিন্তু ঘটনার মূলে মানবচরিত্রে অনায়াসে প্রবেশ করেন।

নাট্যকার মুহূর্ত গুনছিলেন, সুযোগ পেতেই বললেন—আর যেমন ভদ্রলোকের শেক্স্পিয়ার-বোধ, তেমনি তাঁর গিরিশ-বোধ! তাঁর মতন সমালোচকের পক্ষে যোগেশের ট্র্যাজেডি-র মূলে ব্যাঙ্ক-ফেল হওয়া ছাড়া আর কি চোখে পড়বে? ব্যাঙ্ক-ফেল হওয়াটাকেই বা এত তুচ্ছ করছেন কেন? ওটা তো সে সময়ের সামাজিক ব্যবস্থার পতনের প্রতীকও হতে পারে। যাক্ কথা হচ্ছে, ব্যাঙ্ক ফেল না পড়লেই রমেশ 'ক দাদাকে ছেড়ে দিত? ব্যাঙ্ক ফেল পড়েও তো যোগেশ পথে বসেনি, সেই ব্যাঙ্ক তো আবার টাকা দিতে শুরু করলো। সে টাকার ফল যোগেশ পেলেন না, কারণ রমেশ বাধা দিল। রমেশের চরিত্রটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন কি লেখক? "প্রফুল্ল" নাটকের ঘটনাচক্রের মূলে রমেশ-চরিত্রের কুলিশকঠিন গৃধ্নুতা এবং যোগেশের সিনিসিজম্। এই সিনিসিজম্ই তো পুরো ট্র্যাজেডির জন্যে দায়ী। যে জানছে, বুঝতে পারছে যে মা রত্নগর্ভা, এক ছেলে মাতাল, এক ছেলে চোর, এক ছেলে উকিল; যে উপলব্ধি করছে তাকে দিয়ে সর্বনাশা দলিল সই করানো হচ্ছে—সব জেনেও সে কিছুই করছে না; তার কেমন যেন বিতৃষ্ণা এসেছে। লেখক এসব কিছুই বোঝেন নি। যাক্, কলেজের ছাত্রের কাছে দু-চারদিন ক্লাস করুন, সব খোলসা হবে।

কালীকান্ত উঠতে চেষ্টা করলেন; ঘাড়ে মৃদু রদ্দা মেরে তাকে বসিয়ে দিয়ে নাট্যকার বলে চললেন—লোমহর্ষক ঘটনা-প্রবাহ প্রায় সব নাট্যকারই এঁকে থাকেন; কিন্তু ঘটনা যদি আকস্মিক হয়, বা দৈব-ইচ্ছায় ঘটে, তবে মহৎ ট্র্যাজেডি সৃষ্টি অসম্ভব। ট্র্যাজেডির মূল কথাই হোলো মানব-চরিত্রের জটিলতা; ঘটনাটা উপলক্ষ মাত্র। মানুষের ইচ্ছায়, মানুষে মানুষে সংঘর্ষে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়।

দার্শনিক বললেন—একমাত্র গ্রীক নাটক ছাড়া। সেখানে দৈবইচ্ছার প্রাধান্য সত্ত্বেও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়েছে। তার নানা সামাজিক কারণ আছে; দৈবইচ্ছা যে এলিউসিয়ান এবং অর্ফিক্তন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের কাছে কতটা বাস্তব, কতটা সত্য ছিল, তা এই ইলেকট্রিক ফ্যান্-এর তলায় বসে আমরা সম্যক বুঝতে পারবো না। ওদের কাছে দৈব প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার মতনই প্রত্যক্ষ।

নাট্যকার গলা তুলে বললেন—তারপর থেকে কোনো মহৎ নাটকে নায়ক ঘটনার দাসত্ব করেনি। গিরিশের নাম করেছেন লেখক! কিন্তু পড়েননি বলে আমার ধারণা। ক্ষিরোদপ্রসাদ পড়েছেন উনি? পুরো ভীষ্ম নাটকে হয়তো ভীষ্ম-চরিত্র বাদ দিয়ে কেবল কুরুক্ষেত্রের মারামারি-টাই তাঁর চোখে পড়বে। "নর-নারায়ণ" সম্বন্ধে লিখতে গেলে আমি হলপ ক'রে বলতে পারি কর্ণ-চরিত্র খারিজ ক'রে উনি আবার সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে মনোনিবেশ করবেন!!!

দার্শনিকও এবার উত্তেজিত হয়ে-ছেন; বললেন—ব্যাঙ্ক ফেল না হলে "প্রফুল্ল" ঘটতো না!! কি কথা! তবে পাশা না খেললে মহাভারত ঘটতো না! অতএব মহাভারত ঘটনা-সমষ্টি মাত্র, চরিত্ররা গৌণ!

নাট্যকার ফোড়ন কাটলেন—অতএব ব্যাসদেব অবজেকটিভ্ অথর!

এক পশলা হাসি হোলো আবার!

কালীকান্ত বললেন—এবার তাহলে উঠি!

কেউ কর্ণপাত করেন না; কিন্তু আর এক রাউণ্ড চা এসে পড়াতে কালীকান্তর যাওয়া হোলো না।

এদিকে নাট্যকার বলছেন—আসলে কি জানেন। প্রত্যেকে নিজের ক্ষুদ্রতার চৌহদ্দিতে দেখে শেক্স্পিয়ারকে, গিরিশকে। এলিয়টই তো লিখেছেন—স্ট্রেচির চোখে শেক্স্পিয়ার এক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার; মারির চোখে শেক্স্পিয়ার এক নূতন যৌগিক ধর্মের পুরোহিত; উইণ্ডহাম লুইস-এর চোখে তিনি বিপ্লবী। আমাদের এই বাঙালী ছা-পোষা সমালোচকের চোখে শেক্স্পিয়ার অবশ্যই ছা-পোষা যাত্রা-ওয়ালা। মুহুর্মুহু ঘটনা ছাড়া আর কিছু তাঁর চোখে পড়ার কথা নয়।

দার্শনিক জুড়ে দিলেন—ঠিক তেমনি মধ্যবিত্তসুলভ তাঁর ইব্সেন-আলোচনা। শেক্স্পিয়ারেই যিনি হোঁচট খান তিনি ইবসেনকে আর বোঝেন কি করে? দেখি কাগজটা? ইবসেনকে কি কি বিশেষণে উনি ভূষিত করেছেন সেটা স্বচক্ষে দর্শন করি।

সাপ্তাহিকটা একরকম কেড়ে নিয়ে দার্শনিক লেখাটার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে বলেন—এই যে! সাবজেকটিভ্ ট্রীটমেণ্ট! ভাবতান্ত্রিক রীতি! এ'র নাটকে ঘটনার ভিড় নেই, নাটকীয় চরিত্র ঘটনার দাসত্ব করে না। তারপর ৎসাভার্তিন থেকে উদ্ধৃত করা (বিনা স্বীকৃতিতে) জুতোর গল্প। ভাববস্তু-প্রধান! ইবসেন-প্রবর্তিত সাবজেকটিভ্ ট্রীটমেণ্ট!

ভাষাবিদ শূন্য কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন—আমার ধারণা উনি মডার্ণ লাইব্রেরী প্রকাশিত এগারোটি ইবসেন নাটকের বাইরে কিছু পড়েননি। সেই এগারোটারই আবার সবকটা পড়েছেন কিনা সন্দেহ। নইলে ইব্সেন-এর নাটকে ঘটনার ভিড় নেই—এ হেন একখানা উক্তি করলেন কোন আক্কেলে? আর ঐ সাব-জেকটিভ্ যে কি বস্তু কিছুতেই তো বুঝতে পারছি না!

কালীকান্ত এবার প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন—না, না, উনি বলতে চান ইবসেন-এর নাটকে ঘটনা কম, অপেক্ষা-কৃত কম। চরিত্রদের আবেগ এবং ভাবই ওঁর নাটকের সম্পদ।

ভাষাবিদ ধমকে ওঠেন—অর্থাৎ ইবসেন কেরানী। ইবসেন দৈনন্দিন

ঘটনার মধ্যে নাটককে আবদ্ধ রাখেন! জুতো-কেনার মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারকে অবলম্বন করেই তাঁর চরিত্ররা প্রকাশিত হয়! নিজের মধ্যবিত্ততায় ইবসেনকে ধরতে চাইছেন ভদ্রলোক।

কালীকান্ত বললেন—কেন? ইবসেনও কি চমকপ্রদ ঘটনায় না ভাসাতেন? "ডল্‌স্ হাউস" তো—

নাট্যকার চেঁচিয়ে উঠলেন—তাই তো বলছি আমরা। "ডল্‌স্ হাউস" আর "গোস্টস্" ছাড়া ইবসেন-এর কোনো নাটকই প্রায় পড়া হয় না। মডার্ণ লাইব্রেরি-র সংকলনের বাইরে আমরা যাই না। তাই উইলিয়ম আর্চার-এর আড়ষ্ট ভিক্‌টোরিয়ান ইংরিজিতে অনূদিত কয়েকটা সামাজিক নাটক থেকে ইবসেনকে বুঝতে চেষ্টা করি। বিসমিল্লায় গলদ!

দার্শনিক এবার বলে উঠলেন—লেডি ইংগের অফ অস্ট্রাট পড়েছেন? ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লেখা। চিরাচরিত যে ঘটনা-বহুল ষড়যন্ত্র-খুন-খারাপির নাট্যরীতি তাই অনুসরণ ক'রে লেখা। শেষ দৃশ্যটা জানেন? দুজন সামন্তরাজকে নিমন্ত্রণ ক'রে লেডি ইংগের মদের পাত্র হাতে তুলে দিলেন। দুজনে মদ খেয়ে ফেলতেই মহিলা বলে উঠলেন, একটায় বিষ আছে। দুজনই মৃত্যুভয়ে ছট্‌ফট্ করছেন! এতো খাঁটি শেক্‌স্‌পিয়ার ধারা—ফরাসী নাট্যকার স্ক্রীব-এর মারফত এসে পেঁাছেছে ইবসেন্-এর কলমে।

ভাষাবিদ বললেন—ইবসেন্-এর আর একটি নাটক "ভাইকিংস্ এট্ হেল্‌গেলাণ্ড্"। সামুদ্রিক ঝড়ের মতনই এর বিপুল প্রচণ্ড ঘটনার তোড়। পড়েছেন?

কালীকান্ত বললেন—নামও শুনিনি।

ভাষাবিদ বললেন—কাহিনীটা শুনতে ইচ্ছা করেন? ভাইকিং বীরগুনার-এর পুত্র এগিল নিখোঁজ। গুনার ভাবলেন প্রতিদ্বন্দ্বী বীর ওরনুল্‌ফ্ এগিলকে হত্যা করেছেন। তাই গুনার খুন করলেন ওরনুল্‌ফ্-পুত্র থোরাল্‌ফ্-কে। এমন সময় এলেন ওরনুল্‌ফ্, সঙ্গে এগিল; এগিলকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে ওরনুল্‌ফ্-এর ছ'জন পুত্র প্রাণ দিয়েছে। এখন এসে শুনতে হোলো বংশের শেষ বাতিটিও নিভে গেছে ভুল বোঝাবুঝির ফলে। কোথায় জুতো-কেনার ক্ষুদ্রতা, বলুন দেখি কালীকান্তবাবু! এ নাটকটার আর-একটা জিনিস লক্ষণীয়। [illegible] প্রায় চরিত্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে। চরিত্র ঘটনার দাসত্ব প্রায় স্বীকার ক'রে বসেছে। কারণ ঐ ভুল-বোঝাবুঝিটা প্রায় গায়ের জোরে ঘটানো হয়েছে। থোরোল্‌ফ্‌কে যখন সদলবলে গুনার হত্যা করতে এলেন থোরোল্‌ফ্ জানতো তার পিতা নির্দোষ; তিনি এগিলকে রক্ষা করতে গেছেন, খুন করতে নয়। তবু সে কথাটি কইল না; মুখ বুঁজে মৃত্যু বরণ করলো। এ ধরনের ভুল-বোঝাবুঝি ইব্‌সেন ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেছেন ঘটনার চমৎকারিত্বের সার্থে। দেখছেন কালীকান্তবাবু—ঘটনা-প্রাধান্য শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটকে নেই, আছে ইবসেন্-এই (ক্ষেত্রবিশেষে)। অথচ ইবসেনকে বেমক্কা "সাবজেকটিভ্" আখ্যা দিয়ে বসেছেন আপনার সমালোচক।

এবার নাট্যকার যুদ্ধে প্রবেশ করলেন—ইবসেন-এর "প্রিটেণ্ডার্স" পড়েছেন? হাঁ-মুখ দেখেই বুঝেছি পড়েননি। ঐতিহাসিক নাটকের কাঠামোয় হাকন এবং স্কুলে নামক দুই রাজত্বলোলুপ সামন্তের দ্বন্দ্ব।

দার্শনিক ঘৃতাহুতি দিলেন—অন্ততঃ "এম্‌পেরর এণ্ড গ্যালিলিয়ান"-খানা পড়েছেন তো? তাও না? বেশ আছেন মশাই। সম্রাট জুলিয়ান খৃষ্টধর্মকে উৎখাত ক'রে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর—আগাথন-এর বল্লমের খোঁচায় প্রাণ হারিয়ে—তিনি খৃষ্টের কাছে হার মানলেন। শ্রীমতী ব্র্যাড্‌ব্রুক এই নাটকটিকে "ম্যাকবেথ্"-এর সঙ্গে তুলনা ক'রে সমগোত্রীয় প্রমাণ ক'রে ছেড়েছেন। শুধু সমগোত্রীয় নয়, সম-রীতিতে পরিকল্পিত। শেক্‌স্‌পীয়ার আর ইবসেন-এ খুব বেশি অমিল তো চোখে পড়ছে না! মিলের দিকটাই তো বেশী।

ভাষাবিদ বললেন—পুরোপুরি মিল। শেক্‌স্‌পিয়ার উনিশ শতকে জন্মালে ইবসেন হতেন এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ইব্‌সেন-এর নাট্যরীতি শেক্‌স্‌পিয়ারেরই উত্তরসূরী। এতক্ষণ ট্র্যাজেডি আলোচনা করেছি, এবার কমেডি দেখুন।

কালীকান্ত আকাশ থেকে পড়েন—ইবসেন কমেডি লিখেছেন?

ভাষাবিদ বললেন—কেন "লাভ্‌স্ কমেডি"-র নাম শোনেননি? "এজ ইউ লাইক ইট্" পড়েছি বলে মনে হয়। ফাল্‌ক্ আর সোয়ান্‌হিল্‌ডে—রোজালিণ্ড এবং ওরলাণ্ডোর প্রতিচ্ছবি। তার ওপর সেই হাস্যরসের ঝরণা সেই আনন্দ মাঝে মাঝে অপেরার মতন গান, নাচ, ছন্দ।

নাট্যকার বললেন—আর শেষ বয়সের রচনা অমর কাব্যসুষমাময় নাটকগুলি—"হোয়েন উই ডেড এওয়েকেন", "মাস্টার-বিল্ডার", "ব্রাণ্ড্", "পিয়ার গিণ্ট্"—ওসবের মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনা আর জুতো-কেনা খুঁজতে যাওয়া যে নেহাত আহাম্মুকি তা কি বলে দিতে হবে? জীবনের অর্থ খোঁজবার কাব্যময় প্রয়াস ঐগুলো, দার্শনিক তত্ত্বে ঠাসা। ঘটনায়ও। সব মানুষই এ' জগতে আসে একটা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতে; ইবসেন তাকে বলেন "ভোকেশন" বা "কল্"। সেই "ভোকেশন" খুঁজে মরছে শেষ নাটকগুলোর নায়করা। এগুলোর একটাকেও অভিনয়োপযোগী বলে স্বীকার করা হয় না। ওগুলো নাটকই নয়, ওগুলো কাব্য এবং দর্শন।

ভাষাবিদ এবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—হায়রে কপাল! "ডলস হাউস", "গোস্টস্" আর "এনিমি অফ্ দি পিপ্‌ল" প'ড়েই ইবসেনকে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রবক্তা বলে ভেবে বসে আছেন সমালোচক!

দার্শনিক বললেন—এর জন্যে দায়ী বার্ণার্ড শ', আর্চার-প্রমুখ ইবসেন-বাদীরা। নিজেদের সুবিধেমত এঁরা ইবসেনকে বিকৃত ক'রে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন। দৈনন্দিন সমস্যা-মূলক নাটকের রচয়িতাকে তাঁদের ভাল লাগে, তাঁদের দরকার। তাই ইবসেন-এর সারা জীবনের সৃষ্টিকে চেপে দিয়ে দুটি কি তিনটি নাটক নিয়ে জয়ঢাক পিটিয়েছেন। পর্বতকে লুকিয়ে মূষিককে নিয়ে প্রদর্শনী খুলেছেন!

ভাষাবিদ বললেন—আরে রাখো না হে! বার্ণার্ড শ'-এর গ্রন্থখানাই কি পড়েছেন সমালোচক? তাহলে অন্ততঃ সাবজেকটিভ্— অবজেকটিভ্ প্রভৃতি অনুস্বার-চন্দ্রবিন্দুর হাট বসাতেন না। যুক্তি একটা খাড়া করতেন। তাহলে দেখছেন কালীকান্তবাবু, ইবসেন ভাব-তন্ত্র-ফন্ত্র কিছুই প্রবর্তন করেননি। এক কথায় শেক্‌স্‌পিয়ার আর ইবসেন একই জাতের নাট্যকার!

কালীকান্ত বললেন—বাড়ি যাই, বড়ির ঝোল খেয়ে শুতে হবে।

পিকাসো

সমেন্দু ভদ্র

যে-যুগে চিত্রশিল্প প্রকৃতির অনুকরণ করত, এবং দৃশ্যমান জগতের অবিকল প্রতিচ্ছায়া ধারণ করে কৃতার্থ হত, সে-যুগ অনেক দিন আগেই বিগত হয়েছে। এ-কালের চিত্রশিল্প আত্মনির্ভরশীল, সে তার সাবেকী আশ্রয় ত্যাগ করে, স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠালাভ একদিনে সম্ভব হয়নি, বহু আত্মপরীক্ষায় চিত্রশিল্পকে শুদ্ধ হতে হয়েছে, বিস্তর বাধানিষেধের পাঁচিল ডিঙোবার পর তবে সে বিশ শতকের চরিত্রলক্ষণে বিশিষ্ট ও আধুনিক হতে পেরেছে। চিত্রকলার সেই স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে যাঁর কীর্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক, তিনি পিকাসো। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে পিকাসোর বৈচিত্র্যসন্ধানী সৃষ্টিকর্মের স্বরূপ বোঝা অনেকখানি সহজ হবে। তেমনি সহজ হবে, তাঁর বিগত ষাট বছরের শিল্প-অভিযানে এত আপাত-বিরোধ কেন, চিত্রশিল্পের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁর আকৈশোর জেহাদের প্রকৃতিই বা কি, তা উপলব্ধি করা। পিকাসোর সৃষ্টিশক্তি সত্যই বিস্ময়কর, যা নিত্য এক এক অনির্দিষ্ট অভাবিত ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করে সমকালীন শিল্পমহলে দারুণ চাঞ্চল্য আর তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। যে-সব বিরুদ্ধশক্তি আর সন্দেহ-সংশয় তাঁকে চারপাশে ঘিরে ধরেছিল, তারা আজ যথেষ্ট হীনবল হয়ে পড়েছে। যারা পিকাসোকে বাজীকর আখ্যা দিয়ে একঘরে করবার চেষ্টা করেছিল, তারাও আজ উপলব্ধি করেছে যে, চিত্র অথবা যে-কোন প্লাস্টিক শিল্পেই হোক না কেন, পিকাসোর সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার বা তাকে পাশ কাটাবার সাধ্য বর্তমানের কোন শিল্পীর নেই।

পিকাসোকে বলা হয় বিংশ শতাব্দীর তরুণতম শিল্পী। মাত্র গত ২৫শে অক্টোবর যখন তাঁর বয়স আশি বছর পূর্ণ হল তখনো তাঁর তারুণ্য একটুও নিষ্প্রভ হয়নি। এখনও তাঁর হাতের তুলি নতুন নতুন বিস্ময় নিয়ে আসছে, ভাস্কর্যে, ধাতু ও মৃৎশিল্পে, যাকে আমরা 'কিউরিয়ো' বলি এবং আরো রকমারি সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনে আজও তিনি অক্লান্ত। আর এসব ছাড়িয়েও রয়েছে তাঁর দূর-বিস্তৃত ব্যক্তিগত প্রভাব, যা জীবিতকালেই পিকাসোকে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের কান শহর, এখন যেখানে পিকাসোর ভিলা, দুনিয়ার শিল্প-প্রেমিকদের কাছে তীর্থসদৃশ। পিকাসোর দর্শনপ্রার্থী যে-কোন দেশেরই

হোক, তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের স্মৃতি তিনি কোন দিনই ভুলতে পারবেন না।

পাবলো রুই পিকাসো জাতিতে স্পেনীয়, ১৮৮১ সালে স্পেনের মালগা শহরে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন ড্রইং-শিক্ষক। অবস্থা ভাল ছিল না। পিকাসোকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই মানুষ হতে হয়েছিল। বাবার কাছে অঙ্কনবিদ্যার হাতেখড়ি হবার পর থেকেই সাত বছরের পাবলো রাশি রাশি ছবি এঁকে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে থাকেন। বার্সেলোনা ও মাদ্রিদের শিল্প বিদ্যালয়ে পিকাসোর শিক্ষালাভ ঘটে, কিন্তু আর্ট স্কুলে শেখা নিশ্চল রীতি-প্রকরণের প্রতি বরাবরই ছিল তাঁর গভীর অনীহা। কৈশোর কাল স্পেনের বিভিন্ন শহরে কাটিয়ে পিকাসো প্রথমবার প্যারিসে আসেন ১৯০০ সালে। এর চার বছর পর পিকাসো একরকম পাকাপাকি ভাবে ফ্রান্সে ডেরা বাঁধেন, অতঃপর ফ্রান্সই হয়ে ওঠে তাঁর কর্মক্ষেত্র।

যখন তাঁর বয়স উনিশ-কুড়ি বছর মাত্র, তখন থেকেই পিকাসো পরিণত শিল্পী। ঐতিহ্য থেকে পাঠগ্রহণ তখনো যদিও তাঁর শেষ হয়নি, তবু তাঁর আঁকা রাস্তা ও কাফের দৃশ্য, নগ্নমূর্তি, ষাঁড়ের লড়াই, রেসের ছবি, পোর্ট্রেট ও ল্যান্ডস্কেপ—সমস্ত মিলিয়ে শতাধিক ছবিতে পিকাসোর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বিশিষ্ট একক শৈলীর আসনে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠালাভ পিকাসোর পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহজ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা তাঁকে টানেনি বলেই পিকাসো অস্থির ভাবে এক পর্ব থেকে আর এক পর্বে উপনীত হয়েছেন, একটা ছেড়েছেন, অন্যটা ধরেছেন, ক্রমাগত বদলেছেন নিজেকে, শিল্পের ভাব-ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন স্তরেই তাঁর মন শান্ত হয়নি।

যৌবনের প্রথম দিকেই, ছবির বিষয় হিসাবে পিকাসো মানুষকে নিলেন। মানুষের চেহারা নয়, তার অন্তররূপ—তার আবেগ, তার সমস্যা ও দ্বন্দ্ব। পিকাসোর শিল্পী-জীবনের এই আদি-পর্বকে বলা হয় "নীল যুগ" (Blue Period), যখন দুনিয়াকে তিনি বিষণ্ণ দৃষ্টিতেই দেখেছেন, জগতের পাপ ও দারিদ্র্যের বিশ্লেষণে গয়া ও রিবেরার প্রেরণা, ঘৃণা তিক্ততা ও শ্লেষের ব্যঞ্জনায় তুলুজ-লত্রেক-এর প্রভাব যে-কালে স্পষ্টই চেনা যায়। বেশির ভাগ নারী-চরিত্র। এই সব দুস্থ আর সমাজ-পরিত্যক্তাদের মুখে কোনদিন নারীত্বের কমনীয় আভাসটুকু ছিল বলে মনে হয় না। 'সঙ', 'গীটারবাদক বুড়ো', 'ইস্ত্রীরত মেয়েমানুষ', 'অভিনেতা', 'দুই বোন'—এই সব গ্লানিময় দুর্দশাগ্রস্ত জীবন তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হয়নি।

দারিদ্র্যের সঙ্গে নিজেকেও যখন তাঁকে যুঝতে হচ্ছে, আহার, পোশাক ও আশ্রয়ের জন্য বার্সেলোনা ও প্যারিসের পথে পথে ঘুরছেন, শীতের হাত থেকে বাঁচতে, এমনকি, তাঁকে নিজের ড্রইং-এর স্তূপ জ্বালিয়ে দিতে হচ্ছে, তখন তাঁর আঁকা ছবিতেও কঠোর বাস্তবের চেহারাই

ফুটে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সমস্ত ছবিগুলো জুড়ে একমাত্র নীল রঙটাই দেখা দিয়েছিল কেন? ছবি আঁকবার রকমারি রঙ কেনবার সংগতি পিকাসোর ছিল না, অথবা রাত্রিবেলা অল্প আলোতে কাজ করতে বাধ্য হতে হত বলেই মনোক্রোমের ব্যবহার—এরকম অনুমান হয়তো ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু এসব ছাড়াও, মৃত্যু, রাত্রি ও বিষণ্ণতার দ্যোতক নীল রঙ যে পিকাসোর তৎকালীন বিষয়বস্তুর সংগে যথার্থ সংগতিপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'নীল যুগের' পর 'গোলাপী যুগ' (Rose Period)। 'গোলাপী যুগে' বিষয়বস্তু হিসাবে বেশি এল সার্কাস-ওয়ালারা, তাদের দলবল ও পরিবারবর্গ। তাছাড়া খেলোয়াড়, সঙ, বাজীকর ইত্যাদি। এরাও নীল যুগের মতই অভুক্ত ও ছন্নছাড়া—যাদের কাজ হল তামাসা দেখানো, অথচ নিজেরা দুঃখে জরজর। কিন্তু নীল যুগের মানুষদের মত এরা দুঃখ নুব্জপৃষ্ঠ নয়, বা ভাগ্যের হাতের পুতুলও নয়। নীল রঙ ছেড়ে গোলাপী রঙ প্রধান করে তোলার সংগে সংগে একদিকে যেমন আবেগের গভীরতা বাড়ল, অন্যদিকে তেমনি, বস্তুর ত্বক বা বহিরংগের প্রতি শিল্পী অধিকতর মনোযোগী হলেন। বস্তুত দৈহিক কাঠামো ও ভর, এক কথায় তার স্থাপত্যগুণ ক্রমেই পিকাসোর কাছে অধিকতর কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে উঠতে থাকে, আর এ কৌতূহলেরই অন্যতর প্রকাশ আফ্রিকার নিগ্রো ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর আগ্রহে। 'মাথা', 'লাল রঙে নারীর মুখ', কিউবিজম্‌-এর প্রাথমিক সূচনা হিসাবে খ্যাত 'আবিন'র তরুণীরা' এবং কয়েকটি স্টাডিতে আফ্রিকার মুখোশের সাদৃশ্য স্পষ্টতঃ লক্ষ্যণীয়। এগুলির রচনাকালকে তার একটি যুগ (Negro Period) হিসাবে চিহ্নিত করা চলে,—যখন প্রকৃতিবাদী শিল্পের সীমাবদ্ধতা পিকাসোর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং বাস্তব গঠনগত রূপের প্রতি অভিনিবেশে নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি এক স্বতন্ত্র লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছেন।

কিছুকালের মধ্যেই যে নতুন শিল্পরীতি পিকাসোর হাতে গড়ে উঠল, তারই নাম কিউবিজম্‌।

কিউবিজম্‌-এর উদ্ভব পাশ্চাত্যের শিল্পজগতে এক বিপ্লব বলা যায়। গতানুগতিক শিল্পধারার লক্ষ্য ও প্রকৃতিতে কিউবিজম্‌ ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করলেও, কিউবিজম্‌ কোন ভুঁইফোঁড় শিল্পরীতি নয়। পাশ্চাত্যের শিল্পধারার স্বাভাবিক প্রবাহে এর জন্ম। ফ্রান্সে 'ইমপ্রেশানিস্ট' চিত্রকলার আধিপত্য তখন প্রায় অবিসংবাদী; মনে, পিসারো, রেনোয়া—ইত্যাদি ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের আসন সাধারণের কাছে খুবই উঁচুতে। ইমপ্রেশনিজম্‌-এর আলো বা রঙের মুক্তো প্রকৃতি-চিত্রণের পথ পিকাসোকে আকর্ষণ করল না। এমন কি যেসব তরুণ শিল্পীদল গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হবার আশায় মাতিস-এর নেতৃত্বে ফভিজম্‌ (Fauvism) নামে অন্য এক চিত্ররীতিতে ফর্মকে গৌণ করে, আলংকারিক বর্ণপ্রধান্যের দিকে ঝুঁকেছিলেন, তাঁদের সংগেও তিনি একাত্ম হতে পারলেন না। পিকাসো যা খুঁজছিলেন, তা তিনি আবিষ্কার করলেন কুর্বে বা সেজানের চিত্রে, যাঁরা তাঁদের সৃষ্টিতে বস্তুর গঠনরূপ বা স্থাপত্যলক্ষণের দিকেই জোর দিয়েছেন।

দৃশ্যমান জগতে 'স্পেস' ত্রি-মাত্রিক, তার ভিতরকার বস্তুও ত্রি-মাত্রিক। বস্তুকে যথাযথরূপে চিত্রণের অভ্যাসে প্রাচীনতার পারস্পেক্টিভ-এর প্রথাগত নিয়মগুলোকেই কাজে লাগান। অথচ চিত্রের সংবেদন যে তার ফ্রেমে-আঁটা দ্বি-মাত্রিক সমতলের বোধের উপর নির্ভরশীল, তা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। এই বিরোধ উনিশ শতকে সেজানের চোখে ধরা পড়ে। ছবিতে, চোখ-দেখা জগতের বিভ্রম-সৃষ্টির সনাতন কায়দা এড়িয়ে গিয়ে, কি করে ছবিতে স্পেসকে পুনর্নির্মাণ করা যায়, এই সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবনে ও তার নিরাকরণ প্রচেষ্টায়, গ্রহণ-বর্জন ও বস্তুরূপকে প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে নেবার দুরূহ পরীক্ষায় সেজানকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

প্রকৃতির সব কিছুই 'সিলিন্ডার', 'কোণ' ও বর্তুল দিয়ে গড়া—সেজানের
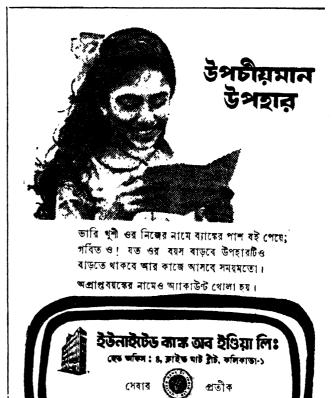
এই অসম্পূর্ণ উপলব্ধি থেকেই কিউ-বিজ্‌ম্‌-এর জন্মসূত্র খোঁজা যেতে পারে।

কিন্তু সেজানের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, পিকাসো তা করলেন। চোখের চেনা বস্তু ও ফর্মকে প্রথমে কতকগুলো সমতলে ভেঙে, ছবিতে তাকে ইচ্ছামত সাজিয়ে দিলেন। প্লাস্টিক ইমেজ-এর দেহকে খণ্ড খণ্ড করে প্রিজম্‌-এর জ্যামিতিক ছাঁদে বিন্যস্ত করলেন। এমনি করে বস্তুর আকারগত গুণটি ঘনিষ্ঠ-ভাবে দেখা গেল।

১৯০৭ সালে পিকাসোর 'আবিন'র তরুণীরা' ছবিটি আঁকা হয়। নতুন রীতির লক্ষণ এতে আভাসমাত্র দেখা গেলেও, এটাকেই এখন ধরা হয় কিউ-বিজ্‌ম-এর আদি ছবি হিসাবে। কিউ-বিজ্‌ম নামের উদ্ভব হয়েছিল অগ্রজ শিল্পী মাতিস-এর একটি লঘু মন্তব্য থেকে। ১৯০৮ সালে প্যারিস সাঁল-তে পিকাসোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী শিল্পী ব্রাক-এর ছবি দেখে মাতিস বলেছিলেন— Too many Cubes (Trop de Cubes)। ছবিতে খামারের ঘর-বাড়িগুলো Cube-এর মত করে আঁকা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, 'কিউবিজ্‌ম্‌' নামের সঙ্গে এই শিল্পধারার সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা ভ্রান্তিকর। কিউবিজ্‌ম্‌-এর জন্মকালে এর শক্তি ও সম্ভাব-নার কথা অনেকের কাছেই ধরা পড়েনি। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, অন্যান্য শিল্প-আন্দোলনের ফ্যাশানের মত এটিও, অল্পদিনের হুজুগে নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু পিকাসো, তাঁর সহযোগী ব্রাক ও অন্যান্য অনুগামীদের কাছে, এই প্রচেষ্টায় নতুন কিছু "আবিষ্কার"-এর চেয়ে আত্মপ্রকাশের তাগিদটাই ছিল বড়।

কিউবিজ্‌ম্‌-এর গোড়াপত্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে পিকাসোর ছবি থেকে গল্প-রস বাদ পড়ল। আগেকার সেইসব ছেলে-মেয়ের ছবি, তরুণ-তরুণী, গণিকা, দরিদ্র-জীবনের কাহিনী-নির্ভর বিষয়-বস্তু ধীরে ধীরে বিদায় নিতে লাগল। নিগ্রো ভাস্কর্যের আদিম মৌল গুণগুলি শোষণ করে কিউবিজ্‌ম্‌-এর ছবি, সাহিত্যভাব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, বস্তুর বিমূর্ত রূপকেই প্রাধান্য দিতে লাগল। প্রকৃতির প্রতিচিত্রণ (representation)-এর বদলে, বস্তু-রূপের ডিজাইনের দিকেই এর ঝোঁক। বস্তুর বিমূর্তন-প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছিল। সেই অসংখ্য পরীক্ষা-প্রয়াসের প্রত্যেক স্তরে পিকাসোর অনলস শ্রম ও মননের ছাপ বর্তমান।

প্রথম দিকে ছবিতে একটা কর্কশ ভাব ছিল। রেখা ও জ্যামিতিক আকার-গুলো ছিল কেমন যেন প্রখর ও অনমনীয়, প্রান্তগুলোয় দেখা যেত ছুরির ফলার ধার। শিল্পী যেন কোন কঠোরব্রতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিউবিজ্‌ম-এর প্রথম দিকের ধাপটিকে বলা হয় "বিশ্লেষণী" অর্থাৎ Analytical Cubism। বস্তুর সরলীকৃত রূপে তার স্থাপত্যলক্ষণই হল ছবিতে প্রধান। পরে সে রূপ আরও টুকরো করে কেটে কেটে সাজানো হল দক্ষ মণি-কারের মত। ছবি আর সরল রইল না,—তা জটিল—আরো জটিল হয়ে উঠল। বস্তুরূপের ত্রি-মাত্রিক আকৃতি তখনো স্পষ্ট,—যথাযথ না থাকলেও তা চেনা যাচ্ছে। কিন্তু ধীরে ধীরে বস্তুর তৃতীয় মাত্রা, অর্থাৎ বেধ মিলিয়ে গেল, রইল শুধু সমতল। বস্তুর ক্ষীণ আভাস অদৃশ্য হল। সম্মুখপট ও পশ্চাৎপটের পার্থক্য লোপ পেয়ে, ছবির জমিতে বিশুদ্ধ ডিজাইন গড়ে উঠল। ছবিতে তখন মুখ, নারী, গীটার, টেবিল বা ফল—কোনটাই প্রায় চেনা যাচ্ছে না। সেজান যা করতে চেয়েছিলেন, এতদিনে তাই সম্পূর্ণ হল।

কিন্তু ভুললে চলবে না যে এই বিমূর্তনের অর্থ, বস্তু-বিচ্ছিন্নতা বা বস্তুনিরপেক্ষতা নয়। কিউবিস্ট শিল্পী সর্বদাই তাঁর প্রেরণার উৎস খোঁজেন প্রকৃতির মধ্যে। শিল্পীর কল্পনায় ফর্ম পরিবর্তিত হয়, তার ভাঙাগড়া চলে, নতুনভাবে সংগঠিত হয়, অবশেষে একটি মৌলিক ডিজাইনে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেখানে বস্তুর আসল রূপের সন্ধান পাওয়া না গেলেও, অবাক হবার কিছুই নেই।

কিন্তু ক্রমে কিউবিস্ট-শিল্পীরা রেখা ও ফর্মের অনড় কাঠিন্যে অতৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন। শিল্পে যে প্রাণ-শক্তির সন্ধানে তাঁরা বিমূর্তনের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার জন্যে রেখা ও রূপের এই কাঠখোট্টা শ্রীহীন ভাব বজায় রেখে চলা তাঁরা অপরিহার্য বলে বোধ করলেন না। ডিজাইন প্যাটার্নে তাই এবার বাঁকা রেখার সৌকুমার্য এল। তারই সঙ্গে বস্তুরূপও অস্পষ্টভাবে ফিরে এল। সেগুলোকে চেনা গেলেও তাদের আসল আকৃতির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রইল না। টুকরো টুকরো করে দেখানোর পরিবর্তে, এবার বস্তুকে অখণ্ডভাবে হাজির করা হল। শুধু তাই নয়। বস্তুকে আলাদাভাবে না দেখে, আর্টিস্ট বস্তুকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিভিন্ন করে দেখতে অধিকতর মনোযোগী হলেন। ফর্ম, রেখা ও অবয়বের পরস্পর-সম্পর্ক, তাদের দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্যময় সহ-অবস্থান ডিজাইনকে প্রাণ দিল।

ছবিতে বুনোনি বা texture আনবার জন্যে কিউবিস্ট-শিল্পীরা কাঠের টুকরো, খবরের কাগজের হেড লাইন, মদের বোতলের লেবেল ইত্যাদি ছবির গায়ে জুড়ে দিতে আরম্ভ করলেন। যাকে collage নামে অভিহিত করা হয়, ডিজাইনের অবিচ্ছিন্নতা ক্ষতিগ্রস্ত না করেও textural effect আনার এই কৌশল প্রথমে উদ্ভাবন করেছিলেন ব্রাক; পরে পিকাসো-সহ অন্যান্য কিউবিস্টরাও তার অনুসরণ করলেন। রঙের সঙ্গে বালি বা পাথরের টুকরো মিশিয়েও কখনো কখনো ছবিতে ব্যবহার করায় তাঁরা অভ্যস্ত হলেন।

কিউবিজ্‌ম্‌-এর এই ধাপটার নাম-করণ করা হয়েছে "সংশ্লেষণী" বা Synthetic Cubism বলে। বক্ররেখা ও নমনীয় ফর্মে যে ডিজাইন গড়ে উঠল, তা অহেতুক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে, আগের চেয়ে সুকান্ত ও সুন্দরই হল না, তা আরও সবল ও সংবদ্ধ হল। ছবিতে আগেকার সেই মৃদু ধূসর বা আবছা ব্রাউন রঙের ত্যাগী-ভাব অন্তর্হিত হয়ে, উজ্জ্বল বর্ণ ছাড়পত্র পেল। রঙের উষ্ণতা ও বৈচিত্র্য বাড়ল। অবশ্য এ রঙের সঙ্গে বস্তুর নিজস্ব রঙের কোন মিল রইল না। কারণ এ রঙ ডিজাইনের অঙ্গ, ডিজাইনের অখণ্ড রূপে তুলে ধরবার জন্য নির্বাচিত, অতএব ডিজাইনের শাসনাধীন। ১৯১৪-১৫ থেকে পরবর্তী কয়েক বছর ধরে কিউ-বিজ্‌ম্‌-এর স্টাইল দ্রুত পাল্টাতে লাগল। পিকাসোর প্রত্যেক ছবিই যেন এক এক ভিন্ন ভিন্ন রীতির নিদর্শন। কখনো ডিজাইনের অংশ হল পোস্টারের মত আয়ত, বা অন্যরকম ক্ষেত্র, কখনো-বা বাঁকা রেখার ছন্দোময় রূপ। তৃতীয় দশক কিউবিজ্‌ম্‌-এর পূর্ণ পরিণতির যুগ। ১৯২১-এ আঁকা পিকাসোর বিখ্যাত 'সুরকারত্রয়' এই যুগের একটি প্রতি-নিধিস্থানীয় ছবি। ছবিটি প্রায় পুরো-পুরি দ্বি-মাত্রিক। তিন মাত্রার বিভ্রম-

বর্জিত তিনজন সুরকার যেন রক্তমাংস-হীন এবং সম্পূর্ণ ভরশূন্য, অথচ তাদের উপস্থিতির সত্যতা সম্পর্কে দর্শকের অণুমাত্রও সংশয় থাকে না।

বস্তুকে একই মুহূর্তে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানোর নূতনত্বে কোন কোন কিউবিস্ট-ছবি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী, শিল্পী ছবির বাইরে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে বস্তুকে না দেখে, যেন ছবির ভিতরে উঠে এসে বস্তুর চারিধারে ঘুরে ঘুরে তা দেখছেন। ছবিতে একই মেয়ের মুখ সম্মুখ-দৃশ্যের সঙ্গে হয়তো প্রোফা-ইলও জুড়ে, বা মিলিয়ে দেওয়া হল। কখনো দুটো চোখের জায়গায় গড়ে উঠল তিনটে চোখ। হাতের আঙুল কয়েকটি সামনের দিক থেকে এবং কয়েকটি উল্টো দিক থেকে যেমন দেখায়, তা একই সঙ্গে গাঁথা হল। Representational Art-অনুসৃত স্বাভাবিক অঙ্গসংস্থান এই-ভাবে এলোমেলো বিপর্যস্ত হয়ে যেতে লাগল। বলাবাহুল্য, অক্ষমের হাতে এ-কাজ অন্তঃসারহীন কসরতে শেষ হতে পারত। কিন্তু পিকাসোর লক্ষ্য কিছু চমকপ্রদ সৃষ্টি নয়। বস্তুর সত্যমূল্য ও সম্ভাবনা আবিষ্কার, তথা বস্তুর দেশ-কাল মাত্রিক চরিত্র-নিরূপণের দুরূহ কর্তব্যপালনেই পিকাসো-প্রতিভার মুক্তি। তাই একথা বোঝা কঠিন নয়, কেন তিনি বস্তুকে কোনদিন ত্যাগ করেননি। অপেক্ষাকৃত নূতন ধারা 'সুরিয়্যালিজম্'এর আঙ্গিকগত প্রভাব কিউবিজম্-এর উপর কিছু পরিমাণে এসেছিল একথা সত্য, কিন্তু সুরিয়্যালিজম-এর বস্তু-নিরপেক্ষ বিমূর্তন-রীতির সঙ্গে কিউবিজম-এর মূলতঃ কোনই মিল নেই।

পিকাসোর 'আয়নার সামনে মেয়ে' (১৯৩২) পরেকার যুগ (Stained Glass Period)-এর উল্লেখযোগ্য ছবি। ছবিটিতে ভারি পর্দার অতি উজ্জ্বল রঙের সন্নিবেশ, এবং প্রকৃত ও আয়নায় প্রতিফলিত দুটি ফিগারে একাধিক দৃষ্টি-বিন্দুর সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। সমস্ত ছবিটি আশ্চর্যরকম রহস্যময় ও সংবেদন-শীল। Alfred H. Barr মেয়েটির বিমূর্ত ফিগারকে বর্ণনা করেছেন simultaneously clothed, nude and x-rayed বলে।

কিউবিজম্-এর পরিণতির যুগে কিছুকালের জন্য পিকাসো সাবেকী রীতিতে ফিরে এসেছিলেন। এ-সময় ক্লাসিকাল ধরনে আঁকা অনেকগুলি ছবি ও পোর্ট্রেটে, কিউবিজম্-এর কোন লক্ষণের খোঁজ পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে এরকম খেয়ালী প্রত্যাবর্তন অনেক-বার ঘটেছে। 'শ্বেতবসনা নারী', 'মা ও শিশু', 'বসন্ত' ও আরও কিছু ছবি প্রাণময় ভাব-প্রকাশে, ও আঙ্গিকগত কলা-কৌশলের নৈপুণ্যে রেনেসাঁস শিল্প-রথীদের সৃষ্টির সমপর্যায়ভুক্ত। গ্রীক পুরাণ-কাহিনী বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করেও বহু ছবি রচিত হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের পাদছায়ায় দাঁড়িয়ে, নবাবিষ্কৃত রীতিতে পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করে নেওয়াই হয়তো পিকাসোর উদ্দেশ্য ছিল।

১৯৩৭ সালে পিকাসোর শিল্পী-জীবনে এক নতুন পর্বের সূত্রপাত ঘটল। য়ুরোপের রাজনীতিতে এ সময় যে করাল ছায়া দেখা দিয়েছিল, তাই এ পরিবর্তনের পটভূমি। পিকাসোর স্বদেশ স্পেনের রিপাবলিক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, ফ্রাঙ্কোর স্বপক্ষীয় নাৎসী বাহিনীর অত্যাচার চলেছে দেশের জন-সাধারণের উপর। সে বছর প্যারিস শহরে শিল্প প্রদর্শনীতে, স্প্যানিশ প্যাভি-লিয়নের জন্য পিকাসো একটি মুর‍্যাল চিত্র অঙ্কনের ভারপ্রাপ্ত হন। ছবিটি আঁকার কাজ তখনো শুরু হয়নি। ঠিক এই সময়, ২৯শে এপ্রিল তারিখে, জার্মান বোমারু বাহিনী গ্যের্নিকা নামে শহর-টির উপর অতর্কিতে বোমা বর্ষণ করে নিশ্চিহ্ন করল। এই বীভৎস হত্যালীলার খবর দ্রুত ছড়িয়ে গেল এবং সারা দুনিয়ায় দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি করল।

এই অমানুষিক ঘটনা সমস্ত তীব্রতা নিয়ে পিকাসোর 'গ্যের্নিকা' নামে বিরাট ছবিতে (১৪০½"×৩১২¾") স্থান পেয়েছে। ১লা মে, অর্থাৎ গ্যের্নিকা শহর ধ্বংস হবার দুদিন পর, ছবির কাজ শুরু হয়। ছবি শেষ হতে সময় লেগেছিল মাত্র এক মাস।

গ্যের্নিকা পিকাসোর শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি হিসাবে সর্বস্বীকৃত। সমান জমির দৃঢ় কম্পোজিশনের বাঁধনে ছবি গড়ে উঠেছে। বহুবর্ণ স্বভাবতই এ-ছবির ভাবের পক্ষে সামঞ্জস্যহীন, তাই সাদার উপর কালো ও ধূসর মামুলি রঙ ব্যব-হার করা হয়েছে। গ্যের্নিকা প্রতীকধর্মী ছবি। এর ভয়াবহ নাটকীয় আবহ যে-কোন দর্শককে দর্শনমাত্র অভিভূত করে। ছবির প্রত্যেক ফিগারেই মৃত্যুকালীন আতঙ্ক ও অসহ্য যন্ত্রণার আক্ষেপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মাঝামাঝি জায়গায় বল্লমবিদ্ধ অশ্বটি স্পেনের রিপাবলিক তথা জনশক্তির প্রতীক, বাঁ-দিকে ষাঁড়ের মাথা পশুশক্তি ও তমসার। ভূতলশায়ী সৈনিকটি সাময়িক পরাজয় সূচিত করছে। ডানদিকের ফিগারটি নিরপরাধ নাগরিকের, তার মুখ ও হাত ঊর্ধে উৎক্ষিপ্ত, কারণ ভয়ঙ্কর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ছুটে আসছে আকাশের দিক থেকে। চারিদিকের আগুন, কান্না ও শিশু-মৃত্যুর বীভৎসতার মাঝখানেও আশা ও বিশ্বাসের সংকেত দেদীপ্যমান। একটি তরুণীর প্রসারিত মুষ্টিবদ্ধ হাতের প্রদীপশিখা ধ্বংসযজ্ঞের উপর বরাভয় ও সত্যের আলোক ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ফ্যাশিজম-এর প্রতি ঘৃণা ও অপরা-জেয় জনশক্তিতে অবিচল বিশ্বাস গ্যের্নিকার সরল প্রতীক ও ইমেজে প্রতিভাত। এই সার্বজনীন সারল্য ও আবেগের প্রত্যক্ষতা গ্যের্নিকাকে শাশ্বত শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। গ্যের্নিকায় পিকাসোর আর এক ভিন্ন রীতির পরীক্ষা ও চূড়ান্ত সাফল্য দেখা গেল। রূপ এক্ষেত্রেও বিমূর্ত ও বিকৃত, অথচ আশ্চর্যরকম স্বচ্ছ। তাদের পরস্পর-সম্বন্ধও প্রায় অনিবার্য। চিত্রের বাণীর সঙ্গে ডিজাইনের এরকম অদ্ভুত সমন্বয় বোধ করি বিশ্বশিল্পে বিরল।

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হল সারা দুনিয়া জুড়ে। ফ্রান্স যখন নাৎসীদের করায়ত্ত হল, তখনো পিকাসো দেশ ত্যাগ করেননি। ট্যাঙ্ক-কামান-অস্ত্রশস্ত্রসমেত জার্মান বাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, চারিদিকে অভাব আর আতঙ্কের কালো ছায়া। এই কঠিন দিনগুলোতে ফ্রান্সের অনেক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী নিগ্রহ থেকে বাঁচবার জন্য নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতার ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু পিকাসো তাদের দলবৃদ্ধি করেননি। পিকাসোকে স্বপক্ষে টানবার জন্যে জার্মানদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। অন্যদের মত পিকাসোকেও ওরা কিছু বেশি খাদ্য ও শীতের জন্য অতি-রিক্ত কয়লা দিতে আগ্রহান্বিত ছিল। পিকাসো ঘৃণাভরে সে অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করেন। "A Spaniard is never cold!" দৃপ্ত স্বরে জবাব দিয়েছেন তিনি। জনশ্রুতি যে, একজন জার্মান অফিসার একবার তাঁর স্টুডিয়োয় ঢুকে, পোস্টকার্ডে মুদ্রিত 'গ্যের্নিকা'র

কুন্টা দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, "এটা কি আপনার করা?" পিকাসো তীক্ষ্ম স্বরে তার মুখের উপর জবাব দেনঃ "না, আপনাদের।"

যুদ্ধের সময় ছবি আঁকবার উপকরণ যখন দুষ্প্রাপ্য, পিকাসো তখন তক্তা বা কমদামী বোর্ডের উপর ছবি আঁকছেন, আর রঙ মেশাচ্ছেন চেয়ারের উপর। দুঃসময়ের 'স্টিল লাইফ' থেকে আগেকার সব সুখাদ্য অন্তর্ধান করেছে। তার জায়গায় দেখা দিয়েছে মানুষের মাথার খুলি, কখনো বা জীবজন্তুর। কাটা-চামচগুলো ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে পেঁয়াজ বা নিকৃষ্ট সব্জীগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যুদ্ধ-বিভীষিকা ও স্বাধীনতা-অপহারকে প্রতি ঘৃণা যখন তাঁর ছবির পটভূমিতে প্রায় সর্বাত্মক, তখনও তিনি জীবনের স্নিগ্ধ রূপকে ভোলেন না। 'মা ও শিশু', 'চিংড়ী হাতে ছোট্ট ছেলে', 'ফুলের তোড়াসহ তরুণী' ইত্যাদি তার প্রমাণ। ছোট-খাট ভাস্কর্য শিল্পেও তাঁর প্রতিভার চকিত দীপ্তি দেখা দিতে থাকে। কাঠ বা কাগজ, লোহা, পাথর, হাড়ের টুকরো, এমন কি ভাঙা বাই-সিকেলের অংশের মত তুচ্ছ সামগ্রীও তাঁর হাতে মুহূর্তে শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৪৪ সালে, অর্থাৎ শত্রুকবল থেকে প্যারিস মুক্ত হবার বছরই পিকাসো ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। যুদ্ধের আঘাতে সমাজের নিদারুণ দৈন্য ও ভগ্নদশা ও দুনিয়া জুড়ে অস্বাভাবিক ঘটনার টানা-পোড়েন পিকাসোকে শিল্প-অতিরিক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। পিকাসোর রাজনৈতিক চেতনা অবশ্যই তাঁর শিল্প-আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

১৯৪৬ সালে পিকাসো দক্ষিণ ফ্রান্সের ভালরি নামক জায়গায় ধ্বংসপ্রায় মৃৎশিল্প (Ceramics) পুনরুদ্ধার করেন। ভালরির তৈরি জিনিসের খ্যাতি ও চাহিদা এখন সারা পৃথিবীতে। চীনামাটির বাসনকোসন, নারী-পুরুষের ও জীবজন্তুর রকমারি মূর্তি, খেলনা ইত্যাদি, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সমবায়ে গড়া শিল্পদ্রব্যের অভিনবত্ব প্রত্যহ আমাদের রুচিকে বদলে দিচ্ছে।

'গ্যোর্নিকা' পিকাসোর কোন বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, তাঁর মানবিকতা ও সার্বজনীন-বোধ পরেকার বিখ্যাত রচনাগুলিতেও সমভাবে উপস্থিত। তাঁর অনন্য ডিজাইন, যা পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বনাম শিল্পী-চেতনার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের রূপ বহন করে, তা প্রত্যেক ছবিতেই মৌলিক— 'শবাস্থিশালা'য়, 'যুদ্ধ ও শান্তি'তে, 'কোরিয়ায় নরহত্যা'য়, এমন কি ১৯৫৮ সালে প্যারিসের ইউনেস্কো ভবনের জন্য তিনি যে মুর্যাল চিত্রটি এঁকেছেন— হয়তো বা তাতেও। 'শবাস্থিশালা'য় নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ছবি প্রতীক-রূপ পেয়েছে। 'শান্তি কপোত'-এর লিথোগ্রাফ লক্ষ লক্ষ মুদ্রণে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পরিচিতি লাভ করেছে। 'যুদ্ধ ও শান্তি' দুই অংশে বিভক্ত (diptych) ছবিতে পিকাসো যুদ্ধকে এঁকেছেন ধ্বংসলীলার মাঝে শকটারোহী কিম্ভূতকিমাকার শিংওয়ালা মূর্তির প্রতীকে, আর তার পাশাপাশি 'শান্তি' যেন দর্শককে স্বপ্নলোকে নিয়ে আসে— যেখানে রঙীন সূর্য, মেয়েদের নাচ, পক্ষীরাজ, শিশুদের খেলা, কমলা-গাছের নিচে বিশ্রামরত নরনারী ইত্যাদিতে শিল্পীর জীবন-প্রতীতি ব্যক্ত।

আজ পিকাসো শিল্পের রাজ্যে এক সংশয়াতীত শক্তি। প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে তিনি পৃথিবীর সমস্ত শিল্পীকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। বিষয় ও আঙ্গিকের উদ্ভাবনে প্রত্যহ দর্শকদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছেন। কোন একটি রীতির গণ্ডী টেনে তাঁর সৃষ্টির চরিত্র বোঝার চেষ্টা হাস্যকর। তাঁর মেজাজ, সংকল্প, রেখা-রঙের তান-লয় শুধু দ্রুত পাল্টেছে বলেই নয়, তা কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মানেনি বলেই এত হত-বুদ্ধিকর। পিকাসো এই তথাকথিত 'ট্রাবল্‌ড্ এজ' এর একমাত্র শিল্পী যিনি কখনো পিছু হটেননি, থেমে যাননি, যাঁর প্রতিভা পুনরাবৃত্তির নিরাপদ সড়ক ধরে অকালমৃত্যুর দিকে এগোয়নি। পিকাসো ফর্মের রাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, ফর্ম টুকরো টুকরো করে পুনঃসন্নিবেশে তাদের স্থান, রূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন, ছবিকে দিয়েছেন তার স্বকীয় সৌন্দর্যমূল্য। পিকাসোই ছবির জগতে, আমাদের জড় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব খোঁজার মজ্জাগত অভ্যাস শুধরেছেন, বস্তুর বাহ্যরূপের চেয়ে মুখ্য করেছেন শিল্পীর মনোভঙ্গীকে। এ-যুগের সমাজ-চৈতন্যে বিজ্ঞান ও টেকনোলজি যে বিরামহীন দ্রুতগতি সঞ্চার করেছে একমাত্র পিকাসোর সৃষ্টি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে, এমন কি, হয়তো তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। পিকাসোকে বোধকরি আজও আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারিনি। শিল্পের স্বাভাবিক প্রসারণ ও বিকাশের পথেই তাঁর রচনার আপাত-দুর্গমতা ক্রমে অপসৃত হবে, নৈকট্যজনিত সম্মোহ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করবে না, আর সেদিনই তাঁর শতভাগ মূল্যায়ন সম্ভব হবে। তথাপি একালের বিড়ম্বিত জীবনযাত্রার প্রতিপদে গ্লানি, হতাশা ও শূন্যতাবোধে আমাদের রাহুগ্রস্ত আত্মা যখন প্রায় অবলম্বনহীন, তখন পিকাসোর শিল্প মানুষের মনে সুস্থ সুন্দর ও মহত্তর জীবন গড়ার আকুতি এনে দিয়েছে। আর তা দিয়েছে বলেই পিকাসোর কাছে আমাদের ঋণ অশেষ।
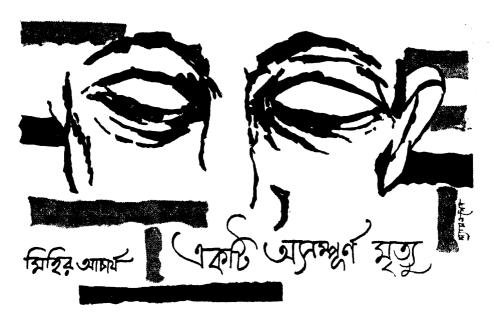
একটি অসম্পূর্ণ মৃত্যু

মিহির আচার্য

মাস দুয়েক আগে কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠার এক কোণে তরুণতম কবির মৃত্যুর সংবাদ বেরিয়েছিল। খবরটি এত নিঃশব্দ হয়তো কারুরই চোখে পড়েনি। খুবই স্বাভাবিক। একজন কবির মৃত্যুতে দেশের কোন ক্ষতি হয় না, তারচেয়ে অনেক দামী খবর ইন্‌জিনিয়ারের মৃত্যু।

আমি ভেবেছিলাম কাল এই সামান্য ঘটনাটাকে সহজেই চাপা দিতে পেরেছে। কিন্তু আমার ভুল ভাঙল যখন দেখলাম সম্পাদক মহাশয় কবির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বকে স্মরণ করে হঠাৎ আমাকেই অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন কবি সম্বন্ধে কিছু লিখতে। সম্পাদকের এই অনুরোধ যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু, তিনি কেন একবার ভেবে দেখলেন না বন্ধুর প্রসঙ্গে বন্ধুর লেখা এবং বিশেষ করে সে বন্ধু যদি কবি হয়, তা কত শক্ত। তবু এ দুরূহ কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে। কারণ আমি মনে করি অসম্পূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের মতো অসম্পূর্ণ জীবনের ট্রাজিডিও কম নয়।

কবি সোমনাথ বলতে আমার চোখের সামনে যে ছবিটি ফুটে ওঠে তা এই :

পৃথিবীর আর-একটি আশ্চর্য বস্তুর মতো সে যে কি করে জীবনধারণ করে আছে সেইটেই এক গবেষণার বিষয়। সব ছাড়িয়ে মুগ্ধ করে ওর প্রাণবান চোখ দুটো—ওই চোখের পুকুরে যেন সমস্ত জীবন-তৃষ্ণাকে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছে সে। আর ওই চোখ দিয়েই সে দেখে, লেখে কবিতা।

ক্ষুধা তাকে তিলে তিলে হত্যা করছে জেনেও বশ্যতা স্বীকার করেনি। কত দিন ওর ঘরে গিয়ে দেখেছি যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠেছে ওর মুখ, থরথর করে কাঁপছে। বুঝতে পেরেছি খাওয়া হয়নি হয়তো বেশ কয়েকদিন ধরে। আমাকে দেখে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। উন্মাদের মতো বুকে ময়লা বালিশ গুঁজে লিখে চলেছে কাগজের পর কাগজ। তারপর আমাকে পড়ে শুনিয়েছে : 'শোন্ তো ত্রিদিব কি রকম হয়েছে। একটা ছোট্ট কোটেশান আছে মাইকেলের ক্যাপটিভ্ লেডি থেকে :'Tho' ours the home of want, I ne'er refine . . .'

পড়তে পড়তে ওর কাশি পাচ্ছে, আকুল হয়ে ওকে থামাতে চেষ্টা করেছি : 'ওরে পাগলা থাম—থাম।'

সোমনাথ দু' চোখে মশাল জ্বালিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করেছে : 'তুই, তুইও আমাকে থামাতে চাচ্ছিস...'

ভয়ে চুপ করে গেছি আমি। ওর মতো বর্বর আবেগ আমি কোথায় পাব!

মাথাভরতি শ্রীহীন চুলের জঞ্জাল ঘামে-গলা, কোথা থেকে ক্লান্ত পায়ে সেদিন ঘরে ঢুকল সোমনাথ।

ওর বনেদী গাম্ভীর্যে উদার চোখ দুটো আমার দিকে মেলে দিয়ে মৃদু হাসল। তারপর তক্তপোশের ওপর স্থির হয়ে বসে রইল। ওর সমগ্র অস্তিত্বে এমন একটা বিষণ্ণ করুণ ভাব ছিল যে সে নীরবতা ভাঙার সাধ্য ছিল না আমার।

বহুক্ষণ পরে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল সোমনাথ। বললে : 'শরীরটা দেউলে হবার চূড়ান্ত নোটিশ দিলে রে ত্রিদিব।'

'মানে? কী বলছিস যা তা—' আমি চমকে উঠে প্রতিবাদ জানালাম।

'হ্যাঁ। এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম শরীরটা দেখাতে...'

'তুই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি!'

আমার বিশ্বাস হয় না কিছুতেই। এই কি সেই সোমনাথ নয়—জীবনপ্রেমের প্রজ্ঞায় ভাস্বর কাব্যিক অহঙ্কারে স্থিরোদ্ধত। বলত : 'জীবনকে ভালোবাসলে জীবন প্রতারণা করে না।'

'অবাক হচ্ছিস না?' সোমনাথ বললে : 'হয়তো উদ্যোগপর্বটা আমার একার হলে আমি কখনোই যেতাম না। কিন্তু কেউ যদি নিজে এগিয়ে এসে আমার জীবনটার দাম দিতে চায় তাহলে তাকে ফেরাই কি কর বল্?'

ক্রমশ সে আমার কাছে হেঁয়ালি লাগছিল। এতদিনের বন্ধুত্বের পরও সে যদি আমার কাছে হেঁয়ালি থাকে, থাকতে

চায়. আমার বলার কিছু নেই। সেটা দূর করা ওরই কর্তব্য।

নিজের ভাবাবেগকে দূ হাতে সরিয়ে দিয়ে স্থির গলায় জিগ্যেস করলাম :

'ডাক্তার কি বললে ?'

'স্টমাকে ঘা হয়েছে।'

'এ্যাঁ !'

'হ্যাঁ, বললে না-খেয়েই অসুখটা বেধেছে। এখন বাঁচতে হলে চাই পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং দামী খাদ্য।'

দুজনেই চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

হঠাৎ খাপছাড়া গলায় সোমনাথ বলে উঠল : 'আমার আচরণ তোর কাছে কেমন বিজাতীয় ঠেকছে তাই না?'

আমি প্রশ্নভরা চোখে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

সোমনাথ আমার ডান হাতটা টেনে নিল ওর কোলে, তারপর আমার আঙ্গুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে : 'বলব। তোকে সব বলব।'

আমার অভিমান দ্বিগুণতর হল। বললাম : 'এতদিন আমাকে সব কথা জানাওনি কেন ?'

সোমনাথ হাসল। বললে : 'যে কথা আমিই ভুলে গিয়েছিলাম সে কথা তোকে কি করে জানাব বল্। বললাম যে তৃপ্তিই ধরে নিয়ে গেল ওর চেনা ডাক্তারের কাছে। সেন্ট্রাল এভিন্যু-হ্যারিসন রোডের মোড়ে দেখা। ও এখন টেলিফোন আপিসে চাকরি করে। আমার চেনার কথা নয় চিনল তৃপ্তিই। শুনলে অবাক হবি ত্রিদিব, অদ্ভুত সেনটিমেন্টাল। আজো বিয়ে করেনি নাকি আমারই জন্যে। কি বাজে মূর্খ মেয়েগুলো, ওরা জানে না পৃথিবীতে একজন লোকের স্থান আর-একজন নিতে পারে।'

একটা গভীর উত্তেজনার পর যেমন করে থিতিয়ে থাকে সমস্ত আবহাওয়া তেমনি আচ্ছন্নতায় ঝিমোতে লাগল সারা ঘরটা।

সোমনাথ দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ভাবছে।

কিন্তু, আমি কী করব। ওর ভাবনার সঙ্গে আমার মিল কোথায়। এতো আগেকার সেই সোমনাথ নয়। আমার বন্ধু, কবি সোমনাথ। আজ এই মুহূর্তে হা-হা-করা ঝড় এসে তাকে আমার কাছ থেকে এক দূরত্বের দ্বীপে সরিয়ে নিয়ে গেছে। সোমনাথ একেবারে অপরিচিত বিদেশী হয়ে গেছে।

হঠাৎ কী-একটা ঘটল সোমনাথের শরীর থেপে উঠল কেমন এক উত্তেজনায়, থরথর করে কাঁপতে লাগল, কাঁপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল : 'ত্রিদিব, আমাকে একটু চেপে ধর। আমার কেমন ভয় করছে...'

আমার শরীরের চাপে মুহুর্মুহু কেঁপে যাচ্ছে সোমনাথের দেহ। ঠাণ্ডা, নিরুত্তেজ।

'কেন বলতে পারিস আমার ভয় হচ্ছে। আমি মরে যাব, মরে যাব ত্রিদিব।'

একটু পরে একেবারে ঝিমিয়ে গেল সোমনাথ। ওর অবসন্ন শরীরকে আস্তে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলাম। চোখ বুজে পড়ে রয়েছে সোমনাথ। হৃৎ-পিণ্ডের ধকধক দ্রুত তালে বেজে চলেছে।

আমি একটা বই তুলে নিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলাম।

সোমনাথ মরবে। মৃত্যুকে সে ঘৃণা করত সবচেয়ে বেশি, জীবনকে ভালো-বাসত প্রিয়ার মতো। বলত : 'অনেক দাম দিয়ে এ-জীবনকে পেয়েছি, কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি একে ছাড়তে রাজি নই।' সোমনাথের স্টমাকে ঘা হয়েছে।

এর কিছুদিন পর এক ঝড়ের রাতে হঠাৎ সোমনাথ এল আমার ঘরে।

বেশ রোগা হয়েছে। চোখের নিচে কালি। সারা মুখ মোমের মতো সাদা, ফ্যাকাসে। কবি সোমনাথ, আমার বন্ধু। জীবনকে ভালোবাসার এ কী নিদারুণ শাস্তি নেমে এল তার জীবনে। জীবনের দুরন্ত বলিষ্ঠ ঘোড়াটাকে শায়েস্তা করতে না-পারলে বোধ হয় এমনি করে তার কশাঘাত পড়ে ঘোড়সোয়ারের সর্বাঙ্গে।

সোমনাথ তক্তপোশে পা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'কী, ভাবনা শেষ হল না তোর ?'

লজ্জিত গলায় জানালাম : 'হয়েছে। কেমন আছিস ?'

সোমনাথ হেসে বললে, 'বেঁচে যে আছি দেখতেই পাচ্ছিস। হ্যাঁরে, এই ঝড়ের রাত্রে তোর অভিসারে এলাম আর তুই কিনা গদ্যের গলায় জিগ্যেস করলি : কেমন আছ ?'

হেসে জবাব দিলাম : 'কাব্য যে আমার ধারেকাছে ঘেঁসে না।'

'তা হলে তুই কোনোদিন লেখক হতে পারবিনে। ছেড়ে দে—' সোমনাথ বললে, 'সারা জীবনটাই তো কাব্য। কাব্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে ? বাঙলার মাটিতে যে কাব্যেরই রস...'

বললাম : 'রস পুরনো হলে যে গেঁজে যায়...'

সোমনাথ বললে, 'তা হোক। যে-সমুদ্রে হাঙর-কুমিরের বাস মণিমুক্তার জন্মও যে সেখানে।'

সোমনাথ তারপর চুপ করে গেল। তারপর এক সময় আমার দিকে ফিরে সুদূরচারী স্বরে বললে, 'জীবনের সবচেয়ে বড় কথা কি জানিস ? ভালো-বাসতে হবে...' বলতে বলতে জড়িয়ে গেল ওর গলার আওয়াজ, গুঁড়িসুড়ি মেরে বিছানায় শুয়ে পড়ে দম বন্ধ করে প্রাণপণে কী-এক যন্ত্রণা চেপে রাখতে চাইল সে।

বললাম : 'কী হল ?'

সোমনাথের ঠোঁটে ক্লিষ্ট হাসির ঢেউ। বললে, 'কিছু না। জিগ্যেস করছিলি না কেমন আছিস, তারই উত্তর।'

'খুব যন্ত্রণা হচ্ছে কি ?'

সোমনাথ এড়িয়ে গেল আমার কথা। বললে, 'আজ রাত্রে ভীষণ ঝড় উঠবে না ?'

আমি চুপ করে রইলাম।

সোমনাথ আবার বললে, 'লোকে আমাকে বলে চূড়ান্ত রোমান্টিক। রোমান্টিক শব্দটা নাক কুঁচকেই বলে ওরা। কারণ অর্থ না-বুঝে কতোগুলো শব্দ সম্পর্কে ঘৃণা প্রচার করাই এ যুগের ফ্যাশান। কিন্তু ওরা বোঝে না কেন বাস্তব এত কঠিন। তাকে সহ্য করতে হলে হয় তোমাকে রোমান্টিক হতে হবে নয় সিনিক। আমরা যা দেখেছি তা কিছু নয়, যা দেখছি তাও হতাশাব্যঞ্জক, যা দেখব তারই ওপর তো আমাদের নতুন আশা। এরই নাম রোমান্টিসিজম।' একটু থেমে : 'মৃত্যুর চেয়ে বড় শত্রু মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। বাঁচতে হলে

মৃত্যুকে ঘৃণা করতে হবে। ভালোবাসাই একমাত্র মৃত্যুকে রোধ করতে পারে।'

আমি কোনো জবাব দিতে না-পেরে একটা সিগারেট ধরালাম।

সোমনাথ এবার সুস্থ হয়ে উঠে বসল। 'যাকগে ওসব কথা। কাজের কথায় আসি। ডাক্তার বলেছে চেঞ্জে যেতে। তৃপ্তিরও তাই মত।'

বললাম : 'বেশ তো। কোথায় যাবি?'

সোমনাথ বললে, 'যেতে তো পারি সুইজারল্যান্ডেই। সে কথা নয়—'

'তবে। টাকা—?'

'টাকাটাও অবশ্যি সমস্যা নয় আমার কাছে। তৃপ্তিকে এক্সপ্লয়েট করা যাবে।'

'এক্সপ্লয়েট! কী বলছিস! তৃপ্তি তোকে ভালোবাসে না?'

সোমনাথ বললে, 'নিশ্চয়ই ভালোবাসে। কিন্তু আমি যে বাসিনে।'

আহত বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

'হ্যাঁ, ভালোবাসিনে।' সোমনাথ বললে, 'পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ লোকেরাই একমাত্র ভালোবাসতে পারে। একজন স্বার্থপরের মতো নিজের পাওনা আদায় করে নেবে আর একজন শুধু আত্মত্যাগ করে দিয়েই যাবে, এর নাম ভালোবাসা নয়। দেবার সমস্ত ঐশ্বর্য থাকতেও যাকে একদিন শুধু হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আজ আমাকে সম্পূর্ণ রিক্ত জেনে সে যখন আরো দিতে আসে, তখন তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো যায়, ভালোবাসা যায় না।'

আমার রাগ হল। বললাম : 'একদিন ভুল করেছি বলেই সেই ভুলটা আর কিছুতেই শোধরানো যাবে না এ ধারণা আর যারই হোক তোর কাছে আশা করিনি।'

সোমনাথ মৌন।

আবার বললাম : 'এ তোমার নিছক কমপ্লেক্স। কে বললে তোকে তৃপ্তি নিঃস্বার্থভাবে শুধু দিতেই চায়। তার নিজের স্বার্থেই সে তোকে সারিয়ে তুলতে চায়, এই সহজ কথাটাও বুঝিসনে।'

সোমনাথ বললে, 'কিন্তু জানিস তুই ওর কাঁধের ওপর কত দায়িত্ব। ওর চাকরির টাকায় কতগুলো মুখ হাঁ করে আছে। বুড়ো বাপমা ভাইবোন।'

বললাম : 'তাহলেই বুঝতে পারছিস এত দায়িত্বের মধ্যে থেকেও যখন তোকে ডাকছে কত স্বার্থপর সে। সংসারের প্রয়োজনে নিজের কাঁধ এগিয়ে দিয়েও ওর পরিশ্রান্ত মুহূর্তে সে যে শুধু তোর সান্নিধ্যই কামনা করে।'

সোমনাথ আর্তস্বরে বললে, 'তুই আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছিস।'

বললাম : 'শক্ত হবার নাম করে অমানুষ হতে তোকে বাধাই দেবো।'

সোমনাথ আরো নিবে গিয়ে বললে, 'আমাকে তুই অমানুষ বলছিস। তুই, তুই—'

ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম : 'দিনে দিনে তুই একটা বাঁদর হচ্ছিস। আচ্ছা ছেলেমানুষ তো!'

বাইরে এতক্ষণ ঝড়ের পদধ্বনি শোনা গেল। সাঁ সাঁ করে হাওয়া উঠছে পামগাছের মাথা থেকে, পুকুরের জলে আলোর প্রতিবিম্বগুলি থরথর করে কাঁপছে। একটু পরেই কালো আকাশটা চিরে হিংস্র ফোঁটায় নামল বৃষ্টি।

বাইরের থেকে চোখ ফিরিয়ে সোমনাথের দিকে তাকালাম। চোখ বন্ধ করে সে কি ভাবছে। কিংবা চোখ বন্ধ করে ঝড়ের পাগলামিকেই বুকে পুরে নিচ্ছে। একটু পরে চোখ খুলে হাসবে শিশুর মতো, তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে বসবে কবিতা। কিন্তু, আশ্চর্য হলাম, আজ যেন সোমনাথ সে সব কিছুই করবে না। কবিতা লেখার চেয়েও বড় প্রয়োজন কি এল তার জীবনে।

'সোমনাথ—এই—' ডাকলাম মৃদুস্বরে।

সোমনাথ ক্লান্তি-ঝরা গলায় উত্তর দিল : 'উঁ?'

'চা খাবি?'

'না।' সোমনাথ আস্তে তার মুখ তুলে কি-খুঁজতে লাগল আমার চোখের মণিতে। তারপর চাপা গলায় বললে, 'আমরা জীবনে দুঃখ পাই কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞানতার জন্যে। এত আলো পেয়েও জীবন এত অন্ধকার কেন, কে জানে।'

বলতে-বলতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বেরোবার জন্যে পা বাড়াতেই আমি আটকালাম ওকে। 'এই ঝড়ের মধ্যে যাস কোথায়!'

সোমনাথের কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কঠিন। বললে, 'বাধা দিসনে। অন্তত তুই আমাকে বুঝবি। আজ রাত্রেই আমাকে বেলেঘাটায় যেতে হবে। তৃপ্তি কেঁদে ফিরে গেছে।'

বললাম : 'দাঁড়া। পয়সা আছে তো তোর?'

সোমনাথ যেন চুরি করে ধরা পড়ে গেছে। লজ্জার হাসিতে ছেয়ে ফেলল ওর মুখ। 'তোর জ্বালায় অস্থির। দে—তাড়াতাড়ি দে—'

ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে বেরিয়ে গেল সোমনাথ।

চুনারের কয়েকটি দিনের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। সোমনাথের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সে সময় তৃপ্তিও ছুটি নিয়ে সোমনাথের সঙ্গী হয়েছিল। দিনগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে কেটে গেল। গঙ্গার পাড়ে স্যানাটোরিয়াম। অজস্র হাওয়া যখন-তখন লুটোপুটি খাচ্ছে। ডানদিকে চোখ ফেরালে চুনার দুর্গ। একটু দূরের পাল্লায় দুর্গাবাড়ি, রামসরোবরও দেখা হয়ে গেল।

সেদিন বিকেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘাটের সিঁড়ির কাছে চুপ করে বসেছিলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখ জুড়িয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে আরাম করে সিগারেট টানছিলাম।

তৃপ্তি এসে বললে, 'বেড়াতে যাবেন না?'

বললাম : 'সোম বেরিয়েছে। ফিরে আসুক।'

তৃপ্তি ম্লান হয়ে বললে, 'ও এখন আর ফিরে আসছে না। ঝগড়া করেছে আমার সঙ্গে।'

আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলাম : 'ঝগড়া! কেন?'

তৃপ্তি বললে, 'ঝগড়া না-করে ও থাকতে পারে না। পৃথিবীতে একমাত্র রাগ ওর আমার ওপরেই। আচ্ছা বলতে পারেন ত্রিদিববাবু, কিসের ওর অভিমান? কী চায় সে?' একটু থেমে : 'জানেন, ও আজো আমার কাছে সহজ-স্বাভাবিক হতে পারেনি। ও আমাকে বিশ্বাস করে না।' বলতে-বলতে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

আমি কিছুক্ষণ স্থানুর মতো বসে রইলাম। পরে বললাম : 'আচ্ছা আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।'

'না না। এ সব কথা ওকে কখনো বলতে যাবেন না।' তৃপ্তি ভয়চকিত

গলায় বলে উঠল : 'আমি তো জানি ওর ভালোবাসায় আঘাত আছে, অবহেলা নেই।'

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম।

কিন্তু এ-আঘাত সোমনাথ করে কার ওপর? তৃপ্তি তো উপলক্ষ্য মাত্র। সোমনাথকে আমি অনেকটা বেশি চিনি। জানি চূড়ান্ত অরাজকতায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে ওর জীবনের ব্যাকরণ, আজ তৃপ্তির শুশ্রূষাতেও সে বিগত স্মৃতির দাগগুলিকে মুছে ফেলতে পারছে না। তৃপ্তি চায় সোমনাথের জীবনকে বদলাতে, তাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে। সোমনাথের অহম্ বিনাযুদ্ধে শ্রান্ত হতে চায় না। দিনের পর দিন যত বেশি করে হার স্বীকার করছে তার দ্বিগুণ রাগে সে জ্বলে উঠছে তৃপ্তির ওপর।

তৃপ্তির কন্ঠস্বরে চমক ভাঙল। সে তখন আশ্চর্যভাবে নিজেকে সংযত করে নিয়েছে।

'আপনি এ নিয়ে আবার আকাশ-পাতাল ভাবতে আরম্ভ করলেন তো। ভেবে ভেবেই আপনারা একদিন ছাই হয়ে যাবেন দেখছি।'

হেসে বললাম, 'অলস ব্যক্তিদের ভাবনাই সার তৃপ্তি...'

'সার নয়, অসাড়।' তৃপ্তি বললে।

আমি হাসতে বাধ্য হলাম।

তৃপ্তি আবার বললে, 'আপনাদের ভাবনাতে চোখের নীল সাদা হবে না, অরণ্য হারাবে না তার সবুজ...' একটু থেমে চিন্তা করে : 'আমার কি ধারণা জানেন ত্রিদিববাবু, আপনাদের মতো জীবনভীরু জীব পৃথিবীতে আর নেই। আর এই জীবন থেকে পালাতে গিয়েই আপনারা কবি হন, গল্প-লেখক হন।'

হেসে বললাম : 'কী রকম?'

তৃপ্তি বললে, 'দেশবিদেশের কবিদের ইতিহাস নিয়ে দেখুন, তাঁরা জীবনের নাম করে কেবল মনগড়া দর্শন আউড়েছেন। জীবননিষ্ঠ কবি হওয়ার চেয়ে তাঁরা জীবনবিমুক্ত দার্শনিক হবার চেষ্টা করেছেন।'

'তাই নাকি?' আমার জিজ্ঞাসা।

তৃপ্তি বললে, 'আপনি ঠাট্টা করবেন তা তো জানিই। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি, জীবন যে-কোন দর্শনের চেয়ে বড়।'

বললাম : 'জীবনের কি কোনো দর্শন থাকার দরকার নেই?'

তৃপ্তি গঙ্গার জলের দিকে চোখ রেখে দৃঢ় গলায় জানাল : 'না নেই। জীবন হচ্ছে নদী, তার গতিকে আপনি দর্শনের বাঁধ দিয়ে রুখতে পারেন না। তাহলে আর সেটা নদী থাকে না, হয় বিল।'

বহুক্ষণ মৌন বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। প্রমত্ত বাতাসে চুল উড়ছে ওর, শাড়ির আঁচল কাঁপছে থরথর করে।

আমার নীরবতায় আবার খিলখিল করে হেসে উঠল তৃপ্তি। বললে, 'আবার ভাবতে আরম্ভ করলেন তো? আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। চলুন বেড়িয়ে আসি—'

খাওয়া দাওয়া সেরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাদের তিনজনের কারুরই চোখে ঘুম নেই। বাইরে ফিনকি দিয়ে নির্লজ্জ জ্যোৎস্না ফুটেছে। গঙ্গার জলে সে কি দুরন্ত স্বপ্নের মাতলামি। সুমুখের প্রকাণ্ড নিমগাছটির উপস্থিতিটুকু অশরীরী দেখাচ্ছে।

ডান দিকে দুর্গের ভগ্ন প্রাচীর নেমে এসে গঙ্গাকে আশ্লেষ করেছে। শের শাহ আর মালিকানের বিদেহী আত্মা কি আজো দুর্গের প্রাকারে ঘুরে বেড়ায়!

সোমনাথ অস্ফুটে বললে, 'কি আশ্চর্য, না?'

বললাম : 'কি?'

সোমনাথ বললে, 'এত আলো। মনে হয় দু হাত বাড়িয়ে তার ঘ্রাণ নিই। সত্যি বলছি ভাই, আমার মরতে একটুও ইচ্ছে করে না, ভারি কষ্ট হয় যখন ভাবি আমি মরে গেলেও এত আলো থাকবে পৃথিবীতে। আলো ...আলোর আনন্দ...'

অবাক বিহ্বলতায় সোমনাথের দিকে চেয়ে রইলাম।

সোমনাথ আজো স্বপ্ন দেখে। জীবনে এত ক্লেদ ক্লান্তি, সৌন্দর্যকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তবু স্বপ্ন দেখে সোমনাথ।

জ্যোৎস্নার দিকে অফুরন্ত মুগ্ধতায় তাকিয়ে রয়েছে সে। সূর্যমুখী যেমন সূর্যের দিকে মেলে ধরে দৃষ্টি। আর, ধীরে ধীরে পায়চারি করছে হাতদুটো পেছনে রেখে।

তৃপ্তি ফিসফিস করে বললে, 'ও পাগল হয়ে গেছে। এ রকম প্রায়ই হয়। আচ্ছা ত্রিদিববাবু, পৃথিবীতে বেঁচে-থাকার দায় এত সেখানে মানুষ চাঁদের দিকে চেয়ে বাজে সময় খরচ করবার উৎসাহ কোথায় পায়, বলতে পারেন?'

বললাম : 'জীবনে কাজ যেমন রয়েছে চাঁদ-ওঠাও তো তেমনি সত্যি।'

তৃপ্তি বললে, 'তার মানে আপনি ওর পাগলামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।'

বললাম : 'মানুষের ভাবাবেগের মুখে পাথরচাপা দেয়ার মতো নির্দয় কাজ আর নেই। আজকের কঠোর রুক্ষ পৃথিবীতে পোড় খেয়েও যদি কেউ চাঁদ-দেখার মতো সুস্থ সুন্দর মন রাখতে পারে, সেটা তো তার শক্তিরই পরিচয়...'

হঠাৎ আমাদের কাছে সরে এসে সোমনাথ জিগ্যেস করল : 'কিসের কথা হচ্ছে তোদের, এ্যাঁ? আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।'

বললাম : 'তোমার অন্যমনস্কতা নিয়েই কথা হচ্ছিল।'

সোমনাথ মৃদু হেসে বললে, 'ও বুঝেছি। তৃপ্তি লাগিয়েছে। আমার অনুভবের সঙ্গে ওর অনুভবের কোনোদিন মিল হবে না।'

তৃপ্তি বললে, 'তার মানে আমি নিরেট পাথর।'

সোমনাথ বললে, 'সে-অহংকার তোমার নেই।'

'তবে?'

'তুমি বলো আজকের মানুষের ওমর-খৈয়াম পড়বার কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই সেটা ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক গঠনের ওপর নির্ভর করে। আজকের দিনে কারুর যদি ওমর-খৈয়াম ভালো লাগে তাহলে তাকে সেকেলে বলে নাকসিঁটকে লাভ নেই।'

'চিন্তায় কর্মে আজকের মানুষ কি বদলায়নি? প্রাণধারণের জ্বালায় আজকের মানুষ যখন...'

সোমনাথ ধমক দিয়ে উঠল। 'থামো। মানুষের মতো দুঃখ-কষ্ট জীবজন্তুদের মধ্যেও আছে। কিন্তু মানুষের একটি জিনিস রয়েছে যা জন্তুদের মধ্যে নেই—সেটা তার ভাবাবেগ, তার কল্পনা করার শক্তি। বোঝার ভারে শ্রান্ত ক্লান্ত যে-লোকটি ভেঙে পড়েছে সেও মাঠের শেষে সূর্যাস্তের রঙ দেখে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়।'

তৃপ্তি শ্লেষকণ্ঠে বললে, 'তাতে কি তার বোঝার লাঘব হয়?'

সোমনাথ বললে, 'তা জানি না। সে-খবরে আপাতত আমার প্রয়োজনও নেই। আমি এই কথা বলতে চাচ্ছি যে মানুষ

স্বপ্ন দেখবেই যতদিন তার জীবন-ধারণের শক্তি থাকবে।'

তৃপ্তি মুখ ফিরিয়ে বাঁকা হেসে বললে, 'ততদিন তার কবিতা চাই, চাঁদ চাই, ফুল চাই—'

সোমনাথ দৃঢ় গলায় বললে, 'চাই চাই, চাই। তার কবিতা চাই, চাঁদ চাই, ফুল চাই, চাই গান-প্রেম-ভালোবাসা—'

তৃপ্তি চুপ করে রইল।

আমি সোমনাথের কথাগুলিই ভাবছিলাম। এই জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রে তার কথাগুলি বেসুরো লাগছিল না। জানি না সে ঠিক বলেছে কিনা! তবু সেগুলি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো কোনো যুক্তি পাচ্ছি না।

রাত ঘন হয়ে উঠল।

নিঃশব্দতার তুষার ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

গঙ্গার জল আপন মনে দুর্বোধ্য ভাষায় গান করে চলেছে।

'আমার ঘুম পেয়েছে। আমি চললাম।' সোমনাথ সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে চলে গেল।

তৃপ্তি স্থির অকম্প্র দাঁড়িয়ে। ওর চোখ থেকে আজ কে যেন ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

জিগেস করলাম : 'ঘুম পায়নি?'

তৃপ্তি বললে, 'আপনি ঘুমোন। আমি পরে যাচ্ছি।'

'না। আমিও থাকি।'

'আপনার পায়ে পড়ি। আমাকে একটু একলা থাকতে দিন।'

তৃপ্তি কাঁদছে। বুঝতে পারলাম না হঠাৎ এখন ওর কান্নার কি দরকার পড়ে গেল। তবে এটুকু বুঝলাম ওর নিরালায় কান্নার সুযোগ করে দেয়ার জন্যেও আমার চলে-যাওয়া দরকার। ঘরে উঠে এলাম। খোলা জানালা ভেঙে জ্যোৎস্না আছড়ে পড়েছে ঘরের ভেতরেও। এত আলো, আলোর সমুদ্র, তবু তৃপ্তির চোখে কান্নার কালি কেন? নাঃ, মনটাই কেমন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল : আজ যদি ঘোর অন্ধকার হত তাহলেই বোধকরি ছিল ভালো। অন্ধকারের দুঃখের রূপ নেই, আলোর দুঃখ রূপে-রঙে দ্বিগুণ হয়ে মানুষকে পীড়িত করে তোলে।

সোমনাথ আর তৃপ্তি। ওদের ভালোবাসা। সর্বাঙ্গীণ ঐক্য না-হলে নাকি ভালোবাসার বাঁধন শক্ত হয় না। ওরা পরস্পরকে ভালোবেসেছে কোন্ ঐক্যের জোরে। নাকি সেই মিলনের সূত্র আবিষ্কার করবার গরজেই তাদের আজকের এই দ্বৈত-সমালোচনা।

সিঁড়িতে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে তৃপ্তি। ঘনঘন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে ওর দেহমূল; সে যেন নিজের ওপর জোর হারিয়ে ফেলেছে।

জানালা থেকে সরে এসে বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম। দু'চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিলাম দেহটাকে।

ঘুমের গভীরে তলিয়ে যাবার আগে টের পেলাম সোমনাথ কখন তার বিছানা থেকে উঠে গেছে। বাইরে থেকে ভেসে এল ওদের ছেঁড়া ছেঁড়া কথা। বুঝলাম ওরা দুটিতে আজ সারা রাত ঘুমোবে না। কিন্তু আমার না-ঘুমিয়ে উপায় নেই।

পরদিনই রওনা হলাম কলকাতার উদ্দেশে। মহানগরীর সর্বগ্রাসী প্রয়োজন আমাকে গ্রাস করে নিল।

ঠিক মাসখানেক বাদে হঠাৎ এক বিকেলে টেলিগ্রাম এল। সোমনাথের মৃত্যু হয়েছে।

চুনার থেকে আমার আসার কয়েক-দিন পরেই তৃপ্তিকে চাকরির খাতিরে

তৃপ্তি কাঁদেনি, কাঁদতে পারেনি। যদিও আমি আশা করেছিলাম, একটু কাঁদুক। কেঁদে হালকা হোক।

হঠাৎ কেমন ভূতুড়ে গলায় চিৎকার করে উঠল তৃপ্তি : 'বলতে পারেন এর মানে কি? কেন সে এমন করল?'

ওর প্রশ্নের তীব্রতার সামনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

'আমাকে এমনভাবে ঠকাবার মানে কি? কি করেছিলাম আমি ওর?' তৃপ্তির গলা কাঁপল, ধকধক করে কাঁপছিল ওর গলার কাছের নীল শিরাটা। চোখ লাল, ঘুরছিল ওর চোখের তারা।

সেই মুহূর্তে তৃপ্তিকে আমার ভয়ংকর প্রাগৈতিহাসিক কোনো মানবীর মতো মনে হল। যে আধুনিক সভ্যতার

ওরা দুটিতে আজ সারারাত ঘুমোবে না।

ফিরতে হয়েছিল। অতএব সোমনাথের মৃত্যুর সময় ঘনিষ্ঠ কেউ ওর শয্যার পাশে ছিল না।

তৃপ্তি সেই গভীর রাত্রিতে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় আমার কাছে এল। ও আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। তৃপ্তি কতক্ষণ শক্ত কঠিন হয়ে বসে রইল আমার তক্তপোশে। কপালে ঘাম, চূর্ণ কুন্তল লেপটে গেছে ঘামে, ঠোঁটের ওপর ঘাম, আর বারবার ওর চোয়ালের হাড়দুটো উঁচু হয়ে উঠছিল।

শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে।

তৃপ্তি কতক্ষণ পর চলে গেল। আমি ওকে আটকাতে পারিনি।

এই সোমনাথ। কবি সোমনাথ, আমার বন্ধু।

জানি, সোমনাথ সম্বন্ধে আমি কিছুই লিখতে পারিনি। আমি আগেই স্বীকার করেছি সম্পাদক মহাশয় আমার ওপর দুরূহ কর্তব্যের ভার দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস সহৃদয় সম্পাদক আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন।

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বহুকষ্টে নীরেনের ঘুম ভাঙ্গানো গেল। ভায়ার কোনো অনুযোগের কৈফিয়ত দেবার আগেই দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সেক্রেটারী এই চেঁচামিচিতে উত্যক্ত হয়ে, কম্বলটা সরিয়ে বিরক্তিভরা মুখ একবার বের করেই আবার ঢাকা দিলেন।

হলের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, প্রেসিডেন্ট তখনও শুভাগমন করেননি। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা হল্লায় ঘুম ভেঙ্গে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠেই আবার শুয়ে পড়ি। কম্বলের ফাঁক দিয়ে যা দেখলাম, চক্ষুকেও বিশ্বাস করা যায় না।

প্রেসিডেন্ট-সাহেব এর মধ্যে কখন এসেছেন, আর কখন যে খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছেন, আমরা কেউ জানতে পারিনি—তখনই মনে হ'ল, নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট-সাহেব আসতেই তাঁর সেক্রেটারী স্বয়ং উঠে দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। কিন্তু তিনিও নেই, তা হলে হয়তো প্রভুর আগমন হতেই, তিনি বিদায় নিয়েছেন।

ঘরে হ্যাজাক্ লাইটের পরিবর্তে একটা মিট্‌মিটে আলো, ইংরেজী ভাষায় যাকে an apology to a light বললেও মন্দ শোনায় না; তারই ক্ষীণ আলোকে দেখলাম, খাটিয়ার একপায়া 'বভঙ্গ'—তিনি নীচে গড়িয়ে পড়েছেন।

মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটি :

'লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
নিবেনি সেইক্ষণ!'

ঠিক এমনি সময়, সেক্রেটারী মুক্ত-কচ্ছ হয়ে বাইরের বারান্দা থেকে উর্ধ্ব-শ্বাসে এই নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করেই প্রেসিডেন্টের কাছে উপস্থিত—টর্চলাইট্ জ্বালিয়ে তাঁর বপুখানি তুলে ধরে কী আফ্‌সোস—চৌপায়াটি আগে কেন তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখেননি। কেন এই মহাভুল হয়ে গেল ইত্যাদি ইত্যাদি। সুখশ্রাব্য কথা, সন্দেহ নেই। যাই হোক, প্রেসিডেন্ট-সাহেব অগত্যা মেঝেতেই বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এত যে কাণ্ড হয়ে গেল, নীরেনের সাড়াশব্দ নেই—অকাতরে ঘুম দিয়ে চলেছে। ভাগ্যবান বলতে হবে নিশ্চয়ই। দুর্ভাগ্যও খানিকটা বটে—এই মধ্যরাত্রে ভগ্ন খট্টাঙ্গ থেকে এই মহাপতনের দৃশ্যটি সাক্ষাৎ-দর্শনের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হল। প্রেসিডেন্ট-সাহেবের খাস সেক্রেটারী তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। আমিও মুখটা কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম।

চব্বিশে অক্টোবর।

গুণু ভোরে উঠেই ডাণ্ডীওয়ালা আর অশ্বের মালিকদের সব মিটিয়ে দিয়েছে। বাস ছাড়বে, অথচ এখনও আমাদের দেখা নেই, এই বা কী রকম!

গুণেন জানতো কোথায় আমরা আছি—তাই ছুটে এসে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতেই উঠে পড়ি। প্রাতে ভগবানের নাম নেবার পূর্বেই, তার পিতৃদেব ও আমার প্রতি অনুযোগের বন্যা বয়ে গেল।

—এ কী? আপনারা এখনও ঘুমিয়ে আছেন? ওদিকে সবাই 'রেডি'। শীগগীর উঠে পড়ুন। এই কুলীরা, এই দোঠো বিস্তারা জলদি বেঁধে নাও।

চমৎকার হিন্দী। হবে নাই বা কেন? আমারই তো ভাইপো।

নীরেন পুত্রের ওপর দখলী-স্বত্ব ছাড়তে চায় না—সেও উঠে চোখ কচ্‌লিয়ে আক্ষেপ করে—

—আমার ছেলে হয়ে হিন্দী বলতে পারে না—বড়ই দুঃখের বিষয়!

গুণুর আবার একটি ছোট্ট তাড়া—

—এসব দুঃখ পরে করবেন, বাবা, এখন উঠে পড়ুন। সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

কথাক'টি শেষ করেই তার অন্তর্ধান।

নীরেন বিছানায় বসেই আছে—কুলীরাও এত তাড়া লাগিয়েছে যে,

বোঁডিং উঠিয়ে নীরেনের বুক পর্যন্ত তোলে আর কি!

আমিও তাদের উপদেশ দিই—

—ঠিক হ্যায়, ঐ বাবুকেও ডি বিস্তারাকে অন্দরমে ভর্ লেও।

নীরেন ক্ষিপ্রগতিতে উঠেই সরে গেল। আপন মনেই বিড়্বিড়্ করে ঃ দূর ছাই, ভোরের অবশ্য কাজগুলো কিছুই করা হল না—যাক্ গে!

চেয়ে দেখি, শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর—প্রেসিডেন্ট নেই। কোন্ সকালে উঠে যে পাত্তাড়ি গুটিয়েছেন, কে জানে?

ইতিমধ্যে কুলীরা বেডিং বেঁধে আমাদের যাবার আগেই উধাও হয়েছে। গরম জামা, এটা ওটা সেটা পরে নিতে কিছু বিলম্ব হয়েছে বৈকি!

নীরেন হেলতে-দুলতে আগে আগে যায়, আমি তার পেছনে। সম্মুখেই ব্যগ্র প্রতীক্ষায় নীরেনের স্ত্রী—তার চোখে সার্চ লাইট। পতি পরম গুরুকে দেখে এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই ঘোমটা টেনে দিলেন। আমি পেছনে আছি কিনা—তাই ডিনামাইট্ ফাটার সুযোগ পায়নি।

নীরেনের মৃদুগুঞ্জন—

দাদা, গতিক ভাল নয়—আর দেখছো বৌদিও আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

—ঘাবড়াও মৎ—ওস্তাদের মার শেষ রাতে।

এগিয়ে খুব চীৎকার করে সকলকে শোনাই—

—আজ নন্দপ্রয়াগে সাধুবাবার আশ্রম দেখতে যাব। নিরানন্দের সঞ্চার যেন না হয়। দোহাই ভগবান, আজ যেন সকল যাত্রীর মন মেজাজ প্রসন্ন থাকে—ছারপোকা কামড়ে গোটারাত যন্ত্রণাভোগের হেতুটা আমার স্কন্ধে চাপিয়ে কেউ যেন গায়ের ঝাল না মেটায়!

সকলের উচ্চ অনুচ্চ কন্ঠের হাসি শুনলাম।

—দেখলে নীরেন, মেঘ কেমন উড়িয়ে দিলাম।

নীরেনের এবার খুব সাহস—দোকান থেকে সে এক কাচের গেলাসে চা ভর্তি করে বাসে উঠে পড়ল। আমিও আপন গেলাসে ভয়সা দুধ বোঝাই করে উঠে পড়ি। কেবল হস্তমুখ প্রক্ষালনের কাজটা আপাততঃ শিকেয় তোলা রইল।

পূর্বেই একটা সম্পূর্ণ বাস রিজার্ভ করা আছে। আমরা উঠতেই ড্রাইভার হর্ণের শঙ্খধ্বনিতে জানিয়ে দিলে, এবার সে ছুটে চলবে।

হুশ্ হুশ্ করে মালবোঝাই আর মানুষ বোঝাই প্রকাণ্ড বাসখানা চলতে থাকে, আমার মনও হাউইয়ের মত ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটে যায়। ষোলজন গাড়োয়ালী ডাণ্ডীওয়ালাও বাসে উঠেছিল—তারা সব শ্রীনগরে নেমে আপন আপন ঘরে চলে যাবে।

আজ কর্মসূচীর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান কাজ—আমার পরমারাধ্য পরম ভাগবত শ্রীশ্রীস্বারিকানাথ দেবতপস্বীর আশ্রম-দর্শন। যাঁর কাছে তিন তিনবার আসতে চেয়েছি কিন্তু একটা না একটা বাধা পড়ায় আসা হয়নি। শেষবার প্লেনের সাতটা টিকিট কেনা হয়েছে। তখন কিছুদিন প্লেন সার্ভিস হয়েছিল। মন আনন্দে ভরপুর ঠিক সেই সময় একটা টেলিগ্রাম পেলাম তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন।

যাওয়া হ'ল না। ঠিক তার তিন দিন পরেই একটা পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে—তাতেই বুঝলাম, এই বাধা পড়ার কারণ কী!

আমার জীবনকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করছেন, যাঁর আলো আমায় পথ দেখিয়েছে; তাঁর শেষনিঃশ্বাস যেখানে পড়েছে, সেই তীর্থে আমি চলেছি।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় তেতাল্লিশ বছর আগে। সেদিন শুনেছিলাম, একজন আবাল্য ব্রহ্মচারী যোগী দক্ষিণ খণ্ডে আছেন। অনেকের মুখেই তাঁর বিভূতির কথা শোনা যায়—কিন্তু কানের ভিতর ঢুকেছিল, মরমে পশেনি; তাঁকে দেখবার কোনও তাগিদ অন্তরে ছিল না। তিনি তখন ধর্মরাজতলা আশ্রমে—আমিও ঘটনাচক্রে তাঁর আশ্রমের সামনে দিয়েই মোটরে অন্যত্র চলেছি। অজ্ঞাতসারেই আমার চোখ সেদিকে পড়ে। দেখলাম, জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীর একজোড়া উজ্জ্বল চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি! কী যে ছিল তার মধ্যে; তা' বুঝিয়ে বলার শক্তি নেই—কিন্তু একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলাম।

যেখানে যাওয়ার কথা—যাওয়া হল না। কিছু দূরে গিয়েই মোটর ঘুরিয়ে ফিরে আসি। যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম, তখন আমার কোনও পৃথক সত্তা ছিল না। সেই মহাযোগীর চরণ স্পর্শ করে আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বহু ইঙ্গিতভরা সুদীর্ঘ পরিচয়ের সুর যেন জেগে ওঠে—আমি নিজেকে নিঃশেষে তাঁর পায়ে সমর্পণ করি। কিন্তু আমি নিজেকে ঢেলে দিলাম; না, তিনিই আমাকে তাঁর মধ্যে টেনে নিলেন, তা ঠিক বুঝতে পারিনি, শুধু মনে হ'ল আমি ভারমুক্ত হয়েছি। সেই স্পর্শের প্রভাবে কী যে একটা অপূর্ব শিহরণ নেমে এল আমার বুকে, তা' আমি ঠিক বলতে পারি না। পরবর্তীকালে সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে আমার সমস্ত জীবনকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কৌলিক প্রথানুযায়ী আমাকে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়েছিল—তখন আমার বয়স মাত্র উনিশ। আমি লোকতঃ শ্রীমৎ স্বামী স্বারিকানাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিনি, কিন্তু আমার অন্তর্জগতে তিনিই ছিলেন আমার গুরুদেব, আমাকে জীবন-মন্ত্রের সন্ধান দিয়েছেন তিনি।

সাধু-সন্দর্শন যে এই ভাবান্তর নিয়ে আসবে—এ ছিল কল্পনার বাইরে। আমার এই সমর্পণের মধ্যে দিয়েই সাধু-বাবার জ্যোতির্ময় মূর্তি আমার মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল—অন্তর্জগতে নিয়ে এল একটা গভীর বিপ্লব। যতই তাঁর অন্তরঙ্গ হয়েছি, ততই তাঁর প্রশান্ত হৃদয়ের অতলস্পর্শী গভীরতায় বিস্মিত হয়েছি। অভ্রভেদী হিমালয়ের মত তাঁর সুগম্ভীর দৃঢ়তা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। আবার ধন্য হয়েছি সেই করুণা-ঘন মহাপুরুষের অপরিসীম স্নেহের ছোঁয়া পেয়ে। তাই তিনি যে আমার জীবনে কী ছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সেবার আমরা যখন পুরীতে গিয়েছিলাম, আমার পিসতুতো ভাই জীবেন্দ্রনারায়ণও সঙ্গে ছিল। ঐ সময় শ্রীশ্রীসাধুবাবাও পুরীতে ছিলেন, আর সেই জন্যেই আমার যাওয়া। তাঁর যৌগিক ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। একদিন রাত্রে আমাদের আলোচনা ক্রমে তর্কে পরিণত হ'ল। জীবেন্দ্রনারায়ণ সাধুবাবার অলৌকিক বিভূতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে, আর আমি তার সন্দেহ খণ্ডনের জন্যে সবেগে তর্ক করে চলি। গভীর রাত্রি—একটা বেজে গিয়েছে—

আমাদের কারো খেয়ালই নেই। সামনের বারান্দায় সারি সারি কয়েকটা মোটা থাম—তার মধ্যে যেটি আমাদের কাছেই, হঠাৎ দেখি তারই পাশে দাঁড়িয়ে জটা-জুটধারী দিব্যকান্তি শ্রীশ্রীসাধুবাবা। আমি ও জীবেন্দ্র একই সঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠি—এ কি! আপনি এখানে? এত রাত্রে? দিব্যমূর্তি মৃদুমন্দ হাসলেন—আমি ও জীবেন্দ্র তাঁকে প্রণাম করতে গেলাম—তাঁকে আর দেখা গেল না—যেন স্তম্ভের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে পরদিন ভোরেই ছুটলাম সাধুবাবার আশ্রমে। আমি কোনও কথা বলার আগেই অন্তর্যামী গুরুদেব আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—ওরকম হয়েই থাকে। ভাবই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মূল।

সাধুবাবার স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা-গুলি চলচ্চিত্রের ন্যায় একের পর এক মনে পড়ে। সাধুবাবা তখন বেনারসে। আমিও গিয়েছি সেখানে। তাঁর প্রবল জ্বর, কিছুতেই ত্যাগ হয় না। আমি জোর দিয়ে বলি—জ্বর ছেড়ে যাবেই। আশ্চর্য, তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল, আর আমার হ'ল দীর্ঘমেয়াদী প্রবল জ্বর। সাধুবাবা বলেছিলেন, গৃহীলোকের এ রকম বলতে নেই—তা'তে কষ্ট হয়।

আর একবার, গুরুদেবের অনুজ্ঞা পেয়ে আমিও আত্মসংযমে ব্রতী হয়েছি। বৈশাখ ও কার্তিক মাসে প্রত্যহ শিব-পূজা করি। সেদিন ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। পূজায় বসে মনে হ'ল, গুরুদেব আমাকে ডাকছেন—তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। পূজা শেষ করেই, বৈশাখের সেই খররৌদ্রে আমি সেই দীর্ঘ ষাট মাইল পথ মোটরে অতিক্রম করে তাঁর সামনে হাজির হয়েছিলাম। আমার অনুযোগের উত্তরে, স্নেহসিক্ত ভাষায় গুরুদেব বলেছিলেন ঃ

—তোমার কথা মনে হয়েছিল, দেখতেও চেয়েছিলাম।

ন্যায়ালিশপাড়া আশ্রমের সেই স্মৃতি আজও আমার মনে তেমনি উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি আমায় বলেছিলেন ঃ

—ধীরেন, এই জন্মেই তুমি সব পাবে—তোমার সিদ্ধি হবে।

আমার যখন করোনারি থ্রম্বসিস—ছ'মাস শয্যাগত; সাধুবাবা লিখলেন—

—চিন্তা করিও না; তোমার ব্যাধি নিজ শরীরে টানিয়া লইব।

কিন্তু গুরুদেবের চরণধূলি পাওয়ার জন্যে মনটা খুব ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাঁকে সেকথা জানাই। তিনি গৃহীর গৃহে পদার্পণ করেন না—তাঁর প্রধান শিষ্য সে কথা লিখতেই আমি গুরু-দেবের চরণে জানালাম—তিনি যেখানে থাকবেন, সেটা তাঁরই আশ্রম। পরম কারুণিক গুরুদেবের আসন টললো—তিনি এলেন আমায় আশীর্বাদ দিতে। আনন্দময়ী মাও সে সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমার গৃহে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে কী যে ঐশীভাবের আদান প্রদান—কী যে দিব্য আনন্দের খেলা তাঁদের চোখে মুখে—সে তো কখনো ভুলবার নয়!

আর একবার, আমার গলার পাশে একটা ফোঁড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছি। অস্ত্রোপচার ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কী হবে এই চিন্তায়, আমার মা সাধু-বাবাকে পত্র লিখে সে কথা জানাতে চান। আমি বাধা দিয়ে বলি, মা, এই সব খুঁটিনাটি আধিব্যাধির কথা, সাংসারিক স্বার্থের বিষয় আমি তাঁকে কখনো জানাইনি—তুমিও যেন কিছু জানিও না।

মায়ের মন শুনবে কেন? তিনি লোক মারফত পত্র পাঠালেন।

উত্তর এল—স্নেহময়ী জননি, তোমার পত্র পাওয়ার আগেই ধীরেনের অসুখ সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি এবং শ্রীশ্রীজগন্ময়ীমাতার চরণে তাহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছি ও করিতেছি—কিন্তু মা, ভোগ অথবা দুর্ভোগ, যাহাই হউক না কেন, তাহা দ্বারাই আমাদের প্রারব্ধের খণ্ডন হইয়া থাকে।

কলেশ্বরে স্বামী দ্বারিকানাথ! তাঁর লীলা-বিভূতির অন্ত নেই। বীরভূমের সেই জনবিরল পল্লী চোখের সামনে ভেসে উঠল। জেগে ওঠে গগনচুম্বী সেই শিবমন্দির—বাংলার সর্বোচ্চ দেবায়তন—আমাকেই তিনি এই মন্দিরের উপলক্ষ্য করেছিলেন। প্রভাতফেরীর সেই গান এখনও কানে শুনতে পাই, 'দেখ দ্বারিকনাথের প্রভাস লীলা এ কলেশ্বরে।' মন্দির-প্রাঙ্গণের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসেছে মেলা—মাঝে মাঝেই বিরাট তোরণ—সমস্ত ভারতের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অস্থায়ী কুটির; এক পাশে রন্ধনশালা—বিরাট অন্নসত্র—এলাহি কারবার। চাল হয়তো কম পড়ে যাবে—অমনি ছ'গাড়ী চাল এসে হাজির। দই কুলোবে কিনা? সঙ্গে সঙ্গে ভারীতে কয়েক মণ দই পোঁছে দিয়ে গেল। কা'র কাজ কে করে, কে জানে! গুরুদেব বললেন—দেখ স্বয়ং কলেশনাথ আর পার্বতীমাতা সব কিছুর ভার নিয়ে-ছেন—যত খুশী খাও, যত খুশী বিলিয়ে দাও—আজ এখানে অন্নপূর্ণার মন্দির।

সমারোহের একদিকে এই চিত্র, আর একদিকে এক পর্ণকুটিরে বসে আছেন, যোগসিদ্ধ তীর্থপতি গুরুদেব—দুই চোখে কী এক উজ্জ্বল স্বর্গীয় দীপ্তি। সামনে টাকা পয়সার পাহাড়—স্তূপাকৃতি প্রণামী—সাধুবাবা দৃক্‌পাত-বিহীন।

আমি তাঁর পাশেই বসে আছি। কলেশনাথ মন্দির যিনি স্থাপন করে-ছিলেন সেই রাজা রামজীবনের কথা উল্লেখ করেই গুরুদেব বলে উঠলেন—

—সেই রাজা আজও উপস্থিত আছেন।

—কৈ, কোথায় তিনি?

গুরুদেব বললেন—এই যে, তুমি, তোমার মধ্যেই রাজা রামজীবনের আত্মা!

আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে আবার যখন নূতন দেহে অধিষ্ঠিত হয়, বহু বিবর্তনের পরও তাকে কেমন করে চেনা যায়, এমনি অনেক প্রশ্নই মনের মধ্যে আনাগোনা করে, কিন্তু সাধুবাবার তপঃকম্পিত মূর্তির সামনে কোনো জিজ্ঞাসাই এগোতে পথ পায় না।

পরে তাঁর মুখেই শুনেছি—মানুষের শেষনিঃশ্বাসের সঙ্গেই জীবাত্মা দেহ হতে বহির্গত হয়ে জ্যোতি-র্ময় অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আকারে সূর্য-মণ্ডলের আকর্ষণীয় শক্তিযোগে অর্যমা-লোকে উপস্থিত হয়। আমাদের ভাবধারা প্রতি নিঃশ্বাসে শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গুপ্তভাবে অর্যমালোকে চিত্রিত হয় বলেই তার নাম চিত্রগুপ্তের দপ্তর। তিনি বলতেন এটাই আমাদের জীবনের রেকর্ড-রুম। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন ভাবের মধ্যে যেটি আমাদের প্রবল, সেই অনুসারেই ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের পথে পরজন্মের অধ্যায় রচিত হয়ে থাকে এবং বহু জন্মের মধ্য দিয়েই আমাদের সংশোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধেও এদিন তিনি বড় সুন্দরভাবে

বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—এই তিনটিই পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যখন কোনও কাজ করি, সেই হ'ল কর্ম, কর্মে নিষ্ঠাই হ'ল ভক্তি, আর যে বিচার-বিবেচনা নিয়ে কাজটি করা হয়, সেই হ'ল জ্ঞান। এই তিনটির ঊর্ধ্বে সিদ্ধ যোগীদের আসন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব তাঁরা দেখতে পান।

আজ সাধুবাবার শেষ-আশ্রম সঙ্গম আশ্রমে চলেছি। তাঁর জীবদ্দশায় বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আসা হয়নি—এই কথা চিন্তা করে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শতস্মৃতি-বিজড়িত আমার জীবনের অতীত যেন মনের দুয়ারে বারে বারেই আঘাত করে—বারে বারেই জানিয়ে দেয়, অসীম তিনি সীমার মাঝে রূপায়িত হয়েছিলেন সসীমকে অসীমের সন্ধান দিতে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

—একদিন পুজোর সময় দেখতে পাই 'ওঁ' এই মন্ত্রের আলোকময় চিত্র। তারপরই 'ও' বর্ণটি লুপ্ত হয়ে যায়, তারপর চন্দ্রবিন্দুর চন্দ্রও আর দেখা যায় না—থাকে শুধু সেই উজ্জ্বল বিন্দুটি।

গুরুদেব বল্লেন—

—মন্ত্রময় দেহের শেষচিহ্ন ওই আলোকময় বিন্দু—ওই হ'ল অবিনশ্বর আত্মা।

তাঁর কাছে জানতে চাই—

—তাকে ধরে রাখা যায় না কেন? বুকে এত পিপাসা, তবু সেই অমৃতরস পান করতে পারি না কেন? কেন তাঁকে এ মনের মাধুরীতে ডুবিয়ে রাখতে পারি না?

গুরুদেব উত্তর দিয়েছিলেন—

—তুমি চ্যুত না হওয়ার কথা বলছ? এই আকুলতাই তোমার সারথি।

আমার জীবনের সারথি শ্রীমৎ স্বামী দ্বারিকানাথ দেবতপস্বীর আরো কত কথাই না মনে আসে, সেই আলোকোজ্জ্বল মহাপুরুষ আমাকে যেন কোন্ গভীরে টেনে নিয়ে গেলেন—

নীরেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—

—দাদা, নন্দপ্রয়াগ এসে পড়ল যে, উঠে পড়—ঘুমুচ্ছ নাকি? গোটাপথ এই কানের কাছে গাড়োয়ালীদের গলা ফাটিয়ে গান আর হাসি, তাতেও তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি—এ কী ঘুম রে বাবা! আশ্চর্য!

—তাই ঘটে! —এ নিদ্রার শেষ নেই!

নেমে পড়লাম। আমাদের জিনিস-পত্র বাসেই রাখা থাকলো। সামনেই খাবারের দোকান। গুণু ওখানেই আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের বন্দোবস্ত করে, কে কী খাবে, দোকানীকে বলে দিলে। একটি বালককে জিজ্ঞাসা করি—

—এখানে কোথায় সন্ন্যাসীর আশ্রম, জানো?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই তাকে বলি—

—আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, তোমার প্রাপ্য তুমি পাবে।

বাঁ-ধারের ঐ দোকান থেকে কিছুটা এগিয়ে ডাইনে নামতে শুরু করি। প্রায় আধ মাইলের ওপর নেমে যাই। সবাই আমার পশ্চাতে। গুণুকে ডাক দিয়ে বললাম—

—দেখ, ডাণ্ডিওয়ালারা সঙ্গে থাকলেও—ডাণ্ডি নেই, ও সব পিপলে-কোটিতে যাদের কাছে ভাড়া নিয়েছিল—তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। নেমে গেলেই আবার উঠতে হয়—সে খেয়াল আছে? তখন যেন তোমাদের সমবেত আক্রমণ-ধ্বনি শুনতে না হয়, বুঝলে?

—উপায় যখন নেই, তখন আমরাও কিছু বলব না—। তবে আসার পথে ধীরে ধীরে উঠবেন আর দাঁড়াবেন।

—শুধু পাহাড়ে ওঠানামা কেন? মানুষ যখন নীচে নেমে যায়, তখন তারা বুঝতে পারে না—কিন্তু উঠতে বড় কষ্ট, বড় বিলম্ব হয়—তবু কখনো ওঠা—কখনো নামা—কখনো উত্থান, কখনো পতন, এই তো জগতের নিয়ম।

যতই আশ্রমের কাছে এগিয়ে আসি, পা যেন কেমন ভারী হয়ে আসে।

ঐ ছোট্ট পাথরের টাইল-দেওয়া কুটিরের সামনে এলাম। ছোট্ট একটু ফুলের বাগানে পাহাড়ী ফুল আর গাঁদা ফুটে রয়েছে তাঁর স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে। চারিদিকে কাঁটার বেড়া—মাঝে ছোট্ট একটু প্রবেশ পথ—সন্তর্পণে ঢুকে পড়ি। কেউ আছেন কিনা, হাঁক দিতেই, একজন সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

—কোত্থেকে আসছেন?

অবশ্য হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। সম্পূর্ণ নাম বলতেই তিনি দুটো হাত ধরে বসালেন। মাত্র দুটি ঘর। একটিতে সাধুবাবা যজ্ঞ করতেন—ঠিক পাশেই একটি তক্তাপোশ পাতা—তার ওপরেই কারুকার্যখচিত একটি চন্দ্রাতপ। এ'র কাছেও গুরুদেবের মহা-প্রয়াণের বিবরণ আবার শুনলাম। পক্ষকাল একাসনে সমাধিস্থ থাকার পর তিনি হঠাৎ গগন-বিদারী ধ্বনি দিয়ে উঠলেন—ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎ সৎ—সঙ্গে সঙ্গেই এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তিনি জ্যোতির্লোকে বিলীন হয়ে গেলেন।

কোনও সাধু সজ্জন অতিথি এলে, ঐ পাশের ঘরেই ব্যবস্থা হোতো। এক কোণে একটি ছোট্ট কুঠরী—যেখানে তিনি স্বহস্তে ভোগ পাক করতেন।

সেই তক্তাপোশের ওপরে একটি কাজকরা সুজনী পাতা আছে—একটি মখমলের তাকিয়ায় তাঁর প্রকাণ্ড রোমাইড্ ছবিটি হেলান দিয়ে রাখা। ছবিটি দেখেই বুঝলাম, আমার অসুখে কলকাতার বাড়ীতে যখন পদার্পণ করেন—তখনই সেটা তোলা হয়েছিল।

সন্ন্যাসী আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে আর ছাড়তে চান না। আমার নাম নাকি বহু শিষ্যের মুখে, তা ছাড়া স্বয়ং গুরুদেবের কাছেও তিনি শুনেছেন। পাশ থেকে আমার একটি ফটো তুলে নিয়ে আমাকেই দেখালেন। বিশেষ করে অনুরোধ করলেন—

—আপনাদের সকলেই এখানে একটু প্রসাদ না নিলে ছাড়বো না। আমি ভাল করেই জানি, আপনি তাঁর আশ্রিত শিষ্য।

জাগ্রত কি ঘুমন্ত জানি না,—তবে তাঁর কৃপাধন্য হয়েছিলাম—এইটুকুই আমার জীবনের সম্বল। করজোড়ে বলি—

—কণিকামাত্র প্রসাদ মুখে দিয়ে নিশ্চয়ই যাব—আপনি যেন কড়ারের বন্দোবস্ত করবেন না। তার আগে নন্দাকিনী-অলকনন্দার সঙ্গমে স্নান করে আসি।

তাঁর শয্যার ওপরেই একটি বই পড়ে আছে উঠিয়ে দেখলাম, তাঁরই জীবনী। এমনি অনির্দিষ্টভাবে বইখানার মাঝা-মাঝি পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল—৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, সাধুবাবার নিজের লেখা বিবরণ—"কৈলাসে গভীর নিশীথে সঙ্গীতের মনোমুগ্ধকর

অস্পষ্ট ধ্বনিও শোনা গিয়াছিল—এবং স্থানে স্থানে দিব্য আলোকমালার ছটাও দর্শন হইয়াছিল।"

কেদারে ফলাহারীবাবা, বদরী-নারায়ণে মৌনীবাবা, যোশীমঠের বর্তমান শংকরাচার্য—সকলকেই আমার সেই অলৌকিক সংগীত-শ্রবণের কথা জিজ্ঞাসা করেছি— চিরহাস্যপুরবাসী আমার গুরুদেবও মানস সরোবরে তাঁর সংগীত-শ্রবণের কথা আমাকে বলে-ছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তাই বুঝি তিনি অলক্ষ্যে এমনি ভাবেই স্মরণ করিয়ে দিলেন। এখানেও সেই কেদারের পথে স্তোত্র-সংগীত-শ্রবণের উত্তর পেলাম।

দুই ভৃত্য সংগেই ছিল। আমাদের পরিধেয় বস্ত্র বয়ে এনেছে। সন্ন্যাসী তাঁর শিষ্যকে সংগেই দিলেন। বেরিয়ে আসার পথে একটি স্থান নির্দেশ করে তিনি দেখালেন, এইখানেই গুরুদেবের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়েছে। ছোট বড় পাথরের শিলা উঁচু করে স্তূপীকৃত; ওখানেই সমাধি-মন্দির তৈরি হবে। চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে, সেই সমাধিতে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করি। তারপর স্নানে যাওয়া গেল।

অলকনন্দা ও নন্দাকিনীর সংগমে দুই নদীর কী প্রবল উচ্ছ্বাস! কী উন্মত্ত উদ্দাম ফেনিলপ্রবাহ। এলো-মেলো ঝোড়ো বাতাস—কনকনে ঠাণ্ডা। ওপর থেকে আরও কিছু নীচে নামতে হবে—এবড়োখেবড়ো সব বড় বড় পাথর—এখানে-ওখানে পা দিয়ে খুব সাবধানে যদি নামতে পারি, তাহলেই ঠিক সংগমস্থলে যাওয়া যায়। শিষ্যটির হাত ধরে ধীরে ধীরে নেমে পড়লাম।

আজ সকালে মুখ ধোওয়া হয়নি। বস্ত্রাদি ও দাঁতের মাজন প্রভৃতি ভৃত্যের কাছেই ছিল—সেও আমার পেছনেই। মুখ ধুয়ে জলে নেমে পড়ি। স্রোতের কী তোড়; বেশী দূরে না গিয়েই জলের মধ্যে এক শিলাখণ্ডের ওপর বসে ঘটির পর ঘটি মাথায় জল ঢালি। স্রোতের প্রবল ধাক্কায় কাত্ হয়ে যাই—কিন্তু একেবারে কুপোকাত হইনি। এক ঘটি জল ভরে নিলাম। স্নানান্তে নতুন কাপড় পরে আবার তেমনি কষ্ট করেই ওপরে উঠে এসে দেখি, নীরেন নেই,—সে এই ভাবগতিক দেখেই আগেই সহ-ধর্মিণীকে নিয়ে পিট্টান দিয়েছে, আর নাকি বলে গিয়েছে, পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা করা চাইতো! আগে দেহ, তারপর ধর্ম। শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্—এই সংস্কৃত নীতিবাক্য আউড়ে তিনি সটান্ ওপরে উঠে গিয়েছেন।

আমার দেখাদেখি, অনুজা ও তার মায়ের সাহস অতিমাত্রায়। তারাও কোমরে আঁচল জড়িয়ে স্নানের জন্য উন্মুখ। আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই বলি—এখানে হ্যাঁ-না বলার কিছুই নেই, তোমাদের মন যা চায়, তাই কর। আমি এখন যাই।

আশ্রমে ফিরে এসে আবার সাধু-বাবার শয্যার পাশে নীচেই বসে পড়ি। উগ্রতপস্বীর উগ্রতপস্যার প্রভাব আমাকে কিছুক্ষণ তন্ময় করে রাখে। দু' চোখ বুজে করজোড়ে শ্রীশ্রীসাধুবাবার কাছে আমার এই কেদারবদরী তীর্থ-ভ্রমণের সুফল ভিক্ষা করি। হঠাৎ আমার মুদ্রিত চোখের সামনে সেই যোগীগুরু শ্রীমৎ স্বামী দ্বারিকানাথ এসে যেন বলছেন --তুমি এগিয়ে চল, আরও আরও গভীরে, ঠিক যেমনটি আমি তোমায় দেখতে চেয়েছি।

সাধুবাবাকে আমি কতভাবেই না পেয়েছি। এ রকমও হয়েছে—পুজোর পর তিনি হোম করতেন—সামনেই আগুন জ্বলছে—কখন যে একখণ্ড জ্বলন্ত অংগার ছিট্কে এসে তাঁর হাত পুড়িয়ে দেয়, খেয়াল নেই—মনকে চেতনার পারে কোন্ ঊর্ধ্বায়নের পথে নিয়ে গিয়েছেন —তাই বুঝতে পারেননি—পরে, বাইরে এসে জ্বালা অনুভব হয়েছে—তাও স্বচক্ষে দেখেছি—কারণ জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পেয়েছি—

—মনের যে অনুভূতি সুখ-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা বুঝিয়ে দেয়, সেই বোধ-শক্তি তখন থাকে না—তাই টের পাইনি। ও কিছু নয়।

অনুজা বারংবার ডাকে, তাগাদা দেয়ঃ

—বাবা, বড্ড দেরী হয়ে গেল, উঠুন, যেতে হবে।

শেষ প্রণতি জানিয়ে উঠে পড়লাম—বাইরে সন্ন্যাসী ফল দিলেন—তাঁর স্বহস্তে তৈরী হালুয়া প্রসাদ খেতে বললেন।

কম্বলের আসনে বসে একটু মুখে দিয়ে নিলাম। তারপর তাঁর সমাধিতে আর একবার প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে আসি। ওপরে উঠে দোকানের কাছে পৌঁছে দেখি, আমাদের খাবার প্রস্তুত।

নীরেনের পেটে হুতাশন· আমাকে দেখেই দপ্ করে জ্বলে উঠল—

—এত দেরী হ'ল যে? স্নানের পর আশ্রমেও চোখ বুজে সিনেমা দেখছিলে বুঝি?

—শুধু তো স্নান নয়, মনটাকে ডুবিয়ে এলাম। তন্ত্রে বলেছে, মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

—তোমার ও সব তন্ত্রমন্ত্র ছাড়ো। আমার যে পেটের তন্ত্রী ছিঁড়ে গেল। বড্ড খিদে!

—এই খিদেটা পেটের না হয়ে যদি মনের হ'তো!

নীরেন এবার সত্যিই গরম হয়ে ওঠে।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলি—তোমার যখন এতই চটিতং ভাব—তখন চরম সত্যি কথা বলেছি, নিশ্চয়ই।

সেও হেসে উঠেই একটা ইংরেজী বুলি ছেড়ে দিলেঃ

—Hunger knows no law.

খেয়ে-দেয়ে আবার সকলেরই রথা-রোহণ। সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটে রুদ্র-প্রয়াগ পৌঁছে স্থানীয় এক বাজে হোটেলে রাত্রি-যাপন। 'কোথায় যাবে গোপাল? সংগে যাবে কপাল।' এখানেও কোনও বিশ্রাম-গৃহ ভাগ্যে জুটল না। মিলিটারী অফিসার ও তাঁর দলবল আগেই সব দখল করে বসে আছেন। সামনে অনেক ছোট বড় জীপ। ভগ্ন, জীর্ণ, হৈ-হল্লা-মুখরিত আমাদের আশ্রয়-স্থানটি। ডাণ্ডীবাহীরা যেখানে শুয়ে-ছিল, তার এক কোণে আমরাও কোনো-মতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকি।

পঁচিশে অক্টোবর সকাল আটটায় রুদ্রপ্রয়াগ হতে হৃষিকেশ যাত্রা করি। মাঝে মাঝেই গাড়ী থামে। কেউ দুধ, কেউ ফল, কেউ বা কদলী ভক্ষণ করে নেয়—সোজা আঠারো মাইল নেমে, শ্রীনগরে এসে গাড়ী থামতেই দুই ভৃত্য রতি ও ঘোঁতা ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ে—ঝক্মকে গোলাপ ফুল আঁকা পট্পটে টিনের সুট্কেশে রাখা গরম জামা কাপড়, নূতন একজোড়া ধুতি আর নগদ চল্লিশ টাকার খোঁজে। আমিও তাদের সংগে গিয়ে দেখি, তারা যে দোকানে বাক্সটি রেখেছিল, ঠিক সেখানেই আছে। যাওয়ার পথে যেখানে নর্দামার ধারে আমরা শুয়ে রাত কাটিয়েছি, সেই স্থানটিও ভাল করে দেখে নিলাম।

দোকানদার বললে—আপনারা চলে যাবার পর দেখলাম, ঐ সুট্কেশ আপনারা ফেলে গিয়েছেন। আমি খাটিয়ার নীচে সরিয়ে রেখেছি।

সততায় মুগ্ধ হ'লাম। ওদিকে দুই ভৃত্য আমার দু'পায়ে ঠক্ ঠক্ করে মাথা ঠোকে—হরদম প্রণামের পর প্রণাম আর গদগদ ভাব—

—পায়ের ধুলো দিন—মাথায় ঠেকিয়ে নিই। বদরীনারায়ণে আপনি বর দিয়েছিলেন—তা' সত্যি ফলে গেল!

—দূর পাগল—আমি বর দেবার কে? আর পায়ের ধুলো? দেখছ না—

ডবল মোজা—তারপর বুটজুতো এত সব খুলে পদরেণু দেওয়া সহজ কথা নয়।

আমি দোকানীর দিকে চেয়ে আছি; সেও বেশ রসিক—অকপটেই বললে—

—সুক্রিয় বলবেন কিনা ভাবছেন?

—না মামুলি ধন্যবাদ দিয়ে তোমায় ছোট করব না ভাই, তবে,—

—তবে শুনুন, গত বছর একজন খুব বড় ঠিকাদার এখানে একটা খোলা সুটকেশ ফেলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে একই ধরনের কয়েকটি সুটকেশ ছিল। তিনি যখন বদরীনারায়ণের পথে রওনা হয়ে যান, আমি দোকানে ছিলাম না। আমি আসতেই ছেলে বললে, "বাবুজী, শেঠজী একটা খোলা সুটকেশ ফেলে গিয়েছেন, দেখলাম, তার মধ্যে একটা খোলা ক্যাশ বাক্স—অনেক টাকার নোট।" তাই তো! এখন করা যায় কী? শেঠজীর ঠিকানা জানা নেই যে তাঁকে খবর দেব। ভাবনায় পড়ে গেলাম। এক তাড়া নোটের বাণ্ডিল, গুণে দেখি নগদ পঁচিশ হাজার টাকা। যত্ন করে তুলে রাখি। যদি তিনি এখানে পক্ষকালের মধ্যে না আসেন—তাহ'লে সব কাগজে বিজ্ঞাপন দেব—নাম ধাম আর কত টাকা আছে, তার সঠিক বিবরণ দিয়ে যেন সেই ভদ্রলোকটি তাঁর সুটকেশ নিয়ে যান। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি—দিন বারো-তেরো পরে তিনি এখানে ফিরে এসেই কী আফসোস—পথে তাঁর নগদ পঁচিশ হাজার টাকা খোয়া গিয়েছে—কুলীর কাছেই সব সুটকেশ ছিল—কিন্তু কোথায় যে পড়ে গেল, না কী হ'ল—পাত্তা নেই।

আমি তখনই তাঁর সুটকেশ সামনে রেখে বলি—

—গুণে দেখুন, আপনার টাকা আর যা যা জিনিস সব ঠিক আছে কিনা!

শেঠজী হাতে স্বর্গ পেলেন এবং সব দেখে শুনে বললেন—সব্ ঠিক্ হ্যায়।

আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি গিলছিলাম—শেষ হতেই জিজ্ঞাসা করি—

—তিনি তোমাকে কী দিলেন?

—হ্যাঁ দশ টাকা দিতে এসেছিলেন—। নিইনি। হাজার টাকা, দশ হাজার দিলেও নিতাম না—আমি তাঁর টাকা তাঁকেই ফেরত দিয়েছি—এর জন্যে আবার পয়সা নেবো কী? আরে রাম রাম, ছিঃ ছিঃ! এই দেখুন না—এই দোতলা বাড়ী—আজ তিন বছর হ'ল, শেষ করতে পারিনি—বাপ ব্যাটা দিনমান মেহনত করে যা রোজগার করি, তাতেই একটু একটু করে 'মকান' বানাচ্ছি। ভগবানের কৃপা—আপনাদের দয়া থাকলে আর এক বছরেই সব শেষ করে ফেলব, আশা করি। আপনি ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করুন, ঠিক পথে চলতে পারি—শিউজীর নাম নিয়ে শেষ ক'টা দিন কেটে যায়।

আশীর্বাদ করব আমি—তোমাকে? তুমিই বরং আশীর্বাদ কর যেন তোমার মত লোক এই দুনিয়ায় আরও বেশী দেখতে পাই।

যেমন বাপ, তেমনি ব্যাটা। বুকে জড়িয়ে ধরে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। এমন সময় দোকানীর এক বন্ধু এসে, এক যাত্রীর সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠতা দেখে প্রশ্ন করে—

—আরে কেয়া জী? আজ এত্তা খোস্‌মেজাজ্ কেঁউ? দোকানী বললে—সেই ব্যাগ-ফেলে-যাওয়া শেঠজীর কথা বলছিলাম। তুমিও তো জানো—এঁদের বল না। এঁরাও একটা বাক্স ফেলে গিয়েছিলেন।

দোকানী এতক্ষণ যা বলেছিল, সেও একটানা ঐ কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতেই বাধা দিয়ে বলি—

—অন্যের কথা শুনে তোমায় বিশ্বাস করব—এতটা ছোট আমি কখন যেন না হই!

আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলি—আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমার মত একটা সুন্দর মানুষের দেখা পেলাম। যাবার পথে এখানে রাত্রিবাস করেছি—কত কষ্ট পেয়েছি তখন জানতাম না—তোমার এই স্থানটিও একটি পবিত্র তীর্থ—অন্ততঃ আমার কাছে।

পেছন থেকে নীরেনের ডাক এলো

—কী দাদা, এখানেও জমে গিয়েছো?

—না জমিনি, বরং উল্টো—একেবারে গলে জল—পারো তো এক ঘটি ভরে নাও।

—ওদিকে ড্রাইভারের কড়া তাগিদ আর মেয়েদের মুখ-ঝামটা কত সইব?

আবার সেই নীরস গদ্যে ফিরে যাই। নীরেন বাসের সামনে এসেই এমন একটা 'মোশান' দেখালে, যেন সে কত কষ্টে আমাকে পাকড়াও করে এনেছে।

আরোহীদের উদরজাত করে বাস ছুটে চলল। মানুষের জীবনে যেমন ওঠা নামা আছে, বাসও ঐ একই নিয়মে এগিয়ে চলে। পরিমলের এবার গল্-ব্লাডারের ব্যথা চাড়া দিয়েছে—ভীষণ কাতর—। যোশীমঠে আসার পথে তার দিদির হয়েছিল—ভগ্নীই বা কিসে কম? সেও দিদির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। নীরেনের শিরঃপীড়া—কন্যা অনুজারও জ্বর-ভাব—ভৃত্য ঘোঁতার পদমর্যাদা বৃদ্ধি অর্থাৎ পা ফুলে ঢোল—চলন্ত হাসপাতাল আমাদের বাসখানা। শেষটায় হৃষিকেশে বিকেল চারটেয় এসে হাঁপ্ ছাড়ল।

কেউ ধরে, কেউ খুঁড়িয়ে সবাই নেমে পড়ে।

সামনেই মাল-ওজনের অফিস। সমস্ত মাল কুলীরাই তুলাদণ্ডে চাপিয়ে দিলে—সের পিছু দু' টাকা ভাড়া। যত সের হবে তার ডবল টাকা গুনে দিয়ে আমরাও তাদের কাছে নিষ্কৃতি পাই। কুলীর দল যিনি আমাদের সরবরাহ করেছিলেন, তিনিও উপস্থিত। তাঁর সামনেই সব ওজন হয়ে দাঁড়াল প্রায় সাত মণ। পাঁচশ' বাট টাকা ভাড়া আর বকশিশ বাবদ চল্লিশ টাকা মোট ছ'শ টাকার ছ'খানা নোট গুনে মিটিয়ে দিল। সে যে শুধু আমাদের ওষুধ দিয়েই চাঙ্গা করত, তা' নয়, সব কিছুরই ভার ছিল তার ওপর। চিরকুমার সভার সভ্য হয়েও একটা পাকা সংসারীর মত চাল ডাল নুন তেলের খুঁটিনাটি খবর সে কী করে রাখে আর সব কিছুই ঠিক ঠিক বন্দোবস্ত করে যায়,—এইটেই আশ্চর্য!

একটা রিজার্ভ ভ্যানে আমরা সচল অচল মালপত্র উঠিয়ে কনখল যাত্রা করি। বাড়ীটা কোনখানে, তা' কেউ আমরা জানতাম না। খুঁজতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। মোটর-ভ্যান দাঁড় করিয়ে, আমি গুণু ও গণেশ পথে পথে টো টো করে ঘুরে বেড়াই—যাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই ভুল পথের সন্ধান দেয়, এড্‌ভোকেট ঠিকানা লিখবার সময় তাহা ভুল করেছিল, তাই এই দুরবস্থা!

পরিমলের যন্ত্রণা প্রবল—ওঁরা সব গাড়ীতেই বসেছিলেন। শেষটায় বাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল। ডেরাডাণ্ডা নামিয়ে ভেতরে যাই। বিদুষী নাতনী বুলবুল আমাদের দেখে আনন্দে অধীর সে কনখলেই তার মেজমামা-মামীর কাছেই আছে। আমরা সবাই একসঙ্গে কল্‌কাতা থেকে রওনা হয়ে ওদের হরিদ্বারেই ছেড়ে ওপরে চলে যাই। মাসখানেক বাস করবে বলে, ওরা কনখলে বাড়ী নিয়েছে।

পরিমলকে ধরাধরি করে নামিয়ে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। নীরেনও বুঝি সিম্‌প্যাথেটিক্ মাথাধরায় কাহিল—সেও বিছানায় গিয়ে তার অমূল্য মস্তকটি উপাধানে সযত্নে রক্ষা করে। ভৃত্য ঘোঁতা পাতিহাঁসের মত খুঁড়িয়ে ঘরের এক কোণে বসে পড়ে। গুণু তার মাকে পিল্, ইন্‌জেকশন্ প্রভৃতি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। আজ যেন সৈন্যের দল রণক্লান্ত হয়ে আপন শিবিরে ফিরে এসেছে।

আমাদের ভোজনের কোনও অসুবিধে না হয়, তাই বুলবুল ও তার মামীমা দু'জনেই কোমরে কাপড় বেঁধে রন্ধনশালায় চলে গেল।

সে দিনের দৃশ্য এখানেই শেষ।

(ক্রমশঃ)

॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ কয়েকটি ছেলেমানুষী প্রশ্ন ও তার জবাব ॥

রবীন্দ্রনাথের 'বিজ্ঞ' কবিতায় দাদা তার ছোট বোন সম্পর্কে মায়ের কাছে অভিযোগ করছে :

"খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠেছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুস।"

কবিতাটিতে খুকির ছেলেমানুষি সম্পর্কে আরো অনেক অভিযোগ আছে। সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ—সে আকাশের চাঁদ ধরতে চায় আর গণেশকে বলে গানুশ। স্পুৎনিক, লুনিক আর ভোস্তোকের যুগে এসে আকাশের চাঁদ ধরতে চাওয়াটা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে নাও হতে পারে। কিন্তু গণেশকে গানুশ বলাটা কিছুতেই সমর্থন করা চলে না। স্বীকার করতেই হয় যে, দাদাটি বিজ্ঞ ও খুকিটি ছেলেমানুষ।

আমরা অবশ্য গণেশকে গানুশ বলার বয়স অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি। ফানুস উড়তে দেখলে আমরা নিশ্চয়ই তারা উঠেছে ভাবব না। তবুও আমরা নিজেদের বিজ্ঞ ভাবতে পারি না। আজকের দিনে প্রত্যেকটি জ্ঞানের ক্ষেত্র এত সুবিস্তৃত ও এত জটিল যে বিজ্ঞ হওয়াটা যে সহজ নয় এইটুকু বোঝবার মতো বিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই হয়েছে।

কিন্তু এর ফল সবসময় যে খুব ভালো হয়েছে তা বলা চলে না। জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ে সহজ প্রশ্নের সহজ জবাবটুকু জেনে রাখতে ভুলে গিয়েছি। যেমন, যদি প্রশ্ন করা যায়—জলে কেন আগুন ধরে না? তাহলে নির্ভুল জবাব আমরা কতজন দিতে পারব এ বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে। যদি প্রশ্ন করা যায়—আগুনের শিখা কেন ওপরের দিকে ওঠে? —তারই বা জবাব কি? প্রশ্নগুলোকে এমনিতে ছেলেমানুষী মনে হতে পারে। কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে যদি ঢোঁক গিলতে হয় তাহলে স্বীকার করা ভালো যে কোনো কোনো ব্যাপারে আমরাও রবীন্দ্রনাথের কবিতার খুকির পর্যায়েই রয়ে গিয়েছি। অর্থাৎ চোখের দেখার গভীরে যেতে পারিনি।

আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে যে দুটি প্রশ্ন ইতিমধ্যেই কথা-প্রসঙ্গে উঠে পড়েছে তার জবাব দেবার ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাক।

জলে আগুন ধরে না কারণ পুরো-পুরি একটি দহনক্রিয়ারই ফল হচ্ছে জল। কাঠ বা কয়লা পুড়লে যেমন ছাই, তেমনি হাইড্রোজেন পুড়লে জল। যে কারণে ছাইয়ে আগুন ধরে না, সেই কারণেই জলেও আগুন ধরে না।

আগুনের শিখা কেন ওপরের দিকে ওঠে? আগুনের শিখা চারপাশের বাতাসকে উত্তপ্ত করে তোলে। সেই উত্তপ্ত বাতাস চারপাশ থেকে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। বাতাসের এই প্রবাহ আগুনের শিখাকেও ঊর্ধ্বমুখী করে।

আরেকটি প্রশ্ন : সূর্য কেন পূর্ব-দিকে ওঠে আর পশ্চিমদিকে অস্ত যায়? এ প্রশ্নের জবাব আশা করি আমাদের সকলেরই জানা। আমাদের এই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে যেমন পাক খাচ্ছে তেমনি নিজের অক্ষদণ্ডের চারদিকেও লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দরবেশী নাচের পাক। এই পাক-খাওয়াকে বলা হয় পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন বা আহ্নিক-আবর্তন। অক্ষ-আবর্তন পশ্চিম থেকে পূবে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একটি করে। ট্রেনের জানলায় বসে বাইরের দিকে তাকালে যেমন আমাদের মনে হয় যে গাছপালা মাঠঘাট পেছনদিকে ছুটে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি ঘূর্ণমান পৃথিবী থেকে সূর্যের দিকে তাকালেও আমাদের মনে হয় সূর্যটাই যেন উল্টো দিকে (অর্থাৎ পূব থেকে পশ্চিমে) পাক খাচ্ছে।

এসব জানা কথা। এত বেশী জানা যে এই লাইনগুলো পড়তে গিয়েও অনেকে হয়তো বিরক্ত হলেন। কিন্তু এবারে একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যার ঠিক-ঠিক জবাব দিতে পারার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাবে এই জানাটা কতদূর পর্যন্ত পাকা হয়েছে।

পূবে-পশ্চিমে বিস্তৃত দু-জোড়া লাইন। এক জোড়া লাইন দিয়ে একটি ট্রেন শুধু পূব থেকে পশ্চিমে যায় আর অন্য জোড়া লাইন দিয়ে সেই একই ট্রেন পশ্চিম থেকে পূবে ফিরে আসে। এবারে প্রশ্ন : কোন্ লাইন জোড়া আগে ক্ষয় হবে?

এ প্রশ্নের জবাব আপনারা ভাবতে থাকুন। ততোক্ষণে অন্য একটি প্রশ্নের ভূমিকা করা যাক।

পৃথিবীর এই আহ্নিক-গতির দরুণ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি বিন্দু একটি নির্দিষ্ট বেগে শূন্যে পাক খেয়ে চলেছে। আমরা জানি, বিষুবরেখার ভূপৃষ্ঠের পরিধি হচ্ছে প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল। অর্থাৎ বিষুবরেখার যে-কোন একটি বিন্দু পৃথিবীর আহ্নিক-গতির দরুণ প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিষুবরেখার প্রতিটি বিন্দুর আহ্নিক-গতির দরুণ বেগ ঘণ্টায় হাজার মাইল। বিষুবরেখা থেকে যতোই মেরু-বিন্দুর দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে ততোই ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি বিন্দুর বেগ কমবে।

এবারে কল্পনা করা যাক, একটি জেট-প্লেন পৃথিবীর বিষুব-অঞ্চলের আকাশ দিয়ে ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে পূব থেকে পশ্চিমে ছুটে দিয়েছে। একনাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ছুটে দেবার পরে প্লেনটি মাটিতে নেমে এল। এই প্লেনের পাইলটের কিন্তু অদ্ভুত একটি অভিজ্ঞতা হবে। তার হাতের ঘড়িতে যদিও চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়েছে কিন্তু আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে সে অনায়াসেই মনে করতে পারে যে দিনের যে বিশেষ সময়ে সে আকাশে উঠেছিল সেই বিশেষ সময়ই যেন তার কাছে এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কায়েম হয়ে থেকেছে; দিন গড়িয়ে রাত হয়নি বা রাত গড়িয়ে আবার দিন হয়নি। পাইলটের এই বিশেষ অভিজ্ঞতা কেন হবে তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই।

এবারে এডগার অ্যালান পো-র একটি গল্পকে আমি প্রশ্ন হিসেবে তুলে

ধরতে চাই। তিন নাবিক-বন্ধুর মধ্যে বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হয়েছে। একজন বরাবর বাড়িতেই ছিল। দ্বিতীয়জন পূব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীকে পুরো একটা পাক দিয়ে ফিরে এসেছে। তৃতীয় জনও পৃথিবীকে পুরো একটা পাক দিয়েছে—কিন্তু পশ্চিম থেকে পূবে। প্রথম জন বলছে, তাদের সাক্ষাৎকারের দিনটিই রবিবার। দ্বিতীয় জন বলছে, সাক্ষাৎকারের দিনটি শনিবার। তৃতীয়জন বলছে, সাক্ষাৎকারের দিনটি সোমবার। তিনজনের কথাই যদি ঠিক হয় তাহলে ধরে নিতে হয় যে সেই বিশেষ সপ্তাহে তিনটি রবিবার পড়েছিল। এখন প্রশ্ন ঃ হিসেবের গোলমালটা কোথায়?

এবারে আগের প্রশ্নের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। কোন লাইন জোড়া আগে ক্ষয় হবে? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, দুই জোড়া লাইনেরই সমান ক্ষয়, কারণ একই ট্রেন সমান সংখ্যক বার সমান বেগে যাতায়াত করছে। কিন্তু হিসেবটা নিশ্চয়ই এতটা সহজ নয়। তা যদি হত তাহলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হত না।

পৃথিবীর আহ্নিক-গতির প্রসঙ্গে প্রশ্নটা উঠেছে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায়?

মনে করা যাক ট্রেনের বেগ ঘন্টায় ষাট মাইল। এটি ট্রেনের নিজস্ব বেগ। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক-বেগও এই ট্রেনে সঞ্চারিত হচ্ছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে আহ্নিক-বেগ ঘন্টায় হাজার মাইল তাহলে ট্রেনের নিজস্ব বেগ ছাড়াও আহ্নিক-বেগের ব্যাপারটাকেও হিসেবে ধরতে হয়। ট্রেনের গতি যখন পশ্চিম থেকে পূবে তখন এই আহ্নিক-বেগটি ট্রেনের নিজস্ব বেগের সঙ্গে যুক্ত হয়। ট্রেনের গতি যখন পূব থেকে পশ্চিমে তখন কিন্তু একটি বেগ অপরটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। বেশি মাপের বেগ থেকে কম মাপের বেগ বিয়োগ করলে যা পাওয়া যায় তাই হয় সে ক্ষেত্রে ট্রেনের বেগ। যাঁদের কাছে এই হিসেব এখনো স্পষ্ট হয়নি তারা যে কোনো একটি পাটীগণিত খুলে আপেক্ষিক বেগের সূত্রটি দেখে নেবেন।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে ট্রেনটি যখন পশ্চিম থেকে পূবে যাচ্ছে তখন তার বেগ অনেক বেশি। আর ট্রেনটি যখন পূব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে তখন তার বেগ অনেক কম। এবারে পুরো ছবিটা একবার কল্পনা করুন। একটি গোলকের ওপরে একটি ছুটন্ত বস্তু কতখানি চাপ দিতে পারবে তা নির্ভর করে তার নিজস্ব বেগের ওজনের ওপরে তো বটেই, তার বেগের ওপরেও। বেগ যতো বেশি হবে ততোই তার চাপ কমবে। বেগ যতো কম হবে ততোই তার চাপ বাড়বে।

এত কথার পরে প্রশ্নের জবাবটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট করে বলে দেবার দরকার নেই। শুধু একটু জেনে রাখা দরকার যে যে-লাইনের ওপরে চাপ বেশি তার ক্ষয় বেশি, যে-লাইনের ওপরে চাপ কম তার ক্ষয় কম।

এবারে পরের প্রশ্ন। একই সপ্তাহের মধ্যে তিনটি রবিবার আসে কি করে?

মনে করা যাক, কলকাতায় এখন রাত বারোটা। অর্থাৎ ইংরেজী মতে নতুন একটি দিনের শুরু। কিন্তু কলকাতা থেকে পূর্বদিকের সমস্ত দেশে এই দিনটি কিন্তু আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আবার কলকাতা থেকে পশ্চিমদিকের সমস্ত দেশে দিনটি তখনো শুরু হয়নি। এবারে ভূপৃষ্ঠে কলকাতার ঠিক বিপরীত দিকে যে বিন্দুটি আছে সেটির কথা ভাবা যাক। কলকাতায় যদি রাত বারোটা হয় তাহলে বিপরীত দিকের এই বিন্দুটিতে নিশ্চয়ই দুপুর বারোটা। কিন্তু কোন্ দিনের দুপুর বারোটা? যদি কলকাতা থেকে পূব দিকে চোখ রাখতে রাখতে যাওয়া যায় তাহলে মনে হবে পরের দিনের দুপুর বারোটা। আর যদি পশ্চিম দিকে চোখ রাখতে রাখতে যাওয়া যায় তাহলে মনে হবে আগের দিনের দুপুর বারোটা।

এবারে পৃথিবীকে পুরো একটি পাক দেবার ব্যাপারটা ভাবা যেতে পারে। কলকাতা থেকে রওনা হয়ে একজন নাবিক যদি পূর্বদিক দিয়ে পৃথিবীকে পুরো একটা পাক দিয়ে আবার কলকাতাতেই ফিরে আসে এবং তার ফিরে আসার দিনটি যদি কলকাতার রবিবার হয় তাহলে তার কিন্তু ধারণা হবে দিনটি হচ্ছে সোমবার। আর যদি সে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে পৃথিবীকে পাক দিয়ে ফিরে আসত তাহলে তার মনে হত সে শনিবারে ফিরে এসেছে।

এডগার অ্যালান পো-র গল্পে একই সপ্তাহে তিনটি রবিবার কি-ভাবে এসে গিয়েছিল তা নিশ্চয়ই আর ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই।

কিন্তু পৃথিবীর মানুষের তারিখ-বারের হিসেবে এই এলোমেলো অবস্থাটা কিছুতেই বজায় রাখা চলে না। এই কারণেই আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখাটি কল্পনা করা হয়েছে। যাঁরা এখনো এই আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাঁরা অতি অবশ্যই একটি ভূগোলের বই খুলে এ-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকুন। নইলে বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় বোকা বনবার সম্ভাবনা তো আছেই, এমন কি এই লেখার পরবর্তী অংশও দুর্বোধ্য ঠেকবে।

এবারে পরের প্রশ্ন।

ফেব্রুয়ারি মাসে ক'টি শুক্রবার? সবচেয়ে কমই বা কত? আর সবচেয়ে বেশিই বা কত?

প্রশ্নের জবাব আমি সরাসরি লিখে যাচ্ছি। আমি ধরে নিচ্ছি, এই জবাব যাঁরা পড়ছেন তাঁদের সকলেরই আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে।

সাধারণ বুদ্ধি থেকে মনে হতে পারে, ফেব্রুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি শুক্রবার হতে পারে পাঁচটি, আর সবচেয়ে কম শুক্রবার হতে পারে চারটি। বছরটি যদি লীপ-ইয়ার হয় আর ফেব্রুয়ারি মাসের পয়লা তারিখটি যদি হয় শুক্রবার, তাহলে অবশ্যই সেই ফেব্রুয়ারি মাসে পাঁচটি শুক্রবার পড়বে। নইলে চারটি।

কিন্তু এমন ব্যবস্থাও করা সম্ভব যাতে একজন মানুষের দিনপঞ্জীতে গোটা ফেব্রুয়ারি মাসে শুক্রবারের সংখ্যা হতে পারে দশ কিংবা একটিও নয়।

কি ভাবে?

মনে করা যাক, লোকটি একটি জাহাজে চেপে প্রতি শুক্রবার সাইবেরিয়া থেকে আলাস্কা যাচ্ছে। যেহেতু সে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে, এবং আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখাটিকে শুক্রবার পার হচ্ছে, অতএব পরের দিনটিও তার কাছে শুক্রবারই হবে। অর্থাৎ একই সপ্তাহে দুটি শুক্রবার। আর বছরটি যদি লীপ-ইয়ার হয় আর ফেব্রুয়ারি মাসের পয়লা তারিখটি হয় শুক্রবার, তাহলে এই ফেব্রুয়ারি মাসে সে মোট দশটি শুক্রবার পেতে পারে।

কিন্তু সে যদি প্রতি বৃহস্পতিবার আলাস্কা থেকে সাইবেরিয়ায় রওনা হত? যেহেতু এবারে সে আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা পার হচ্ছে পূব থেকে পশ্চিমে এবং বৃহস্পতিবার, অতএব পরের দিনটি তার কাছে হবে শনিবার। অর্থাৎ শুক্রবারটি তার কাছে খোয়া গেল। এইভাবে গোটা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতিটি শুক্রবারই তার কাছে খোয়া যেতে পারে এবং মাসের দিনপঞ্জীর পৃষ্ঠা উলটিয়ে গেলে দেখা যাবে যে সারা মাসে একটিও শুক্রবার নেই।

এমনি ধরনের প্রশ্ন আরো অজস্র তোলা যেতে পারে। কিন্তু আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করা দরকার। তবে শেষ কথাটা এই যে, শক্ত কথার শক্ত জবাব দেওয়াটা সহজ কিন্তু সহজ কথায় সহজ জবাব দেওয়াটা খুবই শক্ত।

॥ কলারসিক ॥

শতবার্ষিকী শান্তি উৎসবে বিরাট রবীন্দ্র-মেলা

৩রা নভেম্বর, ১৯৬১ সাল। ঝির-ঝিরে শীতের হাওয়া সঙ্গে করে গোধূলীর ম্লান ছায়া নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। পার্ক সার্কাসের বিরাট ময়দান হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলো সেই গোধূলী লগ্নে, সানাইয়ের আকুল করা মিষ্টি সুরে। পার্ক সার্কাস ময়দানে আয়োজিত রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী শান্তি উৎসবে আগত হাজার হাজার মানুষ সেই সুরের টানে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সুসজ্জিত উন্মুক্ত মঞ্চের দিকে। দেখলো, সাজ্জাদ হোসেন ও তাঁর সম্প্রদায় মঞ্চের আলো-আঁধারে সুরের মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন। রচিত হয়েছে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ।

সন্ধ্যা হলো। থেমে গেল সানাইয়ের মিষ্টি সুর। মঞ্চের উপর একে একে উঠে এলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য ও বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার, ভাষাতত্ত্ববিদ, অধ্যাপক প্রভৃতি খ্যাতনামা সুধীজন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মঞ্চের উপর নিয়ে এলেন রবীন্দ্র-কন্যা মীরা দেবীকে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে ডঃ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতী মীরা দেবীকে অনুরোধ জানালেন উৎসব ও রবীন্দ্র-মেলা উদ্বোধন করতে। কবি-কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী শতবর্ষ পূর্তির প্রতীকস্বরূপ মঞ্চের উপর স্থাপিত শতদীপযুক্ত দীপ-বৃক্ষের শততম দীপটি প্রজ্জ্বলিত করে ঘোষণা করলেন : 'এই শান্তি উৎসব যদি বিশ্বের আতঙ্কিত নর-নারীর মনে অভয় এনে দিতে পারে, তবে জানবো, কবির শতবার্ষিক শান্তি উৎসবের এই আয়োজন সার্থক হয়েছে।'

এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর আবার ছড়িয়ে পড়লো মানুষ—শিশু-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী—কুড়ি একর পরিমিত উৎসব প্রাঙ্গণের সর্বত্র। এ-এক আশ্চর্য পরিবেশ। মেলার পরিবেশ। মেলা-মেশায় আনন্দ কে যেন মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিয়েছে এখানে। কেউ গান শুনছে, নাচ দেখছে, নাটক জমে উঠেছে কোথাও। গুচ্ছে গুচ্ছে মানুষ, যুবক-যুবতী ছিটকে ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। আর এরি পাশে সারি-বদ্ধভাবে মেলাঙ্গনকে বেষ্টন করে দুভাগে রচিত হয়েছে রবীন্দ্র-জীবনীর সঙ্গে সম্পর্কিত অজস্র দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রদর্শনী। রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি বাংলা মেলার সর্বত্রই যেন মিশে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা, শান্তি-মৈত্রী ও বিশ্ব-মানবতার অমর বাণী। এ মেলায় যেমন আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থিত, তেমনি আন্তর্জাতিক রূপও চমৎকার-ভাবে পরিস্ফুট।
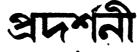
এই বিরাট মেলার পরিচয় একটি মাত্র নিবন্ধে দেওয়া অসম্ভব। এমন অনেকগুলি প্রদর্শনী-মণ্ডপ রয়েছে যার প্রত্যেকটিই পৃথকভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। সময় এবং সুযোগ হলে আমাদের সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা আছে। আজ পাঠকদের কাছে আমরা শুধু এই রবীন্দ্র-মেলার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

পার্কসার্কাস ময়দানে রবীন্দ্রশতবার্ষিক শান্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত "রবীন্দ্র-মেলার" উদ্বোধন করছেন রবীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী।

দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা মণ্ডপ, ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকেও এসেছে কারু-শিল্পের সম্ভার। চেকোস্লোভাকিয়া, গণতান্ত্রিক জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা, পোল্যাণ্ড, আরবলীগ, ইন্দোনেশিয়া, গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম, ঘানা প্রভৃতি বৈদেশিক রাষ্ট্র-সমূহও এই উৎসবে নিয়ে এসেছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠতম শিল্প-নিদর্শন। সংক্ষেপে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে-মেলাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, উৎসবের উদ্যোক্তারা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে এই মেলার আয়োজন করেছেন।

চল্লিশ ফুট উঁচু বিশাল সুসজ্জিত তোরণদ্বার দিয়ে মেলাঅঙ্গনে প্রবেশ করে আপনি দেখতে পাবেন একটি মনোরম ফোয়ারাকে কেন্দ্র করে উড়ছে আমাদের জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের পতাকা। এরি চারিপাশ ঘিরে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন প্রদর্শনীমণ্ডপ। এই মণ্ডপেই আলোক-চিত্রের সাহায্যে রবীন্দ্র-জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে দর্শকদের

সম্মুখে। একশ'খানি বিশাল আলোক-চিত্রে রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কর্ম-বহুল জীবনের নানা রূপ। অন্য ৩২খানি আলোকচিত্র তুলে ধরা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়। এতমধ্যে অনেকগুলি চিত্র এই সর্বপ্রথম দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করে উদ্যোক্তারা আমাদের প্রশংসাভাজন হলেন। নানা ব্যক্তি এবং জাতীয় সংরক্ষণশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত এই আলোক-চিত্রমালা নিঃসন্দেহে এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ বলে বিবেচিত হবে।

'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'—এই নামে অভিহিত বিভাগটি প্রখ্যাত আলোক-চিত্র শিল্পী শ্রীশম্ভু সাহার কৃতিত্বের পরিচয় সগৌরবে বহন করছে। শ্রীসাহা দীর্ঘকালব্যাপী রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি-নিকেতনের অজস্র কর্ম-কাণ্ডের নীরব দ্রষ্টা শুধু নন, আলোক-চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র তার পরিচয় পরিবেশন করার অন্যতম স্রষ্টাও বটে। তাঁর সারা-জীবনে সঞ্চিত প্রায় সমগ্র আলোক-চিত্র এই মেলায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আমরা তাঁকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

এই মেলায় রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডু-লিপি, চিঠি-পত্র, প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ, ১৪টি ভারতীয় ভাষায় ও ৩২টি বিদেশী ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর অজস্র নিদর্শনও স্থান পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্র-নাথ যে-সব পত্র-পত্রিকায় লিখেছিলেন তারও অনেকগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম্য পাঠাগার (বামুনাড়া হিরন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার) এই দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা অতি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছেন বলে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আমরা জানতে পেরেছি। 'হিরন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারে'র এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

বাংলা দেশের প্রখ্যাত শিল্পীরাও এই প্রদর্শনী উপলক্ষে রবীন্দ্র-জীবনীর নানা অধ্যায় নিয়ে রচনা করেছেন চারু-চিত্রের চমৎকার নিদর্শন। প্রখ্যাত শিল্পী রাম-কিঙ্কর, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরোদ মজুমদার, কেশব ভৌমিক, কমলা রায়-চৌধুরী, বিজন চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার প্রভৃতির তৈল-চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে শিল্প-রসিক দর্শকদের তৃপ্তি দেবে। 'রবীন্দ্র-মানসে নারী' এই বিভাগেও স্থান পেয়েছে অনেক মহিলা শিল্পীর চিত্র-নিদর্শন। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের বারো বৎসর বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্র-নাথের কবিতা ও গল্পকে ভিত্তি করে যে সব চিত্র রচনা করেছে তাও সত্যি চিত্তাকর্ষক। শিশুমনের কল্পনা রঙে আর রেখায় বেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে চিত্রগুলিতে।

রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-সব নিদর্শন বিদেশ থেকে এখানে প্রদর্শনের জন্য আনা হয়েছে তার মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার নিদর্শন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এমন নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে যদি অন্যান্য রাষ্ট্রও রবীন্দ্র-জীবনীর সঙ্গে সম্পর্কিত নিদর্শন এখানে উপস্থিত করতে পারতেন তবে সত্যি আমরা আরো খুশী হতাম। এ-দিক দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার নিদর্শনগুলিও দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

গণতান্ত্রিক জার্মান এই রবীন্দ্র-মেলায় তাঁদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী কথে কোলওইতজ-এর শিল্প-কর্মের এক মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। এই প্রদর্শনী অনিবার্যভাবে ভিন্ন আলোচনার দাবী রাখে। আমরা শুধু বলবো, শিল্পী কোলওইতজ-এর এচিং লিথোগ্রাফ, উডকাট ও ড্রয়িং-এর ৭২খানি প্রতি-লিপি থেকে যে আশ্চর্য প্রতিভাশালিনী শিল্পীর পরিচয়লাভ করলাম, এই মেলার পক্ষে তা গৌরবের।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই মেলায় এক বিরাট মণ্ডপে পশ্চিমবঙ্গের জন-জীবনের জ্ঞাতব্য তথ্য সহ বহু নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। আমরা তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

আসাম থেকে শ্রীমতী নীলিমা বড়ুয়া কারু-শিল্পের যে অপূর্ব নিদর্শন এনে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, এই প্রদর্শনীর তা অন্যতম সম্পদ। ভারত সরকারের হস্তশিল্প সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় শাখার কলিকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষও অনেকগুলি চমৎকার নিদর্শনে কারুশিল্পের সৌন্দর্যময় রূপ পরিস্ফুট করার চেষ্টা করছেন দেখে আমরা খুশি হয়েছি।

এই প্রদর্শনীর অন্য আর একটি সম্পদ অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স-এর শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ আয়োজিত বাদ্য-যন্ত্রের প্রদর্শনী। প্রায় একশত জন প্রাচীনতম ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীর তৈল-চিত্র, রাগ-রাগিণীর উপর ভিত্তি করে রচিত রাগিণীমালা-চিত্র এবং সর্বভারতের বাদ্যযন্ত্রের এই বিপুল নিদর্শন দেখে যে-কোনো দর্শক অভিভূত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমরা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষকে তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানাই।

এই কেন্দ্রীয় প্রদর্শনী মণ্ডপগুলি পেরিয়ে গেলে উৎসব প্রাঙ্গণের অন্যত্র চোখে পড়বে অন্যতর প্রদর্শনী মণ্ডপের সারি। এখানে সুদূর মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরালা, উড়িষ্যা, দিল্লী, পাঞ্জাব থেকে যেমন এসেছে নানা শিল্পসম্ভার, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্প ও লোকশিল্পের নিদর্শনও এসে ভীড় করেছে। শিল্পাধিকারের প্রদর্শনী মণ্ডপে কৃষ্ণনগরের শিল্পীর তৈরী রবীন্দ্র-জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় সম্বলিত মৃন্ময়মূর্তি, বাঁকুড়ার পাঁচ-মোড়ার বিখ্যাত পোড়ামাটির ঘোড়া, 'শিল্পশ্রীর' চর্মশিল্পের সুন্দর নিদর্শন প্রভৃতি অনায়াসে সবার মনকে খুশিতে ভরে তুলবে। আগামী ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যহ বেলা ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাকবে। আমরা এই প্রদর্শনী তথা রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব সমিতির কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করছি। বিশ্বের মানুষ জেনে থাক, রবীন্দ্রনাথের কলকাতা শুধু মিছিলের শহর নয়, শান্তি ও মৈত্রীর পরিবেশে শিল্পেরও শহর।

প্রতিবেশী সাহিত্য

(ওড়িয়া গল্প)

॥ ভূমিকা ॥

চৈতন্যদেবের প্রভাবে ওড়িয়া সাহিত্যের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আধুনিক ওড়িয়া কবিতার উদ্গাতা রাধানাথ রায়। ইনি বাঙালী, উড়িষ্যায় থাকতেন। রাধানাথ রায়ের 'ইতালীয় যুবা' গল্পটি ওড়িয়া ছোটগল্পের প্রথম নিদর্শন। প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক ফকিরমোহনের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। ঐতিহাসিক নাটক-রচয়িতা অশ্বিনীকুমার ঘোষের নাটকাবলীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পড়েছে। বাংলা 'সবুজপত্রের' অনুকরণে উড়িষ্যায় গড়ে উঠেছে 'সবুজ সাহিত্য সমিতি'। বিশেষ করে কাব্যে পুরাতন মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা বাতিল করেই ক্ষান্তি দেয়নি, নতুন আঙ্গিক, কথাবস্তু এবং রচনাশৈলীরও আমদানি করেছে এই সমিতি। ওড়িয়া সাহিত্যে এই ভাঙাগড়ার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন অন্নদাশংকর রায়। বাংলার আগে অন্নদাশংকর ওড়িয়াতেই কবি ও অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

......ওড়িয়া ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে গোদাবরীশ মহাপাত্র, গোপীনাথ মহান্তি, নিত্যানন্দ মহাপাত্র, কানুচরণ মহান্তি, বামাচরণ মিত্র, অনন্তপ্রসাদ পান্ডা, উপেন্দ্রকিশোর দাস, ব্রহ্মানন্দ পান্ডা, বৈষ্ণবচরণ দাস, রাজকিশোর রায়, গোবিন্দচন্দ্র ত্রিপাঠী, গোদাবরীশ মিশ্র, সুরেন্দ্রনাথ মহান্তি, মহাপাত্র নীলমণি শাহু, রাজকিশোর পট্টনায়ক, বসন্তকুমারী পট্টনায়ক, উৎকল-ভারতী, উদয়নাথ ষড়ঙ্গী, কমলাকান্ত দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গোদাবরীশ মহাপাত্র ও অনন্তপ্রসাদ পান্ডার গল্পে সামাজিক দুঃখদুর্দশা, নিত্যানন্দ মহাপাত্রের গল্পে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ব্রহ্মানন্দ পান্ডার গল্পে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। হাস্যরসাত্মক গল্প পরিবেশনে মহাপাত্র নীলমণি শাহু ও বামাচরণ মিত্রের প্রয়াস প্রশংসনীয়। উৎকল-ভারতী ওড়িয়া লেখিকাদের মধ্যে অদ্বিতীয়। গল্প বলার ভঙ্গীটিও ভাল। ঘরোয়া ঘটনা পরিবেশনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিন।

—অনুবাদক)

নদী ও সমুদ্র

রচনা—উৎকল-ভারতী

অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্

পাষাণে যে রস থাকে তা মানুষের পক্ষে কল্পনা করা অত্যন্ত কষ্টকর। জড়পদার্থকে তাই অনেকে বলে নীরস পদার্থ। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক একটা পাষাণের টুকরো দেখতে পাই যা নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছে একটি গাছকে। সে-গাছে ফুল ফুটছে, ফল হচ্ছে। প্রকৃতির এ-এক চিরন্তন সত্য।

বিয়ের পর আমাকে এ-বাড়িতে আসতে হল। প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে দেখার জন্য কত লোক এসেছে। নতুন বউকে দেখার জন্য ওদের আগ্রহটাও নতুন। হয়তো দু'একবার আমি হেসেছি, হয়তো কথাও বলেছি হেসে হেসে কিন্তু মন আমার বিক্ষুব্ধ। ওসবের কোন প্রতিক্রিয়া আমার মনে হয়নি। আমার মন যেন পাথর বনে গেছে। পাহাড়ের মতই আমি গাছের জন্য হৃদয়ে অমৃত সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। আমার নিজের এখন দরকার নেই কোন গরলের কোন অমৃতের। ইচ্ছাপূরণ আমার হল না। আর আজ এমন কাউকে এখানে পাচ্ছি না যার কাছে মনের কথা, প্রাণের কথা খুলে বলবো।

বিয়ের অনেকদিন আগে আমার হৃদয়ে আসন পেতে রেখেছিলাম অন্য এক যুবকের জন্য। বিয়ের পর আমার শরীরের মালিক হলেন উনি কিন্তু মনের মালিক যে ছিল সে-ই রইল। মন আমি যাকে দিয়েছি তার সম্পর্কে ও'র কাছে একটি কথাও সে-সম্পর্কে বলিনি। সব-সময় একটা ভয় থাকে এই বুঝি কথাটা বেরিয়ে গেল।

মাত্র বছর পাঁচেক আগের কথা। আমার বয়স ষোল। গ্রামের এক যুবককে আমার ভাল লেগেছিল। আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। দিনে শুধু তাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য নানান বায়না ধরে কলস কাঁখে নদীর তীরে চলে যেতাম। নদীর তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে অদূরে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেও সন্ধ্যার সময় গাড়ি থেকে নেবে আমার সঙ্গে দেখা করত। সেই বালিয়াড়ির ওপর প্রত্যেকদিন কিছুক্ষণ বসে গল্প করতাম।

বছর খানেক পরেই তার চাল-চলন কেমন যেন বদলে গেল। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতাম ওর চোখে ফুটে উঠেছে আমার প্রতি একটা বিরক্তির ভাব।

সেদিনও আমি সোনাঝরা সন্ধ্যায় বালি-চিক্-চিক্ তীরভূমিতে দাঁড়িয়েছিলাম তার পথ চেয়ে। সেদিন সে গাড়ি থেকে নাবল কিন্তু আশ্চর্য আমার দিকে একটিবারও না-তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে হন-হন করে চলে গেল। ভেবেছিলাম হয়তো কোন ব্যাপারে সে রাগ করেছে আমার ওপর। তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম। কিন্তু সে আমার দিকে ঘুরেও তাকাল না। মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার এই নোংরা শাড়ী আর গেঁয়ো ব্যবহার আমার কাছে অসহ্য—আমাকে আর বিরক্ত কর না।

জ্বলন্ত লোহশলাকা যেন আমার বুকে সে বিঁধে দিল। সেখান থেকে ঘরে কিভাবে ফিরেছি টের পাইনি। কখন যে আমার হাত থেকে কলসীটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। সেই কলসীর সঙ্গে আমার ভাগ্যও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। তিনদিন আমি খাইনি, ঐ তিনদিন শতচেষ্টা করেও দরজা খোলানো যায়নি আমাকে দিয়ে।

আমার বাবা-মাও যেন এই ধরনের একটি ঘটনার অপেক্ষায় ছিল। তার কয়েকদিন পরেই শুনতে পেলাম সে বিয়ে করেছে। তারপর আমার বিয়ে হল এমন একজনের সঙ্গে যাকে আমি চিনি না, জানি না।

সেদিন আমার পরনে ছিল নোংরা শাড়ী। আমি ছিলাম গেঁয়ো মেয়ে। আর আজ আমি শহুরে। আমার চাল-চলনে

ষোলআনা শহুরে ভাব। আজ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি আমার কোন্ ত্রুটির জন্য তাকে আমি হারিয়েছি। পুরুষমানুষ একটু চকচকে জিনিস চায়।

ভাগ্যক্রমে এমন একজনের হাতে পড়লাম যিনি আজ পর্যন্ত কোন ব্যাপারে আমাকে দোষী করেননি। সুন্দর বিনম্র স্বাস্থ্য তাঁর। আমাকে সব রকমের স্বাধীনতাই তিনি দিয়েছেন। কোন অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য উনি সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আমার জীবনের ঐ মন দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্ন না থাকলে আমি ওকে পেয়ে নিশ্চয়ই খুশী হতে পারতাম। উনি যত নিবিড়ভাবে আমাকে ভালবাসেন মন আমার তত বেশী বিদীর্ণ হয়। এ-এক অসহ্য যন্ত্রণা, যাকে মনেপ্রাণে ভালবাসতে পারি না তার সংগে ভালবাসার অভিনয় করতে হচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্যও তো আমি, যাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি বহু বছর আগে, তাকে যে ভুলতে পারি না। আজও তো আমার স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারি না সেই নদীতীর, বালিয়াড়ি আর কত কথা......

দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টা শুনে চিন্তায় ছেদ পড়ল। এখন উঠতে হবে। ওঁর আপিস থেকে ফেরার সময় হয়েছে। বিয়ের পর ইচ্ছে করেই আমি আর বাপের-বাড়ি যাইনি। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ঐ গ্রামের সংগে আর কোন সম্পর্ক রাখবো না। স্মৃতিদাহ অসহ্য। কিন্তু সেদিন উনি আপিস থেকে ফিরে জানালেন যে, ওঁকে আপিসের বিশেষ কোন জরুরী কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে দিন কয়েকের জন্য। সে-ক'দিন আমি যেন বাপের-বাড়িতে থাকি। বাপের-বাড়িতে এলাম। যা এতদিন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি তা আর পারা যাচ্ছে না। যন্ত্রচালিতের মত সেই নদীতীরের প্রবল আকর্ষণে আমি গেলাম সেখানে। একা আমি বসে আছি সেই বালিয়াড়ির ওপর। মাঝে মাঝে দু-একটি ছোট পাথরের টুকরো নদীর জলে ছুড়ে ছুড়ে ফেলছি। ছোট ছোট ঢেউ উঠছে আর মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে উঠে নিজের অজান্তেই আমি চলে গেলাম তার বাড়িতে। আমার সেই মনের-মানুষের কাছে। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ভালো আছেন? বউ কেমন আছে?......মনের মত বউ পেয়েছেন তো?

প্রথম প্রশ্নেই সে চমকে উঠল। আমাকে দেখার সংগে সংগে তার দুর্বল রোগা শরীরটা যেন কালো হয়ে গেল। কে যেন তার গায়ে অনেকখানি কালি ঢেলে দিয়েছে। করুণ একটা হাসি হেসে সে বলল, দয়া করে আমার কাছে এসো না, দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলো। এক মারাত্মক রোগে ভুগছি।

অবিশ্বাসের দৃষ্টি হেনে বললাম, এমন কী রোগে ভুগছেন যা আমি টের পাচ্ছি না?

প্রত্যুত্তরে নিজের জামার বোতামগুলো খুলে বুকটা দেখাল। চমকে উঠলাম। ইস্ এত রোগা হয়েছে! পাঁজরাগুলো গোনা যাচ্ছে। বুকে আমার খাঁ-খাঁ করে উঠলো। পরক্ষণে সে ধীরে ধীরে বলল, বউ এখানে নেই, বাপের বাড়ি গেছে। যেরোগে ভুগছি স্বয়ং ভগবানও এসময় আমার কাছে ঘেঁষতে সাহস করবেন না। তারপর সে উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা হাঁটতে-হাঁটতে ইতিমধ্যে সেই নদীতীরে পৌঁছে গেলাম। চঞ্চল শিশুর মতই নদীর জল কোথেকে যেন এসে কোথায় চলে যাচ্ছে।

গোধূলি বেলা। পশ্চিম আকাশকে রাঙিয়ে দিয়েছে সূর্য। জলে তার প্রতিচ্ছবি পড়েছে। এর পরেই অন্ধকার নেবে আসবে। 'যাই' বলে উঠে পড়লাম। সে বলল, তুমি কি এখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারলে না? জীবনের শেষ মুহূর্তেও কি আমি নিজের অপরাধের শাস্তি পাব না।

গুমরে উঠল মন আমার। ওর মুখ চেপে ধরে বললাম, ওকথা বলনা, তবে একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। কথা দাও।

—দিচ্ছি।

—তুমি তো জানো, আমি আজ আর তোমার নই। তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করার যোগ্যতা আর আমার নেই। তাই বলছি দূর থেকে তোমাকে যদি কোন সাহায্য করতে পারি, তুমি তা ফিরিয়ে দিও না যেন।

সে কোন কথা বলল না। তার চোখেমুখে একটা অসহ্য যন্ত্রণার কান্না ফুটে উঠল। আমি ফিরে এলাম।

ওঁর কাছে ফিরে এসে সব ঘটনা খুলে বলে দিলাম। মনে মনে আশংকা ছিল আমার এ-ভালবাসার কাহিনী শোনার পর ওঁর মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে। আশ্চর্য, হল তার বিপরীত। আমার চেয়েও ওঁর সহানুভূতি বেড়ে গেল অনেকগুণে। নিজে উদ্যোগী হয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন। জলের মত টাকা খরচ করলেন।

আজ সে সেরে উঠেছে। নতুন জীবন শুরু করেছে।

আজ আমার বুক থেকে সব ভার যেন নেবে গেছে। এতদিন ভালবাসার একটা কাঁটা যেন আমার বুকের ভিতর বিঁধেছিল। প্রতিটি মুহূর্তে সে-কাঁটা যেন নড়েচড়ে উঠতো আর রক্ত ঝরতো। আমারও যেন নতুন জীবন শুরু হল এখন।

আজ হিসেব করতে বসেছি অতীত ঘটনার। তুলনা করছি ওর সংগে আমার স্বামীকে। যার পায়ে নিজেকে নিবেদন করার মনেপ্রাণে চেষ্টা করেও তাকে পেলাম না, তার মন কাড়তে পারলাম না। তার কাছে আমি গেঁয়ো-মেয়ে। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে যাঁকে বিয়ে করলাম তিনি আমাকে রাজরাণীর মত তুলে নিলেন—সম্মান দিলেন। আমার অতীত যেন নদীকে ভালবাসতো নিবিড়ভাবে। আর আজ ভালবাসছি সুবিশাল সুগভীর সমুদ্রকে।

শব্দকল্পদ্রুম

উত্তরপত্র

মধুসূদন দত্তের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'কালিদাস' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৈতালির 'মেঘদূত'। ছত্রগুলি এইভাবে সাজালেই কবিতা দুটির সম্পূর্ণরূপ পাওয়া যাবে :

কালিদাস		মেঘদূত	
ছত্রসংখ্যা	১১	ছত্রসংখ্যা	১৮
,,	১৯	,,	২১
,,	১২	,,	৬
,,	২০	,,	২৬
,,	১৫	,,	২৫
,,	১৬	,,	২২
,,	২৩	,,	১৭
,,	২৪	,,	১৪
,,	২৭	,,	১৩
,,	২৮	,,	১০
,,	৭	,,	১
,,	৮	,,	৪
,,	২	,,	৫
,,	৩	,,	৯

দেশে বিদেশে

॥ বিদেশী ॥

ভারতবর্ষে বিদেশীর সংখ্যা কত— ১৯৬০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি তার একটা হিসেব পাওয়া গেছে। ১৯৬১ সালের ৩১শে অক্টোবর অবধি কত তা জানা যায়নি। এই মাস দশেক আগের হিসেবে দেখা যাচ্ছে ভারতে বিদেশীর সংখ্যা হচ্ছে ৬০,৮১২। এই হিসেবের মধ্যে যাদের বয়স ১৬ বছরের কম, কমনওয়েলথ দেশসমূহের নাগরিক এবং কূটনৈতিকদের ধরা হয়নি। কমনওয়েলথের মধ্যে আছে পাকিস্থান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, (দক্ষিণ আফ্রিকা এখন নেই)। এদের সংখ্যা ধরলে বিদেশী সংখ্যা নিতান্ত কম হতনা; এক পাকিস্থানীদের সংখ্যাই হবে অনেক। দেখা যাচ্ছে বিদেশীদের মধ্যে ধরা হয়েছে চীনা, তিব্বতী, ইরাণী, আফগান, আমেরিকান, জার্মাণ, রুশিয়ান, ফরাসী, ইতালীয়ান, লিবানিজ; এদের সংখ্যা যথাক্রমে ১১,৩০৭; ১২,২০১; ৫০২৯; ৪৪৩৯; ৩,৭৬৬; ৩,২৯২; ২,২৯৫; ১,০৮৬; ১,২০৫; ১৩। বর্মীদের সংখ্যা ১,৬৭০।

এই বিদেশীদের এক তৃতীয়াংশ পশ্চিম বাংলায়; মহারাষ্ট্রে ১৫,৫০০; দিল্লীতে ৩,১১০; বিহারে ৩,২২৩; হিমাচল প্রদেশে ২,৩৯৬; মধ্যপ্রদেশে ২,২৪৪; আসামে ১,৯৪২; আন্দামানে ,১০৩৫।

॥ ফুলশ্রী ॥

পৃথিবীর সবচাইতে বড় ফুলটি ফুটছে। এ ফুল ফুটবে বোগোরে। বোগোর পশ্চিম জাভায়। ইন্দোনেশীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা সন্তান-প্রত্যাশী পিতার মতো অপেক্ষা করছেন। এ ফুল বিরল এবং এর নামও সামান্য নয়— "এমোরফো ফ্যালাস টিটেনাম"--১৯৫৬ সালে এবং ১৯৫৯ সালে ফুটেছিল— এবার যেটি প্রস্ফুটিত হচ্ছে তা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে হবে ৫ ফুট আর দুই ফুট। ফুলের মতো ফুল বাটনহোলে লাগাবার মতো নয়, কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে যাবার মতো। ফুলশ্রেষ্ঠ; তাই ফুলশ্রী এই হোক ওর বাংলা নাম।

॥ বিজ্ঞান ॥

১৯৬১ সালের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পাবেন কালিফোর্ণিয়ার স্ট্যাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট হফস্টাড্টার ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রুডলফ মোয়েসবার। এ'রা দু'জন যুক্তভাবে পুরস্কারটি পাবেন বলে ২রা নবেম্বর ঘোষণা করা হয়। পরমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁদেরকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। হফস্টাডটারের গবেষণা শান্তির কাজে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব ক'রে তুলেছে। মোয়েসবার গামা রশ্মির বিকীরণ সম্পর্কে যে নতুন তথ্যাবিষ্কার করেছেন, মহাকাশ পরিক্রমার পক্ষে তা খুবই সহায়ক হবে। রসায়নশাস্ত্রে পুরস্কার পাচ্ছেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ ক্যালভিন। তরুলতা কিভাবে কার্বন ডায়োকসাইড গ্যাস আহরণ করে তিনি সেই সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেছেন।

॥ কুকুর ॥

দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, দিল্লীর কেনেল ক্লাব স্থির করেছেন যে, অন্ধদের পথচলায় সহায়তা করতে পারে, তারা কুকুরকে সেইভাবে শিক্ষা দেবেন। এই বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য তাঁরা একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারতের এমন প্রচেষ্টা এই প্রথম।

॥ কঙ্গো ॥

কঙ্গোলীজ সেনাপ্রধান জেনারেল জোসেফ মোবুটু ২রা নবেম্বর ঘোষণা করেছেন যে, কাটাঙ্গী বিমান বোমাবর্ষণ করার পর কঙ্গোর সেনাবাহিনী কাটাঙ্গায় অভিযান সুরু করেছে এবং ইতিমধ্যেই সীমানা অতিক্রম করে কাটাঙ্গার ৩০ মাইল ভেতরে এসে পড়েছে। কাটাঙ্গাবাসীরা তাদের প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করছে। এই অভিযান হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বরাবর। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, তাঁদের সেনাবাহিনীর সৈনাপত্য করছেন আফ্রিকান অফিসাররা। দুদিনজন ইউরোপীয়ান টেকনিসিয়ান আছেন। "যদি সারা আফ্রিকায় কোনো খাঁটি আফ্রিকান সেনাবাহিনী থাকে তো সে আমার"— জেনাঃ মোবুটু একথাও বলেছেন।

॥ সৈনিক ॥

নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, প্রতিরক্ষা দপ্তর জানিয়েছেন, আগামী জানুয়ারী থেকে (অর্থাৎ ১৯৬২ সাল থেকে) পশ্চিম বাংলায় একটি নতুন সৈনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। এজন্য যদ্দিন না পাওত পাহাড়ে স্থায়ী বাড়ী হচ্ছে তদ্দিন বিদ্যালয়টি থাকবে পুরুলিয়ায়।

॥ দুধ ॥

লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ, ২০০ "গোয়ালা" সোভিয়েট দূতাবাস অভিমুখে অভিযান করে; অস্ত্রের মধ্যে তাদের হাতে ছিল একটি ক'রে দুধের বোতল। বোতলের লেবেলে লেখা ছিল— "বিপজ্জনক— তেজস্ক্রিয়-স্পৃষ্ট"। কিন্তু একজন ছাড়া কেউই সোভিয়েট দূতাবাসের দোর অবধি যেতে পারেনি। ১০০ পুলিশ এক কড়া বেষ্টনী রচনা করেছিল; তারই ফাঁক দিয়ে একজন কখন গলে পড়ে সোভিয়েট দূতাবাস অবধি যায়, দরজায় কড়া নাড়ে, দরজাও খোলে। "গোয়ালা" বলে, একটি পার্শেল আছে। দূতাবাসের অফিসারটি বলেন— না, না, না। তারপরই দরজা বন্ধ ক'রে দেন। কিন্তু "গোয়ালা" বোতলটি দোরগোড়ায় রেখে আসে। দূতাবাসের গেটের বাইরে ফুটপাথে আরও এমন তিনটি বোতল পড়ে ছিল।

"গোয়ালারা" সবাই ছাত্র।

॥ সাপ ॥

হাজার হাজার লোক দেখেছে। সংবাদটি আলিপুর দুয়ারের। ভোলাভাবরি কলোনীর দুর্গামূর্তির হাতে একটি কৃত্রিম সাপের পাশে একটি অকৃত্রিম সাপ। দিব্যি জড়িয়ে আছে। দেখে তো কর্মকর্তাদের চক্ষু স্থির। অনেক বাঁশ, অনেক খোঁচা, অনেক হৈ হৈ, উহুঁ, তিনি নড়বেন না। নড়েনওনি। বিসর্জনের নাচ-ফাচ মাথায় উঠল, কোনোরকমে ওকে সুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে তবে স্বস্তি। একেবারে জাগ্রত গোক্ষুর।

॥ ইঁদুর ॥

করিমগঞ্জের এক খবরে প্রকাশ, সেখান থেকে আট মাইল দূরে এক গ্রামে ইঁদুর বাহিনী মানুষকে পাল্টা আক্রমণ করছে।

ধানক্ষেতে বড় বড় ইঁদুর এবং দলবদ্ধ ইঁদুর হানা দিয়ে উপদ্রব করছে দেখে চাষীরা তো ছুটে গেল ওদের তাড়াতে। ইঁদুর তাড়া খেলেই পালাবে, এই ধারণা। কিন্তু ওরা যে রীতিমত রণনীতি শিখে এসেছে কে জানে? সুতরাং, ওদের আকস্মিক সঙ্ঘবদ্ধ বিৎসক্রিগে মানুষেরাই পলায়ন সুরু করল। জয় ইঁদুর বাহিনীর জয়।

ভীতিসন্ত্রস্ত মানবকুল, তখন কৃষিবিভাগের শরণাপন্ন হ'ল; ও'রা তখন কৃষিবিভাগের হাতে পরমাণবিক বিষ দিয়ে ও'দের লোক পাঠালেন। ফল জানা যায়নি।

এখন গবেষণা হ'চ্ছে, ইঁদুরেরা এল কোত্থেকে? কেউ বলছেন মিজো পাহাড় অঞ্চলে তাড়া খেয়ে ওরা এদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

॥ ঘরে ॥

২৬শে অক্টোবর—৯ই কার্তিক: 'কলিকাতার আকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বৃদ্ধি'—বিভিন্ন বিজ্ঞানী মহলের অভিমত —ভারতে বৎসরে দশ হাজার শিশু তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের নূতন বেতনক্রম শীঘ্রই ঘোষণা —রাজ্যসরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা।

২৭শে অক্টোবর—১০ই কার্তিক: পণ্ডিচেরী ও কারিকল ও মাহে মিউ-নিসিপ্যাল নির্বাচনে কংগ্রেসের নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ—কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত পিপলস ফ্রন্টের শোচনীয় পরাজয়।

পশ্চিম তিব্বতে তীব্র খাদ্যসংকট ও অর্থনৈতিক দুর্গতির সংবাদ—বিপুল সংখ্যক তিব্বতীর বাস্তুত্যাগ ও ভারত প্রবেশের সংকল্প—তিব্বতের স্থানে স্থানে চীনা সৈন্য ও খাম্পাদের খণ্ডযুদ্ধ অব্যাহত।

২৮শে অক্টোবর—১১ই কার্তিক: 'আগামী নির্বাচনে (সাধারণ) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস অধিকতর সাফল্য অর্জন করিবে' —পুরুলিয়ায় তিন দিবসব্যাপী কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর উদ্বোধনী ভাষণ—কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় আসীন হইলে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে বলিয়া সতর্কবাণী।

গোয়ায় পাল্টা সরকার গঠনের জন্য মুক্তি সংগ্রামীদের সিদ্ধান্ত—গোয়া-দমন-দিউ জাতীয় অভিযান কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির ঘোষণা—গোয়ার মুক্তি অর্জনের প্রয়োজনে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ।

নয়াদিল্লীতে ভারত ও সিংহলের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত।

'বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আদর্শচ্যুত হইলে সরকারী হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী' —দিল্লীতে উপাচার্য সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে. এল্. শ্রীমালীর হুঁসিয়ারী।

নয়াদিল্লীতে বার্ষিক রাজ্যপাল সম্মেলনে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণের উদ্বোধনী ভাষণে দাবী—'শিক্ষা ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টান্ত দ্বারাই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর'।

২৯শে অক্টোবর—১২ই কার্তিক: উত্তর রেলপথে ভয়াবহ ট্রেণ দুর্ঘটনা—টুণ্ডুলা-ফারাক্কাবাদ প্যাসেঞ্জার লাইনচ্যুত হওয়ায় ২০ জন (ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান-সহ) নিহত ও ৬১ জন যাত্রী আহত।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার ভাবগত ঐক্যের আহ্বান—পুরুলিয়ায় কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বক্তৃতা—শ্রীঅতুল্য ঘোষ পুনরায় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

পাঠ্য-পুস্তক রচনার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় সংস্থার উপর অর্পণের প্রস্তাব—উপাচার্য সম্মেলনে শ্রীনেহরুর বক্তৃতা।

৩০শে অক্টোবর—১৩ই কার্তিক: পশ্চিমবঙ্গ সমেত ৪টি রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা ও অন্যান্য রাজ্যে আন্দোলনের অগ্রগতি—দিল্লীতে রাজ্য সমবায় মন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীনেহরুর উদ্বোধনী ভাষণ।

'কারিগরী শিক্ষা ব্যতীত দেশের উন্নয়ন বা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়'—কাশীপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষণ পরিকল্পনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডাঃ রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) মন্তব্য।

৩১শে অক্টোবর—১৪ই কার্তিক: 'শুধু আকাশ বাতাসই নহে, মানব-সমাজের হৃদয়ও বিষায়িত হইয়াছে'—সোভিয়েট ইউনিয়নের মেগাটনী বোমা পরীক্ষা সম্পর্কে শ্রীনেহরুর উদ্বেগপূর্ণ মন্তব্য।

শিখেদের বিরুদ্ধে বৈষম্যাচরণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত ব্যবস্থা—ভারত সরকার কর্তৃক শ্রীএস্ আর দাশকে (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) চেয়ারম্যান করিয়া তিনজন সদস্য সমন্বিত কমিশন গঠন।

১লা নভেম্বর—১৫ই কার্তিক: 'যুদ্ধায়োজনে সমাধান নাই, নূতন সমস্যারই শুধু উদ্ভব ঘটে—ভারত প্রবর্তিত সহ-অবস্থান নীতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ'—'রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার'-এর নবনির্মিত ভবনে (কলিকাতা) প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উদ্বোধনী ভাষণ। সভাপতি ডাঃ রাধা-কৃষ্ণাণের (উপরাষ্ট্রপতি) মন্তব্য: আদর্শ বিনিময়ের দ্বারাই সারা বিশ্বে এক সমাজ গঠন সম্ভব।

॥ বাইরে ॥

২৬শে অক্টোবর—৯ই কার্তিক: পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা বন্ধের আবেদন ক্রুশ্চেভ (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক নাকচ—মস্কো টেলিভিশনে পরীক্ষা পুনরারম্ভের কারণ বিশ্লেষণ।

২৭শে অক্টোবর—১০ই কার্তিক: ৫০-মেগাটনী পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধের জন্য রাশিয়ার নিকট আবেদন—রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত।

সোভিয়েট ও মার্কিণ ট্যাঙ্ক বহরের বার্লিন সীমান্ত ত্যাগ—স্নায়ুযুদ্ধে কামানসহ ১৬ ঘন্টা মুখোমুখি অবস্থানের পর উভয় পক্ষেরই অপসারণ।

২৮শে অক্টোবর—১১ই কার্তিক: 'পার্টি বিরোধী গোষ্ঠী মলোটভকে (প্রাক্তন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ক্ষমতায় বসাইতে চাহিয়াছিল'—মস্কো-এ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—ভরোশিলভের (পার্টি-বিরোধী কার্যের অভিযোগে অভিযুক্ত সোভিয়েট নেতা) প্রতি করুণা প্রদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ।

২৯শে অক্টোবর—১২ই কার্তিক: রাশিয়ার ৩০-মেগাটন অপেক্ষা বৃহত্তর আণবিক বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ—ফরাসী পরমাণু শক্তি কমিশনের ঘোষণা।

৩০শে অক্টোবর—১৩ই কার্তিক: অবশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নের ৫০-মেগাটনী বোমা বিস্ফোরণ—সুমেরু অঞ্চলে মনুষ্যকৃত সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন নূতন মারণাস্ত্র পরীক্ষা—বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যুগপৎ গভীর উদ্বেগের সঞ্চার।

মস্কোর সমাধিসৌধ হইতে ষ্ট্যালিনের মৃতদেহ অপসারণের সিদ্ধান্ত —সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের সর্বসম্মত প্রস্তাব।

করাচীতে দুই দিবসব্যাপী কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের সম্মেলন আরম্ভ।

৩১শে অক্টোবর—১৪ই কার্তিক: সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বোচ্চ সভাপতিমণ্ডলী হইতে ৪ জন পুরাতন সদস্যের বিদায়—পার্টি প্রধান পদে নিকিতা ক্রুশ্চেভ পুনরায় নির্বাচিত।

বৃটেনের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করিতে আইন প্রণয়ন—পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণে রাণী এলিজাবেথের আভাষ দান।

১লা নভেম্বর—১৫ই কার্তিক: রাশিয়ার অতি বোমা বিস্ফোরণ জনিত তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে অগ্রগতি—আলাস্কার পশ্চিম পার্শ্বে শীঘ্র উপনীত হওয়ার আশঙ্কা।

'রাশিয়াকে জাতিগোষ্ঠী হইতে এক-ঘরে করার দাবী'—মেগাটনী বোমা পরীক্ষার দরুণ রাজাজীর ক্ষোভ প্রকাশ।

।। অশ্লীল বই ।।

সাহিত্যে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা বিচার সমস্যা বহু পুরনো। আজও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। এক দেশের চোখে যা অশ্লীল বলে মনে হয় অপর দেশে তা নাও হতে পারে। কারণ বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। বর্তমানকালে অশ্লীলতা বিচার করা হচ্ছে বিশেষত একটি তথ্যের ওপর নির্ভর করে। যে বই পাঠের ফলে পাঠকের নৈতিক জীবনের ওপর গুরুতর আঘাত সৃষ্টি করে, এমন কি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসে, সে সমস্ত বই নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে "লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার" বইটির ওপর নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কীয় রায় বেরিয়েছে।

বর্তমানে ভারত সরকার অশ্লীল বই আমদানি বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্য। তাঁরা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি কোন বইগুলি অশ্লীল এবং প্রচার নিষিদ্ধ করা হবে, কোন বইটি অশ্লীল, কোনটি নয়? এভাবে বিচার করাও একটি সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকার কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন। তাঁরা কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষকে অশ্লীল বইগুলির তালিকা দিয়ে দেবেন আটক ও নিষিদ্ধ করবার জন্য। কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর ঐ ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করবার পরই এ'দের কাজ আরম্ভ হবে। মাদ্রাজ এবং অন্ধ্র সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করেছেন যাতে রুচিহীন অশ্লীল বই প্রকাশিত না হয় এবং জনসাধারণের নৈতিক মানের অধঃপতন না ঘটে। ভারত সরকারের এ প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু বিচারের মানদণ্ড কি হবে তা সহজে বোঝা যাচ্ছে না।

।। বিদেশে বঙ্কিম ।।

বিদেশে বাংলা ভাষার চর্চা সবথেকে বেশি হচ্ছে সোবিয়েৎ রাশিয়ায়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বাংলা গল্প ও কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার সংগে সংগে বাঙালী লেখকদের সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে সব থেকে বেশি সমাদৃত রাশিয়ায়। বিশিষ্ট বাংলা ভাষাবিদ শ্রীমতী ভেরা নোভিকোভা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যে বই লিখেছেন সেখানি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান। নোভিকোভা কিছুকাল আগে বাংলা দেশে এসেছিলেন। তখন তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং কাঁঠালপাড়া থেকে বঙ্কিম সম্পর্কীয় নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীগোপাল হালদার, অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় এবং নোভিকোভার ছাত্র ও বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র শ্রীউরি ফ্লোলোভ।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য গ্রন্থ সংগ্রহ বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরযুক্ত কতকগুলি বঙ্কিম-রচিত বই রয়েছে। গত শতকে রুশ ভাষাবিদ ইভান মিনায়েফের ভারতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে তাঁর রচিত বইগুলি দিয়েছিলেন।

।। অভিনব বিষ্ণুমূর্তি ।।

মেদিনীপুর শহর হতে পাঁচ মাইল দূরে কংসাবতী নদীর তীরে পাথরা গ্রামে যে অপরূপ পাষাণ মূর্তিটি পাওয়া গেছে সেটি বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়ামের একটি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লাবণ্যমণ্ডিত শক্তিময় এ মূর্তিটি প্রাচীন বাংলার পাষাণ-কলার একটি নিদর্শন। আশুতোষ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের মতে এটি খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষার্ধকালের মূর্তি। আইকনোগ্র্যাফির দিক থেকে এ অসামান্য মূর্তিটি পণ্ডিতজনের যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তেমনি বাংলার প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির গবেষণার একটি অমূল্য আকর বলে স্বীকৃত হবে। "সপ্তনাগের ছত্রতলে মহাপদ্মের উপরে সমপদ-স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান মূর্তিটি।" ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর মত এর চারটি হাতের ওপরের দুটিতে পদ্ম এবং পদ্ম দুটির ওপরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বস্তু ও গ্রন্থ। নীচের দুটি হাতে আছে পদ্ম ও শঙ্খ। দুপাশে দুটি দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তি। তাদের হাতে আছে চক্র ও পদ্ম। তাদের ওপরে দুদিকে আছে একটি পুরুষ ও একটি নারীমূর্তি। পুরুষের হাতে আছে বজ্র এবং নারীর হাতে আছে পদ্ম। সপ্তনাগ ছত্রের ওপর বসে আছেন অমিতাভ বুদ্ধ। তাছাড়া নানাবিধ ক্ষুদ্র মূর্তি রয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধ দেবতা লোকেশ্বর ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর সংমিশ্রণে নির্মিত এ মূর্তিকে পণ্ডিতেরা লোকেশ্বর বিষ্ণু বলে থাকেন।

।। আশ্চর্য ভোজনালয় ।।

সর্বোচ্চ ভজনালয়ের কথা আমরা শুনে এসেছি এতদিন; কিন্তু এবারে একটি আশ্চর্যজনক উচ্চতাসম্পন্ন ভোজনালয়ের কথা জানতে পারা গেছে। এটি স্থাপিত হচ্ছে লণ্ডনে ৫০ ফুট উঁচে। এত উঁচে উঠে খাওয়া-দাওয়ার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তারজন্য বিশেষ লিফটের ব্যবস্থা করা হবে। ভোজনাগারটি ছাড়াও এখানে থাকবে একটি চা ও খাবারের দোকান। সমগ্র লণ্ডন শহরের দৃশ্যাবলী দেখবার জন্য থাকবে একটি খোলা ও ঢাকা বারান্ডা। ভোজনাগারের মেঝেটি মিনিটে প্রায় ছয় ফুট ঘুরবে। যাতে খরিদ্দারেরা এক জায়গায় বসেই লণ্ডনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পারে। মেঝেটি পুরো একপাক ঘুরতে সময় লাগবে আধ ঘণ্টা।

টেলিভিশন ও টেলিফোন সার্ভিসের জন্য ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের বৈদ্যুতিক তরংগ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য ৫০০ ফুট উঁচের যে মিনার তৈরি হচ্ছে তার ওপরেই হবে এ ভোজনাগার। আগামী বছরে মিনারটি নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে এবং ১৯৬৩ সালের মধ্যে কাজ শেষ হবে। উচ্চতার তুলনায় মিনারটি একটু সরুই হবে। এর ব্যাস হবে প্রায় ৫৪ ফুট এবং এটি নির্মাণে প্রধানত কাঁচ ও কংক্রীট ব্যবহার করা হবে। মিনারটির "শিরদাঁড়া" হবে একটি ফাঁপা কংক্রীটনির্মিত স্তম্ভ। ভিত্তির কাছে এই স্তম্ভটির মাপ হবে দুই ফুট পুরু দেওয়াল ও ভিতরের ব্যাস ৩১ ফুট। তারপর ক্রমশ সরু হয়ে এটি ওপরে উঠবে—চূড়োর কাছে এর মাপ হবে ১২ ইঞ্চি পুরু দেওয়াল ও ভিতরের ব্যাস ২০ ফুট, স্তম্ভটির মধ্যে থাকবে লিফট, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, ডাকঘরের কেবল ও অন্যান্য সরঞ্জাম। স্তম্ভটির গায়ের চারদিকে ৩০টি কংক্রীটের ক্যান্টিলিভার ফ্লোর থাকবে। মিনারটির বাইরের আবরণ হবে কাচনির্মিত। এই কাচের আয়তন হবে প্রায় ৫০,০০০ বর্গ ফুট। কাচ পরিষ্কারের জন্য গাড়ির মত যে যন্ত্রটি থাকবে সেটি সব কাচ পরিষ্কার করে, তারপর চূড়োর কাছে গিয়ে একটি জায়গায় আশ্রয় নেবে। ভিত্তিসুদ্ধ মিনারটির মোট ওজন হবে প্রায় ১৩,০০০ টন।

লণ্ডনের এ সংবাদটি অনেকের কাছেই লোভনীয় বলে মনে হবে। কারণ এত ওপরে উঠে খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে কিনা সন্দেহ। তারওপর যাঁরা লুকিয়ে কোথাও কিছু খেতে চাইবেন তাঁরা সহজেই এখানে গিয়ে খাওয়া এবং শহর দেখার কাজ দুই-ই সারতে পারবেন, অবশ্য নিজেদের কাজ মিটিয়ে তারপর।

অভয়ঙ্কর

॥ সাহিত্যিক সমাচার ॥

ইভো আন্দ্রিক : নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

সব রকম জল্পনা-কল্পনার অবসান করে সাহিত্যের জন্য এ বছরের নোবেল-পুরস্কার সুইডিস একাডেমি যুগোশ্লাভিয়ার জনপ্রিয় সাহিত্যিক ইভো আন্দ্রিককে দান করলেন। তাঁদের মতে ইভো আন্দ্রিকের উপন্যাসে আছে মহাকাব্যের গুণ। যুগোশ্লোভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ইভো আন্দ্রিক যুদ্ধোত্তরকালীন যুগোশ্লাভিয়ার 'বেস্ট সেলার'। বয়স সত্তরের প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। আন্দ্রিকের বাবা ছিলেন মেহনতী শ্রমিক, কারিগরী কর্ম ছিল তাঁর পেশা। অতি অল্পবয়সেই, মাত্র দু'বছর বয়সে তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়। জননীর যত্নে গ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দর্শনে ডক্টরেট লাভ করেন। যুব আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁকে কিছুদিন কারাবাস করতে হয়। আমাদের দেশে যেমন অনেক লেখক তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেছেন কারাকক্ষের অন্ধকারে, ইভো আন্দ্রিকের সাহিত্য জীবনের শুরু তেমনই কারাগারের লৌহকপাটের পিছনে। একদা হিটলারের আমলে তিনি বার্লিনস্থ যুগোশ্লাভীয় রাষ্ট্রদূতের কাজও করেছেন।

সুইডিস কমিটি যে উপন্যাসটির জন্য ইভো আন্দ্রিককে পুরস্কৃত করেছেন, তার নাম 'দি ব্রিজ অন্ দি দ্রিনা', এই উপন্যাস রচিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বুদাপেস্টে বসে। ইভো আন্দ্রিকের এই উপন্যাসটিতে ভিসেগ্রাদ শহরের নাগরিক জীবনের ছবি রূপায়িত। অনেককাল ধরে সেই শহর বেড়ে উঠছে, পরিবর্তিত হচ্ছে তার রূপ এবং রঙ, বিচিত্র মানুষের মিছিল সেই শহরে, আর আছে ভিসেগ্রাদের বিখ্যাত ব্রীজটি। এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু সেই ভিসেগ্রাদ ব্রীজ। রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন ঘটেছে, শাসনযন্ত্র বার বার হাত-বদলিয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে, হানাহানির অন্তে শান্তি এসেছে, আবার সেই শান্তির আমেজ ভালো করে জমতে না জমতেই হঠাৎ কখন আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠে লড়াই শুরু হয়ে গেছে, সাধারণ মানুষ জড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের ধূলিঝঞ্ঝায়—তার ভেতর দিয়ে বসনিয়ার মানুষ পুরুষানুক্রমে বাস করছে, শ্রেণী বিভাগে তারা শ্লাভ জাতি,—তাদের জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে কিন্তু তুর্কোমান সভ্যতার ভিত্তিতে। অলসবেলায় বসনিয়ার সেই সরল মানুষগুলি ভিসেগ্রাদের ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে গল্প করে, আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে, আর নীচে বয়ে গেছে কলকল্লোলিনী নদীতরঙ্গ, কত না জল এইভাবে প্রবাহিত হয়েছে, "একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আরেক সোনার সিংহদ্বারে।"

রবীন্দ্রনাথের উপরি-উধৃত উক্তি দিয়েই আন্দ্রিকের পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসের মর্মবাণী বলা যায়। এই উপন্যাসে তিনি ক্ষণকালকে নিয়ে গেছেন অনন্তকালে, ব্যক্তিকে অতিক্রম করে একটা বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর সামগ্রিক রূপায়ণে তিনি মগ্নচৈতন্য হয়ে গেছেন। সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। মানুষের জীবন-স্বপ্নের তিনি সার্থক মূর্তিকার, কঠিন পাথর কেটে প্রতিমা-গঠনের দক্ষতা তাঁর কলমে।

ইভো আন্দ্রিকের অপর উপন্যাস 'বসনিয়ার কাহিনী' ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত। এই উপন্যাসেও যুদ্ধ, তার বর্বরতা এবং যুদ্ধজনিত পৈশাচিক নির্যাতনের বর্ণনা আছে। কিন্তু তাঁর সেই বর্ণনা সংবাদপত্রের রিপোর্টধর্মী নয় তাই তার মূল্য নিছক সাময়িক নয়। তার মধ্যে আছে একটা চিরকালিক আবেদন। বসনিয়ার ত্রাভনিক শহর এই উপন্যাসের পটভূমি। একজন ফরাসী কূটনীতিবিদ আর অস্ট্রিয়ার কনসাল-জেনারেল এই উপন্যসের মূল চরিত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বসনিয়ার বিচিত্র পরিবেশ তাদের হৃদয়ের কিভাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এই উপন্যসে ইভো আন্দ্রিক সেই কথা বলেছেন। পশ্চিমের অধিকাংশ লেখকের মত ইভো আন্দ্রিক তাঁর উপন্যাসে পরিচিত জীবনকেই পরিবেশ করেছেন, তার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতার খুঁটি নাটি বৃত্তান্ত। ইতিহাস, যুদ্ধ, সমসাময়িক কাহিনী, তার সঙ্গে কূটনীতির ফোড়ন এবং সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ইতিহাস পরিবেশন করাই ইভো আন্দ্রিকের রচনার বৈশিষ্ট্য। বিচিত্র কাব্যধর্মী ভাষা এবং বর্ণনার মনোহারিত্ব আছে ইভো আন্দ্রিকের রচনায়। যুগোশ্লাভিয়ার সমকালীন সাহিত্যে যাঁরা খ্যাতিমান তাঁদের নাম মিরোশ্লাভ ক্রেলজা, মারিয়ানা মাজকোভিক, অস্কার ডাভিকো এবং ইভো আন্দ্রিক। ইভো আন্দ্রিকের রচনা অতিসম্প্রতি ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পও বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। রূপক এবং প্রতীকধর্মী। গল্পের ক্ষেত্রে তিনি এখনও নতুন পথ আবিষ্কারে সচেষ্ট।

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের শান্তি পুরস্কারলাভ

অনেক সংবাদের ভিড়ে যে সংবাদটি হারিয়ে গেছে সেটি কিন্তু উপেক্ষনীয় নয়। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের ঐতিহাসিক সেন্টপলস গির্জায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে জার্মান পুস্তক-ব্যবসায়ীরা এই বছরের শান্তি-পুরস্কার দান করেছেন। এই পুরস্কারের মূল্য ১০ হাজার মার্ক অর্থাৎ প্রায় ২৫৮০ ডলার। এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে গত বারো বছর ধরে জার্মান গ্রন্থমেলা উপলক্ষ্যে বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য। পূর্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু মনীষী এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

॥ রবীন্দ্র-শতবার্ষিক পুরস্কার ॥

রবীন্দ্রনাথের শততম জয়ন্তীবর্ষে সাহিত্য একাদেমি দশ হাজার টাকার একটি রবীন্দ্র-পুরস্কার ঘোষণা করেন। একাদেমি যে চারজন ভারতীয় সাহিত্যিককে সম্মানিত করেছেন তাঁদের নাম : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী ও আকুরাতি চলমায়া। এই চারজনই কোন-না-কোন সূত্রে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীর গ্রন্থগারিক হিসাবে সর্বপ্রথম খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর চার-

খণ্ডে সম্পূর্ণ 'রবীন্দ্র-জীবনী' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে 'ভারত পরিচয়', 'জ্ঞানভারতী', 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' দান করেছেন। তিনি বঙ্গদেশ থেকে রবীন্দ্র-পুরস্কারও লাভ করেছেন।

পুলিনবিহারী সেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র, দীর্ঘকাল তিনি বিশ্বভারতীর গ্রন্থণ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'বিশ্বভারতী পত্রিকার' সম্পাদক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে তিনি 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'র সম্পাদক। সম্প্রতি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ 'রবীন্দ্রায়ণ' নামক স্মারকগ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছেন।

ডঃ হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ও হিন্দি সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। প্রায় কুড়ি বছরকাল তিনি 'বিশ্বভারতী'র হিন্দি-ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি সাহিত্য বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কবির', 'বানভট্ট কি আত্মকথা', 'মধ্যকালীন ধর্মসাধনা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকুরাতি চলমায়া তেলেগু সাহিত্যিক। অন্ধ্রপ্রদেশের গন্টুরে তাঁর বাড়ি। তিনি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও গান্ধিজী সম্পর্কে তিনি তেলেগু ভাষায় কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে "বিশ্বকবি রবীন্দ্রুনি জিবিতামু সন্দেশামু" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অপর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'গান্ধিজী চরিত্র উপন্যাসামূলু' ও 'নেতাজী বোসবাবু চরিত্র-উপন্যাসামূলু' অতিশয় জনপ্রিয়। তিনি প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থদুটি তিনি তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

॥ বঙ্গভাষা প্রসার ॥

সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতায় মহারাষ্ট্র নিবাসে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির রজত-জয়ন্তী বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, উদ্বোধক ছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীরামকৃষ্ণ রাও আর সর্বভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডিপ্লোমা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবির। জনাব হুমায়ুন কবির বলেন যে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সরকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। তবে বর্তমানে ভারতের সর্বত্র বাংলা পুস্তকের অনুবাদ হচ্ছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের অনুবাদ আশানুরূপ নয়। সেদিকে সচেষ্ট হতে হবে। ডিগ্রী কোর্সে শীর্ষস্থান অধিকার করে নারায়ণস্বামী অরুণাচলম্ সুধীরা স্বর্ণ পদক, মহারাজা নাটোর ট্রফি এবং পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পান। এছাড়া আরো এগারোজন সুবর্ণ এবং স্বর্ণখচিত পদক লাভ করেন। গুজরাটি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা গান ও আবৃত্তি করেন। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনে ব্রতী হয়েছেন। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রাও দেশের ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণে এই জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা যে সর্বাধিক তা উল্লেখ করে দেশের সংহতি ও ঐক্য সাধনে বাংলার গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

॥ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিফলক ॥

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে হ্যামস্টেড-এর যে বাড়িটিতে কবি বসবাস করতেন সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি লর্ড স্পেন্স, তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। এই স্মৃতিফলকে লেখা আছে ঃ "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ভারতীয় কবি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই ভবনে ছিলেন।"

॥ পাস্তেরনাকের কাব্য-সংকলন ॥

মস্কো শহরের এক সংবাদে প্রকাশ বোরিস পাস্তেরনাকের এক কাব্য-সংকলন প্রকাশের সঙ্গেই ত্রিশ হাজার কপি বিক্রীত হয়। রুশ পাঠকরা পূর্বাহ্নে কোনও বিজ্ঞপ্তি পাননি এই কাব্য-গ্রন্থ সম্পর্কে। বোরিস পাস্তেরনাকের কবিতা অতিশয় জনপ্রিয়। প্রকাশকরা তাঁদের তরফ থেকে 'ডাক্তার জিভাগো' গ্রন্থের লেখকের সম্পর্কে কোনো ভূমিকা দেননি বা তাঁর রচনা সম্পর্কে

কোনো রকম আলোচনা এই কাব্য-সংকলনে নেই।

॥ উদ্বাস্তু লেখক অপহৃত ॥

হাঙ্গেরীয় উদ্বাস্তু লেখক এবং সাংবাদিক ডঃ অরেল আবরানাই ১৯৪৬-এ হাঙ্গেরী থেকে ভিয়েনায় পালিয়ে আসেন। ভিয়েনা থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে যে তাঁকে অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হঠাৎ আক্রমণ করে সম্ভবতঃ হাঙ্গেরীতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাঙ্গেরীর জন্য মোটর-গাড়ির তেল কিনতে আসতেন ডঃ আবরানাই-এর জনৈক হাঙ্গেরীয় বন্ধু, তাঁর নাম জেরো। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই এই বিপদ ঘটেছে। পুলিশ জেরোর বাসা সন্ধান করে প্রচুর রক্তপাত এবং ধস্তাধস্তির পরিচয় পেয়েছে। ঘরে একটি হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ পড়ে থাকায় মনে হয় তাঁকে ওষুধের দ্বারা অচেতন করা হয়েছে। ডঃ আরবানাই কার্ডিন্যাল মিনডস্ জেনথির অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পূর্বে বুদাপেস্টের এক ক্যাথলিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী ছিলেন। হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহ সম্পর্কে আরেকজন হাঙ্গেরীয় সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি "এ কানট্রি ইন ফ্লেমস্" নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। "ট্রানসকনটিনেন্ট প্রেস" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের তিনি সম্পাদক। ইতিপূর্বে এইভাবে লেখক অপহরণের কাহিনী আর শোনা যায়নি। সমগ্র কাহিনীটি রহস্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

॥আন্তর্জাতিক সাহিত্য আলোচনা সভা॥

ভারত তথা বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব বিষয়ে আলোচনার জন্য সমগ্র বিশ্বের প্রায় সত্তরজন সাহিত্যিক ও দার্শনিক ১১ই থেকে ১৪ই নভেম্বর নয়াদিল্লীতে সম্মিলিত হবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, সুইডেন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকে প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগদান করবেন—যথা আলডাস হাক্সলী, প্রফেসার নীবার্গ, বার্লিন, নোসাক প্রভৃতি। ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে আর এস দিনকর, ডঃ মুলকরাজ আনন্দ, কে এম পানিক্কর, বি ভি বডেরকর, শঙ্কর কুরূপ, ডঃ বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। নয়াদিল্লীতে এই অনুষ্ঠান দ্বারাই রবীন্দ্র-সপ্তাহের উদ্বোধন করা হবে, উদ্বোধন করবেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। এই সম্মেলনেই ডঃ রাধাকৃষ্ণন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পুলিন-বিহারী সেন, হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী ও আকুরাতি চলমায়াকে রবীন্দ্র-পুরস্কার দান করবেন।

॥ দুঃস্থ সাহিত্যিকের জন্য ॥

প্রায় দুইশত সাহিত্যিক এবং এক-শত সঙ্গীতবিদ্‌কে রাষ্ট্র থেকে কিছু সাহায্য করা হয় অনশনে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য। প্রাপকদের মধ্যে বাংলা দেশের ২৩জন সাহিত্যিক আছেন, ৪০জন আছেন মালয়ালী সাহিত্যিক, ১৯ জন সংস্কৃত, ১৯ জন তেলেগু এবং ২৮ জন উর্দু লেখক। সাহায্যপ্রাপ্ত হিন্দি লেখকের সংখ্যা মাত্র আট। এই হিন্দি লেখকদের মধ্যে সম্প্রতি পরলোকগত কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীও (নিরালা) ছিলেন। তিনি কেন্দ্র থেকে পেতেন মাসিক একশো টাকা এবং যুক্ত প্রদেশ সরকার থেকে ১৫০ টাকা। বিভিন্ন রাজ্য সরকার থেকে ১৩ জন খ্যাতনামা লেখকের বিধবা সহধর্মিণীকেও সাহায্য দান করা হয়। সাধারণতঃ রাজ্য সরকারের সুপারিশে যে লেখকের মাসিক আয় ১৫০৲ টাকার কম তাঁকে এই জাতীয় সাহায্য দান করা হয়। আবেদনপত্র বিচারের জন্য সাহিত্যিক গোষ্ঠীরই একদল আছে। প্রতি বছর এই সাহায্য-ব্যবস্থাটিকে নতুন করে চালু করতে হয়। আজ কয়েক বছর ধরে এই নীতি অনুসারে যে সব লেখকের অবস্থা "now in indigent circumstances" তাঁদের এই সাহায্যদান করা হচ্ছে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন যে রাজ্য সরকার যে সাহায্যদান করার সিদ্ধান্ত করবেন কেন্দ্র তার দুই-তৃতীয়াংশ দান করবেন।

এই সংবাদ-পাঠে ভারতবর্ষের সাহিত্যিকদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পাঠকের নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ ধারণা হওয়া সম্ভব হবে।

॥ ওডহাউসের আশিপূর্তি ॥

বিখ্যাত রস-রচনাকার পি, জি, ওডহাউস গত অক্টোবর মাসে আশি বছরে পড়লেন। জীভস্ এবং বার্টি উস্টারের স্রষ্টার রসরচনা অবিস্মরণীয় আনন্দ-উৎস। বিগত মহাযুদ্ধের সূচনা থেকে তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে পদার্পণ করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, (এবং সে অভিযোগ অযৌক্তিক) যে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জার্মানীর পক্ষে বেতার-প্রচারে সহায়তা করেছেন। এই অপবাদের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। সেখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত কলঙ্ক অপনোদন করতে সহায়তা করেছেন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক মিঃ ইভ্‌লীন ওয়া। জন্মদিনের প্রশস্তি-দান উপলক্ষ্যে মিঃ ইভ্‌লীন ওয়া যে প্রবন্ধ রচনা করেন তার সাহায্যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ সর্বপ্রথম প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলেন। মিঃ উড-হাউসের দেশবাসী বুঝলেন যে তিনি স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। মিঃ ইভ্‌লীন ওয়ার আবেগময় প্রশস্তি-পাঠে মিঃ উডহাউসের স্বদেশবাসী বুঝেছেন যে অন্যায় হয়েছে। The Guardian-এর আমেরিকাস্থ প্রতিনিধি বি-বি-সি মারফত 'Letter From America' নামে যে বেতার-ভাষণ দান করেন তার শ্রোতার সংখ্যা সংবাদপত্র-পাঠকের চেয়েও অনেক বেশী। তাঁর নাম এলিসটেয়ার কুক্। সম্প্রতি এলিসটেয়ার কুক মিঃ উড-হাউসের আমেরিকার লং আইল্যাণ্ডের বাসভবনে সাক্ষাৎ করে এই মহৎ শিল্পীকে প্রশ্ন করেন যে, স্বদেশ থেকে দূরে বসে ইংরাজ-জীবন নিয়ে লিখতে তাঁর অসুবিধা হয় কিনা। অনেক দিন ত' তিনি ঘরছাড়া, ইংরাজ সমাজের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য সম্পর্কে তিনি
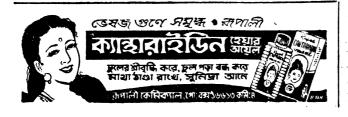
ত্র' অন্ধকারে। মিঃ ওডহাউস তার উত্তরে স্বীকার করেছেন : 'I have never really seen any sort of life—I got it all from the newspapers!'

ওডহাউসের সৃষ্টচরিত্র সমাজ এবং পরিবেশ সবই নিছক কবিকল্পনা।

॥ আগাথা ক্রিস্টি দিল্লীতে ॥

রহস্য-উপন্যাস লেখিকা আগাথার প্রত্নতাত্ত্বিক স্বামী আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দিল্লী আসছেন নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলনে যোগ-দানের জন্য। সেই সংগে রহস্য-উপন্যাস লেখিকা আগাথা ক্রিস্টিও আসছেন। চাঁদনী চক, কনট্ সার্কাস, লালকেল্লা, জুম্মা মস্জিদ প্রভৃতির মধ্যে তিনি হয়ত রোমাঞ্চকর রহস্যের সন্ধান পাবেন। তাঁর রহস্য-নাটক 'The Mouse Trap' গত দশ বছর ধরে লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়েছে।

নতুন বই

অন্তর্লীনা— (উপন্যাস) নারায়ণ সান্যাল। বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯। দাম পাঁচ টাকা।

নারায়ণ সান্যাল কয়েকটি সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা। তাঁর 'বল্মীক' 'মনামী' 'ব্রাত্য' প্রভৃতি উপন্যাস জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে। মানবমনের অন্তর্নিহিত অবচেতন মনের গহনে লেখক বিচরণ করেছেন। এই উপন্যাসের কৃশাণুর মন এক অবদমিত অনুভবে জর্জরিত। ছাত্র অবস্থায় সে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গোয়ার 'মাজা নুড' নামক বিখ্যাত ছবিটিতে ডাচেস অফ অল-ব্যারের মূর্তি দেখে। এর ফলে তার মনে জাগে এক বিচিত্র অনুভূতি। কোনো নারীকে সামনে দেখলেই তার মনে জাগে বিচিত্র শিহরণ, তার মনে হয় যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে তার সমগ্র বসন অন্তর্হিত। মানসিক বৈকল্য দমনের সে বিশেষ চেষ্টা করত—সে এক বিচিত্র সংগ্রাম। পরিশেষে একদিন কৃশাণুর মনের বাসনা পূর্ণ হল। নারায়ণ সান্যাল পাকা আর্টিস্টের মত এই বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন। ভাবা-বেগে চালিত হয়ে তিনি সংযম হারাননি। কি কাহিনীতে, কি ভাষায়। আইভি চরিত্রটিও চমৎকার ফুটেছে। লেখক এখনও নবীন, তাই তাঁর রচনায় কুশলী শিল্পীর মুন্সিয়ানা নেই, মাঝে মাঝে দুর্বলতা উঁকি দিয়েছে, কিন্তু নবীন লেখক অসীম দৃঢ়তার সংগে তার তরণীকে তীরে নিয়ে পৌঁছেছেন এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। যেটুকু দুর্বলতা দেখা গিয়েছে তার জন্য দায়ী জটিল বিষয়বস্তু। এমন একটি কাহিনীকে সার্থক করা সহজ নয়। লেখক সেদিক থেকে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছেন।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ মনোরম।

মানুষের ছবি— (উপন্যাস) সমীর মুখোপাধ্যায়। নিউ যুগের বাণী, ৬০ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৩·৫০ নঃ পঃ।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। যে কয়েকটি চরিত্র এখানে স্থান পেয়েছে তাদের অধিকাংশই স্ব স্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সংগে মিলে গেছে। গ্রাম-জীবনের পটভূমিকায় রচিত গ্রন্থ-খানিতে প্রেমের স্থান মুখ্য, তবুও পণ্ডিতমশায়ের দীর্ঘ জীবন এবং পরিণতি সহৃদয় পাঠকমনে স্বাক্ষর রাখতে পারবে। লেখকের ক্ষমতা খুব উচ্চ শ্রেণীর না হলেও সেখানে শৈল্পিক ক্ষমতা কিছুটা দেখা যায়। গ্রন্থটির সুপ্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ সুন্দর নয়।

জরাসন্ধর ছোটদের প্রিয়গল্প— জরাসন্ধ। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। ২০৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা -৬। দাম ২·০০ নঃ পঃ।

বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক জরাসন্ধের কতকগুলি কিশোরপাঠ্য গল্প এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। টু লেট, শুধু একটা নম্বর, ফুটবল বিভীষিকা, সোনার ঘড়ি, দান-বীর অপূর্ব গল্প। এক একটি গল্পের জগৎ ছোটদের সামনে নতুন হাসির খোরাক এনে দেবে। কোন রকম উপকথা নয়, নিতান্ত বাস্তব জীবনেই এ গল্পগুলির জন্ম। প্রতিটি গল্পই ছোটদের ভাল লাগবে।

কাঁচা মাটি পাকাপথ— (উপন্যাস) দীপেন রাহা। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম ৪·৫০ নঃ পঃ।

একটি ঘটনার আবির্ভাব সব সময়ই চরিত্রকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে না—বিভিন্নমুখী ঘটনার সমাবেশে চরিত্র সমস্যাজালে জটিল হয়ে ওঠে। একটি যুবকের পদে পদে জটিল ঘটনাবর্তে আবর্তন ও উত্তরনের কাহিনী নিয়েই এ উপন্যাস। লেখকের বর্ণনা-কুশলতার জন্যই কাহিনী রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির জন্য লেখকের শৈল্পিক সংযম ও কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন।

জলা পাহাড়— (গল্প)—হরেন ঘোষ। প্রকাশক—কথামালা প্রকাশনী। ১৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

তরুণ লেখক হরেন ঘোষ গল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়দান

করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জলা পাহাড়'। 'জলা পাহাড়' অনেক দিক থেকে একটি সার্থক উপন্যাস। উপন্যাসটির কাহিনীতে এক অনাবিষ্কৃত জগতের পরিচয় আছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে হিমালয়প্রান্ত-নিবাসী গোরখা সম্প্রদায়ের সমাজ-জীবনের কথা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই নবীন লেখকের উপন্যাস 'জলা পাহাড়'। লেখক ব্যক্তিগতভাবে হিমালয় প্রান্তবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত, চরিত্রের সঙ্গে লেখকের আত্মিক যোগ থাকায় 'জলা পাহাড়' উপন্যাসে রূপায়িত চিত্রটি এত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লেখকের ভাষা কাব্যধর্মী, বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষা আশ্চর্য খাপ খেয়েছে। রচনার মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই, বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্র-বিশ্লেষণ ও মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরিবেশনে লেখকের সৃজন-ধর্মী রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

কথা সাহিত্য-জিজ্ঞাসা— (প্রবন্ধ)—**ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী। ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।**

সাহিত্য গবেষক ও সমালোচক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা' নানা কারণে একটি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প সবচেয়ে উন্নত অথচ এই বিভাগটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে কম। বাংলা ছোটগল্পের সর্বপ্রথম সংকলন গ্রন্থ 'কথাগুচ্ছ', আজ থেকে আটাশ বছর আগে তার প্রথম প্রকাশ আর সর্বাধুনিক ছোটগল্পের সংকলন গ্রন্থ 'শতবর্ষের শতগল্প'। এই দুটি গ্রন্থে প্রতিনিধি-স্থানীয় বাংলা ছোটগল্পের নমুনা পাওয়া যাবে। বাংলা কথা-সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ কালে কালে তার প্রকৃতি পরি-বর্তিত হলেও তার মূল সুর হল করুণ মধুর। বাঙালী হৃদয়ে বীভৎস রসের আধিক্য নেই, তাই তার সাহিত্যে বীভৎস রস একেবারে অনুপস্থিত না হলেও তার শ্রেণীতে সে সংখ্যালঘু। মোটকথা বাংলা ছোটগল্পের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বলেছেন—"যাঁদের ছোটগল্প ও উপন্যাস পড়ে পাঠক হিসেবে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত, আনন্দিত, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ন হয়েছি, এখানে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমার দাবী গল্পখোর পাঠকের দাবী। তার বেশী কিছু নয়।"

অনুরাগী পাঠকের চোখ নিয়ে তিনি গল্প পড়েছেন এবং যে সব লেখকের গল্পবৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক, রূপকল্প ও বৈচিত্র্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সূত্রপাতে তিনি বিদেশী সাহিত্যের মেজাজ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় তার প্রয়োজন ছিল। তুলনামূলক আলো-চনায় বাংলা ছোটগল্পের সঙ্গে বিদেশী গল্পের আলোচনা উত্তরকালে অন্য কোনো লেখক নিশ্চয়ই করবেন—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তার সূচনা করলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা যুক্তিসংগত হয়েছে। তবে পশ্চিম দিগন্তে জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, সেই জীবনধারার সঙ্গে প্রাচ্য সংসারের জীবনের অনেক তফাত। শুধু জীবনযাত্রার মান নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ওদেশের ছোটগল্পের একটা বৃহৎ আকর। আমাদের বাংলাদেশে কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য কম, তারপর ভৌগোলিক সীমা-রেখায় বাংলাদেশ বর্তমানে অতি সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমিত, সেখানে গল্পের পট-ভূমির জন্য বৃহৎ ক্যানভাস কোথায়! বাংলা গল্পকে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে, পশ্চিমের আঙ্গিক, দৃষ্টান্ত কিন্তু চোখের সামনে থাকা উচিত, তবেই উৎকর্ষ সাধিত হবে। কনরাড বা হেমিংওয়ে আমাদের দেশেও জন্মাবে, ইতিমধ্যেই তার শুভ লক্ষণ দেখা গেছে নবীন লেখকদের মধ্যে। তবে আনাতোল ফ্রাঁসের মতে—"The short story is sufficient for all ends. A great deal of meaning can be contained in a few words. A well-constructed short story is the delight of the connoisieur. It is an elixir, a quintessence, a precious ointment." সে ছোটগল্প যে দেশেরই হোক্।

'কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা' ছোটগল্প সম্পর্কে সার্থক আলোচনা, তবে লেখক অতি অল্প পরিসরে অনেক কথা বলার চেষ্টা করেছেন তার ফলে বাংলা ছোট-গল্পের আলোচনা পাঠকের তৃষ্ণা পরিপূর্ণভাবে মেটাতে পারবে না, বরং বৃদ্ধি পাবে। বাংলা ছোটগল্পের লেখক-দের শ্রেণী-বিভাগ ও গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখক শ্রদ্ধাসহকারে আলোচনা করায় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বিচার ও বিশ্লেষণের ন্যায়নিষ্ঠ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল।

চাওয়ার আকাশ—(উপন্যাস) **অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজিৎ প্রকাশনী। ৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ২·৫০ নঃ পঃ।**

ঝড়ের রাতে ধনীর দুয়ারে আশ্রয় মিলল একটি আশ্রয়হীন বালকের। তারপর সেই পরিবারের বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে তাদের একজন হয়ে উঠল সেই বালক। কিন্তু আবার একদিন তাকে নিরাশ্রয় হতে হল। কিন্তু ভুলল না তাকে সেই বাড়ীর দুটি মানুষ—মা ও মেয়ে।

কাহিনী নিতান্তই সাধারণ। কোন-রূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা-কুশলতার ছাপ পাওয়া যায় না। চরিত্রগুলি কাহিনী-গ্রন্থনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

দেখা হলো—ইন্দিরা দেবী। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২·৫০।

অন্তর্দৃষ্টি, ভয়, ধূসর দিগন্ত, ব্যাধিমুক্তি প্রভৃতি চৌদ্দটি গল্পের সংকলন। 'দেখা হলো' নামক গল্পটির নামেই গ্রন্থখানির নাম-করণ হয়েছে। সূচীপত্র না থাকায় প্রথম আরম্ভেই উপন্যাস বলে ভ্রম হয়। বড়দের জন্য লেখা এই গল্প-গুলির মধ্যে ভয়, ধূসর দিগন্ত ও দেখা হলো আমাদের ভাল লেগেছে এবং এই কাহিনীগুলির মধ্যে কিছুটা নূতনত্বও আছে। অন্তর্দৃষ্টি গল্পটি স্টেফান জ্বোয়াইগের 'দি ইনভিজিবল কলেকসন' গল্পের অনুকরণে রচিত বলে মনে হয়। ছাপা, বাঁধাই চলনসই হলেও প্রচ্ছদপটটি আকর্ষণীয়।

মানবতাবাদ —বসুধা চক্রবর্তী। দীপায়ন—২০, কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। দাম—৭·০০।

মানবতাবাদ সম্পর্কীয় আলোচনার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে এর পরিচয় রয়েছে সুস্পষ্টভাবে। ধর্মকেন্দ্রিক মানবতাবাদ এবং য়োরোপীয় রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে আধুনিক যে মানবতাবাদ সম্পর্কীয় চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে গ্রন্থকার তা স্বীয় চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। মানবতা

এবং মানবিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ এবং তর্কের বিষয়। বস্তুতপক্ষে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য বিষয় একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে গ্রন্থটির যোগ্য সমাদর হবে কিনা সন্দেহ। তবে এরূপ প্রয়াস প্রশংসনীয়।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

নতুন পাতা। সম্পাদনা জ্যোতিভূষণ চাকী। দাম ৩·০০ নঃ পঃ। ছোটদের বই বাংলা দেশে এখন প্রচুর প্রকাশিত হচ্ছে। আলোচ্য সংকলনটি তারই পর্যায়ভুক্ত। কয়েকটি গল্প বা ছড়াই শুধু সংকলিত হয়নি; জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাকথা পাওয়া যাবে এ বইখানিতে। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, কালিদাস রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, হিরণকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপনবুড়ো প্রভৃতি। প্রতিটি লেখাই ছোটদের ভাল লাগবে। বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাল কাগজ এবং সুন্দর ছাপা।

মানস—সম্পাদক শ্রীরবি রায়। দাম ২·০০ নঃ পঃ। এ সংখ্যাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তরুণ সান্যালের 'তথ্যোন্মাদনা ও সাহিত্যের আবেদন' এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের "ভক্তিরসের কবিতা" দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ। আরও প্রবন্ধ লিখেছেন গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, অম্বুজ বসু প্রভৃতি। কবিতা লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত প্রভৃতি। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প দুটি উল্লেখযোগ্য। বাকি গল্পগুলি মোটামুটি। সংখ্যাটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

স্বগত—সম্পাদক শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য দাম ১·০০ নঃ পঃ। লৌহনগরী দুর্গাপুরে থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি সকলেরই ভাল লাগবে। অধিকাংশ অখ্যাতনামা লেখকদের রচনা নিয়ে সম্পাদিত হলেও সম্পাদনার রুচিশীলতা অভিনন্দনযোগ্য। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এখানে একটি ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, শ্যামসুন্দর দে ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সকলের মনে দাগ রাখতে সক্ষম হবে। অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্তের ও অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি মূল্যবান। বীরেন্দ্র নিওগীর গল্পটি সার্থক। অন্যান্য নতুনদের রচনার মধ্যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

ফসল—সম্পাদক শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম ১·৫০ নঃ পঃ। বাংলা পত্র-পত্রিকার মধ্যে ফসলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর প্রতিটি সংখ্যাই উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটিকা নিয়ে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাটি তার ব্যতিক্রম নয়। প্রশংসার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে নিতাই বসু লিখিত প্রবন্ধটি। আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের নিয়ে এ ধরণের আলোচনার সময় এসেছে। কল্যাণকুমার সরকার এবং অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধটি মূল্যবান। গল্প লিখেছেন নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। নাটিকাটি লিখেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। রিলকের একটি চিঠি অনুবাদ করেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

মহিলা মহল—পঞ্চদশ বর্ষ শারদ সংখ্যা : ১৩৬৮, প্রধান সম্পাদিকা : অঞ্জলি বসু। ৫৪বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : ১·৫০ নঃ পঃ। বাঙালী মেয়েদের এই মাসিক পত্রিকার শারদ সংখ্যা তার পূর্বে সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। এই বিশেষ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : ডক্টর রমা চৌধুরী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, পুষ্পদল ভট্টাচার্য, হেমাঙ্গিনী দত্ত, শান্তি সেন, অর্চিতা রায়চৌধুরী, সাধনা দেবী, নীলিমা দেবী, বেলা দে, কুন্তলা দত্ত, করবী বসু, সুরুচি সেনগুপ্ত, অলকা দেবী, অমিতাকুমারী বসু, ডক্টর উমা দেবী, গিরিবালা দেবী, রেণুকা দেবী, ডক্টর সন্ধ্যা ভাদুড়ী, অমিতা দেবী, কণকলতা ঘোষ, ছবি গুপ্ত, বাণী রায় প্রমুখ। নবীনা ও প্রবীণা লেখিকাদের রচনা সম্ভারে 'মহিলামহল' শারদ সংখ্যা শারদ সাহিত্যের স্মরণীয় সংযোজন। শান্তিনিকেতনের চিত্রনিভা চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদপটটি এই বিশেষ সংখ্যাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কবিপত্র (শারদ সংকলন)—সম্পাদক : তরুণ সান্যাল। দাম এক টাকা।

এই সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, অরুণ সরকার, গোপাল ভৌমিক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন কবিগণ। কাব্যনাট্য লিখেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কাব্য সমালোচনার উপর প্রবন্ধ লিখেছেন মৃগাঙ্ক রায় এবং কবিতার সমস্যার উপর সংক্ষেপে জরুরী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন মণীন্দ্র রায়। 'কবিপত্রের' এই সংখ্যাটি সত্যই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

ভারতে চলচ্চিত্রশিল্প ও সরকার

ভার্গব চৌধুরী

চলচ্চিত্র বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির আধুনিকতম অবদান। রঙে, রসে, রূপে, মাধুর্যে মণ্ডিত একটি অভিনব আন্তর্জাতিক শিল্প। একটি দেশের চলমান রূপের সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিচয় বহুদূরের মানুষের মাঝখানে তুলে ধরছে নিখুঁতভাবে। দৃষ্টিগ্রাহ্য এ শিল্পের মধ্যে ফুটে উঠে কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রিত রূপ।

চলচ্চিত্রের আবির্ভাব দীর্ঘ দিনের নয়। কিন্তু এই অত্যল্পকালের মধ্যেই শিল্পের এই বিশেষ শাখাটি অভাবিত উন্নতি লাভ করেছে। শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রতিটি মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এর উত্তেজনা ও মানবিকতাপূর্ণ রূপ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিকে স্মরণ করলেই উপলব্ধি করা যায়। মানবাকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক চিত্র সম্পূর্ণভাবে চিত্রায়িত করা সম্ভব এর মধ্য দিয়ে। এবং তা সম্ভবও হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি—সিটিজেন কানে, ডেজার্ট ভিক্টরি, দি ওয়ার্লড অব প্লেনটি, ব্রিফ এনকাউন্টার, দি থার্ড ম্যান, মঁসিয়ে ভার্দো, আইভ্যান দি টেরিবল, সং অব সিলোন, বাইসাইকল থিবস, পথের পাঁচালি।

চলচ্চিত্রের প্রধান হচ্ছেন পরিচালক। বিংশ শতাব্দীতে তার রুচি ও প্রগতিশীল দৃষ্টির মধ্যেই এর উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত। সম্মিলিত এ শিল্পরূপটি একজন মানুষের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যার নির্দেশে কাজ করেন অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান, ইলেকট্রিসিয়ান প্রভৃতি। পরিচালকের ভাবাবেগ যেমন গভীর হবে তেমনি নিখুঁত হবে তাঁর মানবিকতার দর্শন। যে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তিনি জীবনকে উপলব্ধি করবেন, তেমনি তার দ্বারা প্রভাবিত হবেন মহৎ শিল্পসৃষ্টিতে। চিত্রকর কেবলমাত্র রঙ, তুলি আর অঙ্কন পদ্ধতির সাহায্যেই চিত্রকে চিরন্তন করে তোলেন না, যা দিয়ে তা সম্ভবপর হয় তা হচ্ছে জীবনকে উপলব্ধি করবার মত মুক্ত চোখ। মানবিক বোধকে ফুটিয়ে না তুলতে পারলে কোন শিল্পীই সার্থকতা লাভ করতে পারেন না; সেখানে অর্থ বা প্রচার যতই প্রবল হোক না কেন। শিল্পটি অবশ্য বিশেষভাবে নির্ভর করে দক্ষ আলোকচিত্র গ্রহণের ওপর। কারণ পর্দায় যে জীবনকে দৃশ্য করে তোলা হবে সেখানে দর্শক দেখবে একটি জীবনের সুন্দর অথবা কুৎসিত রূপকে। যা একদিকে যেমন হবে বাস্তবানুগ তেমনি সত্য হবে সুষ্ঠু অংশনির্বাচন ও তার আলোকচিত্রায়ন।

প্রথম ভারতীয় চিত্র "রাজা হরিশ-চন্দ্র" বম্বের করোনেশন সিনেমা হাউসে প্রদর্শনি ব্যবস্থা হয় ১৯১২-১৩। ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক ছিলেন ডি জি ফালকি। কিন্তু ছবিটি সবাক ছিল না। প্রথম সবাক চিত্র তোলা হল ১৯৩১ সালে। ছবিটির নাম "আলম আরা"। এই ৩১ বৎসরে ভারতে চলচ্চিত্রের অগ্রগতি ঘটেছে বিস্ময়করভাবে। বর্তমানে কাহিনীচিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে ভারতের স্থান প্রথম। কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদেশে কতকগুলি ভারতীয় চিত্র পুরস্কার লাভ করায় তার সম্মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে চারটি ভারতীয় কাহিনীচিত্র ও দুটি প্রামাণ্যচিত্র যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, ইতালি ও চিলিতে যেমন আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে তেমনি ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় একজন ভারতীয় ক্যামেরাম্যান পুরস্কৃত হয়েছেন। বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের রপ্তানি থেকে প্রচুর অর্থাগম হওয়ায় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ কিছুটা কমবার সম্ভাবনা আছে।

বর্তমান আলোচনায় চিত্র-জগতের সাজতামামি উপস্থিত করা উদ্দেশ্য নয়। ভারতে চলচ্চিত্রের বিকাশসাধনে ও উন্নতিকল্পে ভারত সরকার সাম্প্রতিক কালে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়াই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

চিত্রশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে কাঁচা ফিল্মের সমস্যা বিশেষভাবে মনে পড়ে। কারণ গত কয়েক বৎসর ধরে ভারতে কাঁচা ফিল্মের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই বিরাট দেশের চাহিদা উপযোগী অধিকাংশ কাঁচা ফিল্ম আসে বিদেশ থেকে। তার দ্বারা ভারতের প্রায় ৫ কোটি টাকার ওপর বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হয়। ভারত সরকার দক্ষিণ ভারতে উতকামণ্ডের কাছে যে ফিল্ম-তৈরীর কারখানা তৈরি করছেন তার দ্বারা ভারতের একটি বিশেষ জাতীয় শিল্প গড়ে উঠবে। বৈদেশিক ৪ কোটি টাকা নিয়ে মোট ৭ কোটি টাকার বিনিয়োগে নির্মীয়মান এ কারখানায় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ৫ কোটি টাকার মত ফিল্ম উৎপাদন সম্ভব হবে। এই কারখানায় প্রথমে চিত্রশিল্পের উপযোগী ফিল্ম নির্মাণ করা হবে। অবশ্য চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্রের উপযোগী ফিল্ম নির্মাণ করা খুব সহজসাধ্য নয়। এজন্য বিখ্যাত ফরাসী উৎপাদক মোশের বিশেষ সহযোগিতা করছেন। বিদেশ থেকে আমদানি করা হলেও কারখানার অধিকাংশ সরঞ্জাম আসবে ফ্রান্স থেকে। আর এ কারখানার অন্যতম বিশেষত্ব হবে, সমগ্র শিল্প-সংস্থাটি ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত। অবশ্য সে সমস্ত কর্মীদের অধিকাংশই ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ফিল্ম-তৈরীর জন্য যে কাঁচা মালের প্রয়োজন হবে তা ভারতেই নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে। কারণ কারখানা চালু করবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁচা মালের যে প্রয়োজন অনুভূত হবে, তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে এ দেশের মধ্য থেকে সরবরাহ করা হবে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে ভারত সরকার অংশ গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় "ফিল্ম ফিনান্স

কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া" গঠনের মধ্যে। বর্তমান বৎসর থেকেই শুরু হয়েছে এর কার্যক্রম। অবশ্য চলচ্চিত্রে সরকারের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে নানা-রূপ প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্র-শিল্পে রাষ্ট্রের অংশ গ্রহণ ভারতেই প্রথম নয়। ইতালিতে একটি ব্যাঙ্ক, যুক্তরাজ্যে ন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন এবং ফ্রান্সে ন্যাশনাল সেণ্টার অব সিনেমাটোগ্রাফি বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ ও প্রযোজক-গণের ওপর সরকারী চাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে আশা করা অমূলক নয়। সরকার কেবলমাত্র নিজের আদর্শকে বজায় রেখে বা নিজের কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েই সাহায্য করতে চান। সরকারী তথ্য থেকে জানতে পারা যায় যে, "উন্নত রুচিসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ যোগানই চলচ্চিত্র অর্থ কর্পো-রেশনের প্রধান উদ্দেশ্য।......কর্পোরেশন কর্তৃক আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত ছবিগুলি সাধারণ চলচ্চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে—এ হল কর্পোরেশনের আদর্শ।......চলচ্চিত্র অর্থ কর্পোরেশন সেই সব ছবিরই প্রয়োজনায় সহায়তা করবেন যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হবে বাস্তব জীবন ও জাতীয় সমস্যা। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে সেই ছবি।" এক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত ছবিগুলি সরকারী প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

ভারতের মত অল্পশিক্ষিত বহু ভাষাভাষী গণতান্ত্রিক দেশে তথ্য-চিত্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪০ সাল থেকেই সরকারী প্রচেষ্টা শুরু হয় এ ব্যাপারে। যদিও সে সময়-কার প্রযোজিত চিত্রের অধিকাংশই ছিল যুদ্ধ-সংক্রান্ত। কয়েকটি মাত্র ছিল সাংস্কৃতিমূলক। কার্টুন-চিত্র নির্মাণের ব্যবস্থাও সে সময়ে শুরু হয়। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ফিল্ম ডিভিশনের দপ্তর বোম্বাই শহরের মাঝখানে স্থাপিত হল। আজ এ প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর একটি বৃহত্তম সংগঠনরূপে পরিচিত। এখানে নির্মিত কার্টুন চিত্র-গুলির অভিনবত্ব বিস্ময়কর। ফিল্ম ডিভিশন স্থাপিত হওয়ার পর এখানে ১৫৩৯টি সংবাদচিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ১০০টিই রঙীন ছবি। ছবিগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে পুরনো ইতিহাস, শিক্ষা, শিল্প, চলচ্চিত্র, ভ্রমণ ও সাধারণ তথ্য-মূলক। অবশ্য শিশু ও মহিলাদের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের চিত্র তোলা হয়েছে। ডিভিশনের ২০টি প্রযোজনা ইউনিট ছাড়াও তাঁরা বেসরকারী প্রযোজকদের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁদের তথ্যচিত্র ক্রয় করে ডিভি-শন বেসরকারী প্রয়াসকে উৎসাহিত করে। ডিভিশনের স্টুডিওটি সর্বাধু-নিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত। এখানে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, গুজরাটী, কানাড়া, মলয়ালম, মারাঠী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু ও উর্দু, এই ভাষাগুলির মাধ্যমেই চিত্র-গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সুদূর গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শনের জন্য সরকার কতকগুলি গাড়ীর ব্যবস্থা করেছেন। ডিভিশন তাদের বিনামূল্যে চিত্র সরবরাহ করে থাকেন। ৩,৫০০ স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে ও ১২৫০টি অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। প্রতি সপ্তাহে নতুন তথ্যচিত্র পরিবেশিত হয়। তথ্যচিত্র বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসসমূহে যেমন প্রদর্শিত হয় তেমনি বিক্রীতও হয়ে থাকে বিদেশে। তথ্যচিত্র প্রযোজনার ইতিহাস খুব অল্প দিনের হলেও এর আন্ত-র্জাতিক স্বীকৃতি খুবই আনন্দদায়ক। জাতির ভাবগত ঐক্যসাধনে তথ্যচিত্র যে গৌরবপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার সফলতা সকলেই কামনা করে।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে যে, ভারতে চলচ্চিত্র শিক্ষালয় স্থাপন। ১৯৫১ সালে শ্রী এস কে পাতিলের সভাপতিত্বে চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি যে সুপারিশ করেন তার ওপর ভিত্তি করে চিত্রশিল্পের মানোন্নয়ন এবং দক্ষ কারিগর সরবরাহের উদ্দেশ্যেই এ শিক্ষা-লয়ের প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হচ্ছেন শ্রীগজানন জাগীরদার। গত মার্চ মাসে যখন শিক্ষালয়ের প্রকৃত কার্যারম্ভ হয় তখন ফ্রান্সের চিত্রশিল্প শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ মঃ তেসেনো এক পক্ষকাল এই শিক্ষালয়ে সংযুক্ত থেকে পরামর্শ দেন বিভিন্ন বিষয়ে। বহুদিন ধরে ভারতে সুদক্ষ প্রতিভাশালী চিত্রশিল্প কর্মীর অভাব ঘটছিল। শিক্ষিত তরুণ শিক্ষার্থী-গণ এখানে শিক্ষালাভ করছেন চারটি বিষয়ে—নির্দেশনা ও চিত্রনাট্য রচনা, চলচ্চিত্র-গ্রহণ, শব্দ-গ্রহণ ও সাউণ্ড-ইঞ্জিনীয়ারিং এবং চিত্র-সম্পাদনা। চলচ্চিত্র শিল্প সম্যকরূপে বুঝতে হলে শিল্পীর দৃষ্টি ও সামাজিক মূল্যবোধ যেমন থাকবে তেমনি অধ্যবসায়, উৎসাহ এবং আস্থা থাকা দরকার। এরূপ যোগ্য শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে না আশা করি।

বর্তমানে কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলছে। বিদেশী চিত্র-গুলির থেকে অনেক কিছু আমাদের শিক্ষার আছে। সে বিষয়ে চলচ্চিত্র শিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষকে যেমন অবহিত হতে হবে তেমনি শিক্ষার্থীদেরও সচেতন থাকতে হবে।
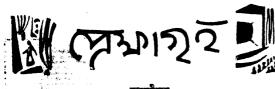
নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

কলিকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ :

গেল ৩রা থেকে ৯ই পর্যন্ত ভারত সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রক কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ উদযাপন করলেন। লাইটহাউস, মেট্রো, এলিট, রাধা এবং পূর্ণ—এই পাঁচটি চিত্রগৃহে দৈনিক প্রোগ্রাম পরিবর্তন ক'রে সর্বসমেত ৩৫টি পূর্ণ দীর্ঘ চিত্র দর্শক-সাধারণকে দেখানোই ছিল এই সপ্তাহ-পালনের মুখ্য অঙ্গ। ছবিগুলি পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেখানো হ'লেও এদের ওপর কোনো প্রমোদকর ধার্য করা হয়নি এবং এরজন্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

৩রা নভেম্বর বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় লাইটহাউসে সরকারীভাবে এই চলচ্চিত্র সপ্তাহের উদ্বোধন করেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এই উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তাতে বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের নির্বাকযুগে জে, এফ, ম্যাডান ও অনাদিনাথ বসু এবং সবাক-যুগে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের অবদানের কথা উল্লেখ ক'রে বর্তমান বাঙলায় যে নব-বাস্তবতার আন্দোলন চলেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এখনকার যুগকে 'পথের পাঁচালী'র যুগ ব'লে অভিহিত করেন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বল্লেন, এই ধরণের উৎসব থেকে আমরা অপরাপর দেশের লোক এবং তাদের নবতম শিল্পপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করতে পারি। তিনি বলেন, আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছবি আরও বেশী ক'রে দেখতে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের ছবিও সারা বিশ্বকে দেখাতে চাই—অবশ্য সে-সব ছবি বিশ্বজনীন, বাস্তব এবং উৎকর্ষের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া চাই।......কেউই অস্বীকার করবেন না যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলচ্চিত্রের আদান-প্রদান ঢের বেশী পরিমাণে হওয়া দরকার। মানবিক বোঝাপড়া বা সমঝোতাকে গভীরতর ও দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে তথ্য ও ভাবের আদান-প্রদানের এই মাধ্যমটি মারফত আমাদের পরস্পরকে ঢের বেশী ক'রে জানবার চেষ্টা করা উচিত। কাহিনী এবং দলিলচিত্রের আদান-প্রদানে ব্যবসায়িক এবং অপরাপর বাধার বর্তমান অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে তিনি বলেন, তিনি 'বার্টার' (বিনিময়) ও 'কোটা' প্রথার পক্ষপাতী নন। তিনি প্রস্তাব করেন, এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হওয়া উচিত, যা বছরের বারো বা চব্বিশটি শ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্রের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং যে-কোনো দেশ নিজেদের চলচ্চিত্র আইনসাপেক্ষে সেই ছবিগুলিকে আমদানী করবার জন্যে অগ্রাধিকার পাবে।......নিজেদের সামর্থ্যের

অজয় কর পরিচালিত 'অতল জলের আহ্বান' চিত্রে তন্দ্রা বর্মণ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দী ছবি 'জব প্যার কীসি সে হোতা হ্যায়' চিত্রে দেব আনন্দ ও আশা পারেখ।

মধ্যে লোকে যাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি দেখবার সুযোগ পায়, তাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। এবং এ জিনিষ কি করে সম্ভবপর হয়, সে সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন এবং আজ যখন বহু দেশের চলচ্চিত্রজগতের কৃতিমান পুরুষেরা এখানে একত্র হয়েছেন, তখন তাঁরা মিলিতভাবে এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে পারেন। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন চলচ্চিত্রকেন্দ্রগুলির মধ্যে শিল্প প্রযুক্তি সম্পর্কে অধিকতর সহযোগিতার প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন যন্ত্রপাতি ধার দেওয়া এবং যৌথভাবে অর্থবিনিয়োগ ক'রে চলচ্চিত্রের প্রযোজনা ও পরিবেশনা। তিনি সকলকে মনে করিয়া দেন যে, আমাদের দেশে চলচ্চিত্র প্রযোজনার সুবিধা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলেও চিত্রগৃহের অভাবে চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ এখনও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশে কাঁচা ফিল্ম প্রস্তুতের কারখানা শীঘ্রই চালু হবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণের যথারীতি ব্যবস্থা হওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রসর দেশগুলির উচিত তাদের উন্নততর জ্ঞানকে অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বিকীরণ করা। ডাঃ রায় অভিযোগ করেন যে, আমাদের দেশে চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে নির্ভুল পরিসংখ্যানের অত্যন্ত অভাব। পরিশেষে তিনি বলেন, মাত্র বিদেশে রপ্তানীর দিকে লক্ষ্য রেখে চিত্রনির্মাণ বোধ হয় কোনো দেশই করে না। নিজের দেশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছবি নির্মিত হ'লে তাদেরই মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের মান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরেই রপ্তানীর বাজারের ভিত দৃঢ় হওয়া সম্ভব। বৈদেশিক চলচ্চিত্র-প্রতিনিধিদের সম্ভাষণ জানিয়ে ডাঃ রায় কলিকাতায় "চলচ্চিত্র সপ্তাহ"-এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'আহ্বান' চিত্রে একটি দৃশ্যে লিলি চক্রবর্তী, সিপ্রা মিত্র ও দুর্গাদাস।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণের পর অভিনেত্রী মঞ্জু দে সমাগত বৈদেশিক প্রতিনিধিদের এক এক ক'রে নিমন্ত্রিত দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আর্জেনিণ্টনার এম, বেরেণ্ডে (উৎসবে প্রদর্শিত দলিল-চিত্র 'স্টোন সেণ্টিনেল'-এর পরিচালক), সি, টিয়েম্পো (আমোরিণা ছবির গল্প-লেখক), এফ, কার্কেডেলো (আমোরিণা ছবির প্রযোজক), ই, সেরানো (অভিনেতা), অ্যামেলিয়া বেন্স (অভিনেত্রী), জে, কব্‌সন (চিত্র-কুশলী), ই, এফ, টরেল এবং আলবার্টো পেরোডি, চেকোশ্লোভেকিয়ার ডঃ এডওয়ার্ড হেজ এবং ব্লাঙ্কা বোডানোভা (অভিনেত্রী—ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ দেখতে এসেছেন), পূর্বজার্মানীর কোলার্ড উল্ফ (ডাঃ ম্যাম্‌লক-ছবির পরিচালক) এবং

'প্যার কা সাগর' চিত্রের একটি দৃশ্যে মীনাকুমারী ও রাজেন্দ্রকুমার।

কুর্ট জর্ডন, জাপানের কোজাবিলস, ডি, আদ্রি যামিক (অভিনেত্রী), হংকংয়ের জুলি, শী, ইয়েন (অভিনেত্রী), মেক্সিকোর ইগ্-ন্যাসিও লোপেজ — টারসো (ম্যাকেরিও ছবির অভিনেতা) এবং তাঁর স্ত্রী, পাকিস্তানের ইউসুফ (চিত্রপরিচালক), পোল্যান্ডের আন্দ্রেজ স্কাইমা (পোলাস্ক ফিল্মের ম্যানেজার) এবং ওয়াদিস্‌ল দুদা, রুমানিয়ার আয়ন ল্যাম্কু এবং আই, বোরোবেন্তু (অভিনেতা), সুইজার্ল্যাণ্ডের জোসেফ কেলিন (প্রযোজক) এবং লুইসা কেলিন, ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিকের ইউজেফ গহের এবং আতেফ সালেম (সেভেন ডটার্স ছবির পরিচালক) ও সোভিয়েত রাশিয়ার কিসিলেভা এবং মিস বোংডাদ্‌জে (অভিনেত্রী—মাত্র ১৭ বছর বয়সেই পাঁচখানি ছবিতে অভিনয় ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছেন)। এ'দের কেউ খালি মাথা হেলিয়ে, কেউ স্বদেশের ভাষায় কথা ব'লে কেউ কেউ ভাঙা ইংরেজীর সাহায্যে, আবার কেউ বা 'নমস্তে', 'নমস্কার' 'ধন্যবাদ' এবং সেভেন ডটার্সের পরিচালক আতেফ সালেম 'আমি আপনাদের দেশে এসে খুব খুশী—খুব খুশী' ব'লে সমবেত দর্শক-বৃন্দকে অভিবাদন জানান। এ'দের প্রত্যেককেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে শ্রীমতী মীরা গুপ্তা (যিনি একদিন অভিনেত্রী মীরা মিশ্র ছিলেন) ফুলের তোড়া উপহার দেন। এবং এ'দের মধ্যে থেকে মিস্ বোংডাদ্‌জে তাঁকে দেওয়া ফুলের তোড়া থেকে একটি লাল গোলাপকুঁড়ি তুলে নিয়ে তাঁরই পার্শ্বে দণ্ডায়মান ডাঃ রায়কে স্মিতহাস্যে উপহার দিয়ে ডাঃ রায় এবং সমবেত সকলকেই চমৎকৃত করেন।

"চলচ্চিত্র-সপ্তাহের" উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে লাইটহাউসে অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে বিখ্যাত জাপানী চিত্র "হ্যাপিনেস অব আস অ্যালোন" দেখানো হয়। জেঙ্গোমাৎসু-য়ামা পরিচালিত এই ছবিখানি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে টোকিও শহরের উপর যখন বোমা বর্ষিত হচ্ছিল, তখন প্রাণভয়ে পরিবারের অপরাপর লোকের সংগে পালাতে পালাতে একটি সদ্য-বিধবা মূকবধির মেয়ে পথিমধ্যে একটি শিশুকে কুড়িয়ে পায়। সর্বস্বহারা পরিবার সাময়িক আয়ের মধ্যে যখন দিনগুজরান করতে থাকে, তখনও মেয়েটি ঐ শিশুটিকে নিজের কাছছাড়া করে না। কিন্তু তার হৃদয়হীন ভাই একদিন তার অজ্ঞাতে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের জিম্মা করে দেয়। দুঃখে মেয়েটি বাড়ী ছেড়ে নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক মূক-বধির যুবকের সম্মুখীন হয়। উভয়ে উভয়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং এই সহানুভূতি থেকেই ক্রমে সখ্য ও প্রেমের পথ দিয়েই উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এই শপথ গ্রহণ করে যে, পৃথিবীর সাধারণ সহজ মানুষের তুচ্ছতাচ্ছিল্যকে হাসিমুখে উপেক্ষা করে তারা দুজনে দুজনের সুখদুঃখকে ভাগ করে নেবে। কত রকম বাধাবিপত্তি এবং অমানুষিক ব্যবহারের জ্বালাকে অতিক্রম করে এই মূকবধির দম্পতি তাদের সুখীজীবনকে গড়ে তুলতে পেরেছিল এবং সবশেষে পালিত শিশুটিকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সৈনিক বেশে দেখতে পেয়ে মেয়েটি সবিস্ময়ে নিজের সার্থকতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তারই বিচিত্র রূপ এই ছবির প্রতিটি ফুটে, প্রতিটি ফ্রেমে প্রতিফলিত হয়ে তার সমগ্র মানবিক আবেদনের দ্বারা আমাদের অভিভূত করেছে। এরকম একখানি বিশ্বজনীন সার্থক চিত্র পৃথিবীকে উপহার দেবার জন্যে আমরা পরিচালক জেঙ্গো মাৎসু-য়ামা, প্রযোজক মাসুমি ফুজিমোতো ও কেনিচিরো সুমিদা এবং চিত্রনির্মিতা টোকিও ইগা প্রোডাকসান্সকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভ্রম-সংশোধন

রঙমহলে 'চক্র' : রচনা : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। গত ২৬শ সংখ্যায় 'চক্র' নাটকের লেখকের পদবী ভুলক্রমে অন্যরূপ মুদ্রিত হয়েছিল।

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

জব্ পেয়ার কিসিসে হোতা হায় : নাসির হোসেন ফিল্মস্-এর চিত্র; ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনা : নাসির হোসেন; সংগীত পরিচালনা : শংকর জয়কিষণ; গীত-রচনা : হসরৎ জয়পুরী ও শৈলেন্দ্র; চিত্রগ্রহণ : দিলীপ গুপ্ত; সংগীতগ্রহণ : মিনু কাত্রার; নৃত্য-পরিচালনা : গোপীকিষণ, সত্যনারায়ণ, হার্মাণ বেঞ্জামিন ও আয়েসা খাঁ; ভূমিকায় : দেব আনন্দ, মোবারক, রাজ মেহরা, প্রাণ, ওয়াস্তি, রাজেন্দ্রনাথ, আশা পারেখ, সুলোচনা, উমা খোশলা, মীনা প্রভৃতি। গেল ৩রা নভেম্বর থেকে পপুলার ফিল্মস্-এর পরিবেশনায় সোসাইটী, কৃষ্ণা, রূপালী, পূর্ণশ্রী প্রভৃতি চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"জব্ পেয়ার কিসিসে হোতা হায়" —ছবিটির নাম ছবিরই একটি গানের
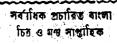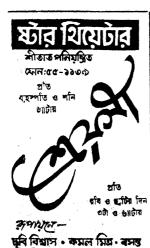
প্রথম কলি থেকে নেওয়া হয়েছে, কিংবা ছবির নাম থেকেই হসরৎ জয়পুরী ঐ গানখানি রচনা করেছেন, তা সঠিক বলতে না পারলেও এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই নৃত্যগীতমুখর প্রেমের চিত্রটি একটি অতি-সাধারণ ছকে বাঁধা গল্প হ'লেও উপস্থাপনার গুণে সাধারণ দর্শকের কাছে উপ-ভোগ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। চমৎকার পরিস্থিতি (situation) সৃষ্টি, চটুল সংলাপ, কথা-সুর ও গাওয়ার গুণে শ্রুতিসুখকর গান, মন-মাতানো নাচ এবং ঘটনার বিন্যাসে ছবি-খানি শতকরা একশোভাগই আনন্দদানের ক্ষমতা রাখে। ছবির শেষাংশের ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানোর প্রলয়ংকর দৃশ্য এমন এক অভাবনীয়তার সৃষ্টি করেছে, যা দর্শককে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে হয়।

চিত্রগ্রহণে দিলীপ গুপ্ত আর একবার অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন। পাহাড়ের বুকে ফুলের সাগরকে তিনি ক্ষণে ক্ষণে যেভাবে ক্যামেরায় ধরেছেন, তা তাঁর তোলা "মধুমতী"কে (বিমল রায় পরি-চালিত) স্মরণ করিয়ে দেয়।

অভিনয়াংশে দেব আনন্দ সুন্দরের ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। মনে হয়, দেব আনন্দকে মনে রেখেই নাসির হোসেন এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। এবং তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছেন আশা পারেখ। নাচে, গানে (ঠোঁট মেলানোতে), অভিনয়ে তাঁর সমান পার-দর্শিতা দর্শককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। কপট শয়তান সোহনলালের চরিত্রাভিনয়ে প্রাণ আর একটি 'ভিলেন'কে পর্দায় প্রতি-ষ্ঠিত করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় সুলোচনা, মোবারক, ওয়াস্তি এবং উমা খোসলা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

চিত্রশিল্পী দিলীপ গুপ্ত, গীতিকার হসরৎ জয়পুরী ও শৈলেন্দ্র, সঙ্গীত-পরিচালক শঙ্কর জয়কিষণ, শব্দধারক মিনু কর্তার, নায়ক-নায়িকা দেব আনন্দ ও আশা পারেখ, শিল্প-নির্দেশক সামেল ও শান্তি দাস এবং কাহিনীকার, প্রযো-জক ও পরিচালক নাসির হোসেন—এই সকলের ঐকান্তিক মিলিত প্রচেষ্টায় "জব্ প্যেয়ার কিসিসে হোতা হায়" হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে দর্শকচিত্ত-বিনোদনকারী চিত্র হিসেবে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে রইল।

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের 'বধূ' চিত্রে সাবিত্রী ও বিশ্বজিৎ।

বিবিধ সংবাদ

কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ভারত সমেত বাইশটি দেশের প'য়ত্রিশখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র দেখানো হ'ল লাইট হাউস, মেট্রো, জলিট, রাধা ও পূর্ণ—এই পাঁচটি চিত্রগৃহে। শহরের অপরাপর লোকের সঙ্গে আমরাও সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি, চিত্র-রসিক দর্শক-সাধারণের মধ্যে বিদেশী ছবি দেখবার আগ্রহ কি বিচিত্র পরিমাণে বেড়ে উঠেছে! প্রতিটি চিত্রগৃহেই টিকিট কাটবার জন্যে দর্শকদের যে-ভাবে দীর্ঘ সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে অসীম অপেক্ষা করতে দেখেছি এবং তারও পরে বহু ব্যক্তিকেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, এই শহরে যদি অন্ততঃ গুটি তিনেক চিত্রগৃহ যুক্ত-রাষ্ট্র এবং ইংলণ্ড বাদে পৃথিবীর অপরা-পর দেশ থেকে নামকরা ছবিগুলি আনিয়ে ইংরেজী সাবটাইটেল জুড়ে নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে, দর্শক অভাবে তাদের কোনো দিনই আফ-সোস করতে হবে না।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এই অভাব-নীয় আগ্রহের কারণ কি? এমন আগ্রহ সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে? এর জবাবে আমাদের মনে দু'টি কথা জাগছে। এক, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র-জগৎসভায় সুদৃঢ় আসন লাভের পর বহু লোকেরই বাঙলা চলচ্চিত্রের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছে! যাঁরা আগে চলচ্চিত্রকে 'ও কিছু নয়' ব'লে অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছিলেন, আজ তাঁরা এবং তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকে চলচ্চিত্রকে যথার্থই শিল্প-মাধ্যম হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন। তাই আজ যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চল-চ্চিত্র আমাদের দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন তাঁরা অপরাপর দেশ কোন্ স্তরের চলচ্চিত্র উপহার দিচ্ছেন, তা' দেখবার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই উৎসুক হয়ে উঠেছেন। দুই, চলচ্চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে যথার্থ রসজ্ঞান লাভ করবার জন্যে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি বহুদিন ধ'রে যে আন্দোলন চালিয়েছেন এবং আজ সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা যে আন্দো-

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত জাপানী চিত্র "থ্রি ট্রেজার্সের" একটি দৃশ্য।

লনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারই ফলে বহু শিক্ষিত যুবক এই সুযোগে বিভিন্ন দেশের নামকরা ছবি দেখে নিজেদের রসপিপাসাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছেন।

স্কাউটস কর্তৃক ছায়ানাট্য অভিনয়

রাঁচী রোডের ভারেচনগর স্কুলে শিক্ষা-শিবির উদ্‌যাপনরত ৪র্থ।২য় কলিকাতার স্কাউট দল সমারোহময় শিবিরাগ্নির রাত্রে এক সুন্দর ছায়ানাট্য অভিনয় করে। হিংস্র জংলীদলের আক্রমণে আকস্মিক বিপদ এবং সেই বিপদ হইতে কৌশলে উদ্ধার লাভের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই ছায়ানাট্য প্রোফেসর অনাথনাথ মিত্রের তত্ত্বাবধানে এবং সর্বশ্রী গৌর শীল ও তপেন চক্রবর্তীর পরিচালনায় সমবেত বিপুল জনমণ্ডলীর নিকট অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। ছায়ানাট্য ব্যতীত অন্যবিধ নৃত্য, গীত ও স্কাউট-সংগীতও এই অনুষ্ঠানে সার্থকতার সহিত পরিবেশিত হয়।

॥ ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির ॥

৩১শে অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় উচ্চাঙ্গ নৃত্য, গ্রাম্য নৃত্য ও 'চিত্রাঙ্গদা' (নৃত্যনাট্য) প্রদর্শিত হয়। সংস্থার সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তীর বার্ষিক রিপোর্ট পাঠের পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রী জে সি গুপ্ত বার-এট-ল, বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী শান্তা ভট্টাচার্য। অরবিন্দ মিত্র, সমর মিত্র, স্বপ্না সেনগুপ্তা, উমা মিত্র, বিষ্ণুপদ মিত্র, নেপাল ঘোষ, গোপাল মিত্র, অনিল ঘোষ ও মনোরঞ্জন বিশ্বাস যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন। অনুপশঙ্কর, স্বপ্না সেনগুপ্তা ও অরুণকুমার নৃত্যে সহকারী পরিচালকরূপে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের হরিণঘাটা শিক্ষাকেন্দ্রের আমেরিকান ছাত্রী শ্রীমতী জেনেট করডিয়ালের ভারতীয় নৃত্যকলায় উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী চমৎকৃত হন।
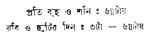
মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্য-বিচিত্রায় জিপসি নৃত্যানুষ্ঠানের একটি দৃশ্যে বাঙ্গালী বালিকাদের সঙ্গে একটি আমেরিকান বালিকাকে (মধ্যে) নৃত্য করতে দেখা যাচ্ছে।

খেলাধূলা

দর্শক

॥ এম সি সি বনাম পশ্চিমাঞ্চল দল ॥

এম সি সি : ২৭২ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড'। জিওফ পুলার ১০৪, টেড ডেক্সটার ৪৩, নাইট ৩৭ এবং এ্যালেন নট আউট ৩৬ রাণ। রঞ্জনে ৬১ রাণে ৩, বোরদে ৩৯ রাণে ২, ভীন ৯৮ রাণে ১ এবং সুর্তি ৫২ রাণে ১ উইকেট)।

ও ১৬৭ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড'। পারফিট ৫৮, নাইট ৩৮ নট আউট। ভীন ৪১ রানে ৩, রঞ্জানে ৬৭ রানে ২ উইকেট)

পশ্চিমাঞ্চল : ২১১ (ডি ভোঁসলে ৬২ নট আউট, জে ভিন ৪২, কণ্ট্রাক্টর ৩২ এবং রঞ্জানে ২৩। স্মিথ ৫৮ রাণে ৫, ব্রাউন ৩৩ রাণে ২ উইকেট)।

ও ১৫৯ (৫ উইঃ। সুর্তি ৫১ নট আউট; শের মহম্মদ ৩৯। ডেভিড স্মিথ ৪৮ রাণে ২, লক ২৭ রানে ২ এবং এম জে কে স্মিথ ৭ রানে ১ উইকেট)।

১ম দিন (৩রা নভেম্বর): এম সি সি দল ২৭২ রাণে (৭ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। পশ্চিমাঞ্চল দল : ২৫ রাণ (১ উইকেট পড়ে। কন্ট্রাক্টার নট আউট ১১ এবং ডি গাই-কোয়াড় নট আউট ২ রাণ)।

২য় দিন (৪ঠা নভেম্বর) : ২১১ রানে পশ্চিমাঞ্চল দলের ১ম ইনিংসের খেলা সমাপ্ত। এম সি সি : ৫৪ রান (২ উইকেটে। পারফিট ৩০ এবং ডেক্সটার ১৬ রান ক'রে নট আউট)

৩য় দিন (৫ই নভেম্বর) : এম সি সি : ১৬৭ রান (৫ উইকেটে ২য় ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড')। পশ্চিমাঞ্চল : ২য় ইনিংসে ১৫৯ রান (৫ উইকেটে) ।

এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় গুজরাট রাজ্যের আমেদাবাদ সহরের সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামে। পীচ নিষ্প্রাণ ছিল না। সময়ে সময়ে বল লাফিয়ে উঠে ব্যাটসম্যানদের তাড়া করেছিল। প্রথম দিনে ৮টা উইকেট পড়ে যায়—এম সি সি দলের ৭টা এবং পশ্চিমাঞ্চল দলের ১টা। প্রথম দিনের ২৭২ রাণে (৭ উইকেটে) এম সি সি দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করায় খেলার আকর্ষণ অনেক বেড়ে যায়। খেলার এই অবস্থায় ইনিংস সমাপ্তির ঘোষণার ফলে এম সি সি দলের অধিনায়ক জনসাধারণের হৃদয় বেশী ক'রে জয় করতে পেরেছেন। মনে পড়ছে প্যাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা। ইংল্যাণ্ডের মন্থর গতিতে রাণ করার দরুণ ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠায় টেড ডেক্সটারের বিপক্ষে সে কি বিরুদ্ধ সমালোচনা! ডেক্সটারের বিপক্ষে প্রধান অভিযোগ ছিল, ক্রিকেট খেলা আকর্ষণীয় করার পক্ষে যে ধরণের খেলা দরকার তার একান্ত অভাব ছিল প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় দিনের খেলায়। অবিশ্যি পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয়লাভে এবং ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ডেক্সটারের ক্রীড়া চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে সংবাদপত্রগুলি ডেক্সটারের প্রশংসায় পঞ্চমুখে ধারণ করেছিল।

সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামে প্রথমদিনের খেলায় ২৮০০০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। লাঞ্চের সময় এম সি সি দলের ৩টে উইকেট পড়ে রাণ দাঁড়িয়েছিল ১১৬। উইকেটে খেলছিলেন পুলার (৬৭ রাণ) এবং ডেক্সটার (১৭ রাণ)।

দলের ৫৬ রাণে ওপনিং ন্যাটা ব্যাটসম্যান রিচার্ডসন খুব জোর আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান। রঞ্জানের একটা জোরালো ওভর-পীচ বল তাড়াতাড়ি ক'রে শেষ সময়ে আটকাতে গিয়ে গালিতে কন্ট্রাকটারের হাতে 'ক্যাচ' তুলেন। কিন্তু কন্ট্রাকটার বলটা ধরে রাখতে পারেননি। কিন্তু ঐ ওভারেই রিচার্ডসনের লেগ-ষ্টাম্প ছিটকে যায়। এরপর পুলারের সঙ্গে ন্যাটা খেলোয়াড় পারফিট জুটি বাঁধেন; কিন্তু বেশীক্ষণ নয়; মাত্র এক রাণ ক'রেই ভিনের বলে দলের ৬৩ রাণে ক্যাচ দিয়ে আউট হ'ন। তৃতীয় উইকেটে জুটি বাঁধলেন পুলার এবং এম জে কে স্মিথ। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ২৭ রান উঠলে পর স্মিথ রঞ্জানের বলে আউট হ'লেন। স্মিথ ২৫ মিনিটের খেলায় ৭ রান করেছিলেন। লাঞ্চের আগেই এম সি সি দলের তিনটে উইকেট পড়ে যায়।

লাঞ্চের পরের খেলায় ডেক্সটার দলের ১৫৯ রানে বোরদের বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৬৯ রান উঠে যায়। ডেক্সটার তাঁর ৪৩ রানে ৭টা বাউণ্ডারী করেন। পুলারের সঙ্গে মারে ৫ম উইকেটে জুটি বাঁধেন দলের ১৫৯ রানে। বোরদের বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে পুলার তাঁর নিজস্ব শত রাণ পূর্ণ করেন। এই শতরান করতে তাঁর ১৭০ মিনিট সময় নেয়—বাউণ্ডারী ছিল ১৭টা। দলের রান দাঁড়ায় ১৮২। দলের ১৯০ রানে সুর্তির বলে খোঁচা মেরে পুলার স্লিপে কণ্ট্রাক্টারের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হ'ন। পুলার খেলেছিলেন ৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট; দলের সে সময়ের ১৯৩ রানের মধ্যে পুলারের রান ছিল ১০৪। দলের ঐ রানের মাথায় মারে এল-বি-ডবলিউ হ'ন। ৭ম উইকেটে খেলতে থাকেন নাইট এবং এ্যালেন। চা-পানের বিরতির সময় দলের রান গিয়ে দাঁড়ায় ৬ উইকেটে ২৩৮। এ্যালেন এবং নাইট যথাক্রমে ১৮ ও ২৪ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। দলের ২৭০ রানে নাইট নিজস্ব ৩৭ রান ক'রে রঞ্জানের বলে বোল্ড আউট হয়ে যান। ৭ম উইকেটের জুটিতে নাইট এবং এ্যালেন ৭০ মিনিটের খেলায় ৭৭ রান যোগ করেন। আর ২ রান হওয়ার পরই দলের ২৭২ রানে ১ম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে ডেক্সটার দর্শকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করলেন। এ্যালেন ৩৬ রান ক'রে নট-আউট থেকে যান। পশ্চিমাঞ্চল দলের রঞ্জানে ৬১ রানে ৩টে এবং বোরদে ৩৯ রানে ২টো উইকেট পান। রঞ্জানের বল অনেক খেলোয়াড়ই নির্ভয়ে খেলতে পারেননি। এক সময়ে তিনি তিন ওভার বলে ৩৮ রান দিয়ে ২টো উইকেট পান।

পশ্চিমাঞ্চল দল খেলা ভাঙ্গার ২০ মিনিট বাকি থাকতে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এই সময়ের মধ্যে দলের ১৬ রানে একটা উইকেট পড়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দল চার ঘণ্টা ব্যাট করে ১৮৬ রান তুলে দেয়—লাঞ্চের বিরতির আগের দুই

ঘণ্টায় ৭৯ রান এবং চা-পানের বিরতির আগের দুই ঘণ্টায় ১০৭ রান। লাঞ্চের আগেই পশ্চিমাঞ্চল দলের সাতটা উইকেট পড়ে যায়। চা-পানের বিরতির পূর্বের খেলায় ভোঁসলে এবং ভিনের ৯ম উইকেটের জুটিতে ৭৬ রান এবং এম সি সি দলের ২য় ইনিংসে ২৫ রানের মধ্যে ন্যাটা খেলোয়াড় পুলার (০ রান) এবং সহ-অধিনায়ক মাইক স্মিথের (৮ রান) বিদায়—এ সমস্ত ঘটনা খেলায় খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২১১ রাণে শেষ হয়। প্রথম দিনের নট আউট ব্যাটস্‌ম্যান কণ্ট্রাকটার এবং গাইকোয়াড় খেলার সূচনা করেন; কিন্তু ৪৫ মিনিটের খেলায় ৩টে উইকেট পড়ে গিয়ে পূর্ব দিনের ২৫ রাণের সঙ্গে মাত্র ৩০ রাণ যোগ হয়। দলের অধিনায়ক কণ্ট্রাকটার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের আসা-যাওয়া দেখলেন। দলের ৩২ রাণে গাইকোয়াড় (৫ রাণ), ৩৪ রাণে সুর্তি (০ রাণ) এবং ৫৫ রাণে বোরদে (১২ রাণ) আউট হ'ন। ৫ম উইকেটে কণ্ট্রাকটারের জুড়ি হ'লেন ভোঁসলে। এই জুটিও বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। ৫ম উইকেটের জুটিতে মাত্র ১৬ রাণ যোগ হ'লে পর দলের ৭১ রাণে কণ্ট্রাক্টার আউট হ'লেন। কণ্ট্রাক্টার ৯৫ মিনিট খেলে নিজের ৩২ রাণ করেছিলেন—বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ৫টা। ৬ষ্ঠ উইকেটে ভোঁসলের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন ঘোরপাড়ে। কিন্তু এই জুটিও দলের পতন রোধ করতে পারেনি—ঘোরপাড়ে নিজস্ব ৭ রাণ ক'রে দলের ৮০ রাণে আউট হ'ন। এর পর দলের সমূহ বিপদ দেখে ভোঁসলে নিজের উইকেট বাঁচিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ সিংজী। ২৫ মিনিটের খেলায় ৭ম উইকেটের জুটিতে ১৯ রাণ যোগ হ'ল এবং এর পরই দলের ৯৯ রাণে ইন্দ্রজিৎ সিংজী ৮ রাণে বিদায় নিলেন। আর কোন রাণ যোগ না হয়েই ৯৯ রাণের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে গেল—ত্রিবেদী 'গোল্লা' করে আউট হ'লেন।

এম জে কে স্মিথ

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় রাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১০৪, ৮টা উইকেট পড়ে। উইকেটে তখন ভোঁসলে এবং ভিন। ফাঁসা-অনের হাত থেকে রেহাই পেতে পশ্চিমাঞ্চল দলের তখনও ৭৯ রাণের প্রয়োজন। বিরতির পর দলের ১৭৫ রাণে ভিন নিজস্ব ৪২ রাণ ক'রে আউট হ'লেন। দলের দারুণ সঙ্কটের সময় ভোঁসলে এবং ভিনের ৯ম উইকেটের জুটিতে দলের মূল্যবান ৭৬ রাণ ওঠে, ১০০ মিনিটের খেলায়। ১০ম উইকেটে জুটি বাঁধেন ভোঁসলের সঙ্গে রঞ্জানে। পশ্চিমাঞ্চল দলের ইনিংস শেষ করার জন্যে ডেক্সটার চঞ্চল হ'য়ে পড়েন। চা-পানের জন্যে খেলা ভাঙ্গতে মাত্র ২ মিনিট বাকি থাকতে ডেক্সটার ২০৯ রাণের মাথায় নতুন বল নিলেন। নতুন বলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ দিল—স্মিথ পশ্চিমাঞ্চল দলের ২১১ রাণের মাথায় রঞ্জানের উইকেট পেলেন। চা-পানের বিরতির আগেই ইনিংস শেষ হ'ল। ১০ম উইকেটের জুটিতে ৩৬ রাণ যোগ হয়—রঞ্জানে ২৩ রাণ করেন। ভোঁসলে ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট খেলে ৬২ রাণ করে শেষ পর্যন্ত নট-আউট থেকে যান।

এম-সি-সি দল ৬১ রাণের ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে। কিন্তু আরম্ভ ভাল হয়নি—দলের ১০ রাণে ১ম এবং ২৫ রাণে ২য় উইকেট পড়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্ধারিত সময়ে দেখা যায় এম-সি-সি দলের রাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৫৪, ২টো উইকেট পড়ে। ফলে তারা ১১৫ রাণে এগিয়ে যায়। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী রাণ (১০৪ রাণ) করার ন্যাটা খেলোয়াড় পুলার ২য় ইনিংসে 'গোল্লা' করেই বিদায় নেন।

তৃতীয়দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় এম সি সি দলের রান গিয়ে দাঁড়ায় ১৬৭, ৫ উইকেট পড়ে।

জিওফ পুলার

উইকেটে ছিলেন নাইট (৩৮ রান) এবং এ্যালেন (২৭ রান)।

এই ১৬৭ রানের উপরই অধিনায়ক ডেক্সটার ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তৃতীয় দিনে দু' ঘণ্টার খেলায় এম সি সি দলের ৩টে উইকেট পড়ে ১১৩ রান ওঠে; পূর্ব দিন ছিল ৫৪ রান, ২টো উইকেট পড়ে। দলের ৯৫ রানে ডেক্সটার নিজস্ব ২৮ রান করে ভিনের বলে খোঁচা মেরে ধরা পড়েন।

৩য় উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং পারফিট দলের ৭০ রান তুলে দেন। পারফিটও ভিনের পরের ওভারে বোল্ড আউট হ'ন নিজের ৫৮ রানে। দলের রান তখন ৯৬ অর্থাৎ ডেক্সটারের বিদায়ের পর তখন মাত্র এক রান যোগ হয়েছে। পারফিট ১১৫ মিনিট খেলে দলের পক্ষে ২য় ইনিংসে সর্বাধিক রান (৫৮ রান) করেন। ৫ম উইকেট (মারে) পড়ে যায় দলের ৯৬ রানের সঙ্গে মাত্র ৪ রান যোগ হলে; অর্থাৎ দলের ১০০ রানে। ৬ষ্ঠ উইকেটে জুটি বাঁধেন নাইট এবং এ্যালেন। এই জুটি ৫০ মিনিটের খেলায় দলের ৬৭ রান তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান।

লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটের ১৬৭ রানে এম সি সি ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

লাঞ্চের পরই পশ্চিমাঞ্চল দল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। হাতে খেলার সময় ছিল তিন ঘণ্টা এবং জয়-লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ২২৯ রান। এম সি সি দলের রিচার্ডসন এবং পুলার অসুস্থ থাকায় ফিল্ডিং করতে নামেননি।

পশ্চিমাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা ভাল হয়নি। দ্বিতীয় বলেই অধিনায়ক কন্ট্রাক্টার 'গোল্লা' করে আউট হন। দলের ৪৪ রানে গাইকোয়াড় (২য় উইকেট), ৭১ রানে শের মহম্মদ (৩য় উইকেট) এবং ৭৫ রানে ভোঁসলে (৪র্থ উইকেট) আউট হন। চা-পানের সময় পশ্চিমাঞ্চল দলের চারটে উইকেট পড়ে ৮০ রান দাঁড়ায়। উইকেটে ছিলেন ৫ম উইকেটের জুটি সুর্তি এবং ঘোড়পাড়ে। চা-পানের পর যে খেলা আরম্ভ হয় তার অল্প সময়ে ঘোড়পাড়ে আউট হন। ঘোরপাড়ের বিদায়ে ৬ষ্ঠ উইকেটে জুটি বাঁধেন সুর্তি সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ সিংজী। এই জুটিই দলের ৫৮ রান তুলে নট আউট থাকেন। পিটিয়ে খেলে তাঁরা দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন। বোলার পরিবর্তন করেও এই জুটিকে ভাঙ্গা যায়নি কিম্বা তাঁদের মনে ত্রাস সঞ্চার করা যায়নি। পারফিট এবং মাইক স্মিথের বলকেও এই জুটি কোন সম্মান দেখাননি। ৬৪ মিনিট খেলে সুর্তি তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করেন। তাঁর মোট ৫১ রানে ৮টা ছিল বাউন্ডারী। অন্যদিকে তাঁর জুটি ইন্দ্রজিৎ সিংজী করেন ২৭ রান।

যে স্পিন বোলারদের উপর খুব বেশী নির্ভর করে এম সি সি দল গঠন করা হয়েছিল তাঁরা দ্বিতীয় ইনিংসে নির্বাচকমণ্ডলীকে খুবই হতাশ করেন।

আমেদাবাদে পশ্চিমাঞ্চল দলের বিপক্ষে এম সি সি দলের সফরের দ্বিতীয় খেলাটিও অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'ল।

॥ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর ॥

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যাবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের প্রথম খেলা পড়েছে ত্রিনিদাদ দলের সঙ্গে ৯ই ফেব্রুয়ারী। ভারতীয় দল ৫টি টেস্ট খেলা সমেত মোট ১১টি খেলায় যোগদান করবে। ৩০শে এপ্রিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর শেষ হবে। এই সফরটি হ'লে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর। ভারতীয় দল প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে যায় ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে ৪টে টেস্ট খেলা ড্র যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটা খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করে।

১৯৬২ সালের টেস্ট খেলা আরম্ভের তারিখ :

১ম টেস্ট : ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ত্রিণিদাদ
২য় টেস্ট : ৭ই মার্চ, জামাইকা
৩য় টেস্ট : ২৩শে মার্চ, বার্বাডোজ
৪র্থ টেস্ট : ৭ই এপ্রিল, বৃটিশ গায়না
৫ম টেস্ট : ১৮ই এপ্রিল, ত্রিনিদাদ

॥ পিটার পারফিট ॥

লণ্ডনের 'ক্রিকেট রাইটার্স ক্লাব' ভারত সফররত এম-সি-সি দলের পিটার

পিটার পারফিট

পারফিটকে ইংল্যান্ডের গত ক্রিকেট মরসুমের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত ক'রেছেন। গত ক্রিকেট মরসুমে পারফিট মোট ২০০৭ রাণ করেন। পারফিটকে নিয়ে এ পর্যন্ত এগারজন ক্রিকেট খেলোয়াড় 'ক্রিকেট রাইটার্স ক্লাব' কর্তৃক প্রতি বৎসরের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করলেন।

ভারতবর্ষ বনাম মালয় ব্যাডমিণ্টন টেস্ট

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম মালয়ের প্রথম বে-সরকারী ব্যাডমিণ্টন টেস্ট খেলায় মালয় ৫—৪ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। মোট ৯টি খেলার মধ্যে ৫টি ছিল সিঙ্গলস খেলা এবং ৪টি ডাবলসের খেলা।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম দুটি সিঙ্গলস খেলায় হার স্বীকার ক'রে পরবর্তী দুটি ডাবলসের খেলায় জয়লাভ করে। ফলে প্রথম দিনের খেলায় ফলাফল সমান ২—২ দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় মালয় দু'টি ডাবলসের এবং একটি সিঙ্গলসের খেলায় জয়ী হয়। অপর দিকে ভারতবর্ষ জয়ী হয় ২টি সিঙ্গলসের খেলায়।

সার্ভিসেস ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নসিপ

সার্ভিসেস ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ন বিমান বাহিনী দল ২ উইকেটে ওয়েস্টার্ণ কম্যান্ড দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু' বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করার গৌরব লাভ করেছে। এই খেলার পর উভয় দলই ২৭ পয়েন্ট ক'রে পায়। কিন্তু বিমান বাহিনী দলের ব্যাটিং এভারেজ অনেক ভাল থাকায় তারাই চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। বিমান বাহিনীর ব্যাটিং এভারেজ দাঁড়ায় ১·৬ এবং ওয়েস্টার্ণ কম্যান্ড দলের ১·৩।

সন্তোষ ট্রফি—পূর্বাঞ্চলের খেলা

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার (সন্তোষ ট্রফি) পূর্বাঞ্চলের লীগ খেলায় বাংলা অপরাজেয় অবস্থায় লীগের খেলা শেষ করে মূলে প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। বাংলা বিহারকে ৪—০ গোলে, উত্তরপ্রদেশকে ৩—২ গোলে, উড়িষ্যাকে ৮—০ গোলে এবং আসামকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে।

বিহার বাংলার কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে।

সুব্রত মুখার্জি কাপ বিজয়ী ক'লকাতার রাণী রাসমণি স্কুল দল।

॥ সুব্রত মুখার্জি কাপ ॥

নয়াদিল্লীতে সুব্রত মুখার্জি কাপ প্রতিযোগিতার প্রথম বছরের ফাইনালে ক'লকাতার রাণী রাসমণি হাইস্কুল ২-০ গোলে গুর্খা মিলিটারী স্কুলকে (দেরাদুন) পরাজিত ক'রে সুব্রত মুখার্জি কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ভারতবর্ষের এয়ারমার্শাল পরলোকগত সুব্রত মুখার্জি'র স্মৃতি-রক্ষার্থে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খেলার চূড়ান্ত ফলাফল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েন্ট
বাংলা	৪	৪	০	০	৮
উড়িষ্যা	৪	২	১	১	৫
আসাম	৪	২	১	১	৫
উত্তরপ্রদেশ	৪	১	০	৩	২
বিহার *	৪	০	০	৪	০

* বিহার ০—৪ গোলে বাংলার কাছে পরাজিত হয় এবং প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে। ফলে উড়িষ্যা, আসাম এবং উত্তরপ্রদেশ দুই পয়েন্ট করে লাভ করে।

উড়িষ্যা দলের বিপক্ষে বাংলার পক্ষে গোল দেন চুনী গোস্বামী ৩, অরুময় ২, নীলেশ সরকার ২, এবং সুনীল নন্দী ১। আসামের বিপক্ষে সমাজপতি, সুনীল নন্দী এবং নীলেশ সরকার একটা ক'রে গোল দেন।

পূর্বাঞ্চল থেকে বাংলা ছাড়াও লীগের রানার্স-আপ দল মূল প্রতি-যোগিতায় খেলবে। আসাম এবং উড়িষ্যা সমান সংখ্যক পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। সুতরাং মূল প্রতি-যোগিতায় খেলার অধিকার লাভের জন্য এই দুই দলকে পুনরায় খেলতে হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সি, কে, সেনের
নূতন অবদান
বসন্ত মালতী
কেশ তৈল
চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কেশ প্রসাধনে শতবর্ষের অভিজ্ঞতা
সি, কে, সেন এণ্ড
কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা-১২
KALPANA.BM.16B

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের
বিচিত্র কাহিনী
ও
আরও বিচিত্র কাহিনী
পড়ে আনন্দ পাবেন

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৮শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 17th November, 1961
40 Naya Paise.

সম্পাদকীয়

মিঃ ক্রুশ্চভ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুইটি বৃহৎ বোমা নিক্ষেপ করেছেন। একটি নোভায়া জেমলিয়ায় সশব্দে বিদারিত হয়েছে এবং ধরণীতল কম্পিত করেছে। সমস্ত পৃথিবীর আবহবিদেরা তাঁদের সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে সেই কম্পিতা ধরণীর হৃৎস্পন্দন অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন, যদিও বোমার সঠিক মাপ এখনও নির্ধারিত হয়নি—৫০, অথবা ৭৫ মেগাটন? কিন্তু তা ছাড়াও আরও একটি বোমা ঐ সপ্তাহেই প্রায় একই সঙ্গে বিদারিত হয়েছে ২২তম কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে। তার ফলে বৃহৎ গ্রানাইটে নির্মিত স্মৃতিসৌধের কবর থেকে মার্শাল ষ্ট্যালিনের শবদেহ পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হয়ে এসে ক্রেমলিনের পাদদেশে পড়েছে। বর্তমান মুহূর্তে এই বিস্ফোরণের কম্পন অনুভূত হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির হৃৎস্পন্দনে। আলবেনিয়া এবং চীন থেকে আরম্ভ করে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ইতালি পর্যন্ত বহুদূর বিস্তৃত পার্টির সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে নানাবিধ কম্পন রেখা অঙ্কিত হয়েছে। সে রেখা কোথাও হতাশার, কোথাও বিক্ষোভের, কোথাও দ্বিধার বশবর্তী। কিন্তু এই দুইটি বোমা যুগপৎ বিদারণের কি কারণ থাকতে পারে?

মিঃ ক্রুশ্চভ নিশ্চয়ই একথা জানেন যে, বিস্ফোরণ দুইটির প্রতিক্রিয়া দুই দিক থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংগঠনকে আঘাত করবে। নোভায়া জেমলিয়ার বিস্ফোরণের জন্য রাশিয়াকে পশ্চিমী শক্তিবর্গ যুদ্ধবাদী বলে চিহ্নিত করবেন এবং নিরপেক্ষদের মধ্যেও ত্রাস ও সন্দেহের সঞ্চার ঘটবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্বশান্তি সংগঠনের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরোধী এবং আণবিক অস্ত্রবিরোধী যে আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত করা হয়েছে, তা বুমেরাং-এর মতো এই বিস্ফোরণের পর রাশিয়াকেই আঘাত করবে। অন্তত সাধারণ মানুষ যে পরিমাণে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি সম্বন্ধে ত্রাসগ্রস্ত হবেন ঠিক সেই পরিমাণেই রাশিয়ার শান্তিকামিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ দেখা দেবে। সুতরাং পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী এই বিস্ফোরণের ঘটনাকে নিজেদের স্বপক্ষে প্রচারের জন্যও ব্যবহার করতে পারবেন।

অন্যদিকে ষ্ট্যালিনকে মৃত্যুর পর 'পস্‌থিউমাস' ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে বাধ্য। তাছাড়া ষ্ট্যালিন সম্পর্কে ক্রুশ্চভ যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা থেকে বহু নিরপেক্ষ লোকের মনে দুইটি প্রশ্ন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক: এক, ষ্ট্যালিনের জীবদ্দশায় তাঁর এই নির্মম পীড়ন সম্বন্ধে রাশিয়ায় কেউই যখন মুখ খুলতে পারেনি, তখন একথা গভীরভাবে চিন্তনীয় যে, এই রুশ পদ্ধতির ডিক্টেটরশিপ সাধারণ মানুষের পক্ষে কাম্য কিনা। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একদল "খুনী, পীড়নকারী এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি" (ক্রুশ্চভের ভাষা অনুসারে) ক্ষমতা দখল ক'রে, আমৃত্যু অবাধে শাসন চালাতে পারে, সে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্য যত বড় প্রসাদই থাক, শিক্ষিত, শান্তিকামী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কোনো মানুষই তাকে গ্রহণীয় মনে করবে না। দুই নম্বর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এই যে, আজ ক্রুশ্চভ ষ্ট্যালিনতত্ত্বের বিনাশ করছেন এবং ক্রুশ্চভকে হৃদয়বান এবং সরল মানুষ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু কালক্রমে তাঁর বিরোধীরা যদি কোনোদিন ক্ষমতায় আসীন হন, তাহলে ক্রুশ্চভ সম্বন্ধেও কি নূতন এবং চমকপ্রদ খুনের কাহিনী প্রকাশিত হবে? এই অদ্ভুত ডিক্টেটরশিপের প্রচারযন্ত্র থেকে প্রসূত তথ্যগুলির কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণীয়, এবং কতটুকু নয়?

এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলি অনিবার্য জেনেও ক্রুশ্চভ দুইটি বোমাই বিদীর্ণ করেছেন। কিন্তু কেন? একথা সত্য যে, ৪০ বৎসর কমিউনিষ্ট শাসনের পর রাশিয়ায় বর্তমান পার্টির ভিতরে নূতন যুগ-লক্ষণ এবং নূতন জনশ্রেণী দেখা দিচ্ছে। ষ্ট্যালিনের স্মৃতি যদি তাঁদের মধ্যে [illegible] ঘৃণিত বস্তুতে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে ষ্ট্যালিনকে মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না এবং এ নিয়ে অতিনাটকীয়তাও অনাবশ্যক। তবে কি পার্টির মধ্যে এখনও একটি শক্তিমান গোষ্ঠী আছেন, যাঁরা ষ্ট্যালিনবাদকে পুনর্জীবিত করে তুলতে চান? যাঁদের প্রতি হুমকি হিসাবে ষ্ট্যালিনের শবদেহের এই শাস্তি এবং যাঁদের থিয়োরির প্রতি আংশিক সান্ত্বনা বা স্তোকরূপে নোভায়া জেমলিয়ায় রুশ শক্তির প্রলয়ঙ্কর পরাক্রম প্রদর্শনের আয়োজন? এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে সঙ্গে একথাও নিঃসন্দেহে স্মরণীয় যে, দুইটি ঘটনাই প্রমাণ করে—ক্রুশ্চভ নিজে এবং তাঁর দলবর্তী নেতারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ষ্ট্যালিনবাদী সংঘর্ষের পথ পরিহার করে চলতে চান। মিঃ ক্রুশ্চভ এই চেষ্টায় কতখানি সাফল্যলাভ করবেন তা অবশ্য নির্ভর করে রাশিয়ার পার্টির আভ্যন্তর অবস্থার উপরে এবং সেখানে এখনও ষ্ট্যালিনপন্থীদের শক্তি কতখানি তার উপরে। অপরদিকে তাঁর সাফল্য নির্ভর করে পশ্চিমী শক্তিবর্গের আচরণের উপরেও। তাঁরা মিঃ ক্রুশ্চভকে কতখানি সফলকাম হতে দেবেন এবং কতদূর পর্যন্ত ষ্ট্যালিনবাদ বিনাশে ক্রুশ্চভকে তাঁরা সাহায্য করবেন?

ফেনিল

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

তারপর
পৃথিবীর সব রাজধানী আর একালের বন্দর নগর
চোখ থেকে মুছে গেলে, অন্ধকার ঘরে
সে তখন প্রশ্ন করে,—প্রশ্ন করে দয়িতাসম্মত মৃদু স্বরে :
কি পেয়েছি এতোকাল থেকে পৃথিবীতে? প্রশ্নের নখরে
আমি বিন্ধ পারাবত, কী দেবো উত্তর?

হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, ব্যাবিলন, প্রাচীন মিশর
মনে মনে ঘুরে আসি; মঙ্গোলীয় মরুভূমি থেকে
যারা এসেছিল নেমে গায়ে মুখে বালুঝড় মেখে,
তারা নেই। মুছে গেছে কতো রাজ্য,
কতো পথ, মানুষের নাম!

ভারত সমুদ্র থেকে প্রশান্ত সাগরে
ঢেউ ভেঙে ভেসে যেতে, ওরা তো আদরে
নিয়েছে বরণ করে! আমি ঋণ কিছু শুধলাম,—
মুখরাকে শূন্য ঘরে শয্যাংশ দিলাম।

রেশম-ওড়না টেনে রেশমী সোহাগে
চকিতে বৈরাগ্য ঢেকে হৃদয়ের গাঢ় রক্তরাগে
পুষ্পিত অধর তুললে, আমি তাকে চুম্বন দিলাম।

তারপর
পৃথিবীর সব রাজ্য, গোরস্থান এবং কবর
মনে মনে ঘুরে এসে চোখ খুললাম;
উত্তর সাগর থেকে তুষারের ফেনা
কেউ রেখে গেছে স্মৃতির ভিতর।
মুছে নিলো অন্ধকার আরো একটি নাম॥

✤

সনেট

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমার অন্তিমলগ্নে তুমি থেকো নিবিড় শিয়রে—
যদি ভীত হই, তুমি বোলো, 'মৃত্যু আমারি প্রতীক
সকলই নশ্বর মায়া।' যদি ভ্রষ্ট হই ক্ষণতরে
বোলো, 'আমাদের প্রেম মোহ নয় শুধু তাৎক্ষণিক'
স্মরণ করিয়ে দিও, যতদিন অস্তিত্ব তোমার—
এ মহা প্রস্থানচিহ্ন অশুচি হবে না বিস্মরণে।
যদি এ বিচ্ছেদ কভু মনে হয় দীর্ঘ গুরুভার
তাহলে সান্ত্বনা খুঁজো সুদিনের সুস্মিত তর্পণে।

জানি, প্রস্থানের চিহ্নে কণ্টকিত স্মৃতির প্রান্তর
গোলাপ সমর্থ নয় বাঁচাতে যা কালের অধীন
সব দৃশ্য মুছে ফেলে বিস্মৃতির বিষণ্ণ ঈশ্বর,
নিরপেক্ষ বিচারক রাখে তা-ই যা দীপ্ত স্বাধীন,
আপন ঐশ্বর্যে জ্বলে স্বমহিম সম্রাটের প্রায়।
আমি অমৃতের ভাগি ক্ষণকাল তোমার কৃপায়।

বাঘের নখের ভয়

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মন্দিরে মসজিদে আর গীর্জা প্যাগোডায়
সহস্রের অজস্র প্রার্থনা জমে জমে পর্বতপ্রমাণ।
মানবিক অধিকারও প্রতিশ্রুত যত সংবিধানে,
স্পষ্ট সেথা অক্ষরের অঙ্গুলি সঙ্কেত। পুণ্যমন্ত্র
ধ্বনিত ঋগ্বেদে, স্বস্থ উপদেশপূর্ণ কোরাণ বাইবেল।
এথেন্স-রোমের পথে ইতিহাস অচৈতন্য ঘুমে।
নানা দেশ নানা জাতি কুম্ভকর্ণ অনির্দিষ্ট কাল।
ভবিষ্যৎ স্বর্ণগর্ভা এইতো ভরসা। বাঘের নখের ভয়
সর্বত্র সমান। রক্তের যে রঙ তাও সর্বত্রই লাল।
জ্যামিতিক নির্ভুল সিদ্ধান্ত। ক্লান্তি আনে দূরপথ
দুর্গম বন্ধুর। কঙ্গোর সর্বাঙ্গে ক্ষত আত্ম লাঞ্ছনায়।
পরমাণু পরীক্ষায় সমূহ সংকট। প্রতিরোধে সংকল্প
অটল—মর্মাহত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল।

তাসের আসরে মত্ত একদল নিশ্চিন্ত আয়েসী।

পঞ্চাশ মেগাটন বোমা ফাটানোর ফলে তেজোষ্ক্রিয় ভস্মরাশি কলকাতার আকাশ থেকে কবে ঝরে পড়বে তা বলা কঠিন। কিন্তু ইতিমধ্যেই এর ফলে আমাদের সাহিত্য-জগৎ বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছেন দেখা গেল।

এ রকম যে হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ. সাহিত্যিকরা সমাজের বিবেক। বাংলা দেশের সাহিত্যিকগণ যে এই ধরনের বিপজ্জনক আণবিক পরীক্ষার ফলে চিন্তিত হবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ বাংলার শিক্ষিত সমাজও এব্যাপারে চিন্তিত। তাঁদের দুর্ভাবনাই ভাষা পেয়েছে সাহিত্যিকদের কণ্ঠে।

'পূর্বপক্ষে'র লেখক জৈমিনি দু-সপ্তাহ আগেই এ ধরনের কিছু একটা করার জন্যে সর্বপ্রথম আবেদন জানিয়েছিলেন। কাজেই বলতে গেলে তাঁর এতে খুশি হবারই কথা। কিন্তু......

হাঁ, এর মধ্যেও একটা কিন্তু আছে। বোমা ফাটানো অন্যায়, সে বিষয়ে প্রতিবাদ না জানানো অন্যায়, কিন্তু সেই প্রতিবাদের ধুয়ো ধরে হতাশা ছড়ানো আরো অন্যায়। এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে চলা উচিত। হতাশার সঙ্গে ভয়, এবং ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। সাংবাদিকতার নামে সেই হতাশকেই যেন উসকে তোলা হচ্ছে কোনো কোনো মহল থেকে।

তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, সাহিত্যিকদের প্রতিবাদের রেশ মেলাতে না মেলাতেই, সম্পাদকীয় মন্তব্যের ধূলিঝড় উঠে আবহাওয়াকে আবিল করে তুলতে চাইছে। এবং বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকেও আক্রমণ করতে দ্বিধা করা হয়নি। অধ্যাপক বসুর অপরাধ (?) তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন—বোমা ফাটানোর ফলে ভয়ের কারণ যতো বেশী বলে প্রচারিত হচ্ছে আসলে কিন্তু ততটা নয়। এবং কলকাতার আকাশে তেজো-

ষ্ক্রিয় ভস্মরাশি এখন যা পাওয়া যাচ্ছে তার উৎসও সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ নয়, ৫৮ সালের প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিস্ফোরণ। এ কথায় কেন যে পত্রিকা-বিশেষ এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তা বোঝা কঠিন। ভারত সরকার এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রে থেকেও তো এই একই কথা জানা যাচ্ছে—উপস্থিত তেজোষ্ক্রিয়তার পরিমাণ অত্যন্তই নগণ্য এবং তা বিপদসীমার অনেক নিচে। কাজেই বোমা নিয়ে ক্রমাগত এমন হাতুড়ি-পেটার হেতু কী তা আমরা বুঝতে অক্ষম। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, এটা যে খুবই ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা সকলেই জানি, বন্যার পিছনে যেমন দেখা দেয় মহামারী তেমনি যুদ্ধের বিষয়ে আতঙ্ক যখন সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে, তখনি উপস্থিত হয় যুদ্ধ। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ওয়র সাইকসিস' সেটা যুদ্ধেরই অগ্রদূত। সন্দেহ হচ্ছে, আমরা বোধহয় নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই ফাঁদেই জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি। নয়তো শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বসু যখন তাঁর জীবনব্যাপী বিজ্ঞানসাধনা এবং মানবহিতৈষণার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বলেন, হতাশ হওয়া উচিত নয়—মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে অজস্র রকম প্রতিকূলতাকে জয় করেই ক্রমবিকাশের বর্তমান স্তরে উপস্থিত হয়েছে, তখন সেই ঋষিকল্প আশ্বাস-বাণীকেও কেন খেলো প্রতিপন্ন করার জন্যে সম্পাদকীয় কলম উদগ্র হয়ে ওঠে? কাজেই আশংকা হচ্ছে, কোথায় যেন এর মধ্যে একটা চালাকি আছে এবং সেই চালাকি আমাদের দিয়ে এক মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের নামে বোধকরি অন্য কোনো জটিলতার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু জৈমিনির স্থিরবিশ্বাস বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিছুতেই নিজেদের এভাবে জড়িত হতে দেবেন না। বিশেষত, জাতিপুঞ্জের বর্তমান অধিবেশনে ভারতের নেতৃত্বে আণবিক পরীক্ষা বন্ধের যে প্রস্তাব গৃহীত হল তার বিরুদ্ধে এক অশ্রুতপূর্ব মিতালিতে রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের একজোট হতে দেখে বাংলার সমস্ত সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই বুঝবেন, পঞ্চাশ মেগাটনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার গ্যারান্টি নয়; আণবিক অস্ত্রসজ্জিত উপরোক্ত চারটি দেশকেই নিরস্ত এবং নিরস্ত্র করতে না পারলে বিপদ কেবল ক্ষেত্র পরিবর্তন করবে, তাকে নির্মূল করা যাবে না।

কাজেই আমাদের অত্যন্ত সতর্কতা ও সাহসের সঙ্গে কর্তব্য নির্ধারণ করা দরকার। বোমার বিপদকে তুচ্ছ করার কথা উঠছে না, কিন্তু অযথা বাড়িয়েই না বলব কেন? শত্রুকে তার শক্তির যথার্থ পটভূমিতে দেখলেই তাকে পরাভূত করা সম্ভব। বাড়িয়ে দেখলে আসে আত্মঘাতী নিবীর্যতা, কমিয়ে দেখলে নামে চরম প্রতিঘাত। দুটি পথই ধ্বংসের। তাই জৈমিনির অনুরোধ, ভারত সরকার এবং আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যে বলেছেন বর্তমানে তেজোষ্ক্রিয় ভস্মরাশির বিষয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, সে তথ্য মেনে নেওয়াই ভালো। আর তারপর হাতপা গুটিয়ে বসে না থেকে প্রকৃত আশাবাদীর মতো এমন একটা দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়া দরকার যাতে জাগ্রত জনমতের সমর্থনে ভারত সরকারের কণ্ঠস্বর আরো শক্তিশালী হয়, এবং আণবিক অস্ত্রধারী চারটি দেশই ভারতের বক্তব্যে কর্ণপাত করতে বাধ্য হয়।

* * *

'বাবা, আমায় একটা তাসা দেবে?' আমার তিন বছরের ছেলে অনুরোধ জানাল।

'না খোকন, এখন কি তাস খেলে? অন্য কিছু খেল গে।'

'বাঃ তাস কেন? আমি তো তাসা চাইলাম—বাজাব!'

চেয়ে দেখি, পেছনে তার বড় দুই ভাইও এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের চোখেও নীরব সমর্থন।

একটু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললাম, 'ছি, ছি ওসব আবার কেউ বাজায় নাকি? যেমন বাজনা, তেমনি তার সঙ্গে নাচ। ওসব নিয়ে মাতে যতো সব বাজে ছোকরাগুলো।'

'তা কেন,' একাদশবর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মন্তব্য করল, 'এই তো সেদিন ভাসানের সময় বিল্টুদা, সমরদারা কেমন মজা করে নাচতে নাচতে গেল!'

কনিষ্ঠটি তৎক্ষণাৎ হাত তুলে নাচতে শুরু করল—'ঝিনঝিন তাকা তাকা, ঝিনঝিন তাকা তাকা।' তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দেখে শিউরে উঠলাম। একেবারে হুবহু অনুকরণ। হা ঈশ্বর, শেষে আমারই বাড়ীতে এই!

যাই হোক, ইতিমধ্যে এক বন্ধু এসে পড়ায় তখনকার মতো অব্যাহতি পেলাম। কিন্তু এখন বসে ভাবছি, এ ব্যাধির প্রতিকার কোথায়? ঐ দামামা-পেটানো বাজনা এলই বা কোথা থেকে, আর কেনই বা দেখতে দেখতে সেটা কচুরি-পানার মতো ছেয়ে গেল সারা দেশে?

বলতেই হবে, ক্ষেত্রটা খুবই তৈরী ছিল। নয়তো এমন রুচিহীন বাজনা, এবং ততোধিক অশ্লীল নাচ কী ক'রে এমন জনপ্রিয় হ'য়ে উঠল? বাজনাটার দ্রুততাল একঘেয়েমির মধ্যে যে একটা আরণ্যক পরিবেশ ফুটে ওঠে, নাচটির নপুংসক অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে যে রকম বীভৎসতা দেখা দেয়, তাই কি আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের একাংশে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করল?

কিন্তু এর চোরা ঢেউ যে এসে লাগছে আমাদের পরিবারের কেন্দ্রস্থলটিতে, তার কি উপায়? নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার আগেই এ বিষয়ে একটা আইন পাশ করা যায় না?

ট্রামে-বাসে এবং সিনেমা-থিয়েটারে ধূমপান বন্ধ করার জন্যে যদি আইনের আশ্রয় নেওয়া গিয়ে থাকে তো এ ব্যাপারেই বা যাবে না কেন?

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯৬০ সালের আরম্ভে কলিকাতায় এক পাঞ্জাবী চিত্রকার তাঁহার চিত্রাবলীর এক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন Artistry House নামক প্রতিষ্ঠানে। আমি তখন বিশেষ দুর্বল, নিদারুণ নিউমোনিয়া রোগে মাসাধিক ভুগিবার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে আসিতেছি। কয়েকজন স্নেহভাজন শিল্পপ্রেমীর কাছে ঐ পাঞ্জাবী শিল্পীর চিত্রাবলীর প্রশংসা শুনিয়া ইচ্ছা হয় যে একদিন স্বচক্ষে দেখিয়া আসি। অনেক কষ্টে ডাক্তারের অনুমতি আদায় করিবার পর সেখানে যাই। আরেক দেখিবার কারণ ছিল এই যে কলিকাতার শিল্প সমালোচকের অনেকেই সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন যে ঐ শিল্পীর চিত্রে মেক্সিকোর শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট—তবে সেটা প্রাচীন মেক্সিকোর শিল্পের না আধুনিক মেক্সিকান চিত্রকারদের প্রভাব সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। সুতরাং স্বচক্ষে না দেখিলে সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না বুঝিয়াই দেখিবার ইচ্ছা হয়।

এখানেই বলা উচিত যে আমি মেক্সিকোর শিল্পের—কি প্রাচীন, কি নূতন—কোন ধারার সম্পর্কেই অভিজ্ঞ নহি। তবে, শিল্পের সচিত্র ইতিহাস মারফৎ প্রাচীন মেক্সিকোর শিল্পের সম্পর্কে এবং বিদেশী (সচিত্র) শিল্প-কলা সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে আধুনিক মেক্সিকান চিত্রকারদিগের শিল্পের সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমার আছে। প্রদর্শনীতে চিত্রাবলী দেখিবার পর, বহু চেষ্টাতেও আমি এই পাঞ্জাবী শিল্পীর চিত্রে মেক্সিকান প্রভাবের কিছুই পাইলাম না—পাইলাম পাঞ্জাবের বিভাগ-জনিত অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির জ্বলন্ত অনুভূতি এবং চিত্রকারের অতীন্দ্রিয় লোকে অভিযানের পরিচিতি—যাহা কোনও দেশের একচেটিয়া নহে, আমাদের দেশীয় ও বিদেশী বিদগ্ধ চূড়ামণিগণ ও শিল্পজ্যোতিষ্কগণ যাহাই বলুন না কেন। অবশ্য এই শিল্পী মেক্সিকো গিয়াছিলেন এবং সেই কারণে তাঁহার শিল্পে মেক্সিকান প্রভাব হইতে বাধ্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপে গিয়াছিলেন ও বিদেশী পুস্তক পড়িয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার সাহিত্য গৌড়ীয় ভাষায় ইয়োরোপীয় সাহিত্যেরই পাঠান্তর এবং যেমন বশিষ্ঠ চীনে গিয়াছিলেন সুতরাং যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ চৈনীক মহাকাব্যেরই সংস্কৃত পাঠান্তর। ইহাই আমাদের আধুনিক সমালোচক ও শিল্প-সাহিত্য বিশ্লেষণ-কারিদিগের জ্ঞান ও গবেষণার পদ্ধতি ও পরিচয়।

পাঞ্জাবী শিল্পী শ্রীসতীশ গুজরাল ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে প্রত্যেকটি ছবি দুই-তিনবার দেখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বলি যে, আমি মেক্সিকান প্রভাব খুঁজিতেছি। শিল্পী প্রথম যৌবনে কর্ণরোগে আক্রান্ত হওয়ায় বধির হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী শিক্ষিতা এবং তাঁহার কথা তাঁহার স্বামী lip-reading—অর্থাৎ ঠোঁটের চলনে—বুঝিতে পারেন, সুতরাং প্রশ্ন করিতেছিলেন শিল্পী এবং আমার উত্তর তাঁহার স্ত্রী বুঝিয়া লইয়া স্বামীকে বলিতেছিলেন। যেখানে ঠেকিতেছিল সেখানে লিখিয়া দিতে হইতেছিল। আমি যখন বলিলাম মেক্সিকান প্রভাব খুঁজিতেছি তখন দুজনেই প্রশ্ন করেন আমি কোন কোন ছবিতে তাহার কতটা পরিচয় পাইয়াছি। আমি কোথায়ও তাহার কিছু পাই নাই বলায় গুজরাল বলেন যে, তার আগের বৎসরে তিনি নিউইয়র্কে যখন তাঁহার চিত্রাবলী প্রদর্শন করেন তাহার অল্প পূর্বেই সেখানে আধুনিক মেক্সিকান শিল্পের ও চিত্রের প্রদর্শনী হয়। কিন্তু কোনও আমেরিকান শিল্পবিদ বা চিত্রসমালোচক তাঁহার—অর্থাৎ গুজরালের—চিত্রে মেক্সিকান প্রভাবের কিছু দেখেন নাই।

আমি কি দেখিতে পাইয়াছি প্রশ্ন করায় আমি যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে শিল্পী ও তাঁহার স্ত্রী নানা প্রশ্ন করেন। ঐভাবে একজনের মারফৎ আর একজনকে বুঝাইতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া আমার স্ত্রী কন্যারা বলেন, শিল্পী দম্পতিকে আমার এখানে নিমন্ত্রণ করিতে। সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দুইজনে আমার বাসস্থলে আসেন এবং আমার চিত্র সংগ্রহ দেখেন। তাহার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলী দেখিয়া সতীশ গুজরাল বলেন যে, তাঁহার মতে অবনীন্দ্রনাথ

Revivalist ও গগনেন্দ্রনাথ Creative artist হিসাবে ভারতীয় চিত্রকরদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য।

এখন কিছুকাল যাবৎ আমাদের ভারতীয় শিল্পকলা ও সাহিত্যের অতি ক্ষুদ্র জগতে "উঁচু মাথা নীচু" করার উদাম খুবই সশব্দে ও সজোরে ঘোষিত হইতেছে। আজ বিশ্বকবিকেও ঐ ক্ষুদ্র জগতের অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি কূপমণ্ডূক বৃথা চেষ্টা করিতেছে তাহাদের উৎক্ষিপ্ত ক্লেদবারিতে কলুষিত করার জন্য। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঐ ভাবেই আক্রান্ত হইয়াছিলেন বহুপূর্বে এবং তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার শিল্পকলাকে নানা অবজ্ঞাসূচক বিশেষণে কলুষিত করা হয়, যাহার মধ্যে Revivalist শব্দটির প্রয়োগ অনেকবার অনেকেই করেন।

আমি সেইজন্য শ্রীগুজরালের মুখে সেই Revivalist শব্দ শুনিয়া প্রশ্ন করি যে তিনি Revivalist বলিতে কি বুঝেন এবং কি অর্থে তিনি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলাকে Revivalist art বলেন। উত্তরে শ্রীগুজরাল বলেন যে, প্রাচীন শিল্পকলার ধারা যিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাকেই তিনি Revivalist বলেন এবং সেই কারণে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে ঐ আখ্যা দিয়াছেন। একথা বলিয়াই তিনি বলেন অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী হিসাবে স্থান "is no less important and significant therefore, than of any other artist of the present age in India." অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের আসন বর্তমান যুগের ভারতীয় শিল্পীদিগের মধ্যে কাহারও চাইতে নীচে নয়। আমি সতীশ গুজরালের উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম যে তিনি প্রকৃত শিল্পসাধক এবং নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস থাকায় ও কোনও হীনমনোবৃত্তিযুক্ত তথাকথিত শিল্পরসিকের চাটুবাক্যের জন্য লালায়িত না হওয়ায় শিল্পের বিষয়ে বিচার-বিবেচনার স্বাধীন ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন নাই।

বাস্তব পক্ষে শিল্পজগতে—বিশেষে ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান কোথায় তাহার বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হয় আমাদের শিল্পকলা বিচার-পদ্ধতির মূলে কি তত্ত্ব, কি শিল্প সংকেত, কি সংজ্ঞা আছে, যাহার বশে আমরা শিল্পকলার শ্রেণী বিচার, জাতি বিচার ইত্যাদি করিয়া থাকি। Revivalist Art, Creative Art, Representational Art, Abstract Art ইত্যাদি সবই বিদেশী সংজ্ঞা এবং সে সকল শ্রেণী বিভাগের মূলে নানা বিদেশী শিল্পরসিক ও সাধকেরা নিজ-নিজ রচিত বিশেষ-বিশেষ সূত্র ও ধারা নিরূপণ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। কিন্তু সেই সূত্র ও ধারাগুলি কোনদিনই সর্ববাদীসম্মত ছিল না বা সেগুলির মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য (axiomatic truth) বা চিরন্তন (Constants) বলিয়া গ্রাহ্য কিছু দাঁড়ায় নাই। বৈদেশীক শিল্প সমালোচনা ও শ্রেণী বিভাগের মধ্যে শুধু যেটুকু পদ্ধতিমূলক বা মাধ্যমজাত (basis of technique or medium) যেমন etching, painting, silver-point, বা oil-colour, water colour, tempera ইত্যাদি, সেইটুকুই মতামতের বা বিচারের অতীত। অন্যদিকে শ্রেণী বিভাগ (Classification) বা শিল্পের ধারা নির্ণয় (School) এতো হয় দেশকাল পাত্র হিসাবে নির্ণীত—যথা Renaissance, Early Italian Primitives, Romanesque Art, Gothic Art ইত্যাদি নয়তো শিল্পী গোষ্ঠী প্রবর্তিত ধারার ভিত্তিতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথা Pre-Raphaelite School, French Surrealists, British Abstract Expressionists, Polish Moderns ইত্যাদি। এগুলির বাহিরে যাহা কিছু আমরা পাই সে প্রায় সবই বিভিন্ন শিল্পরসিকের বা সমালোচকের—কোন কোনও ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিল্পীর—মতামত। তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য যতটা বিভেদ বা বিবাদ তদপেক্ষা অনেক বেশী। Roger Fry Clive Bell-এর মধ্যে মতামতের পার্থক্যের কথা তো তাঁহাদেরই শিল্পবিচার সম্বন্ধীয় পুস্তকে ও প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, আজ যাঁহার মত ও বিচার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গৃহীত, কাল তাঁহার গুণীজন মধ্যে আসনই পড়ে না। Pre-Raphaelite-দিগের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ সমর্থন আসে John Ruskin-এর লেখনী হইতে, আজ সে মতবাদ গ্রাহ্য কোথায়? Clive Bell-এর "Significant form"এর অন্বেষণ আজ কোন শিল্পরসিক করেন?

কিন্তু তবুও এই পাশ্চাত্য শিল্পচর্চা বা সমালোচনার পিছনে গভীর সমীক্ষা ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। বহু তথ্য চিন্তা, সূক্ষ্মভাবের শিল্পবিচারে দীর্ঘকালের গবেষণা এবং শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ও সম্যক পরিচয় না থাকিলে পাশ্চাত্য শিল্পজগতে সমালোচক বা বিশেষজ্ঞ হওয়া চলে না। সেখানে শিল্প সমীক্ষায় বা সমালোচনায় যুক্তিতর্ক বা বিচার বিশ্লেষণ যে ভাবে উপস্থিত করা হয় তাহাতে তথ্য বিচার সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, ও যুক্তি তর্কের ধারা সুসংবদ্ধ হওয়া নিতান্তই আবশ্যক এবং দুইয়েরই মূলে প্রামাণ্য সাক্ষ্য থাকা চাই। নহিলে সেই সমালোচক বা শিল্পবিদের প্রতিষ্ঠা ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য। অন্যদিকে যাঁহাদের সমালোচনা বা মতবাদের পিছনে দীর্ঘদিনের শিল্পতত্ত্ব অন্বেষণের এবং রসজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার খ্যাতি আছে তাঁহাদের মতবাদ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কখনই হয় না, কেন না যে সকল মৌলিক যুক্তির উপর উহা প্রতিষ্ঠিত তাহার সারাংশ প্রামাণ্য বলিয়াই গৃহীত হয়।

পাশ্চাত্য জগতে শিল্পকলার ধারা কিভাবে, কোন্ পথে ও কবে চলিয়াছিল এবং তাহার অসংখ্য ধারার পরিণতি কোথায় কেমনভাবে হয়, সে বিষয়ে অসংখ্য গুণী ও জ্ঞানী রসবেত্তা প্রামাণ্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া ইতিহাস ও তথ্যপূর্ণ অসংখ্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সে কারণে শিল্পচর্চায় তত্ত্ব ও তথ্য কোনটারই অভাব সেখানে নাই এবং সে জন্যই যদি কোনও মতবাদ বা সমালোচনা তথ্যমূলক না হয় অথবা তাহার যুক্তিতর্ক প্রামাণ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাহার ফাঁকি ধরা পড়িতে দেরী হয় না।

শিল্পকলার বিস্তীর্ণ জগতে রূপ-রসের জ্ঞান ও অনুভূতি লাভ যে দীর্ঘদিনের একাগ্র সাধনা বিনা সম্ভব নয় একথা এখন পাশ্চাত্য শিল্পজগতে সর্বজনজ্ঞাত। সুতরাং সেখানে, কি শিল্পবস্তুর ক্ষেত্রে কি শিল্পতত্ত্বের মতবাদে, মেকীর চলন সহজ নয়। সমালোচনা তীব্র ও বিরূপ হইতে পারে, মতবাদ চলিত ধারণা-বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু সেই সমালোচনা নিপুণ বিশ্লেষণ ও যুক্তিসংগত বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই, নূতন মতবাদের ভিত্তি যে বিষয়বস্তু ও শিল্পতত্ত্ব ও তথ্যের উপর স্থাপিত তাহা গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভ হওয়া চাই, নহিলে সংগে সংগে তাহার খণ্ডন ও অসারতা প্রমাণ অনিবার্য। ইহার কারণ এই যে, শিল্পতত্ত্বের বিচার ও তাহার তথ্যের বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা পাশ্চাত্য জগতে দীর্ঘকাল যাবৎ বহু গুণী ও জ্ঞানীজনে করিয়া আসিতেছেন, যাহার ফলে শিল্পতত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশ সেখানে সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীরভাবে হইয়াছে। শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা, প্রথা ও শাখার আঙ্গিক, রীতি-পদ্ধতি ও বিশেষত্ব সেখানে সূক্ষ্ম

ও নিপুণ বিচারে নির্ণয় করা হইয়াছে ও হইতেছে। এমন কি শিল্পকলায় যাহা কিছু অতীন্দ্রিয়ের পর্যায়ে পড়ে (intangibles in art) তাহারও অনুভূতি বিকাশের ইঙ্গিত এখন শুধু তুকতাক ও গৈবীজ্ঞানের উপর ন্যস্ত নাই। তাহাও এখন পরীক্ষা ও প্রমাণ সাপেক্ষ।

আর আমাদের দেশে? এখানে শিল্পকলার বিচার তো সবেমাত্র সেদিন আরম্ভ হইয়াছে। খৃঃ বিংশ শতকের আরম্ভ যখন হয় তখন পর্যন্ত তো ইংরাজ তথা ইয়োরোপীয়েরা আমাদের বুঝাইতেছিলেন যে শিল্পকলার বিষয়ে আমাদের দেশ ধূসর মরুভূমিতুল্য। হিন্দু আমলে তো খিলান-গম্বুজ পর্যন্ত আমাদের স্থাপত্যে ছিল না, ছবিতে বিকৃত পরিপ্রেক্ষিত, বীভৎস দেহ-মুখ-অবয়ব ও বিকট বর্ণযোজন এবং ভাস্কর্যে তদনুরূপ অস্বাভাবিক ও অসম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যোজনা আমাদের আদিম অসভ্যতার পরিচায়ক। তাঁহাদের মতে মুঘল আমলে বিদেশী বণিক, ধর্মযাজক ও যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা আসে। তাহাদের মধ্যে এক ভবঘুরে ইটালীয় ভিক্ষু তাজমহল তৈয়ারী করে। আর এক ইটালীয় সেকরা দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাসের কারুকার্য করে এবং সবশেষে ইংরাজেরা আসিয়া দয়াপরবশ হইয়া আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিষয়ে—এবং অন্য সকল দিকে—শিক্ষা দীক্ষা দিয়া মানুষ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এবং সেই শিক্ষা দীক্ষার সব কিছুতেই ছিল পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ—বিশেষ করিয়া শিল্পকলা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিষয়ে। তখনকার দিনে কতকগুলি পটুয়া ও চিত্রকার কোন প্রকারে অনাদৃত অবস্থায় দিন কাটাইত, হয় মন্দির দেউল ও তীর্থভূমির আশ্রয়ে নয়ত দেশীয় রাজন্যবর্গের কৃপায়।

এই তো ছিল অবস্থা, যখন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা আরম্ভ হয়। এই দুইজনের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথই প্রথমে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির যাহা চিরন্তন সত্তা, সেই রসচেতনার উৎসের সন্ধানে একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় শিল্প-কলায় ভারতীয় বিভিন্ন ধারার প্রকাশ, রূপরসধ্যানের মূর্ত সাধন, এই সকলের রীতি ও প্রথা অনুযায়ী চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি, ইহাই ছিল তাঁহার সন্ধান ও সাধনার লক্ষ্য। এবং সেই সাধনার ফলেই ভারতে শিল্পকলার ক্ষেত্রে নবচেতনার উদয় হয়। সেই নব-চেতনারই ফলে আজ ভারতে ললিত-কলার প্রবাহ বহুমুখী হইয়া নানা দিকে ও নানা রূপে নতুন ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে। অবনীন্দ্রনাথের এই অদম্য প্রয়াস ও উদ্যোগের ফলে ভারতের নিজস্ব প্রতিভা জাগ্রত না হইলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না এবং শুধু সেই জন্যই ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে তিনি আচার্যরূপে সম্মানিত এবং ভারতীয় শিল্পচেতনার প্রাচীন ও সনাতন হোমশিখার রক্ষক আহিতাগ্নি-রূপে পূজ্য।

কত বড় সাধনার ফলে এ দেশের লোকের পাশ্চাত্যের মোহবন্ধন ছেদ করিয়া ঘরের লক্ষ্মীর নির্মল ও শুচিত্বের দিকে মুখ ফিরান সম্ভব হয় সেকথা যাঁহাদের স্মরণ আছে তাঁহারাই বুঝিবেন শিল্পীগুরু রূপে কেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বর্তমান শিল্প-জগতের প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পীর সশ্রদ্ধ স্মৃতিতর্পণের অধিকারী। কি বুঝিবে তাহার মর্ম সেই গুণধরের দল যাহাদের কোনও যোগ নাই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরাত্মার সহিত, যাহারা কথার বাজারে মেকী চালাইয়া গুণীর অপযশ কীর্তনে ও নিজের গুণপনার প্রচারে শতমুখ?

তারপর আসে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিল্পসৃষ্টির কথা। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ একদল শিল্প সমালোচক অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্পর্কে নানা বিপরীত মন্তব্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের শিল্পতত্ত্ব বা প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান বা অধিকার আছে তাঁহারা বলেন, অবনীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র প্রাচীন রীতি ও পন্থার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অগ্রগতি কোন্ পথে ও কি ভাবে হইবে তাহার নির্দেশ তাঁহার নিজস্ব চিত্রকলা হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের বিচার শুধুমাত্র শিল্প-ব্যাকরণের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং সেই কারণেই উহাতে তর্কের অবকাশ আছে। কেননা উহা অসম্পূর্ণ বিবেচনার ফল। কেন তাহা বলিতেছি।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের শিল্পকলা বিষয়ে এখনও সম্যক বিচার বা বিশ্লেষণ হয় নাই। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন ধারার শিল্পকলার রীতি, পদ্ধতি ও আঙ্গিক বিচার অতি দুরূহ ব্যাপার। বিদেশে বহু বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিন যাবৎ অশেষ ধৈর্যের সহিত, এক এক প্রকার শিল্পকলার বহু নিদর্শন অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই পরীক্ষার মূলে একদিকে যেমন আছে অসংখ্য নিদর্শন, যাহার সময়কাল শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠীর নাম এবং শিল্প পদ্ধতি ও রীতি, সন্দেহের অতীতভাবে নির্ণীত আছে এবং সেই শিল্পকলার উপকরণ সম্পর্কেও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত তথ্য আছে, অন্য দিকে আছে পরীক্ষকদিগের দীর্ঘ-দিনের ব্যবহারিক শিক্ষালব্ধ, তথ্যমূলক জ্ঞান, অনুভূতি ও সুতীক্ষ্ম ও দক্ষ চক্ষু। শুধু অনুভূতির বশে শিল্পকলার জাতি, শ্রেণী, পর্যায় বা সময়কাল বিচার পাশ্চাত্য দেশে গ্রাহ্য নয় এবং শিল্পকলা-বিদের অভিজ্ঞতা পূর্ণাঙ্গ কিনা তাহার উপর তাহার বিচারের সমীচীনতা নির্ভর করে।

আমাদের দেশে ঐভাবে শিল্পকলার সমীক্ষণ বা বিশ্লেষণের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। যেভাবে শিল্পকলার বিচার এতদিন হইয়াছে তাহা শুধু চাক্ষুষ বীক্ষণ ও অনুভূতির উপর নির্ভরের ভিত্তিতে স্থাপিত। বলা বাহুল্য, এইরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত যে বিচার তাহার চতুর্দিকেই ফাঁক এবং বিচারের মূলে যে সকল শিল্পকলার সূত্র আমাদের বিশেষজ্ঞরা দাঁড় করাইতে চাহিতেছেন তাহার কোন কিছুই সুসংবদ্ধ বা সম্পূর্ণ নহে। সূত্রই যেখানে অসম্পূর্ণ সেখানে ব্যাকরণই বা কোথায় এবং আঙ্গিক বিচারই বা হইবে কিসের বশে? সুতরাং অবনীন্দ্র-নাথের নিজস্ব রচনার মধ্যে নতুন পথের কি ইঙ্গিত আছে বা না আছে, তাহার নির্ণয় দুইভাবে সম্ভব। প্রথম পথে তাঁহার চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং তাহার ফলাফলের নিকষে বিচার করিতে হয় যে সেগুলিতে নতুন পন্থা বা নতুন পদ্ধতির কোনও পরিচয় আছে কিনা। দ্বিতীয় (ও সহজ) পথে তাঁহার শিল্পকলা সম্বন্ধীয় লিখিত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নিজস্ব চিত্রকলা বীক্ষণ করা প্রয়োজন।

অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন বা নবীন, দেশী বা বিদেশী, কোন কিছুর অনু-করণের বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, শিল্পীর যাত্রাপথে প্রাচীন প্রথা ও রীতি চোরা-বালির মত এবং tradition লোষ্ট্রবৎ, এগুলির পাশ কাটাইলে তবে যাত্রাপথ সুগম হয়। ভারতীয় শিল্প-কলার প্রাচীন নীতি অনুসারে তিনি শিষ্যদের শিখাইয়াছিলেন যে, শিল্পীর দৃষ্টি অন্তর্মুখী হওয়াই শ্রেয় এবং মানসচক্ষে কল্পিত চিত্রের আলেখ্যই ভারতীয় শিল্পকলার বিচারে শ্রেষ্ঠ আসনের যোগ্য। এই নীতি ছাড়া শিল্পীর যাত্রাপথে কোনও অন্তরায় কোনও বন্ধন দিতে তিনি রাজী ছিলেন না। গতানুগতিক ছবি আঁকা—কি বিষয়বস্তু হিসাবে, কি রীতি পদ্ধতির পর্যায়ে—তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন একথা তাঁহার সকল শিষ্য, সকল অনু-রাগী বন্ধু জানিতেন ও জানেন এবং তাঁহার রচিত চিত্রাবলীতেও ঐ মতের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

অবনীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় ললিতকলার প্রবাহে প্রাচীন ভারতীয়, মুঘল ও রাজপুত-কাংড়া ইত্যাদি পরবর্তী ধারার ত্রিস্রোতের সংমিশ্রণ পূর্ণরূপে থাকা প্রয়োজন, নাহিলে স্রোত-ধারা ক্ষীণ মন্দগতি হইবেই। সেই কারণে তাঁহার ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর চিত্রাবলীতে ঐ তিন ধারারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু চিত্রে পূর্ব-কালের কোনও শিল্পধারার আঙ্গিকের স্পষ্ট নির্দেশ আছে অতএব উহা অন্ধ অনুকরণ মাত্র এবং শিল্পশাস্ত্রীদের মতে উহা অধোগামী মনোবৃত্তির (decadence) পরিচায়ক একথা যেমন ভ্রান্ত ঠিক ততটাই উদ্ভট। রেমব্রাণ্টের চিত্রকলায়, পিছনের জমির আলোছায়ার বর্ণবিন্যাসে (chiaro-scuro) মুঘল চিত্রকারদিগের পন্থার অনুসরণ (অনুকরণ নহে) সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই প্রথায় চিত্রের সম্মুখাংশের বিষয়বস্তু জাগিয়া উঠে বলিয়া তিনি মুঘল ও পারস্য দেশের চিত্রাবলীর পন্থা গ্রহণ করেন, একথা তাঁহার জীবনী লেখকের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুঘল আঙ্গিক আছে বলিয়া তাঁহার চিত্রে বর্ণসংকর দোষ আসিয়াছিল এবং সেই কারণে উহা অধোগামী ও খেলো, এ কথা তো কোনও পাশ্চাত্য শিল্পবিদ্ মুখেও আনেন নাই এবং আজও তাঁহার চিত্র বিক্রয় হয়—সোনার নহে—হীরার ওজনে।

অবনীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ সম্পর্কে তাঁহার প্রিয় ও কৃতী শিষ্য অসিতকুমার হালদার বলেনঃ—

"কোনো কিছুর অনুকরণ, দেশী হোক্, বিলাতি হোক্, অবনীন্দ্রনাথ মোটেই পছন্দ করতেন না। দেশের আর্টের ঐতিহ্যবোধের দ্বারা দেশের নিজস্ব প্রগতির অনুসরণ ক'রে (অনুকরণ করে নয়) মৌলিক রচনা করাই তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য হ'ল। সূর্য যেমন রশ্মির দ্বারা সারা সংসারের বিভিন্ন ভাল মন্দ দ্রব্য থেকে রস গ্রহণ করে এবং তারপর রসধারা বর্ষণ করে, তেমনি অবনীন্দ্রনাথও চাইতেন সারা ভারতবর্ষের আর্টের রস-গ্রহণ দ্বারা তাঁর ছাত্রেরা নিজেদের বিমল-চৈতন্যকে জাগ্রত এবং মনঃ-কল্পনায় মৌলিক চিত্র রচনা করবেন।"

অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিত্রকলার সম্পর্কে অসিতকুমার বলিয়াছেনঃ—

"অবনীন্দ্রনাথের নিজের বিশেষ যে দান আধুনিক চিত্রকলায় তার কথা

আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার। অবনীন্দ্রনাথ প্রথমেই রাজপুত-কাংড়া ধরণের সাদা রঙ সব রঙে গুলে 'টেম্পারায়' ছবি আঁকতে যদিও আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তার অস্থায়িত্ব এবং গতানুগতিকতা তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। তাঁর অতিথি তিনজন জাপানী চিত্রকারদের কাজ যখন দেখলেন এদের প্রণালীতেও তাঁর মন ভরেনি। কেননা জাপানীরা কেবল একবার দুবার মাত্র জলে কাগজ বা সিল্ক ভিজিয়ে প্রথমে চীনা কালিতে হালকা করে এঁকে তার উপর তুলি দিয়ে অন্যান্য রঙের পোঁচপাঁচ দেয়। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সুরঞ্জ কবি, চিত্র অঙ্কনে তিনি দিতে চান প্রকৃতির বুকে সকল ঋতুতে সন্ধ্যা, সকাল, রাত্রি যে রঙের বিচিত্র সুরলীলা দেয় তাকেই চিত্রে লীলায়িত করতে। সেই বিচিত্র রঙের সুর ফুটিয়ে তোলার জন্যে তিনি অভিনব ও অনুপম এক নিজস্ব রীতি আবিষ্কার করলেন বহু রঙে পরের পর ছাপিয়ে নিয়ে ছবি এঁকে। যে সকল দর্শকের মন রঙিন সুরে বাঁধা নেই তাঁরা এই প্রকার বিচিত্র রঙের সুরে গ্রথিত চিত্র দেখলে ধাঁধায় পড়লেন। কিন্তু এই অভিনব রীতি অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যেরা তাঁর নিকট শিক্ষা করে প্রাচীনকালের প্রথার গতানুগতিকতার হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন। তাঁরা জোর পেলেন ঐতিহাসিক পৌরাণিক ও গৃহস্থ জীবনের সকল বিষয় চিত্র আঁকতে, বহু বিচিত্র বর্ণে। এইভাবে ভারতীয় চিত্র-কলার স্রোত, যা' অন্তঃসলিলা নদীর মত লুক্কায়িত ছিল তা' চলমান হয়ে উঠলো শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা।"

যাঁহাদের ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের গতিপথের সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আছে বা যাঁহাদের সত্য সত্যই ললিতকলা পর্যায়ে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানলিপ্সা আছে, তাঁহাদের নিকট নিবেদন এইমাত্র যে, যাহা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলার সাধনা বিষয়ে লিখিত ও উদ্ধৃত হইল, তাহার সত্যাসত্যের নিদর্শন তাঁহারা নিশ্চয়ই পাইবেন, যদি তাঁহারা শিল্পী-গুরুর নিজস্ব চিত্রকলার বীক্ষণ সাক্ষাৎ-ভাবে করেন। ইহার অধিক জ্ঞানী ও গুণীজনকে বলিবার প্রয়োজন নাই।

বাকী রহিলেন সেই সকল বিদগ্ধ-চূড়ামণিগণ, যাঁহাদের পেশাই হইল লেখনীর অপপ্রয়োগ—"কুঁদুলে" ও দজ্জাল স্ত্রীলোকের করধৃত শতমুখীর ন্যায়। ইঁহাদের সমালোচনায় মণকরা অর্ধ ছটাকও সত্য বা সার পদার্থ পাওয়া যায় না, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা তো দূরের কথা। ইঁহাদের একজন পঞ্চাশের মন্বন্তরের বৎসরে প্রকাশিত Long-man's Miscellany নামক ইংরেজী পুস্তকে শিল্পী, যামিনী রায়ের প্রশস্তির নামে অবনীন্দ্র প্রমুখ শিল্পী গোষ্ঠীর সম্পর্কে 'খেউড়' গাহিয়াছেন। বড় বড় ইংরাজী শব্দের উল্টাপাল্টা প্রয়োগ তো আছেই—যথা প্রবন্ধের আরম্ভেই আছে— The ancients pro-claimed that reality was an antimony.... এখন antimony অর্থাৎ রসাঞ্জন একটি অতি উত্তম মৌলিক ধাতু। ইহার রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের প্রয়োগ হয় কালাজ্বরে এবং সারগর্ভ ও অসার সকল প্রবন্ধই ছাপা হয় যে টাইপে তাহারও মিশ্রধাতু প্রস্তুত হয় ইহারই প্রয়োগে, এবং ধাতু হিসাবে ইহা নিশ্চয়ই reality অর্থাৎ বাস্তবের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু উহা ভিন্ন reality সম্পর্কে প্রাচীনগণ antimony প্রয়োগ কোথায় করিয়াছেন তাহা ঐ বিদ্বৎবরেরই জানা ছিল। ইহা মুদ্রাকর প্রমাদ নহে, কেননা প্রবন্ধের আরম্ভেই ইহার স্থান, যেখানে প্রুফ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে।

দীর্ঘদিন পূর্বে লিখিত ঐ প্রবন্ধের আলোচনা এখানে করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু কিভাবে যুক্তির নামে ও তথ্যের বদলে, মেকী চালাইয়া গুণীর অপমান এই শ্রেণীর ধুরন্ধরেরা করিয়া আসিতে-ছেন তাহা দেখাইবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই এখানে বলা হইল।

আজও শিল্পকলার বিষয়ে এদেশে সুস্থ সবল ও স্বাবলম্বী নহে। এখনও বিদেশীর মতামতের উপর আমাদের অধিকতর নির্ভর। তাহার কারণ এ দেশের শিল্পচেতনা এখনও জাগ্রত হয় নাই এবং দেশের সেই অর্ধসুপ্ত অবস্থায় যে জোর গলায় চীৎকার করিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করে তাহারই মতামত বাজারে চলে। জাগ্রত হইলে দেশের লোক বুঝিবে যে উঁহাদের মতামতের মূল্য কি। এবং তখন লোকে বুঝিবে যে, শিল্পকলার জগতে ভারতীয় শিল্পী যাহা কিছু সামান্য মর্যাদা আজ পায় তাহার পিছনে আছে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনা। সেই স্বীকৃতি ঐ যুগপ্রবর্তককে না দিলে আমাদের সাংস্কৃতিক দৈন্যই জগতে ঘোষিত হইবে।
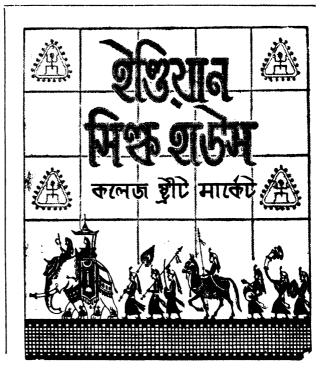
॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ যন্ত্ররচিত স্বরলিপি ॥

এই পৃষ্ঠায় যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তা কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নয়। তা হচ্ছে একটি সংগীতের স্বরলিপি। এবং এই স্বরলিপিটি যদি কোনো সংগীতজ্ঞের রচনা হত তবে বিজ্ঞানের কথার স্তম্ভে এ নিয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন ঘটত না। স্বরলিপিটি যন্ত্ররচিত। সংগীতজ্ঞ পাঠকরা স্বরলিপিটি বাজিয়ে দেখতে পারেন। বীঠোফেন বা মোৎসার্টের পাশে ঠাঁই না হলেও সরাসরি বাতিলের পর্যায়েও ফেলা চলবে না।

যে যন্ত্রে এই স্বরলিপিটি রচিত হয়েছে তার নাম ইলেকট্রনিক কম্পিউটর। যন্ত্রের নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে যন্ত্রটি ইলেকট্রনিক—আধুনিক ইলেকট্রন বিজ্ঞানের একটি অবদান। আর কম্পিউটর শব্দটি শুনে বোঝা যাচ্ছে যে এই যন্ত্রের সাহায্যে হিসেবনিকেশ করা চলে। ডেস্ক্ ক্যালকুলেটর বা কমটোমিটার যাঁরা দেখেছেন তাঁরা হয়তো ধারণা করে বসবেন, ইলেকট্রনিক কম্পিউটর এ-ধরনের যন্ত্রেরই একটি বৃহত্তর সংস্করণ।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটরকে সহজ বাংলায় বলা চলে ইলেকট্রনের সাহায্যে অঙ্ক কষার যন্ত্র। খুব ছোটখাটো ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের সাহায্যেও সেকেণ্ডে আটশোটি যোগ বা বিয়োগ হতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বা নদী-পরিকল্পনায় বা এমনি ধরনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এমন সব গাণিতিক সমাধানের প্রয়োজন হয় যেখানে মানুষের পক্ষে শুধু হাতে আঁক কষে সমাধানে পৌঁছতে পারাটা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ইলেকট্রনিক কম্পিউটর এ-ধরনের অঙ্ক কষার জন্যেও কয়েক ঘণ্টার বেশি সময় নেবে না।

আর এই অঙ্ক-কষার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করেই ইলেকট্রনিক কম্পিউটর ভবিষ্যতের আশ্চর্য সব ক্রিয়াকাণ্ডের নায়ক হয়ে উঠবে। অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়তার মূলে রয়েছে এই ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ভবিষ্যতের মস্ত মস্ত কারখানা এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দ্বারাই চালিত হবে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের রোবোট মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করবে, মোটর গাড়ির ড্রাইভারের আসনে বসে নিখুঁতভাবে গাড়ি চালাবে এবং আরো নানাভাবে মানুষের কায়িক পরিশ্রমকে লাঘব করবে।

একজন স্টেনোগ্রাফার বিশেষ একটি সাংকেতিক পদ্ধতিতে মুখের কথাকে লিপিবদ্ধ করতে পারে। পরে সেই সাংকেতিক লিপিকে ভাষায় রূপান্তরিত করার সময় প্রয়োজন মতো ভাষাকে মার্জিতও করতে পারে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে, এই শ্রুতি-লিখনের কাজটির জন্যে একজন মানুষকেই চাই। সেই মানুষটি প্রয়োজন মতো টাইপরাইটার বা এ-ধরনের কোনো যন্ত্রের সাহায্য নিতে পারে, কিন্তু তাকে মগজও খাটাতে হবে। পুরো কাজটি পুরোপুরিভাবে যন্ত্রের সাহায্যে করার কথা এতদিন কেউ ভাবত না।

কিন্তু হালের গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে, এমন যন্ত্র নির্মাণ করাও সম্ভব যা মুখের কথাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে এবং প্রয়োজন মতো ভাষাকে পর্যন্ত মার্জিত করে হাজির করতে পারে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ-ধরনের যন্ত্র প্রচুর সংখ্যায় নির্মিত হলে স্টেনোগ্রাফারের পদের জন্যে চাকুরি-খালির বিজ্ঞাপন দেবার আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করাটাও এতদিন পর্যন্ত একান্তভাবেই মানবিক কাজ বলে মনে করা হত। কিন্তু হালে এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্রও তৈরি হয়েছে যা মগজওলা মানুষের মতোই ভাষান্তরের কাজ করতে পারে। রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারেও এই যন্ত্র অভিজ্ঞ ডাক্তারের স্থলাভিষিক্ত হবে—এমন সম্ভাবনাকেও এখন আর অবাস্তব মনে করা হয় না।

কিন্তু যন্ত্রের কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়। হালের গবেষণা থেকে আরো জানা যাচ্ছে, শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টির একান্ত মানবিক এলাকাটিও এই যন্ত্রের অনধিগম্য নয়। এমন যন্ত্র তৈরি হয়েছে যা গদ্য বা পদ্য রচনা লিখতে পারে, ছবি আঁকতে পারে ও সুরসৃষ্টি করতে পারে। যন্ত্রের লেখা কবিতা নাকি আধুনিক কবিতার চেয়ে কোনো অংশেই হীন নয়। যন্ত্রের আঁকা ছবি নাকি আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের সমগোত্রীয়। যন্ত্রের তৈরী সুর নাকি অনেক রসজ্ঞ শ্রোতাকেও মুগ্ধ করেছে।

অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যন্ত্র আর শুধু যান্ত্রিক থাকছে না, সৃজনশীল ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হচ্ছে।

সৃষ্টি বা সৃজনশীল ভূমিকা বলতে আমরা কী বুঝব? পরিবেশ থেকে যে নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাকে পুরোপুরি আয়ত্ত ও বিশ্লেষণ করার মধ্যে দিয়ে একটি সমাধানে পৌঁছতে পারার নামই সৃষ্টি। যদি এই সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, যন্ত্রেরও সৃজনশীল ভূমিকা আছে। কারণ এই যন্ত্রও সমাধানে পৌঁছয় ঠিক অনেকটা মানুষের মতোই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে। এমন যন্ত্র সত্যিই তৈরি হয়েছে যা বিশেষ একটি প্রোগ্রামের ভিত্তিতে নিজের লক্ষ্য নিজেই স্থির করে এবং তা করতে গিয়ে ক্রমেই দক্ষতা অর্জন করে ও ক্রমেই নিপুণ হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ, যন্ত্র যেন আর জড় থাকছে না, যান্ত্রিকও নয়, মানুষের মতোই মগজেরও পরিচয় দিতে পারছে। তারপরে যদি এই যন্ত্র কবিতাও লিখতে শুরু করে আর গানও রচনা করতে থাকে—তবে তো মানুষের আর কিছুই করার থাকে না।

কথাটা তা নয়। মানুষের সৃজনশীল ভূমিকাটি ঠিকই থাকবে। যতোদিন না মানুষ হুবহু একটি মানুষকেই তার গবেষণাগারে তৈরী করতে পারছে ততোদিন এই সৃজনশীল ভূমিকা শেষ হবার নয়। তবে যন্ত্র নিশ্চয়ই মানুষকে তার সৃজনশীল ভূমিকার ক্ষেত্রে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। এই সহায়তা মানুষের সৃজনশীল ভূমিকাকেই মহত্তর করে তুলবে।

[উপন্যাস]

—এক—

ভোরের দিকে বেশ খানিক ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গেল। রেখে গেল সর্বাঙ্গ-জোড়া অবসাদ। নির্মলার মনে হল, শুধু দেহ নয়, তার মনের জোড়-গুলোও যেন সব খুলে গেছে। সমস্ত রাত ধরে তন্দ্রা ও জাগরণের ফাঁকে ফাঁকে যে অন্তহীন ভাবনার ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এই মুহূর্তে সব যেন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দুটো কথাকেও এক জায়গায় গুছিয়ে তোলা যাচ্ছে না।

জ্বরের একটা নিজস্ব উত্তেজনা আছে। দেহের উত্তাপ মন এবং মস্তিষ্ককেও তাতিয়ে তোলে, অবাধ কল্পনার রাশ খুলে দেয়। নির্মলার জ্বরতপ্ত মুহূর্তগুলো নানা রঙে রঙীন হয়ে উঠেছিল। অতীতকে ভুলিয়ে দিয়ে, বর্তমানকে অগ্রাহ্য করে এমন একটা স্বপ্নলোকে নিয়ে গিয়েছিল তাকে, সুস্থ দেহে যেখানে সে কখনো পৌঁছতে পারত না। সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে মনে হয়েছিল, জীবনে একটার পর একটা যত ঝড় এসেছে, সব মিথ্যা; এই যে খোলার ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর নোংরা বিছানায় পড়ে সে ছটফট করছে, ঘুমন্ত কচি ছেলেটা আদুল গায়ে গুটিশুটি হয়ে পড়ে আছে এক পাশে, পাঁজরের হাড়গুলো গোনা যায়, পেটটা মিশে গেছে পিঠের সঙ্গে, এ সমস্তই মায়া। এক দিন সব কোথায় মিলিয়ে যাবে। খোকা বড় হতে যে-কটা দিন বাকী। তারপর একে একে সব হবে, সেই কুমারী-জীবন থেকে যা ছিল তার স্বপ্ন। ভদ্র পরিবেশে ছোট্ট সুন্দর পরিচ্ছন্ন একখানা বাড়ি। খোকার একটা ভাল চাকরি...একটি ফুটফুটে বউ...। যে সাধ, আকাঙ্ক্ষা স্বামীকে দিয়ে মেটে নি, ছেলে তা পূরণ করে দেবে।

জ্বর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিটাও কোথায় হারিয়ে গেল। অপরিসর জীর্ণ ঘরখানার চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নির্মলার মনে হল মনটা যেন অসাড় হয়ে পড়েছে। ছেলেটা গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে চলে গেছে। টেনে এনে ছেঁড়া কাঁথাখানা গায়ে তুলে দেবে, হাতের সে জোর-টুকুও নেই। অথচ এমন করে পড়ে থাকাও চলে না। পর পর চারদিন বেরোতে পারেনি। কাজটুকু আছে কিনা, কে জানে? না যদি থাকে, তাদের দোষ দেওয়া যায় না। বড় লোকের বড় সংসার। ঘর ধোয়া বাসন মাজা কাপড় কাচা—কাজ তো কম নয়। বেশি কমের কথা বাদ দিলেও এ সব তাদের অভ্যাস নেই। একটা বেলা হয়তো কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারে, কিন্তু চার চার দিন! যেমন করে হোক, আজ একবার যেতেই হবে। উঠতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি। অনেকখানি পথ। যেতে যেতে যদি ভিরমি লাগে, কে সামলাবে? রাস্তায় পড়ে মরে থাকলেও কেউ জানতে পারবে না। একবার ভাবল, খোকাকে সঙ্গে করে গেলে কেমন হয়। পরক্ষণেই মনে মনে মাথা নেড়ে বলল, তা হয় না। মা তার পরের বাড়ির ঝি, কলতলায় বসে বাসন মাজে, খোকা এখনো জানে না। সে জানে, মা ওদের বাড়িতে মেয়েদের সেলাই শেখায়। মা ও ছেলের মাঝখানে এই মিথ্যার আবরণটুকু যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এটা যদি উঠে যায় ছেলের মুখের দিকে সে তাকাবে কেমন করে? মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এটা তার দুর্বলতা, মিথ্যা মর্যাদার অসঙ্গত মোহ। মা হয়ে ছেলের সঙ্গে এই লুকোচুরি শুধু অশোভন নয়, অন্যায়। তবু পারেনি। সংসারে সকলের কাছে সে ছোট হতে পারে, কিন্তু খোকার কাছে পারে না। শুধু তাই নয়। মায়ের এই সত্য পরিচয়ের রূঢ় আঘাত ঐ শিশুমন সইবে কেমন করে? মুখে হয়তো কিছু বলবে না। কিন্তু ঐ সরল স্বচ্ছ চোখদুটিতে যে নির্মম প্রশ্ন ফুটে উঠবে, তার কী উত্তর দেবে নির্মলা? তার চেয়ে থাক না এই অসত্যের অন্তরাল। খোকার জন্যে সে সব পারে, ত্যাগ করতে পারে সত্যকেও।

জানালার ফাঁক দিয়ে আরব্ধ দিনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে চার-দিক থেকে নিত্য পরিচিত সাড়া-শব্দ—বস্তী-মানুষের জীবন-সংগ্রামের প্রস্তুতি। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। রান্না-পর্বের আয়োজন চলছে ওদিকের কোন্ ঘরে। কলের গোড়ায় হাঁড়ি কলসির ঠুনঠুন, বালতির হাতলের ঝনাৎকার। সে সব ছাপিয়ে কানে আসছে বেসুরো ভাঙ্গা গলায় একটানা 'জয় সিয়ারাম।' একখানি জীর্ণ গামছা সম্বল করে কলের তলায় সশব্দে স্নানে নেমেছে ভগলু কাহার। মেয়েরা বাধ্য হয়ে সরে গেছে। কিন্তু বেশীক্ষণ সরে থাকবে, তার উপায় কী? ঐ লৌহযন্ত্রের ক্ষীণ-জলধারার সঙ্গে সকলেরই প্রাণের যোগ। ওকে কেন্দ্র করেই শুরু হবে এতগুলো মানুষের জীবিকা-যাত্রা। ওরই অগ্রাধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি। শুধু বেঁচে থাকবার দুরন্ত তাগিদ। তার কাছে হার মানে রুচি, মাথা নোয়ায় শালীনতা, খুলে পড়ে ভব্যতার আবরণ। তাই অর্ধোলঙ্গ, অশিষ্ট ভগলু কাহারের পাশে দাঁড়িয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে অমার্জিত ভাষায় কলহ বাধায় সম্ভ্রান্ত

ভদ্রবংশের একদা-অন্তঃপুরিকা মাধবী সেন কিংবা নির্মলা ভট্টাচার্য।

মাথা তুলে ঘরের কোণে দাঁড়-করানো বালতিটার দিকে তাকিয়ে দেখল নির্মলা। খটখটে শুকনো। খাবার জলের মাটির কলসিটাও প্রায় তাই। দুটোকেই ভরে আনতে হবে। আজ আর সে শক্তি তার নেই। অথচ দেরি হলে আর-একটা নিরম্বু দিন, অন্ততঃ একটা বেলা তো বটেই। ও বেলার ভরসাও অনিশ্চিত। তাই খোকাকেই যেতে হবে। কাজটা যে কত কঠিন, বিশেষ করে ঐ লাজুক, ভীরু, দুর্বল ছেলেটার পক্ষে, সবই সে জানে। তবু উপায় নেই। ক্ষীণ-কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিয়ে ডাকল নির্মলা, খোকা, খোকারে। একবার ওঠ, বাবা।

কার্তিকের শেষ। কাঁথাখানা জড়িয়ে দেবার পর আরাম পেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল খোকা। দু-এক ডাকে ভোরের ঘুম ভাঙবার কথা নয়। নির্মলা সরে এসে একটু নাড়া দিতেই ঘুমের ঘোরে কী সব বলে অস্ফুট প্রতিবাদ জানাল। নির্মলা ঝুঁকে পড়ে ছেলের মুখে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলল, বেলা হয়েছে ওঠ।

খোকা চোখ মেলে তাকাল। এদিক-ওদিক চেয়ে বিরক্তির সুরে বলল, কোথায় বেলা হয়েছে? কত অন্ধকার।

—অন্ধকার কিরে! ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখ। এখনি রোদ উঠবে।

খোকা কপাল কুঞ্চিত করে উঠে বসল। তারপর মায়ের হাতখানা ধরে খুশী গলায় চেঁচিয়ে উঠল, মা, তোমার জ্বর ছেড়ে গেছে। হাতটা কেমন ঠাণ্ডা, দ্যাখ।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ; দ্যাখনা?

আরেকটা হাতে ছেলের কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে নির্মলা বলল, আচ্ছা, এবার চট করে এক বালতি জল নিয়ে আয় দিকিন।

খোকার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। অন্যদিন হলে হয়তো খানিকটা আপত্তি জানাত। আজ আর কোনো কথা বলল না। ঘরের কোণ থেকে বালতিটা নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। নির্মলাকেও উঠতে হল। তিনদিন পেটে প্রায় কিছুই পড়েনি। এ অবস্থায় অতখানি পথ যাওয়া অসম্ভব। একবার ভাবল, দুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে খেয়ে তারপর বেরোবে। কিন্তু এমনিতেই যা দেরি হয়ে গেছে, তারপর আর অতটা সময় নষ্ট করা চলে না। তাছাড়া, আজই সবে জ্বর ছাড়ল, ভাত খাওয়া হয়তো ঠিক হবে না। টিনে মুড়ি আছে, তাই দুটো চিবিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি হোক বেরিয়ে পড়া। খোকা এলে তাকেও দুটো দিতে হবে। এ কদিন বিন্দুর মা দুবেলা ডেকে নিয়ে খেতে দিয়েছেন ছেলেটাকে; ওর জন্যেও বার্লি করে পাঠিয়েছেন। আজ সে ফিরে এসে নিজেই রাঁধবে। পরের উপর আর কতদিন নির্ভর করা চলে। ও'রা অবশ্য লোক খুব ভাল। আপদে বিপদে বরাবর দেখাশুনো করে আসছেন। তবু টানাটানির সংসার। ও'দের উপর আর চাপ দেওয়া যায় না। যদিও, বিন্দুকে ডেকে নির্মলাও দু-একদিন রান্না করে খাইয়েছে খোকার পাশে বসিয়ে। বিন্দুর বাবা ওর হাতের রান্নার খুব তারিফ করেন শুনে, মাঝে মাঝে ঝোলটা শুকতোটা পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁর নাম করে। তাঁরাও পাঠিয়েছেন এটা-সেটা। তবু সে আর এ আলাদা জিনিস। সে দেওয়ানেওয়ার ছিল অপ্রয়োজনের আনন্দ, আর এতে রয়েছে প্রয়োজনের গ্লানি। যার হাত থেকেই হোক, বাধ্য হয়ে যে নেওয়া, তার মধ্যে ভিক্ষার দীনতা জড়িয়ে থাকে।

এতক্ষণ যা কিছু করছিল সব মনের জোরে। রাস্তায় বেরিয়েই বুঝতে পারল নির্মলা, তার একটা সীমা আছে। সে জোর আর যাই পারুক, এই অশক্ত দুর্বল দেহটাকে টেনে নিয়ে মনিবের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারবে না। কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। ঠিক সময় বুঝে একটা খালি রিক্সা যাচ্ছিল তার পাশ দিয়ে। তার মিষ্টি ঘণ্টার আবেদনটুকু কানে যেতেই হাঁটু-দুটো যেন আরো অবশ হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হাতে ঠেকল আঁচলে বাঁধা ছোট্ট একটি গাঁট—এক টুকরা নোট আর তার পাশে কয়েক আনা রেজগি। এই তার সম্বল, তার চলমান ধনভাণ্ডার। এর একটা অংশ যখন বেরিয়ে যাবে রিক্সা-বিলাসের দক্ষিণার রূপ ধরে, এই গ্রন্থিটি তখন কী রূপ নেবে, মনে মনে একবার ভেবে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে এরই মত মনটাও তার চুপসে গেল। তবু নিতান্ত বেপরোয়াভাবেই রিক্সাটাতে উঠে পড়ল। চলতে চলতে ঠোঁটের কোণে জেগে উঠল কী এক ধরনের কৌতুক-হাসির ঝলক। গাড়ি করে ঝি চলেছে

পরের বাড়ি বাসন মাজতে। আশে-পাশের লোকগুলো যদি বুঝতে পারত, দৃশ্যটা উপভোগ করত নিশ্চয়ই।

ইচ্ছা ছিল, দু-এক বাড়ি আগেই নেমে পড়বে। কিন্তু থামাতে না থামাতে রিক্সাটা একেবারে মনিবের দরজায় এসে পড়ল। চাকর সঙ্গে করে বাবু যাচ্ছিলেন বাজার করতে। রিক্সা থেকে নামবার আগেই চোখোচোখি হয়ে গেল। একবার তাকিয়েই মাথা নোয়াল নির্মলা। কী ছিল মনিব এবং তাঁর ভৃত্যের চোখে? বিস্ময় না তার সঙ্গে মেশানো কিঞ্চিৎ কৌতুক!

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ল কলতলায়। সেই চেনা বাসনের স্তূপ, তার পাশে কাজ করছে নতুন মানুষ। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল একবার। তার পরেই ভাবল, নিশ্চয়ই ঠিকা লোক: কাজ তো চালিয়ে নিতেই হবে। গৃহিণী সামনেই ছিলেন। অপ্রসন্ন মুখে বললেন, কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন?

—জ্বরে পড়েছিলাম কদিন।

—তা একটা খবর তো দিতে হয়। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, এ রকম কামাই করলে গেরস্তের চলে কি করে?

—খবর আর কাকে দিয়ে দেবো, মা? কে আছে আমার?

—কেন, তোমার ছেলেকেও তো একবার পাঠাতে পারতে।

নির্মলা চুপ করে রইল। ছেলেকে যে এখানে পাঠানো চলে না, সে কথা এ'দের বলবে কেমন করে?

গৃহিণী বললেন, মাইনেটা ও মাসের গোড়াতে এসে নিয়ে যেও।

নির্মলা চমকে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, মাইনে নিতে আসিনি মা। কাল থেকে কাজে আসব, তাই বলতে এলাম। বলেন তো আজ থেকেও—

—আমরা লোক রেখে দিয়েছি।

—বরাবরের মত?

—হ্যাঁ। তোমার আশায় আর কদ্দিন বসে থাকব বল?

গৃহিণী আর দাঁড়ালেন না। একটু ব্যস্ত হয়েই রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

নির্মলার চোখের সামনে সমস্ত বাড়িটা দুলে উঠল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির উপর বসে পড়ে দুহাতে মেঝেটা চেপে ধরল। একটু সামলে নিয়েই মনে পড়ল, আর বসে থেকে লাভ নেই, রোদ চড়বার আগেই বেরিয়ে পড়া দরকার।

কিছুক্ষণ পরেই বাবু বাজার করে ফিরলেন।

একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে গৃহিণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার পুরনো ঝিটিকে দেখলাম যেন?

—হ্যাঁ; এসেছিলেন দয়া করে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন গৃহিণী, তোমার সঙ্গে দেখা হল কোথায়?

—এইখানেই, দোরের সামনে।

নির্মলার চোখের সামনে সমস্ত বাড়িটা দুলে উঠল।

—এখনো দাঁড়িয়ে আছে নাকি? আমি যে বললাম চলে যেতে।

—না, এখন নয়। সেই যখন বাজারে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আসছে।

চাকরটির পেটের মধ্যে তখন থেকেই অদম্য কৌতুকরস উথলে উঠছিল। আর চেপে রাখতে পারল না। বাবুর কথার পৃষ্ঠে যোগ করল, রিক্সা করে আসছিল, মা।

রিক্সা করে! বাজার গোছাতে গোছাতে হঠাৎ গভীর বিস্ময়ে মুখ তুললেন গৃহিণী। বারান্দার ওধারে দাঁড়িয়ে বুরুশ হাতে দাঁত মাজছিল মেয়ে। বছর পনের বয়স, ইস্কুলে উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। বলে উঠল, এতে আর অবাক হবার কি আছে? অসুখ করলে এতটা পথ হেঁটে আসবে কি করে?

—তুই থাম, ধমকে উঠলেন গৃহিণী, অসুখ না হাতি। নিশ্চয়ই অন্য কোথাও কাজ করছে। ওদের কি? একটা টাকা বেশি পেলেই ছুটবে সেখানে।

—কাজ পেলে আর আসবে কেন পয়সা খরচ করে ?

কর্তার মুখে মৃদু প্রতিবাদ শোনা গেল।

—মাইনে নিতে হবে না? ঝাঁঝিয়ে উঠলেন গৃহিণী।

—মাইনে চাইছিল নাকি?

—চাইবার আগেই সে পথ মেরে দিলাম। আমার সঙ্গে চালাকি? বললাম, মাস কাবারে এসো।

—সামান্য কটা টাকা; দিয়ে দিলেই পারতে।

—কেন আমাদের এত গরজ কিসের যে সেধে টাকা দিতে যাবো?

—না; গরজটা আমাদের নয়, ওর।

—আর তোমার বোধ হয় তার চেয়েও বেশী, শ্লেষ-তিক্ত কণ্ঠে বিষ মিশিয়ে বললেন গৃহিণী, বেশ তো তোমার অফিসে দাও না একটা চাকরি করে? কলতলা থেকে একেবারে চেয়ার-টেবিলে গিয়ে বসুক।

কর্তা চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়ালেন। গিন্নীর কথার মধ্যে যে হুল ছিল, সেটা যেন লক্ষ্যই করেননি, এমনিভাবে সহজ সুরে বললেন, ততটা লেখাপড়া ওর জানা থাকলে চেষ্টা করতাম বৈকি? একটি ভদ্রঘরের দুঃস্থ-বিধবা পেটের দায়ে আমাদের বাড়িতে বাসন মাজছে, এটা আমাদের পক্ষেও গৌরবের কথা নয়।

গৃহিণী জবাব দিলেন না, গুম হয়ে বসে রইলেন। ঠাকুর এসে একটা কি জিজ্ঞাসা করতেই সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়লেন, জানিনে, যাও। একটা কাজও কি নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে পার না? সব আমাকে বলে দিতে হবে?

কার্তিকের কড়া রোদ। শুধু কড়া নয়, তার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা গায়ে লাগলে সুস্থ লোকের শরীরেও কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব জেগে ওঠে। ডান হাতখানা অজ্ঞাতসারে চলে যায় বাঁ হাতের কব্জিতে। নাড়ির গতিটা কি একটু চঞ্চল? হাতের কাছে থার্মোমিটার থাকলে কেউ কেউ বগলে লাগিয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পারার রেখাটা পরীক্ষা করেন। একটু যেন পেরিয়ে গেছে 'নর্মাল'-লাইন।

নির্মলা পথ চলতে চলতে বারবার কপালে হাতের উল্টো পিঠটা ঠেকিয়ে দেখছিল। আবার যদি জ্বর আসে ছেলেটাকে নিয়ে নির্জলা উপবাস ছাড়া অন্য পথ নেই। নতুন কাজ কতদিনে জুটবে কে জানে? জুটবে কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

একটানা পথ চলতে গিয়ে পা দুটো আর উঠতে চাইছে না। মাঝে মাঝে মাথাটা এমন ঘুরে উঠছে, যে কোনো সময়ে টলে পড়ে যেতে পারে। তবু হাঁটতে হবে। রিক্সার পিছনে কয়েক আনা পয়সা দণ্ড দিয়ে নিজের উপর নিজেরই ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এই কি তার গাড়ি চড়বার সময়? একটি পয়সাও যে তার কাছে আজ বহুমূল্য।

বস্তী-অঞ্চল। রাস্তায় কোথাও ছায়া নেই। মাথা উঁচু করে নেই কোনো বড় বড় বাড়ি, যার ধার ঘেঁষে চলতে গেলে রোদের হাত থেকে মাথাটা বাঁচান যায়। মাঝে মাঝে দুটো একটা গাছ। তারই কোলে একটুখানি ছায়া। খানিকটা করে বসে, একটু করে জিরিয়ে নিয়ে, ধীরে ধীরে বহু কষ্টে ভেঙ্গেপড়া শরীরটাকে টানতে টানতে যখন সে বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। ছেলেটা এতক্ষণ কী করছে কে জানে? সেই কোন্ সকালে দুটো মুড়ি হাতে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ক্ষিধেয় ছুটফট করছে নিশ্চয়ই। কোন রকমে গিয়ে পেঁছতে পারলেই সব কাজ ফেলে আগে দুটো চাল ফুটিয়ে দেবে। কিন্তু পথ যেন আর শেষ হতে জানে না।

বাড়ির কাছে আসতেই একটা চেঁচামিচির আওয়াজ কানে এল। এ কি! এ যে তারই ঘরের সামনে! অজানা আশঙ্কায় নির্মলার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। জটলাটা নেহাত ছোট নয়। তার মধ্যে হারুর মার গলাটাই সবার উপরে। একটা কিছু উপলক্ষ করে পাড়া কাঁপিয়ে তুলতে এই স্ত্রীলোকটির জোড়া নেই। একটা ছেলে আছে, খোকার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়, কিন্তু দেখতে সমবয়সী; এরই মধ্যে রীতিমত বখাটে হয়ে উঠেছে। তাকে নিয়েই বেশী ভয়। দলে পড়ে ছেলেটা না বিগড়ে যায়। বস্তী-জীবনের সব চেয়ে বড় বিপদ তো সেইখানেই। চারদিকের এই নোংরা ছোঁয়াচ থেকে একটি কচি ছেলেকে কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

নির্মলাকে দেখতে পাওয়ামাত্র রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে এগিয়ে এল হারুর মা। গলাটাকে সপ্তমে চড়িয়ে বলল, বলি, তোমাদের জন্যে কি পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে? এদিকে তো শুনি ভদ্দরনোক। তা ভদ্দরনোকের ঘরে এ রকম ডাকাত জম্মায় বাবার বয়সেও শুনিনি।

—কী হয়েছে? কোনো রকমে দম নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল নির্মলা।

—কী হয়েছে, নিজের চোখেই দ্যাখ, আমি বলতে গেলে বলবে বানিয়ে বলছি। বলে, প্রায় ছুটে গিয়ে ভিড়ের ভিতর থেকে হারুর হাত ধরে টানতে টানতে এনে দাঁড় করিয়ে দিল নির্মলার সামনে। কপালের উপরে খানিকটা জায়গা একটু ফুলে উঠেছে। কেটেও গেছে একটুখানি, তার পাশে রক্তের দাগ।

নির্মলা সেদিকে একবার তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে হারুকে প্রশ্ন করল, কেমন করে লাগল?

উত্তর দিল তার মা, 'কেমন করে, জিজ্ঞেস কর তোমার সোনার চাঁদ ছেলেকে।'

—খোকা লাগিয়ে দিয়েছে?

—লাগিয়ে দেবে কেন? ওপাশ থেকে বলে উঠল কে একজন, খেলতে খেলতে লেগে গেছে। ছেলেপিলের কাণ্ড! ও রকম একটু-আধটু লেগেই থাকে।

—'এর নাম একটু-আধটু!' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তার দিকে বাক্যবাণ চালাল হারুর মা, আর একটু হলে যে একটা চোখই উড়ে যেত।

—'ঈস! তাই তো', এগিয়ে এসে হারুর চিবুক ধরে মুখটা তুলে ধরল কোনো দরদী প্রতিবেশিনী, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে চোখটা। কী খুনে ছেলেরে বাবা!

নির্মলার মাথায় আগুন চড়ে গেল। রোগ, অনাহার, এই রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ পথের ক্লান্তি, শূন্য ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা—একসঙ্গে জড়ো হয়ে জ্বালিয়ে তুলল দাবানল এবং তার সব-গুলোশিখা ধাওয়া করল একটি অসহায় শিশুর দিকে।

'কোথায় সে বাঁদর?' জ্বলন্ত চোখ-দুটো চারদিকে ঘুরিয়ে হিংস্র কণ্ঠে বলল নির্মলা।

'—থাক, এই ভর দুপুরবেলা আর রাগারাগি করতে হবে না। চল ঘরে চল।' বলতে বলতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা এসে নির্মলার হাত ধরলেন, 'পরে এক সময়ে বকে-টকে দিস। তোমরা এখন বাড়ি যাও। ছেলের মাথায় একটু জলপটি দাও গে, হারুর মা। হঠাৎ লেগে গেছে, এখন আর কী করা যাবে।'

—না, আপনি ছাড়ুন, মাসিমা। ওটাকে শেষ না করে আমার শান্তি নেই। কোথায় গেল হারামজাদা?

—'ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে', হারুই হদিস দিল।

নির্মলা ছুটল ঘরের দিকে। বিছানাপত্র তোলা থাকে যে কোণটায়, তার আড়াল থেকে চুলের মুঠি ধরে ছেলেকে বারান্দায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'কেন মেরেছিস হারুকে?'

—আমি মারিনি।

—খালি খালি কেটে গেছে, না?

—গুলি লেগে কেটেছে।

—গুলি লেগে!

মজা দেখতে এগিয়ে এসে ভিড় করেছিল যে-সব ছেলের পাল তার, ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, ড্যাংগুলি খেলছিল ওরা।

নির্মলা গর্জে উঠল, 'আবার ড্যাংগুলি? মানা করে দিয়েছি না ঐ চাষাড়ে খেলা খেলতে?'

'আমি যেতে চাইনি', দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে কান্নার সুরে বলল খোকা, 'ও এসে জোর করে—'

—'জোর করে!' গালের উপর ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল নির্মলা। সরু সরু আঙুলগুলো যেন কেটে বসে গেল কচি মাংসের উপর। মায়ের হাতে মার খাওয়া খোকার অভ্যাস নেই। মায়ের এই হিংস্র মূর্তিও কখনো দেখেনি। তাই কাঁদতে ভুলে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে রইল। নির্মলার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। 'যা মানা করবো, তাই তুই করবি?' বলে আরেকবার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। মেয়েদের মধ্যে দু-একজন উঠে এসে বাধা দিল, 'আহা! মেরে ফেলবে নাকি ছেলেটাকে?'

—ও আপদ মরলে তো আমি বাঁচি, আমার হাড় জুড়োয়— বলে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল। বেদনার্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, একশবার বলেছি, মিশবি না ওদের সঙ্গে। একটা কথা শোনে না আমার! কী হবে ঐ ছেলে দিয়ে? যা; তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। মুখ দেখতে চাই না তোর।

মায়ের হাতের কঠিন আঘাত, তা সে যতই নির্মম হোক, খোকা মুখ বুজে সয়ে নিয়েছিল, কিন্তু মায়ের মুখে এত বড় আঘাত সইতে পারল না। মা তার মুখ দেখবে না—মুখ ফুটে বলা এই শেষ কথাটাই সব চেয়ে কঠোর হয়ে বাজল তার শিশুমনের মাঝখানে। এতক্ষণে তার দু চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জলের ধারা। কণ্ঠ চেপে ধরল দুর্জয় অভিমান। মায়ের মুখের দিকে একটিবার চোখ তুলে তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। বিন্দুর মা এসে পড়েছিলেন। পিছন থেকে ডাকলেন, 'কোথায় যাস? ও খোকা, শোন, শোন।'

ততক্ষণে সে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা
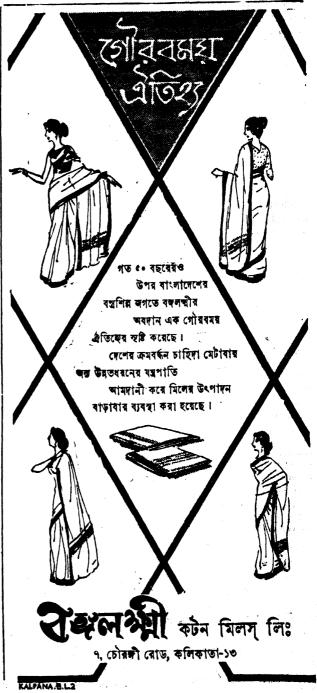
বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের নিরাপত্তা

শ্যামল চক্রবর্তী

এই বৎসর সাহিত্য আকাদেমীর বিচারে বাংলা সাহিত্যের কোন বই পুরস্কৃত হয়নি। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ওপর এই আঘাত চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সাহিত্য-পত্রিকাগুলি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। এই ঘোষণায় বাংলা দেশের সাহিত্যমোদীরা ক্ষুব্ধ, দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করেছেন। রবীন্দ্র-শতবর্ষে এই ঘোষণায় মনে হচ্ছে আকাদেমী যেন ইচ্ছে করেই বাংলা সাহিত্যকে সর্বসমক্ষে হেয় করতে চাইছেন। সেইজন্যেই বাংলা সাহিত্য ও এই সাহিত্যের রথের চাকা যাঁরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের সম্বন্ধে আজ ভাববার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি।

একটা জাতিকে চেনা যায় তার সৃষ্ট-সাহিত্যের মাধ্যমে। আর সেই সাহিত্যসৃষ্টির উৎসই হলেন সাহিত্যিকরা। তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার সাহিত্যিকদের মানসিক পরিবেশটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই কথাই সর্বাগ্রে ভাবা দরকার। কারণ মানসিক পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর না হলে সৎসাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। লিউ টলস্টয় এই সম্বন্ধে সুন্দর করে বলেছেন যে—"This is a most illuminating defination, especially for the creative writer" টলস্টয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে আর এক জায়গায় বলেছেন—যে "Communication of values।" তিনি 'Values' বলতে বলেছেন—"The authors Personal Philosophy, his over all mood or cast of mind, his interpretation of his materials". আর "Communication" বলতে বলেছেন—

"The craftmanship by which the writer gets his values across to his readers".

তাহলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্যিকের Personal philosophy তাঁর সৃষ্টির ওপর অসম্ভব কাজ করছে। কিন্তু যদি মানসিক পরিবেশ সর্বদিকে অনুকূল না হয় তাহলে সাহিত্যিকের Personal philosophy বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তার প্রতিফলন সৃষ্টসাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ পাবেই। এখন দেখতে হবে কেন মানসিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে? অনেক কারণই উঠতে পারে কিন্তু সবচাইতে যে কারণটা বড় সেটা হোল অর্থের অনটন। এই আর্থিক অনটন বাংলার সাহিত্যিকদের সমস্ত চিন্তাধারা নষ্ট করে দিচ্ছে। তা নয়ত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকদের সৃজনক্ষমতা ক্লান্ত, রিক্ত, নিঃশেষিত একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের মতো আর্থিক সচ্ছলতা ও মানসিক শান্তি যদি সমকালীন বাংলা সাহিত্যিকদের থাকতো তাহলে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যেত যে বর্তমান সাহিত্যিকদের সৃজনক্ষমতা নিঃশেষিত হয়নি বরং সৎসাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁরা আজো প্রাণোচ্ছল। তাই সাহিত্যিকদের মানসিক শান্তি ও পরিবেশ সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে হলে চাই অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য। আর, এই স্বাচ্ছন্দ্য একমাত্র সরকারই পারেন।

রবীন্দ্র-শতবর্ষে পশ্চিমবাংলা সরকার বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে মর্যাদা দিচ্ছেন। বাংলা ও বাঙালীর অনেককালের আশা ও সংকল্প যে বাংলা ভাষা শুধুমাত্র সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গনে নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মর্যাদা পাক। বাংলা ভাষার এই সরকারী মর্যাদার প্রাক্কালে সরকার যদি বাংলার সাহিত্যিকদের দিকে একটু দৃষ্টি দেন তাহলে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উপকার হয়। বাংলা দেশের শতকরা নব্বুইজন লেখক দরিদ্র। পত্রপত্রিকাগুলি লেখার জন্য যে পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন তা অত্যন্ত সামান্য। বই প্রকাশ হলেও তার থেকে যা আয় হয় সেটা এমন কিছু বেশী নয় যাতে করে সাহিত্যিকরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। কারণ বই কিনে পড়ার পাঠক বাংলা দেশে আজো হাতে গুনতে পারা যায়। যা কিছু বিক্রি পাঠাগারকে কেন্দ্র করে। সেটা সরকারী, বেসরকারী ও নানা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাহলে লেখককুলের আয় বাড়বে কি করে? এই দরিদ্র অনিশ্চিত অবস্থা হতে কি করে মুক্তি পাওয়া যাবে? যদি এই অনিশ্চিত অবস্থা হতে মুক্তি না পাওয়া যায় তাহলে লেখকের মানসিক শান্তি ও পরিবেশ উন্নত হচ্ছে না, এবং তাঁর Personal philosophy সৎসাহিত্যসৃষ্টিতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই বাংলা দেশের সাহিত্যামোদী ও সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব রাখছি।

বাংলা দেশের সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলি যোগ করলে প্রায় ছয় বা সাতশোর কাছাকাছি দাঁড়াবে। এই পাঠাগারগুলিতে দৈনিক প্রায় সব লেখকেরই বই গড়পড়তা পড়া হচ্ছে। প্রথমে সরকার-পরিচালিত একটি কমিটি এর পরিসংখ্যান তৈরি করবেন। গ্রন্থাগারিকরা এই পরিসংখ্যানের মুখ্য সাহায্যকারী হবেন। প্রতি মাসে গ্রন্থাগারিকরা কোন লেখকের কতগুলি বই পাঠকরা পড়লেন তার পরিসংখ্যান সেই কমিটিকে দিয়ে যাবেন। কমিটি তখন প্রতিটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যানের ওপর প্রত্যেক লেখককে একটা নির্দিষ্ট হারে দক্ষিণা বিধিবদ্ধ করবেন। এই দক্ষিণা পশ্চিম বাংলার সমস্ত পাঠাগারের পরিসংখ্যান যোগ করে প্রতি মাসে দিলে লেখকরা বেশ মোটা রকম একটা নিশ্চিন্ত আয়ের পথ পাবেন। আর এই আয় বেশ সম্মানজনক, কারণ সরকার লেখকের পরিশ্রমের মর্যাদা দিচ্ছেন। ইউরোপের কোন কোন দেশে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং লেখকরা এতে করে বেশ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন। আমেরিকা ও বৃটেনে পত্রপত্রিকাগুলি লেখকদের প্রচুর অংকের পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন যার জন্য তাঁদের এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। রাশিয়ার সামাজিক কাঠামোই ভিন্নতর তাই তাঁদের কথাও এখানে প্রযোজ্য নয়।

সমকালীন সাহিত্যের পাতায় 'অভয়ংকর' লেখকদের সমবায় সমিতির আবেদন করেছেন। অত্যন্ত সুচিন্তিত আবেদন। লেখক-সমবায়-সমিতিও সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন। 'অভয়ংকর' সাহিত্যিকদের মৃত্যুর পর তাঁদের পরিবারবর্গের কথাও বলেছেন। কী শোচনীয় অবস্থায় তাঁদের দিন কাটাতে হয়, ভাবলে পর শুধুমাত্র দুঃখই পাওয়া যায়। কিন্তু সরকার যদি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে লেখকদের আয়ের পথ করেন তাহলে তাঁদের মৃত্যুর পর পরিবারবর্গকে চরম দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয় না। কারণ পাঠকরা চিরদিনই বই পড়বেন। আর আর্থিক দুশ্চিন্তা যদি না থাকে তাহলে সাহিত্যিকরাও সৎসাহিত্য সৃষ্টিতে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারেন।

রবীন্দ্র-শতবর্ষে দেশের সাহিত্যামোদী, সরকার ও লেখক-সমবায়-সমিতি এই বিষয়ে ভেবে দেখতে পারেন। এই ব্যবস্থায় বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উপকার হবে এবং লেখকরাও অর্থের চিন্তার থেকে মুক্তি পেয়ে সৎসাহিত্যসৃষ্টিতে যত্নবান হতে পারবেন।

রাস্তার উপরেই দক্ষিণ-খোলা মাঝারি ধরনের লম্বা একখানা ঘর। একতলা হলেও আলো-বাতাস প্রচুর।

শীতের এক সকালে দক্ষিণদিকের জানালার কাছে ইজিচেয়ারে শুয়ে সুকুমার রবীন্দ্র-রচনাবলী পড়ছিল। তার বুক থেকে পা পর্যন্ত একটা সাদা চাদরে ঢাকা। পায়ের কাছে চাদরের উপরে সূর্যের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে। বেশ লাগছে মিঠা এই রোদটুকু। সুকুমারের ডাইনে ছোট্ট একটা টেবিলে এক গ্লাস জল ও কতকগুলি বই। বাঁয়ে তক্তপোষের উপরে ইতস্ততঃ ছড়ান আরো কতকগুলি বই। মেঝের এককোণে খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার স্তূপ।

ঘরখানায় ঢুকলেই মনে হয়, এর মালিক বই ও কাগজ ছাড়া কিছু জানে না। অসুস্থ শরীর নিয়েও সত্যি-সত্যিই সে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে। কখনো চেয়ারে বসে, কখনো ইজিচেয়ারে শুয়ে, আবার কখনো বা বেশী ক্লান্তিবোধ করলে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বই ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ে। পড়ে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজনীতি ও রাজনীতি। পড়ে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব। লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে বইয়ের উপর দাগ কাটে। কখনো পাশে নোট লেখে। সময় সময় একঘেঁয়েমির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আবৃত্তি শুরু করে দেয়। জোর গলায় আবৃত্তি করে শেলী, কীটস্‌, রবীন্দ্রনাথ। এক সময়ে প্রায় সারাক্ষণ সে ডুবে থাকে জ্ঞান-সমুদ্রে। ডুবে মণিমুক্তা কুড়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাই সে একবারে পাশ করতে পারেনি। স্কুলে মাস্টারি করতে করতে শেষ পর্যন্ত বি-এ ডিগ্রী পেয়েছে। কিন্তু তার সংগে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আসেন। সুকুমারের মতামতকে শ্রদ্ধা করেন তাঁরা।

অসুস্থতার জন্য সুকুমারকে সেই স্কুল-মাস্টারিও ছেড়ে দিতে হয়েছে আজ ছ'মাসের উপর। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সামান্য যে-কটি টাকা পেয়েছিল তাও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। বই কেনার ঝোঁক না থাকলে হয়ত আরো কিছুদিন চলত। ওষুধ কিনতে হয়েছে, বই কিনেছে, ঘর-ভাড়া দিয়েছে। এরপর যে কি করে চলবে তা সে ভাবে না। অভাব যথেষ্ট, কিন্তু অভিযোগ নেই বিন্দুমাত্র। শুধু অপরের কাছে নয়, নিজের কাছেও কোনো নালিশ নেই তার। মানুষটি যেন স্রোতে-ভাসা একগাছা তৃণ। ভেসে চলেছে কাল-সমুদ্রে গা-ঢেলে দিয়ে।

বেলা প্রায় ন'টায় তার দূর-আত্মীয়া নমিতা এক বান্ধবীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। সুকুমার বইয়ের পাশে নোট টুকছিল,

তাদের লক্ষ্য করেনি সে। মেয়ে দুটিও নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। মিনিট-তিনেক পরে বই থেকে চোখ তুলে সুকুমার বলল, সকালে কি মনে করে মিতা?

নমিতা বলল, এলাম আমার ক্লাশ-ফ্রেন্ড কুমকুমকে নিয়ে। ওর বড় আগ্রহ তোমার কবিতা পাঠ শোনার।

তুমি বুঝি গল্প করেচ?

হ্যাঁ। ওর আবৃত্তি করার খুব শখ, করেও ভাল। আমি বলেছি, সত্যিকার আবৃত্তি কাকে বলে যদি শুনতে চাস, যদি উঁচুদরের আবৃত্তি করতে চাস, তাহলে চল্ সুকুমারদার কাছে। তাছাড়া দেখবি পাণ্ডিত্য।

এক-এক সময় তুমি বড় বাড়াবাড়ি করে ফেল, মিতা।

তুমিও মাঝে মাঝে বড় ভুল কর, সুকুমারদা। এই তো নতুন এক অতিথি এসেছে, তাকে বসতেও বললে না!

তুমিই বরং আমায় নিরাশ করলে। আমার প্রতিনিধি হিসাবে তুমি সৌজন্য প্রকাশ করতে পারতে।

বা রে, স্কুল-মাস্টার না হয়ে তোমার উচিত ছিল উকিল হওয়া। যাক, আমরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। বলে, তক্তপোশের এক-পাশ থেকে কতকগুলি বই সরিয়ে নমিতা তার বান্ধবীকে নিয়ে বসে পড়ল। সুকুমারের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল: আমার ক্লাশ-ফ্রেন্ড কুমকুম রায়। আমরা এক-সঙ্গে পড়তাম। ও এখন চাকরি করছে D. A. G. P. T.-র আপিসে। আর সুকুমারদার কথা তো তোকে আগেই বলেছি, কুম।

সুকুমার ও কুমকুম পরস্পর নমস্কার বিনিময় করল। সুকুমার রবীন্দ্র-রচনাবলীখানা বিছানার উপুড় করে রেখে কুমকুমের উদ্দেশে বলল, আপনারা একটু বসুন। আমি আসচি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাশের ঘরের পর্দা ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সুকুমারকে নিয়ে দুই বন্ধুতে অনেক কথা হল। তার জ্ঞান-পিপাসা, তার নির্লোভিতা, তার নিরাসক্তি সম্পর্কে অনেক কিছুই বলল নমিতা। বিশেষ করে তার নিরাসক্তির কথা। জ্ঞানে মৌন, যশ ও খ্যাতিতে কামনাহীন এই মানুষটি এক কথায় অসাধারণ।

মিনিট দশেক পরে সুকুমার ফিরল এক ঠোঙা খাবার ও ছোট্ট একটা কেটলি নিয়ে। কেটলির নল দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

নমিতা বলল, এ তোমার অন্যায়, সুকুমারদা। আমাদের উপর অবিচার তুমি নিজে গেলে খাবার আনতে। বিশ্বেশ্বর কৈ?

সে আসেনি। আজকাল প্রায়ই কামাই করে। বলতে বলতে সুকুমার দুটো প্লেটে ঠোঙার খাবারটা সাজিয়ে দিল আর তিনটি কাপে ঢালল চা।

কুমকুম এবার ভাল করে সুকুমারকে লক্ষ্য করল। দীর্ঘকায় ছিপ্‌ছিপে গড়ন। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, মাথায় বড় বড় চুল। কপালের শিরাগুলো গোনা যায়, ছোট্ট চোখদুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি। মুখখানি রোগ-পাণ্ডুর, তার উপর গুটি কয়েক শুকনো ব্রণ।

কুমকুম বলল, আপনি খাবার নিলেন না কেন?

সুকুমার বলল, একটু আগেই খেয়েছি।

তখনো বেরুতে হয়েছিল, আবার বেরুলে আমাদের জন্য।—নমিতা অভিযোগের সুরে বলল।

সে-কথা যেন লক্ষ্যই করেনি সুকুমার। এক চুমুকে আধ-কাপ চা নিঃশেষ করে কুমকুমের দিকে চেয়ে বলল, কি আবৃত্তি শুনবেন? ইংরেজী না বাংলা?

কুমকুম সসঙ্কোচে বলল, ইংরেজী।

সুকুমার উঠে দেওয়ালে টাঙান শেলফ থেকে মোটা একখানা বই নিয়ে ছোট্ট টেবিলটার পাশের হাতল-ওয়ালা চেয়ারে বসে বলল, আচ্ছা শুনুন—শেলীর 'এ্যাডোনিস'। আপনারা তো জানেন, তরুণ বয়সে ইংরেজ কবি কীটস্-এর রোমে মৃত্যু হয়।

কুমকুম বলল, না, জানি না।

যাক, কীটস্-এর মৃত্যুর পর শেলী এই কবিতাটি লিখেছিলেন, বলেই সুকুমার বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে স্মৃতি থেকে 'এ্যাডোনিস' আবৃত্তি শুরু করল—

I weep for Adonais — he is dead!
O, weep for Adonais! Though
our tears
Thow not the farost which binds
so dear a head!

প্রতিভাধর কবি-বন্ধুর মহাপ্রয়াণে যে ভাবাবেগ নিয়ে শেলী কবিতাটি লিখেছিলেন ক্রমে ক্রমে সেই ভাবে বিভোর হয়ে গেল সুকুমার। অন্তরতম সুহৃদের বিরহ-বেদনা তার কণ্ঠে, অমর প্রতিভার প্রতি হৃদয়ভরা শ্রদ্ধা। সুকুমার কীটস-এর কফিনকে যেন প্রত্যক্ষ করছে। তার কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ শবাধারের উপর সাদাফুলের মতন ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রায় মিনিট কুড়ি নিস্তব্ধ হয়ে কুমকুম এই আবৃত্তি শুনছিল। নমিতা যদিও চা এবং খাবারটা নিঃশেষ করেছে, কিন্তু কুমকুমের আধ-ভাঙা রসগোল্লাটা তার হাতেই রয়ে গেছে। প্রথমে একবার কি দুবার চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছিল, তারপর কাপটা আর ঠোঁটে ঠেকায়নি। নমিতা বার-দুই বলেছে, খেয়ে ফেল—চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু সেকথা কুমকুমের কানে যায়নি।

কুমকুম নিজে ভাল আবৃত্তি করে। নামকরা অভিনেতা ও সাহিত্যিকের

আবৃত্তি সে শুনেছে কিন্তু এত ভাল আবৃত্তি আগে কখনো শোনেনি। শেলীর কাব্যগ্রন্থ সামনে খোলা ছিল বটে, কিন্তু সুকুমার একবারও সেদিকে তাকায়নি। এতেও বিস্মিত হয়েছে কুমকুম।

একটু পরে নমিতা বলল, একটা বাংলা কবিতা শোনাও।

টেবিলের উপর থেকে জলের গ্লাসটা তুলে সুকুমার এক চুমুকেই প্রায় সবটা জল নিঃশেষ করে নমিতাকে বলল, তুমি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে রাখ দেখি।

শুরু হল বাংলা কবিতা আবৃত্তি। সুকুমার আবৃত্তি করল সতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের 'ডাব', জীবনানন্দ দাসের 'বনলতা সেন'। আবৃত্তি করতে করতে জল খেল দুবার। কবি যে ভাব নিয়ে যে কবিতা লিখেছেন, আবৃত্তির সময় সেইভাবে তন্ময় হয়ে যায় সুকুমার। কখনো কন্ঠ উচ্চগ্রামে ওঠে, কখনো খাদে নামে। কুমকুম অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

একটু পরে সে বলল, রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা শোনান।

সুকুমার বলল, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এবার ছোট্ট একটি কবিতা শোনাব। বলে সে আরম্ভ করল—

থাকবো না ভাই, থাকবো না কেউ—
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাওরে চলে
কালের পিছু পিছু।

ক্রমে ক্রমে সুকুমার বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। নিঃশ্বাস একটু জোরে বইছে। শীতের সকালেও কপালে দেখা যাচ্ছে কয়েক ফোঁটা ঘাম। নমিতা হাতের কাছের 'স্টেটসম্যান'খানা তুলে বাতাস করতে তোলে, তার হাত থেকে সেটা নিয়ে সুকুমার বলল এ সৌভাগ্য আমার জন্য নয়। বড় একা আমি—নিঃসঙ্গ।

নমিতা বলল, এখন তো তুমি নিঃসঙ্গ নও?

সুকুমার একটু হেসে বলল, তোমরা আর কতক্ষণ!

নমিতা বলল, আজ শম্ভুদাকে একবারও দেখলুম না যে?

সুকুমার বলল, সে প্রায় রোজই আসে, আমাকে অনেক বিষয় সাহায্য ক'রে। কিন্তু আজ সকালে তার ডিউটি আছে।

শুরু হল আলোচনা। ক্লান্তির ভাব কিছুটা কেটে গেলে সুকুমার নিজেই আরম্ভ করল।

আলোচনা রবীন্দ্র-প্রতিভা নিয়ে। কথায় কথায় এল অন্যান্য মনীষীর কথা। সুকুমার বলল, জীবন-দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য মনীষীর মতোই মানব-প্রেমিক। সত্যকার বড় যাঁরা মহৎ যাঁরা তাঁদের সকলেরই ওই এক বাণী—ভালবাসা, মানুষকে ভালবাস।

কুমকুম বলল, আমার কিন্তু মনে হয়, মহৎদের ওই বাণী পৃথিবীতে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আজকের এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও তার অনেক নিদর্শন রয়েছে।

সুকুমার বলল, তা ঠিক। কিন্তু লড়তে হবে তার বিরুদ্ধে। জগতের কোটি কোটি মানুষকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে।

কথায় কথায় বেলা বেড়ে চলল। নমিতা বলল, বিশ্বেশ্বর তো এল না দেখছি। আমি স্টোভটা ধরিয়ে তোমার খাবারের ব্যবস্থা ক'রে দেই। তোমরা ততক্ষণ কথা বল। আছে কি কি?

সুকুমার বলল, তোমার স্টোভ ধরাতে হবে না; আমিই ব্যবস্থা ক'রে নেব।

নমিতা জানত, এর পর সুকুমারদাকে আর কিছু বলা নিরর্থক। সে ছোট্ট একটি মন্তব্য করল, কারো কাছে কোনো বিষয়েই তুমি ঋণী হ'তে চাও না।

চাইব কোন্ অধিকারে? সংসারটা দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশের জায়গা। আমি তো দেইনি কাউকে কিছু, তাই পাওয়ারও কোনো অধিকার নেই আমার—।

নমিতা ধীরে ধীরে বলল, ও বাব্বা; তুমি কি দাম্ভিক!

কুমকুম বলল, আপনি কারো কাছে ঋণ রাখতে চান না, কিন্তু মানুষ মাত্রেরই যে কারো না কারো কাছে ঋণী থাকতে হয়।

সুকুমার সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, তবু দেখি যতটা পারা যায়।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর নমিতারা উঠল। যাওয়ার সময় নমিতা বলল, কুমকুম কিন্তু মাঝে মাঝে আসবে তোমার কাছে।

কেন?

আবৃত্তি শিখতে আর আলোচনা করতে।

আলোচনা কিসের?—গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল সুকুমার।

কুমকুমের মনে হ'ল সুকুমারের এই প্রশ্নের পিছনেও একটা দম্ভ লুকিয়ে রয়েছে। সে যেন বলতে চায়—আমার সঙ্গে ওর আবার আলোচনা!

বাইরে এসে নমিতা প্রশ্ন করল, কেমন দেখলি মানুষটিকে?

কুমকুম বলল, বড় নিঃসংগ আর দাম্ভিক।

নিঃসংগ ঠিকই, কিন্তু দাম্ভিক নয়। ওর কথাবার্তার ধরনই ওই। জীবনে ঘা খেয়ে খেয়ে এমনটি হ'য়ে গেছে।

দু' মিনিট ওঁর সংগে থাকলেই বোঝা যায়, দুনিয়ার উপর মানুষটির প্রচুর অভিমান আছে।

তার কারণও আছে যথেষ্ট।

কি রকম?

উনি বড় বঞ্চিত। স্নেহের কাঙাল। অথচ স্নেহ পায়নি কোথাও। তা ছাড়া, মানুষটা বড় তেজস্বী। কারো কাছে মাথা নোয়াবে না। নোয়াতে পারলে ওর জীবনের ধারা যেত পাল্টে।

কুমকুমের মনে হ'ল, সত্যিকার মহৎ-জীবনের ট্র্যাজেডীই এই; আর সে ট্র্যাজেডিই তাঁদের মহিমা।

তিন মাসের মধ্যেই কুমকুম আরো কয়েকবার সুকুমারের বাড়ীতে এসেছে। কখনো একা, কখনো বা নমিতাকে নিয়ে। তার আবৃত্তি শুনেছে, তবে পাছে সে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, সেই জন্য কোনো দিনই তার একটি বা দু'টির বেশী আবৃত্তি শুনতে চায়নি। প্রশ্ন করেছে তাকে নানা বিষয়ে, সাহিত্য-সম্পর্কেই বেশী। কেন না, সে নিজে সাহিত্যের ছাত্রী। সমাজ-নীতি, রাজনীতি, সাহিত্য—নানা বিষয়ে সুকুমারের সংগে তার মতের মিল দেখে বিস্মিত হয়েছে।

এক-এক সময় কুমকুমের মনে হয়, তার মনের মণিকোঠায় একটি আদর্শ তরুণ সম্পর্কে যে কল্পনা ছিল, সুকুমার সেই কল্পনারই মূর্ত রূপ! তবে দুঃখের কথা যে, সে রুগ্ন।

আবার এই রোগের জন্যই তার মনে একটা সহানুভূতিরও সঞ্চার হয়েছে। অনেক লোক আসে তার কাছে কুমকুম শুনেছে, তাঁদের কয়েকজনকে সে দেখেছেও, কিন্তু এত সুধী সজ্জনের সমাবেশ হ'লেও, মানুষটি সত্যি নিঃসংগ। আত্মীয়-স্বজনও নাকি আছে অনেক, তবু সংসারে সে একক। হয়ত অসহায়ও।

সুকুমার হয়ত একটু দাম্ভিক, কিন্তু সে দম্ভ আত্মমর্যাদা-বোধের রূপান্তর নয় কি? কিছুদিন থেকে কুমকুম তার অর্থাভাব লক্ষ্য করেছে, কিন্তু আত্মমর্যাদা-বোধের জন্যই সে কোনোদিন মুখ ফুটে নিজের অভাবের কথা ইংগিতেও প্রকাশ করেনি। একক, রুগ্ন এই মানুষটিকে সংগ দিতে ইচ্ছা হ'ল তার, ইচ্ছা হ'ল সেবা করে তাকে। তেজী এই মানুষটির দম্ভকে জয় করার ইচ্ছাটা যে তার মনের কোণে লুকিয়ে ছিল, সে খবর হয়ত সে নিজেই জানত না!

কুমকুম একদিন প্রস্তাব ক'রে বসল তার জীবন-সংগিনী হওয়ার! হো হো ক'রে হেসে উঠল সুকুমার। কুমকুম বলল, তুমি হাসছ যে?

সুকুমারকে সে 'তুমি' বলল এই প্রথম।

সুকুমার বলল, তুমি যে আগুন নিয়ে খেলা করতে চাইছ, কুমকুম।

কি রকম?

আমি গরীব, আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। ডাক্তারেরা আমার রোগ ধরতে পারেন নি। রোগ যে সারবে, এ সম্পর্কেও তাঁরা কোনো আশা পোষণ করেন না। আর তুমি চাইছ আমার জীবন-সংগিনী হ'তে?

কুমকুম কোনো উত্তর করল না। ব'সে, ডান-হাত দিয়ে বাঁ-হাতের তর্জনীতে শাড়ীর খুঁট জড়াতে লাগল। সুকুমার ভাবছিল, এটা কি তার সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার অবচেতন আভাস?

উভয়েই নীরব। সুকুমার কিছুক্ষণ পরে সেই নীরবতা ভংগ ক'রে বলল, একশ' বছর আগে সমাজে যখন কৌলিন্য-প্রথার খুব বেশী সমাদর ছিল তখন শুনেছি, শ্মশান-যাত্রী কুলিন-ব্রাহ্মণের সংগে একত্রে ডজন-খানেক মেয়ের গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হ'ত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়, শ্মশান-যাত্রীর সংগে গাঁট-ছড়া বাঁধার যুগ তো চ'লে গেছে অনেকদিন।

ফেরাতে কিন্তু পারবে না তুমি আমায়—দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা কয়টি ব'লে, উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে গেল কুমকুম।

আর সুকুমার স্তব্ধ-বিস্ময়ে ইজি-চেয়ারের উপর ব'সে রইল। তার চোখের উপর থেকে ম্লান গোধূলির আলো স'রে গেল, নামল সন্ধ্যার অন্ধকার। রাত বেড়ে চলল, ঘরের আলোটা জেলে দিতেও সে একবার উঠল না। কেমন একটা জড়তা যেন চেপে বসল তাকে। সে ভাবছিল কুমকুমের কথা, তার প্রস্তাব! একবার মনে হ'ল, আলোটা তো জেলে দিয়ে যেতেও পারত কুমকুম!

রেজেস্ট্রি ক'রে বিয়ে হ'য়ে গেল তাদের। সাক্ষী হ'ল নমিতা ও শম্ভু চাটুজ্জে। সুকুমারের চাইতে বছর তিনেকের ছোট এই শম্ভু, আই, এ, পরীক্ষার সময় তার কাছে আসত ইংরেজী ও বাংলা পড়তে। তার সাহায্য পেয়েও পরীক্ষার দরজা পেরোতে পারেনি সে। তবে সেই থেকে সে প্রায়ই আসে। এক কোণে ব'সে অপরের সংগে তার আলোচনা শোনে, শোনে আবৃত্তি।

তাকে দিয়ে সুকুমারের কাজ হয় অনেক। মাঝে মাঝে দোকান করে সে, হাট-বাজার ক'রে দেয়, ডাক্তারখানায় যায়—নানা ফরমাস খাটে তার। সুকুমারদা ফরমাস করলে কৃতার্থ হ'য়ে যায় যেন।

বিবাহের আগে থেকেই কুমকুমের হাতের ছোঁয়ায় সুকুমারের ঘরের চেহারা মাঝে মাঝে বদলে যেত, এবার ফুটে উঠল এক নতুন শ্রী। ধূলি-মলিন মেঝে হ'ল তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, ছোট্ট টেবিল-টাতে উঠল টেবিল-ক্লথ ও ফুলদানিতে নিত্য নতুন নতুন ফুলের গোছা।

মাঝে সুকুমারের ঘরের বৈঠক ক'মে এসেছিল। তাদের বিয়ের পর থেকে আবার ঘন ঘন আসর জমতে লাগল। সুধী-সজ্জনের আসর। তার সংগে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—নানা বিষয় আলোচনার জন্য খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এসে সমবেত হন। সাতাশ-আঠাশ বছরের এই তরুণের মতামতকে শ্রদ্ধা করেন তাঁরা। নিজেদের লেখা শোনান, তার মতাগত নিয়ে কাট-ছাঁট করেন।

ছুটির দিনেই আড্ডা জমে ভাল। বেলা ১১টা-১২টা বেজে যায়। ঘন ঘন চা যুগিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ে কুমকুম; আর বেচারা শম্ভুকে বার-বার দোকানে ছুটোছুটি করতে হয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা দু'জন আলোচনা শোনে। শম্ভু এ আলোচনার বেশীর ভাগই বোঝে না। কিন্তু পাঁচজনের কাছে জাঁক ক'রে বেড়ায়: সুকুমারদা একজন মস্তবড় পণ্ডিত।

কুমকুম সময় পেলেই বৈঠকে এসে বসে। মধ্যে মধ্যে আলোচনায় যোগ দেয়। স্বামীর পাণ্ডিত্যের, তার ক্ষুরধার বিতর্ক-শক্তিতে গর্ববোধ করে।

তার সেবা ও যত্নে সুকুমারের স্বাস্থ্যের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। চোখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, মুখে রক্তের আভা।

তার বন্ধু প্রেমাঙ্কুর ডাক্তার কুমকুমকে বললেন, এ আপনার সেবা-যত্নের পুরস্কার।

আর সেও মনে মনে স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। সত্যি মেয়েটা ভাল। আদর্শবাদী, সহানুভূতি-প্রবণ। নইলে একটা চির-রোগীকে আপনার ক'রে নেবে কেন?

চাপা প্রকৃতির মানুষ সে, কথাটা কুমকুমের কাছে প্রকাশ করল না। কিন্তু সে তা বুঝল। আনন্দ হ'ল তার।

তবে এই আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। মাস কয়েক যেতে-না-যেতেই সুকুমারের শরীর আবার ভাঙতে লাগল। এবার ভাঙনটা বেশ দ্রুত।

কুমকুম বলল, তোমার এখানে বড্ড খাটুনি পড়ে; চল আমরা কিছুদিন হাওয়া বদলে আসি।

আমার আবার খাটুনি কি? আমি শুয়ে-ব'সে আরামে আছি! খাটুনি তো তোমার। আপিস করচ, রাঁধচ, সংসার দেখচ—সেবা করচ আমার।

পড়াশুনা, আবৃত্তি—এতে বুঝি পরিশ্রম হয় না?

তা হয়, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমি থাকব কি নিয়ে, কুম?

স্ত্রীকে সুকুমার 'কুম' ডাকল এই প্রথম।

কুমকুম বলল, কেন, থাকবে আমাকে নিয়ে!

সুকুমারের ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা গেল ক্ষীণ একটু হাসির রেখা।

কুমকুম স্থির করল, স্বামীকে নিয়ে হাওয়া-বদল করতে যাবে। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন ভাইজাগ যেতে।

সুকুমার আপত্তি করল, টাকা পাবে কোত্থেকে? ব্যবস্থা করবে তো দেনা ক'রে। আমাদের মত ভদ্রলোকের তো ঐ এক সম্বল।

স্বামীর আপত্তি কানে তুলল না কুমকুম। তবে টাকা যোগাড় করতে বেশ বেগ পেতে হ'ল তাকে। আপিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার নিল বটে, কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়। সোনার দু'খানা গহনা ছিল, তাও বন্ধক রাখল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে হাত পাতল। তারপর একদিন স্বামীকে নিয়ে চলে গেল চেঞ্জে।

যাওয়ার সময় ঘরখানার ভার দিয়ে গেল শম্ভুর উপর। ঠিক হ'ল, সে এখানে থাকবে। সুকুমার তাকে বিশেষ ক'রে বলল, বইগুলোর দিকে নজর রেখো ভাই। খোলা শেলফেও রইল কতকগুলো। এমন সব বই আছে, যা হারালে আর পাওয়া যাবে না।

তারা চলে যাওয়ার পর শম্ভু একখানা খাতা কিনে বর্ণমালা অনুসারে বইয়ের তালিকা করল। মলাট দিল, নম্বর দিল। কয়েকদিন পরে পরে দেখত, সব ঠিক আছে কিনা।

পল্লীগ্রামের ছেলে সুকুমার—মুক্ত আলো-হাওয়ায় মানুষ। ভাইজাগের নীল সমুদ্র, সমুদ্রের হাওয়া, ছোট ছোট পাহাড়, প্রকৃতির সবুজ শোভা—তার মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করল। স্বামী-স্ত্রীতে তারা সাগর-তীরে ঘুরে বেড়ায়। সমুদ্রের ফেনিল ঢেউ গোনে। মুগ্ধ হয়ে যায় দিকচক্রবালের শেষে আকাশ ও সাগরের ছোঁয়াছুঁয়ি দেখে। বেশ লাগে সবুজে-ঘেরা ছোট ছোট পাহাড়গুলো।

কখনো তারা রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে বসে। রেলের লাইন, সিগন্যালের পাখা দেখে মনে হয়, এরা যেন দূর-দূরান্তরের যোগসূত্র। সমুদ্রের উপর উড়ন্ত এরোপ্লেন তাদের মনে করিয়ে দেয় পাঁচ-পাঁচটা মহাদেশের কথা।

একদিন তারা গেল 'সিংহাচলম'-এ। যাওয়ার পথটা ভারী সুন্দর। দু'ধারে ঘন গাছের সারি। হু-হু ক'রে হাওয়া বইছে ডালপালার মধ্য দিয়ে। গাছ-গুলির নিচটা বেশ পরিচ্ছন্ন। প্রায় চার মাইল দূরে ছোট পাহাড়ের উপর নর-সিংহদেবের মন্দির। হাজারো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। খানিকটা উঠে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সুকুমার। কুমকুম বলল, তুমি এখানে বস। আমি গিয়ে দেবতার আশীর্বাদী ফুল নিয়ে আসি।

সুকুমার শুনল না। সে বলল, আমি উঠব। পদে পদে এই বাধা আমার অস্তিত্বকেই অপমান করে। এ অসহ্য!

স্বামী-স্ত্রীতে উপরে উঠল।

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহনকারী মন্দিরের গম্ভীর পরিবেশ বড়ই আনন্দ দিল তাদের। বিশেষ কোনো ধর্ম মানে না সুকুমার, কিন্তু যুগ-যুগ থেকে ভারতের মন্দিরগুলো যে-সংস্কৃতির ধারাকে জিইয়ে রেখেছে, যে-সংস্কৃতি নিয়ে ভারতের গৌরব, সে তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। সে অতীত গৌরবের এই রহস্যের মধ্যে ডুবে গেল, আর সেই সময় কুমকুম দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল: তুমি ওকে ভাল ক'রে তোল, ঠাকুর!

নতুন এই পরিবেশে বেশ একটু উন্নতি হ'ল সুকুমারের। কুমকুমকে সে বলল, জানতুম, মুক্ত আলোবাতাস, মাটির ছোঁয়া, ঘাস-পাতার সবুজশ্রীর মধ্যে ভাল হ'য়ে উঠব আমি।

বড় আনন্দ হ'ল কুমকুমের। মনে হ'ল, তার শ্রম, তার সেবাযত্ন সার্থক হয়েছে। আকৈশোর যে মানুষটিকে সে কল্পনার তুলি দিয়ে এঁকেছে যাকে পেয়েও পায়নি এবার তাকে পরিপূর্ণ-ভাবেই পাবে! সে সোৎসাহে ব'লে উঠল, নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।

কিন্তু মরীচিকা যেমন মানুষের চোখে আলোর ধাঁধা লাগিয়ে পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে যায়, সুকুমারের এই উন্নতিও তেমনি তাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়েছিল মাত্র। একদিন বৃষ্টিতে ভেজার পরই হ'ল তার জ্বর, কাশি। সে জ্বর আর কমে না, কাশিও বন্ধ হয় না।

ভয় পেয়ে গেল কুমকুম। কিছুদিন পরে স্বামীকে নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এল।

ঘরে ঢুকেই আলমারি ও শেলফের সাজান বইয়ের উপর ন্যাপথালিনের বড়ি দেখে সুকুমার ধন্যবাদ দিল শম্ভুকে। শম্ভু সসংকোচে বলল, ও কিছু নয় দাদা!

এবার চলল জোর চিকিৎসা। প্রেমাঙ্কুর দেখে বললেন, একস্-রে করা।

তাতে ধরা পড়ল ক্ষয়রোগ। ডাক্তাররা বিজ্ঞান-সম্মত সকল ওষুধই প্রয়োগ করলেন, কিন্তু ফল হ'ল না কিছুই।

কুমকুমের ইচ্ছা, তাদের বাড়ীর বৈঠক বন্ধ ক'রে দেয়। শম্ভুও তাতে সায় দিল। সুকুমার বলল, খালি রোগ নিয়ে থাকব কি ক'রে? লোকজন এলে তবু অন্য-মনস্ক থাকা যায়।

কুমকুম বলল, ডাক্তাররা [illegible] কথা বলতেও নিষেধ করেছেন।

[illegible] বলব [illegible]। [illegible] পাঁচজন [illegible]?

বৈঠক বসে সপ্তাহে দু'-এক দিন। বন্ধু-বান্ধবরা আসেন। পাঁচটা বিষয়

আলোচনাও হয়। কিন্তু বৈঠকগুলো আগের মতন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মাঝে মাঝে সুকুমার আবৃত্তিও করে। করে ধীরে ধীরে, জোর-গলায় নয়। সে ক্ষমতাও নেই তার। পনর-বিশ লাইন একসঙ্গে ব'লেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, হাঁপিয়ে ওঠে।

আজকাল একটানা বেশী সময় বই নিয়েও থাকতে পারে না সুকুমার। শুয়ে-ব'সে কোনোরকমে সময় কাটায়।

প্রায়ই একা থাকতে হয় তাকে। কুমকুম যে তার কাছে একটু বেশী সময় থাকবে, তারও উপায় নেই। সে ব্যস্ত আপিস নিয়ে, রান্না নিয়ে, রোগীর পথ্য নিয়ে। দেনা শোধের জন্য সম্প্রতি একটা ট্যুশানিও নিয়েছে।

পাশের ঘরে ব'সে রান্না করে সে, স্বামীর পথ্য তৈরী করে। সুকুমার শুনতে পায় তার চুড়ির ঠুন্ ঠুন্, কড়াইয়ের উপর স্কুন্তি নাড়ার শব্দ।

শম্ভুও তাকে সাহায্য করে। আলু-পটলের খোসা ছাড়িয়ে দেয়। কুমকুম ব্যস্ত থাকলে জ্বলন্ত তেলের কড়াটা উনুন থেকে নামায়, জল গরম করে, রোগীর দুধ জ্বাল দেয়।

মধ্যে মধ্যে পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসে তার চাপা কণ্ঠস্বর। সুকুমার এক-একবার কথাগুলো ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু কোনোটিই স্পষ্ট শুনতে পায় না।

সে মনে মনে অনুভব করে, তার ও কুমকুমের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যবধান গ'ড়ে উঠছে। সে রোগী, কুমকুম সুস্থ। সে অক্ষম, তার নির্ভর কুমকুমের উপর। ব্যবধান তো হবেই।

পড়ার আনন্দ, নতুন কিছু জানার আনন্দ থেকেও সে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হচ্ছে। একটু বেশী পড়লেই ছাপা অক্ষরগুলো তার চোখের উপর লেপে-পুছে যায়। চিন্তা করলেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। শেষটায় বইয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক ছাড়তে হ'ল তাকে। বাঁচার তার এত আগ্রহ, এত ইচ্ছা—সে এখনো চায় জীবনকে উপভোগ করতে, নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করতে, কিন্তু সে-পিপাসাও আর মেটাতে পারে না। সে মনে করে, মানুষ সম্পর্কে একটা কথাই বড় সত্য—সে দুর্বল, সে অসহায়।

আকৈশোর সে ছিল অভিমানী। নিজে পারলে এক গ্লাস জলও কাউকে গড়িয়ে দিতে বলেনি। সহোদরদের কৃপণ-হস্তের সাহায্যকে অবলীলায় উপেক্ষা করেছে, আর আজ সে একান্তই পর-নির্ভর। শুধু কুমকুম নয়, শম্ভুর উপরেও তার নির্ভরতা অনেকখানি। কারো কাছে সে ঋণী থাকবে না মনে করেছিল, আর এখন দিনের পর দিন তার ঋণের বোঝা ভারী হ'য়ে উঠছে।

সুকুমারের স্পর্শাতুর মনে এ অবস্থা একান্তই দুঃসহ। অভিমানী মানুষ সে, ক্রমে ক্রমে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। শম্ভুর কাছে, এমনকি কুমকুমের কাছেও কোনোকিছু দাবী করে না সে, চায় না কিছু। কোনো বেদনা, কোনো দৈন্যই প্রকাশ করে না সুকুমার। কিন্তু তার দেহ ও মনের উপর এর দ্রুত প্রতি-ক্রিয়া হয়। আসে অক্ষুধা, অরুচি। সমস্ত ব্যাপারেই কেমন যেন অনীহার ভাব।

দিন কাটে। বাঁচার জন্য সংগ্রামের শক্তিটুকুও তার লোপ পায়। ধীরে ধীরে তার মুখের উপর ম্লান ছায়া নেমে আসে। সব মনে হয় ধোঁয়াটে। অমন যে তীক্ষ্ন অনুভূতি, তার উপরেও যেন একটা মরচে পড়েছে। একটুতেই সব তালগোল পাকিয়ে যায়!

সেদিন উজ্জ্বল নীল আকাশ, অদূরে তালগাছের চূড়া, বাইরে পাখীর কলকাকলি, মোটরের হর্ণ আর পাশের ঘরের চুড়ির ঠুন্ ঠুন্, কড়াইয়ের উপর আলু-পটল ভাজার শব্দ, শম্ভুর কণ্ঠস্বর —সব একাকার হ'য়ে যায় তার কাছে। দুনিয়াটা তার চোখের উপর থেকে স'রে যায়।

কুমকুম হর্লিক্সের গ্লাস হাতে ক'রে এসে দেখে, সুকুমার শেলীর গ্রন্থাবলী বুকে ক'রে শুয়ে আছে। 'এ্যাডোনিসে'র পাতাটা খোলা!

বছরখানেক কেটে গেছে। সুকুমারের ঘর, কুমকুম একদিন এই ঘরে এসেছিল তার সঙ্গে আলাপ করতে, তার আবৃত্তি শুনতে। সেই ঘর, সেই খাট, টেবিল, শেল্ফ্ সব আগের মতই আছে। তালা-বন্ধ আলমারি ও শেল্ফে সাজান আছে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসের বইগুলো। তার উপর ধুলো জমেছে কিছু। দিনের বেলায় ঘরখানা আলোয় আলোয় ভ'রে যায়, শুক্লপক্ষের রাতে পড়ে মিঠা জ্যোছনা। দক্ষিণের বাতাসে দু'ঘরের মাঝের পর্দাটা নড়ে।

আজ এই ঘরে আর কেউ শেলী-কীট্স্-রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে না, বসে না সুধী-সজ্জনের বৈঠক।

এখানে থাকে দু'টি প্রাণী—শম্ভু ও কুমকুম। কিছুদিন হ'ল, তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছে। তারাও আলাপ করে, আলোচনা করে। শম্ভু এসে কুমকুমকে পোর্ট কমিশনারের ডকের সংবাদ দেয়। তাতেও বৈচিত্র্য কম নয়। কোনোদিন বলে, আজ আমে-রিকা থেকে দু'জাহাজ গম এসেছে, আর রাশিয়ায় গেছে একজাহাজ ম্যাঙ্গানীজ। পরদিন হয়ত দেয় বিরাট এক শুল্ক ফাঁকির খবর। কাস্টম্স্-এর শুল্ক ফাঁকি দিতে গিয়ে দু'জন বিদেশী ধরা পড়েছে। তাদের জুতোর সুখতলা ও ব্যাগের চামড়ার ভিতরে পর্দায় পর্দায় সোনার পাত পাওয়া গেছে।

কুমকুমও পরিবেশন করে তাদের আপিসের খবর। কোন্ অফিসারের মেজাজ কেমন, কোন্ উপর-ওয়ালার মেয়েদের উপর নেক্-নজর বেশী—এই সব তথ্য।

শম্ভুই প্রায় নিত্য-নতুন খবর যোগায়। কুমকুম কখনো প্রশ্ন করে, কখনো বা শুনতে শুনতে কেমন অন্য-মনস্ক হয়ে যায়। বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। তবে, সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। শম্ভুর চোখে তা ধরা পড়ে না।

আবার চলে গল্প-গুজব, হাসি। শেল্ফ্ ও আলমারির বইগুলোর প্রাণ থাকলে তারা এ-হাসিতে যোগ দিত কি না, কে জানে!

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'কি বললেন ডাক্তার?'

নীতা ঘাড় ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের আকাশে চোখ রেখে আস্তে বলে, 'বললেন, একদিনে কিছুই বোঝা যায় না। এমন অনেক রোগী আছে যারা দিনের পর দিন স্বাভাবিক, অথচ হঠাৎ কোন একদিন সব কিছু ভেঙেচুরে তচনচ হয়ে যায়। তবু বললেন, ওই যে 'সবাই মারা গেছে, সবাই ও'কে ছেড়ে গেছে', এ-ভাবটা কমে যাওয়া এ-একটা সুলক্ষণ।'

'সেরকম আর বলেন না?' প্রশ্ন করে নিরুপম।

'বিশেষ নয়! এখানে এসে তো অনেক ইম্প্রুভ করেছে। উঃ দিল্লীতে আমার এক একটা দিন এমন গেছে!'

'ডাক্তার আবার কবে দেখতে চান'?

'বলছেন তো সপ্তাহে দু'দিন করে নিয়ে যেতে। কিন্তু ওখানে নয়, ডাক্তারের নিজের চেম্বারে।'

'তোমার অবস্থাটা ভাবলে বড় কষ্ট লাগে।'

'আরও কত কষ্টকর অবস্থায় থাকতে হয় মানুষকে। ধরনা কেন বড়দা, আমার বাবার অবস্থা, সুচিন্তা-পিসিমার অবস্থা। আমার অবস্থার জন্যে তো তবু ভাগ্য দায়ী, কিন্তু এ'দের জন্যে? শুধুই মানুষের নির্মমতা আর ঔদাসীন্যে দু'দুটো সুন্দর জীবন কী অপচয়ই হয়ে গেল। এমন কতই গেছে, কতই যাচ্ছে, কতই যাবে।'

মা সম্পর্কে এ-ধরনের আলোচনায় অনভ্যস্থ মন সাড়া দেয় না, চুপ করে থাকে নিরুপম।

নীতাই আবার ধীরে ধীরে বলে, 'আমাদের দেশের একটা ধারণা বড়দা, যত কিছু প্রয়োজন শুধু যৌবনের। কিন্তু আমার তো মনে হয় অন্তরের সঙ্গীর প্রয়োজন বার্ধক্যেই বেশী। কম বয়সে তো জীবনের কত কাজ থাকে, কত হৈচৈ কত ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু সেই ফেনা যখন মিলিয়ে যায়, সেই কাজ যখন ফুরিয়ে যায়, নিষ্ঠুর পৃথিবী যখন তাকে ভুলে নিশ্চিন্ত হয়, তখনও তো বেঁচে থাকতে হয় মানুষকে? তখন তো বেশীর ভাগ একলাই পড়ে যায় মানুষ। কিন্তু তখন আমরা ভাবি পৃথিবীর কাছে ওর আর কিছু প্রাপ্য নেই। আর বোধকরি নিজেরও ওর কিছু চাহিদা নেই। সেই ভাবাটা কি ভুল ভাবা নয় বড়দা? যদি কেউ অধ্যাত্ম-চিন্তায় মনের আশ্রয় খুঁজে নেয়, খুব ভাল। যদি কেউ যে সংসার তাকে চায় না, সেই সংসারকেই আঁকড়ে ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়, করুক সে তাই। কিন্তু যারা ও দুটোর একটাও পারে না?'

'তাদের সম্পর্কে তুমি কি ব্যবস্থা করছ?'

খুব শান্ত গলায় নিরুপমের কণ্ঠ। তবু যেন মনে হয় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে ওর মধ্যে। কিন্তু নীতা দমে না, সেও শান্ত গলায় বলে, 'ব্যবস্থা করবার সাধ্য আমার কোথায়? শুধু এইটুকুই মনে হয়, বন্ধুর প্রয়োজন মানুষের সব বয়সে আছে। নিঃসঙ্গতা সব বয়সেই কষ্টকর। বার্ধক্যে আরও বেশী।'

'এতক্ষণ ধরে তো ওই একই কথা বললে। কিন্তু বৃদ্ধদের সম্পর্কে এত ভাবলে কবে? আর কেনই বা ভাবলে? তাদের মনের কথা তো তোমার বোঝবার কথা নয়।'

'সুস্থ মানুষরাই তো অসুস্থদের জন্যে ভাবে বড়দা, শক্তিমানেরা পঙ্গুদের জন্যে। বড়লোকরা গরীবদের জন্যে ভাবে, বড়রা শিশুদের জন্যে। নইলে আর ভাবনার অর্থ কি?'

'আচ্ছা তোমার এই থিয়োরির কথা পরে ভেবে দেখবো।' বলে কথায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেয় নিরুপম। মুখের ওপর তুলে ধরে একখানা বই।

এতটুকু মেয়ের এত পাকাপাকা কথা খুব ভাল লাগে না তার। স্নেহ একটু পড়েছে মেয়েটার ওপর, যখন সরল নিঃশঙ্কমনে কাছে এসে বসে, ভাল লাগে। ভাল লাগে ওর মেয়েলি-পনাহীন নির্মল মেয়েমনটি, কিন্তু মাঝে মাঝে কি যে সব অদ্ভুত কথার আমদানি করে মেয়েটা, [illegible] লাগে।

যাদের বয়েস হয়ে গেছে, পৃথিবীর কাছে সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে বসে আছে, আবার তাদের নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? জীবনের শেষ দিন পর্যন্তই

মানুষ চাইতে থাকবে? ত্যাগের সৌন্দর্য, ত্যাগের মহত্ব এগুলোর কোন মূল্য নেই?

বার্ধক্য তো ত্যাগেই সুন্দর।

তখনো যদি সে হাত পেতে বসে থাকে তার চাইতে দৃষ্টিকটু আর কি আছে?

এই কথাই ভাবে নিরুপম।

রাত্রে চিঠি লিখতে বসে নীতা টেবলল্যাম্প জ্বালিয়ে, ঘুমন্ত বাবার চোখটা আলোর তাপ থেকে বাঁচিয়ে।

অনেক কথার পর লেখে—'তোমার পরিকল্পনা ব্যর্থ! এদেশে তোমার 'ওল্ড ক্লাব' গড়ে তোলার আশা দুরাশা। দেশের মন বদলাতে আরও এক শতাব্দী লাগবে। এদের বড়ছেলে তবু মুখের সামনে বই তুলে ধরে থামিয়ে দিয়েছে, এদের মেজছেলে আবার আমার চিন্তা-ধারার পরিচয় পেয়ে মুখের ওপর ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেছে, 'তাহলে আপনার মতবাদটা কি? দেশের যত বিধবা বুড়ী আর যত বিপত্নীক বৃদ্ধকে ধরে ধরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া? আইডিয়াটা ভাল।'

এরপর আর কি বলবে বল?

মানুষ যে কোনদিনই ফুরিয়ে যায় না, সমাজ-ব্যবস্থাই তাদের ফুরিয়ে যাওয়ার অভিনয় করতে বাধ্য করে, একথা স্বীকার করবার মত উদার মন এখনও বিরল। এটা কেউ ভেবে দেখে না মানুষ যদি ফুরিয়েই যাবে, তাহলে যারা এখনো পৃথিবীকে ভোগ করছে, ভোগহীনেরা তাদের ঈর্ষা করে কেন? সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে কেন? আমি এত কথা ভাবি বলে এরা ভাবে আমি নাকি বড্ড বেশী পাকা।

এ-বাড়ীর ছোট ছেলেটা তো স্পষ্টই বলে, 'একেই বলে অকালপক্কতা'। বলে 'যার যা সাবজেক্ট নয় সে তা নিয়ে ভাবতে বসেছে, এটা হাস্যকর।' বলে 'তোমার এ্যাবনর্ম্যাল বাবার সঙ্গে থেকে থেকে, তুমিও অ্যাবনর্ম্যাল হয়ে গেছ।' আচ্ছা তোমার কি মনে হয় বল তো?'

'তোমার কি মনে হয় বল তো?'

একথা বলেছিল 'অ্যাবনর্ম্যাল' মানুষটাও।

সেই কথাই ভাবতে থাকে ফুরিয়ে যাওয়ার অভিনয়-করা নর্ম্যাল মানুষটা।

পাগলটা বলেছিল, 'এইটা তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও সুচিন্তা, কেন কেবল কেবল মনে হয় চিরদিন তুমি আমার কাছেই আছ, একসঙ্গে বেড়িয়েছ, গল্প করেছ, রাগ করেছ, অভিমান করেছ, হেসেছ, ভালবেসেছ, আবার কেনইবা তার সঙ্গে সঙ্গে কেবলই মনে হয় সবটাই খালি সবটাই শূন্য। সেই কতদিন আগে তুমি মারা গেছ, তুমি হারিয়ে গেছ। এরকম কেন হয়? তোমার কি মনে হয় বল তো?'

'সব সময় কেবল আমার কথাই বা ভাবো কেন?'

বলেছিলেন সুচিন্তা।

'তোমার কথা ভাবি কেন? কী অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার সুচিন্তা। তোমার কথা কি আমি ইচ্ছে করে ভাবতে বসি? ভাবনাগুলো তো মনের মধ্যে ভর্তি হয়েই থাকে।'

ওর মনের মধ্যেটা সব সময় ভর্তি হয়ে আছে সুচিন্তায়। কিন্তু সুচিন্তার?

সাতাশ বছর ধরে যখন-তখন ভেবেছেন সুচিন্তা 'তারপর কি করল সুশোভন।' প্রশ্ন করবার সুযোগ জীবনে আর আসেনি বলে ভেবেছেন। কিন্তু সারা জীবন ধরে কি শুধু সুশোভনের কথাই ভেবেছেন সুচিন্তা? শুধু সুশোভনকে দিয়েই মন ভর্তি করে রেখেছেন?

না, এত স্পষ্ট করে হ্যাঁ বলতে পারলেন না সুচিন্তা।

সারা জীবন 'সুশোভন' নামধারী একটা চেতনা মনের একেবারে গভীরতর স্তরের নীচে প্রচ্ছন্ন ছিল, মাঝে মাঝে সে চেতনা শুধু একটা বাষ্পের মত বিষাদ নিয়ে উঠে আসত উপরের স্তরে, ভারাক্রান্ত করে রাখত মন, দুরন্ত একটা অসহিষ্ণুতার জন্ম দিত, আবার এক সময় স্তিমিত হয়ে যেত।

তবু এই ওঠাপড়ার কোন চিহ্ন বাইরে কখনো প্রকাশ পেয়েছে কি? হাত-ভর্তি চুড়ি বালা বাজিয়ে মশলা আর ময়দা মাছ আর মাংস ঘী আর চিনি

নিয়ে রান্নার তদ্বিরত করা কি বন্ধ হয়েছে কোনদিন?

সুচিন্তা ভাবলেন সুশোভন পাগল, তাই তার অত আবেগ। ভাবলেন হয়তো বা অত আবেগ বলেই ও পাগল। ভাবলেন সুশোভনের স্ত্রী যদি বেঁচে থাকতো, যদি তার সেই বাচালতা আর অহঙ্কার নিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখত সুশোভনকে, সুশোভন কি সুচিন্তাকে দিয়ে মন ভর্তি করে রাখতেন?

তারপর সুচিন্তা ভাবলেন সুশোভনের এই দশা কি তাঁকে মর্মান্তিক দুঃখ দিচ্ছে?

বুঝতে পারলেন না।

প্রতিদিন রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার সময়, আর প্রতিদিন স্নানের পর উপাসনার সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চেষ্টা করেন 'ঈশ্বর ওকে সুস্থ করে দাও,' কিন্তু সে প্রার্থনায় প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন কই, শুধু নিষ্প্রাণ শুকনো কয়েকটি শব্দ যেন মাটির পৃথিবীতে পড়ে থাকে। জ্যোতির্ময় পথ বেয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।

অনুপম কুটিরের স্তব্ধতার ঐতিহ্য ঘুচে গেছে। এখন অনেক সময় সিঁড়িতে অনেকগুলো জুতোর শব্দ ওঠে নামে, অনেক রকমের কণ্ঠস্বর ওর দেয়ালে ধাক্কা খায়। অনেক হাসি আর অনেক গান বাতাসে ঝনঝনিয়ে ওঠে।

ওরা প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে আসে।

লালবাড়ী হলদেবাড়ী সাদাবাড়ী আর গোলাপীবাড়ীর ছেলেমেয়েরা। আড্ডায় বসে ইন্দ্রনীলের ঘরে।

ইন্দ্রনীল এদের সঙ্গে গলা খুলে হো হো করে হাসে, চাকরকে অসময়ে চায়ের ফরমাস করে আর অনেক রাত পর্যন্ত গানের আসর চালায়।

কুণ্ঠিত হয় না, শঙ্কিত হয় না।

ওকি বুঝে ফেলেছে ওর এই অসভ্যতা দেখে ভুরু কুঁচকে ওঠবার সাহস আর কারো নেই। ইন্দ্রনীল যে ক্রমশঃই ওর বাবার স্বভাব পাচ্ছে, এই কথা বলে মৃদু তীক্ষ্ন ধিক্কার আর দেবেন না সুচিন্তা।

হ্যাঁ ইন্দ্রনীলের স্বভাব তার বাপ অনুপম মিত্তিরের ধাঁচে।

সুচিন্তার যদি এ ধাঁচ ভাল না লাগে করা যাবে কি। সবাই কি এক প্যাটার্নের হয়!

কিন্তু এঘরে বসে মাঝে মাঝে যেন অবাক হয়ে যান সুচিন্তা, হঠাৎ এ-বাড়ীর ধারা এভাবে বদলে গেল কি করে?

কে দিল ইন্দ্রনীলকে বাড়ীর ধারা লঙ্ঘন করবার সাহস? কে দিল সুচিন্তাকে এই সব গোলমাল হৈ-চৈ সহ্য করবার শক্তি!

এর কারণ কি নীতা?

এর কারণ কি সুশোভন?

সুচিন্তাকে সহ্য করতে হবে।

সুশোভন সুচিন্তার শক্তি হরণ করেছেন।

এ যেন কে বিষ আর অমৃত এক পাত্রে ধরে এনে দিয়েছে সুচিন্তার মুখের কাছে।

গোলাপীবাড়ীর মেয়ে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সুচিন্তা শুনতে পেলেন তার সঙ্গে ইন্দ্রনীল আর নীতাও কথা বলতে বলতে নেমে গেল।

......হারজিতের মীমাংসা মুলতুবী রইল"

হয়তো সুশোভন। সুশোভনের উপস্থিতি।

সুচিন্তা অনুভব করছেন, তিনি এতটুকু ভুরু কোঁচকালেই মুহূর্তে ওরা ভুরু কুঁচকে তাকাবে।

সুচিন্তা যদি বলেন 'এ আমি পছন্দ করি না', ওরা তৎক্ষণাৎ ওদের অপছন্দকর দৃশ্যের দিকে আঙুল বাড়াবে।

সুচিন্তাকে না-শোনার ভান করে থাকতে হবে।

শুনতে পেলেন ইন্দ্রনীল বলছে, 'তর্কটা কিন্তু শেষ হল না। হারজিতের মীমাংসা মুলতুবি রইল।"

গোলাপী মেয়ে কি বললো শুনতে পেলেন না।

শোনবার মনোযোগও ছিল না।

ঠিক মনে হল ইন্দ্রনীলের কণ্ঠে অনুপম মিত্তির কথা বলে উঠলেন। তাস পাশা দাবা বাড়ীতে সব রকম খেলার চাষ বসাতেন অনুপম। তাঁর

খেলুড়িদের বিদায় দানের কালে বলে উঠতেন। 'আজ কিন্তু শেষ হল না। হারজিতের মামলা মুলতুবি থাকলো।'

তা' অনুপম মিত্তির তো তাঁর হারজিতের মামলা মুলতুবি রেখেই সরে পড়লেন। সুচিন্তার হারজিতের হিসেব কবে হবে কে বলবে।

হারের পালাই শুরু হচ্ছে নাকি?

অনুপম কোনখান থেকে দেখে হাসছেন?

নাকি অনুপম শান্ত সভ্য নিরুত্তাপ সুচিন্তার এই অসময়ের অশান্ত উত্তাপ অনুভব করে ব্যঙ্গে মুখ বিকৃত করছেন?

না অস্বীকার করতে পারেন না সুচিন্তা, তাঁর এতদিনকার প্রস্তরীভূত হৃদয় আজও অশান্ত হতে ভুলে যায়নি।

নইলে কাল সন্ধ্যায় যখন হঠাৎ বলে উঠলেন সুশোভন, 'কী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে দেখ সুচিন্তা, সেই রংপুরের বাড়ীর মত ছাতে যাই চল না।'

তখন রক্ত ছলছলিয়ে উঠেছিল সুচিন্তার বুক থেকে মাথায়, মাথা থেকে সমস্ত শিরায় শিরায়।

রংপুরের বাড়ীতে জ্যোৎস্না রাত্রে ছাতে ওঠা হত।

তা'বলে একা সুশোভন আর সুচিন্তা নয়।

সুচিন্তার এক পিসেমশাই আসতেন মাঝে মাঝে। ভারী সৌখিন মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি এলেই বাড়ীতে নানা রকমারি ঘটনা ঘটতো। তিনি বেলফুলের মালা গলায় দিতেন, উড়ুনি গায়ে দিতেন, জরিপাড় শান্তিপুরে ধুতি বার মাস পরতেন।

গরমকালের রাতে জ্যোৎস্না উঠলেই মাদুরে শীতলপাটি বালিশ সব কিছু ছাতে তোলাবার নির্দেশ দিতেন তিনি।

আর নিয়ে জড় করতেন বাড়ীর আর পাড়ার ছেলেমেয়েদের।

মজার মজার গল্প, মৃদু মৃদু গান, মাঝে মাঝে তাস খেলা এই সব দিয়ে আড্ডা এমন জমিয়ে তুলতেন যে সবাই 'পিসেমশাই' বলে বিমুগ্ধ হতো।

বয়েস পঞ্চাশের কাছে, সম্পর্কে পিসেমশাই। কাজেই বারণ করার ইচ্ছে হলেও বারণ করার সাহস কারো হ'ত না। তাছাড়া লোকটি হচ্ছেন ঠাকুমার জামাই! ঠাকুমার কাছে যাঁর সাত খুন মাফ।

স্ত্রীকেও অবশ্য টেনে নিয়ে যেতেন ভদ্রলোক কিন্তু তিনি বেলফুলের গন্ধ আর ফুরফুরে হাওয়ার প্রভাবে দু'-চার মিনিটের মধ্যেই নাক ডাকাতেন।

সুচিন্তা আসতো ছাতে, আসতো সুশোভন সুমোহন সুশোভনের বোনেরা।

কিন্তু তাতে কি?

তখন কে জানতো প্রেম কাকে বলে। কে চাইত একা দেখা হওয়ার সুখ।

কাছাকাছি এসে বসাটাই পরম লাভ।

বসা নয়, বসতে পাওয়া। কবে থেকেই তো 'বড় হয়েছে' বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল সুচিন্তাকে। পিসেমশাইকে ভারী ভাল লাগত ওদের।

বিকেল থেকে ছাতে জল ছিটিয়ে, মাদুর পাটি বয়ে হিমসিম খেত সবাই তবু রাগ করত না।

সেই ছাতে—

হঠাৎ একদিন একগাছা বেলফুলের মালা একটি ইতিহাস রচনা করল।

হয়তো সে মালা পিসেমশাইয়েরই কণ্ঠচ্যুত, হয়তো বা রেকাবিতে ভেজানো ঝরো মল্লিকার সঙ্গে বাড়তি রাখা ছিল।

সেই মালা—

সুশোভন বলে উঠলেন, 'সেই বেলফুলের মালার কথাটা মনে আছে তোমার সুচিন্তা?'

মনে পড়ে, মনে পড়ল।

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই তিরিশ বছর আগের রাতটা তার সমস্ত দৃশ্যপট নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল। বুঝি বহে আনল টাটকা বেলফুলের সেই গন্ধটাও।

কিন্তু সুশোভনের কেন আবার এ সব মনে পড়ছে?

সুশোভন তো সব ভুলে ভুলে যান।

সেই কথাই বলে উঠলেন সুচিন্তা, 'তুমি তো সবই ভুলে যাও, এতদিনের কথা মনে আছে তোমার?'

'মনে ছিল না! মনে থাকত না। সব ঝাপসা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, তোমাকে দেখে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। বেলফুলের মালা নেই?'

'বাঃ মালা আবার কোথা? এখানে কি পিসেমশাই আছেন?'

'কিন্তু আমরা তো আছি সুচিন্তা?'

সহসা আরক্ত মুখে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চেঁচিয়ে ওঠেন সুচিন্তা, 'না আমরা নেই। আমরা মরে গেছি।'

(ক্রমশ)

হিমাচলম্

ধীরেন্দ্রনারায়ন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিনের দৃশ্যান্তর। ২৬শে তারিখ। আমি ও নীরেন একই ঘরে দুই তক্তাপোষে শুয়েছিলাম—আমার উঠতে সেদিন কিছু বিলম্ব হয়েছে—ঘুম যখন ভাঙ্গে তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। নীরেন ইতিপূর্বে কখন যে উঠে স্নান সেরে, পেটে টান ধরায়, ছাদে উঠে ঘুরপাক খাচ্ছে সঠিক বলতে পারবো না। এস্রাজের ছড়ে কাঁপন দেওয়া সুরের মত বুলবুলের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠেই বাইরের বাগানে নেমে পড়ি। নীরেনের গলার আওয়াজে ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখি, তিনি এক ঠোঙ্গাভর্তি গরম জিলিপী টপাটপ মুখে ফেলছেন। আমাকে দেখেই রসভর্তি জিহ্বায় আনন্দোচ্ছ্বাস—

—এই যে দাদা, দ্যাখো, 'চঞ্চুপুটে লয়ে কাক বৃক্ষডালে বসে।'।

—তুমি কি বলতে চাও—'তলেতে শৃগাল ছিল, দেখে লোভ উপজিল?'—

তা নয়,—ধূর্ত শেয়ালের মত তোমাকে বঞ্চনা করে ভক্ষণ করার ইচ্ছে আমার নেই—বে-ফিকির রহো।

তাড়াতাড়ি মুখ ধোয়া প্রভৃতি সেরে সামনের বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গায় নেমে গেলাম—অনেকদিন পরে চমৎকার অবগাহন স্নানে কী তৃপ্তি! তারপর নীরেনের মত না হলেও পেটে কিছু দানা দিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে শুনলাম, পরিমলের তখনও ঘুম ভাঙ্গেনি। সারা রাত অকাতরে ঘুমিয়েছে—পেথিড্রিন ইঞ্জেকশনের মহিমা অপার।

গুনু, গণেন ও তাদের পিতৃদেব ও আমার কন্যা অনুজাকে সঙ্গে নিয়ে চলি দক্ষযজ্ঞশালা দর্শনে—পতিনিন্দা শুনে সতী যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন। সব কিছু দেখলাম—জল স্পর্শ করা, পুজো দেওয়া, যেখানে যা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সব সম্পন্ন করা গেল। সতীর দেহত্যাগের সেই জলাশয়টি শেওলাদামে বোঝাই।

তারপর গেলাম ভীমগোড়া। গঙ্গার একটা ছাড়—তার ওপরে একটা ব্রিজ—পাথরে বাঁধিয়ে জল নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এর সঙ্গে নদীর কোনও সংযোগ নেই—নাম হয়েছে নীলধারা—শান্ত স্থির—গাঢ় নীল—যেন কার স্বপ্নে বিভোর।

চমৎকার সাজানো—অনেকটা পার্কের মত দেখতে। কৃত্রিমতার প্রলেপ দিয়ে যেন অকৃত্রিমকে রূপ দিতে চায়। এখানে-সেখানে বেঞ্চ ছড়ানো। সন্ধ্যার আগে স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ হাওয়া খেতে আসেন—ছেলেমেয়েদের কলহাস্যে স্থানটি মুখর হয়ে ওঠে। এমন মনোরম স্থানে এসেও কিছুক্ষণের জন্যে নীরেন দলছাড়া হ'ল—আধ সের গরম জিলিপীর প্রভাব যাবে কোথায়?

হঠাৎ চোখে পড়ল দু'জন খুব আনন্দে পা ফেলে এগিয়ে আসছেন। হীরের বোতাম সূর্যকিরণে ঝিকমিক করে ওঠে। ভদ্রলোকটির দু' হাতের আট আঙ্গুলে অবশ্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাদ দিয়ে, দামী পাথর-বসানো ষোলটি আংটির বাহার দর্শনীয় বস্তু সন্দেহ নেই। সঙ্গে সহচারিণী, দু'জনের দু'টি হাত পরস্পরের কটি-বন্ধ—হাবভাবে মনে হয়, হয়ত তদ্দেশীয় কোনও এক প্রণয়-প্রশ্রয়িণী হবেন—লিপস্টিকে অনুরঞ্জিত টুকটুকে লাল ওষ্ঠদ্বয়, শ্রীহস্তে ভ্যানিটি ব্যাগ, পরনে বেনারসী জংলা শাড়ী, সর্বাঙ্গ সোনাদানার ওজনে ভারাক্রান্ত—যেন সচল 'গিনি হাউস'। এই সব জবড়জঙ্গ গয়না-গাঁটি বহন করেও তিনি অতি-আধুনিকা হওয়ার চেষ্টায় আছেন।

ঘর্মাক্ত কলেবরে আমরা চোখ ও মনের খোরাক নিয়ে ফিরে আসি। অনেকদিন ঘর্মের সঙ্গে চর্মের কোনও বহিরঙ্গ-সংযোগ ছিল না—এখন সেটা দেখা দিয়েছে।

দেখলাম, পরিমল উঠে বসেছে—দুই ভগ্নীর একই বাক্য—আমাদের ছেড়ে তোমরা একা একাই পুণ্য সঞ্চয় করে এলে? নীরেন অগ্রণী হয়ে কথার উত্তর দিয়ে মারা যায় আর কি!

—এলাম বৈকি! তাছাড়া তোমার এই অসুখ শরীর—ঝক্কি নেবে কে? পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য।

পরিমল চাপা গলায় তার দিদির কানে কানে কি বল্লে—তিনিও ভগ্নীর

কথাগুলি টেপরেকর্ডে অবিকল বাজিয়ে দেন—

—কেন, আমরা যেমন নিয়ে থাকি? নইলে ঠিক ঠিক সময়ে গরম গরম খাবার মুখের গোড়ায় কে যুগিয়ে দিতো?

নীরেনও পাল্টা জবাব দেয়—

—আর কেই বা যখন-তখন নরম-গরম বুলি ঝাড়ত, এই কথাটাও আপনার ভগ্নীকে শুনিয়ে দিন।

সংগ্রাম-পরিষৎ-এর স্ব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়ে আমিও রুলিং দিলাম—

—বটেই তো, নইলে যখন-তখন গবাগব্ গিলতে কেমন করে? লঘু হাস্যে ঘর ভরে গেল।

আমরা সবে খেতে বসেছি, এমন সময় যে মোটর-ভ্যানে আমরা এসেছিলাম, সেইটিই এসে হাজির। গতকালই ড্রাইভারকে বলে রাখা হয়েছিল যেন সে ঠিক একটায় হাজির হয়, আমরা দেরাদুন যাব। কারণ দুটি আর একটি ফাউ। পয়লা নম্বর কলকাতার বার্থ রিজার্ভ—দোসরা নম্বর, দেরাদুন শহরটা ঘুরে আসা আর ফাউ হ'ল গুনুর নিয়মভঙ্গ। আমি, গুণু, গণেন, অনুজা, বুলবুল গাড়ীতে উঠে পড়লাম। নীরেন যথারীতি আহারে মশগুল থাকায় কিছু পরে এসে যোগদান করতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে। দেখলাম, একটি মধ্যবয়স্ক লোক বসে আছে। সমস্ত গাড়ীটাই আমাদের রিজার্ভ—তার মধ্যে বাইরের লোক কেন, জিজ্ঞাসা করায়, সারথি সবিনয়ে জানায়—

—আমার শ্বশুর দেরাদুন যাবে, দয়া করে যদি হুকুম হয়—উত্তর দিলাম —স্বাচ্ছন্দে—তোমার শ্বশুর। আর কথা কী?

আমরা উঠতেই সেই শ্বশুরমহাশয় আমাদের জনে জনে আপ্যায়ন করেন, যেন কতকালের চেনা! গায়ে-পড়া আলাপ আর শিষ্টাচারের বহর দেখে প্রাণ অতিষ্ঠ।

তিনি নীরবে প্রশ্ন করে বসলেন—

—আপনারা কি জাত?

—ব্রাহ্মণ।

—আপনারা দ্বিজ? আমিও মহা-দ্বিজ!

আমার অস্ফুট উচ্চারণ—

—মহৎ শব্দো ন দীয়তে।

তারপরই গলাটা পরিষ্কার করে সুর পঞ্চমে নিয়ে এলাম—

—আমার কাছে শুধু একটাই জাত আছে—সেটা হ'ল খাঁটি মানুষ।

তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করে আপন মনেই বলে যান—

—আমাদের মহাদ্বিজ রাজা গুহককে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বক্ষে স্থান দিয়েছিলেন।

চলতি বাসের মধ্যস্থলে নীরেন উঠে দাঁড়ায়—বুকের পাটা দেখিয়ে বলে—

—আমাদেরও মহামুনি ভৃগুর পদ-চিহ্ন স্বয়ং নারায়ণ আপন বক্ষে ধারণ করেছেন।

পুলকিত-চিত্ত শ্বশুরমশাই-এর বুকের সেনা ফুলে উঠল—আর সব জাতির অস্তিত্ব বেমালুম গাপ করে সরল পাটীগণিতের মত সরল হিসেব করে ফেললেন—

—সেই জন্যেই তো আপনারা এবং আমরা মহাজাতি।

তিনি মহা-উৎসাহে কমা-কোলন-বিহীন অনর্গল কথা বলে যান। গ্রামোফোনের পিন্ বদলাতেও যেটুকু সময় লাগে, তাঁর মুখে সেটুকু সময়েরও বিরতি নেই। ইনি ঘুমিয়েও কথা বলেন কিনা, জানি না।

ভাবলাম, দালাল কিনা, জিজ্ঞাসা করি। সবিনয়ে জানতে চাই

—আপনি কি করেন?

—ইনসিওরের কাজ, দালালি, কনট্রাক্টরি, এখানে কিনে ওখানে বিক্রি করা,—

আরও যে সব ফিরিস্তি দিলেন, সবগুলি কোনও মেধাবী ছাত্রেরও মনে রাখা কঠিন।

মাঝে মাঝে গাড়ী থামে, কথা থামে না। গাড়ী থামার উদ্দেশ্য বুঝি, পথে টোল দিতে হয়, আবার টাল্ খেয়ে গাড়ী চলে, ইনি কিন্তু টলেন না। কথার নায়েগ্রা-প্রপাতে সব কিছুই ভাসিয়ে দিয়ে যান। এক কথায় বল্লেন, দুনিয়ায় এমন কোনও কাজ নেই, যা তাঁর অসাধ্য। আমাদের যে কোনও কাজের ভার যদি তাঁকে দেওয়া যায়, তিনি গ্যারান্টি দিয়ে করে দেবেন—'যে কোনো' কথাটির ওপর বিশেষ ঝোঁক দিয়ে আবার বলেন—

যে কোনও কাজ—আমায় একটু ইঙ্গিত দিয়ে দেখুন—যে কোনও কাজ—

পেছন থেকে বুলবুলের স্বগতোক্তি :

—বড় ডেঞ্জারাস লোক দেখছি।

ওদিকে বুলবুলের দাদু নীরেনের কথামৃত—

—কলিকালের সিদ্ধিদাতা গণেশ!

এডভোকেট গণেনের রায়—

ক্রিমিন্যাল লোক—জেল দেওয়া উচিত।

গুণেন ডাক্তারের কাটাকাটা সার্জি-ক্যাল মন্তব্য—জিহ্বার অপারেশন অপরিহার্য।

কন্যা অনুজা মন দিয়ে একটি উপন্যাস পড়ছিল—এ সব বাজে কথা তার কানে যায়নি।

আমাদের উত্তর বা প্রত্যুত্তরের ধার তিনি ধারেন না—একতরফাই নন্-স্টপ্ কথার ইঞ্জিন চালিয়ে যান। গাড়ী থামতেই তাঁর ছেদহীন, শ্রান্তিহীন, বিরামহীন কথার ফাটকাবাজি বন্ধ হ'ল। আমরাও অব্যাহতি পেলাম।

ভদ্রতার খাতিরেও সেই সবজান্তা মানুষটি একটা শুষ্ক নমস্কার পর্যন্ত না-জানিয়েই নেমে যান, আমরাই বরং পিছু ডাক দিয়ে তাঁকে নমস্তে জানাই।

স্বনামধন্য শ্বশুরমশায়ের মুখ ফিরিয়ে দেখার ফুরসুত নেই—একটা পাক দিয়ে মাথার পেছনে দু'হাত এক করেই নমস্কার জানালেন।

সবাইকে বলি—

আর অবাক হয়ে দেখছ কী? নেমে পড়।

নীরেন তল্পিতল্পা বগলে নিয়ে নামবার মুখে মন্তব্য করে—

দুনিয়ায় যে কত বিভিন্ন জাতের হরবোলা আছে, এত দিনেও তার হদিশ পেলাম না। আচ্ছা দাদা, তুমি অনেক মানুষ, অনেক দেশ দেখলে, বহুদর্শিতাও আছে, এ সব লিখে ফেললেই পারো।

—হ্যাঁ, পারি, মনেও করেছিলাম 'চলার পথে' নাম দিয়ে লিখব কিন্তু—

—তোমার মুখেও কিন্তু—?

—হ্যাঁ, সব সত্যি কথা যদি প্রমাণ দিয়ে বলি, তাহলে যীশুখৃষ্টের মত আমাকেও ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে।

নীরেন বুকঠুকে বলে :

—কুছ পরোয়া নেই, লিখে ফেল।

—আচ্ছা, দেখা যাবে, এখন চল।

নেমেই আমাদের দল কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

গুনু ও গণেন ভাল হোটেলের খোঁজে বেরিয়ে গেল। এতদিনের অরুচি

বিনাশের জন্যে আজ তারা সেই কনখল থেকেই প্ল্যান করে এসেছে।

নীরেন, বললে, অনুজা একটু শহর ঘুরে দেখতে যায়—ওই সংগে ভাল-মন্দ কিছু খেয়েও আসবে। আমি গেলাম স্টেশনে বার্থ রিজার্ভের অভিপ্রায়ে।

গিয়ে দেখি, স্টেশন মাস্টার নেই—তিনি নাকি ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছেন। বার্থ রিজার্ভ করতে গিয়ে শুনি—উপায় নেই—দশ-বারো দিনের আগে হবে না—সব বুকিং শেষ! আমাদের হরিদ্বার পর্যন্ত রিটার্ণ টিকিট আছে, কিন্তু বার্থ রিজার্ভ করা চাই তো। প্লাটফর্মে ঘোরাফেরা করি, স্টেশনমাস্টার এলে তাঁকে ধরে যদি কোনও সুরাহা হয়, এমন সময় পেছন থেকে কে এসে হঠাৎ আমার দু চোখ ধরে জানতে চায়—

—বল দেখি, আমি কে?

—হয়ত মানুষ।

—কেন, জানোয়ার বলে মনে হচ্ছে না কী?

—না দেখলে বলা কঠিন।

চোখ ছেড়ে আমার সামনে এসে কী হাসি!

—আরে, কে রে? জগদীশ? ইস—জগতের ঈশ? তা' তুমি এখানে? তোমাকে বহুদিন বহুদিন দেখিনি!

—ঠিক ধরেছি, তোমার ফেস্ অব দি কাট্ দেখেই ঠিক ধরেছি, তাহ'লে!

—উঁহু, কাট অব দি ফেস—

—ও একই কথা—তারপর হঠাৎ এখানে কি জন্যে? টিকিট?

—বড় টিকিট তো কাটাই আছে—ঘণ্টাও পড়ে গিয়েছে—ট্রেন ছাড়তে যা দেরী।

—ওঃ বুঝেছি—ষাট, ও কথা বলতে নেই।

—আর তুমি এখানেও যথারীতি তোমার লটারীর টিকিট কিনতে এসেছ নাকি?

—না ভাই. সে টিকিট কিনেই এলাহাবাদ থেকে বেরিয়েছি—ফার্স্ট প্রাইজ পেলেই, ব্যস, আর আমাকে পায় কে? তুমি তো সব কথাই জানো—বিশ বছর ধরে যেখানে যত লটারী টিকিট কিনে যাই—কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—তাই সুপ্রীম কোর্টে ধর্না দিয়ে এলাম।

—অর্থাৎ?

—বদরীনারায়ণ। হরেক রকম দেব-দেবীর কাছে কত যে মানত করেছি—ফল হয়নি, তাই একবার—

—শেষ চেষ্টায় বেরিয়েছিলে, কি বল? আমিও কেদারবদরী গিয়েছিলাম।

—আহা হা, আগে জানলে, তোমাকে কেদারনাথে আমার নামে ভোগ দিতে বলতাম।

বললেও দিতাম না—এই বুঝি তোমার ভক্তির নমুনা?

এমন সময় আমাদের দলবল এসে পড়তেই, জগদীশকে দেখিয়ে বলি—

—চিনতে পার?

নীরেন এগিয়ে আসে—

—খুব চিনি, হাড়ে-হাড়ে চিনি—যখন তোমার সংগে পড়তেন, তখন থেকেই চিনি। এ'র নাম জগদীশ পুরকায়স্থ না?

—আগে পুরোই ছিলাম। এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করে হাফ-কায়স্থ হয়েছি।

—তা বেশ! হাফেই বাপরে বাপ! একবার আপনার সংগে কলকাতায় দেখা হয়েছিল—হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে—"বিশ্বময় হরিনাম বল রে বদন ভরে"—সংগে সংগে আপনিও উর্ধবাহু হয়ে লম্ফ দিচ্ছিলেন—"বিশ্বময় অশ্বনাম বল রে বদন ভরে।' সে কী ভুলবার কথা!

—ও হোঃ হোঃ, তোমার খুব স্মরণ-শক্তি দেখছি—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক. তখন একটা ডার্বির টিকিট কিনেছিলাম কিনা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাহ—

জগদীশের পিঠ চাপড়ে বলি ঃ

এর পরেও তোমার হাসি পায়?

—হাসব না? দস্তুরমত ট্রেনিং নিতে হয়েছে—কখন, কি-রকম, ক'টা দাঁত বের করে হাসতে হয়।

—তা' বেশ করেছ। এখন বল দেখি, কোথায় আছ? ভয় নেই, তোমার স্কন্ধে চাপবো না।

—আমি প্রায় দু' মাস সস্ত্রীক মুসৌরীতেই আছি। বদরীনারায়ণ থেকে আসার পরই আমার ওয়াইফের' শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। চল না, একবার তাকেও দেখে আসবে, শহরটাও ঘোরা হবে। এখান থেকে তো বেশী দূর নয়, কি বল?

—শহর আর কি দেখব? তা'ছাড়া আমি ত' ইতিপূর্বে মাস দুই ওখানে ছিলাম।

নীরেনের উস্কানিতে জগদীশ লটারীর বংশপরিচয় ভায়াকে শুনিয়ে গেল—পৃথিবীর কোন্ লটারী কখন এবং কেন সৃষ্টি হয়েছে, তারই জন্ম-ইতিহাসকে পাতিহাঁস বানিয়ে ছেড়ে দিলে। এগুলি তার শুধু কণ্ঠস্থ নয়, একেবারে বুকস্থ।

—দেখ নীরেন, "লট-এ" অরি বসে আছে. তাই আজও আমার ভাগ্যে লটারী উদয় হয়নি। কত হাত দেখিয়েছি, কত কোষ্ঠী বিচার করিয়েছি, তা'রা কি বলে, জানো? আমার কপালে নাকি এক দিন বিরাট অর্থপ্রাপ্তি যোগ আছে।

আমার ভ্রূ-কুঞ্চিত উত্তর—

—সেই আনন্দে থাকো। তবে, একটা কথা, তুমি কি কখনো তোমার অভ্যস্ত জীবনের বাইরে এসে দাঁড়াবে না?

জগদীশ থিয়েটারী ভঙ্গীতে জবাব দেয়—

—জীবন থাকিতে নয়।

—উত্তম। টাকা যখন ঘরে আসবেই. কথঞ্চিৎ মিষ্টিমুখ হয়ে যাক—in advance.

—বেলা একটায় এসে, এর মধ্যেই তিন তিন দফা সে কম্ম শেষ!

—এবার চৌথা নম্বর হোক—আপত্তি নেই তো?

—মোটেই না. খাবারে আবার আপত্তি? আমার চৌদ্দপুরুষ কখনও করেনি।

নীরেন বেজায় খুশী—মনে মনে হয়ত ভাবলে—যাক এ যাত্রায় তার একটি উপযুক্ত দোসর মিলেছে।

—এই তো ব্যাটা-ছেলের মত কথা! আমারও এক কিস্তি শেষ—আপনার সংগে আরও একবার হয়ে যাক।

ভায়ার মাত্রাধিক আনন্দে বাধা দিলাম ঃ

তার আগে ওর মণিব্যাগটা হস্তগত কর—মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ।

সেও জগদীশের হাত ধরে টানা-টানি করে—সেই সংগে কত না অনুরোধ উপরোধ ঃ

—আমাদের সবাইকে আজ খুব পেট ভরে খাইয়ে দিন।

এবার জগদীশের স্বরূপপ্রকাশ!

বাঁ-হাতে বুক-পকেট চেপে ধরেই সে নীরেনের উৎক্ষিপ্ত ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়—

—আমায় এক্ষুনি ফিরতে হবে, ভাই —আর সময় নেই—Very sorry for you, Niren.

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমাদের এই সব খোসগল্প চলছিল। জগদীশ বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওদিক দিয়ে হেলে-দুলে একজন মোটা সোটা ধরনের লোক এগিয়ে আসছেন। একজন চিনিয়ে দিলেন—ইনিই স্টেশনমাস্টার—নাম এস পি পতি।

আমরাও এ্যাপ্লিক্যান্ট—আমাদের দরখাস্ত আছে। সবিনয়ে এগিয়ে গেলাম। সামান্য ভূমিকা শুরু করতেই বল্লেন :

—আমার ঘরে আসুন।

সবাই অনুসরণ করি। আমি ও গুণু ভিতরে ঢুকলাম। চেয়ার দেখিয়ে তিনি আমাদের বসতে বললেন—আর নিজে অন্য কথায় মেতে উঠলেন। তিনি নর্দার্ণ রেলওয়ে ফুটবল টুর্ণামেন্টের অনারারী জেনারেল সেক্রেটারী। কী রকম খেলা হল, কে খেলতে পারে নি, টুর্ণামেন্টের সব খেলা দেখে তিনি আশা করেন, নিশ্চয়ই তাঁর টিম জয়যুক্ত হবে—এই সব আলোচনাই চলে।

খেলার কথা আমার কাছে মন্দ লাগছিল না—কারণ আমিও একদিন খেলোয়াড় ছিলাম। কিন্তু, গুণুর কাছে এ সব অবান্তর, তাই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে আর কি! উসখুস করে, আর ঘন ঘন জোর দিয়ে কাশে, তবুও স্টেশন-মাস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় না। এক-বার গুণুর দিকে তাকান, আবার টুর্ণামেন্টের কথায় মেতে ওঠেন।

সব কিছুরই শেষ আছে। এক সময় তাঁর আলোচনাও থামে; আর সবাই বেরিয়ে যায়—তখন পতি-সাহেবের খেয়াল হয় যে আমাদের একটা আরজি তাঁর কাছে পেশ করার অপেক্ষায় আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

আমাদের বক্তব্য শুনে তিনি কিছু-মাত্র চিন্তা না করেই সাফ জবাব দিলেন—

—অসম্ভব, কোনো উপায় নেই—সব বার্থ রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে—অন্ততঃ দশ দিনের আগে কিছু করা সম্ভব নয়।

গুণু তার ভাষায় মাখন মাখিয়ে যতটা মোলায়েম করা যায়, তার কিছুই ত্রুটি রাখে না—কলকাতায় তার জরুরী কাজের কথা, তার 'নিরাময়', তার 'টি-বি' পেশেন্ট, যত কিছু বাণ তার তূণে রাখা ছিল, এক একটা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে কসুর করে না—এমন কি মোটা হাতের বাজে খরচা করতেও সে রাজী—যদি তিনি একটু কৃপা-কটাক্ষ করেন, কিন্তু কিছুতেই পতি-সাহেবের মন ভাতি হয় না। এমন সময় একজন প্যান্টপরা নব্য ছোকরা ঘরে ঢুকে গুণুর কথা-গুলি বেশ মন দিয়ে শুনছিল, আমার দিকে ঘন ঘন তাকায় আর হাসে।

তাকে জিজ্ঞেস করি

—আমাকে চেনেন নাকি?

—নিশ্চয়ই, ফুটবল খেলার মাঠে দেখেছি। আপনি কোনো ম্যাচই বাদ দেন না। আপনার শিকারের গল্পও অনেক পড়েছি—ভারী—

—থাক, বলতে হবে না। এদিকে পতি-সাহেব যে আমাকেই শিকার করে বসলেন, কি করা যায় বলুন তো?

—দয়া করে আমাকে আপনি বলবেন না। কথাকটি বলেই প্রণাম করতে আসে।

—না ভাই, ও সব করে না—কৈ বললে না, তোমার নাম কি—এখানে কি কর?

—শীতলচন্দ্র দাস—লিলুয়া ওয়ার্ক-শপ স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন থেকে 'টিম' নিয়ে এসেছি—আমি জেনারেল সেক্রেটারী, ক্যাপ্টেনও বলতে পারেন। আমরা ওয়ার্কশপেই কাজ করি, যেটা ভাল সেলুন, সেইটি বাছাই করে সঙ্গে এনেছি। আমরা কালই তুফান এক্সপ্রেসে আমাদের সেলুন জুড়ে নিয়ে কলকাতায় রওনা হব। আপনি যদি যান, কাল সন্ধ্যায় আসুন।

আমাদের টিকিট আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলি—

—হ্যাঁ আছে, শুধু বার্থ-রিজার্ভের জন্যে এখানে ছুটে আসা।

কিছু দরকার নেই, টিকিট থাকলেই হবে।

—কিন্তু একা গেলে তো চলবে না—আমার সঙ্গে অনেক লোক—কি হবে?

—যদি বলেন, আমাদের যতই অসুবিধা হোক, একটা গোটা ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট আমরা ছেড়ে দেব।

ছলছল চোখে তার হাত দুটো জড়িয়ে বলি—

—ভগবানের আশীর্বাদ কার মধ্যে দিয়ে নেমে আসে, আমরা বুঝতে পারি না—নইলে, তুমি এমনি সময়ে ঠিক আমার সামনে এলে কেমন করে? এইটেই তাঁর করুণা!

তাকে সম্বোধন করে বলি :

শীতল, তুমি আমার বুক শীতল করে দিলে। খুব ভাবনায় পড়েছিলাম। তারপর বল, তোমাদের ফুটবল খেলার ফলাফলটা কি?

মাথা নীচু করে সে উত্তর দেয়—

—কাল পাঁচ গোলে হেরে গেছি; আজই ফিরে যেতাম। কিন্তু তা' হোল না—সব প্লেয়ার্স টাউন ঘুরে-ফিরে বেড়িয়ে কাল ট্রেনে উঠবে।

গুণুকে ধাক্কা দিয়ে বলি—

—দেখলে তো ওপরের খেলা। এরা যদি আজই চলে যেত, কাল আমাদের যাওয়াটা কখনই হ'ত না।

দেখলাম, ছেলেটি শিষ্ট, শান্ত, অমায়িক। সে আবার মনে করিয়ে দেয়—

—আপনারা কাল 'তুফান' ছাড়বার আধঘন্টা আগে এসে পড়বেন কিন্তু। এদিকে সব ঠিক থাকবে— কোনো চিন্তা নেই।

গুণুর একটু কেমন যেন সন্দেহ-ভাব—। ফস করে প্রশ্ন করে বসে

—এখানে এসে আবার বিপদে পড়বো না তো—? দেখুন, ঠিক করে বলুন।

শীতলের ঠাণ্ডা চোখ দুটো গরম হয়ে ওঠে—এমনিভাবে চাইলে যে গুণুর মাথা হেঁট। শীতলের হাত দুটি ধরে কুণ্ঠার সঙ্গে বলে—

—কিছু মনে করবেন না—আমরা ঠিক সময়ে এসে যাব।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফলাফল কি হল, জানবার আশায় সকলেই উদগ্রীব।

আমাদের প্রফুল্লতা দেখেই অনুমান করে নেয়—কার্যোদ্ধার হয়েছে।

আমি ছাড়া আর সকলেই উত্তম মধ্যম আহার শেষ করে এসেছে। নীরেন মনে পাড়িয়ে দেয়—

—দেখ দাদা, পেট ব'লে তোমারও একটা বস্তু আছে। চল, স্টেশনের রানিং-রুমেই খেয়ে নেওয়া যাক।

রানিং-রুমে সকলেই খেতে বসল—আমি ছাড়া আর সবার এটি দ্বিতীয় ভাগ।

তারপর বাসে উঠে কনখল।

নীরেন ড্রাইভারকে প্রথম কিস্তি জিজ্ঞেস করে—

—ড্রাইভার সাহেব, আপনার শ্বশুর-মশায় নামবার সময় কৈ আপনার সঙ্গে কোন কথা বললেন না? আপনি তো তাঁর দামাদ?

—খুব বড় আদমী—বহুৎ কারবার—আমাকে তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে নেবেন বলেছেন—

—তাহলেই দফা রফা।

দূরে মুসৌরী শহরের আলোকমালা ঝিকমিক করে—একটা চিত্রিত স্বপ্ন চোখের সামনে ভেসে আসে।

মোটর-ভ্যান ছেড়ে দিলে। বুল-বুলকে বলি—সমস্ত পথটা আমার গানে গানে ভরে দাও।

সেও মিষ্টি গানের পাখায় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়।

অমৃতস্রাবী রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধুর্য-ধারায় নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রি সচকিত হয়ে ওঠে।

যখন কনখলে পৌঁছলাম, তখন রাত একটা। সারথিকে বলে দিলাম—

—কাল আবার ঠিক বেলা একটায় আসবে।

তিনি সেদিনের বাবদ মোটা দক্ষিণা নিয়ে বিদায় হলেন।

যে যার ঘরে চলে গেল—আমি ও নীরেন নির্দিষ্ট ঘরে শুয়ে এক ঘুমে রাত কাবার।

পরদিন, ২৭শে অক্টোবর।

সকলের অভিমত এখানে সপ্তাহকাল বিশ্রাম করে, পরে রওনা হবেন। শুধু আমি ও গুণু, এই দুজন যাত্রী।

ভোরে উঠে সামান্য এধার-ওধার ঘুরে-ফিরে এসেই দেখি, একটি মহতী সভা—সবাই উপস্থিত।

এ যাত্রার মত তীর্থ পরিক্রমা শেষ হয়েছে—শুরু হয়েছে মানস-পরিক্রমা; সবাই যোগ দিয়ে নিজের নিজের স্বাধীন অভিমত বলে যায়। কার কী অনু-ভূতি, পথের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ইতিহাস, কার কোন স্থানটি ভাল লেগেছে—তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কতদিন পরে সব এক সঙ্গে জোট বেঁধে যাওয়া-আসার আনন্দ, তার-পর কে কোথায় আপন আপন কাজে ডুবে যাবে—বুলবুল যাবে কলেজে—অনুজা চলে যাবে শ্বশুরবাড়ী, গুণু 'নিরাময়ে'র কাজে দিনরাত ডুবে থাকবে—গুণেন রুটিন-মাফিক মক্কেলদের মাথায় হাত বুলিয়ে, তাদের আক্কেলসেলামি পকেটজাত করবে—নীরেন চলে যাবে আপন জোতজমির ধান্দায়—এই ধরনের সরল তরল জটিল পর্যালোচনা।

আমি ঢুকতেই নীরেন দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানায়—

আসুন —প্রেসিডেন্টসাহেব —ঐ চেয়ারে বসে আমাদের মিটিং পরি-চালিত করুন।

—আমাকেই কে পরিচালিত করে ঠিক নেই—আমি করব তোমাদের পরিচালনা।

নীরেন একটা দামী কথা বলে ফেল্লে:

—দেখ দাদা, ছোটবেলা থেকে তুমি আমি একসঙ্গে কাটালাম—বহুদিন পরেও দেখলাম—সেই ছেলেবেলার মানুষটি এখনও তোমার মধ্যে বেঁচে আছে। তোমার আবেগ, চঞ্চলতা আর উচ্ছল প্রাণের সাড়া পেয়ে আমি অবাক।

—খুব হয়েছে—এখন প্রেসিডেন্ট আদেশ দিচ্ছেন—আর দেরী করা চলবে না—সভা ভঙ্গ হউক।

শ্রীমান গুণুও সমর্থন করে—

—তাই হোক—নাওয়া-খাওয়া আছে তো—! তাহলে, বড়বাবা দশজনের মধ্যে শুধু আপনি আর আমি মাত্র দুজন যাত্রী?

—আর একদিন আসবে—সেদিন আমিও থাকবো না—তুমি একাই যাত্রী হবে।

আজ যেন সবার মন সুরে বাজছে না— আমার তো নিশ্চয়ই।

স্নানাহার সেরে বারান্দায় পায়চারি করি। নীরেন কাছে এসে দাঁড়াতেই বলি:

—তোমার জন্ম তারিখ বদরী-নারায়ণের পুণ্যভূমিতে পড়ে গেল—আমার পড়বে কাশীতে—জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। গোটাদিন বিশ্বনাথের দরবারে কাটিয়ে যা হয় করা যাবে। গুণু তো সটান কলকাতায় পাড়ি দিচ্ছে। তোমার জন্মদিনে আমরা সবাই তোমাকে ঘিরে ছিলাম—আমার বেলায় আমিই শুধু একা—মন্দ কি!

সময় হয়েছে নিকট
এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

সেই মোটর-ভ্যান এসে দরজার গোড়ায় ভেঁপু বাজিয়ে দিলে।

যার যা মালপত্র উঠে গেল—আমরাও ভ্যানে উঠলাম। নীরেন কেঁদেই অস্থির।

সব সমাপ্তির একটা বেদনা আছে।

তবু বিষণ্ণ পরিবেশ একটু হাল্কা করে দিলাম।

—তোর বুদ্ধিটা আর পাকলো না—এই সব উপযুক্ত ছেলের সামনে, নাতনীর চোখের ওপর এই বয়সেই কান্না পায়? ছিঃ—

মোটর ছেড়ে দিলে।

যথাসময়ে 'ডুন' স্টেশনে পৌঁছে দেখি শ্রীমান শীতলচন্দ্র আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে—

—আপনারা মাত্র দু'জন? আর সব কোথায়?

—কেউ এলো না। আমরা দু'জনেই দু'শ।

নির্দিষ্ট কামরায় উঠবার আগে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে বলি —

তোমার কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে—আমার এই বয়সে এই অক্ষম দেহটাকেও তুমি তোমার কাছে টেনে নিয়েছ—আমায় দর্শন দিয়েছ—তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

ছেড়ে যেতে মন চায় না—তবু যেতে হবে—এও তোমারই বিধান।

ট্রেনের বাঁশী বেজে ওঠে—মনের বাঁশী বাজে না কেন?
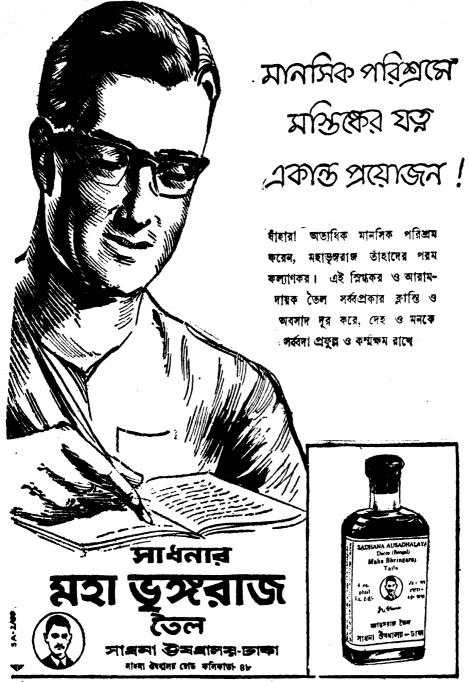
[সমাপ্ত

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ সাঁইত্রিশ ॥

পরদিন, সমস্ত দিনটাই নিঝ্‌ুম হয়ে কাটল লাহিড়ীমশাইয়ের। বেশ গুছিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারছেন না, যা বলতে পারছেন না। বিশেষ ক'রে স্মৃতির দিকটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে। ছাড়া-ছাড়া এক-আধটা কথা বলেন, মনে করবার চেষ্টা করেন, তারপর হার মেনে ছেড়ে দেন। বেশ বেলা পর্যন্তই পড়ে রইলেন। উঠে অনেক পরে আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কেটে এলে বললেন—

"কাল প্রশান্তর বন্ধু রজত এসেছিল —কী বলতে ভুলে গেলাম—স্কুলের ইনস্‌পেকটার আসছে সেই ভাবনায় এমন মাথাটা হয়ে রয়েছে! তোমায় কিছু বলে গেছে মা?"

সমস্ত চৈতন্যটা ও'র দিকে জড়ো করে রেখেছে স্বাতি, সামলে যাচ্ছে, বলল—'বললেন না? বললেন—ঐ সব ভেবে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন—একেবারে কোন ভাবনার দিকেই যেন না যান দু'দিন।... স্কুলের ইনস্‌পেকটার আসছে —এ আর কী এমন বড় কথা বাবা?"

খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ঘুমুলেন, উঠলেন যখন, বিকেল গড়িয়ে গিয়ে বেশ রোদ পড়ে এসেছে। তখন এক আধটা যা প্রশ্ন করলেন, কালকের ঘটনার অনেকটা কাছাকাছি। একবার বললেন—"প্রশান্ত অনেকদিনই যেন আসেনি। কোন বিপদ-আপদ ঘটল কিনা কে জানে।"

স্বাতি অবহেলা ভরে একটু হেসেই বলল—"কী যে বলছ বাবা! বিপদ-আপদ হ'লে টের পাওয়া যেত না? এই তো পুল-কলোনী, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়। মিছিমিছি ওসব ভেবো না। বরং তোমাদের ইনস্‌পেকশনের কথা একটু ভাবো, সে তবু একরকম ভালো। স্কুলের কাগজপত্রগুলো বের করে দোব? তাও না হয় থাকই—ডাক্তারবাবু মানা করে গেছেন যখন।"

—নিজেই ব'কে যায় বেশি, মনটা টেনে রাখবার জন্যে।

একবার বললেন—"জান মা, প্রশান্তর বাবার নাম ছিল দ্বারিকানাথ—কাল ডাক্তারবাবু বলছিলেন।"

বুকটা ধক্ করে উঠল স্বাতির। অমানুষিক চেষ্টায় সহজভাব বজায় রেখে বলল—"শ্রীকৃষ্ণের নাম।"

একটু হেসে বলল—"শুনলেই আমার কীর্তনের মাথুরের কথা মনে পড়ে যায় বাবা—বিশেষ করে যেখানটা দূতীরা গিয়ে ও'কে গঞ্জনা দিচ্ছে। দ্বারকারও তো রাজা। সত্যি কথা বলতে কি বাবা—কৃষ্ণলীলার মধ্যে ঐখেনটা বড় ভালো লাগে—রাজা হয়ে বৃন্দাবনের সব কথা ভুলেছ—বাল্যসখা, সুদাম, মা-যশোদা, যমুনার তীর—এখন শোন মিষ্টি মিষ্টি —বড় শক্ত ঠাঁই, ওদের কাছে জারিজুরি খাটবে না কোন রকম—তা সে যত বড়ই রাজা হও না কেন।" হাসি ফুটল লাহিড়ীমশাইএর মুখেও। ভাগবত থেকে একটা প্রাসঙ্গিক শ্লোকও উদ্ধৃত করলেন। সামলে যাচ্ছে এই ক'রে ক'রে।

কিন্তু হামেসার জন্যে সামলাবার জিনিস তো নয়। বড় অসহায় বোধ হচ্ছে —কী হবে।

এক এক সময় মনের অস্থিরতায় এতদূরে পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে, ইচ্ছা করছে—অনাথকে পাঠিয়ে ডাকিয়ে নিক পুল-কলোনী থেকে ওদের একজনকে। পূর্বেকার সব কথা ভুলে একবার এ বিপদে পাশে এসে দাঁড়াক। একটা সামলাক দিক, তারপর যেমন চলছে, চলবে। অনেক কষ্টে সংযত করে রেখেছে নিজেকে।

দুর্বল হয়ে পড়েছে এটা জেনেও যে, ওদের এ-অবস্থায় আসা সম্ভব নয়। নিরাপদ নয় বলেই সম্ভব নয়। সে-কথা কাল বলেই গিয়েছিল রজত। ও-ও এই-জন্যে আজ নিজে আসেনি, ওকে দেখলেই সব মনে পড়ে যাবে আবার। প্রশান্তকে দেখলে তো কথাই নেই। কথাপ্রসঙ্গে কাল রজত একথাও বলেছিল যে, প্রশান্তকে এ সম্বন্ধে কিছু বলা চলবে না ওর। বলে-ছিল—সেও ওদিকে সসেমিরে হয়ে রয়েছে, মিথ্যা বলে সামলাতে হবে তাকে। নয়তো ছুটে এসে একটা অনর্থই বাধাবে।

এদিকটা সামলে দিয়ে অনাথের কাছে গিয়ে চাপা গলায় পরামর্শ করছে,

চোখের জল ফেলছে। অনাথ একটু বে ভালো আছে সেই সুযোগে সামনের বাগানে গিয়ে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি ওলটাচ্ছে। এক-একবার রাগে গোঁফ জোড়াটা উঠছে ফুলে, এক-একবার দুশ্চিন্তায় ঠোঁটের সঙ্গে একেবারে যাচ্ছে মিশে।

এদিকে থাকার উদ্দেশ্য বোধহয় ওদের পথ আগলানো, প্রশান্ত, রজত যেই যাক।

এই করে সমস্ত দিনটা গেল একরকম ক'রে কেটে। সন্ধ্যা হয়ে যেতে আলো জেনলে স্বাতি লাহিড়ীমশাইকে শুইয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসল। কেউ কাউকে বলেনি, তবু ওর মনের মগ্নচৈতন্যেও যেন ঐ রকম একটা আশা রয়েছে—যদি ওদের কেউ এই রাস্তায় যায়। মুখোমুখি হয়ে বসেছিল অনাথের সঙ্গে, খুব দূরে গুড় গুড় করে একটা আওয়াজ শুনে দু'জনেই হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। অনাথ বলল—"মোটর নাকি?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বাতির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"মেঘ নয় তো অনাথ-কাকা?"

—আতঙ্কে মুখটা শুকিয়ে গেছে। বলল—"চলো তো আকাশের অবস্থাটা একবার দেখি—কাল একবার যখন আরম্ভ হ'য়েছে......"

সামনেটা গাছপালায় আকাশ ঢাকা। ওরা একেবারে রাস্তার ধারে চলে গেল। মাথার ওপরটায় তারা জ্বলছে, তবে খুব দূরে আর একটা গুরু গুরু ডাক শুনে ওরা পশ্চিম আকাশের দিকে ঘুরে চেয়েছে, বারান্দা থেকে লাহিড়ী মশাইএর বিকৃত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"স্বাতি মা—একটা কথা শুনেছ!..." —ওরা শুনতে শুনতেই ছুটল—"প্রশান্ত স্যাঙাতের ছেলে! —আমার স্যাঙাত গো—দারুকেশ!!......"

—বারান্দার খুঁটি ধরে একটু একটু দুলছেন, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। "ও বাবা, তুমি উঠে এলে কেন!—ব'লে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে ধরে ফেলে বিছানায় শুইয়ে দিল স্বাতি। অনাথও একটু ধমক দিয়েই উঠল—"বলছে সবাই কাহিল শরীল—তা কারুর কথা তা শুনবেনি!"

—আর কিন্তু সামলানো গেল না। অনাথের কথাতেই ঠেলে উঠছেন লাহিড়ীমশাই, চোখ দুটো পাকিয়ে বললেন—"তুই কী জানিস—কী জানিস তুই যে মড়োলি করতে এসেছিস? স্যাঙাতের ছেলে—মনে আছে, কি রকম দুর্যোগের মধ্যে ঢুকে বয়ে বাড়ি ঢুকে আরম্ভ করেছে আমার সর্বনাশ—একটু একটু করে জ্বালা গলিয়ে ছুঁচ সে হয়ে উঠেছে ফাল—ঠিক ওর বাপের মতন—মিলিয়ে দেখ হতভাগা, ঠিক ওর বাপের পথ ধরেছে কিনা—যাওয়া-আসা, মিষ্টিকথা, আত্মীয়তা—দেখেছিস্ তো ওর বাপকে, না, আজ এসেছিস?......"

এক রাশ বকে গিয়ে, নিজের উত্তেজনাতেই ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে পড়লেন বিছানায়। চোখের ইশারাতে অনাথকে সরে যেতে বলে হাতটা একটু চেপেই আস্তে আস্তে মাথার ওপর বুলিয়ে যেতে লাগল স্বাতি। স্থির হয়ে পড়ে রইলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আবার তেড়ে উঠে ঐ রকম—পুরনো কথা টেনে এনে প্রশান্তর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। কাল শুনে পর্যন্ত বাইরের স্তব্ধতার অন্তরালে মনটা ছুটোছুটি করে জমাই করছিল তো সব।

এর সঙ্গে, রাত্রি একটু এগুতে আবার দুর্যোগ নামল। কালকের মতো অল্প সময় নিয়ে নয়। কালকেরটা ছিল যেন এক ঝোঁক নূতন ঝঞ্ঝা-বৃষ্টির পূর্বাভাস—ঋতুর শেষ পর্যায়। আজ দিনের বেলাও ছোট-খাট দু'-তিনটা পশলা হয়ে গেছে, তারপর এই। গতিক দেখে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অনাথকে পুল-কলোনীতে পাঠাতেই যাচ্ছিল স্বাতি, একেবারে যেন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল মাথার ওপর—ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, অশনি। অনাথ তবুও লাঠি নিয়ে বেরুবে—ও-ও কিরকম হয়ে গেছে, স্বাতি পা দুটো জাপটে ধরে তাকে নিরস্ত করল, বলল—"ও অনাথ-কাকা, তোমাকেও হারালে আমার কি দশা হবে? এখনও দেহে অসুখ তোমার!"

বাইরে প্রলয়, ভেতরে প্রলয়, স্বাতিও বুঝি আর প্রকৃতিস্থ থাকতে পারছে না। মনে হচ্ছে ছুটে পালাই, মিশে যাই এই দুর্যোগের সঙ্গে।..... রজত কয়েকটা ওষুধ রেখে গিয়েছিল কাল, আজ দুপুরেও গোপেশ্বর এসে কয়েকটা রেখে গেছে। একটা খাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে আরও উগ্র হয়ে উঠলেন লাহিড়ীমশাই। হাতে নিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে।

"আমায় বিষ খাওয়াবে এবার—স্যাঙাতের ছেলের বন্ধু—ও আমায় বিষ খাওয়াবে—দাঁড়া, বুঝেছি, চাকরি নয়—ও-ও একটা বিষ হয়তো—আমি নেব না, আমি রাখব না—দাঁড়া......"

বাক্স খুলে সমস্ত কাগজপত্র বের করলেন। ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে যেন স্বাতি। হাতে মুড়ে বাইরে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন—"ও বাবা! স্কুল কি করেছে?" বলে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থেমে গেলেন। ওর হাতেই আস্তে আস্তে তুলে দিয়ে বললেন—"ঠিক তো, স্কুল কি করেছে?...... একখানা কাগজ দে তো আমায় মা।"

স্বাতি এনেই দিল। সেইখানে বসেই খসখস করে একটা ইস্তিফা লিখে ওর হাতেই তুলে দিয়ে বললেন—"চুকে গেল স্যাঙাতের সঙ্গে সব সম্বন্ধ। ছেড়ে দিলাম ওর ছেলের এই চাকরিরদান। কাল পাঠিয়ে দিবি। দিবি তো, তিন সত্যি গাল্। আমার মেয়ে!"

হাঁক দিলেন—"অনাথ! কোথায় গিয়ে বসে রইলি হারামজাদা!"

অনাথ এসে দাঁড়াল।

"তোল্।" সেলাই-কলটা দেখিয়ে বললেন—"একেবারে পুকুরের মধ্যে...... আমাদের পুকুরে নয়। ...না, না। ফিরিয়ে দিয়ে আসবি কাল—আমি কবে অন্যায় করেছি, আমি কবে প্রতিশোধ নিয়েছি? ......উঃ, আর পারছি না। একটু জল দে তো মা স্বাতি।"

॥ আটত্রিশ ॥

স্বাতি যতক্ষণ জেগে রইল দুর্যোগটা লেগেই ছিল। লাহিড়ীমশাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জলের সঙ্গে ওষুধটা গুলে খাইয়ে দিয়েছিল স্বাতি। উনি যখন জেগে উঠলেন, ভোর হয়েছে, আকাশও পরিষ্কার। যেন কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন সম্পূর্ণ এক অন্য লোকে। একটা অভঙ্গ শান্তি। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছে বাইরে থেকে। অনেক পরে একদিন এই রাতের আলোচনা প্রসঙ্গে রজত বলেছিল—"ওটা দরকার ছিল, সেই উগ্র বিতৃষ্ণা, সেই কাজে ইস্তফা দেওয়া, সেই সেলাই-কল প্রত্যাখ্যান—মনের গ্লানি আর আক্রোশের স্রোতটা বয়ে যাওয়া দরকার ছিল একটা তোড়ের সঙ্গেই, ওটুকু না হ'লে কী যে হোত কিছু বলা যায় না।" তোড়েই ভেসে গেছে সব। একটা অপূর্ব শান্তি, আজকের প্রভাত কালকের রাত্রিকে যেন চিরতরেই বিদায় করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে এ আকাশে তার আর স্থান নেই।

তবু, কিছু না থাকলেও স্মৃতি তো থাকেই। সেইটেই আসছিল ঘুরে—দুর্যোগের সঙ্গে সর্বনাশা বন্ধুত্বের স্মৃতি, কবেকার সেই প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে। সেই সময় পাশ ফিরতে গিয়ে স্বাতির ওপর দৃষ্টি পড়ে গেল, জড়োসড়ো হয়ে পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে উঠে বসলেন লাহিড়ীমশাই।

জানলা গ'লে ভোরের এক ফালি কাঁচা রোদ স্বাতির মুখের ওপর এসে পড়ে গালের কয়েকটা শুষ্ক অশ্রুরেখাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। চোখের কোণ চেপে আর এক বিন্দু অশ্রু নীচে গড়িয়ে পড়ল। স্বাতি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে, এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কান্নারই স্বপ্ন দেখছে কোনও।

বুকের ভেতরটা অসহ্যরকম মোচড় দিয়ে উঠল লাহিড়ীমশাইএর, মনে

পড়ে না এমনটা আর কখনও হয়েছে। উনি এক হিসাবে বইএর সাহচর্যে চিরকাল দুঃখ-কষ্টকে ভুলেই আছেন বলা যায়। এক-একবার ক্ষণিক নিরাশা, ক্ষণিক বিদ্বেষের কথা বাদ দিলে। আজ যেন ও'র এই প্রথম চৈতন্য হোল, দুঃখকে ভোলার সঙ্গে উনি স্বাতিকেও ছিলেন ভুলে।...... স্বাতি ও'র কন্যা—শিষ্যা। এতদিন শুধু শিষ্যা হয়েই ও'র সঙ্গিনী হয়ে ঘুরেছে ও'র জ্ঞানচর্চার কল্পলোকে। আজ এই প্রথম ও'র কন্যা হয়ে যেন দেখা দিল। চোখের জলে। ও-র চোখের জল এর আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ে না। ও'কে আগলাতে, ও'র চোখের জল নিবারণ করতেই ওর নিজের চোখের জল আর বেরুবার অবসর পায়নি।

আজ যেন এ-চৈতন্যটাও এই প্রথম হোল যে, ও'র কন্যা মাতৃহারা; নিজে মায়ের রূপ ধরে, এ-রূপটাও লুকিয়ে রেখেছিল তাঁর কাছ থেকে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন লাহিড়ীমশাই ওর দিকে। আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে ওঠাতে যাচ্ছিলেন, টেনে নিলেন হাতটা। ঘুমুক; ভুলে থাকুক যতক্ষণ পারে।

ওকে নিয়েই পড়ে রইল মনটা। একটু যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখতে লাগলেন লাহিড়ীমশাই। সেও বড় ঘরের একমাত্র সন্তান—ওর জীবনের একটার পর একটা বঞ্চনা যেন ভিড় করে আসতে লাগল মনে; সব বঞ্চনার পরিণাম হিসাবেই শেষতম বঞ্চনা, মাকে হারানো।..... এইখানেই চিন্তাটা হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা প্রশ্ন নিয়ে—এইটেই কি শেষতম, নারী হিসাবে যা একেবারে চরম বঞ্চনা? স্ফুটনোন্মুখ জীবনের যা চরম নৈরাশ্য তারই সামনে উপস্থিত হয়নি কি তাঁর অভাগিনী কন্যা?

কী করে বলা যায় এই শেষ বঞ্চনাই আজকের এই অশ্রুবিন্দুকে টেনে আনেনি? আজ তিনি একটা কথাই ধরেছেন, রজতের কাছে সব শোনা পর্যন্ত—মনটা স্বচ্ছ, মনে পড়ছে কী ঝড় না বয়ে গেছে এই দুটো দিন তাঁর নিজের ওপর দিয়ে। কিন্তু একটি মেয়ে তার পরম আশা পরম অবলম্বন থেকে বিচ্যুত হয়ে কিরকম ব্যর্থ হয়ে গেল সে-কথা কি একবারও ভেবে দেখেছেন?.....ও'র বিদ্বেষটা কি মেয়ের মনে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব? যে মেয়ে ভালবাসল? ভূরি ভূরি কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত তো খুঁজে পাচ্ছেন না কোথাও।

আর, যদি হয়েই থাকে সঞ্চারিত, সে-বিদ্বেষ ওর পক্ষে যে আরও কতগুণে যন্ত্রণার—তা কি কল্পনা করতে পারেন? দুটো বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির দ্বন্দ্বে ও যে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।...... এই প্রসঙ্গ ধরেই চিন্তাটা মোড় ফিরে প্রশান্তর ওপর গিয়ে পড়ল। তার ওপরও এত বিদ্বেষের কারণই বা কি?

এই প্রশ্নটা নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। উঠানে; শেষে আরও ভালো লাগছে বলে বাগানে। আজ বিরাট সমারোহ বাইরে। একটা দিন যেন একটা দুর্যোগের যুগকেই পেছনে করে নূতন রূপে বেরিয়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ পরে যখন আবার ফিরে এলেন ঘরে তখন ঐ প্রশ্নটাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা অন্য আকার নিয়েছে—বন্ধু দারুকেশেরই কথা ধরা যাক, তার ওপরই বা আর বিদ্বেষের অবসর কোথায়? সে যা মূল্য নিল তার পরিবর্তে যা অমূল্য তাই কি রেখে যায়নি তাঁর জন্যে? লাহিড়ীমশাই এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তুললেন কন্যাকে।

আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে......

অনাথ ঠিক করেছে আজ একবার যাবেই রেল-কলোনীতে; শুধু গিয়ে কি করবে সেটা এখন পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেনি। ক'দিন বেরোয়নি ব'লে লাঠিটার দিকে চাওয়াও হয়নি। বেশ ভালো করে তেল লাগিয়ে মুছে-মাছে আমরুলের পাতা দিয়ে পেতলগুলো পরিষ্কার করছিল বাইরের বারান্দায় ব'সে, লাহিড়ীমশাই একটু যেন কুণ্ঠিত কণ্ঠেই বললেন—"শুনছিস্ রে? প্রশান্তর বন্ধু—মানে তোদের ডাক্তারবাবু আর কি—সে বলছিল, কী যেন সব করেছে তার জন্যে তাদের নাকি মাফ করতে হবে, তাই..."

"তা, তানাদের অপরাধটা কি?" বাড়ির দিকে পেছন ফিরেই বসেছিল, গোঁফজোড়া ফুলিয়ে একবার দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল অনাথ। পেতল মাজতে মাজতেই বলল—"একজন হোল ছাওয়াল রায়মশাইএর, তা' তিনি তো আর তপিস্যে করে হতে যায়নি ছাওয়াল। একজন হোল বন্ধু; বেচারিই বলতে হবে......"

"আমিও তো সেই কথাই বলি"—যেন একটু ভরসা পেলেন লাহিড়ীমশাই, বললেন—"তা কথাটা তো বলতে হবে তাকে। তাই বলছিলাম একবার না হয় ডেকে নিয়ে আসবি গিয়ে?"

"এ আর শক্ত কথা কি? কও তো দু-জনারেই ঘেরে নেসি। তাঁনারা মাফ চায় তো পারেখনি—এই বা কোন বেশী কথা লাহিড়ী-বাড়ীর পক্ষে!"

—হুমকিও নয়, অসম্মানও নয়। একটা অভ্যাস, কথা বলার একটা রীতি—যে নাকি চারপুরুষ ধরে জমিদারের সঙ্গে ঘর করছে। পেতলগুলো আরও দ্রুত পরিষ্কার করতে লেগে গেল। (সমাপ্ত)

(২)

জনপ্রিয়তা ও আলমগীর

নাট্যপরিচালক যেদিন আসরে এলেন আমরা চমকে উঠেছিলাম। জবু-থবু হাবাগোবা ফোকলা মানুষ; অথচ ইনি নাকি কলকাতায় একটি আস্ত পেশাদার থিয়েটার চালাচ্ছেন। আগে থাকতে জানান দিয়েই এসেছিলেন; তাই চা-খাবার সেদিন গোড়া থেকেই তৈরী ছিল। ভাষাবিদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বিয়ঁা ভেনু! বিয়ঁা ভেনু! কর্মো ভু পর্তে ভু?

পরিচালক ফরাসী-ব্যাপারে দেখলাম আমাদেরই মতন বিজ্ঞ। তিনি বললেন—নো মসিয়ে, ইংলিশ ইজ্ দি ওনলি পার্লে, দ্যাট আই ভু।

ভাষাবিদ ও দার্শনিক দুজনেই দেখলাম কথাটায় একটা সূক্ষ্ম রসের পরিচয় পেয়ে পুলকিত হলেন। বুঝলাম আজকের আড্ডাটা জমবে।

খানিক খেয়ে (পরিচালক দেখলাম বুভুক্ষু, খেতেও পারেন মন্দ নয়।) পরিচালক বললেন—আজ পর্যন্ত দাদা কলির কলিকাতাকে বুঝতে পারলাম না। এ দর্শক যে কি চায় জানি না। আর না জানলে থিয়েটার উঠে যাবে। শ'খানেক শো চলে যায় বুঝতে কোন পথে নাটকটাকে নেয়া উচিত।

নাট্যকার বললেন—অর্থাৎ? নাটক আবার কোন পথে নেবেন কি? নাটক তো আগে থাকতেই লেখা হয়ে আছে; আপনারা তো তার অভিনয় করছেন শুধু!

পরিচালক ক্রমান্বয়ে তিন মিনিট ধরে কেক খেলেন (কেক্ট এনেছিল ভাল কেক সাহেব-পাড়া থেকে); তারপর বললেন—আগে থাকতে যা লেখা হয়ে আছে আর আমরা যেটা অভিনয় করছি দুটোর মধ্যে ক্রমশই একটা পার্থক্য গজিয়ে উঠতে থাকে। নাট্যকারের নাটক অনেক সময়েই যথাযথ রাখা সম্ভব হয় না।

নাট্যকারের হাত থেকে কাপটা ঠং করে পড়ে গেল—তার মানে? আপনি তার ওপর কলম চালান?

পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই আমি পরিচালক।

দার্শনিক বললেন—মিডলটন যেমন চালিয়েছিলেন ম্যাকবেথ-এর ওপর।

সবাই একটু চাপা হাসি হাসলেন। পরিচালক জবাবে আরো একটু কেক খেয়ে বললেন—না, ম্যাকবেথের মতন নাটক পেলে কলম চালাবার দরকার হোতো না বোধহয়। উপমাটা ঠিক হোলো কি? আমি হয়তো মিডলটন; শেক্সপিয়ারকে তো কই দেখতে পাচ্ছি না কলকাতায়!

উৎপল দত্ত

নাট্যকার একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন; মুখে একটা নীরব উক্তি প্রকট হোলো—নিশ্চয়ই এই স্থূলোদর নাট্য-বিশারদ আমার সাতখানা প্রকাশিত নাটকের একটিও পড়েনি; নইলে শেক্সপিয়ার নেই বলে? মনে মনে এই রকম বলতে বলতে তিনি পোড়া চুরুটের আধখানা ধরাতে শুরু করলেন।

দার্শনিক বললেন—তা কলমটা যে চালান, কি নীতির ভিত্তিতে?

পরিচালক তৎক্ষণাৎ বললেন—কেন, বক্স অফিস! জনপ্রিয়তা!

ক্রোধে দার্শনিক ও নাট্যকারের মুখ কালো হয়ে ওঠে। তাই ভাষাবিদই কথা কইবার ভার নিলেন—লোকে কি চায় তার জন্যে নাটক বদলান?

পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই! লোকে যদি নাটক দেখতেই না এল তবে অভিনয়টা করার সার্থকতা কি? নিভৃতে সাহিত্য বা চিত্রসাধনা হতে পারে; নিভৃত নাট্যসাধনা সোনার পাথরের বাটির মতই উদ্ভট।

ভাষাবিদ বললেন—খাওয়াটা একটু কমিয়ে আমার কথাটা শুনুন দিকি! জনপ্রিয়তার আলেয়ার পেছনে কতদূরে পর্যন্ত গিয়ে থাকেন সাধারণতঃ?

পরিচালক খাওয়া থামালেন না; কিন্তু বললেন— যা যা দরকার সবই করি। নায়ক বাঁচবে, না মরবে। শেষে মিলন হবে, না বিচ্ছেদ। আগুনের খেলা দেখাবো, না বৃষ্টির। কেউ ভালো করছে: তার পার্টটা বাড়ানো হোক। কেউ খারাপ করছে; তার যতটা না থাকলেই নয় ততটা থাক।

একটা বিকট হাস্যরোল উঠলো ঘরের মধ্যে। হাসতে হাসতে নাট্যকার বললেন—তাহলে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ আপনার থিয়েটারে রুদ্ধ?

পরিচালক বললেন—সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি দর্শকের বোধগম্য না হয় তবে রুদ্ধ।

নাট্যকার জ্বলন্ত চুরুটখানা পরি-চালকের নাকের চার ইঞ্চির মধ্যে সবেগে নেড়ে দিয়ে বললেন—দর্শককে ভগবানের বা কাজীর আসনে বসিয়ে শাশ্বত সৃষ্টি সম্ভব? ভিইয়োঁ শেলী, কীটস, র‍্যাবো, ভেরলেন, অস্কার ওয়াইল্ড থেকে শুরু ক'রে চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইন বা ফ্ল্যাহার্টি বা ইংমার বের্গমান—এই সব মনীষীরা যদি জনপ্রিয়তার যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াতেন, তবে আর সার্থক শিল্পসৃষ্টি করা হয়ে উঠতো না।

ভাষাবিদ বললেন—এমন কি বিদ্রোহই এদের শিল্প-প্রেরণার মূল। জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করেছেন বলেই এ'রা শিল্পী।

পরিচালক বললেন—আপনি তো নিজেকে নাট্যকার বলেন! অথচ যাঁদের নাম করলেন তাঁদের একজন ছাড়া কেউ নাট্যকার নন। তার ওপর শেলীর দেশ-ত্যাগের কারণ তাঁর সাহিত্য কি? না ব্যক্তিগত ব্যাপার! ফ্রাসোঁয়া ভিইয়োঁ কি জীবন যাপন করতেন জানেন নিশ্চয়ই; কবি হিসেবে তিনি মহান হতে পারেন, কিন্তু সামাজিক জীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। র‍্যাবো ও ভেরলেন বিকৃত যৌনজীবন যাপন ক'রে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, কাব্যের জন্যে নয়। অস্কার ওয়াইল্ড নাট্যকার হিসেবে রীতি-মত সফল তথা জনপ্রিয় হয়েছিলেন এটা

আপনার জানার কথা। চটকদার কথা আর হাস্যরস প্রচুর পরিমাণে ইনজেক্ট করে তাঁর সামাজিক নাটকগুলোকে হিট করিয়েছিলেন ভদ্রলোক; নাট্যকার হিসেবে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন: লাঞ্ছিত হয়েছিলেন যৌনবিকারের ফলে। একমাত্র কীটসকে ছেড়ে দিচ্ছি: বেচারা সত্যি গালি খেয়েছিলেন: কিন্তু তাও মুষ্টিমেয় গণ্ডমূর্খ স্ফীতমস্তিষ্ক কয়েকটা সমালোচকের হাতে। দেখুন, দাদা, এই নামকটা অনেকেই ক'রে থাকেন অ-জনপ্রিয়তার উদাহরণ হিসেবে। বিশেষ করে আজকাল র‍্যাঁবো-ভেরলেন নিয়ে পড়েছেন একাধিক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী; এঁরা বোধহয় আমাদের বোকা বোঝান; এঁরা ভাবেন ফরাসী এ দেশে কেউ জানে না।

এই বলে পরিচালক আবার বীরবিক্রমে আহার করতে থাকলেন। আমরা যারা ছোট, আমাদের মনে হোলো নাট্যকার জীবনে কখনো এমন অপদস্থ হননি; অন্ততঃ আমাদের সামনে হননি। মুখখানা হাঁড়িপানা ক'রে তিনি একটু দম নিলেন; তারপর যেই বলেছেন—কেন ওরা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন—অমনি পরিচালক আবার শুরু করলেন।—

—আর, ঐ আইজেনস্টাইন! ওঁর সব ছবি জনতা নাকচ করেছিল এ কথা সত্যি নয়। "নেভস্কি" ও "পোটেমকিন" যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল।

নাট্যকার ধমকে উঠলেন—আর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি "ইভান" শুধু নাকচ হয়নি; এক রকম নিষিদ্ধ হয়ে গেল!

পরিচালক ছাড়েন না—শ্রেষ্ঠ কিনা বিবেচ্য; অনেকে বলেন "পোটেমকিন" শ্রেষ্ঠ।

নাট্যকার আরো জোরে ধমকে উঠলেন—কথা হচ্ছে আইজেনস্টাইন জীবনে কখনো জনপ্রিয় হবার জন্যে ছবি করেননি। জনপ্রিয়তা তাঁর উদ্দেশ্য হয়নি কোনোদিন। কোনো ছবি যদি জনপ্রিয় হয়ে থাকে তাহলে আকস্মিকভাবেই হয়েছে।

পরিচালক খুব সরল কণ্ঠে বললেন—তাহলে ছবি করতে গেলেন কেন? বোলো মিলিমিটারে শুধু নিজের জন্য মনের সুখে ছবি তুলে শোয়ার ঘরে বসে দেখলেই পারতেন!

নাট্যকার বললেন—একটা নতুন আর্ট সৃষ্টি করার জন্যে ছবি করেছেন আইজেনস্টাইন। ফ্রেম থেকে ফ্রেমে যাওয়ার নতুন একটা গতি, একটা সংঘর্ষ, একটা শিল্প সৃষ্টি করার জন্যে করেছেন ছবি।

পরিচালক বললেন—অন্ততঃ কিছু লোক যদি তা না বোঝে তবে কার জন্যে এটা সৃষ্টি করছেন?

নাট্যকার বললেন—নিজের জন্যে।

দার্শনিক বললেন—নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে। সেটাই শিল্পের উদ্দেশ্য। নিজেকে মেলে ধরা সব মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। সেটারই উন্নত রূপকে আমরা বলি শিল্পকর্ম। অবশ্যই সেটা আপনার ওপর প্রযোজ্য নয়; আপনি এই রকবাজদের শহরে বক্স-অফিসের ওপর চোখ রেখে নাটক করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ

পরিচালক বাদে সকলে হাসলেন। তিনি শুধু বললেন—মেলে ধরার মানেই হচ্ছে কারুর চোখে নিজেকে মেলে ধরা। কার চোখে? নিশ্চয়ই দর্শকের। পক্ষী-বিশেষজ্ঞরা বলেন ময়ূর বা মোরগ যখন পেখম মেলে বা ডানা মেলে তখন তা মাদী পাখীর মন ভোলাবার জন্যে। আইজেনস্টাইনের মেলে-ধরাটা হয়তো অনেকের ভাল লাগছে না, বা বোধগম্য হচ্ছে না; কিন্তু অন্ততঃ অল্পসংখ্যক কিছু লোককে মনে রেখেই তিনি ছবি করেছেন। চ্যাপলিন বা পুডোভকিন যেখানে লক্ষ মানুষের জন্যে ছবি করেন, আইজেনস্টাইন করেছেন কয়েক শত লোকের জন্যে। তফাতটা সংখ্যাগত, পরিমাণগত; গুণগত নয়। বের্গমান সম্বন্ধেও অনেক কথাই বলা যায়, অনেক কটূক্তিও করা যায়; সেটা আরেক দিন হবেখ'ন। আজকে জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কথা বলা যাক। চলচ্চিত্রের মহারথী তিনজনের নাম করেছেন যাঁদের ঠিক জনপ্রিয়তা জোটেনি; অন্যপক্ষে কয়েক কুড়ি মহারথীর নাম করতে পারি যাঁরা শুধু দিগদর্শক নন, জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান-অধিকারীও বটেন। যথা চ্যাপলিন, পুডোভকিন, ডবশেংকো, ডনস্কয়, ইউৎকেভিচ, বন্ডারচুক এফ পাবস্ট লাং, জাক তাতি, কিং ভিডর, রেনো ক্লেয়ার, অঁরি ক্লুজো, কার্নে, এস-কুইথ, লেসলি হাওয়ার্ড, থরল্ড ডিকিনসন, ওয়াইডা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিপুল জনপ্রিয় বাহিনীর সামনে আপনার উদাহরণ অকিঞ্চিৎকর। যাক, কথা হচ্ছিল কলকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে। জনপ্রিয়তার মুখে তুড়ি মারা সকলের পক্ষে সম্ভব, এক নাট্যকার ছাড়া। কবি, চিত্রকর, ঔপন্যাসিক—সকলে বলতে পারেন ভবিষ্যৎ আমাকে বুঝবে, তাই বর্তমানকে কাঁচকলা! আধুনিক দুর্বোধ্য কবিদের মধ্যে কেউ কেউ যে মহাশক্তিধর এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কানওয়াল কিসন বা রামকিংকর-এর শিল্প বর্তমানে বিপুল জনতা কর্তৃক উপেক্ষিত হতে পারে; ভবিষ্যতের জনতা এঁদের মাথায় তুলে নেবেই। "স্থাবর"-স্রষ্টা বনফুলের বই অধিকাংশ টিম টিম ক'রে এক সংস্করণ চলে; কিন্তু সে দিন বেশী দূরে নেই যখন 'অদ্ভুত'-অধ্যুষিত গোয়াল পরিষ্কার করে লোকে বনফুলের জয়স্তম্ভ তৈরী করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একজন নাট্যকারের নাম করতে পারেন কি যিনি জীবিতাবস্থায় স্বীকৃতি পাননি, কিন্তু মৃত্যুর বহু বৎসর পরে পেয়েছেন?

নাট্যকার বললেন—পাবেন, শীঘ্রই পাবেন। রবীন্দ্রনাথ, পিকাসো।

পরিচালক ততোধিক শান্ত স্বরে জবাব দিলেন—রবীন্দ্রনাথ জীবিত অবস্থায়ই জনপ্রিয় নাট্যকার হিসেবে জনতার প্রণাম কুড়িয়ে গেছেন। জোড়াসাঁকো বা শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত অভিনয়গুলি ছেড়ে দিলাম। পেশাদার মঞ্চে পর্যন্ত তাঁর নাটক সমাদৃত হয়েছে। আর পিকাসো-র নাটক লোকে বোঝেনি; তাই পিকাসো কোনো জন্মে নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবেন না।

ভাষাবিদ বললেন—এর্নস্ট টলের জনপ্রিয় হয়েছিলেন কি? অথচ নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য।

পরিচালকের প্রয়োজন হোলো না, দার্শনিকই বাধা দিলেন—না, টলের জন-

আলমগীরের রূপসজ্জায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

প্রিয়তা পেয়েছিলেন বইকি। পিসকাটর প্রমুখ এক্সপ্রেশনিস্ট পরিচালকরা যেমন ভেরফেলকে তেমনি টলেরকে জনপ্রিয় করে গেছেন।

নাট্যকার সোৎসাহে বললেন—আর চেকভকে করলেন স্টানিসলাভস্কি।

পরিচালক বললেন—দেখছেন? সব চেয়ে জটিল নাটক-রচয়িতারাও জীবিত অবস্থাতেই হিট করে তবে গেছেন। সদ্যমৃত ব্রেশট্‌কে দেখুন না! আর শেক্সপিয়ার-মলিয়েরে তো ছেড়ে দিলাম: তাঁরা বাড়িগাড়ি সাজিয়ে রাজার সংগে করমর্দন করে তবে গেছেন। এদেশেও তাই। নাটাকার প্রত্যেকে জনপ্রিয় হয়েছেন; মানে যাঁরা জনপ্রিয় হয়েছেন তাঁরাই নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন ঃ দীনবন্ধু, মাইকেল, গিরিশ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষিরোদ, রবীন্দ্রনাথ, যোগেশ চৌধুরী। তারপর আধুনিকরা। আর দেখুন সঞ্জয় ভট্টাচার্য কি সুন্দর দুচারটে নাটক লিখেছেন, যা কাব্য হিসেবে আমার পড়তে খুব ভাল লাগে; কিন্তু তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। আর পারেননি বলেই, পারবেনও না। নাট্যকার তিনি হতে পারলেন না।

দার্শনিক বেশ ভেবে বললেন—এর কারণ নাটক আর নাটকাভিনয় অংগাঙ্গি-ভাবে জড়িত। নাটককে শুধু অভিনয় হিসেবে দেখা যেমন আহাম্মকি; নাটককে শুধু সাহিত্য হিসেবে দেখা ঠিক তেমনি একদেশদর্শিতা। এ যেন একই দেহের মুন্ড আর ধড়কে আলাদা করে বিচার করা। কিছু লোক আছে যারা হয় এটা নয় ওটা নিয়ে প্রচন্ড হিড়িং-বিড়িং করে। তারাই বোধহয় 'ভোট-দিন' ধরনের চিৎকারে সমালোচক-দের কর্ণ বধির করে বিপথে চালিত করে। আসলে নাটক একাধারে সাহিত্য ও অভিনয়-লিপি। তাই বর্তমানকে অস্বীকার করা নাটকের পক্ষে অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে দর্শকের প্রত্যক্ষ বিচারে সে যাচাই হয়। অভিনয়ের সময়টাও নাটকের অংশ। সেই সময়টা যদি দর্শক-বিচারে সময়-নষ্ট হিসেবে প্রমাণিতও হয়, তবে নাটকের দফা গয়া, নাট্যকারেরও আশায় জলাঞ্জলি। শুধু সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার আশা নাট্যকার করতে পারেন না।

নাট্যকার খেপে চুরুটটা নামিয়ে রেখে বললেন—আবার শুধু অভিনয়ও নাট্যকারের সাধনা হতে পারে না। ইনি যা বলছেন তাতে তো মনে হচ্ছে নাট্যকারকে কোনো সাহিত্যিক মর্যাদা দিতেই এ'রা নারাজ। যথেচ্ছ কলম চালিয়ে সাহিত্যকে মঞ্চোপযোগী করাই এ'দের কাজ।

পরিচালক এবার আহার শেষ করলেন; শেষ গ্রাসটি চিবোতে চিবোতে বললেন—না, সত্যিকারের সাহিত্য হলে আর মঞ্চোপযোগী করার দরকার হয় না। নাটক যখন সাহিত্যপদবাচ্য হয় তখন তা মঞ্চোপযোগীও হয়। এটাই আমার অভিজ্ঞতা।

নাট্যকার ক্রুর হাস্য করে বললেন—তাহলে আপনাদের হাতে বাজে নাটকই বেশী আসে বুঝি?

পরিচালক অম্লান বদনে বলেন—হ্যাঁ। তবে এক আধজন অজ্ঞ পণ্ডিত বলে থাকেন, বাংলায় উপন্যাস, কবিতা যত ভাল, নাটক তত ভাল বেরুচ্ছে না। উপন্যাস-কবিতা বনফুল, প্রেমেন্দ্র এই রকম দু-চারজন ছাড়া—কোথায় ভাল বেরুচ্ছে আমার জানা নেই। নাটকও তার চেয়ে খারাপ কিছু বেরুচ্ছে না। এক ছোটগল্প ছাড়া বাংলায় প্রথম শ্রেণীর কিছুই বেরুচ্ছে না। সব তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে নাটকও তৃতীয় শ্রেণীর হচ্ছে।

ভাষাবিদ তাঁর সংগে করমর্দন করে বললেন—এ ব্যাপারে আমি আপনার সংগে একমত।

নাট্যকার হঠাৎ গর্জন করে বলে উঠলেন—মঞ্চোপযোগী অর্থ কি? বর্তমান কলকাতার বর্তমান মঞ্চের উপযোগী?

পরিচালক বললেন—হ্যাঁ।

নাট্যকার শ্লেষ ঢেলে বললেন—তার মানে অত্যন্ত নীচু মানের দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্যে আপনারা অকাতরে নাটক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন?

পরিচালক বললেন—হ্যাঁ।

নাট্যকার বলে চললেন দম-দেয়া ঘড়ির মতন—অর্থাৎ টিকিট বিক্রির দিকেই আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার

জন্যে যা কিছু সস্তা, যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল সব আমদানি করতে আপনি প্রস্তুত?

পরিচালক ঢেঁকুর তুলে বললেন—আজ্ঞে না; তা কেন? সস্তা বা প্রতিক্রিয়াশীল জিনিস আমদানি করবো কেন? মঞ্চোপযোগী মানে যে সস্তা জিনিস এই অমূল্য সংবাদটি আপনাকে কে দিলে?

নাট্যকারের রোষদৃষ্টির সামনে পরিচালকের নির্লিপ্ত ভাব দেখে ভাষাবিদ ও দার্শনিক যুগপৎ হেসে উঠলেন। ফলে নাট্যকার অসহ্য ক্রোধে পদচারণ শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতেই বললেন, তবে মঞ্চোপযোগী মানে কি?

পরিচালক দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন—অন্য থিয়েটারের কথা জানি না; সেখানে হয়তো দর্শকের দোহাই দিয়ে সস্তা জিনিস দেখানো হয়; বোম্বের চিত্র-প্রযোজকেরা যেমন দেখান। কিন্তু আমার নিজের ওপর আস্থা আছে। নাটককে মঞ্চোপযোগী করতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয় এনে ফেলা আমার থিয়েটারে অসম্ভব। অথচ নাটকটাকে এমন বাঁধুনি, এমন গতি, এমন চমক দিতে হবে যেন দর্শকের ভাল লাগে; তারা যেন আমার থিয়েটারকে বয়কট না করে। বিষয়বস্তুর ব্যাপারে কোনো রকম আপোস আমি করি না; নাট্যকারের প্রগতিশীল বক্তব্যকে পুরোপুরি বজায় রাখা আমার স্বভাব; কারণ আমি নিজে প্রগতিশীল মানুষ। কিন্তু সেই বিষয়বস্তু যেন এমন রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে আসে, এমন আঙ্গিক নিয়ে মঞ্চে ওঠে যাতে দর্শক বুঝতে পারে ও খুশী হয়। অন্যথায় কি হবে? এই হবে, যে প্রচণ্ড রকমের বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়েও নাটক এমন দুর্বোধ্য রূপরীতিতে আত্মপ্রকাশ করবে যে কেউ বুঝতেই পারলো না। বক্তব্যটা মাঠে মারা গেল। ফর্ম-এর পরীক্ষা কখনো দর্শককে বাদ দিয়ে হতে পারে না। দর্শকের জ্ঞানবুদ্ধিকে বিস্মৃত হয়ে পরীক্ষা চালালে শুধু নিজের বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাবে, দর্শককে সঙ্গে নিয়ে এগুবার পথ রুদ্ধ হয়েই থাকবে। আমি কেমন বুদ্ধিমান তা দেখাবার জন্যে তো আর থিয়েটার খুলিনি মশাই! খুলেছি দর্শককে উন্নততর নাট্যরূপের সন্ধান দিতে। সেটা ক্রমে ক্রমে হয়। প্রথমেই এক যুগান্তকারী পরীক্ষার অবতারণা করলে দর্শক আর আসবেই না; তখন শূন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রাণায়ামে বসতে হবে! এতে নাট্য-জগতের কি উপকার কি উন্নতিটা হবে কিছুতেই মাথায় ঢোকে না আমার!

একটু থেমে পরিচালক আবার বলতে লাগলেন—সর্বোপরি আপনারা যাদের রকবাজ বলে ঠাট্টা করলেন তাদের ওপরে আমার আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি কলকাতার দর্শক ও কলকাতার অভিনেতা ধাপে ধাপে এগিয়ে দুর্জয়তম পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারে উপনীত হতে পারবেন কয়েক বৎসরের মধ্যে। তখন যে কোনো নাটকের যে কোনো আঙ্গিকের রসগ্রহণ করতে দর্শক সক্ষম হবেন; আমার কাজ কমবে।

নাট্যকার পায়চারি থামিয়ে বললেন—নিজের ওপর আস্থা তো থুব। আপনার কি ধারণা নাট্যকাররা আপনার চাইতে থিয়েটারকে ও দর্শককে কম বোঝেন?

পরিচালক আকাশ থেকে পড়লেন; বললেন—নিশ্চয়ই! অধিকাংশ নাট্যকারই কম বোঝেন। অভিনয় এবং পরিচালনা আমার পেশা মশাই! ও'দের চাইতে আমি বেশি বুঝবো না? কি ধরনের নাটক আমার হাতে বেশি আসে জানেন? যেখানে নাট্যকার পরিশ্রমী, আন্তরিক এবং মোটামুটি প্রগতিবাদী; কিন্তু আঙ্গিকের ব্যাপারে নূতন পরীক্ষা তো দূরের কথা, প্রচলিত রীতিনীতিও এ'দের অজানা। আজ শত বৎসর যাবৎ বাংলা নাট্যশালায় যে কায়দাগুলো ব্যবহার হয়ে হয়ে পাকাপোক্ত হয়েছে, সেগুলোও এ'রা জানেন না। ফলে দুর্বল রূপরীতির জন্যে এ'দের বক্তব্যগুলো জোলো, ফিকে অথবা স্থূল, সোচ্চার হয়ে রয়েছে।

নাট্যকার আবার প্রাণপণ শ্লেষ মিশিয়ে বললেন—শত বৎসরের কায়দাগুলো কি? ছেঁড়া ঝোলানো সীন, বাঁশি বাজিয়ে পর্দা ফেলা ও তোলা, দৌরাত্ম্যে আরম্ভ করা এবং কয়েকজন দাম্ভিক আত্মকেন্দ্রিক অভিনেতার আস্ফালন!

পরিচালক এবার চা ঢেলে নিলেন এক কাপ; বললেন—ওগুলো তো কায়দার অপব্যবহার; তার জন্যে কায়দা দায়ী নয়। ঠিক যেমন বিজ্ঞান দায়ী নয় আণবিক বোমার জন্যে। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির ওগুলো অপ-কৌশল। তা ছাড়া কথা হচ্ছিল নাট্য-রচনার কায়দা নিয়ে। হঠাৎ মঞ্চ-প্রয়োগের কায়দায় গেলেন কেন? ও বিষয়ে না হয় আরেক দিন কথা করা যাবে।

নাট্যকার বললেন—নাট্য রচনার কায়দাই বা কী সৃষ্ট হয়েছে?

পরিচালক বললেন (চায়ে আয়েসী চুমুক দিয়ে)—ঐ যে বলেছিলাম, ভাল নাটক মাত্রেই একাধারে মঞ্চ-সচেতন এবং সাহিত্য। সেই মঞ্চ-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে; মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীতে ওর শুরু; ক্ষিরোদপ্রসাদে ওর পুষ্টি; রবীন্দ্রনাথে ওর চরম বিকাশ। এখানে নাটক যেমনি অভিনেয়, তেমনি কাব্য-সুষমাময়। সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিলেই হবে।

নাট্যকার বোধ হয় একটু নরম হলেন; বললেন—দেখুন দাদা, আপনার এই কথাটা বিবেচনা সাপেক্ষ। সাহিত্য আর মঞ্চচেতনা দুটো একই সঙ্গে ভাল নাটকে থাকে, এ কথাটা বিনা প্রমাণে মেনে নেয়া অসম্ভব।

পরিচালক বললেন—প্রমাণ দিচ্ছি সংক্ষেপে, কারণ আমার সময় অল্প; করে খেতে হয় যে! রিহার্সাল আছে একটা। একটি অত্যন্ত মঞ্চ-সফল নাটক নিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো কি-ভাবে কাব্যছন্দ তার মধ্যে খেলা করছে। আরো দেখবেন যেখানেই মঞ্চ-প্রয়োজনে নাটকের বিশেষ আবেগপূর্ণ দৃশ্য আসছে সেখানেই কাব্যও স্পন্দিত হয়ে উঠছে এক আশ্চর্য অধীরতায়। অর্থাৎ জনপ্রিয় নাট্যরচনার সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতি মেনে গেছেন নাট্যকার; দর্শককে ভাল লাগাবার যত পেশাদারী বাণ আছে, সব ছুঁড়েছেন নাট্যকার। সেই জনপ্রিয়তার চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই কাব্যসৃষ্টি করেছেন; জনপ্রিয়তার কায়দাকানুন কাব্যকে সীমিত করেনি, কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি; বরং সাহায্য করেছে, পরিপূরণ করেছে। ভাল নাট্যকার মাত্রেই জনপ্রিয় নাট্যকার।

নাট্যকার বললেন—এক মিনিট! তার মানে কি জনপ্রিয় নাট্যকার মাত্রেই ভাল নাট্যকার?

পরিচালক বললেন—না, নিশ্চয়ই না। ভাল নাট্যকার মাত্রেই জনপ্রিয়; কিন্তু জনপ্রিয় মাত্রেই ভাল নাও হতে পারে। সব মানুষই জীব; কিন্তু সব জীবই মানুষ নয়। যাক। যে নাটকটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটি ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "আলমগীর"; ১৯২১ সালে প্রথম অভিনীত। আপনা-

দের প্রত্যেকেরই নিশ্চয়ই পড়া বা দেখা বা দুটোই।

সকলে ইতিবাচক মাথা নাড়লেন।

পরিচালক উঠে দাঁড়িয়ে যেন অদৃশ্য রিহার্সালকে উদ্দেশ্য করেই বক্তৃতা শুরু করলেন—"আলমগীর" আছে এখানে?

ধুলো ঝেড়ে দার্শনিক বার করলেন একটা ছেঁড়া ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী।

পরিচালক বললেন—এ নাটকের মঞ্চ-সাফল্য সম্বন্ধে অধিক বলার প্রয়োজন নেই। চরিত্র বিশ্লেষণ বা ঘটনা-বিন্যাস—ও সব অধ্যাপকদের বিভাগ। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে দর্শক এ নাটকের ঘটনার গতিতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকতে বাধ্য। ভীমসিংহ-জয়সিংহ সম্পর্ক; আওরংজেব-উদিপুরী; কামবক্স-রূপকুমারী; সর্বোপরি মোগল-রাজপুত সংঘর্ষের পটভূমিকা। সমান্তরাল ভাবে ছুটে চলেছে এতগুলি রসালো, উত্তেজক কাহিনী। প্রত্যেকটিতে আছে আবার একটি ক'রে মধ্যচরিত্র, যে অটল, যে নিরপেক্ষ, যার স্থৈর্য দুই অস্থিরতার মাঝখানে এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। ভীম সিংহ ও জয় সিংহের মাঝখানে বৃদ্ধ রাণা রাজসিংহ; সম্রাট ও উদিপুরীর মাঝখানে দিলীর খাঁ; কামবক্স উপাখ্যানে বিক্রম সিংহ। এই মধ্যচরিত্র, অর্থাৎ ল্যাটিনে যাকে বলা হয় পুংক্টম ইন্‌ডিফেরেন্স, মঞ্চোপযোগী নাটকের এক প্রধান অবলম্বন। যেমন "হ্যামলেট"-এ হোরেশিও, "ম্যাকবেথ"-এ ব্যাংকো, "তপতী"-তে দেবদত্ত।

আর ঘটনার চমৎকারিত্ব ব্যাপারে ক্ষীরোদবাবুর মুন্সিয়ানা সর্বজনবিদিত। প্রথম দশ লাইনের মধ্যে মোগল অন্তঃপুরের একটি ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরা হয়েছে; রূপকুমারীকে হারেমে আনার চক্রান্ত চলেছে; উদিপুরী সেটা জানতে পেরেছেন। পরের দৃশ্যেই আওরংজেব এবং কয়েক লাইনের একটি স্বগতোক্তি মারফত সম্রাটের চরিত্র খোলা পুঁথির মতন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হোলো। তৃতীয় দৃশ্যের শুরুটা মঞ্চে কি রকম হয় একবার আন্দাজ করুন। বাঁশি বাজলো (বাঁশিকে অমন অবজ্ঞা করার কি কারণ বুঝলাম না), আলো জ্বললো; দেখছি—

"জয়সিংহ ও ভীমসিংহ তরবারি হস্তে পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান। মধ্যে রাজসিংহ।"

একটি আশ্চর্য কলহ শুনতে পেলাম; রাজপুত শিভাল্‌রি-গত কলহ। চতুর্থ দৃশ্যে রাজসিংহ জয়সিংহকে কাটতে উদ্যত; গঙ্গাদাস ও বীরাবাই বাধা দিচ্ছেন; জয়সিংহ ধীরস্থভাবে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় অঙ্কেও মুহুর্মুহুঃ ঘটনা ঘটছে; প্রথম দৃশ্যে গরীবদাস ও সুজোতা দেখছে ভীমসিংহ রাজ্যত্যাগ করছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে দিল্লীতে আওরংজেবের চক্রান্ত; রাজনৈতিক কাহিনীটা দানা বাঁধলো। তৃতীয় দৃশ্যটি বিখ্যাত; আওরংজেব-উদিপুরীর একটি চমকপ্রদ কলহ। পঞ্চম দৃশ্যে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় ভীমসিংহ; বীরাবাই কর্তৃক স্তন্যদান। তৃতীয় অঙ্কে নাটক দেখুন উদ্দাম গতি নিয়েছে; আওরংজেবের জিজিয়া করের ইস্তাহার উদয়পুরে জারী করা হয়েছে; জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজ্যত্যাগে কাতর রাণার উপর এবার মোগল আক্রমণের হুমকি এসেছে। তৃতীয় দৃশ্যে তয়বর খাঁ ও রাজসিংহের একটি মধুর সাক্ষাৎকার। চতুর্থে কামবক্স-রূপকুমারী কাহিনীর আরম্ভ। ষষ্ঠ দৃশ্যে রূপকুমারীর বিষপানের উদ্যোগ এবং ঠিক সেই মুহূর্তে বীরাবাই-এর প্রবেশ ও বাধাদান। এটা মঞ্চের পুরোনো একটি কৌশল। শেক্সপিয়ার ("ইট ইজ আই, হ্যামলেট দা ডেন"), ইবসেন ("ইওর কিন্‌স্‌ম্যান, গডমুণ্ড"), রবীন্দ্রনাথ (তৃতীয় দৃশ্যে মালিনীর প্রবেশ), প্রত্যেকেই এই ধরনে ঠিক সময়ে ঠিক লোকটিকে মঞ্চের উপর নিয়ে আসেন। এতে দর্শক চমৎকৃত হ'ন। সপ্তম দৃশ্যে কামবক্স-রূপকুমারীর সাক্ষাৎ ও কামবক্স-এর মহানুভবতা প্রদর্শন। এই মহানুভবতাটা আসছে সম্পূর্ণ অতর্কিতে দর্শকের হৃদয় নিয়ে খেলতে। চতুর্থ অঙ্ক; আসন্ন রাজনৈতিক ঝড়ে উদ্বিগ্ন রাজসিংহ ও কামবক্স-এর সাক্ষাৎকার; কামবক্স-এর প্রবেশটিও পূর্বোক্ত রীতি-অনুসারে; দেখুন—

রাজসিংহ: শাজাদা কামবক্স শুনেছি বালক।

(কামবক্সের প্রবেশ)

কামবক্স: সে বালক আমি—।

দ্বিতীয় দৃশ্যে হাস্যরস; শাজাদা আকবরের মোসাহেব-সংসর্গে হুল্লা। তৃতীয়ে উদিপুরীর ষড়যন্ত্র পুষ্ট হয়েছে আওরংজেব-চরিত্রের আশ্চর্য নাটকীয় বিকাশ। পঞ্চমে ও ষষ্ঠে রাজপুত যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ ও রূপকুমারী-উদ্ধার। পঞ্চম অঙ্কে আওরংজেবের যুদ্ধ প্রস্তুতি। দ্বিতীয় দৃশ্যে, দিল্লী-প্রাসাদে চরম নাটকীয় দৃশ্য; মাতাল উদিপুরী; কুলিশকঠোর আলমগীর; কামবক্স-আকবর বিরোধ; ঠিক সময়ে জয়সিংহের প্রবেশ; ঠিক সময়ে ভীমসিংহের প্রবেশ; দেখুন—

আওরংজেব (জয়সিংহকে) এইবার বলো তুমি জ্যেষ্ঠ। বল, বল, তুমি জ্যেষ্ঠ—

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম: না সম্রাট, জ্যেষ্ঠ আমি।

এর পর থেকে নাটকের দৃশ্যগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র শাণিত হয়ে এসেছে। মোগল-রাজপুত যুদ্ধের চমকপ্রদ ঘটনাবলী, উদিপুরী-কামবক্স, ও শেষদৃশ্যে আওরংজেব-রাজসিংহের আলিঙ্গন।

ঝোলানো সীনকে ব্যঙ্গ করলেন। কিন্তু যখন শ্রীসেতু সেন-এর মঞ্চসংস্কার সত্ত্বেও বাংলা নাট্যশালায় বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তখন ঐ ঝোলানো সীন ছাড়া আর কি দিয়ে দ্রুত পট-পরিবর্তন সম্ভব? একটি বা দুটি দৃশ্যের তো ব্যাপার নয় "আলমগীর"; কখনো উদয়পুর প্রাসাদ, কখনো দিল্লীর, কখনো এলাহাবাদ কেল্লা, কখনো মরুপ্রান্তর, আরাবল্লী পর্বত, গুহার অভ্যন্তর; দৃশ্য থেকে দৃশ্যে ছুটেছে নির্ঝরিণীর মতন; কারণ তবেই নাটক জনপ্রিয় হয়। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে দৃশ্যান্তরে যেতে না পারলে "আলমগীর"-এর ঘটনার বন্যা বাধা পাবে, রসভঙ্গ হবে। ভগ্নপ্রায় বাংলা থিয়েটারে ঝোলানো সীন আর কাঠের খুঁজি-এ (গ্রুভ) আঁটা ফ্ল্যাট ছাড়া আর কিছুই ছিল না যা দিয়ে এ গতি রক্ষা করা যায়। আর সে গতি সঞ্চারিত হলেই "আলমগীর"-এর মঞ্চ-সাফল্য অনেকটা নিশ্চিত এটা মানছেন তো? অর্থাৎ নাটকটা যে রকম ঘটনা থেকে ঘটনায় প্রসারিত; তাতে মঞ্চকৌশলের সচেতন উপস্থিতি লক্ষ্য করছেন?

নাট্যকার বললেন—একটু অতি-নাটকীয়, এটাও অস্বীকার করা যায় না।

দার্শনিক বললেন—আর ঐতিহাসিক তথ্যের প্রচুর বিকৃতি ঘটেছে এটাও অনস্বীকার্য।

এবার খাপ খুললেন ভাষাবিদ; বললেন—ঐতিহাসিক নাটক এটা নয়। যাঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদকে ঐতিহাসিক নাট্য-প্রণেতা বলেন তাঁরা নিতান্ত নির্বুদ্ধি। এ নাটকে তথ্যের ঐতিহাসিকতা খুঁজতে যাওয়া আর "জুলিয়াস সিজারে" কেন ঘড়ি বাজলো সেটা অনুসন্ধান করা একই ধরণের বোকামি। আর "অতি-নাটকীয়" কথাটা অর্থহীন। নাটক মাত্রেই নাটকীয়; জীবন থেকে অনেক উচ্চগ্রামে বাঁধা। এখানে এত বড় বড় ব্যক্তিত্বের সংঘাত হচ্ছে, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হচ্ছে, এখানে ঘটনা অতি-নাটকীয় কি করে হচ্ছে? আমার তো মনে হয় ঘটনাকে এখানে যতই চটকদার করুন, সবই মানিয়ে যাবে।

নাট্যকার একটু ভেবে বললেন—হ্যাঁ, বোধহয় ঠিক বলেছ। "নাটকীয়" বা "অতি-নাটকীয়", সবই আপেক্ষিক। একটা ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে অতি-নাটকীয় মনে হতে পারে; কিন্তু নাটকের ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ঘটনাটিকে দেখলে তা মনে হবে না। নাটকের অন্তর্নিহিত লজিকে ঘটনাটা সত্য বলে

মনে হবে। এলিয়টের মতে নাট্য-কৌশলের মজাই এই—

"it may allow characters to behave inconsistently but only with respect to a deeper consistency

ঐ গভীরতর সামঞ্জস্যই হোলো মঞ্চোপযোগী সব নাটকের মূলশক্তি। প্রচলিত যুক্তিতর্ককে পরাহত করে নাটক তার নিজের উদ্ভট যুক্তি সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নাটক চলাকালীন কোনো প্রশ্ন আর মনে আসে না। ওথেলো কদ্দিন পর ডেসডেমোনাকে মারলেন বা হ্যামলেট কেন প্রতিশোধ নিতে দেরী করছেন, এ আরাম-কেদারার প্রশ্ন; প্রেক্ষাগৃহের সীট থেকে এ প্রশ্ন ওঠে না।

দার্শনিক বলে উঠলেন—আধুনিক নাটকে এই জাগতিক যুক্তিকে অস্বীকার করার ঝোঁক আরো প্রবল। ব্রেশ্‌ট্‌ বলেছেন—

"Incorrectness or considerable improbability even was hardly or not at all disturbing, so long as the incorrectness had a certain consistency .... All that matters is the illusion of compelling momentum in the story being told"

সেই জন্যেই ব্রেশ্‌ট-এর নাটক পড়ে য়্যাশ্‌লে ডাক্সের চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—

"The plots of his plays are full of the crassest improbabilities"

পরিচালক টেবিলে পেন্সিল ঠুকে বললেন—বন্ধুগণ! [illegible] সংযত করুন। বিষয় থেকে সরে যাবেন না। "আলমগীর" কেন অনৈতিহাসিক তার কারণ আছে। খুব সঙ্গত কারণ আছে। আপনারা যা বললেন সবই সত্যি। কিন্তু তার ওপরেও আর একটি জবর কারণ আছে। ১৯২১ সালে অভিনীত যে নাটক সে নাটকের দর্শক হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী শুনলে পুলকিত হবে; তাদের ঐ বাণী শোনানো দরকার এবং শোনালে নাটক জনপ্রিয় হবে এই ধারণারই বশবর্তী হয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ ইতিহাসকে কিছুটা মঞ্চোপযোগী করে নিয়েছিলেন। এবং নাটকের শেষে স্পষ্ট করেই বলেছেন আওরংজেবের মুখ দিয়ে—

"আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ; হিন্দু মুসলমানের মিলন অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে (অর্থাৎ জগৎ লিখিত ইতিহাসের চোখে ধুলো দিয়ে)... এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।"

গভীরতর সামঞ্জস্যের তত্ত্বটা সত্য বটে; কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য, আমার মতে, এই হাততালি-জাগানো কথাগুলো। পুরো নাটকটায় অভিনেতারা যদি একটু ক্ষমতাবান হ'ন, তবে অন্ততঃ সতেরোবার প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে ফেটে পড়ার কথা। আমি গুনে দেখেছি। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটককে জনপ্রিয় করতে কোনো ত্রুটিই রাখেননি। অথচ বিষয়বস্তুর দিক থেকে এমন বলিষ্ঠতা দিয়েছেন যে নাটকটা প্রায় অতি-বিপ্লববাদে গিয়ে ঠেকেছে।

দার্শনিক সচকিত হলেন; বললেন—যথা? যথা? ঐ হিন্দু-মুসলমানের মিলন আহ্বান থেকেই আপনার ঐ উপপত্তি নাকি?

নাট্যকার বললেন—না, না, উনি আওরংজেব-চরিত্রের কথা বলছেন। যে আওরংজেবকে ইংরেজ ঐতিহাসিক আর হিন্দু বর্ণবিদ্বেষীরা মিলে দুশত বৎসর ধরে কালো, বীভৎস, শয়তান-সদৃশ করে এঁকেছে, তাঁকে এই নাটকে নির্ভীকভাবে এক বিরাট পুরুষ হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। মাইকেলের রাবণকে নায়কোচিত করে তোলার চেয়ে এর কৃতিত্ব কোনো অংশে কম নয়।

পরিচালক বলে চললেন—শুধু তাই নয়। হাততালির অজস্র উপকরণের ফাঁকে ক্ষীরোদপ্রসাদ এমন এক মুগুরঘাত হেনেছেন সমাজের মুখে যা নাকি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ পারেননি স্টেজে। রবীন্দ্রনাথ "অচলায়তনে" ধর্মান্ধতার বিভীষিকা দেখিয়েছেন; "বিসর্জনে" ভয়াল দেবীমূর্তিকে পদতলে নিক্ষেপ করেছেন। ঐ প্রচণ্ড পুরুষটিই পেরেছেন! আর পেরেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। শুনুন, আওরংজেব বলছেন; রাজসিংহের উদ্দেশ্যে তাঁর এই স্বগতোক্তি—

"তোমাদের যে কোনো দেবায়তনে প্রবেশ কর। নরকের ভয় তুচ্ছ করে যদি উন্মুক্ত চক্ষে সত্য দেখতে তোমার সাহস থাকে, মন্দির মধ্যে ঐ পুতুলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যদি দৃষ্টি-শক্তিহীন না হও, তখন বুঝবে যোগী, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ, বৈরাগীর মাথার উপর কেন আমি জিজিয়া-কর স্থাপন করেছি। মূর্তির সম্মুখে, তীর্থযাত্রীর উপরে নরকের ভয় দেখিয়ে কর সংগ্রহের অত্যাচার আর সেই জড়মূর্তির পশ্চাতে, নরকের অন্ধকারভরা অন্তরালে লুক্কায়িত বীভৎসতা যদি তুমি দেখতে পারতে রাজসিংহ; সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-বৈরাগীর লীলাকাহিনী কি কুৎসিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, যদি তুমি পড়তে পারতে রাজসিংহ তাহলে এই চিঠি লেখার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে এই তীর্থ-মন্দিরগুলোকে অগ্নিসাৎ করতে তুমি আমার সাহায্যে ছুটে আসতে।"

আওরংজেবকে যদি ধর্মান্ধ রূপে চিত্রিত করতেন ক্ষীরোদপ্রসাদ, তাহলে বুঝতাম এ কথাগুলো সেই ধর্মান্ধতারই প্রকাশ। কিন্তু না! "আলমগীর"-এর আওরংজেব উদারচেতা; ধর্মবিদ্বেষ তাঁর নেই। আরেক জায়গায় আওরংজেব বলছেন দিলীর খাঁকে—

"হিন্দুস্থানীর ভাষায় মোসলেমের অর্থ যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, তাহলে মুসলমান হওয়াটা মোগল-পাঠানেরই একায়ত্ত নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর ভিতরেও অনেক প্রকৃত মুসলমান আছে—অনেক প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত।"

তারপর বলছেন মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে উপহাস করে মাত্র; তারা মুসলমান নামের অযোগ্য। সেই সঙ্গে বলছেন—

"তবে হিন্দুরা তাঁকে যত উপহাস করে, মুসলমান আজও পর্যন্ত তত উপহাস করতে শেখেনি। হিন্দুর তীর্থ ভণ্ডে পরিপূর্ণ। মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়।"

আওরংজেব-এর এই কথায় ক্ষীরোদপ্রসাদের বলিষ্ঠ গোঁড়ামিহীন বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে আর এমন প্রচণ্ড বিপ্লবী কথা তিনি নির্বিবাদে দর্শককে গলাধঃকরণ করালেন কি উপায়ে? দর্শক মেনে নিল কি করে? দাঙ্গা বাধলো না কেন? এই সেদিনও তো দেখেছি কর্ণ-কুন্তী-কৃষ্ণা-বিষয়ক নাটক অভিনয় কালে ধর্মের ষাঁড়েরা লিফলেট বিলিয়েছে থিয়েটারের দোরগোড়ায়, কৃষ্ণাকে নাকি অপমান করা হয়েছে এই মিথ্যা লজ্জার অজুহাতে। আর ১৯২১ সালে "তীর্থ-মন্দিরকে অগ্নিসাৎ" আর "মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়" প্রভৃতি কথা নির্ভয়ে বলে গেলেন কি করে ক্ষীরোদপ্রসাদ? কারণ নাট্যকৌশলে ক্ষীরোদপ্রসাদের অসাধারণ দখল। "আলমগীর" নাটকের চমকপ্রদতা, ঘটনা-সংঘাত; হাততালির-ঝড়-তোলা সংলাপ প্রভৃতি কৌশলে আগুন চাপা পড়েছে। দর্শক নিজের অজান্তেই ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে ঐ কথাগুলো মেনে নিয়েছে। জনপ্রিয়তার মুখে ঝাঁটা মেরে ক্ষীরোদবাবু যদি নির্জলা প্রগতিবাদ উদ্গার করতেন তবে লোকে উঠে যেত, চেঁচাতো, দাঙ্গা করত। না। ক্ষীরোদবাবু জনপ্রিয়তাকে নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। তাই অমন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। দেখছেন? নাটকের জনপ্রিয়তা বক্তব্যকে চেপে তো দেয়ই না, বরং সোচ্চার হতে সাহায্য করে। আজকালকার নাট্যকারেরা রবীন্দ্র-ক্ষীরোদের এই কৌশলটা এদিনে শিখতে পারলেন না এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

[আগামীবারে সমাপ্য]

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

॥ সার্থবাহ ॥

ইতালীয় উপন্যাস : আন্নুন্তসিও ও পরবর্তীরা

আদিরসাত্মক রচনার 'শয্যাপার্শ্বের-সঙ্গী' সেইসব সংকলন-পুস্তকের কোনও-টাতেই বাদ পড়বেন না এমন তুখোড় য়ুরোপীয় লেখক নিশ্চয়ই তলস্তয়ের বা সুইনবার্ণ নন। কে—তা জানতে চাইলে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী পাঠকও বোধহয় চট্‌ ক'রে যে-একটি নাম আওড়ে দিতে পারেন তা হচ্ছে—বোকাচ্চিও। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয়, 'দেকামেরোণে'-খ্যাত, জিওভান্নি বোকাচ্চিও। এবং এই বোকাচ্চিওকে ইতালীয় উপন্যাসের আদিপুরুষ বললে যেহেতু অন্যায় নেই, তাই অনেক পাঠকের মনে একটা ঝাপসা ধারণা বর্তমান যে, ইতালিয়া,—যদি বা দান্তে, লেওপার্দি, ক্রোচের ইতালিয়া তার কথাশিল্পে আদিরসের আধিক্যেই ভোগে। তাঁদের ধারণা যে অসমীচীন নয় তা ঠাওরাতে তাঁরা (যদিও যথেষ্ট ভ্রান্তভাবে) নজির হিসাবে দেখাবেন আধুনিক ইতালীয় উপন্যাসের জনক আন্নুন্তসিওর, এবং আরও পরিচিত, সমকালীন আলবের্তো মোরাভিয়ার উপন্যাসগুলি। এর ওপর, স্বতঃই স্মর্তব্য অষ্টাদশ শতকের ভেনিসীয় কাসানোভা, যাঁর লাম্পট্যলীলা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল তাঁর ফরাসীতে-লেখা আত্মচরিত, 'মেমোয়ার'-গুলি মারফত। মনে পড়তেই পারে পুচ্চিনির অপেরা বা সাল্ভাদোর দালির চিত্রের কামকেন্দ্রিক সত্ত্বের কথা। আর, ইতালীয় রক্তে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার অম্লান স্মারক হিসাবে উদ্ধৃত হতে পারে নেরোর বা বোর্জিয়া ভাইবোনদের ইতিবৃত্ত।

কিন্তু ইতালীর জীবনে ও কথা-শিল্পে তীব্র যৌনতা-বোধের প্রতিফলন যদি বা নিঃসন্দেহ, আধুনিক ইতালীয় উপন্যাসকে সমগ্রভাবে আদিরসাত্মক বলা বিপজ্জনক সরলীকরণ বৈ কিছু নয়। 'আদিরসাত্মক' আখ্যাটিও অবশ্য আপত্তিকর, যদি না উক্ত আখ্যা ইংরেজী 'এরোটিক'-এর বাঙলা করে। আবার, আন্নুন্তসিওর উপন্যাসের যৌনতাকে 'এরোটিক'-এর অন্তর্ভুক্ত করা গেলেও, মোরাভিয়ার বাস্তববাদিতার মূলসূত্র সত্যই যৌনতা কি-না এ প্রশ্নও থেকে যায়। আসলে বোধহয় ইতালীয় উপন্যাসে বোকাচ্চিওর ছায়ামূর্তির অনুসন্ধান অনর্থক। বিশেষতঃ, বিংশ শতকের ইতালীয় উপন্যাসের বহুবর্ণ উত্থানে ও বিন্যাসে। কারণ, এ-সাহিত্যে যাঁরা মহারথী তাঁরা একজন আর একজনের থেকে এমনভাবে পৃথক যে আন্নুন্তসিও, স্ভেভো, ভেরগা, দেলেদ্দা, সিলোনে ও মোরাভিয়া এই ছয়জনকে কোনও একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতের গণ্ডিতে একত্র আলোচনা করা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীয় উপন্যাস বলতে যা বোঝাত তা মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস, যার প্রধান পরিবেশক ছিলেন মান্তসোনি ও গ্যেররাদাজ্জি। যদিও গ্যেররাদাজ্জির 'আস্সেদিও দে ফিরেন্তসে' (ফ্লোরেন্স-পতন)-র চেয়ে মান্তসোনির 'ই প্রোমেস্সি স্পোজি' (বাকদত্তা)-র সাহিত্যিক মূল্য অনেক বেশী, তবু বলতেই হয় যে, যে-প্রভাব ও'দের দু'-জনের ওপরই কার্যকরী হয়েছিল তা বালজাক বা স্তাঁদালের উন্নতমান উপন্যাসের নয়; তা ওয়ল্টার স্কট-প্রদর্শিত পথে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিংবা এ্যান র‍্যাডক্লিফের 'ভয়াল কাহিনীর'। রোমাণ্টিকতায় আপ্লুত হয়েও মান্তসোনি 'সত্য গল্প' বলার তাগিদ পেয়েছিলেন বটে, চরিত্র সৃষ্টিতে পাকা হাতও ছিল তাঁর; কিন্তু বাস্তব-ব্যাখ্যায় কিংবা ঘটনা-সংস্থানে তিনি তৎকালীন য়ুরোপীয় উপন্যাস-শিল্পের সার্থকতর প্রচেষ্টাগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকেননি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রে বাঙলা উপন্যাসের যে-অগ্রগতি ছেদ টেনেছিল মান্তসোনিতেও ইতালীয় উপন্যাস তদনুরূপ একটি আপাতরম্য চরমে পৌঁছায়।

মান্তসোনির 'ই প্রোমেস্সি স্পোজি' থেকে গ্যাব্রিয়েল দান্নুন্তসিওর প্রথম উপন্যাস 'ইল পিয়াচেরে' (প্রমোদ) রচনায় সর্ববিধ গুরুত্ব যেন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথে উপনীত করে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত জগৎ আর আন্নুন্তসিওর জগৎ কোনও-খানেই মেলে না। কাব্যিক অতিমাত্রায়, কল্পনার আতিশয্যে সুযোগ পেলেই অতীন্দ্রিয়ে অপসারী, জ্বালাময়, মানসিকতার প্রতাপে অস্থির, আন্নুন্তসিও যে-অর্থে দ্রষ্টা ছিলেন, তা'র সাক্ষাৎ যেন র‍্যাবোঁর সেই 'ভয়ার্ত'—সেই দার্শনিক-ও-কবিতে, যার অভিশপ্ত দৃষ্টি গৃহীত বোধের জগৎ ভেঙেচুরে অন্যতর এক চৈতন্যে এসে ঠেকে। যেখানে জ্ঞানও অশান্ত। তাই আন্নুন্তসিওর কোনও একটি উপন্যাস পড়তে পড়তে 'শেষের কবিতা'র কথা যদিবা মনে পড়ে, পরক্ষণেই সচেতন হতে হয় যে, প্রেমের এই দুই ভাষ্যকারের পঞ্চেন্দ্রিয়ে ও তাদের চিত্তে কী প্রকাণ্ড গরমিল। প্রেম-কাহিনী নয়, নিছক প্রেমালাপই যার উপাদান এমন উপন্যাস 'শেষের কবিতা' ছাড়া যদি আরেকখানি ভাবা যায়, তাহলে তা অবশ্যই আন্নুন্তসিওর ঐ উপন্যাসটি। 'শেষের কবিতা'র মতনই মদিরভাবে বিয়োগান্ত, আন্নুন্তসিওর উপন্যাসটিতে ভেনিস শহর শিলঙের মতোই এক চিত্রার্পিত প্রেমোদ্যান। ত্রিভুজ প্রেমের বিষাদ-রঙ্গে দুটি কাহিনীর তালও যেন কতকটা এক রকম। কিন্তু আন্নুন্তসিওর স্তেলিয়ো, লা ফস্কারিণা আর দোনাতেল্লার সঙ্গে অমিত, কেতকী আর লাবণ্যর চারিত্রিক অমিল কেবল তাদের স্রষ্টাদ্বয়ের চারিত্র বা ইথস কতো ভিন্ন তা-ই স্মরণ করায়।

আন্নুন্তসিওর উপন্যাসখানির নাম 'ইল ফুয়োকো' * (আগুন)। জেমস্‌ জয়সের সঞ্চিত পুস্তকের একটি নাতি-দীর্ঘ তালিকায় এক সময়ে এই বইখানির স্থান হয়েছিল জেনে উপন্যাসটির সঙ্গত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্বন্ধে আরো নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। (বর্তমান প্রবন্ধকারের ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাই ঘটেছিল।) এই খ্যাতির সমস্তটাই যে আন্নুন্তসিওর সাহিত্য-প্রতিভার পাওনা না-হয়েও থাকতে পারে, এ-রকম মত অবশ্য কেউ কেউ পোষণ করে থাকেন। কারণ, 'ইল ফুয়োকো'র নায়িকা লা ফস্কারিণার চরিত্রে ইতালীয় মঞ্চাভিনেত্রী, আন্নুন্তসিওর প্রণয়িনী, এলেয়োনোরা দুজেকে খুঁজে পাওয়া মোটেই শক্ত নয়; এবং উপন্যাসের কাহিনী যে গ্যাব্রিয়েলে-এলেয়োনোরার বাস্তব প্রণয়ের লিখিত বিবরণ মাত্র, এ-তথ্য আজ অনেকের জানা। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ফরাসী চিত্রকর জাক এমিল ব্লাঁশের আত্মকথায় উক্ত বিষয়ে প্রামাণিক সংবাদ পেতে পারেন।

একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের নায়কত্ব করার মতো কীর্তিমান পুরুষ আন্নুন্তসিও, যিনি প্রণয়িনীরূপে পেয়েছিলেন যুগের দুই মহীয়সী অভিনেত্রী—এলেয়োনোরা দুজে ও জারা বের্ণহার্তকে, যুদ্ধ করেছিলেন পদাতিক, অশ্বারোহী ও বৈমানিকরূপে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক সন্ধিক্ষণে ফিউমের একচ্ছত্র শাসক বনেছিলেন ইতালীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করে; আর এ-সবের মধ্যে যাঁর লেখনী কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে ও রাজনৈতিক বিজ্ঞপ্তিতে সক্রিয় ছিল আশ্চর্যভাবে। 'ইল ফুয়োকো'র লা ফস্কারিণা যদি দুজে হন, হয়ত বের্ণহার্ত তা'র দোনাতেল্লা, কিন্তু উপন্যাসটির

---

* Il Fuoco: I Romanzi del Melagrano. — Gabriele D'Annunzio Il Vittoriale Degli Italiani, 1942.

মূল্যে এ-জাতীয় তাৎপর্যে বাড়ে বা কমে না। কারণ, আম্মুন্তসিওর রচনায় চরিত্র-সৃষ্টির চেয়ে ঢের বেশী জোর বর্ণনায়, পর্যবেক্ষণে, চিন্তানুসন্ধানে এবং সর্বোপরি, অনুভবে। অন্তর্মনা স্তেলিয়োর একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা বর্ণনা করতে আম্মুন্তসিওর বাগভঙ্গী লক্ষ্য করুন :

> "চোখ বন্ধ করল সে : ভুলে গেল জগৎ-সংসার, ঐশ্বর্য। কোনও দেব-মন্দিরের ভিতর যেমন, তেমন তার ভিতর সঞ্চারিত হ'ল এক অন্ধকার ও পবিত্র প্রশান্তি। চেতনা তার অনচ্ছ, নিশ্চল, কিন্তু তার ইন্দ্রিয় সকল মানুষিক সীমা ছাড়িয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায় সোন্নত......। চোখ খুলল সে। দেখল ছায়াচ্ছন্ন কক্ষ, খোলা অলিন্দ দিয়ে দূরে দূরে আকাশ, গাছের সারি, গম্বুজ, মিনারচূড়া, আর শেষে সেই হ্রদটা, যার 'পর ঝুঁকে পড়েছে গোধূলির মুখ, স্তূপ আর নীল ইউগেনীয় পর্বতমালা যেন সন্ধ্যার বিশ্রামে মুড়ে-দেওয়া ডানা পৃথিবীর। সে দেখল নৈঃশব্দের রূপগুলি, আর সেই নিঃশব্দ রূপ যা তাঁকে আঁকড়ে ছিল, বল্কল যেমন থাকে বৃক্ষকাণ্ডকে।" ('ইল ফুয়োকো', পৃষ্ঠা ২২০-২১)

অভিনিবেশী-শক্তির জোরাল, এমন কি, প্রচণ্ড অনুভবের সাক্ষাৎ যদিও আম্মুন্তসিওর কর্মে ও রচনায় অগণিত, তবু তাঁর উপন্যাসের আবহাওয়ায় এক অপার্থিবতার স্বাদ পাওয়া যায়। ঘটনার উল্লেখ তাঁকে কমই ব্যস্ত করে: তাঁর উৎসাহের সবখানিই যেন মনোলোকে টহল দিতে আত্মহারা। 'ইল ফুয়োকো'র আখ্যানভাগ শুধু দুর্বল নয়, উপন্যাসটিকে আখ্যান-বিরহিত বলা অত্যুক্তি নয়। স্তেলিয়ো-লা ফস্কারিণার নৌকাবিহার দিয়ে তাই যে-কাহিনীর শুরু, তার উপসংহারে আসে জার্মান সংগীতকার রিখার্দ ভাগনরের উটকো মৃত্যুর উল্লেখ। (ভাগনর ভেনিসে মারা যান ১৮৮৩ সালে)। কথোপকথন, মন্তব্য, নিসর্গ বর্ণনা, মনস্তত্ত্ব, ঐতিহ্য-উদ্ধার এই সবে এমনভাবে প্রবৃত্ত থাকে আম্মুন্তসিওর ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা যে, ঘটনামূলক জীবনকে বোধ হয় তাঁর বিস্বাদ ঠেকে। আম্মুন্তসিওর আরেকখানি উপন্যাস, 'ত্রিয়ন্ফো দেল্লা মর্তে' (মৃত্যুর জয়)-তেও ভাবনা ঘটনার আরম্ভে থাকে কমই।

তাই যে মৌলিক যৌনবোধ আম্মুন্তসিওর কাছে পুরুষার্থের অন্বয় করত, তা-ও পরিশেষে হয় অলৌকিক, নয় বিকৃত কাম-উপাসনায় ধোঁয়াটে, নয়ত লোমহর্ষক মাত্র। আম্মুন্তসিওর প্রেমিক কখনও চরিতার্থতার রূপক দেখে পক্ক বেদনার সজীবতায়, কখনও শ্বাপদের বেহুঁশ কামে। বাস্তবকে পাশ কাটিয়েই গেছিলেন আম্মুন্তসিও। একদিকে কার্লাইল-নীৎশে-ভাগনর প্রচারিত শক্তিবাদ ও অপরদিকে সতেজ এক রোমান্টিকতা আম্মুন্তসিওর ক্ষমতার অপলাপ ঘটিয়েছিল, মানবিক স্বার্থের দিকে চেয়ে এ-কথা বলতেই হয়।

কিন্তু অভিজাত আম্মুন্তসিওর ঐশ্বর্যময় পথ ছাড়া অন্য পথে উপন্যাস সৃষ্টি ইতালীতে সম্ভব হচ্ছিল একই সময়ে। সোজাসুজি বাস্তবকে অবলম্বন করে লেখার সংকল্প ছিল 'ভেরিসমো' (সত্যতা)-পন্থী ঔপন্যাসিকদের, যাঁদের মধ্যে জিওভান্নি ভেরগা ও গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা প্রধান। সুসভ্য মানুষের জটিল মানসিকতার বিশ্লেষণে আম্মুন্তসিওর যেমন, তেমন ভেরগার প্রত্যয় ছিল গ্রামীণ স্বাভাবিক জীবনের গভীরে পৌঁছানোর। শুরুতে অবশ্য প্রবীণতর ভেরগা আম্মুন্তসিও-সুলভ বিলাসী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন জোর করে তাঁর রচনায় শহুরেপনার যোগান দিতে গিয়ে, বনেদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাঁর চরিত্রগুলি বাছাই করে। কিন্তু ভেরগার এই বেখাপ্পা আভিজাত্য তাঁর প্রখর বাস্তবনিষ্ঠার ঝাঁঝে উবে যায়। তাই প্রথম-দিকের রচনা 'তিগ্রে রেয়ালে' (আসল বাঘ) বা 'এরোস' (কাম)-এ যেন এক পরধন লোভে মত্ত ভেরগাকে দেখি অজানা বা কম-জানা এক বিষয়বস্তু নিয়ে শক্তির অপব্যবহার করছেন। যে জীবনের সঙ্গে ভেরগার আবাল্য পরিচয় এবং যার প্রতি তাঁর মমতাবোধ স্থায়ী, তা ছিল গাঁয়ের মানুষদের জীবন। সিচিলিয়ার সাধারণ মানুষেই ছিল ভেরগার শক্তির উৎস। যখন সিচিলীয় নিম্নমধ্যবিত্ত ও চাষীদের জীবন তাঁর উপজীব্য হল, তখন ভেরগার ঔপন্যাসিকতায় নির্বিরোধ সামর্থ্যের সাক্ষ্য পড়ল। ভেরগার যে উপন্যাস ইতালীয়দের কাছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত, সেই 'মাস্ত্রো-দন জেসুয়াল্দো'র নায়ক জেসুয়াল্দো চাষীর ছেলে। সিচিলীয় জীবনের আর এক মর্মস্পর্শী আলেখ্য তাঁর 'ই মালাভল্লিয়া' (মালাভল্লিয়া পরিবার)-য়। 'কাভাল্লেরিয়া রুস্তিকানা' (গ্রাম্য শৌর্য) নামে ছোট গল্পের যে সংকলন ভেরগা প্রকাশিত করেন ১৮৮০ সালে, তাতেই প্রথম ধরা পড়েছিল তাঁর এই পথ পরিবর্তন। (এই 'কাভাল্লেরিয়া রুস্তিকানা'র একটি গল্প অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছিল মাস্কানির একই নামের বিখ্যাত অপেরা। উক্ত অপেরার শেষ দৃশ্যে নায়ক তুরিদ্দুর গান, 'মাম্মা, কুয়েল ভিনো এ জেনেরোসো......'র বেনিয়ামো জিল্লি-কৃত অপূর্ব কণ্ঠানুবাদ আমাদের জন্য মুদ্রিত করেছেন হিজ মাস্টার্স ভয়েস। ডি. এইচ. লরেন্স গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ করেন।)

'গ্রাদুত্তরি গ্রাদুতরি'—ইতালীয় অনুপ্রাসের এই অপূর্ব উদাহরণটি বলে : 'বিশ্বাসঘাতক অনুবাদক'। হয়ত তা-ই। তবু গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার 'লা মাদ্রে'র 'দি মাদার' নামক ইংরেজী অনুবাদটি আমাদের দেশে একখানি বহুপঠিত বই এবং দেলেদ্দার ইতালীয়ানের সার্দিনীয় স্বাদ যদিবা, লরেন্সের বিচার মতো, ইংরেজীতে অনায়াত্ত হয়েও থাকে, এম, জি, স্টিগমানকৃত উক্ত অনুবাদ নিঃসংশয়ে রসোত্তীর্ণ। ইংরেজী অনুবাদে যাঁরা দেলেদ্দা পড়বেন তাঁরা এই সার্দিনীয় ঔপন্যাসিকার প্রতি অবিচার করবেন না। কারণ, দেলেদ্দার উপন্যাসে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ভাষিক বৈশিষ্ট্যকে অপ্রধান করে। পাহাড় ও সমুদ্রের প্রচণ্ড প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বে অন্বিত সার্দিনীয় চরিত্রে রিপুর তাড়না কিভাবে দুর্বিপাক আনে, তার বাস্তববাদী অনুশীলন শুধু 'মা'-এ নয়, দেলেদ্দার অধিকাংশ উপন্যাসেই। 'ভেরি-

সমো'-অনুপ্রাণিতা দেলেদ্দা যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে সত্যতা খুঁজেছিলেন সদাসতের দারুণ দ্বন্দ্বের খণ্ডিত উগ্র সার্দিনীয় জীবনের ধারায়। তাঁর 'চেনেরে' (ছাই) ও 'লো দেয়া (আইভিলতা) এই অকপট সত্য-ভাষণের সাক্ষ্য। দেলেদ্দার আরেকখানি উপন্যাস, 'লা ভিতা দেল মালে' (অসৎ জীবন) নামতঃ যেন সমগ্র-ভাবে তাঁর উপন্যাসিক সত্তের সংজ্ঞা দেয়।

'শতাব্দীর ব্যাধি'-আক্রান্ত আন্নুন্ত-সিও, বাস্তবকেন্দ্রিক ভেরগা ও নৈতিক-মগ্ন দেলেদ্দা—এঁদের কারুর সঙ্গেই মেজাজে বা শিল্পে অনুমত ছিলেন না ত্রিয়েস্তবাসী ঔপন্যাসিক ইতালো স্ভেভো (আসল নাম এত্তোরে স্মিৎস)। জাতে জার্মাণ-ইহুদী, স্ভেভো তাঁর সমুদয় রচনা ইতালীয় ভাষায়ই লেখেন এবং বিংশ শতকের ইতালীয় ঔপন্যাসিকদের মধ্যে স্বকীয়তার গুণে তিনি প্রধানতম, এমন অভিমত বোধ হয় অপকারী হবে না, যদিও স্ভেভোর নামের সঙ্গে পরিচিত উপন্যাস-পাঠকের সংখ্যা এ-দেশে বা বিদেশে মোটেই আশানুরূপ নয়। ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবসায়ী স্ভেভো যদিও উনিশ শতকের শেষের দিকেই তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশ করেছিলেন, তবু পুরো লেখক হবার গুরুত্ব ও তদনুগ প্রতিপত্তি তিনি লাভ করেন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর। স্ভেভোর রচনার প্রতি সাহিত্যিক মহলকে সজাগ করেছিলেন স্বয়ং জেমস্ জয়স। এবং এ-কথা ঠিক যে, এজরা পাউণ্ডের দৌত্য ব্যতীত জয়সের প্রতিভা যদিবা বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতি পেতে পারত, জয়সের প্রশংসাপত্র না পেলে স্ভেভোর বরাতে ইউরোপীয় মর্যাদা জোটা শক্ত ছিল। উ'চকপালে জেমস্ জয়সের কাছ থেকে স্ভেভোর 'সেনিলিতা' (জরা) অকৃপণ সাধুবাদ পায় ও সেই দুর্লভ উৎসাহই অনেকাংশে স্ভেভোকে বহুকাল পরে মহত্তর একটি রচনার প্রেরণা দিয়েছিল। ১৯২৩ সালে স্ভেভোর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'লা কোশিয়েন্তসা দি ৎসেনো' (জেনোর বিবেক) প্রকাশিত হয়।

স্ভেভোর ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিশদ পরিচয় দেবার সুযোগ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। তবু, এটুকু বলা আবশ্যক যে, ফরাসী ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত যে-মনস্তাত্ত্বিক অভিধায় উপন্যাসের বাচন-প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করেন, স্ভেভোর প্রথম উপন্যাস 'উনা ভিতা' (একটি জীবন)-র ও 'সেনিলিতা'য় সেই মনোবাদী ভাষণের অংকুর ছিল। কিন্তু তবু স্ভেভো তাঁর প্রাপ্য প্রাথমিক খ্যাতি কেন পাননি? জৌলুসহীন, স্তিমিত, অবিচিত্র এক মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তস্থল আবিষ্কারে নিয়োজিত ছিলেন স্ভেভো। এবং জনৈক ইতালীয় সমালোচক* যেমন বলেছেন—সমসাময়িক আন্নুন্তসিওর চমকদার প্রতিভা তখন বিকাশের এরূপ পূর্ণতায় যে, সে-সময় স্ভেভোর উপন্যাসে উপস্থাপিত জগৎ নেহাত সাদামাটা, বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট না-ঠেকে পারত না ইতালীয় উপন্যাসের পাঠকদের কাছে। উপযুক্ত সম্মাননা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্ভেভো 'সেনিলিতা' রচনার পর কুড়ি বৎসর পর্যন্ত সাহিত্য-কর্ম থেকে সরে ছিলেন। 'লা কোশিয়েন্তসা দি ৎসেনো'তে স্ভেভো পুনর্বার লেখনী ধরেন এমন সাহস, অকপটতা ও মানুষ সম্বন্ধে এমন এক জ্ঞান নিয়ে যা, সিন্নিয়র ফ্লোরার মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর লেখকদের কারু ছিল না। স্ভেভো দেখেছিলেন মানুষের শুদ্ধ ও বিকৃত প্রবৃত্তির লীলা, তার অহংবোধ, তার আন্তরিকতা, তার মিথ্যাচরণ—এই সবে মিলে তার অনন্ত চেতনা-স্রোতকে।

দেলেদ্দার বাস্তববোধ যেখানে নৈতিক হেরফেরের পটভূমিকায় আটক, সেখানে সিলোনে এবং সমকালীন অন্যান্য ইতালীয় ঔপন্যাসিকরা তাঁদের ঘটনা ও চরিত্রের গতিবিধি সোজাসুজি জীবন-সংগ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পেঁ'ছে দিয়েছেন। অবশ্য বাস্তবমুখিতার যে পুনর্প্রত্যয়ে সিলোনে, ভিত্তোরিনি, পাভেসে বা মোরাভিয়া বিংশ-শতকী জীবনের এক নির্মোহ আলেখ্য রচনায় ব্রতী, সে প্রত্যয়ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পারেনি। রাজনীতি : ফ্যাসিবাদ ও প্রতিরোধ, সিলোনের একাধিক উপন্যাসে রচনার প্রত্যক্ষ তাগিদ হয়েছে, যদিও সিলোনের মানবিকতা অধিকাংশ স্থলেই তাঁকে উগ্র পন্থার ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছে। এই মর্মে তাঁর 'পানে এ ভিনে' (রুটি ও মদ) উপন্যাসখানি স্মরণীয়। সিলোনের মানবিকতা আরো আবেগান্বিত (ভাবপ্রবণ?) হয়ে যুগের দস্তর অবক্ষয়ের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গরিমায় মহান দেখে কেবল দীন-দরিদ্রদের। তাঁর একটি উপন্যাসে মাতাল পিয়েত্রো সরাইখানার মধ্যে হেঁকে বলে : গরীবরা, এখন তোমাদের গর্বিত হওয়ার সময় এসেছে। নিশ্চিত জেনো, আজ ধরাতলে তোমাদের থেকে মহান্ কিছু নেই।

মুসোলিনি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক জীবনে যে অজস্রমুখ ব্যভিচার ইতালীয় সামাজিক-নৈতিক সত্তাকে কুরে খাচ্ছে, তার বিবরণ দিতেই সাম্প্রতিক ইতালীয় ঔপন্যাসিকদের ন্যায্য উৎকণ্ঠা। এঁদের মধ্যে আলবের্তো মোরাভিয়া সর্বাধিক অনূদিত ও সৃষ্টিশীল। প্রথিতযশা মোরাভিয়া বিংশশতকের প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের একজন নন নিশ্চয়ই এবং তাঁর লেখায় মনস্তাত্ত্বিক ঝোঁকগুলি পড়তে অপারগ হলে, পাঠকের পক্ষে তাঁকে ডানিয়েল ডিফো বা, এমিল জোলার নিকটাত্মীয় বলে ঠাহর হওয়া অসম্ভব নয়। তবু বাস্তবকে জুৎসই করে ধরতে পারা অবশ্যই ঔপন্যাসিক বৃত্তির একটি গুণ এবং মোরাভিয়ার তা আছে। তাঁর উপন্যাসে বাস্তব কদাচই কাহিনী-নির্ভর জোড়াতালিতে বিক্ষত। আর, এই বাস্তবের অকুণ্ঠ বিবৃতি অনেক ক্ষেত্রে মোরাভিয়াকে ইতালীয় জীবনের মূল্যবান যৌন-প্রকরণ সম্বন্ধে অহেতুক হুঁসিয়ার করেছে—এ-সন্দেহ মিথ্যা হলেও, বর্ণময় যৌন-জীবনের চিত্রক মোরাভিয়া সর্বত্রই অপ্রিয় সত্য বলার গুরু দায়ে দায়ী এমতো-ও বলা যায় না।

সমকালীন ইতালীয় উপন্যাস-সাহিত্যের আসর ক্রমবর্ধমান। একাধিক ক্ষমতাবান ও সিসৃক্ষু ঔপন্যাসিক যুদ্ধোত্তর ইতালীতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেরই আন্তর্জাতিক খ্যাতি দেলেদ্দার বা ভেরগার চেয়ে বেশী বৈ কম নয়। যে চারজনকে মোটামুটি এ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায় (এবং যাঁদের অনুল্লেখ বর্তমান প্রবন্ধটিকে বিকলাঙ্গ করে), তাঁরা হচ্ছেন : চেজার পাভেসে 'লা লুনা এ ইল ফালো' : চন্দ্র ও দাবদাহ; 'ইল মেস্তিয়েরে দি ভিভেরে' : বাঁচার ব্যবসা), এলিও ভিত্তোরিনি ('কনভেরসাৎসিয়নে ইন সিচিলিয়া' : সিসিল সংলাপ), ভাস্কো প্রাতোলিনি ('ক্রোনাকে দি পোভের্নি আমান্তি' : দীন প্রেমিকদের কাহিনী) ও জিউসেপ্পে বের্তো ('ইল চিয়েলো এ রস্সো' : আকাশ লাল)।

---

* Francesco Flora : STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, Vol. V : Il Novecento. 'Pirandello e Svevo' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সমস্ত মুখভর্তি বসন্তের দাগ। সামনের দাঁত কটা উঁচু। পান-দোক্তা খেয়ে খেয়ে এমন অবস্থায় এসেছে, সন্দেহ হয় কোন কালে ওর রং সাদা ছিল কিনা। একটা চোখ যেন আরেকটার চেয়ে একটু ছোট। খাড়া নাকটার নীচেই মুড়ো ঝাঁটার মত এক জোড়া গোঁফে আরো যেন বাহার খুলেছে শ্রীমুখের। যেমন রোগা, তেমনই লম্বা। গায়ের রংটা নেহাত আলকাতরার মত নয়, এইটুকু যা বাঁচোয়া।

পরম বিতৃষ্ণা ভরে ওর আপাদ-মস্তক চকিত দৃষ্টিতে একবার নজর করেই সুচেতা স্বামীর দিকে মুখ ফেরাল হতাশ ভাবে। এই লোক!

খবরের কাগজের আড়াল থেকেই এতক্ষণ নীরেন সকৌতুকে স্ত্রীর মুখের বিরাগের ভাব-ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করছিল, এবার হাতের চিঠিখানা সুচেতার হাতে দিয়ে খবরের কাগজটা বেশ ভাল করে মুখের ওপর টেনে গম্ভীরভাবে জবাব দিল, হ্যাঁ। ব্রজেন একেই পাঠিয়েছে। চিঠিখানা পড়েই দ্যাখোনা।

অত্যন্ত বিরস মুখে চিঠিখানা চোখের সামনে খুলে ধরল সুচেতা।

বৌদি,

নীরেনের মুখে সব কথা শুনলাম। রেঁধে রেঁধে, আগুনের আঁচে আপনার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাচ্ছে শুনে ভৈরবকে পাঠালাম। উড়ে বামুন না হলেও মোটামুটি ভালই রান্না জানে। খুব বিশ্বাসী। আমার জানা লোক। যা এ বাজারে পাওয়া সত্যই অতি দুর্লভ। নীরেনের ওকে খুবই পছন্দ হবে, একথা আমি নিশ্চিন্ত মনেই জানি। এবং সেই কারণে আপনারও অপছন্দ হবে না।

ব্রজেন ঠাকুরপো।

এতক্ষণ ধরে খানিকক্ষণ এক-পা, খানিকক্ষণ অপর পায়ের ওপর ভর দিয়ে ভৈরব ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দুজনের দিকে তাকাচ্ছিল, এবার ঘণ্টা-বাজার মত গলায় বলে উঠল, তবে আজ এখন যাই বাবু? কাল সকাল থেকেই একেবারে কাজে লাগব।

আচ্ছা আচ্ছা এখন যাও। কাল সকালে ঠিক এসো কিন্তু—নীরেন এক-কথায় বিদেয় করল ওকে।

ভৈরব বাইরের ঘর থেকে রাস্তায় পা দেবামাত্রই সুচেতা নিজ মূর্তি ধারণ করল। কাল সকালে আসতে বললে যে বড়? ওই ভূতটাকে রাখবে নাকি?

খবরের কাগজের আড়াল থেকে অত্যন্ত নিরীহ কণ্ঠের জবাব এল, না রেখে কি করি? ভাল চেহারার ভাল লোক পাই কোথায়? চুরি ডাকাতি করবে না, একলা বাড়িতে পেয়ে দুপুরবেলার খুন-জখম করবে না, রান্নাবান্না জানবে, বাড়ির গিন্নির মনের মতন হবে, এ রকম লোক তো পৃথিবীতে সহজে জন্মায় না। ব্রজেন খুব চেনা-জানা লোক ছাড়া এখানে দেবে না, তা জানো তো?

তা বলে ঐ ভূতের মত চেহারা! মা-গো-মা! দেখেই তো ঘেন্না করছে। ওর হাতের রান্না খেতে তোমার প্রবৃত্তি হবে?

সুচেতার মুখ ঝামটার জবাবে এবার খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর রাখলো নীরেন। কৌতুক-উদ্ভাসিত মুখে তাকাল স্ত্রীর ক্রোধারক্ত মুখের দিকে। কী রকম লোক চাই বল? আমার মত লোক হলে চলবে, না আমার চেয়েও কম-বয়সী, সুন্দর, জোয়ান ছোকরা—

বাধা দিয়ে অধিকতর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব এল, আঃ থামো তো। অসভ্য কোথাকার! যা মুখে আসে তাই বলছো যে, একটু আটক নেই মুখে? আমি কি সুন্দর লোক চেয়েছি? তা বলে ঐ হত-কুচ্ছিত লোকটা রান্না করেছে ভাবলেই আমার খাবার ইচ্ছে ঘুচে যাবে।

স্ত্রীর রাগকে আমল না দিয়েই এ তরফের বেশ শান্ত জবাব এল। কেন এ তো বেশ ম্যাচ হয়েছে। যেমন কর্তা-গিন্নি, তেমনই ঝি আর বামুন। যেমন তোমার আদরের আল্লাকালী, তার পাশে ভৈরবকে ভালই মানাবে। রান্নার সঙ্গে সম্পর্ক। সেটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেই হল। অত মাথা ঘামানোর কি হয়েছে?

এবার দপ্ করে আরো জ্বলে উঠল সুচেতা। ওঃ এবার এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি ব্যথা কোথায়! সেই গায়ে-পড়া ঢলানী ছুঁড়িটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি বলে বড্ড গায়ে জ্বালা ধরেছে না? পুরুষ জাতটাকে চিনতে আমার বাকি আছে কি না?

নীরেন এবার দু'চোখে গভীর ঔৎসুক্য করে তাকাল স্ত্রীর দিকে, ওরে বাবা, আমি তো জানতাম একলা আমাকেই চিনেছো বুঝি তুমি। আরো কটা পুরুষ দেখেছ সুচেতা? সবগুলি কি একই রকম?

সুচেতার দু'চোখে বিদ্যুৎ চমকাল। বেশী দেখবার দরকার হয় না। হাঁড়ির ভাত একটা টিপলেই সবগুলোর অবস্থা বোঝা যায়। বুঝলে?

দাম্পত্য কলহে ছেদ পড়ল ভাঙা কাঁসরের মত খনখনে গলার চিৎকারে। ও বৌদি, উনুন ধরে গেছে রান্নাঘরে। এসো এদিকে—

এবার হো হো করে হেসে উঠলো নীরেন। ঐ যে তোমার চামুণ্ডা কাঁসর

বাজাচ্ছেন! শুধু কি চেহারা, দু'জনের গলাও যেন ম্যাচ করা! একজনের ঘণ্টা, একজনের কাঁসর!

উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পেল না সুচেতা। অগত্যা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে...

একবার তাকিয়ে সুচেতা দ্রুতপদে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রান্নাঘরে ঢুকতেই আবার খনখন করে কাঁসর বাজাল আন্নাকালী। হ্যাঁ গা বৌদি, ঐ নোক নাকি? ও আঁধবে?

রুক্ষ মুখে সুচেতা জবাব দিল, হ্যাঁ। তাতে হয়েছে কি?

চোখ নাক মুখ একসঙ্গে কোঁচকাল আন্নাকালী। তোমাদের আর আন্নার নোক জুটল না বৌদি? শেষকালে ওর হাতে খেতে হবে? কি ছিরির চেহারা! মরে যাই মরে যাই! মুখপোড়া যেন শ্যাওড়া গাছ থেকে নেমে এয়েছে বেম্ভ-দত্যির মত। বিদেয় কর বৌদি, এখনি বিদেয় কর—

এই মাত্র ওকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। উত্তপ্ত মেজাজ অধিকতর গরম হয়ে উঠল। কটাক্ষে আন্নাকালীর দিকে তাকিয়ে সুচেতা বলল, এতকাল জানতুম শ্যাওড়া গাছে পেত্নী থাকে। বেম্ভদত্যিও যে থাকে, তা জানা ছিল না। তা তুই একটু সাবধানে থাকিস আন্না, শেষ কালে তোর ঘাড়ই না মটকায়। আমরা যদি ওর হাতে খেতে পারি, তুই কি একেবারে রাজরানী এসেছিস যে ওর হাতে খেতে পারবি না? নে এখন মাছটা চট করে কুটে দে দেখি— উনুন বইছে।

নীরেনের কথাটা মিথ্যে নয়। ভৈরবের চেহারার পাশে বোধ হয় একমাত্র আন্নাকালীকেই মানায়। খাঁদা নাক। ছোট ছোট গোল গোল চোখের একটা বেশ টারা। মোটা-সোটা বেঁটে। স্বাস্থ্যটা দশাসই। গায়ের রং ভৈরবের চেয়ে আরেক পোঁচ বেশী কালো। চওড়া সিঁথে। লাল লাল রুক্ষ চুলগুলো মাথার মাঝখানে টান টান চুড়ো করে বাঁধা। বয়স ভৈরবের মতই, বোঝার উপায় নেই পঁচিশ না পঁয়ত্রিশ। যাহোক একটা কিছু হবে। সর্বদাই মারমুখী হয়ে আছে। ঝগড়াটে বলে বদনাম আছে পাড়ায়। ছল-ছুতো পেলেই হল। যে কোন পাড়ার মানুষ পথের কুকুর, অন্য বাড়ির ঝি-চাকর অথবা উড়ে-আসা কাক-চিল, যাহোক একটা কিছু নিয়ে মুখ খুললে সহজে থামবার পাত্রী নয়। সুচেতাদের বাড়ির কাছাকাছি বস্তিতে ওর ঘর। শোনা যায় বিয়ের রাত্রেই ওর স্বামী দেশ-ছাড়া হয়েছে। সেও বছর দশেক হল। সেটা ওর রূপে কি গলাবাজিতে তা অবশ্য জানা যায়নি।

সুচেতা ওর রূপ-গুণের কথা শুনে, চাক্ষুস দেখে, খোশামোদ করে কাজে বহাল করেছে।

কারণ? তা একটা আছে বইকি। সামান্য নয়। বেশ একটু গোলমেলে। বলা যায় প্রাণের দায়ে।

শ্বশুরের আমলের বুড়ী ঝিটা অশক্ত হয়ে পড়ায় দেশে চলে যাবার সময় তার বোনঝিকে আনিয়ে পুরোনো মনিবের বাড়িতে কাজে বসিয়ে তবেই গেছে। সেদিকে একবিন্দুও ত্রুটি রাখেনি সে। আহা! নতুন বৌমার কষ্ট হবে! অমলির আমার 'গতো'র আছে। কুটোটি দুখানা করতে হবে না।

কিন্তু বোনঝিকে একবার চোখে দেখেই সুচেতার দু'চোখ কপালে উঠল!

'গতো'র আছে বইকি! বেশ ভালই আছে। বরং একটু কম থাকলে সুচেতা বেঁচে যেতো।

স্বামী স্ত্রী। অল্পদিন মাত্র বিয়ে হয়েছে। দুজনেরই চমৎকার চেহারা। তবে নীরেনের চেহারাটা একটু বেশী-রকম সুশ্রী আর আকর্ষণীয়।

অমলি ওরফে অমলাবালা প্রথম দিন থেকেই দাদাবাবুকে বড্ড বেশী যত্ন-আদর করতে আরম্ভ করল। নতুন বৌ সুচেতার কাজ কমাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

কমবয়সী যুবতী বিধবা অমলা। আঁটসাঁট সুশ্রী চেহারা। সর্বদা ফিট্‌ফাট। অনবরত পান খায় আর আরশিতে মুখ দেখে, ঠোঁট উলটে চেয়ে দেখে কতটা লাল হল। লুকিয়ে লুকিয়ে সুচেতার স্নো-পাউডার মাখে। আরো একটা গুণ আছে। মাসে দু-তিনটে হিন্দী সিনেমা দেখা চাই।

সুচেতার কাজ কমে গেল অমলা আসার পর থেকেই। নীরেনের খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, সবদিকে অমলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অফিস যাবার সময় পান জল জুতোটি পর্যন্ত সুচেতার আগে আগে ও এগিয়ে দেবে। ঘরে নীরেন একলা আছে, ঝাঁট্‌দেয়া ঘর, ফের ঝাঁটা মারতে যাবে অথবা কাপড় কোঁচাতে। বিনা প্রয়োজনেই ঘুর ঘুর করবে কাছা-কাছি।

মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল দুজনেই। অবশ্য সুচেতার আরেক জ্বালা বাড়লো। বিষম জ্বালা।

ছোটবোন, বড়বোন, বৌদি, কলেজের বন্ধু এদের কাছে বেড়াতে যাওয়া অথবা সিনেমায় দল বেঁধে যাওয়া, এসব নিশ্চিন্ত মনেই স্বামীকে বাড়িতে রেখে হত এতদিন মাঝে মাঝে। অমলা আসার পর থেকে স্বামীকে একা বাড়িতে রেখে বাইরে বেরুনো বন্ধ করতে হল।

শেষপর্যন্ত সুচেতার আর সহ্য হল না। অমলাকে জবাব দিতে হল বাধ্য হয়েই।

স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছিল। নীরেনের চিৎকার কানে এল, সুচেতা, শিগ্‌গির এসো, আমার অফিসের সেই জরুরী চিঠিটা খুঁজে পাচ্ছি না।

কোনমতে দু' মগ জল মাথায় ঢেলে ঘরে ঢুকে অমলার কাণ্ড দেখে ভেজা মাথায় আগুন জ্বলে গেল সুচেতার। বিরক্ত, বিব্রত নীরেন চেয়ারে বসে আছে, আর কোথা থেকে একখানা কাগজ কুড়িয়ে এনে চেয়ারের কাছেই দাঁড়িয়ে অমলা নীরেনকে বলছে, ভাল করে চেয়ে দেখুন তো দাদাবাবু, মনে হচ্ছে এইখানাই সেই চিঠি।

মুখ, জিভ সামলানো গেল না। বেশ কঠোর ভাবেই অমলাকে উদ্দেশ করে সুচেতা বলে ফেলল, অমলা, তুমি ইংরিজী চিঠিও পড়তে পারো দেখছি! এত গুণ যখন তোমার, তখন লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করে মরছ কেন? কোন অফিসে কাজ নাও না!—

এক মাসের মাইনে আগাম দিয়ে অমলাকে বিদেয় করে আন্নাকালীকে রেখে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো সুচেতা!

ভৈরব পরদিন সকালবেলা থেকেই কাজে লাগল।

আর বাধলও সেই দিন থেকে!

ওর গলা শুনেই আন্নাকালী মুখ-ঝামটা দিল। আ মর! মিনসে কথা বলে নাতো যেন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজায়। যেমন চেহারা! তেমনি গলার আওয়াজ। আঁতুড়ে দাই মাগী কি একটু মধুও ঠেকায়নি জিভে!

সুচেতা ধমক দিল। তোর গলায় মধু ঝরছে না? তুই যে রাতদিন কানের কাছে কাঁসর বাজাচ্ছিস, তার বেলা?

কিন্তু গলা বা চেহারা যাই হোক না কেন,—কয়েকদিন যেতেই বোঝা গেল

ভৈরব লোকটা সত্য সত্যই অত্যন্ত ভাল-মানুষ। নিজের মনেই কাজকর্ম করে। চোর-ছ্যাঁচড় তো নয়ই, বরং আম্নাকালীর ভয়ে তটস্থ থাকে সদাসর্বদা। রান্না-বান্নাও জানে মন্দ না।

অবশ্য আম্নাকালী একথা একেবারেই স্বীকার করে না। সুচেতা ওর পক্ষ নিয়ে কথা বললে দশকথা উল্টে শোনায়। মিট-মিটে ডান। অনেক গুণ আছে মুখ-পোড়ার। পরে বুঝবে বৌদি, তুমি ছেলে-মানুষ। লোক চেনে আম্নাকালী—তখন বলবে।

গুণটা টের পেতে দেরি হল না বেশীদিন। বন্ধু ব্রজেনের মুখ থেকেই শুনলো দুজনে।

লোকটার একটিমাত্র দোষ আছে বটে। ভৈরব একটু বেশী মাত্রায় বিয়ে-পাগলা।

ওদের সমাজে বিয়েতে মেয়েকেই টাকা দিয়ে ঘরে আনতে হয়। না খেয়ে-পরে বেচারী মাইনের টাকাগুলো জমায়। আর ওর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে ঠকায় 'ওর দেশিয়া ভাইয়া' বা বন্ধু-বান্ধব। ওর সরল বিশ্বাস আর বোকামির জন্যে অনেকবার ও ঠকেছে। বিয়ে ঠিক করে দেব, সুন্দর মেয়ে আছে—এই সব বলে হাতিয়েছে ওর কষ্ট করে জমানো টাকাগুলি।

এখানেও মাসের শেষে ভৈরব মাইনে নিল না। জমা থাক মা, পরে একসঙ্গে নেবো।

সুচেতা তবু বলল, গোটাদুই টাকা তোমার কাছে রাখো ভৈরব! যদি দরকার হয়—

এপাশ থেকে ওপাশে ঘাড় নাড়ল। ভৈরব, না মা। ও টাকায় আমি হাত দেব না। দরকার-সরকার হয়, সে তখন দু'চার পয়সা চেয়ে নেব তোমার কাছ থেকে পান খেতে।

মনে মনে হাসলো সুচেতা, ভৈরব বিয়ে করার জন্যে টাকা জমাচ্ছ বুঝি?

লজ্জিত মুখে মাথা নীচু করে ভৈরব উত্তর দিল, আমাদের জাতে ভাল মেয়ের পণ অনেক টাকা মা!

কখন ওর পিছনে পিছনে আম্না-কালীও এসে দাঁড়িয়েছিল, খনখন করে উঠল, ওরে, ও মুখপোড়া মিন্‌সে, তোকে মেয়ে দেবে কে? ঐ তো বাঁশকাঠ তার আবার ভাল মেয়ের পিত্যেশ। বিয়ে দেবার নামে পাঁচ ভূতে তোর টাকাগুলো খাবে, এটুকু জ্ঞান-গম্যি যদি তোর ঘটে থাকে! ঢের ঢের লোক দেখিচি বাবু, তোর মত বোকার বেহদ্দ বিয়ে-পাগলা আমি জম্মে দেখিনি।

কাঁচুমাচু মুখে ভৈরব সুচেতাকে সাক্ষী মানলো। দেখলে মা দেখলে, ঐ পেত্নীটা যখন-তখন আমাকে যা-মুখে আসে তাই বলে—শাঁকচুন্নির মুখ দেখ না!

তবে রে হাড়-হাবাতে মিন্‌সে! কোমরে আঁচল জড়িয়ে গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে কোমরে হাত রেখে আম্না কাঁসির বাজাল, যত বড় মুখ নয় তত বড়

কথা! আমি শাঁকচুন্নি? আমি পেত্নী? বলি ওরে ও গো-ভূত, তবে তুই কি? ঘাটের মড়ার আবার লম্বা লম্বা কথা—

আঃ আম্না, তোর জ্বালায় কি বাড়ি ছেড়ে পালাবো? বাবু রয়েছে না ও ঘরে? সুচেতা ধমকাল আম্নাকে। ওর মাইনের টাকা জমিয়ে ও যা খুশি তাই করবে, তোর তাতে কি শুনি? তোর বর জোটে নি বলে ওরও বৌ জুটবে না?

আমার জোটেনি! গজগজ করতে লাগল আম্নাকালী। এত বড় কথা তুমি বললে? ড্যাকরা মিনসে সন্ন্যেসী হয়ে গেল তাই আজ আমার এমন দশা। শিবু দোকানী বলেনি হাজার বার? খোশামোদ করেনি নিমে রক্ষিত? এই আম্নাকে বিয়ে করবার জন্যে? আমি তেমন মেয়ে নই, তেমন পিরবিত্তি যেন না হয়। এ শরীলে—

সুচেতা রাগ করে বললে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজগজ করবি না কাজ করবি?

শিবু দোকানী আর নিমে রক্ষিতের ঘরে গেছে তোকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে। যা তোর মুখ বাবাঃ!

ওদের ঝগড়া শুনে মাঝে মাঝে এদেরও ঝগড়া বেধে যায়। রেগে-মেগে এক এক সময় নীরেন বলে, তোমার চামুণ্ডাকে তাড়াও এবার। বেচারা ভৈরবের প্রাণ গেল ওর মুখের চোটে। ওর কাঁসির শুনলে আমারই বাড়ি ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে হয়।

উত্তরে সুচেতা বলে, তোমার ঘন্টেশ্বর ভৈরবকে তাড়াও। যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে আওয়াজ করছে। বাবাঃ কী লম্বা! সেদিন অন্ধকারে ওকে দেখে আরেকটু হলে মুর্চ্ছা যাই আর কি।

তোমার চামুণ্ডার মত মুখ তা'বলে ওর নেই। দশকথা শোনালে তবেই একটা কথা বলে। কী কথাবার্তা! শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়, যেমন রূপ তেমনি গুণ।

কিন্তু বস্তিবাসিনী ছোটলোক মুর্খ আম্নাকালীর মুখের চেয়েও আধুনিকা সুশিক্ষিতা সুচেতার মুখ যে আরো এক কাঠি সরেশ, তা বুঝি নীরেন জানে না?

যাও! ডেকে নিয়ে এসো তোমার আদর সোহাগের অমলিকে। আম্নাকে পছন্দ হবে কেন? ওতো আর—

ভীত পরাজিত নীরেন সভয়ে তাড়াতাড়ি সুচেতার মুখ বন্ধ করে। থাক থাক। তোমার চামুণ্ডা জন্ম জন্ম থাক। তুমি আর মুখ খুলো না।

সুতরাং ভৈরব আর চামুণ্ডা, ঘণ্টা আর কাঁসির, ঝগড়াঝাঁটি করেও কি জানি কেন টি'কে রইল দুজনেই, একই বাড়িতে।

মাস ছয়েক বাদেই ভৈরব বায়না নিল। দেশে যাবে ও। বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে ওর। চিঠি এসেছে।

শুধু নীরেন নয়। লোকটার শান্ত-শিষ্ট স্বভাবের জন্যে, কাজকর্মের জন্যে সুচেতারও মায়া পড়ে গিয়েছিল। ভাল করে বুঝিয়ে বলল, বিয়ের নামে কবার তো টাকাগুলো মেরে দিয়েছে তোমার সব লোকেরা। এবার যেন আগের মত বোকামি কোরো না ভৈরব।

আনন্দ উজ্জ্বল মুখে এক গাল হাসল ভৈরব। না, মা। মামা-মামী এবার ভালো মেয়ে ঠিক করেছে। এবার বিয়ে হবেই।

তা'বলে বেশীদিন থেক না বাপু। তোমার মায়ের কষ্ট হবে। নীরেন মনে করিয়ে দিল।

পুরো জিভটা বার করে দাঁতে কাটল ভৈরব। না বাবু। এই যাবো, আর বিয়েটা করেই চলে আসব।

বাসন মাজতে মাজতে ভৈরবের মারফত সুখবরটা পেয়ে রাগে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠল আন্নাকালী। কালে কালে কত হল, পুলি পিঠের ন্যাজ গজাল। ঘাটের মড়াকে বিয়ে করার জন্যে ওর দেশের ভাল মেয়েরা 'নাইন' দিয়ে দাঁইড়ে আছে! ওরে ও বুদ্ধির ভাঁড়, বলি তোর ভাঙ্গা আরশিতে কি নিজের রূপের ছিরি একেবারে দেখতে পাস না? একটা চোখ ছোট বলে কি তুই দুটো চোখের মাথাই খেইচিস?

তোর ট্যারা চোখ, তুই চোখের মাথা খা। আমি কেন দেখতে পাব না শুনি? দে দে ডাল-ঢালা কাঁসিটা তাড়াতাড়ি করে মেজে দে, গজরগজর না করে—ভৈরব খুন্তি হাতে কাছে এসে দাঁড়ালো।

জ্বলন্ত আগুনে ঘি পড়ল! কী! আমি ট্যারা! আন্না বাসন মাজা ছেড়ে গলা ছাড়ল। বৌদি, ও বৌদি, এই দণ্ডে আমার মাইনে চুকিয়ে দিয়ে নোক দেখ। আমি আর এ বাড়ি কাজ করবনি বাপু। যেখানে মানীর মান 'সমভোম' থাকে না, তেমন বাড়িতে আন্না কাজ করে না। গতোর খাটিয়ে খাবো, যেখানে যাবো আদর করে নেবে নোকে, 'মুকের কথা'র ধার ধারব কেন শুনি?

আন্নার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে ভৈরব আগেই রান্না ঘরে পালিয়েছিল, তরকারি নাড়তে নাড়তে সেখান থেকে ফোড়ন কাটল, মা বাবু ভাল, তাই তোর মত ঝগড়াটিকে রেখেছে, অন্য বাড়ি হলে কবে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিত।

ঝেঁটিয়ে বিদেয় কে কাকে করে আয় একবার দেখি, ছাই-মাখা হাতেই আন্না মট্‌মট্‌ করে আঙ্গুল মটকাল। ওর চিৎকারে আলসের ওপর এঁটো-কাঁটার লোভে বসে-থাকা কাক ক'টা ভয়ে উড়ে পালাল।

নজ্জা করে না, কতবার তো বিয়ে করতে গেছিস, একটা বৌও তো জুটল না এ পর্যন্ত। এই আমার মুখের বাক্যি শুনে রাখ, তোর কপালে বৌ জোটার আগেই তুই নিমতলার ঘাটে যাবি যাবি যাবি। এই এক দুই তিন—

মট্‌ মট্‌ করে বাদবাকী আঙ্গুলগুলোও মটকাল আন্নাকালী একসঙ্গে।

হাতা খুন্তি ফেলে দোতলায় ছুটল ভৈরব সুচেতার কাছে নালিশ করতে।

আন্নাকালীর 'মুখের বাক্যি'র শাপেই হোক অথবা ছাই-মাখা আঙ্গুলে মটকানোর গুণেই হোক দিন কতক বাদেই ফিরে এল ভৈরব বিয়ে না করেই। শোনা গেল মেয়ের তরফ থেকেই নাকি পছন্দ করেনি ভৈরবকে।

আনন্দে আন্নাকালি ডগমগ। একসঙ্গে গোটা দুই পান মুখে ঠেসে, ভরি খানেক দোক্তা ফেলে দিয়ে কাপড় কোঁচাতে কোঁচাতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে সুচেতাকে, ভৈরবকে শুনিয়ে শুনিয়ে আরম্ভ করল, কেমন বলিনি? গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়। হুঁঃ বিয়ে হবে! সোন্দর মেয়ে। তেলাপোকার আবার পাখি হবার সাধ। মরণ আর কি!

মাস দুই ভৈরব বিমর্ষ মন-মরা হয়ে কাজকর্ম করল। তারপর কিছুদিন না যেতেই মুখে আবার হাসি ফুটল। মাথার চুলে টেরি বাগাতে শুরু করল। ফর্সা ধুতি পরে দুপুরবেলা বেরুনো আরম্ভ করল।

আন্নাকালী কদিন ভুরু-কুঁচকে ওকে নজর করল। বাঁকা কথায় ঠারে ঠারে শোনালোও বিস্তর। ভৈরব কিন্তু কোন উত্তর দিল না। গ্রাহ্যই করল না আন্নাকালীর মুখের বচন।

একদিন সমস্ত দুপুর পাড়া বেড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আন্নাকালী সোজা সুচেতার ঘরে ঢুকল।

ওগো বৌদি গো, সব্বোনাশ হয়েছে!

বালিশে চুল ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে সুচেতা একজন নামকরা আধুনিক সাহিত্যিকের নভেল পড়ছিল। তার নায়ক নায়িকারও তখন 'সব্বোনাশ' হবার মত নিদারুণ অবস্থা। কোটিপতির একমাত্র মা-মরা পরমাসুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে রাত্রির অন্ধকারে বেকার কপর্দকহীন নায়কের কাছে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রেম নিবেদন করছে। প্রাণ যায় যায়—তবু তাদের ঐ শোচনীয় অবস্থায় ফেলে রেখে ধড়মড় করে উঠে বসল সুচেতা। কী হয়েছে? কার সর্বনাশ হল?

ঐ তোমার মিটমিটে ডান ভৈরব মুখপোড়া কি সব্বোনাশ বাধিয়েছে। এতকাল কানে শুনেছিলাম, আজ স্বচক্ষে দেখে এলাম। গলায় দড়ি!

কেন? কি করেছে ও?

সুবি—সুবি। হিরু গয়লার সেই নষ্ট মেয়েটা গো! দু দুটো সোয়ামীকে তাইড়ে পাড়া ঢলিয়ে বেড়ায়। তার সঙ্গে বস্তির কলে দাঁইড়ে দাঁইড়ে সে কি হাসাহাসি। ঢং। ঢলাঢলি। আমি তো দেখে নজ্জায় মরি মা, নজ্জায় মরি!

এই কথা! সরোষে আবার ধপ করে শুয়ে পড়ে চোখের ওপর বইখানা তুলে ধরল সুচেতা। এমন করে বললি আমি ভাবলাম চুরি ডাকাতি না কি কোথায় কার সঙ্গে মারামারি করে এসেছে! তা তুই কি ওর গার্জেন নাকি? ও যদি সুবির সঙ্গে হাসি-গল্প করে, তোর গায়ে এত জ্বালা ধরে কেন বুঝিনে বাপু। এদিকে একদণ্ড তো ওর সঙ্গে তোর বনে না। তুইও একটা গল্প করার লোক জুটিয়ে নে দেখি, তোর মুখের হাত থেকে আমরাও বাঁচি।

আমায় তেমন মেয়ে পেয়েছ কিনা। কথায় বলে, পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই। আন্না তাই। ও সুবি ঢলানীকে সবাই চেনে। কত নোকের মাথা খেয়েছে। দ্যাখো তুমি ও মুখপোড়ার কি দুর্দশা হয়—

হয় হবে ওর হবে। তোর কি? বিরক্ত চিত্তে সুচেতা পাশ ফিরে শুলে। অসময়ে রসভঙ্গ।

আর বই পড়তে পড়তেই কানে গেল ভৈরবের ওপর আন্নাকালীর তর্জন গর্জন।

লোকটার পাগলামো দেখলেও এক এক সময় কষ্ট হয়।

একটা পয়সা প্রাণ গেলে খরচ করে না। দেশে পাঠায় না। জল-খাবার কি বিড়ির জন্যে সুচেতার কাছ থেকে মাঝে মাঝে যে দু'চার আনা নেয়, সেটা পর্যন্ত জমিয়ে রাখে।

এবারে এসে অবধি মাইনের টাকাগুলো নিজের বাক্সেই রাখছিল ভৈরব। হঠাৎ একদিন সবজান্তা আন্নার মুখ থেকেই শুনতে পেল সুচেতা—ও নাকি ঐ টাকায় রূপোর গয়না গড়াচ্ছে। হাঁসুলী খাড়ু নাকছবি কানের ফুল। সুচেতার কাছ থেকে ভাল একখানা শাড়ি ব্লাউজও চেয়ে নিয়ে যত্ন করে রেখে দিয়েছে ঐ বাক্সে মধ্যেই।

যাবে যাবে। 'সর্বোস্ব' যাবে ঐ ঢলানী মাগীর পায়ে। বিয়ে-পাগলা

মিনসেকে নাকি ছুঁড়ি বলেছে শাড়ি গয়না আর টাকা পেলে তবে ওকে বিয়ে করবে। হাড় হতভাগা গোমুখ্যু সেই কথা বিশ্বাস করে ঐ সব গড়াচ্ছে। এ ভাবে কত লোকের টাকা মেরেছে ঐ সুবি, পই পই করে বললাম মুখ-পোড়াকে, তা যদি কানে তোলে। আবার মেজাজ কি? চোখরাঙ্গায় পর্যন্ত আমাকে।

সুচেতা বেশ ঠান্ডা গলায় বলে, আচ্ছা আন্না, তুই তো ওকে দুচক্ষে দেখতে পারিস না। ওর গয়না সুবি যদি নেয়, তোর অত মাথাব্যথা কেন?

ও যে খারাপ মেয়েমানুষ বৌদি। পাড়ায় কেনা চেনে ওকে।

তা ভৈরবের কপালে আর ভাল মেয়ে জুটল কই? খারাপ খারাপই সই। কাঁচ খোকা তো আর নয়, যে বুঝতে পারে না কিছু। তোর কি?

আমার, আমার আর কি বৌদি? লোকের মন্দ দেখতে পারি না তাই বকে মরি। তাতে মিনসের কি রাগ। বলে কি না আমার নাকি ভাতার জোটে না, আর সুবির মত সোন্দর মেয়ে ওকে বিয়ে করবে বলে হিংসেয় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এই তোমার সামনে নাকে খত দিচ্ছি, যদি ওর সংগে আর একটি কথা কই তো কেলে কুকুর বলে ডেকো আমাকে। এত বড় কথা! তুইও বাবুর বাড়ি কাজ করিস, আমিও বাবুর বাড়ি কাজ করি, তুই আমায় বলবার কে রে? বলতে হয় মনিব দু'কথার জায়গায় দশ কথা কইবে, রা'টি কাড়ব না—

হতাশ হয়ে সুচেতা বললে, আচ্ছা আন্না তোর কি জিভে ব্যথাও হয় না? থামতো দেখি।

এই থামছি বৌদি। কী ঘেন্না কী ঘেন্না! তোর হিংসে করবে আন্না? তেমন মায়ের পেটে জন্মাইনি। যা ইচ্ছে কর, জলে ডোব, আগুনে ঝাঁপ দে, আর কথাটি কইব না।

লাল গোলাপফুল আঁকা রং-চং-এ টিনের সুটকেশটার দুটো চাবি করিয়ে-ছিল ভৈরব চাবিওলা ডেকে; ওর সমস্ত সম্পত্তি ওতেই ছিল। হঠাৎ একটা চাবি পাওয়া গেল না।

অনেক খুঁজে-পেতে না পেয়ে ভৈরব কাঁদো কাঁদো মুখে নালিশ করল সুচেতাকে। মা এ আন্নার কাজ। ঐ চাবি সরিয়েছে। যখন-তখন আমি না থাকলেই ও নীচের ঘরে যায়।

না বাপু অমন কথা বোলো না। ভ্রূকুঞ্চিত করে মাথা নাড়ল সুচেতা। ওর যত দোষ আর যত মুখই থাক, এমন স্বভাব ওর নেই। এতদিন রয়েছে, একটা কুটো এদিক ওদিক হয়নি কখনো। ওকে যেন জিজ্ঞাসা করতে যেও না। শুনতে পেলে তোমার রক্ষা থাকবে না।

সভয়ে এদিক ওদিক তাকাল ভৈরব। না মা। জিনিসপত্র সব ঠিক আছে। দেখি খুঁজে আরেকবার।

হ্যাঁ তাই বরং দেখ। আন্না চাবি নিয়ে কি করবে?

কি একটা কথা বলতে গিয়েও ভৈরব চেপে গেল। নিঃশব্দে নীচে চলে গেল।

সত্যসত্যই আন্নাকালী কদিন একে-বারে চুপচাপ। বাড়ির সবাই আশ্চর্য।

নীরেন ঠাট্টা করে বলল, কি গো, তোমার চামুন্ডার হল কি?

সুচেতাও হাসে। হবে আবার কি? ভৈরব প্রেমে পড়েছে বলে ওর গায়েও তার হাওয়া লেগেছে বোধ হয়।

ওর গায়ে প্রেমের বাতাস লাগাবে, এমন পুরুষ পৃথিবীতে জন্মেছে নাকি?

কটা চাও? নেহাত যা মুখ, ভয়ে ওর ধারে-কাছে এগোয় না কেউ। হাজার হোক মেয়েমানুষ, বয়সও বেশী নয়। একটু ছিরি-ছাঁদ করে থাকলে খারাপ দেখায় না। তা তো করবে না। থাকবে একেবারে ঝগড়াটে রণচন্ডীর মত।

মাসকাবারে মাইনেটা পেয়েই ভৈরব হাতজোড় করল। মা দুটো দিন ছুটি

দিতে হবে। শুক্কুর আর শনি। সোমবার ভোরে এসে কাজে লাগব।

বিস্মিত সুচেতা বিরক্ত হল। এই তো সেদিন দেশ থেকে এলে। আবার ছুটি কিসের?

দেশোয়ালী ভাই থাকে বদরপুরে। অনেক করে যেতে বলেছে সেখানে মা—

ওর কাঁচুমচু মুখ দেখে অগত্যা সুচেতা রাজী হল। আচ্ছা এবারকার মত যাচ্ছ যাও। বার বার কিন্তু এরকমভাবে গেলে চলবে না।

আন্নাকালী শুনেই দপ করে জ্বলে উঠল। আমি সাফ কথা বলে দিচ্ছি, নিজের কাজ ছাড়া অন্য লোকের কুটোটি নেড়ে দুখানা করতে পারব না! আমার 'গতোর' অত সস্তা নয়।

গোটা একখানা সাবান ঘষে স্নান করে ধোপদস্ত ধুতি পরে দোতলায় সুচেতাকে প্রণাম করতে এলো ভৈরব। তারপর নীচে নেমে সুটকেশটা হাতে নিয়ে প্রফুল্ল মুখে বেরিয়ে গেল।

সুচেতা আন্নাকালীর হাঁড়িমুখ দেখে ঠাট্টা করে বলল, ভৈরবের চেহারার এত নিন্দে করিস আন্না, সেজেগুজে কিন্তু ওকে বেশ দেখাচ্ছিল। তুই একটু পরিষ্কার-ঝরিষ্কার হয়ে থাকতে পারিস না?

ঝিবিত্তি করতে এসেছি বৌদি, নাগরের মন ভোলাতে তো নয়—ঝংকার দিয়ে উঠল আন্নাকালী। পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে। দেখোনা তোমার কার্তিকের কি দুর্দশা হয়। জানতে আর বাকি নেই আমার। সবি জানা আছে চিতে. কাঁথাখানি মোর কেড়ে নিয়েছে পোষ মাসের শীতে। ওর হাড়-মাস আলাদা হবে—

আন্নার কথায় কান না দিয়ে সুচেতা নিজের কাজে মন দিল।

এবারও আন্নার কথা হাতেনাতে ফলল। রাত গোটা দশেকের সময় ভৈরব কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। পাগলের মত অবস্থা। ওর সুটকেশ চুরি গেছে। টাকা পয়সা গয়নাগাটি সুচেতার-দেওয়া শাড়ি ব্লাউজ—সর্বস্ব গেছে।

নীরেন আর সুচেতা ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে এলো। আহা! কি করে গেল? কোথায়? কেমন করে?

ভৈরবকে আর মুখ খুলতে হল না। কোনমতে কদিন মুখ বন্ধ করে থাকা আন্নাকালী তুবড়ির মত ফেটে পড়ল। কোমরে একহাত, অন্য হাতে রান্নাঘর-ধোবার ঝাঁটা। নেচেকুঁদে পাক খেয়ে, চোখ-মুখ ঘুরিয়ে খনখনে গলায় যা বলল তার মর্মার্থ ভৈরব দুদিনের নোক। আর এই বস্তিতে পঁচিশ বছর কাটাচ্ছে আন্নাকালী। সুবি ডাইনি ছেলে-খাবার যম। তখন পই-পই করে বারণ করেছিল ভৈরবকে ওর পাল্লায় পড়িসনি। বেশ হয়েছে! কথা না শোনার ফল হাতে হাতে ফলেছে। সুটকেশ হারিয়েছে না কচু। সুবি ওকে বিয়ে করার নাম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সুটকেশ-ভর্তি কাপড়, টাকা গয়না সবসুদ্ধ হাতিয়ে সেই গুন্ডার মত ওর পিরিতের নোকটার সঙ্গেই পালিয়েছে। সত্যি কিনা নিজেই বলুক ও—

আন্নার পিলে-চমকানো ধমক খেয়ে ভৈরব ফোঁপাতে ফোঁপাতে চুরি না করেও চুরির দায়ে ধরা পড়ার মত কবুল করল. আন্নার কথা সব সত্যি। সুবির সঙ্গে ঐ লোকটাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, ওর ধর্মভাই বলে। সুবির সঙ্গে বিয়ে ওই দেবে বলেছিল। সেইজন্যেই গয়না-গাটি শাড়ি সব নিয়ে যাচ্ছিল সুটকেশ ভরে। স্টেশনে গিয়ে গাড়ি আসবার আগে কি একটা সিদ্ধির শরবত খেতে দেয় ওকে সুবি। ঘুম ভাঙলে চেয়ে দেখে সব ফাঁকা। সুবি, সুটকেশ, সেই লোকটা, গাড়ি—সব উধাও।

কয়েকদিনের বন্ধ থাকা মুখ আজ ভাল করে খুললো আন্নাকালী।

ফিরলি কোন মুখে রে ঘাটের মড়া? গলায় দড়ি জুটল না একগাছটা? যখন-তখন ছুঁড়িটার সঙ্গে গুজগুজ, ফুস-ফুস। যা কন্ঠিবদল করে আয়—

সুচেতা ধমক দিল, কাটা ঘায়ে তুই আর নুনের ছিটে দিসনি আন্না। এত রাতে তোর গলাবাজি শুনে পাড়ার লোক ছুটে আসবে। যা দেখি, হেঁসেলে ভাত কি রুটি কি আছে ওকে দুটি খেতে দে। পয়সাকড়ি তো গেলই। খাওয়াও হয়নি বেচারীর।

খাওয়া হয়নি। ভাত বেড়ে দেব এক থালা? আহা মরে যাই মরে যাই! বিয়ের ভোজ খেয়েও এখনো পেটে ক্ষিদে আছে নাকি রে মুখপোড়া? ধন্যি বটে তুই। নাজ-নজ্জার মাথাটাও খেয়েছিস একে-বারে? আমি হলে এমুখ আর দেখাতাম না। তুই বলে তাই—

খবরের কাগজটা পড়া হয়নি সকালে। দুপুরবেলা এপাশ ওপাশ করে সুচেতা ডাকল, আন্না ও আন্না, নীচের ঘর থেকে কাগজটা দিয়ে যা না একবার।

সাড়া নেই। কোথায় কি কাজে ব্যস্ত কে জানে?

অগত্যা নিজেকেই নামতে হল নীচে।

বাইরের ঘরের দরজা খোলা। দুপুর বেলা ভৈরব এ ঘরে শোয়। পারতপক্ষে আন্না এ ঘরে ঢোকে না কখনও।

ও ঘরে আন্নাকালীর গলা শুনে আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়াল সুচেতা।

দরজার দিকে পিছন ফিরে দুজনে বসে আছে। মাঝখানে চুরি-যাওয়া ভৈরবের সেই রুপোর গয়না, শাড়ি ব্লাউজ।

গদ গদ কন্ঠে ঘন্টা বাজলো, আন্না-কালী, আর জন্মে তুই আমার পরিবার ছিলি। ভাগ্যিস তুই চাবিটা চুরি করে সব সরিয়েছিলি নইলে 'সব্বোস্ব' ঐ ডাইনির হাতে যেত।

কাঁসর খন খন করে উঠল, তুই যখন ওপরে বৌদির সঙ্গে দেখা করতে গেলি, তখুনি আমি সব সরিয়ে ছেঁড়া কাগজ আর উনুনের এক ঠোঙ্গা পোড়া ছাই ওতে ভরে দিলাম। এবার দ্যাখ, সব ঠিক আছে কিনা, নইলে পরে তো আবার আমাকেই চোর ধরবি।

ঘণ্টার শব্দ আরো গদগদ হল। আমি ওসব কিচ্ছু নেব না। ও তুই রক্ষে করেছিস, সব তোকে দিলাম।

আন্না মুখ ঝামটা দিল, আ খেলেযা! তোর জিনিস, আমি কোন সুবাদে নিতে গেলাম রে মুখপোড়া? আমাকে কি তেমন মেয়ে পেইচিস?

গরগর করে আন্না উঠে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই ভৈরব খপকরে ওর হাতখানা চেপে ধরল। আহা, রাগ করিস কেন আন্না, আমার না হয় ভূতের মত চেহারা। আমার মাথা খাস, একবার গয়নাগুলো তুই পরে দেখ, খু-উব সুন্দর দেখাবে। আ-আ আমি তোকে বিয়ে করব আন্না—

মরণ আর কি বিয়ে-পাগলা মিনসের! ও মা গো! আস্পদ্দার কথা শোন মুখপোড়ার,—

এবার কিন্তু আন্নাকালীর গলায় কাঁসরের খনখনে আওয়াজটা তেমন জোরালো শোনাল না। সিঁড়ির ধাপের কাছে দাঁড়িয়ে বরং সুচেতার মনে হল, আন্নার গলায় এমন মোলায়েম স্বর, ও কখনো শোনেনি এর আগে।

বেশ মিষ্টি। বেশ নরম।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চাপতে দোতলায় শোবারঘরে ছুটলো সুচেতা নিঃশব্দে। কাগজখানা না নিয়েই।

কতক্ষণে নীরেন অফিস থেকে বাড়ি ফিরবে?

॥ বক্রেশ্বর ও তারাপীঠ ॥

বীরভূমের সব জায়গায় প্রাচীনত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। বহুদিনের বীরভূম। হিন্দু সভ্যতা থেকে হাল আমলের সংস্কৃতির চিহ্ন সযত্নে সাজান। প্রাচীন কালে রাজধানী ছিল রাজনগর। রাজনগরে হিন্দু রাজাদের কোন নিদর্শন আজ নেই। আছে পাঠান ফৌজদারদের গড়া প্রাসাদের ভগ্নাংশ, বিক্ষিপ্ত মসজিদ। রাজচিহ্ন না থাকলেও আছে অজস্র দেব-দেউল। ইতিহাস তার প্রাচীন। লৌকিক অলৌকিক কথা-কাহিনী মিলিয়ে সেই সব প্রাচীন মন্দিরগুলো এখনো রহস্যময়। তেমনি একটা মন্দির বক্রেশ্বরের বক্রেশ্বরনাথ।

প্রকৃতির নিভৃত অন্তরালে ছিল একদিন এই স্থান। পুরাণে তাব প্রমাণ আছে। সেখানে বক্রেশ্বর গুহ্যতীর্থ বা গুহ্যকাশী। পূর্বদিকে বক্রেশ্বর নদ। দক্ষিণে পাপহারা নদী। বহু সংখ্যক মন্দিরে বেষ্টিত বক্রেশ্বরনাথ অতি প্রাচীন সাধনার সাক্ষী। পুরাণে বলা হয়েছে :

গৌড় দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরং
সুসংগতং
যন্নাম স্মরন্যোপাপি মুচ্যতে
সর্বপাতকাং
এ কয়া পাপহারিণ্যা জাহ্ব্যাচ
বিশেষতঃ
বক্রেশ্বরেণ ক্ষেত্রেন শূন্যো গৌড়
প্রকীর্তিতঃ।

ক্ষেত্রের উৎপত্তি নিয়ে বহু কথা আছে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। অযোনি-সম্ভবা লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন হয়েছিল বৈকুণ্ঠে। বিচিত্র সেই সভা। এসেছিলেন মুনি অপ্সরা কিন্নর। অভ্যর্থনার ভার পড়েছিল দেবরাজ ইন্দ্রের ওপর।

একে একে সবাই আসছেন। দেবরাজ তাদের সাদর সম্মান জানাচ্ছেন। কিন্তু নিরাপদ কাজ ছিল না দেবেন্দ্রের। সভায় একসঙ্গে এলেন লোমশ ও সুব্রত মুনি। দেবরাজ আগে অভ্যর্থনা জানালেন লোমশ মুনিকে। আহত হলেন সুব্রত। মনে হল দেবরাজ তাঁকে অপমান করেছেন। ক্রোধ সঞ্চারিত হল মনে। ইন্দ্রকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন সুব্রত। পরক্ষণেই চৈতন্য হল সুব্রতের। নিরস্ত হলেন। কিন্তু ক্রোধ প্রকাশিত না হলে কি হবে ক্রোধ সঞ্চারিত হয়েছে মনে। ক্রোধের আগুনে সুব্রত মুনির দেহ আট অংশে বেঁকে গেল। সেই থেকে তিনি অষ্টবক্র মুনি নামে বিখ্যাত।

লজ্জায় মর্মাহত অষ্টবক্রমুনি তারপর আর আশ্রমে ফিরে যাননি। নানা তীর্থ পর্যটন করে বেড়ান। কিন্তু মনে তৃপ্তি নেই। অতৃপ্ত ও অশান্ত মুনি হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লেন বর্ধমানের ঝাঁঝরা গ্রামে। সেখানেই থাকেন, সাধনা করেন। কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না। ছাড়লেন ঝাঁঝরা গ্রাম। আবার পথ। হাঁটতে হাঁটতে এবার এলেন বক্রেশ্বরে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ যা দিতে পারেনি অষ্টবক্রমুনিকে তাই দিল বক্রেশ্বর।। শান্তি ফিরে পেলেন। প্রকৃতির নিবিড়তায় তিনি মুগ্ধ। বনরাজি তাকে শিক্ষা দিল ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। কুসুমিত পুষ্প তাকে দিল পরসেবার দীক্ষা। গুল্মলতার কাছ থেকে তিনি পেলেন ব্রহ্মে নির্ভরতা। স্থির করলেন অষ্টবক্র এই মহাশিক্ষা কেন্দ্র আর কিছুতেই ত্যাগ করবেন না। বহু দীর্ঘ সাধনার পর তুষ্ট হলেন পার্বতীনাথ। বর দিলেন, "আজ থেকে তোমার পূজার পর আমার অর্চনা হবে। তোমার নামেই হবে আমার স্থিতি। এখন থেকে এই ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হবে।" "ইদানীং সিদ্ধপীঠস্থ লোকে খ্যাতো ভবিষ্যতি।"

অন্য কাহিনীও আছে। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা সহ্য করতে পারেননি সতী। তিনি দেহত্যাগ করলেন। কিন্তু মহাদেব সতীর দেহ কাঁধে করে ত্রিভুবন পরিক্রমা করতে আরম্ভ করলেন। সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম। দেবগণ ভীত। ত্রাণ করবেন নারায়ণ। সুদর্শন চক্রে ছিন্ন করলেন সতীদেহ। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল দেহের অংশ। বক্রেশ্বরে এসে পড়েছিল দেবীর ভ্রূমধ্যস্থ স্থান। সেই সেই থেকে বক্রেশ্বর মহাপীঠ। এখানে মহিষমর্দিনী মহাদেব ভৈরব বক্রেশ্বর পূজিত।

বক্রেশ্বরে মনঃ পাতু দেবী
মহিষমর্দিনী
ভৈরবো বক্রনাথস্ত নদী তত্র
পাপহরা।

আর আছে উষ্ণ প্রস্রবণ। তাকে বলে কুণ্ড। আটটি কুণ্ড। ক্ষারকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, জীবকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা এবং বৈতরণী। প্রত্যেকটি কুণ্ডের স্বতন্ত্র ইতিহাস, বিশেষ মাহাত্ম্য। উষ্ণ প্রস্রবণের ধারেই কিন্তু শীতল জলের শ্বেতগঙ্গা।

স্থান মাহাত্ম্য কিম্বা পুরাণের কথা দিয়েও বলা যায় যে, বক্রেশ্বরের মন্দির প্রাচীন। মন্দিরের ফলক থেকে জানা গিয়েছে যে, বীরভূম অধিপতি রাজা আসাদ খাঁর মন্ত্রী দর্পনারায়ণ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দির। হলার্মা এবং সরাব নামে দুই ভাই এই মন্দিরে মিস্ত্রির কাজ করেছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু গিয়েছিলেন বক্রেশ্বরে। সেখানে মন্দিরের গায়ে এক প্রস্তর ফলক থেকে "নরসিংহ" শব্দটি উদ্ধার করেন। আর পেয়েছিলেন হরগৌরীর মূর্তি। তাঁর মতে এই মূর্তির সঙ্গে উড়িষ্যার প্রাচীন রীতির সাদৃশ্য প্রচুর। গৌরীর খোঁপা ও গয়না উড়িষ্যা প্রদেশের। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রাজনগরের রাজা ছিলেন অনঙ্গভীম। এরা গাঙ্গেয় বংশের। অনঙ্গভীমের ছেলে রাজা নরসিংহ। ইনি

[illegible] অধিকার করেন। সেই সময় তিনি বক্রেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে থাকতে পারেন। সেই জন্য বক্রেশ্বরের মন্দিরের স্থাপত্য উড়িষ্যা-রীতির। তাই মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিয়ে মতভেদ না থাকলেও স্থাপয়িতার নাম নিয়ে তর্কের অবসান হয়নি।

বীরভূমের শক্তি-সাধনার আর একটি কেন্দ্র তারাপীঠ। তারা রহস্যে স্থান নির্ণয় করা হয়েছে এই বলে :

বক্রেশ্বরস্য ঐশান্যাং বৈদ্যনাথস্য
পূর্বতঃ
তারাপুরমিতি খ্যাতং নগরী ভূতি
দুর্লভং।

কিন্তু তারাপুরের পীঠস্থান তারাপুরে নয়। মল্লারপুর স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল উত্তরপূবে গেলে পাওয়া যাবে চণ্ডীপুর গ্রাম। এখানে আছে তারাদেবীর মন্দির। প্রবাদে আছে এই তারাপুরে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মহামুনি বশিষ্ট। কিন্তু এই বশিষ্ট নিয়ে শাস্ত্রের কলহ আছে। তবু তন্ত্রের উক্তি এই :

দ্বারিকায়াং পূর্বতীরে শাল্মলী
বৃক্ষ যদ ভবেৎ
তত্র যন্ত্রেন গন্তব্যং যত্র তারা
শিলাময়ী

দ্বারিকা নদীর পূব পাড়ে ছিল বিরাট শাল্মলী গাছ। এই গাছের তলায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বশিষ্ট। সেই গাছ এখন আর নেই। বহুকাল পরে এক বণিক এসে সেখানে পেয়েছিলেন দেবী মূর্তি।

দ্বারিকা [illegible] সওদাগরের বড় বড় জাহাজ পাল তুলে যাতায়াত করত। রত্নগড়ে তখন ব্যবসায়ীদের বাস। যাত্রা করার আগে তারা গঙ্গাকে পুজো দিত। জয়দত্ত ছিল রত্নগড়ের সওদাগর। সাগর থেকে বাণিজ্য করে ঘরে ফিরছিল জয়দত্ত। দুপুরে স্নান খাওয়ার জন্য বাঁধা হলো নৌকো তারাপুরে। সওদাগরের সঙ্গে ছিল তার ছেলে। সুস্থ সবল ছেলে। কিন্তু হঠাৎ অসুখে মারা গেল। শোকে মুসড়ে পড়েছিল জয়দত্ত। আত্মহত্যা করতে জলে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল সওদাগর। এমন সময় লোকের মুখে শোনা গেল তারাপুরে এক অদ্ভুত কুণ্ড আছে। তার জল স্পর্শ করলে মরা মানুষ জ্যান্ত হয় অবশ্য যদি সে মানুষ পুণ্যবান হয়। সওদাগর গিয়েছিল গ্রামে। প্রাণ ফিরে পেল তার ছেলে। রাতে স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিল জয়দত্ত, "এই পুণ্যক্ষেত্র তন্ত্র-প্রসিদ্ধ তারাপীঠ। শাল্মলী গাছের নিকটে ব্রহ্মময়ী শিলামূর্তি আছে। তুমি তাকে উদ্ধার করে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। তোমাকেই করতে হবে তারাদেবী আর চন্দ্রচূড় মহাদেবের পুজোর আয়োজন।" আদেশ পেয়ে সওদাগর জয়দত্ত প্রতিষ্ঠা করেছিল মন্দির। পীঠের প্রচার হয়েছিল তারপর থেকে। জয়দত্ত যেখানে তারামূর্তি পান সেই জায়গার নাম কৈওরের নালা।

কিন্তু বর্তমান মন্দির জয়দত্তের নয়। সে মন্দির ভেঙে গেছে জলপ্লাবনে। তারপর ঢেকার রাজা রামজীবন বহু অর্থ ব্যয় করে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সে প্রায় আড়াইশ বছর আগে। তাই বলিদান প্রথায় অগ্রাধিকার রামজীবনের বংশধর এড়ালের রায়চৌধুরীদের। তারপর পর্যায়ক্রমে বলিদান হতো জেমোর, বাঘডাঙার রাজাদের, রাজনগরের রাজাদের, এবং রাণীভবানীর। এই হল পশু বলিদান প্রথা। এখনো আশ্বিন মাসে শুক্লাচতুর্দশীর দিন মেলা বসে তারাপুরে। লোকে বলে এই দিন নাকি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল জয়দত্তের ছেলে।

তন্ত্রসাধনার দুটি প্রসিদ্ধ স্থান বীরভূমে। তারা সাধনার প্রচলন কবে হতে হয়েছে তা [illegible] কঠিন। তবে প্রমাণ [illegible] সময় বৌদ্ধ-তারা উপাসনার প্রসার ছিল। বৌদ্ধতন্ত্র মতে তারা লোকেশ্বর বুদ্ধের কন্যা এবং তার অন্য নাম হল প্রজ্ঞাপারমিতা।

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে লক্ষণ সেন সম্ভবত পিতার শেষ ইচ্ছা অনুসারে বৈদিক ও তান্ত্রিকগণের মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। তাই লক্ষণ সেনকেই প্রথম তন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়। তার সভা-পণ্ডিত হলায়ুধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ করে সেই সময়ের উপযোগী মৎস-সুক্ত নামে এক মহাতন্ত্রের প্রচার করেছিলেন। "হিন্দু সমাজে সদাচার রক্ষা হয় অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদাভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মৎস-সুক্ত মহাতন্ত্র রচিত হইয়াছে। প্রথমেই বীরাচারীদিগের অভিমত তারাকল্প, একজটা উগ্রতারা, ত্রিপুরাদেবীর পূজাক্রম, মন্ত্রোচ্চার, তৎপরে বৌদ্ধ তন্ত্রানুমোদিত মহাচীন ক্রমে তারাদেবীর সাধন ও নীলসার-স্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধতন্ত্রানুসারে তারার স্তব করা হইয়াছে।"

মন্দির স্থাপত্যের দিক থেকে না হলেও ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মন্দির আকালীপুরের গৌরীশঙ্কর প্রতিমা। ভদ্রপুরের নিকটেই আকালীপুর। মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মন্দির। চিঠি থেকে জানা যায় যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ঘোর বিপদের মধ্যে ছিলেন। তাই আসতে পারেননি। তার ছেলে গুরুদাস প্রতিষ্ঠার মন্ত্র পাঠ করেন। মন্দির বড়, কিন্তু অসমাপ্ত। ভিত ফাটা। প্রবাদ, মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন নাকি ভিত ফেটে যায়। রাতে দেবী স্বপ্নে বলেন যে, তিনি শ্মশানবাসিনী। তার মন্দিরের দরকার নেই। দেবী মন্দিরের দক্ষিণদিকে সিদ্ধাসন। কেউ কেউ বলেন মন্দির নির্মাণের আগে এখানে দেবী ছিলেন। কারো মতে এই আসনে বসে নন্দকুমার সাধনা করতেন।

প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে ফরাসী মহিলাদের জনমত

দিলীপ মালাকার

প্রেম ও বিবাহ-কথা কোন দেশেই নতুন নয়, নতুন নয় তেমনি সমস্যাটাও। সব দেশেই রয়েছে এই চিরন্তন সমস্যা। কোথাও বেশী কোথাও বা কম। কিন্তু এক এক দেশে প্রেম ও বিবাহ নিয়ে জনমতের পার্থক্য দেখা দেয়, বিশেষ করে মহিলাদের বেলায়। প্রেম ও বিবাহ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর সংগ্রহ করেছেন ফরাসী মহিলাদের কাছ থেকে ফরাসী জনমত পরিষদ। তাঁদের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেল যে, তাঁরা প্রায় কয়েক সহস্র ফরাসী মহিলার মতামত সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে একশত মহিলার, যাদের বয়স ১৪ থেকে ৫০ বছর, তাদের তিন থেকে চার ঘণ্টা করে প্রশ্ন করে এমন অনেক তথ্য বার করেছেন ওই প্রতিষ্ঠান যা সত্যি উল্লেখযোগ্য।

ফরাসী জনমত পরিষদ বলছেন যে, তাঁদের অনুসন্ধান থেকে এই জানা গেছে যে, ফ্রান্সে দশটি মেয়ের মধ্যে ন'জনই বিবাহ করে ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে এবং তারা যে ধরণের স্বামী পছন্দ করে তাদের মধ্যে প্রথম পছন্দ হল স্বামীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। শুধু মাত্র শতকরা পাঁচজন চায় তাদের স্বামীরা যেন উচ্চপদস্থ হন। ফরাসী মেয়েরা কি ধরণের স্বামী বা স্বামীর কোন ধরণের গুণ পছন্দ করে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

শতকরা ৫৫ জন ফরাসী মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামী হবার উপযুক্ত পাত্রের গুণ হবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। শতকরা ৩৯ জন মেয়ে মনে করে তাদের স্বামীদের প্রধান গুণ হবে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও দেখতে-শুনতে ভাল। শতকরা ৬ জন মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামীদের প্রধান গুণ হবে যে, তারা যেন শুধু তাদেরই ভালবাসবে। শতকরা ৫ জন মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামীরা হবে ভাল রোজগেরে, উচ্চপদস্থ ও সমাজের উঁচুতলার জীব। শতকরা ৩ জন মনে করে যে, তাদের স্বামীরা তাদের জয় করে নেবে। শতকরা ২ জন মনে করে যে, তাদের স্বামীরা হবে সুরুচিপূর্ণ।

শতকরা ৮ জন মনে করে যে, তাদের স্বামীদের সব রকমের গুণ থাকবে।

এদেশে বিবাহ যেমন হয় তেমনি ভাঙেগও। তবে এখানে বিবাহ ভাঙ্গাটা অপরাধ বা দোষণীয় নয়। বরং বিবাহ না ভেঙ্গে অশান্তির মধ্যে দিন যাপন করাটাই এখানে অপরাধ। বিবাহ ও ও বিবাহ-ভঙ্গ সম্বন্ধে পরিষদ বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ফ্রান্সে আশী লক্ষ মেয়ের মধ্যে পঁয়ষট্টি লক্ষ মেয়েই বিবাহিত। বাকি পনর লক্ষ মেয়েদের মধ্যে দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার বিবাহ ভেঙেগছে অর্থাৎ ডিভোর্স, দু' লক্ষ ত্রিশ হাজার বিধবা, সাত লক্ষ যাট হাজার মেয়ে অবিবাহিত এবং যাদের

বয়স একুশ থেকে চব্বিশ বছর; পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার অবিবাহিত যাদের বয়স পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ, চার লক্ষ অবিবাহিতের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ।

ফরাসী জনমত পরিষদ বলেছেন যে, ফ্রান্সে দশটি বিবাহিতা মহিলার মধ্যে একজন হল ডিভোর্স অর্থাৎ বিবাহ ভেঙেছেন এবং তাদের বয়স সাধারণতঃ পঁচিশ থেকে চৌত্রিশের মধ্যে। ডিভোর্স-এর কারণ বলতে গিয়ে বলেছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাব, মাতলামি, নৃশংসতা— কখনো স্বামীর তরফ থেকে কখনো সমগ্র পরিবারের কাছ থেকে, চরিত্রহীনতা, অলস বা জুয়াখোর এবং শেষ কারণটি হল পারিবারিক নোংরা পরিবেশে সন্তানদের অনিষ্ট হতে পারে, এই সবই হল ডিভোর্সের কারণ।

ডিভোর্সের আগে এরা বিবাহ করে, বিবাহের আগে করে প্রেম। প্রেম করলে বা প্রেমে পড়লেই বিয়ে হয় না, প্রেমের সময়ে চলে বাছাবাছি। এমন অনেক দেখা গেছে যে, একটি মেয়ে হয়ত সাতটা ছেলের সাথে প্রেম করেছে বলে বিয়ে করেছে একজনকেই, সাতজনের সাথে প্রেম করেছে বলে মেয়েটা তো আর সাতজনকেই বিবাহ করতে পারে না? প্রেম করার আগে এরা চোদ্দ থেকে ষোল বছর বয়সেই অনেক ছেলের সাথে পরিচিত হয়। ওটা প্রেম নয় শুধু পরিচয়।

ফরাসী জনমত পরিষদ তাদের উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করেছেন যে, আপনারা যখন তরুণী ছিলেন তখন যদি আপনাদের পিতা-মাতা জীবনের প্রশ্ন নিয়ে সাবধান করতেন বা উপদেশ দিতেন তাহলে কি সেটা ভাল হত? তার উত্তরে শতকরা ৭৮ জন বলেছে যে, হ্যাঁ তাহলে ভাল হত, ১৬ জন বলেছে যে, না তার কোন প্রয়োজন নেই। ৬ জন কোন উত্তরই দেয়নি।

আগেই বলেছি যে, এখানে চোদ্দ থেকে ষোল বছরের মেয়েরা তাদের ছেলে বন্ধুদের সাথে হয় পরিচিত ও তারপর তারা বেড়াতে বেরোয়। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন বয়েসের মহিলারা যা উত্তর দিয়েছেন তার তালিকা দেওয়া গেল। উপরন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কত বছর বয়সে সাধারণতঃ একটি মেয়ে তার ছেলে বন্ধুর সাথে বেড়াতে যেতে পারে। তার উত্তরে এই পাওয়া গেছেঃ—

শতকরা ৫ জন মহিলা বলেছে যে, ১৪ থেকে ১৫ বছরের মেয়ে তার ছেলে বন্ধুর সাথে বেড়াতে পারে। শতকরা ৩৯ জন বলেছে ১৬ থেকে ১৮ বছরের হলে ভাল হয়, শতকরা ৩৫ জন বলেছে ১৯ থেকে ২০ বছরের হলে ভাল, শতকরা ৭ জন ২১ বছরের পক্ষে, শতকরা ১০ জন বলেছে যে, মেয়েরা যেন কেবল মাত্র তাদের ভাবী স্বামীদের সাথেই একা বেরোয়। শতকরা ৪ জন কোন উত্তরই দেয়নি।

কিন্তু সবচেয়ে মজার হল এই যে, এই সব মহিলাদের মধ্যে যাদের বয়স ২১ থেকে ২৪ তাদের শতকরা ৫০ জনই বলেছে যে, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সেই মেয়েদের তাদের ছেলে বন্ধুর সাথে বেড়ান ভাল। এবং এরা বেশী বয়সে ছেলে বন্ধুদের সাথে বেড়াবার বিপক্ষে। আর যে সব মহিলাদের বয়স ২৫ থেকে ২৯-এর মধ্যে তাদের শতকরা ৪৩ জন ১৬ থেকে ১৮ বছরের ও ৩১ জন ১৯ থেকে ২০ বছরের মেয়েদের ছেলে বন্ধুদের সাথে বেড়াবার পক্ষে। কিন্তু যাদের বয়স চল্লিশের ওপরে এবং পঞ্চাশের মধ্যে, তাদের মধ্যে শতকরা ২ জন মাত্র ১৪ থেকে ১৫ বছরের মেয়ের ছেলে-বন্ধুর সাথে বেড়াবার পক্ষে, শতকরা ২৭ জন শুধু ১৬—১৮ বছরের মেয়ের বেড়াবার পক্ষে, তবে শতকরা ৪০ জন ১৯ থেকে ২০ বছরের মেয়েদের একলা বেড়াবার অনুমতি দিতে রাজী। আর এদের মধ্যে শতকরা ২০ জন কেবলমাত্র ভাবী স্বামীদের সাথে বেড়াতে পরামর্শ দেয়, অন্যদের সাথে নয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের যতই বয়স বাড়ে, ততই তাঁরা হন সংরক্ষণশীলা। তাঁরা অল্প বয়সের মেয়েদের স্বাধীনতার বিপক্ষে। কিন্তু অল্প বয়সের মহিলারা, অল্প বয়সের মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত।

প্রেম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ফরাসী জনমত পরিষদ বলেছেন যে, তাঁরা সবাইকে প্রশ্ন করেন—সত্যিকারের গাঢ় প্রেম কি সম্ভব? তার উত্তরে শতকরা ৪৪ জন মহিলা বলেছে যে, তা সম্ভব। শতকরা ৩৩ জন মহিলা বলেছে, 'হয়ত সম্ভব'; শতকরা ১৬ জন মহিলা বলেছে যে, না, তা সম্ভব নয়, শতকরা ৭ জন কোন উত্তর দেয়নি। প্রশ্নকর্তারা নাছোড়বান্দা, তাঁরা আবার প্রশ্ন করেছেন যে, "অটুট প্রেম যদি সম্ভব হয়, তাহলে আপনি কি অটুট প্রেম সত্যি ভোগ করেছেন?" তার উত্তরে শতকরা ২৯ জন মহিলা বলেছেন, 'হ্যাঁ'।

উপরের প্রশ্ন সম্পর্কে অবিবাহিতা কুমারীদের মধ্যে যাদের বয়স পঁচিশের নীচে, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬১ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাসী, শতকরা ২৯ জন বলেছে হয়ত সম্ভব, শতকরা ৭ জন বলেছে, না। কিন্তু এই সব অবিবাহিতা কুমারীদের মধ্যে যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে, তাঁরা কিন্তু শতকরা ৩৬ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাসী, শতকরা ৩৪ জন বলেছে, 'হয়ত সম্ভব' এবং শতকরা ২৩ জন বলেছে, না, সম্ভব নয়। কিন্তু বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের নীচে, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৪৭ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাস রাখে, শতকরা ৩৩ জন বলে, 'হয়ত সম্ভব' আর শতকরা ১৩ জন বলেছে, যে, তা সম্ভব নয়। আর যাদের বয়স পঁয়ত্রিশের ওপর, তাদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাসী, শতকরা ৩৩ জন বলে, 'হয়ত সম্ভব', শতকরা ২১ জন বলেছে, সম্ভব নয়। প্রেমটা মনের ব্যাপার, সুতরাং মনের এই বিচিত্র গতি উপলব্ধি করা সোজা নয়, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। তা ফরাসীই হোক আর বাঙালীই হোক—একই প্রায়।

দেশে বিদেশে

॥ নিশ্চিন্ত ॥

স্টেটসম্যানের এক খবরে প্রকাশ, গত ৬ই নভেম্বর হাওড়া স্টেশনে পুরী-গামী একটি ট্রেণ ছাড়বার মুখে ইঞ্জিনের ড্রাইভারের কাছে এক বৃদ্ধা এলেন। ড্রাইভার স্মিতহাস্যে বৃদ্ধাকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু বৃদ্ধা এমন প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, ড্রাইভার বড়ই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

বৃদ্ধাও এই গমনোদ্যত ট্রেণটির এক যাত্রী। থার্ড ক্লাশে মালপত্র রেখে তিনি ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি ড্রাইভারকে জিগগেস করলেন, ঠিক আছে তো? চাকা ঠিক আছে? কোন দোষ নেই তো?

ড্রাইভার স্বভাবতই তাঁকে আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দিলেন যে, সব ঠিক আছে। বৃদ্ধা এই নিশ্চয়তা পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে ট্রেণে উঠলেন।

॥ সাহায্য ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গরীব পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসছেন। যে সব পরিবারের আয় কিছুই নয় বা—মাসিক ৪০ টাকার অনধিক সে সব পরিবারকে তাঁরা সাহায্য দেবেন। সাহায্যের ধরণটা হবে বস্তুদান। এই বস্তুগুলোর মধ্যে পড়বে সেলাইকল, ছুতোর যন্ত্রপাতি, অম্বর চরকা, সাইকেল ইত্যাদি। পরিবারপিছু আড়াই শো টাকার বেশী দেওয়া হবে না। উদ্দেশ্য—এ দিয়ে তারা ছোটো ছোটো শিল্পে হাত দিতে পারবে। গরীবদের অনেকে বেশ ভাল সেলাই জানে, কিন্তু সেলাইকল না থাকায় তাদের প্রতিভার স্ফুরণ হচ্ছে না, কাঠের কাজে ঝোঁক আছে যন্ত্রপাতি নেই, তাদের পক্ষে এই সাহায্য খুব ফলপ্রসূ হবে মনে করা যাচ্ছে। এজন্য রাজ্য সরকার চলতি বছরের হিসাবে ২,৫৬,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

॥ লোকবল ॥

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন ১৯৬১ সালের লোকগণনা বা আদমসুমারী অনুসারে পাকিস্থানের জনসংখ্যা হয়েছে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর তুলনায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ বেড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই লোকবল বৃদ্ধিকে অভূতপূর্ব বলে অভিহিত করেছেন। পুরুষের সংখ্যা বেশী—৪ কোটি ৯০ লক্ষ; মেয়েদের সংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। মুসলমানরা হচ্ছেন প্রতি একশতজনে ৮৮·১; তপশীল শতকরা ৫·৮; উচ্চ শ্রেণী হিন্দু ৪·৯; খৃষ্টান ০·৮; ০·৪। হিন্দুদের সংখ্যা ১ কোটি ১ হাজার ৪৭৪—তার মধ্যে তপশীলীদের সংখ্যাই ৫৪,১১,০৫৭।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বেশীর ভাগ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করছে।

॥ ১৩০ ॥

হুগলী থেকে যুগান্তরের এক সংবাদে প্রকাশ, বর্ধমান জেলার রায়না থানা এলাকান্তর্গত সোহারা ইউনিয়নের রসপুকুর গ্রামবাসী শ্রীমতিলাল থান্ডারের বয়স ১৩০ বছর। অর্থাৎ এক শতাব্দীরও ৩০ বছর বেশী। শুধু ৩০ নয়, ৫০ নয়, একশত নয়—১৩০। স্বাধীনতার তেরো বছর নয়, বঙ্গভঙ্গের ১৯০৫ ও নয়, এমন কি সিপাহী বিদ্রোহও নয়, তারও আগে ১৮৩১ সালে তার জন্ম। তখন সতীদাহের কাল, ঠগীদের কাল, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিকের কাল। তখন শিখেরা স্বাধীন, ব্রহ্ম স্বাধীন। থান্ডারের স্বাস্থ্য এখনও ভালো। দৃষ্টিশক্তি কিছু ক্ষীণ হয়েছে মাত্র। আহা, এমন মানুষ যদি স্মৃতিকথা লিখতে পারতো!

॥ বিবাহ ॥

বিহারের এক কারিগরি বিদ্যায়তনের অধ্যাপক বিয়ে করবেন বলে ছুটির আবেদন করেছিলেন। দশদিনের ছুটির আবেদন। আজ চার বছর হয়ে গেল, সেই ছুটির আবেদন মঞ্জুর হয়নি। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ, অধ্যাপকের বিয়ে আটকায়নি। তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে শুধু নয়, তাঁর একটি পুত্রসন্তানের আবির্ভাবও হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু ছুটির সেই যে আবেদন তা যে কোন্ ফাইলের তলায় কিভাবে আটকে আছে এবং অধ্যাপক কোন্ অবস্থায় মঞ্জুর-সাপেক্ষ আবেদনের পাশ কাটিয়ে বিয়ে করলেন তা সংবাদে উল্লেখ নেই।

॥ ঔষধি ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রধানত দার্জিলিংয়ের আশে-পাশে নানা প্রকার বনৌষধি চাষের ব্যবস্থা করবেন ঠিক করেছেন। টুং তেল চীন দেশ থেকেই বেশী আমদানী হয় এবং শিল্পকার্যে লাগে। এর চাষের চেষ্টা হচ্ছে, হাজার একরে ২৬০ টন উৎপন্ন হবে। ভারতের এখন দরকার ২০০ টন। ইপিকাক, এলাচ ইত্যাদির চাষও হবে। তাছাড়া মংপুতে কফির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। লাইকোপডিয়াম ও অন্য ১৭টি বনৌষধি চাষের চেষ্টাও হবে। এতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানও হবে।

॥ ফরাক্কা ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মহলের ধারণা যে, অদূর ভবিষ্যতে ফরাক্কা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মন্ত্রী-পর্যায়ে আলোচনা হবে। উভয় সরকারের পদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ইতিমধ্যেই তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। কিন্তু আলোচনা সেখানেই সমাপ্ত হবে না বলে মনে হচ্ছে। পাকিস্থানের ইচ্ছা আলোচনাটা এবার উভয় রাষ্ট্রের সেচ-মন্ত্রীদের মধ্যে হবে। দিল্লীকর্তৃপক্ষ প্রথমে পাকিস্থানের এই ধরণের প্রস্তাবে গররাজী হয়েছিলেন। এখন তাঁরা নিমরাজী।

॥ হরিণ ॥

২৪-পরগণা জেলার বনগাঁওয়ের কাছে এক হরিণ-উদ্যান খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। ৫০০ একর ভূখন্ড ১২ ফুট উঁচু তারের বেড়ায় ঘিরে ফেলা হবে এবং তাতে থাকবে চিতে হরিণ শুয়র ও আরও দু'একটি প্রাণী। ইতিমধ্যেই সেখানে শাল ও অন্য গাছের চাষ হয়েছে। জায়গাটা নাকি ভারী উপযুক্ত। এর তিনদিকে কপোতাক্ষী; সম্ভবতঃ এই থেকে একটা কৃত্রিম হ্রদও করা যাবে। স্থানীয় লোকেরা খুব সহযোগিতা করছে। রাজ্যসরকারের এই পরিকল্পনাটি অনেকখানি এগিয়েছে। এই উদ্যানের প্রান্তে একটি রেস্ট হাউসও নির্মিত হবে এবং সেখানে গিয়ে দর্শকদের দু'একদিন থাকবার ব্যবস্থাও হবে।

॥ সংক্রমণ ॥

এখন ব্যোমপথ বিচরণ আয়ত্তের মধ্যে এসে যাচ্ছে। শিগগির আনাগোনা হবে, ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক ভাবছেন, এভাবে অন্যান্য গ্রহের জীবাণু ঐসব ব্যোমযানে এসে পড়তে পারে এবং পৃথিবীকে সংক্রামিত করতে পারে। তাই তাঁরা বলছেন, যখনই কোন মহাকাশচারী ব্যোমযান পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসবে তক্ষুণি তাকে শোধন করতে হবে। বৈজ্ঞানিকদের আশংকা এইসব জীবাণু মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তুলনা করা হচ্ছে যে, কোনো কোনো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথম যখন ইউরোপীয়ানরা যেতে লাগল তখন সেখানকার আদিবাসীরা অনায়াসেই হাম ও মামসের কবলে পড়ে মারা গেছে। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, অপর কোনো গ্রহে মহাকাশচারী ব্যোমযান অবতরণের পূর্বে শোধন করে নিতে হবে; নইলে ঐ গ্রহের প্রাণী মারা পড়তে পারে।

॥ ঘরে ॥

২রা নভেম্বর—১৬ই কার্তিক: 'কমনওয়েলথ-এর সমস্যা সমাধানে ও কমনওয়েলথকে পূর্ণতাদানে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবার আছে' —দিল্লীতে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উদ্বোধনী ভাষণ।

পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে নিজদিগকে গড়িয়া তোলার জন্য ছাত্রদের প্রতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের (উপরাষ্ট্রপতি) আহ্বান—আসানসোলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ভাষণদান।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের দাবী—রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের কলিকাতাস্থ কনসালেটের সম্মুখে দলবদ্ধ বিক্ষোভ।

৩রা নভেম্বর—১৭ই কার্তিক: ভারতের প্রথম বিমানবাহী জাহাজ 'বিক্রান্ত' বোম্বাই-এ উপনীত—পূর্ণ সামরিক কায়দায় শ্রীনেহরু (প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন।

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শুধু গণতন্ত্রেই সম্ভব'—কমনওয়েলথ প্রেস সম্মেলনে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের (কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের ভারতীয় শাখার সভাপতি) ভাষণ—নানা সমস্যায় কমনওয়েলথ-এর ভবিষ্যৎ বিপন্ন বলিয়া আশংকা প্রকাশ।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পক্ষকালব্যাপী বিদেশ (বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো) সফরে যাত্রা—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ।

৪ঠা নভেম্বর—১৮ই কার্তিক: 'গ্রামের মানুষ ও তাহাদের সমস্যাবলীর পরিচয় জানিতে চাই'—আপন অন্যতম নির্বাচন কেন্দ্র শালতোড়ায় (বাঁকুড়া) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) নির্বাচনী ভাষণ।

৫ই নভেম্বর—১৯শে কার্তিক: হাওড়া বিভাগে সাড়ে তিনঘন্টাব্যাপী ট্রেণ চলাচল বিপর্যস্ত—বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হওয়ার জের।

'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক—দেশবন্ধুর ৯২তম জন্মদিবসে জাতির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

৬ই নভেম্বর—২০শে কার্তিক: 'কলিকাতার বায়ুমন্ডলে সঞ্চিত তেজস্ক্রিয়তা হইতে ক্ষতির আশংকা নাই'—প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন বসুর অভিমত।

'মণিপুর ও নাগাভূমির আঞ্চলিক পরিবর্তনে অরাজকতা দেখা দিবে'—লোকসভা সদস্য শ্রীআচওয়া সিংহের বিবৃতি।

৭ই নভেম্বর—২১শে কার্তিক: কালীপূজা উপলক্ষে মহানগরীতে (কলিকাতা) পাঁচটি মন্ডপে অগ্নিকান্ড—বাজী পোড়াইতে যাইয়া বহু লোক আহত।

'উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা আবশ্যক'—কলিকাতায় শিল্পে লোকবল লাগনো' শীর্ষক আলোচনা-চক্রের উদ্বোধনী ভাষণে ডাঃ রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) দাবী।

৮ই নভেম্বর—২২শে কার্তিক: জাতীয় সংহতি সাধনে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রতী হওয়ার আহ্বান—দিল্লীতে নিখিল ভারত শিল্পী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় প্রচার ও বেতার-সচিব ডাঃ বি ভি কেশকারের ভাষণ।

আবার দক্ষিণ রেলপথে ট্রেণ দুর্ঘটনা—কোরগি ষ্টেশনে মাদ্রাজ-বোম্বাই জনতা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত—ড্রাইভার ও দুইজন ফায়ারম্যান নিহত এবং ৯ জন যাত্রী আহত।

॥ বাইরে ॥

২রা নভেম্বর—১৬ই কার্তিক: পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা স্থগিত রাখার আহ্বান—রাষ্ট্রসংঘ রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতের নেতৃত্বে আনীত প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই শক্তিগোষ্ঠীর আপত্তি অগ্রাহ্য।

মধ্য ফ্রান্সে ৫ জন আলজিরীয় বিদ্রোহী নেতার অনশন—ফ্রান্সে আটক ১৫ হাজার আলজিরীয়কে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে গণ্য করার দাবী।

৩রা নভেম্বর—১৭ই কার্তিক: রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল পদে উ থান্ত (ব্রহ্ম প্রতিনিধি) নির্বাচিত—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

নভেম্বরের শেষ ভাগে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট পত্নী মিসেস কেনেডীর ভারত সফরের সিদ্ধান্ত।

৪ঠা নভেম্বর—১৮ই কার্তিক: 'কোন অবস্থাতেই পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার যৌক্তিকতা নাই: সোভিয়েট ইউনিয়নের অতি-বোমা বিস্ফোরণে ভারত স্তম্ভিত'—জেনেভা, প্যারিস ও লন্ডন বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট শ্রীনেহরুর উক্তি।

লন্ডনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের সহিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) বিশ্বপরিস্থিতি আলোচনা।

কাতাঙ্গায় কেন্দ্রীয় কঙ্গোলীবাহিনীর পশ্চাদপসরণ—ইউরোপীয় অফিসারদের নেতৃত্বে কাতাঙ্গী ছত্রীবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের সংবাদ।

রাশিয়া কর্তৃক আর একটি মেগাটনী পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ—পাশ্চাত্য অপেক্ষা এশিয়ায় তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বৃদ্ধির কথা।

৫ই নভেম্বর—১৯শে কার্তিক: লন্ডন হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নিউ-ইয়র্ক উপনীত—মৈত্রীপূর্ণ আবহাওয়ায় ভারতীয় নেতার বিপুল সম্বর্ধনা।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশ সম্পর্কে মার্কিণ সরকারের উদ্বেগ—প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন রাস্কের ব্যস্ততা।

'আক্রমণ প্রত্যাহৃত না হইলে চীনের সহিত স্বাভাবিক সম্পর্ক অসম্ভব'—নিউইয়র্কে টেলিভিশন ভাষণে শ্রীনেহরুর মন্তব্য—ক্রুশ্চেভ যুদ্ধ চাহেন না বলিয়া আস্থা প্রকাশ।

৬ই নভেম্বর—২০শে কার্তিক: কেন্দ্রীয় কঙ্গোলী সরকার নূতন সংকটের সম্মুখীন—কিন্তু প্রদেশ কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার হুমকী।

তিউনিসিয়ার অনতিদূরে ৬৮ জন খালাসীসহ বৃটিশ জাহাজ নিমজ্জিত।

'বিশ্বনেতা হিসাবে শ্রীনেহরু আব্রাহাম লিংকন ও রুজভেল্টের সমকক্ষ'—ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সম্বর্ধিত।

৭ই নভেম্বর—২১শে কার্তিক: ওয়াশিংটনে কেনেডি-নেহরু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—উভয় নেতার মধ্যে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে নিবিড় আলোচনা।

মার্শাল ভরোশিলফের লাঞ্ছনা—বিপ্লব-বার্ষিকী কুচকাওয়াজ দেখিতে যাইয়া লেনিন স্মৃতিসৌধ হইতে বহিষ্কৃত।

'রাশিয়া আর ৫০-মেগাটন বোমা ফাটাইবে না'—মস্কো-এ বিপ্লব-বার্ষিকী দিবসে ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

৮ই নভেম্বর—২২শে কার্তিক: মার্কিণ প্রেসিডেন্ট পত্নী মিসেস কেনেডির প্রস্তাবিত ভারত ও পাকিস্তান সফর জানুয়ারী মাস (১৯৬২) পর্যন্ত স্থগিত—হোয়াইট হাউসের সর্বশেষ ঘোষণা।

প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত শ্রীনেহরুর আরও একদফা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ঙ্কর

॥ এক ভাষা—এক লিপি—একতা ॥

সম্প্রতি নতুন দিল্লীর এক উর্দু গ্রন্থমেলায় ভা র তে র প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন ঃ মুখের ভাষা এবং লিখিত ভাষার ব্যবধান যেখানে কম সেই ভাষাই উন্নত। সেই প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ভাষার উল্লেখ করেন, তাঁর ধারণা, রবীন্দ্রনাথ সহজ এবং সরল ভঙ্গীতে লিখেছেন বলেই বাংলার পথ-ঘাট তাঁর সঙ্গীতে মুখরিত। সর্বসাধারণে তাঁর সাহিত্য বোঝে। এই যুক্তিতে তিনি বলেন যে, ভাষার মধ্যে যে কৃত্রিমতা এবং অকারণ দুরূহতা আছে তা লোপ করে ভাষাকে সর্বসাধারণের আয়ত্তাধীন করতে হবে। হিন্দিকে সরল করতে হবে হিন্দি-উর্দুর মধ্যে যে বিরোধ আছে তা লোপ করতে হবে তবেই হিন্দি বাংলা, তামিল ও মারাঠীর মত উন্নত হতে পারবে। সেদিনই তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহ একটিমাত্র লিপিতে লেখার স্বপক্ষেও যুক্তিদান করেন। তাঁর মতে সব ভাষাগুলি এক আদি ভাষা থেকে উদ্ভূত, তাই সবকটি ভাষার মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র আছে, সুতরাং যদি লিপি এক হয় তাহলে ভাষার লড়াই খতম হবে এবং দেশে একটা নির্বিঘ্ন অখণ্ডতা বিরাজ করবে। শ্রীনেহরু অবশ্য এই এক লিপিটি রোমক কিংবা নাগরী কি হবে, তা উল্লেখ করেননি। মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মিলনে দেবনগারী লিপিতে সমস্ত ভারতীয় ভাষা লেখার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ মাদুরাই কংগ্রেসে ও দিল্লীর সংহতি সম্মেলনেও এই একই দাবী বা মৃদু ভাষায় প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, তার লিপি নাগরী, সেই নাগরীলিপি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যদি চালু করা যায়, তাহলে এক ভাষা বিনা অস্ত্রে চাঁদসীর চিকিৎসার মত প্রচারিত ও প্রসারিত হবে, এক লিপি এক ভাষা ও একতা অতি সহজেই করায়ত্ত হবে।

বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নানা কারণে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি সহজগ্রাহ্য। কারণ তাঁর ভাষা সংক্রান্ত চিন্তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, কোনোরূপ ভাবাবেগ বা সংকীর্ণ মনোভাবের ফল নয়। তিনি বলেছেন ঃ—

"ভাষা সমস্যা ও ভাষান্ধতা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য একটিমাত্র লিপির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। ভাষা ও লিপি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিশেষ করে জনসাধারণের মনে এই দুটির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। কারণ, তারা ভাষা ও লিপিকে এক করে দেখে। সম্প্রতি দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের একটি অধিবেশন হয়েছে, তাতে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্যে হিন্দি-ভাষা ও হিন্দিলিপি (নাগরী) ব্যাপক-ভাবে ভারতবর্ষে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং যে সমস্ত ভাষা নাগরীতে লেখা হয় না, সেগুলিকে আস্তে আস্তে নিজেদের লিপি ত্যাগ করিয়ে নাগরীতেই লেখবার কথা হয়েছে। কাজেই লিপির প্রশ্নটা হঠাৎ খুব বড় হয়ে উঠেছে। যাঁরা নাগরীর পক্ষপাতী তাঁদের ধারণা, সমস্ত ভারতে একমাত্র নাগরী চললে ভাষাও এক হওয়ার সুযোগ পাবে। পরিকল্পনাটা খুবই লোভনীয় এবং যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা লিখতে নাগরী লিপি ব্যবহার করে আসছেন তাঁদের পক্ষে খুবই সান্ত্বনা-দায়ক। কিন্তু এ পরিকল্পনায় কল্পনার অভাব সূচিত করেছে। একে বলা চলে যারা সব জন্মাবধি নাগরীর সঙ্গে পরিচিত নয়, সেই সব হতভাগ্যের প্রতি স্থূলে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ।" (শারদীয় যুগান্তর—১৩৬৮)।

ডঃ চট্টোপাধ্যায়কৃত এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটি সমগ্র অংশ পুনর্মুদ্রিত করতে পারলে খুশী হতাম, স্থানাভাবহেতু সেই আশা ত্যাগ করতে হয়েছে। আগ্রহশীল পাঠককে এই প্রবন্ধটি পাঠ করতে অনুরোধ করি। যুক্তিবিচারে প্রবন্ধটি অতুলনীয়।

নাগরী লিপিতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত এবং নাগরী লিপি যাঁরা ব্যবহার করেন ভারতবর্ষে, তাঁরা সংখ্যাগুরু, এ ছাড়া এর স্বপক্ষে আর কোনো যুক্তি নেই। সম্প্রতি শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশতম নিখিল ভারত প্রাচ্য মহাসম্মিলনে মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ডঃ ভি, রাঘবন বলেছেন—

"There is no need to be fantastic about a common script for India and the question should be solved from the points of view of what is most practical and the sectors of activity in which the regional Devnagri and Roman script should be used."

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক লিপি এবং এক ভাষা যদি প্রবর্তন করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই অনেক সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু সেই কার্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করাই প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীও কোন লিপি পছন্দ করেন তা বলেননি, তাঁকে নানা বিষয়ে চিন্তা করতে হয়, এই বিষয়টি সম্পর্কে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে যে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন সেই সময় কোথায়? হয়ত একটা কমিটি বসানো হবে, কমিটি সারা ভারতে ভ্রমণ করে সাক্ষ্য, প্রমাণ যুক্তি সংগ্রহ করে বিরাট এক রিপোর্টে অভিমত জ্ঞাপন করবেন এবং সেই রিপোর্টের সুপারিশ চালু করার কালে দেশে আবার একটা হট্টগোল সৃষ্টি হবে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—"প্রত্যেক রাজ্যে ভাষা, সাহিত্য, এবং সংস্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে যে লিপি তার নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে আসছে, তা বর্জন করে অন্য একটি লিপি, এবং যে লিপি গ্রহণ করলে কোন লাভই নেই বরং অতিরিক্ত জটিলতা বাড়বে, সেই লিপি অ-নাগরী অঞ্চলের সবাই গ্রহণ করা মাত্র একাত্মক হয়ে যাবে, একথা কল্পনা করাই শক্ত।"

মানুষের সংস্কৃতি খানিকটা প্রাচীন সংস্কারের মত, সে সেই সংস্কারকে প্রাণ-পণে বাঁচানোর চেষ্টা করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য থাকা কিছু দোষের বস্তু নয়। সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষার মূলে সর্বদাই যে নিছক গোঁড়ামি বা ভাবাবেগ আছে একথাও বলা চলে না। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে আঞ্চলিক প্রকৃতির সঙ্গে প্রচলিত রীতির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। লিপি এমনই এক বস্তু। সংস্কৃত সম্পর্কে যে জিনিস সম্ভব হয়েছে, অন্য ভাষা সম্পর্কে তা সম্ভব নয়, তার কারণ সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব কোনো আকার

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥
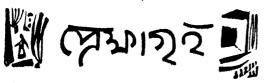
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, চিত্র-সমালোচক ও দর্শক

কলকাতার অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-সপ্তাহে পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহে দৈনিক প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে একুনে পঁয়ত্রিশখানি ছবি দেখানো হ'ল। এর মধ্যে ভারতের নিজস্ব চারখানি ছবি—'সমাপ্তি' (বাংলা), 'কাবুলিওয়ালা' (হিন্দী), 'মুঘল-এ-আজম' (হিন্দী) ও 'পাণ্ডা মান্নিপ্পু' (তেলেগু), আমেরিকার 'অ্যাপার্টমেণ্ট' ও 'ফ্যানি' এবং ইংলণ্ডের 'হ্যাণ্ড ইন হ্যাণ্ড' ও 'দি সিঙ্গার নট দি সঙ'—এই আটখানি ছবি বাদ দিলে অপরাপর দেশের প্রদর্শিত ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশ। টিকিট সংগ্রহের কথা দূরে রেখেও বলতে পারা যায় কোনো একজন লোকের পক্ষে প্রতি দিন তিন-খানি এবং মাঝে ছুটির দিন—৫ই রবিবার ও ৭ই মঙ্গলবার কালীপূজোর দিন—মর্নিং শো ধ'রে চারখানি ক'রে ছবি দেখেও এই একটি সপ্তাহে তেইশ-খানির বেশী ছবি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না। অথচ এমন বহু চিত্র-রসিককেই জানি, যাঁরা ভালোমন্দ নির্বিচারে এই সাতাশখানি ছবিই দেখবার জন্যে আগ্রহোন্মুখ ছিলেন এবং ওরই সঙ্গে ইউ এস এ'র 'অ্যাপার্ট-মেণ্ট' ছবিখানি। কিন্তু চলচ্চিত্র-সপ্তাহের উদ্যোক্তা, ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক সম্ভবতঃ দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা মনে রেখেই এমনভাবে প্রোগ্রাম ছ'কেছিলেন, যাতে কোনো একজন ভদ্রলোক সব ক'খানি ক'রে চিত্ররসিক সকল লোকই প্রদর্শিত সকল ছবিই—এমন কি ভারতীয় ছবি-গুলিও—দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের ছবিগুলিকে পর পর দেখতে পেলেই না আমাদের মনে বর্তমান পৃথিবীর চলচ্চিত্র-জগৎ সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গীন চিত্র ধরা পড়বার সম্ভাবনা থাকে? এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব হয়? আন্তর্জাতিক চল-চ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের সার্থকতাই ত' সেইখানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা

যাত্রিক পরিচালিত চিত্রযুগের 'কাঁচের স্বর্গ' চিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও ছায়া দেবী।

ছবি দেখে ফতুর না হয়ে যান। জানতে ইচ্ছে করে, ছবি-পাগলের দলে এমন কেউ আছেন কি, যিনি তাল ঠুকে এই সাতদিনে একুশ কিংবা তেইশখানি ছবি দেখতে পেরেছেন। আমরা তো বিস্তর আদাজল খেয়েও খানবারোর বেশী ছবি দেখে উঠতে পারিনি। অবশ্য চিত্র-সাংবাদিকদের এই চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কেই ছবি দেখা ছাড়াও অন্য কাজ ছিল। এবং সেই অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করতে পারলে আরও খান-তিনেক ছবিকে চাক্ষুষ করবার সৌভাগ্য অর্জনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চিত্র-সাংবাদিক হিসেবে আমরা মনে করি, যেখানেই এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ পালন করা হয়েছে বা হচ্ছে, সেখানেই এমনভাবে হিসেব করে প্রোগ্রাম বা প্রদর্শনীসূচী প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল, যাতে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং পরিধি বিস্তৃত হয়নি। সাতটি দিনের মধ্যে পঁয়ত্রিশ-খানি ছবির ভীড়ে আমরা প্রায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিলুম এবং ওরই মধ্যে বিশেষ কোন্ কোন্ ছবি দেখতে না

পেলে আফসোসের শেষ থাকবে না, তারই খোঁজে "সাইট অ্যান্ড সাউন্ড", "ফিল্ম অ্যান্ড ফিল্মিং" প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে প্রদর্শিতব্য ছবিগুলি সম্পর্কে তাঁদের কি অভিমত, তাই আবিষ্কার করতে হয়েছে একাগ্রচিত্তে। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে সকল ছবি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা গেল না অত্যন্ত সংগত কারণেই। এবারকার ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যে-সব ছবি দেখানো হ'ল, তার কোনোটিই ১৯৬০ সালের আগে তোলা নয় এবং সেই কারণেই ঐ পত্রপত্রিকার সমালোচকেরা সব ক'টি ছবি দেখবার সুযোগ পাননি। গেল ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসবে জাপান এবং ইতালীর ছবি চিত্ররসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সমধিক। তাই ঐ দুই দেশের চিত্র দেখবার জন্যে সকলেরই মনে অত্যন্ত বেশী আগ্রহ। অথচ দুঃখের বিষয়, আমাদের সহর-কলকাতার উৎসবে একখানিও ইতালীয় চিত্র স্থান পায়নি কোনো অজ্ঞাত কারণে, যদিও নিউদিল্লীর মুদ্রিত তালিকায় ইতালীয় চিত্র "দি কিলার"-এর নাম দেখতে পাওয়া গেছে। জাপান থেকে আগত দু'খানি ছবির মধ্যে "হ্যাপিনেস ফর আস্ অ্যালোন"-এর সাধারণ প্রদর্শনী হয়েছে মাত্র একটি—৩রা নভেম্বরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে প্রদর্শিত হবার পর লাইট হাউসেই রাত্রি নটার শো-তে। মেট্রো সিনেমায় ৭ই তারিখে "দি থ্রী ট্রেজার্স" নামে যে জাপানী ছবিখানি দেখানো হয়, সেটি এবারের উৎসবের দীর্ঘতম চিত্র—দেখাতে ও দেখতে লাগে পুরো তিন ঘণ্টা দুমিনিট এবং ছবিটির বিষয়বস্তুও কিছু বা কিংবদন্তী, কিছু বা কল্পনা আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। কাজেই "ইউকিওয়ারিস্," বা "হ্যাপিনেস ফর আস্ অ্যালোন" কিংবা "রসোমন" প্রভৃতি ছবির মতো এতে মানবিক আবেদন প্রায় নেই বললেই চলে এবং যে-কারণগুলির জন্যে জাপানী ছবি চিত্র-রসিকদের মুগ্ধ করেছে, সেই কারণগুলি এই ছবিটিতে অনুপস্থিত বললেই হয়। এর পরেই যে-ছবিগুলির প্রতি আমাদের মনে আগ্রহ জন্মায়, সেগুলির নাম— 'অ্যামেরিনা' (আর্জেন্টিনা), 'ইফিয়াল্‌টিস্' (গ্রীস), 'কলার স্টাকিং' (পোল্যান্ড), 'দি হায়ার প্রিন্সিপ্‌ল্' (চেকোশ্লোভেকিয়া), 'দি হাণ্ডব্যাক হর্স' (সোবিয়েৎ রাশিয়া), 'প্রোঃ ম্যাম্‌লক' (পূর্ব জার্মাণী), 'মিস্ স্টোন' (যুগোশ্লেভিয়া), 'স্কীড' (চেকোশ্লোভেকিয়া), 'দি ব্রীজ' (পশ্চিম জার্মাণী), 'লাভ হ্যাণ্ডস্ অন দি গ্যালোজ্' (পশ্চিম জার্মাণী), 'দি ক্রসিং অব দি রাইন' (ফ্রান্স), 'রেড ইংক' (হাঙ্গেরী), 'দি কিংডম অ্যান্ড দি বিউটি' (হংকং), 'মেকারিও' (মেক্সিকো), 'ড্যানিয়ুবে ওয়েভ্‌স্' (রুমানিয়া), 'নাইটস্ অব দি টিউটোনিক অর্ডার' (পোল্যান্ড), 'হ্যাতিফা' (পূর্ব জার্মাণী) এবং 'টু লাভ ইজ্ এনাফ' (ফ্রান্স)—মোট এই উনিশখানি ছবি। কিন্তু চাঁদ চাইলেই ত' পাওয়া যায় না। তার জন্যে সাধনার প্রয়োজন এবং আরও যে-জিনিষটি বেশী করে প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে—ভাগ্য। তার ওপর সম্ভব অসম্ভব বললেও জিনিষ আছে। একদিনে মোট তিনটি শো-তে চারখানি ছবি দেখা যায় না, যে-কোনও একটিকে ছাড়তে হয়। অবশ্য সাংবাদিকদের জন্যে প্রেস ক্লাব তাঁদের ময়দানস্থ তাঁবুতে ১লা নভেম্বর থেকে সুরু করে ছ'দিন বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ঐ বিশেষ প্রদর্শনীতে কোন্ কোন্ ছবি দেখানো হবে, তা আগে থাকতে জানতে না পারায় চিত্ররসিক সাংবাদিকরা সাধারণ চিত্রগৃহে কোন্ কোন্ ছবি না দেখলেও চলবে, তা ঠিক করে উঠতে পারেন নি। এবং প্রেস ক্লাবের তাঁবুতে একটি মাত্র প্রক্ষেপণ-যন্ত্রের সাহায্যে—তাও ল্যাম্প-

'সন্ধ্যারাগ' চিত্রের একটি দৃশ্যে কল্যাণী ঘোষ, নির্মলকুমার ও অসিতবরণ।

প্রোজেক্টার—ছবি দেখানোয় ছবিগুলির যথাযথ মূল্যাবধারণে যথেষ্টই অসুবিধা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এখানকার প্রচার বিভাগীয় কর্তা—"কলিকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ' উদ্‌যাপন বিষয়ে সাংবাদিকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা কামনা করলেও বিশেষ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার চলচ্চিত্র সম্পাদক বা সাংবাদিকদের সব ক'টি ছবি দেখবার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন না। তিনি স্পষ্টই বলেন, যখন একখানি ছবিকে একাদিনের বেশী দুদিন সাধারণকে দেখানো যাচ্ছে না, তখন সংবাদপত্র মারফত সে-ছবি ভালো কি মন্দ বা তার বিশেষ বক্তব্য কিংবা শিল্পনৈপুণ্য কি, এ-কথা সাধারণকে জানিয়ে লাভ কি? আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য, বোধ করি, দেশ-বিদেশের কিছু ছবি মুষ্টিমেয় দর্শককে দেখবার সুযোগ দেওয়াতেই পর্যবসিত! এবং বিভিন্ন দেশের ছবির ভালো-মন্দ সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভবতঃ মাত্র আর্থিক আয়ের জন্যেই প্রয়োজন!

অতএব বর্তমান বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্র চিত্র-রসিক পাঠকসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করবার বাসনা আপাততঃ স্থগিত রাখতেই হ'ল। মাত্র যে-বারোখানি ছবি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, জাপান আমাদের এবারেও নিরাশ করেনি। শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি মানুষের আনন্দবিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান হয়, তাহলে জাপানী ছবি 'হ্যাপিনেস ফর আস অ্যালোন' নিশ্চয়ই একটি মহৎ শিল্পসৃষ্টি। সর্বজনগ্রাহ্য শিল্পরীতির সাহায্যে প্রস্তুত এই অপরূপ মানবিক আবেদনপূর্ণ ছবিটি পৃথিবীর যে-কোনও দেশের মানুষকে খুসীতে ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। এর পরেই নাম করব চেকোশ্লোভেকিয়ার ছবি 'স্কাউড'-এর। আঙ্গিক এবং কলাকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখলুম এই ছবিতে। মহাশূন্য পথে আমাদের এই পৃথিবী-গোলকের পথ পরিক্রমার দৃশ্য এবং তারই সঙ্গে ইংরেজী সাব-টাইটেলে 'এই গোলকের উপর দিয়ে মানুষের যাত্রাপথের শেষ আছে কি?' —এই প্রশ্ন যে-কোনও দর্শকের মনকে আলোড়িত করবার ক্ষমতা রাখে।

গল্প বলার ধরন, মন্টাজ সৃষ্টি, গুরুগম্ভীর এবং লঘু-চটুল বস্তুকে পর্যায়ক্রমে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করার কৌশল—যে-কোনও চলচ্চিত্রকুশলীকে এবং বুদ্ধিমান রসজ্ঞ দর্শককে প্রতি মুহূর্তে বিস্মিত এবং আনন্দিত করবে। পশ্চিম জার্মানীর "দি ব্রীজ" আর্টে বাস্তবতার একটি চরম নিদর্শন। লোকক্ষয়ী যুদ্ধকে ধিক্কৃত ক'রে এই ছবি দেখিয়েছে, আক্রমণকারী জাতির প্রয়োজনে নির্দোষ নিষ্পাপ শিশু, বালক, কিশোর, যুবক এবং বৃদ্ধ—কিভাবে মানুষের নৃশংসতার বলি হয়। দৈত্যরাজের মত আগুয়ান ট্যাঙ্কের ক্লোজ-আপ অবিস্মরণীয়। ফ্রান্সের "ক্রশিং অব দি রাইন"-এর বেকার-এর (রুটিপ্রস্তুতকারী) চরিত্রও কোনোদিন দর্শক ভুলতে পারবেন না। বেচারা শান্তি চায়, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে দূরে থেকে সে চায় মানুষের সঙ্গে মিতালি করতে। তার কাছে মানুষের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে—মানুষ; জাতি-ধর্মের প্রশ্ন অবান্তর। তাই সে নিজে ফরাসী হয়েও শত্রুপক্ষীয় জার্মানগৃহকে নিজের ক'রে নিতে পেরেছিল। তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হ'তে পেরেছিল—তাদের একমাত্র মেয়েকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে এসে কর্তব্যহানিজনিত বিবেকদংশনে ক্ষত-
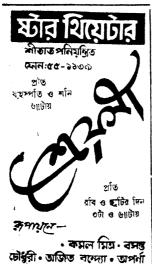
'কান্না' চিত্রে শশিকলা

ছবিখানি দৃশ্যসজ্জা, জাঁকজমক, অসি যুদ্ধ, নাটকীয়তা প্রভৃতিতে মনে হয় যেন আমাদের দেখা সব ছবিকেই অতিক্রম করে গেছে। এই বর্ণাঢ্য চিত্রখানি পৃথিবীর একটি বিরাট চিত্রসৃষ্টি হিসেবে স্মরণীয়।

একটা লক্ষ্য করবার জিনিস হ'ল, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেকেরও বেশী ছবি গত যুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত। এবং এই ছবিগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিই যুদ্ধের ভয়াবহতাকে দর্শক-সমক্ষে উপস্থাপিত ক'রে বলতে চেয়েছে—মানুষে মানুষে হানাহানি কারুরই কাম্য নয়। কিন্তু তবু পৃথিবীর কোটী কোটী জনসাধারণের কাতর প্রার্থনাকে উপেক্ষা ক'রে শক্তিমদে মত্ত দুই প্রধান জাতি—রুশিয়া ও আমেরিকা—'শান্তির জন্য যুদ্ধ চাই', এই বিচিত্র বুলি আউড়িয়ে সমগ্র পৃথিবীকে ভীতসন্ত্রস্ত ক'রে তুলছে ক্ষণে ক্ষণে। কম্যুনিষ্ট এবং ডেমোক্র্যাটিক—উভয় শক্তিই আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে জীবনসম্পদকে চিরতরে স্তব্ধ করবার সর্বনাশা আনন্দে মেতে

বিক্ষত হয়েছিল। ফরাসী ছবি স্বভাবতঃই যৌনগন্ধী হয়ে থাকে—এ ছবিখানিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবু মানবিক আদর্শকে বিচিত্র সংঘাতের মধ্যে প্রোজ্জ্বল ক'রে চিত্রিত করার জন্যে "দি ক্রসিং অব দি রাইন" একটি স্মরণীয় চিত্র। পূর্ব জার্মানীর "প্রোফেসর ম্যামলক" জার্মানীতে ইহুদীবিতাড়নপর্বে একজন অতি-বিখ্যাত, মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ শল্য-চিকিৎসকের বলি হবার জাজ্জ্বল্যমান চিত্র। ম্যামলকের চরিত্রাভিনেতা একজন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ অসামান্য চিত্র-শিল্পী। পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ এবং জাতিগত শত্রুতা সত্ত্বেও প্রেমের অমৃত অঞ্জন দু'টি নরনারীকে অন্তরের দিক দিয়ে কতখানি সান্নিধ্যে আনতে পারে, তারই বলিষ্ঠ চিত্র হচ্ছে হাঙ্গেরীর "আলবা রেগিয়া"। আর্জেণ্টিনার "আমোরিনা", পূর্ব জার্মানীর রঙ্গীন চিত্র "হাতিফা" এবং সৌদী আরবের "সেভেন ডটার্স"ও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে দর্শকদের খুশী করেছে। ফ্রান্সের "টু লাভ ইজ এনাফ" হচ্ছে ঈশ্বরজানিত মেয়ে বার্নাডেট-এর জীবন-কাহিনী; কিন্তু জেনিফার জোন্স অভিনীত আমেরিকান চিত্র "সঙ অব বার্নাডেট" এই ফরাসী চিত্রটি থেকে ঢের বেশী নাট্যসমৃদ্ধ এবং উন্নত-ধরনের চিত্র। আর মেক্সিকোর "ম্যাকারিও"র গল্প বাঙালী দর্শক বহু আগে দেখেছে—তুলসী লাহিড়ী পরিচালিত "মায়া কাজল" এবং ধীরেন গাঙ্গুলী পরিচালিত "এক্সকিউজ মী স্যার" ছবির মাধ্যমে। সবশেষে বলব পোল্যাণ্ডের "নাইট্স অব টিউটনিক অর্ডার"-এর কথা। আমরা সিসিল-ডি-বি-মিল-এর কৃপায় "টেন কমাণ্ডমেণ্টস", "কিং অব কিংস", "সাইন অব দি ক্রশ" প্রভৃতি বহু বড় জাঁকজমকপূর্ণ ছবিই দেখেছি। কিন্তু ইস্টম্যান কলারে তোলা, আলেকজান্ডার ফোর্ড পরিচালিত এই

'আহ্বান' চিত্রের একটি দৃশ্যে হেমাঙ্গিনী দেবী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

উঠেছে। বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশু এবং সাম্প্রতিককালে গান্ধী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে বেঁচে গেছেন!

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

আহ্বান : একতা চিত্রের নিবেদন; ১১৩৫৩ ফুট দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : পঙ্কজকুমার মল্লিক; গীত-রচনা : শৈলেন রায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা মুখোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : অমূল্য বসু; শব্দধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, সুজিৎ সরকার, শ্যামসুন্দর ঘোষ, সুশীল সরকার ও সুনীল ঘোষ; সম্পাদনা : সুবোধ রায়; শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র; রূপায়ণে : অনিল চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, প্রশান্তকুমার, অনুপকুমার, প্রেমাংশু বসু, সুখেন দাস, পারিজাত বসু, হেমাঙ্গিনী দেবী, নিভাননী, শোভা সেন, সন্ধ্যা রায়, লিলি চক্রবর্তী, শিপ্রা মিত্র, গীতা দে প্রভৃতি। সিনে ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১০ই নভেম্বর থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

গরীব, জীর্ণকুটিরবাসিনী রহিমের-মা, আর পল্লীগ্রামের ছেলে হয়েও শহরের বাসিন্দা, তরুণ অধ্যাপক বিমল। গ্রামের পথে চলতে চলতে দুজনে হয় আকস্মিকভাবে মুখোমুখী, আর সঙ্গে সঙ্গেই স্নেহকাঙাল হৃদয়ের তাগিদে বিমল হয়ে ওঠে রহিমের মার আদরের গোপাল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ভ্রাতুষ্পুত্র বিমল দরিদ্র যবনী রহিমের-মাকে অনাথা কাঙালিনী ভেবে দয়া করে—সামান্য অর্থসাহায্য ক'রে। মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বান সে শুনেও শোনে না; তাই দেখি, যখনই রহিমের-মা 'গোপাল' ব'লে ডেকে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, সে বারে বারে তাকে অর্থসাহায্য ক'রে ছোট করে। এমন কি অত্যন্ত ভোরবেলা যখন রহিমের-মা তার গোপাল ভালো দুধ খেতে পায় না ব'লে একঘটি দুধ নিয়ে তার সামনে ধরে তখনও সে সেই স্নেহের দানের দাম দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাত্র ছবির শেষের দিকে যখন রহিমের-মা গঙ্গাজলে গা ডুবিয়ে অসুস্থ বিমলের শিয়রে এসে বসে, মাত্র তখন থেকে বিমল যেন বুদ্ধাকে নিজের মার আসনে বসাতে সক্ষম হয়। মৃতা রহিমের-মাকে কবরস্থ ক'রে প্রথম মাটি দিয়ে বিমল চোখের জল ফেলে এবং এইখানেই আসল গল্পের সমাপ্তি। এই মূল গল্পের সঙ্গে অল্পাঙ্গী ক'রে জড়াবার চেষ্টা হয়েছে একটি মামুলী প্রেমের কাহিনীকে এবং এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো হয়েছে সরলা পল্লীবালা ও শহরে উগ্রাধুনিকাকে। বলা বাহুল্য, চিরাচরিত প্রথামত শেষ পর্যন্ত পল্লীবালাই নায়কের গলায় বরমাল্য দিয়ে ধন্য হয়েছে এবং উভয়ে সম্মিলিতভাবে রহিমের-মার কবরে পুষ্পবর্ষণ ক'রে পরলোকগতার আত্মাকে তৃপ্ত করেছে। বিভূতিভূষণের এই ছোট্ট কাহিনীটিকে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় দর্শকদের অন্তরস্পর্শী করে তোলবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

প্রযোজক-চিত্রশিল্পী অমূল্য বসুর চিত্রগ্রহণও মামুলীর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি কোনোখানে। এই ছবিতে বাস্তবধর্মী মুড-ফোটোগ্রাফী করবার প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে ছবি তুলে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আর বহু কুশলী শব্দধারকের কাজ করেছেন ব'লে এবং ছবির অনেকখানি অংশ বহির্দৃশ্য ব'লে ছবির বহু সংলাপই ঠিকমত বুঝতে পারা যায় না। সুনীতি মিত্রের শিল্পনির্দেশনা ও সুবোধ রায়ের সম্পাদনাও উল্লেখযোগ্য। ছবিতে পাঁচখানি গান এবং কিছু স্তোত্র আছে। এর মধ্যে "বন্ধুরে—আমার ঘুড়ি উড়িয়ে দিলাম তোমার গগনে"— গানখানিই সুরে এবং গাওয়ার দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। আবহ-সঙ্গীতে দৈন্য লক্ষ্য করা গেল বহুস্থানেই।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, প্রত্যেকেরই অভিনয় হয়েছে মামুলী ধরনের। কারণ, নাট্যনৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ কোথায়? সন্ধ্যা রায়ের অভিনয়ের প্রথমদিকে 'কঠিন মায়া'র সন্ধ্যা রায় উঁকি মারছিল ক্ষণে ক্ষণে। অনিল চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংশু বসু, অনুপকুমার, শোভা সেন, শিপ্রা মিত্র, নিভাননী প্রভৃতি অনেকেই কৃতীশিল্পী—বহু চরিত্রে তাঁরা তাঁদের অভিনয়ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু যেখানে গৃহীত চরিত্র সাহায্য করে না, সেখানে তাঁরা কৃতিত্ব দেখাবেন কি উপায়ে? মাত্র কথাগুলিকে নির্ভুলভাবে ব'লে যাওয়া ছাড়া তাঁরা আর কি করতে পারেন?

বিবিধ সংবাদ

এ হপ্তায় দুখানি বাঙলা এবং দুখানি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে।

মা : চিত্ত বসু পরিচালিত এম্-কে-জি প্রোডাক্‌সন্সের চিত্র অনুরূপা দেবীর "মা" কালিকা ফিল্মসের পরিবেশনায় মুক্তি পাচ্ছে রাধা, পূর্ণ, প্রাচী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে। সন্ধ্যারাণী,

দীপ্তি রায়, অনুভা, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, নরেশ মিত্র, পার্থ এবং বাবলু অভিনীত এই ছবিখানি জনপ্রিয়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দর্শকদের অভিবাদন করবে। বহুকাল আগে "মা" নাটকাকারে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল এবং পরে পাইয়োনীয়ার ফিল্ম কোম্পানীর পতাকাতলে নির্মিত ও প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত "মা" ছবিতে ব্রজরাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী কানন অসামান্য নাটনৈপুণ্য দেখিয়ে রসিকজনের হৃদয় জয় করেছিলেন। তাই "মা"-এর নব রূপ দেখবার জন্যে আমাদের আগ্রহের অন্ত নেই।

সন্ধ্যারাগ : শ্রী, ইন্দিরা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে জীবন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত জওলা প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "সন্ধ্যারাগ"। রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কাহিনী "কঙ্কাল" অবলম্বনে রচিত এই ছবিখানিতে সুরারোপ করেছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। পাঠকরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন এই ছবিখানিকে ভারত সরকার কায়রো রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব এবং পরে পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ' চলচ্চিত্রোৎসবে দেখাবার জন্যে নির্বাচিত করেছেন। পরিবেশক —ইস্টার্ণ ফিল্মক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌।

কানন :

প্রযোজক-পরিচালক বি, আর, চোপ্‌রার বহুপ্রতীক্ষিত ছবি "কানুন" ইস্টার্ণ সার্কিট-এর পরিবেশনায় মুক্তি পাচ্ছে প্যারাডাইস, দর্পণা, কালিকা, মেনকা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে। সি, জে, পাবরী রচিত কাহিনীটি একটি হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি করবে ক্ষণে ক্ষণে। এতে অভিনয় করেছেন অশোককুমার, রাজেন্দ্রকুমার, নন্দা, জীবন, নানা পালসিকর, মেহমুদ প্রভৃতি অনেকে।

"তেল মালিশ—বুট পালিশ" :

ওরিয়েণ্ট এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে মেহনতী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ নিয়ে রচিত রাজন ফিল্মসের "তেল মালিশ—বুট পালিশ"। ছবিখানির পরিচালনা করেছেন রমণী দে এবং এতে সুরারোপ করেছেন চিত্রগুপ্ত। অভিনয়াংশে আছেন শেখ মুখতার, চন্দ্রশেখর, কুমকুম, আগা প্রভৃতি।

পোলিশ চলচ্চিত্রোৎসব :

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ শেষ হ'তে না হ'তেই স্থানীয় প্রিয়া সিনেমায় পোলিশ চলচ্চিত্রোৎসব শুরু হবে ১৮ই নভেম্বর থেকে। এই উপলক্ষে উদ্যোক্তা সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা যে প্রদর্শনী-সূচী করেছেন, তা হচ্ছে :—(১) আঁদ্রেজওয়াজদা পরিচালিত "অ্যাসেস্‌ অ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস"—১৮ই, (২) কার্টুন চিত্র "ডেভিল" ও জের্জি কাওয়ালেরাওইজ পরিচালিত "নাইট ট্রেন"—২০এ, (৩) পরীক্ষামূলক কার্টুন "অ্যাটেন্‌শান" ও জে, রাইবকোয়াস্কি পরিচালিত "আওয়ার্স অব হোপ"—২১এ, (৪) কার্টুন চিত্র "সাইক্‌ল্‌ রেস্‌, পরীক্ষামূলক চিত্র "ইট ইজ্‌ এ গ্র্যাণ্ড লাইফ" এবং টি, চ্মিলেওয়েস্কি পরিচালিত "ইভ ওয়াণ্টস্‌ টু স্লিপ"—২২এ এবং (৫) পরীক্ষামূলক কার্টুন "চেঞ্জ অব গার্ড" ও আঁদ্রেজ মুঙ্ক পরিচালিত "ব্যাড লাক"—২৩এ নভেম্বর। উপরে লিখিত তারিখগুলিতে সন্ধ্যা ৬॥টায় প্রিয়া সিনেমায় ছবিগুলি দেখানো হবে।

পোলিশ চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষে পোলিশ কন্সাল মিঃ আর, কাইনস্কি গেল ১৫ই তারিখে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান ক'রে এই উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন এবং এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন।

"অগ্নিশিখা" :

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য রচিত কাহিনী "একটি প্রেমের জন্ম" অবলম্বনে গঠিত শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্র "অগ্নিশিখা"র চিত্রগ্রহণ কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে স্থানীয় টেক্‌নিশিয়ান্স স্টুডিওতে। রাজেন তরফদারের পরিচালনায় নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার এবং অপরাপর ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং নবাগতা শর্মিষ্ঠা। ছবিটিতে সুরারোপ করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

"শ্রেয়সী"র ৩০০তম অভিনয়োৎসব :

স্টার থিয়েটারের "শ্রেয়সী" নাটকের ত্রিশততম অভিনয় হয়ে গেছে গেল ২৮এ অক্টোবর। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে কাল (শনিবার, ১৮ই নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবঙ্কিম কর এবং প্রধান অতিথিরূপে থাকবেন যুগান্তর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা :

"আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ" উপলক্ষে যে-সব বিদেশী অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক, গল্প-লেখক প্রভৃতি কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের ৪ঠা নভেম্বর বিকেলে রবীন্দ্র সরোবরের ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটীর প্রাঙ্গণে চা-পানে আপ্যায়িত করেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটী; ঐদিনই সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে পাঞ্জাব ক্লাব প্রাঙ্গণে বেঙ্গল মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের একটি "কক্‌টেল" পার্টিতে সংবর্ধিত করেন। এবং গেল ৬ই নভেম্বর, সন্ধ্যা ৫-১৫ মিনিটে নিউ সেক্রেটারিয়াটের প্রশস্ত ছাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে বিদেশাগত প্রতিনিধিদের স্মারকবস্তু উপহার দেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তাঁদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকৃত "পথের পাঁচালী"র অংশ, 'পূজারিণী" এবং "যখন সন্ধ্যা নামে" নামে তথ্যচিত্র দেখানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারসচিব শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর সমাগত অতিথিদের যত্ন নিতে ত্রুটি করেননি।

দি প্রোগ্রেসিভ লিটল থিয়েটার :

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র নিবাস প্রেক্ষাগৃহে দি প্রোগ্রেসিভ লিট্‌ল থিয়েটারের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের "নিষ্কৃতি" ও "মুক্তির উপায়" অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। দু'খানি নাটকেরই পরিচালনা করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা সোম।

খেলাধুলা

দর্শক

॥ ভারত সফরে এম সি সি দল ॥

এম সি সি : ২৮৬ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বারবার ৭১, এম জে কে স্মিথ ৫৬, জে টি মারে ৫১ নট-আউট এবং জিওফ পুলার ৪০। বালু গুপ্তে ৭৭ রানে ২, পাই, রামচাঁদ এবং নাদকার্ণী ১টা ক'রে উইকেট)

ও ২য় ইনিংসে ১২৫ রান (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পারফিট ৪৭, জে কে স্মিথ ৪৪ নট-আউট এবং মারে ২৩ নট-আউট)

বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন : ২২৪ রান (অধিকারী ৮৭। নাইট ৩২ রানে ৩, লক ৪১ রানে ৫, বারবার ৩৭ রানে ২ উইকেট)

ও ১৩৭ রান (৭ উইকেটে। স্মিথ ২ রানে, পারফিট ৩৪ রানে এবং মারে ১০ রানে ২টো ক'রে উইকেট)

১ম দিন (৭ই নভেম্বর) : ২৮৬ রানে (৫ উইকেটে) এম সি সি দলের ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। বোম্বাই সি এ দল : ১৯ রান (কোন উইকেট না পড়ে। আপ্তে ১ এবং অধিকারী ১৮ রান ক'রে নট-আউট থাকেন)

২য় দিন (৮ই নভেম্বর) : বোম্বাই সি এ দল : ২১০ রান (৮ উইকেটে। তামহানে ১০ এবং পাই ২ রান করে নট-আউট থাকেন)

৩য় দিন (৯ই নভেম্বর) : ২২৪ রানে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। ১২৫ রানে (১ উইকেটে) এম সি সি দলের ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। বোম্বাই দল : ১৩৭ রান (৭ (উইকেটে)।

বোম্বাইয়ে এম সি সি বনাম বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের তিন দিনের খেলা ড্র গেছে। ভারত সফরে এই নিয়ে এম সি সি দল তিনটি খেলায় যোগদান ক'রে উপর্যুপরি তিনটি খেলা ড্র করলো। রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ান বোম্বাই দলের ভাগ্য ভাল যে, তারা খেলাটি শেষ পর্যন্ত ড্র রাখতে সক্ষম হয়েছে; খেলার তৃতীয় দিনে এম সি সি দলের অধিনায়ক মাইক স্মিথ খেলা ভাঙ্গার ১৫০ মিনিট সময় বাকি থাকতে নিজ দলের ১২৫ রানের (১ উইকেটে) মাথায় ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে যে 'চ্যালেঞ্জ' দিয়েছিলেন বোম্বাই সে 'চ্যালেঞ্জ' নিতে পারেনি; ১৫০ মিনিট সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮৮ রান তো তুলতেই পারেনি বরং ৯৪ রানে ৪টি উইকেট হারিয়ে দারুণ সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। দলের অধিনায়ক পলি উমরিগড় অসুস্থ থাকায় ব্যাট করেননি। আবার নাদকার্ণি নাইটের বলে আহত হ'য়ে মাত্র ৭ রান ক'রে খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হ'ন। ফলে বোম্বাই দলের জয়লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট কমে যায়। এই খেলায় এম সি সি দল পরিচালনা করেন দলের সহ-অধিনায়ক মাইক স্মিথ। ক্রিকেট খেলাকে চিত্তাকর্ষক করার উদ্দেশ্যেই প্রথম দিনে দলের ২৮৬ রানে (৫ উইকেটে) ১ম ইনিংসের এবং তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার ১৫০ মিনিট আগে ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে মাইক স্মিথ যথেষ্ট খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন। বোম্বাই দল এম সি সি দলের এই 'চ্যালেঞ্জের' যোগ্য উত্তর দিতে পারেনি। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত হ'লেও নৈতিক দিক থেকে এম সি সি দলের জয়লাভ হয়েছে।

এম সি সি দলের দুই ন্যাটা খেলোয়াড় পুলার এবং বারবার প্রথম উইকেটে খেলতে নামেন। প্রথম উইকেটের জুটিতে দু'জন ন্যাটা খেলোয়াড়কে সাধারণত দেখা যায় না। দলের ৭৬ রানে পুলার নিজস্ব ৪০ রান ক'রে গুপ্তের বলে বোল্ড হ'ন। পুলার তাঁর ৯৫ মিনিটের খেলায় ৭টা বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। আর এক ন্যাটা খেলোয়াড়—পারফিট ২য় উইকেটে বারবারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন। লাঞ্চের বিরতির সময় দেখা গেল এম সি সি'র ৯৮ রান, ১টা উইকেট পড়ে। উইকেটে তখন খেলছেন বারবার (৪৩ রান) এবং পারফিট (৯ রান)। দলের ১৩৭ রানে বারবার নিজের ৭১ রান ক'রে বিদায় নেন্। ২য় উইকেটের জুটিতে ৫৭ মিনিটের খেলায় দলের ৬১ রান ওঠে। বারবার ৬টা বাউণ্ডারী করেন। পারফিটের সঙ্গে ৩য় উইকেটে খেলতে নামেন এই খেলার অধিনায়ক মাইক স্মিথ। স্মিথ প্রথম দিকে খুব সুবিধা করতে পারেন নি। দলের ১৫৬ রানের মাথায় তিনি খুব জোর রান-আউট থেকে বেঁচে যান। পারফিট হাত জমিয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু নাদকার্ণীর একটা সিদে বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হ'ন। দলের রান তখন ১৬৪। পারফিট ৭৭ মিনিট খেলে তাঁর ৪০ রানে ৩টে বাউণ্ডারী মার দিয়েছিলেন। মাইক স্মিথের সঙ্গে ৪র্থ উইকেটে জুটি বাঁধেন মারে। চা-পানের বিরতির সময় রান গিয়ে দাঁড়ায় ২৫২, ৩টে উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন মাইক স্মিথ (৫৩ রান) এবং মারে (৩৮ রান)। এই ৪র্থ উইকেটের জুটি ভেঙ্গে যায় দলের ২৫৮ রানে। মাইক স্মিথ নিজস্ব ৫৬ রান ক'রে রামচাঁদের বলে উইকেট হারান। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৭৫ মিনিটের খেলায় ৯৪ রান ওঠে। দলের ২৬৭ রানে নাইট (৫ম উইকেট) ৭ রান ক'রে আউট হন। দলের ২৮৬ রানে মাইক স্মিথ প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ফলে মারে ৫১ রান এবং লক্ ৯ রান ক'রে নট-আউট থেকে যান। মারে ৯৩ মিনিট খেলে ৫১ রান তুলেন—বাউণ্ডারী মারেন ৮টা।

প্রথম দিন হাতে মাত্র ২৩ মিনিট খেলার সময় ছিল। বোম্বাই কোন উইকেট না হারিয়ে ১৯ রান করে।

বোম্বাই দল দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৮টা উইকেট হারিয়ে ১৯১ রান করে; মোট রান দাঁড়ায় ২১০, ৮ উইকেটে। ওপনিং ব্যাটসম্যান ভূতপূর্ব টেস্ট খেলোয়াড় অধিকারী ১৯৪ মিনিট খেলে দলের ১৪৩ রানে নিজস্ব ৮৭ রান ক'রে বিদায় নেন্। বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ১০টা। অধিকারীর বিদায়ের পর দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন একমাত্র আমেরিওয়ালা। লক্ ৪১ রানে ৪টে উইকেট পান। এক সময় দেখা যায় ১৪টা বলে লক্ ৩টে উইকেট পেয়েছেন, কোন রান না দিয়েই।

তৃতীয় দিনে বোম্বাইয়ের বাকি ২টো উইকেট পড়ে যায় মাত্র ২০ মিনিটের খেলায়—রান ওঠে ১৪। ২২৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ফলে বোম্বাই ৬২ রানে পিছিয়ে পড়ে।

এম সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭৬ রানে পারফিট (১ম উইকেট) ৬৭ মিনিট খেলে নিজস্ব ৪৭ রান ক'রে আউট হ'ন; লাঞ্চের সময় দলের রান দাঁড়ায় ১০০, ৯০ মিনিটের খেলায়। উইকেটে ছিলেন স্মিথ (৩৩ রান) এবং মারে (১২ রান)। লাঞ্চের পর ২০ মিনিট খেলে স্মিথ দলের ১২৫ রানে (১ উইকেটে) ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বোম্বাই দল খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ১৩৭ রান করে, ৭টা উইকেট হারিয়ে।

॥ ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড ॥

ইংল্যাণ্ড : ৫০০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কেন ব্যারিংটন ১৫১ নট আউট, টেড ডেক্সটার ৮৫, জিওফ পুলার

৮৩, পিটার রিচার্ডসন ৭১। রঞ্জনে ৭৬ রানে ৪ এবং বোরদে ৯০ রানে ৩ উইকেট)।

১ম দিন (১১ই নভেম্বর) : ইংল্যান্ড ২৮৮ (৩ উইকেটে। রিচার্ডসন ৭১, পুলার ৮৩, জে কে স্মিথ ৩৬; ব্যারিংটন ৫২ এবং ডেক্সটার ৩০ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। বোরদে ৬১ রানে ২ এবং রঞ্জনে ৫১ রানে ১টা উইকেট পান)

২য় দিন (১২ই নভেম্বর) : ৫০০ **রানে** (৮ উইকেটে) ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। ভারতবর্ষ (১ম ইনিংস) : ৪২ রান (কোন উইকেট না পড়ে। কন্ট্রাক্টর ৯ এবং মঞ্জরেকার ১৮ রান করে নট আউট। জয়সীমা ৮ রান করে অবসর গ্রহণ করেন)।

৪৫ হাজার দর্শকের সমাবেশে বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট সুরু হয়। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এই খেলাটি পঞ্চবিংশতি টেস্ট খেলা, ভারতবর্ষের মাটিতে উভয় দেশের নবম টেস্ট। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার টসে জয়লাভ ক'রে সর্বপ্রথম ব্যাট করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের পিচ রান তোলার পক্ষে স্বর্গরাজ্য; আবার প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাওয়া যথেষ্ট ভাগ্যের কথা। ইংল্যান্ড সেই ভাগ্যের খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের ৫½ ঘণ্টার খেলায় ইংল্যান্ড ৩ উইকেট খুইয়ে ২৮৮ রান করে। খেলার গোড়াপত্তন খুবই ভাল হয়; ইংল্যান্ড ব্যাটিং-চাতুর্যে দর্শকসাধারণের মনস্কামনা পূর্ণ করে। ব্যাটিংয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন পুলার (৮৩ রান), রিচার্ডসন (৭১ রান) এবং ব্যারিংটন (নট-আউট ৫২ রান)।

কিন্তু ভারতবর্ষের ফিল্ডিংয়ের ব্যর্থতা ইংল্যান্ডের সাফল্যলাভে যথেষ্ট সাহায্য করে। ফিল্ডিংয়ে ব্যর্থতা ছাড়াও ভারতবর্ষকে আর এক মস্ত অসুবিধায় পড়তে হয়। ভারতবর্ষ খেলাতে পূরো শক্তি নিয়ে দল গঠন করতে পারেনি। দলের নির্বাচিত খেলোয়াড় উমরিগড় এবং উইকেট-রক্ষক ইঞ্জিনিয়ারকে দলে পাওয়া গেল না। তাঁরা দু'জনেই আহত থাকার দরুণ খেলতে অক্ষম। এই দু'জনের স্থান পূরণ করা হ'ল বসন্ত রঞ্জনে এবং উইকেট-রক্ষক কুন্দরামকে দলভুক্ত ক'রে।

ফিল্ডিংয়ে ভারতবর্ষের ব্যর্থতা নতুন ব্যাপার নয়—ইতিহাসের মতই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ইংল্যান্ডের রান সবে মাত্র ১৩ এবং পুলার ৯ রান করেছেন। এই সময়ে দেশাইয়ের বলে পুলার সিলি পয়েন্ট এবং গালীর মধ্যিখানে বেশ উ'চু করে

বি কে কুন্দরাম

'ক্যাচ' তুললেন। বলটা মাটিতে পড়তে যে সময় লাগলো তার অনেক আগেই কন্ট্রাক্টার এবং মিলখা সিং দৌড় দিয়ে গেলে সহজেই ধরে ফেলতেন; কিন্তু তাঁরা দু'জনেই এই রকম ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ছবিতে আঁকা মানুষের মত দাঁড়িয়েই রইলেন। এই ঘটনার পাঁচ মিনিট পরেই রিচার্ডসন রঞ্জনের বলে 'ক্যাচ' তুলে দিলেন। এবার ধরার পালা পড়লো উইকেট-রক্ষক কুন্দরামের; বলটা কুন্দরামকে কলা দেখিয়ে কৃপাল সিংকে তাড়া করে।

জিওফ পুলার

কৃপাল সিং অন্যমনস্ক থাকার দরুণ রিচার্ডসন আউট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেলেন। দলের রান এই সময় ছিল মাত্র ১৯। রিচার্ডসন ভারতবর্ষের ফিল্ডিংয়ের দৌড় বুঝে নিলেন। এই

কেন ব্যারিংটন

আলোচ্য ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের প্রথম টেস্ট খেলার দু'দিনে নিম্নলিখিত চারটি রেকর্ড হয়েছে :

ইংল্যান্ডের পক্ষে রেকর্ড

(১) ইংল্যান্ড ৫০০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) : ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বাধিক রানের রেকর্ড।

পূর্ব রেকর্ড : ৪৫৬ রান, বোম্বাই, ১৯৫১-৫২।

(২) ১ম উইকেটের জুটিতে ১৫৯ রান (রিচার্ডসন এবং পুলার) : ভারতবর্ষের বিপক্ষে সমস্ত টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে রেকর্ড।

পূর্ব রেকর্ড : ১৪৬ রান (পার্কহাউস এবং জিওফ পুলার), লীডস, ১৯৫৯।

উইকেট-কিপিংয়ে ভারতীয় রেকর্ড

(৩) প্রথম ইনিংসে ভারতবর্ষের উইকেট-রক্ষক কুন্দরাম পাঁচজনকে আউট করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড স্থাপন করেন।

পূর্ব রেকর্ড : এক ইনিংসে ৪টি—পি জি যোশী, নিউদিল্লী, ১৯৫১-৫২; পি সেন, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২; এম কে মন্ত্রী, লর্ডস, ১৯৫২।

॥ ব্যক্তিগত রেকর্ড ॥

(৪) ১৫১ রান (নট আউট)—কেন ব্যারিংটন। ব্যারিংটনের টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

রিচার্ডসনই লাঞ্চের পরের খেলায় বোরদের বলে কুমারের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে পিছলে গেলেন—কুমার বলটা ধরেও

টেড ডেক্সটার

নরি কণ্ট্রাক্টর

হাতে রাখতে পারেন নি। দলের রান তখন ১১০, রিচার্ডসনের ৪৭।

দুই ন্যাটা খেলোয়াড় রিচার্ডসন এবং পুলার ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা করেন। লাঞ্চের বিরতির সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৯১, কোন উইকেট না পড়ে। রিচার্ডসন ৩৮ রান এবং পুলার ৫১ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পরের খেলায় দলের ১৪৬ রানের মাথায় দুরানীর বলে পুলার বাউন্ডারী ক'রলে দলের ১৫০ রান পূর্ণ হয়। ফলে প্রথম উইকেটের জুটিতে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের রেকর্ড সৃষ্টি হয়। পূর্বের রেকর্ড ১৪৬ রান—(পুলার এবং পার্ক হাউস, লীডস, ১৯৫৯ সাল)। দলের ১৫৩ রানের মাথায় বোরদের নো-বলে পুলার ওভার-বাউন্ডারী মেরে ৬ রান যোগ করেন। দলের রান দাঁড়ায় ১৫৯। বোরদে পুলারকে এতক্ষণে বুঝতে পারলেন। বোরদের পরবর্তী বলেই দ্বিতীয়বার ওভার-বাউন্ডারী করার জন্যে ক্রিজ ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে যান; কিন্তু বলে ব্যাট লাগাতে পারলেন না। বলটা পুলারকে অতিক্রম ক'রে কুন্দরামের হাতে গেল ও কুন্দরাম পুলারকে স্টাম্প-আউট করলেন। ইংল্যান্ডের ১৫৯ রানে প্রথম উইকেট পড়লো। পুলার এবং রিচার্ডসন ১ম উইকেটের জুটিতে ১৫৯ রান ক'রে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় রেকর্ড করেন। পুলার খেলেছিলেন ১৭০ মিনিট। তাঁর মোট ৮৩ রানে ছিল ১০টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারী।

পুলারের বিদায়ের পর দলের ১৬৪ রানে বোরদের বলেই রিচার্ডসন কুন্দরানের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হ'ন। রিচার্ডসন উইকেটে ছিলেন ১৮৭ মিনিট, এবং বাউন্ডারী করেছিলেন ৭টা।

২য় উইকেটের জুটিতে মাত্র ৫ রান ওঠে। এর পর তৃতীয় উইকেটে জুটি বাঁধেন ব্যারিংটন এবং মাইক স্মিথ। চা-পানের বিরতির সময় দলের রান দাঁড়ায় ২০৯, ২ উইকেটে।

দলের ২১৭ রানে ভারতবর্ষ নতুন বল পেয়ে ৩য় উইকেটের জুটি ভেঙে দেয়। ইংল্যান্ডের ২২৮ রানে মাইক স্মিথ (৩য় উইকেট) নিজস্ব ৩৬ রান ক'রে কুন্দরামের হাতে ধরা পড়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। এই দিন মাইক স্মিথকে 'সান গগলস' পরে খেলতে দেখা যায়। ৪র্থ উইকেটে ব্যারিংটনের সঙ্গে অধিনায়ক টেড ডেক্সটার জুটি বাঁধেন। ব্যারিংটন এবং ডেক্সটারের ৪র্থ উইকেটের জুটি এই দিন ৬০ রান তুলে দিয়ে অপরাজেয় থাকেন। দলের রান দাঁড়ায় ২৮৮, ৩ উইকেট পড়ে।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ড চা-পানের বিরতির পর ২০ মিনিট খেলে এবং দলের ৫০০ রানের মাথায় ৮ম উইকেটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়ক টেড ডেক্সটার প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় দিনে ৫টা উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ড ২৬০ মিনিটে ২১২ রান যোগ করে। ইংল্যান্ডের ৮ উইকেটে ৫০০ রান তুলতে ৫৯০ মিনিট সময় লাগে।

লাঞ্চের বিরতির সময় ইংল্যান্ডের রান গিয়ে দাঁড়ায় ৩৮৯, ৩ উইকেট পড়ে। উইকেটে ব্যারিংটন ৯৭ এবং ডেক্সটার ৮৫ রান করে নট আউট থাকেন।

লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভের প্রথম বলেই ডেক্সটারকে তাঁর ৮৫ রানে দুরানী আউট করেন। ডেক্সটার মোট ৩ ঘন্টা খেলে ১১টা বাউন্ডারী মেরেছিলেন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন ১৬১ রান তুলে দেন। ব্যারিংটনের সঙ্গে ৫ম উইকেটে খেলতে নামেন বারবার। ব্যারিংটন তাঁর সেঞ্চুরী রানের মুখে খুব বেশী সতর্ক হয়ে খেলেছিলেন। ৯৬ রানের পর ১২ মিনিটের খেলায় কোন রানই করেননি; উইকেট বাঁচিয়ে বল আটকেছিলেন। শেষ ১০ রান করতে ৪৫ মিনিট সময় নিয়েছিলেন। দুরানীর বল স্কোয়ার লেগে পাঠিয়ে ব্যারিংটন দলের ৪০০ রান পূর্ণ করেন। দলের এই রান তুলতে ৪৭৫ মিনিট সময় লাগে। দলের ৪০০ রান পূর্ণ হওয়ার পরও ইংল্যান্ড মন্থরগতিতে রান করে। ৫ম উইকেট (বারবার) পড়ে দলের ৪৩৪ রানে। ৫ম উইকেটের জুটিতে ৪৫ রান ওঠে, ৬৭ মিনিটের খেলায়। মারে ৬ষ্ঠ উইকেটে যোগ দেন। ইংল্যান্ডের ৪৫৬ রানের মাথায় কণ্ট্রাক্টর নতুন বল আনলেন। নতুন বল নিয়ে খুবই ভাল ফল পাওয়া গেল। রঞ্জনে এই নতুন বলে তাঁর এক ওভারে মারে এবং এ্যালেনকে আউট করলেন। তৃতীয় বলে মারে এবং পঞ্চম বলে এ্যালেন আউট হন। এ্যালেন মাত্র একটা বল কোনরকমে ঠেকিয়েছিলেন। ৪৫৮ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম উইকেট পড়ে যায়।

চা-পানের বিরতির সময় দেখা গেল ইংল্যান্ডের ৪৮০ রান, ৭টা উইকেট পড়ে। ৮ম উইকেটে তখন অপরাজেয় আছেন ব্যারিংটন ১৪৩ রান এবং টনি লক্ ১১ রান করে। চা-পানের বিরতির পর ইংল্যান্ড ২০ মিনিটের খেলায় ২০ রান যোগ করে। দলের ৫০০ রানের মাথায় রঞ্জনের বলে লক্ বোল্ড আউট হন আর সঙ্গে সঙ্গে ডেক্সটার প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন। দলের ১৫৯ রানের মাথায় ১ম উইকেট পড়লে ব্যারিংটন খেলতে নামেন এবং ৪২০ মিনিট খেলে নিজস্ব ১৫১ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। ব্যারিংটন ১৫টা বাউন্ডারী মেরেছিলেন।

এইদিন নতুন বলে রঞ্জনে ৭ ওভার বল করে মাত্র ২৫ রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান।

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসে এইদিনের এক ঘন্টার খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ৪২ রান শোধ করে দেয়। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের সূচনা করেন নরী কণ্ট্রাক্টর এবং জয়সীমা। দলের ১০ রানের মাথায় ব্রাউনের বাম্পার বলে জয়সীমা কাঁধে আঘাত পান এবং এইদিনের মত খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর শূণ্যস্থানে খেলতে নামেন মঞ্জরেকার। ১৩।১১।৬১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

॥ ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা ॥

২৯শে বৈশাখ ১৩৬৮—১২ই শ্রাবণ ১৩৬৮

১২ই মে ১৯৬১—২৮শে জুলাই ১৯৬১

অমৃত

অমৃত

অমৃত

সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

প্রমেন্দ্র মিত্রের নূতনতম কাব্যগ্রন্থ

কখনো মেঘ ৪·০০

[প্রচ্ছদ ও গ্রন্থনের অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল]

কানাই সামন্তের

রবীন্দ্র প্রতিভা ১০·০০

[বিশাল রবীন্দ্রকৃতি ও রবীন্দ্র প্রতিভার আলোচনা গ্রন্থ]

চৌদ্দখানি আর্ট প্লেটে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর, তাঁর আঁকা ছবি ও পেন্সিল স্কেচ, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

দক্ষিণের বারান্দা ৪·০০

[শিল্পগুরু অবনীন্দ্র-দৌহিত্রের লিখিত **রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য** খ্যাতিমান গুণী ব্যক্তিদের ঘরোয়া জীবনের **ঘটনাবলী সম্বলিত স্মৃতিকথা।**]

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই কার্তিকের বই

সাহিত্য আকাদমি কর্তৃক রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশেষজ্ঞরূপে পুরস্কার-প্রাপ্ত—'রবীন্দ্রজীবনী'-কার

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

রবি-কথা ৩·৫০

প্রমথ চৌধুরীর (**বীরবল**)

সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা ৫·০০

(সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ, গ্রন্থ-পরিচয় ও অপ্রকাশিত কবিতা)

[বিশেষ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সম্পাদিত

বনফুল-এর
মনোরম উপন্যাস
জলতরঙ্গ
৪·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
আকাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস
কলকাতার কাছেই
৬·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
রসঘন উপন্যাস
অনষ্টুপ ছন্দ
৪·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
নবতম উপন্যাস
ইস্পাতের ফলা
৩·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
উপন্যাস
বার ঘর এক উঠোন
৭·৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপন্যাস
দেবকন্যা
৪·৫০

প্রশান্ত চৌধুরীর
নবোপন্যাস
স্বগতোক্তি
৩·২৫

দীপক চৌধুরীর
উপন্যাস
নীলে সোনায় বসতি
৩·৫০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
উপন্যাস
অভিষেক
৭·৭৫

আমাদের প্রকাশনার মনোরম গল্পগ্রন্থসমূহ

প্রমেন্দ্র মিত্রের **সপ্তপদী** ২·৫০ ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **মালাচন্দন** ২·৫০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কায়কল্প** ৩·৫০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রূপহলুদ** ২·৫০ ॥ দেবেশ দাশের **রোম থেকে রমনা** ৩·৫০ ॥ অনুরূপা দেবীর **ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মিলন-সেতু** ২·৫০ ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসুর **বাজীমাৎ** ১·৭৫ ॥ জ্যোতির্ময় ঘোষের ('ভাস্কর') **ফাংশন** ৩·০০ ॥

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Firday, 24th November 1961
40 Naya Paise.

কর্ণেল ভট্টাচার্য পাকিস্থানী সামরিক আদালতের দ্বারা দণ্ডিত হওয়ায় ততখানি দুঃখও ছিল না, বিস্ময়ও ছিল না। কারণ পাকিস্থানী সরকার কর্ণেল ভট্টাচার্যকে যে মুহূর্তে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হন, সেই মুহূর্তেই তাঁর ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধে আইনসংগত বিচার যে হবে না, সাক্ষ্য-প্রমাণ যে উপস্থিত করা যাবে না, বিচার যে প্রহসনে পরিণত হবে এবং তিনি যে দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করবেন—একথা কি অপ্রত্যাশিত ছিল? ভারতবর্ষের বহু পত্র-পত্রিকা কর্ণেল ভট্টাচার্য সম্বন্ধে শোকপ্রকাশ করে বলেছেন যে, তাঁকে জংলী আইন এবং বর্বরোচিত বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্থানের কাছে এর চেয়ে ভদ্র, শোভন, কিংবা ন্যায়সংগত আর কি ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায়? পাকিস্থানে স্বনামখ্যাত হিন্দু নেতারা প্রত্যেকেই এই জংলী বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন এবং প্রত্যেকের উপরেই অবমাননা, পীড়ন এবং লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হয়েছে। তবু, আইনত দেখতে গেলে তাঁরা ছিলেন পাকিস্থানেরই নাগরিক, কেউ কেউ প্রাক্তন মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি।

অপরদিকে কর্ণেল ভট্টাচার্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর লোক। তাঁকে পাকিস্থান যখন একবার গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে তখন পীড়ন ও লাঞ্ছনার কোনো অবশেষ রাখা হবে না, একথা আমাদের জানা ছিল। কাজেই সেখানে আমাদের বিস্ময়ের কারণ নেই। দুঃখেরও কারণ নেই এই জন্য যে, শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের হস্তে নিজ সৈনিকের লাঞ্ছনা প্রত্যেক দেশকেই সহ্য করতে হয়েছে এবং এই লাঞ্ছনাই কর্ণেল ভট্টাচার্যকে স্বদেশে বীরের সম্মান দেবে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ আছে অন্যত্র, দুঃখেরও কারণ সেইখানেই।

গত সোমবার পার্লামেণ্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্ণেল ভট্টাচার্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেই বিবৃতি অপ্রত্যাশিত, রূঢ় এবং কূটনৈতিক-বুদ্ধিহীন। একথা দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে, এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিতে প্রধানমন্ত্রী যতটুকু বুদ্ধি এবং সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন, কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রের কাছ থেকেও তার চেয়ে বেশী সতর্কতা এবং বুদ্ধিমত্তা আশা করা যায়। কর্ণেল ভট্টাচার্য সম্বন্ধে ভারত সরকার কতখানি দৃঢ় বা কতখানি নমনীয় নীতি গ্রহণ করবেন, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে এই মামলা সম্বন্ধে পাকিস্থানী বক্তব্যকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দেওয়া ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর

> **বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**
>
> "অমৃতের" আগামী সংখ্যা থেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং অদ্বিতীয় ভ্রমণ-কাহিনী-লেখক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের
>
> **"রাশিয়ার ডায়েরী"**
>
> ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

পক্ষে বুদ্ধিমত্তারও পরিচায়ক নয়, কূটনৈতিক অভিজ্ঞতারও নিদর্শন নয়। তিনি বলেছেন যে, মামলার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে : কর্ণেল ভট্টাচার্যকে কোথায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পাকিস্থানী ভূমিতে, অথবা ভারতীয় জমিতে? "আমাদের বক্তব্য অবশ্যই এই যে, তাঁকে ভারতীয় জমি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে" এবং একথা যদি সত্য হয় তাহলে ঘটনাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত আপত্তিজনক। কিন্তু—আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেই যোগ করছেন—পাকিস্থানী বক্তব্য হচ্ছে যে, তাঁকে পাকিস্থানের জমিতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তা যদি সত্য হয়, স্বভাবতই কর্ণেল ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগও উঠতে পারে।

বক্তৃতাটি লক্ষণীয় এই জন্য যে, ভারতীয় বক্তব্য তিনি একবারও জোরালোভাবে প্রকাশ করেননি এবং বারবারই বলেছেন যে, ভারতীয় বক্তব্য "যদি সত্য হয়" তাহলে—ইত্যাদি। অন্যদিকে পাকিস্থানের গাওনাও তিনি নিজেই গেয়ে দিচ্ছেন, অন্তত চার বার তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যদের বোঝাতে চেয়েছেন পাকিস্থানের আসল বক্তব্যটা কি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই পাকিস্থানের পক্ষের কৌশুলি নন। কিংবা ভারতীয় পার্লামেণ্টও আন্তর্জাতিক আদালতের অধিবেশন-কক্ষ নয়। পাকিস্থানের বক্তব্য চার বার সেখানে জোর দিয়ে উল্লেখ করার কি দরকার ছিল? প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিটি পড়লে যে-কোনো নিরপেক্ষ লোকের সন্দেহ হতে পারে যে, ভারতীয় পক্ষের সত্যতা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত নন। এই সন্দেহ কি তিনি অসতর্কতা-বশত সৃষ্টি করেছেন? অথবা কেনেডি-ক্রুশ্চেভ দূতিয়ালীর পর ১৫ দিনে তিনি এতই ক্লান্ত যে, পার্লামেণ্টে একটি কূটনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাঁর মস্তিষ্ক শিথিল এবং চিন্তাশক্তি ঝাপসা হয়ে এসেছিল? মোটকথা, ভারতের বিপক্ষে এবং দেশমাতৃকার একটি সৈনিক সন্তানের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন একটি বিবৃতি দেওয়ার কোনো অধিকার তাঁর ছিল না। হয় তিনি নীরব থাকুন, নতুবা কর্ণেল ভট্টাচার্যের পক্ষেই ওকালতি করুন। পাকিস্থানের উকীলের ওকালতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে কেউ শুনতে চায়নি। পাকিস্থানে কর্ণেল ভট্টাচার্যের ৮ বৎসর কারাদণ্ড হোক দুঃখ করব না। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেণ্টে তাঁর উপর দ্বিতীয় দণ্ডাদেশের ঘটনা যদি দেখতে হয়, সে আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য, সে আমাদের সমরবাহিনীর অপমান।

প্রজাপতি

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

সে আছে কোথাও নিশ্চিত মনে জানি,
প্রতিদিন তাই বিষন্ন রাজধানী
রূপে আর রসে ফিরে ফিরে রাজা হয়
সন্ধ্যায় আলো চমকিয়ে ওঠে পথে
বেসামাল হাওয়া জানলায় কোন মতে
সমুদ্র থেকে ছুটে এসে কথা কয়।

সে আছে কোথাও এই স্থির বিশ্বাসে
প্রতিদিনই বহু লঘু প্রজাপতি আসে
জঞ্জাল দেখে মুখ তুলে তার পাখা
দেখি আর ভাবি কতদিন গেল চলে
তাকে না দেখেই—একটি কথা না বলে,
অথচ ভুবন কতই না রঙে সাজা।

জ্বরের প্রলাপে

করুণাসিন্ধু দে

জ্বরের প্রলাপে নাকি বার বার ডেকেছি তোমায়
টবে ফোটা ঝরা ফুল, মরা যুঁই, বেদনার মতো,
চক্রবাক-কান্না নিয়ে জীর্ণ দেহে বিশীর্ণ শয্যায়
আতপ্ত করেছি শুধু পাঁজরের হাড় অবিরত।

মনে হলো দু' চোখের জ্বালা-করা আকাশের তলে
হঠাৎ নেমেছি যেন অন্ধকার বিবর্ণ প্রহরে,
কপালের দু'টি রগে দপ করে আলো ওঠে জ্বলে,
যন্ত্রণায় তুমি এলে, যন্ত্রণায়, সারা দেহে, জ্বরে।

গোলাপ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার নিরশ্রু স্তব্ধ দুঃখের বাগানে
অজস্র গোলাপ আজ উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুটে আছে,
আঁকাবাকা ধারালো কাঁটার মুখে
রক্তের অজস্র জয়টীকা।

সুস্মিত কৌতুকে তারা সবাই আমার মুখপানে
তাকিয়ে রয়েছে তারা যমকে রূপকে অনুপ্রাসে
আমার সমস্ত দুঃখ অলঙ্কারে বিচিত্রিত ক'রে
দৃপ্ত ধ্বজা ধ'রে আছে অকিঞ্চন মাটির উপরে!

মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে সম্প্রতি কিছু আলোচনা শুরু হ'য়েছে। এ আলোচনায় সুফল কতোটা দেখা দেবে তা জানিনে। কারণ এদিকে ইতিপূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'য়েছে, কিন্তু তাতে কেউ কান দেননি।

যতোদূর মনে পড়ে, আটদশ বছর আগে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির কাছে সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত মেয়েদের বেশভূষার বিষয়ে একটা নোট পাঠিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল চাকরীজীবী মেয়েদের শাড়ী যেন জাকালো না হয়, আর জামা যেন হয় 'of adequate length. বলা বাহুল্য, এ নির্দেশ আকস্মিক নয়। মেয়েদের বেশভূষার নিশ্চয়ই কোনো অশালীনতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার দরুণ সরকারকে পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে একটা আচরণ-বিধি প্রণয়ন করতে হয়েছে।

তারপর থেকে যমুনায় এবং গঙ্গায় অনেক জল ব'য়ে গেছে। সরকারী কর্ম-চারিণীগণ এই নির্দেশ কতোটা পালন করেছেন তা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু দিল্লী ও কলকাতার নারী সমাজের একটা ক্রমবর্ধমান অংশ যে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে বেশ 'অতি-আধুনিক' হ'য়ে উঠছেন তাতে সন্দেহ নেই।

ফ্যাশন বস্তুটির স্বভাবই বোধহয় এইরকম। যখন তার ভিতর একটা গতি-বেগ দেখা দেয় তখন সে বেনোজলের মতো সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আসে নতুনতর ফ্যাশন, এবং এই ফ্যাশন হয়তো পূর্বতন ফ্যাশনের প্রতিক্রিয়ায় উল্টো দিকে মুখ করে ছোটে। পাঞ্জাবি ও ব্লাউজের ঝুল, চুড়ির প্যাটার্ণ, চুল ছাঁটার কায়দা, সবই এইভাবে সুখ-দুঃখের মতো চক্রবৎ পরিবর্তিত হতে থাকে। এনিয়ে সোরগোল তোলা মোটা-মুটি অর্থহীন।

তবু আলোচনা যখন উঠেছেই তখন কয়েকটা কথা নিবেদন করি।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে প্রথম প্রশ্ন হল, রুচি। কিন্তু রুচি কি প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অমোঘ? যুগে

যুগে রুচিরও তো পরিবর্তন ঘটে! তা যদি হয় তো বেশভূষা বদলাবে না কেন?

বাংলা দেশে এখন যেভাবে মেয়েরা শাড়ী পড়েন তাও তো শাশ্বত নয়। তার প্রচলন ঘটেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার থেকে এবং তার বয়স একশ বছরও পার হয়নি। আর জামা, এখন যদিও অনেক বদলেছে তবু সেকালের সেই লেশ-বসানো পুরোহাতা বা হাফ-হাতা জামা, সেও তো উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় নারীদের পোশাকের অনুকরণে তৈরী। তার আগে কেমন জামা পরতেন ভদ্রমহিলারা? নিশ্চয়ই মুসলমানী ঢঙে। এবং তারও আগে, অর্থাৎ মুসলমান আগমনের আগে? ঠিক বলতে পারব না। হয়তো কাঁচুলি ওড়না জাতীয় কিছু হবে। অন্তত অজন্তার গুহায় আঁকা ছবি দেখলে এই রকমই মনে হয়। কাজেই পোশাকের ব্যাপারটা পরিবর্তনশীল এবং আজ যদি মেয়েরা তাঁদের পোশাকী জামার হ্রস্বতা ঘটিয়ে অন্য ঢঙ আনেন তবে দোষ দেওয়া কঠিন। হতে পারে এটা বাইরের অনুকরণ কিন্তু সে অনুকরণ শুধু মেয়েদের বেলায় দোষনীয়, পুরুষদের বেলায় নয়, এমন তো হতে পারে না। পুরুষেরা যে কী পরিমাণে পাৎলুন-হাওয়াই সার্টে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তা তো চোখ মেললেই দেখা যায়!

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে। কেউ কেউ বলতে পারেন—খাটো জামা যে কুরুচির লক্ষণ এটাও আমাদের অভ্যস্ত চোখের গোঁড়ামি। ধরা যাক, অজন্তার ঐ গুহাচিত্রগুলি। ওগুলির বেশভূষা কি কুরুচিসম্পন্ন? ভারতের ইতিহাসে যাকে স্বর্ণযুগ বলা হয়, সেই সময়ে অংকিত হয়েছিল ঐ চিত্রগুলি। সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ললিত-কলায় সে যুগের যা পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তখনকার মানুষেরা যে কুরুচির সমর্থক ছিল তা মনে হয় না। কাজেই রুচির প্রশ্নও দেখা যাচ্ছে খুবই গোল-মেলে ব্যাপার। এবং চট করে এ বিষয়ে একতরফা রায় দেওয়া কঠিন।

আসলে আজ কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাইয়ের মতো শহর ভারতের ভৌগলিক সীমায় অবস্থিত হলেও তাদের সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার দূরত্ব আগেকার দিনের এ'পাড়া-ও'পাড়া দূরত্বের চেয়েও কম। তাছাড়া শিক্ষার বিস্তার এবং দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ভারতের পুরনো সমাজ-ব্যবস্থাও প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। কাজেই সারা পৃথিবীতে যা ঘটছে এখানেও তাই ঘটবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হয়তো পরিবর্তনটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটায় নানাদিকেই কিছু আতিশয্য দেখা দিচ্ছে। মেয়েদের (এবং পুরুষদের) পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রও তার ব্যতি-ক্রম নয়। যথা সময়ে পরিবর্তনটা ধাতস্থ হলে আবার দেখা দেবে একটা সুস্থতার পরিবেশ। আমরা এই যুগসন্ধির কালটা কতো তাড়াতাড়ি পার হতে পারি সেইটেই হল আসল কথা। তার আগে যতো আলোচনাই করা হোক, সবই হবে অরণ্যরোদন।

* * *

সংসারে সবই অনিত্য। এমন কি পুলিশের লাল পাগড়ীও!

সম্প্রতি জানা গেল, কলকাতা পুলিশের মাথার সেই লাল পাগড়ীর পরিবর্তে দেখা দেবে নীল টুপি। সম্ভবত 'লাল পাগড়ী' কথাটার সঙ্গে যে একটা আতংক এবং বিরূপতার ভাব ব্রিটিশ আমল থেকে জমে উঠেছে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকারের এই ব্যবস্থা। কিন্তু স্বীকার করব, 'লাল পাগড়ী' পরিহিত পুলিশ না দেখলে কলকাতার রাস্তা আমার কাছে অনেক কুৎসিত এবং নিষ্প্রাণ মনে হবে। পিচঢালা ধূসর পথের উপর সাদা পোশাকপরা পুলিশের মাথায় ঐ লাল ছোপটা আমার কাছে ফুলের মতো মনে হতো। বেশ লাগত দেখতে।

কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। লাল রক্ত নীল হ'য়ে গেল।

তা যাক, আমাদের মুখের ভাষায় এবং সাহিত্যেও 'লাল পাগড়ী' কথাটা কি লোপ পেয়ে যাবে এবার? না বোধ হয়। পুলিশের মাথায় নীল টুপি উঠলেও ঐ 'লাল পাগড়ী' যে চট ক'রে আমাদের মন থেকে উধাও হবে এমন আশংকা নেই। 'সূর্যোদয়', 'সূর্যাস্ত' কথাগুলো যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের কৃপায় অসার জানা সত্ত্বেও, আমরা পৃথিবীকে স্থির কল্পনা করে সূর্যকেই উদিত এবং অস্তগামী করি, সেই রকম 'লাল পাগড়ী' কথাটাও হয়তো বেঁচে থাকবে বহুকাল।

আর তারপর? ধীরে ধীরে স্থান লাভ করবে রেফারেন্স বইয়ে—যেমন স্থান পেয়েছে 'নীল বাঁদর', 'কালাপানি' ইত্যাদি উক্তি।

তবে তার আগে পুলিশকে শুধু তার মাথার পোশাক নয়, মনের পোশাকটাও বদলাতে হবে।

* * *

ক্রিকেট! অন্ধকারে কে যেন সুইচ টিপে দিল। আলো জ্বলে উঠল সারা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে। আলোকিত মুখে, আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান বুকে আবালবৃদ্ধবনিতার আজ এইটাই আলোচ্য বিষয়—ক্রিকেট!

বোম্বাইয়ের খেলায় যে-ফল সকলেই আশা করেছিলেন তাই ঘটেছে, অর্থাৎ ড্র। ততঃ কিম্? ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের মতো সব মাঠই যে ইতিহাসের পুনরা-বৃত্তি ঘটাবে এমন তো না-হতে পারে! কাজেই নতুন করে দু পক্ষের খেলোয়াড়-দের তুলনামূলক বিচারে বসতে হয়। এবং এসব আলোচনায় মতৈক্য যতেটা ঘটে তার চেয়ে মতভেদের মাত্রা হয় অনেক বেশী। কাজেই হাজার রকম সংখ্যাতত্ত্ব এবং ঠিকুজি-কুষ্ঠির উদ্ধারে আসরটা বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। কিন্তু ভবিষ্যৎ খেলার অনিশ্চয়তা তাতে একরত্তিও কমে না। কারণ খেলাটা খেলাই।

খেলায় হার-জিৎ আছে, ড্র আছে; কিন্তু আসল ব্যাপার খেলার ফলাফল নয়, কেমন করে খেলা হল সেই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে সব চেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার। এইদিক থেকে খেলা, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলা প্রায় শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনীয়। শুধু গন্তব্যস্থল নয়, কেমন করে যাওয়া হল সেই পথটাও আমাদের জানা থাকা চাই। অর্থাৎ নির্যাস নয়, আমরা চাই ফুল। তাই ক্ষণে ক্ষণে পথচারীর কাছে 'রেজাল্ট' জিজ্ঞাসা করে মনের কৌতূহল মেটে বটে, চোখের তৃষ্ণা মেটে না। আর তাই সম্ভব-অসম্ভব সকলের কাছে একই প্রশ্ন—টিকিট আছে?

না নেই। যতো চোখ দেখতে চায় ততো টিকিট নেই। থাকা সম্ভব নয় বলেই নেই। সারা কলকাতা শহরকে তো স্টেডিয়াম বানানো যায় না!

অবশ্য যাঁরা টিকিট পাবেন তাঁরা ভাগ্যবান। আর যাঁরা শেষ মুহূর্তে হঠাৎ একখানা জোগাড় করতে পারবেন তাঁরা আরো ভাগ্যবান। কিন্তু যাঁরা পাবেন না, তাঁরাই বা হতাশ হবেন কেন? 'আকাশবাণী' থেকে যে ধারা-বিবরণী শোনানো হয়, সেটাও কি কম আকর্ষণীয়? আমার তো মনে হয় সারাদিন কষ্ট করে খেলা দেখার চেয়ে ঘরে বসে খেলা 'শোনা' আরো লোভনীয়। কারণ প্রথমটা যদি হয় গন্ধমাদন, দ্বিতীয়টা বিশল্যকরণী। ঘরে বসে বিশল্যকরণী পেলে অনর্থক গন্ধ-মাদন বয়ে লাভ কী?

(পাঠক! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি হাসছেন! নিশ্চয়ই আপনার পকেটে টিকিট আছে। কিন্তু আমি যদি এইভবে শান্তি পাই আপনি হাসবেন কেন?)

দুই রবীন্দ্রনাথ: আসলে এক

বুদ্ধদেব বসু

মুহূর্তে সব কাজ থেমে গেলো: কলকাতা উপচে পড়লো রাস্তায়। স্কুল-কলেজ শূন্য, স্তব্ধতা নামলো বড়োবাজারে, রাজকার্য অর্থহীন হ'য়ে গেলো। উকিলের শামলা, পাদ্রির আলখাল্লা, হলদে আর গেরুয়া রঙের উত্তরীয়, রাশি-রাশি কালো বাঙালি চুলের ফাঁকে-ফাঁকে গোল টুপি, বাঁকা টুপি, পাগড়ি; কেউ চলছে, কেউ ছুটেছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে চুপ ক'রে। কেষ্টবিষ্টুরা চুনোপুঁটি হ'য়ে গেলেন, চুনোপুঁটিরা সংখ্যায় বেড়ে চললো। অচল হ'লো নাগরিক চক্রযান; মাইলের পর মাইল হাঁটছে লোকেরা, গঙ্গায় নৌকো ভাড়া নিচ্ছে অনেকে; বাড়ি ফেরার কথা কেউ ভাবছে না। আকাশ নীল, রৌদ্রময় অপরাহ্ন; যেন এক অবিশ্বাস্য উৎসবে কলকাতা উত্তাল। কিন্তু ব্যাপারটা কী? রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে: আর তাই ওরা এমন দিশেহারা—ঐ যারা মস্ত লোক আর যারা কিছুই-না—সকলেই বিমূঢ়, হতবুদ্ধি—কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

এমন নয় যে অকালমৃত্যু। এমন নয় যে অপ্রত্যাশিত। এমন নয় যে, উত্তরাধিকার চিরন্তনে পৌঁছবে না। তবু, সেই মুহূর্তে, কঠিন মাটি ফেটে গিয়ে গহ্বর খুলে গেলো। 'কী? রবীন্দ্রনাথ নেই? এ কি সম্ভব? তাহ'লে আমাদের দুঃখের দিনে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো আমরা? কে আমাদের ভালোবাসবেন, শাসন করবেন? কাকে আমরা উত্যক্ত করবো সেই সব তুচ্ছ দাবি নিয়ে, যা শুধু তাঁরই হাতে রত্ন হ'য়ে উঠতো? স্বদেশের সংকটের সময় কে আমাদের উপদেশ দেবেন? তর্কযুদ্ধ মিটিয়ে দেবেন কে? জগৎটাকে এনে দেবেন আমাদের দরজায়? আমাদের নবজাত সন্ততির নামকরণ করবেন? আমাদের জীবনে ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্পণ করবেন শ্রী ও মর্যাদা?' সেদিন, ১৯৪১-এর সাতুই অগস্ট তারিখে এ-সবই ছিলো তাদের মনের কথা, যারা অসংখ্য ও অ-সাহিত্যিক, কবিতায় আসক্ত যাদের বলা যায় না, যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সম্পর্ক এই যে তারা তাঁর স্বদেশবাসী।

সব পেশার, সব ধরনের মানুষ একজন কবির মৃত্যুকে ব্যক্তিগত ক্ষতি ব'লে অনুভব করলে, এটা সম্ভব হ'লো কেমন ক'রে? এর কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসে অন্যতম বিস্ময়। আকারে ও বিস্তারে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় কবি আর একজন মাত্র আছেন: তিনি গেটে, আধুনিক জর্মান সংস্কৃতির স্রষ্টা। সামগ্রিকভাবে স্বজাতির জন্য এই দু-জন যা-কিছু করেছেন, তা স্মরণে রেখে এঁদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা সম্ভব, কিন্তু একই ধরনে প্রতিপত্তিশালী কোনো তৃতীয় কবিকে মনে আনা সহজ নয়। পাউণ্ড বলেছিলেন: 'Tagore sang Bengal into a nation'; এ যদি অত্যুক্তি হয় তবু এ-কথা সত্য যে এক প্রাচীন সভ্যতা যখন ভগ্নস্তূপ থেকে নতুন উদ্যমে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে রচনা করেছিলেন সেই নবজন্মের এক অবিকল চিত্রকল্পরূপে যা ভারতের পক্ষে মান্য আর বাংলার পক্ষে দৈনিক ব্যবহারের সামগ্রী। যেন গান গেয়ে-গেয়ে নিজেকেই তিনি সঞ্চারিত করলেন মানুষের হৃদয়ে, বাদানুবাদে খুঁড়ে-খুঁড়ে মনের তলায় পথ ক'রে নিলেন। এই স্বপ্নালস কবি, মেঘের ও অজানার প্রেমিক, তিনিই আবার গদ্যে এক মহাবল পুরুষ; মিল ও ধ্বনি-মাধুরীর এই জাদুকর সাময়িক বিষয়ে মন্তব্যপ্রকাশেও ক্লান্তিহীন। যাকে আজকাল আমরা সাংবাদিকতা বলি, তা যে কত উঁচুতে উঠতে পারে, তারও অন্যতম চরম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবৎকালের এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, বিমূর্ত বা সাংসারিক—যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি; আর যে-কোনো বিষয়ে দৃষ্টি তাঁর স্বচ্ছ, ব্যাখ্যা সতেজ ও প্রাঞ্জল, ভাষা ঋদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে যেন তাঁকে ভাঙিয়েই বেঁচে ছিলো লোকেরা, তিনিই তাদের মানসজীবিকা জুগিয়ে যাচ্ছেন। অসম্ভব ছিলো তাঁর দ্বারা কোনো-না কোনো ভাবে সংক্রমিত না-হওয়া—বিশেষত তাদের পক্ষে, যারা তাঁর ভাষায় কথা বলে, অথবা তা পড়তে পারে। প্রবীণ রাজনৈতিকের তাঁকে ততটাই প্রয়োজন, যতটা কোনো তরুণ কবিযশোপ্রার্থীর। যারা 'কবিতা-টবিতার ধার ধারেন না' তাঁদের পক্ষে তাঁর গদ্য অনতিক্রম্য।

এই যে অন্য রবীন্দ্রনাথ, আলোচনা-ধর্মী রচনায় যাঁকে পাওয়া যায়, 'টর্ডস য়ুনিভার্সেল ম্যান'-এর * উদ্দেশ্য তাঁরই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের পরিচয়সাধন। বইখানার নামকরণ সুষ্ঠু হয়েছে, কেননা 'বিশ্বমানব' বলতে রেনেসাঁসের ইটালিতে যা বোঝাতো, রবীন্দ্রনাথ সত্যিই তা-ই ছিলেন, সেই ভাস্বর বংশের তিনিই হয়তো শেষ পুরুষ। মানুষের মূল্য তাঁর নিজেরই মধ্যে, মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশেই তাঁর ধর্মসাধন—এটাকে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বাস' বললে ভুল হবে, এটা তাঁর সহজ উপলব্ধি, তাঁর চেষ্টাহীন স্বভাবের স্বীকৃতি। যা-কিছু মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা সবই তাঁর আগ্রহের বিষয়, আর তাই তাঁর জগৎ থেকে ভগবান বাদ পড়েননি। ধর্ম ও 'মানবিক বিদ্যা'র মধ্যে যে-বিভেদ আজ প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কাছে তার অস্তিত্বই ছিলো না; তাঁর সব চিন্তাকে স্পর্শ ক'রে আছে বৈষ্ণব কবিদের এই উত্তরাধিকার—এক অবিরল অনুভূতি যে ভগবান যেমন মানুষের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি ভগবানের পক্ষেও মানুষ, একের অভাবে অন্যের পূর্ণতা নেই। যাকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের 'দর্শন', বা তত্ত্বের দিক, তার মর্মকথা হ'লো এই। অথচ যা না-থাকলে অনাবিল বুদ্ধি এ-যুগে সম্ভব নয়, সেই সংশয়েও তাঁর যথাস্থানে স্বীকৃতি ছিলো; এই ঈশ্বরপ্রেমিক তাঁর স্বদেশবাসীকে ভল্‌তেয়ারীয় বিদ্রূপ শোনাতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মৌলিক অস্তিত্ববাদের সঙ্গে বুদ্ধিজাত সংশয়কে তিনি কী-ভাবে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন, এই পুস্তকের আঠারোটি প্রবন্ধে তার পরিচয় আছে। সংশ্লেষ: রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার মূলসূত্রই তা-ই; জগৎ ও

---

* Towards Universal Man: Rabindranath Tagore. Edited by Bhabani Bhattacharya.

ঈশ্বরের, মানুষের শ্রম ও সৌন্দর্যের, প্রাচী ও প্রতীচীর সংশ্লেষ। 'গীতাঞ্জলি'তে যা উহ্য থেকেও অব্যক্ত নেই, এখানে তা স্পষ্ট হ'য়ে উপরের স্তরে উঠে এসেছে; রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাচ্ছে দশকের পর দশক পেরিয়ে চলেছেন, অনেক কালের পুরোনো ভূত ভাগিয়ে দিয়ে, আরো পুরোনো উপনিষদের ছাই-চাপা আগুনে ফুঁ দিয়ে, অন্য দূর উপকূলের নতুন সুর আপন ক'রে নিচ্ছেন। কেমন ক'রে, ধাপে-ধাপে এগিয়ে, অনেক উক্তি, পুনরুক্তি, পরিশোধন ও অন্তর্দর্শনের ফলে, তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক জগতের অংশ ক'রে তুললেন, আর নিজেকে, উভয়েরই এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—এই অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বিবরণ পুস্তকটির কিঞ্চিদধিক তিনশো পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

প্রবন্ধগুলির বিষয়? ইতিহাস, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্বপীড়া। অধিকাংশেরই আদি রচনার উপলক্ষ ছিলো কোনো সভাস্থলে বক্তৃতা বা দেশের মধ্যে কোনো আদর্শগত সংঘাত। তবু, এখানে যা পাওয়া যাচ্ছে তা কতগুলো মতামতের সমষ্টিমাত্র নয়, এমনকি নির্বস্তুক অর্থে ধারণাও একে বলা যায় না। যিনি লিখতে-লিখতে ভাবেন, আর যাঁর চিন্তার উৎস তাঁর অনুভূতি—বা আদি অর্থে বেদনা, শুধু তাঁর পক্ষেই এ-ধরনের প্রবন্ধ লেখা সম্ভব। অনুভূত, বেদনাবিদ্ধ চিন্তা, ভাবনার দ্বারা শমিত ও ঘনীভূত সংরাগ, আর, অবশেষে, পাঠকের মনে এমন এক নির্মলতার সঞ্চার, যার নিজের বেশি আর-কিছু দেবার নেই: আলোচনার বিষয় যা-ই হোক না, এই লক্ষণগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের চারিত্র। সেইজন্যেই তাঁর প্রবন্ধ উপলক্ষকে অতিক্রম ক'রে যায়; কোনো বিশেষ দেশ ও কালের বিশেষভাবে বাস্তব কোনো সমস্যা থেকে উত্থিত হ'য়েও, দেশান্তরে ও কালান্তরে উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা এরা ধারণ করে।

আমি 'অন্য রবীন্দ্রনাথে'র উল্লেখ করেছি, যেন তাঁর কবিসত্তা থেকে প্রবন্ধকারকে আলাদা ক'রে নেয়া যায়। আসল ব্যাপারটা তা নয় কিন্তু। রবীন্দ্রনাথ এত বেশি পরিমাণে কবি ছিলেন যে কোনো সময়েই অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে; কবিতাই তাঁর সত্তাসার বা তন্মাত্র, আর গদ্য সেই কবিতার গুণেই প্রাণবন্ত। আমরা যারা বাংলায় তাঁকে পড়ি, আমাদের কাছে এটা পুরোনো কথা যে তাঁর কবিতা যেমন মায়াবী তাঁর গদ্যও প্রায় তা-ই; আর এই গুণটিকে ইংরেজি অনুবাদে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হ'লেও 'এ টেগোর রীডার'-এ * তাঁর গদ্য-পদ্যের আন্তর্যোগ অনুসৃত হ'য়ে এই কথাটার আভাস দিচ্ছে যে তাঁর বিপুল বৈচিত্র্য একসূত্রে সংবদ্ধ। আমি প্রথমেই অমিয় চক্রবর্তীকে সাধুবাদ জানাই এইজন্যে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত প্রায় সবগুলি সাহিত্যরূপের নমুনা দিয়েছেন; কেননা বাংলার বাইরে তাঁর চিঠিপত্র ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি এখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত। পুস্তকটির প্রায় অর্ধাংশ প্রতীচীতে পূর্বপ্রকাশিত, অবশিষ্ট বিদেশীর পক্ষে নতুন, আর তা থেকে পত্র, ভ্রমণ-পঞ্জি ও আলাপ-আলোচনা বাদ পড়েনি।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথকে নতুন ক'রে উপস্থিত করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, তাই কোনো-কোনো রচনার অভাব আমি অনুভব না-ক'রে পারছি না। 'শকুন্তলা'—সেই মহৎ প্রবন্ধ তাঁর, যাতে শকুন্তলা ও মিরান্ডা চরিত্রের তুলনা আছে, এটি বিশেষভাবে প্রতীচীর ভোগ্য হ'তো এইজন্যে যে সেখানে যাকে রোমান্টিক ও ক্লাসিক মানস বলা হয়, তারই এক অপূর্ব বিশ্লেষণ এতে সাধিত হয়েছে। আলাপের অংশে কি দেয়া যেতো না সেই সব অন্তরঙ্গ ঘরোয়া কথার উদাহরণ, যা গম্ভীর নয়, জ্ঞানগর্ভ নয়, কিন্তু হাসিঠাট্টার মনস্বিতায় উজ্জ্বল? আর-এক কথা: ভ্রমণপঞ্জির অংশগুলিকে বড়ো বেশি খণ্ডিত মনে হয়, যেন যথোচিত পরিসর না-পেয়ে তারা ম্লান হ'য়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যে 'বড়ো মাপে'র গদ্যশিল্পী, অর্থাৎ তাঁর রচনা যে স্বভাবতই সবিস্তার ও উচ্ছল, এটা কিছু নতুন কথা নয়; সেই প্রসার ও গতিবেগের কিছু নিদর্শন অনুবাদেও অপরিহার্য বলা যায়। 'Poems Old and New' বিভাগটি, আমার মনে হয়, পুস্তকের সবচেয়ে ক্ষীণবল অংশ; কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজে, বা অন্যেরা, তাঁর কবিতার অনুবাদকালে মূলের রূপকল্পের অনুকরণ করেননি, হয়তো তা সম্ভবও ছিলো না তাঁদের পক্ষে; আর ছন্দোবদ্ধ গীতিকবিতার গদ্য অনুবাদ—বিশেষ অবস্থায় ও সময়ে একবার 'গীতাঞ্জলি'তে কৃতী হ'য়ে থাকলেও নিয়মহিশেবে স্বীকার্য হ'তে পারে না। প্রতীচীতে, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের অবক্ষয়ের প্রধান কারণই এই যে তাঁর বাংলা কবিতা, ছন্দ, মিল ও স্তবকসজ্জার কারুকর্ম থেকে স্খলিত হ'য়ে যে-ধরনের একটানা ও একঘেয়ে ইংরেজি গদ্যে পরম্পর প্রকাশিত হয়েছিলো, তাতে তাঁর শিল্পরূপের আভাসমাত্র ধরা পড়েনি। আমরা ব্যথিত হই, কিন্তু অবাক হ'তে পারি না, যখন দেখি যে 'গীতাঞ্জলি'র উত্তেজনা প্রশমিত হবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ইংরেজ বন্ধুরাও তাঁর বিষয়ে নিস্পৃহ হ'য়ে পড়ছেন, আর সাধারণভাবে প্রতীচীতে এই ধারণা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ব্যক্তিহিসেবে মহৎ হ'লেও কবিতায় তাঁর আর-কিছু দেবার নেই। রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শিল্পিতা বিষয়ে যে কিছুই জানে না, সে রবীন্দ্রনাথের অল্পই জানে। বিশ্বমিলনের মন্ত্র নয়, মানবধর্ম ও ভেদভঞ্জনের বাণীও নয়—রবীন্দ্রনাথের ক বি তা যদি জগতের পক্ষে সত্যই আজ প্রয়োজনীয় হয়, তাহ'লে তাকে নতুনভাবে সৃষ্টি ক'রে না-নিলে চলবে না; অর্থাৎ, অনুবাদের ভাষা যাঁদের মাতৃভাষা, এবং যাঁরা আপন ভাষায় কবিতা রচনায় দক্ষ, এমন লোকেরা তাঁর কাব্যের নতুন অনুবাদ করলে তবেই জানা যাবে তিনি কতখানি ও কোন ধরনের কবি।

অবশ্য আমি এ-বিষয়ে সচেতন যে, ইংরেজিভাষী পাঠকের জন্য সংকলিত কোনো রবীন্দ্র-প্রবেশিকা এ-মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো হ'তে পারতো না;

---

* A Tagore Reader, edited by Amiya Chakravarty.

'এ টেগোর রীডার'-এর প্রকাশ যে সম্ভব হ'লো সেটাই আনন্দের কথা, এবং আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে এর পেপার-ব্যাক সংস্করণ বেরোলে তার অভিঘাত উপেক্ষণীয় হবে না। আমি যেগুলোকে বইয়ের 'অভাব' ব'লে উল্লেখ করেছি, কে জানে হয়তো প্রকাশকের কার্পণ্যই সে-জন্য দায়ী; পৃষ্ঠাসংখ্যা আরো বেশি হ'লে সম্পাদকেরও স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যেতো। আজকের দিনের পাশ্চাত্ত্য পাঠক—যিনি হয়তো রবীন্দ্রনাথের নামও শোনেননি বা নাম মাত্র শুনেছেন—তিনি 'এ টেগোর রীডার' ও 'টর্ডস য়ুনিভার্সেল ম্যান' মিলিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথকে যেটুকু পাবেন তাতে তাঁর উৎসাহ জেগে উঠবে ব'লে আশা হয়; উভয় গ্রন্থেই উপকারী টীকা আছে; শেষোক্ত বইটিতে শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবিরের ভূমিকাটি প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কাটাতে খুবই সাহায্য করবে। কিন্তু একটি বিষয়ে আক্ষেপ আমার গভীর; সেটি এই যে অমিয় চক্রবর্তী, তাঁর সম্পাদিত পুস্তকে, শুধু তথ্যগত টীকা পরিবেশন করেছেন; রবীন্দ্রনাথ, ও সাধারণভাবে সাহিত্য বিষয়ে, তাঁর জীবনসঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যদি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সাহিত্যিক ভূমিকা যোগ ক'রে দিতেন, তাহ'লে বইখানার মূল্য বিপুলভাবে বেড়ে যেতো। এর প্রয়োজন আরো বেশি ছিলো এইজন্যে যে অনুবাদ যেখানে যথাযথ হ'লেও যথাযোগ্য নাও হ'তে পারে, সেখানে অন্য ভাষার পাঠকের কাছে কোনো কবিকে উপস্থিত করার একটা ভালো উপায় হ'লো তাঁর বিষয়ে সংবেদনশীল ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা।

আমি বুঝতে পারলাম না, 'টর্ডস য়ুনিভার্সেল ম্যান'-এ প্রতি প্রবন্ধের অনুবাদকের নাম কেন স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত নেই, আর কেনই বা নামপত্রে এই জরুরি তথ্যটি বিজ্ঞাপিত হয়নি যে রচনাগুলি সবই মূল বাংলা থেকে অনূদিত। সমস্ত অনুবাদগ্রন্থেই এই নিয়ম স্বীকৃত হ'য়ে থাকে; ম্যাকমিলান-প্রকাশিত 'দি কালেক্টড পোয়েমস অ্যাণ্ড প্লেজ অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর' এ-বিষয়ে এক অসাধারণ ব্যতিক্রম, এবং সেই উদাহরণ নিশ্চয়ই অনুকরণযোগ্য নয়। ঐ বহুল-প্রচারিত গ্রন্থে অনুবাদের কোনো স্বীকৃতি নেই ব'লেই এক হাস্যকর ও আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে: প্রতীচীতে এমন অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায় যাঁরা রবীন্দ্রনাথ কিছু প'ড়ে থাকলেও, তিনি কোন ভাষায় লিখে-ছিলেন তা জানেন না, বা তা জানলেও ধ'রে নেন যে তাঁর কিছু কবিতা ইংরেজিতেই রচিত হয়েছিলো। যখন দেখা যায় যে স্টিভেন স্পেন্ডারের মতো বিদগ্ধজনও রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজিতে লেখা কবিতা'র উল্লেখ করেন, আর ইঙ্গ-ভারতীয় কবিদের মুখে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত হন তাঁদের গোষ্ঠীর আদিপিতা ব'লে, তখন এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে আজকের দিনে সর্বভারতে ও সর্বজগতে এই কথাটা সবচেয়ে স্পষ্ট ক'রে ও জোরালোভাবে জানানো দরকার যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার লেখক—যেমন জর্মান ভাষায় গ্যেটে, বা রাশিয়ানে পুশকিন, তেমনি বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ। গ্যেটে বা পুশকিন নিজের রচনা পরভাষায় অনুবাদ করেননি—প্রতীচীর কোনো কবির পক্ষে তা কল্পনাতীত; রবীন্দ্রনাথকে অবস্থাগুণে বা অবস্থাদোষে তা করতে হয়েছিলো, কিন্তু মূল রচনাগুলি বাংলাই, এই কথাটি কখনো ভুললে চলবে না।

আজ, তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে, আমরা তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হ'তে দেখছি। বৃহৎ জগতে তাঁর পুনরুজ্জীবনের কাজটি আরম্ভ করার পক্ষে এর চেয়ে সুসময় আর কী হ'তে পারে? এই দুটি ইংরেজি গ্রন্থ তারই সূচনারূপে শ্রদ্ধেয়। না-বললেও চলে যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল, বহুমুখী, শতরূপী প্রতিভার পরিচয়ের পক্ষে এ-দুটি গ্রন্থ যথেষ্ট নয়; তাঁর জীবৎ-কালে ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অন্যান্য ইংরেজি অনুবাদেও তা পাওয়া যায় না। এই কাজ বহুবৎসরব্যাপী পরিশ্রম ও নিষ্ঠাসাপেক্ষ, আর আসলে তাঁর স্বদেশ-বাসীরও কর্তব্য নয় এটি। জগৎকে অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন না বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরা রবীন্দ্রনাথের ভাষা শিখে, নিজ-নিজ ভাষায় এমনভাবে নতুন অনুবাদ সৃষ্টি করেন, যাতে বোঝা যাবে মূল রচনার রূপ ও রীতির বৈশিষ্ট্য, প্রকাশ পাবে ছন্দ, মিল, কারুকর্মের চাতুরী, এবং যাতে অনুবাদের ভাষায় সমকালীন জীবন্ত বাগ্‌ধারা অনুসরণ করা হবে। সেই দিনকে সম্ভব ক'রে তোলা বা এগিয়ে আনা—আমরা যারা বাঙালি বা ভারতীয়, আমাদের প্রয়াসের দ্বারা চরম যা সাধিত হ'তে পারে তা এটুকুই; কিন্তু যদি আমাদের আশানুরূপ ফললাভ না হয়, তবু আমাদের এই সান্ত্বনা রইলো যে তাতে জগতেরই ক্ষতি, আমাদের নয়। *

---

* নায়ু ইয়র্কের 'Saturday Review' পত্রিকার ১৩ মে, ১৯৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ঈষৎ পরিবর্ধিত ভাবানুবাদ।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুই

একচাপে গায়ে গায়ে জড়ানো কতগুলো টালি ও খোলার ঘর। সামনে নর্দমা, তার পাশে রাস্তা, রাস্তার ধারে কল। এইটুকু নিয়েই খোকার জগৎ। রাস্তাটা এগিয়ে গিয়ে মাঠের উপর দিয়ে চলে গেছে। কোথায়, কোন দেশে সে জানে না। মাকে জিজ্ঞাসা করে এইটুকু শুধু জেনেছে, সে দেশের নাম কোলকাতা। বলার সঙ্গে সঙ্গে মা সাবধান করে দিয়েছে 'ওদিকে যেন যাসনে। মস্ত বড় শহর, অনেক গাড়ি ঘোড়া। পথ হারিয়ে যাবে, আর বাড়ি ফিরতে পারবি না।' কোলকাতার সম্বন্ধে খোকার তাই বড় ভয়। বস্তীর ছেলেরা, তার বয়সী কিংবা তার চেয়ে একটু যারা বড়, অনেকেই কোলকাতা দেখে এসেছে। দু'একজন, বিশেষ করে হারু, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও করেছে। কিন্তু খোকা যায়নি। শান্ত নিরীহ নম্র স্বভাবের ছেলে। মা যা বলবে, তার একচুল এদিক-ওদিক করে না। বয়সের তুলনায় একটু বেশী সরল, হয়তো একটু বোকা। কিন্তু লেখাপড়ায় প্রখর বুদ্ধি। একবার পড়লেই মনে থাকে। একবার বুঝিয়ে দিলেই সে অঙ্ক কখনো ভোলে না। বস্তীর মধ্যে একটা ছোট্ট ইস্কুল আছে। রোজ সকালে সেখানে পড়তে যায়। মাইনে দিতে হয় না। দুজন মাস্টার। তার মধ্যে যিনি বড়, তিনি ওর বাবাকে চিনতেন। তাঁর মুখেই শুনেছে খোকা। বাবাকে ওর মনে পড়বার কথা নয়। তিনি যখন মারা যান, তখন ও অনেক ছোট, কথা বলতেও শেখেনি। মার কাছে শুনেছে, কোন্ অফিসে নাকি চাকরি করতেন। অনেক লেখাপড়া শিখেছিলেন, শুধু নিজের চেষ্টায়। তখন ওরা এর চেয়ে ভালো বাড়িতে থাকত। ভালো খেত, ভালো জামা-কাপড় পরত। মা বলে, সে সব আবার হবে। তার আগে ওকেও অনেক লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে।

মাস্টারমশাইকে ওর খুব ভালো লাগে। তিনিও ওকে স্নেহ করেন, মাঝে মাঝে কাগজ-পেন্সিল কিনে দেন। এখানে থাকেন না। ঐ রাস্তা দিয়ে সাইকেল করে আসেন কোলকাতার দিক থেকে। ছুটির পরে চলে যান। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। সাইকেলে উঠবার সময় মাথায় একটা টুপি চাপান, সোলার টুপি, যার নাম হ্যাট, সাহেবরা পরে। ছেলেরা আড়ালে হাসাহাসি করে। খোকার কিন্তু বড্ড ইচ্ছা, ঐ রকম একটা টুপি পরে। একদিন মায়ের কাছে বলেও ফেলেছিল মনের কথাটা। মা তো হেসেই আকুল। টুপি পরবি কি রে? তুই কি সায়েব?

—বারে, তবে মাস্টারমশাই পারেন কেন?

—ওঁকে কতদূর থেকে সাইকেল করে আসতে হয়। মাথায় রোদ লাগে বলে পরেন।

—আমার বুঝি রোদ লাগে না?

—আচ্ছা, আচ্ছা, আরো বড় হ। তখন কিনে দেবো একটা টুপি।

এসব কয়েক বছর আগেকার কথা। এখন আর টুপির জন্যে বায়না করে না। একদিন করেছিল বলে লজ্জা পায় মনে মনে। এখন সে বড় হয়েছে।

মায়ের নিষেধ ব'লে যেখানে সে কোনোদিন পা দেয়নি, আজ সেই অচেনা পথ ধরেই ছুটে চলল খোকা। গাড়ি-ঘোড়ার ভয়? বেশ, গাড়ি-চাপা পড়েই সে মরবে। হারিয়ে যাবে যেখানে খুশি। আর কোনোদিন ফিরবে না। পীচের রাস্তা। দুপুর রোদে তেতে উঠেছে। কোথাও কোথাও গলতে শুরু করেছে। খালি পায়ে চলতে কষ্ট হয়। তবু তারই উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ছুটবার পর পা আর চলে না। শুধু যে সর্বাঙ্গ দিয়ে আগুন ছুটছে তা নয়, তার চেয়েও দাউ দাউ করে জ্বলছে পেটের আগুন। সেই ভোরবেলা, দুমুঠো মুড়ি; কখন জল হয়ে গেছে। তারপর আর পেটে কিছু পড়েনি। সামনে রাস্তার পাশে একটা গাছ দেখে, তারই ছায়ায় বসে পড়ল। চারদিকটা মনে হল অন্ধকার।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবার পর মাথাটা যখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, মনের কোণে ছুঁয়ে গেল বাড়ি ফিরবার কথা। কতদূরে এসে পড়েছে। মা নিশ্চয়ই ভাবছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার শক্ত হয়ে উঠল। না; আর সে বাড়ি যাবে না, কখখনো না। মা নেই, কেউ নেই তার; কেউ তাকে ভালবাসে না। মিনিট কয়েক না যেতেই বুকের ভিতরটা আবার নরম হয়ে উঠল, ঘুরে-ফিরে মায়ের সেই রোগশীর্ণ মুখখানা চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও জলে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে কাঠ হয়ে বসে রইল সেই গাছের তলায়।

তারপর কখন একসময় ক্ষুধার্ত ক্লান্ত দেহখানা এলিয়ে পড়ল ঘাসের উপর। দু'চোখ ভেঙ্গে নেমে এল ঘুম।

গাছটা ঠিক রাস্তার পাশে নয়, রাস্তা থেকে নেমে খানিকটা মাঠ পেরিয়ে ছোট

একটা ডোবার ধারে। এদিকটায় কোনো লোকজন নেই। বিবর্ণ মাঠ, দু'চারটা ছাগল চরছে, কিছু গোরু-বাছুরও ঘুরছে এদিক-ওদিক। দুজন লোক রাস্তার দিক থেকে কথা বলতে বলতে এসে দাঁড়াল, খোকা যেখানে শুয়ে আছে, তার উল্টোদিকে। পরনে লুঙ্গি, তার উপরে একজনের একটা রংচটা জালি গেঞ্জি, আরেকজনের ওরই মধ্যে একটু ফর্সা ফতুয়া। ওদের মধ্যে যে বয়সে বড়, তার গলায় ঝুলছে কালো সুতোয় বাঁধা রুপোর চাকতি, দুহাতে উলকি, কানে গোঁজা বিড়ির টুকরো। একমাথা বড় বড় চুল, বাবরির ছাঁদে ছাঁটা। আরেকজন অনেকটা ছোকরা মত, চোখ-বসে-যাওয়া শুকনো চেহারা, কামানো ঘাড়, সামনের চুলে বাগানো টেরি। বয়স্ক লোকটি ফতুয়ার পকেট থেকে দেশলাই বের করে কানে গোঁজা বিড়িটা ধরাল এবং এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, চলে গ্যাছে পুলিশটা?

—কই? গিয়ে আবার ফিরে এল।

—শালারা টের পেয়েছে।

—আমারো তাই মনে হয়। ফিরে ফিরে দেখছিল আমার দিকে।

—নিশ্চয়ই কোনো শালা থানায় খবর দিয়েছে।

—দেবারই কথা। সাত দিনে সাতটা মাল তো আমরাই সরিয়েছি। —মৃদু হেসে বলল ছোকরা।

—হুঁ; তাই পাহারা বসিয়েছে। চ', এখানে আর সুবিধে হবে না।

বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ খোকার দিকে নজর পড়তেই 'ফতুয়া' বলে উঠল, আরে, ওটা কে?

'গেঞ্জি' এগিয়ে এসে উঁকি দিয়ে খুশির সুরে বলল, বাঃ, বেশ বাচ্চাটা তো। ভদ্দরনোকের ছেলে। ওরে দিয়ে হয় না? কেউ সন্দ' করবে না।

—দাঁড়া, বলে, ঘুরে এসে খোকার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে 'ফতুয়া' হাঁক দিল, ও খোকা...........

খোকার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে লোকটার চেহারা দেখেই ভয় পেয়ে উঠে বসল। 'ফতুয়া' যতদূর সম্ভব মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করল, কোথায় থাক তুমি?

—বস্তিতে।

—কোন্ বস্তিতে?

—ঐ ওদিকে, হাত তুলে রাস্তার দিকটা দেখিয়ে দিল।

—এখানে কী করছ?

—কিছু না।

খোকার চোখের কোলে জলের দাগ তখনো লেগে আছে। সেদিকে চেয়ে মৃদু হেসে সস্নেহে বলল লোকটি—মা বকেছে বুঝি?

মায়ের নাম করতেই খোকার চোখ-দুটো ছলছল করে উঠল। তাড়াতাড়ি আরেক দিকে মুখ ফেরাল, জবাব দিল না।

—তোমার নাম কি?

—শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য।

—বাঃ, বেশ নামটি তো। খাওয়া হয়েছে?

খোকা এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিল না। 'ফতুয়া' আবার প্রশ্ন করল, খিদে পেয়েছে?

—না, বলে, উঠে দাঁড়াল দিলীপ।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বাড়ি।

চলতে শুরু করতেই 'ফতুয়া' ডেকে ফেরাল, শোন শোন, একটা কাজ করতে পারবে?

—কী কাজ?

—ঐ যে ছাগলগুলো চরে বেড়াচ্ছে, ওর থেকে একটাকে ধরে আনতে পার?

—না, বলে, দিলীপ আবার যাবার জন্যে পা বাড়াল।

—আট আনা পয়সা দেবো। ঐ দোকান থেকে পেটভরে মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যেও।

খাবার নাম শুনে, দিলীপের পেটের ভিতর আবার নতুন করে জ্বালা শুরু হল। পা দুটো আগে থেকেই কাঁপছিল, এবার অবশ হয়ে এল। বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠল কান্না।

লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল খোকার এই ভাবান্তর। কাছে এসে তার একটা হাত ধরে বলল, বসো, বসো। বড্ড খিদে পেয়েছে; না? দাঁড়াও, খাবার আনিয়ে দিচ্ছি।

খোকা কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, না। আমি বাড়ি যাবো।

—বেশতো। তার আগে দুটো মিষ্টি খেতে দোষ কি? যাতো রসিদ, খোকার জন্যে চট করে কিছু খাবার নিয়ে আয়।

ফতুয়ার পকেট থেকে পয়সা দিতেই ছোকরামত লোকটি ছুটে বেরিয়ে গেল। খোকার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কী করেন?

—বাবা নেই।

—নেই? আহা! মুখে একটা সংবেদন-সূচক শব্দ করে বলল, তোমরা কটি ভাই-বোন?

—কেউ নেই।

—শুধু তুমি আর তোমার মা?

—হ্যাঁ, বলতে গিয়ে খোকার গলাটা ধরে এল।

রসিদ খাবার নিয়ে এসে পড়ল. কিন্তু খোকা কিছুতেই ঠোঙাটা নেবে না। দুজনে অনেক করে বলে-কয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করাল। খাবারটুকু পেটে পড়তে এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ এল খোকার। মুখে কিছু বলতে পারল না। গুছিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার বয়স তার নয়। খাওয়া হলে খুশি-ভরা লাজুক লাজুক দৃষ্টি তুলে ঐ বাবরি-ওয়ালা রুক্ষ চেহারার লোকটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল এবং তার-পরেই চোখ নামিয়ে নিল।

মাঠের প্রায় সবটুকু জুড়ে এরই মধ্যে নেমে এসেছে কার্তিকের পড়ন্ত বেলার ছায়া। সেইদিকে চেয়েই দিলীপ আবার বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ফতুয়া-পরা লোকটি তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, একলা বাড়ি যেতে পারবে?

খোকা ঘাড় নেড়ে জানাল পারবে।

—এবার তাহলে আমাদের সেই কাজটা করে দিয়ে যাও।

—কোন্ কাজ?

—ঐ যে বললাম, একটা ছাগল ধরে আনা।

—যাদের ছাগল তারা যদি বকে?

—কে বকবে? ও তো সব আমাদের ছাগল।

—তোমাদের!

—হ্যাঁ, সব আমাদের, বলে, হাসতে লাগল 'ফতুয়া'।

খোকা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। রসিদ বলল, মাঠের ও পাশেই আমাদের বাড়ি। ওখান থেকে রোজ চরতে আসে।

—তোমরা ধরতে পার না?

—'ছাগলগুলো ভারী পাজী।' জবাব দিল ফতুয়া, 'বড়রা ধরতে গেলেই ছুটে

পালায়, ছোটদের হাতে ফস করে ধরা দেয়।'

—'তাই নাকি!' ভারী কৌতুক বোধ করল খোকা।

—তোমার মত আমার একটা ছেলে আছে। সে-ই রোজ আসে। আজ তার শরীরটা ভালো নেই; তাইতো মুস্কিলে পড়ে গেছি।

খোকা ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, অত-গুলো আমি একা ধরবো কি করে?

—অতগুলো কে ধরতে বলছে তোমাকে? খালি একটা ধরবে। একটাকে পাকড়াও করতে পারলেই বাকীগুলো সব সুড় সুড় করে পেছন পেছন চলে আসবে।

খোকা হেসে উঠল, ভারী মজা তো?

—তবে আর বলছি কেন? যাও, আর দেরি করো না। তোমাকে আবার বাড়ি যেতে হবে তো? ধরতে পারলেই আট আনা।—বলে পকেটের ভিতর থেকে আধুলিটা তুলে দেখাল।

খোকা সেদিকে না তাকিয়েই মহা-উৎসাহে লাফ দিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। লোকটি ডেকে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও; এই গামছাটা নিয়ে যাও। গলায় একটা প্যাঁচ দিয়ে নিয়ে আসবে।' ঐখান থেকেই গামছাটাকে বল্-এর মত করে ছুঁড়ে দিল খোকার দিকে। খোকা সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল।

কাজটা যত সোজা মনে করেছিল দিলীপ, আসলে দেখা গেল মোটেই তা নয়। জানোয়ারগুলো ভয়ানক চালাক। কাছাকাছি যেতে না যেতেই চট করে সরে যায়। তাড়া করলে এমন ছোটে, কার সাধ্য ধরে? কোনো কোনোটা আবার শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে। মাঠময় ছুটোছুটি করে সারা গায় ঘাম ছুটে গেল, একটাকেও ধরা গেল না। খোকার মাথায় তখন রোখ চেপে গেছে। যেমন করে হোক, ধরতেই হবে। তা নাহলে ওদের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা মোটা গোছের পাঁঠা পেছনের একটা পা একটু টেনে টেনে চলছে। সবগুলোকে ফেলে এবার ঐ খোঁড়ার পিছনেই ধাওয়া করল দিলীপ। এবং বেশ খানিকক্ষণ ছুটবার পর কোনো-রকমে তার গলায় গামছা জড়িয়ে ফেলল।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। খোঁড়া ছাগলটাকে টানতে টানতে প্রাণপণে বট-গাছের দিকে যখন এগিয়ে চলেছে, পেছন থেকে একটা হাঁক শুনে থমকে দাঁড়াল। সর্বনাশ! এ যে পুলিশ! হন-হন করে ওর দিকে আসছে এবং হাতের বেঁটে লাঠিখানা উঁচু করে থামবার ইঙ্গিত করছে। খোকার পা দুটো কে যেন মাটির সঙ্গে এঁটে বসিয়ে দিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দরদর করে বেরিয়ে এল ঘাম।

বস্তিজীবনের সঙ্গে পুলিশ নামক বস্তুটির সম্পর্ক অতি নিবিড়। এখানকার ছেলেমেয়েরা লালপাগড়ি দেখে লাল রঙ্ চিনতে শেখে এবং মায়েরা সিপাই-এর ভয় দেখিয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায়। কত বিচিত্র মানুষের বাস এই খপরা-ঢাকা ঘরগুলোয়, কত বিভিন্ন চরিত্রের সমা-বেশ। এই গলিগুলো যেমন দিনের বেলাতেও অন্ধকার, সেখানে যাদের আনা-গোনা সেই মানুষগুলো অনেকেই তেমনি অন্ধকারের জীব। জীবনের একটা দিক কালো পরদায় ঢাকা। চিরদিন ঢাকা থাকে না। পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টির সার্চলাইট আচমকা একদিন পরদা ভেদ করে আসল মানুষটাকে টেনে বার করে।

গলির মোড় থেকে তিনখানা ঘর বাদ দিয়ে পাকা দেয়াল-ঘেরা টিনের চালায় বছরখানেক ধরে বাস করছেন যে-ব্যক্তিটি, শুদ্ধাচারী স্বপাক-ভোজী সদালাপী ব্রাহ্মণ, প্রতিদিন সশব্দে মন্ত্রপাঠ করতে করতে নামাবলী জড়িয়ে ফিরছেন গঙ্গা-স্নান থেকে, সন্ধ্যাবেলায় ফোঁটা তিলক কেটে স্মিতমুখে প্রতিবেশীদের কুশল সংবাদ নিয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন কোনো-দিন দেবালয়ে কোনোদিন শিষ্য-গৃহে, হঠাৎ এক ভোরবেলায় তার দরজা ভেঙ্গে হানা দিল লালপাগড়ি, লক্ষ্মীর ঝাঁপির ভিতর থেকে বের করল সেরখানেক গাঁজা, দেয়ালের ইঁট খসিয়ে আবিষ্কার করল কয়েক বাণ্ডিল নোট। তারপর ভোজপুরী সিপাই-এর গোটা কয়েক রামগাঁট্টা খেয়ে নামাবলীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল জেল-ফেরত ভয়া গুণ্ডা, কোমরে দড়ি এবং হাতে হাতকড়া পরে চলে গেল থানায়।

নতুন বিয়ের পর সিঁথি-জোড়া সিঁদুর পরে স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে এল মাধুরী। অল্প আয়, বেশী ভাড়ার বাড়ি নেবে সাধ্য কি? তাই, বাধ্য হয়ে উঠতে হল বস্তিতে, নির্মলার পাশের ঘরে সংসার পাতল। মাধুরী তো মাধুরী; নামের সঙ্গে রূপের কী আশ্চর্য মিল আর তেমনি মিঠে স্বভাবেরও। এমনভাবে মিশে গেল যেন মায়ের পেটের বোন নির্মলার। দিদি বলতে অজ্ঞান। স্বামীর সঙ্গে যখনই বেরোয়, খোকার জন্যে একটা কিছু হাতে করে ফেরে—কোনদিন এক বাক্স চকোলেট, কোনোদিন একটা স্প্রিং-এ চলা মোটরগাড়ি। নির্মলা অনু-যোগ করলে হেসে উড়িয়ে দেয়, গলা জড়িয়ে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, তাহলে তোমার সঙ্গে আড়ি; আর কখখনো আসবো না তোমার ঘরে।

ছেলেটি কিন্তু বড় একটা বেরোয় না ঘর থেকে। করে কী? কী করে চলে ওদের? কেমন যেন সন্দেহ হল নির্মলার মনে। আশে-পাশের ঘরে যারা থাকে, তাদের মুখেও একই ছায়া, কথায়-বার্তায় একই সুর। নবদম্পতির চাল-চলনটাও কেমন যেন বদলে গেছে। প্রথম প্রথম যাকে মনে হত খুনসুড়ি, তারই মধ্যে এখন চাপা কলহের আওয়াজ বেরিয়ে পড়ে। বেশিদিন আর চাপা রইল না। গভীর রাত্রে মাধুরীর চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল নির্মলার।

ছুটে গিয়ে দেখে গলায় হাত দিয়ে হাঁপাচ্ছে। চোখদুটো যেন আগুনের গোলা, ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখনই।

—কী হয়েছে! তোমার স্বামী কোথায়? জানতে চাইল নির্মলা।

—কিসের স্বামী! বিয়ে হয়নি আমার।

—বল কি?

—বিয়ে করবে বলে ভুলিয়ে এনেছে? একটা একটা করে গয়নাগুলো সব খুইয়ে আজ এসেছিল এই হারটা নিতে। দিইনি বলে গলা টিপে ধরেছিল। মেরে ফেলত আর একটু হলে।

বলতে বলতে নির্মলাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে এ-পাশ ও-পাশ থেকে ছুটে এসেছিল যে-সব স্ত্রী-পুরুষের দল, মজার গন্ধ পেয়ে তারা আর যেতে চায় না। ভিড় বেড়ে চলল। দু'চারজন অতি-উৎসাহী যুবক ছুটে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীটিকে এনে হাজির করল জনতার দরবারে। টিপ্পনি, টিটকারি তো চললই, তার সঙ্গে চড়-চাপড়, গলা-ধাক্কাও বাদ পড়ল না। তার তরফেও বলবার ছিল অনেক কিছু এবং তারস্বরে সেই মুখরোচক বিবৃতির সঙ্গে হাজির করল একগাদা প্রেমপত্র। নাটারস যখন

বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় নিতান্ত বেরসিকের মত পুলিশের আবির্ভাব।

নায়কের হাতে পড়ল হাতকড়া। সে চলে গেল। নায়িকাকেও যেতে হবে। কোথায়? আপাততঃ কোনো উদ্ধারাশ্রম। এইটুকুই বলতে পারলেন থানা-অফিসার। এর বেশী আর কিছু তাঁর জানা নেই। নির্মলাই বা কতটুকু জানে? তাই যাবার আগে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে শেষবারের মত যখন জানতে চাইল মাধুরী, 'আমার কী হবে, দিদি? আমি কোথায় যাবো?'—

নির্মলা রইল নিরুত্তর। ছেলেটার তবু একটা আশ্রয় জুটবে। আর কোথার না হলেও; জেলখানায়। সে আর কদিন? তারপর নির্বাধ নতুন জীবন। একদা কোথায় কী ঘটেছিল, প্রথম যৌবনের নেশার ঘোরে জড়িয়ে পড়েছিল কার সঙ্গে, সে প্রশ্ন কেউ তুলবে না। হয়তো তারই জন্যে একদিন কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে অনূঢ়া কন্যার পিতৃমহলে। নতুন নারী আসবে তার জীবনে, নতুন প্রেমের আস্বাদ। আর ঐ মেয়েটা? তার জন্যে রইল ক্ষমাহীন মানুষের সদাজাগ্রত প্রখর দৃষ্টি, যার সামনে সে শুধু তিল তিল করে তলিয়ে যাবে, একটা ভেলাও কেউ এগিয়ে দেবে না।

এই সব দৃশ্য চোখ ফোটার পর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে দিলীপ। তার সঙ্গে ঐ লালপাগড়ি নামক ভয়াবহ বস্তুটির অপ্রতিহত প্রচণ্ড প্রতাপ তার কাঁচা মনে দাগ কেটে বসে গেছে। তারই একজনকে লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে তার প্রাণে আর জল রইল না। সিপাইটি হেঁকে উঠল, কিস্‌কা ছাগল হ্যায়, তোমারা?

—না। শুষ্ককণ্ঠে কোনো রকমে উচ্চারণ করল খোকা।

—তব্?

—ঐ ওদের; ওরা আমাকে ধরতে বলেছিল।' আঙুল দিয়ে গাছের দিকটা দেখিয়ে দিল।

সিপাইটি তাকিয়ে দেখে বলল, কৌন্? কিসিকো তো নেহি দেখ্‌তা হ্যায়।

খোকাও দেখল, সত্যিই কেউ নেই। গাছের তলাটা একদম ফাঁকা। ধারে-কাছেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

—সব ঝুট বাত্, ধমকে উঠল সিপাই।

ধমকের ঝাঁকানি খেয়ে খোকার সমস্ত শরীরটা আবার কেঁপে উঠল, গলা দিয়ে স্বর ফুটল না।

সিপাইটি এবার সুর চড়াল, তুম্ চোর হ্যায়, ছাগল চোরি করকে ভাগতা রহা।

—না, আমি চুরি করিনি, বলতে বলতে কেঁদে ফেলল দিলীপ, সত্যি বলছি। দুজন লোক বললে, তাদের ছাগল: ধরে আনতে পারলে আট আনা পয়সা দেবে।

এবার হা হা করে হেসে উঠল পুলিশের লোক। অর্থাৎ এরকম আজ-গুবি কাহিনী চোর মাত্রেই রচনা করে থাকে। হাসি থামলে খোকার বাঁ হাতটা চেপে ধরে বলল, ঠিক হ্যায়; চলো।

—আমি বাড়ি যাবো।

—হাঁ, হাঁ, বাড়ি যাবে, বড়িয়া বাড়ি, একদম রাজবাড়ি।

থানার নাম অনেকবার শুনেছিল দিলীপ, কিন্তু এমন করে দেখতে হবে, কোনোদিন ভাবতে পারেনি। একটা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে, বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ছাগলটা নিয়ে সিপাই চলে গেল। মেঝেটা কারা যেন নোংরা করে রেখে গেছে। খোকা জানলার ধারে শিকগুলো ধরে দাঁড়িয়ে রইল, যদিও পা দুটো আর তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে আলো নেই, আর কোনো লোকও নেই। আশে-পাশে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। তবু প্রথমটা কেমন ভয় করতে লাগল। বেশীক্ষণ নয়। তার পরেই তার সমস্ত মন, সমস্ত চেতনা জুড়ে বসল মা। কী করছে মা? আবার জ্বর এসেছে কি? তাকে না খাইয়ে মা কোনোদিন খায় না। আজও নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি। ঘরের দাওয়ায় সেই থামটা হেলান দিয়ে পথের দিকে চেয়ে বসে আছে। ইস্কুল থেকে কিংবা খেলার মাঠ থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে যেমন করে বসে থাকে মা। সেই বিশেষ ভঙ্গীটি, মায়ের সেই উদ্বেগাকুল মুখখানা মনে পড়তেই খোকার বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

তারপরেই আবার মনে হল, মা কি আজ আর চুপ করে বসে থাকতে পারে? নিশ্চয়ই চারদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, যাকে পাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করছে আমার খোকাকে দেখেছ? কেউ বলতে পারছে না। কেমন করে বলবে? তারা তো কেউ জানে না। কেন মরতে আসতে গেল এতদূর? হঠাৎ কী যে রোখ চাপল মাথায়—ভাবতে গিয়ে নিজেকে তার ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল মনের আর একটা কোণ—তার দোষ কি? মা তাকে মারল কেন? সে তো ইচ্ছা করে লাগিয়ে দেয়নি হারুকে। বেশ করেছে চলে এসেছে। ক্ষণকাল এই অভি-মানটুকু আশ্রয় করে এরই উপরে দাঁড়াতে চাইল দিলীপ। কিন্তু এ টিঁকল না, তার শিশুমনের সবটুকু জুড়ে যে বেদনার ভার, তারই চাপে কোথায় তলিয়ে গেল। মা-ই যে তার সব।

অনেকক্ষণ পরে আরেক জন সিপাই এসে তালা খুলে তাকে অফিসারের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। একজন খাকী পোশাক-পরা ভদ্রলোক তাকে বেশ মোলায়েম সুরে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং মাঝে মাঝে থেমে একটা কাগজে কি সব লিখতে লাগলেন।

—সেই লোকটা কি রকম দেখতে, বলতো খোকা?

—বিচ্ছিরি।

—'বিচ্ছিরি!' হাসলেন ভদ্রলোক। 'তবে তার কথা শুনতে গেলে কেন?'

খোকা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আট আনা পয়সা দেবে বলেছিল বলে? খোকা মাথা নিচু করে পা দিয়ে মেঝেটা খুঁটতে লাগল।

—ছিঃ ছিঃ আট আনা পয়সার জন্যে তুমি একটা ছাগল চুরি করলে।

আমি চুরি করিনি, মাথা তুলে বলল খোকা, তার কণ্ঠে এবং বলবার ভঙ্গীতে দৃঢ়তার আভাস পেয়ে থানা-অফিসার কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাশের টেবিল থেকে আর একজন বললেন, আহা, চুরি বলছেন কেন? ওটা ওর মজুরি। বলে হেসে উঠলেন। থানা-অফিসার সে হাসিতে যোগ দিলেন না, খোকাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার সেই 'বিচ্ছিরি' লোকটা কী পরেছিল বলতো?

—লুঙ্গি।

—আর?

—আর একটা ফতুয়া। মাথায় বাবরি চুল।

'কসাইগুলো রাস্তা বদলেছে, দেখলেন তো?' সহকারীর দিকে চেয়ে বললেন থানা-অফিসার, 'নিজেরা পেছনে থেকে এইসব বাচ্চা ছেলে দিয়ে কাজ হাঁসিল করছে।'

—অসুবিধা তো কিছু নেই, উত্তর

দিলেন সহকারী, দু'চার আনা পয়সা দিলেই এইসব স্ট্রে চাইলড্ পাওয়া যায়।

—কিন্তু একে দেখে ঠিক স্ট্রে চাইলড্ বলে মনে হয় না।

খোকার দিকে ফিরে বললেন, তোমার বাবা মা্মা গেছেন কতদিন?

—আমি জানি না।

—মা কী করেন?

—একজনদের বাড়িতে সেলাই শেখান।

—কোন বস্তিতে থাক তোমরা?

—উই ওদিকে।

—ওদিকে কোথায়? বেলেঘাটায়?

—হ্যাঁ।

—রাস্তার নাম-টাম কিছু বলতে পার?

খোকা মাথা নাড়ল। তারপর, যেন মস্তবড় একটা দরকারী খবর দিচ্ছে, এমনিভাবে চোখ বড় বড় করে বলল, সেই যে বড় আমগাছটা? তার পাশে কল? সেইখানে।

—বুঝেছি এবার। বলে হেসে উঠলেন সহকারী। অফিসার একজন সিপাইকে ডেকে বললেন, ওকে নিয়ে যাও।

খোকা বলে উঠল, আমি বাড়ি যাব।

—আজ এখানে থাকো। কাল দেখা যাবে।

থানা-অফিসার উঠে বারান্দায় পড়তেই একজন লোক নত হয়ে নমস্কার করল।

—কী চাই?

—আজ্ঞে, ছাগলটা আমার, বড়বাবু।

—প্রমাণ কি?

—আজ্ঞে একটা পা খোঁড়া।

—সে তো কত ছাগলেরই থাকতে পারে।

—তা পারে। তবে ওটা আমাকেই দিয়ে দিন বড়বাবু। তার জন্যে—

—কেন? তোমাকে কেন দেবে হামার ছাগল? অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন গর্জে উঠল একটি স্ত্রীমূর্তি।

—ও আবার কে? বিস্ময়ের সুরে যেন আপন মনে বললেন দারোগা।

—ও একটা পাগল।

—'পাগল! পাগল আছিস তুই, পাগল আছে তোর বাবা,' রণরঙ্গিণী-রূপে এগিয়ে এল মূর্তিটি, 'আপনি দশজনকে পুছে দ্যাখেন বড়াবাবু, দোমাস আগে উ ছাগল আমাকে বেচে দেয়নি? ছে টাকা বারো আনা হামার দুধের দাম থেকে কেটে লেয়নি? খোঁড়া বলে বারো আনা পয়সা ছেড়ে দিতে কতো কোসিস কোরলাম। বোললে, তা হোবে না।

—সব বাজে কথা, স্যর।

—'কেয়া? বাজে কথা বলছি হামি! তব্ চল বস্তিমে, সাক্ষী লিয়ে আসি।'... বলেই, প্রতিপক্ষকে সাবধান হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল। স্ত্রীলোকের আচমকা আক্রমণে লোকটা প্রথমে একটু হতভম্ব হলেও সংগে সংগে 'ছাড় ছাড়' বলে রীতিমত পৌরুষ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু বোঝা গেল, ভগবান তাকে যার কবলে ফেলেছেন, সে ব্যক্তিটি জাতে অবলা হলেও দেহে ওর চেয়ে অনেক বেশী বল ধরে। নারীপক্ষেই জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। আরো দুঃখের কথা, আশে-পাশে দাঁড়িয়ে যারা দৃশ্যটা উপভোগ করছিল, তারা সকলেই পুরুষ। কিন্তু স্বজাতি-উদ্ধারে কেউ এগিয়ে এল না, দেখতে না দেখতে লোকটির তর্জনের পরদা নেমে এল আবেদনের খাদে। বিজয়িনী যখন তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বিজিতের গলা থেকে বেরিয়ে এল নাকী সুর—দেখলেন বড়বাবু, মাগীর কাণ্ডটা একবার দেখলেন? আপনার চোখের ওপরেই......

বাকীটুকু আর শোনা গেল না।

(ক্রমশঃ)

"আমি চুরি করিনি......"

ডি, এইচ, লরেন্স ও তাঁর কবিতা

শঙ্কর রায়

সাম্প্রতিক বিশ্বের সবচেয়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসা ডি এইচ লরেন্সের সাহিত্যগত স্বীকৃতি। এককালে যাঁর লেখা তো দূরে থাকুক, নামমাত্র শুনলেই লোকের ভ্রূ-কুঞ্চিত হত, দৃষ্টির সীমার মধ্যে যাঁর উপস্থিতি লজ্জা ও অশুচির বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াত, আজ তাঁর চিরস্মরণীয় জনপ্রীতিলাভ বাস্তবিকপক্ষে অবিশ্বাস্য। তবু সবার সম্মুখে একটা জ্বলন্ত দ্বিধা : শ্লীল না অশ্লীল। সেই দুই মেরুপ্রান্তের মাঝামাঝি স্থান থেকে কাব্যবিচার যৌক্তিক হলেও অলৌকিক; তাই তাঁকে জানবার প্রাক-মুহূর্তে নতুনভাবে কাব্যমন বিচারের অবসর আকাঙ্ক্ষিত এবং আজকের যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে সেই অবসর সময়োচিতভাবে আসন্ন।

পৃথিবীতে গতানুগতিকতার আধিপত্য এত প্রবল যে, তার গর্ব খর্ব করা দুরূহ তো বটেই, এমন কি দুরধিগম্যও। বহিরঙ্গ বিচারের আলোতে কখনও মনে হয়, মানুষ হয়ত তা'র প্রতিরোধ সঙ্কল্পে সুচিরপ্রয়াসী। কিন্তু এই অনুমান সাময়িক ও সে কারণেই ভঙ্গুর। বিশ্বের গতিময়তার কোন কিছুই বৃন্তহীন কুসুমের মত আপন স্বাতন্ত্র্যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত নয়; কিন্তু অতিপ্রাকৃত ব্যতিক্রম তবে কি নিরস্তিত্বমান?...এই অঘটনপ্রপঞ্চকে বলা হয়েছে 'মির‍্যাকল'। সাহিত্য-সংস্কৃতির চরাচরে এই 'মির‍্যাকল' নগণ্য নয়, কেননা নূতনত্বের অনিরম্য পারম্পর্য সাহিত্যের প্রগতিশীল গতানুগতিকতা। কিন্তু আমাদের দেওয়া স্বীকৃতি কদাপিও সময়োচিত নয়, বরং তার বহু পূর্বে অথবা বহু পরে, গতানুগতিকতার মোহকে ধর্মীয় রীতিনীতির মত আঁকড়ে ধরে থাকে, যদি বা তার স্থিতি হয়, তা' অমিতবীর্য স্রষ্টার রচনামাহাত্ম্যেই সম্ভব। বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর অন্ধকারার নরকে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল, দার্শনিকপ্রবর ক্রোচেকে হিটলার মুসোলিনী কি দুর্দশায় ফেলেছিলেন তা' সকলেরই জ্ঞাত। ডেভিড হারবার্ট লরেন্স-ও অংশতঃ এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত আস্ফালনের সাম্প্রতিকতম বলিদান।

একথা অনস্বীকার্য যে, "লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার" তাঁকে বিশ্বখ্যাতি এনে দিয়েছিল। লরেন্সের অসংযম পৃথিবীর লোক মেনে নিতে পারলেন না, দেশে-বিদেশে নিষিদ্ধ হ'ল সেই বই, পরে সেন্সর করে প্রকাশিত হল প্রতিবাদ্য অংশবিশেষ বর্জিত হয়ে। বিচারক রায় দিলেন লরেন্স অশ্লীলতার বাহন।......কিন্তু অশ্লীলতা কি? এর জবাব সম্ভবতঃ কেউই দিতে পারবেন না। কেননা অশ্লীলতা নামক কোন বস্তুই সংজ্ঞায়িত নয়, অশ্লীলতা একটা মনোভাব মাত্র, আমরা যা' নিজেরাই অকারণে আমদানি করেছি। এই হিসেবে শুধু-মাত্র অশ্লীল বলে ফেলে শিল্পীর অমন একটা কম্পোজিশন অঙ্কুরে বিনষ্ট করা সাহিত্য-সমাজে অমার্জনীয় অপরাধ। সাহিত্য জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, জগৎ-সম্পর্কিত জীবন-বিশ্লেষণ, সাহিত্য নিছক সৌখীন কলাবিলাস নয়। তবু লরেন্সকে ক্ষমা করা যায় না তাঁর অসংযমী উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য। যে-নগ্নতা তাঁর রচনায় বিবৃত তা একান্তই অসুস্থতাবোধ ও চিন্তাবিকৃতি-জনিত। লরেন্স-অনুরাগী হয়ত প্রতিবাদ করবেন যে, নিরুদ্দেশ স্বাভাবিকতা বর্জন সাহিত্যের ধর্ম নয়, সেখানে উদ্দেশ্য ও স্বভাবের সঙ্গতি। লরেন্স যন্ত্রসর্বস্বতা ও কৃত্রিমতার বিরোধী ছিলেন, বিজ্ঞানের মন্ত্রে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ ছিলেন না। বলতেন "বিজ্ঞানীমাত্রেই মিথ্যাভাষী"। বলাবাহুল্য, এই সর্বশেষোক্তি তাঁর নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক, আজকের যুগপরিবেশে তো বটেই। "ন্যুডিটি ইজ নট এ ক্রাইম, বাট হোয়াট ইজ ন্যুড ইজ এ ক্রাইম।" নগ্নতা উপলব্ধি সত্ত্বেও নগ্ন-বর্বরতার পরিচয় অপরাধ। একজন দরিদ্র বস্ত্রহীনার নগ্নতা অপরাধ নয়, তাই বলে লজ্জানিবারণ-সক্ষমের নগ্নতা শ্লাঘনীয় নয়। লরেন্সের আবেগ ও উচ্ছ্বাস দমনীয় নয়, কেননা সেটা স্বভাবজ অভিব্যক্তি। কিন্তু আবেগের বল্গাহরিণকে বুদ্ধির চাবুকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বিসদৃশ উচ্ছ্বাসকে মননের নিষ্ঠায় শৃঙ্খলিত করতে হবে, সাহিত্যে এটাই পরিপূর্ণতা। স্বাভাবিক নগ্নতা প্রকাশ করতে গিয়ে লরেন্স নিজে নগ্ন হয়েছেন, লরেন্সের সেখানেই শোচনীয় ব্যর্থতা, তবু লরেন্স শিল্পী হিসেবে অনস্বীকার্য। কারণ সেই পরিসরে সংক্ষিপ্ত একটি প্রচ্ছন্ন পরিপুষ্ট ব্যক্তিরূপের সবাঙ্গ অভিব্যক্তি।

কিন্তু লরেন্সকে ঔপন্যাসিকমাত্র বিবেচনা করলে সত্যের অপলাপ হবে, কবি হিসেবে তিনি আরো কোটী কোটী মাইল অগ্রবর্তী। উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে তিনি কাঠামোকে মেনেছেন তাঁর নৈষ্ঠিক মন দিয়ে, সেখানে একক চরিত্রের বৃত্তে ভাবের কারু-খচিত বিন্যাস। কবিতায় তো ভাবের বিন্যাসই সীমা। সুতরাং স্বাধীনতা সেখানে অনেক নিরঙ্কুশ। লরেন্সের ভাবসমীক্ষা সেই স্বেচ্ছায় উন্মীলিয়মান। অথচ এই লরেন্সের কবিপ্রতিভা অন্ততঃ সুবিদিত নয়। কিন্তু কেবল কবি হিসেবে লরেন্সকে অভিব্যক্ত হতে দেখলে তাঁর আসন অনেক দৃঢ় হত। কিন্তু একটি আদর্শচ্যুতির ফলেই যেন সব জলটাই ঘোলা হয়ে গিয়েছিল এতকাল ধরে, হঠাৎ মন্ত্রবলে আল্লাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপের মত তাঁর মধ্যে মানুষ দেখতে পেল নিজেকে দর্পণিত। আজ লরেন্সের বই গ্রন্থাগার থেকে পাওয়াই সৌভাগ্য। সাহিত্যে এই স্থিতিস্থাপকতার অভাব গ্লানিময় ও ক্ষতিকর। একদিনের দেবতা পাঠকের খামখেয়ালে (অথবা বদখেয়ালে) পরের দিনেই হ'ল অপদেবতা। লরেন্সও এই বিড়ম্বনা হ'তে মুক্তি পাননি। আজ লরেন্সের কবিতার কথা মনে এলেই ভাবি : তাঁর কবিতা কি স্থায়ী হবে? নাকি নামমাত্র সত্তার প্রস্তরাকীর্ণ ইতিহাস তিল তিল করে শুকোবে। না, তাঁর কবিতাই বাঁচবে কলাকৈবল্যের স্রোতে। কেননা এখানেই তিনি যথার্থ 'ফিগারিস্ট', যদিও উদ্দেশ্যবাদশূন্য নয় কখনও। কবিতায়ই তাই তিনি ঐকান্তিক শুদ্ধসত্ত্ব রূপকার। অল্ডুস হাক্সলির ভাষায় : 'He was an artist first of all and the fact of his being an artist explains a life which seems, if you forget it, inexplicably strange. An artist, the sort of artist he is, because he happens to possess certain gift and he leads the sort of life he does, in fact, leads because he is an artist". জীবনকে পরিপূর্ণ প্রতিফলিত করতে গিয়ে লরেন্স বেপরোয়া হয়েছেন, সেই ভুলের মাশুলেই তিনি সাম্প্রতিক চিন্তার সবচেয়ে বিতর্কিত সাহিত্য-স্রষ্টা। কবিতার বেলায় সে কারণেই অনিরুদ্ধ। কবিতা লিখেই তাঁর জীবন শুরু। ঊনিশ বছর বয়সে লিখলেন 'টু গিল্ডার রোজেস্'। লরেন্স এ সম্পর্কে নিজে লিখেছেন "আমার বেশ মনে আছে সেই রবিবার অপরাহ্ণের কথা, যখন আমি আমার প্রথম কবিতা দুটো রচনা করলাম : টু গিল্ডার রোজেস্ ও টু ক্যাম্পিয়ন্স। তখন বসন্তকাল, আমার তো বিংশতিতম বয়ঃক্রম। যে কোন তরুণী লিখতে পারত ঐ কবিতা এবং আনন্দ পেত, আমিও পেলাম। কিন্তু এর পরে আমার কুড়ি বছর বয়সেই আমার কবিদুষমন আমাকে আয়ত্তে

আনিল, আমার মধ্যে থেকে আরো বস্তু-ধর্মী কবিতা এল, আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। তাই আমি 'গিল্ডার রোজেস্'-এর চেয়ে ভালোবাসতে আর কোন কাব্য-সৃষ্টিকেই পারিনি।" অপকৃতির মন। যৌবনকে তাই জীবনস্বতন্ত্র বলেননি। তাই অস্বীকার করেননি যৌবনের ধর্ম। যৌবন কবির উচ্ছ্বাসের সমাবেশ। সেই মুহূর্তে মানুষমাত্রেই কবি। লরেন্স চোখ মুদে দেখলেন বিশ্বপথে কবিমনের মিছিল। রণক্লান্ত সৈনিক তাই ভুলতে পারেননি তাই সেদিনের উজ্জ্বল বাসনার মুহূর্ত। কেননা গঙ্গোত্রীকে অস্বীকার করা গঙ্গার অসাধ্য। লরেন্স এই সহজ স্বীকৃতির প্রতিরূপ। জীবনের প্রথম দিন থেকেই বেছে নিয়েছেন বস্তুধর্মের কৃচ্ছ্রসাধন। বস্তুকে আঁকড়ে ধরেই তাঁর ব্যক্তিজীবনে হলেন ব্যর্থপ্রেমিক। কবি কল্পনার ব্যর্থমুখে দেখলেন,

"স্বচ্ছবৃষ্টিজলের মত সৌন্দর্য,
সে জ্বলছে, জ্বলছে আমার প্রথম
প্রেমের শুভ্রতা : কেননা
নিরাবেগ যৌবনেই আমি ব্যর্থপ্রেম
নিয়ে ফিরেছিলাম। (সাদাফুল)

জীবনে একাধিক প্রেম, বৈচিত্র্য ও হতাশার শায়কে তীক্ষ্ণতর হয়েছিল তাঁর বিশ্লেষণ-ক্ষমতা। জীবনকে শুভ্রতার মাথায় দেখতে গিয়ে হয়েছেন বারবার ব্যর্থমনোরথ। অসহায় সরলতা হয়েছে কুটিল জীবনের কাঠিন্যে চূর্ণবিচূর্ণ। স্বর্গীয় নিরঞ্জন প্রেমের বদলে পেলেন ব্যর্থ পরিহাস। লরেন্সের চোখে সত্য হয়ে উঠল জীবনের বীভৎস নগ্নতা, সেই নির্মম সত্যকে আঁকড়ে ধরে পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় করে চললেন তাঁর প্রেমাদর্শ। যন্ত্রণায় উচ্চারণ করলেন,

"তোমাকে ভালোবাসার যন্ত্রণা
আমার মিথ্যাভাষণের চেয়েও
বেশী কিছু"।
(কোন তরুণী ভার্যা)

সেই নিরুক্তির ছদ্মবেশে বলে ফেললেন,

"রাত্রি সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল
কিন্তু কেন—?" (প্রথম মুহূর্ত)।

এই তীব্রতার অনলে জ্বলে পুড়ে মরেছেন লরেন্স, জ্বলেছে তাঁর সৃষ্টি-মাধুর্য। তবু অশ্লীলতাকে মানেননি কদাপি। বলেছেন, "হোয়াট ইজ্ পর্ণোগ্রাফি টু ওয়ান ম্যান ইজ দি লাফটার অফ্ জিনিয়াস্ টু এ্যানাদার।"

২৩ বছর বয়সে এল তাঁর কবিমনের প্রথম ঋতুপরিবর্তন। তখন তিনি লিখলেন "হেলেনের কবিতা", "ট্রেনে চুম্বন" ইত্যাদি কবিতা। এ সময় তাঁর কবিতায় একটা বিশেষ ব্যাপ্তিবোধ দেখা গেল। যেমন—

"সমস্ত বিশ্বটাই কেবল ঘুরছে,
আনন্দের স্বপ্নে,
যেমন দরবেশী নাচ ধ্বংসার
চরাচরে—
আমার বোধ ও যুক্তি
লাটুর মত ঘোরে (ট্রেনে চুম্বন)"

লরেন্স এইবার যেন জীবনকে যথার্থ জরিপ করতে চাইলেন। উদ্দেশ্যবাদ-আরোপিত 'অনূঢ়া যৌবন' কবিতায় নারীর অধিকারকে মহৎ স্বীকৃতি দিয়ে বললেন যেন রমণীয় উপত্যকায় জীবন মোহময় হয়ে ওঠে। লিখলেন 'একটি নারীর নারীসমাজের প্রতি উক্তি' কবিতায়—

"মুহূর্তময় গতিতে মানুষ মানুষে,
দু'য়ে একে
একীভূত হয় এবং অনেকে এমনকি
মিলিয়ে

গিয়ে শূন্য হয়; সে অনন্যা তুমিই হে
নারী।"

একথা সত্য যে শ্রেষ্ঠ কবিতাও, এমনকি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও, স্বকীয় সময়, স্থান ও ঘটনার উপচ্ছায়ে এসে পরিপুষ্ট হতে চায়। তিনি কবিতাকে বলতেন 'একটা মনোযোগ সৃষ্টির প্রয়াস যার দ্বারা জ্ঞাত পৃথিবীর মাঝে নতুন একটা পৃথিবী গড়া যায়।'...সূক্ষ্ম অনুভূতি যে কতখানি কাব্যসুষমা সংযুক্ত ছিল, এই উপলব্ধি তার নিদর্শন। বাবা-মা ছিলেন দরিদ্র দম্পতি। তার ওপর লরেন্সের আজীবন অসুস্থতা তাঁকে বিষাক্ত করে তুলেছিল কায়মনোবাক্যে। তবু সূক্ষ্ম আবেগ ও নৈসর্গিক অনুভূতি তাঁর মধ্যে অটুট ছিল তাঁর মায়ের মার্জিত ও বোধিসত্ত্ব শিক্ষার ফলে। প'য়তাল্লিশ বছরের জীবনের অর্ধেকই কেটেছে সানাটোরিয়ামে। ফলে কাব্য হয়েছে অবিশ্রান্ত, উত্তেজক ও কামোত্তেজক। লরেন্সের নির্বাচিত কাব্যসঙ্কলনে ভূমিকাচ্ছলে শ্রীযুক্ত জেমস রীভস লিখেছেন,

"In reading it one has so often the feeling in contact with nature at a level just below one's skin. This hyper-sensitive, as it were, subcutaneous growth, the nervous quality in Lawrence's poetry is what makes it exciting, even painful to read."

রীভসের বাচনভঙ্গী যথার্থ সমালোচকেরই সাজে, সেখানে কোন জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি হয়নি সমালোচকের স্বেচ্ছায়, তিনি প্রশংসাই করেছেন তাঁর মৌলিকতার ও স্বধর্ম-নিষ্ঠার।

"At his best, he represented as no other writer so far had done, the conflicts and strains of adolescent growth, the nervous battles just below the surface of emotional growth ...... The form of poem — if it has any form — is organic. It resembles musical impromptu, a series of loosely connected variations ...... reverse of classical."

বস্তুতঃ লরেন্স এই মন ও মননের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। পৃথিবীতে স্বভাব-কবির অভাব নেই, কিন্তু স্বভাব-কবি রূপদক্ষের অভাব, সেই হাওয়ায় শিহরিত স্মরণীয় হাস্নুহানা লরেন্স, তা' না হলে কেবল অশ্লীলতার কবি কদাপিও 'পিয়ানো' বা অগ্নিদান ও তুষার রাত্রির মত কবিতা কল্পনাও করতে পারতেন না। পিয়ানো কবিতায় বিষয় ও মাধ্যমের সেতুবন্ধন, পরিমিতি ধ্রুপদী সাফল্যবাহী। সেখানে অভিব্যক্ত নারী, প্রেম, মাতৃত্ব, শিশু, সঙ্গীত ও এই সবের অতিশায়ী জীবন। এত স্বল্প পরিসর, অথচ কত বিস্তৃত ব্যাপ্তি। শেষে লরেন্স মর্মগভীরে তুলেছেন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা :

"এখনও হৃদয় কাঁদে, আমার পুরাতন
গৃহে উপনীত,
সে এক রবিবার সন্ধ্যাবেলা : চারদিকে
শীতের প্রলেপ জড়ানো।
আলাপী কক্ষের অবকাশে বেজে চলে
দিশারী পিয়ানো।"

একদিকে নিভৃত শান্তি, কোমল-কান্তি, অন্যদিকে তাঁর সুতীব্র কাঠিন্য, বীভৎস রূঢ়তা। এই দুই সত্যের অন্তর্নিহিত প্রতীতি প্রকৃতিপ্রশান্তপরিমিতির সুষমায় এসে তাঁর চারুচেতনাকে অপরিসীম আনন্দে আপ্লুত করেছে। সেই বোধের হ্রস্বতম পরিসরে লরেন্স অবকাশ পেলেন, "সমস্ত বস্তুময় দিবসের অর্থ, একটি মিথ্যার মত শুকিয়ে যাওয়া" (গোধূলি)

লরেন্সের কাব্যপরিক্রমার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যায়ন বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট নয়, কেননা এত বড় পরিচয়ের এত স্বল্পাবকাশে প্রতিভাসায়ন দুঃসাহস। সুতরাং রসপিপাসুর স্বল্পতম পানীয়তেই পরিতৃপ্ত হতে হবে, তাঁর মহাস্বাদন পাঠকের আত্মকৃত জীবনবোধ ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। লরেন্সের কবিবিহীন পরিচিতি নিরর্থক। যদিও তা' আপেক্ষিক, তার অন্তসত্ত্ব ন্যূনতম 'এ্যাবসলিউটিজম্' উপযুক্ত বোধমাত্রেরই বিধৃত। লরেন্স জীবনে বহুপ্রকারের কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে মৌলিকতার উৎকর্ষ আখ্যানমূলক কাব্যেই বেশী। যেমন 'দুই বধূ', 'পরিণয়-প্রত্যূষ' প্রভৃতি। সেখানে আবেগ কণ্ঠস্বর—

"আহা! শুধু পল্লব আর পল্লব!
কিন্তু পশ্চিমে দেখি
লোহিতাভা কেমন ছড়িয়ে পড়ে আসছে
এদিকে
সন্ধ্যার আসন্ন বুকে চোখ রেখে, সে কি
প্রেমের ক্ষত বয়ে ফিরছে গৃহমুখে"।

এবং অপহৃত চুমোর, পুলিন পরাগে
যে সুখ, বিগত সে এখন বিরাগে
(খামারে প্রেম)

মানুষের চারুসাধনা ত্রিমুখী সাধন-সত্তার 'পরে নির্ভরশীল : প্রেরণাদাত্রী নিত্যবহ জীবন; রূপানুরাগ ও এই দুই-এর মিলনান্ত বিশ্বব্যাপ্ত চেতনা, কবির সাধনায় এই তিন সত্য অভিন্নবীজপত্রী-রূপে প্রতিভাত। সেই প্রকৃতিকে অস্বীকার করা কবির অসাধ্য। লরেন্স এই সত্যে তিমিরবিদ্রোহী স্থির নক্ষত্র। তাই তাঁর বিভিংসা নৈসর্গিক, জৈবিক প্রেমসম্পর্কিত ও জীবনসাম্যবিষয়ক কাব্যবৈচিত্র্যে। এই সূক্ষ্মবোধ সর্বত্র, ভালোমন্দে, বিধৃত। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অমৃতের, তবু মৃত্যুর প্রচ্ছায়া সেখানে সতর্ক। এই দুই প্রান্তিক স্বপ্নে কবি বিভোল, কবির আকাঙ্ক্ষার

"নদী ঘুমিয়ে আছে প্রদীপের মাঝামাঝি,
সোনালী ছড়ের টানে আছে টানাটানা,
মধ্যপথে নেমে এসে স্ফীত তীররাজি
প্রকাশিত হ'ল সেথা সুপ্ত অজানা"
(প্রাকযুদ্ধে নদীর বাঁধে)

কেননা কবির সত্তা নিরুচ্চার স্বরে ঘোষণা করবে,

"তার বাহুতে অবশেষে নিদ্রিত নয়
হব অসহায়ের মতো,
আমি কাঁদব, কাঁদব জানি
আনন্দে কিংবা স্মরণে হয়তো"
((দুই বধূ)

অথবা

"ওঃ! কি মধুর
সব বস্তু হতে, অথবা আত্মায়ত্ত
আর না হলে।
কারণ আত্মচিন্তায় আমি পরিশ্রান্ত"।
(সত্তাহীনতা)

নিজের জীবনেও ছিলেন চিত্রকর। প্যারিসে একবার তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। তাঁর তিন-চতুর্থাংশ ছবির বিষয়বস্তু ছিল নিরাবরণ যৌনতা। এর সমালোচনায় শায়কে আহত বাজপাখীর মত কাতর হয়েছিলেন লরেন্স। তবে এই চিত্রধর্মিতা কবিতায় স্বারোপিত ছিল। রীভস কিন্তু বলেন, "তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কবিতা হবে টাটকা ফুল, অমৃত নয়। তাঁর রীতি ছিল ইম্প্রেশনিজম ও এক্সপ্রেশনিজমের মাঝামাঝি পরিসরে রঙের পাত্র ব্যবহার করা।" এর সাক্ষ্য কবিতায় আছে, যেমন—

"পাথরের সোপানের নীচে যে মেয়েটি
তার ডাগর চোখ দুটো বিরহে বিস্তৃত,
তার
ব্যথাতুর আবেগের মুহূর্তে উত্তোলিত
দৃষ্টি আমার পানে, তাই
আমি চেয়ে শুধু মৃদু হাসলাম"
(গীতিনাট্যের পর)

অথবা

"কি অদ্ভুত আর সুন্দর
জীবন তোমার, যার পরে তোমার
নিজের দাবী নেই,
তারপরে তুমি, কেননা তোমার
অভিযোগ সাজে না সবার"।
(মাইকেলেঞ্জেলো)

রীভস বলেছেন, "আমি আগেই বলেছি লরেন্স কবিতা লিখতেন উদ্দেশ্য নিয়ে, উপসংহারের জন্য নয়। তিনি ইংরাজী কাব্যভাণ্ডারে পরিপূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে কবিতা লেখেননি, চেয়েছিলেন সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগমায়াকে প্রকাশ করতে"। তাঁর কাব্য বাস্তবিকই নিরুচ্চার মুহূর্তের আবেগ-সমাহিত। তবু তাঁর কবিতা রইবে না সাধারণ্যে, কেননা তাঁর মধ্যে যে মৌলিকতার সূক্ষ্মতম শায়কের অনুভূতিমাখা উত্তর-প্রভাব, তার উত্তরসাধনা পৃথিবীতে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য, অন্ততঃ ক্রম-বর্ধিষ্ণু নীচতা ও সংকীর্ণতার যুগে। অসংলগ্নতা তাঁর কবিতায় আছে সত্য, কেননা মানসিক অভিজ্ঞতা ও শারীরিক পরিপূর্ণতার মধ্যে রয়ে গেছে যুগান্ত-মেরু ব্যবধান। তিনি ছিলেন, 'a poet more than a creative poet'. এ জন্যেই বাস্তব-প্রাধান্য হয়েছে রোমাণ্টিক, অবিশ্রান্ত, অতৃপ্ত ও দুর্বার। এর একটা ভালো দিকও আছে। বীভৎস রূঢ়তা, কুৎসিত ক্লেদাক্ত কৃত্রিমতা ও জান্তব স্থূলতা প্রকটিত হয়েছে দেখে আমরা বিকর্ষিত হয়ে সূক্ষ্ম, সুস্থ ও শুচির জীবনকে ভালবাসতে শিখি। এই ব্যাপ্তিবোধ উপন্যাসে যেমন শূন্য, কবিতায় ততোধিক পূর্ণ। সেই বিবেচনার বাতায়নে বসে লরেন্সকে অধ্যয়নের অবসর আসন্ন, লরেন্স সেই প্রাপ্য উপলব্ধিকে আবাহন করছেন প্রিয়তমার মত :

I follow her down the night, begging her not to depart.

এক বন্ধুর খোঁজে বেরিয়েছিলাম। খুঁজে খুঁজে হয়রান। রাস্তার নাম নেই, বাড়ির নম্বর নেই। ক'টা বছর আগে জঙ্গল আর পোড়ো মাঠ ছিল, দিনদুপুরে শিয়াল ডাকত। এখন চালে চালে বসতি।

পাড়ার মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করি, কোন জায়গা এটা মশায়?

নেহরু কলোনি।

কী সর্বনাশ! রাজধানী দিল্লি থেকে ঠেলতে ঠেলতে নেহরুকে এই জায়গায় এনে ফেলেছেন?

যে মুরুব্বি মানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন: কত দিকে কত কলোনির পত্তন। এরা এই নাম দেয়, ওরা সেই নাম দেয়। আমি বললাম, দাঁড়া, নামে যখন এক পয়সা খরচা নেই কঞ্জুষপনা কিসের! দিলাম জুড়ে পণ্ডিত নেহরুর নাম। এর উপরে কারা উঠবে, দেখা যাক।

আচ্ছা, অজিত বেরা বলে এক ভদ্রলোক—

সঙ্গে সঙ্গে দেখি, মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে এক খুনখুনে বুড়ো পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছে। একনজরে চিনতে পারি।

তুমি এই জায়গায়?

আমার বন্ধু অজিত বেরা নয়, আমার সেকালের গাঁ-অঞ্চলের প্রিয়নাথ সর্দার। দেখেই চিনেছি' বিলপারে আসাননগরে ছিল সর্দারদের বাড়ি। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান করেন নি তখনো আপনারা। আমাদের বাইরে বাড়ি থেকে পুব দিকে নজর করলেই ঝাপসা-ঝাপসা ঘরবাড়ি দেখা যেত। সেই জায়গা।

পিরোনাথ, তুমিও এসে গেছ?

চেনা মানুষ দেখে একগাল হেসে প্রিয়নাথ ধুঁকতে ধুঁকতে কাছে এসে বসে পড়ল। বলে, আসব না? এসে বেঁচে গেছি ছোটবাবু। গোসাঁই পারল না, ওপারে পড়ে রইল। হি-হি-হি! গোসাঁইর উৎপাত নেই এখানে, দিব্যি আছি।

তবে তো গোড়া থেকেই বলতে হয়। সতুর ভিটে ও সতুর খালের গল্প। আমার আর এক জীবনের কথা।

সতুর খাল আমাদের গাঁয়ের পুব দিকে, তেপান্তর বিলের মাঝখানে। খাল শুধু নামেই। চৈত্র-বৈশাখে ধান কেটে নেওয়া আমাদের বিল মরুভূমির মতো। তার মধ্যে দেখতে পাবেন, খানিকটা বন্ধ জল এক জায়গায়। খাল বলতে সেই। তা-ও কি ছিল আগে! প্রিয়নাথ সর্দার পুকুর কাটাতে গিয়েছিল ওখানে। কাজ শেষ হল না, সিকি আন্দাজ হয়ে অমনি অবস্থায় পড়ে রইল।

কিন্তু বর্ষার সময় একদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখবেন, বিলের মরুভূমি সমুদ্র হয়ে গেছে। গাঁ-গ্রামের যাবতীয় জল বিলে গিয়ে জমেছে, সে জলের কূলকিনারা নেই। অগুন্তি তালের ডোঙা। খরার দিনে এর একটি চোখে পড়েনি—পুকুরে কি খানাখন্দে ডোবানো ছিল। জল দেখে বেরিয়ে পড়ে সারা বিল ছুটোছুটি লাগিয়েছে। এবারে—হাঁ, দেখুন তাকিয়ে খাল কাকে বলে। দু-পাশে ধান রুয়ে সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছে—মাঝের ফাঁকা পথ ধরে খরবেগে জল বড়-গাঙে পড়ে। আর দশটা আজেবাজে খালের মতন নয়, এখন সতুর খাল, খালের উপর দস্তুর-মতো ভাঁটার টান। জল নেমে যায় গাঙে, আর গাঙের মাছ উজানে উঠে আসে বিলে। দূর-দুরন্তরের ব্যাপারি-মহাজন আসে, কেনাবেচার মরশুম পড়ে যায় এই কয়েকটা মাস। ডোঙা তো আছেই, আবার কতজনে ডিঙি চড়ে হাটঘাট করে বেড়ায়। ঠিক যেন গাঙের পাড়ের বাসিন্দা আমরা। ডিঙি চড়ে মজা করে বাপের-বাড়ি শ্বশুরবাড়ি করে বেড়ায় এ-গাঁয়ের ও-গাঁয়ের বউঝিরা।

আর আমরা যত মাছুড়ে মানুষ ঘরবাড়ি ভুলে পড়ে থাকি মরগাঙ রাস্তার বাঁকা তালগাছ-তলায়। বাঁকা তালগাছটা বিলের সর্বঅঞ্চল থেকে নজরে পড়ে। বিলের পথিক দিক্-নির্ণয় করে তালগাছ দেখে, পথের হদিস পায়। সেই তালগাছের এদিকে সেদিকে হাট বসে গেছে। হাট বটে, কিন্তু এতগুলো মানুষ একেবারে নিশ্চুপ। সাপে কাটলেও উঃ—আঃ—করবার জো নেই, চারের মাছ সরে যাবে। ছিপ নিয়ে সারি সারি সব বসেছে—টানে টানে পুঁটিমাছ। ট্যাংরা-কই-সিঙিও ওঠে। রাস্তার উল্টো দিকটায় নরম হাতে ধুজি মেরে ডোঙা নিয়ে সব দূর-বিলে বেরিয়ে পড়ছে। চিকন ধান-চারা কদিনের মধ্যে দেখতে দেখতে জলের উপর মাথা তুলে ঘন কালো ঝাড় বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ডোঙা অদৃশ্য, ধান-গাছ ছাড়িয়ে মানুষগুলোর মাথা থেকে কোমর অবধি শুধু দেখতে পাওয়া যায়। হাতে লম্বা ধুজি, সেই ধুজি উঠছে-পড়ছে। এখানেও মাছ ধরার বন্দোবস্ত—ডোঙা নিয়ে আলের ধারে ধারে চারো-দোয়াড়ি পেতে বেড়াচ্ছে।

সতুর খালের মুখে পাটা দিয়েছে এখন। আ আমার কপাল—কাদের কাছে কী বলছি! গিয়েছেন কখনো বিলে-খালে যে পাটা বললেই অমনি বুঝে যাবেন! বাঁশের পাতলা পাতলা বাখারি বানিয়ে দড়ি দিয়ে বোনা। সেই বস্তু খাড়া করে পুঁতে দেয়। জল বেরিয়ে যাবে, মাছ আটক থাকবে। জল কমলে জাল ফেলে ছেঁকে তুলবে সেই মাছ। ততদিন হাত কোলে করে বসে থাকবে কেন—পাটায় একটু-আধটু ফাঁক করে চারো-দোয়াড়ি পাতে। মাছ ভাবে পালাবার পথ। পালাতে গিয়ে চারের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঢুকতে পারে দিব্যি খেলা করতে করতে, বেরুনোর পথ বন্ধ।

পাটা যেখানে দিয়েছে, তার পাশে টোং। কী মুসকিল, টোং আবার কোন বস্তু? বর্ষায় আসবেন একবার আমাদের ডোঙাঘাটায়—নিমন্ত্রণ রইল—বিলের ধারে নিয়ে গিয়ে টোং দেখিয়ে দেব। টোং কি একটা-দুটো! নিঃসীম সবুজ বিল—টোংগুলো একটা এখানে একটা সেখানে ধানগাছের মাথার উপর চড়ে বসে আছে। ধরে নিন ছোট একটুখানি খাচা—মাচার উপরে খড়ে-ছাওয়া চাল। আলাদা দেয়াল নেই—চালই দেয়াল হয়ে দু-পাশ দিয়ে নেমে পড়েছে। ধুজি পুঁতে ডোঙা আটকাতে হবে টোঙের নিচে। বাবুভেয়েরা হলে সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হত, আমাদের

সে হাঙ্গামা নেই। সুপারিগাছে ওঠার মতন খুঁটির বাঁশ বেয়ে আমরা টোঙে চড়ে বসি।

ভাইঝি'র বিয়ে উপলক্ষে সেবারে শ্রাবণ মাসে দেশে গিয়েছি। বিয়ে-থাওয়া চুকে গেল। শুনলাম, বিলে মাছের অবস্থা বড় ভাল এবার। পবন সর্দারকে বলি, আজ রাত্রে তোমার টোঙে গিয়ে শোব। সন্ধ্যের আগেই গিয়ে পড়ব ওখানে।

মতলব বুঝেছে পবন। একগাল হেসে বলে, তোমার দালানে শোওয়ার বড় কষ্ট কিনা, তাই মাঝ-বিলে গিয়ে শুতে হবে।

সতুর খালের ডাক হয় ফি বছর। এবারে পবন সর্দার ডেকে নিয়েছে। রোখ চড়ে গিয়ে ডাকটা কিছু জেয়াদা হয়ে গেছে। মুনাফা পড়ে মরুক, সতর্ক না হলে ডাকের টাকাটাও উঠবে বলে ভরসা হয় না। একটা মাছ এদিক-ওদিক না হয়, অহোরাত্র সে জন্য পাহারায় আছে। বেলাবেলি এক থালা ভাত গিলে বিলে ডোঙা ভাসিয়ে দিলাম। পবনের পাশে টোঙের উঁচুতে বসে শ্যেন-দৃষ্টিতে নিরিখ করছি, কে কোনখানে চারো পেতে রেখে যাচ্ছে।

বলবেন, চুরি যুক্তি। মুখ বাঁকাচ্ছেন। আজ্ঞে না, চারো থেকে চাট্টি মাছ ঝেড়ে নেওয়া কিম্বা খেজুরগাছের মাথার ভাঁড় থেকে দু-ঢোক রস পেড়ে খাওয়া—এতে চুরি হয় না আমাদের পাড়াগাঁয়ের নিয়মে। চারো ঝাড়ব নয়তো কি হরেকৃষ্ট নাম জপ করতে রাত্রিবেলা বিলের টোঙে এসে উঠেছি?

টোঙে তামাকের ব্যবস্থাটা অতি উত্তম। হুঁকো-কলকে, আগুনের মালসা আর চিটেগুড়-মাখা কড়া দা-কাটা তামাক। তামাকটাই শুধু, আর কিছু নেই। বাখারির উপরেই টান-টান হয়ে গড়িয়ে নেওয়া যায়, অতএব বিছানাপত্র বাহুল্য। এবং অন্ধকার যত গাঢ় হোক, ফাঁকা বিলে অন্ততপক্ষে ঝাপসা রকম নজর চলবেই। অতএব টেমি জেলে রোসনাই করবার কোন মানে হয় না।

ভাবতে গেলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। সুমুখ-আঁধার রাত্রি। এক ঝোঁক ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম গোড়ার দিকে। পবন সর্দার ঠায় বসে। এক সময়ে আমায় ঝাঁকানি দিয়ে চাপা গলায় বলে, ওঠ, উঠে বস। টোঙে কি ঘুমুতে এসেছ? ঘুমুবে তো বাড়ির দালান কোন্ দোষ করল?

অন্ধকার কেটে গিয়ে বিলের প্রান্তে খেজুরবনের শীর্ষে গোলাপি রঙের চাঁদ দেখা দিয়েছে। চারো ঝাড়বার সময় বোধ হয় এইবার, পবন সেই জন্যে ডেকেছে। জিজ্ঞাসা করি, ডোঙায় নেমে পড়ি এইবার—কি বল?

পবন হাত তুলে ফিসফিস করে বলে, চুপ!

তামাক খাবে বলে কলকেয় আগুন দিয়েছে। ঘুঁটের আগুনের উপর সাদা ছাই জমে নিভে আসছে, পবন একটা টানও দেয় না। ঘুম থেকে উঠে দেখছি, একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। হঠাৎ সে বলে উঠল, নাকে গন্ধ পাও না?

সোঁদা-সোঁদা একটা গন্ধ বটে। এক ঝাপটা পুবের বাতাস এসে গন্ধ আরও প্রকট করে দিল।

পবন বলে, ভাঙের গন্ধ। সতুর ভিটে থেকে আসছে। এক-একদিন আসে এইরকম।

সতুর খালের অদূরে সতুর ভিটা। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ভিটা কিছু নয়, একটু উঁচু জায়গা। বাড়াবাড়ি রকমের বর্ষা না হলে জায়গাটুকু ডোবে না। শেয়াকুল, কাঁটা-সেঁজির ঝোপ আর গোটা পাঁচ-সাত পুরানো খেজুরগাছ।

আর বোধ হয় জঙ্গুলে-ভাঙও আছে। নয়তো নিঃসীম নির্জন জলার মধ্যে রাতদুপুরে ভাঙের গন্ধ আসে কেমন করে?

পবন বলে, কাঁচা-ভাঙে এ গন্ধ হয় না। ভাঙ কলকেয় সেজে খাচ্ছে কাঁটা-সেঁজির ঝোপে বসে।

বিল-কিনারের মানুষ আমিও বটে। কত গল্প শুনতে পাওয়া যায়। আজকে যখন এত কাছের ঘটনা, এমন সুযোগ ছাড়া হবে না।

দেখে আসি চল পবন। দু-জনে যাই।

পবন খিঁচিয়ে ওঠে: নড়াচড়া কোরো না, বাঁশ মচমচ না করে।

নাক-কান মলে পুনশ্চ বলে, ওঁদের জায়গায় বসে যা-খুশি ওঁরা করুন গে। ভাঙ খান, গাঁজা খান—আমাদের কি, আমরা কেন দেখতে যাব? আমার সতুর খালের এদিকে নজর না দিলে হল।

কী করব, কাঠের পুতুলের মতো বসে আছি ভিটের দিকে অপলক তাকিয়ে। অনেকক্ষণ পরে মনে হল, দেখতে পাচ্ছি যেন কিছু—কাঁটসেঁজির ঝোপের উপরে খানিকটা জোৎস্না বুঝি জমাট বেঁধে নরমূর্তি ধারণ করল। ধবধবে ফর্শা এক দীর্ঘ পুরুষ, দুধের মতো সাদা দাড়ি। বিলের হাওয়ায় দাড়ি নড়ছে, এত দূর থেকেও ঠাহর পাচ্ছি। না, দেখার ভুল হতে পারে না—সত্যিই এক বুড়ো মানুষ। শোলাবন তাঁর পথ আটকায় না, কাঁটাগাছ গায়ে বেঁধে না। নিশ্চিন্ত গাম্ভীর্যে আপন মনে তিনি পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন সতুর ভিটের এমুড়ো-ওমুড়ো।

আর পারা যায় না। টোঙের খুঁটি বেয়ে সড়াৎ করে ডোঙায় গিয়ে পড়লাম। চুলোয় যাকগে পবন—আপাতত সে চেঁচামেচি করতে পারছে না। ঐখানে বসে বসে চোখ পাকাক, আর গর্জাক মনে মনে। বুড়োমানুষটিকে কাছাকাছি ভাল করে না দেখে আমার সোয়াস্তি নেই। ধুজি মারি নে, ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে ধানের গোছা ধরে ধরে সন্তর্পণে এগোচ্ছি। জলের ছপছপানি না হয়, ডোঙার চলাচলে ধানের মাথা এতটুকু না নড়ে।

শোলাবনের ঠিক পিছনে এসে গেছি। কই, কিছুই না। জ্যোৎস্নার খানিকটা বরফের মতন জমে গিয়ে এক ধবধবে মানুষ হয়েছিল, সে মানুষ গলে আবার জ্যোৎস্না হয়ে গেছে। এতক্ষণে ধুজি ধরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করি। কেউ নেই, কিন্তু ভাঙের গন্ধ বাতাসে। জায়গায় এসে পড়ে গন্ধ তীব্র হয়েছে। এইখানে অনতিপূর্বে ভাঙ টেনে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সেদিন এই হল। এর অনেক দিন পরে কলকাতায় জাপানি বোমা পড়তে হুড়মুড় করে সবসুদ্ধ গাঁয়ে এসে পড়লাম। বিল তখন আর সাগর নয়, মরুভূমি। সারা দিনমান ধরে আকাশ থেকে আগুন ঝরে, মাটি ফেটে চৌচির। সরু সরু ডোঙার দাঁড়াগুলো অজগরের খোলসের মতো এঁকে-বেঁকে পড়ে রয়েছে। রাত্রিবেলা—উপমার কথা নয়—সত্যি সত্যি আগুন জ্বলে সারা বিল জুড়ে। ধান-কাটা হয়ে গিয়ে শুকনো গোড়া রয়েছে—ছাইয়ে জমি উর্বর হয়, সন্ধ্যাবেলা চাষীরা আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায় সেইজন্য। উদ্দাম বাতাসে আগুন লাফালাফি করে। রাত্রির খাওয়া সেরে পুকুর-ঘাটে আঁচাতে যাবার সময় কত দিন এই দৃশ্য দেখে থাকি।

এক রাত্রে বিল-পারের গ্রাম মনোহরপুর থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেকে একসঙ্গে ফিরে আসছি। ডাঙার পথ অনেক ঘুরে ঘুরে গেছে, বিকালবেলা যাবার সময় সেই পথের ছায়ায় ছায়ায় গিয়েছিলাম। এখন জ্যোৎস্না রাত্রে অত ঘুরতে যাই কেন? বিল ভেঙে কোণাকুণি পাড়ি দিচ্ছি, অর্ধেক সময়ে পেঁৗছে যাব।

মাঝামাঝি এসে অবাক। সেই যে সতুর ভিটে—দাড়িওয়ালা ধবধবে মানুষটি ভাঙ সেজে খেয়ে রাত দুপুরে পায়চারি করে বেড়ায়—সেই জায়গায় বাংলাঘর, চৌরিঘর চার-পাঁচখানা। দিব্যি এক গৃহস্থবাড়ি। বাস্তু জমির কার এত অকুলান পড়ল, গ্রাম ছেড়ে বিলের মধ্যে এসে সব ঘর বাঁধতে হল? নাম বল তো মাথা-খারাপ সেই লোকটার।

প্রিয়নাথ সর্দার। তা বটে, ঐ একটা মানুষ প্রিয়নাথ যদি পৈতৃক ভিটা ছেড়ে বাইরে এসে ঘর বাঁধে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। মস্তবড় চাষী গৃহস্থ। গিয়েছি ওদের আসাননগরের বাড়ি। সে এক এলাহি ব্যাপার। মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়োয় মানুষ কিলবিল করছে, গণে পারা যায় না। রান্নাঘরের উনুনের আগুন

শ্রাবণের চিতার মতন রাতদিনের কোন সময় নেভে না।

শুনলাম, খিটিমিটি বাধল প্রিয়নাথের বড় ছেলে রাসবিহারীর বউ আনবার পর থেকে। গোঁয়ার-গোবিন্দ রাসবিহারী, কিন্তু বউ তাকে গুণ করেছে। বউয়ের কথা শুনে কোমর বেঁধে খুড়ি-জেঠিদের সঙ্গে লাগতে আসে। ঝগড়ার চোটে ঘরের চালে কাক বসতে পারে না। শেষটা একদিন ঐ রাসবিহারী 'দুত্তোর' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে—সুবিধা মতো অন্য জায়গা না পেয়ে—বিলের মধ্যে সতুর ভিটের উপর ঘর তুলতে লেগে গেল। বুড়ো হয়ে গিয়ে সংসারে প্রিয়নাথের কোন কথা থাকে না, ছেলে-বউর পিছন ধরে তাকেও উঠতে হল এই নতুন বাড়ি।

নিমন্ত্রণ-ফেরত আমাদের দলের সর্বাগ্রে প্রমথ-দা। তিনি দেখি ঐ মুখো বেঁকেছেন। সতুর ভিটেয় প্রিয়নাথের নতুন বাড়ির দিকে।

ওখানে কেন প্রমথ-দা?

তামাক পিপাসা পেয়ে গেল। পিরোনাথের ক্ষেতে এ পাইতক্কের সেরা তামাক। তামাক পচিয়ে মাখেও খুব জুত করে। কাছে এসে গিয়েছি তো দুটো সুখটান দিয়ে যাই।

আমি তামাক খাইনে। এবং ছেলে-ছোকরার মধ্যে অনেকের অভ্যাস থাকলেও মুরুব্বিদের সামনে খাবে না। তা সত্ত্বেও কেউ আপত্তি করি নে। পরের বাড়ির খাদ্য মুখের সামনে পেয়ে ভুলে গিয়েছিলাম উদরগুলো নিজেদের। ভরাট উদর নিয়ে বিল ভাঙতে ভাঙতে এখন সেটা নিদারুণ ভাবে মনে পড়ছে। অতএব গৃহস্থবাড়ি যখন রয়েছে, খানিকটা জিরিয়ে যাওয়া ভাল।

রাতের খাওয়া শেষ করে প্রিয়নাথ সর্দার উঠানে খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে। এত বড় দলটা শব্দ-সাড়া করে সতুর ভিটেয় উঠছি। প্রমথ-দা এক রশি আগে থাকতে হাঁক পাড়েন: কলকে ধরাও প্রিয়নাথ।

আসেন। বসেন বাবুরা সব। রাত্তির-কালে আসা হচ্ছেন কোয়ানথে?

আরও দুটো পাটি এসে পড়ল। কেউ কেউ গড়িয়ে পড়েছে পাটির উপর। প্রমথ-দা বলেন, ভরভরন্ত গৃহস্থালী আর জ্ঞাতগুষ্ঠি ছেড়ে ফাঁকার মধ্যে ঘর বেঁধেছ—কাজটা কী রকম হল যেন। একা না বোকা—ইচ্ছে করে তুমি সেই একলা হয়েছ।

রাসবিহারী এই সময় খাওয়া শেষ করে জলের ঘটি হাতে রান্নাঘর থেকে আঁচানোর জন্য বেরুল। প্রিয়নাথ কি-একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল ছেলেকে দেখে বাকস্ফূর্তি হয় না। আঙুল তুলে শুধু রাসবিহারীকে দেখিয়ে দিল।

যে-কথা মুখে এসে পড়েছে, না বলে ফেলে প্রমথ-দা সোয়াস্তি পান না। পশ্চিমবাড়ির সেজবাবু তিনি—দুনিয়ার উপর কাকে পরোয়া করেন? বললেন, তুমি ধৃতরাষ্ট্র পিরোনাথ। ধৃতরাষ্ট্রের চোখ ছিল না, তুমি কিন্তু চক্ষু থেকেও অন্ধ। অপত্যস্নেহে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। একদিন পস্তাবে, এই কথা বলে রাখলাম।

আঁচানো শেষ করে রাসবিহারী ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। আবার দেখি কলকে ধরিয়ে টানতে টানতে আসছে। বলে, কি বলছ সেজকর্তা?

কণ্ঠস্বর বেয়াড়া রকমের। গোঁয়ার বলে ছোঁড়াটার বদনাম। প্রমথ-দা ঢোক গিলে বলেন বুকের বল না থাকলে মাঝবিলে এমন ঘর-বসত করা যায় না। তোমার সেটা আছে রাসবিহারী। দস্তুর-মতো আছে। এই সব কথা হচ্ছিল আর কি!

রাসবিহারী ক্যাট-ক্যাট করে বলে, মাঝবিলে বসত না হলে তামাক খেতে উঠতে কোথা তোমরা?

কলকে নামিয়ে কড়ি-বাঁধা হুঁকোর উপর বসিয়ে প্রমথ-দা'র হাতে দিল: সেবা হোক সেজকর্তা।

প্রমথ-দা নির্বিকারভাবে হুঁকো টানতে লাগলেন। বেশ খানিকক্ষণ টেনে হুঁকো নামিয়ে উঠানের মেইকাঠে ঠেশান দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন: যাওয়া যাক। কই গো, কী হল তোমাদের, ওঠ।

এই স্বভাব প্রমথ-দা'র। নিজের কাজটুকু হয়ে যাক, দুনিয়া তারপরে রসাতলে গেলেও আপত্তি নেই। তামাকের আরও দু-একজন প্রত্যাশী। একজন বলেন, দাঁড়াও হে! হুঁকো রেখে দিলে কেন, দাও ইদিকে।

রাসবিহারী বলে, টানবে কোন ছাই? তামাক পুড়ে গিয়ে ঠিকরি অবধি আগুন হয়ে গেছে। তিল পরিমাণ থাকতে সেজ-কর্তা ছাড়বার মানুষ! বোসো মশায়রা, আবার সেজে এনে দিই।

প্রমথ-দা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন: সাজতে হবে না। ক'পা গিয়েই তো বাড়ি। খেতে হয় বাড়ি গিয়ে সেজে খাবে।

ভাল রে ভাল! গিরস্তবাড়ি পায়ের ধুলো পড়েছে। তামাকটুকু না খাইয়ে ছেড়ে দেব কেন?

এগিয়ে এসে রাসবিহারী পথের মুখে দাঁড়াল। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রমথ-দা বলেন, আঁ, গায়ের জোরে অতিথসেবা করবি নাকি। কন্নু তাই। আমি বাপু এগোতে লাগি। ছোঁড়ারা তো তামাক খাবি নে—কাজ কি তোদের এখানে? চলে আয়।

অর্থাৎ মুখে যতই আস্ফালন হোক, বিল পাড়ি দিয়ে একলা গ্রাম অবধি যাবার সাহস নেই। রাসবিহারীও তেমনি—একটি প্রাণীকেও বাড়ির বার হতে দেবে না যা-হোক কিছু আতিথ্য না নিয়ে। তামাক না খায় তো খেজুররস খেয়ে যাবে। উঠানের খেজুরগাছে ইতি-মধ্যে এক মাহিন্দার উঠে পড়েছে, রসের ভাঁড় নামিয়ে আনছে।

বড় যত্ন করল রাসবিহারী, বেরিয়ে পড়তে অনেকটা দেরি হল। প্রমথ-দা একাকী এতক্ষণ সতুর খালের পাশে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার শোভা নিরীক্ষণ করছিলেন।

দিন যায়। মাস কয়েক পরে শুনলাম, প্রিয়নাথ সর্দার খুব বড়লোক হয়ে গেছে। গোপন বৃত্তান্ত, জিজ্ঞাসা করলে বেকবুল যাবে। সতুর ভিটের সেঁজি ও শোলার জঙ্গল কেটেছে। ভাল করে গোড়া তুলে ফেলার দরকার, নয়তো আগামী বর্ষার আবার জঙ্গল ডেকে উঠবে। চাষী মানুষ জমি ফেলে রাখবে না—রবি-খন্দও কিছু আর্জাবে সেখানে। এ বছর না-ই হল তো আগামী বছর। সেজন্য রাসবিহারী নিজে দাঁড়কোদাল ধরে মাটি কোপাচ্ছিল। কোপাতে কোপাতে ঠকাস করে শক্ত জিনিসে কোদাল লাগে। কী না জানি বস্তুটি—চতুর্দিকের মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলল। পিতলের ঘটি একটা, মাটির নিচে অনেককাল থেকে কালীবর্ণ হয়ে গেছে। ঘটিবোঝাই পুরানো আমলের রুপোর টাকা। এখনকার দিনে সে টাকা চলে না, কিন্তু খাঁটি রুপোর দাম আছে। কেশব-পুরের রাজীব স্যাকরার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, টাকা গলিয়ে চাঁদির দরে সে কিনে নিল সমস্ত। লাভই হল—গোণা-গুণতি ন-শ সাতান্ন টাকা বিক্রি করে এখনকার টাকায় বার শ'। দু-চার জায়গায় দর নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে অথবা সদরে চলে গেলে টাকা আরও বেশি হত। কিন্তু ব্যাপারটা চাউর হতে দেওয়া যায় না। যাবতীয় পোড়ো সম্পদের মালিক নাকি সরকার। টের পেলে সরকারে সব বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত।

এসব খবর খোদ প্রিয়নাথ সর্দারের মুখে শোনা আমার। রাসবিহারী মারা যাবার পর শোকের মধ্যে আমায় সমস্ত বলেছিল। চাষী গৃহস্থ টাকা হাতে পেয়ে ফেলে রাখে না। সতুর খালের আশে-পাশে ষোল বিঘে ধানজমি বন্দো-বস্ত করে নিল। আসাননগরের জমির ধান যদ্দুর আসে আসুক—এই নতুন জমি ঘরের কাছে, এক চিটে এখানে এদিক-ওদিক হবে না। বৈশাখে মনের স্ফূর্তিতে চাষ দিল একটা। খাসা জমি, মাটিতে দিব্যি জো রয়েছে এখনো। যৎ-সামান্য বর্ষা পেলেই চারাপাতা এনে রুয়ে দেবে।

প্রথম চাষ দিয়ে এল, সেই রাত্রে এক কাণ্ড—

নষ্টশ্রী বাড়ির ভাটুইঘাস-ভরা উঠানে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার। প্রিয়নাথ হাত তুলে সব

চেয়ে প্রাচীন দীর্ঘতম খেজুরগাছটা দেখাল : শোন ছোটবাবু, এই গাছের মতন লম্বা, আগুনের মতন অঙ্গবর্ণ, শাদা কোষ্টার মতন ফুরফুরে দাড়ি। রাত্রিবেলা স্বপ্নে উদয় হয়ে গোঁসাইঠাকুর বলল, আমার টাকা নিয়েছিস। ভালর তরে বলছি, দিয়ে দে।

দেব। একটা-দুটো ফসল তুলতে দাও সুদসমেত শোধ দিয়ে দেব।

কিন্তু, গোঁসাই নাছোড়বান্দা : এক্ষুনি দে। পিতলের ঘটির মধ্যে যেমন ছিল তেমনি করে পুঁতে রেখে আয়।

কিন্তু সে টাকার এক পয়সাও নেই তখন। জমি কিনে খরচ করে ফেলেছে। প্রিয়নাথ কিছু সময় চায়, গোঁসাই তা দেবে না। রাত্রিবেলা প্রিয়নাথ চোখ বুজেছে কি না বুজেছে, গোঁসাই তৎক্ষণাৎ চলে আসে। অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ঘুমুতে ভয় করে প্রিয়নাথের—যতক্ষণ পারে, নানান কায়দায় চোখ মেলে থাকবার চেষ্টা করে। তারপরে ঝগড়া-ঝাটি অকথা-কুকথা শুরু হয়ে গেল : চোর বজ্জাত! দিবি কিনা আমার টাকা, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দে।

শেষটা শাসানি একদিন : তিন দিনের মধ্যে টাকা শোধ না করবি তো লোভের পরিণাম দেখিয়ে দেব।

নিরুপায় প্রিয়নাথ ভয়ে ভয়ে আছে। টাকা নেই, দেয় কোথা থেকে? তারপর সত্যিই সেই পরিণাম এল। রাসবিহারী হাট করে ফিরেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় ভাত বেড়ে ঠকাস করে পিঁড়ি পেতে বউ ডাক দিল : এস।

রাসবিহারী বলে, হাত-পা ধুয়ে আসি পুকুর-ঘাট থেকে। সতুর খালের সেই অর্ধেক-কাটা পুকুরে পা ধুতে যাচ্ছে, অমনি সাপে কাটল। বা'বা রে, মা রে—করে ছুটে এসে রাসবিহারী উঠানে উপুড় হয়ে পড়ল। রাত্রের মধ্যেই তল্লাটের যত রোজা-গুণীন এসে পড়ে। কত রকম ঝাড়-ফুক, শিকড়-বাকড়। বিষ সাহায্য হল না। সাহায্য হবে কি করে? বিষ তো সাপের নয়, গোঁসাইঠাকুর কাল-সাপ হয়ে প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। পরের দিন দুপুরের আগে রাসবিহারী চোখ বুঁজল।

ছেলের মরার পরে প্রিয়নাথ আর বাড়ির বার হয় না। হাটে-ঘাটে যায় না। জমির এমন ফলন—আর জমি তো উঠানের উপর বললে হয়—তবু কোন-দিন লহমার জন্যে জমির উপর গিয়ে দাঁড়ায় না। ডাকলে বলে, উঁহু, ঘাপটি মেরে আছে কোন্ দিকে। ছেলের উপর শোধ নিয়েছে, বাগে পেলে আমাকেও ছেড়ে দেবে না।

প্রিয়নাথের অবস্থা শুনে একদিন তার বাড়ি গিয়েছিলাম। বিধবা পুত্রবধূ ঘরের দাওয়ায় জল তুলে এনে দিল, সেই-খানে বসে বসে একটু কাক-স্নান। খালের পুকুরে যাবে না। শরীর-ধারণের যত-কিছু করণীয়, সমস্ত বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে। বলে, ফাঁকায় গেলে আমার উপরেও ছোবল মারবে। গোঁসাই ছাড়ে নি এখনো, একটা খেয়ে রাগ যায় নি। এক এক রাত্রে এসে তাগিদ দেয় : আমার টাকা?

তবে প্রিয়নাথও এবার বচসার কায়দা পেয়ে গেছে।

ছেলে নিয়েছ গোঁসাই—শক্ত-সমর্থ ছেলেটা। ছেলে ফেরত দাও, টাকা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিচ্ছি। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ শোধ করব। দাও এনে আমার রাসবিহারীকে।

হেসে হেসে প্রিয়নাথ এই সব বলছিল। বলে, প্যাঁচে ফেলেছি গোঁসাইকে, কি বলেন ছোটবাবু? স্পষ্টাস্পষ্টি কথা, লুকোছাপা কিছু নেই। ছেলে নিয়ে আসবে, তবেই টাকা গুণে দেব। তা গোঁসাই কক্ষনো পারবে না, আমাকেও টাকা দিতে হবে না। কিন্তু বেহায়া কী রকম! এত কথা-কথান্তরের পরেও আসে এক-এক রাত্রে। উল্টে এখন আমার কাছে গালমন্দ শুনে যায়। কায়দায় পেয়েছি, ছাড়ব কেন ছোটবাবু? সে যত বলেছে, আমি তার ডবল তে-ডবল শুনিয়ে থাকি।

আজ প্রায় এক যুগ পরে নেহরু-কলোনিতে সেই প্রিয়নাথ সর্দারের সঙ্গে দেখা। মানুষটা সতুর ভিটের সীমানার বাইরে যেত না—সে আজ কত গাঁ-গাম নদী-খাল পার হয়ে এক রাজ্য ছেড়ে ভিন্ন এলাকায় চলে এসেছে।

গল্প করছে প্রিয়নাথ, আর হেসে খুন। বলে, বর্ডারের উপর পোশাক-পরা মিঞা সাহেবরা ঘাঁটি আটকে রয়েছেন। একটা মাছি গলতে দেন না। কেবল মানুষ বাদ। মানুষের অনেক বুদ্ধি, অনেক বন্দোবস্ত। মানুষের সঙ্গে পেরে ওঠেন না। আর মানুষ নয় বলেই গোঁসাইয়ের পাশপোর্ট হল না। মানুষের বুদ্ধি কোথা পাবে, তাই রাকে পার হবার কায়দা-কানুন করতে পারে নি। গোঁসাই ওপারে, খাসা আছি আমি এখন ছোটবাবু। গোঁসাই এসে জ্বালাতন করবে না।

খল-খল করে আবার সে হেসে উঠল।

খল-খল করে আবার সে হেসে উঠল।

নেহরুর ঈর্ষিত ব্যক্তি: বার্ট্রাণ্ড রাসেল

তাহলে ভারতবর্ষের বিশ্ববিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ঈর্ষার পাত্র থাকতে পারে! এবং লোকটি প্রবল-প্রতাপান্বিত কেউ নয়, ইংলণ্ডের এক নিরীহ গাণিতিক, দার্শনিক রাসেল। মানব-সভ্যতার চরম বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেদিন ইংলণ্ডের ট্রাফলগার স্কোয়ারে। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার 'অপরাধে' ৮৯ বছরের বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে যেদিন কারাবাস করতে হল সেই বিশেষ দিনটিকে পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষ চিরকাল মনে রাখবে বিবেকের ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার তারিখ হিসেবে। অথচ পুলিশের অপরাধ-নামার খাতাটিতে রাসেলের বিরুদ্ধে হয়ত লেখা হয়েছে "পুলিশের কার্যে বাধা এবং রাজ-পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবার জন্য শ্রীবার্ট্রান্ড রাসেলকে গ্রেপ্তার করা হইল।" বাস্তবিক আণবিক অস্ত্রের সঙ্গীন উঁচিয়ে কোনো একটি বিশেষ লোককে না, সমগ্র মানুষের প্রেম-বিশ্বাস-শান্তিকে অর্থাৎ একটা গোটা সভ্যতাকেই যুদ্ধ-বন্দী করা হয়েছিল সেদিন।

রাসেল পৃথিবীর একটি অতি পরি-চিত নাম। স্বদেশে রাসেল অনেকদিন পর্যন্ত নিন্দের ধুলোয় অন্ধকার হয়ে-ছিলেন, কোনো কোনো মহলে তিনি হয়ত অপ্রিয়ংবাদী বলেই অপ্রিয়। তাঁর মতবাদেও সকলের আস্থা সমান না, কিন্তু এই তথ্যে ভুল নেই যে, রাসেল বিংশ শতাব্দীর একটি বিবেকবান ব্যক্তিত্ব। বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল জন্মেছিলেন রাভেনস্ক্রফটে। তাঁর পিতা ছিলেন ভাইকাউণ্ট আম্বারলে, পিতামহ ১৮৩২ সালের রিফর্ম বিল প্রণেতা লর্ড জন রাসেল। নীল রক্তের ঝর্ণাটিকে মার দিক থেকেও পেয়েছিলেন রাসেল। মা, কেণ্ট-ষ্টানলি ছিলেন অ্যাডারলের লর্ড ষ্টানলির চতুর্থ কন্যা। কিন্তু নীলদর্পণে মুখ অনেকদিন দেখেননি রাসেল—'লর্ড' উপাধিতে অধিকার পাওয়ার পরও অনেক বছর অনলংকৃত পদবীতেই পরিচিত থাকতে চেয়েছিলেন। রাসেলের দু' বছর বয়সেই মা এবং তিন বছর বয়সে বাবা মারা যান। ঠাকুরমার কাছেই শৈশব কাটিয়ে-ছেন তিনি। ঠাকুমা লেডী রাসেল ছিলেন গোঁড়া পিউরিটান। ভদ্রমহিলা সুন্দর কবিতাও লিখতে পারতেন। পিতামহীর প্রভাব রাসেলের পক্ষে এড়ানো সম্ভব হয়নি, এবং এই বিষয়ে রাসেলের নিজের স্বীকৃতি হল "She was a more powerful influence upon my general outlook than any one else!"

রাসেলের নাস্তিক পিতা কিন্তু চেয়ে-ছিলেন যে, পুত্রেরও দীক্ষা হ'ক নাস্তিকতায়। তদনুযায়ী ইচ্ছাপত্রে দু'জন নাস্তিক অভিভাবকেরও নাম উল্লিখিত ছিল। কিন্তু কোর্ট উইলকে উড়িয়ে রাসেলকে ন্যস্ত করেছিলেন

নির্মল পাঠক

[illegible] খৃষ্টীয় বিশ্বাসের হাতে।

রাসেলের শিক্ষালাভের ইতিহাস অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই মতন। স্কুলে যাওয়া ঘটেনি তাঁর পক্ষে। ঠাকুরদার গ্রন্থাগারটি ছিল তাঁর একমাত্র পাঠশালা। গ্রন্থাগারের ইতিহাসের গ্রন্থগুলি তাঁকে ইতিহাসে আগ্রহান্বিত করে তুলেছিল। তাঁর নিজের পারিবারিক ইতিহাসের বিবরণও তাঁকে কম প্রেরণা দেয়নি। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে রাসেল পরিবারের যোগাযোগ ছিল ষোড়শ শতাব্দী থেকেই। তবে রাসেলের শিক্ষা-জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল তাঁর ১১ বছর বয়সে। প্রথম ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়তে আরম্ভ করে রাসেল অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন বিষয়টির নতুনত্বে। তাঁর উত্তরজীবনের গণিত প্রতিভার উন্মেষের উৎস হিসেবে ইউক্লিডের যুক্তি-সজ্জাকে দায়ী করা যেতে পারে। সুইস এবং জার্মান দুজন শিক্ষক ছিলেন রাসেলের। পরে এসে-ছিলেন ইংরেজ-শিক্ষকরা। কৈশোরের নিঃসঙ্গ কাল তাঁকে গ্রন্থ-মুখ করে তুলে-ছিল। ধর্ম-বিষয়ক বই পড়তে ভাল-বাসতেন রাসেল। কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসের মাটীতে বেশীদিন পুতুল গড়তে হয়নি তাঁকে। সৃষ্টির প্রথম কারণের প্রচলিত যুক্তির ফাঁকিটাকে রাসেল ধরেছিলেন মিলের আত্মজীবনী মারফৎ। "মদীয় পিতাঠাকুর মহাশয় একদা বলিয়াছিলেন যে 'আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন'—এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই, কারণ ইহার পরবর্তী প্রশ্নই হইতেছে "ঈশ্বরকেই বা কে সৃষ্টি করিল"—মিলের এই অমোঘ উল্লেখ ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে নিয়ে ফেলেছিল কিশোর রাসেলকে। এই সময়-টায় তিনি যে বই পেতেন অম্লান মনে পড়ে যেতেন। ফলে বেশ কিছু বাজে বইও পড়তে হয়েছিল তাঁকে। শেলী ছিলেন তাঁর মনের কবি। বায়রণে, টেনিসনে রাসেলের এতটুকু ভাল লাগা ছিল না।

অবশেষে ১৮ বছর বয়সে রাসেল কেম্ব্রিজে এসে ভর্তি হলেন। কেম্ব্রিজে তিনি তাঁর অমেয় আনন্দলোকটিকে যেন খুঁজে পেলেন। এবং কেম্ব্রিজের সমস্ত কিন্নর দলকেও পেলেন বন্ধু হিসেবে। হেগেলীয় দার্শনিক জে-এম-ই ম্যাক-ট্যাগার্ট, লোয়েস ডিকিনসন, ট্রেভেলান ভ্রাতৃত্রয় এবং জি. ই. মুর তাঁর অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। মুর তাঁর দার্শনিক মত-বাদকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন উত্তরজীবনে। বন্ধুদের সঙ্গে শনিবারের রাত্রি কাটত তর্কে, আলোচনায়। দর্শন, কবিতা, রাজনীতি ইত্যাদি জ্ঞানের চরাচর জুড়ে চলত একদল তরুণ বুদ্ধিজীবীর মানস অভিযান। উদার হাওয়ায় কেম্ব্রিজের আকাশে সেদিনও আশার মেঘ ভাসত। লিটন স্ট্র্যাচির উচ্চমন্যতার বিষাদ তখন পর্যন্ত আক্রমণ করেনি কেম্ব্রিজকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণেরা নতুন দিনের পদশব্দে বধির হতে পারেনি তখনও। তারা প্রায় প্রত্যেকেই তখন প্রভাবিত হচ্ছিলেন হেগেলীয় দর্শনের ছায়ায়। রাসেলও ছিলেন তাদের মধ্যে। কিন্তু কেম্ব্রিজের প্রথম তিন বছর গণিতের বাইরে আর মন মেলবার অবসর পাননি তিনি। চতুর্থ বছরে দর্শন চর্চা শুরু করেন রাসেল এবং ক্রমশঃ হেগেলে (কিছুৎ পরিমাণে কান্টেও) আসক্ত হতে থাকেন।

রাসেল কেম্ব্রিজ ছাড়েন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। তারপরের কিছু কাল কাটে তাঁর বিদেশে। প্যারিসের বৃটিশ দূতা-বাসে চাকরী নেন তিনি। বাইশ বছর বয়সে বিয়ে করেন আলিস পিয়ারসল স্মিথকে। দূতাবাসের চাকরী তাঁর কখনই ভালো লাগে নি, ফলে চাকরী ছেড়ে সস্ত্রীক চলে যান বার্লিনে। বার্লিন

থেকে আমেরিকায়। ইংলণ্ডে ফিরে এসে রাসেল আবার ফিরে আসেন তাঁর নিজস্ব রাজ্যে, দর্শন এবং গণিতের গ্রন্থে।

নানা কারণে ১৮৯৮-এর পর থেকেই কাণ্ট এবং হেগেলের মতবাদে আস্থা হারাতে আরম্ভ করেছিলেন রাসেল। হেগেলের "গ্রেটার লজিক"-এর গণিত প্রসঙ্গ তখন থেকেই তাঁর কাছে অর্বাচীন উক্তি মাত্র। তাঁর কেম্ব্রিজ-বন্ধু মুরেও একদা হেগেলান্ধ ছিলেন এবং হেগেলীয় দর্শনের শেকল কেটে যেই তিনি বেরিয়ে এলেন রাসেলও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকে অনুসরণ করে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। কাণ্টের বিরুদ্ধে তাঁর গ্রন্থ-সঙ্গী ছিলেন হারভার্ডের হোয়াইট হেড। হোয়াইট হেডের সহযোগিতায় তাঁর বিখ্যাত বই "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা" প্রকাশিত হয়। তর্কশাস্ত্র এবং গণিতের পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণের প্রচেষ্টা হিসেবে 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' একটা চিরকালের বই। অবশ্য পরের সংস্করণে প্রথম সংস্করণের অনেক বক্তব্যকেই রাসেল নাকচ করেন পরে।

যদিও মূলতঃ রাসেল রাজনৈতিক মন, তবু প্রিন্সিপিয়া শেষ হবার পর মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলনে মেতে উঠেছিলেন তিনি একদা। মুক্তি আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে উইম্বলডন থেকে নির্বাচনে দাঁড়াতেও মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচক সমিতি ততদিনে তাঁর নাস্তিকতার ভয়াবহ মতবাদগুলি জেনে ফেলেছেন, ফলে পার্লিয়ামেণ্টে যাওয়া আর হয়নি তাঁর।

প্রথম মহাযুদ্ধ রাসেলকে এক নতুন সমস্যার জগতে নিয়ে ফেলল। ফেবিয়ান সমিতির সিডনী ওয়েবের প্রভাবে রাসেল একদা সাম্রাজ্যবাদীই ছিলেন বলতে গেলে। বুওর যুদ্ধে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু ১৯০১-এর পর থেকেই হিংসার আস্ফালনে তাঁর আস্থা কমতে লাগল। ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে সম্পূর্ণ যুদ্ধ-বিরোধী করে তুলল। রাসেল ক্রমাগত যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখে যেতে লাগলেন। ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে আলোচিত হলো বার্ট্রাণ্ড রাসেল নামটি এবং তাঁর মতবাদ। নিজে ত যুদ্ধ-বিষয়ক কোনো কাজে যোগ দেননি, উপরন্তু যাঁরা যুদ্ধ-বিরোধী তাঁদের স্বপক্ষে সরবে প্রতিবাদ করলেন। ফলে ১০ পাউণ্ড খরচা সমেত রাসেলের ১০০ পাউণ্ড জরিমানা এবং দু'বছর জেল হয়। জরিমানার টাকা না দেয়ায় তাঁর কেম্ব্রিজের কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় সরকার পক্ষ থেকে। যুদ্ধ চলাকালীন রাসেলের আশা ছিল, হয়ত শান্তি এলে ভবিষ্যতে যাতে আর সর্বগ্রাসী যুদ্ধ না বাধে তার ব্যবস্থা করবে মানুষের শুভ-বুদ্ধি। ভার্সাই সন্ধি আশাহত করল তাঁকে। তাঁর সমসাময়িক বন্ধুরা রাশিয়ার দিকে চোখ ফেরালেন। রাসেলও ১৯২০ সালে গেলেন রাশিয়াতে। সেখানেও শান্তির ললিত আশ্রয়টিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। চীনে গেলেন। চীনে যদিও শান্তিজলের ধারায় স্নাত হতে পারেননি রাসেল, তবু মনে হয়েছিল প্রাচীন প্রাচীতেই কোথাও শান্তির সকাল অপেক্ষমান।

১৯১৮ সালে আরেকবার রাসেলকে কারাবাস করতে হয়েছিল একটা প্রবন্ধ লেখার জন্যে। কারাগারে তিনি "ইন্ট্রো-ডাকশন্ টু "ম্যাথেমেটিক্যাল ফিলজফি" রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি পাতা পড়তে হত কারাধ্যক্ষকে ছাড়পত্র দেবার আগে। এবং ভদ্রলোক পরে স্বীকার করেছিলেন তিনি একবর্ণও না বুঝেই পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। চীন থেকে ফিরে বাল্যশিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। প্রচলিত শাসনমূলক শিশু-শিক্ষার পক্ষপাতী রাসেল কখনই ছিলেন না। এমন কি যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে রাসেল শিশুপীড়ক শিক্ষা ব্যবস্থাকেও দায়ী করেছেন। শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিবিকাশে বাধা দিলে স্বভাবতঃই তার অন্তরাশ্রিত আবেগ নিরুদ্ধ আক্রোশে এবং অবশেষে হিংসেয় আন্দোলিত হবে। কিন্তু রাসেলের মতবাদ সেদিন কেউই বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। ইংলণ্ডের লোক চিরদিনই তাঁকে বিরুদ্ধ পক্ষের নেতারূপে দেখে এসেছে। অবশ্যই রাসেল কোনোদিন চলতি হাওয়ার পন্থী ছিলেন না। ফলে তাঁকে অনেকবার বিপর্যস্তও যেমন হতে হয়েছে তেমনি সম্মানের আসনও পেয়েছেন অনেক মনে। ইয়োরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রতিটি দেশের রাজধানী তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছে। চিকাগো, লস এঞ্জেলেস এবং হারভার্ডেও সম্মানিত হয়েছিলেন রাসেল। ১৯৪০ সালে সিটি অফ নিউইয়র্ক কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের পদটি দেয়া হয় তাঁকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এক দন্ত চিকিৎসকের স্ত্রী তাঁর নামে মামলা আনেন এই অভিযোগে যে তিনি দর্শন শিক্ষার নামে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেচ্ছ যৌন-চর্চার মতবাদ প্রচার করছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাসেলের নিয়োগ বাতিল করে দিলেন। পরবর্তী কাজ নিলেন রাসেল বার্নেস ফাউণ্ডেশনে। সেখান থেকেও তাঁকে বরখাস্ত করা হল। এবার রাসেল নিজে মামলা আনলেন তাঁকে বেআইনীভাবে বরখাস্তের জন্যে। ক্ষতিপূরণ বাবদ কুড়ি হাজার ডলার নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন রাসেল। দেশে ফিরে তাঁর বিরাট গ্রন্থ "এ হিস্ট্রি অফ ওয়েস্টার্ণ ফিলজফি" শেষ করেন। দর্শন এবং গণিতের পরেই ইতিহাস রাসেলের প্রিয় বিষয়। কিন্তু প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবর্তনমূলক মতবাদকে তিনি কায়মনোবাক্যে কখনই মেনে নেননি। মার্কস এবং হেগেলীয় ইতিহাসের বিবর্তনবাদ তাঁকে তৃপ্ত করেনি। রাসেল মনে করেন দার্শনিকরা প্রায়শঃই সমাজ ব্যবস্থা এবং দর্শনের নিগূঢ় সম্বন্ধটিকে উপেক্ষা করেন। যেমন মার্কসবাদীরা দর্শনকে প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেন, মূল কারণরূপে না। অথচ পৃথিবীর যাবতীয় বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদই কারণ এবং প্রতিক্রিয়ার ফল। প্লেটো অংশতঃ পেলোপোনিশিয়ান যুদ্ধে স্পার্টান বিজয়ের যেমন প্রতিক্রিয়া, তেমনি খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের কারণরূপেও অংশত প্লেটোর দর্শন দায়ী। তাঁর পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে রাসেল থেলস্ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধারাবাহিক দর্শনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন বিভিন্নকালের সমাজ ব্যবস্থার কারণ এবং প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে।

১৯৪০ সালে তৎকালীন বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর স্তুতিবাদী নীতিকে আক্রমণ করেছিলেন রাসেল। তিনি লিখলেন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে যুদ্ধ সমর্থনীয়। অবশ্য এই মতবাদ আদৌ গ্রহণীয় কিনা সন্দেহের বিষয়। 'অবস্থার চাপ' চিরদিনই সমাজ-নীতি এবং রাজনীতির দাস। প্রতিটি জঙ্গী রাষ্ট্র যুদ্ধের প্রয়োজনে এই 'অবস্থার চাপ'টিকে অতি কৌশলে তৈরী করে নেয়। কিন্তু যাই হোক, রাসেল স্বীয় মতবাদের পরিবর্তককে কোনোদিনই শ্লাঘার চোখে দেখতেন না বা দ্যাখেননি। অবস্থার পরিবর্তনে নীতির আমূল সংস্কারেও কখনো লোকভয়ে ভীত হননি রাসেল। এবং হয়ত তাঁর এই নীতি অনুসরণ করেই ইংলণ্ডের লোক তাঁর সম্বন্ধে ধারণা রাতারাতি পাল্টে ফেলেছিল। যুদ্ধকে সমর্থন করার পর স্বদেশে আবার তিনি বিপুল সমাদরে গৃহীত হলেন। ১৯৪৯ সালে তাঁকে 'অর্ডার অফ মেরিট' দেয়া হল, বি-বি-সি থেকে আমন্ত্রণ এল প্রথম রাইথ বক্তৃতামালার জন্যে। ১৯৫০ সালে তিনি পেলেন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মুকুট—নোবেল পুরস্কার। রাসেলের জীবনের ইতিহাস স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। এবং স্বাধীনতা চিন্তার। ব্যক্তিত্বের। হয়ত সেই চিন্তার স্বাধীনতার জন্যে ৮৯ বছরেও কারাবরণের কষ্ট তাঁর কাছে জীবনস্বরূপ। এবং হয়ত তাই তিনি আজ পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষের আকাশ-প্রদীপ।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'আমরা কি মরে গেছি?'

বিষাদে বেদনায় দীন কণ্ঠস্বর নয়, চড়া সুরে বাঁধা কণ্ঠবীণা ঝঙ্কারে ঝন-ঝনিয়ে উঠল। অতএব বোঝা গেল মায়ালতা স্বামীর কাছে এসে হানা দিয়েছেন। অবশ্য এই চড়া সুরের অপরাধটা শুধু মায়ালতারই প্রকৃতির নয়, সুবিমলের প্রকৃতিও কতকাংশে দায়ী।

চড়া সুরের ঝঙ্কার সহযোগে হানা না দিলে উপায় নেই। সুবিমল বেশীর ভাগ সময় যে জগতে বাস করেন, সে জগৎটা অন্ততঃ মায়ালতার অধিকৃত নয়, সেখান থেকে সুবিমলকে টেনে নামিয়ে আনতে হয়। আর এই নামিয়ে আনাটা মিষ্টমধুর নম্র-কোমল সম্ভাষণে সম্ভব নয়।

ইদানীং বয়স হয়ে পর্যন্ত সুবিমলের অন্যমনস্কতা যেন আরও বেড়েছে। অথবা তাঁর মক্কেলের সংখ্যাই বেড়েছে। কারণটা যাই হোক মাঝে মাঝেই মায়ালতাকে বলতে শোনা যায়—'আমি যদি তোমার স্ত্রী না হয়ে মক্কেল হতাম তা'হলে অনেক আদর হ'তো আমার।'

সুবিমল উত্তরে হেসে বলেন, 'তুমিই তো আমার সবচেয়ে বড় মক্কেল। তোমার কেস নিয়েই তো জীবন কাটিয়ে দিলাম।'

মায়ালতা রেগে বলেন, 'তবু তো মক্কেলের জিৎ হ'ল না কোনদিন। চিরকাল হেরেই মলাম!'

'কী আশ্চর্য! কেস তো এখনও শেষ হয়নি। রায় না বেরোলে বুঝছো কি করে—কার হার—কার জিৎ!'

'না মরলে আর বোঝা যায় না?' মায়ালতা পুনশ্চ ঝঙ্কার দেন, 'এই যে চিরকাল ভূতের ব্যাগার খেটে মলাম, কখনো গায়ে একখানা গয়না উঠলো না, কখনো একটা তীর্থ-ধর্ম করলাম না, শুধু তোমার মা পিসি ভাই ভাইপো আপদ বালাই সকলের রসদ জোগাতে জোগাতে কতুর হ'লাম, এটা খুব জিৎ না? তোমার মতন রোজগার যারা করে, তারা বাড়ী করছে গাড়ী করছে!'

এই অভিযোগের মূল টার্গেট অবশ্য সুমোহন। কারণ সে এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ।

স্ত্রী আছে, সন্তানকুল আছে, সুস্থ-সবল একটা লোক, উপার্জন করবার চেষ্টামাত্র করবে না। অথচ খাওয়া-পরার ব্যাপারে তারই খুঁৎ-খুঁতুনির আর অন্ত নেই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করবার জন্যেই যেন ছুতো খুঁজে বেড়ায়।

সুবিমলের যদি কনিষ্ঠের প্রতি অন্তঃসলিলা স্নেহফল্গুধারা এত গভীর না হতো, কবেই মায়ালতা সংসার-কাননের এই আগাছার জঙ্গল উৎপাটিত করে ফেলতেন, কিন্তু সুবিমলকে মনে মনে মায়ালতা বিলক্ষণ ভয় করেন। জানেন নিজে তিনি স্বামীকে যতই ঝঙ্কার দিন, আর কটুকথা বলুন, আর সুবিমল যতই সে সব কথা হেসে ওড়াম, একটা জায়গায় প্রশ্রয়ের সীমারেখা টানা আছে। অদৃশ্য সেই রেখা লঙ্ঘন করবার সাহস হয় না বলেই, আজীবন আপদ-বালাই নিয়ে ঘর করে চলতে হলো তাঁকে।

শ্বশুরবাড়ীর মধ্যে একমাত্র মেজ-দ্যাওর সুশোভনকেই সুচক্ষে দেখতেন মায়ালতা, কিন্তু সেখানেই যেন সুবিমলের স্নেহ-কার্পণ্য।

প্রায় পিঠোপিঠি ছোটভাইয়ের প্রতি খুব একটা স্নেহ-বিগলিত ভাব দেখা যায় না সুবিমলের। বোধকরি বরাবর সে কৃতী বলেই। অকৃতী অধম সবের ছোট ভাইটার ওপরই ষোলআনা ভালবাসা।

কাজেই সুশোভনকে অনেকটা নিজের সম্পত্তি ভাবতেন মায়ালতা, কারণ ওর মালিকানা স্বত্ব যার, সে তো দীর্ঘকাল আগেই চলে গেছে।

বরাবরই সুশোভন এলেই মায়ালতা সংসার ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর যত্ন এবং সুখ-সুবিধে বিধানে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু গত তিন চারটে বছর কেমন যেন বে'ন্দা-বিস্বাদ হয়ে গেছে। সুশোভন আর আসছেন না।

বড় মন খারাপ হয়ে গেছে মায়ালতার। তবু সে মন খারাপের চারা ছিল। কিন্তু এখন? এখনকার মনোবেদনার তুলনা হয়?

কামধেনু রয়েছে, অথচ দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে।

অন্ততঃ এদিকে আর দুধ চালাবে বলে মনে হয় না। অকারণ কেন এই নিষ্ঠুর সংকল্প কামধেনুর! অকারণ! মায়ালতা তো তাই মনে করেন, কারণ অনেক ভেবেও সুশোভনের এই রহস্যময় আচরণের কারণটা অনুমান করতে পারেন না তিনি।

কিন্তু কামধেনু বিমুখতা দেখিয়েছে বলেই আহত হয়ে আহরণ পাত্র নামিয়ে

রেখে সরে আসবেন, এমন নির্বোধ আর যেই হোক—মায়ালতা নয়।

তাই আজ স্বামীর দরবারে হানা।

'আমরা কি মরে গেছি? নীতা কি আমাদের ঘরের মেয়ে নয়?'

এই কথাটি উচ্চারণ করতে করতে ঘরে ঢুকলেন মায়ালতা। অথবা ঘরে ঢুকেই উচ্চারণ করলেন।

সুবিমল বুঝলেন, আপাততঃ তাঁকে নিজের জগৎ থেকে নামতে হবে।

হাতের বই মুড়ে, মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা মরে গেছি—এমন কথা শত্রুতে রটালেও, কেউ বিশ্বাস করবে না। বেঁচে আছি তার ভুরি ভুরি অকাট্য প্রমাণ দেখাতে পারবো। আর নীতা, আমাদের ঘরেরই মেয়ে, এটাও আইনতঃ সিদ্ধ। কিন্তু দু'টো ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র কোথায় ধরতে পারলাম না।'

'তা পারবে কেন। কথার প্যাঁচই শিখেছ, সাদা কথা তো শেখনি কখনো। শুনলে না তো কান দিয়ে তপোর কথা।'

তপো বা তপোধন সুবিমলের মেজ ছেলে। যে সকালবেলা সুচিন্তার বাড়ী ঘুরে এসেছে কাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে।

সুবিমল সহসা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে যান। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেন, 'শুনেছি বৈকি।'

'শুনেছ? শুনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ?' বলি মেজঠাকুরপোর না হয় মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তোমাদের তো হয়নি? অতবড় আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে তিনি কার না কার বাড়ী উঠে বসে রইলেন, মেয়ে তাদের ছেলেদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, আরও কি করছে ঈশ্বর জানেন, এ বিষয়ে একবার তদারক করবে না তোমরা?'

সুবিমল আরও গম্ভীরভাবে বলেন, 'আমরা তদারক করবার কে? সে যদি অন্য কোথাও বাড়ী ভাড়া করে থাকে, সে যদি তার মেয়েকে ইচ্ছেমত স্বাধীনতা দেয়, আমাদের কি?'

'আমাদের কি!'

মায়ালতা গালে হাত দিয়ে বলেন, 'আমাদের কি? স্বচ্ছন্দে বললে এই কথা? নীতা তোমাদের বংশের মেয়ে নয়? ওর একটা নিন্দে অখ্যাতি রটলে সেটা তোমাদের গায়ে এসে লাগবে না? ওর মা নেই, ভালমন্দ বোঝাবার লোক নেই—'

সুবিমল স্ত্রীর প্রতি একটি অতল-স্পর্শী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, 'ওর মা নেই ওর চার বছর বয়েস থেকে। তারপর এই বিশ বছর যাবৎ ও তোমাদের হেফাজতের বাইরেই মানুষ হয়ে এসেছে। এতদিন যদি নিন্দে অখ্যাতি না রটে থাকে, এখনই বা রটতে যাবে কেন?'

মায়ালতা তবু দমতে চান না।

বলেন, 'বিদেশে বিভুঁইয়ে কি করছে না করছে কেউ দেখতে যায় না, এখানে আত্মীয়-সমাজের চোখের সামনে—'

সুবিমল মৃদু গম্ভীর হেসে বলেন, 'তা' বটে! ওটা মনে ছিল না। এখন নিন্দে রটাবার লোক হয়েছে বটে।'

মায়ালতা রেগে বলেন, 'দেখ এ রকম ধিক্কার তুমি আমাকে জীবনভোর দিয়ে এলে, এতে আমি আর টসি না। আমি বলতে চাই—আমি নিজে গিয়ে একবার দেখবো মেজঠাকুরপোর এ রকমটা করবার কারণ কি?'

সুবিমল এবার বিরক্তি প্রকাশ করেন।

ভুরু কুঁচকে বলেন, 'কারণ আবিষ্কার করে তোমার কোনও লাভ হবে?'

'লাভ-লোকসান আবার কি!' মায়ালতা উদারতার অবতার হ'ন। 'মানুষ' বুঝি রাতদিন শুধু লাভ-লোকসানের কথাই ভাববে। সংসারটা কি কেবল আদালত, আর মানুষ হচ্ছে আইনের বই?'

সুবিমল বলেন, 'ঠিক তাই। শুধু মানুষ অগাধ ধৃষ্টতার বশে সেটা স্বীকার করে না।'

'থাক তোমার ওসব উচ্চাঙ্গের কথা তোমার মক্কেলদের জন্যে রাখো। আমি সেই সুচিন্তার বাড়ী যাবো কাল।'

সুবিমল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, 'যাবে, যাবে। ঘটা করে আমার অনুমতি নিতে আসার কোন মানে আছে?'

'অনুমতি! অনুমতি আবার কিসের?' মায়ালতা ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, 'আমি কি তোমার রাজ্য বিকিয়ে দিতে বসছি, তাই অনুমতি চাইছি? আজকালকার দিনে এতটুকু বৌরা পর্যন্ত স্বামী-শ্বশুরের অনুমতির তোয়াক্কা না রেখে যা ইচ্ছে তাই করছে, আমি বুড়ো মাগী একটু এপাড়া ওপাড়া বেড়াতে যাবো, তার অনুমতি চাইবো? যাবো তাই জানালাম তোমায় ব্যস। কেন, সুচিন্তার বাড়ী যেতেই বা আমার দোষ কি? ছেলেবেলার বন্ধু, বলতে গেলে ননদের মতন, তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হতে পারে না? আবার শুনলাম বিধবা হয়েছে, দেখতে যাওয়া তো উচিতই।'

সুবিমল তেমনি মৃদুহাস্যেই বলেন, 'বিধবা হলে দেখতে যাওয়া উচিত, এটা অবশ্য আমি মানি না। কিন্তু যাবে যাওনা কৈফিয়ৎই বা দিচ্ছ কেন? আমি তো তোমাকে যেতে বারণ করছি না। শুধু প্রশ্ন করেছিলাম যদি কেউ একটা অস্বাভাবিক আচরণ করে অবশ্যই তার ভিতরে একটা কারণ থাকে, কিন্তু অন্যের সেই লুকোনো কারণ উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টায় লাভ কি?'

মায়ালতা পানের কৌটা খুলে পান বার করতে করতে বলেন, 'সংসারে ভুল বোঝাবুঝি বলেও তো একটা কথা আছে? কেউ যদি ভুল বুঝে একটা মিথ্যে অভিমান করে বসে থাকে, ভাঙবার চেষ্টা করতে হবে না?'

সুবিমল বলেন, 'ওটা আবার—মানে ওই চেষ্টাটা আবার আর একটা ভুল। গাছের ফলকে যেমন ধোঁয়া দিয়ে পাকাতে গেলে, শুধু দরকাঁচাই থেকে যায় সত্যি পাকে না, মানুষের মনের ধারণাগুলোও ঠিক তাই। ভুল ঠিক ধরা পড়বার জন্যে ধারণাগুলোকে কালের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। যতক্ষণ না অভিমানের তীব্রতা কমে দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন হয়, ততক্ষণ ওই ভুল ধারণা ভাঙতে চেষ্টা করাটা একটা মস্ত লোকসান। সুশোভন অথবা তার মেয়ে যদি আমাদের কোন ব্যবহারে আহত হয়ে থাকে, এখন তাড়াতাড়ি সেই আঘাতে হাত বুলোতে না যাওয়াই ঠিক। অবশ্যই একদিন ওদের কাছে ধরা পড়বে, আঘাতটা ইচ্ছাকৃত নয়। কত আঘাত বোধহীনতা থেকে আসে, কত বা আসে অসতর্কতা থেকে, সেগুলোকেও যারা অপরাধের তালিকায় ফেলে আমি অন্ততঃ তাদের বুদ্ধিমান বলি না। আর সুশোভনকে আমি চিরদিনই বুদ্ধিমান বলে জানি।'

'মেয়েটির পরামর্শেও হতে পারে—' মায়ালতা রায় দেন, 'মেয়েটি মোটেই সোজা নয়। আমার মন নিচ্ছে নির্ঘাৎ ও বাপকে ক্ষেপিয়েছে, এদিকে এলেই নানান বাজে খরচ, তার ওপর ইচ্ছে মতন স্বাধীনতা নেই, তাই চাইতে—'

সহসা হো হো করে হেসে ওঠেন সুবিমল। 'আরে তুমি তো দেখছি কার্য

থেকে কারণসূত্র আবিষ্কার করে বসেই আছ! তবে আর বৃথা শ্রম করতে যাওয়া কেন?'

'ও? তোমারও তা'হলে তাই ধারণা—' মায়ালতা সন্দেহ প্রকাশ করেন।

'এই ধারণাটাই স্বাভাবিক'—সুবিমল বলেন, 'অবশ্য সঠিক না-ও হতে পারে। সেই জন্যেই কালের হাতে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ভার দেওয়াই ভাল।'

মায়ালতা ক্রমশঃই উত্তপ্ত হতে থাকেন। বলেন, 'কথার ব্যবসা করে করে

প্রশ্ন তুলতে শুরু করলে! আমার তো তোমাদের নিয়ে, কখনই কোথাও যাবার ফুরসৎ হয়ে ওঠে না তা জানোই। ছেলেরা বড় হয়েছে—'

'ছেলেরা বড় হয়ে তো আমার মাথা কিনেছে—', মায়ালতা আবার উদ্দীপ্ত হন, 'তারা যে 'বড় হয়েছে', এই সুযোগটুকুই শুধু সংসার থেকে আদায় করে নিচ্ছে, বড়র মত আচার-আচরণটা কি করছে? বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সংসারের প্রতি কর্তব্যের একটা দায়িত্ব

'কারণ আবিষ্কার করে তোমার কোনও লাভ হবে?'

চিরদিন শুধু কথা ফেনাতেই শিখলে। তোমার ওসব কথার মাথামুণ্ডু আমি বুঝি না। আমি কাল যাব। আর তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আমাকে!' সুবিমল মাথা নেড়ে বলেন 'আমাকে কাটলেও না!'

'কেন শুনি?' মায়ালতার উত্তপ্ত কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হয়ে আসে, 'আমাকে তুমি কোথাও একটু পৌঁছে দেবে এ দাবী আমি করতে পারি না?'

'কী মুস্কিল! উকিল-গিন্নী হয়ে তুমিও দেখছি কথায় কথায় দাবী-দাওয়ার

জন্মায় এ ওরা শিখেছে? লেখাপড়াই শিখেছে, একথা শিখেছে গুরুজনের ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য দিতে শেখাটাই আসল শিক্ষা!'

আক্ষেপের সময় মায়ালতা এ রকম ভাল ভাল বাংলা বলে থাকেন।

সুবিমল বলতে পারতেন 'এটা শেখানোর কাজ মায়ের। আর সে কাজ শুরু করতে হয় ছেলের জন্মকাল থেকেই।' কিন্তু বললেন না। জানেন বললে লাভ কিছুই হবে না। এই একটু কথায় আত্মদোষ বিচারের দৃষ্টি খুলে

যাবে না মায়ালতার। ফলের মধ্যে হবে খানিকটা অশ্রুপাতের দৃশ্য।

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই বা আত্মদোষ কে কবে স্বীকার করে? অবস্থা যেমন তেমনই থাকে, যে যার স্বভাবেই চলে, শুধু মাঝখান থেকে কতকগুলো বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি।

বুদ্ধিমানেরা কখনো অপরের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করে না। ঘুলিয়ে তোলে না জলের তলার কাদা। মোটামুটি শান্তি, বাহ্যিক সৌহার্দ্যটুকুই সংসারের কাম্যবস্তু মনে করে অবোধ অন্যমনস্ক অক্রোধী উদার অনেক কিছু সেজে বসে থাকে।

সুবিমল বুদ্ধিমান।

তাই মায়ালতা যখন স্বামীর কাছে ছেলেদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তখন সুবিমল বোকাদের মত বলে ওঠেন না, 'তুমি! তুমিই এর জন্যে দায়ী। দায়ী তোমার অন্ধ স্নেহ, তোমার অপরিণামদর্শিতা।'

সুবিমল শুধু হেসে কথাটাকে হালকা করে দেন। আজও দিলেন।

হেসে বললেন, 'কেন, তোমার কথা তো ওরা শোনে দেখতে পাই।'

'দেখতে 'পাও', মায়ালতা ক্রোধ আর ক্ষোভের সংমিশ্রণে গঠিত একটি বিচিত্র স্বরে বলেন, 'দেখতে পাওয়ার বড়াই আর তুমি কোরো না। কোন্ জিনিসটা তুমি দেখতে পাও সংসারের? তা' যদি পেতে আমার আজ এ হাল হতো না। দেখতে যদি পেতে তা' হলে দেখতে, আমার ইচ্ছের বশে কেউ চলে না, সকলের ইচ্ছের বশে আমাকেই চলতে হয়। এই যে তোমার ভাই ভাদ্দর বৌ—'

সুবিমল সহসা হাতটা তুলে বলেন, 'থাক থাক, ওদের প্রসঙ্গ তো হচ্ছিল না এখন।'

মায়ালতা একটু দমে যান। বোধকরি একটা অপমানবোধের আঘাতে আহত হয়েই দমে যান।

অতঃপর বলেন, 'ওদের প্রসঙ্গ কোন সময়ই না হওয়া উচিত তা' বুঝি। কিন্তু রাতদিন যাকে বুকে জাঁতা নিয়ে সংসার করতে হয় সেই জানে তার জ্বালাটা কি। বেশ ছেলেদের কথা হচ্ছিল তাই বলি—ওরা আমার কথা শোনে বলছ? এত বোঝ আর এটুকু বোঝ না—কথা শুনছে না—এই অপমানটা ধরা পড়বার

ভয়ে আমি সব সময় ওদের ইচ্ছের অনুকূলেই কথা বলে চলি। আমি যখন ওদের ভাল খেতে বলি ভাল পরতে বলি, তোমার অপছন্দ জেনেও ওদের প্রাণে যত চায় খেলতে বলি বেড়াতে বলি আমোদ-আহ্লাদ করতে বলি, তখন ঠিকই কথা শোনে। কিন্তু আমি একটা কাজ বললে শোনে? এই যে কালই, মেজ-ঠাকুরপোর কাছে যেতে বলেছিলাম তো আগে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্তুর সাধনকে। তা' গেল সে? একেবারে ঝাড়া জবাব দিল, 'আমার দ্বারা হ'বে না।' তবে না তপোকে বললাম। তা' সে তো রেগে অস্থির হয়ে এসে বলেছে 'ঠাকুরপো নাকি তাকে চিনতেই পারেনি। আর কি সে যেতে রাজী হবে?'

সুবিমল বোধকরি প্রসঙ্গান্তরে যেতে পেয়ে—নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে বলেন, 'তোমার জন্যেও তো সে ভাবনা রইল। যদি তোমাকেও না চিনতে পারে?'

'আমাকে? আমাকে চিনতে পারবে না?'

মায়ালতা মেঘ-অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মত এতক্ষণের অন্ধকার মুখে একটু গর্বিত হাসি হেসে বলেন, 'আমাকে চিনতে না পারার ভান করবে? আর তাই করে পার পাবে? চিনিয়ে ছাড়বো না আমি?'

'তা' বটে!' সুবিমল বলেন, 'সে অহঙ্কার তুমি রাখতে পারো বটে!'

'তা' হলে নিয়ে যাচ্ছ তো?'

আর একটু বিজয়-গর্বের হাসি হাসেন মায়ালতা, বোধকরি ভাবেন ভুলিয়ে-ভাঁসিয়ে স্বামীকে আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

কিন্তু হাসি মুছে যেতে দেরী হল না, ভুল ভাঙল মুহূর্তেই।

সুবিমল বললেন, 'ও কথাটা আবার কেন? ওর উত্তর তো হয়ে গেছে।'

'হয়ে গেছে? তুমি যা বলবে তার আর নড়চড় হবে না?'

'বাঃ কথার নড়চড় হওয়া কি ভাল? জান তো হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।'

'তুমি কিছু আর হাকিম নও।'

'অনবরত হাকিমের কাছাকাছি থাকতে থাকতে, বোধকরি তার স্বভাবটা প্রকৃতিতে বসে গেছে।'

'ঠিক আছে আমি একলাই যাবো।'

সুবিমল বলেন, 'এই তো বেশ ভাল কথা বলতে শিখেছ। এ নির্দেশ তো আমি অনেকবার দিয়েছি।'

মায়ালতা এবার নিতান্তই রেগে উঠে পড়েন, ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় বলেন, 'তা' দেবে না কেন! ঘাড়ের বোঝা হালকা হয় যে তা'হলে। কিন্তু নির্দেশ দিলেই সব হল কেমন? যখন বয়েস-কাল ছিল, শক্তি-সাহস ছিল, তখন এ নির্দেশ দিতে পেরেছিলে? তা' নয় তখন মাথার ঘোমটা একটু নামালে তোমার মা রাগ করবেন—পিসি রাগ করবেন! আর সেই ভয়ে তুমি তটস্থ। বুড়ি ঝি তা পর্যন্ত সমালোচনা করেছে ব্যাখ্যানা করেছে। এখন ডানাকাটা পাখীকে খাঁচা খুলে দিয়ে বলছ উড়তে। একলা যাবো! রাস্তাঘাট আমি চিনি যে তাই একলা যাবো?

'কী মুস্কিল! তুমি যে দেখি নিজেই ভাঙছ নিজেই গড়ছ! এত পরস্পর-বিরোধী কথা কেন বল বলতো?'

'কেন বলি জানো না? পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বলে।'

এবার সত্যিই ছিটকে বেরিয়ে যান মায়ালতা।

মায়ালতা দুর্বলচিত্ত, মায়ালতা লোভী, তবু মায়ালতার দিকেও তার স্বপক্ষে যুক্তি আছে বৈকি!

মানুষকে তো গড়ে তার পরিবেশ!

নিজেকে নিজে গড়ে তুলতে ক'জন পারে?

সকলের উপাদানই তো আর পাথর নয়, লোহা নয়, জগতে বালি-মাটিই বেশী।

বালি-মাটি।

তাই মায়ালতা অভিমানাহত হয়ে নিরুদ্যম হয়ে যান না।

এবার গিয়ে হানা দেন ছোট দেবর সুমোহনের ঘরে। যদিও এই দুটি দেওর-ভাজে প্রকৃতপক্ষে 'আদায় কাঁচকলায়'—তবু কোথায় যেন একটু বন্ধনও আছে।

সে বন্ধন হয়তো বা সেই দূরকালের দৃঢ় হয়ে বসা সংস্কারের বন্ধন।

মায়ালতা জানেন 'যতই হোক ও স্নেহভাজন'। সুমোহন জানে 'যতই হোক উনি গুরুজন'।

কাজেই যদিও মাঝে মাঝেই এই গুরু-লঘু দুটি জনে প্রবল কলকল্লোলে কলহ হচ্ছে, তবু বাক্যালাপ বন্ধের পথে ওরা নেই।

সুমোহনের বেকারত্বের সুযোগটা যে মায়ালতা একেবারেই পান না তা বললে সত্যের অপলাপ হয়। মায়লতা চূড়ামণি যোগে গঙ্গাস্নান করতে চেয়েছিলেন, কোমর বেঁধে এগিয়ে এলো সুমোহন। অবশ্য এল বেশ একটু টিপ্পনি কেটে।

'বলি বৌদি, হঠাৎ ভূতের মুখে রাম-নামের ঘটা কেন? কখনও তো হিন্দুস্থানীর কোন পরিচয় দেখতে পাওয়া যায় না, চূড়ামণির কপাল ফিরল যে?'

মায়ালতা গরদের শাড়ীখানি পরিপাটি করে পরতে পরতে বলেছেন, 'তোমাদের সংসারে এসে পর্যন্ত তো খালি পেট-পুজোর নৈবিদ্যি সাজাতেই শিখেছি, দেব-দেবীর পুজো নৈবিদ্যি তো শিখিনি, এবার ভাবছি শিখব। তাই প্রথমেই 'যোগের' স্নানে দেহশুদ্ধি করে নিচ্ছি।'

সুমোহন পিঠোপিঠি বলে বসে, 'দেহ তো কলের জলে স্নানেও শুদ্ধ হয়, কিন্তু মনটা? সাধুরা যাকে বলেন চিত্ত। চিত্ত-শুদ্ধির চেষ্টা করেছেন কখনো? ওটাই বরং করুন একটু।'

অতঃপর লেগে যায় তাক ঝমাঝম কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সুমোহন আর মায়ালতা দিব্যি একই গাড়ীতে উঠে বসছেন। এবং আরও তাজ্জবের কথা সারা পথ মুখর করে গল্প করতে করতেই চলেছেন।

আজও তার ব্যতিক্রম হবে না, বুঝেই বোধ করি মায়ালতা স্বামীর কাছ থেকে

হতাশ হয়ে ফিরে স্বামীর কনিষ্ঠটির ঘরে এস হানা দিলেন।

কিন্তু 'ঘর' জিনিসটা তো আর পুরুষের নয়! ঘর হচ্ছে ঘরণীর।

সুমোহনের ঘরেও ঘরণী আসীন। যাকে মায়ালতা মনে মনে দু'চক্ষের বিষ দেখলেও প্রত্যক্ষে সমীহ না করে পারেন না।

সুমোহন আর তার স্ত্রী অশোকা দু'জনে একেবারে ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

অবশ্য সচরাচর এইটাই চোখে পড়ে. স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃতি একেবারে বিপরীতই হয়. একে অপরের পরিপূরক স্বরূপ বলে এই যোগাযোগটি বিধাতা ভেবে-চিন্তে ঘটান. না এটা বিধাতার খেয়াল. তা বলা শক্ত। কিন্তু প্রায় সব সংসারেই এই বিপরীত প্রকৃতির লীলাটি দেখা যায়।

কিন্তু সুমোহন আর অশোকার স্বভাবের পার্থক্য যেন আকাশ-পাতাল।

মনুষ্য-প্রকৃতিতে যতগুলি 'ভাব' আছে. অবশ্যই তার একটা শ্রেণী বা জাত আছে। সে হিসেবে বিচার করলে ওদের একজন শূদ্র একজন বিপ্র।

সুমোহনের মধ্যে যেমন আত্মসম্মানের বালাই মাত্র নেই. অশোকার মধ্যে তেমনি আত্মসম্মানজ্ঞানের অবধি নেই। যেটাকে আপাতদৃষ্টিতে অহংকার বলেই মনে হয়।

সুমোহন জীবনে কখনো উপার্জন করল না।

কেন করল না সে কথাও বলা বড় শক্ত।

সুমোহন কৃতবিদ্য. স্বাস্থ্যবান, কাজেই অন্তরায় কিছু ছিল না কিন্তু অন্তরায় সে নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছিল।

সুমোহনের অজুহাত ছিল. 'ল পড়া', ওকালতি করা' ওসব আমার দ্বারা হবে না। ওকালতি মানেই তো মিথ্যেকথা কওয়া।

সুমোহন সুশোভনদের বাপও উকিল ছিলেন. তিনি তখন মরে হাড় জুড়িয়েছেন। তাই রক্ষে. কিন্তু মা-পিসি তখনও বেঁচে।

পিসি রেগে বলতেন 'ছোটমুখে বড় কথা! তোর বাপ চিরদিন ওকালতি করে গেল না? তোর বড় ভাই ও ই করছে না?'

'করছে বলেই তো জানতে পারছি।'

অম্লান বদনে বলেছিল সুমোহন।

অতএব 'ল' পড়া হল না।

তবে চাকরী-বাকরী।

সুমোহন বড় বড় চুল সমেত মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে জবাব দিয়েছিল. 'পরের চাকরী করা আমার পোষাবে না।'

তবে কি মাষ্টারী?

মাষ্টারী!

হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল সুমোহন।

'সুস্থ মাথা লোক আবার ইচ্ছে করে স্কুল-মাষ্টারী করে? সাতটা গাধা মরে একটা—'

সুবিমল 'থাক থাক' করে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল. 'পরের চাকরী না করিস ব্যবসা কর! কম মূলধনে যা হতে পারে—'

'কম মূলধনে? সুমোহন হেসে উঠে বলেছিল 'তাহলে ষ্টেশনের ধারে পান-বিড়ির দোকান দিই।'

ব্যবসা সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা সে শিখিয়েছিল সেদিন বড় ভাইকে। বলেছিল 'লাখ লাখ টাকা নিয়ে শুরু করতে না পারলে ব্যবসার নাম মুখে না আনাই ভাল। বাঙালীর ব্যবসা ওই জন্যেই—'

এসব অবশ্য দিনাজপুরে থাকাকালীন কথা। তারপর যুদ্ধ দাঙ্গা দেশভাগ এই ত্রিভুজের আক্রমণে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মহা-মহা লোকগুলোই বাণের জলে কুটোর মত ভেসে গেল তো একটা ছেলে. তায় আবার বাড়ীর ছোটছেলে. সে কর্মক্ষেত্র আবিষ্কার করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে কি না করছে. কে দেখতে যাচ্ছে।

ছেলেটার বিয়ে হয়েছে? ছেলেপুলে হয়েছে? হয়েছে তো হয়েছে তখনও ঘরে ভাতের অভাব হয়নি।

তারপর তো দেশ ছেড়ে চলে আসা।

বিদেশে বিভূঁইয়ে সুমোহন কি যার তার খোসামোদ করে বেড়াবে কাজ কাজ করে?

না. সুমোহন আর ও সবের ধারে-কাছে গেল না। সে রাতটাকে যতটা পরিমাণ সম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে সকালে গাত্রোত্থান করে. বাসিমুখেই চা-ভোগটা সেরে নিয়ে ধীরে-সুস্থে দাড়ি কামায়। ধীরে-সুস্থে স্নান করে. ধীরে-সুস্থে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খবরের কাগজটা পড়ে. তারপর বেলা এগারটা নাগাদ প্রাতর্ভ্রমণে বেরোয়।

বেড়িয়ে ফিরে এক গ্লাস মিছরির সরবৎ অথবা ডাবের জল খেয়ে একটু বিশ্রাম করে ভাত খেতে বসে।

দৈনন্দিন রন্ধনতালিকার উপরও প্রায়শঃই দু-একটা বিশেষ 'পদ' তার জন্যে রান্না করা হয়.—তথাপি বাক্যোক্তিটা বড় একটা অনুক্ত থাকে না।

রান্নার রং, গড়ন, স্বাদ, এসব ছাড়াও পর পর দু'দিন একই ধরনের তরকারি পাতে পড়লে সুমোহন প্রায় পাড়ার লোককে ডেকে ডেকে শোনায় তাদের বাড়ীর গৃহিণীর গৃহিণীপনার সুব্যবস্থার কথা।'

খেয়ে উঠে একটি লম্বা দিবানিদ্রা।

এবং বৈকালিক ভ্রমণকে সন্ধ্যায় ঠেলে দিনটাকে কোনমতে সমাপন—এই হচ্ছে সুমোহনের দিন-যাপন পদ্ধতি।

নিজের যে গোটা চারেক ছেলেমেয়ে আছে, সেগুলোকে ভুলেও কোনদিন 'আয়' বলে কাছে ডাকতে দেখা যায় না সুমোহনকে, বরং তাদের নামোল্লেখ কালে বলে 'রেজিমেণ্ট'।

বাচ্চাবেলায় ছেলে রাতে কাঁদলে অশোকাকে কড়া হুকুম দিত—'ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাও, নচেৎ গলা টিপে জন্মের শোধ কান্না ঠাণ্ডা করে দাও। ঘুম না হলে আমি কারোর নই।'

এখন আর রাতে কাঁদার বয়েস কারুর নেই, দিনে কলরব করে। সে কলরবটা বাবার ঘরে হলেই পাখার বাঁট অথবা ছাতার বাঁট দিয়ে তাদের খেদাতে দ্বিধা করে না সুমোহন।

এখানে শ্যামপুকুরের এই ছোট্ট বাড়ীটুকুর মধ্যে এতগুলো লোক আঁটাআঁটি করে থাকা, তবু সুমোহনের আরাম আয়েস স্বাচ্ছন্দ্য ঠিকই জুটে যায়।

মেজাজ যখন খুব শরীফ থাকে তখন সুমোহন হাসে আর বলে, 'হুঁ হুঁ বাবা যে খায় চিনি, তারে চিনি জোগান চিন্তামণি। কিন্তু চিন্তামণি তো আর চিনির বস্তা ঘাড়ে করে বয়ে দিয়ে যান না, রস আহরণের বুদ্ধিটা থাকা চাই। আখ তো রসের সাগর, তবু নিজে থেকে কি রস দেয়? তাকে মাড়াই করবার কৌশলটি প্রয়োগ করা চাই।

এই জগৎ-সংসারখানি হচ্ছে আখের ক্ষেত। রস আছে সর্বত্র কিন্তু সহজে, আপসে, সেটি মেলে না। ইক্ষুদণ্ডের প্রেম-করুণা অথবা সদ্বিবেচনার ওপর ভরসা করে যদি পাত্র হাতে করে বসে থাক, তো তাহলে শূন্যপাত্র নিয়েই ফিরতে হবে। কল চালাতে হবে।

অশোকা যদি আর পাঁচটা মেয়ের মত হতো, যদি স্বামীকে উঠতে বসতে গঞ্জনা দিয়ে উৎখাত করতো, গলায় দড়ি দিতে যেত, বিষ খেতে যেত, তাহলে কি হতো বলা যায় না। কিন্তু অশোকা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মেয়ে। স্বামী সম্পর্কে আশ্চর্য রকমের উদাসীন। সুমোহন সম্পর্কে তার যে বিন্দুমাত্র অভিযোগ আছে, এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। মনেও যে তার কোন ক্ষোভ আছে কি বিষাদ আছে অথবা আক্ষেপ অভিযোগের কারণ আছে, কোন ছলেই সেটা টের পাওয়া যায় না।

আশ্চর্য এক শান্ত হাসিমুখের বর্ম পরে সংসারে ঘুরে বেড়ায় সে, যে বর্মে ঠেকে খেয়ে অনায়াসে পিছলে পড়ে মায়ালতার তূণের বাছা বাছা তীরগুলি।

সুমোহনের সঙ্গে ঝগড়া হয় মায়ালতার, কিন্তু পরবর্তী বাক্যবাণগুলি প্রয়োগ করেন মায়ালতা প্রায়শঃই অশোকার সামনে দেয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

কিন্তু অশোকাও তো একখানা দেওয়াল।

পাথরের দেয়াল।

দেয়াল যেমন নির্বিকারে সব কথা পরিপাক করে, বোঝা যায় না তার কান আছে কিনা, অশোকাও তাই। মায়ালতার তূণের তীর যখন খটাখট্ জ্যা মুক্ত হয়ে বেরোচ্ছে, ঠিক সেই মহা-মুহূর্তেও অশোকা অম্লান হাস্যবদনে প্রশ্ন করতে পারে, অর্থাৎ করে, 'দিদি বিকেলে ছেলেদের কি জলখাবার হবে?' অথবা 'দিদি ওলেোর কুটনো কি এখন কুটে রাখবো?'

পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলো যে একে একে প্রায় সবই অশোকার কাঁধে চেপেছে, এটা কিন্তু না-বা অশোকার না-বা মায়ালতার ব্যবহারে ধরা পড়ে।

অশোকা এমন সুরে প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রশ্ন করে, যাতে মনে হতে পারে নিতান্তই শিক্ষানবীশ সে। আর মায়ালতাও প্রত্যেকটি ব্যাপারে এত 'বাপরে মারে—পারছি না রে—' করেন যা দেখলে মনে হয়, প্রতিক্ষণ ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

মনের মধ্যে অসন্তোষ থাকলে বুঝি এমনিই অসহিষ্ণুতা আসে।

কিন্তু ওর এত সন্তোষ কিসে?

অশোকাকে দেখেন আর ভাবেন মায়ালতা। ভাবেন আর হিংসেয় জ্বলে মরেন।

অশোকার এই সহিষ্ণুতাই বুঝি মায়ালতার অসহিষ্ণুতার আর এক প্রধান কারণ।

অস্থির অব্যবস্থিতচিত্ত লোকেরা আত্মস্থদের প্রতি হিংসে পোষণ না করে পারে না।

তাই মায়ালতা তাঁর চিরদিনের আশ্রিতা চিরদিনের হাততোলায় থাকা পেটের ছেলের চাইতে বয়সে ছোট জাকে রীতিমত হিংসেই করেন।

আশ্রিতা যদি আশ্রিতার ভাবে না থাকে, হাততোলার হাতটা যদি প্রকট না হতে পায়—সুখ কোথা?

অশোকা এমনভাবে থাকে, যেন সে সুবিমলের মেয়েই বা।

চার-চারটে ছেলেমেয়ে তার, চাহিদা তো আছেই তাদের, নানতম হলেও আছে, কিন্তু নির্বিকারভাবেই সেগুলো পেশ করায় সুবিমলের কাছে।

মায়ালতা অবশ্য সেকথা তুলেও খোঁটা দেন, 'আমার কাছে দরকারী কথা হয় না, হয় ভাসুরের কাছে। কালে কালে কতই দেখব।'

অশোকা অবশ্য একথা শুনতে পায় বলে মনে হয় না। কারণ কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন সে করে না।

তবু আশ্চর্য, মায়ালতা মনে মনে যেন অশোকাকে ভয় করেন।

কেমন এক প্রকার সমীহর ভয়।

তাই দেওরের ঘরে ঢোকার দরকার হলে তিনি আগে দেখে নেন জা ঘরে আছে কিনা।

আজও তাই দেখে নিলেন আগে। দেখলেন নেই।

বাঁচলেন যেন।

বললেন, 'কি গো ছোটঠাকুরপো একটা কাজ করতে পারবে? না নানান অজুহাত দেখাতে বসবে?'

(ক্রমশঃ)

॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ সমুদ্র-অভিযানে বিজ্ঞান ॥

এই শতকের বিজ্ঞানীরা এক নতুন ধরনের সমুদ্র-অভিযান শুরু করেছেন। এই অভিযান সমুদ্রপৃষ্ঠে পাড়ি দেওয়া নয়, সমুদ্রের গভীর তলদেশে ডুব দেওয়া। কিছুকাল আগেও বিজ্ঞানীদের হাতে এমন কোনো হাতিয়ার ছিল না যার সাহায্যে সমুদ্রের গভীর তলদেশকে খুঁটিয়ে জানা যেতে পারে। ডুবুরীরা ডুব দিয়ে যেটুকু খবর সংগ্রহ করে আনতে পারত তা সীমাবদ্ধ ছিল মহাদেশের তট-রেখার কাছাকাছি এলাকায়। সত্যিকারের গভীর সমুদ্রের তলদেশ একেবারেই অজানা ছিল বলা চলে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর-বর্তী কালে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই অজানা এলাকাটির রহস্য ক্রমেই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। আর সমুদ্র সম্পর্কে যতোই জানা যাচ্ছে ততোই বোঝা যাচ্ছে যে, এ এক এমন বিপুল রহস্যের এলাকা যে এ-সম্পর্কে জানার শেষ নেই। এমন কি বিজ্ঞানীদের এই ধারণাও হয়েছে যে মানুষের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে সমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞানের ওপরে এবং সমুদ্রের বিপুল সম্পদরাশিকে ভোগ্য করে তোলার ক্ষমতার ওপরে। এই কারণেই প্রত্যেকটি উন্নত দেশে সমুদ্র-বিজ্ঞানের চর্চা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করতে পেরেছে। বলাই বাহুল্য, এই বিশেষ ক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি অগ্রসর দুটি দেশ।

সম্প্রতি ইউ-এস-আই-এস প্রকা-শিত একটি পুস্তিকা আমাদের হাতে এসেছে, যার নাম 'সায়েন্স এক্‌স্‌প্লোর্স দি সী' বা বাংলায় বলা যেতে পারে 'সমুদ্র-অভিযানে বিজ্ঞান'। পাতায় পাতায় ছবি দেওয়া এই ৩৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা-টিতে সমুদ্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজস্র তথ্য-পূর্ণ খবর পাওয়া যাবে। আর বিশেষ করে পাওয়া যাবে মার্কিন বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিবরণ। কৌতূহলী পাঠকরা পুস্তিকাটি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেন। আমি এখানে এই পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করে কিছু কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চেষ্টা করছি।

॥ অশান্ত সমুদ্র ॥

ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ হচ্ছে শতকরা মাত্র ২৯ ভাগ। বাকি সবটাই জলভাগ। মোট জলের পরিমাণ সাড়ে-বারো কোটি ঘন কিলোমিটার। এবং এই বিপুল পরি-মাণ জল স্থির ও শান্ত হয়ে এক জায়গায় অবস্থান করছে না, অনবরত আলোড়িত ও আবর্তিত হয়ে চলেছে। সমুদ্রের মতো এতবেশি অশান্ত এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

সমুদ্রের জল যে সব সময়েই গতি-শীল তার কারণ প্রথমত নিশ্চয়ই বাতাস, তারপরে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন, তার-পরে বিভিন্ন স্তরে সমুদ্র-জলের ঘনত্বের পার্থক্য এবং তারপরে অবশ্যই জোয়ার-ভাঁটা। সব মিলিয়ে এই বিপুল সমুদ্রে নানা বিভিন্নমুখী স্রোতধারার সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্রের এই স্রোত পৃথিবীর আবহাওয়াকেও অনেক পরি-মাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

॥ সমুদ্রের তলদেশে ॥

১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণাই ছিল না। শব্দতরঙ্গ সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে যতোটা সময় নেয় তা থেকে যে সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কে সঠিক হিসেবটা বেরিয়ে আসতে পারে, এ আবিষ্কার পরবর্তী কালের।

হালের গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, গভীর সমুদ্রের তলদেশে অজস্র পর্বত-মালা রয়েছে। এই পর্বতমালার কোনো কোনো শিখর এমন কি মাউন্ট এভা-রেস্টের চেয়েও উঁচু। আবার পর্বতমালা যেখানে রয়েছে সেখানে স্বাভাবিক কারণেই রয়েছে গভীর গহ্বর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আমাদের এই চোখের দেখার ভূপৃষ্ঠ যতো না বিচিত্র, তার চেয়ে অনেক বেশি বিচিত্র গভীর সমুদ্রের তলদেশ।

কিন্তু এই বিচিত্র দেশকে চাক্ষুস অবলোকন করাটা এতদিন প্রায় একটা অসম্ভব কাজ বলে মনে করা হত। সমুদ্রের জলে প্রতি দশ মিটার গভীরতায় চাপ বাড়ে ৬·৩৫ কিলোগ্রাম হিসেবে। একজন ডুবুরী যদি খালি গায়ে জলে নামে তাহলে ৯১৫ মিটার গভীরতায় পৌঁছবার আগেই সমুদ্র-জলের প্রচণ্ড চাপের দরুন তার শরীরটা একেবারে দলা পাকিয়ে যাবে। কাজেই এতদিন পর্যন্ত নানা অপরোক্ষ উপায়ে গভীর সমুদ্রের গভীরতার হদিশ নেবার চেষ্টা করা হত।

কিন্তু হালের বিজ্ঞানীরা এমন একটি আয়োজন করতে পেরেছেন যার ফলে গভীর সমুদ্রের তলদেশে সশরীরে ডুব দেওয়াটা বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠেছে। এই আয়োজনটির নাম 'ব্যাথিস্কাফ'। এই ব্যাথিস্কাফটি দুজন মানুষ-আরোহী সমেত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে এগারো কিলোমিটার ডুব দিয়ে একেবারে তল-দেশে পৌঁছতে পেরেছিল। আশা করা চলে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সমুদ্রের তলদেশটিও প্রায় ভূপৃষ্ঠের মতোই খুঁটিয়ে জানা হয়ে যাবে। গত আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষে এ-বিষয়ে সকল দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা ছিল এবং বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সকল দেশের বিজ্ঞানী-রাই অবহিত হয়েছেন।

সমুদ্রের তলদেশ থেকে গর্ত খুঁড়ে ভূ-অভ্যন্তরের নমুনা সংগ্রহ করার বিষয়ে ইতিপূর্বে একটি সংখ্যায় আমরা আলো-চনা করেছি। আলোচ্য পুস্তিকাতেও এ-বিষয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা আছে। এবং বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্যে দুটি ছবিও পুস্তিকাটিতে দেওয়া হয়েছে। ছবিদুটি এখানে ছেপে দেওয়া হল। কৌতূহলী পাঠকরা পুরনো আলোচনার সঙ্গে এই ছবিদুটি মিলিয়ে নেবেন।

॥ সমুদ্র-অভিযান ॥

আমরা আগের আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম যে, পারমাণবিক তেজে চালিত ডুবোজাহাজ গভীর সমুদ্রে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে পাড়ি দিতে পারে। আলোচ্য পুস্তিকায় এ-প্রসঙ্গে 'ট্রাইটন' জাহাজের ঐতিহাসিক অভিযানের কথা বলা হয়েছে। এই জাহাজটি চুরাশি দিনে গভীর সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে গোটা পৃথিবীকে একটা পাক দিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক অভিযানটি শেষ হয় ১৯৬০ সালের মে মাসে। অপর একটি জাহাজ 'নটিলাস' ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে উত্তরমেরুর তলদেশে অভিযান করেছিল। পুস্তিকায় আরো বলা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক নতুন ধরনের জাহাজ ও ডুবোজাহাজ তৈরি হবে।

॥ সমুদ্রের ভাণ্ডার ॥

সমুদ্র এক অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার। সমুদ্রকে যতো বেশি আয়ত্তের মধ্যে আনা যাবে ততোই এই ভাণ্ডারের চাবি-কাঠিটির সন্ধান পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর প্রায় ২০০ কোটি মানুষ উপযুক্ত খাদ্য পায় না। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যেরই সবচেয়ে বেশি অভাব। এবং পৃথিবীর জনসংখ্যা যে-হারে বাড়ছে তাতে এই খাদ্যাভাব ভবিষ্যতে তীব্রতর হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই বাড়তি
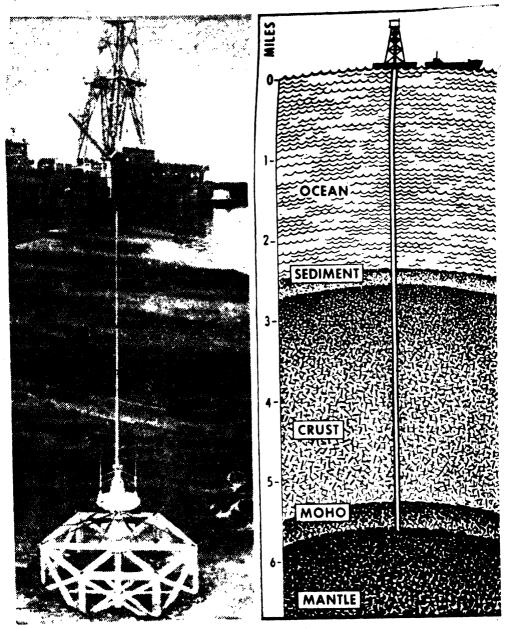
সমুদ্রের তলায় ভূগর্ভ খননের যন্ত্র

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের নক্সা

খাদ্যের যোগান পাওয়া যেতে পারে এই সমুদ্র থেকেই। ভবিষ্যতের মানুষের কাছে এই সমুদ্রই হয়ে উঠবে সবচেয়ে বড়ো খাদ্য-ভান্ডার।

তাছাড়া, সমুদ্র থেকে বিপুল পরিমাণ খনিজ পদার্থও পাওয়া যেতে পারে। আজ পর্যন্ত যতো রকম পদার্থের সন্ধান আমরা রাখি সেগুলো সবই কম-বেশি পরিমাণে সমুদ্রের জলে আছে। অবশ্য এখনো পর্যন্ত এইসব খনিজ পদার্থকে উদ্ধার করবার সহজ কোনো উপায় উদ্ভাবিত হয়নি। তবে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়েও যতোখানি তৎপর হয়েছেন তাতে আশা করা চলে যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বিশেষ ক্ষেত্রেও বড়ো রকমের সাফল্যের সংবাদ পাওয়া যাবে।

সমুদ্রের নোনা জলকে মিষ্টি জলে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি সম্পর্কেও বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। পুস্তিকাটিতে এ-বিষয়েও আলোচনা আছে এবং আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সাফল্য পৃথিবী থেকে চিরতরে জলাভাব দূর করবে।

সমুদ্রের মতো বিপুল এক সম্পদের ভান্ডার আমাদের প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। আর বিজ্ঞানীরা অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবেই আশা করতে পারি যে, একদিন না একদিন এই সমুদ্রকেও পুরোপুরি আয়ত্ত করা যাবে।

নিকোবারের দ্বীপে দ্বীপে

সুরেশচন্দ্র সাহা

পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় দেড়শ' মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হল নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের প্রথম দ্বীপ, কার নিকোবার। এর পর আরও দক্ষিণে একটু পূর্ব ঘেঁসে ক্রমে তেরেসা কাচল-কামোর্তা লিট্‌ল নিকোবার এবং সর্বশেষ গ্রেট নিকোবার নিয়ে গোটা নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ। একটা একটা করে এর সবগুলি দ্বীপই দেখবার সৌভাগ্য হয়ে উঠল।

কামোর্তা দ্বীপের বন্দরের নাম নানকৌড়ি। বন্দর বলতে জাহাজ যাত্রী আর নানা জলযান আনাগোনা-করা কলকাতা বোম্বের মত যে শিল্পোন্নত শহর বোঝায় তার কোন চিহ্নই নেই এখানে। একটা দ্বীপখণ্ডের এক উল্লেখযোগ্য জনপদমাত্র এই নানকৌড়ি। অবশ্য এখান থেকে দূরে এবং অদূরে এই দ্বীপের নানা অংশে সাগরের কিনারায় পাহাড়ের পাদমূলে আরও অনেক জনপদ গড়ে উঠেছে। নানকৌড়ি হারবারে প্রবেশপথটি অনেকটা বাংলা '৪'র মত—এর পাহাড়ঘেরা প্রথম গোলালো অংশ পার হয়ে '৪'র দ্বিতীয় গোলার্ধে প্রবেশ ক'রে জাহাজ নোঙর ফেলে। সাগরের এই অংশটুকু যেন নির্মল নীল জলের এক প্রকাণ্ড সরোবর, গোলালো তীর শ্যামল তরুশ্রেণী-ঘেরা হেলান দেওয়া পাহাড়ের সানুদেশ। পোতাশ্রয় তৈরীর এমন স্বাভাবিক সুরক্ষা ব্যবস্থা খুব কম জায়গায় চোখে পড়ে। যদি কোন সুদূর ভবিষ্যতের ভারতে অমিত নৌবলের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়, তবে গোটা আন্দামান আর নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের এমনি অগণিত স্বাভাবিক সুরক্ষিত পোতাশ্রয়গুলি অদ্বিতীয় নৌ-সামরিক সম্পদ বলে গণ্য হবে।

নোঙরফেলা স্থান থেকে আধ-মাইলের মধ্যে এক ক্ষুদ্র জেটী—সুরাটের বারোচা গ্রাম থেকে আগত মুসলমান বণিক আকুজীদের ছোট জাহাজ 'সকিনা' 'বরোচ' আর কতগুলি মোটরলঞ্চ বাঁধা থাকে এর পাশে। সারা আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের একচ্ছত্র বাণিজ্যা-ধিকারী আকুজীদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এই জাহাজ আর লঞ্চ কটি এবং কলকাতা-পোর্টব্লেয়ারের যাত্রী-ও-মালবাহী "নিকোবার" জাহাজ ছাড়া এই হারবারে হয়ত শুভাগমন হয়নি অন্য কোন জাহাজের। সরকারি-সম্পদ "নিকোবার"ও আসে কাচিৎকদাচিৎ, সরকারী কর্মী বা পি-ডব্‌লু-ডির রসদ বহনের প্রয়োজনে। জেটীর পথবেয়ে এসে জনপদে প্রবেশের মুখে প্রথমেই চোখে পড়ে নারিকেলকুঞ্জ, আরণ্য-শোভার প্রথম সুচারু সোপান। এই নারিকেলকুঞ্জতল অনেক সন্ধ্যাতেই মুখ-রিত হয়ে উঠে দ্বীপবাসী মানুষদের আনন্দকাকলিতে—অনেক আগে ভারতে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নতুন কপির প্রদর্শনের ব্যবস্থাপনায়।

এগিয়ে চলার পথে দেখা যায় গোটাকতক পাহাড়ী ঝর্ণা—ঝির্‌ঝির্ করে এসে সাগরে পড়ছে। অদূরে নিকোবারীদের বসতি—গোটা নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র সেই একই ধরনের গোলাকার ঘর, যার মেঝে তৈরী হয় মাচার মত 'টং' বেঁধে। এই সাধারণ প্রজা-পুঞ্জের কুটীরের মাঝখানে নিকোবার-রানীর রং করা কাঠের বাড়ির বৈশিষ্ট্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, পোর্ট-ব্লেয়ারের সম্ভ্রান্ত ধনীদের বাংলো-টাইপের বাড়ির মত। এখানকার নারকেলের প্রচুর্য, জলে মাছের প্রাচুর্য, বাতাসে মিষ্টিমধুরতা আর পাহাড়ের বনাচ্ছন্ন শ্যামলিমার তুলনা নেই। প্রায় ৭° ডিগ্রী অক্ষরেখায় অবস্থিত নানকৌড়ির নিরভ্র আকাশের গ্রহ-তারা-নক্ষত্রের এমন নীলোজ্জ্বলতা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

নানকৌড়ি থেকে জাহাজে দু'ঘন্টার পথ কাপাঙ্গা। দুধারে অর্ধ-গোলাকার ভাবে দুটি প্রায়-অবিচ্ছিন্ন দ্বীপ, মাঝখানের সাগরটুকু ডিম্বাকৃতি; একেবারে ঘন নীল। এখানে প্রবেশপথ দুটি। উত্তরের প্রবেশপথে দুধারে বনরাজিমন্ডিত তটরেখার দূরত্ব ক্রমেই কমে এসেছে; মিলতে পারেনি—একে অন্যকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অপর প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে মাঝখানের জলাশয়কে মনে হয় যেন একটা প্রশস্ত নদী। যেদিন সুনীল জলধি হইতে এই ভু-খন্ডগুলি মাথা তুলে দাঁড়াল সেদিন প্রকৃতিদেবীও হয়ত ভাবতে পারেননি এই সুদূর রহস্য-লোকে তাঁর এক অচিন্ত্য লীলানিকেতন তৈরি হয়ে গেল। এখানে রোদপড়ে-আসা নির্জন অপরাহ্নে জাহাজের ডেকে

নিকোবারী ললনা

এসে দাঁড়ালে মনে জাগে এক বিষাদের সুর—অজ্ঞাতসারে যেন কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়—নীল যমুনায় ভরা বেদনায় মিলন বাঁশরী বল কে বাজালে।

বাঁ-দিকের কাচল দ্বীপের তীর-রেখায় চোখ মেলে চাওয়া গেল। সে কি নয়নাভিরাম দৃশ্যপট! একটা সুউচ্চ পাহাড় ওপারের সাগরে হেলান দিয়ে ভাঁজের পর ভাঁজ উপরে উঠে একেবারে আকাশটাকে যেন ছুঁয়ে ফেলেছে। এই বিরাট বনময় পাহাড়টার আগাগোড়া নিবিড় তরুশাখাপল্লবে মোড়ক করা, নিশ্ছিদ্র আর অচ্ছেদ্য। সমস্তটা সমতল পাদদেশ জুড়ে নারকেল বন। কার-নিকোবারের নারকেল বন বিরাট হলেও সমুদ্রের ঠিক ধারে এত নারকেল গাছের সমারোহ আর চোখে পড়েনি। নারিকেল-কুঞ্জভরা প্রান্তরে ফাঁকায় ফাঁকায় পর্ণ-কুটীর, সামনে উদার সাগর, মাথার উপর বিশ্বভুবন আলো-করা আকাশ। দ্বীপের পদচ্ছায়াতলে সবুজে-নীলে মিলিয়ে এক বিচিত্র রূপাঞ্জলি।

ডাইনের বনরাজিবহুল কামোর্ত্রা দ্বীপ যেন আপন পায়ে ভর দিয়ে সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা এক ফালি পাহাড় পিঠ টান দিয়ে দাঁড়িয়ে; তবু নেই শুধু তৃণের কার্পেট-মোড়া—যেমনটি চোখে পড়ে আন্দামান-নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র। ওধারে জলের কিনারায় শুধু একটি গাছ, যেন সাথীহারা লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটি ভাবনায় বিভোর!

এর পর আসা গেল তেরেসা দ্বীপে, প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে উজিয়ে। এর প্রবেশপথের ডাইনে একটা নাতিবৃহৎ দ্বীপ, প্রস্তরময়। পাদমূলে আবার সেই নারিকেলকুঞ্জ—ঘন বনময়। এরই পূর্ব উপকূলে মিন্যুক—আমাদের গন্তব্যস্থল। এই মিন্যুকে এবং তেরেসার দক্ষিণ-পূর্বে ফেলে-আসা তাপাইনে (কাপাংগা) নারকেল গাছগুলি একই রকম দেখতে, তাপাইনের নারিকেলবন-মণ্ডিত তীরভূমিটাই যেন অবিকল এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মিন্যুকের উপকূলে।

মিন্যুক একটি গাঁয়ের নাম। উপকূলভাগ পা-দেবে-যাওয়া বালুকায় আকীর্ণ। সামনে স্কুলঘর, অদূরে গ্রামাঞ্চলবর্তী শিক্ষার্থীদের একমাত্র বিদ্যা-নিকেতন। স্কুল প্রাঙ্গণের সামনে ভারতের জাতীয় পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে।

পাশের গাঁয়ে যাওয়া গেল। একটা বাঁশের দুপাশে অনেকগুলো গোটা নারকেলমালা জলপাত্রের মত বেঁধে সামনের এক ক্ষীণতনু ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে গেল গাঁয়ের লোকেরা। বেলাশেষে জলতোলা জনপদবধূ ছিল না কিন্তু একটিও এই দলে। হঠাৎ একদল নেড়িকুত্তা যেন মরাকান্না শুরু করে দিলে। সারমেয়কুলের এমনি অভ্যর্থনার জন্য ত প্রস্তুত ছিলাম না।

একটু আলাপ করা গেল লংকানীর সঙ্গে। বলিষ্ঠগঠন যুবক। কথার মাঝে মাঝে অনুচ্চ ঢেকুর তোলে অনেকটা মুদ্রাদোষের মত। নিকোবার দ্বীপপুঞ্জবাসীদের অনেকেরই আছে অল্পাধিক এই অভ্যাস, উত্তর ইংল্যাণ্ড আর স্কটল্যাণ্ডের লোকের মত। লংকানীর ঘরে আছে বৌ—হার্ট্‌-পিন্‌-হাঁ, বাগানে নারকেল, পাশের ঝর্ণায় জল। ব্যস, আর চাই কি? মাঝখানে একটা সাধারণ উঠোন। দুটি পাতা একটি কুঁড়ির মত উঠোনের এপাশে ওপাশে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের উঁচু মাচার বাসগৃহ। পাশে প্রকৃতি-গড়া বাগিচায় অযত্নে-বেড়ে-ওঠা মিঠকুমড়ো গাছে ফলের অভাব নেই। অনেকগুলো নিষ্ফলা বাতাপী লেবুর গাছও রয়েছে। এরই মাঝখানে একটা অগণিত ফুলে-ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছ। এদের মধ্যে এখনও প্রায় কোন ফুলেরই নামকরণ হয়নি। ফুলজগতে ফুল আছে, এই যথেষ্ট। কি দরকার তাদের গোলাপ-বকুল-রজনীগন্ধা বলে। এই আরণ্য-মানবদের কাছে ফুল শুধু ফুলই। নেহরুর বোতামে-গোঁজা গোলাপের কথা এদের জানা আছে কিনা জানি না। তবে বনপথচারিণী প্রিয়াকে সম্ভাষণ করে—ক্ষণেক দাঁড়াও ফুলবনে, দুহাতে ভরিয়া দেব ফুল—একথা যে কেউ বলে না সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এখানকার অধিবাসীরা প্রায়ই খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী। তবে আশেপাশের কোন কোন লোকের এখনও কোন ধর্মেই নাকি দীক্ষা হয়নি। ক্রমে যে তারা ইস্‌লামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে অথবা ভগবান যীশুভক্তদের অনুগামী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধর্মহীন মানুষদের মধ্যে ইসলাম আর খৃষ্টের বাণীবহ উৎসাহী কর্মীর অভাব নেই। নিষ্ক্রিয় হিন্দুদের কিন্তু এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই, কাউকে নতুন করে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেওয়া হোক আর না হোক। মানব-সভ্যতার আদ্যিকালে যারা হিন্দু ছিল তাদেরই সন্তানসন্ততির সামান্য ভগ্নাংশ হিন্দু নামে ছড়িয়ে আছে গোটাকতক দেশে। নতুন করে কাউকে হিন্দু বানানো হচ্ছে এমন ত শোনা যায় না—দেখাও যায় না কোন সক্রিয় হিন্দু মিশনারী সম্প্রদায়কে। জানি না আবার কোনদিন নবসম্মিকুলে নবীন মানব-সমাজ গড়ে উঠে হিন্দু নামে অভিহিত হবে কিনা।

সর্বদক্ষিণের দ্বীপের নাম গ্রেট নিকোবার. নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ। এর উত্তর বিন্দুতে আছে অতি ছোট দু' একটি দ্বীপ. এরই একটার নাম কুণ্ডল। কুণ্ডলের শেষ অগ্রভাগের একখণ্ড বিরাট শিলাগাত্রে সাগরের অশান্ত ঢেউরাশি বিপুল আক্রোশে ছুটে এসে আছাড় খেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে সাগরের বুকে। কুণ্ডলের পাহাড়ী বনভূমিতে দেখা গেল উর্দ্ধশির বন্য সুপারী গাছের বাহার। আমাদের সুপারী গাছের সঙ্গে এর কোন পার্থক্যই নেই: শুধু ফলগুলি মনুষ্য ব্যবহারের অযোগ্য— ছোট আর তিক্তস্বাদ।

গ্রেট নিকোবারের উত্তরে লিট্‌ল নিকোবার দ্বীপ, একটা সিন্দুর টিপের মত। বালুকাময় বেলাভূমির সমতলে লোকবিরল বস্তী—পুলোমিলো; তার উপরে ক্রম-উচ্চ আরণ্যসৌন্দর্যের মনোরম প্রসারণ। গ্রেট নিকোবারের সর্বদক্ষিণ বিন্দু থেকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের সীমানা খুব বেশী দূরে নয়, একশ' মাইলের কিছু উপর।

পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় সোজা নানকৌড়ির দিকে যাওয়ার পথে আড়াই শ' মাইল দূরে বাঁদিকে পড়ে তিলাংচং দ্বীপ। কোন লক্ষ যুগ আগে হয়ত আন্দামান আর নিকোবার দ্বীপ-পুঞ্জের অন্যান্য পাহাড়ী দ্বীপাবলীর মত আগ্নেয়গিরির উদ্গিরীত গলিত পাথর আর লাভা জমে সৃষ্টি হয়েছে এই দ্বীপের, সমুদ্রের কোল থেকে জেগেছে গৈরিক আর খয়েরী পাহাড়। প্রকৃতির খেয়ালে এর এতটুকু জায়গা এমন নেই যেখানে একখানা ছোট্ট কুটীর তোলা যেতে পারে। এখানে জনমানবের বসতি নেই, সুপারী, নারকেল গাছ নেই, চুই-চুগলম বা শিশু-সেগুনের, বনশ্রেণী নেই। প্রায় গোটা দ্বীপটা অল্প তৃণ আর ঘন গুল্মাচ্ছাদনে সমাকীর্ণ। তাই সম্পদবৈভবসৌষ্ঠবহীন এই কঠিন কালাপাহাড়ী দ্বীপটী যেন

চলার পথের বেশ কিছুটা দূরে অনেকটা অপাংক্তেয় হয়েই দাঁড়িয়ে আছে।

আন্দামান আর নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে গিয়ে শুধু পাহাড়ী রূপ দেখে দেখে শেষে চোখ দুটো যেন কিছুটা শ্রান্তই হয়ে পড়েছিল। এমন সময় পেণছন গেল কার নিকোবারে, নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের এক বিরাট সমতল দ্বীপে। ক্রমে জাহাজ এসে নোঙর করল তীরভূমি থেকে আধ-মাইল দূরে। জাহাজ থেকে নেমে মোটর-বোটে আসতে হয় কিনারার অতি কাছে, সেখান থেকে ডিঙ্গী নৌকোতে কূলে। এখানে জেটী নেই, তাই এই ব্যবস্থা। বিচিত্র এখানকার ডিঙ্গীগুলি—কমবেশী পনের ফুট লম্বা মাত্র তিন ফুট চওড়া ডিঙ্গীগুলি তৈরি হয় অতি পাতলা আর চওড়া তক্তায়। ভেলার মত। মোটরবোট থেকে ডিঙ্গীতে নামতে এইখানে প্রায় নাকানিচুবানি খেতে হয়েছিল নয়াদিল্লীর এক উপমন্ত্রীকে। সমুদ্র যে রাজা মহারাজা মন্ত্রীপারিষদ কাউকেই ছেড়ে কথা কয় না, হাতেনাতে তার প্রমাণ পেয়ে হয়ত স্কুলপাঠ্য কেতাবে-পড়া কিং ক্যানিউটের গল্প মনে পড়ে থাকবে সেদিন মন্ত্রীসাহেবের।

বিচিত্র এই ডিঙ্গীর সঙ্গে আড়া-আড়িভাবে বাঁধা সরু কাঠের টুকরায় সংলগ্ন ডিঙ্গীর সমান্তরালে একই দৈর্ঘ্যের জলে ভাসমান একটা কাঠ থাকে —তার চাঁচামাজা মাথাটা মকরের অনুকরণে খোদিত নক্সায় অলংকৃত। মাল আর মানুষ বহনে এই ডিঙ্গীগুলির ক্ষমতা বিস্ময়কর। বৈঠার তালে দ্রুত লয়ে হারবারে চলাও ততোধিক বিস্ময়ের। নানকৌড়ি, তেরেসা, পুলোমিলো—সর্বত্র এর সমান ব্যবহার।

অতি মিহি শ্বেতবর্ণের বালুকো-রাশি স্তরে স্তরে সাজান আছে কার নিকোবারের তীরভূমিতে। উড়িষ্যা উপকূলের গৈরিক বালু আর আন্দামানের পাথরকুচি বালুর সঙ্গে এর অনেক তফাত। অপূর্ব এই কিনারার কাছে জলের রঙ: খুব গাঢ় সবুজের সঙ্গে এক ভাগ এনামেলী সাদা মেশান—চকচকে উজ্জ্বল মসৃণ। তীরভূমির কাছে সমুদ্রের অনেকটা অগভীর অংশও মিহি বালুকায় গড়া। এর এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে এক একটি লক্ষ টুকরায় ভেঙেভেঙেপড়া শিলাখণ্ড—শুভ্রাসনে কুঁই-বেল ফুলে পুজো পাওয়া শাল-গ্রামশিলার মত।

নিকোবারের ফলমূল—তরমুজ, বৃহদায়তন নারিকেল এবং ডান দিকে প্যান্ডেনাস

পাহাড়ী দ্বীপগুলিতে যেমন সমুদ্রের ধারে একটা মোটামুটি সমতল জায়গা বেছে দশ-বিশ-ত্রিশ ঘর লোক নিয়ে গোটা দ্বীপটির লোকসংখ্যা গড়ে তুলেছে, সমভূমি কার নিকোবারে তা নয়। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় আট মাইল এই দ্বীপের লোকসংখ্যা নেহাত কম নয়। এখানে কিছু কিছু চাষবাস আছে, ব্যক্তিগত মালিকানায় বিরাট বিরাট নারকেল বাগিচা আছে; ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ইস্কুল, থানা পর্যন্ত আছে। আর আছে মিউস, কিনমাই, ছোট লাপাতি, বড় লাপাতি, তাপোয়মিং, চিকচিচা, ক্যানিওকা নামে অনেক গ্রাম।

একটু বেঁটে ধরনের বলিষ্ঠগঠন মঙ্গোলীয়ান মানুষ এই নিকোবারীরা। নিকোবারের সব দ্বীপে এদের সংখ্যাই বেশী। তারপর অন্যান্য জাত—দক্ষিণী, মারাঠী, বাঙ্গালী ইত্যাদি। আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে এক অখণ্ডজাতিত্ব-বোধ খুব নেই। এই দ্বীপপুঞ্জে ইংরেজদের এক কেন্দ্রীয় শাসনে-আনা অনেক গর্ব-করা ভারতবর্ষের রূপটাই যেন প্রত্যক্ষ—যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে, এক হয়নি।

পর্যটক বা পরিদর্শকের প্রতি নিকোবারীদের ঔৎসুক্য খুবই কম, আগ্রহ ও আতিথেয়তাবোধ নেই-ই বলা চলে। লোকগুলি যেন সব কেমন ধরনের। নিকোবারী ভাষা ছাড়া এরা হিন্দুস্থানী জানে কম। বরং প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে জানা ইংরেজী শব্দ সংখ্যা, হিন্দী-জানা শব্দের চাইতে বেশী, যদিও পুরোপুরি বাক্য তৈরী করে কথা বলতে পারে না অনেকেই। সকলের একই রকমের ঘরবাড়ী। ঘরকন্নার খুব একটা ঝামেলা আছে মনে হয় না। এদের মধ্যে রান্না-বাড়ার পাটও খুব একটা নেই। আগে ত প্রধান খাদ্য ছিল নারকেল, পানীয় ডাবের জল। এখনও শ্রমিকরা সারাদিনের মত জাহাজের মাল খালাসের কাজে আসে সামান্য শক্ত নেয়াপাতি নারকেল নিয়ে, সারাদিনের খাদ্য পানীয়ের নিঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা। নারকেল ছাড়া এরা খায় প্যান্ডেনাস, ব্রেড ফ্রুট, পেঁপে কলা, এক জাতীয় লম্বা ধরনের আলু আর সমুদ্রের অফুরান মাছ—প্রায় সবই এদের সেই সনাতন রীতিতে কাঁচা সেদ্ধ আর পুড়িয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। রান্না খাওয়ার সরলতার জন্য মেয়েরা স্বভাবতই আয়েসী। প্রায় আধ মণ ওজনের প্যান্ডেনাস সেদ্ধ করে হয় কাই আর কাই থেকে তৈরী হয় রুটি। ব্রেড-ফ্রুট দেখতে অনেকটা কাঁটালের মত। আলু, পেঁয়াজ, কপি, টমাটো, জন্মে না এখানে—আন্দামান নিকোবারের কোথাও না। নদী না থাকায় কৈ মাছ নেই। সুতরাং কৈ-কপি-প্রিয়দের বড়ই মুশকিল।

কার নিকোবার দ্বীপে নারকেল-বাগিচা দেখবার মত। এক একটি বাগিচায় হাজার হাজার গাছ, এ ছাড়া পথের দুধারে সারিবন্দী গাছ ত আছেই। সুপারী গাছও প্রচুর। নারকেল-সুপারীর এক একটি বাগানকে তীরের দিকে অগ্রসরমান জাহাজ থেকে কি সুন্দরই না দেখায়।

নারকেল এখানে টাকায় ১৬টি, ডাবও তাই। গিয়ে ইচ্ছেমত চান, টাকা

দেখান, দেবে না। প্রথমে একটা সিগারেট, এক টুকরা রুটি বা যা হোক কিছু দিয়ে খাতির জমান, তখন দেবে। সবই মর্জি। এইরকম মর্জি সমস্ত নিকোবারীদের বৈশিষ্ট্য। আগে এক প্যাকেট যে কোন সিগারেট দিলে ১৫।২০টা ডাব বা নারকেল দিয়ে দিত। এখন আর দিতে চায় না—পয়সা চিনেছে। পয়সার উপরও আছে মর্জি। সুতরাং হঠাৎ-আসা ভ্রমণবিলাসীদের কাছে ডাব-সমস্যা কম নয়। লোকে বলে এরা এখন চালাক হয়ে গেছে। এদের চালাক হওয়ার সমস্যা আমাদের মত আগের-চালাকদের কাছে বড় কম নয়। এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম আফ্রিকাতে সাদা আদমিদের পেঁপে খাওয়ার গল্প। সাহেবরা ধোঁকা দিয়ে কাফ্রিদের কাছ থেকে পেঁপে এনে খেত, অথচ খাওয়ার কথা কোন-দিনই ওদের জানতে দিত না। পাছে, একবার স্বাদ পেলে ওরাও পেঁপে খেতে শুরু করে আর শ্বেতাঙ্গদের পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। সখেদে সাহেবটি সেদিন বললেন, ওরা এখন খাওয়া শিখেছে। চালাক হয়ে গেছে। কি বিপদ!

অশেষ উপকারিতার জন্য নারকেল গাছকে বলা হয় কল্পবৃক্ষ। এত নারকেল গাছের সমারোহ সর্বত্র চোখে পড়লেও আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের নারকেল কিন্তু ভারতের মোট উৎপাদিত নারকেলের সামান্য ভগ্নাংশ। সারা ভারতে বছরে প্রায় ১৬ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ৪১৫ কোটি নারকেল জন্মায়। এর শতকরা ৭০ ভাগই জন্মায় কেরালাতে, ১৪ ভাগ মহীশূরে; বাকী ১৬ ভাগ উৎপাদন করে মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং আন্দমান ইত্যাদি রাজ্যগুলি মিলে। সুতরাং একক আন্দামানের নারকেল উৎপাদনের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়।

নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন স্থানে নারকেল ও সুপারী বিক্রীর জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। ফলে ঐ অঞ্চলের নিকোবারী-দের আর্থিক উন্নতি লক্ষ্য করবার মতো। ১৯৫৫ সালে কাঁচলে সমবায় সমিতি স্থাপিত হয় ৮১০্ নিয়ে। ১৯৫৯ সালে এর মূলধন দাঁড়ায় ৭৮,৭০০্ টাকা। অধিকাংশ লোকেরই শেয়ার কেনা আছে। সোসাইটির দোকানে এরা নারকেল ও সুপারী বিক্রী করে। সুতরাং বিক্রীর পয়সা, আবার শেয়ারের উপর ডিভিডেন্ট, দু তরফা লাভ। অবশ্য অনেক জায়গার বিকি-কিনির অবস্থা ভাল নয়। এক সরল নিকোবারী হয়ত সের পাঁচেক সুপারী নিয়ে এসেছে স্থানীয় ব্যবসায়ীর দোকানে। এই, কতটা এনেছিস? এগিয়ে দিল সুপারীগুলি; অর্থাৎ মেপে দেখ। আচ্ছা যা, দু পাউন্ড হয়েছে। ওরে হামিদ, ওকে দু পাউন্ড চাল দিয়ে দে।

সন্দেহমনা দুষ্টলোকে কিন্তু বাণিজ্যপন্থী আকুজীদের রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কথা বলাবলি করে, পাকিস্তান-প্রীতির কথাও—অবশ্য আমরা বলি না।

জনপদে কে নিয়ে গেল আপনাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে? আকুজীদের লঞ্চ। দ্বীপবাসীদের যে নারকেল ছেড়ে ভাত অভ্যেস করান হয়েছে, তার রসদ আসে কোথা থেকে? এই সব দ্বীপে ত আর চাল ডাল নুন তেল মসলার কার-খানা নেই? রাজধানী পোর্টব্লেয়ার পায় কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে, আর দ্বীপ-গুলিতে আসে পোর্টব্লেয়ার থেকে। বেশ। কিসে আসে? আকুজীদের স্টীমার, মোটরবোট, লঞ্চে। কোথায় ওঠে? আকুজীদের দোকানে। আর কোন দোকান আছে? আজ্ঞে না। কি দামে বিক্রি হয়? আমাকে আর প্রশ্ন করবেন, স্যার। নারকেল কেনার নমুনা ত দিয়েছি।

নারকেলের মত শুয়োর পালন কার নিকোবারে এক লোভজনক আয়ের পথ। শুয়োর-সম্পত্তি প্রায় সকলেরই আছে। গরীব, আমীর, সবারই। গরীবের কম-পক্ষে ২৫টি, বড়লোকের হাজার দেড় হাজার। শুয়োরেরও অন্যতম খাদ্য নারকেল। কোন কোন লোকের শুয়োরের জন্য রোজ ৫০০ নারকেল পর্যন্ত খরচ হয়।

নিকোবারে বিয়ের নিয়মটা অদ্ভুত। গোলাম বনেগা—বিয়ের জন্য বরকে গোলাম হয়ে যেতে হয় কনের ঘরে। ওখানেই কাজকর্ম থাকা-খাওয়া, ওখানেই শেষ সমাধি। আমাদের দেশে যেমন জন্মের মত কনে আসে বরের ঘরে। অবশ্য, কনেও যায় বরের ঘরে, তবে কম —বাদানুবাদ সাপেক্ষে। চারিবিবি ফরজ নয় এখানে।

সরল নিকোবারীদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা খুবই কম। ১৯৫৯ সালে নানকৌড়ির একমাত্র অপরাধ একটা ধরা পড়েছে—চুরির। সুতরাং নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পুলিশের কর্মচাঞ্চল্য দেখা-বার সুযোগ নেই। এখানে পুলিশ আছে, তবে তাদের সে জৌলুস নেই। কলকাতার পুলিশ-ত্রাসভীত ফুটপাত পণ্যবিক্রেতার মত এখানকার সুপারী-নারকেল বিক্রিরত কোন পথকোণের বণিককে ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হয় না। ইউনিফরম পরে বাজারে গেলে এখানকার পুলিশরাও পায় না ছ আনার জিনিস চার আনার। এখানকার পুলিশ খাকীটুপিলাঠিতে শোভমান এক রকমের শুধুই মানুষ।

নিকোবারীরা একটি বিষয়ে অতি শৌখীন—পোশাক-পরিচ্ছদ। যারা সভ্যতার আঁচ পেয়েছে, পয়সা চিনেছে, তাদের এক মোটা অংশ ব্যয়িত হয় পোশাকে। জীবনে আর কোন বিলাস এদের নেই—সুযোগও নেই। প্রায় বিশ বছর আগে এদের পরনে ছিল না উল্লেখযোগ্য পরিধেয়। মেয়েদেরও উত্তরচ্ছদ থাকত অনাবৃত। এখন জ্ঞান আর সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে নিত্য নূতন অঙ্গবাসের সঙ্গে বেড়ে চলেছে হাল আমলের ফ্যাসান। জোয়ান পুরুষেরা পরে রং বেরংয়ের রেশমী হাফ প্যান্ট, মেয়েরা লুঙ্গি বা স্কার্ট আর তার রঙের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে দামী অন্তর্বাস। শাড়ী এখনও অচল। তবে খোঁপার কাঁটা, কানের দুল, হাতের কঙ্কন—আজ সবই প্রচলন হতে চলেছে। সুদূরে সাগর কূলের সুপারীনারিকেলকুঞ্জঘেরা লোকবিরল পল্লীর কোন অন্তঃপুর-চারিণীকে দৈবাৎ যদি চোখে পড়ে তার আদিম পরিবেশে, এলোচুলে, খোলা-বুকে দৃষ্টির গোচরে পড়ামাত্র সলজ্জ ত্রস্ততায় পরনের লুঙ্গিটাকে দেয় একটু ওপরে তুলে।

(২)

জনপ্রিয়তা ও আলমগীর

(পূর্ববর্তী সংখ্যার শেষাংশ)
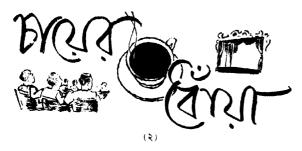
আর এক রাউণ্ড চা-কেক নিয়ে এল কেল্ট; পরিচালক অমনি আহারে মাতলেন। মিনিট পাঁচেক আর কোনো কথা নেই, শুধুই পানাহার। তারপর নাট্যকারের দেয়া একটা চুরুট নিয়ে বললেন—এবার আসা যাক "আলমগীরের" সাহিত্যে, তার কাব্য-স্ফুরণে। নাটকের সাহিত্যরস নাটকের উত্থান-পতনের সংগে জড়িত, এটা স্মরণ রাখতে হবে। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, একটা বিশেষ ঘটনাচক্রে সংলাপগুলোকে ওজন করে দেখতে হবে। নিছক একটি কবিতা কেউ খুঁজে পাবেন না নাটকে। প্রথমেই চোখে পড়বে বাগ্মিতা, রেটোরিক। সেটাও অভিনেতার মুখে আবৃত্তির জন্যে লেখা; তাই কোন চরিত্রের মুখে কোন অবস্থায় সেটা বসানো হয়েছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। আধুনিক বাংলা নাটকের অধিকাংশই এই এক কথায় সাহিত্যের আওতা থেকে বাদ পড়বে। কারণ আধুনিক নাট্যকারেরা স্বাভাবিকত্বের নাম করে নাটক থেকে বাগ্মিতা, কাব্য সব বিসর্জন দিয়েছেন। এমন কি স্বগতোক্তি পর্যন্ত এখন প্রায় নিষিদ্ধ। তাঁরা জীবনকে নাকি যথাযথ প্রতিফলিত করছেন; আর জীবনে মানুষ নাকি কাব্য করে কথা বলে না। অতএব মানবমনের না-বলার বৃহৎ জগৎটা এ'দের নাগালের বাইরে। কিন্তু মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এই বাগ্মিতার আশ্রয় নিয়ে চরিত্রের মনের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। একটা বিশেষ আবেগে অস্থির হয়ে এ'দের চরিত্ররা হঠাৎ যেন নিজেকে দেখতে পায়, আত্মোপলব্ধি করে। সেই আত্মোপলব্ধিই ঝরে পড়ে কাব্যসুষমাময় ভাষায়। সেটা জীবনানুগ কিনা এটা বড় কথা নয়। কিন্তু সেটা যে জনপ্রিয় ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক জীবনানুগ বোবা, তোতলা চরিত্ররা সে জনপ্রিয়তার ধার ঘেঁষেও যেতে পারছে না।

কয়েকটা জনপ্রিয় উদাহরণ আগে দেয়া যাক। লক্ষ্য করবেন, এর প্রত্যেকটাই আবেগমুহূর্তে চরিত্রের উচ্ছ্বাস-প্রকাশ।

মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীকে এক ছদ্মবেশী দূতী এসে প্রিয়তমের খবর দিয়ে সরে পড়েছে। কৃষ্ণকুমারী বলছেন—

এ যে কি মায়াবলে আমাকে উতলা করে গেল আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে। হা রে অবোধ মন, কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস? নিশার স্বপন কি কখন সফল হয়?

"নীলদর্পণে" মহাসর্বনাশে বসু-

উৎপল দত্ত

পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সরলতা বলছেন—

"এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বাহ্যবানের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণীমাত্রেই কালনিদ্রারূপে নিদ্রায় অভিভূত।"

"মালিনীতে" বন্দী ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে বলছেন, মালিনীর মোহে আমিও তো আকৃষ্ট হতে পারতাম, হয়েছিলামও—

"অপূর্ব সংগীতে
বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মতো—সর্ব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমেষের মাঝে।"

"আলমগীরে" উদিপুরী মদ্যপান করছেন আর নিজের মনেই বলছেন—

"আজ কি আমি বিষাদকে হাসাতে সরাব খাচ্ছি রে? খাচ্ছি উল্লাসকে কাঁদাতে। নইলে সে এখনি আমাকে মেরে ফেলত। বুকের ভিতরে পাশে তুলেছে সে এমন পাষাণ-চূর্ণ-করা বিদ্রোহ।"

প্রথমটি আত্মবিলাপ, দ্বিতীয়টি চরিত্রদের দুঃখে তাদের ভীষণ দুর্দৈবে প্রকৃতির অংশ গ্রহণ—প্যাথেটিক ফ্যালেসি, তৃতীয়টি (কবিত্বে এটি স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ) সরাসরি সংলাপ; চতুর্থটি আত্মোপলব্ধি। প্রধানত এই চার রকম ক্ষেত্রে বাগ্মিতাপূর্ণ, কাব্যময় ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নাটকীয়ত্বে চতুর্থই যে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ থাকতে পারে না। নায়ক যখন নিজেকে চিনতে চেষ্টা করে তখন যেমন একটা বিষাদের ভাব স্বভাবতই জেগে ওঠে; তেমনি প্রচ্ছন্ন থাকে একটা নৈর্ব্যক্তিক হাসি যেটা সেই বিষাদকে আরো উজিয়ে দেয়। "তপতীতে" বিক্রম বলছেন—

"তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—তোমার হৃদয় নেই নারী। শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পারো কি। সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড; এ প্রচণ্ড; এতে আছে আমার শৌর্য—আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়।"

এ কথার মধ্যে সত্য-ভাষণ কতটা, দম্ভ কতটা, আর নিজেকে উপহাস কতটা, একবার ভেবে দেখবেন। তেমনি একটা সংলাপের টুকরো দেখুন "আলমগীর" থেকে—

"উদিপুরী : আমি দেখছি আপনার ভিতর দুটো মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর, একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমোয় তখন আসলটা জাগে। আবার নকলটা যখন জাগে, তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়। বাইরে তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না।

আওরংজেব : না, কেন? তা হলে নকলটাকে তোমারই সম্মুখে শেষ করি?

(অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা)

উদিপুরী (অস্ত্র ধরিয়া) : জাঁহাপনা! এইবারে দেখছি দেবদূতে

আপনার জাগ্রত চৈতন্য আক্রমণ করলে।

আও (শয়ন করিলেন) : যাও, আমার মরা হয়েছে। তুমি আমার জীবিতেশ্বরী।"

স্পষ্ট একটা চাপা হাসি শুনতে পাচ্ছেন? নিজেকে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে হাসি পেতে বাধ্য। উচ্চ কান্নার মধ্যেও সে হাসি শোনা যেতে বাধ্য। কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে? তবু এটা সত্যি। নিজেকে দেখার তৃতীয় চক্ষু উন্মিলীত হলে নিজের দুঃখকে বাঁচবার লড়াইকে হঠাৎ হাস্যকর লম্ফঝম্ফ মনে হয়। সেই তৃতীয় চক্ষু পেয়েই লিয়ার গভীর দুঃখে বলে ওঠেন—

"Is man no more than this? Consider him well: Thou owest the worm no silk, the beast no hide, the sheep no wool, the cat no perfume :—Ha! here's three of us are sophisticated".

এই একই আত্মোপলব্ধিতে কবি বলে ওঠেন—

"করিয়াছি বীণার সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস
পরিহাস করি!"

ভাবাবিদ বললেন— থিওফিল গ্যতিয়ের বলছেন একই সুরে: আমাদের দুঃখ দেখে ভগবান হাসেন নাকি?

"ক্রোইয়ে-ভু দ' কে দিয়ু সা মুজ আ ভোয়া সুফ্রির?"

পরিচালকের চা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, চুরুট নিভে গিয়েছিল। কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন বলে ওসব গ্রাহ্য না করে বলে চললেন—তেমনি আওরংজেবেরও তীব্র ব্যঙ্গের সুরে নিজেকে কশাঘাত করা:—

"আও : স্মৃতিপথের মাঝে এক একবার ওই মেয়েটা এসে দাঁড়াচ্ছে।

দিলীর : কে মেয়ে?

আও : সেটা কে, কোথাকার, কি, কেন—শ্যামসিং চলে গেল?

দিলীর : তাকে ডেকে আনব।

আও : না, যখন চলে গেছে, তখন আর তাকে প্রয়োজন নেই। সে থাকলে বলতুম। তখন স্মরণে এল না। আমিই সেই মেয়েটার ঘটকালি করতুম। তার যোগ্য পাত্রের সন্ধান বলে দিতুম। তার পর নিজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতুম।"

আবার শুনুন নির্মম আত্মপরিহাস—

"আওরংজেব : আমার রূপও নেই, যৌবনও নেই। কিন্তু আছে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন তক্তাউস, আর তার চার পাশ ঘিরে আসমুদ্র হিন্দুস্থান। এ যার আছে তার রূপও আছে; যৌবনও আছে।"

আবার শুনুন, সে হাসি প্রায় উন্মাদের অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে—

"আও : মক্কা যাবার পূর্বে আমি একবার দেখে যাই, সমস্ত হিন্দুস্থান আমার পদানত হয়েছে। (উর্ধ্ব দৃষ্টি) যাও—তুমি কাফের—তুমি কাফের—তুমি কাফের। (অপ্রকৃতিস্থ ভাব)

দিলীর (সক্রোধে) : কে? আমি জাঁহাপনা? (তরবারি স্পর্শ)

আও (প্রকৃতিস্থভাবে) : না ভাই—তুমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আমি আমার অন্তরের সংশয়টাকে গালি দিচ্ছি।"

এই হাসি-মেশানো খেদোক্তি জনপ্রিয় নাটকের শক্তিশালী এক অঙ্গ। বোধহয় নিজেকে বাইরে থেকে দেখার সঙ্গে দর্শকের দেখাটা এক হয়ে যায়। দর্শকের অন্তরস্থিত আবেগটাকেই বোধহয় ঐ ধরনের বাগ্মিতায় প্রতিধ্বনিত করা হয়। কারণ সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে নাটকীয় যে দৃশ্য তাতেও দর্শকের হাসি ক্রমান্বয়ে বেরুবার রাস্তা খুঁজতে থাকে। করুণ দৃশ্যে সামান্যতম বিচ্যুতি যে অভিনেতার ঘটেছে তিনিই এর সাক্ষী; দর্শক সুযোগ পেয়েই হেসে উঠেছে। সেই হাস্য-সম্ভাবনাটাকেও নাটকের কাজে লাগাবার এই এক উপায়; উদ্গত হাসিটাকে বিষাদের পথে চালিত করে দেখার উপায় এই আত্মোপলব্ধির করুণ হাসি। নিজের হাসিটাকে মঞ্চের ওপরই এমন অপ্রত্যাশিত হতে দেখে দর্শক আশ্বস্ত হন; ট্র্যাজেডির দিকে তার মন আরো একাগ্রভাবে নিবদ্ধ হয়। এইখানেই "হ্যামলেটের" দুই করুণ ভাঁড় গ্রেভ্‌ডিগারদের সার্থকতা; এইখানেই "কিং লিয়ারের" বিখ্যাত ভাঁড়-এর কৃতিত্ব; এইখানেই "তপতী"-র শেষ দৃশ্যে থমথমে আবহাওয়ায় দেবদত্তের পরিহাসের তাৎপর্য। এই মনস্তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই মসিয়্যু ভের্দুর সৃষ্টি। হাসি-কান্নার সীমারেখাটা অতি ক্ষীণ।

উল্লিখিত চার রকমের বাগ্মিতাই "আলমগীর"-এ বর্তমান; কিন্তু নাটকের চরম মুহূর্তগুলিতে আত্মোপলব্ধির হাসিটাই বেশি।

এই পর্যন্ত বলে পরিচালক আর একবার দম নিলেন। সেই ফাঁকে নাট্যকার বললেন—পুরো "আলমগীর"কে আপনি মঞ্চোপযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করছেন। সাহিত্যের পরিসর আরো বৃহৎ। নাটক হয়েও আরো একটা কিছু হতে হবে "আলমগীর"কে; তবে সে সাহিত্যপদে উঠতে পারে। মঞ্চকে অতিক্রম করে হ্যামলেট চিন্তারাজ্যের বৃহত্তম প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরিচিত হয়েছে বলেই না সে সাহিত্য।

পরিচালক বললেন—তবে আরো চা বলুন; রিহার্সালটা তো গেছেই! আড্ডার এই পরিণাম!

আমরা হাঁকডাক করে চা আনালাম। খানিক চা খেয়ে পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই। "আলমগীর"ও নাটক হয়ে আরো কিছু। কি সেটা? অত সহজে সেটাকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। তবু চেষ্টা করলে খানিকটা পারতেও পারি। চিন্তা স্বভাবতই একটু উচ্ছৃঙ্খল। স্বপ্নালু। শিল্পের কাজ হোলো সেটাকে নিয়মে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ—
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম
উপাদান।
তাহারে দমনে রাখে, ধ্রুব করে
সৃষ্টির প্রণালী
কর্তৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী।
শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে
শৃঙ্খলিত করা,
অধরাকে ধরা।"

নাট্যকারের কাব্য-স্বপ্নও যদি শিল্প-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, তবেই তাকে খুঁজে
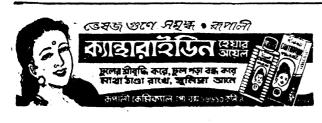
পাওয়া সম্ভব। নচেৎ ইতস্ততঃ-বিক্ষুব্ধ স্বপ্নালুতায় সে কাব্য ব্যর্থ হবে। নাটকের বৃহৎ পঞ্চাঙ্ক পরিসরে সে ভাবালুতা ছড়িয়ে পড়ার প্রচুর জায়গা পায়, এবং সুযোগ পেলেই ছড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে ধ্বংস করে। এ ধরনের ব্যর্থ কাব্যের নিদর্শন বহু নাটকেই পাওয়া যাবে। শৃংখলা ও কেন্দ্রিকতার অভাবে মুহুর্মুহুঃ উ প মা-আ দি নিজেদের গলা কেটেছে; স্বভাব-কবি যে নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে এ ঘটতে পারেনি। "কৃষ্ণকুমারী" একটা পদ্মফুলকে ঘিরে রচিত বলে প্রতীত হয়; সেই পদ্মের মূর্তিরূপ, সে পদ্মের সৌরভ সারা নাটকে নিজেকে ব্যাপ্ত করেছে; সেই সৌরভই শৃংখলের কাজ করেছে। আরেক দিন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রকৃতি আর ঋতুতে ঘেরা; বর্ষার আমেজ "অচলায়তনকে" আগাগোড়া সংহত করেছে; বর্ষার রূপ, বর্ষার উপমা নাটকের কাব্যকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তেমনি "রক্তকরবীকে" করেছে শীত।

"আলমগীর"-এর কাব্যকে বেঁধেছে কে? আমার মতে, একটা তৃষ্ণা, মরুভূমির একটা জ্বলন্ত রূপ। জলের তৃষ্ণায় ছটফট করছে নাটকের প্রত্যেকটা মানুষ। সে জল, সে রস শুধুই জল নয়। সে মরুপ্রান্তর শুধুই ভৌগোলিক মরুভূমি নয়। না বাধা দেবেন না; জানি এটা প্রমাণসাপেক্ষ; প্রমাণ দিচ্ছি। প্রমাণ করবো যে এই মরুতৃষ্ণা নাটকের কাব্যকে ঐক্য দিয়েছে, নাটকের প্রত্যেক চরিত্রকে কাব্যময় করেছে, তাদের নিছক পার্থিবতা ঘুচিয়ে তাদের করেছে কাব্য-স্বপ্নের প্রতীক।

ভীমসিংহের অভিমান যে তার জ্যেষ্ঠতা গোপন করে তার দেবতুল্য পিতামাতা তাকে প্রতারিত করেছেন। সেই অভিমানের কি উপমা দিচ্ছে সে?

"সে অভিমান দারুণ বজ্রের প্রহারের মত; শিলাবিদ্রাবী আগ্নেয় গিরি-গহ্বরের উত্তাপের মত...... শতসূর্যের প্রখরতায় দীপ্ত।"

পিতামাতার রস থেকে বঞ্চিত হয়েছে যে, তার অভিমান উত্তাপের মত। অতএব স্বেচ্ছায় সে চলে গেল রাজ্য ছেড়ে মরুপ্রান্তরে। অন্তরে যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা তাই এবার প্রত্যক্ষ দৈহিক তৃষ্ণায় পরিণত হয়ে তাকে পোড়াচ্ছে। রাণা রাজসিংহ তার সম্বন্ধে বলছেন—

"গঙ্গাদাস!......তাকে একবিন্দু জল খাওয়াতে পারো? একবিন্দু—একবিন্দু? নিদাঘে চাতক যা পাবার জন্যে আকাশ-পানে চেয়ে আর্তনাদ করে। পিতৃপুরুষ যা পাবার জন্য উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় হাহারবে ঘুরে বেড়ায়—একবিন্দু?"

স্বেচ্ছায় সে নিজেকে মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করেছে; তাকে জল খাওয়াতে পারলে তার প্রতিজ্ঞা ভাঙবে। রাজসিংহ বলছেন :

"দোবারির এপারে অগাধ জলরাশি।...... কিন্তু ও পারে? কি শুষ্ক, কি কঠোর, কি উত্তপ্ত শিলাপ্রান্তর!"

এ শিলাপ্রান্তর শুধুই রাজস্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা নয়; এ ভীমসিংহের

উত্তপ্ত অভিমানেরই মূর্ত রূপ। তাই সেখানে সে স্বেচ্ছায় তৃষ্ণায় মরতে চাইছে। বাঁচালো কে? যে রস থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত মনে করেছিল সেই রস, বীরাবাঈয়ের স্তন্যদুগ্ধ।

"বীরাবাঈ : এই নাও : দোবারির ওপারে নয়, এ পারে। জল নয়, দুগ্ধ... ......এ তোমার বিমাতার নির্মল স্নেহ-রসের প্রতিনিধি।"

ভীমসিংহের কাছে পিতামাতা রসের উৎস; মরুপ্রান্তর তার অভিমান।

ক্ষীরোদপ্রসাদের এই মরুপ্রান্তর যে কোনো ভৌগোলিক প্রান্তর নয় তার প্রমাণ দিল্লীর দৃশ্যগুলিতে উদিপুরীর কথা, আওরংজেবের কথা। উদিপুরী বলছেন আওরংজেবকে—

"কাশ্মীরের সেই......অপূর্ব আধার হ্রদের কথা আপনি স্মরণ করুন। যে দিন সে বিশাল জলাশয় আমাকে তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেখে অগণ্য হিল্লোলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।"

এর পরেই নিজেকে পর পর 'জলচারিণী', 'জলকেলিরতা', 'চক্ষুতারকায় সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা' প্রভৃতি বলে বর্ণনা করছেন। উদিপুরী একদিন ছিলেন মূর্তিমতী সুধাধারা, জলস্রোত। আওরংজেবও সেটা স্বীকার করছেন পরোক্ষে; বলছেন—

"আলমগীর ভণ্ড-জগতের উপর খড়্গহস্ত—কুটিলতা তার চক্ষুঃশূল। কিন্তু উদার সরলতার সম্মুখে সে তরল জলধারার কাছে বেতস লতার ন্যায় নমনীয়।"

কিন্তু আলমগীর প্রচণ্ড; আলমগীর মূর্তিমান বহ্নি; আলমগীরের প্রতাপে উদিপুরীর জলস্রোত মরুপ্রান্তরে হারিয়ে গেছে। উদিপুরী বলছেন—

"উৎসব করতে গিয়ে চোখের কোণ দিয়ে কতকগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—উঃ! কি বেগেই না তারা ছুটলো—আমার উৎসবের সমস্ত আয়োজন পুড়িয়ে দিলে।"

এবং অবশেষে অপমানের মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে জলচারিণী উদিপুরী স্পষ্টই বলছেন তয়বর খাঁকে—নিজের চোখের দিকে দেখিয়ে—

"এ মরুভূমিতে এর পূর্বে আর কখন কি জল দেখেছিলে?"

ক্ষীরোদপ্রসাদের মরুপ্রান্তর উদিপুরীর অপমানের মূর্ত রূপ! পুরো দিল্লীই যেন সেই মরুপ্রান্তরে পরিণত হয়েছে; রাজসিংহ হঠাৎ বলে উঠছে—

"তপ্ত দিল্লীর মাটিতে পা দুটো যে পুড়ে ছাই হবার যোগাড় হ'ল।"

শেষ পর্যন্ত নিজেরই পৌরুষের আগুনে সৃষ্ট মরুপ্রান্তরে আটকা পড়লেন আওরংজেব স্বয়ং। বলে উঠলেন—

"পিপাসার্ত আলমগীর! জল জল—আত্মার পিপাসা—চাই জল.........বুঝি আত্মা চেয়েছিল সত্যের ঝরণা থেকে ঝরা জল! কেউ দিতে পারলে না!"

আবার সেই তৃষ্ণা! ভীমসিংহের তৃষ্ণারই এ প্রতিধ্বনি! এবারও রসের তৃষ্ণা। সত্যের তৃষ্ণা। ভণ্ডামিতে-ভরা মরুপ্রান্তরে আওরংজেব-এর আত্মা বন্দী। অনতিবিলম্বে তিনিও ভীমসিংহের মতন দেহের তৃষ্ণায় আক্রান্ত হলেন। ভৌগোলিক মরুপ্রান্তরে আটকা পড়ে আলমগীর বলছেন—

"গুহা আমাকে পিপাসা দিয়ে আক্রমণ করেছে। মনে করেছে আমি কাফেরের জল গ্রহণ করবো।"

শেষে জল নিলেন সত্যাশ্রয়ী ভীমসিংহের হাত থেকে; জলপান ক'রে হেসে বললেন,

"দেখছ কি গুহা-রাক্ষসী, আমি কাফেরের জল গ্রহণ করিনি।"

এই জলের জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলেন আলমগীর; এই তো সত্যের ঝরণার জল; মিলনের জল। এই জল পান করেই তো রাজসিংহকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মুসলমান সম্রাট। আওরংজেবের তৃষ্ণা এই সত্যরসের জন্য; মরুপ্রান্তর তাঁর কাছে বিরোধ আর অসত্যের জগৎ।

তৃষ্ণার জল আর মরুর উত্তাপ পুরো নাটকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কামবক্স্ রূপকুমারীকে যেন দিবাচক্ষে দেখতে পেয়ে বলছেন—

"দেখছি যেন চাঁদিনীমাখা দরিয়ার উথলে-ওঠা তরঙ্গ।"

তৃষ্ণার্ত কামবক্স্। রূপকুমারী তার জলস্রোত।

বীরাবাই এসেছেন, রক্ষা করেছেন রূপকুমারীর প্রাণ; বলছেন—"তুর্কীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা শুনে এ নগরে জলস্পর্শ করব না সংকল্প করেছিলুম। আমি বড় পিপাসার্ত, আমাকে একটু জল দাও।"

কিসের পিপাসা? রূপকুমারীকে রক্ষা করেই তার সতীত্ব রক্ষার কথা ভাবছেন বীরাবাই; সংকল্প করেছেন নিজের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দেবেন; বলছেন—

"স্বর্গে গিয়েও যে সতীন উষ্ণ নিঃশ্বাসের জ্বালায় অস্থির ক'রে আমাকে গৃহ ছাড়িয়েছে; পথের মাঝে সেই সতীনের কলেবর ধ'রে আমারই কাঁধে ভর করলে।"

উষ্ণ নিঃশ্বাস! সব কিছু ছেড়ে মরুর ক্লেশকে স্বীকার করাতেই বীরাবাইয়ের আনন্দ। তাই তিনিও প্রত্যক্ষ মরুপ্রান্তরে প্রবেশ ক'রে ভীমসিংহের মা হলেন।

এমন কি ক্ষুদ্র চরিত্র আকবর, সেও মোসাহেবদের সঙ্গে মদ খেতে খেতে ভাবছে, বাঙ্গালায় যাওয়া কেন দরকার। একজন মোসাহেব বলে দিল—

"বাঙ্গালার মাটিতে রস আছে।

আকবর : নদী সেখানে উজান বয়।

৩য় মো : এটা আমাদের দেখতে হবে। শুধু দেখতে হবে কেন—হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভাসতে হবে।

২য় মো : যেহেতু শাজাদার বয়সটাতে কিছু উজান বহাবার প্রয়োজন হয়েছে।"

আকবরও তৃষ্ণার্ত। তারও উজানের প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নির্মম লেখনীর কাছে নিস্তার নেই। তাকেও রাজ্যলোভে মরুভূমিতে যেতে হোলো, রাজনৈতিক মরুপ্রান্তরে, প্রত্যক্ষ ভৌগোলিক মরুভূমিতে।

একটু থেমে পরিচালক বললেন—দেখতে পাচ্ছেন? একটা মরু-তৃষ্ণার জ্বালায় প্রায় প্রতি চরিত্র ছটফট করে মরছে। তারই প্রত্যক্ষ প্রতীক হিসেবে আসছে রাজস্থানের মরুভূমি। এই মরু-কল্পনাই পুরো নাটকের কাব্যকে নিয়ন্ত্রিত, শৃংখলিত ক'রে শিল্পে উন্নীত করেছে। প্রতি চরিত্র তাই শুধুই একটা কাহিনীতে, একটা জাগতিক ছকে আবদ্ধ না থেকে, সংকেতে ভরে উঠেছে, বাঙ্ময় হয়েছে, কাব্যকল্পনার প্রতীক হয়েছে। উইলসন নাইট নাটক সম্বন্ধে বলেছেন—

"The persons, ultimately, are not human at all, but purely symbols of a poetic vision".

এ কথা "আলমগীর" সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দেখেছেন? ভাল নাটক একাধারে জনপ্রিয় এবং কাব্যময় হয় কি ক'রে? "আলমগীর"-এর মতন নাটক পেলে আমার মতন ক্ষুদ্র জীবের কলম চালাবার কোনো প্রয়োজন হয় কি?

(তামিল গল্প)

॥ ভূমিকা ॥

ভারতের সংস্কৃত-প্রভাবমুক্ত প্রাচীনতম স্বতন্ত্র ভাষা তামিল। প্রেম, ধর্ম ও যুদ্ধ অবলম্বন করে এই ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে আদি দ্রাবিড় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং অতি মনোহারিত্বের প্রকাশ দেখা যায়। প্রায় দু'হাজার তিনশো বছর আগে তিরুবল্লুবর রচিত তিরুক্কুরল গ্রন্থের জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই মহান গ্রন্থ অনূদিত ও সমাদৃত।

তামিল ছোটগল্পের যাত্রা শুরু ১৯৩০ সাল থেকে। প্রথম ছোটগল্প-রচয়িতা হিসাবে ভি ভি সুব্রহ্মণ্যমের নাম খ্যাত। সমসাময়িক কালে বিশ্ববিশ্রুত তামিল মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয়ের ছোটগল্প অনুবাদ করে তামিল সাহিত্যিকদের দৃষ্টি নবদিগন্তের দিকে ফেরান।

আধুনিক তামিল ছোটগল্পের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক 'কল্কি'। আসল নাম আর কৃষ্ণমূর্তি। রচনার প্রাচুর্যে ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ইনি বর্তমান তামিল কথাসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট। জনরঞ্জনই তাঁর লেখার চরম লক্ষ্য।

বর্তমান তামিল ছোটগল্পে পাশাপাশি দুটো চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। একদলের গল্পে আজিকার জীবন ও সমাজসমস্যা সযত্নে পরিহৃত হয়েছে। নিছক আনন্দদানই তাঁদের সাহিত্য-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এঁদের পুরোধা হলেন কল্কি।

অন্যদল লেখকের রচনায় স্থান পেয়েছে সর্বাধুনিক জীবনের সমস্যা ও সমাজসচেতন জীবনবোধ।

বর্তমান গল্পের রচয়িতা ভি গোবিন্দ রাজন্ আধুনিক তামিল কথাসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী।

আসামীর কথা

রচনা—ভি গোবিন্দ রাজন্

অনুবাদ ঃ বোম্মানা বিশ্বনাথম্

—কি বললে, মরার জন্য ঘুষ দিতে চাও?

কনেস্টেবল রাজুর মানবমন যেন সচেতন হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, লোকটাকে কি করে বলি যে ঘুষ দিলে সত্যি তুমি আত্মহত্যা করতে পার। বাধা দেব না। কিন্তু পরক্ষণেই ঘুষের লোভে একটি জীবনকে নষ্ট হতে দেওয়ার কথা চিন্তা করতেই অস্বস্তি বোধ করে। না তা সে হতে দেবে না। এ অসম্ভব। কারো মৃত্যু ঘটিয়ে সে দু'পয়সা কামাতে চায় না।—এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে রাজু একটি চায়ের দোকানে ঢুকল।

—কি ব্যাপার রাজু? দেখে মনে হচ্ছে তোমার উপর দিয়ে খুব ধকল গেছে। এত কাহিল দেখাচ্ছে কেন?—দোকানের ভেতর থেকে তার সহকর্মী বলল।

—আর বলনা ভাই। এত বেলা হল তবু কপালে এক কাপ চা খাওয়ার ফুরসত হল না। মাথার লাল টুপিটা বেঞ্চির উপর রেখে সহকর্মীর পাশে বসল। কড়া এবং গরম এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

—বাইরে আবার কাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছো? নতুন আসামী মনে হচ্ছে!

জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তামিল সাহিত্যিকদের আগ্রহ সুগভীর। বঙ্কিম-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব-সুকান্ত পর্যন্ত বহু বাঙালী সাহিত্যিকদের রচনাসমূহ তামিলে অনূদিত হয়েছে, তামিল সাহিত্যিকদের প্রেরণা জুগিয়েছে।—অনুবাদক

আর বলনা। এ এক অদ্ভুত ধরনের কেস। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল ধরা পড়েছে। শালা অতই যদি মরার সখ তো ঘরে বিষ খেয়ে মর না! লোকটাকে দেখতে সাদাসিধে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে হাড়ে হাড়ে শালা বজ্জাত। আমার একটা কথারও জবাব দিচ্ছে না। কতবড় সাহস দেখেছো, আমাদের কথায় জবাব দেয় না? অনেকক্ষণ ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে হাঁটার পর গরম চা খেয়ে রাজু ঘেমে উঠেছে। তার সারা গা-বেয়ে ঘাম ঝরছে।

—রাস্তায় কতবার জিজ্ঞেস করেছি আত্মহত্যার কারণ। মুখ ফুটে একটি কথাও বলল না। জেদী লোক। এখন ওর দিকে তাকালে ইচ্ছে করছে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে!

—বা, চমৎকার! তুমিই ওকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচালে। আর তোমারই ইচ্ছে করছে ওকে কেটে ফেলতে!

ওদের সংলাপ শুনে আসামী হেসে ফেলল। তা লক্ষ্য করে রাজু বলল, যাক তাহলে তুমি হাসতে পার। তারপর সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়ল রাজু। রাজুর সহকর্মী আসামীকে বলল, অমন দাঁত বের করে হাসছো কেন? জান না আত্মহত্যা বে-আইনী। সরকার কিছুতেই তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেবে না, উল্টে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

—আমি আর বাঁচতে চাই না। আমার কি মরার স্বাধীনতাও নেই? আমি মরলে কারো কোন ক্ষতি আছে! আর শাস্তির কথা বলছেন—বাঁচবো তো আমি আর মাত্র তিনদিন। এখন আমার উপর সাজার হুকুম দিয়েই বা কি হবে!

রাজু ক্ষেপে গিয়ে বলল, তিনদিন পরে কেন আজকেই মরনা কে তোমাকে

বারণ করছে। আমাদের নাগালের বাইরে যা-ইচ্ছে কর।

রাজুর ইচ্ছে করল দশ-পাঁচ টাকা নিয়ে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আবার বিবেকের কথা শুনতে হল: যারা লুকিয়ে-চুরিয়ে মদ তৈরী করে তাদের কাছে ঘুষ নেওয়া অপরাধ কিছু নয়। কিন্তু যে-লোকটা আত্মহত্যার জন্য ঘুষ দিতে চায়......

—এই, আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন?......কি, কথা বলছো না কেন?... বলবে না?

আসামী নিশ্চুপ নিস্তব্ধ। রাজুর মেজাজ বিগড়ে গেল। খিঁচিয়ে উঠল। ইচ্ছে করল কয়েক ঘা ঘুঁষি বসিয়ে দিতে। চড় মেরে মেরে গাল ফুলিয়ে দিতে। কিন্তু কিছুই করল না।

পুলিসের ইউনিফর্ম এবং ভারি জুতো পরে রাজু যখন হাঁটে তখন তার চলনে প্রকাশ প্রায় অদ্ভুত ধরনের এক গাম্ভীর্য। আশপাশের মানুষ ভয়ে কেঁপে ওঠে। কিন্তু সেই রাজুকেই ঘরোয়া পরিবেশে দেখা যাবে ভিন্ন পোশাকে। পরনে এক চিলতে সাদা ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপাল বিভূতি-বিধৃত। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় লোকটা শিবভক্ত। মনে হবে না যে এই সেই কনেস্টবল রাজু। সেই গাম্ভীর্য নেই। কত সহজ-সাধারণ-সরল মানুষ!

পুলিসী চাকরীর অনেক মারপ্যাঁচ সে রপ্ত করেছে। কয়েকটা মারপ্যাঁচ তো তার নিজের তৈরী। কোন জটিল পরিস্থিতিতেই ঘাবড়াবার পাত্র নয় সে। ট্র্যাফিক-কণ্ট্রোলের ভার পড়লে তার পোয়া বারো। আলোহীন, বেশী মাল-বোঝাই আর অন্যান্য নিয়মলঙ্ঘনকারী গাড়িওয়ালাদের পয়সায় তার পকেট ভরে যায়। আজ ক'দিন হল তার ভাগ্যে সিকে ছিঁড়ছে না। এমন জায়গায় পোস্টিং হয়েছে যে হাতে একটি কানা কড়িও পড়ছে না। ঠিক এমন সময় তার একমাত্র আদুরে ছেলেটা কঠিন অসুখে পড়ল। ডাক্তার দুদিন আগেই প্রেস্-ক্রিপ্শন লিখে দিয়েছে। কিন্তু ওষুধ কেনা সম্ভব হয়নি। আজ এই কেসটাকে ধরে খুব খুশী হয়েছিল রাজু। কিন্তু এখন সে অস্বস্তি বোধ করছে। ঘুষ নিয়ে একজনকে আত্মহত্যা করতে দেবে! আজ প্রথম এই পরিস্থিতিতে রাজু ঠেকে গেল। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ আজো যদি ওষুধ কেনা না হয় তাহলে ছেলেটার অবস্থা খারাপ হবে। এই অবস্থায় যার কাছে সে ঘুষ পাবে তার কাছে যেন সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে মনে মনে।

আসামীর নীরবতায় রাজুর মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। ভাবল, এমন এক গোঁয়ার-গোবিন্দকে ধরে আনাই অন্যায় হয়েছে। একে মরতে দেওয়াই উচিত ছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল কিছু নিয়ে ছেড়ে দেবে। আসামীর কাছ-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, পকেটে টাকা-কড়ি কিছু আছে?

লোকটা হকচকিয়ে বোবাদৃষ্টি মেলে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল।

—শোন আর কোনদিন আত্মহত্যার চেষ্টা কর না। এখন ছাড়া পেতে চাও তো টাকাদশেক বের করো।

আসামীকে এবারেও নীরব দেখে রাজু ভাবল, আজ-কালকার দিনে মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোই অনুচিত। চড়া স্বরে বলল, কি টাকা আছে না নেই? ধার-কর্জ করেও দিতে পার। আর তা নাহলে জেলের হাওয়া খেতেই হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

রাজু শেষ তীরটি নিক্ষেপ করে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। তার গোটা শরীরের দিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। হঠাৎ চোখ নিবদ্ধ হল আসামীর হাতের আংটির ওপর।

—আংটিটা কি তোমার?

—হ্যাঁ।

—এটাই আমাকে দিয়ে দাও। আর কোনদিন এমন কাজ কর না, বুঝলে?

আসামী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ আংটিটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে তা খুলে অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃত-ভাবে রাজুর হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল।

রাজুর মন আনন্দে নেচে উঠল। ওষুধ কিনবে এখনই। ছেলেটার অসুখ ঠিক সেরে যাবে।

অবিলম্বে মহাজনের কাছে ওটা বন্ধক রেখে ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরল।

ছেলেটা তখন প্রলাপ বকছে। নাতির কাছে বসে তার দিদিমা কাঁদছে।

ওষুধ-ইনজেকশন সমান চলল। অনেকক্ষণ পরে আশা ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার ফিরে গেল।

ছেলেটার জন্য রাজু সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকলেও যমরাজ হয়ত তার কাছে ঘুষ নিয়ে বাঁচাতে প্রস্তুত ছিলেন না। সে যে-কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। বড়-বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল রাজু। তার বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করছে। পাথরের মূর্তির মত ঠায় বসে রইল সে।

পাঁচ বছর আগে মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর কাছেও ঠিক এমনি বসেছিল রাজু। আজও তার কানে বউয়ের শেষ কথা-গুলো বাজছে: ছেলেটাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করো, ওকে কোনদিন মেরো না।

বউয়ের মৃত্যুর পর একমাত্র ছেলে ছাড়া আর কারো প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না। আর আজ সেই ছেলেটাও তাকে ছেড়ে চলে যেতে বসেছে।...আর ভাবতে পারছে না রাজু।

ছেলের গায় হাত বুলোতে-বুলোতে তার আঙুলের আংটির উপর নজর পড়ল। ভিতর থেকে যেন একটি ধাক্কা খেল রাজু। বউ কত আদর করে আংটি গড়িয়ে তার ছেলের হাতে পরিয়ে গেছে। শত অভাবেও রাজু ছেলের হাতের ঐ আংটি বন্ধক রাখার কথা ভাবেনি। তাইতো! লোকটার হাতের আংটি যে সে একরকম কেড়েই এনেছে! ঐ আংটির পেছনেও হয়তো এই ধরনের স্মৃতিবিজড়িত কোন ঘটনা জড়িয়ে আছে। কে জানে হতভাগ্য এখনও বেঁচে আছে কিনা! চোখ পড়ল দরজার ওপর

টাঙানো বউয়ের ছবির উপর। সে যেন বলছে ঃ ঘুষ খেয়ে একজনকে মরতে দিতে পারো। কিন্তু ঘুষ দিয়ে তোমার নিজের ছেলেকে কি বাঁচাতে পারবে?

মুহূর্তে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাবলে, সে তো আসামীকে বাঁচাতে পারে! মুহূর্তে ছেলের হাতের আংটি খুলে নিয়ে ইউনিফর্ম পরে ছুটে গেল তার সেই মহাজনের কাছে। এই আংটিটা জমা রেখে আগেরটা ছাড়িয়ে সাইকেলে করে সারা শহর গরু-খোঁজা খুঁজতে লাগল আসামীকে। শহরে না পেয়ে নেবে গেল গাঁয়ের মেঠো-পথে। দূর থেকে লক্ষ্য করল একজন লোক পা টেনে-টেনে চলেছে গ্রামের নির্জন অংশের দিকে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে নিশ্চিন্ত হল এই সেই-লোক। রাজু গর্জে উঠল, কোথায় যাচ্ছ? সকালে কি বলেছি মনে নেই? অত করে বলা সত্ত্বেও নির্জন জায়গা খোঁজা হচ্ছে!......অঃ কথা বলবে না। নাও তোমার আংটি। কারো জিনিস মেরে দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়!

এখন রাজুর খুব ক্লান্তি লাগছে। নিজের কাছেই নিজের শরীরটা ভারি লাগছে। লোকটাকে নিয়ে কোনরকমে থানায় পৌঁছে চিরাচরিত ঢঙে সেলাম ঠুকে কেসটা জানাল।

দারোগাবাবুর চোখ-মুখ আনন্দে ভরে গেল। আজ সারাদিনে মনের মত একটা কেসও ধরা পড়েনি তাঁর হাতে। দারুণ উৎসাহে নিজেই আসামীর পকেট সার্চ করতে লাগলেন। একটি চিরকুট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। তাতে লেখা ছিল ঃ আমার আত্মহত্যার কারণ যাঁরা জানতে চান তাঁদের কাছে বলছি, এই আত্মহত্যার জন্য আপনারা অহেতুক ব্যস্ত হবেন না। জীবনের প্রতি আমার ঘৃণা ধরে গেছে বলেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত করেছি। নিজের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমার আছে। আইন আমাকে শাস্তির ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু রক্তমাংসের এই শরীরকে যে-প্রাণশক্তি চালিত করে তার উপর আইন নিজের ক্ষমতা ফলাতে পারে না। —ইতি জীবনবিমুখীন জনৈক আত্মহত্যাকারী।

দারোগাবাবু সোচ্চারে চিঠিটা পড়ে বললেন, কিহে বাঁচতে চাও না। চিঠিতে এ-সব কি লিখেছো! আইন তোমার অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না? এখানে তাহলে কিসের বলে এলে? আইনের নয়?

আসামী রা করেনি।

—এই, একে লক-আপে পোরো।

ঘড়ির দিকে তাকাতেই রাজুর মনে পড়ল ছেলের কথা। ধক্ করে উঠল বুকটা। দারোগাবাবুর কাছে অনুমতি নিয়ে রাজু ঘরে ফিরে এল। এসে দেখে ছেলেটার জ্ঞান ফিরেছে। দিদিমার সঙ্গে কথা বলছে। ডাক্তারবাবু বসে রয়েছেন। এই সাফল্যে তাঁরও চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাজুর মন আনন্দে ভরে উঠল। ছেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবল, ঘুষ ফেরত দিয়ে একজনকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে বলেই নিজের ছেলেও বেঁচে গেছে। তারপর হাজারো বার মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

পরের দিন ট্রাফিক-কন্ট্রোল করার জন্য চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে রাজু। এমন সময় সহকর্মীর কাছে জানতে পারল ঐ আসামী মারা গেছে! রাজু অবিশ্বাস করে বলল, মিথ্যা কথা বলছো কেন!

—আরে না। একটা মজা কি জানো। শত চেষ্টা করেও সরকারী ডাক্তার তার মৃত্যুর কারণ জানতে পারল না।

—সে কি! আমি যে তাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও...

ততক্ষণে চারটে রাস্তাতেই অনেকগুলো গাড়ি সচঞ্চল আর্তনাদ তুলল। রাজু সম্বিৎ ফিরে পেল যেন। যান্ত্রিকভাবে বুকটান করে দাঁড়িয়ে এক হাত গুটিয়ে অন্য হাত প্রসারিত করল। অনেকগুলো গাড়ি এপার থেকে ওপারে চলে গেল। গাড়ি নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আইন তাকে দিয়েছে কিন্তু যে লক্ষকোটি জীবন এই মর্ত্যভূমিতে আসে এবং চলে যায় তাদের নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা পেলেও রাজু হয়ত নিজের ইচ্ছেমত সে গুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত না।

আসামীর কথা রাজুর কানে বাজছে ঃ রক্তমাংসের এই শরীরকে যে-প্রাণশক্তি চালিত করে তার উপর আইন নিজের ক্ষমতা ফলাতে পারে না।

॥ কলারসিক ॥

॥শ্রীমতী নীপা চৌধুরীর একক প্রদর্শনী॥

পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে গত ১৭ই নভেম্বর থেকে শ্রীমতী নীপা চৌধুরীর একক চিত্র-প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। কলকাতায় শ্রীমতী চৌধুরীর এটি দ্বিতীয় একক চিত্র-প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি আগামী ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যহ বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা অবধি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

শ্রীমতী নীপা চৌধুরীর এটি দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী হলেও কলকাতার শিল্প-রসিক ব্যক্তিরা আরো অনেক সমবেত প্রদর্শনীতে এই শিল্পীর চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। কলকাতার বাইরেও শ্রীমতী চৌধুরী শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতায় তাঁর প্রথম প্রদর্শনীর পর ১৯৫৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর দ্বিতীয় প্রদর্শনী। সেই হিসাবে বর্তমান প্রদর্শনীটিকে শ্রীমতী চৌধুরীর তৃতীয় একক প্রদর্শনীরূপেই চিহ্নিত করা যায়।

যাহোক, চার বছর পর আমরা পুনর্বার শ্রীমতী চৌধুরীর এতগুলি সৃষ্টি-কর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশী হয়েছি। খুশী হয়েছি দুটি কারণে। প্রথমতঃ চার বছর আগের শিল্পী নীপা চৌধুরী এখন অনেক পরিণত, অনেক বেশি আত্ম-বিশ্বাসের অধিকারিণী। ফলে, তাঁর চিত্র-সংস্থাপন ও বিন্যাসকলায় এসেছে পরিমিতিবোধসহ রঙ আর রেখার স্নিগ্ধ মাধুর্য। তিনি শিল্পীর প্রাথমিক চাঞ্চল্য ও চটুলতা পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ এই চার বছরে সমসাময়িক শিল্পীদের অনেকের মধ্যে আধুনিকতা ও বিমূর্ত শিল্পের নামে যে উন্মার্গগামিতার লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে, শ্রীমতী চৌধুরী নিজের বিশ্বাসের জগৎ বর্জন করে সেই অহেতুক আধুনিকতা বা বিমূর্ত শিল্প-কলার দিকে একচক্ষু হরিণীর মতো ছুটে যাননি।
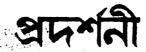
থটফুল

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শ্রীমতী চৌধুরী আমাদের ৬০ খানি চিত্র উপহার দিয়েছেন। এই ৬০ খানি চিত্রের ২৫ খানির মাধ্যম তেল-রঙ, ১৮ খানি অংকিত হয়েছে প্যাস্টেলে, বাকী ১৭ খানির মাধ্যম জল-রঙ। অর্থাৎ চিত্রের মাধ্যম রূপে শিল্পী মোটামুটি প্রচলিত পথেই পদক্ষেপ করেছেন। আর তাঁর চিত্রে আছে প্রকৃতির প্রশান্তি ও প্রতিকৃতির পরিশুদ্ধ রূপ।

এই প্রদর্শনীর সকল চিত্রেই একটি নির্দিষ্ট মান রক্ষিত হয়েছে। তাঁর তৈল-চিত্রের মধ্যে 'তাইপিঙ্ হ্রদ' (২নং) 'ওয়াটার ফ্রণ্ট' (৩নং), 'মাক্স্ওয়েল হিল' (৫নং) ও 'পেনাঙ হিল থেকে' নামক নিঃসর্গ চিত্রগুলি বেশ সুন্দর হয়েছে। অনচ্ছ রঙে প্রতিটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবস্থান, তার ঘনত্ব ও দূরত্ব চমৎকার আঙ্গিক দক্ষতায় এই চিত্রগুলিতে ফুটে উঠেছে। জল-রঙের নিঃসর্গ চিত্রগুলিই তেল-রঙের নিঃসর্গ চিত্র অপেক্ষা আমার বেশি ভাল লেগেছে। হাল্কা রঙে শ্রীমতী চৌধুরী যেভাবে 'হোয়াইট ইন দি ভ্যালি' (৫২নং), কিংবা 'কুমায়ুন হিলস' (৫৪নং) চিত্রদুটিকে আলো-ছায়ার খেলায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, তাতে জল-রঙে তাঁর দক্ষতাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

তেল-রঙে অংকিত প্রতিকৃতি চিত্রগুলির মধ্যে 'বিল্টি' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য চিত্র। 'আয়েষা' (২০নং) ও 'রূপবন্তী'র (২১নং) রূপলাবণ্যেও অনেকে মুগ্ধ হবেন। বিশেষ করে 'রূপবন্তী' চিত্রে ঈষৎ হলুদ পশ্চাদপটে গাঢ় নীল ও হলুদ রঙের প্রলেপে শিল্পী চমৎকার দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। 'চিন্তান্বিত' (২৩নং) চিত্রটি একটি মানুষের বিশেষ ভঙ্গীসহ তার অন্তর্লোককেও প্রকাশ করেছে। 'শূন্য দৃষ্টি' (২২নং) চিত্রখানিতে ক্লান্তির ছাপ আছে, কিন্তু চোখে-মুখে শূন্যতা-বোধের তেমন কোনো ব্যঞ্জনা আছে বলে মনে হল না। অথচ চিত্রখানির সংস্থাপন এবং রেখা-বিন্যাস মনে রাখবার মতো।

শ্রীমতী চৌধুরীর প্যাস্টেলে অঙ্কিত চিত্রগুলি সত্যি বর্ণাঢ্য ও ড্রয়িং-এর দিক থেকে নিখুঁত। তাঁর 'রেড ফ্রক' (৩৯নং), 'কাংড়া মাদার' (২৬নং), 'উইডার' (২৭নং), 'ব্লু মুড' (৩১নং) দেখে স্পষ্ট মনে হয় তিনি অ্যাকাডেমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করেননি। উপযুক্ত শিক্ষা ও নিষ্ঠা ভিন্ন এমন পরিপক্ক রেখাংকন ও বর্ণ-প্রলেপন সম্ভব নয়।

শ্রীমতী চৌধুরীর এই প্রদর্শনী দেখে আমরা আশান্বিত। ভবিষ্যতে তাঁর এই দক্ষতা যদি আরো বৃহত্তর শিল্পের জগৎকে রঙে আর রেখায় রূপায়িত করার জন্য প্রযুক্ত হয় তবে নিশ্চয় আমরা অধিকতর খুশী হব। আজ এই শিল্পীকে আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

ওয়াটার ফ্রণ্ট

লোকে বলে ভাগ্যবানের বউ মরে। কিন্তু সে যে কত বড় মিথ্যা তা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে দুবার উপলব্ধি করলেন যতীনবাবু।

প্রথম বউ মারা যান বিয়ের দেড় বছর বাদে, মাস কয়েকের একটি মেয়ে রেখে। তারপর আত্মীয়-স্বজনের উৎসাহে আরও একবার টোপর পরলেন যতীনবাবু, কিন্তু সে সংসারও তাঁর পাঁচ বছরের বেশী টিঁকল না। দুটি পুত্রের জন্ম দিয়ে প্রায় একইভাবে চোখ বুজলেন তাঁর দ্বিতীয় সহধর্মিণী। দুঃখে হতাশায় দিশেহারা হয়ে যতীনবাবু এবার প্রতিজ্ঞা করলেন, ও হোপলেস এক্সপেরিমেণ্ট আর নয়, ভগবান সংসার-সুখ তাঁর কপালে লেখেননি।

তা হয়ত লেখেননি, কিন্তু সংসারের বোঝা ঘাড়ে চাপাতেও তিনি কোন কসুর করেননি। সে বোঝা তিনি কার ঘাড়ে চাপাবেন? বড় মেয়েটার বয়স তখন বছর সাতেক, আর ছেলে দুটো নিতান্তই শিশু। তাদের তিনি কি গতি করবেন? মেয়েটার তবু মামার বাড়ী আছে, ছেলে-দুটোর তাও নেই। যতীনবাবু দ্বিতীয়-বার বিয়ে করেছিলেন গরীবের ঘরের মেয়ে দেখে, ভগবান তার খুব শোধ নিলেন।—'আবার একটা বিয়ে কর' এ উপদেশ দিতে অনেক লোক জুটল, কিন্তু বাচ্চাবাচ্চাগুলোর একটু দায়িত্ব নিয়ে কেউ তার ভার জাহির করল না। ফলে চাকরি করা ত পরের কথা, ঘর থেকে বেরোনোই যতীনবাবুর পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তাই নিরুপায় হয়ে অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে বাড়ীতে বসে রইলেন তিনি—যেন অবস্থান ধর্মঘট শুরু করলেন ভগবানের অবিচারের বিরুদ্ধে।

তাতেই বোধহয় কিছুটা ফল হ'ল। এক বন্ধুর চেষ্টায় কয়েক দিন বাদে একটি খুব ভাল ঝি জুটে গেল যতীন-বাবুর। বড় দয়া মায়া সে বুড়ীর শরীরে, ক'দিনের মধ্যেই ছেলেমেয়েগুলোকে আপন করে নিল। গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যতীনবাবু আবার কাজে বেরোলেন।

তারপর বছর দুই বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। সরকারী অফিসের বড় চাকুরে ছিলেন যতীনবাবু, আর মনের দিক থেকেও খুব শৌখিন ছিলেন তিনি। তাই বাড়ী-ঘর খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তিনি লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে গেলেন। জীবনে যেন কোন অভাবই রইল না তাঁর।

কিন্তু আবার এল এক অতর্কিত আক্রমণ। বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন যতীনবাবু, হঠাৎ বুড়ী কোথা থেকে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়ল পায়ে।—'বাবুগো, সব্বনাশ হয়েছে আমার, আপনি ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

কিছু না বুঝতে পেরে যতীনবাবু খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধার মুখের দিকে। তারপর একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—'কি হয়েছে বল, শুধু শুধু কাঁদলে বুঝব কেমন করে?'

'বাবুগো, আমার সব্বনাশ হয়েছে'—ঠিক আগের মতই যতীনবাবুর পা দুটো আঁকড়ে ধরে' বুড়ী বলে যেতে লাগল—'আমার একমাত্র মেয়ে বিধবা হইছে। ছেলেমেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী কেউ নাই তার। আপনি যদি চরণে ঠাঁই না দেন তবে ওকে পথে পথে ভিখ মেগে খেতে হবে। মা হয়ে এ আমি কেমন করে সইব গো বাবু—' বলতে বলতে বুড়ী আবার কেঁদে আকুল হয়ে উঠল।

এবার যতীনবাবু একটু বিরক্ত হলেন। পা দুটো টেনে নিয়ে বললেন, 'যা এখান থেকে, বিরক্ত করিস না। এখানে ওসব হবে না। জায়গা কোথায় যে থাকতে দিবি তোর মেয়েকে?'

বুড়ী কিন্তু সেকথায় কান দিল না, আগের মতই অবুঝ কান্না কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কোন জায়গার দরকার হবে না বাবু। সে আমার ঘরের এক কোণেই পড়ে রইবে, টেরও পাবেন না আপনি। জানতেই পারবেন না বাড়ীতে একটা মানুষ আছে বলে। কিন্তু ও যদি গাঁয়ে গাঁয়ে ভিখ মেগে খায় তবে হেথা আমি কেমন করে রইব গো বাবু?'

এইবার টনক নড়ল যতীনবাবুর। 'হেথা আমি কেমন করে রইব গো বাবু—' কথাগুলো শোনামাত্রই যেন চমকে উঠলেন তিনি। বুড়ী যদি সত্যিই পালায়? আর যেন ভাবার সাহস হল না তাঁর,

তাড়াতাড়ি কথার সুর একেবারে পাল্টে ফেলে বলে উঠলেন— 'এইটুকু বাড়ীর মধ্যে কোথায় তোর মেয়েকে রাখবি বলতো?'

'সে আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না গো বাবু, আপনি জানতেই পারবেন না যে, বাড়ীতে মানুষ আছে একটা।'

'তবে আনগে যা। কিন্তু একটা কথা এখন থেকে বলে রাখছি, বাড়ীঘর যেন একটুও নোংরা না হয়, আর আমার বন্ধু-বান্ধবরা এলে খবরদার যেন তোর মেয়ে তাদের সামনে না বেরোয়।'—কথাগুলি বেশ জোর দিয়েই বললেন যতীনবাবু।

সব শর্তে রাজী হয়ে বুড়ী সেই-দিনই মেয়ে আনতে চলে গেল। আর দু'দিন পরে ভোরবেলায় ফিরে এল মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। যতীনবাবু তখন চা খাচ্ছিলেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে।

এক হাতে একটা রঙ-চটা টিনের সুটকেস আর অন্য হাতে ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েকে ধরে প্রায় টানতে টানতে ঘরের মধ্যে এনে বুড়ী নির্দেশ দিল—'বাবুকে প্রণাম কর।'

কোনরকমে মাতৃনির্দেশ পালন করে মেয়েটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে যতীন-বাবু তাকিয়ে দেখলেন, প্রায় বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে এক অসহায় আশ্রয়প্রার্থিনী। খালি গা, বাহুতে কব্জিতে উল্কির ছাপ, পরনে কোরা থান। অলঙ্কারের মধ্যে শুধু একজোড়া পাক দেওয়া রূপোর বালা। যতীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম কি ওর?'

'মতি' —বুড়ী উত্তর দিল।

'আচ্ছা, এখন ভেতরে যাও, বিশ্রাম করোগে।'

দু' এক মাস যেতেই কিন্তু মতির জড়তা কাটতে আরম্ভ করল। আবক্ষ বিলম্বিত ঘোমটা ক্রমেই ছোট হ'তে লাগল, আর যতীনবাবুর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া-আসাটা তারও ক্রমে সহজ হ'তে লাগল। দেখতে দেখতে বাড়ীর চা জল-খাবারের দায়িত্ব চলে গেল তার হাতে। বেশ পরিচ্ছন্ন মতির হাতের কাজগুলো, যতীনবাবু নিজেই একদিন তা সহাস্যে স্বীকার করলেন। কিন্তু মতির যে গুণটি যতীনবাবুকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করল তা হল মতির সীমাহীন স্নেহ। ছেলেমেয়েগুলির একেবারে মতিদিদি-অন্ত প্রাণ হয়ে দাঁড়াল। যতীন-বাবু ভাবতে আরম্ভ করলেন, এমন একটা মানুষের সত্যিই প্রয়োজন ছিল তাঁর সংসারে।

তাই মতি এ সংসারে আসার আগেই তার ওপর যে নিষেধাজ্ঞাগুলি জারি করা হয়েছিল তা একে একে প্রত্যাহৃত হতে লাগল। অনেকদিন বাড়ী ফিরে এসে যতীনবাবু দেখেছেন, ড্রয়িংরুমে বসে মতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প করছে। মাথায় ঘোমটা নেই, শান্ত নরম মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্নেহভরা খুশীর হাসিতে। কিন্তু যতীনবাবুকে দেখা মাত্রই তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেছে সে বাড়ীর ভিতরে।

যতীনবাবু তা দেখে কোনদিন বিরক্ত হননি, বরঞ্চ লজ্জিতই হয়েছেন মনে মনে, তাঁর পূর্ব-আরোপিত কড়া নিষেধাজ্ঞা-গুলির কথা মনে করে। একদিন তাই মতির সন্ত্রস্ত পলায়ন দেখে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'মতির দেখছি কিছুতেই ভয় গেল না আমাকে দেখে।'

এইভাবে একদিন যে মতি অবাঞ্ছিত সমস্যা হয়ে এ বাড়ীতে এসেছিল, সে হয়ে দাঁড়াল অনিবার্য প্রয়োজন। যতীন-বাবু আপন মনেই বললেন একদিন—ভালই হল।

কিন্তু এ ভাল যে কি মর্মান্তিক ভাল তা বছর খানেক বাদে আর-এক সাংঘাতিক আঘাতে উপলব্ধি করলেন যতীনবাবু। আঘাত লাগার পরে যতীনবাবুর খেয়াল হল, একথা আগেই ভাবা উচিত ছিল তাঁর।—হঠাৎ প্রবল জ্বরের আক্রমণে মাত্র দিনসাতেক ভুগে চিরকালের জন্যে চোখ বুজল মতির মা।

যেমন করে ঐ বুড়ী একদিন আছড়ে পড়েছিল যতীনবাবুর পায়ে, ঠিক তেমনি করেই কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মতি যতীনবাবুর কাছে জানতে চাইল—'আমি এখন কোথায় যাব বাবু? আমার যে কেউ নাই এ সংসারে।'

এতদিনের বিশ্বস্ত সেবিকার মৃত্যুতে যতীনবাবুর মন এমনিতেই ব্যথায় ভরে ছিল তার ওপর এই অসহায়া আশ্রয়প্রার্থিনীর আকুল ক্রন্দন। সুমুখে চোখ তুলে তাকাতে দেখলেন ছেলেমেয়ে-গুলোও শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। যতীনবাবু তাই আর কোন কথা না ভেবে ভগ্নকণ্ঠে জবাব দিলেন,—'তুমি এখানেই থাকবে মতি, তোমার মায়ের কাজ তুমি করবে।'

তারপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা শেষ হয়েছে, অন্তত আরও পঁচিশবার। যতীনবাবুর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেদুটিও লেখাপড়া শিখে চাকরিতে ঢুকেছে। পেন্সনভোগী বৃদ্ধ যতীনবাবুর শুরু হয়েছে রুটিন-বাঁধা জীবন, আর পঞ্চাশোর্ধ্ব মতি হয়েছে সে সংসারে অবিসংবাদিত কর্ত্রী।

ছেলেদের ঠিক সময়ে অফিসের ভাত দেওয়া, বৃদ্ধ যতীনবাবুর যাবতীয় কাজের ঘড়ি ধরে তদারক করা, সকলের জামা-কাপড় ঠিক রাখা প্রভৃতি যাবতীয় কাজই মতিকে করতে হয়। রান্নার জন্যে লোক আছে, বাসন-মাজার জন্যেও আছে ঠিকে-ঝি, তবুও মতির যেন কাজের শেষ নেই। একদিন তাই সে যতীনবাবুকে বলল—'বুড়ো বয়সে এত কাজ আর পারি না, এবার শ্যামল আর অমলের বিয়ে দিয়ে দাও। ওদের সংসার ওরা বুঝে নিক।'

কথাটা যে যতীনবাবুও ভাবছিলেন না এমন নয়। তাই মতির প্রস্তাবে বেশ উৎসাহই দেখালেন তিনি। মতিও অনতি-বিলম্বে সে প্রস্তাব পেশ করল ছেলেদের কাছে। ছেলেদেরও তাতে কোন আপত্তি ছিল না। তবুও সঙ্গে সঙ্গে এ সব প্রস্তাবে সম্মতি জানানো রীতি নয় বলে তারা উপহাসছলে কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল—'না মতিদি, ওব্যাপারে আমরা নেই। আমরা বিয়ে করি আর বউগুলোর সঙ্গে রোজ ঝগড়া বাধুক তোমার। মাঝ থেকে আমাদের তখন প্রাণান্ত হবে। দরকার নেই ওসব ঝামেলায়, এই বেশ আছি আমরা।'

কথাগুলো শোনা মাত্রই মতি যেন ক্ষেপে অনমানুষ হয়ে গেল। রীতিমত ঝাঁজিয়ে উঠে বলল—'কি বললি? তোদের বউরা এসে ঝগড়া করবে আমার সঙ্গে? দুই ধমকে ঠাণ্ডা করে দেব না? এইটুকু টুকু সব নেতার মত ছেলে বুকে করে মানুষ করলাম, আর এই বুড়ো বয়সে তোদের বউদের নাকনাড়া খেতে হবে?'

মতির ভঙ্গী দেখে বড়ছেলে শ্যামল হো হো করে হেসে উঠল।—'এই দেখ মতিদি, বলতে না বলতেই তুমি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলে। আর এর পর

সত্যিই যখন ওরা নাকনাড়া দিতে আসবে তখন কি করবে ?'

মতি যেন এবার সত্যিই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। হাসতে হাসতে বলল— 'আচ্ছা আগে আসুক না ওরা।'

এসব ব্যাপারে প্রস্তাব উঠতে যা দেরি, কার্যকর হতে বিশেষ সময় লাগে না। তার ওপর ছেলে যদি লেখাপড়া-জানা আর রোজগারে হয়, আর বাড়ী থাকে কলকাতা শহরে। শ্যামলের বিয়ে হ'ল অঘ্রানে, আর অমলের বিয়ে তার পরের আষাঢ়ে। নতুন করে আবার সেজে উঠল যতীনবাবুর সংসার, আর এর পরবর্তী অধ্যায় যা অবধারিত তাও ঘটতে আরম্ভ করল একটু একটু করে।

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে দুই বউর মধ্যে প্রায়ই মন-কষাকষি ও বিরোধ দেখা দিতে লাগল, কিন্তু একটা ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত রইল না। শুধু তাই নয়, অনতিবিলম্বেই ও ব্যাপারের যে একটা ফয়সালা হওয়ার দরকার, সে সম্বন্ধেও তারা একমত হ'ল।

সে বিষয়টি হ'ল ঐ মাগীর, অর্থাৎ মতিদির অসহনীয় মোড়লি। বড়বউ যতদিন একা থেকেছে ততদিন মুখ খোলেনি, কিন্তু ছোটবউ আসার পর সে আর কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারল না। —সংসারের প্রতিটি খুটিনাটি কাজ তার অনুমতি নিয়ে করতে হবে, একদিন বাপের বাড়ী বা সিনেমা যেতে হলেও তাকে বলে যেতে হবে। এও না হয় সওয়া যায় কিন্তু বাপের বাড়ীর লোকজন এলে ওর মাতব্বরি এমনই বেড়ে যায় যে তখন যেন লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। ঠিক যেন শাশুড়ীঠাকরুন ওদের। মুখ টিপে হাসে সবাই, মন্তব্য করতেও ছাড়ে না কেউ কেউ। অথচ শ্বশুরমশাইর জন্যে বলারও উপায় নেই কিছু। তাই যেপথে গেলে কাজ হবে সেই পথই ধরল দুই বউয়ে।

ছেলেদের মনে এতদিন যে অভিযোগ অবাক ছিল, সহধর্মিণীদের অনুপ্রেরণায় এইবার তা ভাষা পেল। প্রকাশ্যে ঝগড়া শুরু হতে লাগল মতিদির সঙ্গে, আর ক্রমে ক্রমে তা চরমে উঠল। একদিন রাগের মাথায় এক কাঠের চেলা নিয়ে শ্যামল ধাওয়া করল মতিদির দিকে। মুহূর্তের মধ্যে সারা বাড়ী ক্রুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'ল।

যতীনবাবু শান্ত, ধীর, স্বল্পভাষী মানুষ। তখন আর ওনিয়ে কোন কথা বললেন না। তারপর সন্ধ্যায় ছেলেরা অফিস থেকে ফিরতে তিনি তাদের ডেকে নিয়ে এসে কোন ভনিতা না করেই সোজাসুজি নিজ বক্তব্য পেশ করলেন। —'দেখ, যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করতে নিজেও কোনদিন চেষ্টা করিনি, তোমাদেরও করতে বলিনি। কদিন ধরেই তোমাদের কথাটা বলব কিনা ভাবছিলাম, আজ বুঝলাম এতদিন না বলে' অন্যায় করেছি। এভাবে আর একত্রে বাস করা সম্ভব নয়।'

যেন বজ্রপাত হ'ল ঘরের মধ্যে। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। তারপর ছোটছেলে অমল কাঁদো কাঁদো হয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল 'আপনি আমাদের এবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলছেন ?'

'তোমরা না গেলে আমাকেই যেতে হবে। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে সেটা খুবই কঠিন হবে, আর বোধ হয় ভালও দেখাবে না।' —আগের মতই ধীর অকম্পিত কণ্ঠে কথাগুলি বললেন যতীনবাবু।

'না, না, আপনার বাড়ী, আপনি যাবেন কেন? গেলে আমাদেরই যেতে হবে, এবং যাবও আমরা—' গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে শ্যামল বলল—'তবে দুঃখ এই যে মতিদির জন্যে আপনি আমাদের ত্যাগ করলেন।'

'তোমাদের ত্যাগ করার কোন ইচ্ছা যদি আমার থাকত তবে এত ঘটা করে

তোমাদের ঘিরে দিয়ে নতুন করে সংসার সাজাতে চাইতাম না। কিন্তু কি করব বল, আমার ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছা নয়, সংসার-সুখ আমার কপালে নেই।'—তারপর একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন যতীনবাবু—'তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। যে মানুষটা আজ ত্রিশ বছর শুধুমাত্র আমার মুখের কথায় ভরসা রেখে এই বাড়ীতে বাস করেছে, এত কষ্ট করে তোমাদের মানুষ করেছে, সে যদি নিজে থেকে না চলে যায়, আমি তাকে যেতে বলতে পারব না। তবে তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার সম্পত্তির এক কণা থেকেও তোমরা বঞ্চিত হবে না।'

এরপর অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না, সকলেই মুখ নিচু করে বসে রইল। তারপর যতীনবাবুই আবার নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন,—'তোমরা মানুষ হয়েছ, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ সুতরাং এ সংসারে আমার আর কোন কাজ নেই বললেই হয়। কিন্তু আমি যেতে চাইলেই ত যেতে পারব না। যে কষ্ট আমার কপালে লেখা আছে তা আমাকে ভোগ করতেই হবে। সে অবস্থায়ও আমার মতিকে ছাড়া চলবে না। বৌমারা নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, তাদের আর বিব্রত করার কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

সুতরাং আবার ভাঙল যতীনবাবুর সংসার। দুই ছেলেই বাসা ঠিক করে মাসখানেকের মধ্যে অন্যত্র চলে গেল। আর নিরানন্দ নির্জন নিঃশব্দ গৃহে যতীনবাবু আবার বইয়ের রাশির মধ্যে ডুবে গেলেন।

কিন্তু এভাবে আর বেশীদিন চলল না। যে কালযন্ত্রণা ভোগের আশঙ্কিত প্রতীক্ষায় যতীনবাবু বেঁচে ছিলেন এতদিন অবশেষে তা এসে ঘিরে ধরল তাকে। মাসের পর মাস দুরারোগ্য রোগে ভুগে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেলেন তবুও নিষ্কৃতি পেলেন না। সত্তর বছরের বন্দী প্রাণ যেন খাঁচায় পোষা পাখীর মতই ওড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। —দেখতে দেখতে মাথা খারাপ হয়ে গেল রোগযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে লাগলেন মতিকে। কিন্তু তবুও মতি মুখ বুজে সব অপমান সহ্য করে একমনে সেবা করে যেতে লাগল। আহার, নিদ্রা, স্বাস্থ্য সবই গেল তার একে একে, কিন্তু কোন কিছুতেই সে হার মানল না।

শেষের দিকে ছেলে-বউরাও আসা-যাওয়া শুরু করল, থাকতেও লাগল পালা করে। দীর্ঘকাল শয্যাশ্রয়ী বিকার-গ্রস্ত রোগীর সেবা করতে গেলে যে সব অবাঞ্ছিত কাজ করতে হয় তা করার মত অভ্যাস বা মানসিক গঠন কিছুই ওদের ছিল না। তবুও এটা ওরা জানত যে ওকাজগুলি তাদেরই করণীয়, যদিও জীবনপ্রাণ তুচ্ছ করে কোথা থেকে আর একজন এসে ওদের হয়ে সে কাজগুলি মুখ বুজে করে যাচ্ছে। তাই ছেলে-বউ কেউই একথা না ভেবে পারল না যে, ভাগ্যি মতিদি ছিল। বার বার করে তারা মনে মনে প্রণাম জানাল তাকে। কয়েক-বার বলেও ছিল তারা মতিদিকে, উঠে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে। কিন্তু সে তার জবাবে শুধু একটু ম্লান হাসি হেসে বলেছে, '—এসব কাজে তোমাদের ত অভ্যাস নেই ভাই, পারবে কেন?'

মৃত্যুর তখনও দিনদুয়েক বাকি: যতীনবাবু মতিকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দুই ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন —দেখ, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়ে এসেছে, এবার আমি যাব। তার আগে কটা কথা তোমাদের বলে রাখি, নইলে, আর হয়ত সময় পাব না। যদি পার ত কথাগুলো রাখার চেষ্টা করো। এতদিন ধরে মতি যা করেছে তা আসলে তোমাদেরই কাজ। কিন্তু তোমরা ত পারতেই না, কোন মানুষ এমন পারে বলেও জানতাম না। অথচ এর জন্য ও কোনদিনই কিছু পায়নি। ত্রিশ বছর আগে ওর মায়ের হাত ধরে আশ্রয়ের আশায় ও যখন এবাড়ীতে এসেছিল, তখনই কথা হয়ে গিয়েছিল ও কোনদিন কিছু দাবি করবে না। ওর কথা ও রেখেছে, এবার তোমরা তোমাদের ঋণ পরিশোধ কর। আমার অনুরোধ, যেকটা দিন ও বাঁচে ওকে তোমরা এবাড়ীতে থাকতে দাও। আমি মরে গেলে ওর সব জোরই চলে যাবে সুতরাং বৌমাদের সঙ্গেও আর ওর ঝগড়া করতে সাহস হবে না।...আর যদি ও থাকতে না চায় তবে ওকে অন্তত শ পাঁচেক টাকা দিয়ে দিয়ো। ওর চেয়ে অনেক বেশী টাকা আমি তোমাদের জন্যে রেখে যাচ্ছি।'

দুই ছেলেই সাশ্রুনয়নে বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিল।

তারপর একদিন যতীনবাবুর ইহ-যন্ত্রণা শেষ হল। তার জন্যে যথারীতি কান্নাকাটিও হল কিছুক্ষণ। শেষে শব-যাত্রা হতে বউরা ঘরদোর পরিষ্কারে মন দিল।

দাহ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কিছুক্ষণ বাইরের ঘরে বসে থেকে শ্যামল স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটু জোর গলায় প্রশ্ন করল—হ্যাঁগো, মতিদিকে ডেকে খাইয়েছ কিছু, না সারাদিনই ও-ঘরে পড়ে পড়ে কাঁদছে?'

বড়বউ ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল—'কয়েকবার ডেকেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই উঠল না।'

'বাঃ, চমৎকার কথা। তার মানে সারাদিন আজ মানুষটার মুখে এক ফোঁটা জলও পড়েনি!' —কথা বলতে বলতেই শ্যামল উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু তার ঘর থেকে বার হওয়ার আগেই ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে ছোটবউ ছুটে এসে বলল—'মতিদিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সেকি? মানুষটা চোখের সম্মুখে দিয়ে বেরিয়ে গেল, অথচ কেউ দেখলে না?'

'বিকেল বেলাতেও বাবার ঘরের মেঝেয় শুয়েছিল, তারপর কখন যে উঠে চলে গেল—' অপরাধীর মত আস্তে আস্তে বলে চলল বড়বউ।

'ব্যাস, আর কি। তাহলেই ত সব ঠিক হয়ে গেল— স্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে শ্যামল আর একবার সবকটা ঘর খুঁজে দেখল। বাবার ঘর শূন্য, মতিদির ঘরে পড়ে আছে একটা ডালা-ভাঙ্গা খালি টিনের সুটকেস কিছু ছেঁড়া খবরের কাগজ, অন্য সব ঘর নিস্তব্ধ অন্ধকার। রাস্তায় বেরিয়ে এসে কয়েকবার ক্লান্ত কণ্ঠে শ্যামল চিৎকার করে ডাকল 'মতিদি! মতিদি!'—কিন্তু সে ডাকে কেউ সাড়া দিল না।

দশদিন পরে ঘটা করে শ্রাদ্ধ হল। কত ধনাঢ্য পিতৃবন্ধু ও আত্মীয়স্বজন এল শ্যামলদের পিতৃদায় উদ্ধারে। কিন্তু এল না শুধু জীর্ণদেহ, ছিন্নবাস অতি সামান্যা নারী, যার কাছে পিতা ওদের চিরকালের জন্যে দায়বদ্ধ করে গেছেন।

শুধু সুরুচি সুদর্শনা ও সুশিক্ষিতা স্ত্রী পেলেই পুরুষের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না। পুরুষ চায় মনের মত স্ত্রী। শুধু একালে নয়, চিরকালই পুরুষ এ আকাঙ্ক্ষা করে এসেছে। তাই দেবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে : 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি। ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিনীম্ ॥' অর্থাৎ রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুকে পরাজয় করার শক্তি দাও এবং আমার রুচি মেজাজ ও মতের সংগে মেলে এমন মনোরমা স্ত্রী দাও!

কিন্তু তেমন স্ত্রী কি সচরাচর মেলে? তাহলে দেশে দেশে এত অনাচার ব্যাভিচার বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘনঘটা কেন, কেন বিয়ে ভাঙার রীতিকে আইনসম্মত করার প্রয়োজন হল সনাতন হিন্দু সমাজেও। অথচ মনের মত স্ত্রী না পাওয়ার পেছনে অধিকাংশ সময়েই যে পুরুষের বাতিক ও মনের দোষ, একথা আমরা ভুলে যাই। ধরুন কালিফোর্ণিয়ার সেই ভদ্রলোকের কথা। ভদ্রলোক নামকরা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মচারী, বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু ভালবেসে বিয়ে করা স্ত্রীকে মনের মত গড়ে তোলা নিয়ে তিনি যখন ক্ষেপে গেলেন, তখন বন্ধুরা হাসলেও স্ত্রীর পক্ষে কান্না ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। স্ত্রীর উপর তিনি হুকুম জারী করলেন, উচ্চকণ্ঠে হাসা যাবে না, দ্রুতবেগে হাঁটা যাবে না এবং খাবার টেবিলে বসে কিছুতেই পা নাচান চলবে না। শুধু তাই নয়, আরো নানা রীতিনীতি নিখুঁত মেনে চলতে হবে। অথচ স্ত্রী হোক আর যাই হোক, শ্রীমতী ছেলেবেলা থেকেই প্রাণচঞ্চলা হাস্যমুখরা মেয়ে। চিরকাল কলকলকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়েছে, একটু বুঝি চেঁচিয়েই কথা বলেছে এবং হেঁটেছে দ্রুতভঙ্গিতে। বিয়ে করার আগে ভালবাসার পর্বে শ্রীমতীর এই প্রাণচঞ্চলা রূপেই ভদ্রলোককে বেশি মুগ্ধ করত। কিন্তু বিয়ের পর শ্রীমতীকে স্ত্রীরূপে পেয়ে তিনি অভিজাত নারী হিসেবে তাকে গড়ে তুলতে চাইলেন।

বলা বাহুল্য, ভদ্রমহিলা ছ সপ্তাহ পার হবার আগেই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতে আর্জি পেশ করলেন। মনের মত স্ত্রী হওয়া থেকে নিজের স্বভাবানুযায়ী জীবন পাওয়াকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিলেন। কিন্তু আদালতের সমন পেয়ে স্বামী তো রেগেই আগুন। যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! যার গ্রাম্যতা দূর করে ভব্যতাময়ী করতে চাই সেই বলে উৎপীড়ক! তিনি অনেক টাকা খরচ করে নামী অ্যাডভোকেট নিযুক্ত করলেন। কিন্তু বিচারপতির সামনে হাজির হয়ে স্ত্রী ফরিয়াদ দিলেন, স্বামী নিষ্ঠুর মানুষ। স্ত্রীকে মানুষ বলেই মনে করেন না, কেবলমাত্র আদেশ পালনের
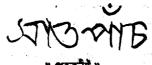
॥ পত্রকীট ॥

যন্ত্র হিসেবেই পেতে চান। বিচারপতি স্ত্রীর আর্জি মেনে নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীত্বের সৌন্দর্যসাধন সম্পর্কে দার্শনিক টমাস ডে'র বিখ্যাত বইটি প্রকাশিত হবার পর য়ুরোপে স্ত্রীলোককে নিখুঁত করার চেষ্টা আরম্ভ হয়। টমাস ডে মেয়েদের সাজ-সজ্জা, প্রসাধন ও কেশ-বিন্যাসের তখনকার রীতিগুলি পছন্দ করতেন না। স্বামীর মুখের উপর কথা বলা, খিল-খিল করে হাসা, কোন বিষয় নিয়ে যে-কোন লোকের সংগে তর্ক করা একেবারেই বরদাস্ত করতেন না। তিনি নারীকে অহঙ্কার বর্জন করে বিনয় ও লজ্জার স্বাভাবিক অলঙ্কারে ভূষিতা দেখতে চাইতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, প্রত্যেক ভদ্র নারীর হাঁটার ভঙ্গি হবে মৃদু-মধুর, অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে প্রিয়ভাষী হবে তার কথোপকথন এবং কথার মধ্যে থাকবে শিক্ষা ও মার্জিত রুচির পরিচয়। চঞ্চলতা প্রগল্ভতা এবং সাজসজ্জায় আধিক্যতা সর্বদা বর্জন করতে হবে।

দার্শনিক টমাস ডে'র পরিকল্পিত রীতিনীতিগুলি লোকে এখনও মনে করে রেখেছে। সে বইটি যাঁরা পড়েননি, তাঁরাও অবচেতন সংস্কার দিয়ে তাঁর বাতলে দেওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে শ্রীময়ী নারীত্বের নিশানা বলে মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ভুলে গেছে দার্শনিক টমাস ডে তাঁর পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে স্বয়ং যে অমানুষিক চেষ্টা করেছিলেন তা কেমন নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

খুব অল্পবয়স থেকে নিজে শিক্ষা দিয়ে নিখুঁত মেয়ে গড়ে তোলার জন্য টমাস ডে একটি অনাথ আশ্রম থেকে দুটি সুন্দরী ও সদ্বংশজাতা মেয়ে নিয়ে আসেন। মেয়ে দুটির বয়স তখন সবে দশ পেরিয়েছে। রোজ সকালে পাঁচটায় মেয়ে দুটিকে ঘুম থেকে উঠতে হত। আধ ঘন্টার মধ্যে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে সাড়ে পাঁচটা থেকে সড়ে ছটা পর্যন্ত প্রার্থনা। তারপর দুঘন্টা তাদের তিনি ইংরেজি পদ্য ও ল্যাটিন শেখাতেন। আধঘন্টা বিশ্রামের পর ব্রেক-ফাস্ট। ব্রেক-ফাস্ট শেষ হলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট খবরের কাগজ পড়া। স্নানের আগে পনের মিনিট ফ্রী-হ্যান্ড ব্যায়াম। ঠিক একটায় লাঞ্চ শেষ করে দুঘন্টা বিশ্রাম (দিবানিদ্রা নয়)। তিনটেয় টিফিন সেরে বৈকালিক সাজগোজ করা ও অতিথি আপ্যায়ন। সন্ধ্যা ছটায় গণিত কষা ও ইংরেজি গদ্য পাঠ। সাতটায় ডিনার সেরে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়া।

এই রুটিন অনুযায়ী জীবনযাত্রাকে শুধু বেঁধে রাখা নয়, তাছাড়াও উচ্চকণ্ঠে হাসা নিষেধ, দৌড়ান মানা এবং তর্ক করা নৈব নৈব চ।

সারা লন্ডন শহর মেতে উঠেছিল টমাস ডে'র এই শ্রীময়ী নারীত্ব গঠনের সাধনা নিয়ে। সর্বত্র এই আলোচনা, খবরের কাগজে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। কিন্তু হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছিল লন্ডনের সাধারণ স্ত্রীলোকেরা। প্রতিদিনই দল বেঁধে তাঁরা টমাস ডে'র বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতেন। স্ত্রীজাতিকে বিধি-নিষেধের বন্দীত্বে আবদ্ধ রাখার প্রতিবাদে তাঁরা উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার দিতেন টমাস ডে'কে।

প্রাত্যাহিক বিক্ষোভে উত্যক্ত হয়ে ডে সাহেব মেয়েদুটিকে নিয়ে ফ্রান্সের একটি নিরিবিলি পল্লীতে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। সেখানেও ঘড়ি ধরে তাঁর শিক্ষা দেওয়া চলল। নানা নীতিগল্পের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের নারীত্বকে বিকশিত করে তোলার প্রেরণা দিতেন। কয়েক বছর পর তাঁর মনে হল, শুধু মার্জিত-রুচি ও সুশিক্ষা দিলে শিক্ষা শেষ হবে না। নারীত্বকে সাহসে ও সহ্যশক্তিতে বরণীয়া করে তুলতে হবে। তখন তিনি তাদের পিস্তল চালান শিক্ষা দিলেন এবং সহ্যশক্তিকে বাড়াবার জন্য হাতের উপর গরম মোম ঢেলে ও ছুরি দিয়ে চামড়া কেটে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মেয়ে দুটির বয়স বেড়ে ষোল বছর হবার আগেই একটি মেয়ে গ্রামের এক দুর্দান্ত গুণ্ডাকে বিয়ে করে পালিয়ে গেল। আরেকটি একটি যুবককে জোর করে বিয়ে করল।

টমাস ডে তখনও শিক্ষাদানে বিরত থাকেননি। মেয়ে দুটির বিবাহকে স্বীকার করে নিজের বাড়িতে দুই দম্পতিকে নিয়ে এলেন। কিন্তু নিত্য লেগে রইল তাদের দাম্পত্য-কলহ, কখনো কখনো তা মারামারিতেও পর্যবসিত হত। কিন্তু দুই স্বামীই একবাক্যে টমাস ডে'কে বলল, আপনি এবার [illegible]। আমাদের স্ত্রীকে নিখুঁত করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। আমরা ওদের [illegible] পেয়েই ওদের নিয়ে সুখী হয়েছি।

নিরাশহৃদয় বৃদ্ধ টমাস ডে তারপরও আরেকবার অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেবারও তিনি আগের মতই ব্যর্থ হন।

আমরা ভুলে যাই, প্রত্যেকটি মানুষের যথার্থ বিকাশ তার [illegible] প্রবণতাগুলির স্বাভাবিক [illegible]। আর সেখানেই বাধে বিপদ। [illegible] স্ত্রী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা [illegible] একথাটা মনে রাখলে অনেক [illegible] হাত থেকে রেহাই পাবেন।

বাতিক শিল্প

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

বর্তমান ভারতে বাতিকের (BATIK) কাজ হস্তকারিগরি শিল্পের মধ্যে একটি।

বাতিক কথাটা ভারতীয় নয়।' ডাচ্ বা ওলন্দাজীয় ভাষা।

অধুনা ডাচ্ অধীনমুক্ত ইন্দোনেশীয়ায় বাতিক কথার যেমন প্রচলন, তেমনি হস্তকারিগরি শিল্পক্ষেত্রে ইহার প্রচুর ব্যাপকতা। ইন্দোনেশীয় কুটিরশিল্প বলিতে বাতিকের কাজকেও বুঝায়। বংশপরম্পরায় পরিবারগতভাবে এই কাজ চলে।

বাতিক একজাতীয় ছাপার (Hand-Print) কাজ। কাপড় বা চামড়ার উপর এই কাজ চলিয়া থাকে।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাচ্যের দ্বীপময় দেশগুলিতে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন ইন্দোনেশীয় এই চমৎকার গৃহশিল্পের প্রতি তাঁহার বাস্তব দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি সাদরে ও সানন্দে তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কুটিরশিল্পকে সমৃদ্ধ করিবার মানসে এই গৃহশিল্পটি গ্রহণ করেন এবং বিশ্বভারতীর সুযোগ্য শিক্ষক ও কারিগরের সাহায্যে এই কুটিরশিল্পের নবরূপ দানে সচেষ্ট হন। ইন্দোনেশীয় এই কুটিরশিল্পটি প্রকৃতপক্ষে তখন হইতে সর্বভারতে প্রচার ও প্রচলন হইতে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে খানিকটা দ্বিমত আছে। অনেকে মনে করেন, শিল্পটির জন্মস্থান প্রকৃতপক্ষে ইন্দোনেশীয়া নয়,—ভারতবর্ষের সৌরাষ্ট্র-প্রদেশ। কারণ, উত্তরপ্রদেশে অদ্যাবধি এমনি রীতিতে কাপড় ছাপা হয়, যাহার 'মিডিয়াম' মোম নয়,—কাদা মাটি।

বাতিক পদ্ধতিতে মোমের (Bee's wax) মাধ্যমে ছাপার কাজ চলে। এই মোমের সঙ্গে অবশ্য রজনের (Resin) খাদ মিশাইতে হয়। এই খাদ মোমের ওজনের অর্ধাংশ হইবে। অনেকে আবার প্যারাফিনও ব্যবহার করেন, যদ্দ্বারা ছুপার উপর বেশী cracks বা ভাঙাচোরা পাওয়া যাইতে পারে।

সৌরাষ্ট্রের কাদামাটির বাতিকের কাজ

বাতিক শিল্পে প্রথমে একটি ভাল ডিজাইন বা নক্সা করিতে হয়। এই ডিজাইন এক হইতে ছয়বর্ণ পর্যন্ত করা যাইতে পারে। ডিজাইনটি কোন উদ্দেশ্যে (purpose) রচিত হইল, তাহাও দেখিতে হইবে। অর্থাৎ ব্লাউজ পিসের দরকার হইলে ব্লাউজ পিসের সবর্ণ composition যেমনটি করা প্রয়োজন, তেমনটি করিতে হইবে। শাড়ী হইলে সেই অনুযায়ী composition, বুটি পাড় ও পাল্লু। সর্বাঙ্গীণ ডিজাইন রচিত হইবার পর শাদা কাপড়ের উপর ইহাকে ট্রেসিং করিতে হইবে। (ট্রেসিং পেপারের উপর ডিজাইনটি প্রথম ট্রেস্ করিয়া লওয়াই ভাল)। তারপর মোম লাগাইবার পালা।

প্রজ্জ্বলিত কোন হারিকেন বা ইলেকট্রিক স্টোভের উপর একটি বাটিতে রজনের সঙ্গে মোম গলাইতে হয়। মোম যখন রজনের সঙ্গে গলিয়া জলের আকার ধারণ করে, তখন তুলির সাহায্যে সেই গলিত মোম ডিজাইনের বর্ণানুযায়ী ভরাট করিয়া দিতে হয়।

পূর্বে জানা দরকার, বাতিক শিল্প রঙের ক্ষেত্রে পাত্লা হইতে গাঢ়ত্ব (light to deep) রূপান্তরিত করিতে হয়। যেমন হলুদ হইতে সবুজ, সবুজ হইতে গাঢ় বাদামী, তারপর কালো। অথবা হাল্কা নীলের উপর কোন সবুজ, গাঢ় পাটকেলে তারপর গাঢ় নীল। হাল্কা পিঙ্কের উপর বেগুনী রঙ্ তারপর কালো। এমনি আর কি! আর লক্ষ্য রাখিতে হইবে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের সম্পর্ক বা রিলেশন। 'হারমোনি'-ও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

এখন ডিজাইনের মধ্যে যেস্থানে শাদা আছে, শাদা কাপড়ে ট্রেসিংয়ের পর গলিত মোম দ্বারা সেই শাদা স্থান নিপুণভাবে ভরাট করিয়া দিতে হইবে। ভরাট হইবার পর প্রথম কোন লাইট রঙে (হাল্কা হলুদ, নীল, লাল বা পিঙ্ক) ডিজাইনপূর্ণ কাপড়টি ডুবাইয়া দিতে হইবে। এখন ডিজাইনের যে শাদা স্থান মোমে ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একমাত্র সেই সমস্ত স্থান ছাড়া সমস্ত কাপড়ে হাল্কা রঙ লাগিয়া
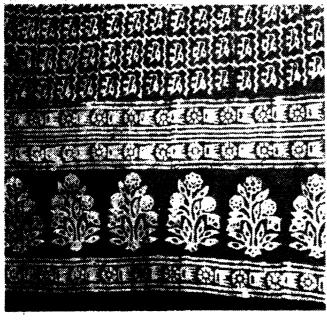
যাইবে। তারপর কাপড় শুকাইয়া লইয়া আবার ডিজাইনের কম্পোজিশন অনুযায়ী হাল্কা রঙের উপর গলিত মোম দ্বারা ভরাট করিয়া দিতে হইবে। তারপর দ্বিতীয় রঙের মধ্যে কাপড়টি পুনঃ ডুবাইতে হইবে। এখন যেসব হাল্কা রঙের উপর মোম আছে, সেইসব স্থান ব্যতীত সর্বত্র দ্বিতীয় বর্ণটি লাগিয়া যাইবে। আবার কম্পোজিশন অনুযায়ী দ্বিতীয় বর্ণটিকে ঢাকিয়া দিতে হইবে। তারপর করিতে হইবে তৃতীয় বর্ণ। মোম দ্বারা তৃতীয় রঙটি পুনরায় ঢাকিয়া দিয়া চতুর্থ গাঢ়বর্ণে ডুবাইয়া দিতে হইবে। এমনি করিয়াই মোম লাগান ও রঙের কাজ শেষ করিতে হইবে। শেষ হইলে পর এখন সমস্ত দেহে মোম লাগান কাপড়টিকে ফুটন্ত গরম জলে ফেলিয়া দিয়া উত্তম করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। গরম জলের পার্শে মোম ধুইয়া গেলে এবার কাপড়টি তুলিয়া লইয়া পুনরায় সাবান জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

বাতিক প্রিন্টের সময়ক্ষণ ও সম্পূর্ণতা (completion) নির্ভর করে বস্তু ও ডিজাইন কম্পোজিশনের উপর। মূল্য নির্ভর করে raw materials ও কারিগরের দৈনিক পারিশ্রমিকের উপর।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ছ' গজ লম্বা সিল্ক-শাড়ীর মোটামুটি মূল্য : ১০০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা পর্যন্ত।

সেইরূপ সূতির স্কার্ফের মোটামুটি মূল্য : ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা।

স্কার্ট : ৩৬৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা।

'ব্লাউজ পীস' : ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা।

'ড্রেস মেটেরিয়াল' : ১০৲ টাকা হইতে ১৪৲ টাকা।

'স্টোল' : ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা।

বাতিক প্রিন্টের অর্ধেক সৌন্দর্য তাহার cracks-এ আর অর্ধেক তাহার বর্ণ-বিন্যাসে।

বাতিক প্রিন্ট প্রোডাকশানের পক্ষে অসুবিধাজনক। কারণ, এই প্রিন্ট হস্ত-কারিগরি ছাড়া মেসিনের সাহায্যে তৈরী করার কোন সহজ পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইন্দোনেশীয়ায় মোমকে নিপুণভাবে কাপড়ের উপর ভরাট করিয়া দিবার জন্যে এক প্রকারের 'টুল' (Tool) ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতীতে তুলি বা 'ব্রাস' ব্যবহৃত হয়। তুলি ব্যবহার করার তাৎপর্য, কাপড়ের উপর 'স্ট্রোক'গুলি জোরালো বা প্রাণবন্ত হয়। Tools ব্যবহারে তাহা হয় না। শোনা যায়, ইন্দোনেশীয়ান রীতিতে কাপড়ের উপর cracks হওয়া disqualification,—কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতিতে cracksই তাহার বিশেষত্ব ও সৌন্দর্যের স্বরূপ।

বাতিক প্রিন্টে আরেকটি জিনিস হয় না, সেটি তাহার ডুপ্লিকেশন। ডিজাইন ও বর্ণ মোটামুটি ঠিক হইলেও cracks-এর জন্যে original হইতে ডুপ্লিকেশনে কিছু পরিবর্তন হইতে বাধ্য।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

দ্বাদশ আসর

কথার মানে—পূর্বপক্ষ

[বারটি শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেকটি শব্দের পাশে কয়েকটি করে অর্থ দেওয়া আছে। তার মধ্যে একটি অর্থ ঠিক। যে অর্থটি নির্ভুল বলে মনে হচ্ছে, সেটি দাগ দিয়ে কিংবা একটি কাগজে লিখে রাখুন। উত্তর অন্যত্র দেওয়া আছে। সবগুলি শেষ না করে উত্তর দেখবেন না। যদি দশ বা তার বেশী প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে বাংলা শব্দের উপর আপনার বেশ দখল আছে। আট থেকে নয় পর্যন্ত শুদ্ধ হলেও মন্দ নয়।]

১। মঞ্জুষা
(ক) পল্লবাঙ্কুর
(খ) চরণালংকার
(গ) পেটিকা
(ঘ) মনোহর

২। হাবশী
(ক) অভিলাষ
(খ) আবিসিনিয়া দেশের অধিবাসী
(গ) আবশ্যিক
(ঘ) হবিষ্য

৩। স্বত্ব
(ক) কড়ার
(খ) নির্যাস
(গ) অধিকার
(ঘ) আপনা হতে

৪। স্তিমিত
(ক) নিশ্চল
(খ) শব্দিত
(গ) সম্মোহিত
(ঘ) অন্ধকার

৫। সেঁউতি
(ক) সন্ধ্যাদীপ
(খ) শিউলি ফুল
(গ) সেচনপাত্র
(ঘ) স্যাঁতসেঁতে ভাব

৬। সিকতা
(ক) আর্দ্রীকৃত
(খ) বালুকাময় ভূমি
(গ) শুভ্রতা
(ঘ) জলকণা

৭। শ্লাঘ্য
(ক) অহংকারী
(খ) শৈথিল্য
(গ) প্রশংসনীয়
(ঘ) দণ্ডযোগ্য

৮। লিপ্সা
(ক) লেহন করবার ইচ্ছা
(খ) লোভ
(গ) কার্পণ্য
(ঘ) লেপন করবার ইচ্ছা

৯। লাচাড়ী
(ক) ত্রিপদী ছন্দ
(খ) নৃত্যবিশেষ
(গ) সহায়হীনা স্ত্রী
(ঘ) নর্তকী

১০। রাসভ
(ক) কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা
(খ) গর্দভ
(গ) রাশভারী
(ঘ) রাগিণী বিশেষ

১১। মীলিত
(ক) সংকুচিত
(খ) বিকশিত
(গ) সম্মিলিত
(ঘ) মিশ্রিত

১২। ভেখ
(ক) তুলসীর মালা
(খ) ছদ্মবেশ
(গ) ঝোলা
(ঘ) দণ্ড

দেশে বিদেশে

॥ ট্রেন দুর্ঘটনা ॥

সংসদের জনৈক সদস্য একবার বিদ্রূপ করে রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকে বলেছিলেন, তিনি সার্থকনামা পুরুষ। ভারতের রেলপথকে আজ তিনি যে দুর্গতির মধ্যে নামিয়ে এনেছেন তাতে সব যাত্রীই এখন রেলগাড়ীতে ওঠার আগে জগ (জগৎ) ও জীবনের মায়া কাটিয়ে শুধু রাম নাম ভরসা করে। বিদ্রূপ হলেও কথাটা যে কতখানি মর্মান্তিক সত্য তা এই বছরের এপর্যন্ত ট্রেন দুর্ঘটনার হিসাব দেখলেই বুঝতে পারা যাবে।

মোট ১৮টি উল্লেখযোগ্য ট্রেন দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ১২৯ জন আর আহত হয়েছেন ৩৯৪ জন। এ ছাড়াও আছে পথের মধ্যে ইঞ্জিনের গন্ডগোল, বগীর লাইনচ্যুতি ও ট্রেন-লরী সংঘর্ষের কয়েকটি ঘটনা যার হিসাব এরমধ্যে ধরা হয়নি।

॥ অবাঞ্ছিত মৈত্রীর অবসান ॥

ভারতের বৃহত্তম ও সরকারী দল হিসাবে কংগ্রেসেরই জাতীয় সংহতি অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু কেরালায় শাসনক্ষমতা ফিরে পাওয়ার তাগিদে বছর দুই আগে মুশ্লিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় আদর্শে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন তাঁরা। সে অন্যায়ের ফল ফলতেও খুব বেশী সময় লাগেনি। অনতিবিলম্বেই সারা ভারত জুড়ে আবার জেগে ওঠে ভয়াবহ মুশ্লিম সাম্প্রদায়িকতা।

আশার কথা, বিলম্বে হলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এতদিনে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। কেরালায় মুশ্লিম লীগের সঙ্গে অবাঞ্ছিত মৈত্রীর অবসান ঘটিয়েছেন তাঁরা। দেশবাসীর একান্ত কামনা, নিছক নির্বাচনী স্বার্থে কংগ্রেস ভবিষ্যতে এভাবে কোন সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে যেন জোট না বাঁধেন।

॥ শিখ নৈরাশ্য ॥

পাঞ্জাবী সুবা দূর অস্ত, জেনে-ও তিনি পাঞ্জাবের অকালপন্থী শিখেরা। তোরাই সবসময়ের সম্মুখীন হয়ে নিতান্ত নিরুপায়ের মতই [illegible] সম্মত হয়েছিলেন তাঁরা। অন্তত এইটুকু আশ্বাস নিয়ে মাষ্টার তারা সিং অনশন ভেঙেছিলেন যে, শিখদের প্রতি অবিচারের তদন্ত করতে যে কমিশন গঠিত হবে তার সদস্যরা অকালীদের মনঃপূত হবেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীসুধীরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন মাষ্টার তারা সিং ও তাঁর অনুগামীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মাষ্টারজী অকালীদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় বলেছেন, অনশনের সময় তাঁকে প্রস্তাবিত কমিশনের সম্ভাব্য সদস্য বলে যে ক'জনের নাম বলা হয়েছিল তাঁদের একজনকেও কমিশনে নেওয়া হয়নি। তাছাড়া কমিশনের বিচার্য বিষয় এত অস্পষ্ট যে সুবার কথা তাঁদের সম্মুখে তোলার কোন সুযোগই নেই। সুতরাং পাঞ্জাবী সুবার কিছুই এখনও পাওয়া যায়নি জেনেই শিখদের এগোতে হবে।

বলা বাহুল্য, আবার যদি শিখেদের সুবা আন্দোলন শুরু হয় তবে সে আন্দোলন অবশ্যই শান্তিপূর্ণ অনশনের পথ ধরে এগোবে না। বর্তমান রাজনীতিতে অনশন যে নিতান্তই বন্ধ্যা নীতি তা পরপর সন্ত ফতে সিং ও মাষ্টার তারা সিংয়ের দীর্ঘ নিষ্ফল অনশন থেকে উপলব্ধি করেছেন শিখেরা।

॥ দুঃখের আবেদন ॥

দুঃখের আবেদন যে আজও আছে সংসারে, দুঃখীর চোখের জল যে চোখেই শুকায় না সকল সময় তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেল অতি সম্প্রতি।

স্রোতের শ্যাওলার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল মায়ে মরা বাপে খেদানো অসহায় একটি মেয়ে। কখনো দূর-আত্মীয়ের হৃদয়হীন অবজ্ঞার মাঝে, কখনো বিপদসংকুল রাস্তায়, কখনো বা কয়েদখানার নিষ্ঠুর প্রহরায় অতিবাহিত হচ্ছিল তার অভিশপ্ত দিনগুলি। শেষে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হল তার দুঃখময় জীবনের মর্মবিদারী কাহিনী।

সেই প্রকাশই অমৃতবর্ষণ করেছে হতভাগিনীর জীবনে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ। এক কল্যাণময়ী নারী সেই সংবাদ পাঠ করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন ঐ ভাগ্যহীনার সমগ্র ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে। ৯ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কর্মী শ্রীমতী হাসি বসু হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অপরাজিতা চক্রবর্তীকে নিয়ে গেছেন তাকে কন্যারূপে পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

॥ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ॥

কমনওয়েলথ প্রেস সম্মেলন উপলক্ষ্যে কয়েক দিন আগে করাচীতে সমবেত কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাক জঙ্গীনায়ক আয়ুব, আগামী বসন্তকালে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সমেত যাবতীয় মৌলিক স্বাধীনতাই পাকিস্থানে পুনঃপ্রবর্তিত হবে। তবে, জনাব আয়ুব বলেছেন, আবার যাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার না হয় পাকিস্থানে তার জন্যে যাবতীয় মৌলিক অধিকারই আইন, নীতি ও জাতীয় স্বার্থের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

পাক রাষ্ট্রপতির সৈনিকসুলভ সারল্য অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। সৈন্য-নিয়ন্ত্রণাধীন একনায়ক-শাসিত পাকিস্থানকে যে গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য বলে প্রচার করেননি তিনি তার জন্যে ধন্যবাদ তাঁকে। শুধুমাত্র এই কারণেই পাকিস্থানের অধিবাসীরা আশা করতে পারেন যে, দেশের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ এক দিন পাবেন তাঁরা।

॥ বর্বরোচিত ॥

গুপ্তচরবৃত্তির সাজানো অভিযোগে ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালতে ৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন ভারতীয় সীমান্ত হতে পাকপুলিশ কর্তৃক অপহৃত ভারতীয় নাগরিক লেঃ কর্ণেল গুণীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য। গত ৪ঠা এপ্রিল ভারত-পাক সীমান্তে বনগাঁয় গিয়েছিলেন তিনি জরীপের কাজে, তারপর আর ফিরে আসতে পারেন নি। এত দিন ধরে বিচারের প্রহসন চলার পর সেদিন তাঁর আট বছর জেল হ'ল। ভারত সরকার সেদিন পাক সরকারের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু পাক সরকার

তাতে কর্ণপাত করেননি। এবারও ভারত সরকার কর্ণেল ভট্টাচার্যের এই অন্যায় নিগ্রহকে অমানুষিক ও বর্বরোচিত বলে ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু এই ভর্ৎসনা ও ধিক্কার যে কর্ণেল ভট্টাচার্যের মুক্তির ব্যাপারে কোন কাজে লাগবে না তা ভারত সরকারের অজানা নেই।

॥ আইখম্যান ॥

আইখম্যানের বিচারের অভিযোগ-পর্ব শেষ হয়েছে, কিন্তু রায় দেওয়া হবে মাঝ-ডিসেম্বরে বা তারও পরে। কিন্তু এই বিলম্বের জন্যে আইখম্যান বিশেষ বিচলিত নন। উত্তরইস্রেলের কোন এক স্থানে বন্দী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খুনী এখন একমনে তাঁর আত্মজীবনী লিখে যাচ্ছেন। খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যেই তাঁর হাজার পাতার ওপর লেখা হয়ে গেছে।

॥ হত্যার খতিয়ান ॥

১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডে হোমিসাইড এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর 'হোম অফিস রিসার্চ' ইনষ্টিটিউট সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে জনসাধারণকে নরহত্যার হিসাব জানিয়ে যাচ্ছেন। সর্বশেষ হিসাবে প্রকাশ, মৃত্যুদণ্ড রহিত হওয়ার পর ইংলণ্ডে হত্যাকারীর সংখ্যা বাড়েনি। প্রতি দশ লক্ষ মৃত্যুতে হত্যার সংখ্যা এখন ৩·৫, যা আগেও ছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইংলণ্ডে হত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ হলেও বৈষয়িক স্বার্থে হত্যা এখনও মৃত্যু-দণ্ডনীয় অপরাধ। আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও বৈষয়িক স্বার্থে হত্যা বাড়ছে ইংলণ্ডে, আর এই কারণেই অন্যান্য কারণে হত্যার সংখ্যা সেখানে কমলেও মোট নরহত্যার সংখ্যা আগের মতই থেকে গেছে। মৃত্যুদণ্ডের ভয় কোন ব্যক্তিকে হত্যা-লিপ্সা থেকে নিবৃত্ত করে কিনা এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। তবুও যে মৃত্যুদণ্ড রহিত হওয়া সত্ত্বেও অবৈষয়িক কারণে নরহত্যা কমে গেছে ইংলণ্ডে সেটা অবশ্যই ভেবে দেখার কথা।

॥ তদন্তের নির্দেশ ॥

প্রিয় সহকর্মী সার্জি কিরভের হত্যাকে উপলক্ষ্য করে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাশিয়ায় এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন স্তালিন। তাঁর নির্দেশে সেদিন প্রায় সব কজন বলশেভিক নেতাকে, লালফৌজের অধিকাংশ নায়ককে ও কয়েক লক্ষ সাধারণ মানুষকে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। বিনা বিচারে ঐভাবে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হলেও সেদিন রাশিয়ায় স্তালিনের ঘাতক-বৃত্তির কোন সমালোচনা হয়নি, কারণ সেই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকার মধ্যে সেটা সম্ভব ছিল না।

সাতাশ বছর বাদে সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ আবার সেই ব্যাপক গণহত্যার কথা তুলেছেন এবং সে সম্পর্কে পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেদিন স্তালিনের নিষ্ঠুর কাজের যাঁরা সহায়ক ছিলেন তাঁদের বিচার করা হবে।—বিলম্বে হলেও ক্রুশ্চেভের এই সত্যানুসন্ধান প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিরভের হত্যার ব্যাপারেও ক্রুশ্চেভ ইঙ্গিতে বলেছেন, ওটাও স্তালিন-নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ কিরভ স্তালিনের বন্ধু হলেও বহু ব্যাপারে তাঁদের মতপার্থক্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

॥ অর্ধেকই মানসিক রোগ ॥

বৃটেনের মানসিক স্বাস্থ্য তথ্যানুসন্ধান সংস্থার সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে প্রকাশ, বৃটেনের হাসপাতালগুলির শতকরা পঞ্চাশটি শয্যাই এখন মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে। ঐ সংস্থা থেকেই প্রকাশিত একটি পুস্তিকাতে দুঃখ করে বলা হয়েছে, যথেষ্ট সহযোগিতা ও আর্থিক স্বাচ্ছল্যের অভাবে মানসিক রোগ সম্পর্কে উপযুক্ত পরিমাণ গবেষণা হচ্ছে না। সর্বরোগজয়ী বিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক সভ্যতার প্রকৃত রোগ বোধ হয় এই ছোট্ট সংবাদটুকুর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

॥ লোকান্তর ॥

প্রবীণ জননেতা বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ১৫ই নভেম্বর পরলোকগমন করেছেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও জনমতনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষেরই শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি যখন এম-সি-সির ছাত্র ছিলেন তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। এবং জাতির সঙ্গে সে যোগ আমৃত্যুকাল অটুট ছিল।

॥ পঞ্চাশ ॥

ঊনপঞ্চাশের ওপরে এক কাঠি হচ্ছে পঞ্চাশ। বিশ্বের চারদিক থেকে কাতর আবেদন হয়েছে সোভিয়েট রুশিয়া যেন ৫০ মেগাটন পারমাণবিক বোমা না ফাটায়। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তা মানেন নি। পঞ্চাশেরও কিছু বেশী শক্তির বোমা একটি ফাটিয়েছেন। এতে তাঁদের কি পরমার্থ লাভ হল বলা কঠিন। সোভিয়েট রুশিয়া যখন গাগারিন-টিটভকে ব্যোমমার্গে পাঠায় লোকে খুশী হয়; তার মধ্যে যাই হোক একটা মানবিক সভ্যতার অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু ব্যোমমার্গে ঐ ধরনের ৩০/৫০ মেগাটনের বোমা ফাটিয়ে কাদের ভয় দেখাচ্ছেন? মার্ক্সীয় তত্ত্বানুসারে যদি একথা তাঁরা মানেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র-পরিচালকেরা সংখ্যালঘু, তবে ত্রিজগতের সংখ্যালঘুর পাপে সংখ্যাগুরুর শাস্তি কেন? যদি জবাব হয়, সংখ্যাগুরু সংখ্যা-লঘু বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়কদের গদীচ্যুত করে না কেন, তবে বলতে হয়, এমন যে জাঁদরেল বিপ্লবের দেশ রুশিয়া, সেখান-কার সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু ষ্ট্যালিন আমলাতন্ত্রকে সহসা শাসনচ্যুত করতে পারেনি। তোমার শক্তি আছে, এটা দেখা-বার জন্য দরিদ্র নিরীহ জনসাধারণের ওপর দাপট কেন? এ তো সেই বুর্জোয়া সংখ্যালঘুদের অত্যাচারেরই সামিল হ'ল। পারমাণবিক বিস্ফোরণ করে মানব-জাতিকে বিপন্ন করা কোনমতেই সমর্থ-নীয় নয়—সে বিস্ফোরণ আমেরিকার উদ্যোগেই হোক কি সোভিয়েট রুশিয়ার উদ্যোগেই হোক।

॥ ঘরে ॥

৯ই নভেম্বর—২৩শে কার্তিক : কলিকাতা মহানগরী হইতে সংক্রামক ব্যাধির মূলোৎপাটনের প্রয়াস—রাজ্য সরকার কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ।

কেরলে মুসলিম লীগ কর্তৃক কংগ্রেস ও পি-এস-পি'র সহিত সম্পর্ক ত্যাগ—বিধানসভায় স্পীকার মিঃ কয়ারেরও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত।

অতি-বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ—নয়াদিল্লীস্থ রুশ দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ।

১০ই নভেম্বর—২৪শে কার্তিক : 'ঘরোয়া আচার-অনুষ্ঠানগুলি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক'—উৎকলভবনে (কলিকাতা) অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উৎসবে ফোঁটা গ্রহণান্তে ৮০ বৎসর বয়স্ক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুসলিম লীগ গঠনের দরুণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর উদ্বেগ—সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য মুসলিম নেতাদের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন।

১১ই নভেম্বর—২৫শে কার্তিক : 'লেঃ কর্ণেল ভট্টাচার্যের উপর পাক্ সামরিক আদালতের দণ্ডাদেশে ভারত সরকার স্তম্ভিত—সর্বমহলে বিচার-ব্যবস্থার প্রতিবাদ।

'রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন চিন্তার মূর্ত প্রতীক'—রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ে দিল্লীতে উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ভাষণ।

১২ই নভেম্বর—২৬শে কার্তিক : স্বতন্ত্র পার্টির সহিত উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদের (বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল) সংযুক্তি প্রস্তাব—গণতন্ত্র পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে অনুমোদিত।

'কেরলে অবশিষ্টকালের জন্য কংগ্রেস-পি-এস-পি কোয়ালিশন অটুট থাকিবে'—হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর উক্তি—মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক মনোভাবে ক্ষোভ প্রকাশ।

১৩ই নভেম্বর—২৭শে কার্তিক : পাক্ সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ড-প্রাপ্ত কর্ণেল ভট্টাচার্যের মুক্তির জন্য ভারত-সরকারের নূতন উদ্যম—দিল্লীতে পাক্ হাই-কমিশনার মিঃ আল হিলালীর সহিত ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ সেক্রেটারী শ্রীতায়েবজীর আলোচনা।

দেশের উন্নয়নে সকল পর্যায়ের কর্মীদের সেবাপরায়ণ, কর্মনিষ্ঠ ও নিয়মানুবর্তী হইবার জন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের (উপ-রাষ্ট্রপতি) আহ্বান—দিল্লীতে তৃতীয় এশীয় রেল সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ।

১৪ই নভেম্বর—২৮শে কার্তিক : 'কংগ্রেস ব্যতীত বিকল্প সরকার গঠনের অন্য দল নাই'—মালদহে জনসভায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভাষণ।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রায় ৪ হাজার নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত।

উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক দিল্লীতে বৃহত্তম শিল্পমেলার উদ্বোধন—বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়াসহ বিশ্বের ১৯টি রাষ্ট্রের যোগদান।

শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) ৭২তম জন্মদিনে অন্যান্য স্থানের ন্যায় কলিকাতা মহানগরীতেও সাড়ম্বরে শিশু-দিবস উদ্‌যাপন।

১৫ই নভেম্বর—২৯শে কার্তিক : প্রবীণ কম্যুনিষ্ট নেতা বিধানসভা সদস্য শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের (৬৫) কলিকাতায় পরলোকগমন।

॥ বাইরে ॥

৯ই নভেম্বর—২৩শে কার্তিক : নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকৃত—দীর্ঘ বৈঠকান্তে নেহরু-কেনেডি যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ—যুদ্ধের ঝুঁকি পরিহারের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ।

কাতাঙ্গা অভিযান ও বিশৃঙ্খলা নিবারণে কঙ্গোলী সরকারের উদ্যম—ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার নিকট অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা।

১০ই নভেম্বর—২৪শে কার্তিক : পশ্চিম বার্লিনের মর্যাদা সংক্রান্ত প্রশ্নে নূতন ৪ দফা সোভিয়েট প্রস্তাব—পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট ঘরোয়াভাবে প্রেরণের কথা।

লুকাইয়া বাঁচিবার কথা না বলিয়া যুদ্ধ প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান—রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ—'হয় সহ-অবস্থান, নয় বিলুপ্তি'—একটি পথ বাছিয়া লইবার দাবী।

১১ই নভেম্বর—২৫শে কার্তিক : লেঃ কর্ণেল জি ভট্টাচার্য (পাকিস্থানে অপহৃত ভারতীয় সামরিক অফিসার) ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত—গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে ঢাকায় বিচারান্তে পাক্ সামরিক আদালতের রায়—অপর দুইজনেরও দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড।

'সার্বজনীন নিরস্ত্রীকরণই যুদ্ধ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়'—নিউইয়র্কে ছাত্রসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য শক্তিগোষ্ঠী-বহির্ভূত জাতিগুলির গুরুত্ব উল্লেখ।

রাশিয়ায় স্ট্যালিনগ্রাদ সহরের নূতন নামকরণ 'ভলগোগ্রাদ'—স্ট্যালিনস্ক ও স্ট্যালিনো সহরেরও নাম পরিবর্তন।

১২ই নভেম্বর—২৬শে কার্তিক : 'দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণ স্থায়ী সংঘর্ষ ডাকিয়া আনিবে'—ওয়াশিংটনে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী—ভারতীয় প্রধান-মন্ত্রী কর্তৃক পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা।

১৩ই নভেম্বর—২৭শে কার্তিক : ২৮শে নভেম্বর নাগাদ আণবিক পরীক্ষা বন্ধের আলোচনা পুনরারম্ভের প্রস্তাব—রাশিয়ার নিকট বৃটেন ও আমেরিকার নোট প্রেরণ।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বহু মার্কিণ জঙ্গী বিমান ও বৈমানিক আমদানী—আমেরিকার হস্তক্ষেপে ইন্দোচীনে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব—জঘন্য ভাবে চুক্তি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিবাদ।

'বিশ্বের অবস্থা এখনও খারাপ, তবে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই'—লস এঞ্জেলসে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১৪ই নভেম্বর—২৮শে কার্তিক : দক্ষিণ আফ্রিকাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে বহিষ্কারের সুপারিশ—বৈষয়িক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনেরও দাবী—রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটির প্রস্তাব।

সমগ্র উত্তর কাতাঙ্গায় শোম্বের (প্রেসিডেন্ট) কর্তৃত্ব কার্যতঃ বিলোপ—কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত আঞ্চলিক প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন।

পশ্চিম নিউগিনিকে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার সংকল্প ঘোষণা—প্রেসিডেন্ট সুয়েকার্ণো কর্তৃক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকী।

১৫ই নভেম্বর—২৯শে কার্তিক : বায়ুমণ্ডলে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা সুরু না করার জন্য কেনেডির নিকট অনুরোধ—বিশ্বের বিশিষ্ট লেখক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের আবেদন।

॥ একটি মূল্যবান ছবি ॥

কলকাতায় এমন একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিবহ ছবি আছে যা আমাদের অনেকেরই অজানা। ছবিটি বিখ্যাত আমেরিকান মুক্তিদাতা ও বিপ্লবী জর্জ ওয়াশিংটনের। ১৮০১ সালে কয়েকজন আমেরিকান ব্যবসায়ী কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী রামদুলাল দে-কে ছবিটি উপহার দেন। ন ফুট দীর্ঘ ও ও ছ ফুট প্রশস্ত এ ছবিটি এখনও অনেকটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অবশ্য কালের ছাপ এর ওপর যে পড়েনি তা নয়। উজ্জ্বলতা কমে গেছে, এমন কি একটু ময়লাও হয়েছে। কিন্তু সেই গিল্টি করে বাঁধান অবস্থা এখনও ঠিক আছে।

ওয়াশিংটনের এই প্রতিকৃতিটি আমেরিকান চিত্রকর গিলবার্ট স্টুয়ার্টের আঁকা বলে অনেকে মনে করেন। এখানে ওয়াশিংটন বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। বাঁ হাতের নীচে যে তরবারি আছে তিনি তার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। এ ছবিটির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ করে যখন এটির অন্তরালে রয়েছে ভারত ও আমেরিকার মৈত্রীমূলক মনোভাবের পরিচিতি। রামদুলালের অবর্তমানে তাঁর বংশধরেরা ছবিটি বিক্রি করে দেন। এখন ছবিটি বেসরকারী তত্ত্বাবধানে কলকাতাতেই আছে।

॥ মেরুদণ্ডের পরিবর্তন ॥

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর একটি আশ্চর্য সাফল্যের সংবাদ পাওয়া গেছে।

ব্রিটিশ শল্য চিকিৎসক ডাঃ রবার্ট রোফ ছয় বছর বয়সের এক পঙ্গু বালিকার মেরুদণ্ড পরিবর্তন করে তাকে নতুন জীবন দান করেছেন। প্রায় আড়াই বছর ধরে বালিকাটি প্লাস্টারে মোড়া অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিল, অ্যানএর ছিল বাঁকা মেরুদণ্ড। যার ফলে তার ডান পা-টি বাম পায়ের তুলনায় প্রায় ছয় ইঞ্চি ছোট হয়। এক বছর আগে তাকে ডাঃ রোফের হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ডাঃ রোফ "অস্থি ব্যাংক" থেকে অস্থি সংগ্রহ করে তার সমগ্র মেরুদণ্ড খণ্ডে খণ্ডে পরিবর্তন করে ফেলেন। এখন বালিকাটি দৌড়াতে লাফাতে এমন কি স্কিপ পর্যন্ত করতে পারে। আর এক খণ্ড অস্থি বসান হলে বালিকাটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা এবং পড়াশুনা করতে পারবে।

॥ শুক্রে জল চাঁদে বালি ॥

পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প রয়েছে তার থেকে প্রায় চার গুণ বেশী জলীয় বাষ্পের সন্ধান পাওয়া গেছে শুক্র গ্রহে। শুক্র গ্রহের এই জলীয় বাষ্প পৃথিবীর আকাশের খুব উঁচুতে মেঘের মধ্যে যে জলীয় বাষ্প আছে প্রায় তার সমপরিমাণ। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন শুক্রের চারদিকে মেঘাবরণের অন্তরালে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের অনুমান করছিলেন তা সত্য নয়। এ সংবাদ থেকে জানা যায় যে শুক্র গ্রহে কার্বণ-ডাইঅক্সাইড প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি মনুষ্যবাহী বেলুন মহাশূন্যের প্রায় ১৫ মাইল ঊর্ধ্বে থেকে এই তথ্য আহরণ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অপর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, চাঁদ বালির মত একটি আবরণ দিয়ে মোড়া। এ সংবাদে আমাদের আশান্বিত হওয়ার কারণ রয়েছে অনেক দিক থেকে। ঐ বালির হাজার হাজার মাইল অন্তরাল থেকে হয়ত একদিন জলের আবির্ভাবও ঘটতে পারে। বাতাসও মিলতে পারে। সুতরাং চাঁদের মা বুড়ীর দেশে আমরা সহজে রকেট ভ্রমণ করতে পারব। অবশ্য চাঁদে সম্ভব না হলেও অন্যত্র এ সম্ভাবনা যে নেই তা নয়।

॥ সমস্যা সমাধান ॥

অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে কি উপহার দেবেন তা সহজে ঠিক করতে পারেন না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র সহজে এ সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে। যন্ত্রটি একটি মানুষেরা সে আপনাকে উপদেশ দেবে আপনার স্ত্রীকে আপনি কি উপহার দেবেন। অবশ্য যন্ত্রটি কেবলমাত্র স্বামীদের ব্যবহারে লাগবে।

॥ পকেট রেডিও ॥

হাসপাতালে ডাক্তার সব সময় একই জায়গায় থাকেন না। তাঁকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোগী দেখে বেড়াতে হয়। রোগীর অবস্থা যখন হয়ত এখন তখন, অন্য ওয়ার্ড থেকে তার জরুরি ডাক পড়ে। দেরী করা খুবই অন্যায়। লেনিনগ্রাদের মেডিকেল ইলেকট্রিক ইকুইপমেণ্ট সংস্থা এ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বেতার ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছেন। প্রত্যেক রোগীর বিছানার সঙ্গে থাকবে একটি প্রেরক যন্ত্র (ট্রান্সমিটার)। রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে গেলে রোগী নিজে অথবা শুশ্রূষাকারী ডাক্তারকে ডাকতে পারে—ডাক্তার না আসা পর্যন্ত তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারে। অবশ্য ডাক্তারের পকেটে থাকবে গ্রাহক-যন্ত্র (রিসিভার)। রিসিভার বেজে উঠলেই ডাক্তার যন্ত্রের সাহায্যে সব কথা শুনে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে নির্দেশ দেন। অবশ্য ক্ষুদ্র প্রেরক যন্ত্রও তার সঙ্গেই থাকবে। দশ পনের মিনিটের কাজ দু এক মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ রসসাহিত্যিক থারবার ॥

তিরিশ এবং চল্লিশের শতকে যে মার্কিন লেখক ইংরাজী সাহিত্য-পাঠকের হৃদয় হরণ করেছিলেন তাঁর নাম জেমস গ্রোভার থারবার, তিনি সংক্ষেপে জেমস থারবার নামেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই রসসাহিত্যিক ও শিল্পী ওহায়োর কলম্বাস শহরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিগত ২রা নভেম্বর ১৯৬১ তারিখে 'ব্রেণ অপারেশনে'র ফলে দেহত্যাগ করেছেন। মার্ক টোয়েনের পর রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত বড় সাহিত্যিকের আর আবির্ভাব ঘটেনি। জেমস থার-বারের সরস ব্যঙ্গরচনার আঙ্গিক ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এবং সেই নতুন ধারাকে তিনি সার্থক করতে পেরে-ছিলেন। জেমস থারবার তাঁর রচনায় অতি-প্রাকৃত কল্পনার আশ্রয় নিয়ে-ছিলেন, উদ্ভট কল্পনা অতিশয় সতর্কতা এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি তাঁর কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

থারবারের এই বিশিষ্ট স্টাইল আকার নিতে কিছু সময় লেগেছে। ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর তিনি কয়েক বছর সাংবাদিকতা করেছেন। Columbus Dispatch নামক পত্রিকায় সংবাদের মধ্যে তিনি কাহিনীর সন্ধান পেতেন। ফ্রান্সে থাকার সময় জেমস থারবার একটি উপন্যাস রচনায় হাত দেন, কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। এর পর Chicago Tribune পত্রিকার রিভিয়েরা সংস্করণে তিনি সহকারী সম্পাদকের কাজ গ্রহণ করেন। ১৯২৬-এ আমেরিকায় ফিরে New York Evening Post-এর সম্পা-দকীয় বিভাগে কাজ পান। এই সময় থারবার New Yorker নামক পত্রিকায় নিয়মিত রচনা পাঠান, আর তা সরাসরি অমনোনীত হয়ে ফেরত আসে। অবশেষে এক দিন ঘড়ি ধরে ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একটি গল্প লিখে ফেললেন। স্ত্রী ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে বসেছিলেন, তিনি স্বামীকে গঞ্জনা দিতেন যে, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লিখতে তিনি অযথা সময় নষ্ট করেন। এই রচনাটি মনোনীত হল। ১৯২৯-এ তাঁর সেই রচনা 'Is Sex Necessary?' প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র আমেরিকা বুঝল যে, এক নতুন শক্তিমান লেখক এবং শিল্পীর আবির্ভাব ঘটল।

New Yorker নামক পত্রিকাটি যখন সবে গড়ে উঠছে হ্যারল্ড রসের নেতৃত্বে, সেই পত্রিকার সম্পাদকীয় গোষ্ঠীতে ছিলেন লেখিকা ডরোথী পার্কার আর শিল্পী পিটার আরণো প্রভৃতি। জেমস থারবারকে মিঃ রস রেখে-ছিলেন পত্রিকার ম্যানেজার করে। বলা বাহুল্য তাঁর সেই ম্যানেজারী তেমন সাফল্য লাভ করেনি। এই বিষয় তিনি পরে লিখেছেন "The Years with Ross" নামক গ্রন্থে। এই হাস্যরসে লেখা আত্ম-কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৯-এ, যখন লেখক সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন। চোখের দৃষ্টি হারালেও অপূর্ব মনোবল হারাননি জেমস থারবার।

থারবার ছিলেন মনে প্রাণে হেনরী জেমসের শিষ্য। থারবারের রচনা সমাজ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা। শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ রচনার উদ্ভটত্বের সঙ্গে মিশিয়ে-ছিল গভীর সমাজ-সচেতন মন। পল জেনিংস্ সম্প্রতি থারবারের ব্যঙ্গ-রচনা সম্পর্কে লিখেছেন :

> "His humour was the first that could be regarded as a genuine literary product of an age in which the ordinary man, heir to centuries of peasant and family life, suddenly (for art telescopes these processes) is up against the fragmentation, complexity and directionless menace of industrial civilisation."

শিল্পগত সভ্যতার আতঙ্ককর অবস্থার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জেমস থারবার তার তরুণরোধের পরিহাসকর প্রচেষ্টা না করে পরিহাসের মাধ্যমে তার অসারত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। সেখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। রচনার অঙ্গীভূত বাক্য থারবারের কাছে ছিল "things"—, চোখের দৃষ্টির অভাব যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল বাক্য ততই তাঁর কাছে 'থিং' হয়ে উঠল। জীবনের শেষপাদে দীর্ঘকাল এই অন্ধত্বর অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও তাঁর রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটেনি। মানুষের প্রতি থারবারের ছিল সুগভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা ছিল ভ্রান্ত উক্তি, ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা ভ্রান্ত নীতিগত বাহুল্যের প্রতি। মনের গহনে ঠিকমত কথা তাঁর জমা ছিল এবং উপযুক্ত বাক্য এবং বক্তব্য এমন এক স্বপ্নলোক রচনা করত যেখানে এতটুকু জটিলতা বা ভ্রান্তি খুঁজে পাওয়া যেত না, যা পাওয়া গিয়েছে তা নিছক আনন্দমধুর রসবস্তু।

থারবারের 'The Secret Life of Walter Mitty' এবং 'The Mule Animal' রূপালি পর্দায় রূপান্তরিত হয়েছে। Walter Mitty-তে উদ্ভট দিবাস্বপ্নের এক আশ্চর্য চিত্র পাওয়া যায়। থারবারের প্রথম জীবনের কথা পাওয়া যাবে তাঁর "My Life and Hard Times" নামক গ্রন্থে, এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩-এ এবং "The Night The Bed Fell" ও "The Dog That Bit People" নামক থারবারের দুটি বিখ্যাত রস-রচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই দুটি রচনা অনেক সংকলন-গ্রন্থে (Anthology) সংকলিত হয়েছে।

১৯৩৭-এ 'Let Your Mind Alone' নামক গ্রন্থে বিদগ্ধের প্রগতিশীলতার প্রতি শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। ১৯৪১-এ প্রকাশিত "Fables For Our Time" নামক গ্রন্থে নীতিবাগিশতার প্রতি কষাঘাত করেছেন থারবার। লেখক হিসাবে সমাজ-জীবনের ত্রুটি, মানসিকতার দৈন্য, বোকামি, ভণ্ডামি, নীচতা ও পাগলামিকে তিনি ব্যঙ্গ করে গেছেন। সেই ব্যঙ্গ তাঁর সমা-লোচনা, তাঁর বক্তব্য। একটি রচনাকে পঁচিশবার সংশোধন করে তবে সন্তুষ্ট হতেন জেমস থারবার।

দৃষ্টির ক্ষীণতার ফলেই থারবারের বিখ্যাত অঙ্কনভঙ্গী গড়ে ওঠে। কয়েকটি মাত্র রেখায় এমন সুন্দর ব্যঙ্গ-চিত্র আর কোনো কার্টুনিস্ট আঁকেননি। ইদানীং কেউ কেউ থারবার-প্রদর্শিত পন্থা গ্রহণ করছেন লক্ষ্য করা গিয়েছে। "The Years with Ross" নামক গ্রন্থে থারবার লিখেছেন যে ই. বি.

হোয়াইট একদিন লক্ষ্য করলেন যে থারবার ছবিকে 'থ্রি ডাইমেনসান্যাল' বা ত্রিস্তরীয় করার জন্য চেষ্টা করছেন, হোয়াইট তাই দেখে বললেন—'Don't do that. If you ever got good you'd be mediocre' —তার ফলে থারবারের আঁকা ছবির এই বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক স্কেচ করার সময় দৃষ্টি-ক্ষীণতার জন্য ছবিগুলি বড়ো করে আঁকতেন—তার থেকেই ছোট করে নেওয়া হত।

থারবার, ন্যুইয়র্কে প্রযোজিত 'The Thurber Carnival' নামক নাটকে নিজেই থারবার সেজে অভিনয় করেছেন। এই মঞ্চাভিনয় লণ্ডনেও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু থারবারের এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তা আর সম্ভব হল না। আজ থারবারের মৃত্যুর পর মনে হয় যে তাঁর রচনার সমাদর কালের অগ্রগতির সঙ্গে অধিকতর সমাদর লাভ করবে, গ্রহণীয় ও বোধগম্য হবে। পল জেনিংসের মতে—"He created a genre and was a giant in it. In a century's time, critics may acknowledge Walter Mitty, as a basic twentieth-century figure. If Faust is pure intellect and Don Juan is pure sense, Mitty is pure fantasy." অতি-প্রাকৃত, উদ্ভট এবং স্বপ্নলোকের এক অপূর্ব স্বাদ পাওয়া যায় জেমস থারবারের রস-রচনায়।

নতুন বই

স্বাহা (উপন্যাস)—সুষমা দেবী। **প্রকাশক : এম সি সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।**

'স্বাহা' উপন্যাসের রচয়িত্রী শ্রীমতী সুষমা দেবীর অন্য কোনো রচনা আমরা আগে দেখিনি। সম্ভবতঃ এই উপন্যাসটি তাঁর প্রথম রচনা, সেই হিসেবে লেখিকা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একটি সৎ, সরল এবং সুস্থ স্বভাবের মেয়ের জীবনে লম্পট স্বভাবের পাশের বাড়ির ছেলে পলাশ কি নিদারুণ অভিশাপ এনে দিয়েছিল 'স্বাহা' উপন্যাসে সেই কাহিনী বিবৃত। দায়িত্বজ্ঞানহীন, ধনী সন্তান পলাশ, বিলেতযাত্রার প্রাক্কালে কিশোরী কুমারী স্বাহাকে প্ররোচিত করে যে সে তাকে ভালোবাসে এবং বিবাহ করবে, সরল প্রাণে সেই কথা বিশ্বাস করে স্বাহা তার অভিভাবকদের

নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে নির্ধারিত বিবাহ-দিবসে বাড়ি ছেড়ে পালায়। এই কান্ড করে সে নিছক সেণ্টিমেণ্টের ঝোঁকে। তারপর পথে করুণাময়ী করুণার সঙ্গ লাভ করে লক্ষ্মৌ শহরে যায়। সেখানে নার্সিং শিক্ষা করে ভালো নাম করে। সেখানেও সে দেখতে পায় এ যুগের পুরুষের আকৃতি। কামতাড়িত দায়িত্বজ্ঞানহীন করুণার স্বামীকে সে হতাশ করে। এদিকে বিলাত থেকে বাঁদর হয়ে ফিরে এসে পলাশ স্বাহার জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। সেই ভয়ংকর মুহূর্তে যার সঙ্গে একদিন বিবাহের সব ঠিক হয়েছিল এবং যাকে এক হিসাবে ছাদনাতলা থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল সেই ডাঃ ঘোষের উদার বাহুবন্ধনে স্বাহা ধরা দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে। 'স্বাহা' উপন্যাসের কাহিনী-অংশ সংক্ষেপে এই। বিষয়বস্তু আধুনিক-কালের এবং উপন্যাসটিতে লেখিকা এ যুগের এক সামাজিক অভিশাপের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেইদিক থেকে এই উপন্যাসটি অতিশয় মূল্যবান এবং সময়োপযোগী হয়েছে। লেখিকার গল্প বলার ধরনটি বেশ ঝরঝরে। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রাবলীও নিখুঁত, বাস্তব এবং স্পষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটির ছাপা, ও বাঁধাই পরিপাটি প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বনে যদি ফুটল কুসুম (উপন্যাস)—
প্রতিভা বসু। গ্রন্থম। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৪-৫০ নঃ পঃ।

নিজের পরিশ্রমে বড়লোক হতে গেলে যে পরিমাণ পৌরুষ দরকার সেটা অনেক ক্ষেত্রেই রূপ নেয় একটা বজ্র-কঠোর আত্মম্ভরিতায়। ঠিকেদারী ব্যবসায়ে ফেঁপে-ওঠা দারুকেশ্বরবাবুরও তাই হয়েছিল। পৈতৃক সূত্রেই তিনি কর্তৃত্বপরায়ণ, কৃপণ এবং উন্নতিগৃধ্নু ছিলেন। পিতার মতোই তিনি সংসারকে চিনেছিলেন টাকার রূপে। আর এই নিয়েই তাঁর সঙ্গে পিতার ছাড়াছাড়িও হয়েছিল। কিন্তু পিতার চেয়ে দারুকেশ্বর অনেক বেশী কঠোর ও নির্মম। অর্থ-প্রতিপত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিপত্নীক সংসারে তিনি হয়ে ওঠেন একজন ছোটখাট ডিকটেটারের মতো নিরঙ্কুশ। তাঁর তিন ছেলে এবং দুই পুত্রবধূ এই একনায়কতন্ত্রে ভালোই ছিল। ছোট ছেলের বিবাহ হওয়ার পর পুত্রবধূ মাধবী এসে এই কংক্রীটে বাঁধানো নিশ্ছিদ্র সংসারে প্রথম বাইরের হাওয়া আনল। তারপর ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল পরিবর্তন, প্রথমে তার স্বামী সর্বেশ্বরের মধ্যে তারপর গোটা সংসারটাতেই। দারুকেশ্বর নির্মমভাবে বাধা দিতে লাগলেন সমস্ত রকম নতুন ব্যবস্থায়। পুত্র সর্বেশ্বরের সঙ্গে ঘটল তাঁর চরম বিচ্ছেদ। তারপর ধাপে ধাপে এই বিরোধ কীভাবে সর্বেশ্বরের অকালমৃত্যু এবং ছোট বৌয়ের অবিচল আদর্শ-নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে দারুকেশ্বরের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন আনল, সেইটেই হল এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য-বিষয়।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কাজে-কাজেই তিনটি—দারুকেশ্বর, সর্বেশ্বর এবং ছোট বৌ। এদের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রও খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সাবলীল। গল্প বলার একটি নিজস্ব কৌশল আছে তাঁর। এ উপন্যাসে তিন-পুরুষের চরিত্র-বিবর্তনকে তিনি যে ভাবে স্বল্প পরিসরের মধ্যে রূপায়িত করে তুলেছেন তাতে শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বইটির প্রচ্ছদ ও ছাপা-বাঁধাই চমৎকার।

রমেশচন্দ্র সেনের শ্রেষ্ঠ গল্প—
(গল্প) কতকথা। দাম পাঁচ টাকা।

রমেশচন্দ্র সেন পরিণত বয়সে লেখা শুরু করে এর মধ্যেই যা লিখেছেন তার পরিমাণ বড় কম নয়। তার মধ্যে উপন্যাসও আছে, গল্প গ্রন্থও আছে। তাঁর 'শতাব্দী' এবং 'কুরপালা' গ্রন্থ দুটিতে লেখকের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের বরিশাল-নোয়াখালির পল্লীজীবনই তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের পটভূমি। মিতবাক বর্ণনা এবং চরিত্র-চিত্রণের মুন্সীয়ানায় মনে হয় সেই প্রায়-বিস্মৃত গ্রামজীবনকে যেন নতুন করে দেখতে পাওয়া গেল।

বর্তমান শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনে মোট চব্বিশটি গল্প আছে। এর মধ্যে অবশ্য নাগরিক পরিবেশেরও অনেক কাহিনী স্থান পেয়েছে। দেখা গেল, শুধু গ্রাম নয় শহরে জীবনকেও তিনি সাহিত্য-রূপায়িত করতে সক্ষম। এর মধ্যে সাদা ঘোড়া, কাশ্মীরী তুষ, সাকীর প্রথম রাত্রি, ভাত ইত্যাদি গল্প বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। গল্পকার হিসাবে রমেশবাবুর সব থেকে বেশী সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে সমাজের নীচুতলার মানুষ—ঘোড়ার সহিস, কেরানী, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বিধবা, ডোম, ফকির, গণিকা এমন কি পকেটমার। বইটিতে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা লেখক-পরিচিতি থাকায় রমেশবাবুর সাহিত্যকৃতির সম্বন্ধে একটা পূর্বধারণা এসে পড়ে। এটার কোনো দরকার ছিল না, কারণ লেখক আমাদের পাঠক-মহলে অপরিচিত নন।

বাঁকাপথ— শ্রীমীরাটলাল। নয়া প্রকাশ, ২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ২.০০ নঃ পঃ।

শ্রীমীরাটলাল রচিত "বাঁকাপথ" তার পূর্ব গ্রন্থের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। প্রতিটি চরিত্রই কষ্টকল্পনা-হীন ও বাস্তবানুগ, পরিণতির দিকে সাবলীল যাত্রা লেখকের সার্থক শিল্পী-প্রতিভার পরিচায়ক। চরিত্রগুলি বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত। নৈতিক বোধ লোপ পাওয়ার মুখে। জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের দ্বারাই এ ধরনের রচনায় অনেকটা সার্থকতা আসে। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভাষা সম্পর্কে সচেতন হলে শ্রীমীরাটলালের ভবিষ্যৎ উপন্যাস আরও উল্লেখযোগ্য হবে।

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—
(কবিতা) কান্তিচন্দ্র ঘোষ। কমলা বুক ডিপো। কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৬৲ টাকা।

এই সর্বজনপ্রশংসিত অনুবাদ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রই আনন্দিত হবেন। ওমর খৈয়াম ছিলেন পারস্য-দেশের কবি ও দার্শনিক। প্রায় হাজার বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু এখনো তাঁর রোবাইয়াৎ-গুলি সমান জনপ্রিয় রয়েছে। তার কারণ ওমর শুধু সুরা ও সাকীর ভজনা করে ভোগবাদ প্রচার করেননি, মনুষ্য-জীবনের নশ্বরতা এবং সৃষ্টিরহস্যের দুর্বোধ্যতার বিষয়ে এক অসহায় কাতরতা ধ্বনিত হয়েছে কবিতায়, এই জন্যেই তিনি চিরন্তনতা লাভ করেছেন।

পরলোকগত কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রথম যখন এই রোবাইয়াৎগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন, সে আজ ৪২ বছর পার হয়ে গেছে, তখনই তিনি

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সাধুবাদ অর্জন করেছিলেন। প্রথম সচিত্র সংস্করণটি প্রকাশিত হয় প্রায় বত্রিশ বছর আগে। কাজেই এ অনুবাদ এতদিন ছিল বাজারে দুষ্প্রাপ্য এবং বাংলার নবীন পাঠক সমাজের কাছে অপরিচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ হাতে পেয়ে তাঁরা খুশি হবেন। পাতায় পাতায় বহুবর্ণ চিত্রগুলি এ বইয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

তোমার প্রতিমা—(কবিতা) : তারাপদ রায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। ২২।১সি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিঃ-২৬। দাম ১·৫০।

কবিতার বই এবং আধুনিক কবিতা, কিন্তু স্বচ্ছ এবং সুন্দর। তারাপদ রায় বাংলার নবীনতম কবি কিনা জানিনে, কিন্তু প্রতিশ্রুতিবান এতে সন্দেহ নেই। 'তোমার প্রতিমা' কবির প্রথম কাব্য-সংকলন হলেও এতে অপটুতার ছাপ নেই, বরং আবেগের এমন একটা শান্ত পৌরুষ এখানে লক্ষ্য করা গেল যা প্রশংসনীয়। কবিতাগুলি সবই বাংলা দেশের মৃন্ময়ী মূর্তির আরাধনায় নিবেদিত। কিন্তু স্বদেশী কবিতার বহুলাচরিত বাঁধা-সড়কে না হেঁটে কবি নিজের মতো একটা পথে-চলা পথ আবিষ্কার করে নিয়েছেন পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশে। ফলে কবিতা-গুলি বিষণ্ণ এবং বেদনার্ত। কিন্তু হতাশাক্রান্ত নয়। কারণ যদিও তিনি জানেন, 'এ জীবন অনন্ত প্রবাস' তবু শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে পারেন, 'আমি এখনো বেঁচে আছি।' এই সংহত পৌরুষের লাবণ্যে আমরা মুগ্ধ হই। বইয়ের ভিতর অনেকগুলি কবিতাই উল্লেখযোগ্য, তবে, 'স্মৃতিকথা' কবিতাটি নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রচ্ছদপত্র কিন্তু আমন্ত্রণ জানায় না।

রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গে : কাব্য নাটক (প্রবন্ধ)—ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত। প্রকাশক : স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দান কিন্তু সেই বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা আজও হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা খণ্ড আলোচনা, সর্বাত্মক আলোচনার সংখ্যা তেমন উল্লেখনীয় নয়। ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত এই আলো-চনায় প্রায়শঃ রবীন্দ্রনাথের অভিনীত-কাব্য-নাটকগুলিই নির্বাচিত করেছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্য-সমালোচনা পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেছেন। এদিক থেকে তাঁর এই আলোচনা সার্থক হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই লেখককে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায়, প্রথমনাথ বিশী, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতির রবীন্দ্র-জীবন ও নাট্য-সমালোচনা সম্পর্কিত গ্রন্থের কিছু তথ্য ব্যবহার করতে হয়েছে, এবং তা সঙ্গত হয়েছে। এই আলোচনা-গ্রন্থে লেখক প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নাট্য ও কাব্যনাট্যের রূপ ও রীতি, ও পরে রুদ্রচণ্ড, প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী প্রভৃতি নাটক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-নাথের নাটকের প্রথম ধারা দ্বন্দ্ব নাটক : যথা—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, রাজা ও রানী, চিত্রাঙ্গদা, নটীর পূজা—। সেইভাবে যদি এই আলোচনার গ্রুপিং করা হত তাহলে আরো ভালো হত। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্যোতের ট্রাজেডি বা সেকস্পীয়রের ট্রাজেডির সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের ট্রাজেডির প্রকৃতিগত মিল নেই, ইবসেনের ট্রাজেডির মত রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডির পরিণতি তার চরম আকস্মিকতায়। লেখকের আলোচনা অতিশয় সংযত, বিজ্ঞানসম্মত এবং ভাবা-বেগহীন। যে কোনো সার্থক আলোচনা-গ্রন্থের এইটাই মূলকথা। সেই কারণে ডঃ সুশীলকুমার গুপ্তের এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য—শিশিরকুমার ঘোষ। মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম আট টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে তাঁর উত্তরকাব্য কিছুটা উপেক্ষিত। সনাতনপন্থী বিচারকের দৃষ্টিতে উত্তরকালে সাধারণ মানুষের প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনামুক্ত রবীন্দ্রমানসের পরিচয় মেলে একালে। সেখানেই সমালোচকগণ বিহ্বল হন।

"আমার কাব্যের ঋতু-পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে"। রবীন্দ্রকাব্য বিচার প্রসঙ্গে এই-ই চরম সত্য এবং বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচার করা খুবই সহজ। বিশেষ করে নিজের সৃষ্টির ব্যাখ্যা যখন তিনি করেন নিজেই। এতদিন পর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ সে পথ অবলম্বনে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ফসলে এমন মূল্যবান কলাকৃতি বা রূপকল্পনার স্বাক্ষর মেলে যা কেবলমাত্র রবীন্দ্র-কাব্যেই নয় বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারেও সহজে মেলে না। দীর্ঘজীবনের পরি-সমাপ্তির মুহূর্তে যে সোনার ফসল তুলে দিয়েছেন সোনার তরীতে সমালোচকের বিচারালয়ে তার অবিচার ঘটেনি। সার্থকতার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অসার্থকতার প্রতি বিচার করা হয়েছে সত্যদৃষ্টির গুণে। বন্দিত কবির বন্দনায়ই কেবলমাত্র সমালোচক মুখর হয়ে থাকেননি। "অস্তগামী

সুবের" চিত্তজগতের নানা প্রশ্ন, পরিবর্তন, জিজ্ঞাসার বিচিত্র দ্বন্দ্বসংকুল ভাবমানস উপলব্ধিতে শ্রীযুক্ত ঘোষের সত্য আবিষ্কারের প্রতি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা গেল।

তাঁরা সব সিদ্ধান্তে একমত না হতে পারলেও শ্রীযুক্ত ঘোষের এ গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণের নতুন মালমশলা পাওয়া যাবে অনেক।

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ—(প্রবন্ধ) প্রতিভা গুপ্ত। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ছ টাকা।

শিক্ষিকা-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের (হেসটিংস হাউসের) অধ্যাপিকা শ্রীমতী প্রতিভা গুপ্ত "শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ" নামক গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবী পরিকল্পনা ও শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিকতম পদ্ধতির সংমিশ্রণ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ন'টি বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রেরণা, আশ্রম, গুরু, ছাত্র, লক্ষ্য, পাঠ্য ও পদ্ধতি, শিশু-সাহিত্য, লোকশিক্ষক ও কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই রকম একখানি গ্রন্থ রচনা করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। লেখিকা অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে সেই দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্য-সম্পর্কিত অধ্যায়টি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করলেই ভালো হত। এই বিভাগটি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের অন্য দিক আলোচনার সমীচীন প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান-পদ্ধতি এবং রবীন্দ্রনাথের চোখে ছাত্র সংক্রান্ত আলোচনা দুটি সুন্দর হয়েছে। অরূপ গুহঠাকুরতা অঙ্কিত প্রচ্ছদটি সুন্দর।

বিপ্লবী-বীর রাসবিহারী বসু (জীবনী)—নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

রাসবিহারী বসু নামটি বাঙালীর কাছে উপকথার মত, তিনি বিপ্লবীদের শিরোমণি, এবং স্বয়ং নেতাজী তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—
"Representative of all Indian Independence movement in the East."—সেই রাসবিহারী বসুর জীবন-কথা রচনা করেছেন তাঁর বিপ্লবী সহকর্মী শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যতই বিকৃত করা হোক বিপ্লবী-বীর রাসবিহারী বসুর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙালীর মনে। রাসবিহারী বসুর রোমাঞ্চকর জীবন, তাঁর ভারত-ত্যাগ, ভারতত্যাগের পর জাপানে আত্ম-গোপন এবং পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অঙ্কে ব্যাংকক সম্মিলনে রাসবিহারী বসুর ঐতিহাসিক ভূমিকা বাঙালী চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। এই জীবনী-গ্রন্থে উত্তর ভারতে গুপ্ত সমিতি গঠন, বেনারসের যুবসঙ্ঘ, বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহিত যোগাযোগ, বেনারসে রাসবিহারী, বিষ্ণু পিঙ্গলে, প্রতাপ সিংহ, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, দামোদর স্বরূপ শেঠে, গণেশীলাল খাস্তা, বিনায়ক রাও কাপলে, কর্তার সিং ও কামাগাটা মারু, রডা কোম্পানীর পিস্তল চুরি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও জাপানে আত্মগোপন পর্যন্ত এই গ্রন্থের প্রথম পর্ব অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান. শেষাংশে রাসবিহারীর জাপান প্রবাস, আই এন এ বাহিনী গঠন ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। লেখক অতিসুন্দর পদ্ধতিতে এই জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেছেন, বিপ্লবী-বীর রাসবিহারীর বাল্যজীবন, কর্মজীবন ও প্রবাসজীবন ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসের এক গৌরবময় অংশ প্রকাশ করে লেখক একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ সাহায্য করেছেন একথা লেখক ভূমিকায় স্বীকার করেছেন, গ্রন্থটির সেই কারণে ছাপা ও বাঁধাই একটু উন্নত হলে ভালো হত। নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিপ্লবী-বীর রাসবিহারী বসুর এই জীবনী'টি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাই অতিশয় চিত্তাকর্ষক হয়েছে বলা যায়।

সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার (সমাজ-বিজ্ঞান)—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ। ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলিকাতা-৯। দাম সাত টাকা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক হিসাবে প্রখ্যাত। সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক চিন্তারও তিনি প্রচুর পরিচয় দান করেছেন। সমাজের অনুদ্ঘাটিত অন্ত-র্লোক সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়কর জ্ঞান। এই সম্পর্কে তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন, সমাজের বাস্তব সংস্থিতি এবং তার অন্ধকার দিকটা সম্পর্কে সাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে লেখক এই বিষয়ে যৌনবিকৃতি ও যৌনাপরাধ নামক যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তার কয়েকটি সংস্করণ শেষ হওয়ায় তিনি সেই গ্রন্থটি প্রকাশ বন্ধ রেখে এই বিষয়ে পুনরায় নতুন করে পর্যালোচনা শুরু করেন। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর সেই পরিশ্রমের ফল। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অন্যায়, অনাচার এসে পুঞ্জীভূত হয়ে সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি-মূলে আজ নাড়া দিয়েছে সেই সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজসেবী, চিন্তানায়ক এবং সৎ-নাগরিক মাত্রেরই কর্তব্য এই বিষয়ে সচেতন হওয়া। এই গ্রন্থরচনায় পুলিশ রিপোর্ট, আইন-আদালতের রিপোর্ট, চিকিৎসকদের বিবরণী ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিই লেখক অধিকতর নির্ভর করেছেন। আদিম মানবজীবন ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে লেখক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ধর্মাচার বনাম যৌনাচার, ব্রহ্মচর্য না যৌনসংহার, যোগী ও ভক্তসমাজ, ধর্মাশ্রমে যৌনাচার, ভিক্ষুক সমাজ, স্বভাব-ভিক্ষুক, কুলিসমাজ, গুন্ডা-জগৎ, গণিকা-জগৎ, গুপ্ত পতিতা, স্বাধীন পতিতা, পেশাদার পুরুষ, কয়েদীসমাজ, জঙ্গী যৌনাচার, উন্মাদ-মহল, সৌখীনতার অনাচার, দুর্নীতির ব্যবসায়, চোরাই ব্যবসা, নারীহরণ, ব্যাভিচারের মনস্তত্ত্ব এবং এবং ব্যাভিচার বনাম বিকৃতাচার—প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রবীণ সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত এই সমাজ-সমীক্ষা চিন্তাশীল পাঠকের কাছে এক অনাবিষ্কৃত জগতের সন্ধান এনে দেবে। এই জাতীয় গ্রন্থরচনায় যে সংযম এবং শালীনতার পরিচয় প্রয়োজন, প্রবীণ লেখক তাঁর যুক্তি ও তথ্য পরিবেশনে সেই অসামান্য সংযমের পরিচয় দান করেছেন। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা, ছাপা ও প্রচ্ছদ সুরুচিসম্পন্ন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

ঋতুপত্র—সম্পাদক সুবোধ ঘোষ। তরুণ লেখকদের মুখপত্র ঋতুপত্র।" দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন বহ্নিকুমারী

চক্রবর্তী ও মানস রায়চৌধুরী। গল্প লিখেছেন দিলীপ মিত্র, কালিদাস রক্ষিত, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও গোপাল ভট্টাচার্য। এ'দের গল্পে যথেষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। কবিতা লিখেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল কাশেম রহিমুদ্দিন, সমীরকুমার গুপ্ত, শেখ আবদুল জব্বার, সমীর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

নবজীবন (হুগলী জেলা বার্ষিকী) —সম্পাদক : সুকুমার দত্ত। দাম ২·৫০ নঃ পঃ। হুগলী জেলার পরিচিতি-সমন্বিত একটি সুন্দর পত্রিকা। হুগলী জেলা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও নানা দিক দিয়ে সবিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, রামমোহন রায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি হুগলী জেলার লোক ছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ জেলার অবদান কম নয়। হুগলী জেলার কীর্তি ও সমৃদ্ধির মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে এ পত্রিকা থেকে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে অনেক তথ্যও এর মধ্যে আছে। ছোটদের বিভাগটি মোটামুটি মন্দ হয়নি। বাঙলাদেশের প্রতিটি জেলার প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে যদি তাঁরা এ ধরণের পত্রিকা প্রকাশ করেন তবে একটি জাতীয় অভাব পূরণ হবে বলে আশা করি।

সুরংগমা পত্রিকা—সম্পাদক প্রফুল্লকুমার দাস। দাম ২·০০। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি সংগীত বিদ্যালয় হতে প্রকাশিত পত্রিকা। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ওপর আলোচনা করেছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রফুল্লকুমার দাস প্রভৃতি। রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্পর্কে লিখেছেন রাশিয়ার এ সিদরোফ এবং কিউবার মেরিয়েনো রদরিগস্। ভাষা ও সাহিত্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন মোজ্জল হায়দর চৌধুরী (পাকিস্তান), শ্রীমতী অচলা বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মদেশ), টি ডব্লিউ ক্লার্ক (ইংলণ্ড), নরম্যান ব্রাউন (যুক্তরাজ্য) প্রভৃতি। অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন সতীন্দ্র ভৌমিক, অমিয় চক্রবর্তী (বস্টন), ফ্রান্সিস ওয়াটসন (ইংলণ্ড), নীলকৃষ্ণ ঘোষ (ব্রহ্মদেশ) ডেম সিবিল থর্নডাইক (ইংলণ্ড), টমাস সিলবার-স্টাইন (জার্মাণী), এ ডব্লিউ ট্রেম্যান (কানাডা), এস আর সাফাথ (ইরাণ) প্রভৃতি দেশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্যান্য বহু দেশের রচনা পাওয়া যাবে এ সংখ্যায়।

মানব মন—সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের পত্রিকা। এ সমস্ত বিষয়ের আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যাবে এর প্রতিটি সংখ্যার মধ্য থেকে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, সবিতা মুখোপাধ্যায়, সমর গুপ্ত, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, আবদুল করিম প্রভৃতি। তাছাড়া আছে পাভলভের রচনার অনুবাদ ও পাভলভ-পরিচিতি। প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের এ পত্রিকা পড়া উচিত।

চিত্রাংগদা—সম্পাদক অজিতমোহন গুপ্ত। দাম ২·৫০ নঃ পঃ। 'চিত্রাঙ্গদার' এটি বিশেষ শারদীয় সংখ্যা। তিনটি উপন্যাস লিখেছেন শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল ও সৌরীন সেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি যথেষ্ট মূল্যবান। তাছাড়া অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন—আশাপূর্ণা দেবী, কনক মুখোপাধ্যায়, সুশীল জানা, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, স্বারেশ শর্মাচার্য প্রভৃতির লেখা উল্লেখযোগ্য। বহু ছবি আছে। মোটামুটিভাবে পত্রিকাটি সুখপাঠ্য।

শব্দকল্পদ্রুম

কথার মানে—উত্তর পত্র

১। **মঞ্জুষা**
(গ) পেটিকা, বেত বাঁশ ইত্যাদির তৈরী পেড়া।

২। **হাবশী**
(খ) আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া দেশের অধিবাসী।

৩। **স্বত্ব**
(গ) ধনাদিতে অধিকার, দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয়াধিকার। তু—'গ্রন্থকার কর্তৃক সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত'।

৪। **স্তিমিত**
(ক) নিশ্চল। তু—'কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যান মগন স্তিমিতলোচন কি অমৃত রস পানে।'

৫। **সেঁউতি**
(গ) নৌকার মধ্যে জল জমলে সেই জল সেচনের জন্যে লোহা কাঠ ইত্যাদির তৈরী যে সেচনপাত্র ব্যবহৃত হয়। তু—'সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ'।

৬। **সিকতা**
(খ) বালুকাময় ভূমি।

৭। **শ্লাঘ্য**
(গ) প্রশংসনীয়।

৮। **লিপ্সা**
(খ) লোভ।

৯। **লাচাড়ী**
(ক) ত্রিপদী ছন্দ বিশেষ।

১০। **রাসভ**
(খ) গর্দভ।

১১। **মীলিত**
(ক) সংকুচিত।

১২। **ভেখ**
(খ) ছদ্মবেশ।

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥

পোলিশ কন্সালের বক্তৃতা ঃ

গেল ১৫ই নভেম্বর পোলিশ চলচ্চিত্রোৎসবের প্রাক্কালে সাংবাদিক সম্মেলনে পোলিশ কন্সাল মিঃ কাওয়িন্স্কি যে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন, তা একাধিক কারণে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমেই তিনি ভারতের বাজারে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পোলিশ চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর সমস্যার কথা তুলেছেন। এ সমস্যা খালি পোল্যাণ্ড-নির্মিত চলচ্চিত্রেরই নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ড বাদে পৃথিবীর অপর সকল দেশের ছবিরই সমস্যা। সদ্যসমাপ্ত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও এই সমস্যার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন, "নিজেদের সামর্থের মধ্যে লোকে যাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলি দেখবার সুযোগ পায়, তাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। এবং এ-জিনিস কি ক'রে সম্ভবপর হয়, সে সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন।" 'বার্টার' ও 'কোটা'-প্রথার তিনি পক্ষপাতী নন, এ-কথা জানিয়ে ডাঃ রায় প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হওয়া উচিত, যা বিভিন্ন দেশে তোলা ছবি থেকে বছরের বারো বা চব্বিশটি শ্রেষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' অবলম্বনে রচিত ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত জোয়ালা প্রোডাকশন্সের 'সন্ধ্যারাগ' চিত্রে নায়িকা নবাগতা কল্যাণী ঘোষ

ছায়াচিত্রের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং যে-কোনও দেশ নিজেদের চলচ্চিত্র আইন-সাপেক্ষে সেই ছবিগুলিকে আমদানি করার সুযোগ পাবে। চলচ্চিত্রামোদী প্রতিটি লোকই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্রগুলি দেখবার বাসনা পোষণ করেন। অথচ ইংরেজ-আমলে প্রবর্তিত বিদেশী চলচ্চিত্র আমদানি সংক্রান্ত নীতি আজও এই স্বাধীন ভারতে অটুট থাকার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে প্রস্তুত ছবি যথেচ্ছ সংখ্যায় ভারতে নিয়ে আসার কোনো বাধা নেই, অথচ অপরাপর দেশ---যেখানে ইংরেজী ভাষার চলন নেই, সেখান থেকে কোনো ছবি আনতে গেলেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়। এ-ছাড়া বিভিন্ন দেশের সবাক ছবিতে---রাশিয়ান, ইতালীয়, ফরাসী, পোলিশ, জার্মান, জাপান বা অপর কোনো দেশীয়---ইংরেজী বা হিন্দী সাব-টাইটেল জুড়ে তা সাধারণ্যে দেখালে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সে-প্রদর্শনী কতখানি সাফল্যলাভ করবে, তা আজও পরীক্ষাসাপেক্ষ। অথচ এ-কথা অনস্বীকার্য যে, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে এ-ধরনের পরীক্ষা এখনি শুরু করা প্রয়োজন এবং "আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে"র অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, যদি যথার্থই উৎকৃষ্ট বিদেশী ছবি কোনো চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষ দেখাবার ব্যবস্থা করেন, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে লাভবানই হবেন। অবশ্য চিত্র-প্রদর্শনের আগে আসে চিত্র-পরিবেশনের কথা এবং এ-ব্যাপারে বিদেশী মুদ্রার সংস্থান ও অপরাপর সরকারী বিধি-

এম কে জি প্রোডাকশন্সের অনুরূপা দেবীর 'মা' চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিষেধ, আইন-কানুন প্রভৃতির যথোপযুক্ত আধুনিকীকরণের কথা। মনে হয়, এ-ব্যাপারে কোনো সর্বভারতীয় সংস্থা যথেষ্ট উদ্যম নিয়ে পথ-পরিষ্কারের কাজে অগ্রসর হ'লে পোলিশ কন্সাল উত্থাপিত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া সম্ভব।

মিঃ কাওয়িন্স্কি প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্যে পোল্যান্ড গেল কয়েক বছরের মধ্যে অন্ততঃ ন'খানি ভারতীয় ছবি ক্রয় করেছে। সেগুলি হচ্ছে : (১) বাবলা, (২) দো বিঘা জমীন, (৩) আওয়ারা, (৪) বুটপালিশ, (৫) রাহী, (৬) পথের পাঁচালী, (৭) শ্রী-৪২০, (৮) জাগতে রহো এবং (৯) হীরামোতি। পোল্যান্ডের চিত্রামোদী দর্শক-সাধারণ নাকি ছবিগুলি দেখে খুশীই হয়েছেন।

যুদ্ধপূর্বকালে পোল্যান্ডের চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে মিঃ কাওয়িন্স্কি যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন, তা আজও পর্যন্ত আমাদের দেশে অমৃসৃত প্রথার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তিনি দুঃখ ক'রে বলেছেন, সে-সময়ে পোল্যান্ডের চলচ্চিত্র-শিল্প ছিল সম্পূর্ণরূপে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। চলচ্চিত্র-নির্মাণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থেকে শুরু ক'রে কাঁচা ফিল্ম এবং রাসায়নিক দ্রব্য—সবই বিদেশ থেকে আমদানি করা হ'ত। তখন চলচ্চিত্র প্রযোজকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অল্প অর্থ নিয়োগ করে যতবেশী সম্ভব লাভ করবার দিকে। কাজেই এ হেন অবস্থায়

উন্নত ধরনের শিল্পসৃষ্টি তখন একরকম অসম্ভব ছিল বললেই হয়।

যুদ্ধের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। যদিও যুদ্ধবিধ্বস্ত পোল্যাণ্ড বিভিন্ন রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে দিনের পর দিন বিপর্যস্ত হয়েছে, তবু ওরই মধ্যে নতুনভাবে জন্ম নিয়েছে পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্রশিল্প (পোলিশ সিনেমা সম্পর্কে ২৮এ জুলাই তারিখে প্রকাশিত 'অমৃত'-এর ১২শ সংখ্যার 'প্রেক্ষাগৃহ' দ্রষ্টব্য)। পোল্যাণ্ডে আজ বছরে ২৫ খানি কাহিনীচিত্র এবং ১৫০ খানি দলিলচিত্র ও ক্ষুদ্রচিত্র তৈরি হয়ে থাকে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে পোল্যাণ্ডে মাত্র ১৫০ খানি কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে ওয়ারশ'তে মাত্র তিনটি চিত্রগৃহ ছিল; আজ সেখানে ৪৩টি চিত্রগৃহে নিয়মিতভাবে ছবি দেখাচ্ছে। ওখানে চিত্রপ্রযোজকের সংখ্যা বর্তমানে ৪০ জনের বেশী নয় এবং এ'দের মধ্যে ১০ জন মাত্র একখানি করে ছবি নির্মাণ করেছেন।

অবশ্য সংখ্যার দিক দিয়ে পোল্যাণ্ড খুব নীচুতে পড়ে থাকলেও উৎকর্ষের বিচারে পোল্যাণ্ডের স্থান পৃথিবীর চলচ্চিত্রজগতে বেশ উঁচুতেই বলতে হবে। কারণ পোল্যাণ্ডের ১৫০ খানি কাহিনীচিত্রের মধ্যে অন্ততঃ ১৫ খানি ছবি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। মাত্র উন্নতমানের ছবিই—সে দেশী বা বিদেশী হোক—যাতে দর্শকদের দেখানো হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটি "চিত্র-নির্বাচনী-সংস্থা" পোল্যাণ্ডে নিয়মিতভাবে কাজ করে যায়।

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

মা : এম্-কে-জির-চিত্র: ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : অনুরূপা দেবী; চিত্রনাট্য : মণি বর্মা; পরিচালনা : চিত্ত বসু; সঙ্গীত-পরিচালনা : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়; চিত্র-গ্রহণ : সুহৃদ ঘোষ; শব্দ-ধারণ : বাণী দত্ত; সম্পাদনা : রবীন দাস; শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু; রূপায়ণ : সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি রায়, অনুভা গুপ্ত, সীতা দেবী, অপর্ণা, বেলা সরখেল, সুচন্দা, মালা বাগ, ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ, বিকাশ রায়, নরেশ মিত্র, অসিতবরণ, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কালিকা ফিল্মস্ ডিস্ট্রিবিউটারের পরিবেশনায় গেল ১৭ই নভেম্বর থেকে রাধা, পূর্ণ, প্রাচী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় মাতৃহত্যা করেছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনের জন্যে বনবাসী হয়েছিলেন যে-আদর্শের বশবর্তী হয়ে, অনুরূপা দেবীর "মা" উপন্যাসের নায়ক অরবিন্দ ঠিক সেই একই আদর্শ প্রণোদিত হয়ে শুধু যে তাঁর পতিগতপ্রাণা প্রথমা স্ত্রী মনোরমাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, তা নয়, পিতার কঠিন আদেশ অমান্য করতে না পেরে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহও করেছিলেন প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এ ছাড়াও দ্বিতীয় ভাবী শ্বশুরের কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হবার শর্তস্বরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী এবং তার গর্ভজাত সন্তানকে কোনো দিনই স্বীকার করবেন না বা তাদের সঙ্গে কোনো রকম সংশ্রব রাখবেন না।

এই মধ্যযুগীয় আদর্শ থেকে আজকের সমাজ বহু দূরে চলে এসেছে; আজকের যুগের সন্তান পিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিমান হয়েও নিজের জীবন-সঙ্গিনী নির্বাচনে তৃতীয় ব্যক্তির আজ্ঞাবহ নয়। যে-রামচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অরবিন্দ প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে ব্রজরাণীকে বিবাহ করেছিলেন, স্বয়ং সেই রামচন্দ্রও বোধ করি অরবিন্দের কাছে আদর্শের দিক দিয়ে পরাস্ত হতেন। তাই আজকের দর্শক যদি অরবিন্দের বাহ্যিক কাঠিন্যপূর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে তার নিরুচ্চার সন্তান-বাৎসল্য ও পত্নীপ্রেমের দ্বন্দ্বকে সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে না নেয়, তা'হলে তার প্রতি বিশেষ দোষারোপ করা যাবে না। বিশেষ, অরবিন্দ যখন নিজে পছন্দ করেই দরিদ্র-কন্যা মনোরমাকে বিবাহ করেছিলেন, তখন সামান্য বরপণ দিতে না পারার অপরাধকে মৃত্যুঞ্জয় বসু যত বৃহৎ করেই দেখুন না কেন, অরবিন্দের মত শিক্ষিত যুবক কি ক'রে পিতার অর্থগৃধ্নুতাকে সমর্থন করে আদরিণী স্ত্রীকে সন্তানসম্ভবা জেনেও চিরতরে পরিত্যাগ করে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে, তা আজকের দিনের দর্শকের মনে একটি বৃহৎ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর আগে অনুরূপা দেবী যে-আদর্শের সংঘাতের ওপর অরবিন্দ চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা সম্ভবতঃ অবান্তর। এবং "মা" নামকরণের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর পাঠকদের নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, তাঁর উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাদ্য হচ্ছে, অরবিন্দের দ্বিতীয় স্ত্রী, নিঃসন্তান ব্রজরাণীর অন্তরে মাতৃভাবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, যা সম্ভব
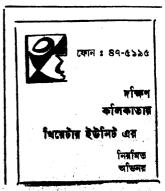
হ'ল গর্ভধারিণী মায়ের মৃত্যুর পর অজিতের ব্রজরাণীকে মাতৃরূপে বরণ ক'রে "মা" ডাকে তৃপ্ত করার মাধ্যমে। পিতা কর্তৃক অকারণে নিগৃহীতা ও লাঞ্ছিতা মায়ের প্রতি অজিতের ভক্তির সীমা ছিল না; কিন্তু তার চেয়েও প্রচণ্ড ছিল তার পিতার প্রতি নিরুদ্ধ অভিমান, যে-অভিমান তাকে অসুস্থ নিদ্রিত পিতার সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েও জাগ্রত পিতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই অভিমানাহত কিশোর অজিতের সকল মনোবেদনা দূর হল বিমাতা ব্রজরাণীকে মাতৃসম্বোধন ক'রে তার বুকে মাথা রেখে। "মা" উপন্যাসের চিরন্তনী মূল্য এইখানেই।

প্রায় তিরিশ বছর আগে "মা" উপন্যাসের নাট্যরূপ যখন "নাট্য-নিকেতন" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তখন অরবিন্দের ভূমিকায় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নিতাইয়ের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ব্রজরাণীর ভূমিকায় নীহারবালা এবং অজিতের ভূমিকায় সরযূবালার অনবদ্য অভিনয় নাট্যামোদী দর্শকমহলে যে-বিচিত্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার স্মৃতি আজও আমাদের মানসপটে জাগরূক আছে। তারপর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় পাইয়োনীয়ার ফিল্মসের সবাক চিত্র "মা" সমগ্রভাবে সাফল্যমণ্ডিত না হলেও ব্রজরাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী কাননের অসামান্য অভিনয়-চাতুর্যের জন্যে চিত্রামোদী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল।

এম-কে-জি প্রোডাকসন প্রাঃ লিমিটেডের নিবেদন "মা" দ্বিতীয় সবাক চিত্ররূপ। যতদূর সম্ভব মূল উপন্যাসের অনুসরণ করে মণি বর্মা এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। এবং ছবির শেষাংশকে কারুণ্যে ভরিয়ে দেবার জন্যে মুমূর্ষু মনোরমার মৃত্যু ঘটিয়ে তার দাহকার্য পর্যন্ত সম্পাদন করেছেন। অরবিন্দ চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ব্রজরাণীর চরিত্রের সপত্নীর প্রতি বৈরীভাব এবং সন্তানহীনতার জ্বালা

অগ্রদূত পরিচালিত তারাশঙ্করের 'উত্তরায়ণ' চিত্রে সুপ্রিয়া, উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

থেকে ঘটনাপরম্পরায় অপরিচিত অজিতের সান্নিধ্যে মাতৃভাবের উন্মেষ এবং তারপর ধীরে ধীরে আমূল চারিত্রিক পরিবর্তনের ফলে জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে পূর্ণ মর্যাদাদান ও সপত্নীপুত্র অজিতকে নিজ সন্তানজ্ঞানে বক্ষে ধারণ করে মাতৃহৃদয়ের পিপাসার নিবৃত্তি-সাধন—সমস্তই এই চিত্রনাট্যে বিধৃত হয়েছে। এবং বিরাটকায় উপন্যাসের 'কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা রাখি' করতে গিয়ে চিত্রনাট্যটি যথেষ্টই দীর্ঘ হতে বাধ্য হয়েছে। এবং তার ওপর সম্ভবতঃ দর্শকচিত্তবিনোদন ও কিছু নিশ্বাস ফেলবার জায়গা দেবার জন্যে স্থানে অস্থানে গানের সমাবেশ করায় চিত্রনাট্যটি আরও দীর্ঘায়ত হয়েছে।

পরিচালক চিত্ত বসু "মা"-র বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন দৃশ্য-নির্মাণে অতি-নাটকীয়তা বা মেলোড্রামার আশ্রয় নিয়েছেন। এমন কি, শ্মশানের দৃশ্যে স্বাভাবিকভাবে ব্রজরাণীকে শোকাতুর অজিতের সান্ত্বনা-দায়িনীরূপে প্রতিষ্ঠিত না করে দু'জনকে চিতার দু'পাশে দাঁড় করিয়েছেন এবং পরে ব্রজরাণীকে ধীর পদক্ষেপে অজিতের নিকটবর্তিনী করে বারংবার 'অজু' সম্বোধনের পর অজিতের মুখ দিয়ে "মা" বলিয়ে উভয়ের মিলনে ছবির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। মনে হয়, ব্রজরাণীর মধ্যে মাতৃহৃদয়ের উন্মেষের ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি বাস্তবধর্মী চিত্র-গঠনের সুযোগ ছিল অনুরূপা দেবীর "মা"-এর বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে। অবশ্য পরীক্ষানিরীক্ষার দুরূহ পথে না গিয়ে দর্শকসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী চিত্রনির্মাণে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা

অধিকতর প্রশস্ত এবং চিত্ত বসু বুদ্ধিমানের মত সেইপথই অবলম্বন করেছেন।

ছবিতে চিত্রগ্রহণ এবং শব্দধারণের কাজে সুহৃদ ঘোষ এবং বাণী দত্ত যথারীতি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। উন্মত্ত অশ্বযুগলবাহিত গাড়ীর দুর্ঘটনার দৃশ্য যে-অপরূপ কৌশলে চিত্রিত হয়েছে, তা বহুদিন স্মরণ রাখার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক রবীন দাসের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। দৃশ্যপটরচনায় কার্তিক বসু যথেষ্ট পরিশ্রম করে সুফল লাভ করেছেন। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আবহসঙ্গীত নাট্যমুহূর্তরচনায় অত্যন্ত সাহায্য করেছে। কিন্তু গানগুলি সুগীত হলেও সুপ্রযুক্ত নয় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অবান্তর বলে মনে হয়েছে।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই অরবিন্দের ভূমিকায় বিকাশ রায়ের অসামান্য নাট্যনৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি অরবিন্দ চরিত্রের মর্মস্থলে পৌঁছেছেন এবং তাঁর হৃদয়বেদনা, সংস্কার ও সহজাত হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব প্রভৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন অবলীলাক্রমে। লাঞ্ছিতা, নিগৃহীতা, পতিপরায়ণা বধূ এবং স্নেহময়ী উচ্চাদর্শপরায়ণা মাতা—এই উভয় রূপকেই সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন দীপ্তি রায়। দর্শক-সহানুভূতি সহজেই তাঁর দিকে প্রসারিত হবে। ব্রজরাণীর কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন সন্ধ্যারাণী।

"অগ্নিবন্যা" চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও পদ্মা দেবী

তিনি এমনই একজন অভিনেত্রী, যাঁর মধ্যে কর্কশতা, ক্রূরতা, কাঠিন্য শোভা পায় না। সেই কারণে ব্রজরাণীর মনের ঈর্ষা, জ্বালা এবং পরুষভাব তাঁকে ফোটাতে হয়েছে অত্যন্ত চেষ্টা করে। কিন্তু ব্রজরাণী চরিত্রে যেইমাত্র কোমলতা স্পর্শ করল, তার হৃদয়ের কোমলবৃত্তি যখন ধীরে ধীরে বিকশিত হতে লাগল, তখন সন্ধ্যারাণী যেন নিজেকে ফিরে পেলেন এবং দর্শকও তাদের চিরচেনা সন্ধ্যারাণীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বালক অজিতের বেশে পার্থ এবং কিশোর অজিতের বেশে বাবলু— দুজনেই সুন্দর। তবে বাবলুকে বেশী করে লোকের মনে ধরবে, কারণ কাহিনী তাকে নাট্যনৈপুণ্য দেখাবার বেশী সুযোগ দিয়েছে। ছোট্ট, মিষ্টি চরিত্র শরৎশশী—এই চরিত্রে অনুভা গুপ্ত স্বচ্ছন্দে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, যেমন করবেন তাঁর স্ত্রীসর্বস্ব স্বামীর ভূমিকায় অনাড়ম্বর অভিনয়ে অসিতবরণ। অন্যান্য ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, সন্তোষ সিংহ, নরেশ মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা, সীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন।

এম-কে-জি প্রোডাকসনের "মা" দর্শকসাধারণকে সমগ্রভাবে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

"শিউলিবাড়ি" চিত্রে উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী

সন্ধ্যারাগ : জওলা প্রোডাকসনের নিবেদন; ১১,৯০৩ ফুট দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কঙ্কাল'; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : জীবন গঙ্গোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবিশঙ্কর; চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত; শব্দধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : কমল গঙ্গোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশ : প্রসাদ মিত্র; রূপায়ণ : অসিতবরণ, নির্মলকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, কালী সরকার, হরিধন হরিমোহন, সমর চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী ঘোষ, রেণুকা, রাজলক্ষ্মী, কৃষ্ণা, মন্দিরা প্রভৃতি। ইস্টার্ণ ফিল্ম ক্র্যাফ্‌ট্‌স-এর পরিবেশনায় গেল ১৭ই থেকে শ্রী, ইন্দিরা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

আজ থেকে ৭০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ "কঙ্কাল" নামে যে-ছোট গল্প লেখেন, গল্পগুচ্ছের ভিতরে তা' সাড়ে ছয় পাতার বেশী স্থান অধিকার করে নেই। সেই ছোট্ট, অতিপ্রাকৃত, বিয়োগাত্মক গল্পটিকে আশ্রয় করে "সন্ধ্যারাগ" ছবিখানি গড়ে উঠেছে।

একদা যে তিনটি বাল্যসংগী একটি আস্ত নরকঙ্কালের হাড় থেকে অস্থিবিদ্যা শেখবার চেন্টা করেছিল, তাদেরই মধ্যে একজন বহুকাল পরে রাত্রিকালে সেই নরকঙ্কালবিলম্বিত ঘরের পাশে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে বাধ্য হয়ে ঐ কঙ্কালের জীবিতাবস্থার কথা মনে মনে আলোচনা করতে গিয়ে যেন এক অশরীরীর সম্মুখীন হয় এবং ঐ অশরীরী নারীর জীবন-কাহিনীই কঙ্কালের মধ্যে বিধৃত। নিজের জীবনকাহিনী বলতে গিয়ে মেয়েটি বারে বারে বলেছে, সে ছিল অপরূপ সুন্দরী, যে নিজের সুগঠিত হাত দু'খানি দেখে মনে করত, এই হাত "পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে।"

ছোট্ট গল্পটিকে পর্দায় পূর্ণ দীর্ঘ কাহিনীচিত্রে রূপান্তরিত করবার জন্যে চিত্রনাট্যকার (এবং পরিচালকও বটে) জীবন গঙ্গোপাধ্যায় কিছু বা মূল গল্পের ইঙ্গিতগুলির সাহায্যে আবার কিছুবা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ঘটনার মালা গেঁথেছেন। অন্ধকার রাত্রে ট্রেণ ফেল হয়ে একরাত্রির জন্যে নিজেদের পরিত্যক্ত ভিটেয় মানসের বাস করতে আসা, পরলোকগত সেজকাকার সংগে মানসের চেহারার মিল, অশরীরীর আবির্ভাবের আগে ঝড়-বৃষ্টির সাহায্যে অতিপ্রাকৃত আবহসৃষ্টি, অশরীরীর জীবিতাবস্থায় বালিকা-বধূরূপে খেলাধূলা এবং সেইজন্যে শ্বশুড়বাড়ীতে নিগ্রহ ইত্যাদি কাল্পনিক ঘটনা মূল বিষয়বস্তুর সংগে সুন্দরভাবে একাত্ম হয়ে উঠেছে। কিন্তু যেখানে বালবিধবা নায়িকা দাদার ডাক্তার-বন্ধুর সংগে মনের দিক দিয়ে ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে এবং ডাক্তার শশিশেখর (শেখর) বিবাহ করতে যাচ্ছে শুনে নিজে হাতে বিষমিশ্রিত মদ তাকে খেতে দিয়ে নিজে বাসরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বিষপানে নিজের জীবনাবসান ঘটাল, সেখানে চিত্রনাট্যকার গল্পের দাবিকে ঘটনাসংস্থাপন বা গতি—কোনো দিক দিয়েই মেটাতে পারেননি। যে মুন্সিয়ানার গুণে চিত্রটি একটি মহৎ সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হতে পারত, এই অংশে তার যেন সমূহ অভাবই লক্ষ্য করলুম।

পরিচালকরূপে জীবন গঙ্গোপাধ্যায় ছবির প্রথমার্ধে যেমন স্বচ্ছন্দে সুন্দর কাজ করেছেন, দ্বিতীয়ার্ধেও তেমন নৈপুণ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখাতে পারেননি। পাহাড় চূড়ায় দণ্ডায়মানা নায়িকা বকুলকে ডাক্তার শশিশেখরের প্রথমে মহীয়সী রমণীরূপে দেখতে পাওয়ার দৃশ্য যেমন প্রশংসা দাবি করবে, তেমনি বিপরীতভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে অসুস্থা বকুলের নাড়ী দেখার দৃশ্যটি। ছবিটি শেষার্ধে এমনই মন্থর গতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে যে, মনে হয়, ছবিটি আর চলছে না—একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—এ বিষয়ে সম্পাদকের দায়িত্বও অল্প নয়।

অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত। ছবির অতিপ্রাকৃত রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ক্যামেরা সংস্থাপন এবং আলোছায়ার খেলার মাধ্যমে। বহির্দৃশ্যগুলি ছবির বিশিষ্ট সম্পদ হতে পেরেছে। শব্দগ্রহণে, বিশেষ ক'রে নানা রকম আবহসৃষ্টিকারী শব্দগ্রহণে অতুল চট্টোপাধ্যায় প্রচুর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসাদ মিত্র গল্পের চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে মিটিয়েছেন তাঁর দৃশ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে। ছবিটিতে তিনখানি রবীন্দ্রসংগীত আছে। প্রত্যেকটিই সুগীত, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম গান "হারে রে রে" বকুলের মানসলোকের প্রতিধ্বনি হলেও বাড়ীর মধ্যে রাত্রিবেলা উচ্চকন্ঠে গাইবার উপযোগী নয়। এবং তেমনই "বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা"—মদের পাত্র সামনে রেখে নায়িকার দাদা ভোলানাথের মুখে এই গান অত্যন্ত অশোভন।

নবাগতা নায়িকা কল্যাণী ঘোষকে বিধবা বকুলরূপে মানিয়েছে চমৎকার এবং তাঁর বাচনহীন অভিব্যক্তিগুলিও সুন্দর। মাত্র চাউনি দিয়ে তিনি সুন্দর ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর বাচনভঙ্গী আড়ষ্ট ও কৃত্রিমতাপূর্ণ এবং সেই কারণেই শ্রুতিসুখকর নয়। বালিকা-বকুলরূপে কৃষ্ণা ঢের সহজ কথাবার্তা বলেছে। নায়িকার দুর্ভাগ্যের সংগে সহানুভূতিসম্পন্ন ভ্রাতা ভোলানাথের ভূমিকায় অসিতবরণ তাঁর স্বভাবসুলভ স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন। মানসরূপী নির্মলকুমার অতিপ্রাকৃত পরিবেশে তাঁর প্রতিক্রিয়াগুলি সুচারুরূপে পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু ডাক্তার শশিশেখর রূপে

বি আর চোপরার 'কানুন' চিত্রে রাজেন্দ্রকুমার ও নন্দা

তাঁর অভিনয় তেমন হৃদয়গ্রাহী হতে পায়নি। কিশোর-ভোলানাথের ভূমিকায় সমর চট্টোপাধ্যায় সুযোগমত সুঅভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় কালী সরকার (নিশি), হরিধন মুখোপাধ্যায় (শ্বশুর), হরিমোহন বসু (নায়েব), রেণুকা (শাশুড়ী), সন্ধ্যাদেবী (পিসিমা) এবং রাজলক্ষ্মী (গ্রাম্য প্রতিবেশী) যথাযথ সুঅভিনয় করেছেন।

"সন্ধ্যারাগ" একটি মহৎ শিল্পসৃষ্টি হতে গিয়েও হ'তে পারেনি।

বিবিধ সংবাদ

পাসপোর্ট ও সৌগন্ধ :

এ সপ্তাহে মাত্র এই দুটি হিন্দি চিত্র মুক্তিলাভ করছে। প্রথম চিত্র—নুতন ফিল্মসের রসহ্যঘন সঙ্গীতমুখর রোমান্টিক চিত্র 'পাসপোর্ট'। পরিচালনা: প্রমোদ চক্রবর্তী, সঙ্গীত-পরিচালনা: কল্যাণজী আনন্দজী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রছেন মধুবালা, প্রদীপকুমার, নাজির হোসেন, কে এন সিং, হেলেন প্রভৃতি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জ্যোতি এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে চিত্রটি প্রদর্শিত হবে। দ্বিতীয় চিত্র—দক্ষিণ ভারতের হরি হরণ ফিল্মসের 'সৌগন্ধ'। পরিচালনা: জি কে রামু, সঙ্গীত: দিলীপ। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন—অঞ্জলি দেবী, জেমিনী গণেশ, কমলা লক্ষ্মণম্ এবং এস সরোজা প্রভৃতি। নিউ সিনেমা, কৃষ্ণা, ম্যাজেষ্টিক, প্রিয়া, চিত্রা, ছায়া, ভবানী প্রভৃতি চিত্রগৃহে এই চিত্রটি মুক্তি পাবে।

পোলিশ চলচ্চিত্রোৎসব : গেল হপ্তার প্রধান ঘটনা প্রিয়া সিনেমায় শনিবার, ১৮ই নভেম্বর থেকে সুরু করে রবিবার বাদে পাঁচ দিন ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে পোল্যাণ্ডে নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ ছবির প্রদর্শনী। এই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি দেশকে যত ঘনিষ্ঠভাবে জানা যায়, তেমন আর অন্য কিছু দ্বারাই সম্ভব নয়। পোল্যাণ্ডের সরকার ও জনসাধারণের সঙ্গে ভারত সরকার ও জনসাধারণের সম্বন্ধ নিবিড় হয়ে উঠবে এই চলচ্চিত্রোৎসবের মারফত। সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে এই উৎসব সম্পন্ন হল। প্রথম দিন ওয়াজ্‌ডা পরিচালিত "আশেস্ অ্যান্ড ডায়ামণ্ডস্" ছবিটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। এর মধ্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা এবং রাজনৈতিকসত্তার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত করুণভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

অনুশীলন সম্প্রদায় :

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুশীলন সম্প্রদায় কবির বহুখ্যাত গল্প "কাবুলিওয়ালা"র নাট্যরূপ পরিবেশন করবেন আসছে ২৮-এ নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। "কাবুলিওয়ালা"র নাট্যরূপ দিয়েছেন কানাই বসু। পরিচালনা, দৃশ্যরচনা এবং আলোকসম্পাতের ভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে মমতাজ আহমেদ খাঁ, খালেদ চৌধুরী এবং তাপস সেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, মমতাজ আহমেদ খাঁ, সীতা মুখোপাধ্যায়, শাশ্বতী রায়, বুলু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

●

লোটাস অ্যামেচার ক্লাব :

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আগত বিদেশী প্রতিনিধিরা গেল ৫ই নভেম্বর লোটাস অ্যামেচার ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হয়ে অরুণা উত্তমসিং এবং গোপাল ট্যাণ্ডনের ক্ল্যাসিক্যাল নাচ দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। ক্লাবের সভাপতি আর ডি, বানশাল অতিথিবৃন্দকে একে একে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

●

শ্রীএন্, সি, এ, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ

শ্রীএন্, সি, এ, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিমিটেডের হয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজের মৌলিক রচনা অবলম্বনে "কাঞ্চনজঙ্ঘা" নামে যে-ছবি করছেন দার্জিলিং শহরকে কেন্দ্র করে, তার দুটি বৈদেশিক চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন স্থানীয় সেন্ট জোসেফ কলেজের দুজন ছাত্রী—বিদ্যা সিংহ ও নীলিমা রায়-চৌধুরী। এছাড়া রয়েছেন ছবি বিশ্বাস (দার্জিলিংয়ে অবসর যাপনের জন্যে আগত একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের পিতা), করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (মা), অনুভা গুপ্তা (বড় মেয়ে), অলকানন্দা রায় (ছোট মেয়ে), অনিল চট্টোপাধ্যায় (ছেলে), সুব্রত সেন (বড় জামাই), পাঁচ বছরের মেয়ে ইন্দ্রাণী সিংহ ও পাহাড়ী সান্যাল (মামা)। এ ছাড়াও পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়েও যাঁরা নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন এস. বিশ্বনাথন্ এবং নবাগত অরুণ মুখোপাধ্যায়। ইস্টম্যান কলারে সুব্রত মিত্র দ্বারা তোলা ছবিটি এরই মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী এগিয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে, নভেম্বরের মধ্যেই ছবি তোলার কাজ সম্পূর্ণ হবে।

সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেবের সম্বর্ধনা :

গেল ১১ই নভেম্বর, শনিবার যাদবপুরে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংসদ তাঁদের অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষ্যে সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বিমল রায় এবং বিশিষ্ট শিল্পীরূপে উপস্থিত থাকেন নির্মল ঘোষ। শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে তিলক, মাল্য ও মানপত্রাদি দানের পর সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। সবশেষে খেয়াল ও ঠুংরি পরিবেশন করেন নির্মল ঘোষ।

●

ব্ল্যাক টাইট্‌স্‌ :

ফরাসী নর্তক ও নৃত্যরচয়িতা রোলাণ্ড পেটিটের সহযোগিতায় পরিচালক টেরেন্স ইয়াং সুপার টেক্‌নিরামা ৭০ এবং টেকনিকলারে "ব্ল্যাক টাইট্‌স্‌" নামে যে ব্যালে ফিল্ম সৃষ্টি করেছেন, তার প্রথম প্রদর্শনী হয়ে গেল লণ্ডন কোলিসিয়ম থিয়েটারে।

●

উত্তর-সরণী :

কিছুদিন আগে রঙমহলে উত্তর-সরণী গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। শচীন ঘোষ প্রদত্ত নাট্যরূপটির পরিচালনা করেন প্রেমাংশু বসু। শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মিলিত নৈপুণ্যে, অবহ-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, সার্থক নাট্যরূপায়ণে এবং সুপরিচালনা গুণে অভিনয়টি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছিল।

●

ম্যাক্‌নীল অ্যাণ্ড বেরী :

গেল ১০ই নভেম্বর রঙমহল মঞ্চে ম্যাক্‌নীল অ্যাণ্ড বেরী লিমিটেডের অর্থবিভাগ (ক্যাশ ডিপার্টমেন্ট) অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" অভিনয় করেন।

●

একটি রুশ চলচ্চিত্র :

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সৌজন্যে সংপ্রতি আমরা একটি বাস্তবধর্মী অথচ কাব্যসুষমায় রুশ চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। ৮০৩৭ ফুট দীর্ঘ, ৯ রীলে সম্পূর্ণ, "ব্যালাড অব এ সোলজার" নামক এই চলচ্চিত্রটি পরিচালক গ্রীগরী চুক্‌রাই-এর মননশীলতার গুণে এমনই একটি হৃদয়গ্রাহী রসোত্তীর্ণ শিল্পবস্তুর রূপ পরিগ্রহ করেছে, যা দর্শককে আনন্দে উদ্বেলিত করে তোলে। শোনা যাচ্ছে, ছবিটির সাধারণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিখ্যাত পোলিশ ছবি 'অ্যাশেজ এণ্ড ডায়মণ্ড'এর একটি দৃশ্য। প্রিয়া চিত্রগৃহে পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন হয় এই ছবিটি দিয়ে।

●

খগেন রায়ের পরিচালনায় শ্রীচিত্রের "অবশেষে"র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, লিলি চক্রবর্তী, জহর রায়, কাজরী গুহ, রেনুকা রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। সুরারোপে সুশান্ত লাহিড়ী। ছবিটি মুক্তি-প্রতিক্ষায়।

●

তারু মুখোপাধ্যায় যিনি "ইঙ্গিত" ছবিতে নতুন কিছু করবার চেষ্টা করেছিলেন, তার নতুন বই হচ্ছে "সৎভাই"। কাহিনী, রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি নিজেই। শিল্পী-তালিকায় আছেন, সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ, অসীমকুমার, কমল মিত্র, লিলি চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, সরযূবালা, জহর রায়, অনুপকুমার প্রভৃতি। শীঘ্রই ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিবেন বলে জানা গেছে।

●

২৫শে নভেম্বর বেলা ২-৩০ মিঃ বিশ্বরূপা মঞ্চে গিরিশ নাট্যোৎসবে শিল্পশ্রীর সভ্যবৃন্দ কর্তৃক "ক্ষত্রবীর" গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। নাট্য ও সংগীত পরিচালনা করবেন যথাক্রমে সুধামাধব চট্টোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র সরকার।

খেলাধূলা

দর্শক

॥ ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড ॥

ইংল্যাণ্ড : ৫০০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ব্যারিংটন ১৫১ নট আউট, ডেক্সটার ৮৫, রিচার্ডসন ৭১, পুলার ৮৩ রান। রঞ্জনে ৭৬ রানে ৪ এবং বোরদে ৯০ রানে ৩ এবং দুরাণী ৯১ রানে ১টা উইকেট)।

ও ১৮৪ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রিচার্ডসন ৪৩, ব্যারিংটন ৫২ এবং লক ২২ রান ক'রে নট-আউট। দুরাণী ২৮ রানে ২, দেশাই ১৯ রানে ১ এবং রঞ্জনে ৫৩ রানে ১ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৩৯০ রান (সেলিম দুরাণী ৭১, বোরদে ৬৯, মঞ্জরেকার ৬৮, জয়সীমা ৫৬ এবং কৃপাল সিং ৩৮ রান নট-আউট। লক ৭৪ রানে ৪, এ্যালেন ৫৪ রানে ৩, ডেক্সটার, স্মিথ এবং বারবার ১টা ক'রে উইকেট।

ও ১৮০ রান (৫ উইকেট পড়ে। জয়সীমা ৫১, মঞ্জরেকার ৮৪ রান। রিচার্ডসন ১০ রানে ২, ডি স্মিথ ১৮ রানে ১, এম স্মিথ ১০ রানে ১ এবং লক্ ৩৩ রানে ১ উইকেট)।

১ম দিন (১১ই নভেম্বর) : ইংল্যাণ্ড ২৮৮ (৩ উইকেটে। রিচার্ডসন ৭১, পুলার ৮৩, জে কে স্মিথ ৩৬; ব্যারিংটন ৫২ এবং ডেক্সটার ৩০ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। বোরদে ৬১ রানে ২ এবং রঞ্জনে ৫১ রানে ১টা উইকেট পান)।

২য় দিন (১২ই নভেম্বর) : ৫০০ রানে (৮ উইকেটে) ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। ভারতবর্ষ (১ম ইনিংস) : ৪২ রান (কোন উইকেট না পড়ে। কণ্ট্রাক্টর ৯ এবং মঞ্জরেকার ১৮ রান করে নট আউট, জয়সীমা ৪ রান করে অবসর গ্রহণ করেন)।

সেলিম দুরাণী

৩য় দিন (১৪ই নভেম্বর) : ভারতবর্ষ : ২৫৫ রান (৫ উইকেট পড়ে। বোরদে ৪২ রান এবং দুরাণী ৪১ রান ক'রে নট-আউট থাকেন)।

৪র্থ দিন (১৫ই নভেম্বর) : ৩৯০ রানে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। ইংল্যাণ্ড : ১২৭ রান (৩ উইকেট পড়ে। উইকেটে নট-আউট থাকেন ব্যারিংটন এবং ডেক্সটার যথাক্রমে ৩৪ ও ১৬ রান ক'রে)।

৫ম দিন (১৬ই নভেম্বর) : ১৮৪ রানে (৫ই উইকেটে) ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের সমাপ্তি। ভারতবর্ষ : ১৮০ রান (৫ উইকেটে)।

বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত মোট ১১টি সরকারী টেস্ট খেলার মধ্যে খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ৮টি খেলা ড্র এবং খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি মাত্র ৩টি খেলায় (১৯৩৩—৩৪ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে, পাকিস্থানের বিপক্ষে ১৯৫২—৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ১০ উইকেটে এবং ১৯৫৫—৫৬ সালের টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ২৭ রানে জয়লাভ করে)। এমনকি, শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলও এখানে যে তিনটি খেলা হয়, তার কোনটিতেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি করতে পারেনি। তাই বোম্বাইয়ের মাটি নিয়ে ক্রিকেট খেলার উদ্যোক্তাদের আজ বড় দুঃশ্চিন্তা—বিশেষ করে ভারত সফরকারী বৈদেশিক ক্রিকেট দলের। ক্রিকেট খেলার ভাষায় বোম্বাইয়ের পীচ 'স্পোর্টিং পীচ' নয়। এখানের পীচে ব্যাটসম্যানদের স্বচ্ছন্দে প্রচুর রান করা সম্ভব, কিন্তু বোলারদের উইকেট পাওয়া সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য ব্যাপার। ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে শক্তিশালী দলকেও এখানে হতাশ হ'তে হয়। একপক্ষ ব্যাটিংয়ে খুব দুর্বল না হলে অপরপক্ষের শক্তিশালী বোলাররা তাঁদের সুনাম বজায় রাখতে পারেন না। তাই ক্রিকেট খেলায় দলের শক্তি পরীক্ষার স্থান হিসাবে বোম্বাইয়ের যোগ্যতা আছে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বোম্বাইয়ের পীচের বর্তমান আচরণ যদি সংশোধন করা না হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত সফরকারী বৈদেশিক ক্রিকেট দল বোম্বাইয়ের মাটিতে টেস্ট খেলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, এমন আশংকা কোন কোন মহল থেকে করা হয়েছে।

টনিলক

মঞ্জরেকার

ভারতবর্ষের খেলার বিপক্ষে সব থেকে বড় অভিযোগ, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে

বোম্বাই ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম টেষ্টের চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে সেলিম দুরানী শূন্য রানে মাইক স্মিথকে বোল্ড আউট করেছেন।

বোম্বাইয়ের প্রথম টেষ্ট খেলায় তারা খেলার মত খেলা খেলেনি, জয়লাভের মত খেলা তো দূরের কথা। খেলা ড্র করে ভারতবর্ষ পরাজয়ের কলঙ্ক কপালে নেয়নি—এইটাই যদি আমাদের কাছে বড় সান্ত্বনা হয়, তাহলে এখানে ক্রিকেট খেলার অপমৃত্যু ঘটতে বেশী সময় নেই বুঝতে হবে।

ভারতবর্ষের খেলা শ্রোতা এবং দর্শক সাধারণের মধ্যে কোন উত্তেজনা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। খেলা দেখে এবং খেলার বিবরণ শুনে লোকে ক্লান্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে বিরক্তও। খেলাধুলার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে এইখানেই। এই টেষ্ট খেলার আকর্ষণ শুধু এই দুই দেশের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার অনুরাগী মাত্রেই এই খেলার ধারা এবং ফলাফলের জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন। খেলার গতি এবং ফলাফল তাঁদের খুবই হতাশ করেছে।

১৯৬১ সালেরই ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে অস্ট্রেলিয়া—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এই টেস্ট সিরিজে 'রাবার' পায়। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার জয় ২, হার ১, ড্র ১ এবং 'টাই' ১। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরাজয় কি কোন অগৌরবের হয়েছিল?

এই দুটি দেশ ক্রিকেট খেলার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে জয়-পরাজয়ের বহু উর্ধ্বে খেলার স্বার্থকেই স্থান দিয়েছিল। তাদের আক্রমণাত্মক খেলায় ক্রিকেট খেলা উপভোগ্য হয়েছিল—খেলায় উত্তেজনা এবং দুঃসাহসিক অভিযানের অভাব ছিল না। রমণীয় ক্রিকেটের সুস্বাদ দর্শক সাধারণ আকণ্ঠ পান ক'রে ধন্য হয়েছিলেন। সেই সুস্বাদ থেকে শ্রোতা এবং পাঠক সমাজও বঞ্চিত হননি।

তারপরও আছে মাত্র কয়েক মাস আগের ইংল্যাণ্ড—অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে টেস্ট সিরিজে যে 'রাবার' লাভ করলো তা এই আক্রমণাত্মক খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে।

ক্রিকেট খেলায় এই নবজাগরণের দ্যুতিতে অতি রক্ষণশীল ইংলিশ ক্রিকেটেরও কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা ভেঙেছে। ক্রিকেট খেলাকে উজ্জ্বলতায়, রমণীয়তায় এবং প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ক'রে উপভোগ করতে তারাও যে কম আগ্রহশীল নয় তার প্রমাণ দিয়েছে ভারত সফরের তিনটি খেলায়—পশ্চিমাঞ্চল দল ও বোম্বাই দলের সঙ্গে তিন দিনের খেলায় এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট ম্যাচে। বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট খেলার শেষ দিনে খেলা ভাঙ্গার ২৪৫ মিনিট আগে, ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার তাঁর দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার (৫ উইকেটে ১৮৪ রাণের মাথায়) সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে যে 'চ্যালেঞ্জ' দেন ভারতবর্ষ সোজাসুজি তা প্রত্যাখ্যান করে। ভারতীয় ক্রিকেটের এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে যথেষ্ট বিস্ময় এবং হতাশার সৃষ্টি করেছে। ক্রিকেট খেলার দুঃসাহসিক অভিযানে ভারতবর্ষের এই নির্বাক দর্শকের ভূমিকা আগামী দিনের ভারতীয় ক্রিকেটকে দূর ব্যবধানে সরিয়ে দিল।

তৃতীয় দিনের খেলাতে ভারতবর্ষ ৪টে উইকেট হারিয়ে ২১৩ রান করে—মোট রান দাঁড়ায় ২৫৫, ৪ উইকেট পড়ে। দ্বিতীয় দিনে এক ঘণ্টার খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ভারতবর্ষ ৪২ রান শোধ দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ণে খেলোয়াড় কণ্ট্রাক্টর এবং মঞ্জরেকার অত্যন্ত মন্থর গতিতে খেলতে থাকেন। তাঁদের এই আত্মরক্ষামূলক খেলা দর্শক সাধারণের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দলের ৮০ রানে কণ্ট্রাক্টর নিজস্ব ১৯ রান ক'রে এ্যালেনের বলে বোল্ড-আউট হ'ন। তৃতীয় দিনের ৮০ মিনিটের খেলায় কণ্ট্রাক্টর মাত্র ১০ রান করেছিলেন। মঞ্জরেকারের সঙ্গে ২য় উইকেটে জয়সীমা পুনরায় খেলতে নামেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ব্রাউনের বলে আহত হয়ে জয়সীমা অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁর ৪ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় উইকেটে মঞ্জরেকার এবং জয়সীমা জুটি বেঁধে খেলার চেহারা কিছুটা পালটে দেন। লাঞ্চের সময় এক উইকেট পড়ে রান দাঁড়ায় ৯৯—জয়সীমা ১৬ রান এবং মঞ্জরেকার ৫২ রান।

লাঞ্চের বিরতির পরের খেলাতেও আত্মরক্ষামূলক নীতির কোন পরিবর্তন হ'ল না; দুজনেই রান করার চেয়ে উইকেট আঁকড়ে খেলতে থাকেন; কিন্তু এত করেও উইকেট বাঁচানো গেল না, দলের ১২১ রানে মঞ্জরেকারকে বিদায় নিতে হ'ল। মঞ্জরেকার ৬৮ রান ক'রে লকের হাতে ধরা দিলেন। আর মাত্র

২ রান করলেই মঞ্জরেকারের টেস্ট খেলায় ২০০০ রান পূর্ণ হ'ত। মঞ্জরেকারের ৬৮ রান করতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। তৃতীয় উইকেটে জয়সীমার সংগে খেলতে নামেন মিলখা সিং। দলের ১৪০ রানের মাথায় মিলখা সিং ক্রস ব্যাট চালিয়ে এ্যালেনের বল মেরে ব্রাউনের হাতে ক্যাচ দেন। জয়সীমার সংগে এরপর খেলতে নামেন বোরদে। আধ ঘণ্টার খেলায় দলের মাত্র ৪ রান দেখে দর্শকেরা খেলোয়াড়দের প্রতি বিদ্রূপ ধ্বনি দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। অচিরেই ফল পাওয়া গেল। বোরদে খেলার এই একঘেয়েমি থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। ২৭৫ মিনিটের খেলায় রান দাঁড়ায় ১৫০। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান হ'ল ১৭৩, উইকেটে তখন জয়সীমা (৫৬ রান) এবং বোরদে (১৫ রান)।

ডেক্সটার চা-পানের বিরতির পরই আক্রমণাত্মক খেলায় মাঠ সাজান। হাতে-নাতে ফল পাওয়া যায়। ডেক্সটার তার ৫ম বলে জয়সীমার উইকেট পান; জয়সীমা তাঁর ৫৬ রানে ১১টা বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। ন্যাটা ব্যাটসম্যান সেলিম দুরাণী ৫ম উইকেটে বোরদের খেলার সংগী হ'ন। এই পঞ্চম উইকেটের জুটি এইদিন নট-আউট থেকে যায়। এইদিনের ৮৫ মিনিটের খেলায় ৫ম উইকেটের জুটিতে ৮২ রান যোগ হয়। রান দাঁড়ায় ২৫৫, ৪টে উইকেট পড়ে। ফলে ফলো-অনের হাত থেকে ছাড়ান পেতে ভারতবর্ষের তখনও ৪৬ রানের প্রয়োজন ছিল।

খেলার চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৯০ রানে শেষ হ'লে ইংলণ্ড ১১০ রানে এগিয়ে যায়। এইদিন বোরদে এবং দুরাণীর খেলা দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়—বিশেষ ক'রে দুরাণীর নানা ভংগীর মার। তাঁর খেলার কথা অনেক দিন ভারতীয় টেস্ট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে দুরাণী এবং বোরদে ১৫৯ মিনিটে দলের ১৪২ রান তুলে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ৫ম উইকেটের জুটির রেকর্ড করেন। পূর্বে রেকর্ড ছিল ৮৯ রান (মঞ্জরেকার এবং কৃপাল সিং, লর্ডস, ১৯৫৯)। এই নিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ৬টি উইকেটের জুটিতে শত রান করলো—১ম উইকেটের জুটিতে ২০৩ রান (বিজয় মার্চেণ্ট এবং মুস্তাক আলী, ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৩৬), ২য় উইকেটের জুটিতে ১০৯ রান (কন্ট্রাক্টর এবং আব্বাসআলী বেগ, ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৫৯), ৩য় উইকেটের জুটিতে ২১১ রান (বিজয় মার্চেণ্ট এবং বিজয় হাজারে, নিউদিল্লী, ১৯৫১—৫২, (২) ভিনু মানকড় এবং বিজয় হাজারে, লর্ডস, ১৯৫২), ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ২২২ রান (বিজয় হাজারে এবং মঞ্জরেকার, লিডস, ১৯৫২), ৫ম উইকেটের জুটিতে ১৪২ রান (বোরদে এবং দুরাণী, বোম্বাই, ১৯৬১) এবং ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে

জয়সিমা

১০৫ রান (বিজয় হাজারে এবং ডি জি ফাদকার, লিডস, ১৯৫২)।

দুরাণী তাঁর ৭১ রানে ১০টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। ১ম ইনিংসে তাঁর ৭১ রানই দলের সর্বোচ্চ রান।

দলের ৩১৫ রানে দুরাণী এবং ৩৪১ রানে বোরদে তাঁর নিজস্ব ৬৯ রানে আউট হ'ন।

লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৩৪২, ৬টা উইকেটে পড়ে। উইকেটে ছিলেন কৃপাল সিং এবং কুন্দরাম। বিরতির পরের খেলায় লক্ তিন ওভার বলে কোন রান না দিয়ে দু'জনকে আউট করেন। কুন্দরামকে আউট করলে লক্ তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ২০০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। আধুনিককালের ক্রিকেট খেলায় লক্ ছাড়া অপর কোন বোলার ২০০০ উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব লাভ করতে পারেননি। দলের ৩৯০ রানে কুমার (১০ম উইকেট) লকের বলে বোল্ড আউট হ'লে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। চতুর্থ দিনের খেলার শেষের দিকে লক ৮ ওভার বলে ৪টে মেডেন নিয়ে মাত্র ১০ রান দিয়ে শেষ চারজন ব্যাটসম্যানকে আউট করেন।

খেলার ৪র্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের ৩টে উইকেট পড়ে ১২৭ রান ওঠে, ১৩০ মিনিটের খেলায়। ইংল্যাণ্ড ২৩৭ রানে এগিয়ে যায়।

খেলার শেষ দিনে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার খেলোয়াড়ের যথার্থ ধর্ম পালন করলেন—৭২ মিনিট খেলার পর দলের ১৮৪ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে দান ছেড়ে দিয়ে। এই ৭২ মিনিটের খেলায় ২টো উইকেট পড়ে ইংল্যাণ্ডের ৫৭ রান ওঠে। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে নট-আউট থেকে যান ব্যারিংটন (৫২ রাণ) এবং টনি লক (২২ রান)। ব্যারিংটনের ১ম ইনিংসের নট-আউট ১৫১ রান এবং ২য় ইনিংসের নট-আউট ৫২ রান টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একটা টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী এবং অর্ধশত রান ক'রে উভয় ইনিংসে নট-আউট থাকার কৃতিত্ব

প্রশান্ত ব্যারিংটনকে নিয়ে মাত্র ছ'জন খেলোয়াড় লাভ করেছেন।

ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর তখন ২৪৫ মিনিট খেলার সময় পড়ে থাকে। ভারতবর্ষ ২৯৪ রান পিছিয়েছিল। ভারতবর্ষকে খেলায় জিততে হ'লে ২৯৫ রান তুলতে হবে এই ২৪৫ মিনিট খেলার সময়ে—অর্থাৎ প্রতি মিনিটে গড়ে ১·২ রান করতে হবে।

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় জয়লাভের কোন চেষ্টাই করেনি। খেলা মাত্র দশ মিনিট হয়েছে; দলের রাণ ৫, কণ্ট্রাক্টর ১ রাণ ক'রেছেন। এই অবস্থায় কণ্ট্রাক্টর স্মিথের বল মেরে বারবারের হাতে 'ক্যাচ' তুলে দিয়ে আউট হন। জয়সীমার সংগে দ্বিতীয় উইকেটে খেলতে নামেন মঞ্জরেকার। লাঞ্চের সময় দলের রান উঠলো ২৬, ১টা উইকেট পড়ে। জয়সীমার তখন রান ১৬ এবং মঞ্জরেকারের ৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকার ২ রান ক'রে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত ২০০০ রান পূর্ণ করেন। এই রান তুলতে তাঁকে ৩৮টি টেস্ট খেলায় নামতে হয়েছে। লাঞ্চের পরের খেলায় জয়সীমা তাঁর ২৮ রানের মাথায় বারবারের বলে ড্রাইভ মারতে গিয়ে বল ফস্কে যান; মারে স্ট্যাম্প ক'রে জয়সীমাকে আউট করতে পারলেন না। আমার পাশের শ্রোতা কণ্ট্রাক্টরের বিদায়-ব্যথা ভুলে গিয়ে মারেকে নিয়ে টিপ্পনী কাটলেন 'রাখে হরি, মারে কে?'

দু' ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষের মাত্র ৯৩ রান স্কোর বোর্ডে ঝুলতে দেখে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক বুঝলেন সোজা আংগুলে ঘি উঠবে না। বারবারকে বসিয়ে তিনি ব্যারিংটনকে বল করতে ডাকলেন। নিয়মিত বোলার বদলের উদ্দেশ্য, ব্যাটসম্যানদের উত্যক্ত করা। ব্যারিংটনের বলে বাউণ্ডারী মেরে মঞ্জরেকার দলের রান একশতের ঘরে তুললেন; তখন খেলা হয়েছে ১২৫ মিনিট।

চা-পানের বিরতি এসে গেল। ১৫৫ মিনিটের খেলায় তখন ভারতবর্ষের রান ১২৮। জয়সীমা ৪৮ এবং মঞ্জরেকার ৭৬ রান ক'রে অপরাজিত।

চা-পানের বিরতির পরের খেলায় দলের ১৩৬ রানের মাথায় জয়সীমা অনে একটা 'ক্যাচ' তুললেন স্মিথের বলে। ২০ গজ দূরে মিড-অনে দাঁড়িয়ে-ছিলেন বারবার, দৌড়ে এসে বলটা লুফলেন। জয়সীমা এবং মঞ্জরেকারের ২য় উইকেটের জুটিতে ১৩১ রান ওঠে ১৫৪ মিনিটের খেলায়। এই ১৩১ রান আবার ২য় উইকেটের জুটিতে নতুন রেকর্ড হ'ল ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায়। ২য় উইকেটের জুটিতে পূর্ব রেকর্ড: ১০৯ রান (কণ্ট্রাক্টর (৫৬) এবং আব্বাসআলী বেগ (১১২), ১ম টেস্টের ২য় ইনিংস, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯)। জয়সীমার বিদায়ের পর মাত্র ৪ রান যোগ হয়ে দলের রান দাঁড়াল ১৪০। আর দলের এই রানের মাথায় লকের বলে মঞ্জরেকার এল-বি-ডবলউ হয়ে বিদায় নিলেন। জয়সীমা এবং মঞ্জরেকার ভারতবর্ষকে খেলা অমীমাংসিত রাখতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিলেন। জয়সীমার তুলনায় মঞ্জরেকার অনেক বেশী ভাল খেলেছিলেন। মঞ্জরেকারের ৮৪ রানে ছিল ৭টা বাউণ্ডারী, জয়সীমার ছিল ৪টে ৫১ রানে। জয়সীমা তাঁর ৫১ রান তুলতে ১৬৭ মিনিট সময় নিয়েছিলেন; কিন্তু মঞ্জরেকার তাঁর ৮৪ রান করে-ছিলেন ১৬৪ মিনিট খেলে। দলের ১৬২ রানের মাথায় ২টো উইকেট পড়ে গেল। রিচার্ডসন পর পর দু'টো ওভারে এই ২টো উইকেট পেলেন, মিলখা সিং এবং সেলিম দুরাণীকে আউট ক'রে। মিলখা সিং এ্যালেনের হাতে 'ক্যাচ' দেন। দুরাণী কোন রান না ক'রেই রিচার্ডসনের বলে তাঁরই হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হ'ন। দুরাণীর বিদায়ে সারা মাঠে বিষাদের ঘন ছায়া নেমে আসে—যে দুরাণী ১ম ইনিংসের খেলায় দলের সর্বোচ্চ ৭১ রান ক'রে দর্শক-সাধারণের চিত্তবিনোদন ক'রেছিলেন তাঁরই কি এই খেলা! টেস্ট ক্রিকেট খেলায় রিচার্ডসনের এই প্রথম অপ্রত্যাশিত সাফল্য। ৬ষ্ঠ উইকেটে বোরদে (১২ রান) এবং কৃপাল সিং (১৩ রান) শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান।

॥ ডুরাণ্ড কাপ ॥

গত বছরের ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার যুগ্ম-বিজয়ী মোহন-বাগান ২—০ গোলে ইলেকট্রিক্যাল এ্যাণ্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেণ্টার দলকে (সেকেন্দ্রাবাদ) পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিনবার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। মোহনবাগান ২য় রাউণ্ডে সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ দলকে ৫—১ গোলে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে ২—১ গোলে মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপকে পরাজিত করে। সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ দলের বিপক্ষে মোহনবাগান দলের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী 'হ্যাট্‌ট্রিক' করেন।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে গত বছরের ডুরাণ্ড কাপের যুগ্ম-বিজয়ী ইস্টবেংগল ক্লাব ১—১ গোলে অন্ধ্র পুলিশের বিপক্ষে খেলাটি ড্র করে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় অন্ধ্র পুলিশ দল ৩—০ গোলে ইস্টবেংগল দলকে পরা-জিত ক'রে ফাইনালে ওঠে।

ইস্টবেংগল ২য় রাউণ্ডে পাঞ্জাব পুলিশকে ৪—২ গোলে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে ৩—১ গোলে গুর্খা ব্রিগেড একাদশ দলকে পরাজিত করে।

অন্ধ্র পুলিশ কোয়ার্টার ফাইনালে ৬—১ গোলে এ বছরের ক'লকাতার প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতার রাণার্স-আপ বি এন আর দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের খেলার ৩৩ মিনিটে পুলিস দল প্রথম গোল দিয়ে বিরতির সময়ে ১—০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার তিন মিনিটে বি এন আর গোলটি শোধ দেয়। খেলার ১৩ মিনিট পর্যন্ত আর কোন গোল হয়নি। খেলার শেষ ১৮ মিনিটে পুলিশ দল ৫টা গোল দিয়ে রেল দলকে নাস্তা-নাবুদ ক'রে তুলে।

অমৃত পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ইস্কন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩২৯	সম্পাদকীয়	
৩৩০	হয়তো বৃথাই (কবিতা)	—শ্রীবিষ্ণু দে
৩৩০	মাটির সাধক হও (কবিতা)	—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক
৩৩১	পূর্বপক্ষ	—শ্রীজৈমিনি
৩৩৩	মহারাজা মান্ধাতা	—শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৩৩৬	সংগীত-বীক্ষণ	—শ্রীআনন্দভৈরব
৩৩৭	রাশিয়ার ডায়েরী (ভ্রমণ-কাহিনী)	—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
৩৪৫	অল্ডাস হাক্সলির সাহিত্য-জিজ্ঞাসা	—শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়
৩৪৭	মতামত	—শ্রীশান্ত রায়
৩৪৮	তেজস্ক্রিয় ভস্মচিন্তা	—শ্রীকণাদ রায়
৩৪৯	মসিরেখা (উপন্যাস)	—শ্রীজরাসন্ধ
৩৫৪	মন্দিরে মন্দিরে : তমলুকের বর্গভীমা	—শ্রীতীর্থঙ্কর

সাঁঝের প্রদীপ ও ঘরের আলো
কিষাণ
হারিকেন লন্ঠনই
সর্ব্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৭৩, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১ ফোন-২২-৬৫৮০

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৮০	সংবাদ-বিচিত্রা	
৩৮১	দেশে-বিদেশে	
৩৮৩	ঘটনা-প্রবাহ	
৩৮৪	সমকালীন সাহিত্য	—শ্রীঅভয়ংকর
৩৮৯	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
৩৯৮	খেলাধূলা	—শ্রীদর্শক

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

অনুষ্টুপ

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩০শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday 1 December, 1961.
40 Naya Paise.

ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে আবার চীনা সৈন্যেরা অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে—এই সংবাদ যতখানি উদ্বেগজনক, তার চেয়েও বোধ করি আরও উদ্বেগজনক ভারত সরকারের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এই হামলা প্রতিরোধ সম্বন্ধে তাঁর দেশবাসীকে কোনো স্পষ্ট কর্মপন্থা বা দৃঢ়নীতির আভাস দিতে পারেন নি। প্রথম চীনা আক্রমণের ঘটনার পর পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারত সরকারের অজ্ঞাতসারে চীনা সৈন্যেরা ঐ অঞ্চলে নিজেদের সামরিক অধিকার বিস্তার করেছে। চীনাদের এ সম্বন্ধে যাই বক্তব্য থাক—কেউই নিজেকে আক্রমণকারী বলে বর্ণনা করে না, ইতিহাসে চিরকাল সমস্ত আক্রমণকারীরাই নিজের 'ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার' দোহাই দিয়েছে। সুতরাং চীনা তরফের বক্তব্য কোনো দেশপ্রেমিক ভারত সন্তানের কাছেই গ্রাহ্য হতে পারে না। আমাদের বক্তব্য এ সম্বন্ধ স্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত। ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী নিজে এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেছেন যে, আমাদের জমি বে-আইনীভাবে অধিকার করা হয়েছে।

অতঃপর জনসাধারণের পক্ষ থেকে দুইটি প্রশ্ন দাঁড়ায় ঃ এক, এই পরহস্তগত জমি ভারত সরকার পুনরুদ্ধারের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবেন? দুই, ভবিষ্যতে যাতে চীনের আক্রমণ চেষ্টা আর অগ্রসর হতে না পারে এবং আর অসতর্কতাবশত (অথবা ভাই ভাই গলাগলির সুখস্বপ্নে) ভারতভূমি যাতে আক্রমণকারী চীনা সৈন্যের দ্বারা লাঞ্ছিত না হয় তার জন্য ভারত সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই দুইটি প্রশ্নের একটিতে প্রধানমন্ত্রী আগাগোড়া অস্পষ্ট এবং প্রতিশ্রুতিহীন নীতির পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এবং দৃঢ় আশ্বাস উচ্চারণ করেছেন।

অর্থাৎ বেদখলী জমির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে কোনো দৃঢ় বা আশাপ্রদ নীতির আভাস তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। ভারত সীমানার ভিতর থেকে চীনাদের বিতাড়িত করার জন্য তিনি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত নন। তাঁর নীতির সংগে আমরা একমত হই বা নাই হই, এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার নয়, একথা অনেকেই স্বীকার করবেন। কারণ একথা সত্য যে, ভারত সীমানায় যে সমস্ত এলাকা চীনা সৈন্যেরা দখল করেছে, সে সব এলাকা ভারতের পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুর্গম, রণকৌশলের দিক থেকে ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্বল এবং ঐ সব এলাকার সংগে এখনও আমাদের উপযুক্ত পরিবহণ সংযোগ স্থাপিত হয়নি। অতএব ঐ এলাকা থেকে চীনাদের বিতাড়িত করার চেষ্টা দুরূহ, ব্যয়সাধ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশংকা আছে। কাজেই ভারত সরকার হয়ত সে পন্থা গ্রহণীয় মনে করেন না। কিন্তু চীন-ভারত সীমান্তে এমন অঞ্চলও আছে যেখানে রণকৌশলের দিক থেকে দেখলে সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ ভারতের দিক থেকে ঐ সীমানায় পৌঁছোনো, সীমানা ভেদ ক'রে চীনের অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়া এবং কিছু দূর পর্যন্ত চীনা ভূমি দখলে আনা অপেক্ষাকৃত কম দুঃসাধ্য। অপর দিকে চীনাদের পক্ষে ঐ এলাকায় প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা অপেক্ষাকৃত বেশী দুঃসাধ্য। যে কোনো লোক স্বীকার করবেন যে, লাডাকে ভারতের সামরিক অবস্থান যেমন দুর্বল, নেফা অঞ্চলে চীনাদের অবস্থানও প্রায় তেমনি দুর্বল। সুতরাং ভারত সরকার চীনা আক্রমণের জবাবে যদি পাল্টা আক্রমণের দ্বারা তাদের জব্দ করতে চাইতেন, দীর্ঘ চীন-ভারত সীমান্তে তার জন্য উপযুক্ত লক্ষ্যস্থলের অভাব ছিল না। ভারত সরকার তা করেন নি কেন? সামগ্রিক যুদ্ধ বা 'টোটাল ওয়ারের' ভীতি? দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি বন্ধ হওয়ার আশংকা? এই আশংকাগুলির চেয়ে মাতৃভূমির মর্যাদা কি কম গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হয় যে, জমি পুনরুদ্ধারের প্রথম প্রশ্নটিতে ভারত সরকার সত্যই নিরুপায়—ভূগোল, অর্থনীতি এবং রণনীতি সবই তার বিরুদ্ধে, তবু প্রশ্ন থাকে ঃ ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিরোধ করা হবে বলে পণ্ডিত নেহরু যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার কতখানি পালিত হয়েছে? দেড় বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের আর এক ইঞ্চি জমিও চীনারা কবলিত করতে পারবে না, আর এক পাও তাদের অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না। এই প্রতিশ্রুতি শুধু তিনিই দেন নি, রাষ্ট্রপতির নীতিবাচক ভাষণে পার্লামেন্টে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী বার বার এই আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করেছেন। সেই আশ্বাসের সমস্ত প্রতিধ্বনি হয়ত আকাশে মিলায়নি। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দৃঢ় প্রতিশ্রুতি সংবাদপত্রের পাতায় যে জায়গায় ছাপা হয়েছিল, সেখানে ছাপার কালি বোধ করি এখনও শুকোয় নি। দুর্বল, হৃতগৌরব, অবমানিত একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় পার্লামেন্টে পণ্ডিত নেহরুকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, এক ইঞ্চি নয়, আরও বহু বর্গমাইল জুড়ে চীনা সৈন্যের ছাউনি অগ্রসর হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তার প্রতিরোধ করতে পারে নি। অথবা, আরও শোচনীয়, হয়ত ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধের অধিকার এবং নির্দেশও দেওয়া হয় নি। প্রধানমন্ত্রীর এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই কলংকজনক ব্যর্থতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা থাকবার মতো।

হয়তো বৃথাই

বিষ্ণু দে

হয়তো সে চেনে আমাকে মেঘের ছায়ায়,
হয়তো মোটেই জানে না শূন্য নীলে।
অথচ আমারই হৃদয় সে তনু কায়ায়
মুখের তন্নতন্ন ছবিতে মিলে
উধাও নিত্য নাক্ষত্রিক মায়ায়।

হয়তো বৃথাই। হয়তো উপমা চিলে,
একার আকাশে উড়ন্ত হাহাকার।
কিংবা স্থিতিই যদি মেলে একবার,
সে বুঝি একটি সারস, চন্দনবিলে
একটি পা তুলে চাল দেখে দুনিয়ার।

তবু রোজ ভাবা সে যে কার ভারি পায়ায়
সন্ধ্যাতারাকে নামাব শিশির ঢেলে!

* * *

মাটির সাধক হও

বীরেন্দ্র মল্লিক

জানি আমি কোনো এক মাটির কণিকা;—
একটি কণিকা ছাড়া কিছু নয়;
মাটি হতে উঠিয়াছি; কহি যে মাটিরই কথা,
মেলে ধরি মাটির বিস্ময়;
মাটি সে ত জানি ঠিক; তবু প্রাণ হয় না ক' মাটি;
মাটিতেই প্রাণ আছে, গান আছে, সুর আছে;
কথাটাও জানিয়াছি খাঁটি।
দেখ নি কি কোনোদিন মাটির টপর পরে এক বীজ
মাটিতেই মেলে প্রাণ, মাটিতেই পেয়ে ঘ্রাণ
বেড়ে ওঠে মনসিজ
কাঁপিয়েছে তোমার আমার ধরে এক লতা পাতা ফুল?
থেকে থেকে ভরে ওঠে মাটির নিঃশব্দ ডাকে মনের দুকূল।

মাটির স্পন্দন শুনি মাটিতেই বেড়ে-ওঠা শিরায় শিরায়,
মাটির প্রলাপে তারা মাটিরই স্বপনে ভাই নাচে হাসে গায়;
তুমি আমি সেই মাটি; শুনে শুনে
সে-মাটিরই ছন্দে কথা কই,
মাটিতেই বাঁধি ঘর মাটির আকাশ লাগি জেগে রই।

মাটি সে ত মাটি নয়; মনে হয় আরো খাঁটি আকাশের চেয়ে
মাটিকে ত ছুঁতে পারো; কতদূরে মেঘেদের তারাদের মেয়ে!
মাটিতেই পথ হাঁটি; মাটিতে দাঁড়িয়ে তবে চেয়েছি ওপরে,
মাটিকে আশ্রয় করে ভেসে যাই বারবার বিশাল সাগরে

মাটিকে করো না তুচ্ছ; আরো ভাল করে ধরো মাটি;
মাটিকে ধরলে পরে এ-জীবন এ-হৃদয় হবে আরো খাঁটি;
মাটির আরেক রূপ আছে; দিবারাত্র তারই ধ্যান করো,
মাটির প্রতিমা গড়ে সাধকেরা প্রাণ দিয়ে বলেছেন,
'সবচেয়ে বড়'
মাটির সাধক হও; মাটিতেই ফলে সোনা,
ফলে ফুল লতা পাতা বেল,
মাটির প্রাণের সাথে দেখ নি কি গান গায়
সারা দিন তিতির দোয়েল,
মাটি শুধু মাটি নয়, আমাদের সকলের 'মা'-টি জেনো ভাই,
তারই স্নেহে বাস করে মাটিরই ময়ূর-পঙ্খী গড়া চাই।

সাহিত্য আকাদামি গত বছর কোনো বাংলা বই পুরস্কারযোগ্য বিবেচনা করেন নি, এতে বাংলা দেশের প্রত্যেক সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন। কিন্তু সেই স্বাভাবিক ক্ষোভটুকুকে মূলধন ক'রে কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনার কামনায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূকে যেভাবে অবমাননা করা হয়েছে তাতে সকলেই শিহরিত হবেন।

কিছু দিন আগে খবরের কাগজে একটি বিবৃতি দিয়ে কয়েকজন প্রবীণ সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী বাংলা বইয়ের পুরস্কার না পাওয়ার বিষয়ে সমস্ত দোষ শ্রীকবিরের উপর চাপান খুবই অসংগত বলে ঘোষণা করেছিলেন।

বিবৃতি যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের নামগুলি লক্ষ্য করার মতো। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এখন জীবিত নেই—সম্প্রতি রাজশেখর বসু এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তকেও আমরা হারিয়েছি। আমাদের মধ্যে আজ যে সব সাহিত্যিক বর্তমান আছেন তাঁদের ভিতরে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁদেরই কয়েক জনের নাম লক্ষ্য করা যাবে ঐ বিবৃতিগুলিতে। এঁদের নামে অভিসন্ধি আরোপ করা এবং বাংলা সাহিত্যকে অবমাননা করা প্রায় একই কথা। কিন্তু সাহিত্যের (!) জন্যে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে বসে সেই মাত্রাহীন অবিবেচনারই পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন সম্প্রতি এক সাহিত্যবন্ধু দৈনিক পত্রিকা।

এই পত্রিকাটির এক সম্পাদকীয় নিবন্ধের লেখক, শ্রীহুমায়ুন কবিরকে অপদস্থ করার জন্যে যত রকম উপমা উৎপ্রেক্ষার প্যাঁচ জানা আছে সবই প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে বলে বসেছেন যে, ঐ সব বিবৃতিদানকারী বিজ্ঞানী, অধ্যাপক এবং লেখকদের বিষয়ে "দুর্জনে" ভাববে এটার মূলে রয়েছে অতীতের কোনো উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞতা বা ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতির জন্যে স্তাবকতা।

শ্রীহুমায়ুন কবিরের নির্বাচনী মনোনয়নের ব্যাপারে যোগ্যতার মাপকাঠি কী তা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু তিনি মনোনয়ন লাভ করেছেন। নির্বাচিত হবেন কিনা সে বিচারের ভার তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর উপর। তবে তাঁকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এই সাহিত্যপ্রেমী সম্পাদকমশাই বাংলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ জীবিত সাহিত্যিক এবং বাংলা সাহিত্যকে যে কলমের এক খোঁচায় কোথায় নামিয়ে দিলেন তাই ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি।

একটা কথা তবু দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, "দুর্জনে" যা ভাবতে পারে ঐ নির্জলা সাহিত্যপ্রেমিক সম্পাদকও তা ভাবতে পারেন। কিন্তু সজ্জনে যা ভাবতে পারেন তা তিনি ভাবতে পারেননি। সেটা হল এই যে, ঐ সম্পাদকীয় নিবন্ধটির লেখক বা তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের কেউ যদি অতীতে কোনো উপকার অথবা ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি পেতেন তবে হয়তো এতদূর রুষ্ট হতেন না।

সকলেই নিজের মতো অন্যকে

দেখে। উক্ত সম্পাদকমশাইও নিজের আয়নাতেই অন্যের মুখ দেখেছেন। কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না যে, রামায়ণের যুদ্ধে ভস্মলোচনের মতো তিনি ততদিন পর্যন্তই নিজের দৃষ্টি দিয়ে চারিদিক ছারখার করতে পারবেন, যতদিন তাঁর চোখের সামনে একখানি আয়না তুলে ধরা না হয়। দুঃখের বিষয়, বর্তমান ক্ষেত্রে আয়নাটি তিনি নিজেই আমাদের উপহার দিয়েছেন। এবং তাঁর নিজের চোখের দৃষ্টিই এখন তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু।

কারণ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, সাহিত্যিকগণ তাঁদের স্বাভাবিক সৌজন্য-বশত এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ না জানালেও তাঁদের প্রতি এই রুচিগর্হিত ইঙ্গিত বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিঅনুরাগী ব্যক্তিরা কখনোই মার্জনা করবেন না। সম্পাদকমশাই বাংলা সাহিত্যের ত্রাণকর্তা সেজে ইনিয়ে-বিনিয়ে যতো মাতব্বরীই করুন, তাঁর স্বার্থসন্ধ আসল রূপটি আজ দিবা-লোকের মতো স্পষ্ট।

বাংলার অগ্রগণ্য সাহিত্যিকগণ এক বিরাট আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। বৃটিশ যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত অজস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে যাচ্ছেন। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্য যে আজ অগ্রসর বলে স্বীকৃত তাতে কেবল বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রেরই নয়, আমাদের সম-কালীন সাহিত্যিকদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁদেরই ভিতর যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের অনুগ্রহলিপ্সু বলে লোক-সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করলে বাংলা সাহিত্যকেই উপহাসাস্পদ করা হয়।

উপরোক্ত পত্রিকাটি তার নিজের পকেটে রক্ষিত একটি আদি ও অকৃত্রিম "বাংলা সাহিত্যের" প্রতি বাৎসল্যবশত এই বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সেবকগণের শিরচ্ছেদ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু এদের এই ছিন্নমস্তা আনন্দ আর কতদিন এমন অপ্রতিহত থাকবে?

* * *

এবার ইস্কুলের পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হবে। নতুন ক্লাসে ওঠার পর কোন ছাত্রই পুরো একটা বছর পড়তে পারেনি। খুবই চাপ পড়েছে তাদের উপর। আর সত্যি বলতে কি, এ চাপ তাদের পিতামাতার উপরও। কারণ ফেল করা মানে কেবল সময় নয়, টাকা'রও অপব্যয়। ছাত্র এবং তাদের পিতামাতা, এই উভয় পক্ষই তাই পরীক্ষার জন্যে তৈরি হ'চ্ছে এখন।

বাস্তবিক পড়াশোনার ব্যাপারটা শুধু শিক্ষার্থী নয়, তাদের অভিভাবকের উপরও কতোটা চাপ সৃষ্টি করে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

অনেক দিন আগের কথা। তখন নতুন বাড়ী বদলেছি। সিঁড়ি দিয়ে আসতে-যেতে পাশের সরু প্যাসেজের ওপারে একখানি ঘর দেখা যায়। তার খোলা জানলার পাশে অনেক সময়ই দেখতে পাই মেঝেয় মাদুর পেতে বসে আছেন এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক। মোটা-সোটা, সদালাপী মানুষ। নিজেই যেচে আলাপ করলেন। কথার ঢঙে বুঝতে পারলাম, আদি নিবাস পদ্মা-পারে।

সেদিন সকালে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। কানে গেল এক বিচিত্র সোরগোলের শব্দ। ঠাহর করে শুনতে পেলাম—

"টান, টান, টান; ঠ্যাল, ঠ্যাল; নামা, নামা; তোল, তোল তোল; মার মোচড়, মার মোচড়...!'

সেই ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর। কৌতূহলী হ'য়ে ওদিকে তাকাতেই চোখাচোখী হ'য়ে গেল তাঁর সঙ্গে। বললাম—

'কী ব্যাপার? আলমারী-টালমারী সরালেন নাকি?'

'না-া-াঃ', ভদ্রলোক অমায়িকভাবে হেসে তাঁর পাশে বসা একটি শিশুর হাত থেকে একখানি শ্লেট নিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এই, পোলাডারে এউগ্‌গা ক ল্যাখাইলাম!'

মুহূর্তে আমার চোখের উপর থেকে যেন একখানি পর্দা সরে গেল। দিব্যদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম, কীভাবে মানবশিশুকে 'মানুষ' করে তোলা হয়। হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না।
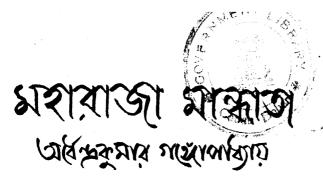
বাংলা ভাষায় প্রবাদ আছে—'মান্ধাতার আমলের বস্তু'। 'মান্ধাতার সময়ের প্রথা,' —অর্থাৎ প্রাচীনকালের অতি পুরাতন বস্তু বা প্রথা।

রাজা মান্ধাতা কত প্রাচীনকালের রাজা তাহা সঠিক বলা যায় না. তবে বৌদ্ধযুগের বহু পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন. ইহা অনুমান করা যায়।

তিনি যে কালের মানুষই হউন. তাঁহার জন্মের কাহিনী. এবং জীবনের কীর্তি-কথা অতি বিচিত্র. অতি অলৌকিক. অতি বিস্ময়-প্রদ. কৌতুক-প্রদ।

ভূতপূর্বকালে আনন্দ উপোষধ নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজার মস্তকে একটি বিস্ফোটক হইয়াছিল. এই বিস্ফোটক পক্ক হইয়া স্ফুটিত হয়, এবং রাজার মস্তক হইতে এক অভিরূপ. দর্শনীয়, অতি প্রসন্ন-রূপ এক রাজকুমারের জন্ম হয়। এই রাজকুমার বৌদ্ধপুরাণে সুপরিচিত বত্রিশটি মহাপুরুষের লক্ষণ বা চিহ্নধারী কুমার ছিলেন। উপোষধ রাজার ছয় সহস্র রানী ছিলেন, কুমারের জন্মে রানীদের স্তন্য স্নেহরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—তাঁহারা সকলে বাৎসল্যরসে অভিভূত হইয়া কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'কুমার! আইস! তুমি আমার স্তন পান কর ("মাং ধয়," "মাং ধয়।")। এই সম্বোধন হইতে কুমারের নামকরণ হইল—'মান্ধাতা'। মূর্ধা বা মস্তক হইতে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহার আর একটি নাম হইল—'মূর্ধাত'। কুমার কুমার-ক্রীড়া বা বাল্য-লীলা কাল অতিক্রম করিয়া জনপদ বা দেশ-ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা পীড়িত হইয়া, দেহরক্ষা করিলে. অমাত্যগণ কুমারকে সংবাদ পাঠাইলেন. আপনার পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, অতএব আপনি প্রত্যাগমন করিয়া দৈব-রাজ্য গ্রহণ করুন।' কুমার বলিয়া পাঠাইলেন, 'ধর্মানুসারে যদি রাজার আসন আমার প্রাপ্য হয়—তাহা হইলে এইখানেই আমার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হউক।' অমাত্যগণ সংবাদ পাঠাইলেন—রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে 'রত্ন-শিলা' এবং 'শ্রী-পর্যঙ্ক' বা 'লক্ষ্মীর আসন' আবশ্যক। তাহা শুনিয়া কুমার তাঁহার আরক্ষদেবতা দিবৌকস নামক যক্ষদেবতাকে নির্দেশ দিলেন এবং এই নির্দেশ অনুসারে যক্ষদেবতা 'রত্ন-শিলা' ও 'রাজ্য-লক্ষ্মীর সিংহাসন' আনয়ন করিলেন। তাহার পর অমাত্যগণ সংবাদ দিলেন, 'অভিষেক-অনুষ্ঠান দেব-পীঠ বা দেবতার আয়তন বা মন্দিরে সম্পন্ন করিবার বিধি আছে, সুতরাং আপনি দেবতা-পীঠে চলিয়া আসুন।' কুমার বলিলেন, 'ধর্মবলে যদি আমার রাজ্যপ্রাপ্তি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেবতার মন্দির এই স্থানেই উপস্থিত হউন।' কুমারের ইচ্ছা-শক্তিতে অভিষেকের 'মন্দির' তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পর অমাত্যগণ.—জনপদ, নিগম ও গ্রামসমূহ হইতে প্রধান প্রজাগণ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অভিষেক-স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আসুন! আমরা আপনার "পট্ট-বন্ধন" করিয়া, আপনার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করি।' রাজকুমার বলিলেন—'আমার পট্ট-বন্ধন ও অভিষেক কি মনুষ্যগণ দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে? আমার রাজ্য যদি ধর্মশক্তিবলে প্রাপ্য হয় তাহা হইলে "অ-মনুষ্য", অর্থাৎ দেবগণ আমার পট্টবন্ধন সম্পন্ন করিবেন। কুমারের ইচ্ছাক্রমে দেবগণ আবির্ভূত হইয়া কুমারের পট্টবন্ধন করিয়া রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবামাত্র রাজা মান্ধাতা সাত প্রকার 'রত্ন' বা শ্রেষ্ঠ বস্তু দৈব-বলে প্রাপ্ত হইলেন এবং এই 'সপ্ত-রত্ন' তাঁহার অভিষেক-সভায় উপস্থিত হইল—(১) 'চক্র-রত্ন' (শ্রেষ্ঠ রথ), (২) 'হস্তি-রত্ন'—যূথ-পতি রাজকীয় হস্তি, (৩) 'অশ্ব-রত্ন'—শ্রেষ্ঠ রাজকীয় অশ্ব, (৪) 'মণি-রত্ন'—শ্রেষ্ঠ রাজকীয় রত্ন (Crown Jewels). (৫) 'পরিনায়ক-রত্ন'—শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন উপদেষ্টা অমাত্য-রত্ন, (৬) 'স্ত্রী-রত্ন',—রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ রমণী রাজার সম্রাজ্ঞীর পদের যোগ্য রমণী; (৭) 'গৃহ-পতি-রত্ন'—প্রজা-পালক সংসারী শ্রেষ্ঠ পুর-প্রধান। এই সাতটি রত্ন রাজা মান্ধাতার রাজ্য-পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ সহায়করূপে আবির্ভূত হইল। রাজা মান্ধাতার রাজ্য বৈশালীর সামন্ত রাজা দ্বারা শাসিত রমণীয় বনখণ্ড সহস্র শূর ও বরাঙ্গ-রূপী শত্রু-সৈন্য প্রমর্দক বীরগণ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ঐ স্থানে পঞ্চশত ঋষি ধ্যান-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই বনখণ্ডে অসংখ্য পক্ষী ও মৃগ বাস করিতেছিল। এবং শব্দ-কণ্টক জাতীয় ধান্য আহারের জন্য পক্ষীরা অবতীর্ণ হইয়া কোলাহল করিত। সেই বনে দুর্মুখ নামে এক ঋষি পক্ষীদের কোলাহলে কুপিত হইয়া পক্ষী ও বকগণকে অভিশাপ দিয়া বন পক্ষীহীন করিলেন। অমাত্যগণ রাজার নিকটে এই সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রশ্ন করিলেন—'এমন প্রকৃতির ঋষিরাও আছেন—যাঁহারা অসহায় পক্ষীদের প্রতিও অনুকম্পাহীন?' অমাত্যগণ, আপনারা ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করুন যে, তাঁহারা সেই স্থানে চলিয়া যান—যেখানে আমার শাসন নাই,—আমার রাজ্যে তাঁহাদের বাস করা কর্তব্য নহে,—অন্যত্র যাইয়া বাস করুন।' ঋষিরা রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—'রাজা মান্ধাতা চতুর্দ্বীপের অধীশ্বর,—সুতরাং আমরা সুমেরু পরিখণ্ডে চলিয়া যাই।' ঋষিরা সেই স্থানে চলিয়া গেলেন।

রাজার নির্দেশে বিভিন্ন অধিকারের অমাত্যগণ (চিন্তক, তুলক, উপ-পরীক্ষক) রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প-স্থান, কর্ম-স্থান সকল পরিদর্শন করিতে করিতে দেখিলেন যে, এক শ্রেণীর প্রজাগণ (মনুজাগণ) কৃষিকর্ম করিতেছে এবং রাজাকে সংবাদ দিলেন যে, তাহারা এমন সব শস্যাদি কর্ষণ করিতেছে—যাহা হইতে নানা ঔষধি উৎপন্ন হইবে। রাজা সংবাদ পাইয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, দেবগণ সপ্ত-বিংশতি জাতির বীজাদি বর্ষণ করুন। রাজার আদেশক্রমে দেবতারা বীজ বর্ষণ করিলেন। জনপদের এক স্থানে অমাত্যগণ কার্পাস বা তুলার চাষ আরম্ভ করিলে রাজা প্রশ্ন করিলেন—'কি নিমিত্ত কার্পাসের চাষ?' অমাত্যগণ বলিলেন : 'বস্ত্র বয়নের জন্য।' রাজা শুনিয়া ইচ্ছা করিলেন—'আমার রাজ্যে প্রজাগণ কার্পাসের চাষ করিতে চায়,—সুতরাং দেবগণ কার্পাস বর্ষণ করুন এবং বস্ত্র বর্ষণ করুন।' রাজার ইচ্ছাক্রমে দেবগণ বস্ত্র বর্ষণ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন —'ইহা কাহার পুণ্যে হইল?' তাহারা বলিল, 'দেবগণ এবং তাহাদের পুণ্যে হইল।' রাজা চিন্তা করিলেন, প্রজাগণ রাজার পুণ্যের প্রভাব অবগত নহে। জম্বুদ্বীপে আমার রাজ্য স্ফীত, সমৃদ্ধ, কল্যাণকর এবং বহু দানশীল প্রজাগণ দ্বারা সমাকীর্ণ। আমি সপ্ত রত্নের অধিকারী—চক্র-রত্ন, হস্তি-রত্ন, অশ্ব-রত্ন, মণি-রত্ন, গৃহপতি-রত্ন, স্ত্রী-রত্ন, এবং অমাত্য-রত্ন। অহো! আমার অন্তঃপুরে এক সপ্তাহকাল সুবর্ণ বর্ষণ হউক! একটি স্বর্ণ-মুদ্রাও (কার্ষাপণ) যেন অন্তঃপুরের বাহিরে পতিত না হয়।" রাজার ইচ্ছানুসারে অন্তঃপুরে

রাজার ইচ্ছানুসারে অন্তঃপুরে
সপ্তাহকাল সুবর্ণ বৃষ্টি হইল। রাজা

তাঁহার প্রজাগণকে বলিলেন—'আপনারা ইচ্ছামত ধন-রত্নাদি গ্রহণ করুন।'

অতঃপর রাজা মান্ধাতা মহা-সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ষট-চক্র প্রেরণ করিলেন। যক্ষ দিবৌকস সম্মুখীন হইলে তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—'আমার আজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই এমন কোনও দ্বীপ আছে?' যক্ষ উত্তর করিলেন—'বহু জনাকীর্ণ পূর্ব-বিদেহ নামে এক দ্বীপ আছে—আপনি নিজে তথায় গমন করিয়া আপনার শাসন প্রতিষ্ঠিত করুন।'

এই কথা শুনিয়া সার্ধ অষ্টাদশ কোটী সৈন্য লইয়া সহস্র পুত্রাদি কুটুম্ব পরিবৃত হইয়া রাজা মান্ধাতা পূর্ব-বিদেহ দ্বীপে গমন করিয়া আপনার রাজ্য-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার পর রাজা দিবৌকস যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে যক্ষ বলিলেন যে, অপরগোদানীয় নামক আর এক সমৃদ্ধ দ্বীপ আছে, যেখানে গমন করিয়া রাজা মান্ধাতার শাসন প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য। এইরূপে অপরগোদানীয় দ্বীপে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পরে, উত্তর-কুরু নামক দ্বীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দ্বীপ কল্পদৃষ্য-লম্বিত বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। তৎপর সুমেরু পার্শ্বে উন্ত শ্বেত প্রদেশ দেখিতে পাইলেন যে, তথায় লোকেরা কর্ষণ ব্যতিরেকে তণ্ডুল-ফল-শালী পরিভোগ করিতেছে। সেই দেশ অধিকার করিয়া তণ্ডুল-ফল-শালী পরিভোগ করিয়া যক্ষকে প্রশ্ন করিলেন, জম্বুদ্বীপে অন্য কোন অনধিকৃত দ্বীপ আছে কি? তিনি বলিলেন যে, অন্য কোনও দ্বীপ নাই, তবে তিনি শুনিয়াছেন যে, স্বর্গলোকে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ সুখবহুল চিরস্থির উচ্চ বিমানে বাস করেন। এই সংবাদ শুনিয়া দেবতাগণ-অধ্যুষিত ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অভিমুখে যাত্রা করিয়া, ক্রমে ক্রমে কাঞ্চনময় সুমেরু পর্বত, বিনতক পর্বত, সুদর্শন পর্বত, যুগংধর পর্বত অতিক্রম করিয়া দেখিলেন যে, সেখানে পঞ্চশত ঋষি ধ্যান করিতেছেন—তাহার মধ্যে দুর্মুখ নামে এক ঋষি গহোদকের অঞ্জলি ক্ষেপণ করিয়া মান্ধাতার সৈন্যদলকে শক্তিহীন করিলেন। অমাত্য-রত্নকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, ঋষিদের শক্তি তাঁহাদের জটাজুটে অবস্থিত; তখন রাজা মান্ধাতা আদেশ দিলেন ঋষিগণের জটাজুট শীর্ণ হউক, এবং আমার সৈন্যশ্রেণী উড্ডীন হইয়া অগ্রে গমন করুক। তাহাই সিদ্ধ হইলে, রাজা মান্ধাতা তিন যোজন সহস্র কাঞ্চনময় ভূমিতে উপস্থিত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সুদর্শন নামক নগর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, ঐ স্থানে উদক-নিঃসৃত নাগগণ, করোটী-পাণি দেবতাগণ, মাল্যধর দেবগণ, সদামত্ত দেবগণ এবং চতুর মহারাজগণ রাজা মান্ধাতার সৈন্যগণকে বিষ্কম্ভিত করিলেন। অনন্তর রাজা মান্ধাতাকে দেখিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ বলিলেন, "রাজা মহেশাখ্য সত্ত্বসম্পন্ন মনুষ্য—তাঁহার বিরোধিতা কর্তব্য নহে।'—এই বলিয়া অর্ঘ্য হস্তে লইয়া দেবগণ রাজা মান্ধাতাকে প্রত্যুৎগমনপূর্বক স্বাগত করিলেন। অনন্তর রাজা নীল-নীলা বর্ণ মেঘরাজির ন্যায় উন্নত বন-রাজি দেখিয়া প্রশ্ন করিলে, যক্ষ মান্ধাতা দেখিতে পাইলেন যে সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, বৈদূর্যময় প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত সহস্রদ্বার-শোভিত প্রাসাদ-মালার পঞ্চশত নীল বসন-ধারী যক্ষ সূচী ও আলম্বন-যুক্ত বেদিকা নানা পুষ্প দ্বারা, স্বর্ণ-বালুকা ও চন্দন-বারি দ্বারা সুশোভিত ও সুরভিত করিতেছেন, এবং তাহার মধ্যে নানা জলজ পক্ষীগণ মধুর স্বরে কূজন করিতেছে।

রাজা মান্ধাতা আকাশ হতে স্বর্ণবৃষ্টি করছেন। (অমরাবতী)

বলিলেন, 'ইহা পারিজাতক নাম দেব উদ্যান—এই স্থানে দেবগণ বৎসরের মধ্যে চারি মাস পঞ্চ কামগুণ দ্বারা আবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করেন, রমণ করেন, এবং পরিচরণ করেন। আপনিও এখানে গমন করিয়া দেবগণের ন্যায় ক্রীড়া করুন, রমণ করুন।' রাজা সেস্থানে ক্রীড়া ইত্যাদি করিতে করিতে 'সুধর্মা' নামক দেবসভা দেখিতে পাইলেন—যেখানে চতুর মহারাজাগণ দেবতা ও ও মনুষ্যগণের ধর্ম ও অর্থ-প্রাপ্তির চিন্তা করিয়া পরীক্ষা করেন। রাজা তাহার নিকটে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ফল-বৃক্ষ প্রোথিত রহিয়াছে—এবং সেই স্থানে সুদক্ষ মালাকারগণ মালা এবং অবতংস (পুষ্পরচিত অলংকার) রচনা করিতেছেন। সেই সুদর্শন নগরে চার প্রকার কল্পদৃষ্য-বৃক্ষে, নীল, লোহিত ও পীত বর্ণের তুত্তিচেলসমূহ ('চেলীর কাপড়') বৃক্ষশাখা হইতে দোদুল্যমান। দেব ও দেবকন্যারা যাহাই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন তাহাই লাভ করিতেছেন। নানা বাদ্য-ভাণ্ড বৃক্ষে—বেণু, বল্লরী ও সুঘোষক বাদ্যাদি লম্বিত রহিয়াছে—দেব ও দেব-

কন্যাগণ যখন যাহাই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন তাহাই লাভ করিতেছেন। আর উপস্থিত রহিয়াছে—মধু, মাধব, কাদম্বরী প্রভৃতি নানা জাতির পানীয়। সুদর্শন নগরে নানা গৃহ, কুটাগার, হর্ম্য ও প্রাসাদমধ্যে উৎকৃষ্ট আসন-যুক্ত নানা অবলোকন স্থান (বাতায়ন) ও সংক্রমন স্থান রহিয়াছে, যেখানে সহস্র সুন্দরীগণ, অপ্সরাগণ অনুপান সেবা করিয়া—তূর্য্যনাদ মুখরিত গৃহে দেবতাগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, রমণ করিতেছেন, পাদচারণা করিতেছেন। সেই দেবসভা তিনশত যোজন বিস্তৃত, এবং তাহার মধ্যে স্ফটিকময়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদের মধ্যে শক্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতার পৃথক পৃথক আসন নির্দিষ্ট রহিয়াছে। এই আসনমালার শেষপ্রান্তে রাজা মান্ধাতার জন্য পৃথক আসন নির্দিষ্ট ছিল। মান্ধাতা তথায় উপস্থিত হইলে, দেবগণ অর্ঘ্য হস্তে লইয়া রাজাকে প্রত্যুৎগমন করিয়া স্বাগত করিলেন—এবং রাজাকে তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে বসাইলেন—তাঁহার অনুচরগণ বাহিরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পর রাজা মান্ধাতা অভিলাষ করিলেন যে তিনি ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন করিবেন—এই অভিলাষ প্রকাশ করিলে, ইন্দ্র রাজা মান্ধাতাকে তাঁহার অর্ধাসন প্রদান করিলেন। তাহার পর রাজা ষট্‌-ত্রিংশ চক্র প্রেরণ করিলেন। তখন দেব ও অসুরের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মান্ধাতা দেবগণকে তাঁহাদের ধনুক আনিতে বলিলেন। ধনুকে আনয়ন করিলে, মান্ধাতা ধনুকে আকর্ষণ করিয়া ধনুর্গুণের শব্দ করিলেন। তাহা শুনিয়া অসুরগণ সভয়ে প্রশ্ন করিল—'ইহা কাহার গুণ-শব্দ?' উত্তর হইল: 'রাজা মান্ধাতার।' তাহারা সেই গুণ-শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত ও বিস্মিত হইল। তদনন্তর—আকাশ-পথে গমন করিয়া দেব ও অসুরগণের মধ্যে রথস্থাপনা করিলেন। আকাশ-পথে রাজা রথচালনা করিয়া অসুরগণকে ভগ্ন ও পরাজিত করিয়া অসুরগণের পুরী আক্রমণ করিলেন, এবং পরে প্রশ্ন করিলেন, কাহার জয় হইল, উত্তর হইল, দেবতাদের জয় হইল। রাজা মান্ধাতা বলিলেন, 'আমি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবগণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী—সুতরাং এইক্ষণ হইতে আমি ইন্দ্রকে স্থানচ্যুত করিয়া, দেবগণ ও মনুষ্যগণের উপর আধিপত্য করিব।' অতঃপর রাজা মান্ধাতা, তাঁহার দৈবশক্তি হারাইয়া ইন্দ্রত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন এবং মরণান্তিক প্রগাঢ় বেদনা-যুক্ত হইয়া অসুস্থ হইলেন। জম্বুদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া অসুস্থ হইলে অমাত্যগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, দেবতাদের ব্যত্যয় হেতু কোন পশ্চিম জনপদ লাভের সম্ভাবনা আছে কি? রাজা মান্ধাতা মরণ সময়ে কি করিবেন? রাজা মান্ধাতা তাঁহার সপ্তরত্নের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর চতুর দ্বীপে মনুষ্যকামী সমৃদ্ধিযুক্ত রাজৈশ্বর্যের আধিপত্য করিয়া দেবতাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

প্রজারা জিজ্ঞাসা করিলেন মান্ধাতা তাঁহার মৃত্যুকালে কি বাণী দিয়াছেন? উত্তর হইল, "কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—রাজা মান্ধাতা সাত প্রকার রত্নের অধীশ্বর ছিলেন, এবং চার প্রকার দৈবশক্তির অধিকারী ছিলেন, এবং তিনি চতুর দ্বীপে মনুষ্যকামী সমৃদ্ধি-যুক্ত রাজৈশ্বর্যের আধিপত্য করিয়া দেবতাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগের অতৃপ্তিজনিত দুঃখ ভোগ করিয়াছেন।"

উপরে উদ্ধৃত রাজা মান্ধাতার কাহিনীতে আমরা বৌদ্ধপুরাণকারদের কল্পিত ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গের বর্ণনা পাইতেছি। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত স্বর্গ হইতে বৌদ্ধগণের স্বর্গ কম আকর্ষণীয় নহে। প্রাসাদ হর্ম্যাদির বিবরণে বৌদ্ধ-স্থাপত্যের নির্মাণ-পদ্ধতির কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। 'সূচী' এবং 'আলম্বন'—বৌদ্ধ-স্থাপত্যের বিশেষত্ব; সাঞ্চী ও ভারহুতের পাষাণ প্রাকারে (রেলিং) 'সূচী' ও 'আলম্বনে'র প্রয়োগ দেখা যায়। অমরাবতী ও জগ্‌গয়পেতর স্তূপে রাজা মান্ধাতার একাধিক মূর্তি-চিত্র পাথরে উৎকীর্ণ আছে। তাহাদের রচনাকাল আনুমানিক দুই হইতে একশত খৃষ্ট পূর্ব শতাব্দী। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে শস্য উৎপাদনের স্বল্পতা ও খাদ্য-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং যে বস্ত্র-সমস্যা দেখা দিয়াছে—আমাদের মহামান্য মন্ত্রী মহাশয়দের মধ্যে কেহ রাজা মান্ধাতার অলৌকিক শক্তি ও উঁহার প্রজা-রঞ্জনী প্রচেষ্টার অনুকরণ করিতে পারিলে বাংলাদেশের নানা সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

স্বর্গ হইতে সুবর্ণ মুদ্রার বর্ষণের ব্যবস্থা হইলে আমাদের রাষ্ট্রের অর্থ-সমস্যা অচিরে পরিপূর্ণ হইতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা আশা করা মূর্খ-কল্পনার দিব্য-স্বপ্ন।

রাজা মান্ধাতার উৎকীর্ণ মূর্তি অমরাবতীর প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পকীর্তি হইতে সংগৃহীত।

সংগীত-বীক্ষণ
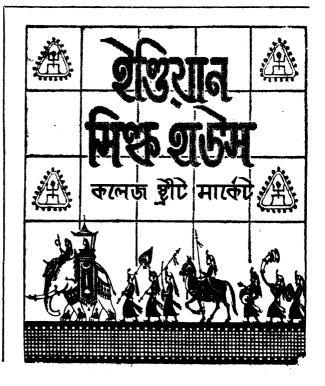
আনন্দভৈরব

নিখিল ভারত সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন

শীতের কলকাতায় সংগীতের আবহাওয়া বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। নানা সংগীত সম্মেলনে বহু শ্রোতা সংগীত-সুধাপানে তৃপ্ত হন। এই তো কিছুদিন আগে 'ললিতকলা কেন্দ্রের' বাৎসরিক সংগীত সম্মেলন হয়ে গেল। প্রতি বৎসর বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ সম্মেলনের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে, তাতে অধিকতর সংখ্যক শ্রোতা শোনবার সুযোগ পাচ্ছেন। এটা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নেই।

গত ২৫শে নভেম্বর মহাজাতি সদনে অষ্টম বার্ষিক নিখিল ভারত সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডক্‌টর বি ভি কেসকার। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত ও ললিতকলার সর্বাধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়।

উদ্বোধন-ভাষণে ডক্‌টর কেস্‌কার বলেন, সংগীতের মান উন্নয়নের জন্য কেবলমাত্র ভালো শিল্পী প্রয়োজন, এমন নয়, সেই সঙ্গে ভালো শ্রোতারও প্রয়োজন। সংগীত সম্মেলন ভালো শ্রোতা তৈরীরও ক্ষেত্র। এখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভালো শিল্পীর সমাবেশ হবে, এরূপ ধারণা ঠিক নয়। এরূপ ভ্রান্ত ধারণা অবসানের জন্য সংগীত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে রাগের ভাণ্ডার অতি বৃহৎ ও বিচিত্র। এই বৃহৎ ও বিচিত্র রাগৈশ্বর্যের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। সংগীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান-সূচী এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে বহুতর প্রবীণ ও নবীন শিল্পীর সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে ভারতীয় সংগীতের যথাযথ রূপায়ণের সঙ্গে পরিচিত সমাজদার শ্রোতা তৈরীর পথ প্রশস্ত হয়। তা ছাড়া, সংগীতকে জনশিক্ষার মধ্যে এরূপভাবে সন্নিবেশ করা সঙ্গত যাতে শিশুগণ, শিক্ষার্থিগণ সংগীতকে সহজে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করতে পারে।

প্রধান অতিথি শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন সংগীতের এমনই মোহিনী শক্তি তার দ্বারা আকৃষ্ট হয় না এমন লোক আছে কিনা সন্দেহ। সংগীত-সম্মেলন তো আছেই, এই রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষেই তো সারা দেশব্যাপী কী সংগীত-উদ্দীপনাই দেখা গেল। সভাপতির ভাষণে শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় সংগীতের পোষণে অর্থানুকূল্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক পটভূমিতে তুলনামূলক আলোচনা করেন। শ্রী জে সি দাশগুপ্ত কর্তৃক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের পর প্রথম অধিবেশনের সংগীতানুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

এই অধিবেশনে পুরিয়া-ধানেশ্রী রাগে সানাই বাজান ওস্তাদ আলি হোসেন ও তাঁর পুত্র আসগার হোসেন। সানাই-বাদনের পর ইমনকল্যাণ রাগে সরোদ বাজান শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। সানাইয়ের জোর আওয়াজের ঠিক পরেই অন্য যন্ত্রের আওয়াজ কিছুটা দুর্বল মনে হয়। পর-পর দুটি যন্ত্র-সংগীতানুষ্ঠানের পর চন্দ্রকোষ রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রীমতী মীরা খিরওয়াদকার। প্রথম এন্‌ জি সোথে ও পরে এস এন রতনজঙ্কার, মল্লিকার্জুন মনুসুর, হীরাবাই বরোদেকর ও বিলায়েত হোসেন খাঁর নিকট শিক্ষা-প্রাপ্তা এই শিল্পী কলকাতায় অপেক্ষাকৃত নবাগতা। তাঁর কণ্ঠ সুরেলা ও গাওয়ার পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য আছে। চন্দ্রকোষ রাগের পরিবেশনে আলাপাংশে কিছু পুনরাবৃত্তি হলেও, পরিচ্ছন্ন তান-প্রয়োগে ও সামগ্রিকভাবে রাগ-রূপায়ণে তাঁর অনুষ্ঠান প্রশংসনীয়। খেয়ালের পর তিনি ঠুংরি পরিবেশন করেন। শ্রীমতী খিরুওয়াদকারের সঙ্গে তবলা ও সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন যথাক্রমে ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ ও মহম্মদ সগীরুদ্দিন খাঁ। সাথ-সংগতে এই দুই শিল্পীর সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠান হল কথক নৃত্য। পরিবেশন করলেন শ্রীমতী রোশনকুমারী। শ্রীমতী রোশনকুমারী কথক ও ভারত নাট্যম উভয় নৃত্যে পারদর্শিনী। তিনি জয়পুরের শ্রী কে এস মোরে ও পণ্ডিত সুন্দরপ্রসাদের নিকট কথক নৃত্য শিক্ষা করেন, আর ভারত নাট্যম শিক্ষা করেন শ্রীগোবিন্দ-রাজ ও মহালিঙ্গম পিল্লাইয়ের নিকট। আলোচ্য অনুষ্ঠানে শিল্পী ধামার তালে কথক নৃত্য পরিবেশন করেন। সচরাচর এই নৃত্যে ত্রিতালের প্রয়োগ হতেই দেখা যায়। সেজন্য শিল্পীর উক্ত অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। গানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মধুর রসের হোরি গানে ধামার তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা হলেও, ধামার ধ্রুপদাঙ্গ তাল। নৃত্যের ক্ষেত্রে তথা বর্তমান সম্মেলনে কথক নৃত্যানুষ্ঠানে এই তালের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করে শ্রীমতী রোশনকুমারী আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। বিসমপদী এই তালের মাধ্যমে নৃত্যে সাবলীলতা ফুটিয়ে তোলা দুরূহ। কিন্তু শিল্পী নৃত্যশৈলীতে তাঁর অধিকারের বলে বিভিন্ন হ্রস্ব ও দীর্ঘ লয়কারিতে যে স্বচ্ছন্দতা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বিশেষ উপভোগ্য ও প্রশংসনীয়। ঘুঙুরের সূক্ষ্ম নিকণ ও ছন্দ তাঁর নৃত্যের অভিব্যক্তির খুব সহায়ক হয়েছে। তৎসহ ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁয়ের সাথ-সঙ্গত চমৎকার লেগেছে।

গত ২৬শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সাত দিনে আরো আটটি অধিবেশনে বহিরাগত ও স্থানীয় অনেক শিল্পী এই সম্মেলনে যোগদান করবেন। তার বিবরণ পাঠক-বর্গের সামনে পরে উপস্থাপিত করব।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

।। এক ।।
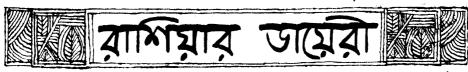
পালমের বিমানঘাঁটিতে প্রভাতের কুয়াশা তখনও জড়ানো। দিল্লীর পথে-প্রান্তরে শিশিরবিন্দুর ওপর লক্ষ সূর্য তখনও ঝলমল করে ওঠেনি। মহানগরী পাশ ফিরে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে। ট্যাক্সিখানা ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাকে নিয়ে ছুটে এসে পৌঁছে দিল বিমানঘাঁটির প্রবেশপথে। ইংরেজ আমলে এটি লর্ড উইলিংডনের নামাঙ্কিত ছিল। স্বাধীন ভারতে এর বর্ণাঢ্যতা বেড়েছে যেমন, তেমন প্রচুর সমৃদ্ধিলাভ করেছে। আজ ২রা অক্টোবর।

লোকে বিলেত যায় হাসিমুখে, আত্মীয়বন্ধু মহল বিদায়-সম্ভাষণ জানায় খুশীমনে। আমেরিকা-যাত্রাটা যেন অনেকের কানে সৌভাগ্যের মতো শোনায়। ও-জগৎটা যেন জানা, না গিয়েও জানা! কেউ জাপান কি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে, অশান্তি নেই তার মনে। কারণ ওসব দেশে গেলে গণ-গোত্রে তেমন অমিল ঘটবে না, জাতধর্ম নিয়ে কথা উঠবে না!

দিল্লীর কয়েকজন বন্ধু যদিও আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে এসেছিলেন, তবুও আমার মন ছিল একা: যাচ্ছি বটে, কিন্তু উৎসাহ যতটা, ততটা হর্ষ-কম্প-রোমাঞ্চ, স্বস্তি ততটা নেই। এ যাচ্ছি এমন একটি অভিনব জগতে যার সঙ্গে সমগ্র ভারতের স্বভাব-প্রকৃতির কোথাও মিল আছে কিনা সন্দেহ। সর্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তার বিষয় এই, সোভিয়েট ইউনিয়ন তথা রাশিয়ার বিষয় সর্বাপেক্ষা কম জানি! ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যেটুকু জেনেছি, সেটুকু ইংরেজের মুখ থেকে শোনা, বাকিটুকু শুনেছি আমেরিকার মুখে। শুনে এসেছি স্টালিন আমলের ভয়াবহ উৎপীড়নের কাহিনী, অহেতুক হত্যা-হানাহানির সাংঘাতিক বিবরণ, এবং পুলিশ ও জহ্লাদ গোষ্ঠীর সেখানে নাকি অপ্রতিহত রাজ্যপাট! সত্য কথা সেখানে বলতে কেউ সাহস পায় না এবং চাপা চাপা গোপন কানাকানিতে সে-দেশ জীর্ণ। সে-দেশে ধর্ম নেই, ঈশ্বর নেই, মেয়েদের সততা ও সতীত্ব নেই, পারিবারিক জীবনব্যবস্থা ব'লে কিছু নেই, এবং সন্তানদের পিতৃপরিচয় স্টেটের সঙ্গে নাকি বাঁধা। সভ্যতার আলো পাছে প্রবেশ করে, এই ভয়ে লৌহ যবনিকার দ্বারা সেই 'মগের মুলুকে' চারিদিক থেকে নাকি ইন্দিছিন্দি বন্ধ। সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা, জননিয়ন্ত্রণ, অর্থবন্টন-নীতি, বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা, চাষবাসের রীতি-নীতি,—অর্থাৎ আগাগোড়া সমগ্র দেশের জীবন নিতান্তই বিশেষ এক গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারের উপর দাঁড়িয়ে। সেই দেশ ছেড়ে যারা কোনমতে পালাতে পেরেছে, তারা নাকি ধনে-প্রাণে এযাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছে! ভূ-পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ হল সোভিয়েট ইউনিয়ন। বাকি প্রায় পাঁচ ভাগ পৃথিবীর ঘৃণা ও নিন্দা নাকি এমনভাবে আর কোনও দেশ নিঃশব্দে বরদাস্ত করেনি।

যাবার সময় আমার ভারতীয় মন কেমন যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল! একদিকে শঙ্কা উদ্বেগ দুর্ভাবনা অস্বস্তি অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে রোমাঞ্চ শিহরণ আকুলতা কৌতূহল আকর্ষণ—এই উভয়ের নাটকীয় ঘাত-সংঘাতে আমি বিপর্যস্ত ছিলুম। পূর্বসংস্কার তথা 'প্রেজুডিস' এমনভাবে আমার আর কোনও ভ্রমণকে এর আগে আচ্ছন্ন করেনি এবং এমন কন্টকাকীর্ণ সংকট-পিচ্ছিল এবং সংশয়াকুল পথ দিয়েও আমার মন কখনও হাঁটেনি! ইংরেজের সঙ্গে তথা অল্পবিস্তর ইউরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহুকালের, চিনি তাদের মর্মে মর্মে। তাদের কালোটা জানি, আলোটাও জানি। ফরাসীদের সঙ্গে ফরাসডাঙ্গায় ঘর করেছি এই সেদিন পর্যন্ত। জর্মন-আমেরিকানদের সঙ্গে কাজ-কারবার মেলামেশা করছি অনেক কাল থেকে। আরব, ইহুদী, আর্মানি, পর্তুগীজ, পাঠান, বর্মী, সিংহলী, জাপানী,—এরা চিরকাল কলকাতায় অবারিত জায়গা পেয়ে এসেছে। হাজার হাজার চীনাদের সঙ্গে এই কলকাতায় আজও আমরা একান্ন-বর্তীভাবে মানুষ—তাদেরকে চিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। কিন্তু রুশকে আমরা চিনিনে, এবং একটি সোভিয়েট নাগরিকের সত্য রূপটি কেমন,—আমরা সঠিক জানিনে। শত সহস্র সংবাদপত্রে, সাময়িক কাগজে, পুস্তিকায়, সমালোচনায়, ছায়াচিত্রে, গ্রন্থে, গালি ও নিন্দায়, দলাদলির বিচিত্র সংবাদে, সরকারী ও বেসরকারী তথ্য-প্রকাশে,—প্রত্যেক গণতন্ত্রী দেশের প্রাত্যহিক জীবনের মোটামুটি সবই ত জানি! জানিনে শুধু রাশিয়া। ওরা ভেবে-চিন্তে নিজেদের সম্বন্ধে যেটুকু খবর দেয় তার বেশি এক লাইনও জানবার উপায় নেই। ফলে, এই অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধানের বাইরে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তারা শুধু আমাদের সভয় কৌতূহল ও ঔৎসুক্যকেই জাগিয়ে রেখেছে। সেই কারণে বিগত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে যখন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী খুশ্চেভ কলকাতায় এসেছিলেন, তখন পঞ্চাশ লক্ষ লোক তাঁদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছিল। সেটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পঞ্চাশ লক্ষাধিক কৌতূহল মাত্র, পৃথিবীর কোথাও বাঙ্গালীর মতো এমন জনসম্মেলনের রেকর্ড আর কেউ করেনি!

* * *

যথাসময়ে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এসে পৌঁছলেন পালমে। আমরা যাচ্ছিলুম তাসকন্দ,—আগামী ৭ই অক্টোবর তারিখে যেখানে এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলনের অধিবেশন বসবে। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে সেখানে লেখক-প্রতিনিধি এবং পর্যবেক্ষকরা আসবেন এবং একদল ভারতীয় লেখকও সেই অধিবেশনে যোগদান করবেন। এই ভারতীয় গোষ্ঠীর মুখপাত্র হয়ে যাবার দায়িত্ব নিয়েছেন তারাশংকর নিজের উপর। আমরা মোট প্রায় ত্রিশজন, কিন্তু কেউই নির্বাচিত প্রতিনিধি নই,—মনোনীত সঙ্গী মাত্র। একথা মনে ছিল, সামগ্রিক মনোনয়নের ব্যাপারে

তারাশঙ্করের সম্পূর্ণ হাত ছিল না। কেননা এ ব্যাপারে প্রথমত সর্বভারতীয় জটিলতা ছিল, দ্বিতীয়ত অ-বাঙ্গালী লেখক মহলের সঙ্গে তাঁর তখন পরিচয় ছিল কম। আমার যাবার উৎসাহটা তিনিই প্রথম খুঁচিয়ে তোলেন। মাঝখানে একবার আমি এরিয়ানা ডাকোটা প্লেনে কাবুল হয়ে যাবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়ে বেঁকে বসেছিলুম, এবং তাঁকেও যেতে মানা করেছিলুম। সেই আপত্তির ফলে আমাদের দুজনের জন্য পৃথিবীর প্রথম যাত্রীবাহী রুশ জেট-বিমান "টি-ইউ-১০৪" প্লেনে দুটি সীট্ রিসার্ভ করা হয়। এই বিমানে সেদিন আর দুজন বাঙ্গালী সোভিয়েটের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে মস্কো যাচ্ছিলেন ভিন্ন কাজ নিয়ে। তাঁদের একজন হলেন ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, অন্যজন নগেন্দ্রনাথ দাস।

এর কয়েক মাস আগে এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির আহ্বানে ভারতীয় সভ্য হিসাবে তারাশঙ্কর দিন আষ্টেকের জন্য মস্কো গিয়েছিলেন। কিন্তু জেট-বিমান এবং তাসকন্দ এই তাঁর প্রথম। আমাদের সঙ্গে উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিস্বরূপে যাচ্ছেন কয়েকজন চীনা, জাপানী, বর্মী, সিংহলী, ইন্দোনেশীয় ও ভিয়েটনামি। বেলা নটায় আমরা বিমানটির মধ্যে প্রবেশ করলুম। আমরা নিজেদের খরচেই তাসকন্দ যাতায়াতের টিকিট করেছি, সুতরাং স্বল্পমূল্য টুরিস্ট ক্লাসেই আমাদের জায়গা হয়েছিল,—ওটা প্রায় সেকেন্ড ক্লাসেরই সামিল। এই সুবৃহৎ আকাশপক্ষী যখন উড্ডীন হবে,—তার মুন্ডটা হবে পাইলট্ ক্যাবিন, বুকের মধ্যে থাকবে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা, পেটে-পেটে আমরা, এবং ল্যাজের দিকটায় যা স্বভাবতই থাকে,—অর্থাৎ টয়লেট বা শৌচাগার।

৯-৫ মিনিটের পর জেট-বিমানটি তার নাকটি ঘুরিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে দৌড়িয়ে চলল এবং বহুদূর অবধি উট-পাখীর মতো ছুটে এসে এক জায়গায় থামল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে একটি ভারত-সোভিয়েট চুক্তি অনুযায়ী এই প্লেনটি দিল্লী-মস্কো আনাগোনা করছে। কিন্তু পালম ছাড়া ভারতের অপর কোনও বিমান-বন্দরে এর যাবার শর্ত নেই, যদিও আমেরিকা, বৃটেন, ফরাসী, ওলন্দাজ,—এদের সকলেরই আছে। রাশিয়ার সঙ্গে নেই কেন, এ আমার অজ্ঞাত। যাই হোক, এই বিমানের যাত্রাটি দেখার জন্য বহু নর-নারী এনক্লোজারে দাঁড়িয়ে দূর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

প্লেনটি কয়েক মিনিট দাঁড়াল, তারপর ভয়াবহ গর্জনের দ্বারা ভিতরে ভিতরে দম নিল। অতঃপর হঠাৎ তড়িৎ-গতিতে বহুদূর অবধি দৌড়িয়ে গিয়ে কোন্ মুহূর্তটিতে ঠিক ভাসমান হয়ে গেল, টের পেলুম না বটে—কিন্তু হাতঘড়িতে দেখে নিলুম ঠিক ৯-১৫ মিনিট। দেখতে দেখতে দু মিনিটের মধ্যে মহাশূন্যের দিকে মিলিয়ে গেলুম সূর্যালোকে। সেই শূন্যব্যোম থেকে নিচের দিকে ঠাহর করা গেল, ভূ-পৃষ্ঠের শুধু একটা মস্ত ধূসর হরিতাভ ছায়া,—আর কিছু না! আমরা ক্রমশ আরও উপরে উঠছিলুম এবং প্রথম দিকটায় প্রতি ঘণ্টায় ৫০০ মাইল বেগে যাচ্ছিলুম। দিল্লী থেকে তাসকন্দ আকাশপথে প্রায় দেড় হাজার মাইল। কিন্তু আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার তিন চারশো মাইল আগে থেকে এই যন্ত্রদানবকে ধীরে ধীরে রাশ টেনে বাঁধতে হবে। এই বিমানের গতিবেগ নাকি অনন্য।

মেঘলোকের বহু ঊর্ধ্বে কোন্ একটা শূন্যে আমরা বিলীন হয়ে গেলুম, অনুধাবন করা কঠিন। পৃথিবীর অপর কোনও যানবাহনে এমন করে নিজেকে একান্ত নিরুপায় মনে হয় না, এবং সাংঘাতিক অপমৃত্যুর সঙ্গে এমন ক'রে কটাক্ষ-বিনিময়ও ঘটে না! ঝড়-তুফানে লণ্ডভণ্ড সমুদ্রে রাত্রির অন্ধকারে জাহাজের মধ্যে ওলোট-পালট খেয়ে দেখেছি,—সেখানেও আমরা মৃত্যুভয়-ভীত! কিন্তু তবু সেখানে দৈবাৎ বাঁচবার একটা সুদূর সম্ভাবনাও থাকে। এখানে তা নেই। জেট-বিমান যখন মুখ থুবড়ে পড়ে, তখন দু' মাইল অবধি তার হাড়-পাঁজরা মেদ-মজ্জা ছিটকে চলে যায়! মনে আছে কিছুদিন আগে ইংরেজের কমেট্ বিমান ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার পথে আমাদের কলকাতার গঙ্গার কোথায় যেন প'ড়ে গিয়ে জলের ধারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আগামী কালই কোন্ দেশ ও কোন্ জাতি কি প্রকার সাফল্যলাভ করবে, সেটি অনুমান করা কঠিন। আজকে যে জাতি আপন কীর্তি নিয়ে অহঙ্কার করে, কালকে সে নির্বোধ ব'নে গিয়ে চুপ করে যায়, এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

প্লেন ভেসে চলছে কি প্রকার গতিতে, উপলব্ধি করা যায় না। মহাশূন্যে স্থির, মহাকাশের সূর্য অকম্প। কেউ যদি এখন বলে, প্লেনের গতি নেই,—অবিশ্বাস করব না। কেবলমাত্র হাতঘড়ির সঙ্গে ওর গতি নির্ণীত হচ্ছে। বুঝতে পারি আমাদের গতি উত্তর-পূর্বে। পাকিস্তানের আকাশে আমাদের পক্ষে নিঃশ্বাস নেওয়া নাকি এ যাত্রায় বেআইনী হবে। একটু সুস্থির হবার পর প্লেনের অন্দরমহলে চোখ পড়ছে। ভিতরে দেখতে পাচ্ছি সম্পদের প্রাচুর্য। কোনও ধনী ক্রোড়পতির বৈঠকখানার আসবাবসজ্জাটা ঠিক এই প্রকার কিনা ঠাওরাচ্ছিলুম। রাশিয়ান জারের আমলে যারা এককালে 'নোবল্' ব'লে পরিচিত হত, তাদের গদি মখমল আর আরাম-বিলাসের অনুকরণও হয়ত আছে এই ধনাঢ্যের পরিবেশের মধ্যে। জার নেই কিন্তু জাঁক আছে।

এতক্ষণ পরে উদিতা 'হোস্টেস্' বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘাঙ্গী একটি রুশ যুবতী। মাথার চুলে ও চোখের তারায় কিছু রুক্ষতা আছে। একটু বেশি পরিমাণ স্বাস্থ্যবতী,—স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ্যে গায়ে কাঁটা দেয়। ওর সঙ্গে মলয়দেশ নগরে সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের দশাটা কেমন হয় ভাবছিলুম। মেয়েটির মুখখানি প্রসন্ন এবং সেবাপ্রবণশীল। কিন্তু এর বিপরীতটি প্রকাশ পেলেও চাকরি রাখা চলে না? যদি প্রৌঢ়বয়স্কা এবং দুশ্চিন্তা-জর্জরিতা এক হোস্টেস্ বেরিয়ে আসতেন, কেউ খুশী হত কি? সুতরাং প্রত্যেক যাত্রীর যৌবন-নিকুঞ্জে পাখী যদি না ডেকে ওঠে তবে হোস্টেসের মূল্য কি? ওটাই ত বিজ্ঞাপন! আমার ভুল ভাঙল,—মেয়েটির মুখে ও ঠোঁটে রং-পাউডারের চিহ্নমাত্র নেই। তার চেহারা ও পোশাকের সংযত শালীনতা ও শোভন আচরণ এই দুটিই আমাদের দুটি আকর্ষণ করেছিল। প্রাতরাশ দেবার আগে মেয়েটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে আমাদের জানিয়ে গেল, আমাদের প্লেন এবার ১১,০০০ মীটার অর্থাৎ প্রায় চৌত্রিশ হাজার ফিট উঁচুতে উঠে যাচ্ছে! তারাশঙ্কর এক সময় কোনওমতে ঘূর্ণির মতো দাঁড়িয়ে উঠে টলতে টলতে প্রাণের দায়ে টয়লেটের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু একটু পরে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে ফিরে এসে ঈষৎ কাতর কণ্ঠে বললেন, না হে, হল না! শরীরের কলকব্জা সব বিগড়ে গেছে!

প্রাতরাশের মধ্যে ছিল আঙুর, আপেল, মাখন, চীজ, মাংসের চপ, কয়েকটা মটরশুঁটি মেশানো ভাত, একটি ছোট গোলাকার পাঁউরুটি, ক্রীম বিস্কুট, টম্যাটো, একটি সাহেবী মিষ্টান্ন এবং এক পেয়ালা কফি।

আমরা আরামে আছি। ভিতরে একটু গরম বোধ হচ্ছে, সেইজন্য মাথার কাছাকাছি একটি যান্ত্রিক ছিদ্রপথ দিয়ে মাঝে মাঝে সুচারু পরিমাণ বাহিরের স্নিগ্ধ বাতাস ভিতরে আনা হচ্ছিল। সীটের পাশে দুপাটা কাচের গোলাকার জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছে, আমরা শ্যামলাভ ভারতের ক্রোড়ভূমির উত্তরে হিমালয়ের উত্তর চূড়াগুলি অতিক্রম করছি। দুগ্ধশুভ্র চূড়ারা রয়েছে অনেক নীচে,—তেল-ভুলানো ছোট ছোট সাদা পুতুলের মতো। তাদের উপরে শরৎকালের স্বর্ণরৌদ্র ঝলমল করছে। তাদের সেই বিশাল মৌন মহিমা উপর থেকে এখন আর বিস্ময়াবিষ্ট করছে না,—কিন্তু নিচেকার দিগ্‌দিগন্তব্যাপী একটা অবাস্তব শ্বেতচ্ছায়া আমাদের অবাক দৃষ্টিকে একপ্রকার মোহে ও মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কারাকোরমের সর্বোচ্চ চূড়াটি দূরে থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মতো দেখা যাচ্ছিল। ডানদিকে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে সুপ্রাচীন তিব্বত তার কৈলাসের সহস্র জটা এলিয়ে,—দুটি তার বিশাল নীলাভ চক্ষু 'মানস' ও 'রাক্ষস' নিমীলিত তপস্যায় নিথর; ক্ষমা ও প্রসন্নতার সুন্দর। আমরা হিমালয় অতিক্রম করছিলুম।

হিন্দুকুশ গিরিশ্রেণীর একটি অংশ আফগানিস্তানে, অন্যটি পামীরে,—যেটি ভূ-পৃথিবীর 'উপরতলার ছাদ' বলে পরিচিত। মালভূমি পামীর মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে এবং উত্তরকাশ্মীর ও কারাকোরমের বাইরে। মধ্য এশিয়ার বিশাল মরুলোক তাকলামাকান চীনাদের নিকট সিনকিয়াং নামে পরিচিত। এটির বিস্তার হল উত্তর তিব্বতে ও মঙ্গোলিয়ায়। এই মরুভূমির উত্তরভাগে রুশীয় তিয়েনসান এবং দক্ষিণে কুয়েনলান গিরিশ্রেণী। তাকলামাকানকে ডানদিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে রেখে আমাদের প্লেন অনেকটা উত্তর-পশ্চিম দিকে ঈষৎ বাঁক নিচ্ছিল। আমাদের নিচের দিকে পৃথিবীর এই ভূভাগে শত শত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসে স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট ছিল কিনা সন্দেহ। পার্বত্য উপজাতিরা এই সভ্যসমাজবর্জিত ভূভাগে ছোট ছোট জনপদ সৃষ্টি ক'রে গোষ্ঠীশ্রেণীভুক্ত হয়ে বাস করত। শস্য, সব্জি, বৃক্ষলতা ও তৃণদল তারা আজও হয়ত চোখে দেখেনি। কেননা এই আদি-অন্তহীন মালভূমির উচ্চতা হল সচরাচর দশ হাজার থেকে বাইশ হাজার ফীট উঁচু। সেই কারণে মধ্য এশিয়ার ক্যারাভান-পথের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা বংশপরম্পরা কাটিয়েছে। পশুপালন ছিল তাদের উপজীবিকা। জন্তুর মাংস খেয়ে তারা পেট ভরাত, এবং জন্তুর লোম ও চর্মের দ্বারা পরিধেয় বানিয়ে নিত। পেটের দায়ে তারা ক্যারাভান লুট করেছে যত, বালুপাথরের ওই বিস্তীর্ণ মালভূমিতে রক্ত গড়িয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ সেই পামীর সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত, এবং তাজিকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ওদিকে তাকলামাকান্-এর মরু-ভূভাগে এখন নাকি চীনাদের মোটরগাড়ি আনাগোনা করে কাশগড় থেকে ইয়ারকন্দে, খোটান ও তারিম থেকে উরুমচিতে। যান্ত্রিক যুগে ক্যারাভানের বাণিজ্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে।

কারাকোরম ও হিন্দুকুশের ফ্রেমে বর্তমান ভারত ও পাকিস্তান বাঁধানো। তার ওপারে আফগানি হিন্দুকুশের উত্তর সীমানা তার সুবিশাল তুষারশৃঙ্গদল নিয়ে তাজিকিস্তানে প্রবেশ করেছে। সেখানে উভয় দেশের সীমানা নির্ণীত হয়েছে অক্সাস তথা আমুদরিয়া নদীর দ্বারা। মধ্য এশিয়ার দুটি প্রধান নদী শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া বেরিয়ে এসেছে তিয়েনসান গিরিশ্রেণীর ভিতর থেকে। প্রথমটি বয়ে গিয়েছে খিরগিজিয়া, তাজিক, উজবেক এবং কাজাখস্তান পেরিয়ে আরল সমুদ্রের দিকে, এবং দ্বিতীয়টি ওই একই পথে আফগান সীমানা বেয়ে তুর্কমেনিস্তানের মরুভূমি পেরিয়ে পুনরায় উজবেকিস্তানের ভিতর দিয়ে চলে গেছে আরল সমুদ্রে। পৃথিবীর অপর কোনও ভূভাগে শতসহস্র যোজন বালুপ্রান্তর পেরিয়ে কোনও নদী এমন ক'রে প্রবাহিত হয়নি, —যেমন হয়েছে বিস্তীর্ণ মধ্য এশিয়ার মরুলোকে।

পামীর ছাড়িয়ে এলুম আরও অনেক উত্তরে, এবং সোভিয়েট

ইউনিয়নের আকাশলোকে যে আমরা ভেসে আসছি, তার প্রথম সংকেত পাওয়া গেল যখন সামনের লাল আলোটা দপ করে জ্বলে উঠে ঘোষণা করল : ধূমপান করো না! দেখতে দেখতে বিমানের শ্লথগতির নির্দেশ মিলল ভিন্নপ্রকার একটি আওয়াজে। আমাদের পথ ফুরিয়ে এসেছে। আমরা একটি অভিনব জগতে এবার নেমে পড়ব।

দুর্ভাবনা অনেক আছে মনে। সম্পূর্ণ একটা অচেনা এবং অজানা দেশে যাচ্ছি, তার জন্য উদ্দীপনার অভাব নেই, কিন্তু এমন একটি জগতে গিয়ে নামছি যার সঙ্গে জানা পৃথিবীর প্রকৃতিগত মিলও নেই। চলিতকালের সভ্যতাকে যারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে 'নতুন' সভ্যতাকে চালু করেছে, বৈপ্লবিক চেতনায় যারা নিত্যনিয়ন্ত্রিত, ঈশ্বরকে যারা পরিহাস-বিদ্রূপের দ্বারা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, যাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক, যারা বহির্জগতের তথাকথিত সভ্যসমাজের অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে এক বিচিত্র সমাজ সৃষ্টি করেছে, যারা সমষ্টির পক্ষে বিবেচনার জন্য যে-কোনও ব্যক্তিকে যে-কোনও সময়ে বলি দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না এবং যাদের দেশের হাওয়ায়, জলে, স্থলে, খাদ্যে এবং মাটিতে সর্বনাশা 'বিষাক্ত' মিলিয়ে রয়েছে, আমি আর মাত্র দু-মিনিটের মধ্যে সেই 'সাংঘাতিক' দেশে পদার্পণ করছি! শুধু দুর্ভাবনা নয়,—আমি শঙ্কাকুল হয়ে উঠেছি! আমি আজও একজন উপবীতধারী কুলীন ব্রাহ্মণ, আচারনিষ্ঠ সংরক্ষণশীল পরিবারে আমি মানুষ, দেবদ্বিজে আমি আজও অনুগত, ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান—সুতরাং আমি শঙ্কাকুল, এতে সন্দেহ কি!

শোনপক্ষীর মতো চক্রাকারে বিমানখানা একবার ঘুরল, একবার কাত হল,—আকাশ গেল পাতালে, একটা মস্ত শহর যেন নীচের থেকে ডিগবাজি খেয়ে উপরে উঠে গেল, তিয়েনসান পাহাড় একবার যেন অতলে ডুব দিল! আমরা পাখীর পেটের ভিতরে বসে অনুভব করলুম, সমগ্র সৃষ্টি উলটে-পালটে যেন পাক খেয়ে গেল!

দেখতে দেখতে বিমান নেমে এল গাছপালা ও লতাগুল্মভরা দুর্দিনের সেই প্রাচীন পৃথিবীর মাটিতে। পৃথিবী যেন রুদ্ধকণ্ঠ, অর্থাৎ আমাদের অনেকের কানে তালা লেগেছে!

তাসকন্দের বিমানঘাঁটিতে আমাদের প্লেন এসে নামল। হাতঘড়িতে দেখলুম, বেলা বারোটা বেজে পনের। দিল্লী থেকে তাসকন্দ ঠিক তিনঘণ্টা!

এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলন উপলক্ষ্যে নানান দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এই বিমানঘাঁটিতেই এসে নামবেন, এই রোমাঞ্চকর কৌতূহল ছিল স্থানীয় জনসাধারণের মনে। সেইজন্য আবেষ্টনীর বাইরে মস্ত এক জনতা এসে ঘিরেছিল। আমরা যখন প্লেন থেকে নামবার জন্য প্রস্তুত হলুম, তখনও মাথাটা টলছে, শরীরের ভিতরটা যেন শূন্য। পরে শুনেছিলুম, আমাদের বিমানটি নাকি চল্লিশ হাজার ফীটেরও বেশি উপরে উঠেছিল। বিমানবিহারের ফলে ভবিষ্যৎ-কালের মানুষের শরীরে তার অন্তত্ন্তের বিকলতা ও নূতন কোনও ব্যাধির সৃষ্টি হবে কিনা এখনই বলা কঠিন!

প্লেন থেকে নামবার জন্য যে এলুমিনিয়মের সিঁড়িটার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেটি এতই নড়বড়ে এবং পলকা যে, প্রত্যেক যাত্রী অতি আড়ষ্ট এবং সতর্কতার সঙ্গে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ এতে আকস্মিক অপঘাতের ভয় ছিল। এ ধরনের সামগ্রী সৃষ্টির মধ্যে যে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, সেটি মনকে প্রথমেই পীড়া দিল। হয়ত বুঝিয়ে দেওয়া হল, এ দেশে পা ফেলতে হয় খুব সাবধানে!

পথ আমাদের নির্দিষ্ট—যেমন সব বিমানঘাঁটিতেই দেখা যায়। সেই পথ ধ'রে আমরা একটি প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকায় প্রবেশ করলুম, এবং তার দোতলায় মস্ত এক সুসজ্জিত কক্ষে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলুম। আশে-পাশে যে-জনতাটিকে লক্ষ্য করছি, তাদেরকে নিতান্ত অপরিচিত মনে হচ্ছে না। এদেরকে যেন দেখে এসেছি নেপালে আর ভুটানে, দার্জিলিঙে আর পেশাওয়ারে। এরাও সেই একই শ্রমিক সাধারণ, যেমন-তেমন নতুন-পুরনো পাজামা পরা, যেমন-তেমন জামা-জুতো পরা,—কেউ সামান্য দাড়ি রেখেছে, কেউ বা দাড়ি কামায়নি, কেউ ফর্সা, কেউ পীতাভ, কেউ বা কিছু তামাটে। কারও মুখের ছাঁচ মঙ্গোলীয়, কেউ তুর্কীয়, কারও বা যেন পাঠানের মতো। আশে-পাশে মেয়ে আছে ওই একই শ্রেণীর ঘাগরাপরা এবং জুতোও আছে তাদের পায়ে। মাথায় যেমন-তেমন একটা ওড়না বাঁধা,—কারও বা পিছনে বেণী ঝুলছে গোটা দুই। যাদের পরনে ফিটফাট খাকি মিলিটারী পোশাক, এবং যাদের দেখলে গা ছমছম করে, তারা প্রায় সকলেই সাহেব,—সম্ভবত রুশ! তারা গম্ভীর এবং কর্মব্যস্ত। শ্রমিক সাধারণের মাঝখানে একদল শ্বেতাঙ্গ অফিসারের আনাগোনার দৃশ্য দেখায় আমাদের চোখ অভ্যস্ত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা প্রকট। আমরা কোন্ বিচিত্র দেশের মানুষ ওদের মাঝখানে এসে পড়েছি, সেজন্য আশেপাশে কানাকানির আর অন্ত নেই। বহু লোক কাছে এসে আলাপ করবার জন্য উৎসুক—এটি লক্ষ্য করছি। কিন্তু অতি নিকটে আসছে না কেন, তাই ভাবছি। সেটা ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান শুধু নয়, হয়ত অন্য কোনও বাধা আছে,—এটিও যেন আঁচে অনুমান করতে পারি। সে বাধা কি, আমি জানিনে। বহুলোকের নাড়া মাথার চাঁদিতে কালো রংয়ের চৌকো টুপি,—তার উপর সাদা সূচীশিল্পের কাজ-করা। বহু লোক কাছে এসে খুশী মুখে আলাপ করবার জন্য উৎসুক দেখতেই পাচ্ছি। অনুমান করতে পারি, হয়ত ওরা কিছু লাজুক এবং আড়ষ্ট। এমন হতে পারে, ওরা প্রথম বাইরের লোক দেখল! আর নয়ত ওরা পরদেশীর সঙ্গে আলাপ করতে ভয় পায়,—কে জানে কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখবেন কিনা। সে যাই হোক, ওদের আকুলতা এবং আমাদের আগ্রহ খুব কম ছিল না। কিন্তু দোভাষীর সাহায্যে আলাপ করাটা সঙ্গত হবে কিনা ভাবছিলুম।

সাবেক কালের জমিদারবাড়ির আসবাবপত্রসজ্জিত এক মস্ত কক্ষ—ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো। কড়িকাঠের শিলিংএ বিচিত্র কারুকার্য, দেওয়াল-গুলিতে নানান চিত্রণ, ছোট ছোট শ্বেতপাথরের মূর্তি এখানে-ওখানে। ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল রেকাব গদি-আঁটা। একপাশে আমাদের এয়ার-ইণ্ডিয়া-ইন্টারন্যাশনালের একটি 'মর্তিমান' প্রচার বিজ্ঞাপন। একটি অশোভন এবং কুদর্শন পুরুষমূর্তি হেঁট হয়ে সেলাম ঠুকে ভারতীয় বিমানের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে! এই কুরুচি-পূর্ণ পুতুলটি কোন্ শিল্পীর অপসৃষ্টি জানিনে। কিন্তু এই 'বামনের'

গোঁফজোড়া এবং অভদ্র ভঙ্গী দেখলে গা জ্বলে যায়!

অনেকক্ষণ কাটল পাসপোর্ট এবং ভিসার জটিল কর্মসম্পাদনে। তারাশঙ্কর ঈষৎ অস্বস্তিবোধ করছিলেন—সেটি স্বাভাবিক। কোথাও থেকে একটা অভ্যর্থনা তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে আসুক, হয়ত এজন্য তাঁর প্রতীক্ষা ছিল। এই প্রকাণ্ড কক্ষে নানান বর্ণের ভদ্রমহিলার মধ্যে কয়েকজন শ্বেতকায়া মহিলা আনাগোনা করছিলেন। তাঁদেরই ভিতর থেকে একটি মেয়ে এবার আমাদের দিকে এগিয়ে এল। অতি ভদ্রবেশা এবং সুশ্রী তরুণী। মাথার সোনালী চুলগুলি যেমন-তেমন ভাবে ফেরানো, গায়ে একটি বিস্কুট রঙের হাতকাটা গরম সোয়েটার, মুখে রং-পাউডারের লেশমাত্র আভাস নেই, কচি কচি কোমল দুটি চোখ, গোলাপের মতো নরম বর্ণ,—মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী। কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্ট। এটি রুশ মেয়ে। বয়স বছর কুড়ি।

আমরা ভারতীয়, এই আমাদের দুজনের পরিচয় এবং এইটুকুই যথেষ্ট। মেয়েটি প্রথম আলাপেই সুস্পষ্ট হিন্দি ভাষায় কথা বলল। এমন পরিচ্ছন্ন হিন্দি শুনে প্রথমটা হতচকিত হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু এক সময় স্বীকার করতেই হল, হিন্দিতে আমাদের উভয়ের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। ইংরেজিতে কথাবার্তা বললে বড়ই বাধিত হই। মেয়েটি তখনই ইংরেজিতে আলাপটি ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, আপনারা তাহলে কোন্ ভাষা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করেন?

তারাশঙ্কর অনেকটা এই প্রকার জবাব দিলেন, আমরা ভারতীয়, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী। আমাদের ভাষা বাঙ্গলা, যে-ভাষা ছিল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

মেয়েটি সম্ভবত আরেকটি প্রশ্ন করেছিল, টেগোর হিন্দিতে কিছু লেখেননি?

একবর্ণও না। —তারাশঙ্কর বোধ করি আরও বলতে চাইলেন,—যে-ভাষা ভারতের মধ্যে আজও শ্রেষ্ঠ, 'টেগোর' সেই ভাষাতেই লিখে গেছেন!

মেয়েটি জবাব দিল, সোভিয়েট ইউনিয়নে টেগোরকে সবাই পরম শ্রদ্ধা করে।

কথায় কথায় মেয়েটি একসময় জানাল, সেই আমাদের দোভাষীর কাজ করবে, এতে আমাদের সায় আছে ত?

তারাশঙ্কর বললেন, আছে বৈকি। এ ত আনন্দের কথা। খুব চমৎকার তোমার কথাবার্তা। কোথায় আমাদের যেতে হবে এবার নিয়ে চল।

তারাশঙ্করের পক্ষে বিশ্রামের দরকার ছিল। তিনি কিছু কৃশ ও ক্লান্ত। রুগ্ন ঠিক নন, কিন্তু ঈষৎ রোগা-ভাঙড়ো। তিনি বিশ্রামসহ আলাপচারীর পক্ষপাতী, অর্থাৎ বিশ্রম্ভালাপ তাঁর প্রিয়। অতিমাত্রায় ধকল সহ্য করা তাঁর শরীরে বাধে। ঔষধপত্রের বাক্স তাঁর সঙ্গেই চলে।

অদৃশ্য কোনও একটা ব্যবস্থার দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিলাম বৈকি। একসময় জানতে পারলুম, আমাদের গাড়ি প্রস্তুত, এবার বুঝি শহরে যেতে হবে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তুটি আমাদের হাতছাড়া হয়েছিল—সেটি পাসপোর্ট। কিন্তু সেটি নাকি যথাসময়ে আমাদের পুনরায় হস্তগত হবে, ভাববার কিছু নেই। পাসপোর্ট-খানা ঠিক যেন কোন্ একটা জটিল গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে একসময়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ওটা হারালে আমরা বড় অসহায়!

এ অট্টালিকার সমস্তটাই পাথরের তৈরি,—সেটি বেলেপাথর। তাসকন্দ শব্দটার অর্থ হল, 'তাস' অর্থাৎ পাথর, 'কন্দ' ওরফে শহর। কিন্তু নানাবর্ণের বিভিন্ন এবং বিচিত্র পাথরের কাজ ইতিমধ্যেই আমাদের চোখে পড়েছে, এবং মনে মনে তারিফ করেছি। সমস্ত চেহারাটার মধ্যে একটি বিশালত্বের ভাব পাওয়া যাচ্ছিল।

মোটরগাড়িটি ভাল, ড্রাইভার হল উজবেক। লোকটি নিছক আজ্ঞাবহ, ভিন্নদিকে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। পিছনের সীটে আমরা দুজন,—সামনে ড্রাইভারের ডান পাশে মেয়েটি বসল। এ গাড়িটির স্টীয়ারিং বামদিকে। আমার মনে প্রেজুডিস প্রবল। আপাতত এদেশের কোনও মেয়ে এবং পুরুষকে সহজে গ্রহণ করতে আমি অক্ষম! আমার চিত্ত সংকীর্ণ এবং সন্দিগ্ধ। এই সুশ্রী মেয়েটির সরল, স্নিগ্ধ এবং সুমিষ্ট আলাপের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সৌজন্য রয়েছে,—কিন্তু আমার মনে মুহূর্মুহুঃ ভিন্ন কথার আনাগোনা চলছিল। প্রকাশ্য সরলতার পিছনে আর কিছু নেই ত?

তোমার নাম কি?

লানা!—মেয়েটি সহাস্যে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—আপনাদের সুবিধে অসুবিধে সব আমাকে বলবেন। আমি সব সময়ে আপনাদের কাজে থাকব।

বিস্তৃত মসৃণ পথে গাড়ি চলল। প্রথম পথের দুপাশে মস্ত বাগান, এবং সেখানে বড় বড় ডালিয়া গোলাপ আর সূর্যমুখীর অজস্র সমারোহ। এপাশে ওপাশে প্রান্তরে ধুলো উড়ছে মাঝে মাঝে। গাছপালা লতাপাতায় চারিদিক ছাওয়া সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন যেন শুষ্কতার আমেজ পাই, বাতাসে রুক্ষতা বেশি। কাশ্মীরের শ্রীনগরের পথঘাটের কথা মনে পড়ছিল। পপলার, চেনার এবং উইলো তাদের সেই পরিচিত চেহারা নিয়ে এখানে দুই পাশে সরে যাচ্ছে। পথে পথে জনতার জটলা ও

কোলাহলের আভাসমাত্র নেই। বন-বাগান গাছপালার আশেপাশে এবং সমান্তরাল পথের দুধারে তাসকন্দ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি পথ প্রায়ই ঋজু,—চোখ তুললে সোজা তিন-চার মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তাসকন্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা কোনমতেই মনে পড়ে না যে, চারিদিকের দেশজোড়া মধ্য এশিয়ার আদিঅন্তহীন মরুভূমির মাঝখানে তাসকন্দ অঞ্চল একটি ওয়েসিস্ অর্থাৎ মরূদ্যান মাত্র। প্রাচীন তুর্কিস্তানের সেই অতিখ্যাত রুক্ষতা যেন কারণে কোমলতার রূপান্তরিত হয়েছে। এই রম্যনগরীর হরিৎশোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

গাড়ি চলছে। যান-বাহন পথের ডানদিক ঘেঁষে যায়—এটি সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নেরই নিয়ম। লোক-জন হাঁটে ডানদিকের ফুটপাথে, ফিরে আসে বাঁ দিকে। এরা দক্ষিণপন্থী, লেফ্‌টিস্ট নয়! বিমানঘাঁটি থেকে শহরের মাঝখানে পৌঁছনো পর্যন্ত অপরিচ্ছন্ন এবং নোংরা কোনও লক্ষ্যণীয় কিছু চোখে পড়ে কিনা তাই খুঁজছিলুম, কিন্তু অশোভন ও কুশ্রীভাব চিহ্ন কোথাও পাওয়া গেল না। না আছে নোংরা ইতর বস্তি, না বেশ্যাপাড়া সস্তা চায়ের দোকান, না বা রেডিয়ো যন্ত্রে অশ্লীল গানের চীৎকার। এমন নিঃঝুম, গম্ভীর, স্বল্পবাক এবং কলের পুতুলের দেশে এসে নামব ভাবিনি! পথে একটি জঞ্জাল প'ড়ে নেই, ফুট-পাথের ধারে কোথাও বিকিকিনি নেই, সর্বত্র জনবিরলতা বিরাজ করছে। কোনও বাগানবাড়ি থেকে সাহেব মেম বেরোচ্ছে, কোথাও থেকে বেরোচ্ছে চৌকোনো টুপি-পরা উজবেক। টুপিটার রং কালো, পাড় তার সাদা এবং অতি মনোজ্ঞ লেস-বুনোনি সূচীশিল্পের কাজ-করা। টুপিটা পরা হয় ঠিক মাথার চাঁদির ওপর, এবং ওটার স্থানীয় নাম হল "তুবেতেইকা"। আমার পক্ষে ওটা লোভনীয় হয়ে রইল!

বিদেশে এলে একটি দুর্বলতা প্রায় সকলকেই পেয়ে বসে। সেটি হ'ল কথায়-কথায় নিজের দেশের সঙ্গে তুলনা। এ দুর্বলতা অতিক্রম করা আমার উচিত ছিল, কেননা এটি স্বভাবের ত্রুটি। মাইল চার-পাঁচ এসে যখন একটি রেলপথের লেভেল্-ক্রসিং পার হলুম, এবং আরও কিছুদূর এগিয়ে যখন তিন-বগিওয়ালা ট্রাম চলতে দেখলুম, মনে মনে বলতে হল, কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির পরি-চ্ছন্নতাবোধ তোমাদের চেয়ে অনেক কম স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের রেলপথ বা রেলগাড়ি অথবা ট্রামগাড়ির চেহারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি সুশ্রী!

দুই পাশের গাছপালার শান্তশ্রী পথগুলিকে সুন্দর ক'রে রেখেছে। সাদা ও সবুজ মেলানো ছোট ছোট একতলা গৃহস্থ-বাংলোগুলি ছবির মতো মনে হচ্ছে। প্রত্যেকটি বাড়ির নম্বরের উপর একটি করে আলো দেওয়া—যাতে রাত্রে খুঁজে পেতে অসুবিধে না হয়। ফুলের অবারিত সমারোহ দেখে সহসা তাসকন্দকে উদ্যান-নগরী বলতে ইচ্ছা করে। এটি যে মরুশহর, সেকথা ভুলে যেতে হয়।

অভিনবত্বের চমক ভাঙতে দেরি হচ্ছিল। ওরই মধ্যে পেরিয়ে যাচ্ছিলুম এক একটি বিস্তীর্ণ অট্টালিকা। পুরনো মনে হচ্ছে না কোথাও। ফাটল-ধরা ক্ষয়িষ্ণু ঘরদোর দেখছিনে, প্রাচীনের মুখে পাউডার বুলিয়ে আধুনিক বানাবার চেষ্টা চোখে পড়ছে না, যেমন-তেমন ভাবে 'দিনগত পাপক্ষয়' ক'রে দুঃখী জীবন যাপনের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছিনে। চট করে যেটা মনে হয়, সেটা হল এই—দারিদ্র্য-দশার আভাসমাত্র নেই! কিন্তু পোশাক-আশাক এবং দৈহিক প্রসাধন পারিপাট্যে ইতর-ভদ্র এরই মধ্যে কিছু চোখে পড়েছে বৈকি।

পনের-ষোল মাইল সুন্দর পথ অতিক্রম করে এলাম। এটি শহরতলী,—দুই পাশের ক্ষেতখামার ও শ্রেণীবদ্ধ পপলারশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে দূর পূর্বদিকে তিয়েনসান গিরিশ্রেণী দেখা যাচ্ছে। বাতাস রুক্ষ শীতল। এখনও বৃষ্টির কাল শেষ হয়নি, কিন্তু বর্ষা এখানে একটানা নয়। উপরে মেঘ আনা-গোনা করে, কিন্তু দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। আমাদের গাড়ি এসে বাঁদিকে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। চাষী ছেলেমেয়ে এবং বর্ষীয়সী নানা স্ত্রীলোক চোখে পড়ল। পরনে কালচে ঘাঘরা ধুলোমাটি লাগা, মাথায় সাদা ওড়না বাঁধা, হাতে কাঁচকড়ার বালা,—ভুটিয়া-নেপালীর সঙ্গে তফাত কমই। মুখের রং রোদপোড়া, কিন্তু কালো নয়। যদিও মুসলমানের দেশে এসেছি,—এখন পর্যন্ত একটি মসজিদ চোখে পড়েনি। কোথাও কোনও ব্যক্তিকে নমাজ পড়তে দেখিনি।

গাড়ি এসে থামল একটি সাবেক কালের শৌখীন বাগানবাড়ির ফটক পেরিয়ে ভিতর দিকে। এতক্ষণ পরে মানুষের সমাগম পাওয়া গেল। দেখতে দেখতে এগিয়ে এলেন দুচারজন ভদ্র-লোক, তাঁদের কেউ রুশ, কেউ বা উজবেক। তাঁদের প্রায় সকলেরই সাজ-সজ্জা ইউরোপীয়। অভ্যর্থনাটা যন্ত্র-চালিত নয়,—স্বতঃস্ফূর্ত এবং আন্তরিক ব'লে মনে হল। একটি বস্তু লক্ষ্য ক'রে এসেছি। ভারতবর্ষের নাম শোনামাত্র সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধায় সকলেই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। দেখতে দেখতে আরও দুতিনখানি গাড়ি এসে পৌঁছল, এবং একটা শোরগোল পড়ে গেল। আমাদের পৌঁছবার আগে অন্যান্য দুতিনটি দেশের প্রতিনিধিও এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আগামীকাল থেকে আরও অনেকেই আসবেন।

নীচের তলায় একটি হলে সাময়িক আপিস বসে গেছে। এখান থেকে বিনা-মূল্যে যথেচ্ছ পরিমাণ চিঠিপত্র ও তারবার্তা পাঠানো চলবে। সর্বপ্রকার খবর ও সন্ধান এখানেই মিলবে। ধোবা, নাপিত, একে একে সব এখানে বসে গেছে দেখলুম। ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধপত্র—যখন যা দরকার। বাড়িখানার ভিতরবাগে আপাদমস্তক কার্পেট মোড়া। চিনামাটির বড় বড় জঞ্জাল ফেলার সুশ্রী পাত্রগুলি সব জায়গায় মজুত। সিগারেট ও দেশলাই না চাইতেই পাবে! দেখেশুনে বেশ একটু চনমনে হয়ে উঠলুম।

তারাশঙ্করের হিসাব-বুদ্ধি ছিল। দিল্লী থেকে আসবার সময় তিনি চায়ের ফ্লাস্ক এনেছিলেন। তাঁর পক্ষে যখন তখন চা হ'লে ভাল হয়। অসময়ে এখানে চা মেলে না, এবং সকাল আটটার আগে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে চা মেলা দুষ্কর! সেই কারণে রাত্রে বিছানায় যাবার আগে পরদিন প্রভাতের জন্য ফ্লাস্কে গরম চা সঞ্চয় ক'রে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে তৈরি-চা অত্যন্ত হাল্‌কা, জলপ্রধান, দুধবিহীন,—এবং সেই হরিদ্রাভ গরম জলের গেলাসটির উপর ভাসতে থাকে এক চাকলা লেবু: সেটিও সোভিয়েট লেবু,—ভিন্ন ধরনের স্বাদ এবং রস কম। গরম চা-কে বলা হয় 'গরিয়াচি চায়।' দুধ হল 'মালাকো'। চিনি হল 'শাখার'। সোভিয়েট চা আমাদেরকে বরাবর দুঃখ দিয়েছে!

দোতলায় উঠে দূরে কোণের একটি স্যুইট-এ আমাদের দুজনের থাকার জায়গা হল। শয়নকক্ষটির কোলে যেটি এণ্টি-রুম, সেটিকে বাইরের বসবার ঘর বলো—আপত্তি নেই। দুটি ঘরের আসবাবপত্র যথেষ্ট। দুখানি পাশাপাশি খাট,—উপরে গোলাপী রংয়ের শাটিন সিল্কের সূচীশিল্পিত 'বেডকভার' দিয়ে ঢাকা এবং তার নীচে পরিচ্ছন্ন নধর বিছানা পাতা। মাথার বালিশ দুটো মস্ত বড়, এবং ঢোকা, অত্যন্ত নরম এবং আরামদায়ক। সে-বালিশ এতই বড় যে, শুলে পিঠ পর্যন্ত তার উপর চেপে থাকে। মস্ত মোটা একখানা কম্বল চাদরমোড়া,—মাঝখানে বাদামি ধরনের একটি ফাঁক,—অর্থাৎ চাদর ছাড়িয়ে কম্বলটিকে বার ক'রে নেবার যেন একটি সুবিধা থাকে। অবিকল এই খাট, কম্বল বালিশ, চাদর, নিচেকার গদি ও স্প্রিং,—

সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্ভবত একই ছাঁচে ঢালা,—কোথাও এর ব্যতিক্রম আমি দেখিনি। বাইরের লোককে লুকিয়ে নিজের জুতো নিজে পালিশ ক'রে নিতে অবশ্যই পারতুম,—কিন্তু দুখানি ক'রে বুরুশ প্রত্যেক হোটেলের প্রত্যেক ঘরটিতে যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে পাওয়া গেছে, তেমনি রংয়ের কৌটা কোথাও খুঁজে পাইনি। এর মধ্যে 'মুচি-ইউনিয়নের' কোনও সংকেত আছে কিনা জানিনে!

গোবর ঘরে যখন আমরা ঢুকলুম, লানা রইল বাইরে আমাদেরই জন্য অন্য কাজকর্মের তদারকে। এর মধ্যে আরেকটি মেয়েকেও আমাদের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে, তার নাম নিকা। মেয়েটি লানার চেয়ে বয়সে সামান্য বড়। কিন্তু তার ঠোঁটে রং এবং মুখে গোলাপী পাউডারের আভাস আছে। সেটিও বিশেষ ভদ্র ও কর্তব্যনিষ্ঠ। দুটিকেই আমাদের কাজে কেন দেওয়া হল, এবং তার তাৎপর্য কিছু আছে কিনা—এর খোঁজ পাইনি। লানা আমাদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলে কিনা এবং হিন্দি ভাষাতেই আমরা ঘনিষ্ঠ আলাপ করি কিনা—এটি হয়ত বা জানবার দরকার ছিল! নিকা হিন্দি জানে না। আমরা অবশ্য হিন্দি অপেক্ষা ইংরেজিতেই আলাপচারী করা বেছে নিয়েছি। আমাদের পক্ষে এই প্রকার অ-ভারতীয় ভাষায় আলাপ করাটা ভারতের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক হচ্ছে কিনা, এ প্রশ্ন আছে বৈকি। একজন বিদেশিনী হিন্দি বলবার জন্য উৎসুক, অথচ আমরা ভারতীয় হয়ে অপর একটি বিজাতীয় ভাষা ব্যবহার করছি,—যেটি রুশ এবং ভারতীয় কোনটাই নয়,—এটির মধ্যে একটি অগৌরব আছে বৈকি। সর্বাপেক্ষা ভাল হত যদি আমরা কেবলমাত্র বাঙলায় কথা বলতে পারতুম। কিন্তু সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্ভবত শতখানেক লোক হয়ত তখন বাঙলা জানে, এবং তাদের কেউ এখনও আমাদের সামনে আসেনি। দুঃখের বিষয়, সোভিয়েট ইউনিয়নকে এই কথা বিশ্বাস করতে দেওয়া হয়েছে যে, হিন্দি ভাষাই একমাত্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পরিগণিত, এবং তার ভিতরের ভাবটি হল এই যে, হিন্দি সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমানিত। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কবি, সকলেই ওখানে জানে, কিন্তু তাঁর ভাষা যে তথাকথিত 'রাষ্ট্র-ভাষা' নয়,—এ সম্বন্ধে ওরা অধিকাংশই এখনও অন্ধকারে বাস করে। এমন উদাহরণ চোখে পড়েছে যেখানে রবীন্দ্রনাথের হিন্দি অনুবাদ থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

কিন্তু এবার বোধ হয় চাকাটা একটু ঘুরেছে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদান [illegible] বেড়ে ওঠার পর থেকে সোভিয়েট [illegible] বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়েছেন। বাঙলা ভাষা শিখবার জন্য একটি ব্যাপক তোড়জোড় চলছে।

সোভিয়েট বিদ্যা আমার কম। শ্রেণীহীন সমাজ বলতে যে একটি বিশেষ সংজ্ঞা মনে মনে লালন করে এসেছি, এখানে এসে চারদিক দেখে শুনে সেই ধারণার ঈষৎ ব্যতিক্রম ঘটল। রাস্তায় রাস্তায় সেই একই ঝাড়ুদার কাজ করছে, রাজমিস্ত্রিরা পাকা ইমারতে ইট পাথর গাঁথছে, জন-মজুরে তেমনি যোগান দিচ্ছে, ছোট ছোট দোকানে সিগারেট-বিস্কুট-চকোলেট বিক্রি করছে দোকানিরা, খবরের কাগজের স্টল নিয়ে বসেছে কেউ, এখানে ওখানে ছোট ছোট খাবারের দোকানদার! সেই ট্রামগাড়ি, ট্যাক্সি, সেই অবস্থাপন্নরা ছুটিয়ে চলেছে প্রাইভেট কার, সেই গরীব-গৃহস্থরা বাজারের পুঁটলি ঝুলিয়ে ধীরগতিতে রাস্তা পেরিয়ে চলেছে।

আমাদের আশেপাশে যারা ঘুরছে তারা অবস্থাপন্ন। স্পষ্ট দেখছি তারা অর্থশালী। তারা বড় বড় সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তা, কেউ শিক্ষক, লেখক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, শিল্পী, অধ্যাপক, রঙ্গালয়ের কর্ণধার, সম্পাদক, কলেকটিভ ফার্মের কর্তা, যুব প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক ইত্যাদি। এ'দের সকলের উচ্চভাগে যাঁরা আনাগোনা ও দেখাশুনা করছেন তাঁরা উজবেক রিপাবলিকের মন্ত্রিমণ্ডলীর সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, পার্টির অন্যান্য কর্তা, পুলিশ ও পররাষ্ট্র বিভাগের নানা লোক ইত্যাদি।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বাগানবাড়ির ভিন্ন নাম হল 'দাচা'। আমরা প্রথম দিন একটি দাচায় গিয়ে উঠেছিলুম। যাঁরা অবস্থাপন্ন, অর্থাৎ লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, কবি, সম্পাদক, চিত্রতারকা, মঞ্চাভিনেতা,—এ'দের প্রায় সবাই এক একটি দাচার মালিক। এ'রা স্বোপার্জিত অর্থে বাড়ি ও বাগান নির্মাণ করিয়ে নেন। জমি-জায়গা কিনতে হয় না,—ওটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে! ওটার মালিকানা হল স্টেটের। স্টেটের প্রতীক জনগণ। জনগণের প্রতীক পার্টি, পার্টির প্রতীক গভর্ণমেণ্ট। ওদেশে গিয়ে প্রথম উল্লেখ করতে হয় পীপ্‌ল্, তারপর পার্টি, তারপর গভর্ণমেণ্ট! এ তিনটি পরস্পর অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অতঃপর একে একে নানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলুম। আমি নিজে সাতে-পাঁচে নেই। আমি জানতে এসেছি, জানাতে আসিনি। আমি পর্যবেক্ষক এবং শিক্ষানবীশের ভূমিকা নিয়েছিলুম। আমার মুখে ভাষা ছিল না। বলা বাহুল্য, তারাশংকর হলেন কেন্দ্রীয় আকর্ষণ, তিনি ভারতীয়দের মুখপাত্র। আলাপ পরিচয় এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরের নানা জটিল অলিগলির কূটনীতিক ভাষা কিছু দুরূহ বৈকি। এসব ব্যাপারে এই অল্পকালের মধ্যে তারাশংকর এখনও প্রস্তুত হননি। কিন্তু যাঁরা এসেছেন তাঁরা এ সম্বন্ধে পাকা লোক,—তাঁরা ত সাদামাটা জবাব শুনতে আসেননি। তাঁরা এসেছেন বিবিধপ্রকার প্রত্যাশা

নিয়ে। মস্কো থেকে এসেছেন একদল রুশ সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রকাশক, শিল্পী, এবং তাঁদের সঙ্গে সাহিত্য-কর্মীরা। তাঁরা জানতে চান ভারতের মানসজগৎ, এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সমাজের মূলনীতির ব্যাখ্যা, মহাদেশীয় সাহিত্যের নীতিনির্ধারণ, এবং ভারতের সহযোগিতার তথ্যাদি। ভারত সম্বন্ধে সকলের প্রবল ঔৎসুক্য।

আলাপ-সালাপের মধ্যে মনে মনে আমি যখন ঠাওরাচ্ছিলুম, এই সম্মেলনের সুযোগে প্রসিদ্ধ লেখক সলোকভের সঙ্গে পরিচয় হবে কিনা, তখন একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী পাশ থেকে একদৃষ্টে এবং একমনে তারাশঙ্করের মুখশ্রীভাবটি নিঃশব্দে এঁকে নিচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের চেহারাটা অন্যদের থেকে পৃথক। ঘন মাথার চুল ঢেউখেলানো, বড় বড় চোখের নিঃশব্দ চাহনি, স্বল্পবাক, নিরীক্ষণশীল —হঠাৎ ঠাউরে নিয়েছিলুম এ-ব্যক্তি একজন দুর্ধর্ষ পুলিশের গোয়েন্দা, এবং আমার মাথায় যে-কয়গাছি চুল এখনও অবশিষ্ট আছে, সেগুলি আতঙ্কে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তখনই দাঁড়িয়ে উঠেছিল! চিত্রশিল্পী তিনি, এবং তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ—এ খবরটি পরে পেলুম। যাঁরা মস্কো থেকে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সকলেই যে ইংরেজি জানেন, এমন নয়। বস্তুত, ইংরেজি-জানা লোক বড়ই কম এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে তেমন লোককে খুঁজে বার করতে হয়। উচ্চ-পদস্থ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ইংরেজির ধার ধারেন না। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে একজনও কেউ ইংরেজি জানেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এখানে কাজকর্মের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ফরাসী, জর্মন এবং ইংরেজি, —এই তিনটি ভাষার দোভাষীর সংখ্যাই বেশি। দোভাষী ভিন্ন আমাদের পদক্ষেপ-মাত্র অসম্ভব।

নিচের তলার একটি হলে অবেলায় আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাঁচের জানলার বাইরে বাগান। বড় বড় গাছে ফুল ও ফল ধরেছে। পীচ ফলে এখনও রং ধরেনি। আখরোট গাছে ফল আসেনি। অচেনা পাখী এখান ওখান ঘুরছে বটে, ওদের মধ্যে চড়াই পাখীটি আমার চেনা। উজবেক ভদ্রলোকরা কয়েকজন আনা-গোনা করছেন, তাঁদের কারো কারোকে দেখামাত্রই কেমন যেন মানসিক একটি যোগসূত্র অনুভব করছি। ও'দের চেহারা, পোশাক ও চাহনি ভারত, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের খুব কাছাকাছি। টুপিটিই একমাত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

সরু ও লম্বা টেবিলে আমরা বসেছি। হলের সঙ্গেই লাগোয়া রান্না-ঘর। আহার্যবস্তুর তালিকা প্রচুর। আঙুর ও আপেল অজস্র। মাছের দাগা, দু' রকম মাছের ডিম—লাল ও কালো ক্ষুদ্রকায় মিহি দানার মতো, নাম ক্যাভিয়ার। এই ক্যাভিয়ার আসে কাস্পিয়ান ও আরল থেকে। এ ছাড়া তিন রকমের মাংস, চীজ, মাখন, সাদা ও কালো পাউরুটির চাক্‌লা, ছোট ছোট বাটামাছের মতো মাছের রান্না, আঙুরের লাল মদ, ভোদ্‌কা, এবং কোনিয়াক্—যেটাকে ওদেশের হুইস্কি বলা চলে। এছাড়া শশা, টমাটো, কাঁচা পেঁয়াজ, বাদাম, কাঁকড়ার শাঁসের স্যালাড, এবং দেশি ঝোলা গুড়ের চাটনি। গরুর মাংসটি সুদক্ষভাবে প্রস্তুত এবং বড় বড় চৌকো বরফির মতো থান্-থান্ ভাবে কাটা। পাখীর মাংসের মধ্যে মোরগ ও হাঁস। মাছের মধ্যে দাগা মাছ হল স্থানীয়,—ছোট মাছগুলি সম্ভবত টিনের প্যাকিং খুলে আনা। মাংসের বড়াগুলি সুদৃশ্য। অবশেষে এল মধ্য এশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পোলাও।

তারাশঙ্কর মাংস খেতে নারাজ, তাঁর পেটে এসব আজকাল সয় না!

আহারাদির পর উপরে এসে বসেছি, এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন গোপাল হালদার মহাশয়। তিনি মস্কোয় এসেছেন মাসখানেক আগে তাঁর শিক্ষক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের সঙ্গে। সুনীতিবাবু এসেছেন ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে, এবং গোপালবাবু তাঁর সেক্রেটারীর কাজ করছেন। উভয়ে এখানে এসে উঠেছেন তাসকন্দের নবনির্মিত বড় হোটেলে। গোপালবাবুকে পেয়ে আমরা এই প্রথম বাংলায় কথাবার্তা বলতে পারলুম, এবং পরিচিত মানুষ পেয়ে তারাশঙ্কর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এই বাড়িতেই এসে গিয়েছেন গেরুয়া-জড়ানো মাথা-ন্যাড়া সিংহলী বৌদ্ধ লেখক, বর্মী, চীনা, জাপানী,—এ ছাড়া দূর আফ্রিকার ঘানা থেকে একটি আজানুলম্বিত বাহু কৃষ্ণবর্ণ তরুণ, একটি চঞ্চল কৃষ্ণকামিনী, এবং তাঁদের সঙ্গে অপর একটি ঘানা-মহিলা। একে একে নানা দেশের নানা সাহিত্য-কর্মী এসে পড়েছেন। এমন অনেকে আছেন যাঁরা শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, সম্পাদক, কবি ও সমালোচক। আমাদের ভারতীয় গোষ্ঠী আগামী পরশু অথবা তার পরের দিন এসে পৌঁছবেন। তাঁরা কাবুল হয়ে আসছেন।

ছুটি আমাদের নেই, ঢালাও বিশ্রম্ভালাপের কথা ওঠে না। সন্ধ্যা-সমাগমকালে আমাদের বেরোতে হল। কোট-প্যান্ট-জুতো-মোজায় সারাদিন এঁটেসেঁটে থাকার মধ্যে যে বন্ধন-জর্জরতা আছে সেটিতে আমরা অভ্যস্ত নই। এ-বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে রাত্রে শোবার সময়। মোটর সকল সময়েই প্রস্তুত, এবং যিনি আমাদের চলাফেরার ভার নিয়েছেন তিনি একজন বিশিষ্ট উজবেক অফিসার, সমগ্র উজবেকিস্তান রিপাবলিকের ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানগুলির সভাপতি। নাম রুস্তম ইসমাইলভ। স্বাস্থ্যবান লোকটি অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী এবং হাসিখুশী। কাঁধের ওপর হাত রেখে কথা বললে মনে হয় বহুকালের পুরনো বন্ধু। আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ যত্ন ও সমাদরের প্রতি সর্বক্ষণ তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। এবার আমাদেরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে তিনি গ্রামের পথের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লানা ও নিকা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। তারাই আমাদের প্রতি কথাটি রুশ ভাষায় অনুবাদ ক'রে অন্যকে শোনাচ্ছে। মনে পড়ছে তিব্বত ভ্রমণকালে হুনিয়াদের সঙ্গে এবং বর্মায় বর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে এই প্রকার দোভাষীর সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছিল। এখানে ভিন্ন কথা। ইংরেজি আমাদের উভয় পক্ষেরই ভাষা নয়। কিন্তু আমরা যা কিছু বলাবলি করছি তা যথাযথ অনুবাদ করা হচ্ছে কি? সরলহাস্য যদি বক্রহাস্যে পরিণত ক'রে দেওয়া হয়? পরিহাস যদি ব্যঙ্গ হয়ে ওঠে অন্যের কানে? কৌতূহলী প্রশ্ন যদি গোয়েন্দাগিরির আকার নেয়? অভিমত এবং মন্তব্যগুলি যদি প্রচার-কার্যের চেহারা পায়? মেয়েদুটির উপর আস্থা রাখা চলে ত? আমরা যে পৃথিবীব্যাসী কমিউনিস্ট সমাজে এসে পড়েছি!

চলন্ত গাড়ির মধ্যে ব'সে আমার সংশয়াতুর দৃষ্টি একবার নিঃশব্দে লানার দিকে ফিরল। না, ভুল বোধ হয় হচ্ছে না! মেয়েটির পাতিহাঁসের মতো কচি দুটি চোখে এবং প্রসন্ন মধুর হাস্যে লেশমাত্র সন্দেহজনক কিছু নেই। আমি নিজেই সংশয়গ্রহী,—পাপ আমরাই মনে। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো চিন্তাভ্যাস আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে।

মধ্যাহ্নকালে যে-পথে এসেছি, সেই পথ দিয়েই যাচ্ছি। গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে। চাষী ও কর্মীদের ছোট ছোট বাংলোর কাঁচের জানলার লেসযুক্ত ফাঁক দিয়ে ঝিলিক ক'রে ভিতরের দিকে চোখ পড়ছে। কিন্তু পর্দার আড়ালে প্রকৃত চেহারাটা কেমন, সেটা কি জানছি? তবে কিনা জীবনযাত্রাটা অসচ্ছল নয় বলেই মনে হয়। অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের ভয়াবহ দারিদ্র্য-দশার চিহ্ন এখনও কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া মাত্র ছ' ঘণ্টায় কতটুকুই বা দেখা যায়।

আমাদের গাড়ি ভিন্নপথ ধ'রে এবার শহরে এসে ঢুকল। (ক্রমশঃ)

অল্ডাস হাক্সলির সাহিত্য জিজ্ঞাসা

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বিংশ শতক যে সব নবীন ঔপন্যাসিককে উপহার দিয়েছে, তরুণ বয়সের ঝাঁঝে-ঝাল্‌জে পুরনো সমাজ-প্রথার প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাবে উৎচকিত সেই সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মধ্যে অল্ডাস হাক্সলি একটি বিশিষ্ট নাম।

হাক্সলির সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের উপন্যাসমালায় যুদ্ধোত্তর হতাশায় বিহ্বল, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য এক জগৎ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সেই সমাজের মানুষেরা অবশ্য মুষ্টিমেয়; ইংল্যান্ডের জনসাধারণ থেকে ভিন্নতর। কেননা, যুদ্ধে পঙ্গু হলেও অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী ইংরেজের পক্ষে 'রুল ব্রিটানিয়া'র সুর ভোলা শক্ত; তাছাড়া লীগ অব নেশনশ-এর আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে ঐ প্রতিষ্ঠান-নির্দেশিত পন্থাতেই বিশ্ব-বাসীর মুক্তি। কিন্তু যুদ্ধের সংঘাতে যে পুরনো মূল্যবোধ ধূলিসাৎ হয়েছে, হাক্সলির ভাবজগতের পাত্র-পাত্রী সেগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তীক্ষ্ন ব্যঙ্গবাণে আক্রমণ করেছে; বিশ্বাসবাদের স্থান দখল করেছে শুভ-নাস্তিকবাদ। ভাবালু আদর্শবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের মুখে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাসের বিদ্রূপাত্মক হাসি। যুদ্ধোত্তর কালের আত্মিক সংকটে তারা মুহ্যমান না হয়ে বিদ্রূপ করে তাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

ইংল্যান্ডের এই তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যারা যুদ্ধের সময়ে বেড়ে উঠেছে অথচ যুদ্ধে যাদের সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে হয়নি, তাদের চোখে পুরনো জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ভাবাবাদী রুপার্ট ব্রুকের রঙিন চশমা খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক।

বস্তুত ভিক্টোরিয়ান যুগের আদর্শ-বাদের যেটুকু অস্তিত্ব তখনো অবশিষ্ট ছিল, এদের আবির্ভাবে তা সম্পূর্ণ উবে গেল। মস্তিষ্কজীবী তরুণদের আবি-র্ভাব ইংরেজী সাহিত্যে এক নব-পর্যায়ের সূচনা করলো। এই নবতন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীই হাক্সলির উপন্যাসের উপ-জীব্য। ভিক্টোরিয়ান যুগের নৈতিক শুচিতার আবহাওয়ায় মানুষ প্রখ্যাত লেখক টমাস হেনরি হাক্সলির নাতি হয়েও অলডাস-কে বিদ্রোহী হতে হলো, সমাজ বিশ্লেষণে নব্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনকারীদের দলে ভিড়তে হলো নিছক আত্মিক সংকটের চাপে।

১৮৯৪ সালে হাক্সলি ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। সতেরো বছর বয়সেই সাময়িক অন্ধতার জন্য পুঁথি-পত্তর গুটিয়ে ইটন-এর বিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করে গ্র্যাজুয়েট হন। যুদ্ধকালীন সময়ে সরকারী অফিসে প্রথমে চাকরি নেন, পরে সে চাকরি ছেড়ে স্কুল মাস্টারী করতে আরম্ভ করেন। উপন্যাস পাঠকের একথা স্বভাবতই মনে হবে যে যুদ্ধ তাঁর মনে কোনো রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি। তাঁর উপন্যাসে অবশ্য যুদ্ধের কথা আছে। উপন্যাসের চরিত্রের মুখে তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য বসিয়েছেন তা নিছক পরিহাসমূলক। যুদ্ধের শেষে মিডলটনমারি সম্পাদিত সাময়িকপত্র 'এথেনিয়াম'-এর দপ্তরের কাজে তিনি যোগদান করেন' এবং কিছুদিন ঐ পত্রিকায় বিচিত্র নিবন্ধাদি রচনা করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি উদীয়মান ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

হাক্সলির সাহিত্য সাধনাকে মোটামুটি দুই পর্বে ভাগ করা যায়। দুই মহাযুদ্ধ হাক্সলির সাহিত্যিক জীবনের দুই পর্ব। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন সময়ে তিনি ইংরেজ সমাজজীবনের খুঁটিনাটি তন্ন-তন্ন করে দেখেছেন। যুদ্ধকে এড়িয়ে গেলেও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সামাজিক অবক্ষয়কে তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ভেঙে-পড়া সামাজিক মূল্য-বোধকে আঁকড়ে ধরে তদানীন্তন ইংরেজরা মন-গড়া যে জগতে ম্রিয়মাণ জীবনযাপন করছিল অথচ প্রবলভাবে বাঁচার মতো কোনো বিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছিল না;—বিশ শতকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকের বহু লেখকই একদিকে সেই যন্ত্রণা ও অস্বস্তি এবং অন্যদিকে পুরাতনের প্রতি হাস্যকর আকর্ষণকে স্ব-স্ব সাহিত্য-কর্মে প্রতিভাত করেছেন। এঁদের মধ্যে হাক্সলিকেই সর্বাপেক্ষা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মনে হয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত বহু ধরনের সুখপাঠ্য রচনায় তিনি ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় হাক্সলি সর্বাপেক্ষা সিদ্ধহস্ত। এঁর ব্যঙ্গবান এতই তীক্ষ্ন ও অব্যর্থ ছিল যে কোনো কোনো সমালোচক হাক্সলিকে জোনাথান সুইফট-এর নব্য সংস্করণ হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

হাক্সলি লরেন্সের মন্ত্র-শিষ্য—এমন একটি অলীক প্রবাদ এক সময় প্রচলিত ছিল। কিন্তু সাহিত্যপাঠকের বুঝতে দেরী হবে না যে লরেন্সের সঙ্গে তাঁর জমিন-আসমান ব্যবধান। লরেন্স তাঁর রক্তের আবেগে এক মুহূর্তেই আমাদের উদ্দীপিত করেন আর হাক্সলির আবেদন প্রথমে মস্তিষ্কের কাছে। বুদ্ধিবৃত্তির জট ছাড়াতে ছাড়াতে হাক্সলির হিম-শীতল ঘৃণা ও প্রখর বিদ্রূপের মর্ম আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

অল্ডাস হাক্সলি

ছোটগল্পগ্রন্থ 'লিম্বো'

ও মর্টাল কয়েলস (১৯২২), ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সালে লেখা উপন্যাসাবলী ক্রোম ইয়েলো, এ্যান্টিক হে, পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট, দোজ ব্যারেন লিভস্, প্রবন্ধ সংকলন জেস্টিং পাইলেট এবং 'লেডা' কবিতাবলীকে হাক্সলির সাহিত্য-সাধনার প্রাথমিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়ী সমাজ-জীবনের হাল্কা মানুষের মত মানুষদের নিয়ে ক্রোম ইয়েলো, মর্টাল কয়েলস ও এ্যান্টিক হে তিনটি গ্রন্থেই হাক্সলি বিদ্রূপ করেছেন, শেষোক্ত গ্রন্থে সেই বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে। গল্পের চাইতে হাক্সলি শিল্প, শিক্ষা, যৌনতত্ত্ব, চাষ-বাস, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, সামাজিক সমস্যা ইত্যাকার বিষয় নিয়ে পাত্র-পাত্রীদের টেনে আলোচনায় নামিয়েছেন, পুরনো মতের গোঁড়ামিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। নিজের মতের স্বপক্ষে বক্তৃতা করতেও ছাড়েননি। বুদ্ধিবাদের আবহাওয়ায় গল্প ভারাক্রান্ত হলেও শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা কম চিত্তাকর্ষক লাগে না; অম্ল-মধুর ঠাট্টা-বিদ্রূপের রসানে সে আলোচনা আরো সুস্বাদু লাগে। ক্রোম ইয়েলোর সেই সংস্কৃতিবান ক্ষুদ্র বামনাকৃতি স্বামী-স্ত্রীকে কি ভুলতে পারা যায়? আড়ালে থেকে নিজেদের আকৃতি সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া জোয়ান একমাত্র বংশধরের মন্তব্য শুনে যারা আত্মহত্যা করে বাঁচলো। কিংবা এ্যান্টিক হে-র সেই মিসেস ভিভিয়েস—যার প্রেমিক যুদ্ধে নিহত হলো—তাকেও মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। যুদ্ধের কোনো বর্ণনা গ্রন্থে নেই। কিন্তু বিবিক্ত হৃদয়ের হাহাকার সমস্ত উপন্যাসে মরণোৎসবের কালো ছায়া ফেলেছে। আবার শিয়ারওয়াটারের মত বিজ্ঞান-গবেষকের চরিত্রাঙ্কনেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—যে গবেষক শূন্যগর্ভ অহমিকায় নিজের অবহেলিত স্ত্রী কিংবা সামাজিক কোনো মানুষেরই তোয়াক্কা করে না।

হাক্সলি শিল্পীসুলভ দূরত্ব বজায় রেখে এবম্প্রকার বিভিন্ন চরিত্র এঁকেছেন, নিদারুণ অভিজ্ঞতা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টার মত যেন সমস্ত মজাদার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। এ্যান্টিক হে-র বিষয়বস্তুর সঙ্গে টি এস এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের মিল আবিষ্কার করা যেতে পারে। একদিকে যেমন সভ্যতার ব্যাধি ও বন্ধ্যাত্ব চিত্রিত হয়েছে অন্যপক্ষে লেখক তা নিয়ে মনে মনে কৌতুক অনুভব না করেও পারেছেন না।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে সামাজিক মানুষের প্রতি হাক্সলির মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। লরেন্সের সঙ্গে হাক্সলির নিবিড় বন্ধুত্বই হয়তো পরোক্ষভাবে এর জন্য দায়ী। 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্টে'র র‍্যাম্পিয়ন চরিত্রে লরেন্সের কিছুটা আদল আসে। র‍্যাম্পিয়নের শুধু বুদ্ধির প্রাখর্যই ছিল, মানবিক সমবেদনার অনুভূতি ছিল না। এ উপন্যাসে হাক্সলি দেখিয়েছেন যে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে মানবিক সহানুভূতির গাঁটছড়া না বাঁধতে পারলে মানব সমাজ ও পৃথিবীর উদ্ধার নেই। হাক্সলির মত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বিশ্ব নিয়মের অন্তর্গত এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রতি ধাবিত হওয়া এবং যুক্তিবাদী মনকে মিস্টিক বিশ্বপথের বশবর্তী করে তোলা রীতিমত বিস্ময়কর।

অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করে জগদ্ব্যাপারে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। 'আইলেস ইন্ গাজা' (১৯৩৬) উপন্যাসে এই মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছেন। 'এন্ডস্ এ্যান্ড মিনস' (১৯৩৭) গ্রন্থে নিজের এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে সুচিন্তিত যুক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। এলিয়টের মতো, ধর্মই মানুষের মোক্ষ—এমন কথা হাক্সলিও চিন্তা করেছেন কিন্তু তা বলে খৃষ্টধর্মে মানসিক যন্ত্রণার নিরসন খোঁজেননি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতার ভাষ্যে মনোনিবেশ করে সান্ত্বনা পেয়েছেন কিনা তিনিই জানেন। হাক্সলির হার্দ্য-পরিবর্তনের তত্ত্বের সঙ্গে কবি অডেনের কথঞ্চিৎ মিল থাকলেও অডেন ও তাঁর সম্প্রদায়ের মত কোনো রাজনৈতিক মতবাদে তাঁর আস্থা ছিল না। হাক্সলির মিস্টিক বিশ্বাস তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিসম্মত।

চল্লিশের যুগে হাক্সলি আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংস্পর্শ থেকেও তিনি নিজেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই সময়ে রচিত 'আফটার মেনি এ সামার' (১৯৪০) এবং 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপ' (১৯৪৫) গ্রন্থের গল্পাংশের সঙ্গে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই। ডি এইচ লরেন্সের মত হাক্সলি বিজ্ঞান-যুগের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা মনে পোষণ করতেন না কিন্তু যন্ত্র-সভ্যতার ক্রমপ্রসার তাঁর মনেও যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার করেছে। 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-এ এই সভ্যতার ভবিষ্যতের এক ছবি তিনি এঁকেছেন যেখানে ল্যাবরেটরীর টেস্ট-টিউবে প্রস্তুত বংশধরেরা কলের পুতুলের মত মনিবের হুকুম তামিল করে চলেছে, জীবন-ধারণের সমস্ত শর্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করেও। যন্ত্র-সভ্যতার যান্ত্রিকতায় বিরক্ত হাক্সলি বিজ্ঞানের যুগকে ব্যাঙ্গ-কটাক্ষবিদ্ধ করেছেন। যন্ত্র-সভ্যতার চরমোৎকর্ষ আর একদিক দিয়ে যে ভবিষ্যতের সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে 'আইলেস ইন গাজা'তেও এই ভাবনায় হাক্সলি বিহ্বল।

'আফটার মেনি এ সামার' উপন্যাসটি হাক্সলির পূর্বেকার ক্ষুরধার বুদ্ধি-দীপ্ত সরস রচনারীতির কথা স্মরণ করায়। এই গ্রন্থে অগাধ ধনৈশ্বর্য সমাজে যে কলুষপ্রভাব বিস্তার করে—তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করে লেখক দেখিয়েছেন যে নিরবচ্ছিন্ন যৌনসম্ভোগের বাসনায় সুদীর্ঘ জীবনযাপন করতে করতে ধন ও যৌবনের অধিকারী কেমন করে একটি মর্কটে রূপান্তরিত হলো।

সভ্যতার স্বন্দ্বময় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারার ফলে যে আত্মিক সঙ্কট 'টাইম মাস্ট্ হ্যাভ্ এ স্টপ্' গ্রন্থেও তা প্রকট হয়ে উঠেছে। সমালোচকদের মতে হাক্সলির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তাঁর রচনাকে সর্বত্র শিল্পরসসমৃদ্ধ করতে পারেনি, তার কারণ তিনি পূর্বসূরীদের মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করতে সক্ষম হননি। মানুষের মূর্খতা, লোভ ও নিষ্ঠুরতার প্রকাশে তিনি বিদ্রূপের কশা হেনেছেন বটে কিন্তু অগ্রজদের ব্যাপক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অনায়ত্ত থেকে গেছে। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর উন্নাসিক প্রতিভূ হিসেবেই তিনি সাহিত্যের দরবারে এসেছেন। 'দোজ ব্যারেন লিভস্'-এর একটি 'লেখক-চরিত্রে'র জবানীতে যেন হাক্সলির আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তি ধরা পড়েছে— "I write with care, earnestly, with passion even, just as if I had a soul to save by giving expression to (my thoughts). But I am well aware, of course, that all these delightful hypotheses are inadmissible. In reality I write as I do merely to kill time and amuse a mind that is still, in spite of all my efforts, a prey to intellectual self-indulgence".

শেষের দিকে রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে 'এপ্ এ্যান্ড এসেন্স' হাক্সলির চিন্তাধারার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর-চিহ্নিত ও বক্তব্যসমৃদ্ধ। বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত নতুন নতুন আণবিক মারণাস্ত্রের যুদ্ধ যে মানব-জাতির সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনবে—তিক্ত হতাশায় তিনি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। মনুষ্য-সমাজের আচার-আচরণে বিচলিত হাক্সলির ঘৃণার প্রকাশে উপন্যাসের শিল্পরসের আস্বাদন কিঞ্চিৎ তিক্ত।

তিনি কল্পনায় দেখেছেন তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আণবিক মারণাস্ত্রের প্রয়োগে বিশ্ব ধ্বংসীভূত হয়েছে ও শুধু নিউজিল্যান্ড রেহাই পেয়ে গেছে। দুশো বছর পরে লস্ এঞ্জেলস্-এ নিউজিল্যান্ডের কজন পর্যটক এসে পৌঁছালো। তারপর তারা যা দেখলো সমগ্র উপন্যাসটি তারই দৃশ্যমান চলচ্চিত্র।

পর্যটকদের চোখে পড়লো, সভ্যতার ধ্বংসভূমিতে মানুষ মর্কটে পরিণত; শিশুরা বিকলাঙ্গ ও বুদ্ধিহীন। নপুংসক পুরোহিতেরা তাদের ধরে ধরে বলি দিচ্ছে এবং শিশুদের মায়েদের কশাঘাত করছে। চতুর্দিকে যা ঘটে চলেছে সবই জঘন্য ব্যাপার। নিউজিল্যান্ডের পর্যটকেরাও অত হীন না হলেও একেবারে অপদার্থ। মানবের দুরবস্থার অবসানের কোনো সংকেত নেই, নেই কোনো ভরসার বাণী বা দিগ্‌দর্শনের প্রচেষ্টা। তিক্ত হতাশার মধ্যে বিপদের সঙ্কেতধ্বনি জানিয়েই তিনি থেমেছেন। এই গ্রন্থকে তাই 'বিপদের সঙ্কেতধ্বনি' বলে প্রকাশক বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। বর্তমানকালের মত নির্বোধ মানুষ যদি আণবিক অস্ত্র নিয়ে এমনি খেলা চালিয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে ঐরকম ঘটবে।

হাক্সলির রচনারীতি তাঁর পূর্ব-সূরীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জীবনের বহমান স্রোতে গা না ভাসিয়ে, জীবনকে দ্রষ্টার নির্লিপ্তি নিয়ে দূরে থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অধিকাংশ উপন্যাসকেই তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার বাহন করে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাস প্রায়শই কথোপকথননির্ভর: পাঠকের সামনে পাত্র-পাত্রীরা শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতেই অধিকতর আগ্রহশীল। চরিত্র-গুলিও নিজেদের স্বধর্ম পালন করার চাইতে তাঁর ভাব-জগতের প্রতিনিধিত্ব করতেই ব্যস্ত। কিন্তু হাক্সলির সরস রচনারীতি ও বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্যের প্রাখর্য উপভোগ্যও বটে। বিশেষ করে শেষ দিককার উপন্যাসে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি আজও খুঁজে চলেছেন। জেন্টিং পাইলেট্, গ্রে এমিনেন্স, থিমস্ এ্যান্ড ভ্যারিয়েসন প্রভৃতি বহু প্রবন্ধসাহিত্যেও হাক্সলি রচনা করেছেন যার মধ্যে তাঁর বিশ্ব-বীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের বিপদ-সঙ্কুল ভবিষ্যতের কথা ভেবে কখনো সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, কখনো মুক্তির উপায় খুঁজেছেন বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে। এমনকি গীতার ভাষ্যেও মনোনিবেশ করেছেন। হিন্দুধর্মের আকর্ষণে আমেরিকার রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্য হয়েছেন এমন কথাও শোনা যায়। ৬৭ বছর বয়েসে জীবনের পথে সচল এই অভিযাত্রীর অস্তিত্বকে পাওয়ার আগ্রহে আজও পথ চলার বিরাম নেই। ফরাসী ভাষাতেও হাক্সলি সুপণ্ডিত। স্বরচিত 'লেডা' কবিতাবলী ব্যতীত তিনি ফরাসী কবি মালার্মে ও ভালেরির বহু বিখ্যাত কবিতার উপভোগ্য অনুবাদ করেছেন। এই সুশিক্ষিত, মনস্বী লেখক তাঁর মননশীল রচনার সৌকর্যে আজও বিশিষ্ট।

মতামত

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু,

প্রথম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' প্রবন্ধ শিক্ষিত অ-বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের হিন্দী অনুবাদ সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন তা' ভাষার তীব্রতা ও রূঢ়তার জন্য হিন্দী সাহিত্য-অনুরাগীদের মনে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে।

তিনি লিখেছেন, "রবীন্দ্র-সংগীতের হাস্যকর হিন্দী অনুবাদের সঙ্গে আমরা অল্প-বিস্তর পরিচিত, 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে'—এইরূপ সুন্দর চরণের হিন্দী অনুবাদ হয়েছে—'লুটা দে মেরা শির, তেরা টেংরিকা গর্দাপর।'"

কিন্তু যতদূর জানি—এ ধরনের অনুবাদ আজ পর্যন্ত হয়নি। দিল্লী, কোলকাতা, পাটনা ইত্যাদি শহর থেকে গীতাঞ্জলির অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোথাও গীতাঞ্জলির প্রথম গানের এরূপ উদ্ভট অনুবাদ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্র-সংগীতের এ ধরনের হিন্দী অনুবাদ বাংলাদেশে মুখে মুখে প্রচলিত আছে, তাও বেশীর ভাগ বেকারমহলে। একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, গীতাঞ্জলির হিন্দী অনুবাদ যাঁরা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত রবীন্দ্র-অনুরাগী। অতএব অরুণবাবুর এ ধরনের উক্তি হিন্দী সাহিত্য ও তার অনুরাগীদের পক্ষে অপমানজনক। সাহিত্য যতই ক্ষুদ্র হোক, যতই কম বিকশিত হোক, যতই দুর্বল হোক তবু সে সাহিত্য। একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে আমাদের উচিত প্রত্যেক সাহিত্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা। তাঁরা কোন হীন উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গান, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদির অনুবাদ করেন নি। আর আমরা যদি প্রতিবেশী সাহিত্যকেই হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করি তবে কী সাহসে আমরা আশা করি সমগ্র ভারতের একতা বা বিশ্বের একতা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অন্যের মহত্ত্বকে স্বীকার করে নিলেই আমরা মহৎ হতে পারবো, অন্যথা নিন্দার দ্বারা নয়।

আমরা অরুণবাবুর কাছে অনুরোধ করছি তিনি তাঁর মতের সমর্থন প্রমাণ-সহ করুন। কারণ যাতে অ-বাঙালী সম্প্রদায় বুঝতে পারে তাদের অনুবাদের মূলে ত্রুটি কোথায় ও অরুণবাবু যদি প্রমাণসহ নিজ উক্তির সমর্থন ক'রেন তবে আমরা তাঁর সৎসাহসেরও পরিচয় পাবো।

আমার মনে হয় হিন্দী ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের [illegible] রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহশীল। তাঁরা বাংলাভাষাকে যথেষ্ট সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন। এর মূলে আছে তাঁদের রবীন্দ্র-প্রেম। তাঁরা যে বিপুল পরিমাণে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর উৎসবের আয়োজন ক'রেছিলেন, যেভাবে বাংলার বন্যা-ত্রাণ তহবিলে অর্থ-সাহায্য ক'রেছিলেন, যেভাবে রবীন্দ্র-সংগীত শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তা দেখে এই কথাই মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের নন, তাঁদেরও আত্মীয়।

হতে পারে তাঁদের অনুবাদ দুর্বল, হতে পারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদে তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুর ও ভাবকে সর্বাংশে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা চেষ্টা ক'রে চলেছেন, এটা কী আমাদের ভাষা ও জাতির পক্ষে গর্বের বিষয় নয়।

অরুণবাবু যে 'একত্তরশতী'র কথা বলেছেন, তা সত্য কিন্তু এই দুর্বল অনুবাদ প্রচেষ্টার পেছনে আছে তাঁদের অন্তরে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝবার ও জানবার এক অদম্য ইচ্ছা।

রবীন্দ্র-নাটকের যে হিন্দী অনুবাদ আকাশবাণী প্রচার করেছেন তা হিন্দী সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে মনে হয়েছে অপূর্ব। যদি দুর্বল অনুবাদই তাঁদের কাছে এরূপ 'অপূর্ব' মনে হয় তবে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সবল ও সুষ্ঠু অনুবাদ আগামী দিনে তাঁদের কাছে কতখানি সুন্দর ও তৃপ্তিদায়ক মনে হবে অনুমান ক'রে নিতে কষ্ট হয় না।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচুর হিন্দী অনুবাদ হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। কতগুলি আংশিকভাবে যথার্থ আবার কতগুলি একেবারেই অযথার্থ। যাঁরা হিন্দী অনুবাদ সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাঁরা হিন্দীতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ পড়তে পারেন, সুরেন্দ্র এ্যান্ড কোং, এলাহাবাদ ও কুমারী নন্দিনী বিনায়কের অনুবাদ। অথবা I P T A দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নাটকের হিন্দী অনুবাদ।

গীতাঞ্জলির অনুবাদ (পাটনা) আমরা পড়েছি। তার প্রথম গানের প্রথম পংক্তিগুলির এইভাবে অনুবাদ করা হয়েছে, "ঝুকা দো শির্ মেরে
তেরে চরণোকে ধুলি পর্,
আঁসু তু ধুলোতে যা,
সারি জীবন কী গরবো কো"

শ্রীমুখোপাধ্যায় যে অনুবাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার ভাষা হিন্দী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না।

আমার এই চিঠি প্রকাশিত হবে এই আশাই করি। নমস্কারান্তে—শান্তা রায়, গিরিডি কলেজ, বঙ্গ-সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, গিরিডি।

তেজস্ক্রিয় ভস্মচিন্তা

কণাদ রায়

আজেবাজে চিন্তাকে আমরা সাধারণতঃ হেয় করার জন্যে 'ছাই-ভস্ম' চিন্তা বলি। কিন্তু কে জানত যে এই 'ভস্ম-চিন্তা'ই বিংশ শতাব্দীতে অবশেষে অমোঘ হয়ে দেখা দেবে।

বাস্তবিক, চিন্তার কারণ বইকি! যেভাবে চারদিকে পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটছে তাতে চিন্তার মেঘটি ক্রমশঃই জমে জমে অন্ধকার হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় ভস্মের আচ্ছাদনে কবে যে আমরা সমাহিত হব নিশ্চয় করে কেউ কিছু বলতে পারে না। সবচেয়ে আতঙ্কের কারণ হচ্ছে পৃথিবীর খাদ্য-সামগ্রীও যদি তেজস্ক্রিয় ভস্মের স্পর্শে বিষাক্ত হয়ে ওঠে তাহলে কি খেয়ে বাঁচবে মানুষ? ইতিমধ্যেই গুজব শুরু হয়ে গেছে যে, পুঁইশাক তেজস্ক্রিয় ভস্মের আধার। আবার শোনা যাচ্ছে তেজস্ক্রিয় ভস্মের আক্রোশ এশীয় মহাদেশের উপরেই বেশী। অর্থাৎ পরমাণবিক যুগে আমাদের ভূমিকা হতভাগ্য গিনিপিগদের মতই। কিন্তু যেহেতু আমরা মানুষ-গিনিপিগ, মৃত্যুবাণের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। সেই কৌতূহলকে মনে রেখেই নীচে প্রশ্নোত্তরে ভস্ম-সমস্যাটির ওপর আলোকপাত করা হল।

*** তেজস্ক্রিয় ভস্ম কি?**

তেজস্ক্রিয় ভস্ম হল পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণজনিত আবর্জনা। বাতাসে এই আবর্জনা তেজস্ক্রিয় হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

*** তেজস্ক্রিয় ভস্ম কি কি ক্ষতি করতে পারে?**

বিজ্ঞানীরা বলেন, এই বিষ-ভস্ম ক্যান্সার, লুওকেমিয়া, বন্ধ্যাত্ব এবং ভবিষ্যৎ মানবদের বিকলাঙ্গতার কারণ হতে পারে।

*** তেজস্ক্রিয় ভস্ম কি করে মানুষের সংস্পর্শে আসে?**

বিস্ফোরণ ক্ষেত্রের কাছে থাকলে ত্বকের মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি। কিন্তু খাদ্য-সামগ্রীকে বিষাক্ত করেই তেজস্ক্রিয় ভস্ম বেশী বিপদ ঘটায় মানুষের।

*** পরমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে কতখানি তেজস্ক্রিয় ভস্ম উৎপন্ন হয়?**

হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বিস্ফোরণকে বাদ দিলে পৃথিবীর সমস্ত তেজস্ক্রিয় ভস্মের উৎস হ'ল পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণ। তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির উৎপাদনকে প্রায় দ্বিগুণিত করেছে সোভিয়েট রাশিয়ার পরমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষাগুলো।

*** এখন পর্যন্ত এই বিষাক্ত ভস্ম কি বিপদ-সীমায় পৌঁচেছে?**

বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তরে এক-মত নন। তবে মোটামুটি প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদ-জনক অবস্থার সৃষ্টি এখনো হয়নি এবং হতে দেরীও আছে অনেক।

*** ক্রমাগত পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে বিপদ-সীমাটি কি অচিরেই অতিক্রমিত হবে?**

যদি ঘন ঘন বিস্ফোরণ হতে থাকে কিংবা দীর্ঘদিন ধরে যদি পরীক্ষা চলতে থাকে তাহলে বিপদ-সীমায় পৌঁছনো অসম্ভব নয়।

*** তেজস্ক্রিয় ভস্ম কি কোনোরকমে এড়ানো সম্ভব?**

পরীক্ষা বন্ধ না করা পর্যন্ত এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

*** মানুষের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর এই ভস্মের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কি?**

পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সঠিক বলতে পারছেন না, ঠিক কি ধরনের এবং কতখানি ক্ষতি ভবিষ্যতের মানুষকে সইতে হবে। এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর একমাত্র সময়ের পক্ষেই দেয়া সম্ভব।

*** এই বিপজ্জনক ভস্মরাশি থেকে নিজেদের বাঁচাবার কোনো উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে কি?**

অনেক উপায়ে তেজস্ক্রিয় ভস্মের বিপদ-মাত্রাকে কমানো যেতে পারে, তবে এখন পর্যন্ত তার কোনো প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, তেজস্ক্রিয়তা এড়া-বার জন্যে খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন, তেজস্ক্রিয় ভস্মের চেয়েও বিপদজনক।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— তিন —

নির্মলার রান্নাঘরে সেদিন আর আগুন জ্বলল না। 'এই আসে, এই আসে' করে বেলা গড়িয়ে গেল। রাস্তার পাশে ঝাঁকড়া আম গাছটার ছায়া দীর্ঘতর হল, আস্তে আস্তে ছেয়ে ফেলল মাঠের কোল। তারই সংগে একরাশ ভয় ও দুর্ভাবনার কালো ছায়া তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ধরল। এরই মধ্যে দু'তিনবার বিজুর মার কাছে ঘুরে এসেছে। ভিতরে ভিতরে উদ্বেগ বোধ করলেও বাইরে তিনি বারবার আশ্বাস দিয়েছেন, কোথায় আর যাবে? এখখুনি এসে পড়বে। তুই বাড়ি যা। অসুখ শরীরে আর ঘোরাঘুরি করিসনে। না হয় এখানেই একটু গড়িয়ে নে।

—না দিদি, আমি যাই। যদি এসে পড়ে, আমাকে না দেখলে ভয় পাবে। সে রকম ভয়কাতুরে ছেলে।

সন্ধ্যার পর নির্মলা আর স্থির থাকতে পারল না। ও বাড়িতে গিয়ে কেঁদে ফেলল, আমার মন বলছে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটেছে। খোকা আর ফিরবে না।

—বালাই ষাট! মা হয়ে এ রকম 'কু'ডাক ডাকতে আছে? ছিঃ।

—আমার যে ভাঙা কপাল দিদি। ওটাই আগে মনে আসে। আর ওই যদি না হবে, আমার মাথাটা হঠাৎ এমন খারাপ হতে যাবে কেন? কোত্থেকে এল এই চণ্ডাল রাগ? গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, কোনোদিন একটা কড়া কথাও তো বলিনি ছেলেটাকে। দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতে পারি না। তার ওপর আবার রাগ করবো কোন্ মুখে?

এমনি কত কথা বলতে লাগল নির্মলা। কত দিনের কত তুচ্ছ ঘটনা। সেই কবে, বড় বেশী জ্বালাতন করছিল বলে গালটা একটু টেনে দিয়েছিল। তখন সে কতটুকু! সবে কথা বলতে শুরু করেছে। প্রথমে পা ছড়িয়ে বসে খুব খানিকটা কাঁদল। মা কোলে করতে গেল ছিটকে পালিয়ে গেল। তারপর নিজের গালে নিজেই হাত বুলোতে বুলোতে গোল গোল চোখ করে বিজ্ঞের মত বলল কী রকম ভাঙা ভাঙা গলায়, 'কাঁচি গাল, মারলে লাগে না বুঝি?' 'কাঁচি-গাল' কথাটা সবে শিখেছে তখন, হয়তো মায়ের মুখ থেকেই শোনা। সেই থেকে, ছেলেকে আর কখখনো মারবে না, প্রতিজ্ঞা করেছিল নির্মলা। আজ সেটা কেমন করে ভুলল?

বিজুর মাও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বামী বড়বাজারে এক মাড়োয়ারীর দোকানে কাজ করেন। ফিরতে রাত হয়। তার আগে কাকেই বা বলা যায়? বস্তিতে বিশেষ কারো সংগেই ওঁদের জানাশুনো নেই। যে যার নিজের ধাঁধায় ঘোরে। তাছাড়া বেশীর ভাগই মিস্ত্রী, মজুর ফেরিওয়ালা শ্রেণীর লোক। তারা আর কী পরামর্শ দেবে? ওরই মধ্যে একটি ছেলে মাঝে মাঝে ওঁদের ফাই-ফরমাস খাটে। কোন্ কারখানায় যেন কাজ করে। বিজুকে দিয়ে তাকেই ডেকে পাঠালেন। খবর পেয়েই এল এবং সব শুনবার পর গম্ভীরভাবে বলল, বড়ই ভাবনার কথা। একদল ছেলেধরা বেরিয়েছে আজকাল। ছোট ছেলে পেলেই কী একটা শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে যায়।

—কোথায় নেয়? ভীত, শুষ্ক কণ্ঠে বলল নির্মলা।

—নিয়ে যায় ওদের আড্ডায়, তারপর চালান করে দেয় কোথায় কোথায় তার কিছু ঠিক আছে? এই তো—

—না, না; ওসব বাজে কথা, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন বিজুর মা। ভাল লোককেই ডেকে এনেছেন বিপদে সাহায্য করতে। ছেলেটি মোটেই দমবার পাত্র নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছিল, সে যা বলেছে, একেবারে খাঁটি সত্য। তিনি আর সে সুযোগ দিলেন না, মাঝপথেই বলে বসলেন, আচ্ছা, তাহলে তুমি এখন এসো, হারাধন। দেখি, রাত্তিরে যদি না ফেরে কাল আবার ডাকবো তোমাকে। একটু খুঁজে টুজে দেখতে হবে বাবা, কোথায় গেল ছেলেটা।

—তা দেখবো বই কি মাসিমা, একশবার দেখবো। তাছাড়া ছেলে হারিয়ে যাওয়া, আমাদের বস্তিরও দুর্নাম। কি বলিস সতে?

'সতে' বলে যে বন্ধুটি না ডাকতেই এসেছিল এবং পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব কথা, পরম বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল, এক কাজ করলে হয় না?

কী? বেশ খাতির করার ভাব নিয়ে জানতে চাইল হারাধন।

—চল, ভিখিরীদের পাড়াটা একবার দেখে আসি। ও শালারা বড় বদমাস। রাস্তাঘাটে ছেলে একলা দেখলে মুখে কাপড় গুঁজে নিয়ে যায়। কানা খোঁড়া বানিয়ে ভিক্ষে করায় তাদের দিয়ে।

'অ্যাঁ'! আঁতকে উঠল নির্মলা। হারাধন সেসব ভ্রূক্ষেপ করল না। 'ঠিক বলেছিস, চল্।' বলে, একটা লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল গলির মধ্যে

এবং বন্ধুর হাত ধরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিজুর বাবা সেদিন আরো রাত করে ফিরলেন, এবং স্ত্রীর মুখে সব শুনে নিরাশার সুরে বললেন, এত রাত্তিরে কোথায় খুঁজবো? সকাল হোক। তারপর—

—তা বললে মায়ের মন শুনবে কেন? তোমার ভরসায় বসে আছে সেই সকাল থেকে। এই মাস্তর একরকম ঠেলে বাড়ি পাঠালাম। আহা! ঐটিই ওর শিবরাত্রির সলতে। যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে,—

পরিণামটা মনে মনে কল্পনা করেই শিউরে উঠলেন বিজুর মা, মুখ ফুটে আর বলতে পারলেন না।

ভদ্রলোক আর আপত্তি করলেন না। কোনো রকমে নাকে মুখে কিছু দিয়ে লাঠি ও লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, যদিও জানতেন, এ রকম খোঁজার কোনো অর্থ নেই।

নির্মলার ঘরে সেদিন সন্ধ্যা প্রদীপ পড়ল না, দুয়ারে পড়ল না জলের ছিটে। গলায় আঁচল জড়িয়ে সিন্দুর-মাখা লক্ষ্মী মূর্তির পায়ের তলায় প্রতি সন্ধ্যায় পৌছে দেয় যে আনত প্রণামখানি, তাও বাদ পড়ে গেল। গৃহস্থের অকল্যাণ হবে, সে ভয় আর মনে এল না। এরচেয়ে বড় অকল্যাণ আর কী হতে পারে? চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল, প্রতি পলে পলে যে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা, তাও যেন শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে শূন্য আনত দৃষ্টি মেলে বারান্দার সেই খুঁটিটায় হেলান দিয়ে আসাড়ের মত বসে রইল নির্মলা। কামারের হাতের ঘা খেয়ে খেয়ে একটা কাদার তাল যেমন শক্ত নিরেট হয়ে ওঠে, একটার পর একটা অদৃষ্টের আঘাত ওর হৃদয়টাকেও তেমনি কঠিন করে তুলেছিল। শুধু কঠিন নয়, অনেকটা যেন জড়ীভূত আনড় বেদনা-বোধ-হীন।

বড়দের মুখে সে বরাবর শুনে এসেছে, মানুষ অদৃষ্টের হাতের খেলনা, এ জীবন শুধু ভাগ্যের খেলা। বেশ, তাই হল। কিন্তু তার যিনি ভাগ্য-দেবতা তিনি কি আর কোনো খেলা জানেন না? তার এই তিরিশ বছরের জীবনটা নিয়ে কেবল ছিনিমিনি খেলে গেলেন? মনে পড়ছে কবে কোন্ একটা বইতে যেন একবার পড়েছিল, জীবন নদীপ্রবাহের মত, সেই স্রোতের টানে আমরা ভেসে চলেছি। কথাটা হয়তো ঠিক, কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। স্রোত যেমন আছে, তার সঙ্গে আছে আবর্ত আছে তরঙ্গভঙ্গ। নির্মলার নিজের জীবনে সেই দুটোই বেশী প্রত্যক্ষ! স্বচ্ছন্দে ভেসে-চলা কেমন বস্তু সে কোনোদিন জানেনি, জেনেছে শুধু একটা ঢেউ-এর কবল থেকে আর একটা ঢেউ-এর মুখে আছড়ে-পড়া।

ছেলেবেলার কটা বছর ওরই মধ্যে একটুখানি আলাদা। কিন্তু সে আর কতটুকু! প্রখর রৌদ্রের তাড়নায় মিলিয়ে যাওয়া কুয়াশার মত কৈশোর দিগন্তের কোন কোণে কবে হারিয়ে গেছে। তবু মন ফিরে ফিরে চায়, মধ্যাহ্নের তাপদগ্ধ পথিক ছায়াহীন মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে যেমন পিছন ফিরে তাকায় দূর গ্রামোপান্তে ফেলে-আসা প্রভাতের পানে, যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু।

তিন মেয়ের মধ্যে নির্মলাই সবচেয়ে ছোট; অর্থাৎ বাপের আদরের সবচেয়ে বড় অংশীদার। কিন্তু মেয়ের জীবনে পিতৃস্নেহের চাইতে যেটা বড় প্রয়োজন—পিতৃধন, দিদিদের বিদায় করতেই সেখানে ঘাটতি দেখা দিল, তার অংশে আর কিছু রইল না। বাপ ছিলেন মহকুমা আদালতের উকিল, তাও ঠিক প্রথম লাইনের নন। মক্কেলের হাত থেকে দিনান্তে যা আসত, সবটাই চলে যেত সংসারের মুখে, সঞ্চয়ের খাতে এক কণাও পৌঁছত না। তবু বড় এবং মেজো মেয়ের বিয়েতে কোনোদিকে টানাটানি করেননি।

ছেলে দুটি ভালোই পেয়েছিলেন, বড়টি ডাক্তার তার সঙ্গে সরকারী চাকুরে, অর্থাৎ মাস-মাইনের উপর উপরি হিসাবে কিঞ্চিৎ প্রাইভেট প্রাকটিস্। মেজোটি কোনো সুবিধাজনক রেল-অফিসের মেজো কিংবা সেজোবাবু। তারও একটা 'প্রাইভেট প্রাকটিস্' ছিল এবং সেখানকার রোজগারটা মাইনের অংককে অনায়াসে ছাড়িয়ে যেত। স্বামীর এই 'উপরি'টাই ছিল মেজো মেয়ের গর্বের বস্তু। তাকে 'প্রাইভেট' রাখা দূরে থাক, একটু ফলাও করে প্রচার করার দিকেই তার ঝোঁক ছিল বেশী। 'উপরি'র ওপর দিয়ে বড়কে সে যে হারিয়ে দিয়েছে, একথা প্রকারান্তরে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করত না। তাছাড়া তার নিত্যি নতুন বেশভূষা এবং প্রসাধনের বাহুল্যে এই 'উপরি'র মহিমাই সদম্ভে প্রচার করত। এরই জন্যে তার বিশেষ খাতির। ঝি, চাকর আর পড়শী মহলেই শুধু নয়, বাপ মায়ের কাছেও। সমবয়সী, সখীরা, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু স্বামীরা এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী নয়, সামনে ওর গয়নার পালিশ ও শাড়ির জলুস নিয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করত, পেছন ফিরতেই দুচোখ থেকে ফেটে পড়ত ঈর্ষার জ্বালা। দিদিও যে প্রায় সেই দলে, মেজোর অজানা ছিল না। তারজন্যে রাগ করত না, বরং একটু করুণার চোখে দেখত বেচারাকে।

নির্মলা তখন ছোট। বড়দিকে খুব ভালবাসত, কিন্তু রীতিমত সমীহ করত মেজদিকে। 'উপরি' নামক বস্তুটি সম্বন্ধে তার স্পষ্ট কোনো ধারণা তখনো জন্মায়নি। তবু একটা অদ্ভুত মোহ ছিল এর উপর। মনে মনে কামনা করত, বড় হলে তার যখন বর আসবে, তার রূপ একটু কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু মেজদির বরের মত যেন 'উপরি' থাকে।

নির্মলার দোষ নেই। সে একা নয়। এদেশের ঘরে ঘরে ছোট থেকে বড় সকলের চোখেই 'উপরি'র তৃষা। রাজ্যপাট উঠেছে, পড়েছে, এক রাজার পর আর এক রাজা এসেছে, এক বংশের পর আর এক বংশ। সেই ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে এ দেশের মানুষ করেছে শুধু চাকরি। এক সরকারের দরবার থেকে আনুগত্যের সেলাম চালান করেছে অন্য সরকারে। শাসক গোষ্ঠী ও তার চারদিক ঘিরে যে সীমাহীন ভোগ-বিলাস তার প্রয়োজন মিটিয়ে 'তলব' বলে এই চাকরি-জীবীদের পকেটে যা এসেছে তা যৎসামান্য, তাতে অভাব মেটে না। টাকায় আট সের চাল, তবু লেগে থাকে দুর্ভিক্ষ। তাঁতীর ঘরে বস্ত্রের পাহাড়। এদিকে গৃহস্থের অন্তঃপুরে একবস্ত্রা নারী স্নান করে নিজের দেহেই শুকিয়ে নেয় তার স্বল্প আচ্ছাদন। তাই নিছক প্রাণধারণের প্রয়োজনে দেখা দিয়েছে অন্য পন্থা। ডান হাতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাঁ হাত, প্রকাশ্য রাজপথের আড়ালে গোপন সুরঙ্গ পথ, 'তলব'এর উপর কিঞ্চিৎ 'উপরি'। রাজার আশেপাশে যাদের আনাগোনা সেই সব আমীর ওমরাহ্, অমাত্য পারিষদ থেকে শুরু করে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে যে চাপরাশী বা চৌকিদার, সকলেই ঐ একই

পথের পথিক। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত একটা শিকলে বাঁধা।

হাজার হাজার বছর ধরে এই ব্যবস্থাই দেখে এসেছে এদেশের সাধারণ মানুষ। দেখেছে, 'দ্বারী হস্তে মুদ্রা দুই চারি' না দিলে রাজদর্শন হয় না, অনুগ্রহ লাভ তো দূরের কথা। নজরানার ব্যবস্থা না করলে প্রার্থিত ব্যক্তির নজরে পড়া যায় না, প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে। ভেট না দিলে কারো সঙ্গেই ভেট হয় না। তাই কারো চাকরি হয়েছে শুনলে আজও তারা অকপটে প্রশ্ন করে 'মাইনে কত?' 'এত'। 'উপরি?' উত্তরে 'নেই' বললে অবিশ্বাস করে কিংবা মনে করে লোকটা নেহাত অপদার্থ।

নির্মলা বড় হয়ে উঠল। বাড়ন্ত গড়ন; বয়স যা, তার চেয়ে দেখায় বেশী। মা আবার আসলের চেয়েও দু'বছর কমিয়ে বলেন। যাদের কাছে বলেন, পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলারা, নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করেন। লোকের কাছে যাই বলুন, নিজের চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। উঠতে বসতে কর্তাকে তাগাদা করেন। তাঁর মুখে সেই এক উত্তর 'চেষ্টা তো করছি। এখন না জুটলে কি করব? প্রজাপতির নির্বন্ধ।' গৃহিণী রেগে ওঠেন, 'প্রজাপতি কি তোমার মেয়ের সম্বন্ধ বাড়ি বয়ে পৌঁছে দেবে?' হাত পা কোলে করে বসে আছ কোন ভরসায়?'

—বেশ তো, বসে না থেকে না হয় বেরোলাম। ঘোরাঘুরি করে একটা যোগাড়ও করা গেল। তারপর? কার ভরসায় এগুই? জানতো সবই।

সে কথা মিথ্যা নয়। সবই তাঁর জানা। ঋণ করে দুটিকে পার করতে হয়েছে, পৈতৃক ভদ্রাসন বাঁধা পড়েছে। সুদের ভবিষ্যতে ছাড়ানো যাবে এমন কোনো উপায়ও চোখে পড়ে না। একটি ছেলে নেই যে পিছনে এসে দাঁড়াবে। একহাতের রোজগার। তাও আগেকার সে জোর নেই বয়স বাড়ছে, অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়েন। তার উপর সত্যিই আর চাপ দেওয়া যায় না।

কোনো উত্তর না দিয়ে গৃহিণী নিঃশ্বাস ফেলে অন্যত্র চলে যান। কর্তা বৈঠকখানায় গিয়ে বসেন। সেখানেও আগের মত মক্কেলের ভিড় নেই। নতুন নতুন এমন সব আইন হচ্ছে যার ফলে দিনদিন মামলার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ঋণ-সালিসী বোর্ড হবার পর খাতের মোকদ্দমা নেই বললেই হয়। মহাজন আর গাঁটের পয়সা খরচ করে খাতকের বিরুদ্ধে লড়তে চায় না। কোনো লাভ নেই। সুদ তো দূরের কথা, আসল টাকাও সারা জীবনে আদায় হবে না। লম্বা লম্বা কিস্তি বেঁধে দিয়ে, ধার আর যাতে শোধ দিতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই করে দিচ্ছেন আদালত। সরকারও এখন খাতকের পক্ষে। তাই মহাজন আজ নিতান্তই অভাজন।

ছোট ছোট জমিদারদের অবস্থা আরো শোচনীয়। খাজনার মামলায় ডিগ্রী পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। পেলেও সেই দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি। কে যায় ঐসব ঝামেলায়? তাই মামলা এড়াতে পারলে এর মধ্যে আর কেউ মাথা দিতে চায় না। প্রজারা দয়া করে যা দেয়, তাই নিয়েই খুশী।

বড় বড় শহরে জমি কেনা-বেচা কিংবা কিছু বাড়ি-ভাড়া সংক্রান্ত

মামলা আছে। একদল উকিলের সেইটাই অবলম্বন। মফস্বলে ওসব কেস্ হতে গোনা যায়। দু'চারটা যা আসে, বেশীর ভাগই জুনিয়রদের হাতে। তাদেরও সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, দিন দিন বাড়ছে। সব দিক থেকেই উকিলের আজ দুর্দিন।

শূন্য বৈঠকখানায় বসে এই সব কথাই বোধহয় ভাবছিলেন জগদীশবাবু। নির্মলা ঘরে ঢুকে ডাকল, বাবা।

—কি মা?

—কাছারির বেলা হল; উঠবে না।

—ও, হ্যাঁ। বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। বাড়ির ভিতরে যাবার পথে একবার তাকালেন মেয়ের দিকে। মনে হল, অনেক দিন যেন তাকে দেখেননি। চোখের আড়ালে হঠাৎ কখন ঝাড়া দিয়ে বেড়ে উঠেছে টের পাননি। শুধু মাথায় বাড়েনি, সেই সঙ্গে বেড়েছে শ্রী। একটি স্নিগ্ধ লাবণ্যের স্পর্শ লেগেছে মুখখানায়। অমলা বিমলার মত ওরও এবার পরের ঘরে যাবার সময় হল। একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, বুকের ভিতর থেকে, চেপে গেলেন। কাছে এসে সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, ইস্কুলে যাসনি আজ?

—না, বাবা, তেমনি নত মুখেই বলল নির্মলা।

—কেন?

আরো নুইয়ে পড়ল মাথাটা। আঁচলের কোণটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, এখন থেকে বাড়িতেই পড়বো।

কারণটা আর জানতে চাইলেন না জগদীশ। বুঝলেন এটা ওর মায়ের ব্যবস্থা। বই-এর বদলে এবার ওর হাতে উঠবে হাতা-বেড়ি। তারই আয়োজন চলছে। কিংবা রাস্তাঘাটে লোকের নজর এবং তার চেয়েও বেশী, উঠতে-বসতে দরদী প্রতিবেশিনীর বাক্যবাণ যতটা সম্ভব এড়াবার জন্যে মেয়েকে ঘরের আড়ালে বন্ধ রাখবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, সংসারের যা অবস্থা, ইস্কুলের মাইনে বইখাতা, কাগজ-পেন্সিল, বাইরে বেরোবার মত পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় ইত্যাদি নানা বাবদে মাস মাস যে টাকাটা যাচ্ছে, তাকেও সামান্য বলা চলে না, সেটুকুও যদি বাঁচানো যায় অদূর ভবিষ্যতে ওবই কাজে লাগবে। কী হবে আর পড়াশুনো করে? যে-রকম ঘরে যাবে, তাতো বোঝাই যাচ্ছে। সেখানে এইটুকু লেখা-পড়াই হয়তো অবাঞ্ছিত বিলাস বলে গণ্য হবে। ঠিকই করেছেন গৃহিণী। কিন্তু মেয়েও যে এই বয়সে সব বুঝে এই নতুন ব্যবস্থা নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে, এতেই তাঁর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। তার বাপ যে কত অক্ষম, ঐটুকু মেয়েরও আজ আর তা অজানা নেই। ওর কাছেও যেন ধরা পড়ে গেছেন জগদীশ।

এবার তিনি সত্যিই উঠে-পড়ে লাগলেন। দু'চার জায়গা থেকে পর পর কয়েকটি দল এসে কনে দেখে গেল। কিন্তু আসল জায়গায় গিয়েই সব আটকে যায়। বেশীর ভাগ পাত্রের খাঁই মেটানো ওঁর সঙ্গতির বাইরে। আর

"ইস্কুলে যাসনি আজ?"

একটু নিচের স্তরে নামতে হবে। সে রকম চাকরি-বাকরি নাই বা থাকল, নাই বা হল পাশটাশ, ঘরে যদি মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান থাকে তাহলেই চলবে। মেয়ের কপালে সুখ থাকলে নিতান্ত সাদাসিদে অবস্থার মধ্যেও সে সুখী হতে পারবে।

তেমন একটি সম্বন্ধই এবার পাওয়া গেল। ছেলেটির বয়স একটু বেশী, তাহলেও দোজবরে নয়। দেখতে-শুনতে মোটামুটি। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছিল, তার পরে আর পড়তে পারেনি। গ্রামের মাঝেই কয়েক বিঘা জমি-জমা রেখে গেছেন বাপ। জন লাগিয়ে সেগুলো চাষ-আবাদের ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। তার সংগে একটা ছোটমত চাকরিও আছে—পাশের গ্রামে মাইনর ইস্কুলের থার্ড মাস্টারি। ঘরে এক মা। বোনেদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। অবস্থা একেবারে অস্বচ্ছল নয়। ছেলে বিয়ে করবে না বলেই মনে মনে ঠিক করেছিল। কিন্তু মায়ের শরীর ভেঙে পড়ছে। তাঁর দেখাশুনা এবং সংসারের কাজকর্ম করবার জন্যে ঘরে একজন কাউকে না হলে আর চলছে না। ভাগিনীপতি এসেছিলেন মেয়ে দেখতে। নির্মলাকে পছন্দ হয়েছে। ঐরকম বড়সড় বৌ-ই তাদের দরকার, দাবি-দাওয়া কিছু নেই। সাধ্যমত যা এঁরা দেবেন, তাতেই খুশী।

বাপের মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। তাঁর অত আদরের নির্মলা। কলকাতায় না হোক, অন্ততঃ তাঁদের এই কাটোয়ার মত কোনো শহরে একটি ভাল লেখাপড়া-জানা চাকরে ছেলের হাতে পড়বে, একান্ত মনে এইটাই আশা করেছিলেন। তার কোনোটাই হবে না। গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টার—ওকি একটা চাকরি? তাছাড়া, গ্রামে, মাটির বাড়িতে থাকা তো মেয়ের অভ্যাস নেই। পুজোর ছুটিতে যতবার 'দেশে' গেছে, তিন-চার দিনের বেশী মন লাগিয়ে থাকতে পারেনি। সেই রকম ঘরে সারাজীবন সে কাটাবে কী করে? তারপর, বলতে গেলে চাষী গৃহস্থের ঘর। ধান পাট কলাই সর্ষে নিয়ে সংসার। সে সবই বা সামলাবে কেমন করে? ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র অবশ্য ভালো। নম্র, নিরীহ, শান্ত মেজাজের মানুষ। শরীর স্বাস্থ্যও বেশ। বয়স একটু বেশী হলেও নির্মলার সংগে বেমানান হবে না। তবু ছেলেটিকে সব দিক দিয়ে ওর মনে ধরবে কি?

এসব প্রশ্ন মায়ের মনেও দু'একবার দোলা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি জোর করে সব ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। স্বামীর চেয়ে তাঁর বাস্তববুদ্ধি বরাবরই প্রখর। তিনি বুঝেছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁদের ইচ্ছা বা আকাঙ্খার মূল্য কানা-কড়িও নেই, আসল কথা হল সামর্থ্য। সে দিক থেকে বিচার করলে, এর চেয়ে উপরের স্তরে হাত বাড়াতে যাওয়া তাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। বরং অপেক্ষা করলে আরো নেমে আসতে হবে। যে দিন আসছে, তার চেহারা আরো ভয়ংকর। পড়ন্ত বেলার দীর্ঘায়ত ছায়ার দিকে তাকিয়ে ভাঙা নৌকার মাঝি যেন তার দাঁড়ের বেগ প্রাণপণে বাড়িয়ে দেয়, আসন্ন রাত্রির দিকে চেয়ে মাও তেমনি তাঁর জীর্ণ সংসারটিকে যেমন করে যত দ্রুত হোক ঠেলে নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্যেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েটাকে যাহোক করে পার করা। সেদিকে যত দেরি হবে, পথ তত দুর্গম। স্বামী যখন ইতস্ততঃ করছেন, তিনি তখন মনস্থির করে ফেললেন। সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা গিয়ে বললেন, পণ্ডিতমশাইকে ডেকে পাঠিয়ে আসছে মাসের প্রথম দিকেই দিন-তারিখ ঠিক করে ফেল।

জগদীশের মুখে তখনো একটা ছোট্ট 'কিন্তু' এসে পড়েছিল, কিন্তু গৃহিণীর মুখের দিকে চেয়ে তাকে আর বাইরে আসতে দেননি। বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে শুধু বলেছিলেন, বেশ।

নির্মলার কাছে কেউ কিছু জানতে চায়নি। মাও না বাবাও না। দিদিরা তখন শ্বশুরবাড়ি। জানতে চাইলেই বা কী হত? মুখ ফুটে বলতে পারত কি না, এ বিয়েতে আমার মত নেই, এ ঘর-বর আমার মনের মত হয়নি, এর চেয়ে অনেক বেশী আমার আশা? ছিঃ ছিঃ একথা কি কখনো বলা যায়? তাছাড়া, বাবার অবস্থা সে তো জানে। তাঁর মনের কথাটাও অজানা নয়, কত বড় অনিচ্ছায়, নিতান্ত বাধ্য হয়েই যে তিনি এরকম ঘর-বরে মেয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, এটা তো তার কাছে গোপন নেই। সব দিক ভেবে মাও যে কেন আর দেরি করতে চাইছেন না তাও সে বোঝে। সুতরাং যা এল তাকেই গ্রহণ করতে হবে। দিদিদের, বিশেষ করে মেজদির ভাগ্য নিয়ে সে আসেনি। তাই নিজের ভাগ্যের কাছে নতি-স্বীকার করে ভিতরে ভিতরে নিজেকে তৈরি করে ফেলল। মনে মনে যে স্বপ্ন ছিল, সাধ ছিল, বাইরে তা দেখা দিল না বলে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। সংসার বড় কঠিন, জীবন বড় নির্মম, এ শিক্ষা সে ছোট থেকেই পেতে শুরু করেছিল।

কিন্তু প্রতি মানুষের মধ্যে আর একটা সর্বনেশে মানুষ বাস করে। সে যখন জেগে ওঠে, কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তাকে এঁটে উঠতে পারে না। যুক্তির বন্ধন খসে পড়ে, বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে যায়। একদিন নির্মলার জীবনেও দেখা দিল সেই অশুভক্ষণ, তার শান্ত সংসারের নিস্তরঙ্গ ধারায় নিয়ে এল প্রলয়ের বান। এক মুহূর্ত দাঁড়াতে দিল না, একটিবার সামনে পেছনে তাকাতে দিল না, তীর-বেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অতলের পথে। সে যদি একা হত, হয়তো তত দুঃখ ছিল না। নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছে, এই বলে খানিকটা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে যে স্বামীকে সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলেছিল নিজের সংগে। তার অমন স্বামী। প্রশান্ত, সরল, নির্বিরোধ, একদিনের তরেও স্ত্রীকে এতটুকু দুঃখ দেননি, তার অসংগত খেয়ালের একটিবার প্রতিবাদ করেননি, সমস্ত জীবন ধরে তাকে শুধু সুখী করতে চেয়েছেন। শুধু একটি কথাই ছিল তার মুখে, বেশ, তুমি যা বলছ, তাই হবে।

আজ মনে হচ্ছে, এর আগেও কতদিন হয়েছে, অত ভাল, অত নরম না হয়ে একটু যদি কঠোর হতেন স্বামী, একটু শক্ত, বলিষ্ঠ, তাহলে হয়তো এইখানে এসে তাকে দাঁড়াতে হত না।

সেই দিনগুলো ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে। কত ছোট বড় বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তখন কে ভেবেছিল ঐগুলো জড়ো হয়েই একদিন প্রলয় ঘটাবে?

(ক্রমশ)

॥ তমলুকের বর্গভীমা ॥

খুব পুরানো জায়গা তমলুক। আগে লোকে বলত তাম্রলিপ্ত। অবশ্য ১৯৫৫ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তমলুককে পরিখা খুঁড়ে খরোষ্ঠিলিপিযুক্ত একটা মৃৎপাত্র পেয়েছেন। তাতে লেখা আছে তামলিপ্তি। এখানে দ্রাবিড় সভ্যতার উৎকর্ষ দেখে হিংসায় জ্বলে উঠেছে আর্যরা। তারা বলেছে তমোলিপ্তি— অন্ধকারের দেশ। জৈন কল্পসূত্রে আছে যে খৃষ্ট-পূর্ব অষ্টম শতকে ২৩শ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ এখানে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর চতুর্যাম ধর্মমত প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তারপরে বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্তির নাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে। বিজয়সিংহ সিংহল জয় করতে যাত্রা করেছিলেন এই পোতাশ্রয় থেকে। এখান থেকে বোধিদ্রুম নিয়ে যাত্রা করেছিলেন মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা। ফা হিয়েন দু'বছর কাটিয়ে গিয়েছেন এখানকার বৌদ্ধ-শ্রমণে। সাত শতকে এসেছিলেন হিউ-য়েং সাঙ। তখন তাম্রলিপ্ত ছিল দর্শালি বিস্তৃত। তখন তাম্রলিপ্ত ছিল সাগর থেকে একটু দূরে।

সাগর সরে গেছে এখন। তাম্রলিপ্ত নেই আর এখন। এখন লোকে বলে তমলুক। কিন্তু এখনো আছে তমলুকের বর্গভীমা।

অনেকের বিশ্বাস বর্গভীমা জাগ্রত দেবী। লুপ্ত বৌদ্ধ বিহারের ওপর গড়ে উঠেছে শক্তির মন্দির। এখানে প্রতিষ্ঠিত তারা বা শক্তিমূর্তি। অনেকেই বলেছেন মন্দিরটি উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের আপত্তি করেছেন কেউ কেউ। তাঁদের মতে এই মন্দিরের বাইরের দিকটায় উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতির প্রভাব থাকলেও মন্দিরের ভিতরের অংশটা অনেকটা বুদ্ধ-গয়ার অনুরূপ। গঠনরীতিতে তিনটে ভাগ লক্ষ্য করা যায়। বড় দেউল মন্দিরের অভ্যন্তর। তার পাশে জগমোহন। সামনে নাটমন্দির। বড় দেউল এবং জগমোহনে যাবার মাঝখানে ঢাকা জায়গা। এখানে পণ্ডিতেরা বসে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। তাকে বলে জ্ঞানমণ্ডপ।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের ভিত্তিমূলে তৈরি করে তার ওপর পাথর ও ইঁটের ত্রিশ ফুট উঁচু গাঁথনি। এই বনিয়াদের ওপর ন'ফুট ভিত-বিশিষ্ট তেহারা প্রাচীর তৈরি করে ষাট ফিট উঁচু খিলানাকার ছাদ। বাইশটা সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠতে হয়। মন্দিরের ভেতর ঢুকলে মনে হয় যে প্রথমে একখণ্ড শ্বেত-পাথর খোদাই করা হয়েছিল। তারপর তার চারদিকে ইঁটের পাঁচিল গেঁথে দেওয়া হয়েছে। খাঁজ করে পাথর খোদাই করা হয়েছিল বলে মন্দিরের শোভা বহুগুণ বেড়ে গেছে। কোথাও কোন জোড়া আছে বলে মনে হয় না। মন্দির ও মূর্তির গঠন-শৈলী এখনও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যখন ক্রেন বা অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল, তখন কি করে অমন বড় বড় পাথরকে অত স্বচ্ছন্দ্যসৌন্দর্যে স্থাপন করা হয়েছে।

মূল মন্দিরের সামনে আর একটা মন্দির। তার নাম যজ্ঞমন্দির। শোনা যায় স্বামী-পুত্রহীনা বিধবা সূতোর ব্যবসা করে অনেক টাকা উপায় করেন। মরার আগে সেই টাকা দিয়ে তিনি এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। এখন এই যজ্ঞমন্দির বর্গভীমার মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। অনেকের ধারণা জগমোহনই এই দুটি মন্দিরের যোগপথ। যজ্ঞমন্দিরের সামনে বলিদান ও নাচের মণ্ডপ। তার সামনে তোরণ ও নহবতখানা।

পাথর কুঁদে বার করা হয়েছে বর্গভীমার মূর্তি। কোঁদা পাথরের এমন মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। চতুর্ভুজা এই মূর্তি উগ্রতারা মূর্তির অনুরূপ। শিবমূর্তির উপর দেবীর উদ্ভব। আর আছে ক্ষুদ্রায়তন দশভুজা মহিষমর্দিনী। দেবী মূর্তির শেষসোপানে আছেন "ভূতিনাথ" ভৈরব।

বর্গভীমা দেবী একান্ন পীঠের অন্তর্গত না হলেও অনেকে একে উপপীঠ বলে মনে করেন। শক্তির মন্দিরে কিন্তু বৈষ্ণবের চক্রচিহ্ন আছে। কেউ কেউ বলেন যে, মুসলমান রাজত্বের সময় কৈবর্ত রাজের অধীনে ছিল তমলুক। তাঁরা বৈষ্ণব। এই চিহ্ন তাঁদের দান। এবং তখন থেকেই বলিদানকে বড় করে দেখা হয় না। এই থেকে আবার পাওয়া যায় বর্গভীমা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী। বলা হয়ে থাকে কৈবর্তরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালু ভুঁইয়া বর্গভীমার দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তমলুকের রাজ্যশাসন পাওয়ার পর এই কীর্তি স্থাপন করেছিলেন তিনি।

আরো প্রবাদ আছে। তখন বাড়-বাড়ন্ত বন্দর তাম্রলিপ্তি। একদিন এক ধনপতি সদাগর সিংহল যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। তখন এক লোকের হাতে অপূর্ব সুন্দর সোনার ভৃঙ্গার দেখতে পান। খুবই পছন্দ হয়েছিল সদাগরের। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোথায় পাওয়া যায়। লোকটা বলেছিল নগরের শেষে যে জঙ্গল আছে তার মধ্যে আছে এক কুয়া। পিতলের জিনিস সেই জলে ডোবালেই সোনা হয়ে যায়। এই কথা শোনার পর আর স্থির থাকতে পারেনি সদাগর। বাজারের সব পিতল কিনে ডুবিয়েছিলেন সেই কুয়োর জলে। পিতলের সব বাসন সোনা হয়ে গেল। ধনপতি সদাগর যাত্রা করলেন সিংহল। সেবার অপরিমিত অর্থ পেয়েছিলেন বণিক। ঘরে ফিরে তিনি সেই কুয়োর ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্গভীমার মূর্তি ও মন্দির। আর মন্দিরটি নাকি বিশ্বকর্মা নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন।

বর্গভীমা জাগ্রত দেবী। বহুকাল থেকে লোকে ভয়-ভক্তি করে। এমন কি কালাপাহাড়ও মাথা নীচু করেছিল এই দেবীর কাছে। উড়িষ্যা বিজয়ের পথে বহু মন্দির ধ্বংস করেছে কালাপাহাড়। কিন্তু বর্গভীমা দেখে মুগ্ধ কালাপাহাড় কোন ক্ষতি ত করেই নি, বরং ফারসীতে একটা দলিল লিখে দিয়ে যায়। তাকে বলা হয় বাদশাহী পাঞ্জা। বর্গীর হাঙ্গামায় তছ-নছ হয়েছে বাংলার একাংশ। কিন্তু বর্গভীমার ভয়ে তমলুকের কোন ক্ষতি করতে সাহসী হয়নি মারাঠারা। বরং তারা ষোড়শোপচারে পুজো দিয়েছে দেবীকে। বহু অলংকারে সাজিয়ে দিয়েছে মূর্তি। রূপনারায়ণ বহুবার ক্ষতি করতে চেয়েছে। কিন্তু দেবীর তিরস্কারে মন্দিরের কাছে তার স্রোত সংযত করতে বাধ্য হয়েছে।

এখন অবশ্য আধুনিক শহর তমলুকের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবাই কষ্টকর হয়ে ওঠে বর্গভীমার প্রাচীন গৌরবের কথা।

সেই নিরংকুশ দুপুরের আতিশয্য, তখন মাঠ-ঘাট জুড়ে ভয়ংকর একটি দুঃস্বপ্নের মতো, এলোমেলোভাবে ছড়ানো। অযোধ্যা পাহাড়ের নীল কণ্টুর ঝাঁঝা-করা উগ্র একটি আগুনে রঙের মধ্যে অদৃশ্য। যে-পুকুরের নিঃশেষ যৌবনের গায়ে গা দিয়ে পড়ে থাকার জন্য ভোর থেকেই ভিড় করতো মেয়েরা, সে-পুকুর এখন জ্বরো রুগীর মতো হাঁসফাঁস করছে: রাজহাঁসগুলো জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে একটা গাছের নীচে চোখ বন্ধ ক'রে ঝিমুচ্ছে। একটি সীমাহীন শূন্যতা ভয়ের মতো থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

এ অবস্থায় ঘর থেকে বেরুনো নিষেধ। তবু একটি দুর্বার কৌতূহল শহর-সীমান্তের মানুষগুলোকে ও-দিকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেল। পুকুরের পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছুটতে ছুটতে কৌতূহলী মানুষের দল আর একটি মানুষকে দেখবার জন্য এগিয়ে গেল: কয়েকটা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-ও যথারীতি গিয়ে পুকুরের বড়ো পাড়ের নীচে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, শুধু তাই নয়, দু'জন ছেলে সেই মুহূর্তেই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা আরো বাড়িয়ে তোলে। মানুষের পেছনে পেছনে গোটা দুয়েক কুকুরও কৌতূহল সামলাতে না পেরে এসেছিল। তারপর হঠাৎ কুঁইকুঁই ক'রে লেজ গুটিয়ে উধাও হয়ে গেল কোথায়।

মাথার ওপর দ্বাদশ সূর্যের বৈশাখী তান্ডব। কাঠ-কাঠ জমি ফাটা-ফাটা মাটি হাঁটতে হাঁটতে রোদের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে কোথায়! শুধু মুকুলদা'র পাঁচিলের ওপাশ থেকে সবুজ সবুজ গাছপালার,—আতা-নিম—আর আশ-শ্যাওড়ার ভুতুড়ে ঝোপঝাড়ের ছায়া সেই পাঁচিলের ওপরে মরার মতো নিস্তব্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল। কিছুদূরে বাগদীপাড়ার কুঁড়ে কুঁড়ে ঘরগুলোয় তখন রোদের আগুন মেখে শব্দহীন আর্তত্তা।

বন্দুকের শব্দ আমি শুনতে পাইনি; আর, শুনতে পেলেও বা কি হতো! আমার বুকের মধ্যে বন্দুকের না-শোনা শব্দ বারবার আমাকে, এমনিতেই নিঃশেষে হত্যা করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কোক্-বসন্ত পাখির একটানা কোক্ কোক্ শব্দ আমার বুকে ঢিপ্‌ঢিপ্ ক'রে শিহরণ জাগাচ্ছিল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমিও ছুটে গিয়েছিলুম।

'কে?'

'ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মুখটা নেই।'

'মুকুলদা?'

'তাইতো মনে হচ্ছে।'

মুকুলদা!

আমার মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে গিয়েছিল। হয়তো এক মুহূর্তের জন্য আমি জ্ঞান হারিয়েছিলুম; ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে সারা দেহ আমার কাঁপছিল; আমার মন মুখ খুলে হাহাকার করবার জন্য বিকৃত ভঙ্গী ক'রেই থেমে গেল। বাচ্চা ছেলেটার মতো আমি-ও নিঃসম্বিৎ হয়ে মাটিতে,—সেই আগুনের মতো গরম মাটিতে—চারদিকের সেই নোংরা ময়লা ছড়ানো পাথরের মতো শক্ত মাটিতে কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়তে চেয়েছিলুম, কিন্তু তা'র পরিবর্তে আমাকে বসে পড়তে হয়েছিল।

এর মধ্যেই পুলিশ এসে গেছে। কিন্তু,—মুকুলদা!

আমি বিশ্বাস করতে চাইনি। কারণ মুকুলদাকে নির্মমভাবে হত্যা করার কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না। মুকুলদা তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে মারিনি। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তুমি এমন ক'রে মরতে পার!

আমি জানি, আমার দিকে কেউ নজর দেবে না এখন। আমার মতো

আরো পাঁচজনের সঙ্গে মুকুলদার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল; শুধু আমি একটু বেশি ক'রে মুকুলদা'র বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতুম।

'আরে রাম রাম, নসিব কা ক্যা খেল্......। হট্ যাও তুম্‌লোক্, এত্‌না নজদিক্ মত আও......'

বাচ্চাগুলোকে লাঠিওয়ালা পুলিশ ঘরে পাঠিয়ে দিল। এ দৃশ্য কারুর-ই দেখার নয়। এ দৃশ্য আমার-ও দেখার নয়।

তবু দেখতে হচ্ছে।

মুকুলদার মুখ দেখা যাচ্ছে না। ও'র শার্ট আমি চিনি। ও'র কালো হাতের শিরাগুলো যেখানে যেখানে দড়ির মতো, সে জায়গা-টা এখান থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মুকুলদার মালকোঁচা-দেওয়া কাপড়পরার রীতি-ও আমি চিনি; এমন কি ব্রাউন রঙের যে পাম্পসু প'রে তিনি অফিসে যেতেন সেই জুতো জোড়াই এখন পায়ে।

শিকার করার নেশায় মুকুল'দা রাতের পর রাত জঙ্গলে কাটিয়েছেন; বাড়িতে বুড়ো-মা ও বৌকে রাতের পর রাত একলা কাটাতে হয়েছে। আমি অবশ্য একটু বেশি রাত ক'রে ওদের পাহারা দিয়েছি কতোদিন। যখন কিছুতেই ওঠার গরজ দেখাতুম না, যখন বৌদি তাঁ'র ফর্সা হাতের সরু সরু পাতলা পাতলা আঙুল নেড়ে তাঁ'র বাপেরবাড়ির নানা গল্প কিছুতেই শেষ করতে চাইতেন না, তখন মাসী-মা, —মুকুলদার মা-কে আমি যা ব'লে ডাকতুম,— এসে বলতেন, কোন কোন দিন বেশ গম্ভীর গলায়, চোখদুটোতে একটা অস্বাভাবিক বিমর্ষতা না দীপ্তি, কে জানে, কি—, ফুটিয়ে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে বলতেন : বৌ-মা আর রাত ক'রো না। অত কি গল্প আছে তোমাদের যে শেষ হ'তে চায় না?

আমি গোড়ার দিকে সংকোচ অনুভব করলেও শেষ পর্যন্ত ওটা সয়ে গিয়েছিল। রাতের বেলায় কি জানি কেন, মাসী-মা আমাকে তেমন সহ্য করতে পারতেন না। অথচ দিনের বেলায় আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আর নানা ফাইফরমাস খাটতে বলতেন। বলা-বাহুল্য, মাসী-মাকে খুশী করার জন্য ওসব ব্যাপারে আমার অনাগ্রহ ছিল না। অনায়াসেই আসা-যাওয়ার জোরে দিয়ে আমি ওখানে মানিয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে। বৌদি-কে আমার আর পর-পর বলে মনে হতো না। পঁচিশ বছরের নিঃসন্তান বৌ-দিকে কুমারসম্ভবের পার্বতীর মতো-ই মনে হ'তো। পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা।

তা' বলে মুকুলদার ওপর আমার কোন ঈর্ষাও ছিল না। না, ছিল একটু। একটু ছিল। তবে মুকুলদার চেহারার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছরের আধবুড়ো মানুষের চেহারার ছাপ ছিল না, বরং আমার সাতাশ বছরের সঙ্গে তা'র মিল ছিল। এমন সহৃদয় মানুষ আমি আর দেখিনি। কতোদিন সন্ধ্যে বেলায় তাঁর সেই ঝোপে-ঝাড়ে-ভরা ভুতুড়ে বাড়ির দাওয়াতে বসে আমি আর মুকুলদা আড্ডা দিয়েছি। ছোটনাগপুরের এমন কোন অরণ্য নেই, যা' মুকুলদার বন্দুকের সঙ্গে অপরিচিত। বনের গল্প করতে করতে মুকুলদা একেবারে আরণ্যক হয়ে যেতেন। বাঘের চোখের মতো তাঁর চোখদুটো মাঝে মাঝে জ্বলতো। বৌদি চা' করে আনতেন। মুকুলদা'র সামনে বেশিক্ষণ বসতে চাইতেন না। রান্না করার অছিলায় উঠে যেতেন। মুকুলদা তাঁর জন্য বেশি আগ্রহ-ও দেখাতেন না, অথচ বৌদিকে অবহেলা করতেও তেমন আমি দেখিনি।

কতোদিন দেখেছি, রোববারের ছুটিতে বন্দুক খুলে ঘসামাজা করছেন মুকুলদা; নলের ওপর কি যেন তেল মাখাচ্ছেন। এক চোখ বন্ধ ক'রে নলের ভেতরে কি যেন পরীক্ষা করছেন। অনাবৃত লোমশ কালো শরীরটাকে তখন অনেক সময় বুনো মোষের মতো, কিংবা ভালুকের মতো মনে হয়েছে। কি ক'রে এই দেহকে সহ্য করেন বৌদি!

আশ্চর্য বৌদি এখানে নেই; মাসী-মা এখানে নেই। কি করছেন ওঁরা। ফুলে ফুলে কাঁদছেন? জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন? কে দেখছে ওঁদের? বৌদির চেহারাটা কেমন হয়েছে এখন? কল্পনা করতে পারছি না। না-কি ওঁরা জানেন না? ঘরের কোণে ঠাণ্ডা খুঁজে ওঁরা ঘুমুচ্ছেন না তো?

নিজের মাথার রগদুটোকে টিপে নিজেকে একটু সবল করতে চাইলুম। এ সময় আমার অতন্ত ভেঙে পড়া চলবে না। আমি ভেঙে পড়লে বৌদির কি হবে?—ঠিক সেই সময় আমি চোখ বন্ধ করে কি ভাবছিলুম, কতো কি ভাবছিলুম। ভাবতে ভাবতে একসময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম বৌদি আমার বুকের উপর ভেঙে পড়ছেন শোকে, দুঃখে, বেদনায়, আর্তিতে; অথচ কি আশ্চর্য বৌদির চোখে জল কোথায়? না-কি অতি-বেদনার দাহ তাঁর চোখের জল শুকিয়ে দিয়ে গেছে। আরো স্পষ্ট ক'রে দেখলুম, মুকুলদা'র মা, আমার মাসী-মা হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেছেন। আর, সেই বিরাট বাড়ীটা তার চারদিকের পাঁচিলঘেরা পরিসরের দু-তিন বিঘের মতো জায়গার এক কোণে, এক-টেরে ভয়ে কাঁপছে। বৌদি আমা'র দিকে ভয়ার্ত চোখ তুলে বলছেন : কি ক'রে একা থাকবো?

আমার মুখ দিয়ে একটা অব্যক্ত শব্দ বেরিয়েছিল। কেউ হয়তো সে শব্দ শুনেছে কি না জানি না। আমি নিজে শুনেছি। শব্দটি একটি মাত্র অক্ষরের; অসহায়, একটি আহত অক্ষর : না—। এ শব্দটি-র অর্থ আমার জানা নেই।

মাথা পুড়ছে। ভিড় বাড়ছে। পুলিশের দল-ও বাড়ছে। কয়েকটা চিল অনেক ওপরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়ালুম। মুকুলদাকে এবার সাহস ক'রে দেখলুম। একটু কাছে গিয়ে, মুখের ওপর একটি নিরাসক্ত বিমর্ষতা ফুটিয়ে একবার মাত্র উঁকি দিয়ে মুকুল-দার শিকারী মুখটাকে খুঁজছিলুম। তারপরেই শিউরে উঠে পিছিয়ে এলুম।

পুলিশের সেই লোকটা তখন-ও হাঁক দিচ্ছিল : হট্ যাইয়ে, নজ্‌দিক্ মত্ আইয়ে। তারপর খৈনী টিপ্‌তে টিপ্‌তে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল, গাড়ী এসে নিয়ে যাবে মুকুলদা'কে।

মুখ দেখে কেউ সনাক্ত করতে পারবে না মুকুলদা'কে। আমিও না, বৌদিও না। বাঁ পাশে কাত্ হয়ে উপুড় হয়ে মুকুলদা পড়ে আছেন বন্দুকটাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে। বন্দুকের জোড়া নল তখনো চোয়ালের হাড়ের নীচে ঠেকানো। ডান পাশের চোখ-নাক-কান-মাথা, রক্তে-ঘিলুতে তাল পাকিয়ে—। উঃ—

আর দেখা গেল না। অথচ সারা দেহ অবিকৃতভাবেই পড়ে আছে। মুখের দিকে না তাকালে মনে হবে, মুকুলদা যেন বন্দুকটিকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধ'রে ঘুমুচ্ছেন।

এখন মনে পড়ছে, মুকুলদাকে ঠাট্টা ক'রে বৌদি একদিন বলেছিলেন, বন্দুকটাই আমার সতীন। মুকুলদা একটুখানি হেসেছিলেন। বলেছিলেন : ঠিক বলেছো; এ'র হাতেই আমার

জীবন-মরণ। ভারী ভালোবাসে আমাকে, অন্য কারুর দিকে নজর দেয় না।

বৌদির মুখ-টা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল সেদিন। মুকুলদা তা' লক্ষ্যও করেন নি। শুধু বৌদির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'তেই বৌদি মুখ নামিয়ে যেন ওখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্যই বললেন : যাই, তোমাদের চা নিয়ে আসি। বৌদি আর দাঁড়াননি।

মুকুলদা এমন আচমকা হোঃ হোঃ ক'রে হেসেছিলেন যে আমিই চমকে উঠে বলেছিলাম : কি হলো? এমন ক'রে—

মুকুলদার হাসি শেষ হ'তে সময় লাগলো। এ হাসি ভালো লাগেনি আমার। কেমন যেন ছুরির মতো তীক্ষ্ণ হাসি, তীর হাসি: আমার গায়ে লাগছিল। আমার গায়ে কেটে কেটে বসছিল।

অবশ্য মুকুলদা সেদিন এ হাসির বিষয়টাকে হঠাৎ অন্য গল্পে চালান ক'রে দিয়ে ব্যাপারটাকে তুচ্ছ ক'রে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন : তোমাকে এ গল্প বলিনি বুঝি!

অরণ্যের গল্পে মুকুলদা একেবারে অন্য মানুষ। বন-পাহাড় যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে তখন। কেমন ক'রে একটা বুনো কুকুর, হুড়ার না কি যেন ব'লে, দাঁত বা'র ক'রে লোভাতুর দৃষ্টিতে ছাগলটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল, তা'র চুপ্সানো পেট-টা কেমন ক'রে ওঠা-নামা করছিল, অথচ কিছুতেই সাহস ক'রে ছাগলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছিল না—হয়তো আশঙ্কা করছিল, কেউ কোথাও তা'কে লক্ষ্য করছে—। তারপর গাঁক্ করে একটা শব্দ। আর—। মুকুলদা আবার হেসে উঠলেন—বললেন : ওঃ যদি দেখ্তে সে পালানো। বুনো কুকুরটা প্রাণভয়ে চোখের নিমেষে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল, ওঃ—। আর মাচায় ব'সে আমি প্রায় হেসে গড়িয়ে পড়ি আর কি! কিন্তু—

প্রায় চমকে উঠেই বললাম : কিন্তু কি? খুবেই দুর্বল গলায় বললুম বলেই মনে হলো।

মুকুলদা খুব সহৃদয় ভাবেই বললেন : কি আর! বাঘ। বাঘের সাড়া পেয়েই বুনো কুকুরটা—প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালালো। বেচারী শুধু ছাগলটাকে চোখে দেখেই ক্ষান্ত হলো, আস্বাদ নেবার সময় পেলো না।

তারপর, আমার দিকে তাকিয়ে সহজভাবেই বললেন : চল না একবার আমার সঙ্গে। নওয়াগড়ের জঙ্গলে নিয়ে যাবো। নাঃ কিচ্ছু হবে না—তোমাদের মতো ইস্কুল-মাস্টারের দ্বারা। ছাত্র ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়েই যতো বীরত্ব! যাবে একদিন বাঘ শিকার করতে? না-না, শিকার করতে নয়, দেখতে? তোমার দ্বারা ওসব সাহসের কাজ হবে না।

এই সব গল্প সেদিন আমার ভালো লাগেনি। মুকুলদা'র মনে কি আছে আমি জানি না; কিন্তু আমি দারুণ অস্বস্তি নিয়ে সেদিন এসেছি ওখান থেকে। পরে অবশ্য, ও কথা তেমন ক'রে মনে থাকেনি। আমাকে মুকুলদা যে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গল্প বলেছিলেন সেদিন, এ কথা মেনে নিতে স্বস্তি পাই না, কিন্তু না মেনে নিলে-ও সুখ পাই না, ব্যথা পাই না, কিছু একটা চিন্তার খোরাক পাই না। এবং আজ থেকে ঠিক তিন দিন আগে হঠাৎ আমাকে বলেছিলেন : ওহে, আমি শিকারে যাচ্ছি রণজিৎপুরের জঙ্গলে। আসতে, দু' তিন দিন দেরী হবে।

মনে মনে খুশী হয়ে মুকুলদা'র খুব প্রশংসা করেছিলুম। আমাদের হেড্‌মাস্টারমশাই-ও যে মুকুলদা'র শিকারের গল্প করেন, সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিলুম।

মুকুলদা কেমন ক্রূরদৃষ্টিতে একবার তাকালেন। কোন জবাব দিলেন না। পরের দিন সন্ধ্যের সময় বৌদি-কে গিয়ে বললুম : কৈ চা-টা একটু দেবেন নাকি?

মাসী-মা কোথায়? বেশ ... হাঁকতে হাঁকতেই ওদের ঘরে ঢুকলুম। বৌদি-কে খুব উজ্জ্বল মনে হলো। কপালে বড়ো ক'রে সিঁদুরের টিপ পরা; সাদা-মাঠা হলে-ও শাড়ী-র টকটকে লাল পাড়-টা চোখকে টানতে পারে। মনে হলো বৌদি সেজেছেন।

বললেন : বসো। চা নিয়ে আসছি।

'মাসী-মা কোথায়?'

'পুজোর ঘরে। বেরুতে দেরী হবে!'

এ কথাটা অতো ফিস-ফিস ক'রে বলার কি প্রয়োজন ছিল! এই ফিস্-ফিস্ শব্দটা আমাকে এক নিমেষে কেমন এক শিহরণের মধ্যে ফেলে অবশ ক'রে এনেছিল প্রায়।

যে-হাসির কোন মানে হয় না, যে-হাসির মানে বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, যে-হাসির মানে জীবন-ও হয় মৃত্যু-ও হয়, তেমনি একটু আশ্চর্য হাসি হেসে বৌদি বললেন : এক্ষুনি আসছি। মনে হলো, একটি খঞ্জন পাখি লাফাতে লাফাতে চলে গেল। ভারী ভালো লাগলো—'এক্ষুনি আসছি।'

এ ঘরটার দুটো দরজা। সদর দো'র দিয়ে ঢুকে, ভেতরের দোর দিয়ে আরো

ভেতরে যাওয়া যায়। বৌদি চলে যেতেই কি ভেবে সদর দোরের কপাটে-র ছিট-কিনিটা তুলে দিয়ে এসে ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় একটা পত্রিকা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখার চেষ্টা করলুম। অথচ এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই, আমার মনের মধ্যে যেন একটা ঝড় বইছিল তখন।

বৌদি চা' নিয়ে এলেন। চা দেবার সময় আমার প্রায় গা ঘে'সে দাঁড়ালেন তিনি। ওঁর দিকে মুখ তুলে তাকালুম—নির্বোধ একটি বাছুরের মতো। কতোক্ষণ সে ভাবে তাকিয়েছিলুম জানি না। বৌদি আমার বসার চেয়ার ধ'রে কতোক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন জানি না; আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বৌদি-ও সে চা খাবার জন্য কিছুতেই অনুরোধ জানালেন না। আমি হঠাৎ যেন পাখির মতো হাল্‌কা হয়ে গেছি মনে হলো; আমার নাক-মুখ-কান-চোখ কোথায় যেন একটি অস্বাভাবিক তাপের মধ্যে জ্বরো রুগীর মতো ফ'ুসতে লাগলো। আমি নির্বাক, নিঃস্পন্দ অবস্থায় প্রায় যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায় বৌদির সেই চাঁপাকলি আঙুল ধ'রে আমার ঠোঁটে ছ'ুইয়ে মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলুম কিনা জানি না। বৌদির দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো অবস্থা-ও আমার ছিল না। আস্তে আস্তে আঙুলগুলো মুক্ত ক'রে নিয়ে, আরো শান্ত সংযত গলায় বৌদি বললেন : চাটা জুড়িয়ে গেল তো?

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ হলো। এ শব্দ বৌদি নিশ্চয়ই চেনেন। তাঁর মুখটা মরা মানুষের মুখের মতো পাণ্ডুর হয়ে গেল। কিন্তু তাও এক মুহূর্তের জন্য। ছিট্‌কিনি বন্ধ দেখে একবার যেন দারুন এক ঘৃণায়—না, অসম্ভব, ঘৃণায় নয়, বোধ হয় অভিমানে, তিনি আমার চোখের উপর চোখ রাখলেন। তারপর ওদিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন : কে?

'আমি! খোল।'—মুকুলদা'র গলা।

কিন্তু মুকুলদা তো শিকারে বেরিয়ে গেছেন! সকালেই বেরিয়ে গেছেন! বৌদি দরজা খুলে দিলেন। বললেন : শিকারে যাওনি?

মুকুলদা একবার আমার দিকে ফিরে-ও তাকালেন না। দ্রুতবেগে বন্দুক সহ অন্য ঘরে চলে গেলেন। বৌদি-ও তাঁকে অনুসরণ করলেন। আমি কিছুক্ষণ একলা বসে থেকে, এভাবে বসে থাকাটা ভালো দেখাবে না বলেই,—অতি দুর্বল-কণ্ঠে 'মুকুলদা' ব'লে ডাক দিতে দিতে ওদের শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

বৌদির দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো অবস্থাও আমার ছিল না।

বৌদি নির্বিকারভাবে এসে বললেন, তুমি এখন যাও। ওঁর খুব মাথা ব্যথা করছে।

আর কোন প্রশ্ন না ক'রেই আমি প্রায় লেজ-গুটোনো কুকুরের মতো পালিয়ে এলুম। হঠাৎ মনে হলো, মুকুলদার বলা সেই হ'ুড়ারের গল্প, বাঘের সাড়া পেয়ে যে পালিয়ে বেঁচেছিল।

আমার নিজের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। আমার মনকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। সেই ভিড়ের মধ্যে শুধু আমার মুখ, শুধু আমার মন ধীরে ধীরে আগুনে-পোড়া মড়ার দেহের মতো বিবর্ণ হয়ে আসছিল; আমার সর্বাঙ্গে দগদগে পোড়া ঘা ফুটো ফুটে উঠছিল আর আমি উন্মাদের মতো নখ দিয়ে আমার মনকে আঁচড়ে আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিলুম। একটা প্রচণ্ড ঘৃণায়, সেই অবস্থাতেই আমি ফেটে পড়তে চাইলুম। লোকটার ওপর আমার ঘৃণা আমার চোখ ভেদ ক'রে আমার বিকৃত মুখের রেখা ডিঙিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো। এতো বড়ো কাপুরুষ এ'র আগে কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হলো না। লোকটা (না, মুকুলদা নয়) সেই বুনো কুকুরটার চেয়ে-ও ভীরু। হাতের তাক্ এমন ক'রে নিজের ওপর চালিয়ে মূর্খ, অপদার্থ, ভীরু প্রমাণ দিয়ে গেল যে, যতো বড়ো শিকারী-ই সে হোক্ না কেন, একটা মেয়েকে গুলী করার মতো ক্ষমতা তা'র ছিল না। ভীরু, ভীরু; ওর বাঘ শিকারের গল্প মিথ্যে, একটা বুনো কুকুরকেও মারবার সাহস ওর ছিল না।

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

॥ সার্থবাহ ॥

ইতালীয় নাটক ঃ

।। ঐতিহ্য ও প্রকৃতি ।।

চতুর্দশ শতকের ইতালীয় কবি পেত্রার্কার প্রেমের কবিতা মারফত এলিজাবেথীয় কবিদের যে-শিক্ষা ইংরেজী কবিতার উন্নতিকল্পে সম্ভব ও সার্থক হয়েছিল, সেইরূপ কোনও শিক্ষা ইতালীয় নাট্যকাররা ইংরেজের বরে নেননি। তাই সপ্তদশ শতকের ইতালীয় নাটক যেন লাতিন জাত্যাভিমানের মোড়কে রাখা এক দেশাচার, যা বিধানের জন্য বড়জোর প্রতিবেশী ফ্রান্সের রাসীনের কাছে যেতে রাজী ছিল, কিন্তু সাগরের এক চিলতে পেরিয়ে ইংলণ্ডে হাজির হবার দৌলত যার ছিল না। অথচ য়ুরোপীয় নাটকের গুরু, গ্রীকদের পর অবিসংবাদী গুরু তখন ইংলণ্ডেই! সেক্সপীয়রকে না-জেনে ইতালী (যেমন ফ্রান্সও) নাট্য-শিল্পের আধুনিক মহত্ত্ব ও গুরুত্বের সঙ্গে অপরিচিত ছিল অনেককাল।

তাই কেবল ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকেই ব্রাক্কো, ভেরগা ও পরে প্রাগা, আন্নুর্তসিও এবং বর্তমান যুগে পিরান্দেল্লো প্রমুখ নাট্যকাররা ইতালীর রীতিমতো রঙিল নাট্য-সাহিত্যে মাত্র কয়েকজন জীবননিষ্ঠ শিল্পী। বলা যায় যে মোটামুটি একশ বছরের ইতিহাস নিয়ে ইতালীয় নাটক তার বর্তমান স্বপ্রতিষ্ঠায় বিচার্য। কারণ সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের অনেকদূর পর্যন্ত ইতালীয় নাট্য-শিল্প যে-নানাবিধ প্রাপ্তি ও ক্ষতিতে চিহ্নিত তার ইতিহাসে বৈচিত্র্য থাকলেও জীবন-সন্ধান কমই টের পাওয়া যায়। এবং সেই বৈচিত্র্যের অবদান আধুনিক কালের ইতালীয় নাটকে এতো স্বল্প যে একমাত্র ইতালীয় নাটকের অভ্যুত্থান বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতলাভের জন্যই তার প্রসঙ্গ পাড়া চলে।

অবশ্য ইতালীয় নাট্য-সাহিত্যে একটি প্রধান লক্ষণ আগাগোড়াই থেকেছে শিল্প-সচেতনতা। অনেকাংশে জীবন-বিমুখ যদিও, তবু ইতালীয় নাটক ঘুরে ফিরে নাটকের কলাকেন্দ্রিক সম্ভাবনার হরেক উপলব্ধি প্রশংসনীয়ভাবে আত্মস্থ করেছে। এই শিল্প-সচেতনতা,—শিল্প-চাঞ্চল্য বললেও অত্যুক্তি হয় না,—ইতালীয় নাটকে মানবিক মূলধনের অবক্ষয়কে এক আংশিক ক্ষতিপূরণ দিয়েছে এবং নাটকের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে, এটুকু মানতে হয়। কারণ বস্তুর সার্থক সূত্রপাত যতো দেরীতেই আসুক না ইতালীয় নাটকে, তার বিবর্তনে শিল্প-অবহিতি যে যথেষ্ট নিরীক্ষা-পরীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রমাণ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইতালীয় নাটক; এবং এই দুই শতাব্দীর অপসারী নাট্য-প্রচেষ্টার নির্দেশ আধুনিক ইতালীয় নাটকের বৃত্তান্তে নেহাত অমূলক ভণিতা হবে না। কারণ, উক্ত নির্দেশ ইতালীয় নাট্য-প্রণোদনারই পরিচয়।

চার্চের গন্ডি পেরিয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করার বেশ কিছুকাল পর ইতালীয় নাটক শিল্প-সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপপত্তি লাভ করল সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে। কমেডি বলতে তখন যা বোঝাত তা ছিল প্রহসন এবং সেই প্রহসনের অভিনয়ে প্রথম ধরা দিয়েছিল ইতালীয় নট ও নাট্যকারদের ক্ষমতা, বিবেচনা ও শিল্পবোধ। তখনকার ইতালীয় নাটকে অভিনেতাদের পক্ষে সৃষ্টির সুযোগ মিলেছিল আশ্চর্যভাবে অবাধ। অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যের অবতারণা ও অভিনয়-নির্দেশনা দিয়েই নাট্যকারের কর্তব্য শেষ হ'ত। থাকত 'লাৎসি' বা 'হাস্যকর মুখভঙ্গী'র উল্লেখ মাত্র, কথা বা সংলাপ বানিয়ে নিতে হ'ত অভিনেতাদের। এ ধরনের নাটকের অভিনয়ে নট-নটীদের উপস্থিত-বুদ্ধি, রসজ্ঞান, বাচনশক্তি এমতো দরকার হ'ত যে অভিনয়ের ওস্তাদিতেই নাটকের সুনাম বাঁধা থাকত। স্বীকার করতে হয় যে নাটককে অভিনয়ের ওপর এমন সাহসিকভাবে নির্ভরশীল করার উদ্যোগ ইতালীয় নাট্যকারদের এক উদ্ভাবন, যার স্বপক্ষে, বোধ হয়, সর্বকালেই কিছু বলার থাকে। এইভাবে তাঁরা অভিনয়ে যে-স্বাভাবিকতার সঞ্চার নিশ্চিত করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে নাট্যকলার এক চিরন্তন মোক্ষ, যদি বা সংলাপ রচনার দায়িত্ব অভিনেতৃবর্গের হাতে ছেড়ে-দেওয়ার মধ্যে নাট্যকারের কর্তব্যচ্যুতির ভয়াবহ দৃষ্টান্তও বর্তমান।

ইতালীয় নাটকে এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় সপ্তদশ শতকে এমন সম্পন্ন রূপ পায় যে তার পাশে দস্তুরমত লিখিত, 'সাহিত্যিক' নাটক নিন্দনীয় ঠেকত। প্রকৃত কলাকুশল কমেডি ছিল ঐ প্রণোদনাসিদ্ধ 'কোম্মেদিয়া দেল্লার্তে' বা 'জাত কমেডি'র আয়ত্বে, আর 'সাহিত্যিক', পরিশীলিত কমেডি, যার রূপদানে অভিনেতার অসীম সৃষ্টিশীলতা থাকত রচিত নাটকের নিয়ন্ত্রণে, নিন্দিত হ'ত 'কোম্মেদিয়া এরুদিতা' বা 'গৎ-বাঁধা' কমেডি ব'লে।

'কোম্মেদিয়া দেল্লার্তে'র দৃষ্টান্ত যেমন য়ুরোপীয় নাটকের ইতিহাসে আঙ্গিকের (এবং অনেক প্রহসন-চরিত্রের) কারণে স্মরণীয়, তেমনি ইতালীয় নাট্য-শিল্পের পরবর্তী অভিব্যক্তিগুলিতেও নাট্য-প্রেরণার আরো কিছু অভিনবত্ব আভাসিত। যেমন, সপ্তদশ শতকেরই ক্লাসিকপন্থী দুই নাট্যকার, মাফ্‌ফেই ও আলফিয়েরি-র পূর্বসূরী নাট্য-সাধনা। ফরাসী রাসীনের যে-প্রভাব ইতোমধ্যে ইতালীয় নাটকে সঞ্চারিত হয়েছিল তা থেকে মুক্তিলাভের পথ আলফিয়েরি খোঁজেন গ্রীক নাট্যকারদের কাছ থেকে সরাসরি কাহিনী ধার ক'রে ঃ ইউরিপিদেসের 'ওরেস্তাস্' ও সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে'র আখ্যান নিয়ে রচিত হয় আলফিয়েরি-র 'ওরেস্তে' ও 'আন্তিগোনে'। (পুরাবৃত্তের অনুরূপ ব্যবহারের জন্য তিনজন খ্যাতনামা ফরাসী নাট্যকার —জিরোদু, আনুইল ও ককতো, আলফিয়েরি-র কাছে ঋণী)। মাফ্‌ফেই-র 'মেরোপে' নাটক গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয় (এই কাহিনী ভলতেয়ার ও ম্যাথু আর্নল্ডকেও অনুপ্রাণিত করে)।

এইভাবে দরবারী প্রহসনের পর ক্লাসিকপন্থী নাটক ইতালীয় নাট্য-সাহিত্যের যে ঘনত্ব আনল তা আবার অষ্টাদশ শতকের অন্যতর এক নাট্য-আন্দোলনে কিছুটা ক্ষয়িত হ'ল। কার্লো গদসি বাস্তবজীবনকে পরিহার ক'রে পুরোপুরি রূপকথা নিয়ে নাটক রচনার তাগিদ পেলেন। গদসির নাটকে পশুপক্ষী, ফুলফল বাক্‌পটু পাত্রপাত্রী হয়ে উঠল (কে জানে গদসিই মিকি-মাউসের জন্মদাতা কি-না!); আর ঐ সব মনুষ্যেতর চরিত্রের মাধ্যমে গদসি ব্যঙ্গ করার সুযোগ নিলেন সমসাময়িক নীতি-বাগীশ নাট্যকার কয়েকজনকে।

গদসির আমলে নাটকের একটি উপনাম হয়েছিল 'ফিয়াবা' বা রূপকথা।

অষ্টাদশ শতকের 'ফিয়াবা'গুলি ইতালীয় নাটককে এক ক্রমবর্ধমান অবাস্তবের দিগন্ত দেখাচ্ছিল। হয়ত এই বাস্তব-বৈমুখ্যই পরিশেষে ইতালীয় নাটকে সফল বাস্তববাদিতার উন্মেষ সম্ভব করল। কতকটা প্রতিরোধের ঢঙে উনবিংশ শতকী কয়েকজন নাট্যকার ইতালীর এই বিচিত্রপথগামী নাট্য-ধারায় এতাবৎ অবহেলিত সামাজিক মানুষ ও তা'র হৃদ্-গত জগৎকে নাটকের উপজীব্য করলেন। এ যেন এক জমকালো ঐতিহ্যের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে সামান্য এক স্বাধিকারে উপনীত হওয়া। মার্তিনি, জিয়াকোসা, রোভেত্তা ও ব্রাক্কো এই গোষ্ঠীর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। আরো পরে ইবসেনের প্রভাব ধাতস্থ করার আগেই, উনবিংশ শতকের ইতালীয় নাট্যকাররা 'উদ্দেশ্যমূলক' নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বাস্তববোধের আন্দোলন উপন্যাসে যেমন আনে 'ভেরিসমো' (সত্যতা)-বাদ, তেমন নাটককে করে 'উদ্দেশ্যমূলক' (আ তেসি)। এই আন্দোলনের ফলে বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী, ফসলও অনেক। রোবের্তো ব্রাক্কোর 'ই ফান্তাসমি' (ছায়ামূর্তিরা) ও জিওভান্নি ভেরগার 'লে ভের্জিনি' (কুমারীরা) থেকে জিয়ান্নিনো আন্তোনা-ত্রাভেরসি-র 'ই পারাস্তিতি' (পরগাছারা) পর্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক নাটকের সুস্পষ্ট হদিশ পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ উনবিংশ শতকের শেষভাগেই আধুনিক ইতালীয় নাটকের উৎপত্তি। তৎকালীন যে কোনও নাট্যকারের রচনাতেই নবজাত বাস্তববাদের ছাপ যেন অনিবার্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কো প্রাগা (১৮৬২-১৯২৯) -রচিত 'লা মোরালে দেল্লা ফাভোলা' *। প্রাগার এই সামাজিক-নাটকের বিষয়বস্তু নেহাত অবিচিত্র নয়। মূলতঃ যদি বা একটি গুপ্ত-প্রণয় কাহিনীটির উদ্যোক্তা, নাটকটি কিন্তু চিরাচরিত পরকীয়ার মজাদার ব্যবস্থাপনা করে না। নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ ও তা'র পারিবারিক পরিস্থিতির আলেখ্য-দানেই নাটকটির আদত মন্তব্য। ব্যভিচার তাঁর নাটকের উপলক্ষ্য হলেও, প্রাগা যে তাঁর নাটকটি মিলনান্ত করেছেন তা কোনও দুঃসাহসিকতার বশবর্তী হয়ে নয়; তাঁর উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন, প্রাগার 'উদ্দেশ্য' মহৎ। উনবিংশ শতকের শেষাংশে যে-ক্ষয়িষ্ণু ও ক্লান্ত সভ্য-জীবন দুর্বলভাবে—কখনও আকস্মিক বিভ্রান্তিতে, নৈতিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হ'ত, তা'র মানসিক প্রতাপ অবশ্যই নীতিকে অমান্য করার মতো বিপুল ও প্রচণ্ড ছিল না, এবং ফলে পদস্খলনের দায় মানুষকে বেশ জবরভাবেই পোয়াতে হ'ত। প্রাগার নাটকটি এরূপ এক পদস্খলনের ছবি ও সে-সঙ্গে উদ্ধারের ইঙ্গিত। নায়িকা লুচিয়া বিবাহিতা, দুইটি সন্তানের জননী। সে এক সন্ধ্যায় তা'র প্রণয়াসক্ত আউগুস্তোর ঘরে অভিসারে এলো। এই আসা লুচিয়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তা'র নির্বোধ ও সম্ভ্রান্ত 'মধ্যবিত্তপনা' (borghesuccia) থেকে মুক্তি পাবার এক চপল উদ্বেগ তাকে পেয়ে বসেছিল, আর কতকটা যেন পরীক্ষার ছলেই সে তা'র ব্যভিচারকে সক্রিয় করতে পেরেছিল এইভাবে আউগুস্তো-সকাশে এসে। আউগুস্তো-লুচিয়ার এই মিলন, যা নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য জুড়ে, লুচিয়াকে গোড়া থেকেই কেমন যেন খাপছাড়া বাতলায় : বাড়ী ফেরার জন্য লুচিয়ার দারুণ ব্যস্ততা, পুনর্মিলনের দিনাবধারণে তা'র ঔদাসীন্য, কথাবার্তায় তার বেমানান অসহযোগ। কিন্তু তবু বাস্তব অনস্বীকার্য ও অপরিবর্তনীয় : লুচিয়া আউগুস্তোর ঘরে এসেছে। ঘটনার গতি হঠাৎ বিস্ময়কর-ভাবে পাল্টায় কিছু পরেই, যখন সেই সন্ধ্যায় পুনর্বার লুচিয়া আউগুস্তোর ঘরে ফিরে আসে এবং বলে যে বাড়ী ফিরে যেতে সে অপারগ। বাড়ী ফিরে যাবে না সে। ভয় আর লজ্জা। স্বামী কার্লোর সঙ্গে প্রতারণা, আউগুস্তোর বাহুডোর থেকে মুক্ত হয়ে কার্লোর বাহুডোরে ফিরে-যাওয়ার সুদীর্ঘ ছলনা সে-সন্ধ্যায় তাকে এক বিকট ধিক্কার দিয়েছিল। আউগুস্তোকে জানায় লুচিয়া যে সে ঘরে ফিরবে না আর কখনও। বলাই বাহুল্য যে আউগুস্তো (কিছু-কাল পূর্বেই যে লুচিয়াকে নায়কসুলভ উদার্যে গ্রহণের অঙ্গীকার জ্ঞাপন করেছিল) এই বেখাপ্পা সংঘটন দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি এবং সে'ত' প্রথমটা লুচিয়াকে স্থান দিতেই গররাজী। (এ-স্থলে লক্ষণীয় প্রাগার বাস্তববুদ্ধি ও নাগর-মনস্তত্বের জ্ঞান; মধ্যবিত্ত ব্যভিচারী যে কতো স্বপ্নালু—ব্যভিচারের দায়িত্ব নিতে হ'লে কী ভাবে তা'র ল্যাজ গুটিয়ে যায়, তা'র অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন প্রাগা লুচিয়া-আউগুস্তোর দ্বিতীয় মিলনে।) লুচিয়া আউগুস্তোর গৃহে আশ্রয় পেল বটে, কিন্তু তা কেবল এক গৃহহীনা প্রায়োন্মাদিনীকে সমূহ বিপদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য আউগুস্তোর মানবিক কর্তব্য পালন। এরপর সেই রাত্রেই কীভাবে লুচিয়ার মা, কারোলিনা ও মামা, দোন রাইমন্দো সদ্বুদ্ধি, অনুকম্পা ও ধর্মীয় অনুশাসনের মিলিত প্রণোদনায় পরিতাপ ও আত্মহননের মাঝ থেকে রিক্তা লুচিয়াকে উদ্ধার ক'রে এনে আপন সংসারে তা'র পুনর্বাসন সম্ভব করেন তা'র এক মোটামুটি স্বাভাবিক কাহিনী প্রাগার নাটকটিকে মিলনান্ত তৃতীয়াঙ্কের শেষ দৃশ্যে নিয়ে যায়। লুচিয়ার পদস্খলন অবশ্যই অপরাধ, পাপ; কিন্তু প্রাগার 'উদ্দেশ্য' কেবল ঐ নির্ধারণেই সিদ্ধ হয় না। দোন রাইমন্দো জানান যে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত থেকে পলায়ন নেই লুচিয়ার। গুরুজনদের ক্ষমা সে পেয়েছে, ঈশ্বরের ক্ষমাও সে পাবে, কিন্তু কৃত-কর্মের জন্য মনস্তাপ ও শুদ্ধতা-অর্জনের তপস্যা তাকে করতে হবে সংসারাশ্রমের মধ্যে থেকেই। চুপ থাকবে লুচিয়া তা'র পাপ সম্বন্ধে আর গোপনে তা'র তদারক করবে। অন্যায় নেই লুচিয়ার পাপ লুকানোতে, কারণ তা'র পক্ষে এই লুকানোই এক কঠিন ও পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত।

প্রাগাকে উদ্দেশ্যমূলক-নাটকের প্রাথমিক পর্যায়ে একজন প্রতিনিধি, ভাবা চলে। প্রাগার পর ইতালীয় নাটকে সৃষ্টির যে জোয়ার এলো তা ঐ উদ্দেশ্যমূলক নাটকেরই রসপুষ্ট। তখন য়ুরোপীয় নাট্যকাররা যেন একজোটে 'উদ্দেশ্যমূলকের' সাধনায় (অনেকাংশেই ইবসেনীয় রীতির অনুসরণে) বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন : ইংলণ্ডে শ, স্পেনে এচেগারে, গ্রীসে খেনপুলস, ফ্রান্সে ব্রিয়ো। অনুরূপ সাধনা থেকেই ইতালীতে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটকের উদ্বর্তন সম্ভব হ'ল বুত্তি, নিক্কোদেমি, মার্তোল্লিও ও প্রধানতঃ পিরান্দেল্লোর রচনায়। বস্তুতঃ এই পর্যায়ে ইতালীর সামাজিক-নাটক, —ত্রাভেরসি-ভেরগার লালিত চারাগাছ, আধুনিকতায় কৃতবিদ্য হ'য়ে এমন এক পরিণতি পে'ল যা ইতালীয় নাট্য-সাহিত্যে অভূতপূর্ব। আর, একমাত্র আন্নুন্তসিওকে বাদ দিলে, যা'র ঢালাও প্রভাব কোনও ইতালীয় নাট্যকারেই নিরুত্তর থাকেনি। ইতালীর এই আধুনিক সামাজিক-নাটকে ব্রাক্কো

* L'AMICO, dramma in un atto: La morale della favola, commedia in tre atti. Fratelli Treves, Editori, Milano.

থেকে পিরান্দেল্লো পর্যন্ত এবং তারপরও, প্রধান লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখেছিল মধ্যবিত্ত জীবন ও সংলাপের অজটিলতা, যা আটপৌরে কথোপকথনের আদেশেই নির্মিত হ'ত। বিশেষতঃ সংলাপের এই অনাড়ম্বর, অসাহিত্যিক গঠন, যা প্রাগা, ভেরগা বা পিরান্দেল্লোর পাতায় দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নেহাত সাদামাটা কথার, প্রশ্ন-উত্তরের হ্রস্বকায় নগণ্য বাক্যের, কাব্য-বিরহিত রূপকের-ঝোঁক-শূন্য, সরল, আবশ্যকীয় উক্তিরই সমাবেশ ঘটিয়েছে, তা', মনে হয়, 'কোম্মেদিয়া দেল্লার্তে'রই এক দুর্মর উপদেশ। ধারণা হয় যে 'কোম্মেদিয়া দেল্লার্তে' কাহিনীকে মুখ্য বাংলে এমন কি বিষয়বস্তুর, মূলোক যেভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিল, বিংশ শতকী ইতালীয় সামাজিক-নাটকে তদনুরূপ অভিসন্ধি নাটকীয়ত্বের সন্ধানকেই জোরাল করেছে, সংলাপ বা বিষয়বস্তুর পৃষ্ঠপোষকতা না ক'রে। (বোধহয় উগো বেত্তির নাটক-গুলিতে ছাড়া এ যুগের অন্য কোনও সার্থক ইতালীয় নাট্যকারের রচনায় সংলাপের জাঁকজমক চোখ ধাঁধায় না।)

উ'চকপালে অভিজাত আন্নুন্তসিও উদ্ভাবনী শক্তির অতিরিক্তে ভুগতেন দরাজভাবে এবং আত্মাদর তাঁকে ঘুরে ঘুরে প্রথার বিরুদ্ধতা ক'রাত, কী শিল্পে কী জীবনে। তাই 'উদ্দেশ্যমূলকের' যুগে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক আন্নুন্তসিও নাটকে কারসাজি দেখানোর সুযোগ ছাড়েননি। এর অর্থ এই নয় যে তিনি নাট্যকার হিসাবে তুচ্ছ ছিলেন। কল্পনা, কাব্য, কাহিনী আন্নুন্তসিওর করায়ত্ত থাকত না কদাচই। কিন্তু বর্ণাঢ্যতা, রোমাঞ্চ, যৌন-তীব্রতা প্রভৃতি কয়েকটি ব্যক্তিক তাড়নায় নাট্যকার আন্নুন্তসিও এভাবে উৎক্ষিপ্ত ছিলেন যে তিনি খুব অনায়াসেই পারিপার্শ্বিক বাস্তবকে ত্যাগ করে অন্যত্র পাড়ি দিতেন। 'ইল সগ্নো দি উন মাত্তিনো দি প্রিমাভেরা' (বসন্তপ্রভাতের স্বপ্ন) রচনার পর-বৎসর তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'ইল সগ্নো দি উন পোমেরিদজিও দাউত্তুন্নো' (শরৎ অপরাহ্নের স্বপ্ন)। স্বপ্ন! অভিনেত্রী জারা বের্নহার্ত-এর উপযোগী করেই নির্মিত হ'ল আন্নুন্তসিওর 'লা চিত্তা মর্তা, (মৃত শহর)! তবু, দান্তে-বর্ণিত ফ্রাঞ্চেস্কার কাহিনী নিয়ে রচিত 'ফ্রাঞ্চেসকা দা রিমিনি'তে আন্নুন্তসিওর সৃজনীশক্তি যে দুর্লভ এক সার্থকতা লাভ করেছে, একথা ইতালীয় সমালোচকরা স্বীকার করেন।

আধুনিক ইতালীয় নাটক যে-প্রতিভাধর ও সিসৃক্ষু নাট্যকারের প্রতীক্ষায় ছিল এবং যাঁর নিরহঙ্কার আবির্ভাব একটি সুনির্দিষ্ট স্থিতিতে পৌঁছে ইতালীয় নাটকের অভিভাবকত্ব করল কয়েক দশক ধরে, তিনি, লুইজি পিরান্দেল্লো, অবশ্য আন্নুন্তসিওর চমকদার অস্তিত্বের পাশে ছিলেন একমাত্র আয়ুষ্কালের বন্ধনেই। প্রায় সমবয়সী এই দুই ইতালীয়ের ব্যক্তিত্বে, শিল্পে ও জীবনবোধে তফাত কী প্রকট! মিল বোধহয় কেবল এ'দের শিল্প-চরিত্রের একটি সমন্ধপাতেই : ঔপন্যাসিক আন্নুন্তসিওর নাটক আর নাট্যকার পিরান্দেল্লোর উপন্যাস সার্থকতার মাপকাঠিতে সমগোত্রীয়। আর একটা মিল বোধহয় এই যে আন্নুন্তসিও ও পিরান্দেল্লো দুজনেই ইবসেনের প্রভাব অনেকাংশে এড়িয়ে গেছিলেন।

বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মধ্যবিত্ত পিরান্দেল্লো গোড়া থেকেই বাস্তব-সাধক। উন্নাসিকতার পরিপন্থী এক বিবেকবোধও তাঁর শিল্পচর্চাকে পথ দেখিয়েছে আগাগোড়া। নাটকে ইবসেনীয় সংঘাত অপেক্ষা সহজতর, মানবিক পরিণতিতে যবনিকাপাত ঘটান যেন পিরান্দেল্লোর উদ্দিষ্ট। বুদ্ধির চেয়ে অন্তরের পথেই তাঁর আকর্ষণ বেশী। পিরান্দেল্লোর প্রথম নাটক 'লুমিয়ে দি সিচিলিয়া' * (সিচিলির পাতিলেবু)-তে উক্ত মন্তব্য প্রতিপন্ন হবে। এই একাঙ্কিকায় এক গ্রাম্য বাজিয়ে মিকুচ্চিও, বোনাভিনো তা'র গাঁয়ের মেয়ে, খ্যাতনাম্নী গায়িকা সিনা মারনিসের উৎকট শহুরেপনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সিনাকে কেবল দেখতে দেয় তা'র সঙ্গে-আনা গাঁয়ের টাটকা পাতিলেবুগুলি, ছুঁতে দেয় না। অভিমানক্ষুব্ধ মিকুচ্চিও ধিক্কারে ভেঙে পড়ে সিনার মা, মার্তার নাকের কাছে একটা লেবু ধ'রে : ঘ্রাণ নাও, ঘ্রাণ নাও তোমার দেশের......আর ব'ল ত' একটা একটা করে এগুলো ছু'ড়ে মারি তোমার ঐ বিবিসাহেবার মাথায়। 'লা মরসা' ('ভাইস'-যন্ত্র)-য় আশ্চর্য প্রবলতা আসে স্ত্রীর গুপ্তপ্রণয়লীলার এক নাটকীয় বিজ্ঞপ্তির পর শান্তশিষ্ট স্বামীর বজ্রা-দপি কঠোর বহিষ্কারদণ্ডদানে ও স্ত্রীর আত্মহত্যায়। নাটকীয় মুহূর্তের অপূর্ব স্বাভাবিক সংস্থান পিরান্দেল্লোর এই নাটকে; চরিত্রসৃষ্টিতেও রীতিমতো দক্ষতা এবং সংলাপে ধার ও সংযম এই প্রথমদিকের রচনায় লক্ষণীয়ভাবে বর্তমান।

উল্লিখিত নাটক দুটি পিরান্দেল্লোর স্বল্প-পরিচিত (ইংরেজী অনুবাদও হয়নি বোধহয় ও-দুটির) রচনা হলেও, তাঁর নাট্য-প্রতিভার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে। কাহিনীর অনুরূপ অজটিলতা পিরান্দেল্লোর পরবর্তী নাটকগুলিতে ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে এবং অনুরূপ নির্মম ও স্বচ্ছ বিয়োগান্তের প্রখর আবহাওয়া ট্র্যাজি-কমেডির নাতিশীতোষ্ণ (মানবিক?) ধাতস্থ করবে। আর, বাস্তবের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র কোনও কালে ছিন্ন হয়নি বলেই আধুনিক মননের ক্ষেত্রেও পিরান্দেল্লো আদপে অনগ্রসর থাকতে পারেননি। ক্রমান্বয়ে তাই তাঁর নাটকে মনস্তত্ত্ব ও দর্শন বাস্তববাদের উপযোগী বিদ্যা হিসাবে পরিচালিত হয়েছে। পিরান্দেল্লো উপস্থাপিত করেছেন তাঁর 'নগ্ন মুখোস' (মাশেরে নুদে)-এর তত্ত্ব, দেখিয়েছেন মানুষের সেই প্রাচীন চিন্ত—মান্তসোনির প্রিয় সেই 'শক্ত, মৌলিক অনুভূতি,'—স্থির নয় অস্থির, এক নয় বহু; পরিচিত বাস্তবের তাৎপর্য নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন তিনি, এমন কি নাট্যকারের অবহেলিত মানস-সন্তান 'চরিত্রগুলির' প্রহেলিকাবৎ অস্তিত্বের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন অবিবেকী নাট্যকারকে। 'প্রা সিয়োরা মর্লি উনা এ দুয়ে' (শ্রীযুক্তা মর্লি এক ও দুই), 'সেই পেরসোনার্দাজ্জি ইন চেরকা দাউত্তরে' (লেখকের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র), 'তুত্তো পের বেনে' (ভালর জন্য সব) প্রভৃতি নাটকে বাস্তববাদী পিরান্দেল্লো এই জাতীয় মননের অভিনব গুরুত্বে বিংশশতাব্দীর মানুষের জীবন দেখেছেন ও তা'র নাট্যরূপ দিয়েছেন। ইতালীয় নাটকের যে কল্পনাবিলাস ঊনবিংশ শতকে প্রথম বাস্তববোধের সংঘাতে পরিত্যাজ্য প্রমাণিত হয়েছিল, তা থেকে মুক্তিলাভের সুদীর্ঘ সাধনা পিরান্দেল্লোর মানবিকতায় ও সক্ষম শিল্পে পূর্ণতা পায়। 'সেই পেরসোনাদজ্জি'র অপার্থিব মনুষ্য-চরিত্রগুলির প্রতিও কী মানবিক অভিনিবেশ পিরান্দেল্লোর :

পিতা। মহাশয়, আমরা বাঁচতে চাই!

থিয়েটারের ম্যানেজার। (সবিদ্রূপে) চিরকাল?

পিতা। না, মহাশয়। অন্ততঃ এক মুহূর্তের জন্যে, ওদের মধ্যে।

একজন অভিনেতা। আহা, শোন, শোন!

প্রথম অভিনেত্রী। আমরা আমাদের ভেতর বাঁচতে চাই।

যাদুজগতের ভিতরও পিরান্দেল্লো তাঁর মুক্ত মানবিক সত্তাকে কোনও ভ্রান্তি-বিলাসের সুযোগ দেন না!

* Maschere Nude di Luigi Pirandello: La Morsa, Lumie di Sicilia, Il Dovere del Medico. Arnoldo Mondadori Editore, 1949.
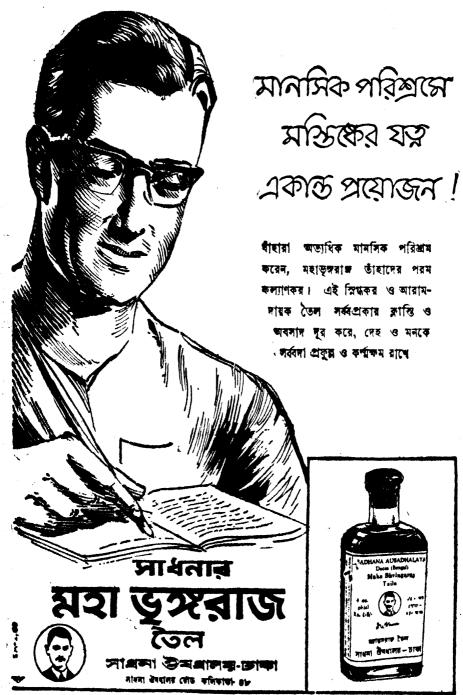
মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন!
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরামদায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা ৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

জাপানী মেয়ে

অমিয়া সরকার

প্রতিবেশী দেশ জাপানের বিষয়ে কিছু বলতে হ'লে সর্বপ্রথম এই কথাই বলতে হবে যে জাপান এমন একটি দেশ যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নূতন ও পুরাতন হাত মিলিয়ে পাশাপাশি চলছে।

জাপানের নৈসর্গিক দৃশ্য বিদেশীর কাছে সবপ্রধান আকর্ষণীয় বস্তু। সমস্ত দেশটি পাহাড়, নদী, লেক, পাহাড়ী পথ এবং ছোট ছোট জলপ্রপাত দিয়ে কে যেন সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। জাপানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনবদ্য সৌন্দর্য হলো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ও সমুদ্র-খাঁড়ি। এই দেশে প্রচুর উষ্ণ প্রস্রবণও দেখা যায়।

জাপানের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মত জাপানের মেয়েরাও তার স্বকীয় ঐতিহ্যে বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে। এদেশের মেয়েরা ঘরের ও বাইরের কাজ যে রকম সুষ্ঠুভাবে চালান, সেটি একটি দেখার জিনিস। ঘরোয়া জীবনে আগেকার প্রাচ্য প্রভাব অনেক পরিমাণে কেটে গিয়ে পাশ্চাত্যের ছাপ পড়েছে। ওদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক রীতিনীতির অনেক মিলই আছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত পিতা বা স্বামীই সংসারে সর্বেসর্বা ছিলেন। স্ত্রীরা স্বামীদের "প্রভু" (জাপানী ভাষায় "শুজিন") বলে ডাকতেন, কিন্তু আধুনিক যুগে আর এ রীতির চল নেই, এখন মেয়েরা পাশ্চাত্যের মতই "আমার স্বামী" এই কথাটিই ব্যবহার করেন। স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও নামের ব্যাপারে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। স্বামীরা স্ত্রীদের ডাকতেন, "হে, হে' করে। আমাদের দেশের ওগো, বড়-বউ, মেজবউ-এর মত আর কি! কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন স্বামীরা স্ত্রীদের নাম ধরেই ডেকে থাকেন।

গত বিশ্বযুদ্ধের আগেও জাপানী পুরুষের পক্ষে গৃহস্থালীর কাজে মেয়েদেরকে সাহায্য করা একটা ভীষণ লজ্জার ও অপমানের বিষয় ছিল। এ রকম ব্যাপার শোনাই যেত না, শোনা গেলেও সে একটা বিরাট হৈ-চৈ-এর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে, গৃহস্থালীর কাজ স্ত্রী-পুরুষের সহযোগিতায় হয়ে থাকে এবং তাতে কেউ অবাকও হয় না।

স্নান জাপানী মেয়েদের কাছে একটি বিলাস। স্নানের ঘর ব্যবহারেও একটা নিয়ম ছিল। প্রবেশাধিকার সব আগে ছিল গৃহস্বামীর, তারপর বাড়ীর আর সকলের। এই রীতি এখনও গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, শহরে এই প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। এখন যে যার আপন আপন সুবিধা মত স্নানের ঘর ব্যবহার করে থাকেন।

জাপানী সংসারে খাবার ভাগ করার মধ্যেও অসম বণ্টনের প্রথা দেখা যেত। সম্প্রতি ইউনেস্কোর এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, প্রাক্ যুদ্ধকালে শতকরা ১৪জন পূর্ণ-বয়স্ক জাপানীকে সংসারের সকলের সঙ্গে একই পরিমাণে খাদ্যের ভাগ পেয়ে বড় হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। অধুনা এই সংখ্যা শতকরা ১৪র জায়গায় শতকরা ৩৩জনে দাঁড়িয়েছে। এখন শহরাঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক পরিবারের সকলে সমানভাবে খাবারের ভাগ পেয়ে থাকে। কিন্তু গ্রামের বেশীর ভাগ কৃষক পরিবারে (শতকরা প্রায় ৫০টি) এখনও সেই আগেকার প্রথা চলে আসছে। আগে দৈনন্দিন আহার্যের কিছু অংশ সর্বপ্রথমে মৃত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হতো। তারপরে বাড়ীর কর্তা ও বড়ছেলেকে প্রাণভরে দিতে হতো। আমাদের দেশে বাড়ীর কর্তাদের আহারে বসার যে ছবি আমরা গল্প উপন্যাসে পাই, সেই রকম আর কি! শেষে যা ঝড়তি-পড়তি থাকত, তাই মা, মেয়েরা ও অন্য ছেলেরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে খেত।

জাপানে সাধারণ নিয়ম এই যে, রাত্রিবেলায় বাড়ীর কর্ত্রী সকলের শেষে শুতে যাবেন। স্বামীর আগে স্ত্রী শুতে গেলে, স্ত্রীর ভাগ্যে কুঁড়ে, আয়েসী, আরামবিলাসী ইত্যাদি নানা রকম শ্রুতিসুখকর উপাধি পাড়া-প্রতিবাসী ও আত্মীয়স্বজনের কাছ হতে লাভ হয়ে থাকে। আবার বাড়ীর কেউ বিছানা ছাড়ার আগে উঠেই সংসারের কাজে লাগতে হয়। এ ব্যাপারে আমাদের প্রথার সঙ্গে মিল আছে।

আবার এ দেশের ভদ্রমহিলারাও সাধারণতঃ আমাদের দেশের মেয়েদের মত কোনও উৎসবে বা কোথাও কিছু দেখতে গেলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। এক ঘরে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এতটুকু গোলমাল হয় না। এ'দের শিশুদের বিশেষত্ব এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের মত তারা কান্নাকাটি বা গোলমাল করে না। কিছু দেখতে বা শুনতে গেলে জাপানী মেয়েরা চুপচাপ বসে থাকে বা কথা বললেও এত আস্তে কথা বলে, যাতে করে অন্য লোকের কোনও অসুবিধা না হয়। এ'দের ভদ্রতায় মুগ্ধ হতে হয়। তাঁরা কৃত্রিমতা মোটেই জানেন না। চলা-ফেরা কথাবার্তাতে এমন একটি স্বাভাবিকতা আছে যা আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে ক্রমশঃই দুর্লভ হয়ে পড়ছে। জাপানী মেয়েদের নম্রতা ও সংযমই চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, অথচ অনর্থক লজ্জা বা জড়তা

জাতীয় বেশভূষায় (কিমোনো) জাপানী রমণী

ইউরোপীয় পরিচ্ছদে জাপানী রমণী

এ'দের মধ্যে একেবারেই নেই। ইংরেজী "Smart" কথার যথাযথ অর্থ এদের মধ্যেই পাওয়া যায়। জাপানী মেয়েদের ঘর সাজানোর প্রথা পৃথিবী-বিখ্যাত। বাহুল্য বর্জিত করে ঘর-দুয়ার সাজানোই জাপানী মেয়েদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

যদিও জাপানে শহরাঞ্চলে "গাউন" পরার চল আজকাল খুবই হয়েছে, কিন্তু আজও এ'রা জাতীয় পোশাক হিসাবে "কিমোনো" ব্যবহার করেন। কোনও উৎসবে বা সামাজিক নিমন্ত্রণে এ'রা কিমোনোই ব্যবহার করেন। এ'দের কিমোনো প্রায়ই রঙচঙে বা গাঢ় রংএর হয় না। মহিলারা সাধারণতঃ কালো বা ছাই রংএর কিমোনোই বেশী ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু ছোট ছোট মেয়েরা যখন রঙিন বা ফুলদার কিমোনো পরে বেড়ায়, তখন প্রজাপতির মত সুন্দর দেখায়। কিমোনোর পিছন দিকে, কিমোনো বেঁধে রাখার জন্য যে কোমর-বন্ধনীটি থাকে তাকে "ওবি" বলে। ঐ ওবিটিতেই ও'দের পোশাকের বাহার। গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা সুন্দর জরি ও রেশমের কাজ-করা "ওবি" ব্যবহার করেন। যিনি যত ধনী তিনি তত দামী "ওবি" ব্যবহার করেন। জাপানী মেয়েদের চুল বাঁধার কায়দাও দেখার জিনিস। কুমারী, চিরকুমারী ও বিবাহিতা প্রত্যেকেরই ভিন্ন রকমের চুল বাঁধা দেখে তাঁদের পর্যায় নির্ণয় সহজ হয়ে যায়। যাঁরা মা হয়েছেন, তাঁদের চুল-বাঁধা আর এক রকম। এত ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় চুল বাঁধা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

জাপানে ছ' থেকে ন' বৎসরের সকল ছেলেমেয়েকেই বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে হয়। আগেকার দিনে মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের মেয়েরা কিছুটা লেখাপড়া শেখার পর, কি করে উপযুক্ত গৃহিণী হওয়া যায়; স্কুলে সেই শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্তু আজকাল এই শিক্ষা ব্যবস্থা উঠে গিয়েছে এবং প্রত্যেকেই, কি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, কি কারিগরি-বিদ্যার ক্ষেত্রে অর্থকরী বিদ্যা লাভ করছেন। শিক্ষা বিভাগের "তৃতীয় স্তরের" (third grade) কয়েকটি বছর ছাড়া, সমগ্র শিক্ষা-জীবনেই আবশ্যিক সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত।

১৯৫০ সালে এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম চল হয়। ১৯৫৭ সালে শতকরা ৫১জন মহিলা গ্র্যাজুয়েট হন এবং উপরোক্ত অংশের শতকরা ৬৩জন অফিসের কাজে গিয়েছেন। যদিও এই স্নাতকের সংখ্যা, সংখ্যালঘু পর্যায়েই পড়ে, তবুও আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে, এই সংখ্যাই গরিষ্ঠতা লাভ করবে।

সামাজিক প্রগতির সঙ্গে তাল রাখার জন্য সম্প্রতি জাপানে সামাজিক আইনের অনেক পরিবর্তন করতে হয়েছে। আগে, অভিভবকেরাই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে বিয়ে দিতেন কিন্তু ক্রমশঃই সে প্রথা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায় যে, স্বনির্বাচিত বিবাহের সংখ্যা এখনও গরিষ্ঠতা লাভ করেনি। অভি-ভাবক-নির্বাচিত বিবাহের সংখ্যা যেখানে শতকরা ৭৩ স্বনির্বাচিত বিবাহের সংখ্যা সেখানে শতকরা ২৭। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে ক্রমশঃ এই ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজের চিন্তা-শীল ব্যক্তিরা মনে করেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই উপরোক্ত সংখ্যা বিপরীতভাবে "রিপোর্টে" স্থান পাবে। শিক্ষা সম্পূর্ণ না হ'লে আজকাল কোনও মেয়েই বিয়ে করতে চান না। সেই জন্য বাল্য-বিবাহ প্রথা নেই। অবশ্য আগেও ছিলো না। ১৭।১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহের রীতি আগে ছিলো না এখন, ২২।২৩ বছরের আগে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করা সম্ভবপর হয় না। জাপানের রাজপরিবারের রাজকুমার এবং রাজকুমারীর বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের স্বনির্বাচিত বিবাহের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি।

বিগত বিশ্বযুদ্ধে যে জাপান প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, সেই দেশও আজ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে পরিমাণে অগ্রগামী হয়েছে, তা উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে জাপানের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করার রয়েছে।

ভ্রমণবিলাসীদের প্রধান আকর্ষণ ফুজি পর্বত

॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ বার্ধক্যের স্বাস্থ্য ও ভোজন ॥

যৌবনের উদ্দাম ও রঙীন দিনগুলি পার হয়ে যাঁরা প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা দিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে শুধু এই ভেবেই মন খারাপ করেন যে, বয়স বাড়ছে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণটি যেমন মানুষের জীবনে স্মরণীয়, তেমনি যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণটিও। সব মানুষেরই প্রথম জীবনে আক্ষেপ থাকে যে, বয়স কেন বাড়ছে না! আবার সব মানুষেরই শেষের জীবনে আক্ষেপ এসে যায় যে, বয়স কেন বাড়ছে! তবে প্রথম জীবনের আক্ষেপ মানুষকে অনেক সময়ে আরো উদ্যোগী হতে সাহায্য করে, শেষের জীবনের আক্ষেপ মানুষের বয়সকে যেন আরো তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেয়। আসলে এই শেষের জীবনে এসে ঠিকভাবে বেঁচে থাকাটা সব মানুষের কাছে মস্ত একটা সমস্যা। সামান্যতম কারণেও শরীর তখন ভেঙে পড়তে চায় আর শরীর ভেঙে পড়ার সামান্যতম আভাসেও মন তখন একেবারেই মুষড়ে পড়ে। আর শরীর ও মন যদি ঠিক না থাকে তাহলে সকল বয়সের মানুষের কাছেই জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। শেষের জীবনের মানুষের পক্ষে তো বটেই।

এই কারণেই শেষের জীবনে এসে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া দরকার শরীরের দিকে। শরীর যদি ঠিক থাকে তাহলে দুশ্চিন্তার অন্য কারণ যতোই থাকুক না কেন, জীবনটাকে দুর্বিসহ ঠেকে না, হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে পরিহাস করার কথাও ভাবা চলে।

বলা বাহুল্য, শরীর ঠিক রাখতে হলে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হয় খাদ্যের দিকে। তাই আমি চল্লিশ-ধরোধরো বা চল্লিশোর্ধ্ব পাঠকদের কাছে খাদ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চাই। তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত 'ইয়োর হেল্‌থ' পত্রিকার গত অক্টোবর সংখ্যা থেকে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, এই বয়েসের লোকদের পক্ষে কোনো সময়েই খুব কম খাওয়া উচিত নয়, বা খুব বেশিও নয়। এবং বলা বাহুল্য, লক্ষ্য রাখা দরকার যে শরীরটা যেন খুব বেশি মোটাও না হয় বা খুব বেশি রোগাও।

খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা তুলবার আগে আরো একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। যৌবনে যে পরিমাণ ক্যালরি দরকার, বার্ধক্যে ততোখানির দরকার নেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি শ্লথ হয়ে আসে, ফলে ক্যালরির প্রয়োজনীয়তাও হয় কম। স্টোভের পলতে উস্কিয়ে দিলে জ্বালানী খরচ হয় বেশি, পলতে নামিয়ে দিলে জ্বালানী খরচ হয় কম— এ ব্যাপারটাও অনেকটা তাই।

এবারে খাদ্যের আলোচনায় আসা যাক। প্রথমেই বলা দরকার যে, বার্ধক্যে প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা যতো বেশি এমন আর কোনো কিছুরই নয়। বার্ধক্যে প্রোটিন খাদ্যের ঘাটতি হলে কত রকমের যে রোগ হতে পারে তার সীমাসংখ্যা নেই।

বলা বাহুল্য, শরীরকে প্রোটিন খাদ্য যোগান দেবার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম। মাধ্যমটা অবশ্যই সহজ, কিন্তু পাঠকরা বুঝতে পারছেন, আমাদের দেশে সহজ-লভ্য নয়। খাঁটি দুধ কী বস্তু তা আমরা অনেকেই ভুলে গিয়েছি। মাছের কথা না তোলাই বোধ হয় ভালো। বাকি থাকে ডিম ও মাংস। দুটোরই দাম এত চড়া যে আমি যদি বলি যে রোজ অন্তত একটি ডিম ও খানিকটা মাংস অবশ্যই খাওয়া দরকার তাহলে কথাটা হয়তো ঠাট্টার মতো শোনাবে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, বার্ধক্যে পৌঁছে শরীরকে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন খাদ্যের যোগান দিতে না পারলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমে যায়। শরীর সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতাও দেখা দিতে পারে। এক কথায়, শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সামান্যতম কারণেও অকেজো হয়ে পড়বার আশংকা থাকে।

ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাদ্যের পরিমাণকে যতো কমের দিকে রাখা যায় ততোই ভালো। একেবারে বাদ দেবার কথা বলা হচ্ছে না। তবে যথাসম্ভব কম।

কিন্তু খাদ্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকা দরকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। বিশেষ করে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্‌স্‌ ও ভিটামিন সি।

আর যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া দরকার ফলের রস। বার্ধক্যে পৌঁছে শরীরকে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় পদার্থের যোগান দেওয়া দরকার। দিনে চার-পাঁচ গ্লাশ ফলের রস কেউ যদি খেয়ে যেতে পারেন তাহলে তাঁর শরীর বার্ধক্যের অনেক চিহ্ন থেকেই মুক্ত থাকবে। বিশেষ করে তার চামড়ার জৌলুষটি নিশ্চয়ই খোয়া যাবে না।

এমনি আর একটি পদার্থ হচ্ছে ভিটামিন বি-২ বা রিবোফ্লাভিন। শরীরকে এই পদার্থটি যতো বেশি পরিমাণে যোগান দেওয়া যাবে ততোই ভালো। রিবোফ্লাভিন মানুষের শরীরের কোষ-গঠনে একটি অপরিহার্য উপাদান। আর শরীরের কোষ যতোদিন সঞ্জীবিত থাকে ততোদিন শরীরে কোনো গ্লানি জাঁকিয়ে বসতে পারে না। আর শরীর তাজা থাকা মানেই মন তাজা, মন তাজা মানেই বেঁচে থাকাটা একটা স্ফূর্তির ব্যাপার। কাজেই, বার্ধক্যে যাঁরা পৌঁচেছেন বা পৌঁছতে চলেছেন তাঁরা সবচেয়ে বেশি খেতে চেষ্টা করুন রিবোফ্লাভিন বা ভিটামিন বি-২। এই

পদার্থটিকে পাওয়া যাবে দুধে তো বটেই, তাছাড়া মেটুলিতে, কলিজায়, কিডনিতে এবং কোনো কোনো শাকসব্জিতে।

তাহলে মোট কথাটা এই যে বার্ধক্যে পেঁছে রোজ যেটুকু খাদ্য না খেলেই নয় তা হচ্ছে ঃ আধসের দুধ বা দুগ্ধজাত পদার্থ, ফলের রস, কাঁচা সব্জি, একটি ডিম, খানিকটা মাছ বা মাংস, কিছু পরিমাণে গম বা গমজাতীয় খাদ্য এবং মাখন।

ফিরিস্তি শুনে অনেকেই হয়তো আঁতকে উঠেছেন। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, দীর্ঘায়ু হবার জন্যে এবং সুস্থ শরীরে যৌবনের উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু দাম চাওয়া হচ্ছে তা ফললাভের তুলনায় খুবই সামান্য। কম খেয়ে একটু একটু করে খরচ বাঁচিয়ে যেটুকু সাশ্রয় হয় তা বড়ো রকমের একটা রোগের ধাক্কায় অনায়াসেই বহুগুণ হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। বার্ধক্যে পেঁছেও আপনি যদি প্রিয়জনদের কাছে প্রিয় থাকতে চান তাহলে সবচেয়ে আগে আপনাকে নিরোগ থাকতে হবে। বার্ধক্যের রোগ অনেক সময়ে সবচেয়ে প্রিয়জনকেও রোগীর প্রতি বিমুখ করে তোলে। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কখনো কার্পণ্য করবেন না। কিংবা আনাড়ীর মতো খাবেন না। একটু ভাবনাচিন্তা করে চললেই আপনি অনায়াসে আপনার আহার্যকে ব্যালান্সড বা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারেন। আর সব সময়ে মনে রাখবেন, আমরা বেঁচে থাকার জন্যে খাই। খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকি না।

॥ নভোচারীর ভোজন-পর্ব ॥

ভোজনের আলোচনাতেই যখন এসে পড়া গিয়েছে তখন একজন নভোচারীর ভোজন-পর্বের বর্ণনা তাঁর নিজের ভাষাতেই এখানে উদ্ধৃত করাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এই নভোচারীটি হচ্ছেন হের্মান তিতোভ। সকলেই জানেন, হের্মান তিতোভ দু-নম্বর ভোস্তক-এর যাত্রী হয়ে পঁচিশ ঘণ্টারও বেশি সময় মহাকাশে কাটিয়ে এসেছেন। বলা বাহুল্য, এই পঁচিশ ঘণ্টার মধ্যে বার কয়েক তাঁকে ভোজন-পর্বও সারতে হয়েছিল। এই ভোজন-পর্বের বর্ণনা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক।

"আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, পৃথিবীর চারদিকে তৃতীয় পাক দেবার সময়ে আমি প্রথমবার খাব। এই খাওয়াটি হবে আমার লাঞ্চ। তারপরে দুপুরে হল। সেই কোন্ সকালে পৃথিবীর মাটিতে থাকার সময়ে আমি প্রাতরাশ সেরেছিলাম, আর এতক্ষণে দুপুরের খাওয়ার সময় হল। আমার যে খুব একটা ক্ষিদে পেয়েছিল তা নয়। তবুও আমি খেতে বসলাম। খেতে বসার এ এক অদ্ভুত ধরন। প্লেট নেই, কাঁটা চামচ নেই, কোলের ওপরে ন্যাপ্কিন নেই। খাবারের বাক্স থেকে আমি প্রথম টিউবটা বার করে নিলাম। পৃথিবীতে এই টিউবটির ওজন ছিল ১৫০ গ্রাম। কিন্তু মহাকাশে এই টিউবটির কিছু ওজন নেই। টিউবের মধ্যে ছিল সুপ। ঠিক যেমনভাবে টিউব টিপে টুথ-ব্রাশে পেস্ট লাগাতে হয় তেমনিভাবে আমি মুখের মধ্যে সুপ পুরে দিলাম। আমার ভোজনপর্বে দ্বিতীয় দফাতেও ছিল এমনি আরেকটি টিউব, যার মধ্যে ছিল মাংস ও মেটুলির লেই। তারপরে আরো একটি টিউব যার মধ্যে ছিল কালো আঙুরের রস। একই প্রক্রিয়ায় আমি আঙুরের রস খেলাম এবং মুখের সমস্ত খাদ্যবস্তুকে সেই সঙ্গে গলাধঃকরণ করলাম। কয়েক ফোঁটা ফলের রস ছিটকে বাইরে পড়ে গিয়েছিল। রসের ফোঁটাগুলো ঠিক বেরীফলের মতো চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে লাগল। টিউবের ঢাকনা দিয়ে ফোঁটাগুলো ধরে নিলাম এবং তারপরে মুখের মধ্যে পুরে দিলাম।

"মহাশূন্যে পান করা ও খাওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু অন্য কোনো দিক থেকে অসুবিধে নেই। পৃথিবীর মাটিতে এ-ব্যাপারটা যতোখানি সহজ, মহাকাশেও তাই। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে মহাকাশে থাকার সময়ে আমি লাঞ্চ, ডিনার ও ব্রেকফাস্ট খাব। প্রত্যেকটি খাওয়াই আমি ঠিক সময়ে খেয়েছি। তবে খেতে হয়েছে টিউব থেকে, যা মহাকাশ-যাত্রীর খাদ্য। তবে আমি কিন্তু খানিকটা শক্ত খাবারও সঙ্গে নিয়েছিলাম— কয়েক টুকরো রুটি। মহাকাশে থাকার সময়ে আমি এই রুটি চিবিয়েছিলাম আর ভিটামিন পিল্‌ খেয়েছিলাম। এক কথায়, ভোজন-পর্বটা খুব ভালোভাবেই সারা গিয়েছিল, ঠিক, 'পৃথিবীর মতো' করেই। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে দীর্ঘকালীন মহাকাশ-যাত্রায় ভোজন-পর্ব সারাটা আর কোনো সমস্যাই থাকছে না। অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য মজুদ থাকা চাই।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যবস্তু চর্ব্য ও চোষ্য না করা হলেও কোনো ক্ষতি নেই। লেহ্য ও পেয় হওয়াটাই যথেষ্ট। আর ব্যাপারটা একদিক থেকে সুবিধেরও বটে। আমরা, এই বিশ শতকের মানুষেরা সব সময়েই বড়ো বেশি ব্যস্তবাগীশ। আয়েস করে খাবার মতো যথেষ্ট সময়ও সব সময়ে আমাদের হাতে থাকে না। এ-অবস্থায় যদি চলতে ফিরতে বা কাজ করতে করতে পকেট থেকে খাবারের টিউব বার করে ভোজন-পর্বের মতো একটি সময়সাপেক্ষ ও জটিল ব্যাপারকে সেরে নেওয়া যায় তাহলেই বা মন্দ কি। আর কথাটা আমার মনগড়া নয়। কোনো কোনো বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ভবিষ্যতের মানুষ এমনি একটি সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ভোজন-পর্ব সমাধা করবে। তাতে সুবিধে এই যে, প্রত্যেক বয়সের প্রত্যেক মানুষের জন্যে পুরোপুরি ব্যালান্সড বা সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য সরাসরি কারখানা থেকে তৈরী হয়ে আসবে। ভোজন-বিলাসীরা হয়তো এতে দুঃখিত হবেন। আর দামোদর শেঠদের পক্ষে নিশ্চয়ই সে এক চরম দুর্দিন। কিন্তু হেঁসেল ঠেলতে ঠেলতে যাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি কেটে যায় তাঁরা নিশ্চয়ই এই দিনটিকে স্বাগত জানাবেন।

* * *

যুগান্তর পত্রিকার ছোটদের পাততাড়ি পৃষ্ঠায় নিউটন সম্পর্কে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

নিউটনের খাবার সময় উৎরে যায় দেখে তাঁর গৃহকর্ত্রী একটি মেয়েকে তাঁর কাছে পাঠালেন খাবার দিয়ে। মেয়েটি গিয়ে দেখে নিউটন তন্ময় হয়ে কাজ করছেন। মেয়েটি নিজের উপস্থিতি জানান দিল। বিরক্ত হয়ে নিউটন মুখ তুলে চাইলেন। বললেন, 'রেখে দিয়ে যাও।' মেয়েটি বলল, 'আপনি এখনই খেয়ে নিন। পরে ভুলে যাবেন।' নিউটন বললেন, 'তুমি রেখে যাও, আমি ঠিক খেয়ে নেব।' অগত্যা মেয়েটি খাবার রেখে চলে গেল। যাবার সময়ে বলে গেল, 'ডিমটা চার মিনিট সেদ্ধ করে নেবেন, বুঝলেন?'

ঘণ্টা খানেক পরে মেয়েটি দেখতে গেল নিউটন খেয়েছেন কিনা। গিয়ে দেখে ফুটন্ত জলের পাত্রের সামনে নিউটন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে রয়েছে ডিমটা আর পাত্রের মধ্যে ফুটন্ত জলে সেদ্ধ হচ্ছে তাঁর ট্যাকঘড়ি।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুমোহন এই অসময়েও বিছানায় শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছিল, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃ-জায়ার সম্মানার্থে পাটা গুটিয়ে ধীরে সুস্থে উঠে বসে, কিন্তু সেই সম্মানীয়ার প্রতি সবটা মনোযোগ দিচ্ছে, এটা তো আর ভাবতে দিয়ে ফেলা চলে না, তাই বালিশের তলায় রক্ষিত একটি পায়রার পালক টেনে বার করে কান চুলকোতে চুলকোতে আরামের মুখভঙ্গী করে অলস সুরে বলে, 'কাজটা কি তাই আগে শুনি? শাদা কাগজে তো আর সই দিতে পারি না!'

'শাদা কাগজে সই দিইয়ে নিচ্ছিও না আমি তোমায়।' মায়ালতা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, আর কাজ আমার বাপের বাড়ীরও নয়, তোমাদেরই।'

সুমোহন একই ভঙ্গীতে বলে, 'ঠিক আছে, পেশ করে যাও।'

'পেশ! পেশ করবো?' মায়ালতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'কথা বলবার সময় একটু খেয়াল রাখলে ভাল হয় না, কার সঙ্গে কথাটা বলছো? আমি করবো তোমার কাছে আবেদন পেশ!'

পায়রার পালক নামিয়ে সুমোহন এবার সহসা 'বাবু গেড়ে' বসে সসম্ভ্রম ভক্তির ভণিতায় বলে, 'অপরাধ হয়েছে মার্জনা করুন। বলুন কী আদেশ?'

'সাধে কি আর এ মুখো হতে চাই না—' মায়ালতা ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠে প্রায় চলে যেতে উদ্যত হ'ন।

'আরে বাবা হ'লটা কি।' সুমোহন দুই হাত তুলে থামানর ভঙ্গী করে—'এ তো আচ্ছা জ্বালা, ডাইনে গেলেও বিপদ, বাঁয়ে গেলেও বিপদ। অত ভণিতা না করে ঝপ করে বলে ফেললেই তো আপদ চুকে যায়। বল কি বলবে শোনা যাক।'

মায়ালতাও অবশ্য সত্যি চলে গিয়ে কাজ পণ্ড করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তবে নাকি—সুমোহনের বচন আর বাচনভঙ্গী এতই গাত্রদাহকারী যে মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত।

এখন সুমোহনের কণ্ঠে আপোসের সুরের আভাস দেখে সামলে নেন নিজেকে,—ভারী ভারী মুখে বলেন, 'ভয়ানক একটা কিছু কাজ চাপাতে চাইছি না, বলছিলাম,—মেজ ঠাকুরপোর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবো, নিয়ে যেতে পারবে?'

'মেজ ঠাকুরপো!'

সুমোহন অত্যন্ত বিলম্বিত লয়ে বলে 'মেজ ঠাকুরপোর সঙ্গে 'দেখা করতে' যাবো!' 'দেখতে যাবো' নয়! অর্থাৎ অসুখ-বিসুখ কিছু নয়। মেজদার কপালটা হঠাৎ এত ফিরলো কেন বুঝতে পারছি না তো!'

'বুঝতে না পারবার কি আছে তাও তো—বুঝছি না। ভাইয়ে ভাইয়ে এক-ধারা। সোজা কথার প্যাঁচালো জবাব। নিয়ে যেতে পারবে কিনা সেটার সোজা জবাব দাও দিকি।'

সুমোহন আবার পায়রার পালকটার জন্যে বালিশের তলা হাতড়াতে হাতড়াতে আরো বিলম্বিত লয়ে বলে, 'তা' এটাই বা না পারবার কি আছে! ফার্স্ট ক্লাশ ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ করে—'

মায়ালতা ছোট দ্যাওরকে এবার ধমকে 'থামান, ন্যাকামি করছো কেন? ট্রেন আবার কি? আমি বুঝি তোমায় দিল্লী নিয়ে যেতে বলছি? কেন তুমি জানোনা মেজ ঠাকুরপো কলকাতায় এসে রয়েছে?'

কলকাতায় এসে রয়েছে! মেজ ঠাকুরপো, মানে মেজদা?'

'তা' আবার কোন মেজ ঠাকুরপো—তাই শুনি? সাধে তোমার কথা শুনলে হাড়ে বিষ ছড়ায় আমার! ওই নিয়ে এত কথা হল বাড়ীতে, আর বলতে চাও তোমার কানে ঢোকেনি?'

সুমোহন এবার পালকটা খুঁজে পেয়েছে, অতএব সেটার সদ্ব্যবহার করতে করতে চক্ষু মুদে বলে, 'বাড়ীতে যত কথা হয়, সব যদি কানে ঢোকাতে শুরু করি, তা হলে তো বাড়ীতে বাস করাই চলত না।'

'হুঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' মায়ালতা বিষ মুখে বলেন, 'তবে মেজ ঠাকুরপো কলকাতায় এসে আমাদের খবর পর্যন্ত না দিয়ে অন্যত্র উঠেছে, এ খবর কানে নিলে অবিশ্যি তোমার নিজের কিছু গায়ে বাজত না।'

'রোসো কথাটা আমায় বুঝতে দাও, মেজদা কলকাতায় এসেছে, অন্যত্র উঠেছে এবং—'

'শুধু অন্যত্র উঠেছে নয়, অনেক দিন থেকে রয়েছে, বুঝলে? তার মানে রিটায়ার করে দিল্লীর বাস উঠিয়ে চলে এসেছে। অথচ—'

সুমোহন ভুরু কুঁচকে বলে, 'ঘটনাটা

সত্যি হলে ব্যাপারটা তাজ্জব বটে। কিন্তু গুজবটা রটাচ্ছে কে?'

'গুজব!' মায়ালতা ফের উত্তেজিত হন। 'গুজব রটিয়ে বেড়াবার সখ আর যার থাক, তোমার দাদার অন্ততঃ নেই নিশ্চয়! গজেব! তপো গিয়ে দেখে এল না? তুমি বলতে চাও এ সবের কিছু জানো না তুমি?'

'বলতে চাই' কেন, বলছিই তো! আশা করি এ আশা করছো না শ্রীমান তপোধন এসে বলে গেছেন আমায়।'

মায়ালতা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'আহা! তপোধন এসে না বললে আর সংসারের খবর জানবার রাস্তা নেই তোমার। বলি পুরুষ মানুষ আবার কোন কথাটা নিজে জানে নিজে বোঝে? যে জানাবার সেই জানায়, যে বোঝাবার সেই বোঝায়।'

সুমোহন সকৌতুকে হেসে উঠে বলে, 'সেই 'সে'টি বলতে কাকে ধরছো বলতো? তোমাদের ছোট বৌ নয়তো?'

'না তো কি—পাড়ার লোকের বৌকে ধরতে যাবো?' মায়ালতা চটে ওঠেন, 'তুমি এমন ভাব দেখাও, যেন ছোট বৌয়ের সঙ্গে তোমার বাক্যালাপই নেই!'

সুমোহন বলে, 'নাঃ বাক্য নেই, তা' বলতে পারি না। বাক্য আছে। তবে আলাপ? ওটাতেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'আহা মরে যাই—' মায়ালতা ঠোঁট উল্টে মুখ বাঁকিয়ে শালীনতার প্রশ্ন বিস্মৃত হয়ে বলে ওঠেন, 'তবু যদি না তিন তিনবার ধরা পড়ে যেতে। পষ্ট করে আর বলতে চাই না, তবে, তোমাদের ওই ন্যাকামি আমার গায় বিষ ছড়ায়।'

মায়ালতার কথা বলার ধরনই এই। শুনে শুনে অন্তত তাঁর দেবরটির কানে ঘাঁটা পড়ে গেছে, তাই অধিক কিছু বিচলিত না হয়ে সেও মুখ বাঁকিয়ে বলে 'অস্পষ্টতাও কিছু রাখলে বলে তো মনে হচ্ছে না। আর বিষ ছড়ানোর কথা যদি বললে, সে আর তোমার কিসে না ছড়ায়। আপাততঃ বিষাক্ত প্রসঙ্গগুলো বাদ দিয়ে মেজদার প্রসঙ্গটাই হোক। একটু যেন রহস্যময় লাগছে। তপো যদি সত্যি নিজে চক্ষে দেখে এসে থাকে, তা' হলে আর গুজব বলে ওড়াই কি করে। তা সেই অন্যাটি কোথায়? বড় পিসিমার ছেলেদের বাড়ী না কি?'

মায়ালতা এতক্ষণে কথার মূলকেন্দ্রে আসতে পেরে—ঈষৎ উৎসাহিত হন। বলে ওঠেন, 'কিছু যখন জানো না বলছো, তখন গোড়া থেকেই শোন। সুচিন্তাকে মনে আছে তোমার?'

'সুচিন্তা!'

সুমোহন হেসে ওঠে, 'সুচিন্তা, দুশ্চিন্তা এ সবের মধ্যে তো বাবা আমি নেই। আরো প্রাঞ্জল করতে হবে ব্যাপারটা।'

'আরে বাবা তোমাদের দিনাজপুরের বাড়ীর পাশের বাড়ীর সেই ঘোষ কাকা? তাঁর মেয়ে—'

'সুচিন্তা সুচিন্তা—! ও হো-হো! মনে পড়েছে। সুচিন্তাদি। সেই সব সময় ধিঙ্গী নাচ নেচে বেড়াত, আর আমাকে একেবারে আমল দিত না। খেলার দলে যোগ দিতে গেলে খালি ইট বইয়ে, ফল পাড়িয়ে খাটিয়ে মারতো। কিন্তু সহসা মেজদাকে ছেড়ে আবার তার প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছ কেন?'

মায়ালতা সহসা কোপকটাক্ষ ত্যাগ করে একটি রহস্যময় হাসি হেসে বলেন, 'ওই দুই প্রসঙ্গই যে একসঙ্গ হয়ে গেছে গো ছোট ঠাকুরপো। তবে আর বলছি কি। তোমার মেজদা এখন সেই সুচিন্তার বাড়ীতেই বসবাস করছেন।'

'আই সি! ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেষ্টিং লাগছে তো! তারপর?'

'তারপর আর কি। তোমার দাদা কোথা থেকে যেন খবরটা শুনে এসে বলাতে, আমি তপোকে পাঠালাম, তা' মেজবাবু না কি তপোকে চিনতেই পারলেন না।'

'বটে বটে! এ যে আরও ইন্টারেষ্টিং মনে হচ্ছে। তা' হলে বোঝা যাচ্ছে শেষ যে বছর এসেছিল মেজদা, সে বছরই এই সব সাধু সংকল্প করে গিয়েছিল। আর অবশ্যই তা করবার কারণও ঘটেছিল।'

মায়ালতা ক্ষণপূর্বের রহস্যহাস্য ত্যাগ করে এবং ক্রুদ্ধমূর্তি পরিগ্রহ করে বলেন, 'তা' সে কারণটা বোধকরি আমিই ঘটিয়েছিলাম।'

'আহা হা সেটা স্বেচ্ছায় গায়ে পেতে নিচ্ছই বা কেন? কারণটা আমিও ঘটাতে পারি, যে কেউই পারে'। মোট কথা ও'কে দোহনটা একটু বেশী হয়ে যেত এটা ঠিক।'

কথা—গায়ে নিতে বারণ করলেও মায়ালতা সেটা না নিয়ে ছাড়েন না। বলেন, 'শাক দিয়ে মাছ ঢেকে আর কি হবে, কাকে উদ্দেশ করে বললে তা' তো আর বুঝতে বাকী নেই আমার। কিন্তু এ কথাও বলি ঠাকুরপো, তোমার ছেলে-মেয়েদের—'

সহসা কথার রাশ টেনে ফেলেন মায়ালতা এবং কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার বলেই বোধ করি আর কিছু না পেরে বড়সড় একটা হাই তুলতে শুরু করেন।

যতক্ষণ না অশোকা নিজের বক্তব্যটা বলে নেয়, ততক্ষণ আর মায়ালতার হাই তোলা এবং আলস্য ভাঙ্গার শেষ হয় না।

হ্যাঁ অশোকার প্রবেশই মায়ালতার অকস্মাৎ কথা থামিয়ে ফেলার কারণ। ঈশ্বর জানেন কেন মায়ালতা অশোকাকে এত ভয় করেন। ভয় বা সমীহ। মুখো-মুখি অশোকার সামনে কোন ছোট কথা বলতে বেধে যায় মায়ালতার। যা বলেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

আর মজাও দেখ, মায়ালতা ভাবেন এতক্ষণ তো অন্য কথা হচ্ছিল, ঠিক যে মুহূর্তে মায়ালতা 'তোমার ছেলেমেয়ে' কথাটি উচ্চারণ করেছেন, সেই মুহূর্তেই কিনা ওর আবির্ভাব। কথাটা সুমোহনকে বলে নেওয়া হল না, অথচ অশোকা নিশ্চয়ই ভাবল—কিন্তু অশোকা ভাবলে মায়ালতাকে কি ফাঁসি দেবে?

কিচ্ছু না।

জীবনে কোনদিনই অশোকা শোনা-কথার উল্লেখ করে উত্তর প্রত্যুত্তর করে না।

তবু কেমন অস্বস্তি। করে না বলেই হয়তো। এই ভয় পাওয়া থেকেই বোধকরি মায়ালতার মধ্যে এমন আক্রোশের জন্ম। মুখোমুখি বলতে পারেন না বলেই দেয়ালকে মাধ্যম করেন।

তবু রক্ষে! ভাবেন মায়ালতা, তবু পুরো কথাটা বলা হয়নি। সুশোভনের টাকায় যে সুমোহনের ছেলেমেয়েদের প্রায় সারা বছরের জামা-জুতো হয়ে যায় সেইটাই তো বক্তব্য ছিল মায়ালতার।

যাক অশোকার বক্তব্য বলা হয়ে গেছে।

মায়ালতা হাই থামিয়ে ত্রস্তে-ব্যস্তে উত্তর দেন, 'ওবেলার মাছের কথা বলছ? তা' ওবেলার জন্যে রাখতে যদি না কুলোয় এবেলাই হোক। ওবেলার জন্যে বরং হাঁসের ডিম এক ডজন আনিয়ে—' কথা শেষ না হ'তেই 'আচ্ছা।' বলে চলে যেতে উদ্যত হয় অশোকা, কিন্তু খপ করে সুমোহন তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করে বসে, 'বাড়ীতে যে সব ঘটনা ঘটে, খবর রটে সে সব আমাকে শোনানো হয় না কেন?'

অশোকা উত্তর দেয় না, কিন্তু চলেও যায় না। বোধকরি প্রশ্নের দ্বিতীয় লহরীর জন্য অপেক্ষা করে।

অবশ্য মুখের ছবিতে জিজ্ঞাসুর ভঙ্গী ফুটে ওঠে না। শুধুই তাকিয়ে থাকে।

সুমোহন গম্ভীরভাবে বলে, 'মেজদাকে নিয়ে বাড়ীতে যে সব আলোচনা হয়ে গেছে, আমি জানতে পারিনি কেন? জানো আমাকে এ সব জানানো তোমার ডিউটি!'

অশোকা হাসেও না রাগেও না —কোনও প্রতিবাদও তোলে না। শুধু

সহজ ভাবে বলে চলে যায়, 'আমিও ভাল করে কিছু শুনিনি।'

'দেখলে তো?' সুমোহন বলে মায়ালতার দিকে তাকিয়ে।

'দেখলাম' জীবন-ভোরই দেখছি!' বলে উঠে পড়েন মায়ালতা। বলেন 'কাল সকালের দিকেই যাবো।'

'ভাল কথা। তোমার গিয়ে ওই সুচিন্তার হদিসটা আমায় জানিয়ে দিও।'

'সে তোমাকে ওপো বুঝিয়ে দেবে অখন।'

বলে বিদায় নেন মায়ালতা। আর ভাবতে ভাবতে যান ঠিক এই দাঁও অশোকার সামনে পড়তে হবে কিনা।

ভিতরে ভিতরে এই ভয় আছে বলেই বোধকরি যখন বুকের জোর করে কিছু বলে বসেন মায়ালতা, সেটার ভাষা অতিরিক্ত রকমের ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

সকালে বাবাকে নিয়ে হেঁটে খানিকটা বেড়িয়ে আসা নীতার নিত্য নিয়ম। আজও গিয়েছিল, আর বেড়াতে বেড়াতে এমন একটা দিকে গিয়ে পড়েছিল যেখানে কর্পোরেশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা স্বরূপ বস্তি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে।

কাছ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সুশোভন, তারপর দ্রুত ভঙ্গীতে নিতান্ত কাছে সরে এসে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, নীতা নীতা দেখ কাণ্ড! বাড়ীঘর সব ভেঙে শেষ করছে।'

বাবাকে সহজ কথার মধ্যে এনে পরীক্ষা করবার ছলে নীতাও দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'ভালই তো করছে বাবা।'

'ভালই করছে?' উত্তেজিত হন সুশোভন, 'তুই বলিস কি নীতা গরীব মানুষদের ঘরবাড়ী ভেঙে আশ্রয়চ্যুত করছে, সেটা ভাল হল?'

'বাঃ নয় কেন? ভাঙাটাই তো শেষ কথা নয়। আবার নিশ্চয় নতুন আশ্রয় গড়া হবে ওদের জন্যে। ভেঙে শেষ না করলে তো আর নতুন করে গড়া হয় না। মানুষ সেই পচা খুঁটি আঁকড়ে বসে থাকে।

অদূরে কয়েকটা লোক জটলা করে নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে নানা কথা বলাবলি করছে, আর এখানে সেখানে জায়গায় জায়গায় স্তূপীকৃত করা রয়েছে বস্তিবাসীর নগণ্য গৃহস্থালীর বিবর্ণ উপকরণ। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে আশ্রয় নির্মাণ করে দিয়ে তবে উচ্ছেদ করার কোনও পরিকল্পনা আপাততঃ অন্ততঃ নেই কর্তৃপক্ষের। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন সুশোভন, 'তুই তো বলে দিলি নতুন ঘর গড়া হবে। তা সেটা আগে হয় না কেন? এখন ওরা যাবে কোথায়; থাকবে কোথায়?'

বাবাকে নিজের জগৎ ছাড়া বহির্জগতের কথা ভাবতে দেখে নীতার প্রাণটা আশায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ভাবে যে ফিরছেন! ফিরছেন সুশোভন।

ফিরছেন বুদ্ধির জগতে, সহজ চেনার জগতে। তাই প্রশ্ন ফেলে আর কথা ফেলে দেখতে চায় কতটুকু তার শিকড়।

'কোথাও না কোথাও থাকবেই বাবা।'

'দেখ নীতা, তুই বড্ড নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছিস আজকাল। কোথাও না কোথাও থাকবে বলে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকলেই চলবে? দেখতে হবে না কোথায় থাকলো?'

'বাঃ আমরা কোথা থেকে দেখব?'

'দেখব না? আমরা দেখব না?' সুশোভন প্রায় চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'গরীবদের দেখব না আমরা? ওরা বানের জলে ভেসে বেড়াবে আর আমরা প্রাসাদে বসে আরাম করবো? আমি জানতে চাই কে ওদের ঘর ভাঙবার হুকুম দিয়েছে।'

কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে এদিক ওদিক থেকে তাকাচ্ছিল লোক, নীতা ব্যস্তভাবে বলে, 'কি মুস্কিল, এতো কর্পোরেশনের স্কীম অনুযায়ী হচ্ছে। এই নোংরা এই কাঁচা ড্রেন, এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া—এসবের উন্নতি হবে না?'

'উন্নতি হবে!'

সুশোভন ঈষৎ নরম হ'ন।

নরম আর ঠাণ্ডা গলায় বলেন, 'তা' বেশ উন্নতি যেন হ'ল। কিন্তু নীতা, যারা উৎখাত হ'ল তারা কি কোনও দিন আবার ফিরে আসতে পাবে? এখানে যে-সব নতুন ঘরবাড়ী উঠবে, তাতে থাকতে পাবে?'

নীতা সান্ত্বনা আর আপোসের সুরে বলে, 'আহা ঠিক এরাই হয়তো আর এখানে ফিরে না এল, আর কেউতো আসবে। আর এরা অবশ্যই অন্য কোথাও সেট্‌ল্ করবে।'

'অন্য কোথাও'!

আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সুশোভন, চাপা ভারী গলায় বাঘের মত গর্জন করে ওঠেন 'অন্য কোথাও মানে অন্য আর একটা বস্তিতে। এই তো? বুঝলে নীতা তুমি ছেলেমানুষ তাই এখনো লোকের ধাপ্পায় ভোলো, কথায় বিশ্বাস করো। আমি বলে দিচ্ছি এদের কস্মিনকালেও উন্নতি হবে না। এইসব কাঁচা ড্রেন পাকা হয়ে আর ভাঙাচোরা রাস্তায় পীচ ঢালাই হয়ে, তার ধারে ধারে উঁচু উঁচু কংক্রীটের বাড়ী উঠবে, আর সে বাড়ীতে এসে বাস করবো—এই আমরা বুঝলে নীতা এই বড়লোকেরা। উন্নয়ন! ঘোড়ার ডিম। ও সব ছল, বুঝলে নীতা ওসব ছল। গরীবকে দূর করার ফন্দী। ওদের ঠেলতে ঠেলতে একেবারে সমুদ্রের জলে ফেলে দেবে বুঝলে? পৃথিবীতে থাকবে শুধু বড়লোকেরা।'

চমৎকৃত হয় নীতা।

এমন করে চিন্তা করেননি সুশোভন কতদিন। সে চিন্তায় ভুল আছে কি সত্য আছে, সে কথা ভাবছে না নীতা, ও শুধু ভাবছে, বাবা তলিয়ে অনেকটা ভাবতে পারছেন।

আগে এমনি কত কথাই বলতেন সুশোভন। তখন অবশ্য কথায় কথায় এত উত্তেজিত হতেন না, ঠাণ্ডা মাথায় তর্ক করতেন। আর নীতা যতই সমানে সমানে তর্ক করুক, কখনো সেটাকে তার ধৃষ্টতা বলে গণ্য করতেন না। তর্ক চালাতেন।

কিন্তু সে আসরে কি শুধুই নীতা থাকত আর সুশোভন থাকতেন?

আরও একটি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মূর্তি নীরবে একধারে বসে পরম কৌতুকে উপভোগ করত না কি এই দুটি বয়স্ক নাবালকের তর্কাতর্কি আর মতবাদের প্রবল পার্থক্য!

আঃ জীবন কী সহজ ছিল তখন!

দিনগুলো কি সুন্দর।

আকাশ কী মনোহর, বাতাস কী মধুর আলো কী উজ্জ্বল!

সে দিন কি আর কখনো ফিরে আসবে নীতার জীবনে?

হঠাৎ মনটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। উঠল অভিমানে ভরে।

নীতা কতদিন চিঠি দেয়নি সাগরকে।

সাগর কতদিন যেন চিঠি দিচ্ছে না নীতাকে! না এই সেদিন দিয়েছিল বুঝি।

কবে যে ফিরবে সাগর সাগরপার থেকে।

দু' বছর কি এত দিন?

* * *

'হঠাৎ তুমি গোমড়া মুখ হয়ে গেলে যে?' সুশোভন অভিযোগ করে ওঠেন, 'তোমায় তো দোষ দিইনি আমি।'

নীতা তাড়াতাড়ি সাগরে-ভেসে-যাওয়া মনকে ডাঙায় টেনে এনে বলে, 'বাঃ গোমড়া মুখ হবো কেন? চিন্তা করছি।'

'চিন্তা করছ? গরীবদের কথা চিন্তা করছ তুমি?'

'করছি বৈকি বাবা।'

'বেশ! তবে ওদের সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দেওয়াটা বন্ধ করো।'

নীতা চিন্তাশীলের ভঙ্গীতে বলে, 'তা' সত্যি ফেলে দিতে গেলে বন্ধ করতে হবে বৈকি, সবাই মিলে চেষ্টা করে রুখতে হবে। কিন্তু সত্যিই কি আর

তাই দেবে বাবা? গরীব লোকদের সাহায্য না হলেও তো বড়লোকের চলে না। ওরা কাছাকাছি না থাকলে বড়লোকদের বাসন মাজবে কে? কাপড় কাচবে কে? জুতো ঝাড়বে কে? মোট বইবে কে? রিকশা টানবে কে? নিজেদের স্বার্থেই বড়লোকরা ওদের টিঁকিয়ে রাখবে।'

'কে বলেছে তোমায় এ কথা?'

সুশোভন আবার ধমকে ওঠেন, 'কিছু জানো না তুমি। পৃথিবীকে দেখতে এখনও অনেক বাকী আছে তোমার। ওরা থাকবে না। ওরা লুপ্ত হয়ে যাবে, মুছে যাবে। সমুদ্রের জলেও যদি না কুলোয় তো বড় বড় বোমা ফেলে ওদের একেবারে ধ্বংস করে দেবে। সব কাজ করবে যন্ত্র।'

'যন্ত্র!'

'না তো কি। বিজ্ঞান এতদিন ধরে শুধু ওই মতলবই করছে। বড়লোকেরা নিজেদের সব কিছু কাজ যন্ত্র দিয়ে করিয়ে নেবে। আর গরীবদের মেরে ফেলবে।'

নীতা অনুভব করছে অনেকগুলো দৃষ্টি তাদের দিকে নিবদ্ধ, এখান থেকে পালাতে পারলেই ভাল হয়। কিন্তু বাবার এই কথার স্রোতকে হঠাৎ করে ব্যাহত করে দিতেও ইচ্ছে করছে না।

না জানি আরও কি বলতে পারেন সুশোভন। দেখা যাক আরও কতটা ভাবতে পাচ্ছেন।

তাই যতটা সম্ভব নরম গলায় কথার জের টেনে রাখে, 'তাই কখনো হতে পারে বাবা? পৃথিবীতে গরীবই তো বেশী কতজনকে মারবে?'

'কোটি কোটি লোককে মারবে—' উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন সুশোভন 'পৃথিবীর জমিটা অনেকখানি দখল করে নিজেরা হাত-পা মেলে থাকবে বলে, গাদা গাদা লোককে শেষ করে ফেলবে। আমি বলছি তোমায় নীতা—এরপর সাধারণ মানুষ বলে কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু বড়লোক আর শুধু যন্ত্র।'

নীতা বাবার হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলে, 'শেষ হতে কেউ যাবে না বাবা। গরীবরাও তখন বড়লোক হয়ে যাবে।'

'না না—কক্ষনো না। তুই আমাকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করছিস নীতা।'

'আচ্ছা বাবা চল এ নিয়ে বাড়ী গিয়ে তর্ক করিগে।'

'কেন বাড়ী গিয়ে কেন?' সুশোভন গুমগুম করে পা ফেলে খানিকটা পায়চারি করে নিয়ে বললেন 'এখানেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। ডাক ওই ওদের একজনকে ওরা কি বলে ওদের নিজের মুখেই শোন।'

'ওরা আবার কি বলবে?'

নীতা বিস্মিত প্রশ্ন করে।

'ওরা আবার কি বলবে! বাঃ! বেশ চমৎকার! ওদের কথা ওরা বলবে না? ওরা চিরদিন চুপ করে থাকবে? পড়ে মার খাবে?'

'তা কেন খাবে বাবা। ওরাও আর চুপ করে থাকে না, পড়ে মার খায় না।

নীতা কি হঠাৎ ভুলে গেল যে সুশোভন অসুস্থ, সুশোভন অপ্রকৃতিস্থ, সুশোভন অবোধ। উনি এতক্ষণ ধরে যা কিছু বললেন হয়তো এই মুহূর্তেই ভুলে যাবেন। ভুলে গেল কি নীতার কাজ হচ্ছে শুধু বাবাকে আগলে বেড়ানো। ভুলে গেল তাই এই আবেগ আর বেদনা ফুটে ওঠে ওর কথায়।

"বাঃ গোমড়া মুখ হবো কেন? চিন্তা করছি।"

শুধু ওদের মধ্যে একতা নেই বলেই উন্নতি নেই। সকলে মিলে একজোট হয়ে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে বলতে জানে না তো 'আমার ঘর চাই, বাড়ী চাই খেতে চাই পরতে চাই।' ফিসফিস করে বলে, 'আমি ঘর চাই, আমি বাড়ী চাই, আমি খেতে-পরতে চাই।' বলে 'আমার ছেলেটাই শুধু কতো কেন মানুষ হোক আমার অমুকের ছেলেটা মুখ্যু আর বেকার হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াক, তাতেই মজা। দেশের কথা ভাবে না, শুধু নিজের কথা ভাবে। ভাবে না একজনের লোভের আগুন সারা দেশটাকে জ্বালিয়ে শেষ করতে পারে। লোভমুক্ত হয়ে সবাই যদি মাথা তুলে উঠে চেঁচাতে পারে, কেউ মরবে না।'

সুশোভন কি সত্যি ভাল হয়ে গেলেন? সত্যি তাঁর হারিয়ে-যাওয়া বুদ্ধি ফিরে পেলেন? তাই অভিযোগের সুরে বলেন, 'ওদের দোষ দেখবার কোন অধিকার তোমার নেই নীতা। ওরা অতকথা ভাবতে যাবে কেন? ওরা কবে কি পেয়েছে? শিক্ষাহীন অন্ধকার বুদ্ধি ওদের। আর তোমার এই বাবালোকেরা? যারা অনেক অনেক পাণ্ডিত্যের বোঝা নিয়ে উচ্চশিক্ষার বড়াই করে! ওরা সব বুঝেও শুধু নিজের ভাণ্ডার ভরানো, নিজের লোভের মাল-মশলা জোগাবার জন্য দেশের অনিষ্ট করছে না? দেশের অকল্যাণ ডেকে আনছে না? তারা জানে আগুন যখন লাগবে তাঁর ঘরটাও বাদ যাবে না।' (ক্রমশঃ)

উৎপল দত্ত

(তিন)

॥ আঙ্গিক ॥

পরিচালক দ্বিতীয়বার যেদিন এলেন সেদিন নাট্যকার কতকগুলো প্রশ্ন শানিয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে প্রস্তুত ছিলেন; আসা মাত্র পর পর ছুঁড়ে জ্যামুক্ত করতে লাগলেন তাদের। বললেন—সেদিন আপনি বলে গেলেন নাটকে যেখানে বৃষ্টি দরকার সেখানে বৃষ্টি নামান, যেখানে আগুন লাগাবার দরকার সেখানে আগুন। এ কথাগুলোর অর্থ কি? মঞ্চকৌশলকে কতটা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে দিয়ে থাকেন? আঙ্গিককে প্রাধান্য দিলে নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না কি? বর্তমানে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে আঙ্গিক ক্রমশঃ বিপজ্জনক আকার ধারণ করছে এটা স্বীকার করেন কি?

বুঝলাম সেদিনকার পরাজয়ে নাট্যকার কতকটা ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। পরিচালক কিন্তু নির্বিকার চিত্তে চা-জলখাবার দাবি করলেন। কেষ্ট সব সরবরাহ করলো এবং তিনি পানাহারে মত্ত হলেন। একটু পরে খেতে খেতেই বললেন—আপনার প্রশ্নগুলো দুটো বিভিন্ন মার্গের। আঙ্গিককে প্রাধান্য দেওয়া উচিত কিনা, এটা এক প্রশ্ন। আঙ্গিককে প্রাধান্য কতটা দিয়ে থাকি, সেটা আরেকটা প্রশ্ন। আমি যা করে থাকি, আগেই বলেছি, নির্লজ্জভাবেই বলেছি, সেটা বক্স-অফিসের মুখ চেয়ে। যা করা উচিত, সেটা বৃহত্তর বিশ্বনাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার জাতীয় থিয়েটারের প্রশ্ন। আমি যা করি, সেটা থেকে সব সময়ে সমগ্র আমাকে খুঁজে পাবেন না। পেশাদার থিয়েটারের সীমায় আমার সমস্ত চিন্তাজগৎকে কি করে পাবেন?

ভাষাবিদ বললেন—অর্থাৎ নিজেকে গোপন রেখে পেশাদার নাট্যশালার সেবা করতে হয়?

পরিচালক বললেন—অনেক সময়ে। ভাষাবিদ বললেন—ভিক্তর উগোকে যেমন তাঁর উন্মত্ত আবেগপূর্ণ কাব্য থেকে চেনা অসম্ভব। জাঁ কক্তো বলেছেন, "ভিক্তর উগো, সেত্যাঁ ফু কি সে ক্রোইয়ে ভিক্তর উগো।" অর্থাৎ, উগো আবার কে? সে একটা পাগল যে নিজেকে উগো বলে মনে করে।

নাট্যকার গম্ভীর আদালতী কায়দায় বললেন—তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে আপনি আঙ্গিককে প্রশ্রয় দিতে চান না, পেশাদার নাট্যশালায় দিতে বাধ্য হন?

পরিচালক চায়ে বিষম খেলেন; প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন—সেটা আবার কখন বললাম? বলেছি আমার চিন্তাজগৎকে পুরোপুরি পেশাদার থিয়েটারে খুঁজে পাবেন না। আঙ্গিককে প্রশ্রয় না দেওয়ার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না; উপরন্তু বলতে চাই ব্যক্তিগতভাবে আমি আঙ্গিকের সম্পূর্ণ প্রাধান্যের পক্ষপাতী। পেশাদার থিয়েটারে বরং তাকে খর্ব ক'রে, সীমিত ক'রে, খেলো ক'রে রাখতে হয়; বক্স-অফিসের দাস ক'রে রাখতে হয়। আমার মনের থিয়েটারে আঙ্গিকের একচ্ছত্র স্বৈরতন্ত্র।

এবার নাট্যকারের বিষম খাওয়ার পালা। অবশ্য তরল কিছু খাচ্ছিলেন না, টানছিলেন চুরুটের ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াই অতিরিক্ত গিলে ফেলে একটু কাশলেন। সেই সুযোগে দার্শনিক বললেন—কিন্তু নাটকে কথা প্রধান। কথার চাতুর্যেই, কথার ঝংকারেই পুরো দৃশ্যের আবহাওয়াটা গড়ে তোলা যায়। দুষ্মন্তের জনপথে রথ ছোটানো শুধু কথার মারফত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দর্শকের কাছে। "মৃচ্ছকটিকে" বসন্তসেনার প্রমোদগৃহ বর্ণনার জন্যে দৃশ্যপটের দরকার হয়নি। "তপতী" নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যপট বা যবনিকার খোকামি সম্বন্ধে যে কঠোর উক্তি করে গেছেন জানেন নিশ্চয়ই। অত কেন? নাট্যগুরু শেক্সপিয়ারের 'পঞ্চম হেনরি'-র সূত্রধারের প্রথম সংলাপটা স্মরণ করুন; দৃশ্যপটের ব্যাপারটা দর্শকের কল্পনার উপর ছেড়ে দিতে কি আবেগময় আহ্বানই না জানিয়েছেন মহাকবি!

পরিচালক অম্লানবদনে বললেন—তা কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ারের মতন নাট্যকার দিন আমায়; আঙ্গিককে এক হুকুমে গৌণ করে দেব। ওঁদের নাটকে কথার যে জাদু আছে, দিন আমাকে সে জাদু, তারপর কথা বলবেন। কাব্যের ছন্দে সব অপূর্ণতাকে যিনি ভরিয়ে রাখতে পারেন তাঁর মুখেই সাজে আঙ্গিকের সমালোচনা। বার্ণার্ড শ' পারেননি, ইবসেন পারেননি, চেকভ পারেননি; পারেননি ব্রেশ্ট্, টলের, এমনকি ও'নীল। পুঙ্খানুপুঙ্খ আঙ্গিক নির্দেশ রেখে গেছেন এঁরা সংলাপের পাশাপাশি। রবীন্দ্রনাথ-শেক্সপিয়ার আর ক'টি মশাই? বার্ণাড শ'-রা যেক্ষেত্রে পারলেন না, সেক্ষেত্রে বাংলার ঢালহীন তলোয়ারহীন নিধিরামদের আর আঙ্গিককে আক্রমণ ক'রে কাজ নেই। আর আপনি বললেন নাটকে কথা প্রধান; এটা আমি স্বীকার করি না। দু'তিনজন মহাশক্তিশালী ক্ষণজন্মা স্বভাবকবি ছাড়া, কোনো নাট্যকার জগতে নেই যাঁর কথা প্রধান হবার যোগ্যতা রাখে।

নাট্যকার কিছু একটা নিশ্চয়ই বলতেন, কিন্তু পরিচালক বলে চললেন বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতন—এটা আমরা প্রমাণ করবো একটু পরে। প্রথমে আমাদের একটু ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে হবে। আঙ্গিক আকাশ থেকে পড়ে না; ভগবানও তাকে ছুঁড়ে দেন না। প্রতি দেশে প্রতি যুগে থিয়েটারের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক-কলা গড়ে উঠছে। নাট্যকার সে আঙ্গিককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকার ক'রে নেন; সে আঙ্গিককে স্বীকার না করে উপায় নেই; সে আঙ্গিক নাট্যকারের অবচেতনকে পর্যন্ত অধিকার ক'রে বসে আছে। শকুন্তলায় দৃশ্যপটের নির্দেশ নেই, কারণ দৃশ্যপটের নামও কেউ শোনেনি তখন পর্যন্ত। শেক্সপিয়ারেও সেই একই কারণে কল্পনা-নির্ভরতার আবেদন; কারণ শেক্সপিয়ারের যুগে থিয়েটারটি কি মাল ছিল জানেন তো? দিনের আলোয় অভিনয় হত; বৃষ্টি

নামলে অভিনয় স্থাগত; পোশাক-আশাক সব এলিজাবেথীয় যুগেরই—মধ্যযুগের পঞ্চম হেনরি-র পোশাক যোগাড় করার উপায় নেই; ছেলেরা মেয়ের পার্ট করছে; দর্শকবৃন্দ অভদ্র; চারটি সৈনিক দেখে বুঝতে হবে হেনরি-র বিরাট বাহিনী যুদ্ধে যাচ্ছে; অভিনেতারা প্রাণপণে চেচাচ্ছেন আর হাত পা ছুঁড়ছেন—এই নাকি অভিনয়। এমতাবস্থায় দর্শকের কল্পনার উপরে নির্ভর না ক'রে উপায় কি? কিন্তু ধীরে ধীরে মঞ্চ বাক্সবন্দী হল, যবনিকার আবহার এল, উইংস এল, উপরের বর্ডার এল, এল দৃশ্যপট, এল নানাবিধ যন্ত্রপাতি, আলো, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। নাট্যকাররাও এইসবকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এখন আর কথার উপরই নির্ভর ক'রে থাকতে হচ্ছে না; দর্শকের চোখকেও তৃপ্তি দেওয়া যাচ্ছে। নাটক প্রকৃতই দৃশ্যকাব্য হয়েছে। এখন সত্যি ঝড় বইয়ে দেওয়া যাচ্ছে মঞ্চে; অতএব ফলাও করে কোনো চরিত্রের মুখে ঝড় বর্ণনা করার দরকার নেই। এখন আস্ত একটা যুদ্ধকে মঞ্চের উপর হাজির করা যাচ্ছে; তাই নেপথ্য-যুদ্ধকে বর্ণনা করে পলাশীর আবহাওয়া ফোটাবার দরকার নেই। আমি তো বলব নাট্যকাররা এখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন; অনেক সময়, অনেক কালি, অনেক কাগজ বেঁচে গেল, এখন সরাসরি নাটকের মূল বিষয়ে প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন চরিত্রদের মনস্তত্ত্বের গভীরে ঢোকার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

নাট্যকার হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—প্রত্যক্ষ একটা ঘটনাকে তুলে ধরা ফিল্মের কাজ; নাটক সে ব্যাপারে ফিল্মের প্রভাবে স্বকীয়তা হারাচ্ছে। নিজস্ব ব্যাকরণ, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ভাষা হারিয়ে সে অন্যের চর্বিতকে চর্বণ করছে।

পরিচালক বললেন—এ রকম একটা দুর্মর কুসংস্কার ক্রমেই দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বটে! তবে ওটা অজ্ঞতাপ্রসূত। জমকালো দৃশ্য যে ফিল্মের অঙ্গ এটা কে বললে? যিনি বলেছেন তিনি ফিল্মের কিছু বোঝেন? আগুন-বৃষ্টি-ঝড়-যুদ্ধ-জাতীয় আঙ্গিক-আড়ম্বর চরমে উঠেছিল উনিশ শতকের মঞ্চে; তখনো ফিল্মের জন্ম হয়নি। আজ যদি সেই আঙ্গিক-ঐতিহ্য থেকে থিয়েটার শিক্ষা গ্রহণ করে তবে সেটা ফিল্মের প্রভাব হয় কি করে? আর থিয়েটারের নিজের ভাষা কি বস্তু আমার জানা নেই। কারুরই জানা নেই। এখনো সে ভাষা সৃষ্টিই হয়নি। থিয়েটার এখনো কথা, আঙ্গিক-অভিনয়, বাচিক-অভিনয়, আলোক, মঞ্চসজ্জা ও আবহ-সঙ্গীত-এর জগাখিচুড়ি। এগুলোর সমন্বয়ে যে ভাষা বেরুবে সে এখনো ভবিষ্যতের জঠরে। ফিল্মের অবশ্যই নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, অপূর্ব ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাময় সে ভাষা; তবে তা জমকালো দৃশ্যচ্ছটা নয় এটা যে কোনো রসিকই জানেন।

দার্শনিক বললেন—আপনি বললেন নাট্যকাররা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আঙ্গিককে স্বীকার করে নিচ্ছেন; এর অর্থ?

পরিচালক বললেন—যেমন ধরুন সংস্কৃত নাটকে কোথাও কোনো যবনিকার উল্লেখ নেই; কিন্তু যবনিকা অবশেষে আমাদের থিয়েটারে এল এবং তৎক্ষণাৎ নাট্যকাররা ফলাও করে নাটকে যবনিকাপাতের নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। এখন ওটা কলমের টানেই এসে যায়, ওটাকে কেউ আর বিশেষ লক্ষ্য করেন না। কিন্তু ভুললে চলবে না, যবনিকাও আঙ্গিকের অংশ। তেমনি সতু সেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আমদানি করতেই নাট্যকাররা সোৎসাহে বাইশ-তেইশটি করে বিভিন্ন দৃশ্য এক এক নাটকে এনে ফেললেন। এখন আর কেউ সেটাকে আঙ্গিকের প্রাধান্য বলে ক্রন্দন করেন না। কিন্তু ভুললে চলবে না, ঘূর্ণায়মান মঞ্চও আঙ্গিকের অংশ। তেমনি এসেছে তাপস সেনের আলোক-বিপ্লব; তেমনি নব্য নাট্যকাররা সেই আলোকশিল্পের সুযোগ নিতে শুরু করেছেন। প্রথমটা গোঁড়াপন্থীদের চোখে লাগছে বটে, কিন্তু অচিরে যবনিকা বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের মতন এও স্বীকৃতি পাবে। আবার বেচারা তাপসবাবুর ওপর গোঁড়াদের যে একপেশে আক্রোশ, সেটারও কারণ খুঁজে পাই না। আঙ্গিক বলতে শুধু আলোকই বোঝায় না, পরিবেশনার সমস্ত মাধ্যমগুলোকেও বোঝায়—মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, টিমওয়ার্ক, পরিচালকের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব; এ সবই আধুনিক আঙ্গিকের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এগুলো হয়তো বুদ্ধিহীন গোঁড়াদের চোখে পড়ে না; তাঁরা তাই তাপসবাবুকে নিয়েই পড়েছেন। আসলে পুরো যুগটা বদলে যাচ্ছে; তাপস সেন সেই পরিবর্তনে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

নাট্যকার কিছুতেই এসব মানতে পারছেন না এটা বোঝা গেল। প্রথমতঃ গলায় ঘোৎকার তুলে তিনি প্রতিবাদ জানালেন। তারপর বললেন—কিন্তু আঙ্গিক অলঙ্কারমাত্র। অতিরিক্ত অলঙ্কার চাপিয়ে কি নাট্যসুন্দরীর রূপ খুলবে? না, তাকে জবড়জং জমিদার-গিন্নী বানিয়ে ফেলা হবে?

পরিচালক বললেন—আঙ্গিক যে অলঙ্কার এটা আপনার ধারণা মাত্র এবং আমার মতে আপনার ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। আমি বলব আঙ্গিক কথাটা এসেছে অঙ্গ থেকে ষ্ণিক প্রত্যয় করে। পুরো অঙ্গটাই হচ্ছে আঙ্গিক। নাট্যসুন্দরীর পুরো দেহটাই আঙ্গিক; তার প্রাণটুকু হচ্ছে নাটকটা। দেহ বাদ দিয়ে প্রাণ হয় না। আঙ্গিক অলঙ্কার নয় যে, খুলে রেখে দেওয়া চলে। দেহটাকে খুলে রেখে, বা তলোয়ার দিয়ে দেহের এখান ওখান কেটে ফেলে প্রাণটুকুকে বাঁচাতে পারবেন না। দেহ গেলে প্রাণও গেল। প্রাণকে প্রকাশ পেতে হবে দেহের মাধ্যমে। বলতে পারেন দেহে মেদ জমতে দেওয়া উচিত নয়, বা টাক পড়তে দেওয়া উচিত নয়। দেহটাকে সুন্দর, সুঠাম করে তুলতে হবে। সেটা আমি জানি। আঙ্গিককে শিল্পসম্মত করে রাখতে হবে। কিন্তু আঙ্গিক-বিরোধিতা বা আঙ্গিককে সস্তা অলঙ্কারের সঙ্গে তুলনা—ওসব নেহাত অজ্ঞতার পরিচয়। বনফুলের ভাষায় ওসব থিয়েটারের পদীপিসীদের কথা।

নাট্যকার বললেন—মানে?

ভাষাবিদ হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন—"অগ্নীশ্বর" বইয়ে বনফুল এই পদীপিসী-মনোবৃত্তির উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বল-

লেন—সে আমার জানা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐ কথাটির প্রয়োগটা বুঝতে পারলাম না।

পরিচালক কিন্তু হাসেননি। বেশ গম্ভীর তার্কিক ভঙ্গীতে বললেন—মানে বলছিলাম একদল লোক আছেন যাঁরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। নূতনকে গ্রহণ করা এঁদের পক্ষে অসম্ভব। রেলগাড়ি যখন প্রথম চললো, এঁরা বলেছিলেন ওসব শয়তানির অবসান অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যখন আকাশে উড়লো, এঁরা বললেন ওসব নাস্তিকতার পরাজয় ঘটলো বলে। তেনজিং যখন এভারেস্ট চড়লেন, এঁরা বললেন ওসব বুজরুকি। গাগারিনও এঁদের মতে মিথ্যাবাদী। এখন এঁরা স্বচ্ছন্দে সেই রেলগাড়ি চড়ে কাশীধাম ঘুরে আসছেন, প্লেনেও চড়ছেন অম্লান-বদনে, তেনজিং-গাগারিনকেও সবার অজান্তে মেনে নিয়ে বসে আছেন। তেমনি থিয়েটারের পর্দাপিসীরাও নূতন আঙ্গিকের অভ্যুত্থানে 'ধর্ম গেল' বলে রব তুলেছেন। আবার দেখবেন একদিন এঁরা নির্বিবাদে সকলের অজান্তে তাপস-খালেদদের স্বীকার করে ভবিষ্যতের তাপসদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন।

ভাষাবিদ এবং দার্শনিক দুজনেই হাসলেন উচ্চৈস্বরে। নাট্যকার কোনো যুক্তি না দিয়ে শুধু বললেন—আই ডোন্ট এগ্রি। তাপস সেন-খালেদ চৌধুরীরা যদি শিল্পসম্মত আঙ্গিক-প্রয়োগ করতে পারতেন তবে তাঁদের নিয়ে এত গণ্ডগোল হোতো না। বিশেষ করে তাপস সেনের আলোক-সম্পাত এত বেশি সচেতন, এত সোচ্চার, এত স্থূল যে নাটকের পরিবেশকে অতিক্রম করে সে নাটককে লঙ্ঘন করে, নাটকের বক্তব্যকে চেপে দেয়। সে চোখ ধাঁধায়।

পরিচালক বললেন—কোন নাটকে এটা ঘটেছে উদাহরণ দেবেন?

নাট্যকার সদর্পে বললেন—"সেতু", "অঙ্গার" এবং "ফেরারী ফৌজ" সাম্প্রতিক তিনটি নাটকেই আমি তাপসের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করেছি। তিনটিতেই ছেলেটা সংযমের সীমা অতিক্রম করেছে—রেলগাড়ি, জল আর আগুনের খেলায় মত্ত হয়ে নাটকের বারোটা বাজিয়েছে।

পরিচালক বললেন—বারোটা ঠিক বাজিয়েছে কি? গণ্ডগোলই বা কোথায় বাধলো? লোকে তো তিনটেতেই তাপস সেনের প্রশংসা করেছে। যাক, জনপ্রিয়তার ওজর আপনি মানতে রাজী নন, তাই ওসব আপনাকে বলা বৃথা। আপনি বলছেন "সেতু", "অঙ্গার" ও "ফেরারী ফৌজ"-এ তাপস সেনের কলাকৌশল স্থূল হয়েছে, সোচ্চার হয়েছে। "স্থূল" কেন বলছেন বুঝলাম না। স্থূলে বলবো তাকে যা উৎকট রকমের বাস্তব। একটা পাঁঠার দোকানের দৃশ্যে কেউ যদি আস্ত একটা পাঁঠা ঝুলিয়ে রাখতেন, তাকে বলতে পারতাম স্থূল। সেতুর রেলগাড়ির দৃশ্যে যদি মডেল রেলগাড়ি চলত তাহলে তাকে স্থূল বলা যেত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শুধু শব্দ আর আলোর প্রক্ষেপণে ট্রেন-এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে; ট্রেনটিকে তুলে ধরা হয়নি, ট্রেনটুকুকে সাজেস্ট করা হয়েছে। সেটা স্থূল হবে কেন? অঙ্গার-এর জলও তেমনি অপূর্ব ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেরারী ফৌজ-এর আগুনও তাই। উপরন্তু ফেরারী ফৌজ-এর আগুন পুরো নাটকের বক্তব্যকে এক চমকপ্রদ প্রতীকের সাহায্যে দর্শকের চক্ষুর সামনে উপস্থিত করেছে। নাটককে তো চেপে দেয়নি, বরং নাটককে বাঙ্ময় হতে সাহায্য করেছে। অঙ্গার-এর জল সম্বন্ধেও একই বক্তব্য। অতএব "স্থূল" কথাটি আপনি প্রত্যাহার করতে বাধ্য।

নাট্যকার বললেন—আর "সোচ্চার"?

পরিচালক বললেন—সোচ্চার কখনো কখনো হওয়া প্রয়োজন, নাটকেরই স্বার্থে। অভিনয় কি সব সময়ে নীচু পর্দায় বাঁধা থাকে? মাঝে মাঝে নাটকেরই প্রয়োজনে অভিনেতারা গলা তোলেন না? হাত পা ছোঁড়েন না? দৃশ্যসজ্জায় মাঝে মাঝে নাটকেরই স্বার্থে চড়া রং ব্যবহার করা হয় না কি? পরিচালক মাঝে মাঝে অভিনয়ের গতি বাড়িয়ে দেন না? তেমনি আলোক-সম্পাতও মাঝে মাঝে সোচ্চার হতে বাধ্য, তীব্র হতে বাধ্য। আঙ্গিকের অন্য অংশগুলোর বেলায়, আপনারা আপত্তি করেন না, কারণ এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আলোক-সম্পাত নূতন ধারা নিয়েছে, নিজের স্থান করে নিচ্ছে; তাই আপনাদের অনভ্যস্ত চোখ টাটাচ্ছে, অন্তরস্থ পর্দাপিসীরা প্রতিবাদ করে উঠছে। ফেরারী ফৌজ-এর শেষ দৃশ্যে আলো কতকটা সোচ্চার হতে বাধ্য, কারণ পুরো নাটকের ক্লাইম্যাক্স ঐ আগুন। ঐ আগুন বিপ্লবীদের শেষ বিজয়, অত্যাচারীর পরাজয়। ঐ আগুন আসলে অগ্নিযুগের প্রতীক। তাই ওখানে তাপসবাবু সোচ্চার না হয়ে কি করবেন? আর নাটকের বারটা বাজাচ্ছেন তাপসবাবু—এই অভিযোগটি উল্লিখিত নাটকগুলির রচয়িতাদের কাছ থেকেই আসা উচিত ছিল; কই তাঁরা তো একথা বলছেন না? তাঁদেরই নাটককে হত্যা করছেন তাপসবাবু, আর তাঁরা মনের আনন্দে তাপসবাবুর হাড়ি-কাঠে গলা বাড়াচ্ছেন? না, আমার মনে হয় সেটা ঠিক নয়। আসলে ঐ নাট্যকাররা আধুনিক নাট্যকার। আধুনিক মঞ্চের সঙ্গে তাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক মঞ্চের কলাকৌশলকে তাঁরা আদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন; নাটকের মধ্যেই রেখে গেছেন কলাকৌশলের স্থান।

তাই তাপসবাবু তাঁদের নাটকের পরি-পূরক, হত্যাকারী নন।

দার্শনিক জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা, আপনার মতে আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

পরিচালক জবাব দিলেন—প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিচালকের অভ্যুত্থান পরিচালকের ক্রমবর্ধমান একনায়কত্ব আঙ্গিককে সংহত ক'রে, সুসমঞ্জস ক'রে মঞ্চে উপস্থাপন করছেন এ'রা। এককাল—এই সেদিন—অর্থাৎ শিশিরবাবুর আগে পর্যন্ত—পরিচালক বলে কেউ ছিলেনই না; ছিলেন মোশান-মাস্টার, যিনি কোনোমতে কথাগুলো 'বলিয়ে' নিতেন। আলোক-সম্পাত বা মঞ্চসজ্জা বা অভিনেতাদের গ্রুপিং প্রভৃতি সম্পর্কে এ'দের কোনো ধারণা বা দায়িত্বই ছিল না। আজ পরিচালকরা—অন্ততঃ কয়েকজন পরিচালক—সমগ্র আঙ্গিকের ওপর প্রাধান্য এবং স্বকীয়তা বিস্তার ক'রে নাটককে ঐক্যবদ্ধ শিল্পরূপ দিচ্ছেন।

নাট্যকার একগুঁয়ের মতন বললেন—এবং সেই সঙ্গে নাটকের সর্বনাশ করছেন। যে থিয়েটারে ছিল নাট্যকারের নিরঙ্কুশ আধিপত্য; সে থিয়েটারকে এ'রা বারো ভূতের আস্তানা করে তুলেছেন।

পরিচালক আরো খাদের আশায় কেষ্ট-র দিকে একটু দৃষ্টি হেনে বললেন—বারো ভূত কি?

নাট্যকার জবাব দেওয়া দরকার মনে করলেন না। তাই পরিচালকই বলে চললেন—নাট্যকাররা চিরকালের দাম্ভিক পরশ্রীকাতর, স্ফীতমস্তিষ্ক......

নাট্যকার একটা অস্ফুট গর্জন করতে পরিচালক থামলেন। তারপর শান্ত হয়ে বললেন—নাট্যকারদের আধিপত্য ক্রমশঃ খর্ব হতে চলেছে। শুধু এ দেশে নয় সারা পৃথিবীতে পরিচালকদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাররা পিছু হটছেন। পরিচালকের ক্রম অর্থেই আঙ্গিকের ক্রম কারণ প্রত্যেকেই হল পরিচালকের আত্মপ্রকাশের ভাষা। এতদিন থিয়েটার নাট্যকারদের অধীনে ছিল একথা স্বীকার করি, কারণ এতদিন আঙ্গিক শৈশবাবস্থায় ছিল। এখন এ যুগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক (এবং নাট্যকার) বের্টল্ট ব্রেশট বলছেন—'The theatre is not the servant of the dramatist, but of society' এটাই বর্তমান পরিচালকদের জগৎ-কাঁপানো রণ-হুঙ্কার।

দার্শনিক বললেন—স্তানিস্লাভ্স্কি থেকে এ বিপ্লবের শুরু, কারণ তিনি খোদ শেক্সপিয়ারের ওপর কলম চালিয়েছিলেন 'ওথেলো' প্রযোজনার সময়। ওঁর "ওথেলো" অভিনয়ের পাণ্ডুলিপিটা ছেপে বেরিয়েছে, পড়ে দেখেছি। তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্যের শেষে নোট লিখেছেন:

"এমিলিয়ার সঙ্গে ডেসডেমোনার অংশটুকু কেটে দিলে কেমন হয়? তাহলে ওথেলোর প্রস্থানের পর একটু নীরবতা, এবং ডেসডেমোনার হতভম্ব অবস্থা দেখিয়েই পর্দা ফেলে দেয়া যায়। সেটা আরো নাটকীয় হবে।"

এ রকম বহু জায়গায় তিনি শেক্স্পিয়ারকে এক-আধটু রদবদল করার পক্ষপাতী।

নাট্যকার ট্র্যাজিক ভঙ্গীতে বললেন—কিন্তু সেটা কি ভালো?

পরিচালক বললেন—ভালো-খারাপ বিচার করা অসম্ভব, কারণ আমরা স্তানিস্লাভস্কি-র "ওথেলো" দেখিনি। প্রশ্নটা অন্যখানে। প্রশ্নটা ঝোঁকের, চিন্তাধারার। শেক্সপিয়ারের নাটককেও অনাদি-অনন্ত বলে মানতে স্তানিস্লাভ্স্কি রাজী নন। অন্য নাট্যকারদের তো কথাই নেই।

ভাষাবিদ বললেন—মেইয়েরহোল্ড ঠিক এমনি জায়গায় গোগোল-এর "ইনস্পেক্টর-জেনারেল" পরিচালনার সময়ে বারংবার নাটককে অতিক্রম ক'রে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ধরুন—ডাক্তার চরিত্রটি। গোগোল-এর নাটকে এ চরিত্রের কোনো কথাই নেই। মেইয়েরহোল্ড তাকে দিয়ে অনর্গল দুর্বোধ্য জার্মান বলিয়েছেন।

দার্শনিক বললেন—আর গর্ডন ক্রেগ তো নাট্যকারকে রীতিমত একটি জগদ্দল পাথর বলে মনে করতেন। বলেছেন থিয়েটার একটি স্বতন্ত্র শিল্প; আর নাট্যকাররা কথা ধার করেছেন সাহিত্য থেকে; ধার-করা জিনিস নিয়ে তাঁরা থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করছেন। শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হল মূকাভিনয়, পুতুলনাচ এবং ফরাসী মাইমদের আনন্দোচ্ছল হাসি। ক্রেগ বলছেন, পরিচালকরা নিজেরাই নাটক লিখতে শুরু না করলে উপায় নেই। পরিচালকরাই শুধু পারবেন কথাকে আঙ্গিকের দাস ক'রে থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে। নইলে থিয়েটারই সাহিত্যের দাস হয়ে থাকবে।

ভাষাবিদ বললেন—ফরাসী থিয়েটারের অন্যতম দিকপাল গ্যাস্ত' বাতি বলতেন, কথা-মহাশয় আমাদের সর্বনাশ করলেন; তাঁর প্রভুত্ব ঘোচাতে না পারলে থিয়েটারের মুক্তি নেই। বলছেন:

"A text cannot say everything. It can go only as far as all words can go. Beyond them begins another horizon, a zone of mystery, of silence......It is that which it is the work of the directors to express."

থিয়েটারের জগৎ কথার পরও যে জগৎ সেই জগৎকে ঘিরে। এবং সেই জগৎকে মূর্ত করে তোলবার একমাত্র উপায় খাঁটি থিয়েটারি আঙ্গিক। "সির ল্য মো" বা "কথা-মহাপ্রভু"-র সামনে মাথা নীচু করে থাকলে জীবনে সে জগতে পেঁছিনো যাবে না।

পরিচালক এবার উঠে দাঁড়িয়ে বিষম হাঁক ছেড়ে বললেন—নূতন নাট্যশালা আর সাহিত্যের দাসত্ব করতে চাইছে না এটা আজ অবিসম্বাদী সত্য। আমারও যদি উপায় থাকতো তবে নূতন নাটককে নূতন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করে নূতন বাংলা থিয়েটারের জন্ম দিতাম। সে থিয়েটার হ'ত স্বকীয়তায় ভাস্বর: পরের মুখে ঝাল খেয়ে তার দিন কাটতো না। কিন্ত হায়, বক্স-অফিসের জন্যে নিজেকে সংযত ক'রে কথার বেসাতি ক'রে যেতে হচ্ছে। মাইকেল-ক্ষীরোদ-রবীন্দ্র-নাথের যুগের থিয়েটার সত্যিই কথার দাস হয়ে ধন্য হয়েছে, কারণ ও'রা ছিলেন কথার রাজা। বর্তমানের ডাক লক্ষ্য কথাকে অতিক্রম করা। কারণ, আজকের রামা-শ্যামা-যদুর কথা থিয়েটারকে শৃংখলিত করছে, বোঁড়া বানাচ্ছে।

নাট্যকার পুনরায় বললেন—আই ডোণ্ট এগ্রি।

॥ বালুচর শাড়ি ॥

বাঙলার হস্তশিল্প এক গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। বাঙালীর প্রবল সৌন্দর্য-তৃষ্ণা ও প্রয়োজনবোধ থেকেই এই শিল্পধারার বিকাশলাভ সম্ভব হয়েছিল। হস্তশিল্পীর সৃষ্টি-ধর্মী মনন-ক্রিয়ায় বাঙলার মাটিতে যে অসংখ্য রকমের হস্তশিল্প আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে বয়নশিল্পের স্থানই বোধ হয় সবচেয়ে উঁচুতে। ঢাকার মসলিন, জামদানী আর মুর্শিদাবাদের বালুচর শাড়ির বয়ন-নৈপুণ্য ও বর্ণ-বৈচিত্র্যময় শিল্প-সৌন্দর্য একদা সমগ্র বিশ্বের কাছে ছিল অবাক-বিস্ময়ের বস্তু। সে-সব এখন রূপকথার কাহিনী। বাঙলার মাটি থেকে সেই ঐতিহ্য দীর্ঘকাল হল বিদায় নিয়েছে। আজ কয়েকটি যাদুঘর বা সংগ্রহশালার গ্যালারীতে কিংবা কয়েকজন শিল্প-দরদী মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যেই শুধু এই লুপ্ত ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এই যখন অবস্থা তখন বয়ন-শিল্পের সেই লুপ্ত ঐতিহ্য নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অসংগত হবে না বোধ হয়। আর সেই আলোচনার সূচনারূপে আমরা পাঠকদের সম্মুখে মুর্শিদাবাদের বালুচর শাড়ির কথাই উপস্থিত করছি।

মুর্শিদাবাদ জেলার বালুচর নামক স্থানই (বর্তমান জিয়াগঞ্জ অঞ্চল) বালুচর শাড়ির আদি জন্মভূমি। একটি বিশেষ স্থানকে কেন্দ্র করে যে বয়ন-শিল্পের আবির্ভাব, পরবর্তীকালে সেই বিশেষ স্থানের নামের সংগে মিশে গেছে তার পরিচয়। সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এই বয়ন-শিল্পের ঐতিহ্য মুর্শিদাবাদের বালুচর অঞ্চলে সজীব ছিল। বালুচর অঞ্চলের অনেকগুলি গ্রাম তখন এমন এক বয়ন-কৌশলের জন্ম দিয়েছে যার সংগে বাঙলা তথা ভারতের অন্য অঞ্চলের বয়ন-কৌশলের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এর মধ্যে বাহাদুরপুর নামক গ্রামটি ছিল এই শিল্পের শ্রেষ্ঠ উৎপাদন কেন্দ্র। এখানেই জন্মগ্রহণ করে বালুচর শাড়ির শেষ শ্রেষ্ঠতম শিল্পী দুবরাজ দাস।

বালুচর শাড়ি রেশম সুতোয় প্রস্তুত বস্ত্র। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে-সব রেশমী বস্ত্র দেখি তার সংগে এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এক ধরনের বিশেষ তাঁতে, বিশেষ বয়ন-কৌশলে এই রেশমী বস্ত্রে রূপায়িত হত নর-নারী ও জীব-জন্তুর আকৃতি-প্রতিকৃতি সহ পুষ্পিত নক্সার অপূর্ব এক বর্ণাঢ্য শিল্প-সুষমা। ঢাকার তাঁতীরা মসলিন বা জামদানী বয়নের জন্য যে তাঁত ব্যবহার করতেন বালুচর শাড়ির শিল্পীদের ব্যবহৃত তাঁতের সংগে মূলতঃ তার কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু বালুচর শাড়ির শিল্পীরা যে উপায়ে, যে বিশেষ কৌশলে তাঁদের বিশেষ প্যাটার্ণগুলিকে রূপদান করতেন তা ঢাকার বয়ন-শিল্পীদের কলা-কৌশল থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঢাকার জামদানী শাড়ির সংগে এর কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও, বৈসাদৃশ্যটাই ছিল প্রবল। প্রধানতঃ নক্সা-পরিকল্পনার পার্থক্যেই জামদানী আর বালুচরের পার্থক্য নিরূপিত হয়। জামদানীতে সূক্ষ্ম বয়ন-পারিপাট্যের সংগে থাকে জ্যামিতিক নক্সার বর্ণ-বৈচিত্র্য। কিন্তু বালুচরের বিশেষত্ব হল নানা কাহিনী-চিত্র ও পুষ্পিত নক্সাকে আশ্চর্য বর্ণময় সৌন্দর্যে নিখুঁত বুনন কৌশলে গ্রথিত করা। বালুচর শাড়ির শিল্পীরা এ-সব ছাড়াও আঁচলকে এমনভাবে বর্ণাঢ্য ও কাহিনী-চিত্রের নক্সায় সজ্জিত করতেন যে অন্য বয়ন-শিল্পের নিদর্শনের সংগে তার কোনো তুলনাই হয় না।

একখানি বালুচর শাড়ি প্রস্তুত করতে অনেক সময় ছয় মাস পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হত। কোনো একক শিল্পীর পক্ষে এককভাবে বালুচর বয়ন করা সম্ভব ছিল না। এ-কাজে একজন মূল শিল্পীসহ অন্য একজনের সহযোগিতা ছিল অপরিহার্য। সহযোগী নক্সার সূত্রটিকে বিশেষ কৌশলে তুলে দিত মূল শিল্পীর হাতে, মূল শিল্পী সেই সূত্র নিয়ে জমিনের সূত্রসহ তোলানীর কারু-কৌশলে রূপ দিত পরিকল্পিত নক্সাটি। এইভাবে সাত থেকে চৌদ্দ রকমের নানা জাতীয় নক্সায় বালুচর শাড়ি তার সর্বাঙ্গে সৃষ্টি করতো মনোমুগ্ধকর রূপের ঐশ্বর্য। এ-এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বালুচর শাড়ি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই একমাত্র অনুমান করতে পারবেন কী অসাধারণ নিষ্ঠা, শিল্প-চেতনা আর কল্পনা-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বাঙলার এই বয়ন-শিল্পীরা।

এই শাড়ি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পাঁচ
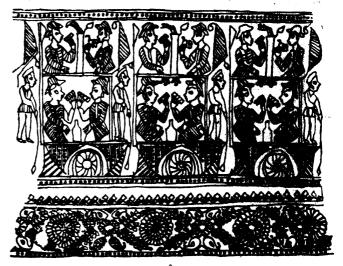
বালুচর শাড়ি—১

গজ ও প্রস্থে হত বিয়াল্লিশ ইঞ্চি। জমিনের রঙ ছিল খুব গাঢ় লাল, নীল কিংবা বেগুনী। যে-প্যাটার্ণগুলি জমিনের বুকে বয়ন-নৈপুণ্যে ফুটে উঠতো তার রঙ ছিল সাধারণতঃ সাদা, লাল, হলুদ, সবুজ, গোলাপী কিংবা গৈরিক। শাড়ির পাড় ও আঁচল বাদে সমস্ত জমিনে ছড়ানো থাকতো উপর-নীচে লম্বমান কিংবা তেরছাভাবে সাজানো বুটির সারি। শাড়ির প্রান্তভাগ ঘেঁসে পুষ্পিত নক্সার আশ্চর্য সৌন্দর্য-ময় পাড় এবং আঁচলকে ঘিরে ভাগে ভাগে সজ্জিত কল্কা, পুষ্পিত নক্সা, নর-নারী, পশু-পক্ষী ও যান-বাহনের জীবন্তরূপ এমন চমৎকার শিল্প-চাতুর্যে শিল্পীরা তুলে ধরতেন যে, রসগ্রাহী মানুষের মন তাকে কোনকালেই উপেক্ষা করতে পারবে না বোধহয়।

বালুচর শাড়ি—২

বিভিন্ন যাদুঘরের গ্যালারীতে কিংবা কলকাতায় প্রদর্শিত কয়েকটি প্রদর্শনীতে আমরা বালুচর শাড়ির যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছি তা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি এই শিল্পধারা বাঙলার নবাবী আমলে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেই চরম উৎকর্ষতার পথে এগিয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ শাড়ির জমিনে এবং আঁচলে যে-সব কাহিনী ও নক্সা রূপ পেয়েছে তা ঐ যুগেরই স্মৃতিবহ। এইসব শাড়ির কোনখানির আঁচলে শিল্পী তুলে ধরে-ছেন পুষ্পিত নক্সার মাঝখানে নায়িকার মূর্তি, কোনখানিতে কল্কার মাঝখানে

বালুচর শাড়ি—৩
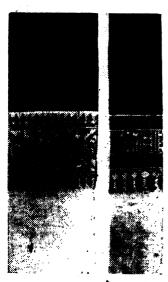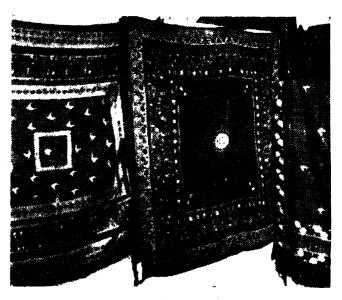
ধূমপানরত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবার কোন-খানিতে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিতা নারী-মূর্তি কিংবা সিংহ-শিকারের দৃশ্য। অনেকগুলি শাড়ির আঁচলে ইংরেজ নর-নারীর বিভিন্ন মূর্তি ও ইঞ্জিন-আরোহণের দৃশ্যও রূপায়িত হয়েছে। মোটকথা ঃ বাঙলার বয়ন-শিল্পীরা সমসাময়িক যে-সব ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, তাঁদের প্রতিভা ও কারুনৈপুণ্য তাকেই ভিত্তি করে রেশম-সূত্রে, রঙে আর নক্সায় বালুচর শাড়ির অঙ্গে অনায়াস স্বচ্ছন্দে তা বিধৃত করতে অগ্রসর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। বালুচর শাড়ির শিল্পীরা পাড়ে বা জমিনে যে-সব বর্ণ-সুষমা সমন্বিত নক্সা বা প্যাটার্ণ উপহার দিয়েছেন তা মোগল তথা পারস্য শিল্পকলার ধ্যান-ধারণার স্মৃতিকেই আমাদের মনে জাগিয়ে দেয়।

এই শিল্পের শেষ শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন দুবরাজ দাস। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বালুচর শাড়ির একটি প্রদর্শনীতে গোষ্ঠ কর্মকার নামে একজন বালুচর-শিল্পীর নামস্বাক্ষর লক্ষ্য করেছিলাম। এঁকে দুবরাজ দাসের পূর্বসূরী বলেই আমার মনে হয়েছে। কারণ এঁর বয়ন করা শাড়ির আঁচলে যে নক্সা ও আকৃতির চিহ্ন পরিস্ফুট, দুবরাজ দাসের সময় অত জটিল বয়ন-কৌশলের প্রচলন ছিল না বলেই আমার ধারণা। সব শাড়ির গায়ে সব শিল্পীর নাম লেখা নেই। ফলে, নক্সা-পরিকল্পনা ও বয়ন-কৌশল বিচার করেই সেইসব শাড়ির কালনির্ণয় করা হয়। কিন্তু কাল নির্ণীত হলেও স্রষ্টা শিল্পীর নাম অজ্ঞাতই থেকে যায়। মহাকালের এ-এক নিষ্ঠুর পরিহাস।

যাহোক, বালুচর শাড়ির ঐতিহ্য আজ অবলুপ্ত। শুনেছি, এর সর্বশেষ শিল্পীও গত হয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। জানি না বাঙলা দেশে এখনও কোনো বালুচর-শিল্পী বেঁচে আছেন কিনা। যদি থাকেন তবে তাঁর সাহায্য নিয়ে এই শিল্পধারার পুনরুজ্জীবন করাই হবে জাতীয় সরকারের অন্যতম কর্তব্য। আমরা এ-দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বালুচর শাড়ি—৪
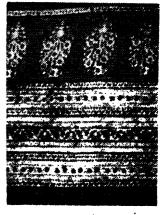
ঠিক চোরের মতই প্রবেশ করলেন গণি শেখ। নিঃশব্দে। সন্তর্পণে। পা টিপে টিপে। পিছনে দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। একাদশীর চাঁদ তখন নিমডালের ওপাশে নুয়ে গিয়েছে।

মনটা কেমন যেন হ'য়ে যাচ্ছে আজকাল। কেবল সন্দেহ আর সন্দেহ। জ্বালা আর অস্বস্তি। নিজের ঘরে আসবেন তাও তাঁকে চোরের মত আস্‌তে হয়। অন্ততঃ তাই আসেন গণি শেখ। সাড়া না দিয়ে। সন্তর্পণে। বোঁটা-খসা শেফালীর মত।

জানালার কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন। হারিকেনটা টেবিলের ওপর মিটমিট করে জ্বলছে। কিন্তু শাজেদা কই—শাজেদা? কোথায় গেল? বাইরে? ঘাটে?

চোখটা আঁধারে অভ্যস্ত হ'লে ঠিক সেই দৃশ্যই দেখলেন তিনি। যে আশঙ্কা এতদিন তাঁর বুকে জমা ছিল। পাথরের মত। প্রহরে প্রহরে তিনি যে আশঙ্কায় শিউরে উঠ্‌তেন। ঠিক তাই। সেই দৃশ্য। সেই নীল পর্দাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে শাজেদা। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে পাশের ঘরে। ওঘরে পড়ছে সেলিমা আর মাহ্‌মুদ। প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়ে। মাস্টার-সাহেবের কাছেই পড়ছে। পাড়ারই ছেলে নঈম। এবার বি, এ, পড়ছে। রাতের বেলা ঘন্টা দু'য়ের জন্যে এসে পড়িয়ে যায়।

দরজা ভেঙে গিয়ে শাজেদার টুঁটি চেপে ধরতে ইচ্ছে হয় গণি শেখের। উত্তেজনায় তিনি কাঁপ্‌ছেন। ওখানে দাঁড়িয়ে কি? কাজ নেই? সংসারের কাজ হ'য়ে গেছে সব? এশার নমাজ পড়েছে? এতক্ষণ ধরে ওজু করে (হাত মুখ ধুয়ে) নমাজটা পড়লে পারতো ত পাটিতে বসে। তারপর কোর'ন শরীফ পড়া। কতদিনই ত কোরান শরীফ পড়ার কথা বলা হ'ল। পড়লে মন ভাল থাকে। আত্মা পবিত্র হয়। তা নয়। উত্তেজনায় আবার কাঁপলেন গণি শেখ—কেবল ঐ নীল পর্দা আর নীল পর্দা।

না তেমন কিছু একটা করলেন না গণি শেখ। মান-সম্মানের ভয় আছে। গ্রামের মোড়ল তিনি। ধীর পায়ে নেমে গেলেন উঠানে। তারপর উঠান থেকে শব্দ করতে করতে ঘরে উঠলেন। দরজায় বার দুই টোকা দিয়ে ডাকলেন, কই গা—কোথায় গেলে সব। যেন কিছুই জানেন না। উত্তেজনায় শরীরটা কাঁপেনি তার।

দ্রুত পায়ে এসে দরজা খুলে দিল শাজেদা। তারপর হেসে লুটিয়ে পড়ল। হাসি একটু কমের দিকে এলে বল্‌লু, জান—সেলিমা 'টৌক্সি' কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে না। মাস্টার-সাহেব যতবার বল্‌ছে টৌক্সি ও ততবার বল্‌ছে 'টেস্‌কি'। তারপর আবার দম-লাগা হাসিতে ভেঙে পড়ল শাজেদা। হাসির উচ্ছ্বাসে যৌবন-নিটোল দেহের ভাঁজগুলো কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

হারামজাদা নঈম!

দেহের প্রান্তভাগে যেন আগুন ধরে গেছে। দেখ—পড়ান বন্ধ হ'য়েছে। কথা শুনছে, কালসাপিনীর মিষ্টি হাসি গিলছে। না, পড়ান বন্ধ করে দিতে হবে কাল থেকে। দরকার নেই ছেলে-মেয়েকে মানুষ করে।

জ্বলে উঠ্‌লেন গণি শেখ। মনে মনে। কি রূপ!—ঐ রূপ হ'য়েছে কাল। আগে রূপ নেশা ধরাত মনে। এখন উত্তেজনা জাগায়। জ্বলেপুড়ে মরেন তিনি। না—এবারেও তেমন কোন কড়া কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে। যেন এ-সব কথা তিনি কানেই করেননি। পাঞ্জাবিটা খুল্‌তে খুল্‌তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বল্‌লেন—জয়নালের ছেলেটাকে কিছুতেই বাঁচান গেল না। পুলিশ তাকে জেলে দেবে।

হাসি থেমে গেছে শাজেদার। চোখ দু'টো ছলছলে হ'য়ে উঠেছে। যেন তার নিজের ছেলের জেল হ'বে। বল্‌লো, আহা—বড্ড ভাল ছেলে ছিল গো। যখন যা বলতুম তাই শুনতো। তুমি এখান-ওখান চলে গেলে ওকেই তো পেতুম হাতের কাছে।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গণি-সাহেব উচ্চারণ করলেন, আল্লা হু।

তারপর একটু থেমে বললেন, নমাজ পড়েছ—এশার নমাজ?

কোনকালে। উত্তর দিল শাজেদা।

নিজের মনেই গণি শেখ টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন, কো—ন কা—লে। বটে! না তার নিজের মনটাই আজকাল বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে। যাচ্ছে। ভাল চিন্তা যেন আসেই না। কেবল কুৎসিত সন্দেহ।

বললেন, যাও—এক লোটা জল নিয়ে এসো। আমিও নমাজটা পড়ে নিই।

রাহেলা মারা গেল—প্রথম পক্ষের স্ত্রী। তারপর সংসারে এল বিপর্যয়। দৈনন্দিন সকল কাজে এ বিপর্যয় লক্ষ্য করলেন গণি শেখ। লক্ষ্মী যেন ছেড়ে যাচ্ছে সংসার থেকে। জমজমাট সংসার—কি হ'য়ে চলেছে। এ বিপর্যয় লক্ষ্য করে শিউরে উঠেছিলেন তখনই—সেই পঞ্চাশ বছর বয়সে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে দেখতেন, ভাত রান্না হয়নি, কাপড়-চোপড় অপরিষ্কার, ওজুর জলটা নেই যথাস্থানে। মনটা জ্বলে উঠত তখন। আজ তিনি সব পাচ্ছেন হাতের গোড়ায়। না বলতেই। ওজুর জল। সাজা পান। তবুও মনটা গুমরে ওঠে। আগে ধক্ করে জ্বলে উঠেই নিভে যেত। এখন জ্বলে ধিকিধিকি। তুষের আগুনের মত। বিষিয়ে ওঠে সারা দেহমন। ও রূপ নয়—আগুন। আগুনের কুণ্ড। ওহ্—কবে রেহাই পাবেন এ দাহন থেকে।

বাড়ীর মানদারটার সাথেই বা অমন হাসাহাসি কেন! দেখতে পেতেন না—কিন্তু হঠাৎ দেখে ফেলেছেন, রাতেরবেলা হাট থেকে বাজার করে দিয়ে বাড়ী পাঠিয়েছেন মানদারটাকে। বলে দিয়েছেন তাঁর ফিরতে দেরী হ'বে। মানদারটা চলে এসেছে। তিনিও আর থাকতে পারেননি। কেবল সন্দেহ আর সন্দেহ। চলে এসেছেন প্রায় সাথে সাথেই। এসে উঠানের জমাট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ভূতের মত। মানদার—বাড়ীর চাকর। তার সাথেও এত হাসাহাসি!

বাজারটা সামনে রেখে দু'জনা যেন হাসিতে ভেঙে পড়েছে। লংকার ঠোঙাটা হাতে নিয়ে শাজেদা বলে, এই বোকাই লংকা এনেছিস হাট থেকে? কেন, হাটে আর লংকা ছিল না বুঝি। এ গাম্লাখানিক বেটে তরকারিতে দিলে স্বাদ হ'বে মনে করেছিস?

আম্তা আম্তা করে মানদারটা জবাব দেয়, বাজার ত আমি করিনি—চাচা করেছে।

হরিণীর মত অপলক দু'টি চোখ তুলে শাজেদা কেবল একটিবারের মত শুধাল, চাচা করেছে? তারপর আবার সেই যৌবন-উত্তল দেহে ভাঙ-পড়া হাসিতে ভেঙে পড়ল।

আকাশ-ভরা তারার নীচেয় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল গণি শেখ। মনটা যেন উত্তেজনার ভাপে ঝল্সে যাচ্ছে। তারপর মনে মনে শত প্রশ্ন আর মনে মনেই তার শত উদ্ভট উত্তর। আমার বাজার করা ভাল লাগে না? তা' লাগ্বে কেন? মানদারটা বাজার করলে ভাল হত? আমার থেকে বেশী বোঝে ও? এত হাসাহাসি—তার কারণ? সেবে ভাব? ওযে বাড়ীর মানদার সেকথাও ভুলে গেল রাক্ষসী?

পাশের ঘরে ছেলেমেয়ে দু'টোকে পড়াচ্ছিল নইম। ওরও পড়ান বন্ধ হ'য়ে গেছে। কান পেতে শুনলেন গণি শেখ। হ্যাঁ, পড়ান বন্ধ হ'য়েই গেছে। কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এমন কিন্নরী হাসি না শুনলে চলে! এক শাজেদাকে কেন্দ্র করে সারা বাড়ীটা এ কী হ'য়ে চলেছে! মাস্টার থেকে শুরু করে চাকর পর্যন্ত। ছিঃ! আজরাইল কোথায়—আজরাইল? এসে জানটা কবজ করে নিয়ে যাক্।

না আর সহ্য করা যায় না। গিয়ে চুলের মুঠি ধরে লাথির ঘায়ে হাসি বন্ধ করতে হবে।

উঠানের ওপর কয়েকটা শব্দায়মান স্পর্ধিত পদক্ষেপ নিক্ষেপ করে রোয়াকের ওপর উঠে এলেন গণি শেখ। ঠিক সেই সময় পড়ার ঘর থেকে ছুটে এল সেলিমা। শুধাল, আমার ফ্রক এনেছ আব্বা—ফ্রক?

বাজারের জিনিসপত্র সব নীচেয় নামান ছিল। সেদিকে লক্ষ্য করে ফ্রক না দেখ্তে পেয়ে প্রায় কেঁদে উঠল সেলিমা, কই আমার ফ্রক আননি ত।

রাগে তখন কাঁপছিলেন গণি শেখ। গোটা দুই চড় কষিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, দূর হ সব চোখের সামনে থেকে। বাড়ী আস্তে না আস্তে প্যানপ্যানানি। দূর হ সব—দূর হ।

একী? মাতালের মত চেহারা! বাজারের সামনে বসে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল শাজেদা। কই, স্বামীর এ-মূর্তি সে ত কখনো এর আগে দেখেনি।

গ্রামের মোড়ল। দায়িত্ব অনেক। এই-মাত্র কাজীপাড়া থেকে সইদ এসে জানিয়ে গেল তার মেয়ের বিয়ের কথাটা। আকস্মিকভাবেই সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে। আজ রাতেই বিয়ে। যেতে হ'বে মোড়ল-সাহেবকে।

এসব কাজে গণি শেখ না করেন না। করতে পারেন না। তাঁকে যেতে হয়। আজও যাবেন সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন সইদকে।

রাত গভীর হয়। কলা গাছের মাজ-পাতায় চাঁদের আলো পড়ে চিক্চিক্ করে। বাড়ীর পাশের ঝোপ জঙ্গল থেকে রাত-জাগা পোকামাকড়ের আওয়াজ ভেসে আসে। রাত বাড়ে। আর বাড়ে গণি শেখের চিন্তা। দিনের বেলা হ'লেও তবু এত চিন্তা থাকে না। কিন্তু এ যে রাতকাল। রাতকাল নয় বিষমকাল। শাজেদাকে ছেড়ে যেতে মন সন্দেহাকুল হ'য়ে ওঠে। তবুও যেতে হয়। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে তৌফিককে ডেকে সতর্ক করে দিয়ে যান, একটু সাবধানে থাকিস সব। ঘুমিয়ে যেন মরে যাস্নে একেবারে। চোর ডাকাতের যা আমদানি আজকাল।

তৌফিক মাথা নেড়ে সতর্ক হ'য়ে থাকার সম্মতি জানায়। দোলায়িত মনে পথে নেমে পড়েন গণি শেখ। পাশের ঘরে মাস্টারটা তখনও ছেলে-মেয়েদের পড়াচ্ছে।

ঐ আর এক নতুন সমস্যা। নতুন সন্দেহ। তৌফিক। গণি শেখেরই ছোট ভাই। কলেজে পড়ে। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। থাক্বে ছুটিভোর। নতুন সন্দেহের উৎস। শাজেদাটা ওর সাথে যেভাবে মেশে। বড্ড সন্দেহ হয়। কুৎসিত চিন্তাটা বড্ড মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নইম আসে—পড়িয়ে চলে যায়। সন্দেহ কম। কিন্তু ও যে থাক্বে পুরো মাস। সারাটা দিনরাত। অথচ কিছু বল্তে পারেন না গনি শেখ। কী-ই বা বল্বেন। ছোট ভাই। কী-ই বা বলা যায়। অথচ সন্দেহটা বাড়ছে।

শেখপাড়া পেরিয়ে কখন যে মাঠের কিনারায় এসে পড়েছেন তা' খেয়ালই হয়নি গনি শেখের। এই মাঠটা পেরিয়ে তবে কাজীপাড়া। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। আকাশভরা তারা। চাঁদের কোমল আলো বিছিয়ে পড়েছে আউশ-আমনের খেতে। পথ চল্তে চল্তে অকস্মাৎ গণি শেখ বলে ওঠেন, তওবা—তওবা। ছিঃ, এসব কি চিন্তা পেয়ে বসেছে তাকে। সেকি নিজ চোখে দেখেছে তেমন কিছু? কোন দিন? কোন অসতর্ক মুহূর্তে?

অতলান্ত গভীর মন তোলপাড় হ'য়ে ওঠে। অলিগলি তল্লাস করে দেখেন ভাল করে। কই না ত। তেমন কিছু দেখেননি কোনদিন। না—দেখেননি। কেবল ঐ যা একটু হাসাহাসি। কিন্তু তাতে কি হ'য়েছে এমন। কচি মেয়ে—কচি বয়স। একটু হাসবে না। হাসুক। আহা, ওর যে এখন ফোটার সময়। জীবনের দিগন্ত শুধু রঙীন হ'য়ে উঠেছে। পথ চল্তে চল্তে হঠাৎ আবার সশব্দে গণি শেখ উচ্চারণ করেন, তওবা—তওবা।

রাস্তাটা মাঠের ওপর দিয়েই চলে গেছে। মাঝে মাঝে খেজুর আর বাব্লা গাছ হ'য়েছে রাস্তার ধারে। কেউ লাগায়নি গাছগুলোকে—আপনিই হ'য়েছে। একটা খেজুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত

খেয়াল পেয়ে বসে গণি শেখের। শাজেদার চরিত্রের যাচাই করবেন তিনি। সতী কি অসতী। যাচাই-এর অদ্ভুত পন্থা। মনে মনে প্রতীজ্ঞা করেন তিনি, এই খেজুর গাছ থেকে উই-ই বাবলার চারা পর্যন্ত যদি তিনি এক দৌড়ে এক দমে যেতে পারেন তবে শাজেদা সতী। নইলে......

আবার সেই কুৎসিত চিন্তাটা মনের মাঝে পাক দিয়ে ওঠে। আচ্ছা দেখাই যাক না একবার।

চারপাশটা একবার দেখে নেন ভাল করে। না—কেউ নেই কোথাও। দূরের বাবলা গাছটার দিকে একবার তাকান ভাল করে। তাইতো পথটা অনেকখানি দূর মনে হ'চ্ছে। পারা যাবে তো এক নিশ্বাসে পৌঁছানো। অনেকদিন দৌড়ানোর অভ্যাস নেই। না—পারা যাবে ঠিকই। কেন পারা যাবে না? সতী নারীর তেজস্বিতায় স্বামীর বহু দুর্বলতা কেটে যায়। বিবি রহিমা, বিবি হাজেরা এদের কথা যে ভোলবার নয়।

কাপড়টা সোজা করে নেন গণি শেখ। তারপর লম্বা একবুক বাতাস টেনে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেন। প্রাণপণে। বাবলা গাছের ছায়ায় তাঁকে পৌঁছুতেই হবে। জোর—আরো জোর। কিন্তু একী—বুকটা এভাবে ধড়ফড় করছে কেন? অর্ধেক পথ এসে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নেন। তারপর বুকে হাত দিয়ে সেইখানেই বসে পড়েন। হাঁফ লেগে গেছে। দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। বহুদিন পর জনবিরল নির্জন প্রান্তরে বসে সমলাগা হেঁফো রুগীর মত হাঁফাতে থাকেন গণি শেখ।

আবার সেই কুৎসিত চিন্তাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিষাক্ত সাপের মত। হ'বে না—সে যে আজ হোঁচট খেয়ে পড়ে মরেনি সেই তো তার ভাগ্য। অসৎ দুশ্চরিত্রা না হ'লে কি আর এমন হয়। যা ঢলে ঢলে গায়ে-পড়া হাসি। রূপ নয়—আগুনের কুণ্ড। এতক্ষণ হয়তো.....

না—বিয়ে-বাড়ীতে যাওয়া হ'ল না গণি শেখের। বহুক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হ'য়ে তিনি উঠে পড়লেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরলেন বাড়ীর পথে। আজ দু'টোকে যদি এক জায়গায় পান খুন করে দেবেন সাফ। এমনভাবে আর দাহন সহ্য করা যায় না।

চোরের মতই তিনি উঠানে পা দিলেন। নিঃশব্দে, সন্তর্পণে। উঁকি দিলেন এদিক-ওদিক। হ্যাঁ ঐ তো আলো জ্বলছে মাস্টারদের ঘরে। তবে কী! তবে কী!! জানালার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সর্পের চোখের মত নিষ্পলক তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন ঘরের ভিতর। না—ওখানে ত শাজেদা নেই। তৌফিক আর নইম—দু'জনা বসে কি যেন বই পড়ছে আর গল্প করছে। তবে শাজেদা কোথায়? নীল পর্দার ওখানে কী? দাঁড়িয়ে আছে কামাতুর দৃষ্টি মেলে?

সরে এসে দাঁড়ালেন আর এক জানালায়। নিজের ঘরের জানালা। হ্যাঁ, টেবিলের ওপর হারিকেনটা জ্বলছে মিটি মিটি। আর শাজেদা?

অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা আলোয় দেখতে পেলেন গণি শেখ, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের ক্লান্তিতে অতল ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেছে শাজেদা। শুভ্র কেতকীর পাঁপড়ির মত কোন অলক্ষ্যে মুড়ে গেছে চোখের পাতা দু'টো। অবিন্যস্ত হ'য়ে গেছে বেশবাস। সারা অঙ্গব্যাপী নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালার মত নব যৌবনোদ্গমের প্রবল বেগ। হারিকেনের আলোয় যেন অপরূপ দেহকান্তি ঝলমল করছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন জানে না কেউ—হঠাৎ খেয়াল হ'ল বিয়ে-বাড়ীর অনেক লোক যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে।

সোনা-গলা চাঁদের আলোর নীচে আবার এসে দাঁড়ালেন গণি শেখ। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন—তেমনি সন্তর্পণেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বাড়ীর সীমানা পেরিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি আর একবার বলে উঠলেন, তওবা, তওবা।

শব্দকল্পদ্রুম

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ত্রয়োদশ আসর

॥ কথার মানে—পূর্বপক্ষ ॥

[বারটি শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেকটি শব্দের পাশে কয়েকটি করে অর্থ দেওয়া আছে। তার মধ্যে একটি অর্থ ঠিক। যে অর্থটি নির্ভুল বলে মনে হচ্ছে সেটি দাগ দিয়ে রাখুন। নইলে একটা কাগজে লিখে রাখতেও পারেন। উত্তর অন্য পৃষ্ঠায় ছাপা আছে। সবগুলি শেষ না করে উত্তর দেখবেন না। যদি দশ বা তার বেশী প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল হয় তাহলে বুঝতে হবে বাংলা শব্দের উপর আপনার বেশ দখল আছে। আট-নটি হলেও মন্দ নয়।]

১। **বিসমিল্লা**
- (ক) ঈশ্বর
- (খ) মোল্লা
- (গ) আরম্ভ
- (ঘ) নমস্কার

২। **ব্যবচ্ছেদ**
- (ক) দূরত্ব
- (খ) বিতরণ
- (গ) বিভাগ
- (ঘ) আবরণ

৩। **মঞ্জীর**
- (ক) রক্তবর্ণ লতাবিশেষ
- (খ) সুন্দর
- (গ) ফুলের কুঁড়ি
- (ঘ) নূপুর

৪। **হরিতাল**
- (ক) হেঁতাল গাছ
- (খ) সেঁকো গন্ধক ঘটিত দ্রব্যবিশেষ
- (গ) হরীতকী
- (ঘ) বহুতলবিশিষ্ট প্রাসাদ

৫। **স্বাতী**
- (ক) সঙ্গী, সহচর
- (খ) নক্ষত্র বিশেষ
- (গ) দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দানের মন্ত্র
- (ঘ) বজ্রচিহ্ন

৬। **স্কন্দ**
- (ক) কার্তিকেয়
- (খ) ষাঁড়ের ঝুঁটি
- (গ) স্কন্ধের পঞ্চমাংশ
- (ঘ) ফলাকার উদ্ভিদাংশ

৭। **সেঁতানো**
- (ক) সিক্তপ্রায় হওয়া
- (খ) উচিতমত শিক্ষা দেওয়া
- (গ) সহযাত্রী হওয়া
- (ঘ) প্রবেশ করা

৮। **সিরিশ**
- (ক) আঠাবিশেষ
- (খ) পুষ্পবিশেষ
- (গ) মহাদেব
- (ঘ) নারায়ণ

৯। **শ্লিষ্ট**
- (ক) শ্লেষ্মাযুক্ত
- (খ) দ্ব্যর্থবাচক
- (গ) পরিত্যক্ত
- (ঘ) সুশীল

১০। **মোহরম**
- (ক) নূতন খাতা পত্তন
- (খ) নববর্ষ
- (গ) গৃহপ্রবেশ
- (ঘ) মহরম পর্ব

১১। **লোকায়ত**
- (ক) অলৌকিক
- (খ) সর্বজনীন
- (গ) সামাজিক
- (ঘ) নাস্তিক

১২। **রসকলি**
- (ক) চিনির রসে পাক করা নারিকেলের লাড়ু
- (খ) রসিকা
- (গ) মালাচন্দন
- (ঘ) তিলক

॥ ব্রিটিশ পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধি ॥

ব্রিটেনের বই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই বিক্রি হয় প্রচুর পরিমাণে। ১৯৫৯ সালের মধ্যে এই কাগজের মলাট বইগুলি ১৯৫৩ সালের পর তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭০,০০০,০০০ খণ্ডের মত। এই কাগজের মলাট-দেওয়া বইগুলি কেবলমাত্র গল্প উপন্যাসই নয়, বিজ্ঞান, শিল্প, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি এমনকি পাঠ্য-পুস্তকও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৫৫-৫৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশকগণ গড়-পড়তা ২০,৫০০-র বেশি বই প্রকাশ করেন। পুরনো বইয়ের নতুন সংস্করণের সংখ্যা প্রায় ৫,৭০০। বর্তমানে প্রায় ১,২০০ প্রকাশন প্রতিষ্ঠান বৎসরে নতুন বই বের করছেন ২০,০০০-এর থেকেও বেশি। আর ব্রিটিশ বইয়ের রপ্তানির পরিমাণ বর্তমানে বৎসরে ১৬০,০০০,০০০ খণ্ডের থেকেও বেশি।

॥ নতুন সংসার ॥

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী ফ্রান্সিস ব্রাডস্লি পত্নীকে হারিয়ে বিশেষ নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন। এমন সময় তার আলাপ হল শ্রীমতী হেলেন নর্থ নামক ৩১ বৎসর বয়স্কা একজন মহিলার সঙ্গে। শ্রীব্রাডস্লির বয়স ৪৫ বৎসর। শ্রীমতী হেলেনের স্বামী কিছুদিন আগে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। আটটি সন্তান-সন্ততি নিয়ে তিনি বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়েন। এমন সময় শ্রীব্রাডস্লির নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। তাদের বিয়ে হল। এবং সে বিয়ে বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলেই মনে হয়।

ফ্রান্সিসের নতুন সংসার উঠে এল তার পুরনো বাড়ীতে। ফ্রান্সিসের দশটি সন্তানের সঙ্গে এসে যোগ দিল তার নতুন বউয়ের আটটি সন্তান। এই নতুন সংসারটির হাল-চালের খবর খুবই চমৎকার এবং আনন্দদায়ক। কিন্তু এই নতুন সংসারে আরও নতুন অতিথির আগমন নিশ্চয়ই সুখকর বলে মনে হয় না। অবশ্য তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মিঃ ও মিসেস ব্রাডস্লির ওপর। তাদের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা হয়ত যে কোন পরিস্থিতি স্বীকার করে নিতে পারবে।

॥ স্টেশন নীলাম ॥

"দেনার দায়ে নীলাম"--বাংলা দেশের ছেলে-বুড়ো সকলেই এ শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত। যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ার খবরও আমাদের কাছে নতুন নয়। দরজা-জানলা মায় গোটা বাড়ী, থালা-বাটি-কলসী সবই দেনার দায়ে নীলাম হতে শোনা গেছে। কিন্তু স্টেশন নীলামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এই প্রথম।

ঘটনাটা ঘটেছে আমাদের এই বাংলা-দেশের চন্দননগরে। চন্দননগরের স্টেশন মাষ্টার মশায় তো তাঁর ৩২ বছরের চাকুরী-জীবনে এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হননি। এবারেই প্রথম তিনি মুষড়ে পড়লেন। চন্দননগরের আলু ব্যবসায়ী শ্রীসুজয়চন্দ্র ঘোষ আদালতের পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তিনি "ইস্টার্ন রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজারে"র বিরুদ্ধে ৫৩৫৫ টাকা ১৮ নয়া পয়সার ডিক্রি পেয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষের সঙ্গে আদালতের নাজির ও পেয়াদা। স্টেশন মাষ্টার এ টাকা না দিলে তিনি স্টেশনের সম্পত্তির উপযুক্ত পরিমাণ নীলাম করে তাঁর টাকা তুলে নেবেন। মজা দেখতে এসে ভীড় জমাল শ'দুয়েক লোক। নাজিরের পরামর্শে মাষ্টার মশায় পূর্ব রেলের পক্ষে জামিনদার হয়ে দাঁড়ালে ডিক্রিদার তখনকার মত তাঁকে নিষ্কৃতি দেন। বলা যায় না হয়ত একদিন এ ঘটনা সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। আবার নিছক এমন একটি প্রহসনও হতে পারে।

॥ হাওয়াই মোটর গাড়ী ॥

দিল্লীর আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে এমন সমস্ত অদ্ভুত জিনিস রয়েছে যা দর্শকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এদের মধ্যে সব থেকে আশ্চর্য জিনিস মার্কিনী হাওয়াই মোটর গাড়ী। ডাঃ বারটেলসেন নামক জনৈক চিকিৎসক এই গাড়ীর উদ্ভাবক। অবশ্য গাড়ীটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ এখনও শেষ হয়নি। গাড়ীটি চালু হলে পরিবহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। গাড়ীটির নীচের দিকে বহু ব্লেডযুক্ত কতকগুলি পাখা আছে। এই সমস্ত পাখায় সৃষ্ট বায়ু-প্রবাহের ওপর ভর দিয়ে গাড়ীটি চলে। মাটির এক ফুট ওপর দিয়ে এর গতিপথ। আর গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল পর্যন্ত।
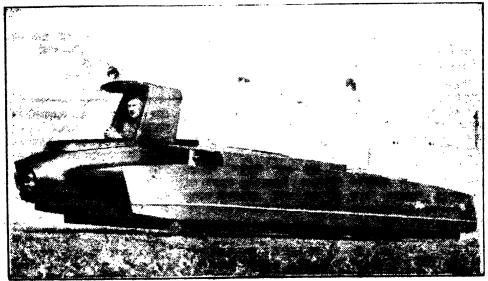
হাওয়াই মোটর

দেশে বিদেশে

॥ প্রত্যাবর্তন ॥

ফিরে এলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিন মহাদেশ ছুঁয়ে, চার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও যুগ্ম-বিবৃতি প্রকাশ করে। দেশে ফিরে এসেই আবার নয়াদিল্লীতে সম্বর্ধনা জানালেন প্রাচ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে। বিশ্বশান্তির জন্যে বিরাম নেই শ্রীনেহরুর। দেশে-বিদেশে নাকি নামও ছড়িয়েছে তাঁর শান্তির দূত বলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, ঘরে ফিরতেই দেশের লোকের পর্বত-প্রমান অভিযোগ শুনতে হল তাঁকে লোকসভার অধিবেশনে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, জিনিসপত্রের আগুন দর,—এসব মামুলি অভিযোগ ত আছেই, তার সঙ্গে আছে পড়োশী প্রতিবেশীদের প্রতিকারহীন অসংখ্য উৎপাতের কথা।—পাকিস্থান কর্ণেল ভট্টাচার্যকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আট বছর জেল দিয়েছে কোন বাধা না পেয়ে কমিউনিষ্ট চীন লাডাকের ভেতরে আরও খানিকটা ঢুকে পড়েছে, গোয়ায় ভারতীয়দের ওপর পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ধোঁয়া সারা দেশের আবহাওয়াকে আবার কলুষিত করে তুলেছে, ইত্যাদি। সংবাদে প্রকাশ, শ্রীনেহরু নাকি এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় খুবই অস্বস্তিবোধ করেছিলেন।

এই অস্বস্তিটাই স্বাভাবিক এক্ষেত্রে। পাড়া প্রতিবেশীর দোল-দুর্গোৎসব থেকে শুরু করে মেয়ের বিয়ে মড়াপোড়ানো প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় যাদের তাদেরও বাড়ী ফিরলে শুনতে হয় ঘরে চাল নেই, ছেলেটার অসুখ, পাওনাদারের তাগাদা বা বুড়ো বাপের হাঁপের টান বাড়ার কথা। অভিযোগের ফর্দ শুনে একটু অস্বস্তি তাদেরও হয় কিন্তু তাই বলে কি পরোপকার বন্ধ হয় তাদের? করলে লোকে বলবে কি, আর পাড়ার কাজকর্মই বা চলবে কেমন করে?

॥ ১৯৫৯ ॥

কোন সন তারিখের কথা নয়, ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যের কুড়ি মাসের আত্মহত্যার হিসাব। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে এই বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেরালায় আত্মহত্যা করেছে ১৯৫৯ জন! বিধানসভায় সংবাদটি প্রকাশকালে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বেকারী, দারিদ্র্য, ঋণ, পরীক্ষা ও প্রেমে ব্যর্থতা ঐ সকল আত্মহত্যার প্রধান কারণ।

॥ দণ্ডকারণ্য ॥

দণ্ডকারণ্য বাঙালীর হাতছাড়া হতে চলেছে। বন কেটে বসত করার অসুবিধা সীমাহীন, দণ্ডকারণ্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু তাই বলে সম্মান নিয়ে বাঁচার সুযোগ পেয়েও যদি আমরা তা হেলায় প্রত্যাখ্যান করি তবে তার ফলভোগ আমাদেরই করতে হবে। পঁয়ত্রিশ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে দণ্ডকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এত প্রচার, অনুরোধ, উপরোধ এমনকি ধমক সত্ত্বেও মাত্র দুহাজার পরিবারকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ফলে স্বভাবতই ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ মহলে এখন কথা উঠেছে, বাঙালী উদ্বাস্তুরা যদি দণ্ডকে নাই যায় তবে পশ্চিম পাকিস্থানের অবাঙালী উদ্বাস্তুদের সেখানে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, সিন্ধী, পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা যদি একবারের জন্যেও দণ্ডকে প্রবেশের সুযোগ পায় তবে তার সদ্ব্যবহার করতে তারা এতটুকুও বিলম্ব করবে না।

দণ্ডকের পুনর্বাসন ব্যবস্থার ত্রুটি দেখিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করা যায়। কিন্তু তবুও শত অসুবিধার মাঝেও সিন্ধী পাঞ্জাবীরা সেখানে দলে দলে ছুটে যায় আর বাঙালীরা যায় না কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইকথাই বলতে হয় যে, একদিন পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া বাঙালী আজ তার জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে।

॥ সন্তানে নিষ্ঠুর ॥

অতি ক্রোধী বাপ-মায়েদের জন্যে একটি সংবাদ।—এক দুর্ঘটনায় পড়ে বাড়ীর মোটর সাইকেলখানা ভেঙ্গে ফেলেছিল উত্তর ইতালীর ত্রিমেসিন শহরের জোসেপ রোসি নামে একটি ১৮ বছরের ছেলে। কিন্তু অত্যন্ত ক্রোধী বাপমাকে সে কথা বলার সাহস তার ছিল না, তাই ঐ রাত্রিতেই সে এক কল্পনাতীত রোমহর্ষক কাণ্ড করে বসল। তার বাবা মা আর তিন বছরের ছোটবোন ঘুমোচ্ছিল যে ঘরে সেই ঘরে নিঃশব্দে ঢুকে তিনজনকেই সে গলা টিপে হত্যা করল।

জোসেপ এখন কারারুদ্ধ, বিচারধীন।

॥ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামান ॥

আমেরিকার সাতজন শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ ঐ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষামান সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জনের রীডিং পড়ার যোগ্যতার অভাব তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ শতাংশের অযোগ্যতা কল্পনাতীত। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অফ ফ্যাকাল্টিজ জ্যাক বার্জুন রিপোর্টের ভূমিকায় বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর বাছাই করা ছেলেদের মধ্যেও আমি দেখেছি, প্রতি দশজনের মধ্যে অন্তত একজনের বানান, বাক্যরচনা, যতিচিহ্ন, উচ্চারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানও নেই। বহু ছাত্র আছে যারা পড়তে পারে না বলে লিখতেও পারে না।—'বার্জুন বলেছেন, গত তিরিশ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামান যে কত নিচে নেমে এসেছে তা ঠিকমত জানলে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় এই মারাত্মক ত্রুটির কারণ আলোচনা করে নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশনের অধ্যাপক জন ড্যানিয়েল ও হান্টার ডিক বলেছেন, স্কুলের প্রাথমিক ক্লাসগুলিতে

আজকাল অক্ষর-জ্ঞান করানো হয় না। গোড়াতেই তাদের মুখে মুখে বড় বড় কথা শিখিয়ে অভিভাবকদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। এইকারণেই পরে বড় হয়েও তাদের প্রাথমিক শিক্ষাটুকুর অভাব থেকে যায়।

॥ অধঃপতন ॥

আরও মারাত্মক সংবাদ পাওয়া গেছে, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে। ঐ কলেজের পাক্ষিক পত্রিকা 'পি'র (Pi) সম্পাদকীয়তে অতি ক্ষোভের সঙ্গে বলা হয়েছে, কলেজের প্রতি পাঁচটি ছেলের মধ্যে একটি ছেলে চোর। কারণ, এবছরের সেশন শুরু হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ কলেজের ভোজনালয় থেকে চুরি হয়েছে ১৩১টি চায়ের চামচ, ৮৬টি ছুরি, ২৮৬টি গ্লাস। তার আগের চুরি ধরলে মোট গ্লাস চুরি হয়েছে ৯০০টি।

পত্রিকার মন্তব্যে বলা হয়েছে, এই হারে যদি চুরি চলতে থাকে তবে সারা বছরে অন্তত দেড় হাজার পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ খোয়া যাবে। যার মানে হল, কলেজের সমগ্র সাহায্যের টাকাটাই এই অপহরণব্যাধিবিশিষ্ট ছাত্রদের কুকীর্তির খেসারত দিতে ব্যয় হয়ে যাবে। চৌর্যের পেছনে যদি অন্য কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ না থাকে তবে বুঝতে হবে, ইউনিয়নের প্রতি পাঁচজন লোকের মধ্যে অন্তত একজন চোর।

॥ দেড়শ' বছর পরে ॥

নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর সেন্ট হেলেনার বন্দীনিবাস যখন বন্ধ হল, তখন সেই বন্দীনিবাসের রক্ষী কর্পোরাল উইলিয়াম গ্লাস আর দেশে ফিরতে চাইলেন না। বৃটিশ সরকারের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন, কোন একটি নির্জন দ্বীপে জীবনের বাকি কটা দিন তাঁকে সপরিবারে থাকতে দেওয়া হোক। —সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল, বৃটিশ সরকার কর্পোরালকে ট্রিস্টান ডি কুনহা দ্বীপে বসবাসের অনুমতি দিলেন। কর্পোরালও হৃষ্ট চিত্তে তাঁর পরিবারের লোকজন ও সেন্ট হেলেনার দুই পাথর-মিস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন ঐ জনহীন দ্বীপে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন থেকে প্রায় দু'হাজার মাইল পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে আগ্নেয়গিরির উদ্গারে গড়ে ওঠা তিনটি ছোট দ্বীপের সমন্বয় ট্রিস্টান ডি কুনহা। ১৫০৬ সালে ট্রিস্টান ডি কুনহা নামে এক পর্তুগীজ নাবিক দ্বীপগুলিকে খুঁজে বার করেছিলেন বলে তাঁরই নামে তাদের পরিচয়। তবে তারপর তিনশ' বছরের মধ্যে একজন মানুষও সে দ্বীপে যায়নি। শেষে ১৮১৬ সালে বৃটেন দ্বীপকটিকে অধিকারে আনে সেন্ট হেলেনার বন্দীনিবাসকে নিরাপদ করার প্রয়োজনে। অবশ্য সেন্ট হেলেনা থেকেও দ্বীপগুলির দূরত্ব প্রায় পাঁচশ' মাইল। চারটি দ্বীপে মোট বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য জায়গার পরিমাণ বারো বর্গমাইল। বাকি অংশ পর্বতসংকুল।

অনাদিকালের নীরব দ্বীপ প্রথম মুখর হল কর্পোরাল ও তাঁর সঙ্গীদের আগমনে। তারপর প্রায় এক'শ বছর আগে এক জাহাজডুবির কয়েকজন বিপন্নযাত্রী সাঁতরে এসে আশ্রয় নেয় ঐ দ্বীপে। সেই মুষ্টিমেয় অধিবাসীর সংখ্যাই শতাধিক বছরে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬৩ জন। দ্বীপের সব লোক একটিমাত্র গ্রামেই বাস করত, ওদের মধ্যে পারিবারিক উপাধি ছিল মোটে সাতটি। ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন, মোটর প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণাই ওদের ছিল না। মোট তিরিশ একর জমিতে ওরা চাষ করত, হাঁস মোষ মুরগি পুষত, তাতেই সুখে দিন কেটে যেত ওদের। কতবার ওদের দ্বীপ ত্যাগ করে চলে আসতে বলা হয়েছিল কিন্তু আসেনি; নীল আকাশ ঢাকা অপার সমুদ্রের বুকে ছোট্ট কটি সবুজ দ্বীপের স্বপ্নমায়ায় তারা দুই শতাব্দী ধরে বিভোর হয়েছিল।

কিন্তু প্রকৃতির রোষ আবার ঘরছাড়া করেছে তাদের। কয়েক শতাব্দী ধরে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে উঠে ঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করেছে ঐ ২৬৩টি মানুষকে। বৃটিশ জাহাজে চেপে তারা চলে এসেছে বৃটেনে আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে আধুনিক সভ্যতার রূপ দেখে। পাকা রাস্তাই তারা দেখেনি কখনো, দেখেনি পুলিশ, পোস্টঅফিস। এমন কি পয়সার ব্যবহার তারা ভাল করে জানে না। আর তাদের দৃষ্টির সম্মুখেই আজ হঠাৎ উদ্ঘাটিত হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের নয়নাভিরাম লীলা। বৃটেনের পুলিশকে এখন সবচেয়ে বেশী হয়রান হতে হচ্ছে প্রকৃতি-পালিত ঐ মানুষকটিকে নিয়ম মেনে পথ চলা শেখাতে। রিপ্ ভ্যান উইংকলের ঘুম ভেঙেছিল কুড়ি বছর বাদে, আর এদের ভেঙেছে দেড় শ বছর পরে। তাই ওদের বিস্ময়ের সীমা নেই। কিন্তু তবুও ইতিমধ্যেই ওরা অস্থির করে তুলেছে কাজ দেওয়ার জন্যে, কারণ বসে থাকার অভ্যাস ওদের নেই।

বৃটিশ সরকার ওদের কাছে প্রস্তাব করেছেন, স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে ট্রিস্টানোর মতই একটি দ্বীপ শেটল্যাণ্ডে গিয়ে নতুন করে বসতি গড়ে তুলতে, ট্রিস্টানো থেকে যার দূরত্ব সাত হাজার মাইল। কিন্তু সে প্রস্তাব ওদের মনঃপুত নয়, ওরা আবার ট্রিস্টানোতেই ফিরে যেতে চায়। ওদের নেতা রিপোর্টে বলছেন বারবার করে, যদি সম্ভব হয় তবে কালই আমার লোকজনদের নিয়ে আমি ট্রিস্টানোয় ফিরে যাব।

॥ নিরুদ্দেশ ॥

দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন। একজন আমেরিকার, একজন সিংহলের। আমেরিকায় নিরুদ্দেশ হয়েছেন নিউইয়র্কের গভর্ণর অসংখ্যপতি রকফেলারের পুত্র মাইকেল রকফেলার। গত রবিবার ডাচ নিউগিনির উপকূলে নৌকাডুবির পর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, জল স্থল অন্তরীক্ষ তোলপাড় করেও।

অপর নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন সংসদের উপ-অধ্যক্ষ, এক সিংহলী মিশনের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন ভারত সফরে। আকাশ বাণী থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানেই তাঁর সন্ধান পাওয়া যাক না কেন, অবশ্যই যেন তাঁর সঙ্গে সিংহলী মিশনের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।

॥ লোকান্তর ॥

অবিভক্ত বাঙলার প্রাক্তন মন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহরায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। এই বিশিষ্ট শিল্পপতি কলিকাতার শেরিফ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৯২১ সাল থেকে তিনি নানাবিধ সরকারী ও বে-সরকারী কাজে লিপ্ত ছিলেন।

ঘটনাপ্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৬ই নভেম্বর—৩০শে কার্তিক : মাষ্টার তারা সিংকে শিরোমণি অকালী দলের সভাপতি পদ হইতে গদিচ্যুত করার ব্যবস্থা—গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির ৯৯ জন সদস্যের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর—তারা সিং কর্তৃক অকালী ওয়ার্কিং কমিটির তিনজন সদস্য সসপেন্ড।

কলিকাতায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ হায়াতো ইকোদা সম্বর্ধিত।

১৭ই নভেম্বর—১লা অগ্রহায়ণ : ভারতের জন্য ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (সাড়ে পাঁচ কোটি ডলার) মার্কিন সাহায্য—দুই দেশের মধ্যে ৪টি চুক্তি সম্পাদনের ঘোষণা।

শিখদের অভিযোগ তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত দাশ কমিশন (শ্রী এস্ আর দাশের নেতৃত্বাধীন) সম্পর্কে মাষ্টার তারা সিং-এর বিরূপ মনোভাব—অপর একটি কমিশন নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ।

১৮ই নভেম্বর—২রা অগ্রহায়ণ : কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন—নয়াদিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত ত্রিপুরা, মণিপুর ও হিমাচল প্রদেশের কর্মকর্তাদের বৈঠক।

পাঞ্জাবী সুবার প্রশ্নে অকালীদের আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্প—২২ দফা বক্তব্য সম্বলিত ইস্তাহার প্রচার।

১৯শে নভেম্বর—৩রা অগ্রহায়ণ : পঞ্চ-বার্ষিক যোজনার অভিজ্ঞতার আলোকে পনেরোসালা যোজনা রচনা—ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যম—মহাজাতি সদনের (কলিকাতা) আলোচনা-চক্রে শ্রীশ্রীমন্ নারায়ণের (পরিকল্পনা কমিশন সদস্য) ঘোষণা।

২০শে নভেম্বর—৪ঠা অগ্রহায়ণ : লাডাক সীমান্তে চীনা বাহিনীর আরও ভূমি-গ্রাস : নূতন এলাকায় পরীক্ষা-চৌকী স্থাপন'—লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক তথ্য পেশ।

আসামের বাঙালী যুবকদের পদব্রজে নয়াদিল্লী অভিযান—নেতৃবৃন্দ সকাশে প্রকৃত পরিস্থিতি উত্থাপনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

দিল্লীতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইকেদার বিপুল সম্বর্ধনা—রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় মৈত্রী-পূর্ণ ভাষণ।

২১শে নভেম্বর—৫ই অগ্রহায়ণ : নূতন চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রীঅজয় ঘোষের (ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক) প্রতিবাদ—দিল্লীতে বিবৃতি প্রসঙ্গে অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধের দাবী।

কেরলে কংগ্রেস - পি-এস-পি বিরোধের অবসান।

৩রা ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাশিয়ার প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গাগারিণের পৌর সম্বর্ধনা—কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্ত।

২২শে নভেম্বর—৬ই অগ্রহায়ণ : আগামী নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীবৃন্দ—দিল্লীতে শ্রীনেহরুর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির (কংগ্রেস) বৈঠকে তালিকা চূড়ান্তরূপে নির্ধারণ।

ভারত ও জাপানের মধ্যে অধিকতর বোঝাপড়ায় আস্থা প্রকাশ—নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে জাপ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইকোদার ঘোষণা—শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা ফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

॥ বাইরে ॥

১৬ই নভেম্বর—৩০শে কার্তিক : কিভুতে (কঙ্গো) রাষ্ট্রসংঘের ১৩ জন ইতালীয় বৈমানিককে হত্যা—বিদ্রোহী কঙ্গোলী সৈন্যদল কর্তৃক নদীতে মৃতদেহ নিক্ষেপ।

"নিরস্ত্রীকৃত না হইলে বিধ্বংসী আণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি লইতে হইবে"—মেক্সিকোয় সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী—গোয়ার মুক্তির প্রশ্নে প্রয়োজনে 'অন্য ব্যবস্থা' অবলম্বনের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

১৭ই নভেম্বর—১লা অগ্রহায়ণ : রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক কিন্দুর (কিভূর অন্তর্গত) চারিপাশের সমস্ত বিমানঘাটি বন্ধ—বিদ্রোহী কঙ্গোলী সৈন্যদের ঘিরিয়া নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিরক্ষায় আমেরিকার দৃঢ় সংকল্প—ডীন রাস্কের (মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব) বিবৃতিতে পরিকল্পনা ঘোষিত।

১৮ই নভেম্বর—২রা অগ্রহায়ণ : 'রাশিয়ার ১০০ মেগাটন আণবিক বোমার সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনাতীত'—সোভিয়েত সমর নেতাদের ঘোষণা।

'বার্লিন সমস্যা মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছে'—আমেরিকা সফরান্তে ভারত ফিরিবার পথে শ্রীনেহরুর উক্তি।

১৯শে নভেম্বর—৩রা অগ্রহায়ণ : কায়রোতে নাসের (আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট) ও টিটোর (যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট) সহিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘরোয়া বৈঠক—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ-স্থায়ী আলোচনা—বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ।

ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা—চার-খানা মার্কিন রণতরীর রাজধানীর অদূরে উপস্থিতি।

উত্তর কাতাঙ্গার এলাবার্ট-ভিল অঞ্চল কঙ্গোলী সৈন্যদল কর্তৃক দখল।

২০শে নভেম্বর—৪ঠা অগ্রহায়ণ : রাষ্ট্রসংঘ বৎসর ঘোষণার জন্য শ্রীনেহরুর উপস্থাপিত প্রস্তাব—সাধারণ পরিষদের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সানন্দ সমর্থন।

২১শে নভেম্বর—৫ই অগ্রহায়ণ : পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখার আলোচনা (জেনেভায়) পুনরারম্ভে রাশিয়ার সম্মতি—ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ প্রস্তাবের উত্তর দান।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের নিবিড় আলোচনা।

২২শে নভেম্বর—৬ই অগ্রহায়ণ : বার্লিন সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত আলোচনার প্রশ্নে মূল নীতি সম্পর্কে পশ্চিম জার্মাণ চান্সেলার আদেনয়েরের সহিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির মতৈক্য—ওয়াশিংটনে উভয় নেতার মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান।

ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে সম্ভাব্য মার্কিন হস্তক্ষেপের নিন্দা—রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কিউবার অভিযোগ সম্পর্কে বিতর্ক।

অভয়ংকর

॥ জনতা ও জীবন ॥

সোভিয়েট সাহিত্যে ইলাইয়া এরেণবুর্গ এক অবিস্মরণীয় নাম। এই উপন্যাসকারকে সমালোচকরা রঞ্জনরশ্মির তীব্র আলোকসম্পাতে বিচার করে বারবার দেখেছেন শিল্প ও শৈলীর ক্ষেত্রে তিনি কতখানি সার্থক। মানুষ হিসাবেও যে এরেণবুর্গ কতখানি মনোহর, আর তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবন যে কত মধুর তা জানা প্রয়োজন। দলের নেতৃস্থানীয় যাঁরা তাঁদের রুচি সম্পর্কে মন্তব্য করতে তাঁর বাধে না, অথচ তাঁর সংগে যাঁদের মতান্তর তাঁরা কেউ সংঘর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করেননি। এরেণবুর্গের সার্বভৌমিক দৃষ্টিভঙ্গী সুপরিচিত কিন্তু সার্বভৌমিক নীতিবিরোধী আঁদে ঝদানভের কোপানলে তিনি ভস্মীভূত হননি।

এরেণবুর্গের জীবনযুদ্ধের কৌশল মাত্র একটি, সেই কৌশলের নাম তাঁর পরিমিতিবোধ, সময় জ্ঞান এবং তাঁর এই জ্ঞান প্রায় অলৌকিক। তিনি জানেন কখন কথা বলতে হয় আর কখন কথা বন্ধ করে মৌনী থাকতে হয়, আর কালের হাওয়া বুঝে কোন কথা উপযুক্ত এবং উচিত বিবেচনা করে বলতে হয়। যুদ্ধোত্তর বিদগ্ধ ইহুদী জনের নিপীড়নের কালে তিনি অতিশয় অস্বস্তিবোধ করলেও নির্বাক ছিলেন। ব্যক্তিগত আলোচনায় কিছুসংখ্যক কবি এবং শিল্পীকে তিনি প্রশংসা করেছেন, তাঁর স্বদেশে এরা Formalist হিসাবে নিন্দিত এবং এইসব তথাকথিত ফর্মালিস্টকে যখন তাঁর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তখন তিনি তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেননি।

দলের অধিপতিদের তিনি প্রায়ই বিরক্ত করেছেন, উত্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেই ব্যাপারেও তাঁর নিজস্ব মাপকাঠিতে যেটুকু নিরাপদ সীমানা বলে তাঁর ধারণা ছিল কখনো তা অতিক্রম করেননি। তিনি বলেছেন সকল লেখককেই বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্বাধীনতা দেওয়া হোক। আর এই আবেদন যখন তিনি জানিয়েছেন তার সংগে আর একটি লাইন যোগ করেছেন, আর সেই লাইনেই তিনি দল থেকে লেখককে যে নির্দেশ দান করা হয়েছে তার জন্য উচ্চ প্রশংসা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনী People and Life নামক গ্রন্থপ্রকাশেও ইলাইয়া এরেণবুর্গ আবার সেই অপূর্ব সময়জ্ঞানের পরিচয়দান করেছেন। ঝড়ের মুখে যৌবনদিনের বুভুক্ষা-বিড়ম্বিত কাহিনী সম্পর্কে কিছু লেখা নিরাপদ ছিল না, সেইকাল তাঁর প্যারী শহরে কেটেছে, কিংবা ম্যাকস্ জ্যাকব কি ইতালিয়ান শিল্পী মদিলিহানী সম্পর্কেও কিছু বলা যেত না, কারণ এরেণবুর্গের স্বদেশে তখন এঁদের একটি মাত্র পরিচয় যে তাঁরা 'degenarate'—এখন কিন্তু অনুকূল পবন প্রবাহিত তাই এখন ফেলে-আসা অতীত সম্পর্কে কিছু বলা নিরাপত্তার দিক থেকে অসংগত নয়, এখন সোনার অতীত সম্পর্কে সত্যকথনে বাধা নেই। এই আত্মজীবনীর কাহিনী আগাগোড়া ছোটখাটো ঘটনার বিবরণে পরিপূর্ণ, সর্বদা যে এইসব গল্পাংশ সহজ ভংগীতে এগিয়েছে তা নয়, বরং কিঞ্চিৎ অসংলগ্ন গতিতেই লিপিবদ্ধ। তাতে কিন্তু কিছুই এসে যায় না, কারণ এই আত্মজীবনীতে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্যারীতে যে উদ্দাম ও দুরন্ত-যৌবনের দিনগুলি তিনি যাপন করেছেন তার বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরেণবুর্গ সেই যৌবনদিনে যেসব কবিতা লিখেছেন, সেই সব কবিতা তাঁর এখনকার মতানুসারে নিছক বালসুলভ। কবিতা লিখলেও তাঁর অন্তরঙ্গ মেলামেশা ছিল পিকাসো, লীজার, এপোলিনেয়ার, সুতিনে, ম্যাকস্ জ্যাকব, মদিলিহানী এবং আরো কয়েকজন কবি এবং শিল্পীদের সংগে।

এরেণবুর্গ তখনও পায়ের তলার মাটি খুঁজে পাননি, কিন্তু তখনই তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরস্পরবিরোধী ভাব জেগেছে, আর এই মনোভঙ্গী উত্তরকালে দলীয় কঠোরতা এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন :

"There are white nights when it is difficult to determine the source of the light that excites and disturbs, prevents one from sleeping, favours lovers. Is it evening twilight or dawn? In nature this mingling of light does not last long. Half an hour, an hour. But history is in no hurry. I grew up in a duel light and have lived in all my life, into my old age."

আজও কি তিনি জেনেছেন এখন ঊষা কি গোধূলি? কিংবা সত্যই কি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে?

এই আত্মকথায় nostalgia বা ঘরকুনো স্মৃতির প্রাচুর্য অত্যধিক, কিন্তু তার মাধুর্য অপরিসীম। অনেক কবি এবং চিত্রশিল্পীর যে অন্তরঙ্গ পরিচয় People and Life-এর মধ্যে পাওয়া যায় তার মূল্য কম নয়। এঁদের এরেণবুর্গ ভালোবাসতেন, তাদের কাছে ভালোবাসা পেয়েছেনও নিবিড়ভাবে।

তাঁর এই অন্তরংগ রেখাংকনে মদিলিহানীর সম্পর্কে যে কথা আছে তা মর্মস্পর্শী, যথা :

"All his portraits are like his models — but what is extraordinary is that Modigliani's models resemble each other; it is not a matter of assumed style — but of the artists view of the world. Zborowski with the face of a good natured sheep-dog, the lost Soutine, the tender Teanne in her suift, an old man, a model. Somebody with a moustache; all are hurt children — I believe that the world seemed to Modigliani like an enormous Kindergarten run by v unkind adults."

মদিলিহানীর শোচনীয় জীবনাবসানের কথা যাঁরা জানেন এবং তাঁর শিল্পকৃতির সংগে যাঁরা পরিচিত তাঁরা এরেণবুর্গের এই রেখাচিত্রে এক সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল বন্ধুর হৃদয়ের স্পর্শলাভ করবেন।

এই গ্রন্থে আবার হালকা হাসির ঢেউ আছে, অনেক গল্প চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে পিকাসো এবং লেলিনগ্রাদের এক চিত্রকরের কথোপকথন কৌতুকপ্রদ। যথা :

"পিকাসো—এখানে কি রঙ বিক্রি হয়?

শিল্পী—নিশ্চয়ই, যত আপনি চান পাবেন।

পিকাসো—কি আকারে পাওয়া যায়?

শিল্পী (সবিস্ময়ে)—কেন টিউবে!

পিকাসো—টিউবের গায়ে কি লেখা থাকে?

শিল্পী (অধিকতর বিস্ময়ে)—কেন, সেই রঙের পরিচয় থাকে? যেমন সুবর্ণ-গৈরিক, নীল, সবুজ, বাদামী—ইত্যাদি।

পিকাসো—রঙের উৎপাদন এখানে বুদ্ধিগ্রাহ্য করা উচিত। টিউবের গায়ে শুধু লেখা থাকবে, 'মুখের জন্য,' 'চুলের জন্য', 'সামরিক পোশাকের জন্য' ইত্যাদি। সেই ত' অধিকতর ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচায়ক।"

দশ বছর আগে হলে এই রসিকতার উল্লেখ করতে ইলাইয়া এরেণবুর্গকে অন্ততঃ দশবার চিন্তা করতে হত। এরেণবুর্গ ভাগ্যবান, কারণ তিনি সেই-কাল পর্যন্ত জীবিত আছেন যেকালে এসব কথা লেখা নিরাপদ, একথা নির্বিঘ্নে নিরাপদে লেখা চলে। এরেণ-বুর্গ অবশ্যই আজ বিষাদগ্রস্ত, তাঁর যেসব বন্ধু সেইকালেই এসব কথা বলেছেন তাঁদের অকালমৃত্যুর কথা তাঁকে দংশন করছে।

এরেণবুর্গ এই গ্রন্থে মুক্ত ছন্দে মনের কথা লিখেছেন। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আর গ্রন্থশেষে যখন লেখক পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি স্বয়ং কম্যুনিস্ট এবং সোভিয়েট নাগরিক তখন বিস্ময়ের ও পুলকের আর সীমা থাকে না।

প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ংকর বিভীষিকার কথা উল্লেখ করেই এরেণবুর্গ বলেছেন যে তিনি র‍্যাকস্‌লাও, স্টকহোল্‌ম এবং অন্যত্র শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন এবং আজীবন শান্তি কামনায় সংগ্রাম করে চলেছেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর এরেণবুর্গের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে 'The Thaw' এবং 'The Spring'। এই স্মৃতিকথা পাঠ করে পাঠক তাই ঝড়ের শেষে বসন্তের আভাস পাবেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পনের বছর বয়সে ইলাইয়া এরেণবুর্গ বিপ্লবের কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে কারারুদ্ধ হন তারপর কয়েক মাস জেলে কাটিয়ে নির্বা-সনের জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। সেইকালেই প্যারী শহরের 'মোতপেস্ত' এসে 'লেফট' ব্যাঙ্কে'র শিল্পী ও লেখক মহলের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসেন। কেরুয়ারী বিপ্লবের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত যেন তিনি বিপ্লবের কথা ভুলেছিলেন। প্যারীর বুভুক্ষায় জ্বালায় জর্জরিত হয়ে এরেণবুর্গ কবিতা লিখেছেন, মদ্যপান করেছেন, প্রেম করেছেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছেন। তারপর লেলিন ফিরে আসার কয়েক মাস পরেই তিনি পেট্রো-গার্ডে ফিরে এলেন। এই আত্মস্মৃতির অধিকাংশই তাই ১৯০৬-১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্যারীর ইতিহাস। উদ্দাম কল্পনাবিলাসের এমন চিরায়ত সংসার আর কোথায়, কোথায় সেই স্থান যা দেখে মন বলবে—'ওয়া হমিনস্ত'।

এই গ্রন্থের কুত্রাপি এরেণবুর্গ তাঁর অ-রাজনৈতিক অতীতের জন্য শোক প্রকাশ করেননি। প্যারীর 'ফর্মালিস্ট' এবং 'কস্‌মোপলিটানদের' সম্পর্কে যে এরেণবুর্গ বেদনাবোধ করেছেন, তা খাঁটি, হৃদয়স্পর্শী এবং মনোরম। নিজের ইহুদি রক্তের সম্পর্কে এতখানি সচেতনতা বিস্ময়কর।

আরো বিস্ময়কর, লেলিনের মেন্‌-সেভিক প্রতিদ্বন্দ্বী পলি মারটভের প্রসঙ্গ। এরেণবুর্গ প্যারীতে পলির সঙ্গে দেখা করতেন, আর সেই পলি ছিল—"a gentle and attractive man of the utmost integrity." মর্দিলিহানীর কথা হয়ত বলা যায়, এমন কি 'ফর্মালিস্ট' কিংবা 'ডিজেনারেট' গোষ্ঠীর কথাও না হয় বলা হল, কিন্তু লেলিনের শত্রুদের সম্পর্কে এই উক্তি প্রকাশে বিস্ময়ের সীমা থাকে না, মনে প্রশ্ন জাগে সত্যই কি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে? Thaw শেষ হওয়ার পর Spring-এর আগমন হয়েছে? ইলাইয়া এরেণবুর্গ, শক্তিমান, জনপ্রিয় এবং সফল উপন্যাস-রচয়িতা। তাঁর এই স্মৃতিচারণ সম্পর্কে সোভিয়েটের আকাশ-বাতাস আজ কি ভাবায় মুখরিত, তা জানার বাসনা হওয়াই স্বাভাবিক। এই গ্রন্থ যেমন তাঁর অনেক অনুরাগী পাঠককে ক্ষিপ্ত করবে তেমনই আবার অনেক পাঠকের পুরাতন ক্ষতে হিমশীতল প্রলেপ প্রদান করবে। অচিরেই এরেণবুর্গের এই জীবনী 'People and Life' এ যুগের এক সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থে পরিণত হবে সন্দেহ নেই। *

* People and Life — A first volume of Autobiography :: By Elya Ehrenburg (Macgibbon & Kee, 21s).

নতুন বই

কীর্তিনাশা—দীপক চৌধুরী। প্রকা-শক : দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, পাঁচ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখকদের অন্যতম শ্রীদীপক চৌধুরীর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'কীর্তিনাশা' মিষ্টি-মধুর প্রেমের এক কাহিনী। সাধারণ স্কুল-মাস্টারের ছেলে শশাঙ্ক আর একদা-রাজা মৃত্যুঞ্জয়ের নাতনী করবী, এদেরই প্রেম

এবং মিলনের মাঝে এসেছে নানান ঘটনা, নানান মানুষ। সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুর দিকে। কালোবাজারী লোভ আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ধীরে ধীরে মাথা তুলছে অখ্যাত বল্লভপুর গ্রামেও। এরই আবর্তে ঘূর্ণিত হয়েছে সখানীরা, অবিনাশ চট্টজ্জে, গঙ্গাধর, গণি মিঞারা আর টুটু। প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত এবং স্বাভাবিক। কীর্তিনাশার তীরে এই গ্রামটিতে ঊনবিংশ শতকের আভিজাত গরিমার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কালের অভ্যুদয়ের ইশারা দিয়ে উপন্যাসের শেষ। বাংলা দেশের এক বিশেষ যুগ সার্থক হয়ে উঠেছে দীপকবাবুর লেখায়।

ক্রৌঞ্চ-নিষাদ—(উপন্যাস)—অজিত দাস। পরিবেশক—এম সি সরকার এন্ড সন্স (প্রা) লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছ'টাকা।

ইংরেজী ঊনিশ শ পঞ্চাশের কাল আর নদীয়া জেলার পটভূমিতে ক্রৌঞ্চ-নিষাদ উপন্যাসটির কাহিনী ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। একদিন সামরিক প্রয়োজনে হাজার হাজার প্রাণী বাস্তুচ্যুত হয়েছে ধুবুলিয়া গ্রামে, অবশ্য তারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, সেখানে বসেছে মার্কিন জঙ্গী বিমানের আড্ডা। আবার পট পরিবর্তন, ঊনিশ শ' পঞ্চাশ, নেই সেই সামরিক বাহিনী, স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন। এখন সেখানে আসছে ট্রাকে চড়ে ছিন্নমূল বাস্তুহারার দল ট্রাকে চড়ে দলে দলে আসছে 'বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায়—'। এই বাস্তুহারা কলোনীকে কেন্দ্র করে অজিত দাস তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ক্রৌঞ্চ-নিষাদ' লিখেছেন। তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থ পাঠের সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু 'ক্রৌঞ্চ-নিষাদ' আমাদের অভিভূত করেছে। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে কল্পনার বলিষ্ঠতায়, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় ক্রৌঞ্চ নিষাদ' একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কলকাতার এত কাছে ধুবুলিয়া, তবু সেখানে কি অবস্থা তা ক'জনের জানা আছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কতটুকু পাওয়া গেছে? এই বাস্তবানুগ কাহিনীতে সেই বিচিত্র পরিবেশ অবহেলিত জগতের একটা রেখাচিত্র পাওয়া যায়। সংবেদনশীল মন নিয়ে লেখক দুঃখী মানুষের দিন যাপনের ইতিহাস রচনা করেছেন, সেই সঙ্গে আছে বাংলার আর এক সম্প্রদায়ের কথা যারা আমাদের আপনজন ও ঘরের মানুষ হলেও আমরা পর করে রেখেছি। তারা বঙ্গীয় খৃষ্টীয় সমাজের মানুষ, আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায় তারাও আমাদের মতই পুরো বাঙালী সে চিত্র এই 'ক্রৌঞ্চ-নিষাদে'র পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। অহিপদ, শ্রীমন্ত আইচ, উপেন শিকদার চমৎকার ফুটেছে, সেইসঙ্গে এই কলোনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সুকুমার—সে যেন কালের প্রহরী।—তিন শ' কুড়ি পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই উপন্যাসটি সাহিত্যিক সততার এক নিদর্শন। লেখকের রচনাভঙ্গী উচ্ছ্বাস-বর্জিত এবং ঝরঝরে হওয়ায় উপন্যাসটি পড়তে এতটুকু হোঁচট খেতে হয় না। নিঃসন্দেহে বহুদর্শী লেখক স্বচক্ষে দেখে এবং স্বকর্ণে শুনে এই টাইপ চরিত্র-বিশিষ্ট উপন্যাসটি রচনা করেছেন। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী ও সি গাঙ্গুলী, ছাপা এবং গ্রন্থসজ্জা মনোরম।

তীর ভাঙা ঢেউ—(উপন্যাস)—প্রসাদ ভট্টাচার্য। ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬। দাম দু'টাকা।

দিনের পর দিন—(উপন্যাস)—রামগোপাল নাথ। আনন্দ পাবলিসার্স, ১৮বি, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দু' টাকা।

পাইকা অক্ষরে আশি-পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ উপন্যাস। একে বড় গল্প হিসাবেই বিচার করা উচিত। সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্তীকালের পটভূমিতে রচিত ফকীরের অপূর্ব কেরামতি এবং তাঁর উদাত্ত চণ্ডীপাঠে ইংরেজ কালেক্টার সাহেবের তাজ্জব হওয়ার আজগুবি অলৌকিক ঘটনা। ছাপা এবং বাঁধাই খারাপ।

দিনের পর দিন উপন্যাসটি পাইকা অক্ষরের ছাপায় একশ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুতরাং বড় গল্প উপন্যাসের গৌরবলাভ করেছে। তবে রামগোপাল নাথের 'দিনের পর দিন গল্প হিসাবে সার্থক। জীবন-দর্শনের জন্য এক বিচিত্র জগৎ নির্বাচন করেছেন লেখক, সেইদিক থেকে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন 'বড়-মিস্ত্রী' এবং 'বিলাসী' চরিত্রচিত্রণে। ছাপা, প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়।

আবছায়া—(উপন্যাস)—ক্রান্তদর্শী। প্রকাশক—ছাত্র শিক্ষা নিকেতন। ইন্দু প্রকাশনী। ৭, মদনমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৬। দাম দু টাকা।

'ক্রান্তদর্শী' এই ছদ্মনামে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন যে-লেখক তিনি নিঃসন্দেহে শক্তিমান। কাহিনীটি রোমান্টিক। শমিতার কলঙ্কের কথা এই উপন্যাসের উপজীব্য। তার মা ছিলেন অভিনেত্রী। বয়স তার কুড়ির বেশী নয়। নির্মল দাশগুপ্ত তার জীবনে এসেছিল একদিন অনাহূতের মত, তারই দোরে এসে একদিন শমিতার মামা নামক জনৈক আগন্তুক এসে জানালো—শমিতা কাল ভোরে আত্মহত্যা করেছে। বর্তমান সমাজ জীবনের এক অভিশাপ এই 'আবছায়া' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। লেখকের ভাষা সুন্দর, শুচি-স্নিগ্ধ এবং সমাজ-সচেতন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ যেমন সুন্দর হয়েছে ভিতরের মুদ্রণ সেই ধরনের ভালো হলেই সব দিক থেকে শোভন হত।

গ্রহান্তরে জীবন—(বিজ্ঞান)—কুমাররঞ্জন রায়। প্রকাশক : এস রায় এ্যান্ড কোম্পানী। ১৭৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। দাম—এক টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

আজ আর গ্রহান্তরে যাতায়াত করাটা একটা সমস্যা নয়, বিস্ময় নয়, আমাদের প্রতিবেশী গ্রহগুলি হয়ত শঙ্কিত হয়ে আছে, পৃথিবীর মানুষের সম্ভাব্য আক্রমণাশঙ্কায়। শুক্র গ্রহ এবং মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পুস্তক বাংলা ভাষায় বেশী নেই, অথচ আজ এরই প্রয়োজন সর্বাধিক। মহাশূন্যে সূর্য, সৌর-জগৎ, পৃথিবীতে প্রাণের অভ্যুদয়, মঙ্গলগ্রহ, শুক্রগ্রহ, অন্যান্য গ্রহ, গ্রহাণু-পুঞ্জ, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ, অন্যান্য উপগ্রহ সম্পর্কে লেখক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। লেখকের ভাষা সুন্দর, জটিল বিষয়কে সর্বজনবোধ্য করে পরিবেশনের শক্তি তাঁর আছে। আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার পৌরজন মহাকাশ বিজয়ী গাগারিণকে সম্বর্ধিত করবেন, সেই মুহূর্তে কুমাররঞ্জন রায় রচিত এই সুন্দর, সুখপাঠ্য, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

সময় ও সুকৃতি—(দিব্য জীবন কাহিনী)—জ্যোতির্ময়ী দেবী। ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

জ্যোতির্ময়ী দেবী বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত নাম নয়। তাঁর 'রাজঘোটক', 'আরাবল্লীর আড়ালে' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ-গুলি একদা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাস। আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় দিব্য-জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে লেখিকা যে সমস্ত আলোচনা করেছিলেন তা একত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। এই রচনাগুলির মধ্যে 'সাধু-কথা', 'পঞ্চনদবাসিনীদের সৎসঙ্গে' এবং 'হিমালয়ের আহ্বান' বিষয়বস্তু ও রচনা-গুণে অপূর্ব হয়েছে। 'সময় ও সুকৃতি' রচনাটি শ্রীশ্রীসারদামণি সংক্রান্ত আলোচনাটিতে আকুলতা ফুটে উঠেছে। লেখিকার ভাষা সুন্দর এবং বক্তব্য বিষয় পরিবেশনে যে সংযম এবং শালীনতা রক্ষার প্রয়োজন সে বিষয়ে তিনি সচেতন, ভাবাবেগহীন এই নিবন্ধগুলি সুখপাঠ্য সার্থক রম্য রচনা হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ সুরুচিসঙ্গত।

মুখের ভাষা বুকের রুধির—অমিতাভ চৌধুরী। গ্রন্থ প্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অমিতাভ চৌধুরীর এই গ্রন্থটি আসামের বাংলা ভাষা আন্দোলনের এক রম্য-রিপোর্টাজ। কাছাড় অঞ্চলে ১৯৬১-র মে মাসে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের প্রাক্কালে ভাষা আন্দোলনে যে নিদারুণ পরিণতি ঘটেছিল, এগারজন বঙ্গভাষী বুকের রুধির দিয়ে মুখের ভাষাকে রক্ষার জন্য দাবি জানিয়েছিল সেই রোমাঞ্চকর কথা লেখক অপূর্ব ভাষায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যে-সংবাদ পাঠ করে বাঙ্গালীমাত্রেই ব্যথা ও বেদনায় শিহরিত হয়েছেন 'মুখের ভাষা বুকের রুধিরে' পাওয়া যাবে তার অন্তরঙ্গ ইতিহাস। প্রতিটি ঘটনা নিখুঁতভাবে, প্রায়-গল্পাকারে বিধৃত করেছেন লেখক, সমগ্র গ্রন্থটি তাই এক নিঃশ্বাসে পাঠ করে চোখের জল মুছতে হয়। দেশ আজ স্বাধীন তবু কি বিচিত্র সমস্যার মধ্যে সেই দেশের মানুষকে দেশের মানুষেরই হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে, কি ঘৃণিত চক্রান্ত আর ঈর্ষাদুষ্ট সংঘর্ষই না ঘটেছে কাছাড়ে 'মুখের ভাষা বুকের রুধিরে' লেখক অসামান্য লিপিকুশলতায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রন্থটিতে অনেকগুলি চিত্র সংযুক্ত থাকায় আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাপা সুন্দর।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অনুশীলন—সম্পাদনায় : গোপাল ঘোষ ও শ্যামসুন্দর দে। দাম : ১·২৫ নঃ পঃ। মননধর্মী প্রবন্ধ পত্রিকা। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে প্রবন্ধ লিখেছেন, মজাফার আহমদ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, মনোরঞ্জন রায়, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, আবদুল হালিম, সুকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রভৃতি।

সোমপ্রকাশ—সম্পাদক : সুশীল ভট্টাচার্য। বিশেষ শারদ সংখ্যা। প্রবন্ধ লিখেছেন অরুণা হালদার, সুভদ্র সেন ও সুমনা সেন। গল্প লিখেছেন মিহির আচার্য, নরেন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণন চন্দর প্রভৃতি। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিপ্লবী নায়ক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে স্মৃতি-চিত্র লিখেছেন সন্তোষ ভট্টাচার্য। তাছাড়া আরও অনেকের লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ।

দর্শক—সম্পাদক : রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। নব-বাংলা নাট্য পরিষদ পরিচালিত "দর্শকে"র এটি একটি বিশেষ সংখ্যা। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বিভিন্ন খবর পাওয়া যাবে। এর পূর্ববর্তী ও বর্তমানসংখ্যার মধ্যে সম্পাদকদ্বয়ের উচ্চ রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্দ্রপুরী— সম্পাদক— বঙ্কিমচন্দ্র সাহা ও লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়। "ইন্দ্রপুরী"র সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব। এ সংখ্যায় লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, নরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি।

শব্দকল্পদ্রুম

॥ কথার মানে [উত্তরপক্ষ] ॥

১। বিসমিল্লা
(গ) ঈশ্বরের নাম স্মরণ। যে কোন কাজের আরম্ভে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা হয় বলে বিসমিল্লা শব্দের অর্থই দাঁড়িয়ে গেছে আরম্ভ।

২। ব্যবচ্ছেদ
(গ) বিভাগ—dissection

৩। মঞ্জীর
(ঘ) নূপুর।
তু—মণিময় মঞ্জরী পায়
দুরীহি তোজ চলি যায়।

৪। হরিতাল
(খ) সেঁকো-গন্ধক ঘটিত দ্রব্য বিশেষ। এর বর্ণ হলদে।

৫। স্বাতী
(খ) নক্ষত্রবিশেষ।

৬। স্কন্দ
(ক) কার্তিকেয়

৭। সেঁতানো
(ক) সিক্তপ্রায় হওয়া। তু—স্যাঁত-সেঁতে।

৮। সিরিশ
(ক) চামড়া হাড় ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত এক রকম আঠা।

৯। শিলষ্ট
(খ) দ্ব্যর্থবাচক।

১০। মোহরত
(ক) নূতন খাতা পত্তন।

১১। লোকায়ত
(ঘ) নাস্তিক।

১২। রসকলি
(ঘ) বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর তিলকবিশেষ।

নান্দীকর

।।আজকের কথা।।

অথ দর্শক কথা:

যত উৎকৃষ্ট নাটকই লেখা হোক না কেন, লেখক কখনও আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেন না যতক্ষণ না তা সাফল্যের সংগে মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। তেমনই যত উচ্চাংগের শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রই প্রস্তুত হোক না কেন, তার পরিচালক এবং প্রযোজক কিছুতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন না, যতক্ষণ না রসিক-দর্শক সেই ছবি দেখে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। শূন্য প্রেক্ষাগৃহে নাটকের অভিনয় এবং চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী জনমানবহীন প্রান্তরে অসি চালনার মতই নিরর্থক। দোকানীরা খরিদ্দারকে লক্ষ্মীর সংগে তুলনা করেন; যে দর্শক-সাধারণের কৃপার ওপর সাধারণ রংগমঞ্চ বা চিত্র-গৃহের অস্তিত্ব নির্ভর করে, মঞ্চ বা চিত্রগৃহের মালিকের কাছেও তাঁরা ঐ লক্ষ্মীর মতই বরণীয়। 'সবারে করি আহ্বান' ব'লে বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে সুরু ক'রে স্মারক-রজনী উপলক্ষে দর্শকদের মধ্যে স্মারক-পুস্তিকা ও মিষ্টান্ন বিতরণ পর্যন্ত প্রতিটি কাজই দর্শকের তুষ্টি বিধানের জন্যে—তাকে আকর্ষণের জন্যে। প্রেক্ষাগারকে নয়নাভি-রাম ক'রে সাজানো, ডানলোপিলো আঁটা পুসব্যাক চেয়ার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—সবই দর্শক-লক্ষ্মীকে স্থায়ী করবার জন্যে। এবং এর ওপরেও আছে দর্শকের সংগে কর্তৃপক্ষের এবং তাঁদের নিয়োজিত কর্মীদের সুব্যবহার। টিকিট বিক্রেতা, দ্বাররক্ষক, নির্দিষ্ট আসন প্রদর্শনকারী প্রভৃতি সকলকেই যে শুধু ভদ্র ও বিনয়ী হ'তে হয়, তাই নয়, তাদের ভদ্র চেহারা বিশিষ্ট ও ভদ্রপোষাক পরিহিত হওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মী নিয়োগ যে কর্তৃপক্ষের ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচায়ক, একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু 'দর্শক-সাধারণ', এই আখ্যায় ভূষিত করলেও এই গণতন্ত্রের যুগেও সকল দর্শককে এক গোষ্ঠীভুক্ত করা সম্ভব নয়। কাঞ্চন-কৌলীন্যের কথা না তুলেও বলতে পারা যায়, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও নীতিজ্ঞান সকল দর্শকের সমান নয়। আবার উচ্চ শিক্ষা সত্ত্বেও প্রাথমিক যে শিক্ষা, সেই সহবৎ শিক্ষাই হয়নি, এমন দর্শকও বিরল নয়। সুখের কথা, আজকের দিনের দর্শকের আচরণ পূর্বের তুলনায় ঢের উন্নত। বছর তিরিশ আগেও প্রেক্ষাগৃহের ভিতর ও বাহিরের দেওয়াল দর্শক-মুখ-নির্গত তাম্বূলরাগরঞ্জিত নিষ্ঠীবন দ্বারা শোভিত হয়ে থাকত এবং তারই পাশাপাশি দরজায় থাকত চুণের দাগ। এ ছাড়া সামান্য কথা নিয়ে তর্ক এবং অতি শীঘ্রই তা হাতাহাতিতে পরিণত হওয়া খুবই সুলভ ছিল। এবং ছিল কথায় কথায় অশ্লীল মন্তব্য। সেই বিখ্যাত 'সখীর নাচ' দেখতে দেখতে অথবা ছবির পর্দায় চুম্বন বা আলিংগন দেখে নানা মন্তব্য করা কিম্বা টেনে শিস্ দেওয়ার যুগ আজ গত হয়েছে। তা ছাড়াও ছিল ক্রন্দনরত সন্তানের জননীকে চালিত ভাষায় স্তন দুগ্ধদানের অমূল্য উপদেশ। শুনেছি ষ্টার থিয়েটার নাট্যা-চার্যের পদে যখন অমৃতলাল বসু আসীন, তখন কোনো দর্শক অভিনয় চলার সময়ে এই অমূল্য উপদেশ দান করেছিলেন ব'লে তিনি সাময়িকভাবে অভিনয় বন্ধ ক'রে দর্শক প্রবরকে টিকিটের মূল্য ফেরত দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন।

"ওয়ানটেড" চিত্রে জনি ওয়াকার

পশ্চিমবংগ সরকারের আইন প্রবর্তনের ফলে আজ প্রেক্ষাগৃহগুলি বিড়ি-সিগারেট, চুরোট, পাইপ, নিঃসৃত সম্মিলিত গন্ধী ধূমশূন্য। সে যুগে আমাদের মত ধূমপানের আনন্দে বঞ্চিত অভাজনদের যে দশা হ'ত, তা অবর্ণনীয়। এবং আজকাল সিনেমা গৃহে বিরতির সময় 'চাই পান বিড়ি, সিগারেট' ইত্যাদির উৎপাতও বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু কোনো কোনো সাধারণ রংগমঞ্চের কর্তৃপক্ষ এখনও এই উৎপাতকে বরদাস্ত ক'রে যাচ্ছেন।

সাধারণ আচরণের উন্নতি হ'লেও আজকের দর্শক কিন্তু এখনও আদর্শ

অগ্রগামী প্রযোজিত ও পরিচালিত তারাশঙ্করের "কান্না" চিত্রে উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী

দর্শককে পরিণত হ'তে পারেননি। আজও দুঃখের সংগে লক্ষ্য করি, বহু দর্শকই পিজ্ঞাপিত সময়ের পরে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে অপরদের অত্যন্ত বিরক্তি উৎপাদন ক'রে নিজেদের আসন গ্রহণ করেন। ছবি বা অভিনয় আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর যদি একটি লোকও বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশ করেন, তাহ'লেও তিনি যে সকল দর্শকের মনোনিবেশে এবং রস-গ্রহণে ব্যাঘাত জন্মান, এটা অবিসংবাদীভাবে সত্য। বিশেষ ক'রে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আসন গ্রহণে সাহায্যকারী ব্যক্তি যখন টর্চের আলো দেখিয়ে সেই বিলম্বাগত ভদ্রলোককে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে পৌঁছে দেন, তখন অভিসম্পাত বাণী বর্ষণ করেন না, এমন দর্শক বিরল। ছবি বা অভিনয় দেখবার জন্যে মনের যে একটা প্রস্তুতি আছে, তাকে অস্বীকার করা সহজ নয়। এর পরের উপদ্রব হচ্ছে, দুই বন্ধু বা বান্ধবী মিলে অনুচ্চ কণ্ঠে আলাপ-আলোচনা করা। এবং প্রকৃষ্টতম উপদ্রব অনুভূত হয়, যখন রাত্রির প্রদর্শনীতে কোনো ভদ্রলোক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হন ছবি দেখার পরিবর্তে নাসিকাবাদনপূর্বক সুখ-নিদ্রায় অভিভূত হতে। দর্শক মাত্রেরই সচেতন হওয়া উচিত, প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্ট অপর দর্শকের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে এমন কিছুই করা উচিত নয়, যাতে অন্য লোকের মনে মনেও বিরক্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

মঞ্চাভিনয় আলোচনা:

অঘটন আজো ঘটে: থিয়েটার সেণ্টারের নিবেদন; কাহিনী, গীত-রচনা ও সুর: দিলীপকুমার রায়; নাট্যরূপ: ধনঞ্জয় বৈরাগী; প্রযোজনা, পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: তরুণ রায়; মঞ্চ স্থাপনা: সুনীলমাধব সেন; আলোক-সম্পাত: তাপস সেন; নৃত্য পরিকল্পনা: দীপান্বিতা রায়; রূপায়ণ: অসিত—তরুণ রায়; অমল—পিকু নিয়োগী, আনন্দগিরি—মহম্মদ জ্যাকেরিয়া, শ্যামঠাকুর—শশাঙ্ক ঠাকুর, অরুণ—তরুণ মিত্র, জমিদার—তারাপদ ভট্টাচার্য, কর্তাবাবু—প্রশান্ত ঘোষ, রহমত—অমরেশ দাশগুপ্ত, গুরুদেব—স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতী—দীপান্বিতা রায়, নন্দা—কৃষ্ণা রায়, কমলা—মঞ্জু ব্রহ্মচারী, অন্নপূর্ণা—অসীমা পাল প্রভৃতি।

জেনিফার জোন্স অভিনীত "সঙ্ অব বার্ণাডেট" ছবির গোড়াতেই একটি সাব-টাইটেল ছিল:

"From them who believe in God,
no explanation is necessary
From them who do not believe
in God, no explanation is
possible."

(যাঁরা ভগবৎ বিশ্বাসী, তাঁদের জন্যে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; যাঁরা ভগবৎ বিশ্বাসী নন, তাঁদের জন্যে কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়)। দিলীপকুমার রায় রচিত "অঘটন আজো ঘটে" গ্রন্থ সম্বন্ধে সমান কথাই বলা যায়। ভূমিকায় শ্রীরায় লিখেছেন, "এ-বইটি লেখা শুধু তাঁদের জন্যে যাঁরা জানতে চান ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় কিনা, ভক্ত কাতর হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি রক্ষা করেন কিনা—এক কথায়, ভগবত করুণা ভাববিলাসী কল্পনা মাত্র, না পরীক্ষাসহ, অনুভবগম্য সত্য।...সর্বান্তঃকরণে ভগবানকে ডাকলে তাঁর কৃপা এ-যুগেও পাওয়া যায়, তিনি ইচ্ছা করলে এ-বিংশ শতাব্দীতেও অঘটন ঘটাতে পারেন এবং দরকার হ'লে ঘটিয়েও থাকেন।"

এই বস্তুসর্বস্ব জগতে, বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মন সমস্ত ঘটনাকে যুক্তির কষ্টি-পাথরের মাধ্যমে বিচার ক'রে দেখতে চায়। শ্রীচৈতন্যের ভগবৎ প্রেরণাকে নির্দিষ্ট খাদবাহী উন্মত্ততা ব'লে আখ্যা দেয়, রামপ্রসাদের 'বেড়াবাঁধা মেয়েকে' মানসিক বিভ্রান্তি ব'লে হেসে উড়িয়ে দেয়, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ মাতৃ-দর্শনকে দুর্বল মনের কল্পনা ব'লে নস্যাৎ ক'রে দেয়, এমন সুস্থমনা বিজ্ঞ লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে। কিন্তু দুঃখের অমানিশার মধ্যে মানুষ যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে যুক্তিতর্কের থেই হারিয়ে অকূল পাথারে ভাসতে থাকে, তখন সে এমন একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়, যা তাকে বাঁচবার শক্তি দেবে, মনোবলকে ফিরিয়ে আনবে, তার পায়ের তলায় শক্ত মাটির স্পর্শ দিয়ে তাকে সোজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ শর্ত ক'রে ভগবানে বিশ্বাস করতে চায়। সে এই 'অঘটন আজো ঘটে' গ্রন্থের

সূত্রধার এবং যথার্থ নায়ক অসিতের মতই বলে—"কিছু যদি হাতে পাই—যাকে লাভ ব'লে চিনতে পারি—তাহ'লে সব ছাড়তে আমি রাজি। কিন্তু কিছুই পেলামনা পাবার মত—অথচ যা আছে সব খুইয়ে বসব, এ কেমন কথা?" কিন্তু ভক্ত আনন্দগিরি বলেন—"বাবা, এ পথে পাওয়া যায়না। কারণ এর নাম দরদস্তুর করা ঃ আমি ত্যাগের দাম দেব, তুমি প্রাপ্তির মাল সরবরাহ করো—যেন একটা যোঝাপড়ার ভাব—চুক্তির বন্দোবস্ত।...... যে ছাড়তে ভয় পায়, সে দুর্ভাগা পায়না কিছুই।"

"অঘটন আজো ঘটে" আ-লে এই গ্রন্থের নায়ক অসিতেরই সংশয়োত্তরণের কাহিনী। তার মানসমুক্তির পথে সহায়তা করেছে মাত্র অমল এবং সতীর কাহিনী দু'টি। "বিশ্বাসে মিলয়ে মুক্তি, তর্কে বহু দূর"—এই সত্য যেদিন সে মর্মে অনুভব করতে পারল, একজনের ঐকান্তিক বিশ্বাস তার আপন জনেরও মোহমুক্তি ঘটাতে পারে, এ-বস্তু যখন সে প্রত্যক্ষ করল, তখন সংশয়ের গণ্ডী পেরিয়ে অকুতোভয়ে বলতে পারল—তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময়-স্বামী, আমি স্বয়মানন্দের চরণে শরণ নেব—শুধু দেব আর দেব। কিছু চাইব না ঠাকুর কি গুরুর কাছে—একমাত্র শরণ ছাড়া'।

মনে সংশয় ছিল, দিলীপকুমারের "অঘটন আজো ঘটে"-কে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগী মূল বইটির ওপর যথেষ্ট সুবিচার করতে পারবেন কিনা। কারণ, মূল বইয়ের মধ্যে রয়েছে, অনেকগুলো কাহিনী, যাদের একের সঙ্গে অপরের যোগ নেই। তার ওপর কাহিনীগুলি বহু ঘটনা দ্বারা পল্লবিত এবং বিক্ষিপ্তভাবে কথিত। কিন্তু 'অঘটন আজো ঘটে' অনেক অঘটনই ঘটিয়েছে এবং তার মধ্যে প্রধান হ'ল এর অসাধারণ নাট্য-রূপদান। কি যে আশ্চর্য উপায়ে বহু বিক্ষিপ্ত ঘটনা এবং সম্বন্ধহীন কাহিনীকে একটি ধারাবাহিক কাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং দর্শকের জিজ্ঞাসু ও অবিশ্বাসী মনের প্রতিধ্বনি তুলে অসিতকে বহু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী ক'রে তার মনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-মনকেও অন্ততঃ সাময়িকভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে, তা যিনি প্রত্যক্ষ না করবেন, তাঁকে ব'লে বোঝানো যাবে না। দিলীপ রায় রচিত গান ও সুরসমৃদ্ধ হয়ে নাটকটি আধুনিক চরিত্র-অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অসামান্য ভাগবতী প্রেরণাদায়ক মহৎ শিল্পসৃষ্টি রূপে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঘটন হ'ল, একটি মাত্র দৃশ্যপটের মাধ্যমে এই নাটকটি অভিনীত হওয়া। সামনে একটি প্রধানতঃ ইঙ্গিতধর্মী সেট, যার সিঁড়িটির ধাপও দর্শক-দৃষ্টির অন্তরালে থেকে নাটকীয় চরিত্রের মনোজগতের উত্থানপতনের সাক্ষ্য বহন করছে এবং পিছনে একটি পর্দা যার উপর বিভিন্ন কাট-আউটের প্রতিচ্ছবি এবং কখনও তাতেই গতিশীল আলোছায়া নাটকীয় ঘটনাকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করছে—একেই সহায় ক'রে নাটকের তিনটি অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল। তাতে কখনও বাঙলা, কখনও আসাম, আবার কখনও বাঙলাপশ্চিম ঘটনা দেখে কোনো দর্শকমনেই প্রশ্ন জাগল না—এ কেমন ধারা? সুনীলমাধব সেনের মঞ্চস্থাপনার কৃতিত্ব এইখানেই। অবশ্য কোনো রকম দৃশ্যপট না থাকলেও যাত্রাভিনয় দেখে রসগ্রহণ করতে আমাদের দর্শকদের কোনোরকম অসুবিধাই হয়না। রক্তবর্ণ শিখাবিশিষ্ট প্রদীপ সুন্দর বিভ্রমের সৃষ্টি করেছিল।

তৃতীয় এবং শেষ—অবশ্য ইংরেজী কথাকে বাঙলায় বলি, শেষ বলেই সবচেয়ে ছোট নয়, বরং বেশ বড়োই—অঘটন হ'ল মুখোস-সম্প্রদায়ের অভিনয়। এই

সম্প্রদায়ের নিয়মিত শিল্পীদের মধ্যে কেউ যে গঙ্গাস্নান করেন এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় কালীতলায় যান, এ-সংবাদ আমাদের কানে কোনো দিনই আসেনি। অন্ততঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী মনের অধিকারী যে তাঁরা প্রত্যেকেই, এ-কথা হলপ ক'রে বলতে পারা যায়। তাই 'অঘটন আজো ঘটে'র মত কাহিনীকে রূপায়িত করার মত আবেগশীল ভাবালুতাপূর্ণ অভিনয় তাঁদের দ্বারা কি ক'রে সম্ভব, এ জিজ্ঞাসাও আমাদের মনকে পীড়িত করেছিল। কিন্তু—বৃথা এ সংশয়। যে বা যাঁরা প্রকৃত শিল্পী, তাঁরা যে যে-কোনও চরিত্রকেই প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে পারেন, এই সত্যকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করলেন— "মুখোস"-সম্প্রদায়ের শিল্পীবৃন্দ। এবং এরই মধ্যে আমরা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়েছি, সতীর ভূমিকায় দীপান্বিতা রায়ের অসামান্য নাট্যনৈপুণ্য দেখে এমন প্রাণঢালা অভিনয় আমরা সাম্প্রতিক কালে কোথাও দেখেছি ব'লে মনে ক'রতে পারছিনা—প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, উনি দৈব-অনুপ্রাণিত হয়ে অভিনয় করছেন। সতী-চরিত্রের অন্তরের ভাগবত প্রেরণা, সাংসারিক জীবনের সংগে তার অধ্যাত্ম-জীবনের দ্বন্দ্ব এবং তারই ফলে তার মনের ব্যথা বেদনা, স্বামীপুত্রকে সুখী করতে না পারায় মানসিক অবসাদ, আবার নব নব অনুভূতির ফলে আত্মচেতনার উন্মেষ—এ সমস্তই অত্যন্ত সাবলীলভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। শেষ দৃশ্যে দেবতার চরণে আত্মসমর্পিতভাবে জীবনের সংশয় ও বিশ্বাসের উপরে

অগ্রদূত পরিচালিত তারাশংকর রচিত "বিপাশা" চিত্রের একটি মুহূর্তে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

নিজেকে স্থাপন করার মুহূর্তে নৃত্যের মাধ্যমে তাঁর আরাধ্য দেবতাকে আকুল আহ্বান প্রাণস্পর্শী। সতীর স্বামী অরুণের ভূমিকায় তরুণ মিত্রও তাঁর গৃহীত চরিত্রের ক্রম-বিবর্তনকে সুচারুরূপে রূপায়িত করেছেন। ঈশ্বর-অবিশ্বাসী অরুণ যেখানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সহসা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বাতাহত কদলীর মত ভূমি-গ্রহণ করে বা যেখানে সতীর মুখ থেকে আর একবার বিবাহ করতে অনুরুদ্ধ হয়ে ব্যথিতচিত্তে সতীর পানে তাকায় ও তাকে জবাব দেয়, সে-সব জায়গায় তাঁর অভিনয় দর্শকচিত্তকে অভিভূত করে। দিলীপ রায় দ্বারা শিক্ষিত হয়ে গানে ও কথায় শ্যামঠাকুরের মধুর চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন শশাংকঠাকুর। আনন্দগিরির ঈশ্বরজ্ঞানিত মহান চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন মহম্মদ জ্যাকেরিয়া। সুন্দর বাচনের দ্বারা চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তিনি। অবিশ্বাসী যুবক অমল সংসারের বহু আঘাতে জর্জরিত হয়ে কিভাবে ভগবৎ করুণালাভ করল, তাকে অত্যন্ত সুকৌশলে রূপায়িত করেছেন পিকু নিয়োগী। স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভণ্ড গুরুদেব প্রেক্ষাগৃহকে খানিকক্ষণের জন্যে হাল্কা হাসিতে ভরিয়ে তুলেছিল, যদিও আমাদের মনে হয়েছে, তাঁর অভিনয়ে আর একটু সংযমের প্রয়োজন

সত্যজিৎ রায়ের নব-চিত্রার্ঘ "কাঞ্চনজঙ্ঘা চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও নবাগতা বিদ্যা সিংহ

ছিল। যাকে নিয়ে নাটক, যার সংশয়োত্তরণে নাটকের সমাপ্তি সেই অসিত চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তরুণ রায়। ভগবানকে মানতে না পারার বেদনা, শিক্ষাদীক্ষা, অর্থ-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও মনের সংশয়দ্বন্দ্বের জ্বালা, চোখের সামনে ঈশ্বরের করুণাধারাকে অজস্রধারায় প্রবাহিত হতে দেখেও তার মনের সংশয়-আকুলতা এবং সবশেষে গুরুপদপ্রান্তে আত্মনিবেদনে প্রস্তুতি—সমস্তই আশ্চর্য সাবলীলভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সুন্দর অভিনয়ের মাধ্যমে। অপরাপর ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন তারাপদ ভট্টাচার্য (জমিদার), প্রণত ঘোষ (কর্তাবাবু), অমরেশ দাসগুপ্ত (রহমত), মিতা ও মানস (রজত), কৃষ্ণা রায় (নন্দা), মঞ্জু ব্রহ্মচারী (কমলা) প্রভৃতি।

দিলীপ রায়-কণ্ঠনিঃসৃত গান এবং যন্ত্রসংগীত দ্বারা বহু স্থানে চমৎকার আবহসৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু টেপ-রেকর্ডার প্রায়ই উচ্চগ্রামে চালু থাকায় অনেক জায়গায় তা অভিনয়ে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং অল্প-কিছু ছোটখাট ত্রুটীর কথা বাদ দিলে এইটিই হচ্ছে "অঘটন আজো ঘটে" অভিনয়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ত্রুটী। কিন্তু এই ত্রুটী সত্ত্বেও মুখোস-অভিনীত "অঘটন আজো ঘটে" আধুনিক মঞ্চাভিনয়ের একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

শকুন্তলা (অসমীয়া চিত্র): কামরূপ চিত্রের নিবেদন; ১১৪১৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য, গীত-রচনা, সংগীত-পরিচালনা ও প্রযোজনা: ভূপেন হাজারিকা; চিত্রগ্রহণ: বিজয় দে, শব্দধারণ: অবনী চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীতানুলেখন: সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শব্দ-পুনর্যোজনা: শিশির চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা: শচীন মুখোপাধ্যায় ও অনিল পাইন; সম্পাদনা: শিব ভট্টাচার্য ও অমলেন্দু শিকদার; রূপায়ন: পবিত্র বরকাকতী, ধীরাজ দাস, ফণী শর্মা, অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইভা আচাও, কৃষ্ণ বরা প্রভৃতি। পরিবেশনা: শ্রীকৃষ্ণ ফিল্মস্।

মহাকবি কালিদাসের "শকুন্তলা" পৃথিবীর অমর কাব্যগুলির অন্যতম। কালিদাসের জন্মকাল এবং বাসস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহুতর মতদ্বৈধতা থাকলেও তাঁর "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকের কাব্যমাধুর্য এবং চরিত্রচিত্রণের অপরূপত্ব সম্বন্ধে সকলেই একমত। প্রকৃতির কোলে লালিতা অপ্সরাকন্যা শকুন্তলার সঙ্গে নৃপতি দুষ্মন্তের প্রথম সন্দর্শনেই প্রেম, দুর্বাসার অভিসম্পাতে দুষ্মন্তের স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায় ও অঙ্গুরীয়-অভিজ্ঞান হারিয়ে যাওয়ায় শকুন্তলার বিপত্তি এবং পরিশেষে পুত্রের মাধ্যমে উভয়ের মিলন—এ-কাহিনী বহুবার বহুরূপে দর্শকের সামনে এসেছে, মঞ্চে এবং পর্দায়। "ভোঃ ভোঃ, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ", এই নিষেধাজ্ঞা যে আশ্রম-পালিতা শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্মন্তের প্রণয়বাণ নিক্ষেপের প্রতিও প্রযুজ্য হতে পারে, এই ইংগিত বুঝে এই অপরূপ নাটকের মর্মে প্রবেশ করবার মতো রস-জ্ঞান, দুর্ভাগ্যের বিষয়, অতি অল্প

লোকেরই আছে। তাই দেখি, দেশে এবং বিদেশে, মঞ্চে এবং পর্দায় এই চিরন্তন অম্লান কাহিনী বহুরূপে চিত্রিত হ'লেও তাদের কোনোটিকেই কালিদাস-চিত্রিত "শকুন্তলা'র যথার্থ' রূপ ব'লে মনে করতে পারিনি। রাজকমল কলা-মন্দিরের হয়ে ভি, শান্তারাম কিন্তুত পটভূমিকার ওপর "শকুন্তলা"-কাহিনী-কে বিধৃত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনিও মূল শকুন্তলার কাব্য-সুষমাকে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। সিল্ক জর্জেটের বেষ্টনীর মধ্যে মহাকবির শকুন্তলা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাই ভূপেন হাজারিকার অসমীয়া চিত্র "শকুন্তলা" যদি কালি-দাসের স্বর্গীয় সুষমাকে মূর্ত ক'রে তুলতে না পেরে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শান্তারামের হিন্দী চিত্রের প্রদর্শনী ক্ষেত্রের তুলনায় অসমীয়া চিত্রের প্রদর্শনসম্ভাব্যতা শতাংশের একাংশও নয়। তাই এ ছবিতে সুবিস্তৃত ভূখণ্ড নিয়ে কণ্বমুনির তপোবন রচনা করাও যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনই সম্ভব হয়নি নৃপতি দুষ্মন্তের রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বিরাট রাজ-প্রাসাদ ও সভাস্থল নির্মাণ। শ্রীহাজা-রিকাকে সাধুবাদ দেব এই জন্যে যে, তিনি "শকুন্তলা"র মত একটি ক্লাসিক কাহিনীকে অসমীয়া চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন এবং স্টুডিও-অভ্যন্তরেও আসামের নিসর্গদেশকে অপরূপভাবে মিলিয়ে মহর্ষি কণ্বের তপোবনকে জীবন্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। চিত্র-নাট্য রচনায় কালিদাসের মূল-কাহিনীকে মোটামুটিভাবে অনুসরণ করে গেছেন।

অসমীয়া ভাষা বাঙলারই সগোত্র হ'লেও বাঙালী দর্শকের পক্ষে তাকে ছবির পর্দায় অনুসরণ ক'রে অর্থ হৃদয়-ঙ্গম করা প্রায় দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি

দে প্রোডাকশন্সের 'সঞ্চারিণী' চিত্রে কণিকা মজুমদার, পাহাড়ী ও ছায়া দেবী

হয় না; তবু অত্যন্ত পরিচিত বিষয়-বস্তু ব'লে ছবির সামগ্রিক রসগ্রহণে কোনো রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। শ্রীহাজারিকার স্বরচিত গান-গুলি তাঁরই সুরসমৃদ্ধ হয়ে অসমীয়া দর্শকদের কানে যে মধুবর্ষণ করতে সক্ষম হবে, এ-কথা সহজেই বলতে পারা যায়; কারণ গানগুলি ভাষা না জানা সত্ত্বেও আমাদের খুশী করেছে তাদের সুরমাধুর্যে; তার ওপর প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত অসমীয়া ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি-ক্রিয়াও আমাদের অনুমানকে সমর্থন করেছে।

চিত্রশিল্পী বিজয় দে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ছবিটিকে আলো-ছায়ার একটি সুরে বেঁধে। কাহিনী উপযোগী হয়েছে তাঁর চিত্রগ্রহণ পদ্ধতি। আসামের নিসর্গশোভাকে তিনি সুন্দর-ভাবে ক্যামেরার ফ্রেমের মধ্যে এনে ফেলে-ছেন। ছবির দু'টি জায়গা—এক, শকুন্ত-লার পতিগৃহে যাত্রার সময় ও দুই, ছবির শেষদিকে পুত্র ভরতের মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মিলনের সময়—গেভা-কলারে তোলা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত দু'টি রঙীন দৃশ্য মোটের ওপর চক্ষুতৃপ্তিকর।

শব্দগ্রহণে, সঙ্গীত-গ্রহণে এবং শব্দ-পুনর্যোজনায় তিনজন শব্দযন্ত্রীই যথা-যোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শিল্প-নির্দেশনায় শচীন মুখোপাধ্যায় ও অনিল পাইন যতখানি সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করেছেন।

অভিনয়াংশে প্রথমেই রাজা দুষ্মন্তের ভূমিকায় পবিত্র বরকাকতীর সংযত ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। তার ওপর তাঁর মত সুপুরুষ অসমীয়া কেন, বাঙলা ও হিন্দী ছবিতেও ক্বচিৎ দেখেছি। মহর্ষি কণ্বের ভূমিকাকে প্রাণবন্ত ক'রেছেন ধীরাজ দাস; পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যে তাঁর করুণ অভিনয় স্মরণীয়। দুর্বাসার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চরিত্রে কৃতি অভিনেতা ফণী শর্মার বাচন ও ভাবপ্রকাশভঙ্গী দুর্লভ ক্ষমতার পরিচায়ক। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন অনীতা বন্দ্যো-পাধ্যায়। দুষ্মন্তরূপী পবিত্র বরকাকতীর পাশে তাঁকে নিষ্প্রভ মনে হ'লেও তাঁর দীর্ঘ দেহ আশ্রমবালিকাসুলভ এবং তিনি মোটের ওপর সুঅভিনয় করেছেন। প্রিয়ংবদারূপে ইভা আচাও নাচে-গানে,

অভিনয়ে অত্যন্ত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন; তিনি এই ছবির অন্যতম স্তম্ভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর তুলনায় অনসূয়ার ভূমিকাভিনেত্রী কৃষ্ণা বরার অভিনয়ের সুযোগ কম ব'লেই তিনি ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। অপরাপর ভূমিকা চলনসৈ:

অসমীয়া চিত্র-জগতে "শকুন্তলা" একটি স্মরণীয় সৃষ্টি এবং নূতন পথের দিসারী।

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্রমেলা :

অখিল ভারত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব অনুষ্ঠিত "রবীন্দ্র-মেলা" নানাকারণে হাজার হাজার দর্শককে পার্ক সার্কাস ময়দানে উপস্থিত হ'তে বাধ্য করেছিল। মেলার মধ্যে "রবীন্দ্রকক্ষ" এবং "সংগীত-কক্ষ" যে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়েছিল, তার তুলনা মেলা ভার। বহুজনকে অনুযোগ করতে শুনেছি, মাত্র দশ দিনের আয়ুষ্কাল নির্ধারিত করে কর্তৃপক্ষ ঐ সুসজ্জিত মেলার উপর যেমন অবিচার করেছেন, তেমনই করেছেন অগণিত দর্শকের উপর। গেল ২১-এ নভেম্বর উৎসব কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের যে চা-চক্রে সমবেত করেছিলেন, সেখানে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষ যেন এই রকম মেলাকে বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা প্রস্তাবটিকে বিশেষ বিবেচনা করে দেখবেন।

হেরেসিম লেবেডেফ স্মরণোৎসব :

১৭৯৫ সালের ২৭-এ নভেম্বর কলকাতা শহরের চীনেবাজার অঞ্চলে ডোম লেনে (ডোমতলা), "ডিস্‌গাইস" (Disguise) নামে যে বাঙলা নাটকটি পুরুষ এবং স্ত্রী শিল্পী দ্বারা অভিনীত হয়, তার প্রযোজনা করেছিলেন, রুশদেশীয় হেরেসিম লেবেডফ। রঙ্গমঞ্চে বাঙলা নাটকের এই সর্বপ্রথম অভিনয়ের সংগে লেবেডেফের নাম স্মরণ করবার জন্যে লিটল্‌ থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভায় ২৭-এ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, এরই সংগে তাঁরা বাঙলা নাট্যাভিনয়ে আঙ্গিকের প্রাধান্য নিয়ে একটি তর্কসভার বৈঠক বসান। এবং সব শেষে বনফুল রচিত "নব সংস্করণ" নাটিকাটি অভিনয় করেন।

মুক্তঅঙ্গন :

গেল বছর ২৭-এ নভেম্বর "মুক্ত-অঙ্গন" প্রতিষ্ঠিত হবার পর বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিতভাবে অভিনয় করেছিলেন। আবার বর্ষাবিদায়ের পর এ'রা এ'দের দ্বারোদ্ঘাটন করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। এবার এ'দের প্রথম নাটক "ললনা" নিয়ে এ'রা নাট্যরসিক সাধারণকে অভিবাদন করবেন ৯ই ডিসেম্বর। তার আগে এ'দের প্রতিষ্ঠাদিবস এবং লেবেডেফ স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের সভাপতিত্বে নাট্যকার মন্মথ রায়, অভিনেতা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এবং বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তক ও যশস্বী পরিচালক সতু সেনকে সম্বর্ধিত করেন। এই সংগে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে মিষ্টান্ন ও পুষ্পস্তবক দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

স্বপ্নের দেশ ডিজনীল্যান্ড। বিচিত্র চিন্তার কৃতিমরূপে ফুটে উঠেছে ওয়াল্ট ডিজনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে। মিঃ ডিজনীর সংগে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালে। শিশুপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রীকে এই সহরটি বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। ছবিতে শ্রী নেহরু ও মিঃ ডিজনীকে দেখা যাচ্ছে।

এ'রা গেল ২৭-এ নভেম্বর একটি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

"ফেরারী ফৌজ-"এর ১০০তম স্মরণোৎসব :

গেল ১৫ই নভেম্বর লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভা থিয়েটারে "ফেরারী ফৌজ"এর শততম স্মরকোৎসব

অগ্রগামী পরিচালিত "কান্না" :

তারাশঙ্কর লিখিত "কান্না"কে চিত্রে যথাযথভাবে রূপায়িত করবার জন্যে অগ্রগামী গোষ্ঠী মূল গল্পটির বক্তব্যকে বজায় রেখে তার আবশ্যকমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করছেন। অন্যায় করলে শাস্তি পেতেই হবে এবং মানবতাকে কখনও অস্বীকার করা যায়

পাসপোর্ট চিত্রে মধুবালা ও প্রদীপকুমার

না। এই হচ্ছে কাহিনীটির মূল বক্তব্য। এর বিভিন্ন চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার রাধামোহন ভট্টাচার্য, নবাগতা নন্দিতা বসু, সুলতা চৌধুরী, শোভা সেন এবং আরো অনেকে। ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন সুধীন দাসগুপ্ত। ছবিটি অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

সানফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসব :

১৯৫৭ সাল থেকে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম বছরে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বলে নির্বাচিত হয় এবং শ্রীরায়কেও পুরস্কৃত করা হয়। পরের বছরে "অপরাজিত" ছবির পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখানোর জন্যে শ্রীরায়কে আবার পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৬১-র উৎসবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "দেবী" ছবি দেখাবার কথা ছিল, কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। এই আন্তর্জাতিক উৎসবের পাঁচজন বিচারকের মধ্যে এবার আছেন বাঙলাদেশের বিখ্যাত পরিচালক শ্রীতপন সিংহ। তিনি মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের বৈদেশিক গুণীজন বিনিময় পরিকল্পনা অনুসারে দুই মাসের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছেন। সানফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে শ্রীসিংহ বলেছেন, "বার্লিন, এডিনবরা ও বৃহদায়তন না হলেও এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে এবং হলিউডের চিত্রনির্মাতারা এতে যোগ দিলে এই উৎসব বিশ্বের বৃহত্তম উৎসবে পরিণত হবে।" তিনি এই উৎসবের এবং এর পরিচালক আর্ভিং এম লেভিনের প্রচুর সুখ্যাতি করেন। ভারতে ফিরে যাবার আগে তাঁর হলিউড ও হনলুলু দেখবার ইচ্ছা আছে। শ্রীসিংহ এরই মধ্যে ওয়াশিংটন, বাফেলো, রচেস্টার, নিউইয়র্ক এবং ডেনভার কলোরাডো প্রভৃতি জায়গা দেখে এসেছেন।

পশ্চিম বার্লিনে ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহ :

দু'বছর আগে পশ্চিম বার্লিনের ভারতীয় ছাত্ররা 'ভারত মজলিস" নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম জার্মাণীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ বাড়াবার জন্যে। ১৯৫৮ সালে বার্লিনে প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়। এ-বছর মে মাসে "ভারত মজলিস" রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করেন মহাসমারোহের সঙ্গে। এই বছরই বার্লিন কংগ্রেস হলে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ এবং ওস্তাদ ইমরাত খাঁর বাজনা শুনে বার্লিনের লোকেরা মোহিত হয়ে যায়। এর পরে ভারতীয় এবং জার্মাণ-শিল্পীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" অভিনীত হয়। সব শেষে চতুর্থ ভারতীয় সংস্কৃতি সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত—অভিনয় এবং কলা প্রদর্শনীর মাধ্যমে জার্মাণ-ভারত মৈত্রীকে এমন পরিস্ফুট করা হয়েছে যে, পশ্চিম বার্লিনের মেয়র উইলি ব্র্যান্ড বলেছেন "অল্প-কালের মধ্যেই ভারতীয় সাংস্কৃতিক সপ্তাহ" আমাদের বার্লিনের সাংস্কৃতিক
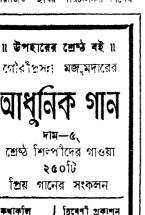
অল্প দিনে প্রতিষ্ঠিত সুঅভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জি'কে অজয় কর পরিচালিত "অতল জলের আহবান" চিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে

জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

●

আগামী ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর বেহালার অহীন্দ্রম নাট্য-সংস্থার ভ্রাম্যমান "অহীন্দ্র-মঞ্চ" নামে একটি রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন করবে। উক্ত মঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন ডঃ কালিদাস নাগ। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত থাকিবেন অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, জ্যোতি বসু, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মুখার্জি এবং আরও অনেকে।

উক্ত দিবসদ্বয়ে সংস্থার সভাবৃন্দ কর্তৃক অমর গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত "সংস্কার" ও "সার্কাসের দেশ" নাটকদ্বয় মঞ্চস্থ হবে।

'শ্রেয়সী'র তিনশততম রজনীর স্মারক উৎসবে প্রধান অতিথি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন

এ সপ্তাহের চিত্র মুক্তি

এ সপ্তাহে যে তিনটি হিন্দী চিত্র মুক্তি লাভ করছে তার মধ্যে 'পাসপোর্ট' চিত্রটির গত সপ্তাহে মুক্তি লাভের কথা ছিল; কিন্তু অনিবার্য কারণে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। প্রথম চিত্রটি গোল্ডেন ফিল্মসের 'ওয়ান্টেড'; পরিচালনা করেছেন এন এ আনসারী, সংগীত পরিচালনায়—রবি। রূপায়ণে—সাঈদা খান, বিজয় কুমার, জনিওয়াকর, এন এ আনসারী, হেলেন প্রভৃতি। গ্রেস ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় জনতা, লোটাস, গ্রেস, রূপালী, নাজ, লিবার্টি, ছায়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে। দ্বিতীয়টি রেশমা ফিল্মসের 'কাঁচ কী গুড়িয়া।' চিত্রটি অঞ্জনা রাওয়েল রচিত বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস 'অশ্রুমুকুল' অবলম্বনে নির্মিত। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন এইচ এস রাওয়েল। সংগীত পরিচালনায় সুহৃদ কর। বিভিন্নাংশে সাঈদা খান, মনোজ কুমার, শোভা খোটে প্রভৃতি। ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, বসুশ্রী ও বীণা প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবে। তৃতীয় চিত্র—নূতন ফিল্মসের "পাসপোর্ট" জ্যোতি, প্রভাত, উজ্জ্বলা, পূর্ণশ্রী, প্যারামাউন্ট, পার্কশো, ভবানী প্রভৃতি চিত্রগৃহে মিউজিক্যাল ফিল্মসের পরিবেশনায় প্রদর্শিত হবে।

ষ্টার থিয়েটারে 'শ্রেয়সী' নাটকের তিনশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব

গেল ১৮ই নভেম্বর ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'শ্রেয়সী' নাটকের ৩০০তম অভিনয়ের স্মারক উৎসব বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র করের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, "নাটক জনপ্রিয় হয় কালের কথা ও যুগের কথা যে নাটকে থাকে। সেই নাটকই দর্শক সাগ্রহে গ্রহণ করেন। শ্রেয়সী নাটকটি দর্শকদের সে চাহিদা মিটিয়েছে তার প্রমাণ আজকের ত্রিশততম অভিনয়ের স্মারক-উৎসব।" সভাপতি শ্রীকর মঞ্চশিল্পীদের কথা উল্লেখ করে বলেন, শিল্পী হতে হলে সাধ, সাধ্য ও সাধনা থাকা চাই। ৩০০তম অভিনয়ের এই উৎসবটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীসলিলকুমার মিত্র, লেখক, নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলী এবং নেপথ্য কর্মিবৃন্দকে মূল্যবান উপহারে সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানান্তে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শ্রেয়সী নাটকটি অভিনীত হয়।

টুকিটাকি

বৃটিশ চলচ্চিত্র জগতে টনি রিচার্ডসন একটি নতুন কিন্তু উল্লেখযোগ্য নাম। রিচার্ডসন আগে ছিলেন থিয়েটারের লোক। ইংলন্ডের 'ক্রুদ্ধ যুবক' জন অসবোর্ণ-এর সঙ্গী হয়ে তিনি প্রথম ছবি তোলেন "ল্যুক ব্যাক ইন অ্যাংগার" এবং তারপরে "দি এন্টারটেইনার"। দুটোই অসবোর্ণ-এর বিখ্যাত নাটক এবং চলচ্চিত্রে এদের নাটকত্ব ব্যাহত হয়নি। এবারে রিচার্ডসন তুলেছেন শেলাগ ডিলানির "এ টেষ্ট অব হনি" (মধুর স্বাদ)। বর্তমান ছবিটির চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও প্রযোজনা সবই করবেন টনি রিচার্ডসন। "এ টেষ্ট অব হনি" কিন্তু ছবিতে তোলা নাটক হবে না। চলচ্চিত্র ভাষার মাধ্যমেই উত্তর ইংলন্ডের কলকারখানা, চিমনীর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন জীবনকে উদ্ঘাটিত করবেন রিচার্ডসন। জো স্কুলে পড়া সপ্তদশী। মার সঙ্গে থাকে সে। বাবা নেই। মা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। বার বার বাড়ি বদলাতে হয় তাদের কারণ বাড়ি ভাড়ার টাকা সব সময় সংগ্রহ করতে পাবে না মা। শেষকালে মা ধনী প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। জো আশ্চর্য হয় না এতটুকু। কারণ জীবনকে সে ভাবাবেগের চশমা ছাড়াই দেখতে শিখেছে।

"এ টেষ্ট অব হনি"র ভূমিকালিপি তেমন তারকা খচিত নয়। মা-র ভূমিকায় অভিনয় করছেন ডোরা ব্রায়ান। নায়িকা জো-র ভূমিকায় নির্বাচিত করা হয়েছে উনিশ বছরের নবাগতা রিতা টুসিংহামকে। অন্যান্য চরিত্রে আছেন রবার্ট ষ্টিফেনসন, মুরে মেলভিন এবং পল ডানকুয়া।

* * *

কলকাতায় "স্যাফায়ার" সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে। 'স্যাফায়ার' শুধু রহস্য চিত্রই নয়, সাদা এবং কালো চামড়ার সমস্যাটিকেও সার্থকতার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছিল ছবিটিতে। স্যাফায়ারের চিত্রকাহিনীকারের নবতম চিত্র "ভিক্টিম" তোলা হচ্ছে আরেক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। জনৈক সমকামী যুবকের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু লোক তাকে ব্ল্যাকমেল করত। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যুবকটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। জনৈক সরকারী উকিল (অভিনয় করেছেন ডার্ক বোগের্ড) আসল রহস্য উদ্ধারে এগিয়ে আসেন, নিজের সুনাম-এর দিকে না তাকিয়ে তিনি হতভাগ্য যুবকটির পক্ষ নেন। ডার্ক বোগের্ড এর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সিলভিয়া সিমস। অভিনয়ের অন্যান্য লোকেদের মধ্যে আছেন ডেভিড বার্ড, ডেনিস প্রাইড, পিটার ম্যাক হেনেরি।
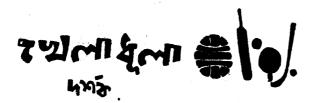
॥ ভারত সফরে এম সি সি দল ॥

ক্রি-কন্ট্রোল প্রেসিডেন্ট একাদশ দল : ২৮১ রাণ (৫ উইকেটে ডিক্রেয়ার্ড। পতৌদির নবাব ৭০, সর্দে্ট ৬৯, পি রায় ৬৫ এবং ভোঁসলে ৪৬ নট আউট)। ও ১৬৩ (৫ উইকেটে ডিক্রেয়ার্ড। এ এল আপ্তে ৭৬ নট অ'উট। লক ৫৪ রাণে ২ এবং ব্যারিংটন ৫৩ রাণে ২ উইকেট)।

এম সি সি দল : ২৬১ রাণ (জে কে স্মিথ ৮৯, বার্টার ৫৪। প্রসন্ন ৭১ রাণে ৩, বিশ্বনাথন ৫৫ রাণে ২ এবং রাজীন্দর পাল ৬৮ রাণে ২ উইকেট)

ও ১৮৪ রাণ (৬ উইকেটে। পিটার পারফিট ৮৪। সর্দে্ট ৬২ রাণে ৪ উইকেট)

১ম দিন (১৮ই নভেম্বর) : প্রেসিডেন্ট একাদশ : ২৮১ রাণ (৫ উইকেটে। ভোঁসলে ৪৬ রাণে নট আউট)।

২য় দিন (১৯শে নভেম্বর) : পূর্ব দিনের ২৮১ রাণের (৫ উইকেটে) মাথায় প্রেসিডেন্ট একাদশ দলের ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। ২৬১ রাণে এম সি সি দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। কোন উইকেট না পড়ে প্রেসিডেন্ট একাদশ দলের ১৬ রাণ।

৩য় দিন (২০শে নভেম্বর) : ১৬৩ (৫ উইকেটে) রাণের মাথায় প্রেসিডেন্ট একাদশ দলের ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। এম সি সির ২য় ইনিংসে ১৮৪ রাণ (৬ উইকেট)।

এম সি সি দলের ভারত সফরের তালিকায় হায়দ্রাবাদের মাঠ টেস্ট খেলার মাঠ হিসবে চিহ্নিত করা হয়নি। খেলার তালিকায় সেখানে দেওয়া হয়েছিল একটা তিন দিনের খেলা, ক্রি-কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির একাদশের সঙ্গে এম সি সি দলের। এ যেন দুধের স্বাদ ঘোল খেয়ে মেটান—কোথায় টেস্ট খেলা আর কোথায় তিন দিনের খেলা! কিন্তু এই তিন দিনের খেলাটাই শেষ পর্যন্ত আপন মহিমায় বোম্বাইয়ের টেস্ট খেলার থেকেও ক্রিকেট খেলার রসিক সমাজে বড় স্থান পেয়ে গেল। হায়দ্রাবাদের ফতে ময়দানে খেলার শেষ দিনে ২৫,০০০ হাজার দর্শক ক্রিকেট খেলায় এক ভিন্ন রূপের পরিচয় পেলেন; উত্তেজনায় এবং খেলা দেখার আনন্দে তাঁরা সেদিনের ক্রিকেট খেলাকে যেভাবে উপভোগ করলেন তার তুলনা সাম্প্রতিককালের ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে খুবই কম।

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি একাদশ দল পরিচালনা করেন তরুণ খেলোয়াড় পতৌদির নবাব। ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম দল পরিচালনা। টসে জয়ী হলে প্রেসিডেন্ট একাদশ দল প্রথম ব্যাট করে। প্রথমদিনে দলের ২৮১ রাণ ওঠে ৫ উইকেটে। দলের সর্বোচ্চ রাণ করলেন অধিনায়ক 'টাইগার'। এই নামেই তিনি ইংল্যাণ্ডে সুপরিচিত। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব ওপনিং ব্যাটসম্যান পংকজ রায় ৬৫ এবং সর্দে্ট ৬৯ রাণ করেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে প্রেসিডেন্ট একাদশ দল আর ব্যাট করেনি। পূর্ব দিনের ২৮১ রাণের ওপরই দলের ইনিংস ঘোষণা করা হয়। এম সি সি দলকে রাণ তুলতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। দলের ৭২ রাণের মধ্যে পাঁচজন ভাল ভাল ব্যাটসম্যান আউট হ'লেন মাত্র ৯০ মিনিটের খেলায়। তখনও দলের 'ফলো-অন' থেকে রেহাই পেতে ৬০ রাণের প্রয়োজন। সহ-অধিনায়ক মাইক স্মিথ দলকে এই শোচনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা করলেন। দলের ৫৮ রাণে তৃতীয় উইকেট পড়লে মাইক স্মিথ খেলতে নামেন। বারবার এবং নাইটকে জুটি পেয়ে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে নিজস্ব ৮৯ রাণ করেন। দলের ২৪৪ রাণের মাথায় মাইক স্মিথ (৯ম উইকেট) জয়সীমার বলে বোল্ড-আউট হন। স্মিথের ৮৯ রাণে ছিল ১৪টা বাউন্ডারী। এম সি সি দলের ১ম ইনিংস ২৬১ রাণে শেষ হলে প্রেসিডেন্ট একাদশ দল ২০ রাণে এগিয়ে যাওয়ার গৌরব লাভ করে। আলোচ্য ভারত সফরে এম সি সি দল পুরো এক ইনিংসের খেলায় এই প্রথম বিপক্ষের থেকে কম রাণ করলো। সভাপতি দলের ২য় ইনিংস খেলা-ভাঙ্গার আধ ঘন্টা আগে আরম্ভ হয়। কোন উইকেট না পড়ে ১৬ রাণ ওঠে।

তারপর এলো খেলার তৃতীয় দিন। খেলা মামুলীভাবে অমীমাংসিতই থেকে যাবে এই ধারণা নিয়ে যখন দর্শক সাধারণ বিষণ্ণ মনে খেলা দেখছেন তখন সকলকে অবাক ক'রে প্রেসিডেন্ট একাদশ দলের অধিনায়ক দলের ১৬৩ রাণের (৫ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। তখন খেলা ভাঙ্গতে ১৩০ মিনিট সময় বাকি—এম সি সি দলকে খেলায় জিততে হ'লে এই সময়ে ১৮৪ রাণ তুলতে হবে। এম সি সি দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার এই 'চ্যালেঞ্জ' প্রত্যাখ্যান করলেন না। ক্রিকেট কিভাবে খেলতে হয় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের এমন মহাসুযোগ কি আর হাত ছাড়া করা যায়? পিটিয়ে রাণ তুলতে গিয়ে উল, খড়ের মত এক একটা উইকেট পড়তে লাগলো। দলের মাত্র ১১২ রাণের মধ্যে নামকরা নির্ভরশীল খেলোয়াড়—রিচার্ডসন, ব্যারিংটন, মাইক স্মিথ এবং ডেক্সটার বিদায় নিয়েছেন। দলের এই সম্মান রক্ষার খেলায় পিটার পারফিট ভাঙ্গনের মুখে একদিকে আটকে রেখেছেন। মাঠের দর্শকরা এমন ক'রে কখনো খেলার মাঠে ঘড়ির কাঁটার পিছনে ছোটেননি। প্রতি সেকেণ্ড—প্রতি মিনিট তাঁরা গুণে যাচ্ছেন। ৭ম উইকেটে খেলছেন পারফিট এবং বারবার। দলের ১৮০ রাণের মাথায় রাজীন্দর পালের বলে বারবার কাট মারলেন; দলের রাণ দাঁড়াল ১৮২। আর মাত্র দু'রাণ বাকি। ঘড়ির কাঁটা যেন আর নড়ে না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেও কি খেলা দেখছে? পারফিট সর্দে্টর বলে জয়লাভের বাকি ২ রাণ করলেন। খেলা ভাঙ্গার তিন মিনিট আগে দলের ১৮৪ রাণ (৬ উইকেটে) ওঠে গেলে এম সি সি ৪ উইকেটে জয়ী হল।

রাজস্থান বনাম এম সি সি

রাজস্থান : ২৬৮ রাণ (হনুমন্ত সিং ১২৪ রাণ। ডেভিড স্মিথ ৪৭ রাণে ৬ এবং ডেভিড হোয়াইট ৬৩ রাণে ৪ উইকেট) **ও ১৫৫ রাণ** (৬ উইকেটে ডিক্রেয়ার্ড। কে এম রাংটা ৪৭ রাণ; ডেভিড হোয়াইট ১৭ রাণে ৩ উইকেট)

এম সি সি : ২২২ রাণ (৬ উইকেটে ডিক্রেয়ার্ড। ব্যারিংটন ৯১ রাণ। সুন্দরম

কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান : ছাত্র বিভাগে বিজয়ী বাংলা দলের এবং ছাত্রী বিভাগে জয়ী মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

৩০ রাণে ২ এবং রাজ সিং ৪৫ রাণে ২ উইকেট) ও ৮৬ রাণ (২ উইকেটে। রাসেল নট আউট ৪১ রাণ)

১ম দিন (২২শে নভেম্বর) : রাজস্থান ২৪৫ রাণ (৭ উইকেটে)। মানকড় ৭ এবং রমেশ সা ০ ক'রে নট আউট।

২য় দিন (২৩শে নভেম্বর) : ২৬৮ রাণে রাজস্থান দলের ১ম ইনিংসের সমাপ্তি। ২২২ রাণে (৬ উইকেটে) এম সি সি দলের ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। রাজস্থান (২য় ইনিংসে) ২৭ রাণ (১ উইকেটে)।

৩য় দিন (২৪শে নভেম্বর) : ১৫৫ রাণে (৬ উইকেটে) রাজস্থান দলের ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। এম সি সি (২য় ইনিংস) : ৮৬ রাণ (২ উইকেটে)।

প্রথম দিনের খেলায় রাজস্থান দলের ৭ উইকেটে ২৪৫ রান ওঠে। সেলিম দুরানী দলের পক্ষে সেঞ্চুরী (১২৪ রান) করেন। আলোচ্য সফরে এম সি সি দলের বিপক্ষে এই প্রথম সেঞ্চুরী। দলের ৩৮ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) দুরানী খেলতে নামেন। তাঁর হুক এবং ড্রাইভ মারগুলি উপভোগ্য হয়েছিল। স্মিথ ছাড়া অন্য কোন বোলার তাঁর রান সংখ্যা আটকে রাখতে পারেন নি। দুরানী এবং হনুমন্ত সিংহের ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ৯৬ রান এবং দুরানী ও রংটার ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৭৯ রান ওঠে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে রাজস্থান দলের প্রথম ইনিংস ২৬৮ রানে শেষ হয়। এম সি সি দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার নাটকীয়ভাবে দলের ২২২ রানে (৬ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তখনও রাজস্থান দলের সমান ২৬৮ রান করতে এম সি সি দলের ৪৬ রান বাকি ছিল।

এই দিনের খেলায় সব কিছু মজা তোলা ছিল চা-পানের পরের খেলার জন্যে। চা-পানের আগে দর্শক-সাধারণ কল্পনাও করেননি ব্যারিংটন তাঁদের এমনভাবে আনন্দ দিয়ে যাবেন। ব্যারিংটন রাজস্থান দলের বোলিংয়ে তখনও বেশ কোণঠাসা হয়ে খেলেছেন। হঠাৎ তিনি মাথা তুলে দাঁড়ালেন। ১৫,০০০ দর্শক অবাক বিস্ময়ে ব্যারিংটনকে দেখতে লাগলো। আনন্দধ্বনিতে সারা মাঠ ভেঙে পড়লো। ব্যারিংটনের খেলা তো নয়, যেন রানের 'টাইফুন' বয়ে যাচ্ছে। দুরানীর এক ওভার বলে ব্যারিংটন ২৫ রাণ করলেন। দুরানীর প্রথম ও দ্বিতীয় বলে ব্যারিংটন যথাক্রমে ৪ এবং ৩ রান করেন; তৃতীয় বলে নাইট করেন ১ রান। এর পর ব্যারিংটন দুরানীর বাকি তিনটে বলের প্রতিটি বলে 'ওভার-বাউন্ডারী' মারেন। ব্যারিংটন এবং নাইটের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ১০৮ রান ওঠে, এই রানের মধ্যে এক ৬১ রানই ওঠে চা-পানের পরবর্তী ২০ মিনিটের খেলায়। ব্যারিংটন মাত্র ৯ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। তাঁর ৯১ রানে ছিল ৪টে বাউন্ডারী এবং ৩টে ওভার-বাউন্ডারী; খেলেছিলেন ১৩৪ মিনিট। এই দিনে রাজস্থান দল ২য় ইনিংসের খেলায় ১টা উইকেট খুইয়ে ২৭ রান করে।

খেলার তৃতীয় দিনে রাজস্থান ১৫৫ রানে (৬ উইকেটে) ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে।

এত দেরীতে সমাপ্তি ঘোষণার জন্যে খেলায় আর কোন আকর্ষণ ছিল না। হাতে তখন খেলার সময় ছিল মাত্র ৯৭ মিনিট। এই সময়ে ২০২ রান ক'রে খেলায় জয়লাভ করা কোন দলেরই পক্ষে সম্ভব নয়। খেলা ড্র যায়।

॥ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৬১ সালের জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ (সাঁতার) : বালক বিভগ—পশ্চিমবাংলা ৪২ পয়েন্ট, মণিপুর ৪, ত্রিপুরা এবং উত্তরপ্রদেশ ২, অন্ধ্র ১। বালিকা বিভাগ—পশ্চিমবাংলা ২৪ পয়েন্ট এবং মণিপুর ২ পয়েন্ট।

ফুটবল ফাইনাল : বিজয়ী—অন্ধ্র ৩; রাণার্স-আপ—পাঞ্জাব ১।

কাবাডি ফাইনাল : পাঞ্জাব ৩০-২১ পয়েন্টে অন্ধ্রকে পরাজিত করে।

টেবল টেনিস ফাইনাল : ওয়েস্ট বেঙ্গল ৩-১ খেলায় অন্ধ্র প্রদেশকে পরাজিত করে। ছাত্র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন—মধ্যপ্রদেশ।

খো-খো ফাইনাল : মধ্যপ্রদেশ ২০-৭ পয়েন্টে পাঞ্জাব প্রদেশকে পরাজিত করে।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস রাধাকৃষ্ণন ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী অন্ধ্র পুলিশ দলের অধিনায়ক জুলফিকারের হাতে কাপটি প্রদান ক'রছেন।

সন্তোষ ট্রফি—উত্তরাঞ্চল

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতার উত্তরাঞ্চলের খেলায় রেলওয়ে এবং দিল্লী দল মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ ক'রেছে। খেলায় দিল্লী দল অপরাজেয় অবস্থায় পুরো ৮ পয়েন্ট লাভ করে।

লীগ খেলার ফলাফল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েন্ট
দিল্লী	৪	৪	০	০	৮
রেলওয়ে	৪	৩	০	১	৬
মধ্যপ্রদেশ	৪	২	০	২	৪
পাঞ্জাব	৪	০	১	৩	১
রাজস্থান	৪	০	১	৩	১

॥ ডুরাণ্ড ফুটবল ॥

১৯৬১ সালের ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশ তার গত বছরের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। ফাইনালে অন্ধ্র পুলিশ দল ১—০ গোলে গত বছরের যুগ্ম বিজয়ী মোহনবাগানকে পরাজিত করে। পুলিশ দলের এই জয়লাভ সঙ্গতই হয়েছে, অপ্রত্যাশিত ঘটনা হয়নি। ক'লকাতার বাইরেও ফুটবল খেলার মান যে কোন অংশে ক'লকাতার থেকে কম নয় অন্ধ্র পুলিশ দলের শেষের তিনটি খেলায় তা প্রমাণিত হয়েছে। শেষের তিনটি খেলায় অন্ধ্র পুলিশ দল ৬—১ গোলে বি এন আর, সেমিফাইনালে ৩—০ গোলে ইস্টবেঙ্গল এবং ফাইনালে ১—০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গত বছরের ডুরাণ্ড ফুটবল কাপের যুগ্ম বিজয়ী। ইস্টবেঙ্গল এবং বি এন আর এ বছরের ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন এবং রাণার্স-আপ।

ফাইনালে পুলিশ দলের রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই মোহনবাগান দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা গোল দেওয়ার বিশেষ কোন সহজ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে পারেনি। খেলার সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, উভয় দলেরই রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়রা খেলায় আধিপত্য বিস্তার করে, তুলনায় বেশী করে পুলিশ দল।

ডুরাণ্ড কাপের পূর্ব বিজয়ী দল (১৯৫৮ সাল থেকে) : ১৯৫৮ মাদ্রাজ রেজিঃ সেন্টার, ১৯৫৯ মোহনবাগান, ১৯৬০ মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (যুগ্ম বিজয়ী)।

॥ রাশিয়ান ফুটবল দল ॥

দিল্লীর এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় রাশিয়ান সার্ভিসেস দল ৫—০ গোলে এ বছরের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী অন্ধ্র পুলিশ দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। রাশিয়ান সার্ভিসেস দল আরও বেশী গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করলে বিস্ময়ের কারণ হ'ত না। ফুটবল খেলার প্রতিটি বিভাগে তারা অন্ধ্র পুলিশ দলের থেকে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। এক কথায়, তাদের খেলার সামনে অন্ধ্র পুলিশ দল দাঁড়াতে পারেনি। ক্ষিপ্রতায়, বল নিয়ন্ত্রণের দক্ষতায় এবং রক্ষণ ও আক্রমণের কৌশলে সেনাদল দর্শক-সাধারণকে যে আনন্দ দান করে তা অনেক দিন লোকের মনে থাকবে।

॥ সাউথ অস্ট্রেলিয়ান টেনিস ॥

সাউথ অস্ট্রেলিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নসীপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি বহিরাগত খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার দু'জন ডেভিস কাপ খেলোয়াড়কে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে ওঠেন। মুখার্জি প্রথম রাউণ্ডে রীডকে, পরবর্তী রাউণ্ডে বব্ হিউটকে এবং কোয়ার্টার-ফাইনালে ৫-৭, ৬-৩, ৬-৪ গেমে কেন ফ্লেচারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে সেমিফাইনালে ওঠেন। সেমিফাইনালে রয় এমারসন স্ট্রেট সেটে মুখার্জিকে পরাজিত করেন। অপর দিকের সেমিফাইনালে নীল ফ্রেজার স্বদেশবাসী উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রয় লেভারকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করেন।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস (ফাইনাল) : রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৬-২, ৬-৩, ৬-২ গেমে নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস (ফাইনাল) : মিস মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৫-৭, ৬-৪ গেমে মিস ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার খেত'ব লাভ করেন।

মিক্সড ডাবলস (ফাইনাল) : আর টেলর (বৃটেন) এবং ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪ গেমে ফ্রেড স্টোলী এবং লেসলী টার্ণারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস (ফাইনাল) : নীল ফ্রেজার এবং রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ২-৬, ৬-১, ৬-২ গেমে রড লেভার এবং জন শেফার্ডকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস (ফাইনাল) : মিস মার্গারেট স্মিথ এবং মিস রোবিয়ান এবার্ণ (অস্ট্রেলিয়া) ৫-৭, ৬-২, ৬-৩ গেমে মিস লেসলী টার্ণার এবং মিস লেহানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা বিষয় লেখক

অপেশাদারী নাটক

নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে বেশীরভাগ সময়ই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় নাটকই। নারী-চরিত্রে কাকে পাওয়া যাবে। পট-পরিবর্তন ক'বার। সেট তৈরী করতে খরচ হবে কত। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে-কোন অপেশাদারী নাট্যসংস্থাকে। এইসব প্রশ্নের সহজ সমাধান পাওয়া গিয়েছিল জোছন দস্তিদারের দুই-মহল নাটকে। তাঁর লেখা নতুন নাটক "বিংশোত্তরী" তেমনিই অপেশাদারী সংস্থাগুলির জন্যেই রচিত। নাটকীয় সংঘাতে পরিপূর্ণ। বাস্তব, জীবন্ত চরিত্রগুলি স্বাভাবিক। দাম—আড়াই টাকা। প্রকাশ করেছেন—"ধারাবাহিক", ২৯।১, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। নিকটস্থ বইয়ের দোকানে কিনতে না পেলে, "ধারাবাহিক"-কে চিঠি লিখুন।

অমৃত

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 8th December, 1961.
40 Naya Paise.

ইতিহাস কি বিচিত্রগামী! গত শনিবার ময়দানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভায় গিয়ে এই কথাটি আরও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করা গেল। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই বক্তৃতামঞ্চেই খুব বেশী দিনের কথা নয়, নয়াচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্ লাইকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মিঃ চৌ এন্ লাই-এর সে বক্তৃতা এখনও অনেকে বোধ হয় বিস্মৃত হননি। সে সময় "হিন্দী-চীনী ভাই ভাই" শ্লোগানের মুহুর্মুহুঃ ধ্বনির মধ্যে তাঁর বক্তৃতার সৌজন্যমূলক ও স্তুতিবাচক অংশগুলি সেদিন হয়ত ততখানি বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। কারণ চীন-ভারত মৈত্রীর "মহান, উজ্জ্বল এবং সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী" বন্ধনের মধ্যে ঐ স্তুতি তো আমাদের কাছে সামান্য মনে হয়েছে। আজ আমার মনে পড়ল। তিনি পুনঃ-পুনঃ বলেছিলেন যে, ভারতের শান্তিকামিতায় তিনি বিশ্বাসী। তিনি পঞ্চশীলের প্রভূত জয়গান ক'রে বলেছিলেন যে, পণ্ডিত নেহরু এশিয়ার একজন মহান্ নেতা। সেদিনের পরিবেশ আজও বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। মঞ্চের সম্মুখে যে বিশিষ্ট অতিথি, যে প্রেস গ্যালারি, এবং যে মন্ত্রিমণ্ডলী উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন ও পাশে যে ফটোগ্রাফারের দল উচ্চ মঞ্চ থেকে ক্রমাগত বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় তাঁদের ফ্ল্যাশ বাল্ব ঝলসিত করে মিঃ চৌ এন্ লাই-এর প্রতিকৃতি গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন, গত শনিবারের জনসভায়ও প্রায় সেই সমাবেশই ছিল। প্রায় একই শ্রোতৃ-মণ্ডলী।

কিন্তু ইতিহাস পালটেছে। এই সভামঞ্চ থেকেই আজ নেহরু বলতে বাধ্য হলেন যে, চীনের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি রুখবার জন্য ভারতবর্ষকে প্রস্তুত হতে হবে, কিন্তু এ শুধু জঙ্গী প্রস্তুতি নয়। যেহেতু রাষ্ট্রের আসল স্থায়ী শক্তি নির্ভর করে তার শিল্প-সম্পদের উপরে এবং যেহেতু অদ্যকার দিনে যুদ্ধ মাত্রেই ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা সেইজন্য তিনি চান ভারতবর্ষ দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুক। তিনি বললেন, চীন এবং গোয়া সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ পন্থা গ্রহণে তিনি ভীত নন, কিন্তু স্থিরমস্তিষ্কে এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তিনি অগ্রসর হতে চান। কিন্তু একথা ঠিক যে, কোনো দেশই "তার বুকের উপরে হামলাকারীদের" উৎপাত সহ্য করবে না।

কিন্তু এই ঘোষণার প্রাক্কালে যে মুহূর্তে তিনি চীনের ভারত-সীমান্ত লঙ্ঘনের প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন, তৎক্ষণাৎ দেখা গেল যে, কূটনৈতিক অতিথিদের আসন থেকে তিনজন পীত চেহারার মানুষ উঠে দাঁড়ালেন। একসঙ্গে প্রায় সমান তালে পা ফেলে চীনা দূতাবাসের এই তিনজন প্রতিনিধি সমস্ত সভামঞ্চটির সম্মুখ-ভাগ দিয়ে প্রায় মার্চ করার ভঙ্গীতে যখন বেরিয়ে গেলেন, শুধু একটা অস্ফুট ধ্বনি বিশিষ্ট অতিথি-দের আসন থেকে শোনা গেল। বলাবাহুল্য, মঞ্চের উপর থেকে পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টিও নিশ্চয়ই এই অপসৃয়মান তিনটি উদ্ধত মানুষকে লক্ষ্য করেছিল।

প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যভাবে এমন অবমাননা কোনো বৈদেশিক প্রতি-নিধিরা আজ পর্যন্ত করেনি। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর কণ্ঠস্বরে তার পরেও সামান্য ক্রোধের আবেগ দেখা দেয়নি।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কথা নয়, আমরা জানতে চাই, নয়াচীনের এই তিনজন কূটনৈতিক প্রতিনিধির অসৌজন্য কলকাতার জনসাধারণ কিভাবে নিয়েছেন। যে-কোনো আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন দেশ তার প্রধান নেতার এই অবমাননা নিশ্চয়ই মুখ বুজে সহ্য করত না। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কোন্ দলের, কংগ্রেসের, অথবা পি-এস-পি'র কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির সে প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর বৈদেশিক নীতি কিংবা স্বরাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে আমরা একমত, কি দ্বিমত সে প্রশ্নও ওঠে না। আসল কথা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের যিনি জননির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, গত ১৪ বৎসরের মধ্যে যাঁর সর্বাগ্রগণ্য নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন মাত্র ওঠেনি, তাঁকে লক্ষ লক্ষ লোকের জনসমাবেশে চীনা প্রতিনিধিরা "ওয়াক্ আউটের" দ্বারা অপমানিত করতে চেয়েছিলেন। এই অবমাননা শুধু প্রধানমন্ত্রীর নয়, এই অবমাননা কলকাতার নাগ-রিকদের, এই অবমাননা সমগ্র ভারতবর্ষের। চীনা প্রতিনিধিরা একথা জানতেন যে, জনসমাবেশে বক্তৃতার সময় প্রধানমন্ত্রী চীন-ভারত সীমান্তের প্রশ্ন উত্থাপন করবেনই—একথা যে-কোনো নির্বোধও জানত। সুতরাং এই ভান করার প্রয়োজন ছিল না যে, তাঁরা না-জেনে সভায় এসেছিলেন এবং ঐ প্রসঙ্গ শোনা মাত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য সভাস্থল ত্যাগ করেছেন। তাঁরা এই অজুহাতও দিতে পারবেন না যে, ঐ সভায় পণ্ডিত নেহরু চীনের প্রতি কোনো অশোভন উক্তি করেছিলেন। এমনকি, কোনো বিতর্কমূলক প্রশ্ন ওঠার পূর্বেই তাঁরা "ওয়াক্ আউট" করে-ছিলেন, তাও প্রমাণ করা যায়। কাজেই এই অবমাননা unprovoked এবং সুপরিকল্পিত। কিন্তু কল-কাতার জনসাধারণ এই ঔদ্ধত্য ও অবমাননার কি প্রতিবাদ জানাবেন? উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভ বা শ্লোগানের কথা আমরা বলছি না। কিন্তু কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছ থেকে কি আমরা আশা করতে পারি যে, অতঃপর চীনা দূতাবাসের কোনো অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ একযোগে প্রত্যাখ্যানের জন্য তাঁরা সম্মিলিত হবেন?

একটি প্রার্থনা

গোপাল ভৌমিক

সময়-শ্রেষ্ঠীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে কে নেয় যৌবন?
প্রথামত তমসুক নিয়ে
বিনিময়ে দেবে সে আমাকে
জরা ও মরণ।
অথচ আমি যা চাই, সে তো সূর্য
চিরায়ত আলো আর উত্তাপের খনি ঃ
মুঠো মুঠো বিলিয়েও
যা থাকে সে তাই নিয়ে ধনী
রয়েছে, থাকবে তাও জানি।
আমাকে অযথা কেন সময়ের প্লানি
বার বার ছুঁয়ে যায়
যেন কত কৃপা প্রার্থী আমি!
আমার যৌবন কেন সূর্য হয়ে জ্বলে না সদাই?
কেন সে ক্ষণিক সুখে পুড়ে হয় হাউয়ের ছাই?

* * *

একান্ত একটি দিনের ইচ্ছা

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

না আমায় ডেকো নাকো। এই রৌদ্র, হীরের প্রাসাদ
ছেড়ে যেতে মন নেই। কিশোর শীতের বেলা সুবাসিত
কী খুশি ছড়ানো দ্যাখো, আন্তরিক বিপুল আহ্লাদ
রৌদ্রে ঘাসে শিশিরে; ও বলতে পারো মেঘলোকে গীত;
এবং আকাশ জুড়ে সুনির্মল পক্ষী উচ্চকিত,—
না আমায় ডেকো নাকো। এই রৌদ্র, হীরের প্রাসাদ
ছেড়ে যেতে মন নেই।

কি হবে ওখানে বলো, হে বন্ধু প্রিয় পরিজন,
দেয়ালের চতুর্বাহু জড়ানো যে আশ্চর্য গহ্বর
যেখানে কেবল চাপা কণ্ঠস্বর, বাঁকা চোখে স্বার্থের ওজন
অহরহ অভিনয় সবিনয় নিবেদনে
প্রাত্যহিক প্রশ্ন অতঃপর;

না, আজ ওখানে আর ডেকো নাকো।
এই রৌদ্র, হাওয়ার প্রহর
বরং এখানে এসো, এখানে আলোর দেশে
বিস্তারিত মনের সংসার॥

স্বরক্ষেপ

মানস রায়চৌধুরী

ঝর্ণায় কেন তৃষ্ণা ফিরালে তড়িৎ ফিরালে মেঘদল
সাত বছরের পদচিহ্নিত বনানী ভীষণ চেনা
একই পথে আর হাঁটতে পারি না যান্ত্রিক চলাচল
ঝর্ণায় কেন যেতে বলেছিলে ঝর্ণা কি কোনো ছল?

স্নানের সকাল ভারি হয়ে আসে, দুপুর সাবানশূন্য
খোঁপা খুলে দিলে অলীক ফেনায় পুঞ্জিত কেশদাম
সমস্ত দিন সেই ভাবনায় দেহমন বড় ক্ষুন্ন
কেন যে আমাকে বলোনি, বললে উন্মাত ফেনিলতা
ভাসিয়ে দিতাম শুষ্ক অলক দেহরেখা অবিরাম।

কেন বলেছিলে পাহাড়ে বিজন পেতে রেখো সংসার
মেষপালকের আনন্দ আজো কাজে কি অকাজে বন্দী
শব্দিত বেণু কোন অনন্তে ফিরে পাবে অধিকার
কেন ডেকেছিলে না দেওয়া যখন রক্তের অভিসন্ধি!

প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। কথাটা পুরনো, কিন্তু যতোবারই এর সত্যতা আবিষ্কার করি ততোবারই মুগ্ধ হই।

যেমন ধরুন এই কলকাতা শহর। বাইরের লোক যখন একে দুর্গন্ধের শহর, বিশৃঙ্খলার শহর ব'লে টিপ্পনী কাটে, তখন আমরা কী জবাব দিই? তখন আমরা বলি, এটা রবীন্দ্রনাথের শহর, এবং এই একটি নাম উল্লেখ করেই বোঝাতে চাই, শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতির মান এখানে আকাশচুম্বী—সারা ভারতে এর জুড়ি মেলে না। আর সত্যিই তো, কবিতা আর সাহিত্য নিয়ে এখানে এত উত্তেজনা, এমন প্রতি সপ্তাহে ছবির প্রদর্শনী আর গানের জলসা, যে সত্যিই মনে হয় শহরটা বুঝি স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কিন্তু এ হল ভালবাসার কথা। আবেগ হিসাবে মহৎ, কিন্তু যুক্তি হিসাবে অচল। কলকাতা সত্যিই সংস্কৃতি-পাগল শহর। তবে সেটা তার বাইরের চেহারা, ভিতরে-ভিতরে অসুস্থ। নাড়ীতে হাত রাখলেই টের পাওয়া যায় তার বিকারের গতিবেগ।

না, আমি ছাত্র-অসন্তোষ, রাস্তায় মারপিট, কর্পোরেশনের হৈ-হুল্লোড় ইত্যাদির কথা বলছি না। আমি বলছি আরো গোড়ার কথা, অর্থাৎ মনের কথা। কলকাতারও একটা মন আছে। সে মন আমার-আপনার-সকলের মন নিয়েই তৈরী। এই মনেরই বহিঃপ্রকাশ হল সংস্কৃতির বিচিত্র অবদান। কিন্তু তার তলায় রয়েছে অসুস্থতা। সেই মানসিক অসুস্থতার দিকেই ইঙ্গিত করতে চাইছি আমি।

জানি, এখুনি একটা তর্ক উঠবে। প্রশ্ন হবে, এই অসুস্থতার নিদান যে আমার মনগড়া নয় তার প্রমাণ কী?

প্রমাণ দেব। সেজন্যে তৈরী হয়েই আসরে নেমেছি আজ। দৈনিক যুগান্তরের ১৯শে নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভদ্রব্যক্তিরা পড়ে দেখুন—

'এদিকে পশ্চিমবঙ্গে মদ বিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, কলিকাতার মাসে গড়ে ত্রিশ হাজার গ্যালন দেশী মদ বিক্রয় হয়। তাহা ছাড়া ২৫ হাজার গ্যালন বিয়ার, ৮ হাজার গ্যালন ভারতে প্রস্তুত 'বিদেশী মদ' ও দেড় হাজার গ্যালন বিদেশী মদ এই মহানগরীর বাসিন্দারা মাসে ক্রয় করিয়া থাকেন।'

আপত্তি উঠতে পারে, মদ্য বিক্রয়ের এই ফিরিস্তিটা যে কলকাতাবাসীদের মনোবিকারের পরিচয় দিচ্ছে তার নিশ্চয়তা কী?...মদ্যপান নৈতিক দিক দিয়ে সমর্থনীয় কিনা সে তর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, কলকাতার মতো শহরে, যেখানে বিপুলসংখ্যক মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের দিনগত পাপক্ষয় ক'রে প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত, সেখানে প্রতি মাসে মদের এই দ্বিতীয় টাল্লা-টাঙ্ক নিঃশোষিত হওয়া নিশ্চয়ই সুস্থতার পরিচায়ক নয়। বিশেষ করে শ্রমিক অঞ্চলের সাক্ষী থেকে আমরা জানি, অশান্তি যতো বেড়ে যায়, রোজগার যতো কমে ততোই মানুষ মনকে মাদক-দ্রব্যে অসাড় করতে চায়। কিন্তু এটা বাহ্য, এর পরেও একটা তুলনামূলক সমীক্ষা রয়েছে উপরের ঐ উদ্ধৃতির ঠিক নিচেই।—

'প্রকাশ যে, ১৯৫৮ সালে এই রাজ্যে যেখানে প্রতি মাসে প্রায় ৬৪ হাজার গ্যালন দেশী মদ বিক্রয় হইত, সেখানে ১৯৬০ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৯ হাজার গ্যালনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।'

এই অঙ্কের একটা বড় অংশ যে কলকাতার প্রাপ্য তাতে সন্দেহ নেই। এবং '৬১ সালে অঙ্কটা যে আরো স্ফীত হ'য়ে উঠবে তাতেও সংশয় প্রকাশ করা চলে না। তাছাড়া রয়েছে বেআইনী কারবার। তার সুরঙ্গচারী চেহারাটা স্পষ্ট ক'রে দেখা না গেলেও 'যুগান্তর' যা জানাচ্ছেন তাও কম নয়।

'১৯৬০ সালে কলিকাতা পুলিশ ছয় হাজার গ্যালন বেআইনী চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।'

আর উদ্ধৃতির দরকার নেই। শুধু এর সঙ্গে যোগ করুন গাঁজা, আফিম ইত্যাদি অন্যান্য মাদক দ্রব্যের বিক্রির পরিমাণ, এবং ভেবে দেখুন, মাসে কতোবার ঐ ধরনের মাদক দ্রব্যের চোরা-কারবারের কথা জানতে পারেন আপনি কাগজ থেকে। তাহলেই বুঝতে পারবেন, কলকাতার উচ্চ-মধ্য-নিম্নস্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ কেমন মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে মনোবিকারের লক্ষণ। '২৮ মণ পনর সের বে-আইনী গাঁজা' ধরা পড়লে (যুগান্তর, ১৯শে নভেম্বর) সরকারের আয়বৃদ্ধি ঘটে ঠিকই। কিন্তু গাঁজাটা গাঁজাই থেকে যায়, এবং তা বিক্রিও হয়, তবে আইনসঙ্গতভাবে, এই যা!

ওদিকে অবশ্য সাহিত্য সম্মেলনে আমরা জাতীয় সংহতিতে সাহিত্যের অবদান ইত্যাদি বিষয়ে আবেগদীপ্ত ভাষণ দিচ্ছি, ছবির প্রদর্শনীতে ছোট-ছোট পিকাসো-মাতিসের সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য ধন্য করছি, এবং সঙ্গীত সম্মেলনের অলৌকিক মাধুর্যের টানে ফুটপাথে বসে রাত ভোর করে দিচ্ছি। সংস্কৃতির শত শত প্রদীপ জ্বলে উঠছে দিকে দিকে। কিন্তু তার ঠিক নিচেই?

অতলস্পর্শী অন্ধকার!...... আমরা কোথায় চলেছি!!

* * *

কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে। তবু মানুষে কুকুর পোষে এবং লাই দেয়। বোধহয় তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই যে, কাউকে লাই দিয়ে মাথায় তুলতে না পারলে কারো-কারো ঘুম হয় না। চতুষ্পদ পেলে ভালো, নয়তো দ্বিপদেও আপত্তি নেই।

দ্বিপদের কথা থাক। এ জাতীয় জীবকে লাই দিয়ে আমরা যে কতো বিপদে পড়ি, সে অভিজ্ঞতা আশা করি সকলেরই আছে। চতুষ্পদের কাহিনী বলছি।

ইংলণ্ডের এক সমীক্ষায় জানা গেছে, সেখানে শিশুদের মধ্যে যে সব অন্ধত্ব দেখা দেয় তার অর্ধেক কারণ কুকুর। না, কুকুর তাদের চোখ খুবলে দেয় বলে যে শিশুদের অন্ধত্ব ঘটে তা নয়। বরং কুকুর তাদের নয়নানন্দকর ভাবেই চলাফেরা করে। কিন্তু এইসব দর্শনধারী কুকুরকে মানবশিশুরা একটু বেশী চোখের সামনে রেখে আদর-আপ্যায়ন করে বলেই বিপত্তি ঘটে।

কুকুরকে যখন তারা কোলে তুলে, বুকে জড়িয়ে, চুমু খেয়ে মনের সাধে লাই দিতে থাকে তখন কুকুরের গা থেকে এক রকম ক্ষুদ্রাবিক্ষুদ্র ডিম গিয়ে—মাথায় নয়—আশ্রয় নেয় তাদের চোখের মধ্যে। তারপর কালক্রমে এই ডিমগুলো ফাটে, এবং ওদেরই বিষে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে শিশুরা।

অতএব কুকুর-বিলাসীরা সাবধান। কলকাতাতেও আজকাল কুকুর, বিশেষ করে অ্যালসেশিয়ান পোষা দারুণ একটা ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পাঁচসালা পরিকল্পনা দুটিতে মানুষের যতোটা সুবিধে হয়েছে তার চেয়েও বেশী হয়েছে কুকুরের। বাড়ীতে আজকাল রেডিওগ্রাম, ফ্রিজের মতো আস্ত একটি কুকুরও চাই। নাহলে 'সমাজে'র চোখে জাতে ওঠা যায় না। জানি না, এ 'সমাজ'টা কোথা থেকে আমদানী হল, আর তার চোখটাই বা কেন এমন কুকুর-কেন্দ্রিক, কিন্তু এদিকের চোখ সামলাতে ওদিকের কাঁচ-কাঁচ চোখগুলো যে অন্ধত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, সেটা খেয়াল আছে তো?

কুকুরকে লাই না দিলে সত্যি যদি কারো মাথা খালি-খালি লাগে, তবে চতুষ্পদ ছেড়ে দ্বিপদ ধরাই বোধহয় কম বিপজ্জনক!

রেনেসাঁস ও রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে রেনেসাঁস ঘটে গেছে। কিন্তু ইদানীং কেউ কেউ এতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই সংশয়ীদেরও দুই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী। এক দিকের কথা হলো রেনেসাঁস কখনো পরের উপনিবেশে ঘটতে পারে না। অতএব ওটা রেনেসাঁস নয়। আরেক দিকের বক্তব্য হলো রেনেসাঁস যদি ঘটে থাকত তাহলে আমাদের সংস্কৃতির এ দেউলে দশা কেন? রবীন্দ্রনাথের পরে এমন নিঃশেষিত অবস্থা কেন? অতএব ওটা রেনেসাঁস নয়। রেনেসাঁসের দীপমালা অত অল্প সময়ের মধ্যে নিবে যায় না।

এ ছাড়া আরো একটা মত শোনা যায়। রেনেসাঁস ঘটেছিল বটে, কিন্তু তার মেয়াদ ফুরোবার আগেই কাউন্টার রেনেসাঁস ঘটে। সুতরাং কাটাকুটি হয়ে গেছে। এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমরা যে তিমিরে, আমরা সে তিমিরে। রবীন্দ্রনাথ থাকতেই কাউন্টার রেনেসাঁস শুরু হয়। যদিও তিনি তার ঊর্ধ্বে।

এসব কথা শুনলে কার না বুকটা দমে যায়? কিন্তু অন্য রকম কথাও শুনেছি। শুনে উদ্দীপনা পেয়েছি। একবার এক ব্যারিস্টার আমাকে তাঁর মোটরে করে বাড়ী পৌঁছে দেন। বললেন বাধ্য হয়ে আইনকে পেশা করতে হয়েছে। আসলে তাঁর নেশা হলো গণিত-শাস্ত্র। রাশিয়ানরা স্পুটনিক উদ্ভাবন করার অনেক আগেই তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, স্পেস বিজয়ের দিন আগত ওই। ভারত তবু কই? তাই তিনি একাই এ বিষয়ে গবেষণায় লেগে যান। কাজেই স্পুটনিক সম্বন্ধে তিনিই এদেশে সবচেয়ে বেশী জানেন। এখন তিনি স্লাইড তৈরি করিয়ে তাই নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় আপিসে আপিসে যান। লোকের আহ্বানে। বাবুরা ছুটির পরেই ছুট দেন না, তন্ময় হয়ে ডায়াগ্রাম দেখেন ও লেকচার শোনেন। সম্প্রতি ডাক আসছে মফঃস্বলের স্কুল কলেজ থেকে। সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও। এই তো সেদিন তিনি সুন্দরবনের দিকে গিয়ে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের ভিড়ে স্লাইড দেখিয়ে ও বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। অন্ধকার রাত্রে খোলা আকাশের নিচে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছিল। ব্যাটারির গোলমাল।

ভদ্রলোক বললেন, "দেশে এখন রেনেসাঁস এসেছে। অন্তহীন কৌতূহল। লোকে সব কিছু দেখতে চায়, শুনতে চায়, জানতে চায়, বুঝতে চায়।"

হাঁ। এই হচ্ছে রেনেসাঁসের প্রকৃত লক্ষণ। অন্তহীন কৌতূহল। নতুন চোখে দেখা। নতুন কানে শোনা। নতুন মন দিয়ে জানা। নতুন মগজ দিয়ে ভাবা। নতুন বুদ্ধি দিয়ে বোঝা। নতুন হাত দিয়ে করা। নতুন হাতিয়ার দিয়ে গড়া।

এ রকম লক্ষণ যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়ে না থাকে তবে আমাদের দেশে রেনেসাঁস এর আগে ঘটেনি, সবে ঘটতে আরম্ভ করেছে। আমাদের রেনেসাঁস তা হলে পিছনে নয়, সামনে। কিন্তু গত দেড় শ' বছরে যা দেখা গেল সেটা তবে কী? কোন্ নামে তাকে অভিহিত করব? এত কাল যে আমরা রেনেসাঁস বলে তার পরিচয় দিয়ে এসেছি সেটা কি নিতান্তই ইউরোপের নকলনবিশী?

তার আগে বলি ইউরোপে কী ঘটেছিল? সংক্ষেপেই সারতে হবে।

প্রাচীন গ্রীকদের জগৎ-জিজ্ঞাসা, জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যসৃষ্টি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের নিজেদের দেশ থেকেই। শূন্য আসন পূর্ণ করে ইহুদীস্থান থেকে সমাগত খ্রীস্টীয় জগৎমীমাংসা, জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যধ্যান। খ্রীস্টধর্ম গ্রীস থেকে রোমে যায়, সেখান থেকে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে। গ্রীস থেকে উত্তর মুখেও যায়। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলও খ্রীস্টান হয়। সেই থেকে বাইবেল হলো একাধারে ধর্মশাস্ত্র, নীতিসার, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, আয়ুর্বেদ। যাহা নাই বাইবেলে তাহা নাই ধরাতলে। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আছে তাতে। প্রশ্ন করাটাই তো অহমিকা। মাথা নত করে মেনে নাও যা বলা হচ্ছে। এমন কি বাইবেল খুলে দেখতেও চেয়ো না। পড়াশুনা সকলের জন্যে নয়। যারা পড়বে তারা মাতৃভাষায় পড়বে না। ল্যাটিন গ্রীক শিখতে হবে। তাও শুধু বাইবেল বা তার ভাষ্য অধিগত করার জন্যে।

ধর্মযাজকরা যে কেবল আত্মার পাপ-মোচন নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন তাই নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মর্ত্যলোকে স্বর্গ-রাজ্য সংস্থাপন। সেইজন্যে রাষ্ট্রকেও তাঁরা আনতে চান সঙ্ঘের এক্তারে। তাঁদের জুরিসডিকশন জীবনের যাবতীয় বিভাগে পরিব্যাপ্ত। মানুষ কী বিশ্বাস করবে, কী চিন্তা করবে, কী লিখবে, কী আঁকবে, কী গড়বে এ সমস্ত তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করবেন। রাজার উপর তাঁরাই অধিরাজা। তাঁদের যিনি পোপ তিনি দীন দুনিয়ার মালিক। তাঁরও একপ্রস্থ সৈন্যসামন্ত, বিচারালয়, কারাগার, শ্মশান। মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে না মারলে নাকি তার আত্মা অনন্তকাল নরকে পুড়তে থাকবে। সুতরাং পাপ দেখলেই পোড়ান। পাপের সংজ্ঞাও অতি ব্যাপক। কোনো একটি আপ্ত বাক্য যদি চোখ বুজে মেনে না নাও তবে তুমি পাপী, তোমাকে অনন্তকাল নরকে পুড়তে হবে, তার চেয়ে এখানেই শরীরটাকে দগ্ধ হতে দিয়ে আত্মাকে বাঁচাও।

হাজার বছর ধরে চলে এই সর্বাত্মক ধর্মানুসরণ। ভালো কাজও বড় কম হয়নি। যেখানে সভ্যতা ছিল না সেখানে সভ্যতার প্রসার হয়। যাজকরা কৃষকের সঙ্গে জমি চাষ করেন, শ্রমিকের সঙ্গে কায়িক শ্রমে লেগে যান। নতুন ধরনের কমিউনিটি গড়ে ওঠে। সেখানে প্রতি-বেশী প্রতিবেশীর জন্যে অকাতরে ত্যাগ স্বীকার করে। মানবপ্রেমের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখান সাধুরা। অত্যাচারী রাজা রাজড়াদের সায়েস্তা করা হয়। বুনো জমিদারদের পোষ মানানো হয়। বহু-গামী পুরুষদের একগামী করা হয় বিবাহসূত্রে। নারীর সতীত্বের আদর্শ কঠোর হয়। সুন্দর সুন্দর উপাসনা-মন্দির নির্মিত হয়। বারো মাসে তেরো পার্বণ জীবনের দুঃখ দৈন্য ভুলিয়ে দেয়। সঙ্ঘ হয় গরীবের মা-বাপ। আপদে-বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা পরিবার-পরিজন ছেড়ে বৃহত্তর মানব-পরিবারের ভার কাঁধে তুলে নেন। প্রেমের সঙ্গে গলিত কুষ্ঠরোগীর পরিচর্যা করেন। সন্ন্যাসিনীরাও তেমনি সেবাব্রত বরণ

করে মানবের দুঃখমোচনে জীবনের সার্থকতা লাভ করেন।

সাধুদের ধারণা ছিল তাঁদের মেষ-পালের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যারা একবার গ্রীস রোমের সভ্যতার আস্বাদন পেয়েছে তারা আরো কিছু চায়। সে জিনিস গ্রীস রোমেই পাওয়া যেতো. পেতে হলে গ্রীস রোমের উত্তরাধিকার মেনে নিতে হয়। তার আগে খোঁজ নিতে হয় গ্রীস কী রেখে গেছে. রোম কী রেখে গেছে। খৃষ্টীয় সঙ্ঘ সমাজের সম্পত্তি ব্যবস্থায় হাত দেয়নি। সম্পত্তি থাকলে দেওয়ানী ফৌজদারী আইন থাকে। আইন পড়তে হয়। তাই রোমান আইন পড়ার রেওয়াজ বরাবর বহাল ছিল। আইন পড়ার জন্যে যারা ল্যাটিন পড়ত তারা ভাষা শিখতে গিয়ে সাহিত্য পড়ত। ল্যাটিন ক্লাসিকগুলি কোনো দিন অচলিত হয়নি। সেই সূত্রে প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে একটা ধারা-বাহিকতা ছিল। গ্রীক সাহিত্যকেও পাওয়া যেত ল্যাটিনের মাধ্যমে। অবশ্য ক্ষীণভাবে। ওদিকে বৈদ্যবৃত্তির জন্যেও কতক লোক কবিরাজী পড়ত। আরবী ভাষায় পেতো গ্রীক আয়ুর্বেদের বই। আরবরা উত্তর আফ্রিকা অধিকার করে স্পেনে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। আরবী ভাষার মাধ্যমে গ্রীক দর্শনেরও খোস খবর পাওয়া যেতো। ল্যাটিনে তর্জমা হয়ে গ্রীক দর্শন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশ করে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হতো আইন, কবিরাজী আর থিওলজি। একটু একটু করে গ্রীক দর্শন বিজ্ঞানও কৌতূহল জাগালো। সাধুদের মধ্যেও এ কৌতূহল সঞ্চারিত হলো। বাইরে তাঁরা কড়া, ভিতরে তাঁরা নরম। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে কেই বা হাজার বছর ধরে চায়!

বহির্জগৎ সম্বন্ধেও কৌতূহল দুর্বার হয়ে ওঠে। জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কত লোক ভারত আবিষ্কার করতে। ভারত বলে ভুল করে আমেরিকা আবিষ্কার করে। তার পর জলপথে ভারত আবিষ্কৃত হয়। ভারতকে চিনত প্রাচীন গ্রীকরা রোমানরা। খৃষ্টীয় ইউরোপ চিনত না। কারণ স্থলপথ দখল করে আগলে বসেছিল আরব ও তুর্ক মুসলমানরা। তুর্করা অবশেষে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে। সেখানে তখনো গ্রীক বিদ্যার টোল ছিল। টোলের পণ্ডিতরা বুঝুন না বুঝুন পুঁথিগুলো যত্ন করে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এবার পৃষ্ঠপোষকের অভাবে টোল বন্ধ করে দিয়ে পুঁথিপত্র সমেত সরে পড়তে হলো। বলা বাহুল্য খৃষ্টান তাঁরাও হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান হতে তাঁদের আপত্তি ছিল। চললেন তাঁরা ইটালী। সেদেশে তাঁদের ও তাঁদের পুঁথিপত্রের সমাদর হলো। মনে রাখতে হবে যে সঙ্ঘ এতে বাদ সাধেনি। রেনেসাঁসের প্রথম অধ্যায়ে সঙ্ঘ বুঝতে পারেনি যে মানুষের মন গ্রীক ভাষায় লেখা দুর্বোধ্য পুঁথি পড়ে প্রশ্ন করতে শিখবে, তর্ক করতে শিখবে। ভোগপ্রবণ হবে। দেহসৌষ্ঠব চাইবে। রূপদীক্ষা নেবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা দাবী করবে। প্রকৃতির রহস্য ভেদ করবে। পৃথিবীকে গোল বলে গতিশীল বলে সব গোলমাল করে দেবে। তাহলে খৃষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বই যে টলমল করে।

সত্যি, এইভাবেই একটা ভূমিকম্প ঘটে গেল। ঘটতে সাহায্য করল নব-উদ্ভাবিত মুদ্রাযন্ত্র। খৃষ্টধর্মের যা সারবস্তু তা কাঁপবার নয়, ফাটবার নয়, ভাঙবার নয়, ধসবার নয়। কিন্তু খোলসটাকেই তো লোকে ধর্ম বলে জানে ও মানে। এক একটা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয় আর একটার পর একটা পাথর খসে পড়ে। রেনেসাঁস এসে হাজার বছরের কারাপ্রাচীর নাড়িয়ে দিল। সবটা একদিনে ধূলিসাৎ হলো না, আজো হয়নি। কিন্তু মানুষ এখন যে জগতে বাস করে সে জগৎ মধ্যযুগের মন-গড়া জগৎ নয়। সে জগৎ মানুষের মনকেও গড়ে-পিটে ছাঁচে ঢালাই করে নেয় না। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ বহু-ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে। তার অন্তঃপ্রকৃতিও এখন প্রকৃতিরই মতো বিজ্ঞানের কৌতূ-হলী চক্ষুর সম্মুখে দ্রৌপদীর শাড়ী উন্মোচন করছে। আগেকার দিনে যাকে শয়তানের দ্বারা অনুপ্রাণিত মারাত্মক পাপ মনে করা হতো একালে সেসব প্রকৃতির দেওয়া সহজাত প্রবৃত্তি বা ইনস্টিংক্ট। অথবা অবচেতনের ক্রিয়া। পাঁচশ' বছরে মানুষের স্বভাব অবশ্য বদলায়নি, কিন্তু ভালো মন্দ সম্বন্ধে তার ধারণা খুব বেশী বদলেছে। সেই জন্যে দাসপ্রথা রহিত হয়েছে, নারী ও শূদ্রের মর্যাদার উন্নতি হয়েছে, গণতন্ত্র বিবর্তিত হয়েছে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। আর্টে সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। দর্শন আর থিওলজির ধার ধারে না।

এর কালো দিকও আছে। ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির ভয় ভেঙে যাওয়ায় মানুষ নিরঙ্কুশ ও যথেচ্ছচারী হয়েছে। যেমন প্রাইভেট জীবনে তেমনি পাবলিক জীবনে। তার ফলে এসেছে নৈতিক তথা অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক অরাজকতা। অরাজকতা এলে তার পালটা ডিক্টেটরশিপ আসে। একাধিক ডিক্টেটরের দাপটে মানুষ আবার ভেড়া বনে গেছে। এদের অন্যায় হুকুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছে, নির্বাসনে গেছে, কারাগারে পচেছে। বিজ্ঞান এখন পরমাণু বোমা বানিয়ে মনুবংশ ধ্বংস করতে সাহায্য করছে। প্রকৃতি মানুষের কাছে বিভীষিকা ছিল। এখন মানুষই প্রকৃতির কাছে বিভীষিকা। কারণ পরমাণু বোমা ফাটলে কেবল যে মানুষই নিশ্চিহ্ন হবে তাই নয়, পশু-পাখী গাছপালা কীটপতঙ্গও মুছে যাবে। রেনেসাঁস যদি না ঘটত দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটত না, তৃতীয়টার আশঙ্কা দেখা দিত না। সেই জন্যে রেনেসাঁসের উপর বহু লোকের ঘেন্না ধরে গেছে। তারা আবার ক্যাথলিক চার্চের কোলে ফিরে যাচ্ছে। ধর্মের মধ্যে শান্তি খুঁজছে।

এই তো ইউরোপ আমেরিকার অবস্থা। এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক আমাদের দেশে রেনেসাঁস হয়েছে কি হয়নি কি হচ্ছে। হলে তার দৌড় কত-দূর। আমাদের ইতিহাস ঠিক ইউরোপের অনুরূপ নয়। তবে আমাদেরও একটা প্রাচীন যুগ ছিল। আমাদেরও একটা মধ্যযুগ এলো। মধ্যযুগের গোড়ায় এলো অবতারবাদী পৌরাণিক ধর্ম। বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেই। মধ্যযুগের মাঝখানে এলো অবতারবিরোধী ইসলাম ধর্ম। বাইরে থেকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কোনোটাই একচ্ছত্র হয়নি, সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি। ইসলাম যদি না আসত পৌরাণিক ধর্ম বৌদ্ধধর্মকে তাড়িয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতো। একচেটে অধিকার পেলে কার না মাথা ঘুরে যায়। কে না সর্বশক্তিমান হতে চায়। পৌরাণিক ধর্মেরও ক্ষমতা অভ্রভেদী হতো। ইসলাম এ দেশে প্রোটেস্টান্ট মার্গের কাজ করেছে। অপর পক্ষে পৌরাণিক ধর্ম যদি না থাকত, যদি শক্তিমান না হতো, ইসলাম এসে সর্বেসর্বা হয়ে বসত। তার আজ্ঞাধীন হয়ে মানুষ মাথা তুলতে পারত না। পৌরাণিক ধর্ম থেকে তাকে সংযত করেছে।

না। ভারতের মধ্যযুগ ইউরোপের মধ্যযুগের সঙ্গে হুবহু মেলে না। এ দেশের মানুষকে সমাজে ও রাষ্ট্রে

স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু সব দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখাও হয়নি। এটা মনোপলি না থাকার সুফল। তাছাড়া প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা চিরটা কাল ছিল, অন্বয় রক্ষা করেছিল মহাভারত ও রামায়ণ। ইউরোপে ইলিয়াড অডিসি কে পড়ত? তার কাহিনী কে শুনত? তার অভিনয় কে দেখত? প্রাচীন ভারতের দর্শন-চিন্তাও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, যদিও লোকে ভুলে গেছল যে, আরো ছ'টি দর্শনও ছিল। নিরীশ্বরবাদী সিদ্ধান্তও ছিল। আধ্যাত্মিকতা বলতে মধ্যযুগে বোঝাত সাধারণত দেবদেবীবাদ বা অবতারবাদ বা ঈশ্বরবাদ। কদাচিৎ ব্রহ্মবাদ বা শূন্যবাদ।

মধ্যযুগের ইউরোপের সঙ্গে হুবহু মিল ছিল না সেটা ঠিক, কিন্তু মধ্য-যুগের যেটা বৈশিষ্ট্য বা যুগধর্ম সেটা ভারতকেও ইউরোপের সঙ্গে একাকার করেছিল। বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। অতএব তর্ক কোরো না, বাছা। যা বলছি তাই প্রামাণিক বলে মেনে নাও। যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস মানুষকে নিজের চেষ্টায় বিশ্বরহস্য ভেদ করতে শেখায় না। তার মনে কৌতূহল জাগায় না, জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে না, অনুসন্ধানের প্রবর্তনা দেয় না। সে চোখ কান বন্ধ করে কেবল নাম জপে আর ধ্যান করে। অমন লোকের কাছে প্রকৃতি তার রহস্য অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবে কেন? অনা-বৃষ্টিতে অতিবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষে প্লাবনে মহামারীতে সে শুধু কাতর কণ্ঠে রোদন করে, "হা রাম! ইয়া আল্লাহ্!" কিন্তু ঈশ্বর তাকে যে সব ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করে না, করতে জানে না, করতে চায়ও না। সমুদ্র পড়ে রয়েছে দেশের তিন দিকে। সে সমুদ্রযাত্রা করবে না। কারণ কি? কারণ কিছু নেই। শুধু জানে, নিষেধ। কেন নিষেধ মানবে? ওরে বাপ রে! না মেনে উপায় আছে! জাত যাবে যে! ইহকাল পরকাল যাবে। জন্মালে নীচ কুলে জন্মাতে হবে। না জন্মালে নরকে দগ্ধ হতে হবে। আপাতত ধোপা নাপিত বন্ধ। হুঁকো চলবে না। শেষে কি অস্পৃশ্য হতে হবে?

হ্যাঁ, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধনও ছিল। জাতের অত্যাচার এমনটি কোথাও কেউ দেখেনি। জাত যাবার ভয়ে মানুষ কেঁচো হয়ে রয়েছিল। শুধু যে ইহজন্মে যাবে তা নয়, জন্ম-জন্মান্তরে যাবে। জাতের সংখ্যা নেই। এক এক করে নিম্নতর জাতে জন্মাতে হবে। চাঁড়াল হতে হবে, ডোম হতে হবে, মুচি হতে হবে। সমাজকে জাতিবর্ণহীন করার লেশমাত্র অভিপ্রায় বা উদ্যম ছিল না। সে কল্পনাই ছিল না। নিজের তৈরি গোলকধাঁধায় নিজেরই ঘুরে মরার ভয়ে যুক্তিহীন বিধিনিষেধ মানতে মানতে জ্ঞান অস্থির। ইসলাম গ্রহণ করে হয়তো এক প্রস্থ ভয়ের হাত থেকে বাঁচা যেতো। কিন্তু আরেক প্রস্থ ভয়ের খপ্পরে পড়া যেতো। যাহা নাই কোরানে তাহা নাই জগতে। উহাই বিজ্ঞান, উহাই দর্শন, উহাই ইতিহাস, উহাই সাহিত্য, উহাই অর্থনীতি, উহাই রাজনীতি। নাচতে পারবে না, গাইতে পারবে না, আঁকতে পারবে না, গড়তে পারবে না। বারো মাসে তেরো পার্বণ নেই। হোলি খেলা নেই, রামলীলা নেই, রাস নেই, ঝুলন নেই, দুর্গাপূজা নেই, কালীপূজা নেই, মেয়েলি বার-ব্রত স্নান নেই, যা আছে তাতে নারীর স্থান নেই বা থাকলে পর্দার আড়ালে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, মুসলমান হলেও আরবরা গ্রীক দর্শন গ্রীক বিজ্ঞান বর্জন করেনি। তারাই বরং ইউরোপে চালান দিয়ে প্রাচীন গ্রীক জীবনধারাকে ফল্গু নদীর মতো বহতা রাখে। কিমিয়া বা আলকেমি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন কেমিস্ট্রির উদ্ভব হলো। আমাদের দেশে রসায়ন অনেক আগেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মাটির উপর থেকে লুপ্ত হয়ে যাবার পর কেউ তাকে মাটির তলায় বহতা রাখেনি। এ দেশে যারা ইসলাম নিয়ে এলো তারা প্রধানত পাঠান তুর্ক মোগল। নিজেরাই অশি-ক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। তাদের মাদ্রাসা বা মক্তবের ত্রিসীমানায় গ্রীক দর্শন বা গ্রীক বিজ্ঞান বা কিমিয়া বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল না। কদাচ কখনো দু'চার ঘর সুধী আরব ইরান থেকে আসতেন। এসে এ দেশের ইসলামের মরুভূমিতে হারিয়ে যেতেন। একে উর্বরা করা দুরূহ ছিল। সে মন নেই, সে মেজাজ নেই। প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্যই ছিল প্রকৃতি।

তবে সৌন্দর্যধ্যান ছিল। না থাকলে তাজমহল হতো না, ফতেপুর সিক্রী হতো না, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হতো না, মোগল মিনিয়েচার চিত্রকলা হতো না, শালিমার উদ্যান হতো না, কাশ্মীরী শাল গালিচা হতো না, অসংখ্য প্রকার কারুশিল্প হতো না, এত রকম ফুল এত রকম ফল এত রকম আম থাকত না। এত রকম রান্নাও থাকত না। মধ্যযুগের ভারত ইউরোপের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। বিবিধ অর্থে। তাই ভারত আবিষ্কারের জন্যে ভারতে

আসার জলপথ আবিষ্কারের জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তার ফলে পশ্চিমের রেনেসাঁস সুগম হয়। পরোক্ষভাবে ভারতও তার এক কারণ। ভারতের বিচিত্র সমৃদ্ধি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ভারত দুর্বল ছিল না। দীন ছিল না। বাদশারা তাকে দীন দুর্বল হতে দেননি। তবে শেষের দিকে তাঁদের অশুভ-বুদ্ধি যেমন তাঁদের পক্ষে কাল হলো তেমনি তাঁদের রাজ্যের পক্ষেও। তাঁদের দেশের পক্ষেও। সমুদ্রপথ অন্বেষণ করতে যারা প্রাণ হাতে করে বেরিয়েছিল ইতিহাস হলো তাদেরি প্রতি অনুকূল। সমুদ্রযাত্রা ছেড়ে দিয়ে যারা পাঁজি দেখে গোরুর গাড়ীতে চড়ত ইতিহাস হলো তাদের প্রতি বিমুখ। মোগলরাও সমুদ্র সম্বন্ধে সজাগ ছিল না। মধ্য এশিয়ায় সমুদ্র কোথায় যে তাদের সমুদ্র-ভয় ভাঙবে! আমার এক পশ্চিমা মুসলমান সহকর্মী নদীর ভয়ে পূর্ববঙ্গে বদলি হতে চাইতেন না। আরব হলে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় থাকত। কিন্তু পাঠান মোগলদের ঐতিহ্য অন্যরূপ।

সী পাওয়ার যার দুনিয়া তার। এই হলো অষ্টাদশ শতকের অলিখিত নিয়ম। ইংলণ্ড ছিল অগ্রগণ্য সী পাওয়ার। নেপোলিয়ন তার সঙ্গে বল-পরীক্ষায় হেরে যাওয়ার পর তাকে রুখবে এমন শক্তি পৃথিবীতে ছিল না। ভারতে থাকত কী করে! ভারত দুদিন আগে না হোক দুদিন পরে ইংলণ্ডের ছত্রাধীন বা প্রভাবাধীন হতোই। এটার যদি আর কোনো কারণ নাও থেকে থাকে তবে সমুদ্র অধিকারই ভারত অধিকারের অর্ধেক কারণ। তাও যদি ফরাসীদের মতো সেকালের পক্ষে আধুনিক স্থলসৈন্য থাকত! যুদ্ধবিদ্যার অগ্রগতির খবর মোগলরাও রাখত না, মারাঠারাও না, শিখরাও না, রাজপুতেরা তো নয়ই। কিন্তু আরো গভীরে গেলে দেখা যাবে সব কারণের তলায় ছিল রেনেসাঁসের দ্বারা ইউরোপের বলাধান ও তার অভাবে ভারতের বন্ধ্যাত্ব। আমাদের জগৎ-জিজ্ঞাসায়, জীবন-দর্শনে ও প্র্যাকটিক্যাল ক্রিয়াকর্মে বার্ধক্য এসেছিল। আর ইউরোপের এসেছিল যৌবন। প্রাচীন সভ্যতা কি কেবলমাত্র গৌরবের বিষয়! সে যদি প্রকৃতির মতো পুরাতন হয়েও নিত্য নূতন না হয়, যদি শীতের পরে বসন্তের স্ফূর্তি অনুভব না করে, যদি রাত্রির পরে দিনের আলোর পরশ না পায় তবে সে মানুষকে দুর্বল করে, শোষিত ও লাঞ্ছিত করে।

ইউরোপের রেনেসাঁস তাকে দিগ্বিজয়ী করে, এটাই মূলগত সত্য। কিন্তু দিগ্বিজয়ী না যদি করত তা হলেও কিছু এসে যেতো না। সেই অভিনব শক্তি জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে স্পন্দন নিয়ে আসে। কিছুই তার আওতা থেকে বাদ পড়ে না। ধর্মেরও নবযুগ আসে। সমাজেরও। সব একদিনে নিখুঁৎ হয়ে গেল তা নয়। মানবিক কখনো নিখুঁৎ হতে পারে না। প্রাকৃতিক কখনো নিখুঁৎ হতে পারে না। নিখুঁৎ হলে তার আর অদল-বদল চলে না। আর অদল-বদলই তো প্রকৃতির নিয়ম। অদল-বদল নেই শুধু নির্গুণ ব্রহ্মের। রেনেসাঁসের মানব হলো প্রকৃতির নিয়মে চালিত। প্রকৃতিকে জয় করার অভিলাষ পোষণ করে সে প্রকৃতির নিয়ম অধ্যয়ন করে। অনুসন্ধান করে। আরম্ভ করে। তার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সে পায় প্রাচীন গ্রীস থেকেই। সেই জন্যে ইউরোপের রেনেসাঁস গ্রীসেরই পুনর্জন্ম। কৌতুকের কথা গ্রীস ততদিনে তুর্কের পদানত হয়েছে। তাই তার নাম করে অপরের পুনর্জন্ম হলো, তার নিজের হলো না। তাকে অপেক্ষা করতে হলো উনবিংশ শতক অবধি। তার মতো আরো কয়েকটি দেশকেও।

রেনেসাঁস ইউরোপে এলো গ্রীস থেকে। আর আমাদের দেশে এলো ইউরোপ থেকে। কথা হচ্ছে আমরা কি তাকে দুই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলুম, না দুই হাত দিয়ে ঠেলা দিলুম, না তার নাম করে ঘরোয়া এক জাতের রেনেসাঁস খাড়া করে ভাবলুম এই তো কেমন রেনেসাঁস? তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর, হাঁ, হাঁ, হাঁ। আমরা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে গ্রহণও করেছি, দুই হাত দিয়ে ঠেলাও দিয়েছি, তার নামে নাম রেখে ঘরোয়া একটি জিনিসকে রেনেসাঁসও ভেবেছি। অর্থাৎ নাম আর বস্তু কখনো অভিন্ন, কখনো বিভিন্ন।

রেনেসাঁস চান না এমন লোক দেড় শ' বছর আগেও ছিলেন, এখনো রয়েছেন। এঁদের বাদ দিলেও যাঁরা চান তাঁদের মধ্যেই দোটানা ছিল। এখনো কি নেই? প্রথম অবধি রেনেসাঁসের পক্ষপাতীরা দ্বিধাগ্রস্ত। রেনেসাঁস কি এ দেশে ইউরোপের অনুরূপ হবে, না ভারতের স্বকীয় রীতির হবে? রেনেসাঁস কি হবে গ্রীসের পুনর্জন্ম, না ভারতের পুনর্জন্ম? গ্রীক সভ্যতার বড় বড় দানগুলো কি বিশ্বজনীন ও চিরন্তন, না ইউরোপনিবদ্ধ ও তৎকালীন? কেন আমরা গ্রীসের দ্বারস্থ হব? কোন্ দুঃখে? কিসের অভাবে? গ্রীসকে বর্জন করলে এমন কী ক্ষতি যার পূরণ এ দেশের মধ্যেই নেই? ভারত কি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়? ভারত কি সংস্কৃতির দিক থেকেও পরমুখাপেক্ষী? না হয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা গেছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছে, তা বলে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাও স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিতে হবে? রেনেসাঁসের শর্ত কি সংস্কৃতিক আত্মসমর্পণ?

যুক্তি যদি একদিকে আঙুল বাড়ায় আর সেণ্টিমেণ্ট অন্যদিকে তা হলে মানুষ দেড় শ' বছরেও মনঃস্থির করতে পারে না। একবার যুক্তির পথ ধরে চলা, একবার হৃদয়াবেগের। এটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এর খেসারৎ আছে। যেখানে হৃদয় আর মস্তিষ্ক মিলে মিশে কাজ করে সেখানে যেমন প্রগতি হয় অন্যত্র তেমন নয়। আমাদের প্রগতি কেন আশানুরূপ হয়নি তার কারণ আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের পা মিলছে না। ভারতীয় স্বামী-স্ত্রী যখন হাঁটে তখন স্বামী লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়, স্ত্রী পিছনে পড়ে থাকে। তখন স্বামীকেই থামতে হয়। ইংরেজ স্বামী-স্ত্রী যখন হাঁটে তখন একসঙ্গে পা তোলে পা ফেলে। কেউ পিছিয়ে থাকে না, কাউকে থামতে হয় না। প্রগতি যদি হয় হৃদয় ও মস্তিষ্কের একসঙ্গে পা তোলা পা ফেলা তা হলে নৈরাশ্যের হেতু থাকে না।

এখন যুক্তি কী বলে শোনা যাক। যুক্তি বলে, আমাদের জগৎ-জিজ্ঞাসা যদি দেড় হাজার বছর আগে যেখানে ছিল সেইখানে থমকে থাকে আর জগৎ যদি ঐ দেড় হাজার বছরে অনেক লক্ষ যোজন অতিক্রম করে থাকে তা হলে আমরা কি নতুন জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন জগৎ-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হব, না জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পুরাতন জগৎ-জিজ্ঞাসারই পুনরুক্তি করতে থাকব? কার অনুগত হব আমরা? নতুন জগতের, না পুরাতন জগৎ-জিজ্ঞাসার? যদি নতুন জগতের দিকে মুখ ফেরাতে হয় তা হলে ইংরেজী শিখতে হবে, আধুনিক দর্শন বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে, বিশ্ব-সাহিত্যের সাগর জলে স্নান করতে হবে, যা বিশ্বজনীন তাকে সাদরে বরণ করতে হবে, যা বিজাতীয় তাকেও গ্রহণ করতে হবে আপনারই পরিপূরকতার জন্যে, বাংলা ভাষায় এনে দিতে হবে সমুদ্রের জোয়ার। এর ফলে জীবনদর্শনও বদলে যাবে। যাক না! ক্ষতি কী! আমরা নতুন যুগের মানুষ। যে জীবনদর্শন দেড় হাজার বছর আগে তখনকার নতুন যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছিল সে জীবনদর্শন আমাদের জীবনের সঙ্গে কি খাপ খেতে পারে? জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন জীবন-দর্শন বানিয়ে নেব, না জীবনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কবেকার পুরাতন জীবনদর্শনের জের টেনে যাব? কার প্রতি আমাদের আনুগত্য? জীবনের প্রতি, না গতানুগতিক জীবনদর্শনের প্রতি? মানছি সেকালের সৌন্দর্য-সৃষ্টি অপূর্ব। কিন্তু কেমন করে মানব যে তার পুনরাবৃত্তি করলেই তেমনি সৌন্দর্যসৃষ্টি হবে? নতুন

সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যে নতুন ধ্যান চাই। প্রকৃতির দিকে তাকাতে হবে। নারীর দিকে তাকাতে হবে। দেহের দিকে তাকাতে হবে। অনুরাগ সাধন করতে হবে। বৈরাগ্য সাধনে আর যাই হোক সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় কি?

হৃদয়াবেগ কর্ণপাত করতে চায় না। তার কথা হলো, আমি সতী। আমি পতিব্রতা। আমি এক কালে যার হাত ধরেছি সে অতীত হতে পারে, পুরাণ হতে পারে, গতানুগতিক হতে পারে, কিন্তু সেই আমার ও আমি তার। আমি বন্ধ্যা হতে পারি, মূর্খ হতে পারি, দীন হতে পারি, কিন্তু আমি তাকেই চিনি ও মানি, আর কারো দিকে তাকাব না। তোমার ওই জগৎবাবু অতি বদ্ লোক। দেখছ না কেমন করে বণিকের বেশ ধরে পরের ঘরে ঢুকে পড়েছে, এখন পরেছে রাজবেশ। জীবনবাবুও তার দোস্ত হয়েছে। এসব বহুরূপীর কাছে কী আছে শেখবার? না আছে এদের আধ্যাত্মিকতা, না নৈতিকতা। বোঝে শুধু শাসন ও শোষণ। পার্থিব ধনসম্পদ ও সামরিক শক্তি এই দুটি এদের অভিষ্ট। এর জন্যে এরা না করতে পারে হেন কাজ নেই। সৌন্দর্য? ছি ছি। তোমার কি লজ্জাসরম নেই? যা শিব তাই সুন্দর। নাই বা হলো সত্য। হলোই বা অতিপ্রাকৃত, অপ্রাকৃতিক। মোট কথা আমি প্রকৃতির মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব না। ও মাগী আজ এক রকম, কাল এক রকম। কিছুতেই ওর মন ভরে না। ফের যদি তুমি ওর দিকে তাকাও আমি অন্ন-জল ত্যাগ করব। আমাকে আমার আত্মসম্মান নিয়ে মরতে দাও।

ঐ যে প্রকৃতির মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, পদ্মা নদীর মতো এক কুল ভাঙ্গা আরেক কুল গড়া, ওটা কুলবতী নারীর কর্ম নয়। অথচ ওইটেই রেনেসাঁসের মূল সূত্র। ওটা বাদ দিলে রেনেসাঁস একটা কথার কথা। ধরতাই বুলি। দ্রোণাচার্য ছেলেবেলায় পিটুলি গোলা জল খেয়ে ভাবতেন দুধ খেলেন। একেই বলে, ভাজেন ঝিঙে তো বলেন পটল। যে কারণেই হোক রেনেসাঁস শব্দটা মনে গেঁথে গেছে। কিন্তু তার জন্যে কুলবতী নারী কুল ছাড়তে পারে না। আমাদের এই পাঁচ হাজার বছরের কুলবতী সভ্যতা নদীর কূলে লালিত। সমুদ্রের অকূলে ভাসতে তার আন্তরিক অনিচ্ছা। পশ্চিম মহাদেশ ও আধুনিক যুগ যদি হুড়মুড় করে তার ঘাড়ে এসে না পড়ত তা হলে সে স্বেচ্ছায় এতটুকুও বদলাত না। তাকে বদলে দিতে হলে তার উপর জোর খাটাতে হয়। তা সে গায়ের জোরেই হোক আর অবস্থার জোরেই হোক। তেমন অবস্থায় পড়লে সে অনিচ্ছার সঙ্গে বদলায়। ওইখানেই তার বৈশিষ্ট্য। বদলাব না বলে সে যদি সত্যি সত্যি অন্ন-জল ছাড়ত তা হলে এতকাল সে ইহলোকে টিকে থাকত না। বহু প্রাচীন সভ্যতার মতো তারও পরলোক-প্রাপ্তি হতো। আমাদের সভ্যতার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়নি। হয়েছে সাগর সন্দর্শন।

মনে রাখতে হবে যে রেনেসাঁস হচ্ছে লুপ্তপ্রায় স্রোতকে আবার বহতা করা। গ্রীস শুকিয়ে এসেছিল। তাকে ইউরোপের খাতে বইয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু ভারত চিরকালই বহমান ছিল। কোনো কালেই শুকিয়ে যায়নি। ভারত যা হয়েছিল তার নাম কানা গরু। তাঁর ভিন্ন গোঠ। আর-সব গরু যেদিকে যাবে সেদিকে তিনি যাবেন না। তাঁর একার একটা গোচারণ ভূমি। তা না হয় হলো। কিন্তু তাঁর জন্যে আলাদা একটা মহাকাল, আলাদা একটা যুগ, আলাদা একটা শতাব্দীমালা কেমন করে সম্ভব? স্পেস না হয় স্বতন্ত্র, টাইম স্বতন্ত্র হবে কি করে? পশ্চিমকে না হয় গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখলেন, কিন্তু আধুনিককে রুখবেন এমন শক্তি কি তাঁর আছে! অথচ পশ্চিমের উপর অভিমান করে আধুনিকের সঙ্গে অসহ-যোগ করতেও তাঁর বাধেনি!

ভারতের রেনেসাঁস ঠিক ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মতো নয়। রেনেসাঁসের জীবন-দর্শনের মূল সূত্র যে প্রকৃতির মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, নির্মমভাবে এক হাতে ভাঙ্গা আরেক হাতে গড়া, এইখানে তার আন্তরিক কুণ্ঠা। পরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল সে বাধ্য হলে গলাধঃকরণ করবে, অথচ চন্দ্রগ্রহণের সময় হাঁড়ি ফেলতেও ভুলবে না। পুরোনো বোতলে যদি নতুন মদ ভরতে হয় সে হাজার বার 'না' বলে অবশেষে 'হাঁ' বলবে, অথচ বোতলের তলার দিকে যে পুরোনো মদ আছে সে-মদ ঢেলে ফেলবেও না। ধুতির উপরে প্যান্ট পরতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। প্যান্ট পরতে হবে বলে ধুতি খুলতে হবে? ছি-ছি! ক্ষণকালের জন্যেও উলঙ্গ হতে নেই। আত্মসম্মানে বাধে।

ভাঙ্গার কাজ হয়নি বললেও চলে। যা আপনা হতে ভেঙ্গে পড়ছে বা পড়ো পড়ো করছে তারই গায়ে গায়ে গড়ার কাজ চলেছে। প্রকৃতির মতো ভাঙ্গতে সাহস নেই, ইচ্ছা নেই। তবে গড়তে মন গেছে। এই যা লাভ। কৌতূহল জেগেছে, পাশ্চাত্য বলে বিরাগ নেই, আধুনিক বলে অসহযোগ নেই, উপরোধে ঢেঁকি গেলাতে হয় না। কিন্তু পিছুটান এখনো এত তীব্র যে হঠাৎ কোনো কারণে যদি এ দেশ আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা হলে পুরাতন অভ্যস্ত আচারে ফিরে যাবে। পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার প্রচ্ছন্ন এক নিশির ডাক আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি' গল্পের শেষ ক'টি লাইনে এর ইঙ্গিত নিহিত।

"হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, রেবি, চলে আয়।

সুড় সুড় করে রেবতী পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।"

বলা যায় না কবে কোন্ পরি-স্থিতিতে মধ্যযুগের পিসিমার ছায়া পড়বে দেয়ালে। আধুনিক যুগের রেবতী তাঁর পিছন পিছন চলে যাবে। একবার ফিরেও তাকাবে না। যেখানে যুক্তির সঙ্গে সেন্টিমেন্টের স্বতোবিরোধ সেখানে যুক্তি দু-চার পা এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেন্টিমেন্টকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি তার নেই, বরং তাকেই পিছনে টেনে রাখার শক্তি আছে তার পশ্চাদবর্তিনীর। এ সমস্যার সমাধান গত দেড় শ' বছরেও হয়নি, স্বাধীনতার চৌদ্দ বছরেও হয়নি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ও হয়নি। তাঁর শতবার্ষিকীতেও হয়নি। পিসিমা এখনো অবুঝ, তাই রেবতী এখনো নাবালক। পিসিমাকে অমান্য করার মতো মুরোদ সেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকের নেই। সে আইন অমান্য করতে পারে, ফাঁসী কাঠে ঝুলতে পারে, কংগোতে গিয়ে শোম্বেকে হটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু পিসিমাকে 'না' বলতে পারে না।

রাজনীতিক্ষেত্রে স্বরাজ এসেছে, অর্থনীতিক্ষেত্রে 'টেক অফ' অচিরে আসবে, কিন্তু ভারতের হৃদয় এখনো সেইখানেই রয়েছে যেখানে ছিল দেড় হাজার বছর আগে। বিপ্লব যদি ঘটে তার পরেও দেখা যাবে পিসিমা বলবান, রেবতী দুর্বল।

ছেলেবেলায় আমার বিশ্বাস ছিল যে পিসিমাকে বোঝানো যায়। এখন আমার বয়স হয়েছে। আমি আর বিশ্বাস করিনে যে রেবতী তার পিসিমাকে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে পারবে। পিসিমার মৃত্যু কামনা করা পাপ। তাঁর উপর জোর খাটাতে যাওয়া অপরাধ। তা হলে কি তাঁর ইচ্ছার কাছেই আত্মবলি দিতে হবে? না। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলতর করতে হবে। এমন এক অবস্থাকে ডেকে আনতে হবে যা পিসিমাকেও বিপর্যয় লাফ দিতে বাধ্য করবে। লাফ না দিলে মরণ। শিল্প-বিপ্লবের থেকেই সে অবস্থার উদ্ভব হবে। ইউরোপেও তাই হয়েছিল। নইলে রোমের পিসিমাকে অগ্রাহ্য করার মতো সাহস প্রোটেস্টান্টদের থাকলেও ক্যাথলিক-দের ছিল না। হাজার বছরের পিসিমা। আদর যত্ন বড় কম করেননি। যদিও রাগ

করে গায়ে ছাপও দিয়েছেন। এখন তিনি মান-সম্মান নিয়ে কাশীবাস করেন। ভূমিকা পায়, কিন্তু ইউরোপের রেবতী তার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় অটল। সে কখনো ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়, কখনো ভুল সিদ্ধান্ত। কষ্ট পায়, পস্তায়, ভুল সংশোধন করে, ভুলের মাশুল দিতে দিতে দেউলে হয়, কিন্তু ভুলটা তার নিজের ভুল। ভুল করার অধিকার সে অর্জন করেছে। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তার নিজের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সে সংগ্রাম করে আদায় করে নিয়েছে। কেবল পোপের কাছ থেকে নয়, রাজার কাছ থেকেও। নেবে একদিন ডিকটেটরের কাছ থেকেও। না, এ দায়িত্ব ডিকটেটরকেও সঁপে দেওয়া যায় না। প্রগতির বিনিময়েও না।

রেনেসাঁসের জীবন-দর্শনের মূল সূত্র যেমন প্রকৃতির মতো হওয়া তেমনি তার প্রধান কীর্তি হলো মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব তার নিজের হাতে নেওয়া। গোড়ায় কম মানুষের জন্যে। পরে বেশী মানুষের জন্যে। পরিশেষে সব মানুষের জন্যে। সব মানুষ সমান আর সব মানুষ স্বাধীন এই প্রতীতিতে উপনীত হতে পাঁচশ' বছর লেগে গেল। এর মধ্যে গুটি দুই রাজার মাথা কাটতে হলো, গোটা কয়েক গৃহযুদ্ধ লড়তে হলো, গোটা দুই-তিন বড় বড় বিপ্লব ঘটাতে হলো, দু'-দুটো মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হলো। আরো একটার জন্যে পরমাণবিক বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। বোঝা যাচ্ছে বহু প্রার্থিত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মধ্যে সাম্য আর স্বাধীনতা সমীপবর্তী হয়েছে, মৈত্রী এখনো সুদূর পরাহত। রেনেসাঁসের পালা এখনো সাঙ্গ হয়নি। ভারতের মৈত্রীসাধনার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ এবং গৌরবময় তার থেকে মনে হয়েছিল ভারতই এর অগ্রণী হবে। এখন আমি অতটা নিশ্চিত নই। কিন্তু মনের কোণে বিশ্বাস করি যে দেড় হাজার বছরের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলে ভারতই হবে মানবমৈত্রীর অগ্রদূত। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সে দুর্বলতা অবিলম্বে কাটিয়ে ওঠা যায়। মানুষের অসাধ্য কি আছে। ইচ্ছা থাকলেই উপায় থাকে।

রেনেসাঁসকে যদি একটা অবিভাজ্য ঐতিহাসিক প্রোসেস বলে ধরে নিই, যদি একটা দেশের ধারা না বলে যুগের ধারা বলে মেনে নিই, তা হলে বুঝতে পারব রবীন্দ্রনাথ কোন্‌খান থেকে কেমন করে অবতীর্ণ হলেন। যে প্রাণপ্রবাহ প্রথমে ইউরোপকে প্লাবিত করে পরে ভারতকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারই একটি ঢেউয়ের নাম লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, আর-একটির নাম শেক্সপীয়ার, আর-একটির নাম গেটে, আর-একটির নাম রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য আরো অনেকগুলি ঢেউয়ের নাম করতে পারা যায়। স্বদেশের শিল্পী-পরম্পরায় এঁদের যথাবিহিত স্থান আছে, কিন্তু কেবল সেইটুকু দেখেই এঁদের যথার্থ স্থান নির্দেশ করা যায় না। চিলিতে সেদিন ভূমিকম্প হলো, তার দরুণ প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্তের জল উদ্বেল হয়ে উত্তর প্রান্তে তরঙ্গিত হলো, তার ফলে জাপানের সাগরতীরে অবস্থিত শহর গ্রাম ডুবে গেল। শস্য-হানি, প্রাণহানি হলো জাপানীদের। একেই বলে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। এর রহস্য না জানলে ইতিহাসের রহস্য বোঝা যায় না। রেনেসাঁসও তেমনি একটি আন্তর্জাতিক ভূমিকম্প বা প্লাবন। পুরাতনকে ধ্বংস করে নতুনকে গড়বার সুযোগ দিল সেই প্রোসেস। গড়ার ভার যাঁদের উপর বর্তাল রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরি একজন কারিগর। তাঁর দেশ ভিন্ন, দেশের অবস্থা ভিন্ন, কিন্তু যুগ অবিভাজ্য।

লেওনার্দো প্রভৃতির সঙ্গে এক-নিঃশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করা নতুন কথা নয়। যাঁরা করেন তাঁরা এই ভেবে করেন যে ওদেশের রেনেসাঁসে লেওনার্দো বা গ্যেটে যেমন বিচিত্রকর্মা মহাবাহু এদেশের রেনেসাঁসে তেমনি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ওদেশে যদি রেনেসাঁস আদৌ না ঘটত তা হলে কি এদেশে রেনেসাঁসের কোনো আশা ছিল? আর এদেশে যদি রেনেসাঁস না ঘটত তা হলে রবীন্দ্রনাথের অনন্য প্রতিভা কি তাঁকে বিচিত্রকর্মা মহাবাহু করত? একজোড়া রেনেসাঁসই একসূত্রে গ্রথিত।

সমুদ্র পার হয়ে আসতে কয়েক শতাব্দী লেগেছে। তাই দুটো আলাদা রেনেসাঁস বলে মনে হচ্ছে। দেশভেদে দুই স্বতন্ত্র রূপ। যেমন রুশী কমিউনিজম ও চীনা কমিউনিজম। দেশের ইতিহাস ভেদে দুই প্রস্থ দ্বিধাদ্বন্দ্ব। হাজার বছরের খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ ইউরোপীয় শিল্পী ও কবিরাও চাননি। লেওনার্দো, মাইকেল এঞ্জেলো ইত্যাদি পাশ্চাত্য রেনেসাঁস নায়করা গভীরভাবে খ্রীস্টান ছিলেন। যদিও নিবিড়ভাবে বিজ্ঞানসিদ্ধ। পুরোনো বোতল ও নতুন মদ নিয়ে এদিকে যা হয়েছে ওদিকেও তাই হয়েছিল। পুরোনো মদ ফেলে দিতে গোড়ার দিকে কেউ রাজী হননি। এ অধ্যায় এলো ফরাসী বিপ্লবের কিছু আগে। অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দী পরে।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে। স্নানের পরে ময়লা জল ফেলে দিতে গিয়ে বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ো না। রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপের বিজ্ঞজনরা বলে আসছেন, পুরাতনের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তনকেও ফেলে দিয়ো না। তা ছাড়া পুরোনো মদেরও দাম কম নয়। লোকে তো বেশী দামই দেয়। বোতল খালি করতে ইউরোপের সুধীদের আপত্তি ভারতের সংরক্ষণশীলদের মতোই দৃঢ়। না, ইউরোপও মধ্যযুগের প্রভাবমুক্ত হয়নি। গ্রীক চেতনার পুনরুজ্জীবন খ্রীস্টীয় চেতনার [illegible]। ইউরোপ এখনো হাড়ে হাড়ে খ্রীস্টান।

রেনেসাঁসকে আবাহন করেছিলেন খাঁটি খ্রীস্টানরাও। তার থেকে মনে হতে পারে যে দুই চেতনার মধ্যে স্বতোবিরোধ নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল বিরোধ আছে ও সেটার নিষ্পত্তি আজো সম্ভব হয়নি। রেনেসাঁস অনুরাগীরা প্রকৃতির বাইরে বা ঊর্ধ্বে পা বাড়াবেন না। মানুষকেই জগতের শেষ কথা বলবেন। খ্রীস্টধর্মের অনুরাগীরা প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করবেন। খ্রীস্ট তাঁদের চোখে ঈশ্বর তথা মানব। সমাজের ও নীতির বুনিয়াদ এক পক্ষের মতে মানবিক। অপর পক্ষের মতে ঐশ্বরিক। বিভেদ শুধু পুরাতনের সঙ্গে নতুনের নয়। তার চেয়েও গভীর। বিভেদ থাকলে যে বিরোধ বাধবেই এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু বিরোধ ধীরে ধীরে বাধল। ছেলে-দের কার মতো করে মানুষ করা হবে? বিদ্যালয়গুলো সেকুলার হবে, না খ্রীস্টান হবে? প্রজাদের কার মতো করে পালন করা হবে? রাষ্ট্র সেকুলার হবে না খ্রীস্টান হবে? এ ধরনের বহু প্রশ্ন একে একে ওঠে। তর্ক করে যখন মীমাংসা হয় না তখন বাহুবল প্রয়োগ করতে হয়। যার গায়ের জোর বেশী সেই জেতে। কিন্তু অপর পক্ষ তাকে নৈতিক জয় বলে স্বীকার করে না। আজো করেনি। বহু শতাব্দীর পরে হল্যাণ্ডের ক্যাথলিকরা যেই রাজ্যের ভার পেলো অমনি শুরু হলো ক্যাথলিক ছেলেদের জন্যে আলাদা স্কুল, ক্যাথলিক শ্রমিকদের জন্যে আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন, ক্যাথলিক খেলোয়াড়দের জন্যে আলাদা ক্লাব, ক্যাথলিক শ্রোতাদের জন্যে আলাদা রেডিও ইত্যাদি। বিরোধ অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমাদের নিজেদের মধ্যে এ জাতীয় বিভেদ বা বিরোধ তেমন স্পষ্ট হয়নি। হলে তিনি কোন্ পক্ষে যেতেন বলা দুঃসাধ্য। তবে তাঁর শেষ জীবনের লেখা পড়লে ও কথা-বার্তা শুনলে মনে হতো বিরোধের দিন তিনি রেনেসাঁসের পক্ষেই রায় দিতেন। সেকুলারের পক্ষে। প্রাকৃতিকের পক্ষে। মানবিকের পক্ষে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে অপর পক্ষে তাঁর হৃদয় নেই। তার মানে তিনি যুক্তির দ্বারাই চালিত। হৃদয়াবেগের দ্বারা নয়। তিনি রেবতী নন। তিনি অবাধ্য সন্তান।
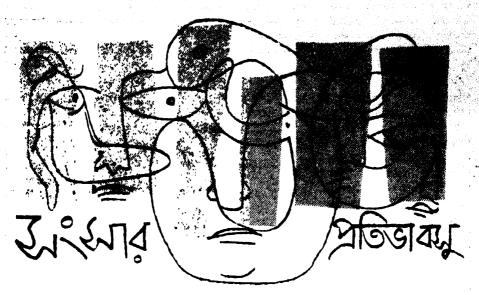
ছেলে আর ছেলের বৌকে গেট পর্যন্ত বিদায় দিয়ে শূন্য মনে, শূন্য হৃদয়ে স্বামীর ঘরের দরজার চৌকাঠে এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন সুষমা। সুদর্শন মিত্র আজ আর ভারি কাচের চশমার ফাঁকে তাঁর স্বল্প দৃষ্টি মেলে দিয়ে বইয়ের অক্ষর হাৎড়ে বেড়াচ্ছেন না, জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন, তারাভরা অন্ধকার আকাশে। বোঝা গেল তিনি উদ্‌ভ্রান্ত, অন্যমনস্ক। ছেলের বিচ্ছেদ-বেদনায় আজ তিনি সুষমার মতোই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। ছেলে তাঁর সঙ্গী ছিলো, বন্ধু ছিলো, মনোমতো ছিলো, সেই ছেলের অবিরত সাহচর্যের অভাবের কথাটা এখনো তিনি মনের মধ্যে মেনে নিতে পারছেন না। সুষমার বুকে কান্নার সমুদ্র ঢেউ হ'য়ে গড়িয়ে এলো, তিনি দু' হাতে মুখ ঢাকলেন।

অথচ ঘটনাটা খুব স্বাভাবিক, সৌমিত্র তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে গেল। সুষমা দেখে এসেছেন সেই ফ্ল্যাট, পুরোনো বালিগঞ্জের অভিজাত পল্লীর একটি বিশিষ্ট বাড়ির বিশিষ্ট অংশ। দুজনের জন্য পাঁচখানা ঘর, দু'টো বাথরুম, একটা গোল বারান্দা, ভাড়া ছ'শো টাকা। রমলার খুব পছন্দ হ'য়েছে, শাশুড়িকে নক্সা কেটে বুঝিয়ে দিয়েছে কোন্ ঘর সে কেমন ক'রে সাজাবে। এমন কি সুষমা যদি বেড়াতে এসে এক-আধ রাত কাটাতে চান ছেলে, ছেলে-বৌর সঙ্গে তারও বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারবে সে।

সৌমিত্রের বয়েস সাতাশ, মাইনে পায় সতেরো শো। কোনো এক বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের আপিশের পাবলিসিটি অফিসার সে। চাকরিটা দু' বছর আগে, স্বভাবের ব্যতিক্রম হ'য়ে সুদর্শনই কোনো এক বড়োলোক বন্ধুকে ধ'রে করিয়ে দিয়েছিলেন। অবিশ্যি ছেলের বুদ্ধি বিদ্যা এবং সততার উপর তাঁর গভীর বিশ্বাসই এই প্রেরণার মূলে ছিলো। পুরো দেড় বছর চাকরি ক'রে কায়েমী হ'য়ে তারপর বিয়ে করেছিলো সৌমিত্র। রমলা বৌ হ'য়ে মাত্র ছ' মাস এ-বাড়িতে এসেছে। কিন্তু এ-বাড়ি তার ভালো লাগল না। এ পাড়াটা বড়ো বেশী মধ্যবিত্ত। তাছাড়া এই আধুনিক জগতে যৌথ পরিবার ব্যাপারটা কোনো রকমেই সে সমর্থনযোগ্য মনে করে না। আর তার স্বামীকে যেখানে তাঁর পিতার উপর নির্ভর করতে হয় না, নিজের উপার্জন যার বেশ একটু ভদ্রগোছের, সে অমন মা-বাবার গা-ঘেঁষে থাকবেই বা কেন। সে তো রীতিমতো অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার।

সব কথাই ঠিক। তবু সুষমার অবুঝ হৃদয় যে কেন প্রবোধ মানছে না কে জানে। রমলার বয়সী নিজেকে, আর সৌমিত্রের বয়সী সুদর্শনকে মনে পড়ছে তাঁর। যদিও বয়সের পার্থক্য তাঁর আর সুদর্শনের যতোটা ছিলো, রমলা আর সৌমিত্রের তা নয়। রমলা সৌমিত্রের সমবয়সী, আর তিনি সুদর্শনের আট বছরের ছোটো।

সুদর্শন মিত্র প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছিলেন তাঁকে। সুষমা দেবী পিছন ফিরে তাকিয়ে একটি উনিশ বছরের মেয়েকে লাল বেনারসী পরে, কপালে চন্দন দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পা দিতে দেখলেন। সূর্য উঠলো, ফুল ফুটলো, আলোয়-আলোয় ছেয়ে গেল দশদিশি। সুষমার সিঁথির সিঁদুরের রং অনুরাগে রঞ্জিত হ'য়ে টকটক করতে লাগল। সুদর্শন বললেন, 'আমার মা, দিদি, ভাগ্নে-ভাগ্নি এবার সব তোমার, আমার শুধু তুমি।' আকণ্ঠ আরক্ত হ'য়ে সুষমা দেবী মনে-মনে প্রার্থনা করলেন স্বামীর এ দায়িত্ব যেন আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি।

সুদর্শন যদিও একটি সাধারণ চাকরি থেকে ধীরে ধীরে উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছিলেন, তবু নিজে খুব সাধারণ ছিলেন না। এককালে কবিতা লিখতেন, সে-কবিতায় আস্বাদ ছিলো, শাণিত ছুরির মতো, বুদ্ধির দীপ্তিতে ধারালো ছিলো সেই কবিতা। একখানা মাত্র বই আছে তাঁর। মাত্র ষোলোটি কবিতার সমষ্টি। সেই ক'টি কবিতা এখনো পর্যন্ত সাগ্রহে মনে রেখেছে অনেকে, এখনো কোনো প্রকাশক কেনো কোনো কবিতা সংগ্রহ বার করলে সুদর্শন মিত্রকে বাদ দিতে পারে না। তা ব্যতীত ছাত্র হিশেবেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিলো। ইংরিজি অনার্সে বি-এ'তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে উত্তীর্ণ হ'য়েছিলেন বলেই যে

তিনি অনন্য ছাত্র ছিলেন, তা নয়, পড়াটাই তাঁর নেশা ছিলো। আর ছিলো অপরিসীম স্মরণশক্তি। চোখ দিয়ে অক্ষরগুলো একবার দেখলে দ্বিতীয়বার দেখার দরকার হ'তো না। বইয়ের পর বই নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ব'সে থাকতেন তিনি। আর সেই পড়াটা তাঁর শুধুমাত্র সাহিত্যের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকতো না, দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এমন কি আইনের বই পর্যন্ত বাদ যেতো না। আসলে সেই পড়াটাই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাল হ'লো। অল্প বয়সে ঐ কয়েকটি কবিতা প্রসব ক'রেই একটি নিষ্ফল বিদ্যার ঢিবি হ'য়ে রইলেন। বি-এ পাশ ক'রে আর এম-এ পড়লেন না, ভালো লাগলো না ঐ ধারাবাহিক নিয়মের গণ্ডী-ঘেরা ছাত্রবৃত্তি। পড়া ছেড়ে খুব কয়েক দিন রাজনীতি করলেন, শেষে বিধবা মায়ের তাড়নায় টিকতে না পেরে অথবা সেই নিরুপায় ভদ্রমহিলার কণ্ট সইতে না-পেরে চট ক'রে এক যেমন-তেমন কাজে ঢুকে পড়লেন। বেশী উচ্চাশা ছিলো না, সামান্য মাইনেতেই মা আর ছেলের চলে যাচ্ছিলো দিন। হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটলো। ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্টে ভগ্নীপতি মারা গেলেন, আর বত্রিশ বছর বয়সের দিদি দু'টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে এসে তাঁকেই অবলম্বন করলেন। দিদির ছেলেটির বয়স আট, মেয়েটির চার। পরিবারটা আচমকা বড়ো হয়ে গেল।

মনটা খারাপ লাগলো খুব। সংসার বেড়েছে ব'লে নয়, ভগ্নীপতিকে খুব পছন্দ ছিলো বলে, ভালো বাসতেন ব'লে। এই অপমৃত্যুর দুঃখ ভুলতে সময় লাগলো, সংসার চালাবার দায়িত্বে টিউশনি নিতে হ'লো দুটো-তিনটে। সব যেন গোলমাল হ'য়ে গেল। আর মনের যখন এই অবস্থা, এক বিস্বাদ আর ব্যর্থতার বোঝা বয়ে যখন প্রায় হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছেন এমন সময়েই দেখা হ'য়ে গেল সুষমার সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ সব অন্ধকার ফেটে আলোর উচ্ছ্বাস তার সমস্ত দুঃখ হরণ ক'রে নিল। প্রেম ক'রে বিয়ে করার পক্ষে তখনকার সমাজ খুব অনুকূল ছিলো না, গুরুজনেরা অভ্যস্ত ছিলেন না, অতএব যথেষ্ট নিন্দে হ'লো, বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছতে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'লো, তবু নির্ভয়ে অগ্রসর হ'লেন তিনি, আর এই অগ্রসরের পথে সবচেয়ে বড়ো বন্ধু হ'য়ে দাঁড়ালেন তাঁর দিদি, সুদর্শনের শোকার্ত দিদি সুমিত্রা। স্বামীকে হারিয়ে প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনা তখন তাঁর মর্মে মর্মে তিনি বুঝতে পারলেন ভাইয়ের কথা। এক দিকে মা আর হঠাৎ এগিয়ে-আসা অভিভাবকের দল, অন্য দিকে একা সুমিত্রা। ভাইয়ের হ'য়ে সারা দিন লড়ছেন তিনি, তর্ক তুলছেন, কথা কাটছেন, তাঁদের অমত করার দুর্বল কারণগুলিকে তুলোর মতো পিঁজে পিষে উড়িয়ে দিচ্ছেন যুক্তির বাতাসে।

এ-সব কথাই সুষমা সুদর্শনের কাছে শুনেছিলেন তখন। প্রত্যেক দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা এসে সুদর্শন বলতেন তাঁকে, নিজে যতো ভয় পেতেন, তার চেয়ে সুষমাকে বেশী ভয় পাইয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। বিয়ের পরে নিরাপদে একা হ'য়ে সুষমা বলেছিলেন 'ভাগ্যিস দিদি ছিলেন।'

চোখ বড়ো ক'রে সুদর্শন বলেছিলো, 'তা না হ'লে কী হ'তো?'

'সেই তো, আমার ভাবতেই ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে।'

'কেন, তোমার বাবার সেই মনোমতো পাত্র শচীবিলাসবাবু—' সুদর্শন জানতেন এই শচীবিলাসের নাম শুনলে খেপে যান সুষমা, স্ত্রীর ভারি মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতেন তিনি, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলতেন, 'বোকাটা, একটুও বোঝো না কেন, যে আমি আর কেউ নই, আমি সুদর্শন মিত্র, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আমার কাছ থেকে আমার প্রিয়তমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে।'

মনে আছে মা-বাবাকে ছেড়ে এসে কী কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু সুদর্শন সব ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। একা এক সুদর্শনের প্রেম সহস্র বাহু হ'য়ে ঘিরে রেখেছিলো তাঁকে। সমস্ত পৃথিবীর সব সুখ, সব উত্তাপ ঐ একটি মানুষের মধ্যেই নিহিত ছিলো তখন তাঁর জন্য। সব ভালো লেগেছে, স্বামীর সংসারের ভালো-মন্দ আপদ-বিপদ অভাব-অভিযোগ এমন কিছু নেই যা থেকে নিজেকে এক মুহূর্তের জন্য এতোটুকু আলাদা মনে হ'য়েছে তাঁর। স্বল্প-আয় সুদর্শনের সংসারের সমস্ত কাজ একা হাতে করতে করতে ঘামতে-ঘামতে গুণ গুণ গান উঠেছে গলায়, অসন্তুষ্ট শাশুড়িকে যত্ন দিয়ে তুষ্ট করতে-করতে আত্মপ্রসাদ হয়েছে; স্বামীর একান্ত আপন জনকে প্রাণান্ত হ'য়ে কিছু করতে পারছে বলে। আর দিদি। দিদির দুঃখ কি তাঁর নিজের দুঃখ বলেই মনে হয়নি? দিদি তাঁকে ভালোবেসেছেন, আদর করেছেন, চুমু খেয়েছেন, দিদির স্নেহের কোনো তুলনা ছিলো না। দিদির চার বছরের মেয়ে পারুল আর আট বছরের ছেলে সুরঞ্জন সারা দিন লেপটে থেকেছে মামীর কাছে। সুদর্শন ঠাট্টা করেছেন, 'তোমার পুষ্যির সংখ্যা একটু কমাও দয়াময়ী, অভাগার দিকে একটু তাকাও।'

অভাগা তো কত! লজ্জা-সরম যেন ছিলো কিছু। যতোটুকু আপিস, তার পরেই বাড়ি। তারও উপরে কামাই। আর যতোক্ষণ বাড়ি আছে ততক্ষণই স্ত্রী। একেবারে যা-তা! সকলের কাছে মুখ দেখানো ভার হ'ত সুষমার।

সুদর্শনের চাকরিতে ধাপে-ধাপে ওঠবার অনেক রকম পরীক্ষা ছিলো। কোনো দিন সে-সব পরীক্ষার ধার দিয়েও যাননি। কৌতূহলবশতও কোনো দিন সেই সব নিয়মের কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেননি। কিন্তু কাজে চৌকষ ছিলেন, তাঁর অপরিসীম বুদ্ধি সেখানেও তাঁকে চিহ্নিত করলো। চাকরির যে বিভাগে তিনি ঢুকেছিলেন, বহু বছর যাবৎ সেখানে একটা সাংঘাতিক আঙ্কিক গোলযোগ চ'লে আসছিলো, সরকারের বহু অর্থ অপচয় হচ্ছিলো সেই ভুলের খাতে। বিয়ের পরে উপার্জন বাড়াবার তাগিদেই একটু মন দিয়েছিলেন চাকরিতে, ভাবছিলেন এবার একটা পরীক্ষা দিয়ে সত্যি কিছু আয় বাড়ানো যাক, আর সেই মনোযোগের ফলেই ধরা পড়লো সেই ভুল। রীতিমতো একটা চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটলো। দিল্লির দপ্তর থেকে ভালো ভালো চিঠি এলো, মাইনে বাড়াবার প্রস্তাব হলো, সুযোগ বুঝে সব প্রত্যাখ্যান ক'রে অন্য এক আব্দার ধরলেন সুদর্শন। তিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে এমন একটা পরীক্ষায় বসতে চাইলেন তিনি, যে-পদমর্যাদায় পৌঁছতে হ'লে মাঝখানে আরো অন্য দু'টো পরীক্ষা দিয়ে ধীরে-ধীরে উঠতে হয়।

কর্তার সুনজরে ছিলেন, তার উপরে অত বড়ো এক কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়ে নিজেকে অসামান্য ক'রে তুলেছিলেন বলে কিছু কাঠখড় পুড়লেও শেষ পর্যন্ত সেই পরীক্ষা দিতে দেয়া হ'লো তাঁকে। ছ' মাস সময় পেয়ে সেটা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেল। অনেক

উপরওয়ালা ডিঙিয়ে একেবারে সাড়ে-তিন শো টাকা মাইনের অফিসার হ'য়ে বসলেন। সে দিনে সাড়ে-তিন শো টাকা কম মাইনে ছিলো না। আর এ উন্নতি যে সুদর্শনের বৌয়ের পয়াতেই হ'লো এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না কারো মনে!

দু' ঘরের ছোট্ট বাড়ির কষ্ট ছেড়ে প'য়ষট্টি টাকা ভাড়ার তিন ঘরের ফ্ল্যাটে এসে উঠলেন, ঠিকে ঝির বদলে বেশী মাইনে দিয়ে সারাদিনের কাজের লোক এলো, দিদির বাচ্চাদের পাড়ার পাঠশালা ছাড়িয়ে বড়ো ইশকুলে ভর্তি করা হ'লো। বিধবা কন্যার দিকে তাকিয়ে অবিরত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে-ফেলতেও একটু হাসি ফুটলো সুদর্শনের মায়ের মুখে, বৌর দিকে তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন, আর দিদি তাকে জড়িয়ে ধ'রে লক্ষ্মীসোনা বললেন। আর সুদর্শন! সে তো দস্যু।

বিয়ের পুরো তিন বছর পরে বড়ো মেয়ে সুমিতা কোলে এলো সুষমার। সংসার মোটামুটি স্বচ্ছন্দগতিতেই চলছিলো, কালের প্রলেপে শোকটাও অনেকটা নির্বাপিত হ'য়ে এসেছিলো, হঠাৎ সামান্য কয়েকদিনের জ্বরে দিদি মারা গেলেন। শাশুড়ির শোক দ্বিগুণিত হ'লো কয়েক-দিনের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন সুদর্শন, মাতৃহারা বালক-বালিকা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হলো, সকলের সব বেদনা মুছে দেবার অবিরল চেষ্টায় নিজে শোক করবার সময় পেলেন না সুষমা। তার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় মেয়ে সুমনার জন্ম হ'লো। সুমনার জন্মের পরেই যুদ্ধ লেগে জিনিসপত্রের দাম আগুন হ'লো। চার-চারটি শিশুকে সমানে মানুষ ক'রে তুলতে গলদ্‌ঘর্ম হতে লাগলেন তিনি। সুমনার ছ' বছর পরে সৌমিত্র জন্মালো, এই সৌমিত্র।

সংসরের উপর দিয়ে অনেক ঋতুর প্রলেপ পড়েছে ততোদিনে। শোকে-তাপে অকালবার্ধক্যে পঙ্গু হ'য়েছেন শাশুড়ি, ভাগ্নি পারুল রীতিমতো বড়ো হ'য়ে উঠেছে, আর ভাগ্নে আই-এস-সি পাশ ক'রে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেই সময় নিজের ছেলেমেয়ের কথা ভাবেননি সুষমা, মৃত ননদের পুত্র-কন্যাকে যোগ্য ক'রে তোলাই সেই সময়ে তাঁর একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হ'য়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং-পড়াতে কম খরচ লাগেনি, সেই খরচ মেটাতে সংসারের জঠরে একটি-একটি ক'রে ভারি গয়নাগুলো আহুতি দিয়েছেন তিনি। তা হোক, মনে-মনে ভেবেছেন, বাড়ির সবচেয়ে বড়ো ছেলে, একবার মানুষ হ'য়ে উঠলে আর দুঃখ কী। মামার পিছনে ও-ই দাঁড়াতে পারবে। আজকাল ইঞ্জিনীয়ারদের কতো আদর, কতো চাহিদা, একবার কোনো রকমে পাশ ক'রে বেরুতে পারলেই হ'লো।

কথাটা সত্য। কষ্ট ক'রে হোক, দুঃখ ক'রে হোক চারটে বছর কেটেই গেল। এই চার বছরে শাশুড়ি মারা গেলেন, পারুলের বিয়ে হ'য়ে গেলো আর সুরঞ্জনও বেশ ভালোভাবে পাশ ক'রে বেরুলো। পাশ ক'রে বেরুলেই যে চাকরি, মামীর সেই স্বপ্নকেও সফল করতে দেরি করলো না সে। কিন্তু চাকরির পিছনেই যে আরো একটি আয়োজন সম্পূর্ণ হচ্ছিলো। তা সুষমা ভাবেননি। হঠাৎ একটি বিশেষ আত্মীয় মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়েই সব-কিছু ওলোট-পালট হ'য়ে গেল। খবরটা শুনে চাকরি আর বইয়ের পাতায় হারিয়ে-থাকা মামা সুদর্শন-ও চমকে উঠলেন। অবাক হ'য়ে বললেন, 'সে কী, টুকু যে তোর মাসী হয়। আমার নিজের খুড়তুতো বোন।'

সুরঞ্জন গোঁজ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আড়ালে ডেকে নিয়ে সুষমা বললেন, 'আর কয়েকটা দিন যেতে দে রঞ্জন, একটু ভেবে দ্যাখ,—' কথা শেষ করতে না দিয়ে সুরঞ্জন উদ্ধত হ'য়ে বললো, 'ঠিক আছে, তোমাদের যদি মত না থাকে, এ-বাড়িতে উঠতে দিও না তাকে।'

সুষমা ব্যথিত হ'য়ে বললেন, 'একথা বলা তোর পক্ষে যতো সহজ, আমার পক্ষে

"ঠিক আছে, তোমাদের যদি মত না থাকে, এ-বাড়িতে উঠতে দিও না তাকে।"

নয়। দিদি বেঁচে নেই, মা বেঁচে নেই, আমি ছাড়া আর কে আছে তোর? তোর বৌকে কে আদর ক'রে ঘরে তুলবে?'

'যার ঘরে আসছে, সেই তুলবে। আমি কিছু অপারগ নই যে স্ত্রীকে খাওয়াতে পারবো না।'

মামীর কাছে বাচ্চা হ'তে আসা পারুল বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে, রাগী গলায় বললো, 'সেই সঙ্গে এটাও মনে রেখো দাদা, সেই যোগ্যতার মূল্য চিরদিন কাকে দিতে হয়েছে।'

'কাউকে-না-কাউকে দিতেই হয়,' সুরঞ্জন সমান উদ্ধত। 'সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।' মা-বাবা না থাকলে মামা, মামী করেই থাকে, মামা-মামী না-থাকলে অন্য কেউ। একটা শিশু নিজে-নিজে বেড়ে ওঠে না। যাই হোক, এ বিষয়ে আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে রাজী নই।' ব্র্যাকেট থেকে ছেড়ে-রাখা শার্টটা গায়ে দিয়ে অসময়ে বেরিয়ে গেল সুরঞ্জন।

ভাগ্নের এই ব্যবহারে সুষমা মর্মাহত হয়েছিলেন বৈকি। সব-কিছু মেনে নেবার পরেও সে যখন বিয়ে ক'রে চলে গেল বাড়ি ছেড়ে, সেই চব্বিশ বছর বয়সের সাবালক বিবাহিত ভাগ্নেটির জন্য খেতে বসে কতো দিন গলা দিয়ে ভাত নামেনি, শুতে গিয়ে চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। স্নেহ সত্যিই নিম্নগামী, সত্যিই অবুঝ। সুদর্শন সান্ত্বনা দিয়েছেন, 'এই তো সংসারের নিয়ম সুষমা, তা নিয়ে দুঃখ করাটা বোকামি। বড়ো হয়েছে, উপার্জন করছে, বৌ নিয়ে আলাদা সংসারে আলাদা থাকবে, এতো সুখের কথা। এ সব দুর্বলতা তুমি ছাড়ো।'

স্বামীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে-শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কথা মনে পড়েছে তাঁর। মাত্র তিনখানা ঘরের অপরিসর একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে ছোটো বড়ো মাঝারি পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে, রুগ্ণ শাশুড়ি নিয়ে, স্বামীর বইয়ের নেশা আর পরিমিত আয় নিয়ে গুছিয়ে সংসার করতে কতো পরিশ্রম হয়েছে, মনে পড়েছে সেই সব কথা। মাত্র একটি কাজের লোকের সাহায্যে দু'হাতকে দশহাত বানিয়ে চর্কির মতো ঘুরেছেন সারাদিন। বালতি-বালতি কাপড় কেচেছেন, রাশি রাশি সেলাই করেছেন। হাট-বাজার, ওষুধপথ্য, সেবা-শুশ্রূষা—কী না! হঠাৎ-হঠাৎ কী খেয়াল হয়েছে সুদর্শনের, মমতায় গলে গিয়ে স্ত্রীর জন্য একটা কিছু করবার বাসনায় অস্থির হয়ে উঠেছেন, দৌড়ে গিয়ে অসম্ভব মূল্যে কিনে নিয়ে এসেছেন কিছু। বই পড়া ফেলে পাইচারি করেছেন, সব শেষে আবার একটা পরীক্ষা দিয়ে আর এক ধাপ উঁচুতে উঠে আরো কিছু উপার্জন বাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। মামার কাণ্ড দেখে হেসেছে সুরঞ্জন, মামীকে সব কাজে সাহায্য করেছে। 'বলেছে, দাঁড়াও না, মাত্র তো আর কটা দিন, একবার পাশ ক'রে বেরুলে আর ভাবনা নেই। প্রথম কর্তব্য হবে বাড়ি বদলানো, আর প্রধান কর্তব্য হবে—আর তোমাকে কোনো কাজ করতে না-দেয়া। আর ততোদিনে মামার বইয়ের বাতিক তো আরো অনেকটা বেড়ে যাবে, নতুন বাড়িতে তাঁকে একটা আলাদা লাইব্রেরি করে দিতে হবে, আর সৌমিত্রকে তো আমি মানুষ করবো, তার জন্যে ভাবতে হবে না কারো। তারও আলাদা ঘর থাকবে, সেখানে সে লিখবে পড়বে, একা বসে ভাববে। একা থাকলে মনের উন্নতি হয়। আর সুমিতা সুমনার জন্যও—' বলতে বলতে কল্পনার পাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে সে, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে সব শুনেছেন সুষমা। তারি মধ্যে সুমিতা সুমনার ঝগড়া বেধে গেছে সেই কল্পিত বাড়ির কোন ঘরে কে থাকবে তাই নিয়ে। [illegible] বছরের সৌমিত্র কিছুই বোঝেনি, কিছুই ভাবেনি, হঠাৎ লাফ দিয়ে দাদার কোলে চড়ে, চুমু খেয়ে লজেন্স কিনতে চলে গেছে।

সেই সুরঞ্জন! কষ্ট হবে না সুষমার। যে-বছর এই বাড়িটা তৈরি হলো, গৃহপ্রবেশের সময় এসেছিলো সে, আলাদা থেকে-থেকে দূরে হয়ে গেছে, পর হয়ে গেছে। কে বলবে এই ছেলে একদিন এ-বাড়ির সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়েই বড়ো হয়ে উঠেছিলো। আর কিছুদিন পরে সৌমিত্রও কি তাই হয়ে যাবে না? তাঁর সমী। তাঁর ছেলে, তাঁর একমাত্র ছেলে, যাকে তিনি একবেলা চোখের আড়াল করতে পারেননি।

ফ্ল্যাট ছেড়ে নিজেদের বাড়িতে আসবার দু'বছরের মধ্যে বড়ো মেয়ে সুমিতার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো। সুমিতা যাবার পরে তার সাজানো ঘরটি গভীর শূন্যতা নিয়ে হাহাকার করতো তাঁর বুকের মধ্যে, নিজের সন্তান পরের হাতে তুলে দেয়ার যে কী কষ্ট তা তিনি মর্মে-মর্মে বুঝেছিলেন। সুদর্শন তখনো তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, ভাগ্নের বেলায় যেমন করে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই, কেবল গলার স্বরটা একটু বেশী ভারি ছিলো। ঈষৎ ভাষান্তর ক'রে বলেছিলেন, 'মেয়ে তো পরের ঘরে যাবার জন্যই। কাঁদছো কেন, আপন সংসারে গিয়ে এখন কতো সুখী হবে।'

আপন সংসার! এটাও কি তার আপন সংসার ছিলো না? এ-বাড়ি তবে কাদের জন্য বানালেন, এ-বাড়ি বানাবার জন্য তবে কেন এতো কষ্ট করলেন।

একটা সুবিধে দরের জমির জন্য কম ঘুরে বেড়াননি তিনি। মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে সুমিতার উৎসাহই পাল্লা দিয়েছে বেশী। সারাদিন এ বাড়ির প্ল্যান নিয়ে তার কতো জল্পনা-কল্পনা। শেষে সুষমা একাগ্র হয়ে, চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, খোঁজ করে পুরো এক বছরের চেষ্টায় খানিকটা দক্ষিণে সরে এসে আশ্চর্য সস্তায় কিনে ফেললেন জমিটা। আর কেনবার পরে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সুদর্শন। স্ত্রীর নিজস্ব সঞ্চয়ে কেনা এক টুকরো সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে খুব ভালো

লাগলো তাঁর, বুকভরে হাওয়া নিলেন তিনি, মনে-মনে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার অঙ্কটা গুনে নিলেন।

কতো সাধের বাড়ি সুষমার, নিজে ব'সে-ব'সে এই বাড়ির প্ল্যান করেছিলেন, নিজে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখেশুনে করিয়ে নিয়েছিলেন। কী খুশিই হয়েছিলো সবাই। খাঁচার পাখিরা যেন আকাশে মুক্তি পেলো। আলাদা ঘরের স্বাধীনতা নিয়ে কে যে কী করবে ভেবে পায়নি।

বড়ো মেয়ের বিচ্ছেদের ফাঁকটা ভরতে না ভরতেই ছোটো মেয়ে বিয়ে করলো। ছোটো মেয়ে তাঁর আদেরে আহ্লাদী। সারাদিন তার দুরন্তপনা। বাড়িটা ভরিয়ে রাখতো ও। নাচতো, গাইতো, ছবি আঁকতো, ভাইকে ক্ষেপাতো, বাবাকে জ্বালাতো, আদর উঠলে মাগো বলে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তো পিঠে। সেই মেয়েটাও চলে গেল, আর সে যাবার পরে বাড়িটা যেন ঝপ ক'রে ডুব দিল জলে। সুষমার বুকটা ব্যথা হ'য়ে গেল কাঁদতে-কাঁদতে। মায়ের সেই অশ্রুভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বিয়েতে অতিথি-হয়ে-আসা বড়ো মেয়ে বললো, 'আমি তো ক'দিন থেকে যেতে পারতাম তোমার কাছে, কিন্তু কী ক'রে থাকি বল, ও'র আবার আমি না-থাকলে চলে না।' ঢোক গিলে সুষমা বললেন, 'সেই তো।'

এই তৃতীয়বার সুদর্শন সান্ত্বনা দিলেন তাঁকে, সেই একই ভঙ্গি, কিন্তু কথার আওয়াজে একটু বেশী শ্লেষ জড়ানো। বুক-চাপা গোপন কান্নার রেশটা তখনো তিনি সামলে উঠতে পারেননি। সুমিত্রা গিয়েছিলো, সুমনা তো ছিলো? তোলপাড়-করা দুর্দান্ত সুমনা। সহ্য করতে একটু বেগ পেতে হয় বৈকি।

এবার আরো একজন সান্ত্বনা দিল। সে সমী। সৌমিত্র। স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ষোলো বছরের ছেলে। মায়ের কান্নার সঙ্গে নিজের কান্না মিশিয়ে সরু-মোটা গলায় বললো, 'ভাগ্যিস আমি ছেলে। ভাগ্যিস আমাকে কোনোদিন এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে না। আমি তোমার কষ্ট সইতে পারি না, মা।'

ভাগ্যিস একটা ছেলে আছে। স্বামী-স্ত্রী মনে মনে সেই সময়ে অনেকবার উচ্চারণ করেছিলেন এই কথাটা। ভেবেছিলেন সংসারে ছেলের যে এতো মান সে তো এই জন্যই। সে থাকে, সে ছেড়ে যায় না, সে চিরদিনের। সুখে-দুঃখে ছেলেই মা-বাবাকে ঘিরে থাকে। স্ত্রী দিয়ে, সন্তান দিয়ে আবার শূন্য ঘর ভ'রে তোলে।

একটু ভুল হয়েছিলো সুষমার, কী যেন আশা করেছিলেন তিনি। বড্ডো ক্লান্ত হয়েছেন, একাদিক্রমে এতো বছর সংসারের চাকা ঘুরোতে ঘুরোতে আর তাঁর দেহে বল নেই। তিনি কি ভেবেছিলেন এবার বিশ্রাম নেবেন? তাই কি রমলার হাতে সমস্ত সংসার সঁপে দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি আমার শুধু বৌমা নও, মা, মেয়ে, সব।' সমী বলেছিলো, 'এবার তোমার ঘর কিছুটা ভরলো তো মা?' সুষমা তাঁর সাতাশ বছরের সতেরোশো টাকা মাইনের অতখানি উঁচু লম্বা ছেলেকে সাত বছরের বালকের মতো আদর করেছিলেন। ছেলে তাঁর সকলের ছোটো, ছেলে তাঁর আজও শিশু, এখনো সে মা-বাবা-অন্ত প্রাণ। তাঁদের ছোট পরিবারের তাঁরা তিনজন একাত্ম। তিনজন তিনজনের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ। তিনজন তিনজনকে পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে, সম্পর্ক এবং বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও তিনজন তিনজনের বন্ধু।

স্ত্রীর কান্নার শব্দে ফিরে তাকালেন সুদর্শন। তাকিয়েই রইলেন। ধীর পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন, কী বলতে গিয়ে চুপ করলেন, সুখ কষ্ট ছাপিয়ে স্ত্রীর বেদনাটাই বড়ো হ'য়ে উঠলো মনে। আর কেউ না বুঝুক, তিনি বুঝতে পারলেন সুষমার হৃদয় যুক্তি বুদ্ধির বশ নয়, নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে দেউলে হ'য়ে চিরকাল সকলকে করেছেন তিনি, আজ যদি শেষ সম্বল একমাত্র ছেলের কাছে কিছু তার দাবি থাকে, দোষ দেবার কিছু নেই। সে-দাবি কতোটুকু? শুধু একটু সান্নিধ্য। সে-দাবি কি তাঁর মনেও একটু ছিলো না? বুকটা ভারি হ'য়ে উঠলো। এবার আর তিনি কোনো সান্ত্বনা দিলেন না স্ত্রীকে, হয়তো তাঁর নিজেরই সেদিন সান্ত্বনার দরকার ছিলো।

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ দুই ॥

মধ্যাহ্নকালে যে-তাসকন্দ দেখেছিলুম, সন্ধ্যাকালে এ অঞ্চলটি তার থেকে পৃথক। এটি জনবহুল অংশ,— যাকে বলা চলে চৌরঙ্গীর পাড়া। চীৎকার নেই কোথাও, ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক নেই সস্তায় দামি সামগ্রী বেচবার, মোটরের হর্ণ নেই, বাসযাত্রীর ভিড় নেই, বিজ্ঞাপনের চোখ ধাঁধানো নোংরা আড়ম্বর নেই! সিনেমা আছে, তার প্রবেশপথে আলোও জ্বলছে, এবং সামনের মস্ত বড় চিত্রপটে একটি ছবি আঁকাও আছে—কিন্তু সেই ছবিতে রয়েছে পুরুষ অথবা মেয়ের তেজস্বী দীপ্তি! সেখানে স্ত্রীলোক তার সুকৌশল বসন-ভঙ্গীর দ্বারা যৌন-আবেদন জানাচ্ছে না! এপাশে ওপাশে সুবৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী, এবং তারই নীচে নীচে প্রকাণ্ড এক একটি দোকান,—এগুলিকে বলা হয় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। কোথাও সিগারেট দেশলাই এবং প্রসাধন সামগ্রীর দোকান। কোথাও অতি সুদৃশ্য তেরপল ঢাকা বিভিন্ন মনোহারী ও কেক-বিস্কুটাদির বিপণি-বেসাতি। পথে কোথাও কোথাও পানীয়ের পরিচ্ছন্ন কেন্দ্র। সেখানে মোটা হাতলের কাঁচের মগে কেউ পান করছে সফেন বীয়ার, কেউ টমাটো অথবা আঙ্গুরের রস, কেউ বা গ্রেপ ওয়াইন্। এই লাল রংয়ের হাল্কা আঙ্গুরের মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে নাকি বিশেষ উপযোগী, এবং এবস্তু বহু গৃহস্থ নিজ নিজ ঘরে প্রস্তুত করে। এটি অনুমতিসাপেক্ষ নয়।

আমাদের গাড়ি একটি বাগানের পাশ দিয়ে ঘুরে এল। বাগানের মাঝখানে একটি বড় ফোয়ারা,—তার মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটা দিয়ে বহুবর্ণাঢ্য ক'রে তোলা হয়েছে। বাগানের চারপাশে প্রশস্ত পথ। পূর্বদিকে মধ্য এশিয়ার প্রসিদ্ধ নাভয় অপেরা হাউস, এবং বাগানের পশ্চিমে সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর নব-নির্মাণরত তাসকন্দ হোটেল। অপেরা হাউস, থিয়েটার, সার্কাস, প্রদর্শনী, যাদুঘর, চিত্রশালা—ইত্যাদির প্রাচুর্য সম্বন্ধে এরই মধ্যে প্রচুর আলাপ-আলোচনা কানে এসেছে। 'নাভয়' নামটি মধ্য এশিয়ার অতি পরিচিত। এই ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম আলীশের নাভয়। তাঁর আদি বাড়ী ছিল আফগানিস্থানের অন্তর্গত হিরাট শহরে। তাঁর বাল্য ও যৌবন কাটে দেশের নানা রাজনীতিক ঝড়ঝাপটার মধ্যে, সেই ঝড়ে তিনিও বিপর্যস্ত হন। তিনি ছিলেন কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত, সমাজসেবী এবং রাজনীতিক। তাঁর বন্ধু ছিলেন তদানীন্তন সুলতান হোসেন বায়কারা,—যিনি আলীশেরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহকারে আমীর বানিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। দেশ এবং জাতির উন্নতিকল্পে আলীশের আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই আমলে সমগ্র তুর্কিস্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রথম আস্বাদ লাভ করে। তাঁর কাব্য ও লোকসঙ্গীত মধ্য এশিয়ার বিরাট মরুভূমির একটি মরুদ্যান থেকে অন্যটিতে এতকাল ঘুরে বেড়িয়েছে। তখনকার দিনে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দিতে ভৌগোলিক ও রাজনীতিক সীমানা নির্দেশ নিয়ে আজকের দিনের মতো এত কচকচি ছিল না। সেই কারণে ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল অনেকটা যেন একাকার ছিল।

নাভয় অপেরা হাউসের সামনে আমরা সদলবলে এসে নামলুম। বিস্তীর্ণ পাথরের সোপানশ্রেণী পেরিয়ে উপরে উঠে গিয়ে দাঁড়াতেই উৎসাহী জনতা এবং অপেরা হাউসের কর্তৃপক্ষ এবং শিল্পীরা আমাদেরকে ঘিরে দাঁড়ালেন। অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন হাউসের ডাইরেক্টর এবং কর্মীরা। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এসেছেন। ছবি তুলছেন অনেকে। আমরা ব্যক্তিভাবে কোথাও পরিচিত নই, সাপ-ব্যাং কী লিখি আমরা,—কোন্ বিষয়ে আমরা পোক্ত, কেউ জানে না। আমাদের পরিচয় হল আমরা "ভারতবর্ষ", এবং দ্বিতীয় পরিচয় আমরা নাকি লেখক! একটি বস্তু কথায় কথায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে,—ভারতের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ! ভারত শুধু একটি সাধারণ দেশ নয়, শুধু ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে তাই নয়। ভারত অনন্য, ভারতের সংস্কৃতি সমগ্রভাবে প্রাচ্যের মধ্যে আপন স্বকীয়তায় গৌরবান্বিত। সমবেত জনতার মুখে চোখে শ্রদ্ধার একটি দীপ্তি, একটি মহৎ প্রত্যাশা,—তারা শুনতে চায় নবভারতের বাণী ও দেশজোড়া সংগঠনের কাহিনী।

অপেরার ভিতরের চেহারাটি মনোজ্ঞ। লবীর অংশটা অতি বিস্তৃত, সুপরিসর এবং সুসজ্জিত। চারিদিকে নানা কীর্তিমান ব্যক্তির তৈলচিত্র, তার মধ্যে আছেন আলীশের নাভয়ের পক্ষ্মশ্মশ্রুবিলম্বিত ছবি। অন্যান্য দিকে সম্পদ্ ও ঐশ্বর্যের চিহ্ন ছড়ানো। সিঁড়ি চলে গিয়েছে উপরতলায়। সেখানে যাদুঘর, চিত্রশালা, পাঠাগার এবং প্রাচীন ইতিহাসের বিবিধ সমাবেশ।

প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত দর্শনার্থীরা উঠে দাঁড়াল, এবং হাততালি দিতে লাগল। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বিচিত্র জাতির দর্শক—পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত। উজবেক মেয়ে আপন রেশমী ঘাঘরায় মাঝে মাঝে বিচিত্রবর্ণা হয়ে উঠেছে। অনেকে কিছু না জেনেও হাততালি দিচ্ছে। টুপি দেখে চিনতে শিখেছি কা'রা হল উজবেক! ওদের মধ্যে অনেকে আছে যারা কিরগিজ এবং কাজাখ, তুর্কমেন অথবা তাজিক। রোগা কিংবা স্বাস্থ্যহীন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, এবং যারা থিয়েটার অথবা অপেরায় আসবে,—তারা অবশ্যই আটপৌরে জামা-কাপড়ে আসবে না। তবু অনেকের পোশাক যথেষ্ট পোশাকী নয়, অনেকে গোঁফ দাড়ি কামিয়ে আসার সুযোগ পায়নি। খালি পায়ে কেউ আসেনি, অথচ নতুন চকচকে জুতো বহু লোকেরই পায়ে নেই। প্রেক্ষাগৃহে জনতার

যে চেহারাটা প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা স্বচ্ছল-বিত্ত সমাজের। ওদের মধ্যে রয়েছে উজবেক মেয়ে, যারা কিছ্ব লাজ্বক, কিছ্ব কুণ্ঠিত, কিছ্ব বা ভীর্ব। শত শত বছর পরে ওরা যেন ঘোমটা খ্বলে কনে-বৌয়ের মতো দরজার বাইরে পা বাড়িয়েছে।

আনন্দের কথা এই, র্বশ মেয়ে-প্বর্ষ আলাদা বসেনি। ওদেরই মধ্যে তা'রা আত্মীয়ের মতো আসন নিয়েছে। উ'চুনীচু নেই। একপক্ষের গরজ, অন্য-পক্ষের ভ্রুকুণ্ডন—এটি চোখে পড়ছে না। এক আসনে ওরা বসে, একপাতে খাবার খায়, একসঙ্গে জটলা করে।

প্রেক্ষাগৃহটির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালে যে-সম্পদ এবং বৈভব চোখে পড়ে, সেটি কলকাতার মেট্রো সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ অপেক্ষা কম নয়। নাভয় অপেরার পিছনে রয়েছে সমগ্র উজবেকিস্থান রিপাবলিক, মেট্রোর পিছনে মাত্র ক্ষুদ্র একটি কোম্পানী। স্বতরাং এক্ষেত্রে তুলনা দেওয়াটাই আমার পক্ষে অন্যায়। সামনে যে-মঞ্চ এবং যবনিকাটি দেখছি, সেটি আমার পক্ষে বিস্ময় বৈকি। মঞ্চের সর্বোচ্চ খিলানে সোনালী ও রক্তিম বর্ণে সোভিয়েট দেশের প্রতীকচিহ্ন কাস্তে-হাতুড়িসহ পতাকাটি নানাবর্ণ-শালী হয়ে শোভা পাচ্ছে। এমন ব্হদা-কার ও প্রশস্ত মঞ্চ আমিই বা আর কোথায় দেখলুম? এতকাল ধরে শ্বনে এসেছি সোভিয়েট ইউনিয়ন চাষী-মজ্বর-সর্বহারার দেশ,—যাকে ব'লে এসেছে সবাই প্রোলেটেরিয়েট। যারা হত্যায়, হাঙ্গামায়, নিষ্ঠ্বরতায়,—কোনটাতেই কুণ্ঠিত হয় না; যারা জন্মদ্বঃখী ও দরিদ্র —সর্বনাশ যাদের নিত্যসঙ্গী। যারা গ্হহা-গর্তে, বস্তিতে, কানাচে, কারখানায়, মাঠে-ময়দানে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে থাকে,—সেই ছিন্ন জীর্ণবাস, উপবাসী, র্বগ্ন, বিকলাঙ্গ, রক্তচক্ষ্বর দল, —তারা কোথা গেল? আমি অনেকটা মানসিক অশান্তির মধ্যে ছিল্বম। কই তা'দের ত' দেখছিনে?

লানা ও নিকা আমাদের মাঝখানে বসল দোভাষীস্বর্প। তর্বণী বিদেশি-নীকে পাশে বসিয়ে অপেরা দেখার অভ্যাস আমার কমই। আরও বিপদ, প্রেক্ষাগৃহের একেবারে মধ্যে কানের কাছে মুখ রেখে কথা না বললে, আশপাশে বিরক্তিকর কারণ ঘটবার ভয় যেমন আছে, তেমনি দোভাষীর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনেরও বিবেচনা আছে।

যবনিকা ওঠবার আগে ম্দ্বকণ্ঠে লানাকে প্রশ্ন করল্বম, তুমি যদি অযোগ্য ব'লে প্রমাণিত হও, তোমার উপায় কি হবে?

লানা বলল, কাজটি আমার চলে যাবে। তখন অন্য কাজ নেব।

কাজ যদি চট্ ক'রে খ্ব'জে না পাও?

লানা স্নিগ্ধ মিষ্ট ম্বখে হাসল,— কাজ চাইলেই কাজ পাব! যখন খ্বশি চাইব আমার উপযুক্ত কাজ, তখনই পাব। এখানে বেকার কেউ থাকে না।

প্রশ্ন করল্বম, তোমাদের আদি বাড়ি কোথায়, লানা?

আদি বাড়ি!—আমরা রাশিয়ান। আমার ঠাকুরদাদা এখানে চ'লে আসেন। সেই থেকে এই আমাদের দেশ।

যবনিকা উঠল। পালাটি হল, 'লয়লা-মজন্ব'। সেই চিরন্তন মধ্বর ও বেদনাময় ভালবাসার কাহিনী। এ'টি নাচে, গানে এবং কনসার্টে সম্পন্ন করা হবে। আগাগোড়া গল্পটি যে আমাদের নিকট অতি পরিচিত, এটি জেনে লানা একট্ব বিস্মিত হল! এ গল্পটি ভারতে যে চিত্রিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে বারম্বার, এ'টি ওর পক্ষে সংবাদ। উজবেকিস্তানে বাইরের প্ৃথিবীর সংবাদ অতি অল্পই আসে। ইউরোপ ও আমেরিকার কথা না তোলাই ভাল, কিন্তু ভারতবর্ষের কয়েকটি চিরায়ত সাহিত্যের বই এবং দ্ব'একটি প্রাচীন প্ব'থিপত্র ছাড়া আর কিছ্ব আজও এসে পে'ছিয়নি। একালের ভারতবর্ষ থেকে পত্র-পত্রিকা, সাহিত্যের বই, সংবাদপত্রাদি কোনটার খবরই ওরা জানে না। সম্ভবত 'চরিত্র নষ্টের' ভয় পায়! আধ্বনিক ভারতবর্ষের কোনও পরিচয় সোভিয়েট জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট বিদিত নয়।

মঞ্চশিল্পের এই উন্নত চেহারা আমার পক্ষে অভিনব বস্তু। যিনি কনসার্ট ডাইরেক্টর, তাঁর হাতের ভঙ্গীর সঙ্গে স্বরের তাল সমস্তটাই ছন্দোবদ্ধ। এইসব গান, স্বর এবং মীড় ও মূর্ছনার সঙ্গে ভারতের একটি নাড়ির যোগ আছে। ওরা বাজাচ্ছে বটে, কিন্তু কানে শ্বনছি ভারতীয় সংগীতের স্বরের রেশ। ভাষাটা জানিনে, কিন্তু লক্ষ্যৌয়ের কোনও সংগীতের জলসায় বসে উর্দ্বভাষাও ত একদা ব্বঝতে পারিনি? সেই আশ্চর্য আনন্দের ম্বহুর্তগ্বলিতে লানার মতো যদি কেউ আমার কানে কানে বলত, এই

নাচ ও গানের স্বভাবের সঙ্গে মধ্য এশিয়া, ইরাণ, আফগান, পাকিস্থান এবং উত্তর ভারত একই যোগস্বত্রে গাঁথা, আমি বোধ হয় অবিশ্বাস করতুম না! আমি ভারতীয় 'লয়লা মজন্ব'কেই দেখছিল্বম ব'সে ব'সে। পরিপাটি বসন-ভূষণ, মধ্বর ও ললিত ন্ৃত্যভঙ্গী, এবং লাবণ্যের অজস্র ঐশ্বর্য,—আমার চোখের উপর একটি মায়াচ্ছন্ন নন্দনকানন স্ৃষ্টি করেছিল। মনে মনে ভাবল্বম রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ আন্বক্ল্য এবং পরিপ্বষ্ট জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতা ভিন্ন এইর্প সার্থক স্ৃষ্টি বোধ হয় সম্ভব নয়।

পালানাট্যের আগে ও পরে যাঁরা আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে র্বশ ভাষায় একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন, তাঁদের একজন হলেন উজবেক শিল্পি-গণের মুখপাত্র—মুখ্তার আশ্রাফি এবং অন্যজন একটি স্বপ্রসিদ্ধ মহিলা-শিল্পী গালিয়া ইসমাইলোভা। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদেরই মতো আ-কারান্তে স্ত্রীলিঙ্গ! ওদের দেশেও আছে মায়া, মীরা, ফ্বর্তসোভা, রোমানোভা, কামিলোভা, নাসিরোভা, জ্বলফিয়া ইত্যাদি।

ফিরবার পথে একটি আচ্ছন্ন ভাব ছিল। ওটা কাটিয়ে উঠতে পারল্বম না। হঠাৎ কিছ্ব যেন একটা নতুন আবিষ্কার করেছি, সেটা লালন করছি মনে মনে। এপাশে ওপাশে কি ঘটছে, গাড়ির মধ্যে কে কি কথা বলছে—ঠিক ধরতে পারছিনে। নতুন দেশে এসে পড়েছি, সেটি বড় কথা নয়। কিন্তু নতুন একটি মনোজগতে এসেছি! মনে ভয় ছিল হয়ত প্রতি পদক্ষেপেই অস্বাভাবিকের সাক্ষাৎ ঘটবে, হয়ত কথায়-কথায় র্বচিবিকারের স্বখ্যাতি করতে হবে, হয়ত স্থ্বলব্বদ্ধি এবং অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা করমর্দন করবে এবং আমাকে হয়ত বা অনিচ্ছ্বক ওজন-করা হাসি হেসে চারিদিকের র্বচিজ্ঞান-হীনতাকে কথায় কথায় তারিফ করতে হবে! সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা এই, ওরা ওদের সকল কীর্তি ও কার্যকলাপ সাগ্রহে দেখাতে চাইছে, কিন্তু এখনও কোনও মন্তব্য শ্বনতে চাইছে না। ওদের ইচ্ছা, যা কিছ্ব ওদের পক্ষে স্বন্দর, ওদের জনসাধারণ যা কিছ্ব গড়ে তুলেছে, যা কিছ্ব ওদের সম্পদ, আমরা যেন একেকটি ক'রে সব দেখে যাই।

হোটেলে এসে ভূরিভোজ সারতেই রাত প্রায় বারোটা বাজল। বিদায় নেবার

আগে লানা ও নিকা প্রশ্ন করল, কাল কখন আসব?

তারাশঙ্কর বললেন, সকাল নটায় আমরা তৈরি হব, সেই সময় এলেই চলবে।

থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা লানা, তোমরাই ত সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছ! এমন কিছু আছে যা দেখলে তোমরা দুঃখিত হও?

আকাশ পাতাল লানা কি যেন ভাবল, পরে বলল, কই, কী এমন আছে? আপনি কি দেখতে চান বলুন না?

আমার কৌতূহলটা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। তাই ফস ক'রে তখন বললুম, এমন বস্তিপল্লীর মধ্যে সাধারণ মানুষের মাঝখানে গিয়ে বসতে চাই যারা নির্ভয়ে আর নিঃসঙ্কোচে আলাপ করবে। পারবে সে সব জায়গায় নিয়ে যেতে?

পারব! —লানা জবাব দিল, দেখবেন, সবাই হাসিমুখে গল্প করবে। কিন্তু আপনি কি তাদের ভাষা জানেন যে, নিরিবিলি কথা বলবেন? আমাকে ছাড়া আপনার চলবে কেমন ক'রে? চলুন, কাল থেকে, যেখানে আপনার খুশি!

মেয়েদুটি হাসিমুখে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

* * *

বনবাগানের পাখির ডাকে ঘুম ভেঙেছিল মনে আছে। তারাশঙ্কর অসীম অনুগ্রহবশে তাঁর ফ্লাস্ক থেকে একটু তথাকথিত গরম চা উপহার দিলেন! প্রভাতকালে উঠে আমরা উভয়ে দেশ, কাল এবং পাত্র সম্পর্কে কিছু আদিরসাত্মক হাসিপরিহাসে মগ্ন ছিলুম! সত্যই, বীরভূমের খাঁটি বাঙালী তারাশঙ্করের পক্ষে কোট-প্যান্ট মোজা-জুতো চড়ানোটা প্রতিদিন বড়ই বিরক্তিকর। জুতোর ফোস্কার ভয়ে তিনি সঙ্গে ক'রে ভিন্ন ধরনের চোখ-কান-খোলা জুতো এনেছেন।

বাগানবাড়ি মাত্রেরই নাম 'দাচা'। এই দাচা-র মালিক কে, তিনি জীবিত কিংবা 'লিকুইডেটেড'—এ আমরা কেউ জানিনে। আমার ধারণা, তিনি শুদ্ধাচারী ও ধনী মুসলমান ছিলেন। কারণ, এ বাড়ির বাথরুম তথা শৌচাগারগুলি একেবারে প্রতি তলার সেই শেষ প্রান্তে, —শয়নকক্ষ থেকে অনেক দূর। যিনি মালিক তাঁর হয়ত কস্মিনকালে এ ধারণা ছিল না যে, পৃথিবীর বহু অঞ্চলের বহু জাতির লোক এই বাড়িতে একদা একত্র হয়ে প্রতি সকালে একই সঙ্গে একই শৌচাগার দখল করার জন্য হুড়োহুড়ি বাধিয়ে দেবে। অপরাধ তাঁর নয়, কারণ তিনি হয়ত তাঁর এই চতুষ্পার্শ্ববর্তী এস্টেটের মাঝখানে এই সুন্দর উদ্যান-বাটিতে সপরিবারেই বাস করতেন। কিন্তু যাঁরা এসব ভেবেচিন্তে না দেখে এই প্রকার অভব্য একটা অবস্থার মধ্যে এতগুলি ভদ্র নরনারীকে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁরাই অদূরদর্শী! তারাশঙ্কর বোধ করি গোপাল হালদার মশায়কে একথাগুলি বলেছিলেন, এবং সম্ভবত গোপালবাবুর চেষ্টাতেই দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যার দিকে আমরা একপ্রকার 'গ্রাম্য' জীবন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে সদ্যনির্মিত তাসকন্দ হোটেলে জায়গা পেয়েছিলুম। আমাদের মনের ভাবখানা এই, আমরা যেন ভারতীয় কমিউনিস্টদের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছি! আমাদের পক্ষে এই অপরিচিত দেশে সর্ববিষয়ে সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা যেন তাঁদেরই যত দায়! আমাদের এ-মনোভাব অসঙ্গত!

স্নানাদি এবং প্রাতরাশ সারতে দেরি হল বৈকি। দেশে এর আগে বিনামূল্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, এবার চিঠি লিখতে হল। চিঠিপত্র সেন্সার করা হবে ধ'রে নিয়েছি। সুতরাং সেন্সাররা যাতে কষ্ট না পান তার জন্য সাদামাটা দুচার লাইন পাঠিয়ে দিলুম। এ স্থলে বলে রাখা চাই, ওখান থেকে যতগুলি চিঠি লিখেছি,—তার মধ্যে দীর্ঘ পত্রও ছিল, এবং যতগুলি বই-কাগজ-প্যাকেট-পুস্তিকা ইত্যাদি পাঠিয়েছি,—সবগুলি যথাসময়ে কলকাতায় পৌঁছেছে! আমার ধারণা, কারও মনে কোনও প্রকার সন্দেহের সূত্রপাত না ঘটে, এ সম্বন্ধে অদৃশ্যলোক থেকে কারও নির্দেশ ছিল! প্রত্যক্ষভাবে কারও আচরণে কোনওপ্রকার দোষত্রুটি ধরতে পারছিনে এজন্য মনটা যেন খুঁতখুঁত করছে!

যথারীতি রুস্তম ইসমাইলভ হাসি-মুখে আমাদের ধরে গাড়িতে তুললেন। লোকটা যাদু জানে। হ্যান্ডশেক করে না, সোজা সমাদরে জড়িয়ে ধরে। কেউ কারো ভাষা জানিনে, কিন্তু তার স্নেহ-স্পর্শের মধ্যে রয়েছে অতি প্রাচীন যেন এক পরমাত্মীয়। চওড়া বুকের ছাতি,

তার চেয়েও প্রশস্ত তার আচরণ,—চরিত্রের এমন উদার প্রকাশ সচরাচর চোখে পড়ে না। লোকটার বয়স পঞ্চাশ কি হয়েছে? মাথায় টাক দেখে ঠিক বোঝা যায় না।

ল্যানা ও নিকাসহ আমরা একগাড়ি লোক নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলুম। এশিয়া আফ্রিকা লেখক সম্মেলন উপলক্ষ্যে এই বৃহৎ নগরীতে উত্তেজনা এসে পৌঁছেছে। নানা দেশের প্রতিনিধিদের এক এক দলের মোটর যাচ্ছে পথে পথে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শহর স্পষ্টত দুটি। নাভয় অপেরা হাউসের দিকটা নব্য শহর, আমরা সেদিকটা বাদ দিয়ে প্রাচীন শহরের দিকে চললুম। মনে রাখা দরকার, মধ্য এশিয়ার লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল মরুভূমির মাঝখানে একেকটি বিন্দুর মতো কতকগুলি মরুদ্যান চিরকাল ধরেই ছিল। তাসকন্দ তারই একটি বিন্দু। যেমন বিন্দু হল সমরকন্দ, বোখারা, খিভা, খোয়েজিম, জাফরসান, ফারগানা, আন্দিসান—ইত্যাদি। আদিতে এরা মরু-সন্তান। এরা চিরকাল চেয়ে থেকেছে ক্যারাভানের দিকে, এবং এক একটি মরুদ্যানে সামান্য যা কিছু ফলিয়েছে তাই বেচে দিন গুজরান করেছে। এই ঘিঞ্জিঘিঞ্জি বাজার যেখানে বসত, সেইখানে এসে পৌঁছত ক্যারাভান, এবং আশেপাশে এখানে ওখানে বালু মাটি আর পাথর দিয়ে বস্তি গড়ে উঠত। সভ্য দেশ থেকে তখনও ওদের পাড়ায় দেশালাই এসে পৌঁছয়নি, সেই কারণে চীনামাটির পাত্রে ছোট ছোট কাঠের কুচির আগুন বিক্রি হত। একদিকে ছিল মধ্যযুগীয় আমীর-ওমরাহ-সুলতান প্রভৃতির স্বেচ্ছাচারী রাজ্যপাট; জলাশয়ের উপর যার যতখানি অধিকার, সে ততখানি রাজনীতিক দিক থেকে শক্তিশালী,—অন্যদিকে অসহায়, ক্ষুধার্ত, পাগল, চরসখোর, বাউণ্ডুলে, ক্রীতদাস, সমাজশত্রু,—এদের নিয়ে তুর্কীস্তান। যারা ছিল ভদ্র, নীতিপরায়ণ এবং নিরীহ—তাদের দুর্গতির অন্ত ছিল না। এই মরু-পৃথিবীর বাইরে পালাবার পথও তারা খুঁজে পেত না। পশ্চিমে কশ্যপ উপসাগর, উত্তরে অন্তহীন বালুপথ,—যেটাকে বলা হত 'ক্যারাভানের সমাধিভূমি'।—পূর্বদিকে চীন-মঙ্গোলিয়ার ও দক্ষিণ সাইবেরিয়ার ঊষর ও ধূসর অনধ্যুষিত বালুপাথরের জগৎ, এবং দক্ষিণে ইরাণ, আফগান ও ভারত। পৃথিবীর অপর কোনও অঞ্চল বোধকরি এত দুস্তর, অনধিগম্য এবং অবরুদ্ধ নয়। সভ্য জগৎ কোনও কালে ওদের খবর রাখেনি, বৈজ্ঞানিক যুগে কাকে বলে সে সংবাদও ওরা কখনও পায়নি। এই বিশাল মরু-পৃথিবীর মধ্যে শুধু দুটি বৃহৎ নদী চিরকাল বালুডাঙার ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে,—শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া!

বিস্ময়ের কথা এই,—এই সুবৃহৎ মরুজগতের ভিতর থেকে একদা উঠে এসেছিল ভারত-সংস্কৃতির আদিগুরু আর্যজাতি! এখনও তাদের শেষ বংশধরদের ছিটেফোঁটারা নাকি বসবাস করছে পাঞ্জাবের দূর উত্তর সীমান্তে পামির পর্বতমালার আশেপাশে,—অন্তত তারা তাই বলে। এই তুর্কিস্তানের ভিতর দিয়ে একদা তীরধনুক বল্লম তরবারি নিয়ে ছুটে এসেছে সম্রাট আলেকজান্ডার তার মাসিডোনিয়ার সেনাদলসহ জন্তুর চামড়া গায়ে জড়িয়ে। এই মরুলোক বিজয়দর্পে জয় করেছিল সম্রাট-দস্যু চেঙ্গিস খাঁ তার মঙ্গোলিয় বর্বর সেনাদল নিয়ে,—রক্তে আগুনে ধ্বংসে নিষ্ঠুরতায় ছারখার করেছিল মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ। হূন, তাতার, তুর্কি, আরব, পারসী, পাঠান, বালুচ, মধ্যরুশীয় কসাক,—কেউ তুর্কিস্তানকে ছেড়ে কথা কয়নি। এই সমস্তর মূলে কিন্তু ছিল জলাভাব! জল যত শুকিয়েছে, খাদ্যের অভাব যত ঘটেছে, মানুষের সর্বব্যাপী হিংস্রতা ততই কঠোরতর হয়ে উঠেছে। আর্যরা ভারতে প্রবেশ ক'রে যে-উপনিবেশ স্থাপন করেছিল; হয়ত তার মূলে কারণটাই ছিল হিমালয়ের জল এবং ভারত-আকাশের জলদজাল!

তারপর দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল অনেক শতাব্দি। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর সমগ্র তুর্কিস্তান এল রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে। জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের সৈন্যদল মরুলোক পার হয়ে এসে এক একটি মরুদ্যানে ছড়িয়ে পড়ল, আধিপত্য বিস্তার করল, সম্রাট-প্রতিনিধিদের ধ'রে এক এক ঘাঁটিতে বসিয়ে দিল, জলাশয়গুলির উপর দখল নিল; প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করল, রাজস্ব আদায় করতে লাগল আপন খেয়াল-খুশিতে। তারা আপন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থার সুযোগ নিতে লাগল চারিদিকের দারিদ্র, মূর্খ ও বিভ্রান্ত জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, বিবাদ বাঁধিয়ে দিতে লাগল ইহুদির সংগে তুর্কিদের, তাতারের সংগে মোঙ্গলদের, মুসলমানদের সংগে খৃষ্টানদের। কিন্তু তবুও রুশরা প্রধান দুটি কাজ করল। রুশ ভাষা ও সাহিত্যের সংগে মধ্য এশিয়ার একটু আধটু সংযোগ ঘটিয়ে ওদের ভিতর থেকে ক্রীতদাস প্রথাকে আইনের দ্বারা বিতাড়িত করল, এবং যোগাযোগ রক্ষার সর্বপ্রকার সুবিধার জন্য 'ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ' বসিয়ে দিল। বর্তমানে তাসকন্দ থেকে রেলপথে মস্কো গিয়ে পৌঁছতে মোট ছয়দিন লাগে। শুনলুম গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে রৌদ্রের জন্য এবং শীতকালে দিনমানের প্রথমভাগে তুষারপাতের ফলে রেলগাড়িতে আনাগোনা দুঃসাধ্য। সমগ্র ইউনিয়নে পরিভ্রমণের প্রধান বাহন হল বিমান। বিমান ভিন্ন দ্রুত এবং অবারিতভাবে যাতায়াত কোনও সময়েই সম্ভব নয়। বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূ-পরিমাণ হ'ল ৮৬,৪৬,০০০ বর্গমাইল,—সমগ্র পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ, বর্তমান ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রায় সাত গুণ বড়। রুশ বিমানের ভাড়া রুশ রেলপথের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া অপেক্ষা কতকটা কম। রুশ রেলপথে শুধু আছে দুইটি শ্রেণী। প্রথমটি অতিশয় বিলাস-বৈভবে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়টি সাদামাটা। ভারতীয় রেলপথের তৃতীয় শ্রেণী অপেক্ষা ভাল নয়। একদা এই 'তৃতীয়' শ্রেণীতে আমি ভ্রমণ করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু 'বহু সম্মানিত ভারতীয় অতিথির' পক্ষে সেটিতে চড়া সম্ভব হয়নি!

গাড়ি আমাদের নিয়ে পথে পথে ঘুরছে। নগরের শান্ত ভাবটি লক্ষ্য করবার মতো। মধ্য এশিয়ার যেটি প্রধান সামাজিক কলঙ্ক—সেই ভিখারী শ্রেণীর একটিও এখনও চোখে পড়ছে না। তবে তা'রা কোথায় গেল? 'লিকুইডেট' করা হয়েছে কি? হাসিমুখে ল্যানা জবাব দিল, না না, তা হবে কেন? সবাই এখন কাজ ক'রে খায়। ভিক্ষা আমাদের দেশে নিষিদ্ধ!

যারা কাজ করেনি কোনকালে, অথচ বুড়ো হয়েছে,—কেউ দেখবার নেই, তাদের উপায়?—প্রশ্ন করলুম।

ল্যানা বোধ করি এই জবাবটি দিল, হয় তারা ব'সে ব'সে কিছু করে এবং পয়সা পায়। নয় তাদেরকে কেউ খাওয়ায়, নয় থাকে দাতব্যের উপর। অনেকে

পেন্সনও পায়। এদেশে উপোস করে না কেউ।

এর পর কবে যেন লানাকে একা পেয়ে প্রশ্ন করেছিলুম, সত্যি বল ত লানা, বিদেশী অতিথিদের সম্ভবপর প্রশ্নগুলির জবাব কি তোমাদের আগে থেকে শিখে রাখতে হয়? ওটা কি তোমাদের চাকরির প্রধান সার্টিফিকেট?

লানা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। আমার চোখ-মুখের আপাত সৌজন্যের পিছনে যে কুটিলতা ছিল, সেটি সে উপলব্ধি করল। পরে শান্তকণ্ঠে বলল, আমাকে গালমন্দ নাই করলেন! এখানে থাকুন যতদিন খুশি, চোখ কান খুলে রাখুন, যখন যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ান। আমি ত বলিনি আমার সব কথা চোখ বুজে বিশ্বাস করুন?

পথে রুগ্ন, দুর্বল, লাঠি-ধরা, আতুর, হতভাগ্য এ ধরনের একটি লোকও এখনও চোখে পড়ছে না। নব্য শহরটি অতি স্নিগ্ধ, অগণিত বৃহৎ অট্টালিকা-সম্বলিত, বনবাগান ও ফুলেফলে ভরা। একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। শ্বেত-পাথরের মূর্তি এবং পুতুল সোভিয়েট ইউনিয়নের বড় প্রিয়। স্পষ্টত পুতুল পুজোয় এরা অতিশয় অভ্যস্ত, এবং এটি পৌত্তলিক মনোভাব! একই মূর্তি একই ভঙ্গীতে দেখতে পাওয়া যায় বহু জায়গায়। সেটি হল লেনিন এবং স্টালিনের সম্মিলিত মূর্তি! ভঙ্গীটি হল এই প্রকার,—দুজনে একই আসনে বসে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গের মতো আলাপ করছেন! মূর্তিটির প্রকৃত ব্যঞ্জনা হ'ল—লেনিনের একমাত্র বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও যোগ্যতম প্রতিনিধি হলেন স্টালিন! এই ব্যঞ্জনাটি আধুনিক সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে সত্য ইতিহাস কিনা, এতটা আমার তলিয়ে জানা নেই। কিন্তু এটুকু জানি একই মূর্তি বহু জায়গায় ছড়িয়ে রাখার মধ্যে রুচিবোধ ও রসবোধের যেমন অভাব আছে, ঠিক তেমনি মূর্তিটি তার অভি-নবত্ব এবং আকর্ষণও হারিয়েছে। বিদেশীরসগ্রাহীর পক্ষে এটি দৃষ্টিকটু! এ যেন পুতুলের দেশ!

উজবেক জনসাধারণের মধ্যে বোধ করি যে অংশটা 'অতি উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ অবস্থাপন্ন'—তারা বেশ খাঁটি সাহেব, তারা অধিকতর 'সভ্য'। তারা মসজিদ, ইসলাম, নমাজ, মক্কা—এ সবের তেমন ধার ধারে না। শূকরের মাংস ভোজনে তাদের অনেকেরই বিশেষ তেমন আপত্তি নেই! একদিন এই দৃশ্য দেখে ভয়ে-ভয়ে কয়েকজন ভারতীয় মুসলমান বন্ধুকে খাবার-টেবলে ব'সেই প্রশ্ন করে-ছিলুম, এবং তাঁরা সবাই নানাবিধ সুস্বাদু আহার্য বস্তুর আয়োজনের মাঝ-খানে বসেই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, আপনি একেবারেই আধুনিক নন্। মুসলমান জগৎ যে কত এগিয়ে গেছে আজকাল, আপনি তার কিছু খবর রাখেন না! গরু-শূকরের ঝগড়া সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই!

শূকর ও গরুর মাংস ভোজন অগ্র-গতির প্রতীক্ কিনা আমার জানা নেই। তবে এটুকু জানি, আমাদের প্রাক্তন ইংরেজ সরকার গরু ও শূকরের মধ্যে ত্রিশ বৎসর কাল দাঙ্গা বাধিয়ে রেখেছিলেন। সে যাই হোক, একথা পরে শুনেছিলুম, মধ্য এশিয়ার মুসলমান-প্রধান অঞ্চল-গুলিতে প্রকাশ্যে অথবা কোনও হোটেলে শূকরের মাংস বিক্রি হয় না! ওটার ওপর কর্তৃপক্ষ জোর দেন না। উজবেকদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় মাংস হল মোটাসোটা ভেড়ার মাংস এবং তারই 'পিলাও'। উজ-বেকিস্তানে চাউল ও গমের অভাব নেই। ফসলের মাঠগুলিকে সঞ্জীবিত করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জলাশয় এবং জল-চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন বহু অঞ্চলে।

তুর্কিরাই ভিন্ন নামে তাতার হয়ে উঠেছিল কিনা এটি আমার পক্ষে গবে-ষণার বিষয়। মঙ্গোলীয় তাতারের কথা শুনেছি। তাতার শব্দটা শুনলে এখনও গা ছমছম করে! তাতার, মঙ্গোল, তুর্ক, ইরান, আফগান, কাজাখ, তাজিক, কির-গিজ,—সব রক্ত মিলছে এসে এই উজ-বেকিস্তানে। রুশ-কসাক কেউ বাদ যায়নি। পথে-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায় উজবেক ও রুশ নরনারী অবাধে মিলেছে। ওদের মধ্যে প্রণয় ঘটেছে, উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে বেঁধেছে। বর্ণবিদ্বেষ লেশ-মাত্র চোখে পড়ে না। সরকারি চাকরি-বাকরির ব্যাপারে উঁচু-নীচু আছে কিনা এখনও স্পষ্ট জানতে পারিনি,—সম্ভবত 'কী-পোস্ট'গুলিতে রুশ প্রাধান্য কিছু আছে,—তাসকন্দ বিমানঘাঁটিতে কতকটা দেখতেও পাওয়া গেছে! কিন্তু সামাজিক ও সাধারণ কর্মজীবনে উঁচুনীচু প্রভেদ নেই। সেখানে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের পার-স্পরিক সম্পর্ক অবারিত, শ্বেত-অশ্বেত ভেদাভেদ নেই। এ দৃশ্যটি দিবারাত্র স্বচক্ষে দেখেছি বলেই বিশ্বাস করি, নচেৎ ইংরেজ আমলের বর্ণ-বিদ্বেষের মধ্যে মানুষ হয়ে এটি কখনই বিশ্বাস করতুম না। অত বড় উদার আমেরিকান সমাজ, কিন্তু সেখানেও সামাজিক জীবনে নিগ্রো-পীড়ন আজও শেষ হয়নি! ইংল্যাণ্ডে আজও বর্ণবিদ্বেষ রয়ে গেছে।

পথে ট্রামগাড়ি চলছে,—কখনও দুই বগি, কখনও বা তিন বগি। ট্রলি বাস রয়েছে, ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে,—গাড়ি অপেক্ষা ঘোড়াগুলি উঁচু এবং বৃহদাকার। ক্ষেত-খামার চাষবাসের কাজে ওরা কোথাও গরু ও বলদ ব্যবহার করে না। ঘোড়াকে ওরা কাজে লাগায়, এবং সেই সুবৃহৎ স্বাস্থ্যবান পেশীবহুল এক-একটি ঘোড়ার ভীষণ চেহারা দেখলে ভয়-ভয় করে। সাইকেল আছে প্রচুর। আর আছে ট্যাক্সি। ট্যাক্সির গায়ে সাদায়-কালোয় ছককাটা স্টীম-লাইন। খালি ট্যাক্সি একটি সবুজ সাংকেতিক আলো জেলে রাখে—যাতে দূরের থেকে তাকে ডাকতে পারা যায়। বাসগুলি থামবার সময় আপনা থেকেই তার দরজা খুলে যায়, যাত্রীরা একটি-একটি করে শান্ত-ভাবে সামনের দরজা দিয়ে ওঠে এবং পিছনের দরজা দিয়ে নামে—না গোলমাল, না ঠেলাঠেলি। সীট যদি পেয়ে যায় ভাল, না পেলে আমাদেরই মতো মাথার পাশে হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে। যাত্রী ওঠবার পর গাড়ি স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈদ্যুতিক কৌশলে দরজা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়। টিকিট না কিনে কেউ গা ঢাকা দেবার চেষ্টা পায় না, কনডাক্টর তার নির্দিষ্ট সীটে ব'সে থাকে, যাত্রীরাই হাতাহাতি ক'রে পয়সাটা দেয়। কন্-ডাকটর তার রীল্ থেকে টিকিট ছিঁড়ে হাত বাড়ায়। কাছে অথবা দূরে যেখানেই যাও, ভাড়া ৪৫ 'নয়া পয়সা'। ট্রাম ওরফে 'স্ট্রীট কারের' ভাড়া ৩০ নয়া পয়সা। ট্রলি বাস ৩৫ নয়া পয়সা। কোনও যান-বাহনে মেয়েদের জন্য আলাদা সীট সংর-ক্ষিত নেই—মেয়ে-পুরুষ অবাধে ব'সে পড়ছে পাশাপাশি, যেমন আছে আমাদের বোম্বাই শহরে। ওদের প্রতি ১০০ কোপেক-এ এক রুবল হয়,—যেমন আমাদের টাকা-পয়সা।

চেনার এবং পপলার শ্রেণীর ভিতর দিয়ে যদিও বহুদূরে তিয়েনসানের তুষারশৃঙ্গগুলি চোখে পড়ে, তবুও

মধ্যাহ্নকালের রৌদ্র বেশ গরম। মাঝে মাঝে থেমেছি, পথের এখানে ওখানে ঘুরেছি. রুশ ভদ্রলোকেরা বিশেষ সৌজন্যের সঙ্গে আলাপচারী করছেন,—এবং তাঁদের কথাগুলি অনুবাদ ক'রে দিচ্ছে নিকা ও লানা। আমরা যেন শীত-কালীন লক্ষ্ণৌ-কানপুরের পথেঘাটে ঘুরেছিলুম!

একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। উজবেকিস্তানের পাঠ্য এবং লেখ্য লিপি হল আরবি অক্ষর, এই ত' জানতুম। কিন্তু সেই আরবি অক্ষর কোথাও চোখে পড়ছে না কেন জানিনে। যেখানেই যাচ্ছি, রুশীয় লিপি দেখছি। উজবেক সাহিত্যের বই তবে কোন্ লিপিতে লেখা হয়? সেকালের আলীশের নাভয় কোন্ লিপিতে লিখেছেন? একালের আইবেক্ কোন্ লিপিতে লিখ-ছেন? লিপি যদি না থাকে, সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চেহারাটা দাঁড়িয়ে থাকে কি? বাঙ্গালী সাহিত্যকর্মীকে যদি বলা হয়, দেবনাগরী অক্ষরে বাঙলা ভাষা লেখ, তারা কি রাজি হবে?

চেয়ে দেখছি এই বিরাট সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায় ১৭০টি পৃথক পৃথক ভাষা আছে। তার মধ্যে মোট ৮৫টি ভাষার উন্নত ও অনুন্নত লিপি পাওয়া গেছে। এই ৮৫টি ভাষার মধ্যে ৫২টি ভাষা কেন্দ্রিয় সোভিয়েট সরকারের দ্বারা স্বীকৃত, এবং এদের লিপিও নাকি একেকটি পৃথক। সমস্তগুলির মধ্যে রুশভাষা হল সম্পদ্ এবং ঐশ্বর্যে পরি-পূর্ণ। এই ভাষায় পুশকিন, লারমেনটভ, গোগল, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডসটয়ভস্কি, গোর্কি, চেকভ, পাস্টেরনাক, মায়াকভস্কি প্রভৃতি জগৎবরেণ্য প্রতিভারা বিপুল সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন,—তাঁদের সকলের লিপিই ত রুশ! সুতরাং এই সর্বজন-গ্রাহ্য লিপিটিকে সর্বাধিগম্য ক'রে তোলার জন্য পূর্বোক্ত ৫২টি ভাষাভাষী সম্প্রদায়েরা এই লিপিই নিয়েছেন সাহিত্য-কর্মের বাহনস্বরূপ। এই অবশ্যপাঠ্য রুশলিপি গ্রহণের ফলে রুশভাষা শিক্ষাও সহজসাধ্য হয়েছে। এর ফলে কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের কি-কি সংস্কৃতি লোপ পেতে বসেছে সে-খবর পাইনি বটে, কিন্তু এতে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল ভূভাগ একই যোগসূত্রের দ্বারা গ্রথিত হয়ে গেছে! একজন রুশের পক্ষে ৫২টি ভাষা ও বিভিন্ন লিপি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, কিন্তু ৫২টি সম্প্রদায় যদি কেবলমাত্র রুশ ভাষাটি শেখে—তাতেই কাজ চলে যায়। সর্বাপেক্ষা স্বল্পশিক্ষিত মিস্ত্রি-মজুরকেও দেখে নিলুম, বিশিষ্ট একজন রুশ পণ্ডিতের সঙ্গে সে হাসিখুশী মুখে আলাপ ক'রে গেল! ভাষায় না আছে কৃপণতা, না বা জড়তা। মধ্য এশিয়ার সমস্ত বালক-বালিকা মাতৃভাষা ও রুশ ভাষা একই সঙ্গে শেখে। বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে মাতৃভাষার পাশে হিন্দি শিক্ষার যে প্রাথমিক দুস্তরতা, ওখানে সেটা নেই। ওখানে মাতৃভাষার প্রথম পাঠ হল রুশলিপিতে। আরবি অক্ষর গিয়ে ঢুকেছে সম্ভবত পুরনো কালের মোল্লাদের ঘরে, নয়ত মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায়।

মধ্যাহ্ন ভোজন চলছে অপরাহ্নে,—এই ভোজনের নাম 'ডিনার'।—'লাঞ্চ' ওদেশে নেই। ব্রেকফাস্ট ঠিক আছে, কিন্তু নৈশভোজন হয়ে উঠেছে 'সাপার'। ঘড়ির কাঁটায় ওদের খাবার বাঁধা নেই, খাবার পর কেউ কেউ ঘড়ি দেখে বটে! দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খেতে দাও। খাওয়াটা আরম্ভ সকাল আটটায়, শেষ হয় রাত বারোটার পর যেন কোন সময়। সুস্থকায় মেয়ে-পুরুষ দিনে চারবার ভূরিভোজের পাত পেতে বসে। প্রতি ভোজেই মাংসের ভাগ আছে। যকৃৎ ওদের দেহে কাজ করে ভাল। এ ছাড়া রাস্তাঘাটে আছে এটা-ওটা, এ-দোকান, ও-দোকান। পকেটে পয়সা প্রায়ই থাকে, —সুবিধে পেলেই আপেল চিবোতে বসে, নয়ত ব'সে যায় কোনও হোটেলে 'সাস্লিক' অর্থাৎ শিককাবাব আর পাউ-রুটির বড় বড় ফালা নিয়ে। বড় পেটুক। পৃথিবীর আর কোন্ দেশে মদ-মাংসের সঙ্গে এতখানি আইস ক্রীম খায়, আমার অবশ্য জানা নেই!

পাখী যখন বাসার কথা ভাবতে বসেছে, এমন সময় একটি উৎসাহজনক খবর এল, তাসকন্দ হোটেলে আমাদের জায়গা হয়েছে, এবং এখনই আমাদের রওনা হতে হবে। আমার বিশ্বাস, এটি গোপাল হালদার মহাশয়ের উদ্যোগে হয়েছে। তাড়াতাড়ি আমরা প্রস্তুত হলুম।

আধঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছলুম তাসকন্দ হোটেলে। সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণীর আশে-পাশে কৌতূহলী নানা লোকজন দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা সবাই ওদের কাছে নতুন, একেবারে আনকোরা। ওদের জগৎ বোধকরি ওদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এতকাল। ওরা এখন নতুনের জন্য কাঙ্গাল।

দুই মহলা বৃহৎ কাঁচের দরজা খুলে পুলিশ-পাহারা আমাদের পথ ক'রে দিল। ভিতরটা যেন শ্বেতপাথরের প্রাসাদ। সম্পদে ও সাজ-সজ্জায় ঝলমল করছে। সামনে লবীর কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে লানা ও নিকা আমাদেরকে নিয়ে গেল একটি কোণের দিকে—যেখানে লিফ্ট্। একটি ধবধবে তরুণী সেই লিফ্ট্-এ আমাদের ঢুকিয়ে ঘড়ঘড়িয়ে নিয়ে তুলল 'চিতির্ভে' নম্বরে, অর্থাৎ চারতলায়। লিফ্ট্-এর কলকব্জায়, দোলনে, আওয়াজে অতিশয় অপটুতা মনকে পীড়া দেয়। যারা কথায়-কথায় রকেট ওড়ায় তারা ছোট জিনিসের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, এটি আশ্চর্য। যাই হোক, উপরে গিয়ে দরদালানের মাঝামাঝি একটি মেয়ে-আপিস দেখে লানা কি যেন আলাপ করল। অতঃপর খাতাপত্রের সঙ্গে চাবির নম্বর মিলিয়ে ৬৪নং ঘরটি দেওয়া হল তারাশঙ্করকে, এবং একই দেওয়ালের সঙ্গে ৬৬নং ঘরটি আমাকে।

চাবি খুলিয়ে ঘরের মধ্যে আমাকে পৌঁছিয়ে লানা বাইরে যাবার সময় বলে গেল, আমি বাইরে রইলুম, দরকার হলেই ডাকবেন।

সাংঘাতিক মোটা এবং ভারি কাঠের দরজাটা বন্ধ ক'রে একবার সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভিতরে এসে দাঁড়ালুম। সমস্তটা ধাঁধা লেগে গিয়েছিল, কানেও বোধ হয় তালা লেগেছিল। ঠিক হতবুদ্ধি অথবা হতচকিত,—আমার অবস্থাটা কি প্রকার হল মনে নেই। কাঠের মেঝে, যেমন আমাদের দেশে পাহাড়ি শহরের হোটেল অথবা বসতবাড়িতে হয়। কিন্তু এখানে কাঠগুলি বাদামি ডিজাইনে বসানো। এক-একটি পালিশ করা টুকরো, চওড়ায় ইঞ্চি তিনেক, লম্বায় ফুটখানেক। উপরবাগে ঝকঝকে মেটে পালিশ,—কিন্তু তলার দিকে এমনি পালিশ আছে কি? মেঝের অনেকখানি কার্পেট দিয়ে ঢাকা,—তার উপর নানা কারুশিল্পের ছাপ রয়েছে, কিন্তু বর্ণ হল লাল! পাশাপাশি দুখানি খাট,—তার উপর সেই একই গোলাপী সিল্কের 'বেড-কভার', একই বৃহৎ চৌকো বালিশ দুটি, একই কম্বল চাদর মোড়া, এবং একই বিছানার চাদর। দুখানি খাটের মাথার দিকে দুটি টিপাই—তাদের উপর মোটা কাঁচের চাকতি বসানো। দুটি টেবল ল্যাম্প, অ্যাস-ট্রে,—দেওয়ালের নীচে কাঠের স্কার্টিংয়ের পাশে আলোটার জন্য

প্লাগ-পয়েন্ট লাগানো। এক কোণে একটি লেখাপড়ার টেবল,—কাঁচ দিয়ে ঢাকা। টেবলের উপর একটি টেলিফোন যন্ত্র, এবং তার ডায়ালের এক-একটি গর্তে শুধু যে এক-একটি অংক আছে তাই নয়,— ওর মধ্যে আছে রুশ হরপ। একটা মামুলি দোয়াত-কলমের ব্যবস্থা রয়েছে বটে। একখানা ছাপা কাগজ দেখছি,— সেটিতে রুশ ভাষায় নানা নির্দেশ লেখা। টেবলের উপর একটি সোনালি রং করা মস্ত টেবল ল্যাম্প সবুজ শেড দিয়ে ঢাকা। চেয়ারের গদির রংটি লাল, তার উপর ঈষৎ সোনালি ছককাটা। এদিকে একটি গোলাকার টিপাইয়ের উপর একখানি কাঁচের থালা, চামচ, মাখন লাগাবার পরিচিত একটি হাতল, ছুরি ও কাঁটা, দুটি ছোট কাঁচের গেলাস, দুটি নুন আর গোলমরিচের ছোট ছোট শিশি। মাঝখানে একটি ফুলদানির উপর মস্ত এক লতাপাতা মেলানো ফুলের তোড়া। এসব ফুল ও পাতা কাশ্মীর, কুমায়ুন, আসাম ও দার্জিলিংয়ে অজস্র। কিন্তু হঠাৎ ফিরে একবার ছুঁয়ে দেখলুম, ওগুলি রঙীন কাগজের ফুল কিনা। না, ঠিক আছে। তবে শুধু চোখেই দেখো, গন্ধ বাতাস কম! সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে রংবাহার কাগজের ফুল এবং সবুজ প্লাস্টিকের লতাপাতা ও ডালপালার চলন খুব বেশি। কৃত্রিম বস্তুর দ্বারা চোখের তৃপ্তি ঘটে,—মনের তৃপ্তি নাই ঘটল! বরফ, তুষার এবং ঠাণ্ডায় ওদের প্রাকৃতিক শোভার সর্বনাশ হয়ে যায়, ওদের চোখের তারায় সাদাটে ছায়া পড়ে—সেই কারণে ওরা চোখের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায় সর্বত্র। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র সবুজ বর্ণের ছায়া রচনার জন্য অবলীলাক্রমে বহু অর্থ ব্যয় ক'রে থাকেন। মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরা তাদের বালু-পাথর-কাঁকরের দেশে আগে খুঁজে আনে জল, তারপর বানিয়ে তোলে কল-কারখানা, ঘরদোর আর রাস্তাঘাট,—তারই ফাঁকে ফাঁকে মাটি আর ঘাস সংগ্রহ ক'রে আনে, এবং গাছপালা বসায়। তাসকন্দে আজও ওদের একটি পারিবারিক প্রথা বর্তমান। প্রতি পরিবারের প্রতিটি সন্তান কুড়িটি ক'রে গাছ পুঁতবে। এই নিয়মটি শপথ হিসাবে প্রত্যেককে প্রথম জীবনে ব্রতরূপে গ্রহণ করতে হয়। তাসকন্দের উদ্যান-নগরী নাকি এইভাবেই সৌন্দর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

চুপ! অত্যন্ত মিহি সুরে কে যেন গানের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা কইছে। না, ঘরে কেউ নেই,—একটি ছোট্ট রেডিয়ো যন্ত্র টিপাইয়ের ওপর রাখা। সেটা বন্ধ করলুম ত আরেকটা। এটার আওয়াজ আসছে কড়িকাঠের কোণের একটি গর্ত দিয়ে। তার নীচে দেওয়ালে একটি সুইচ। ওটা টিপে বন্ধ করলুম,—কিন্তু কই, গান ও বক্তৃতা বন্ধ হয় না ত! অনেক টেপাটিপি করলুম,—কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হতে চাইল না। অত্যন্ত পীড়াদায়ক উৎপাত মনে হল। রাগ ক'রে বসতে গেলুম টেবলের সামনে। ড্রয়ারের কোণে সাংঘাতিক ঠোকা লাগল হাঁটুতে। চেয়ারখানা বেবঙ্গা, গদি আছে, হাতল আছে,—কিন্তু আরামদায়ক নয়। বসলে আপনা হতে শরীরটা হড়কে আসে, হাতলের ওপর হাত রাখা অসুবিধা। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। গায়ের কোট খুলে ওয়ার্ডরোবের মধ্যে রাখতে গেলুম। কিন্তু ডালাটা যদি বা হেঁচকা দিয়ে খুলল, বন্ধ করবার সময় ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে। চাবি ঘোরাতে গেলুম, আঙুলে আঘাত লাগে! বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জল দিতে এলুম, হঠাৎ কলের মুখটা বনবিড়ালের মতো এমন সশব্দে ফ্যাঁস ক'রে খিঁচিয়ে উঠল যে, ভয় পেয়ে কল ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

দরজায় টকটক্ শব্দ শুনে এবার এগিয়ে গিয়ে খুললুম। লানা হাসিমুখে বলল, খাবেন চলুন।

খাবো কি বলছ? এখন সবে সাড়ে সাতটা। দশটার আগে জলস্পর্শ করব না।

ও'রা সবাই আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।—আসুন।

মধ্যপ্রাচ্য, নিকটপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব-প্রাচ্য এবং দূরপ্রাচ্য,—এ ছাড়া আফ্রিকার কয়েকটি স্বাধীন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা প্রায় প্রতি বিমানেই এসে পৌঁছচ্ছেন। একে একে এসেছেন জাপান, চীন, ফিলিপাইন এবং পূর্ব ইউরোপের ও'রা। পর্যবেক্ষকস্বরূপ যোগদান করছেন কয়েকজন আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, পশ্চিমজর্মন, অস্ট্রিয়া, ইসরায়েল, ইটালী, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ইত্যাদি। দেখতে দেখতে তাসকন্দের নাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠল, এবং সেই পরিমাণে শত সহস্র রকমের কর্মতৎপরতা দেখা দিল।

সঠিক হিসেব ক'রে দেখিনি, তবে মনে হচ্ছে পর্যবেক্ষকদের দল ছাড়া কম বেশি প'য়ত্রিশটি জাতির প্রতিনিধি এশিয়া-আফ্রিকা লেখক সম্মেলনে যোগদান করছেন। কানাকানিতে শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, পারস্য এবং পাকিস্তানের কেউ এখানে আসবার ছাড়পত্র পাননি। কিন্তু এমন একটি অন্তরালবর্তী ব্যবস্থা নাকি আছে,— যদি কেউ উক্ত দেশগুলি থেকে কোনমতে এসে পৌঁছতে পারেন তবে তাঁদের রাহাখরচের ব্যবস্থা করা হবে। তারাশংকর সন্দেহ করেন, এ সুযোগ শুধু ওদের জন্যই নয়, অন্যান্য অনেকেই এ সুযোগ নিয়েছেন! তা হবে। অপরের খরচে এসে খেয়ে-দেয়ে পাঁচটা আমোদ-আহ্লাদ ক'রে বিদেশে বেড়িয়ে যাওয়া মন্দ কি? আমাদেরই কপাল মন্দ!

সাহেব মেমরা 'কালা-আদমি'-দের সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গের মতো মেলা-মেশা করছে, খাচ্ছে-বসছে, হাসি-তামাসা-গলাগলি করছে, এটি একটু নতুন। আমরা ইংরেজ আমলে মানুষ। সেদিনকার চৌরঙ্গী আর কলকাতার মধ্যে যে-ব্যবধান, লণ্ডন ও দিল্লীর ব্যবধান তার চেয়ে কম ছিল না! আপিসের বড়বাবুরা এই সেদিন পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে সদাগরী আপিসের বড় সাহেবের ঘরে ঢুকত, এবং ইংরেজি গালমন্দ খেয়ে এসে ঝাল ঝাড়ত দেশী কেরানিদের ওপর। ইংরেজ সাহেবদের এককলমের খোঁচায় চাকরি নষ্ট হবার আতঙ্কে একটি বিরাট বাঙালী সম্প্রদায়কে যে-দুর্ভাবনা, উদ্বেগ এবং অসম্মান নিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন্ কোন্ ইংরেজ উপনিবেশে এমনতরো কলঙ্কের ইতিহাস ছিল,—আজও সেটি জানতে ইচ্ছা করে। তাসকন্দে এসে প্রথম জানতে পারলুম, রুশসম্রাট জার নিকোলাস যখন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর তাঁর সৈন্যদল পাঠিয়ে মধ্য এশিয়ার উপর প্রথম রুশ প্রভুত্ব বিস্তার করেন, তখন তাঁর সনদের প্রথম নির্দেশ ছিল এই, বর্ণবৈষম্য একেবারেই রাখা চলবে না, এবং সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় সাদা, হলদে, তামাটে ও কালোর ভেদাভেদ সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে ঘুচিয়ে দিতে হবে! এর ফলে দাঁড়াল এই, জারের আমলের সর্বপ্রকার শোষণ, দোহন, উৎপীড়ন, অনাচার এবং অপমান সত্ত্বেও উভয় উভয়ের একান্ত কাছাকাছি রয়ে গেল, রয়ে গেল ভাল-মন্দয়, সুখে-দুঃখে এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল।

জারের আমলে যে সকল রুশ ছিল 'দেশদ্রোহী, বিপ্লববাদী, স্বদেশী নেতা, আন্দোলন ও বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী'—তাদের একটা অংশকে যেমন পাঠিয়ে দেওয়া হত অনধ্যুষিত এবং তুষারাচ্ছন্ন সাইবেরীয় 'তুন্দ্রায়,' তেমনি অন্য অংশটাকেও ছেড়ে দিয়ে আসা হত মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে। এই নির্বাসিত রাজনীতিক ও সামাজিক কর্মীরা জায়গা পেয়ে যেত মোঙ্গল, তুর্কি, তাতার এবং মুসলমান সমাজে। এরা আশার আলো' জ্বালাত' মধ্য এশিয়ায়, এক ঘরে থাকত, এক পাতে খেত, বিবাহ করত নূতন সমাজে। ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিক অসন্তোষ,—এরা একে একে ছড়িয়ে দিত ঘরে ঘরে। সেই কারণে বলশেভিক বিপ্লব যখন বেধে উঠল, তখন মধ্য এশিয়ার রাজনীতিক ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে 'উর্বর'। রুশসম্রাট ওখানকার মরুভূমির বালু নিয়ে যে-সকল 'প্রাসাদ' নির্মাণ করেছিলেন তার অনেকগুলি সামান্য হাওয়ার ফুৎকারে ধ্বসে গেল। উজবেক, কাজাখ, কিরগিজ, তুর্কমেন এবং তাজিক,—এদের সমাজ অবাধে মিলে গেল রুশ বিপ্লববাদীদের সঙ্গে। অর্থাৎ এদের উভয়ের ভালবাসার জন্ম হয়েছে দেশব্যাপী বেদনার যুগে, অপরিসীম দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে। বিপ্লবের পর আজ পর্যন্ত প্রায় দুই পুরুষ কাটতে চলল। মধ্য এশিয়ায় বহু প্রকারের রক্তসংমিশ্রিত একটা নূতন জাত এবার দাঁড়িয়ে উঠেছে,—তারা পর্যটকের প্রশ্নের উত্তরে একথা আর বলতে চায় না, তারা কাজাখ কিংবা উজবেক, মঙ্গোল কিংবা তাতার, য়িহুদী কিংবা তুর্ক, মুসলমান কিংবা খৃষ্টান—তারা কেবল বলতে চায়, আমরা সোভিয়েট নাগরিক! যদি প্রশ্ন করো, কোন্ দেশের তোমরা? কোন্ সমাজের? তখনই তারা জবাব দেবে, আমরা সোভিয়েটের এবং কমিউনিস্ট সমাজের। নানা প্রশ্নের পর জবাব হয়ত এক সময় মিলবে, আমরা কাজাখ কিংবা তুর্কমেন কিংবা উজবেক। কিন্তু যে-সমাজটিকে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি সেটি এমন নূতন, এমন বিচিত্র এবং বিস্ময়কর, যেটি অনেক সময় আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। প্রতিনিধি দলকে অভিনন্দন ও প্রীতি জানাবার জন্য একের পর এক দল যারা সারা দিনমান ও অর্ধেক রাত পর্যন্ত বারম্বার এগিয়ে আসছে, কেউ তারা আমাদের নাম-ধাম কখনও শোনেনি,—কিন্তু তাদের কাছে ভারতবর্ষ, চীন, সিংহল, বর্মা, শিয়াম, ভিয়েটমিন, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, জাপান—এই নামগুলিই যথেষ্ট। ব্যক্তি অপেক্ষা দেশের মূল্যই বেশি! আমরা হিন্দু কি মুসলমান, খৃষ্টান কিংবা য়িহুদী,—এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। তবু বলব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট সম্মান, সম্ভ্রম, এবং শ্রদ্ধাবোধ প্রত্যেক জাতি ও প্রতিনিধিদের মুখে চোখে প্রতিফলিত। মনে মনে ভাবছিলুম, আমরা যেন এই শ্রদ্ধার যোগ্য হতে পারি!

একে একে এবং দলে দলে এসে পড়ছেন অগণিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এবং সম্পাদকেরা, সংখ্যাতীত ক্যামেরাম্যান এবং রিপোর্টার। ছোট ছোট দল যেখানে যেভাবে পাকিয়ে উঠেছে, সেখানেই এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন সাংবাদিকরা এবং ক্যামেরাম্যানরা। সোভিয়েট ইউনিয়নের পনেরোটি 'স্বাধীন' রিপাবলিক এবং তৎসহ 'আউটার মঙ্গোলিয়ার' বহু লোক এসে পৌঁছেছেন। সাহিত্যকর্মীদের তরফ থেকে এসেছেন কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, অধ্যাপক, দার্শনিক, এবং সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাডেমির বহু কর্মী। তাসকন্দ হোটেলের এই আন্তর্জাতিক অগণিত নরনারীর সমাবেশের ফলে নীচের তলাকার লবীতে বসে গেছে পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, পাসপোর্ট অফিস, ফরেন এক্সচেঞ্জ, অভ্যর্থনা অফিস, পুলিশ বিভাগ, সাংবাদিক কেন্দ্র, বইয়ের এবং মনোহারীর দোকান,—এমন কি মেয়েদের জন্য গহনার দোকানটিও বাদ যায়নি। পুঁথি ও ঝুটো মুক্তোর মালা, ঝুটো সোনার আংটি, পাকাচুলো ঘাড়কাঁপা বুড়ো ও বানরের পুতুল, নানাবিধ ফ্ল্যাগওয়ালা সেফ্টিপিনের আংগট, চকচকে স্পুটনিকের ছোট ছোট মডেল, কাঠের ও প্লাস্টিকের ও প্লাসটার-অফ-প্যারিসের নানাবিধ পুতুল, বিবিধ প্রকার প্রসাধন সামগ্রী। কিন্তু সবগুলির মধ্যে এমন কোনও সামগ্রী বিশেষ চোখে পড়ল না যেটির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও বৈশিষ্ট্য আছে! মাথার তেল এবং গ্লিসারিন আমার প্রয়োজন ছিল, তা পাইনি। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা ক'রেও দেখেছি, এবং খোঁজ নিয়েও জেনেছি—সাবান, দাঁতমাজন, দাঁতের বুরুশ, কোল্ড ক্রীম, স্নো, পাউডার, পমেড, এসেন্স ইত্যাদি সামগ্রীগুলি খেলো ধরনের, এগুলির কোনটাই ব্যবহার করতে ইচ্ছা যায় না। ওদের দেশের কোনও প্রসাধন সামগ্রী তথা কসমেটিক এখনও ভারতবর্ষের পর্যায়ে এসে পৌঁছয়নি। তারাশঙ্কর আমার মাথার তেল এবং গ্লিসারিন্ যোগাচ্ছিলেন। গ্লিসারিন্ কতকটা গায়ে না মাখলে শুকনো হাওয়ায় অস্বস্তি লাগে। ওরা অনেক কিছু দেয়, কিন্তু তেল দেয় না।

রাত দশটায় লানা এবং নিকা বিদায় নেবার পর বিশেষ দুঃসাহস সহকারে আমরা দুজন নীচের তলাকার হোটেলে গিয়ে ঢুকলুম। বৃহৎ ভোজনের আসর। ভিতরটা লম্বায় বোধকরি দেড়শ ফুট এবং চওড়ায় পঁচাত্তর। ভোজনের আসর মানে শুধু ভোজন নয়। একটি টেবলের চারদিকে নানান দেশের মেয়ে পুরুষ,—তাদেরই মাঝখানে ফোড়নের মতো একজন-দুজন-চারজন দোভাষী অথবা দোভাষিণী। আমাদের চোখে পড়ছে, দোভাষীদের মধ্যে স্থানীয় উজবেক নরনারী একেবারেই কম। হয় ওরা দোভাষীর কাজ এখনও ভাল ক'রে শেখেনি, কিংবা সম্প্রদায় হিসাবে ইংরেজি-ফরাসী-জর্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় এখনও তেমন কিছু ব্যুৎপত্তিলাভ করেনি, আর নয়ত এর মধ্যে রাজনীতিক কারণ কিছু বর্তমান। বন্ধুবর শ্রীধরণীর বিশ্বাস, পাছে আমরা মধ্য এশিয়ার জাতিগুলির উপর রুশ প্রভুত্বের বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কিছু সংগ্রহ করি, সেই কারণে রুশ দোভাষী ভিন্ন অপর কারোকে আমাদের কাজে দেওয়া হয়নি। বাঙ্গালী যেটুকু ফরাসী জানে, উজবেকরা অতটুকু ইংরেজিও জানে কিনা সন্দেহ। রুশভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষার সংবাদপত্র অথবা সাময়িক পত্রাদি তাসকন্দে আমার চোখে পড়েনি। সম্মেলনের অধিবেশন কালে নিউজ বুলেটিনগুলি, যেগুলি সম্মেলন-সম্পর্কীয়, সেগুলি মোট ছয়টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল,—ইংরেজি, ফরাসী, জর্মান, রুশ, চাইনীজ এবং আরেকটি কি যেন। উজবেকদের নিজস্ব লিপি আরবিতে একটিও ছাপা হয়নি। ইংরেজি ভাষায় সাপ্তাহিক 'মস্কো নিউজ' শুধু দেখতে পেতুম। প্যারিস এবং লণ্ডনের দুখানি কমিউনিস্ট পত্রিকা, "লা হিউম্যানাইট" এবং "ডেইলি ওয়ার্কার"—এ দুটি কাগজ তাসকন্দ হোটেলে দেখতে পেতুম কিনা, এটি এখন আর আমার মনে পড়ে না। সম্ভবত দেখেছি।

চেনা মুখ দেখে আমরা টেবল বেছে নিই। নতুন কেউ ভোজনের আসরে

ঢুকলে প্রায় সবাই আপন আপন টেবল থেকে মুখ তুলে তাকায়। সবাই অল্প-স্বল্প কানাকানি ক'রে বুঝতে চায়, এ ব্যক্তি কোন্ দেশের। পোশাক অল্পবিস্তর প্রায় সকলেরই এক। বুক খোলা কোট, নেক্‌টাই, প্যাণ্ট। আমরা দুজন দিল্লীর দরবারি পোশাক নিয়েছি। তারাশঙ্করের মাথায় খদ্দরের টুপি, গায়ে লংকোট, পরনে প্যাণ্ট, পায়ে কালো মোজা এবং কাবুলি-ঘণ্টির চপ্পল। মোজা জুতো বাদ দিলে তাঁর আপাদমস্তক সাদা পোশাক। তিনি বলেন সাদা তাঁর প্রিয়। সাদা মানে শ্বেতপতাকা, সাদা পায়রা, শান্তির প্রতীক্। সাদাসিধে।

হোটেলের মধ্যে তরমুজ এবং খরমুজার ছড়াছড়ি। তরমুজ, আঙুর, আপেল, পীচ, পিয়ার,—এগুলি উজবেকিস্তানের বৈশিষ্ট্য। মাংসের নানাবিধ প্রকরণ। শূকর নেই,—গরু, ভেড়া এবং মোরগের অতি প্রাধান্য। মাছ আছে বটে, তবে ক্ষুদ্র এবং কাহিল। এছাড়া সেই লাল-কালো মাছের ডিম,—ক্যাভিয়ার,—প্রথম চোটে তার বোট্‌কা আঁসটে গন্ধ নাকটাকে পীড়িত করে। তারপরে ধীরে-ধীরে দিনে-দিনে সেটা প্রিয় হয়ে ওঠে, যেমন অনেকের কাছে কমিউনিজম, যেমন অবশেষে একদিন না পেলে কা'রো কা'রো মন খুঁতখুঁত করে! মদের মধ্যে 'ভোদ্‌কা'—ইংরেজি উচ্চারণ 'ভড্‌কা',—দেখতে পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ জল, অতি নিরীহ,—গলার মধ্যে গেলে নাকি নাভিকুণ্ডলী অবধি হঠাৎ একবার জ্বলে ওঠে। ওটাও যেন রুশীয় কমিউনিজমের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে! এছাড়া সেই 'কোনিয়াক্' হুইস্কি—সোনার মতো রং, চড়া সুর—এটিও রুশীয়। মেয়েলি মদ,—আঙুরের থেকে তৈরি, রক্তের মতো রাঙ্গা, লিপস্টিকও হার মেনে যায়! প্রকাশ্যে কেউ জল খায় না, ওটা নাকি প্রিমিটিভ,—তাই পাতের পাশে বোতল খুলে দেওয়া হয় চোঁয়াটে 'মিনারল ওয়াটার',—দুর্বল সোডা ওয়াটারের মতো। আমাদের কাছে সরু-সরু টিকিটের বই দেওয়া হয়েছে। তার থেকে একটুকরো ছিঁড়ে নেন হোটেলের গৃহিণী প্রতি বেলায় ভোজনের আসরে। এ টিকিট সঙ্গে থাকা চাই, না থাকলে মুখ কাটুমাছু,—পয়ের পালায় দিয়ে দেওয়াটাই বিধি! প্রথম দু'চারদিন মদের বিতরণ অবাধ ছিল, যত পার খাও!—তারপর দেখা গেল, টিকিট বই থেকে একখানা উপরন্তু টিকিট বেশি দিয়ে দিলে বিশেষ একটু পরিমাণ এবং বিশেষ একটি প্রকার মদ পাওয়া যায়। ওটার তাৎপর্য এই, একবেলা আহার করার পরিবর্তে একপাত্র মদ খেতে পাবে বৈকি! খাওয়াটা সারাদিনে তিনবার। অনেকে ওটাকে দুইবারে পরিণত ক'রে সন্ধ্যার ভোজনে মদ নিতে লাগল। টিকিট যাদের আছে দ্রুত ফুরিয়ে এল, তাদেরকে টাকা অর্থাৎ রুবল খরচ করতে হল! অনেকে ইতিমধ্যেই হয় রুবল সংগ্রহ অথবা উপার্জন করেছিলেন, আর অন্যত্র আপন আপন দেশীয় মুদ্রা এখানে এসে রুবলে পরিণত ক'রে নিয়েছিলেন।

আমাদের উভয়ের কাছে ১৯৫৮ সালের ভারতীয় বিধি অনুযায়ী এক একজনের ২৭০্ টাকা ছিল। এখানে টুরিস্টদের জন্য বর্তমানে কন্‌সেসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই কারণে ভারতের প্রতি দশ টাকায় মোট ২০ রুবল ও ৭৭ কোপেক হিসাবে বিনিময় দেওয়া হচ্ছিল। তারাশঙ্কর এই হোটেলে এসে প্রথম সন্ধ্যাতেই এক থোকে ১২০০ শত রুবল রোজগার করলেন, অর্থাৎ তাঁর একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ ইংরেজিতে রূপান্তরিত হয়ে সম্প্রতি সোভিয়েট 'ফরেন্ লিটারেচার ম্যাগাজিনে' ছাপা হয়েছে। এটি তারই পারিশ্রমিক। এ কাগজটি যিনি সম্পাদনা করেন, তিনি হলেন মিঃ চেকভস্কি,—এখানে তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপও চলছে। একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা যখন উক্ত ১২০০ শত রুবল থেকে ইনকম্ ট্যাক্স কেটে নিয়ে প্রায় ১১৪২ রুবল তারাশঙ্করের হাতে দিয়ে রসিদ সই করিয়ে চলে গেলেন, তারাশঙ্কর সানন্দ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, একটি প্রবন্ধের জন্য জীবনেও এত টাকা কখনও যে পাইনি হে! এ যে অবিশ্বাস্য! একটা ভাল ক্যামেরা কিনে নিয়ে যেতে হবে, বুঝলে? এ টাকা ত' আর দেশে নিয়ে যাওয়া যাবে না,—সেখানে ত' ছেঁড়া কাগজ! না না, ভেব না কিছু,—তোমাকেও কিছু দেব!

তারাশঙ্কর আমাকে ১৭৫ রুবল দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দিল্লী ফেরার ঠিক আগে—যখন তাঁর খরচের কথা আর কিছু রইল না। তাই সই!

এখানে উল্লেখযোগ্য এই, পরবর্তীকালে সোভিয়েট ইউনিয়নে থাকাকালীন আমি প্রায় ১৭,০০০ হাজার রুবল উপার্জন করেছিলুম। সেটা কি-কি প্রকারে ঘটল, সে-আলোচনা পরে করব। সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থের সচ্ছলতা প্রচুর, এবং উপার্জন অতি সহজসাধ্য। আমাদের ভারতীয় টাকার সঙ্গে রুবল বিনিময়ের সরকারি ব্যবস্থা হল, প্রতি পনেরো রুবলের বিনিময়ে ভারতীয় আঠারো টাকা হয়। এটি যেন অনেক ভারতীয়ের পক্ষে একটু ক্ষোভের কারণ!

—(ক্রমশঃ)

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(তিন)

সম্ভবতঃ ওয়াজেদ আলি শা'র মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে সুবিখ্যাত সুরবাহার-সেতারবাদক সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ মেটিয়াবুরুজ দরবারের প্রধান যন্ত্র-সংগীতকাররূপে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তাঁর বয়স প্রৌঢ় দশায় উপনীত হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তাঁর পিতা গোলাম মহম্মদ খাঁ তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় বীন্‌কার ওমরাও খাঁর শিষ্য ছিলেন। ইনি বীণার ঢঙে সুরবাহার বাজাতেন ও সেতারে তাঁর বাজনা রেজাখানি পদ্ধতির অনুসরণ করে। সাজ্জাদ মহম্মদ তাঁর পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং তাঁর পিতার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে সুরবাহারের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌রূপে পরিণত হন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও বহু সেতারের গৎ রচনা করেছেন। বর্তমান সময়ে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেব ও মাননীয় ডঃ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল গতের ভাণ্ডারের খানিকটা রক্ষা করতে পেরেছেন। সাজ্জাদ মহম্মদের অন্য নাম ছিল সৈয়দ মহম্মদ। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই বাল্যকালে তাঁকে দেখেছেন।

তবে সাজ্জাদ মহম্মদের হাতে গড়া শিষ্য এখন কেউই বেঁচে নেই। প্রাচীন গুণীগণের নিকট শুনেছি যে, তাঁর সুরবাহারের আকার ইম্‌দাদ্‌ খাঁর সুরবাহার অপেক্ষা কিছু ছোট ছিল। তাঁর তারগুলিও অপেক্ষাকৃত শিথিলরূপে বাঁধা হতো। কেননা তিনি মীড়্‌, গমক ও ঝালার সঙ্গে সঙ্গে সুরবাহারে বোল্‌ ও তারপড়ন-এর কাজও যথেষ্ট দেখাতেন। তার শক্তভাবে বাঁধা থাকলে মীড়ের পরিধি কমে যায়। পক্ষান্তরে সুরবাহার যন্ত্রের আকার বৃহৎ হলে বোল, লড়ি ও পড়নের ব্যবহারে ব্যাঘাত জন্মে। পরবর্তী সুরবাহারীগণ একই যন্ত্রে এতগুলি অঙ্গ প্রদর্শনে সমর্থ হতেন না। কিন্তু সাজ্জাদ মহম্মদ বীণা যন্ত্রের দ্বাদশ অঙ্গের কোনটি বাদ দেননি। সেতারের গৎকারীতেও মীড়্‌, আঁশ, কৃন্তন, ছুট্‌, গমক, জমজমা, জোড়্‌, ঝালা ও বোলের কাজ তিনি যতটা প্রকাশ করতে পেরেছেন, সেতারের রেজাখানি গতে কখনও কেউ তা পারেননি। পরবর্তী গুণীগণ তাঁর বাজনার কিছু অংশ নিয়ে গুণীসমাজে কৃতিত্ব ও নাম অর্জন করেছেন। ওয়াজেদ আলি শা'র মৃত্যুর পর ইনি ও দৌলত্‌ খাঁ ধ্রুপদী নেপাল রাজ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে কলিকাতা ত্যাগের মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর সংগীত সভায় মেটিয়াবুরুজের সকল গুণীগণেরই বৃত্তি ধার্য করে তাঁদের অনেকেরই কলিকাতায় অবস্থান সম্ভবপর করে তোলেন। সাজ্জাদ মহম্মদও তাই কলিকাতায় থেকে যান। এঁর একমাত্র পুত্র আব্বাস মহম্মদের অকাল মৃত্যুতে ইনি শোকে-তাপে বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে যান।

তবে ঠাকুর-দরবারে তাঁর যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। এবং এঁর বাজনার শক্তিও ছিল অব্যাহত। এঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন মহম্মদ খাঁ। মহম্মদ খাঁ সাজ্জাদ মহম্মদের কোন পরিচারকের পুত্র ছিলেন। কিন্তু সেবার গুণে তিনি সাজ্জাদ মহম্মদের হৃদয় অধিকার করে তাঁর পুত্র-স্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন। পুত্রের সকল শিক্ষাই মহম্মদ খাঁ লাভ করেন। মহম্মদ খাঁর পর বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত ধ্রুপদী ও সেতারী স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর-দরবারে এসে সাজ্জাদ মহম্মদের নিকট বহু বর্ষ ধরে সুরবাহার ও সেতার শিক্ষা করেন। স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন ডঃ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অগ্রজ এবং একাধারে কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতে তিনি অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করে গেছেন। ইনি বহু সংগীত-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সাজ্জাদ মহম্মদ যখন যতীন্দ্রমোহনের দরবারে প্রবেশ লাভ করেন, তখন রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) বাংলার সংগীত আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী চিরদিনই তাঁর সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত ছিলেন। ক্ষেত্রমোহনই ঠাকুর দরবারে রামপ্রসন্নের সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। রাজা সৌরিন্দ্রমোহন প্রথম বয়সে ক্ষেত্রমোহনের নিকট সেতার শিক্ষালাভের পর আলি মহম্মদ খাঁ রবাবী ও পরে সাজ্জাদ মহম্মদের নিকট শিক্ষার ফলে সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অনেকেরই এই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, বিখ্যাত ইম্‌দাদ্‌ খাঁ সেতারী সাজ্জাদ মহম্মদের শিষ্য ছিলেন।

এ ধারণার মূলে কোন সত্যই নাই। সাজ্জাদ মহম্মদ নিজ পরিজন, প্রতিপালক, রাজা কিংবা অপেশাদার বিদ্যার্থীদিগকেই বিদ্যাদান করতেন। রামপ্রসন্নকে পেশাদার বলা চ'লতো না। কেননা বিষ্ণুপুরের সকল সংগীত-গুণীগণই কুলগুরু পুরোহিতগণের বংশসম্ভূত। প্রকৃত তথ্য এই যে, ইম্‌দাদ্‌ খাঁ প্রথম যৌবনে যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন তিনি কাওয়ালী পদ্ধতিতে সেতার বাজাতেন এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের অনুগ্রহে মাঝে-মাঝে গোপনে অন্ধ-বৃদ্ধ সাজ্জাদ মহম্মদের অজ্ঞাতসারে তাঁর বাজনা শোনবার সুযোগ পেতেন। এই ভাবেই তিনি সাজ্জাদ মহম্মদের সুরবাহারের মীড়্‌, *গমক ও ঝালার কাজ ও সেতারের রেজাখানি বাজ কিছু কিছু শুনে আয়ত্ত ক'রতে পেরেছিলেন। তবে সাজ্জাদ মহম্মদ ও ইম্‌দাদের বাদ্য পদ্ধতির ধারা বিভিন্ন ছিল। সাজ্জাদ মহম্মদের বাজ* মহম্মদ খাঁ, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের হাতেই শুধু দেখা যেত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সাজ্জাদ মহম্মদ যখন ঠাকুর মহারাজার দরবারে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন এবং তানসেনের পুত্র-বংশীয় রবাবী কাসেম আলি খাঁ কলিকাতা ত্যাগের পর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন দরবার অলঙ্কৃত ক'রছিলেন, ঐ সময় তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় ও কাসেম আলির ভাগিনেয় স্বনামধন্য বীন্‌কার মহম্মদ উজীর খাঁ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে রামপুর ত্যাগ করে কলিকাতা নগরীতে পদার্পণ করেন। এঁর তখন পূর্ণ যৌবনকাল ও একাধারে ইনি বীণা ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে অলোকসামান্য সংগীতপ্রতিভা বিকাশে সংগীত-গুণীসমাজকে অভিভূত করে ফেলেছিলেন। যাঁরাই তাঁর বাজনা

শুনেছেন, তাঁরাই বলেছেন যে, তাঁর তুল্য শ্রুতিমধুর যন্ত্র-সঙ্গীতবাদন কখনও তাঁরা শোনেননি। যদুভট্টের কণ্ঠসঙ্গীত যেরূপ অসাধারণ স্বর-লালিত্যে পূর্ণ ছিল, উজীর খাঁর যন্ত্র-সঙ্গীতও সেইরূপ ছিল। স্বরমাধুর্যে তাঁর তুলনা ছিল না, যদিও তাঁর তুল্য বিদ্যান কলাবিদ্ তখনকার দিনে ভারতে আরও কয়েকজন অন্ততঃ জীবিত ছিলেন। কেননা তানসেনের বংশধর কয়েকজন গায়ক-বাদক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতভূমির সঙ্গীতের শোভাবর্ধন করে গেছেন। মদীয় পিতৃদেব যখন যন্ত্রসঙ্গীতের আকর্ষণ অনুভব ক'রতে লাগলেন, তখন প্রায়ই আফ্‌সোস করে বলতেন যে, তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনে বঙ্গদেশে কাসেম আলি, সাজ্জাদ মহম্মদ ও উজীর খাঁ'র অবস্থিতি সত্ত্বেও এ'দের বাজনা শোনবার প্রবৃত্তি তাঁর জাগেনি—সেই কারণেই ভারতের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র-সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য হতে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। উজীর খাঁ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি মেটিয়া-বুরুজ ও ঠাকুর-দরবারে বৃত্তিভুক্ত কলাকার হতে রাজী হননি।

ইনি কলিকাতায় চাঁদনীচকে একটি বাড়ীতে অবস্থান ক'রতেন, সে বাড়ীর মালিকের নাম মুন্সিজী। কোথাও বাঁধাবাঁধিভাবে চাকরি না করলেও সম্মানের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হলে কলিকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন রাজসভা ও জমিদারদের বাড়ীতে তিনি যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এইভাবে মেটিয়াবুরুজ ও ঠাকুর দরবারে তাঁর বাজনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুরুবংশজাত বলে বৃদ্ধ সাজ্জাদ মহম্মদ উজীর খাঁর সঙ্গে বিশেষ স্নেহ-সম্বন্ধ রক্ষা করে চলতেন। সে যুগে উজীর খাঁ কলিকাতায় কয়েকজন উপযুক্ত শিষ্য গঠন করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে মেদিনীপুরে পঞ্চেৎগড়ের জমিদার যাদবেন্দ্র মহাপাত্র সুরবাহার যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। উজীর খাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন ভবানীপুরের রুদ্রবীণবাদক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপপত্তি ও ক্রীয়াঙ্গে প্রমথবাবুর নাম বাংলার সঙ্গীতইতিহাসে চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে। উনি উজীর খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ও উজীর খাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত কলিকাতায় ও রামপুরে উজীর খাঁর সাহচর্য করে গেছেন। কলিকাতায় উজীর খাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে বাবুরাম সহায় মিত্র সেতারী, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। উজীর খাঁর শৌখীন শিষ্যদের মধ্যে কলিকাতায় হেদুয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশীয় তারাপ্রসাদবাবু, পানিহাটির জমিদার অর্ধেন্দুবাবু ও স্টার থিয়েটারের ঐক্যতান বিভাগের অধ্যক্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত হাবু দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উজীর খাঁ ঐ সময়ে আট বৎসরকাল কলিকাতায় বস-

বাস করেছিলেন। ভারত-গৌরব পূর্ব-বংগবাসী ওস্তাদ আলাউদ্দিনের সঙ্গে তখনও উজীর খাঁর দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি। উজীর খাঁ সকল জলসাতেই তাঁর মাতুলালয়ের শিক্ষা অনুযায়ী সুর-শৃঙ্গার ও রবাব যন্ত্র বাজাতেন। শুধু নিজভবনে তাঁর পিতৃকুলের যন্ত্র বীণার চর্চা রক্ষা করতেন। তাঁর বাজনা কলিকাতাতেই খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে উঠেছিল এবং কলিকাতাকে কেন্দ্র করেই তিনি মাঝে মাঝে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজদরবারে নিমন্ত্রিত হয়ে বাজাতে যেতেন।

আট বৎসর কলিকাতা বাসের পর ১৮৯৮ সালে উজীর খাঁ রামপুরের নূতন নবাবের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রামপুরে ফিরে যান। তিনি রামপুর যাত্রাকালে যখন হাওড়া স্টেশনে উপনীত হন, তখন শতাধিক কলাবিদ ও অভিজাত ধনীগণ ও সহস্রাধিক গুণ-মুগ্ধ কলিকাতাবাসী তাঁর বিদায় অভিনন্দনের জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রমথবাবুই এঁদের অগ্র-স্থানীয় ছিলেন। উজীর খাঁর কলিকাতা ত্যাগের কিছু পরেই সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁরও দেহান্তর ঘটে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলিকাতায় কাসেম আলি খাঁ, সাজ্জাদ মহম্মদ ও উজীর খাঁর অবস্থিতির ফলে কলিকাতা হতে শুরু করে সারা বাংলাদেশে যন্ত্র সঙ্গীতের উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। সে যুগ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে যন্ত্রসংগীত ও তন্ত্রকারদিগের সমাদর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক মাত্রায়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ-শতাব্দীর গোড়ায় সাজ্জাদ মহম্মদের শিষ্য মহম্মদ খাঁ ও ইমদাদ খাঁ সুর-বাহার ও সেতারে কলিকাতায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তবে মহম্মদ খাঁর বাজনা ছিল ধ্রুপদ ও বীণার অঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইমদাদ খাঁ-ই সর্বপ্রথম খেয়াল ও সারেঙ্গীর অঙ্গে সুরবাহার যন্ত্রালাপের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর সেতারের বাজনায় জয়পুরের মসিদখানি বাজ ও সারেঙ্গীর তানের সমন্বয় দেখা যায়। আমরা যে পদ্ধতিকে ইমদাদখানি পদ্ধতি বলে থাকি, তা হচ্ছে বিভিন্ন সংগীত পদ্ধতির সুকৌশল ও সুন্দর সমন্বয়। ইমদাদ খাঁ যুক্তপ্রদেশের এটোয়া শহরে জন্ম-গ্রহণ করেন। বহুদিন পর্যন্ত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবার অলংকৃত করেন। তিনি শ্রুতিধর পুরুষ ছিলেন ও বিভিন্ন ওস্তাদদিগের কণ্ঠসংগীত শ্রবণের ফলে সে সকল সংগীতের মিশ্রণে নিজস্ব একটি পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। কলিকাতার সংগীত সমাজের সহিতও ইনি যুক্ত ছিলেন এবং কলিকাতা শহরকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন শহরে ইনি সংগীত পরি-বেশনার্থ গমনাগমন করতেন। মহম্মদ খাঁ কিন্তু বীণকার ঘরের বনিয়াদী শিষ্য ছিলেন। এঁর বাজনা এত শ্রুতিমধুর ছিল যে, ইনি যখন সুরবাহারে মীড়সহ ঝংকার দিতেন তখন গৃহপালিত বিহঙ্গ সকল এক সঙ্গে তান ধরতো। ইনি গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত জমিদার জ্ঞানদা-প্রসন্নবাবুকে (মনুবাবু) অতি উত্তমরূপে সুরবাহার শিক্ষা দিয়েছিলন। রাণাঘাটের বামাচরণ ভট্টাচার্যও তাঁর অপর কৃতী শিষ্য। এঁর গুণাপনা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। মদীয় পিতাঠাকুরের মাতুল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, আমার দাদামশাই আমার বাল্যকালে মহম্মদ খাঁর গল্প বলতেন। চক্রবর্তী-মহাশয় সেতারের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি মহম্মদ খাঁর কাছে যখন সেতার শিখতে যান তখন খাঁ সাহেবের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল তা এখানে উদ্ধৃত করছি।

দাদামশাই—খাঁ সাহেব। আপনার বহু নাম শুনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনি কি আমাকে সেতার শেখাবেন?

খাঁ সাহেব—বাবুজী! আমি শরিফ লোকেদের শেখাতে কুণ্ঠিত নই। আপনি জমিদার ও শৌখীন, আপনাকে নিশ্চয়ই শেখাবো। আপনি সেতারে কোন রাগ শিখতে চান?

দাদামশাই—ভৈরবী রাগিণীটি আমার অতিপ্রিয়। আমি আপনার কাছে সেতারে ভৈরবী শিখতে চাই।

খাঁ সাহেব—বাবুজী ভৈরবী তো বহু রকমের আছে। আপনি কোন ভৈরবী শিখতে চান?

দাদামশাই—ভৈরবী আবার কত প্রকার হতে পারে? ভৈরবী নামে তো একটি রাগিণীই আমরা জানি।

খাঁ সাহেব—ভৈরবী চার প্রকারের আছে। আপনি কোন ভৈরবী শিখতে চান?

দাদামশাই—চার প্রকারের ভৈরবী, সে আবার কি কথা?

খাঁ সাহেব—হ্যাঁ, চার প্রকার ভৈরবী আছে। একটি হলো সাত দিনে শেখবার ভৈরবী। দ্বিতীয়টি এক মাসের ভৈরবী, তৃতীয়টি এক বছরের ভৈরবী আর চতুর্থটি সারা জীবনের ভৈরবী। আপনি কতদিন আমার কাছে শিখবেন, সেই বুঝে আমি শেখাবো।

দাদামশাই—খাঁ সাহেব। আপনি আমাকে নতুন কথা শোনালেন। তবে আমি তো ঢাকায় বাস করি, মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসি। এবারে মাস-খানেক এখানে থাকবো। তাই এক মাসের ভৈরবী শেখান।

মহম্মদ খাঁর জ্ঞানের পরিধি এই কথোপকথন থেকেই বুঝা যাবে। উজীর খাঁর কলিকাতা ত্যাগের পর আট-দশ বৎসরকাল মহম্মদ খাঁ কলিকাতার শ্রেষ্ঠ যন্ত্রীরূপে পরিচিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বর্তমানে একজনও জীবিত নেই। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কলিকাতায় হেদুয়ার সুবিখ্যাত ঘোষ পরিবারের স্বর্গীয় তারাপ্রসাদ ঘোষ। ইনি কলিকাতার অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যায় ও ক্রীয়াঙ্গে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে গেছেন। তিনি কৈশোর বয়সে কাশীধামে আলি মহম্মদ খাঁর নিকট কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষালাভ করেছিলেন। যৌবনকালে দৌলত খাঁর নিকটে ধ্রুপদ ও মহম্মদ খাঁর নিকট সেতারের অনেক দুর্লভ বিদ্যা ইনি সংগ্রহ করেন। এঁর সঙ্গে যোগাযোগের সৌভাগ্যলাভ আমার এক সময় ঘটেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে যে সব বিকাশ-সাধিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস তাঁর কাছ থেকেই আমি পেয়েছি।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন বোনের মধ্যে মেজদিই সব চেয়ে দেখতে ভাল। মা প্রায়ই বলতেন, 'বিমুলিটাকে নিয়ে আমার ভাবনা নেই। যে দেখবে লুফে নিয়ে যাবে।' অবশ্য লুফে ঠিক নেয়নি, বেশ কিছু দিয়েই গছাতে হয়েছিল। যাই হোক, বিমলা জানত এবং আশেপাশে সকলকে জানিয়ে দিত যে, তার রূপ আছে। বিয়ের পর রূপের সঙ্গে এল রূপো। তখন গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না। নির্মলাকে সে ভালবাসত। তার মধ্যে অনেকখানি ছিল করুণা, খানিকটা ছিল তাচ্ছিল্য। ছোট বোনের বিয়েটা যে আশানুরূপ হয়নি বড়দির মনে সে জন্য হয়তো কিছু ক্ষোভ ছিল, কিন্তু বাইরে সেটা কখনো প্রকাশ করত না। কথায়-বার্তায় আচরণে দেখাবার চেষ্টা করত, তাদের তুলনায় অনেক দিক দিয়ে নিরু বরং ভাল ঘরেই পড়েছে। ছোট্ট সংসার, একগাদা পুষ্যি নেই, বলতে গেলে দুটি মানুষ। শাশুড়ী আর ক'দিন? তবু যদ্দিন আছে, মাথার উপরে কত বড় একটা আশ্রয়! বুড়ী বড় ভালোমানুষ, একেবারে বৌ-অন্তপ্রাণ। এই বয়সেও সংসারের সব ঝক্কি-ঝামেলা নিজের ঘাড়ে। নতুন বৌকে নড়ে বসতে দেয় না।

নির্মলার শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গ উঠলে অমলা এই দিকটার উপরেই জোর দিত। বিমলা ঠিক উলটো। নিরু মনোমত ঘরে পড়েনি—এই অপ্রিয় সত্যটা চেপে রাখবার দিকে তার কোনো-রকম ইচ্ছা ছিল না। এ বিষয়ে তার মনের যে ক্ষোভ, সেটা সে সকলের সামনেই প্রকাশ করত। নির্মলা কী ভাববে, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না।

বিয়ে এবং তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মিটে যাবার পর নির্মলা ক'দিনের জন্যে মায়ের কাছে এসেছে। দিদিরা তখনো আছে। ভিতরের বারান্দায় গল্পের আসর বসেছে। একথা ওকথার পর কোন একটা প্রসঙ্গে অমলা বলল, চালের দাম যে রকম বাড়ছে, কিছুদিন পরে আমাদের বোধহয় উপোস করে মরতে হবে। সেদিকে নিরু একেবারে নির্ভাবনা। উঠোনে ধানের গোলা, ঘরের পাশে ঢেঁকি। ইচ্ছেমত পাড়ো, ভানো, খাও।

—কী দরকার বাপু অত সব হ্যাঙ্গামা করে? তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বিমলা, তার চেয়ে মুদীর দোকানে বলে পাঠাও, সঙ্গে সঙ্গে পছন্দমত মাল হাজির।

—তার সঙ্গে চড়া দামের বিল।

—হলই বা? টাকা থাকলে দামের ভাবনা কিসের? চড়ুক না কত চড়বে?

—তোর না হয় ভাবনা নেই, সবাই তো আর তোর মত বড়লোক নয়। আমাদের বাপু একটা টাকা বাড়লেই গায়ে লাগে।

দিদির মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা শ্লেষ থাকলেও বিমলা মনে মনে খুশী হল। 'বড়লোক' কথাটা তার সম্বন্ধে যে যেমন করেই বলুক সে খুব উপভোগ করে।

পাড়ার দু' একটি মেয়েও ছিল দলের মধ্যে। তার ভিতর থেকে একজন, তার শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়, বলে উঠল, দাম দিয়েও কি ভাল চাল পাবার উপায় আছে আজকাল? হয় একগাদা কাঁকর, নয়তো গন্ধ। কোনো কোনোটা আবার—

—সে সব ঐ র‍্যাশনের চাল, বাধা দিয়ে বলল বিমলা। না নিলেই হয়। দু'চারটাকা বেশী দিলে ব্ল্যাকে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়। আমরা তো তাই কিনি। কে বসে বসে কাঁকর বাছে, বাবা? তাছাড়া, আমি আবার খুব মিহি চাল না হলে একেবারেই খেতে পারি না। ও-ও তাই। ভাতটা একটু গায়ে ভারী হলেই বলবে, ভাত না খেয়ে গাবের বিচি খেলেই তো হয়।—বলে খিল খিল করে হেসে উঠল। সে হাসিতে বিশেষ কেউ যোগ দিল না।

একটি বর্ষীয়সী মহিলা বসে ছিলেন কোণের দিকে। বললেন, তা যাই বল মা, নিজের ঘরের জিনিস গাবের বীচি হলেও 'অমৃত'। তার কাছে কি আর কিছু দাঁড়াতে পারে? কথায় বলে ধানই হল ধন। গোলাভরা ধান যার ঘরে, তার আর কী চাই? লক্ষ্মী সেখানে বাঁধা।

বিমলা মুরুব্বিয়ানা সুরে প্রতিবাদ করল, সেদিন আর নেই মাসিমা। এক-গাদা ধান থাকলেই আজকের সমাজে মান নেই, তাকে কেউ আমল দেয় না। সবাই জানতে চায়, মানুষটা করে কী? রোজগার কত?

নিজের শ্বশুরবাড়ির কথা উঠতেই নির্মলা সেখান থেকে উঠে গিয়েছিল। তার সেই শূন্য স্থানটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিমলা ঈষৎ চাপা গলায় যোগ করল, এই আমাদের নিরুর কথাই ধরুন। যে-ঘরে গেল, দুবেলা দুমুঠো খাবার হয়তো জুটবে। কিন্তু যার হাতে পড়ল, তার পরিচয়টা কী? লোকে যখন জিজ্ঞেস করে, কী করেন তোমার ভগ্নীপতি, আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যায়। চাষবাস করে, একথা বলি কেমন করে?

—শুধু চাষবাস কেন, তার সঙ্গে একটা চাকরিও তো করে, উত্তর দিল অমলা।

—চাকরি! মানে, ঐ পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাস্টারি!—বলে অট্টহাসির মত

তুলল বিমলা। হঠাৎ থেমে গিয়ে করুণ সুরে অনেকটা যেন নিজের মনে বলল, সত্যি, নিরুর জন্যে ভারী দুঃখ হয়। পেটভরে দুটো খেতে পেলেই মেয়েমানুষের সব হল? আর কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই? দুদিনের জন্যে একটু কোথাও যাওয়া, দুখানা ভালো কাপড়, দুটো গয়না—এ সব না হলে চলে? কিন্তু আসবে কোত্থেকে? সব চেয়ে বড় কথা—কার বৌ বলে নিজের পরিচয় দেবো।

পাশের ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সব কথাই নির্মলার কানে গিয়েছিল। শুধু কানে যাওয়া নয়, মনের সংগেও একসুরে মিলে গিয়েছিল। ঠিকই বলেছে মেজদি। অন্য সকলে তাকে শুধু ঠকিয়েছে, মিথ্যা প্রবোধ আর আশার স্তোক দিয়ে ভোলাতে চেয়েছে। মেজদি তাকে সত্যিই ভালোবাসে। তাই রূঢ় সত্যের নিরাবরণ রূপ ছোট বোনের সামনে তুলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নির্মলার চোখে ঘুম আসেনি। কী করবে সে? ঐ মাটির দেওয়ালে ঘেরা খড়ো ঘরের মধ্যে ঢেঁকি, কুলো আর হাতা-বেড়ি নিয়েই কাটাবে তার সারা জীবন! একটু সাজ একটু প্রসাধন, কোলকাতায় গিয়ে গাড়ি করে একটু বেড়ানো, রেস্তোরা কিংবা মিষ্টির দোকানে বসে দুদিন মুখ বদলানো, মাঝে মাঝে সিনেমায় ঢুকে দু একটা ছবি দেখা—এসব না হলে মানুষ বাঁচে কি করে? কিন্তু তার জন্যে যে টাকা চাই, তা তাদের নেই। জমি থেকে যা আসে তার থেকে খাওয়াটা কোনো রকমে চলে, মাইনে থেকে এতদিন আসত তেল নুন মসলা, প্রয়োজনমত মা ও ছেলের মোটা মিলের ধুতি। নতুন বৌ আসবার পর কয়েকটা নতুন দফাও জুড়েছে হয়েছে ঐ সংগে—শাড়ি, শেমিজ, দু' একখানা সাবান, একটু মাথার তেল, দুটো চুলের ফিতে। এই চাপটুকু এরই মধ্যে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ ফুটে না বললেও, স্বামীর মুখে তার স্পষ্ট চিহ্ন নির্মলার চোখ এড়ায়নি। শাশুড়ীর কথাবার্তায় তার আভাস পাওয়া গেছে। সে নিজেও বোঝে। এই টানাটানি দিন দিন বেড়ে চলবে। এদিকে সামান্য কয়েক বিঘা জমির ফসল, তার উপরে গোনাগুনতি কটা টাকা; দুটোই একেবারে বাঁধা; হঠাৎ কোনদিক থেকে বাড়তি কিছু এসে পড়বে, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ওদিকে প্রয়োজনগুলো বাড়ের মুখে। এ দুয়ের সমন্বয় ঘটবে কেমন করে নির্মলা কিছুতেই ভেবে পেল না।

মেজদি চলে যাবে। জামাইবাবুর ছুটি নেই, ছোট ভাইকে পাঠিয়েছেন বৌদিকে নিয়ে যেতে। ভারী আমুদে ছেলে। এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। মেজদি বলছিল, পাস করলেই সংগে সংগে রেলের আফিসে ঢুকবে। দাদাই সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। একসময়ে এই প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শিক্ষিত ছেলেটির দিকে জগদীশবাবুর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। মেজো মেয়ের কাছে একটু গোপন আভাস দিয়েছিলেন, 'নিরুর সংগে বেশ মানায়, কী বলিস?' বিমলা আমল দেয়নি। বলেছিল, মায়ের পেটের বোন হবে জা, এ যেন কেমন বিচ্ছিরি লাগছে, বাবা।

বাবা তবুও হাল ছাড়েননি, "তাতে আর কী হয়েছে? এ রকম তো কত হয়।" বলে দু-একটা দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন। তখন মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছিল মেয়ে, ওদের খাঁই মেটানো আমাদের সাধ্যে কুলোবে না। ঐ ছেলেকে দিয়ে নগদে, গয়নায়, দান-সামগ্রী মিলিয়ে দশটি হাজার টাকা ঘরে তুলবে বলে বসে আছে আমার শাশুড়ী। পারবে তুমি?"

কথাটা কানে গিয়েছিল নির্মলার এবং বাবার সেই আশাহত ম্লান মুখখানাও চোখে পড়েছিল। তার আগে এইখানেই বিজনকে ও দু-তিনবার দেখেছে। সেও ওর সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না। বৌদির ছোট বোন হিসেবে সান্নিধ্যেই শুধু আসেনি, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টাও করেছে।

নির্মলা আপত্তি করেনি, একটু প্রশ্রয়ই বরং দিয়েছিল। বাবার মনের সেই আশার রঙ হয়তো ওর কুমারী হৃদয়ের নিভৃত কোণে, ফুটিয়ে তুলেছিল একটুখানি রঙীন স্বপ্ন। তাই, একদিন সদ্য বর্ষণমুক্ত আঁধার সন্ধ্যায় নির্জন ছাতে পাশাপাশি বেড়াতে বেড়াতে বিজন যখন ওর বাঁ হাতখানা দুহাতে তুলে নিয়ে উজ্জ্বল চোখদুটি ওর আনত মুখের উপর রেখে অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমাকে আমার খুউব ভালো লাগে, জানো নির্মলা!' নির্মলা হাত ছাড়িয়ে নেয়নি, দূরেও সরে যায়নি। সেই প্রগাঢ় স্পর্শ, গভীর সুরে বলা সেই 'ভালো লাগা' তার সমস্ত দেহমন যেন কোন্ মোহাবেশে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেই ক্ষণটিতে বিজন যদি তার সবল বাহু দুটি বাড়িয়ে তাকে বুকের উপর টেনে নিত, নির্মলা বাধা দিতে পারত না, নিজেকে হয়তো নির্বিচারে সঁপে দিত সেই 'ভালো লাগা'র মধুর স্রোতে। তার অন্তর জুড়েও যে সেদিন 'ভালো লাগা'র বাঁশির সুর বেজে উঠেছিল।

তেমন কিছুই ঘটেনি। হয়তো ঘটত, কিন্তু তার আগেই ছাতের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়েছিল বিজন। নির্মলা তখনো যেন সম্বিত ফিরে পায়নি। কেমন আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়েছিল। তারপর হঠাৎ চমকে উঠেছিল মায়ের ডাক শুনে। সাড়া দেবার আগেই মা উপরে উঠে এসেছিলেন এবং বিজনকে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, এই যে বাবা, তুমি এখানে? চা দেওয়া হয়েছে, এসো। নির্মলার দিকে ফিরে তিরস্কারের সুরে বলেছিলেন, তোকে না বললাম, বিজুকে ডেকে দে? সব ভুলে বসে আছ? সেই কখন দুটো ভাত খেয়ে উঠেছে, তারপর এক ফোঁটা চা-ও পায়নি ছেলেটা। এত বড় মেয়ে! কোনোদিকে যদি হুঁস থাকে?

বিজন বলেছিল, ওর কোনো দোষ নেই, মাইমা। তখন থেকে তাড়া দিচ্ছে। খিদে নেই বলে আমিই দেরি করেছি। ওবেলা বড্ড বেশী খাওয়া হয়ে গেছে।

—বেশী কী হল বাবা? কিছুই করতে পারিনি, এ্যাদ্দিন পরে এলে; সাধ তো যায় এটা-ওটা করে দিই। কিন্তু—যাক, আর দেরি করোনা, সামান্য কিছু মুখে দেবে চল। নিরু তোর বিজনদাকে নিয়ে আয়...... বলে মা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। নির্মলাও সংগে সংগে তাঁর অনুসরণ করল।

সেই পরম মুহূর্তটি কেটে যেতেই কোথা থেকে এক রাশ লজ্জা এসে তাকে ছেয়ে ফেলেছিল, মাথা নুইয়ে দিয়েছিল মাটির দিকে। বিজনের মুখের পানে চোখ তুলে তাকাবে, এমন শক্তি ছিল না।

বর্ষার নবীন মেঘে ঘনায়মান, নিরালা ছাতের সেই বিশেষ সন্ধ্যাটিকে আশ্রয় করে একটি সুখনীড় কখন যে অন্তর-গহনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, নির্মলা নিজেই জানতে পারেনি। জানল সেইদিন, যেদিন মেজদির মুখের সেই কঠোর সত্যের রূঢ় আঘাতে সে নীড় ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তারপরেও একবার কী একটা উপলক্ষ করে বিজন এসেছিল, তাকে কাছে পাবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু নির্মলা আর ধরা দেয়নি। নিজের সীমারেখা সম্বন্ধে সে

তখন যথেষ্ট সচেতন। অসম্ভব আশার ছলনায় তাকে লঙ্ঘন করলে মেয়েমানুষের কপালে ঘরে-বাইরে উপহাস ছাড়া আর কিছুই যে জোটে না, একথা জেনেই নিজেকে সে কঠিন বর্মের আচ্ছাদনে ঢেকে ফেলেছিল।

এবার অনেকদিন পরে আবার বিজনের সঙ্গে দেখা। সেদিনকার মনে আশা-নিরাশার দোলা লেগেছিল যা নিয়ে, তার সব কিছু আজ চুকে শেষ হয়ে গেছে।

বিশেষ স্থান পেয়ে এসেছে। তার একখানা আলাদা ঘর আছে। যখনই আসে, একা অথবা জোড়ে, ঐখানেই তার শোবার ব্যবস্থা। যখন থাকবে না, তখন অন্য সকলের কাজে লাগলেও নামে ওটা বিমলার ঘর।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কী একটা কাজে নির্মলা ঐ ঘরে ঢুকেই অন্ধকার দেখে ফিরে যাচ্ছিল আলো আনতে। হঠাৎ কানে গেল মৃদু গম্ভীর স্বর—'শোনো'। চমকে

'তোমাকে আমার খুউব ভালো লাগে, জানো নির্মলা!'

বর্মের কোনো কথাই এখন ওঠে না। তবু ওকে দেখেই বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে উঠল। নিজেকে বারংবার চোখ রাঙিয়েও স্বচ্ছন্দভাবে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না, সহজ সুরে দুটো মামুলি কুশল প্রশ্ন করতে গিয়ে গলাটা, মনে হল, আটকে যাচ্ছে।

বাপের বাড়িতে মেজদি চিরদিনই

উঠে দেখল জানালায় দাঁড়িয়ে বিজন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে বলল, দাঁড়ান, আলো নিয়ে আসি।

—থাক না? আলো কী হবে? বলে কাছে সরে এল। ক্ষণকাল ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, এটা কী মাস, বলত?

—আষাঢ় মাস। মাথা নিচু করেই বলল নির্মলা।

—কী আশ্চর্য! সেদিনটাও ছিল আষাঢ় মাস। ঠিক এমনি সন্ধ্যাবেলা। মেঘ ছিল, বৃষ্টি ছিলনা। মনে পড়ে?

মনে পড়ে বৈকি? পড়লেও মুখ ফুটে বলা যায় না। নির্মলা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। দেখে ফেললে কেউ কিছু মনে করতে পারে। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও কেন যেন থেমে গেল।

বিজন উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। হয়তো, জানত এ কথার উত্তর নেই; থাকলেও এখন আর পাবার উপায় নেই। অন্য কথা পাড়ল, একটু যেন অভিমানের সুর, 'বিয়ের সময় একটা খবরও কি দিতে নেই?'

এবার মাথা তুলল নির্মলা। মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, কেন বাবা তো আপনাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে-ছিলেন।

—তুমি তো ডাকনি?

—আমি!

—হ্যাঁ; নেমন্তন্ন নয়, শুধু একটা খবর। সময় থাকতে একবার জানানো। তাহলে আর এতবড় সর্বনাশ ঘটতে পারত না।

—এসব কী বলছেন আপনি? রূঢ় কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ করল নির্মলা।

—না কিছুই বলছি না। বলবার কিছু নেই। বড় নিশ্চিন্ত ছিলাম। যখন জানতে পেলাম, তখন আর সময় নেই।

নির্মলা কোনো উত্তর না দিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই বিজন ঘুরে এসে সহসা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল, অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো, নির্মলা, বন্ধু বলে, আপন জন বলে মেনে নাও। বলো, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?

—পথ ছাড়ুন।

—না; আগে আমার কথার উত্তর দাও।

—আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—না ভেবে যে পারি না। কেমন করে ভুলি, সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী? শুধু একটা মারাত্মক ভুল। যার ফলে

আমিও তোমাকে হারালাম, তুমিও সুখী হতে পারলে না।

—কে বললে, আমি সুখী হতে পারিনি?

—কে আর বলবে? আমি নিজেই তা বুঝতে পারছি।

—মিথ্যা কথা! ভুল বুঝেছেন আপনি।

বলেই আর দাঁড়াল না নির্মলা। বিজন কি বলবে বা কখন পথ ছেড়ে দেবে, তার জন্যে অপেক্ষা না করে পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নির্মলা মনে করেছিল, এর পরে বিজন নিশ্চয়ই চলে যেতে চাইবে। কিন্তু আশ্চর্য, দু-তিন দিন কেটে গেল, তবু তার নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। দিব্যি হাসি-গল্প-ঠাট্টা-পরিহাস করে তার মজার মজার গল্প বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। নির্মলারই হল মহা মুশকিল। সে সব ঠাট্টা-তামাশায় যোগ দিতেও পারে না, চুপ করে থাকলে বা উঠে চলে গেলেও দৃষ্টি-কটু লাগে। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা। তার মধ্যেও কয়েকবার ওকে নির্জনে পাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নির্মলা কিছুতেই সেটা ঘটতে দেয়নি।

সকাল বেলা বিজন রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছে, পিয়ন একটা খামের চিঠি দিয়ে গেল। সেটা হাতে করে ভিতরে এসে বিমলাকে ডেকে বলল, এই নাও বৌদি, তোমার মহাভারত।

—মহাভারত মানে?

—ওজন থেকে যা বুঝছি, অষ্টাদশ পর্ব না হলেও অন্ততঃ চতুর্দশ পর্ব অর্থাৎ চৌদ্দ পাতা তো হবেই।

—'আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে,' এক ঝটকায় চিঠিখানা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল মেজদি, আমিও দেখে নেবো।

—কী দেখবে?

—মহাশয় কত পর্ব ছাড়েন, অষ্টাদশ না অষ্ট-আশি।

—তা দেখো; আপাততঃ গরিবের বখশিসটা—

—কিসের বখশিস?

—বাঃ সকাল বেলা এমন একটি জিনিস বয়ে এনে দিলাম।

—সেই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার। ধন্য হয়ে গেলে। তার ওপরে আবার কী চাই?

—কাজ নেই আমার ধন্য হয়ে। ফাঁকা পুরস্কারে পেট ভরে না। ধরা-ছোঁয়া যায় এমন কিছু ফেল।

—এই নাও।

একটা ধার ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে নিয়ে খামখানা এগিয়ে ধরল দেওরের দিকে।

—ওটা কী হল?

—ভাগ দিচ্ছি।

—ও তো খোসা।

—শাঁস কি এত সোজা? তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। হবে, হবে। সবুরে মেওয়া ফলে।

এগিয়ে এসে আশ্বাসের ভঙ্গিতে ওর পিঠ চাপড়ে দিল। বিজন হাত উলটে নিরাশ সুরে বলল, আপাততঃ মেওয়া না হোক, এক প্যাকেট সিগারেটও ফলল না!

—আচ্ছা, দাঁড়াও। বলে বিমলা চিঠিখানা ব্লাউজের ভিতর রেখে ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে একখানা পাঁচ টাকার নোট দেওরের হাতে দিয়ে বলল, হল তো?

বিজন মহা উৎসাহে বৌদির হাতে গোটা কয়েক ঝাঁকানি দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, থ্যাংক্ ইউ, থ্যাংক্ ইউ, বৌদি।

—উঃ, কী দস্যি ছেলেরে বাবা!

ঐখান দিয়ে নির্মলা যাচ্ছিল কী কাজে। বিজন তার দিকে ফিরে বলল, তোমার মহাভারত কবে আসে, নিরু?

—'মহাভারত!' ব্যাপারটা বুঝলেও ভ্রূকুঞ্চিত করে বিস্ময়ের ভান করল নির্মলা।

—হ্যাঁ; বৌদির তো তারিখ বাঁধা আছে—মঙ্গল আর শনি। তোমার?

নির্মলা কিছু বলবার আগেই মেজদি বলে উঠল, তাতে তোমার স্বার্থটা কি শুনি?

—চিনির বলদের যে স্বার্থ। বয়েই সুখ। তাছাড়া এমনি আর একটা বখশিস যদি জোটানো যায়।

—বড্ড লোভ দেখছি। কিন্তু সবাইকে তো তোমার দাদার মত কাব্যি রোগে ধরেনি যে রাত জেগে জেগে মহাভারত রচনা করবে?

—মহাভারত না হোক, অন্ততঃ রামায়ণ?

—না গো, না। বলে, যেন ভগ্নীপতির হয়ে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে, এমনিভাবে যোগ করল, আহা, বেচারা কাজের মানুষ, তায় ইস্কুল-মাস্টার। তোমাদের মত অত রস-টস নেই।

স্বামীর কথাটা এবার স্পষ্টভাবে এসে পড়তেই নির্মলা আর দাঁড়াল না, পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকেই শুনল, দেওরের কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলছে মেজদি, ওর সামনে এসব কথা পাড়তে গেলে কেন? এতে শুধু ওর দুঃখ বাড়ে, তা বোঝ না?

বিজনও তেমনি স্বর নামিয়ে বলল, চিঠিপত্তর একেবারেই লেখে না ভদ্রলোক?

—কই, দেখি না তো।

বিজন আর কিছু বললনা। মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। বাপের বাড়ি এসেছে দিন পনর হল, তার মধ্যে স্বামীর হাতের একখানা মাত্র চিঠিই সে পেয়েছে। তাও নেহাৎ কাজের চিঠি—মায়ের অসুখ তেমনি চলছে, চাকরটা এখনো বাড়ি থেকে ফেরেনি, তেঁতুল-তলার জমিটায় চাষ দেওয়া হচ্ছেনা, এমনি দু'চারটা দরকারী খবর, তারপরেই 'ইতি'। মাত্র কদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে, এখনো গায়ে নতুন বৌ-এর গন্ধ, তবু সংসারের প্রতিটি ব্যাপারে তার উপরে স্বামীর এই আস্থা ও নির্ভরতা, এর মধ্যে একটা গৌরব আছে। নির্মলার মনকে তা স্পর্শ করেনি এমন নয়। কিন্তু একটি সদ্য-পরিণীতা তরুণীর মন শুধু এইটুকু নিয়েই কি তৃপ্ত হতে পারে? স্বামীর কাছ থেকে তার আর কোনো প্রত্যাশা নেই?

নতুন বিয়ের পর বাপের বাড়ি এসে যে বস্তুটির জন্যে মেয়েরা ডাকপিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকে, তার বর্ণ-পরিচয় নির্মলার বিয়ের আগেই হয়ে গেছে। সখীরা যখন আসত, বুকের ভিতর লুকিয়ে আনত মোটা মোটা রঙিন খাম। দুপুরবেলা আশেপাশে গুরুজনের সাড়া-শব্দ যখন বন্ধ হয়ে গেছে, কোণের ঘরের মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্ছ্বাসভরা গুঞ্জনে পড়ে যেত পাতার পর পাতা, তার মধ্যে কাজের কথা থাকত যদি একআনা, বাকী পনরআনা ভরতি শুধু বাজে কথা। তবু শুনতে শুনতে যেন নেশা ধরে যেত নির্মলার। মাঝে মাঝে কান দুটো লাল হয়ে উঠত। ছিঃ ছিঃ, এ সব কথা লিখল কেমন করে! ভারী অসভ্য তো! সখীকে ধমকে উঠত, 'থাম্, আর পড়তে হবে না।' সে শুধু মুখের ধমক। মন পড়ে থাকত সখীর হাতের ঐ কাগজ-গুলোর দিকে, ঐ অর্থহীন নির্লজ্জ প্রলাপ এবং তার মধ্যে জড়িয়ে আছে যে মাদক রস। মনে মনে ভাবত, এই চিঠি একদিন তার কাছেও আসবে। তার জীবনের সেই নতুন মানুষটি হয়তো এর চেয়েও সুন্দর ভাবায় নতুন ভঙ্গিতে শোনাবে তার মনের কথা। ভাবতে ভাবতে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হত নির্মলার দেহ-মনে। (ক্রমশ)

প্রদর্শনী

॥ কলারসিক ॥

॥ প্রেমিক যুগল ॥
শিল্পী ঃ অনিলবরণ সাহা

॥ শীতের প্রারম্ভে ছবির আসর ॥

শীতের মরশুমে চিরকাল কলকাতায় শিল্প-সংস্কৃতির আসর জমে। এবারও জমেছে। কলা-শিল্পীরা কলকাতার প্রদর্শনী ভবনগুলো তাঁদের সারা বছরের সৃষ্টি-সম্পদে ভরে তুলেছেন।

নভেম্বরে বিভিন্ন শিল্পীর কয়েকটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে এবং পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে। শিল্পীরা প্রায় সকলেই আমাদের পূর্ব-পরিচিত। নতুন কোনো বিস্ময়ের চমক বা আবিষ্কারের আনন্দ এই চিত্র-প্রদর্শনী থেকে না পেলেও, আমরা অনেক শিল্পীর কাজে নিষ্ঠা ও সততার সন্ধান পেয়েছি। এবং নিষ্ঠা ও সততা যেখানে আছে, সেখানে আজ না হোক্ আগামী দিনের জন্য আমাদের প্রত্যাশাও রইলো অনেকখানি।

ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ ভবনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন 'সোসাইটি অফ কনটেম্পরারী আর্টিস্টস' নামক সংস্থা, অন্যটি ছিল শিল্পী তুফান রাফাই-এর একক প্রদর্শনী।

সমকালীন শিল্পীসংঘের এই দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীতে ১০০খানি চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শন নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন ২০ জন শিল্পী। জাপানের শিল্পী হাজিমে সো এই প্রদর্শনীতে আমন্ত্রিত শিল্পীরূপে এসেছিলেন ৭খানি চিত্র নিয়ে।

সমকালীন শিল্পীসংঘের খ্যাতনামা প্রায় সকল শিল্পীর কাজ আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি। এই প্রদর্শনীতে আশা করেছিলাম, তাঁদের যৌবনোচিত দুঃসাহস প্রত্যক্ষ করে সান্ত্বনা পাবো। কিন্তু কেন জানিনে, তাঁদের কাজ আঙ্গিক গঠনে এমনভাবে ব্যয়িত হয়েছে যে, অন্য কোনো বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁরা মনোযোগ দিতে পারেন নি বলে মনে হয়। অথচ সমকালীন রীতি-নীতি দিয়ে সমকালীন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না রূপায়ণের জন্য এঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই রূপায়ণের চেষ্টা যে একেবারে হয়নি, তা বলছিনে। কিন্তু এই শিল্পীসংঘের একক শিল্পীর একক প্রদর্শনীতে ইতঃপূর্বে যা আমরা দেখেছি, মূলগতভাবে তার বিশেষ ব্যতিক্রম কেন এখানে তাঁরা উপস্থিত করতে পারলেন না, এটাই আমার জিজ্ঞাসা।

এই শিল্পীসংঘের দুই প্রধান শিল্পী সনৎ কর ও অরুণ বসুর কাজই একটু বিচার করে দেখা যাক। সনৎবাবুর তৈল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির প্রত্যেকটিতে এবার পুষ্পিত নক্সার পরিবেষ্টনে দৈহিক অবয়ব বা বিশেষ ভঙ্গী কেমন যেন এক স্বপ্নাচ্ছন্ন পরিবেশ রচনা করতেই ব্যস্ত। অবয়বগুলিকে ভেঙেছেন তিনি, কিন্তু কেন তার কোনো সদুত্তর আমি অন্ততঃ খুঁজে পাইনি। আর ঐ পুষ্পিত নক্সার আবেষ্টন কিসের ব্যঞ্জনা বহন করছে, তাও আমার বুদ্ধির অগম্য। অথচ সনৎবাবুর তুলির টান কত সুন্দর, রঙ প্রয়োগের নিপুণতাও অনস্বীকার্য। বিমূর্ত শিল্পের মোহ ত্যাগ করে সনৎবাবু যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে অন্যত্র, অন্য উপায়ে শিল্প-সত্তা আবিষ্কারে তৎপর হন, তবে হয়তো ভঙ্গী-সর্বস্বতা-মুক্ত আরো বলিষ্ঠ চিত্র-সম্পদ তিনি আমাদের উপহার দিতে পারবেন।

অরুণবাবুর চিত্রগুলিও অন্য অর্থে ভঙ্গী-সর্বস্ব। তবু ভাল লাগে। কারণ তাঁর রেখার মধ্যে তির্যকতা আছে।

॥ [illegible] ॥ শিল্পী ঃ অরুণ বসু

কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট মা হলে তিনিও বেশী দূর অগ্রসর হতে পারবেন না বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। বড় কবিকে যেমন তাঁর বাক্‌ভঙ্গী দিয়ে চেনা যায়, তেমনি বড় শিল্পীকেও চেনা যায় তার চিত্রভঙ্গী দিয়ে। শিল্পী সনৎ কর ও অরুণ বসু সেই দুর্লভ চিত্র-ভঙ্গীর অধিকারী হতে চলেছেন। এ-কথা বিনা দ্বিধায় বলছি। কিন্তু শুধু ভঙ্গী দিয়ে তাঁরা চোখ ভুলাবেন না যেন— এইটুকু আমার নিবেদন।

এই প্রদর্শনীর অন্য দুই খ্যাতনামা শিল্পী সোমনাথ হোড় ও রেবা দাশগুপ্ত। সোমনাথ হোড়ের এচিং 'জেলের জাল' ও 'সৃষ্টি' অনবদ্য। তৈল-রঙের চিত্রগুলি আমার তেমন ভাল লাগেনি। শ্রীমতী রেবা দাশগুপ্তের 'ফল-বিক্রেতা' ও 'কম্পোজিসান' মন্দ লাগলো না।

অন্যান্য যে-সব শিল্পীর কাজে নিষ্ঠার ছাপ লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের মধ্যে দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাতায়নবর্তিনী', সত্যসেবক মুখার্জির 'বিশ্রাম' ও 'অবসর', সুহাস রায়ের 'চাষা ও বলদ', শ্যামল দত্ত রায়ের "বেহালা বাদক", অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর 'প্রেম ও প্রত্যূষ', সুনীল দাশের 'জুয়াড়ী', অনিলবরণ সাহার "প্রেমিক যুগল" ও শৈলেন মিত্রের 'সূর্যমুখী' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

আমন্ত্রিত জাপানী শিল্পী 'শিব', 'ধ্যানমগ্ন', 'গঙ্গামাতা' প্রভৃতি চিত্রে

॥ বেহালা বাদক ॥
শিল্পী : শ্যামল দত্তরায়

চমৎকার রঙপ্রয়োগ ও তুলির টানে আমাদের যেভাবে মুগ্ধ করেছেন, তা মনে থাকবে অনেক কাল। বিমূর্ত চিত্র হয়েও এগুলো আমাদের মনকে আসল বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে নেয় না। এখানেই এ'র সার্থকতা। আমরা এই শিল্পীকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ ভবনে প্রদর্শনীটি শিল্পী তুফান রাফাই-এর ২০খানি চিত্র নিয়ে সজ্জিত হয়েছিল। বোম্বাইয়ের এই শিল্পী এক-জন সাধারণ শ্রমিকরূপে জীবন আরম্ভ করে আজ যেখানে উঠে এসেছেন, তা তাঁর অসাধারণ শ্রম ও সাধনার ফল। এই প্রদর্শনী দেখে কেউ অনুমান করতে পারবে না শিল্পী রাফাইকে কী প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে শিল্পী হতে হয়েছে। শিল্পী রাফাই-এর চিত্রগুলিতে তাই বিধৃত হয়েছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাঁর রূপায়ণের মধ্যে নিজস্বতা আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ছবিগুলি যেন কার্টুন চিত্রের মত। কিন্তু শিল্পী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে বস্তুর নির্বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে তাকেই প্রতিটি চিত্রে বিধৃত করতে চেয়েছেন। মনে হবে, 'কিউবিজম' পদ্ধতিতে অঙ্কিত এগুলি। আসলে সবকিছুকে একটি প্যাটার্ণে বাঁধবার জন্য তাঁকে এই বিশেষ রীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই তাঁর চিত্রে কোথাও জ্যামিতিক পদ্ধতির, আবার কোথাও ছন্দিত রেখার আভাস। রঙ প্রয়োগেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাঁর 'রাস্তার দৃশ্য', 'ভিখারী', 'বিশ্রাম', 'বন্দী', 'গো-যান' প্রভৃতি সকল ছবিতে দর্শক তাই রসবোধের সন্ধান পাবেন। আমরা এই শিল্পীকে অভিনন্দিত করি।

* * *

শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরী শিল্পীরূপে যে নিজস্ব পথ আবিষ্কারে ব্যস্ত—আর্টিস্ট্রি হাউসের এই প্রদর্শনী দেখে তা অনুমিত হয়। এখানে প্রদর্শিত ২৭ খানি তৈলচিত্র ও ২২ খানি রেখাচিত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে শিল্পীর নিষ্ঠাকে। তিনি মানুষের ব্যথা-বেদনাকে তুলি আর রঙে বিধৃত করার জন্য উজ্জ্বল বর্ণ-বিলেপন ত্যাগ করে এক ধূসর অনুজ্জ্বল মিশ্রণের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই প্রকরণ-পদ্ধতি চমৎকার মিলে গেছে। জননীরূপের নানা মূর্তি তাঁর চিত্রে

গায়ক (১৭) শিল্পী : অজয় মুখার্জি

সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এর মধ্যে 'মাতৃত্ব', 'শূন্য মুহূর্ত', 'বাৎসল্য' ও 'স্বর্গীয় ছায়া' আমার বেশ ভাল লেগেছে।

শ্রীমতী রায়চৌধুরীর রেখাচিত্র-গুলিতে রূপ পেয়েছে আমাদের ছিন্ন-মূল উদ্বাস্তু জীবন। এখানেও ছিন্নমূল নারীর নানা ভঙ্গী, তার ব্যথা-বেদনাকে তিনি রূপ দিয়েছেন আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে। আশা করবো, শ্রীমতী রায়-চৌধুরীর এই বলিষ্ঠ জীবন-চেতনা তাঁকে আরো নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে পরিচালিত করবে। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীর জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম।

* * *

শিল্পী শ্রীনগেন্দ্রনাথ হেমরাম এক-কালে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাঁচীর বিকাশ বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষক। শ্রীহেমরামের ৪১খানি জল-রঙের চিত্র দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় আর্টিস্ট্রি হাউসে। অপূর্ব ছন্দময় এ'র শিল্পকর্ম। তাঁর 'কুম্ভকার' কিম্বা সাঁওতালী নৃত্যের 'কম্পোজিসান' দেখলে অনায়াসে বোঝা যায়, তিনি একজন পাকা শিল্পী। শ্রীহেমরামের 'আলিঙ্গন', 'আপ্যায়ন', 'বিশ্রাম', 'মৃত্যুর পাশে জীবন' প্রভৃতি চিত্রগুলি যে-কোনো শিল্প-রসিক ব্যক্তিকে আনন্দ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ভবিষ্যতে শ্রীহেমরাম কল-কাতায় যদি তাঁর নতুন চিত্রকলা নিয়ে উপস্থিত হন, তবে আমরা নিশ্চয় আনন্দ বোধ করবো।

* * *

শিল্পী শ্রীঅজয় মুখার্জী ২৩খানি চিত্র নিয়ে এই সর্বপ্রথম এককভাবে

কলকাতার শিল্প-রসিক ব্যক্তিদের দরবারে উপস্থিত হলেন। অবশ্য এর আগে আমরা দু'একবার শিল্পী শ্রীমুখাজীর চিত্র দেখার সুযোগ পেয়েছি। কলকাতার দু'একটি সমবেত প্রদর্শনীতে শ্রীমুখাজীর চিত্র প্রশংসিতও হয়েছে। কিন্তু একজন শিল্পীকে অনুধাবন করার পক্ষে সেগুলি কোনদিন যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা যায় না। এবার শিল্পী একক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সেই সুযোগ প্রদান করায় আমরা খুশি হয়েছি। এবং সানন্দে বলতে পারিঃ শ্রীমুখাজীর নিষ্ঠা ও সততা যদি অব্যাহত থাকে তবে তিনি বাঙলা দেশের সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে অনায়াসেই নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হবেন।

শ্রীমুখাজীর এই চিত্র-প্রদর্শনীতে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত। মূলতঃ তিনি কিউবিজমের প্রভাবাধীন হলেও তাঁর চিত্রের সামগ্রিক প্যাটার্ণ, ডিজাইন ও রঙ প্রয়োগের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এখানে শিল্পী শুধুমাত্র অনুকরণ করেননি একটি শিল্পরীতিকে আত্মস্থ করে তাকে নিজস্ব ভঙ্গীতে রূপ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। একজন নতুন শিল্পীর পক্ষে এটা বড় রকমের কৃতিত্বের কথা। এছাড়া চিত্রের সামগ্রিক রূপ-রেখাকে তিনি যেভাবে ডিজাইনে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন, জল-রঙকে বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতায় যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাও অভিনন্দনযোগ্য।
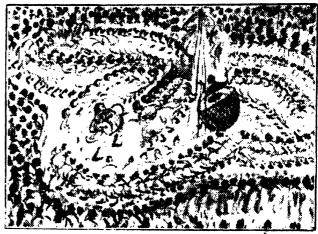
।। আদিবাসী উৎসব নৃত্য ।। শিল্পী : নগেন্দ্রনাথ হেমরাম

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শিল্পী জল-রঙ সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন ইদানীংকালের অনেক শিল্পীর মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায় না। ২৩ খানি চিত্রের এক-খানি বাদে সবগুলিই অঙ্কিত হয়েছে জল-রঙের মাধ্যমে। এর মধ্যে: 'কিডন্যাপ' (২নং), 'মি এন্ড পেট' (৫নং), 'এ্যাওয়েটিং' (৯নং), 'ফ্লোটিং বাউন্স' (১০নং), 'টু সিস্টারস' (১২নং), 'প্রিডেট' (১৬নং), 'মিউজিসিয়ান' (১৭নং), 'প্রাউড গার্ল' (২২নং) ও 'মাদার এন্ড চাইল্ড' (২৩নং) নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য চিত্র। এই চিত্রগুলিতে হাল্কা ব্রাশের টানে কোনটায় চমৎকার জমিন, কোনটায় প্যাটার্ণ, কোনটায় রঙ আর রেখার সমন্বয়, কোনটায় সামগ্রিক ব্যঞ্জনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সব মিলে ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও দর্শক মনকে খুশী করার ক্ষমতা রাখে। এখানেই শিল্পী শ্রীঅজয় মুখাজীর জয়। আমরা ভবিষ্যতে এই শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনী দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলুম।
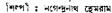
।। শিল্পী শ্রীমতী অরুন্ধতী রায় ।।

শ্রীমতী অরুন্ধতী রায় চিত্র-শিল্পী নন। ইনি প্রকৃতির রূপমুগ্ধ দ্রষ্টা—শিল্পী-ভাস্কর। মৌন প্রকৃতি অহরহ আপন খেয়াল-খুশিতে গাছের ডালে কিংবা শিকড়ে, কয়লার খনিতে বা পোড়া ইটের পাঁজায় যেসব অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টিতে মগ্ন, ইনি সেগুলিকেই আবিষ্কার করে, প্রকৃত ভাস্করের মত সামান্য একটু অদল-বদল করে—তাই-ই হাজির করেছেন সভ্যজগতের সম্মুখে। শ্রীমতী রায় এইভাবেই পরিচয় দিয়েছেন তাঁর শিল্পী মনের। প্রখর শিল্পী-মন ছাড়া প্রকৃতির জগৎ থেকে এমনি করে শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। বলতে দ্বিধা নেই, শ্রীমতী রায় সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে যে রূপ

।। ব্যালে ।। শিল্পী: অরুন্ধতি রায়চৌধুরী
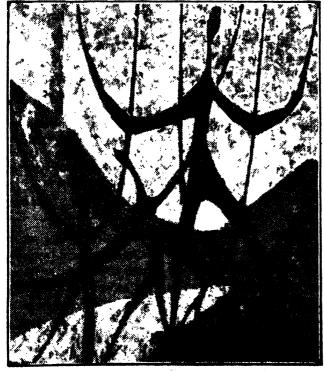
অন্তরে ছিল গাছের ডালে কিংবা শিকড়ে তা আমাদের দৃষ্টি-গোচর করেছেন। তাঁকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

এই প্রদর্শনীতে গাছের শিকড়, কান্ড বা শাখা-প্রশাখায় রচিত ৬৫টি নিদর্শন ছাড়াও কয়লা ও ঝামায় রচিত ৬টি শিল্প-নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। শুনেছি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এইসব আজে-বাজে উপাদানের সাহায্যে অনেক চমৎকার শিল্প-সৃষ্টি করে নাম দিয়েছিলেন কাটুম-কুটুম। শ্রীমতী রায়ের সংগৃহীত ও তাঁর হাতে রূপায়িত এই সুন্দর শিল্পবস্তুগুলিকে কি সেই নামে অভিহিত করা যায়? আমার তা মনে হয় না। কারণ, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর কাটুম-কুটুম রচনা করেছিলেন, শ্রীমতী রায় ঠিক অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। মূলতঃ প্রকৃতি যে রূপে তার শিল্পসৌন্দর্য রচনা করেছে তিনি তা প্রায় অবিকৃতই রেখেছেন। মানুষ-ভাস্কর এখানে শিল্পরূপের মাধ্যম নির্বাচন করেননি, আঙ্গিক বা ভঙ্গী রচনাতেও তার হাত নেই কিছু। অতএব একে প্রকৃতির রাজ্যে শ্রীমতী রায়ের শিল্প-দৃষ্টির আবিষ্কার ছাড়া আর কি বলতে পারি আমরা?

যাহোক, আমরা এই প্রদর্শনী উপভোগ করেছি। দেখেছি, বটের ঝুরিতে গড়ে ওঠে ঊর্ধ্ববাহু মানুষ, বোগেনবিলিয়া গাছের ডালে রূপ পাওয়া 'স্রোতের বিরুদ্ধে' (৮নং) চলা মানুষের জীবন্ত মূর্তি, পেয়ারার ডালে 'ভারসাম্য' (১৫নং) রক্ষা করার প্রয়াস, শ্যাওড়া-গাছের গুঁড়িতে ফুটে ওঠা 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৭নং) সরীসৃপের রূপ। এ-ছাড়া অশ্বত্থ, কৃষ্ণচূড়া, গন্ধরাজ, আম, শ্বেত আকন্দ ও সমুদ্রের জলে ভেসে আসা নামা-না-জানা গাছের শিকড় কিংবা ডালে রচিত 'সৈনিক' (২৪নং), মাঝি (২১নং), সাপ (২৫নং), 'জীবনের ছন্দ' (২৭নং), গরুড় (৩৮নং), 'শকুন' (৪১নং), গ্রাম্য মেয়ে (৪৩নং), মৎস্যকন্যা (৫নং), ড্রাগন (৬০নং) প্রভৃতির শিল্প-সৌন্দর্যও আমাদের বিস্মিত করেছে।

শ্রীমতী রায় ইতিমধ্যে কলকাতা ও দিল্লীতে তাঁর এই সঞ্চিত সম্পদ প্রদর্শন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। আমরা আশা করি তাঁর সচেতন শিল্পী-মনের সাধনায় প্রকৃতির আরো নতুন রচনা আমাদের দৃষ্টি-গোচর করতে তিনি কুণ্ঠিত হবেন না।

জাপানী শিল্পী হাজিমে সো ৪৫খানি চিত্র নিয়ে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান, বিশেষ করে হিমালয় অঞ্চলের মঠ-মন্দির, নিঃসর্গ ও উপজাতিদের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে রচিত হয়েছে এই চিত্রগুলি। শিল্পী হাজিমে সো দু'চোখ ভরে যা দেখেছেন, বিশেষ করে ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠানের যে-সব দৃশ্য তাঁর শিল্পী-মনকে আকর্ষণ করেছে তা নিষ্ঠার সংগে জাপানী ওয়াশ পদ্ধতিতে জল-রঙের মাধ্যমে সুন্দরভাবে রূপ দিয়েছেন দেখে আমরা খুশী হয়েছি। তাঁর রচিত হৃষিকেশের 'নন্দী', লছমনঝোলার 'নরসিংহ অবতার', উত্তর কাশীর 'শিব', সিমলার 'দুর্গামাতা', দেবপ্রয়াগের 'বরাহ অবতার' হরিদ্বারের 'গরুড় দেব' সত্যি সুন্দর হয়েছে। এগুলি শুধু স্কেচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। শিল্পীর সচেতন মন এগুলিকে শিল্প-সুষমাদানেও সক্ষম হয়েছে। হিমালয় অঞ্চলের গদ্দা উপ-জাতিদের পাঁচখানি চিত্র আমার খুব ভাল লেগেছে।

আমরা এই বিদেশী শিল্পীকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মতামত

মাননীয় সম্পাদক, সবিনয় নিবেদন, ভুবনেশ্বর-১ ২০।৯।৬১

১৯শ সংখ্যা 'অমৃতে' জৈমিনি তাঁর লিখিত 'পূর্বপক্ষে' পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে লেখক হিসাবে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' মুদ্রিত দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর উষ্মার কারণ প্রণিধান-যোগ্য। কেননা যে মহাপ্রাণ শেষ জীবনে নামের আগে শ্রী বর্জন করেছিলেন এবং জীবদ্দশায় যখন তাঁর সমস্ত গ্রন্থই নিছক 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামাঙ্কিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাঁর মৃত্যুর বিশ বৎসর পরে তাঁর শততম জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশিত রচনাবলীতে 'শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' মুদ্রিত করার পক্ষে কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে, তা সহজবোধ্য নয়। অভ্যস্ত চোখে সব পাঠকেরই এ ব্যাপার বিসদৃশ ঠেকেছে।

তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারই নন 'বিশ্বভারতী'ও রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা হিসাবে 'বিচিত্রা' নামে যে রবীন্দ্র-রচনা-সঞ্চয় প্রকাশ করেছেন, তাতেও লেখক হিসাবে 'শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' মুদ্রিত হয়েছে।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হলো যে, 'বিশ্বভারতী' কর্তৃপক্ষ যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের আগে শ্রী যুক্ত করে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি তখন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বক্রোক্তি ক'রে কি হবে? এ সম্পর্কে 'বিশ্ব-ভারতী' গ্রন্থন-বিভাগ আলোকপাত করলে রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠক সাধারণ বাধিত হবেন। নমস্কারান্তে—

রণেন সেনগুপ্ত

॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ॥

রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে সকলেই একথা স্বীকার করবেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মানুষের অস্তিত্ব তো দূরের কথা, এই পৃথিবীরই অস্তিত্ব থাকবে কিনা সে-বিষয়ে জোর করে কিছু বলা চলে না। কারণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হবার খুবই সম্ভাবনা। এমন কি সত্যিকারের যুদ্ধ যদি শুরু নাও হয়, শুধু যুদ্ধের একটা আবহাওয়া যদি বজায় থাকে, তাহলেও পৃথিবী ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ খুব নিরাপদ নয়। কারণ, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে দুই বিরোধী শিবিরের যুদ্ধ-প্রস্তুতি অব্যাহত থাকবে এবং তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মাঝে মাঝে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে। যুদ্ধ-প্রস্তুতি বন্ধ করার পথ কী, তা বিজ্ঞানের কথায় আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরিণতি কী, সে-বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই কিছুটা আলোচনা তোলা যেতে পারে।

নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কলকাতায় যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল সেই উপলক্ষে 'বম্বম্যানিয়া' নামে চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি রঙীন ব্যঙ্গচিত্র দেখানো হয়েছিল। মাত্র বারো মিনিটের এই ব্যঙ্গচিত্রে পৃথিবীর এক ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে নির্মম ঠাট্টা করা হয়েছে। একটি স্কুলের ছাত্র ক্লাশ থেকে অজ্ঞাত কিছু রাসায়নিক পদার্থ বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সেই পদার্থটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ছোটখাটো একটি বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কৌতূহলী হয়ে তার বাবা সেই রাসায়নিক পদার্থটি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। এবারে যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতে গোটা ফ্ল্যাটটাই ধ্বংস হয়ে যায়। তখন একদল বিজ্ঞানী মাটির নিচের পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পদার্থটিকে পরখ করে দেখেন। এবারে যে বিস্ফোরণ ঘটে তাতে গোটা শহরে আগুন ধরে। তাই দেখে এক যুদ্ধ-পিপাসু জেনারেল বিজ্ঞানীদের সম্মানিত করে বিস্ফোরণের শক্তিবৃদ্ধি করতে বলে। সেই পরীক্ষার ফলে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবীর এক উপগ্রহে বসে একটি ছোট্ট কুকুর অবাক বিস্ময়ে দেখে যে, মহাশূন্যে ভেসে চলেছে পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষ। এই ব্যঙ্গচিত্রটি যে নিতান্তই একটা ব্যঙ্গ নয় তা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে এই অস্তিত্বহীন ভবিষ্যতের দিকেই ঠেলে দিতে পারে। এমন কি পরীক্ষা-মূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলেও অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা কম নয়।

সম্প্রতি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তেজস্ক্রিয় ভস্মপতনের বিপদ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিষয়টির ওপরে আলোকপাত হয়েছে খুবই কম। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি প্রশ্রয় পেয়েছে এবং খবরের কাগজের পাঠকরা আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়েছেন। তবে, সুখের বিষয়, প্রাথমিক সোরগোলটা কেটে যাবার পরে দু-একটি পত্রিকার রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত হতেও দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি বিবৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের শ্রীযুক্ত আর কে মণ্ডল তেজস্ক্রিয় ভস্মপতনের বিপদ সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধটিকে ভিত্তি করেই এই আলোচনা তুলছি।

॥ তেজস্ক্রিয়তা ॥

তেজস্ক্রিয় ভস্মপতনে কী কী বিপদ ঘটতে পারে, তা বুঝতে হলে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে প্রথমে কিছুটা ধারণা করে নেওয়া দরকার। আবার তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে প্রথমে জানা দরকার পরমাণুর গড়ন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটি নিউক্লিয়স এবং তাকে ঘিরে এক বা একাধিক ইলেকট্রন—এই হচ্ছে পরমাণু। বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক থেকে নিউক্লিয়স পজিটিভ এবং ইলেকট্রন নেগেটিভ। স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেকট্রন কণাগুলোর মোট নেগেটিভ চার্জ নিউক্লিয়সের মোট পজিটিভ চার্জের সমান হয় এবং ফলে এই দুটি বিপরীত-ধর্মী চার্জে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে পরমাণুটি হয় বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। কোনো কারণে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে ইলেকট্রনের মোট নেগেটিভ চার্জ নিউক্লিয়সের পজিটিভ চার্জের চেয়ে বেশি হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক থেকে পরমাণুটি হবে নেগেটিভ। আর যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় তাহলে পরমাণুটি হবে পজিটিভ।

পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। কিন্তু ইলেকট্রন কণিকার ভর এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তার দ্বারা পরমাণুর মোট ভরের ইতরবিশেষ হয় না। অর্থাৎ ইলেকট্রনের ভরের তুলনায় নিউক্লিয়সের ভর এতই বেশি যে, নিউক্লিয়সের ভরের ওপরেই পরমাণুর মোট ভর নির্ভর করে।

নিউক্লিয়স বা কেন্দ্রীন নামটি শুনে বোঝা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় অবস্থানের জন্যেই এই নাম। ইলেকট্রন যেমন বিশেষ একটি কণিকার নাম, নিউক্লিয়স তা নয়। নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে দু-ধরনের কণিকা—প্রোটোন ও নিউট্রন। বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক থেকে প্রোটোন পজিটিভ ও নিউট্রন নিরপেক্ষ।

এবারে পরমাণুর গড়নের মূলে একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে বলেই পজিটিভ নিউক্লিয়স ও নেগেটিভ ইলেকট্রনের মধ্যে একটি আকর্ষণের ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং ইলেকট্রন নিউক্লিয়সের চার দিকে পাক খেয়ে চলে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সূর্যের চার দিকে গ্রহের আবর্তনের সঙ্গে এ-ব্যাপারটাকে তুলনা করা চলে। তবে সৌরমণ্ডলে আকর্ষণের ক্ষেত্রটি মহাকর্ষগত, পরমাণুর অভ্যন্তরে আকর্ষণের ক্ষেত্রটি বৈদ্যুতিক।

তাহলে ধরে নিতে হয়, নিউক্লিয়সের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন যে পরস্পরের সঙ্গে এঁটে থাকে, সেখানেও নিশ্চয়ই একটি আকর্ষণী-শক্তি আছে।

বিজ্ঞানীরা এই আকর্ষণী-শক্তির নাম দিয়েছেন নিউক্লিয়র শক্তি। আর যে-কোনো উপায়েই হোক, এই বজ্র-আঁটুনিকে ভাঙতে পারলেই নিঃসৃত হয় পারমাণবিক তেজ।

আগেই বলেছি, পরমাণুর মধ্যে এক বা একাধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে। হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে আছে একটি ইলেকট্রন, হিলিয়াম পরমাণুর মধ্যে দুটি, আর্গন পরমাণুর মধ্যে আঠারোটি, ইত্যাদি। অতএব, হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়সের পজিটিভ চার্জ হবে একটি ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের সমান। তেমনি হিলিয়ামের, তেমনি আর্গনের, ইত্যাদি।

স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো পদার্থের পরমাণুর মধ্যে যতো সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তাকেই বলা হয় সেই পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা। অর্থাৎ, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১, হিলিয়ামের ২, ইত্যাদি।

আগেই বলেছি, পরমাণুর ভর নির্ণীত হয় নিউক্লিয়সের দ্বারা। নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে প্রোটোন ও নিউট্রন। প্রোটোনের কত সংখ্যক থাকবে তা নির্ভর করে ইলেকট্রনের সংখ্যার ওপরে, অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার ওপরে। কাজেই, পারমাণবিক সংখ্যাটি যদি ঠিক থাকে তাহলে প্রোটোনের সংখ্যা কম-বেশি হবার উপায় নেই। কিন্তু নিউট্রন যদি কম-বেশি হয় তাহলে পরমাণুর ভর কম-বেশি হবে বটে, কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ৯২। কিন্তু পারমণাবিক ভর সর্বক্ষেত্রে সমান নয়—কখনো ২৩৪, কখনো ২৩৫, কখনো ২৩৮। ইউরেনিয়াম-২৩৪-এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪২টি নিউট্রন। ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪৩টি নিউট্রন। ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর পরমাণুর নিউক্লিয়সের মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটোন ও ১৪৬টি নিউট্রন। অর্থাৎ প্রোটোনের সংখ্যা সর্বক্ষেত্রেই সমান, সেই কারণে পারমাণবিক সংখ্যাও সর্বক্ষেত্রে ৯২। কিন্তু পারমাণবিক ভর কখনো ২৩৪, কখনো ২৩৫, কখনো ২৩৮। অতএব, একই পদার্থ ইউরেনিয়ামকে পাওয়া যাচ্ছে তিনটি বিভিন্ন পারমাণবিক চেহারায়। একই পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট একই পদার্থের এই যে বিভিন্ন পারমাণবিক চেহারা—এরই নাম 'আইসোটোপ্'। খবরের কাগজের কল্যাণে এই শব্দটি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত।

পেঙ্গুইন প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক অভিধানে 'আইসোটোপ'-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা এই : "একই মৌলিক পদার্থের কতকগুলি পরমাণু যদি এমন হয় যে, তাদের পারমাণবিক সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে সমান কিন্তু পারমাণবিক ভর পৃথক, তাহলে পরমাণুগুলিকে বলা হয় এই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ।" আশা করি এই সংজ্ঞাটিকে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। পেঙ্গুইনের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে : "কোনো একটি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন আইসোটোপে বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকে।" ওপরে ইউরেনিয়ামের যে দৃষ্টান্তটি দিয়েছি তা থেকে এই উক্তিটিও নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরমাণুর নিউক্লিয়সে প্রোটোন ও নিউট্রনের মধ্যে যদিও একটা বজ্র-আঁটুনি থাকে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বজ্র-আঁটুনি বেসামাল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এই বেসামাল অবস্থারই দৃষ্টান্ত হচ্ছে আইসোটোপ। যখনই কোনো পরমাণু এমনি এক বেসামাল অবস্থায় পৌঁছয় তখনই সেই পরমাণুটি হয়ে ওঠে ভঙ্গুর বা উত্তেজিত। পরমাণুর এই উত্তেজনাকেই বলা হয় তেজষ্ক্রিয়তা। তেজষ্ক্রিয় পরমাণু থেকে কয়েক ধরনের তেজ নিঃসৃত হয়। দু-ভাবে তা হতে পারে। পরমাণুর ভেতর থেকে বিদ্যুৎ-বাহী কণিকা-বর্ষণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে নিঃসৃত তেজকে বলা হয় আল্‌ফা বা বিটা রশ্মি। পরমাণুর উত্তেজনার ফলে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে নিঃসৃত তেজকে বলা হয় গামা রশ্মি। ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে আমরা যে এক্স-রে ব্যবহার করি তাও এক ধরনের গামা রশ্মি।

কোনো কোনো মৌলিক পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থাতেই তেজষ্ক্রিয়। যেমন রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। কোনো কোনো মৌলিক পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে তেজষ্ক্রিয় করে তোলা চলে। যেমন ফসফরাস—৩১ তেজষ্ক্রিয় নয়। কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থটির একটি আইসোটোপ (ফসফরাস—৩২) পাওয়া যেতে পারে যা তেজষ্ক্রিয়।

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ তেজ নিঃসৃত হয়, অপর দিকে তেমনি একশোটিরও বেশি আইসোটোপ তৈরি হতে পারে। এই আইসোটোপগুলো মেঘের মতো আকাশে ওঠে এবং তারপরে দীর্ঘ সময় ধরে মাটিতে ঝরে পড়তে থাকে। এরই নাম 'তেজষ্ক্রিয় ভস্মপতন'। বা, ফল্-আউট। এই ইংরাজি শব্দটি খবরের কাগজের কল্যাণে আমাদের কাছে একটা আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে যে তেজষ্ক্রিয় ভস্মপতন হয় তা তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথমটিকে বলা চলে স্থানীয় বা তাৎক্ষণিক। বিস্ফোরণ হবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাইল জুড়ে এই ভস্মপতন হয়। সাধারণত পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণ এমন এলাকায় ঘটানো হয় যার আশেপাশে কোনো লোকালয় নেই। সুতরং পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে এই স্থানীয় বা তাৎক্ষণিক ভস্ম-পতন থেকে কোনো বিপদ হবার আশংকা থাকে না। দ্বিতীয়টিকে বলা চলে মাধ্যমিক বা ট্রোপোস্ফিয়ারগত ভস্ম-পতন। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তরকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার: ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ-এগারো মাইল পর্যন্ত এই স্তরটি বিস্তৃত। মাধ্যমিক বা ট্রোপো-স্ফিয়ারগত ভস্মপতন কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ধরে হতে পারে এবং কোথায় কিভাবে হবে তা প্রধানত বায়ু-প্রবাহের ওপরে নির্ভর করে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে স্ট্রাটোস্ফিয়ারগত ভস্ম-পতন। বায়ুমণ্ডলে ট্রোপোস্ফিয়ারের ওপরের স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এই স্ট্রাটোস্ফিয়ারগত ভস্মপতন হয় সবচেয়ে ব্যাপক এবং বহু বৎসর ধরে তা চলতে থকে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, কলকাতার বাতাসে এখনো পর্যন্ত যেটুকু তেজ-ষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ১৯৫৮ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে। সোভিয়েত পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফল এখনো পর্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে ধরা পড়েনি। তবে আগামী দশ থেকে পনেরো বছর ধরে সোভিয়েত পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত তেজষ্ক্রিয় ভস্মপতনের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

আগামী সংখ্যায় এই আলোচনা শেষ করার ইচ্ছা রইল।

প্রতিবেশী সাহিত্য

(কানাড়ী গল্প)

॥ ভূমিকা ॥

কানাড়ী সাহিত্য এক হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিনাশের সংগে সংগে কর্ণাটক সাংস্কৃতিক জীবনে দেখা দিল ভাঙ্গন। কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চল ১৯টি ভাগে বিভক্ত হল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সারবস্তু সম্বল করে কানাড়ী সাহিত্যিকেরা নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছেন। পরিশীলিত শিল্পকৃতি এবং পরিণত মনের ছাপ পাই আজকের কানাড়ী সাহিত্যে। কানাড়ী সাহিত্যিকেরা বাংলা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বহু কবি সাহিত্যিকের রচনাসম্ভার কানাড়ীতে অনূদিত হয়েছে। বাংলার পটভূমিকায়ও কানাড়ী সাহিত্যিকেরা গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের মর্মন্তুদ দুর্ভিক্ষের করুণ ছবি পাই 'অন্ন' গ্রন্থে।

কানাড়ী উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটছে। মাস্তির নাম কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেও ছোটগল্পলেখক হিসেবে তিনি অনন্য। শুধু দিন-এনে-দিন-খাওয়া মানুষের কান্না-হাসির কাহিনীই নয় মধ্যবিত্ত-জীবনও তাঁর সাদামাটা আংগিকে চমৎকার ফুটে ওঠে। মাস্তির গল্প বিদেশী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। মাটিঘেঁষা মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে বেত্তিগেরীর লেখায়ও। মনস্তত্ত্বমূলক গল্প রচনায় কৃষ্ণকুমার সিদ্ধহস্ত। প্রতীকধর্মী ও ব্যঞ্জনাপ্রধান গল্প রচনায় এইচ পি যোশী মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। নামকরা ছোটগল্পলেখকদের মধ্যে বাসবরাজ কাট্টিমনি, কুলকুণ্ড, বেন্দ্রে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। নিছক প্রেমের গল্প লিখে 'আনন্দ' যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছেন। সম্প্রতি নতুন লেখকদের গল্পসংকলন 'হেন্ডাতিয়ু হেসারো' যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সদাশিবের 'নাল্লিয়াল্লি নিরুবাস্তিত্ব' এবং সরোজিনী মাহিশির 'রূপা' যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছে। নতুন নতুন আংগিকে বাস্তবধর্মী চিত্রকল্পের উপস্থাপনায় বিচিত্র কানাড়ী জীবনকে প্রতিফলিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন আধুনিক কানাড়ী কবি-সাহিত্যিকেরা। বাসবরাজ কাট্টিমণির গল্পে সমাজের নীচুতলার মানুষের বিচিত্র জীবন স্থান পেয়েছে। তাঁর অন্যতম একটি অভিনব গল্প বুট-পালিশ। —অনুবাদক

বুট-পালিশ

মূলরচনাঃ **বাসবরাজ কাট্টিমনি**

অনুবাদ ঃ **বোম্মানা বিশ্বনাথম্**

—পালিশ...... বুট-পালিশ......

আমার এই আওয়াজ আপনারা শুনেছেন বহুবার। এ গলা আপনাদের পরিচিত। স্টেশনে-পথেঘাটে, সিনেমার কাছে, যেখানে-সেখানে এই কথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শুনে-শুনে আপনাদের মাথা ধরার উপক্রম হয়েছে। এই ধরুন আপনি হয়ত কোনদিন নববধূর সংগে হাসতে হাসতে হাঁটছেন, অথবা পা দোলাতে দোলাতে খবরের-কাগজ পড়ছেন আর বার বার ট্রেন আসছে কিনা উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে নিচ্ছেন ঠিক সেই সময় আমি আপনার পাশ দিয়ে চলে যাই। আমার একটি ধান্দা ঃ বুট-পালিশ। এইটেই আমার লক্ষ্য।

আশ্চর্য আমার কথা আপনার কানে ঢুকতে না ঢুকতেই আপনি মুখ ঘুরিয়ে নেন। মুখে কৃত্রিম একটা গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করেন। যাতে আপনার ঐ মুখ দেখে ভড়কে গিয়ে আমি সরে পড়ি। আপনার ঐ অগ্নি-দৃষ্টি দেখে ভয় পাওয়ার পাত্র আমি নই। ও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। আপনি যখন না বলে পিছু হটেন আমি ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার বুটজুতো ধরে বলি, বেশী নয় বাবু, মাত্র এক-আনা। খুব সুন্দর পালিশ করে দেব। আরশির মত মুখ দেখা যাবে। তারপর আমি আমার ছোট্ট বাক্সের ভিতর থেকে পালিশের ডিবে আর ব্রাশ বের করি। ঠিক এই অবস্থায় কেউ না করতে পারে না। এক আনার তো ব্যাপার। পা বাড়িয়ে দেয়। আমি মাথা গুঁজে এক-মনে পালিশ করে যাই। যতক্ষণ না চকচক করে আমি স্বস্তি পাই না।

পাঁচ বছর বয়স থেকে আজ দশ বছর এই বুট-পালিশ ছাড়া আর কোন কাজ আমি করিনি। বুট-পালিশ আর আমি এবং আমি আর বুট-পালিশ। এ-কাজ ছেড়ে দিলে আমি অকূল-পাথারে পড়ে যাব। বাঁচতে পারব না।

শুনে নিশ্চয়ই আপনি আশ্চর্য হবেন না। কারণ, আশ্চর্য হওয়ার মত কোন ঘটনাও আমি বলতে যাচ্ছি না। জানেন, এ-দুনিয়ায় আমার বলতে কেউ নেই। আমিও কারোর নই। বাবা-মাকে চোখে দেখিনি। তারা যে কারা, কোথায় আছে কিছুই জানি না। জ্ঞান হওয়ার পরে দেখি আমি এই অবাক পৃথিবীতে এক বুড়ো ভিখিরীর কাছে আছি। সেই আমাকে কোলেপিঠে করে অত্তবড় করেছে। আমার বয়সী আরও দশ-বারটি অনাথ ছেলে তার কাছে ছিল। শহরের বাইরে এক দীর্ঘ ধর্মশালায় আমরা ছিলাম। প্রত্যেক ছেলেরই এক ধান্দা ঃ বুট-পালিশ। সকাল-সন্ধ্যে আমরা কাজ করে যা পাই তা তুলে দিই ঐ বুড়োর হাতে। সেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করত। ওর নামও আমি জানি না। বুড়ো বেচারা বারো-মাস কাশতো। এই কাশতে-কাশতেই দুর্বল শরীরে আমাদের জন্য রান্না করত। আমাদের সবাইকে সে নিজের ছেলের মত দেখত। সবাই তাকে দাদা বলে ডাকতাম। বুড়োটা একদিন শেষ-বারের মত কেশে মুখে আঁজলা-আঁজলা রক্ত তুলে মারা গেল। আমরা আবার অনাথ হয়ে গেলাম। অকূলে কূল পাওয়ার চেষ্টা করলাম। আস্তে-আস্তে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দিন কাটাতে লাগলাম।

সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারি না। আমি অসুস্থ ছিলাম। বুড়োটা আমার গায়ে হাত দিয়ে বলল, গা তেতে আছে, জ্বর হয়েছে, আজ কাজে যেও না। বিশ্রাম কর। একটা চট বিছিয়ে আমাকে শুইয়ে দিয়ে গায়ের ওপর আর একটি চট দিয়ে ঢেকে দিল আমাকে। আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, আজ এখানে পড়ে জ্বরে ভুগছ আর তোমার মা হয়ত এখন ইমারতে বসে হাসছে অথবা গান গাইছে।

—আমার মা!

আমার মা যে বেঁচে আছে সেদিন প্রথম আমার মনে হল। আমি জানতাম অন্যের যেমন মা হয় আমারও তেমনি মা একজন ছিল। এতদিন আমার ধারণা ছিল আমার জন্মের পরেই মা মারা গেছে। বাবারও হয়ত একই গতি হয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে জানলাম মা বেঁচে রয়েছে—কোথাও হাসছে বা গান গাইছে, আমি খুব দুঃখ পেলাম। হৃদয় আমার বিদীর্ণ হল। তাকে আমার দেখা চাই—চাই-ই। মায়ের কোলে মুখ

লুকিয়ে একবার অন্তত বসতে না পারলে আমার এ-জন্ম বৃথা।

—দাদা, আমার মা কোথায়?

বুড়ো সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কি জানি—কোথায়? তবে মনে হচ্ছে বেঁচে আছে।

—দাদা তুমি কি তাঁকে দেখেছো?

—না। দেখলে কি আর আজ তুমি এখানে পড়ে থাকতে—এই অবস্থায়। কত আদর পেতে।

বুড়ো আরও কত কী বলেছিল মনে নেই। সব কথা ঠিক বুঝতেও পারিনি। এটুকু বুঝেছিলাম যে আমার জন্মের পরে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছে। কেউ আমার মায়ের কুমারীত্ব নষ্ট করেছে। তারই ফলে হয়েছে আমার জন্ম। সমাজের ভয়ে জন্মের পর-মুহূর্তেই আমাকে ফেলে গেছে একটি মন্দিরের পিছনে। তারপর আমার শরীরের সেই মাংসের পুঁটলি নজরে পড়ল এই বুড়োর। বুড়ো আমাকে কোলে তুলে নিল। এই বুড়োর বউ নাকি আমাকে নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করত। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বুড়ী মারা গেল।

—আমার মা আমাকে এ-ভাবে ফেলে গেছে কেন দাদা?

—ওসব তুমি বুঝবে না। বড়-লোকের ঘরের ব্যাপারই আলাদা। এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। এখন ঘুমিয়ে পড়।

—একটি কথা, মা কি এখনও বেঁচে আছে?

—থাকবে না কেন! হয়ত কাউকে বিয়ে করে সুখেই আছে।

—আচ্ছা আমার কথা কি তার মনে জাগে না?

—কেন জাগবে না। সমাজের ভয়ে একদিন তোমাকে ফেলে গেছে, কিন্তু তাই বলে কি মায়ের মন তার সন্তানের জন্য তোলপাড় করবে না। আজও সে নিশ্চয়ই তোমাকে ফেলে যাওয়ার কথা ভুলতে পারেনি। হয়ত তোমার জন্যে মাঝে মাঝে দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলে।

বুড়োর কথা শুনে বুকটা আমার ভার হয়ে গেল। আবেগে বললাম, দ'দা, যে করেই হ'ক আমার মাকে খুঁজে বের করো, অন্ততঃ একটি বার আমি দেখব। বুড়ো কোন কথা না বলে আমার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। সেরে উঠে আমি পাগলের মত আদা-জল খেয়ে উঠেপড়ে মাকে খুঁজলাম। কোন মহিলাকে দেখতে পেলেই ছুটে যেতাম তাঁর কাছে। ড্যাব ড্যাব করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমার মুখের আদলের সঙ্গে মিল খোঁজার চেষ্টা করতাম। কোন মায়ের কোলে ছোট্ট শিশুকে দেখলে বুক আমার ধক্ করে উঠত। মনে হত ঐ ছোট্ট শিশুটিকে কোথাও ফেলে আসার জন্য তার মা যাচ্ছে। সিনেমার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আমি চেষ্টা করতাম আমার মাকে খুঁজে বের করার। বুড়োর মুখে যা শুনেছিলাম তাতে মনে হ'ল আমার মা খুব ধনী পরি-বারের। তাই দামী শাড়ি-পরা কোন মহিলাকে দেখলেই কাছে গিয়ে তাঁর মুখ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতাম।

একদিন একটি থিয়েটার হলের কাছে দাঁড়িয়ে খুঁজছি আমার মাকে। এক দম্পতি ট্যাক্সী থেকে নামল। তাঁদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুলে পর্যন্ত আভিজাত্যের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে ঐ মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সৌভাগ্য আমার। সেও আমার দিকে তাকাল। সেও যেন কাউকে খুঁজছে। বুকে আমার তোল-পাড় শুরু হল। সেও আমাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। তার গৌরবর্ণ চেহারায় ফুটে উঠেছে একটা মমত্ব, তার বড় বড় চোখে স্নেহের ভাষা। তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় সে আমারই মত কাউকে খুঁজছে। আমাকে যেন সে জড়িয়ে ধরতে চায়। আমাকে সে জড়িয়ে ধরে মায়ের মত যেন আদর করতে চায়। যাক্, আমি মা খুঁজে পেয়েছি। এতদিনে ঠাকুর আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন......আমার কপাল ফিরেছে। আমার মাকে আমি পেয়েছি! কতদিন ধরে আমি মাকে খুঁজছি। আজ আমি তাঁকে পেয়েছি।

আমার নোংরা জামা-কাপড়ের কথা সে মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার চুলে যে একফোঁটা তেল পড়েনি তাও ভুলে গিয়েছিলাম। এমন কি আমি যে একজন বুট-পালিশওয়ালা সে-কথাও আমার মনে ছিল না। আনন্দে আমার মন কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। আমার সেই মা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—আমিও তাঁর দিকে। কিন্তু পর-মুহূর্তে ব্যাগ থেকে একটি সিকি বার করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর তাঁর স্বামীর হাত ধরে হলে ঢুকে গেল।

আমি যেন স্বপ্নে বিভোর হয়ে-ছিলাম এতক্ষণ। ঐভাবে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে যেন মা আমার প্রতি সবচেয়ে বড় ঘৃণা প্রকাশ করল। কত বছর পরে মার দর্শন পেলাম তাতেও এই ঘটল! জীবনটা বড় ফাঁকা মনে হল। বাঁচা দুঃসহ হয়ে উঠল। সিকিটা ফেলে দিয়ে সেই থিয়েটার হলের গেটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। পা-গুলো যেন আমার অবশ হয়ে গিয়েছিল। আকাশ-পাতাল ভাবছি। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে আমার মাকে আমি পেয়েছি! কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার সমস্ত ভাবনার খেই হারিয়ে যাচ্ছে।

তবু একটি ইচ্ছা মনে মনে দানা বাঁধছে। নাটক শেষ হওয়ার পর ওরা বেরোবে। তখন নিশ্চয়ই আর একবার আমার দিকে তাকাবে। মায়ের সস্নেহ দৃষ্টি আর একবারু দেখতে পাব।

অনেক রাত্রে নাটক ভাঙল। ওরা বেরিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না।

সে-রাত্রে আমার চোখে ঘুম ছিল না। একটি বাউল-মন বার বার আমাকে বিছানা থেকে তুলতে চাইল। নিয়ে যেতে চাইল পথেঘাটে বাজারে-স্টেশানে। পারলাম না আর শুয়ে থাকতে। উঠে অনেকক্ষণ ঘুরে শেষে স্টেশানের এক কোণে গুটিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

এখনও আমাকে কে যেন পথে-ঘাটে ঘোরায়। মহিলাদের দিকে তাকানো আমার একটি যান্ত্রিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বুড়োর কাছে শুনেছি মা আমার বেঁচে আছে। না থাকলে অন্য কথা কিন্তু আমার মা যে আছে। নিজের চোখে দেখেও কি সে নিজের ছেলেকে চিনতে পারবে না! যে হাজার-হাজার মহিলাকে আমি দেখেছি তাদেরই মধ্যে হয়ত আমার মা আছে। কিন্তু আমি চিনতে পারব কি করে!

হ্যাঁ—যে কথা বলছিলাম, এই দুনিয়ায় আমার নিজের বলতে কেউ নেই। আমি নিজের নামই জানি না। জানব কি করে আমার নামকরণই হয়নি। লোকে আমাকে 'বুট-পালিশ' বলে ডাকে। যাক নামে কি এসে যায়। মা বেঁচে থাকতেও যখন মাকে খুঁজে পাচ্ছি না, বাবা যে কে তা যখন জানি না তখন নিজের নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না। আমি এই অবাক পৃথিবীর একজন নামগোত্রহীন ছেলে। যে পুরুষের জন্য আমার জন্ম সে আমাকে স্বীকার করতে চায় না। যে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছে, এই পৃথিবীতে এনেছে সে আমাকে কলঙ্ক মনে করে! কার পাপে আমার এই সাজা? আমি এমন কি পাপ করেছি? কোন প্রয়োজনে আমি এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি? বেঁচে থাকার জন্যই তো আমাকে বুট-পালিশ করতে হচ্ছে। এ-কাজ ছেড়ে দিলে আর কিছুই থাকবে না। কোন আশায় বাঁচব? কার প্রতীক্ষায় দিন গুনবো......

—পালিশ ......বুট-পালিশ ......মাত্র এক আনা বাবু......

ইউরোপীয় খোলা বাজার

বরুণকুমার মজুমদার

ইউরোপের খোলা বাজারে বৃটেনের যোগদানের সিদ্ধান্ত ভারতের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক মহলকে রীতিমত চিন্তিত করে তুলেছে। সম্প্রতি যে কমনওয়েলথ প্রেস সম্মেলন হয়ে গেল নয়াদিল্লীতে তাতেও এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বৃটেন যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত খোলা বাজারে যোগ দেয় তবে তাতে কমনওয়েলথের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

ভারতের বিভিন্ন মহলের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এই দুশ্চিন্তা অবশ্যই অমূলক নয়। তবুও সাধারণভাবে হয়ত এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একটি ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থায় ইউরোপেরই একটি দেশ হিসাবে বৃটেন যদি যোগদান করে তবে ভারতের বৈষয়িক স্বার্থ তাতে কেমন করে ক্ষুন্ন হবে। বিষয়টি সঠিকভাবে জানা যাবে যদি ঐ ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাটির গঠন ও কার্যক্রমের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায়।

১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লাক্সেমবুর্গ, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও ইতালী—পশ্চিম ইউরোপের এই ছয়টি দেশ রোমে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে একটি বাণিজ্য সংস্থার পত্তন করে এবং '৫৮ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার কাজকর্ম শুরু হয়। এই বাণিজ্য সংস্থাটিরই নাম ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি, যাকে বাঙলায় সাধারণ বাজার, বারোয়ারী বাজার, খোলা বাজার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

মোটামুটিভাবে এই খোলা বাজারের দুটি উদ্দেশ্য। এক, বাণিজ্য সংস্থার অন্তর্ভুক্ত সকল সভ্য রাষ্ট্রের সমান আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি করা। যখন খোলা বাজারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে রূপায়িত হবে তখন একজন ইতালীয়ের জার্মানীর যে কোন স্থানে দোকান খোলার স্বাধীনতা থাকবে, একজন জার্মান শ্রমিক তার শ্রেষ্ঠতর কর্মপটুতার জোরে একজন ফরাসী শ্রমিককে ফ্রান্সেরই একটি কারখানা থেকে স্থানচ্যুত করতে পারবে, আবার ফরাসী শ্রমিকও একই অধিকারে কাজ পাবে হল্যান্ডে, ইতালী বা লাক্সেমবুর্গের যে কোন খনিতে বা কারখানায়। ঠিক যেমন আজ বাঙলার মানুষ অবাধে কাজ পেতে পারে মাদ্রাজে বা একজন মারাঠী শ্রমিক কাজ পেতে পারে কলকাতায়।

দ্বিতীয়, বহির্বিশ্বের সঙ্গে এই সংস্থাভুক্ত রাষ্ট্রগুলির যাবতীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক একই রকম হবে। সংস্থাভুক্ত কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য, কৃষি বা পরিবহণ সম্পর্কিত কোন চুক্তি স্বাক্ষর করবে না। জাতীয় নীতি সকল সদস্য রাষ্ট্রের একই রকম হতে হবে এমন কোন কথা চুক্তিতে না থাকলেও এটুকু বোঝাবুঝি আছে যে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নীতি নিরূপণ কালে কোন সদস্য-রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের কথা বিস্মৃত হবে না। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সংস্থাভুক্ত ছয়টি রাষ্ট্রই উত্তর অতলান্তিক শক্তি জোটের সদস্য।

তিনটি পর্যায়ে খোলা বাজারের কাজ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হবে। প্রত্যেকটি পর্যায়েরই সময় চার বছর। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার কথা '৬২ সালের শেষে। তবে কোন সভ্য-রাষ্ট্র যদি চুক্তির সর্তমত এগিয়ে চলতে না পারে তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ তিন বছর পর্যন্ত পেছিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু প্রত্যেকটি পর্যায়ের কাজ শেষ হতে যত দেরীই হোক না কেন ১৯৭৩ সালের মধ্যে খোলা বাজারের যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণরূপে চালু হবেই। আর ঠিকমত কাজ চললে ১৯৭০ সালেই তা সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যেই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি ৪০ শতাংশ আভ্যন্তরীণ শুল্ক কমিয়ে ফেলেছে এবং আগামী বছরের মধ্যে আরও ১০ শতাংশ কমিয়ে ফেলবে। ১৯৬৫ সালের মধ্যে (খুব দেরী হলে '৬৮ সাল) সংস্থাভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে ৬০ শতাংশ আভ্যন্তরীণ শুল্ক কমিয়ে ফেলার কথা। আর ১৯৭০ সালে (সর্বশেষ '৭৩ সালে) সংস্থাভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ শুল্ক বলে আর কিছুই থাকবে না।

১৯৭০-৭৩ সালের মধ্যে সংস্থাভুক্ত দেশগুলির মধ্যে শ্রমিকদের অবাধ ভ্রমণ ও বিনা সর্তে কর্মলাভের অধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হবে। ১৯৬২ সালের মধ্যে সকল দেশের শ্রমিকের মজুরি অবশ্যই সমান হবে। শ্রম আইন বা সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়গুলিতেও সভ্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বুঝাপড়া থাকবে।

সংস্থাভুক্ত রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশগুলিকে (শুধু আফ্রিকার মরক্কো ও টিউনিসিয়া বাদ), যার অধিকাংশই এখন স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের সকলকে ১৯৬২ সালের পর সহযোগী সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হবে। সহযোগী সদস্য দেশগুলি ১৯৭০-৭৩ সালের মধ্যে ইউরোপের খোলা বাজারের বিশেষ সুবিধাগুলি ভোগ করবে, যা আফ্রিকার বা এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির থাকবে না। অর্থাৎ ইউরোপের খোলা বাজারের সদস্যরূপে প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ সেনেগল, মালি, মালাগাসি প্রভৃতি দেশগুলি যেভাবে বিনা শুল্কে জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করার সুযোগ পাবে বা ঐ সকল দেশ থেকে সস্তায় পণ্য আমদানি করতে পারবে বা ঐ সকল দেশে গিয়ে কাজ পাবে, কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসাবে ঘানা, নাইজেরিয়া বা এশিয়ার ভারত, মালয় প্রভৃতি দেশগুলির সে সুযোগ থাকবে না। এর পর বৃটেন যখন কমন মার্কেটের সর্তগুলি মেনে নিয়ে ঐ বাণিজ্য সংস্থাটিতে প্রবেশ করবে তখন কমনওয়েলথে থাকার জন্য বৃটেনের কাছ থেকে যে বাণিজ্যিক সুবিধাটুকু কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি পাচ্ছিল তাও আর পাওয়া সম্ভব হবে না। ভারত, মালয়, ঘানা বা নাইজেরিয়ার কাছে অর্থনীতিক সুযোগের বিচারে বৃটেন ও জার্মানী বা ফ্রান্স বা ইতালী একই পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং পর পর এশিয়া বা আফ্রিকার প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশগুলির কাছে কমনওয়েলথের আর কোন আকর্ষণই থাকবে না। এই কারণেই এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বৃটেন যদি ইউরোপের খোলা বাজারে যোগ দেয় তবে কমনওয়েলথের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, বৃটেনের সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিও যদি ইউরোপের খোলা বাজারের সহযোগী সদস্য হয় তবে তারাও ঐ প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলির মত ইউরোপের খোলা বাজারের বিশেষ সুযোগগুলি ভোগ করার অধিকার অর্জন করবে। তা হয়ত করবে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বৃটেনের সঙ্গে কয়েকটি কমনওয়েলথভুক্ত দেশ অবশ্যই তার অনুগামী হবে। কিন্তু ভারত, সিংহল, ঘানা প্রভৃতি দেশগুলির পক্ষে এটা কোন মতেই সম্ভব হবে না। কারণ এক্ষেত্রে অর্থনীতির চেয়েও রাজনীতির প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেবে। যে কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে, ইউরোপের খোলা বাজারের অন্তর্ভুক্ত সকল রাষ্ট্রসদস্যই উত্তর অতলান্তিক চুক্তি জোটের (NATO)

অন্তর্ভুক্ত, এবং মূলত পূর্ব ইউরোপের সুসংবদ্ধ কমিউনিস্ট শক্তিজোটের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এই রাজনীতি-অনুপ্রাণিত অর্থনীতিক শক্তিজোট গড়ে তুলেছে। ইউরোপের খোলা বাজারের মূল অনুপ্রেরণা এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। ১৯৪৮ সালে মার্কিন কংগ্রেসে এই বিষয়ে যে পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়েছিল তার খানিকটা উল্লেখ করলেই ইউরোপের খোলা বাজার সম্বন্ধে মার্কিনী মনোভাব বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে। তাতে বলা হয়— "....it is declared to be the policy of the people of the United States to encourage these countries (i.e. the countries of Europe) through a joint organisation to exert sustained economic efforts .... which will speedily achieve the economic co-operation in Europe which is essential for lasting peace and prosperity".

প্রকৃতপক্ষে NATO যেমন পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শিবিরের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপের সামরিক শক্তিজোট, ইউরোপের কমন মার্কেট বা খোলা বাজারও তেমনি পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতিক শক্তিজোট। এই কারণেই বিশ্বরাজনীতিতে নিরপেক্ষতাকামী কোন দেশের পক্ষে ইউরোপের খোলা বাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপেরও সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড প্রমুখ দেশগুলির পক্ষে এই অর্থনীতিক জোটে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না।

এখন প্রশ্ন হ'ল যে, বৃটেন হঠাৎ তার এত দিনের নীতি পরিবর্তন করে, কমনওয়েলথকে পথে বসিয়ে এইভাবে খোলা বাজারে যোগ দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন? এর এক কথায় উত্তর দিয়ে বলা যায়, গরজে। যতদিন বৃটেনের একক শক্তিতে চলার ক্ষমতা ছিল ততদিন সে একাই চলেছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিকে বৃটেনে বাণিজ্য করার বিশেষ সুবিধা দিয়ে সে কমনওয়েলথ ও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির বাজার দীর্ঘকাল একচেটিয়া করে রেখেছিল। এ ছাড়াও লাতিন আমেরিকায় ছিল তার বিরাট বাণিজ্যিক স্বার্থ। কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে আজ প্রায় সকল বাজারই তার হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে। লাতিন আমেরিকা বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার অর্থনীতিক এক্তিয়ারভুক্ত। আর এশিয়া ও আফ্রিকায়, বিশেষ করে আফ্রিকায় আজ তার বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে জার্মানী। উচ্চহারে মজুরি দিয়ে ও চড়া দামে কাঁচা মাল কিনে বৃটেনের পক্ষে কিছুতেই আর জার্মানীর মত সস্তা দামে বিশ্বের বাজারে মাল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তারপর খোলা বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ শুল্কের হার যত কমবে জার্মানী, ফ্রান্স বা খোলা বাজারের অন্তর্ভুক্ত শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলির পক্ষে আরও সস্তায় কাঁচা মাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, যার মানে আরও সস্তা দরের জিনিসে তারা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারে ছেয়ে দিতে পারবে। আর বৃটেনের পক্ষে সে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমরা কমনওয়েলথের ভেতরে আছি মুখ্যত অর্থনীতিক সুবিধার খাতিরে, অর্থাৎ শিল্পসমৃদ্ধ বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনে কিছুটা সুবিধা হয় বলে। কিন্তু তাই বলে সেই সুবিধার বিনিময়ে এমন কোন সর্ত স্বীকার করে নিইনি যে, জার্মানী বা ফ্রান্সের কাছে আমাদের পণ্য বেচব না বা তাদের কাছ থেকে বৃটেনের চেয়েও সস্তা দরে মাল পেলে তা কিনব না। এ কারণে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি আজ বৃটেনের কাছ থেকে যা সুবিধা পাওয়ার তা ত নিচ্ছেই, পরন্তু জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলছে। ফলে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিতেও আজ বৃটেন নিজের দেশে বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়েও একচেটিয়া বাণিজ্যিক সুযোগ বজায় রাখতে পারছে না। শুধু তাই নয়, খোলা বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক বাধা যতই অপসারিত হবে ততই সস্তা হবে তাদের পণ্য। আর ততই কমনওয়েলথ সমেত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বাজারে সঙ্কুচিত হবে বৃটেনের বাণিজ্য।

এ অবস্থায় কমনওয়েলথ বৃটেনের কাছে একটা অবাঞ্ছিত দায় বলে বিবেচিত হলে তাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না। আজ আর বৃটেন বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর শক্তি নয়, সে মর্যাদাও তার ভবিষ্যতে ফিরে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কমনওয়েলথও আজ আর একটা সুখী পরিবার নয়, বিভিন্ন বাণিজ্যিক, রাজনীতিক ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থ তাকে বহুধা বিভক্ত করে একটি বর্ণহীন, বৈশিষ্ট্যহীন অতি দুর্বল সংগঠনে পরিণত করেছে। কমনওয়েলথভুক্ত সকল দেশ বৃটেনের কাছে বাণিজ্যিক বিশেষ সুবিধার দাবীদার, কিন্তু বৃটেনের কোন পাল্টা অর্থনীতিক বা রাজনীতিক সর্ত তাদের কেউ মানতে রাজী নয়। তার ওপর কমনওয়েলথভুক্ত সকল দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক বিনা বাধায় বৃটেনে অবতরণ করে তার অর্থনীতিক কাঠামোকে রীতিমত বিপন্ন করে তুলেছে। এ অবস্থায় পণ্যজীবী বৃটেন যদি খোলা বাজারে যোগ দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে আপোসে আসতে চায় তবে সেইটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক কাজ বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া বৃটেন এটাও জানে যে, কমনওয়েলথভুক্ত শ্বেতকায় দেশগুলি বা আফ্রিকারও সদ্যস্বাধীন অনেকগুলি উপনিবেশের সঙ্গে তার খোলা বাজারে যোগ দেওয়ার পরেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে না। বৃটেনের খোলা বাজারে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিবাদ কেবল ভারতের পক্ষ থেকেই উঠেছে, কারণ নিরপেক্ষ ভারতের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হবে না পশ্চিমী শক্তিজোট-সৃষ্ট ইউরোপের খোলা বাজারে যোগ দেওয়া। আবার বৃটেনও সে প্রতিবাদে কর্ণপাত করছে না এই জন্যে যে, ভারতের বাজার আজ আর তার একচেটিয়া নয় এবং বর্তমান ব্যবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে যত দিন যাবে ততই জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সস্তা দরের পণ্যের তাড়নায় তাদের পিছু হঠে আসতে হবে। সুতরাং বৃটেনের ইউরোপের খোলা বাজারে যোগদানের সিদ্ধান্ত অপ্রতিরোধ্য, অপরিবর্তনীয়।

অতএব নতুন করে ভাববার কথা এখন ভারতেরই। সকল সর্ত মেনে নিয়ে বৃটেন যখন ইউরোপের খোলা বাজারে যোগ দেবে তখন বৃটেনে ভারতের বাণিজ্যিক বিশেষ সুবিধা আর কিছুই থাকবে না, বৃটেনের মৌখিক শত আশ্বাস সত্ত্বেও। তখন বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতের কাছে বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স সমপর্যায়ভুক্ত হবে। বৃটেনে ভারতবাসীদের অবাধে যাওয়ার যে সুযোগটুকু ছিল, তাও বৃটেনে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হওয়ার পর আর থাকবে না। সুতরাং তারপর শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলার সুযোগটুকু বজায় রাখার আনন্দে ভারতের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকায় আর কোনই অর্থ হবে না। বৃটেনের খোলা বাজারে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের উচিত হবে কমনওয়েলথ ত্যাগ করা এবং প্রতিবেশী বর্মার অনুকরণে একটি স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলা। ও ব্যাপারে বর্মার চেয়ে ভারতের সুযোগ অনেক বেশী। এত বড় একটা বাজারে বাণিজ্য করার সুযোগ পাওয়ার সত্তে সব শিল্পসমৃদ্ধ দেশই সাগ্রহে এগিয়ে আসবে এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে ভারত অতি সাফল্যের সঙ্গেই তার স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারবে।

শহর থেকে মাইল দেড় দূরের গ্রান্ড ট্রাংক রোডের এই ক্যালভার্টে অনেক দিন ধরে ও'রা আসছিলেন—সে আজ অনেকদিন। একটা মুখস্থ ছবি। তিনজন বন্ধু। পরিষ্কার ধবধবে শার্ট গায়ে, তিনজনের হাতেই ছড়ি। লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রত্যহ পাঁচটা না বাজতে বাজতেই ও'রা তিনটিতে একটি হয়ে চলেছেন। বয়স হয়েছে অনেক—একেবারে ঝুনো নারকেল। মাথার চুল সাদা, গাল তোবড়ানো কিন্তু পরিষ্কার করে কামানো। বৈকালিক ভ্রমণ-বিলাসে তরুণের উৎসাহকেও পিছু হটায়। অন্ততঃ শহরের সকলের তাই অভিমত। ও'রা যেন পাল্লা দিয়ে আগিয়ে চলেছেন বার্ধক্যজনিত স্থবিরতার আক্রমণ থেকে নিজদেরকে বাঁচিয়ে। ও'দের হেঁটে যাওয়ার দৃপ্তভঙ্গী, সময়ের মর্যাদাজ্ঞান, পরিচ্ছন্নতা, সর্বোপরি প্রাণোচ্ছলতা দর্শনযোগ্য—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এমন কি বার্ধক্যের যে গাম্ভীর্য নিত্য সহচর তাকেও বিদায় নিতে হয়েছে নিরুপায় হয়ে। ও'রা তিনজন যখন রাস্তা দিয়ে যান তখন ও'দের হাসারোল, প্রগলভতা এবং অঙ্গভঙ্গী মিলিত তিন যুবতী পথচারিণীদের নির্লজ্জ বাচালতাকেও হার মানায়।

দেখলে মনে হবে না যে ও'রাও কোন সময় বিভিন্ন বয়সের নির্দিষ্ট গন্ডীতে ঘুরপাক খেয়েছেন, সেগুলো অতিক্রম করেছেন আনন্দে, বিষাদে, শোকে অথবা শান্তিতে। তবে একটা কথা মনে হয়, যে অধুনা ও'রা এই সব পার্থিব অনুভূতির বাইরে, শুধু মিলিত এই ভ্রমণবিলাসে মাতোয়ারা।

আমার বন্ধু পরমেশ বলছিল যে তার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। সে ও'দেরকে দেখলেই ভাবে তিনটি সুখী লক্কা পায়রা। এককালে চাকরি করতেন। উপারের চেয়ে উপরি পেতেন বেশী। এখন 'রিটায়ার্ড লাইফ'। ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, নাতি-নাতনী—মোট কথা কাঙ্ক্ষিত বস্তুসকল আমলকীর মতই ও'দের আয়ত্তে। বাহ্যিক যে প্রকাশ সেটা অকিঞ্চিৎকর, অগোণ। আসলে তিনজনেই নিতান্ত স্বার্থপর ভোগী। বিকেলের এই বেড়ানোটা নেহাত বাতের হাত হ'তে রেহাই পাওয়া এবং আরও কিছুদিন সক্ষমভাবে বাঁচা ও অনিদ্রাজনিত অভিশাপের থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা অবলম্বন মাত্র।

কেন যে পরমেশ ও-সব কথা বলে আমি বুঝি না। মালতী সান্যালের সঙ্গে আলাপের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেননি মালতীর দাদু ভবতারণ সান্যাল। তাছাড়া মালতীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেও পরমেশের কিছু ক্ষতি হবে না বলেই মনে করি। মালতী ছাড়াও ডজনখানেক রমা, মাধুরী, শিপ্রা পরমেশকে ঘনিষ্ঠ করে পেতে চায়। ও নাকি চিঠির জবাব দিতে হাঁফিয়ে উঠেছে। বলে—সব চিঠিগুলোর বক্তব্য যখন এক তখন আর হাতে লিখে উত্তর দিতে পোষাচ্ছে না। একটা কিছু জবাব লিখে টাইপরাইটারে কার্বন কপি করলে সময়ের সাশ্রয় হবে, শুধু সম্বোধনগুলো আলাদা আলাদা করলেই গোলযোগ থাকবে না। ও চিরদিনই ঐ রকম। সাধারণ ক্ষেত্রে অসাধারণ কিছু বক্তব্য পেশ করে বাহবা কুড়োতে ওর নাকি আনন্দ বেশী। আমাকে শুনতে হয় পরমেশের কথা মনোযোগ দিয়ে। তাতে একটা লাভ সময়ের অপচয় হয় না। তা না হলে যতক্ষণ না আমি সায় দেব ততক্ষণ অনর্গল বলে যাবে কিছু-না-কিছু একটা অবলম্বন করে। এবং বক্তব্যের মাঝে যদি প্রতিবাদের বেড়া বাঁধতে যাওয়া হয় তা হলে একটা খুনোখুনি কান্ড ঘটে যেতে পারে—এমন কি প্রতিবাদ যদি কৌতুহলের নামাবলী জড়িয়ে হাজির হয় তাহলেও। আমি ওকে বলেছিলাম যে তোমার অপোজিসন পার্টির লীডার হলে বেশ মানায়। শুনে খুশী হয়েছিল। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে ও কিন্তু সত্যিই বুদ্ধিমান।

ওই বৃদ্ধত্রয়ের সম্পর্কে পরমেশের ধারণা কেন যে এমনতর বিরূপ সে কথা জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে যা শুনেছিলাম তা হলো এই যে, নিতান্ত ভন্ড এবং দাম্ভিক ও স্বার্থপর না হলে কি ও'রা বারো মাস তিরিশ দিন ঠিক একই সময়ে এমনি ঝকঝকে, হাসিতে, গল্পে মশগুলে হয়ে বেড়াতে বের হতে পারেন। ও'দের বাড়ীতে সমস্যা আছে, রোগ আছে শোক আছে, আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত আছে;

কিন্তু কিছুতেই ও'রা নিজস্ব স্ফূর্তিকে দিনেকের জন্য বিসর্জন দিতে রাজী নন।

একথায় প'রে যদি কেউ বলে যে না, ও'রা অন্যান্ তাহলে পরমেশ তাঁকে তর্কে আহ্বান জানাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে তর্কে যদি মীমাংসা না হয়, পরমেশ হয়ত অবশেষে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধেও আমন্ত্রণ জানাতে কুণ্ঠিত হবে না।

যাই হোক ওসব কথা থাক। পর-মেশের কথা আরম্ভ হলে তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়াই ভালো।

যে কথা বলছিলাম তাতেই ফিরে আসা যাক, অর্থাৎ এই বৃদ্ধত্রয়ের কাহিনীতে। ভবতারণ সান্যাল, নবঘন সেন আর নলিনী শর্মা অতি দ্রুত ব্যস্ততাকে মাথায় ক'রে নির্দিষ্ট ক্যাল-ভার্টে এসে বসেন—বেশ কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসেই থাকেন। অনেকটা পথ হে'টে এসে হাঁফ ছেড়ে বিশ্রাম নেন। সারে সারে কখনও বা দু'-একখানা বাস, লরী, মোটর তীব্রগতিতে পেরিয়ে যায়। উজ্জ্বল একটা শাটিনের মতো গ্রান্ড ট্রাংক রোডটা পড়ে থাকে। তার দু'পাশে হরেক রকমের গাছ-গাছালি বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় মনোহর হয়ে ওঠে বিভিন্ন ঋতুতে। মাননীয় অতিথি সমাগমে নির্মিত তোরণের মতো প্রকৃতির এই সুসজ্জিত নিকেতনে ওঁরা তাদের সংগী হয়ে পরম তৃপ্তিতে বিকেলটা কাটান। পরে সূর্যমেজা হাল্কা অন্ধকারে পুন-রায় উঠে পড়েন।

মাঝে মাঝে অবশ্য বৈচিত্র্য সাধনের নিমিত্ত ভবতারণ সান্যাল রাস্তার পাশ থেকে ছোট ই'টের টুকরো অথবা পাথর কুচি কুড়িয়ে আনেন। ক্যালভার্টের বাঁধানো মসৃণ পিঠে ছক কাটেন ই'ট দিয়ে। বাঘবন্দী খেলা জমে ওঠে। কৈশোরের উত্তাপকে অনুভব করেন সান্যাল আর শর্মা। ঝগড়া-ঝাঁটি পর্যন্ত হয়। এমন কি কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফিরবার সময় এমনিতেই কথা খুব কম হয়। তবু যেদিন মনোমালিন্য হয় সেদিন যেন নিস্তব্ধতাটি প্রবলভাবে অনুভূত হয়। নবঘন সেন এ খেলায় যোগদান করেন না। তিনি দেখেন অথবা দেখেন না তবে মাঝে মাঝে তাঁকে মধ্যস্থতা করতে হয়। না করলে উপায় থাকে না।

হেড লাইটের তীক্ষ্ন দ্যুতিতে বাড়ী ফেরার পথ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হাত দিয়ে টেনে ধরেন সান্যাল শর্মাকে—সরে এসো, চাপা পড়ে মরবে।

শর্মা ঝাঁকিয়ে হাত সরিয়ে দিয়ে রাস্তার ধুলোতে নেমে আসেন।

—খেলায় হেরে গিয়ে তেজ দেখ সেন।

ঐ পর্যন্তই। পরের দিন আবার সেই অন্তরংগ তিনজন।

নবঘন সেনের ভূমিকাটা ওরই মধ্যে স্বতন্ত্র। সান্যালের যেমন নস্যি শর্মার তেমনি খৈনী আর সেনের গীতা। ও'রা দু'জন যখন বাঘবন্দী খেলেন বা খেলেন না, এমনি বসে থাকেন, সেন তখন পকেট থেকে বের করেন ছোট্ট একটি গীতা—সর্বশাস্ত্রের শিরশ্চূড়ামণি। বের করা হয় ঐ বা, খুলবার দরকার হয় না। কারণ আগাগোড়া কণ্ঠস্থ। বারো বছর বয়েস থেকে পড়ছেন। অনর্গল বলে যেতে পারেন। শুধু কী বলা। প্রতিটি শ্লোকের ব্যাখ্যায়, তুলনামূলক আলোচনায়, বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিতদের মতামত উল্লেখে সেনের বক্তব্য সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। ওটি তাঁর কাছে গ্রন্থ নয় তাঁর আত্মার আত্মীয়। তাই, বলে শেষ হয় না। একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

বিকালের স্নিগ্ধ অবকাশে হয়ত তিনজন ক্যালভার্টে বসে। মাথার উপরে একটা শিরিষ আর অশ্বত্থ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। ঢলে-পড়া সূর্যের নরম আলোয় ঘনসন্নিবিষ্ট পাতার ফাঁক দিয়ে আশে-পাশের সমস্ত স্থানটিতে একটি চমৎকার জাফরির জটিল নকশা করে দিয়েছে। দূরাগত মোটর-ট্রাকের গুঞ্জন-ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে শিরীষ গাছটাতেই রয়েছে অথচ দেখা যাচ্ছে না এমনি গোপন স্থান থেকে একটা তিলে-কোকিল ডাকছে, অন্যান্য পাখিদের কল-রব প্রভৃতি মিশিয়ে একটা উপভোগ্য রমণীয়তা। ভবতারণ সান্যাল কৌটোটা খুলে তর্জনী ডুবিয়ে কৌটোর গা থেকে একটিপ নস্য সবে উর্ধমুখী করেছেন অথবা শর্মার খৈনী রীতিমতো প্রস্তুত, এখন শুধু পরম আয়াসে অধরায়ত্ত করলেই হয়, এমন সময় অনচ্ছে মাতব্বরি ঢঙে প্রশ্ন করে সেন—বলত সান্যাল 'গীতা' শব্দটাকে ওল্টালে কী হয়?

একটি চমৎকার সুরের সিম্ফনীর মাঝে যেন হাঁড়িচাচা পাখী ডেকে ওঠে।

বেলুন-ফাটা আওয়াজে চেঁচিয়ে ওঠেন শর্মা—তোমার মুণ্ড হয়! বলি ওই কথাটা আর কতোদিন জিজ্ঞেস করবে?

অপ্রস্তুত হয়ে ওঠেন সেন। মুখ কাচুমাচু করেন। সামলে নেন সান্যাল। বলেন—হলেই বা, ও জানবারে বলেই তো জিজ্ঞেস করে। না কী হে নবঘন। তবে শোন 'গীতা' শব্দটাকে ওল্টালে 'তাগী' অর্থাৎ 'ত্যাগী' হয়। মানে হচ্ছে, গীতা যে উল্টে-পাল্টে পড়ে সে ভোগের দিক থেকে ত্যাগের দিকে যায়—তাই না? দেখতো কেমন সুবোধ ছাত্রের মতো তোমার ব্যাখ্যা মনে রেখেছি।

অতঃপর এই প্রসংগ নিয়ে জমজমাট মগ্ন হন আলোচনায় অতল গভীরতায়। আলোচনা অবশ্য করেন সবটাই সেন। বাকী দুজন মুখ কালো করে শোনেন, ধমক খান, ঘাড় নাড়েন। বাড়ী ফেরার পথেও যতক্ষণ না ছাড়াছাড়ি হয় ততক্ষণ সেন বুঝিয়ে চলেন গীতার মাহাত্ম্য। রাত্রে শোবার আগে লণ্ঠনটাকে উসকিয়ে গীতার পাতা খুলে যে শ্লোকটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেখানটার পানে তাকিয়ে থাকেন সান্যাল আর শর্মা। কিছুতেই বুঝতে পারেন না ওই একটা শ্লোক নিয়ে অত কথা সেনের কী বলার ছিল আর বললাই বা কী করে! না ঃ সেন বাহাদুর বটে। তারপর পরম শ্রদ্ধায় বইটি বন্ধ করে মাথায় ঠেকিয়ে "দুর্গা" বলে শুয়ে পড়েন।

দিন যায়। আলাপে উৎসাহে বিকেলটা যে কোথা দিয়ে কেটে যায় টের পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে আপসোস করেন তিনজনেই সারা দিন-রাত্রিরটা যদি বিকেল হতো তাহলে কী স্ফূর্তিই না লাগত।

বিকেলের এই সরল পরিবর্তিত ক্ষণে তিন বৃদ্ধ মগ্ন হন প্রায় জনমানবশূন্য একটি পরিচিত ক্যালভার্টে। সেখানে স্মৃতি-চয়নের পুলকে, বয়সটা যেখানে প্রধান প্রতিবন্ধক ঠিক সেই হেতু বর্তমান পাগ্রসরতার বিপক্ষে, সনাতন ধর্মের মহিমা কীর্তনে, প্রাচীনতার জয়গানে, বয়সানুপাতে নিজ নিজ স্বাস্থ্য ও শারীরিক সামর্থের আলোচনায়, পুত্রদের স্ত্রীদের প্রতি আনুগত্যজনিত ক্ষীণতা ও দৌহিত্রদের দুরন্তপনার কাহিনী বর্ণনায়, বৌমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার নমুনা উল্লেখে, গীতার ভাষ্যে, বাঘবন্দী খেলায়, নীরব নিশ্চল উপভোগে এক একটি বিকেল

মসৃণভাবে গড়িয়ে যাচ্ছিল দিগন্তের গর্ভে—নিরবচ্ছিন্নভাবে।

কিন্তু সেদিনকার সাথে আজ কত তফাত।

নবঘন সেন নিজেকে বড় অসহায় মনে করেন অধুনা। মাত্র মাস খানেকের ব্যবধানে সান্যাল আর শর্মা মারা গেলেন। পুরো এক বছর হলো। সান্যালের মারা যাওয়াটা এত সংক্ষিপ্ত যে বিশ্বাস করা যায় না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বালিশে হেলান দিয়ে এক চটকা ঘুমিয়ে নিতেন। সেদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিকেলে বের হবার সময়টি পার হতে চলেছে দেখে সান্যালের মেজ বৌমা বাবাকে ডেকে তুলে দিতে ঘরে ঢুকে প্রথমে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেননি আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় দেখে। কেউ ভাবতেও পারত না যে তিনি মারা গেছেন অকস্মাৎ। একটি অসাধারণ শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর সংবাদ বেশ অনেকদিন ধরেই লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল। তবে শর্মা ভুগেছিলেন দিন তিন। আপোপ্লেক্সি হেমারেজ ইন দি ব্রেন। নিশ্চেতন হয়ে পড়েছিলেন। ডান ধারটা প্যারালিসিস হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে। কোন রকম যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র ছিল না। সেন দেখতে গিয়েছিলেন। অনেকবার ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু কোন কথাই কানে গেল না। ডাক্তার এসেছিল। চোখের পাতা দুটো আঙুলে করে ফাঁক করে টর্চের আলো ফেলাতে শুধু মণিটা একটু সরে গেল। উঠে চলে এসেছিলেন। সারা রাত ঘুম আসেনি। গীতা পড়েছিলেন তন্ময় হয়ে। সেই তাঁর শেষ গীতা পাঠ। তারপর আর খোলেননি। অদ্ভুত এক ভয় এসে তাঁকে আশ্রয় করেছিল। বলতে গেলে সারা জীবনের সংগী ঐ বইটিকে তিনি এমন কি চোখের সামনে থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

সান্যাল মারা যাওয়ার পরেও ওঁরা দুজনে বেড়াতে বের হতেন। কথায়-বার্তায় সান্যালের প্রসংগ উঠত। আলোচনাতে নিজেদের প্রসংগ এসে পড়ত স্বাভাবিকভাবে। শর্মা বলত—যাবার পালা পড়ল সেন. এবার তৈরী হওয়া যাক্। শুধু ডাকের অপেক্ষায় থাকা।

দরদর করে ঘাম বের হত সেনের। বলত—তুমি থাম শর্মা। হার্টফেল করে মারা গেল লোকটা। এমনি ভুগে ভুগে যদি মরত তাহলে না হয় বোঝা যেত।

ঐ একই কথা সেন। জন্মাবধি যে হার্ট একবার না থেমেও অনবরত

একাদিক্রমে ধুকধুক করছে, ক্ষণেকের তরে বন্ধ হলে সব লীলা সাঙ্গ। ছুটো-ছুটি পড়ে যাবে গঙ্গায় নিয়ে যাবার জন্য, তা সে রোগে ভুগে হোক আর হঠাৎ হার্টফেল করেই হোক।

নির্মম এই সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারই বা আছে। সেন পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে থাকতেন।

সেই শর্মাও গেল। এবার বুঝি তাঁর পালা। ভীতিপ্রদ এই প্রতীক্ষায় তিনি এখন একলা। সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে নির্বান্ধব একলা। এত চেনা জানা আত্মীয়, পুত্র-পৌত্র—এই মায়াময় বন্ধনের লাখো গ্রন্থিতে থেকেও তিনি একক। সান্ত্বনার কথা অবান্তর। তাই পালিয়ে বেড়ান সান্যাল বা শর্মার কথা উঠলে। কথা ওঠে ঘরে-বাইরে—সর্বত্র। ওঁদের ঘন বন্ধুত্বের, বৈকালিক ভ্রমণের নিয়মিত উৎসাহের কথার পরেই সেনের সংগী-বিহীন একক অস্তিত্বের সহানুভূতিপূর্ণ আলোচনাও তাঁর কাছে অসহ্য।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে আগের মতই, তবে বুঝি আগের মতো নয়। আগের সেই প্রতীক্ষিত বিকেলের আগমন ছিল কী দারুণ ঈপ্সিত, আর এখন অনাকাঙ্ক্ষিত বিকেলের উপস্থিতি মর্মান্তিক হয়ে ওঠে সেনের কাছে। মনে হয় যেন বড় তাড়াতাড়ি হাজির হয়, দুপুর শেষে হতে না হতেই। শুধু আসা নয়। তাগাদা দেয় বের হতে। সত্যি বলতে কী ভাল লাগে না আর। রীতিমতো লজ্জা লাগে। এ লজ্জা যে কী রকম বোঝানো বড় মুস্কিল। বের হলে যেন মনে হয় সমস্ত জগৎ সংসারের লোক ইঙ্গিতে তাকেই দেখাচ্ছে, তাঁকেই দেখছে—যে বিচ্ছিন্ন নিঃসংগ। শুধুমাত্র অপেক্ষমান মৃত্যুর করাল গ্রাসের সম্মুখে। তবু বের না হলেও চলে না। ঘরে বসে থাকলেও মনটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে। নাতি কনক এসে বলে—দাদুর কী একলা বের হতে ভয় করে?

সংগে সংগে জড়িয়ে ধরেন বুকে। বলেন—না, না, এই তো বের হলাম বলে।

বিকেলে বের না হলে মনে হয় যেন সবাই তাঁর চারপাশে ঘিরে রয়েছে ছায়ার মতো এবং তাদের ফিস্‌ফিসানি কানে আসে—বুড়োটার হয়ে এসেছে, আর বেরোতেও পারে না।

অতর্কিতে চেঁচিয়ে ওঠেন—বৌমা, আমার লাঠিটা দাও শিগ্‌গীর। কোথায় থাকো তোমরা।

সেনের স্ত্রী হেমনলিনী থপথপ করে আগিয়ে আসেন লাঠি হাতে করে। বলেন—এই নাও, অমন ষাঁড়ের মতো

চাঁচাচ্ছলে কেন? তোমার কী ভীমরতি ধরেছে?

প্রত্যেকের মুখেই এক কথা। হলো কী! এরা কি সবাই জানতে পেরে গেছে নাকি? তাঁর বেঁচে থাকাটা কি অশোভন ঠেকছে সবার কাছে। কিন্তু কেন? তিনি তো এখনো বেশ শক্ত; কোন গোলমালই তো টের পান না। তবে কেন? রুগ্ন বালকের মতো কাঁপতে থাকেন। হাত থেকে লাঠিটা পড়ে যায় ঠকাস্ করে মেঝের উপর। সেন তুলতে তুলতে ভাবেন—কেন পড়ে গেল লাঠিটা! তবে কী তাঁর স্নায়ুগুলো তাদের নিজস্ব ধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে। এমনি করে সব ধীরে ধীরে জরার গ্রাস করবে, আর সর্বশেষে মৃত্যু এসে দাঁড়াবে মুখোমুখি!

এক মুহূর্তে আরও অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েন নবঘন সেন। অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে সেনের হাবে-ভাবে, দেহে-মনে। সান্যাল আর শর্মা মরে গিয়ে তাঁকে যেন একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। মুখে এক মুখ অযত্ন-বর্ধিত গোঁফ দাড়ি।

কনক বলে—দাদুকে একটা বুড়ো ভূতের মতো লাগছে।

হেমনলিনী বলেন—ভূত নয় ব্রহ্ম-দৈত্য। আগে একদিন দাড়ি না কামিয়ে বিকেলে বেড়াতে যেতেন না, আর এখন বন্ধুদের শোকে...। ঢঙ আর কাকে বলে। আবার দেখা যায় সব কামিয়ে ফেলেছেন। পরিস্কার চাঁচাছোলা। বৌমারা হাসাহাসি করেন। বাবার শেষ বয়সে বেশ খেলায় পেয়েছে—মাস কতক ধরে রাখা, পরে একদিন কামিয়ে ফেলা।

পরমেশকে একদিন জিজ্ঞেস করে-ছিলাম—বলতে পারো পরমেশ, বৃদ্ধ নব-ঘন সেন বেশ ব্রজেন শীলের মতো দাড়ি রেখে পরে নির্মূল করেন কেন? এর মনস্তত্ত্বটা ভাই আমি তো বুঝি না।

পরমেশ যেন তৈরী হয়েই ছিল। বলে—সহজ কথা। বলছিলাম না, বুড়ো তিনটে পরস্পর খুব স্বার্থপর।

আমি অবাক হয়ে বলি—এর মধ্যে তুমি ওসব কী দেখলে?

পরমেশ চুপ করিয়ে দেয় আমাকে। বলে—বলতে দাও শেষ করে; পরে ফুট কেটো। ভাসা ভাসা বুদ্ধি নিয়ে মাঝে ঠেকো দিও না।

বলি—বল।

—আসলে কী জানো, সেন যদি সত্যিই বন্ধু হতো তাহলে এতদিন আত্মহত্যা করত। তবু সান্যাল আর শর্মার বন্ধুত্বটা প্রগাঢ় ছিল। মাস কয়েকের ব্যবধানে মরেছে। আর এ ব্যাটা কেমন দিনের পর দিন পার করে দিচ্ছে—মরবার এতটুকু চেষ্টা নেই। মাস কতক দাড়ি রাখে তারপর কামায় এই ভেবে যে আবার অতবড় জমকালো দাড়ি গোঁফ গজাবে। একবার কামানোর পর আবার ঘন হয়ে গজাবে। পুনরায় কামাবেন তারপর গজাবে। এইভাবে ও'র সমস্ত মৃত্যু-চিন্তাকে ঠেকিয়ে রাখছেন বালির বাঁধ দিয়ে।

পরমেশের কথা শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারি না। কোন উচ্চবাচ্য না করেই ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হই।

শরীরটা ভাল ছিল না সেনের। রক্তামাশয় হয়েছিল। দিন কতক হলো পথ্য পেয়েছেন। শরীরে এখনো আগে-কার বল ফিরে পাননি। তা সত্ত্বেও এসেছিলেন বেড়াতে টুকটুক করে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে। এসে বসেছিলেন ক্যালভার্টে। ভাবছিলেন—জীবনের কী বিচিত্র গতিময়তা। মৃত্যুর দিকে ধাবমান অথচ উদ্যমের অন্ত নেই। 'যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখাঃ দ্রবন্তি'। বিড় বিড় করে গীতার শ্লোক আওড়ান। সান্যাল আর শর্মার মুখ ভেসে ওঠে। সবই পূর্ববৎ চলেছে, শুধু ওরাই দুজন কাছে নেই। কাছে যে নেই পাশে বসে যে বাঘবন্দী খেলা নিয়ে হৈচৈ করছে না তাই বা সব সময় সব-দিন ভাবতে পারেন কই? এক এক সময় মনে হয়, এমন কি শুনতে পান যেন ওদের কলরব। তন্ময়তার লূতাতন্তুতে আচ্ছন্ন করে ফেলে ক্রমশঃ। সারিবন্ধ ট্রাকের গর্জনে চমক ভাঙে। না, ওরা আর এখানে নেই। ওরা এখন ভিন্ন দিকে গেছে। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি...'। শোকের কিছু নেই। জন্ম ধ্রুব মৃত্যুর অনুগামী। সব বোঝেন, তবু জলভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে বৃদ্ধের চোখ দুটি ঘনিষ্ঠ দুই সঙ্গীর জন্য: কিছুতেই আটকাতে পারেন না ওদের চিন্তাকে। গাল বেয়ে দরদর করে জল পড়ে। সম্বন্ধ যখন গড়ে ওঠে দিনে দিনে উপলব্ধি করা যায় না তার সামগ্রিক অবয়বটিকে, তবে সেই গাঢ় বন্ধনের মাঝে বিচ্ছেদ যখন নেমে আসে তখন বেশ বোঝা যায় কতটা গভীর হয়ে সে জড়িয়ে গিয়েছিল।

একদিকে মৃত্যুর অমোঘ শাসন অপর দিকে তারই সামনে জীবনের জাগ্রত মিছিল—প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, বন্ধুত্ব ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছে জয়গানে মুখর হয়ে। হোক না তার সবটাই মায়া। ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপলব্ধির সার্থক-তায় এদের ভূমিকাটা কী নেহাতই অকিঞ্চিৎকর?

আজীবন গীতা পাঠ করেও কিছু-তেই যে তিনি সামান্য শোক সংবরণ করতে পারছেন না। সব পাঠ, সমস্ত ধ্যান ধারণায় এই মর্মান্তিক অকৃত-কার্যতায় নবঘন সেন হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন।

দিনান্তের রাঙা রোদে দৃশ্যমান চিত্রপট অপরূপ হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আর দেরী নেই।

রূপো দিয়ে মাথাটা বাঁধানো কুকুর-মুখো বেতের লাঠিটাকে দুবার ঘুরপাক দিয়ে দাঁড় করান। কেমন যেন বীভৎস ভাবে তাকিয়ে থাকে অপলক মরা দৃষ্টি নিয়ে কুকুরের মাথাটা সেনের দিকে। ভয়ে শিউরে ওঠেন। পরক্ষণেই লাঠিটাকে ঘুরিয়ে ক্যালভার্টের গায়ে ঠেসিয়ে রাখেন।

মহাপ্রস্থান পথের কাহিনীটির সাথে একটা মিল ভেসে ওঠে। একে একে সকলের পতন এল, তবু চলেছেন যুধিষ্ঠির। সঙ্গে চলেছে একটি কুকুর। কী বিসদৃশভাবেই না মনে হলো তাঁর যে লাঠির ডগায় কুকুরের মাথাটির সাথে সেই অপার্থিব কুকুরটির হুবহু একটা মিল রয়েছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সেন। অসংলগ্ন চিন্তায় ক্রমশঃ অস্থিরতা আসছে সারা শরীরে। বহুদিন গীতা খোলেননি। চিন্তাও করেননি ওসব নিয়ে। চিন্তা করতে তাঁর ভয় লাগে। এক প্রবল মৃত্যুভয়ে হিম হয়ে যায় তাঁর শরীর। কিন্তু চিন্তা করব না মনে করলেও নিস্তার নেই। আবাল্য পরিচিত ওই গ্রন্থখানির প্রতিটি শব্দ যে তাঁর কাছে গভীর অর্থবহ। স্মৃতির প্রতিটি কোষে তার স্থায়ী অবস্থান। আবার মগ্ন হয়ে পড়েন। কতক্ষণ বসেছিলেন কে জানে। পড়ে গিয়েছিলেন ক্যালভার্টের অনুচ্চ বেদী থেকে রাস্তার ধুলোয়। জ্ঞান ছিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত আরম্ভ হচ্ছে দেখে খুঁজতে বের হয়েছিলেন ছেলেরা। অবশ্য ওদের আন্দাজ করাই ছিল। সোজা চলে এসেছিলেন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে এই ক্যালভার্টের দিকে।

তবে এসেও খুব লাভ হয়নি। তার অনেকটা আগেই সেন মারা গেছেন। তাঁর মৃতদেহের অদূরে পড়ে রয়েছে লাঠিটা বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো।

টর্চের আলো পড়তেই কুকুরের হাঁ-মুখটা বেশ স্পষ্টভাবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

।। রেস্তোরাঁর বিয়ে ।।

আজব শহর কলকাতার পথে পথে আজব ঘটনার সমারোহ। সেই কলকাতার সর্বশেষ বিস্ময়কর ঘটনা রেস্তোরাঁয় বিয়ে।

অল্প সময়ে বিনা খরচায় বিয়ে করবার এমন সুন্দর ব্যবস্থা এর আগে ঘটেছে কিনা শোনা যায়নি। বোধহয় এটিই সর্বশেষ সংস্করণ। ঘটনার প্রাণকেন্দ্র রাণাঘাট। তিনজন যুবক ফ্রক পরিহিতা এক স্কুল বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল এক রেস্তোরাঁয়। অল্প সময়ের মধ্যে সকলে যখন বেরিয়ে এল সেখান থেকে তখন দেখা গেল বালিকার পরনে শাড়ি কপালে সিঁদুর।

বাতাসের আগে খবর ছড়ায়। মজা দেখতে লোক জমেছে রেস্তোরাঁর বাইরে। সংগে সংগে এসেছে পুলিশ। তাই বাধ্য হয়ে বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষের সকলে গেলেন জেল হাজতে। স্বামী-স্ত্রীর "মধু যামিনী" কাটছে হাজতে। অল্প সময়ে অল্প পয়সায় এমন একটি বিয়ের খবর বিচিত্র নয় কি।'

॥ জাহাজের গতি পরিমাপে রাডার ॥

ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিকগণ রাডার যন্ত্রের সাহায্যে এমন একটি ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে এগিয়ে চলেছেন যা বিজ্ঞানের উন্নতিকে আর এক ধাপ এগিয়ে দেবে। তাদের গবেষণার ফলে জাহাজের পশ্চাৎ ভাগের সংগে যুক্ত বয়ার দ্বারা প্রতিধ্বনিত রাডার-সংকেত হতে জাহাজের গতি পরিমাপ সম্ভব হবে। এর দ্বারা জাহাজগুলির প্রকৃত গতি পরিমাপ অকারণ নির্দিষ্ট-পথে ব্যয়বহুল সমুদ্র যাত্রা ছাড়াই সম্ভব হতে পারবে। রাডার ব্যবহারে আরও অনেক বেশী কাজ পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানিগণ মনে করছেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা জাহাজ নির্মাণকারীদের পূর্ব-পরীক্ষিত মডেল খোলের গতির সংগে জাহাজের গতির একটা তুলনামূলক পরীক্ষার সুযোগ হবে। তা ছাড়া জাহাজের ডিজাইন সম্পর্কেও এই বিশেষ যন্ত্রটি সাহায্য করতে পারবে।

॥ সৌরশক্তি-চালিত বিজলী স্টেশন ॥

সেমি-কণ্ডাকটর সৌর ব্যাটারির ওপরে কয়েকটি আয়নার সাহায্যে সূর্যের আলো ফেলে সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা ওই ব্যাটারির শক্তি ৬ থেকে ৮ গুণ বাড়িয়ে তুলতে সফল হয়েছেন। মোট ১০ বর্গমিটার আয়তনের সেমি-কণ্ডাকটর সিলিকন প্লেটের একটি ব্যাটারি পাঁচ কিলোওয়াট বিজলীশক্তি উৎপাদন করতে পারে।

সোবিয়েত বিজ্ঞানীদের মতে, সোবিয়েত মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলিতে যে-সূর্যালোক পড়ে, তার এক-শতাংশমাত্র এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে যে-পরিমাণ বিজলীশক্তি উৎপাদন করা যাবে তা হবে বিশ্বের বৃহত্তম ভোলগা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বর্তমানে উৎপাদিত বিজলী শক্তির সমান।

ইতিমধ্যেই উজবেকিস্তানে এই রকম একটি সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্টেশন নির্মিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই কেন্দ্রটি সৌরশক্তি থেকে ৫,০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে।

।। ছবির বাজার সেরা বছর ।।

১৯৬১ সাল ছবির বাজারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। এতদিন ছবির বাজার ছিল ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের একচেটিয়া। কিন্তু আমেরিকা তাদের ওপর একহাত দেখে নিয়ে জানিয়েছে যে তারা কেবল মাত্র বিশ্বের বৈষয়িক বাজার চালায় না ছবির বাজারও চালায়।

নভেম্বরের এক বৃহস্পতিবারে কাতারে কাতারে লোক এসে জমেছে ন্যুয়র্কের পার্ক বার্নেট দোকানের নীলাম ঘরে। টিকিট বিক্রি হয়েছে চোরা বাজারে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোক এসে জমেছে এই ৬০মিঃ-এর উত্তেজনায়। ব্যবসায়ী অ্যালফ্রেড য়ুলিয়ম্ রেরিকসনের সংগ্রহের চব্বিশখানা ছবি বিক্রি হবে। সোবিয়েৎ রাশিয়া থেকেও প্রতিনিধি এসেছে।

ছবির বাজার জুয়ার বাজারের মত। কখন কোনটি কি দামে বিক্রি হবে তা বলা মুস্কিল। প্রথমে যে ছবিটি বিক্রি হল তাতে সুবিধা হল না। কিন্তু বাজার কয়েক মুহূর্তে গরম হয়ে উঠল বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর রেমব্রাণ্ড-এর "আরিস্টটল কনটেমপ্লেটিং দি বাস্ট অব হোমার" ছবিটি ন্যুয়র্ক মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্ট-এর অধ্যক্ষ মিঃ জনস ররিমার মাত্র তেইশ লক্ষ ডলারে (এক কোটি পনের লক্ষ টাকা) কিনে নেওয়ার সংগে সংগে ছবির ইতিহাস পাল্টে গেল। এত দামে কোনো ছবি বিক্রি হয়েছে কি-না জানা যায়নি। তারপর এই ৬০ মিনিটের বাজারে ছবি বিক্রির সমস্ত ইতিহাস পাল্টে যায়। বিক্রির পরিমাণ ৪৬৭৯২৫০ ডলার সাম্প্রতিককালে সর্বাপেক্ষা বেশি। তারপর রেমব্রাণ্ডের এ ছবিটি পূর্বে সর্বাধিক অর্থে বিক্রিত (১১৬৬৪০০ ডলার) রাফেলের "আলবা ম্যাডোনা" ছবিটির রেকর্ড ভেঙে দেয়।' রাফেলের এই ছবিটি ১৯৩১ সালে সোবিয়েৎ রাশিয়া ম্যানড্রু মিলনের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই নীলামে যে সমস্ত ছবি বিক্রি হয়েছে সমস্তই বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকরদের অন্যান্য ছবিতে যে দাম পাওয়া গেছে তা এই রকম ৩০ লাখ, ১৫ লাখ, ১০ লাখ ও পাঁচ লাখ টাকার মত।

"আরিস্টটল কনটেমপ্লেটিং দি বাস্ট অব হোমার"

উৎপল দত্ত

(চার)

॥ দৃশ্য সজ্জা ॥
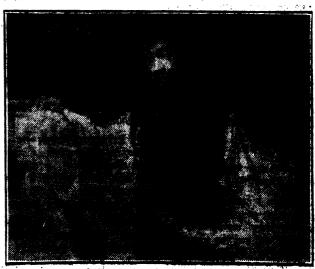
নাট্যকার ঃ তাহলে আঙ্গিক বলতে আপনি কি বোঝেন?

পরিচালক ঃ আঙ্গিক বলতে বুঝি

(১) অভিনয়

(২) দৃশ্যসজ্জা

(৩) আলোকসম্পাত

(৪) আবহ-সংগীত

এই চারটি ক্ষেত্রেই পুরোনো যুগের সঙ্গে আমাদের যুগের গরমিল। চার ক্ষেত্রেই আমরা সুদূরপ্রসারী বিপ্লব ঘটাতে বদ্ধপরিকর। পারবো কিনা জানি না; তবে চেষ্টা করে যাবো।

ভাষাবিদ ঃ এক নম্বর বললেন—অভিনয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কি করতে চান আপনারা?

পরিচালক ঃ তার আগে বুঝতে হবে আমাদের আগের যুগে অভিনয়টা কেমন ছিল। সেটা ছিল একক অভিনয়ের গৌরবময় অধ্যায়। বিরাট বিরাট অভিনেতারা মঞ্চ কাঁপিয়ে চলে গেছেন। অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করবো সবচেয়ে শেষে, কারণ ঐটিই সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন। আজকে দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারটা নিয়ে পড়া যাক। শুধু একটা প্রশ্ন মনে রাখবেন। এই সেদিন পর্যন্ত অভিনেতাই ছিলেন থিয়েটারের মূল গায়েন। তাঁকে তুলে ধরাই ছিল দৃশ্যসজ্জার কাজ; তাঁকে সুযোগ করে দিতেই নিয়োজিত ছিল আলোক; তাঁর সংগে সংগত করতেই ডাকা হোতো সংগতকারদের। অভিনেতার দৌরাত্ম্যে অন্য তিনটি আঙ্গিক বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অভিনেতার স্বেচ্ছাচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে বাংলা নাট্যসজ্জার ক্রমবিবর্তনকে।

দার্শনিক ঃ লেবেডফ্-এর থিয়েটারে কি রকম দৃশ্যপট ছিল?

পরিচালক ঃ লেবেডফই বলুন আর ১৮৩৫ সালের প্রসন্ন ঠাকুরের থিয়েটারই বলুন—দৃশ্যসজ্জা বলতে আঁকা সীন ছাড়া আর কিছু ব্যবহারের প্রমাণ নেই। রোলার-এ জড়িয়ে সীনটাকে সড়াৎ ক'রে ফেলে দেয়া হোতো অভিনেতার পেছনে। ১৮৩৫ সালের কাগজে লিখছে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয় সম্বন্ধে ঃ (ব্রজেনবাবুর বই দ্রষ্টব্য)

> "দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির পারস্পেক্টিভ মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নাই।"

অর্থাৎ একখণ্ড চট বিছিয়ে তার ওপরে মেঘ, জল প্রভৃতি এঁকে, এই বিরাট পটখানাকে ঝুলিয়ে দেয়া হোতো অভিনেতার পেছনে। গোড়ার দিকে মনে হয় যতদূর সম্ভব চটকদার রং ব্যবহার ক'রে দর্শকদের চোখে ধাঁধাঁ লাগাবার চেষ্টা হোতো। এটা যে যাত্রা নয়, থিয়েটার, এই চেতনাই যেন সদর্পে প্রকাশ পেত। নবলব্ধ স্বাতন্ত্র্যে বড় বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল থিয়েটার। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে 'শকুন্তলা', অভিনয়ের কথা আছে, ১৮৫৭ সালের কথা।

> "ছাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন স্টেজ-এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলংকারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিলেন।"

ঐ নীরেট ধরনের আড়ম্বর-স্পৃহা—বিশ হাজার টাকার গয়নার মতনই—মঞ্চকে আচ্ছন্ন করেছিল। দর্শককে চমকিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। অথবা দর্শক পুরো ব্যাপারটাকে নূতন মনে করে আপনা থেকেই চমকিত হয়ে উঠতো।

দার্শনিক ঃ এই আঁকা-সীনের ব্যাপারটা ও'রা শিখলেন কোত্থেকে? বাংলা যাত্রায় তো আর দৃশ্যপট নেই।

পরিচালক ঃ না, যাত্রার সংগে আমাদের থিয়েটারের যোগাযোগটা পরোক্ষ এবং মামুলি। এ থিয়েটার বিদেশ থেকে আমদানি। সীন আঁকার পদ্ধতিটা কলকাতার ইংরাজি থিয়েটার থেকে শেখা। ইংলণ্ডের থিয়েটারে আঁকা সীন কি করে এল সেটা আর এক ইতিহাস; যাঁর ইচ্ছা হবে রিচার্ড সাদার্ন-লিখিত "চেঞ্জেবল্ সিনারি" গ্রন্থখানা পড়ে দেখতে পারেন। কলকাতার ফিরিঙ্গি থিয়েটার ঐ ঝোলানো আঁকা-সীন-এর প্রবর্তন করে। সেটাই নকল করে বাংলা থিয়েটার। এমন কি ফিরিঙ্গি শিল্পীদের ভাড়া ক'রে এনে আঁকিয়ে নেয়াও হয়। "হলবাইন" "গ্যারিক" প্রভৃতি নামের উল্লেখ এই সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে।

ভাষাবিদ ঃ একমাত্র জ্যোতি ঠাকুরের জোড়াসাঁকো থিয়েটারে এই ঝোলানো সীন ছাড়াও আরো কিছুর চেষ্টা হয়েছিল; তার প্রমাণ পাই তাঁরই স্মৃতিকথা থেকে "নব-নাটক" অভিনয় সম্বন্ধে ঃ

> "দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বন-দৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আঠা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।"

বাস্তবতা সৃষ্টির একটা প্রয়াস এখানে দেখা যাচ্ছে।

পরিচালক ঃ অথচ একই অভিনয়ে অন্যান্য দৃশ্যে আঁকা-পট ব্যবহার করেছেন ও'রা। এতে যে সুর কেটে যাচ্ছে, প্রচণ্ড একটা বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে এটা ও'রা বোঝেননি।

নাট্যকার ঃ আঁকা-সীন সম্বন্ধে আপনার আপত্তিটা কি?

পরিচালক ঃ আমার আপত্তির প্রয়োজন নেই মঞ্চের প্রথম বিপ্লবী আদল্‌ফ্ আপিয়া ঝোলানো সীনের হাঁড়ি ফাটিয়ে দিয়েছেন।

ভাষাবিদ ঃ হ্যাঁ, "কমোঁ রেফর্মের নোত্র্ মিজ্-অঁ-সীন" প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, অভিনেতার দেহ একটা আস্ত ত্রিমাত্রিক বস্তু; পেছনে আঁকা সীনটা দ্বিমাত্রিক চিত্রমাত্র; এ দুয়ের বিরোধ মেটাবে কে?

দার্শনিক ঃ আরো বলেছেন, স্টেজের মেজের সঙ্গে পটে আঁকা মেজে কিছুতেই মেলে না। অথচ স্টেজের মেজেটাই হচ্ছে অভিনেতার চলাফেরার জায়গা; সেটা মঞ্চের একটা প্রধান অংশ। তার সংগে ঝগড়া করা কুমীরের সংগে কলহের মতনই ভীষণ ব্যাপার। ওর পর ঝোলানো সীন আর জলে বাস করতে পারেন না।

পরিচালক ঃ অথচ আমাদের নাট্যশালা সেই ১৮৩৫ সালের ফিরিঙ্গি

থিয়েটারের নকলনবিশী থেকে আর বেরুতে পারলো না। ফিরিঙ্গি থিয়েটার এগিয়ে গেল; তৎকালীন বৃটিশ থিয়েটারের প্রভাবে কলকাতার সাঁ সুসি প্রভৃতি রংগালয় বহুরকম মঞ্চপরীক্ষা করলো, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বাংলা থিয়েটারকে আর এগুতে অনিচ্ছুক দেখা গেল। ঐ ১৮৩৫-এর আঁকা-সীন-পদ্ধতিই একেবারে মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসলো আমাদের থিয়েটারে। কেন জানেন? আমার মনে হয় এর কারণ বিরাট অভিনেতাদের আবির্ভাব। এর আগের যুগে দেখি থিয়েটারের নতুনত্বে লোক চমৎকৃত। অর্ধেন্দু-গিরিশের যুগ থেকে কাগজে দেখছি অনবরত অভিনয়ের প্রশংসা; পরস্পরের তুলনা; একজনের প্রতি আক্রমণ, আরেকজনের প্রতি অহেতুক চাটুবৃত্তি। অভিনেতারা মঞ্চ দখল করেছেন। তাই দৃশ্যসজ্জাকে উপেক্ষিত, অবহেলিত, দুয়োরানীর মতন পড়ে থাকতে হোলো পেছনে। অথচ আঙ্গিকের বিকাশে দুয়োরানীর অধিকার কোনো সুয়ো-র চেয়ে কম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সে অধিকার স্বীকৃত হয়নি। লোকে তখন এ'র নিমচাঁদ ভালো, না ও'র, এ'র যোগেশ ভাল, না ও'র, এই সব অবান্তর আলোচনায় মত্ত। মঞ্চ-সজ্জাও তখন ন্যাকড়ায় আঁকা বনপথ আর কক্ষ আর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ থেকে ঐ অভিনেতাদের প্রতিভার আগুনে পুড়ে মরতে লাগলো। আশ্চর্য ব্যাপার, এখনো পর্যন্ত ঐ একক অভিনেতার অসংযত আস্ফালন চলছে। তাই এখনো থেকে থেকে নোংরা ঝোলানো সীন ব্যবহার হয়েই চলেছে।

নাট্যকার ঃ আঁকা-সীন-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কি হয়নি আমাদের থিয়েটারে? তবে ফ্ল্যাটের ব্যবহার এল কি করে?

পরিচালক ঃ বিদ্রোহ হয়েছে, সত্যি কথা। কাঠের খাঁজে আঁকা ফ্ল্যাট ঠেসে দেয়া হয়েছে মঞ্চের উপর। কাট-আউট ব্যবহার হয়েছে। ঝোলানো সীনের গায়ে ফুটিয়ে দেয়া হয়েছে দরজা-জানলা। ছোট-খাটো বেদী ও সিঁড়ির ব্যবহার হয়েছে। অবশেষে সতুবাবুর হস্তক্ষেপে ঘূর্ণায়মান মঞ্চও এসেছে। কিন্তু এর একটিও আঁকা সীনকে হটাতে পারেনি মঞ্চ থেকে। এর একটিও সত্যিকারের শিল্পসম্মত দৃশ্যসজ্জা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। অভিনেতার গগনস্পর্শী দম্ভের পায়ে তাদের চুরমার হতে হয়েছে। অভিনেতাকে মঞ্চটা ছেড়ে দিয়ে এরা সবাই গিয়ে ভিড় করেছে পেছনের দিকে, ধুকপুক ক'রে কোনোমতে বাঁচবার জন্যে।

ভাষাবিদ ঃ সেইজন্যেই এই সেদিনও কি সব বীভৎস কুৎসিত সীনই না দেখতাম আমরা। মনে আছে "বঙ্গে বর্গীতে" লুণ্ঠিত গ্রাম এ'কে দেয়া হয়েছিল। জ্বলন্ত আগুন স্থির হয়ে আছে পেছনে; অমন অনড়, প্রস্তরীভূত শিখা জীবনে দেখিনি। আর সামনে গাদা গাদা আঁকা মৃতদেহ।

নাট্যকার ঃ একটি ছুদের দৃশ্যপটে আকাশে উড়ন্ত পাখী। আঁকা দেখেছি। সে পাখী যে অচল ত্রিশংকু হয়ে আছে শিল্পীর চোখে তা পড়েনি।

পরিচালক ঃ "চিরন্তনী" নামে একটি নাটকে হাসপাতালের দৃশ্যে সারি সারি বিছানা মায় রুগীদের পর্যন্ত এ'কে দেয়া হয়েছিল। একটা ঘড়ি ছিল দেয়ালে, তাতে বারোটা বেজে গেছে; আর বাজবে না। পাখা আছে মাথার উপরে, জীবনে ঘুরবে না। স্টেথিস্কোপশুদ্ধ এক ডাক্তারকে যে কেন এ'কে দেয়া হয়নি বুঝলাম না।

দার্শনিক ঃ আচ্ছা, ঐ সব দৃশ্যপটগুলোকে প্রতীক বলে ধরে নিতে আপত্তি কি? বাস্তবতা খুঁজেছেন কেন? বাস্তবের ইঙ্গিত মাত্র বুঝে নিন না।

পরিচালক ঃ আঁকার স্থূল পদ্ধতিটা দেখলেই বুঝবেন শিল্পী মোটেই ইঙ্গিত দেন নি, প্রাণপণে বাস্তবটাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে ও'র স্থূল রসবোধে ওর চেয়ে ভাল কিছু খেলেনি। পটুয়াদের মধ্যে ক'জন সত্যিকারের শিল্পী থিয়েটারে এসেছেন?

ভাষাবিদ ঃ আর ইংগিত ওরকম রুগী-টুগী এ'কে হয় না; শুধু যদি একটি খাট থাকতো তো হাসপাতাল বলে মেনে নিতাম; শুধু যদি ন্যাড়া গাছ একটা থাকতো তো বর্গী-বিধ্বস্ত গ্রামের প্রতীক হিসেবে মেনে নিতে পারতাম। ইঙ্গিত বা প্রতীক কম-কথার জিনিস; এত বেশি বললে আর প্রতীক-টতীক থাকে না; ও হোলো স্থূলতম শিল্পবোধের পরিচয়।

পরিচালক ঃ থিয়েটারের প্রতীক থিয়েটারের নিজস্ব কায়দায় হবে। এবং সেটা নব-নাট্য আন্দোলনের কর্মীরাই করবেন। এখনো তার লক্ষণ স্পষ্ট হয়নি, তবে হবে।

নাট্যকার ঃ ঐ নিজস্ব কায়দাটা— বুঝলাম না।

পরিচালক ঃ চিত্রকলার প্রতীকগুলো যেমন চিত্রকলার মাধ্যমেই আসছে; থিয়েটারের ইঙ্গিতগুলোও তেমনি বলিষ্ঠ থিয়েটারি ঢং-এই হবে। ন্যাড়া গাছকে যুদ্ধের প্রতীক করাটা চিত্রকলার কায়দা; শকুনের ডানা ঝটপট দেখিয়ে আকালের চেহারা আনাটা চলচ্চিত্রের কায়দা হতে পারে। একটি গমক তানে 'পবন চলত শননন' গানের মূল কথাটা পরিস্ফুট করা যেতে পারে। ঠিক তেমনি, আঁকা-সীন, বা ফ্ল্যাট বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দৌরাত্ম্য কাটলে থিয়েটারের দৃশ্য-সজ্জাও তেমনি নিজস্ব থিয়েটারি ইংগিতে কথা কইবে।

নাট্যকার ঃ যথা? আপনার হাতে থিয়েটার পেলে কি করবেন?

পরিচালক ঃ থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেব। তারপর বাদ দেব উইংস্, বর্ডার প্রভৃতি। তারপর হটাবো সীন-জাতীয় যত জিনিস। মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেব; এলোমেলো এদিকে ওদিকে সিঁড়ি সাজাবো। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর বেদী ব্যবহার করে মেঝে আর ব্যাটেন লাইটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গাটা ব্যবহার করবো। ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করবো ক্রেগ-এর আঁকা রেখা-কাটা একটা কালো পর্দা, বা ব্রেশ্‌ট্-বর্ণিত বিদ্যুৎ আঁকা একটা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে ব্যবহার করবো নীল পোষাক পরা জনা কুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শংকরের প্রদর্শিত কিছু লাল রিবন নাড়বো। বৃষ্টি বোঝাতে গুটি দশেক ছাতা খুলে ধরবো। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলোকে নাড়াবো ভীম বেগে। মাতালের চোখে কলকাতা দেখাবো ঃ কার্ডবোর্ডের মনুমেণ্ট আর হাইকোর্টকে চাকায় বসিয়ে ছুটিয়ে দেব মঞ্চের উপর দিয়ে, এলোমেলো ডগমগ কলকাতা—। যাক্ করবো অনেক কিছুই। কিন্তু যা করবো তা থিয়েটারি ঢং-এই করবো। চিত্রপটের খোকা-সুলভ বাস্তবতা আমদানি করবো না। অন্য শিল্প থেকে ধার ক'রে করবো না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। অভিনেতাদের অত্যাচারে মঞ্চের যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, ছেঁড়া ময়লা সীন আর বিবর্ণ হলদে আলো আর কার্বন আর্ক-ল্যাম্পের মুর্খ জগতে যখন অভিনেতারা পরস্পরকে প্যাঁচ মেরে আত্মসন্তুষ্ট, তখন দৃশ্যসজ্জার প্রথম আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করলেন গণ-নাট্য সংঘ। তাঁরা এই সীনের খোকামি ছাটাই করে স্রেফ একটি চটের পর্দার সামনে অভিনয় শুরু করলেন। ঐ নোংরা সীনের জগতের তুলনায় এ যে ঢের বেশি শিল্পসম্মত তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু দৃশ্যসজ্জার দিক থেকে বক্তব্য থেকে যায়। কি জন্যে ও'রা একরঙা পর্দাকে দৃশ্য হিসাবে ব্যবহার করলেন তার দুটো ব্যাখ্যা দেয়া যায় ঃ

(১) ও'রা জনতার কাছে নাটক পেঁাছে দেয়ার ব্রত নিয়েছিলেন। হাতে নাট্যশালা ছিল না, বা থাকলেও তাঁরা নিতেন না। অল্প খরচে অত্যন্ত সচল অভিনয়-দল গঠনের অঙ্গ হিসেবে হালকা দৃশ্যপট সৃষ্টি করেছিলেন। একরঙা চটের পর্দা নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া সম্ভব।

(২) তাঁরা সচেতনভাবে মঞ্চের নোংরামি ত্যাগ করার জন্যে সীন-আদি বাদ দিয়ে একরঙা পর্দার প্রচলন করেছিলেন।

গণনাট্য সৃষ্টির ব্যাপারে ও'দের মহান ভূমিকা স্বীকার করেও বলবো এ দুটো ব্যাখ্যার কোনোটাই আমার কাছে সন্তোষজনক নয়। অত্যন্ত অল্প খরচে অত্যন্ত হালকা রেখেও দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টি করা যায়। একরঙা পর্দার সামনে অভি-

নয় করলে অভিনয় আর আবৃত্তির মধ্যে তফাত রইল কি? মঞ্চের কলাকৌশল জানা থাকলে 'অংগার' নাটক নিয়েও অবলীলাক্রমে সারা ভারত সফর করা যায়। তার জন্যে মঞ্চের চেহারাটাকে বিকৃত করার প্রয়োজন নেই। আমার দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির তাৎপর্য হোলো মঞ্চের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে মঞ্চের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসা। ঐতিহ্যকে একেবারে নাকচ করলে কিসের উপর দাঁড়াবো? আরো লক্ষ্যণীয় —অভিনেতার আধিপত্য কিন্তু পরোক্ষে স্বীকার করেই নেয়া হোলো। মঞ্চসজ্জা অনাদৃত ছিল, এখন একেবারেই পরিত্যক্ত হোলো। আগে অভিনেতা সর্বপ্রধান ছিলেন, এখন অভিনেতা একমাত্র গাইন হয়ে উঠলেন। সারা মঞ্চে অভিনেতা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি বলবো মহান গণনাট্য সংঘ এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। পুরোনো রংগমঞ্চকে মুক্ত করতে গিয়ে সে মঞ্চের শিকলে নিজেরাই বাঁধা পড়েছেন। না, এ পথে বাংলার নাট্যশালা সংস্কার হবে না। দৃশ্যসজ্জাকে বাদ দেয়ার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। বরং তাকে উন্নত, শক্তিশালী করে অভিনেতার সমান পর্যায়ে তুলে আনতে হবে। মঞ্চের ঠাট বজায় রেখেই মঞ্চকে এগিয়ে নিতে হবে, মঞ্চকে অস্বীকার ক'রে নয়।

নাট্যকার ঃ তাহলে বর্তমান নবনাট্য আন্দোলন দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে কি করছে?

পরিচালক ঃ বর্তমানে তারা সীন আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কব্জা ভাঙছে। সীনের দৌরাত্ম্যের কথা আগেই বলেছি। আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কথা বলার প্রয়োজন নেই। আপনারা জানেন দু মিনিটের বেশি একটা দৃশ্য স্থায়ী হচ্ছে না, তার আগেই মঞ্চ ঘুরে যাচ্ছে, আর রঙীন রঙীন সব সীন বেরুচ্ছে। একটা নাটকে বাইশটা দৃশ্য! ভাবতে পারেন? কলকাতার পেশাদার নাট্যশালার কাছে ঘূর্ণায়মান মঞ্চটা শিশুর হাতে খেলনার মতন: ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে দেখে তার অপরূপ আশ আর মেটে না। নবনাট্য আন্দোলন ওসব ছাটাই করে সলিড, আস্ত সেট্ প্রবর্তন করছে: ঘরবাড়ি, নদীর বাঁধ সব আস্ত ত্রিমাত্রিক রূপে তুলে ধরছে। 'রূপকার' 'শিল্পীমন' 'গন্ধর্ব' এবং 'দশরূপক' সম্প্রদায়গুলির সাম্প্রতিক নাটকগুলি লক্ষ্য করলেই দেখবেন এদিনে বোধ হয় ঠিক পথে এগুতে শুরু করেছি। এখানে ছেঁড়া সীনও নেই, আবার একরঙা পর্দাও নেই। সত্যিকারের দৃশ্যসজ্জার গোড়াপত্তন হচ্ছে। অবশ্যই 'বহুরূপী' এবং 'লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ' এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। কিন্তু ধারাটা ছড়িয়ে পড়ছে এটাই সবচেয়ে আশার কথা। কারণ এ না হলে আধুনিক নাট্যকারদের নাটক অভিনয় হবে কি করে?

নাট্যকার ঃ অর্থাৎ?

পরিচালক ঃ আগেকার নাট্যকাররা অভিনেতা-কেন্দ্রিক মঞ্চের জন্যে লিখে গেছেন। তাই দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে তাঁদের কোনো নির্দেশ থাকতো না। শুধুমাত্র কোথায় ঘটনা ঘটছে তার একটা ইংগিত দিয়েই সংলাপে চলে যেতেন তাঁরা। যেমন 'নীলদর্পণ' দৃশ্যের কি নির্দেশ দিচ্ছেন দীনবন্ধু? 'গোলকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক', 'সাধুচরণের বাড়ি', 'বেগুণবেড়ের কুঠি', 'গোলোক বসুর দরদালান' ইত্যাদি। ঐটুকুই। আর কিছু নয়। কিন্তু ইওরোপে যেদিন আর্ভিং-কেম্বলদের আধিপত্য ঘুচতে শুরু করলো, সেদিন থেকে নাট্যকাররা আশ্চর্য সব নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। ইবসেনের নির্দেশগুলো দেখুন: পাতার পর পাতা লিখে গেছেন। 'গোস্ট্‌স্' নাটকের শেষে সূর্যোদয়ের নির্দেশটা মনে আছে? বার্ণার্ড শ'-র যে-কোনো নাটকের নির্দেশ দেখুন: 'জানলা দিয়ে পাহাড়ের তুষার দেখা যাবে' (আর্মস্ এণ্ড দি ম্যান) বা 'ঝমঝম করে গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি পড়ছে' (পিগমেলিয়ন) এসব তো আছেই। মায় আসবাবপত্র কোন নাটকের কি ধাঁচের হবে তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আছে। আর্চার-এর 'গ্রীন গডেস্' নাটকের গোড়ায় একটি ভূপাতিত এরোপ্লেন দেখাবার নির্দেশ আছে; নাটকের শেষে মঞ্চে বোমাবর্ষণের নির্দেশ আছে। গোর্কি-র 'লোয়ার ডেপথ্‌স্'-এ দেয়ালে কতটা রং উঠে গেছে তারও বর্ণনা আছে। আরো পরের যুগে আমেরিকার কিংসলি-র 'ডেড্ এণ্ড' নাটকে একটি বস্তীর মাঝখানে একটি ডোবা থাকার নির্দেশ আছে; নাটকের নায়করা, অর্থাৎ বস্তীর ছোকরারা সেই ডোবায় চান করছে আর সংলাপ বলছে। পেছনে নদী থাকবে; নাটকের মাঝখানে সেই নদী দিয়ে একটি আলোয় আলোকিত জাহাজ চলে যাবে। রুশ নাট্যকার কর্নেইচুক-এর 'ফ্রন্ট' নাটকে ট্যাংক চালাবার কথা আছে। তেমনি দেখুন আধুনিক বাঙালি নাট্যকাররাও বিচিত্র সব নির্দেশ দিচ্ছেন; বিচিত্র সব জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছেন দর্শককে। অঙ্গারের শেষ দৃশ্যে খনির তলায় গহ্বরের অভ্যন্তর দেখাবার নির্দেশ আছে। কোনো আঁকা-সীনে সে পরিবেশ ফুটতে পারে কখনো? কোনো একরঙা পর্দায়ই কি ফুটবে তা? দিগিনবাবুর 'তরংগ' নাটকের একটি নির্দেশ ঃ

> "বালুচর। শেষ রাত্রি, ঘন অন্ধকার। দূরে আর একটা চরের বাড়ীগুলো কালো রেখার মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নদীর ধারে কাশবন। কাশবনের মধ্য দিয়ে নদী থেকে পারে উঠবার একটা আঁকাবাঁকা পথ। ছায়ার মতো কতকগুলো লোক বসে..."

বলুন তো, কেবল আঁকা পটে এ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে? বিজন ভট্টাচার্যের নাটকেও এই ধরনের নির্দেশের ছড়াছড়ি। আরো নূতন নাট্যকাররা আরো দুর্জয় পরীক্ষা চালাচ্ছেন, আরো কঠিন জিনিস আনতে বলছেন মঞ্চে। দিলীপ রায় 'একটি নায়ক' কাব্যনাট্যে কি নির্দেশ দিচ্ছেন শুনুন—

> "একটি গ্লে-ওয়ারিশ মৃতদেহ টেবিলের ওপর রাখা হয়েছিল। সারাদিন সে উপেক্ষিত অবস্থায় গবাক্ষ থেকে পালিয়ে-আসা বৃষ্টির ছাট, রৌদ্রের তাপ সহ্য করেও নির্বিকার পড়ে রইলো; কিন্তু রাত্রের অন্ধকারের গভীরতায়, কেউ কোথাও নেই দেখে সে ধীরে ধীরে উঠে বসলো।"

এখানে শুধু পরিবেশ নয়; ঐ বৃষ্টির ছাট আর রৌদ্রের তাপের মধ্যে ফুটে উঠবে অবহেলিত মানবতার বেদনা। নাটকের নায়কের বেদনাটাকে মূর্ত করতে চাইছেন কতকগুলি দৃশ্যমান জিনিসের সাহায্যে। কোনো কথা বলার আগে দ্রুত দেখাতে হবে একটি ছুটির দিনের হিসাব কয়েক মিনিটের মধ্যে—একটি দিনের বৃষ্টি আর রোদ, একটি দিনের লাঞ্ছনা। তেমনি দেখুন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নচিকেতা'-র একটি নির্দেশ—

> "সম্মুখে সমতল প্রান্তর। পিছনে পথ, বক্ররেখাকারে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। রাত্রির আকাশ। আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল। সপ্তর্ষি মণ্ডলের কিছু উপরে শিংশুমার। এগারোটি নক্ষত্রে শিংশুমার মৎস্যাকারে অবস্থিত। প্রথম সারিতে দুইটি, দ্বিতীয়ে তিনটি, চতুর্থে দুইটি, তাহার পর প্রত্যেক সারিতে এক-একটি করিয়া চারটি। দ্বিতীয় সারির মধ্যমটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ইনিই যম।"

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ ঐ রকমই হবে আধুনিক নাট্যকারদের নির্দেশ। এটা স্টান্ট নয়; "নচিকেতা' পড়া থাকলে জানতেন ঐ নক্ষত্র, বিশেষতঃ যমের সংগে নাটকের কি গভীর সম্পর্ক। আধুনিক দৃশ্যসজ্জা যদি এটাকে ধরতে না পারে, যদি বাদ দিয়ে একরঙা পর্দার আশ্রয় নেয়, তবে আমার মতে তা এ নাটকের ক্ষতি করবে। নতুন দৃশ্যসজ্জা নাট্যকারদের কলম খুলে দেবে। ইচ্ছে মত পরীক্ষা তাঁরা চালাতে পারবেন। স্টেজে দেখাবো কি করে—এ আর্তনাদ বিগত যুগের আর্তনাদ। বর্তমান মঞ্চে অসম্ভব বলে কিছুই থাকবে না।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাথার উপর রোদ উঠছে বেড়ে।

বাবাকে আর বেশী উত্তেজিত করতে সাহস হয় না নীতার। তাছাড়া চটপট ভেবে নেয়, বাড়ী ফিরেই সুশোভনের আজকের এই কথাবার্তাগুলো লিখে ফেলবে। লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে দেখাবে। হয়তো এই চিন্তার উন্মেষ, এই ভাবনা-ধারণার প্রকাশ থেকে ডাক্তার বড় রকম একটা আলো পেয়ে যাবেন।

তাই বলে নীতা, 'তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। বড়লোকদেরই খুব একটা শাস্তির দরকার। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে পৃথিবীটা তোমাদের একলার নয়।'

'এই তো—ঠিক বলনি এতক্ষণে!'

সুশোভন নিতান্ত হৃষ্টস্বরে বলেন, 'এতক্ষণে তোর নিজের বুদ্ধি ফিরে পেয়েছিস। মনে হচ্ছিল সুচিন্তার ওই একগাদা ছেলের সঙ্গে মিশে মিশে তুই একেবারে বোকা হয়ে গেছিস! তা' হলে ডাক এবার ওদের একজনকে। শুনি ওরা কোথায় যাবে!'

নীতা ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বলে, 'আচ্ছা বাবা ডাকবো। আর একদিন ডাকবো। আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে তো? দেখছ না কত রোদ উঠে গেছে।'

'তা' উঠুক। তুমি ওই লোকটাকে ডাকো।'

'না বাবা—লক্ষ্মীটি, আর একদিন।'

'কেন আর একদিন কেন!'

জেদের সুর সুশোভনের—'আজই। ...ওহে শুনছো শোন এদিকে।'

পিতাপুত্রীর এই দাঁড়িয়ে পড়ে কথা বলার শুরু থেকেই জটলাকারীদের দৃষ্টি পড়েছিল এদিকে, এবং ভাবভঙ্গী দেখে বুঝতে অসুবিধে ঘটেনি এদের, আলোচ্য বস্তু বস্তি আর বস্তিবাসীরাই।

সুশোভন হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়োমতন একজন এগিয়ে এল।

বাবা কি বলতে কি বলবেন ভেবে নীতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আচ্ছা এসব ভাঙা হচ্ছে কি কর্পোরেশন থেকে?'

লোকটা অবজ্ঞাভরে বলে, 'যম জানে আর সেই করপোরেশানই জানে।'

সুশোভন ভারী গলায় বলেন, 'তোমরা জানো না?'

'নাঃ! জানবার দরকারই বা কি। এখেনে আর থাকা চলবে না, দূরে দূরে করে বিদেয় করে দিচ্ছে এইটুকু জেনে নিয়েছি, ব্যস!'

'বাঃ। তারপর কোথায় গিয়ে থাকবে তা' জানতে হবে না?'

'কিছু দরকার নেই বাবু। সার কথা এই বুঝেছি যদ্দিন প্রেমাই থাকবে কেউ মারতে পারবে না, আর যেদিন প্রেমাই ফুরোবে কেউ ঠেকাতে পারবে না। মাঝখানে যা হচ্ছে হয়ে যাক।'

হঠাৎ সুশোভন ও'র ধরনে গর্জন করে ওঠেন, 'না হয়ে যাবে না। ও সব আবদার চলবে না। তোমাদের বলতে হবে 'আগে আমাদের বাড়ীঘর করে দাও, তবে ঘর ভাঙতে পাবে। নইলে—'

সুশোভনের কথা শেষ হবার আগেই লোকটা হঠাৎ অসভ্যর মত খ্যা খ্যা করে হেসে উঠে বলে, 'বাবুকে তো রোজ দেখি সায়েব সেজে হাওয়া খেয়ে বেড়াতে, আর য্যাখন ত্যাখন হাওয়াগাড়ী চড়ে হাওয়া হতে, আজ হঠাৎ গরীবের জন্যে দরদ উঠল কেন বলেন তো? সামনের এলেকশানে নামছেন বুঝি?'

নীতার মুখটা আরক্ত হয়ে ওঠে, আর সুশোভনও হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে যান। নীতার হাতটা চেপে ধরে অসহায় সুরে বলেন, 'ও কী বলছে নীতা?'

'কিছু না বাবা; তুমি বাড়ী চল।'

'তাই চল, তাই চল!'

ভয় ভয় মুখে বলেন সুশোভন 'ও রাগ করেছে।'

তাড়াতাড়ি, নীতাকে প্রায় হিঁচড়ে টেনে নিয়ে ভারী শরীরটা নিয়ে দৌড়তে থাকেন। পিছনে উদ্দাম হয়ে ওঠে অনেকগুলো কণ্ঠের অসভ্য অশ্লীল হাসি।

এ হাসি শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত এই মুহূর্তে ওরা গৃহচ্যুত হচ্ছে, মর্মাহত চিত্তে সজল চক্ষে দেখছে ওদের অনেকদিনের গড়া পাতানো সংসারটা কোদাল আর শাবলের ঘায়ে টুকরো টুকরো হচ্ছে। না সে বিশ্বাস হচ্ছে না।

'সায়েবকে যে ভেঙচাতে পেরেছে, এইটাই যেন এখন ওদের পরম লাভ।

খানিকটা গিয়ে সুশোভন গতি শ্লথ করেন।

নির্জীব কণ্ঠে বলেন, 'ওরা আমাদের ফলো করছে না তো নীতা?'

'না তো বাবা।'

'দেখেছ ভাল করে!'

'হ্যাঁ বাবা!'

'উঃ খুব বাঁচা গেছে। আরটু হলে ধরে ফেলত!'

সুশোভন না চেতনায় জগতে ফিরে আসছিলেন?

আসছিলেন সহজ বোধের জগতে।

অন্ততঃ নীতা তাই ভেবে এতক্ষণ পুলকিত হচ্ছিল যে।

হতাশ একটা নিঃশ্বাস বুক ছাপিয়ে উঠে চলন্ত বাতাসের গায়ে আছড়ে পড়ে। বাবার হাতটা চেপে ধরে নীতা।

দু' চার পা হেঁটে সুশোভন আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'আচ্ছা নীতা, লোকটা অমন করে হাসল কেন বল্ তো?'

'হাসল কেন?' অম্লান বদনে বলে নীতা, 'লোকটা যে পাগল বাবা!'

'পাগল! ও! তাই বল!'

সুশোভনও সহসা গলা ছেড়ে হেসে ওঠেন, 'তাই বলি ভাল কথা বলতে গেলাম, অমন ব্যঙ্গ করলো কেন, হাসলো কেন! পাগল! আই সি! পৃথিবীতে পাগলের সংখ্যা যে কত!'

'তাই তো বাবা! এবার চল তাড়াতাড়ি।'

'কিন্তু নীতা, আরও অনেক লোক যেন হাসল মনে হ'ল!'

'তা' হাসলই তো!' নীতা জোর দিয়ে বলে 'হাসবে না? পাগলের পাগলামি দেখে হাসল।'

'ওঃ তাই! কিন্তু কী আশ্চর্য্য দেখ নীতা, এখানে কেউ নেই, তবু যেন হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

'ওটা মনের ভ্রম বাবা। চল চল লক্ষ্মীটি। কত দেরী হয়ে যাচ্ছে। সুচিন্তা-পিসিমা হয়তো সেই কখন থেকে তোমার জন্যে ফল-টল কেটে বসে আছেন।'

'বসে আছে!'

সুশোভন ব্যাকুল স্বরে বলেন, 'সুচিন্তা বসে আছে, আর তুমি আমায় বলছ না সে কথা?'

'এই তো বললাম।'

'তা' আগে বলতে হয় তো!'

ভারী অসন্তুষ্ট শোনায় সুশোভনের কণ্ঠস্বর, 'এতক্ষণ পরে বলছ। বেশ তো আমার অর কি। আমি বলে দেব সুচিন্তাকে, সব দোষ এই তোমার। বলব নীতা আমাকে একটা পাগলের পাল্লায় নিয়ে গিয়ে ফেলে—'

নীতা ভয়ের মুখ করে বলে, 'বোলো না বাবা। বলে দিও না। পিসিমা তা' হলে আমায় আস্ত রাখবেন না।'

'আস্ত রাখবে না!'

আবার দাঁড়িয়ে পড়েন সুশোভন, 'তোমায় আস্ত রাখবে না? তার মানে? মারবে? দেখ নীতা, তোমাকে মারলে আমি ওই সুচিন্তাকেও রেহাই দেব না। জব্দ করে দেব। কিন্তু নীতা—' মুখটা ফের অসহায়ের মত করেন সুশোভন, 'সুচিন্তা তো অমন নয়। তোমাকে সে কত ভালবাসে।'

'কী মুস্কিল। তুমি কি সত্যি ভাবছ বাবা? আমি তো ঠাট্টা করলাম।'

'ঠাট্টা করলে? ঠাট্টা করলে তুমি আমার সঙ্গে। তা' সেটা আগে বলবে তো?' আমি এদিকে রেগে যাচ্ছি সুচিন্তার ওপর। তাই তো ভাবছি সুচিন্তা কেন এমন হবে।'

'তা তো নিশ্চয়!' নীতা মহোৎসাহের সুরে বলে, 'তুমি কিন্তু বাবা বাড়ী গিয়ে সব ফলগুলো খেয়ে ফেলবে। তা'হলে খুব খুশী হবেন পিসিমা।'

'খুশী হবে? সত্যি বলছিস?'

'বলছি তো বাবা।'

স্তিমিত হয়ে আসে নীতার কণ্ঠস্বর। আর কতক্ষণ উৎসাহের অভিনয় করবে সে? কতদিন করতে পারবে!

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত এক কণা আশার দীপ্তি দেখা দিয়েই আবার যে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে দেয়।

নীতা কি এবার হার মানবে?

না না, সাগর ফিরে আসার আগে নয়। চড়ায় আটকে-যাওয়া জাহাজখানা ভাসানো যায় কিনা দেখবে শেষ অবধি। সাগর! সাগর! সাগর।

আজ রাত্রেই সাগরকে একটা চিঠি লিখবে নীতা।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই সুশোভন বলেন, 'তখন যেন কি বলছিলি নীতা? কি করলে সুচিন্তা খুব খুশী হবে। মনে পড়ছে না তো।'

কিন্তু নীতারই কি মনে আছে? বানিয়ে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করতে যায় নীতা, কিন্তু ততক্ষণে বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছে যায়। আর দেখতে পায় দরজার সামনেই সুচিন্তা দাঁড়িয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠিত মুখে। সে মুখে চটকরে খুশির আভা ফোটানো যাবে এমন আশা কম।

এরা কাছে পৌঁছতেই সুচিন্তার চিন্তিত বিরক্তির স্বর যেন আছড়ে পড়ে, 'এতক্ষণ কোথায় বেড়াচ্ছিলে নীতা? সেই কখন থেকে তোমার জেঠিমা আর কাকা এসে বসে আছেন!'

নীতা পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মায়ালতাও ভারীমুখে সেই কথাই বলেন, 'কতক্ষণ থেকে এসে বসে আছি। সকালবেলা এতটা বেড়ানো বুঝি নিয়ম তোমাদের?'

'নিয়ম আর কি।' নীতা শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার সিঁড়ির দিকে দেখে নিয়ে সামান্য হাসির মত মুখে বলে, 'বেড়াতে বেড়াতে যেদিন যেমন হয়ে যায়।' সুশোভন আসছেন ধীরে ধীরে। তিনি উঠে আসার আগে জ্যোঠির সঙ্গে প্রথম কথাগুলো হয়ে গেলেই যেন ভাল হয়।

'অ! তা' বেড়াবার সুবিধের জন্যেই বুঝি এদিকপানে থাকতে আসা?' বললেন মায়ালতা ঠোঁট টিপে।

নীতা সহসা কুণ্ঠা ত্যাগ করে সহজ গলায় বলে, 'ধরেছেন ঠিক। সত্যিই তাই। কিছুদিন থেকেই তো শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না বাবার—'

'তাই বুঝি চেঞ্জে নিয়ে এসেছিস বাবাকে?' মায়ালতা একটু ক্রুরহাসি হেসে বলেন, 'তা চেঞ্জে আসার জায়গাটা নির্বাচন করেছিস ভাল। দিল্লীর মানুষ হাওয়া খেতে এল ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে। তা' একবার খবর দিলে কিছু ক্ষেতি ছিল না বাছা। কে আর তোমাদের পাকাধানে মই দিত।'

'এসব কেন বলছেন জেঠিমা?' আরক্ত মুখে বলে ওঠে নীতা, 'বাংলাদেশের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু নির্জনে থাকলে উপকার হবে বলেই—' থেমে যায় নীতা। বুঝতে পারছে না সে জ্যেঠি কতটা জেনেছেন আর কতটা না জেনেছেন। অনেকক্ষণ নাকি এসেছেন, সুচিন্তার সঙ্গে তো কথা চালিয়ে গেছেন।

সুচিন্তা কি বলেছেন সুশোভনের বুদ্ধির জগতে দেউলে হয়ে যাওয়ার খবর! নীতার যেন মনে হয় বলেননি সুচিন্তা। বললে কি মায়ালতা এমন উগ্র-

মূর্তি ধারণ করেই থাকতেন! একটু বিষণ্ণ একটু নরম হতেন না?

আশ্চর্য! মায়ালতার ব্যবহার চিরদিনই দেখে এসেছে, সে যেন একেবারে মধু-ঝরা। আজ কেন এমন বিপরীত মূর্তি।

ছোটকাকা এসেছেন না কি। তিনিই বা কই? এদিক-ওদিক তাকায় নীতা। নিরঞ্জনের ঘর থেকে কথার আওয়াজ

সুশোভনের ওই বিহ্বল দৃষ্টি থেকে কিছু অনুমান করতে পারলেন না তিনি? না কি যেটা আশংকার বাইরে, ধারণার বাইরে সেটা অনুমান করা সম্ভব নয় বলেই মায়ালতা অমন খরখরিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠলেন!

'কি গো মেজ ঠাকুরপো, আমাকেও চিনতে পারছ না কি?'

"বেড়াতে বেড়াতে যেদিন যেমন হয়ে যায়।"

আসছে মনে হচ্ছে। ওখানেই জমিয়ে নিয়েছেন বোধ হয়।

মায়ালতা আরও কিছু বলতে গিয়েই থামলেন।

সুশোভন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছেন, থেমে থেমে। বিকলভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

পিছনে সুচিন্তা।

স্ট্যাচুর মত ভাবলেশশূন্য মুখে।

বোঝা যাচ্ছে সহসা নিজেকে সংবরণ করে নিয়েছেন সুচিন্তা, সমাহিত করে নিয়েছেন নিজেকে নিজের মধ্যে।

মায়ালতা কি অন্ধ?

সুশোভন তেমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্খলিত স্বরে বলেন, 'চিনতে! চিনতে পারছি তো!'

সহসা সুর বদলাল মায়ালতা।

বিগলিত হাস্যে আবদারে গড়িয়ে-পড়া সুরে বলে ওঠেন, 'চালাকি করে আর আমায় ফেরাতে পারবে না মেজ ঠাকুরপো। আমি যে কী চীজ্ জানো তো? আমি তোমায় নিয়ে গিয়ে তবে ছাড়ব। সুচিন্তা তুমি কিছু মনে কোর না ভাই, তবে এও বলি বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ী থাকলে লোকে বলবে কি, সেটা তোমারো একবার ভাবা উচিত ছিল। আর নীতা—'

'জেঠিমা!'

নীতা অসহিষ্ণু প্রতিবাদ তোলে।

কিন্তু মায়ালতা সেই ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সুরটুকু ধর্তব্য করেন না, উচ্চ হাস্যরোলে ডাক দেন, 'ও ছোট ঠাকুরপো, দেখ দেখে যাও; তোমার মেজদা আমাকেও চিনতে পারছে না। এই কৌশলটাই রপ্ত করে রেখেছ বুঝি মেজ ঠাকুরপো? না কি কেউ কিছু শেকড়-বাকড় ছুঁইয়ে গুণ-তুক করে জড়পদার্থ বানিয়ে রেখেছে তোমায়।'

সুচিন্তার দিকে একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করেন মায়ালতা।

কিন্তু সুচিন্তা তো পাথরের স্ট্যাচু।

আর নীতাও বোধকরি তাই হবার সাধনা করছে।

মায়ালতার হাস্যরোলে সুমোহন বেরিয়ে আসে এবং 'কী ব্যাপার!' বলে এগিয়ে আসে।

কিন্তু ব্যাপার আর তখন অপর কাউকে বোঝাতে হয় না, সুশোভনই সবটা বুঝিয়ে দেন। সুমোহনকে দেখেই ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত পুলকে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নীতা, নীতা, আমার সেই ছোট ভাইটা!'

নীতা এগিয়ে গিয়ে কাকাকে প্রণাম করে শান্ত নির্লিপ্ত স্বরে বলে, 'ও কি বাবা ছোট ভাইটা বলছ কেন? নাম ধরে বলবে তো!'

'নাম ধরে! হ্যাঁ হ্যাঁ নাম ধরেই তো বলবো। কিন্তু নীতা নামটা? নামটা কোথায় গেল! নামটা তো খুঁজে পাচ্ছি না। নীতা শুনছো খুঁজে দিচ্ছ না কেন?'

চেয়ারের উপর বসে পড়েন সুশোভন হতাশের মত।

এবার একটু থতমত খান মায়ালতা। এর ওর মুখের দিকে তাকাতে থাকেন।

সুমোহন চোখের ইশারায় নীতাকে বলে 'কতদিন?'

নীতা কিন্তু সে ইশারায় সাড়া দেয় না। বাবার চেয়ারের পিঠটা শক্ত করে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুচিন্তা ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যান, আর নিরঞ্জনও একবার ঘরের বাইরে এসে সমস্ত পরিস্থিতিটার ওপর চোখ বুলিয়ে ফের ঘরে ঢুকে পড়ে।

'মেজদা আমি মোহন।'

কাছে এসে আস্তে উচ্চারণ করে সুমোহন, নীতার প্রতি একটি জ্বলন্ত

কটাক্ষপাত করে। রাগতে বড় দেখা যায় না সুমোহনকে, কিন্তু আজ সে নীতার ওপর একান্ত রেগেছে। যেন নীতাই কী এক ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত করে অপদস্থের একশেষ করতে চেয়েছে তার জেঠা-কাকাকে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মাথার গোলমাল ঘটেছে সুশোভনের, দু'-চারটে স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে মগজের জমাট বাঁধুনির, কিন্তু সে খবরটা তুই চেপে রেখে নিজের দায়িত্বে লুকিয়ে বসে আছিস কি বলে?

তুই একা তোর বাপের খবরদারির মালিক?

সুশোভনের ভাইরা কেউ নয়?

হতে পারে ভাইদের দিক থেকে খবরাখবর নেওয়ার তেমন চাড় নেই। তা' সহজ সুস্থ মানুষের জন্যে রাতদিন কে আবার উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকে? 'বাবার শরীর তেমন ভাল নয়, তাই কলকাতায় যাওয়া স্থগিত রাখলাম,' পোস্টকার্ডে এইটুকু জানিয়েই কর্তব্য সারা হয়ে গেছে তোর!

ভয় নেই।

দায়িত্ববোধ নেই।

একা একটা ছেলেমানুষ মেয়ে, একটু বিচলিত বিকলতাও নেই। এতবড় খবরটা জানতে দেয়নি।

এতক্ষণ নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলছিল বটে সুমোহন, কিন্তু সেও তো ঘুণাক্ষরে এদিক দিয়ে গেল না!

'এ'রা কতদিন হ'ল এসেছেন' এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাবার ভঙ্গীতে বলল, 'এই তো কতদিন যেন হল। বার-তারিখ আর কে মনে রেখে দিয়েছে বলুন।'

সুচিন্তাও শুধু কুশল প্রশ্ন করেছেন, শুধু বলেছেন, 'ওরা বেরিয়েছে।'

বতদূর বোঝা যাচ্ছে সুচিন্তার ভাড়াটে এরা নয়।

ভাড়াটে রাখবার মত ব্যবস্থাও তো নয় বাড়ীর। এই তো এদের ঘর-সংসারের মধ্যেই তো উঠে এল নীতা, উঠে এসে বসলেন সুশোভন। ভাড়াটের ভঙ্গী এ নয়।

এত কথা এত বিশদ করে অবশ্য এই মুহূর্তে ভাবতে বসেনি সুমোহন। ভাবনাগুলো ছায়া ফেলে ফেলে দ্রুত সরে গেছে, আর সুমোহন নিজে আস্তে কাছে সরে এসেছে। কাছে এসে বলেছে—'মেজদা আমি মোহন।'

মোহন। মোহনই সুমোহনের ডাক-নাম।

সুশোভন আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, 'ও নীতা, ও সুচিন্তা, শুনতে পেলে—মোহন! মোহন। দেখলে তো তোমরা কেউ নামটা খুঁজে বার করতে পারলে না, মোহন খুঁজে দিল। মোহন! মোহন! কী আশ্চর্য, হঠাৎ কী রকম যে সব হারিয়ে যায়।'

সুমোহন মায়ালতা নয়। সুমোহন নির্বোধ নয়। তাই পরিস্থিতির পরিমাপে নিজেকে ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে সহজ গলায় বলে, 'তারপর মেজদা, দিল্লী থেকে কবে এলে?'

'দিল্লী থেকে!'

সুশোভন বিপন্নভাবে বলেন, 'নীতা, দিল্লী থেকে আমরা কবে এলাম?'

'সেই তো বাবা ওমাসের দোসরা।'

'ওই। ওই শুনলে তো মোহন, ও মাসের দোসরা।'

'কলকাতায় থাকছ তো এখন?'

সুশোভন স্বচ্ছন্দে বলেন, *'থাকবই তো! আর কি সুচিন্তাকে মরতে দিই? দিল্লীতে সব্বাই মরে যায়! কিন্তু তুমি? তুমি কি দিল্লীতে ছিলে?'*

'না মেজদা আমি তো বন্নার এখানেই আছি।'

'তুমি বড্ড বাজে কথা বল মোহন। এখানে আবার কবে ছিলে তুমি? এই তো এলে, এই তো তোমার নামটা হারিয়ে গেল। আবার তুমি খুঁজে দিলে।'

'বাবা চল, ঘরে চল তোমার ফলটল খাবার সময় হল।'

'ফল খাবার সময় হল?'

সুশোভন সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, 'আর মোহন? মোহনের ফল খাবার সময় হ'ল না? তোরা কি হলি নীতা? মোহনের ঘরবাড়ী সব ভেঙে গেল, ও খাবে না? কোথায় খাবে ও?'

'কী বাজে কথা বলছ বাবা!' নীতা ধমকে ওঠে, 'কাকার আবার ঘরবাড়ী ভাঙতে যাবে কেন? সে তো অন্য লোকের! গরীব লোকের।'

'গরীব লোকের। তাই তো। ঠিক ঠিক ঠিক বলেছিস। এই নীতা আমাকে সব ঠিক করে দেয় মোহন।'

মায়ালতা ফস্ করে বন্ধ মুখ খুলে বসেন। এই কথার পিঠে বলে ওঠেন, 'তা' নীতা তো আর চিরদিন তোমার সব ঠিক করে দিতে বসে থাকবে না গো মেজ ঠাকুরপো। বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হবে না নীতা'কে? তখন?'

'তুমি আবার কথা বলছ কেন?'

ভারী গলায় ধমকে ওঠেন সুশোভন, 'তুমি বললেই অমনি নীতাকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দেব? তোমার হুকুম?'

মায়ালতা যেন কৌতুক পান।

যেমন কৌতুক জগতের নিরেনব্বই জন পায় পাগল দেখে। 'সুশোভন পাগল হয়ে গেছেন।' এই ভয়ঙ্কর সত্য শব্দটা আপাততঃ এখন আর বিমূঢ় করছে না মায়ালতাকে। তাই তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেবরের মুখচ্ছবি অবলোকন করে বলেন, 'তা' আমি তো হুকুম দিতেই পারি। আমি ওর জেঠি না? ও আমার শ্বশুর-কুলের মেয়ে না? ও বিয়ে না হয়ে ভেসে বেড়ালে আমাদেরই নিন্দে না?'

কথাটা মায়ালতা কাকে বলছেন সেটা অবশ্য নীতার কাছে ধরা পড়তে দেরী হয় না, তবু সে অবিচলিত কণ্ঠে বলে, 'আচ্ছা একটু বসুন জেঠিমা, বাবাকে আগে একটু খাইয়ে নিই, তারপর যত খুশি প্রশ্ন করবেন। এই সময় ওঁ'র কিছু খাওয়া অভ্যাস কিনা।'

মায়ালতা সবটা পরিপাক করে নিয়ে ছলছল চোখে, অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'খুশি? খুশির প্রশ্ন করবার মুখ কি আর রেখেছেন ভগবান! অবাক হয়ে তাই দেখছি আর ভাবছি এ কী! কী মানুষের, এ কী পরিণতি। আচ্ছা মেজ ঠাকুরপো ভাল করে চেয়ে দেখে বল তো, আমাকে কি সত্যিই একেবারে চিনতে পারছ না?'

হঠাৎ নিজের ধরনে হা-হা করে হেসে ওঠেন সুশোভন। 'চিনতে পারবো না মানে? কে বলছে পারিনি? তুমি সেই ওদের বাড়ীর বড় বৌ না?'

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

॥ পরলোকে সরলাবালা সরকার ॥

বাঙলার মহিলা সাহিত্যসেবীদের অন্যতমা সরলাবালা সরকার পরলোক-গমন করেছেন। উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর সংযোগরক্ষীদের মধ্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আজীবন সাহিত্যপ্রিয়তা সাহিত্যজগতে তাঁর স্থান করে দিয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর।

এই প্রখ্যাতনামা লেখিকা ১৮৭৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের কাঠালপোতায় জন্মগ্রহণ

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার

করেন। উনিশ শতকের নব-জাগরণ তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। একনিষ্ঠ সাধনা এবং জানবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনকে মার্জিত রূপে গড়ে তোলে। পিতামহী রামসুন্দরীর প্রভাবই ছিল সবথেকে বেশী। সরলাবালার দেশ-প্রীতি ও সাহিত্যানুরাগ গড়ে ওঠে তাঁরই প্রেরণায়।

সরলাবালার শিক্ষাজীবন শুরু হয় পিতা কিশোরীলাল সরকারের কাছে এবং তার পরিপূর্ণতা লাভ করে জ্যেষ্ঠা-গ্রজ ডাক্তার সরসীলাল সরকারের স্নেহানুকূল্যে।

অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই তাঁর কাব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। দশ-এগার বৎসর বয়সে তিনি কবিতা রচনায় সিদ্ধ হয়ে ওঠেন। ১২৯৪ সালে মাত্র বার বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলেও সাহিত্যসেবা অম্লান ছিল। কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প ভারতী, বঙ্গলক, প্রদীপ, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এবং নিরলস সাধনার ফলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি সাহিত্য-জগতে স্বীকৃতিলাভ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনে সরলাবালার অবদান স্মরণীয় হ'য়ে আছে। তাঁর জীবনকথা থেকে জানা যায় যে, তিনি বাঘা যতীন, মানবেন্দ্র রায়, সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিকে শাসক-চক্ষুর অন্ত-রালে বহুবার জননীর স্নেহ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের তিনি ছিলেন ভাগিনেয়ী। সরলাবালার জীবনে গৌরাঙ্গের লীলা ও কীর্ত্তনগানের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আসে এই মাতুলের প্রভাবে।

মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র কন্যা শ্রীযুক্তা নিঝরিণী সরকার, দুজন দৌহিত্রী, দৌহিত্র আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

॥ আক্রমণ যুদ্ধ নয় ॥

খণ্ডিত ভারতের চেয়ে চীন আকৃতিতে প্রায় চারগুণ বড়, কিন্তু তবুও চীনের ভূমিলালসার তৃপ্তি নেই। তাই ভারতের উত্তর সীমান্তের প্রায় চুয়াম হাজার বর্গমাইল জমির ওপর সে দাবী জানিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই দাবী-কৃত জমির প্রায় বারো হাজার বর্গমাইল সে দখল করে নিয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার এই অন্যায় অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ-কল্পে আজ পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি বলে সম্প্রতি চীন তার লোলুপ থাবা আরও একটু প্রসারিত করেছে। স্বভাবতঃই চীনের এই সম্প্রসারণশীল নীতির বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নিবীর্য নিষ্ক্রিয়তা দেশবাসীর মনে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে, এবং সংসদের বর্তমান অধি-বেশনে প্রায় সব দলের পক্ষ থেকে অবি-লম্বে চীনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী উঠেছে।

কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীমেনন প্রায় আগের মতই নির্বিকার। তাঁরা বলেছেন, এই আক্রমণ যুদ্ধ নয়! সুতরাং যুদ্ধে যা করণীয় তা এক্ষেত্রে করা চলে না। তাঁরা ঠিকই বলেছেন, এ আক্রমণ সত্যই যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ হয় দুই পক্ষে, কিন্তু এক পক্ষ সমানে এগিয়ে আসা সত্ত্বেও অপর এক পক্ষ যদি চোখ বুজে শান্তি ও অহিংসার কথা প্রচার করে তবে যুদ্ধ হবে কেমন করে? কিন্তু যুদ্ধ হোক বা না হোক, ভারতের আরো কিছু জমি গেল।

॥ শান্তিবাদীর এ কি রূপ ॥

বাইরে যে ভিজে বিড়াল, ঘরে সেই বনবিড়াল। সাধারণত মসিজীবী বঙ্গ-সন্তানদের ক্ষেত্রেই এই অপবাদ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁরা এখন জোর গলায় বলতে পারেন, তাঁদের এই নীতি ভারত সরকারেরই অনুসৃত নীতি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী সারা পৃথিবীতে শান্তিকামী জননায়করূপে পরিচিত, হয়ত শান্তির শ্রেষ্ঠ পুরস্কারও তিনি শীঘ্রই পাবেন। কিন্তু দেশের শাসনকার্য চালান তিনি সম্পূর্ণ অন্য রীতিতে। গত ১৯শে মে মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে শিলচরের এগারজন বাঙালী তরুণ-তরুণীকে পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারাতে হয়। শ্রাদ্ধের পর কাঙালী-ভোজনের মত এই গুলীচালনার পরেও গুলীচালনার যৌক্তিকতা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিচারপতি মেহরোত্রাকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। সেই তদন্ত কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে আসাম রাইফেলসের ক্যাপ্টেন মোহন সিং সুময়া বলেছেন, তাঁর মতে সেদিন শিলচরের পরিস্থিতি এমন অব-নত হয়নি যার জন্যে সামরিক হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে পুলিশকে সরিয়ে সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে আসার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

॥ বন্যায় ক্ষতি ॥

সারা দেশ জুড়ে এ বছর যা বন্যা হয়ে গেল তা প্রকৃত অর্থেই অভূত-পূর্ব। লোকসভায় প্রদত্ত সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, এই বন্যায় সারা ভারতে ৯৬২ ব্যক্তির প্রাণহানি হয়েছে, এবং প্রায় ২৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। ৩১ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে এবং গৃহ ধ্বংস হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৭১ হাজার। গবাদি পশু হারিয়েছে ৩,৫৯৮টি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য

বিহারের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

॥ বিচ্ছেদ ॥

১৯৬০ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয়েছে মোট ৫,৯৯৪টি। বিচ্ছেদ প্রার্থনার কারণরূপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে ব্যাভিচার, নিষ্ঠুরতা, দুর্ব্যবহার, পরিত্যাগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, যৌন অক্ষমতা, দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী রাজ্য হ'ল মহারাষ্ট্র, সেখানে গত বছরে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয়েছে এক হাজার তেইশটি। মহারাষ্ট্রের পরেই স্থান ক্ষুদ্রতম রাজ্য কেরালার এবং তারপরে পশ্চিমবঙ্গের। এই দুই রাজ্যের মামলার সংখ্যা যথাক্রমে ৭৪৩ ও ৬৯৮। সবচেয়ে কম বিচ্ছেদ-প্রার্থনা জানিয়েছে উড়িষ্যা, মাত্র ৬৮টি। বহু বিষয়েই রাজ্য তালিকায় উড়িষ্যার নাম সবার নীচে থাকে, কিন্তু এই ব্যাপারে লাস্ট হওয়া উড়িষ্যার পক্ষে অবশ্যই শ্লাঘার বিষয়। স্লো সাইক্ল্ রেসে লাস্ট হওয়ার মত।—বোম্বাই, কেরালা, বাঙলায় বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রার্থনা সবচেয়ে বেশী আর বিহার, উড়িষ্যায় সবচেয়ে কম, এই তথ্য থেকে একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটি হ'ল দাম্পত্য জীবনের উপর আধুনিক শিক্ষা ও যান্ত্রিক সভ্যতার বিপর্যয়কর প্রভাব।

॥ নেপাল পরিস্থিতি ॥

নেপালের রাজা মহেন্দ্র রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র কায়েম করেছেন। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ভারতের পক্ষে মহেন্দ্রের এই স্বৈরতন্ত্রী আচরণ সমর্থনযোগ্য না হলেও পররাজ্যের ঘরোয়া ব্যাপারে অযথা মন্তব্য অপ্রয়োজনীয় ভেবে ভারত সরকার এতদিন নীরব ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি চীনে গিয়ে সেখানকার জঙ্গী শাসকদের জবরদস্ত নির্দেশে রাজা মহেন্দ্র যেভাবে নেপালের সর্বনাশের ব্যবস্থা করে এসেছেন তাতে ভারত সরকারের পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয়নি। ভারতের কাছে আজ চীনের ভয়ংকর রূপ সুস্পষ্ট, সেকারণে নেপালের ওপর চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে সেটা যে শেষ পর্যন্ত ভারতেরই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এটা ভারত সরকার উপলব্ধি করেছেন। রাজা মহেন্দ্র চীনে গিয়ে শুধু যে নেপালের শ্রেষ্ঠ গৌরব এভারেষ্ট শৃঙ্গের উপর সার্বভৌম অধিকার ত্যাগ করে এসেছেন তাই নয়, লাসা-কাঠমাণ্ডু সড়ক নির্মাণের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে তিনি খাল কেটে কুমির আনার ব্যবস্থা পাকা করে এসেছেন।

নেপালকে এই সর্বনাশা বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রকৃত অর্থ ভারতেরই স্বার্থরক্ষা করা, এই কথা বুঝে নিয়ে আজ ভারত সরকারের কর্তব্য হওয়া উচিত নেপালের গণতান্ত্রিক শক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। ইতিপূর্বে রাণাশাহীর অবসানকল্পে ভারত সরকার নেপালের গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাহায্য করেছিলেন এবং সেকারণে নেপালবাসীরা সেদিন ভারত সরকারকে মুক্তিদাতা বলেই অভিনন্দন জানিয়েছিল। আজও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই।

॥ রুশ-ভারত বাণিজ্য ॥

এই বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রুশ-ভারত বাণিজ্যের যে এক বছরের হিসাব প্রকাশ পেয়েছে, তাতে দেখা যায়, লেনদেন করে ভারতের কয়েক কোটি টাকা লাভ হয়েছে। ভারত রাশিয়ায় পণ্য রপ্তানি করেছে ২৮·৮২ কোটি টাকার, আর সেদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেছে ১৫·২২ কোটি টাকার। যে সকল পণ্য দুই দেশের মধ্যে বিনিময় হয়েছে তা লক্ষ্য করলে দুই দেশের অভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। ভারত রাশিয়া থেকে যা এনেছে তা সবই প্রায় যন্ত্রপাতি। আর রাশিয়া ভারত থেকে নিয়েছে ১১.৫৮ কোটি টাকার কফি, চা, কোকো ও মসলা; কাঁচা চামড়া ও পশুলোম ৪·৩৯ কোটি টাকার; কাপড় ৪·২৩ কোটি টাকার; ফল ও শাকসব্জী ২·৩৪ কোটি টাকার; তুলা ১·৬৫ কোটি টাকার; জুতা ১'২২ কোটি টাকার; বনস্পতি ও অন্যান্য স্নেহজাতীয় বস্তু ৯২·৩১ লক্ষ টাকার।

॥ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ॥

ঘানায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে উত্তর-স্নাতক ও অব-স্নাতক ছাত্রের মোট সংখ্যা ৭৫০। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনকালে ঘানার রাষ্ট্রপতি ডঃ কুয়েম এনকুমা বলেছেন, শীঘ্রই মধ্য ঘানার কুমাসি নগরে দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। তার নাম হবে কুয়েম এনক্রুমা বিশ্ববিদ্যালয়। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যেই সারা পৃথিবী থেকে যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহ করা হবে।

॥ সস্তায় বিমান ভ্রমণ ॥

বৃটিশ ইউরোপীয়ান এয়ারওয়েজ লণ্ডন, গ্লাসগো, এডিনবরা বিমানপথে একটি নৈশ বিমান চালু করেছেন। ৫৭৬ মাইল দীর্ঘ এই বিমানপথের জন্য ভাড়া ঠিক হয়েছে ৪৭.২৫ টাকা, অর্থাৎ মাইলপিছু দুআনা। এয়ারওয়েজ দাবী করেছেন এর চেয়ে সস্তা বিমান ভাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ডাক বহনের উদ্দেশ্যে এই নৈশ বিমানটি প্রবর্তিত হলেও এখন যাত্রীবহন করা হচ্ছে। বৃটিশ রেলপথ এই সস্তা বিমান-পথ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিল। আমরা ক'লকাতায় ট্যাক্সি চাপি মাইলপিছু আট আনা দিয়ে, আর লণ্ডনের লোকেরা আকাশে উড়ছে মাইলপিছু দু আনা দিয়ে!

॥ অবশ্যম্ভাবী ॥

ঢাকায় এই বছর কয়েকজন পুরোহিত নাকি লুঙ্গি পরে পূজো করেছেন এবং পূজার্থীরাও লুঙ্গি ও পাজামা পরে অঞ্জলি দিয়েছেন। বিজয়ার পরেও হিন্দুরা নাকি নিজেদের মধ্যে আলিঙ্গনের সময় পরস্পরকে আদাব ও সালাম বলে সম্ভাষণ করেছেন।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, হিন্দুদের মুস্লিম ধর্মগ্রহণও খুব ব্যাপক হয়ে উঠেছে। ধর্মান্তরিতদের মধ্যে আবার নারীর সংখ্যাই বেশী। পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের মধ্যে এর ফলে দারুণ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে এই মর্মে দাবী উঠেছে যে, সরকার অবিলম্বে এমন আইন পাশ করুন যাতে পিতা ও অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ধর্মান্তর নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

॥ সুমেরুর বলাকা ॥

কাব্যের চিরন্তন অনুপ্রেরণা আজ ত্রাসের রূপ ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসেছে পাকিস্থানে। প্রতি বছরেই এই সময় তীব্র শীত হতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে উত্তর মেরু থেকে দলে দলে হাঁস উড়ে আসে পাকিস্থান ও ভারতের নাতিশীতোষ্ণ জলাশয়গুলিতে। এবারও এসেছে তারা। কিন্তু পাক সরকার সকলকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, পরমাণু বোমার ভস্ম ছড়িয়ে আছে ওদের সর্বদেহে। ঐ তেজস্ক্রিয় হাঁস মনুষ্যভোগের অনুপযুক্ত। সুতরাং লোভের বশবর্তী হয়ে কেউ যেন ওদের হত্যা না করে।

॥ ঐতিহ্য ॥

এতদিন মাঝে মাঝে সুরমত্তা চার্চিল-তনয়ারই জেল বা জরিমানার সংবাদ পাওয়া যেত। এইবার ম্যাক-মিলান-তনয়ারও দণ্ডভোগের সংবাদ পাওয়া গেল। আর আশ্চর্যের বিষয় যে, বৃটেনের এই দুই রক্ষণশীল প্রধান-মন্ত্রীরই মেয়ের নাম সারা।

॥ স্বাগতম ॥

মহাকাশচারী মহাবীর গাগারিন এসেছেন ভারতে, শুভেচ্ছা সফরের আমন্ত্রণে। ভাগ্যবতী শ্রীমতী গাগারিনও আছেন তাঁর সঙ্গে। দিল্লীতে স্বতস্ফূর্তভাবে অসংখ্য মানুষ সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, বিংশ শতব্দীর কলম্বাস এই নূতন পৃথিবীর বার্তাবহকে। বোম্বাই পরিদর্শন করে ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় আসবেন তিনি। কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের আন্তরিক ইচ্ছায় সার্থক হয়ে উঠুক তাঁর সাদর সম্বর্ধনা।

ঘটনাপ্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২৩শে নভেম্বর—৭ই অগ্রহায়ণ : 'ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৬২) শেষার্ধে দেশব্যাপী (ভারত) সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান : ২রা মার্চ মধ্যে ফলাফল ঘোষণা সমাপ্তির আশা'—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

'বিশ্বশান্তি রক্ষা ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধান ভারত ও জাপানের সাধারণ লক্ষ্য'—নেহরু-ইকেদা যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা—জাপ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর সমাপ্ত—অচিরে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য উভয় প্রধান-মন্ত্রীর আহ্বান।

২৪শে নভেম্বর—৮ই অগ্রহায়ণ : ভারতের মধ্যেই স্বতন্ত্র মুশ্লিম রাজ্য গঠনের দাবীতে গোপনে প্রচার অভিযান —পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সতর্কতার সহিত অবস্থা পর্যবেক্ষণ।

কমাণ্ডার নানাবতীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ বহাল—সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আপীলের আবেদন বাতিল—আহুজার হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব-পরিকল্পিত বলিয়া অভিমত দান।

পর্তুগীজ দ্বীপ (অঞ্জাদেব) হইতে ভারতীয় জাহাজের উপর গুলীবর্ষণ—লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি—ঘটনা গুরুতর বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য।

প্রাক্তন মন্ত্রী (অবিভক্ত বাংলার) ও বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের (৬৮) পরলোকগমন।

২৫শে নভেম্বর—৯ই অগ্রহায়ণ : পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতা বিলোপের জন্য পুলিশী ব্যবস্থা দাবী—গোয়ান রাজনৈতিক সম্মেলনে (বোম্বাই) শ্রী এম্. সি. চাগলার উদ্বোধনী ভাষণ।

'ফরাক্কা বাঁধের কাজ অব্যাহত গতিতে চলিবে'—দিল্লী হইতে কলি-কাতা প্রত্যাবর্তনের পর ডাঃ রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) ঘোষণা।

২৬শে নভেম্বর—১০ই অগ্রহায়ণ : ভারতীয় বিমান বাহিনী নির্মিত প্রথম আভ্রো—৭৪৮ বিমানের ('সুব্রত') প্রথম আকাশ যাত্রা—দিল্লীতে শ্রীনেহরুর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন—'সুব্রত' ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের সাফল্যের প্রতীক বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য।

২৭শে নভেম্বর—১১ই অগ্রহায়ণ : 'ভারতীয় এলাকায় চীনাদের অনুপ্রবেশ বড় আকারের না হইলেও দুষ্ট অভিপ্রায় সমন্বিত—উত্তর সীমান্ত সম্পর্কে ভারতকে সতর্ক থাকিতেই হইবে—দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

লাসা-কাঠমাণ্ডু সড়ক নির্মাণ সম্পর্কে চীন-নেপাল চুক্তি—ভারতের স্বার্থহানিকর বলিয়া রাজ্যসভায় শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

২৮শে নভেম্বর—১২ই অগ্রহায়ণ : ভারত-সীমান্তে চীনের আরও তিনটি সামরিক চৌকী প্রতিষ্ঠা—লোকসভায় উপস্থাপিত ভারত সরকারের শ্বেতপত্রে ঘোষণা—সীমান্তের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রীনেহরুর বিবরণ পেশ।

পাঞ্জাবী শিখগণ কর্তৃক দাশ কমিশনের উদ্বোধনী অধিবেশন (দিল্লী) বর্জন—পরবর্তী শুনানীর তারিখ ৩রা জানুয়ারী (১৯৬২) নির্ধারিত।

২৯শে নভেম্বর—১৩ই অগ্রহায়ণ : সোভিয়েট প্রথম গগনচারী মেজর ইয়ুরি গাগারিনের দিল্লী উপস্থিতি—রাজধানীর পথে পথে জনতার বিপুল সম্বর্ধনা।

পাকিস্তানে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কর্ণেল ভট্টাচার্যের আশু মুক্তি অর্জনের জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত—লোকসভায় বিতর্কের উত্তরে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রী এ. কে. সেনের বিবৃতি।

॥ বাইরে ॥

২৩শে নভেম্বর—৭ই অগ্রহায়ণ : বৃটিশ সরকার কর্তৃক কেনিয়ার নেতা মিঃ জেমো কেনিয়াট্টার উপর সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার।

২৪শে নভেম্বর—৮ই অগ্রহায়ণ : সাইবেরিয়ার নোভোসিবিস্ক সহরে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সহিত ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কেকোনেনের জরুরী বৈঠক—পঃ জার্মানী ও মিত্র শক্তিবর্গের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে আলোচনা।

পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার রাষ্ট্রসংঘ সনদ বিরোধী—সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে মন্তব্য—আফ্রিকাকে আণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ।

কাতাঙ্গাকে অবশ্যই কঙ্গোর মধ্যে থাকিতে হইবে—রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদে কঙ্গো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ।

২৫শে নভেম্বর—৯ই অগ্রহায়ণ : 'অন্যান্য রাষ্ট্র পরমাণু পরীক্ষায় বিরত থাকিলে রাশিয়াও প্রস্তুত : নিরস্ত্রী-করণ চুক্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঐকমত্য চাই'—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

বিভিন্ন দেশের নিকট হইতে 'আজাদ কাশ্মীরের' (পাক্ অধিকৃত) স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা—দুই তিন মাসের মধ্যেই আন্দোলন সুরু—'আজাদ কাশ্মীর' প্রেসিডেণ্ট কে. এইচ. খুরশীদের সদর্প ঘোষণা। (করাচী সংবাদ)

২৬শে নভেম্বর—১০ই অগ্রহায়ণ : রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদের বিরুদ্ধে কাতাঙ্গার সর্বাত্মক যুদ্ধের হুমকী—কাতাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট শোম্বের আস্ফালন।

২৭শে নভেম্বর—১১ই অগ্রহায়ণ : আলজিরিয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দুইদিনে ১৭ ব্যক্তি নিহত ও ৮৭ জন আহত হওয়ার সংবাদ।

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ-করণ সম্পর্কে রাশিয়ার চার দফা নূতন প্রস্তাব—ফ্রান্সকেও ত্রিশক্তি আলোচনায় (জেনেভা) যোগদানের আহ্বান জ্ঞাপন।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে (সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র) হত্যার ষড়যন্ত্র—ফরাসী মিশনের ৯ জন গ্রেপ্তার।

২৮শে নভেম্বর—১২ই অগ্রহায়ণ : নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা সংস্থা গঠনের জন্য সাধারণ পরিষদের (রাষ্ট্রসংঘ) প্রস্তাব—ঐকমত হওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে অনুরোধ।

'রাশিয়া দুনিয়াকে কম্যুনিষ্ট করার চেষ্টা ছাড়িলেই বৃহৎ সমস্যাগুলির সমাধান'—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির উক্তি।

২৯শে নভেম্বর—১৩ই অগ্রহায়ণ : মার্কিন রকেটযোগে প্রেরিত শিম্পাঞ্জীর দুইবার পৃথিবী পরিক্রমার পর নিরাপদে অবতরণ।

'নাটো' আণবিক বাহিনী গঠন পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করিতে হইবে—নূতন পশ্চিম জার্মাণ সরকারের নীতি ঘোষণা।

মহাশূন্যে প্রথম মানুষ যাত্রী

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

"প্রথম স্পুৎনিকের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? তখন কি ভাবতে পেরেছিলেন যে, আপনি হবেন দুনিয়ার প্রথম মহাকাশ অভিযাত্রী?" সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে গাগারিন বলেন :

"তখন আমি ওরেনবুর্গ বিমান বিদ্যালয়ের শিক্ষণমালা প্রায় শেষ করে এনেছি। সেদিন "এম-আই-জি" জঙ্গী বিমান নিয়ে এক চক্কোর দিয়ে নেমে এসেই স্পুৎনিকের খবর শুনলাম। সেদিনই বুঝেছিলাম মানুষের মহাকাশ যাত্রার আর বেশী দেরী নেই। তবে সেটা যে এত তাড়াতাড়ি হবে তা ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম আরো বছর দশেক লাগবে। সে যাই হোক, মহাকাশে উড়ে যাবার স্বপ্ন আমার ছোটবেলাকার, তবে আমিই যে প্রথম অভিযাত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করব তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ছোটবেলায় জুলেভার্ন পড়েছি! কিন্তু তারচেয়েও ভাল লেগেছিল "আন্দ্রোমেদা নীহারিকার" গল্প।"

ওরেনবুর্গ বিদ্যালয়ে বিমান-বিদ্যা শিক্ষার সময় ১৩ ঘন্টা তালিমী প্রোগ্রামের পর গাগারিণ একাই বিমান নিয়ে আকাশে ওঠেন। এ-রকম কৃতিত্ব বড় একটা নজরে পড়ে না। খেলাধুলাতেও তিনি ছিলেন চৌকশ, বিশেষ করে বাস্কেটবল ও ফুটবলে। ওরেনবুর্গ বিদ্যালয়ের আগে এক টেকনিক্যাল স্কুলে ধাতু ঢালাই-এর কাজ শিখেছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি এক শখের পাইলটদের ক্লাবে ভর্তি হন। খেলাধুলোর দিকে এত ঝোঁক ছিল বলে গাগারিণ লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন না। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তাঁর ক্লাসে তিনিই ছিলেন মনিটার এবং স্কুলের দেয়াল-পত্রিকার সম্পাদক তিনিই ছিলেন।

গাগারিণের কীর্তির পিছনে রয়েছে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস। এই বিস্ময়কর ইতিকথার উপক্রমণিকার জন্ম ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। প্রথম স্পুৎনিকে বেশী কিছু যন্ত্রপাতি কলকব্জা ছিল না। কারণ সে ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করে তাকে কক্ষপথে সংস্থাপিত করা। এর পরে মহাকাশে আবির্ভূত হোল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্পুৎনিক। মহাশূন্যের যাত্রীর উপর তেজস্ক্রিয়া, মহাজাগতিক রশ্মি এবং ধাবমান উল্কার প্রভাব কি রকম হবে না হবে সে বিষয়ে বহু তথ্য আমরা তৃতীয় স্পুৎনিক থেকে পেয়েছি। তৃতীয় স্পুৎনিকের পর মহাশূন্য বিজয়ের সংগ্রাম এক নতুন কান্ডে উত্তীর্ণ হোল। প্রথম লুনিক চাঁদের পথে সূর্যের দিকে পাড়ি দেয় ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী।

১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী এইভাবে মানুষ পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখিয়ে সূর্যের কৃত্রিম

গাগারিন

গ্রহ সৃষ্টি করে, যে গ্রহ সৌর পরিবারের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

মহাজাগতিক গবেষণার পরবর্তী অধ্যায় রচিত হয় চাঁদকে কেন্দ্র করে, কারণ চাঁদই আমাদের সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। ১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর একটি গবেষণার যন্ত্রপাতির আধার নিয়ে দ্বিতীয় লুনিকের চন্দ্রলোক যাত্রা শুরু হয়। দ্বিতীয় লুনিকের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল পৃথিবী ও চাঁদের চৌম্বক-ক্ষেত্র পরীক্ষা করা। সেই রকেট থেকে স্বয়ংচালিত মহাজাগতিক স্টেশন আলাদা হয়ে গিয়ে চাঁদ ও পৃথিবী সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পৃথিবীতে টেলিমিটার ক'রে জানায়।

১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর যাত্রা করে সোভিয়েতের তৃতীয় লুনিক চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবার একটি মহাজাগতিক স্টেশন নিয়ে। ৫ই অক্টোবর থেকে মহাজাগতিক স্টেশনটি চন্দ্র প্রদক্ষিণ শুরু করে এবং টেলিমিটার ও টেলিভিশনে বিভিন্ন তথ্য ও সংকেত পাঠাতে থাকে যার মধ্যে ছিল চাঁদের অদৃশ্য দিকের আলোকচিত্র। এর পর ১৯৬০ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা খুব ভারি জাতীয় স্পুৎনিক নিয়ে বার কতক পরীক্ষা চালাবার পর ১৯শে অগাষ্ট একটি অতিকায় মহাব্যোমযান কক্ষপথে পাঠান, যার মধ্যে ছিল স্ত্রেলকা ও বেলকা নামে এক জোড়া কুকুর এবং অন্য কতকগুলি জীব, উদ্ভিদ এবং মানুষের দেহচর্ম। মানুষকে মহাশূন্যে পাঠাবার পথে সেই হল প্রথম ধাপ। সেই মহাব্যোমযানটির ওজন এবং "প্রাচী" নামে যে মহাব্যোমযান চালক গাগারিণকে নিয়ে ঘুরে এল তার ওজন খুব কাছাকাছি। প্রথম মহাব্যোমযানের জীবাধারের মতই গাগারিণের জাহাজ থেকেও তাঁর কেবিনটি আলাদা করে ফেলা হয় নামবার সময়।

গাগারিণের মহাব্যোমযানের কেবিনে কি রকম প্রতিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল? প্রথম কথা মহাব্যোমযানের বিশালতা। প্রকান্ড না হলে কোন মহাব্যোমযানে মানুষ পাঠাবার মত সমস্ত রকমের সাজ-সরঞ্জাম রাখা যায় না। এই দিক থেকে সোভিয়েত অন্য সব দেশের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে আছে। ঐ উড়োজাহাজের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০০০ মিটার করে বাড়ে। প্রথম ২০০ সেকেন্ডে ত্বরণের পরিমাণ দাঁড়ায় সেকেন্ডে ৪০ মিটার। সেই বেগ সহ্য করার জন্য গাগারিণকে মেঝেতে শুয়ে পা দুটি চেয়ারের ওপর রাখতে হয়েছিল, কারণ প্রচন্ড মহাকর্ষ তাকে মেঝেতে চেপে ধরে। তারপর ভূপ্রদক্ষিণ আরম্ভ হলে মহাকর্ষ যখন শূন্যতে দাঁড়ায় তখন অবস্থা হয়ে যায় অন্য রকম।

সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে উড়োজাহাজটিকে ফিরিয়ে আনা। তাকে যে-কোন সময় নামিয়ে আনার জন্য পৃথিবী থেকে বেতার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা চাই। নামবার সময় জাহাজের বেগ ব্রেক দিয়ে ক্রমশ কমিয়ে আনতে হয় এবং আবহমন্ডলের ঘর্ষণে জাহাজ যাতে জ্বলে যেতে না পারে তার জন্য গোটা জাহাজটি তাপ-প্রতিরোধী ব্যবস্থায় আবৃত থাকা চাই।

গাগারিণের পরিক্রমার মেয়াদ মাত্র ১০৮ মিনিট ছিল বলে কাজটা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু গ্রহ-গ্রহান্তরের যাত্রীকে মহাশূন্যে থাকতে হবে দিনের পর দিন। তাছাড়া কেবিনের মধ্যে পৃথিবীর মত একটি জীবন-চক্র চালু না করতে পারলে চাঁদ শুক্র বা মঙ্গলে যাওয়া সম্ভব হবে না। মানুষকে গ্রহ-নক্ষত্র বিজয়ের পথে এগিয়ে যেতে হবে ধাপে ধাপে। গাগারিণের যাত্রা হচ্ছে প্রথম ধাপ। তারপর গিয়েছেন তিতভ। কিন্তু সে অন্য কথা।
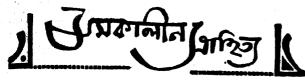
অভয়ঙ্কর

॥ লেখক সম্মেলনের কথা ॥

অন্নদাশঙ্কর রায় 'লেখক সম্মেলনের কথা' নামক একটি প্রবন্ধে লেখক সম্মেলন সম্পর্কে অনেক 'হোম ট্রুথ' প্রকাশ করেছিলেন, সেই মন্তব্য তিনি করেছিলেন জাপান, বরোদা এবং কলকাতা এই তিনটি প্রান্তে তিনটি বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান করে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর সেই প্রবন্ধটি থেকে কিঞ্চিৎ উধৃত করছি ঃ

"সিনেমার ষ্টার না হলে চলে না। মূঢ় জনতা ষ্টার দেখবে বলেই যায়। কোন্ ছবিতে কে নেমেছে এইটেই তাদের সর্বপ্রথম ভাবনা। ছবিটা হয়তো বাজে। তার জন্য কিছু আটকায় না। এখন এই ষ্টার পদ্ধতি কি সাহিত্যেও মানতে হবে? সম্মেলনে যাঁরা দর্শক বা শ্রোতা হন তাঁরাও কি জবাহরলাল ও রাধাকৃষ্ণনের নাম শুনে ভিড় করেন? দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হাঁ। বরোদাতেও হাঁ। কলকাতাতেও হাঁ। এঁরা না এলে ভিড় হতো না। এত চাঁদা উঠতো না। এতো ফটোগ্রাফার ও এত রিপোর্টার আসতেন না। এঁদের ভাষণকে জায়গা জুড়তে দিয়ে আর সকলের বক্তৃতার জন্য স্থানাভাব হলো সংবাদপত্রে। যে অধিবেশনের সভাপতি মামা বরেরকর ও উদ্বোধক আমি, সে অধিবেশনে দশ পনেরো মিনিটের জন্যে এসে রাধাকৃষ্ণণ কী বলে গেলেন দেশের লোক তা সবিস্তারে জানলো। কিন্তু আসল অধিবেশনটার সম্বন্ধে খবর পেলো যে মামা বরেরকর সভাপতি হয়েছিলেন ও অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি কয়েকজন বলেছিলেন। দুটি ঘণ্টার বিবরণ দু' লাইনে সারা। এটা একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবিই নয়..."

(অপ্রমাদ ঃ পৃঃ ৯৬)।

উধৃতি দীর্ঘ হল। উপায় নেই, আরো অন্ততঃ একটি প্যারাগ্রাফ দিতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। এতখানি উধৃত করার অর্থ এই যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বরাবরই এমনটি ঘটে আসছে, কি করে ব্যতিক্রম হবে? তাই ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দেও যা ঘটেছে, ১৯৬১-তেও তাই ঘটতে বাধ্য। এই বছর বোম্বাই শহরে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, সারা ভারতবর্ষ থেকে সেই সম্মেলনে নাকি প্রায় দুশো জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমবেত হয়েছিলেন। এতবড় সর্বভারতীয় সম্মেলনে বাংলা দেশের কোনো প্রথম সারির সাহিত্যিক যেতে পারেননি। বাংলা সাহিত্যে শুধু যে আকাদেমি পুরস্কারে বঞ্চিত তা নয়, সে স্বেচ্ছায় সর্বভারতীয় প্লাটফর্ম থেকে সরে এসেছে, সেখানে সে অনুপস্থিত। ফেলের ফন্দে বঙ্গদেশ বলে অযথা আমরা কান্নাকাটি করছি। যাক্ সে কথা। সম্মেলনের কথায় আসা যাক। সম্মেলন হয়েছে মহা সাড়ম্বরে, এ হল এক হিসাবে নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন, প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। যে কোনো কারণেই হোক্, উদ্যোক্তারা এটিকে চতুর্থ অধিবেশন বলেছেন। দিল্লী শহরে যে অনুষ্ঠানটি ঘটেছিল সেটি আফ্রো-এশীয় সম্মেলন। সেইখানেই অবশ্য এই জাতীয় সম্মেলনের কথা ওঠে এবং ঝোঁকের মাথায় বঙ্গদেশের তরফ থেকে কলকাতা সেই প্রথম সম্মেলনকে আহ্বান জানায়। অতঃপর কি ঘটেছিল সে অনেকেরই জানা আছে, সুতরাং সে কথাও যাক। এই বোম্বাই অধিবেশনে মোট প্রতিনিধি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন একশ। অবশ্য সব সম্মেলনে যা হয়ে থাকে, এখানেও তাই, যাঁরা প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঠিক কতজন কুলীন সাহিত্যিক এসেছিলেন, সে নিয়ে কথা উঠেছে। তবে এইসব নিয়ে কথা কাটাকাটি করা উচিত নয়। কুলীন হোক আর ব্রাত্যই হোক সাহিত্যকে ভালো না বাসলে কি আর তাঁর ঘরের খেয়ে অত দূরে বন্য মহিষ বিতাড়নে গিয়েছিলেন? সভা-সম্মেলনে দুচারজন রবাহূত ব্যক্তির ভিড় হয়েই থাকে। এ নিয়ে হাতাহাতি করে লাভ নেই। রথ-দেখা ও কলা-বেচা নীতি এখনও অনেকে মেনে থাকেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই বোম্বাই শহরের বাইরের ক'জন সাহিত্য-রসিক জানেন যে, চতুর্থ নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে কি কি হল, কে কি বল্লেন! এক রকম কেউই কিছু জানেন না, প্রথম দিনের বিবরণ ১৮ই নভেম্বর তারিখের প্রভাতী সংস্করণ সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হয়েছে বারো-চৌদ্দ লাইন, তবে তার সবটুকুই ডঃ রাধাকৃষ্ণণের উদ্বোধনী ভাষণ। তারপর আর কিছুই নেই, এমন কি দু লাইনও নয়! অথচ তিন দিনের অনুষ্ঠান ১৭ই থেকে ২০শে নভেম্বর। দুঃখ করার কিছু নেই, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দেই অন্নদাশঙ্কর রায় একথা বলছেন, কালের গতিকে ধারা পাল্টায় অনেক সময়, আমাদের দেশে কিন্তু পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই রীতি।

প্রথম দিনের সম্মেলনে উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রথমেই বললেন যে, লেখকদের সেতু রচনা করতে হবে,

"Men of letters should bridge the gulf between the world of facts and the world of values."

—নিঃসন্দেহে মূল্যবান কথা। এই পারমাণবিক বোমা-আতঙ্কিত জগতে সাহিত্যিকই একমাত্র শক্তিধর প্রাণী যাঁরা পথনির্দেশ করবেন, কারণ, সাহিত্য হল অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির সংমিশ্রণ। তিনি আরো বললেন ঃ

"We should not look upon ourselves as mere statistical units or scientific beings of bone and muscle. Man is not a cog in a machine but a spark of the divine and the body is a temple of God."

—এইভাবে অতি সুন্দর ভাষায়, বিভিন্ন উধৃতি সহকারে পঁচিশ মিনিটকাল বলার পর ডঃ রাধাকৃষ্ণণ অন্যত্র যাওয়ার জন্য থামলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ চাবন বললেন—"বোম্বাই শহরটা শুধু কাপড়ের কল, অফিস এবং

স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়েই নয়, এটা সাংস্কৃতিক মিলন ক্ষেত্র, এই শহরের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা পাশাপাশি থাকেন।"

সম্মেলনের মূলে সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত মস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার। তিনি কানাড়ী সাহিত্যিক, মহীশূরের কোলার জিলার অধিবাসী। মহীশূর সরকারের একসাইজ কমিশনর ছিলেন। বর্তমানে কানাড়ী ভাষায় সেক্সপীয়র অনুবাদে ব্যস্ত আছেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন :—"আমাদের দেশের লেখকদের রচনার পরিমাণ কম, সেই নিয়ে দোষ দেওয়া যায় না, আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া প্রতিকূল। ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ কিনতে পাঠকের বিতৃষ্ণা, কিন্তু উচ্চমূল্যে বিদেশী গ্রন্থ কিনতে তাঁদের বাধে না। গ্রন্থ সমালোচকগণ সম্পর্কেও তাঁর মতামত অতিশয় তীক্ষ্ন, তিনি বললেন নিষ্ঠুর সমালোচকরা অনেক তরুণ লেখকের সর্বনাশ করেছেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার বলেন যে, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রচুর অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। পঞ্চাশখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ নিয়ে এই কাজ শুরু করা যেতে পারে। অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসার ভিন্ন সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। পরিচিত সাহিত্যিক ভিন্ন অপরের সঙ্গে আমরা পারতপক্ষে মিশি না, এ আমাদের দোষ। প্রচুর মেলামেশা করা উচিত প্রতিটি সাহিত্যিকের। এক ভাষায় রচিত গ্রন্থ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের হোক, সংগ্রন্থ হলে সেদিকে সকলের দৃষ্টি পড়বে।

এই সভায় এসেছিলেন মার্কিন কবি ও গ্রন্থগারিক লুইস অনটার মেয়ার। তিনি বলেছেন—

"I am just watching. A neutral. I am no beatnik nor the pendulum. I am not against the cult of beatnikism. I feel neutralism is a great, live force. Dynamic and not static."

অনটার মেয়ার অতিশয় সহৃদয় এবং সরল প্রকৃতির মানুষ। সভার শেষে ২২শে নভেম্বর নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতির জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সাতরায় দুর্গাপ্রাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। সভায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো প্রকার উল্লেখ হয়নি।

যাই হোক, সংবাদ প্রকাশিত হোক আর না হোক, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক যদি সমবেত না হতেও পারেন, তবু সম্মেলন একটা পারস্পরিক মিলন ক্ষেত্র, প্রদেশগুলির মধ্যে বিভেদ দূর করে সংহতিসৃষ্টির মহামিলন ক্ষেত্র, সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

নতুন বই

আলোর কবি : রবীন্দ্রনাথ— (সংকলন)—অনুবাদ—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংকলক—প্রফুল্লচন্দ্র দাস। প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন বুক সপ্, ১২৩।১এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পাশ্চাত্য জগতের স্বনামধন্য কয়েকজন লোকের শ্রদ্ধাঞ্জলি একত্রিত করে প্রকাশ করেছেন কটকের উৎসাহী প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাস। তিনি রোগশয্যা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে লেখালেখি করে এই রচনাগুলি সংগ্রহ করেছেন। ফাদার দোমিনিক পীর, পার্ল বাক, হ্যালডর ল্যাক্সনেস, দুসান জবাভিটেল প্রভৃতির মূলে রচনা থেকে এইগুলি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন পণ্ডিচেরীর শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ভূমিকায় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন : "আলোর কবিরূপে, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন জাতিগত অহং-এর বিনাশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষকে দৃঢ়মূল করে তুলেছে বৈচিত্র্যের মাঝে একতায় তার আস্থাকে, যে একতার মাঝেই সব কিছু বিধৃত। নেতিবাদের পথে সে-একতা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। ...রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন আমরা মিথ্যা গর্ব পরিহার করি, বরণ করে নিই দেশে-দেশে উদ্ভাসিত জ্যোতিপুঞ্জকে, কারণ সে সবও ত' অখণ্ড দীপান্বিতারই অঙ্গ।" গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে এদেশের চারজন এবং ভিয়েৎমিন ও জাপানের দুজন লোকের শ্রদ্ধাঞ্জলি সংযুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বিদেশী লেখকদের প্রচুর ছবি দেওয়া হয়েছে। সংকলক ও প্রকাশক প্রফুল্লচন্দ্র দাস এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সুপরিকল্পিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটির প্রচ্ছদচিত্রটি এঁকেছেন কটকের শিল্পী অসিত মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র প্রবাহ— তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী সম্পাদিত। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি। হুইলারস্ বিল্ডিং, ১৫, এলগিন রোড, এলাহাবাদ। দাম—২·৫০ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক-সংকলনের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ বৈচিত্র্যসম্পন্ন। বাংলা ইংরেজী ও হিন্দী এই তিনটি ভাষার বিবিধ রচনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখিত তাঁর প্রথম আত্মকথা সংকলিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঙলা বিভাগে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অসিতকুমার হালদার, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাছাড়া লিখেছেন অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বাসব ঠাকুর প্রভৃতি।

ইংরেজী বিভাগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সুনীলকুমার বসু লিখিত "রবীন্দ্রনাথ এ্যাণ্ড হিউম্যানিজম"। রবীন্দ্র-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, রচনার অনুবাদ ও আরও কয়েকটি প্রবন্ধে এ বিভাগটি সমৃদ্ধ।

হিন্দী বিভাগে প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ সম্পূর্ণানন্দ (শত শত প্রণাম), ডঃ হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় গীত), সুমিত্রানন্দন পন্থ (রবীন্দ্রনাথ অউর ছায়াবাদ), বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডে (মহামানব রবীন্দ্রনাথ), মন্মথনাথ গুপ্ত (রবীন্দ্রনাথ অউর লোকসাহিত্য) এবং শান্তা পাণ্ডে (রবীন্দ্র সাহিত্য মেঁ নারী)। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা প্রভৃতি সঙ্কলিত হয়েছে।

গ্রন্থটি সুখপাঠ্য। সম্পাদকের রুচিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায় সম্পাদনার মধ্যে। তিনি রবীন্দ্রনাথের নানা প্রতিকৃতি, তাঁর হাতের লেখার প্রতিচ্ছায়া দিয়ে গ্রন্থটি সুশোভনের চেষ্টা করেছেন। এবং তিনি সার্থক হয়েছেন। এ রকম একটি গ্রন্থের স্বল্প মূল্য অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলেই মনে হবে।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য— (দিব্যজীবন কথা)—তারকচন্দ্র রায়। প্রকাশক : এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

শ্রীতারকচন্দ্র রায় রচিত জীবনকথা 'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য' সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৩২৬

বঙ্গাব্দে 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণটি সংশোধিত ও পরিবর্তিত আকারে 'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও শৈশব থেকে সুরু করে আদিপর্বে সন্ন্যাস পর্যন্ত, মধ্যপর্ব সার্বভৌম মিলন থেকে রামানন্দের মাহাত্ম্য পর্যন্ত এবং অন্ত্যপর্বে নীলাচলে ভক্তসঙ্গ থেকে তিরোধান পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা সাধারণতঃ কারো জীবনে ঘটে না। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলে এই অঘটন সংঘটিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে ভগবানের পূর্ণাবতার মনে করেন। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো
বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ
কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ
হরীন্দুঃ।।"

রাধাভাব সমন্বিত কৃষ্ণরূপচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নূতন কোনো ধর্ম প্রবর্তন করেননি। ভক্তিদ্বারা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় না তবে সম্ভোগ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের জীবন ঈশ্বর-সম্ভোগের দৃষ্টান্ত। শ্রীচৈতন্য প্রেমাবতার, তিনি আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করেছেন, যবনকেও কৃপাকণা বিতরণে কুণ্ঠিত হননি। সামাজিক বৈষম্যের লৌহযবনিকা ভেদ করে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মানব-প্রেমের প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। শাস্ত্রের বচন ও শ্রীচৈতন্যের আচরণ দর্শনে সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোলকবাসী আদিপুরুষ সর্বকারণ-কারণ গোবিন্দের অবতার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুপণ্ডিত তারকচন্দ্র রায় অশেষ ভক্তিভরে বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রীয় যুক্তিবিচার দ্বারা 'প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের' এই দিব্য-জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি ভক্তজনের কাছে পরম মূল্যবান। প্রচ্ছদভূষণ ও মুদ্রণ মনোরম।

গৌড় জনবধু—(উপন্যাস) শক্তিপদ রাজগুরু। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণ-ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৫-৫০ নঃ পঃ।

আলোচ্য গ্রন্থটিই শ্রীযুক্ত রাজগুরুর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ। চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বাঙলা দেশের সামাজিক জীবন পরিপ্রেক্ষিতেই কাহিনীর প্রক্রমণ। সেদিন বাঙালীর অন্তসার-শূন্য ব্যাভিচারময় জীবনধারায় যে নব-জীবনের জোয়ার এসেছিল তা ইতিহাসের পাতায় আজও লেখা আছে। বাঙলার লৌকিক জীবনধারার বিচিত্রতা সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। পূজাপার্বণ, সামাজিক আচার-পদ্ধতি, দলাদলি, কুৎসা প্রভৃতি ফুটে উঠেছে ইতিহাসের পাশে-পাশে। অবশ্য পুরান দিনের পটভূমিকায় রচিত হলেও এর ওপর ইতিহাস প্রভাব বিস্তার করেনি। কাহিনী স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত। শ্রীযুক্ত রাজগুরুর এ উপন্যাস রসোত্তীর্ণ। তা সম্ভব হয়েছে তাঁর জীবনকে সার্থকভাবে দেখার গুণে। বাকুড়ার লোকজীবনের কিছু পরিচয় এর মধ্যে পাওয়া যায়। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

কেয়াঞ্জলি— (উপন্যাস) বিশ্ববন্ধু সান্যাল। প্রকাশক—গ্রন্থজগৎ। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আড়াই টাকা।

অর্থনৈতিক দীনতার ফলে আজ সমাজ-জীবনে যে ব্যাভিচার এবং পাপ প্রবেশ করেছে এবং তার ফলে সুস্থ সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। এই অভিশাপের ফলে মধ্যবিত্তজীবন আজ ধ্বংসের মুখে। লেখক নিপুণতার সঙ্গে এই কথাই তাঁর এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রিয়ব্রত, কেয়া, অঞ্জলি ও সুশীলা চরিত্রটি চমৎকার ফুটেছে। মদাপ যোসেফ বুড়োও বাস্তব হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ কাহিনীটি লেখকের মুন্সীয়ানায় বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন ইন্দ্র দুগার।

নিশিভোর— (উপন্যাস) বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

বাসব ধনীর সন্তান, গানবাজনা মাইফেলে দিন কাটায়, চন্দননগর থেকে মজলিস সেরে ফেরার পথে মোটর-এ্যাক্সিডেন্ট। হাসপাতালে দু'মাস পড়ে থাকতে হল, উত্তরা তার জীবনসঙ্গিনী, তার দুর্ঘটনাজনিত কদাকার মুখ দেখে সে যন্ত্রণায় কাতর, তারপর অন্ধ কেয়ার সঙ্গে তার দেখা, তার অপূর্ব কণ্ঠস্বর। এই কেয়াকে দস্যুরা টেনে নিয়ে যায় তাদের বাগানবাড়িতে, তার পরিচয় কেতকীবাঈ। আর উন্মাদিনী উত্তরাও সেই বাগানবাড়িতে ছিল। ছদ্মবেশী মানসমোহন নিহত হয়ে কাহিনীর শেষ। রোমান্টিক এবং রহস্য গল্পের সংমিশ্রণে গঠিত কাহিনী। এই জাতীয় উপন্যাস যাঁরা পাঠ করতে ভালোবাসেন তাঁদের পছন্দমাফিক গ্রন্থ 'নিশিভোর'। প্রচ্ছদটি সুন্দর, এঁকেছেন শচীন বিশ্বাস।

কয়েক ফোঁটা অশ্রু— (গল্প)— সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশক— বিশ্ববার্তা সাহিত্যাগার। ৪৪।৪, গরচা প্লেস, কলিকাতা-৯। দাম— তিন টাকা।

লেখক প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে লক্ষ্য করেছেন যে, 'চক্‌চক্‌ করলেই সোনা হয় না', লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন সব ঘটনা সংঘটিত হয় যা অস্বাভাবিক মনে হয়। "কয়েক ফোঁটা অশ্রু"তে তিনি সেই সব করুণ এবং "মর্মন্তুদ" কাহিনী পরিবেশন করেছেন, এবং গল্প হলেও এই কাহিনীগুলি খাঁটি সত্য এই লেখকের কৈফিয়ত।

স্বপ্ন-মারীচ— (গল্প)—বিভূদান রায়চৌধুরী। প্রকাশক—নবভারতী। ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিভূদান রায়চৌধুরীর এই সদ্য প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'স্বপ্নমারীচ, নন্দিনী, আকস্মিক, সমাধান, চিত্রশিল্পী উজ্জ্বল সেন, নীলনীল খাম, শাশ্বতী, স্বপ্ন-মারীচ প্রভৃতি কয়েকটি গল্প আছে। লেখকের গল্পগুলির মধ্যে একটা করুণ-মধুর সুর বর্তমান। ছোটগল্প রচনায় তাঁর দক্ষতা আছে, অপূর্ব সংযম এবং লিপিকুশলতার সঙ্গে তিনি ছোট-খাটো কয়েকটি ঘটনার সমাবেশে গল্পগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষা কাব্যধর্মী এবং মনোজ্ঞ। গ্রন্থটিকে একটি সূচীপত্র থাকা উচিত ছিল। ছাপা তেমন সুন্দর হয়নি, প্রচ্ছদটি ভালো হয়েছে।

সঙ্গীতবীক্ষণ

আনন্দভৈরব

নিখিল ভারত সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন

এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। ২৬ নভেম্বর রবিবার সকালে ও রাত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে ভাটিয়া রাগে খেয়াল গান পরিবেশন করেন মহিল ভগ্নীদ্বয়—জ্যোৎস্না মহিল ও সুলভা মহিল। ভাটিয়ার রাগের রূপটি এঁরা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তা ছাড়া তাঁদের তান-বৈচিত্র্য ও পরিবেশনকালে পরস্পর সহযোগিতা প্রশংসনীয়। এই অধিবেশনে দেশী-টোড়ী রাগে শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল-গায়ন ও শুদ্ধ সারং রাগে শ্রী ডি. কে. দাতারের বেহালা-বাদন উপভোগ্য হয়েছে। রাত্রির তৃতীয় অধিবেশনে কেদার রাগে খেয়াল ও তারানা পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়ক। কেদার রাগ-রূপায়ণে পূর্বাপেক্ষা তাঁর কণ্ঠের বলিষ্ঠতা ও প্রস্তুতির অধিক পরিচয় পাওয়া গেছে। শ্রীমতী পটনায়কের গায়কিতে বিষ্ণু দিগম্বর ঘরানার তথা পণ্ডিত বিনায়ক নারায়ণ পটবর্ধনের গায়কির ছাপ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তারানায় তাঁর বৈশিষ্ট্যও এই উক্তি সমর্থন করে। তারানার পর তিনি একটি ভজন গান করেন। তারপর রাগেশ্রী রাগে সন্টুর বাজিয়ে শোনান জম্মুর (অধুনা বোম্বাই নিবাসী) শ্রীশিবকুমার শর্মা। সন্টুর যন্ত্রটি ভারতবর্ষের প্রাচীন শততন্ত্রী বীণার আধুনিক সংস্করণ। শ্রীশিবকুমার শর্মার পিতা পণ্ডিত উমাদত্ত শর্মা ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল সংগীতের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি পুনঃ-প্রচলন করেন। তৃতীয় অধিবেশনের শেষ শিল্পী সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। তিনি ছায়ানট রাগে খেয়াল (হিন্দী), দরবারী কানাড়া রাগে বাংলা খেয়াল ও শেষে ঠুংরি পরিবেশন করেন। রাগ-রূপায়ণ, তার ষড়জের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির গুণে শ্রীচক্রবর্তীর অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ্য হয়েছে। তা ছাড়া, এই সম্মেলনে বাংলা খেয়াল গেয়ে তিনি এ ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ করলেন।

চতুর্থ অধিবেশনে মহিল ভগ্নীদ্বয়ের গায়ন ভালো হয়েছে। তাঁরা প্রথমে ছায়ানট রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরি গান করেন। কিন্তু ঠুংরির পরেই কেন যে তাঁরা খেয়াল গান (আভোগী-কানাড়া রাগে) পরিবেশন করলেন ঠিক বোঝা গেল না। ঠুংরির পরে খেয়াল পরিবেশনে রীতিবিরুদ্ধতা আসে না কি? এই অধিবেশনে মারুবেহাগ ও হংসধ্বনি রাগে খেয়াল এবং পরে ঠুংরি পরিবেশন করেন শ্রী এ. কানন। চতুর্থ অধিবেশনের শেষে শিল্পী ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ। তিনি হেম-বেহাগ রাগে আলাপ জোড় ঝালা ও গৎ এবং পরে ঠুংরি বাজান। তবলা সঙ্গত করেন পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।

পঞ্চম অধিবেশনে সন্টুর যন্ত্রে পুরিয়া-কল্যাণ রাগে আলাপ ও গৎ বাজিয়ে শোনান শ্রীশিবকুমার শর্মা। তারপর বাগেশ্রী রাগে খেয়াল গান পরিবেশন করেন কাবুলের ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন সারং। এই নবাগত শিল্পীর কণ্ঠস্বরে পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা আছে। ঠুংরি ও পরে একটি পোস্তু গজল গেয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন। এই অধিবেশনের শেষাংশে সংগীত শ্যামলার শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক 'পারিজাত হরণ' ব্যালে সুষ্ঠুভাবে মঞ্চস্থ হয়।

ষষ্ঠ অধিবেশনে ধ্রুপদ পরিবেশন করেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের শিষ্যা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর প্রেমলতা শর্মা। তাঁর গায়ন আরম্ভের পূর্বে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বলেন, বর্তমানে ডাগরবাণী ধ্রুপদের তুলনায় খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের প্রচলন খুব কম। এখনও খুব অল্প সংখ্যক গুণী আছেন যাঁরা খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ জানেন। কিন্তু ঠিকভাবে রক্ষিত না হলে এই ধ্রুব-পদ্ধতির গান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে একটি—'সাজো সাজো আওত হ্যায়' (সিন্ধুড়া রাগ, ধামার তাল) খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদটি ডক্টর প্রেমলতা শর্মা পরিবেশন করলেন। তাঁর ৩/৪, ৩/৮, ৩/১৬, ৪/৫, ২/৫, ১/৫, ৪/৭, ২/৭, ১/৭ ইত্যাদি মাত্রাংশের লয়কারি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তারপর তিনি একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় পদ্ধতিতে রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি না থাকাতে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে বাইরের লোকের পক্ষে ইচ্ছে থাকলেও রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া অসুবিধাজনক। এই অনুষ্ঠানের পর শ্রীমতী সুনন্দা পটনায়কের খেয়াল ও ভজন এবং কুনওয়ার রাজেন্দ্র সিংয়ের বেহালা বাদন প্রশংসার্হ। ষষ্ঠ অধিবেশনের শেষ শিল্পী পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। তিনি মালকোষ রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরি গান পরিবেশন করেন। স্বর-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে ও রাগ-রূপায়ণের পরিচ্ছন্নতার গুণে এই শিল্পীর অনুষ্ঠান আনন্দদায়ক হয়।

সপ্তম অধিবেশনেও পণ্ডিত ভীমসেন যোশী শুদ্ধ কল্যাণ রাগে খেয়াল এবং পরে ঠুংরি ও ভজন গান করেন। এই অধিবেশনের আর একটি আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের তবলা লহরা। বারানসীর এই কৃতী শিল্পী বর্তমানে বার্ধক্যে উপনীত। কিন্তু তবলায় তাঁর হাতের বাণী ও শৈলী এখনও পরিষ্কার ও সরস। সপ্তম অধিবেশনের শেষ শিল্পী বিষ্ণুদিগম্বর ঘরানার অন্যতম ধারক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর। তিনি নট রাগে খেয়াল এবং পরে শাওনী, চণ্ডীদাসের বাংলা পদ ও ভজন পরিবেশন করেন। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের ন্যায় হিন্দুস্থানী সংগীতের কলাকার ও শাস্ত্রবিদ কর্তৃক চণ্ডীদাসের বাংলা পদ গায়ন নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি তাঁর 'বাংলা ভাষার উচ্চারণজনিত দোষত্রুটি ক্ষমার্হ' এই অনুরোধ জানিয়ে পদটি গাইলেন। আমরা জানি, বাংলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতজীর শ্রদ্ধা আছে। তাঁকে স্বাগত জানাই।

অষ্টম অধিবেশনে ইমন রাগে খেয়াল ও মারবা রাগে বাংলা খেয়াল পরিবেশন করেন শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর শ্রীমতী রাগিনী ও তাঁর সহশিল্পীগণ ভারতীয় নৃত্যমালা প্রদর্শন করেন। সম্মেলক নৃত্যে শিল্পীদের পরস্পর বেশ সহযোগিতা আছে দেখা গেল। সম্ভবত জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতার দিক ভেবে তাঁরা নৃত্যমালায় কয়েকটি আঞ্চলিক নৃত্যের যোজনা করেছিলেন। তবে আমরা তাঁদের নিকটে আরো ক্ল্যাসিকাল নৃত্য আশা করেছিলাম।

নবম অধিবেশন এবং সমগ্র সম্মেলনের বিষয়ে আমাদের মতামত পরবর্তী সংখ্যায় উপস্থিত করব।

নান্দীকর

॥ আজকের কথা ॥

নাটক ও আঙ্গিক :
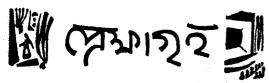
গেল ২৭এ নভেম্বর লেবেডফ-দিবস উপলক্ষ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপ যে-তর্কসভার আয়োজন করেছিলেন, তার বিষয়বস্তু ছিল : "এই সভার মতে আঙ্গিকের প্রাধান্য বর্তমান বাঙলা নাটকের ক্ষতি করিতেছে।" এই বিতর্কের সপক্ষে ছিলেন নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ অজিত ঘোষ, আর বিপক্ষে ছিলেন উৎপল দত্ত এবং ডঃ সাধন ভট্টাচার্য (ইনি অনুপস্থিত তাপস সেনের বিকল্প হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন ব'লেই মনে হচ্ছে)। প্রথমেই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি যে, এই বিতর্ক-সভায় আমরা উপস্থিত থাকতে পারিনি অন্যত্র আটক প'ড়ে গিয়েছিলুম ব'লে। নইলে আমরা যে একটি চমৎকার উপভোগ্য সন্ধ্যা কাটাতে পারতুম, কাগজের বিবরণ পড়ার পর এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এবং কানে এল, তিল ধারণের স্থান-রহিত মিনার্ভা প্রেক্ষাগৃহের সামনে সেদিন প্রায় দেড় কি পৌনে দু'ঘন্টা ধ'রে একা উৎপল দত্তই তাঁর যুক্তি ও প্রমাণ-সংবলিত বাগ্মিতার ঝড়ে বাজীমাৎ করেছিলেন।

প্রস্তাবের সপক্ষে যাঁরা, তাঁরা আঙ্গিকের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেননি; তবে বলেছেন, তার আতিশয্য দুষ্য। আঙ্গিককে প্রাধান্য দিলে নাটক পড়বে চাপা; আঙ্গিকের ব্যবহার ঠিক ততটুকুই হওয়া উচিত, যতটুকু নাটকের দাবি; তার কণাও বেশী নয়। নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আজ প্রয়োগকর্তার মাত্রা জ্ঞানের।

প্রস্তাবের বিপক্ষে বলতে উঠে উৎপল দত্ত-ও এ-কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রযোজনার সব দিকের

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার নিবেদন 'সূর্যস্নান' চিত্রের দুটি বিশিষ্ট স্ত্রী-চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র ও লিলি চক্রবর্তী
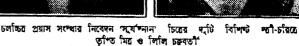
সুষ্ঠু সমন্বয়ই প্রয়োগকর্তার লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদ্দেশ্য হবে নাট্যরস ফুটিয়ে তোলা এবং নাটকের বহির্ভূত কোনো জিনিষকে প্রাধান্য না দেওয়া।" পাঠক মনে করতে পারেন, উভয় পক্ষ যদি একই কথা বলে থাকেন, তাহ'লে ঝগড়াটা কোনখানে? ঝগড়া হচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নিয়ে এবং উপলক্ষ ঐ সভায় অনুপস্থিত তাপস সেনের অভিনয়-জগতে অনুপ্রবেশ। তাপস সেন নাট্য-জগতে এসেছিলেন আলোকসম্পাতকারীর ভূমিকা নিয়ে—অত্যন্ত নির্দোষ এবং নিরামিষ ব্যাপার। শুনেছি, স্টার রঙ্গ-মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের যুগে সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর কোন একটি বিশেষ ভঙ্গীকে দর্শকসমক্ষে সোচ্চার ক'রে তুলে ধরবার জন্যে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—'ফোকাস'। সেই আলো! শিশিরকুমার 'সীতা' অভিনয়ে পাদপ্রদীপকে পরিহার করেছিলেন সযত্নে এবং ফুটলাইটের ব্যবহার তুলে দিয়ে ওপর এবং নেপথ্য থেকে স্পট ও ফ্লাড—উভয়বিধ আলোর সহায়তায় মঞ্চ ও মঞ্চের ওপরকার শিল্পীদের আলোকিত করতেন আলোকশিল্পী ননী সান্যালের সহযোগিতায়। এরপর আলোর বৈপ্লবিক ব্যবহার সুরু করেন আমেরিকা ফেরত সতু সেন। 'অসবর্ণা' নাটকের কালিকা-তাণ্ডব নৃত্যের সময় মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহে দ্রুত পরিবর্তনশীল আলো-ছায়ার খেলার সাহায্যে যে অভূতপূর্ব এবং অভূতপর (আজ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার সে-জিনিষ চোখে পড়েনি) বৈদ্যুতিক চমকের সৃষ্টি করেছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। কাজেই তাপস সেন অভিনয়কে প্রাণবন্ত এবং সোচ্চার এবং ভাবমূর্ত করবার জন্যে সেই আলো নিয়ে যদি একটু হেরফের করেন, তাতে কার কি আপত্তি করবার থাকতে পারে? কিন্তু সেই তাপস সেন ছুঁচ হয়ে ঢুকে যখন ফালের আকার ধারণ করলেন (অবশ্য বেরিয়ে আসেননি এখনও এবং যদি কোনোদিন সত্যিই আসেন, তাহ'লে অনুমান করা কঠিন নয়, সেদিন তাপসতাপিত নাটকের ও সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের রঙ্গমঞ্চের মৃত্যু ঘটিয়েই তা' আসবেন), তখনই চতুর্দিকে পড়ে গেল 'গেল-গেল' রব। ভারত-সীমান্তে চীনা অনুপ্রবেশও মানুষকে
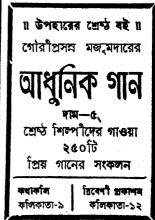
টাস ফিল্মসের "কানামাছি" চিত্রের একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও অনুপকুমার

এতখানি অস্থির করে তুলতে পারেনি। 'সেতু'-নাটকে ট্রেনের দৃশ্য, 'অঙ্গার'-এ খনিগহ্বরের জলমগ্ন হওয়ার দৃশ্য এবং সংপ্রতি 'ফেরারী ফৌজ'-এ জাহাজঘাটার গুদামে আগুন লাগার দৃশ্য। তাই নাট্যকার এবং তার পক্ষের লোকেরা চীৎকার ক'রে বলছেন, এ অসহ্য, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, নাকটুকু ঢোকাতে দেওয়া হয়েছে বলে উষ্ট্রপ্রবর তাঁর পুরো দেহটাকেই প্রবেশ করাবেন, এমন ত কোনো কথা ছিল না! অপর পক্ষ, অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের প্রয়োগকর্তা এবং মঞ্চমালিকেরা বলছেন, তাপস সেন ন্যায্য কাজেই করছেন, নাটকের প্রয়োজনকে আশ্চর্যভাবে পূর্ণ করেছেন, তাঁর সাহায্য না পেলে অভিনয় সার্থক হ'ত না। এবং দর্শকবৃন্দ জোরে এবং আরও জোরে হাততালি দিয়ে তাপস সেনকে অভিনন্দিত করছেন। এই বিশেষ দৃশ্যগুলি যে আলোরই খেলা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই ব'লে এতখানি? আলোকসম্পাতের ব্যাপারটা হচ্ছে আনুষঙ্গিক, তার স্থান গৌণ, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও গৌণ। কিন্তু এ যে একেবারে তেড়ে এগিয়ে এসে ক্লাইম্যাক্স্ এর সৃষ্টি করে! দর্শককে চমকে দিয়ে বলে —ওগো, আমায় দ্যাখো। না, না, এতো ভালো নয়, এ যে নাটকের নির্ঘাত জাত মারা!

উৎপল দত্ত বলেছেন, তাপস সেন যা করেছেন, তা নাটকের প্রয়োজনেই করেছেন, নাটকের যিনি প্রয়োগকর্তা তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশেই করেছেন। নাটক ক্ষুণ্ণ হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাহায্যে দৃশ্যকাব্য অধিকতর সার্থক হয়ে উঠেছে। "দর্শকেরা যদি এখন তাপস সেনের আলোকসম্পাত নিয়ে একটু বেশি আলোচনা করেন, তবে তার কারণ জিনিসটি তাঁদের কাছে, অন্তত অনেকের কাছে নতুন। নতুন জিনিষ একটু মোহগ্রস্ত করেই থাকে, সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ক্রমশ তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন, সহজ চোখে, সহজ মনে বিচার করতে পারবেন—এই আশা তিনি অনায়াসে পোষণ করতে পারেন।"

শ্রীদত্ত ঠিকই বলেছেন। চিরাচরিত প্রথার বাইরে নতুন কিছু করলেই রক্ষণশীল দলের লোকেরা চেঁচিয়ে ওঠেন। মাইকেল 'অমিত্রাক্ষর'-প্রবর্তন করলে 'ছুছুন্দরী বধকাব্য' লিখে তাঁকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন পয়ার-ত্রিপদীকে ভেঙ্গে ছন্দের মুক্তি দেন, তখন তাঁকে 'পায়রা কবি' ব'লে উপহাস করবার চেষ্টা হয়েছিল। এই সেদিন শিশিরকুমার যখন অভিনয়ে নবধারার গঙ্গোত্রী বইয়ে দেন, তখন দানীবাবু প্রমুখ পুরাতন পন্থীদের স্তাবকের দল তাঁর গায়ে কম কর্দম ক্ষেপণ করেননি। এবং চলচ্চিত্র যখন প্রথম বাঙ্ময় হ'ল, তখন চলচ্চিত্রের কবর তৈরী হ'তে বাকী নেই ব'লে আক্ষেপ করবার লোকের অভাব হয়নি। অথচ রঙ্গমঞ্চ চিরদিনই নতুনের পক্ষপাতী। খালি রঙ্গমঞ্চই বা বলি কেন? মানুষের আনন্দবিধানের প্রতিটি মাধ্যমই যুগরুচি অনুযায়ী নিত্য পরিবর্তনশীল। নইলে ইংরেজ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ চিরকেলে যাত্রা ছেড়ে থিয়েটারের প্রতি ঝুঁকে পড়ল কেন? যেখানে সমস্তটাই কল্পনার সাহায্যে, সেখানে মঞ্চের পশ্চাদপটে রাস্তা, বন, নদী, পাহাড় আঁকা দরকার হ'ল কেন? বাঙলা রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে গিরিশচন্দ্র ছিলেন থিয়েটারের ম্যানেজার। স্টারে অমৃতলাল বসু হলেন—নাট্যাচার্য। মঞ্চে সামাজিক নাটকে দেশকালপাত্রোপযোগী সাজসজ্জার দিকে প্রখর দৃষ্টি দিতেন, তার মঞ্চে ব্যবহৃত আসবাবপত্রও যাতে বাস্তবানুগ হয়, তাও দেখতেন। এমনকি শেরী, স্যাম্পেন, ব্র্যান্ডি প্রভৃতি বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজও যাতে ঠিক ঠিক হয়, সেদিকে তাঁদের যথেষ্ট লক্ষ্য থাকত। কিন্তু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে সমান কথা বলা যায় না। এখানে ও'রা ভেল্‌ভেটের কোট-প্যান্টের প্রতি সেকালের লোকেদের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্বকে ত্যাগ করতে পারেননি। নূতনত্বের প্রতি এ'দেরও লোভ ছিল। বিবাহ-বিভ্রাটে বিলাসিনী কার্ফর্মা'র একটি মেড়াকে শৃংখলিত অবস্থায় সঙ্গে ক'রে মঞ্চে আবির্ভূত হতেন—সেই মেড়ার গলায় থাকত কোঁচানো চাদর; মেড়াটি মিঃ কার্ফর্মা'র প্রতীক।
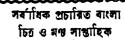
পরে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ অমর দত্ত 'অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল'বেশে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। আরও পরে মিনার্ভায় 'কিন্নরী' নাটকে যখন কিন্নরী-রূপিনী সুবাসিনী 'উত্তর উত্তর চলে এস নরবর'-গান গাইতে গাইতে মঞ্চের ওপর নীচে থেকে ওপরে ধীরে ধীরে উঠে অদৃশ্য হ'য়ে যেতেন, তখন দর্শকরা সবিস্ময়ে দেখত, পিছনে অত্যুচ্চ হিমালয়ের গিরিগাত্র বেয়ে রজতশুভ্র ঝর্ণাধারা সবেগে নিম্নে পতিত হচ্ছে। আবার মনোমোহন পাঁড়ের 'মনোমোহন থিয়েটারে' দর্শকরা দেখল, থিয়েটারের দৃশ্যের মধ্যে স্বপ্নদৃশ্য দেখানো হচ্ছে সিনেমার সাহায্যে (যতদূর মনে পড়ে, 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর স্বপ্নদৃশ্য!)। আর্ট থিয়েটারের প্রথম নাটক 'কর্ণার্জুন'-এ আমরা দেখলুম, ভেলভেটের মোহ ত্যাগ ক'রে অর্জুন, ভীম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সজ্জিত হয়েছেন সিল্কের চওড়াপাড় ধুতি দ্বারা। শিশিরকুমারের 'সীতা'য় দেখলুম, স্বর্ণ-সীতা গড়বার প্রস্তুতি পর্বে বাহকেরা স্বর্ণতাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নীরবে বাঙলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবর্তিত আবহসঙ্গীতের মূর্চ্ছনার সঙ্গে। আবার তাঁরই 'জনা'য় দেখলুম, আলোছায়ার খেলার সাহায্যে শুভ্র পশ্চাদপটে তরঙ্গায়িত গঙ্গা মূর্ত হয়ে উঠেছে। নাটকের বিষয়বস্তুকে গতিশীল করবার প্রয়োজনে প্রস্তুত হ'ল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। এবং তাকে আরও গতিশীল করবার প্রয়োজনেই হয়েছে আজকের 'ফেরারী ফৌজ'-এর ত্রিস্তর মঞ্চ। রঙ্গমঞ্চ নাটকের প্রয়োজনে এবং দর্শকদের সামনে নূতনত্বের চমক সৃষ্টি করবার বাসনায় এইভাবেই নতুন নতুন পন্থা, নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছে গোড়া থেকেই—যখন যেমন এবং যতখানি পেরেছে, তেমন এবং ততখানি। এবং তাতে কোনোদিনই নাটক বা অভিনয় ক্ষুণ্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত বা জাতিচ্যুত যদি না হয়ে থাকে, আজও হবে না।

কালিদাস বা সেক্‌স্‌পীয়ার যদি আজ জন্মাতেন, তাঁরাও আজকের দিনের যান্ত্রিক সহায়তাকে উপেক্ষা করতেন না। যদি তাঁরা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে এই সহায়তাকে বর্জন করতেন, তাহ'লে তাঁরা কালিদাস বা সেক্‌স্‌পীয়র হ'তে পারতেন না, তাঁরা রামাশ্যামা হয়েই থাকতেন। যুগকে উপেক্ষা না করেও যুগকে অতিক্রম ক'রে চিন্তা করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা অমর হয়েছেন। এবং আজ শিশিরকুমার, হেনরী আর্ভিং, কাচালভ যদি থিয়েটারের actor-dircetor (অভিনেতা-নির্দেশক) থাকতেন, তাঁরাও নাটকের প্রয়োজনে তাগ্রস সেনের শিল্প-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে অনুমাত্রও ইতস্তত করতেন না।

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

ওয়ান্টেড (হিন্দী) : গোল্ডেন ফিল্মসের নিবেদন; ১৪১৩২ ফুট দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : কে, বি, পাঠক; পরিচালনা : এন, এ, আনসারী; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবি; গীত-রচনা : শাকিল বাদাউনি; চিত্র-গ্রহণ : কে, এস, জেটলি; শব্দধারণ : পিটলে; সঙ্গীত-গ্রহণ : মিনু কার্তার ও কৌশিক; নৃত্য-পরিকল্পনা : সূর্যকুমার; সম্পাদনা : এম, এস, সিন্ধে; শিল্প-নির্দেশনা : মনজুর; রূপায়ণ : সঈদা, দুলারি, মনোরমা, শাম্মি, হেলেন, জনি ওয়াকার, বিজয়কুমার, টনি ওয়াকার (প্রযোজক), এন-এ-আনসারি, নাজির হোসেন, আনওয়ার হোসেন, ইস্‌মাইল প্রভৃতি। গ্রেস ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় গেল ১লা ডিসেম্বর থেকে জনতা, মেট্রোস, গ্রেস, লিবার্টি, নাজ প্রভৃতি ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

বর্মামূলুকে খুন-জখম করবার অপরাধে যাঁর নামে একদিন পুলিস থেকে হুলিয়া বেরিয়েছিল, তিনিই আজ অসৎ পথ ত্যাগ ক'রে শেঠ দীনদয়াল হয়ে সুখের সংসার পেতেছেন স্ত্রী এবং কন্যা সরিতাকে নিয়ে। তাঁর একটি যে ভাবনা ছিল, সরিতাকে সৎপাত্রে অর্পণ করা নিয়ে, তার থেকেও তিনি নিষ্কৃতি পেলেন, যেদিন শুনলেন তাঁর মেয়ে একজন প্রিন্সকে ভালোবেসেছে। দীনদয়াল যখন পরমানন্দে প্রিন্সের সঙ্গে কন্যা সরিতার বিয়ের স্বপ্ন দেখছেন, তখন হঠাৎ তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেল; তিনি জেনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যে, প্রিন্স আর কেউই নয়, তাঁরই অফিসের কেরানী রমেশের ছোট ভাই দীপক। কিন্তু তাঁর মত পরিবর্তন

'কাঁচ কি গর্ড়িয়া' চিত্রে সঈদা খান

করা সম্ভব হ'ল না; কারণ, স্ত্রী অত্যন্ত যুক্তি দেখিয়ে বললেন, দীপকের সংগে বিয়ে না হ'লে তাঁর মেয়ে অত্যন্ত অসুখী হবে। তবে তাই হোক ব'লে তিনি যখন স্ত্রীর ইচ্ছাকেই কার্যে রূপ দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর জীবনে দুষ্ট শনির মত আবির্ভূত হয় তাঁর বর্মা জীবনের সংগী—সর্দারিলাল, যিনি এখন মিঃ খান্না নামে পরিচিত। এই মিঃ খান্না উভয় পরিবারকেই কি রকম বিপর্যস্ত করে এবং দীনদয়ালের মোটর ড্রাইভার বিলাইতীর সহায়তা ও বুদ্ধিগুণে শেষ পর্যন্ত কি ক'রে সব দিক রক্ষা পায়, তাই নিয়েই এই ছবিখানির শেষের দিকের বেশ একটা মোটা অংশ গ'ড়ে উঠেছে।

প্রথমে কমেডি-রোমান্স ও গান এবং শেষের দিকে কমেডি ও সাসপেন্সের জুড়ী চালিয়ে ওয়াকার ভ্রাতৃত্রয় (জনি, টনি ও বিজয়কুমার) সাধারণ দর্শকের মনোহরণ করতে চেয়েছেন ব'লে পরিচালক আনসারির কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে। রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্সের মধ্যে জনি ওয়াকার যেভাবে কৌতুক-রসকে এনে ফেলেছেন এখানে সেখানে, তা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। "ওয়ান্টেড" ছবির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। প্রায় প্রতিটি গানই সুলিখিত; সুরসমৃদ্ধ ও সুগীত।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলেই বলতে হয়, দার্শনিক ড্রাইভার বিলাইতীর ভূমিকায় জনি ওয়াকার তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন। শাম্মির 'চমকী' তাঁর পাশে পাশে গিয়েছে এবং গানের জলসায় ঢোল বাজানোতে দু'জনের মধ্যে কে যে কাকে পরাস্ত করেছেন, তা বলা খুবই শক্ত। নায়িকা সরিতার ভূমিকায় সঈদা খানও চমৎকার অভিনয় করেছেন। দীপকের বৌদি ও রমেশের স্ত্রীরূপে দুলারী স্নেহমমতাময়ী নারীর চিত্রটিকে সহজেই ফুটিয়ে তুলেছেন। দীনদয়ালের স্ত্রীর ভূমিকায় মনোরমা উপভোগ্য অভিনয় করেছেন। নায়কের ভূমিকায় নবাগত বিজয়কুমার অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস ভঙ্গীতে অভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকা যথাযথ।

"ওয়ান্টেড" ছবিটি পুরোপুরি বোম্বাই ঢংয়ে তৈরী এবং বোম্বাই-ছবির দর্শক-সাধারণ যে এটি দেখে যথেষ্টই উল্লসিত হবেন, এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

অনুশীলন সম্প্রদায় অভিনীত "কাবুলিওয়ালা" :

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুশীলন সম্প্রদায় কবির "কাবুলিওয়ালা" গল্পটিকে নাট্য রূপায়িত ক'রে মঞ্চস্থ করেছেন একাধিক বার। আমরা সংপ্রতি বিশ্বরূপাতে গিরিশ নাট্যোৎসব অনুষ্ঠানে তাঁদের এই অভিনয় দেখেছি। সম্প্রদায়ের সম্পাদক মণিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, নাট্যকার "রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেননি, বিকৃত করেননি। তাতেই এই নাটক সত্যকার নাটক হয়েছে এবং সত্যকার 'কাবুলিওয়ালা'ই থেকেছে, যা রবীন্দ্র-মানসসম্ভূত।" কোনও গল্পের নাট্যরূপ সত্যকারের নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা, যথার্থ নাকট হিসেবে মর্যাদা পাবে কিনা এবং সেই বিশেষ গল্পকে অতিক্রম করেছে কিনা, তার বিচারের ভার নিশ্চয় যাঁরা সেই নাটককে মঞ্চস্থ করছেন, তাঁদের ওপর নয়, যাঁরা সেই নাটকের অভিনয় দেখেন, সেই দর্শক সম্প্রদায়ের ওপরই ন্যস্ত থাকে। এ-ক্ষেত্রে অনুশীলন সম্প্রদায় এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম ক'রে নিজেরাই নাটককে 'সত্যকার নাটক হয়েছে' ব'লে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। এবং সংগে সংগে এ-কথাও বলি, শ্রীকানাই বসু প্রদত্ত নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথকে স্থানে স্থানে অতিক্রমও করেছে আর সর্বত্র 'সত্যকার নাটক'-ও হয়ে ওঠেনি। উল্লেখ করতে

পারি, কাব্লিওয়ালার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে মিনি তার হাত থেকে কিসমিস খোবানি কিছুতেই নেয়নি, দ্বিগুণ সন্দেহের সঙ্গে তার বাপের হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হয়ে ছিল। দুই—মিনির সঙ্গে ভাব হওয়ার পর থেকে ছুরি মেরে ধরা পড়ার দিন পর্যন্ত একটি দিনও কাবুলিওয়ালা মিনির সঙ্গে দেখা না ক'রে থাকেনি; শত ব্যস্ততার মধ্যেও সে মিনিকে দেখে গেছে। এবং তিন, বিবাহের রাঙা চেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি কাবুলিওয়ালার মুখে 'খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস্ ?'; এই কথা শুনে লজ্জায় আরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং পরে চ'লে গিয়েছিল। এইসব জায়গায় নাট্যকার দ্বারা রবীন্দ্র-নাথ অতিক্রান্ত হয়েছেন। আর গল্প-বহির্ভূত যে-সব ঘটনা তিনি নাটকের সৌকর্যার্থ সৃষ্টি করেছেন, তা সব সময় নাট্যরসসমৃদ্ধ হয়নি। যেমন মিনির বাবা নিরঞ্জনের উকীল বন্ধু জ্যোতিষের স্ত্রীর সঙ্গে নিরঞ্জন-পত্নী হেমাঙ্গিনীর সাক্ষাৎকারের ঘটনা।

অভিনয়ে সবচেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে ছোট মিনির ভূমিকায় ভারতী মুখোপাধ্যায়। অতটুকু মেয়ে যে অমন স্বচ্ছন্দে অঙ্গভঙ্গী সহকারে উপযুক্ত বাচনের সঙ্গে মিনিকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারে, এ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আশ্চর্য অভিনয়-প্রতিভা, আশ্চর্য শিক্ষণ-কৌশল। মমতাজ আহ্‌মেদ নামভূমিকার মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করেছেন। বিশেষ ক'রে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মিনির বাপের কাছে তার হৃদয় উদ্ঘাটনপর্ব অসামান্য নাট্যবিভূতিসম্পন্ন। তাঁর কণ্ঠ-স্বর মনোবেদনাকে যেভাবে প্রকাশ করেছিল, তার তুলনা কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কাবুলিওয়ালার মনের হাহাকার দর্শকচিত্তকে মথিত উদ্বেলিত করেছিল। তাঁর অঙ্গসজ্জাও অত্যন্ত প্রশংসা পাবার যোগ্য। মিনির পিতা নিরঞ্জনের ভূমিকায় চারুপ্রকাশ ঘোষ অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। অপরাপর চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন সুবিমল রায় (জ্যোতিষ), সুন্দর সরকার (জটাধর), শাশ্বতী রায় (হেমাঙ্গিনী) ও সীতা মুখোপাধ্যায় (উর্মিলা)।

মঞ্চসজ্জা সাধারণ পর্যায়ের।

অনুশীলন সম্প্রদায়ের "কাবুলি-ওয়ালা" উপভোগ্য হয়ে উঠেছে ছোট্ট মিনির ভূমিকায় ভারতী মুখোপাধ্যায় এবং কাবুলিওয়ালার ভূমিকায় মমতাজ আমেদের অনবদ্য অভিনয়গুণে।

বিবিধ সংবাদ

কমলা থ্রি রিং সার্কাস ঃ

কলকাতায় বড়দিনের উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে—সার্কাস। কিন্তু আজকাল সচরাচর সার্কাস-ওয়ালাদের শহর কল্‌কাতার বুকে তাঁবু গাড়তে দেওয়া হয় না। তাই "কমলা থ্রি রিং সার্কাস" তাঁদের তাঁবু খাটিয়েছেন নতুন (অবশ্য এতদিনে পুরোনোই হয়ে গেছে!) হাওড়া পুলের ঠিক পশ্চিমের খোলা জায়গাটিতে। গেল ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এর উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকে বুঝলুম, এক "কার্ল হেগেনবেক"-এর সার্কাস ছাড়া এত বড় সার্কাস দল কলকাতায় এর আগে কখনও আসেনি। দেশী এবং বিদেশী—অসংখ্য ক্রীড়াকুশলী এই দলে রয়েছেন এবং এ'দের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগে অসামান্য পারদর্শী। এ'দের ট্রাপিজ, রোমান রিং, খাটানো তার প্রভৃতির মেয়ে-পুরুষ খেলোয়াড়রা হাসতে হাসতে এমন রোমহর্ষণ খেলা দেখিয়ে থাকেন, যা দর্শককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। এ'দের ঘোড়া, হাতী, বাঘ এবং সিংহ-ও আছে প্রচুর সংখ্যক। এক-সঙ্গে দু'টি রিং-য়ে এবং কখনও কখনও তিনটি রিং-য়ে এ'রা খেলা দেখিয়ে থাকেন অবিরাম এত দ্রুত লয়ে যে, মনে হয়, দর্শক ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আর একটি কথা; এ'দের ক্লাউনরা (ভাঁড়েরা) সম্ভবতঃ প্রথম দিন বলে দর্শকদের কানে পৌঁছোনোর মত চড়া গলায় কথা কইতে পারেননি। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দি, এই "কমলা থ্রি রিং সার্কাস"-এর সহায়তাতেই জেমিনীর

গঙ্গা-যমুনা চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা

"চন্দ্রলেখা"র সার্কাস-দৃশ্য অত লোম-হর্ষকভাবে চিত্রিত হয়েছিল।

কলকাতায় জনি ওয়াকার ও সম্প্রদায়:

"ওয়াণ্টেড" ছবির মুক্তি উপলক্ষ্যে বোম্বের বিখ্যাত কৌতুক-অভিনেতা জনি ওয়াকার তাঁর দুই ভাই—ছবিটির প্রযোজক টনি এবং নায়ক বিজয়কুমার ওয়াকারকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। গেল শনিবার, ২রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লোটাস সিনেমায় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি চা-চক্রে মিলিত হয়েছিলেন। প্রেস ডিস্ট্রিবিউটার্সের তরফ থেকে আর. ডি. বানশাল ওয়াকার ভ্রাতৃবৃন্দকে পরিচিত করান।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা:
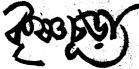
২রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার "মুক্তাঙ্গনে" সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা পোলিশ চলচ্চিত্রোৎসবের সাফল্য উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের চা-পানে আপ্যায়িত করেছিলেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পোলিশ ছবির প্রদর্শনীর সম্ভাব্যতার কথাও আলোচিত হয় চা-পানের পর। খুব শিগ্‌গিরই এ সম্পর্কে একটি পাকাপাকি বন্দোবস্ত যাতে হয়, তার চেষ্টা চলছে।

অফিস ক্লাব নাট্য প্রতিযোগিতা:

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অফিস ক্লাব-গুলির মধ্যে নাট্য প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে গেল ২রা ডিসেম্বর থেকে। মাণিকতলার ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে নব-নির্মিত "কাশী বিশ্বনাথ ইনস্টিটিউট" হলে "আনন্দম্" সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা হবে ছ'দিন ধ'রে—২রা, ৯ই, ১৬ই, ২৩-এ, ২৪-এ, এবং ৩০-এ ডিসেম্বর।

থিয়েটার ইউনিটের "কৃষ্ণচূড়া":

দক্ষিণ কলকাতার নামকরা নাট্য-গোষ্ঠী থিয়েটার ইউনিট ১৪ই ডিসেম্বর থেকে সুরু ক'রে প্রতি বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে তাঁদের নতুন নাটক "কৃষ্ণচূড়া"-কে মঞ্চস্থ করবেন। সমরসেট মম-এর গল্প অবলম্বনে রচিত নাটকটির পরিচালনা, মঞ্চসজ্জা এবং আলোক-নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছেন যথাক্রমে শেখর চট্টোপাধ্যায়, খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন।

২৪ পরগণা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

সংগঠনী আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক ২৪ পরগণা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী ১৬ই ডিসেম্বর থেকে সংগঠনী রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রীদিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন যুগান্তর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

"ওয়াণ্টেড" চিত্রে সৈয়দা খান ও বিজয়কুমার

দশরূপক:

আসছে ১১ই ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৭টায় "দশরূপক" নাট্যসম্প্রদায় পরেশ ধর রচিত মৌলিক নাটক "দশরূপক"-কে মঞ্চস্থ করবেন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। নির্দেশনা, সঙ্গীত পরিচালনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছেন যথাক্রমে ভরদ্বাজ, জগন্নাথ ধর ও রবীন দাস।

অপেশাদার যাত্রা প্রতিযোগিতা:

"দিশারী" সাংস্কৃতিক পরিষদ একটি অপেশাদার যাত্রা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগী সংস্থা-গুলিকে ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। এ সম্পর্কে জানতে হ'লে ৯।৪এ, ডাঃ

সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪-তে দিশারী কার্যালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

নীলদর্পণ :

৫ই ডিসেম্বর, সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার হেড অফিসের সাংস্কৃতিক বিভাগ তাঁদের চতুর্দশ বাৎসরিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটক মঞ্চস্থ করবেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন যথাক্রমে শ্রীযতীন ভট্টাচার্য ও ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

কাজল :

বি-এ-পি প্রোডাকসন্সের "কাজল" সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে। এতে সুরসৃষ্টি করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং ছবিটিতে রূপায়ণে আছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, অর্পণা, চিত্রিতা মণ্ডল, কমলা মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন নর্মদা পিকচার্স।

আগুন :

পরিচালক অসিত সেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "আগুন" গল্পটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন। এর প্রধান চরিত্রগুলিতে আছেন সন্ধ্যারাণী, কণিকা মজুমদার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার প্রভৃতি। বাদল পিকচার্সের রাখালচন্দ্র সাহা ছবিখানির প্রযোজক এবং ডি-আর-পিকচার্স হচ্ছেন পরিবেশক।

যাত্রিক পরিচালিত "কাঁচের স্বর্গ" চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও দিলীপ মুখার্জি

কাঁচের স্বর্গ :

চিত্রযুগের "কাঁচের স্বর্গ" যাত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এতে আছেন কাজল গুপ্ত, মঞ্জু দে, আরতি দাস, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি নামকরা শিল্পীরা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র ছবিখানির সংগীত পরিচালনা করছেন। মিতালী ফিল্মের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

কানামাছি :

আজ শুক্রবার, ৮ই ডিসেম্বর থেকে টাস ফিল্মের "কানামাছি" উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলাতে মুক্তিলাভ করছে। শৈলেশ দে লিখিত মূল গল্প থেকে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মৃণাল সেন। নচিকেতা ঘোষ ছবিখানিতে সুরসৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায় প্রভৃতিকে। ছবিখানির একমাত্র পরিবেশক হচ্ছেন টাস পিকচার্স।

বিমল ঘোষের প্রযোজনায় 'বধূ' চিত্রটির কাজ সমাপ্তপ্রায়। 'বধূ' ছবিটির কাহিনীকার হলেন শৈলেশ দে। পরিচালক ভূপেন রায় বধূকে দেখেছেন একটি সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। বধূর ভূমিকালিপি তারকাখচিত। ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, সরযূবালা, মঞ্জুলা, মেনকা দেবী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। সংগীতাংশের ভার পেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নেপথ্যসংগীতে আছেন কিন্নরকণ্ঠী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

অগ্রগামী প্রযোজিত ও পরিচালিত তারাশংকরের 'কান্না' চিত্রে উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু

খেলাধুলা

দর্শক

॥ ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষ ॥

ভারতবর্ষ : ৪৬৭ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। পলি উমরীগড় নট-আউট ১৪৭, **মঞ্জরেকার ৯৬,** জয়সীমা ৭০। লক ৯৩ রানে ৩, নাইট ৮০ রানে ২, ডেক্সটার ৮৪ রানে ২ এবং এ্যালেন ৮৮ রানে ১ উইকেট।

১ম দিন (১লা ডিসেম্বর) : ভারতবর্ষ ২০৯ রান (৩ উইকেটে); দুরানী ৯ এবং উমরীগড় ১২ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

২য় দিন (২রা ডিসেম্বর) : ভারতবর্ষ ৪৩৭ রান (৭ উইকেটে); উমরীগড় ১৩২ এবং ইঞ্জিনিয়ার ১৮ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

৩য় দিন (৩রা ডিসেম্বর) : ৪৬৭ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮ উইকেট পড়ে ১৬৫ রান।

কানপুরে ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ১লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। পাঁচ দিনের টেস্ট খেলার তিন দিন গত হয়েছে, বাকি আছে দু'দিন। এই তিন দিনের খেলায় ভারতবর্ষ ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসে ৪৬৭ রান (৮ উইকেটে) ক'রে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ড দল ৮ উইকেট খুইয়ে প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৬৫ রান করে। ফলো-অনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে এখনও ইংল্যাণ্ডের ১০৩ রানের প্রয়োজন, হাতে জমা আছে মাত্র দু'টো উইকেট।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর টসে জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে গত টেস্ট সিরিজে তিনি পরপর ৪টে টেস্ট খেলায় টসে হেরে গিয়ে ৫ম টেস্টে টসে জয়ী হয়েছিলেন। এবার ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায় তিনি টসে জয়ী হ'তে পারেননি। মাঠের হাজার হাজার দর্শক ভারতীয় দলের অধিনায়কের এই জয়লাভে আনন্দধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানায়।

দলের ৪১ রানে অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টর (১ম উইকেট) নিজস্ব ১৭ রান ক'রে নাইটের বলে বোল্ড আউট হ'ন। তিনি 'ওভার পিচ' বলে ড্রাইভ মারতে যান কিন্তু ব্যাটের তলা গলিয়ে বলটা উইকেট ভেঙ্গে দেয়। জয়সীমার সঙ্গে ২য় উইকেটে জুটি বাঁধেন মঞ্জরেকার।

লাঞ্চের সময়ের স্কোর ছিল ৭৩ রান (১ উইকেটে)। জয়সীমা ৩৬ রান এবং মঞ্জরেকার ২০ রান করে নট-আউট থাকেন।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর (ডানদিকে) এবং জয়সীমা ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে নামছেন।

লাঞ্চের পরের খেলায় ২য় উইকেটের জুটিতে শতরান উঠে যায়। দলের ১৪৪ রানের মাথায় জয়সীমা লকের বল সোজা মেরে ওভার-বাউণ্ডারী করেন। বলটা মাঠের স্ক্রিনের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে যায়। কিন্তু লকের ঠিক পরের বলে ড্রাইভ মেরে রিচার্ডসনের হাতে বল তুলে দেন। জয়সীমা ২৩০ মিনিট ব্যাট ক'রে নিজস্ব ৭০ রান তুলেছিলেন। বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ৮টা আর ওভার-বাউণ্ডারী ১টা। মঞ্জরেকারের সংগে ৩য় উইকেটে দুরানী খেলতে নামেন। তখন চা-পানের জন্যে খেলা ভাঙ্গতে বেশী দেরী ছিল না। দুরানী লকের বল ভয়ে ভয়ে খেললেন। চা-পানের বিরতির সময় দলের রান একই রইলো ১৫০ রান (২ উইকেট পড়ে)। মঞ্জরেকারের ৫৮ রান। দুরানী তখনো কোন রান করেননি।

দলের ১৯৩ রানের মাথায় মঞ্জরেকার নিজস্ব ৯৬ রান ক'রে এ্যালেনের বলে নাইটের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হ'ন। মাত্র ৪টে রানের জন্যে তিনি সেঞ্চুরী রান করতে পারলেন না। সারা মাঠ তাঁর দুঃখে চুপ হয়ে গেল। মঞ্জরেকার খেলেছিলেন ২২৫ মিনিট এবং এই সময়ে বাউণ্ডারী করেন ১০টা। বোম্বাইয়ে এই সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় মঞ্জরেকার দুই ইনিংসে মোট ১৫২ রান

(৬৮ ও ৮৪) করেছিলেন। টেস্ট খেলায় তাঁর মোট রান দাঁড়ালো ২১৭৮। এই নিয়ে তিনি ৩৯টা টেস্ট ম্যাচে যোগদান করলেন। দুরানীর সঙ্গে ৪র্থ উইকেটে জুটি বাঁধলেন উমরীগড়। ৩১০ মিনিটের সময় দলের ২০০ রান পূর্ণ হয়। নির্দিষ্ট সময়ে ভারতবর্ষের রান গিয়ে দাঁড়ায় ২০৯, ৩ উইকেট পড়ে। দুরানী ৯ রান এবং উমরীগড় ১২ রান ক'রে ঐ দিনের মত নট-আউট থেকে যান।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ ৫½ ঘণ্টার খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে ২২৮ রান যোগ করে পূর্ব দিনের ২০৯ রানের সঙ্গে। মোট রান দাঁড়ায় ৪৩৭, ৭ উইকেট পড়ে। দ্বিতীয় দিনে উমরীগড়ের খেলা দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। প্রথম দিনে মঞ্জরেকার ৯৬ রানে আউট হয়ে দর্শকদের মনে যে বেদনা দিয়ে যান, দ্বিতীয় দিনে উমরীগড়ের খেলায় দর্শকরা তা ভুলে যায়। উমরীগড় ১৩২ রান ক'রে এই দিন নট-আউট থেকে যান। তাঁর ৮ম উইকেটের জুটি ইঞ্জিনিয়ার নট-আউট থাকেন ১৮ রান ক'রে।

দ্বিতীয় দিন দলের ২৬১ রানের মাথায় দুরানী (৪র্থ উইকেট) নিজস্ব ৩৭ রান ক'রে ডেক্সটারের বলে লকের হাতে ধরা পড়েন। উমরীগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন বোরদে। লাঞ্চের সময়ের স্কোর—২৮২ (৪ উইকেট পড়ে)। উইকেটে নট-আউট থাকেন উমরীগড় (৪০ রান) এবং বোরদে (১৪ রান)।

লাঞ্চের পর দলের ২৯৩ রানের মাথায় বোরদে (৫ম উইকেট) তাঁর ২১ রান ক'রে ডেক্সটারের বলে বোল্ড-আউট হ'ন। উমরীগড়ের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি হিসাবে খেলতে নামেন সরদেশাই —তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা। ডেক্সটারের একটা বল তাঁর উইকেটের বেল প্রায় ছুঁয়ে তীব্রগতিতে চলে যায়। সরদেশাই খুব জোর সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে যান। টেস্ট খেলায় তাঁর প্রথম রান করতে তাঁকে কুড়ি মিনিট সময় অপেক্ষা করতে হয়। উমরীগড়ও একবার আউট হ'তে হ'তে ছাড়া পেয়ে যান তাঁর ৫০ রানের মাথায়। এ্যালেনের বলে ড্রাইভ মেরে উমরীগড় মিড-অনে ডেক্সটারের হাতে বল তুলে দেন। বলটা খুব জোরালো ছিল, ডেক্সটার হাতে ধরে রাখতে পারেন নি; উমরীগড় ২ রান তুলে নেন। আরও একবার দলের ৩৩৩ রানের মাথায় উমরীগড় তাঁর ৬৯ রানে লকের হাতে 'ক্যাচ' তুলে দেন। বলটা ভাগ্যবলে লকের হাতের মধ্যে থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে যায়।

চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৩৬৮, ৫ উইকেট পড়ে। উমরীগড়ের রান তখন ৮৯ এবং সরদেশাইয়ের ২৮।

পলী উমরিগড়

এম মঞ্জরেকার

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় পলি উমরীগড়ের শতরান

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (৩) : ১৩০ রান* (মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২); ১১৮ রান (ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯) এবং ১৪৭ রান* (কানপুর, ১৯৬১)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে (২) : ১১৭ রান (কিংস্টোন, ১৯৫২-৫৩) এবং ১০০ রান (ত্রিনিদাদ, ১৯৫২-৫৩)।

পাকিস্তানের বিপক্ষে (৫) : ১০২ রান (বোম্বাই, ১৯৫২-৫৩), ১০৮ রান (পেশোয়ার, ১৯৫৪-৫৫); ১১২ রান (দিল্লী, ১৯৬০-৬১); ১১৫ রান (কানপুর, ১৯৬০-৬১) এবং ১১৭ রান (মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১)।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে (১) : ২২৩ রান (হায়দ্রাবাদ, ১৯৫৫-৫৬)।

* নট আউট।

চা-পানের বিরতির পর লক যে বল দিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন সরদেশাই সেই বলেই নিজের উইকেট ভাঙ্গলেন। উমরীগড় এবং সরদেশাইয়ের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৭৫ রান ওঠে, ১০৭ মিনিটের খেলায়। ৭ম উইকেটে খেলতে নামেন কৃপাল সিং। এর পর এ্যালেন এবং লকের বলে পরপর দুটো বাউন্ডারী করলে উমরীগড়ের রান দাঁড়ায় ৯৮। প্রথম দিনে মঞ্জরেকার ৯৬ রানে আউট হয়ে যান। ক্রিকেট খেলায় এই নব্বুইয়ের ঘরটা খুবই ভয়ের—৯১ রানের মাথায় পৌঁছেও নিস্তার নেই—অনেকে আউট হয়েছেন। উমরীগড়ের ৯৮ রান—দর্শক এবং শ্রোতাদের বুক ভয়ে ধুকপুক করতে থাকে। উমরীগড় তাঁদের সমস্ত শংকা দূর করলেন—৯৮ রানের মাথায় এ্যালেনের বলে তিন রান ক'রে। রান দাঁড়াল ১০১। এই শতরান করায় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় উমরীগড়ের ৩০৩৩ রান দাঁড়ায়। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র উমরীগড়ই তিন সহস্র রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করলেন। ২৭৮ মিনিটের খেলায় তাঁর শতরান পূর্ণ হয়। বাউন্ডারী করেন ১০টা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই নিয়ে উমরীগড়ের ৩টে সেঞ্চুরী হ'ল। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল ১১টা। দলের ৪১৪ রানে কৃপাল

সুভাষ গুপ্তে

সিং মাত্র ৭ রান ক'রে নাইটের বলে বোল্ড হয়ে বিদায় নিলেন। ৮ম উইকেটে উমরীগড়ের সঙ্গে যোগ দিলেন ইঞ্জিনিয়ার। খেলার নির্দিষ্ট সময়ে দলের রান দাঁড়ায় ৪৩৭ (৭ উইকেট পড়ে)। নট-আউট থেকে যান উমরীগড় (১৩২ রান) এবং ইঞ্জিনিয়ার ১৮ রান)।

তৃতীয় দিনে ৪৫ মিনিট খেলার পর ভারতবর্ষের অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টর দলের ৪৬৭ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। তৃতীয় দিনের ৪৫ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের ১টা উইকেট পড়ে ৩০ রান ওঠে, মোট রান দাঁড়ায় ৪৬৭ (৮ উইকেটে)। উমরীগড় ১৪৭ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। উমরীগড় এই নিয়ে ৫১টা টেস্ট ম্যাচ খেললেন। এই ৫১টা টেস্ট খেলায় তাঁর মোট রান ৩০৭৯, সর্বোচ্চ রান ২২৩ (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৫-৫৬), সেঞ্চুরী সংখ্যা ১১টা। উইকেট পেয়েছেন ১০৯৮ রানে ২৪টা।

তৃতীয় দিনে পূর্ব দিনের অপরাজেয় খেলোয়াড় উমরীগড় এবং ইঞ্জিনিয়ারের ৮ম উইকেটের জুটি ৪৫ মিনিটে ৩০ রান করার পর ভেঙ্গে যায়। ইঞ্জিনিয়ার দলের ৪৬৭ রানের মাথায় ৩৩ রান ক'রে আউট হ'ন। তাঁর আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ইংল্যান্ড দল প্রথম ইনিংসের খেলায় দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। তৃতীয় দিনের ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিটের খেলায় ইংল্যান্ড ৮টা উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৬৫ রান করে। ইংল্যান্ডের এই বিপর্যয়ের প্রধান কারণ সুভাষ গুপ্তের মারাত্মক বোলিং। অনেক দিন পরে গুপ্তে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর অসামান্য ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিলেন। এই দিন তিনি ৬৭ রানে ৫টা উইকেট পান। খেলার এক সময় দেখা যায় তিনি ১৮টা বলে মাত্র ৬ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেয়েছেন। তাঁর পরই বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন বোরদে, ২৮ রানে ৩টে উইকেট নিয়ে। এইবারের টেস্ট খেলা ধরে সুভাষ গুপ্তে এক ইনিংসের খেলায় ১২ বার ৫টা অথবা তার বেশী ক'রে উইকেট পেলেন (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪ বার, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪ বার, পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ বার এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১ বার)। সুভাষ গুপ্তে এক ইনিংসের খেলায় ৫টা ক'রে উইকেট পেয়েছেন ৮ বার, ৬টা ক'রে ১ বার, ৭টা ক'রে ২ বার এবং ৯টা ক'রে ১ বার। এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড—৯টা (১০২ রানে ৯টা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯)। গত বছর পাকিস্তানের বিপক্ষে সুভাষ গুপ্তে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। ৩টে টেস্ট খেলে ২৪৩ রানে তিনি মাত্র ৮টা উইকেট পেয়েছিলেন। ১৯৬১ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের খেলা ধরে, তাঁর বোলিংয়ের হিসাব দাঁড়িয়েছে : ১৪৭টা উইকেট, ৪২১২ রানে (৩৫টা টেস্ট খেলায়)।

ইংল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় দলের ২৯ রানের মাথায় গুপ্তের ৩য় ওভারের প্রথম বলেই প্রথম উইকেটের জুটি রিচার্ডসন (২২ রান) ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। এক ঘণ্টা খেলে লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৪৩ (১ উইকেটে)। পুলার ১১ এবং ব্যারিংটন ৬ ক'রে নট আউট ছিলেন। চা-পানের জন্যে খেলা ভাঙ্গতে তখন ৪৫ মিনিট বাকি, এমন সময় ইংল্যান্ড দলের ভাঙ্গন আরম্ভ হ'ল। দলের ৪৭ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়লো—ব্যারিংটন ২১ রান ক'রে আউট হলেন। ২য় উইকেটের জুটিতে ৫৮ রান উঠেছিল। ব্যারিংটনের খেলা থেকে বিদায়ের পর থেকেই ইংল্যান্ডের দারুণ পতন আরম্ভ হ'ল। মাইক স্মিথ, ডেক্সটার, পুলার এবং মারে বিদায় নিলেন—এই চারটি উইকেটের বিনিময়ে ইংল্যান্ড মাত্র ১৭ রান পেল। চা-পানের বিরতির সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়াল ১০৪ রান, ৬টা উইকেট পড়ে। ২য় উইকেট পড়েছিল দলের ৮৭ রানে, ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায় দলের ১০৪ রানের মাথায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৯ মিনিট আগে উইকেটের উপর ছায়া পড়ায় খেলা বন্ধ হ'য়ে যায়। ইংল্যান্ডের স্কোর দাঁড়ায় ১৬৫ রান, ৮ উইকেট পড়ে। সোমবার (৪ঠা ডিসেম্বর) বিশ্রামের দিন। মঙ্গলবার থেকে পুনরায় খেলা সুরু হবে। ইংল্যান্ডের হাতে আছে মাত্র ২টো উইকেট। ফলো-অনের হাত থেকে ছাড়ান পেতে এখনও ইংল্যান্ডকে ১০৩ রান তুলতে হবে। উইকেটে অপরাজেয় আছেন বারবার (৪১ রান) এবং টনি লক (রান হয়নি) ৩।১২।৬১

হাবুল সরকার

॥ পরলোকে শ্রীহাবুল সরকার ॥

মোহনবাগান ক্লাবের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীহাবুল (শ্রীশচন্দ্র) সরকার মঙ্গলবার, ২৮শে নভেম্বর তারিখে ৭৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী প্রথম ভারতীয় দল মোহনবাগানের পক্ষে তিনি ফাইনাল খেলায় রাইট-ইনসাইড খেলোয়াড় হিসাবে খেলেছিলেন। ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে আর মাত্র এই তিনজন খেলোয়াড় জীবিত রইলেন—সর্বশ্রী হীরালাল মুখার্জি (গোলরক্ষক), জে এন রায় (রাইট আউট) এবং রেভারেণ্ড এস কে চ্যাটার্জি (ব্যাক)। শ্রীহাবুল সরকার একজন চৌকস কীর্তিমান খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল ছাড়াও তিনি হকি এবং ক্রিকেট খেলাতে যথেষ্ট ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিশুদ্ধ গহনা
অল্পদামে ও আধুনিকতায়ই
আমরা সুপরিচিত
ফোন ৪৫-৬৪০৭
শিল্প নৈপুণ্যে
রূপায়ন জুয়েলার্স
ডায়মণ্ড হারবার রোড, বেহালা (থানার সম্মুখে)

VAPOLINE
INDICATIONS:
DIRECTIONS:

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৫৩৩	কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস	—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
৫৩৫	দিনান্তের রঙ (উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৫৩৯	দেশে-বিদেশে	
৫৪০	ঘটনা-প্রবাহ	
৫৪১	সমকালীন সাহিত্য	—শ্রীঅভয়ংকর
৫৪৫	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
৫৫২	খেলাধুলো	—শ্রীদর্শক
৫৫৫	ত্রৈমাসিক সূচীপত্র	

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

Friday, 15th December, 1961
40 Naya Paise.

গোয়া সম্বন্ধে লোকসভায় গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা যেমন অকস্মাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো সমস্ত দেশের উত্তেজনা ও আবেগকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের গত কয়েকদিনের ক্রম-ম্রিয়মাণ বলিষ্ঠতা আবার ধীরে ধীরে জনসাধারণকে হতাশ করে এনেছে সন্দেহ নেই। সমস্ত দেশ অন্তরের সঙ্গে প্রত্যাশা করেছিল যে, একবার অন্তত কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের আপোষমুখী নীতি বিসর্জন দিয়ে অন্তত একটি ব্যাপারে হেস্ত-নেস্ত করার জন্য প্রত্যক্ষ পন্থা গ্রহণে প্রস্তুত হয়েছেন। হয়ত এই সিদ্ধান্তের পিছনে খানিকটা নির্বাচনী রাজনীতির প্রভাব থাকতে পারে, খানিকটা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমেননের ব্যক্তিগত উৎসাহের আধিক্যও থাকতে পারে। তথাপি এবিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে, জনসাধারণ একটি বলিষ্ঠ নীতির পরিচয় পেতে চায় এবং গোয়া সীমান্তে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্ভাবনা তাঁদের দ্বারা অবিসম্বাদিতভাবে অভিনন্দিত হবে।

তাছাড়া, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সরকারের সক্ষমতার দৃষ্টান্ত হিসাবে গোয়া সীমান্তে এই বলিষ্ঠতার নিদর্শন স্থাপন করা দরকার ছিল। প্রকৃতপক্ষে সামান্য দূরদৃষ্টি বিস্তার করলেই একথা বোঝা যায় যে, চীন-ভারত সীমান্তকে দৃঢ়তর করার জন্যই গোয়া সীমান্তে সামরিক কর্মসূচী দরকার। কারণ কোনো দেশই শুধু সৈন্যবলের দ্বারা সীমান্তকে রক্ষা করতে পারে না। প্রতিরক্ষার প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে দেশের সম্মিলিত মানসিক বল। সেই বল, সেই মানসিক দৃঢ়তা এবং মাতৃভূমির প্রত্যেকটি ইঞ্চি জমির প্রতি দেশবাসীর সেই অখণ্ড প্রেম উদ্দীপ্ত করার জন্য ভারতবর্ষে কোনো একটি দৃষ্টান্তের দরকার ছিল। আমরা মনে করেছিলাম, গোয়া সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করবে। চীন-ভারত সীমান্তের উদ্দেশে ভারতের যাত্রারম্ভের সূচনা জ্ঞাপন করবে।

কিন্তু গত ৫ দিনের মধ্যে তাপমান যন্ত্রের চঞ্চল পারদ-শীর্ষের মতো ভারত সরকারের বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা ক্রমনিম্নগামী হয়েছে। জনসাধারণ অতিরিক্ত আশা করেছিলেন, এমন অপবাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। বৃহস্পতিবার লোকসভায় নেহরুর বক্তৃতায় দুইটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিলঃ (১) গোয়া সীমান্তে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আসন্ন; (২) বৃটেন বা অন্য কোনো মিত্ররাষ্ট্রের আপোষ প্রচেষ্টা নেহরু অর্থহীন বলে বর্ণনা করছেন (এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছেন)। এর পর যে-কোনো লোক আশা করতে পারে যে, ভারত সরকার আর কোনো দ্বিধাগ্রস্থতা প্রদর্শন করবেন না এবং ২৪, ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গোয়ার সংগ্রাম আরম্ভ হবে—অর্থাৎ এ আর কয়েকটি ঘণ্টার প্রশ্ন মাত্র। কিন্তু পরবর্তী ৫ দিনে—এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত উপরোক্ত প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয়েছে এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কারণ প্রায় ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে নেহরুজী পুনরায় ঘোষণা করেছেন যে, তিনি এমন কিছু করতে চান না যার ফলে আপোষের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পূর্বে আপোষ প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলেন তা প্রত্যাহার করা হল। 'আসন্ন সংগ্রামের' ঘোষণা আবার কোনো এক দূরবর্তী লক্ষ্য বা 'সম্ভাবনায়' পরিণত হল। কার্যত নেহরুজী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটি ক্ষিপ্র এবং স্থূল পদক্ষেপের দ্বারা গোয়া সীমান্ত থেকে কয়েক মাইল পশ্চাদপসরণ করে এলেন। বলাবাহুল্য, এই অনিশ্চয়তা এবং মতির অস্থিরতা দেশের মানসিক বলের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতিকারক। জনসাধারণের আন্তরিক এবং গভীর আবেগ নিয়ে এইভাবে ছেলে-খেলা করা যায় না।

কিন্তু রাজনীতির পর্যবেক্ষকেরা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং শেষ মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্থতা ও বিলম্ব সত্ত্বেও গোয়া সীমান্তে বৃহৎ ঘটনা—আজ না হোক, কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানেই ঘটতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় সরকার সবলে সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য আবার পশ্চাদপসরণ করতে পারেন না, বিশেষত বর্তমান নির্বাচনী আবহাওয়ায়। তাছাড়া, এই [illegible] অন্তরালে যদি তাকানো যায় পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন যে, এ শুধু পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত দ্বিধাগ্রস্ততার ফল নয়। আসলে এই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যে দ্বিধা-বিভক্ত তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। সেই দ্বিমতের প্রতিফলন ঘটছে সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তার মধ্যে। যুদ্ধের কোনো সিদ্ধান্তের জন্য সমস্ত দেশের ঐক্যবদ্ধ ও অবিসম্বাদিত সম্মতি দরকার। পণ্ডিত নেহরু সমস্ত দেশের কাছ থেকে সেই সম্মতি পেলেও, সম্ভবত তাঁর নিজের সহযোগীদের কারো কারো কাছ থেকে তা পাননি। কাজেই দুর্ভাগ্যের ন্যায় ইত্যবসরে বৃটিশ দূতাবাস ও ন্যাটো শক্তিবর্গের প্রভাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করছে।

এই হেমন্ত

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এই মফস্বলে—
লোভের নোঙরা হাত
যেখানে নদীর টুঁটি টিপে ধরেনি
পোল তুলে,
(যদিও তা ধরবে একদিন, ধরবেই)

যেখানে কারখানার অসংখ্য চিমনি
অঢেল নীল আকাশকে
এখনো বিদ্রূপে ভেঙচি কাটেনি,
(তাও কি আর না কাটবে?)

বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালার মত
যেখানে সবে দানা বাঁধছে উপনিবেশ,
টেলিগ্রাফের তারে দোল খায় উদাসীন নীলকণ্ঠ
এবং ডানায় অরণ্যগন্ধ
ঘরে উড়ে আসে প্রজাপতি;

হরেক কুঁড়ির ঝাড়লণ্ঠন দুলিয়ে
উঠোনে গেরস্থ পাহারা দেয়
যুবক বকফুলের গাছ
এবং নিম কি বকুল ঝোপে
থেকে ঘুঘু ডাকে; রৌদ্রে পায়রা ওড়ে

হেমন্তের মধুর দিনগুলি
আলফান্সো আমের আঁটির মত
সেখানে যতই কেন নিঙড়ে-নিঙড়ে,
পিষে পিষে নিই—
আশ তবু মেটে না।

লোভী বালকের মত শুধুই চাখি আর চাখি।

* *

স্মৃতিগন্ধা

বটকৃষ্ণ দে

ঘরে আমার স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি
চার-দেয়ালে বসুধারার মতোই অংকিতা—
আমার তীরে রেখে গেলে তমিস্রার অন্ধ কারুকৃতি,—
তুমি যে শুধু স্মৃতি এখন,—মানবে মন কি তা?

(২)

ঘরে আমায় সে একা ফেলে গেছে
স্মৃতি, কেবল স্মৃতিকে সাথী দিয়ে—
আয়তি, চুড়ি, ঝিনুক, কড়ি রইলো প'ড়ে পিছে
আমি বৃদ্ধ, বুড়ী অতীত নিয়ে।

(৩)

ঘরে আমার ছড়িয়ে আছে, স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি!
মুহূর্তের মুক্তি নেই, যখুনি তুমি ধেয়ানে
মূর্ত হবে,—হঠাৎ যেন কে আনে
তখুনি এক যুবতী—সে যে স্মৃতিরই রূপ-রীতি!

(৪)

মধ্য রাতে কে ডাক দিলো, দুয়ারে দাঁড়ালে কে?
পর্দা দোলে, ফিসফিসানি, কীসের রিনিঠিনি!
ঘরের মধ্যে ব্যাকুল নিশিগন্ধা ছড়ালে কে!
তুমি? না, হাওয়া।
না, না সে স্মৃতি।
তোমায় আমি চিনি॥

নেশা, বিশেষ করে পানাসক্তির বিষয়ে কথা হচ্ছিল। গতবারে আমি দেখিয়েছি, কলকাতায় মদ্যপানের ঝোঁক কেমন হু হু করে বেড়ে চলেছে। আর তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছি মনোবিকারের কথা। কিন্তু বিষয়টা পরিষ্কার হয়নি। কেন ঘটেছে এই মনোবিকার সে বিষয়ে বিচার করে দেখা হয়নি। এবার একটু অন্যদিক থেকে চেষ্টা করে দেখা যাক।

সুস্থ মনের ধর্ম হল এই যে, সে একটা লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। একে বলা যায় তার আদর্শ। এবং এই আদর্শকে সার্থক করে তোলার জন্যে তার যে আচার-আচরণ তাই দিয়েই তৈরী হয় তার way of life বা জীবনবেদ।

বলা বাহুল্য, এ বেদ ঋষিদের বেদ নয়। জীবনকে আমি যেভাবে পেতে চাই, যেভাবে আমি জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠতে চাই তারই উচ্চাভিলাষ দিয়ে তৈরী হয় এই জীবনযাত্রার প্রণালী।

এর মধ্যে একটা নৈতিক বিচার আছে। কিন্তু আমি সে কূট-তর্কের মধ্যে যাব না। কারণ কোন্‌টা সুনীতি আর কোন্‌টা দুর্নীতি এর কোনো সহজ সমাধান নেই। আমি তাই ওসব গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ে উল্লেখ করব সমাজের কথা, রুচির কথা। এবং এইদিক থেকেই, নৈতিক প্রশ্ন না তুলেও, চুরি করে বড়লোক হওয়ার way of life-কে আমি ধিক্কার দেব।

কিন্তু উপস্থিত কালের গন্ডীর মধ্যে নেমে এসে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? সমাজের আজ ছত্রভঙ্গ অবস্থা, ব্যক্তিগত রুচি বিপথগামী। প্রত্যেকেই আমরা নিজের জীবনটাকে নিয়ে ফাটকা খেলছি, এবং যতো হেরে যাচ্ছি, ততোই হ'য়ে উঠছি মরীয়া। এই নিঃস্বতাই আজ ব্যাধির মতো ফুটে বেরিয়েছে আমাদের আচার-আচরণে।

সুস্থ মন তাই এখন সুদূরের স্বপ্ন। লক্ষ্যহীন, উদ্‌ভ্রান্ত মনের হিস্টিরিয়াতে প্রতিনিয়ত উত্তেজনার খোরাক না জোটালে পদে-পদেই দেখা দেয় শূন্যতা আর অবসাদ। মদ্যপান তার একটি দিকের চেহারা। ওরই সঙ্গে গা মিশিয়ে রয়েছে তিন তাসের খেলা, ফাঁকা সাহেবীআনা, এমন কি সংস্কৃতিচর্চার বহিরঙ্গ-বিলাস।

স্বাধীনতা লাভের অন্য যতো সুফলই হোক, জাতি হিসাবে ক্রমে আমরা নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছি, আমার এ আশঙ্কাকে কিছুতেই আর চাপা দিয়ে রাখতে

পারিনে। যখন আমরা পরাধীন ছিলাম, তখন একটা লজ্জা ছিল, জেদ ছিল। আমরা আমাদের বিদেশী শাসকদের সমকক্ষ হ'য়ে দেশকে স্বাধীন করব এই লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত ছিল আমাদের মন। এবং বাধা যতোই প্রবল হ'য়েছে ততোই যেন বেগবতী নদীর মতো তরঙ্গের শিখরে শিখরে তাকে অতিক্রম করার জন্যে উন্নত হ'য়ে উঠেছি আমরা। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর যেন কেমন এক পরিতৃপ্তিতে সব-পেয়েছির দেশে চলে গেলাম, আর দিনে দিনে আমাদের মনের নদীতে চড়া পড়তে লাগল। আমরা সমুদ্রের কথা ভুলে গেলাম। আমাদের পাঁকের জলে আর তৃষ্ণা মেটে না।

কাজেই উত্তেজনা চাই। মদের আড্ডায় যেতে আর লজ্জা নেই। আমরা স্বাধীন যে! জাতীয় কলঙ্ক তো কিছু নেই। মাথা উঁচু ক'রে 'বারে' ঢোকো। তারপর নেহাৎ যদি ব্যাপারটাকে রামা-শ্যামার মতো 'মেদো' ব্যাপারই মনে হয় তো, পানীয়টার নাম দাও 'ড্রিংকস'—ব্যাস্, সাতখুন মাফ। আর তাতেও যদি বিবেকে কাঁটা ফোটে তো, পানপাত্র হাতে সাংস্কৃতিক আলোচনা শুরু কর। ডীলান টমাস, কাফ্‌কা, মাতিস, বাখ; কিম্বা সিনেমার নিওরিয়ালিজম, রবীন্দ্রনাথের ছবি, নিউক্লিয়ার ফিজিকস্...! বিদগ্ধ বলে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

এমনি এক ঘরোয়া আড্ডার কথা জানি। নিজে গাড়ী চালিয়ে এসেছিল যুবকটি। মেয়েটি বসেছিল নাইলনের শাড়ী পরে। সামনে 'রঙ্কোর পিতা আলুর চাষ করিতেন' যে-স্কটল্যাণ্ডে সেইখানে প্রস্তুত এক নৈকষ্য কুলীন পানীয়। আশিদ্রচকে সাহিত্যের পরীক্ষায় মোটামুটি একটা পাশ-নম্বর দিয়ে যুবকটি যখন সবে প্যাসের দিকে থাবা বাড়িয়েছে এমনি সময় বিহ্বল গদগদভাবে তরুণীটি প্রশ্ন করল, 'টুকুদা, আমায় একটু ফ্রেঞ্চ শিখিয়ে দেবে?'

'ফ্রেঞ্চ?' একটা হেঁচকি তুলে থেমে পড়ল যুবকটি।

'কেন, পারব না শিখতে?'

'না, তা পারবে না কেন? দেব'খন শিখিয়ে। যা বলছিলাম, প্যাসের্র কবিতার সংগে রিলকের একটা অদ্ভুত—!'

'তুমি জার্মানও জানো' ধনুকের মতো ভুরু বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল তরুণীটি।

'জানি। মানে, অল্প-স্বল্প। গ্যয়টে পড়বার সময়—!'

'তা হোক অল্প। ওতেই হবে। আমাকে ওমনি একটু জার্মানও শিখিয়ে দেবে। উমাটার বড় বাড় বেড়েছে দু'পাতা জার্মান উল্টে!'

'কী সিলি, শিখবে নিজের কালচারের জন্যে।' যুবক জ্ঞানগর্ভ হাসির সংগে মন্তব্য করল, 'তাছাড়া জার্মানটা অতো সহজও নয়।'

'হোক না কঠিন। তুমি শেখাবে না, তাই বল।'

'কী আশ্চর্য! আমি কি তাই বলেছি। হবে'খন একদিন।'

'না, একদিন নয়। কালই শুরু করব। আসছ তো?'

'নিশ্চয়ই! বাঃ—!'

বলা বাহুল্য সে আসেনি। শুধু কাল নয়, কোনোদিনই আসতে পারেনি। এ বাড়ীর দরজা তার কাছে চিরদিনের মতো রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

কিন্তু হলে হবে কি? এ তো নিজের ইচ্ছায় ঘটে না। এযে একটা ব্যারাম, হিস্টিরিয়া! এই অন্তঃসারশূন্যতার হাত থেকে তাদের অব্যাহতি কোথায়! শুধু যতো দিন যায় ততোই বেড়ে ওঠে এই দেউলিয়াপনা, আর সেই সংগে চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে চলে শুঁড়ির দোকানের বিল। নান্য গতিরনাথা।

• • •

"এইখানে আসিলে সকলেই সমান" —শ্মশানের বিষয়ে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উক্তিটি নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। কিন্তু আমি এমন একটা ভুয়োদর্শনের বাণী লিখিত দেখেছিলাম একটা পাঁচিলের গায়ে, যা পড়লে আঁতকে উঠতে হয়।

কয়েক বছর আগে কলকাতার এক বিখ্যাত হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল মরকুটে চেহারার এক গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে কতকগুলি দড়ি বাঁধা বাঁশের খাটিয়া। তারপর আর দু পা এগোতেই দেখতে পেলাম, হাসপাতালের গেটের পাশে কে যেন কাঠ কয়লা দিয়ে লিখে রেখেছে—এইখানে আসিলে কাহাকেও ফেরৎ দেওয়া হয় না।

বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তারপর অপ্রতিভভাবে নিজের মনেই একটু হেসে পরম আশ্বাসের সংগে লক্ষ্য করলাম, না আমি ভিতরে যাইনি, বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু ঐ অদৃশ্য লেখকের কথা ভুলতে পারলাম না। চেনা জানা কেউ হাসপাতালে গেলেই বেজায় মন খারাপ হয়ে যেত। এবং সশরীরে ফিরে না আসা পর্যন্ত শান্তি পেতাম না।

অবশেষে একদিন আমাকেই হাসপাতালে যেতে হল। সত্যি কথা স্বীকার করব, ভালো মানুষও সেখানে অনেক দেখেছি। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাটাই এমন বিশৃংখল আর হৃদয়-সম্পর্কহীন যে মনে হয় যেন দ্বীপান্তরে এসেছি। কেন যে তা মনে হয় সে বিষয়ে কাগজে অনেক লেখালেখি হয়েছে। ফল হয়নি বিশেষ কিছুই। ইউরোপ-আমেরিকায় অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও মাঝে মাঝে check up-এর জন্যে সানন্দে hospitalised হন। আর এখানে? হত-দরিদ্র ব্যক্তিরাও প্রাণপণ চেষ্টায় হাসপাতালে যাওয়ার দিনটিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। আর তারপর যেদিন তাকে নিতান্তই হাসপাতালে যেতে হয় সেদিন তার মুখ দেখলে মনে হয় সত্যিই বুঝি তাকে পাতাল-প্রবেশ করতে বলা হচ্ছে।

এই ফোবিয়া বা অ্যালার্জি কাটানোর জন্যে কর্তৃপক্ষ কি তৎপর হতে পারেন না? এমন কিছু ব্যবস্থা যাতে হাসপাতালগুলিই আগে "রোগমুক্ত" হয়, এবং হাসিমুখে আমরা আরোগ্যলাভের জন্যে সেখানে আশ্রয়লাভ করতে পারি?

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় ভারত-প্রেমিক জর্জ টম্পসন

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ২০শে এপ্রিল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত কলকাতার ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ছিল Society for the Acquisition of General Knowledge বা সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সদস্যগণ কর্মজীবনে প্রবেশ করবার পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও স্বদেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন এ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন প্রবীণতম নব্যবঙ্গ তারাচাঁদ চক্রবর্তী: সহকারী সভাপতি—কালাচাঁদ শেঠ এবং রামগোপাল ঘোষ: সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র: কোষাধ্যক্ষ—রাজকৃষ্ণ মিত্র। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ দে প্রভৃতি ছ'জন ছিলেন অধ্যক্ষ সভার সদস্য। ডেভিড হেয়ার, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি সে যুগের প্রবীণরাও ছিলেন এ সভার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থের ১৯ থেকে ২১ পৃষ্ঠায় এ সভার কর্মপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

মুখ্যতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনার জন্য এ সভা প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমে ক্রমে রাজনীতি-চর্চার দিকেও এ সভার সভ্যেরা ঝুঁকে পড়লেন। এ সভার একবার একটি অধিবেশন হয় হিন্দু কলেজে (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩)। কলেজের অধ্যক্ষ ডি এল রিচার্ডসনও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ অধিবেশনের একজন বক্তার (দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের) বক্তৃতাকে রাজদ্রোহজনক বলে প্রতিবাদ করলে সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী সভামুখ্যের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে এ প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেন। তারাচাদ চক্রবর্তীর এ সাহস দেখে কোন কোন সদস্য রাজনীতি-চর্চায় উৎসাহিত হয়ে উঠেন। এর পর সভার অধিবেশনে রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধাদিও পঠিত ও আলোচিত হতে থাকে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে সভার মুখপত্র হিসেবে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামে একখানি দ্বৈভাষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এ পত্রিকায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ছাড়াও সমসাময়িক রাজনীতি আলোচনাও থাকত। এত ব্যাপকভাবে দেশের বাস্তব সমস্যা আলোচনা ইতিপূর্বে আর কোন পত্রিকায় করা হয়নি।

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার ইংলণ্ড থেকে ফিরবার সময় (১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) সঙ্গে নিয়ে এলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ-বাগ্মী জর্জ টম্পসনকে। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করে, সমস্ত ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ-সংকল্প ঘোষণা করে এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম সদস্য হিসেবে ভারতবর্ষের অগণিত জনসমাজের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ভারতে আসবার আগেই তিনি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দ্বারকানাথের ইচ্ছা ছিল এ উদারনৈতিক রাজনীতিবিদের সহায়তায় তিনি সমকালীন শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের পাশ্চাত্য রাজনীতিতে সুশিক্ষিত করে তুলবেন। জর্জ টম্পসনকে কলকাতায় আনার পর তাঁকে 'নব্যবঙ্গে'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'নব্যবঙ্গ' এই বিখ্যাত পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদকে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে অভিনন্দন জানালেন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় জর্জ টম্পসন সে অধিবেশনে বিশেষ কোন রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা না করে সাধারণভাবে তাঁর এ দেশে আসার কারণ

বর্ণনা করলেন। আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন :

"For some years I have felt a deep and constantly growing interest in the condition, the prospects and the destinies of the people of India. I have read of India, and I have dreamed of India, and I have spoken in behalf of India. But dreaming or talking or writing, I have always had one wish present to my mind, that I might see the country for myself, might mingle with its people as I do now, and through the knowledge acquired by travelling and observation, be able to be of more service to the cause of my fellow-subjects here".

জর্জ টম্পসনের এ প্রাথমিক উক্তির মধ্যেই তাঁর ভারতে আসার দুটো কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের তৎকালীন বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, দ্বিতীয়তঃ ভারতের ব্রিটিশ প্রজাপুঞ্জকে ইংলন্ডের ব্রিটিশ প্রজার মত সমান জ্ঞান। এ মনোভাবের মধ্যে জর্জ টম্পসনের উদার রাজনৈতিক এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য পেয়েছে। সুদূরে ইংলন্ডে বসে স্বার্থান্বেষী ভারতীয় সরকারের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যারা ভারত শাসনের মূল নীতি নির্ধারণ করেন তাদের শাসন-নীতি ভ্রান্ত হতে বাধ্য। এ ছাড়া ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে ইংলন্ডের প্রজার মত সমদৃষ্টিতে না দেখলে শাসন ব্যাপারে তাদের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়।

বাস্তবিক পক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ছিলও তাই। উচ্চ ক্ষমতায় আসীন ভারতবর্ষের রাজকর্মচারীরা শাসক ইংরেজ জাতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইংলন্ডের সর্বোচ্চ শাসন-কর্তৃপক্ষকে শাসন-নীতি নির্ধারণের জন্য পরামর্শ দিতেন। তাঁরাও ব্রিটিশ স্বার্থ-অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে ভারত-শাসনের মূলনীতি নির্ধারণ করতেন। এ ছাড়া ভারতীয় প্রজার প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল পরাজিত জাতির প্রতি বিজেতা জাতির দৃষ্টি স্বভাবত যেমন হয় তেমন। জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গের প্রতি তাঁর প্রথম উক্তিতেই ভারত-শাসনের এ দুটো দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

নব্যবঙ্গকে লক্ষ্য করে জর্জ টম্পসন বললেন : 'তোমাদের দেশের নদীর অতুলনীয় সৌন্দর্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে আমি এখানে আসিনি, তোমাদের দেশের পর্বতের মহত্তম সৌন্দর্যও আমাকে আকর্ষণ করেনি কিংবা তোমাদের ভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পুরাকীর্তির ঐশ্বর্য দেখাও আমার এ দেশে আগমনের উদ্দেশ্য নয়।' স্বদেশে নিজের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে আমি এদেশে এসেছি :

"......to study the living population and all other subjects only in connection with the present and future well-being of those who were created to possess and enjoy the riches of the splendour of this glorious region".

জর্জ টম্পসন আরো বল্লেন : 'যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসিত হচ্ছে সেজন্য ইংলন্ডের জনসাধারণ ভগবানের নিকট তাদের দায়িত্ব অনুভব করুক—এ জাগ্রত ভাবনা আমার বহুকালের।......ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার জন্য এ দেশ সম্পর্কে যথাযথ একটা ধারণা করতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। এ অবস্থায় ভারতবর্ষে বর্তমানে যে অন্যায় অবিচার অবাধে চলছে তার প্রতিবিধানের জন্য তাদের পক্ষে কোন পরামর্শ-দানের প্রশ্নই ওঠে না।'

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলন্ডবাসীর এ অজ্ঞতা দূর করবার জন্য জর্জ টম্পসন তাই নব্যবঙ্গকে উপদেশ দিলেন :

"It is of vital importance to you and to your country, that the apathy, indifference, and ignorance of the people of England should be removed".

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলন্ডের জনসাধারণের বিরূপ ধারণা, ঔদাসীন্য এবং অজ্ঞতা দূর করা শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে সে সময় সবচাইতে প্রয়োজনীয় কাজ বলে জর্জ টম্পসন মনে করছেন কেন? কারণ ইংলন্ডের জনসাধারণই পার্লামেন্টে সদস্য প্রেরণ করে, সে সদস্যরাই ভারত-শাসনের জন্য 'চার্টার' প্রণয়ন করেন—যে চার্টারের বিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষ শাসিত হয়। অতএব ভারত-শাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হল ইংলন্ডের জনসাধারণ। সেজন্য শাসন ব্যাপারে সুবিচারের জন্য যদি কারো কাছে আবেদন করতে হয় সে আবেদন করতে হবে ইংলন্ডের জনসাধারণের কাছে—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে নয়। কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হল একটি আইন অনুযায়ী গঠিত শাসন-সংস্থা যে সংস্থা ভারত-সম্রাট এবং ইংলন্ডের জনসাধারণের নামে ভারতবর্ষ শাসন করে। যে ক্ষমতা কোম্পানীর ওপর ন্যস্ত হয়েছে, কোম্পানী তা সুবিচারের সঙ্গে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের উপকারের জন্য প্রয়োগ করছে কিনা—ইংলন্ডের রাজা ও জনসাধারণ তা দেখতে অবশ্যই বাধ্য। এ কর্তব্য তাঁরা সম্পাদন করতে পারেন না ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যদি তাঁরা অজ্ঞ থাকেন।

জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে জানালেন ইংলন্ডীয় কর্তৃপক্ষ ভারতের উন্নতির জন্য সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি ভারতবাসী তাঁদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে দেন। সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন দুষ্ট-ক্ষতকে জীইয়ে রাখা তাঁদের কোনক্রমেই ইচ্ছা নয়। কারণ এ সত্য তাঁরা ক্রমশই উপলব্ধি করছেন যে সমস্ত রকমের সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থা ভারতবর্ষ ও ইংলন্ড—উভয় দেশের লোকেরই বৃহৎ কল্যাণের পরিপন্থী। নব্যবঙ্গকে লক্ষ্য করে জর্জ টম্পসন বললেন : এ কথা তোমরা বিশ্বাস করো—যারা তোমাদের কল্যাণের জন্য গভীরভাবে অনুভব করেন—এ রকম সহস্র সহস্র লোকের সহানুভূতি ও সদিচ্ছা নিয়েই আমি এ সমুদ্রপারে এসে উপস্থিত হয়েছি।

আলোচ্য সময়ে ইংলন্ডের রাজ-নীতি-সচেতন জনসাধারণ এবং উচ্চতম শাসন-কর্তৃপক্ষ যে ভারতবর্ষের যথার্থ উন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত—জর্জ টম্পসনের এ উক্তি ইতিহাস-সমর্থিত—তা যাচাই করতে গেলে ফিরে যেতে হয় সে সময়কার ইংলন্ডের ইতিহাসের রাজ্যে—যে সময় ইংলন্ডীয় কর্তৃপক্ষ ভারত-শাসনের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

সে সময় ভারতবর্ষেও এক শ্রেণীর উদারনৈতিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন যাঁরা ছিলেন এ দেশের শাসন-সংস্কারে আগ্রহান্বিত। ভারতবর্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির জন্য বহু সংস্কার পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপ দেওয়া এতদিন পর্যন্ত তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কার্কি যুদ্ধের পর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে সে সমস্ত সংস্কার পরিকল্পনাকে তাঁরা কার্যকরী রূপ দিতে চাইলেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ঐ সময়কার ইংলন্ড ও ভারতেতিহাসের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে 'England and India' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

১৮১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লর্ড লিভারপুল। তাঁর শাসন-কালে আসল ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল Lord Castlereagh-এর হাতে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর জায়গায় হাউস অফ কমনস-এ

ক্ষমতার অধিকারী হন মহামনা ক্যানিং। লর্ড ক্যানিং ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্, প্রতিভাবান বাগ্মী এবং অন্তরে অন্তরে খাঁটি উদারনৈতিক। লর্ড লিভারপুলের মন্ত্রীত্বকালে (১৮১২—১৮২৭) হাউস অফ কমনস্‌এর নেতা নির্বাচিত হন লর্ড ক্যানিং। সে সময় থেকেই ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন হতে থাকে। রাষ্ট্রচিন্তায় ইংলণ্ড ক্রমশঃ যে উদারনৈতিক আদর্শের দিকে ঝুঁকেছিল হাউস অফ কমনস্‌-এর নেতৃপদে লর্ড ক্যানিং-এর নির্বাচনই তার এক অভ্রান্ত প্রমাণ। যে সমস্ত সংস্কারকার্য এতদিন বিলম্বিত হচ্ছিল তাদের কার্যকরী রূপ দিতে এখন এগিয়ে এলেন রাষ্ট্রনেতারা। সামান্য অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধানকে ক্রমশঃ সংস্কার করা হল, যে বর্বর আইন শ্রমিক-শ্রেণীকে ইংলণ্ডের মাটিতে ক্রীতদাস করে তাদের নিয়োগ-কর্তাদের পদানত করে রেখেছিল সে আইন রহিত করা হল। এ ছাড়া অতিরিক্ত মাইনের দাবীতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়া আইন-অনুযায়ী আর নিষিদ্ধ কাজ বলে বিবেচিত হল না, সর্বশেষে হাউস অফ কমনস্‌-এ আসন লাভ করবার ব্যাপারে কিংবা উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মে নিয়োগ ব্যাপারে ক্যাথলিকদের ওপর এ পর্যন্ত যে বাধা ছিল তা অপসারিত হল। ক্যাথলিক-মুক্তি ব্যাপারে লর্ড ক্যানিং-এর মহৎ প্রয়াস খুবই উল্লেখযোগ্য।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে Reform Bill গৃহীত হবার পর সংস্কার এবং উদারনৈতিক আইন প্রণয়নের পথে ইংলণ্ড অনেক এগিয়ে গেল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড শিক্ষায় এত অনুন্নত ছিল যে প্রতি ১১ জনের মধ্যে একজনের বেশী ছাত্র স্কুলে যেত না। জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য এখন কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হল। একই বৎসরে শিশুদের ফ্যাক্টরিতে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা হল। যে আইন অলস ভিক্ষা-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিত এবং সৎ উপায়ে শিল্পায়ন-প্রয়াসকে নিরুৎসাহ করত—তার সংস্কার করা হল ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে। প্রতি সংখ্যা সংবাদপত্রের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চার পেনি ট্যাক্সকে কমিয়ে এক পেনিতে পরিণত করা হল। এভাবে সাংবাদিকতার শৃঙ্খল মোচন করা হল ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে। ফৌজদারী আইনকেও অনেক অংশে সংশোধন করা হল।

ইংলণ্ডের মত এ সময়কার ভারত-শাসন নীতিরও লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন সংস্কারকার্যকে ত্বরান্বিত করে মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। যে সমস্ত মহৎ ও উদারমনা রাজনৈতিকের ওপর ইংলণ্ডের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত ছিল তাঁরা ভারত-শাসনে নিযুক্ত উদারনৈতিক শাসকদের মত ভারতের উন্নতির জন্যও উৎসুক ছিলেন। এ সময় ভারতীয় জনসাধারণকে আইনের বলে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল তা যেন ইংলণ্ডের Reform Act-এরই প্রতিরূপ। ইংলণ্ডে ক্যানিং, গ্রে এবং লর্ড জন রাসেলের মত উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ্ যে সংস্কার-প্রবৃত্তির প্রভাবে নিত্য নতুন জনহিতকর আইন প্রণয়ন করছিলেন—সে একই সংস্কার-প্রবৃত্তি ভারতবর্ষে মানরো, এলফিনস্টোন এবং বেণ্টিক প্রমুখ শাসনকর্তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

জনকল্যাণমূলক সংস্কার কার্যে ভারতীয় উদারনৈতিক শাসনকর্তাদের সামনে বাধা ছিল প্রচুর। একদিকে কোর্ট অফ ডিরেক্টারস তাঁদের শাসননীতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করতেন, আর একদিকে কলকাতার স্বার্থান্বেষী ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় তাদের স্বার্থবিরোধী মনে হলে এঁদের সংস্কার-কার্যকে তীব্রভাবে সমালোচনা করতেন। এ অবস্থায় সদাজাগ্রত দৃষ্টি এবং অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাঁরা ভারতের জনকল্যাণমূলক একটা শাসন-নীতি নির্ধারণ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

জর্জ টম্পসন যখন হাজার হাজার লোকের সহানুভূতি ও সদিচ্ছা নিয়ে এ দেশে এসেছেন বলে নব্যবঙ্গকে জানাচ্ছেন তখন এ রাষ্ট্রনৈতিক হাওয়া পরিবর্তনকেই লক্ষ্য করছেন। নব্যবঙ্গকে তিনি বললেন, তাঁর ভারতে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য হল নিজে স্বচক্ষে দেখে, বিচার-বিবেচনা করে ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। এ জ্ঞানলাভের জন্য এদেশীয় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও মতামতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা তিনি অবশ্য কর্তব্য মনে করেন। এর পরিবর্তে কি পুরস্কার কামনা করেন জর্জ টম্পসন? নব্যবঙ্গ যদি তাঁদের দেশবাসীর ন্যায্য দাবী-দাওয়াকে ইংলণ্ডের সে শ্রেণীর লোকের কাছে সার্থকভাবে উপস্থিত করবার জন্যে উপযুক্ত হন—যাঁরা নৈতিক এবং রাজনৈতিক সুবিচারে বিশ্বাসী—তবেই তিনি নব্যবঙ্গের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন মনে করবেন।

নব্যবঙ্গের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটরের' ১৫ই জানুয়ারী, ১৮৪৩-এর
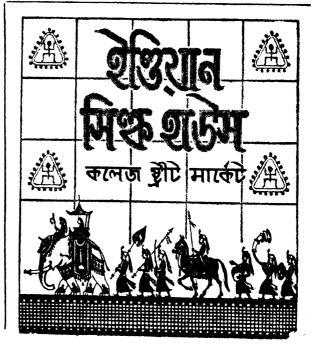
সংবাদ-বিভাগ থেকে জানা যায় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার এ অধিবেশনে ২০০ জনের বেশী দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। য়ুরোপীয়দের মধ্যে ছিলেন মিঃ জর্জ টম্পসন, ডঃ ডাফ এবং মিঃ কের। অধিবেশনের সভাপতি জর্জ টম্পসনের বক্তব্য সম্পর্কে অনুকূল মতামত প্রকাশ করে নিজেদের উন্নতির জন্য এ সভার সঙ্গে সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে সকল সভ্যকে অনুরোধ জানালেন। এ সভায় জর্জ টম্পসনের বক্তৃতা ছাড়াও কিশোরীচাঁদ মিত্র—Phychology of Bones সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। এ বক্তৃতার পর তিনি এ দেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে জর্জ টম্পসনের নিঃস্বার্থ প্রয়াসের জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উত্তরে জর্জ টম্পসন বলেন—যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেছেন সে উদ্দেশ্যকে সার্থকতার পথে এগিয়ে *দেবার জন্যে যদি তাঁরা তাঁর সঙ্গে কার্যকরীভাবে সহযোগিতা করেন তবেই তিনি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন।*

জর্জ টম্পসনের বক্তব্য সম্পর্কে নব্যবঙ্গের মনোভাব

নব্যবঙ্গের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'র ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩-এর সংখ্যায় জর্জ টম্পসনের সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় বক্তৃতা সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এ মন্তব্যে জর্জ টম্পসনের বক্তব্য বিষয়ে নব্যবঙ্গের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জর্জ টম্পসনের বক্তব্যের আন্তরিকতা এবং যাদের প্রতি সে বক্তব্য প্রযুক্ত হয়েছে তাদের প্রতি তাঁর প্রীতির গভীরতা সম্পর্কে সম্পাদক নিঃসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করেন। সম্পাদক আরো লেখেন —সে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা জর্জ টম্পসনের এ ধরনের আরো বক্তৃতা শুনবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

জর্জ টম্পসনের বক্তৃতা শুনবার জন্য আগ্রহের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সম্পাদক লেখেন:—নানা কারণে এ দেশের য়ুরোপীয় এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত দূরান্তবর্তী এবং সীমাবদ্ধ। এর সমস্ত কারণ বর্ণনা সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব নয় বলে কয়েকটিমাত্র কারণ তিনি উল্লেখ করেন। প্রথম কারণ হল ভারতবাসী সম্পর্কে ইংলণ্ডাগত ইংরেজের সংস্কারান্ধতা। এ সংস্কারান্ধতা এত প্রবল যে তাকে হিন্দুদের জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এ সংস্কারান্ধতার ফলেই তারা দেশীয় লোকদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলে, কোন সময় তাদের তাচ্ছিল্য করে, আবার কোন সময় তাদের ওপর মুরুব্বিয়ানা করে। শিক্ষিত, অনুভূতিপ্রবণ এবং বিবেকবান ভারতীয়ের কাছে সেটা অত্যন্ত বিরক্তিজনক। এ ছাড়া দেশের সামরিক ও অসামরিক ইংরেজ কর্মচারীদের যে মর্যাদা, কর্তৃত্ব এবং শক্তি দেওয়া হয়েছে —দেশবাসীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা এবং দূরত্বের অন্যতম কারণ হল দেশবাসীর সঙ্গে আন্তরিক ও সহৃদয় ব্যবহার না করেও এ সমস্ত কর্মচারী তাদের নিকট থেকে জোর করে শ্রদ্ধা আদায় করতে চায়। দেশবাসীও ওপরে ওপরে ওদের সম্মান করে বটে কিন্তু সাধারণতঃ তারা সরকারী কর্মচারীদের বিশ্বাস করে না। কারণ তারা মনে করে *এ সমস্ত ক্ষমতায় আসীন কর্মচারী দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে চায় না, কিংবা সরকারী পদের দায়িত্বের জন্য কোন প্রকার অন্যায়ের প্রতিকার করতে অক্ষম। তাদের সঙ্গে এ দেশবাসীর সহযোগিতার অভাব বা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত না হবার প্রধান কারণ এ সমস্ত বাধা।* অবশ্য যে সমস্ত ইংরেজ তাঁদের জাতীয় অহমিকা এবং সংস্কারান্ধতা দূর করে আমাদের দেশের শিক্ষিত এবং সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করেছেন তাঁরা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ সমস্ত সৎ ইংরেজের মধ্যে সম্পাদক উল্লেখ করেছেন—এফ, জে, শোর, রবার্ট রিকার্ডস্, কর্ণেল টড্ এবং স্যার চার্লস ফোরব্‌স্-এর নাম।

জর্জ টম্পসন সম্পর্কে দেশীয় সমাজের হঠাৎ-জাগ্রত ঔৎসক্যের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে সম্পাদক বলেন: পৃথিবীর অপরভাগে লক্ষ লক্ষ দাসত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তির জন্য অক্লান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ইনি সার্থকভাবে সংগ্রাম করেছেন (এখানে সম্পাদক আমেরিকায় জর্জ টম্পসনের দাসত্ববিরোধী আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন—মন্তব্য লেখকের)। ন্যায় এবং মানবতার স্বপক্ষে সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি শুধু বিপন্ন নয়, মৃত্যুর পর্যন্ত সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভারতবাসীর প্রতি যে অন্যায় অবিচার অনুষ্ঠিত হয় ইংলণ্ডে সে খবর প্রচার করবার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি প্রকৃত ভারতপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে তিনি ভারতবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণের একজন নির্ভীক প্রবক্তা। এ দেশে তিনি এসেছেন তাঁর প্রিয় ভারতবাসীর অবস্থা সম্যক অবগত হবার জন্য এবং যে ভারত-শাসন পদ্ধতির তিনি এতদিন সমালোচনা করেছেন সে পদ্ধতির কর্মধারা স্বচক্ষে দেখবার জন্য। নিজের পত্র পরিজন ব্যক্তিগত কাজকর্ম ফেলে তিনি বন্ধু ভ্রাতা ও সহযোগী প্রজা হিসেবে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন যাতে এ দেশীয় প্রজার অবস্থা দেখে তিনি এখানকার বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা নিয়ে যেতে পারেন।

সম্পাদক জর্জ টম্পসনকে একজন মানবপ্রেমিক মিশনারীর সঙ্গে তুলনা করে লেখেন: 'এ ধরণের মিশনারী ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে আসেননি। যাঁদের কল্যাণ কামনায় তিনি এত শ্রম স্বীকার করেছেন, এত স্বার্থত্যাগ *করেছেন তাঁরা যদি নতুন আশা এবং উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে ওঠেন এর চাইতে আশ্চর্যের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। সৌভাগ্যের বিষয় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় তিনি বক্তৃতা দেবেন শুনে আমাদের অনেক দেশবাসী তাঁকে স্বাগত এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। জর্জ টম্পসনের বক্তব্য সম্পর্কে আমরা কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য করতে চাই না। আমাদের পাঠকের অন্তরকে সহজেই তা স্পর্শ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।*

জর্জ টম্পসনের এ দেশে আসার উদ্দেশ্য এবং এদেশীয় সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁর মতামতের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ইতিমধ্যে শিক্ষিত সমাজের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছে বলে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ আকাঙ্ক্ষার আংশিক পরিতৃপ্তির জন্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বগৃহে মিঃ টম্পসনকে একটি পার্টিতে মিলিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। মিঃ টম্পসন সে আমন্ত্রণ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন এবং সে পার্টিতে বেশ কিছু সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন। *

---

* জর্জ টম্পসনের বক্তব্য ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত জর্জ টম্পসনের ইংরেজী বক্তৃতা থেকে এবং 'বেঙ্গল স্পেকটেটরে'র সম্পাদকীয় মন্তব্য ও অপরাপর সংবাদ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' থেকে গৃহীত হয়েছে। ভাষান্তর লেখকের। —লেখক।

মোহ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আজকেও অজিত মিত্র লোহার পুলটার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে দিলে নিচে ক্যানালের কালো জলের ভেতর। তার রক্তিম অগ্নিবিন্দুটা কুড়ি ফুট তলায় বড়ো বড়ো পাথরের ভেতরে হারিয়ে যাওয়ার আগেই পেছনের অনেকখানি ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে হাসপাতালের ঘণ্টার আওয়াজ আসতে আরম্ভ করল।

ঠং ঠং—ঠং ঠং—শেষটা ঠংটা জোরে বাজল। রাত এগারোটা। এবং, প্রত্যেক দিনের মতো আজও অজিত মিত্রের মনে হল, ওটা যেন কাদের ছুটির ঘণ্টা। মানুষের সজাগ চোখ আর বুদ্ধির শাসনে যারা বন্দী ছিল—এই-বারে বাইরে বেরিয়ে এল তারা। অজিত মিত্র যদি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে পশ্চিমের আকাশে কালপুরুষ অস্তে নেমে যাওয়া পর্যন্ত—তা হলে দু চোখ ভরে এক আশ্চর্য নাটকের অভিনয়ও বুঝি সে দেখতে পায়।

কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়ানো চলে না। কনকন করে শীতের হাওয়া আসে, ওভারকোটের কলার তুলে দিয়েও দুটো কানের ভেতর একটা তীব্র যন্ত্রণাকে ঠেকানো যায় না; ক্লান্তিতে মেরুদণ্ডটা দুভাঁজ হয়ে আসতে চায়, চোখের পাতা-দুটো ভারী হয়ে নেমে আসে। তখন সিগারেটে একটা শেষ টান দেয় অজিত মিত্র মধ্যমাকে ধনুকের ছিলার মতো করে সিগারেটটা ছুঁড়ে দেয়—একটা ব্যর্থ আর জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার আগ্নেয়রেখার মতো অর্ধচন্দ্রাকারে আকাশের দিকে উঠে নিচের পাঙ্কিল কালো জলের ভেতরে হারিয়ে যায় সেটা।

তখন নির্জন পথে, ভারী জুতোটার সংঘর্ষে পথের খোয়ায় কর্কশ আওয়াজ তুলে, পুল থেকে নেমে হাঁটতে থাকে অজিত মিত্র, মধ্যমাকে ধনুকের ছিলার থেকে যেন একটা কুয়াশার আবরণ সরে যায়, ব্রাহ্ম সমাজের পুরোনো বাড়ীটার সামনে প্রতিদিনের মতো কুকুর ডাকতে থাকে —কখনো বা কার যেন ক্ল্যারিয়োনেটের আওয়াজ কানে আসে। অজিত মিত্রের গলাটা জ্বালা করে। কিছুদিন থেকেই—এই সময়টাতে এই জ্বালাটা সে টের পায়, মনে হয় অতি-রিক্ত সিগারেট খাওয়ার জন্যেই এমনটা হয়েছে।

অজিত মিত্র রোম্যাণ্টিক নয়। অন্তত এই শহরে আসবার আগে কোনো দিন ছিল না। এল-আই-সি'র চাকরি নিয়ে এখানে সে এসেছে মাত্র মাস ছয়েক হল। আর এই লোহার পুলটাকে আবিষ্কার করেছে কেবল মাস-দেড়েক আগে।

চল্লিশ বছরে পা দিয়েও সে এখনো ব্যাচেলর। এতদিন বিয়ে না করার পেছনে কোনো কঠিন প্রতিজ্ঞা নেই—প্রথম যৌবনের কোনো মনোভঙ্গ নয়। সুযোগ হয়েছে তো সময় হয়নি, আবার সময় যখন পাওয়া গেছে তখন যোগাযোগ আর ঘটে ওঠেনি। এখন ব্যাচেলারের জীবনটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, চল্লিশ বছর পেরিয়ে সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটাতে আর প্রবৃত্তি নেই, হয়তো সাহসও হয় না।

বেশ ছিল অজিত মিত্র। মন দিয়ে চাকরি করা, ভালো ব্রীজ খেলা, বিলিতি উপন্যাস পড়া, এই বয়েসেও স্টিক নিয়ে কখনো কখনো হকির মাঠে নেমে পড়া আর মেসের দায়িত্বহীন দিন-গুলোকে একটার পর একটা নিরুদ্বেগে পার করে দেওয়া। এখানেও তার ঠিক এই ভাবেই কাটছিল। স্টেশনের কাছে হেড্‌ক্লার্কের বাড়ীতে রাত সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটা পর্যন্ত তাস খেলা, তারপর ওভারকোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে দিয়ে, নির্জন পথের খোয়ায় জুতোর আওয়াজ শুনতে শুনতে নিঃসঙ্গ লাইটপোস্টগুলির তলায় নিজের নানা আকারের ছায়ার শোভাযাত্রা তৈরী করে, এই লোহার পুলটা পার হয়ে মেসে ফিরে যাওয়া।

এর মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করে বসল : এত রাতে ক্যানালের পুল পেরিয়ে একা যান? ভয় করে না?

—কিসের ভয়?

—জায়গাটার বদনাম আছে—জানেন না?

—ভূতের কথা বলছেন?

—ভূত কিনা জানি না। বছর ত্রিশেক আগে বিপ্লবীরা ওখানে একজন

আই-বি অফিসারকে খুন করে ডেড্-বডিটা নীচের ক্যানালের জলে ফেলে দেয়। তারপর থেকে গোটা তিনেক সুইসাইড্ হয়েছে ওখানে, দুটি পুরুষ —একটি মেয়ে। জলে পড়বার আগে আছাড় খেয়েছে বড়ো বড়ো পাথরে, মাথার খুলি চুরমার হয়েছে, হাত-পা ভেঙেছে। সেই থেকে—

আর একজন সমস্ত জিনিসটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললে, আরে রাখো ও-সব। একটা বনেদী জমিদার-বাড়ীর ত্রিশ বছরের স্ট্যাটিস্টিক্স নাও—ও রকম অনেক সুইসাইড্ আর মার্ডারের খবর পাবে। আসলে জায়গাটা একটু আনক্যানি বলেই এ-সব গল্প রটে। আমি তো কতবার রাত দেড়টা-দুটোয় ওই পুল পেরিয়ে আসা-যাওয়া করেছি, কোনোদিন তো কোনো ভূত-পেত্নী এসে ডেকে বলেনি—এসো, সুইসাইড্ করো এখানে।

হেডক্লার্ক আশুবাবু বললেন, মানে জায়গাটা এমন নিরিবিলি আর ঝাঁপিয়ে পড়তে এত সুবিধে যে কেউ আর কষ্ট করে দড়ির ফাঁস কড়িকাঠে লাগাতে যায় না। কিংবা রেল-লাইন পর্যন্ত আসতে চায় না। সেই জাপানের 'সুইসাইড্ রকের' ব্যাপার আর কি!

আলোচনা হল এই পর্যন্ত। আর সেই রাত্রেই, তাস খেলে ফেরবার সময়, অজিত মিত্র প্রথম সচেতনভাবে এই লোহার পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম অনুভব করল, এই জায়গাটা একটু আলাদা—চেনা পৃথিবী আর অচেনা মৃত্যুর একটা সীমান্ত-বিন্দুর মতো নিঃসংগ রহস্য দিয়ে ঘেরা।

এতদিন পরে অজিত মিত্র দেখতে পেলো, এই পুলটার ধারেকাছে অনেক দূর পর্যন্ত কোনো বসতি নেই; [illegible]ন শহরটাকে দুটো রাজ্যের মতো দু'ভাগে আলাদা করে রেখেছে, মাঝখানে অনেকটা জুড়ে খানিক নো-ম্যান্স্ ল্যান্ড। শীতের কুয়াশা-মাখানো দ্বাদশীর জ্যোৎস্নার পেছনে হাসপাতালের হলদে বাড়ীটা প্রায় মুছে গেছে—শুধু তার দোতলার কয়েকটা উজ্জ্বল জানলা ভৌতিক চোখের মতো জ্বলছে; অনেকখানি সামনে তিনকোনা চুড়োওয়ালা ব্রাহ্ম সমাজের পুরোনো বাড়ীটাকে একটা বিরাট কবরের মতো দেখা যায়। বাঁ-দিকে একটু বাঁক নিয়েই খালটা খানিক এলোমেলো জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, ডাইনে শহরের আবর্জনা-ফেলা একটা নোংরা মাঠ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো, তার ওপরে শীতের কুয়াশা ঘনিয়েছে শ্মশানের ধোঁয়ার মতো। আর সেই ধোঁয়ার ভেতর একটা করোগেটেড্ টিনের চাল চিকমিক করছে—ওটা লাশ-কাটা ঘর। উটের পিঠের মতো রাস্তা থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে ওঠা এই পুলটা যেন একটা অবজার্ভেশন টাওয়ার— এইখানে দাঁড়িয়ে—জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বুঝি চোখের দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

পুলের দু'ধারে কাঠমল্লিকা আর রাধাচূড়ার ডালে উত্তরের বাতাস সাড়া দিয়ে উঠল, চারদিকের স্তব্ধতা ভেঙে কারা যেন খসখস শব্দ করে এগিয়ে এল অজিত মিত্রের দিকে। একটা অসহ্য উগ্র প্রতীক্ষায় স্নায়ুগুলো চকিত হল অজিত মিত্রের—তার দু'চোখে সন্ধানী আলো জ্বলে উঠল, সারা শরীরে শীতার্ত শিহরণ জাগল, মস্তিষ্কের কোষে কোষে একটা বিদ্যুতের চক্র ঘুরে গেল। লোহার রেলিংটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আবার বাতাস এল, আবার কুয়াশা-জড়ানো জ্যোৎস্নার পুলের দু'ধারে কাঠমল্লিকা আর রাধাচূড়োর ছায়ায় ঢেউ উঠল, আবার খস্খস্ শব্দে ভরে উঠল চারদিক। না—কিছুই ঘটল না। অজিত মিত্র বুঝল, শীতের পাতা ঝরছে—এ তারই দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। নীচে আকারহীন কতগুলো বড়ো বড়ো পাথরের স্তূপের ভেতর দিয়ে পঙ্কিল কালো জলের স্রোত চলেছে, একটা পচা জান্তব দুর্গন্ধ উঠছে সেখান থেকে। মরা বেড়াল-কুকুর কিছু আছে হয়তো। অথবা—অথবা পাথরের তলায় আত্ম-হত্যা করা কোনো একটা মৃতদেহ, গুঁড়ো হয়ে যাওয়া মাথাটা থেকে চাপ-চাপ কালো রক্ত পাথরের ওপর ছড়িয়ে—

ঠং ঠং — ঠং ঠং —

হাসপাতালের ঘড়িতে এগারোটা বাজল। আর একবার শিউরে উঠল অজিত মিত্র, মনে হল ও যেন কোনো নতুন নাটকের যবনিকা ওঠবার সংকেত। আর একটু—আর একটু যদি অপেক্ষা করা যায়, তা হলে এখানে কী ঘটবে আর কী যে ঘটবে না, তা অজিত মিত্র কল্পনাও করতে পারে না।

কিন্তু উত্তরের হাওয়ায় শীত করতে লাগল, কোটের কলার তুলে দিয়েও কানের কনকনানি বন্ধ করা গেল না। তখন যেন অজিত মিত্রের মনে হল, এখুনি যে অভিনয়টা এখানে আরম্ভ হতে যাচ্ছে, তার প্রবেশপত্র সে পায়নি, আর তার অনধিকার চর্চা চলে না। একটা অতৃপ্ত নৈরাশ্য নিয়ে সে নেমে এল পুল থেকে, অন্যমনস্ক জুতোর সংগে উঁচু হয়ে ওঠা নুড়ির সংঘর্ষে পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর্তনাদ করে উঠল। আর ব্রাহ্ম সমাজের বাড়ীটার সামনে আসতেই দুটো কুকুরের ডাক তাকে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল।

একদিন—দু'দিন—তিন দিন নয়। আজ দেড় মাস ধরে অজিত মিত্র এক আশ্চর্য রঙ্গমঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে আর অনধিকারীর লজ্জা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। মাঝখানে এই শীতের ভেতরেও প্রবল ধারাবর্ষণ নেমেছিল একদিন, সারা রাতে তার বিরাম ঘটেনি, সন্ধ্যার পর মেস থেকে বেরুতে পারেনি সে। আর রাতভর একটা অদ্ভুত মানসিক চঞ্চলতার মধ্যে কাটিয়েছে—মনে হয়েছে কিসের একটা ব্যর্থ আহ্বান বৃষ্টি আর বাতাসে তার দরজায় এসে ঘা দিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সকালের আলোয় সে লজ্জা পায়। দিনের বেলায় ওই পুলটার কোনো কুহক থাকে না—খালের পচা জল, শহরের আবর্জনার স্তূপ হাসপাতালের ভাঙা এনামেলের প্যান, টুকরো টুকরো প্লাস্টার,—ব্যাণ্ডেজের তুলো কাপড়ের দিকে তাকিয়ে গা ঘিন-ঘিন করে। দু-চারটি হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়ে খালের জল থেকে চুনো মাছ ধরবার চেষ্টা করছে সে দৃশ্যও চোখে পড়ে—টিনের চাল দেওয়া লাশকাটা ঘরটাও তখন ওদের সংগে একাকার হয়ে যায়। তখন মনে হয়, মিউনিসিপ্যালিটির ভেতরে এমন একটা নোংরা জায়গা থাকা অত্যন্ত অন্যায়, আর এই খালটাকেও বুজিয়ে দেওয়া উচিত—এরই জন্যে শহরে এত মশার উপদ্রব।

কিন্তু রাত্রে—

জ্যোৎস্নায়, মেঘে ঢাকা ঘন অন্ধকারে অথবা আকাশজোড়া তারার আলোয়—সব অন্য রকম হয়ে যায়।

অসংখ্য, অলক্ষ্য চিতা থেকে ধোঁয়ার রাশ শীতের কুয়াশা হয়ে এখানে জমাট বাঁধে. উত্তরের হাওয়ায় পাতা-ঝরানো রাধাচূড়ো আর কাঠমল্লিকার গাছ থেকে কারা যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে। অজিত মিত্র অপেক্ষা করে, সিগারেট ধরায়। পুলের নীচে আকারহীন কালো কালো পাথরগুলো আর সরীসৃপ জলের রেখা দেখা-না-দেখা লাশকাটা ঘরটার সঙ্গে একটা সুরে বাঁধা পড়ে যায়. মনে হয়, এইখানে যে খুন হয়েছে. যারা আত্মহত্যা করেছে—তারা সবাই ওই লাশকাটা ঘরের টেবিলে গিয়ে শুয়েছে—যেমনভাবে নাটকের চরিত্রকে এক দৃশ্য থেকে আর এক দৃশ্যের মধ্যে এগিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু তারপর? তৃতীয় দৃশ্য? চতুর্থ? পঞ্চম? উদগ্র একটা কল্পনা বিস্তার করে অজিত মিত্র তাদের দেখতে চেষ্টা করে—অনুমানের প্রয়াস পায়। কিন্তু হাসপাতালে রাত এগারোটার ঘণ্টা বাজলেই, তৃতীয় দৃশ্যের পট ওঠবার সময় হলেই—আর সে দাঁড়াতে পারে না। উত্তরের তীব্র বাতাসটাই যেন নিষেধের মতো তাকে ঠেলে নামিয়ে দেয় পুলের ওপর থেকে, খালের জলে ফেলে দেওয়া সিগারেটটার শেষ জ্বালা জ্বলতে থাকে তার গলায়—জ্বলে তারই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মতো। তখন মাথা নামিয়ে বিতাড়িতের মতো তাকে মেসের দিকে ফিরে যেতে হয়।

না, অজিত মিত্র কোনো দিন রোম্যান্টিক ছিল না। সে চিরকাল সাদা চোখ দিয়ে জীবনটাকে দেখেছে, নিজেকে জেনেছে কাজের মানুষ বলে। কোনোদিন কবিতা লেখেনি, কলেজের পরীক্ষা পাসের জন্যে যে ক'টি কবিতা পড়তে হয়েছে তার বাইরে সাধ্যমতো সে কখনো যায়নি। তা হলে এমন কেন ঘটল?

দিনের বেলায় সমস্ত ব্যাপারটাই তার হাস্যকর মনে হয়। এমন কি, প্রত্যেক রাতে পুলের ওপর দাঁড়িয়ে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করবার অভ্যাসটা পর্যন্ত অবাস্তব বোধ হতে থাকে। তখন যুক্তি বলে, ও আর কিছু নয়—অনেকখানি পথ হাঁটতে হাঁটতে ওখানে একটু জিরিয়ে নেয় সে—যেদিন খুশি পুলটার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে নিজের পথে এগিয়ে যেতে পারে। এই মানসিক প্রশান্তিটা চলে রাত সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা পর্যন্ত—তাসের শেষ বাজী মিটে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর দুটো পান-বিড়ির দোকান ছাড়িয়ে, চৌমাথার বটগাছ আর লেটার বক্স পেছনে ফেলে, সদর হাসপাতালের সীমাটা পার হলেই—

দুধারে রাধাচূড়ো আর কাঠমল্লিকা ছায়া দুলিয়ে দুলিয়ে ডাক পাঠায়: শুরু হয় শহরের নো ম্যান্স্ ল্যান্ড, নুড়ি-ওঠা পথটা ক্রমশ উটের পিঠের মতো উঁচু হতে থাকে এবং তারপর—

কোনো স্নায়বিক ব্যাধি? কোনো মানসিক বিকার? কিন্তু তাদের তিন-পুরুষে কারো ও ধরনের [illegible] ছিল বলে অজিত মিত্রের জানা নেই। তাদের স্পোর্টসম্যানের পরিবার। বাবা নামকরা হকি খেলোয়াড় ছিলেন, কাকা প্রথম জীবনে দুর্দান্ত ফুটবলার ছিলেন—এখন টেনিস খেলেন, ষাটের কাছাকাছি এসেও তাঁর প্রচণ্ড [illegible] কামানের গোলার মতো ছোটে। খেলোয়াড় হিসেবে অজিত মিত্রেরও যে কিছু নাম ছিল না তা নয়। তা হলে?

দিনের বেলায় কিছুই বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাত তাকে ক্রমশ [illegible]

ভেতরে জড়িয়ে আনাতে থাকে, তার আত্মবিশ্বাস, তার বুদ্ধি, তার স্পোর্টসম্যান সত্তাকে একটা ডাকিনী-মন্ত্রে যেন ঘুম পাড়িয়ে ফেলে। হাসপাতাল পার হওয়ার সময় পর্যন্ত হয়তো সে ভেবেছে, আজ আর কোনো মতেই দাঁড়াব.না—আজ মাথা সোজা রেখে, বুদ্ধিকে জাগিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে পুলটা পার হয়ে যাব। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই কখন তার পা ঠিক লোহার পুলে উঠতেই থেমে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে পাতা ঝরার শব্দে, কুড়ি ফুট নীচ থেকে ক্যানালের কালো পঙ্কিল জলের মৃদু কলধ্বনিতে, চিতার ধোঁয়ার মতো কুয়াশায় রাত এগারোটার ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত একটা দুর্বোধ উত্তেজনায়—দূরের দেখা-না-দেখা লাশকাটা ঘরটার দিকে চোখ রেখে সে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়, ওই এগারোটার ঘণ্টা যদি কোনো দিন না শোনা যায়, যদি হাসপাতালের দারোয়ান বাজাতে ভুলে যায় ওটা—তা হলে কী হতে পারে? আসলে ওই ঘণ্টাটা সেই আশ্চর্য নাটকের সূচনা নয়—ও যেন তাকে চেনা-জানা মানুষের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার একটা অবাঞ্ছিত ঘোষণা। যদি ওটা কোন দিন না বাজে, তা হলে একটা মিছরির দানা যেমন করে ধীরে ধীরে জলের ভেতরে গলে মিশে যায়, তেমনি করে অজিত মিত্রও এই শীতের কুয়াশার ভেতরে—এই স্তব্ধ রাত্রিতে কণায় কণায় সেই রহস্য-জগতের মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারে; এই সাঁকো থেকে শুরু করে—ওই লাশকাটা ঘর ছাড়িয়ে যে নাটক এগিয়ে চলেছে—কখনো গিয়ে বসতে পারে তার দর্শকের ভূমিকায়।

আজ হঠাৎ মনে হল, সেই অজানা জগতের দরজাটা কিছুতেই খুলবে না—যদি নিজের হাতে তা সে খুলতে না পারে। কুয়াশার ভেতরে এক টুকরো চাঁদ লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে—নীচে খালের জলেও তার রক্তিম ছায়া পড়ল। তখন পাতায় খসখস আওয়াজ তুলে কে যেন স্পষ্ট ভাষায় তাকে ফিস-ফিস করে বলে গেল, পারো—এই মুহূর্তেই পারো তুমি।

কী পারি? কী পারি?

দু'বার—তিন বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করল অজিত মিত্র, কিন্তু তার দরকার ছিল না। উত্তরটা অনেক আগেই তার মনের ভেতরে পৌঁছে গিয়েছিল। তার আগে আরো তিনজন তা পেরেছে। দুটি পুরুষ, একটি মেয়ে। রেলিং বেয়ে আর একটু ওপরে ওঠো, মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে দাও সামনে পা দুটো তুলে নিয়ে এইবারে শরীরটাকে আলগোছে সাদা কুয়াশার ওপর ছড়িয়ে দাও। তারপর—

মুহূর্তে সমস্ত বাঁধন থেকে মুক্তি পেলো অজিত মিত্র—সকালের আলোয় যেমন করে বোঁটা থেকে শিউলি উঠে আসে। একটু জোর লাগল না, এক বিন্দু ব্যথা বাজল না, কোথাও তার এতটুকু দায় আছে বলে মনে হল না। অজিত মিত্র তৈরী হল। তার মাথার ভেতরটা বাইরের কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেল, তার সমস্ত চেতনাকে একাকার করে কাঠমল্লিকা আর রাধাচূড়োর ঝরা-পাতা কথা কইতে লাগল, তার সমস্ত বোধগুলো নীচের আরক্তিম-কালো সরীসৃপ জলস্রোতের সঙ্গে বইতে লাগল একধারায়। আর দেরী করা নয়। আর দেরী করবার দরকার নেই।

এই লঘু কুয়াশায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হলে যা কিছু ভার সব কমিয়ে দিতে হবে। অজিত মিত্র গায়ের ওভার-কোট খুলে রেলিংয়ের ওপর রাখল, তারপর যখন পায়ের জুতোটাও খুলতে যাচ্ছে, তখন—

—কী করছেন বাবু এখানে?

যেন পিঠের ওপর সাপের ছোবল পড়েছে, এমনি একটা চমক লেগে অজিত মিত্র ফিরে তাকালো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল তার।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল এক-জন পুলিশ কনস্টেবল আর দুজন কুলি। কুলিরা একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের স্ট্রেচারের সঙ্গে লণ্ঠন আর তার আলোতে দেখা যাচ্ছে একটা রক্তমাখা পিণ্ডাকার শব। উত্তরের হাওয়ায় তার আবরণটা সরে গেছে খানিকটা মাংসের স্তূপের ভেতর থেকে দুটো ঠিকরে-বেরুনো চোখের দৃষ্টি তাকিয়ে আছে যেন অজিত মিত্রের দিকেই।

পাহারাওলা আবার সন্দিগ্ধ গলায় বললে, এখানে এত রাতে কী করছেন বাবু?

—এমনি —দাঁড়িয়ে আছি.

—দাঁড়াবেন না। এ সব জায়গা ভালো নয়। চারদিকে জনমানুষ নেই—রাহাজানি-গুণ্ডামি হতে পারে। বাড়ী চলে যান।

—যাচ্ছি। কিন্তু ওটা কী স্ট্রেচারে?

—ও একটা বুড়ী। সন্ধ্যেবেলায় ট্রেনে কাটা পড়েছে। মর্গে নিয়ে যাচ্ছি।

স্ট্রেচারটা এগিয়ে চলল। আর দোল-খাওয়া লণ্ঠনের আলোয় সেই বিকৃত মাংসপিণ্ড থেকে দুটো ঠিকরে-বেরুনো চোখ যেন একভাবে তাকিয়ে রইল অজিত মিত্রের দিকে। সেই চোখের দৃষ্টি দুটো ছুরির ফলার মতো বিঁধতে লাগল তার বুকে।

অ্যানাস্থেসিয়ার প্রভাব কেটে গেলে যেমন অপারেশনের যন্ত্রণা সমস্ত শরীরকে নাড়া দিয়ে তোলে, তেমনি করে জেগে উঠল অজিত মিত্র। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবার ঝনঝন করে উঠল তার—মৃত্যুর মোহকে ছাপিয়ে জাগল ভয়। সেই দুরন্ত ভয়ের তাড়নায় অজিত মিত্র ওভারকোটটাকে কাঁধের ওপর ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল—জামাটাকে গায়ে পরবার মতো সাহসও সে আর খুঁজে পেল না।

আজ থেকে এই লোহার পুলটাকে ভয় পাবে অজিত মিত্র। তাসের শেষ বাজী মিটে গেলে, আরো আধ মাইল ঘুরে বাজারের পথ দিয়ে সে মেসে ফিরে আসবে—কিন্তু রাত এগারোটার ঘণ্টা শোনবার জন্যে এইখানে আর কোনো দিন সে আসবে না। ওই পিণ্ডাকার রক্তমাখা শরীর থেকে চোখ দুটো বেরিয়ে এসে প্রহরীর মতো পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে—স্পোর্টসম্যান অজিত মিত্রেরও এত বড়ো সাহস নেই যে সেই স্থির ঠিকরে-আসা দুটো অস্বাভাবিক চোখের দিকে দ্বিতীয়বার সে তাকাতে পারে।

অজিত মিত্র ছুটল। প্রাণপণে পালিয়ে চলল।

আর উত্তরের বাতাস উঠল রাধা-চূড়ো-কাঠমল্লিকার ডালে, চিতার ধোঁয়ার মতো কুয়াশার আবরণটা কাঁপতে লাগল। বাতাসের শব্দে, পাতার আওয়াজে অজিত মিত্রের মনে হল, একটা চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অসহায় ক্ষোভে কান্না যেন চারদিকে হাহাকার করে উঠেছে।

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ তিন ॥
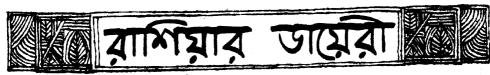
সকাল সাড়ে সাতটার আগে তাসকন্দে প্রভাত হতে চায় না। কেউ বেরোয় না পথে। কিন্তু স্ত্রীলোকরা অন্ধকার থাকতে উঠে পথঘাট পরিস্কার করার কাজে লেগে যায়। পায়ে মোজা জুতো, গায়ে মোটা গরম পোষাক, মাথায় ফেট্টি বাঁধা, এবং হাতে একটা জঞ্জাল কুড়িয়ে নেবার হাতল,—এটির জন্য হেঁট হয়ে ঝাড়ু দিতে হয় না। অল্পবয়সী কেউ বিশেষ নয়, প্রায় সবাই প্রবীণা, কিংবা বৃদ্ধা। রোগা পাৎলা কেউই নয়। ঝাড়ুদার মাত্রই মেয়ে, এটি দৃষ্টিকটু। ভারতের একাধিক পাহাড়ি শহরেও এ রেওয়াজ আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য শহর মারী-তেও দেখেছি এই ব্যবস্থা। কলকাতাতেও প্রায় আধাআধি এই।

পূর্বমুখী জানালার বাইরে দূরে নাভয় অপেরা হাউস দেখতে দেখতে সুসজ্জিত হয়ে উঠছে। প্রত্যেক দেশের জাতীয় পতাকা নাভয়ের ললাটে বসানো হচ্ছে। ভারতেরটি প্রায় মাঝামাঝি শোভা পাচ্ছে। কারও পতাকাই অতিশয় প্রাধান্য পেয়ে দৃষ্টিকটু হয়নি। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রবল আত্মপ্রাধান্য প্রচারের বিশেষ কোনও প্রকার চেষ্টা পাননি। সমাগত বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিগণের আতিথেয়তা ও আপ্যায়নের প্রতিই প্রধানত তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এতগুলি বিভিন্ন জাতিকে নিজের ঘরে পেয়ে কোনও প্রকার রাজনীতিক প্রচারের সুযোগ তাঁরা নেননি। কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্ট সকল প্রতিনিধিগণের প্রতি সমানভাবে তাঁরা বিনীত, বন্ধুবৎসল ও বশম্বদ ছিলেন।

নাভয় অপেরা হাউসকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র তাসকন্দ নগরীকে যেভাবে বিপুল সমারোহে আলোকমালায় ও বিচিত্র সজ্জায় সুসজ্জিত করা হয়েছিল, সেটি ঐতিহাসিক। কেবলমাত্র লেখকদের নিয়ে এই প্রকার একটা দেশব্যাপী বিচিত্র সমারোহ ঘটতে পারে, কোনও দেশের আধুনিক কালের ইতিহাসে এটি নেই। কানাকানিতে খবরটি শুনলুম, সোভিয়েট ইউনিয়নের 'রাইটার্স ইউনিয়ন বোর্ড' সমস্ত খরচপত্র যুগিয়েছেন, এবং তার পরিমাণ হল এক কোটি রুবলেরও বেশি। এই বোর্ডের অধীনে পনেরোটি "স্বাধীন" সোভিয়েট রিপাবলিকের পনেরোটি 'রাইটার্স ইউনিয়ন' আছেন।

তবে কি লেখক সমাজই এত টাকার সংস্থান করল? একটু থতিয়ে গেলুম বৈকি। 'সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন' এত টাকা কোথা থেকে পান সেই খোঁজ এখনও অবশ্য পাইনি। কিন্তু আমার অবস্থাটা ঈষৎ করুণ। সমগ্র তাসকন্দ, এই হোটেল, ওই নাভয় অপেরা হাউসের বিপুল আয়োজন, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সমাবেশের ফলে অগণিত নবলব্ধ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভাবালাপ—এর মধ্যে কোনও কিছু তলিয়ে দেখার, ভাববার, বিশ্লেষণ করবার, পৃথকভাবে প্রত্যেক বস্তুকে ওজন করে নেবার,—কোনও অবকাশ আমার নেই। দেখতে দেখতে হাজার হাজার কৌতূহলী নরনারীর জনতা দাঁড়িয়ে গেছে হোটেলের বাইরে। ভিতরে ঢোকবার এবং বাইরে বেরোবার পথ প্রায় অবরুদ্ধ হতে বসেছে। আবালবৃদ্ধবনিতার সেই নিরেট, অব্যাহত, অশ্রান্ত এবং উৎসুক ভিড়ের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করার কালে আমাদের হেপাজতের জন্য লানা ও নিকাকে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এই জনতার দিকে তাকিয়ে একটি বস্তু লক্ষ্য করবার ছিল। ওদের মুখে চোখে যে স্বভাব-সরলতা এবং একান্ত অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছে সেটি বড় দুর্লভ। ওরা যেন দুই পুরুষে ভালবাসার নূতন পাত্র খুঁজে পায়নি,—এবং আমাদের প্রত্যেকের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য ওদের অধীর ব্যাকুলতা দেখলে বার বার থমকে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে! ভাষা এবং অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য অবরোধ চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ওরা যেন সকলের বুকের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। এমন আগ্রহ না দেখলে বিশ্বাস করতুম না।

একটি উদাহরণ দিই। মোটর চড়ায় অরুচি এসে গেছে ব'লে একদিন অপরাহ্নে লানাকে সঙ্গে নিয়ে পথে-ঘাটে বেরিয়ে পড়েছিলুম। পায়ে না হাঁটলে ভ্রমণ এবং দর্শন কোনটাই সিদ্ধ নয়। হাঁটাপথের কল্যাণে অপরিচিত সেই মধ্য এশিয়ার উদ্যান-নগরীর এখানে-ওখানে ঘণ্টা দুই ঘুরে আবার ফিরে আসছিলুম। জানি কৌতূহলী এবং উৎসুক একটি জনতা আমাদের প্রথম থেকেই অনুসরণ করছে। কথায় কথায় আমরা একটি মস্ত ডিপার্টমেণ্টাল দোকানে ঢুকে চারিদিকের অজস্র সামগ্রীসম্ভার এবং খরিদ্দারদের অকৃপণ ক্রয়-শক্তি লক্ষ্য ক'রে বেরিয়ে আসছিলুম। কিন্তু ফুটপাথ ততক্ষণে অবরুদ্ধ। আমার জন্য নয়, ভারতের একটি মানুষের জন্য! সেই ভারত, চিরকাল যে-দেশ রূপকথার রাজকন্যা এবং পরীরাজ্যের কাহিনী শুনিয়েছে! সেই ভারত, যার প্রধানমন্ত্রী নেহরু; যার কবি হলেন "টাগোর।" "ইন্দে, ইন্দে" কলরব করছে সবাই,—ইণ্ডিয়া! সেই "ইন্দে," যেখানে এই তাসকন্দেরই এক প্রিয় সেনানায়ক 'বাবুর' গিয়ে রাজ্যপাট বসিয়েছিল। সেই 'বাবুর' ছিল উজবেক,—সে গিয়ে দুই দেশের মধ্যে প্রথম বন্ধুত্ব স্থাপন করে, এবং ভারতের মোগল রাজ্যপাটের সঙ্গে মধ্য-এশিয়া সেইকালে নাকি অনেকটা একাকার হয়ে যায়। "বাবুর" ওদের কাছে বড় শ্রদ্ধেয়, এবং সেই সেকালের দুর্বোধ্য "উজবেক" ভাষাভাষীদেরকেই আজও বাঙ্গলায় "উজবুক" বলা হয় কিনা আমার জানা নেই। যাই হোক, ভিড় থেকে বেরোবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম এমন সময় শশব্যস্তে ওই জনতার মধ্যেই এসে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর দেহ কিছু বিশালতর,

পোষাক-পরিচ্ছদ গরীব-গেরস্থর। মহিলার পরণে মোজা-জুতো, ধূসর গাউন, মাথায় ওড়না বাঁধা। জাতিতে মধ্য-এশিয়। তিনি সেই জনতার জটিলতা কাটিয়ে এসে সহসা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং একেবারে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে অবলীলাক্রমে আমার মাথায় ও পোড়ারমুখে চুম্বনাদি আরম্ভ করে দিলেন, তাতে আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হল, এবং বহুকাল পরে যেন উপলব্ধি করলুম,—জননীর কোলে আমি সেই কবেকার তিন বছরের শিশু হয়ে আজও থেকে গেছি। সেদিন ওই বৃদ্ধার স্নেহ-স্পর্শের মধ্যে সম্রাট বাবরের জন্মভূমির নিবিড় আস্বাদ পেয়েছিলুম, এবং এখনও ভাবলে হাসি পায়, শ্রীমতী লানা এবং ওই বৃদ্ধা—দুজনের চোখই বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল! সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে জনসাধারণের মধ্যে স্নেহ-প্রকাশের জন্য এই আকুলতা কেন, এটি আমার সন্দিগ্ধ মন অনেকবার তোলা-পাড়া করেছে, কিন্তু ততবারই আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি। আন্তরিকতার যোগ্য মূল্য না দিতে জানলে নিজকে বড়ই ছোট মনে হয়।

দিনেরবেলায় নানা দৃশ্য দর্শন এবং সন্ধ্যার দিকে রঙ্গালয়াদি, এই ত' আমাদের কাজ। এ শহরের সর্ববৃহৎ সিনেমা হল্ দেখলুম,—তার সঙ্গে ছাত্র প্রতিষ্ঠান এবং তাদের বিরাট ঐশ্বর্য-প্রাসাদ দেখে আমরা অভিভূত। মরু-ভূমির বালু পাথরের ওপর আঁচড় কেটে ময়দানব এবং বিশ্বকর্মারা যেন নতুন পৃথিবী সৃষ্টির কাজে বসেছে। আমরা গরীবের দেশ থেকে গেছি, এসব দেখে হতবুদ্ধি হই বৈকি। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের কানে কানে সেদিন আমার একটি কথা বলতে ইচ্ছা হয়েছিল যে, সমস্ত ভারত জুড়ে আমরাও লক্ষ লক্ষ বৃহৎ প্রাসাদের মালিক। শত শত বছর ধরে অযুত কোটি টাকা আমরাও ত' বৃহত্তর মানবকল্যাণের জন্য অকাতরে ঢেলে দিয়ে এসেছি! কাশী, কাঞ্চি, মাদুরা, মহীশূর, ত্রিবন্দরম, কনৌজ, মগধ, পাটলীপুত্র, নালন্দা, দিল্লী, প্রয়াগ, লক্ষণাবতী,—কোথায় নেই ভারতের কালজয়ী কীর্তি? একালের দিল্লী, কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, জয়পুর, উদয়পুর, আমেদাবাদ,—এসব অঞ্চলে ত' লক্ষ লক্ষ মনোরম চিত্ত-বিভ্রান্তকর প্রাসাদ দেখে বেড়িয়েছি! আন্তর্জাতিক টুরিষ্টের দল প্রতি বছর আমাদের দেশে এসে দশ কোটি টাকা খরচ করে কী দেখে যায়? সে কি দারিদ্র্য? কই, সেকথা ত' কেউ বলে না। মাসের পর মাস তারা ভারতের আশ্চর্য সম্পদ ও ঐশ্বর্য দেখে বেড়ায়। তারা দেখে যায় আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী বিপুল জড়বস্তুর প্রাচুর্য। ইংরেজ অবশ্য যাবার আগে আমাদের মেদ-মজ্জা-রক্ত তার সিংহের ক্ষুধায় চেটে নিয়ে গেছে বটে,—কিন্তু কমিউনিজমের আদর্শ চালু হবার অন্তত দু'হাজার বছর আগে থেকে ভারতের জনসাধারণ ভারতের অপরিমেয় কীর্তিসম্ভার নিজেদের হাতেই কি গড়েনি? ঐশ্বর্য আর সম্পদের স্বর্ণ-যুগে যে ভারতের চাষীর ঘর অন্নবস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল, কই সেকথা উঁচুগলায় আজ কেউ বলছে না ত? অন্ন আর আশ্রয়ের অভাবে, জ্ঞান আর বিদ্যার অভাবে আমরা পথে-পথে ঘুরেছি, ইতি-হাসে একথা নেই ত! বর্তমান শতাব্দির বৈজ্ঞানিক ধাক্কার জন্য নতুন একটা জাতির সৃষ্টি হয়েছে ভারতে, তাদের নাম "মজদুর",—হাঁ, এটার জন্য ভারত অবশ্য প্রস্তুত ছিল না কোনদিন! কিন্তু ভারতবর্ষ ত' কোনদিন 'প্রলেটেরিয়েটের' দেশও ছিল না! তারা কি কোনওকালে বর্বর, বন্য, হিংস্র, সভ্যতালেশবিবর্জিত জাতি ছিল? আমাদের পুরনো ইতিহাসে অন্ন-বস্ত্র আর আশ্রয়ের জন্য হাহাকার নেই ত! ভারতের পথে পথে যারা ঘুরেছে তারাই জানে, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাও বিপুল ঐশ্বর্য এবং বিশালতর কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে এসেছে! শুধু তফাৎ এই, আমরা প্রচার ক'রে বেড়াইনে, প্রকাশ করি মাত্র।

একটি জলাশয়ের তীরে এসে দাঁড়ালুম। বন-বাগানের কোলে এই সুবৃহৎ সরোবরের দিকে চেয়ে চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল। এটি ওদের ভাষায় 'কম্‌সোমল্ লেক', অর্থাৎ যৌবন-সরোবর! কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকের মতো অত বৃহৎ না হলেও অনেকটা কাছাকাছি। এটি তাসকন্দর নব্যকালের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের হাতে মাটি খুঁড়ে দূরের থেকে জল এনে বানিয়েছে। এটি সান্ধ্যভ্রমণের পক্ষে মনোরম, এবং নৌকাবিহারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। মরুভূমির দেশে এমনতরো জলাশয় নির্মাণ—এইটি হল এর বাহাদুরি। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, শ্রেণী-হীন সমাজের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এটিকে নিজেদের কাজ বলেই মাটি খুঁড়েছে। খুঁড়তে তারা বাধ্য হয়েছিল কিনা, এরূপ আলোচনা কোথাও আমি শুনিনি।

'উর্দা' নামক একটি সঙ্কীর্ণ স্রোত-স্বিনী কোথা থেকে এসেছে খোঁজ করিনি। বোধ করি তিয়েনসানেই এর উৎপত্তি। এই নদীটির এপারে নতুন শহর, যেটাকে বলা চলে সাহেবপাড়া,—আর ওপারে হল 'দেশী' তাসকন্দ। এই পুরনো শহরেও কিন্তু একদিকে অগণিত সৌধশ্রেণী নির্মিত হচ্ছে, হাজার হাজার রাজমিস্ত্রি আর মজুর কাজ করছে,—এবং মিস্ত্রি-মজুরদের ধুলো-বালি-চুন-কালিমাখা চেহারা মনে করি পৃথিবীর সর্বত্রই এক। ওদের প্রত্যেক নির্মাণকার্যের বিরাটত্ব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অলংকরণের মনোহারিত্ব বাইরের চেহারায় কম। প্রায় একই ডিজাইনের বিশাল বাড়ী বহুসংখ্যক। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হলদেটে ইঁটের গগণস্পর্শী স্তূপ,—একই নেগেটিভ থেকে শত শত ছবি যেন প্রিন্ট করা,—চোখ সেখানে ক্লান্ত হতে থাকে! শিল্প-সৃষ্টির আনন্দ হোল তার বৈচিত্র্যে, এটি ওদের বোঝবার সময় এসেছে। আধুনিক সোভিয়েট কথা-সাহিত্যও যেন অনেকটা এই। একই গল্পের ছবি যেন বহু গল্পে একই চিত্রণ নিয়ে হাজির হয়। মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য যে রসসাহিত্য-শিল্পের মস্ত উপাদান! বিশেষ ছাঁচের মধ্যে পড়লেই ত' মানুষের অপমৃত্যু! মানুষ যে সব ছাঁচের বাইরে! কিন্তু একথা এখন থাক্।

পুরনো শহরের একটা অংশে এসে পড়লুম। পুরনো মানে মধ্যযুগীয় মরুচারীদের মাটির বস্তি। বিশৃঙ্খল ও বহুদূর বিস্তৃত ধুলো মাটির ছাদ ও ঘর। কুঁড়ে দরিদ্র হতশ্রী ঘর-দোর, দুঃখ-দুর্দশায় জরাজীর্ণ। মাটির ছাদগুলি এবং অলিগলি ধুলোয় ধূ-ধূ করছে। একটি দুটি নয়, সংখ্যাতীত। প্রতি অলিগলির শেষ প্রান্তের দিকে মরু-প্রান্তর চোখে পড়ছে। রাস্তাঘাট আজও অনেকাংশে মধ্যযুগীয় চেহারা নিয়ে বালু-কাঁকর-পাথরে আকীর্ণ। বস্তুত, এদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজ এখনও অনেক বাকি। এই আপাত চেহারার চাকচিক্যের আশেপাশে বৃহত্তর জীবন এখনও অনেক দুর্গত। অনেক জায়গায় আশ্রয় তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু সেই ঘরটিতে পৌঁছবার পথ এখনও তৈরি হয়নি। ইলেকট্রিক আলো হয়ত প্রায় ঘরে-ঘরেই পৌঁছেছে, হয়ত বা অনেক ঘরে রেডিয়ো যন্ত্রও থাকে, কিন্তু

তাসকন্দের আশেপাশে এবং গায়ে-গায়ে জীবন ধারণের দুস্তরতা এখনও শেষ হয়নি, এটির চিহ্ন প্রায়ই চোখে পড়ে। আমরা "চৌরঙ্গী" ছেড়ে যেন পুরনো বেলেঘাটা-বেলগেছে আর পাতিপুকুরের আশেপাশে ঘুরেছিলুম। মাঝে মাঝে মনে পড়ছিল কাশীপুর পাইকপাড়ার স্লাম্, মাঝে মাঝে লক্ষ্ণৌ-অযোধ্যার দেহাতী পল্লী, মাঝে মাঝে লাহোর আর রাওয়ালপিণ্ডির আনাচ-কানাচ। মাঝে মাঝে ধ্বংসধ্বংসের দারিদ্র্য ধু ধু করছে।

নিন্দুকের মুখে শুনেছি, ওরা নাকি তাসকন্দে এই মধ্যযুগীয় এবং কুদৃশ্য মাটির ঘরদোর এবং বস্তিপল্লীকে তুলনামূলক কারণে মডেল্ হিসাবে রেখে দিতে চায়—ট্যুরিষ্টদের জন্য এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্যও। সকলের নীচের মানুষ যারা, যাদের বাস্তবিকই কোনও পুরুষে অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের নির্দিষ্ট সংস্থান ছিল না,—তাদেরকে টেনে তুলে ভদ্র মানুষের পদমর্যাদা দেওয়া,—এই চেষ্টা ত' যীশুখৃষ্টের আমলেও ছিল না। পুরনো ছাঁচের একটা নিদর্শন যদি ওরা রেখেই দেয়,—সে ত' ঐতিহাসিকের কাজে লাগবে!

কিন্তু একথা অকুণ্ঠভাবেই বলব, জনসাধারণের সম্পূর্ণ ঐহিক দায়িত্ব ওরা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। সর্বাপেক্ষা স্বল্প বেতনভোগী কর্মীর সামনে মাসে-মাসে ৩৫০ রুবল ফেলে দিয়ে ওরা একথা বলেনি যে, এই টাকা নিয়ে তুমি যা খুশি করোগে। বাঁচতে হয় বাঁচো, মরতে হয় মরো। ওর মধ্যেই বাড়িভাড়া, ওর মধ্যেই ডাক্তার-বদ্যি, ওর মধ্যেই ছেলেমেয়ের পড়াশুনো, ওর মধ্যেই ভবিষ্যৎ সংস্থান!—না, এমন কথা ওরা বলেনি। ওরা বরং এই কথা বলছে, বেশ ত, ৩৫০ রুবলের ওপর আরেকটি কাজ দিচ্ছি বিকেলের দিকে, এসো। তোমার আপন যে-যেখানে আছে,—মা-বাপ-ভাই-বোন - স্ত্রী-সন্তান - ভাগ্নে-বৌদি,—দাও সবাইকে পাঠিয়ে, সবাই এসে চাকরি নিক্। ডাক্তার-বদ্যির খরচ আমাদের, ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর খরচ আমাদের, হাঁসপাতালে কারোকে যদি পাঠাও, সে খরচও আমাদের। আর বাড়ি-ভাড়া? প্রতি ১০০ রুবলে যদি ৪টি রুবলও তোমার দিতে গায়ে লাগে তবে আরও কিছু কম দিয়ো! পাকা বাড়ী-ঘর আমরাই তুলে দিচ্ছি! বলা বাহুল্য, যারা সব চেয়ে কম মাইনে অর্থাৎ মাত্র ৩৫০ রুবল পায়, এ ব্যবস্থা তাদের জন্য।

দুধ, মাখন, রুটি, মাংস, আলু, পেঁয়াজ, টমাটো, অন্যান্য দু একটি সব্জি এবং মৌসুমী ফল—এগুলির দাম এভাবে নির্ণীত যে, সকলের হাতে গিয়ে যেন পৌঁছতে পারে। এ নৈলে চলবেই বা কেন? গরুর মতো শান্ত জীবও চাট্ মারে যদি তাকে অল্প খেতে দিয়ে বেশি দুধ দুয়ে নাও! আহার্যের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ না থাকলে মানুষের চেহারায় কি ধরণের শীর্ণতা এবং কায়িক দুর্বলতা আসে—আমি বাঙলা দেশের লোক, সেকথা জানি বৈকি। এখানে সর্বাপেক্ষা স্বল্পবিত্ত মেয়ে পুরুষকে দেখেছি,—কিন্তু দুর্বল শীর্ণ রুগ্ন অর্ধাহারী,—এমন বিশেষ কেউ চোখে পড়েনি। সমস্তটার অন্তরালে সম্ভবত এমন একটা কঠিন শাসন-শৃঙ্খলার পরিপাট্য আছে যেটি সমগ্র দেশটিকে যন্ত্রচালিতের মতো ক'রে রেখেছে, অথচ তার বাইরের সামগ্রিক চেহারাটা উৎসাহ-জনক এবং তৃপ্তিদায়ক। জনসাধারণ তার নিজের কাজ সম্পূর্ণ জানে, এবং গভর্ণমেণ্ট তার নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বোঝে। এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ কোথাও এখনও দেখতে পাচ্ছিনে। গভর্ণমেণ্টের বাইরে কিছু নেই,—সেটি যেন একটি মস্ত ঊর্ণনাভের জাল,—দেশের প্রতি শিরা উপশিরায় যেখানে যত শত সহস্র 'ইউনিয়ন' রয়েছে, সমস্তগুলির সঙ্গে তার যোগ কোথাও সূক্ষ্ম এবং কোথাও বা স্থূল। মোট পনেরোটি রিপাবলিক, —পনেরোটিই জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ "স্বতন্ত্র" এবং "স্বাধীন", কেউ কারো মুখ-চাওয়া নয়,—ভাষা, স্বার্থ ও সুবিধা নিয়ে কেউ কারো সঙ্গে কোঁদল বাধায় না, কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে কোনোটা ভিক্ষের ঝুলি পেতে দাঁড়িয়ে থাকে না,—প্রত্যেকটিই স্ব-সম্পূর্ণ। কোনও একটা রিপাবলিক যদি আজ মনে করে যে, চল ভাই, আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের খপ্পর থেকে বেরিয়ে যাই,—তাহলে তাদের ধ'রে রাখার মতো কোনও প্রকাশ্য শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা নেই! কিন্তু আজ কেউ আর সেকথা বলে না, সে-আলোচনা করে না। কেন করে না আমি জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে পনেরোটি ছোট বড় বেলুনের পনেরোটি টানা-সুতো এক অদৃশ্য কঠিন মুঠিতে কেউ আড়াল থেকে ধ'রে রয়েছে। তুমি উড়তে পার, ভাসতে পার, রঙ্গীন রূপে খেলাও দেখাতে পার,—কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যেতে পার না। সুতোটা মুঠিতে ধরা আছে! এটি দেখেছি, সোভিয়েট ইউনিয়নের বালকবালিকারা রবারের বেলুনের প্রতি খুব অনুরক্ত।

হাজার হাজার লোক দেখছি পথে ঘাটে, হাজার হাজারের জনতা প্রায় দিবা-রাত্র ঘিরে রয়েছে আমাদের এই তাসকন্দ হোটেলে—যেটি এখনও অর্ধসমাপ্ত, এবং যেটির পূর্বাংশটি মাত্র উদ্বোধন করা হয়েছে এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে,—কিন্তু কোনও একটি মানুষের আচরণে বিশদৃশ এমন কিছু দেখছিনে যেটি দৃষ্টিকটু। এত বড় শহরে অন্তত এমন দু'চারটি ঘটনা আশা করা যায় যে, কেউ কারোকে গালি দিচ্ছে, কেউ মারতে উঠছে, কেউ উচ্ছৃঙ্খলতা করছে, কেউ
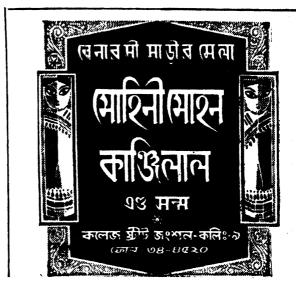
হাঙ্গামা বাধাচ্ছে, কেউ গরম ভাষায় তর্ক-বিতর্কে মেতেছে, কেউ মেয়েদের প্রতি ঈষন্মাত্র অসভ্যতা করছে, কেউ নীতিবিগর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছে,—না, এমন একটিও দেখছিনে। রাস্তায় কোথাও মিছিল নেই, অসন্তোষের ধোঁয়া নেই, পথেঘাটে দেশনেতাদের নিয়ে কেউ দল পাকিয়ে নোংরা কথা বলে না, রাস্তাঘাটে হাসি হুল্লোড় নেই, বর্বর লাউড্-স্পীকারে কেউ নোংরা গান বাজাতে থাকে না, রাত এগারটার পর মাতাল যাচ্ছে না পথ দিয়ে, পতিতা নামক কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই, জুয়ার কোনও আড্ডা নেই, চোর-ছ্যাঁচড়ের কথাবার্তাও শুনছিনে। এই সূত্রেই বলা দরকার, সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের কারাগারগুলি খালি হয়ে যাচ্ছে, এবং নতুন কয়েদী আর তেমন এসে পৌঁছচ্ছে না। যাই হোক, এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে নানাভাবে সন্ধান নেবার চেষ্টা পেয়েছি, এবং লানা প্রমুখ যে কয়জনের কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাদের কারোকে অবিশ্বাস করার কারণ ঘটেনি। জুয়া, পতিতা, রাহাজানি, বলপূর্বক স্ত্রীলোকের প্রতি অনাচার, ডাকাতি, গুণ্ডামি, ধর্মান্ধতা, জিনিসপত্র কেনার সময় দর কসাকসি, —এসব বিষয় আলোচনা ওদের নিকট হাসির বস্তু। অনেক সময় প্রশ্ন তুলে আমি নিজেই লজ্জা পেয়েছি।

থিয়েটার, সিনেমা, ব্যালে, অপেরা, স্কুল, কলেজ, নাচগানের বিদ্যালয়, যাদুঘর, প্রদর্শনী এবং লোককল্যাণমূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠান, একটির পর একটি ডিপার্টমেন্টাল দোকান, স্থানীয় রেড স্কোয়ার, ষ্টালিন স্কোয়ার,—এমন কি আঞ্চলিক কমিউনিষ্ট পার্টির বিরাট অট্টালিকা,—একে একে সব দেখে বেড়াচ্ছি। এই সেদিন সার্কাসে গিয়ে একটি মেয়েকে শুধু মাত্র দু'পাটি দাঁতের জোরে সুউচ্চ শূন্যে লাট্টুর মতো ঘুরতে দেখে এমনি অভিভূত হলুম যে, লানাকে সঙ্গে নিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাতে গেলুম। সেটি গ্রীণরুম্। মেয়েটির বয়স কম নয়। নাম আনা খালাডিনা। আমার অভিনন্দনলাভে খুশী হয়ে সে নিজের একটি ছবি এবং দু'চার লাইন লেখায় ভারতের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাল। আমি চমৎকৃত হয়ে গেলুম যখন শুনলুম তার বয়স ৪৭ বৎসর।

আমাদের হোটেলে এবার এসে উঠেছেন সোভিয়েট লেখক সঙ্ঘের বড় বড় হোমরা চোমরা। আমার চোখে সবাই নতুন, তাঁদের প্রত্যেকের এলাকায় তাঁরা কিরূপ প্রতিপত্তিশালী—এ আমার জানা নেই। এঁরা হলেন কন্স্টান্টিন সিমনভ, বোরিস পোলেভয়, সাফ্রোনভ, চেকভস্কি, কন্সটান্টিন চুগোনভ, পাভেল লুকনিট্স্কি, শরফ রসিদভ, আইবেক, গুলফিয়া, বরোদিন, মীরতেমির, আবদুল্লা কাহার, মাহসুদ শাহাজাদা, কুদ্দুস মহাম্মাদি ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে যিনি অতিশয় মিষ্টিভাষী, শান্ত, ভদ্র এবং ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ,—তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র। তাঁর বিনয়-নম্রতার মধ্যে ভারতীয় প্রকৃতির চেহারা লক্ষ্য করে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। অত্যন্ত সাদাসিধে মিষ্ট মানুষটি দোভাষীর মারফৎ আমাদের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ করতেন যখন তখন। পরে এঁর নাম জানলুম, শরফ রসিদভ। ইনিই আমাদের সর্বপ্রধান আঞ্চলিক অতিথিসেবক, উজবেক রাইটার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, এবং উজবেকিস্তান সুপ্রীম সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের প্রিসিডিয়মের সভাপতি। এঁর বয়স ৪০।৪২ হয়ত হবে। পরে শুনেছিলুম ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ বিপ্লবের বছরে এক দরিদ্র চাষীর ঘরে এঁর জন্ম হয়। ইনি এখন উজবেকিস্তানের একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। আগে যাঁদের নাম করলুম তাঁরা কেউ কবি, কেউ নাট্যকার, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ সম্পাদক, কেউ বা রাইটার্স ইউনিয়নের ফরেন কমিশনের সভাপতি। আমি আশা করেছিলুম আধুনিক রুশ সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক মাইকেল সোলোকভ হয়ত এসে পৌঁছবেন, কিন্তু তিনি এলেন না। হয়ত 'রঙের গোলামকে' কোনও রহস্যজনক কারণে চেপেই রাখা হল। এঁরা ভিন্ন এসে পৌঁছেছেন সুপ্রসিদ্ধ ও সুশিক্ষিত কয়েকজন মহিলা-দোভাষী। তাঁদের কেউ হলেন অকসানা, ভেরা, নাটাশা, মেরিয়ম—এবং আরও অনেকে। তারাশঙ্কর এর কয়েক মাস আগে যখন মস্কোয় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে অকসানা এবং নাটাশার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু লানা এবং নিকা আমাদের সঙ্গে এবার কাজ করছে, সেই হেতুই পূর্বোক্ত দুই মহিলা নিয়মানুগত্য রক্ষার জন্যই শুধু শুভেচ্ছা ও লৌকিক সমাদর জানিয়ে সরে-সরে রইলেন। তারাশঙ্কর এতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিনা, সে-খোঁজ আমি করিনি। কিন্তু আমার এই কথাই মনে হয়েছিল, হয়ত এটি কর্তৃপক্ষেরই নির্দেশ। হয়ত একই পরদেশীর কাছে একই দোভাষীকে বারম্বার কাজ করতে দেওয়া তাঁদের পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে যথেষ্ট সমীচীন নয় বলেই তাঁরা মনে করেন।

ভারতীয় লেখকদের সঙ্গে সোভিয়েট লেখকদের তুলনা করা চলে না। সোভিয়েট লেখকদের সম্ভবত প্রথম থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শ ও নীতি শিক্ষালাভ করতে হয়। তাঁরা ক্রমশ তৈরি হয়ে ওঠেন একটি বিশেষ সামাজিক চিন্তাধারায়। উজবেকিস্তানের নানা মরুশহরে কমিউনিষ্ট পার্টির এক একটি বিরাট কেন্দ্র বর্তমান,—এবং তাদের এক একটিতে যে-ধরণের কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায়, সেটি কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অগণিত বিভাগের কর্মব্যস্ততাকে অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দেয়। এসব আপিসে ঢোকবার জন্য অনুমতির দরকার হয়। বড় বড় সরকারি আপিসে যাওয়াও যা, পার্টি আপিসে যাওয়াও তাই। পার্টির প্রত্যেকটি কর্মচারী রীতিমতো বেতনভোগী,—এবং সেই বেতন সরকারী যে কোনও কর্মচারীর সমান। পার্টি এবং গভর্ণমেণ্ট সব একাকার। একই ব্যক্তি,—ডান হাতে পার্টি, বাঁ হাতে গভর্ণমেণ্ট। যেমন আমাদের নেহরু, যেমন দেশাই, যেমন ডাঃ রায়। তফাৎ এই এঁদের ডান হাতে গভর্ণমেণ্ট বাঁ হাতে পার্টি। ওখানে এর অবিকল বিপরীত। সোভিয়েট ইউনিয়নে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ পার্টির অধীনে,—পার্টির বাইরে গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্বই নেই। সকালের পার্টিই হয়ে দাঁড়ায় দুপুরের গভর্ণমেণ্ট ; বিকালের পার্টি রাত্রে পরিণত হয় গভর্ণমেণ্টে। প্রথম স্থানে জনগণ, দ্বিতীয় স্থানে কমিউনিষ্ট পার্টি, তৃতীয় স্থানে গভর্ণমেণ্ট, চতুর্থ স্থানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য! অর্থাৎ আমাদের মতো সোভিয়েট ইউনিয়নেও শ্রীগণেশের পূজা সর্বাগ্রে!

চতুর্দিকব্যাপী কর্মব্যস্ততার মধ্যে ভারতীয় গ্রুপের সবাই একে একে এসে পৌঁছলেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এসে উঠলেন ঠিক আমার পাশের ঘরে। তিনটি কুলীন ব্রাহ্মণ রইলুম ঠিক পাশাপাশি। দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছেন মাত্র একজন, তিনি কেরালার জনৈক অধ্যাপক, নাম দামোদরণ্। জাতিতে তিনি কমিউনিষ্ট, ঈষৎ উগ্রপন্থী, কিঞ্চিৎ স্বল্পবাক। তাঁরই ঘরে আমাদের প্রিয়বন্ধু এবং মধুরভাষী শ্রীমান্ সুভাস মুখোপাধ্যায় এসে সহবাসী হয়েছেন। সুভাষ নিজে কবি ও কমিউনিষ্ট। তাঁদের কাছাকাছি রয়েছেন লক্ষ্মৌয়ের প্রসিদ্ধ বিপ্লববাদী লেখক এবং কমিউনিষ্ট শ্রীযুক্ত যশপাল।

কমিউনিষ্ট নেতা শান্ত সদাশিব শ্রীযুক্ত সাজ্জাদ জহীর বোধ করি কোনও বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছেন। ডাঃ মুলুকরাজ আনন্দ্ তাঁর এক তরুণী মহিলা-সেক্রেটারীসহ আমাদের সেই 'দাচার' বাগানে একটি ভিন্ন কুটীরে বাস করছেন। তাঁর কাজকর্ম নাকি অনেক। তাঁর প্রকৃত 'বর্ণ' কি আমার জানা নেই,— তবে এদেশে তাঁর সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা প্রচুর, এবং অনুবাদ ইত্যাদি থেকে উপার্জন তার চেয়েও বেশি। ভারতীয় কোনও ভাষায় তাঁর কোনও বই আছে ব'লে শুনিনি,—তিনি ইংরেজি লেখেন। সুতরাং সেই হিসেবে তিনি 'ভারতীয়' নন্, আন্তর্জাতিক! আর আছেন উড়িষ্যার কন্‌গ্রেসী এম-এল-এ এবং তরুণ লেখক সত্যানন্দ চম্পতরায় ও অনন্ত পট্টনায়ক, মহারাষ্ট্রের দেশপান্ডে, সিংহবিক্রমী আচার্য আত্রে এবং বিশিষ্ট সুপণ্ডিত মহিলা শ্রীমতী দুর্গা ভাগবৎ, বিহারের আছেন দুজন নাম মনে নেই, পাঞ্জাবের আছেন শিউদানসিং চৌহান, প্রীতমসিং সফীর, হরগোবিন্দ সিং, মিঃ সন্তোসিং শেখোন, গোবিন্দসিং মাল-সুখানী এবং সুদর্শনা কবি এবং আফগানের ভারতীয় কনসাল-জেনা-রেলের স্ত্রী শ্রীমতী প্রদ্যোৎ কাউর। এ ছাড়া আছেন রাজস্থানের রাণাবংশের মেয়ে এবং প্রসিদ্ধ লেখিকা রানী লক্ষ্মী-কুমারী চুন্দাবৎ, বোম্বাইয়ের চিত্রনাট্য-লেখক পরিহাসরসিক রাজিন্দরসিং বেদী, এবং দিল্লীর মকতবা জামিয়া মিলিয়ার ম্যানেজার ও কবি মিঃ তাবান। আসাম থেকে এসেছিলেন একজন,—তাঁর নাম মনে নেই। গুজরাট থেকে এসেছিলেন নাট্যকার প্রাগজি দোসা। যাঁরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁদের নাম ভুলতে পারিনি। এঁরা ছাড়া আমাদের প্রায় নিত্যসঙ্গী ছিলেন "অমৃতবাজার পত্রিকার" সুযোগ্য প্রতিনিধি, সাংবাদিক, গ্রন্থকার, হাস্য-রসিক, এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী। বছর দেড়েক আগে সেই সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ও বন্ধুবৎসল শ্রীধরণীর আকস্মিক হৃদ-রোগে মৃত্যু ঘটে গেছে!

দুই বিরাট মহাদেশের লেখক সম্মেলনে সম্ভবত মহাদেশীয় সাহিত্য আলোচনাও হবে,—কিন্তু এই হোটেলের শত শত প্রতিনিধিগণের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে আন্তর্জাতিক পলিটিকসের গন্ধই প্রধান ছিল। মোট প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ৪০০ শ'র কিছু বেশি। কিন্তু মাত্র দুটি জাত যদি মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়,—সেখানে সাহিত্য গৌণ, পলি-টিকস্‌ই মুখ্য! আলাপ পরিচয়, ভাল-বাসা আদান-প্রদান, একত্র বৈঠক,—সব মিলিয়ে মানুষ ও সাহিত্যের মূল্য অপেক্ষা আগাগোড়া পলিটিকস্‌ই প্রধান। আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের যে-প্রতিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি, তার ফললাভ ঘটছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তিলাভে। রবীন্দ্রনাথের কতগুলি কালোত্তীর্ণ কবিতায় যেমন উচ্চাঙ্গের রসব্যঞ্জনা ছিল, তেমনি ছিল সুস্পষ্ট রাজনীতিক চেতনা! যেমন, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান—"। মনে রাখা দরকার, এই ছয় কোটি "যাদের"কে নিয়ে একদা ইংল্যাণ্ডের চাণক্য মিঃ চার্চিল ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়েছিলেন। আরও একটি উদাহরণ দিই, "হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"—এই মনোরম কবিতাটি এক মহৎ 'রাজনীতিক' ব্যঞ্জনায় দেদীপ্য-মান, এটি আজ দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় এটি নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলুম!

এখানে সকল প্রকার কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, বন্ধুত্ব বিনিময়, এবং সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেই অদূরবর্তী রাজনীতির কম্পন। সমগ্র আবহাওয়ায় মিলিয়ে রয়েছে কুট-নীতিক নিঃশ্বাস। তাসকন্দে আসবার আগে এটির জন্য সবাই আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি কিনা সেইটিই প্রশ্ন। আসবার আগে তারাশঙ্করের বাসনা ছিল ভারতীয় দল যাতে ভারত-সরকারের সরকারী ছাপ নিয়ে আসে! নিতান্তপক্ষে যদি দিল্লীর সাহিত্য-আকাদেমীরও সনদ নিয়ে আসতে পারা যায়! কেননা তারাশঙ্কর আসবার আগে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাসকন্দে সাহিত্যের নামে রাজনীতি করতে যাচ্ছিনে! এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও শ্রীনেহরু ভারতীয় দলের সঙ্গে ভারত সরকার তথা সাহিত্য আকাদেমীর নাম সংযুক্ত করতে রাজি হননি। সোভিয়েট ভূমিতে পদার্পণ করব অথচ রাজনীতি এড়িয়ে যাব,—এটি সম্ভব নয়। তারাশঙ্করের কাছে শ্রীনেহরুর সেই চিঠিখানি আমার দেখা ছিল।

তা হলে আমরা কা'রা? কী আমা-দের পরিচয় রইল এখানে? আমরা সবাই যে ভারতেরই কয়েকটি অপোগণ্ড সন্তান, এতে অবশ্য সন্দেহ নেই! কিন্তু আমাদেরকে না পাঠিয়েছে ভারতের জন-সাধারণ, না ভারত গভর্ণমেণ্ট, না বা কোনও সাহিত্য সংস্থা। আমাদের মা-বাপ নেই, হুজুগের বন্যায় আমরা ক'জন এই আজব দেশের দক্ষিণ উপকূলে আকাশপথে ভেসে এসেছি মাত্র, এবং এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের কয়েকটি কাগজে ভারতীয় দলটিকে নিয়ে হাসি-তামাসা ও বক্রবিদ্রূপ ছাপা হচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে বিশেষ দল এবং বিশেষ কয়েকজন অ-বাঙ্গালী লেখকের কিছু গাত্রদাহও ছিল। মনে পড়ছে, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান রাই-টার্স কন্‌ফারেন্স বসেছিল, কিন্তু সেখানে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েও আমি যেতে পারিনি। তার কিছু সূত্র এখানে পাওয়া যায় এবং সেই সূত্রেই যে একটি সংস্থা জিয়ানো ছিল, সেই সংস্থার পক্ষ থেকেই তারাশঙ্কর আমাকে মনোনীত করেন!

এই প্রকার এলোমেলো অবস্থার মধ্যে আবার নতুন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। আমাদের ভারতীয় দলটির মধ্যে চাপা ঘরোয়া বিরোধ প্রকাশ পাচ্ছিল। কা'রো সঙ্গে কা'রো তেমন মতের মিল ঘটছে না। তারাশঙ্করের রকম-সকমের সঙ্গে মিল নেই অনেকগুলি লোকের,— তাঁরা আমাকে আড়ালে আবডালে পেলেই দু'চার কথায় নালিশ জানাচ্ছেন। তাঁদের ধারণা, এসব দায়িত্বের কাজ ডাঃ রাধা-কৃষ্ণন, কিংবা রাজাগোপালাচারীর,— নিদেন পক্ষে প্রফেসার হুমায়ুন কবীরের! যশপাল ত' যখন তখন উগ্রমূর্তি! বন্ধুবর শিউদানসিং চৌহান অত্যন্ত বিরূপ। কংগ্রেসী এম-এল-এ সত্যানন্দ বিশেষ দুঃখিত। শ্রীধরণী চিন্তিত। মুলুকরাজ হালে পানি পাচ্ছেন না! এদিকে আমি উদ্বিগ্নচক্ষে দেখছি, তারাশঙ্করের শরীর ভাল নেই, সব সময় জ্বর-জ্বর, হজমের গোলমাল,—ঘর থেকে তিনি বেরোতে চান না।

কোনওপ্রকার রাজনীতিক মিশন্ নিয়ে আমরা তাসকন্দ লেখক-সম্মেলনে আসিনি। উদ্দেশ্য আমাদের স্পষ্ট। আমরা সৎসাহিত্য, শিল্পকলা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতির ভাব, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পরিচয়, এশিয়া আফ্রিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ভাব-বিনিময়,— এই সব চিন্তা নিয়েই তাসকন্দে এসেছি। তা যদি হয় তবে রাজনীতির ব্যাপার-গুলো আমাদের লেখক-সমাজে ঢুকিয়ে দিয়ে লাভ কি? ওসব ব্যাপার থাক্ বড় বড় রাষ্ট্রনায়কদের জন্য। আমরা খাব-দাবো, পাঁচটা দেশের পাঁচ রকম সাহিত্যের কথা শুনব, আমোদ-আহ্লাদ করব, তারপর ডুগডুগি বাজিয়ে বাড়ী চ'লে যাব। এ ছাড়া আমাদের কাজ নেই।

তারাশঙ্করের এবম্প্রকার যুক্তি তাঁর শাদাসিধা মনের পরিচয়।

হোটেল থেকে নয় মাইল দূরে আমাদের সেই প্রাক্তন 'দাচা' ওরফে বাগানবাড়ীর দোতলার চওড়া বারান্দায় ভারতীয় দলের ঘরোয়া বৈঠক বসেছিল। কোনও বা'ইরের লোক এদিকে নেই, কেউ কোথাও থেকে গোয়েন্দাগিরি না করে! আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা ধীরে ধীরে বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল।

রৌদ্র মধুর হয়েছে পুরনো জমিদার-বাড়ীর বন-বাগানে। মিষ্ট শীত পড়েছে।

অপরিচিত পাখী আর পতঙ্গ গাছপালায় ঘোরাফেরা করছে। বাগানের এক কোনে মালী আর চাষীদের গল্পের জটলা বসেছে। সেই সুপ্রাচীন পৃথিবী চোখের সামনে যেন নূতন পল্লব মেলে ধরেছে।

তর্ক বেধে উঠল সম্মেলনের একখানি ক্ষুদ্র ছাপা পুস্তিকা নিয়ে—সেটি 'এজেণ্ডা' অর্থাৎ সম্মেলনের পক্ষে আলোচ্য বিষয়বস্তুর তালিকা। বিষয় ছিল মোট পাঁচটি। প্রথম ও শেষ তিনটি মামুলি। কিন্তু বিতর্ক-জাল সৃষ্টি হল দ্বিতীয়টি নিয়ে—যেটিতে 'কলোনিয়ালিজ্‌ম্' অর্থাৎ উপনিবেশবাদকে আক্রমণ করার একটি প্রস্তাব ছিল। তারাশঙ্কর রেগে উঠলেন এবং বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, আমরা কয়েকটি দেশের লেখক মিলে কয়েক মাস আগে মস্কোতে ব'সে 'প্রস্তুতি কমিটি'র বৈঠকে 'এজেণ্ডা' স্থির ক'রে গিয়েছিলুম, এবং সেটি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। এটির সঙ্গে তা'র মিল নেই কেন? সেই এজেণ্ডা কে বা কা'রা পাল্‌টালো? কেন পাল্‌টালো? আমরা ভারতবর্ষের লোক চিরকাল উপনিবেশবাদকে ঘৃণা করে এসেছি সত্য, কিন্তু এখানে সাহিত্যিক সম্মেলনে আমরা কি উপনিবেশবাদকে গাল দেবার জন্য জড়ো হয়েছি? আমরা কি কমিউনিষ্ট দেশে এসেছি কলোনিয়াল্ পাওয়ার্সদের আক্রমণ করার জন্য? আমাকে খবর না দিয়ে এবং আলোচনা না ক'রে এভাবে যারা এজেণ্ডার মধ্যে এই প্রকার বেআইনী কারচুপি করেছে তারা সাধু নয়, তারা সৎপ্রকৃতির নয়,—এ ব্যাপারে আমি নিজকে প্রতারিত বোধ করছি! এই নীচতা এবং ক্রূরতা আমি বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই!

বাঙলার এক সুদূরে পল্লীগ্রামে এক সৎ ব্রাহ্মণ বংশে তারাশঙ্করের জন্ম। কিছুকাল আগে শুনেছি তাঁর ইষ্টদেবতা নাকি তাঁর জাগ্রত হাতে একটি বাস্তব চাঁপা ফুল প্রক্ষেপ করেছিলেন! এই দূর বিদেশে এসেও তিনি তাসকন্দ হোটেলে তাঁর নিজের ঘরটির কোনে ব'সে যথাসময় পুজো-আহ্নিক করতে ভোলেন না। সেই ব্যক্তি আজ মানুষের চাতুরী ও কপটতা এভাবে কেনই বা বর-দাস্ত করবে? এটা কি ঠিক পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করার মতো নয়? তারা-শঙ্করের অভিমতের জোর ছিল বৈকি।

খোলা বারান্দার এক কোনে 'ক্ষুদ্র ভারতবর্ষে' ঝড় উঠল। তর্ক যাঁরা বাধিয়ে তুললেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কন্‌গ্রেস, কমিউনিষ্ট, গরমপন্থী, নরমপন্থী, চরম-পন্থী, উদারপন্থী, উভচর, চীন ও সোভিয়েট বিশ্বেষী, স্বার্থপন্থী এবং তারাশঙ্কর-বিরোধী! উত্তেজিত কণ্ঠে দাঁড়িয়ে উঠলেন শ্রীমতী দুর্গা ভাগবৎ, রুষ্ট হলেন আচার্য আত্রে, হাস্য ও ব্যঙ্গে মাতলেন শ্রীমতী প্রদ্যোৎ, রানী লক্ষ্মী-কুমারী চিন্তান্বিত, জহীর শান্ত ও প্রসন্ন, সুভাষ নীরব, প্রীতম সিংয়ের ওকালতি, শেখোন সিংহের প্রচণ্ড বক্তৃতা, মুল্‌করাজ নতমুখ, দেশপাণ্ডে বিদ্রূপাত্মক, যশপাল ভীষণ বিরক্ত, সুনীতি-বাবুর মিটমাটের চেষ্টা,—এবং শ্রীধরণীর ঠোঁটের হাসিটুকু এইটুকুই যেন জানিয়ে দিচ্ছে—তিনি জানেন এ খেলা কা'র, এবং খেলোয়াড় কে কে! কমিউনিষ্টদের সততা সম্বন্ধে শ্রীধরণীর যথেষ্ট আস্থা ছিল না। তিনি তাসকন্দ হোটেলে সারা-দিন রাত্রির অধিকাংশ কালই আমাদের গা ঘেঁষে থাকতে ভালবাসতেন, এবং তারাশঙ্করের সঙ্গে বিশেষভাবে গল্প-গুজব করতেন। মানুষটি খুবই মজ-লিশী ছিলেন।

যাই হোক, সেই ঝড়ের মধ্যে এক সময় তারাশঙ্কর ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর "লীডার-শিপে" ইস্তফা দিয়ে বসলেন, এবং সেই লণ্ডভণ্ড অবস্থার মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় স'রে দাঁড়িয়ে সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "তা' হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, আপনারা অনেকে মিলে আমাকেই "লেট্ ডাউন" করতে চান্, এই ত?"

আমরা সচকিত হয়ে তাকালুম। "—অবশেষে থলির ভিতর থেকে বিড়ালটি বেরিয়ে এল।"

তাঁর কণ্ঠস্বরটি ঠিক পুরুষজনো-চিত নয়, ঈষৎ ললিত রসাশ্রিত। কিন্তু তাঁর এই নাটকীয় বিদারণে অনেকেই একটু হতচকিত হয়ে তাঁর প্রতি তাকালেন। তিনি স্বীকার পেলেন, 'এজেণ্ডার' মধ্যে "ঔপনিবেশিক" শব্দ-গুলি তিনিই সংযুক্ত ক'রে দিয়েছেন! এমন কাজ তিনি কেন করেছেন এবং তাঁর অধিকার ছিল কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "একমাস ধ'রে আমি মস্কোতে ছিলুম, এবং এ নিয়ে আমার অনেকের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। উপনিবেশবাদকে আক্রমণ করার পক্ষে কয়েকটি শব্দ বসাবার সময় আমার মনে হয়নি, এতে কোনও অন্যায় হয়েছে! এর জন্য যদি আমাকে 'সেন্সার' করেন ত' করুন!"

নৌকা প্রায় ডোবে এমন সময় ডাঃ সুনীতিকুমার হাল ধরলেন! তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গীয় আইন পরিষদের সভাপতি, এবং তিনি বোধ করি অনুধাবন কর-ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র গোপালবাবু ঠিক বিধিসম্মত কাজ করেছেন কিনা। সুনীতিবাবু সকলকে শান্ত করার চেষ্টা পেলেন।

উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে যাঁরা কমিউনিষ্টপন্থী তাঁদের অনেকেই গোপালবাবুকে সমর্থন কর-ছিলেন। কিন্তু কথাটা থেকেই গেল, প্রস্তুতি কমিটির সভা না হয়েও এবম্বিধ আচরণ গোপালবাবুর পক্ষে ন্যায় ও যুক্তিসম্মত হয়েছিল কিনা! কারণ প্রস্তুতি কমিটিতে মাত্র যে দুজন ভারতীয় কিছুকাল আগে এসে মস্কোতে বৈঠক করেছিলেন—তাঁদের একজন তারাশঙ্কর, অন্যজন মুল্‌করাজ।

শ্রীধরণী কাগজ কলম নিয়ে বসলেন এবং সুনীতিবাবু সকলের সম্মতিক্রমে ভারতীয় গ্রুপের নীতি কি প্রকার হওয়া উচিৎ এই নিয়ে একটি নূতন খসড়া প্রস্তুত করতে লাগলেন। অতঃপর অনেকের অনুরোধে তারাশঙ্কর তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন। এস্থলে বলা দরকার, ডাঃ সুনীতিকুমার রচিত এবং শ্রীধরণী কর্তৃক অনুলিখিত খসড়াটি পরবর্তীকালে বিশেষ কোনই কাজে লাগেনি। সেটি কাগজপত্রের মধ্যেই রয়ে গেল। মাঝ থেকে তর্কবিতর্কই সার হল, এবং সুপণ্ডিত গোপাল হালদার মহাশয় যথাপূর্বম্ সকলের শুভানু-ধ্যায়ীই রয়ে গেলেন। কিন্তু তারাশঙ্করের সাময়িক পদত্যাগ ঘোষণা এবং সেটির পুনঃগ্রহণের সংবাদটি কৈ-মাছের মতো কানে হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়ে তাসকন্দ হোটেলের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রশ্ন করল অনেকেই,—এ ত্যাগ কেন, এ পুনঃগ্রহণই বা কেন!

অতঃপর গোপাল হালদার মহাশয় তাঁর এই অনধিকার আচরণের ফলে অনুজ্জ্বল হননি। তিনি আপন বিশ্বাসে অটল হ'য়ে ছিলেন। তিনি হয়ত এর জবাব দিতে পারতেন এই ব'লে যে, ভারতের প্রকৃতিই এই! গ্রীকদের সঙ্গে ভারত যুদ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু সুন্দরী হেলেনকেও সে ঘরে এনেছিল! কন্‌গ্রেস লড়াই করছে বটে কমিউ-নিজমের বিরুদ্ধে, কিন্তু "কলেকটিভ ফার্মে"র প্রগতিশীল নীতিও সে আজ গ্রহণ করতে চাইছে! এটির নাম ভারত প্রকৃতির সাংস্কৃতিক সংহতি-বোধ,—হাজার হাজার বছরের 'সীনথেসিস!' তিনি অবশ্যই বলতে পারতেন, এই তাসকন্দ থেকে একদা 'সাম্রাজ্যবাদী' সেনানায়ক বাবর গিয়ে বিজয়ীর বেশে ভারতের সম্রাট হয়েছিলেন এবং পরে ভারতবাসীরা তাঁরই নাতিকে জামাই বানিয়ে গলায় মালা দিয়েছিল!

সীনথেসিস!

* * *

জনসাধারণের মনকে শিক্ষিত, উদ্বুদ্ধ এবং রঞ্জিত ক'রে তোলবার জন্য উজবেক কর্তৃপক্ষের সর্বাঙ্গীণ অধ্য-বসায় লক্ষ্য করবার বিষয়। যত সংখ্যক তাঁরা সিনেমা থিয়েটার অপেরা সার্কাস প্রদর্শনী ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন, ঠিক তত সংখ্যকই নির্মাণ করেছেন যাদুঘর ও চিত্রশালা। প্রত্যেকটির জন্যই বৃহৎ এক একটি অট্টালিকা। কোনোটি ঐতি-হাসিক, কোনোটি ভৌগোলিক, কোনোটি

বৈজ্ঞানিক, কোনোটি বা লোকশিক্ষার কেন্দ্র।

এমনি একটি মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলুম এক মধ্যাহ্নকালে। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ সুনীতিকুমার, গোপাল হালদার, সুভাষ, শ্রীমতী বিকোভা ও শ্রীমতী লানা। বিরাট এবং বিস্তৃত এক অট্টালিকা, এবং এটি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। সোপানশ্রেণী বেয়ে উপরে উঠে যেতেই যথারীতি ডবল পাল্লাযুক্ত মস্ত দরজাটা স'রে দাঁড়াল, এবং যথারীতি ডাইরেক্টর মহাশয় অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বস্তুতঃ, যাদুঘর কোনও দেশেই দরিদ্র নয়। দিল্লী-কলকাতাতেও নয়, তাসকন্দেও নয়। কলকাতার যাদুঘরটির সামগ্রিক চেহারার মধ্যে যে-মহিমা, তার তুলনা সকল দেশেই কম। এখানে যে-চিত্রশালা এবং সংগ্রহ সেগুলি একদিকে যেমন নতাই চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু দেশভেদে যাদুঘরেরও প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। তৈল-চিত্রগুলির বর্ণচ্ছটার মধ্যে তার জীবন্তরূপ দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। অপরূপা নগ্না নারীর দেহলাবণ্যের সম্মুখে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে সঙ্কোচ হয়, —মনে হয় সেও যেন জাগ্রত চক্ষে দর্শকদের নির্লজ্জ চক্ষুও দেখে নিচ্ছে! এরা অধিকাংশই অষ্টাদশ এবং ঊনিশ শতকের। আধুনিক সোভিয়েট আমলের চিত্রগুলিতে সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য রাজনীতির ব্যঞ্জনা আছে। কিন্তু একালের চিত্রগুলিতে নারীর দেহ-সৌন্দর্যের অতিশয় বিচিত্রণ কমই। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রচলিত শিল্পকলায় কোথাও যৌন আবেদনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। এখানে ওখানে উজবেকিস্তানের জাতীয় চারুশিল্প তা'র ঐশ্বর্য-সম্ভার নিয়ে সুসজ্জিত রয়েছে। সূচীশিল্পের বিবিধ ও বর্ণাঢ্য কাজ এক একটি মহলকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে রেখেছে। কাঠের কাজ, শ্বেত ও পীতবর্ণ পাথরের কাজ, পশম ও জাজিমের কাজ, এবং সোনার সুতোয় বোনা এক একটি কাজ, —একে একে দেখলে চোখ ঠিকরে যায়। এক স্থলে ভারতীয় শাড়ি, শাল এবং নানাবিধ সামগ্রী রাখা আছে। সমগ্র অট্টালিকার হিসাব নিলে হয়ত ২৫।৩০ হাজার দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকা মেলে।

ঐতিহাসিক যাদুঘরটি ভিন্ন প্রকৃতির। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এটির প্রথম উদ্বোধন হয়। এটাও একটি ললিত-কলার কেন্দ্র। এখানে প্রাচীন উজবেক এবং মধ্য-এশিয়ার ঐতিহাসিক সামগ্রী সংরক্ষিত। বৌদ্ধযুগের নানাবিধ শিল্পসামগ্রী প্রাচীন যুগের বিস্মৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে তুলে আনা,—ইতিহাস যেন চারিদিক থেকে কথা বলছে কানে কানে! মানুষের আদিম চেহারা দেখলে ভয় করে! যখন সে ঘর বাঁধতে শেখেনি, পরিধেয় আবরণের প্রশ্ন ওঠেনি, মাটি খুঁড়ে ফসল সৃষ্টির কথা যখন তাদের মাথায় আসেনি, প্রদীপের আলো আবিষ্কার করেনি এবং আগুনের ব্যবহারও শেখেনি! তখনও চলছে জন্তু আর মানুষে বাঁচবার জন্য প্রাণান্ত লড়াই! চারিদিক থেকে পাথর ছুঁড়ে অতিকায় জন্তুকে বধ করতে হয়, জন্তু লুকিয়ে এসে মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়! স্নেহ-মমতা আসেনি, দাক্ষিণ্য এসে পৌঁছয়নি, পিতামাতা পুত্র কন্যা—এদের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠেনি। এগুলি পটে আঁকা ছবি নয়, মূর্তি দিয়ে প্রকাশ করা। অতঃপর জীবন-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে বংশপরম্পরায় মানবজাতির ঐতিহাসিক যুগে এসে উত্তীর্ণ হওয়া! চারিদিকে আশ্চর্য ছবি এবং বহুবিচিত্রের সমাবেশ দেখে আমরা অভিভূত। ভারতীয় বিভাগের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও নেহরুর মূর্তি। রঙীন তৈলচিত্রের মধ্যে রয়েছে শ্রীযুক্ত পৃথ্বীরাজ কাপুর এবং শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেনের ছবি,—এবং ভারতের অন্যান্য বহু প্রদর্শনী। এ ছাড়া রয়েছে চীন, ব্রহ্ম, ইতালী, ফরাসী, জর্মন, উজবেক, মধ্য-এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য। আজ আমাদের সঙ্গে দোভাষী হিসেবে রয়েছেন শ্রীমতী বিকোভা, তিনি খাঁটি রুশ মেয়ে। তিনি বাঙলা বলতে এবং পড়তে জানেন। প্রাচ্য বিদ্যার তিনি একজন অধ্যাপিকা এবং বিদুষী। অত্যন্ত শান্ত, সৌজন্যশীলা এবং বিশেষ ভদ্র নারী। মস্কোর সাংস্কৃতিক মহলে তাঁর নাম-ডাক খুব। ভারতীয় এবং বিশেষ ক'রে বাঙলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। সুনীতিবাবুর সকল কর্মে তিনি আগ্রহশীল। তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে রুশ নারী সম্বন্ধে মন শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। বিকোভার বয়স ৩২।৩৪ হতে পারে। বাহিরে আসার আগে ভিজিটার্সের খাতায় আমাদের কিছু কিছু লিখতে হল!

থিয়েটার, সিনেমা, ক্লাব, এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত, আমি গুণিনি। তবে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় তাঁদের অধীনে রেডিও ও টেলিভিশন, সকল শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের কর্মীসমাজ, লেখক-সমাজ, শিল্পী-সমাজ, সঙ্গীত-লেখক সমাজ, নির্মাতা সমাজ, সিনেমা-কর্মী সমাজ, সাংবাদিক-সমাজ, রঙ্গালয় সমিতি, পররাষ্ট্রীয় মৈত্রী সমিতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান-শিক্ষা সমাজ এবং লোকশিল্প সমিতি প্রভৃতি আপন আয়ত্তে রেখেছেন। এগুলি শুধু নামে মাত্র আপন আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে না! প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক অট্টালিকা এবং এক একটির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা। শুধু এক তাসকন্দের সমুদ্রে শহরেই প্রতিদিন আটটি থিয়েটার এবং অপেরা জনপরিপূর্ণ থাকে,—অন্তত তিন দিন আগে টিকিট না কিনলে চলে না! অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ নরনারী টাকা খরচ করার জন্য ব্যগ্র, কারণ ভবিষ্যতের ভাবনা তাদের কম। যারা ওরই মধ্যে বিলাস চায়, তা'রা ব্যাঙ্কে টাকাও জমায়! পথের ঝাড়ুদার ডিপার্টমেন্টাল্ দোকানে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে একই সামগ্রী কিনছে,—উভয়ের পোষাক আসাক একই প্রকার পরিচ্ছন্ন। কেউ কারোকে ছোটবড় মনে করছে না,—প্রাচীন চিন্তাভ্যাস গত চল্লিশ বছরে তার শিকড় তুলে নিয়ে সরে গেছে। এটি আমার চোখে নতুন।

মিউজিয়ম দেখা গেল মোট পাঁচটি। লাইব্রেরী চৌত্রিশটি, এবং এর অনেকগুলি এক একজনের নামাঙ্কিত। ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীটি লেনিনের নামে। এ ছাড়া আছে গোগল, স্টালিন, নাভয়, নরিম্যান, মায়াকোভস্কি, গোর্কি, অস্ত্রভস্কি, গাইদার, লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়া এবং পুশকিন। স্পোর্টস্ স্টাডিয়াম আছে পাঁচটি, জলখেলার সৈকত দুটি, এবং স্পোর্টস এসোসিয়েসন মোট বারোটি। মোট আশী হাজার ছেলেমেয়েদের এগুলি খেলাধুলার কেন্দ্র। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বোচ্চ কর্তা হলেন আমাদের গাইড—রুস্তম ইসমাইলভ। তিনি কত হাজার রুবল মাইনে পান্ সে-খোঁজ নিতে এখনও বাকি আছে!

প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে, শক্তিতে, দুর্জয় সংকল্পে, এবং ইচ্ছার দৃঢ়তায় উঠে দাঁড়িয়েছে মরুভূমির একটা জাতি, এবং আলীশের নাভয়কে তারা এই কারণে শ্রদ্ধা করে যে, তিনি পাঁচশ' বছর আগে মধ্য-এশিয়ার এই সম্পদ ও সৌভাগ্যের স্বপ্নচ্ছবি এঁকে গিয়েছিলেন। "শিল্পী ফরহাদ্"-এর প্রণয় কাহিনীটি তিনি প্রথম কবিতায় প্রকাশ করেন,—এবং অতঃপর এটি নাটক হয়ে ওঠে। চীনদেশের প্রতিভাশালী যাদুকর-ইঞ্জিনিয়ার "ফরহাদ্" মধ্য-এশিয়ায় জলস্রোতের সঙ্গে জীবনের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন, এবং রাজকুমারী "শিরীন" তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পথে-পথে বেরিয়ে এসেছিলেন, এইটি ছিল নাটকের প্রতিপাদ্য। এই নাটকটি এককালে বাঙলায় লেখেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এবং "শিরী-ফরহাদ্" অভিনীত হয় 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গলা সন ১৩১৩ অব্দে। সেটি আজ থেকে ৫৫ বছর আগেকার কথা। নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর কর্তা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। এটি ছিল গীতিনাট্য। বিস্ময়ের কথা এই, পঞ্চান্ন বছর আগে একজন বাঙালী লেখক আলীশের নাভয়ের কবিতা ও গীতিনাট্যের খোঁজ পেয়েছিলেন!

(ক্রমশঃ)

॥ জুয়া খেলার মাঠ ॥

মার্কিণ দেশের জনপ্রিয় খেলা বাস্কেটবল আর বেসবল। এই দুই খেলার ফলাফলকে কেন্দ্র করে এমন জুয়া খেলা সুরু হয়েছে যে মাঠকেই জুয়া খেলার কেন্দ্র বলে মনে হয়। হাজার হাজার ডলার হাওয়ায় ঘুরছে—আর এহাত থেকে ওহাতে চলে যাচ্ছে—খাস মার্কিণ মুলুকে।

এ্যারল ওয়াগম্যানের বয়স ২৮ বছর হলেও সে আদালতে ৩৭টি ঘুষ দেওয়া ও একটি ষড়যন্ত্রের মামলার সংগে জড়িত বলে স্বীকার করেছে; তার এ কীর্তি কাহিনীর সূত্রপাত বহুদিন পূর্বে থেকেই। গত এপ্রিল মাসে সে একবার ধরা পড়ে। তখন প্রকাশ পায় যে সে পয়েণ্ট ছেড়ে দেওয়ার জন্য একাধিক খেলোয়াড়কে কমপক্ষে ১৪২৫০ ডলার ঘুষ দিয়েছে। এক বছর আগে ফুটবল খেলার "ব্যবস্থা" করতে গিয়ে শাস্তি পায়। মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে যে, ওয়াগম্যান বাস্কেট বল খেলার ব্যাপারে পাঁচটি কলেজের ৯জন খেলোয়াড়ের প্রত্যেককে ৭৫০ ডলার থেকে ১৫০০ ডলার পর্যন্ত ঘুষ দিয়েছে। আর এই ডলার প্রসাদের আশ্চর্য ফল ফলেছে। খেলায় পয়েণ্টের ব্যবধান গিয়েছে অবিশ্বাস্যভাবে কমে। এর থেকে বোঝা যায়, ওয়াগম্যান অবশ্য আনকোরা আসামী নয়। তাছাড়া জুরির তদন্তে জানা গেছে যে, ঘুষের ব্যাপারে ২২টি স্কুলের প্রায় ৩৭জন খেলোয়াড় জড়িত।

॥ "ঠাণ্ডা" আলো ॥

"অত্যধিক উত্তাপই হল আলো"। স্কুলে বিজ্ঞানের ক্লাসে তাই শেখান হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতের আলোয়, উত্তাপের সংগে কোন সম্পর্ক থাকবে না। তা হবে ঠাণ্ডা আলো।

ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকের কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোক এবং আলোকিতকরণ প্রতিষ্ঠানের একদল গবেষক হয়তো এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবেন আলোর জগতে। এঁরা তেজস্ক্রিয় আলো উৎপাদন করা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি যখন কোন উজ্জ্বল পদার্থের সংস্পর্শে আসে, তখন এই "ঠাণ্ডা" আলো উৎপন্ন হয়। একটি ঘড়ির আলোকিত কাঁটা ঠাণ্ডা আলো দেয়। জোনাকী পোকা ঠাণ্ডা আলো বিকীরণ করে, কিন্তু সেই আলো মানুষ বা পশুর পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু রেডিয়ামসহ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হয় বলে আলোকবিকীরণকারী ঘড়ির কাঁটা একটুখানি বিপজ্জনক। এই জিনিষ দিয়ে উজ্জ্বল তেজস্ক্রিয় আলো তৈরী করতে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োজন এবং তাতে বিকীরণের বিপদও অনেক বেশী বাড়বে। সম্প্রতি যে সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী করা হচ্ছে তাতে অনেক রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যাচ্ছে। যেগুলি থেকে কেবলমাত্র বিটা রশ্মির বিকীরণ হয় এবং সেগুলি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। এই পদার্থগুলি আলোর উপযোগী বলে মনে হয়।

এই পদ্ধতিতে যে তেজস্ক্রিয় আলোর নক্সা তৈরী করা হয়েছে, তা থেকে স্বাভাবিক ১৫ অথবা ২৫ ওয়াটের বাল্বের মতো আলো পাওয়া যাবে। দূর গ্রামের কুটীর, জাহাজের কেবিন, তাঁবু, ট্রাফিক আলো, পথের বাঁক অথবা পকেটে রাখবার মতো চিরকাল ধরে আলোক-বিকীরণকারী টর্চ লাইট হিসেবে, তেজস্ক্রিয় আলো এখনই সম্পূর্ণ উপযোগী বলে মনে করা হচ্ছে। রাত্রিতে কাজ করার মতো উজ্জ্বল বাল্ব বা টিউব এখনও তৈরী করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আলোকিতকরণের কারিগরী বিদ্যায়—প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এ উন্নতি নতুন একটা বিপ্লবের সম্ভাবনাপূর্ণ। কাজেই ভবিষ্যতের পৃথিবীর আলোর উৎস হবে তেজস্ক্রিয় "ঠাণ্ডা" আলো।

॥ অস্ত্রোপচার পর্যবেক্ষক ॥

এ ব্যাপারটা একমাত্র মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। কিন্তু আধুনিক সোভিয়েৎ রাশিয়ায় কাজটা করছে যন্ত্র। অপারেশনের জায়গায় অধিক লোক থাকা খুবই খারাপ। কিন্তু এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটি অপারেশনকারী ডাক্তারকে সাহায্য করবে। ৪।৫ জন নার্সের কাজ যন্ত্রটি একাই করবে। ফলে অপারেশনের সময় লোকের প্রয়োজন হবে খুব কম।

ডাক্তার যখন গুরুতর একটি রোগীর দেহে অপারেশন করছেন। তখন যন্ত্রটি আপনা হতেই রোগীর নাড়ির গতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, রক্তের চাপ, হৃৎস্পন্দন, তাপমাত্রা এবং মস্তিষ্কের অবস্থা খুব সহজেই ডাক্তারকে বলবে সঠিকভাবে: এ যন্ত্রটি ব্যাপক হারে উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

॥ বিশ্বের বৃহত্তম প্রপেলার ॥

প্রপেলার জাহাজের অন্যতম অংশ এবং এর ওপরেই জাহাজের নিরাপত্তা নির্ভর করে। ৭৭০০০ টন ওজনের জাহাজ চালনার জন্য হামবুর্গে ৪৪ টন ওজনের একটি প্রপেলার নির্মাণ করা হয়েছে। এটির ব্যাস হল প্রায় ২৬ ফিট। তামা, এ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানীজের মিশ্রণে নির্মিত এই প্রপেলারটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রপেলার। যে কারখানায় এই প্রপেলারটি নির্মিত হয়েছে, সেটি জাহাজের প্রপেলার তৈরীর ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম কারখানা এবং ক্ষুদ্র মোটর বোর্ডের প্রপেলার থেকে সুরু করে বিরাট আকারের জাহাজের প্রপেলার তৈরী করে। কারখানাটির বয়স একশ বছরের ওপর। বিশ্বের সমস্ত জাহাজ নির্মাণ কারখানার জন্য সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করতে এই কারখানার মোট উৎপাদনের ৭০ ভাগ রপ্তানী হয়। বর্তমানে সমুদ্রগামী প্রায় প্রতি চতুর্থ জাহাজটির প্রপেলার জার্মাণীতে তৈরী হয়। অনেক সময়ই বিদেশী জাহাজ-মালিক বিদেশের কোন জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় জাহাজ তৈরীর অর্ডার দিলেও প্রপেলার তৈরী করে জার্মাণী থেকে।

সমুদ্র অধিকাংশ সময়েই উত্তাল থাকে। আর সেই উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের গতি নির্ভর করে প্রপেলারের ওপর। প্রপেলার তৈরীর জন্য বিপুল পরিশ্রম আর অত্যন্ত নির্ভুলতার প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় যে জাহাজই তৈরী করা হোক, তার প্রত্যেকটির জন্য পৃথক প্রপেলার প্রয়োজন। জলস্রোতের গতি এবং জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভুলভাবে স্থির করতে হয় নক্সা তৈরী করার সময়। হামবুর্গের কারখানাটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করে। নতুন কোন প্রপেলারের নক্সা আঁকা সম্পূর্ণ হলে, অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীরা ঢালাইয়ের জন্য ধাতু-মিশ্রণ তৈরী করে। অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই মিশ্রণ সর্বক্ষণ পরীক্ষা করা হয়। এগুলি এমন সতর্কতার সংগে ঢালাই করা হয়, যাতে মাপের এক মিলিমিটারের ভগ্নাংশেরও কম বেশী না হয়। ঢালাই হওয়ার পর এগুলি বিশেষ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ৪৪ টনের মতো বিপুল আকারের প্রপেলার তৈরী করতে নক্সা আঁকার পর, ডেলিভারী দেওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজে দুমাস সময় লাগে।
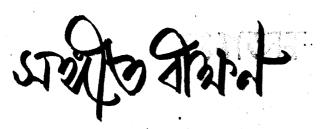
আনন্দভৈরব

নিখিল ভারত সদারংগ সংগীত সম্মেলন

এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ ২৪শে নভেম্বরের এবং দ্বিতীয় থেকে অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ ১লা ডিসেম্বরের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

নবম অধিবেশনে বেহালায় বেহাগ রাগের আলাপ ও গৎ এবং পরে ঠুংরি বাজিয়ে শোনান শ্রী ডি, কে, দাতার। খেয়াল পরিবেশন করেন ওস্তাদ আমীর খাঁ প্রথমে কেদার ও নায়কী কানাড়া রাগে এবং পরে বিশেষ অনুরোধে চন্দ্রকোষ রাগে। এই অধিবেশনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্বরোদে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ও সেতারে শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বৈত বাদন। তাঁরা পূরিয়া-কল্যাণ, মাজখাম্বাজ ও রাগমালায় আলাপ ও গৎ পরিবেশন করেন। সুরের পরিবেশ সৃষ্টিতে, রাগালাপে, ঝালায়, তান প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে, ছন্দোবৈচিত্র্যে এই দুই শিল্পীর দ্বৈতবাদন বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছিল। তৎসঙ্গে পণ্ডিত কিষেণ মহারাজের তবলা-সংগতও উল্লেখযোগ্য। সারারাত্রিব্যাপী এই নবম অধিবেশনের এবং এই অষ্টম বার্ষিক সংগীত সম্মেলনের শেষ শিল্পী পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর। তিনি ললিত রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। তবলা সংগত করেন পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ এবং সারেংগীতে ছিলেন মহম্মদ সগীরুদ্দিন খাঁ। এই বয়সেও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর উদাত্ত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। রাগ-রূপায়ণে তাঁর বিশুদ্ধ পদ্ধতি ও সরস মেজাজের ফলে একটি চমৎকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। 'যোগী মত জা' বিখ্যাত এই ভজনটি গেয়ে তিনি তাঁর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

এই সম্মেলনের নয়টি অধিবেশনে উল্লিখিত শিল্পীগণ ছাড়াও আরো অনেক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন ও তাঁদের নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

সংগীত সম্মেলনের পক্ষে মহাজাতি সদন উপযুক্ত স্থান। যাতায়াতের ব্যবস্থায়ও অসুবিধে ঘটার কথা নয়। তৎসত্ত্বেও এই সম্মেলনে শ্রোতার সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় আশানুরূপ মনে হয়নি। সারারাত্রিব্যাপী শেষ অধিবেশনটি ছাড়া বাকি অধিবেশনগুলি রাত্রি বারোটার মধ্যে শেষ করার জন্য নিয়মবদ্ধ ছিল। এরূপ নিয়মের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার ফলে কোনো কোনো শিল্পীর পরিবেশন কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এবং শিল্পীও এই সময়ের গণ্ডিবদ্ধতার জন্য অস্বস্তি অনুভব করেন।

এই সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডক্টর বি ভি কেসকার বলেছিলেন, সঙ্গীতের মান উন্নয়নের জন্য কেবলমাত্র ভালো গায়কের প্রয়োজন, এমন নয়, সেই সঙ্গে ভালো শ্রোতারও প্রয়োজন। একথা ঠিক। সমজদার শ্রোতা পেলে শিল্পী রস-সৃষ্টিতে সফল হতে অধিকতর সচেষ্ট হন। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় শিল্পী যখন দ্রুত লয়ের কসরৎ দেখাতে থাকেন, তখনই তাঁর ভাগ্যে অধিকাংশ শ্রোতার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি বাহবা মেলে। তিনি তাঁর গায়ন-বাদন-ক্রিয়ায় এতক্ষণ অর্থাৎ লয়-কৌশল দেখানোর আগে পর্যন্ত যে বিস্তারিত আলাপের ভূমিকা করে এসেছেন, মীড়-প্রয়োগের যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন, স্বর ও তানের যে সাবলীল প্রয়োগ করেছেন, যে ছন্দোবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মূল্যায়ন যেন গৌণ হয়ে পড়ে। তার ফলে হয় শিল্পী নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন, নয়তো লয়ের কসরৎ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত রসভঙ্গ করে ক্ষান্ত হন।

আলোচ্য সম্মেলনে বাংলা গান পরিবেশন উল্লেখযোগ্য। চারটি অধিবেশনে বাংলা গান পরিবেশিত হয়েছে, তার মধ্যে দুটিতে বাংলা খেয়াল। বাংলা খেয়াল সম্পর্কে সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিতর্ক হচ্ছে এবং হয়তো ভবিষ্যতে আরও হবে। কিন্তু এই বিতর্কের আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়: উচ্চারণের অস্পষ্টতার জন্য যদি খেয়াল গায়কের (তথা গায়কের) কণ্ঠে গীত গানের কথা বোধগম্য না হয় তা হলে ভাষার প্রশ্ন, তা হিন্দীই হোক আর বাংলাই হোক অথবা অন্য কোনো ভাষাই হোক, বিবেচ্য ধর্তব্যের বাইরে চলে যায়। যে শব্দচয়ন দ্বারা ভাষার গঠন হয়, সেই শব্দ ও শব্দ-সমষ্টিকে শ্রবণগোচর ও বোধগম্য করানোই প্রথম কথা। ভাষার উপযোগিতা তার পরের প্রসঙ্গ।

বর্তমানে সংগীত সম্মেলনে সংগীত সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা প্রায় হয় না বললেই চলে। হয়তো শ্রোতৃসাধারণ সংগীততত্ত্ব আলোচনা শুনতে উৎসাহী না হতে পারেন ভেবে ব্যবস্থা করা হয় না। কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ হলেও এরূপ আলোচনার প্রয়োজন আছে। আজও ঘরানায় ঘরানায় অনেক ক্ষেত্রে একই রাগ-নিয়মে পার্থক্য বিদ্যমান। সঙ্গীতকে ব্যাপকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হলে রাগ-নিয়মের একীকরণ ও সামঞ্জস্য প্রয়োজন। তার জন্যও সম্মেলনে সঙ্গীতালোচনার আবশ্যকতা আছে।

ধ্রুপদ, বীণ এবং কথক ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যান্য ক্ল্যাসিকাল নৃত্য অনুষ্ঠানসূচীতে অধিকতর সন্নিবেশ করা যায় কিনা বিবেচনা করে দেখতে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই।

মতামত

রবীন্দ্র কবিতার হিন্দী অনুবাদ

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু,

১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকার প্রকাশিত শ্রীশান্ত রায় মহাশয়ের মন্তব্যের উপর আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার হিন্দী অনুবাদ সম্বন্ধে আমি কিছু উগ্র-পন্থী, কিন্তু হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে আমার কোনও বিদ্বেষ নাই। তাহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আমি "হিন্দী ভাষায় প্রেমের কবিতা" শীর্ষক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। পুস্তকখানি পড়িয়া স্বর্গত ডাক্তার অমরনাথ ঝা মহাশয় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "হিন্দী ভাষার এরূপ গুণ-গ্রাহী পুস্তক তিনি পূর্বে পড়েন নাই।" সুতরাং আমার মন্তব্য হিন্দী ভাষার উপর বিদ্বেষপ্রসূত নহে।

অনেকেই স্বীকার করেন যে আধুনিক হিন্দী ভাষা অত্যন্ত অপরিণত ভাষা, বাচনভঙ্গী ও শব্দসম্পদে অত্যন্ত দরিদ্র। কেবল বাংলা ভাষার তুলনায় নয়, মধ্যযুগের "রীতি কবিতার" গুণের তুলনায় আধুনিক হিন্দী অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও প্রকাশরীতিতে অত্যন্ত গুণহীন।

এই দরিদ্র ভাষার মারফত রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার আস্বাদন করিবার চেষ্টা বাতুলের প্রয়াস। সুতরাং এইরূপ গুণহীন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য কি? আমার মনে হয় ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, হিন্দী ভাষাভাষী বন্ধুদের মূল বাংলা ভাষা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য আস্বাদনের বাধা রচনা করা। উর্দু-ঘেঁসা হিন্দী ভাষার কথা বাদ দিলে, সাধারণ হিন্দী ও বাংলা ভাষার মধ্যে খুব বেশী প্রভেদ নাই। অনেক সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব্দ দুই ভাষাতেই প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে। হিন্দী ভাষাভাষীদের পক্ষে বাংলা ভাষা শিখিয়া লওয়া বিশেষ কিছু আয়াসসাধ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা নাগরী অক্ষরে ছাপিলে—হিন্দী ভাষাভাষীরা অনেকেই সহজে ইহার রসাস্বাদ করিতে পারেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি যে আমার এক তামিল বন্ধু আমার বাড়ীতে এক সপ্তাহকাল মাত্র অতিথি ছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের কিছু অংশ তিনি ইংরেজী অক্ষরে অনুলিখিত করিয়া লইয়া মূল কবিতার রস প্রভূতরূপে আস্বাদন করিয়া যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছিলেন। আমি যখন চীনদেশে যাই—সে সময়ে একদল চীনদেশের স্কুলের ছাত্রী—মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান "আমারে কে নিবি ভাই" ইংরেজী অক্ষরে লিখিয়া লইয়া, ইহার সুর আয়ত্ত করিয়া তাহার পরদিন সমবেত কন্ঠে শুনাইয়া আমাকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বাংলার একটি কীর্তন গানও—"কি আর বলিব আমি" —ঐ স্কুলের ছাত্রীরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে দখল করিয়া আমাকে চমকৃত করিয়াছিলেন।

আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে অবাঙ্গালী বন্ধুদের পক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষা করা এমন কিছু দুরূহ তপস্যা নহে। আমার সুযোগ্য বন্ধু শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—অনেক অবাঙ্গালীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা শিখাইতেছেন। লক্ষ্য করিয়াছি যে তাঁহার বাংলা শিক্ষার ক্লাসে হিন্দী ভাষাভাষীরা বড় আসেন না।

ইহার কারণ হইল বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিকট বিমুখী ভাব। আমাদের হিন্দী ভাষাভাষী বন্ধুগণ হিন্দী ভাষার বর্ম পরিধান করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এই মনোভাব বিদ্বেষপ্রসূত। অনেকেই জানেন, আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের কেরামতিতে, হিন্দী ভাষা, বাংলা ভাষা এবং তামিল ভাষাকে আঘাত করিবার একটি মারাত্মক অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আমি দৃঢ়স্বরে দাবী করিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিবার কোনও নীতিমূলক কারণ নাই। ইহা নিশ্চয় অভিসন্ধিমূলক।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার কাব্যের জন্য দিল্লীতে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হইয়াছে এবং হইতেছে। গত বৎসরে, আমি শ্রীঅমল হোমের মারফত আবেদন দিয়াছিলাম—যে অনুবাদ করিয়া অর্থব্যয় না করিয়া বিশিষ্ট অর্থ পারিতোষিক ঘোষণা করিয়া অন্ততঃ ১০০ শত জন হিন্দী ভাষাভাষীকে বাংলা শিখান হউক, যাহাতে অন্ততঃ একশত জন অবাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের কবিতা মূল ভাষায় পড়িয়া রস আস্বাদন করিতে পারেন। বলা বাহুল্য আমার আবেদন দিল্লীতে মনঃপূত হয় নাই।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে অতি শ্রেষ্ঠ অনুবাদেও আসলের সুর, রস ও সৌরভের এক ভগ্নাংশও পরিবেশন করা যায় না।

আমাদের হিন্দীভাষী বন্ধুগণ যদি যথার্থই রবীন্দ্র-প্রেমিক হইয়া উঠিয়া থাকেন তাঁহারা অনুবাদের অন্তরাল পরিহার করিয়া রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতার আস্বাদন করুন।

অনুবাদের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে উপহাস ও অবমাননা করা বহুদিন চলিয়াছে; ইহার বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিবাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

—অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ তার জীবনেও এসেছে সেই পথ চেয়ে বসে থাকবার দিন। বন্ধুদের মত দুটি বেলা ডাকপিয়নের প্রতীক্ষা। কি জানি কী লিখবে নরেন? সেই সব কথা, সখীরা যা তন্ময় হয়ে শোনাত তার কানে? কিন্তু এ মানুষটা যে বড্ড লাজুক আর মুখচোরা। মুখ ফুটে দুটো কথা বলতে গেলে তিনবার ঢোক গেলে। তা হোক। চিঠির কথা তো মুখ ফুটে বলতে হয় না। সে মুখের কথা নয়; মনের কথা, হাত দিয়ে বলা। চিঠি হল মানুষের মানস-লিপি। বাইরেটা যাই হোক, মনটা যে ওর সত্যিই সুন্দর। চিঠির মধ্যে থাকবে তার প্রতিচ্ছায়া।

চিঠি যখন এল নির্মলার সমস্ত প্রত্যাশা যেন তাকে ব্যঙ্গ করে উঠল। এই তার প্রথম প্রেমপত্র! ইচ্ছা হল তখনই ছিঁড়ে ফেলে। তারপর কেমন মায়া হল মানুষটার উপর। লেখার মধ্যে আগাগোড়া কেমন একটি অসহায় সুর। 'সব কথা তোমাকে জানালাম, বল এবার কি করবো'—এমনি একটা নির্ভরতা। মনের একটা দিক ক্ষোভে অভিমানে ভরে উঠলেও আর একদিকে রইল এই করুণা। তার সঙ্গে একটুখানি গর্ব—স্বামী তাকে আর কিছু না দিক, দিয়েছে মান, দিয়েছে গৃহিণীর মর্যাদা।

যদিও গৃহিণী হবার মত বয়স তার নয়, তবু এই সান্ত্বনা দিয়েই মনকে সে বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু মেজদি ও বিজনের চাপাগলার দুটি কথা সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। 'বেচারা কাজের মানুষ তায় ইস্কুল-মাষ্টার'। এর ভিতরে যে সুস্পষ্ট অবজ্ঞা ছিল তারই আঘাতে সে স্বামীর উপর রুষ্ট হয়ে উঠল। তারপর ধিক্কার দিল নিজের অদৃষ্টকে। কেন এমন হয়? কাজের মানুষ কি সংসারে ঐ একটিই? ইস্কুল-মাস্টার কি আর নেই? সদ্য পরিণীতা স্ত্রীর কাছে এমনি চিঠিই কি তারা লিখে থাকে?

অনেক দিন পরে, মনের রঙ যখন ফিকে হয়ে গেছে, ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে নয়, এমনি কী একটা কথাচ্ছলে স্বামীর কাছে এই চিঠির প্রসঙ্গ তুলেছিল নির্মলা। পরিহাস-তরল সুরে বলেছিল, নতুন বৌএর কাছে ঐ রকম চিঠি লেখে নাকি কেউ! কী ফ্যাসাদেই না পড়েছিলাম সেদিন! বন্ধুরা বলছে, ঝগড়া হয়েছে নাকি তোদের?

'কেন?' বিস্ময় প্রকাশ করেছিল নরেন, 'ঝগড়ার কথা তো ছিল না ওতে। যদ্দূর মনে পড়ে কাজের কথাই লিখেছিলাম।

এমন লোককে কেমন করে বোঝানো যায়, স্বামী-স্ত্রীর যে জগৎ, তার সবখানিই কাজের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয়, তার বাইরে আছে 'অ-কাজ' বা 'অ-দরকার'এর অন্তহীন সীমানা। সেটা নিছক 'বাজে কথা'র রাজ্য, তারই থলে বয়ে আনে চিঠি। সে তো প্রয়োজনের পেয়াদা নয়, অ-প্রয়োজনের দূত।

বিজন কদিন থেকেই 'যাবো' 'যাবো' করছিল। সংকল্পটা যতখানি মৌখিক ততটা বোধহয় আন্তরিক নয়। ভিতরে তেমন জোর ছিল না। তাই এ তরফ থেকে মৃদু আপত্তির হাওয়া উঠতে না উঠতেই ভেঙে যাচ্ছিল। এবারে ওর বাড়ির দিক থেকেও রীতিমত তাগিদ এসে গেল। আর দেরি করা চলে না। কাল সকালের গাড়িতেই যাওয়া স্থির। আজ তাই একটু বিশেষ রকম রান্না-বান্না'র আয়োজন হয়েছিল। নির্মলা এবং তার মা সকাল থেকেই সে সব নিয়ে ব্যস্ত। বিমলাকে এ জাতীয় ব্যাপারে কেউ ডাকে না। এদিকে তার আগ্রহও নেই। বিয়ের আগে মায়ের কাছে একটু-আধটু যা শিখেছিল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে সব ঝালাবার দরকার হয়নি। ঠাকুর যা করে। দেখাশুনো যেটুকু দরকার তার জন্যে তো শ্বাশুড়ীই রয়েছেন।

রান্নার খানিকটা দেরি দেখে সে তার নিজের ঘরে শুয়ে ভিজে চুলের গোছা খাটের পাশ দিয়ে নামিয়ে দিয়ে একখানা হালকা ধরনের নভেল নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছিল। বিজন সু'চারবার নির্মলাকে একটু আড়ালে পাবার বৃথা চেষ্টা করে অগত্যা বৈঠকখানায় গিয়ে খবরের কাগজে মন দিয়েছিল। সেখানে কেউ নেই। জগদীশবাবু খানিকক্ষণ আগে কাছারি চলে গেছেন।

একটি লোক এসে সামনের খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। পরনে মোটা ধুতি; ঝোলানো নয়, উল্টে নিয়ে নিচের দিকটা কোমরের সামনে গোঁজা, পল্লী-অঞ্চলে বয়স্ক লোকেরা যে-রকম পরে থাকে। গায়ে হাতেকাচা টুইলের শার্ট, ইস্ত্রি করা নয় বলে এখানে-ওখানে কুঁচকে রয়েছে। গলার বোতাম লাগানো। কলারটা বেশ এঁটে বসেছে। বুকের উপর দুটি বোতাম নেই। জামার হাত-দুটোও ছোট হয়ে গেছে। বোতামের বদলে সুতো দিয়ে বাঁধা। পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। হাতে বাঁশের ডাঁট-ওয়ালা ছাতা, পুরানো কালো কাপড়ের উপর নতুন সাদা ছাউনি।

লোকটি চৌকাট পেরোতেই বিজন একপলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, বাবু নেই; কোর্টে গেছেন।

এর পরেও চলে না গিয়ে ইতস্ততঃ করছে দেখে যোগ করল, চারটের পর এলে দেখা হবে।

সেই মুহূর্তে 'তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে, ঠাকুরপো' বলতে বলতে পেছন

দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল বিমলা। আগন্তুকের দিকে নজর পড়তেই বসে উঠল, এ কি! নরেন যে? কখন এলে তুমি?

সকুণ্ঠ উত্তর এল, এই অাসছি।

বিজন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের সুরে বলল, নরেন! মানে, আমাদের নরেনদা, অর্থাৎ নির্মলার—

—হ্যাঁ গো। তুমি বুঝি চিনতে পারনি? চিনবে কি করে? দ্যাখইনি তো কোনোদিন।

সর্বনাশ! আর আমি ও'কে মক্কেল মনে করে সোজা বিদেয় করে দিয়েছিলাম।

—তাই নাকি?—বলে, হেসে গড়িয়ে গেল বিমলা।

—ঈস্, ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছিসে বৌদি। তা নৈলে আরো কী করে বসতাম কে জানে?

—"তা, তোমার কোনো দোষ নেই," বলেই নরেনের দিকে ফিরে কৌতুকের সুরে যোগ করল বিমলা, কিছু মনে করো না ভাই, তোমাকে দেখে শ্বশুরবাড়ি এসেছ মোটেই মনে হয় না, ঠিক মনে হচ্ছে, গাঁ থেকে কেউ মামলা করতে এল। চল ভেতরে চল। বাড়ির খবর সব ভালো?

—আজ্ঞে, হাঁ।

ছাতাটা দুহাতে ধরে সংকুচিত ভঙ্গিতে নরেন বিমলার পিছন পিছন বাড়ির মধ্যে ঢুকল। বিজনও গেল তার সংগে।

ভিতরে গিয়েও নরেনকে আর এক দফা হাসি-ঠাট্টার পাল্লায় পড়তে হল। বিমলা ব্যাপারটাকে বেশ খানিকটা রঙ চড়িয়ে হাজির করল সকলের সামনে। কলকণ্ঠে চারদিক মুখর করে বলল, আমার গুণধর দেওরের কান্ড শোনো তোমরা। বেচারা নতুন জামাই; এসেছে শ্বশুরবাড়ি, আর উনি তাকে খালি গলাধাক্কাটা মারতে বাকী রেখেছেন। কী অপরাধ? না, সাজ-পোশাক আর চেহারাটা নাকি বাবুর গেঁয়ো মক্কেলগুলোর মত।

বলতে বলতে অট্টহাসির লহর তুলে বারান্দার উপরেই ধপাস করে বসে পড়ল। আশে-পাশে সকলের মুখে ফুটে উঠল সে হাসির ঝলক। ঝি-চাকর এমন কি. গৃহিণীও একটু মুখ টিপে হাসলেন।

রান্নাঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সকলের অলক্ষ্যে শুধু একজনের মুখে নেমে এল থমথমে অন্ধকার। স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই নির্মলার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। লোকটা কী! পরিহাসের নামে এত লাঞ্ছনাতেও কোনো বিকার নেই। সকলের সংগে সেও যেন এটা উপভোগ করছে! এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হতে পারে! তারপর আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঐ নিরীহ লোকটার উপর।

মা বুঝতে পারলেন না। নির্মলার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, একেবারে ধোঁয়ার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছিস? বাইরে গিয়ে দাঁড়া। এবার আমি একাই সামলাতে পারবো। তুই বরং ওদিকটা দ্যাখ। নোংরা কাপড়টা ছেড়ে একখানা ভালো শাড়ি বের করে পর। মুখ-চুখগুলো পরিষ্কার করে নে।

খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে স্বামীর সংগে যখন একান্তে দেখা হল, এতক্ষণের সেই জ্বালাই বেরিয়ে এল নির্মলার মুখ থেকে, 'দেশে কি ধোবার আকাল পড়েছে? জামা-কাপড়টাও কাচিয়ে নেওয়া যায় না?'

নরেন নিজের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সলজ্জ মৃদু হাসির সংগে বলল, ময়লা দেখাচ্ছে নাকি? কালই তো সাবান দিয়ে কেচে নিলাম।

—সাবান-কাচা জামা পরে কেউ বাইরে বেরোয়?

—ইস্কুলে তো এই পরেই যাই রোজ।

—ওগুলো পরে ঐ গাঁয়ের ইস্কুলেই যাওয়া যায়, এখানে আসা চলে না।

নরেন জবাব দিল না। নির্মলা আবার বলল, আর ঐ বিশ্রী ছাতাটা না আনলে হত না?

—রোদের মধ্যে অনেকটা পথ—

—তাই বলে, ঐ সাদা কাপড়ের তালি-দেওয়া বুড়োটে ছাতা? ও জিনিস কোনো ভদ্দরলোকে ব্যবহার করে?

—অনেক দিনের পুরনো ছাতা। কয়েকটা জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম—

—'ফুটো হয়ে গেলে তাকে ফেলে দিতে হয়,' কথার মাঝখানেই ঝাঁঝিয়ে উঠল নির্মলা।

নরেন আর কথা বাড়াল না। বিমর্ষ মুখে বসে রইল। নির্মলার ক্ষোভ তখনো পড়েনি; রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে জলের আভাস ফুটে উঠল—কী দরকার ছিল সাত তাড়াতাড়ি ছুটে আসবার? একটা দিন পরে এলেও ঐ ছেলেটার সামনে এমন করে আমার মাথা কাটা যেত না। ছিঃ ছিঃ, কী ভাবল ও!

'ভাবা'টা যদি শুধু নীরবে হত তাহলেও তেমন ভাবনা ছিল না। কিন্তু যা ভাবে তাকে সরবে শোরগোল তুলে প্রকাশ করাই বিজনের স্বভাব। তারই আর একপ্রস্থ পরিচয় পাওয়া গেল বিকালে জলখাবার-এর বৈঠকে।

বারান্দায় পাশাপাশি আসন পেতে দুই কুটুম্বকে খাবার দিয়েছেন গৃহিণী। কাঁসার ডিশে লুচি, পটল-ভাজা, তার সংগে কয়েক রকমের মিষ্টি। নরেন এসে বসেছে, বিজনের তখনো দেখা নেই। কয়েকবার ডাকাডাকির পর পাশের ঘর থেকে যখন বেরোল, সেদিকে তাকিয়েই বিমলা এবং পাড়ার একদল মেয়ে (নতুন জামাই এসেছে খবর পেয়ে যারা আগে থেকেই এসে জড়ো হয়েছিল), খিলখিল করে হেসে উঠল। বিজনের মাথায় সেই সাদা তালি-দেওয়া ছাতাটা। বিমলা বলল, ওকি! বিষ্টি হচ্ছে নাকি, ঠাকুরপো?

—না, দেখছিলাম, দাদার ছাতাটা কোন্ যুগের। প্রথমে মনে হয়েছিল মোঘল আমলের। এখন দেখছি তারও অনেক আগে! সম্রাট অশোক কিংবা বিম্বিসার বোধহয় দান করে গিয়েছিলেন দাদাকে।

সংগে সংগে আর এক দফা হাসি।

বিজন হাসল না। তেমনি গবেষকসুলভ বিজ্ঞের মত বলল, তা, এক কাজ করুন দাদা। আপনি এবার এটা ক্যালকাটা মিউজিয়ামে দান করে দিন। বলেন তো আমি পৌঁছে দিতে পারি। এরকম একটা ঐতিহাসিক সম্পদ ওরা দেখা মাত্র লুফে নেবে।

বলবার ভঙ্গিটা এমন গম্ভীর অথচ রসাল যে, সকলের সংগে নরেনও সেই হাসির পাল্লায় যোগ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার দু-একটি রেখা মুখের উপর ফুটে উঠতে না উঠতেই সহসা মিলিয়ে গেল। বোধহয় কিছুক্ষণ আগেকার দাম্পত্য দৃশ্যটা মনে পড়ে গিয়েছিল। আড় চোখে একবার দরজার দিকটায় তাকিয়েই সংগে সংগে নজর দিল খাবারের ডিশে।

কপাটের আড়ালে একখানি চেনা আঁচলের আভাস।

মেয়েদের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল, আচ্ছা ছেলে, বাবা। আরেক-জন তরুণীকে বলতে শোনা গেল, সুন্দর হাসাতে পারেন ভদ্দরলোক। মার মুখেও সুখ্যাতি—বিজন আমার ভারী আমুদে ছেলে। এই কটা দিন সমস্ত বাড়িখানাকে যেন মাতিয়ে রেখেছিল। এবার তুমি বসো বাবা। চা ঠান্ডা হয়ে গেল।

নিজের আসনে বসে পড়ে পাশের দিকে চেয়ে বলে উঠল, কই, দাদাকে চা দিলেন না?

গৃহিণী বললেন, ও চা খায় না।

—সে কি! কোন্ দেশী লোক আপনি! চা খান না কেন?

নরেন বলল, অভ্যাস নেই।

—কি মুশকিল, না খেলে অভ্যাস হবে কি করে? না, না সে হবে না। দিন মাইমা, ও'কে চা এনে দিন।

—কখনো খাইনি, ওটা ঠিক সহ্য হবে না।

—এই দেখুন, আপনি নিজের কথায় নিজেই হেরে যাচ্ছেন। কখনো যা খাননি, সহ্য হবে কি হবে না, বুঝলেন কি করে? খেয়ে দেখুন না? আলবত সহ্য হবে। না হয় একটা হজমিগুলি খেয়ে নেবেন।

নরেনের চোখদুটো অজ্ঞাতসারেই বোধহয় চলে গেল পাশের ঘরের দরজার দিকে। বিজন লক্ষ্য করেই বলে উঠল, কী দেখছেন? ও, অনারেবল হাইকোর্টের হুকুম চাই? যাও তো বৌদি, হুকুমটা নিয়ে এসো। জজসাহেবকে যদি সশরীরে হাজির করতে পার, আরো ভালো হয়। রায়টা সবাই শুনতে পারে।

বিমলা সেখানে বসেই হাঁক দিল, কইগো, জজসাহেব, একবার কাছারিতে এসো।

কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একজন বর্ষীয়সী বলে উঠলেন, আহা! সে কখনো আসতে পারে এই আড্ডায়? এমনিতেই নিরু কিরকম লাজুক।

—আচ্ছা, তার হয়ে হুকুমটা না হয় আমিই দিলাম, হুকুমের ভঙ্গিতেই বলল বিমলা।

—ব্যস্। মিটে গেল তাহলে। এবার চায়ের ব্যবস্থা করুন মাইমা।

—ও যখন বলছে, ওর অভ্যেস নেই......

—থাক, তোমাকে আর জামাই-এর হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। আমি দেখছি...বলতে বলতে বিমলা লুটিয়ে-পড়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে একরকম ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় কিন্তু সকলের চাপে পড়ে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল নরেন। গরমের পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারেনি। একটা চুমুক দিয়েই চমকে উঠল এবং বিকৃত মুখে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল। সমবেত হাসির রোল তুলে দৃশ্যটা সকলেই উপ-ভোগ করল। বিমলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। 'চুক' 'চুক' করে মুখে একটা ছদ্ম সহানুভূতির আওয়াজ তুলে বলল, আহা! জিবটা পুড়ে গেল!

দাঁড়াও আমি ঠান্ডা করে দিচ্ছি।

প্লেটে ঢেলে খানিকটা ঠান্ডা হবার পর 'এইবার নাও' বলে সেটা যখন তুলে ধরল, নরেন হাত বাড়াতে ইতস্ততঃ কর-ছিল। বিমলা তার জন্যে অপেক্ষা করল না। প্লেটখানা সোজা নিয়ে ঢেলে দিল মুখের মধ্যে। এ রকম একটা কান্ডের জন্যে নরেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে, খানিকটা মুখে গেলেও, বাকী তরল পদার্থটুকু কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জামা-কাপড়ে। চারদিকে আবার হাসির রোল।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে নিজের জীবনের দৃশ্যপটগুলো পাতা উলটে দেখতে গিয়ে নির্মলার মনে হয়েছে, এই সব ব্যাপারগুলোকে অন্য সকলের মত সেও তো সেদিন উপভোগ করতে পারত ততটা যদি নাও পেরে থাকে, ঠাট্টার সম্পর্কীয় আত্মীয়জনের সাধারণ পরি-হাস বলে গ্রহণ করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এ দিকটার দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা সেদিন তার ছিল না। একটা কথাই কেবল মনে হয়েছিল, এ পরিহাস নয়, উপহাস এবং তার চেয়েও বেশী, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা। একজন সামান্য লেখাপড়া-জানা গেঁয়ো গরীব চাষীর যা প্রাপ্য। তার জন্যে মেজদি বা বিজনকে সে কোনো দোষ দেয়নি। সমস্ত অন্তর বিরূপ হয়ে উঠেছিল এই অবজ্ঞার যে লক্ষ্যস্থল, সেই মানুষটার উপর। এরা যে তাকে কী চোখে দেখছে, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও যার নেই, কিংবা সে বোধ থাকলেও অপমানে জ্বলে উঠবার মত আত্মসম্মান-বোধ নেই, তেমন স্বামীকে সে ক্ষমা করে কেমন করে? সেই নিরীহ, নির্জীব, অতিশীতল লোকটার উপর করুণা নয়, তীব্র আঘাত দিয়ে তাকে সচেতন করে তুলবার জন্যেই সেদিন সে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

শ্বশুরবাড়ি এসে নতুন জামাতা একটা বেলা কাটিয়েই ফিরে যেতে চাইবে, রাত্রিবাস পর্যন্ত করবে না, কোনো শ্বশুর-শাশুড়ীই তা ধারণা করতে পারেন না। জগদীশবাবু কাছারি থেকে ফিরে নরেনের মুখে তার তখনই চলে যাবার প্রস্তাব শুনে রীতিমত বিস্মিত হলেন। গৃহিণীও আমল দিতে চাইলেন না। বললেন, তাই কখনো হয়? দুপুর রোদ্দুরে তেতে পুড়ে এলে, কী খেলে না খেলে দেখতেও পেলাম না। আজ তো কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। কালকের দিনটা থেকে পরশু যেও।

নরেনের যে খুব বেশী আপত্তি ছিল, হাব-ভাবে তা মনে হল না। দুটো একটা দিন থাকবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এইটাই স্বাভাবিক। তবু মৃদু স্বরে জানাল, আজ্ঞে, মা একা আছেন। শরীরটাও তেমন ভালো নেই।

—বেয়ান কি তোমাকে আজই ফিরতে বলে দিয়েছেন?

—না, তা বলেননি।

—তবে আর কি? তেমন কিছু অসুখ তো নয়। একটা দিন উনি একাই থাকতে পারবেন।

ভিতরে আসতেই নির্মলা সোজা বলে বসল, না, মা। তুমি বাধা দিও না। শ্বাশুড়ীর অসুখ, যেতে চাইছে, যাক।

মা বেশ খানিকটা আশ্চর্য হলেন। সেদিন বিয়ে হয়েছে মেয়ের। তার মুখে

পুরনো পাকা গিন্নীর মত এ ধরনের মতামত একেবারেই আশা করেননি। তারপরেই মনে করলেন, এটা অভিমানের কথা। হয়তো কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া হয়েছে দুজনের। সস্নেহে মেয়ের মুখে কপালে হাত বুলিয়ে বললেন, আচ্ছা কুঁদুলী তো? আসতে না আসতেই বুঝি শুরু করেছিস?

মেয়ের মুখে লজ্জার রঙিন আভা ফুটে উঠবে, তার সংগে এক ঝলক মৃদু হাসি, এইটাই আশা করেছিলেন। কিন্তু নির্মলা গম্ভীর মুখে তেমনি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দেখে মায়ের মনে বিস্ময়ের সংগে কিঞ্চিৎ আশংকাও যুক্ত হল। তারই আভাস পাওয়া গেল যখন জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে রে?

—হবে আবার কী?

—ওর যাওয়া নিয়ে তুই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস কেন?

—যাওয়াই উচিত। তা না হলে শ্বাশুড়ী হয়তো রাগ করবেন।

মায়ের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। বলতে পারতেন, 'সে ভাবনা তোমার চেয়ে তাঁর ছেলেরই বেশী হবার কথা। সে তো তা নিয়ে ভাবছে না।' কিন্তু এ নিয়ে বোধহয় আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। ক্ষুণ্ণমনে নিজের কাজে চলে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, তাই যদি বোঝ, আমার আর কী বলবার আছে। কর তোমাদের যা ইচ্ছে!

মা ও মেয়ের কথাবার্তা নরেনের কানে গিয়ে থাকবে। সে আর দেরি না করে তখনই রওনা হয়ে পড়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে অনেকদিন পরে নির্মলা ছাদে গিয়ে উঠল। বিজন ঘুরতে বেরিয়েছে। বিমলাও গেছে পাড়া বেড়াতে। মা রান্নাঘরে। বাবা মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত। হাতে কাজ নেই, মনটাও ঠিক সুস্থ নয়। আলসের উপর ঝুঁকে পড়ে দূরে গাছপালার দিকে তাকিয়ে ছিল। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দেখল বিজন। হঠাৎ খেয়াল হল, বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে, চারদিকে গাঢ় হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। তখনই নেমে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার থেমে গেল। বড় দৃষ্টি-কটু দেখায়। বিশেষ করে, কাল সকালেই যখন ও চলে যাচ্ছে।

বিজন কাছে এগিয়ে এসে একটু ভারী গলায় বলল, আমার ওপর তুমি রাগ করেছ, নির্মল?

নির্মলাকে সে সকলের সামনে বলে নিরু বা নির্মলা, এমনি নির্জন সান্নিধ্যে যখন দেখা হয়, তখন আলাদা সুরে বেরিয়ে আসে এই আবেগভরা আকার-হীন ডাক—'নির্মল'। নির্মলার বুকের ভিতরটা একটু যেন নড়ে উঠল। বাইরে তার কোনো আভাস পাওয়া গেল না।

—বলুন, নিচে আমার কাজ আছে।

—এই সামান্য সাদা ব্যাপারটাকে এমন কুৎসিত করে দেখলে তুমি! নরেনদাও কি—

—না, তার সে বিদ্যে কোথায়? আপনার ঐ উঁচুদরের তামাশাগুলো

"কালকের দিনটা থেকে পরশু যেও।"

শুষ্ক নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, কেন, রাগ করতে যাবো কিসের জন্যে?

—নরেনদাকে নিয়ে ওবেলা একটু ঠাট্টা-তামাশা করছিলাম।

—তাতে আর কী হয়েছে? গরিব-দের নিয়ে বড়লোকেরা চিরদিনই ঠাট্টা করে থাকে।

—কী বললে! হঠাৎ যেন চমকে উঠল বিজন।

নির্মলা কোনো উত্তর না দিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল। বিজন বলল, দাঁড়াও।

বোধহয় বুঝতেই পারেনি। একে গেঁয়ো মানুষ, তায় লেখাপড়া জানে না।

'ঠিক তাই', তিক্ত কণ্ঠে বলল বিজন, 'আমারই ভুল হয়েছে। যে যা, তাকে সেইভাবেই দেখা উচিত ছিল।'

নির্মলা চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। জ্বলন্ত চোখদুটি তুলে বক্তার মুখের দিকে তাকাল। কোনো উত্তর না দিয়ে পরমুহূর্তেই দ্রুত পায়ে নেমে গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাবার পর স্বামীর সংগে অন্য কোনো কথাবার্তা হবার

আগেই নির্মলা বলে উঠল, তোমাকে পড়তে হবে।

নরেন বুঝতে পারল না। একটু বিস্ময়ের সুরে বলল, কী পড়বো।

—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর লোকে যা পড়ে, আই-এ বা আই-এস-সি?

—বলকি! এখন, এই বয়সে—

—লেখাপড়ার আবার বয়স আছে নাকি?

—সব যে ভুলে মেরে বসে আছি। তাছাড়া, কোথায় পড়বো? এখানে তো কলেজ নেই।

—কলেজ কি হবে? বাড়িতে পড়বে, প্রাইভেট পরীক্ষা দেবে। যাঁরা মাস্টারি করে তাদের বেলায় এ সুবিধে আছে। আমি খবর নিয়েছি।

নরেন বুঝল কথাটা নিছক খেয়ালের ঝোঁকে বলেনি নির্মলা। ভেবে চিন্তে, খোঁজ খবর নিয়ে, মনে মনে কোনো একটা উদ্দেশ্য স্থির করে তার-পর এসেছে তার কাছে। স্ত্রীকে সে মনে মনে ভয় করত। প্রস্তাবটা যতই কঠিন বা অবাস্তব হোক, সরাসরি উড়িয়ে দিতে পারল না। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, কিন্তু, কেন বল দেখি? এতদিন পরে হঠাৎ লেখাপড়া করবার দরকার পড়ল কিসে?

—লেখাপড়া না করলে, তোমার যা বিদ্যা তাতে চাকরি হয় না। তার চেয়ে বড় কথা, অন্ততঃ গোটা তিনেক পাশ না দিলে লোকে মুখ্যু বলে, আমল দেয় না, ঠাট্টার নামে তাচ্ছিল্য করে......

বলতে বলতে চোখদুটো যেন জ্বলে উঠেছিল নির্মলার। নরেন আর কথা বাড়াতে সাহস করেনি। বিস্ময়-বিমূঢ় চোখ তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল স্ত্রীর মুখের দিকে। তারপর চিন্তান্বিতসুরে বলেছিল, আচ্ছা, তাই হবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

'তাই হবে' বলে তখনকার মত এড়িয়ে গেলেও, কি করে কি হবে নরেন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না। নির্মলা ব্যাপারটাকে চাপা পড়তে দেয়নি। কয়েকদিন পরে আবার তুলতেই নরেন বলল, পাশ করা কি সোজা কথা? পড়বার অভ্যেস চলে গেছে। তাছাড়া—

—কিছুদিন চেষ্টা করলে অভ্যেস আবার ফিরে আসে। ম্যাট্রিক তো ভাল-ভাবেই পাশ করেছিলে, শুনেছি।

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে...

—তা অবিশ্যি করেছিলাম।

—তবে?

বাবার কাছে শোনা একটা দৃষ্টান্তও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করল নির্মলা। কে একজন লোক সরকারী চাকরি থেকে পেনসন নেবার পর প্রায় ষাট বছর বয়সে নতুন করে ল' কলেজে ভর্তি হয় এবং পাশ করে ওকালতি শুরু করে। শুধু একটা নয়, এ রকম ঘটনা আরও হয়েছে। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, কোথায় কে এক মহিলা, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এম-এ পাশ করেছিলেন। তখন সাত ছেলের মা। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছরে; ম্যাট্রিকটাও পাশ করেননি। একজন মেয়েমানুষের পক্ষে যা সম্ভব নরেন যদি তার কাছাকাছিও যেতে না পারে তবে সে কেমনধারা পুরুষ?

এর উত্তরে নরেন আর কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি। তবু আমতা আমতা করে বলেছিল, সকালটা মাঠে বেরোতে হয়, দুপুরে ইস্কুল, কখন যে পড়ি?

—কেন, অত বড় রাতটা আছে কি জন্যে?

—মার শরীরটাও—

—সে সব আমি দেখবো।

—কলেজে না গেলেও, বইপত্তর, খাতা, পেন্সিল...খরচ নেহাত কম নয়।

'—সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। এই নাও....' বলে হাত থেকে এক-গাছা চুড়ি খুলে দিয়েছিল, 'পরে আরো দেবো।'

—না, না; গয়না কী হবে? ও তুমি তুলে রাখো। দেখি অন্য কোথাও—

—আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না। তুমি মানুষ হলে অনেক গয়না হবে আমার। এটা তুমি নাও।

স্বামীর হাতে চুড়িটা গুঁজে দিয়ে বলেছিল, তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি আর দেরি করো না। বুঝতে পারছ না, আমি কতখানি অস্থির হয়ে উঠেছি?

বলতে বলতে চোখদুটো জলে ভরে গিয়েছিল।

স্বামী আর একটি কথাও বলেননি। দিন তিনেকের মধ্যেই কিছু বই এবং খাতা কাগজ সংগ্রহ করে নিয়মমত পড়া-শুনো শুরু করেছিলেন।

(ক্রমশ)

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমা

॥ সার্থবাহ ॥

ইতালীয় কবিতা : যুদ্ধপ্রধান কাব্য ও অবসাদ

"ইতালীর লেখকগণ ও শিল্পিগণ

আমি প্রচণ্ডভাবে আপনাদের বলতে পারি যে ইতালীর জন্য আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ করার চেয়ে ভালো কাজ আপনাদের কাছে আর কিছু নেই। আমার ইচ্ছা করে আপনাদের দেখাতে কী ভাবে আমরা ফ্যুতুরিসমো-বাদিরা যুদ্ধকে উনত্রিশ বছর পূর্বে 'জগতের একমাত্র স্বাস্থ্য' ব'লে ঘোষণা ক'রে আজ তাকে এইভাবে ফুলসজ্জায় সাজাচ্ছি

এই আফ্রিকীয় যুদ্ধ হয়

(১) যথার্থ জীবন পুনরারম্ভের সর্বাপেক্ষা পরিণত এক পন্থা যা মুসোলিনির নব ইতালীর সেবা করে

(২) আমাদের আত্মনীন মূল্যগুলির সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ নির্ণেতা

(৩) আমাদের সর্বাপেক্ষা সুন্দর মানবিক দ্রুততা ও এককালীনতা (সিমুলতানেইতা)

(৪) গীতিধর্মী প্রণোদনা আফ্রিকানিসমের সর্বাপেক্ষা নিখুঁত ভাষ্য আমাদের উপদ্বীপে........." —যথাযথ বিরতি-চিহ্নের ব্যবহার থাকলে এবং আরেকটু মোদ্দা-কথা বললে উপরের প্রচারপত্রটি অনায়াসে কোনও সামরিক দপ্তরের সন্তান! আসলে কিন্তু এর জন্ম একজন কবির লেখনীতে। এমিলিয়ো ফিলিপ্পো তোম্মাসো মারিনেত্তি—যা'র সংক্ষিপ্ত, চালু সংস্করণ এফ. টি. মারিনেত্তি—নামধেয় একজন প্রখ্যাত আধুনিক ইতালীয় কবির তিন শতাধিক পৃষ্ঠার একটি কাব্য, "'২৮শে অক্টোবর' ডিভিসনের আফ্রিকীয় কবিতা"* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে উক্ত আহবস্তব।

মারিনেত্তির 'আফ্রিকীয় কবিতা' আয়তনে জগতের যে-কোনও গদ্য-কবিতার চেয়ে নিঃসন্দেহে গুরু এবং আত্মশ্লাঘা যদি সর্বতঃ মিথ্যাভাষণ না হয়, তাহ'লে মারিনেত্তি তাঁর এই কবিতায় ফ্যুতুরিসমো (ভাবীবাদ?)-র 'অকাট্য জয়'ও সপ্রমাণ করেছেন। তবু য়ুরোপীয় গদ্য-কবিতার আসরে, র‍্যাবো, লোত্রেয়াম' ও পোর্সের পাশে নেহাতই বেপাত্তা যে 'ইল পোয়েমা আফ্রিকানো'র মারিনেত্তি, এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরূপে হাজির মারিনেত্তি তাঁর এই স্থূলকায় কিতাবখানির রসদ জুটিয়েছিলেন অবশ্যই চোখে-দেখা একটা জলজ্যান্ত যুদ্ধ থেকেই। আবিসিনীয় যুদ্ধ। 'এককালীনতা'র আজ্ঞায় জড়ো-করা বিস্তীর্ণ যুদ্ধাঙ্গনের নানা এলাকার নানা ঘটনা নিয়ে মারিনেত্তি তাঁর অতিকায় কবিতার তাঁতটি বুনেছিলেন। সুযোগ ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণাটিকে উপযুক্ত নিষ্ঠা ও শক্তি দিয়ে কবিচিত্তে ধারণ করার, তাকে প্রকৃত কাব্যিক মর্যাদায় সুস্থ রাখার এবং মানবিক স্তন্যদানে তাকে লালিত করার। কিন্তু মারিনেত্তি যেমন 'ফ্যুতুরিসমো'র আঙ্গিক আঁকড়ে থেকে কবিত্বকে ডুবে যেতে দিয়েছিলেন, তেমনি শক্তিবাদের ফতোয়ায় মানবিকতাকে বাৎলেছিলেন পরধর্ম। মুসোলিনির নব ইতালিয়া যে কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তিনি আবিসিনীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত বিষবাষ্পের মতোই এক বিকট মরণেই আত্মস্থ ছিলেন!

দুইটি কারণে মারিনেত্তি আমাদের আলোচ্য থেকে যা'ন। প্রথমতঃ তাঁর আবিষ্কৃত আঙ্গিক 'ফ্যুতুরিসমো', যা'র অনুশীলনে ও ব্যবহারে তিনি নিজে অন্ততঃ আমরণ নিযুক্ত ছিলেন। অভিব্যক্তির যে সংজ্ঞায় চিত্রশিল্পে ব্রাক ও পিকাসো জ্যামিতিক অধ্যায়নে 'কিউবিসমে'র ঢঙে দৃশ্যকে রূপায়িত ক'রতেন, তা'রই ছাঁচে মারিনেত্তির 'ফ্যুতুরিসমো', শুধু চিত্রে নয়, বচনেও অনুরূপ কৌণিক পর্যবেক্ষণের ভিন্নতর সমাবেশ চিন্তা করেছিল। (চিত্রে ফলিত 'ফ্যুতুরিসমো' দ্রষ্টব্য জিনো সেভেরিনির আঁকা ছবিগুলিতে)। মারিনেত্তির এই আঙ্গিক চিত্রবিদ্যায় কোনখানে কিউবিসমের থেকে ভিন্ন তা বিশেষজ্ঞেরই অবধার্য; সাহিত্যে এই আঙ্গিকের উদ্দিষ্টরূপে যা হৃদয়ঙ্গম হয় তা 'এককালীনতার' ব্যুৎপত্তিতে বাস্তবকে বহুমুখী আক্রমণে কাবু-করা, আর—এটাই মুখ্য,—ভাষায়, বক্তব্যের দাপটে, ব্যাকরণকে নস্যাৎ করা। মারিনেত্তির প্রধানতম সাধনা ছিল ঐভাবে ঐতিহাসিক ইতালীয় ভাষাকে তা'র নির্ধারিত স্বভাব খুইয়ে 'মুক্ত পদগুলি' (পারোলে ইন লিবের্তা)-র' মারফত সরাসরি বক্তব্য-পৌঁছানোর এক কৌশল হ'তে দেওয়া। তাঁর লিখিত গদ্যে পদ্যে কেবল বিরতি-চিহ্নগুলি নয়, ব্যাকরণ-সঙ্গত ভাষা নির্মাণের অধম উত্তম অনেক বিধি-ব্যবস্থাই লোপাট হয়েছিল। আর কিছু না হলেও, জানান বা 'কমুনিকেশন'-এর মোক্ষম এক কারসাজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মারিনেত্তির ভাষা! 'আফ্রিকীয় কবিতায়' বারেবারে মারিনেত্তির তামসিক উৎকণ্ঠা ভেঙে শব্দ করেছে তাই টাটকা পাখীরা, ডেকেছে হুবহু মেসিনগান, গলায় ঘন্টা বাঁধা উটদের কারাভান চলেছে, বোমাবর্ষী উড়োজাহাজ কণ্ঠলাভ করেছে। ভাবানুষঙ্গে মারিনেত্তির রুচি নেই কিন্তু শব্দানুষঙ্গ কদাচই তাঁর হাত ফস্কে পালিয়েছে।

বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা 'ফিগারো'-তে ১৯০৯ সালে মারিনেত্তির 'ভাবীবাদী' ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল। 'পোয়েজিয়া' নামক একটি আন্তর্জাতিক সাময়িক পত্রের সম্পাদক হিসাবে সুপরিচিত হয়েছিলেন তিনি। এবং তাঁর প্রথম রচনা (ফরাসীতে লেখা) 'মারফাকা ল্য ফ্যুতুরিস্ত' থেকে 'ইল পোয়েমা আফ্রিকানো' পর্যন্ত স্বকীয় আঙ্গিকে বেশ কয়েকখানি পুস্তকের তিনি প্রণেতা। শিল্পি হিসাবে ক্ষমতাবান তিনি ছিলেন না একথাও সত্য নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মারিনেত্তি যে তাঁর মৃত্যুর পর এক কুড়ি বছর না পেরোতেই ধামাচাপা পড়লেন, তা'র কারণ তাঁর অচরিতার্থ শিল্প যতটা, তা'র চেয়ে অনেক বেশী তাঁর বক্রী অন্তর। মারিনেত্তির স্বদেশপ্রেম যুদ্ধবাদীর বক্তৃতায় চিহ্নিত ছিল।

রাজনীতি ও যুদ্ধ কবি মারিনেত্তিকে যতখানি কাব্যোদ্দীপনা জুগিয়েছিল ততখানি এ যুগে বোধহয় এক তাঁরই দেশবন্ধু ও অগ্রজপ্রতিম, গাব্রিয়েলে দান্নুন্তসিও ছাড়া আর কাউকে করেনি। ফাসিবাদের সমর্থনে মারিনেত্তি তাঁর 'ফ্যুতুরিসমো এ ফাশিসমো' লেখেন ১৯২৪ সালে। উক্ত গ্রন্থে মারিনেত্তি

* IL POEMA AFRICANO Della Divisione 28 Ottobre: F. T. Marinetti, Della Reale Accademia D' Italia. A. Mondadori, Milano.

যে গণতন্ত্র-বিরোধী যুযুৎসার সপক্ষে রায় দেবার জন্য শিল্প-রাজনীতির অন্যায় জড়াজড়ি বরদাস্ত করেছিলেন, তা'ও ছিল না আকস্মিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে রচিত তাঁর আঙ্গিকসমৃদ্ধ 'গোয়েরবা সোলা ইজিয়েনে দেল মন্দো' (যুদ্ধ একমাত্র স্বাস্থ্য জগতের) -তেও তিনি ইতালীকে যুযুধান করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আরো আগের রচনা 'ৎসাং তুম্ব তুম'-এ মারিনেত্তির বিষয়বস্তু বল্কান যুদ্ধ। 'একটি বোমায় আটটি চিত্র' (অত্তো আনিমে ইন উনা বম্বা) তাঁর আরেকটি পুস্তকের নাম।

দেশপ্রেম ও রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি অবশ্য একজন ইতালীয় কবিতে অনাচার নয়। ঊনবিংশ শতকের মাৎসিনি ও গারিবল্দির নেতৃত্বে জাতীয় অভ্যুত্থানের যে প্রকাশ 'রিসর্জিমেন্তো' আন্দোলনে, তার অনেকাংশেই সমসাময়িক সাহিত্যিকদের, বিশেষতঃ কবিদের, অকৃপণ অবদান লক্ষিত হয়। দেশপ্রেম, রাজনীতি,— পরের ধাপেই যুদ্ধ। 'রিসর্জিমেন্তোর' জাতীয় ঐক্যসাধন সংগ্রামের পথ মোটেই এড়িয়ে যায়নি। তাই যুদ্ধের সংস্পর্শ থেকে বাণীকে বঞ্চিত রাখতে পারেননি ঊনবিংশ শতকী অনেক ইতালীয় কবিই। বাথাতুর লেওপার্দি পর্যন্ত ঐ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জয়ধ্বনি ক'রে যেন তাঁর আজন্ম বিষাদ ভোগের পটভূমিকাতে রঙ লাগিয়েছিলেন। বলা যায় যে, রণাঙ্গনে এসে দাঁড়াতে পর্দানশিন ইতালীয় কলালক্ষ্মীর ঘোমটা আরো লম্বা না হয়ে খসেই যেত এবং তা সাবলীলভাবে। যুধ্যমান পিতৃভূমি কাব্যের উদার উৎস হ'ত এবং জাতির কাছ থেকে সাধুবাদ লাভের আশায় নয়, দেশপ্রেমের আন্তরিক দায়েই, ইতালীয় কবিরা তাঁদের 'সামরিক' পদোন্নতিকে শিরোধার্য করতেন! 'রিসর্জিমেন্তো'র কবিদের মধ্যে ধারাল দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি পাওয়া গেছিল জিওভান্নি প্রাতি, আলেয়ার্দ আলেয়ার্দি, গাব্রিয়েলে রসেত্তি (ইংরেজী রসেটি ভাইবোনদের পিতা) ও গোফ্রেদো মামেলির কবিতায়। শেষোক্ত জন মাত্র একুশ বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হ'ন।

শুধু ঊনবিংশ শতকেই বা কেন, ইতালীয় কাব্যের ঐতিহ্য কি আগাগোড়া দেশপ্রেম, কূটনীতি ও সমরাগ্নির উত্তাপে ইতালীয় কবিদের এক অসাধারণ উগ্রতা প্রতিপন্ন করায় না? দান্তের মহাকাব্যেই যে শুধু ক্ষুরধার রাজনীতির সংক্রাম তা নয়, লাতিনে-লেখা দান্তের 'দে মনার্কিয়া' কূটনীতির একটি সংহিতা। প্রেমের কবি পেত্রার্কার সনেটগুলির উদ্ভাবনে মহিয়সী লাউরা যদি বা, পেত্রার্কার বিস্তর 'কান্তসোনে' রচিত হয়েছিল স্বদেশ-পূজার নিমিত্তে। যুদ্ধ আরিয়স্তোর 'ওরলান্দো ফুরিয়োসো'য় যেমন, তেমন তাস্সোর 'জেরুসালেম্মে লিবেরাতা'য়।

তাই মারিনেত্তির কাব্যে দেশপ্রেমের ফাসিবাদী বিকার শতধা নিন্দনীয় জানার পরও, ইতালীয় কবিতাকে যুযুধান ব'লে আখ্যেয় করাতে তা'র একটি স্বভাবের নিরূপণই ঘটে। এ স্বভাবকে স্বীকার ক'রলে বিস্ময় কম হয় 'রিসর্জিমেন্তো'র জাতীয়তাবাদী ঝাঁঝে, বিষাদাচ্ছন্ন লেওপার্দি ও দরদী মান্তসোনির মতো, কার্দুৎচিকেও দগ্ধ হ'তে দেখলে। যে কার্দুৎচিৎ অনেক কবিতাই নিঃসংশয়ে 'শুদ্ধ কবিতার' পর্যায়ভুক্ত হয়, তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয়েছিল জবরদস্ত দেশপ্রেমের একরঙা আকাশের নীচে।

জিওসুয়ে বার্দুৎচি, যাঁকে আধুনিক ইতালীয় কবিতার জনক বলা নিশ্চয়ই এক নিরাপদ মূল্যায়ন, অবশ্য প্রাথমিক উত্তেজনা কাটিয়ে উঠে বেসুরো গেয়েছিলেন। দেশপ্রেমের প্রথাসিদ্ধ প্রণোদনাকে জোলো রোমান্টিকতা ব'লে বাতিল ক'রে, কার্দুৎচি তৎকালীন ইতালীয় সাহিত্য-সমাজকে বেশ একটু চমকে দিয়েছিলেন। দেশপ্রেমের পরিবর্তে তিনি ক্লাসিক পন্থায় কাব্যচর্চার প্রস্তাবকে সহনীয় ভেবেছিলেন, এবং প্রাচীন ছন্দগুলির পুনর্ব্যবহারে আচরিত কাব্যবোধে নূতন অনুভূতির সঞ্চার খুঁজেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের গুইত্তোনে আরেদসোর নির্দেশিত 'কনজেদো' বা 'গানের উপসংহার' রচনায় পাকা হাত কার্দুৎচির :

বিদায়ী

ত্রিবর্ণ পুষ্পরে,
ডুবে যায় তারকারা মধ্য-পারাবারে
আর নেভে গানগুলি আমার অন্তরে।

দেশপ্রেম,—বা, যুদ্ধ থেকে অনেক অনেক দূরে কার্দুৎচির কাব্যিক অভিনিবেশ। তাঁর 'ওদি বারবারে' (অসভ্য স্তবমালা)-র ছান্দসিক গবেষণা, কিম্বা তাঁর 'সা ইরা' (চলবে) সনেটগুলির সার্থকতা নিয়ে যদি বা মীমাংসায় পৌঁছান সময়সাপেক্ষ, তাঁর কাব্যের অপূর্ব চিত্রধর্মিতা
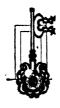
ও সঙ্গীতময়তা অবিলম্বেই পাঠককে মুগ্ধ ক'রে ঃ

শিস দিতে দিতে শিকারী লোক
দোরগোড়া থেকে তাকিয়ে রয়,
গোল্লাপী-গোল্লাপী মেঘের ফাঁকে
ঝাঁক ঝাঁক কালো পাখী
('সান মারতিনো')

নিসর্গ-চিন্তায় কার্দুৎচি যেন ভালেরির প্রতীকী-সমৃদ্ধির আমেজ ধ'রে ফেলেছেন ঃ

আল্পসের বিস্তৃত বৃত্তে পাংশুল, স্তিমিত
শিলা আর দীপ্র হিমবাহের উপর
মধ্যদিন উজ্জ্বল, অমিত, সংহতঃ
নিরবধি মৌনতার মাঝে রাজেশ্বর।

কার্দুৎচি এইভাবে রোমান্টিকতার আপাতঃবিরোধী যে মনস্কাম নিয়ে ক্লাসিক ছন্দের প্রবর্তন ক'রতে ব্রতী হয়েছিলেন তা'র আসল কাম্য না-ছিল রোমান্টিকতার বিনাশ, না-ছিল ক্লাসিক কাব্যের অনুকৃতি। দুই-ই সমানে অশোভন, এবং অসম্ভবও ছিল। আর কার্দুৎচির কবি-প্রতিভা ছিল এমনই পরিণত ও এমনই মৌলিক যে, রোমান্টিক-ক্লাসিক দ্বন্দ্বে বিচলিত থেকে কবিতাকে বলি দেওয়ার উপায় ছিল না তাঁর। তাঁর সমস্ত জল্পনা খুঁজেছিল 'রিসর্জিমেন্তো'—নিষ্ক্রান্ত, আদর্শনিষ্ঠ কবিতাকে সর্বাঙ্গীন মুক্তির সঙ্গে পরিচিত করান। তাই কার্দুৎচির উত্তরসাধক জিয়োভান্নি পাস্কোলিতে ইতালীয় কবিতার গীতিধর্ম অবাধ ও সুসম্পন্ন হ'তে পেরেছিল।

কাব্যের প্রায় সর্ববিধ ঐশ্বর্যেরই ধারক ও পরিবাহক হয়েছিল কার্দুৎচির কবিতা। ভাব, নিসর্গ, ছন্দ, আবেগ আর মানবিকতা। কিছুই বিপন্ন হয়নি তাঁর সর্বতোক্ষম কবিতার সাধনায়। আর সুষমার সঙ্গে কার্দুৎচির কাব্যে যুক্ত হয়েছিল সৃষ্টির প্রতাপশীল উর্বরতা। অগণিত কবিতা তাঁর একটি সঞ্চয়িতা, 'পোয়েসিয়ে'তে। মৃত্যুর আগের বৎসর কার্দুৎচি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যে কার্দুৎচি যৌবনের চাপল্যে এক সময় তাঁর 'শয়তানের স্তব' কবিতাটি লিখে স্বজাতির উৎকণ্ঠিত হতাদর কুড়িয়েছিলেন ('শয়তানের স্তব' রচনায় কি কার্দুৎচি নেহাত স্বাদেশিকতার কবল থেকে পালিয়ে বেখাপ্পা এক পরদেশী জলুস যাত্রা করেছিলেন? বোদলেয়রের 'শয়তান প্রশস্তি', 'ল্য লিতানি দ্য সাতাঁ' দশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।) তিনি জীবন-সায়াহ্নে স্বদেশে ও সর্বত্র একাধারে নিপুণ ও মহান শিল্পী ও যুগসন্ধির শ্রেষ্ঠ ইতালীয় কবি ব'লে স্বীকৃত হ'ন।

কবির দেশ ইতালী; কোনও শতাব্দীতে ইতালীয় কাব্যস্রোত নিস্তরঙ্গ থাকে না। দান্তে, পেত্রার্কা, আরিয়স্তো, তাস্সো, কাম্পানেল্লরও পর উদয় হয় লেওপার্দির। তাঁর পরও আরেক দিকপাল কার্দুৎচি। একই নিয়মে কার্দুৎচির উত্তরপুরুষও ইতালীয় কাব্যে অনুপস্থিত থাকেন না; তামাদি হবার সুযোগ পায় না ইতালীয় কাব্যের সম্পত্তি। তাই কার্দুৎচির পরও অল্পবিস্তর ক্ষমতাবান আরেক কবির আবির্ভাব সম্ভব হ'ল। এ'কে অবশ্য কবি উপাধি যথার্থ মানায় না, কারণ ইনি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারই ছিলেন প্রধানতঃ। তবু নিঃসন্দেহে কবিও ছিলেন এই বিচিত্র ইতালীয়, গাব্রিয়েলে দা'ন্নুন্তসিও। কার্দুৎচি ও পাস্কোলির শুদ্ধ কাব্যের পর আন্নুন্তসিও আবারো আমদানি করলেন পুরোদমে যুযুধান ইতালীয় কাব্যের ব্যায়াম।

আত্মজীবনীমূলক, প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'লাউস ভিতাই' (জীবন-গরিমা) দিয়ে আন্নুন্তসিওর কাব্যচর্চা শুরু। উপন্যাসে তাঁর মুখ্য শিল্পচর্চার সুযোগ নিলেও, এবং নাটক রচনায় তৎপরতা দেখালেও প্রথম যৌবনের আকর্ষণ, কবিতাকে নির্বাসিত না-করারই তোড়জোড় আন্নুন্তসিওর কর্মব্যস্ত সাহিত্যিক জীবনে আগাগোড়া। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উপন্যাসে বা নাটকে কাল্পনিকেরই মস্ত সাধক, আন্নুন্তসিও তাঁর কবিতায় অনমনীয়ভাবে দেশপ্রেমের বাস্তবিককে কবুল করেছিলেন। দেশপ্রেম আর যুযুৎসার মধ্যে শান্তিরক্ষার তৃতীয় স্বর শোনার মতো কান আন্নুন্তসিওর বৈপ্লবিক শরীরে না-থাকারই কথা, এবং তাই, মারিনেত্তির মতো প্রমত্ত না হয়েও, দেশপ্রেমের সম্ভ্রান্ত সুযোগকে আন্নুন্তসিও যুদ্ধ-করার প্রেরণাদানে লাগিয়েছিলেন। শিল্পী আন্নুন্তসিও-কর্তৃক ফিউমে-শাসনের লোমহর্ষক (যদি বা হাস্যকরও) কাহিনী যেমন হজম করা কঠিন, তেমন বিস্বাদ তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, যা'তে ছিল ফাসিবাদের নিঃসঙ্কোচ অঙ্কুর। জাতীয়তাবাদী ও সামরিক তালের গানে ভরেছিল তাঁর 'লে কান্তসোনি দেল্লা জেস্তা দোলত্রেমারে' (সমুদ্র-সমর সঙ্গীত)। 'ফিগারো' পত্রিকায় (জুলাই ১৩, ১৯১৪) প্রকাশ করেছিলেন আন্নুন্তসিও তাঁর ফরাসীতে-লেখা 'অদ পুর ল্য রেসুরেকশি'য় লাতিন', (লাতিন পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্র), যা'তে শুনিয়েছিলেন তিনি সমগ্র লাতিন জাতীকে ঃ 'নির্মম এক যুদ্ধে ডেকে-নিচ্ছে আমাদের বন্য শক্তি', 'জয়'কে বলেছিলেন 'প্রমত্ত শস্যসম্ভোগী'। 'ত্রে সাল্মি পের ই নস্ত্রি মর্তি' * (আমাদের মৃতদের জন্য তিনটি গান)—নামক রূপক-আলেখ্যে আন্নুন্তসিওর দেশ-মাতৃকা বলেন ঃ "খোঁজো আমার সেই মুখ, যা রক্তের আর ঘর্মের, কামনার আর ক্লান্তির"। সত্যসন্ধ আন্নুন্তসিওর কী সার্থক প্রহেলিকা!—"...... আর তারপর ওপর থেকে শোনা গেছিল নির্মাংস কণ্ঠস্বর, যা বলেছিল ঃ 'ধন্য মৃতেরা'। স্পষ্ট হয়েছিল একটি কণ্ঠস্বরের ঘোষণা ঃ 'ধন্য যারা তোমার জন্য মরবে'।" সশস্ত্র দেশপ্রেমও আন্নুন্তসিওর কাছে প্রকৃত কাব্য হয়ে ওঠে ঃ

"আর জীবনের সদৃশ হয়েছিল স্বপ্ন
উষ্ণ শোণিত যেমন সদৃশ্য হয় মদের
যখন তোমার সকল সন্তানের প্রতিভা
উৎসারিত হয়েছিল প্রথমতম ক্ষত
থেকে।"

('পের ই কম্বাত্তেন্তি' ঃ যুদ্ধরতদের জন্য)

কর্মোদ্দীপনায় সজাগ, তীক্ষ্ণ, অদম্য আন্নুন্তসিওর রৌদ্রময় জীবনবেদ যেন শতাব্দীর অবসাদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছিল। তথাপি ১৮৯০-দের ভ্রান্তি-বিলাস পেরিয়ে এসে মৌলিক বিংশ শতাব্দী এক শূন্যতা আর অবসাদেরই দ্বারোদ্ঘাটন করেছিল। মানুষ তখন চেয়েছিল বিরতি, ছায়া, জীবনের শান্ত সৌজন্যে মুগ্ধ হবার অবসর। এমন কি স্বয়ং আন্নুন্তসিওই একটি কবিতায়ই চিন্তা করেছিলেন বেলা শেষ-হয়ে-আসার নিষ্কর্মা ক্ষণটির কথা ঃ

পথের গোলকধাঁধা দিয়ে
অবসাদের আকণ্ঠ পিপাসাকে
হেঁচড়ে নিয়ে-যাওয়া শহরের ওপর
যখন নামে রাত্রি

('পের ই চিত্তাদিনি' ঃ নাগরিকদের জন্য)

বিশ শতকের সুরু থেকে ফাশি-বাদের পূর্ব পর্যন্ত ইতালীতে তাই আন্নুন্তসিওর বহুধাব্যস্ত কর্ম ও শৌর্যের চোখ ধাঁধানো আলো থেকে অপসরণ খুঁজেছিলেন 'ক্রেপুস্কোলারি' কবিবৃন্দ। নামতঃ তাঁরা ছিলেন 'সন্ধ্যা-লোকের কবি' এবং তাঁদের উদ্দিষ্ট ছিল আন্নুন্তসিও-শোভন হাঁকডাকে বাক্তিত্বের

---

* ASTEROPE di Gabriele D' Annunzio. Arnoldo Mondadori Editore, 1949.

বইখানিতে আন্নুন্তসিওর অন্যান্য অনেক দেশপ্রেমের কবিতা সংকলিত হয়েছে।

বিকাশ না-চেয়ে, যথেষ্ট দমিত ও ক্লিষ্ট-ভাবে মানবিক অন্তর্লোকে প্রবেশাধিকার পাওয়া, আর সেখানকার আলো-আঁধারিতে বিক্রমহীন কালাতিপাত করা।

কোররাদাসিনি, মারিনো মরেত্তি ও গুইদো গোৎসানো—'ক্রেপুস্কোলারি'-রূপে এই তিনজন কবিতাকে তাঁর খানদানী তকমা ছাড়ানর প্রচেষ্টায় উল্লেখ্য। এ'দের প্রতিরোধ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেবল আন্নুন্‌সিওর প্রাখর্য ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধেই হয়নি'ক, কার্দুচ্চি ও প'স্কোলির পদ্ধতি ও ভাষায়ও তাঁরা উন্নাসিকতার গন্ধ পেয়েছিলেন। এবং অন্ততঃ গোৎসানোর কবিতায় বিষয়গত ও ভাষিক সরলীকরণ লক্ষণীয় সার্থকতায় পৌঁছে ঐতিহ্যকামিদের তাক লাগিয়েছিল। এই সরলীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আরেকজন ইতালীয় কবির কবিতাও বিচার্য হয়, যদিও তিনি 'ক্রেপুস্কোলারির' একজন ছিলেন না। দিনো কাম্পানা। কাম্পানা ন্যায্যতঃ যে গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত তাঁর উদ্ভব হয়েছিল আরো পরে, ফাশিস্ত ইতালীতে এবং সে গোষ্ঠির পালনীয় ধর্মও সন্ধ্যালোক-সেবন ছিল না। দুঃসাহসী এক নাম ছিল সে ধর্মের—'এরমেতিসমো' বা 'অস্বচ্ছতা'।

দিনো কাম্পানার কবিতায় অনুভব সহজ শব্দ তালে-তালে আবেগান্বিত হয়। 'এ র মে তি স মো'-প্র স্তা বি ত 'অস্বচ্ছতা' অবশ্য টের পাওয়া যায়। এই 'অস্বচ্ছতা' যে 'দুর্বোধ্যতার' সংগে এক নয় এটুকু বুঝলে, কাম্পানার 'অস্বচ্ছতা'ও সমঝান যায়। 'এরমেতিসমো' যা প্রতিপাদ্য করেছিল তা' ছিল এই যে আপন নৈঃসংগ্যে কবি যে দুর্বার ভাষণে বাধ্য হবেন, তাঁর রহস্যময় পবিত্রতা অটুট থাকবে ঃ ভাষাকারের ভূমিকায় এসে তাঁর কবিতাকে বোধ্য করার জন্য ভাষিক বা ভাবগত আটঘাট বাঁধার দায় কবির নেই। তাই 'এরমেতিসমো'র অস্বচ্ছতা এক হিসাবে ইতালীয় কাব্যে সরলীকরণ প্রক্রিয়ারই উৎক্রান্তি। যুক্তির বাঁধন অচিন্ত্য কাম্পানার প্রায়-অবোধ তবু তাজা এক স্মৃতির সংলাপেঃ

তোমায় ভালবেসেছিলাম শহরে যেথায়
শূন্য
পথে পথে দাঁড়িয়ে পড়ে পদক্ষেপ শ্রান্ত
যেথায় এক আলতো সুখ এই যে বৃষ্টি
হবে
সন্ধ্যাবেলায় হৃদয় নয় পূর্ণ নয়
হতাশ্বাস
ঝাঁপিয়ে যায় স্বিভাব এক বসন্তের
বেগনিতে দুরান্ত ক্ষীণ আকাশ পার।

কাম্পানার স্মৃতিপটে একটি অস্পষ্ট অবিশ্বস্ত ক্ষণকে কেবল বাচনই পরাবর্তিত করে ঃ

এক পলকের মধ্যে
ঝরা হল গোলাপগুলি
চ্যুত পাপড়িরা
যেহেতু আমি ভুলতে পারিনি
গোলাপগুলি
তাদের খুঁজেছিলাম দুজনায়
খুঁজে পেয়েছিলাম গোলাপদের
হয়েছিল ওর গোলাপ হয়েছিল আমার
গোলাপ
এই গমনকে ডেকেছিলাম প্রেম ব'লে......
('ইন উন মোমেন্তো' ঃ এক পলকের মধ্যে)

এইমতো অবচ্ছিন্ন, অবচেতন সারল্য বিংশশতকী য়ুরোপীয় কবিদের অনেককেই অযথা বিড়ম্বিত করত। কাম্পানা ও 'এরমেতিসমো'-বাদী জিয়ুসেপ্পে উঙ্গারেত্তি ছাড়া অনুরূপ প্রত্যক্ষ আবেশ কবিতা-বলে অলজ্জিত থাকতে পারতেন বোধহয় কেবল পোল এলুয়ারই।

'এরমেতিসমো'-বাদিদের অনেকেই এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ইউজেনিয়ো মনতালে ও নোবেল-পুরস্কৃত সালভাতোরে কুয়াসিমোদো এই গোষ্ঠির শিল্পধর্মে আস্থাবান ছিলেন, যদি বা এ দুজনের ক্ষেত্রে ঐ ফলিত অস্বচ্ছতা অনেকখানিই লোপ পেয়েছে গুরুতর কাব্যিক অবধানের চাপে। এ'রা দুজনেই আজকের ইতালীয় কবিতায় পুরোগামীদের অন্যতম। জটিল হলেও মনতালের চিত্রকল্পগুলি নিসর্গ-নিষ্ঠ অনেকাংশে এবং প্রধানতঃ দার্শনিক বৃত্তিতে তাঁর ভাবনা অবধারিত। মনতালের কবিতায় টি, এস, এলেয়টের প্রভাব (আঙ্গিকগত) অনস্বীকার্য।* আশ্চর্য শক্তিমান্ কবি কুয়াসিমোদো তাঁর বিদগ্ধ বিষাদ-ভাবনা নিয়ে। যে-অবসাদ সমানে শতাব্দীর ও

* মনতালের দুইটি কবিতা, 'লা প্রিমাভেরা ইতলেরিয়ানা' ও 'জিরর্ণে এ নত্তে' দ্রষ্টব্য। প্রসংগতঃ ইতালীতে গত বিশ বছরে এলিয়টের কবিতা ও প্রবন্ধ যথেষ্ট অনুদিত হয়েছে। চেজারে লোদোভিচি, লুইজি বের্তি ও প্রখ্যাত সমালোচক মারিও প্রাৎস এলিয়ট-অনুবাদক হিসাবে খ্যাতনামা। মনতালে স্বয়ং ইতালীতে প্রথম এলিয়ট-অনুবাদে হাত দেন। 'সোলারিয়া' (ডিসেম্বর, ১৯৩০) নামক সাময়িক পত্রিকায় মনতালে 'এ সং ফর সিমেঅনে'র ইতালীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে তিনি 'আনিমুলা'রও অনুবাদ করেন।

ইতালীয় কাব্যযন্ত্রের প্রসব, তা' তাঁকে যেন প্রাকৃত ও মানবিক হবার প্রেরণাই দেয় আচ্ছন্নতার ফাঁকে ফাঁকে, পঙ্গু বা উন্নাসিক করে না। 'সন্ধ্যা' তাঁর কাছে কেবল প্রাকৃতিক নয়, মানুষও সন্ধ্যার মূর্তিতে অংশীদার ঃ

যে যার একলা স্থির ধরার উপরে
সূর্যের একটি কিরণে বিদ্ধ
আর সন্ধ্যা হয় ঝপ ক'রে।

জীবজন্তু তাঁর কাছে আর তা'দের রুষ্ট নিরালায় প'ড়ে থাকে না; তা'রা হয় তাঁর 'সাধের জীবজন্তু'। লেওপার্দি, বোদলেয়র, লোরকা—এ'দের কথা থেকে থেকে মনে পড়ায় কুয়াসিমোদোর কবিতা, কিন্তু সার্থক কবির ক্ষেত্রে যা হয়, ঐ জাতীয় পূর্বপুরুষের প্রতিধ্বনি কুয়াসিমোদোর বংশ-পরিচয়ই স্পষ্ট ক'রে।

'এরমে'তসমো'র সম্পাদক উঙ্গারেত্তি নিজেই ১৯৪৭ সালে তাঁর 'ইল দোলোরে' (দুঃখ) মারফত 'এরমেতিসমো'-পন্থার বিলয় প্রস্তাবিত করেন। উপসংহারে উঙ্গারেত্তির একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা উধৃত করি ঃ

একটা পুরো রাত
পাশে প'ড়ে
খুন-হওয়া
এক সংগীর
দাঁত কিড়মিড় করা
মুখ যা'র
পূর্ণিমা চাঁদে উধাও
যা'র দুখানা হাতের
কাঁপুনি
প্রবিষ্ট
আমার মৌনের ভিতর
আমি লিখেছি
প্রেমময় পত্র
কখনো হইনি
অতো
জীবনের সংগে লাগোয়া।

কবিতা আর যুযুধান নয়। অবসাদ। কিন্তু সৃষ্টিশীল এই অবসাদ।

গোঁফ দিয়ে যায় চেনা

"নাগার্জুন"

গোঁফও যে মানুষ চেনার অন্যতম উপায় স্বর্গত সুকুমার রায়* তার উৎকৃষ্ট হদিস দিয়েছেন। বাংলা প্রবাদে বলে: শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। কিন্তু শুধু শিকারী বেড়াল কেন, শিকারী মানুষও যে গোঁফে বিশিষ্ট হতে পারেন তার উত্তম নিদর্শন শিকারী কুমুদ চৌধুরী।

কবি সুকুমার রায়ের গোঁফ সংক্রান্ত বিখ্যাত বয়েৎটি হল:

গোঁফের আমি গোঁফের তুমি গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।

তাহলে গোঁফ না থাকলে কি পুরুষের মুখ অচেনার অন্ধকারে কালো হয়ে থাকবে? বাস্তবিক যাদের গোঁফ নেই তাদের চেনা সহজ না। যেমন মেয়েদের। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রমের সংস্কৃত শ্লোকটিই সাক্ষী দেবে যে, মেয়ে-চেনা-চোখ কোনো দেবতারই নেই, মানুষ ত সেদিনকার তৃণ! শুধু মেয়েরাই বা কেন গোঁফবিহীন পুরুষরাও কি কম অচেনা! এমনকি নিজের ভাইকেই চেনা যায় না গোঁফ না থাকলে।

একটি প্রাচীন স্পেন-দেশীয় গোঁফবাক্য হচ্ছে: "চুমুর মুখে গোঁফ নেই ত পান্তা ভাতে নুন নেই।" গোঁফ-তত্ত্বের ওপর মনোসমীক্ষকদের মতামত বিচিত্র এবং বিভিন্ন। কেউ কেউ বলেন: গোঁফ হচ্ছে গোঁড়ামির প্রতীক, তাহলে রামমোহন রায়ের গোঁফ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আবার কারো কারো মতে গোঁফ ব্যবহৃত হয় শুধু আত্মপ্রত্যয়ের দম্ভ মেটানোর জন্যে—কিন্তু কায়েদে আজম জিন্না ত কখনই গোঁফের কাছে মুখ বিক্রয় করেননি। অপর পক্ষে যৌন-বিজ্ঞানীরা গোঁফকে তুলনা করেছেন জোনাকিদের আলোর সঙ্গে। মেয়ে জোনাকিরা যেমন কনে-দেখা আলো জেলে পুরুষ-জোনাকিকে ডাকে, পুরুষের গোঁফও তেমনি এক রমণী-মোহন সংকেত। অর্থাৎ মেয়েদের দিকে হাতছানির বদলে গোঁফছানি।

ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায় গোঁফ অপরিহার্য। গোঁফ করিৎকর্মা, গোঁফ ছদ্মবেশ, এমনকি গোঁফই বয়েস। শার্লক হোমস থেকে আরম্ভ করে আজকালকার কত সত্যান্বেষীই না নিখুঁত কামানো কোনো ভালমানুষের ছবিতে গোঁফ এঁকে আসল খুনীকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। গোঁফ শুধু ব্যক্তিত্বকেই বেঁধে রাখে না, গায়ের রঙও গোঁফের সাহায্যে বিকীরিত হয়। লক্ষ্য করে

দেখবেন ফরসা লোকরা গোঁফ কম রাখেন, শ্যাম কিংবা কৃষ্ণবর্ণের পুরুষরাই বেশি গোঁফাশ্রিত। কারণ কুচকুচে কালো গোঁফের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনো ধরনের রঙকেই একটু ফরসা দেখায়। মেয়েরা যেমন কালো তিলকে 'বিউটি স্পট' হিসেবে ব্যবহার করে, পুরুষের গোঁফও তেমনি মুখবর্ণকে আলোকিত করার 'স্পট লাইট'। গোঁফ থাকলে গোঁফ-চর্চাও থাকবে। গোঁফে তা দেয়ার ধরন দেখে তাবড় তাবড় লোকেরও মেজাজের আন্দাজ পাওয়া যায়। ঐ ধরনটাকে যদি একবার চিনে নিতে পারেন, তারপর মারুন না আপনি ঝোপ বুঝে (গোঁফ বুঝেও বলতে পারেন) কোপ! এই গোঁফ-ঘেঁষা-কোপ কদাপি ব্যর্থ হবার নয়। কারণ ডিমে তা দেয়ার মত গোঁফে তা দেয়ারও একটা মৌতাত আছে এবং সেই মৌতাত বুঝে তাতালে তাতল সৈকতেও ফুল ফোটাতে পারবেন আপনি।

তবে মোটামুটিভাবে আধুনিক গোঁফকে যুদ্ধ-শিশু বললে অন্যায় হয় না। প্রুশিয়ান তথা জার্মান সৈন্যরা সাহসের তেলটা ফুরোলেই গোঁফের সলতে উস্কে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের আলো জ্বালাত। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বৃটেনের মিত্র ছিল তুরস্ক। তুর্কী সৈন্যদের ছিল আকর্ণ গোঁফ রাখার অভ্যেস। যুদ্ধশেষে বৃটিশ সৈন্যরা এই তুর্কী গোঁফকেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধস্মৃতি-রূপে বহন করে ফিরেছিল দেশে। কাইজার, হিটলার, স্ট্যালিন, দ্য গল এবং চিয়াং কাইশেক প্রমুখ যুদ্ধ-নেতারা সবাই গুম্ফযুক্ত পুরুষ।

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে গোঁফ-গবেষণায় নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিটির ঠোঁটের ওপরে একগাছি চুলও নেই। ব্যক্তিটি হলেন মেজর জিওফ্রে পিকার্ড, বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর ভূতপূর্ব মনো-সমীক্ষক বর্তমানে নিউ ক্যাসল জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক। তাঁর 'জার্নাল অফ মেণ্টাল সায়েন্স' পুস্তকটিতে গোঁফ-গবেষণার এক কৌতুকপ্রদ বিবরণ রয়েছে। সৈন্য বাহিনীতে থাকাকালীন তাঁর ওপর ভার পড়েছিল অফিসার-পদপ্রার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার। তিন চারশ গোঁফদার লোককে বেছে নিয়েছিলেন পরীক্ষার জন্যে। গোঁফের আকার অনুযায়ী প্রার্থীদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হ'ল: ট্রিমড্, ব্রাশ, হেয়ার লাইন, ডিভাইডেড্ এবং টুথব্রাশ। পরীক্ষার ফলাফলটি অদ্ভুত হয়েছিল। প্রথমোক্ত চার শ্রেণীর প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা তেইশজন পাস-মার্ক পেল। এবং শেষ বিভাগটির অর্থাৎ "টুথব্রাশ" শ্রেণীর একটি লোকও নিয়োগের উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি।

স্মিল

স্ট্যালিন

হিটলার

নাভেন

ক্যান্টিনফ্ল্যাস

খুব অবাক হয়ে মেজর পিকার্ডি অন্য একটি সৈন্যাবাসেও এই একই ধরনের পরীক্ষা চালাতে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর এক সহযোগীকে। কিন্তু ফলা-ফলের এতটুকু তারতম্য হয়নি, অর্থাৎ 'টুথব্রাশ'য়ালারা সকলেই ফেল্। অথচ স্বয়ং হিটলারের ছিল 'টুথব্রাশ' গোঁফ: তাহলে কি ধরতে হবে হিটলারের চরম পরাজয়ের জন্যে দায়ী শুধু তাঁর ঐ ভুবনবিখ্যাত গোঁফটিই? গোঁফ-তত্ত্বের এই নিগূঢ় সমাচারটা জেনেই কি চ্যাপ-লিন তাঁর সর্বহারা ভবঘুরে চরিত্রটির মুখে 'টুথব্রাশ' গোঁফ দিয়েছিলেন এবং মঁসিয়ে ভার্দুতে চরিত্র পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল ভিন্ন ধরনের গোঁফটিতে!

চলচ্চিত্র অভিনেতাদের গোঁফ যুগকেও চিহ্নিত করে অনেক সময়। তবে এই গোঁফ-কৌলিন্য হলিউডে অভিনেতাদেরই একচেটে। গিলবার্ট, ডগলাস, ক্লার্ক গেবল, কোলম্যান প্রমুখ চিত্রনায়কেরা বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর গোঁফ-চাষীদের মুখে কম প্রভাব বিস্তার করেননি একদা। তবে আজকের তরুণ নায়করা প্রায় কেউই গোঁফকান্ত পুরুষ নন। ক্যারি গ্রান্ট, গ্রেগরী পেক, এলভিস প্রিসলে, মন্টেগোমারী ক্লিফট, এ্যানথনি পার্কিনস, পল নিউম্যান ইত্যাদি সকলের মুখেই কেশচিহ্নহীন। বাংলা-দেশেও নায়কদের উত্তমমুখ গোঁফে চিত্রিত না। তাঁরা চুলচেরা সৌন্দর্যে বিশ্বাসী। অর্থাৎ কেশবিন্যাসের কৌশলেই হালআমলের ছায়ানটেরা উত্তম হতে চান। কিন্তু চুলের ভৌগোলিক অবস্থান গোঁফের ওপরে হলেও বিশ্বস্ততার সারিতে প্রথম স্থান গোঁফের। গোঁফ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। আপনি হাজার পরিচর্যা করুন, যদি ওঠবার হয় চুল উঠে আপনাকে বিপদে ফেলবেই! টাককে আটকানোর বিজ্ঞান আজো অনাবিষ্কৃত, নইলে বিজ্ঞানের দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টাকের তলায় হাঁটিতেন না। কিন্তু গোঁফকে আপনি না ফেললে গোঁফ আপনাকে ফেলবে না। টাক এবং সময়ের হাতে মাথার চুল চুরি হতে পারে, কিন্তু গোঁফ চুরি অসম্ভব। তা সে গোঁফ যারই হোক, আপনার, আমার কিংবা 'হেড আপিসের বড়বাবুর!'

গোঁফযুক্ত লোকদের মাত্র শতকরা তেইশজন পাশ করতে পেরেছিল বলে যাঁদের গোঁফ নেই, তাঁদের কিন্তু উল্লসিত হবার এতটুকু হেতু নেই। কারণ পিকার্ডি গোঁফহীন লোকদের মধ্যেও শতকরা তেইশজনকেই মাত্র পাস করাতে পেরে-ছিলেন।

গোঁফের শ্রেণী-বিচারে আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। দেশী মতে গোঁফ ছয় প্রকারের :

মহিষশৃঙ্গ, মুলোজোড়,
গুল্লাফতা, পাতালফোঁড়
ঊর্ধ্বখোঁচা বেলাপাতি
গোঁফ হয় এই ছয় জাতি॥

এবং এর ওপর আছে বর্ষনির্ভর আকার, অর্থাৎ যার আয়তন বছরে বছরে পাল্টায়, প্রায় গাড়ির মডেলের মতই। গোঁফ যে পৃথিবীর অন্যান্য পদার্থের মতই পরিবর্তনশীল তার প্রমাণ পাবেন দুর্গোপুজোর অসুরের গোঁফের ক্রমবিবর্তনটিকে লক্ষ্য করলে। আজকাল কটা অসুরের মুখে মহিষ-শৃঙ্গ, মুলোজোড় দেখতে পান আপনি হলফ করে বলতে পারবেন না। এমন কি কার্তিকের সুপরিচিত বেলাপাতি গোঁফটিও থার্মোমিটারের পারদ স্তম্ভের মতই প্রায় অদৃশ্য।

তাহলে কি বলতে হবে গোঁফের চাষ আমাদের দেশে ক্রমশঃ কমে আসছে? সম্ভবতঃ না। কারণ হাল আমলের নব্য যুবকদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬৫ জন গোঁফ রাখেন। তবে লুকিয়ে রাখেন, কারণ একেবারে গোঁফহীন মুখ হালহীন নৌকোর মতই প্রায়। নিজেদের আকর্ষণ বাড়াবার জন্যেই তরুণদের এই হাল্লাকর্ষণ।

তবে গোঁফের হালটি থাকলে মেয়েদের কাছে নাজেহাল হবার সম্ভা-বনা কম এ তথ্যও কেউ হলফ করে বলতে পারেননি আজ পর্যন্ত। অতএব মাভৈঃ। গোঁফ না থাকলে যতটা ছোট হবেন ভাবছেন, গোঁফদার হলে ঠিক ততটাই হয়ত বড় হবেন।

মহিষশৃঙ্গ, মুলোজোড় গুল্লাফতা, পাতালফোঁড়, ঊর্ধ্বখোঁচা, বেলাপাতি গোঁফ হয় এই ছয় জাতি।

॥ অয়স্কান্ত ॥

॥ তেজস্ক্রিয়তার উৎস ॥

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে যে-ধরনের আলোচনা চলেছে তাতে মনে হতে পারে, তেজস্ক্রিয়তা মাত্রেই জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। আসলে কিন্তু তা নয়। তেজস্ক্রিয়তা তখনই জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে যখন তা বিশেষ একটি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়েছে যে, কলকাতার বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা এখনো পর্যন্ত বিপজ্জনক সীমানার অনেক অনেক নিচে। বিভিন্ন সূত্র থেকে যে-সমস্ত তথ্য প্রচারিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, কলকাতার বাতাসে প্রতি ঘন মিটারে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা হচ্ছে এগারো মাইক্রো-মাইক্রো কুরী। অন্তত একশো মাইক্রো-মাইক্রো কুরী না হওয়া পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যে তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ লাগার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এ থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, এখনো পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ ঘটেনি। তবে বিষয়টি সম্পর্কে সকলেরই পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটাই এমন যে, ভবিষ্যতে আরো একাধিক বার পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এ-ধরনের প্রত্যেকটি বিস্ফোরণের অনিবার্য ফল এই যে, আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতে অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় বিষাক্ত হয়ে উঠবে। এবং এই প্রক্রিয়ায় কোথাও যদি একটা ছেদ না আসে তাহলে এই বিষ মানবজাতির গোটা ভবিষ্যতকে বীভৎস অবলুপ্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে।

কাজেই তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে এই মুহূর্তে আতঙ্কিত হবার যদিও কিছু নেই, কিন্তু চিন্তান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

গত সংখ্যায় আমরা পরমাণুর গড়ন ও তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে আলোচনা তুলেছিলাম। তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা যদি স্পষ্ট হয়ে থাকে তাহলে একথাটি বোঝা যাবে যে, তেজস্ক্রিয়তা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ছাড়াও অন্যান্য নানা কারণে হওয়া সম্ভব। যেমন, মাটির নিচে অজস্র খনিজ পদার্থের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন পদার্থও আছে যা তেজস্ক্রিয়। যেমন, ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম জাতীয় পদার্থ যেখানে আছে সেখানে তার দরুন তেজস্ক্রিয়তাও থাকবেই। এই গেল তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হবার একটি উৎস। অন্য আরেকটি উৎসও আছে। মহাশূন্য থেকে আমাদের এই পৃথিবীর ওপরে সব সময়েই তেজস্ক্রিয় রশ্মিপাত হচ্ছে। তার মানেই তেজস্ক্রিয়তা। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, প্রাকৃতিক কারণেই এই পৃথিবীর সর্বত্র কিছুটা তেজস্ক্রিয়তা থেকেই যাচ্ছে। এই তেজস্ক্রিয়তার মধ্যেই আমরা জন্মেছি ও বড়ো হয়েছি। তেজস্ক্রিয় পদার্থের দরুন যে তেজস্ক্রিয়তা তা পদার্থের পরিমাণের ওপরে নির্ভর করে। পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে তেজস্ক্রিয়তাও বেশি। পরিমাণ কম হলে তেজস্ক্রিয়তাও কম। আর মহাজাগতিক রশ্মির জন্যে যে তেজস্ক্রিয়তা তা যতোই উঁচুতে ওঠা যাবে ততোই বৃদ্ধি পাবে। সূর্যে যদি বড়ো রকমের কোনো আলোড়ন ঘটে বা কোনো তারায় বড়ো রকমের কোনো বিস্ফোরণ, তাহলেও শেষোক্ত ধরনের তেজস্ক্রিয়তা বাড়বে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই দু-ধরনের তেজস্ক্রিয়তা প্রাকৃতিক কারণে বা জাগতিক নিয়মে সৃষ্ট, মানুষের এতে কোনো হাত নেই। আর, পৃথিবীর কোনো অঞ্চলই এই তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত নয়। বিজ্ঞানীরা এই তেজস্ক্রিয়তার নাম দিয়েছেন 'ব্যাকগ্রাউন্ড' বা পটভূমিক তেজস্ক্রিয়তা। কলকাতার বাতাসে এখন যে-পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে তা পটভূমিক তেজস্ক্রিয়তার চেয়ে প্রায় এগারো গুণ বেশি। বলা বাহুল্য, এই বাড়তি তেজস্ক্রিয়তা মানুষেরই তৈরী।

আর মানুষের তৈরী তেজস্ক্রিয়তার কারণ পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ তো বটেই, তা ছাড়াও অন্য আরো অনেক কিছু। চিকিৎসার জন্যে যে রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করা হয় বা রেডিও-থেরাপি, তার ফলেও তেজস্ক্রিয়তা হতে পারে। তেমনি হতে পারে পারমাণবিক পাওয়ার-স্টেশন থেকে বা পারমাণবিক চুল্লী থেকে। স্থানবিশেষে বা মানুষ-বিশেষে এই তেজস্ক্রিয়তা কম বা বেশি হয়ে থাকে। বিষয়টি এত জটিল যে, তেজস্ক্রিয়তার মাপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করাও খুবই শক্ত ব্যাপার। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং এখনো করছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, সে-দেশে এখনো পর্যন্ত পারমাণবিক বিস্ফোরণ-জনিত তেজস্ক্রিয়তা খুবই কম। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের গবেষণাও ব্রিটেন সম্পর্কে এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে। মোটামুটি বলা চলে, পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে তেমন বিষাক্ত করে তুলতে পারেনি। তবে ভবিষ্যতের কথা জোর করে কিছু বলা চলে না। গত সংখ্যার আলোচনায় আমরা বলেছি, এক-একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে পনেরো থেকে বিশ বছর ধরে তেজস্ক্রিয় ভস্মপতন হতে পারে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন যে, কলকাতার বাতাসে বর্তমানে তেজস্ক্রিয়তার যে ছোঁয়াচ লেগেছে তা ১৯৫৮ সালের মার্কিন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফল। পরবর্তীকালের বিস্ফোরণের ফল টের পেতে অবশ্যই সময় লাগবে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ সম্পর্কে ততোটা চিন্তাগ্রস্ত নন যতোটা চিন্তাগ্রস্ত শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পারমাণবিক তেজের প্রয়োগ সম্পর্কে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনিবার্য ফল হিসেবে শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমশই অধিক অধিক মাত্রায় পারমাণবিক তেজ ব্যবহার করা হচ্ছে। অদূরভবিষ্যতে এমন কি রাস্তার মোটরগাড়িও হয়তো পারমাণবিক তেজের দ্বারা চালিত হবে। পারমাণবিক তেজের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের তোড়জোড় এমন কি আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে। এইভাবে

পারমাণবিক তেজের প্রয়োগ যতো ব্যাপক হবে ততোই বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। এমন কি পারমাণবিক চুল্লীর আবর্জনা অপসারণ করাটাও বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমতো একটা সমস্যা। কারও মতে এই আবর্জনার গতি হওয়া উচিত মাটির গভীরে, কারও মতে গভীর সমুদ্রে। উনুনের ছাই ফেলার মতো এই আবর্জনাকে যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করা চলবে না। কারণ পারমাণবিক চুল্লীর আবর্জনা অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয়। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক তেজের প্রয়োগকে কিভাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তোলা যায়, তাই নিয়েই বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ তো একটা রাজনৈতিক সমস্যা। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিলেই তা বন্ধ হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অন্য সমস্যাটি থেকেই যাচ্ছে।

॥ মানবদেহে তেজস্ক্রিয়তার কুফল ॥

প্রথমত তেজস্ক্রিয়তার ফলে নানা ধরনের শারীরিক রোগ হতে পারে। যেমন ক্যানসার বা লিউকোমিয়া। দুটোই মারাত্মক রোগ। এমনি আরো নানা রোগ। এমন কি প্রজনন-ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তেজস্ক্রিয়তা রোগের কারণ হবে তখনই যখন তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় তা হওয়া সম্ভব নয়। যদি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয় বা পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলেই এই শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু মানুষের শরীরের গড়নটা এমনই যে, অল্পমাত্রার তেজস্ক্রিয়তার ফলেও শরীরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আইসোটোপ একটু একটু করে সঞ্চিত হতে পারে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, তেজস্ক্রিয় আয়োডিন দুধের সঙ্গে শরীরের মধ্যে ঢুকতে পারে এবং থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডে জমা হয়ে থাকতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কাটি খুবই বেশি। সোভিয়েত মেগাটন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের পরে লণ্ডনের বিজ্ঞানী-মহলে কথা উঠেছিল যে, দুধের মধ্যে নাকি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন পাওয়া যাচ্ছে। সুখের বিষয়, এই আশঙ্কাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। দুধে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন আসে গোরুর খাদ্য থেকে। গোরু যদি এমন মাঠে চরতে যায় যে-মাঠের ঘাসে তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ লেগেছে তাহলে সেই গোরুর দুধে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থাকাটা অসম্ভব নয়। এই একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য থেকেও মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঠাঁই করে নিতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার ছোঁয়াচ লাগলে মাঠের ফসলই হোক বা সমুদ্রের মাছই হোক, কোনো কিছুই নিরাপদ নয়।

দ্বিতীয়ত, তেজস্ক্রিয়তার ফলে মানুষের প্রজনন-অঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে মাত্রার কম-বেশি বলে কিছু নেই। যে-কোনো মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার ফলেই জীবকোষের মধ্যে কিছু না কিছু বিকৃতি বা মিউটেশন হওয়া সম্ভব। আর জীবকোষের বিকৃতি ঘটা মানেই ভবিষ্যৎ বংশধারার মধ্যে বিকৃতি। এই বিষয়টিও এত জটিল যে, স্পষ্টভাবে কিছু নির্ধারণ করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। মার্কিন বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ২টি শিশু কোনো না কোনো প্রজননগত বিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। জাতিসঙ্ঘের বৈজ্ঞানিক কমিটির হিসেব অনুসারে, ১৯৫৮ সালের পরে পৃথিবীতে যদি আর কোনো পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ না ঘটত তাহলে প্রজননগত বিকৃতির লক্ষণাক্রান্ত শিশুর সংখ্যা এক লক্ষের বেশি হত না আর লিউকোমিয়া রোগাক্রান্তের সংখ্যা হত ২৫,০০০ থেকে ১,৫০,০০০। কিন্তু ১৯৫৮ সালের পরেও পৃথিবীতে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং তার ফলে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ। তার মানে, ১৯৫৮ সালের তুলনায় বিপদের সম্ভাবনা এখন প্রায় দ্বিগুণ।

প্রজননগত বিকৃতি নিয়ে এই পৃথিবীতে একটি শিশুরও জন্ম হোক, তা নিশ্চয়ই আমরা চাই না। এই কারণেই পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষকে এক জোট হয়ে দাবি তুলতে হবে, পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ এই মুহূর্ত থেকেই বন্ধ হোক।

তৃতীয়ত তেজস্ক্রিয়তার ফলে জীবজগতে খাদ্য-যোগানের সূত্রটি ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আমরা জানি, জীবজগতে খাদ্য-যোগানের ব্যাপারে একটা পরস্পর-নির্ভরশীলতা আছে। সেখানে এমন কি ক্ষুদ্র কীটও তুচ্ছ নয়। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার ফলে জীবজগতের বিশেষ একটি শাখা একেবারেই লোপ পেতে পারে এবং তার ফল কোনো না কোনো ভাবে অন্যান্য প্রত্যেকটি শাখার জীবকেই টের পেতে হবে।
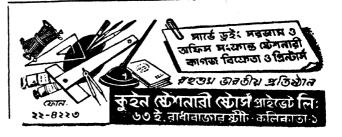
মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন!
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

মার্শাল যে দুর্ধর্ষ শিকারী তার প্রমাণ আছে তাঁর শিকার-কাহিনীতে। তিনি শুধু বড় শিকারীই নন, তিনি বড় সাহিত্যিকও।

মার্শাল একজন আমেরিকান। শিকার তাঁর হবি। শিকার উপলক্ষে তিনি আলাস্কা, আফ্রিকা, ইন্দো-চায়না, ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছেন এবং বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। শিকারে প্রতি মুহূর্তে বিপদ আছে বলেই শিকারে তাঁর প্রবল আকর্ষণ। এভারেস্ট শৃঙ্গ দুরারোহ বলেই সে দুঃসাহসীদের আকর্ষণ করে।

মানুষের বিপদের প্রতি এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বড়ই বিস্ময়কর। প্রতি মুহূর্তে মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে যে সংগ্রাম করছে, পুনঃ পুনঃ সেই মরণের কবলেই সে নিজেকে নিক্ষেপ করছে!

শিকারে হত্যা আছে। যাঁরা অহিংস তাঁদের কাছে হত্যা নিন্দনীয়। একজন শ্বেতাঙ্গের কাছে এই আবেদনের বিশেষ মূল্য নেই। কেউ কেউ বলেন নেহাত খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া হত্যা নিন্দনীয়।

এই সকল যুক্তির জবাবে মার্শাল বলেন, 'যদি আদিম যুগে প্রাচীন মানবগোষ্ঠী বন্য জানোয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করত, তা হলে এ পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি লুপ্ত হয়ে যেত। বেঁচে থাকত শুধু হিংস্র জানোয়ার। আর খাদ্য? একটা নরহন্তা বাঘের কাছে পথিকের দেহ-মাংসের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। একজন কসাইর কাছে একটি জানোয়ারের মাংসের মূল্য কয়েকটি টাকা। কিন্তু একজন শিকারীর কাছে তাঁর শিকার তাঁর শৌর্য ও বিজয়ের নিদর্শন। বহু বিপদসংকুল অভিযানের সাফল্যের প্রতীক। বছরের পর বছর কাল-সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। বিলীন হয় না এই জীবন-মৃত্যুর জড়াজড়ি-করা পর্যটনের স্মৃতি। অরণ্যের প্রভাত, অরণ্যের সন্ধ্যা, নৈশ অরণ্যের বিচিত্র ধ্বনি, অঘটনের মুখোমুখি হয়ে দেহের রোমাঞ্চ ও শিহরণ অবিস্মরণীয়।

মার্শালের অরণ্য-অভিযানের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয় বনবাসের সেই দিনগুলি। বনের অলি-গলি হাতছানি দিয়ে ডাকে শিকারীকে। অজ্ঞাতে টেনে নিয়ে যায় গভীর থেকে গভীরতর গহনে। সেই স্মৃতিতে গ্লানি নেই, আছে আনন্দ। আর আছে ক্যাম্প-লাইফের বিচিত্র দিনগুলির মায়া।

বাংলাদেশে বাস করেও ভুটানে শিকারের জন্যে যাওয়া হয়নি। লাইসেন্স ফী ফেরত নিতে হয়েছিল অনিবার্য কারণে। সেই ভুটানকে শিরায় শিরায় অনুভব করলাম মার্শালের বর্ণনায়। তিনি এসেছিলেন বঙ্গদেশ থেকে নয়। সুদূর আমেরিকা থেকে। সমুদ্র-মহাসমুদ্র ডিঙিয়ে।

শিকার-ক্ষেত্র ভুটানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। এখানে আছে দুর্গম হিমাদ্রি-দেহ। গহন অরণ্য। অসংখ্য জানোয়ার। আর অরণ্যপ্রান্তে আছে প্রচুর বন্য অধিবাসী। ছোট ছোট জীর্ণ কুটীরে।

শিকারী এলেন। সঙ্গে ছিল ফিরিঙ্গী দোভাষী আর একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ও একজন দেশী বাবুর্চী। পার্শ্বচর হিসাবে ছিল গাদা বন্দুক হাতে একজন আদিবাসী। এ লোক অরণ্যে পথ দেখায়। জানোয়ারের সন্ধান দেয়। বনের লক্ষণ দেখে জানোয়ারের স্বরূপ বলে দেয়।

ভারী রাইফেল আছে সাহেবের হাতে। হাল্কা রাইফেল বড় জানোয়ারের বেলা উপযোগী নয়। বিদ্ধ করার ক্ষমতা এ রাইফেলের যাই থাক। জানোয়ারকে ভারী রাইফেলের ভারী গুলি ছাড়া রুখে রাখা বড় কঠিন। গুলি খেয়ে বাঘ ছোটে অসম্ভব বেগে। হয়ত বহু দূরে গিয়ে

তারা মরে অগম্য গহনে, অথবা ঘায়েল হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বন্য জানোয়ারের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে এই গুলি-খাওয়া বাঘ নিদারুণ। মানুষের সঙ্গে ত আর ধ্বস্তাধ্বস্তির প্রয়োজন হয় না। কণ্ঠনালীতে দুটো ধারালো দাঁত বসিয়ে দিলেই হল। তারপর মুখে ঝুলিয়ে নিয়ে সুকোমল নরমাংস খাওয়া।

অদ্ভুত দৃশ্য আর অদ্ভুত পরিবেশ। ট্রাকে করে ক্যাম্পে পৌঁছতে দেখা যায় চিতল হরিণ। রাত্রে ছাউনির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় হরিণ, বরাহ। এরা ক্ষেতের বেড়া ভাঙে। ফসল খেয়ে ফেলে। আর রাতে শোনা যায় বাঘের নির্ঘোষ। সে গর্জনে পাহাড় অরণ্য কেঁপে ওঠে। কাঁপে বন্য জানোয়ার—যারা বাঘের ভক্ষ্য।

শিকারীর বাহন ছিল দুটো হাতী। একটা নর। অন্যটা মাদী। জঙ্গল থেকে খেদা করে ধরা বুনো হাতীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এমন হাতী। শিখেছে চমৎকার। রাইফেলের আওয়াজে চমকায় না। মাহুতদের কথা বোঝে। বাঘ দেখতে পেলে অথবা অদূরে বাঘের অস্তিত্ব টের পেলে ওদের শুঁড় উঁচু হয়ে ওঠে। দেহটা কাঁপতে থাকে খানিক সময়। তারপর আর কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না। যে বাঘ লাফ দিয়ে হাতীর দেহে দাঁত বসিয়ে দিতে আসে, তার সে মুহুর্মুহুঃ আক্রমণের মুখেও হাতী দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল পাহাড়ের মতই।

তবু যে বিপদ নেই তা নয়। বুনো হাতীর পাল থেকেও বিপদ আছে। বনে প্রণয়-পীড়িত হাতী আছে। গুণ্ডা হাতী আছে। গৃহপালিত হাতীর প্রতি তাদের লোভ দুর্জয়।

মার্শাল কখনো হাতীর পিঠে গদিতে বসে শিকার করেননি। বড় বড় পা দিয়ে পাহাড়ে ঢালু পথে পাথরের দৃঢ়তা পরখ করে নিয়ে পেছনের পা দুটো গুটিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে যেভাবে পাহাড় চড়ে, আবার ঢালু পথে অবতরণ করে, আনাড়ীর কাছে সেটা খুবই বিপজ্জনক। গোড়ার দিকে সাহেবের ভয় হয়েছিল প্রচুর। ক্রমে বেশ অভ্যস্ত হয়েছিলেন। গদী-বাঁধা মোটা দড়ি—দু' হাতে না ধরেও প্রয়োজন অনুসারে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তেন অনায়াসে। চারিদিকে ডাল-পালা থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যেই কিছু কুস্তি-কসরতের প্রয়োজন হয়।

বনে বড় বড় জানোয়ার অসংখ্য। আফ্রিকার পরে এমন জানোয়ার বোধ হয় আর কোথাও নেই। বড় এবং হিংস্র জানোয়ার শুধু বাঘ, লেপার্ড, ভালুকই নয়। বুনো হাতী, বুনো মোষ, বাইসন জল-মহিষের সংখ্যাও অগণ্য।

এদের মুখোমুখি হতে হবে এই বিরাট-দেহ, দোদুল-গতি হস্তীপৃষ্ঠে। নীচে শর বা ঘাসের জঙ্গল চিরে। আর ওপরের ডালপালা আর মোটা মোটা গাছে-জড়ানো লতা থেকে হাত-পা-মাথা বাঁচিয়ে। হাতী এতে সাহায্য করে। শুঁড়ে টেনে ডাল ভেঙে দেয়। লতা ছিঁড়ে দেয়। সরিয়ে দেয়। খানিকটা বুঝে নিয়ে সাহেবের মনে হয়েছে এই এরোপ্লেন মোটরের যুগেও হাতীর মত নির্ভরযোগ্য আর উপভোগ্য বাহন আর নেই।

একটি মাহুত তার হাতীর সমবয়সী। দু'জনে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। দুজনে পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী। মাহুত হাতীর চালক। হাতীও তার রক্ষক। ওরা একে অন্যের ভাষা বোঝে। হাতী শুঁড়ে ধরে মাহুতের জন্যে জ্বালানী কাঠের গাছ উপ্‌ড়ে ফেলছে। আবার পায়ে, বা কানে কাঁটা ফুটলে হাতী আর্তনাদ করে কাত হয়ে মাটিতে শুয়েছে। মাহুত সন্তর্পণে কাঁটা তুলে ফেলছে।

সাহেবও ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলেন। আক দিয়ে কলার কাঁদি এনে হাতীদের খেতে দেন। হাতীদের চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। হাতী বুদ্ধিমান। স্নেহপরায়ণ। স্মরণ-শক্তিও ওদের বিস্ময়কর।

একজন বুনো আদিবাসীকে পাশে বসিয়ে মার্শাল শিকারে বেরিয়েছেন। আদিবাসীর হাতে বন্দুক। গাদা-বন্দুক। নিরস্ত্র হয়ে ওরা শিকারে বেরোয় না। তা না হয় যাক্। কিন্তু ওরা বড় সহজে উত্তেজিত হয়। কখন হঠাৎ বাঘ দেখে অসময়ে গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে যদি শিকারী জখম নাও হয়, বাঘ জখম হলে মুস্কিল। আহত বাঘ বনের কাঠুরে আর কুটিরের মানুষ—সকলের পক্ষেই বিপজ্জনক। একথা শিকারী মাত্রেই জানেন যে, অক্ষত বনের বাঘের চেয়ে আহত বাঘ অনেক বেশী ভয়ংকর।

পাহাড়ের দেহে সবুজের সমুদ্র। এ সমুদ্রেরও কূল-কিনারা নেই। কোথাও মাথার ওপর ঘন-পল্লবের ছায়া, কোথাও পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে গলে নেমেছে গলিত রৌপ্যের মত সূর্যকিরণ। কি গম্ভীর গভীর অনুভূতি!

কুলীদের কথাই ঠিক্। জানোয়ারের সীমা-সংখ্যা নেই। লেখা-জোকা নেই। ধাবমান জানোয়ারের পদধ্বনি শোনা যায়। কোথাও জঙ্গলে ভীষণ শব্দ। ডাল-পালা ভেঙে-চুরে ছুটছে বড় বড় জানোয়ার। জানোয়াররা আগন্তুকদের আবির্ভাব টের পেয়েছে। ওরা দেখছে শিকারীদের। কিন্তু ওরা দৃষ্টিগোচর নয়। ওরা শুধু শব্দ!

ওরা কারা?

বাঘ, লেপার্ড, হাতী, বাইসন, বুনো মোষ, অজগর?

শিকারীদের আছে কল্পনা। আছে আতঙ্ক। কিন্তু আতঙ্ক আছে বলেই আকর্ষণ আছে। অরণ্যের অলি-গলি আজ রহস্যে নিবিড়। ...

একটা শুকনো নদী পার হতে গিয়ে শিকারী দেখলেন, নদী-পাড়ের অরণ্যে অসংখ্য জালীপথ। অনেকগুলো সংকীর্ণ, কতগুলো প্রশস্ত। এই শেষোক্ত পথ-গুলিতে যাতায়াত করে বড় বড় জানোয়ার। এরা কখন যে বেরিয়ে অতর্কিতে এই পাড়ের সমান উঁচু হাতীর পিঠের মানুষদের আক্রমণ করে কে বলবে?

পাশ্বোপবিষ্ট দেশী শিকারীর দুটো আঙুল তার বন্দুকের ট্রিগারের ওপরে কাঁপছে।

সাহেবও নির্বিকার নন্। শিহরণ অনুভব করছেন ক্ষণে ক্ষণে।

নালার বালুতে অসংখ্য জন্তুর পায়ের ছাপ। সব কটা বড় জানোয়ারের পাঞ্জা আছে ওখানে। হাতীর আছে। ফসল পাকার সময় হয়েছে। ভুটানের পর্বতমালা থেকে নেমে এসেছে জানোয়ারেরা ফসল খেতে। মোষ, বাইসন, বরাহ, হরিণ। হরিণ আর বরাহের পেছনে আসে বাঘ।

হয়তো বাঘের সঙ্গে অচিরেই সাক্ষাৎ হবে। হয়ত বনের হাতীর সঙ্গে হবে শিকারীদের হাতীর ঠোকাঠুকি। হাতী-শিকার আইনে নিষিদ্ধ। ওটাকে এড়িয়ে যেতেই হবে। গুণ্ডা হাতী এলে কখন কি অঘটন ঘটে!

শিকারী খুঁজছেন বিরাট শিংওয়ালা বুনো মোষ। বাইসন। আর অরণ্য-

শিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রফি—বাঘ! ওরা দেখতে ভয়ংকর। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভীষণ। দেহ-শক্তিতে অতুলনীয়। শুধু মানুষ নয়, বনে এমন জানোয়ার নেই যে ওকে ভয় করে না। বাঘের পায়ের নিচে শুকনো ডালপালা ভাঙ্গার শব্দে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায় অধিকাংশ জানোয়ার।

একদল চিতল হরিণ শিকারীদের নজরে এসেছে। কি সুন্দর ওদের চিত্রিত আঙরাখা। শিকারী ভাবছেন—বোধ হয় বাঘ ও লেপার্ডের পরে এমন সুন্দর জানোয়ার পৃথিবীতে আর নেই। ওর অঙ্গাবরণ কি মসৃণ! সূর্যকিরণ ঝলকে উঠছে ওর দেহে। কি ক্ষিপ্র ওর গতি। সামান্য একটু শব্দে ঘাড় উঁচু করে ওরা তাকায়। কি সুন্দর চকিত এই দৃষ্টি।

খাদ্যের জন্য মাংসের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সাহেব ওদের মারবেন না। কুলীদের জন্য একটা শম্বর মেরে নিলেই চলবে। সবচেয়ে সুস্বাদুও বটে শম্বরের মাংস।

হরিণগুলো এগিয়ে আসছে শিকারীদের হাতীর কাছে। বুনো হাতী আর পোষা হাতীর তফাত ত' ওরা জানে না। হাতীর পিঠে অত উঁচুতে স্থাণুর মত নিঃশব্দ মানুষগুলোকেও ওরা দেখছে না। মানুষের গন্ধও বোধহয় অত উঁচুতে হরিণের নাকে প্রবেশ করে না। সে গন্ধ টের পায় গাছের ডালের বানরেরা।

হাতী সবে মাত্র অর্ধমাইল অতিক্রম করেছে। অদূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জানোয়ার ছুটেছে। হাতীর পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেছে কোনো জানোয়ারের। জন্তুটাকে দেখা যায় না। দেখা যায় ঘাসের মধ্যে ছুটন্ত আলোড়ন। হয়ত একটা শিকারের সুযোগ আসছে। সাহেব রাইফেল হাতে নিয়েছেন।

বেরিয়ে এলো একটা প্রকাণ্ড বরাহ।

রাইফেল নিশানা করে সাহেব ফায়ার করেছেন। দুম্ করে আওয়াজ হল ভীষণ। কিন্তু শুয়োরটা তেমনি বেগে পালিয়ে গেল। গুলি গায়ে লাগেনি।

শিকারী ভাবলেন, নিশানায় ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শুধু নিশানা নয়, সংকল্প আর ইচ্ছাশক্তিও থাকা চাই। ও দুটো হয়ত ছিল না।

আর একটা সুযোগ এসেছে। একটা বাদামী রঙের জানোয়ার দেখা যাচ্ছে। মাথাটা রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। একটা ঢালু পাহাড়ের গায়ে খানিকটা উঁচুতে।

মাহুত প্রশ্নের জবাবে বলল, 'শম্বর—খুব বড় বটে।' একবার ফায়ার মিস্ হয়েছে। আরো মিস্ হলে শিকারী হিসাবে সাহেবের ওপরে কারো আস্থা থাকবে না। খুব সাবধানে জানোয়ারটা লক্ষ্য করে সাহেব ফায়ার করেছেন।

গুলি ঠিক লেগেছে। শম্বরটা গুলি খেয়ে পাহাড়ের ঢালু দিয়ে গড়িয়ে প্রায় হাতীর পায়ের কাছে এসে পড়েছে।

চুল্লীর আগুনে দেখা যাচ্ছে দেহাতীদের মুখ

বিপুল দেহ শম্বরটার। শিংগুলিও মোটা এবং দীর্ঘ। গৃহসজ্জার পক্ষে চমৎকার।

জংলীরা অতিদ্রুত হাতী থেকে নেমে পাকা কসাইর মত ছুরি চালালো শম্বরের দেহে। বড় বড় মাংস আর মাথাটা ঝুলিয়ে দিলে হাতীর দেহের সংগে। তারপর হাতীকে নির্দেশ করা হল ক্যাম্পের পথ।

সেদিনকার শিকার শেষ।

প্রথম দিনের পর্যটন বেশ ভালই লাগল সাহেবের। কোথায় কোন্ সুদূরে রয়েছে নগরের কোলাহল। এখানে আছে নিবিড় গহনের অনুভূতি। অরণ্যের স্তব্ধ শান্তি। জ্যোৎস্নার প্লাবন নেমেছে প্রান্তরে। অরণ্যে আলোছায়ার বৈচিত্র্যও কি বিস্ময়কর।

অদূরে ক্যাম্প। চুল্লীর আগুনে দেখা যাচ্ছে দেহাতীদের মুখ। আশে-পাশে শোনা যায় অরণ্যের মর্মর। ওদের চেতনার স্পর্শ লাগে অন্তরে। যে ভাবনা কখনো ভাবা হয়নি, যে অনুভূতির সংগে আজো পরিচয় হয়নি সেই ভাবনা আর অনুভূতির আবেশ ভেসে এসেছে অরণ্য-বায়ুতে।

সাহেবের ছাউনিতে কাছে-পিঠের বস্তি থেকে এসে জমায়েত হয়েছে বহু লোক। নূতন সাহেব কত দিন থাকবেন? কেমন তাঁর সাহস? ওরা হয়ত এসেছে এই মনে করেই যে, বড়-সাহেবের সংগে পরিচয়ে কিছু লাভ এবং কিছু গৌরব অবশ্যই আছে।

একজন বলছে—সাহেব, একটা মানুষ-খেকো বাঘ মাত্র পনর মাইল দূরে একটা বস্তিতে মানুষ খেয়েছে। বাঘ-টাকে মারবেন আপনি?

আর একজন বলছে—এদিকে বাঘ নয়। একটা খ্যাপা হাতী রোজ রাত্রে

ভাঙছে তাদের খেতের বেড়া। ফসল নষ্ট করছে। ভেরী বাজানোর আওয়াজকে পরোয়া করে না। হল্লাকে ত' কখনই না। মশালকেও না। বলুন ত' সাহেব কি করা যায়? দিননা ওকে খতম করে?

তৃতীয় ব্যক্তি বলছে—মহিষের মত বিরাট বাঘটা দিনে-দুপুরে মারছে গেরস্তর গোরু মোষ। রাখালদের একটুও ভয় করে না। সেদিন এক থাপ্পড়ে একটা জোয়ান ছোকরার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিলে বাঘ। বাঘটাকে মেরে আমাদের গোরু-মোষের প্রাণ বাঁচান সাহেব।

শিকার-ক্যাম্পে এমনি কত অনুরোধ আসে অপোগণ্ড দেহাতীদের কাছ থেকে।

শুধু বাঘ হাতীর ভয় নয়। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে এই বস্তি অঞ্চলে। এক অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়ায় এই বন-প্রান্তরে। জ্যোৎনা-লোকে গাছের ঝিলিমিলি ছায়ায় সাহেবের প্রেতাত্মাকে দেখা যায়। দেহ নেই। আছে শুধু ছায়া। সাহেব পাট-চাষের জন্যে এসেছিলেন দশ বছর আগে। মারা গেলেন ম্যালেরিয়া জ্বরে। কিন্তু আজো তাঁকে দেখা যায় তাঁর জীর্ণকুটির আঙিনায়। দেখা যায় চাঁদের আলোতে!

সাহেব, কোনো ফিকির-কৌশল জানা আছে আপনার? তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক। ঘুমিয়ে থাক তাঁর কবরে!

নিরুপায় নির্বোধ পাহাড়ী লোক-গুলো বাঘ আর ভূতের কাহিনী বলছে এক নিঃশ্বাসে। নগরের কোলাহল ও সভ্যতা থেকে শত শত ক্রোশ দূরে এই অজানা ভুটান-সীমান্তে চাঁদের আলো আর অরণ্যের অদ্ভুত মায়ায় শিক্ষা আর অশিক্ষার পার্থক্য বুঝি মুছে যায়। ঐ বাঘের কাহিনীর মত ঐ প্রেতাত্মার ছায়াও মার্শালের চিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে আনমনা করে তুলছে।

কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে বল্লম আর বাঁশের লাঠি ঘুরিয়ে বস্তির লোকগুলো ফিরে গেল আপন আপন কুটিরে।

ওদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গলের ভিতরে দুড়দাড় আওয়াজ তুলে উপস্থিত হ'ল এক পাল বুনো হাতী। হাতীরা এসেছে নূতন শিকারীদের দেখতে না পোষা হাতীর লোভে? কে জানে? চন্দ্রালোকে দেখা যায় শুণ্ডের আস্ফালন। বড় বড় ছায়া মূর্তি। কানে শোনা যায় জঙ্গল তাড়নার শব্দ। যেন ডাকাত পড়েছে অরণ্যে। ক্যাম্পের চতুঃসীমানায় দাপাদাপি আর গর্জন!

ভীতিবিহ্বল ক্যাম্পের কুলীরা আগুনের কাছে জড় হয়ে দেখছে এই লঙ্কাকাণ্ড। বড় বড় চোখ পাকিয়ে আর মার্শাল গুলি-বোঝাই রাইফেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের সামনে।

অদ্ভুত হাতীদের আচরণ। যেমন অকস্মাৎ তাদের আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি হঠাৎ তারা প্রস্থান করলে।

হাতী আর নেই। কিন্তু কত রকম শব্দ আছে জঙ্গলে। কত বিচিত্র ধ্বনি। বৃক্ষপত্রের মর্মর ছাপিয়ে কানে আসছে কত অদেখা জানোয়ারের বুলি।

হঠাৎ আকাশ চিরে গেল একটা জন্তুর করুণ আর্তনাদে। এ আর্তি বরাহ-শিশুর। বাঘ ওকে মেরেছে। পর মুহূর্তে শোনা গেল বাঘের গর্জন!

বাঘ যখন তার শিকারের অনুসরণ করে তখন সে নিঃশব্দে পথ চলে। কিন্তু এক অরণ্য ছেড়ে অন্য অরণ্যে যাওয়ার সময় সে ডাকে। বিশেষ ঋতুতে সে ঘন ঘন ডাকে সঙ্গিনীর সন্ধানে।

বাঘের ডাকটা ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। ওটা আসছে ঐ শুষ্ক নালার দিক থেকে। আওয়াজ ক্রমেই গভীরতর...মেসিনগান থেকে নিক্ষিপ্ত একটা ধ্বনিময় উড়ন্ত গুলি যেন ছুটে আসছে বায়ুভরে। একটা নিরবচ্ছিন্ন গুম গুম আওয়াজ গড়িয়ে চলেছে। পাহাড় বন কাঁপছে সে ধ্বনিতে।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে বাঘ আসবে না। তথাপি জংলী লোকগুলো এক জায়গায় ঠাসাঠাসি করে বসেছে। তাদের ভয়, আর্তদৃষ্টি মার্শালের দেহেও শিহরণ এনেছে।

আগুনের কাছে বাঘ আসিনি। অদূরে চন্দ্রালোকে দেখা গেল তার ছায়ামূর্তি। চলে গেছে নালার রেখা অনুসরণ করে।

শিকারী ভাবছেন সেই বুনো বস্তিবাসীর পনর মাইল দূরের মানুষ-খেকো বাঘের কথা। বাঘের পক্ষে পনর মাইল কিছুই নয়। একটা ক্ষুদ্র-কায় বুনো মানুষের দেহে কতটুকু মাংসই বা আছে। ও ত হজম হয়ে গেছে। আবার সে বাঘ ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে। হয়ত এদিকে এগিয়েছে। ক্যাম্পে যে দরজা নেই! ঐ শয়তান মানুষধরা বাঘগুলো যে এক বস্তিতে দু'বার শিকার ধরে না!

ক'তগুলো ল্যান্টার্ণ আছে। আগুনের কুণ্ড আছে। ও বাঘগুলো সহসা আলোর কাছে আসে না। ওরা ধরে গ্রামান্তর যাত্রী-পথিককে। হয়ত দুপুরে বস্তির কুটির থেকেও মানুষ টেনে নিয়ে যায়। সব ল্যান্টার্ণগুলো জ্বালিয়ে রাখা হল।

তবু শিকারীর চোখে ঘুম নেই। দুটি মুদিত চোখে দেখছেন অরণ্যের নৈশ রাতের বধ্যভূমি। দেখছেন তার রক্তাক্ত অভিনয়। হাতী ছাড়া বাঘকে ভয় করে না এমন জন্তু নেই। হরিণ-যূথ মাথা উঁচু করে শুঁকছে বাতাস। বিপুল শক্তিশালী বন্য বরাহ চলছে সন্তর্পণে। কখন ঝোপঝাড় ফুঁড়ে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঐ রাক্ষস। কিছু বুঝে উঠবার আগেই হবে তাদের জীবনান্ত।

ভুটান অভিযানের দ্বিতীয় দিন। নালা অতিক্রম করে হাতী চলেছে মাহুতের নির্দেশে। অরণ্য চর পর্বত ওদের কাছে কিছু প্রতিবন্ধকই নয়। ওদের কি ভয়ডর নেই? হয়ত আছে ক্ষণিকের কম্পন। কয়েক সেকেণ্ড। তখন মাহুত ও শিকারী ঐ কম্পনের কারণ অনুসন্ধান করে। কারণ আর কিছু নয়। হাতীর শ্রবণ অথবা দর্শনেন্দ্রিয় বাঘের সান্নিধ্য জেনেছে।

সেদিন একটা চরম মুহূর্তের সম্মুখীন হলেন শিকারী। একটা নালা পার হয়ে যাচ্ছেন অপরাহ্ণের দিকে। পার্বত্য অরণ্যে এমন নালা অনেক থাকে। নালার দু' দিকের তটভূমি দশ ফুট উঁচু। ঐ নালাগুলি বাঘের যাতায়াতের পথ। ওখানে বালুতে রেখে যায় ওদের পায়ের ছাপ। অন্য জন্তুও আসে ফাঁকায় রোদ পোহাতে।

নালা পেরিয়ে হাতী চড়বে পাড়ের ওপরে।

হঠাৎ!

হাতীর শুঁড়টা উঁচু হয়ে উঠল আকাশে। হাতীর দেহে কম্পন। ভীত ত্রস্ত মাহুতের চোখ দুটো ঘুরছে ডাইনে বাঁয়ে। হাতীর দেহকম্পনে

মার্শাল স্খলিত হয়ে পড়ছেন পুরু গদীর আসনের ওপর থেকে! ভূমিকম্প? না।

'ও সেই।'

শিকারী প্রস্তুত।

বাঁ দিকের উঁচু পাড়ের জঙ্গলে কোথায় একটা হুলুস্থূল শুরু হয়েছে। জন্তুর হল্লা, গোমরানো গম্ভীর আওয়াজ, ডালপালা আলোড়নের শব্দ।

মাহুত বললে বাইসন। ওরা এক পাল!

প্রত্যেক শিকারীর কাছে বাইসন-শিকার লোভনীয়।

বাইসনগুলি কি চঞ্চল হয়েছে শিকারীদের গন্ধ পেয়ে? সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু হঠাৎ মাহুতের বাক যেন রুদ্ধ হয়েছে। একটা অস্ফুট শব্দ করে একখানা কম্পিত হাত তুলেছে উঁচু পাড়ের দিকে।

শিকারী গোড়ায় কিছুই দেখতে পাননি। জানোয়ারের চলাচলের রাস্তা অনেক। রাস্তাগুলোর মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের ব্যবধান। শিকারী ঘুরে বসে নিরীক্ষণ করে দেখছেন।

মাত্র দশ হাত দূরে হাতীর পিঠের সমান উঁচু নালার তটভূমিতে ঘাসের ভিতরে মনে হচ্ছে একটা মাথা। সাদা-কালো-হলদে রেখায় বিচিত্রিত। সেই ভয়ংকর! দুটো হলদে চোখ জ্বলছে!

এই ভয়ংকরের ভয়ে কোলাহল উঠেছিল বাইসনের পালে। স্পষ্ট বোঝা গেল বাইসনের প্রতি বাঘ এতই একান্তভাবে নিবিষ্ট ছিল যে, পেছন দিক থেকে চলমান হাতী তার নজরে আসেনি। কিন্তু হঠাৎ শিকারীদের দেখতে পেয়ে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দেহের প্রত্যেকটি রেখায় ফুটেছে জিঘাংসা।

বাঘের চোখে চোখ রেখে মার্শাল উপলব্ধি করলেন রেখাংকিত মুণ্ডের মাঝখানে আগুনের মত ঐ চোখ-দুটো বিবশ করে দিতে পারে যে কোন জানোয়ারকে। বরাহ আর মৃগ ত' তুচ্ছ!

শিকারী এই দৃষ্টির সম্মুখে যে অচঞ্চল ছিলেন তা নয়। কিন্তু সামলে নিতে শিকারীর সময় লাগে না।

বাঘ সিংহ প্রভৃতি জানোয়ার কখন যে আক্রমণ করবে তা ওদের চোখ দেখলেই বোঝা যায়। এই বাঘটার ভঙ্গী ও চোখ দেখে শিকারীর কোন সন্দেহ ছিল না যে, বাঘ আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়েছে। মাটিতে গুঁড়ি মেরে বসেছে। বাইসনের অনুসরণে ওর তাপমান যন্ত্র চরমে উঠেছিল। হঠাৎ শিকারীর উপস্থিতি বাঘকে রাগিয়ে দিয়েছে। যদি বাঘকে পালিয়ে যেতে হয় তবু আততায়ীর মুণ্ডপাত না করে পালাবে না।

হিংস্র জন্তুদের স্বভাবই এই। আত্মরক্ষার প্রধান উপায় আততায়ীকে হঠাৎ আক্রমণ।

সাহেব রাইফেলের লাইন মিলিয়ে লক্ষ্য স্থির করছেন। মনে মনে ভাবছেন। হঠাৎ লাফিয়ে পড়তে পারে হাতীর পিঠে। ভয় পেয়ে হাতী ছুটবে। শিকারীরা পড়ে যাবে মাটিতে বাঘের মুখে। তারপর এক একটি গ্রাসে সাবড়ে দেবে ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড!

বাঘের যে লেজটা ডাইনে বাঁয়ে নড়াচ্ছিল হঠাৎ সেটা উঁচুতে উঠেছে। মুখটা হাঁ করেছে। দেখা যাচ্ছে দু-পাটি সাদা ধারালো দাঁত—শাণিত ছোরার মত।

চরম সংকটে শিকারীদের চোখ ও স্নায়ু দ্রুত কাজ করে। তথাপি নিখুঁত নিশানা হওয়া প্রয়োজন। মুহূর্তে মৃত্যু না হলে জখম-খাওয়া বাঘ ভীষণ হয়ে ওঠে।

হাতী আর কাঁপছে না। দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত।

হঠাৎ 'দুম' করে ফায়ার হল। যে মুহূর্তে বাঘ লাফ দেবে ঠিক সেই মুহূর্তে। হয়ত বা বাঘ যখন লাফিয়ে উঠেছে শূন্যে।

বাঘের মস্তিষ্ক বিদ্ধ করেছে গুলি। নিমেষে ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল হয়ে গেছে। চারশ গ্রেন বুলেট তার কাজ করেছে। আশ্চর্য! মুহূর্ত পূর্বের ঐ বিপুল শক্তিময় দেহের একটা পেশীও ওর নড়ছে না!

একটি মোক্ষম গুলিতে সাহেবের সুদূর আমেরিকা থেকে ভারতে ও ভুটানে আসা সার্থক হল।

সার্থকতা কি হত্যায়? শিকারী বলেন, হত্যায় নয়। দুর্জয়কে জয় করায়। তাঁর পরবর্তী জীবনে বহু সন্ধ্যা ও রজনীকে ঐ পর্যটনের স্মৃতি আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে।
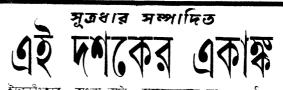
(পাঁচ)

॥ আলো ॥

[প্রচুর চা-সিঙাড়ার সদ্ব্যবহার করে পরিচালক আবার বক্তৃতা দিতে উঠলেন।]

পরিচালক : নতুন আলোকসম্পাত কোন্ পথে যাওয়ার চেষ্টা করছে তা বুঝতে গেলে আবার সেই পুরোনো কাসুন্দি না ঘেঁটে উপায় নেই; অর্থাৎ এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের নাট্যশালায় আলোকসম্পাতের কি হাল হয়েছিল সেটা বুঝতে হবে। দেখুন, বাংলা নাট্যশালা মহাশক্তিশালী নাট্যকারের জন্ম দিয়েছে। কয়েকজন প্রতিভাবান অভিনেতাকেও তুলে ধরেছে; কিন্তু মঞ্চকলা-কৌশলের ক্ষেত্রে বাংলা নাট্যশালা গত একশ' বছরে কিস্যু করেনি—একেবারে শূন্য, রিক্ত, দেউলে। এটা স্বীকার করতে কষ্ট হয়, কিন্তু স্বীকার করতে হবে, নইলে আত্মসন্তুষ্টিও কাটবে না, নবনাট্য আন্দোলনকেও বুঝতে পারবো না, ভবিষ্যতের দিকে পা ফেলতেও পারবো না। এবং এই দেউলিয়াপনার মূল কারণ আমরা বলেছি দাম্ভিক অসংযত অতি-অভিনেতাদের দল, যাঁরা নাটকের মধ্যমণি হয়ে থাকার প্রলোভনে এবং নিজেদের দুর্বলতায় ভীত হয়ে মঞ্চের অন্যান্য বিভাগগুলোকে পঙ্গু করে রেখেছিলেন।

দার্শনিক : সে তো আপনি দৃশ্য-সজ্জার আলোচনায় বলেছেন।

পরিচালক : বারবার বলার প্রয়োজন আছে, কারণ জাত্যাভিমানে আমরা বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে গর্বান্ধ হয়ে অজস্র অত্যুক্তি করে থাকি। আজ বাংলার রঙ্গমঞ্চকে সঠিকভাবে যাচাই করার দরকার আছে। আগেই বলেছি অভিনেতাকে বড় করতে দৃশ্যসজ্জাকে আঁকা-সীন আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। আলোকসম্পাত আবার দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই আঁকা-সীন যেখানে প্রধান দৃশ্যপট সেখানে আলোর উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে থাকবে এটা সহজেই বোঝা যায়।

নাট্যকার : কেন ?

পরিচালক : আঁকা-সীন অর্থই হচ্ছে পুরো মঞ্চ জুড়ে একটা দ্বিমাত্রিক চিত্রপট। আলোর সেখানে একমাত্র কাজ পটটাকে দৃশ্যমান করে রাখা, আলোকিত করে রাখা। যদি একটা ছায়ার দরকার হয় তবে সীনে ছায়াটা এঁকেই দিতে হবে; আলোকের সাহায্যে ছবির ওপর ছায়া ফেললে তো চলবে না! রাতের দৃশ্য এঁকেই বোঝাতে হবে; রাতের স্বল্প চন্দ্রালোক যদি আলো দিয়ে বোঝাতে যান তো পেছনের সীনটা অদৃশ্য হয়ে যাবে! একটা নাটক দেখেছিলাম—"হায়দ্রাবাদ"; রাত্রের নগরীর দৃশ্য বোঝাবার জন্যে পটুয়া চাঁদ এঁকেছেন, নীলাভ বাড়ি এঁকেছেন, বাড়িগুলোর অসংখ্য

উৎপল দত্ত

আলোকিত জানলা এঁকেছেন। সেখানে আলোর কর্তব্য কি? সমান উজ্জ্বল আলোকে পুরো পটটাকে উদ্ভাসিত করে রাখা। আলোও যদি স্বধর্ম পালনে ব্রতী হয়ে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করতো তবে পটুয়ার এত পরিশ্রম বিফল হোতো, দৃশ্যপটটা দেখাই যেত না। "ঝিন্দের বন্দী" দেখেছেন? এই সেদিন হয়ে গেল 'মিনার্ভায়'। উদিতের বাগানবাড়ির সামনে এক প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে প্রাসাদের; ছায়াটা আঁকা; সে ছায়া সৃষ্টিতে আলোর কোনো অংশ থাকতে পারে না; আলোটাকে উজ্জ্বল রেখে আঁকা ছায়াটাকে দৃশ্যমান করাই আলোকশিল্পীর একমাত্র কাজ এখানে। ঠিক তাই হয়েছিল আমাদের থিয়েটারে; এই সেদিন পর্যন্ত তাই ছিল; এখনো অনেক জায়গায় তাই আছে। এই নিখাদ নির্ভেজাল তাঁবেদার আলোকসম্পাত কি দিয়ে করা হয়ে এসেছে?—পায়ের কাছে এক সারি ফুটলাইট; আর মাথার উপরে কয়েক সারি ওপেন-ট্রাও ব্যাটেন, সাদা থিয়েটারি বাংলায় যার নাম ঝরি। এ ছাড়া কতকগুলো বড় ফ্লাড খাড়া করে সাজিয়ে একজোড়া টরমেণ্টর ব্যাটেন। তাও বৃহৎ ওলিভেট্ ফ্লাড নামক বস্তুটিও এঁরা কোনোদিন ব্যবহার করার কথা ভাবেন নি। এই সমস্ত অসংযত চুনকাম-করা আলোর ফল কি জানেন? পুরো মঞ্চটাকে সমানভাবে আলোকিত করার কি ফল? প্রথমত দৃশ্যপটটাকে একটা নোংরা ন্যাকড়ার মতন দেখাতো; দ্বিতীয়ত মঞ্চের কোনো একটা অংশকে গুরুত্ব দেবার প্রশ্নই উঠতো না; তৃতীয়ত আবহাওয়া সৃষ্টি জিনিসটি একেবারেই অসম্ভব; চতুর্থত, উজ্জ্বল দৃশ্যপটের সামনে অভিনেতাকে আলাদা করে তুলে ধরতে অতিরিক্ত কড়া আর্ক লাইট দরকার হোতো। আর ঐ আর্ক-ল্যাম্পেরই বা কি ব্যবহার আমরা দেখেছি? অভিনেতা-হুজুরের চোখ-পাকানো আর দাঁত-কিড়মিড়ের মুহূর্তে একটা "ফোকাশ" মেরে মুখখানাকে উজিয়ে দেয়া ছাড়া স্পট-লাইটের ব্যবহার আমরা কোথায় দেখেছি? তাপস সেনের আগে স্পট-লাইটের প্রকৃত ব্যবহার দেখিনি? এ কথাটা স্বীকার করতে হবে। স্বীকার করতে কারো কারো বুক ভেঙে যাবে জানি, তবু করতে হবে।

নাট্যকার : কিন্তু আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না। পুরোনো দিনের আলোর চেয়ে তাপসবাবুর আলো তো উন্নত হবেই; তাতে কি প্রমাণ হল? 'আলালের ঘরে দুলাল' থেকে নজীর দেখিয়ে এখন যদি কেউ প্রমাণ করতে বসেন যে বনফুল অনেক উন্নত, তাতে কি 'আলালের ঘরে দুলালের' কৃতিত্ব কমে? তাতে কি নতুন কিছু আমরা জানতে পাচ্ছি?

পরিচালক : আপনার উপমা ঠিক হল না। "আলালের ঘরে দুলাল" অনেক দিন আগেই সিংহাসনচ্যুত হয়ে হয়ে গেছে; বঙ্কিমবাবুরা সে ধারাকে অনেক পুষ্ট, অনেক বেগবতী করে বিশ শতকের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিশ শতকে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তররা সে ধারাকে যথাযথ বইয়ে নিয়ে গেছেন সামনের দিকে। থিয়েটারে তা হয়নি। "আলালের ঘরে দুলাল" থিয়েটারে জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসেছিল এই সেদিন পর্যন্ত, এখনো কতক কতক আছে। এবং একদল লোক এখনো চীৎকার করে বলেন, ঐ আলালী আলোই আসল থিয়েটার; তাপস সেন যা করছে সব বাজে। সেইজন্যেই

থিয়েটারের "আলাল" নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাহিত্যে "আলাল" একটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃত; থিয়েটারের "আলাল" কিন্তু একটি কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে, থিয়েটারের বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথদের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। তাই একে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন।

নাট্যকার : কিন্তু তাপসবাবু পুরোনো আলোকসম্পাতকে ভেঙ্গে কি গড়ছেন? নিছক বাস্তবতা! যেমন "অংগারের" জল বা "ফেরারী ফৌজের" আগুন। বাস্তবতা কি শিল্প? বাস্তবানুকরণই কি থিয়েটারের উদ্দেশ্য?

পরিচালক : নিশ্চয়ই না! সত্যিকারের থিয়েটারে বাস্তবতার স্থান নেই। কিন্তু বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চে ঐ বাস্তবতাই প্রয়োজন। এতদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চ ছিল হরি ঘোষের গোয়াল; তাকে বাস্তবোত্তর শিল্পে নিয়ে যেতে হলে আগে নিছক বাস্তবতাই কিছুদিন গড়তে হবে। যে শিশু দাঁড়াতে শেখেনি তাকে গোড়াতেই একশো মিটার দৌড়ে নাম লেখাতে দেয়া কি উচিত? তাপসবাবুরা বাংলা নাট্যশালার আঙ্গিককে দাঁড়াতে ও হাঁটতে শেখাচ্ছেন। ভবিষ্যতের রেকর্ড-ভাঙ্গা দৌড়ের গোড়াপত্তন করছেন। গত একশ বছর শিশু যে শুধুই মাটিতে পড়ে কেঁদেছে আর আঙুল চুষেছে।

ভাষাবিদ : তাপসবাবুর আলোকসম্পাতের মূল নীতিগুলো কি?

পরিচালক : সেটা অবশ্যই তাপসবাবু ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না। তবে তাঁর কাজ দেখে আমরা একটা অনুমান করতে পারি নিশ্চয়ই। কথাটা আমাকে ইংরাজিতে বলতে দেবেন দয়া করে?

ভাষাবিদ : কেন?

পরিচালক : কারণ বাংলা পরিভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

নাট্যকার : বেশ, বলুন।

পরিচালক : তাপসবাবুর আলো is more than a medium of visibility. It affects the appearance of all clements of the stage and by this power becomes a determining element in the composition of a stage picture. শুধুমাত্র মঞ্চটাকে দৃশ্যমান করার মধ্যেই তাপস সেনের আলো আবদ্ধ নেই। মঞ্চের প্রত্যেকটা বস্তু, প্রত্যেকটি মানুষকে আলোর স্পর্শে একটা অন্য চেহারা দেন তাপসবাবু; সেই খণ্ড খণ্ড চেহারা থেকে সমগ্র নাটকটার একটা ঐক্যবদ্ধ চেহারা গড়ে ওঠে। আধুনিক থিয়েটারের আলো সর্বসময়ে নাটকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা কয়। এ ধরনের আলোর জন্যে স্বভাবতই পুরোনো আঁকা-সীন একেবারে অনুপযুক্ত। এখন দরকার ত্রিমাত্রিক সজ্জা, আস্ত ত্রিমাত্রিক জিনিস যার উপরে আলো খেলতে পারে, যা আলো নিতে পারে। দরকার আস্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা-বিশিষ্ট সলিড বেদী, সিঁড়ি; দরকার কালো বা ধূসর পশ্চাদপট যা উজ্জ্বলভাবে আলো বিকিরণ করবে না, অর্থাৎ আলোক-পরিকল্পনাকে বিচ্ছুরিত আলোয় ছত্রভঙ্গ করবে না।

দার্শনিক : সেটা বুঝলাম। একটা আস্ত জিনিসকে আলোকসম্পাতের দ্বারা বিভিন্ন চেহারা দেয়া যায়—এটা সহজেই বোঝা যায়। একটি কিউবকে সামনে থেকে কড়া আলোয় উদ্ভাসিত করলে সেটাকে কিউব বলেই চেনা যায় না; কারণ কোণাগুলো, ধারগুলো সম্মুখ-আলোয় অদৃশ্য হয়ে যাবে। অথচ পাশ থেকে বা নীচ থেকে এক এক পাশকে আলোয় উদ্ভাসিত করলে কিউবটার নানা চেহারা বার করে দেয়া যায়।

ভাষাবিদ : অর্থাৎ এক এক পাশ আলোয়, এক এক পাশ আঁধারে থাকলে তবেই তার কিউবত্ব স্পষ্ট হয়।

পরিচালক : সেইজন্যেই আধুনিক আলোয় আঁধারের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। আগে অভিনেতার অহমিকাকে সেবা করার জন্যে ছায়া বা আঁধারকে মঞ্চ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। আধুনিক নাট্যশালায় অভিনেতাই তো সর্বেসর্বা নন; নাটকের পরিবেশের খাতিরে এমনও প্রয়োজন হতে পারে যখন মঞ্চসজ্জার একটি অংশ উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হবে, অথচ অভিনেতাকে আধা-অন্ধকারে ঢেকে রাখা হবে। যেমন "অঙ্গার" নাটকের শেষ দৃশ্য। বা "পুতুলখেলায়" ডাক্তারবাবুর বুলবুলকে প্রেম-নিবেদন করার ক্রমঘনায়মান আঁধারের দৃশ্যটি। মনে হচ্ছে মনের কথা বলতে বলতে দুজনের মন থেকে পারিপার্শ্বিকের অস্তিত্বটাই মুছে গেছে, দুজনে কি একটা অন্য জগতে গিয়ে পৌঁছেছেন। উল্লিখিত দুটি দৃশ্যেই দৃশ্যসজ্জার কালো রং, আলো এবং নাটকের কথা ও অভিনয় এক সুরে গেঁথে গেছে। নির্মল গুহরায় এবং খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে তাপস সেন, তাপস সেনের সঙ্গে তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায় ও লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের টিমওয়ার্ক অংগাংগীভাবে মিলে গেছে।

নাট্যকার : হ্যাঁ, উল্লিখিত দৃশ্যদুটি আধুনিক আলোকসম্পাতের এক একটি অপূর্ব নিদর্শন। তেমনি আমার মনে হয় "রক্তকরবী"-র জাল খুলে রাজার বেরিয়ে আসাটিও আর একটি চরম দৃষ্টান্ত। এখানে নাটকের স্বার্থেই আলোকসম্পাত ও ধ্বনিপ্রক্ষেপণ হঠাৎ সোচ্চার হয়ে মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে তোলে। "অংগারের" জলের দৃশ্যও তাই।

ভাষাবিদ : "অংগার"-এর শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত হয়েছে শেষ দৃশ্যে নয়, চতুর্থ দৃশ্যে যখন খনি-দুর্ঘটনার পরে শ্রমিকদের জীবনরক্ষার চেষ্টা চলছে। এখানে তাপসবাবুর আলো অস্থির ব্যাকুল; রেসকিউ টীমের তৎপরতার সঙ্গে কি অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়েছে আলোর ছুটোছুটি!

দার্শনিক : আচ্ছা, এই নতুন ধরনের, নতুন নাট্যাদর্শের আলোক-কল্পনাকে কার্যকরী করতে বিগত দিনের যন্ত্রপাতি তো যথেষ্ট নয়। তাপসবাবুর তথা আধুনিক মঞ্চের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কি রকম? পাওয়া যায় সেসব?

পরিচালক : মোটামুটি কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায়। সেগুলির প্রবর্তন হচ্ছে। পুরাতন ঝাঁপ আর ফুট-লাইটের বেড়া ভেঙে তাপসবাবুরা আধুনিক সরঞ্জাম আনতে শুরু করেছেন। তার তালিকাও কম নয়। আশ্চর্য ব্যাপার—এতকাল বাংলা থিয়েটার চলছে, কিন্তু এই অতি-সাধারণ যন্ত্রগুলোও এদিকে আসেনি। এসেছে কিছু চমক-লাগানোর বাজে জিনিস; অদৃশ্য হওয়ার আয়না, আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, আর রঙীন কাগজের চক্র! অথচ এতদিন আমাদের বড় বড় নাট্যরসিকরা থিয়েটারে চমক লাগাবার অপচেষ্টা দেখেননি। আজ সেই তাপসবাবু মঞ্চের সামান্যতম চটি খিরিয়ে আনতে কিছু যন্ত্র প্রচলন করছেন, এমনি আঙ্গিকের প্রাধান্য নিয়ে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেছে।

দার্শনিক : আধুনিক থিয়েটারের আলোর সরঞ্জামের একটু আভাস দেবেন?

পরিচালক : হ্যাঁ, দিচ্ছি। তবে স্বভাবতই আলোর মান বিদ্যুতের প্রবেশের সঙ্গেই থিয়েটারে বিজ্ঞানও প্রবেশ করেছে। কিছু কিছু অঙ্কও আমাদের বুঝতে হবে। আধুনিক থিয়েটারের প্রধান আলো হল

(১) প্লেনো-কনভেক্স্ লেন্স স্পট

(২) ফ্রেসনেল স্পট

(৩) এলিপসয়ডাল-রিফ্লেক্টর স্পট

সবই স্পট, দেখছেন? ফ্লাড্-আদি বা ব্যবহার হয় মোটামুটি সাইক্লোরামাকে আলোকিত করতে বা অনুরূপ গৌণ-স্থানে। আধুনিক মঞ্চে পাশ থেকে, সামনে থেকে ওপর থেকে এবং নীচ থেকে যত আলো দেয়া হয় সব স্পট থেকে। কারণ স্পট-এর আলোকে নিয়-ন্ত্রিত করা যায়, তার জোরালো আলো শিল্পীর হাতের মুঠোয়। লেনস্-এর ব্যবহার আলোর দূরত্ব সত্ত্বেও তার শক্তি, তার তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে। ২৫০ ওয়াট, ৪০০ ওয়াট, বা হাজার ওয়াট, বা ১৫০০ ওয়াট, যে ল্যাম্পই ব্যবহার করুন না কেন, আলোর ক্যান্ডল্-পাওয়ারকে নানা লেন্স-এর জোড়, ব্যবহার করে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে পারা যায়। কারণ ফরমুলা হল :

$$F.C. = \frac{c.p.}{d^2}$$

f. c. অর্থে ফুট-ক্যান্ডল্, c. p. মানে ক্যান্ড্ল্-পাওয়ার, d অর্থে দূরত্ব। তাহলে ধরুন কুড়ি ফুট দূরে একটি মাঝারি আকারের স্পট আছে, তাতে একটি ১৫০০ ওয়াটের বাল্ব আছে। কত ফুট-ক্যান্ড্ল আলো পাবো? ফর-মুলা প্রয়োগ করে কি পাচ্ছি? ১৬০০ ওয়াট বাল্ব থেকে লেন্স্-এর মাধ্যমে পাচ্ছি ১৬,০০০ ক্যান্ডল-পাওয়ার। অতএব,

$$F.C = \frac{16000}{20^2} = \frac{16000}{400}$$

$$= 40$$

অর্থাৎ ৪০ ফুট ক্যান্ড্ল্ আলো পাবো। ঐ ফর্মুলা থেকে জ্ঞাতব্য সব তথ্যই তো পেতে পারি, কারণ,

$$c.p. = d^2 \times F.C.$$

$$\text{এবং } d = \sqrt{\frac{c.p.}{F.C.}}$$

কি বলছি বুঝতে পারছেন?

দার্শনিক : হ্যাঁ।

পরিচালক : তাই বলছিলাম ৮", ৬" ৫", ৩"—নানা রকমের লেন্স ব্যবহার করে আধুনিক থিয়েটার আলোর ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। এর ওপর এসেছে ডিমার—প্রত্যেক আলোর আলাদা ডিমার; আলোকে ক্রমশঃ বাড়ানো এবং কমানোর জন্যে। এরই ফলে সম্ভব হয়েছে দর্শকের প্রায় অজান্তে একটি দৃশ্যের সম্পূর্ণ আলোকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা। এরই ফলে সম্ভব হয়েছে "অঙ্গারের" চতুর্থ দৃশ্যের শেষে প্রচণ্ড হতাশার ছবি ফুটিয়ে তোলা—সমস্ত আলো ক্রমশঃ নিভে গিয়ে একটি আর্তনাদের মতন লাল আলোকরেখার দ্বারা খনিমুখের বৃহৎ লৌহতোরণকে আঘাত করা। তারপর আরো একটি জিনিসকে প্রচলন করেছেন তাপসবাবু; কাট-অফ্ বা আলোর মুখোশ। বিদেশের থিয়েটারে কাট-অফ ছাড়া আলোর ব্যবহার কেউ ভাবতেই পারে না। কাট্-অফ্-এর ব্যবহার কেন? অবাঞ্ছিত জায়গায় যাতে আলো না পড়তে পারে; তা ছাড়া আলোরও আকার নির্ধারণ করার জন্যে।—ফ্যানেল, শাটার, ম্যাট, আইরিস নামাঙ্কম মুখোশ পরিয়ে আলোকে বাঁকানো-চোরানো যায় এটা এদ্দিন অভিনেতার দাস বাংলা থিয়েটারে কারুর মাথায় খেলেনি। তাপসবাবু এই কাট্-এর কায়দাকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কিভাবে সচল কাট্অফ্-এর ব্যবহার শুরু করেছেন তা বোধহয় পৃথিবীর নাট্য-শালার ইতিহাসে লিখিত হওয়ার যোগ্য।

নাট্যকার : সচল কাট্-অফ মানে?

পরিচালক : তাপসবাবুর অনুমতি ছাড়া বলতে পারলাম না এর বেশি। উনি নিজেই বিস্তারিত বলবেন এই আশায় এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলাম। এর-পর আসছে রং-এর ব্যবহার। আগে লাল, নীল, সবুজ আলোর অসংযত ফোকাশ-মারা আপনারা দেখেছেন। এমন কি আর্ক-ল্যাম্পের সামনে নানা রং-এর জিলেটিন আঁটা চক্রও ঘুরিয়ে দিয়ে মঞ্চে ঘন ঘন রং পরিবর্তন করে বালসুলভ কুরুচির পরিচয় দেয়া হোতো; এখনো অধিকাংশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অভিনয়ে দেয়া হয়। সদর্পে বলছি, তাপসবাবু প্রথম শিল্পসম্মত রং-এর ব্যবহার চালু করেছেন। গাঢ় লাল গাঢ় নীল, গাঢ় সবুজ প্রভৃতিকে সংযত করে শুধুমাত্র চরম কয়েকটা মুহূর্তে ব্যবহার প্রথম তাপসবাবুই করলেন। এইসব রং-এর মুশকিল কি জানেন? এরা আলোর তেজ কমিয়ে দেয়। গাঢ় লাল শতকরা মাত্র দশভাগ আলোকে লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয়; গাঢ় সবুজও তাই; আর গাঢ় নীল মাত্র তিন-ভাগ আলোকে যেতে দেয়। অথচ সমস্ত দৃশ্যের ঘনত্ব ছায়াময়তাকে কাজে লাগিয়ে যে সাদা আলো তার ব্যবহারের রেওয়াজও [illegible] দিয়েছেন তাপসবাবু। ফ্যাকাশে এম্বার বা গোলাপী ধরনের একটি ফিকে [illegible] তাপসবাবুর [illegible] রং। এম্বার শতকরা ৮০ ভাগ এবং গোলাপী শতকরা ৬৫ ভাগ আলোকে নির্বিঘ্নে লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয়; অথচ মঞ্চের স্বপ্নময়তাকে ভেঙে তছনছ করে না। তাপস সেনের আর একটি প্রবর্তন—মোটিভেটিং লাইট। একটা দৃশ্যের প্রধান আলোকের উৎসটা ঠিক করে পরে দৃশ্যের আলোটাকে সেই প্রধান আলোর পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ করা—এই জিনিসটাও এদ্দিন আমাদের থিয়েটারে আসেনি। জানলা দিয়ে দিনের আলো আসছে—পুরোনো থিয়েটারে জানলার উপর পেছন থেকে কড়া ফ্লাড লাইট মেরেই খালাস; সামনের আলোগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সামনে থেকে ততোধিক কড়া রশ্মিপাত করে বিপর্যয় ঘটাতো। তাপস সেনের সূর্যের আলো, বা চাঁদের আলো দেখেছেন? বা মঞ্চের উপর জ্বলন্ত হারিকেন বা বৈদ্যুতিক বাতি থাকলে তার আলোয় উদ্ভাসিত মুখ বা আসবাব বা দেয়াল দেখেছেন? "ফেরারী ফৌজে" হ্যারিকেন নিয়ে মা আর অশোকের দৃশ্যটা দেখেছেন? তার চাইতেও অপূর্ব মোটিভেটিং আলোর প্রয়োগ দেখেছিলাম "সাংবাদিক" নাটকের শেষ দৃশ্যে, যখন একটি বেতারযন্ত্রের আলোকোদ্ভাসিত ডায়াল-এর আলোয় নায়কের মুখখানা দেখতে পেয়েছিলাম। মনে রাখবেন ঐ নাটকের ঐ দৃশ্যে রেডিওটি একটি প্রধান চরিত্র। আরো বহু জিনিসের ব্যবহার তাপসবাবু চালু করার চেষ্টা করছেন—লিনেবাখ্ ল্যাটার্ণ, ক্লাউড্-মেশিন, এনিমেটেড স্লাইড্—। ধোঁয়ার ব্যবহারটাই দেখুন না! আগে কেউ ভেবেছিলেন ধোঁয়ার ওপর আলো খেলিয়ে নানা প্যাটার্ণ সৃষ্টি করা যায়?

নাট্যকার : কিন্তু ওগুলো যে নিছক প্রকৃতিকে নকল করার যন্ত্র, বাস্তবতার নামে স্বাভাবিকতার বিষ!

পরিচালক : আগেই তো বলেছি, সেই বাস্তবতাও এখনো আমাদের থিয়েটারে আসেনি। তাকে আনা প্রয়ো-জন। তার পরে এগুতে পারবো বাস্তবোত্তর শিল্পের দিকে। তাপস-বাবুর অন্তরে যে স্বপ্ন আছে "শিশুতীর্থ" পরিকল্পনায় তার কতকটা আঁচ আমরা পেয়েছি। আজ যে তিনি নিজেকে সংযত করে, খাটো করে থিয়েটারকে বাস্তবতার দিকে নিয়ে চলেছেন, তার জন্যে তাঁর এই সাময়িক আত্মত্যাগের জন্যে তাঁকে আমাদের অভিবাদন জানানো উচিত। তাপস সেন যে শিল্পী তার কি প্রমাণ জানেন? এই-সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়াও আশ্চর্য সব দৃশ্য তিনি সৃষ্টি করেন উচ্ছিষ্ট, ফেলে-দেয়া জিনিস দিয়ে। একটি ভাঙা মোড়া দিয়ে "নীচের মহলে" মোটর-গাড়ি চালিয়েছিলেন। কতগুলো বিয়েবাড়ির রানিং লাইট কয়েকটা পুরোনো বিস্কিটের টিন, কিছু ছেঁড়া কার্ডবোর্ড—এইসব হচ্ছে তাঁর আসল উপকরণ। এসব মিলিয়ে বা হয় তা দেখে আমার বিশ্বাস হয় ইনি বা এঁর উত্তরসূরীরা নিয়ে যাবেন থিয়েটারকে সেই বাস্তবোত্তর স্বপ্নজগতে যেখানে গড়ে উঠবে থিয়েটারের ভাষা।

কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস

উপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

ইংরেজী ১৮৬১ সালে ভারতে এবং বিশেষ করে বাঙলা দেশে বহু মনীষী ও অসীম প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অতুল যশ ও খ্যাতি লাভ করে বাঙলা দেশ, ভারত তথা জগৎসমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এঁর জন্ম ১৫ই জানুয়ারী ১৮৬১ এবং মৃত্যু তারিখ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯০৫। এক সময়ে লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় এই মর্মে এক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিলঃ—"যে দেশে রাজা রামমোহন রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কর্ণেল সুরেশ-চন্দ্র বিশ্বাসের মত কৃতী পুরুষের জন্ম সে দেশ কখনই নগণ্য ও প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না, সে দেশ নিশ্চয়ই জগতে গর্ব ও গৌরবের আসন অধিকারের যোগ্য।" ভারত আজ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙলা মায়ের এই জগৎ বিখ্যাত বীর সন্তানটির নাম বিস্মৃতপ্রায়।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম কেবল বাঙলা ও সমগ্র ভারতে নয়, সুদূর ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত ছিল। তিরাশী বৎসর পূর্বে ইংরেজী ১৮৭৮ সালে যখন পরাধীন ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের করকবলে আবদ্ধ তখন বাঙলা মায়ের এক দামাল ছেলে মাত্র সতের বৎসর বয়সে কে-জানে-কোন খেয়ালের বশে কপর্দকশূন্য ও একান্ত সহায়-সম্বলহীন হয়ে সহসা একদিন সুদূর লণ্ডন শহরে পাড়ি দেন।

যখন সুরেশ ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র তখন তিনি এ বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিষ্টার য়্যাস্টন সাহেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। চেহারায় ছিপছিপে কিন্তু দেখতে সুরেশ বেশ সুন্দর ফুটফুটে ছিলেন। দৈহিক শক্তি অপেক্ষা মানসিক শক্তিতে অতিশয় শক্তিমান, তরশূন্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্ন একটি কিশোর। খেলাধূলা ও ব্যায়াম চর্চায় খুব ওস্তাদ এবং ইংরেজী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। এই গুণগুলির দ্বারাই তিনি য়্যাস্টন সাহেবকে মুগ্ধ করেছিলেন। সুরেশের পিতা গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের পরম ভক্ত। তিনি সব সময় হরি-নাম সংকীর্তনে মত্ত থাকতেন, নিতাই-গৌরের নামে অশ্রু বিসর্জন করতেন। গিরিশবাবুর আদি নিবাস ছিল নদে জেলার নাথপুর গ্রামে। তিনি কল-

সুরেশ বিশ্বাস

কাতার সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইণ্ডিয়া অফিসের একটি বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। নিজ প্রতিভাবলে কলকাতার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে কড়েয়া নামক পল্লীতে (অধুনা যাহা পার্ক সার্কাস নামে খ্যাত) একখানি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী নির্মাণ করে বসবাস করতেন— সুরেশের বাল্য জীবন সেখানেই অতি-বাহিত হয়েছিল। গিরিশবাবু যখন হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন যে অবাধ্য পুত্র সুরেশ লণ্ডন মিশন গির্জার পাদরী সাহেবগণ কর্তৃক প্রলুব্ধ হয়ে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তখন তিনি অতিশয় রাগান্বিত হয়ে পুত্রকে তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন।

পরম বৈষ্ণব পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সুরেশ মনে মনে এই দৃঢ় সংকল্প করলেন—'মরি কি বাঁচি, যাহোক কিছু একটা করতে হবে।" যেমন সংকল্প করা, অমনি ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল। একদিন ডায়মণ্ডহারবার বন্দরস্থিত এক বিলাতী জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গায়ে-পড়ে আলাপ করলেন এবং অনাহূত অনাদৃত হলেও তিনি পুনঃ পুনঃ নিজ বুদ্ধি কৌশলে ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন সাহেব প্রথমে খুবই বিরক্তি বোধ করেছিলেন কিন্তু নাছোড়বান্দা সুরেশের জনবাঞ্ছা শেষে পূর্ণ করেছিলেন। জাহাজের পাকশালার ছোট একটি পরিদর্শকরূপে বিনা বেতনে একটি কাজ দিয়ে সুরেশকে লণ্ডন শহরে নিয়ে গিয়েছিলেন, কেবল মাত্র এই শর্তে যে, জাহাজে খাওয়া-দাওয়া ও থাকবার জায়গা এবং লণ্ডন বন্দরে পৌঁছান ছাড়া ক্যাপ্টেন সাহেব সুরেশের অন্য কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।

এই শর্তে সুরেশ একদিন কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ জাহাজে চড়ে উধাও হয়ে গেলেন। স্নেহময়ী জননী নিস্তা-রিণী দেবী অতিশয় ধর্মপ্রাণা ও কোমল-স্বভাবা ছিলেন, তিনি পুত্রবিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং সুরেশের পলায়নের এক বছরের মধ্যেই পুত্রবিরহে হঠাৎ মারা যান। গিরিশবাবু গোঁড়া হিন্দু এবং অতিশয় ধর্মপ্রাণ ছিলেন, অবাধ্য পুত্র খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করল দেখে তিনি মুখে তিরস্কার করেছিলেন বটে কিন্তু অন্তরের অন্তঃ-স্থলে বড়ই দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পুত্রবিচ্ছেদের একটা গভীর বেদনা লুকানো থাকলেও কখনও বাইরে প্রকাশ করতেন না। এই ছিল পরম বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য।

লণ্ডনে সুরেশ প্রথমে বহু বাধা-বিঘ্ন, কষ্ট ও বিপদে পড়েছিলেন। সহায়-সম্বলহীন সুরেশকে লণ্ডন শহরে নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন উপায় না পেয়ে খুব ছোট ছোট কাজ—যেমন খবরের কাগজ, খেলনা, পুতুল বিক্রি করতে হয়েছিল। শেষে সুরেশ জার্মানীর জগৎবিখ্যাত হেগেনবেগ সার্কাসে এক চাকুরি গ্রহণ করেন। এই সার্কাসে সুরেশ হিংস্র বন্য জন্তু যেমন—সিংহ, বাঘ, হাতি, গণ্ডার ও সাপ প্রভৃতিকে বুদ্ধি ও কৌশলবলে বশীভূত করতে শিক্ষা করেছিলেন। এই সার্কাসের সঙ্গে অদ্ভুত কৃতিত্বপূর্ণ

খেলা দেখাতে দেখাতে সুরেশ ইউরোপের সমস্ত দেশগুলি পরিভ্রমণ করে অবশেষে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশের রাজধানী রিয়ো-ডি-জেনেরো নগরে ইংরাজি ১৮৮৬ সালে উপস্থিত হন।

সার্কাস পরিত্যাগ করে সুরেশ ইংরেজি ১৮৮৭ সালে জুন মাসে ব্রাজিলের রাষ্ট্রীয় সৈন্যবিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৮৮৯ সনে এক ঘরোয়া যুদ্ধের পর ব্রাজিলে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। সুরেশ গণতান্ত্রিকদের পক্ষ নিয়ে কেবলমাত্র পঞ্চাশজন সৈন্যের সাহায্যে সাগরতীরে নাথীরয় নামক জায়গায় এক গভীর রাতে অসংখ্য সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত বিপক্ষ দুর্গ অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। দুর্গের অস্ত্রাগার পুড়িয়ে ছারখার করে যে অনন্যসাধারণ সাহস ও অদ্ভুত রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন তা জগতের রণ-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ সুরেশ একটি সাধারণ সৈনিকের পদ হতে রাতারাতি লেফট্যানেন্টের পদে উন্নীত হন। পরে ক্রমশঃ নিজ প্রতিভাবলে সুরেশ ব্রাজিলের সৈন্য বিভাগে কর্ণেলের পদ পেয়েছিলেন। সুরেশ ইংরাজি ১৯০৫ সালে ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা যান। তিনি সামরিক কার্য উপলক্ষে যখন "স্যান্টা টেরিজা" নামক স্থানে ক্যাম্পে ছিলেন সে-সময়ে হঠাৎ কঠিন নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং দূরবর্তী শহর থেকে বড় চিকিৎসক ও ঔষধাদি পৌঁছাবার আগেই মারা যান। কর্ণেল স্যার জন মুরের সমাধির মতন কর্ণেল বিশ্বাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি নির্জনে ও অসম্মানিতভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। সেই কারণে তাঁহার সমাধিস্থানের কোনও ফটো পাওয়া যায়নি।

সুরেশ শুধু সার্কাস ও যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন তাই নয়। তিনি ব্রাজিলে একজন সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রলোক বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সাহিত্য, জ্যোতিষবিদ্যা, খগোল বিজ্ঞান, টেলিভিশন, হিপনোটিজম, মেসমেরিজম ও সাইকিক্যাল (জীবাত্মা সম্বন্ধীয়) বিদ্যা বিশেষভাবে চর্চা করেছিলেন। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, ল্যাটিন, স্প্যানিস ও পর্টুগীস ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে পারতেন। ব্রাজিল থেকে তিনি নিয়মিত রূপে "লণ্ডন একাডেমি অব সাইকিক্যাল ষ্টাডিস" পত্রিকায় প্রবন্ধ ও আলোচনা ধারাবাহিকভাবে পাঠাতেন। ইউক্লিডাস-ডা-কুনহা নামক তৎকালীন ব্রাজিলের এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ঐ দেশের সম্ভ্রান্ত বংশীয় সমাজে খুব মেলামেশা করতেন। তিনি মার্সেল হামের্সের (যিনি পরে ব্রাজিল গণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন) অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং মার্সেলের পুত্রের ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুরেশের একটি পুত্র "হার্মেস বিশ্বাস"কে প্রেসিডেন্টের নামে নামকরণ করা হয়েছিল কারণ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার সময় প্রেসিডেন্ট বালকের "গড ফাদার" রূপে কাজ করেছিলেন।

কর্ণেল বিশ্বাসের বৃদ্ধা সহধর্মিণী আজও জীবিতা আছেন, তাঁহার বয়স তিরানব্বুই। ইনি ব্রাজিলের এক অভিজাত বংশের মহিলা। এঁর সঙ্গে বিশ্বাসের বিবাহ-বন্ধন একটা আশ্চর্যজনক প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। যুবক সুরেশ রিয়ো-ডি-জেনেরো নগরে এক সার্কাস প্রদর্শনীতে একদা পিঁজারার মধ্যে এক দুর্দান্ত বন্য সিংহের সঙ্গে খেলা দেখাচ্ছিলেন, সেই খেলার অদ্ভুত কৌশল ও দক্ষতা দেখে সমগ্র দর্শকমণ্ডলী অতিশয় চমকিত ও ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ে। সেই প্রদর্শনীতে "ডোনা মেরিয়া আগণ্টা ফারনানডেস" নাম্নী স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বংশের সতের বৎসরের এক অপূর্ব সুন্দরী অনূঢ়া দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুরেশের বন্য সিংহের সঙ্গে এই অসমসাহসিক খেলার অদ্ভুত কৌশল, অসাধারণ সাহস ও সৌম্যমূর্তি দেখে মনে মনে তাঁর প্রতি আকৃষ্টা হয়ে পড়েন। পরে ঐ মেয়েটির এক বন্ধুর বাড়ীতে সুরেশের সঙ্গে তাঁর দৈবক্রমে দেখা হয় এবং আলাপ পরিচয় হয়। এই আলাপে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। পরে ঐ দেশীয় সামাজিক প্রথানুসারে ইংরেজি ১৮৯০ সালে উভয়ের বিবাহ হয়। সুরেশের ছয়টি সন্তান (পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা) জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে তিনটি পুত্র শৈশব অবস্থায় সুরেশের জীবদ্দশায় মারা যায়। সুরেশের বৃদ্ধ সহধর্মিণী, দুই পুত্র, এক কন্যা, জামাতা, এক পুত্রবধূ (বড় পুত্রের বিবাহ হয়নি) ও নাতি-নাতিনীসহ রিয়ো-ডি-জেনেরো নগরে বসবাস করছেন। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পরে বৃদ্ধা সমর বিভাগীয় বৃত্তি (military widow pension) ভোগ করছেন।

লেখক কর্ণেল বিশ্বাসের এক ভাগীনেয় (কনিষ্ঠ ভগিনীর পুত্র)। ইনি বহুদিন যাবৎ কর্ণেল বিশ্বাসের পরিবারবর্গের সহিত পত্রের আদান-প্রদান করছেন এবং মাতুলের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কর্ণেল বিশ্বাসের বস্কো নামক একটি অতি প্রিয় হাতী ছিল যাকে নিয়ে তিনি সার্কাসে খেলা দেখাতেন। ঐ হাতীটি মারা গেলে ব্রাজিলের গভর্ণমেণ্ট কর্ণেল বিশ্বাসের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঐ হাতীটির কঙ্কাল সযত্নে রিয়ো-ডি-জেনেরোর মিউজিয়মে রক্ষা করছেন।

অধুনা "বাঙালী থোকায়?" শীর্ষক প্রসঙ্গে বাঙলা দেশে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সুপ্ত বাঙালীর পুনর্জাগরণ উদ্দেশ্যে বহু আলোচনা ও আন্দোলন হয়েছে। এই সময় আমার মনে হয় যদি কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের অদ্ভুত জীবনের ঘটনাবলীসম্বলিত একখানি ছবি চলচ্চিত্রে যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয় তাহলে বাঙলা দেশের তথা ভারতের তরুণ ও কিশোরদের আদর্শহীন জীবনের সামনে একটি উৎসাহকর ও শিক্ষাপ্রদ বিষয় হতে পারে।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মায়ালতা সারাদিন ধরে ছটফট করছিলেন, কতক্ষণে সুবিমলকে রিপোর্ট টা দেবেন, তথাপি সুবিমল যখন প্রশ্ন করলেন, 'তারপর, অভিযানটা কেমন হল? আশা করি খুব সাকসেস্‌ফুল?' তখন গুম্‌ হয়ে গেলেন মায়ালতা। বোধ করি এ প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাস পেলেন।

'কি, যাওনি নাকি শেষ পর্যন্ত?'

'যাব না কেন।' ভুরু কুঁচকে মুখ ফেরালেন মায়ালতা, 'ভয়টা কিসের?'

'কি হ'ল, তোমাকে চিনতে পেরেছে তো?'

'হ্যাঁ আমার অনেক জন্মের ভাগ্যি। দেখ এই তোমায় বলে রাখছি আমি, ছোটঠাকুরপো যতই তোমাকে বোঝাতে আসুক মেজঠাকুরপোর মাথার দোষ হয়েছে আমি সে কথা মানব না।'

মাথার দোষ!

চমকে উঠলেন সুবিমল। এদিক থেকে তো কই ভাবেননি তিনি। অথচ ভাইপোকে দেখে চিনতে না পারার ভান করার মধ্যে যে না আছে যুক্তি না আছে সুশোভনের প্রকৃতির পরিচয়, এটা চিন্তা করে দেখেননি। সুশোভনের এই অন্যত্র থাকাটা, ভাইদের প্রতি বিরূপতা এইটাই ধারণা করে নিয়েছিলেন। 'মাথার দোষ' শব্দটা যেন সুবিমলের মাথার মধ্যে এক ঘা হাতুড়ি বসিয়ে দিল। কিন্তু এ আঘাতের দিকে দৃষ্টি দেবার মত সূক্ষ্মদৃষ্টি মায়ালতার নেই। তাছাড়া সুশোভনের প্রতি সুবিমলের বড়ভাইয়ের উপযুক্ত খুব যে একটা বাৎসল্য-রসাশ্রিত স্নেহ কখনও দেখেছেন তাও তো নয়। বরাবরই তো সুশোভনের কথায় 'মেজবাবু' বলে শ্লেষোক্তি করে থাকেন সুবিমল।

কাজেই নিজের মনে কথার স্রোত চালিয়ে যান মায়ালতা।

'কী কেলেঙ্কারী, কী কেলেঙ্কারী! দেখে-শুনে পালিয়ে আসতে পথ পাইনে। আচ্ছা, গোড়া থেকেই বলি' তা'হলে, গিয়ে দেখি বাপ-বেটিতে বেড়াতে গেছেন, সুচিন্তা আর তার ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা হল। তা' যত জিজ্ঞেস করতে যাই 'তোমার এখানে এসে ওঠার কারণটা কি,' ততই কথা চাপা দেয়। সাত সতেরো অন্য কথায় এসে পড়ে। সেই ছেলেবেলাকার কথা তুলে কথা কয়। ওদিকে ছোটঠাকুরপো তো সুচিন্তার ছেলের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়ে গল্প শুরু করেছে। অনেকক্ষণ পরে বেড়িয়ে ফিরলেন বাপ-বেটি।

'ওমা, দেখা হয়ে সেই কায়দা। যেন দেখেছে কি না দেখেছে, চিনি কি না চিনি, ছোটঠাকুরপোকে যেন আস্তে আস্তে চিনছে। আমি অত মানব কেন, এগিয়ে গিয়ে কথা বলতেই বলল কিনা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পারবো না কেন, তুমি তো ওদের বাড়ীর বড়বৌ।' এতটা পারলেন আর কাদের বাড়ীর সেটুকু আর বলতে পারলেন না। এক কেন, ও এক নতুন ফন্দী।'

'থামো থামো' বলে সুবিমল সুমোহনের ঘরে এসে দাঁড়ান, 'ব্যাপার কি দেখলি মোহন?'

'আর ব্যাপার!' মোহন হতাশার ভঙ্গী করে বলে, 'একেবারে তো বদ্ধ পাগল অবস্থা।'

হঠাৎ এরকম হবার মানে?'

'মানে বলা শক্ত। ব্যাধি যে কি সূত্রে কখন ভিতরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু হঠাৎ নয়। যা শুনলাম নীতার মুখে, গত তিন বছর থেকেই সূচনা দেখা দিয়েছিল। তারপর চিকিৎসা করাবার জন্যে কলকাতায়'—

'তা' নীতা দেবী আর এর এক টুকরোও আমাদের জানানো বিবেচনা করেননি?' চেঁচিয়ে উঠলেন সুবিমল।

কি বলতো সুমোহন ঈশ্বর জানেন কিন্তু তার আর উত্তর দেওয়া হল না, পতিঅনুগামিনী সতী মায়ালতা ততক্ষণে সুবিমলের পিছু পিছু এসে হাজির হয়েছেন, এবং নিজস্ব নীতিতে পরের কথার উত্তরও দিয়ে বসেছেন, 'তবে আর বলছি কি! কক্ষনো সত্যি নয়, এ হচ্ছে সাজা পাগল। সত্যি পাগল হলে মেয়ে ভয় পেত না? পারতো আমাদের একেবারে ছেঁটে বাদ দিয়ে—স্বাধীনভাবে এতটা করতে! এতে বাপেরও সায় রয়েছে সে তো পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'

'না না, কী যে বল বৌদি।' সুমোহন বকে ওঠেন 'নিজে চক্ষে দেখে এলাম। দেখে বুঝলে বড়দা, দুঃখই হল। এইতো মানুষের মহিমা। বড় চাকরি করলেই বা কি, আর ব্যাঙ্কে মোটা টাকা থেকেই বা কি, এক নিমিষেই তো সবই ফক্কিকার।'

মায়ালতা কথার উপর কথা চাপান, 'ওঃ তাই নাকি ঠাকুরপো? তাই বুঝি তুমি জগতের সেরা অসার বস্তুটার জন্যে আর মাথা খাটানো দরকার মনে করনি?'

সুমোহন অবিচলিত চিত্তে বলে, 'কতকটা ঠিক বলেছ!'

সুবিমল বিরক্ত কণ্ঠে বলেন 'তুমি আবার এখানে এসে হাজির হলে কেন? সত্যি ব্যাপারটা শুনতে দাও না?'

'ও, আমার কাছে বুঝি 'সত্য ঘটনা' পাওয়া যেত না?' মায়ালতা ঝঙ্কার দেন, 'কিন্তু আমি এই বলে রাখছি এরপর আমার কথাই বিশ্বাস করতে

হবে কিনা। পাগল যদি হয় তো সেয়ানা পাগল বোঁচকা-আগল। নীতাকে একটু ধিক্কার দিয়ে কথা বলেছি বলে আমায় একেবারে ধমকে উঠল। কথার তোড়ই বা কি। 'নীতাকে তুমি বকছো। মানে? কী রাইট আছে তোমার নীতাকে বকবার? বেশ করেছে নীতা তোমাদের বাড়ী থেকে চলে এসে। তোমার মত ঝগড়াটে গিন্নীর কাছে ও থাকবে কেন? দেখ দিকি এই সুচিন্তাকে? সী ইজ এ লেডি। যাকে বলে ভদ্রমহিলা। নীতা সুচিন্তার মতন হবে।' এই সব অজস্র কথা।'

সুবিমল ঈষৎ শুকনো মুখে বল্লেন, 'এই সব বলল?'

'বলল কি না বলল জিগ্যেস কর না তোমার ওই ছোটভাইকে। হুঃ, আমি তো সবই অতিরঞ্জিত করে বলি এই তোমার বিশ্বাস। সাক্ষীই বলুক অতি-রঞ্জন কি সত্যি। আমি বলে দিচ্ছি, ওই সুচিন্তাই কিছু গুণতুক্ করেছে। আর এও নির্ঘাৎ যে তলে তলে চিরকাল দেখাশোনা ছিল দু'জনের। ছেলেবেলার ভাব-ভালবাসা'—

'থামবে তুমি?'

ভারী গলায় ধমকে ওঠেন সুবিমল।

কিন্তু ধমকে কে কবে গৃহিণীকে থামাতে পেরেছে? সুবিমলও পারলেন না। উত্তরে মায়ালতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কেন, থামবো কেন? হক কথা বলবো রাজাকে ডরাব না, এই হচ্ছে আমার সোজা কথা। মেজবাবুকে সাদাসিধে সরল মানুষ বলেই জানতাম এতকাল, কি করে বুঝবো পেটে একখানা মুখে একখানা। ও মা আমি কোথায় ইয়ে করে বললাম, 'তা বেশ এখানে তো অনেকদিন থাকা হ'ল মেজঠাকুরপো, এবার বাড়ী চল।' শুনে আমায় যেন এই মারে তো এই মারে।

'ওর যে যেখানে আপনার লোক ছিল আমি নাকি তাদের মেরে ফেলেছি। এ বাড়ীতে ওর আর কেউ নেই।

'তা' আমিও তেমনি নাছোড়বান্দা। বললাম, আচ্ছা বেশ দেখবেই চল তোমার কেউ আছে কিনা। আমি আজ অমনি ফিরে যাব না, তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবই। বলব কি, নেহাত নাকি ছোট-ঠাকুরপোর চোখে দেখা তাই,—নইলে আর মুখে উচ্চারণ করতে পারতাম না। যেই না ওই কথা বলা ছুটে গিয়ে সুচিন্তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে একেবারে চোখ বুঁজে আর্তনাদ 'সুচিন্তা ও-বাড়ীর বড়বৌকে তাড়িয়ে দাও, এক্ষুণি তাড়িয়ে দাও। তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যেতে এসেছে ও। আর কোনদিন ওকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিও না।' ছি ছি, সে দৃশ্য দেখে আমার একেবারে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। মরমে মরে গিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাই না। কিন্তু ধন্যবাদ দিই তোমাদের সুচিন্তাকে। হেলল না দুলল না, মরমে মরে গেল না, আমাকে কিনা পষ্ট বলে দিল, 'অবস্থা তো দেখছ বৌদি। বেশী উত্তেজিত করে ক্ষতি ডেকে আনায় লাভ নেই। আজ বাড়ী যাও।'

আমিও তেমনি শুনিয়ে দিয়ে এসেছি 'শুধু আজ কেন জন্মেরশোধই যাচ্ছি। তোমার বাড়ীতে কোনদিন পা ধুতেও আসতাম না, যদি আমাদের আপনার লোকটা না থাকতো এখানে। তা মানুষটা তো ভূত বনে বসে আছে আর কার কাছে আসবো।' বলে খব-খরিয়ে চলে এলাম, তা নীতাও এমন শক্ত মেয়ে একবার ছুটে সঙ্গে নেমে এল না। বলল না 'জ্যেঠিমা পাগলের কথা ধরো না।' পাগল বলে তো পরিচয়ই দেয়নি—'

এতক্ষণে হঠাৎ একটা প্রতিবাদ ওঠে মায়ালতার কথার। অলক্ষ্যে কখন অশোকা এসে ঘরে ঢুকেছিল। প্রতিবাদটা তার কণ্ঠ থেকেই ওঠে।

যদিও এটা অশোকার সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু অশোকার বোধ করি ঘরের পরিস্থিতিটা আজ নিতান্তই অসহ্য হয়েছে। কারণ মায়ালতা একনাগাড়ে বকেছেন বলে চলেছেন, আর এক ভাই বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আর এক ভাই কাঠ হয়ে বসে যেন বোবা-কালার ভূমিকা অভিনয় করছেন।

তবে কথা অশোকা বেশী বলে না, শুধু মৃদুকণ্ঠে বলে, 'পাগলের পরিচয় পাগল নিজেই দিতে পারে দিদি, তার জন্যে অন্য লোককে খাটতে হয় না। বড়দা আসুন না, আপনার খাবার দিয়েছি।'

কোর্ট থেকে ফিরে এসেই একটু মোটা জলখাবার খাওয়া সুবিমলের বরাবরের অভ্যাস, আর অশোকার অভ্যাস তাকে পারিপাটি করে গুছিয়ে ঠিক করে দেওয়া। ভাসুরকে সে 'বড়ঠাকুর' বলে না বলে মায়ালতা তার মধ্যে সম্ভ্রমের অভাব অনুভব করে খাপ্পা হন, কিন্তু অশোকা বড়দাই বলে।

অশোকার মুখে প্রতিবাদ! অপরের সম্বন্ধে কথা!

সবচেয়ে আশ্চর্য হয় সুমোহন।

কারণ ওবেলা বাড়ী ফিরে সুশোভনের অবস্থা ও তাদের অভিযানের বর্ণনাটা করবার চেষ্টা করেছিল সে স্ত্রীর কাছে, কিন্তু সফল হয়নি। অশোকা উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে বলেছিল, 'এসব আমাকে বলে লাভ কি?'

সুমোহন থেমে গিয়ে ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছিল, 'তা স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে কি মানুষ প্রতিটি লাইনে লাভ-লোকসান হিসেব করে?'

'বিষয়বস্তুটা কি গল্প করার মত?' বলে অশোকা পশম আর বোনার কাঠিতে মনোনিবেশ করেছিল অতঃপর।

এখন নিজেই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কথা বলল দেখা যাচ্ছে।

সেটা মায়ালতাও দেখলেন।

আর ভাবলেন, আর কিছু নয় ভাসুরের সুয়ো হওয়া। এত অহংকার তো ওই ভাসুরের আস্কারাতেই হয়েছে। তবু মুখোমুখি কিছু বলতে পারেন না, পরোক্ষে বলেন, 'চলে আসুন। হুকুম! মানুষ তো—যেন যন্তর, তাই সব সময় ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছুটবে। দুদণ্ড সুখ-দুঃখের কথা কইবে না মানুষ?'

'সুখের আর কোথা!...বড়দা আসুন তাড়াতাড়ি। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।' বলে চলে যায় অশোকা।

আর সে চলে যাবার পর মায়ালতা ফোঁস করে ওঠেন, 'দেখলে তো? দেখলে তো তোমরা দুভাইয়ে চারচক্ষু মেলে। ছোট হয়েও ছোটবৌ আমাকে কী রকম অগ্রাহ্য করে?'

সুবিমল উঠে পড়ে চলে যেতে যেতে বলেন, 'ছোট বড় কি আর শুধু বয়সের হিসেবেই হয় বড়বৌ?'

মায়ালতা অবশ্য অভিমান করে বসে থাকেন না। সে ক্ষমতাও তাঁর নেই। ছোট-বৌ তাঁর স্বামীর কি পরিমাণ যত্ন করল তার তদারকে না গিয়ে থাকতে পারেন না। অতএব স্বামীর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে শেষ উত্তর উচ্চারণ করেন তিনি, 'তা মন বুদ্ধি জ্ঞান চৈতন্যর তো আর একটা সের বাটখারার মাপ নেই, যে তাই দিয়ে ওজন হবে কে বড়, কে ছোট! আবহমানকাল থেকে বয়স দিয়েই ছোট বড়র হিসেব হয়ে আসছে।'

বলাবাহুল্য একথার আর উত্তর কেউ দেয় না। মায়ালতার অনেক কথারই উত্তর দেয় না কেউ। নিষ্প্রয়োজন বোধ করে। অনবরত কথা আর অনবরত সে কথায় অভিযোগের সুরে আরোপ করে করে মান-সম্মান খুইয়ে বসে আছেন মায়ালতা। তাঁর নিজের পেটের ছেলেমেয়েরাও বলে, 'তোমার মত অমন অফুরন্ত জীবনীশক্তি নেই মা আমাদের, কি করবো বল? তোমার সব কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

* * *

স্বল্পভাষিণী অশোকার যেটুকু যা কথা প্রায়শঃ বড় ভাসুরের সঙ্গে!

মায়ালতা এর সমালোচনা করেন। কিন্তু সমালোচনার অভ্যাসের পরিবর্তন করবার মেয়ে অশোকা নয়। ছেলেদের বই-খাতা জামা জুতো স্কুলের মাইনে যাকিছু

দরকার হয় ভাসুরের কাছেই সে সরাসরি বলে। আর অকুণ্ঠিতভাবে বলে।

মায়ালতা টের পেলে দেয়ালের কাছে অবাক হন, 'জানি না বাবা কি করে মানুষ এত সপ্রতিভ হয়! চিরটাকাল জানি চাইতে হলে লোকের মাথাটা হেঁট হয়, গলাটা কাঁপে। কিছু না, কিছু দেখি না। এ এক অদ্ভুত!'

অশোকা হয়তো পিছন ফিরে বসে পান সাজছে, ফিরেও তাকায় না। অথবা মায়ালতা যদি অনেকক্ষণ শক্তি ক্ষয় করতে থাকেন, তখন একবার ঘুরে বসে বলে, 'দিদি চারটি সুপুরি কেটে দেবেন? কথা কইতে কইতে কাজটা হয়ে যাবে।'

মায়ালতা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে যান।

এবং অবাক হয়ে দেখেন হয়তো পরদিনই অশোকা বলছে, 'বড়দা, গোটা চারেক টাকা রেখে যাবেন, আজ আবার ওদের স্কুলে ক্যান্‌ ফী না কি দিতে বলেছে।'

এমনিই সহজ আবেদনের ভংগী অশোকার।

কুণ্ঠা ওকে স্পর্শ করে না।

আজও সেইভাবেই আবেদন করল সে, 'আপনি কি মেজদাকে দেখতে যাবেন বড়দা?'

সুবিমল সচকিতে বলেন, 'এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। ভাবছি প্রতিক্রিয়াটা ভাল হবে কি না। কেন বলতো মা?'

'যদি যান আমাকে সঙ্গে নেবেন।'

'তোমাকে? তুমি যেতে চাও? কিন্তু তুমি সেখানে গিয়ে—'

একটু বিপন্ন শোনায় সুবিমলের কণ্ঠস্বর।

'আপনার কি মনে হয় বড়দা যাওয়া উচিত নয়।'

'না না উচিত অনুচিতের প্রশ্ন কিছু না। বলছি তোমার কি গিয়ে স্বস্তি হবে? মানে আর কি শোভন তো শুনেছি কাউকে ঠিক চিনতেই পারছে না।'

'সে তো শুনলাম। কিন্তু বড়দা, ওঁর জন্যেও ততটা না, আমার একবার আপনাদের সেই সুচিন্তাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'সুচিন্তাকে!'

'হ্যাঁ বড়দা।'

'কিন্তু কেন বলতো মা?'

'এমনি।'

* * *

অনুপম কুটিরের প্রতিবেশী মহলে আবার একটা চাঞ্চল্য! তবে লালবাড়ী গোলাপী বাড়ীরা এখন আর কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেই অনুমানের বহর বাড়িয়ে আলোচনা চালায় না, সরাসর অনুপম কুটিরের বাসিন্দাদেরই ধরে।

লালবাড়ীর মেয়ে, যার রংটা লালচে, আর নাম কৃষ্ণা, সে ইন্দ্রনীলকে আটকায় রাস্তার মাঝখানে, 'এই, তোমাদের বাড়ীতে কাল কে এসেছিল বল তো?'

ইন্দ্রনীল গম্ভীরভাবে বলে, এটা একটা প্রশ্ন? অর্থাৎ প্রশ্নের বিষয়?'

'নিশ্চয়! একটি বয়স্কা মহিলা আর আধাবয়সী ভদ্রলোক হঠাৎ তোমাদের বাড়ী এলেন কেন সেটা জানতে হবে না আমাকে? এমন যদি হয় কোন বুড়ী আইবুড়ী মেয়ের মা, সুপাত্রের খোঁজে ঢুকে পড়েছেন—'

ইন্দ্রনীল বলে 'তা' হলে আর তোমার ভাবনার কি আছে? ঢুকে অবশ্যই বুঝে ফেলেছেন ভুল জায়গায় ঢুকেছেন।'

'উঁহু। অজ্ঞ লোকেরা কোন ছেলের গায়ে দুটো ডিগ্রীর ছাপ দেখলেই তাকে সুপাত্র ভেবে বসে থাকে।'

'তা' হলেও চিন্তিত হবার কিছু নেই, ছাপটাপগুলো ওপর দিকেই বেশী। এই তো আমি এবার এম-এ ফেল করবো ঠিক করেছি।'

'তোমার কথা কে ধরছে!', কৃষ্ণা—তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'তুমি আবার নিজেকে গননার মধ্যে নিচ্ছ কেন? হচ্ছে তোমার দাদাদের কথা।'

'স্বীকার করছি আমার দাদারা অতীব সুপাত্র, কিন্তু তাঁদের জন্যে 'ছেলেধরা' আসতে দেখলে তোমার মাথা ব্যথা কেন তা'তো বুঝছি না।'

'বুঝবে কোথা থেকে: চক্ষু থাকতেও অন্ধ যে। নীতাদি সম্পর্কে বোধকরি কোনদিন ভেবে দেখনি?'

হঠাৎ গলা খুলে হেসে ওঠে ইন্দ্রনীল, 'ও হে বালিকা, তুমি এখনো নিতান্তই অবোধ আছ। নীতার এসব নীচু ডালের ফুলের দিকে দৃষ্টিপাতের দরকার আছে নাকি? সে মেয়ে অনেকদিন আগে মগডাল নুইয়ে হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে।'

'তার মানে?'

'মানে অতীব প্রাঞ্জল। সপ্তাহে সপ্তাহে বিলেতি ছাপমারা চিঠি আসে তার নামে।'

'বল কি? সত্যি?'

'শতকরা একশো পাঁচ সত্যি।'

'তার মানে ওনার ভাবী বর কোন লম্বা ল্যাজের আরাধনা করতে গেছে।' কৃষ্ণা বেণী লটপটিয়ে বলে।

'তাই মনে হয়।' বলে ইন্দ্রনীল।

'জিজ্ঞেস কর না।'

'না, অপরের প্রাইভেট রুমে উঁকি দেওয়ার মত বদ ইচ্ছে আমার নেই।'

'আমার আছে। আমি আজই এ বিষয়ে আদ্যোপান্ত জেনে নেব।'

ইন্দ্রনীল ব্যস্তভাবে বলে, 'এই খবরদার! কিছু জিগ্যেস কোর না। ওর ইচ্ছে হলে নিজেই বলবে।'

কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে বলে 'ও' সম্পর্কে তোমার এত 'হাঁ হাঁ' করে ওঠা সমীহ আমার খুব ভাললাগল মনে হচ্ছে তোমার?'

'আমার সব কিছু, আচার আচরণ ঠিক তোমার ভাললাগার স্কেলে ফেলে গড়তে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা আছে?'

'আছে!' একটু বিজয়গর্বের হাসি হাসে কৃষ্ণা।

'ওটা তোমার ভুল ধারণা।' —ইন্দ্রনীল বলে, 'নেহাত সাগরপারের সাগরময়ের চিঠিগুলো চোখে না পড়ে গেলে, তাকাতাম তোমার দিকে?'

'বটে নাকি? অর্থাৎ নীতাই হ'ত মনোনীতা?'

'নিশ-চয়!' কী একখানা মেয়ে!'

'বয়সে তো, তোমার চাইতে বড়।'

'তাতে কি?'

'তাতে কি! বয়সে বড় মেয়ে বিয়ে করতে বাসনা হয় তোমার?'

'আমার বাসনার প্রশ্ন তো এখন তোমাদির খাতায়।'

'আহা বড় কষ্ট না? কিন্তু বরের চেয়ে বৌ বয়সে বড়, এ তোমার ভাল লাগে?'

'না লাগবার কি আছে তা'তো বুঝি না। বয়সে বড় বর তো মেয়েদের খুব ভাল লাগে দেখি।'

'খুবই স্বাভাবিক। হরিণের নাকে দড়ি পরিয়ে সুখ কি? পরাতে হয় তো সিংহের নাকেই পরানো ভাল।'

'হুঁ, তোমরা এ-পাড়ার মেয়েরা নাকে দড়ি পরানোটাই বোঝ ভাল দেখছি।'

'তার মানে?' কৃষ্ণা চোখ পাকিয়ে বলে, 'আবার কোথায় নাক আর দড়ির যোগাযোগ দেখলে?'

'কেন, তোমার প্রিয় বান্ধবী বিনতা আর আমার হতভাগা প্রতিবেশী অমল সেন তো সর্বদা দেখাচ্ছে।'

'তাই বল!' কৃষ্ণা স্বস্তির ভান দেখিয়ে বলে, 'ওদের তো অনেককাল ধরেই ব্যাপার চলছে।'

'অভিভাবকদের আপত্তি নেই?'

'আপত্তি থাকবে কেন? খেঁদি মেয়ের বিনি পয়সায় বিয়ে হয়ে যাবে, মন্দ কি? মেয়ের প্রেমপাত্তরের বাড়ী আছে—গাড়ী আছে।'

'তা' আছে। কিন্তু খেঁদিটা তুমি সম্পূর্ণ হিংসের বশে বলছ।'

'ইঞ্চি ফিতে ধরে মেপে দেখতে পারো। কিন্তু সে কথা যাক। সাগরপারের খবর দিয়ে তুমি তো আমায় মুস্কিলে ফেললে দেখছি। আমি তো অন্যদিকে একরকম হিসেব মিলিয়ে আনছিলাম। কিন্তু বলতেই হবে নীতাদি তা 'হলে বেশ খেলোয়াড় মেয়ে—'

'ছিঃ কৃষ্ণা। যা তা শব্দ উচ্চারণ কোর না।'

'ও বাবা!' কৃষ্ণা অভিমানভরা গলায় বলে, 'দরদটা যে বড্ড ঘোরালো দেখছি। তা বলে আমি সত্যি কথা বলতে ভয় পাবো নাকি? নীতাদির সম্পর্কে তোমার মেজদাটি রীতিমত ঘায়েল হয়ে নেই বলতে চাও?'

'মেজদা সে টাইপের ছেলে নয়।'

'ইস! পুরুষমানুষের আবার টাইপ! লাইনো মেসিনের টাইপের মত গলিয়ে সম্পূর্ণ নতুন টাইপ করে ফেলা যায় ওদের।'

'এত পুরুষমানুষ দেখে বেড়ালে কবে?'

'জন্মাবধি।'

'হুঁ। তাই দেখছি। কিন্তু কেউ যদি চাঁদ দেখে চন্দ্রাহত হয়, সে দোষ চাঁদের নয়।'

'দেখ, তোমার এই নীতাদির দিকে টেনে কথা কিন্তু আমার খুব ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু আমারও মনে হচ্ছে আমাদের এই পথের ধারে দাঁড়িয়ে প্রেমালাপ পথ-চারিদের খুব ভাল লাগছে না।'

'প্রেমালাপ! তার মানে?'

'ওঃ নয় বুঝি?' ইন্দ্রনীল নিরীহ-ভাবে বলে, 'আমার কেমন ধারণা হচ্ছিল—'

'ধারণা বদলাও।'

'আচ্ছা!'

কৃষ্ণা হঠাৎ সকৌতুকে বলে ওঠে, 'উঃ আমাকেই কি কম ধারণা বদলাতে হয়েছে?'

'কার সম্বন্ধে?'

'এই তোমার সম্বন্ধে। বাবাঃ, আগে আগে যা ছিলে মশাই। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে, দেখে মনে হ'ত যেন মরু-ভূমির মাঝখান দিয়ে চলেছ। এদিক ওদিক কোনদিকে দৃষ্টি নেই, শুধু পথটুকু পার হওয়াই লক্ষ্য।'

'তা সত্যি! ওই রকমই ছিল আমা-দের রীতি-নীতি। জানতাম এদিক-ওদিক তাকানোটা অমার্জনীয়, অমার্জিতের চিহ্ন।'

'সেটা বদলালো কি করে?'

'সত্যিকথা শুনলে রাগ করবে।'

'অর্থাৎ রাগ করার মত কথা।'

'মানে তোমার মত রণচণ্ডীদের রাগ করার মত! নইলে সত্যভাষণ হচ্ছে, নীতা এসে যেন আমাদের বাড়ীর বন্ধ জানলাগুলো খুলে দিল।'

কৃষ্ণা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা প্ল্যান্ করছিলাম, সেটা ভাঙতে হবে মনে হচ্ছে।'

'কারণ?'

'সারাজীবন ওই নীতার মহিমা শুনতে পারবো না।'

'উঃ। সাধে বলি মেয়েরা হচ্ছে হিংসুটের প্রতীক।'

'মেয়েরা মানে আমাদের মত এই অধম মেয়েরা। নীতাদির মত মহিমময়ী মেয়েরা নয় নিশ্চয়ই?'

'আমারও একটা প্ল্যান ছিল, সেটা ভাঙতে হবে মনে হচ্ছে।'

'কারণ?'

'কারণ—সারাজীবন ধরে খোঁটা খেতে পারবো না।'

কৃষ্ণা হি হি করে হেসে উঠে বলে, 'আচ্ছা কবে থেকে আমাদের এই প্ল্যান, বল তো?'

'কি জানি!'

'ক'দিনই বা তোমার সঙ্গে আমার চেনা!'

'আপাততঃ তো মনে হচ্ছে জন্ম-

'সকলের নয়। মেয়েদের নয়। এই তো তোমার মা। দেখছি তো—'

ইন্দ্রনীল সহসা গম্ভীর হয়ে কথায় বাধা দিয়ে বলে, 'কী দেখছো?'

'দেখছি জীবনের প্রথম ভালবাসা অমর।'

'ক'দিনই বা গেছ আমাদের বাড়ী? তার মধ্যেই এত দেখতে পেলে?'

'চোখ থাকলে এক লহমায় দেখা যায়। তা'ছাড়া মেয়েমানুষে মেয়েমানুষকে ভুল দেখে না। কিন্তু তুমি কি রাগ করলে?'

ইন্দ্রনীল ঈষৎ উদাসভাবে বলে,
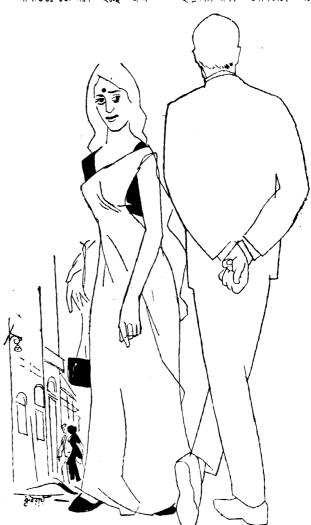
"সারাজীবন ওই নীতার মহিমা শুনতে পারবো না"

জন্মান্তর। তবে ধোপে টি'কবে কিনা জানি না।'

'জানো না?'

'না। কি করে জানবো বল। মন হচ্ছে নদীর মত—'

'না রাগের কি আছে। সত্যকে অস্বীকার করতে চাইলেও সে সত্য। কিন্তু প্রসঙ্গটা উৎসাহজনক নয়।'

'আচ্ছা থাক! কিছু মনে কোর না।'

'আচ্ছা চলি।' (ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

॥ ধূর্জটি প্রসাদ ॥

অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মূলত শিক্ষাব্রতী এই মনীষী ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, শিল্পানুরাগী, সঙ্গীতবিদ, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বে সুপণ্ডিত। কিন্তু এ সবের চেয়েও বড় কথা, তিনি ছিলেন বাঙলা ও উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত মহলের নবীন-প্রবীণ সকলের একান্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় একটি সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁর নিকট-

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সংস্পর্শে আসার সুযোগ যাঁদের ঘটেছে তাঁরাই জানেন, বিদ্যা ও জ্ঞানের, শিল্পবোধ ও যুক্তিবাদের কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

রচিত সাহিত্যকীর্তির মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ হয়তো বেঁচে থাকবেন। কিন্তু এটা সত্যই দুর্ভাগ্য যে পরবর্তী যুগের মানুষ সে সাহিত্য পাঠ করে প্রকৃত মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারবে না। গোষ্পদে প্রতিবিম্বিত সূর্যের মত ধূর্জটিপ্রসাদের সম্পূর্ণ রূপের অতি ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচনাবলীতে। কীর্তির চেয়ে অনেক মহৎ মানুষটি আজ হারিয়ে গেলেন।

॥ উত্তর সীমান্তে ॥

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন, চীনের সাম্প্রতিক দক্ষিণমুখী সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গত ৩১শে অক্টোবর ভারত সরকার চীন সরকারের কাছে যে নোট পাঠিয়েছিলেন, তার উত্তরে চীন সরকার জানিয়েছেন, ম্যাকমোহন লাইনকে তাঁরা ভারতের উত্তর সীমান্ত বলে স্বীকার করেন না। সুতরাং উত্তর সীমান্তে ভারতের সামরিক প্রস্তুতি যদি অব্যাহত থাকে তবে ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করে চীনা সৈন্যবাহিনী হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পদপ্রান্তের শেষ সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। কারণ চীনের মতে অতখানি পর্যন্ত তার রাষ্ট্রীয় সীমানার বিস্তৃতি।

চীন সরকারের এই সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য আমাদের অতি শান্তিবাদী প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও আর হজম করা সম্ভব হয়নি। তাই লোকসভার ক্রুদ্ধ সদস্যদের তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, দরকার হলে চীনের এই জবরদস্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েও তিনি রুখে দাঁড়াবেন। চীনের সাম্রাজ্যবাদী লালসা থেকে ভারতকে রক্ষা করতে শেষ পর্যন্ত যদি অস্ত্র ধারণ করতে হয় সে কাজ করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করবেন না। তবুও শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ যাতে ত্যাগ করতে না হয় তার জন্যে তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। কারণ চীনের সঙ্গে ভারতের যদি সত্যই যুদ্ধ বাঁধে কোনদিন তবে অচিরেই তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে। নির্বাচনের পরেও প্রধানমন্ত্রীর এ দৃঢ় মনোভাব অপরিবর্তিত থাকবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ আছে। তবে যা তিনি বলেছেন তা যদি সত্যিই তাঁর মনের কথা হয় তাহলে চীনারা যে আর এক পাও এগোতে সাহস করবে না সে সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ।

॥ পশ্চিম সীমান্তে ॥

ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা হামলাদারদের উৎপাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম সীমান্তে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের স্পর্ধিত আচরণও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সারা ভারতে গোয়ার মুক্তির দাবী প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজরা গোয়ায় বারো হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছে। শুধু তাই নয়, দমনের কাছে দুইটি পর্তুগীজ যুদ্ধজাহাজ নোঙর ফেলে যে-কোন জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। গোয়ার উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্যে বড় বড় কামান পাতা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী পথগুলির উপরেও মাইন পাতা হয়েছে। সংক্ষেপে, গোয়া দখলে রাখার উদ্দেশ্যে যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী পর্তুগাল আজ তার সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারতের জল ও স্থল সীমান্ত লঙ্ঘন করে ও যত্রতত্র কয়েকবার গুলীবর্ষণ করে কয়েকজন ভারতীয় নাগরিককে নিহত ও আহত করেও পর্তুগাল তার মনোভাব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে। পর্তুগীজদের পক্ষে এই ঔদ্ধত্যপ্রকাশের মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিকতা নেই, কারণ ভারতের শাসকবর্গের অতি লজ্জাকর দুর্বলতা ইতিপূর্বে অনেকবারই তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের প্রায় বিশজন নাগরিককে গুলী করে হত্যা করেও পর্তুগালকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয়নি।

কিন্তু এবারও ভারত পর্তুগালের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে বলে আশা হয় না। গোয়া সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে সৈন্য গোয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পর্তুগীজ বোম্বেটেগুলিকে ধরে আরব সাগরের জলে চুবিয়ে দিয়ে আসবে এতখানি ভাবার মত কোন ঘটনাই এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। গোয়া সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করার কারণরূপে বলা হয়েছে, পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনী যাতে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে প্ররোচনা সৃষ্টি করতে না পারে এটা তারই প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা।

॥ টাঙ্গানিকা ॥

আফ্রিকার আরও একটি দেশ স্বাধীন হল। টাঙ্গানিকা প্রথমে ছিল জার্মানীর উপনিবেশ; প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর হাতছাড়া হয়ে হয় বৃটেনের রক্ষণাধীন। চল্লিশ বছর পরে সে রক্ষণমুক্ত হ'ল। ইতিপূর্বে আরও দুটি প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশ রক্ষণাধীন অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে, সে দেশ দুটি হ'ল ক্যামেরুনস ও টোগোল্যান্ড। টাঙ্গানিকার পূর্ণ মুক্তির পর আর একটিমাত্র প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশের মুক্তি বাকি রইল, সে দেশটি হ'ল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকাকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেই রক্ষকই এখন ভক্ষক হয়ে বসেছে।

সদ্য স্বাধীন টাঙ্গানিকা আয়তনে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার বর্গমাইল এবং তার লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৯০ লক্ষ। তার মধ্যে স্থায়ী শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীর সংখ্যা প্রায় একুশ হাজার। টাঙ্গানিকার কৃষ্ণাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী মিঃ জুলিয়াস নিয়েরেরে সে দেশের অবিসংবাদিত নেতা। টাঙ্গানিকা স্থির করেছে ৯ই ডিসেম্বর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরেও সে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

॥ গর্বের কথা ॥

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ডঃ আর্তুরো ফ্রন্ডিজি এসেছিলেন ভারত সফরে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত তাঁর দেশটির সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ভৌগোলিক ব্যবধানে আমরা দূরে হলেও সংস্কৃতির বন্ধনে আমরা অতি নিকট। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনায় এত জনপ্রিয় যে তাঁকে অনেক সময় আর্জেন্টিনার জাতীয় কবি বলে মনে হয়।

॥ ঘরে ॥

৩০শে নভেম্বর—১৪ই অগ্রহায়ণ : গোয়ায় পর্তুগীজদের সামরিক প্রস্তুতি ও সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ—লোকসভায় শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) উদ্বেগপূর্ণ তথ্য প্রকাশ—যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারতের প্রস্তুতি।

তিন মাসে পাক বিমানের চারিবার ভারতের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন—লোকসভায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের উক্তি—রাষ্ট্রসংঘ কমিশনের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ।

১লা ডিসেম্বর—১৫ই অগ্রহায়ণ : 'দেশে আজ গুণগত যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীর প্রয়োজন'— এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভায় শ্রীনেহরুর ভাষণ দান।

বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের (৮৬) কলিকাতায় জীবনাবসান।

২রা ডিসেম্বর—১৬ই অগ্রহায়ণ : 'শান্তিপূর্ণভাবে চীনা অধিকৃত ভারতের অংশ মুক্ত করা সম্ভব না হইলে অন্য পন্থা গ্রহণ করা হইবে'—ময়দানে (কলিকাতা) জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—প্রধানমন্ত্রীর উক্তিতে অসন্তুষ্ট চীনা কূটনীতিকদের সভাস্থল ত্যাগ।

'বাংলা সাহিত্য ভারতে নব-জাগরণের পথ প্রদর্শক'—গঙ্গাটিকুরীতে (বর্ধমান) বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালীর উদ্বোধনী ভাষণে মন্তব্য।

'সমগ্র গোয়া সশস্ত্র শিবিরে পরিণত ও সৈন্যদের অবিরাম কুচকাওয়াজ'—বোম্বাই-এ গোয়া রাজনৈতিক সম্মেলনের নেতা মিঃ জর্জ ভাজের বিবৃতি।

৩রা ডিসেম্বর—১৭ই অগ্রহায়ণ : জন্মদিনে (৭৮তম) রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে দেড় লক্ষাধিক কাঠা ভূমি (বিহারে সংগৃহীত) অর্পণ—নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে দানোৎসব।

রাষ্ট্রীয় সফরে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিঃ এল আই ব্রেজনেভের ১৫ই ডিসেম্বর দিল্লী আগমন।

৪ঠা ডিসেম্বর—১৮ই অগ্রহায়ণ : কলিকাতা মহানগরীতে প্রথম গগনচারী য়ুরি গাগারিনের (সোভিয়েট নাগরিক) বিপুল সম্বর্ধনা—বিভিন্ন সভায় প্রতিভাষণে য়ুরি কর্তৃক মহাশূন্যে অভিযানের অভিজ্ঞতা বিবৃত—পাঁচ বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রালোকে গমন সম্ভবপর বলিয়া আশা প্রকাশ।

নয়াদিল্লীতে আর্জেণ্টিনার প্রেসিডেন্ট ফ্রন্দিজী সম্বর্ধিত।

৫ই ডিসেম্বর—১৯শে অগ্রহায়ণ : ভারতীয় এলাকায় পর্তুগীজ সৈন্যদের হানা ও গুলীবর্ষণ—সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় বাহিনীকে গোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইবার সরকারী নির্দেশ।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (৬৭) কলিকাতায় পরলোকগমন।

৬ই ডিসেম্বর—২০শে অগ্রহায়ণ : 'ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে তাহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে'—রাজ্যসভায় ভারতে চীনা অনুপ্রবেশ সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী মেজর গাগারিনের কলিকাতা ত্যাগ—দমদম বিমানঘাঁটিতে প্রীতিপূর্ণ বিদায় সম্বর্ধনা।

সীমান্তবর্তী ভারতীয় গ্রামে (গোয়ার সন্নিহিত) পর্তুগীজ সৈন্যদের গুলীবর্ষণ।

কোচবিহার পৌর এলাকায় এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী।

॥ বাইরে ॥

৩০শে নভেম্বর—১৪ই অগ্রহায়ণ : রাষ্ট্রসংঘে কোয়ায়েতের প্রবেশের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগ—কোয়ায়েত সার্বভৌম রাষ্ট্র নয় বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন।

ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে কার্যতঃ সামরিক শাসন প্রবর্তিত—প্রেসিডেন্ট জোয়াকিম বালাগুয়ের কর্তৃক বর্তমান সরকার বাতিল—৮ ব্যক্তির একটি গোষ্ঠীর (বালাগুয়েরর নেতৃত্বাধীন) হাতে ক্ষমতা অর্পণ।

১লা ডিসেম্বর—১৫ই অগ্রহায়ণ : এলিজাবেথভিল হইতে বিমানযোগে গোপনে প্রেসিডেন্ট শোম্বের (কাতাঙ্গা) রাজধানী উপস্থিতি—প্যারিস হইয়া ব্রেজিলে গমনের পরিকল্পনা প্রকাশ।

রাষ্ট্রসংঘে কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিতর্ক সুরু—বিতর্ককালে সাধারণ পরিষদে আমেরিকা কর্তৃক সোভিয়েট বক্তব্যের বিরোধিতা।

২রা ডিসেম্বর—১৬ই অগ্রহায়ণ : এলিজাবেথভিল বিমানঘাঁটিতে (কঙ্গো) রাষ্ট্রসংঘবাহিনী ও কাতাঙ্গা সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ—রাষ্ট্রসংঘবাহিনীভুক্ত বহু সৈনিক নিখোঁজ।

লাওসের প্রিন্সত্রয়ের নিকট বৃটেন ও রাশিয়ার যুগ্মবার্তা—কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন।

৩রা ডিসেম্বর—১৭ই অগ্রহায়ণ : পাক-ভারত অস্থাবর সম্পত্তি চুক্তি কার্যকরী করার প্রশ্নে ১১ই ডিসেম্বর করাচীতে উভয় রাষ্ট্রের বৈঠকের ব্যবস্থা।

৪ঠা ডিসেম্বর—১৮ই অগ্রহায়ণ : 'কাতাঙ্গা সম্পর্কে উ থাণ্টের (রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল) ক্রিয়াকলাপ অসহনীয় প্ররোচনার সামিল'—গোপনে প্যারিসে পৌঁছিয়া শোম্বের (কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট) বিবৃতি।

২১শে ডিসেম্বর বারমুদায় কেনেডি-ম্যাকমিলান (আমেরিকা ও বৃটেনের রাষ্ট্রীয় নেতৃদ্বয়) জরুরী বৈঠক।

৫ই ডিসেম্বর—১৯শে অগ্রহায়ণ : রাষ্ট্রসংঘবাহিনী ও কাতাঙ্গা ফৌজের মধ্যে এলিজাবেথভিল অঞ্চলে পুনরায় লড়াই।

'উত্তর কোরিয়াকে বাদ দিয়া কোরিয়া প্রসঙ্গে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হইবে—উত্তর কোরীয় সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘকে সতর্কীকরণ।

৬ই ডিসেম্বর—২০শে অগ্রহায়ণ : রাষ্ট্রসংঘ ও কাতাঙ্গায় অস্ত্র সম্বরণ চুক্তি বাতিল—ভারতীয় ও সুইডিশ বিমানকে পাল্টা আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশদান।

প্রতিরক্ষাখাতে ১৯৬২ সালের সোভিয়েট বাজেটে ব্যয়ের মাত্রা বর্ধিত (বাজেটের পরিমাণ ১,৩৪০ কোটি নয়া রুবল)।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ গগনে গগনে ॥

একটা অসম্ভব কিছু আবদার করলে মানুষে বলে যে একেবারে চাঁদ পাওয়ার জন্য কান্না, আবার কারো হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্তিত হলে বলে একেবারে হাতে চাঁদ পেয়েছে। আজ আর এসব ব্যাপার তেমন অসম্ভবের সীমানায় দাঁড়িয়ে নেই। নেপোলিয়ান নামক গোঁয়ার ব্যক্তিটি এই 'অসম্ভব' কথাটি জ্ঞানীদের অভিধান থেকে উঠিয়ে দিতে বলেছিলেন, আজ নেপোলিয়ানকে স্মরণ করে অসম্ভবই সম্ভব হয়ে উঠেছে।

'স্পেস' বা মহাশূন্যে বিচরণ করা ক্রমশঃই ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার যাওয়ার মতো সহজ হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানের বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির বলেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছে। আজ বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রে চাঁদও মানুষের করায়ত্ত। মেজর ইউরি গাগারিণ নব্বুই মিনিটের এক ঘূর্ণীপাকে মহাশূন্যে পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমা করে এসেছেন, এবং শুধু চাঁদ নয়, অচিরেই তিনি শুক্র গ্রহ, মঙ্গল গ্রহ প্রভৃতিতে পরিভ্রমণ করবেন। মানুষের আর কি লাভ করতে বাকী রইল। এখন মানুষ অনায়াসেই সশরীরে স্বর্গধামে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। হাতে হাতে স্বর্গলাভ।

স্বর্গের উচ্চতা কতখানি? এর কোনো উত্তর গাগারিণ দেননি। তিনি বিজ্ঞানের দেশের মানুষ, অলৌকিক রহস্যে বিশ্বাসী নন, তাই কোনো অতি-প্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি বলেছেন—"আমি মহা-শূন্যে তেমন কোনো শক্তির অস্তিত্বও অনুভব করিনি। মাধ্যাকর্ষণের সীমানার বাইরেও আমি বৈজ্ঞানিকদের অপরূপ সৃষ্টির মধ্যে পরমানন্দে স্বাভাবিক ভাবেই কাল কাটিয়েছি।" তিনি দেখে-ছেন পৃথিবী গোলাকার, সূর্য বাহির আকাশে অতিশয় উজ্জ্বল, তার সেই জ্বলন্ত মূর্তির দিকে তাকানো যায় না, খালি চোখে ত নয়ই। পৃথিবী থেকে আমরা যেভাবে দেখি তার চেয়ে শত-গুণে বেশী উজ্জ্বল সেই জ্যোতিপুঞ্জ। আকাশের নগ্নরূপ আমরা ঠিক যেমনটি দেখি তেমন নয়, এতটা নীল নীল নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"খোলো খোলো, হে আকাশ,
স্তব্ধ তব নীল-যবনিকা—
খুঁজে নিতে দাও সেই
আনন্দের হারাণো কণিকা।"

যবনিকা উত্তোলিত হলে নাকি দেখা যাবে আকাশ একটি কর্ষিত কৃষি-ক্ষেত্রের মতো অসমতল এবং সে আকাশের গায়ে ফোটা তারাদল যেন সদ্যবোনা শস্যবীজের মতো, আর আকাশের রঙ ঘন-ঘোর অন্ধকার। এই আকাশের গায়ে আনন্দ কণিকার একটুও স্পর্শ নেই। আর স্বর্গরাজ্য! সে কোথায়? স্বর্গই বলতে পারে একমাত্র স্বর্গ সেই বিষয়ে ওয়াকেফহাল। তবে এত দ্রুত হতাশ হওয়ার কারণ নেই, এখন যখন একবার মহাশূন্যে বিচরণপথ আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে আর ভয় কি? এককালে এ যে সম্ভব তা কি মনে হয়েছে?

মহাজাগতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আরো দ্রুত উন্নতি লাভ করে প্রকৃতিকে পরাজিত করতে পারে। আকাশের ঘন কৃষ্ণ মসীরেখা এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা করতে পারে। ভারতের পৌরাণিক বৃত্তান্তে আছে স্বর্গের সিঁড়ি নাকি একদা রচিত হয়েছিল। সেই সিঁড়িটি কে যেন নিয়ে পালিয়েছে। রবীন্দ্রনাথেরও কবিতায় স্বপ্নলোকের চাবি হারাণোর কথা আছে, স্বর্গের সেই সিঁড়ি যা উপকথায় পড়ে গেছে এবং স্বপ্নলোকের চাবি যা কল্পনা-বিলাসী কবির মনোরাজ্যের বস্তু, কঠোর বিজ্ঞান তা নিশ্চয়ই অসামান্য কৌশলে সম্ভব করে তুলতে পারে। হয়ত বর্তমান কালটি সেই কার্যের পক্ষে অনুকূল। তাই আজ সৌরজগতের রহস্য ধীরে ধীরে উন্মোচিত। আবরণ ভেদ করে যা রূঢ় বাস্তব তা প্রকাশিত হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় তাই চারিদিকে বিস্ময় বিহ্বলতা।

তারার দেশের পথ সোভিয়েট 'স্পেস্-সীপ' ভোস্টোক্ ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন করেছে। দু'জন পৃথিবীর মানুষ সেই স্পেস-সীপের যাত্রী ছিলেন। আকাশের সীমানা পর্যন্ত তখনও তাঁরা পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু পরীক্ষার এই সবে সুরু, এরপর আরো অনেক যাওয়া-আসার পর সমগ্র বিশ্বটি করতলগত আমলকীর মত সুলভ হয়ে উঠবে। চাঁদের দেশে যাওয়াটা যখন অনায়াসসাধ্য, তাহলে চাঁদের দেশে একটি 'বেস ক্যাম্প' বসিয়ে অন্যত্র ওঠা-নামা করা যাবে।

মানুষ যা কল্পনায় আনতে পারেনি, আজ গগনবিহারী মেজর ইউরি গাগারিণের ভারত-ভ্রমণের মুহূর্তে এ দেশের মানুষের মনের পক্ষীরাজকে বাধাবন্ধহীন করে তুলেছে।

আমাদের এই কলিকাতায় বিগত সোমবার ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে মেজর ইউরি গাগারিণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অশোকস্তম্ভের একটি ধাতব প্রতীকচিহ্নের ভিতর বাংলা ভাষায় লিখিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হল কলিকাতাবাসী নাগরিকগণের পক্ষ থেকে। বিশদ বিবরণ সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন।

সেই ধূসর সন্ধ্যায় মেয়র মহোদয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"ভারতের প্রতিটি মানুষ তোমার বিজয় গৌরব একান্ত আপনার মনে করে, কেননা সৌরপথে তুমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছ।" গগনবিহারী গাগারিণের সাফল্যগৌরব সমগ্র জগতের। ভারত-বর্ষের ঐতিহ্য এই, সে অপরের বিজয়-গৌরবকে একান্ত আপনার গৌরব মনে করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। মেজর গাগারিণ বলেছেন মহাকাশ অপূর্ব ক্রীড়াঙ্গন। তাঁর যাত্রাপথে ভারত অক্ষ-সীমায় পড়েনি তাহলে তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ গঙ্গা দেখতে পেতেন। যেমন দেখেছেন—আরনেষ্ট হেমিংওয়ে যে কিলিমানজারোকে অমর করে গেছেন, সেই পর্বতশিখরের তুষারকিরীট।

একথা লিখেছেন ইউরি গাগারিণ তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ Road to the Stars নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটি সম্প্রতি এই দেশে পাওয়া যায়, দাম তিন টাকা। এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সুলিখিত, এবং সাহিত্যসমৃদ্ধ। তাই অনেকে মনে করছেন, হয়ত গাগারিণের নামে কোনো পেশাদার এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। মেজর গাগারিণের হাতে এত অবসর

কোথায়? মেজর গাগারিণের এই গ্রন্থে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কিত চিন্তায় পরিপূর্ণ, সেটা অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তিনি একজন বিশুদ্ধ কম্যুনিষ্ট। মহাশূন্যে ভাসার সময় তাঁর বার বার ভি, আই লেনিন এবং এন, এস, ক্রুশ্চেভের কথা মনে পড়েছে। আফ্রিকার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় পাট্রিস লমুম্বার নিদারূণ হত্যার কথা মনে পড়ে অন্তর বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। যাঁরা মহাকাশে কোনোদিন বিচরণ করেনি তাঁরা অবশ্যই প্রতিবাদ করতে পারেন না যে এই সব চিন্তা অন্তরে জাগে কি জাগে না। তবে Road to the Stars গ্রন্থটি মহাকাশ বিচরণের বিবরণ হিসাবে তেমন কৌতূহলোদ্দীপক নয়, পাঠকের তৃষ্ণা মেটে না। একটিমাত্র বিষয় যে মানুষ কোনোদিন মাটি ছেড়ে ওঠেনি তার কাছে বিস্ময়কর, শূন্যে বিচরণকালে দেহের ভারহীনতা, যার ফলে শোয়া যায় না, বসা যায় না। কিন্তু অন্য কাজকর্মে অসুবিধা হয় না। এ ছাড়া 'স্পেস্-সীপে'র গায়ে 'পোর্ট হোল' ছিল, সেই ছিদ্রপথে তিনি নীচের পৃথিবী দেখেছেন। তবে কিভাবে যে আবার মাটিতে নেমে এলেন সে কথা এই গ্রন্থে লেখা নেই।

এই গ্রন্থ পাঠে বোঝা যায় মেজর গাগারিণ একজন উচ্চ শিক্ষিত, প্রাণোচ্ছল, সহৃদয় মানুষ। যাঁরা কলিকাতায় মেজর গাগারিণকে দেখেছেন বা আলাপ করেছেন তাঁর সঙ্গে, তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। মেজর গাগারিণের মধ্যে এক সপ্রতিভ সদানন্দময় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বর্তমান যুগের মানুষকে দেখা গেল। তিনি কলকাতা শহরে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—"মহাকাশ অনন্ত অসীম। সেইখানে প্রত্যেকের ঠাঁই হতে পারে।" জনতা এবং অশান্তিবহুল পৃথিবীর মানুষ এই সংবাদে নিশ্চয়ই প্রীতিলাভ করবেন। কারণ আমাদের কবি তাঁর অন্তিম মুহূর্তে যে স্বপ্নলোকের ছবি দেখেছিলেন—সম্মুখের সেই শান্তি পারাবারই মহাশূন্য।

বিখ্যাত ভারতীয় লেখক খাজা আহমেদ আব্বাস লিখেছেন—Till we reach the Stars—, এই গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মোট ১৪৫ পৃষ্ঠার বই, দাম সাড়ে আট টাকা। পৃথিবীর প্রথমতম কসমোনট ইউরি গাগারিণ ঠিক যে মুহূর্তে ভারতে পরিভ্রমণ করছেন সেইকালে এমন একখানি গ্রন্থপ্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাজা আহমেদ আব্বাস এই গ্রন্থে কিষাণ তনয় ইউরি কিভাবে হঠাৎ খ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছেন তার মানবিক বিবরণ দান করেছেন। সেই সঙ্গে স্পেস ফ্লাইট সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে কি পরিমাণ সাফল্যময় গবেষণা চলছে তার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

এই কাহিনীটি সত্যই বিজ্ঞানসম্মত, অথচ উপন্যাসের মতো মনোরম। অসার সায়েন্স-ফিক্‌সান পাঠে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরাও এই গ্রন্থপাঠে আনন্দ পাবেন। খাজা আহমেদ আব্বাস তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে গাগারিণের গল্প বলতে গিয়ে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিকে মহৎ-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

১৯৬১-র ১২ই এপ্রিল তারিখে কসমোড্রোমে ইউরি গাগারিণ যখন মহাশূন্যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে 'ভোসটক'-এ উঠলেন, তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান পরিকল্পনাকার, প্রধান বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার দল ও কারিগরবৃন্দ। খাজা আহমেদ আব্বাস এই ঘটনাটি বর্ণনাকালে গাগারিণকে ঐতিহাসিকের ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আর্কিমেডিস থেকে সুরু করে বলেছেন—'to the invisible phalanx of his comrades from the past, the dreamers who centuries earlier, had predicted such a flight into space and had laid the scientific foundation for it —'

বহির্জগতের মানুষের কাছে গাগারিণের গগন-পরিক্রমা এক বিরাট বিস্ময়, কিন্তু সোভিয়েটের মানুষের কাছে আব্বাসের মতে—
"it has been a shot in the arm, a supreme moral booster and source of immense sense of self-confidence."

আগামী কয়েক বছরে সোভিয়েট ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা হয়ত পাল্লা দিয়ে মঙ্গল, শুক্র, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াত সুরু করবেন, সেদিন মানুষের মনে আজকের বিস্ময় না থাকলেও, ইউরি গাগারিণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই ঐতিহাসিক শূন্যে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অতি সংক্ষেপে গাগারিণ স্বয়ং বলেছেন—
"The signal is given, explosions have started, producing a deafening din. The Rocket quivers and begins to move. We feel an excessive heaviness—I feel four pounds of my weight become forty."
এই ভার আবার পরে কমে গিয়ে সোলার মত হালকা হয়ে যায়। 'স্পেস ভ্রমণ' জেট-বোয়িং বিমান ভ্রমণের মত সুখকর নয়, তার বিপত্তির দিকটুকু বাদ দিলেও অন্যান্য ক্লেশ কম নয়। খাজা আহমেদ আব্বাসের সাহিত্যরসসমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি উৎসাহী পাঠকের মনে আনন্দ দান করবে।

গাগারিণ এ যুগের একজন স্মরণীয় মানুষ, তাই ভারত সরকারের তিনি সম্মানিত অতিথি। তাই শীতের রাতে দলে দলে মানুষ ভীড় করে তাকে দেখতে ছোটে,—এরপর, গাগারিণের মত গগনবিহারী মানুষের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে, গগনে গগনে তাদের নিত্য নূতন লীলার সংবাদ পাওয়া যাবে, সেদিন কিন্তু মানুষের মনে সেই সংবাদ এতখানি রোমাঞ্চ সৃষ্টি করবে না। মেজর ইউরি গাগারিণ প্রথম স্পেস ফেরত মানুষ হিসাবেই স্মরণীয়।

(1.) **ROAD TO THE STARS — Yuri Gagarin — (Jaico) — Price Rs. 3/-**

(2.) **TILL WE RICH THE STARS — Khaza Ahmed Abbas — (Asia Publishing House)—Price Rs. 8-50 nP.**

নতুন বই

বনতুলসী (গল্প)—**ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রকাশক : ক্যালকাটা বুক হাউস। ১।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।**

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বঙ্গ সাহিত্যে ইদানীংকালে একটি অতি পরিচিত নাম। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মৌলিক গবেষণায় এবং বাঙ্গলা লোক-সাহিত্য ও লোক-শ্রুতি সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থাবলী পণ্ডিত মহলে সমাদৃত। একদিন কিন্তু তিনি ছোট গল্প ও কবিতা লেখক হিসাবেই বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্ত মন-প্রাণ নিবেদন করেছেন। তবু প্রথম প্রেমের হাতে নিস্কৃতি নাই। ছোট গল্প তাঁর প্রথম প্রেম, সেই প্রেমের পরিচয় তাঁর এই সদ্য প্রকাশিত গল্প সংকলন 'বনতুলসী'। এই সংকলনে লেখক বনতুলসী, ঝরা পালক, কীর্তিনাশা, দক্ষিণায়া,

অখ্যাতি, দিদির সাথে আড়ি, বোবা, পুনর্জন্ম, মনের আগুন, টাঙ্গাওয়ালা, অবিশ্বাসী, পলাতকা, বিসর্জন ও টেলিগ্রাম নামক চৌদ্দটি গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রথম গল্প 'বনতুলসী'টিতে সাঁওতাল জীবনের সরল অনাড়ম্বর চিত্র লেখক রূপায়িত করেছেন। কয়লাখাদের কুলী শাকার জীবনের কাহিনী, দশ দিনের ছেলে রেখে তার স্ত্রী মারা গেল হাসপাতালে, সেই ছেলেকেই সে মানুষ করে তুলল। পদ্রীর মা বলেছিল এত কষ্ট করে ছেলেটাকে হাসপাতাল থেকে এনেছিস কেন, দু'দিন পরে ত' পাদ্রী সাহেবেরা নিয়ে যেত। সেই অন্ধ পদ্রীর মা রাজী হল শাকার ছেলেকে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। পদ্রীর মার ছোট বোন ময়ূরা অতিশয় মুখরা। সে শাকাকে বিবাহ করতে রাজী, শাকার মনে সংশয়। কিন্তু বিবাহ শেষ পর্যন্ত হল। তারপর ময়ূরার কোলে আসে তার নিজের সন্তান, তখন শাকার সেই মা-হারা ছেলেটিকে নিয়ে দ্বন্দ্ব লাগে, শেষ পর্যন্ত কি পাদরীদের হাতেই দেবে। সব সমস্যার সমাধান করে দেয় ময়ূরার নবজাতক। সে আঁতুড়েই মরে গেল আর তার স্থান অধিকার করল শাকার ছেলে। ময়ূরা কিছুতেই তাকে পাদরীদের হাতে দেবে না। 'দিদির সাথে আড়ি', 'মনের আগুন', 'বোবা' প্রভৃতি গল্পেও লেখকের এই গভীর সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি গল্পের মধ্যে এক আশ্চর্য চমক আছে। লিপি-চাতুর্যে এবং কল্পনার বলিষ্ঠতায় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট সংযোজন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তরুণ শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়কৃত বহুবর্ণ প্রচ্ছদটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

ক্রন্দসী (উপন্যাস)—**শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কল্লোল প্রকাশনী, এ-১৩৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-১২। দাম দু টাকা।**

আমি চঞ্চল হে— (উপন্যাস)—**চিত্রগুপ্ত। চলন্তিকা প্রকাশক, ১২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা।**

বিউটি স্পট—(গল্প) **জগন্নাথ সরকার। বেঙ্গল বুক ব্যাঙ্ক, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দু'টাকা মাত্র।**

ইদানীংকালে অতিখ্যাত, প্রখ্যাত প্রভৃতি জনপ্রিয় লেখক ছাড়াও নতুন লেখকদের গল্প এবং উপন্যাস কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে, এ এক শুভ লক্ষণ। এতদ্বারা নতুন লেখকদের শক্তিমত্তা এবং লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাঁদের মধ্যে মহৎ প্রতিশ্রুতি আছে তাঁদের আবিষ্কার করা যায়। প্রথম গ্রন্থ 'ক্রন্দসী' উপন্যাসের লেখক হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রহস্য উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা করেছেন; কোল-প্রিন্স অনঙ্গকিশোর রায়ের লক্ষপতি পিতার বিষক্রিয়ায় মৃত্যু এবং তার বন্ধু সৌমেন এল রহস্যভেদ করতে। জানা গেল অনঙ্গ মৃগাঙ্কবাবুর ছেলে নয়, সে ভুজঙ্গবাবুর ছেলে, মৃগাঙ্কবাবুর পানের মশলায় বিষ মিশিয়েছিল অনঙ্গ, আর ইলোরা দেবী সুধাংশুবাবুর কন্যা নয়। শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক কাহিনী। "আমি চঞ্চল হে" লিখেছেন 'চিত্রগুপ্ত'। এ'র ভাষা মনোরম। রূপসী এবং ক্রন্দসী কলকাতার কথা নিয়ে উপন্যাস। কঙ্কাল-সার হরিনারায়ণ। মেয়ে অনুরূপা একদিন তাঁর রোগশয্যায় চাকরী খতমের দুঃসংবাদ নিয়ে এল। এখানেও রজত সান্যাল থানা অফিসার ম্যান্ডাভিল গার্ডেনে দুঃসাহসিক ডাকাতির তদন্তে ব্যস্ত। অতনু শেষ দৃশ্যে অনুরূপার ঘরে রিভালবরের গুলিতে একরকম আত্মহত্যা করে। সে অনুরূপার বন্ধু জয়ার স্বামী এবং অনুরূপার জীবনের আকাশের ধূমকেতু। অতি রোমান্টিক রোমাঞ্চ কাহিনী। 'বিউটি স্পট' একটি গল্পগ্রন্থ। লেখক জগন্নাথ সরকার দেশীয় ভাষায় নামকরণের উপযুক্ত কিছু খুঁজে না পেয়ে গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'বিউটি স্পট'। কিন্তু সমরখন্দ ও বোখারার বিনিময়ে যে লালগালের কালো তিল কাম্য তা তিনি জানেন। গল্পগুলি সংক্ষিপ্ত সেই তার সর্বোত্তম গুণ। প্রতিটি গল্পে লঘু সুর আছে। লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণে সমাজ-জীবনের উপেক্ষিত আর এক দিকের ছবি আঁকা হয়েছে। সব গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ না হলেও, 'লেখক ও নায়িকা', 'সভাপতি', 'সাহিত্য সম্রাট' গল্প তিনটি চমৎকার। লেখকের শ্লেষাত্মক রচনায় আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, তবে সরস শ্লেষ রচনার সর্বপ্রধান গুণ সংযম এবং শালীনতা। সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

গ্রন্থ তিনটিই প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পারিপাট্যে মনোরম।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৯্ টাকা।

বাংলাদেশে যদিও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা, তবু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সাধনায় আমরা আজো পশ্চাদপদ। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই আজো গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ক্লাসগুলি পরিচালিত হয়। সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের বইয়ের অভাবই তার প্রধান কারণ। যেহেতু বিষয়টি আমাদের দেশে অভূতপূর্ব, অতএব প্রামাণ্য পুস্তকের সম্মান নিঃসন্দেহে কিছুকাল পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিই

পাবে। ইতিপূর্বে অবশ্য গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের একটি বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ দিল্লীর নরসিংহ দাস পুরস্কার পেয়েছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার সর্বাথ-সাধক পুস্তকের সংখ্যা বাংলা ভাষায় অঙ্গুলিমেয়। রাজকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক" পুস্তকটি সেই অভাব আংশিক পূর্ণ করল। আংশিক বলতে হল কারণ যদিও গ্রন্থটি সপূর্ণ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-রূপে বিজ্ঞাপিত, তথাপি কয়েকটি বিষয়ের অনুপস্থিতিতে আলোচ্য পুস্তকটি ঠিক পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। যেমন স্বীকৃতভাবেই 'বিবলিওগ্রাফীর' ওপর কোনো আলোচনা বর্তমান পুস্তকে নেই। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণও এই জাতের গ্রন্থে আশা করা অন্যায় হবে না, কিন্তু উক্ত বিষয়ের উল্লেখ চোখে পড়ল না বইটিতে। এবং ক্লাসিফিকেশন স্কিমে শুধু ডিউইর দশমিক বিভাগটিই আলোচিত হয়েছে। রঙ্গনাথনের বিশ্ব-বিখ্যাত কোলোন স্কিমটির স্থান এই গ্রন্থে হয়নি।

কিন্তু অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সবই সুআলোচিত এবং সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। পুস্তক-নির্বাচন, গ্রন্থাগার-সংঘটন এবং পরিচালনা, ক্যাটালগিং প্রমুখ গ্রন্থাগারের প্রাথমিক বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এবং ছবি ও ছক সন্নিবেশিত হওয়াতে সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বিষয়টি আকর্ষণের কারণ হয়েছে।

বিজ্ঞানের বই বাংলায় প্রাঞ্জল করে লেখা কষ্টসাধ্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু একেবারেই দুঃসাধ্য না। তার প্রমাণ অর্থনীতি, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতির বাংলা সংস্করণগুলি। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যায় আলোচ্য গ্রন্থটির ভাষা সম্বন্ধে আরেকটু যত্নবান হলে অন্ততঃ গুরু-চণ্ডালী দোষগুলো এড়ানো যেত। পরিভাষা যদিও তর্কসাপেক্ষ, তবুও Call number-এর বাংলা 'ডাক সংখ্যা', Book Classification-এর বঙ্গানুবাদ 'পুস্তকের জাতিবিচার' গ্রহণীয় কিনা সন্দেহের বিষয়। পরিশেষে বর্তমান সমালোচকের বিনীত অনুরোধ আগামী সংস্করণে গ্রন্থটির যেন একটি ইনডেক্স সন্নিবেশিত হয়।

রহস্যময় রূপকুণ্ড (অভিযাত্রী কাহিনী)— বীরেন্দ্রনাথ সরকার। আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ। কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

তরুণ লেখক বীরেন্দ্রনাথ সরকার দুর্গম রূপকুণ্ডে একক প্রচেষ্টায় অভিযাত্রায় গমন করেন। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে ১৬০০০ ফুট উঁচুতে একটি নির্জন নীল হ্রদ। তার নাম রূপকুণ্ড। তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে মৃত মানুষের অসংখ্য কঙ্কাল। তাদের জামা, ছাতা, জুতা, আর অলঙ্কার। কিসের আকর্ষণে তারা এই দুর্গমপথে এসেছিল তারা কি তীর্থযাত্রী, না দুঃসাহসী সেনা দল! তারা মহামারীতে মরেছে না শীতের তাড়নায় এইভাবে শুকিয়ে মরেছে। কে বলতে পারে। পণ্ডিতজনের গবেষণার আর অন্ত নেই। মাধোয়াল সিং ফরেস্টারের কানে এই রহস্যময় রূপকুণ্ডের সংবাদ সর্বপ্রথম পৌঁছেছিল, তারপর থেকে চলেছে নানা গবেষণা। দুঃসাহসিক তরুণ বীরেন্দ্রনাথ সরকার শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ করে স্বচক্ষে রূপকুণ্ড দেখে এসে সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে। গ্রন্থটি অতিশয় চমকপ্রদ। মুদ্রণ এবং অঙ্গসজ্জা পরিচ্ছন্ন।

॥ সংকলন ও পত্র পত্রিকা ॥

ডায়েরী—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বিভিন্ন আকারের ডায়েরী প্রকাশের ব্যাপারে এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স তাঁদের পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছেন। এই ডায়েরীগুলিতে বাংলা, ইংরেজী, শকাব্দ, হিজরী ও সংবতের সাল-তারিখ আছে। তাছাড়া এগুলিতে অজস্র ধরণের জ্ঞাতব্য তথ্য থাকায় এর উপযোগিতা-বৃদ্ধি ঘটেছে। বড় আকারের তিন সাইজের ডায়েরীর দাম—রয়াল ৪·৫০ নঃ পঃ, ডিমাই ৩·৫০ নঃ পঃ এবং ক্রাউন ২·৭৫ নঃ পঃ। অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ডায়েরীগুলির দাম হল এই রকম—এভারিম্যানস ১.৭৫ নঃ পঃ, জ' ডায়েরী ১·৭৫, লিটল ডায়েরী ১·২৫, বাংলা ডায়েরী ১·৭৫ এবং প্ল্যাস্টিকের মলাটযুক্ত অত্যন্ত ছোট লিটল ডায়েরী ১·২৫ নঃ পঃ। এই শেষোক্ত ডায়েরীতে এক-এক পৃষ্ঠায় তিনটি তারিখ ছাপা আছে।

কোমল গান্ধার—সম্পাদন—প্রদীপ-কুমার পাল প্রভৃতি। দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্র "কোমল গান্ধারের" এটি প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত (আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্বরূপ)। "ঋত্বিক ঘটক : চলচ্চিত্র ও আধুনিক মন" এ বিষয়ে লিখেছেন ময়ুর ভট্ট। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার প্রভৃতি কবিতা লিখেছেন। এজরা পাউণ্ড ও লরকার কবিতার অনুবাদ করছেন যথাক্রমে মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকজন নতুন লেখকের গল্প সংযোজিত হয়েছে।

দৃশ্যপট—সম্পাদনা— শিবেন চট্টোপাধ্যায় ও অমলেশ ভট্টাচার্য। তরুণ কবিদের কবিতা সংকলন (১ম খণ্ড)। কবিতা লিখেছেন তরুণ সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অমলেশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত চক্রবর্তী, কুমারেশ ভট্টাচার্য, ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রবন্ধ লিখেছেন অমলেশ ভট্টাচার্য ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার।

কৃত্তিবাস—সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। (কবিতার পত্রিকা)। বর্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে কতকগুলি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো লেখার উত্তেজনা প্রকাশ পাওয়ায় বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব-হানি ঘটেছে। অধিকাংশ কবির একাধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের পূর্ববর্তী কবিতার সঙ্গে এ কবিতাগুলির কোন পার্থক্য দেখা গেল না।

নান্দীমুখ—সম্পাদনা— সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। অধিকাংশ তরুণ লেখকদের রচনায় নান্দীমুখ সজ্জিত। কবিতা লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র রক্ষিত ও অরুণাচল বসু। অন্যান্য যারা কবিতা ও গল্প লিখেছেন তাদের এখনও কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। আলোচনা বিভাগ মন্দ নয়। লুসুনের একটি গল্প সংকলিত হয়েছে।

নান্দীকর

॥আজকের কথা॥
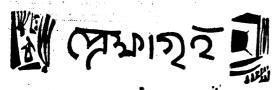
সত্যজিত রায়ের নতুন ছবি :

পৃথিবী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সত্যজিত রায়ের নতুন ছবি "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র জন্যে। "পথের পাঁচালী", "জলসাঘর" বা "তিনকন্যা"র অন্তর্গত "পোস্টমাস্টার", "সমাপ্তি", "মনিহারা"-র মত বহুপঠিত গল্প বা উপন্যাস নয়, "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ছবির জন্যে সত্যজিত রায় নিজে কলম ধরেছেন। বর্তমান ইওরোপের অত্যাধুনিক পরিচালকদের মতে "ফিল্মের জন্যে যে-গল্প, সে-গল্প শুধু ফিল্মের মারফতই বলা বা বোঝা যাবে, সাহিত্যের মাধ্যমে তাকে বলাও যাবে না, বোঝাও যাবে না"। আজকের ইওরোপের এক একটি ছবির গল্প এমনই যে, সাহিত্যের ভাষায় তাকে বলতে গেলে দেখা যাবে যে, তা আদৌ বলাই যাচ্ছে না, অথবা দু'লাইনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। সত্যজিত রায়ও কোনো সাহিত্যিক মর্যাদাসম্পন্ন গল্প অবলম্বন করে তাঁর ছবি করছেন না; ছবির জন্যে তিনি 'ছবির ভাষায়' একটি গল্প নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

তবুও "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র মধ্যে মোটামুটি যে ছোট্ট গল্পটুকু পাই, তা হচ্ছে—একটি ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তা হচ্ছেন অত্যন্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি; এমনই জবরদস্ত এবং রাশভারী যে, তাঁর সামনে তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত ভয়ে মুখ খুলতে পারেন না। তাঁর বড় মেয়েটির এমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, যার সঙ্গে বিবাহে সে অসুখী, যাকে সে চেষ্টা করেও ভালোবাসতে পারছে না। ছোট মেয়েটিরও বিয়ের জন্যে এমন এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেছেন, যার দিকে মেয়েটির ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে করে না। —এই পরিবারটি ছুটি উপভোগের জন্যে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে এসেছিল। ফিরে যাবার দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে, তখনই সুরু হ'ল গোলমাল, প্রকাশ পেল প্রতিটি চরিত্রের অন্তর্লোকের চিত্র। অবজার্ভেটারী হিলের চূড়ো থেকে দার্জিলিংয়ের কেন্দ্রস্থল "ম্যল"-এ আসবার পথে বহু দিনের চাপা অন্তর্বেদনা ধীরে ধীরে ভাষা পেতে আরম্ভ করল। দলটি যখন "ম্যল" পেরিয়ে আরও নীচে বাজারের কাছে এসে পৌঁছোল, তখন অবাধ্য সন্তানেরা নিজের নিজের পথ বেছে নিয়েছে;

সন্তোষ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "মন দিল না বঁধু" চিত্রে সবিতা বসু

উদ্ধত পিতার স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত জীবনের মূল্যায়নকে তারা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেছে। জাগতিক লাভের বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করতে গিয়ে পরাস্ত হয়ে পিতা তখন একা হাহাকার করছেন।

তুষারশুভ্র "কাঞ্চনজঙ্ঘা"কে পশ্চাদ্‌পট রূপে ব্যবহার করে দার্জিলিংয়ের মনোরম পটভূমিকায় সমস্ত ছবিটি তোলা হয়েছে ইস্টম্যান কলারে। তাই স্বাভাবিক রঙ নিয়ে এই ছবি দর্শকদের কাছে হবে একটি অপরূপ আকর্ষণীয় বস্তু। ২৭শে অক্টোবর থেকে সুরু করে ১৩ই নভেম্বর—এই আঠারো দিন প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত ঠাসবুনোনি স্যুটিং করে শ্রীরায় ছবির অন্ততঃ ছটি রীল (৬,০০০ ফুট) সম্পূর্ণ করেছেন এবং নভেম্বর মাস শেষ হবার আগেই পুরো ছবির কাজ তাঁর শেষ হয়ে গেছে। দু'লাখ আশী হাজার টাকার (২,৮০,০০০্) মধ্যে ছবিখানিকে শেষ করতে হবে, এই কথা মনে রেখে তিনি

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের "বধু" চিত্রে কমল মিত্র ও ছবি বিশ্বাস

যেমন একটি ফুটও ফিল্ম বাজে নষ্ট করেননি, তেমনই স্যুটিংয়ের সময়ে একটি মুহূর্তও বৃথা যেতে দেননি। এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, শ্রীরায়ের প্রতিটি সট্ তাঁর চিত্রনাট্যে খালি লেখাই থাকে না, আঁকাও থাকে। অথচ সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যময় এই ছবিটিতে তিনি স্যুটিংয়ের সময় দার্জিলিংয়ের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে যেখানেই সুবিধা পেয়েছেন, সেখানেই ধরে রেখেছেন। "ম্যল"-এর দৃশ্যে স্থানীয় লোকেরা কতক বা জেনেই এবং কতক-বা না-জেনেই তাঁর ক্যামেরার মধ্যে ধরা পড়েছে। একটি দৃশ্য আছে যেখানে তাঁর ছবির বড় মেয়ে একটি বেঞ্চে বসে কয়েকখানি চিঠি পড়ছে। সেই বেঞ্চেই তিনজন তিব্বতী প্রৌঢ়া বসেছিলেন; তাঁরা সম্ভবতঃ লক্ষ্যই করেননি কিংবা বুঝতেই পারেননি যে, ওখানে ফিল্ম তোলা হচ্ছে। তাই অনুভা গুপ্তা অভিনীত বড় মেয়ের সঙ্গে তাঁদেরও ছবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। ছবিতে যেখানে বড় জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ের মধ্যে একটি মর্মান্তিক দুঃখের দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে, সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে পিছনে একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দৃশ্য—অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে হৈ-হৈ করে খেলা করছে। পাহাড়ের চূড়োর হোটেলে বাগানের দৃশ্যে দুটি ইংরেজ-দম্পতি অত্যন্ত অজান্তে শ্রীরায়ের ছবির মধ্যে এসে গেছেন "এক্‌স্ট্রা" হিসেবে। সত্যজিতবাবু হাসতে হাসতে বলে উঠেছিলেন—"আমার ছবিটি দেখছি ক্রমেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে।"

২৯-সংখ্যায় জানানো হয়েছে যে, "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র চরিত্রলিপিতে আছেন—ছবি বিশ্বাস (কর্তা), করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (মা), অনুভা গুপ্তা (বড় মেয়ে), অলকানন্দা রায় (ছোট মেয়ে), অনিল চট্টোপাধ্যায় (বড় ছেলে), পাহাড়ী সান্যাল (মামা), সুব্রত সেন (বড় জামাই), ইন্দ্রাণী সিংহ (পাঁচ বছরের মেয়ে), এন বিশ্বনাথন (পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত) এবং নবাগত অরুণ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া আরও দুটি চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন দার্জিলিংয়ের সেণ্ট জোসেফ কলেজের ছাত্রী নীলিমা রায়চৌধুরী ও বিদ্যা সিং।

চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র ইস্টম্যান কলারে যে-ছবি তুলেছেন অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে, তা' যখন শ্রীরায়কে খুসী করতে পেরেছে, তখন দর্শক-সাধারণও যে তা' দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন, এ ভবিষ্যম্বাণী অনায়াসেই করতে পারা যায়।

॥ চিত্র সমালোচনা ॥

কানামাছি : টাস্ ফিল্মসের নিবেদন; ১২,৪৩২ ফুট দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : শৈলেশ দে; চিত্রনাট্য : মৃণাল সেন; পরিচালনা : ভবেন দাসের তত্ত্বাবধানে 'টাস ইউনিট'; সুর-সৃষ্টি : নচিকেতা ঘোষ; গীতরচনা : শ্যামল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত; শব্দধারণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা; সঙ্গীতানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সুনীতি মিত্র; সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী; রূপায়ণ : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, প্রভাবতী জানা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায়, পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী, মাস্টার তিলক প্রভৃতি। টাস্ পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল ৮ই ডিসেম্বর থেকে উত্তরা, পূরবী ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"টাস ফিল্মস"কে ধন্যবাদ এমন একখানি নিছক হাসির ছবি উপহার দেবার জন্যে। বহুদিন বাদে—সম্ভবতঃ "কাঞ্চনমূল্যে"-এর পর বাঙলা ছবির দর্শক প্রাণ খুলে হাসতে পারল। এবং এই হাসির মধ্যে কোনো খাদ নেই, অর্থাৎ অশ্লীলতা বা নিম্ন শ্রেণীর ভাঁড়ামোর সাহায্যে হাসাবার চেষ্টা নেই। নির্দোষ, নির্মল হাসি, যার উৎস হচ্ছে এক জোড়া গোঁফ। "গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা"—সেই গোঁফের আশ্রয় নিতে হয়েছিল শ্রীমান তপনকে নিজেরই যমজ ছোট ভাই সাজবার জন্যে। এক মিথ্যেকে ঢাকবার জন্যে আর এক মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া আর কি!—ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাচ্ছি বললে হয়ত তপন সদানন্দবাবুর কাছ থেকে দুটোর সময় আপিস থেকে ছুটি পেত; কিন্তু দুর্বুদ্ধি আর কাকে বলে? সে বলে বসল, মায়ের অসুখ—সিরিয়াস! বেচারা তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, ঐ ভীড়ের মধ্যে পাব্লিক গ্রীণ গ্যালারীর তপনকে মেম্বারদের গ্যালারী থেকে সদানন্দবাবু আবিষ্কার করবার সুযোগ পাবেন। কিন্তু দৈবক্রমে সেই অঘটনই ঘটল এবং তার ফলে সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী তপনের চাকরী যাবার উপক্রম। যে লোক সামান্য একটা খেলা দেখবার জন্যে এমন একটা প্রচণ্ড মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে, তাকে সদানন্দবাবু কিছুতেই চাকরীতে বহাল রাখতে পারেন না। অতএব একান্ত নিরুপায় হয়ে তপনকে বলতে হ'ল—"আমি যাইনি, স্যর—আমার ছোট ভাই, মানে আমার যমজ ভাইকে আপনি দেখে থাকবেন—সে—"। রাগতেও যতক্ষণ, ঠাণ্ডা হ'তেও ততক্ষণ সদানন্দবাবুর। তাই তপন তো চাকরীতে বহাল রইলই, উপরন্তু তপনের সেই নিষ্কর্মা ছোট ভাই সদানন্দবাবুর একমাত্র মেয়ে বাণীর গৃহশিক্ষকের চাকরী পেয়ে গেল। এর ওপর সদানন্দবাবু তাকে অফিসেও চাকরী দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তপন বহু চেষ্টায় তাঁকে এ থেকে নিবৃত্ত করে। গোঁফ-ওয়ালা তপন গৃহশিক্ষকতা করে, গোঁফবিহীন তপন করে চাকরী। এই-ভাবেই বেশ চলছিল। কিন্তু আবার গোল বাঁধল, যখন বাণীর বিবাহের প্রসঙ্গ উঠল। সদানন্দবাবু চান তপনের সঙ্গে বাণীর বিবাহ দিতে, আর বাণী নিজে চায় তপনের গোঁফওয়ালা ভাইটিকে বিবাহ করতে এবং তাতে তার মায়েরও যথেষ্ট সমর্থন আছে। নানা রঙ্গরসের ভিতর দিয়ে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেই হাল্কা হাসির ছবি "কানামাছি"র সমাপ্তি।

এমন একখানি হাসির ছবিকে সোজা ঝরঝরে ক'রে বলবার জন্যে যে-টুকু দরকার, সেটুকু মুন্সীয়ানা চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন দেখাতে ত্রুটি করেননি। কোনো রকম ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে তিনি দৃশ্যগুলিকে যথেষ্টই কৌতুহলোদ্দীপক ক'রে সাজিয়েছেন। অবশ্য এতে সংলাপের ভাগ আরও কম করবার সুযোগ ছিল এবং গানের কোনো দরকার ছিলনা; বিশেষ ক'রে ঘুম-পাড়ানি গানটি ছবির গতিকে করেছে ব্যাহত। আর একটি কথা। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার দৃশ্যে দেখলুম, তপন ছাতা নিয়ে আনন্দে নৃত্য করছে; কিন্তু পরের দৃশ্যে দেখা গেল, তিন গোলে মোহনবাগান হেরেছে ব'লে সে গুম্ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে খানা-পিনা পরিত্যাগ ক'রে। কারুর প্রিয় দল হেরে গেলে সে ত' গ্যালারীতেও গুম্

হয়ে বসে থাকে, ছাতা হাতে নাচানাচি করে না। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।

হাল্কা হাসির ছবিতে যেমন উজ্জ্বল আলোকচিত্রের কাজ করা উচিত, মাত্র ঘুম-পাড়ানি গানের দৃশ্য ছাড়া বাকী সর্বত্রই চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত তাই করেছেন। শব্দগ্রহণের ব্যাপারেও এ-ছবিতে যেটুকু সোচ্চার হওয়া দরকার, মনে হয় শব্দযন্ত্রী মৃণাল গুহঠাকুরতা তার থেকেও একটু বেশী রেখেছেন। শিল্প-নির্দেশনায় সুনীতি মিত্র দৃশ্যটিকে যথেষ্ট বাস্তবানুগ করবার চেষ্টা করেছেন। গান দু'খানির ভাষা ও সুর ভালো হ'লেও ছবিটিতে তারা যে অপ্রয়োজনীয়, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। কমল গাঙ্গুলী সম্পাদনার কাজ বেশ অনায়াস ভঙ্গীতেই করেছেন।

অভিনয়ে মত করেছেন তপন এবং তার কল্পিত গুম্ফধারী ভাইয়ের (ভাইয়ের কোনো নাম দেওয়া হয়নি, সম্ভবতঃ ইচ্ছে ক'রেই) ভূমিকায় অনুপ-কুমার—এ ছবিতে তিনি একাই একশো। যেখানে কণার সঙ্গে বিবাহ-সমস্যায় তিনি তপনরূপে প্রকাশিত হবেন, না তার ভাইয়ের বেশে,—সেখানে দ্বন্দ্বের সমাধানে তাঁর উন্মত্ততার অভিনয় বহুদিন মনে রাখবার মতো। সদানন্দবাবুর 'বাঙ্গাল' ভৃত্যের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিরাচরিত প্রথায় সুঅভিনয় করেছেন। এবং সদানন্দবাবু রূপে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় অত্যন্ত উপভোগ্য; বিশেষ ক'রে তাঁর রেগে যাওয়ার দৃশ্যগুলি অদ্ভুতভাবে স্বাভাবিক লেগেছে। বাণীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে মানিয়েছে অনেকখানি দীনেন গুপ্তের ফোটোগ্রাফীর গুণে এবং কিছুটা প্রাণানন্দ গোস্বামীর মেক্-আপের ফলে। তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ অভিনয় ক'রে ভূমিকাটিকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছেন। বাণীর দুষ্টু ভাইয়ের ভূমিকায় মাস্টার তিলককে বেশ সপ্রতিভ লেগেছে। অপরাপর ভূমিকায় জহর রায় (চাণাচুরওয়ালা), তুলসী চক্রবর্তী (অফিস-কেরাণী), তপতী ঘোষ (তপনের ভগ্নি), পদ্মাদেবী (তপনের মা), সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (সদানন্দের স্ত্রী) প্রভৃতি সকলেই চরিত্রানুগ সুঅভিনয় করেছেন।

হাল্কা হাসির ছবি হিসেবে 'কানামাছি' বাঙলা চলচ্চিত্রে একটি স্মরণীয় যোজনা।

বিমল রায় প্রোডাকসন্সের 'কাবুলিওয়ালা' চিত্রে বেবী সোনু (মিনি) ও সজ্জন।

কাঁচ-কী-গুড়িয়া (হিন্দী) : রোশনী ফিল্মসের নিবেদন ঃ ১৫,০৭২ ফুট দীর্ঘ ও ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ঃ অঞ্জনা রাওয়েল; চিত্রনাট্য ঃ নবেন্দু ঘোষ; সংলাপ ঃ বিষ্ণু শর্মা ও পল মহেন্দ্র; পরিচালনা ও প্রযোজনা ঃ এইচ্, এস্, রাওয়েল; সংগীত-পরিচালনা ঃ সুহৃদ কর; চিত্রগ্রহণ ঃ রণজোড় ঠাকুর; শিল্প-নির্দেশনা ঃ সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা ঃ কৃষ্ণ সচদেব; রূপায়ণ ঃ সঈদা খান, লীলা চিটনীস, শুভা খোটে, মনোরমা, মমতাজ বেগম, দুলারী, মনোজকুমার, কৃষ্ণ ধাওয়ান, তরুণ বসু, ইফ্‌তিকার, কুন্দন প্রভৃতি। ইন্টারন্যাশনাল পিকচার্স সার্ভিসেস-এর পরিবেশনায় গেল ১লা ডিসেম্বর থেকে ওরিয়েন্ট, সুরশ্রী প্রভৃতি চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরাতন আদর্শ ত্যাগ ক'রে নবতর আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়েছে। কাল যা নির্বিচারে মেনে নেওয়া যেত, আজ তাকে মানতে মন চাইছে না; বিশ্লেষণ ক'রে, বিচার ক'রে মন দেখতে চাইছে যাকে এতদিন ভালো ব'লে জানতুম, সেটা সত্যিই ভালো কিনা। হোক না অজ্ঞাত কুলশীল মেয়ে, যদি বুঝি সে সত্যিই নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, কেন তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে মহিমান্বিত
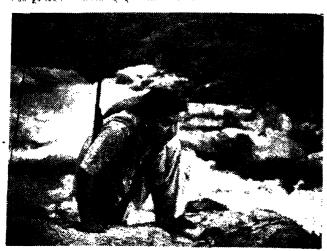
'শিউলিবাড়ি' চিত্রের একটি বিশেষ দৃশ্যে উত্তমকুমার

নারীর মর্যাদায় ভূষিত করব না? সেকালের রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্যে প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণীকে বনবাসে পাঠাতে দ্বিধা করেননি, এ-কালের আমাদের রাণী সোরিয়ার জন্যে অবলীলাক্রমে সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। এই নবতম আদর্শকে উপজীব্য ক'রে হিন্দী ছবি রচনা করা কচিৎ দেখা যায়। তাই "কাঁচ-কী-গুড়িয়া"তে এই নব মূল্যায়নকে তুলে ধরবার জন্যে পরিচালক-প্রযোজক এইচ, এস, রাওয়েলকে ধন্যবাদ দিই।

নিঃসহায় তরুণী শক্লার জীবনের বিচিত্র উত্থান-পতনকে ঘিরে ছবিটি রচিত হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রিনী মায়ের সাক্ষাতে সে যাকে বিপত্তারিণী ভেবে নতুন ক'রে মা ডেকে ধন্য হয়ে গেল, কয়েক দিন যেতে না যেতেই সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল, তিনি তাকে ঘৃণ্য রূপজীবিনীর জীবন যাপন করাতে বদ্ধপরিকর। সে যখন অকূলে পাথারে ভাসছে, তখন তার ত্রাণকর্তারূপে এল এক সুদর্শন যুবক, যে তাকে বিবাহ করে জীবনসঙ্গিনী ক'রে নিল। শক্লার মধুর ব্যবহারে তার রক্ষণশীল শ্বশুর যখন তাকে বধূরূপে পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করলেন, তার কিছু পরেই তার জীবনে শনির মত উদয় হ'ল এক ভ্রষ্ট-চরিত্র ক্রূর, যে তাকে বারাঙ্গনা-গৃহে উপভোগ্য বস্তুতে পরিণত করতে চেয়েছিল। শ্বশুর কালবিলম্ব না ক'রে অন্তঃসত্ত্বা শক্লাকে বিতাড়িত করলেন পুত্রের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। এর পর কত দুঃখের সাগর পেরিয়ে শক্লা নিজেকে অকলঙ্ক ও নির্দোষ প্রমাণ ক'রে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তাই নিয়েই ছবির পরিসমাপ্তি।
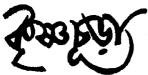
অভিনয়ে শক্লার চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন সঈদা খান তাঁর আন্তরিকতা দ্বারা। উদারচিত্ত সংযতচরিত্র নায়কের ভূমিকায় মনোজকুমারের অভিনয় হয়েছে অত্যন্ত সাবলীল। নায়কের মার ভূমিকায় লীলা চিটনীস ও গণিকালয়ে শক্লার প্রতি সহানুভূতিশীল নারীর ভূমিকায় শুভা খোটেও চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় কৃষণ ধাওয়ান, তরুণ বসু, ইফতিকার, কুন্দন প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

সুহৃদ কর প্রদত্ত সুরারোপে গানগুলি হয়েছে সুখশ্রাব্য এবং আবহ-সংগীতও হয়েছে যথাযথ। অপরাপর সকল বিভাগেই কলাকুশলের কাজ পরিচ্ছন্ন।

বিবিধ সংবাদ

সোভিয়েত চলচ্চিত্রোৎসব :

আজ শুক্রবার, ১৫ই থেকে ২৮এ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪ দিন ধরে জ্যোতি সিনেমায় সোভিয়েত চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে যে-অনুষ্ঠান-লিপি প্রচারিত হয়েছে, তা এখানে দেওয়া হ'ল :—

(১) দি ফেট অব এ ম্যান—১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই
(২) দি লেটার দ্যাট ওয়াজ নট সেন্ট —১৮ই
(৩) দি ফার্স্ট ফ্লাইট টু দি স্টারস্ —১৯-এ, ২০-এ ও ২১-এ
(৪) মেডেনস্ স্প্রিং—২২-এ, ২৩-এ ও ২৪-এ
(৫) লয়লীমজনু—২৫-এ
(৬) দি মামলুক—২৬-এ, ২৭-এ ও ২৮-এ

একমাত্র আজ, ১৫ই রাত্রি ৯টায় একটি প্রদর্শনী হবে। অপরাপর দিন প্রত্যহ ৩টা, ৬টা ও ৯টা—তিনটি ক'রে প্রদর্শনী হবে।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে গেল ১১ই ডিসেম্বর ইউ-এস-এস-আর-এর কন্সাল জেনারাল একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই চিত্রোৎসবের উদ্দেশ্য ও বিবরণ পেশ করেছিলেন।

বিশ্বরূপায় "সেতু"র ৫০০ রজনীর স্মারকোৎসব :

গেল ১০ই ডিসেম্বর, 'সেতু'র ৫২০-তম অভিনয়ের আগে ৫০০-তম রজনীর স্মারকোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ডঃ কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। উভয়কে বিশ্বরূপার প্রবীণ কর্মীদের দ্বারা মাল্যদানের পর 'সেতু'-সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পী ও কর্মীকে বহু প্রকার প্রয়োজনীয় উপহার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। পরে বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে রাসবিহারী সরকারের ভাষণের পর প্রধান অতিথি এবং সভাপতি সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। পরে যথারীতি 'সেতু'-র অভিনয় শুরু হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত অতিথিবৃন্দকে বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ মিষ্টিমুখ করিয়ে আপ্যায়িত করেন।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা :

গেল ৪ই ডিসেম্বর, দক্ষিণ কলকাতার "মুক্তাঙ্গন"-মঞ্চে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে এবং বর্মা-শেল কোম্পানীর সহযোগিতায় (১) পাঁচতুপি, (২) বোম্বাইয়ের ধীবর, (৩) ত্রিবাঙ্কুরের গ্রাম ও (৪) প্রতিযোগী জগৎ নামে চারটি বিশিষ্ট স্বল্পদৈর্ঘ চিত্র দেখানো হয়।

বিজয় গুপ্তর "চিঠি" :

পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয় গুপ্ত রচিত "চিঠি" গল্পটির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। শোনা যাচ্ছে জানুয়ারী মাস থেকে এর চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। ছবিটিতে সুর-যোজনা করবেন হৃদয় কুশারী।

এস, বি, এণ্টারপ্রাইজের "পাশাপাশি" :

গেল ২৪-এ নভেম্বর থেকে এঁদের নতুন ছবি "পাশাপাশি"র চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়ে গেছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। পরিচালনা করছেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রূপায়ণে আছেন ছবি বিশ্বাস, অনুপকুমার, প্রবীরকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, লিলি চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী এবং আরও অনেকে।

মুক্তিমায়ার "খনা" :

প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী "খনা"র জীবনী নিয়ে রচিত এই ছবিটি খুব শিগ্‌গিরই মুক্তি পাবে ব'লে শোনা যাচ্ছে। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা, পদ্মা, তপতী ঘোষ প্রভৃতি চিত্রজগতের বহু পরিচিত শিল্পিবৃন্দ। ছবিখানির পরিচালনা করেছেন অধুনা-পরলোকগত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংগীত-পরিচালনা করেছেন প্রবীর গুপ্ত।

বঙ্গীয় নাট্য-সংগঠনী :

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর নবতম শাখা, ডুয়ার্সের ময়নাগুড়ি শহরে গেল নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে "নিখিল ডুয়ার্স নাট্য অধিবেশন" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চালসা থেকে শুরু ক'রে তোষানদী পর্যন্ত এলাকার সমস্ত নাট্যসংস্থা সংগঠনীর পতাকাতলে সমবেত হবেন ব'লে জানিয়েছেন। এই সম্মেলনে সংগঠনীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন রবি চৌধুরী ও দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল কেন্দ্রের সম্পাদক রমেন ঘোষ ও সানু রায়চৌধুরী নবনাট্য আন্দো-

লন এবং বিভিন্ন সংস্থার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন।

বার্ণপুরের ভারতী ভবনের উদ্যোগে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ঃ

ভারতী ভবন এই দ্বিতীয় বছর অপেশাদার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করছেন ৩০-এ, ৩১-এ ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী, ১৯৬২-তে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে এঁরা এই বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন ঃ (ক) শ্রেষ্ঠ সংস্থা, (খ) গুণানুসারে দ্বিতীয় সংস্থা, (গ) শ্রেষ্ঠ পরিচালক, (ঘ) শ্রেষ্ঠ নাট্যকার (মাত্র মৌলিক অপ্রকাশিত নাটকই বিবেচিত হবে), (ঙ) শ্রেষ্ঠ আঙ্গিক, (চ) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং (ছ) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে জানতে হ'লে প্রমোদ-সচিব এবং মঞ্চ-সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

পরলোকে শ্রীতুলসী চক্রবর্তী

বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্রের খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীতুলসী চক্রবর্তীর জীবনাবসান ঘটেছে। দীর্ঘ নটজীবনে নানাধরণের চরিত্রে যে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তা বাঙলা নাট্য ও চলচ্চিত্র সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর এই চল্লিশ বৎসরের অভিনয় জীবনের মধ্যে তিনি একমাত্র শ্রীসত্যজিৎ রায়ের "পরশ পাথর" চিত্রে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। পার্শ্বচরিত্রগুলির অভিনয়ে তিনি শিল্পীকুশলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তুলসীবাবুর প্রতিভা কেবলমাত্র অভিনয়ে আবদ্ধ ছিল না, সংগীত ও নৃত্যেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। এমনকি সুদক্ষ অভিনয়-শিক্ষক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। রসিকমন, আলাপপ্রিয়তা ও চরিত্রমাধুর্য তাঁর পরিচিতের গন্ডীকে যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনি মানুষ হিসাবেও তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯২০ সালে তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগদান করবার পর বহু ভূমিকায় অভিনয় করেন। সম্ভবতঃ ১৯৩৬ সালে প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ' চিত্রে প্রথম তাঁর চলচ্চিত্রাভিনয়। এর পর নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। অধুনা তিনি স্টার থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। "কানামাছি" চিত্রে তাঁর একটি ভূমিকা আছে এবং আরও কতকগুলি চিত্র মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

পরলোকে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের আর একটি দুঃসংবাদ। গেল ৯ই ডিসেম্বর সকালে সুখ্যাত চিত্রশিল্পী অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় —স্টুডিও মহলে যিনি 'বেটেদা' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি—অত্যন্ত আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেছেন করোনারি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে। প্রথম জীবনে নিউ থিয়েটার্সের আলোক-সম্পাতকারীর পদ থেকে ধীরে ধীরে তিনি নিজের চেষ্টায় একজন প্রথম শ্রেণীর আলোক-চিত্রশিল্পী রূপে পরিগণিত হন। প্রচার-চিত্র, সংবাদ-চিত্র, দলিল-চিত্র প্রভৃতির চিত্রগ্রহণে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য এবং সমানভাবেই তিনি 'কালামাটি', 'লৌহকপাট' প্রভৃতি বহু প্রথম শ্রেণীর চিত্রগ্রহণে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগব্যথা অনুভব করছি। তাঁর শোকসন্তপ্ত জননী, জায়া এবং কন্যাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নেই। "পরমেশ্বর তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন।

পরলোকে পার্বতীশঙ্কর দে ঃ

"অগ্রদূত" পরিচালকগোষ্ঠীর অন্যতম জন সহকারী—সরোজ দে, নিতাই বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্বতীশঙ্কর দে যে একদিন "অগ্রগামী" পরিচালকগোষ্ঠী-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, এ-সংবাদ নিশ্চয়ই পাঠকদের অজানা নেই। এবং এই "অগ্রগামী"-গোষ্ঠী বাঙলার চিত্র-প্রিয় দর্শকদের উপহার দিয়েছেন "সাগ-

রিকা", "শিল্পী", "ডাক-হরকরা", "হেডমাস্টার" প্রভৃতি বিখ্যাত জনপ্রিয় ছবি। আমরা জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে, এই "অগ্রগামী"-গোষ্ঠীর অন্যতম স্তম্ভ, পার্বতীশঙ্কর দে গেল ২৮শে নভেম্বর সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগের আকস্মিক আক্রমণে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বিখ্যাত গণিতকার গৌরীশঙ্কর দে'র পৌত্র পার্বতীশঙ্কর ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অমায়িক, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। তাঁর বিধবা পত্নী ও শিশু-কন্যাকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ দাস :

"বাঙলা মা তোর শ্যামল গায়ে বাদল ঝরে দিনরজনী"—এই গানখানি বাংলার ঘরে ঘরে শুধু যে গ্রামোফোন-রেকর্ডেই বাজত, তা নয়, বাঙালীর ছেলেমেয়েরা সকাল-সন্ধ্যে-দুপুরে সব সময়েই এই গান গেয়ে আনন্দ পেত। এই গান যাঁর কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে এই রকম জনপ্রিয়তা লাভ করে, সেই ধীরেন্দ্রনাথ দাস গেল ২৫শে নভেম্বর পরলোকগমন করেছেন। মনে পড়ে, শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত "নাট্যমন্দিরে" রঘুবীর নাটকে একটি গায়কের ভূমিকায় তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণের কথা। লাজুক, নম্র, অল্পভাষী ধীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে বহু গানই শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। পরে তাঁকে দেখি গ্রামোফোন কোম্পানীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে। তাঁর গাওয়া "আজ আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে" "বাংলা মা তোর সোনার ক্ষেতে", "ওগো, তোরা কে যাবি পারে" প্রভৃতি বহু গানই ঐ প্রথম গানখানিরই মত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমরা তাঁর পরলোকগমনে বন্ধু-বিয়োগব্যথা অনুভব করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রজগতের জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীমান অনুপকুমার (সত্যেন্দ্রনাথ) তাঁর দ্বিতীয় পুত্র।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র একটি মনোরম দৃশ্যে নবাগতা অলকানন্দা ও এন বিশ্বনাথন

সাংস্কৃতিক উৎসব

সম্প্রতি এক নূতন ধরণের সাংস্কৃতিক উৎসব হয়ে গেল কলকাতারই সন্নিহিত একটি নূতন নাগরিক উপনিবেশ বাঙ্গুর এভিনিউতে। যশোর রোড দিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে যেতে জায়গাটা চোখে পড়ে, এককালের পরিত্যক্ত জলাভূমি নতুন নতুন বাড়ী, গাড়ী আর সবুজসাথীদের আনন্দময় কলকোলাহলে মুখর।

বাঙ্গুর এভিনিউরই বাসিন্দারা—যাঁরা ভারতের নানান প্রদেশ থেকে এসেছেন—গড়ে তুলেছেন একটি সুসংহত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "বৈকালিকী"। এরই উদ্যোগে গত ২৪শে নভেম্বর থেকে ২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত উদযাপিত হয়ে গেল—ঐ উৎসবটি—ওঁরা যার নাম দিয়েছিলেন "সাংস্কৃতিক সংহতি উৎসব।"

এই উৎসবটি উদ্বোধন করতে এসেছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মনীষী ডঃ কালিদাস নাগ। ডঃ নাগ বাঙ্গুর এভিনিউ'র নানা ভাষাভাষী নাগরিকদের এই সংহতি উৎসবের প্রশংসা করলেন—শিক্ষা ব্যবস্থার একীকরণের মধ্য দিয়ে নতুন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সচেতন উদারচেতা করে গড়ে তোলবার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন। বললেন, "আপনারা যদি সত্যই আত্মকলহ পরিত্যাগ করে প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার এই প্রচেষ্টায় নিষ্ঠার সঙ্গে রত থাকতে পারেন তাহলে

আপনারা নতুন ভারতের অগ্রণীদেরই অন্যতম হবেন তাতে সন্দেহ নেই।"

উৎসবটি উদ্বোধনের আগেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবলদেব সুর এবং বৈকালিকীর সভাপতি শ্রী এন সি রায় সমাগত অতিথিদের আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য নতুন ভারতের গঠনে যথাশক্তি ভূমিকা গ্রহণ করা এবং তার জন্য ভাষা বা সম্প্রদায়গত সর্বপ্রকার ভেদাভেদ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা।

প্রথম দিনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। ডাঃ সেনগুপ্ত অতি চমৎকারভাবে মানুষে মানুষে ঐক্যভাব অথচ সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে ভারত আবহমানকাল যে আদর্শ অনুসরণ করে এসেছে, সেটি বুঝিয়ে দেন। শান্তি পেতে হলে, সে শান্তি রাষ্ট্রগতই হোক বা ব্যক্তিগতভাবেই হোক, চাই সহনশীলতা—চাই অপরকে শ্রদ্ধা করবার মনোভাব।

মার্কিণ মনীষী ডাঃ ডানকান এমরিক ছিলেন প্রথম দিনের প্রধান অতিথি। তিনি বল্লেন, সংহতি মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে সকল মানুষের সব কিছুই একই রকম। তা যদি হয় তাহলে এই পৃথিবী মানুষের বসবাসেরই অনুপযুক্ত হয়ে যাবে, এর সমস্ত সৌন্দর্য লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়ে যে মিলন—যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য, সেটাই হবে মানবিক সংহতি। ডাঃ এমরিক মানুষের সাংস্কৃতিক সংহতি সৃষ্টির একটি পাঁচ দফা সূত্রের উল্লেখ করলেন। তিনি বল্লেন : সাংস্কৃতিক সংহতিকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন—অন্য মানুষ ও তার জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে জানবার আগ্রহ, চাই অপর ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, চাই পরস্পরের সম্পর্কে সহিষ্ণুতা, চাই অপরের সহানুভূতি, আর চাই নিজের জীবনধারা নির্বাচনের স্বাধীনতা।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে এর পরে পরিবেষিত হ'ল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীত—অংশ গ্রহণ করলেন স্থানীয় শিল্পীরা। দ্বিতীয় দিবসে এসেছিলেন আমেরিকান লোক-নৃত্য সংগ্রাহক ও গবেষক শ্রীরিক হোল্ডেন, যিনি মরুভূমি অঞ্চলের কয়েকটি নাচের রূপ দেখালেন স্থানীয় তরুণদের নিয়ে। বললেন, নৃত্য মানুষকে প্রেরণা দিয়ে এসেছে। নৃত্য যাঁরা দেখেন আর নৃত্যে যাঁরা যোগ দেন তাঁরা সকলেই এ থেকে আনন্দ পান। এই দিন আর একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল শ্রীবিষ্ণু ঘোষের শরীর-চর্চা-প্রদর্শনী। শ্রীঘোষ তাঁর স্বভাবসুলভ সুললিত বাচনভঙ্গীর সাহায্যে সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক সূচীতে ব্যায়ামের অনুশীলনের অপরিহার্যতা উল্লেখ করলেন। দর্শকদের মধ্যে দেখলাম একটা উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল, অনেকেই বললেন শরীরচর্চাকে আমাদের জাতি গঠনের একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ করে তুলতেই হবে। শ্রীধূর্জটি মুখার্জি, শ্রীমন্টু ভট্টাচার্য প্রভৃতি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন।

তৃতীয় দিবসে অনুষ্ঠিত হ'ল সামাজিক সম্মিলন—প্রায় হাজারখানেক লোকের চায়ের আসর। যোগ দিয়েছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস। আর এসেছিলেন বহু সাংবাদিক, গ্রন্থকার, ব্যবসা-পরিচালক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারজীব ইত্যাদি ইত্যাদি। পরস্পরের আলাপ হ'ল, দেশের জন্য ভালো কিছু করতে হবে তাঁরা সংকল্প নিলেন। এরপর শিল্পী রথীন ঘোষ পরিবেশন করলেন তাঁর বিখ্যাত "মহাভারতী"—ভারতকে তুলে ধরলেন তার চির-সমুজ্জ্বল মহিমায়। রাত্রির দিকে জমজমাট আসরে পরিবেশিত হল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কাহিনী অবলম্বনে একখানি নাটক। মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ আন্তরিক শপথ নিলেন, ভারতকে গড়ে তুলতে হবে—রামকৃষ্ণের আদর্শে, বিবেকানন্দের কর্মযোগের শিক্ষায়।

উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল এবং যাঁরা বাণী পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

টুকিটাকি

লেখক বিশ্বনাথী

জাস্টিন লরেন্স এবার চিত্র পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর "ক্যাশ ডিমান্ড" তোলা হবে একটি ব্যাংক ডাকাতির কাহিনীকে ভিত্তি করে। ভূমিকালিপির মধ্যে আছেন পিটার কুশিং এবং আন্দ্রে মোরেল।

যুদ্ধকাহিনী নিয়ে "দি লংগেস্ট ডে" তোলা হচ্ছে। পিটার লফোর্ড অভিনয় করছেন লর্ড লোভাট-এর চরিত্রে। লোভাট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মরণীয় যুদ্ধনায়ক ছিলেন। উইলিয়াম হোল্ডেন, রিচার্ড টড এই ছিত্রের অন্যতম অভিনেতা। "ওয়ালজ অফ দি টরিডোরস" ছবির কাজ শেষ হলে পিটার সেলার্স চিত্রজগত থেকে বেশ কিছুদিনের জন্যে অবসর নেবার কথা ভাবছেন। এবছরে বিশ্রামহীন তিনটি ছবিতে পর পর কাজ করেছেন সেলার্স এবং আগামী বছরের আগে কোনো ছবির জন্যে চুক্তিই করবেন না তিনি। সেলার্স চিরদিনই বিভিন্ন চিত্রে নতুন ধরণের চরিত্রে অভিনয় করতে অভ্যস্ত।

সুসান হেওয়ার্ড এর নতুন ছবির নাম "আই থ্যাংক ইউ ফুল"। 'অই উল ক্রাই টুমরো' এবং 'আই ওয়াণ্ট টু লিভ' ছবি দুটির অভিনয় দর্শকমনের অটুট স্মৃতি হয়ে আছে আজো। ইংলণ্ডের এম-জি-এম স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে "আই থ্যাংক ইউ ফুল"। পরিচালক হলেন রবার্ট স্টিভেন্স। নাটাকার জন মর্টিমার বর্তমান বৃটিশ চিত্রনাট্যকার। ডায়না সিলেন্টিনো নাম্নী এক নবাগতা অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রী চুক্তিবদ্ধা হয়েছেন ছবিটির জন্যে। তাঁর স্বামীর ভূমিকায় থাকবেন পিটার ফিঞ্চ।

খেলাধুলা

দর্শক

॥ ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড ॥

ভারতবর্ষ : ৪৬৭ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পলি উমরীগড় নট-আউট ১৪৭, মঞ্জরেকার ৯৬, জয়সীমা ৭০। লক ৯৩ রানে ৩, নাইট ৮০ রানে ২, ডেক্সটার ৮৪ রানে ২ এবং এ্যালেন ৮৮ রানে ১ উইকেটে।

ইংল্যান্ড : ২৪৪ রান (বারবার নট-আউট ৬৯, লক ৪৯, পুলার ৪৬। সুভাষ গুপ্তে ৯০ রানে ৫, বোরদে ৫৫ রানে ৩, রঞ্জনে ৩৮ রানে ১ এবং দুরাণী ৩৬ রানে ১ উইকেট) ও ৪৯৭ রান (৫ উইকেটে। ২য় ইনিংসের খেলা অসমাপ্ত। কেন ব্যারিংটন ১৭২, জিওফ পুলার ১১৯, টেড ডেক্সটার নট-আউট ১২৬ এবং রিচার্ডসন ৪৮। গুপ্তে ৮৯ রানে ১, দুরাণী ১৩৯ রানে ১ এবং বোরদে ৪৪ রানে ১ উইকেট)

১ম দিন (১লা ডিসেম্বর) : ভারতবর্ষ ২০৯ রান (৩ উইকেটে); দুরাণী ৯ এবং উমরীগড় ১২ রান করে নট-আউট থাকেন।

২য় দিন (২রা ডিসেম্বর) : ভারতবর্ষ ৪৩৭ রান (৭ উইকেটে); উমরীগড় ১৩২ এবং ইঞ্জিনীয়ার ১৮ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

৩য় দিন (৩রা ডিসেম্বর) : ৪৬৭ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮ উইকেট পড়ে ১৬৫ রান।

৪র্থ দিন (৫ই ডিসেম্বর) : ২৪৪ রানে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি। ফলো-অন করে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ২০০ রান (১ উইকেটে)। পুলার ১০১ রান এবং ব্যারিংটন ৪৭ রান করে নট-আউট।

৫ম দিন (৬ই ডিসেম্বর) : ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসে ৪৯৭ রান (৫ উইকেটে)।

টেড ডেক্সটার

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ মাঠের মতই কানপুরের গ্রীণ পার্ক নিষ্ফলা মাঠ। কানপুরে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার ফলাফল বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট খেলার মতই দাঁড়িয়েছে—খেলার ফলাফল অমীমাংসিত। ফলে ভারতবর্ষ উপর্যুপরি ৭টি টেস্ট খেলা ড্র করলো—১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫টি এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা। কানপুরের এই গ্রীণ পার্ক মাঠেই ১৯৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষ জয়লাভ করেছিল। গ্রীণ পার্ক রাতারাতি ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং সেই সঙ্গে পয়মন্ত মাঠ হিসাবে এই মাঠের খ্যাতি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা, ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডকে ফলো-অন করতে বাধ্য করেছে—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে এই কৃতিত্ব প্রথম। কিন্তু ইংল্যান্ড ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে যেভাবে রাণ তুলেছে তাতে ইংল্যান্ডের পক্ষে ফলো-অন করার অপমান অনেকখানি ধুয়ে গেছে। ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে পুরো দুদিন এবং তৃতীয় দিনেরও ৪৫ মিনিট ব্যাট ক'রে ৮ উইকেটে ৪৬৭ রাণ তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। মোট ১১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের ৪৬৭ রাণ মোটেই দ্রুতগতিতে রাণ করার দৃষ্টান্ত নয় এবং টেস্ট খেলায় রাণ করার এই গতি আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলার পক্ষে অনুকূল নয়। তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষ ৮টা উইকেট পায় মাত্র ১৬৫ রাণে। ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় জয়লাভের আশা দেখা দেয়। কিন্তু ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৯ম

দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাইক স্মিথ শূন্য রাণে গুপ্তের বলে আউট হয়েছেন

জিওফ পুলার

উইকেটের জুটির (বারবার এবং টনি লক) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পুলার, ব্যারিংটন এবং অধিনায়ক ডেক্সটারের [illegible]তাপূর্ণ খেলার দরুণই ভারতবর্ষের সমস্ত আশা বিলীন হয়ে যায়। প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ডের দারুণ সংকটের মুখে (৮ উইকেটে ১৬৫ রাণ) ৯ম উইকেটের জুটি বারবার এবং টনি লক বেপরোয়া পিটিয়ে খেলে যান এবং ৯ম উইকেটের জুটিতে ৮১ রাণ তুলে দিয়ে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ৯ম উইকেটের জুটিতে নতুন রেকর্ড রাণ করেন। তাঁরা মাত্র ২৪ রাণের জন্যে ইংল্যাণ্ডকে শেষ পর্যন্ত ফলো-অনের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেননি। কিন্তু তাঁদের এই দৃঢ়তাপূর্ণ খেলাই দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ডকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বড় কৃতিত্ব যে, তারা [illegible]ট থেকে দলকে রক্ষা করে শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র করেছে। ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক বিপর্যয় সৃষ্টি কর[illegible]ও শেষ পর্যন্ত তার জের টেনে রা[illegible] পারেনি; ভারতবর্ষ আলোচ্য টেস্ট খেলায় জয়মাল্য হাতছাড়া করেছে।

[illegible]ল্যাণ্ডের পক্ষে তিনজন পুলার ([illegible]), ব্যারিংটন (১৭২) এবং [illegible] (১২৬ নট আউট) এবং [illegible]র পক্ষে উমরীগড় (১৪৭ নট [illegible]) সেঞ্চুরী রাণ করেন। ইংল্যাণ্ডের [illegible] ইনিংসে সুভাষ গুপ্তে ৯০ রাণে [illegible]কেট পান। কয়েকজন খেলোয়াড় [illegible] টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে [illegible]ত রেকর্ডও করেছেন। কয়েকটি [illegible] দলগত রেকর্ডও হয়েছে। এই [illegible] ঘটনা বাদ দিলে কানপুরের এই [illegible]য় টেস্ট খেলার কোন আকর্ষণ [illegible] কি? অন্ততঃ ক্রিকেট খেলার [illegible]ক্রিকেট খেলা হয়নি।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষ মাত্র ৪৫ মিনিট ব্যাট ক'রে ৪৬৭ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ৪৬৭ রানের প্রত্যুত্তরে ইংল্যান্ড ৩য় দিনে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট ব্যাট ক'রে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৬৫ রান তুলে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৯ মিনিট আগে উইকেটের উপর ছায়া পড়ার দরুণ খেলা বন্ধ হয়। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অপরাজেয় ছিলেন বারবার (৪১ রান) এবং টনি লক (শূন্য রান)।

টেস্ট খেলায় যে সব খেলোয়াড় তিন সহস্র রাণ করেছেন তাঁদের নাম :

মোট রাণ	খেলোয়াড়ের নাম	মোট টেস্ট খেলা
৭,২৪৯	ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইং)	৮৫
৬,৯৯৬	ডন ব্র্যাডম্যান (অ)	৫২
৬,৯৭১	লেন হ্যাটন (ইং)	৭৯
৫,৮০৭	ডেনিস কম্পটন (ইং)	৭৮
৫,৭৫৪	নীল হার্ভে (অ)	৭৪
৫,৪১০	জ্যাক হবস (ইং)	৬১
৪,৫৫৫	হার্বার্ট সাটক্লিফ (ইং)	৫৪
৪,৫৩৭	পিটার মে (ইং)	৬৬
৪,৪৫৫	এ উইকস (ওঃ ইণ্ডিজ)	৪৮
৩,৭৯৮	সি ওয়ালকট (ওঃ ইণ্ডিজ)	৪৪
৩,৫৩৩	এ মরিস (অ)	৪৬
৩,৫২৫	পি হেণ্ড্রেন (ইং)	৫১
৩,৪৭১	বি মিচেল (দঃ আফ্রিকা)	৪২
৩,৪১১	কলিন কাউড্রে (ইং)	৫৩
৩,৪০২	সি হিল (অ)	৪৯
৩,৩৮৬	ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (ওঃ ইণ্ডিজ)	৪১
৩,৩৫২	জি সোবার্স (ওঃ ইণ্ডিজ)	৩৭
৩,২৮৩	ফ্রাঙ্ক উলি (ইং)	৬৪
৩,১৬৩	ভিক্টর ট্রাম্পার (অ)	৪৮
৩,০৭৩	এল হ্যাসেট (অ)	৪৩
৩,১০৬	সি ম্যাকডোনাল্ড (অ)	৪৭
৩,০৭৯	পলি উমরীগড় (ভা)	৫৯

ইং=ইংলণ্ড; অ=অস্ট্রেলিয়া; ওঃ ইণ্ডিজ =ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ; দঃ আফ্রিকা=দক্ষিণ আফ্রিকা; ভা=ভারতবর্ষ।

চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের খেলা

একদিন বিশ্রামের পর চতুর্থ দিনের খেলায় (৫ই ডিসেম্বর) যখন ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় দিনের নট-আউট খেলোয়াড় বারবার এবং লক পুনরায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন, তখনও ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের ১০৩ রানের প্রয়োজন ছিল। ইংল্যাণ্ডের হাতে জমা ছিল তিনজন খেলোয়াড় বারবার, লক এবং শেষ খেলোয়াড় ডেভিড স্মিথ। ৯ম উইকেটের জুটিতে বারবার এবং লক দলকে ফলো-অনের অপমানের হাত থেকে উদ্ধার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাত্র ২৪ রানের জন্যে লক্ষ্যস্থলে ইংল্যাণ্ডকে পৌঁছে দিতে পারলেন না। দলের ২৪৩ রানের মাথায় লক নিজস্ব ৪৯ রান ক'রে আউট

কেন ব্যারিংটন

হ'লেন। ডুরানীর শেষ বলটায় বাউণ্ডারী মারতে গিয়ে লক ডুরানীর হাতেই ক্যাচ দিয়ে আউট হ'ন। লক ৮০ মিনিট খেলে নিজের ৪৯ রান করেন। বাউণ্ডারী মারেন ৮টা। এই ৯ম উইকেটের জুটিতে বারবার এবং লক ৮১ রান তুলে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ৯ম উইকেটের জুটির নতুন রেকর্ড রান করলেন। পূর্বের রেকর্ড ৭০ রান (টাউনসেণ্ড এবং ভেরিটি, ক'লকাতা, ১৯৩৪)। লকের বিদায়ের পর বারবারের সঙ্গে ১০ম উইকেটে খেলতে নামেন ডেভিড স্মিথ। বারবার এক রান করলেন রঞ্জনের প্রথম বলে; দলের রান দাঁড়াল ২৪৪ এবং বারবারের ৬৯। ডেভিড স্মিথ রঞ্জনের বলের সম্মুখীন হ'লেন। প্রথম বলটা সামলালেন, কিন্তু ২য় অর্থাৎ রঞ্জনের ওভারের ৩য় বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হ'লেন। বারবার ১৮১ মিনিট খেলে নিজের ৬৯ রাণ ক'রে নট আউট থেকে যান। ইংল্যাণ্ড এই দিনের ৭৫ মিনিটের খেলায় ৭৯ রাণ করে।

লাঞ্চের ২৫ মিনিট আগে ভারতবর্ষের থেকে ২২৩ রাণ পিছনে পড়ে ইংল্যাণ্ড ফলো-অন করে। দলের ৯৪ রাণে রিচার্ডসন ৪৮ রাণ ক'রে আউট হ'ন। পুলারের সঙ্গে ২য় উইকেটে খেলতে নামেন ব্যারিংটন। এইদিন আর কোন অঘটন ঘটেনি। ইংল্যাণ্ড ২০০ রাণ তুলে দেয় ১ উইকেট খুইয়ে। পুলার (১০১ রাণ) এবং ব্যারিংটন (৪৭ রাণ) নট আউট থেকে যান। পুলার তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ৩য় সেঞ্চুরী করলেন। পূর্বের সেঞ্চুরী ১৩১ রাণ (ভারতবর্ষের বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৯) এবং ১৭৫ রান (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ওভাল, ১৯৬০)।

শেষ দিনের ৫½ ঘণ্টার খেলায়

ইংল্যান্ডের ৪ উইকেট পড়ে ২৯৭ রাণ ওঠে—মোট রাণ দাঁড়ায় ৪৯৭, ৫ উইকেটে।

৫ম দিনে প্রথম ৫২ মিনিটের খেলায় ২৩ রাণ উঠলে ইংল্যান্ডের ২২৩ রাণ দাঁড়ায়। বাস্তবিকপক্ষে এরপর থেকেই ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের কাছে যে ২২৩ রাণ বাকি ছিল তা উসল হয়ে যায়। দলের ২৩৩ রাণের মাথায় পুলার (২য় উইকেট) নিজস্ব ১১৯ রাণ ক'রে দুরাণীর বলে কনট্রাকটরের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হন। পুলার ১৪টা বাউন্ডারী মেরেছিলেন। পুলার এবং ব্যারিংটনের ২য় উইকেটের জুটিতে ১৩৯ রাণ ওঠে। টেস্ট খেলায় পুলারের পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে: টেস্ট খেলা ১৪, মোট রাণ ১১৬৮, সর্বোচ্চ রাণ ১৭৫ (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ওভাল, ১৯৬০) এবং সেঞ্চুরী সংখ্যা ৩। মাইক স্মিথ খেলতে নামেন কিন্তু পরবর্তী ওভারে দলের ২৩৪ রাণের মাথায় গুপ্তের তৃতীয় বলে মাইক স্মিথ কোন রাণ না করেই আউট হন। পঞ্চম দিনের খেলায় এইটুকুই যা উত্তেজনা এনেছিল। ৪র্থ উইকেটের জুটি হিসাবে খেলতে নামেন অধিনায়ক ডেক্সটার। লাঞ্চের সময়ে স্কোর ছিল ২৮৪ (৩ উইকেটে)। ব্যারিংটন ৮৯ রাণ এবং ডেক্সটার ২৪ রাণ ক'রে উইকেটে ছিলেন। চা-পানের বিরতির সময়ের স্কোর ৪১৪ রাণ ৩ উইকেটে। ব্যারিংটনের রাণ তখন ১৫৮। এই ৪র্থ উইকেটের জুটি ভেঙ্গে যায় দলের ৪৪০ রাণে ব্যারিংটন যখন নিজস্ব ১৭২ রাণ ক'রে রাণ-আউট হয়ে যান। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ব্যারিংটন এবং ডেক্সটার দলের ২০৬ রাণ তুলে দেন। ব্যারিংটন ১৭২ রাণ করেন ৪০৬ মিনিটের খেলায়; বাউণ্ডারী করেন ২৬টা। এই নিয়ে ব্যারিংটন টেস্ট খেলায় ৫টা সেঞ্চুরী করলেন। ১৯৬১ সালের পাকিস্তান ও ভারত সফরে এ পর্যন্ত করেছেন ৩টে—ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২টো, ১ম ও ২য় টেস্ট খেলায়। তাঁর ১৯টা টেস্ট খেলায় মোট রাণ দাঁড়াল ১৫৪৫, সর্বোচ্চ রাণ ১৭২ (ভারতবর্ষের বিপক্ষে, ২য় টেস্ট, কানপুর, ১৯৬১), সেঞ্চুরী সংখ্যা ৫। ডেক্সটারের সঙ্গে খেলতে নামেন বারবার। ডেক্সটারের রাণ তখন ৮৯। দলের ৪৫৯ রাণের মাথায় বারবার নিজের ১০ রাণ করে রাণ আউট হয়ে যান। মারে খেলতে নামেন। ডেক্সটার (১২৬ রাণ) এবং মারে (৯ রাণ) ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৩৮ রাণ তুলে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ডেক্সটারের পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে: টেস্ট খেলা ২০, মোট রাণ ১৩৩৬, সর্বোচ্চ রাণ ১৪১, সেঞ্চুরী সংখ্যা ৪।

॥ এম সি সি বনাম মধ্যাঞ্চল দল ॥

এম সি সি : ৪০৫ রাণ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পিটার পারফিট ১৬৬ নট আউট, ডব্লিউ ই রাসেল ১০১, রিচার্ডসন ৫৮, মাইক স্মিথ ৩৮ নট আউট)

ও ৫৮ রাণ (৩ই উইকেটে। রহিম ৩১ রাণে ২ উইকেট)

মধ্যাঞ্চল দল : ২৩৪ রাণ (এম শর্মা ৬৮, কে রাংটা ৫২। এ্যালেন ৬৮ রাণে ৩, বারবার ৮৩ রাণে ৩ এবং নাইট ১৬ রাণে ২ উইকেট পান)

ও ২৩৫ রাণ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সূর্যবীর সিং ১১২, হনুমন্ত সিং ৪৭। ব্রাউন, নাইট এবং পারফিট প্রত্যেকে ২টো ক'রে উইকেট পান)

১ম দিন (২৬শে নভেম্বর) : এম সি সি ৪০৫ রাণ (৩ উইকেটে); পিটার পারফিট ১৬৬ রাণ এবং মাইক স্মিথ ৩৮ রাণ ক'রে নট-আউট থাকেন।

২য় দিন (২৭শে নভেম্বর): পূর্ব দিনের ৪০৫ রাণের (৩ উইকেটে) উপর এম সি সি দল প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২৩৪ রাণে সমাপ্ত।

৩য় দিন (২৮শে নভেম্বর) : ২৩৫ রাণের (৬ উইকেটে) মাথায় মধ্যাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা। এম সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৮ রাণ (৩ উইকেটে)

এম সি সি দল টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। খেলার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলের ৩টে উইকেট পড়ে ৪০৫ রাণ দাঁড়ায়। নিষ্প্রাণ পীচে মধ্যাঞ্চলের বোলাররা হাড়ভাঙ্গা খেটে মাত্র ৩টে উইকেট পান। এম সি সি দল রাণ করার উপযুক্ত উইকেট পেয়ে চুটিয়ে রান তুলে নেয়।

খেলার দ্বিতীয় দিনে পূর্ব দিনের ৪০৫ রাণের (৩ উইকেটে) উপর এম সি সি দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পিটার পারফিটের নট-আউট ১৬৬ রাণ তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের সর্বোচ্চ রাণ হিসাবে গণ্য হয়। মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে ২৩৪ রাণে শেষ হ'লে এম সি সি দল ১৭১ রাণে এগিয়ে যায়। ফলে মধ্যাঞ্চল দলকে ফলো-অন করলে পড়তে হয়।

খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ১০ মিনিট আগে মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ায় এইদিন তাদের আর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। খেলার তৃতীয় দিনে মধ্যাঞ্চল দলের অধিনায়ক কে এম রাংটা খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ২০ মিনিট আগে দলের ২৩৫ রাণের (৬ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তখন এম সি সি দলের পক্ষে খেলায় জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল ৬৫ রাণের। ২০ মিনিটের খেলায় ৬৫ রাণ করা মুখের কথা নয়। কিন্তু এম সি সি দলের অধিনায়ক মাইক স্মিথ এই 'চ্যালেঞ্জ' মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। এম সি সি দল প্রায় জয়লাভের লক্ষ্যস্থল ছুঁয়ে ফেলেছিল; মাত্র ৭ রানের ব্যবধান থাকতে খেলা ভেঙে যায়। ফলে তারা জয়ী হ'তে পারেনি। খেলাটা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যায়। ৩টে উইকেট হারিয়ে এম সি সি ৫৮ রাণ তুলে দেয় মাত্র ২০ মিনিটের খেলায়।

॥ বাংলা বনাম উড়িষ্যা ॥

উড়িষ্যা : ৬৭ রান (আর বি ফেনী ৮ রানে ৪ উইকেট)

ও ৯১ রান (ভি সাভান্ত ২০ রানে ৫ উইকেট)

বাংলা : ২৬৬ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এ রায় ৬৫, এ ব্যানার্জি ৪৮। এস শতপতি ৭৯ রানে ৪ এবং এন এন স্বামী ৬১ রানে ৪ উইকেট)

কটকে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা দল এক ইনিংস এবং ১০৮ রানে উড়িষ্যাকে পরাজিত করে। খেলার দ্বিতীয় দিনে চা-পানের বিরতির এক ঘণ্টা আগেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

॥ রাশিয়ান সার্ভিসেস দল ॥

রাশিয়ান সার্ভিসেস ফুটবল দল ভারত সফরের দ্বিতীয় খেলায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর একাদশ দলকে ৬-০ গোলে, তৃতীয় খেলায় ১১-১ গোলে বোম্বাইয়ের লীগ চ্যাম্পিয়ান টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে, ৪র্থ খেলায় ৩-০ গোলে সার্ভিসেস দলকে এবং ৫ম খেলায় ৪-০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করেছে। রাশিয়ার এই সার্ভিসেস দলে আছেন ২০ জন সভ্য, ১৬ জন খেলোয়াড় এবং ৪ জন ম্যানেজার। ১২-১২-৬১

অমৃত পাব্‌লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।